সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কৃষ্ণলীলা
—শ্রীমনীষী দে অঙ্কিত

(জলরঙ)

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

কাহাকে গুরু করিব ?

'শ্রোত্রিয়'—যিনি বেদের রহস্যবিৎ, 'অবৃজিন'—নিষ্পাপ, 'অকামহত'—যিনি তোমাকে উপদেশ দিয়া অর্থসংগ্রহের বাসনা করেন না, তিনিই শান্ত, তিনিই সাধু। বসন্তকাল আগমন করিলে যেমন বৃক্ষে পত্রমুকুলোদয় হয়, অথচ উহা যেমন বৃক্ষের নিকট ঐ উপকারের পরিবর্তে কোন প্রকারপ্রত্যুপকার চাহে না, কারণ উহার প্রকৃতিই অপরের হিতসাধন। পরের হিত করিব, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ কিছু চাহিব না। প্রকৃত গুরু এইরূপ।

"তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনাঃ।
অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ।"

—'তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ জীবনসমুদ্র পার হইয়া গিয়াছেন এবং নিজের কোন লাভের আশা না রাখিয়া অপরকেও তারণ করেন।' এইরূপ ব্যক্তিই গুরু, আর ইহাও বুঝিও যে, আর কেহই গুরু হইতে পারে না। কারণ—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

—'নিজেরা অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, কিন্তু অহংকারবশতঃ মনে করিতেছে তাহারা সব জানে; শুধু ইহা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত নহে, তাহারা আবার অপরকে সাহায্য করিতে যায়। তাহারা নানা কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় তাহারা উভয়েই খানায় পড়িয়া যায়।' তোমাদের বেদ এই কথা বলেন।

তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, যাঁহার কিছু দিবার আছে; কারণ শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাপ্রদান অর্থে বুঝায় ভাবসঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটা ফুল দিতে পারি, তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ধর্মও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কবিত্বের ভাষায় বলিতেছি না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

ভারতের সমস্যা ও তাহার সমাধান

ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

ভারতের সমস্যা বহু এবং চিরন্তন। এই প্রকার সমস্যা অল্পবিস্তর প্রায় সকল দেশেই বিদ্যমান। এই সব বাদ দিয়াও কতকগুলি নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে এই সকল সমস্যার মূল ভারতের স্বাধীনতা বলিলেও ভুল হইবে না। অনুগ্রহলব্ধ এই স্বাধীনতা যেন সমস্যাবলীর স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের সম্ভাবনা ভারতীয় নেতাদের চিন্তার অতীত থাকিলেও, বহুদর্শী বিচক্ষণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজের অজ্ঞাত ছিল মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ত্যাগ অনিবার্য জানিয়াই কতকগুলি দুরূহ দুরতিক্রম্য সমস্যার বীজ বপন করিয়াই ইংরেজ বদান্যতার ভাণ করিয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিল। স্বাধীনতার অবৈধ সন্তান পাকিস্থানই এখন ভারতের প্রধান সমস্যা।

কিন্তু ইংরেজের এই জঘন্য ব্যবহারের কারণ কি?

বর্তমান পৃথিবীতে কোন জাতিই নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করে না। কিছু অভিসন্ধি থাকেই। পূর্বাহ্নেও দর কষাকষি করিয়া রাতারাতি বিবাগী হইবার এমন কি কারণ উপস্থিত হইল, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত ছিল ভারতীয় নেতাদের। উল্লাসের আতিশয্যে মহা সমারোহে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বিদায় অভিনন্দন জানাইবার কোন যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইংরেজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে এমন একটা অবস্থার ভিতর ফেলিয়া এদেশ ত্যাগ করা, যাহাতে যে কোন কালেই সমস্যার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া, নিশ্চিন্ত মনে সংগঠনের সাহায্য আপনাকে সমৃদ্ধিশালী করিতে না পারে। অগণিত লোকবল, অপরিমেয় খনিজ সম্পদ, সুবিস্তৃত বনভূমি অসংখ্য স্রোতস্বতী, বহু সহস্র বৎসরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সমৃদ্ধ এই মহান দেশ যে উপযুক্ত পরিবেশে আপনাকে পৃথিবীর শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? প্রায় দুই শত বৎসর ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছে। এ দেশের নদনদী পাহাড় পর্বত, বন উপত্যকা কিছুই তাহার অবিদিত নাই। ভূগর্ভস্থ বহু সম্পদের সন্ধানও সে পাইয়াছে। কিছু কিছু আহরণ করিয়া তাহার নিজ স্বার্থে ব্যবহারও করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই তাহার থাকিবার কারণ নাই।

একদা যে ইংরেজের রাজ্যে সূর্য অস্ত যাইত না, একদিন যে সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল বলিয়া পরিগণিত হইত, শুধু এই ভারতবর্ষের দৌলতে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি বলিয়া খ্যাত ছিল যে দেশ, সে দেশ তাহার হস্তচ্যুত হওয়া যে ইংরেজের কত বড় দুর্ভাগ্য তাহা কল্পনা করাও কঠিন। তাহার উপর সেই ভারত যদি শক্তি-সমৃদ্ধিতে বৃটেনকে ছাড়াইয়া যায়, তবে তাহা সহ্য করিবে কেমন করিয়া ইংরেজ?

ইহাই পাকিস্থান সৃষ্টির একমাত্র কারণ। নতুবা মুসলমান ইংরেজের এত অন্তরঙ্গ নহে যে তাহার জন্য বিনা স্বার্থে ত্রিশ কোটি হিন্দুর চিরশত্রু করিবার ঝুঁকি সে লইবে। বর্তমান ভারতবাসী ভুল করিলেও অদূর ভবিষ্যতে বৃটেন সম্বন্ধে তাহার ধারণা নিশ্চয়ই বদলাইবে।

কয়েক সহস্র বৎসরের ভৌগোলিক ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়াই ইংরেজ ক্ষান্ত হয় নাই। সে এবং তাহার স্বগোত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের সঙ্গে অসাধু মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়া, রাষ্ট্রসংঘে নির্লজ্জ ভাবে ভারতের বিরুদ্ধে তাহাকে সমর্থন করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র দিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিয়া ভারতের ভীতি উৎপাদন করিয়া, যে ভাবে উভয় রাষ্ট্রের ক্ষতি করিতেছে, তাহাতেই উহাদের স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষমতার উগ্র নেশায় অন্ধ হইয়া ভারতের শাসকবৃন্দ ইহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রতিরক্ষা ব্যয় শুধু এই কারণেই বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারই জন্য অত্যাবশ্যকীয় বহু কার্য অবহেলিত হইতেছে।

কল্পনাতীত দুর্ব্যবহার এবং অপরিমিত ক্ষতি করিয়া শক্তি-সামর্থ্যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ভারতকে বিশ্বাস করা পাকিস্থানের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। ভারতের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা তাহার মনে সর্বদাই জাগ্রত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং ইঙ্গ আমেরিকা জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাহার আত্মরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছে। এই ভাবে একটা দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে ভারত এবং পাকিস্থানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে না। প্রতিরক্ষা ব্যয় বাহুল্যের জন্য উভয় রাষ্ট্রই ঋণ-জালে জড়িত হইতেছে। উন্নতি দূরে থাক, ক্রমশঃ তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে। অকূল পাথারে তাহারা হাবুডুবু খাইতেছে।

পাকিস্থান সমস্যা মিটাইতে পারিলে বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে অনায়াসে।

দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী। দ্রুত শিল্পোন্নয়ন করিয়া পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র সমূহের অন্তত সমকক্ষ হইব জীবনযাত্রার মান উন্নীত করিয়া তাহাদের সমপর্যায়ে উঠিব, বিশ্ববাসীর চারিত্রিক উন্নতি করিয়া পৃথিবী হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চিরকালের জন্য বিদূরিত করিয়া বিশ্বব্যাপী চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা করিব, বিশ্বব্যাপী ভারতকে নেতা বলিয়া গণ্য করিবে, ইহাই যে ভারতের কর্ণধারের মনোবাঞ্ছা তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

হাজার বৎসরের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মাত্র সেদিন মুক্ত হইয়া— যাহার সমুদয় কৃতিত্ব তাহার নিজস্ব নহে, আজই ভারত বিশ্বনেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হইবে, বৃহৎ শক্তিবর্গের কে ইহা সহ্য করিবে? এই নেতৃত্ব লইয়া কলহ বিবাদের যে অন্ত নাই; একটা বিশ্ববিপর্যয়ও অসম্ভব নহে।

এই দুরাশা, ইহার জন্য অশোভন আগ্রহ, বিরামহীন বাগাড়ম্বর, অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি শুধু অর্থহীন নহে, ভারতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্টের পক্ষে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা যাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা সম্ভব হইবে অতি সাধারণ নেতার দ্বারা? এই দুরাকাঙ্ক্ষা বাতুলতা ব্যতীত আর কি?

ভারতের সমস্যা সমাধান করিতে হইলে এই দুই মূল সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। নচেৎ অন্য কোন সমস্যাই সমাধান হওয়া সম্ভব নহে, বৃথাই অর্থব্যয়, বৃথাই হয়রাণী।

উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা, বড় হইবার বাসনা মানুষ মাত্রেরই

আছে এবং সেই সঙ্গে সমষ্টিগত ভাবে জাতিরও আছে। উহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই উন্নতির সংজ্ঞা সংস্কৃতি ও সভ্যতা অনুযায়ী পৃথক হইয়া থাকে। জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধেও এই ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য। প্রাচ্য সভ্যতায় মানুষের উন্নতি বলিতে যাহা বুঝায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় সেরূপ বুঝায় না। ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি কত উন্নতি করিয়াছে বলিতে তাহার পোষাক পরিচ্ছদ কিংবা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বুঝায় না। আট হাত পরিধেয় লইয়া মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে 'মহাত্মা', বিলাতে 'হাফ নেকেড ফকির'।

এই কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য লইয়া ভারতবর্ষ বহু সহস্র বৎসর যাবৎ বাঁচিয়াই নাই, পরাধীন অবস্থায়ও বিশ্বের দরবারে বিশেষ আসন পাইয়া আসিয়াছে। বিশ্ব সভ্যতায় তাহার অবদানও কিছু কম নহে। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সে কখনও হিংসাদ্বেষ কিংবা পরস্বাপহরণের শিক্ষা দেয় নাই। তাহার শিক্ষা ন্যায় ও নীতির, ত্যাগ ও প্রেমের; শাসন কিংবা শোষণের নহে।

পাশ্চাত্যের উন্নতির মানদণ্ড ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ, বিলাস লালসায়। ভারতের মাপকাঠি জ্ঞান ও প্রেম। ভারতের কৃষ্টি তাহার পর্ণকুটিরে, তাহার শস্যক্ষেত্রে; ইউরোপ আমেরিকার সভ্যতা তাহাদের চক্ষু ঝলসান নগরী ও অতিকায় শিল্পশালায়। তাই ভারতের অবদান উপনিষদ ও গীতাঞ্জলি, ইউরোপ আমেরিকার আণবিক বোমা ও মহাশূন্যভেদী রকেট। বিশ্বরূপ দর্শন করিতে ভারতের মনীষীকে রথে চড়িয়া চন্দ্রমণ্ডলে হানা দিতে হয় না, বিশ্বরূপ লইয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বর তাহার অন্তরে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

সুতরাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান স্থির করিবার কোন যুক্তি নাই। ভারতের প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, শরীর সুস্থ রাখিতে যাহা আবশ্যক শুধু তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া মনের উন্নতি সাধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইবে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ভবিষ্যতে বিশ্বের দরবারে ভারতের যদি শ্রেষ্ঠ আসন পাইতে হয় তবে ইহাই হইবে প্রকৃষ্ট পন্থা। নচেৎ সংঘর্ষ অনিবার্য, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

বিজ্ঞানের পথে ভারতকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া যাহারা অগ্রসর হইয়াছে, যাহাদের অর্থের পরিমাণ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, যন্ত্রপাতিতে যাহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তাহাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে কোন ভরসায় কোমর বাঁধিব? দুই শতাব্দীর ব্যবধান পূরণ করিবার আয়োজন করিতে করিতে উহারা আবার আমাদিগকে এক শতাব্দী পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইবে।

পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন পরিকল্পনা ঢালিয়া সাজিতে হইবে।

বর্তমান পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে দেশের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা একবার হিসাব করিয়া দেখিবার সময় নিশ্চয়ই আসিয়াছে। স্বাধীনতা অর্জন করিবার সময় ভারতের ষ্টার্লিং ব্যালান্স অর্থাৎ ইংলণ্ডে ভারতের আমানত ছিল সতেরোশ' কোটি টাকা। উহাতেই আমরা নিজেদের অত্যন্ত ধনী মনে করিতাম। কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে এই মূলধন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়াছে, অধিকন্তু উহার বহুগুণ ঋণ করিতে হইয়াছে বিদেশ হইতে। পরিকল্পনার ফল পাইতে এখনও বহু বিলম্ব অথচ বিপুল করভারে মানুষের প্রাণান্ত। এক শ্রেণীর অধিবাসী অসম্ভব ধনী হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত? ইহাদের লইয়া গড় হিসাব করিয়াই জাতির মাথা-প্রতি আয়বৃদ্ধির ধাপ্পাবাজী চলিতেছে। শতকরা আশী জনই অর্থাভাবে জীবন ধারণের একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে অসমর্থ। পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে ইহাদের জীবনযাত্রার মান নাকি উন্নত হইবে; কিন্তু সে পর্যন্ত ইহারা বাঁচিবে কি?

সুতরাং এইরূপ পরিকল্পনার পশ্চাতে আরও অর্থ ব্যয় করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। যাহাকে ইংরেজিতে বলে 'থ্রোইং গুড মানি আফটার ব্যাড,' ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া আরও শত শত কোটি টাকা উহার পশ্চাতে ঢালিয়া অতল তলে ডুবিয়া কি লাভ হইবে?

কোন দেশের উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাই বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ জাতি। দুর্বল কলহপ্রিয় জাতি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য বহুবার দিয়াছে। সুতরাং প্রধান আবশ্যক অধিবাসীর স্বাস্থ্য এবং একতা রক্ষা করা।

ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করিল তখন তাহার চল্লিশ কোটি অধিবাসীর অন্তত ত্রিশ কোটি একমত হইয়া কংগ্রেসকে সমর্থন করিত। দশ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্বেই ইহার অর্ধেকেরও বেশী কংগ্রেসের বিরোধী হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও বিবাদের অন্ত নাই ঈর্ষা দ্বেষও কম নাই। ভাষা, সীমানা, শিল্প-বাণিজ্য, চাকরী প্রভৃতি বহুবিধ প্রশ্ন লইয়া বিবাদ লাগিয়াই আছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দুর্নীতি ব্যভিচার, অনাচার অবিচার ইত্যাদি অসংখ্য ব্যাধিতে সমাজ আজ জর্জরিত; ভাঙ্গিয়া পড়িতে বিলম্ব নাই। বিশেষ তৎপরতার সহিত প্রতিকার করিতে না পারিলে অরাজকতা ও রাষ্ট্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। শুধু বক্তৃতা এবং প্রচারের দ্বারা একতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা সমাজের নৈতিক এবং আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করাই একমাত্র প্রতিকার।

কি উপায়ে ইহা সম্ভব?

পূর্বেই বলা হইয়াছে উন্নতির মূল হইল স্বাধীনতা, এবং উহা রক্ষা করিতে হইলে চাই সুস্থ সবল দেহ। সুতরাং এই প্রশ্নই অগ্রাধিকার পাইবার অধিকারী।

খাদ্যশস্য অথবা প্রোটিন কি স্নেহজাতীয় অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যের অভাব যদি দেশে থাকে তবে উপযুক্ত পরিমাণে উহা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। উহার জন্য আবশ্যকীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে। বিলাসিতার সামগ্রী, সৌখিন বস্ত্রাদি, মোটর গাড়ী ইত্যাদির আমদানী নিষিদ্ধ করিতে হইবে। অসম্পূর্ণ বৃহৎ শিল্পের জন্য সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতির আমদানী বন্ধ করিতে হইবে, ঐ সকল কাজ বন্ধ করিতে হইলেও। বিদেশে ভারতীয় মিশনের ব্যয় কঠিন হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এক এলাকাস্থিত বিভিন্ন দূতাবাস সংযুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে মিশনের ভার স্থানীয় লোকের উপর ন্যস্ত করিয়া, আর্থিক দিক হইতে অনাবশ্যক মিশন বন্ধ করিয়া, ব্যয় সাশ্রয় সম্ভব হইবে, বিদেশী

মুদ্রার আবশ্যকতা কমান যাইবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অন্যান্য বহু দিক দিয়াও বিদেশী মুদ্রার ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব হইবে।

পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ করিলে বিদেশে বাণিজ্য মিশন পাঠাইবার আবশ্যকতা হ্রাস পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে। তথাকথিত কালচারাল মিশন নিষিদ্ধ করিয়া ব্যয় কমাইতে হইবে। অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে বিদেশে ছাত্র প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। বিলাতী ডিগ্রীর মোহ ত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রীদের ভ্রমণ বিদেশে অথবা স্বদেশে—কঠিন হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

আইনসভা হইতে ভূরি ভূরি আইন পাশ করিলেই দেশের উন্নতি হয় না। স্বাধীনতা পাইবার পর ভারতের আইনসভাগুলি হইতে যে পরিমাণ আইন প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার ওজন বোধ হয় এক টন হইবে। কিন্তু উহাতে দেশের জনসাধারণের কি উপকার হইয়াছে? আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক অথচ শিক্ষার দিক দিয়া কোন উন্নতিই লক্ষ্য করা যায় না। বরং পুরাতন পরাধীন অবস্থায়ও ইহার সব দিক দিয়া জনসাধারণ বেশী উন্নত ছিল।

অক্ষরজ্ঞান বিদ্যা কিংবা শিক্ষার পরিচায়ক নহে। শুধু উহার বিস্তারে কৃতিত্বের কিছু নাই। বিদ্যা অর্জন সময়-সাপেক্ষ সত্য; কিন্তু সাংসারিক, সামাজিক অথবা নৈতিক জ্ঞানের জন্য বিদ্যা একান্ত আবশ্যক নহে। ভারতের জনসাধারণের শতকরা নব্বই জন নিরক্ষর মানুষের এই সকল জ্ঞান খুব কম ছিল না। যাঁহারা তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। সুতরাং উহা লইয়া ঢাক পেটানোর কোন অর্থ নাই।

সুতরাং এই প্রকার আইনসভা পোষণ করিয়া জনকতক ভাগ্যবান ব্যক্তির গলাবাজির ও অর্থ উপার্জনের সুবিধা করিয়া দেওয়া শুধু নিরর্থক নহে, অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে। ইহা দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ (এক্সপ্লয়েট) ব্যতীত আর কিছুই নহে। আইনের সংখ্যা অথবা পরিমাণ উহার মূল্যের পরিচায়ক নহে, যেমন নহে অর্থ ব্যয় কার্য্যফলের পরিচায়ক। উহার দ্বারা জাতি তথা দেশের কি উপকার হইল, তাহাই প্রকৃত মূল্য। আইনসভা রদ করিয়া স্বল্পব্যয়সাধ্য বিকল্প ব্যবস্থা যত সত্বর হয় করিতে হইবে।

লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম আয়াঙ্গার তাঁহার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে সম্প্রতি গণতন্ত্র সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ভারতের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। শ্রীআয়াঙ্গার বলিয়াছেন, 'গণতন্ত্র ব্যর্থ হইলে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আকারে সরকার প্রবর্তন সর্বোত্তম হইবে' (যুগান্তর, ১১ই অক্টোবর, ১৯৫৯)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যে ভাবে শাসন পরিচালনা করেন তাহাতে সিনেটের আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। প্রচুর সম্পদশালী আমেরিকার পক্ষে অনাবশ্যক এই ব্যয় নগণ্য হইতে পারে; কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রকার বিলাসিতার অর্থ করভারে নিষ্পিষ্ট হওয়া। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে জনসাধারণের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কয়েকজন সৎ বিশেষজ্ঞ লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা যাইতে পারে। ইহাও গণতন্ত্রের আখ্যা পাইবার অধিকারী, কারণ ইহা সাধারণ নির্বাচনমূলক। ইহা নিশ্চয়ই ডিক্টেটারী শাসন নহে।

ইহার দ্বারা শাসন পরিচালনার ব্যয় প্রচুর পরিমাণে লাঘব করা সম্ভব হইবে। দরিদ্র দেশবাসীকে বিপুল করভার হইতে কিঞ্চিৎ অব্যাহতি দেওয়া যাইবে।

ভারতেও বৃটেনের মত পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া গর্ব কিংবা উল্লাস করিয়া কি লাভ? উহার দ্বারা শাসন-যন্ত্রের উপর জনসাধারণের কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে তাহাই হইল মূল কথা। এদেশে বর্তমানে ইহার কতটুকু আছে?

আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিলে যানবাহনের আবশ্যকতা কমিয়া যাইবে। উহার কোন সমস্যা থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। বিদেশ হইতে ইঞ্জিন, মোটর গাড়ী প্রভৃতির আমদানী প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ইহা ব্যতীত ব্যবসায়ের জন্য মানুষের ছুটাছুটি কমিবে। ট্রেনের ভীড়ের সমস্যাও সম্ভবত সমাধান করা যাইবে। কর্মচাঞ্চল্য জাতীয় উন্নতির একমাত্র পরিচায়ক নহে। চঞ্চলতা কমিলেই যে জাতি অধঃপাতে যাইতেছে তাহাও সত্য নহে। সুতরাং ছুটাছুটি কমিলে যে দেশের ক্ষতি হইবে এমন আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন জনসাধারণকে এক্সপ্লয়েট করিবার অতিশয় শক্তিশালী যন্ত্র। উহার দ্বারা লোকশিক্ষা সামান্যই হয়, পরন্তু মানুষের মন বিপথে আকর্ষণ করিয়া চিন্তাশক্তি খর্ব করে। চারিত্রিক অবনতি যে হয় তাহা অনস্বীকার্য। সুতরাং এই সকল যন্ত্র কঠিন হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। ইহাতে জাতির নৈতিক উন্নতির সাহায্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে খরচও কমিবে।

সম্প্রতি এদেশে টেলিভিশন যন্ত্রের ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে উহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ যন্ত্রের কোন অংশই ভারতে প্রস্তুত হয় না; উহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। উহার জন্য প্রচুর বিদেশী মুদ্রার আবশ্যক। সুতরাং দেশের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ঐ যন্ত্রের আমদানী নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য কমাইবার জন্য উহার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ঐ উদ্দেশ্যে টেনেসি ভ্যালির অনুকরণে এদেশে নদী পরিকল্পনা রচনা করিয়া কাজ করা হইতেছে। ঋণ করিয়া ঐ সকল পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে বর্তমানে করভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঋণ পরিশোধ করিবার পরও এই করভার যে লাঘব করা সম্ভব হইবে তাহাও মনে হয় না। এই সকল পরিকল্পনা সম্বন্ধে অধুনা বহু প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যপ্রকারে সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইন্দারা ও নলকূপের সাহায্যে উহা হইতে পারে।

বন্যার জন্য প্রায় প্রতি বৎসরই প্রচুর শস্য নষ্ট হইয়া থাকে। এ বৎসর যাহা হইয়াছে তাহার তুলনা মেলা দুষ্কর। উহার জন্য নদী পরিকল্পনাকেও দায়ী করা হইতেছে। নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। উহা বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বন্যা শস্য ব্যতীত অন্যান্য দিক দিয়া যে ক্ষতি করে তাহার পরিমাণও কিছু কম নহে। সুতরাং যত ব্যয়সাধ্যই হউক এই ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং উহাকে অগ্রাধিকারও দিতে হইবে।

জমি এবং খাদ্যের অভাবে কৃষক আজ কারখানার মজুর হইয়াছে। প্রচারও ইহার জন্য কতকটা দায়ী। হাতের কাজ

বলিয়া নেতাগণ প্রচার করিয়া থাকেন। সুতরাং মনমাতী কৃষিকর্ম হইতে মজুরের কাজে প্রলুব্ধ হইয়া থাকে। ক্ষেতের কাজ কি চাষের কাষ নহে? না জল-কাদা ভাঙ্গা অসম্মানের? কৃষিকাজ কি সম্মানের কাজ নহে? আপনার জমিতে ফসল উৎপাদন করিয়া মানুষ যদি রৌদ্রোজ্জ্বল নীল আকাশের নীচে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া সপরিবারে শান্তিতে বাস করিয়া, দিনান্তে একবার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করিতে পারে, তবে তাহা অপেক্ষা শান্তিময় জীবন আর কি হইতে পারে? অপরের গোলামী করিয়া অতিকায় ব্যারাকে অথবা অন্ধকার বস্তিতে বিশুদ্ধ বায়ুবর্জিত পায়রাবতের খোপে বাস করা কি অপেক্ষাকৃত বেশী সম্মানের? প্রত্যহ ষ্ট্রাইক লক আউটের সম্মুখীন হইয়া কাজ করা কি বেশী সুখের? এই প্রচার ধাপ্পাবাজী ব্যতীত আর কি? গ্রামীন বিশুদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস করিয়া কারখানার চরিত্রহীন সভ্যতার পত্তন করা পরিতাপের বিষয় নিশ্চয়ই।

বৈদেশিক অর্থ অর্জনকারী পাট এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদন হ্রাস করিয়া, উহার পরিবর্তে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। বর্তমান গভর্ণমেণ্ট বিদেশী মুদ্রার জন্য যেন উন্মাদ হইয়া যে কোন প্রকারে উহা সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। উহাতে জাতি নিরন্ন হইয়া ধ্বংসই হউক, অথবা বিবস্ত্র হইয়া লজ্জার বালাই পরিত্যাগই করুক। পাটের ফসল কম হইলে বিদেশী মুদ্রার অর্জন কমিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু খাদ্যশস্য বৃদ্ধি পাইলে উহার আমদানী কমাইয়া বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন কমানও সম্ভব হইবে।

মানুষ যখন তাহার আদিম বন্যজীবন পরিত্যাগ করিয়া কুটির নির্মাণ করিল, তদবধি শত সহস্র বৎসর ধরিয়া কখনও তাহার বাসগৃহের সমস্যা দেখা দেয় নাই। গ্রাম পত্তন করিয়া, ভূমি কর্ষণ করিয়া, স্ত্রী-পুত্রসহ সে গৃহেই বাস করিত। কিন্তু যখন সে যান্ত্রিক জীবনে পদার্পণ করিল, সহর পত্তন করিতে বাধ্য হইল, তখন দেখা দিল তাহার বাসগৃহের সমস্যা। আজ তাহার সেই বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে, যাহার জন্য সমুদয় জীব হইতে সে স্বতন্ত্র ও উন্নত, যাহার জন্য সে সামাজিক জন্তু—সোসাল অ্যানিম্যাল আখ্যা পাইয়াছে। আজ বাসগৃহের অভাবে রাস্তায়, গাছতলায় পরিবার লইয়া মানুষ বাস করিতে বাধ্য হইতেছে, যেখানে বিচরণ করে সারমেয় তাহার ক্ষণিকের সঙ্গিনী লইয়া, শৃগাল তাহার রাত্রের সহচরী লইয়া। ইহাই কি উন্নতির নিদর্শন, সভ্যতার পরিণাম?

ক্রমবর্ধমান এই সমস্যা সমাধান করা এখন মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্যা দরিদ্র ভারতেও দেখা দিয়াছে, অন্যান্য দেশের অনুকরণে শিল্পোন্নয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া। পর্ব্বত পরিমাণ ইস্পাত সিমেণ্ট ব্যবহার করিয়াও গৃহ সমস্যার শেষ দেখা যাইতেছে না; ইহার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, পল্লীজীবন বর্জন করিয়া মানুষ নাগরিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ জীবনের অনিবার্য মানসিক ও শারীরিক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে।

বৃহৎ শিল্পের প্রসার সীমাবদ্ধ করিয়া মানুষকে পুনরায় পল্লীজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া মনে হয়। বৃহৎ শিল্প বিকেন্দ্রীয় করিয়া সহরের আবশ্যকতা কমান সম্ভব। ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটিরশিল্পের প্রসার করিয়া শিল্পজাত দ্রব্যের প্রয়োজন মেটান সম্ভব। ইহার দ্বারা বেকার এবং গৃহসমস্যা দুই-ই সমাধান করা যাইবে। গ্রাম বর্জন করিয়া সহরবাসী হওয়াই গৃহসমস্যার একমাত্র কারণ। গ্রামে কখনও গৃহ সমস্যার প্রশ্ন দেখা দেয় নাই।

উল্লিখিত কর্মসূচী লইয়া কাজ করিলে ভারতের আভ্যন্তরীণ অশান্তি দূর করা সম্ভব হইবে। উহাতে দেশের ঐক্যের সাহায্য হইবে। চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পাইবে! শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যয় কমিয়া যাইবে। সেই অনুপাতে করভার লাঘব করা সম্ভব হইবে।

উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। উহা অবিলম্বে সমাধান করিতে হইবে। ঐ সমস্যার দরুণ প্রচুর অর্থব্যয় হইতেছে। দ্রুত সমাধান করিতে পারিলে ঐ অর্থ বাঁচিয়া যাইবে। পুলিশ এবং মিলিটারী চিকিৎসা ব্যর্থ হইয়াছে। উহা বর্জন করিতে হইবে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উপায় স্থির করিতে হইবে। নাগাজাতি ভৌগোলিক হিসাবে, বংশে, ভাষায়, সভ্যতায় অথবা অন্য কোন দিক দিয়াই ভারতীয় বলা যায় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য আদিবাসীদের সঙ্গে উহাদের তুলনা হয় না, কারণ তাহারা ভৌগোলিক দিক দিয়া নিঃসন্দেহে ভারতের অন্তর্ভুক্ত। নাগারা সব দিক দিয়াই পৃথক জাতি। প্রত্যেক জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। এই সত্য ভারত মানিয়া লইয়াছে। সুতরাং এই অধিকার নাগাদের দিতে হইবে। অন্যান্য সীমান্ত রাজ্য ঐ দাবী করিতে পারে, অথবা ভারতের সংহতি বিঘ্নিত হইবে বলিয়া বল প্রয়োগের চেষ্টা শুধু ব্যর্থ হইবে না, উহাতে বিপরীত ফল ফলিবে। নাগাদের দাবী মানিয়া লইয়া ঐ রাজ্যের উন্নতির জন্য উপযুক্ত অর্থ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাহায্য করিলে মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। ভবিষ্যতে নাগারাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইবে। যে অর্থ এবং উদ্যম বর্তমানে নাগাদের দমন করিবার জন্য ব্যয় করা হইতেছে উহার দ্বারাই উল্লিখিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; অধিকন্তু শত্রুতার স্থলে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

চীন-ভারত সমস্যা—ভারত যখন প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তখন তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য স্বীকার করা ভারতের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। এখন উহা লইয়াই পুরাতন বন্ধু চীনের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়াছে। চীন কোন যুগে তিব্বতের উপর আধিপত্য করিয়াছে বলিয়া বর্তমানেও তিব্বত চীনের অধীনে থাকিবে, ইহা কোন যুক্তি নহে। এই সমস্যা সমাধানের এখন একমাত্র উপায় দালাই লামা এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে ভারতের বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া, অথবা ভারতের আশ্রয়ে রাখিয়া তাঁহাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা। তিব্বতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারত হইতে চালান যাইবে না। তিব্বতে বসিয়াই করিতে হইবে। স্বাধীনতার উপযুক্ত মূল্য তিব্বতবাসীকে অবশ্যই দিতে হইবে।

চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সাম্প্রতিক হইলেও অতি দ্রুত জটিলতা অর্জন করিতেছে। ঐ বিবাদ সত্বর মীমাংসা না হইলে চীন কিংবা ভারত কাহারও মঙ্গল হইবে না। এই বিবাদ লইয়াই হয়তো শেষ পর্যন্ত বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিবে। কারণ ঐ সীমান্তের গুরুত্ব এতো অধিক যে বৃহৎ কোন শক্তিই নিস্পৃহ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে না। মীমাংসা করিতে হইলে উভয় পক্ষেরই জিদ্ পরিত্যাগ করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ভূগোল এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে

চীন-ভারত সীমানা নির্দিষ্ট করিতে হইবে, সে লাইন ম্যাকমোহন লাইনই হউক, অথবা উহার দু'হাত এধার ওধারই হউক। ম্যাকমোহন লাইনের দাবী লইয়া চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নহে। একদা অপেক্ষাকৃত দুর্বল চীনের অনুপস্থিতিতে ইংরেজ ম্যাকমোহন লাইনে সীমানা স্থির করিয়াছিল বলিয়া ভারতও ঐ দাবী করিবে, ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ভারত বৃটিশ 'সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, কিংবা বৃটেনের উত্তরাধিকারীও নহে যে বৃটিশের অনুষ্ঠিত পথের দাবী সে আজ করিবে।

তিব্বতের পক্ষে ওকালতি এবং ম্যাকমোহন লাইনের দাবীর জন্যই ভারত আজ চীনের আস্থা হারাইয়াছে। ইংরেজ আমেরিকার সহিত ভারতের হরদম মহরমও চীনকে তৎপর করিয়াছে হিমালয়ের অংশ শুধু দাবী করিতে নহে, অধিকারও করিতে। চীনের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নহে যে অদূর ভবিষ্যতে হিমালয় যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক ঘাঁটি হইয়া চীনকে বিপন্ন করিবে না। যে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লইয়া তাহার বিস্তৃত এলাকা দশ বৎসর যাবৎ পররাষ্ট্রের কবলিত রাখিয়া শুধু কথার তুবড়ি ফুটাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, বিদেশী কুচক্রীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করিয়া আপন সীমান্ত-রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, তাহার সীমান্তের অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে শক্তিশালী কোন রাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

চীনের কার্যকলাপ শঠতা এবং দুর্বৃত্তপণা নিঃসন্দেহ; কিন্তু ইহাই রাজনীতি। ভারতের কর্ণধার ইহা বোঝেন কি না সন্দেহ! তাঁহার বিশ্বশান্তির নেশা তাঁহাকে কূটনীতি বুদ্ধি বিবর্জিত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ভারতকে যেমন ম্যাকমোহন লাইনের পুতুল ভুলিতে হইবে, চীনকেও তদ্রূপ তাহার পুরাতন সীমান্তে, অর্থাৎ ম্যাকমোহন লাইনের অপর পার্শ্বে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সীমানা নির্ধারণে ইহাই ন্যূনতম প্রয়োজন।

ইহাতে যদি চীন সৈন্য অপসারণ করিয়া আপোষ নিষ্পত্তি করিতে রাজি না হয়, তাহা হইলে তাহার আচরণের পক্ষে কোন যুক্তিই থাকিবে না। চীনকে তখন পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে ভারতের আত্মরক্ষার যুদ্ধ তাহাকে নিঃসঙ্গ হইয়া করিতে হইবে না। ঐ যুদ্ধ অবিলম্বে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইবে। ঐ ঝুঁকি লইয়া চীন যদি ভারতের অংশ দখল করিয়া বসিয়া থাকে, তবে নূতন বিশ্বযুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চীনের। যুদ্ধং দেহি বলিয়া মাথা গরম করা কাহারও পক্ষে শুভ নহে।

পাকিস্থান সমস্যা—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শক্তিশালী প্রতিবেশী ভারতকে পাকিস্থান বিশ্বাস করিতে পারে না, বিশেষ করিয়া পূর্বপাকিস্থান যখন চতুর্দিকে ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত।

ভারত কাহাকেও আক্রমণ করিবে না, ইহা ভারতের মূল নীতি। কোন দেশ হইতে ভারতের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও নাই। ব্রহ্মদেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দুর্বল। সে তাহার আপন সমস্যা লইয়া বিব্রত। তাহার পক্ষে ভারত আক্রমণ অচিন্তনীয়। চীন, রাশিয়া কিংবা আমেরিকা ভারতকে আক্রমণ করিলে অবিলম্বে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইবে। ভারতের ন্যায় বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধি-সম্ভাবনাপূর্ণ দেশ অপর রাষ্ট্রের করতলগত হইয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিবে, ইহা কেহই সহ্য করিবে না। সুতরাং ভারতের পক্ষে বিপুল সৈন্য বাহিনীর কোন প্রয়োজন নাই। ব্যয়বহুল সমরসম্ভার, যাহা প্রতিরক্ষা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ভারতের পক্ষে কমান শুধু সম্ভব নহে, কর্তব্যও বটে। ঐ ভাবে সে পাকিস্থানের আস্থাভাজন হইবে। পাকিস্থানও তাহার সামরিক ব্যয় হ্রাস করিয়া দেশের উন্নতির দিকে মন দিতে পারিবে, দেশের জনতার লাঘব করিতে পারিবে। পাকিস্থানের হুমকি আক্রমণের পূর্বসূচনা নহে, উহা মাত্র ভারতকে বিরক্ত করা। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উভয়ের ভিতর অনাক্রমণ চুক্তির কোন মূল্য নাই। উহাতে আস্থা আসে না। অন্ত ভাবেই বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এই ভাবেই পাক-ভারত সমস্যা সমাধান হইবে। ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পাকিস্থান এবং ভারত নির্বিবাদে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসাবে বাস করিতে পারিবে। নতুবা প্রাপ্য অর্থ অথবা খালের জল লইয়া আলোচনা চালাইলে খালের ঘোলা জল কোন কালেও স্বচ্ছ হইবে না।

উল্লিখিত কর্মসূচিই হইবে নব ভারতের নূতন পরিকল্পনা। অর্ধভুক্ত, উলঙ্গপ্রায়, অকালে জরাগ্রস্ত দেশবাসীর উন্নতির ইহাই একমাত্র এবং প্রকৃষ্ট পন্থা।

অনেকে অবশ্য মনে করেন, বিপ্লব ব্যতীত জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফরাসী, চীন এবং রুশ বিপ্লবের ইতিহাস তাঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন। বর্তমান রাশিয়া ও চীন সম্বন্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে পরস্পরবিরোধী তথ্যসম্বলিত যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা বাদ দিলেও ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ঐ দুই দেশের ভাগ্য এখনও কালের কষ্টিপাথরে বিচার হয় নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীন তাহার পুরাতন শাসকের নিষ্পেষণ হইতে মুক্তির সংগ্রাম শুরু করে। ১৯৬১তেও তাহা শেষ হইবে কি না সন্দেহ! এখনও তাহার গৃহবিবাদের অবসান হয় নাই। ইতোমধ্যে চীনের দুঃখ-দরিয়ার দুকূল প্লাবিত হইয়াছে অশ্রুর বন্যায়, মরুপ্রান্তর রঞ্জিত হইয়াছে তপ্ত শোণিতে। সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্বও কি শেষ হইয়াছে?

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ফরাসী জাতি তাহার রাজবংশ নির্বংশ করিয়া নিজের উন্নতি-প্রয়াসী হইয়াছিল। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য দিয়াছে ঐ জাতি, তাহার কতটুকু প্রতিদান তাহারা পাইয়াছে? দুই শতাব্দী অন্তে আজ আবার ঐ দেশে জঙ্গী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! ইতোমধ্যে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বহু বার সে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে।

সুতরাং রক্তাক্ত বিপ্লব পন্থা নহে। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমেই জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সম্ভব। উহার ভিতর দিয়াই আনিতে হইবে অহিংস বিপ্লব। শুধু আবশ্যক বলিষ্ঠ সৎ নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব।

বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে বঙ্গ মহিলা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ ও বিংশ শতাব্দী বাঙ্গালার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। ইহা সাহিত্যে ও শিল্পে গৌরবান্বিত; কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতে মুখরিত। এ যুগে বাঙ্গালীর মনে প্রাণে এক নূতন উন্মাদনা জাগরিত হইয়া তাহাকে সমুদয় ভারতে শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছিল। নবযুগের নূতন প্রবাহে স্বদেশমন্ত্রে বাঙ্গালী জাতি সমুদয় ভারতের মন মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজসভায় স্বর্গগত গোখলে মহোদয় বাঙ্গালীর অভ্যুদয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—বহু বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি ভারতে গণনীয়। ভারতবাসীর সম্মুখে যতগুলি কর্ম্মপথ মুক্ত রহিয়াছে তাহার সকল পথেই বাঙ্গালী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে কয়েকজন সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্মবেত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী। বক্তা, সংবাদপত্র পরিচালক ও রাজনীতিকদিগের মধ্যেও কয়েকজন বাঙ্গালী উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। শারীরিক বল ও সাহসের অভাব বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের একটি প্রধান কলঙ্ক বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ইহার সংস্কার আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকখানি এংলো ইণ্ডিয়ান পত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলি সত্য হইলে বলিতে হয় যে, এই কলঙ্কের দুঃখ বঙ্গীয় যুবকদিগের হৃদয়ে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে, শারীরিক বল ও সাহস প্রকাশে পরাঙ্মুখ হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা এখন উহা লাভ করিবার জন্যই সচেতন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার যুবকগণের মত বাঙ্গালার রমণী-সমাজেও নূতন যুগের নবীনমন্ত্রে জাগরণের সাড়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানে ধর্ম্মে, শিল্পে সাহিত্যে, সমাজসেবা ও রাজনীতিতে তাঁহারা যেমন সমুদয় ভারতে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তেমনি আকাশে, সমুদ্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শিকারে এবং ক্রীড়াকৌশলেও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গরমণীগণ সমগ্র ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বাঙ্গালার দেশাত্মবোধের জাগরণের প্রথম পর্য্যায়ে "হিন্দুমেলার" অবদান অপরিসীম। সে মেলার কাহিনী এখন বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে এই মেলার বিষয়ে লিখিয়াছেন—আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত। হিন্দুমেলার অন্যতম প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলার তত্ত্বাবধানে একটি ব্যায়াম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একজন ইংরাজশিক্ষক এই বিদ্যালয়ে জিমন্যাষ্টিক শিখাইতেন। কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যায়ামশিক্ষকরূপে মফঃস্বল সহরেও চাকুরী পাইলেন। শুধু তাহাই নহে, নবগোপাল সার্কাসের সূত্রপাত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—কতকগুলো মড়াখেকো ঘোড়া লইয়া নবগোপাল বাবুই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় ব্যায়াম কৌশলে সুদক্ষ প্রিয়নাথ বসুর প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস গড়িয়া ওঠে। এই সার্কাসে যোগদান করিয়া কয়েকজন বঙ্গরমণী বিশ্বজগতকে বিমোহিত করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে যুগে কোন বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে প্রকাশ্য সার্কাস রিংএ অবতীর্ণ হইয়া খেলা দেখান নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ছিল। বাঙ্গালার বীর রমণীগণ সে অভাব দূর করিয়া বাঙ্গালীর ভীরুতার কলঙ্ক দূর করিয়াছিলেন। সার্কাস-জগতে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা খেলোয়াড় শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। ইহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙ্গালী মেয়ে সার্কাস খেলায় যোগদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু যোগদান নহে, সুশীলাসুন্দরীর কৃতিত্ব—তাঁহার অদ্ভুত শারীরিক শক্তিকৌশল প্রদর্শনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কেহ কেহ বলেন, সুশীলাসুন্দরী সমগ্র ভারতের মধ্যে হিংস্র ব্যাঘ্রের খেলা দেখাইতে প্রথম মহিলা খেলোয়াড়। শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় রমণী বন্য ব্যাঘ্রকে লইয়া প্রকাশ্য সার্কাসে খেলা দেখাইয়া যশস্বিনী হইতে পারেন নাই। সুশীলা নির্ভয়ে অস্ত্র না লইয়া, আত্মরক্ষার জন্য একগাছি ছড়ি পর্য্যন্ত না লইয়া ব্যাঘ্রপিঞ্জরে প্রবেশপূর্ব্বক যে আশ্চর্য্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদের বুঝান অসাধ্য। ইংলিশম্যান পত্রের ইংরাজ সম্পাদক তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন হিন্দুরমণীগণ অবলা বলিয়াই কথিত। কিন্তু সুশীলাসুন্দরী একান্ত নির্ভয়ে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়াই দুইটি বন্য ব্যাঘ্রের কক্ষে প্রবেশ করিয়া একান্ত নির্ভয়ে এবং অবিচলিতভাবে তাঁহার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রোফেসার বোস লিখিয়াছেন—রিক্ত হস্তে, সামান্য বস্ত্রে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া অর্দ্ধঘণ্টার উপর বাঘে-মানুষে প্রকৃত মল্লযুদ্ধ এবং ব্যাঘ্রগুলিকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া পিঞ্জরের প্লাটফরমের উপর একেবারে লম্বমান হইয়া শয়ন ও লম্ফ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক গ্রীবাদেশ ঘন ঘন দংশন করান ও পরস্পর ঘন ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গন গ্রহণ এরূপ লোমহর্ষণ শোণিত শোষক ব্যাপার আর কেহ কোথাও দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। ব্যাঘ্রের খেলা ব্যতীত সুশীলাসুন্দরী ট্রাপিজ ও লেডার প্রভৃতিতেও ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে পারিতেন এবং সেই সকল খেলায় তিনি অল্প সাহস, কৌশল ও শক্তিমত্তার পরিচয় দেন নাই।

সার্কাস ক্রীড়ায় সুশীলাসুন্দরীর পরে মৃন্ময়ীর নাম করিতে হয়। ইনি হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের সহিত খেলা দেখাইয়া অভূতপূর্ব্ব খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বন্য ব্যাঘ্রের সহিত তিনি

যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশল ও বীরত্বের সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা স্বপ্নে দেখিলেও লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। ইঁহারই কথা উল্লেখ করিয়া সেকালে কবি গাহিয়াছিলেন,—

কাঁদায়ে কল্পনা
গর্জে বাঘাসনা
বঙ্গবীরাঙ্গনা
বরে মরণে!

সুশীলাসুন্দরীর ভগিনী কুমুদিনীও 'লেডার' ও অন্যান্য খেলা ব্যতীত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানাবিধ নয়নরঞ্জক খেলা দেখাইতেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালী অবলাজাতির একজনের দ্বারা অশ্বারোহণ ও অশ্বপৃষ্ঠে নানারূপ অঙ্গচালনা দর্শককে কিরূপ বিমুগ্ধ করিত তাহা অনুমান করা যায়। গ্রেটবেঙ্গল সার্কাসের সহিত এই বীররমণীত্রয় ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে যাইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তথা হইতে পিনাং ও পরে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত বিজয়গর্ব্বে খেলা দেখাইয়া অর্থে ও সম্মানে ভূষিতা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীমেয়ে প্রমীলাসুন্দরী এ্যাক্রোব্যাট্স্ সার্কাসে খেলা দেখাইয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। বেণীবাবুর এ্যাক্রোব্যাটস সার্কাসে ইনি খেলা দেখাইতেন। লোকবোঝাই পাল্কীগাড়ি বর্শা দিয়া ঠেলিয়া দিতেন, ত্রিশ মণ ওজনের পাথর বুকে ভাঙ্গিতেন, তিন মণ ওজনের গোলা লইয়া খেলা করিতেন। তিনি বোসেস্ সার্কাসেও খেলা দেখাইয়াছেন। গায়ত্রী দেবী নাম্নী একজন বাঙ্গালী মহিলা ঘোড়দৌড়ে জকি হইয়া প্রতিযোগিতায় অশ্বচালনা করিয়াছিলেন। ইদানীংকালে 'জেমিনী সার্কাসে' কুমারী রেবা রক্ষিত নাম্নী এক বঙ্গবীরাঙ্গনা নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া রমণী-বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রক্ষিত বক্ষের উপর ভারী 'রোলার' উত্তোলন, কণ্ঠদ্বারা বর্শা-ফলকের মুখে লৌহদণ্ড বাঁকান, পৃষ্ঠদেশে ধারালো তরবারি রাখিয়া পেটের উপর প্রস্তর ভগ্ন করা এবং বন্দুকের লক্ষ্যভেদে কৃতিত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বর্গীয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে "দেবী চৌধুরাণী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর সার্কাসে যোগদান করিয়া বুকের উপর হস্তী উত্তোলন করিয়া এবং ২৫০ পাউণ্ড স্প্রীং (বিশ্বরেকর্ড) টানার খেলা দেখাইয়া প্রভূত যশ ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

এ দেশে শক্তি-চর্চার একটি প্রাচীন পদ্ধতি ছিল মল্লযুদ্ধ। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে এবং পুরাণাদিতে ইহার পরিচয় আছে। মল্লযুদ্ধকালেই মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে এবং পাহাড়পুর, ময়নামতী ও বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ফলকে আজিও সেকালের মল্লযুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠান ও মোগল শাসনকালেও এ দেশে মল্লক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু দেশের দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে মল্লক্রীড়া বা কুস্তি বাঙ্গালার ভদ্রসমাজে অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। কিন্তু ১২৩৩ সালেও যে এদেশের বালিকাগণ শরীরচর্চ্চা করিতেন তাহা বলিলে এখন হয়ত কেহই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে ১২৩৩ সালে কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীতে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাগণ মল্লযুদ্ধ করিত। চৈত্রমাসে গাজনের মেলায় চড়কে আরোহণ করিতে যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেও সেকালে বঙ্গ রমণীগণ পশ্চাৎপদ ছিলেন না। স্বদেশীযুগে বাঙ্গালার মহিমময়ী বীরমাতা সরলা দেবী "বীরাষ্টমী সমিতির" মাধ্যমে পুরুষগণের সহিত বাঙ্গালার নারী সমাজেও শরীরচর্চ্চার জন্য নূতন প্রেরণা আনয়ন করিয়াছিলেন। তার পর হইতে কলিকাতায় এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন সহর ও পল্লীতে বিভিন্ন আখড়া বা ক্লাবের সহযোগিতায় বাঙ্গালার নারীসমাজ আপনার শারীর সামর্থলাভের জন্য একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। লাঠি ও ছোরাখেলা এবং যুযুৎসু প্রভৃতির চর্চ্চা আজ বঙ্গকুমারীর শিক্ষালাভের অপরিহার্য্য অংশ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার "রামমোহন রায় শতবার্ষিকী প্রদর্শনী" ক্ষেত্রে কুমারী অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায় বেগবান মোটরগাড়ি রোধ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র পনের বৎসর। বরিশালের রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহঠাকুরতা বাঙ্গালার অন্যতম ব্যায়ামাচার্য্য বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা উষারাণী বসু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতার হৃষিকেশ পার্কে স্বাস্থ্য ও শিল্পপ্রদর্শনীতে একখানা চলন্ত মোটরগাড়ি থামাইয়া তাঁহার পিতার বাণী "বাংলাদেশ থেকে আমি অন্ততঃ একশ রামমূর্ত্তি গড়ে' দিয়ে' যাব" কথাটার সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন। কলিকাতা বাগবাজারের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের সময় বঙ্গ বালিকাগণ লাঠি ও ছোরাখেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "স্কুলঅফ ফিজিক্যাল কালচারের" উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বহু ব্যায়াম সমিতি যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বরোদার আর্য্যকন্যা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালার বালিকাগণ ব্যায়ামের বৈচিত্র্যে অধিকতর দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে মহিলাদের দৌড় প্রতিযোগিতায় বঙ্গকুমারী নীলিমা দাস ও মেরী ডি সুজা যথাক্রমে ১৩'৬ এবং ১৩'১ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতের জাতীয় স্কুল গেমসে ৮০ মিটার হার্ডল রেসের বিজয়িনীর (১৮'৩ সেঃ) নাম কুমারী নমিতা ঘোষ। রাইফেল চালনায় সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ বঙ্গ রমণীর কৃতিত্বেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। বোনলেস খেলায় এবং তারের উপর ব্যালান্সের খেলায় বাজে শিবপুর ফ্রেণ্ডস ক্লাবের সভ্যা কুমারী জ্যোৎস্না দে ও কুমারী নির্ম্মলা মোদকের কৃতিত্ব রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি অর্জ্জন করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে জানিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ কুমারীগণ লাঠি, তরবারি ও ছোরার খেলায় এবং ভারোত্তোলনে এমন কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন যে, তাহাদের খেলা দেখিয়া দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত যে আরও সংগৃহীত হইতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

বিমান চালনা কার্য্যে ইউরোপ ও আমেরিকার মহিলাগণ কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিতেছেন। বঙ্গ রমণীগণও কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহেন নাই। কুমারী সুষমা মুখার্জ্জি নামে একটি মেয়ে দমদম

উড়োজাহাজ ঘাঁটিতে এরোপ্লেন চালনা শিক্ষা করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই প্রথম শ্রেণীর লাইসেন্স পাইবার জন্য পরীক্ষা দিবেন। বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম এরোপ্লেন চালনা শিক্ষা করিতেছেন 'দাশরায় স্মৃতি তহবিল' হইতে মহিলা শিক্ষার্থিনীদের বিমান চালনা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম বৎসরেই কুড়ি জন বাঙ্গালী হিন্দু ও একজন মুসলমান রমণী বিমান চালনা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে তিনজনকে মনোনীত করা হয়।

(১) কলিকাতা বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী কুমারী অঞ্জলি দাস।

(২) লাহোর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক।

(৩) শ্রীহট্টের রমা গুপ্তা।

পরে স্থির হয় একঘণ্টা কাল বিমান বিহারের ফল পরীক্ষা করিয়া তিনজনের মধ্যে প্রথম স্থানীয়াকে এক হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় স্থানীয়াকে পাঁচ শত টাকা বৃত্তি দিয়া দমদম বিমান ক্লাবে তাঁহাদিগকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সম্প্রতি তহবিলের সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে স্কটিশচার্চ্চ কলেজের কুমারী অশোকা রায়কত বি, এ, বিমান চালনার জন্য বৃত্তি পাইবেন স্থির হইয়াছে। ইঁহার শিক্ষাদান ফল দেখিয়া দ্বিতীয় বৃত্তিপ্রদান করা হইবে এবং সেই সময়ে কুমারী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৃত্তিদানের বিষয় বিবেচনা করা হইবে। এয়ারহষ্টেস পদেও কয়েকজন বঙ্গকুমারী কৃতিত্বের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, শ্রীমতী দূর্ব্বা ব্যানার্জ্জি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি বৈমানিকের চাকুরী লাভ করিতে পারিতেছেন। ইহা বঙ্গকুমারীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে।

সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ, ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট কুমারী গীতা চন্দ পর পর সাত বার বিমান হইতে প্যারাশুটযোগে লম্ফপ্রদান করিয়া প্রথম ভারতীয় মহিলা প্যারাট্রুপার হিসাবে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন শ্রীমতী চন্দ বিমান বাহিনীর একজন ডাক্তার এবং ছাত্রীসেনা হিসাবে শিক্ষালাভের ব্যাপারে তিনিই বিমান বাহিনীর প্রথম মহিলা। বর্ত্তমানে তিনি বিমান বাহিনীর কালাইকুন্দা কেন্দ্রে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত আছেন। ভারতের প্রথম মহিলা প্যারাট্রুপার শ্রীমতী গীতা চন্দের কৃতিত্বে বঙ্গমাতার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশের অধিবাসী বাঙ্গালীজাতির সন্তরণপটুতা চির-প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার রমণীগণও সন্তরণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'চর্য্যাগীতিকায়' জানা যায়, খেয়া পারাপারের কাজও একসময়ে বাঙ্গলার রমণীগণই করিতেন। পল্লী অঞ্চলে এখনও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে বঙ্গবালিকাগণকে সন্তরণ শিক্ষা দিবার জন্য অনেক ক্লাব বা সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বঙ্গকুমারীগণের সন্তরণ পটুত্বের কাহিনী সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে। কিন্তু জলক্রীড়া বা সন্তরণ যে অতি প্রাচীন কালেও বঙ্গরমণীর অন্যতম প্রধান শারীর ক্রিয়া তাহার পরিচয় সেন রাজত্বে লিখিত পবনদূত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ১২৩৬ সালেও অষ্টাদশ বর্ষীয়া বঙ্গরমণী ক্রীড়াচ্ছলে কুতূহলে সন্তরণদ্বারা অবলীলাক্রমে গঙ্গা পার হইতেন তাহার বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে লিখিত আছে।

১৩৪২ সালে নিখিল ভারতীয় মহিলাদিগের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকাটি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম কুমারী বাণী ঘোষ। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই ছোরা ও লাঠি খেলা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে তিনি মহিলাদের সকল সন্তরণ প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন এবং ইংরাজ ও এংলো ইণ্ডিয়ান মহিলা সন্তরণকারীদিগকে অনায়াসে পরাজিত করিতেছেন। পুরুষ সন্তরণকারীদিগের সহিতও তিনি বহু সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১৭ জন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে তিনি পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়া প্রথম হইয়াছিলেন। আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের অষ্টম বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অষ্টমবর্ষীয়া কুমারী তারকবালা, সপ্তমবর্ষীয়া চামেলী ও ষষ্ঠবর্ষীয়া মনোরমা নাম্নী বালিকা সন্তরণকারিগণ সাত মাইল সন্তরণে সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়াছেন, আমাদের দেশে কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাঁতারুগণ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইঁহারাই এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ সাঁতারু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মেয়েদের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার স্থান সবার উপরে। বাঙ্গালা ৪৫ বোম্বাই ১১ ও দিল্লী ৩ পয়েণ্ট পেয়ে যথাক্রমে লাভ ক'রেছে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান। এবার প্রথম দিন বাঙ্গলার দীর্ঘদেহী মহিলা সাঁতারু কল্যাণী বসুর নিকট ২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলে বোম্বাই-এর ডলি নাজিরের পরাজয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাঙ্গলার মেয়েরা বিশেষ করে সন্ধ্যা চন্দ্র ও কল্যাণী বসু যে ভাবে অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। ১০০ মিটার ব্যাকষ্ট্রোকে সন্ধ্যা চন্দ্র ডলি নাজিরের ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন। আর কল্যাণী বসু ২০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলে দেখিয়েছেন অপূর্ব্ব কৃতিত্ব। মেয়েদের ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেসে নূতন রেকর্ড করেছেন বাঙ্গলার রিলে টীমের চার জন সাঁতারু সন্ধ্যা চন্দ্র, গীতা দে, কল্যাণী বসু ও অনুরাধা গুহ।

১৩৬৫ সালে কলিকাতার আজাদহিন্দ বাগে দুইটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার সাঁতারুদের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার সন্তরণ পটীয়সী মেয়েদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর আর এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। দুইটি বিষয়ের ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করা ছাড়াও একাধিক বিষয়ে ম্লান করিয়াছেন মেয়েদের রাজ্য রেকর্ড। ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করিবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র আর ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্যা কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা। ১০০ মিটার সাঁতারে কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্রের উত্তরোত্তর উন্নতির কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যা চন্দ্র ১ মিনিট ২১'৫ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার ব্যাক্‌ষ্ট্রোক বা পিঠ সাঁতারে নূতন করিয়া ভারতীয় রেকর্ড করেন। আজাদ হিন্দ বাগে বাঙ্গলার রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপের সময় তিনি সেই রেকর্ডকে আরও উন্নত করে ১ মিনিট ২৮'৪ সেকেণ্ড করেন। এক সপ্তাহ পরে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কুমারী সন্ধ্যা চন্দ্র আরও খানিকটা উন্নতি ক'রে ১ মিনিট ২৮'২ সেকেণ্ডে ১০০

মিটার (পিঠ সাঁতার) অতিক্রম করেছেন। জাতীয় সন্তরণে বাঙ্গলা মহিলাদলের অধিনায়িকা কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতার সাঁতারেও দিনে দিনে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। দিল্লীতে অনুরাধা কোন রেকর্ড না করলেও আজাদ হিন্দ বাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপে ১০০ মিটার বুক সাঁতারের দূরত্ব ১ মিনিট ৩৭' ৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেন। ১৯৫৫ সালে ডলি নাজির কৃত রেকর্ড (১ মিনিট ৩৮ সেকেণ্ডে) ম্লান করে দেন। পরে ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তিনি এই সময়কে আরও উন্নত ক'রে ১ মিনিট ৩৬' ৩ সেকেণ্ড করেছেন ১৩৬৬ সালেও সন্ধ্যা চন্দ্র সন্তরণে পূর্ব্ব রেকর্ড অতিক্রম করেন।

ঐ প্রসঙ্গে সন্তরণ পটীয়সী বঙ্গকুমারী আরতি সাহার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আরতি ইতিপূর্ব্বে বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে সন্তরণে রেকর্ড করিয়াছিলেন এবং ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু বর্ত্তমান ১৯৫৯ সালের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম তাঁহার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ২৭শে আগষ্ট ফ্রান্সের উপকূলে কেপগ্রিজনেজ হইতে ইংলণ্ডের ডোভার পর্য্যন্ত বাত্যা বিক্ষুব্ধ উদ্দাম তরঙ্গসঙ্কুল ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবার জন্য বিলি ব্যাটলীন আয়োজিত আন্তর্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আরতি যোগদান করেন। প্রারম্ভে নৌকা বিভ্রাট হওয়ায় তাঁহার যাত্রা সুরু করিতে চল্লিশ মিনিট দেরী হয়। তথাপি তিনি সন্তরণের মধ্য পথে আমেরিকার গ্রেটা এণ্ডারসনকে ধরিয়া ফেলেন; কিন্তু পথ প্রদর্শক পাইলটের ভুলের জন্য ১৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল সন্তরণ করিয়াও এবং ইংলণ্ডের উপকূলের মাত্র তিন মাইলের মধ্যে আসিয়াও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য নৌকায় উঠিয়া পড়িতে বাধ্য হন। ইংলিশ চ্যানেল কখনই সন্তরণকারীদের নিরাপদে সফল হইতে দেয় নাই এবং এবারে চ্যানেলের জলস্ফীতি, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং হিমশীতল উত্তাল জল আরও প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা সফল না হইলেও মহিলা প্রতিযোগীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিবার জন্য আরতি পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন এবং অসাধারণ মনোবল ও সহিষ্ণুতার জন্য আরও পঁচিশ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার নারীদের মধ্যে শ্রীমতী সাহা এই প্রথম অভিযানে অগ্রণী হইয়াও ১৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল দুর্জ্জয় তরঙ্গের মধ্যে যুঝিবার ক্ষমতা এবং দুর্দ্ধর্ষ সাহস দেখাইয়া সকলের অভিনন্দন লাভ করেন।

কিন্তু প্রথম অসাফল্য শ্রীমতী আরতিকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় চেষ্টায় ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ফ্রান্সের কেপ গ্রিজনেজ হইতে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া ১৬ ঘণ্টা ২ মিনিট সংগ্রামের দ্বারা চ্যানেল অতিক্রম পূর্ব্বক ইংলণ্ডের কোকষ্টোনে পৌঁছিয়া ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিবার দুর্লভ গৌরব লাভ করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে প্রথম একজন মহিলা সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। তারপর বিগত ৩২ বৎসর মাত্র সাতটি দেশ হইতে ১৮ জন মাত্র মহিলা এই দুরতিক্রম্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনও এশিয় মহিলা স্থান লাভ করেন নাই। এই গৌরব সেদিক দিয়া নিশ্চয়ই অসামান্য। দ্বিতীয়বার চ্যানেলে অবতরণ করিয়া সন্তরণ আরম্ভ করিবার পর কিছুক্ষণ তিনি অনুকূল আবহাওয়া পাইয়াছিলেন। কিন্তু তারপর প্রবল ঝড়, হিমশীতল জলস্রোত, এবং উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাশি অন্যান ছয় ঘণ্টাকাল তাঁহাকে প্রতি নিয়ত বাধা দিয়াছে—এমনও সময় গিয়াছে যখন মনে হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে চ্যানেল অতিক্রম করা বোধ হয় আর সম্ভব হইল না। পথপ্রদর্শক ক্যাপ্টেন বলিয়াছেন—প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীমতী সাহা যে ভাবে সন্তরণ করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আমি কখনও সেরূপ দেখি নাই। কাজেই সংকল্পের দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তরণ কৌশল সবদিক দিয়াই এই গৌরবের পূর্ণমর্য্যাদা তিনি লাভ করিয়াছেন। সাগর বিজয়িনী মহিলাদের মধ্যে এশিয়ায় তিনিই প্রথম এবং সমগ্র ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশ তাঁহার অর্জ্জিত এই দুর্লভ গৌরবের অংশীদার হইয়াছে। কুমারী সাহার বীরত্বে বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গরমণীর নানা তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী জানিতে পারা যায়। পদব্রজে ও নৌকায় সেকালে তাঁহারা পুরী, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমনাগমন করিতেন। তুষারমৌলি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হরিদ্বারেও তাঁহারা গমন করিয়াছেন। কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালী দেওয়ান সাহেবের স্ত্রী একবার অমরনাথ যাত্রী ছিলেন। তিনি নিজের খরচে যাত্রীদের জন্য হাসপাতাল ও ভাণ্ডারা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রতিবৎসরই কষ্টকর গিরিপথে বঙ্গনারী অনায়াসে শ্রীধাম কেদার-বদরী গমন করিয়া দেবদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। তাঁহাদের ভ্রমণ কাহিনী নানা পুস্তকে ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অতিশয় দুর্গম মানস-কৈলাস তীর্থ বঙ্গমহিলার গমন একটি পরম বিস্ময়কর ব্যাপার। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা সরকার এই দুর্গম পথে হিমালয় বিজয় করিয়াছিলেন। সেই দুর্গম পথে আস্‌কোট হইতে ৫০ মাইল উত্তরে ভীষণ নির্পানী পড়াও। উহা দৈর্ঘে প্রায় ১৩ মাইল। পথে এক বিন্দুও বারি নাই! এমন খাড়া পথ যে, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে। সেই সকল সোপান বহিয়া প্রতি পদক্ষেপে উর্দ্ধে উঠিতে হয়। উঠিতে উঠিতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, যাত্রীর মাথা ঘুরিয়া যায়—পর্ব্বত-পীড়া আরম্ভ হয়। তাহার পর সেই ভীষণ লিধুলেক্‌ গিরিবর্ত্ম। কুয়াশায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন—তাহার উপর বরফের উপর দিয়া পথ। সে পথের রেখা পর্য্যন্ত নাই। ভারবাহী ছাগল ভেড়ার দল বাণিজ্যের দ্রব্য সম্ভার লইয়া বরফের উপর দিয়া যে স্থান দিয়া গিয়াছে, সেই রেখাতেই মানুষ চলাচলের পথ পাড়য়াছে। রেখা ছাড়া অপর দিকে যাইলে বিপদের সম্ভাবনা। বরফে চড়িবার আগে মাল বোঝাই ঘোড়াগুলিকে আগাইয়া দিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোড়ার পা বরফে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।—আমাদেরও পা বরফে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বহুক্ষণ চেষ্টার পরে আমরা শক্ত বরফে আসিয়া পৌঁছিলাম। ক্রমে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে এবং বরফে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। বেলা প্রায় ১২টায় সময় লিধুপাশের উচ্চ শিখরে উঠিলাম।

লিধুলেকপাস সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৬০০০ ফিট উচ্চ। এতক্ষণ কেবল বরফের চড়াই উঠিতেছিলাম। এইবারে আমাদের উৎরাই করিতে হইবে। নামিবার সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমরা শনৈঃ শনৈঃ বরফ হইতে নামিতে লাগিলাম। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল। অনুমে যাইতে

না যাইতেই হাঁপাইতে হইল। বঙ্গনারীর এই হিমালয় বিজয় কাহিনী পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য।

ভূপৃষ্ঠ হইতে হিমালয়ের চো ওয়ু শৃঙ্গ ২৬,৮৬৭ ফুট উচ্চ। আজ-পর্য্যন্ত যাঁহারা পদব্রজে ওই শৃঙ্গে আরোহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইদল সফল হইয়াছেন। বলা বাহুল্য সেই দুইটি অভিযাত্রীদলে কোন রমণী ছিলেন না। কিন্তু বিশ্বে রমণী সমাজ বেশীদিন এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহিলেন না, বিভিন্ন দেশের নারীদের লইয়া গঠিত আন্তর্জাতিক অভিযাত্রিণীদল গত আগষ্ট মাসে (১৯৫৯) চো ওয়ু পর্ব্বত শৃঙ্গ জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। চো ওয়ু পৃথিবীর ষষ্ঠ উচ্চতম পর্ব্বত শৃঙ্গ। ইহার পথ যেমন দুর্গম, তেমনি ইহার আবেষ্টনীও তুষারাস্তীর্ণ ও ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ, পর্ব্বত, নদী, গিরিশৃঙ্গ, জলপ্রপাত সবই তুষারে আচ্ছন্ন থাকিয়া সব সময়ই রজতগিরি সন্নিভ বোধ হইয়া থাকে কোথাও পথের রেখামাত্র নাই। এই চির তুষারের দেশে আন্তর্জাতিক অভিযাত্রিণী নারীগণের নেত্রী শ্রীমতী ক্লডকোগান তাঁহার এগারজন সহযাত্রিণী লইয়া নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে গত ২১শে আগষ্ট (১৯৫৯) যাত্রা করেন। শ্রীমতী কোগান নিজে জাতিতে ফরাসী—তাঁহার সঙ্গিনীগণের মধ্যে ছিলেন আরও দুইজন ফরাসী, তিন জন ইংরাজ, একজন সুইস, একজন বেলজিয়ান, একজন অষ্ট্রেলিয়ান এবং তিনজন ভারতীয় মহিলা। আনন্দ ও গৌরবের কথা এই যে, এই তিনজন ভারতীয় মহিলাই বাঙ্গালী, পশ্চিমবঙ্গের দার্জ্জিলিং সহরের অধিবাসিনী। ইহাদের মধ্যে দুইজন হইতেছেন এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং নোরকের কন্যা শ্রীমতী পেমপেম ও শ্রীমতী নীমা এবং অন্যজন তেনজিং-এর ভাগিনেয়ী শ্রীমতী দোমা। আন্তর্জাতিক মহিলা পর্ব্বত অভিযাত্রিণী দলে ইহাদের যোগদানে বঙ্গরমণীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এই মহিলা পর্ব্বত অভিযাত্রিণীদল ২১শে আগষ্ট (১৯৫৯) কাঠমাণ্ডু হইতে যাত্রা করিয়া মোটরযোগে বানেপা গিরিবর্ত্ম পর্য্যন্ত গমন করেন এবং তথা হইতে পর্ব্বতারোহণ সুরু করেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি অভিযাত্রিণীদল উনিশ হাজার ফুট উচ্চে পৌঁছিয়া তথায় তাঁহাদের কেন্দ্রিয় শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর শিখর অভিমুখে তাঁহাদের যাত্রা আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত ২৩,০০০ ফুট উচ্চে তাঁহারা তাঁহাদের চতুর্থ শিবির সংস্থাপন করেন। এই সময় হইতে প্রতিপদক্ষেপে তাঁহাদের যাত্রা ব্যাহত হইতে থাকে। কারণ সেপ্টেম্বরের শেষদিকে আবহাওয়া খারাপ হইতে থাকে এবং যখন তখন দুঃসহ তুষার ঝটিকা ও তুষারপাত হইতে থাকে। তেপুসাং নামে একজন মালবাহী শেরপা এই সময় বরফের ধ্বসে চাপা পড়িয়া নিহত হয় এবং দুইজন অভিযাত্রিণী পর্ব্বতপীড়া ও স্নায়বিক ক্লান্তিতে আক্রান্ত হওয়ায় নিম্নতম আশ্রয় শিবিরে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। মূল বাহিনী কিন্তু অগ্রসর হইতেই থাকে এবং অক্টোবরের ১লা হইতে সতেরই তারিখের মধ্যে কোন সময়ে একই দিনে অথবা বিভিন্ন দিনে দলের নেত্রী শ্রীমতী ক্লড কোগান, তাঁহার সহকারিণী বেলজিয়াম কুমারী ক্লডিন এবং শেরপা আং নরবুর মৃত্যু হয়। সংবাদে প্রকাশ এই সময় চো ওয়ুর প্রাকৃতিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্য্যোগপূর্ণ ছিল এবং ঘণ্টায় একশত মাইল বেগে তুষার ঝটিকা বহিতেছিল এবং এই তুষার ঝটিকা এক সপ্তাহেরও অধিককাল স্থায়ী ছিল। ঠিক কবে এই তুষারঝঞ্ঝাজনিত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই এবং নিহত অভিযাত্রিণীদের মৃতদেহও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। বলাবাহুল্য, অভিযানটি এখানেই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মাত্র কয়েকজন শেরপা সহকারী লইয়া সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের দ্বারা গঠিত আন্তর্জাতিক অভিযাত্রিণী বাহিনী হিমালয়ের একটি প্রধান গিরিশৃঙ্গ জয় করিতে এই সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইয়াছিল এবং প্রায় সাফল্যের অতি নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বঙ্গকুমারী পেমপেম, নীমা ও দোমার যোগদান ঘটনা হিসাবে যেমন আনন্দদায়ক, তেমনি অপরিসীম গৌরবাত্মকও। প্রকৃতি বিরূপ না হইলে নারী অভিযাত্রিণী বাহিনী যে চো ওয়ু বিজয় করিতেন এই বিশ্বাস অবশ্যই করা যায়। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় ইহাদের অদম্য সাহস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু নিষ্ফলতা ও মৃত্যুর দ্বারা চিহ্নিত হইলেও এই রমণী বীরত্ব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতের রমণী সমাজ প্রেরণা লাভ করিবেন। দুঃখের পরীক্ষায় এবং দুঃসাহসের তপস্যায় বাঙ্গালার নারী সমাজের এই গৌরবে এই দুর্দ্দিনেও বাঙ্গালীজাতির বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিবে। বঙ্গরমণী, তথা বাঙ্গালীজাতির এই নবীন অভ্যুদয় সফল হউক ;—

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

বন কেটে বসত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

তেইশ

কুমিরমারির হাট সেদিন। মেছোডিঙি ঘাটে বেঁধে বোঠে রেখে জগা নেমে পড়ল। বলাই ভয়ে ভয়ে একবার বলেছিল, দাঁড়াও ভাই একটু। মাছগুলো উঠে যাক।

আমার কি দায় পড়েছে?

ভ্রূক্ষেপ না করে ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে অদৃশ্য। জগন্নাথ নিতান্ত পর-অপর এখন। গগনের খাতিরে ডিঙিটা বেয়ে এনে দিল, ডিঙি পৌঁছে গেছে—ব্যস, ছুটি। দু-জন ব্যাপারি এসেছে ঐ ডিঙিতে—তাদের সঙ্গে ধরাধরি করে বলাই মাছের ঝোড়াগুলো খাতায় তুলে ডাক ধরিয়ে দিল। সমস্ত বলাইর ব্যবস্থা। কাজকর্ম সম্পূর্ণ শিখে গেছে।

বিকালবেলা হাট পাতলা হয়ে গেছে। নানা অঞ্চলের নৌকো এসে জমেছিল, বেচাকেনা সেরে একে একে সব কাছি খুলে দেয়। ঘাটের জল দেখবার জো ছিল না, আস্তে আস্তে আবার ফাঁকা হয়ে আসে। জগা সেই যে ডুব দিয়েছে—যাবার সময় হয়ে এল, এখনো তার দেখা নেই। খুঁজে খুঁজে বলাই হয়রান। কোথায় গিয়ে পড়ে আছে—হোটেলের ভাত না-ই হোক, চিঁড়ে-মুড়কি জলযোগ করতেও তো একটিবার দেখা দেবে মানুষটা!

জগা তখন ছই-দেওয়া বড় এক হাটুরে নৌকোর ভিতরে। নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। যারা গাঙে-খালে ঘোরে, জগাকে চেনে তারা মোটামুটি সবাই। মাঝি বলে, এ নৌকোয় উঠলে কেন তুমি? আমরা মোটে একটুখানি পথ যাব—বয়ারখোলায়।

জগা বলে, এই যাঃ! বয়ারখোলার নৌকোয় উঠে বসেছি?

তুমি কি ভাবলে বল দিকি?

জগা দাঁত বের করে হাসেঃ যাব তো সাঁইতলা। চৌধুরিগঞ্জ বরাপোতা—ঐদিককার কোন একখানা হলে চলে।

মাঝি বলে, জলের পোকা হলে তুমি। তোমার এমনিধারা ভুল হয়ে গেল?

হল তো দেখছি। তামাক খাওয়াও দিকি ও বোঠেওয়ালা ভাই—

মাঝি বলে, তামাক খাবে কী এখন! গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকো ছাড়া হবে। নেমে যাও তুমি তাড়াতাড়ি।

জগন্নাথ বলে, যা কাদা! উঠে যখন পড়েছি, নেমে কাদায় পড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না। একেবারে বয়ারখোলা গিয়েই নামা যাবে।

মাঝি বুঝে ফেলে এইবারে হেসে উঠলঃ বুঝলাম, বয়ারখোলাতেই যাবে তুমি। মতলব করে উঠেছ। মস্করা না করে গোড়ায় সেইটে বললে হত। নাও, বোঠে ধরে বোসোগে। শিওবর, জগার হাতে বোঠে দিয়ে জুত করে তুমি কলকে ধরাও।

হাটুরে নৌকোর নিয়ম হল, উটকো যাত্রী টাকাপয়সায় ভাড়া দেবে না, গতরে খেটে দেবে। জগন্নাথ হেন পাকা লোক নৌকোয়, তাকে না খাটিয়ে ছেড়ে দেবে কেন?

জগন্নাথ বোঠে বেয়ে চলেছে। আর বলাই ওদিকে সমস্ত হাট পাতিপাতি করে খুঁজছে তাকে। যাকে পায় জিজ্ঞাসা করে, জগা গেল কোন দিকে, জগাকে দেখেছ? ক'টা দিন জগা নৌকোয় আসে নি, শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। নতুন ছাঁটের গরুর মতো জোয়াল আর কাঁধে রাখতে চায় না। বিষম ব্যস্ত হচ্ছে বলাই—আর দেরি করলে সাঁইতলা রাতের ভিতরেই পৌঁছন যাবে কিনা সন্দেহ। ডিঙি নিয়ে আসতে হবে তো আবার সকালবেলা!

বয়ারখোলায় নেমে জগন্নাথ সোজা চলল পাঠশালা-ঘরের দিকে, গগন দাস একদা যেখানে গুরু হয়ে বসেছিল। গাঁয়ের মধ্যে ঐ একটা বাড়ি শুধু চেনা, ঐখানে এসে আড্ডা জমাত সে গগনের সঙ্গে। চেনা আছে আরও একজন মানুষ—তৈলক্ষ।

কী কাণ্ড! আ'লপথে চলার উপায় নেই। হলুদবরণ ধানগাছ ফসলের ভারে নুয়ে পড়েছে দু-পাশ থেকে। পায়ে পায়ে ধান ঝরে পড়ে। ধানের ঘষায় পায়ের গোছার উপর খড়ির মতন ছাপ এঁকে যায়। অঘ্রাণ শেষ হয়ে যায়, কেটে তোলে নি এখনো ক্ষেতের ধান?

কত আর তুলতে পারে বল! খাটছে তো সকাল থেকে রাত দেড় পহর দু-পহর অবধি। দিনমানে ধান কেটে এনে ফেলে খোলাটের উপর, রাতে মলন মলে। লক্ষ্মীঠাকরুন এত দিয়েছেন যে ধান তোলার খোলাটই পায় না খুঁজে। যেখানে যেটুকু উঁচু চৌরস জায়গা, লেপে-পুছে সেখানে খোলাট বানিয়ে নিয়েছে। পাঠশালা-ঘরের উঠানও দেখ পালায় পালায় ভরতি।

গাছের গুঁড়ি-ফেলা ডোবার ঘাটে পা ঘষে ঘষে ধুয়ে হাতের চটি-জোড়া পায়ে পরে জগা এবার ভদ্র হল। তাইতে আরও গোলমাল। ক্ষিপ্ত হয়ে এক ছোঁড়া চেঁচিয়ে উঠল, বড্ড যে জুতোর দেমাক! মা-লক্ষ্মীর ধান মাড়িয়ে চলেছ—খোল জুতো বলছি।

দাওয়ার উপরে তৈলক্ষ। সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করে, কাকে বলিস রে সুদন?

চিনি নে। ম্যাচ-ম্যাচ করে আসছে দেখ ধানের উপর দিয়ে।

তৈলক্ষ বলে, কে হে তুমি? জুতো পরে ধানের উপর দিয়ে আসতে নেই। ঠাকরুনের গোসা হয়।

চটি খুলে জগা আবার হাতে নিল। ঐখান থেকে চেঁচায়: আমায় চিনতে পারলে না তৈলক্ষ মোড়ল? সেই কত আসতাম। গগন গুরুকে আমিই তো জুটিয়ে দিয়েছিলাম।

তৈলক্ষ তড়াক করে উঠে পৈঠা অবধি নেমে এসে খাতির করে: এসো এসো জগন্নাথ। এদ্দিনে সদয় হল? বলি, পাকাপাকি এলে তো? না, এসেই অমনি পালাই-পালাই করবে?

পাকা ছড়াদারের মতো কথা বলে জগা: যাত্রার দলও কি পাকাপাকি তোমাদের? যতক্ষণ দিনমান, ততক্ষণ কমল দল মেলে আছে। রাত্তির হলে আর নেই। তোমাদের যাত্রাও গোলা ভরতি ধান আছে যদ্দিন। ধান ফুরোবে, দল যাবে। পাঠশালার নিয়েও যে ব্যাপার হত। সমস্ত ছেড়েছুড়ে হাত-পা ধুয়ে উঠে আসব তোমাদের এখানে, দল গেলে আমার তখন কি গতি বল?

চিনতে পেরে তৈলক্ষের বড় ছেলে সুদনও উঠে এসেছে দাওয়ায়। কলকেয় তামাক সেজে গেঁয়ো কাঠের কয়লা ধরাচ্ছে টেমির উপর ধরে। বলে, খাটতে পারলে কখনো ভাতের অভাব! গুরু মশায়ের কাছে যখন আসতে, ধানের ভরা নিয়ে হাটে হাটে ঘোরা কাজ ছিল তোমার। দল উঠে যাক কি যাচ্ছেতাই হোক গে, গাঙ-খাল তো শুকিয়ে যাবে না! নতুন রাস্তাপথে আবার গরুরগাড়ির চল হয়েছে। তোমার মতন লোকের কি ভাবনা?

তামাক টানতে টানতে তৈলক্ষকে জগা বলে, ক্ষেতখামার দেখতে দেখতে এলাম। চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু পাঠশালা বাতিল করলে কেন বল তো মোড়ল? বেশ নামডাক হয়েছিল বয়ারখোলার পাঠশালার। রাজি থাক তো বল—সেই গগন গুরুকে খবর দিয়ে দিই। এখন সে ঘেরিদার—টাকাপয়সা করেছে। কিন্তু সুখ নেই। খবর দিলে পালিয়ে এসে পড়বে ফাটক-পালানো আসামির মতো।

তৈলক্ষ বলে, গোড়ায় পাঠশালার কথাই হয়েছিল। দু-এক হাট ঘোরাঘুরিও করেছিলাম গুরুর চেষ্টায়। তারপরে মাতব্বরদের মন ঘুরে গেল: খরচপত্তোর দু-পয়সার জায়গায় চার পয়সা হলেও এবারে অসুবিধা হবে না—যাত্রার দল হোক এবারটা।

জগা বলে, যাত্রা আর পাঠশালা দু-রকমই তো হতে পারে।

তৈলক্ষ ঘাড় নেড়ে বলে, ওইটি বোলো না। যাত্রার দলেও ছেলেপুলের অনেক কাজ। জুড়ির দল—মুখোড়ে আটটা করে ধরলে চার সারিতে আটু গণ্ডা। তার উপরে রাজকন্যা সখী কেষ্ট-রাধা গোপিনী—সবই তো ছেলেপুলের ব্যাপার। তারা পাঠশালায় বসে সকাল-বিকাল ক-খ-ঠ কষতে লাগল তো পেয়াজ সামলায় কে? লেখাপড়া আর পালাগান উল্টো রকম কাজকর্ম—দুটো এক সঙ্গে হয় না।

আবার নিজেই বলছে, পুরোপুরি উল্টো—তাই বা বলি কেমন করে? পাঠ পড়তেও পড়াশুনো লাগে। মোশান-মাস্টার কাঁহাতক পড়িয়ে পড়িয়ে দেবে, শুধু একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে তো দল চলে না। তা এবারটা যাত্রা হল। দেখা যাক, কি রকম দাঁড়ায়। আয়েন্দা সনে আবার না হয় একটু পাঠশালা করে নেওয়া যাবে।

জগাকে বলে, দরাজ গলাখানা তোমার। এক একটা গানে আসর ফেটে চৌচির হবে। বিবেক নিয়ে ভাবনা ছিল, মা বীণাপাণি সুবুদ্ধি দিয়ে তোমায় হাজির করে দিলেন।

প্রশংসার কথায় জগা চুপ করে আছে।

তৈলক্ষ বলে, কি ভাবছ? ভাবনার কিছু নেই। জবর মাস্টার এনেছি। সবাই তো নতুন। সকলের সঙ্গে তুমিও শিখে পড়ে নেবে। ঠিক হয়ে যাবে।

জগার অভিমানে আঘাত লাগে: আমায় কাঁচা লোক ঠাওরালে নাকি তৈলক্ষ মোড়ল? যাত্রার নামে ঘর ছেড়ে বেরুই—কতটুকু বয়স আর তখন! বিবেকই তো কতবার করেছি! মেডেল আছে, আটঘরার রসিক রায় দিয়েছিল। বিষম খুঁতখুঁতে মানুষ—তার হাত থেকে মেডেল জিনে নিয়েছি আমি। চাট্টিখানি কথা নয়।

পরনে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, কপালে সিঁদুর আর চন্দন গলায় এক বোঝা কড় রুদ্রাক্ষ আর কাঠের মালা—এই হল বিবেকের সজ্জা। একটো নয়, কথাবার্তা একটিও বলে না, গান শুধুমাত্র। শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্য থেকে সম্রাটের শুদ্ধান্তঃপুর—বিবেকের গতি সর্বত্র। চক্ষের পলকে কোন কৌশলে পৌঁছে যাচ্ছে, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। মানুষজন যাত্রা শুনতে আসরে বসে এই সব আজেবাজে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাইরের দেশদেশান্তর শুধু নয়, মনের অন্ধিসন্ধিতেও বিবেকের অবাধ ঘোরাঘুরি। কোন লোক মনে মনে কি ভাবছে, সে তা সঠিক জানতে পারে। অত্যাচারীকে সাবধান-বাণী শোনায়, বেদনায় মুহ্যমান বিরহিণীকে প্রিয়-মিলনের ভরসা দেয়, দুঃখে ভেঙে-পড়া মানুষকে আশার বাণী বলে। যাত্রার দলে ভারি খাতির বিবেকের। আসর মুকিয়ে থাকে—যখন বড্ড সঙ্গিন অবস্থা, বুঝতে পারে এইবারে এসে পড়বে বিবেক। দুঃখ-বেদনায় মানুষ আর নিশ্বাস নিতে পারছে না—ঠিক সেই চরমক্ষণে দেখা গেল, আধ-খাওয়া বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটেছে বিবেক আসর পানে। আধা-পথেই গান ধরেছে—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ওরে দুষ্ট, (ও তোর) ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট,
ঘটিবে অনিষ্ট ঘোর, বুঝিবি কি মহাকষ্ট—

আসর জুড়ে বাহবা-বাহবা রব। উল্লাসে শ্রোতারা ফেটে পড়ছে। রক্ষে পেয়ে গেল এতক্ষণে। পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়—আর কোন সংশয় নেই বিবেকের এই গানের কথার পরে। পুণ্যবান নায়কের মুণ্ড দুইখণ্ড হয়ে গেলেও শেষ অঙ্কে নির্ঘাৎ সে বেঁচে উঠবে। ঝোঁকের মাথায় মেডেলই বা ফেঁকে বসল মুরুব্বিদের কেউ।

এ হেন বিবেকের পার্ট আবার এসে যাচ্ছে। মাণিক হাতের মুঠোয় পেয়ে ছাড়ে কেউ কখনো? চুলোয় যাকগে সাঁইতলা আর গঙ্গা দাসের ঘেরি। সাধ করে বানানো আলা পরমাল করে দিয়

মানবেলা থেকে ছিটকে-পড়া ওরা ঐ তিনটি প্রাণী। বিশেষ করে মাতব্বর ঠাকরুনটি—ঐ চারু। জগা নিরুদ্দেশ কুমিরমারির হাট থেকে। জীবনে এমন কতবার ঘটল। সাঁইতলার উপর তিক্ত বিরক্ত, বয়ারখোলার দলের মধ্যে সে জুটে গেল।

চব্বিশ

ভাল যাত্রার দলে বারমেসে কাজকর্ম। বৃষ্টিবাদলার সময় তিনটে কি চারটে মাস ঘরে বসে কাজ। পালা ঠিক করে ফেলে পাঠ লেখাও, পেরাক্ত দাও, সাজপোশাক বানাও, বাক্সপেটরা গোছাও। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, দেয়া ডাকছে, ঘরের মধ্যে ঝুমুঝুমু ঝুমুঝুমু সখীদের পায়ের ঘুঙুর, রাজকন্যা ছোঁড়াটার নাকিসুরের একটো। সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি একনাগাড় চলেছে। তার পরে বৃষ্টিবাদলা বিদায় হল তো মজা এইবারে। দেশ-দেশান্তর চরে ফিরে গাওনা করে বেড়াও। নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন মানুষ। আজকে এই গাঁয়ে পাত পেড়ে খাচ্ছি, কালকের অন্ন কোথায় মাপা আছে সে জানেন দেবী অন্নপূর্ণা আর দলের ম্যানেজার।

এসব পেশাদারি পাকা দলের রীতি। বাদা অঞ্চলের শখের দলের পরমায়ু অখণ্ড নয় অমনধারা। এ বছর রমারম চলছে, কিন্তু ও-বছর চলবে কিনা, সেটা নির্ভর করে ক্ষেত কি পরিমাণ ফসল দেবে তার উপরে। খামার ভরা তো মনও ভরা। খামার খালি তো তিন বেলার তিন পাতড়া ভাত কোন কৌশলে জুটবে, মানুষ তখন তাই ভাববে—আমোদস্ফূর্তি উঠে যাবে মাথায়। ভিন্ন বছরের কথাই বা কেন, সামনের বোশেখ-জষ্ঠিতেই দেখা যাবে ধান যত গোলা-আউড়ির তলায় এসে ঠেকছে, দলের মানুষ দুর্লভ হচ্ছে ততই। আয়ান ঘোষ আসেনি আজকের আসরে, যে লোকটা মৃত্ত-সৈনিক করে তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে আয়ানের কথাগুলো তার মুখে জুড়ে দেওয়া হল। কিন্তু পরের দিন খোদ রাধিকাই গর-হাজির হয়তো। শখের দল, শখ হল তো আসবে। মাইনে খায় না যে কান ধরে বেত মারতে মারতে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। তেমনি ওদিকে পালাগান দেওয়ার মানুষও ক্রমশ অমিল হয়ে আসছে। নিয়ম ছিল, বায়না পনের তঙ্কা নগদ এবং খাওয়া। পনের কমিয়ে দশ, তারপরে পাঁচ, ক্রমশ ষোলআনাই মকুব হয়ে গেল, শুধুমাত্র এক বেলা পেটে খাওয়া দলের লোক ক'টির। এত সুবিধা দিয়েও কাউকে রাজি করা যায় না। এখন খোরাকির দাবিও তুলে নেওয়া হয়েছে। সামিয়ানা খাটিয়ে অথবা কোন রকম একটা আচ্ছাদন দিয়ে দাও উঠানে। পান-তামাক এবং লণ্ঠনের প্রয়োজনীয় কেরোসিনটুকু দাও—ঘরে খেয়ে তোমার বাড়ি গেয়ে আসব। তবু কালেভদ্রে কদাচিৎ গাওনার ডাক পড়ে।

তবে জগা করিৎকর্মা লোক—দল একেবারে উঠে গেলেও সে বসে থাকবে না। বিবেক সাজা ছাড়াও কাজ জুটিয়ে নিয়েছে, পয়সা রোজগারের নতুন ফিকির। কুমিরমারি থেকে রাস্তা বেরিয়ে বয়ারখোলা ফুঁড়ে সোজাসুজি চলে গেছে চৌধুরিগঞ্জের দিকে। দু-তিন বছর মাটি ফেলার পরে রাস্তা মোটামুটি চালু এখন। বাদার মানুষ দিনকে দিন ভদ্র হয়ে উঠে ডাঙার পথে চলাচল শুরু করেছে। জলচরেরা স্থলচর হচ্ছে ক্রমশ। আরও দেখবে দু-চার বছর বাদে খোয়া ফেলে পাকা করে দেবে যখন এই রাস্তা—শহর জায়গার মতন মোটরবাস ছুটাছুটি করবে বাদার পাকা-রাস্তা দিয়ে। এখন কিছু গরুর গাড়ি চলে মাটির রাস্তায়। খামারের ধান গাড়িতে চাপান দিয়ে খোলাটে তোলে, মানুষ নৌকোর হাঙ্গামা নিতে যায় না। তবে ভগবতীর স্কন্ধে চেপে যাওয়া বলে মানুষ সোয়ারি কিছু দ্বিধা করে গরুর গাড়ি চাপতে। মেয়েলোক হলে তো কিছুতে নয়। কিন্তু কতদিন! উত্তরে দক্ষিণে টানা পথ চলে গেছে, জোয়ার-ভাঁটার তোয়াক্কা নেই। অতএব জরুরি কাজকর্ম থাকলে এবং গাঙে বেগোন হলে নিতেই হবে গরুর গাড়ি।

তৈলক্ষ মোড়ল একখানা গরুর গাড়ি করেছে। সুদন চালায়। কাজকর্ম না থাকলে জগাও এক একদিন গাড়োয়ান হয়ে গাড়ির মাথায় চেপে বসে। ডা-ডা-ডা-ডা—খাসা লাগে গরুর লেজ মলে এমনি ধরনের মোলাকাত করতে। নৌকোর কাজে জগার জুড়ি নেই, গাড়ির কাজেও ক'টা দিনের মধ্যে দেখতে দেখতে সে ওস্তাদ হয়ে উঠল। আবার মোটরবাস চালু হয়ে গেলে জগা যদি ড্রাইভার হয়, তার সঙ্গে তখনও দেখো কেউ গাড়ি দাবড়ে পারবে না।

চৈত্রের গোড়া অবধি ধান বওয়াবয়ি চলল, গাড়ির তিলেক ফুরসৎ নেই! মাঠের কাজ কর্ম শেষ হয়ে গেলে সুদন তখন গাড়ি নিয়ে কুমিরমারি চলে যায়। হয় কিছু কিছু রোজগার। বিশেষ করে হাটবারগুলো ফাঁক পড়ে না, ব্যাপারিদের মাল পৌঁছে দেবার ভাড়া পাওয়া যায়। অন্য ভাড়াও জোটে অবরে সবরে।

একদিন এক কাণ্ড হল। মানুষ সোয়ারি দু-জন। কুমিরমারিতে তারা মোটরলঞ্চে করে এসেছে। যাবে চৌধুরিগঞ্জ। এসেছে দেড় প্রহর বেলায়, গাঙের গোনও ভাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ছেড়ে সন্ধ্যার আগে করালীর মোহানায় নামিয়ে দিত। তবু কিন্তু নৌকোয় গেল না, অত সকাল সকাল পৌঁছতে চায় না তারা। গদাধর ভট্টাজের হোটেলে ভরপেট খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে যখন উঠল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হাটেরও শেষ হয়ে এসেছে। ভরা জোয়ার, নাবালে কোন নৌকো যাবে না। দেখ, কোথায় গরুর গাড়ি পাওয়া যায়।

সুদনকে গিয়ে ধরল। চরের উপর গরু ছেড়ে দিয়ে হাটখোলার প্রান্তে গাছের ছায়ায় গাড়ির চালার উপর সে শুয়ে আছে। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, জ্বর হয়েছে। ব্যাপারির ধানের বস্তা বোঝাই দিয়ে গাড়ি দাবড়ে আসছিল ঠিক দুপুরবেলা, পথের মধ্যে জ্বর এসে গেল। বস্তাগুলো কোন গতিকে ঘাটে নামিয়ে সেই থেকে শুয়ে পড়ে আছে। হাটুরে অনেকেই তো বয়ারখোলায় ফিরবে, তাদের একজন কেউ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে, সুদন শুয়ে পরে থাকবে অমনি—এই মতলব মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। এমনি সময় গদাধর মধ্যবর্তী হয়ে এসে ধরল: নৌকো নেই, অন্য গাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না, এই দুটো মানুষকে চৌধুরীগঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। জরুরি কাজ ওঁদের, পৌঁছতেই হবে। ন্যায্য ভাড়া পাবে, না হয় কিছু বেশি ধরে নেবে। নিতেই হবে মোটের উপর। দর কষাকষি করে শেষ পর্যন্ত যে অঙ্কে রফা হল, তার পরেও আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠে বসল সুদন তড়াক করে।

গাড়ির দুই রিক্ত মশায়। সেটা অবধান করুন।

ভুঁড়িওয়ালা মোটাসোটা • ইয়া এক লাস—প্রমথ হালদার, চৌধুরী-এস্টেটের ম্যানেজার। প্রমথ বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাপু। চোখ আমাদের কাণা নয়। ধানের বস্তা বোঝাই

দিস. বেশ তো আমরাও পস্তা হয়ে যাব। হেলব না, দুলব না, নড়া চড়া করব না—তবে আর কি! সুখ করতে কে চাচ্ছে, গিয়ে পৌঁছলেই হল।

কত কষ্টে যে সূদন বয়ারখোলা অবধি গাড়ি চালিয়ে এলো সে জানেন মাথার উপরে যিনি আছেন। বাপের পুণ্যের জোর, তাই মুখ থুবড়ে পড়ে নি। আর পারে না। বড় রাস্তা ছেড়ে বেশ খানিকটা আলপথ ভেঙে তৈলক্ষ মোড়লের বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে গরুর কাঁধের জোয়াল নামিয়ে সূদন বলে, আর যাবে না, নেমে পড়ুন এবারে—

রোগা লিকলিকে অন্য মানুষটা—আদালতের পেয়াদা, নাম নিবারণ। সে খিঁচিয়ে ওঠে: তেপান্তরের মধ্যে এসে বলে নেমে পড়ুন। ইয়ার্কি? আমাদের যা-তা মানুষ ভাবিস নে। উনি হলেন ফুলতলা এষ্টেটের ম্যানেজার। দশখানা লাটের মালিক, প্রতাপে বাঘ আর গরু এক ঘাটে জল খায়।

প্রমথও তেমনি মেজাজে নিবারণের পরিচয় দেন: আর এই যে এঁকে দেখছ, সরকারি লোক ইনি; চাপড়াশখানা দেখাও না হে নিবারণ। সরকার তো নিজে আসেন না, এই সব মানুষ দিয়ে কাজকর্ম করেন। এঁর পায়ে একখানা যদি কাঁটা ফোটে, সেটা সরকারের পায়ে ফোটার সামিল। জানিস?

বাদা রাজ্যের বোকাসোকা মানুষ সূদন, খুব বেশি বিচলিত হল মনে হয় না। বলে, চন্দ্র-সূর্যি যা-ই হোন হুজুর মশায়রা, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি। নতুন ছাঁটের গরু আপনাদের সুদ্ধ কোন খানাখন্দে নিয়ে ফেলবে, ঠেকাতে পারব না। সেটাই কি ভাল হবে মশায়?

প্রমথর মেজাজ খাদে নেমে এলো: তাহলে কি করব বাবা, উপায় একটা কর। চৌধুরিগঞ্জে যেতেই হবে, বড্ড জরুরি কাজ। অত ভাড়া কবুল করলাম তো সেইজন্যে।

সূদন একটু ভেবে বলে, আছে একজন আমাদের বাড়ি। জগন্নাথ তার নাম। মেজাজ-মরজি ভাল থাকলে সে দিয়ে আসতে পারে। ধাঁ করে পৌঁছে দেবে, তার মতন গাড়িয়াল এ পাইতল্লাটে নেই। এইখানে থাক একটু তোমরা, বাড়ি গিয়ে তাকে বলে কয়ে দেখি। গরু দুটো রইল, ভয় কি তোমাদের?

যাত্রার বায়না বিষম মন্দা এখন। পেয়াজের ঘরে জগা বিনা কাজে একলা বসে ছিল। অত দরের মানুষ দু'টি বিপাকে পড়েছে—শুনতে পেয়ে দ্বিরুক্তি না করে সে রাস্তায় ছুটল। গরুর কাঁধে জোয়াল তুলে দিল: ডা-ডা ডা-ডা—গরু তুই ভেবেছিস কোনটা? হুজুরদের জরুরি কাজ। চাঁদ উঠবার আগে সাঁইতলার খাল পার করে দিবি। নয়তো ছাড়ান নেই।

গাড়ি চলেছে, চলেছে। মাঠ ছেড়ে জঙ্গলে এলো। খানিকটা জায়গা হাসিল হয়নি এইখানে। না হলেই বা কি—কাঠকুটো বেচেও পয়সা। বাদাবনের এই বড় মজা। যেমন-কে-তেমন বন রেখে দাও, পয়সা গণে দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে যাবে। হাসিল করে নোনা জলে বুড়িয়ে রাখ, গাঙ-খালের চারা মাছ এসে আপনি জমাবে। কঠিন বাঁধের ঘেরে নোনা জল ঠেকিয়ে রেখে লাঙল নামাও, লক্ষ্মী ঠাকরুন সোনার ঝাঁপি উপুড় করে ক্ষেতময় ধান ঢালবেন, তাড়া অভাবে তার সিকির সিকি কম নেই।

দু-পাশে জঙ্গল, গরুর গাড়ি চলেছে নতুন মাটির রাস্তার উপর দিয়ে। ডালপালা ছাতের মতন মাথার উপরে। আকাশে চাঁদ নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

রাস্তাও যেমনি এই দিকটায়। উঠছে, উঁচুমুখো উঠে চলেছে—স্বর্গধামে নিয়ে তোলবার গতিক। হুড়মুড় করে তৎক্ষণাৎ আবার পাতালের তলে পতন। ভেঙে চুরে গাড়ি উলটে পড়ে না, লোহা দিয়ে ধুরো বানানো নাকি?

নিবারণ সুমিষ্ট স্বরে বলেন, পথ ভুল করে পর্বতে ওঠোনি তো বাবা? দেখ দিকি ঠাহর করে।

আর প্রমথ হালদার গর্জন করে উঠলেন, কোথায় আনলি? হাড়-পাঁজরার জোড় খুলে মারবি নাকি রে হারামজাদা?

গালিগালাজে জগার স্ফূর্তি আরও বেড়ে যায়। কানের কাছে মধুকণ্ঠে যেন তার তারিপ হচ্ছে। হি-হি করে হেসে বলে, গরুর খাবার খড় রয়েছে পিছন দিকে। আঁটিগুলো টেনে গদি করে নিয়ে গতর এলিয়ে দিন। ঝাঁকুনি লাগবে না, আয়েসে ঘুম ভেঙে যাবে।

সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রমথ নির্নিরীক্ষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন, রাত দুপুরে কোন অজঙ্গি জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেললি, পথ বলে তো মালুম হয় না। সে বেটা গাড়িতে তুলে মাঝপথে চম্পট দিল। ভাড়ার লোভে ভাঁওতা দিস নে—সত্যি কথা বল, পথঘাট চিনিস তো সত্যি সত্যি?

জগন্নাথ বলে, বাদা রাজ্যি হুজুর ফুলতলার মতন বাঁধা শড়ক কোথা এখানে? এ-ও তো ছিল না এদ্দিন। সাপ-শুয়োরের চলাচলে পথ পড়ত, তাই ধরে আমরা যেতাম?

প্রমথর সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে: বলিস কি, সাপ-শুয়োর খুব বেরোয় বুঝি?

জগা বলে, ওরা তো সামান্য। বড়রাও আছেন। রাতের বেলা নাম করব না হুজুর।

জঙ্গল আরও এঁটে আসে। রাত্রিচর পাখির ডাক। গাছগুলো জোনাকির মালা পরেছে। পাতায় ডালে হাওয়া ঢুকে অনেক মানুষের ফিসফিসানির মতো শোনা যায় চতুর্দিকে।

সজোরে গরুর লেজ মলে জগা চেঁচিয়ে ওঠে: ডা-ড'-ডা-ডা—নড়িস নে যে মোটে? বেতো রুগি হলি নাকি ম্যানেজার?

প্রমথ হালদার নিজের চিন্তায় ছিলেন। চমকে উঠে বললেন, ম্যানেজার কাকে বলছিস রে হতভাগা?

জগা ভালমানুষের ভাবে বলে, গরুর নাম হুজুর। মানুষজন কেউ নয়। এই ডাইনের ইনি। খেয়ে খেয়ে গতরখানা বাগিয়েছে দেখুন। তিন মণের ধাক্কা। তোয়াজের গতর পারতপক্ষে নড়াতে চান না। শুয়ে শুয়ে খালি জাবর কাটবেন আর লেজে মাছি তাড়াবেন। পিটুনি দিই হুজুর, আবার ম্যানেজার বলে তোয়াজও করি। যাতে যখন কাজ হয়।

নিবারণ শুনে ফিক ফিক করে হাসে। রসটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। বলে বড্ড কাজিল তুই তো ছোঁড়া। ম্যানেজার হলেই বুঝি গায়ে-গতরে হতে হবে? ক'টা ম্যানেজার দেখেছিস তুই শুনি?

জগা সঙ্গে সঙ্গে বলে, দেখব কোথায় হুজুর? সে সব ভারি ভারি

মানুষ বাদাবনে কি জন্ম মরতে আসবেন? ম্যানেজার দুরস্থান। চাপরাশিই বা ক'টা দেখেছি? এদ্দিন বাদে মানুষের গতিগম্য হওয়ায় এখনই যা একটি দুটি আসতে লেগেছেন। বাঁয়ের এই এনারে দেখছেন, রোগা প্যাঁকাটি পাঁজরার হাড় গণে নেওয়া যায়—কিন্তু ছোটে একেবারে রেলের ইঞ্জিনের মতন। চুঃ-চুঃ! চাপরাশি ভাই, অত ছুটলে ম্যানেজার পেরে উঠবে কেন? মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

অর্থাৎ ডাইনের গরু ম্যানেজার, বাঁয়ের গরু চাপরাশি। কাউকে বাদ দেয়নি। নিবারণও অতএব চুপ। অন্ধকারে পা টেপাটেপি করছেন দু'জনে। গাড়োয়ান টের পেয়ে গেছে, একজন হলেন চৌধুরি এস্টেটের ম্যানেজার অপরে আদালতের চাপরাশি। সেই আগের ছোঁড়াই নিশ্চয় বলে দিয়েছে। মেজাজ হারিয়ে আত্ম-পরিচয় দিয়ে ফেলা উচিত হয়নি তখন। পাকা লোক হয়ে এই বিষম কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন, তার জন্ম মনে মনে পস্তাচ্ছেন এখন। গাড়োয়ান কৌতুক করে গরু দুটো এঁদের দুই নামে ডাকছে। তা সে যা-ই করুক, কানে তুলা আর মুখে ছিপি আঁটলেন আপাতত। ভালয় ভালয় চৌধুরি-আলায় পৌঁছানো যাক, তার পরে শোধ নেওয়া যাবে। পথের মাঝখানে এখন কিছু নয়।

চলেছে, গাড়ি চলেছে। এক সময় প্রমথ বললেন, দু-ঘণ্টায় পৌঁছে দেবে বলেছিলে কিন্তু বাবা—

ঘাড় নেড়ে জগা সজোরে সমর্থন করে, দেবোই তো—

ম্যানেজার দেশলাই জেলে বিড়ি ধরালেন। অমনি ট্যাঁক থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে নিলেন: এগারোটা বেজে গেছে—

জগা বলে, কলের ঘাড় যদি লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটে। গরু তার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন হুজুর?

কথার তুবড়ি, জবাব দিতে দেরি হয় না। নিবারণের ধৈর্য থাকে না। খিঁচিয়ে উঠল: একের নম্বর শয়তান হলি তুই।

পরম আপ্যায়িত হয়েছে, এমনি ভাবে দন্ত মেলে জগা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, সবাই বলে থাকে এটা। আপনারাও বলছেন।

নিবারণের গা টিপে প্রমথ হালদার থামিয়ে দিলেন। বলেন, ভালই তো। দেরি তাতে কি হয়েছে। দিব্যি ডাঙায় ডাঙায় যাচ্ছি—জলে পড়ি নি তো। খাসা আমুদে লোক তুমি বাবা, হাসিয়ে রসিয়ে কেমন বেশ নিয়ে যাচ্ছ। চৌধুরি-আলার একটা লোক কিন্তু বলে এসেছিল, কুমিরমারির নতুন রাস্তায় ডাঙাপথে দু-ঘণ্টা হদ্দ আড়াই ঘণ্টার বেশি লাগে না।

কে লোক—অনিরুদ্ধ?

তাকেও চেন তুমি? বাঃ বাঃ, সবই দেখছি চেনাজানা তোমার। কিন্তু দু-ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা হতে চলল, পথ ঠিক মতো চেনা আছে তো? মানে বড্ড আঁধার কিনা, আর চলেছ জঙ্গল-জাঙাল ভেঙে—

জগা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, আমি ভুল করলেও গরু কখনো ভুল করবে না হুজুর। কত ধান বওয়াবয়ি করেছে, ছেড়ে দিলে চরতে চরতে কত দূর অবধি চলে যায়, পথঘাট গরুর সব নখদর্পণে থাকে।

সশঙ্কে নিবারণ বলে ওঠে, কী সর্বনাশ! সে ছোঁড়া তো জরের নাম করে বাড়ি গিয়ে উঠল। তুই তবে কি গরুর ভরসায় এই রাত্রে আমাদের বাদার পথে ঘোরাচ্ছিস?

আজ্ঞে হুজুর, ভয় করবেন না। মানুষের চেয়ে গরুর বুদ্ধি বেশি। চাপরাশি ছটকো মতন আছে, তার কথা বাদ দিলাম। কিন্তু এই ম্যানেজারটি হলেন ভারি সেয়ানা—দেখেশুনে হিসেব করে চরণ ফেলে। পিটিয়ে খুন করে ফেলেন, কিছুতে বেপথে যাবে না। এক কাজ করেন আপনারা—এক এক আঁটি খড় মাথার নিচে বালিশ করে নিয়ে ঘুম দেন। উতলা হবেন না, ভাবনা করবেন না। আলার উঠোনে হাজির হয়ে আপনাদের ডেকে তুলে দেব। বলে মনের স্ফূর্তিতে জগা গান ধরে দেয়—

ও ননদী পোড়াকপালি,
মিথ্যে বলে মার খাওয়ালি?
আসুক তো শ্বশুরের বেটা,
বলে দিব তারে—
ভাত-কাপড় না দিবার পারে,
বিয়া কেন করে?

প্রমথ ডাকছেন, শোন বাপধন—

কলি কয়েকটা সমাধা করে থেমে গিয়ে জগা বলে, কি?

বলছি কি, চুপচাপ চলো। গান-টান আলায় গিয়ে হবে।

জগা বলে, ভাল লাগছে না হুজুর? আমার গানের সবাই তো সুখ্যাতি করে।

খুব ভাল লাগছে। ভারি মিঠে গলা তোমার। তবে ঐ যে বললে, এ পথে আরও অনেকের চলাচল। রাতে নাম করতে নেই, তাঁরাও সব ঘোরাফেরা করেন। দরকার কি, গান শুনতে তাঁরা যদি গাড়ির কাছ ঘেঁসে আসেন।

এবারে জগা রীতিমতো ধমকে উঠল: বাদাবনে আসতে গেলেন কেন হুজুর? পাকা ঘরের ঘেরের মধ্যে মেয়েমানষের মতো ঠ্যাং ধুয়ে বসে থাকুন সেই তো বেশ ভাল। ভরদ্বাজ মশায় কিন্তু এদিক দিয়ে ভাল। বনবাদাড় গ্রাহ্য করে না, একলা চরে বেড়াতে ভয় পায় না রাত্তির বেলা।

প্রমথও চটেছিলেন কি-একটা জবাব দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। ভারি যেন রসিকতার কথা—হেসে উঠলেন তেমনি ভাবে। বললেন, ভরদ্বাজকেও জান তুমি? খাসা লোক তুমি হে—দুনিয়ার সঙ্গে ভাবসাব, সব কিছু জানাশোনা!

ঢাকের আওয়াজ আসছে। আওয়াজ মৃদু—অনেকটা দূর বলেই। জগা বলে, শুনতে পাচ্ছেন? কালীতলায় পুজো দিচ্ছে কারা।

প্রমথ বলেন, জায়গাটা কোথায়?

একেবারে কয়ালী গাঙের উপর। আসল সাঁইতলা—সাঁইয়ের যেখানটা আসন ছিল। আপনাদের চৌধুরি-আলা ওর লাগোই পেয়ে যাব। গরু তবে ভুল পথে আসেনি, বুঝতে পারছেন?

প্রবল উৎসাহে গরু দুটোর পিঠে পাচনির খোঁচা দিয়ে জগা জিভে টক্কর দেয়: টক-টক। চল সোনামানিক ভাইরা আমার, টেনে চল দিকি পথটুকু—

হুড়মুড় করে, পড়বি তো পড়, গরুর গাড়ি একেবারে জলের মধ্যে। ছিটকে উঠল জল—মুখে-চোখে কাপড়ে-জামায় জল এসে পড়ল। প্রমথ শুয়ে পড়েছিলেন একসময় গামছার পুঁটুলি মাথার নিচে গুঁজে দিয়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

কোথায় এসে ফেললি রে?

পথে জল জমেছে সন্দ করি।

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রমথ বলেন, দু-মাসের ভিতর আকাশে এক কুচি মেঘ দেখলাম না, জল জমবে কেমন করে? কি গেরো, জোম অথই সমুদ্দুরের মধ্যে এনে ফেলেছিস—এখন উপায় কি বল?

জগন্নাথ ইতিমধ্যে লাফিয়ে পড়েছে। জল সামান্য, কিন্তু হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে গেল। নোনা কাদা—সমস্ত রাত্রি এবং এক পুকুর জল লাগবে পায়ের এই কাদা ছাড়াতে। এদিক-ওদিক ঠাহর করে দেখে সে হেসে উঠল: সমুদ্দুর নয় আজ্ঞে, খাল। এর পরে আরও একটা খাল—সাঁইতলার খাল যাকে বলে। প্রায় তো বাড়ি এনে ফেলেছে।

আবার কৈফিয়তের ভাবে বলে, নতুন রাস্তা তেলিগাঁতি হয়ে গেছে। অনেকখানি ঘুর-পথ। খালের উপর পুল বানাচ্ছে, এখনো হয়ে যায় নি। ম্যানেজার তাই বোধ হয় ভাবল, খাল ভাঙতে হবে তো একেবারে সোজাসুজি গিয়ে উঠি। বড় কাস যখন ডাইনে নেমে পড়েছে, গানের মধ্যে অত শত ঠাহর করতে পারিনি।

নিবারণ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে: বেশ করেছে। রাত দুপুরে গামছা পরে খাল সাঁতরাতে হবে কিনা, সেইটে জিজ্ঞাসা কর এবার তোর ম্যানেজারকে।

জগন্নাথ অভয় দেয়: নির্ভাবনায় বসে থাক চাপরাশি ভাই। ম্যানেজার মশায় নড়াচড়া কোরো না—ওজনে তারিফি কি না, নড়াচড়ায় চাকা বসে যাবে। গরু যানকে মস্তন বেয়াক্কিলে নয়। এনে ফেলেছে যখন, ঠিক ওপারে নিয়ে তুলে দেবে।

[ক্রমশঃ।

ছবি

শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য্য

আমরা ঘরে ঘরে বড়লোকদের ছবি ঝুলানো দেখিতে পাই। এখানে প্রশ্ন এই যে, আমরা এ সকল লোকের ছবি ঝুলাইয়া রাখি কেন? তাহার এক মাত্র উত্তর এই যে, আমরা এ সকল লোককে তাঁহাদের জীবদ্দশায় শ্রদ্ধা করিতাম। ছবি তাঁহাদের প্রতীক, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের ছবি আমাদের ঘরে ঝুলাইয়া রাখি। মহাপুরুষদের জীবন আমাদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে, সেই জন্যই আমরা তাঁহাদের ছবি ঘরে টাঙাইয়া রাখি।

আমরা শুধু মহাপুরুষদের ছবিই ঝুলাইয়া রাখি না। আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর, সুন্দর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের ছবিও ঝুলাইয়া রাখি। কোন জলপ্রপাতের, পর্বতের বা সমুদ্রের ছবিও ঝুলাইয়া রাখি। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব উপলব্ধির জন্য আমরা এ সকল ছবি ঝুলাইয়া রাখি।

কখনও আমরা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার ও ভীষণ সর্প প্রভৃতির ছবি ঝুলাইয়া রাখি। কখনও বা প্রস্ফুটিত পদ্মের বা গোলাপের ছবি ঝুলাইয়া রাখি, তাহাও আমাদের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত।

ছবিমাত্রই বাস্তবের প্রতীক। এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, ছবিতে আমরা বাস্তবের কতটা আভাস বা বোধ পাই? বাস্তব আর প্রতীক কি একই? কালীর ছবি, আর কালী দেবী কি একই? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি কি একই? সেইরূপ মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু, আর তাঁহাদের ছবি কি একই? এক যে নয়, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, কারণ বাস্তব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র বসু আর ইহজগতে নাই। যদিও কেহ কেহ বলেন যে, সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন, তথাপি জগদ্বাসী অধিকাংশের মতানুসারে তাঁহাকে মৃত বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

অনেকে ঘরে পিতামাতার ছবি ঝুলাইয়া রাখেন, শুধু ঝুলাইয়াই রাখেন না, অনেকে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদের ছবির পূজাও করেন। কেহ বা গুরুর ছবি বা পাদুকা পূজা করেন। ছবির পূজা করিতে পারিলে মূর্তিরও পূজা [illegible] জল, অর্ঘ্য ও আকৃতি প্রতিফলিত হয়, মূর্ত্তিতে তদুপরি অবয়ব সংস্থানও প্রদর্শিত হয়। মূর্ত্তি ছবির চেয়ে বেশী বাস্তব বা জীবন্ত হয়, কারণ বাস্তবের সঙ্গে মূর্ত্তির ছবির চেয়ে বেশী সাদৃশ্য থাকে।

যে মানুষ মরিয়া যায়, তাঁহার আত্মা কি তাঁহার মূর্ত্তি বা ছবিকে সঞ্জীবিত করে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত ছবি আছে বা মহাত্মা গান্ধীর যত ছবি আছে, প্রত্যেকটিই তাঁহাদের স্মারক। সুতরাং ঐগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বা মহাত্মা গান্ধীর আত্মাদ্বারা সঞ্জীবিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু যখন কোন চিত্রকর নিজ কল্পনা বলে ভীষণ সিংহ বা ব্যাঘ্রের ছবি অঙ্কিত করেন, কিংবা ঐ চিত্রকরই যখন কল্পনাবলে সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মের সন্নিধানে কোন রাজহংসের চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন ঐ চিত্র কতটা বাস্তব হইতে পারে, তাহা বলা কঠিন ব্যাপার! কারণ চিত্রিত পদ্মে বাস্তব পদ্মের পেলবতা ও শীতস্পর্শ নাই। তথাপি চিত্রিত পদ্ম বাস্তব পদ্মেরই প্রতীক, এতদ্ব্যতীত উহা বাস্তব চিত্রকর কর্ত্তৃকই চিত্রিত হইয়াছে। হউক উহা চিত্রিত বা কল্পিত, তথাপি উহা বাস্তবেরই প্রতীক। চিত্রিত রাজহংস বা পদ্ম রাজহংস বা পদ্মেরই দ্যোতক বা সূচক, উহা অন্য কোন বস্তুকে বুঝায় না। সেইরূপ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী বা সুভাষচন্দ্রের ছবি ঐ ঐ ব্যক্তিকেই বুঝাইবে, অপর কাহাকেও বুঝাইবে না। এইরূপে দেবদেবীর মূর্ত্তি বা ছবি ঐ ঐ দেব দেবীকেই বুঝাইবে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বা কোন পশুর মূর্ত্তি বা ছবি সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। দ্যোতক দৃশ্যকে বুঝায়—প্রতীক বাস্তবকে বুঝায়, সুতরাং দ্যোতক বা প্রতীকের মধ্যে একটা প্রাণশক্তি আছে, নতুবা উহা দৃশ্য বা বাস্তবকে বুঝাইবে কেন? অতএব ছবি বা মূর্ত্তিমাত্রই প্রাণবন্ত। সেইজন্যই আমরা দেবদেবীর মূর্ত্তি বা ছবিকে কিংবা মহাপুরুষদের মূর্ত্তির বা ছবির পূজা করি। তাঁহাদের পূজা করিয়া আমরা প্রাণে বল পাই। সেই সকল মূর্ত্তি বা ছবি প্রাণবন্ত ও বলবন্ত বলিয়াই তাহাদের পূজা করিয়া আমরা প্রাণবন্ত ও বলবন্ত হইয়া উঠি। সুতরাং কেহ কখনও মূর্ত্তি বা ছবিকে প্রাণহীন মনে করিবেন না।

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

তখনকার দিনে থিয়েটার কেমন হবে জানতে চেয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের কাছে, তিনি এড়িয়ে গেলেন, থিয়েটারের অবস্থা জানতে এসেছিলেন উনি, কিন্তু স্পর্শকাতরতার জন্যে কিছু করতে পারলেন না। অবশ্য তখন থিয়েটারের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। মাতালকে ওঁর ঘৃণা ছিল না, ওঁর বাড়িতেই ত কত মাতাল ছিল, তাছাড়া লোকেন পালিত ছিলেন ওঁর বন্ধু, কিন্তু Vulgarity-র জন্যেই পারলেন না।

আরে আমার কথাই ধরুন যখন প্রথম চাকরী নিলুম, ম্যানেজার বলে আমার নাম জানান হল, আমার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা, বেশ সাহস নিয়ে গেলুম প্রথম রিহার্স্যাল দিতে। গিয়ে দেখি কতকগুলো মোটা মোটা কালো কালো ঝি তাদের মধ্যে দু'চারজন যে ভাল দেখতে ছিল না এমন নয়। তবে তাদের সবাইকে দেখলেই মনে হত খুব মুখ আলগা খোলার ঘরে যারা থাকে তারাই উঠে এসেছে বুঝি। নতুন ম্যানেজারকে দেখতে মুখ ভর্তি পান আর গা ভর্তি গয়না পরে এসে একদিকে বসে আছে: পুরুষেরা অন্যদিকে। দেখেই ত আমার বুক বিশ হাত নেবে গেল, হঠাৎ নৃপেনবাবু বাঁচিয়ে দিলেন, মাইরি কু একটা পান দে ত' বলে যেই ঢুকেছেন আমিও তেড়ে উঠেছি, তুমি কে বট হে? চাকরী রাখতে চাও না চাওনা, চাও ত সরে পড়। ব্যস, ঐ ঘটনার পরই আমার দাম বেড়ে গেল।

দ্বিজবাবুর সঙ্গে মঞ্চের কারোরই গভীর যোগ ছিল না; কাউকে শেখাননি, শুধু দানীবাবুকে সাজাহান আর চন্দ্রগুপ্তে কিছুটি নড়াচড়া করতে শেখালেন।

বোধহয় ডা: অধিকারী বললেন, দানীবাবু বলেছিলেন বাপী তাঁকে শিখিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—দানীবাবু, যদি বলে থাকেন বাপী শিখিয়েছেন তাহলে ভুলে বলেছেন, বাপের কাছে কখনো শেখেননি! তবে বাপকে খুব ভক্তি করতেন।

দানী বাবুর একটা মস্ত গুণ ছিল, শিক্ষিত লোক দেখলে মুখ বন্ধ করতেন, কিছুতেই আর খুলতেন না। ওঁর গাঁজা খাওয়া অভ্যেস ছিল। (উনি তখন আমার কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে) বিশুকে চুপি চুপি ডেকে বলছেন, ভায়া আমি ওই কোণে (কোণের urinal-এর পাশে) যাবো আর ওই ছেলেটা ধরিয়ে দেবে এখন।

—বিশু শুনে বললে, বেশ ত আপনি খান ত, ঘরেই ব্যবস্থা করে দেব'খন।

তাড়াতাড়ি তখন বলছেন, না ভায়া, ওখানে কত শিক্ষিত লোক আছে, কে আমায় কি ভাববে, উনি বড় একটা খিস্তি করতেন না, কেবল সামান্য দু'একটা কথায় মাত্রা ব্যবহার করতেন। ওঁর নামে বদনাম যে রটিয়েছিল তাকে আমি চিনি। ওই যে মস্ত বড়—

—হ্যাঁ, নামটা মনে পড়ছে না, খেতে পাচ্ছিনা বলে আমার কাছে এসে কাজ নিয়েছিল।

Open Air Theatre আমাদের দেশে করা সম্ভব কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন—আমাদের দেশে Open Air Theatre হ'তে পারে না; আর ওটাত আসলে বাঁধা Theatre-এ শুধু দর্শকদের অংশ খোলা। তা তাতে আলোকের দরুণ যা খরচ হবে তাতে তিনটে থিয়েটার হতে পারে।

—অ্যাবি থিয়েটার কোনদিন ফুল না হয়ে যায়নি। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তাছাড়া, ওদেশের বড়লোকেরা ছিলেন ত, কাজেই দাঁড়িয়ে গেল।

—Experimentation করাও দরকার, তবে সেটা যাত্রার Form নিয়ে হলেই ভাল হয়।

থিয়েটার জলসা বলায় উনি বললেন—ভাল থিয়েটার করলে চলবে না। ভাল দৃশ্যপট দিয়ে ভাল অভিনয় করলে লোকে নিশ্চয়ই নেবে, তার পর রুচি বদলাতে হবে।

সংস্কৃত নাটক পড়া সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন—সংস্কৃত নাটক পড়াও দরকার। নইলে নিজেদের ঐতিহ্য জানব কেমন করে? ভাসের নাটকও বেশ ভাল জিনিষ, আমাদের অবস্থা ত ওই জন্যেই খারাপ। আমরা নিজেদের অতীতের কথা কিছুই জানি না। Wilson সায়েব মৃচ্ছকটিকের প্রশংসা করে আমাদের সত্য করে দিলেন। অথচ ওটা অনেক পরে লেখা মনে হয়, দশম শতাব্দীর হবে হয়ত। তার আগে 'বেবুশ্যের' বিয়ে বোধ হয় চলত না।

—পশ্চিম দেশে Sex-এর ওপর ঝোঁকটা বেশি। আমাদের দেশে সমাজের ভয় ছিল। দু'চার জন করেনি এমন নয়, কিন্তু ওদের মত অত preoccupied হলে আমাদের tradition এতদিন চলতে পারত না। মুনি ঋষিদের অপ্সরা সংযোগ allegory বলেই মনে হয়, সেগুলোর মূল কথা হ'ল যতই আত্মনিগ্রহ কর না কেন কামকে জয় করা মোটেই সহজ নয়।

২১শে আগষ্ট এসে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের শেষ অংশটা পড়লেন। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের শেষের দিকে যে ব্রাহ্মণকে আনা হয়েছে সে সম্বন্ধে বললেন—ওকে আনা হয়েছে একটি যুগের শেষ বোঝাতে।

কৃষ্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূত্রপাত করলেন কিন্তু (যুদ্ধ শেষে) যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে বসিয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে পারলেন না। ফিরে গিয়ে দেখলেন যত পাপ সব এসে যদুবংশে জড়ো হয়েছে। সেই পাপ দূর করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অর্জুনেরও ক্ষমতা গেল। তাঁর চোখের সামনে যদুনারীদের কেড়ে নিয়ে গেল।

যুধিষ্ঠির খবর পেয়ে বললেন, ভায়া, আমাদের সময় আর নেই, এবার অভিমন্যুর ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে সরে পড়ি। তাই গেলেন তাঁরা।

শিশিরবাবুরা চরিত্রের সমগ্রতার ধারণা করে অভিনয় করতেন

বটে, কিন্তু সমগ্রতার ধারণা তাঁরা রাখতেন না, দৃশ্য থেকে দৃশ্যেই অভিনয় করতেন। Productionএর সমগ্রতার ধারণা নিয়ে প্রথম নাটক আমরাই করি—পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। তখন অপরেশবাবুর আর্ট থিয়েটার বাট টাকায় ভাড়া নিতে হয়েছিল, আমি তখন মদনের চাকরী নিয়েছি, রিহার্স্যাল দেখে ভাল মনে হল না তাঁদের, দিলেন গোলমাল বাধিয়ে।

আগেকার দিনে গিরিশবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবু আর অমৃত বোস ছাড়া বাকী সবাই চরিত্র সম্বন্ধে কিছু না ভেবেই হাততালি পাবার জন্যে অভিনয় করতেন, একবারকার benefitএ অমর দত্ত যোগেশ করছেন। আমি আর যতে রায় অনেক কষ্টে দু' টাকার টিকিট কিনে একটাকার সিটে বসেছি, অমর দত্ত এক জায়গায় সংলাপ বলছেন, ভাবনা আমার···যাদব, যাদব বলতে গিয়ে হঠাৎ গলা চড়ালেন। যতেটা ছিল cantankerous সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মাধব, তারপর লোকেরা এই মারে ত এই মারে, তাকে বার করে এনে সব ঠাণ্ডা করি।

হাততালি দিলে নটরা হাত তুলে নমস্কার করতেন, তবে ওই আগের তিনজন ছাড়া। নৃপেনবাবুর ওই দোষটা বড় বেশি ছিল।

অমরবাবুর মত দানীবাবুও অভিনয় ভাল করতেন না, তবে কণ্ঠস্বর ছিল অপূর্ব। গিরিশবাবুর পরেই তাঁর গলা, অমত মিত্র মশায়ের গলাও ভাল ছিল, তবে নড়াচড়া করতেন না দানীবাবু অবশ্য শরীরটা একটু বাঁকাতেন, তবে সব চরিত্রে একই রকম করতেন বলে মোটেই মানাত না, তাছাড়া পোষাক পরা সব চরিত্রে—সিরাজ, মীরকাশিম, ছত্রপতি—এক ধরণের অভিনয় করতেন, চরিত্রগুলোর পোষাকও হত এক রকমের। এক শঙ্করাচার্যের বেলায় কিছুটা আলাদা, গিরিশবাবু ওই ভূমিকাটা করার আগে ছেলেকে কাশী নিয়ে গিয়েছিলেন।

গল্প আছে, গিরিশবাবু একবার ছেলেকে বলেছিলেন—কাল কি বই করছিলি রে—ঐ (একটি সামাজিক বইয়ের একটি চরিত্রের নাম করে) না সিরাজ ?

দানীবাবু উত্তর দিলেন, সবাই কী সব পারে ?

তবে অশিক্ষিত দর্শকদের জমিয়ে দেবার কায়দা গিরিশবাবু খুব ভাল জানতেন, দানীবাবুও কিছুটা পারতেন, অশিক্ষিত পটুত্ব কিছুটা ছিল তাঁর। আর কি দম, একটানা বাইশ তেইশ লাইন বলতে পারতেন।

দানীবাবু অভিনয় করতে শেখেন দ্বিজুবাবুর কাছে, ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে প্রথম, অবশ্য তাঁর (দ্বিজুবাবুর) চরিত্রের conception আর আমার conception-এ অনেক তফাৎ ছিল, চাণক্য করার প্রথম দিন সকালে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে এসেছিলুম, তবে তর্কাতর্কিই হ'ল।

উনি বললেন, কাত্যায়ন একটি fool (হয়ত নাটকের দিক থেকে প্রয়োজন নেই বলে বলেছিলেন)।

তা' আমি বললুম, কি করে হবে। চাণক্যই ত বরং সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী ধরণের পায়ে কুশ ফুটেছিল বলে একটি বিতিকিচ্ছিরী কাণ্ড করলে, তাকে সভায় নিয়ে এসে অপমান করিয়ে প্রতিহিংসার কথা খুঁচিয়ে তুললে কে ? মুরাকে চন্দ্রগুপ্তের সামনে অপমান করাল কে ? সেলুকাসকে আনালে কে ?

তবে কাত্যায়ন চরিত্রের দুর্বলতা হ'ল, কোন একটি জিনিষ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবার ক্ষমতা ছিল না তার, সে ক্ষমতা ছিল চাণক্যের। আর চাণক্য ত মিথ্যে কথা বলত না, মেয়েকে পেয়ে বললে, আমি চলে যাব, কিন্তু তুমি তোমার সুযোগ্য মন্ত্রীর সাহায্যে সুখে রাজ্য শাসন কর, ভয় নেই। কাত্যায়ন fool হ'লে কি বলতে পারত ?

দ্বিজু বাবু শুনে বললেন, খুব ভেবে পড় ত ! ওঁর লেখার খুব একটা ভাল কিছু ছিল না মনে একটা ধারণা ছিল, আমার লেখা কেউ বুঝবে না, কাজেই যাতে জমে যায় তাই করাই ভাল।

আমি যখন প্রথম চাকরীতে ঢুকি, তখন কোনোদিক থেকে সাহায্য পাইনি, দলের লোকেরা তাড়াতে বদ্ধপরিকর, কিন্তু ভাগ্য ভাল ছিল, প্রথম রাত্রিতেই জমে গেল।

কাগজওয়ালারা প্রথম দু'তিন বছর আমাকে কোন আমলই দেয়নি বরং উল্টে গালাগাল দিয়েছে। অন্য থিয়েটারের কর্তারা আমাকে ভাগাতেই চাইত, তাছাড়া মদন কোম্পানী আবার বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দিত না।

'ছ'—একদিন নেশার ঘোরে একটি ভাল কথা বলেছিল। (ওই যে ভুঁড়িওয়ালা জমিদার, কি নাম যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, গোপিকারমণ, আমরা বলতুম ধোপিকাদমন, তার ওখানে)। ওর তখন বেশ নেশা, বললে—শিশির ভাদুড়ি, তাকে আমরাই তুলেছি, আবার আমরাই নাবাবো। কথাটাতে exaggeration থাকলেও কিছুটা সত্যি বটে।

আমার প্রথম প্রশংসা করে 'নাচ ঘরে' মণিলাল। আর লিখে না হলেও, প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন দীনেশ সেন। অবশ্য ফল তাতে ভাল না হয়ে খারাপই হয়েছিল।

শিবপুরে একটা মিটিংএ (হরিগোপালের ক্লাব গোবর্দ্ধন নাট্য সমাজে) প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে সুখ্যাতি করেছিলেন। প্রথমে আমাকে আবৃত্তি করতে বললেন, আমি তখনও আবৃত্তি করা ছাড়িনি, কাজেই একটা (বোধহয় পঞ্চনদের তীরে) আবৃত্তি করলুম। তারপরেই উনি বক্তৃতা করতে উঠে রামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলেন। এক জায়গায়—গাভী যেমন বৎসকে লেহন করে তেমনি রাম চোখ দিয়ে লবকে লেহন করেছেন—বলায় খুব হাসির রোল পড়ে গেল। উপমাটা অবশ্য খুব ভুল দেননি।

ওঁর একটা নাটক (নাম ত্রিবঙ্কঈশ্বর—ত্রিবাঙ্কুরের এক শিব-মন্দির নিয়ে লেখা, বেশ ভালই হয়েছিল। তা' আমি বললুম, বদলে দিন। উনি বললেন, তুমিই নাওনা লিখে, তাতে আমি বললুম, সে আমি পারব না।) হারিয়ে ফেল'। উনি কিন্তু শুনে বললেন, ও কিছু নয়, অমন আমার কত গেছে।

দীনেশবাবুর ছেলে অরুণ একটা উপন্যাস লিখেছিল, পড়ে বেশ ভাল লেগেছিল, বললে, ছাপলে পয়সা হবে ? বললুম, হবে। তা' আমাকে দেয়নি।

অরুণ বোকার মত রিটায়ার করলে। স্কটিশচার্চ কলেজের সাহেবেরা বারণ করেছিল, বলেছিল, ও কাজ করো না, তা শুনলে না। ওর ছেলে সময় শুনলুম মঞ্চোয় আছে, এই মঞ্চোর সঙ্গে জোড়টা ভাঙা দরকার।

লোকে বলে, রবীন্দ্রনাথ নাকি মঞ্চের জন্যে ভুজঙ্গেক কি করতে চেয়েছিলেন আমরাই দিইনি, কথাটা সত্যি নয়।

রবি বাবু খুব একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন না, ওর চেয়ে অবন বাবু অনেক ভাল অভিনয় করতেন, রবি বাবু যে ভূমিকাতেই নামুন না কেন, সব সময়েই মনে হ'ত রবি বাবুকে দেখছি।

একজন বললে—কেন, বিসর্জনে রঘুপতি? হাসলেন—ও ভূমিকার কথা আর ব'ল না ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে। রঘুপতির পাজামা আর পাঞ্জাবী পরা চেহারা!

ডাকঘরের কথা উঠল, বললেন—ডাকঘরের প্রথম অভিনয় দেখেছিলুম, বিচিত্রা ভবনের মেঝেয় বসে। অবন বাবুর ঘরোয়া বইটিতে আছে, অবন বাবু নন্দলালকে ঘরের চালে লাউ ঝুলিয়ে দিতে বলেছিলেন এই বইটিতেই। মোড়লের ভূমিকায় অবন বাবু সত্যি ভাল অভিনয় করেছিলেন, আর রবি বাবু এলেন, কারো বুঝতে ভুল হ'ল না—রবি বাবু এলেন।

সাধারণ ভাবে থিয়েটারের কথায় বললেন—থিয়েটারকে ভাল বাসতে পারা চাই ত? সে ভালবাসা ছিল গিরিশ বাবুর। অমর দত্তকে সোমবারের মধ্যে আড়াই হাজার টাকা জমা দিতে হবে, নয়ত ক্লাসিক থিয়েটার থেকে উৎখাত করবে। শনিবার পর্যন্ত নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে টাকা আর যোগাড় হ'ল না। খবর পেয়ে গিরিশ বাবু ডেকে পাঠিয়ে বললেন, এত জায়গায় ঘুরেছ আর আমার কাছে আসতে পারনি? এই নাও টাকা যখন পারো শোধ দিয়ো, না পারো দিয়ো না; কিন্তু সোমবার সকাল দশটার সময়েই যেন টাকাটা জমা পড়ে। থিয়েটারকে আগে বাঁচাও. হীরেন দত্তর ছেলে নাকি কথাটা লিখেছে, কিন্তু লোকের কী নজরে পড়েছে?

গিরিশ বাবু সম্বন্ধে এত কথা জানি যে দু'শ' পাতার একখানা বই হ'তে পারে। কিন্তু লিখবো কখন? বই যা দরকার দেবে কে? আর যে ক'মাস লিখবো, সে ক'মাসের খরচ চলবে কি করে আমার?

গিরিশ বাবুকে মাতাল চরিত্রহীন বলে, কিন্তু তাতে কী তাঁর বৈশিষ্ট্য যায়? হীরালাল বাবুর মুখে গল্প শোনা, একদিন একজন মাতাল থিয়েটারে খুব হল্লা করছে। শুনে গিরিশ বাবু বললেন, ডেকে আন ত খানকীর ছেলেদের (মুখ বড় খারাপ ছিল ওঁর: প্রায় কথাতেই একটা মাত্রা জুড়ে দিতেন) তারা এলে পরে বললেন, আমি মদ খেলে মাতাল, না খেলে গিরিশ ঘোষ। মদ না খেলে তো বেটারা (একটা মাত্রা জুড়ে) কে?

ছবি এবার সম্বর্দ্ধনা পেলো, তা ভালই হয়েছে। অভিনয়ও ভালই করে। ছবি রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা বলেছে বুঝি! ভাবছে খুব বড় কথা বললুম, কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত করলে কোনও জিনিষ কি ভাল হয়? রাশিয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত করে ভাল সাহিত্যই মরে গেল, এ সম্বন্ধে আমার একটা প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে আছে, কিন্তু ছাপবে কে?

এই সম্মান আমাকেই প্রথমে দিলে, আমি গোড়ায় রাজি হইনি। শেষ পর্যন্ত সতীশের (অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ) কথায় রাজী হলুম, তাছাড়া একটা লোভও হয়েছিল; আর লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মানে তিন চার লাখ টাকা দেবে বলেছিল, সবই প্রায় ঠিক, 'শ্রীরঙ্গম' নাম মেনে নিল, agreementও ready হঠাৎ একটি ফ্যাকড়া উঠে সব বানচাল হয়ে গেল।

যাবার সময় শেষ কথা বললেন—আমায় একটি বাড়ি দাও আর কিছু উৎসাহী ছেলেমেয়ে, বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

৫

বাংলা নাটকের ঠিক বিবর্তন অনুসরণ করে নাটক উনি পড়তে শুরু করেননি, গিরিশচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবেই প্রথম তাঁর দুটি বই পড়লেন। এবার অন্য কারোর বই পড়া দরকার, নিজেই বললেন একথা, কিন্তু কার বই?

নানারকম প্রস্তাব হল, শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে, রবীন্দ্রনাথের "মালিনী" পড়বেন। কথাটা কি করে বাইরে রটে গিয়েছিল, কাজেই আটাশ তারিখে যখন এলেন ঘরে তখন প্রচণ্ড ভীড়, এসে বসার পর, নজরুলের কথা উঠল, বললেন—কাজীর "বিদ্রোহী" সারা কোলকাতায় পড়ে বেড়িয়েছি। লেখাটা প্রথম বোধ হয় বেরিয়েছিল মোসলেম ভারতে নয় একটা সাপ্তাহিকে, কি যেন নাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—বিজলীতে।

তার প্রতিভা ছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যাহ্নে তাঁর গণ্ডীর বাইরে অমন করে কেউ দাঁড়াতে পারেনি, তবে তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হল কই?

সব কিছুই একটু করে করলে অথচ কোনটাই ভাল করে করলে না, বেশ ছিল আমার কাছে, ঝপাক করে গিয়ে ঢুকল প্রবোধের ওখানে, অবশ্য ওর কি অসুবিধে হচ্ছিল তা আমি জানি।

দিল্লীতে আজিজুল হক নিয়ে গিয়ে কোনরকম সাহায্য করলেন না, আমিও চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুই হল না, উত্তরবঙ্গের জমিদার দুভাই কি নাম যেন? (বুড়ো বয়েসের সঙ্গে এই হয়েছে দোষ নাম ভুলে যাই।)

ওদের মধ্যে বেঁটে কে? দুজনেই অবশ্য লম্বা, তারই মধ্যে বেঁটে যে তাকে সাহায্য করতে বলাতে, বললে, কেন করব? (এক চিত্র প্রতিষ্ঠানের নাম করে) ওরা টাকা দিচ্ছে, ওদের হয়ে করছি।

প্রশ্ন করলুম, টাকা নাও তোমরা?

বললে, সবাই যখন নেয়, আমিই বা নোবনা কেন?

দিল্লীর দরজায় দরজায় ঘুরে এই জ্ঞান হয়েছে কিছু জানেনা ওরা, ওদের না সরালে মঙ্গল নেই, তবে 'কমু'দের দিয়েও কিছু হবে না।

দেবুদার দেশ মেদিনীপুর আর মেদিনীপুরে ওর মামার বাড়ি, কিছুদিন আগে দেবুদা মেদিনীপুর থেকে ঘুরে এসেছেন। সেখানকার কে ওঁর সম্বন্ধে কি বলেছে বলায়, উনি বললেন—একটানা মেদিনীপুরে কখনো থাকিনি, গরমের ছুটিতে আর পুজোর ছুটিতে দাদামশায়ের কাছে বেড়াতে যেতুম, বাবা মারা যাবার পর মা অবশ্য ছোটদের নিয়ে ওখানে ছিলেন লেখাপড়া শেখানোর জন্যে, তা কারো লেখাপড়াই হল না। তারাকুমার পোষ্টাপিসে ঢুকে পড়ল। আমি কোলকাতাতেই থাকতুম। আর বিশুও আমার কাছেই ছিল। পনেরো থেকে সতেরো সালের ভেতর একটা ওলট পালট হ'ল।

মেদিনীপুরে থাকার সময়েই যোগজীবনদের সঙ্গে খুব ভাব হয়। ক্ষুদিরাম, যোগজীবন, বিনয়ের দাদারা সব অনেক কিছু করেছিল; পর পর তিন চারজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে মারল, সবাই ফাঁসি গেল।

বিনয়কে সেদিন দেখলুম, ডেপুটী সেক্রেটারী হয়েছে। তাকে বললুম, তোমরা সব জোলো হয়ে গেছ। মেদিনীপুরের ছেলেদের আগে কিছু পদার্থ ছিল এখন আর কিছু নেই। আবার সব 'কমু' হচ্ছে।

ছেলেমেয়েদের স্কুল থেকেই নিজের মতামত গড়তে দেওয়া উচিত। আর তার জন্তে প্রচুর বই পড়তে দেওয়া দরকার।

পড়ানোর মাষ্টার আপনিই পাওয়া যাবে। আমাদের ছেলেবেলায় একটা cultural atmosphere ছিল। ছোট থেকে কত বই যে পড়েছি। আমারই শেখা হল না, কিন্তু ভায়েরা সবাই গান শিখেছিল। বিশু ত ভালই গাইত, পুতুও ভাল গাইতে পারত, কিন্তু বাইরের লোকের সামনে গাইত না, বাড়ির লোকের কাছেই গাইত।

উনিশ থেকে আটত্রিশ পর্যন্ত খুব পড়েছি। তখন সব রকম পত্রিকা নিতুম আর বইও কিনতুম। Times literary supplement থেকে ভাল বইয়ের খোঁজ পেতুম। তারপর থেকে কিছু বিশেষ পড়া হয়নি। অবশ্য ওদেশেও ভাল বই বেরোনো বহুকাল বন্ধ হয়েছে।

এবার এলেন 'মালিনী' প্রসঙ্গে, ব—লেন—মালিনী রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যেতে পারে, ওঁর আর একখানি ভালো নাটক 'তপতী'। বাকি সব কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রচলিত নাট্যধারার ছাপ ত আছেই। বিসর্জন দেখ, রাজারাণী দেখ।

উনি খুব থিয়েটার দেখতেন, তবু লোকেরা বলবে, উনি কালেভদ্রে থিয়েটার দেখেছেন। শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারে দু'চারবার গেছেন। অথচ তার উলটো প্রমাণ ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে রয়েছে।

বোধহয় চতুর্থ পত্রেই আছে পার্লামেণ্ট দেখার কথা। সেখানে উনি বলছেন, আমাদের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের ষ্টেজের দু'পাশের দরজা দিয়ে মাঝে মাঝে পোষাক পরা দু'চারজন লোক বেরোত, তাদের ভাব দেখে মনে হ'ত যেন বলছে, কি হবে তা' আমরা জানি। পার্লামেণ্টের নক্ষত্ররা অনেকটা ওই রকম ভাব নিয়ে ঘোরাফেরা করছে।

তখন মাত্র ওঁর আঠার বছর বয়স, কাজেই থিয়েটার দেখতে উনি তখন থেকেই পোক্ত ছিলেন বোঝা যায়। (আবার আমি বলছি বলে কথাগুলো হয়ত পরের সংস্করণে তুলেই দেবে।)

মালিনী বোঝা ত খুব কঠিন নয়, ওই যে 'পরমক্ষণ' বলছে প্রথমেই, ক্ষমা করো ক্ষেমঙ্করে—এখানটাই সেই পরমক্ষণ এলো আর তার প্রেমধর্ম জয়ী হ'ল। মালিনীর সুপ্রিয়র ওপর একটু ঝোঁক পড়েছে। ভালবাসা এই কথাটা জোর করে বলতে পারব না, বরঞ্চ মনে একটা ছায়া পড়েছিল এইটুকুই বলা যায়, সেটারও একটা innuendo আছে মাত্র। তবে যদি বলো মালিনী ক্ষেমঙ্করকে দেখে ভালবেসে ফেলেছিল, তবে সেটা ভীষণ ভুল করা হবে।

মালিনী অবশ্য সাধারণবোধ্য নয়, ওর যেটুকু popularity তাও কিন্তু আমার জন্যে। যে এ্যামেচার দল বইয়ের কথা জানতে এসেছে, তাকেই বলেছি দুটো নারী চরিত্র আছে, তোমরা মালিনী করো বেশ ভালো বই। উনিশশো আটত্রিশ সালেই বর্ধমান রাজ কলেজের মেয়েদের দিয়ে করালুম। উত্তরপাড়া কলেজের ছেলেদের দিয়েও করিয়েছি, তবে public boardএ হয়নি। বড্ড ছোট, দেড় ঘণ্টার বই। সবাই বললে আবার একটা শঙ্খধ্বনি হবে। শঙ্খধ্বনি বই ভাল হলে কি হবে পয়সা দেয়নি যে, তাছাড়া মালিনীর সিনটিনে হাজার চারেক টাকা লাগবে, তাই সবাই পেছিয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন বই পড়া যায়, এ সম্বন্ধে বললেন—রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী পড়া যেতে পারে, রক্তকরবী একসঙ্গে সবটা না পড়লে অসুবিধে হয়, ওই বইটার মধ্যে একগাদা idea আছে, বলতে চেয়েছিলেন মাঠে চাষ করে ফসল ফলানো, পাঁচফুল তুলে মাটি খুঁড়ে তাল তাল সোনা তোলার চেয়ে অনেক ভাল, বইয়ের শেষ কথা হল, পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে বুরোক্রেসির ওপর ওঁর যে সব ক্ষোভ ছিল তা পিলপিল করে ঢুকে পড়ল। মালিনী কিন্তু খুব ভাল নাটক হয়, কটি ভাল ছেলেমেয়ে দাও, রিহার্স্যাল দিতে দিতে তোমাদের যার যা প্রশ্ন আছে তার উত্তর পাইয়ে দেব। বাংলা নাটক অন্ততঃ পঞ্চাশখানা পড়া যায়, গিরিশ বাবুরই চল্লিশখানা আছে পড়ার মত বই। ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণ খুব ভাল বই। দ্বিজু রায়ের ভীষ্ম মোটেই ভাল বই নয়। ক্ষীরোদবাবুর ভীষ্ম অনেক ভাল, ওঁরটি মোটেই দ্বিজুবাবুর দেখে লেখা নয়। দ্বিজুবাবুর ত' অনেক পরে লেখা। একজন প্রস্তাব করলেন—ইংরেজী বই, বিশেষ করে সেক্সপীয়রের বই পড়ুন না।

উত্তরে বললেন—ইংরেজি বই পড়তে পারিনা, প্রথমতঃ দাঁতটা খুলে যায়; তাছাড়া অনেককাল পড়া অভ্যেস নেই, দম পাব না।

রবীন্দ্র রচনাবলী প্রসঙ্গে বললেন—রচনাবলী আমার মোটেই পছন্দ হয় না, ওটা চারু ভটচাজের করা।

মালিনীর পর রবীন্দ্রনাথের আর কোন বই পড়া হলনা, বলেছিলেন পরে এক সময় রক্তকরবী পড়ে শোনাবেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর মুখে রক্তকরবী পড়া ও তার বিশ্লেষণ শোনা হল না।

[ক্রমশঃ।
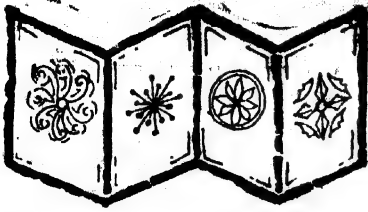
বিপ্লবী ৺সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পত্রাবলী

[ঋষি রাজনারায়ণ বসুর মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন ৺অভয়চরণ বসু। মেদিনীপুর সহরে ইঁহাদের নিবাস ছিল। অভয়চরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা ৺সুরবালা বসু। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার মধ্যম পুত্র। বীর ক্ষুদিরামের ইনি বিপ্লব-গুরু। সরকারের হইয়া বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে নরেন গোঁসাইকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। সেই অপরাধে চন্দননগরের ৺কানাইলাল দত্তের এবং মেদিনীপুরের ৺সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসী হয়। ফাঁসির মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রনাথ পত্র দুইটি লিখিয়াছিলেন। পত্র দুইটি হইতে বিপ্লবীর ভগবদ্বিশ্বাস, মাতৃভক্তি এবং অবিচলিত চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। মেদিনীপুর রাজনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসুর সৌজন্যে]।

দাদা জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুকে

১৭। ১১। ০৭, মঙ্গলবার

বেলা ৪টার পর

পূজনীয়—

দাদা বাবু

গত শনিবার আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু আসিলেন না কেন? সেদিন হইতে আপনার জন্য আশা করিয়াছিলাম কিন্তু আপনি আজ পর্য্যন্ত আসিলেন না। যাই হউক—আজ এখুনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বলিলেন যে, আপিল অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং ২১ তারিখ, শনিবার সকালে দিন স্থির হইয়াছে। অতএব মধ্যে আর মাত্র তিন দিন সময়। পত্র পাঠ আপনি একবার শেষ দেখা করিয়া যাইবেন। যেদিন আসিবেন সেদিনই দেখা হইবে। অন্য কেহ যদি দেখা করিতে চান সঙ্গে লইয়া আসিবেন। মিঃ রায়কে দেখিতে ইচ্ছা করে। যদি তিনি আসেন তবে সুখী হইব। তৎপরে দাদা! আপনার নিকট একটি অনুরোধ আছে—জানিবেন আপনার নিকট এটি আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ সেটি এই যে আপনি যেরকমই ভাবুন আমার অনুরোধ ভাবিয়া দেখিবেন যেন শেষ জীবনে এই বৃদ্ধ বয়সে মা কোন বিশেষ কষ্ট না পান। আর আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শনিবার সকালে আসিয়া কেহ লইয়া যাইবেন। ন' দিদি প্রভৃতি আসে ত ভালই। প্রার্থনাদি করিয়া যেন সৎকার করা হয়। আশা করি পত্রপাঠ একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

ইতি—

আপনার স্নেহের ভাই সত্যেন্দ্র

দিদি সুরবালাকে

১৭। ১১। ০৭, মঙ্গলবার,

শ্রীচরণেষু—

বেলা ৪টা

ন' দিদি, এখুনি সাহেব বলিলেন যে, শনিবার, ২১শে তারিখ দিন স্থির হইয়াছে। মধ্যে মাত্র আর তিন দিন সময়। শনিবার সকালে যেন দেহ লইয়া যাওয়া হয় ও বিশেষ প্রার্থনাদি করিয়া যেন সৎকার করা যায়। বিশেষ আমার বলিবার কিছু নাই কেবল তুমি, সেজ দিদি প্রভৃতির নিকট এই অনুরোধ যে সকলে মিলিয়া মাকে দেখিও—মা যেন শেষ জীবনে কোনরূপ বিশেষ কষ্ট না পান। সেজদিকে আমাদের বাড়ীতে ও মাকে লইয়া সব সময় প্রার্থনাদি করিতে বলিও। দিদিমাকে ও মামাবাবুকে আমার শেষ প্রণাম দিও। তুমি আমার ভালবাসা জানিও। আর কি লিখিব, যদি কেহ দেখা করিতে চান শুক্রবারের মধ্যে আসিলে দেখা হইবে। আজ তবে শেষ বিদায়।

ইতি—

তোমাদের

স্নেহের ভাই সত্যেন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের পত্র

১

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তোমার জন্মদিনের জন্যে তিনটে ধাঁধাঁ চেয়ে পাঠিয়েছ। কিন্তু তুমি নিজেই এমন একটি ধাঁধাঁ তৈরি করেছ যে, আমি তার কিনারা করতে পারছিনে। তোমার চিঠি যখন এল তখন তোমার জন্মদিন পেরিয়ে গেছে—তোমার সেই গেল-জন্মদিনে আবার ধাঁধাঁ পৌঁছবে কি ক'রে? তা ছাড়া আর-একটা মুস্কিল আছে—আমি অনেক রকম লেখা লিখেছি, কিন্তু জেনে শুনে ইচ্ছে ক'রে ধাঁধাঁ লিখিনি। আমার অনেক লেখা অনেক লোকে ধাঁধাঁ ব'লে মনে করে, কিন্তু সেরকম ধাঁধাঁ ত কারো ভালো লাগে না। কিন্তু রোসো—মনে পড়চে অনেক দিন আগে যখন তুমি জন্মাওনি, হয়ত তোমার মাও জন্মাননি, তখন ছেলেদের জন্যে কখনো কখনো হেঁয়ালি তৈরি করেছি। তারি থেকে তিনটে তোমাকে পাঠাই—আসচে বছরের জন্মদিনের আগে হয়ত তুমি পাবে।

(১) তিন অক্ষরের কথা। প্রথম ও শেষ অক্ষর ছেড়ে দিলে কাম থাকে না। শেষ দুটো অক্ষর ছেড়ে দিলে বাম থাকে না। সমস্তটা ছেড়ে দিলে প্রাণ থাকে না।

(২) চার অক্ষরের কথা। প্রথম দুটো অক্ষর একটি প্রাণী, শেষ দুটো অক্ষর তার বন্ধন। সমস্ত কথাটার মানে হচ্ছে বাঁধা পড়লে সেই প্রাণীর অবস্থা।

(৩) তিন অক্ষরের কথা। তার প্রথম অংশটাকে ইংরেজি শব্দ ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। তারো যা মানে বাকি অংশটারও সেই মানে, সমস্ত কথাটারই সেই একই মানে। ইতি ১২ বৈশাখ ১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী

"রবি-বাবু"

২

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

তুমি আর ফুলদিদি দুই বোনে আমার দুই ধাঁধাঁর উত্তর ঠিক বের ক'রে দিয়েছ। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার বাবা ধাঁধাঁর উত্তর বের করবার বয়স পেরিয়ে গেছেন। আমার তৃতীয় ধাঁধাঁর উত্তর হচ্ছে সংগীত। Song গীত। প্রথম অংশটাকে ইংরিজি শব্দ ব'লে ধ'রে নিলে তারও যা মানে, তার পরের অংশেরও সেই মানে, সমস্ত কথাটারও সেই মানে।

আমি কেমন আছি জানতে চেয়েছ। খুব ভালো আছি। ছেলেবেলায় অসুখ করলে খুসি হতুম, ইস্কুলে যাওয়া বন্ধ হ'ত। কিন্তু তখন শরীর এত সুস্থ ছিল যে, শরীরের উপর ভারী রাগ হ'ত। এখন শরীরটাকে অ:্যন্ত সুস্থ ব'লে কেউ দোষ দিতে পারবে না—বেশ অনেক দিন ধ'রে অসুখ ক'রে আছে। ছুটি পেয়েছি। প্রায় সমস্ত দিন, রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত বাইরে ব'সে থাকতে পাই—কেউ বক্তৃতা করতে ডাকে না, তুমি ছাড়া কেউ ধাঁধাঁ চেয়ে পাঠায় না, চিঠি লেখলেও জবাব দিইনে। ছেলেবেলায় ছুটির দিনে খেলা ছিল মাটির উপর ধুলো নিয়ে, আজ ৬৫ বছর বয়সে আমার খেলা নীল আকাশের উপর ভাবনা নিয়ে। কিসের ভাবনা? সেই বয়সে মন ফিরে গেছে ব'লেই তোমার বয়সের মেয়ের চিঠির জবাব দিতে ডাক্তারের নিষেধ মানিনে। আমার একটি সঙ্গিনী আছে, তার বয়স তিন—তাকে দিনের মধ্যে পাঁচ ছ বার বাঘের গল্প বলতে হয়। আমার অন্য সব কাজ গিয়ে এই একটাতে এসে ঠেকেছে। আমার মনিবটি বড় শক্ত, কিছুতে ছুটি দেয় না।

আমার জন্মদিনের জন্যে যে খাতাটি পাঠিয়েছ ঠিক দিনে সেটি খুলব। আমাদের দেশে দোকানদারেরা বৎসরের প্রথম দিনে নতুন খাতা খোলে। আমিও আমার ৬৫ বছর বয়সের দিনে তোমার হাতের দেওয়া নূতন খাতা খুলব। কিন্তু আজকাল খাতা ভর্ত্তি করবার মত মূলধন বেশি নেই। ইতি ১৭ বৈশাখ ১৩৩২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

ডাক্তারের কড়া হুকুমে চিঠিপত্র লেখা কমিয়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু তুমি লিখেছিলে এক বছরের মধ্যে তুমি ভালো মেয়ে হ'য়ে উঠবে তাই শুনে তোমাকে আমার এই শেষ আশীর্বাদ পাঠাচ্ছি। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে হ'য়ে উঠলে সবাই আমার চিঠির গুণব্যাখ্যা করবে এ লোভ সামলাতে পারলুম না।

তা ছাড়া তুমি আমাকে আরো একটা মস্ত লোভ দেখিয়েছ। আমাকে বলেছ, আমি "খুব ভালো লোক।" তোমাকে আমি চিঠি লিখেছি এই হচ্ছে তার একটিমাত্র প্রমাণ। এত সহজে এত বড় খ্যাতি আমার জীবনে আর কখনো পাইনি। এ জগতে দুঃসাধ্য ভালো কাজ ক'রেও "ভালো" উপাধি সব সময়ে মেলে না। তাই তোমার কাছ থেকে আমার "ভালো" উপাধি আরো পাকা ক'রে নেবার জন্যে এই চিঠিখানি লিখলুম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেব। অতএব এ চিঠির উত্তরে তোমার কাছ থেকে দ্বিতীয় প্রশংসাপত্র পাবার আশা নেই। ফিরে এসে যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা হয় তাহ'লে দেখতে পাবে "রবিবাবু" তোমাদেরই মত ছোট ছেলে-মেয়েদের বন্ধু। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। ইতি ৭ আগষ্ট ১৯২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

লিখতে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচবে আজও আমার হাতে।
সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,
সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
সেই কলমে শিশু দোয়েল
শিস্ দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি'।
পারুল দিদির বাসায় দোলে
কনক চাঁপার কচি কুঁড়ি।
খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলা-ঘরে;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথহারানো তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথ-পাতা
সেই কলমে আপ্‌নি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ই বৈশাখ ১৩৩৪

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৬

জীবনের সুখবাসনা আগন্তুকী নয়, স্বাভাবিকী। কিন্তু তার সুখ কিসে? একমাত্র রসস্বরূপকে পেয়ে। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। জীব আনন্দী শুধু রসবস্তুকে পেয়ে। আর সেই আনন্দকে একবার জানলে, আর ভয় নেই। ন বিভেতি কুতশ্চন।

সেই আনন্দকে জানি কী করে? পাই কী করে? অনুভবে। আস্বাদনে। আস্বাদনের উপায় কী? সান্নিধ্য। আর সান্নিধ্যের তপ্ততা ও গাঢ়তা সেবায়। আর, প্রেম ভক্তি ছাড়া কি সেবা সম্ভব? সুতরাং প্রেম-ভক্তিই সাধ্যবস্তু।

দ্বাপরে কৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ। ব্রজেন্দ্রনন্দন আর শচীনন্দন। উভয় লীলার সেবাতেই আস্বাদনের পূর্ণতা। 'এথা গৌরচন্দ্র পাব সেথা রাধাকৃষ্ণ।'

কৃষ্ণসেবার চার ভাব। দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। মধুরই সব ভাবের শ্রেষ্ঠ, মধুরই সাধ্য-শিরোমণি। মধুরেরই আরেক নাম কান্তা প্রেম। 'পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।' আরেক নাম শৃঙ্গার। 'সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।' কিন্তু সঙ্গম-সুখ থেকেও সেবা-সুখ বেশি মধুর। 'কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হইতে সুমধুর, তাতে সাথী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী।'

শ্রদ্ধাই সাধনের মূল। শ্রদ্ধা কাকে বলে? শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। কৃষ্ণভক্তি করলেই সমস্ত কর্ম করা হল, আলাদা করে আর কিছু করতে হবে না—এই শাস্ত্রকথায় নির্বিচল বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। 'শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়।' আর এই শ্রদ্ধার মূল সাধুসঙ্গ। 'সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥' আর কৃষ্ণরতিই সর্বসিদ্ধি। 'কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥' আর কৃষ্ণরতি কৃষ্ণভক্তিই সাধন। আর সেই সাধনের উপচার হরিনাম। নামকীর্তন।

এ কে এল নবদ্বীপে?

একে চেন না? বিদ্যায় বাকি দেশ জয় করে এসেছে। নবদ্বীপ জয় করতে পারলেই অদ্বিতীয় হতে পারবে। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা গেল কোথায়? ঘরের কোণে মুখ লুকোল নাকি?

বিস্তর হাতি-ঘোড়া-দোলা লোকজন নিয়ে এসেছে। চালচলন দেখে মনে হয় যেন অঢেল পয়সা। বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে এসেছে কিন্তু বিনয় নেই একবিন্দু। আটোপটঙ্কারে কথা কইছে। কে আছ নবদ্বীপে, যদি সাহস না থাকে, আমাকে লিখে দাও জয়পত্র।

কে এ পণ্ডিত? এর নাম কী?

কেশব পণ্ডিত।

দেশ কোথায়?

কাশ্মীর।

কী এর বৈশিষ্ট্য?

ইনি সরস্বতীমন্ত্রের উপাসক। সরস্বতীর বরপুত্র! তাঁর নখাগ্রে সর্বশাস্ত্রের অধিষ্ঠান। শুধু তাই নয়, তার জিহ্বায় স্বয়ং সরস্বতী প্রবক্তা। সরস্বতীর বরে দিগ্বিজয়ী।

নবদ্বীপের পণ্ডিতের দল ভড়কে গেল। স্বয়ং সরস্বতীর সঙ্গে কে বিচার করবে?

আলোকচিত্র

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু যেন লিখতে ভুলবেন না।]

মৃৎশিল্পী মূর্ত্তি
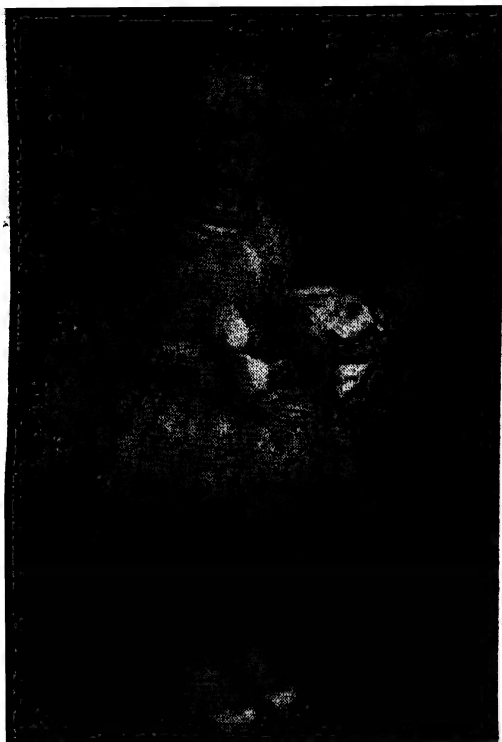
—কুসুমকুমার বাগচী

একাত্মা

—চিত্তরঞ্জন নন্দী

হতভম্ব

—জয়দেব মণ্ডল

পুতুল পুতুল —চিত্ত নন্দী

একা —সুকুমার মণ্ডল

শিকার —কুমার রায়

প্যাগোডা

—ধীরেন্দ্র গাঙ্গুলী

তাজ —তৃপ্তি দাস

অনুশীলন —সন্তোষকুমার মজুমদার
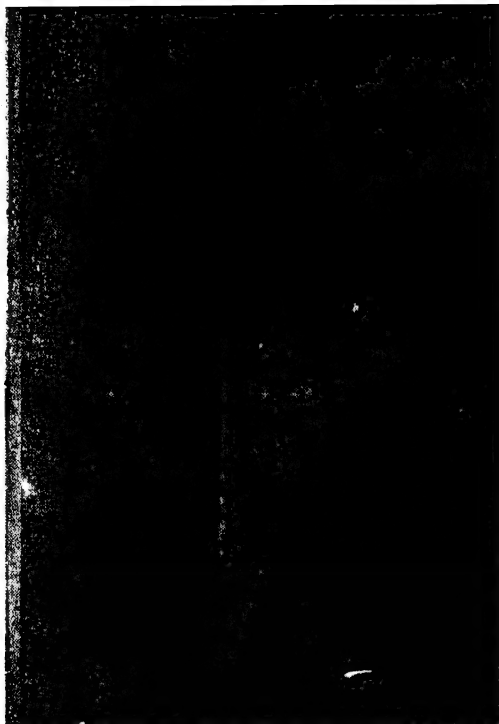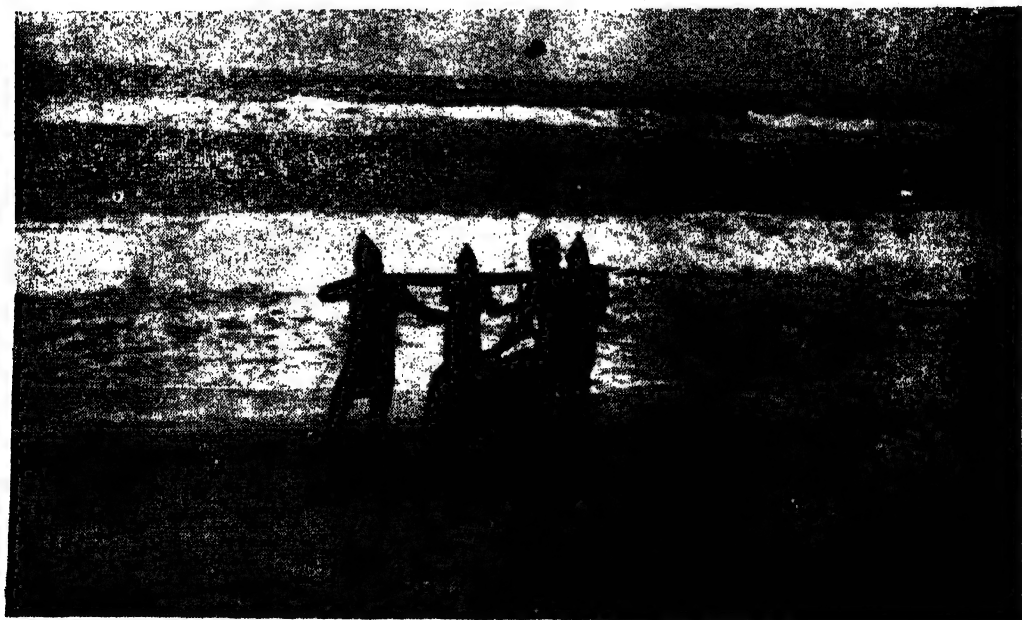
পরীক্ষা আগত ঐ

—দীপক ঘোষ

জ্ঞানান্বেষক

—বিশ্বজিৎ সেন

তাহলে ধূলিসাৎ হল নবদ্বীপের মান। সকলে দস্তখৎ করে জয়পত্র তবে লিখে দাও কেশবকে।

জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যা। গঙ্গার ঘাটে পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আছে নিমাই। পুরোনো পড়া আলোচনা করছে। বেড়াতে বেড়াতে সেখানে হাজির হল কেশব।

যোগপট্ট ছন্দে বপু বাঁধা, বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ রেখে শাস্ত্রব্যাখ্যা করছে, কে এই পণ্ডিত—থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দিগ্বিজয়ী।

সঙ্গের লোক বললে, 'ইনিই নিমাই পণ্ডিত।'

'কী পড়ায়?'

'ব্যাকরণ। আর ব্যাকরণের মধ্যে সবচেয়ে যা সোজা সেই কলাপ।'

অবজ্ঞার হাসি হাসি হাসল কেশব। যে সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তাকেই লোকে পণ্ডিত বলে। যার শুধু ব্যাকরণে জ্ঞান সে পণ্ডিত হয় কী করে? তাকাল আরেকবার নিমাইয়ের দিকে। কী অপূর্ব সুন্দর দেখতে। সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, সুবলিত মস্তকে চাঁচর কেশ, প্রদীপ্ত চোখ, সমস্ত মাঠঘাট আলো করে বসেছে। কিন্তু সামান্য বৈয়াকরণিককে আমার ভয় কী। দিগ্বিজয়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয় এমন কী আছে তার প্রতিষ্ঠা! যাই একবার, দেখি বাজিয়ে।

গঙ্গার বন্দনা করে নিয়ে দিগ্বিজয়ী এগুলো নিমাইয়ের দিকে।

তার সঙ্গের লোক পরিচয় করিয়ে দিল।

সশিষ্য উঠে দাঁড়াল নিমাই। সাদরে অভ্যর্থনা করল। বললে, 'বসুন'।

'তুমিই বুঝি নিমাই পণ্ডিত? দেখতে তো প্রায় বালকের মত। কী পড়াও? ব্যাকরণ?' কেশবের প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা: 'বালশাস্ত্র? আর তাও নাকি শুনতে পাই, কলাপ? যা সবচেয়ে সরল, শিশুবোধ্য।'

'তাও পড়াতে পারি এমন অভিমান করতে পারিনা।' নিমাই বললে সবিনয়ে, 'আমি নিজেও কিছু বুঝিনা, শিষ্যদেরও পারিনা কিছু বোঝাতে।'

'পারোনা? কলাপ তো জলের মত তরল।'

'কোথায় আপনি সর্বশাস্ত্রে সর্বকবিত্বে প্রবীণ, আর কোথায় আমি নবীন বিদ্যার্থী! আপনার সঙ্গে কি আমার তুলনা!' নিমাই তৃণের মত হয়ে বললেন। 'আপনার কবিত্ব শুনতে বড় ইচ্ছা হয়। কৃপা করে গঙ্গার মহিমা কিছু বর্ণনা করুন। কাব্য আস্বাদ করা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ঘটবে পাপমোচন।'

সগর্বে দিগ্বিজয়ী মনে মনে শ্লোক রচনা করে মুখে আওড়ে যেতে লাগল অনর্গল। একাদিক্রমে একশো শ্লোক। আর আবৃত্তি করে যাচ্ছে উদ্দাম ঝড়ের মত, চিন্তা করবার জন্যেও কোনো ছত্রে বিন্দুমাত্র ছেদ টানছে না। সন্দেহ কি, জিহ্বাগ্রে স্বয়ং সরস্বতী বসেছে, নইলে এই শক্তি মানুষে সম্ভব হয়? শ্রোতারা সবাই উল্লাসে হরি-হরি করে উঠল। যত শব্দ ছন্দ অলঙ্কার সব যেন হাত ধরাধরি করে মেতেছে আনন্দে নৃত্যে। এ অদ্ভুতশক্তি লোকের সঙ্গে নিমাই আঁটবে কি করে? নিমাইয়ের জন্যে সকলের কষ্ট হতে লাগল।

কিন্তু নিমাই নিঃসঙ্কোচ। নিরুদ্বেগে বললে, সত্যি আপনার মতন কবি নেই আর পৃথিবীতে। কার সাধ্য প্রাক্‌ভাবনা না করে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন কবিত্বময় শ্লোক রচনা করতে পারে। কার বা সাধ্য আদ্যোপান্ত অর্থ বোঝে। আসল বোদ্ধা আপনি আর আপনার বরদাত্রী সরস্বতী। ইচ্ছে করে এই শ্লোকগুলির মধ্য থেকে যে কোনো একটা বেছে নিয়ে তার ব্যাখ্যা করেন নিজমুখে!'

'বেশ তো বলো কোন শ্লোকটার ব্যাখ্যা চাও।' গর্বভরে তাকাল কেশব।

'আমি বলব? আপনার রচনা, আমার কি মনে আছে?'

'তা তো ঠিকই। তবু আভাস দাও, ভাবার্থ দিয়ে বোঝাও কোনটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।'

'আচ্ছা বলি।' বলে গোটা একটা শ্লোকই আবৃত্তি করল নিমাই। উচ্চঘোষে বললে,

'মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্যচরণা
ভবানীভর্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥'

কেশবের চক্ষুস্থির। বললে, 'সে কি কথা? ঝঞ্ঝাবাতের মত একশোটা শ্লোক হুহু করে বলে গেলাম, তার মধ্যে থেকে এটাকে বেছে নিয়ে কণ্ঠস্থ করলে কী করে? তুমি কি শ্রুতিধর?'

নিমাই নম্রমুখে বললে, 'সরস্বতীর বরে তুমি যেমন কবি হয়েছ, তেমনি কেউ শ্রুতিধরও তো হতে পারে।'

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল কেশব। এমন অসম্ভব শ্রুতিধর কে কোথায় দেখেছে!

'শ্লোকটার ব্যাখ্যা করুন।'

'ব্যাখ্যা তো সোজা।' উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ

করে বলতে লাগল কেশব : 'যে শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে সৌভাগ্যবতী, সুরনরগণ যার চরণ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর চরণের মত পূজা করে, যে ভবানীভর্তার মাথায় বিরাজিত বলে অদ্ভুতগুণান্বিতা, সেই গঙ্গার এ মহিমা নিশ্চিতরূপে নিরন্তর দীপ্তি পাচ্ছে।'

নিমাই বললে, 'ভালো কথা, এবার তবে শ্লোকের দোষ-গুণ বিচার করুন।'

কেশব ক্রুদ্ধ হল। বললে, 'এ শ্লোকে দোষের লেশস্পর্শ নেই। সমস্তই এর গুণ। দুটো অলঙ্কার দেখতে পাচ্ছ না? একটা উপমা, আরেকটা অনুপ্রাস'—

'কিন্তু দোষ?'

'দোষ?' ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল কেশবের। 'তুমি তো বৈয়াকরণ, শিশুপাঠ্য কলাপের শিক্ষক, তুমি অলঙ্কার কী বুঝবে? তুমি তো আর অলঙ্কার পড়নি। আমার শ্লোকে কবিত্বের যে সার নিহিত আছে তা বোঝ তোমার বিদ্যা কই?'

'অলঙ্কার পড়িনি বটে,' নিমাই বললে শান্তস্বরে, 'কিন্তু লোকমুখে শুনেছি কিছু কিছু। যা শুনেছি তার থেকে বলতে পারি, আপনি রুষ্ট হবেন না, আপনার এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ আছে'—

'মিথ্যে কথা।' হুঙ্কার ছাড়ল দিগ্বিজয়ী।

'ব্যস্ত হবেন না, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।' নিতাই বলতে লাগল : 'যে বস্তু অজ্ঞাত তাকে বলে বিধেয়, আর যে বস্তু জ্ঞাত তাকে বলে অনুবাদ। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম কি? তার নিয়ম আগে অনুবাদ বসবে, পরে বিধেয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়। এখন দেখুন, আপনার শ্লোকের প্রথম ছত্রের এই কথাটা : মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং। এখানে, গঙ্গার কী মহত্ত্ব, প্রারম্ভেই জানা যায় না। সুতরাং মহত্ত্ব কথাটা বিধেয়। আর ইদং—জ্ঞাতবস্তুকে জানাবার শব্দ, সুতরাং এটা অনুবাদ। মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং না বলে বলা উচিত ছিল ইদং গঙ্গায়াঃ মহত্ত্বং। সুতরাং বাক্যের বিন্যাসে পরিস্ফুট অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ঘটেছে।'

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল কেশব।

'ও রকম দোষ আরো একটা ঘটেছে। ধরুন দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব কথাটা। এখানে লক্ষ্মী জ্ঞাত, তাই সে অনুবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় লক্ষ্মী বলতে কী কোথায় কাকে বোঝায়, তা অজ্ঞাত। সুতরাং দ্বিতীয় শব্দ বিধেয়, লক্ষ্মী শব্দ অনুবাদ। দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব বলাতে, অনুবাদ আগে না বলে আগে বিধেয় বলাতে, এখানেও অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ হয়েছে। অন্য দোষও দেখাচ্ছি।'

বলে কী বালক! হতচেতনের মত তাকিয়ে রইল দিগ্বিজয়ী।

'হ্যাঁ, বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ।'

'সে আবার কোথায়?'

'ধরুন ভবানীভর্তৃ কথাটা। কথাটার মানে কী? মানে হচ্ছে, ভবানীর স্বামী। ভব বা মহাদেবের যে পত্নী অর্থাৎ দুর্গা—সেই ভবানী। এখন ভবানীর স্বামী বললে মহাদেবকেও বোঝানো যায়, আবার মহাদেব ছাড়া ভবানীর অন্য স্বামী আছে—এ ভাবনাও অসম্ভব হয় না। প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল ইঙ্গিত যদি এসে পড়ে তাকেই বিরুদ্ধমতিকৃৎ দোষ বলে। যদি ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্তা বলা হয়, তা হলে সেটা খোদ ব্রাহ্মণও হতে পারে, আবার ব্রাহ্মণপত্নীর দ্বিতীয় স্বামীও বাতিল হয়ে যায়না।'

'আর নেই?' দিগ্বিজয়ী বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল।

'আরো দুটো আছে। একটা পুনরাত্ত, আরেকটা ভগ্নক্রম।' নিমাই বলল স্বচ্ছন্দে।

'আমাদের সবাইকে বলুন বুঝিয়ে।' শ্রোতার দল চঞ্চল হয়ে উঠল।

'ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পরেই বাক্যের সমাপ্তি ঘটা সমীচীন। বিভবতি—এই ক্রিয়াপদেই বাক্যের শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, না, ক্রিয়াপদের পরে 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই এখানে ঘটেছে পুনরাত্ত।'

'কিন্তু ভগ্নক্রম!' শ্রোতাদের মধ্য থেকে কে বলে উঠল।

'বলছি। এই শ্লোকে চারটি চরণ বা ছত্র আছে। প্রথম চরণে "ত"—এর অনুপ্রাস, তৃতীয় চরণে "র"-এর অনুপ্রাস, চতুর্থ চরণে "ভ"-এর অনুপ্রাস, কিন্তু দ্বিতীয় চরণে দেখছ কোনোই অনুপ্রাস নেই। আদ্যোপান্ত একই নীতি মানা হলনা বলে ভগ্নক্রম দোষ হয়েছে। যদি দ্বিতীয় চরণে অনুপ্রাস থাকত, কিংবা প্রত্যেক চরণই অনুপ্রাসমুক্ত থাকত, তা হলে ঘটত না ভগ্নক্রম।'

'কিন্তু গুণ?'

'বলেছি তো পাঁচটা গুণও আছে, কিন্তু যা দেখালাম, ঐ পাঁচ দোষেই সমস্ত গুণ ছারখার হয়ে গেছে। সুন্দর শরীরে যদি একটিও ধবল কুষ্ঠের দাগ থাকে, যত ভূষণেই তাকে সাজাও না, সেই এক দাগের দোষে সমস্ত অলঙ্কার মূল্যহীন।' নিমাই তাকাল দিগ্বিজয়ীর দিকে। বললে, 'দেবতার প্রসাদে আপনি লোকোত্তর প্রতিভা পেয়েছেন, যার বলে নির্বিচারে কবিতা তৈরি করলেন অনর্গল, কিন্তু রচনার বিচার না থাকলে দোষ এসে পড়ে অলক্ষ্যে। 'বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্মল। সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল॥'

নিমাইয়ের কথা শুনে, কাণ্ড দেখে, দিগ্বিজয়ী স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরাভবের লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না, কথা আসছে না কণ্ঠে। প্রতিবাদ তো দূরস্থান। শেষকালে একটা 'পড়ুয়া বালকের' কাছে অপমানিত হতে হল। কিন্তু যে ব্যাখ্যা করল সে তো সাধারণের সাধ্য নয়। তার জিহ্বার সরস্বতী কি স্থান বদলে বসল গিয়ে নিমাইয়ের রসনায়? কে এই বালক?

'তোমার ব্যাখ্যা শুনে আশ্চর্য লাগছে। অলঙ্কার পড়নি, কোনো শাস্ত্রাভ্যাস নেই। অথচ এ সব অর্থ প্রকাশ করলে কী করে?'

'আমি কী জানি! সরস্বতী যা বলতে বলল তাই বললাম।'

'আর আমি সরস্বতীর বরপুত্র, আমাকে তিনি নির্জিত করলেন 'শিশুদ্বারে।' ক্ষোভে-লজ্জায় পুড়ে যেতে লাগল কেশব: 'আমার বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রেখে আমাকে দিয়ে অশুদ্ধ শ্লোক রচনা করালেন। একটা সিদ্ধান্ত স্ফুরণও হল না আমার! কেন? কেন?'

নিমাইয়ের শিষ্য ছাত্রেরা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এখন দিগ্বিজয়ীর এই নিশ্চিত পরাজয়ে তারা উল্লাস করে উঠল। কী অভ্রংলিহ অহংকার! নিমাইকে কত উপেক্ষা, কত অবজ্ঞা। শুধু বাল্যশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াও, তাও আবার সরলতম কলাপ। তুমি কাব্য বিচারের কী বুঝবে! যে অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েনি তার আবার কাব্য জিজ্ঞাসা কিসের। কত আস্ফোট, কত বাগাড়ম্বর। কিন্তু আমাদের নিমাইকে দেখতো। কী অগাধ বিদ্যা অথচ কী সুন্দর বিনয়। যেমন নির্ভর তেমনি নিরভিমান। দিগ্বিজয়ীর এমনি হেরে যাওয়া নয়, যাকে হেয় জ্ঞান করেছে তার কাছে হেরে যাওয়া। তাই নিমাইয়ের দলের ছেলেরা দিগ্বিজয়ীকে পরিহাস করে উঠবে তা আর বিচিত্র কি।

কিন্তু নিমাই শাসন করল। নিবৃত্ত করল শিষ্যদের।

বরং প্রশংসা করল দিগ্বিজয়ীর। বললে, 'কাব্যের দোষগুণের বিচার সামান্য ব্যাপার। আসল বিষয় কবিত্বশক্তি, কবিতা রচনার ক্ষমতা। আপনি সে শক্তিতে অতুলন। সূক্ষ্ম চোখে দেখতে গেলে কবিত্বে দোষ কার বা নেই বলুন, কালিদাস ভবভূতিতেও আছে। আপনার কবিতা গঙ্গাজলধারার মত পবিত্র আর অচ্ছিন্ন স্রোত। যার মুখ দিয়ে অমন কাব্যবাক্য বেরয় সে মহাকবি-শিরোমণি।' বিনয়ে আরও স্নিগ্ধ হল নিমাই: 'আমার শৈশবচাপল্য মার্জনা করবেন। আপনার কবিত্বের সত্যিকার দোষগুণ বিচার করি, আমার এমন যোগ্যতা নেই। আপনি শ্রান্ত হয়েছেন, রাতও অনেক হল, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। কাল আবার না হয় বিচার করা যাবে।'

'এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহো দুঃখ নাহি পায়॥'

শিষ্যেরা ঘিরে ধরল নিমাইকে: কেন, কেন, দিগ্বিজয়ীর পতন হল?

'আর কেন! শুধু অহঙ্কার। এই বিপ্রের অহংকার হয়েছিল—জগৎসংসারে তার কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যেই আসবে সেই পরাস্ত হবে।' হাসল নিমাই— 'সরস্বতী তা সইবে কেন?'

শুন ভাই সব! এই কহি সত্য কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥

'দিগ্বিজয়ীকে সভামধ্যে জয় করলে আরো ভালো হত।' বললে শিষ্যদের কেউ-কেউ। 'তা হলেই ওর শিক্ষা হত সমুচিত।'

'না, সেটা উচিত হত না। সে অপমান ওর মৃত্যুতুল্য হত। ওর সর্বস্ব লুট করে নিত সকলে। বিরলে জয় করলাম ওকে, যাতে ওর গর্ব ক্ষয় হয় অথচ মনে ও দুঃখ না পায়।'

দিগ্বিজয়ী বাড়িতে ফিরল বটে কিন্তু ঘুমুতে গেল না।

সারারাত সরস্বতীর আরাধনা করল। কী দোষ করেছি যাতে আমার প্রতিভার সঙ্কোচ ঘটল। লোপ পেল বিচারবুদ্ধি।

সরস্বতী দেখা দিলেন। বললেন, 'যার কাছে তোমার পরাজয় হয়েছে, তিনিই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। আর জেনো আমিই তাঁর পাদপদ্মের দাসী।'

'তুমি তাঁর দাসী?' দিগ্বিজয়ী নিস্পন্দ-আড়ষ্ট।

'হ্যাঁ, তিনি আমার কান্ত, আমার প্রভু। তাঁর কাছে আমার স্ফূর্তি নেই, বরং অগাধ লজ্জা। তুমি যাও, ওঁর কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করো, চরম কবিত্ব লাভ করবে।'

প্রভাত হতেই দিগ্বিজয়ী নিমাইয়ের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। ডাক শুনে নিমাই বাইরে আসতেই দিগ্বিজয়ী তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

নিমাই ব্যগ্র হাতে তুলল তাকে মাটি থেকে। বললে, 'সে কী! তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর আমি এক অপোগণ্ড বালক। তোমার এ কী দৈন্য।'

দিগ্বিজয়ী কাতর কণ্ঠে বললে, 'আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি সরস্বতীপতি নারায়ণ, তুমিই সমস্ত বিদ্যার রাজাধিরাজ। কী শুভক্ষণে এলাম আমি নবদ্বীপ। প্রভু, আমার সমস্ত অবিদ্যা বাসনার বন্ধন দূর করে দাও। কী করে যাবে দুর্বাসনা। দাও তার উপদেশ।' কাঁদতে বসল দিগ্বিজয়ী।

নিমাই বললে, 'কী আর উপদেশ দেব। সমস্ত জঞ্জাল ছেড়ে, আর সব চেয়ে বড় জঞ্জাল অহঙ্কার, কৃষ্ণ-চরণ ভজনা করো। এই অনন্ত সংসারে যদি কিছু সত্য বস্তু থেকে থাকে তা কৃষ্ণ ভক্তি। তাই সর্বভূতে দয়া করে কৃষ্ণভক্তি করো।'

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিদ্যায় সভে কহে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়॥

কেশবকে আলিঙ্গন করল নিমাই। দেখতে-দেখতে কেশবের দেহে ভক্তি, বিরক্তি আর বিজ্ঞান দেখা দিল। তৃণের চেয়ে অধিক এল কোমল নম্রতা, দম্ভের বাষ্পমাত্র রইল না। বাড়ি ফিরে গিয়ে হাতি ঘোড়া দোলা—যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল—সব জনে জনে বিলিয়ে দিল। কৌপীন পরল, দণ্ডকমণ্ডলু হাতে নিল। সংসার ছেড়ে চলে গেল অসঙ্গ হয়ে।

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম? কৃষ্ণ ছাড়া এমন দয়ালু, কে আছে যে তার ভজনা করব? স্তনলিপ্ত কালকূট পান করিয়ে বালকৃষ্ণের প্রাণনাশ করতে চেয়েছিল পুতনা, তবু বদান্য কৃষ্ণ সেই পুতনাকে ধাত্রীগতি দিলেন, মৃত্যুর পরে সিদ্ধদেহে দিলেন তাকে কৃষ্ণসেবার অধিকার। এত মহৎ করুণা আছে কোথায়? কিন্তু কেন এই করুণা? কাপট্যের অভিনয় হলেও ক্ষণকাল পুতনার মধ্যে ভক্তির আভাস জেগেছিল, জেগেছিল বাৎসল্যের আভাস, যখন সে কৃষ্ণকে কোলে টেনে নিয়েছিল, স্তন্যদানে দেখিয়েছিল উন্মুখতা। যদিও তার অন্তরে জিঘাংসা, যদিও আসলে সে পাপীয়সী, তবু কৃষ্ণের জন্যে ঐটুকু সে করেছিল বলে, কোলে টেনে নিয়েছিল বলে, স্তন্যপান করাতে চেয়েছিল বলে, কৃতজ্ঞ কৃষ্ণ তার দেহান্তরে দিলেন তাকে প্রেমসেবার অধিকার। পুতনা যদি করুণা পায়, আমিও পাব। আমি যে ধরেছি কৃষ্ণভক্তি। জানি আমার গাঢ়তা নেই, একান্ত চিত্ততা নেই, জানি আমি কাপট্যলেশশূন্য নই, জানি বিষয়েবিলাসে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত—তবু যেহেতু কৃষ্ণকে একটু ভালোবাসার ভাব করেছি, ডেকেছি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, তাতেই তিনি অস্থির হয়ে উঠবেন। তিনি কৃপণ নন, অকৃতজ্ঞ নন, ক্ষুদ্রাত্মা নন। তিনি দাতার রাজরাজেশ্বর।

এই যে নরদেহ পেয়েছি, এই তো তাঁর অনন্ত কৃপা। 'নরতনু ভজনের মূল।' দেবতার দেহে জ্ঞান-ভক্তির সাধন নেই, সে সাধনের সুযোগ শুধু নরদেহে। তাই স্বর্গবাসীরাও এই মর্তদেহের অভিলাষী। কিছু করতে হবেনা, শুধু গুরুকে কর্ণধার করে দেহতরীকে ভবসাগরে ভাসিয়ে দাও। কৃপার বাতাস বইছে, অনুকূল তরঙ্গে নিয়ে যাবে গন্তব্যে, মনোহরের বন্দরে।

শুধু চলো, চলো আর চলো।
অর্থান্তরে ব্রজ, ব্রজ, ব্রজ।

[ক্রমশঃ।

সৈয়দ নওশের আলি

[জনপ্রিয় দেশকর্ম্মী ও পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান এম. এল. সি]

খাঁটি জাতীয়তাবাদী ও সংগ্রামী পুরুষ বলতে যা বুঝায়, ইনি হচ্ছেন তাই। একটি বৈশিষ্ট্যময় আদর্শ জীবন এঁর, যে-জীবনের মূল দাবীই হচ্ছে—মানুষে মানুষে ভেদ করলে চলবে না, নিচে যে রয়েছে, টেনে তুলতে হবে তাকে ওপরে। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদই সৈয়দ নওশের আলির জনপ্রিয়তার জন্য প্রধানত: দায়ী, এ নিশ্চয়।

যশোহর জেলার (বর্ত্তমানে পাকিস্তানভুক্ত) একটি নগণ্য গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে এই কর্ম্মী-মানুষের জন্ম হয় ১৮৯১ সালের আগষ্ট মাসে। কিন্তু দরিদ্র হলেও এই সৈয়দ পরিবারটির খ্যাতি ছিল সেই সমাজে বহুকাল আগে থেকেই। নওশের আলির পিতা সৈয়দ ওমেদ আলি ছিলেন বিশেষ শিক্ষানুরাগী। কর্ম্মজীবনে ফৌজদারী আদালতে তিনি সামান্য কাজ করতেন বটে কিন্তু সেকালের এম-ভি পাশ করা ও ইংরেজী পাশ লোক বলতে তিনিই ছিলেন গ্রামের প্রথম। অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও ছেলে লেখাপড়া করে মানুষ হয়ে উঠুক, এ ছিল তাঁর মুখ্য দাবী ও প্রত্যাশা।

পিতৃ-আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে বালক নওশের আলির পড়াশুনো সুরু হয় এবং সে প্রথম নিজ গ্রামের এম, ই স্কুলেই। তাঁর মা (নসিমন-নেচ্ছা) ছিলেন অশেষ বুদ্ধিমতী—ছেলেবেলায় মায়ের সস্নেহ প্রভাবে তিনি আপনি প্রভাবিত হয়েছিলেন অনেকটা। কাজেই সহসা পা পিছলে পড়ার কিংবা লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা তাঁর ছিল না, স্পষ্টত: বলা চলে।

সৈয়দ নওশেরের অগ্রগতির পথে দু'টি বড় বাধা ছিল পাশাপাশি —এক আর্থিক দৈন্যাবস্থা, দ্বিতীয় নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য। সারাটা ছাত্র-জীবন সংগ্রাম দিয়ে যেতে হয় তাঁকে এ দু'টির সাথে চূড়ান্তভাবে। অটুট মনোবলের অধিকারী ছিলেন বলে তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। পড়াশুনোর ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে এক একটি ধাপ তিনি অতিক্রম করে চলেন।

গ্রামের স্কুল থেকে এম, ই পরীক্ষা দিয়ে নওশের আলি বৃত্তি পান এবং সেইটি সম্বল করে ভর্ত্তি হন পরে খুলনার দৌলতপুর হাইস্কুলে। ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স (সর্ব্বশেষ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা) পাশ করেন তিনি সেই স্কুল থেকেই আর সে-ও বৃত্তিসহ। চললো পড়াশুনো দৌলতপুর কলেজে আর্টস্ নিয়ে—বৃত্তি পেলেন তিনি যথারীতি আই-এ পরীক্ষাতেও। তার পরই চলে আসেন তিনি কলকাতায় এবং সিটি কলেজ থেকে ১৯১৩ সালে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ থেকে তিনি একে একে আইনের সব কয়টি পরীক্ষায় পরম সাফল্য অর্জ্জন করেন।

বাস্তব কর্ম্ম-জীবনে যে লোককে প্রতিষ্ঠা পেতে হবে, ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর ভেতর বেশ কতকগুলো বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। নির্দ্ধারিত পুঁথি-পুস্তক তিনি বড় একটা কিনতে পারেন নি,—স্বাস্থ্যও ছিল বরাবর প্রতিকূল। কিন্তু যে-টুকু পড়তেন বা শুনতেন, মনোযোগ দিতেন তাতে অতিমাত্রায়—সেখানে কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না। কি স্কুল কি কলেজ—সর্বত্র শিক্ষক-সমাজ তাঁর অপূর্ব সাধারণ জ্ঞান ও মননশক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন।

সৈয়দ নওশের বাল্যাবস্থা থেকেই নিতান্ত নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি যাহা ভুল ও বেঠিক মনে করতেন, দাঁড়িয়ে বলতে কখনও এতটুকু দ্বিধা করতেন না। প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নির্ভীকতার পরিচয় তিনি রেখে এসেছেন। কলেজ-জীবনে পরলোকগত রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জী (পশ্চিমবঙ্গ) ছিলেন তাঁর একজন শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক। এই আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদও তিনি আপন গুণে আদায় করে নেন তখনই।
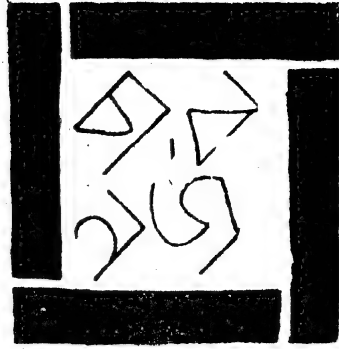
সৈয়দ নওশেরের বৈচিত্র্যময় কর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত ১৯২২ সালে—যে সময় তিনি কলকাতা হাইকোর্টে এডভোকেটরূপে ব্যবসা সুরু করেন। পসার জমাবার মতো কোন সংস্থানই সে সময় ছিল না তাঁর। কিন্তু তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁকে কয়েক বছর ভেতরেই প্রথম শ্রেণীর আইনজীবীর মর্য্যাদা এনে দেয়।

ইত্যবসরে জন্মভূমির সেবার জরুরী আহ্বান আসে সৈয়দ নওশেরের নিকট। তাঁর জেলাবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে তিনি নির্ব্বাচিত হলেন যশোহর জেলা বোর্ডের সদস্য। ১৯২৮ সালে তিনি ঐ
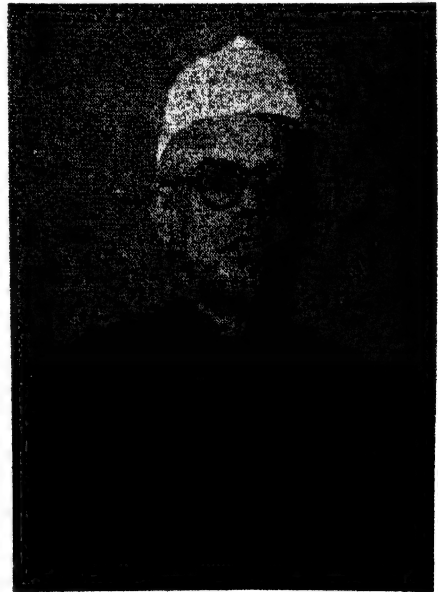
সৈয়দ নওশের আলি

বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করেন। জেলা বোর্ডটি যাতে সত্যি জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে, তজ্জন্য তাঁর প্রয়াসের অন্ত ছিল না। বহু প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে এই সময়। কিন্তু তার জন্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে পিছ-পা হয়ে আসেন নি তিনি।

সমাজে ও দেশে নওশের আলির সুনাম ও জনপ্রিয়তা বেড়ে চলে ক্রমেই। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির তিনি ছিলেন একজন অগ্রণী নেতা। ১৯৩৫ সালে নতুন শাসন পদ্ধতি অনুসারে বাংলার যে কৃষক-প্রজা মুসলেম লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তিনি তাতেও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সবল হাতে ছিল সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও চিকিৎসা-দপ্তর। নীতিগত কারণে ফজলুল হকের সঙ্গে বিরোধিতা হওয়ায় ১৯৩৮ সালের জুন মাসে তিনি সাগ্রহে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি নির্ব্বাচিত হন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার। কি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে, কি প্রাদেশিক মন্ত্রী হিসাবে, কি আইন সভার স্পীকার হিসাবে ব্যক্তিত্বে ও স্বকীয়তায় স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি সর্ব্বত্র।

কৃষক-প্রজা পার্টি ছেড়ে দিয়ে সংগ্রামী সৈয়দ নওশের যোগদান করেন কংগ্রেসে। সে সময় দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী) রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের সাথে তখন থেকেই নওশেরের বিশেষ হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো ব্যাপারে তাঁদের ভেতর বহু নিবিড় আলোচনা হয়েছে সেদিনে।

দেশ-বিভাগের প্রশ্নে নওশের আলির জাতীয়তাবাদী মন প্রচণ্ড রকম ক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রকাশ্য বৈঠকে এই আত্মঘাতী বিভাজন প্রস্তাবের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর অকাট্য যুক্তি ও সাহসিকতাপূর্ণ স্পষ্টোক্তিতে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড পর্য্যন্ত অসুবিধা বোধ করতে থাকেন অন্ততঃ তখনকার মতো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি অন্তর্ব্বর্ত্তী পার্লামেন্টের (১৯৫০) সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং সে কংগ্রেস-কর্ম্মিরূপেই। ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের মনোনয়নেই তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বর্ত্তমানে সৈয়দ নওশের পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য। কম্যুনিষ্ট সমেত বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমর্থনে তিনি এই আসন অধিকার করেন। শারীরিক দিক থেকে তিনি এখনও খুব সুস্থ নহেন। কিন্তু তাঁর সৎসাহস ও মনোবল অটুট রয়েছে, একটু আলাপেই তা বুঝা যায়। কথা প্রসঙ্গে তিনি এই ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে, এ না করলে দেশ ও পার্টির মঙ্গলের সম্ভাবনা নেই। এইখানেই সংগ্রামী সৈয়দ নওশেরকে বুঝি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেলো।

মেজর খগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

[সুখ্যাত সার্জ্জেন]

কথা শোনার কর্ণ—কথা বলার কণ্ঠ—আর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য নাসিকা—জীবনধারণে অপরিহার্য্য। এগুলি রোগাক্রান্ত হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ প্রয়োজন। বিশিষ্ট ডাঃ খগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (মেজর কে, কে, ঘোষ) শরীরের এই তিনটি অঙ্গের ব্যাধি নিরাময়ের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভারতবর্ষে সুপরিচিত। ধীর, স্থির, শান্ত ও প্রচার-বিমুখ এই ব্যক্তিকে দেখে মনে শ্রদ্ধা জেগেছিল। পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান খগেন্দ্রকৃষ্ণ ২৬শে মার্চ্চ ১৯০০ সালে স্বগ্রাম জকপুরে (মেদিনীপুর) জন্মগ্রহণ করেন। তিন মাস বয়সে তিনি বাবা গোপালচন্দ্র ঘোষকে হারান তখন মা মহামায়া দেবী ছয় সন্তানকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বড় ভাই ৺মণীন্দ্রকৃষ্ণ মেদিনীপুর ও কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট, মেজভাই ৺শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ, বড় ভগিনীপতি ৺রায় বাহাদুর মন্মথনাথ বসু ও মেজ ভগিনীপতি ছিলেন বগলাচরণ বসু। মাতুলালয় থানাকুল নবাসন গ্রাম। প্রথমে জকপুর পাঠশালা, পরে পিংলা ও কাঁথি বিদ্যালয়ে পড়িয়া তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উক্ত বৎসর প্রশ্নপত্র তিনবার পরীক্ষার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়া যায়। খগেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯১৯ সালে মেদিনীপুর কলেজ হইতে আই, এস, সি পরীক্ষা পাশ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২৬ সালে এম, বি ডিগ্রী লইয়া তথায় ক্লিনিক্যাল সার্জ্জারীর হাউস সার্জ্জেন নিযুক্ত হন। ১৯২৭-৩২ সাল পর্য্যন্ত তিনি ডাঃ এন, জে জুডার অধীনে E. N. T.র বিভিন্ন বিভাগে অবৈতনিক ক্লিনিক্যাল সহকারী ও হাউস সার্জ্জেন হিসাবে কাজ করেন। এখানে গ্রিন, উইলসন, বারনাডো ও লেষ্টার প্রভৃতি অধ্যাপকদের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। উচ্চশিক্ষার্থে ডাঃ ঘোষ ১৯৩২ সালের মে মাসে এডিনবরা রয়্যাল ইনফারমারীতে যোগদান করেন এবং আটমাসের মধ্যে F. R. C. S. ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার পর তিনি সেণ্ট্রাল লণ্ডন E. N. T. হাসপাতালে যুক্ত হন এবং তথা হইতে ১৯৩৩ সালের জুন মাসে তাঁহাকে Diploma in Laryngology & Otology (D. L. O.)
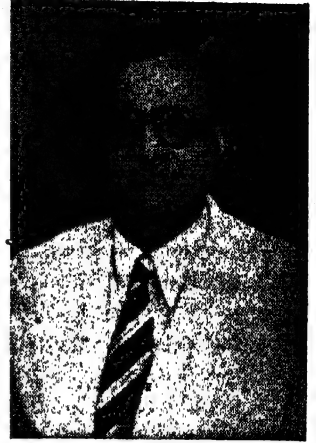
মেজর খগেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ

ভারতে ফিরিয়া ডাঃ ঘোষ মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ জুডার অধীনে ১৯৩৩এর সেপ্টেম্বর মাসে অবৈতনিক ক্লিনিক্যাল টিউটর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫-৪৮ সাল পর্যন্ত তথায় অবৈতনিক জুনিয়র ভিজিটিং সার্জ্জেন হিসাবে থাকেন। পরবৎসর প্রখ্যাত চিকিৎসক শ্রীসত্যবান রায় অবসর গ্রহণ করিলে তিনি অবৈতনিক সিনিয়র সার্জ্জেন নিযুক্ত হন। ১৯৫২ হইতে অগাষ্ট ৫৭ পর্য্যন্ত তিনি উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে যুক্ত ছিলেন এবং বর্ত্তমানে তিনি মেডিক্যাল কলেজের

অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে রহিয়াছেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ডাঃ আর, এন, চৌধুরী, ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ফনিভূষণ সুর, বিগ্রেডিয়ার এ, এন চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২২ সালে ডাঃ ঘোষ ইউনিভারসিটি ট্রেণিং কোরের সদস্য হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ সালে কমিশনড অফিসার পদ প্রাপ্ত হইয়া মেজর পদে উন্নীত হন।

নিজ পেশা ছাড়া মেজর ঘোষ বহু প্রতিষ্ঠানে যথা Doctors' Amusement Club এর সভাপতি, ভারতীয় মেডিক্যাল এসোঃ এর (কলিকাতা শাখা) সভাপতি ও লাইফ সদস্য, উহার বঙ্গীয় শাখার সহঃ সভাপতি, কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য, নিখিল ভারত Antolaryngologist এসোঃ এর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, উহার বঙ্গীয় শাখার বর্ত্তমান সভাপতি, এক্সপেরিমেণ্টাল সায়েন্স সোসাইটির আজীবন সদস্য হইয়াছেন।

সৌখীন নাট্যাভিনয়ে ডাঃ ঘোষের অংশ গ্রহণ উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনে তিনি হকি খেলায় সুনাম অর্জ্জন করেন এবং বর্ত্তমানে তিনি একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী হিসাবে মোহনবাগান ক্লাবের সহিত জড়িত আছেন। এছাড়া তিনি রাধারমণ কীর্ত্তন সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ও সুগায়করূপে পরিচিত। বহুদিন হইতে তিনি এস্রাজ বাজনা সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের (স্বামী বিরজানন্দর আশ্রিত) সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত আছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছি ডাঃ ঘোষের স্বহস্তে পশমের বুননের কাজ দেখে।

হুগলী জেলার সুগন্ধা গ্রামের শ্রীপরেশনাথ সিংহের কন্যা শ্রীমতী সুধা দেবীকে মেজর ঘোষ বিবাহ করিয়াছেন।

কথায় কথায় তিনি আমায় বলেন, মা একাধারে বাবার ও মায়ের দায়িত্ব পালন করেছিলেন—তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়েছি—সেই স্নেহময়ী জননীকে আমরা হারালুম ১৯৩০ সালে। আমাদের জন্য মায়ের কষ্টভোগ জীবনে ভুলতে পারব না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন

[বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও সমাজসেবী]

চোখে-মুখে প্রতিভার দীপ্তি ও সারল্যের ছাপ রয়েছে এই মানুষটির। আপন গুণবত্তায় ইনি নিতান্ত অপরিচিত জনকেও মুহূর্ত্তে আকৃষ্ট করতে পারেন। কালিয়ায় (যশোহর) বিখ্যাত সেন-পরিবার এঁর নামে বিশেষ গর্বিত। বাইরের সমাজেও শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেনের সত্যি প্রচুর খ্যাতি।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় কালিয়া গ্রামে ১৮৮৫ সালের নভেম্বর মাসে। তৎকালীন বিশিষ্ট সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটর (খুলনা) রায় মহেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুরের ইনি জ্যেষ্ঠপুত্র। পরিবারের প্রোজ্জ্বল ধারা অনুসরণ করে এই নবজাতকও জীবন-পথে সোজা এগিয়ে যাবেন, এ যেন ছিল নিশ্চিত।

কার্য্যক্ষেত্রে হলোও কিন্তু তাই। বাপ-মায়ের সুকৃতিপ্রাপ্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কোথাও আটকে থাকলেন না। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর সাফল্য ঘোষিত হতে দেখা গেলো। গ্রামের হাইস্কুলেই তিনি পড়াশুনো সুরু করেন এবং ছাত্র হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পায় গোড়া থেকেই। আর সুন্দরভাবে জীবন গঠন করবেন বলে তিনি চলে আসেন কলকাতার হিন্দু স্কুলে। এই বিদ্যায়তন থেকেই তিনি ১৯০১ সালে এনট্রান্স পাশ করেন। প্রধান শিক্ষক রায় রসময় মিত্র বাহাদুর তাঁকে খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বরাবর, শ্রীসেনের মনে এ গর্ব্ব আজও রয়েছে। ১৯০৬ সালে তদানীন্তন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এনট্রান্স পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভর্ত্তি হন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে, (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) সেখান থেকে আই-এ পাশ করে তিনি চলে যান প্রেসিডেন্সী কলেজে। এইখানেও স্বনামধন্য অধ্যাপক ডব্লিউ সি ওয়ার্ড ওয়ানের তিনি ছিলেন একান্ত প্রিয় ছাত্র। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর আইনশাস্ত্র পড়বার দিকে তাঁর ঝোঁক যায়। এই মুহূর্ত্তে তৎকালীন বাঙ্গলা সরকার তাঁকে ডেপুটি পুলিশ সুপারের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েন, তাই যুবক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেই লোভনীয় পদও গ্রহণ করলেন না। বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজে যথারীতি চললো তাঁর আইন পড়া।

বি, এল, ডিগ্রী নিয়েই শ্রীসেন আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদ্যোগী হন। আপন খুল্লতাত হাইকোর্টের সে সময়কার নামকরা এডভোকেট রায় সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুরের কাছে ইনি শিক্ষানবীশ হিসাবে কাটান দু' বছর। তার পরই ১৯১১ সালে তিনি খুলনা বারে যোগদান করেন। দেখতে না দেখতে তাঁর নাম ও খ্যাতি দূরাঞ্চলে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়ে। সে দিনের (১৯২৩) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি গ্ল্যাডিং আই-সি-এস তাঁকে সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটারের পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি নতুন মর্য্যাদায় অধিকারী হন—যশোহরের সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটারের পদ লাভ করেন তিনি সে সময়ে। এই দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকাকালীন তিনি পরম দক্ষতা সহকারে বহু চাঞ্চল্যকর দায়রা মামলা পরিচালনা করেন।

দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তান সরকার আইনবিদ্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে অবসর নিয়ে থাকতে দিলেন না। ১৯৫২ সালে তিনি আবার পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হলেন। সেদিনে কয়েকটি Gang case পরিচালনায় যে দক্ষতার পরিচয় দেন, তাতে তাঁর খ্যাতি বেড়ে যায় বহু গুণে। Mongla port police Firing Enquiryতে সরকার পক্ষের হয়ে যে ভাবে তিনি কার্য্য পরিচালনা করেন, তা ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে
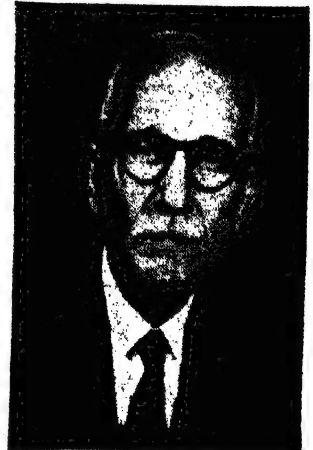
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন

উল্লেখযোগ্য। যশোহর খুলনায় ফৌজদারি উকিল হিসাবে তিনি ছিলেন সে সময়ে সমধিক জনপ্রিয় ও খ্যাতিসম্পন্ন।

১৯৫৮ সালে শ্রীসেন পাকিস্তান ছেড়ে এসে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এখানেও তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি পেলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে—তাঁকে নিয়োগ করা হলো চুঁচুড়ায় (হুগলী) সরকারী panel pleader পদে। এই পদেই তিনি আজও অবধি অধিষ্ঠিত রয়েছেন—অর্জ্জিত সুনাম এখানেও ঠিক অক্ষুণ্ণ আছে।

সমাজসেবী ও শিক্ষানুরাগী হিসাবেও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র কম নয়। খুলনার গাজিরহাটে তিনি জনসেবার তাগিদে প্রচুর অর্থ ও একটি বিস্তীর্ণ ভূমি দান করেছেন—যা ভিত্তি করে সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে উঠেছে। নিজের স্বনামধন্য পিতামহ গিরিধর সেনের নামে এই চিকিৎসালয়টি উৎসর্গীকৃত। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র যেমনি জ্ঞানপিপাসু তেমনি বিদ্যোৎসাহী। কালিয়া হাইস্কুলের পরিচালনা কমিটির দীর্ঘ ২০ বছরেরও বেশী সময় পর্য্যন্ত তিনি সদস্যপদে (Founder's representative) অধিষ্ঠিত আছেন। কালিয়ার বিরাট যৌথ সেন-পরিবারটি জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে ঘিরে যেন একটি মধুচক্র রচনা করেছে। পরিবারের কারও ভেতর এতটুকু অহংকারের ছাপ নেই, সকলেই বিনয় ও শিক্ষাভারে নত—এইটি আপনি চোখে পড়ে যায়। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের অনুজ বিশিষ্ট এডভোকেট হাইকোর্ট বারের বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র সেন, অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দননগরের মহকুমা হাকিম সোমেন্দ্রচন্দ্র সেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীলোকেন্দ্রচন্দ্র সেন (মেদিনীপুরের সাব-জজ), কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপূর্ণেন্দ্রচন্দ্র সেন (বীরভূমস্থ দুবরাজপুরের মুন্সেফ)—এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজ প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকারী। ৭৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেও জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মনের দিক থেকে এখনও সবল। তাঁর অসাধারণ বিচারবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে আরও শ্রদ্ধা এনে দেবে, এ একরূপ নিশ্চয় করে বলা চলে।

শ্রীসরোজকুমার দত্ত

[ভেষজশিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার]

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় যে ক'জন বাঙালী স্বীয় দক্ষতায় কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বেঙ্গল ইমিউনিটি নামক ভেষজ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীসরোজকুমার দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগের অন্যান্য বহু কৃতী বাঙালীর মত তিনিও জীবন সুরু করেছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হিসাবে কিন্তু জীবনের সোজা বাঁকা পথ আজ তাঁকে শিল্পপতিদের দলে টেনে নিয়ে গেছে। অবিভক্ত বাঙলার জননায়ক এবং পাকিস্তানের ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বর্গীয় কামিনীকুমার দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসরোজকুমারের জন্ম ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাসে নোয়াখালীতে। কুমিল্লা থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে আই-এস-সিতে ভর্তি হন। কিছুকাল বাদে তিনি পড়াশোনা ছেড়ে যোগ দেন অসহযোগ আন্দোলনে। পরে National Council of Education (বর্ত্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথম শ্রেণীর ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পর পর পাঁচ বছর আসাম এবং শ্রীহট্টের বিভিন্ন চা বাগানের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করার পর স্বাধীন ভাবে ঠিকাদারী ব্যবসা করবেন বলে চলে আসেন
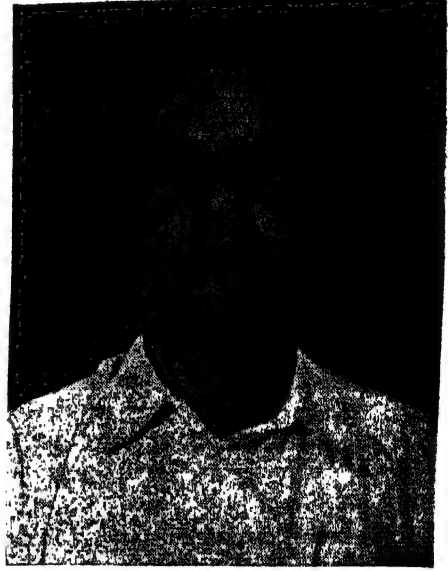
শ্রীসরোজকুমার দত্ত

কলকাতায়। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সেই কাজেই লিপ্ত ছিলেন। ঠিক ঐ সময় স্বর্গীয় ক্যাপ্টেন দত্তের নায়কত্বে বেঙ্গল ইমিউনিটি বিরাট জয়যাত্রার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। নিত্য নতুন তার সংযোজনা আর সমৃদ্ধি। প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্দ্ধমান কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ক্যাপ্টেন দত্ত একজন তরুণ সহকর্মী খুঁজছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সরোজের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাকেই তিনি গ্রহণ করলেন কোম্পানীর সেক্রেটারী হিসাবে। শিক্ষা সুরু হল প্যাকারের কাজ থেকে। কারখানা, গবেষণাগার এবং অফিসের সমস্ত কাজ না শেখা পর্যন্ত তিনি সেক্রেটারীর পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। ক্যাপ্টেন দত্তর মৃত্যুর পর ১৯৪১ সালে শেয়ার হোল্ডাররা শ্রীদত্তকেই কোম্পানীর নতুন কর্ণধার নির্বাচিত করেন। জৈব ভেষজ উৎপাদন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বেঙ্গল ইমিউনিটি যে ভারতীয় কোম্পানীগুলির পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে, তার অনেকখানি কৃতিত্বই শ্রীদত্তের।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীদত্তই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম গভীর সমুদ্রে মাছধরার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাছধরা জাহাজখানি সরকার জবর দখল করায় তাঁদের সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

সুপুরুষ সদালাপী শ্রীদত্ত অতি উঁচুদরের কথক। আগ্রহ-উদ্দীপক আলোচনা সুরু করে তিনি যে কোন লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখতে পারেন। বিশ্বভারতীর আজীবন সদস্য শ্রী দত্তের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত স্মারকনিধি ভাণ্ডার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা দান করেছেন। তিন পুত্র তিন কন্যার জনক শ্রী দত্তের পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী মধুরস্বভাবা বিদুষী, কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী।

ধী, মনেও চলছে বই কি। মনও চায় তামসিক হতে, রাজসিক সাত্ত্বিক হতে। অর্জুন বললেন, তবে এ বাধা দূর করে কে?

বাধার অনুভূতি কাজ করে বাধাকেই দূর করতে। তখন প্রকাশ বা আনন্দের দিকে তার লক্ষ্য থাকে না, বাধাকে দূর করবার কাজেই সে মত্ত প্রকাশ-আনন্দ আপনিই এসে পড়ে। জীব যে পরিমাণে এই প্রকাশ ও আনন্দের বাধাকে দূর করতে পারে, সেই পরিমাণে সে প্রকাশ ও আনন্দের অধিকারী হয়। সকলেই এই বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। ইতর জীব ক্রমশ এই বাধা অতিক্রম করে ঊর্দ্ধগতিতে মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে সাত্ত্বিক প্রকাশ ও আনন্দ জড়রাজ্যে বীজভাবে অন্তর্নিহিত ছিলো, পশুরাজ্যে অস্পষ্ট আবছা ছিলো, প্রকৃতির তাড়নায় তাই একদিন আপন চেষ্টায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মানুষের অন্তর্জগতে ও বহির্জগতেও সেই একই সংগ্রাম—প্রকাশ ও আনন্দের বাধা অতিক্রম করবার সংগ্রাম। মানুষ চলেছে নিরন্তর এই সংগ্রাম করতে করতে—অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, প্রেম দ্বারা দ্বেষকে জয় করে সে চলেছে তার সত্ত্বগুণের অধিকার দখল করতে—সে চলেছে এগিয়ে অবাধ আনন্দের দিকে, প্রকাশের দিকে। এই ক্রম, ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার ক্রম—যার ফলে জীব শিবে পরিণত হচ্ছে।

অর্জুন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এই জীব-জগৎ, জড়-জগৎ যা কিছু সব প্রকৃতি দ্বারা চালিত হচ্ছে। আজ রহস্য আর রহস্য নয়। চিররহস্যের লৌহ-কপাট আজ অর্জুনের সম্মুখে খুলে গিয়েছে। কত তুচ্ছ মানুষের শক্তি—কতটুকুই বা তার ক্ষমতা।

একটি মাত্র শক্তি—যার নাম আদ্যাশক্তি, তিনিই প্রকৃতি। তাঁকে জানাই জ্ঞান। ভগবান বললেন, এই জ্ঞান অর্জন করো। জ্ঞানই সব।

জ্ঞানে কর্মে তবে প্রভেদ কোথায়?

ভগবান বললেন, জ্ঞান ছাড়া কর্ম নেই। অর্জুন জানতে চাইলেন, এই জ্ঞানীকে জানবো কি করে?

জ্ঞানী যে, সে কারু অনিষ্ট করে না—বালকের মতো তার স্বভাব। বালক খেলাঘর বানায়, আবার নিজেই ভাঙে। অতুল ঐশ্বর্য, সব ফেলে ঐ বালকই চলে যেতে পারে। জ্ঞান আগুন। ঐ আগুনে সবকে পোড়াতে হবে—কাম ক্রোধ লোভ মোহ সবকে। অর্জুন বললেন, জ্ঞান হলে কর্ম থাকে কি ক'রে?

কর্ম ছাড়া জ্ঞান নেই, কর্মও জ্ঞান ছাড়া নয়। ভগবান বললেন, এই জ্ঞানই জীবন।

তাহলে আমাকে জীবহত্যার কাজে উত্তেজিত করছো কেন? যা হয় বলো, জ্ঞান, না কর্ম? কৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, জ্ঞানও চাই, কর্মও চাই। কাজ না ক'রে কি শুধু জ্ঞান নিয়ে থাকা যায়? সেটা তখন হয় বোঝা।

কর্ম ছেড়ে চক্ষু বুঁজে
জ্ঞানের মাঝে ব্রহ্ম খুঁজে
মনে মনেও ভাবতে হবে
ঐ সেটেরই কথা।

তাইতো বলছিলাম, কর্ম ভিন্ন উপায় নেই। নিষ্কাম কর্ম যে করে, তার জ্ঞানে কর্মে প্রভেদ থাকে না। অর্জুন বললেন, জ্ঞান কার? শেখে কে? আত্মাই কি শেখে? ভগবান উত্তর দিলেন, সকল প্রকৃতিই আত্মার জন্যে, আত্মা প্রকৃতির জন্যে নয়। প্রকৃতির অস্তিত্বের প্রয়োজন সেই আত্মার শিক্ষার জন্যে—এই শিক্ষা, এই জ্ঞানের দ্বারাই সে আপনাকে মুক্ত করতে পারে। এই কথাটা মনে রাখলেই প্রকৃতিতে আর আসক্তি আসে না। প্রকৃতি হলো পাঠ্যপুস্তক, পড়া হয়ে গেলেই ফেলে দাও।

কাজ করো, প্রভুর মতো কাজ করো—ক্রীতদাসের মতো নয়, স্বাধীনভাবে কাজ করো, প্রেমের সঙ্গে কাজ করো। ক্রীতদাসের কাজে প্রেম নেই—শেকলে বাঁধা জীব, যেমন করাও তেমনি করে। চাই প্রেম। প্রকৃত সত্তা প্রকৃত জ্ঞান, প্রকৃত প্রেম অনন্তকালের জন্যে পরস্পর পরস্পরে আবদ্ধ। একটি যেখানে, অপরগুলোও সেখানে। ওরা একে তিন—সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দেরই ত্রিবিধ রূপ। ভগবান বললেন, আমি কর্ম করি কেন? জগৎকে ভালবাসি ব'লে। ঈশ্বর ভালবাসেন ব'লেই অনাসক্ত। তাই বলছিলাম, প্রকৃত ভালবাসা না থাকলে অনাসক্ত হওয়া যায় না। আসক্তি তো আকর্ষণ—শারীরিক আকর্ষণ, ভৌতিক আকর্ষণ। যে-আকর্ষণে দুটি বস্তু নিয়ত কাছে যাবার চেষ্টা করছে, না যেতে পারলেই যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত হতে হবে। আর এ-মুক্তি আছে একমাত্র অনাসক্তিতে। অভ্যাসের দ্বারা মানুষ সবকিছুকেই আয়ত্তে আনতে পারে। প্রকৃতিও পোষ মানে, কিন্তু তাকে বশে রাখতে হলে নিয়ত সজাগ থাকা চাই। প্রকৃতির প্রতিশোধ সে বড় ভীষণ অবস্থা।

সকল কাজই ফিরে আসে ফলরূপে

অর্জুন বললেন, কাজ আমাকে দেবে কি?

দেবে ফল। ভগবান বললেন, সকল কাজই ফলরূপে আবার ফিরে আসে। একের কাজ অপরকে প্রভাবিত করে। কর্মেরও শক্তি বাড়ে—কাজ করলেই, আরো করতে ইচ্ছে নয়। কেউ অসৎ কি একদিনে হয়? একদিনের অসৎ কাজ তাকে ঐদিকেই প্ররোচিত করে। এমনি করেই মানুষ ধাপে ধাপে নীচে নামে। এটা প্রভাব—কর্মের প্রভাব। মনেরও আছে প্রভাব।

অর্জুন বিস্মিত হয়ে মনের প্রভাব কি, জানতে চাইলেন।

এক মন আর এক মনের ওপর কাজ করতে পারে। কাজ তো ক্রিয়া, তারও আছে কম্পন। এই কম্পনই কাজ করে। এক সুরে বাঁধা নানা বাদ্যযন্ত্র একটি তারের ঝংকারে সব যন্ত্রগুলোই বেজে ওঠে। মনও তেমনি যদি এক সুরে বাঁধা থাকে, তবে একের চিন্তা অপর মনেও কাজ করে। সৎ-চিন্তাও করে, অসৎ-চিন্তাও করে।

অর্জুন উল্লসিত হয়ে উঠলেন, বললেন, কম্পন তো তরঙ্গ। জগতের কোনো তরঙ্গই তো মরে না? ভগবান উত্তর দিলেন: না, মরে না। লক্ষ লক্ষ আলোক-তরঙ্গ যেমন শূন্যে ঘুরছে—তেমনি ঘুরছে মানুষের চিন্তাতরঙ্গ। প্রত্যেকটি মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি চিন্তা এই শূন্য আকাশে ভাসছে। তারা আধার খুঁজছে—সেই আধার, যে আধারে তার সুর বাঁধা। মানুষও চেষ্টা করছে সেই আকাশে ভাসা চিন্তাতরঙ্গকে ধরবার জন্যে। সে তরঙ্গ ধরতে হলে, মনকেও সেই ভাবে তৈরি করতে হবে। মানুষ এমনি করেই এগিয়ে চলেছে তার চিন্তার ক্রম-পরিণতির দিকে।

সেই জন্যেই ভগবান বলছেন, সৎকাজ করো, যা তোমার জীবনের পরেও কাজ করতে থাকবে—সৎচিন্তা করো, যা তোমার উত্তর-সাধকের সহায়স্বরূপ হবে। ভুলে যেও না, তোমার আজকের কাজের পিছনে রয়েছে বহু জন্মের সাধনা। তা যদি না থাকতো, জগতে কোনো কাজই সম্পূর্ণ হতো না। আজ যা সমাধা হলো, জানবে, তার সুরু হয়েছে অনেক কাল আগে। কত জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলকে হাতের কাছে পেয়ে, মানুষ আজ নিজেকেই আবিষ্কর্তা মনে করেছে। কিন্তু সে কতটুকু করেছে? পিছনে রয়েছে কত জন্মের তপস্যা। অর্জুন বললেন, তাহলে চিন্তাতেও তো কর্ম রয়েছে?

আছে বই কি। ক্রিয়ার দ্বারা, চিন্তার দ্বারা যে ফল উৎপাদন হয়ে থাকে তাকেই কর্ম বলে। কারণ থাকলে তার ফল হবেই। এই কর্মের বিধানে জগৎ চলছে। যা দেখছো, অনুভব করছো, সবই পূর্বকর্মের ফল। আবার অপর দিকে তারাই কারণ হয়ে অন্য ফল উৎপাদন করে। একে বলে নিয়ম বা বিধান। ঘটনাশ্রেণীর পুনরাবর্তনের নাম নিয়ম। একটি ঘটনার পরেই আর একটি ঘটনাকে ঘটতে দেখে, আবার ঘটবে বা সর্বদাই ঘটবে মনে করা যায়—মন সেই ঘটনাগুলো যে ভাবে ঘটবে তা ধরতে পারে।

কর্মযোগ

ভগবান বললেন, কর্মযোগ কি? কর্ম-রহস্যকে জানা। সকলেই কাজ করছে। কিসের জন্যে? মুক্তির জন্যে, স্বাধীন হবার জন্যে! মনের স্বাধীনতা, দেহের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা, সকল বিষয়ের স্বাধীনতা মানুষ চাচ্ছে। মানুষ চেষ্টা করছে মুক্তিলাভ করতে, বন্ধন থেকে পালাতে—জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক, এ চেষ্টা মানুষ নিরন্তর করছে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী গ্রহ সকলেই বন্ধন থেকে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পালাতে পারছে না—পালানো যায় না। এখানে মুক্তি নেই, মুক্তি পেতে হলে জগতের বাইরে যেতে হবে। এই জগতের বাইরে যাওয়াই হলো সাধনা।

অর্জুনের তত্ত্বজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠলো। বললেন, মুক্তিই যদি সব, তবে আর কর্ম করা কেন? কর্ম থেকেই তো মানুষ মুক্তি চাচ্ছে।

কর্মকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়—কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। ভগবান আরও বললেন, জগতের বাইরে যাওয়া। এই যাবার পথই কর্মযোগে আছে। তুমি নিরন্তর কর্ম করো আসক্তি না রেখে। কোনো বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িও না। মনকে স্বাধীন রাখো। দুঃখ আসক্তি থেকেই আসে, কর্ম থেকে নয়। কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেই দুঃখ পাবে। অপরের ছবি পুড়ে গেলে দুঃখ হয় না, কিন্তু যখন সেটাকে আমার বলছি, তখনি দুঃখ পাচ্ছি। অধিকারের ভাব থেকেই স্বার্থ আসে, আর স্বার্থপরতাই দুঃখের কারণ। এইখানেই কর্মযোগ বলছে, জগতের যত ছবি আছে, তার সকল সৌন্দর্য ভোগ করো—কিন্তু নিজেকে কখনো তার সঙ্গে মিশিয়ে দিও না। 'আমার' বলো না। আমার শরীর, আমার বাড়ী, আমার ছেলে কেউ-ই তোমার নয়। এগুলো স্বার্থপরতার কথা। এই প্রবৃত্তিকে নাশ করো। তোমার মনকে থামাও। মন থামাতে শিখলেই, যা খুসী করতে পারো, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো—তোমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। একেই বলে বৈরাগ্য—কর্মযোগের সার কথাই হলো অনাসক্তি। অনাসক্তি বাইরের শরীরকে দিয়ে নয়, অনাসক্তি মনে। 'আমি' 'আমার'—শরীরের সঙ্গে এই যে যোগ, তাই তো বন্ধন। যদি শরীরের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের সঙ্গে এই যোগ না থাকে, তবে সে যেখানেই থাক না কেন, সে অনাসক্ত। অর্জুন বললেন, পারে না যদি তবে মুক্তির জন্যে চেষ্টা করছে কেন? ভগবান উত্তরে বললেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই মুক্তির জন্যে চেষ্টা করছে। পরমাণু থেকে মানুষ পর্যন্ত। অচেতন প্রাণহীন জড়বস্তু থেকে সর্বোচ্চ মানবাত্মা সকলেই মুক্তির জন্যে চেষ্টা করছে। এই মুক্তি-চেষ্টার ফলই হলো জগৎ। এই জগৎরূপমিশ্রণে প্রত্যেক পরমাণুই অপর পরমাণু থেকে পালাবার চেষ্টা করছে এবং অপরে চাচ্ছে তাকে আবদ্ধ করে রাখতে। পৃথিবী পালাতে চাচ্ছে সূর্যের কাছ থেকে, চন্দ্র পৃথিবীর কাছ থেকে—কিন্তু তারা তাদের ধরে রেখেছে। সকলেই মুক্তির জন্যে চেষ্টা করছে—সাধুও করছে, চোরও করছে। কিন্তু ওদের দুজনের চেষ্টা এক নয়। একের চেষ্টায় আছে আনন্দ, অপরের চেষ্টায় বন্ধন—এ বন্ধন তার বাড়তেই থাকে। কারণ সে চেষ্টা করছে অভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। জট তো ঐখানেই বাঁধছে। কিন্তু অভাব থেকে মুক্তি কে দিতে পারে? তুমিই বা কতটুকু পারো দিতে? তুমি দুঃখের বোঝা চিরকালের জন্যে নামাতে পারো না—নিত্য সুখও পারো না দিতে, পারো না দুঃখও দিতে। যা পারো তা ক্ষণিকের।

অর্জুন বললেন, তবে পরোপকারের সার্থকতা কোথায়?

কি দেবে তুমি

ভগবান হাসলেন: তোমার দেবার প্রশ্নই এখানে নেই। তুমি কি দেবে? কতটুকুই বা পারো দিতে? জগৎ তোমার দেওয়ার অপেক্ষা করে না। তোমার অবর্তমানেও জগৎ চলবে। জগতের কোনো প্রাণীর জন্যে তুমি নও—কেউ কারো জন্যে কিছু করতে পারে না। পরোপকারে নিজেরই উপকার হয়। জগতে কেউ তোমার ওপর নির্ভর ক'রে নেই—মনে রেখো, একটা গরীবও অপেক্ষা ক'রে নেই তোমার মুখের দিকে চেয়ে। শুধু তুমি কেন, জগতে একটি প্রাণীও—যদি তাদের সাহায্য করবার কেউ না থাকে, তবু তারা সাহায্য পাবে, তারা বেঁচেও থাকবে। ভগবান বললেন, জগতে কারুর জন্যে প্রকৃতির গতি বন্ধ থাকবে না। বরং তোমারই পরম সৌভাগ্য যে অপরকে সাহায্য ক'রে নিজে শিক্ষালাভ করতে পারছো। জগতের সাহায্যের জন্যেই আমার জন্ম, এই চিন্তাই অহংকার। সে পেলো তার নিজের কর্মের ফলে: তুমি সেই কাজের বাহকমাত্র। জগতে এমন কোনো জিনিস নেই, যা তোমার ওপর তার শক্তি প্রকাশ করতে পারে, যতক্ষণ তুমি তাকে না তার শক্তি প্রকাশ করতে দাও। মানুষের আত্মার ওপরও কোনো শক্তি নেই যে তার কাজ করতে পারে, যতক্ষণ না আত্মা বোকা হয়ে সেই শক্তির আজ্ঞা পালন করে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, তবে?

এই 'তবে'র উত্তর দিলেন ভগবান: দুঃখ যেমন দূর করাও যায় না, তাকে রোধ করাও যায় না। যেখানে মঙ্গল, সেখানেই অমঙ্গল। আবার যেখানেই অমঙ্গল, সেখানেই মঙ্গল। জীবন যেখানে, মৃত্যুও সেখানে ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করছে। যে হাসছে সেই কাঁদবে। আবার যে কাঁদছে, সেও একদিন হাসবে। এই হয়। হাসবার শক্তি যেখানেই আছে, কাঁদবার শক্তিও সেখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে

জানবে। জগতের ব্যক্ত শক্তিসমষ্টি সর্বদাই সমান। ওকে বাড়ানোও যায় না, কমানোও যায় না। সেই একই সুখ-দুঃখ নিয়ে মানুষ কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ,—এ চিরকাল ধরে চলে আসছে। মানুষ চেষ্টা করছে—অবিরাম চেষ্টা করছে—তাকে সমান অবস্থায় আনবার। কিন্তু সে চেষ্টা তাকে অপর দিকে ঠেলে দেওয়া পর্যন্তই।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, এ বৈষম্য তবে ঘটছে কেন? পৃথিবীর ধন-সম্পদে আমারও যেমন অধিকার, অপরেরও তো তেমনি অধিকার?

ভগবান বললেন, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা। ওঠা-নামাই ওর স্বভাব। মৃত্যুশূন্য জীবন যদি বলতে পারো, তবেই উত্থানকে পতন থেকে পৃথক করতে পারো। জীবন মানেই তো নিয়ত মৃত্যু। আলোর পোড়াটাই ওর জীবন। জগতে সাম্যভাব কখনো হয়নি, হতে পারে না। জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণই হলো বৈষম্যভাব। বিরোধ, প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই শক্তির উদ্ভব। সম্পূর্ণ সাম্যভাব—যার মানে হলো, সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য, জগতে কখনোই তা হতে পারে না। তাহলে জগৎ থেমে যেতো, সৃষ্টি থেমে যেতো। ভগবান বললেন, সেই কর্ম, যা নিয়ত অভ্যাস করলে এ রহস্য জানা যায়। অভ্যাসেরও ক্রম আছে। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, সকলের শেষে অভ্যাস। প্রত্যেক যোগ সম্বন্ধে এই একই কথা।　[শেষ।]

এই মিনতি রাণি!

সমীরণ গুহ

সখি, অনেক আগের কিশোরবেলার কথা মনে কি পড়ে?
তোমার আমার যত্নভরা পুতুলখেলার খেলাঘরে,
স্থগিত রেখে পুতুলখেলা দু'-হাত দিয়ে জড়িয়ে গলা,
বসতে পাশে কাছটি ঘেঁষে চোখটি তুলে বলতে হেসে, গল্প বলো।
আমার কথার বেদন-গানে সুর ধরত তোমার প্রাণে,
কণ্ঠ তোমার আসত বুঁজে, বেদনায় চোখ ছলোছলো।

দেহে তোমার বান ডাকল, ফুটল যে রঙ চোখে-মুখে।
দেখে দেখে ভীষণ মাতন লাগল যে গো আমার বুকে।
তোমায় ডেকে কইনু আমি, 'ভালোবাসি তোমায় রাণি!'
লাগল কাঁপন তোমার দেহে হাসলে তুমি সলাজ হাসি।
যেই শুধানু নয়ন চুমি, 'ভালোবাস আমায় তুমি?'
কি জানি কোন লজ্জাত্রাসে, ঢাকলে নয়ন আঁচল বাসে,
উঠতে ছুটে কইলে তুমি, সরম-রাঙা, 'ভালোবাসি।'
আমি যবে আঁধার রাতে ডাকনু তোমায় বাদলধারায়,
তুমি তখন আসলে কাছে সরম বয়ে নয়নতারায়!
জড়িয়ে যখন কইনু আমি, 'ছাড়বো না আজ তোমায় রাণি!'
বুকের ভেতর সরমে রেঙে দু'-হাতে মুখ ঢাকলে।
কপোল চুমি কইনু আমি, 'তোমার রাণি সব নিয়েছি।'
থরথরিয়ে মৃদুভাবে কইলে তুমি, 'সব দিয়েছি।'
সুর ধরাল তোমার কাঁকন, পাগল হ'ল মনের মাতন,
বাদলধারার তালে সে রাত বুকের ভেতর কাঁপলে।

তোমার পাশে আবার যখন আসনু আমি সন্ধ্যাবেলা
তখন তোমার কোমল হাতে ছিল যে গো ফুলের মেলা।
'কাহার তরে ও ফুল নিয়ে?' যখন আমি কইনু প্রিয়ে!
প্রণয় ভাবে চাইল যে গো কাজল কালো তোমার আঁখি।
তোমার গাঁথা ফুলহারে প্রেমে তুমি বাঁধলে মোরে,
কইলে তুমি হাতে বেঁধে, 'এই আমাদের মিলনরাখী।'
দু'-হাত দিয়ে ধরলে তোমায়, সরমে তুমি বিষম ঘামায়,
মাথার 'পরে আঁচল টেনে নিলে যে মোর চরণধূলি।
হিয়াতে মোর সকল মাতন এলো তখন আগল খুলি।
নিদাঘ-বেলায় বিষম ঘেমে আসনু যখন তোমার দ্বারে,
আঁচল দিয়ে মুছলে সে ঘাম, কণ্ঠ বেড়ি যতন ভরে।
তোমার হাতে মধু বীজন জুড়াল মোর এ প্রাণ-মন,
বসতে দিয়ে আসন বসন দিব্যি দিলে মাথার কিরে।
যখন আমি ডাকনু 'রাণি' ফেরালে চোখ ঝিলিক হানি,
অধর-কোণে ফুটল হাসি ফুটল যে লাজ তোমায় ঘিরে।
কোলের 'পরে রেখে মাথা কইলে তুমি কতো কথা,
হৃদয় আমার ভরিয়ে দিলে তোমার গানের মূর্চ্ছনায়।
আমার প্রাণে জাগল যে সুর রিণি-ঝিনি মনোবীণায়।
যখন আমি তপ্তদেহে এলেম পাশে জ্বরের ঘোরে,
ব্যাকুল মুখে আসলে ছুটে দু'-হাত দিয়ে ধরলে মোরে।
মাথার 'পরে কোমল করে, নিলে সে মোর বিকার হরে,
বুজনু আমি আঁখির পাতা কোমল তোমার শয্যাপাতে।
নিদ্রাহারা তোমার আঁখি করল সেবা সারারাতি,
শুষ্ক তোমার আননখানি দেখনু উঠে রাতপ্রভাতে।
শুধায় যবে, 'এ কি প্রিয়ে!' কণ্ঠ বেড়ি দু'-হাত দিয়ে
উজল মুখে হরষ ভরে, কইলে তুমি, 'নয় কথা নয়।'
তোমার বুকে লুকিয়ে আনন দেখনু সুধা পৃথ্বীময়।
মনে নাই সখি, মনে কি নাই, সে সব দিনের সে সব কথা?
আমার পায়ে ফুটলে কাঁটা বাজত তোমার বুকে ব্যথা।
আজকে তুমি জ্বর-বিকারে রইছ পড়ে শয্যাপরে,
আমার লাগি ভাবনা ভেবে ঝরছে চোখে ব্যথার ধারা।
তোমার সেবা করলে আমি, কষ্ট হবে, ভাবছ তুমি,
(তাই) করছে নিষেধ বারে বারে করুণ তোমার নয়নতারা।
মিনতি মোর শোন গো সখি! তোমার কাছে এ ভিখ মাগি,
পরাণ সঁপে করব সেবা আপন ভুলে আমি
কৃপা করে এইটুক দাও, এই মিনতি রাণি!

ভেরা ফিগ্‌নার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমল সেন

আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারী। কাল পয়লা মার্চ—জারের আসার দিন, তার মৃত্যুর তারিখ।

ফাঁদ পাতা হবে তিনটে। এক মাইন। তার পর, বোমা। তৃতীয়তঃ, ছোরা। প্রথমে মাইন ফাটানো হবে।

তাতে ফল না হ'লে বোমা—মলয়-সদোভয় রাস্তার দু'পাশে দু'-দু' করে চার জন বোমা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে। সিগনাল পেলেই বোমা ছাড়বে।

তাতেও যদি কিছু না হয়, তো ছোরা। একজন ছোরা নিয়ে লাফিয়ে পড়বে জারের উপর এবং চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কাজ শেষ করবে। বন্দোবস্ত এই—

কিন্তু এ কী! মাইন্ যে পাতা হয়নি আজও, বোমাও মোটে একটা তৈরি হ'য়েছে, আরো তিনটে চাই। মাঝে রাত্রিটা মাত্র সময়।

বিকেল পাঁচটায় কর্মীরা এসে সমবেত হ'ল—সুখানভ, কিবালচিচ, গ্রাশেভস্কি, ভেরা ফিগনার, শোফিয়া প্রভৃতি।

সবাই বোমা প্রস্তুতে লেগে গেল। সে কী উত্তেজনা! সে কী উৎসাহ! ঘণ্টায় ঘণ্টায় শহরের খবর নেওয়া হ'চ্ছে,—পুলিশ টের পেলেই সব মাটি।

শোফিয়ার উপর বোমা-নিক্ষেপকারীদের সিগ নাল দেওয়ার ভার। অথচ সে কিছুতেই কাজ করা ছাড়বে না।

ভেরা তাকে জোর করে শুইয়ে দিল—বিশ্রাম না ক'রলে কালকের কর্তব্য করার মতো জোর পাবে কোথা থেকে?

শোফিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুয়ে প'ড়লো। সমস্ত রাত জেগে কাজ ক'রলো ভেরা এবং আরো জনতিনেক। ঢং ঢং ঢং—ঘড়িতে আটটা বেজে গেল। বোমা চারটাও তৈরি শেষ—১৫ ঘণ্টার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর। মাইন্ পাতাও সারা। সব ঠিক!

শোফিয়া বোমা ছোঁড়ার পর নিক্ষেপকারী চার জন কোথায় যাবে, কেমন ক'রে যাবে, তাই বুঝিয়ে দিতে লাগলো।

ভেরা নিজের বাড়ীতে গেল—মাইন্ ফাটার কিছু আগে কবোজেভ্,—বাসকা তার ওখানে গিয়েই উঠবে। মাইন ফাটাবে ফ্রোলেংকো,—মাইন ফাটার পর যদি বাঁচে নিরীহ একজন খদ্দেরের মতো পালিয়ে যাবে।

কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা কম—মরার সম্ভাবনাই পনেরো আনা। বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু তার জন্ত ফ্রোলেংকোর কোন দুশ্চিন্তাই নেই।

ভেরা ঘরে ব'সে আছে,—উত্তেজনায় অস্থির। ফ্রোলেংকো তার ঘরে গেলো—বগলে এক বোতল মদ,—আর কিছু খাবার। দিব্যি আরামে সে খেতে লাগলো।

ভেরা তো অবাক! এমন সময়ে কি খাওয়া আসে? বিশেষতঃ এই লোকটার, অল্প কিছুক্ষণ পরে যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে!

ভেরা জিজ্ঞেস ক'রলো—আপনি এমন নিশ্চিন্ত আছেন কেমন ক'রে বলুন তো? একটা উত্তেজনা বোধ ক'রছেন না?

ফ্রোলেংকো হেসে ব'ললো,—না, মোটেই না।

কেন বলুন তো?

তাহ'লে খাওয়াটা মাটি হবে। দেখছেন মদ কেমন টকটকে লাল, জারের রক্তও বোধ করি এতো লাল নয়।

ভেরা ব'ললে, আশ্চর্য! স্থির মৃত্যুমুখে যাবার পূর্বক্ষণে এতো আনন্দের সংগে খেতে কাউকে দেখিনি।

ফ্রোলেংকো হেসে ব'ললে, বাঃ রে, আপনার তো বেশ বিবেচনা! এই হয় তো জীবনের শেষ খাওয়া, এটাও ভালো ক'রে খাবো না?

ভেরা মনে মনে ফ্রোলেংকোকে তার অপূর্ব সাহসের জন্ত নতি জানালো। ফ্রোলেংকো খেয়ে-দেয়ে চ'লে গেলো।

তার পর যথাসময়ে মারণাস্ত্রসহ তিন দল হত্যাকারীই প্রস্তুত। জার দোকানের পাশের রাস্তা দিয়ে যাবেন না, যাবেন খালধারের একটা রাস্তা দিয়ে।

এমনটা যে হবে কেউ আশা করেনি—হায় হায়! তিন-তিনটে ফাঁদ।

তেজস্বিনী নারী শোফিয়া—যার উপর বোমা-নিক্ষেপকারীদের সিগ নাল দেওয়ার ভার—সে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো। তার পর হুকুম দিল, চলো খালের পাশের রাস্তায়।

বোমা নিয়ে দলশুদ্ধ সেই রাস্তায় গিয়ে ওঁৎ পেতে রইলো। জারের গাড়ী যথাসময়ে এলো, আর বোমাও পড়লো।

গর্বিত জারের জীবলীলা এতোদিন পরে শেষ হ'ল

বোমা-নিক্ষেপকারীদের মধ্যে গ্রিনেভিৎস্কি হত হ'ল। শোফিয়া

পালিয়ে গেলো। রাইনকন্ত্ও পালালো—কিন্তু পুলিশের চরের দৃষ্টি প'ড়লো তার উপর।

ফলে অনেক বিপ্লবীর ধরা প'ড়বার পথ প্রশস্ত হ'ল।

কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশন। আজ বিপ্লবীদের মহা আনন্দের দিন—দু' বছর বার বার চেষ্টার পর জার নিহত।

মৃত সম্রাটের পুত্র তৃতীয় আলেকজেন্ডার এখন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী—রাজ্যভার গ্রহণ করেছে, কিন্তু অভিষেক বা অন্য কোন উৎসব হয়নি এখন পর্যন্ত—বোধ হয় বিপ্লবীদের ভয়ে।

কার্যনির্বাহক সমিতি স্থির করলো, তৃতীয় আলেকজেন্ডারকে একখানা চিঠি পাঠাবে, তাতে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য কি, কী তাদের দাবী, কতটুকু কি পেলে বিপ্লবান্দোলন ছেড়ে দিতে পারে তারা, তাই লেখা থাকবে।

চিঠি লেখা হল।

মান্যবরেষু,—

পিতৃশোকে আপনি কাতর, এ জেনেও আপনাকে কয়েকটা কথা জানাতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা যত বড়ই হোক না কেন, তার চেয়েও একটা বড় জিনিষ আছে দুনিয়ায়;—তা হচ্ছে, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য। এর কাছে প্রত্যেক নরনারীকে বলি দিতে হবে তার সমস্ত ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত। দেশের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে অন্যের মনে যদি আঘাত দিতে হয় তো তাও দিতে বাধ্য আমরা। এই কর্তব্যবোধে আপনার কাছে চিঠি দিচ্ছি; এক্ষুনি, কেন না বিপ্লবের কথা কে বলতে পারে ঠিক করে?—অদূর ভবিষ্যতে হয়তো রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে দেশের বুকের ওপর দিয়ে, আরও হবে অনেক অনাচার।

আপনার পিতাকে হত্যা করে আজ যে রক্ত-হোলি শুরু হল দেশে, মনেও করবেন না এ আকস্মিক। দেশবাসী কেউ এতে অবাক হয়নি। গত দশ বছর ধরে জাতি যে উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করে এসেছে, তার পরে এ হতেই হবে। এ হত্যার অর্থ—এই সঞ্চিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ। ভালো করে বুঝতে হবে। জাতির জীবনের স্পন্দনের সংগে পরিচয় নেই যাদের তারা বলবে একে একদল দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্র, তারা বলবে একে ডাকাতি। আপনিও কি তাই বলবেন?

এ বিপ্লবীদলকে পিষে মারবার জন্য আপনার পিতা কি না করেছেন? পৈশাচিক অত্যাচার; জাতির শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মান-সম্মান সমস্ত অবহেলা করে শুধু নির্যাতনের আয়োজন। তবু থামেনি এ বিপ্লব। জাতির খাঁটি লোক যারা, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ এবং শ্রমশীল যারা, তারাই দলে দলে এতে যোগদান করেছে। এদের নিয়েই গত তিন বছর ধরে লড়াই চলছে সরকারের সংগে। আপনি জানেন, আপনার পিতাও অলস হয়ে বসে ছিলেন না এতোদিন। অপরাধী নিরপরাধী যাকেই পেয়েছেন, তাকেই ফাঁসিতে লটকিয়েছেন। জেল ভর্তি—সাইবেরিয়ায়ও আর শূন্যস্থান ছিল না, এতো লোক সেখানে নির্বাসিত হয়েছিল। বিপ্লবী নায়কদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে দলকে মুণ্ডহত্যা করেছেন কত বার। তবু থামেনি আন্দোলন। বরং দিন দিন প্রবলতর হয়ে উঠেছে। দশ-বিশজনকে হত্যা করে কী হবে? এ বিপ্লব তো আর ব্যক্তি বা সমষ্টিবিশেষের উপর নির্ভর করছে না। একটা সমগ্র জাতির বিক্ষুব্ধ অন্তরাত্মা আত্মপ্রকাশ করেছে এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সমগ্র জাতিকে কে ফাঁসির রজ্জু দেখিয়ে ভয় দেখাবে? ও করে এ বিপ্লব থামানো অসম্ভব।

তা যদি হত, তা হলে ইহুদীরাও পারতো যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে জাতির আকাঙ্খিত খৃষ্টধর্মের লোপ করতে।

সরকার বহু লোককে ধরে ফাঁসি দিতে পারেন, দু'-চারটা বিপ্লবীদলকে হয়তো নষ্ট করতে পারেন। এমন কি, বর্তমানের সবচেয়ে বড়ো বিপ্লবীদল, তারও তিনি বিনাশ করতে পারেন,—তাতেই কি বিপ্লব থামবে?

বিপ্লবের বীজ কোথায়?—জাতির মনে। সর্বব্যাপী অসন্তোষ, নবীন আদর্শের প্রতি প্রবল একটা আকাঙ্ক্ষা—তাই-ই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করে লোককে। সরকার সমগ্র জাতিটাকেই তো মেরে ফেলতে পারেন না—নির্যাতন শুধু বিপ্লবের অগ্নিকুণ্ডেই ইন্ধন জোগায়। সরকার দশজনকে ধরে ফাঁসি দেয়, একশ' জন আরও বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে আসে সে স্থান পূর্ণ করতে। বিপ্লবের আগুন সরকারী নির্যাতনের হাওয়ায় উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে ওঠে।

এই কি আমরা দেখে আসিনি গত দশ বছর ধরে?

আজ দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা জাতির ভবিষ্যৎ কি! সরকার যদি নির্যাতনের দণ্ড সংহৃত না করেন তবে এ বিপ্লব আরো প্রবল, আরো ভীষণ হবে। এক দল নষ্ট হলে শক্তিশালী নবদলের প্রতিষ্ঠা হবে। জাতির মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে, সরকারের প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকবে না। তার পর একদিন এ স্বেচ্ছাচার জারতন্ত্র রক্ত-বিপ্লবের প্রলয় লীলায় তাসের ঘরের মতো ভূলুণ্ঠিত হবে।

কী ভীষণ ভবিষ্যৎ! আমরা বিপ্লবী, আমরা আরো ভালো ক'রে বুঝি—এই বিপ্লব জাতির মুক্তির সংগে সংগে কতো বড়ো একটা ক্ষতিও বহন ক'রে আনবে। কত বিদ্যা, কত শিল্পকলা, কত সম্পদ নষ্ট হবে। এই ধ্বংসের শক্তি যদি সৃজনের দিকে দিতে পারতুম আমরা, তবে জাতি কত উন্নত হ'ত।

কিন্তু দিতে পারি না কেন আমরা? কেন আমরা এ বিপ্লবের রক্ত হাতে মাখতে বাধ্য হই? কেন এ বেদনাময় কর্তব্য?

তার কারণ, এ স্বেচ্ছাচারতন্ত্র রুশ সরকার, এ রাষ্ট্রই নয়। খাঁটি রাষ্ট্র হ'ল তাই যার মধ্য দিয়ে প্রজামণ্ডলীর আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাদের ইচ্ছা ফুটে ওঠে। কিন্তু রুশিয়ায় কি?—একদল পরস্বাপহারী গুণ্ডার রাজত্ব। কথাটা রূঢ় হ'লেও ক্ষমা ক'রবেন—এ সত্য, অতীব সত্য।

সম্রাটের কী ইচ্ছা জানি না, তার সরকার দেখছি বরাবরই জাতির সুখ-দুঃখ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। জনসাধারণ প্রকৃত প্রস্তাবে আজ দাস—প্রভু তাদের অভিজাতবর্গ, সরকারই তাদের ছেড়ে দিয়েছে অভিজাতবর্গের দংষ্ট্রার মুখে। সরকার সংস্কারমূলক নিয়ম করেন মাঝে মাঝে। তাতে লাভবান হয় অভিজাতবর্গ, তাদের শক্তি বাড়ে, কিন্তু জনসাধারণের দাসত্বের নিগড় আরো শক্ত হয়, দুঃখ আরো বাড়ে। তারা আজ ভিক্ষুক, নিরন্ন, নিজের পর্ণকুটিরে শান্তিতে ম'রবে, তারও যো নেই। আইন তাদের রক্ষা করার জন্য সৃষ্ট হয়নি।

বিলাসী, অপব্যয়ী, অত্যাচারী অভিজাতবর্গ, তাদের রক্ষা করার

জন্যই আইন, তাদের জন্যই সরকার। তারা অতি হীন পৈশাচিক অত্যাচার ক'রলেও তাদের শাস্তি নেই!

অথচ, কেউ যদি জাতির মংগলের জন্য আঙুলটিও তোলে অমনি সরকার, তার আইন, তার মারণাস্ত্র—একসংগে ক'রে ক্ষেপে ওঠে।

এই কি রাষ্ট্র? না। এ একদল স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর পিশাচের তাণ্ডবলীলা! তাই তো রুশ সরকারের আজ কোন নৈতিক প্রভাব নেই জাতির উপর, কেউ তাদের সমর্থন করে না। তাই এই বিপ্লব। রাজঘাতক তাই আজ জাতির দ্বারা এতো অভিনন্দিত। ভণ্ড যাদুকরদের মুখে অন্য কথা শুনতে পাবেন আপনি, কিন্তু যদি দৃষ্টি থাকে তো দেখুন—রুশে আজ রাজহত্যা কত জনপ্রিয়। এখন উপায় কি? উপায় দু'টো। এক, আপনারা যদি জাতির ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রকে গঠন করেন। নতুবা, আমরা যে পথ ধরেছি—বিপ্লব।

আশা করি, জাতির মঙ্গলামঙ্গলের দিকে চেয়ে, তাকে বিপ্লবের রক্তসাগরে আকণ্ঠ নিমগ্ন হওয়ার বেদনাময় কর্তব্য থেকে রক্ষা ক'রতে আপনি প্রথম পথটাই বেছে নেবেন।.....

১০ই মার্চ, ১৮৮১ কার্যনির্বাহক সমিতি
"প্রজার দাবী"

এই চিঠির এক কপি নতুন জারের কাছে পাঠানো হ'ল।

পুলিশও অলস হ'য়ে বসে ছিল না। বিপ্লবীদলে পুলিশের চর ছিল, তারই সাহায্যে বিপ্লবী-নায়কদের একে একে ধ'রতে লাগলো। খানাতল্লাসে খানাতল্লাসে শহরে আতংক লেগে গেলো।

ভেরার জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন—শুধু ভেরার নয়, অনেক বিপ্লবীর জীবনেও তাই। কত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে, কত জীবন বলি হ'য়েছে,...সব আজ সার্থক হ'ল, সব প্রেতাত্মা তৃপ্ত হ'ল আজ জারের রক্তে। সমগ্র রুশজাতির প্রাণে একটা চাপা আনন্দের স্রোত ব'য়ে গেলো।

৩রা মার্চ।

ভজ্‌নেস্কি-ব্রিজ্‌এর কাছে একটা বাড়ীতে ভেরা আছে। হঠাৎ কোন খবরাখবর না দিয়ে কিবালশিশ এসে ঢুকলো।

ব্যাপার কি?

সেবলিন আত্মহত্যা করেছে।

সে কি! কেন?

পুলিশ ঘেরাও করেছিল বাড়ী। জেসাস্না ধরা পড়েছে। কিন্তু তার চাইতেও একটা বড়ো বিপদ সামনে।

কি?

দোকানটা যেমন কে তেমন প'ড়ে আছে। পুলিশের খানাতল্লাস করার খুবই সম্ভাবনা। ওটা তুলে দেওয়া দরকার।

ভেরা বললে, কার্যনির্ব্বাহক সমিতির বৈঠক ডেকে তা ঠিক করা যাক।

সমিতির বৈঠকে ভেরা প্রস্তাব করলো, মৃত জারের জন্য যে মাইন পাতা হয়েছিল নতুন জারকে তাই দিয়ে অভিনন্দিত করা হোক। নতুন জার এরই মধ্যে এপথ দিয়ে গেছেন, কাজেই এটা নিঃসন্দেহ—পুলিশ দোকানের রহস্য এখনও ভেদ করতে পারেনি।

কিন্তু বেশীর ভাগ সভ্য মত দিল না এতে। পুলিশের দৃষ্টি সম্প্রতি এতো প্রখর যে তা করা দলের পক্ষে বিপজ্জনক হবে।

ভেরা উষ্ণ হয়ে বললে, কিন্তু এতে কত বড় একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হবে দেশে, তা কি আপনারা বুঝতে পারছেন না? আপনাদের এটুকু সাহস থাকা উচিত।

বৃথা এ গরম বক্তৃতা।

প্রস্তাব না-মঞ্জুর হল।

ভেরা, শোফিয়া—দু'জনকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে পুলিশ, কিন্তু পাচ্ছে না। অথচ দুজনেই রাজধানীতেই আছে—অবশ্য বিভিন্ন স্থানে।

শোফিয়া রাজধানী ছেড়ে যায়নি, কারণ তার মতলব নতুন জারকেও শেষ করে যাবে।

এই মতলব নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করে দিল। ছদ্মবেশে রাজ-প্রাসাদের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়। রাজবাড়ীতে যারা কাজ করে তাদের সংগে ভাব করে সম্রাটের গতিবিধি সম্বন্ধে খবর নেয়। আর মতলব আঁটে।

পুলিশও ফেরে তার খোঁজে। শোফিয়া এক স্থানে দু'রাত থাকে না। আজ এখানে, কাল কোথায় থাকবে তা কেউ বলতে পারে না। বন্ধুদের বাড়ী সে যেতো না, কারণ তাহলে বন্ধুরা হয়তো তারই জন্য বিপন্ন হবে। একদিন বোধ হয় অন্য কোথাও স্থান না পেয়ে ভেরার কাছে এসে বললো, তোমার এখানে থাকতে পারি এ রাতটা? ভেরা অবাক হয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললো, শোফি, তুমি আমাকে এতো পর মনে করো জানতুম না।

শোফিয়া বললে, পর মনে করবো কেন?

নইলে, বোনের ঘরে থাকতে আবার অনুমতি চাওয়ার দরকার হয় নাকি?

শোফিয়া বললে, ব্যথা পেয়েছিস ভেরা। আমি ও ভেবে বলিনি। জানিস তো দিদি, আমার সংগে যাকেই দেখবে পুলিশ তাকেই ফাঁসি দেবে।

ভেরা জবাবে বিছানার শিয়রে একটা রিভলবার দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ দেখেছিস, আমার এখানে যে মহাপ্রভুরা আসবেন—তাদের অভ্যর্থনার জন্য।

সে রাত নিরাপদে কেটে গেল।

শোফিয়ার মত নারী দুর্লভ! ভেরা শোফিয়া দুজনেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে পলিসি হিসাবে বাঁধা-পথের বাইরে চলতে বাধ্য হয়েছে। নইলে তাদের নৈতিক চরিত্র ছিল অনিন্দ্যসুন্দর।

একদিন শোফিয়া ভেরার কাছে এলো। ভাই, গোটা পনেরো টাকা ধার দিতে পারিস? আমার হাতে যা ছিল ওষুধ-পত্তরে খরচ হয়ে গেছে। একটা সিল্কের পোষাক বিক্রী করতে দিয়েছি, তার টাকা পেলেই ধার শোধ দিয়ে যাবো।

ভেরা তাকে টাকা এনে দিল। অথচ এই শোফিয়ার হেফাজতে প্রচুর টাকা। কিন্তু সে সব সমিতির। না খেয়ে-মরলেও সে টাকায় হাত দেবে না শোফিয়া। কত বড় চরিত্রের জোর থাকলে এ হয়?

শোফিয়া সেদিনও বেরিয়েছে তার মতলব নিয়ে। এক বিশ্বাসঘাতক তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল।

পুলিশ তাকে এমন ক'রে বাঁধলো যে, তার মনে হ'ল শরীরের

শিরাগুলি যেন কে কেটে দিচ্ছে। বললো, একটু আলগা করো বাঁধন, ভারি লাগছে আমার।

পুলিশের কর্তা পৈশাচিক হাসি হেসে বললো, এখনই কি হয়েছে লক্ষ্মী! আরো কত লাগবে!

সোফিয়াকে উল্টো ঘোড়ায় চাপিয়ে, তার বুকে "রাজহন্তা" লেবেল এঁটে শহরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

তারপরে বিচার।

সরকারী উকিল তাকে অভিযুক্ত করলো রাজহত্যার অপরাধে। শুধু তাতেই উকিলের তৃপ্তি হ'ল না।

আমি এ নারীকে জানি। এ যে শুধু রক্তলোলুপ তা-ই নয়, এ দুশ্চরিত্রা।

সোফিয়া মুখ তুলে চেয়ে দেখলো, কে এ উকিল! চিনতে পারলো। তারই বাল্যবন্ধু, বাড়ীর পাশে বাড়ী, কিন্তু একটা কথাও বললো না সোফিয়া।

বিচারে তার চরম দণ্ড হ'ল।

এই প্রথম রুশনারী, যিনি বিপ্লবী বলে ফাঁসিকাঠে আত্মবলি দেবার মহৎ সম্মান প্রথম লাভ করেন।

ভেরার উপরেও পুলিশের উপদ্রব শুরু হ'ল।

ভেরা পালিয়ে ওডেসায় এলো। এসে দেখে, কার্যনির্ব্বাহক সমিতির ২৮ জন সভ্যের মধ্যে ২০ জন ধরা প'ড়েছে। অধৃত অবস্থায় আছে তিনজন মহিলা, পাঁচজন পুরুষ।

বিপ্লববাদীরা আশা ক'রেছিল, জারহত্যার সংগে সংগেই দেশময় একটা বিদ্রোহ জাগবে। তা কিছু না হওয়ায় এইবার তারা ভয়ানক দমে গেলো। পুলিশের হাত কেউ যে এড়াতে পারবে না, এ তারা বেশ জানতো। কারণ, দলের ভিতর এমন একজন গুপ্তচর র'য়েছে পুলিশের—যে এ দিকের সব খবর জানে এবং ওদিকে সব খবরগুলি সে বেমালুম চালান করে। কে এ? ধরা শক্ত।

বিপ্লবীদল চালাতে পারে, এমন একজন লোক দলে আছে শুধু এখন। সে ভেরা ফিগ্‌নার। সমস্ত ভার স্বভাবতই তার উপর এসে পড়লো।

কর্মক্ষেত্রে নেমে ভেরা দেখলো, আগের মতো কর্মী নেই এখন। নতুন যারা ঢুকছে তাদের গড়ে তুলতে পারলেই তবে দল জেগে উঠবে আবার।

ভেরা গড়নের দিকে মন দিল। পেট্রোগ্রাদ থেকে কেন্দ্র মস্কোতে স্থানান্তরিত করা হ'ল। দলের মুখপত্র বের করা হ'ল। প্রচারকার্য্য চলতে লাগলো খুব জোর।

তার পর দু' বছর কেটে গেছে—পুরানো কার্যনির্ব্বাহক সমিতির সবাই ধরা পড়েছে। মুক্ত শুধু ভেরা ফিগ্‌নার। শত চেষ্টাতেও পুলিশ তার নাগাল পায়নি।

ভেরার একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী—ডিগায়েভ। ওডেসায় দলের একটা প্রেস আছে—তার ভার নিয়ে ডিগায়েভ সস্ত্রীক সেখানে থাকে।

একদিন খবর এলো, রুশ সরকার প্রেস বাজেয়াপ্ত করেছে—ডিগায়েভ পুলিশের হাতে বন্দী।

দিনকয়েক পরে ডিগায়েভ হাজির। ভেরা তো অবাক্! আনন্দও হ'ল।

তুমি না ধরা পড়েছিলে?

হাঁ।

কি করে পালিয়ে এলে?

ওঃ, সে অনেক কৌশলে। পুলিশ আমায় বললো আমায় নিয়ে গিয়ে ভেরা, তোমার বাড়ী কোথায়? আমি বললুম কিভে। সেখানে গিয়ে আমার যা কিছু বর্ণনা দেওয়ার আছে, দেব।

পুলিশরা রাজী হ'ল।

না, কিছুতেই কিভে নিয়ে যেতে চায় না, তার পর শেষটায় কি তানি কি ভেবে রাজি হ'ল। এক অন্ধকার রাত্রে দুটো পুলিশের পাহারায় আমায় নিয়ে চললো গাড়ীতে ক'রে ষ্টেশনের দিকে। খোলা একটা মাঠের মধ্য দিয়ে পথ। মাঠের মাঝামাঝি যখন এলো, আমি পকেট থেকে এক মুঠো তামাকচূর্ণ বের করে পুলিশ দুটোর চোখে মারলুম ছুঁড়ে। বেচারাদের দুর্দশা তখন বুঝতেই পারছেন। আমিও গাড়ী থেকে নেমে অন্ধকারে তলিয়ে গেলুম।

তারপর কোথায় গেলে?

ওডেসায়, আমাদের দলভুক্ত সৈন্যসম্প্রদায়ের আড্ডায়। তারপর পুলিশের কড়া দৃষ্টি একটু নরম হ'তে গতকল্য এখানে এলুম।

দু'-চার জন অতি বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া ভেরার আসল বাসস্থানের কথা কেউ জানতো না। কাজেই ভেরা জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার ঠিকানা কি ক'রে পেলে?

ডিগায়েভ বললে, এখানে এসে জেনেছি। যার 'কেয়ারে' আপনাকে চিঠি লিখতুম, তিনি অনেক পীড়াপীড়ির পর বললেন।

কাল এসেছ, সমস্ত রাত কোথায় ছিলে? পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছ নাকি?

না, তবে যেখানে ছিলুম সেখানটারও খুব সুনাম নেই।

আচ্ছা, তুমি তো জানি তামাক খাও না। তামাকের গুঁড়ো কী ক'রে পেলে?

পথেই কিনে নিয়েছিলুম, পালাবার প্ল্যান আগে থাকতেই ঠিক ছিল কি না!

ভেরা আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। তার দরদ হ'ল ডিগায়েভের জন্য। হায় বেচারা! মুক্ত হ'য়েও মুক্তির আনন্দ উপভোগ করার যো নেই। বউকে যে পুলিশের কবলে ফেলে আসতে হয়েছে।

এরই কিছুদিন পরে কর্মীর পর কর্মী ধরা প'ড়তে লাগলো। এ যে দলের সেই একই বিশ্বাসঘাতকের কাজ, তা বুঝতে ভেরার বাকী রইলো না।

ডিগায়েভ ব'ললে, ওডেসায় যাদের ধ'রেছে, তাদেরই কেউ হয়তো সব কথা ব'লে দিচ্ছে।

ভেরা ব'ললে, কিন্তু কে সে?

পুলিশের চর কেউ হবে।

কিন্তু পুলিশের চর এলো কোত্থেকে? ওডেসায় তো ছিলে তুমি আর তোমার স্ত্রী, আরও একজন। এরা তো আর চর নয়?

ডিগায়েভ মাথা চুলকাতে চুলকাতে ব'ললে, আমার তো মনে হয়, আমাদের দলের কোনো পুলিশের চরের এ কাজ।

ভেরা একটু চিন্তিত হ'ল।

কাজ যে এখনো অনেক বাকী। বিপ্লবীদলকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে

যাওয়া চাই ধরা পড়ার আগে, কারণ সে ধরা প'ড়লে বর্তমান বিপ্লবীদলকে রুশিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলা পুলিশের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না পুলিশও তাই বারে বারে জাল ফেলছে—ভেরা যদি ধরা পড়ে। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পুলিশের খর নজর, বিজ্ঞাপন, প্লাকার্ড, পুরস্কার ঘোষণা, কিছুরই বাকী নেই।

—অথচ ভেরাকে চোখে কেউ দেখে না!

এ যেন আফ্রিকার নদীতে নেমে কুমীরের সংগে লড়াই করা।

একদিন ডিগায়েভ চিন্তিত মুখে এসে ব'ললে, এখানে কি আপনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করেন?

নিশ্চয়।

কেউ চেনে না বুঝি এখানে আপনাকে?

হাঁ, অনেকটা তাই। ভেরা ফিগনারের নাম অনেকে শুনেছে কিন্তু দু-চারজন খুব বিশ্বস্ত বন্ধু ছাড়া ভেরা ফিগনার ব'লে চেনে না কেউই।

কিন্তু, সে দু-চারজন বন্ধুর মধ্যে একজনও কি পুলিশের চর নেই?

আছে—মার্কুলভ। সে দেখতে পেলেই বিপদ।

ডিগায়েভ তখন অন্য কথা পাড়লো। আচ্ছা, আপনি বের হন কখন?

সাধারণত আটটায়।

আটটায় কেন?

একটা ডাক্তারি স্কুল বসে তখন। তাদেরই কারুর ছাড়পত্র নিয়ে বেরুই কি না আমি।

আর একদিন ডিগায়েভ একথা সেকথার পর ব'ললে, আপনি রোজই দেখি এই দোর দিয়ে বেরোন। একটা দোরই বুঝি এ বাড়ীতে?

ভেরা ব'ললে, তা কেন? বাড়ীওয়ালার ঘরের দিক্ দিয়ে আর একটা দোর আছে। তবে আমি কক্ষনো ও দোর দিয়ে যাই না।

অন্য কেউ এ সব প্রশ্ন করলে ভেরা নিশ্চয়ই সন্দেহ ক'রতো,—ব'লতো না কিছু। কিন্তু ডিগায়েভ—বিশ্বস্ত বন্ধু। তার কথা স্বতন্ত্র।

১০ই ফেব্রুয়ারী।

ভেরা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে, ঠিক আটটা বেজেছে। বাড়ী থেকে বের হ'ল। দশ-পাও বোধ হয় এগোয়নি। ও কে? মার্কুলভ্ না? হাঁ—তাই তো। ও কি ক'রে এলো? নিশ্চয়ই পুলিশের চরটি খবর দিয়ে আনিয়েছে। নির্ঘাৎ—এইবার ভেরা ধরা পড়লো বুঝি!

মার্কুলভ্ ভেরার পিছু নিয়েছে, কিন্তু ধ'রছে না। ভেরা খুব জোরে জোরে পা চালিয়েছে, মার্কুলভও তাই। ভেরা পথ চলছে, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করছে চারিদিকে—পালাবার কোন অলিগলি নাই—লুকোবার কোন ঠাঁই নেই। সত্যিই কি ধরা পড়তে হবে? আচ্ছা, পকেটে কি আছে?

ভেরা হাত দিয়ে দেখলো, একখানা নোটবুক আর মনিঅর্ডারের রসিদ একখানা। নোটবুকে কয়েকটা নাম আছে, তারা এ দলের নয়—অথচ তাদের জীবন নিয়েও টানাটানি হবে। না, যে ক'রেই হোক এ নষ্ট ক'রে বাঁচাতে হবে তাদের।

ভেরা তখনও চলছে সমানভাবে। অন্তরালে যে পুলিশের ব্যূহ চারিদিকে, তা যেন সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল।

ডোণ্ট কেয়ার! যা হবার হবে।

দ্রুততর পদচালনা।

সামনেই একটা অর্ধগোলাকৃতি বাগান—তারপরেই একটা বহু-পুরানো বাড়ী।

ঐখানে বন্ধু ইভাসেভ থাকে, না? হাঁ, ঐ তো তার দোকান।

ভেরা সেই দিকে ফিরবে—

কিন্তু ফেরা আর হ'ল না। কোথা থেকে যে দলে দলে পুলিশ এসে তাকে ঘিরে ফেললো, তা সে বুঝতেই পারলো না!

রুশ-পুলিশের বহুবর্ষব্যাপী অনুসন্ধান সার্থক হ'ল—

ভেরা ফিগনার আজ বন্দিনী। [ক্রমশঃ

অবিচ্ছেদ মানে

পরেশ মণ্ডল

ত্রিশঙ্কুর মতো হবে উদাসীন মন
চিরদিন। পথ খোঁজা শেষ হবে নাক'
যদি কেউ ধরে বসে একাধিক। বন
বড় জঙ্গল। ওই হিসেবিরা থাক্।

উর্বর মাঠে বসে। যতো জঞ্জাল
সহগামী আমার। ঝঞ্ঝার টানে
ফেরাবে রথের মুখ? তুমি বাচাল
দূতী! আমি পাবো ঠিক অবিচ্ছেদ মানে।

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পরের দিন যথাসময়ে ব্রেকফাষ্ট খেতে খাবার-ঘরে গিয়ে দেখি—সেই কালকের লোকটি তার টেবিলে বসে আছে। তার ব্রেকফাষ্ট খাওয়া হয়ে গেছে, টেবিলে বসে বসেই খবরের কাগজ পড়ছে। টেবিলে যেতে তার টেবিলের কাছাকাছি দিয়েই যেতে হয়। যখন যাচ্ছি—লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হেসে আমাদের সুপ্রভাত জানাল। আমরা দু'জনেই প্রত্যুত্তরে সুপ্রভাত জানিয়ে নিজেদের টেবিলে গিয়ে বসলাম এবং লক্ষ্য করলাম, মার্লিন নিজের চেয়ারটি একটু টেনে একেবারে লোকটির দিকে পিছন ফিরে বসল। একটু চাপা গলায় হেসে মার্লিনকে বললাম—তুমি দেখছি লোকটির প্রতি বিশেষ বিরূপ।

মার্লিন শুধাল, কেন ?

বললাম, লোকটি আলাপ করার জন্য সুপ্রভাত জানাল—এক মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বললেই হ'ত।

বলল, তোমার অত ইচ্ছে হয়েছিল—তুমি বললেই পারতে।

বললাম, তুমি যে রকম গম্ভীর ভাবে চলে এলে—আমি আর দাঁড়িয়ে কথা বলি কোন্ ভরসায়।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, ভালই করেছ—লোকটা ভাল নয়।

হেসে শুধালাম, তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বলে ?

বলল, শুধু তাই নয়, লোকটার ভিতরে একটা অবজ্ঞা আছে।

শুধালাম, অবজ্ঞা—কার প্রতি ?

বলল, তোমার প্রতি।

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, ইংরেজরা ত সাধারণতঃ যে কোনও বিদেশীদের নিজেদের চেয়ে ছোট মনে করে—কেউ কেউ আবার কালোদের মানুষ বলেই মনে করে না। তারা অতি ইতর—ও সেই দলের।

অবাক হয়ে শুধালাম তুমি কি করে এত বুঝলে ?

বলল, কালকে ওর তাকাবার ধরণেই বুঝেছি।

বুলা! বহুদিন আগেকার মার্লিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল—আমি বিশেষ করে কোনও জাতেরই নই, আমি জগতের মেয়ে। মনে আছে ত—আমার ছাত্রজীবনের কাহিনীতে তোমাকে লিখেছিলাম—একদিন লণ্ডনে মার্লিনদের বাড়ীতে 'চা' খেতে খেতে মক্টনের কথায় ইংরেজ জাতের আভিজাত্যের গর্ব্বের ইঙ্গিতে মার্লিন কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ? মনে আছে ত মক্টনকে বলেছিল—এই আভিজাত্যের গর্ব্বেই তোমরা সকলের চেয়ে ছোট। এবং সেইদিনই প্রথম টের পেয়েছিলাম—মার্লিন আসলে ইংরেজ নয়, স্পেনদেশীয়, মার্লিনের পিতামহ স্পেন ছেড়ে এদেশে এসে বসবাস সুরু করে'ছিলেন, যদিও মার্লিনের মা ইংরেজ। মনে আছে ত ? তাই মার্লিনের চুল কালো, চোখ কালো, গায়ের রং এদেশী মেয়েদের মতন উৎকট সাদা নয়—উজ্জ্বল গোলাপী। সবই ত জান।

শুধু তাই নয়, সেইদিনের পর থেকে এটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি—খাঁটী ইংরেজদের উপর মার্লিনের মন খুব সদয় নয়। মনের গভীরে কোথায় যেন একটা বিরাগ ছিল লুকিয়ে, কচিৎ কখনও তার আভাষ পাওয়া যেত কথায়-বার্ত্তায়। কিন্তু এর পিছনে যে একটি কারণ ছিল সেটা টের পেয়েছিলাম আরও অনেক পরে।

* * * *

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেবাকোম্ব গেলাম। এস্‌টন্ লজে গিয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়তেই, সেই বৃদ্ধাটি দরজা খুলে দিয়ে সুপ্রভাত জানিয়ে হেসে আমাদের ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ভিতরে গিয়ে লাউঞ্জে বসবার অল্পক্ষণ পরেই গ্রেসও ভিতর থেকে এল সেখানে। হেসে সুপ্রভাত জানিয়ে শুধাল, বাইরে বাগানে বসবেন ? আজকের দিনটা বড় সুন্দর !

সত্যই দিনটা বড় সুন্দর হয়েছিল। গত ক'দিনের মেঘলা মেঘলা ভাবটি কেটে গিয়ে পরিষ্কার সূর্য্য দেখা দিয়েছিল আকাশে। চারিদিকে ঘন সবুজ সোনালী সূর্য্যের আলোয় যেন গাঢ়তা দিয়ে ঝলমলিয়ে উঠেছিল। এরকম দিন ইংল্যাণ্ডে খুব কমই পাওয়া যায়।

বললাম প্রভাতটি বড় সুন্দর হয়েছে। তবে, বাইরে বাগানে বসলে আপনার ঠাণ্ডা লাগবে না ?

বলল না, না। ফাঁকায় বসলে আমি ভালই বোধ করি।

বাগানে গেলাম। ছোট বাগান—তারই একপাশে তিন চারখানা ছোট বেতের চেয়ার পাতা রয়েছে দেখলাম। গ্রেস সেইখানে নিয়ে গেল। আমাদের জন্য আগে থেকেই গ্রেস এ বন্দোবস্ত করিয়েছিল কিনা জানি না। সেইখানেই বসা হল।

গ্রেস বলল, আপনারা দয়া করে আজও আমার খবর নিতে এসেছেন—সেজন্য আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ।

হেসে মার্লিন বলল, বা রে, আসবার ত কথাই ছিল।

গ্রেস বলল ডাঃ চৌধুরীও এসেছেন।

মার্লিন বলল, ডাঃ চৌধুরীটি যে আমার বাহন—নইলে আসব কি করে।

আমি বললাম, যদি কিছু মনে না করেন—আপনারা কথাবার্ত্তা বলুন, আমি সমুদ্রের ধারটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখে আসি।

গ্রেস শুধাল, আপনার এখানে বসতে কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে?

বললাম, না না, তা নয়। তবে—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মার্লিন হেসে বলল, যে রকম ছটফটে লোক, একটু ঘুরেই আসুন না—উনি থাকলে আমাদের নিরিবিলি গল্প হয়ত সেরকম জমবে না।

একটু চুপ করে থেকে গ্রেস মার্লিনকে বলল, যদি আমাকে নিয়ে কথা বলতে চাও, তবে ডাঃ চৌধুরী থাকাতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

মার্লিন তৎক্ষণাৎ বলল, বেশ! (আমার দিকে চেয়ে) তুমি বস তাহলে। কিন্তু গ্রেস! তোমার বিষয়ে যদি কথা বলি, তোমার কোনও আপত্তি নেই ত ভাই? কিছু মনে করো না—সত্য কথা বলতে গেলে, তোমাকে যে অবস্থায় দেখছি, তোমার একটা ভাল ব্যবস্থা না হলে আমি সুস্থ হয়ে এখান থেকে যেতে পারব না।

গ্রেস একটু চুপ করে থেকে মার্লিনকে শুধাল, কি তোমার প্রশ্ন?

মার্লিন বলল, আমার কোনও প্রশ্ন নাই—আমি শুনতে চাই।

একটু হেসে শুধাল, কেন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হল—এই ত?

মার্লিন বলল, যদি বল।

গ্রেস বলল, আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলাম—মুখ পুড়ে গেল।

মার্লিন বলল, তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আগুন নিয়ে খেলা করবে—এ ত আমি কোনও দিনই ধারণা করিনি।

একটু চুপ করে থেকে গ্রেস বলল, শুনবে? আগুনের তাপের আকর্ষণে নয়—রেগে। রেগে ভেবেছিলাম—দেখি না আগুনে আমার মুখ পুড়ে যাচ্ছে দেখে যদি তার মনে কোনও সাড়া জাগে। কিন্তু কিছুই হল না—সেই উদাসীন ভাব, আমি থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! তাই বোধ হয় রেগে শেষ পর্য্যন্ত দিক-বিদিক জ্ঞান হারালাম। আমি ত লুকিয়ে কিছু করিনি—সবই ত জান।

একটু চুপ করে মার্লিন বলল—গ্রেস! তুমি লালকাকাকে একেবারেই চিনতে পারনি—আগাগোড়া ভুল বুঝেছ।

গ্রেস চোখ তুলে মার্লিনের দিকে চাইল। প্রশ্ন করল, কি রকম?

মার্লিন বলল, লালকাকা তোমাকে কি রকম ভালবাসেন, তুমি কোনও দিনই ধারণা করতে পারনি। উদাসীন ত ননই। তিনি আজও তোমার সমস্ত খবর রাখেন। তোমার দুরবস্থার কথা তাঁর একটুও অজানা নাই—তাই তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছেন। শুনলে অবাক হবে—তিনি তোমার জন্য আমাদের হাতে দু শ' পাউণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি গ্রহণ করলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

কথাগুলি বলে মার্লিন একদৃষ্টে গ্রেসের মুখের দিকে চেয়ে রইল। গ্রেস একবার চোখ তুলে মার্লিনের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

মার্লিন আবার বলল, আমি যতদূর মিঃ লালকাকাকে চিনেছি—তিনি বোকা নন। তোমার মনোভাব তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি। তোমার লীলায় তাঁর বুক ভেঙ্গে গেছে কিন্তু মুখে তিনি কিছু বলেননি। হয়ত ভেবেছিলেন তুমি নিজেই একদিন নিজের ভুল বুঝতে পারবে। তোমার কোনও স্বাধীনতায় কোনও দিনই ত তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। সেই ত তাঁর স্বভাব। শুনলে বিস্মিত হবে গ্রেস—তোমার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তিনি নিজেকেই দোষী করেন, তোমাকে নয়। আমাদের বলেছেন সে কথা। কি মানুষ!

গ্রেস কোনও উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে চুপ করেই বসে রইল। খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। হঠাৎ গ্রেস চোখে রুমাল দিয়ে কাঁদতে লাগলো। মার্লিন নিজের চেয়ারখানি গ্রেসের চেয়ারের কাছে টেনে নিয়ে গ্রেসকে একহাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনার সুরে বলল, গ্রেস! প্রিয়তম গ্রেস! শান্ত হও। অযথা উত্তেজিত হয়ে নিজের ক্লান্তি বাড়িও না।

একটু পরে জলভরা চোখ তুলে মার্লিনের দিকে চেয়ে গ্রেস বলল, তবে কেন? কেন তিনি আমাকে অত অবহেলা করেছেন? জান মার্লি—দিনের পর দিন চলে গেছে আমাকে একটি চুমো পর্য্যন্ত খাননি।

মার্লিন বলল, গ্রেস! এখানেই ত তোমার ভুল। তুমিও ভারতবাসী নিয়ে ঘর করছ, আমিও করছি। এটুকু লক্ষ্য করনি যে এদের মন সাধারণত অন্তর্মুখী—ইংল্যাণ্ডের লোকের মত বহির্মুখী নয়। এদের অনুভূতি যতখানি, মুখে প্রকাশ তার চাইতে অনেক কম—বিশেষতঃ স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কে। এদেশে ঠিক উল্টো। ভারতবাসীর মনের অনুভূতির গভীরতা বিচার করতে হয় বাইরের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নয়, অন্তরের পরশ দিয়ে।

হঠাৎ গ্রেস আবার চোখ তুলে চাইল। শুধাল, তাই বলে স্ত্রী অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করছে—স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা থাকলে—সেটাও কি ওরা নির্ব্বিবাদে সহ্য করে, বলতে চাও?

মার্লিন বলল, হ্যাঁ, এক জাতের লোক আছে সহ্য করে—তবে নির্ব্বিবাদে নয়। বিবাদটা তারা নিজেদের অন্তরের মধ্যেই যতদূর সম্ভব হজম করার চেষ্টা করে—বাইরে বিরোধের সৃষ্টি সহজে হতে দেয় না। আমি যতদূর বুঝেছি ভাই—বাইরের বিরোধটাকে তারা কুৎসিত বলে মনে করে, তাই চেষ্টা করে সেটাকে এড়িয়ে চলতে। ভারতবাসীরা বেশীর ভাগই বোধ হয় এ দলের। মিঃ লালকাকা ত নিশ্চয়ই। তাদের মানসিক সহ্যশক্তি যে সাধারণ ইংরেজদের চেয়ে অনেক বেশী। সাধারণ ইংরেজ ভালবাসা থাকুক বা না থাকুক—ও অবস্থায় একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুনোখুনি করে বসে।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। একটু পরে গ্রেস শুধাল, তা তুমিই বা এত জানলে কি করে?

মৃদু হেসে মার্লিন বলল, আমিও ত প্রায় বারো বছর ভারতবাসী নিয়ে ঘর করছি। তার উপর মিঃ লালকাকাকে দেখেছি। তাঁকে বুঝলে এসব কথা অতি সহজ হয়ে যায়।

মার্লিনের কথাগুলি শুনতে শুনতে অবাক হয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে মার্লিনের মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম—আজও মনে আছে।

* * * *

পরের দিন ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আবার গেলাম বের্বাকোম্বে। মার্লিনকে এইনলজের কাছাকাছি নামিয়ে দিয়ে আমি গেলাম সমুদ্রের ধারে—একটা রেঁস্তোরায় মার্লিনের জন্য অপেক্ষা করব, এইরকম ঠিক হয়েছিল মার্লিনের সঙ্গে। ঠিক হয়েছিল—মার্লিন একলাই আজ গ্রেসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে সমুদ্রের ধারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে রেঁস্তোরায়। মার্লিনকে নামিয়ে দেবার সময় বলেছিলাম, লীনা! আজই কিন্তু টাকাকড়ি দিয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে এস। টর্কিতে আর ভাল লাগছে না।

মার্লিন বলেছিল, আমি খুব চেষ্টা করব।

ঘণ্টা দেড়েকেরও উপর একটা রেঁস্তোরায় অপেক্ষা করলাম মার্লিনের জন্য—মার্লিন ফিরে এল। শুধু শুধু বসে থাকা চলে না, তাই ইতিমধ্যে চায়ের সঙ্গে কিছু জলযোগও করে নিতে হল। মার্লিনের মুখ দেখেই বুঝলাম—মার্লিনের মনটা খুশীতে ভরা।

মার্লিনকে বললাম, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে—তোমার কাজ সফল হয়েছে।

হেসে মার্লিন বলল, ষোল আনা।

শুধালাম, কি হল বল?

বলল, কি আর হবে। শেষ পর্য্যন্ত সবই রাজী হয়েছে। টাকাকড়িও নিয়েছে এবং লালকাকা যদি ওকে এসে নিয়ে যায়—ফিরেও যাবে।

বললাম, বাঃ—আন্তরিক অভিনন্দন। তুমি সত্যি অঘটন ঘটাতে পার।

মার্লিন হেসে বলল, এ আর এমন কঠিন কাজ কি? এ আমি আগেই জানতাম।

শুধালাম, কি করে?

বলল, গ্রেসকে ত কিছু কিছু চিনতাম।

শুধালাম, আচ্ছা, ওর প্রেমিকটির কি খবর? সে ওকে ছেড়ে গেল কেন?

মার্লিন বলল, প্রেমিক না ছাই। ঝোঁকের মাথায় তার সঙ্গে চলে এসেছিল, শেষ পর্য্যন্ত যা স্বাভাবিক, সে ওর কাছে অসহ্য হল। তাই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, যাই হোক—গ্রেস একটা লীলা দেখালে বটে!

বলল, ইংরেজ মেয়েদের মনের উত্তাপ যে এত বেশী হতে পারে—এটা এর আগে আমার ঠিক জানা ছিল না।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, ইংরেজ মেয়েরা যে বড্ড হুঁশিয়ার। মনের উত্তাপে বেহুঁস তারা সহজে হয় না।

বুলা! আগেই তোমাকে বলেছি—এ ধরণের কথা ইংরেজদের বিষয় মাঝে মাঝে মার্লিনের কাছে শুনতাম এবং এ-ও বলেছি যে এর পিছনে একটি কারণ ছিল, সেকথা টের পেয়েছিলাম অনেক পরে।

বললাম, সব রকমই সব দেশের মধ্যে আছে।

সেকথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, শোন! আজই তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। লালকাকাকে একখানা চিঠি লেখ—তিনি যেন পত্রপাঠ এসে গ্রেসকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। গ্রেস যেতে রাজী। টাকাটাও নিয়েছে—সেকথাও লিখে দিও। বিশেষ করে গ্রেসের শরীরের কথা লিখ—দেরী করলে গ্রেস বাঁচবে না। অবশ্য গ্রেসও আমাকে কথা দিয়েছে—সে টাকার জন্য লালকাকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখবে।

* * * *

সেই দিনই বিকেলে বাইরে খাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আমি আমাদের শোবার ঘরে লালকাকাকে চিঠি লিখতে বসেছি—চিঠিখানা শেষ করে, চা খেয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাব।

মার্লিন বলল, আমি ততক্ষণ লাউঞ্জে গিয়ে 'চা'এর হুকুম দি, তুমি চিঠিখানা শেষ করে লাউঞ্জে এস।

বললাম, বেশ। আমি মিনিট কুড়ির মধ্যেই আসছি।

লাউঞ্জ, অর্থাৎ সাধারণ বসবার ঘর, আমাদের শোবার ঘর থেকে বেশী দূরে নয়—এক তলায়ই। ঘরটি বড় সুন্দর—দামী দামী আসবাবে সাজান এবং পিছনের একটা বড় জানালা দিয়ে দূরে সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যায়। ফাঁক পেলেই লাউঞ্জে বসতে আমাদের খুব ভাল লাগে। এবং বিকেলের চা'টা সাধারণত আমরা লাউঞ্জেই আনিয়ে নিতাম। বেশী নয়, দু-একজন হোটেলবাসী মাঝে মাঝে লাউঞ্জে থাকত—হয় কিছু পড়াশুনা করছে কিংবা এককোণে একটি টেবিলে দাবাখেলার ব্যবস্থা ছিল—তাই খেলছে। কিন্তু দেখা হলে 'সুপ্রভাত' বা 'শুভসন্ধ্যা' জানান ছাড়া কেউ কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করত না।

আমার চিঠিখানা শেষ করতে প্রায় আধ ঘণ্টার উপর লাগল—ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে লিখতে হবে ত! চিঠিখানা শেষ করে, শোবার ঘর থেকে লাউঞ্জের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম—মার্লিন দ্রুতপদে লাউঞ্জের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল—উত্তেজিত মুখে রক্তমাভা। আমি মার্লিনের কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পরিচারিকা খাবার ঘর থেকে এগিয়ে এল মার্লিনের কাছে। মার্লিন তার দিকে চেয়ে বলল, আমাদের 'চা' লাউঞ্জ থেকে শোবার ঘরে নিয়ে চল—সেইখানেই চা খাব।

বেশ, বলে পরিচারিকাটি লাউঞ্জের ভিতর গেল ঢুকে। আমি লাউঞ্জের দিকে চেয়ে দেখি—সেই লোকটা ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার সময় যাকে দুদিন দেখেছি লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আছে—মুখে একটা বিকৃত ঘৃণার হাসি।

একখানি হাত দিয়ে মার্লিনের একটি বাহু জড়িয়ে নিয়ে শুধালাম কি হল লীনা?

চলতে আরম্ভ করল। বলল, চল শোবার ঘরে—বলছি।

শোবার ঘরে গিয়ে চা খেতে খেতে খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে রইল বসে। চা খাওয়া শেষ হলে আমিই শুধালাম, হল কি লীনা?

বলল, ঐ লোকটা—ইতর, আগেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এত ইতর তা জানতাম না।

শুধালাম, কেন?

একটু চুপ করে থেকে বলে যেতে লাগলো, যতদূর মনে আছে বলি—আমি লাউঞ্জে গিয়ে দেখি—ঐ লোকটা একলা লাউঞ্জে বসে চা খাচ্ছে, আর কেউ নেই। আমি ঢোকামাত্র হেসে আমার কাছে এগিয়ে এসে আলাপ সুরু করল এবং আমি বসার পর নিজের চা নিয়ে এসে বসল আমার কাছে।

শুধালাম, তারপর ?

বলল, প্রথমটা ভদ্রভাবেই কথা বলছিল এবং আমিও ভদ্রতা বজায় রেখে যতটুকু দরকার সেই ভাবেই ওর কথার জবাব দিচ্ছিলাম —এই যেমন টর্কি কি রকম লাগছে, ইত্যাদি। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল—ঐ কাল লোকটি কি আপনার স্বামী? একটু রাগ হল। যাই হোক, গম্ভীর ভাবে জবাব দিলাম—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন আবার বলল, ও লোকটি ভারতবর্ষীয় আমি জানি। বলল ও নিজেও নাকি ভারতবর্ষে গভর্মেণ্টে কি বড় কাজ করে, ছুটি নিয়ে দেশে এসেছে। আমি আর কি বলব—চুপ করেই ছিলাম। হঠাৎ প্রশ্ন করল—আপনি কখনও ভারতবর্ষে গেছেন ? সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—না। আবার প্রশ্ন করল, কতদিন বিবাহ হয়েছে ? ক্রমেই আমার রাগ বাড়ছিল। একটু রেগেই বোধ হয় বললাম, তা আপনার আমার বিষয় এত জানবার প্রয়োজন কি ? বলে কি জান ?

শুধালাম, কি ?

মার্লিন বলল, বলে রাগ করবেন না। আপনি ভারতীয়দের চেনেন না—আমি চিনি। আপনি ত আমারই দেশের মেয়ে, তাই আপনার অবস্থায় আপনার জন্য আমার বড় দুঃখ হয়েছে। তাই এত খবর নিচ্ছি। এই বলে একটি হাত আমার হাতের উপর রাখল। সরিয়ে নিলাম।

বললাম, লোকটি ত ভীষণ খারাপ ?

মার্লিন বলল, তার পর শোন, নিজের মনেই যেন বলল— হায় রে! আপনার মতন এমন একটি মেয়ে শেষে কিনা একটা অসভ্য ভারতীয়ের হাতে পড়ল—অসহ্য হল। উঠে দাঁড়ালাম। কড়া একটা কিছু বলেছিলাম—কি বলেছিলাম মনে নাই। ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকাকে ডেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম—এমন সময় তোমার সঙ্গে দেখা।

কথাগুলি শুনে আমি চুপ করেই বসেছিলাম। একটু পরে মার্লিন আমার হাত ধরে মৃদু হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি মন খারাপ কর না। ওটা কি একটা মানুষ! ওর কথায় কি এসে যায়।

* * * *

ব্যাপারটা কিন্তু সেইখানেই শেষ হল না। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পর লাউঞ্জে গেলাম—যেমন রোজই যাই। ডিনারের পর লাউঞ্জে গিয়ে বসে কফি খেতাম—পরিচারিকা সাজিয়ে কফি দিয়ে যেত— শুধু আমাদেরই নয়, হোটেলবাসীদের মধ্যে আরও অনেককে। এই সময়টা লাউঞ্জে একটু গুলজার হত এবং হোটেলবাসীদের মধ্যে আলাপেরও সুযোগ ঘটত। এইভাবে প্রথম দিন সন্ধ্যার পরে একটি দম্পতির সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল—মিঃ ও মিসেস গ্রীফিথ। এঁরা যুবক যুবতী নন, দুজনেই মধ্যবয়সী। মিঃ গ্রীফিথ বোধ হয়, মধ্যবয়সের সীমাটিও গেছেন ছাড়িয়ে। এই দম্পতিটির ভদ্রতা ও সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আজ লাউঞ্জে যাওয়ার আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না—কি জানি সেই লোকটার সঙ্গে যদি আবার দেখা হয় সত্যকথা বলতে গেলে— ওর মুখ দেখার আর আমার ইচ্ছা ছিল না।

মার্লিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আজ যাবে লাউঞ্জে ? প্রশ্ন করেছিল, কেন যাবে না ?

কি বলব—ইতস্তত করছি।

মার্লিন বলল, সেই লোকটার ভয় ? তাকে অবজ্ঞা করার শক্তি আমার আছে।

লাউঞ্জে গেলাম—গ্রীফিথ-দম্পতিও ছিলেন। এক কোণে কফি নিয়ে বসে আমরা চারজন গল্প সুরু করলাম। আশে পাশে আরও দু-চারজন বসে কফি খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে কিংবা খবরের কাগজ পড়ছে। সে লোকটা লাউঞ্জে নেই দেখে খুসীই হয়েছিলাম।

আমাদের মধ্যে কথায় কথায় ভারতবর্ষের কথা উঠল। মিসেস গ্রীফিথ আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার একবার ভারতে যেতে বড্ড ইচ্ছে করে। শুনেছি বড় সুন্দর আপনাদের দেশ—ঝকঝকে সূর্য্যের আলোয় চিরবসন্ত।

হেসে বললাম, সুন্দর নিশ্চয়ই তবে চিরবসন্ত নয়। গরমের সময় প্রখর তাপ অনেক সময় অসহ্য হয়ে ওঠে।

মিসেস গ্রীফিথ বললেন, তাও শুনেছি বটে, তবে সেটা ত বছরের মাত্র কয়েকটা দিন।

বললাম, ভারতবর্ষের মজা কি জানেন ? সেখানে সবরকম আবহাওয়া পাওয়া যায়। প্রখর গরমের সময় কোনও পাহাড় কিংবা সমুদ্রের ধারে গেলেই শরীর ঠাণ্ডা হয়।

মিসেস গ্রীফিথ শুধালেন, গরমের সময়টা পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রের ধারে খুব ভিড় হয় বুঝি ?

বললাম, পাহাড় বা সমুদ্রের ধার ত একটা নয় অনেকগুলি আছে। এবং আমাদের দেশের সাধারণ লোক ত খুবই গরীব— সকলেই পাহাড়ে যেতে পারে না।

সেই লোকটি ইতিমধ্যে যে কখন ঘরে ঢুকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল, টের পাইনি। হঠাৎ নেশায় জড়িত কণ্ঠে বলে উঠল—শুধু গরীব নয়, অসভ্য জীবনে সভ্যতার আলো এখনও পেল না।

চেয়ে দেখি লোকটি একটি মদের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

এ কথা ত চুপ করে সহ্য করা চলে না। লোকটির দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম, আপনি আমার চাইতে ভারতের বিষয় বেশী জানেন দেখছি।

লোকটি হেসে উঠল। বলল, আমি দশ বছর ভারতে ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে আছি। আমি জানি না—কি রকম উলঙ্গ অবস্থায় আপনার দেশের লোকেরা রাস্তায় শুয়ে থাকে।

গ্রীফিথ-দম্পতি বোধ হয় বিশেষ অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন। লোকটির কথা থামিয়ে দিয়ে মিঃ গ্রীফিথ বললেন—তা আপনি দয়া করে চুপ করুন। আপনাকে ত কেউ আমাদের কথার মধ্যে কথা বলতে আমন্ত্রণ করে নি ?

লোকটি বলল, কিন্তু (আমাকে দেখিয়ে) এই লোকটি আপনাদের সুব ভারতের বিষয় যা-তা বুঝিয়ে দেবে আমি তাতে রাজী নই। জানেন—আমরা ওদের জন্য কিনা করেছি, ওদের মানুষ করে তোলার জন্য সভ্য করে তোলার জন্য। অথচ ওরা এখন আন্দোলন সুরু করেছে—আমাদেরই তাড়াতে চায়। এত বড় অকৃতজ্ঞ ওরা।

মার্গিন বলল, ওরা যে আপনাদের তাড়াতে চাইছে—আপনাকে দেখে সেটা ত কিছু অন্যায় বলে মনে হয় না। খুবই স্বাভাবিক।

লোকটি বোধ হয় একটু রেগে গেল। মার্গিনকে বলল, তা আপনি ওদের বিষয় কি-ই বা জানেন। আমাদের সভ্যতার মুখোসপরা একটিমাত্র লোক ত দেখেছেন জীবনে।

মার্গিন বলল, তা একটি মাত্র লোক দেখেই এইটুকু বুঝতে পেরেছি—মানুষ হিসাবে আপনার মতন' লোকের চাইতে ওরা অনেক বড়।

লোকটি এবার সত্যিই রেগে গেল। বলল, আপনি চুপ করুন। আপনার সঙ্গে আমার কোনও কথা নাই। আপনার মতন মেয়েদের আমি ইংলণ্ডের কলঙ্ক বলে মনে করি।

সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। মার্গিনের দিকে চেয়ে দেখলাম—মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আমারও রাগ হল। কি করি? একটা কিছু এখন আমার করা দরকার। উঠে গিয়ে লোকটার বুকের কোটটা ধরে বলা উচিত তোমার কথা এই মুহূর্ত্তে প্রত্যাহার কর—নইলে—। কড়া ভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ মার্গিন উঠে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণস্বরে বলল, এ ঘরে কি এমন একটি ইংরেজ নেই, যে মানুষ, যে ঐ ইতর লোকটার বর্ব্বরতা সংযত করতে পারে? যদি না থাকে ত বুঝব ইংল্যাণ্ড মানুষ হারিয়েছে।

একটু দূরে একটি ইংরেজ যুবক একলা বসে কফি খেতে খেতে খবরের কাগজ দেখছিল। হঠাৎ সে উঠে দ্রুত এগিয়ে এল সেই লোকটার কাছে। গম্ভীরভাবে বলল, আপনি এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

মিঃ গ্রীফিথ ও আমি নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—এগিয়ে গেলাম লোকটির দিকে।

লোকটি মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, কেন?

কড়াভাবে সেই যুবকটি বলল, এই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে যান—নইলে—

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। তারপর কি ভাবল জানি না—টলতে টলতে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় জড়িতকণ্ঠে বলে গেল—

তাই হোক। মিষ্টিমুখেরই জয় হোক। [ক্রমশঃ।

শেষ কথা

[Let us contend no more, love
Strive nor weep :
All b~~e~~as before love,
—Only sleep. —*R. Browning*]

কথার পরে কথার মালা, কেঁদে কেঁদে চেষ্টা,
অনেক খোঁজা অনেক খুঁজি, ভালবাসার তেষ্টা
মিটলো না ত' মিটুক হাত যেমন ছিল থাক :
ঘুমের 'পরে ঘুম দিয়ে তাই সময় কেটে যাক।

অনেক কথা কইলে তুমি কথায় চেঁচামেচি
আমার কথা, তোমার কথা, পাখীর কিচিমিচি ;
কথায় ছুরি শানাও পরে চোখের পানে চাও,
গাছের ডালে বাজের চোখে শিকার দেখে যাও।

সবাই প্রাণ জমার ঘরে দুয়ারে দেয় খিল,
আমরা শুধু কথার পরে খুঁজি কথার মিল ;
বন্ধ কর বর্ণমালা কথার গালাগাল,
ঠোঁটের 'পরে ঠোঁট রাখা আর গালের 'পরে গাল।

সত্যি যাহা তার চেয়ে কি মিথ্যে আছে কিছু
মিথ্যা আছে তোমার কাছে, মিথ্যা পিছু পিছু!
গাছের ডালে সাপের বাসা, সাপের দাঁতে ধার,
কাজ কি গিয়ে গাছের তলে নাই বা গেলে আর?

গাছের ডালে ফল পেকেছে টক্‌টকে রঙ তার,
চোখ দিও না, হাত দিও না, লোভ দিও না আর,
নইলে তুমি নইলে আমি স্বর্গে যাবার পথে
হারিয়ে যাবে হারিয়ে যাব পুরুষ প্রকৃতিতে।

দেবতা হ'য়ে মন্ত্র দিয়ে মুগ্ধ কর মন,
মানুষ হয়ে জড়িয়ে দাও মধুর আলিঙ্গন।

কেবল প্রেম ভালবাসা শুধু প্রেমের কথা
শিখিয়ে নাও শিখিয়ে দাও প্রেমের মধুরতা,
গাইবো আমি গাইবো তোমার প্রণয়-রামায়ণ,
ভাববো শুধু তুমি আমার প্রেমের নারায়ণ।

যা চাও তুমি তাই নিয়ে যাও আমার দেহ-মন,
সার্থক হোক তোমার পায়ে আত্মসমর্পণ।

ঘটবে যা যা ঘটুক তা কাল আজকে রাতে নয়,
দুঃখ ব্যথার বিদায় দিয়ে আজকে পরিণয়।

একটু কাঁদি কাঁদব আমি আমার বোকামীতে,
ঘুমাও প্রিয়, হারিয়ে যাও, তোমার প্রণয়ীতে॥

অনুবাদক—পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়

অস্তগামী সূর্য

[*Osamu Dazai's* THE SETTING SUN"-এর অনুবাদ]

সপ্তম অধ্যায়

নাওজির জবানি

কাজুকো

কোন লাভ নেই, আমি চললাম। কি উদ্দেশ্যেই বা বাঁচা—এ কথার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। শুধু যারা বাঁচতে চায়, তারা থাক না বেঁচে। মানুষের বেঁচে থাকার যেমন অধিকার আছে, মৃত্যুরও তেমনি অধিকার আছে।

আমার কথার মধ্যে নতুনত্ব নেই, চিরন্তন রূঢ় বাস্তব বললে ভুল হবে না। এ ধারণার মুখোমুখি দাঁড়াতে মানুষের ভয় হয়।

যারা বাঁচতে চায়, শত বাধা সত্ত্বেও তারা যেমন করেই হোক বেঁচেই থাকে। এ তাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসনীয়, এবং মানব-জন্মের গৌরব বলতে একেই বোঝায়। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মৃত্যু পাপ নয়। আমার মত কিশলয়ের পক্ষে এ ধরণীর আলো বাতাসে প্রাণ বাঁচানো অসম্ভব। আমার ভেতর কিসের যেন অভাব আছে। আজ অবধি যে বেঁচে আছি এই আমার কৃতিত্ব।

হাই ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে প্রথম যখন আমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের সুস্থ সবল বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়লাম, তখন তাদের কর্ম্মক্ষমতা দেখে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় আমায় নেশা ধরতে হল। আধো নেশার ঘোরে আমি তাদের আক্রমণ রোধ করলাম। পরে সেনাবিভাগে ভর্ত্তি হয়ে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন স্বরূপ আফিং ধরি। কি তখন অবস্থা, সে তুমি কল্পনাও করতে পার না—নয় কি?

রুক্ষ, শক্তিমান, না নৃশংস হতে সাধ গেল। ভাবলাম, ঐ একটি মাত্র রাস্তায় আমি নিজে আর পাঁচজনের বন্ধুত্ব দাবী করতে পারি। মদে ঠিক সুবিধে হল না। সারাক্ষণ মাথা ঘুরত। সেইজন্য নিরুপায় হয়ে নেশা ধরলাম। আমায় পরিবার ভুলতে হল। পিতৃরক্ত অস্বীকার করতে হোল। মায়ের শালীনতা প্রত্যাখ্যান করতে হল। ভগ্নীর প্রতি দুর্ব্বলতা জয় করতে হল। ভাবলাম এ ছাড়া সবার মাঝে ঠাঁই মিলবে না।

আমি বন্য হয়ে উঠলাম। অভব্য ভাষা ব্যবহার করতে শিখলাম। কিন্তু এর অর্দ্ধেকটা, না—শতকরা ষাট ভাগই দুর্ব্বল অভিনয়। হীন প্রবঞ্চনা মাত্র। সাধারণ লোকের সঙ্গে আমি এত উদ্ধত ব্যবহার করতাম যে, আমার উন্নাসিক ব্যবহারে সবাই ক্ষেপে যেতো। আমায় তারা কোনদিনও ভাল চোখে দেখেনি। অন্যদিকে আবার যে সব শিল্পী সাহিত্যিক বন্ধুদের আমি একদিন স্বেচ্ছায় বর্জ্জন করেছি, তাদের কাছে ফিরে যাওয়াও অসম্ভব। আমার মধ্যে আয়াসলব্ধ এই রুক্ষতা শতকরা ষাটভাগ হলেও, বাকী চল্লিশভাগের মধ্যে কোন ভেজাল নেই। উচ্চশ্রেণীর চূড়ান্ত ভব্যতা আমার আর এক মিনিটও বরদাস্ত হয় না। সেই সব বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজের শীর্ষস্থানীয় যারা, তাঁরা আমার নিন্দনীয় ব্যবহার ক্ষমা করবেন না, এবং শীঘ্রই তাঁদের 'মহল থেকে আমায় বিতাড়িত হতে হবে। যে দুনিয়া আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছি, সেখানে আবার ফিরে যাওয়া চলে না। অথচ নীচের মহলের এরা আমায় (ব্যঙ্গ করে বিনয় দেখিয়ে) দর্শকের আসনে ঠেলে রেখেছে!

যে কোন সমাজে আমার মত এমনি জীবনীশক্তিহীন ত্রুটি বহুল চরিত্র দেখা যায়; নিজস্ব মতামত, অথবা অন্য কোন কারণে এরা মরে না, নিজেরাই এরা নিজেদের সর্ব্বনাশ ডেকে আনে। ঘটনা পরিবেশের প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদই আমার জীবন ধারণের পথে প্রধান অন্তরায়।

সব মানুষই সমান।

হয়ত দর্শন একেই বলে। না জানি কোন দার্শনিক অথবা শিল্পী এই অতুলনীয় অভিব্যক্তি করেছিলেন। বলবার আগেই বোধ হয় এই কীট কোন মাতালের আড্ডাখানা থেকে বেরিয়ে সমস্ত জগৎময় করে এ পৃথিবীর মাধুরী শোষণ করে নেয়।

এই অদ্ভুত দর্শনের সঙ্গে গণতন্ত্র অথবা মার্ক্সবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। অকারণে মদের ঝোঁকে কু-লোকে সুন্দরের প্রতি এই মন্তব্য করে। কেবল বিরক্তি হয়ত হিংসাই এর কারণ কোন আদর্শের প্রতি এর আদৌ লক্ষ্য ছিল না।

কিন্তু সাধারণ এক ভাড়াটে থানার হিংসার জ্বালায় যে মন্তব্যের সূত্রপাত, জনসাধারণের ভেতর সগৌরবে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে শাস্ত্রের রূপ নিল। গণতন্ত্র অথবা মার্ক্সবাদের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না। দেখতে দেখতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সূত্র গুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সে এক অবিশ্বাস্য রকম বিমিশ্র অবস্থার সৃষ্টি করল।

আমার মনে হয় এই অসম্ভব উক্তির এ হেন বিরাট রূপান্তরে 'মেফিস্টো' স্বয়ং বিচলিত হ'তেন।

সব মানুষই সমান।

কত হীন এই মন্তব্য। এ উক্তির নিজস্ব গ্লানির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনুষ্য জাতির অধঃপতন। সকল গর্ব্বের অবসান। সকল উদ্যমের উচ্ছেদ।

মার্ক্সবাদ শ্রমিকদের প্রাধান্য ঘোষণা করে কিন্তু এ কথা বলে না যে, সব মানুষই সমান। গণতন্ত্র ব্যক্তিগত মর্য্যাদা স্বীকার করে কিন্তু একথা বলে না যে, সব মানুষই সমান। অপদার্থ শুধু একথা প্রচার করে যে, যত উঁচু দরের মানুষই হোক না কেন, সে মানুষই।

আর সকলের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই।

কেন বলবে 'সমান'? 'উন্নততর' বলতে পারে না? এই হ'ল দাসমনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া।

অত্যন্ত অসভ্য ও ঘৃণ্য এই উক্তি। আমার ধারণা—'এ যুগের যাবতীয় উদ্বেগ'—পরস্পারের প্রতি আতঙ্ক, নৈতিক অবনতি, উপহসিত উদ্যম, প্রবঞ্চিত সুখ, সৌন্দর্য্যের অশুচিকরণ, সম্মানের অধঃপতন—এ সকলের সূত্রপাত ঐ অবিশ্বাস্য অভিব্যক্তির থেকে।

এ কথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই উক্তির কদর্য্যতাকে আমি ভয় পেয়েছিলাম। মর্মাহত, বিব্রত হয়ে আমি সারাক্ষণ উদ্বেগে কাটাতাম এবং আমার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হ'ত। মদ এবং বিষাক্ত মাদক দ্রব্যের গুণে যে ক্ষণিকের বিশ্রাম আমি পেতাম, তা অপরিহার্য্য হয়ে উঠল। নেশা কেটে গেলেই সব গোলমাল ঠেকত। আমি দুর্ব্বল একথা সত্যি। কোথায় একটা মস্ত বড় ফাঁক রয়ে গেছে। আমি যেন শুনতে পাই কে এক জংলী বুড়ো ঘেন্নায় ঠোঁট বেঁকিয়ে আমার বিষয় বলছে—এতো মাথা ঘামাবার কি আছে? সবাই জানে ছেলেবেলা থেকেই ও একটা কুঁড়ে, কামুক, স্বার্থপর, নষ্ট ছেলে। এখন পর্যন্ত লোকমুখে এ মন্তব্য শুনে অপ্রস্তুত হয়ে মাথা হেঁট করেছি, কিন্তু আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিবাদ জানিয়ে যাব।

কাজুকো। আমায় বিশ্বাস করো। আমোদ আহ্লাদে কখনও তৃপ্তি পাইনি। সম্ভবতঃ এ থেকে ভোগবিলাসের অসারতাই প্রমাণিত হয়। আমি বনেদী ঘরের ছেলে; এই 'আমি'র মত থেকে পালিয়ে বেড়াবার আশায় দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ডুবে থাকতাম।

জানি না এর জন্ত আমাদের বাস্তবিকই দায়ী করা যায় কিনা? যে পরিবারে জন্মেছি, তার জন্ত কি আমরা দায়ী? কেবলমাত্র পারিবারিক অবস্থার জন্তই কি ইহুদিদের মত সারা জীবন আমাদের মাথা নীচু করে সসঙ্কোচে অপমানের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে?

এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। কিন্তু সবের উপরে একটা জিনিষ ছিল—মা'র ভালবাসা। সেকথা মনে করে আমার এতকাল মরা হয়নি। একথা ঠিক যে, মানুষের যেমন করে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে, তেমনি ইচ্ছা মত মরতেও বাধা নেই; তবু মা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন স্বেচ্ছামৃত্যুকে জোর করে দূরে ঠেলে রেখেছিলাম, কারণ জানতাম আমার ইচ্ছা পূর্ণ করা মানে মায়ের মৃত্যু ডেকে আনা।

আমি জানি আমার মৃত্যুতে কারুর শারীরিক ক্ষতি হবে না। না কাজুকো, তোমার কত কষ্ট হবে আমি তা জানি। আমি জানি তোমার মত ভাবপ্রবণ হৃদয়ে আমার মৃত্যুসংবাদ কি দারুণ আঘাত দেবে। কিন্তু লক্ষ্মী বোন আমার, ভেবে ছাখো বৃথা জীবনের অসহ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার যে আনন্দ তাকেই আমি স্বেচ্ছায় বরণ করছি। একথা ভেবে তুমি সান্ত্বনা পাবে।

যে ব্যক্তি অনুকম্পা ভরে আমার আত্মহত্যার প্রতি কটাক্ষ করে (সাহায্যের জন্য হাত না বাড়িয়েই) বলবেন যে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত আমার বেঁচে থাকাই উচিত ছিল, তিনি অতিমানব; স্বয়ং সম্রাটকেও ফলের দোকান দেবার পরামর্শ দিতে তাঁর গলা কাঁপবে না।

কাজুকো, আমি মরে বাঁচব। বেঁচে থাকার শক্তি আমার নেই। টাকা নিয়ে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করার ক্ষমতাও নেই। লোকের কাছে হাত পাতা আমার দ্বারা হবে না। এমন কি মিষ্টার উয়েহারার সঙ্গে যখনই মদ খেতে গিয়েছি, আমার ভাগের দাম আমিই দিয়েছি। আমার এই ব্যবহারের তিনি অত্যন্ত নিন্দা করতেন। বলতেন—এ আমার সস্তা বনেদী চাল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঠিক অহঙ্কারের বশে আমি এ কাজ করতাম না। তাঁর উপার্জিত অর্থে মদ খেতে বা মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি করতে আমার ভয় হত। মিষ্টার উয়েহারার লেখার প্রতি সম্মান দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। বাইরে আমি এমনি ভাব দেখাতাম, কিন্তু সেকথা মিথ্যে। কেন যে করতাম নিজেই জানি না, শুধু বুঝতাম অপর কেউ আমার হ'য়ে দাম দিয়ে দিলে অস্বস্তি লাগে। বিশেষতঃ আর কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে আমোদ-আহ্লাদ করতে রীতিমত ঘৃণা বোধ হ'ত।

আমার নিজের ঘর থেকে টাকা নিয়ে মাকে ও তোমাকে কষ্ট দিয়ে স্ফূর্ত্তি করেও সুখ পাইনি এক তিল। আমার এই অস্বস্তিকর অবস্থা গোপন করার ইচ্ছায় 'প্রকাশনী' কারবারের চিন্তা করি, নতুবা মন থেকে আমার আদৌ এ ধরণের কোন ইচ্ছা ছিল না। শত নির্ব্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও এটুকু বুঝতাম যে, যে ব্যক্তি এক গেলাস মদ পর্য্যন্ত পরের অর্থে খেতে নারাজ, তার দ্বারা আর যাই হোক ব্যবসা করা চলবে না। সুতরাং সে চেষ্টা বৃথা।

কাজুকো, আমরা গরীব হয়ে গেছি। আমাদের যখন অবস্থা ভাল ছিল, তখন সর্ব্বদা অপরের জন্ত খরচ করতে চাইতাম; কিন্তু এখন আমাদের খরচ অন্তদের চালাতে হবে।

কাজুকো, এর পর বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। বৃথা। আমি মরছি। আমার কাছে একটা বিষ আছে, যা খেলে মৃত্যুকালে কোন যাতনা হয় না। সৈন্ত বিভাগে চাকরি করার সময়ে আমি এই বিষ সংগ্রহ করে রেখেছি।

কাজুকো, তুমি সুন্দরী। (বরাবর আমার সুন্দরী মা, বোনের জন্য মনে মনে গর্ব্ব ছিল) তুমি বুদ্ধিমতী। তোমার বিষয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। দুশ্চিন্তা করার ক্ষমতাও তোমার নেই। যে দস্যু তার শিকারের শোকে অপ্রস্তুত হয়, তার মত শুধু আমি লজ্জিত হতে পারি মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি বিয়ে করে সুখী হবে, তোমাদের সন্তানাদি হবে এবং তোমার স্বামীর ভেতর দিয়ে তুমি নতুন করে বাঁচবে।

কাজুকো, আমার একটি গোপন কথা আছে। বহুকাল আমি একে গোপন করে রেখেছি। এমন কি যুদ্ধে গিয়েও আমি সে কথা ভুলতে পারিনি। আমি সেখানেও তার স্বপ্ন দেখতাম। কতবার যে দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। ঘুম ভেঙ্গে গেলে টের পেতাম যে, ঘুমের মধ্যে আমি কেঁদেছি।

কারও কাছে আমি তার নাম বলতে পারি নি। কিন্তু এখন

মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে, আমার প্রাণসমা ভগিনীকে একথা জানানো প্রয়োজন বোধ করছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আজও তার নাম করতে ভয় পাই। তবু মনে হয় যদি আমার মনের কথা বাইরের জগতের কাছ থেকে গোপনে বুকে চেপে মরি, তবে কবরের নীচে আমার পাঁজরার ভেতরটা আধ ঝলসানো, স্যাঁৎসেঁতে রয়ে যাবে। একথা ভেবে এত অশান্তি পাই যে তোমাকে, শুধু তোমাকেই একথা বলে যাব, এমন খাপছাড়া ভাবে বলব যেন আর কারও বিষয়ে গল্প করতে বসেছি। আর আমি একে তৈরী গল্প বললেও তুমি নিশ্চয়—তখনই বুঝবে কার বিষয়ে কথা হচ্ছে। ঠিক গল্প না বলে একে ছদ্মনামের সূক্ষ্ম আবরণও বলা চলে।

হঠাৎ মনে হ'ল—তুমি কি আগে থেকে সব জান? হতে পারে তুমি তাকে কখনও চোখে দেখনি, তবু সে তোমার অতি পরিচিত। তোমার চেয়ে সামান্যই বড় হবে সে। তার চোখ দুটি বাদামের আকারের, পুরোপুরি আমাদের জাপানী বৈশিষ্ট্য নিয়ে তৈরী। তার সুদীর্ঘ চুলের ভার (কখনও যা' কেশকুঞ্চন যন্ত্রের সংস্পর্শে আসে নি) সেকেলে জাপানী কায়দায় শক্ত করে মাথার পেছনে টেনে বাঁধা। পোষাক অত্যন্ত খেলো, কিন্তু ধবধবে পরিষ্কার এবং অতি পরিপাটি করে পরা। যুদ্ধোত্তর কোন এক নতুন আঙ্গিকে পর পর অনেকগুলি ছবি এঁকে নাম করেছিলেন—মহিলা তাঁরই স্ত্রী। চিত্রকর অতি লম্পট, বর্ব্বর স্বভাবের মানুষ, কিন্তু স্ত্রীর স্বভাব অতি শান্ত, মধুর, হতভাগিনীকে দেখে মনে হয়, স্বামীর দুর্ব্যবহার তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

সেদিন আমি উঠে দাঁড়িয়ে যেই বলেছি—এবার তবে আসি। —দেখি সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আমার পাশে পাশে হাঁটতে সুরু করল। অসঙ্কোচে মুখের পানে চেয়ে প্রশ্ন করল,—কেন যাবে? তার কণ্ঠস্বর অবিচলিত শান্ত। মাথাটি একপাশে ঈষৎ হেলিয়ে অকৃত্রিম সন্দেহভরে সোজা চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল। তার চোখে না ছিল বিদ্বেষ, না ছিল আত্মগোপনের প্রয়াস। সাধারণতঃ তার চোখে চোখ পড়লে আমি সসঙ্কোচে দৃষ্টি সরিয়ে নিই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে গেল। প্রায় ষাট সেকেণ্ড বা তার চেয়েও বেশী সময়, তার মুখের মাত্র একফুট দূর থেকে সেই অপরূপ দুটি চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে কোন এক অসীম সুখসাগরে ডুবে গেলাম। শেষ পর্য্যন্ত হেসে ফেললাম—কিন্তু—

তার মুখের ওপর গাম্ভীর্য্যের ছায়া নেমে এল—ওঁর আসার সময় হল।

হঠাৎ মনে হল সেই মুখে একটি মাত্র শব্দ আঁকা আছে,—সেটি হল—শুচিতা। জানিনা শব্দটির যথার্থ সংজ্ঞা পূতিগন্ধমাখা কঠিন কঠোর, অথবা এই অপরূপ মুখাভিব্যক্তির মত পরম মধুর।

আমি আবার আসব।

এস।

আগাগোড়া আমাদের কথাবার্তা একেবারেই অবান্তর ছিল। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় আমি চিত্রকরের বাড়ী গিয়ে দেখি তিনি নেই, যে কোন মিনিটে এসে পড়ার কথা। তাঁর স্ত্রী আমায় অপেক্ষা করতে বললেন এবং আমি আধঘণ্টা বসে বসে পত্রিকার পাতা উল্টোলাম। এর পরেও যখন দেখলাম ওঁর ফেরার কোন লক্ষণ নেই, তখন আমি উঠে পড়লাম। বিদায় নেবার অবকাশমাত্র, ব্যস তার বেশী কিছু নয়, কিন্তু এরই মধ্যে সেদিন তার চোখের দিকে চেয়ে আমার মরণ হল।

সে চোখের ভাষায় এমন কিছু ছিল, যা দেখে তাকে মহীয়সী বললেও ভুল হবে না। আমি শুধু জোর গলায় বলতে পারি যে, একমাত্র আমাদের মা জননীকে বাদ দিয়ে, বাকী উচ্চকুলোদ্ভব যাদের মধ্যে আমার তোমার বাস, তাদের একজনের পক্ষেও এ হেন 'সত্তা'র অসতর্ক অভিব্যক্তি সম্ভব নয়।

এর পর এক শীতের সন্ধ্যায় তার পাশ ফেরানো মুখের সৌন্দর্য্য আমায় ভাবাবেগে আপ্লুত করে।

সেদিন সকাল থেকে শিল্পীর ঘরে বসে আমরা মদ খেয়ে তথাকথিত জাপানী সংস্কৃতির ধ্বজাধারী সমাজকে গালাগাল দিয়ে হৈ হৈ হাসি ঠাট্টায় ডুবেছিলাম। একটু পরে শিল্পী ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে লাগলেন। আমারও তন্দ্রা আসছিল, এমন সময়ে কে যেন আমার গায়ের ওপর একখানা কম্বল ছুঁড়ে দিল। আমি আধখানা চোখ খুলে দেখি, মেয়ে কোলে জানালার ধারে বসে তন্ময় হ'য়ে টোকিওর আকাশে শীতের নীল রং ধরা দেখছে। দূর নীলিমার পটভূমিতে তার পরিচ্ছন্ন নিখুঁত মুখের ছায়া রেনেসাঁ যুগের ছবির মত অপূর্ব্ব উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে। আমার গায়ে কম্বলটি ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যে কামগন্ধ বিবর্জিত মমতার স্পর্শ পেলাম। সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে 'মানবতা' শব্দটি ব্যবহার করলে ভুল হ'ত না। কি সে করছে, সে সম্বন্ধে নিজেই সচেতন ছিল না, শুধু একটি মানুষের প্রতি দরদের প্রকাশ মাত্র, তার পর বাইরের শান্ত আকাশের দিকে চেয়ে ছবির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

আমি চোখ বুজে পড়ে রইলাম। আমার দেহের ভেতর দিয়ে প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার তীব্র প্রবাহ বয়ে গেল। চোখের পাতা ভেদ করে কান্না ঝরে পড়ল, আমি কম্বল টেনে মাথা চাপা দিলাম।

কাজুকো, প্রথম প্রথম আমি যখন শিল্পীর বাড়ী যেতাম তাঁর কাজের নিজস্ব আঙ্গিক এবং দুরন্ত আবেগ আমায় সম্মোহিত করেছিল, কিন্তু ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হবার পর, তাঁর শিক্ষার অভাব, দায়িত্বহীনতা, তাঁর অপরিচ্ছন্নতা আমার মোহ ভেঙ্গে দিল। তাঁর স্ত্রীর অপূর্ব্ব মধুর স্বভাব আমায় দুর্বার বেগে অপর দিক থেকে টানতে লাগল। না, এক অকৃত্রিম মমতাস্বাদ আমায় পাগল করে তুলল। শুধু একবার চোখের দেখা দেখব—এই আশায় আমি শিল্পীর বাড়ী যেতাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই চিত্রকরের ছবির মধ্যে যেটুকু মাধুর্য্যের স্পর্শ পাওয়া যায়, সে শুধু স্ত্রীর সুকুমার চরিত্রের ছায়া মাত্র।

এবার আমি আমার মনের খাঁটি কথা খুলে বলব এই মাতাল, লম্পট চিত্রকর অত্যন্ত ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী। যখন তাঁর টাকার প্রয়োজন হয়, তখন চলতি ঢং-এ ছবি এঁকে, নিজেকে মস্ত শিল্পী বলে লোকের মনে ধাঁধা লাগিয়ে, প্রচণ্ড দামে যাহোক এক আধখানা ছবি বাজারে চালিয়ে দেন।

বিদেশী বা জাপানী চিত্রকরদের অঙ্কন পদ্ধতি সম্বন্ধে ভদ্রলোকের হয়ত কোন ধারণাই নেই এবং নিজে কি আঁকেন, তাও হয়ত ঠিক

বোঝেন না। মোট কথা, টাকার টান পড়লে ভদ্রলোক পাগলের মত ক্যানভাসে রং বোলান।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিজের জঘন্য ছবিগুলো সম্বন্ধে ভদ্রলোকের মনে আদৌ কোন দুশ্চিন্তা, লজ্জা, ভয় কোনটাই নেই। উল্টে তা নিয়ে মনে মনে অহঙ্কারই আছে। যে নিজের কাজই বোঝে না, সে অপরেরটা কি বুঝবে? বোঝা দূরে থাক, ভদ্রলোক খালি অন্যের কাজের খুঁৎ ধরে বেড়ান এবং গালমন্দ করেন।

মোট কথা, অধোগামী জীবনের ফল ভুগতে হচ্ছে বলে পাড়া ফাটিয়ে আক্ষেপ করে বেড়ানো ভদ্রলোকের স্বভাব, কিন্তু বাস্তবিকই তিনি গেঁয়ো ভূত ছাড়া আর কিছুই নন নেহাৎ বড় সহরে এসে আশাতীত সাফল্যে জীবন ধন্য হয়ে গেছে। তাঁর অহমিকা এমন চরমে উঠেছে যে, একটি একটি করে সংসারের সব রকম রস চেখে বেড়াচ্ছেন।

একবার আমি তাঁকে বলেছিলাম, যখন আমার আর সব বন্ধু-বান্ধব ফূর্ত্তি মেরে বেড়াচ্ছে। তখন একা বসে পড়া শোনা করতে এত ভয় করে যে, কিছুই এগোয় না। সেই জন্য ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময়ে ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে যেতে হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—কি? বুঝেছি, যত সব বড়মানুষী চাল শুনলে গা জ্বলে যায়। কয়েক জন লোক মিলে হল্লা করছে দেখলে আমার তো আক্ষেপের অন্ত না, না জানি কত কি মজা লুটে নিচ্ছে, আমি বুঝি মাঝে থেকে ফাঁকে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি!

জবাব শুনে বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। তাহ'লে নিজের এই ব্যভিচারিতার পেছনে এতটুকু অনুশোচনা মাত্র নেই।

উল্টে তিনি বুদ্ধির সংস্পর্শ বিবর্জ্জিত এই আনন্দের বড়াই করেন। একেই বলে সুবিধাবাদী গর্দ্দভ।

এই শিল্পীর নামের পেছনে আরও অনেক নিষ্ঠুর বিশেষণ যোগ দেওয়া যায়, কিন্তু কি হবে আর? তাঁর সঙ্গে তোমার কি যোগ তাছাড়া মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার কথা মনে পড়ছে এবং তাঁর জন্য হঠাৎ বুকের ভেতরটা এমন মোচড় দিয়ে উঠেছে যে, এখুনি ছুটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একবার মদ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ভদ্রলোকের অনেক ভাল গুণও আছে। থাক্ তাঁর কথা, আর নয়।

শুধু তোমায় জানিয়ে যাব দিনের পর দিন তাঁর স্ত্রীর জন্য নিষ্ফল আকাঙ্খায় কেমন জ্বলে-পুড়ে মরেছি। ব্যস্ এতটুকু।

কিন্তু একটা কথা, এর পর তুমি যেন তোমার ভাই-এর 'মনস্কাম পূর্ণ করার আশায়, জীবিতকালীন এই ব্যর্থপ্রেম মরণের পর কারুর দ্বারে পৌঁছে দিয়ে দিয়ে এস না। তুমি তো জানলে, জেনে মনে বললে—ওঃ তাই বুঝি? এই ব্যাপার? সেই যথেষ্ট। তাছাড়া এই লজ্জাকর অপরাধের গ্লানি অন্তত তোমার কাছে স্বীকার করলে, তুমি বুঝলে আমার হৃদয় দহন জ্বালা—এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

একবার স্বপ্ন দেখলাম আমি তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে আছি, তখনই বুঝলাম, অনেক দিন আগেই আমি তার হৃদয়ে স্থান পেয়েছি। ঘুমভাঙ্গার পর কিছুক্ষণ অবধি তার করস্পর্শের উষ্ণতা আমার হাতে জড়িয়েছিল।

মনে মনে বললাম—এইটুকুই আমার পাওনা, এর বেশী কিছু নয়। এ বিষয়ে নৈতিক ভীতি আমার ছিল না, কিন্তু ঐ অর্দ্ধউন্মাদ, ঐ বিকারগ্রস্ত শিল্পীকে মনে ভয় পেতাম। তাকে ভুলতে চেয়েছিলাম। হৃদয়ের জ্বালা পাত্রান্তরিত করার আশায় আমি—হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তেমনি মেয়েমানুষ নিয়ে মারাত্মক রকম লাম্পট্যে মেতে রইলাম। এমন বাড়াবাড়ি শুরু করলাম যে একরাত্রে স্বয়ং শিল্পী পর্য্যন্ত আমার প্রতি বিরক্ত হ'লেন। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। আমার মত মানুষ দু'বার প্রেমে পড়ে না। হলফ্ করে বলতে পারি যে, আমার পরিচিত কোন মেয়ে তার মত এত সুন্দরী, এমন প্রেমময়ী ছিল না।

কাজুকো, মৃত্যুর আগে একবার তার নাম লিখে যাব।

সুগা। এই তার নাম।

গতকাল আমি এক নর্ত্তকীকে (আকাট্ মূর্খ) এখানে এনেছি, যার প্রতি কণামাত্র দুর্ব্বলতা আমার নেই। শীগগিরই মরতে হবে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু আজ সকালেই চলে যাব—এমন কথা ভাবিনি। মেয়েটিকে আজ ভোরে এখানে আনার কারণ, যে সে গাড়ী করে বেড়াতে চেয়েছিল, আমিও টোকিও সহরের অনাচারে ক্লান্ত হয়ে দিন দু'য়েকের জন্য বোকা মেয়েটির সঙ্গে এখানে জুড়িয়ে যেতে চাইলাম। জানতাম তোমার খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু তবু দু'জনে শেষ পর্য্যন্ত চলেই এলাম। তুমি যেই টোকিও চলে গেলে, অমনি মনে হ'ল এই তো সুযোগ। আগে মনে করতাম আমাদের নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ীতেই নিজের ঘরে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলে যাব। পাঁচজনের আড্ডাখানায় মৃত্যু হ'লে তার পর যে-সে এসে আমার দেহ স্পর্শ করবে—একথা ভাবতেও মন বিষিয়ে উঠত। কিন্তু আমাদের নিশিকাতা ষ্ট্রীটের বাড়ী বেহাত হ'য়ে গেছে, এখন এখানেই মৃত্যু বরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

তা সত্ত্বেও যখনই মনে হ'ত আমার মৃতদেহ তোমারই হাতে পড়বে এবং তুমি কতদূর বিচলিত হবে, তখনই মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিধ এসেছে এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত মরা আমার হ'ত না।

কিন্তু আজ পেয়েছি অপূর্ব্ব সুযোগ। তুমি এখানে নেই। আছে একটা নিরেট বোকা নাচওয়ালী—আমার আত্মহত্যার একমাত্র সাক্ষী।

গত রাতে একত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে তাকে দোতলার ঘরে শুইয়ে দিয়ে এলাম। আমি নীচে এসে মা যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন, সেখানে আমার বিছানা পেতে নিলাম। তার পর এই ইতিবৃত্ত লিখতে বসেছি।

কাজুকো!

আর কোন আশা নেই। বিদায়।

শেষ বিশ্লেষণে এই দাঁড়ায় যে, আমার মৃত্যু স্বাভাবিক। শুধুমাত্র আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা অসম্ভব। একটা অনুরোধ করতে ভারী সঙ্কোচ হচ্ছে। মনে আছে, মায়ের একখানা তসরের কিমনো, আসছে গ্রীষ্মে আমার কাজে লাগবে ভেবে ঠিক করে রেখেছিলে? সেখানা আমার কফিনে দিয়ে দিও। সেখানা আমার গায়ে দেবার সাধ ছিল। রাত শেষ হয়ে এল। তোমায় অনেকক্ষণ ভোগালাম। বিদায়।

আমার গতরাতের মদের নেশা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। শেষ সময়ে আমি শান্তভাবেই মরব।

বিদায়, আবার বিদায়।

কাজুকো!

শেষ পর্য্যন্ত আমি আমার বড় ঘরের রক্তের মর্য্যাদা দিয়ে গেলাম।

অষ্টম অধ্যায়

তমসা

একে একে সবাই আমায় ছেড়ে গেল।

নাওজির মৃত্যুর পর এক মাস আমি দেশের বাড়ীতে থেকে সমস্ত দেখাশোনা করলাম। তার পর হতাশায় বুক ভরে মিষ্টার উয়েহারাকে চিঠি লিখলাম।

মনে হচ্ছে আপনিও আমায় ত্যাগ করলেন। না, বোধ হয় ক্রমশঃ আমায় ভুলতে বসেছেন। কিন্তু আমার আর কোন দুঃখ নেই। এতদিনে আমার সাধ মিটেছে, আমি সন্তানের মা হতে চলেছি। আজ সব হারানোর দিনে, সব পাওয়ার আনন্দ বয়ে এনেছে আমার ভেতরের ক্ষুদ্র প্রাণটুকু।

একে আমি 'চরম ভ্রান্তি' বা ঐ জাতীয় কিছু বলে স্বীকার করব না। আজ আমার কাছে দুনিয়ার যা কিছু ব্যাপার যুদ্ধ, শান্তি, সংঘ, বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদির রহস্য ঘুচে গেছে। সম্ভবতঃ আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি আপনাকে এ সবের কারণ বলছি শুনুন—যুগে যুগে নারী সবল শিশু জন্ম দেবে বলে।

প্রথম থেকেই আপনার চরিত্র ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আমার এই একাগ্র প্রেমের অভিযানে জয়লাভ করা। এখন, যখন বাসনা চরিতার্থ হয়েছে, গভীর অরণ্যে স্তব্ধ জলাভূমির মত আমার হৃদয়ও শান্তিতে ভরে উঠেছে। আমি জানি, আমারই জয়। কেবলমাত্র মাতৃহৃদয়ের গর্ব্বে মেরী ও তাঁর সন্তান দেবমাতা ও দেবশিশুর আসনে অধিষ্ঠিত।

আশা করি, আমাদের শেষ দেখা হবার পর আপনি পূর্ব্ববৎ নর-নারী পরিবেষ্টিত হয়ে গিলোটিন, গিলোটিন সুর সহযোগে সুরার বন্যার ভেতর দিয়ে অধঃপতনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন।

এ নারকীয় জীবনধারা পরিবর্ত্তিত করুন, একথা আমি বলব না। সম্ভবতঃ আপনার শেষ সংগ্রাম এই পথেই চলবে।

মদ খাওয়া ছেড়ে দিন, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে তাকান, দীর্ঘায়ু হোন। আপনার অপূর্ব্ব শিল্পসমৃদ্ধ জীবনের দায়িত্ব পূর্ণ করুন। বা এই জাতীয় কোন ভণ্ড অনুজ্ঞা করার আমার একেবারেই ইচ্ছা নেই।

যতদূর জানি আপনার অপূর্ব সমৃদ্ধ জীবন এর নয়, আগামী দিনের মানুষ আপনার নিরবচ্ছিন্ন ব্যভিচারিতার জন্যই আপনাকে মনে রাখবে বেশী।

বলিদান! এরা সব কালের বিবর্ত্তমান নীতিবোধের যূপকাষ্ঠে বলিদান মাত্র।

জগতের কোথাও একটা বিপ্লব অবশ্যই ঘটে চলেছে, কিন্তু চিরন্তন নীতিজ্ঞান আজও অব্যাহত অবস্থায় আমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করছে এবং আমাদের অগ্রগতির পথ আগলে বসে আছে। সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তাল জলতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত হয়ে চলেছে, কিন্তু সমুদ্রের তলদেশে এর আঘাত পৌঁছয় না। সেখানে ঘুমের ভান করে জলধি নিঃশব্দে কালের পদধ্বনি শুনছে।

কিন্তু বোধ হয় আমার এই যোগাযোগের সূত্রপাত দ্বারা আমি প্রাচীন বিধিনিষেধ যৎসামান্য উল্লঙ্ঘন করতে পেরেছি এবং আমার ভাবী সন্তানের হাত ধরে দ্বিতীয়, তৃতীয়তম যুদ্ধে অগ্রসর হব।

আমার প্রেমাস্পদের' সন্তান গর্ভে ধারণ করে তাকে মানুষ করে তোলাই হবে তথাকথিত নীতিবোধের বিরুদ্ধে অভিযান।

আপনি আমায় ভুলতে পারেন, মদের পঙ্কে ডুবে আপনার মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু এ দুরূহ অভিযানের সার্থকতায় আমার দেহ মন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

অল্প কিছুকাল আগে আমি একজনের কাছে আপনার চারিত্রিক অপদার্থতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। যাই হোক আপনি আমায় শক্তি দিয়েছেন, আপনি আমার অন্তরে বিদ্রোহের রামধনু এঁকে দিয়েছেন। আপনি আমায় বেঁচে থাকার উপাদান যুগিয়েছেন। আপনার সম্বন্ধে আমার মনে যে গর্ব্ব আছে, তার বীজ আমি সন্তানের মধ্যেও বপন করে দেব।

জারজ সন্তান ও তার মা! *

সূর্য্যের মত প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। আপনি আপনার সংগ্রাম চালিয়ে যান।

এ বিপ্লবের শেষ নেই; বহু, বহুতর অমূল্য প্রাণ এর পায়ে বলিদান করতে হবে।

বর্ত্তমান যুগে সৌন্দর্য্যের প্রতীক যদি কিছু থাকে, তা এ'র অসংখ্য নরবলি।

আরও একজন এই যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ আছেন—তাঁর নাম মিষ্টার উয়েহারা।

আর আপনার সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র এই উৎসর্গীকৃত প্রাণটির হয়ে আপনার কাছে একটি বর ভিক্ষা চাই। আমি আমার সন্তানকে অন্ততঃ একবার আপনার স্ত্রীর কোলে দিয়ে বলতে চাই—একটি মেয়ের সঙ্গে নাওজির গোপন মিলনের ফল।

কেন এমন করব? তার কারণ আমি কাউকে বলতে পারি না। কেন তা আমি নিজেও ঠিক জানি না। কিন্তু এটুকু সাহায্য আপনি আমায় করবেন। দয়া করে হতভাগ্য নাওজির কথা ভেবে আপনি এতে আপত্তি করবেন না।

বিরক্ত হলেন বোধ হয়! তা হোন—এ আমার সইতেই হবে। নিঃসঙ্গ এক রমণীর কথা শীগগিরই আপনার মন থেকে মুছে যাবে জানি। ধরে নিন্ এটুকুই তার অপরাধ।

আমার মাথা খান—কথা রাখুন।

অনুবাদ—কল্পনা রায়।

সমাপ্ত

Commonsense is instinct, enough of it is genius.

—*Shaw*

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

—কাকীমা ! ও কাকীমা !

কার মিষ্টিগলার ডাক শুনে চমকে উঠলেন যমুনা দেবী। ভোরবেলায় স্নান সেরে গরদের থানখানি পরে সবে মাত্র ঠাকুরঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন তিনি। ছোট্ট বাগানটি থেকে তুলে এনেছেন সাজিভর্তি ফুল, পূজার জন্য। ওঁকে রীতিমত অবাক করে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে ওপরে উঠে এলো সুমিতা।

—আমি এসেছি কাকীমা ! দেখুন কা'কে নিয়ে এসেছি। হাসিমুখে বললো সে।

—ও মা ! আমার মিতুরাণী যে ! আয় আয়। তা এত ভোরে ঠাকুরপো আসতে দিলে যে ? কোলে তোর ও কে রে ? দেখি দেখি, কবে হলো ? একটা খবরও তো পাই নি। সাজিটা নামিয়ে রেখে ওর কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিজের কোলে নিলেন যমুনা দেবী।

—কি ভাবছেন আপনি ? খিল-খিলিয়ে হেসে উঠে বললো সুমিতা। আসবার সময় এক গাদা জঞ্জালের মধ্যে থেকে এই মাণিকটাকে কুড়িয়ে পেলাম কাকীমা ! দেখুন, দেখুন কি সুন্দর !

—ওমা তাই বুঝি ? তা বেশ করেছিস্। তা মানুষ করতে পারবি তো ? এ যে সদ্য জন্মেছে বলে মনে হচ্ছে রে ! একে বাঁচিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। আহা, এমন ফুলটাকে কোন পাষাণী ফেলে দিয়েছে গো ?

—তবে কি হবে কাকীমা ? ব্যথা-ছলো-ছলো চোখ দুটি মেলে করুণ সুরে বললো সুমিতা। আমি তো কিছু জানিনা। ও তাহলে আপনার কাছে থাক। একটু বড় করে আমায় দেবেন।

ও মা ! পাগলী মেয়ে এ আবার কি বলে গো ? আবার এই বয়েসে মায়াবন্ধনে জড়াবি আমায় ? আচ্ছা, সে পরের কথা। আগে ওকে চান করিয়ে একটু মিছরির জল খাইয়ে দিই। তুই বোস বাছা !

বাচ্ছাকে নিয়ে যমুনা দেবী নিচে নেমে গেলেন।

চঞ্চল পায়ে সুমিতা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ওর শুকিয়ে মজে যাওয়া মনের নদীটাতে যেন হঠাৎ পুলকবন্যার ঢল নেমেছে। সে অধীর আবেগে দুকূল ভাসিয়ে মত্ত উল্লাসে নেচে চলেছে। কোনো বাধাই মানবে না সে আর। মহাসাগরের ডাকে টুটে গেছে তার কারাবন্ধন। মহামুক্তির আনন্দ-কল্লোলে, হারিয়ে গেছে ক্ষুদ্র ভয়, ভাবনা, সংস্কারের কুটোগুলো।

সুদামের ঘরের দরজায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালো সুমিতা। তখনও খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছে সুদাম। আহা কি চমৎকার ঐ পবিত্র মুখখানা ! ঢিলে পায়জামা আর জালি গেঞ্জি পরা। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সুদাম। একটি হাত বুকের ওপর ; আরেকটি হাত উল্টে মাথার তলায় রাখা, বালিশটি পাশে সরানো রয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া এসে এলোমেলো কোঁকড়া চুলগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মিনিট নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুমিতা। অবাধ্য চোখ দুটো যে ফিরতে চায় না। কত কত দিন, কত মাস, বছর যার ব্যাকুল অন্বেষণে কেটেছে তার, এইতো, দুহাত দূরে রয়েছে সেই মনোহারী ছবিখানি। কিন্তু দু'হাত দূরতো নয়। মাঝে যে এক অতলান্তক খাদ। কি করে যাবে ওর কাছে ?

একটা রুদ্ধ বেদনার স্তূপ যেন ওর কণ্ঠনালির শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে চাইলো। দু হাতে বুকটা চেপে ধরে, আস্তে আস্তে বাগানের দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সুমিতা।

পরিচ্ছন্ন ছোট্ট বাগানটি দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে গেলো ওর। কার দরদী মনের অনুরাগ ছড়ানো যেন প্রত্যেকটি গাছের শাখায়, পাতায়, ফুলে। তাই ওরা অত পরিচ্ছন্ন, সুন্দর প্রাণময়।

একধারে তারের জালের ওপর ঘন বেগুনি রং-এর বাগনভ্যালিয়া, তার পাশেই লতানো যুঁই-এর ঝাড়, দুজনে হাত বাড়িয়ে যেন পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে চাইছে। বেল, যুঁইও ফুটেছে অজস্র। তার মাঝে মাঝে লাল, আর হলদে রং-এর গোলাপ ফুটে, দূর থেকে একখানি কাশ্মীরী শাড়ীর কারুকার্য্যকরা পাড়ের মত লাগছে দেখতে। ও পাশে ল্যাভেণ্ডার চাঁপার কয়েকটি গাছ। ওতে ফুল ফোটেনি এখনও। তারই পাশে আলো করে ফুটে আছে ক্রিসানথিমাম। মাঝামাঝি চারটি থাকে ফুটেছে লাইলাক ভায়োলেট, সুইটপি, ডেজি। ভোরের দমকা বাতাস লেগে থর-থর করে কাঁপছে ওরা।

কি সুন্দর ! কি সুন্দর ! আপন মনে বললো সুমিতা।

ওদের লালকুঠির অত বড় বাগানটা যত্নের অভাবে দিনে দিনে কি হতশ্রী হয়ে যাচ্ছে ! ভজনদা বড্ড বুড়ো হয়ে গেছে আর পারে না খাটতে, আর কে-ই বা নজর দিচ্ছে বাগানের দিকে—

—মিতা ! কার ভারি কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে মুখ ফেরালো সুমিতা।

সুদাম এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে।

চোখ দুটো ঈষৎ ফুলো ফুলো, তখনও যেন ঘুম জড়িয়ে আছে চোখে মুখে—কখন এসেছো মিতা ? ডাকোনি কেন আমায় ? বললো সুদাম।

—এসেছি কতক্ষণ ? তা, পনেরো কুড়ি মিনিট হ'ল। ভারি অবাক্ হয়ে গেছ না ? রাত না পোয়াতেই কেন এলাম ? কোন উপায়ে তাই তো ? কিন্তু এর চেয়েও অবাক্ হয়ে যাবে আরেকটি জিনিষ দেখলে দামীদা'! খুসি, আর কৌতুকভরা হাসি চিক্‌মিকিয়ে উঠলো ওর দুটি চোখে, আর ঠোঁটের ফাঁকে।

—তাই নাকি ? প্রসন্ন হাসির সঙ্গে জবাব দিলো সুদাম— অবাক্ হবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আমি মিতু !

—কৈ রে, মিতু, একে এবার একটু ধর দিকিনি বাছা ! চট্ করে পুজোটা সেরে নিই ! বলতে বলতে যমুনা দেবী, একটি ছোট্ট গরম শালে বাচ্চাটিকে জড়িয়ে এনে সুমিতার কোলে দিলেন।

—এ কি ? কবে হলো ও ? কিছু জানি না তো ! বিস্ময়ভরে বললো সুদাম।

—বাচ্ছাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে খিল খিল করে হেসে উঠলো সুমিতা।

—ঐ পাগলীর কাণ্ড! হাসতে হাসতে জবাব দিলেন যমুনা দেবী—এখানে আসবার পথে কুড়িয়ে পেয়েছে। মানুষ করবার ইচ্ছে আছে তবে ভয় পাচ্ছে, এ সব ব্যাপার কিছু জানা নেই তো? কাজে কাজেই আমাকেই একটু শক্ত সামোথ করে দিতে হবে আর কি! নাও দামী একটু তাড়াতাড়ি চা খেয়ে, বাগানের কাজ আজ থাক—দোকান থেকে চট করে বাচ্ছাটার জন্তে জামা, বিছানা, কিডিং বোতল, কাউগেট মিল্ক এই সব এক্ষুণি যা লাগবে, আমি একটা ফর্দ্দ করে দিচ্ছি, কিনে আনো। ওর সঙ্গে তুইও যা না মিতু, পছন্দ করে সব নিয়ে আয়! দামীর ছোটবেলার দোলনা খাট আছে, সেটা আম ঝেড়ে-ঝুড়ে, ঠিক করে নেব। চলে গেলেন যমুনা দেবী ব্যস্ত ভাবে।

—সত্যিই তুমি অবাক করতে জানো মিতা! দেখি, দেখি—দু'হাত বাড়িয়ে বাচ্ছাটাকে নিজের কোলে নিয়ে বললো সুদাম বাঃ! একেবারে গোলাপ ফুলের মত ছেলেটি তোমার দেখছি। একটা সুন্দর ফুলের নাম দিও এর, খুব মানাবে।

—ফুলের নাম? না দামীদা'। বেদনা-ছলো-ছলো কণ্ঠে বললো সুমিতা—আমার জীবন ভরা অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। সেই অন্ধকারের ভেতর আলো হয়ে জ্বলবে আমার এই মাণিকটা, তাই ওর নাম রাখলাম—আলোক।

—তাই হোক মিতা! কয়লার খনির নিকষ-কালো অন্ধকারের ভেতরই জন্মায় উজ্জ্বল হীরে। মহামণি কোহিনূর। তোমার আলোক নাম সার্থক হোক ওর জীবনে।

নাও তোমার আলোককে এবার, তৈরী হয়ে নিই। এখুনি মা এসে তাগাদা লাগাবেন। সুমিতার হাতে আলোককে দিয়ে বাথরুমে চলে গেলো সুদাম।

সুদামের ঘরে এসে ওকে নিয়ে খাটে বসলো সুমিতা। আলোককে বুকে জড়িয়ে ধরে, দুলে দুলে, গুন গুন্ করে গান গেয়ে ওকে ঘুম পাড়াতে লাগলো।

—ঘণ্টাখানেক পরে এলেন যমুনা দেবী, একখানি একশো টাকার নোট সুমিতার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—দে ওকে শুইয়ে দিই। আমি পূজো সেরে তোদের চায়ের জল চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, মঙ্গলকে বলেছি তোদের চা, আর পাঁউরুটি টোষ্ট করে দিয়ে যাবে, মালপো তৈরী করেছিলাম, আছে দু-চারখানা, আর কি খাবি বল? আহা বাছা রে, কত দিন দেখিনি তোকে—কি রোগা হয়ে গেছিস ক' বছরে। নে ওঠ বাছা, সে-সব কথা এখন থাক, এখন খোকনমণির জিনিষগুলো আগে নিয়ে আয়, চা খেয়ে।

—খোকন নয় কাকীমা! ওর নাম দিয়েছি আলোককুমার। যমুনা দেবীর কোলে আলোককে তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো সুমিতা—দামীদা'র হয়েছে তো? আমি যাই, চা নিয়ে আসি গে।

—ও মা, সে কি কথা! তুই এসেছিস এই আমার কত ভাগ্যি রে, আবার দু' দণ্ডের জন্তে এসে খাটতে যাবি কেন? বোস্ আমার কাছে, মঙ্গলই চা আনবে।

—না, না, একটু হাত-পাগুলো নাড়াচাড়া করতে দিন কাকীমা, সব যে জড় হয়ে গেলো, দিন-রাত শুয়ে-বসে থেকে। চঞ্চল পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সুমিতা।

ওর গমনপথের দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে মৃদুকণ্ঠে আক্ষেপ করলেন যমুনা দেবী—মরে যাই বাছা রে, আলোককে নিয়ে তিনি চলে গেলেন নিজের ঘরে।

সুদামের ঘরেই চা'য়ে বসলো ওরা। কাপে চা ঢেলে সুদামের হাতে তুলে দিলো সুমিতা, নিজেরটিও পূর্ণ করে, কাপের চিনি গুলিয়ে নিচ্ছিলো চামচ নেড়ে। মুখে ওর ফুটেছে একটা সলজ্জভাব।

কত দিন পরে একসাথে বসেছে ওরা দু'জন। হায়! মাঝের পাঁচটা বছর যদি মুছে দিতে পারতো জীবন থেকে! অবনত দৃষ্টিতে ভাবে সুমিতা।

—বাঃ! চা যে জল হয়ে গেলো, খাও? পাথরকুচি তো আর চায়ে দাওনি, দিয়েছ মাত্র দু'চামচ চিনি, আর সে গলে গিয়েও ভাবছে চামচের পিষুণি এখনও থামে না কেন?

—চামচে রেখে, কাপটি হাতে তুলে নিয়ে চোখ তুলে চাইলো সুমিতা।

সুমধুর লজ্জা কাঁপছে ওর নীল চোখের পাতায়! গালে ফিকে গোলাপী ছোপ, ঠোঁটে চাপা স্নিগ্ধ হাসির ঝিলিক্!

পাশেই খোলা জানলা দিয়ে বাসন্তী রং এক ঝলক হাল্কা রোদ এসে ওদের ছুঁই-ছুঁই করছে। জানলার ওপাশে এপ্রিল ফুলের গাছে ফুটেছে থোকা-থোকা রক্তরাঙা ফুল; আর তারই ওপর উড়ে এসে বসেছে একজোড়া দুধশাদা শান্তির দূত। ওরা যেন রক্তময়ী মহাযুদ্ধের শেষে, রক্তাক্ত সমরাঙ্গনের বুকে শুভ্র শান্তির পতাকা।

হৃদয়কুম্ভ যখন কামায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন বুঝি এমনি করেই সে স্তব্ধ হয়ে যায়। ধ্বনি হয়ে যায় মূক, আর ভাব-মুখর হয়ে ওঠে। কত কথাই বলার ছিলো ওদের দুজনার, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে সে সব কথাগুলো যেন গেছে হারিয়ে; তাই নিঃশব্দে দুজনে চা খেতে লাগলো আনমনা হয়ে।

—আরে! একি! একি? এই সক্কালবেলায় তোমার ভবনে ইছামতীর দর্শন পাবো, এমন ঘটনা তো চোখে দেখেও; বিশ্বাস করতে পারছি না হে!

চমকে উঠে ওরা দুজনে মুখ ফেরালো,—একটু দূরে দু' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে অনিরুদ্ধ।

—এসো, এসো, দাঁড়িয়ে কেন? কতক্ষণ এসেছো? অপ্রস্তুতের হাসির সঙ্গে বললো সুদাম।

—এসেছি কতক্ষণ? তা মিনিট কুড়ি হবে। মাসীমার সঙ্গে দেখা করে, মিতার খোকাকে দেখে এবারে এলাম ইছামতীকে দর্শন করতে।

—আঃ! কি বাজে বোকছো দাদা? চাপাস্বরে বললো সুমিতা।

—আপনার কথার হেঁয়ালী আমার মস্তিষ্কেও ঢুকছে না যে, একটু শাদা-মাটা করে বলুন, তবেই তো বুঝবো ঠিক। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললো সুদাম।

—ধীরে বন্ধু ধীরে। বলছি সব বলছি। পাশের চেয়ারটিতে বসে একটি সিগারেট ধরালো অনিরুদ্ধ। চোখ বুজে আয়েস করে ধোঁয়া ওড়ালো। তারপর বললো—ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, মানে আমি আরো স্পষ্ট করেই বলছি, তোমার অতি প্রিয় কাব্যগ্রন্থ

বালুচরের লেখিকা ইছামতী সশরীরে তোমার সামনে বিরাজ করছেন, এই আর কি!

—চট করে উঠে দাঁড়িয়ে পালাতে গেলো সুমিতা। টপ করে ওর হাতখানি ধরে ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিলো অনিরুদ্ধ।

—আমার অনেক দিনের আশা সত্যিই তুমি সার্থক করেছো মিতা! উঃ! আজ একের পর একটি করে আশ্চর্য্য ঘটনা এমন ভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে যে, মঙ্গলগ্রহ থেকে যদি কোনো আশ্চর্য্য প্রাণীর আবির্ভাব হয় এখানে, তাহলে আর বেশী কিছু আশ্চর্য্য হবো না নিশ্চয়ই। এমন অপূর্ব ভাব আর ভাষা কোথায় পেলে মিতা? তাহলে তুমিই আমায় পাঠিয়েছিলে বইখানা? গভীর আনন্দ-ছলো-ছলো কণ্ঠে শুধালো সুদাম।

মুখ নিচু করে বসেছিলো সুমিতা। দারুণ লজ্জায় ওর কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে। তাই জবাব দিতে পারলো না কিছু। শুধু মুখ তুলে একবার চাইলো সুদামের দিকে।

ওর নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের গভীর নীলের মত দুটি চোখে সকল প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলো সুদাম।

—আমি জানতাম মিতা, তুমি একদিন সার্থক কবিতা রচনা করবে—মৃদুকণ্ঠে বললো সুদাম। মনে পড়ে—যখন আমার লেখা কবিতা শুনতে তুমি, তখন মাঝে মাঝে ব্যাকুলভাবে বলতে আমায় জানো দামীদা'। কত কথা আমার মনেও ভিড় জমায়,—কিন্তু আমি পারি না তাদের মুখে ভাষা দিতে—তাই মাঝে মাঝে বড় ব্যথা পাই মনে। তখনই জেনেছিলাম এ তোমার ফুল ফোটানোর বেদনা!

এ সব শিক্ষা তো আমার তোমার কাছেই দামীদা'! শান্ত কোমলকণ্ঠে বললো সুমিতা—পৃথিবীর অসীম সৌন্দর্য্যকে দেখবার জন্য নতুন দৃষ্টি তুমিই আমায় দিয়েছিলে! তার গন্ধ আর রসকে গ্রহণ করবার মত মনোবল আমি তোমার কাছেই পেয়েছিলাম—তাই যেদিন দাদা আমার বই ছাপিয়ে এনে দিলেন আমার হাতে সেদিন সবার আগে তোমাকে সে বই দেবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। তারপর দাদার সাহায্যেই পাঠিয়েছিলাম তোমায় বালুচর এক কপি!

—ও! তাই বুঝি? আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! এতদিন ধরে গোলকধাঁধায় ঘুরিয়েছেন আমায়। হাসতে হাসতে বললো সুদাম।

—বাঃ, চমৎকার! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। এই হচ্ছে কলির মাহাত্ম্য;—বুঝলে মিতা! কপট গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ!

হো-হো করে হেসে উঠলো সুদাম আর সুমিতা।

ওদের হাসির শব্দ শুনে ঘরে এসে দাঁড়িয়ে বললেন যমুনা দেবী—ওমা! এখনও গল্প করবি তোরা? খোকনের জিনিস-পত্তোর কখন আসবে?

—আসবে মাসীমা! সব আসবে। খোকন যখন এসেছে, তার মাল পত্তোরও আসবে! এখন মিতাকে একটু প্রাণ খুলে হাসতে দিন মাসীমা! বেচারি এই পাঁচ বছর হাসির ভাঁড়ারে একেবারে তালাচাবি দিয়ে রেখেছিলো!

—আহা, মরে যাই! মিতার দিকে চেয়ে স্নেহার্দ্র সুরে বললেন তিনি—খোকনকে তবে একটু দেখিস মিতু! বেলা হলো, রান্নার জোগাড় করিগে।

—তা হবে না কাকীমা! আব্দার ধরলো মিতা, আজ আমি রান্না করবো। আমার রান্না করে সকলকে খাওয়াতে কত ইচ্ছে করে কাকীমা, কিন্তু একটা দিনও সে সাধ আমার মিটলো না। আজ আপনি আমায় দেখিয়ে দেবেন আমি রাঁধবো, লক্ষ্মীটি কাকীমা! বলতে বলতে সুমিতা উঠে এসে দু' হাতে ওঁর গলাটা জড়িয়ে ধরলো।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে রে পাগলী! ওর পিঠে ছোট ছোট চাপড় দিয়ে বললেন যমুনা দেবী—কি রাঁধবি বল্? আমাদের তো নিরামিষ ব্যাপার, শুধু তোর জন্যেই মাছ হবে। আর অনিরুদ্ধ, তুমি বাবা আজ এখানেই খাবে।

—একে আপনার হুকুম, তার ওপর মিতার হাতের রান্না, একে অমান্য করবার ছেলে আপনার অনিরুদ্ধ নয় মাসীমা! তবে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে মাকে বলে আসি।

—ঠিক আছে। দামীদা' আর তুমি দুজনে গিয়ে খোকনের জিনিষগুলো কিনে তার পর বাড়ী যেও দাদা! আমি আর যাবো না, ততক্ষণ কাকীমার সঙ্গে রান্না করিগে। কি রান্না করবো বলো তোমরা দুজনে। আর মাছ আমিও খাই না কাকীমা, অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি, শুধু দাদার জন্যে মাছ হবে।

—লাফিয়ে উঠলো অনিরুদ্ধ। সবাই মিলে আমাকে একঘরে করবার মতলব, কেন বলো তো? ভালো ভালো নিরামিষ রান্নাগুলো নিজেরা খাবে আর দাদার জন্যে কতকগুলো মড়া? কক্খোনো না। আজ একেবারে বাছাই বাছাই জিনিষ খাওয়াতে পারো তো খাবো।

—কি খাবে বলেই ফেলো না—হাসিমুখে শুধোলো সুমিতা।

—কি খাবো? দাঁড়াও ভাবি। মাথা চুলকে বললো অনিরুদ্ধ—নাঃ, রান্নাগুলোর নাম যে খুঁজে পাচ্ছি না, হ্যাঁ মাসীমা, আপনার ওপরই ভার দিচ্ছি—নামগুলো সব আপনি ঠিক করে দেবেন। নাও এবারে রাঁধো মিতা, আমিও এখুনি ঘুরে আসছি, সত্যিই তুমি হাতা খুন্তি ধরছো,—না মাসীমা সব রেঁধে তোমার নামে চালালেন, এ আমায় দেখতেই হবে।

—বেশতো, পাহারা দেবে চলো রান্নাঘরে। এবারে বলুন কাকীমা, কি রান্না হবে?

—রান্না? তা মাছ তো কেউ ছোঁবে না—তবে নিরামিষই সব হোক। ফুলকপি কড়াইশুঁটি দিয়ে জাফরাণী ঘি-ভাত কর। আর তার সঙ্গে ছানার কালিয়া—বেগুনের ঝাল, এঁচোড়ের ঘণ্ট,—আর আলু-পটলের দমপোক্ত কর। শেষে আমের চাটনি আর কমলা লেবুর পায়েস। আর কি খাবে বলো তোমরা—বাবা!

ওরে ব্বাবা! এর ওপরে আরো? চোখ বড় করে বলল অনিরুদ্ধ। মিতা তাহলে কাল সকালে রান্নাঘর থেকে বেরুবে মাসীমা, আজ শুধু হরিমটর চিবুতে হবে দেখছি।

—ইস তাই বৈ কি। তোমরা ফিরে এসে দেখবে সব রেডি। বাজি রাখো,—কে হারে আর কে জেতে।

—আলবৎ বাজি ফেলবো'। টেবিল চাপড়ে বললো অনিরুদ্ধ! আমি হারি যদি তবে মিতার খোকনকে একটা পেরাম্বুলেটার দেব।

—আর আমি যদি হারি, তবে তোমাকে একটা খুব সুন্দর

টুকটুকে বউ এনে দেব। বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে ছুটে পালালো সুমিতা।

যমুনা দেবীও ওর পেছন পেছন যেতে যেতে বললেন—পাগলীটা চিরকালই একভাবেই রইলো!

সুদাম টেবিলের ওপর হাত দুটি রেখে এতক্ষণ উপভোগ করছিলো ওদের হাস্য-পরিহাসগুলো, এবারে চোখ তুলে চাইলো অনিরুদ্ধর দিকে। আশ্চর্য্য! অনিরুদ্ধর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

পকেট থেকে রুমালটা বার করে চোখ মুছতে মুছতে বললো অনিরুদ্ধ। —আজ মিতাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো সুদাম! ভীষণ ভাবে ঝলসে শুকিয়ে যাওয়া একটা লতা গাছ—আবার যেন নতুন করে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে। ও বাঁচবে। আবার সবুজ পাতায় ফুলে ও হাসবে।

মৃদু গলায় বললো সুদাম—এত ভালো মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা কেমন করে সম্ভব হোল এ তো আমি কিছুতেই ভেবে পাই না অনিদা! আমার ধারণা ছিলো, মিতা সুখী হয়েছে,—কিন্তু এখন যা দেখছি বা শুনছি—

—তবু তো তুমি কিছুই দেখোনি সুদাম! দেখেছি কিছু কিছু আমি। মিতাকে বিয়ে করেছিলো ও স্রেফ টাকার লোভে। সেই টাকাগুলো যখন হাতছাড়া হয়ে গেলো, তখনই ওর স্বরূপ প্রকাশ পেল! মিতাকে বললো অসীম,—তোমার বাবার নামে নালিশ করো, পৈতৃক বিষয় যা ইচ্ছে তাই করবার অধিকার নেই ওঁর! সমস্ত বিষয় মামলা করলে তোমার হাতে ফিরে আসবে। মিতা রাজী হয়নি। তখন থেকে আরম্ভ হলো ওর অত্যাচার। অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে মিতুকে আর ওর বাবাকে।

আমাকে ও বললো একদিন,—তুমি একটু চেষ্টা করো না মিতাকে রাজী করাবার। এর জন্যে পারিশ্রমিক অবিশ্যি দেব।

আমি একটু ভেবে রাজি হয়ে গেলাম—তখন মিতা একেবারে একলা থাকতো। অন্য কারুর বাড়ীতে আসা বারণ ছিলো অসীমের। মিতাও কোথাও বেরুতো না।

আমি ভাবলাম—মিতার সঙ্গে দেখাশোনা করবার এই হচ্ছে মস্ত সুযোগ।

সে সুযোগের সদ্ব্যবহারও করলাম। আমার অবাধ যাওয়া-আসায় অসীমের আর আপত্তি রইলো না, মিতাও একটু স্বস্তি পেলো আমাকে পেয়ে।

চায়ের কাপ হাতে মিতাকে আসতে দেখে কথা থামালো অনিরুদ্ধ।

—বাঃ! চুপ করলে কেন? বেশতো গল্প করছিলে। চায়ের কাপটি টেবিলে রাখতে রাখতে বললো সুমিতা—বুঝেছি, আমার নিন্দে করা হচ্ছিলো।

—কাপটি হাতে তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ। একশো বার নিন্দে করবো—একটা মোটা রকমের দাঁও কষে গেলো তোমার জন্যে।

অসীমের কথাটা যদি তুমি শুনতে—তাহলে ব্যারিষ্টারের ফি টাকাও বুঝেছো; হো-হো, শব্দে হেসে উঠলো অনিরুদ্ধ।

—ঐ আশায় থাকো তুমি, আমি চললাম রান্না করতে—তোমাকে আজ বাজি হারিয়ে পেরাম্বুলেটার কিনিয়ে তবে ছাড়বো।

কোমরে কাপড় জড়িয়ে হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেলো সুমিতা।

চা শেষ করে, সিগারেট ধরালো অনিরুদ্ধ। অসীমের দিকে এগিয়ে দিলো সিগারেট-কেসটা।

—ও রসে বঞ্চিত আমি দাদা! যোড় হাতে সিগারেট প্রত্যাখ্যান করলো সুদাম।

—ও! তাই নাকি! ভালো করেছো। হ্যাঁ, তারপর—যাওয়া-আসা করি আমি, বোঝাই অসীমকে সময় লাগবে। আরেকটি বায়না ধরলো সে—লালকুঠিটা বিক্রি করলে আসবাব সমেত বেশ মোটা টাকা হাতে আসবে।

মিতা এক এক সময় বলতো,—আর সইতে পারছি না দাদা, লালকুঠি ওঁর নামে লিখে দিই—ওঁর যা প্রাণ চায় করুক। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি। কারণ মিতার এক লক্ষ টাকা ও আগেই কেড়ে নিয়েছিলো, এবারে সঙ্কল্প ছিলো তার—ঐ বাড়ী এবং মূল্যবান ফার্নিচার আর অন্যান্য জিনিষগুলো বিক্রি করে ও শুকতারাকে নিয়ে বিলেতে পালাবে। সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য যা হোক করবে। আমাকে মদের ঝোঁকে সব কথা বলে ফেলতো কি না—আর আমি বলতাম—ব্যস্ত হয়ো না, ধৈর্য্য ধরো, সময় লাগবে।

এর পরেই এলো পুলিশ হাঙ্গামা। অলকাপুরীর হাঙ্গামা, খানিকটা ওর ঘাড়েও এসেছিলো কি-না! অনেক টাকার খেসারত দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে হোল। ঠিক তারপর থেকেই ওর স্বভাব আরো জঘন্য, আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। তখন ওর একমাত্র কাম্য বস্তু হচ্ছে প্রচুর টাকা; আর তার জন্যে ও যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত আছে। তা—সে কাজ যত জঘন্য বা ভয়াবহ হোক্ না কেন। আমাকেও মনে হয় ও এখন আর বিশ্বাস করে না, কিন্তু কিছু বলতেও সাহস পায় না। কারণ ওর ভেতরের কথা সব আমার জানা কি না।

নিজের হাতঘড়িতে নজর বুলিয়ে চমকে উঠলো অনিরুদ্ধ—এই রে, ন'টা বাজলো যে, দোকান বাজার কখন হবে? তারপর কোর্টে যাবার তাড়া রয়েছে, সে সব কথা তো ভুলেই গেছি—নাঃ মিতাই জিতবে বাজিতে, বেলা একটার আগে আসা আমার হয়ে উঠবে না।

—একটা কথা। ওর টেবিলে রাখা হাতটির ওপর হাত রাখলো সুদাম। বরফের মতো ঠাণ্ডা সে হাত।

—বলো। কি জানতে চাও? বিস্ময়-কৌতূহল ফুটেছে অনিরুদ্ধর চোখের দৃষ্টিতে।

—বালুচর বইখানি মিতার কত দিন আগে লেখা?

—ও, সে কথা বলতে তোমাকে ভুলেই গেছি। বছর তিনেক আগেকার কথা বলছি। যখন আমি মিতার কাছে যাওয়া-আসা সুরু করেছি, সেই সময়ে একদিন মার্কেট থেকে কিছু ভালো কেক প্যাস্ট্রি ফুল, আর একখানি শাড়ী নিয়ে ভোরবেলায় মিতার ঘরে গেলাম, ওকে চমকে দেব বলে। কারণ সে দিনটা ছিলো ওর জন্মদিন। বিয়ের পর থেকে ওর জন্মদিনে আর ও কারুকে ডাকতো না কিন্তু আমার মনে ছিলো সে তারিখটির কথা।

গিয়ে দেখলাম, ও ঘুম থেকে উঠে সবে বাথরুমে গেছে, বিছানার পাশে পড়ে আছে একখানি কালো চামড়াবাঁধানো খাতা।

নির্ব্বিচারে সেখানি তুলে নিয়ে দেখতে লাগলাম পাতার পর পাতা উল্টে। চমৎকার এক একটি সনেট! যেমন ভাব তেমনি ভাষা। ওর কাব্যসাগরে যখন একেবারে ডুব দিয়েছি, ঠিক তখনই নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলো সুমিতা।

—এ কি দাদা, এত সকালে যে? হিজিবিজি লেখাগুলো দেখলে কেন বলোতো? ছি, ছি, ভারি লজ্জা করছে আমার কিন্তু।

—খাতাটি হাতে চেপে রেখে চাইলাম ওর দিকে। লজ্জায় সত্যিই গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে ওর। বললাম—তোমার জন্মদিনের শুভ ইচ্ছা আর আশীর্ব্বাদ জানাতে এসেছি মিতা! আর অভিযোগও জানাচ্ছি তার সঙ্গে, তুমি যে আমাকে এত পর ভাবো, তা এই মাত্র জানলাম।

—কেন? কি করেছি আমি দাদা? মিতার দু'-চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি।

—এমন অপূর্ব্ব কবিতা লিখে লুকিয়ে রেখেছো এত দিন? আমাকে বঞ্চিত করেছো তোমার এমন সুন্দর কাব্যরস থেকে?

—তোমার ভালো লেগেছে দাদা? ব্যাকুলভাবে বললো মিতা—আমার মনে হয়েছিলো কি জানো? সময় কাটে না, তাই যা মনে আসে হিজি-বিজি লিখি, নেহাৎই কাঁচা হাতের লেখা, দাদীমা' থাকলে তাঁকে দেখাতাম, কিন্তু তোমাকে দেখাতে সত্যিই বড় লজ্জা করছিলো তাই। যা হোক, ওরকম আরো অনেক লেখা আছে। সব দেখাবো। এবারে হলো তো? ফুল আর শাড়ী হাতে তুলে নিয়ে খুব খুসি হয়ে বললো—আমার জন্মদিন তুমি মনে রেখেছো দাদা! কিন্তু আমি ভুলে গেছি—

সেদিনের পর থেকে পড়তে লাগলাম ওর রাশি রাশি কবিতা! বললাম—আমি এগুলো থেকে বেছে কবিতা নিয়ে বই বার করতে চাই মিতা! এমন অপূর্ব্ব জিনিষ অবহেলা করে অপচয় করবার নয়—এ যে সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ!

—তা কি করে হবে দাদা? ওদিকে আগুন তো জ্বলছেই,—ওতে যে ঘৃতাহুতি দেওয়া হবে! ভয়ে ভয়ে বললো সুমিতা।

—তোমায় কিছু ভাবতে হবে না মিতা, বললাম আমি—ছদ্মনামে বার করবো বইখানা। লেখিকার নাম হবে 'ইছামতী।'

চমৎকার নাম দিয়েছো দাদা! তবে তোমার ইছামতীর পাকে, পাকে যে শুধুই বালি আর বালি। তার দু'কূলে নেই সবুজ সমারোহ, নেই জীবনের কলতান,—শুধু ধূ! ধূ! বালুই তার জীবনের সাথী। তাই ইছামতী বই-এর নাম দিও দাদা, 'বালুচর'।

[ক্রমশঃ।

রিসার্চ

সাধনা সরকার

টেবিলের অন্ধকারে পৃথিবীর শব,
অজস্র বইয়ের স্তূপে তান্ত্রিক উপাসনা চলে,
হৃদয়ে কুলুপ এঁটে বুদ্ধির হাত টেনে নিয়ে
ভ্রূকুটিল চোখে দার্শনিক সমীক্ষা সুরু।

এদিকে যূথচারী কয়েকটি তারা
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নীচে শব্দহীন শরীরী সংকেতে
মায়াবিনী, বেলোয়ারি জ্যোৎস্নার দিন
ঘামে ঘুমে শান্ত হওয়া উন্মুক্ত পদাবলী রাত।
দেওয়ালের শ্যেনচক্ষু টিকটিকি ভাবে—
এই সব পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, ভণিতার
অস্থি-মেদ-মজ্জা-শিরা আর উপশিরা খুঁটে
দার্শনিকের অনুপলব্ধ আত্মরতির
এ কোন প্রত্যয়লব্ধ জীবন-জিজ্ঞাসা?
চেতনার স্তব্ধ যাদুঘরে অভিভূত হয়ে
অতীতের মনীষার ফসিল
ক্ষতিহীন আবিষ্কৃতিরনি জীব প্রত্ন-জিজ্ঞাসার সাঙ্কেতিক উপাদান হয়ে

ব্রেইল অক্ষরে মোড়া জীবনের
প্রবীণ তত্ত্বজ্ঞ
আদিম কনফুশিয়সের মতো স্তব্ধ সমাহিত
স্থবির মুহূর্ত্তগুলি হাসে
শঙ্কর আর জৈমিনির হাসি
'মানুষের জন্ম মৃত্যু, সুখ-দুঃখ আর
অস্তিত্বের সত্যাসত্য বোধ
ঐহিক ও পারত্রিক সমস্যার জটিল গ্রন্থি খুলে ফেলা
পুরুষের অপ্রাকৃত সত্তা নিয়ে
মস্তিষ্কের উপলব্ধি কোষে প্রজ্ঞার সন্ধান খুঁজে ফেরা
এ সবই মানুষের বাগীশ্বরী চেতনার
পারমাণবিক প্রতিভাস।

যেন বিন্দু থেকে বৃত্তে ছুটে গিয়ে
বৃত্ত থেকে বিন্দুতে চক্রাকার পরিভ্রমণ
বিনিদ্র সময়ের ফাঁকে
সময় ফুরায়
অবলুপ্ত পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতা
টেবিলে ঘুমায়।
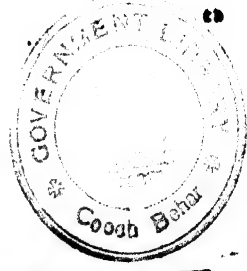
ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আঠারো

যে ঘরে য়ুসুফ থাকত সেই ঘরেই পল্লব রাত্তে শুল। সে রাত্তে কী বৃষ্টি! সঙ্গে সঙ্গে সারা আকাশে বিদ্যুৎ ছুরি শাণায়। থেকে থেকে কড় কড় কড়'কড়। কাঁপা বাষ্পের বুকে এত আগুনও লুকিয়ে থাকে!

খানিক বাদেই কোথায় বা মেঘ, কোথায় বা ঝড়! আকাশে ফের চাঁদ ওঠে হেসে।

পল্লবের মনের মধ্যে আবার শান্তি ফিরে আসে। এলিওনোরার শুধু আশ্বাসেই নয়, বেদনায়ও ও যেন বল পায়। একলা হ'য়েও পারল ক্ষোভ জয় করতে—আর পল্লব পারবে না বন্ধু-বান্ধব থাকা সত্ত্বেও?

জানলা খুলে দিয়ে বাইরের ব্যালকনিতে একটি আরামকেদারা টেনে নিয়ে ও চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে।

জীবন বিচিত্র বৈ কি! বহুরূপীও বটে—ঠিক ঐ আকাশের মতন। খানিক আগে যেখানে বেধেছিল মেঘের কুরুক্ষেত্র, খানিক পরেই সেখানে শান্ত তারার সভা বসেছে কান্ত চাঁদের আলোয়! সামনের গাছে ক্ষণে ক্ষণে মর্মরের প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে হাওয়ার সম্ভাষণে। ওদিকে পায়ের নিচে হ্রদের বুকে সোনার স্তম্ভ ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। অশান্তি ক্ষোভ দুঃখ আছে সত্যি, কিন্তু উল্টো পিঠেই কি নেই শান্তির প্রলেপ, আশার বাণী?

ও সব চেয়ে গভীর শান্তি পায় আজ এই চিন্তায় যে, এই দুঃখ পাওয়া ওর দরকার ছিল বিশ্ববাসীর নিয়তির সরিক হবার জন্যে। যদি এক কথায় আইরিনকে পেত তবে বিশ্বের হৃদয়ে বেদনার বাণী শুনতে পেত কি এভাবে? এলিওনোরার ব্যথার ব্যথী হতে পারত কি?

শুধু তাই নয়—অনুভব করে ও গভীর ভাবে—একজনের ব্যথাও আর একজনকে যে শক্তি দিতে পারে, একথা মর্মে মর্মে ও উপলব্ধি করতে পারত কি যদি না নিজে ব্যথার আগুনে পুড়ে শুদ্ধিলাভ করত? চলার পথে একমাত্র দুস্তর বাধা—ক্ষোভ। ও স্থির করল, এ ক্ষোভকে জয় করতেই হবে আইরিনের কাছে কোনো কিছু না চেয়ে। এলিওনোরার একটা কথা আজ ওর হৃদয়তন্ত্রীতে কেবলই বেজে বেজে ওঠে—আহা, ওকে একটু সময় দাও।

উনিশ

পরদিন পল্লব লুনা হোটেলে ফিরল বিকেলবেলা। হঠাৎ ফের বৃষ্টি। ওর মন কেমন করে উঠল। সব ক্ষোভ ভুলে আইরিনকে লিখল কোনো মানা না মেনে।

তোমার চিঠি না পেয়ে মনে অভিমান জমেছিল। শুনলাম, তোমার শরীর ভালো নেই। এ জন্যে উদ্বিগ্ন আছি, কিন্তু অভিমানকে বোধ হয় জয় করেছি। ঠিক করেছি আর দশ পনের দিনের মধ্যেই দেশে ফিরব। কুসুম ডাকছে। সে জেলে গেছে। তাই মোহনলালকেও দেশের কাজের কিছু ভার নিতে হয়েছে—যে কাজ আগে কুসুম করত। আমি আর দেরি করতে চাই না। সালভিনি ফিরলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেই দেশে ফিরব। তিনি দু-চার দিনের মধ্যেই রোমে ফিরবেন শুনছি।

তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করেছ কেন ঠিক জানি না! তবে যেখানে ভিতরের ব্যাপার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সেখানে জল্পনা কল্পনা ক'রে মনকে অকারণ উত্তেজিত করে ফল কী? মনে আশা আছে তুমি তোমার খবর দেবে সময় হ'লেই। তোমার মনের ভাব এখন কী জানি না। তবে এলিওনোরা কাল বলছিল, তোমাকে সময় দিতে বলছিল, যে সব দুর্ভাবনা তোমাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে তাদের থিতিয়ে যেতে না দিলে চলবে কেন? কথাটা আমার মনে লেগেছে। আমি অপেক্ষা করব শান্ত মনেই, ভেবো না। কিন্তু এর পরে আর চিঠি লিখব না, তোমার মনে দুর্ভাবনার ফেনা সব থিতিয়ে গেলে হয়ত তুমি লিখবে। তখন—কী হবে তখন, কে জানে?

লিখে মনে হল বড় শুষ্ক চিঠি। একবার ভাবল ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু সে ইচ্ছা জোর ক'রে দাপিয়ে রেখেই চিঠিটা ডাকে দিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় রোজকার মতন আহারের টেবিলে এসে বসল।

কিন্তু কোথায় শাপিরো? ওর মন আজ উৎসুক হ'য়ে উঠেছে ওর জন্যে—আরো কাল দেখা হয়নি বলে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হয়—এ বন্ধুটির কিছুই না জেনেও কেন তাকে এমন ভালোবেসে ফেলল! কেন মনে হয় ওকে বহুদিনের চেনা? কেন ওর সঙ্গ এত তৃপ্তি বহন করে আনে ও মনের কথা কিছু না বলা সত্ত্বেও? সব চেয়ে আশ্চর্য—ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর থেকেই কেমন করে এমন বদল হল নিজের মনের? মাসখানেক আগে কী দুঃখই পেয়েছে ও আইরিনের কথা ভাবতে! কিন্তু আজ সে দুঃখের তলেও এ কী অচঞ্চল সমাহিতি! জীবন বিচিত্র বৈ কি! নৈলে কি—মনে পড়ে যায় কবিতার দুটি চরণ:

> যার লাগি চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর,
> তাহারে বাদ দিয়েও দেখি—বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।

এমনি সময়ে শাপিরোর আবির্ভাব।

পল্লব উঠে দাঁড়িয়ে বলে: এসো এসো। আজ এত দেরি!—আমি ঠায় আধ ঘণ্টা ব'সে।

শাপিরো কোমল কণ্ঠে বলে: je vous demande perdon monami!* আজ একটু বিশেষ কাজ ছিল। কিন্তু তুমি কেন মিথ্যে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে ভাই?

পল্লব হেসে বলে: বাঃ, খাসা বন্ধু! একলা একলা বুঝি খেতে ভালো লাগে?

খেতে খেতে ওদের গল্পালাপ সুরু হয়।

শাপিরো প্রথমেই বলল: তোমার তিরস্কার ভাই, মাথা পেতে নিচ্ছি। কারণ, এলিওনোরাকে ভালো ক'রে না জেনে ওকে 'বিলাসিনী' বলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে—আরো এই জন্যে যে সে তোমার বান্ধবী।

পল্লব বলল: আশ্চর্য, কাল ও-ও বলছিল এই কথা—যে বাইরে থেকে ওকে দেখে লোকে বিলাসিনীই ভাবে। আমি বললাম—তুমি বিলাসিনী নও উচ্চাশিনী। ব'লেই থেমে: কিন্তু সত্যি ও ভালো মেয়ে। বলেই বলল ওকে এলিওনোরার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা।

শাপিরো মৃদু স্বরে বলল: আহা, বেচারি! বলে একটু থেমে—

---

* তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, বন্ধু!

তবে সিন্তোরার একথা আমি মেনে নিতে পারছি না যে আত্মদান যৌবনেরই ধর্ম। এ-ধর্ম অতি অল্প লোকেরই। আর তাঁদেরই নাম মহৎ।

পল্লব একটু পরে বলল: শাপিরো, তোমাকে একটা কথা যদি খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি—উত্তর দেবে?

কী?

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: য়ুসুফ কী লিখেছে এলিওনোরা সব বলল না। তবে ভাবে মনে হ'ল—ব'লে থেমে একটু ইতস্তত ক'রে। মনে হ'ল—হয়ত আইরিন অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছে—ইতিমধ্যে কোনো রুষ যুবককে ভালো বেসে ফেলেছে ব'লে।

শাপিরো একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: এরকমটা হওয়া অসম্ভব আমি বলি না, কিন্তু—এক্ষেত্রে তা হয় নি ব'লেই আমার মনে হয়। কেন—বলব?

পল্লব উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। শাপিরো মৃদু হেসে বলে: ভাই, যে-মেয়ে একবার তোমাকে ভালেবেসেছে সে—মানে আর যাই পারুক না কেন, তোমার আশা নির্মূল না হ'লে আর কারুর দিকে ঝুঁকতে পারবে বলেও আমার মনে হয় না—ভালোবাসা তো দূরের কথা।

পল্লব বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে: ভাই, এ তোমার মনভোলানো কথা। আমার বরাবরই অবাক লেগেছে ভাবতে যে আইরিনের মতন মেয়ে কেমন ক'রে আমার মতন অজ্ঞাত-কুলশীলকে ভালোবাসল! ওর সঙ্গে আমি যতই মিশেছি ততই মনে হয়েছে আমি ওর অযোগ্য। তাই তো আমার মন আজ বলে যে ও শেষে টের পেয়েছে যে আমাকে বিবাহ ক'রে ও সুখী হতেই পারে না। নৈলে কেন আমাকে দূরে ঠেলবে বলো?

শাপিরো হাসে: ভাই, তোমার কথা শুনে সময়ে সময়ে কী যে ভালো লাগে কেমন ক'রে বোঝাব?

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে বলে: মানে?

মানে তোমার এই আশ্চর্য আত্মবিলোপের ক্ষমতা। তাই তুমি মনে করতে পারলে যে, আইরিনের মতন মেয়ের তুমি যোগ্য পাত্র নও। আইরিনকে আমি জানি না। তোমার কাছে যা শুনেছি তাতে আমার শুধু এইটুকু মনে হয়েছে যে ও সুন্দরী ও প্রাণোচ্ছলা। আমাদের দেশে এরকম মেয়ে খুব বিরল নয়। কিন্তু তুমি ভাই, নিজেকে জানো না আজো। আর জানো না ব'লেই এমন কথা বলতে পারো যে তুমি আইরিনের মতন মেয়ের ভালোবাসার যোগ্য নও। আর একথা তোমার মুখের কথা নয়—অন্তরের কথা ব'লেই তুমি এত বেশি ভালোবাসা পাও।

পল্লব অবাক হয়ে বলে: কী বলছ তুমি শাপিরো?

বলছি শুধু এই কথা ভাই, যে, যারা মনে করে তারা ভালোবাসার যোগ্য, তারাই সবচেয়ে কম পায় সত্যিকার ভালোবাসা—কী পুরুষের কী মেয়ের।

পল্লবের মন মুহূর্তে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, ওর হাতের প'রে সস্নেহ চাপ দিয়ে বলে হালকা সুরে: mille mercis, mon ami! কেবল একটু টুকব: তুমি কি জানো ভালোবাসা কা'কে বলে? তোমাকে দেখে আমার কেবলই মনে পড়ে আমার সেই বিপ্লবী বন্ধুর কথা—যে ঠিক তোমারই মতন জীবনকে সঁপে দিয়েছে একটি মাত্র লক্ষ্যের পায়ে। তার লক্ষ্য—দেশসেবা, তোমার লক্ষ্য কাজ আর কাজ, আর কাজ—যদিও—ব'লে একটু থেমে—কী যে সে কাজ জানি না আজো, তুমি তো বলবে না, জানব কেমন ক'রেই বা?

শাপিরো ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, পরে বলে: শুনবে তবে? বলব?

পল্লব খুশিভরা সুরে বলে: বলবে? সত্যি?

শাপিরো নরম সুরে বলে: বলব ভাবছিলাম কিছুদিন থেকেই। তবে তোমার মতন স্বভাব-সরল তো নই ভাই, তাই সাধ জাগলেও সাধ্য হয় না মনের দুয়ার খুলতে—সাত পাঁচ ভাবনা আসে। কিন্তু এখানে নয়, চলো আমার ঘরে। কেবল একটি কথা দিতে হবে—আজ আমি যা বলব তা এদেশের কাউকে বলতে পাবে না।

তাই হবে।

ওরা দুজনে উঠল তিনতলায়। শাপিরো ওকে বসতে ব'লেই দোর বন্ধ করে চাবি দিলো।

কুড়ি

পল্লব একটু আশ্চর্য হ'য়ে ঘরটির এদিক ওদিক চেয়ে দেখে। দেখবার প্রায় কিছুই নেই বললেই হয়: ছোট্ট ঘর—হোটেলে সবচেয়ে সস্তাঘর—যাকে বলে "গ্যারেট"। একটি ছোট খাট, একটি টেবিল, একটি লোহার তোরঙ্গ, দুটি চেয়ার, একটি বইয়ের শেল্ফ আর কোণে একটি তেপায়া টেবিলে একটি জল ঢালবার গামলা ও ঘড়া—ব্যস্। ওর মনে প'ড়ে যায় বিখ্যাত বিশ্বপ্রেমিক থোরোর ঘরের বর্ণনা। পল্লব আজ পর্যন্ত কোনো হোটেলে এমন রিক্ত ঘর দেখেনি। একটি আলনা পর্যন্ত নেই—আলমারি তো দূরের কথা।

শাপিরো হেসে বলল: আমার গরিব ঘরে তোমাকে আনলাম—কারণ এটি হ'ল তিনতলার কোণে একটি মাত্র ঘর—এখানে কথাবার্তা কইলে কেউ শুনতে পাবে না। বলেই থেমে: আশ্চর্য হচ্ছ হয়ত—কিন্তু কেন এভাবে আছি শুনলে—বুঝতে বেগ পেতে হবে না।

একটি সিগার ধরিয়ে শাপিরো বলল: তোমাকে আজ যা বলতে যাচ্ছি শুধু যে কখনো কাউকে বলিনি তাই নয়, ভাবিওনি যে কাউকে কোনো দিন খোলাখুলি বলবার এমন প্রবল ইচ্ছা হতে পারে আমার। বলে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে: তবে এ অঘটন ঘটল কেন—আমি জানি: তোমার সরলতার ছোঁয়াচে। অর্থাৎ মনের কথা যে অবাধে বলতে পারে সেই পারে অপরের মনের কথা টেনে বার করতে।

পল্লবের মন আনন্দে উজিয়ে ওঠে। শাপিরো বলে চলে: আমি প্রথম থেকেই এমন চাপা প্রকৃতির ছিলাম না। এক সময়ে হাসতাম তোমার মতনই খোলা হাসি, মনের কথা বলতাম তোমারি মতন—অনর্গল। বন্ধুত্ব পাতাতেও আমার জুড়ি ছিল না। কিন্তু—একটা বিষম ঘা খেয়ে আমার স্বভাব বদলে গেছে—যদিও প্রায়ই শোনা যায় মানুষের স্বভাব কখনো বদলায় না। যাক, এসব অবান্তর কথা। আজ সংক্ষেপে তোমাকে বলব আমার কথা—আর কোনো কারণে নয়, শুধু এইজন্যে যে তুমি সত্যিই শুনতে চাও আর তোমাকে আমি চিনেছি বন্ধু বলে। বলে পল্লবের দিকে দুটি হাতই বাড়িয়ে

দিল। পল্লব সানন্দে ওর হাত দুটি নিজের দু হাতের মধ্যে খানিক ধরে রেখে ছেড়ে দিল।

শাপিরো সিগারে টান দিয়ে সুরু করে: শোনো। আমার এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবনের উপর দিয়ে কত জলঝড় যে বয়ে গেছে তোমাকে একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব, যদিও পারব কি না জানি না।

কেন শাপিরো?

ভাই, মানুষ দিনে দিনে পলে পলে যত কিছু ঠেকে শিখেছে তার কতটুকুই বা দু-চার কথায় ব'লে প্রকাশ করতে পারে? যা হোক শোনো। সব কথা বলতে গেলে রাত কাবার হ'য়ে যাবে। তাই বলব যা সংক্ষেপে ব'লেও বোঝানো যায়। শোনো।

নিবন্ত সিগারটা ফের ধরিয়ে শাপিরো ব'লে চলে:

তোমাকে বলেছি আমার বাবা থেকেও নেই। আমাকে তিনি ত্যাজ্য পুত্র করেছেন।

ত্যাজ্য পুত্র?

হ্যাঁ, শোনো বলি। একটানাই ব'লে যাব এবার। ব'লে ফের থেমে: আমার বাবা ছিলেন মস্কোয় মস্ত নামকরা সার্জন। ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধের আগে তিনি প্রচুর টাকা করেন। যুদ্ধ বাধবার উপক্রম হ'তেই ষ্টকহলমের ব্যাঙ্কে তাঁর প্রায় সব টাকা পাঠিয়ে দেন ও তারপরেই পাছে তাঁকে যুদ্ধে যেতে হয় এই ভয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেন। ঠিক করেছিলেন, আমাদের পরে নিয়ে আসবেন, কিন্তু যুদ্ধের ডঙ্কা এত আচম্বিতে বেজে উঠল যে, আমার মা'র সঙ্গে আমি মস্কোতে আটক পড়ি—আরো এই জন্যে যে আমার বাবা পলাতক।

যুদ্ধের কয় বৎসর আমরা দারুণ অর্থকষ্টে পড়ি। আমার মা ছিলেন যেমন ধার্মিকা তেমনি স্বাবলম্বিনী। যুদ্ধের সময় এক ম্যুনিশন ফ্যাক্টরিতে কাজ নিয়ে আমাকে অতি কষ্টে মানুষ করেন। তাঁকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হ'ত। ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, যক্ষ্মারোগে তিনি মারা যান। তখন আমার বয়স পনের বৎসর।

মা'র মৃত্যুর পরে আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। বাপ থেকেও নেই, স্নেহময়ী মা-ও আমার জন্যেই খেটে খেটে অকাল মৃত্যু বরণ করলেন। মন আমার বিকল মতন হ'য়ে যায়। এক কাকা দয়া ক'রে আমাকে পোষ্যপুত্র নেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা ভালো ছিল না। কাজেই আমি অভাব অনটনের মধ্যেই মানুষ হই।

আঠারো বৎসর বয়সে আমাকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়। যুদ্ধে গিয়ে আমি প্রথম দেখতে পাই আমাদের সভ্যতার নিজমূর্তি। মা'র প্রভাবে আমি ক্যাথলিক ধর্মের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম, রোজ ভগবানকে ডাকতাম। কিন্তু আমার অমন মা যখন দারুণ রোগে অসহ্য যন্ত্রণায় তিল তিল ক'রে মারা গেলেন তখন আমি বিশ্বাস হারালাম। এই সময়ে এক বিখ্যাত বিপ্লবীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। এই নাস্তিক মহাবীরই আমার দীক্ষাগুরু।

তিনি কার্ল মার্ক্সের বাণী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন সরল ভাষায়। বললেন: মানুষ যা কিছু পেয়েছে লড়াই ক'রেই পেয়েছে—ভগবানকে ডেকে পায়নি। তিনি আমার তরুণ মনে বুনে দিলেন বিদ্রোহের বীজ। আমি রক্ত দিয়ে স্বাক্ষর ক'রে ভর্তি হলাম তাঁদের দলে। তিনি বললেন: ভগবান নেই বটে, কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে উচ্চাশা, প্রেম ও গঠননৈপুণ্য, মানুষের মুক্তি মিলতে পারে শুধু এই গুণ তিনটির বিকাশে। কিন্তু এদের মধ্যে প্রেমই সব চেয়ে বড় হ'লেও তাকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে প্রথমে চাই অন্যায়কে অন্যায় ব'লে চেনা ও তার বিরুদ্ধে প্রাণপাত ক'রে যুদ্ধ করা। তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন কয়েক জন বুদ্ধিমান ও নিষ্ঠুর মানুষ এ জগতের নায়ক। তারাই দরিদ্রের রক্ত শোষণ করছে। সব আগে চাই তাদের হাত থেকে রাজদণ্ড ছিনিয়ে নেওয়া। এ-জগতের সভ্যতা বলো, কালচার বলো, আর্ট বলো, সমাজ বলো—সবেরই খোরাক জোগাচ্ছে কোটি কোটি দরিদ্র কৃষাণ আর শ্রমিক। এরা দুর্বল, যে হেতু বিচ্ছিন্ন। এদের শিখিয়ে পড়িয়ে গ'ড়ে তুলতে হবে—দীক্ষিত করতে হবে সৌভ্রাত্র্যে। সে সৌভ্রাত্র্যের প্রতিষ্ঠা শুধু রুশ দেশে করলে চলবে না, চাই সব দেশের শ্রমিকদের ডাক দেওয়া: তোমরা ভাই ভাই, কাছে এসো পরস্পরের, দূর করো অত্যাচারীকে। ফরাসী বিপ্লবের তিনটি নীতি—স্বাধীনতা, সৌভ্রাত্র্য ও সাম্য—liberte, frarernite, egalife—বিশ্বব্যাপী হ'লে তবেই মানুষের মুক্তি। যে সর্বশক্তিমান্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ ভগবান্‌কে মানুষ নিছক ভয়ের তাগিদে গ'ড়ে তুলেছে—তাঁর কল্পিত করুণার কাছে হাত পাতে তারাই যারা অজ্ঞান—যারা জানে না যে আমাদের নিয়তি গড়বার ভার আমাদেরই—কোনো রহস্যময় আকাশ-পারের স্বেচ্ছাচারী বিশ্বরাজ নয়। তিনি নাস্তি। অস্তি কী? না, মানুষের নিজের বুদ্ধি, বিবেক ও গঠন প্রতিভা—সবার উপর—মানব-প্রেম। এ সবই তো তুমি জানো। তাই এ কথা থাক।

আমি দীক্ষিত হলাম এই নিরীশ্বর বিপ্লববাদের মন্ত্রে। পণ নিলাম—শ্রমিকদের জন্যেই জীবন দেব, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের গণ্ডি কাটিয়ে সমষ্টির মধ্যেই খুঁজব আত্মবিসর্জনের পরমানন্দ। আনন্দ বলছি লক্ষ্যকে নিশানা করে—কারণ এ-আনন্দে পৌঁছানোর পথে দুঃখ-কষ্টের অবধি নেই, কারণ অত্যাচারীরা সংঘবদ্ধ এবং তাদের হাতেই শক্তির পেষণযন্ত্র। আমরা—জগতের উৎপীড়িত ও নিরন্নের দল—les insultes et les miserables du monde—এই মুষ্টিমেয় কয়েক লক্ষ ধনিক ও মধ্যবিত্তের বিলাসের খোরাক জোগাতেই এ যাবৎ উদয়াস্ত খেটে প্রাণপাত করে এসেছি। এখন থেকে খাটব—শুধু কোটি কোটি উৎপীড়িতের জন্যে, নিরন্নের জন্যে, সর্বহারাদের জন্যে। এই মহাবাণীর ডাকে আমার বুকের রক্তে ডমরু বেজে উঠল: এই-ই তো জীবন—মানুষই সত্য—ভগবানের কাছে দরবার ক'রে মানুষ কবে বড় হয়েছে? খৃষ্টও দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন না, তাই বললেন: সীজারকে দাও তার প্রাপ্য। কিন্তু সীজারকে কর দেব কেন—যখন তার প্রাপ্য কানাকড়িও নয়? কেন রাজারা, অত্যাচারীরা নিরন্নের অর্জিত ধনধান্য কেড়ে নিয়ে বিলাসে ডুবে থাকবে—নিরন্নদেরকেই জোর ক'রে সেপাই ক'রে তাদের দিয়েই দাবিয়ে রাখবে বাকি নিরন্নদেরকে? এরই নাম তো দানবিকতা। বাইবেলের একটি কথা কেবল সত্য: ভগবান নেই বটে, কিন্তু শয়তান আছে। এ শয়তান হ'ল ধনিকদের সংঘ। তাই সব আগে এদের করতে হবে নিরস্ত্র, পরাভূত, পর্যুদস্ত।

তারপর সে কী কাণ্ড! মার মার রবে সর্বত্র বিদ্রোহের তাণ্ডব-লীলা জেগে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একদল গৃহশত্রু বিদ্রোহের নাম ক'রে ফিরিয়ে আনতে চাইল অত্যাচারীর প্রতিষ্ঠা। এরা হ'ল আরো বড় শত্রু—anti-revolutionary: ফলে আমাদের দেশে নিরাশা

গেল ছেয়ে। ঠিক এই সময়ে আমি পড়লাম একটি ধনী গৃহশত্রুর সোনিয়া ব'লে একটি মেয়ের প্রেমে। মন আমার দোটানায় পড়ে উঠল টলমল ক'রে: মোহ আর আদর্শ, সুলভ সুখ আর দুঃখের ডাক, সহজ পথের লোভ আর দুর্গম পথের বিভীষিকা। দুর্ভাবনায়, অশান্তিতে, অন্তর্দ্বন্দ্বে আমি অস্থির হ'য়ে উঠলাম।

ঠিক এই সময়ে সোনিয়ার বাপ গুলী চালালেন একদল নিরস্ত্র বিদ্রোহীর জনতার উপরে। দু' হাজার লোক মারা গেল। তাদের অপরাধ—তারা খেতে না পেয়ে চেয়েছিল অন্ন। এই অপরাধে তাদের দেওয়া হ'ল মৃত্যুদণ্ড। দেশময় হাহাকার জেগে উঠল। চারদিকে বিশৃঙ্খলা—কোথায় নেতা? কা'কে বিশ্বাস করবো?

শাপিরোর কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল: ঠিক এই সংকটলগ্নে নিরাশার কুয়াশা কেটে যেতে না যেতে দেখা গেল একটি অভ্রভেদী মাথা—মাত্র একটি, দুটি নয়। যে এল সুইজর্লণ্ড থেকে যেখানে বহু বৎসর সে যাপন করেছিল নির্বাসিতের বিপন্ন জীবন। সে হঠাৎ এসে তার আশ্চর্য প্রতিভাবলে সংঘবদ্ধ করল একদল নিপুণ বিদ্রোহীকে। সৈন্যদের নেতৃত্ব এরা রাতারাতি অধিকার করল দুর্বার তেজে, যে তেজ তারা পেয়েছিল ঐ অদ্বিতীয় মানুষটির অগ্নিসত্তার কাছ থেকে। এরা একতানে বলল—জগতের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে—যে দরিদ্রতম মানুষ যতদিন না মানুষের মতন বাঁচবার অধিকার পাবে ততদিন আমরা যুদ্ধ করব—সুখ, মান, সর্বস্ব, প্রাণ—সব যায় যাক তবু ভয়ে পেছুব না।

বলতে বলতে শাপিরোর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, বলল: প্রণাম খৃষ্টকে নয়, যিনি ছিলেন নাস্তির ধামাধরা, প্রণাম সেই মহামানবকে যিনি সর্বহারাদের মুক্তিদাতা, পরমবন্ধু।

পল্লব চমকে ওঠে: কে তিনি? লে—

শাপিরো গাঢ়স্বরে বলে: হাঁ পল, সে অমর প্রাণ—লেনিন। একা দাঁড়ালেন তিনি শুধু স্বদেশের রাজতন্ত্রের বিপক্ষে নয়, সারা জগতের সংঘবদ্ধ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন মেঘমন্দ্রস্বরে: যতদিন না প্রতিমানুষের, দীনতম মানুষের অন্নসংস্থান হয় ততদিন বিলাসীরা পাবে না পরমান্ন। জগত বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল। দানবিক শক্তিদের অনীকিনী কলচাক, র‍্যাঙ্গেল, য়ুডেনিচ প্রমুখ ধূর্তদের নেতৃত্বে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে এল এ-বজ্রকঠিন যোদ্ধা তথা কুসুমকোমল বিশ্বপ্রেমিককে ডুবিয়ে দিতে, কিন্তু একের পর এক তারা তাঁর প্রতিঘাতে পড়ল ব্যর্থ ঢেউয়ের মতনই ভেঙে—হাহাকার ক'রে। অত্যাচারের গর্জমান ঢেউ জয়ী হল না, জয়ী হ'ল মহত্ত্বের অটল নীরব পর্বতশিখর—একা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অকুতোভয়! বলো পল, এ-মহিমময় দৃশ্য কি মানুষ মিশরের কারাওদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কখনো দেখেছে? আমার জীবন সার্থক যে তাঁকে আমি চর্মচক্ষে দেখেছি: ঈশ্বরের সন্তান নয়—মানুষের বন্ধু, অত্যাচারীর পৃষ্ঠপোষক নয়—দরিদ্রের সহায়, দুর্গতের ভিক্ষাদাতা নয়—নিরন্নের সহযাত্রী, সারথি, পরম সুহৃৎ।

পল্লব সবিস্ময়ে বলল: তুমি কি তবে—

শাপিরো সগর্বে বলল: হাঁ পল, আমি বলশেভিক, লেনিনের পরিচারক। এখানকার একটি রুষ প্রতিষ্ঠানে কাজ করি। ইতালির শ্রমিকদের জাগানোই আমার ব্রত। কিন্তু গোপনে। বাইরে আমি এখানকার একটি কেরাণী মাত্র। বলে একটু থেমে: হাঁ বলতে ভুলেছি—যেদিন সোনিয়ার পিতা দরিদ্রদের উপর গুলী চালালেন সেদিন আমি তাকে গিয়ে বললাম আমার সঙ্গে আসতে—আমার পাশে দাঁড়াতে। সে ভয় পেয়ে আমার আংটি ফিরিয়ে দিল। বেদনায় আমি রাতের পর রাত ঘুমুতে পারিনি। এরই নাম ভদ্রনারীর বুর্জোয়া প্রেম! না পল, ব্যক্তিগত ছদ্মপ্রেম আমার জন্যে নয়। বলতে বলতে বেদনায় ওর স্বর গাঢ় হ'য়ে এল: সেদিন আমি মনের দুঃখে ক্ষোভে প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমি যদি কখনো বিবাহ করি—প্রেমের জন্যে করব না। যদি পাই কখনো এমন কোনো মেয়ে যে নিরন্নের মুখে অন্ন জোগাতে চেয়ে দুঃখ বরণ করতে রাজি, যে সবার জন্যে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা ছাড়তে উন্মুখ—এক কথায়, যে মানুষের মুক্তির জন্যে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত—তবে তাকেই দেব মালা। বঞ্চিত, ধূলিম্লান ও বুভুক্ষু মানুষই আমার কাছে ভগবান্, সমাজ, রাষ্ট্র—আর কোনো ভগবান, সমাজ, রাষ্ট্র আমি মানি না।

পল্লব তার নিজের হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পায়।

একুশ

এর পরে ওরা পরস্পরের আরো কাছে এসে পড়ল। রোজই সন্ধ্যাবেলা বেরুত বেড়াতে। ওদের গল্প আর যেন শেষ হ'তে চায় না। পল্লব ওর জীবনের একটা কথা বলে তো শাপিরো বলে তিনটে। পল্লব একদিন হেসে বলল: শাপিরো, যদি য়ুসুফ আজ তোমাকে দেখত তো বলত: এ তো সে শাপিরো নয়, তার মুখোশ প'রে আর একটা মানুষ।

শাপিরো হেসে বলল: বললে ভুল বলবে ভাই! কারণ একই মানুষের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ জড়াজড়ি ক'রে গায়ে গায়ে বাস করে—যা খেলেই কখনো এটা উপরে আসে কখনো বা ওটা। এই-ই মনস্তাত্ত্বিক সত্য।—আর সেই জন্যেই না মানুষ চেনা এত শক্ত। যাকে দশ বছর ধ'রে দেখছি ক, তাকে হয়ত তারপরে পাঁচ বছর দেখব খ, তার পরের তিন বছর গ এই ভাবে। কিম্বা উপমা দেওয়া যেতে পারে—পাপড়ি মেলা। একটা পাঁপড়ি মেললে ফুলের এক চেহারা, দুটো মেললে আর এক রকম, তিনটে মেললে আবার আর এক রকম। কিন্তু এ সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় একদিনে নয়, বহুদিন লাগে ঠেকে শিখতে। আর তাই তো বিজ্ঞ বিচক্ষণ বলি শুধু তাকেই যে বহুদর্শী—অন্যভাষায়, যে অনেক পোড় খেয়ে পোক্ত হয়ে উঠেছে। বলে ফের একটা সিগার ধরিয়ে: আমার নিজের জীবনেরই একটা দৃষ্টান্ত একথার ভাষ্য হিসেবে পেশ করি শোনো।

বলে সিগারে টান দিয়ে সুরু করল: আমি তখন লেনিনের সৈন্যদলে। হঠাৎ আবার একটি যুদ্ধে আমি কলচাকের হাতে বন্দী হই। সেদিন রাত্রে আমার ও আমার প্রায় দশ বার জন সহচরের একটা অন্ধকার কারাগারে কাটল। পরদিন সকালবেলা শুনলাম যে আমাদের সকলকেই বধ করা হবে—কেন না, কলচাক মহাপ্রভুর হাতে বন্দীদের খেতে দেবার মতন যথেষ্ট রসদ নেই।

সেদিনকার সন্ধ্যাবেলা বোধ হয় আমার জীবনের ইতিহাসের পাতায় বরাবর রক্ত-অক্ষরে লেখা থাকবে। একে একে আমার তিন

তিনটি বন্ধুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল। বধ্যভূমিটি আমাদের হাজত থেকে এক শত হাতও হবে না। বন্দুকের আওয়াজ ও তাদের অন্তিম আর্তনাদ পর পর কানে আসতে লাগল। আমারও ডাক এল বলে। নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন এ পৃথিবীকে শেষ বিদায়বাণী শোনাবার লগ্ন আসে!

পল্লব শিউরে ওঠে। শাপিরো ব'লে চলে: ডাক এল যথাসময়ে, যেমন চিরকাল আসে। আমার পায়ের বেড়ি খুলে নিয়ে দুধারে দুজন শান্ত্রী আমাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলল।

হঠাৎ আমার মনে বিষম ভয় কেঁপে উঠল—যে, এখনই মরতে হবে! জীবনে কখনও আমি মরবার ভয়ে এ রকম ভীত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রাণে আমার কখনও কেউ মমতা দেখেনি। বাবা-মা ছেলেবেলা থেকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতেন পাছে আমি পাহাড় পর্বত জাহাজ ষ্টীমার থেকে লাফ মারি, কি বনে জঙ্গলে যাই হারিয়ে। পাড়া পড়শিরা আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করত: একটা অশান্ত ভূত ঢুকেছে মানুষের খোলে। এ-হেন আমি বেশ মনে পড়ে—সেদিন ঘাতক সৈনিকদের বন্দুকে টোটা পুরতে দেখতে না দেখতে ভয়ে চোখে অন্ধকার দেখলাম। প্রাণ আকুলি বিকুলি ক'রে উঠল।

তার পর?

হঠাৎ না ভেবে চিন্তে দিলাম ছুট। আমার দুপাশে দুজন শান্ত্রী গাছের গুঁড়িতে বন্দুক হেলান দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল। আমাকে ছুটতে দেখে তারা যেন চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। কাজেই আমি একটু ষ্টার্ট পেয়ে গেলাম। তার পরই সোরগোল: ধর্ ধর্ ধর্। কিন্তু ততক্ষণে আমি তিনশো হাত দূরে!

ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে তবে বোধ হয় এই সংকটলগ্নে তিনি আমার সব চেয়ে কাছে এসেছিলেন। হ'ল কি, ঘাতক সৈনিকদের বন্দুক উঁচু করে ধরে থাকাই সার হ'ল—ছুঁড়তে পারল না। কারণ তাদের সামনে ধাওয়া করেছে পাঁচ-সাত জন শান্ত্রী আমাকে ধরতে। ছুঁড়লে তাদের গায়ে লাগার সম্ভাবনাই বেশি তো। কাজেই এই দুর্দিনে শত্রুই হয়ে দাঁড়াল আমার পরম মিত্র—বর্ম যাকে বলে। তবু দুজন ঐ ফাঁকে গুলী ছুঁড়েছিল। শুধু একটা গুলী আমার পকেট কেটে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

তারপর?

তার পর আমার আর কিছুই মনে নেই, আমি পাগলের মতন ছুটতে লাগলাম সব ভুলে। হ্যাঁ, কেবল একটা কথা মনে আছে, স্কুল-কলেজে দৌড়োনোয় আমি বরাবর প্রথম হতাম। আমার হঠাৎ মনে হ'ল যেন আমি সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছি।

তারপর?

বললাম না—ভাগ্যদেবতা জীবনে সেই একটিবারই আমার সবচেয়ে কাছে এসেছিলেন? নৈলে কি আমি না জেনে বলশেভিক সৈন্যদলের দিকেই মুখ ক'রে ছুটি? ঘণ্টাখানেক ছুটেই তাদের লাইনে পৌঁছে গেলাম।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: আচ্ছা তোমার বাবা তোমাকে আর ডাকেন নি?

শাপিরোর মুখ ম্লান হ'য়ে আসে হঠাৎ: ডেকেছিলেন ভাই! আর শুধু ঐ ব্যথাটাই আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি আজো। কারণ—এ আমার এক বিচিত্র গতি আমাদের হৃদয়ের—আমি সোনিয়াকে ভুলতে পারলাম এক বৎসরের মধ্যে—যাকে এক সময়ে দুদিন না দেখলে চোখে অন্ধকার দেখতাম—কিন্তু আমার বাবাকে ভুলতে পারি নি আজো—তিনি আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হওয়া সত্ত্বেও।

পল্লব চমকে ওঠে: শত্রু?

নয়? যে বলে লেনিন মহাদানব, বলশেভিকরা নরকের সামন্ত, কম্যুনিসম মানে শয়তানের রাজ্য? বাবা আজ ষ্টকহলমে পলাতক হোয়াইট রাশিয়ানদের নায়ক, বাস করেন মস্ত বাগানওয়ালা প্রাসাদে। কিন্তু তাঁরও ঐ এক দুর্বলতা: তিনি বন্ধুবান্ধব স্ত্রী সব ছেড়ে বিদেশে থাকতে পারলেন, কেবল তাঁর বিদ্রোহী উন্মাদ দিগ্‌ভ্রান্ত কুলতিলককে আজো ভুলতে পারেন নি। তিনি কাপুরুষ ও বিলাসী, কিন্তু আমাকে তিনি আজো ভালোবাসেন—ফিরে চান তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিরূপে। অথচ তাঁর কিসের অভাব বলো? কেন চান আমাকে—যাকে তিনি মনে করেন বিধর্মী উন্মার্গগামী, দানববাহিনীর পদাতিক? আমরা পরস্পরকে অভিশাপ দিই হয়ত প্রতিদিন সাঁঝ-সকালে। কিন্তু তবু তিনি আমাকে ডাকেন ফিরে ফিরে আর আমি যেতে চাই—কিন্তু যাব কোন্ মুখে বলো—যে বাপ—ব'লে শাপিরো দুহাতে মুখ ঢাকে। [ক্রমশঃ।

বিশ্রাম

(Mathew Arnold রচিত Requiescat হইতে)

গোলাপ শুধু গোলাপ দিয়ে শয্যা সাজাও তার
শোকের চিহ্ন নাই বা দিলে তায়,
কি শান্তিতে ঘুমায় দেখো, জাগবে না সে আর,
আমি যদি অমন হতেম হায়!

সবার দাবী মিটাতে তো হাস্‌লো জীবনভোর
হরষধারায় করিয়ে গেল স্নান,
এত দিনে এ সংসারে মিললো ছুটি ওর,
ক্লান্ত বড় ক্লান্ত এখন প্রাণ।

তপ্ত উষর, শব্দমুখর, পথের কাঁকর'পরে,
ঘুরে ঘুরে গেছে জীবনচাকা,
হৃদয় তবু আকুল ছিল, শান্ত ঘুমের তরে,
সে শান্তি আজ নীরবে দিক্ দেখা।

দেহের খাঁচায় বন্দী পরাণ নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
ঝাপটে পাখা ছিল পাগলপারা,
আজ সে পাখী মুক্তি পেল, মরণ-মহাকাশে,
কোন অসীমে কোথায় হল হারা!

অনুবাদিকা:—সবিতা রায়চৌধুরী

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪৭। মহাসর্পের তখন মহা-ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মন। বোধ করি ভগবৎ-প্রবেশের অপেক্ষায়, বোধ করি বা নিজের ক্ষয়ের অনিবার্য্যতায় তিনি সংবৃত করলেন না নিজের বদন।

৪৮। শ্রীভগবান যখন তাঁর মুখবিবরে প্রবেশ করেছেন তখন নিজেকে বিশেষ কৃতার্থ বলে মনে করলেন মহাসর্প। গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল তাঁর কর্ম ও প্রজ্ঞা। শম্বরাসুরের মায়াবিদ্যা তিনি জানেন। তাই অধীর হয়ে, সঙ্কুচিত করতে গেলেন বদন। কিন্তু পারলেন না, এতটুকুও না।

৪৯। শ্রীভগবানের যে ভাবটিরই প্রয়োজন করা হোক না কেন, সে ভাব কখনও উপযোগী হয় না অভাবের। তাই যে মুখখানিকে একবার ব্যাদান করে মহাসর্প গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণকে, সেই মুখের হাঁ-টি তিনি আর বন্ধ করতে পারলেন না।

৫০। গলার মধ্যে কীলকের মত দাঁড়িয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নিজ্বালার মত তাঁর তেজ, দহন করতে লাগল অঘাসুরকে। তার পরে যাতে অসুরের সুনিশ্চিত মৃত্যু ঘটে সেই প্রক্রিয়ায় নিজেকে স্ফীত ও বর্দ্ধিত করতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ।

লীলাকিশোর শ্রীভগবান নিখিল কলাবিদ্যায় যিনি সৌভাগ্যবান, যতিদের হৃদয়ে প্রবেশ করতেও যিনি ঘৃণা বোধ করেন তিনি তখন তাঁর করুণারুণ অপাঙ্গের তরঙ্গ-স্খলিত অমৃতধারায় একদিকে যেমন সঞ্জীবিত করলেন তাঁর সহচরদের, অন্যদিকে তেমনি বিপুল হয়ে উঠলেন অঘাসুরের অভ্যন্তরে। মহামস্তিষময় অঘাসুর বিদীর্ণ হয়ে গেলেন; পাকা কাঁকুড়ের মত।

৫১। দেবশত্রুর দেহ বিদীর্ণ হতেই ব্রহ্মা শিব ও শতক্রতু সপ্তমুখর হয়ে উঠলেন বনমালীর জগৎ-পাবন স্তুতিগানে। কারণ, অঘাসুরের তেজঃ তখন শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছে। সূর্য বা চন্দ্রের মতই মহোজ্জ্বল সে তেজঃ। হঠাৎ দেখা গেল সেই তেজঃ গগন-সরোবর পার হতে হতে নিরালম্বের মত ভাসছে।

৫২। আর এদিকে মহাসর্পের বিরাট ফণার সে কী মৃত্যুচাঞ্চল্য! লুটিয়ে পড়তেই ফণা-গহ্বর থেকে বেরিয়ে এলেন বনমালী। উদয়গিরির গহ্বর ছেড়ে এ যেন গভস্তিমালীর নিষ্ক্রমণ। এবং আশ্চর্য, ইত্যবসরে কখন যেন ব্রজবালকেরাও প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, এবং তাঁদের জীবিতেশ্বরের পূর্বেই বেরিয়ে এসেছেন ফণা-গহ্বর থেকে।

৫৩। ভূতেশাদি-বন্দিত-চরণ বনমালী যখন বহিরাগত হলেন, তখন অঘাসুরের সেই তেজঃ সুরাসুরদের বিস্ময়বিমূঢ় করে দিয়ে, তাঁদের নয়ন সম্মুখেই লয় হয়ে গেল, নবমেঘমেদুর শ্রীকৃষ্ণে। যে অসুর প্রথমে নিজের অভ্যন্তরে নিয়ে এসেছিলেন ভগবানকে, তিনিই শেষে নিজে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন সেই ভগবানেই; অঘাসুরের এই কীর্ত্তিরসের মহান্ অনুভাব-তথ্য সত্যই বর্ণনাতীত!

আর সেই লয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাকায় বেজে উঠল ভেরী, পটহে পটহে বেজে উঠল ঘোর ঘনাঘাতের তুমুল ধ্বনি; উচ্চণ্ড বেজে উঠল ডিণ্ডিমের ডিম্ ডিম্। মহাধুমে বাজতে লাগল দুন্দুভি।

গান গেয়ে উঠলেন গন্ধর্ব-বিদ্যাধর ও অশ্বমুখ-প্রেয়সীরা; স্তো্ত্র পাঠ করতে লাগলেন মুনিজনেরা; শব্দের ওজস্বিতায় ক্ষণকালের জন্য যেন বধির হয়ে গেলেন স্বর্গের অমরেরা।

উর্বশী ইত্যাদি স্বর্গের অপ্সরাগণ নেচে উঠলেন। মৃদঙ্গে বোল তুললেন সিদ্ধবধূরা। সুন্দর ভুরু বাঁকিয়ে মধুরে গেয়ে উঠলেন কিন্নরপ্রিয়ারা। দেবাঙ্গনারা দুহাতে ঝরাতে লাগলেন দেবদ্রুমের কুসুম। সে এক বিপুল আহ্লাদে মাতাল হয়ে উঠল যেন অমর-নগরী।

বেশী কী, চন্দ্রশেখরেরও চাঁদ থেকে ঝরে পড়ল অমৃত। অমৃতের রসে আপ্লুত হয়ে শরীরী হল মুণ্ডমালা। তখন কী তাদের নৃত্য! কী তাদের নটন-পটুতা! নৃত্যের ঘূর্ণীর মধ্যে ডিমিডিমি বেজে উঠল ডমরু, অট্ট-অট্ট রোল উঠল অট্টহাসির। শব্দের সংস্কার-সারে যেন ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড বিদীর্ণ করে পরমানন্দে তাণ্ডবে মেতে উঠলেন চণ্ডিকেশ।

৫৪। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন এই রকমের একটি অনুভূতি নিয়ে ব্রজবালকেরা তারপর দেখতে পেলেন তাঁদের নীতি-নন্দিত-ভুবন সুকুমার ব্রজরাজকুমারকে; কী সুন্দর তাঁর নয়ন, যেন পদ্মের পাপড়ি খুলছে শিশু-রোদ্দুর! সুখে বিবশ হয়ে গেলেন তাঁরা। একে একে ভগবানকে আলিঙ্গন করে বললেন—

সখা, খেলতে খেলতে বিষম বিষের ভীষণ হল্‌কায় আমরা তো লেহ্য হয়ে গিয়েছিলুম। তা আপনি কেমন করে আমাদের বাঁচালেন?

শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের চমৎকৃত করে দিয়ে বললেন—আমি যে' বিষের ওষুধ জানি। এই ওষুধে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সাপ, আবার এই ওষুধের এতটুকুও গন্ধ পেলে প্রাণহারা প্রাণ পায়। অনুভব করে মধুপানোৎসবের মহোল্লাস।

৫৫। কৃষ্ণের মুখের আনন্দিত ভাষা উৎকর্ণ হয়ে সকলে শুনলেন পরম সৌহার্দ্যে, আচ্ছন্ন হয়ে গেল হিয়া। এ ওঁকে, উনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করতে করতে বললেন—

ভাই সব, আমরাও দৈবজ্ঞ, তখনি তো বলেছিলুম, বকাসুরের মত এ বেটাকেও বধ করবেন আমাদের সখা।

সৌভাগ্যশালী ব্রজবালকদের মন। এবার তাঁরা লোকোত্তরচরিত ভগবানের আদেশে যূথবদ্ধ করলেন বাছুরদের। সুন্দর হরিণদের মত এতক্ষণ সেগুলি এদিকে ওদিকে নাচা-কোঁদা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপরেই ব্রজবালকদের নজর পড়ল তাঁদের বাঁকগুলির প্রতি। চোখ কপালে তুলে দেখলেন ব্রজরাজমহিষীদত্ত ভোজ্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই বাঁকগুলিকে রক্ষা করছেন পক্ষিস্ত্রীরা সদলে। হাসতে হাসতে বাঁকগুলিকে খুলে নিয়ে তাঁরা অনুসরণ করলেন ভগবানের।

৫৬। অনন্ত রহস্য করুণাসুন্দর কনকাম্বর নন্দকিশোর তখন বাছুর ও রাখালদের নিয়ে, বয়স্যদের সঙ্গে খেলতে খেলতে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন নির্জন বনভোজনের একটি উপযুক্ত স্থান। কিছু দূরেই চোখে পড়ল—সরোবর, এবং তার সরস পুলিন পবিসর।

৫৭। দেখেই বলে উঠলেন—

আ হা হা, কী সুন্দর স্থান, একটি পাখীও এখানে চরে না—চোখ জুলিয়ে দিয়েছে! মায়ের কোলের মত আনন্দ দিচ্ছে এই পুলিন-পদবী। ভাই সব, ভয়ের কিছুই তো দেখছিনে এখানে। পায়েরজলা

পথও বিরল। এইখানেই আমাদের ভোজনের আয়োজন করা যাক। কাছাকাছি বাছুরেরা চরুক আর আমরাও বনভোজন করি।

৫৮। হাসতে হাসতে একসঙ্গে সকলে সায় দিলেন—হ্যাঁ, তাই হোক। আর আমাদেরও তর সইছে না সখা, বেজায় ক্ষিদে।

শ্রীকৃষ্ণও তখনি তাঁর অপার মহিমায় আদেশ দিলেন—এইখানেই তবে ভোজনস্থল রচনা করা হউক।

গাছের ঘন ছায়ায় কর্পূর-ধূলিধবল দীর্ঘ পুলিনখানি হেসে রয়েছে লেশমাত্র প্রয়োজন নেই লেপনের। বাতাসে উড়ে আসছে পদ্মসরোবরের মাননীয়া জলকণা, ভেসে আসছে কহলারের কমনীয় গন্ধ। পুলিনের মাঝখানটিতে শ্রীকৃষ্ণ এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই ব্রজবালকেরাও তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মন তাঁদের আর এখন চঞ্চল নয়।

৫৯। পদ্মের সহস্র পাপড়ির মত একটি সুপরিচ্ছন্ন মণ্ডল রচনা করে তাঁরা দাঁড়ালেন। কে যেন জল দিয়ে কে যেন ধুয়ে দিয়ে গেছে পুলিনের জঠরদেশ। আর সেই মণ্ডলের মধ্যস্থলে কিঞ্জল্কাবৃত বীজকোষের মত বিরাজ করতে লাগলেন কনককুচি রুচিরাম্বর শ্রীভগবান।

৬০। এই সদ্ভাবের সন্নিবেশে পদ্মের পাপড়িগুলিতে যেন সৃষ্টি হয়ে গেল বলয়াকৃতি তিন-চারটি রঙের কয়েকটি সারি। সারিগুলির মধ্যে ব্যবধান থাকলেও প্রণয়ের অচ্ছিন্নবোধে সেগুলি যেন অবহিত। শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল প্রত্যেকের অভিমুখিন: তাই শ্রীকৃষ্ণই যেন প্রত্যেকের মধ্যেই অভিমান এনে দিলেন…"মমৈবায়মভিমুখমুখ:" (গী:। ১৩।১৩)। এবং নিজেও তখন "সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্"—ইতি প্রাচীন বাক্যাম্বয়ের অভিনয় করতে করতে সহর্ষে বলে উঠলেন—

সোনার চাকতির মত আপনারা তো সকলেই চমকাচ্ছেন, এবার তাহলে ভাল ভাল খাবারগুলিকে দয়া করে বের করে ফেলুন।

বাঁকগুলি থেকে খাদ্যভার নামিয়ে নিয়ে কেউ তখন সেগুলিকে সাজিয়ে রাখলেন পরিচ্ছন্ন চাদরের উপর, কেউ রাখলেন ফুলের পাপড়িতে, কেউ চকচকে দড়ির গোছার উপর, কেউ তোড়ার বিনোটে, কেউ তকতকে পাথরে, কেউ লতার নির্মলতায়। শুভ রেখাঙ্কিত হাতের পাতা, উত্তরীয়ের আঁচলা, উরুদেশের উপর পিঠ, সব কিছুই যেন তাঁদের খাবার রাখার থালা হয়ে দাঁড়াল। তারপরে নিজের নিজের খাবার থেকে সেরা খাবারটি বেছে নিয়ে পাতার ঠোঙায় সাজিয়ে তাঁরা নিবেদন করে দিলেন প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণায় প্রথমেই।

৬১। ভোজন-বাসরে শ্রীকৃষ্ণের সে কী হাসি, আর হাসানোর ঢঙ। শাঁসালো কত সব মিষ্টি মিষ্টি বুলি। সুধার সু-ধারায় যেন ধুয়ে যেতে লাগল তাঁর দশন ও বসন। তার পরে পরমকৌতুকী নিজের ছোট্ট পেটটির উপর কষির নিকটে মুরলীটি তাঁর রাখলেন। সুলক্ষণ বগলটিতে বিন্যস্ত করলেন বেত্র ও বিষাণ, ক'রে, পরমসুন্দর বাম করতলে গ্রহণ করলেন—এক গ্রাস দই-ভাতের মণ্ড। করেই, তিনি এমন একটি বিশেষ সুন্দর ঢঙে সেই বাঁ হাতেরই আঙুলগুলিকে নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে তুলে নিলেন করমচার আচার, যেস্বর্গে বসেও হেসে ফেললেন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ, এমন কি অমরনগরের নাগরীরাও।

খেতে খেতে ব্রজবালকদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল বাজি ধরা। কোন্ খাবার বেশী ভাল। শেষে দেখা গেল, যে যার নিজের নিজের খাবারটিরই মাধুর্য্য-বর্ণনায় সহস্রমুখ হয়ে উঠেছেন, আর হো: হো: করে হাসছেন। সরল প্রাণের সরল হাসি হাসাল ভগবানকেও। একমুখ মিষ্টি হাসি হেসে তিনিও ডান হাত চালিয়ে দিলেন। খেতে খেতে কথার পিঠে কথা কইতে কইতে যখন অতি মর্মপ্রিয় হয়ে উঠছেন সকলের, তখন—

৬২। ঠিক সেই সময়ে, অঘাসুর বধের বৈভব দেখে এবং কল্যাণ ও দাক্ষিণ্যগুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও, বিস্মিত ব্রহ্মার হৃদয়ে জাগল মদাভিমান। সহস্র সহস্র পরমেশ্বরেরও যিনি পরমেশ্বর, তাঁরই ঐশ্বর্য্য পরীক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠলেন তিনি।

৬৩। সমুদ্রের জল কত, খবরটি জানতে হলে সমুদ্রের সীমানায় দাঁড়িয়ে কেউ কি কখনও একগাছি সাত বিঘৎ লাঠি ব্যবহার করে? আকাশের পরিমাণ কত মাপতে হলে কেউ কি কখনও ওজন-দড়ি ব্যবহার করে? না। যার এমন মোহ ঘটে তাকে হাস্যাস্পদ হতে হয়। ব্রহ্মারও হল তাই।

৬৪। তিনি মায়াবলে ভগবানের বাছুরগুলিকে অপহরণ করলেন।

জলাধার বটে দুটিই, কিন্তু কূয়ো আর সাগর কি একই বস্তু? না। জ্যোতির্ময় বটে দুটিই, কিন্তু জোনাকী ও সূর্য কি একই পদার্থ? না। আঁধার ঘটায় দুটিই, তাই বলে রাত্রি ও রাহু কি এক? না। তাই মদোন্মত্তের মত পিতামহ ব্রহ্মাও বুঝতে পারলেন না নিজের ও শ্রীভগবানের মায়াবিদ্যের সামান্য বিশেষ ভাব।

৬৫। ব্রহ্মা যখন বাছুরদের অপহরণ করেন রাখালেরা তখন ভগবানের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করছিলেন সানন্দে। উজ্জ্বল হাসির মাধ্যমে যেখানে চতুর্দ্দিকে উঠছে এত কথার এত মিষ্টি কথার এত উপকথার রূপকথার ফোয়ারা, সেখানে কি কারো মনে থাকে বাছুরদের কথা? ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ভুলেও গিয়েছিলেন রাখালেরা। কিন্তু হঠাৎ তাঁদের মস্তিষ্কে জেগে উঠল বৎসস্মৃতি! তাঁরা তাকালেন মাঠের দিকে—যেখানে চরছিল বাছুরের দল। একটিও নেই।

৬৬। কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তাঁরা বলে উঠলেন—কৃষ্ণ, সখা! মহাবিপদ হল, একটিও বাছুর দেখা যাচ্ছে না! নতুন ঘাসের লোভে লাফাতে লাফাতে দূরে কোথাও চলে গেল না তো? খুঁজে ফিরিয়ে আনতে এখনি আমাদের দৌড়তে হয়।

কথা নয়ত, যেন নালিশ। মুচকি মুচকি হেসে চন্দ্রবদনে তৃপ্তির গ্রাস তুলতে তুলতে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

৬৭। শুনুন শুনুন, আপনারা এইখানেই থাকুন। আমিই যাচ্ছি খুঁজতে।' বলেই আর এক খামচা খাবার বাঁ হাতে তুলে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লেন অতিবলী। বগলদাবায় বেত্র-বিষাণ নিয়ে কোমরের কাপড়ের ফাঁসে বেণুটিকে সেঁদিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাছুরদের সন্ধানে।

৬৮। দেশোচিত বেশে শ্রীকৃষ্ণ চষে ফেললেন বনপ্রদেশ। শ্রীঅঙ্গের পরমালোকে আলোকিত হয়ে উঠল বনভূমি কিন্তু কোথাও তাঁর চোখে পড়লো না খরখরে খুরের এতটুকুও একটি চিহ্ন। তার বদলে তিনি দেখলেন—অবজ্ঞাগ্রস্ত তৃণাঙ্কুরে শ্যামল হয়ে রয়েছে বনতল চতুর্দিকেই। নাঃ, এ পথে বাছুরেরা তাহলে চলেনি—স্থির করে নিয়ে

সেখান থেকে কৃষ্ণ ফিরলেন। অপরিমেয় যাঁর ধীশক্তি তিনিও তাহলে অধীর হন!

কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে কি অনন্ত-রমণীয়া মায়ার আনুকূল্যে,—বাছুরচুরি রাখালচুরি দুইই হল? ভেবেই চোখ ফিরিয়ে দেখলেন,—তাঁর সহচরেরাও নেই! অথচ তিনি নিজে অনুভব করলেন অক্ষত রয়েছে তাঁর আত্মবল। শান্ত হল তাঁর সন্দেহ। সুনিশ্চিত হলেন, পরমেষ্ঠীরই এই কাজ।

এবং তৎক্ষণাৎ সন্ত সন্ত, তিনিই হয়ে গেলেন, বাছুরের পাল, রাখালবালকের দল, মুরলী বাঁক বিষাণ, মালা, ভূষা, পাঁচনবাড়ী সমস্ত যাঁর যেমনটি গুণ বর্ণ রূপ বয়স, যেমনটি স্বর প্রজ্ঞাভাব নাম কীর্ত্তি সমস্তই। তিনিই হলেন সব।

৬৯। আনন্দাত্মক ও চিদাত্মক করে এই সমস্তেরই সম্পাদনা করেছিলেন তিনিই স্বয়ং। শুদ্ধ হলেও অখিলকার্য্যজাত, কারণ থেকে কখনও ভিন্ন হয় না। তবুও এক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ ভাবের অভ্যুদয় হওয়াতেই তাদের লীলোপাধি ভিন্ন হয়ে গেল। অতএব এই নিসর্গোত্তম বিরাট সৃষ্টিটি অনির্বচনীয় ভাবে অদ্ভুত হয়েই দাঁড়াল।

শ্রীভগবানের আত্মবাহুল্য যখন ধারণ করল তত্তদ্ ভাবাপন্ন গোপকুমারদের এবং বাছুরদের আকৃতি, তখন তিনি সেই গোপ-কুমারদের দিয়েই একত্রিত করলেন সেই বাছুরদের, এবং দিবাবসানে বনের আশ্রয় ত্যাগ করে বাছুরদের গোহালে নিয়ে যেতে হবে এই অছিলায় নিজের অবিকৃত আত্মার প্রয়োজনায় বারংবার বাজিয়ে দিলেন তাঁর বেণু।

৭০। মনোমন্থন বেণুধ্বনি! শুনতে পেয়েই শ্রীভগবানের আত্ম-ভূত সমস্ত সহচর সারা পৃথিবী মাৎ করে বাজিয়ে দিলেন তাঁদের পাতার ভেঁপু বেণু বিষাণ শৃঙ্গ। মনের উল্লাসে চতুর্দ্দিক থেকে একত্রিত করলেন আত্মভূত সমস্ত বাছুর। তারপরে অন্যদিনের মতই প্রবেশ করলেন ব্রজে।

৭১। তাঁদের ঘরে নিতে এসেছিলেন মায়েরা। নিজের ছেলে ফেলে, পূর্ব্বেও তাঁরা দেখতে ভালবাসতেন শ্রীকৃষ্ণকেই, আজ কিন্তু তাঁরা নিজের ছেলের মাধ্যমেই লাভ করে বসলেন কৃষ্ণ-সাধারণ প্রেম। প্রতি-চমৎকারিতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁদের মন। মন ভরে নামল নির্বৃতি।

৭২। এবং সুবলাদির মত অন্যান্য বালকেরাও দেখতে দেখতে পূর্বপূর্ববৎ, মায়েদের দিয়েই স্নান ইত্যাদির কাজগুলি সারিয়ে নিয়ে প্রীত করে ফেললেন তাঁদের মন। এখানে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যেহেতু কৃষ্ণাত্মক এরা সকলেই অনন্ত উপতাপ শান্তিকারী সেই হেতু এঁরা কেউই রটিয়ে দিলেন না পাপহারী ভগবানের সেদিনের সেই কীর্ত্তি।

৭৩। অন্যদিনের মতই কৃষ্ণাত্মক বাছুরেরাও ফিরে গেল তাদের মায়েদের কাছে। বাছুরজননীদেরও হৃদয় অপূর্ব সন্তোষে গলে গেল। বাছুরদের অভিভূত করে, অসীম করুণায় তাঁরা চাটতে লাগলেন তাদের গা। অপরিসীম আনন্দে দুধ খেল বাছুরেরা। তারপর কণ্ঠে একটি ঘরর ঘর ঘরর ঘর তৃপ্তির স্বর তুলে মায়েদের কোলের মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সুখে।

৭৪। শ্রীকৃষ্ণও নিজের ঘরে ফিরলেন। বাল্যখেলার বিবরণ দিতে, গোকুলেন্দ্রের কাছে যখন গেলেন তখন পিতৃদেব দু হাত দিয়ে সোজা বুকের উপর উঠিয়ে নিলেন ছেলেকে। বুকে বাঁধলেন স্নেহের অতি নিবিড় বাঁধনে। পদ্মের মত কী নরম নরম ছেলের মুখ! পাছে দাড়ি লেগে ছড়ে যায়, তাই অতি সাবধানে গালের উপরে রাখলেন ছেলের গাল। তারপর কৃষ্ণের মাথা থেকে উষ্ণীষটি নামিয়ে নিয়ে আঘ্রাণ করলেন তাঁর শির। জলে ভাসতে লাগল দু নয়ন। তবুও তৃপ্তি নেই। তারপরে যেন মহিষীর তৃপ্তির জন্যেই তাঁকে মুক্তি দিতে হল তাঁর ছেলেকে।

৭৫। আর কৃষ্ণের জননী অতুল বাৎসল্যরসের যিনি অদ্বিতীয়া পতাকাস্বরূপিণী তিনি কেবল দাঁড়িয়ে বাণীহীন আনন্দে দেখলেন সেই দৃশ্য। তারপরে মা যশোদা কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে ঝেড়ে তুলে ফেললেন গোখুর ধূলি। ততঃপর যখন তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে চন্দন মাখালেন, তখন এত নির্মল, এত ঝকঝকে হয়ে উঠল শ্রীকৃষ্ণের লাবণি যে তিনিই যেন একখানি বিগ্রহ হয়ে দাঁড়ালেন জননীর বাৎসল্য-সারের।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ আহার করলেন, পা ধুলেন, বুকে হার দোলালেন, কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খেলায় কাটালেন, সর্ব্বশেষে শুয়ে পড়লেন পরার্ধমূল্যের পালঙ্কের শুভ্রতায়। ভোর করে দিলেন রাত।

৭৬। পরদিন সূর্য্যও উঠল তো শ্রীকৃষ্ণও উঠলেন। বনমালা গলায় দুলিয়ে বনগমনের উদ্যোগ করছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর আত্মভূত সহচরেরাও হুল্লোড় করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত। জননীরা তাঁদের খাইয়ে-পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের আঙিনায়।

৭৭। বাপ-মাকে রাজি না করিয়ে কৃষ্ণ কোথাও যেতেন না। তাই, তাঁদের আদর কুড়িয়ে এবং অনুগমনে বাধা দিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আত্মরূপী সহচর ও আত্মরূপী প্রতিপাল্যদের আত্মপ্রতিপালক হয়ে পূর্ব পূর্ব দিনের মতই বনের পথে চলে গেলেন।

৭৮। এর পর কয়েক মাস কেটে গেল এই ভাবে। তারপর অকস্মাৎ একদিন—

সেদিন শ্রীকৃষ্ণ চলেছেন জনাভিরাম দাদা শ্রীবলরামের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে লালিত্য ছড়িয়ে চলেছেন আত্মভূত রাখাল ও সহচরের দল, গিরি গোবর্দ্ধনের নিকটে এসে আত্মভূত বাছুরদের তাঁরা চরাতে যাবেন, এমন সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল।

গিরি গোবর্দ্ধনে যে সব ভিন্ন গোহালের ধেনু চরছিল, তারা হঠাৎ তাদের নিজেদের দুধের বাচ্ছাদের ছেড়ে দিয়ে—কোনোটি সদ্যজাত, কোনোটি বা এক বছরের হবে, কোনোটি বা দু' বছরের, এত জোরে দৌড়িয়ে আসতে লাগল শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূত বাছুরগুলির দিকে, যে অবাক হয়ে তাদের আভীরেরা, লাঠি হাঁকিয়েও তাদের রুখতে পারলেন না। কী আশ্চর্য, ধেনুর দল কি আকাশ বেয়ে উড়ে যাচ্ছে নাকি?

আত্মভূত বাছুরগুলির কাছে ধেনুরা এল। নতুন-জাগা একটি বাৎসল্যরস তাদের যেন পেয়ে বসেছে। অবসন্ন হলেও তারা হাম্বা-ধ্বনি তুলল। উগ্র স্নেহের উৎকণ্ঠায় ভরা হাম্বা। তারপরে বাছুরদের আঘ্রাণ করতে লাগল সোৎসাহে। লেহন করতে লাগল। সেখান থেকে নড়বার নামটিও করল না, চরতেও গেল না, ঘাসও খেল না। [ক্রমশঃ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১১

কানপুর থেকে যখন বেরিয়েছিলেন ভবানী, মনটা ছিল বিক্ষুব্ধ। এলাহাবাদ থেকে নৌকায় কাশীর পথ ধরলেন তাঁরা। গঙ্গার দুই কূলের প্রকৃতির শোভা যেন ধীরে ধীরে তাঁকে প্রশান্তির প্রলেপে শান্ত করলো। নদী ও গ্রাম-প্রকৃতিতে এমন কোন চিরন্তন ঔদাস্য ও শান্তি আছে, যা স্পর্শকাতর মনকে স্পর্শ না করে পারে না। চলতে চলতে ভবানীর মনে হলো, মাতৃসমা এই নদীর মতো এমন সম্পদ যেন আর কিছু নেই। যৌবনে সমকালীন ছাত্রদের ইংরাজী সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে পড়ে প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখেছিলেন ভবানী। স্বদেশ থেকে এই সুদূরে এসে উত্তর-ভারতের ভূ-প্রকৃতি দেখে দেখে বাংলার শ্যামল সৌন্দর্যকে আরো অপরূপ মনে হতো। মন্দাক্রান্তা ছন্দে বহমান এই নৌকাযাত্রার সময় প্রকৃতির এই অজস্র অবারিত সৌন্দর্য তাঁর চোখে নতুন করে ভাল লাগলো। মাঝিদের নৌকা টানা দাঁড়ের ক্যাঁ কোঁ তীব্র করুণ শব্দ, এর মধ্যে যেন তাঁর নিজের মানসের কোন মিল আছে। সহসা জীবনটা যেন বড় বেশী গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। টেলিগ্রাফে খবর যাচ্ছে, রেলপথ তৈরী হচ্ছে ভাবতেও যেন কেমন বিব্রত লাগে ভবানীর। এত গতি দিয়ে কি হবে? প্যারেড, কুচ, ভঙ্গিবাজনা, ক্যান্টনমেন্টের দ্রুত ছন্দ জীবন এখানে যেন সে সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। পশ্চিমা মাঝিরা চৌকা ধরিয়ে অড়হর ডাল ও ভাত রান্না করে খাচ্ছে। খেতে খেতে দুটো একটা কথা যা বলে, শুনে অবাক হয়ে থাকেন ভবানী। ছেদীরামের চাচী এতদিনে মারা গেল। ছবিলালের বাবা নিজে প্রয়াগ আর গয়াজীতে তীরথ ধরম করতে যাচ্ছে। যাবার সময়ে তার দুধেলা গাই বাছুর, আফশোষ—দুই টাকায় বেচে দিয়ে গেল। মানুষটা অনেক পয়সা করেছে। কেন না নিজের গাঁয়ে ইটের বাড়ী বানিয়েছে। কোন না তিনশো টাকা খরচ হলো তাতে? বড় ভারী মানুষ।

এই সব ছোট ছোট কথা। পরিষ্কার বোঝা যায় তাদের জীবনের পরিধি ওর চেয়ে বিস্তৃত নয় আজও। তার বাইরে কি হলো না হলো তারা মাথা ঘামায় না। ভবানী ভাবেন, এই সব মানুষকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ঐ যে আর একটা জীবন গড়ে উঠছে, তাতে এদের লাভ কি? সর্বদা শোনা যায় এতে ইণ্ডিয়ার ভাল হবে। সে কোন ইণ্ডিয়া? নদীবক্ষের দুই পারে চলমান জীবন। প্রত্যহ অপরূপ স্বর্ণসন্ধ্যা নামে। নদীর 'পরে আকাশ অনেকক্ষণ অবধি সুনীল থাকে। দুই পাশে লোকালয় থেকে শিবমন্দিরের আরতির ঘণ্টা বাজে। কোথাও দেখা যায় শ্মশানের আলো। ধিকিধিকি চিতা জ্বলছে।

চন্দনের সঙ্গে ভবানীর অনেক কথা হয়। অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলেন অনেক কথা। বলেন—চন্দন, তোমাদের গ্রামে সতী দেখেছ?

চন্দন বলে—জানি একবারই হয়েছিলো। আমাদের জন্মের আগে। তবে কোম্পানী কানুনের পরে।

ভবানী আজ তাকে এমন কথা বললেন, যা তাঁর মনেই ছিলো, অথবা যা কোনদিনও বলবেন বলে ভাবেননি। বলেন—আমি যখন খুব ছোট, তখন ছয় বছর বয়সে আমাদের গ্রামে একজন সতী হয়েছিলেন। সে কথাটা আমি কোনদিনও ভুলিনি। তার ক'দিন বাদেই কোম্পানী কানুন চালু হলো। তাই আমাদের গ্রাম আর ঐ অঞ্চলে সেই শেষ ঘটনা। মনে ছবির মতো আঁকা রয়েছে। আজকে সন্ধ্যায় ঐ যে ঢাক বাজছিলো? ঢাকের শব্দ শুনে মনে হলো, সেদিনও এমনি সন্ধ্যা ছিলো, এমনই ফাল্গুনের শেষ, যতদূর মনে পড়ে।

চন্দন মনের কারবারী নয়। সেই কথা মনে পড়বার এখন কি হলো সে কার্যকারণ বুঝতে পারে না। যে কথা ভবানী বলতে পারেন না, সে হলো এক জলযাত্রায়। সে চার বছর হলো, ব্রাইটের কোন এক সফরে একসঙ্গে গাজিপুর অবধি গিয়েছিলেন তিনি। অন্য বজরা, অন্য সহচর। ব্রিজদুলারীকে তখনো তিনি তেমন জানেন না। এক পদস্খলিতা রমণীর স্বর্ণভূষার কথা শুনেছিলেন। শুনেছিলেন দেশীয় সিপাহীদের কাছে। শুনেছিলেন, যে অন্য কোন সাহেব হলে কথা ছিল না, ঐ ঘৃণিত মানুষটার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে তাদেরই স্বদেশ স্বজাতির মেয়ে, তাতেই তারা অপমানিত হয়েছে। তাঁর কাজ করতেন যে ব্রাহ্মণ-সিপাহী সে বলতো—আশ্চর্য গয়নার লোভ ঐ মেয়েটার। ওর জন্যে সোনা কিনতে কিনতে ঐ সাহেব ফতুর হলো।

ভবানী তখন জনশ্রুতি শুনে শুনে বিরূপ ধারণাই পোষণ করতেন। বজরা তীরে লাগিয়ে একই জায়গায় পৃথক পৃথক ঠাঁইয়ে রান্নার ব্যবস্থা হতো। রাজপুত হাবিলদার ও সিপাহীদের অনুরোধে ভবানী অনেক সময় সুস্বরে স্তোত্রসঙ্গীত শুনিয়েছেন। তরুণ কণ্ঠের সে শুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ গঙ্গার প্রশান্ত ঊর্মিমালার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়তো। তখন দুটি ভক্তিনম্র চোখের নীরব প্রণাম তাঁর পায়ে কতবারই লুটিয়ে পড়তো, কোনদিনও চেয়ে দেখেননি ভবানী। পরে জেনেছিলেন। আবক্ষ গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ তুলে সেই মেয়েটি কি আকুল ভক্তিতে চোখ বুঁজে প্রণাম করতো

করজোড়ে তাও যে দেখেননি তা নয়। তখন ভাবতেন সে শুধু পুণ্যার্জনের স্পৃহা। দেবমন্দিরে সোপান বাঁধিয়ে দেয় পুণ্যের আশায়—সে তো ঐ কলুষিতা মেয়েরাই। পুণ্যের প্রয়োজন তারই, যে পাপে ডুবে আছে।

আজ তাঁর পুনর্বার সে কথা মনে হয়। মনে হয় চিন্তাধারায় তিনি ব্রিজদুলারীকে অবমাননা করেছিলেন একদিন। তাই আজ যেন দুঃখ হয়। কেন দুঃখ হয়? সে কোথায়, আর তিনি কোথায়! সংস্কার ও বহু বাধা মন থেকে কাটিয়ে একদিন ত' তিনি সহজ মানবধর্মে তাকে ভালবেসেছেন। একদিন? কেন, আজ ভালবাসেন না? তবে সেই সুন্দর মুখ, সেই বিষণ্ণ হতাশা, তাঁকে আজ ব্যথিত করলো কেন? মেয়েদের সম্পর্কে অবিচার আর অত্যাচার—মেয়েরা যে কত অসহায় সে কথা, এই মেয়েটিকে না জানলে কি তিনি বুঝতেন? এই একটি মেয়েকে অসহায় ভাবে নিপীড়িত হতে দেখে তবে না মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে তিনি শিখলেন? তাঁর স্বদেশেই কি মেয়েরা কম অত্যাচারিত?

আজ ব্রিজদুলারীর কথা মনে হতে সেই বিগত শৈশবস্মৃতি মনে পড়ে। ভবানী ধীরে ধীরে বলেন। ঈষৎ অন্যমনস্ক ভাবে, ভুরু কুঁচকে বিস্মৃত টুকরোটাকরা মনে করে করে। চন্দনের সঙ্গে অলিখিত একটা সন্ধি হয়েছে যেন। আর শ্রোতা এখানে অবান্তর। ভবানী অন্যমনে ঈষৎ বিষণ্ণ হেসে বলেন—কি জানো, সে যেন একটা কাহিনী। কেউ যেন আমাকে বলেছিল। কিন্তু কাহিনী ত নয়। আমার জীবনেই দেখা। বৃহৎ পরিবার আমাদের। আমার একজন পিসীমা ছিলেন। কলকাতার কাছে গ্রাম। যে কোন সময়ে আইন চালু হয়ে যাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। এমনি সময় পিসেমশায় মারা গেলেন। আমাদের গ্রামে নয়। দূরে। খবর এলো। আমাদের বাড়ীর যিনি কর্তা ছিলেন, তাঁকে গ্রামের দশজনে বুদ্ধি দিলো। তিনি ঠিক করলেন যে পিসীমাকে সতী করতে হবে। আর এমন ধুমধাম হবে, যে সকলে মনে রাখবে।

সেই জ্যাঠামশায়কেও মনে পড়ে ভবানীর। পিসীমা তাঁর চেয়ে বছর বারোর বড় ছিলেন। কুলীন ঘরের মেয়ে। কুলীনের স্ত্রী। উনিশ সতীনের একজন। স্বামীর সঙ্গে জীবনেও যোগ ছিল না তাঁর। হেমশশীর বিয়ে তাঁদের বাড়ীতে একটা উপহাসের কথা ছিলো। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারটিতে মহিলাদের মধ্যে, যাঁরা স্বামিপ্রেমে সোহাগিনী, অথবা সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিতা তাঁরা নির্মম ও নিষ্ঠুর কৌতূহলে সে প্রসঙ্গ বার বার তুলতেন—হেমশশীর বিয়ের কথা। ফুলে মেল নৈকষ্য কুলীন মুখোটি মহাশয় একজন ভৃত্য ও একটি বিশ্বস্ত নাপিত সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করে বেড়াচ্ছিলেন। নাপিত এসে একদিনের পথ এগিয়ে থাকতো এবং খোঁজখবর করে ঠিক করতো। মুখোটি মশায় নতুন হাঁড়িতে মুগের ডাল-চালে সেদ্ধ খেয়ে এঁটো কলাপাত জলে ফেলে সন্ধ্যেবেলা গিয়ে উঠতেন ভাবী শ্বশুরগৃহে। হেমশশীকে তিন শত এক সিক্কা টাকা পণ ও চার জোড়া ধুতি-চাদরের বিনিময়ে তিনি উদ্ধার করে যান। এক দণ্ডের নোটিশে বিয়ে। নতুন একখানা চেলীও জোটেনি। ভবানীর জননীর একখানা চেলীও জোটেনি। ভবানীর জননীর একখানা বেগুনফুলী নূতন শাড়ী ছিল, তাই পরে বিয়ে হয়েছিল। রাত না পোহাতে মুখোটি, হেমশশীর কানের মাকড়ী ও গলার মুড়কীমালা চেয়ে নিয়ে প্রস্থান করেন। আর কখনো তাঁকে দেখেননি হেমশশী। বাড়ীর মেয়েরা হাসতে হাসতে বলতেন—ঠাকুরকন্যার মতো স্বামি-ভক্তি তাই দেখিনি। ঠাকুরজামাই ফর্সা না কালো, তাই চেয়ে দেখতেও সময় দিলেন না, অথচ তাঁরই এক কথাতে ঠাকুরকন্যা গহনা খুলে দিলে?

হেমশশীর বিবাহ হয়েছিল মাত্র। দেহে মনে তিনি কুমারীই ছিলেন। আর সেই এক ধরণের সরল শুচিতা তাঁকে ঘিরেছিলো। পূর্বের অবস্থার সঙ্গে তফাৎ এই, যে বিয়ের ডালায় 'শ্রী' গড়তে, ইতু পূজায় ঘট তুলতে, জয়মঙ্গলবারের ব্রত করতে তাঁর অধিকার হয়েছিল। ভবানীর মনে আছে বাগান থেকে নারকেল আসতো। পিসীমা সন্ধ্যাস্নানের ভিজে চুল মেলিয়ে সেই নারকেল কুরে বড় বড় কাঁসার থালায় চুড়ো করে রাখতেন। পরে মায়েদের সঙ্গে বসে সন্দেশ তৈরী করতেন ছাঁচে বসিয়ে। ব্রতপূজার দিনে পাথরের থালায় শসা, বাতাবিলেবু ও কলা কেটে কেটে রাখবার দায়িত্ব ছিলো তাঁর। বাড়ীতে বহুজনের একজন। হেম রয়েছে, শাকগুলি বেছে রাখুক, হেমকে ডাক, দাসী চাকরদের জল খেতে দিক—হেম যেন ছোট ছোট মেয়েদেরই একজন। ভবানীর মা ছিলেন কোমল প্রাণের ক্ষীণকায় মানুষটি। হেমশশীর সঙ্গে তাঁর একটা সখ্যতা ছিল। দুইজনে একসঙ্গে নাইতে গেলে পুকুরপাড়ে বসে জলে পা ডুবিয়ে কথা তাঁদের ফুরোত না। ভবানীর মা নীচু গলায় তাঁর বাপের বাড়ীর গল্প করতেন। তিন ক্রোশ দূরেই পিত্রালয়, তবু আর কোনদিনও যেতে পারবেন না—কুলীনের মেয়ের চিরদিনের দুঃখের কথা।

সহসা হেমশশীর যেন সে সামান্য পদমর্যাদা থেকে কোথায় উঠে এলেন। জ্যাঠামশাই-এর উৎসাহে হৈ চৈ পড়ে গেল। গাঁয়ের দশটা মানুষ এল। ঢাক বাজল। ঢুলিরা ঢাক বাজিয়ে বাড়ীর সামনে লোক জড়ো ক'রে ফেললো। এক নিমিষে বোধ হলো কি না কি হতে চলেছে। ভবানীর মনে আছে একটা নিরবয়ব উন্মত্ততা অথবা ঝোঁক বা নেশা যেন সংক্রামিত হয়ে পড়লো বাড়ীতে। প্রবীণারা তাল তাল হলুদ বাটলেন। তেল হলুদ বাটি ভরে ভরে রাখা হলো। আশপাশের বাড়ী থেকে মেয়ে বৌ-রা ছেলে কোলে তাড়াতাড়ি এলেন। উদ্যোগী জ্যাঠামশায় ভবানীকে কোলের কাছে বসিয়ে ফর্দ লিখছেন, পুরুতঠাকুর হাঁকছেন, ভবানীর আজও মনে পড়ছে—ঘৃত ৩৲—ওড়ন পাড়ন বস্ত্র—১৲—সতীবস্ত্র একজোড়া ২।০—কাঠ—৩৲—পুরোহিত ৩৲—দান ১৲—চাল ।০—সুপারি ৫১০—ফুল ।০—কর্পূর ।০—মিষ্টান্ন ।০—হরিদ্রা ।০—চন্দন-ধূপ-নারিকেল ।৫—বেহারা ।।০—ঢুলি ৷।০—নাপিত ।০—তবলদার ৶০

জ্যাঠামশাই বলছেন—হ্যাঁ পুরুতমশাই, একুনে হলো পনেরো টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা, এঁ্যা? পুরুতঠাকুর বললেন—হ্যাঁ। এ হলো কম করে—এ আপনি যত বাড়াতে চান!

তারপরে ঢোল ঢাক কাঁসি ঝাঁঝর ঘণ্টা বেজে উঠলো। ভবানী যেন আজও দেখছেন, পিসীমার পরনে নূতন চেলি, সর্বাঙ্গে তেল হলুদ, মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা—কিন্তু পিসীমা যেন ভূতেধরা মানুষ হয়েছেন। * অপ্রকৃতিস্থ চোখে ঘরের জনসমুদ্রের দিকে চাইছেন, আর একরকম আর্তনাদ করে উঠে পালাতে চাইছেন। দশজনে তেল সিঁদুর ও হলুদ দিতে দিতে আবার বসিয়ে দিচ্ছে। সেই নিচু কুঠুরি ঘর ধুনোর গন্ধে অন্ধকার! কোনো অজানিত ভয়ে ভবানীর

বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে মা-কে পাচ্ছেন না। মা বুঝি ঐ ভীড়ে আছেন ?

তারপর আর কিছু মনে পড়ে না। পরে অবশ্য জেনেছিলেন তিনি, যে জ্যাঠামশায়ের ওপর তম্বি করে গিয়েছিলেন ইংরেজ দারোগা। তবে বাঙালী থানা-কর্মচারীটি পিছু ফিরে এসে পুণ্যবান জ্যাঠামশায়ের পদধূলি নিয়ে গিয়েছিলেন।

বোনকে সান্ত্বনা দেবার ছলে জ্যাঠামশায় বলেছিলেন—মঠ দেব আমি তোর নামে। মঠ দেব।

নদীর ভাঙনে সে মঠ টেনে নিয়েছে বুকে। কিন্তু হেমশশীর মর্মন্তুদ সে মৃত্যুজ্বালা এতটুকু কমেছে কি ? ভবানী জানেন, যে না, কমে নি।

এ মর্মন্তুদ কাহিনী শেষ করে ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন—আমাদের দেশের মেয়েরা, বুঝলে চন্দন, বড় অভাগী। তাদের দুঃখ তাদের বাপ-ভাইরাও বোঝে না। এতটুকু নয়।

ভবানীর কথা শেষ হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে দিচ্ছে চোখ মুখ। জলে তারার ছায়া ঝিকমিক করছে। মৃদু-মন্দ বাতাসে পাল তুলে চলেছে নৌকো। চন্দন চুপ করে থাকে। তারপর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বলে—ডাক্তারসাহেব, এবার কেন যেন বসন্তকালটা বড় সুন্দর হয়েছে! তাই না ? ...াছে যত বোল এসেছে, ফসলও চমৎকার হলো—সুন্দর লাগছে যেন দেনগুলো রোদও যেন মিঠা।

সত্যই সুন্দর হয়েছে দিন। এই প্রাকৃতিক-সুষমার অতীত কোন সৌন্দর্য যেন ব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বচরাচরে! কেন যেন মোহিনী মায়াজাল বিস্তার করেছে বসন্তের দিনগুলি। কোন্ উৎসব আসন্ন ?

* * * *

বারাণসীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মহাদেবের ললাটিকা-চুম্বিত জাহ্নবীর অপরূপ চিরায়ত সৌন্দর্য দেখে তৃপ্ত হলো নয়ন। অন্তর থেকে ধন্য বোধ হলো নিজেকে ভবানীর। বারাণসীর নামে এমন কোন যাদু আছে, প্রণাম করতে সাধ যায়। এক অঞ্জলি জল তুলে মাথায় দিলেন ভবানী। নৌকা করে যাত্রীদের নিয়ে দেখাতে বেরিয়েছে মাঝিরা। তাদের গাঁতিদার সুউচ্চকণ্ঠে বলে চলেছে—হরিশঘাট দর্শন করুন, ঐ দেখুন কেদারঘাট —আহাহা—কালুডোম রাজা হরিশ্চন্দ্রের সুবর্ণ নিয়ে কি ধনী হলো, ঐ যে তার কুঠি! আর ঐ চৌষট্টিঘাট, পেশোয়া প্রাসাদ দেখুন!

বড় বড় ছাতার নিচে যেন মেলা বসেছে দশাশ্বমেধ ঘাটে। স্তবস্তোত্র নামগানের ধ্বনি উঠছে প্রভাতী আকাশের দিকে। ঘাটের নিচের দিকে দুই পাশে যে সকল গুপ্ত শিবমন্দির আছে, গঙ্গার জল কমে যাওয়াতে তারা প্রকাশ হয়েছে। জাহ্নবী এতদিন ধরে পূজাছলে মহাদেবকে গৈরিক মাটিতে বিভূষিত করেছেন। ভিখারী

দেবতা—নাম সার্থক করে মহাদেব ধূলি-ধূসর হয়েই বিরাজ করছেন। মন্দিরের আধখানি এখনো জলে ডোবা। ছলাং ছলাং করছে জল। ঘাট-পূজারী নৌকা নিয়ে শিবকে ফুল ও বেলপাতা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি যে নিরত গঙ্গার পবিত্র ঊর্মিতে ধৌত, সে কথা মনে না রেখে সে তরুণ পূজারী কমণ্ডলু থেকে শিবশীর্ষে জল ঢেলেও দিচ্ছে। অধিকন্ত ন দোষায়—এমনি একটা তৃপ্তির ভাব সে মহাদেবের মুখে চোখে। বাঙালী ভাস্কর বেশ তৃপ্ত আলাভোলা ভাবটি এনেছেন মহাদেবের মুখে। মনে হচ্ছে নিছক জলধারা না হয়ে দুধ-মধু বা ঘি হলেও ভোজনপ্রিয় লোভী দেবতাটি অসন্তুষ্ট হতেন না।

ঘাটে ছাতার তলে তেল ও স্নানের আয়োজন নিয়ে বসে আছেন পূজারীরা। একটি ঢেবুয়া পয়সা, দুটি কড়ি, বা একটি আধলা পয়সার বিনিময়ে তেল মেখে স্নান করে নিপুণ স্নানার্থী। অর্ঘ নিয়ে জলে দাঁড়িয়ে দ্রুত মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। সকলে ওপরে সকালের আলো এসে ঝলমল করছে।

পুঁঠিয়ার ঘাটে নৌকা ঠেকিয়ে উঠে আসতে আসতে সহসা মনে হয় সকল মানুষ যেন গঙ্গার দিকে তাকাচ্ছেন দাঁড়িয়ে উঠে। নৌকাগুলি যেন হর-হর বলতে বলতে দ্রুত পাড়ের দিকে আসছে।

—চন্দন দেখ! আজ ধন্য হলে।

সমবেত সকলে হাত জোড় করে রয়েছে। চন্দনও হাত জোড় করে। গঙ্গার বুক দিয়ে তীব্র স্রোতের বিপরীতে ভেসে চলেছেন শয়ান ভঙ্গীতে চিতসাঁতারে এক বিরাটকায় পুরুষ। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, চোখ মুদ্রিত—বিশাল দেহটি দিগম্বর। জনতার জয় জয় ধ্বনির মধ্যে দৃক্‌পাত নেই। যেন মহাদেবের এক নর প্রতীক ঐ আত্মভোলা সন্ন্যাসী।

ত্রৈলঙ্গস্বামিজী কী জয়! এই শুনে এক অন্ধ বৃদ্ধাও প্রণাম করেন শশব্যস্তে। বারাণসীর মানুষ এই মহাপুরুষকে স্বয়ং মহাদেবের অংশোদ্ভূত বলেই জানে।

চন্দন বলে—তিনি কি দুইশো বছর সত্যিই বেঁচে আছেন? ভবানী বলেন—সে শোনা কথা। তবে আত্মভোলা এক শিশুর মতোই পুরুষ তিনি। সকলে বড় শ্রদ্ধা করে।

দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিধানে ভবানীর জ্ঞাতিদাদার বাড়ী। ভবানীদের জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। ভবানীকে দেখে সকলেই আনন্দিত হলেন। দীর্ঘদিন বাদে আত্মীয়স্বজন সম্মিলনে ভবানীরও আনন্দ বোধ হলো। রুচি-মেজাজ ও শিক্ষাদীক্ষায় তিনি এঁদের থেকে অনেক স্বতন্ত্র। তবুও গৃহ এবং পরিবারের পরিবেশটি তাঁর কাছে খুব ভাল লাগলো। ভবানীর দাদা হরিশঙ্কর আবগারী বিভাগের কেরাণী। তামাক ব্যবসায়ীদের কল্যাণে তাঁর উপার্জন ভালই। মানুষটি স্নেহশীল হাসিখুসী। সাংসারিক সকল কর্ত্তব্যই বেশ হাসিমুখে করতে পারেন। অপ্রিয় কর্ত্তব্যগুলিও হাসি ও মিষ্টি কথার প্রলেপে এমন ভাবে নির্ব্বাহ করেন, যে কোন পক্ষই ব্যথা পায় না। ভবানী উপবীত রেখেছেন মাত্র। অন্যথায় আচার ব্যবহারে অধার্মিক। তাঁর পরিবারের মধ্যে থাকবার পক্ষে তো বটেই। এই নিয়ে কোন গোলমাল হতে পারে জানে—তিনি পূর্ব্বাহ্নেই ব্যবস্থা করেছেন।

বললেন,—ভাই, তোমার চিঠি পেয়েই আমার বন্ধু (বনসীজীকে) বললাম। গোরখনাথ পণ্ডিতের নাতজোয়, বড় ভাল লোক। আমার বাড়ীর লাগাও হাবেলীটি খরিদ করেছেন। বললাম যে বনসাজী, আমার ভাই সোজা মানুষ নন্। সাহেব বড় খাতির করেন তাঁকে। তাঁর চালচলনও সাহেবী কায়দার। তা তাঁর থাকবার কি বন্দোবস্ত করি?

—বাড়ীতেই তো হতে পারতো—বিব্রত হয়ে পড়েন ভবানী।

হরিশঙ্কর বলেন,—তাঁর বাড়ীতেই দুইখানা কামরা—দিব্যি আলোবাতাস—চৌকি, টেবিল, কুর্সী, সেজবাতি সব আছে, কোন মুস্কিল হবে না। চল দেখিয়ে দিই।

হরিশঙ্করের স্ত্রী ভেতরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। নাস্তিক এই দেবরটিকে নিয়ে যদি কোন গোলমাল হয়, সে আশঙ্কা ছিল। এমন সু-সমাধান হলো দেখে যেন আশ্বস্ত হলেন। চুড়ি বাজিয়ে শব্দ করলেন। হরিশঙ্কর বললেন—যাও হে অন্দরে। তোমাকে কতদিন দেখে নি। সবাই অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে।

ভবানী হেসে জুতো খুলে ভেতরে গেলেন। হরিশঙ্কর চন্দনকে নিয়ে পড়লেন। বললেন—হাবিলদারজী, তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি তুমি একজন কৃতী মানুষ।

চন্দন হেসে বললো—আমি হাবিলদার নই।

হরিশঙ্কর তাড়াতাড়ি বললেন—আহা, না হলেও অচিরে হবে। আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

চন্দনকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে বললেন—পছন্দ হয়? আচ্ছা—তোমার দেশ কোথায়?

—ডেবাপুর-বিঠুর।

—তাই বলি। ডেবাপুর বড় ভারী জায়গা। সেখানকার মানুষ ভারী-নামী হয়।

ডেবাপুরে তিনি কোনদিনও যাননি। তবু অতিথিকে খুসী করবার জন্য হৃদয়ধর্মে বলে চললেন—কি সে জায়গা? কেমন সেখানকার বৈশিষ্ট্য। চন্দন বোধ হয় মানুষটাকে আবছা বুঝলো। তাই সে প্রতিবাদ করে ভুল ভেঙে দিল না। বরঞ্চ গম্ভীরমুখে সায় দিতে লাগলো। চাকর প্রচুর মিষ্টান্ন থালায় সাজিয়ে নিয়ে এলো। হরিশঙ্কর বললেন—এই সামান্য আয়োজন।

চন্দন প্রতিবাদ করতে না করতে তিনি খাদ্যমূল্যের কথায় চলে গেলেন। বললেন—আর কি, অবস্থা যা হলো মানুষকে পয়সা চিবিয়ে খেয়ে বাঁচতে হবে। কোনো কারণ নেই, হঠাৎ বাড়তে সুরু করেছে দাম। জৌনপুরী গমের ভাল আটা, টাকায় তিরিশ সের ছিলো আটাশ সের হয়েছে, আর বালি চালের মণ দেড় টাকা থেকে উঠলো দুই টাকায়—দুধের দাম টাকায় তিরিশ সের—বল ভাই! কি খাবে আর কি খাওয়াবে। আটা না কি টাকায় পঁচিশ সের হলো বলে। কাশী ছেড়ে যেতে হবে আর কি! তিরিশ বছরের বাস। মামাদের দিক থেকে দেখতে গেলে তিন পুরুষ বলা চলে। সোজা কথা ত' নয়, চৈৎসিংহের আমলে দাদামশায়ের বাবা পাথরের বাসনের ব্যবসা করেন এসে। ঐ বাড়ীর সামনে তাঁরও বাড়ী ছিল! কিন্তু কি জান, মানুষ এমন ভুলে যায়, যে আজ দুলীজীর হাবেলী বললে দেখিয়ে দিতে কেউ নেই।

চন্দন বোঝে যে এই গল্পস্রোতে বাধা না পড়লে মুস্কিল হবে। সে বলে—আমি একটু গঙ্গাজীতে স্নান করে ঘুরে আসি।

হরিশঙ্কর তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যান। বলেন—দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে ফের গল্প হবে।

ভবানীশঙ্করকে ঘরে বসিয়ে জলযোগের থালা সাজিয়ে দিয়ে বৌঠান বসেন। একদা বাড়ীর বধূ ছিলেন, দেওরদের সঙ্গে বাক্যালাপ বা গল্প-গুজবে বাধা ছিল অনেক। এখানে বিদেশে তিনিই সংসারের গৃহিণী। অতিথিকে আদর যত্ন, সেও নিজেরই করতে হবে। দেশাচারে বাধে। কিন্তু কি আর করা যায়! আর এমন সুপুরুষ লম্বা-চওড়া বিদ্বান্ দেবরের সম্পর্কে তাঁর গর্বও কম নেই। আজ সামনে বসে তিনি কুশলবার্ত্তার পর বলেন—কতদিন আর এমন থাকবেন? সংসার করবেন না?

—আর বৌঠান, বয়স হয়ে গেল!

—কি বয়স? পুরুষমানুষের চৌত্রিশ বছর একটা বয়স না কি? আর এমন ঘর, এমন বংশ। কুলীনের ঘরে এমন কত হয়।

ভবানী ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন এড়িয়ে বলেন—বাড়ীতে কোন কাজ আছে কি? কেমন যেন মনে হচ্ছে?

বৌঠান বলেন—সে কথা বলেননি দাদা আপনাকে? এ বছর থেকে বাসন্তী কালীপূজা নিলাম যে? আর দশ দিন বাদে পূজা। মির্জাপুরের কাকার পরিবার এসেছেন, ও জৌনপুর থেকে আমার বোন ভগিনীপতি আসতে পারেন। বৌঠানকে বেশ ভাবিত দেখা যায়। বলেন এত বড় কাজটা নিলাম, ভালভাবে হলে বাঁচা যায়।

কোনও উৎসবেরই প্রস্তুতি বটে। অনেক দিন পরে দেখছেন বলে ভবানীর বড় মধুর লাগে এই পরিবেশ। এবাড়ী ওবাড়ী থেকে মহিলারা আসছেন। তাঁদের পান-সুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা করছেন বৌঠান। কেউ বা ডাল ভাজতে বসেছেন কাঠের উনোন জেলে। দু তিন জন হাতে ধরাধরি করে হামালদিস্তেয় হলুদ কুটছেন। বযুস্থানীয়ারা সুপারি কুচোচ্ছেন আলতাপরা পা মুড়িয়ে বসে। বিখ্যাত মিত্র বাড়ী থেকে মিত্রগৃহিণীকে আনা হয়েছে। সম্মানিত তিনি, বয়োবৃদ্ধা। তিনি তক্তাতে পিঁড়েতে বসে আছেন। তাঁর দাসী পাশে দাঁড়িয়ে আছে পানের কৌটা হাতে। তিনি যেমন তেমন লোক নন। সারদা মিত্রের মা। তাঁর ছেলেদের কথায় অনেক কিছু হতে পারে। এই সেদিনই সরকারী রাস্তা মেরামতের খাতিরে নিজেদের জমি দিয়েছেন কতখানি। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর খাতির করে চলেন তাঁদের। তাঁদের মাধ্যমে বহু বঙ্গসন্তান এসে সহজেই কমিসারিয়েটে ভর্ত্তি হয়েছেন। কোম্পানীর চাকরী তাঁরা বললেই হয়ে যায়। মিত্রগৃহিণী মানুষটি সামান্য দাম্ভিক। তবে পরোপকারী। তাঁর বাড়ীতে নিত্য ক্রিয়া পার্বণ, সে হেতু এই মহাপূজায় কি করণ বিধি ও আয়োজন প্রয়োজন তা তাঁর মতো কেউ জানেন না। কাশীতে বাঙালী সমাজে তাঁর ডাক পড়ে ঘরে ঘরে। তিনি কোথাও অন্ন গ্রহণ করেন না। বিশেষ উপরোধে মিষ্টান্ন ও তাম্বুল নিয়ে সৌজন্য করেন। বর্তমানে তিনি হরিশঙ্করের ব্রাহ্মণীকে প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। কাশীতে বসেও তাঁর পরনে ঢাকা ও ফরাসডাঙার তাঁতের কাপড় ও বিষ্ণুপুরের গরদ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। গায়ের চাদরটি দাসীর হাতে। উৎকৃষ্ট তিন পেড়ে শাড়ীর টুকটুকে [illegible] পা দুটি ঈষৎ উন্মুক্ত। পায়ে আলতা ও আঙুলে রূপোর চুটকী। হাতে গোরখী চুড়ির আগে বাউটি। গলায় মুড়কি মালা ও কানে চারটি করে আটটি মাকড়ি। নাকের হীরার ফুলের সঙ্গে টানা দেওয়া। মিত্রগৃহিণী স্মৃতি হতে বলে যান।

—সর্বৌষধি ষড়ঙ্গ ধূপ ষোড়শাঙ্গ ধূপ গুগ্গুল, সরল কাঠ, দেবদারু তেজপাতা, বালা, শ্বেতচন্দন, অগুরু, কুড়, গুড়, ধুনা, মুথা হরীতকী, লাক্ষা, জটামাংসী, শৈলেয় ও নখী—ষোড়শাঙ্গ ধূপ সকল দেবকাজে লাগে। আর পুষ্প নির্বাচনে রক্তপদ্ম, রক্তজবা, কৃষ্ণাপরাজিতা, রক্তকরবী ও দ্রোণপুষ্প—নিজে বলে দিবে। তোমরা যে পুরোহিতকে দিয়ে কাজ করাবে তিনি অনভিজ্ঞ, একটুকু ত্রুটিতে দোষ অর্জাবে।

সমবেত মহিলারা শোনেন ও বলেন—দিদি, আপনার তুল্য জ্ঞান কি সকলের আছে?

তিনি তুষ্ট হয়ে পান খেয়ে রূপার পিকদানীতে পিচ ফেলেন ও বলেন—জামাইয়ের কালেক্টরীর নাজির হওনে সারদা ও কুলদা দেবী কালীপূজা করেছিলেন। তারাপীঠ থেকে মা পুরোহিতকে সপরিবারে নৌকাযোগে আনেন। মুর্শিদাবাদ খাগড়া থেকে কাঁসার বাসন এসেছিল, ষোলটি বলি পড়েছিল—পঞ্চরত্ন নবরত্ন প্রকৃত আনা হয়—কাশীর মানুষ আজও বলবে। আমাদের রামকৃষ্ণপুরের ভদ্রাসন থেকে পূজার ফর্দ আনা হয়। এখন কি সেই মন কারু হয়, না সেই নিষ্ঠা আছে?

তা তো নিশ্চয়—এমন ঘর না হলে এমন লক্ষ্মী কেন, ধর্ম যেখানে লক্ষ্মী সেখানে—এই রকম কথা বলেন সকলে। মিত্রগৃহিণী তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়ান। তাঁর পাল্কী এসেছে। বলেন—দেখ বউ, আমি কিন্তু পূজাদর্শন করে চলে যাব। আমার ভাগ্না-বউ, তার মেয়ে—তারা খেয়ে যাবে। মন্ত্র নিয়ে থেকে বাইরে ত আহারের উপায় নাই আর কর্তাকে ও ছেলেদের জান না, বউরা এসেছেন—কাজের লোক হয়েছে, তবু প্রত্যহ আমার হাতের দুটি-একটি তরকারী চাই—নচেৎ কুলদা সারদা আহার করেন না। এমন কি বলে থাকেন, মায়ের হাতের পরমান্ন, এ যে খায় নাই, সে বুঝবে না। আত্মীয় পরিজনে নিত্য খেতে এক শত পাত পড়ে—আমি কি বসে সারাদিন থাকতে পারি? হাঁ, তোমরা একালের অন্যান্য কেবোড়া বামুনদের মত নও—তোমাদের নিয়মনিষ্ঠা আছে, পূজা ভালই হবে।

হরিশঙ্কর দাদার বাসায় অন্দর বাহিরে খুব দূরত্ব নেই। ভবানীর কানে কথাগুলি আসে, ও কৌতুক বোধ হয়। মিত্রপরিবারের বৈভব ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর দাদা বৌঠান খাতির করেন বটে কিন্তু মিত্র-গৃহিণী কি এঁদের তাঁর সমকক্ষ মনে ভাবেন? না তো! তবে আসেন কেন? সম্ভবতঃ নিজের ঐশ্বর্যের স্তুতিবাদ শুনতে তাঁর ভাল লাগে। মধুর বোধ হয়। ঐশ্বর্য যদি গর্বের বস্তু হয়, তবে ঐশ্বর্যের গর্ব করতে পারেন মিত্র-গৃহিণী। কেন না, অগাধ ভূ-সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা শুধু নয়, সোনা ও মূল্যবান অলঙ্কারও অনেক তাঁদের। পেশোয়া পরিবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার প্রাক্কালে মিত্র-মহাশয় অলঙ্কার ও সোনার বাসন সুলভে কিনেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে। শোনা যায়, তার মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তরাদিও আছে।

বর্তমানে মিত্রদের অবস্থা সুখী। আত্মীয়-পরিজনসহ রূপার বাসনে অন্নগ্রহণ করেন তাঁরা।

* * * *

টেলিগ্রাফ ও সরকারী ডাক-ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ফৌজী রেজিমেন্ট হতে রেজিমেন্টে কি ভাবে সংবাদ চলেছে এই সময়ে—বিপ্লবের রূপ

তার গতি। বারাণসী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ক্যান্টনমেন্ট। শুধু বহু দূরে দাবানল জ্বললে বাতাসে তার উত্তাপ পেয়ে বুনো ঘোড়া যেমন ঘাড় বাঁকিয়ে বাতাস শোঁকে বার বার—এখানকার ফৌজের মধ্যেও সেই ভাব। তবে সে খুবই সতর্কভাবে।

চন্দন এক্কা ভাড়া করে রেজিমেন্টের বাণিয়া শোভারামের গদীতে উপস্থিত হলো। সুন্দর বাঁধানো চওড়া সড়কের মুখে শাস্ত্রীর কাছে গিয়ে বললো—শোভারামজীর শ্বশুরালয় থেকে আসছি। জরুরী দরকার। কথা বলবার সময়ে শাস্ত্রীর কাছে যতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘেঁষলো, শুধু ঐ কথা বলবার জন্য অত নৈকট্য প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্রী সে কথা বলতে সে বললো—আরে ভাই, তোমাদের সহরে এসে আদব কায়দা ভুলে গেলাম। বলে তার পকেটে টুপ করে একটি টাকা ফেলে দিলো। চৈৎরাম জৈৎরাম মগনরামদের টাকা খরচ করতে তার কোন বিবেক দংশন হলো না। কেন না, এ টাকা কি-ই বা।

মাথার টুপী ঠিক করে নিয়ে সে শোভারামের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো। যে গদী, সেই বাড়ী শোভারামের। ঢুকে বললে—কানপুর থেকে আসছি। গোলাপলাল খবর দিল। বললো অতিথয়েহ মানকে তনুহুবন্তি মনুহুবন্তি করতি আপনার জুড়ি নেই।

শোভারাম উঠতে না উঠতে বললো—না, না, তাই বলে ব্যস্ত হবেন না।

—কোনো কিছু আনলেন সঙ্গে ?

—এনেছি বৈ কি, গরম গরম গল্প—আমরা রইস মানুষ। ভার তো বইতে পারব না। তাই গোলাপলাল কোন জিনিষ দিয়ে ভার বাড়ায়নি। তবে গল্পের তো ভার নেই জী! আর কলিজা আমার এত বড়, যে অনেক গল্পের ঠাঁই আছে সেখানে—জানলেন ?

—যেমন !

—একলা আপনাকে বলে কি সুখ? একদিন একটা বন্ধুজনের আসর হয় না ? মানুষ না পেলে বলে কি সুখ ?

একটু ভাবে শোভারাম। তার পর বলে—এখানে থাকছেন কোথায় ?

শুনে ভ্রূ কুঁচকে যায়। বলে—বাঙ্গালীবাবুরা সাহেবদের সঙ্গে এককাট্টা। তাদের সঙ্গে কেন ?

চন্দন চোখে চোখ রেখে বলে—দরকারের সময়ে সব চলে, জানলেন ? তবে প্রয়োজন ফুরোলে আর না টানাই ভাল দোস্তি। তবে এ-ও ত বাংলা মুলুক।

—বলতে পারেন। আচ্ছা, তবে চেষ্টা করব আপনাকে খবর দিতে। শেঠ বাঁকেলালের মা মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। ও দিন তাঁর বাড়ীতে অষ্টাহ ভাগবত পাঠ, রামায়ণ পাঠ, ও নিমন্ত্রণ। সেদিন সুযোগ হতে পারে।

● ● ● ●

বাঁকেলালের বাড়ীর সে বৈঠকে নয়। উৎসর্গীকৃত আমবাগানে দাঁড়িয়ে কথা হয়। 'লুধিয়ানা শিখ' এর নিহাল সিং গ্রেওয়াল ও রিসালায় সেকেণ্ড রিসালদার মেজর অমর সিংকে দেখা যায় আলোছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে ঘোড়ার পাশে। নিহাল সিংহের বয়স বেশী। ভারী শরীর—গম্ভীর কণ্ঠ—ক্রোধী মেজাজের মানুষটি। বলেন—[illegible] পাতের গন্ধ জমিত না। সে গল্প এখানে পুরনো হয়ে গিয়েছে। এত পুরনো হয়ে গিয়েছে, যে সে গল্পকে গোরের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছি বলতে পার।

চন্দন বলে—দিনকাল খুব তাড়াতাড়ি কাটছে বলতে হবে। এক মাসের কহানী, সে বুড়া হয়ে গোরের তলায় চলে গেল ? শাহী জায়গা আপনাদের বারাণসী।

হাত দিয়ে বাতাসকে ঝাপট মারবার মতো একটা দ্রুত অসহিষ্ণু ভঙ্গী করেন নিহাল। বলেন—বলবার মতো কিছু থাকে ত' বলো। যদি বুঝি খাঁটি কথা বলছ, তবে ঠিক আছে। আর, আর যদি বুঝি ফাঁকি দিচ্ছ, কোন বদমায়েশের হয়ে ভাঙাতে এসেছ বদমতলবে, তবে বুঝব ঐ ম্লেচ্ছ ফিরিঙ্গীদের নিমক খেয়ে এ কাজ করছ। আর তবে, তবে তোমাকে নিয়ে গিয়ে টকর সাহেব (Henry tucker) এর কাছে ধরিয়ে দেব। বলবো এই বদমায়েস সিপাহীদের কানভারী করতে এসেছে। ক্ষেপিয়ে তুলতে চায়। টকর সাহেবের এক হুকুমে তোমাকে লটকে দেবো, তোমার ঐ জওয়ান চেহারা আর হাসি মুখ কালো হয়ে যাবে। ঝুলে যাবে ঐ গলা। জানলে ?

চন্দন গলা থেকে পরিহাস ত্যাগ করে। বলে—না। অনেক কথা বলবার দরকার নেই। অল্প কথায় শুনুন। আটায় গুজব যা রটেছে, মিথ্যে নয়। কানপুরে শুনে এলাম, বাণিয়ারাই আটা নিয়ে রাগারাগি করছে। কিসের মিশাল আছে, কোন হাড়ের গুঁড়ো অথবা আরো আরো খারাপ কিছু—সে আটা কেউ ছোঁবে না।

—এখনই কথা হচ্ছে। আর কার্তুজের কথায় ভুল কিছু নেই। কার্তুজের কাগজে কি মাখিয়ে দিয়েছে, আমরা নাম বলতে পারি না, অথচ দাঁতে না কাটলে উপায় নেই।

—রেজিমেণ্টের হাল কি রকম?

—রেজিমেণ্ট গরম হয়ে আছে। শুধু কি রেজিমেণ্ট? সহরের নামী হিন্দু, আর নামী মুসলমান, কে চায় বলুন এ ফিরিঙ্গীদের? আর এতদিন এ খবর চাপা ছিল, এখন আমরা কানপুরে বসে নিশ্চয় জেনেছি যে অংরেজরা হেরে ফৌত হয়ে গিয়েছে রুশের কাছে। ফৌজের অবস্থা জানেন, আমরা কালা আদমী, আমাদের জানের দাম নেই। রেল বসাচ্ছে কেন? মানুষে এমনিতে হাহাকার করছে, ভাল চাল, ভাল গম, ভাল ঘি, শব্জী—সব তোমরা দাম চড়িয়ে দিয়েছ। আর যা আছে সব লুঠে নিয়ে যাবে? কানপুরের বাতাস খুব গরম, এত গরম, যে একবার সাহেব ভাবছে গড় সামিল করি, আবার করছে না। ভয় পাচ্ছে। ভাবছে গড় সামিল যদি করেই কোন বারাকে আর সেখানে যদি শহরের অংরেজ লোক বিবি বাচ্চা নিয়ে চলে যায়—তবে এক নিমেষে ফৌজ রুখে যাবে।

—তাদের ভেতরের খবর কেমন করে জানলে?

—কেমন করে জানল চন্দন? চন্দন বলে—আমাদের লোক আছে সেখানে।

—যদি ফৌজ রোখে, তবে তাদের পেছনে কে আছে?

—অনেকে আছে। শহরের বড় বড় মানুষ আছে। চোট খায়নি কে, আর যে মানুষ, যার শরীরে সাচ্চা রক্ত আছে, সে কখনো দিনের পর দিন পড়ে পড়ে মার খেতে পারে? না সাহাব। আমরা আবার নিজেদের রাজ চাই। ফৌজী রেজিমেণ্টে সাহাব, আপনি সুবাদার, আপনি রিসালদার—সিপাহীর কি আছে বলুন? কতদিন সে খাতায় সাত টাকায় টিপ ছাপ দেবে, আর খালি হাতে চার পয়সা ছয় পয়সা বকশীষ নিয়ে সাহেবদের তাঁবুর বাজনা বাতির দিকে চেয়ে চেয়ে ভুখাপেটে পেটি বেঁধে নিজেকে শায়েস্তা করবে?

নিহাল সিং বলেন—এখানে ফৌজের বাতাস খুব গরম। আমরাও তা জানি। তবে এখানে শহরের বড় বড় আমীর লোকরা বিশেষ বড় বড় বাঙ্গালী বাবুরা তারা কি আমাদের পেছনে থাকবে? মনে হয় না। তবে এখন অবস্থা যে রকম তাতে একবার কিছু হলেই রুখে যাবে সিপাহী সওয়ার।

অমর সিং এতক্ষণ চুপ করেছিলেন, এবার বলেন—হপ্তায় হপ্তায় হাট বসছে ব্যাসকাশীতে, রামনগরে—শুনেছি সাধু-ফকির-সন্ন্যাসী দরবেশরাও সেই সব কথাই বলছেন।

এবার তিনজনে চলতে থাকেন আমবাগানের সুঁড়িপথ ধরে। পায়ে পায়ে শুকনো পাতায় শব্দ হয়। নিহাল সিং চন্দনের দিকে আড়ে আড়ে তাকান। হিসাবটা যেন তখনো মেলাতে পারছেন না। বলেন—তুমি কি কখনো ফৌজে ছিলে?

—না।

—এবার কি করবে?

—ফিরে যাব ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে।

—কোথায়, কানপুর?

—হাঁ।

—তোমার বাড়ী সেখানে?

—যখন যেখানে থাকি, সেখানেই ঘর—তবে আমার নিজের ঘরও কানপুরের কাছেই।

একার শব্দ হয় খপ, খপ, করে। চলতে চলতে চন্দন ভাবে তার ঘরের কথা। তার দাদা পরদাদায় যে ঘর, সেই তো তারও ঘর হতে পারত। তার আর চম্পার ঘর। একদিন চম্পাও সেখানে বধূ হয়ে আসতে পারতো। তার ক্ষেতের পাকা গমের ওপর—চম্পাও তো তার মার সঙ্গে মাড়িয়ে মাড়িয়ে গমগুলির খোসা ছাড়াতে পারতো। সে ক্ষেতের কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এলে—চম্পাই তো তার শ্রান্ত দেহে বাতাস করতে পারতো। বরঞ্চ বাইরে বাইরে ঘুরে চন্দন বোঝে, তাদের জীবনযাত্রার সমৃদ্ধি আছে ঠিকই, কিন্তু সুরুচি নেই। পরিচ্ছন্নতা নেই। তাদের ঘরে ঘি ও দুধ পচে একটা কটু গন্ধ হয় গরমের দিনে। রোজকার সংসারের জঞ্জালগুলি তাদেরই দরজার পাশে জমতে থাকে। রামনবমীর আগে তাদের জমিয়া জঞ্জাল কেটে পুড়িয়ে দেয়।

সে চম্পাকে নিয়ে হয়তো অন্য ভাবে সংসার করতো। তাদের সংসারে সব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হতো। সে ও চম্পা সন্ধ্যায় নদীর ধারে বসে গল্প করতো। মেলাপরবের দিনে অমন লুকিয়ে চুরিয়ে নয়—গোছাভরা চুড়ি কিনে সে নিজের এক্তিয়ারেই চম্পার হাতে তুলে দিতো। চুড়িওয়ালা হাত টিপে পরাতে গেলে চম্পার যদি ব্যথা লাগতো, তার দিকে চেয়ে চম্পা সে ব্যথা সহ্য করতো। হয়তো তাও নয়—চম্পা আর সে নৌকো ভাড়া করে ভেসে ভেসে বেড়াতো। যখন জল দেখে দেখে মন খারাপ হতো, চম্পাকে নিয়ে সে পাড়ে নামতো। হেঁটে বেড়াতো সবুজ ঘাসের মাঠে।

এই সবই হতে পারতো। হলো না। চন্দন বুঝতে চেষ্টা করে, সে কেন এল এই পথে। কেন এই ঘরছাড়া, ঠিকানা ছাড়া, অনির্দেশের স্রোতে ভাসলো। শুধু কি যৌবনের রোমাঞ্চপ্রিয়তা, না কি অন্য কারণ আছে? সে ত' সিপাহী নয়!

চম্পাই তাকে টেনে এনেছে। তার চম্পা—একান্ত তারই—কিন্তু চম্পার জন্যে আর ঘরের পটভূমিকা সম্ভব হলো না। এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের অশান্ত রঙ্গমঞ্চে চম্পা বিকশিত হয়ে উঠেছে পূর্ণরূপে রঙে—চন্দন সেই জন্যই এসেছে। মনে করে নিতে হবে এই তাদের ঘর।

চম্পা—মনে করতেই চম্পার নিষ্পাপ সপ্রেম হৃদয়ের সৌরভে যেন তারও হৃদয় ভরে উঠলো। কেন যেন নিজেকে বড় ভাগ্যবান মনে হলো চন্দনের।

[ক্রমশঃ।

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রথম ছ'দিনের যে অভিজ্ঞতা সম্বল করে বাঁকুড়ায় চললুম,—সেটা নেহাৎ তুচ্ছ নয়। বস্তুত অভিজ্ঞ দাদাদের সঙ্গে থেকে এবং জেলের সরকারী ব্যবস্থায় আমাদের কাঁচা এবং রকমারি চরিত্রে পাক ধরার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ইতিমধ্যেই একটা সাধারণ পাকা রঙের ছোপ ধরেছে। আমরা জেণ্টলম্যান, আমাদের জীবনযাত্রার একটা মিনিমাম ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুনির্দিষ্ট, রাজবন্দী হিসাবে আমাদের ব্যবহারের এবং সরকারের নিকট থেকে ব্যবহার পাওয়ার মধ্যে আমাদের আত্মসম্মানের দাবী সর্বাগ্রগণ্য, তার কাছে সুখ-সুবিধা তুচ্ছ, তার জন্য সংগ্রামে আপোষ নেই, এই সব ধারণা ও চেতনা আমাদের বাইরের জীবনের সকল বিভিন্নতাকে একাকার করে দিতে সুরু করেছিল—সর্বপ্রকারে একভাবে চলার প্রয়োজনীয়তা সকলের মনকেই কমবেশী দখল করেছিল।

যেদিন প্রথম সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশ করলুম সেই দিনই জেল কর্তৃপক্ষ যেন আমাদের প্রত্যেকেরই এক একটি সংসার সাজিয়ে দিলে। এটা মনে রাখা দরকার, ১৬ থেকে ২০ সাল এবং ২৩-২৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত অজস্র পরিমাণে নানা যন্ত্রণা ভোগ এবং অবিরাম মরণবাঁচন লড়াই করে রাজবন্দীরাই সরকারকে বাধ্য করেছিল রাজবন্দীদের জন্যে একটা নির্দিষ্ট মানের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করতে।

প্রত্যেকের জন্য একখানা লোহার খাট, চটের গদি ও কম্বল ছাড়া তোষক, চাদর ও বালিশ এল,—একখানি ছোট প্লেন টেবিল ও চেয়ার এবং একটি লকার (ছোট্ট আলমারী) দেওয়া হল,—কাপড় জামা-জুতা, সেভিংসেট, টুথপেষ্ট ও ব্রাস থালা-বাটি-গ্লাস এবং এ ছাড়া কারো ট্রাঙ্ক, কারো সুটকেস ফরমাস অনুযায়ী এসে গেল। এই initial expenses বাবদ বছরে ২৫০ টাকা নির্দিষ্ট ভাতা। তা ছাড়া পড়াশুনা, খেলাধূলা এবং কুচাকাচা জিনিসের প্রয়োজনে পৃথক মাসিক ভাতাও নির্দিষ্ট। আর খাই-খরচের সাধারণ ভাতা দৈনিক ১।০, কোন জেলে বা ১।৵০ আবার কোথাও বা ১।।৵০ পর্যন্ত।

প্রথম দিনই প্রত্যেকের জন্য এক প্যাকেট করে কাঁচি সিগারেট এসে গেল। সেটা খাই-খরচের বাজেটের অন্তর্ভুক্ত বলে' পরের দিন নিজেদের হাতে catering-এর বন্দোবস্ত হওয়ায় কয়েক প্যাকেট কম আনা হল—যারা খায়, তারা এক এক প্যাকেট পেল'। আমি দাদাদের সঙ্গে দোতলায় থাকি, সিগারেট খাই না। নীচের ঘরে রমেন দাস এবং সুরেশ ভরদ্বাজ সিগারেট খান—অংশুবাবু, রঞ্জিত, গণেষ ঘোষও খায় না। নীচের বারান্দায় রমেনবাবু, সুরেশবাবু, রঞ্জিত এবং আমি তাদের আড্ডা করলুম, এবং সেইখানে রমেনবাবু ও সুরেশবাবুর পাল্লায় পড়ে জীবনে প্রথম সিগারেট খেলুম এবং তারপর ক্রমে ধূমপানে পক্কতা লাভ করলুম।

প্রথম কয়েকটা দিনের বিচিত্র ঘটনার হুড়োহুড়িতে ভাববার অবসর ছিল না—পরে ধীরে সুস্থে বাইরের জীবনের সঙ্গে এই নতুন পরিবর্তনগুলোকে মিলিয়ে দেখে বেশ খানিক রোমাঞ্চ অনুভব করলুম—যেন পদোন্নতি হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জে থাকার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যেতুম। জীবনের সঙ্গে রোজ রাত্রে কলেজ স্কোয়ারে মিলতুম। সে এক খোট্টার রুটীর দোকান আবিষ্কার করেছিল—অক্সফোর্ড মিশনের বিপরীত ফুটপাতে—সেখানে বড় বড় মোটা রুটী পাওয়া যেত দু' পয়সা করে—তার সঙ্গে মিলতো ডাল, ভাজি (ঘ্যাঁট) এবং চাটনী (তেঁতুল গোলা) তিন চীজ। চার পয়সায় আমাদের পেট ভরে যেত। তাই খেয়ে মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে অতুলদা'দের বাড়ীতে (কে পি বোসের বাড়ী) নীচের একটা ঘরে চুপি চুপি গিয়ে শুয়ে পড়তুম। যেদিন একটু সকাল সকাল হত—সেদিন বরানগরে ফিরতুম। এক একদিন বরানগরে যাব বলে টালা পর্যন্ত গিয়ে আটকে যেতুম গোপাল ভট্টাচার্যের বাসায়—তিনি তখন আমাদের বাড়ী ছেড়ে টালায় ননী গোঁসাইয়ের বাড়ীতে ঘর ভাড়া করে মা ও ভাইদের এনেছেন। '২৪ সালে কলকাতায় চলে আসার পরও মাঝে মাঝে বরানগর যেতে গিয়ে রাত করে ফেলে গোপালবাবুর বাসায় ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে তুলে, তাঁর ভাইয়ের মশারি তুলে ঢুকে শুয়ে পড়তুম তার পাশে।

বাবুয়ানির নাম গন্ধ বিধাতা পুরুষ আমার কপালে লেখেননি—অনেকগুলো টাকাই তো নিজের হাতে ফুঁকেছি,—কিন্তু একটা দামী সাবান, এক শিশি এসেন্স কখনো ব্যবহার করিনি,—গ্যালারী ছাড়া, সবচে-র সস্তার টিকিট ছাড়া কখনো বায়োস্কোপ-থিয়েটার দেখিনি। যখন একটু বাবুয়ানি করার বয়েস এবং অবস্থা,—তখনই

তো ননকোপারেশন আন্দোলনে godly হয়ে মুখে চাপদাড়ি গজিয়েছে, পিওর খদ্দরের ধোক্তড় এবং নাগরা বা স্যাণ্ডেল সজ্জা—plain living and high thinkingএর যুগ।

এ-হেন আমি না চাইতেই কাঁচি সিগারেট, Snow, Cream—অন্তের কথায় দরকার কি?—আমার রোমাঞ্চ হবে না? না নিয়েও লাভ নেই, পচে যাবে পাওনা। নিয়ে রাখলে বরং কাজ দিতে পারে।

যাই হোক, মেদিনীপুরযাত্রী অনুকূলদা, গিরীনদা এবং অংশুবাবু (মলজার) আর বাঁকুড়াযাত্রী আমি, রঞ্জিত আর গণেশ ঘোষ একসঙ্গে হাওড়া ষ্টেশনে এলুম—সঙ্গে নেওয়া হল ট্রাঙ্ক, বিছানা ও তৈজসপত্র। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার পৃথক escort—একজন করে ইউরোপীয়ান officer ও ৪ জন করে armed police, হাওড়ায় কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকার পর পৃথক হলুম—যেন নতুন পৃথক সংসার ঘাড়ে পড়লো আমারই,—কারণ আমিই বয়োজ্যেষ্ঠ।

বিকালে খড়্গপুরে নামলুম—রাত্রে অন্য গাড়ীতে বাঁকুড়া যেতে হবে। পথে আমাদের খাওয়ার বরাদ্দ কত তাও জানি না—officer বেটা সব হাতিয়ে রেখেছে। আমাদের চা-ও খেতে দেয় না দেখে তাগাদা করতে হল। কিছু ব্যবস্থা হল সন্ধ্যার সময়। পুলিশগুলো কিছু খেলে কিনা, জানতেও পারলুম না। কিন্তু officer-এর মুখে মদের গন্ধ টের পাওয়া গেল—বেটার কিছু উপরি পাওনা হয়েছে।

গাড়ীর অনেক দেরী দেখে তাস নিয়ে বসা গেল, এবং রাগ চেপে officer বেটাকে নিয়েই ব্রীজ খেলে সময় কাটানো হল। রাত্রের খাবার সময় পার হয়ে গেছে, ক্ষিধে পেয়েছে—ব্যাটাকে বললুম। সে বলে এখানে খানার কোন ব্যবস্থা নেই। একটু ইতস্তত করে শেষে বললুম, দেখছি তোমার নামে রিপোর্টই করতে হবে—তোমার profit করা বেরিয়ে যাবে। বেটা গজ গজ করতে করতে চলে গেল, খাওয়ার ব্যবস্থা হল। ফাইটের হাতেখড়িও হয়ে গেল। লজ্জারও আড় ভাঙলো।

সকালে বাঁকুড়ায় পৌঁছে জেলে প্রবেশ করলুম। গেটের অফিসে নাম ধাম লেখা হল,—জিনিসপত্র তল্লাসী করে ছাড়া হল,—আমাদের ওজন নেওয়া হল,—তার পর চললুম ডেরায়। সেটা ফিমেল ওয়ার্ড—মেয়ে কয়েদী ছিল না বলে আমাদের জায়গা করা হয়েছে সেখানেই। একটা সেলের সারির পিছনে, জেলখানার একটা প্রান্তে খানিকটা খোলা জায়গার পর একটা বড় ঘর। ঐ খোলা জায়গাটার আর এক পাশে আর একটা বড় খালি ওয়ার্ডও আছে এবং একটা বড় ইঁদারা আছে। সেখানে আগে ধোবীখানা ছিল, এখন খালি।

আমাদের ঘরটার মধ্যে দু সারিতে অনেকগুলো মাটির বেদী ছিল, তার চারটে রেখে বাকিগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে,—ঐ ঢিবি চারটেকে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে আমাদের জিনিসপত্র রাখবার জন্যে,—এবং ঘরের আর একদিকে আমাদের জন্তে লোহার খাট, টেবিল প্রভৃতি আনা হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ঘরে থাকবে একজন "ফালতু"—কয়েদী attendant, সে সেখান থেকে কখনও বাইরে যেতে পারবে না। বাইরে থেকে আমাদের ঘরে যে সব কয়েদীরা জল বা খাবার নিয়ে আসবে,—ধোপা বা নাপিত আসবে,—সকালে একবার ডাক্তার আসবে, একবার সদলবলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসবে,—তাদের দরজা খুলে দেওয়ার জন্তে একজন warder সর্বদা মোতায়েন থাকবে বন্ধ দরজার বাইরে। ঘরটার অপরদিকের দরজা দিয়ে একটা ছোট্ট ঘেরা কম্পাউণ্ডের মধ্যে পায়খানা—সেই কম্পাউণ্ডের পিছনের দরজা দিয়ে মেথর যাতায়াত করবে—তারও সঙ্গের পাহারা সে দরজা খুলবে এবং বন্ধ করবে। সকালে ও বিকেলে দুবার সামনের দরজার পাহারা ওয়ার্ডার আমাদের বাইরের কম্পাউণ্ডের মাঠে বেড়াতে কিম্বা Badminton খেলাতে নিয়ে যাবে, দরজায় তালাবন্ধ থাকবে, ফালতু ওয়ার্ডার আমাদের সঙ্গে থাকবে এবং ফিরিয়ে এনে আবার তালাবন্ধ করবে। অদ্ভুত জীবন—কতদিন চলবে কে জানে!

জেলার জ্যোতির্ময় বসু সেকেলে ডাকসাইটে ছুঁদে জেলার, পাঁড় মাতাল এবং জেলখানার মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর। সে কথা পরে হবে।

২।১ দিনের মধ্যেই তিনি আমাদের গরম জামা নেই দেখে গায়ের মাপ নেওয়ালেন—বললেন, এখানে ভয়ঙ্কর শীত পড়ে, গরম জামা না হলে চলে? তারপর ২।১ দিনের মধ্যেই জামা নিয়ে এলেন, খেলো পটুর half-lining দেওয়া জামা—দেখে গা জলে গেল। ওর চেয়ে গরম জামা না থাকাও ঢের ভাল। কিন্তু ঝানু অমায়িক বচনের কাছে হার মানতে হল। বুঝলুম, ডবল দামের বিল দিয়ে অনেকগুলো টাকা মারবে। ছেলেমানুষ পেয়ে ভোগা দিয়ে আরো কত মারবে কে জানে! মনটা খিঁচড়ে গেল।

মাঝে মাঝে তিনজনেই তাস নিয়ে বসি—আর পৃথক ভাবে আমি একটু পড়াশোনার চেষ্টা করি—বাঁকুড়া জেলেই প্রথম প্রায় ৩০ বছর বয়েসে শরৎ চাটুজ্যের গ্রন্থাবলী পড়লুম, ইতিপূর্বে টুকরো টাকরা ছাড়া পড়িনি। রঞ্জিত বেশ ধীরস্বভাব, সে ফালতু আশুকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার মতন ভাবে গল্প করে কাটায়। বিষ্ণুপুরে রেল থেকে নেমে সিওড়ের আশু নাপিত বললেই সবাই চিনবে। সে অমাবস্যার রাত্তে কাগের ঠ্যাং এনে দিলে তালা খুলে দিতে পারে এমন গুণীন! রঞ্জিত গদগদ হয়ে শোনে। আর গণেশ যেন একটা দুরন্ত স্কুল-পালানো ছেলে, একটা না একটা হুড়োহুড়ি সৃষ্টি করে নিয়েই আছে। একটা বেরাল ছিল পাকা চোর—আমাদের ঢাকা দেওয়া খাবার সকলের সামনে থেকে সে ঢাকা সরিয়ে কিছু খেয়ে পালায় রোজ—গণেশ তাকে ধরবার জন্তে একটার পর একটা প্ল্যান নিয়ে চেষ্টা করে চলেছে—হঠাৎ হয়তো Badminton Racket ছুঁড়ে তাকে মারতে গিয়ে ঢাকা খাবারই ছত্রাকার করে দিলে।

আমাদের ঘরটার মতন ঘর বোধ হয় কোনো জেলে আর একটা নেই। ঘরটা খুব পুরানো—জেল তৈরী হওয়ার আগেকার। পিছন দিকের প্রকাণ্ড দরজাটা এবং জানালাটা পুরানো সেকেলে—জানালাটাতে খড়খড়ি লাগানো এবং দুটোরই ফ্রেম কাঠের। দরজার ফ্রেমটা ৮ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি মোটা বীম দিয়ে তৈরী, তাতে লাগানো আছে প্রকাণ্ড দুটো কাঠের পাল্লা। সেই কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে জেলের মোটা গরাদেওয়ালা একটা প্রকাণ্ড দরজা গেঁথে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে তার হুড়কো (লোহার) বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় রাত্রে। রাত্রের প্রয়োজনের জন্তে ঘরের এক কোণে দুটো টুকরী থাকে। লোহার হুড়কোটা যে হুকে আটকে তালা ঝোলানো হয়, সে হুকটা মোটা মোটা ইস্ক্রুপ দিয়ে দরজার কাঠের ফ্রেমের একদিকে আঁটা।

একদিন দেখি, গণেশ লোহার খাটের ডাণ্ডা ছত্রীর একটা ডাণ্ডা খুলে নিয়ে জানালার ছিটকিনি আটকাবার হুকের মধ্যে গলিয়ে চাড় দিয়ে ভাঙছে। বললে, দেখুন না, কি করি। হুকটাকে খুলে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে পিটিয়ে সোজা একটুকরো লোহার পাত করে নিয়ে তার একটা ধার পিছনের সিঁড়ির ধাপে জল দিয়ে ঘষতে সুরু করে দিলে। বলে, দেখুন না,—শালাকে ইস্ক্রুপ ড্রাইভার করে দরজার হুড়কোর ইস্ক্রুপ খুলবো। সে অসীম ধৈর্য্যসহকারে ঘষে; আমরা বলি, একটু ঠাণ্ডা আছে, থাক্ ঐ নিয়ে।

একদিন দেখি রাত্রে পিছনের দরজায় তালা লাগানোর পর সে হ্যারিকেন থেকে একটা পালকে করে তেল নিয়ে ইস্ক্রুপগুলোকে ভিজিয়ে তার ইস্ক্রুপ ড্রাইভার চালাতে সুরু করেছে—গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে। কয়েক ঘণ্টা খেটে শেষে একটু ধূলো দিয়ে ইস্ক্রুপের তেল ঢাকা দিয়ে দিলে। এমনি চললো দিনের পর দিন—আমরা দেখিও না, কিছু বলিও না! থাক্ ঐ নিয়ে যতদিন পারে।

ছুটো মাটির ঢিবির মাঝের গলিতে মেঝের বিছানা করে আশু শোয়। তার কয়েদী-খানা জেলের কিচেন থেকে আসে, আমাদের রান্না হয় হাসপাতালে। আমাদের খানার কিছু ভাগও আশু পায়। সে বেশ খুসীই আছে। কিন্তু গণেশের কাণ্ডটা তাকে লুকিয়েই করতে হয়।

একদিন রাত্রে আমাদের খাওয়াদাওয়ার পর আশুকে খাইয়ে শুইয়ে গণেশ দরজা নিয়ে পড়েছে। আশু এটুকু টের পেয়েছে যে বাবুরা দরজার কাছে কি যেন করে। সে উঁকি মেরে দেখার জন্যে ঘুমিয়ে পড়ার ভাণ করে পড়ে থাকে। একটু মাথা তুললেই দেখতে পায় রঞ্জিত সামনে বসে আছে। সেদিন কিন্তু ঘটনাটা হল একটু অন্যরকম। গণেশ আমাদের ডাকলে—আশু ঘুমিয়েছে দেখে আমরা উঠে গেলুম। ইস্ক্রুপ ঘুরেছে, খুলে গেছে। কিন্তু হুড়কোর মাথাটা পাশের দেওয়ালে এমন ঠেসে ঢুকেছে যে তাতেই দরজাটা খোলা যাচ্ছে না। কাজেই দেওয়ালের বালি কুরে কুরে একটা নালীর মত করা হল—দরজাও খুললো!

ইতিমধ্যে রঞ্জিত আশুকে নিয়ে একদিন এক কাণ্ড বাধিয়েছিল। আমরা যে মাঠে খেলতে যাই সেখানে একটা বড় বেলগাছ ছিল এবং তার গোড়াটা মাটি দিয়ে বাঁধিয়ে একটা বেদীর মত করা ছিল। একদিন সেটাকে একটু গোবরমাটি দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে, আশুকে দিয়েই। আশু জিজ্ঞাসা করেছে, ওখানে কি হবে? রঞ্জিত বলেছে, আসছে অমাবস্যায় আমরা ওখানে কালীপুজো করবো, আর নরবলি দোব। বেশ নিখুঁত কালো একটা লোক চাই। তা অন্য লোক পাওয়া না গেলে তোকে দিয়েও হবে। তুইও তো বেশ কালো আছিস। তুই স্বর্গে চলে যাবি।

আশুর তো শুনে পিলে চমকে গেছে। সে যা কিছু প্রশ্ন করে, রঞ্জিত আরো রং চড়িয়ে জবাব দেয়। শেষে আশু কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার মা আছে—আমি জেল থেকে আমার চেয়ে কালো একটা লোক এনে দোব—আমাকে মারবেন না। রঞ্জিত বলে, মা থাকলেও আমরা শোধন করে নোব। আশু আরো কাঁদে।

যে দিন দরজা খোলা হয়েছে,—সেদিন আশু ঘুমের ভাণ করে দেখেছে। দরজা খুলে একখানা চেয়ার বার করে তার ওপর উঠে কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের মাথা ডিঙিয়ে দেখা গেল না। তারপর চেয়ারের পাশে আমি দাঁড়ালুম এবং চেয়ার থেকে আমার কাঁধে উঠে গণেশ দেখলে, দেওয়ালের ওপারে সামনেই এক লাঠি এবং হ্যারিকেন নিয়ে এক ওয়ার্ডার বসে পাহারা দিচ্ছে। সুতরাং ঘরে ফেরা হল। হুড়কোর ইস্ক্রুপও এঁটে দেওয়া হল। কিন্তু বালিভাঙা নালী মেরামতের উপায় কি?

ঘরে পানের সরঞ্জাম ছিল। খানিক চূণ নিয়ে বালির সঙ্গে মেখে নালী ভরাট করা হল, কিন্তু দেওয়ালের ময়লা হলদে রংয়ের সঙ্গে মিললো না—যেন দাঁত বার করে রইলো। ভেবেচিন্তে একটু খয়ের গুলে লাগিয়ে দিলুম,—কিন্তু তাতে যেন সাদা দাঁত লাল হল মাত্র। শেষে অগত্যা তারই ওপর কিছু ধূলো চাপা দিয়ে তালাটাকে ঝেড়ে ঝুড়ে দুর্গা বলে শুয়ে পড়লুম।

ভোরে জমাদার দরজাটা খুলে দিয়ে যায়। রোজকার মতন সেদিনও খুলে দিয়ে গেছে—"দাঁত" নজরে পড়েনি। দিনের বেলা আমরা আর একটু মেরামত করে ফেললুম।

অনবরত দরজা খোলা আর বন্ধ করার ডিউটি দিতে দিতে সামনের দরজার পাহারা ওয়ার্ডার একটু ঢিলে হয়ে গেছে। রোজকার মতন সেদিন সকালে যখন সে আমাদের মাঠে চরাতে নিয়ে গেছে,—দরজাটা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছে। আমরা ফিরে এসে দেখি আশু নেই। ওয়ার্ডারের মহা বিপদ! সে আমাদের বন্ধ করে রেখে ছুটলো আশুর খোঁজে। পরে জানা গেল, দরজা খোলা পেয়েই আশু এক ছুটে পালিয়ে গেছে একেবারে গেটে।

সেখানে গিয়ে গেটের দরজার গরাদে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদে আর বলে, জীগ্গির গেট খুলুন, আমাকে বাঁচান। জেলার ভেতর থেকে ধমক দেয়, বলে, কি হয়েছে বল,—ও বলে, আগে আমাকে বাঁচান,—সব বলছি। তারপর তাকে তালা খুলে অফিসে নিয়ে গেলে সে বলেছে,—স্বদেশী বাবুরা ভারি গুণীন,—কালী সাধনা করে,—রোজ রাতে দরজার তালা খুলে সারা জেল ঘুরে বেড়ায়, এই অমাবস্যেতে কালীপুজা করবে,—আমাকে কেটে নরবলি করে দিবে বলেছে।

দারোগা তো এ সব কথা বিশ্বাস করতে পারে না,—কিন্তু তবু সাবধান হওয়া ভাল। সেই দিনই আমাদের সে ঘর থেকে সরিয়ে ইঁদারার ধারের বড় ঘরটাতে নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরটারও দরজাটা কাঠের,—তার ওপর গরাদে দেওয়া লোহার দরজা বসানো। ইঁদারার পাড়ের চারিদিকে বেশ চওড়া করে শানবাঁধানো। প্রকাণ্ড ঘর, বড় বড় জানালা অনেকগুলো, এক এক জানালায় সামনে এক একখানা খাট পড়লো। ঘরে দিনরাত বন্ধ থাকতে হয় না, উঠান খোলা, আগের চেয়ে অনেক ভালো। রাত্রে ঘরে তালাবন্ধ করা হয়, ভোরে খুলে দেওয়া হয়, এবং ওয়ার্ডার বেড়াতে নিয়ে যায় আগের মাঠেই। ঘরটার সঙ্গে সংলগ্ন একটা ছোট ঘরে ঢুকরী আছে,—পায়খানা। সেটারও বাইরের দিকে একটা গরাদে লাগানো খোলা জানালা আছে—সেটাকে কম্বল টাঙিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। একজন নতুন "ফালতু" এল,—তরুণ—জাতে ভূমিজ—নাম মনুয়া। নম্র, সৎ, বুদ্ধিমান, এবং গান গাইতে পারে।

সেখানে গিয়েই গণেশের চোখের অসুখ হল—পড়াশুনো মোটেই করতে পারে না—মাথা ধরে, চোখ টনটন করে—ভীষণ অবস্থা—

কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে চোখ পরীক্ষা করানো একান্ত দরকার। দরখাস্তের পর দরখাস্ত চললো এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তাকে কলকাতায় পাঠানো হল।

তারপরই সেখানে এলেন সত্যেনদা—সত্যেন মিত্র। তিনি খানিক জায়গা পর্দা দিয়ে ঘিরে নিলেন—একটু সাধন ভজন করেন। তার কয়েকদিন পরেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হল অজিত মৈত্র এবং অম্বিকা থাঁকে। দমদমার কাছে রেল লাইনের ওপর এক শান্তি চক্রবর্তীকে কেউ ঘাড়ে ভোজালীর কোপ মেরে খুন করেছিল, আগে বলেছি। সেই খুনের দায়ে ধরা পড়ে মামলায় খালাস হয়ে অর্ডিনান্সে আটক হয়ে এঁরা দুজন এসেছেন। দুজনই তরুণ—অজিত নিতান্ত ছেলেমানুষ, আর অম্বিকা একটু বড়।

সত্যেনদার একটু অসুবিধা বোধ ছিলই এবং এসেই বদলীর জন্যে তিনি লেখালেখি সুরু করেছিলেন। এখন আরো অসুবিধা বোধ হল এবং তিনি জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ঐ ঘরের সংলগ্ন পাশের আর একটা বড় ঘরে একা থাকার বন্দোবস্ত করলেন এবং কয়েকদিন পরেই বদলী হয়ে গেলেন।

তিনি দৈনিক দশ টাকা food allowance পান—জেল থেকে মাছ-মাংস-ডিম-দুধ নেন, ফরমাস দিয়ে কিছু কিছু রান্না করিয়ে নেন, একটা ইকমিক-কুকারও আছে, আর কলকাতা থেকে নানা রকমের tinned food আনান—রোজ দশ টাকা খরচ করা চাইতো! কাজেই একটু সাধন-ভজনের জন্যে পৃথক না থাকলে চলে না।

যাই হোক, তিনি যাওয়ার পর এক দিন আমরা চারজনে ইঁদারার পাড়ে বসে জটলা করছি, আর মনুয়ার গান শুনছি—স্নানের সময় হয়েছে। মনুয়া গাইছে—

আর বাঁশী বাজাও শ্যাম কেনে
ও শ্যাম কেনে হে
তুমার বাঁশী কুল চোরা জালা দেইছে পানে হে—
লিব তুমার বাঁশী কাড্যে—
(আর) যবুনাতে দিব ছাড্যে—হে—
লিব তুমার চূড়া খোড্যা করবো অপমানে হে···
তুমার বাঁশীর এমনি ধারা
(আর) শ্রীরাধিকার মন চোরা হে—
(এই) পোচাই শেখকে চরণ ছাড়া ক'রো না আর যেনে হে।

পচাই শেখ একজন কৃষ্ণভক্ত ভূমিজ জাতীয় মুসলমান জোলা তার বাঁধা আরো গান মনুয়া গায়। সেই পচাইকেও মনুয়ার সঙ্গে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, এক মিথ্যা মারামারির মামলায়।

আমরা তেল মাখছি, মনুয়া পিঠে তেল মাখিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় ডেপুটী জেলার হাজির—গেটে অফিসে পুলিশ সাহেব (S. P. Bankura) বসে আছেন আমাকে আর রঞ্জিত বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আমরা বললুম, একটু বসতে বলুন, আমরা স্নানটা সেরেই যাচ্ছি। তিনি ফিরে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক slip নিয়ে ফিরে এলেন তাতে পুলিশ সাহেব লিখেছেন,—You are ordered to come at once.

আমরা পরামর্শ করে slip-এর উল্টো পিঠে লিখে দিলুম—We shall not go untill we finish our bath unless we are physically forced to go.

ডেপুটী জেলার slip নিয়ে চলে গেল এবং আবার একটু পরে ফিরে এসে দাঁড়িয়ে থাকলো—বললে চান করে নেন, আমি দাঁড়াচ্ছি। আমরা বেশ ধীরে সুস্থে দেরী করে স্নান সেরে গেলুম। পুলিশ সাহেব রেগে লাল হয়ে বসে আছে। আমি আগে অফিসে ঢুকলুম। সাহেব জিজ্ঞাসা করলে Narayan Banerjee? আমি—yes. সাহেব একখানা চোথা এগিয়ে দিয়ে বললে—Here are the charges against you—you can write your answer here if you like—বলে চোথার নীচের দিকটা দেখিয়ে দিলে। চার্জ হল—Conspiracy to wage War against His Majesty's Government, organising terroristic activities ইত্যাদি—

জবাব দিলুম—The charges are vague, false and without any foundation whatsoever. You note it down if you like.

রাগে গর গর করতে করতে ডেপুটী জেলারকে ইসারা করলে, ডেপুটী জেলার আমায় বললে, আসুন—আমি বাইরে এলে রঞ্জিত ঘরে ঢুকলো। সে বাইরে থেকে সব শুনেছিল—আমারই মতন জবাব দিয়ে চলে এলো।

ঘরে এসে জল্পনা কল্পনা চললো—ব্যাটার নামে রিপোর্ট করতে হবে—একেবারে বড়লাটের কাছে—আমরা ভারত সরকারের বন্দী—ব্যাটা আমাদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছে—কৈফিয়ৎ দিতে হবে, ঘাট মানতে হবে।

আনাড়ী তো! Caseটা গোছাতে পারছিলুম না। order মানাতে পারেনি, ওতেই তো জব্দ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত খেয়াল হল, বসতে চেয়ার তো দেয়নি!

একটা লড়াইয়ের জন্যে মন ছটফট করছিল। ঠিক করা হল, ৭ দিনের নোটিশ দিয়ে hunger strike করবো যদি ব্যাটা না মাপ চায়।

দরখাস্ত দেওয়া হল। ৭ দিন কেটে গেল, কোন জবাব নেই। স্থির হল, hunger strike সুরু করবো। অজিত এবং অম্বিকা বললে, আমরাও যোগ দোব। আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলুম, বরং তোমাদের অস্ত্রত সরিয়ে নিতে বলি, তোমরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ো না। তারা বললে আমরা এ জেলে থাকতে আপনারা hunger strike করলে আমরা পৃথক থাকলেও যোগ দোবই।

সুতরাং আমাদের দুজনের নামে hunger strike ঘোষণা করে Superintendent-এর কাছে লিখে পাঠানো হল, ওরা দুজনও লিখে দিলে আমাদের প্রতি সহানুভূতিতে ওরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে।

গায়েও কিছুদিন আগে থেকে চুলকানি হয়েছিল এবং সেজন্যে সকালে চিরেতা ভিজে আর মিছরির জল একটু করে খেতুম। স্থির হল, ওটা চালিয়ে যেতে হবে। রঞ্জিত বললে, ঐটুকু থাকলে দু' মাস চালানো যাবে।

Hunger Strike-এর খবর পেয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, ডাক্তার এসে লেকচার সুরু করলে। শেষ পর্যন্ত S.D.O.—আম

বোধ হয় সত্যেন দত্ত—এসে বোঝাতে লাগলেন,—সত্যেন মিত্র আমার বন্ধু, সুতরাং আমি আপনাদের দাদার মতন, আমার কথা শুনুন—রিপোর্ট যখন করেছেন, S.P.-কে কৈফিয়ৎ দিতেই হবে—সেই ওর শাস্তি ইত্যাদি—

আমরা সব কথা উড়িয়ে দিলুম। রোজ দু'বেলা রীতিমতন খানা তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখে, আবার দুবেলা যেমন-কে-তেমন আছে দেখে সরিয়ে নিয়ে যায়। কয়েক দিন এমনি চলার পর একদিন সকালে ডাক্তার এসে খবর দিয়ে গেল, আজ আপনাদের পৃথক পৃথক সেলে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে, একটু পরেই নিতে আসবে—আমি পালাই।

আমরা পরামর্শ করে দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে তার ওপর ঠেসে লোহার খাট, টেবিল, চেয়ার, ট্রাঙ্ক স্তূপাকার করে আটকে রেখে যে যার বিছানায় শুয়ে থাকলুম।

খানিক পরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে এসে দরজা ঠেলাঠেলি করে জানালায় এসে আমাদের বললে, দরজা খোল। আমরা চুপ করে পড়ে থাকলুম। শেষে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট চলে গেল এবং খানিক পরে S.P. এবং armed force নিয়ে ফিরে এল। তারাও দরজা ঠেলাঠেলি করলো, খুলতে পারলে না। শেষে S.P. আমাদের ভয় দেখিয়ে warning দিয়ে সেপাইদের জানালার সামনে সাজালে—তারা গুলী চালাবার ঢংয়ে হাঁটু মুড়ে বসলো। আমরা দেখছি শুয়ে শুয়ে নির্বিকার।

সুতরাং এ ঢং ছেড়ে আবার দরজা ঠেলাঠেলি করে শাবল এনে দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিয়েও সুবিধে করতে না পেরে শেষে দরজার পাশের দেওয়াল ভাঙ্গতে সুরু করলে। S. P. রেগে আগুন হয়ে গেছে,—এদিকে দরজার ফাঁকেও শাবল চালিয়ে ঝাঁকি দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত দরজা একটু ফাঁক হল এবং তার মধ্যে শাবল চালিয়ে খাট সরাবার চেষ্টা করতে করতে খাট সরালো—সবাই মিলে ঠেলে দরজা খুলে ফেললে।

S. P. আমাদের খাটের কাছে এসে একে একে জিজ্ঞাসা করলে will you get up or not? আমরা বললুম, we won't। S. P. সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের মুখের দিকে চেয়ে ইসারায় permission চাইলে গায়ে হাত লাগাবার—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইসারায় বারণ করলে। ওরা থোঁতা মুখ ভোঁতা করে গর গর করতে করতে চলে গেল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও দুঃখ এবং সহানুভূতি প্রকাশ করে lecture দিয়ে চলে গেল। আমরা উঠলুম—যেন লড়াই ফতে করেছি।

আমাদের সেলে পোরা হল না, কিন্তু ২।১ দিন পরেই আমার বদলীর অর্ডার এল, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেই। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং spokesman বলে আমাকে পৃথক করার বন্দোবস্ত হল। রঞ্জিত বলে দিলে, আমরা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক চালিয়ে যাবো, যতদিন না আপনার কাছ থেকে খবর পাই—আমরা বলবো আমাদের সঙ্গে পৃথক ফয়শালা করলে চলবে না, ফয়শালা করতে হবে নারাণ বাবুর সঙ্গে, আমরা তাঁর ফয়শালা মেনে নোব।

গেটে গিয়ে দেখি, রঞ্জিতের দাদা এসেছেন রঞ্জিতের সঙ্গে interview করতে। তাঁরা গোড়া থেকেই চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মঞ্জুর হয়েছে হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের পর, যাতে বাড়ীর লোকের পীড়াপীড়িতে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছাড়ে। সরকারের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি।

যাবার সময় একখানা ছোট চিঠিতে আমাদের খবর লিখে, আলমবাজারের ধীরেন চাটুজ্যের নাম ঠিকানা দিয়ে হাতাওয়ালা সোয়েটারের হাতা উলটে তার মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছিলুম, পথে কোনো রকমে সেটা ফেলে দিতে পারলেও হয়ত কেউ কুড়িয়ে নিতে পারবে এবং ঠিকানায় পাঠিয়েও দিতে পারবে।

আমার সঙ্গে চললেন জেলের ডাক্তার এবং I B officer—নাম বোধ হয় সুরেন লোধ। গাড়ীর কিছু দেরি ছিল, দেখি রঞ্জিতের দাদাও সাক্ষাৎ সেরে এসে গেছেন। ভরসা হল,—কিন্তু তিনি পাশের গাড়ীতে উঠলেন। কিন্তু হাওড়ায় নামলুম একসঙ্গে—এবং তিনি একটু দূরে দূরে থেকে পিছন পিছনই চলতে লাগলেন আমাদের দিকে নজর রেখেই।

মোটরে ওঠার সময় আমি এক ফাঁকে চিঠিটা ফেলে দিলুম ঠিক মোটর ছাড়ার সময়। রঞ্জিতের দাদা চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ধীরেন চাটুজ্যের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি সেটা কাগজে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন—কাউন্সিলে তা নিয়ে প্রশ্ন করাও হয়েছিল। সুতরাং কাজ হয়েছিল,—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যখন ষ্টেট ইয়ার্ডেই নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল, তখন সবাই এসে ঘিরে ধরলেন খবরের জন্তে এবং খাওয়াবার জন্তে। তখনও ওঁরা জানেন না, আমি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করে এসেছি। তখন উপেনদা, অমরদা (চাটুজ্যে) প্রভৃতিকে ফিমেল ইয়ার্ড থেকে নিয়ে এসে ষ্টেট ইয়ার্ডেই সকলের সঙ্গে রেখেছে। সকলে বাঁকুড়ার কথা শুনলেন, এবং তারপর নানা মন্তব্য এবং ষ্ট্রাইক ছাড়ার পরামর্শ এবং খাওয়াবার জন্তে পীড়াপীড়ি শুরু হল। তাঁদের সুখের সংসারে এ কি উৎপাত!

আমি বিপদে পড়লুম। একদিক থেকে উপেনদার ঠাট্টা এবং পীড়াপীড়ি, আর একদিক থেকে অমর ঘোষের (অতুলদার ভাই) গুরুগম্ভীর মন্তব্যের মাঝখানে টাইট হয়ে বসে থাকাটা যে কি রকম বিপন্ন অবস্থা, তা কেউ হয়ত বুঝবেন না। জলতেষ্টা পেয়েছে, অথচ বলতে পারছি না! শেষ পর্য্যন্ত ওঁরা এক কাপ লেবুর রস এনে চেপে ধরে মুখে ঢেলে দিয়ে বললেন, এতে দোষ হবে না, এ জলেরই সামিল। বললুম বাঁকুড়ায় ওদের কে পীড়াপীড়ি করে ফলের রস খাওয়াচ্ছে? মনটা খিচড়ে গেল।

ওদিকে দাদারা গেটে লিখে পাঠিয়ে বন্দোবস্ত করছিলেন, একটু পরেই লোকজন এল, আমাকে লটবহর সমেত নিয়ে গেল হাসপাতালে। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। দাদারাও—

হাসপাতালে একটা বড় ঘরে তখন একা থাকতেন কুমিল্লার অতীন রায়,—যিনি পরে কুমিল্লায় এক লেবার হাউস সংগঠন করেছিলেন। তিনি অনুশীলন পার্টির লোক, কিন্তু বলশেভিক বিপ্লব তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। কুমিল্লার অমূল্য মুখার্জী (চিটাগঙ বোমার মামলার শাকল মুখার্জির দাদা), যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি অতীন বাবুর সঙ্গে লেবার হাউসে যোগ দিয়েছিলেন। অনুশীলনের এই Junior Sectionই বর্ত্তমান R. S. P.র গোড়া।

যাই হোক, আমাকেও সেই ঘরেই নিয়ে তুললে—সেটাই রাজবন্দীদের রাখার ঘর। অতীন বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। সন্ধ্যার আগে কয়েকজন দাদা ষ্টেট ইয়ার্ড থেকে দেখতে এলেন এবং আর একবার লেকচার, মন্তব্য এবং খাওয়াবার জন্তে পীড়াপীড়ি চললো।

শেষ পর্যন্ত আবার এক কাপ ফলের রস,—এক চুমুক খেয়ে রেহাই পেলুম। সে রাতটা অতীন বাবুর সঙ্গেই কাটলো।

সকালেই অতীন বাবুকে সরিয়ে নিয়ে গেল। কয়দিন একা থাকলুম একটা বুড়ো ফালতু গায়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়,—স্নান করিয়ে দেয়, আর বকর বকর করে সহানুভূতি প্রকাশ করে। ৮।১০ দিনে দুর্বল হয়েছি, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে উঠে ২।৪ মিনিট পাইচারী করি। ওজন ক্রমশই কমছে। মাথাটা হালকা লাগে।

দু'-এক দিন পরেই আবার আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড নামক একটা ছোট ঘরে। সেখানে attendant একজন জাপানী কয়েদী, নাম ওকিমা, সম্ভবত ছদ্মনাম, ভাল ম্যাজিসিয়ান। তার কাছে ২।৪টে তাসের খেলা শিখলুম। পরে শুনেছিলুম, ডাক্তারের বন্দোবস্তে, ওকিমা আমাকে জল খেতে দিত গ্লুকোস মেশানো জল। কথা বলতো পরিষ্কার বাঙ্গলা।

১১ দিন হল। বাঁকুড়ার ওদের কথা ভাবি, কূলকিনারা পাই না—কিন্তু বুঝি, ওরা টাইটই আছে। আমার মনের অবস্থা বস্তুবিষ্যতি ভন্তবিষ্যতি। এমন সময় হঠাৎ এলেন non-official visitor মণিলাল নাহার (বিজয় নাহারের কাকা বোধ হয়)। তিনি বললেন, সরকার বাঁকুড়ার পুলিশ সাহেবের কৈফিয়ৎ তলব করেছিল, তিনি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, ডেপুটী জেলার নাকি তাঁকে বলেছিল, The state prisoners were not actually bathing when they were summoned to the office—তাই তিনি misled হয়েছিলেন—ইত্যাদি—

মণিলাল নাহার খুব সহানুভূতি প্রকাশ করে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নানা কথা বোঝালেন, বললেন, বাঁকুড়ার ছেলেরা কারো কোন কথা শুনতেই চায় না, বলে, নারান বাবুর কাছে যান, তিনি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছেড়েছেন জানলেই আমরা ছাড়বো, না হলে ছাড়বো না। এ অবস্থায় আপনার ঘাড়েই সব দায়িত্ব। পুলিস সাহেবকে যে ডেপুটী জেলারের ঘাড়ে অনেকটা দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে, এটা তার পক্ষে যথেষ্ট লজ্জার কথা। এর চেয়ে বেশী কিছুর জন্যে জেদ করে বসে না থেকে—ছেলেগুলোকে কষ্ট না দিয়ে, আপনার উচিত একটু নরম হওয়া। এত অন্যায় দুনিয়ায় আছে যে, একটু compromise করে না চললে বেঁচে থাকাই অসম্ভব—ইত্যাদি—তিনি বললেন, আপনি কিছু খান, প্রথমে এক গ্লাস সরবৎ খান, আমি দেখে যাব।

অনেক ভাবলুম দাদাদের মতিগতির কথাও ভাবলুম এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কথায় রাজী হলুম। ইতিমধ্যেই তাঁর ইঙ্গিতে এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ এসে গেছে। চোখ কাণ বুজে ওষুধ গেলা করে সেটা খেয়ে নিলুম। নাহার অনেক ভাল কথা বলে বিদায় নিলেন।

তারপর এক চিঠি লিখলুম গভর্ণমেণ্টের কাছে এবং যেন আহত বিবেককে চাঙ্গা করার জন্যেই তাতে লিখলুম, অতঃপর এ ধরণের ব্যাপার ঘটলে I shall take the law into my own hands and not wait for the government —ইত্যাদি—

তারপর চিন্তা হল বাঁকুড়ার ওদের জানাবো কি করে? অন্য কারো কথায় ওরা বিশ্বাস করবে না—অথচ রাজবন্দীদের মধ্যে পত্রালাপ নিষিদ্ধ। যদি আমার চিঠি ওদের কাছে এই বিশেষ অবস্থার জন্যে পৌঁছায়ও,—অন্ততঃ কয়েক দিন দেরী হবেই কর্তাদের decisionএর জন্যে। ভেবে চিন্তে বাঁকুড়া জেলের Superintendent Dr. manuএর নামে এক চিঠি লিখে সব জানালুম এবং লিখে দিলুম, চিঠিটা বন্দীদের না দেখালে তারা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছাড়বে না। ওদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছাড়তে আরো দুদিন দেরী হয়েছিল।

হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের কাণ্ডকারখানার একটা ভাল অভিজ্ঞতাই হল। প্রথম দিন পেট চুঁই চুঁই করে,—দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত অভ্যাসবশে ৫০ বার খাওয়ার কথা মনে হয়,—তৃতীয় দিন থেকেই easy হয়ে আসে।

হাসপাতালে আমাকে ইউরোপীয়ানদের ওয়ার্ডে সরাবার পর রাজবন্দীদের ঘরে আনা হয়েছিল নলিনী গুপ্তকে,—খোঁড়া নলিনী গুপ্ত,—সদ্য গ্রেপ্তার হয়ে এসেছিলেন। বিলেত, রাশিয়া প্রভৃতি ঘুরে এম এন রায়ের লোক বলে পরিচয় দিয়ে তিনি গোপনে ভারতে ফিরে কিছু দিন সপত্নীপ্রতিম দুই বিপ্লবীদলের নেতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা বলে জল ঘুলিয়ে পরে গ্রেপ্তার হয়েছেন। দাদাদের কারো মতে তিনি একজন political adventurer মাত্র—কারো মতে international spy,—আরো কত কি। ভগবান জানেন। তবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিনা পাসপোর্টে এদেশ-ওদেশ করে বেড়ালো,—ধরা পড়ায় পরেও পালালো,—এমনি নানা কথা তাঁর নামে প্রচলিত ছিল।

হাসপাতালে কয়েক দিন রাখার পর তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শুনেছিলুম তাঁর জেল হয়েছিল,—কিন্তু পরে আবার শুনেছিলুম, তিনি আবার পালিয়ে ভারত ত্যাগ করেছেন!

আমাকে কিছু দিন হাসপাতালে রেখে chicken soup খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। ওকিমা সুপ তৈরী করার পর মাংসটুকু রেঁধে খেতো গোপনে, আমাকেও এক আধ টুকরো দিত। কয়েক দিনের মধ্যেই শরীর ভাল হল, ওজন বাড়লো, তারপর আমাকে সরানো হল misdemeanant yard-এ। সেটা Bomb yard-এর পাশেই।

খাওয়ার ব্যবস্থা হল State-yard-এর সঙ্গেই—সেখান থেকেই ফালতুরা খাবার দিয়ে যেত। ঝাল একেবারে বাদ, ডাল তরকারী সবই মিষ্টি, এক দিন বিরক্ত হয়ে কি বলেছি,—ফালতুরা গিয়ে কি বলেছে, কে জানে—উপেনদা এক slip পাঠিয়েছেন,—"ভায়া হে, ১ টাকা ৬ আনায় এর চেয়ে ভাল খাওয়া হয় না!"

রাগে গা জ্বলে গেল,—ডেপুটী জেলারকে ডেকে বললুম,—আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে Bomb yard-এর ভূপেন দা'র সঙ্গে—নইলে আমি আবার খাওয়া বন্ধ করবো। তাই হল।

এদিকে নৃপেন মজুমদারকে আনা হল সেই ইয়ার্ডে এবং আমাকে পাঠানো হল ঐ State yard-এই। রগড় হল বেশ—সকলে আলাদা খায়দায়, আমি আলাদা। ডেপুটী জেলারকে এবং ভূপেনদাকে বলে গিয়েছিলুম, আমার খানা Bomb yard থেকেই যাবে, নইলে খাবো না। তাই চললো দিন দুই-তিন। আমি ওদের চেয়ে ভালই খাই—লজ্জা চেপে থাকি। ব্যাপারটা হল অত্যন্ত দৃষ্টিকটু—উপেনদার একটু জব্দ-জব্দ ভাব। শেষে একদিন অমরদা আমাকে ডেকে কাছে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে সন্তর্পণে বললেন, এখানে খেলে কি তোমার কষ্ট হবে?

শোনো কথা! উপেনদাকে লক্ষ্য করে অমরদাকে দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়ে রাগ জল হয়ে গেল। ডেপুটী জেলার এবং ভূপেনদাকে লিখে দিয়ে ওখানেই ভিড়ে গেলুম।

উপেনদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ জমলো তারপরে, এবং কথা-বার্ত্তায় আমার এলেমের পরিচয় পেয়ে তিনি appreciation হিসাবে বললেন, "তোমাকে আমাদের old cows association এর junior member করে নিলুম। আমাদের কাজ হল, খাওয়া-দাওয়া আর জাবর কাটা।" অতুলদা ছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে উপেনদা বললেন, "ওর নাম কেটে দোব,—যাক ও তরুণ ষ্টীলেনদের দলে।" তখন উপেনদা অতুলদাকে একটা বিষয়ে বাগ মানাবার চেষ্টা করে পেরে উঠছেন না—সে কথা যথাসময়ে আসবে।

দিন কতক বেশ কাটলো। রোক একটু বেড়েছে। অমরদাও ভালবাসতে শুরু করেছেন। এমন সময় একদিন ২৫ সালের গোড়ার দিকেই, হঠাৎ order এল মেদিনীপুর জেলে বদলীর। মনে হল, এইবার একটু "থিতু" হব। কারণ মেদিনীপুর জেলে বাছা-বাছা অনেক দাদা আছেন। কিন্তু আমাকে সেখানে পাঠাবার কারণ কি?

ভাবতে ভাবতে মনে হল, হাজার-ষ্ট্রাইক ছাড়ার পর গভর্ণমেণ্টকে যে চিঠি লিখি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেটা ফেরৎ পাঠিয়েছিল improper language বলে। তাতে আমি তার নামেই এক রিপোর্ট করে আর একটা দরখাস্ত করি অনধিকার চর্চ্চা বলে। তখন সে আমার আগের চিঠিটা পাঠাতে রাজী হয়—পাঠিয়ে দেয়। আমরা India Govt. এর prisoner বলে তার মাতব্বরী খাটেনি। লোকটা ছিল অত্যন্ত পাজী, নাম সলিসবেরী। সম্ভবত সেই চেষ্টা করে আমার মেদিনীপুরে বদলীর ব্যবস্থা করেছে। মেদিনীপুরে পাঠানোর অর্থ, শীঘ্র বেরোতে পারবো না।

যাই হোক,—উপেনদা তখন লেখালেখি ও দরবার করছেন খালাস পাওয়ার জন্যে। ১২টা বছর আন্দামানে কাটিয়ে এসে তিনটে বছরও না যেতে, আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্যে জেলে পচা—তাও কিছু না করেই, অর্থাৎ না পেরেই, এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না।

অতুলদারও কিছু না করেই—কণ্ট্রাক্টরী ব্যবসা মাটি হতে বসেছে—তাঁর ভাই ২৪ সালে তাঁর সঙ্গে অনবরত interview করে ব্যবসাটা চালাচ্ছিলেন,—তিনিও (অমর ঘোষ) গ্রেপ্তার হওয়ায় ব্যবসা শিকেয় ওঠার যোগাড়। উপেনদা তাঁকেও সঙ্গে রাখতে চেষ্টা করছিলেন,—এবং অমরদাকেও (চাটুজ্যে)।

তখন I. B-র কর্তা ভূপেন চাটুজ্যে আর S. B-র কর্তা নলিনী মজুমদার। তিনি মাঝে মাঝে জেলের Office-এ গিয়ে বসে উপেনদাকে ডেকে পাঠান,—সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলে। এমনি ভাবে একদিন উপেনদা Office গেছেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "বড্ড পায়খানা লেগেছে" বলে পালিয়ে এসেছি।

ব্যাপারটা হচ্ছে, যখন অবনী মুখার্জি মস্কো থেকে এম এন রায়ের চিঠি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন উপেনদা তাঁকে লুকিয়ে রাখার জন্যে কার কাছে যেন এক পোষ্টকার্ড লিখেছিলেন ইসারায়। নলিনী মজুমদার উপেনদাকে সেই গল্প শোনালে তিনি অস্বীকার করলেন। তখন নলিনী মজুমদার মুখ টিপে হেসে ধীরে ধীরে সেই intercepted পোষ্টকার্ডখানা বার করে তাঁকে দেখায়। তাই তাঁর হঠাৎ বড্ড পায়খানা পেয়ে গেল।

আমার মেদিনীপুর যাত্রার কথা শুনে বললেন,—বেশ হল, ভেসে ভেসে বেড়ানোর চেয়ে পাকা বন্দোবস্ত—ভালই হল। আমারও যে একটা উৎসাহের আমেজ না লেগেছিল, তা নয়।

আমি যখন মেদিনীপুরে গেলুম, তখন state yard-এ আছেন ১০।১২ জন রাজবন্দী—প্রায় সকলেই বাছাবাছা দাদা। যুগান্তর দলের আছেন যাদুদা, মনোরঞ্জন দা (গুপ্ত), ভূপতিদা, নরেন্দা—অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, অমৃত সরকার, সতীশ পাকড়াশী এবং সুরেশ ভরদ্বাজ—মলঙ্গার অনুকূলদা, গিরীনদা, অংশু ব্যানার্জি। আমার পরে একে একে গিয়ে জুটেছিলেন গণেশ ঘোষ, পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, নিরঞ্জন সেন।

ঘরটার একপাশে ফুলবাগান করা হয়েছে—জায়গাটা নেহাৎ ছোট নয়। সেই দিকের বড় বড় জানালার সামনে জোড়া জোড়া খাট—দু জন করে দাদার—মাঝে মাঝে Passage—সেই দিকেই আমার খাট পড়লো। সামনের দরজার বিপরীত দেওয়ালেও বড় জানালার সামনে এমনি খাট। ফুলবাগানের উল্টাদিকে ঘরের

বাইরে কিচেন, এবং ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্ক প্রভৃতির গাদা, রাত্রের জন্যে পরদা দিয়ে ঘেরা lavotory এবং তারপর খানিকটা জায়গা খালি—বাসনপত্র, জল প্রভৃতি থাকে। ইয়ার্ডের এক কোণায় পায়খানা—টুকরী সাজিয়েই বানানো হয়েছে। আর দরজার সামনে স্নানের "হাওদা" অনেক খানি লম্বা শান বাঁধানো জায়গা—মাঝে একটা চওড়া নালী জলের—রোজ সকালে কয়েদীরা ভায়ে ভারে জল বয়ে এনে ভরে দিয়ে যায়—তার দুপাশে দুটো চাতাল—যার দিক চালু—বসে স্নান করার জন্যে। তার দুইদিকে দুটো চওড়া নালী জল বেরিয়ে যাওয়ার।

মেদিনীপুর কলকাতার চেয়ে গরম, শুকোরুখো জায়গা, জলকষ্ট জেলেও আছে। কয়েদীদের স্নান করার জল মাপা লোহার সরার দু'সরা। কাজেই—অভাবে স্বভাব নষ্ট—তারা আমাদের স্নানকরা জলটা পাশের ছুটো নালীতে আটকে রাখতো,—বেরিয়ে যেতে দিত না—এবং সেই জলে পরে নিজেরা স্নান করতো—প্রথম প্রথম মনটা পাক দিয়ে উঠতো, মনে মনে মনে তাদের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হত—কিন্তু সময়ে সব রোগই নিরাময় হয়—কয়েকদিনেই সয়ে গেল।

আলিপুরে লেখাপড়ার atmosphere ই ছিলনা—ছিল খেলাধূলো এবং exercise এর রেওয়াজ। খেলার মধ্যে indoorতাস আর Outdoor Badminton—দুটোই অভ্যাস হয়েছিল। মেদিনীপুরে পড়াশুনোও প্রচুর, আর খেলাধুলার ব্যবস্থাও যথেষ্ট। ইয়ার্ডের মধ্যে Badminton খেলা চলতো, আর জেলের একদিকে একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল, সেখানে বিকালে আমরা ওয়ার্ডারের পাহারায় খেলতে যেতুম—টেনিস, ফুটবল, সব কিছু। ডেপুটী জেলার জিতেন বাবুরও খেলাধুলা অভ্যাস ছিল, তিনিও অবসর করে নিয়ে এসে জুটতেন, খেলতেন। খেলা ও বেড়ানো অন্ততঃ ঘণ্টা দুই। আমাদের মধ্যে ভূপতিদা ছিলেন সব খেলায় ওস্তাদ।

আমার ভুঁড়ি গজিয়েছিল, এবং পা দুটোর জোর কমে গিয়েছিল। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াকে মাসের পর মাস বেঁধে রেখে দিলে বোধ হয় এমনিই হয়। রবি সেনের ওজন তখন ২১৬ পাউণ্ড, কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দৌড়ে পারতুম না। ফুটবল খেলতে গিয়ে খানিক দৌড়াবার পর হাঁটু দুটোর যেন খিল খুলে যেত, দাঁড়াতে পারতুম না। ভেবে চোখে প্রায় জল এসে পড়ার যোগাড় হ'ত।

ক্রমে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল। এই অবস্থায় একবার এক রীতিমত tournament খেলার ব্যবস্থা হল। টেনিস single ও double কে কার সঙ্গে খেলবে, সেটা lottery করে ঠিক হল। এক অপূর্ব tenis singles match হল, আমি আর ভূপতিদা। আমি সে খেলার বর্ণনা লিখতে পারবো না—আপনারা আন্দাজ করে নেন। শুধু এইটুকু বলতে পারি, শেষ পর্যন্ত খেলেছিলুম, আর দর্শকেরা সারাক্ষণ লুটোপুটি করে হেসেছিল।

পড়াশুনো চলতো রীতিমত—২।১ জন ছাড়া সকলেই রীতিমত মনোযোগ দিয়ে প্রচুর লেখাপড়া করতেন। একখানা হস্তলিখিত মাসিকপত্র চালানো হ'ত, তাতে প্রায় সকলকেই কিছু না কিছু লিখতে হ'ত। আমার জীবনে লেখাপড়ার একটা বিরাট সুযোগ এ'ল। সে কথা পরে লিখবো। মাসিকের নাম "ভাঙ্গাকুলো"।

মেদিনীপুর জেলাটা যেমন সর্ববৃহৎ, জেলটাও তেমনি সর্ববৃহৎ। এইখানেই সেই বিখ্যাত—কুখ্যাত বলার চেয়ে বিখ্যাত বলাই ভাল—১০০ ডিগ্রী নামক সেল—যার বীভৎসতার তুলনা হয় বোধহয় ফরাসী বাস্তিলের সঙ্গে, যদিও বাস্তিলের বীভৎসতাটা আমার অনুমান মাত্র। মনে করুন একখানা দোতলা ইমারৎ পাথরের ইট সাজিয়ে গাঁথা একটা বিরাট বন্ধ বাক্সের মতন। তার দু'মুড়োয় আছে দুটি লোহার দরজা, এবং দুই পাশের দেওয়ালের মধ্যে দুই সারিতে দুই তলায় ২৫টা করে ১০০টা গরাদে ও মোটা জাল লাগানো ঘুলঘুলি জানালা। মাঝখান দিয়ে একটা পথ এবং দুই ধারে ২৫টা করে সেল, দুই তলায় ১০০টা সেল। দিনরাত অমাবস্যা। এই সব সেলে একসময় রাজবন্দীরা দিনরাত তালাবন্ধ থাকতেন।

[ক্রমশঃ।

বোষ্টনের সান্ধ্য-প্রতিলিপি

[টি, এস্‌, এলিয়টের "Boston Evening Transcript"এর অনুবাদ]

আন্দোলিত হ'লো
পাকা ফসলের মাঠের মত আন্দোলিত,—
বোষ্টনের 'সান্ধ্য-প্রতিলিপি'র
উৎসাহী পাঠকরা।

এদিকে ছায়ায় সন্ধ্যা নামল রাস্তায়,—
বর্ণহীন ম্লান অন্ধকার;
সে অন্ধকার
রাতের অলস স্বপ্ন জাগায়
কারো চোখে, কারো দেহে—
বিফলতা রিক্ত করে উচ্ছ্বসিত কামনা আসে
উজ্জ্বল বিপুল বন্যায়।

রক্তের গভীর স্রোত ঘিরে
শুধু এক ম্লান শূন্যতা। বিচ্ছেদ-বিষাদ—সব;
তবুও সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
আমি উঠলাম। এবং জমাট দরজায়
ঘণ্টা বাজিয়ে,—ক্লান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম:
হেরি এই যে সান্ধ্য-প্রতিলিপি!
(ঠিক যেমন কেউ 'রচিফাউকুড়'কে বিদায় জানিয়ে বলত,
যদি ঐ ম্লান নির্জন রাস্তাটা হ'ত সময়
আর সে দাঁড়িয়ে থাকত স্থির
সুনিশ্চিত শেষ প্রান্তে।)

অনুবাদক—আশিস ঘোষ-রায়

কাল তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

লোহার বেঞ্চিতে পা ছড়িয়ে বসে অলস কৌতুকে ধীরাপদ যেন হৃদয়শূন্য এক কালের কাণ্ড দেখছিল এতক্ষণ ধরে। পাকস্থলীর গা-ঘুলনো অস্বস্তিটাও টের পাচ্ছে না আর।

সমান করে ছাঁটা মেহেদির বেড়ায় ঘেরা এই ছোট্ট অবসর বিনোদনের জায়গাটুকুতেও কাল তার পসার খুলে বসেছে। কেউ দেখছে না। কিন্তু দেখলে দেখার মতই। ধীরাপদ দেখছে। আর এইটুকু দেখার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে এক ধরনের আত্ম-বিস্মৃতির তুষ্টিতে বিভোর হয়ে আছে।

খানিক আগে অদূরের দ্বিতীয় ফাঁকা বেঞ্চিটাতে এসে বসেছিল এক বিরাট-বপু কাবুলীওয়ালা। শীতের পড়ন্ত রোদটুকু মিষ্টি লাগছিল ধীরাপদর। ভেবেছিল, কাবুল নন্দনটিরও সেই লোভেই আগমন এবং উপবেশন। কিন্তু না। সুস্থির হয়ে বসতে পারল না বেশিক্ষণ। উঠে এ-মাথা ও-মাথা টহল দিল একবার। জোব্বার জেব থেকে বড়সড় একটা রংচটা পকেট ঘড়ি বার করে সময় দেখল বার দুই। আবার বসল।

একটু বাদে প্রতীক্ষার অবসান। অতি নম্র দ্বিধান্বিত চরণে যে-লোকটি তার কাছে এসে দাঁড়াল, ধীরাপদর দেখে মনে হল সে বাঙালী। পরনে ধোপ-দুরস্ত ট্রাউজার আর বুশ সার্ট। চকচকে পরিপাটি চেহারা। হাতের মজবুত লাঠিটা দণ্ডধারী বিচারকের মতই মাটির ওপর সোজা করে ধরে বুকটান করে বসল জীবিকান্বেষী প্রবাসী পুরুষ। সেই মুহূর্তে পুরুষোত্তম। আর রমণীসুলভ শরণাগত মূর্তি ভদ্রলোকের।

কান পাতলে এখান থেকেও শোনা যায় কিছু। কিন্তু শোনার দিকে মন নেই ধীরাপদর। দেখার দিকে ঝোঁক। শুনতে গেলে দেখার তন্ময়তায় ছেদ পড়ে। শোনার চেষ্টা ছেড়ে ধীরাপদ দেখতেই লাগল।

কি কথা হল ওরাই জানে। হঠাৎ মাটির ওপর সজোরে লাঠিটা ঠুকে একটা চাপা হুঙ্কার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল কাবুলীওয়ালা। প্রায় অশ্লীল কটূক্তিসহ দু' তিনটে ভাষার একটা টগবগানি কানে এলো শুধু। ঠাস ঠাস করে পাকা বাঁধানো লাঠির ঘা পড়ল বেঞ্চিটার ওপর। আলটিমেটাম গোছের কিছু একটা বলে সরোষে ধপ করে আবার বেঞ্চির ওপর বসল সে।

তারপর মাথা নেড়ে ভদ্রলোকের নীরব স্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং বিনীত প্রস্থান। প্রায় হাঁ করে চেয়ে আছে ধীরাপদ। কাবুলীওয়ালা মুখ তুলে দেখল একটু, হাসল একটু। পকেট থেকে আবার সেই ঘড়ি বার করে সময় দেখে উঠে চলে গেল।

হাঁটু মুড়ে তলপেটে চাপ রেখে বিস্মৃতপ্রায় অস্বস্তিটা উপেক্ষা করতে চেষ্টা করল ধীরাপদ। নতুন খোরাকের খোঁজে অলস দু' চোখ চারদিকে ঘুরে এলো একবার। অপেক্ষা করতে হল না। এবারেরও রঙ্গপট সামনের ওই খালি বেঞ্চটাই। আবার এক ভদ্রলোক এসে বসেছে। পরনে দামী স্যুট, পায়ে চকচকে জুতো আর হাতে দাম-রস্তা সিগারেটের টিন সত্ত্বেও এক নজরে বাঙালী বলে চেনা যায়। তার চঞ্চল প্রতীক্ষা কাবুলীওয়ালার থেকেও স্পষ্ট। কোটের হাতা টেনে হাত-ঘড়ি দেখছে, এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে নাচাচ্ছে মুহুর্মুহু, আধ-খাওয়া সিগারেট সজোরে মেহেদি বেড়ার ওপর ছুঁড়ে মেরে একটু বাদেই টিন খুলছে আবার।

কিন্তু এবারের প্রতীক্ষা সার্থক যার আবির্ভাবে, তাকে দেখেই ধীরাপদ প্রায় হতভম্ব! ঢ্যাঙা আধবয়সী একটি মুসলমান, পরনে চেক-লুঙ্গি, গায়ে শাদার ওপর শাদা ডোরাকাটা আধময়লা পাতলা জামা, খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখের কষে পানের ছোপ। সব মিলিয়ে অদ্ভুত মূর্তি একটি। কিন্তু তাকে দেখা মাত্র সাগ্রহে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালো স্যুটপরা ভদ্রলোক। তারপর দুজনেই ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসল বেঞ্চিতে। ফিস ফিস কথাবার্তা। হাতমুখ নেড়ে ভদ্রলোকটিই কথা কইছে বেশি। অন্য লোকটি অপেক্ষাকৃত নির্বিকার।

কথার মাঝে লোকটা নিজের পকেটে হাত দিতেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সিগারেটের টিন খুলে ধরল। কিন্তু লোকটা নিরাসক্ত। সিগারেটের টিনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে পকেট থেকে বিড়ি বার করে বিড়ি ধরালো। তারপর পরিতৃপ্তি সহকারে বিড়িতে গোটা দুই তিন টান দিয়ে কি যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেটের টিনসুদ্ধ দু'হাত মাথার ওপরে তুলে গৌরাঙ্গভক্তের মতই নাচ জুড়ে দিল।

দেখার বৈচিত্র্যে প্রায় দূরে বসেছে ধীরাপদ। লুঙ্গিপরা লোকটা নিস্পৃহমুখে সেই নাচের মাঝখানে আবারও কি বলায় সঙ্গে সঙ্গে দম-ফুরানো কলের পুতুলের মতই নাচ থেমে গেল। শিথিল ভঙ্গিতে তার পাশে বসে পড়ল আবার। টিন খুলে সিগারেট ধরাল। কোটের পকেট থেকে একটা স্ফীতকায় পার্স বার করে গোটাকতক দশ টাকার নোট তার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পার্স

পকেটে চালান করল। তারপর আর একটি কথাও না বলে শুধু একটা উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উঠে চলে গেল সে।

বিড়ি ফেলে নোট ক'খানা গুণে পকেটে রাখল লোকটা। ধীরাপদর মনে হল গোটা সাতেক হবে। মনে মনে একটু খুশি হল সে। অমন নাটকীয় প্রাপ্তির কারণে নয়, এক্ষুনি উঠে চলে যাবে বোধ হয় লোকটা—ওই যাচ্ছে। মনে মনে এবারে জোরালো রহস্যের জাল বুনবে ধীরাপদ। সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম। সময় না কাটলে দুর্বহ বোঝার মত, কিন্তু কাটাতে জানলে চোখের পলকে কাটে। ধীরাপদ জানে। তার ওপর বিমনা হবার রসদ পেয়েছে মনের মত। এই জন্যেই আসা এখানে। এই জন্যেই এসে বসা।

কিন্তু শুরুতেই মেহেদি বেড়ার ওধারে একটা চেঁচামেচি শুনে রহস্যের বুননি ঢিলে হয়ে গেল। যাক, দেখার মত নতুন কিছু ঘটে যদি। উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল ধীরাপদ। এতক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোর ফলে সর্বাঙ্গের সব ক'টা স্নায়ু একসঙ্গে ঝিমঝিম করে উঠল। চোখে লালচে অন্ধকার, পায়ের নিচে ভূমিকম্প। তাড়াতাড়ি বেঞ্চিতে বসে পড়ে দুচোখ বুজে ফেলল ধীরাপদ। একটুখানি সামলে নিয়ে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকালো। সব ঠিক আছে, কিছুই ওলট পালট হয়নি। উঠে দাঁড়ানোর দরকার ছিল না। চেঁচামেচির কারণ বসে বসেই অনুমান করা যাচ্ছে। বেড়ার ওধারে বসে নানা রকমের চাট বেচছে একটা লোক। তার সামনে দশ বারটি খদ্দেরের রসনা চলছে। তাদেরই কোনো একজনের সঙ্গে হিসেবের গরমিল এবং বচসা।

অনেকগুলো কচি গলার কলকলানি কানে আসতে ঘাড় ফেরাল ধীরাপদ। রবারের বল নিয়ে ফিরিঙ্গী শিশুরা খেলতে এসেছে জনাকতক আয়ার তত্ত্বাবধানে। বেড়ার ভিতরে তাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তত্ত্বাবধানকারিণীরা সকলে ঠাসাঠাসি হয়ে বসল ওই বেঞ্চিটাতে। কেউ বিড়ি ধরালো, কেউ সস্তা সিগারেট, কেউ কিছু না। তাদের উগ্র প্রসাধনটুকুও চোখ এড়ালো না ধীরাপদর। কালো মুখে পুরু পাউডারের প্রলেপ, কারো ঠোঁট আর নখ রাঙানো, কারো কালো চোখে গাঢ় কাজল, কারো খোঁপায় ফুল একটা দুটো। ধীরাপদর মজা লাগছে দেখতে। কিন্তু ওরা আবার আড়ে আড়ে দেখছে তাকেই আর একজন আর একজনের গায়ে ঢলে পড়ে হাসছে।

ফিরিঙ্গীদের ফিটফাট বাচ্চাগুলো মাটি বার করা ঘাসের ওপর হুটোপুটি করছে একদিকে। তাদের মধ্যে সব থেকে সবল বাচ্চাটা সর্দারী করছে আর সকলের ওপর। একে ধাক্কা দিচ্ছে, ওকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে—কারো পিঠে দুমদাম বসিয়ে দিচ্ছে ঘুঁষা, কারো চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসছে। সবলের এত দাপট বরদাস্ত করতে পারছে না অন্য বাচ্চাগুলো। সরবে অথবা নীরবে অবাধ্য হচ্ছে তারা। ফলে দেখা গেল, ডানপিটে বাচ্চাটা একজনকে মাটির ওপর ফেলে তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। নিচের ছেলেটা হাত পা ছুঁড়ছে শুধু, চেঁচাতেও পারছে না। দমবন্ধ হবার উপক্রম। ধীরাপদ ভাবছে উঠে ছাড়িয়ে দেবে কি না। অন্য ছেলেগুলোর উত্তেজিত কলরবে আয়াদের রসালাপে ছেদ পড়ল। তারা হুটোপুটি করে উঠে এসে ছেলেগুলোকে ছাড়িয়ে দিল, মৃদুমন্দ শাসন করল, গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিল। আয়ার হাতে বন্দী হয়েও রাগে ফুঁসছে সেই সবল ছেলেটা।
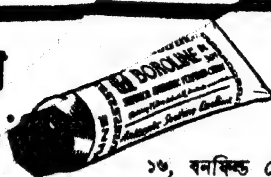
বেশ লাগছিল ধীরাপদর। প্রকৃতির মালখানায় প্রবৃত্তির কারিগরি দেখছিল। গাছে নতুন পাতা দেখা দিলেই মালী ভাবে ভবিষ্যতের ফল আর ফুলের কথা। এই নতুন শিশুদের অতি স্বাভাবিক দুরন্তপনার মধ্যেও তেমনি একটা অনাগত কালের ছবি দেখছে ধীরাপদ। তার এই আজব চিন্তার কথা জানতে পেলে লোকে হাসবে। কিন্তু লোকের কথা ভেবে সে চিন্তার লাগামে রাশ টেনে ধরে না কখনো। এই এক ব্যাপারে বেপরোয়া স্বাধীন।

দিনের ছোট বেলা পড়তে না পড়তে সন্ধ্যে। বিকেলের আলোয় কালচে ছোপ ধরেছে। এরই মধ্যে বেলা পড়ে আসছে দেখে মনে মনে খুশি। দূরে চৌরঙ্গীর প্রাসাদ চূড়ার ঘড়িটাতে পাঁচটা বাজে। ওই ঘড়িটাকে মনে মনে ভাল বেসে ফেলেছে ধীরাপদ। মাঝে মাঝে অচল হয়, দশ বিশ মিনিট পিছিয়ে চলে প্রায়ই। ধীরাপদর তাতে আপত্তি নেই, এগিয়ে চললেই আপত্তি। বাড়িটাতে ঢালাও ব্যবসা ছিল ইংরেজদের, এখন মালিকানা বদলেছে। কিন্তু ঘড়িটা এক ভাবেই চলেছে। চলেছে আর বন্ধ হচ্ছে। দেশেরও মালিকানা বদলেছে। কিন্তু ধীরাপদ এক ভাবেই চলেছে। চলছে আর থামছে।

অথচ বদলাচ্ছে তো সব কিছুই। এই কার্জন পার্কই কি আগের মত আছে? আগের থেকে অনেক সংকীর্ণ হয়েছে, অনেক ছোট হয়ে গেছে। শোভা বেড়েছে বটে—কিন্তু অনেক ছাড়তে হয়েছে তাকে। নরম ঘাস আর নরম মাটি খুঁড়ে খুবলে পিচ দিয়ে বাঁধানো হয়েছে প্রায় অর্ধেকটা। দেহের শিরা উপশিরার মত ঝকঝকে তকতকে আঁকা বাঁকা অজস্র ইস্পাতের লাইন বসেছে তার ওপর। সেদিকের সবুজের ওড়না খসেছে। লোহা আর পিচের বাঁধনে শক্ত মজবুত হয়েছে তার হৃৎপিণ্ড। আর, সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য রোমান্সের হাওয়াও বদলেছে এখানকার। আগে সন্ধ্যা হতে না হতে জোড়া জোড়া দয়িত দয়িতার আবির্ভাব হত। পরস্পরের কটি বষ্টন করে হাঁটতে নয়ত গুল্ম ঝোপের আড়ালে বা সুপরিসর মেহেদি বেড়ার নিরিবিলি পাশটিতে বসে বার' মাস বসন্তের হাওয়া লাগাত গায়ে। ধৈর্য ধরে বসে থাকলে আরো গাঢ়তর অনুরাগের আভাসও পাওয়া যেত। বসন্তের সেই সব অনুচর সহচরীরা কোথায় এখন?

বোধ হয় অন্য জায়গা বেছে নিয়েছে।

ভাবনাটা এবারে একঘেয়ে লাগছিল ধীরাপদর। আর সেই সঙ্গে পাকস্থলীর অস্বস্তিকর যাতনাটা চাড়িয়ে উঠতে চাইছে আবার। হাঁটুতে চাপ রেখে আর একটু ঝুঁকে বসল। বেড়ার ওধারে দিনগত কর্মকোলাহলের দিকে চোখ ফেরাল। হঠাৎ কিছু একটা ত্রাসের কারণ ঘটল বুঝি সেদিকে। ত্রস্ত চকিত আবহাওয়া। দু' হাত চার হাত দূরে দূরে পসার নিয়ে বসেছিল ফলওয়ালা বাদামওয়ালা খেলনাওয়ালা চাটওয়ালারা। কোথা থেকে কি করে যেন একটা বিপদের গন্ধ পেয়ে হুড়মুড়িয়ে পসার তুলে নিয়ে যে যেদিকে পারে উধাও হতে লাগল। ক্ষিপ্র, দিশেহারা তৎপরতা তাদের।

কি ব্যাপার?

হল্লা আসছে, হল্লা। ট্রাম লাইনের আশে পাশে পসার নিয়ে বসা বে-আইনী। যারা বসে তারা শুধু পেটের আইন বোঝে। অতর্কিতে হল্লা পুলিস এসে এদের নীতির আইন বোঝায়। পাছে বুঝতে হয় সেই ত্রাসে বোঝা নিয়ে ছোটে তারা।

চট বিছিয়ে চিনেবাদামের স্তূপ সাজিয়ে বসেছিল একজন। কেনা-বেচায় মশগুল ছিল বলেই বোধহয় বিপদ সম্বন্ধে লোকটার ষষ্ঠ চেতনা সজাগ ছিল না তেমন। টের পেল যখন দেরি হয়ে গেছে। এক টানে বাদামসুদ্ধ চট গোটানোর সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একখানা কালো বুট উঠে এলো সেই চট-মোড়া চিনেবাদামের টালের ওপর।

তারপর দৃষ্টি বিনিময়।

সেই বিনিময় দেখে ধীরাপদ মুগ্ধ। বাদামওয়ালার হাল ছাড়া সমর্পণের চকিত-চকোর দৃষ্টি, হল্লা সিপাইয়ের এক পা মাটিতে, এক পা বাদামের টালে দু' হাত কোমরে আর শৌর্যভরা দুই চোখ অবলা প্রতিম ভীরু ব্যক্তিত্বের মুখের ওপর।

কালের কাণ্ডর এই অঙ্কটিতে এসে প্রায় হাততালি দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল ধীরাপদর। পেটের ওপর থেকে নিজের হাঁটুর চাপ শিথিল হয়ে গেছে খেয়াল নেই।

দেখতে দেখতে অফিস ফেরত জনতার ভিড়ে সমস্ত এলাকা ছেয়ে গেল। সার বেঁধে চলেছে। বাঙালী অবাঙালী, খেতাঙ্গিনী, শ্যামাসঙ্গিনী। মুখের দিকে ভালো করে তাকালে তাদের গৃহ প্রত্যাবর্তনের তাগিদটুকু উপলব্ধি করা যায়। সমস্ত দিনের খাটুনির পর এই অধিকারটুকু অর্জন করেছে তারা। এটুকু মূল্যবান। নিস্পৃহ চোখে ধীরাপদ খানিকক্ষণ ধরে এই জনতার মিছিল দেখল চেয়ে চেয়ে। কেউ ব্যস্তসমস্ত, কারো গতি ধীর মন্থর। অফিসের চাপে শুধু ওই ফিরিঙ্গী মেয়েগুলোরই প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়নি মনে হল। কলহাস্যে নেচে কুঁদে চলেছে তারা দল বেঁধে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন বাঙালী মেয়ে চলেছে একটি দুটি। তাদের চলন বিপরীত। জীবনীশক্তিটুকু যেন অফিসের কাজে নিঃশেষ করে এসেছে। কোনরকমে এখন ট্রাম বা বাসের গহ্বরে একটুখানি ঠাঁই পেলে বাঁচে। এরই মধ্যে এক-একজনের মোটামুটি রকমের সুশ্রী নারী-অঙ্গে বহুজোড়া চোখের নীরব বিচরণ লক্ষ্য করল ধীরাপদ। সামনের ওই ফর্সামত বিবাহিতা মেয়েটিকে এক-চাপ জনতা যেন চোখে চোখে আগলে নিয়ে চলেছে। ধীরাপদ হাসছে একটু একটু। প্রাকৃতিক চাহিদার কোনটা না মিটলে চলে? কোন জ্বালাটা কম?

দেখতে দেখতে দিনের আলো ডুবল। চৌরঙ্গীর প্রসাদ চূড়ার ঘড়িটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আর। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোর মেলায় চৌরঙ্গী হেসে উঠবে। একটা দুটো করে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। নিয়ন লাইটের বিজ্ঞাপন-তরঙ্গও শুরু হয়ে গেছে। তবে এখনও চোখে পড়ে না তেমন।

বেঞ্চির একধারে সরে এলো ধীরাপদ। ওটি তিনেক নব্যকান্তি বাকি জায়গাটুকু দখল করেছে। ধীরাপদ উঠেই যেত, কিন্তু তাদের রসালো আলোচনা কানে যেতে কান পাতল। আবছা অন্ধকারে মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না। বিদেশী ছবির স্তুতির উচ্ছ্বাসে কান ভরে যাচ্ছে। একজনের এই দুবার দেখা হল, একজনের তিনবার —আর একজনের পাঁচ বার। ছবির মত ছবি, তাই ঘুরে ফিরে বার বার আসছে। বার বার এসেও পুরনো হচ্ছে না। কি নাম বলছে —ছবিটার! আগ্রহে একটু ঘুরেই বসল ধীরাপদ।

...বীটার -ষ্টস!

বীটার রাইস! [illegible] হব

আর। ছবি না-ই দেখুক, নাম [illegible] হজমোরার কোনো ছবির [illegible] অদ্ভুত

নাম।···বীটার রাইস। বাংলায় কি হবে? তেতো চাল? কটু চাল? ছুর···! বাংলা হয় না। বাংলা করলে স্নায়ুর ওপর শব্দ দুটো তেমন করে ঝনঝনিয়ে ওঠে না। বীটার রাইস। খাসা নাম। একবার দেখলে হত ছবিখানা। পারলে দেখবে।

কি বলে ওরা! ও ছবি, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করল বুঝি ছবির নায়িকা? সিলভানা ছবির নায়িকাই হবে বোধ হয়। আরো খুশি হল ধীরাপদ। ওদের খেদ শুনে হাসি পায়। বীটার রাইসের নায়িকা আত্মহত্যা করবে না তো কি। ছবিখানা দেখার আগ্রহ দ্বিগুণ বাড়ল ধীরাপদর। কিন্তু কোন দেশের ছবি? কারা জেনেছে বীটার রাইস-এর মর্ম?

ছবির প্রসঙ্গ থেকে নায়িকার সৌন্দর্য আর অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিকে ঘুরে গেল ওদের আলোচনা। এবারে, দুবার তিনবার আর পাঁচবার করে দেখার তাৎপর্য বোঝা গেল। বীটার রাইসের নায়িকা মরেছে, সিলভানা মরেনি। কাহিনীর নায়িকা মরেছে, ছবির নায়িকা মরেনি। দর্শকের অতনু-মনে উর্বশীর পরমায়ু সেই নায়িকার। তার বেশবাসের নমুনা যা শুনছে, সেটা বোধ হয় ছবির প্রয়োজনে। কিন্তু বীটার রাইসের প্রয়োজন আর আঁটসাঁট অত্যল্প বেশবাস উপচে-পড়া নারী-তনু-মাধুর্যের আবেদনে যোজন তফাৎ। সেই আবেদনে এই তিন দশকের অন্তত মেজাজ রাঙা।

হায় গো সাগরপারের সিলভানা, তোমার ছায়া এমন, তুমি কেমন?

হাসি গোপন করে ধীরাপদ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। আবার না স্নায়ুগুলো ঝিম ঝিম করে ওঠে হঠাৎ। মাথাটা ঘুরছে একটু, শরীরটাও দুলিয়ে উঠছে কেমন। কিন্তু ও কিছু নয়। দু'পা হাঁটলেই সেরে যাবে। হালকা লাগছে অনেক। লাগবেই। দেহ সম্বন্ধে সচেতন হলেই যত বিড়ম্বনা। ওইটুকু খাঁচার মধ্যে মনটাকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেই যত গোল। এত বড় দুনিয়ায় দেখার আছে কত। সেই দেখার সমারোহে নিজেকে ছেড়ে দাও, ছড়িয়ে দাও, মিশিয়ে দাও। শুধু নিজের সঙ্গে যুঝতে চেষ্টা কোরো না। তাহলেই সব বিড়ম্বনার অবসান, সব মুশকিল আসান। পনের থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত বলতে গেলে এই দেখার আর্টটাও রপ্ত করেছে ধীরাপদ। রপ্ত করে জিতেছে। যেমন আজকের দিনটাও জিতল।

সেই জেতার আনন্দে বড় বড় পা ফেলে ট্রাম ডিপো আর রাস্তা পার হয়ে চৌরঙ্গীর ফুটপাথএ এসে দাঁড়াল সে। আর সেই আনন্দেই আজকের মত ছেলে পড়ানোর কর্তব্যটাও অনায়াসে বাতিল করে দিতে পারল। ও-কর্তব্যটার প্রতি বিবেকের তাড়না নেই একটুও। নিক্তি মেপে ছাত্রের জন্যে বিদ্যা কেনেন তার অভিভাবক। মাসে তিরিশ টাকার বিদ্যে। প্রতি দিনের কামাই পিছু এক টাকা কাটান। এর বাইরে আর কোনো কৈফিয়ত নেই।

সন্ধ্যারাতের চৌরঙ্গী। সদ্য-যৌবনা কিশোরীর প্রথম অভিসারের তারুণ্য। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর দেখছে ধীরাপদ। তবু নতুন মনে হয় রোজই। কবে একদিন নাকি এই চৌরঙ্গীতে বাঘ ডাকত। ধীরাপদর হাসি পায়। আফ্রিকায় সিংহের রাজত্ব ছিল শুনলেও হয়ত দূরের বংশধরেরা হাসবে একদিন।

রাতের চৌরঙ্গীর এ আলোয় কি এক মদির উপকরণ আছে। এখান দিয়ে হাঁটতে হালকা লাগে, নেশা ধরে। ধীরাপদ পায়ে পায়ে
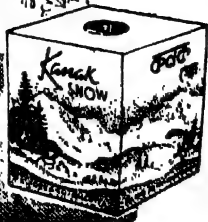
এগিয়ে চলে আর লোকজনের আনাগোনা দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এখানকার জীবন যেন এমনি আলোর প্রতিবিম্বিত মহিমা। নারী-পুরুষেরা আসছে, যাচ্ছে। হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ। পুরুষের বেশবাসে তারতম্য নেই খুব। তকতকে, ফিটফাট। কিন্তু নারী এখানে বিচিত্ররূপিনী। তাদের বাসের ওধারে অন্তর্বাসের কারুকার্যটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট। চার আঙুল করে কোমর দেখা যায় প্রায় সকল আধুনিকারই। উপকরণের মহিমায় মাঝবয়সী রমণীরও যৌবন উদ্ধত। রংবাহার রূপের মেলা। রাতের চৌরঙ্গী আভিজাত্যের পরাভব জানে না।

ধীরাপদর মনে হয় খুশির দূত-দূতী এই নারী-পুরুষেরা। কিন্তু তবু কোথায় একটুখানি অসম্পূর্ণ লাগে তার। কিছুকাল আগেও এই একই চৌরঙ্গীর একটু যেন ভিন্ন শোভা দেখেছে। এই সেদিনের ইংরেজ আমলে। সেই শোভা আরো উচ্ছল, আরো মদিরাচ্ছন্ন। কিন্তু তার যেন বনিয়াদ ছিল একটু। নামজাদা বাইজীর সঙ্গে তার আধুনিকা কন্যার যেমন তফাত। সবই আছে, সাধনাটুকু নেই শুধু। কালচারের ছটা আছে, বনিয়াদটুকু খসেছে।··নারীতে যা স্বাভাবিক, শিল্পের নাকি তা নিকটবর্তী। কিন্তু এখানে নারীর স্বাভাবিকতায় শিল্প খুঁজতে গেলে ছন্দপতন।

তার থেকে এই ভালো। যেমন দেখছে সেই ভালো।

ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

—বাস-ষ্টপে সেই মেয়েটা আজও দাঁড়িয়ে।

বাঁয়ে লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, সামনে রাস্তা। রাস্তার ওধারে বাস-ষ্টপ। সেই ষ্টপের কাছে মেয়েটা দাঁড়িয়ে। যেমন সেদিন ছিল। একের পর এক বাস আসছিল, থামছিল, চলে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো বাসেই ওঠার তাড়া নেই মেয়েটার। নিরাসক্ত মুখে যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখছিল, পথচারীর আনাগোনা দেখছিল। ধীরাপদর প্রথম মনে হয়েছিল কারো প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রতীক্ষাই বটে, কোন্ ধরনের প্রতীক্ষা সেটাই সঠিক বুঝে ওঠেনি।

বছর কুড়ি-একুশ হবে বয়েস। ক্ষীণাঙ্গী। পরনে চোখ-তাতানো ছাপা শাড়ি আর উংকট-লাল সিল্কের ব্লাউস। বুকের দিকে চোখ পড়লেই চোখে কেমন লাগে। কিন্তু তবু চোখ পড়েই। মুখে আর ঠোঁটের রঙে আর একটু সুপটু-সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলে, অথবা, ওই পদার্থটুকু পরিহার করলে মুখখানা প্রায় সুশ্রীই বলা যেত। সুশ্রী আর শুকনো।

মেয়েটিও দেখেছিল তাকে সেদিন। একবার নয়। একটু বাদে বাদে বারকতক। শেষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল মুখোমুখি। ছু'পা এগিয়েও এসেছিল। মাঝে রাস্তা। রাস্তা পেরোয়নি। থমকে দাঁড়িয়ে আর একবার তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখেছিল। তারপর ফিরে গেছে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখানে।

ধীরাপদ দেখতে জানে। দেখার মত করেই দেখতে জানে। সেই দেখায় ভুল বড় হয় না। কিন্তু সারাক্ষণ ভয়ানক অন্যমনস্ক ছিল সে-দিন। সোনা বৌদি প্রথম বোঝাপড়া শুরু করেছিল সেই দিনই। সেটা যেমন আকস্মিক তেমনি অভিনব। ধীরাপদ আঘাত পায়নি, অবাক হয়েছিল শুধু। আর ভেবেছিল। সেই ভাবনায় তাঁকে সেদিন অনেক দেখাই অসম্পূর্ণ ছিল। এই মেয়েটার হাবভাবও তলিয়ে বোঝেনি। তাও বুঝত, যদি না মুখখানা অমন শুকনো দেখাত। ধীরাপদ হতভম্ব হয়ে ভেবেছিল, মেয়েটি কি কোনো বিপদে পড়ে তাকে বলতে এসেছিল কিছু? তাহলে এসেও ওভাবে ফিরে গেল কেন?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চোখ গেছে তার। ভদ্রলোক মনে হওয়া শক্ত বটে। গালেও খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিন চারদিন শেভ করা হয়নি। কাছাকাছি এসে এই সব লক্ষ্য করেই ফিরে গেছে মেয়েটা, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি বোধ হয়।

কিন্তু আজ? আজ তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে দিল ওই মেয়েটা কে। কোন প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই সাজ পোশাক, সেই রং-চং, সেই শুকনো মুখ। বাস আসছে, দাঁড়াচ্ছে, চলে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামা দেখছে, পথচারীর আনাগোনা দেখছে। মাঝের রাস্তার এদিকে দাঁড়িয়ে ধীরাপদ হেসে উঠল নিজের মনেই। বীটার রাইস। এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিল ছবিটার কথা। ছবিটা দেখতে হবে। বেশ নাম।

কিন্তু মেয়েটা যে চেয়েই আছে তার দিকে। কুড়ি একুশ বছরের অপুষ্ট মেয়ে। সর্বাঙ্গে আলগা পুষ্টিসাধনের কারুকার্য। মোহ ছড়ানোর প্রয়াস। শুধু মুখখানা শুকনো। তাজা মুখ নাকি জীবনের প্রতিবিম্ব। সেখানে টান ধরলে প্রতিবিম্ব তাজা হবে কেমন করে? বীটার রাইসের নায়িকা আত্মহত্যা করেছিল, আসল রমণীটি তাজা। কিন্তু এই মেয়েটা শুধু আত্মহত্যাই করেছে, ওর মধ্যে সিলভানা কোথায়? ওর কি প্রত্যাশা?

প্রত্যাশা আছে নিশ্চয়। এক পা ছু'পা করে এগিয়ে আসছে মেয়েটা। নিজের দিকে তাকালো ধীরাপদ। জামা কাপড় পরিষ্কারই বটে, আজ সকালের কাচা। গালেও এক-খোঁচা দাড়ি নেই। নিজেরই ভদ্রলোক ভদ্রলোক লাগছে।

আজও মাঝের রাস্তাটার ওধারে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর খুঁটিয়ে দেখার জন্যে নয়। গাড়ি যাচ্ছে একের পর এক। লাল আলো না জ্বলা পর্যন্ত দাঁড়াতে হবে। তারপর আসবে। আসবেই জানে। কিন্তু তারপর কি করবে? ধীরাপদর জানতে লোভ হচ্ছে। কিন্তু আর সাহসে কুলোচ্ছে না। আত্মহত্যার পরেও যারা বেঁচে থাকে তারা কেমন কে জানে।

হন হন করে লিণ্ডসে ষ্ট্রীট ধরেই হাঁটতে শুরু করে দিল সে। বেশ খানিকটা এসে ফিরে তাকালো একবার। লাল আলো জ্বলছে এখন। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা এধারে চলে এসেছে। আর, ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখছে। একনজর তাকিয়েই ধীরাপদর মনে হল, দেখছে না নীরবে অনুযোগ করছে যেন। কিন্তু প্রেতের অনুযোগ অমন খচখচিয়ে বেঁধে। ধীরাপদর বিঁধছে কেন? শুধু মনে হচ্ছে, মুখখানা বড় শুকনো আর বড় করুণ। অপটু প্রসাধনের প্রতি ধীরাপদর বিতৃষ্ণা বাড়ল। ওই মেয়ে কোন্ মন ভোলাবে? কিন্তু নিজের মাথা ব্যথা দেখে ধীরাপদ আবারও হেসেই ফেলল।

ফুটপাথের শো-কেস্ ঘেঁষে চলেছে। যা চোখে লাগে দেখে, না লাগলে পাশ কাটায়। ও-গুলো যে কেনার জন্য একবারও মনে হয় না। দেখতে বেশ লাগে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে আবারও একটু। বড় রাস্তা ধরে হনহনে করে খানিকটা হাঁটতে পারলে ঠিক হত। শুধু মেয়েটাই

গণ্ডগোল করে দিলে। সুন্দর বিলিতি বাজনা কানে আসছে একটা। দিশি হোক বিলিতি হোক, কানে যা ভালো লাগে তাই ভালো। বাজনা অনুসরণ করে সামনের একটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। হাল ফ্যাশানের মস্ত গ্রামোফোন রেডিওর দোকান। শো-কেস্ এ নানা রকমের ঝকঝকে বাদ্যযন্ত্র। ভিতরটা আলোয় আলোয় একাকার। সেই আলো ফুটপাথ পর্যন্ত এসে পড়েছে। ভিতরের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধায়।

বাজনাটা মিষ্টি লাগছে ধীরাপদর। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতর ওপর ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়লে যেমন লাগে। ব্যথা মরে না, আরামও লাগে।

বাজনাটা করুণ অথচ মিষ্টি। অভিজাত সঙ্গীতরসিকের ভিড় এখানে।···আসছে, যাচ্ছে। কেউ মোটর থেকে নেমে দোকানে ঢুকছে, কেউবা দোকান থেকে বেরিয়ে মোটরে উঠছে। অবাঙালী মেয়ে পুরুষের সংখ্যাও কম নয়, সাহেব মেমও আছে।

মুখ তুলে ভিতরের দিকে তাকাতেই ধীরাপদ হঠাৎ যেন হকচকিয়ে গেল একেবারে। বিস্মিত, বিভ্রান্ত!

দোকান থেকে বেরিয়ে আসছেন একটি মহিলা। হাতে খানকতক রেকর্ড। পরনে প্লেন চাপা রঙের সিল্কের শাড়ি, সিল্কের ব্লাউস—গায়ের রঙ ঘেঁসা প্রায়। যৌবন হয়ত গত। যৌবন-শ্রী অটুট।

মহিলা বেরিয়ে আসছেন। আর স্থানকাল ভুলে নিষ্ক্রামণের পথ আগলে প্রায় হাঁ করে চেয়ে আছে ধীরাপদ। নির্বাক, বিমূঢ়

দরজার কাছে এসে মহিলা ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালেন একবার। হ্যাংলার মত একটা লোককে এভাবে চেয়ে থাকতে দেখলে বিরক্ত হবারই কথা।

থতমত খেয়ে ধীরাপদ সরে দাঁড়াল একটু। মহিলা পাশ কাটিয়ে গেলেন। ধীরাপদ সেই দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার চেতনা যেন সক্রিয় নয় তখনো।

দু'পা গিয়েই কি ভেবে মহিলা ফিরে তাকালেন একবার। তারপর থেমে গেলেন। ধীরাপদ চেয়েই আছে। মহিলার দু'চোখ আটকে গেল তার মুখের ওপর। দু'চার মুহূর্ত। তারপরেই বিষম এক ঝাঁকুনি খেলেন যেন। এক ঝলক রক্ত নামল মুখে। ফুটপাথ ছেড়ে তরতরিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেলেন।

ধীরাপদ দেখল ক্রোম কালারের চকচকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। তকমা-পরা ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠতে গিয়েও আবার থামলেন মহিলা। ফিরে তাকালেন।

ধীরাপদ চেয়েই আছে। তার দিকেই ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন। বোধহয় ভাবলেনও একটু। হাতের রেকর্ড ক'খানা পিছনের সীটে রেখে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে এলেন আবার। ধীরাপদর দিকেই, ধীরাপদর কাছেই। এরই মধ্যে সামলে নিয়েছেন বোঝা যায়।

ধীরাপদ—ধীরু না?

চেষ্টা করেও গলা দিয়ে একটু শব্দ বার করতে পারল না ধীরাপদ।···ফ্যাসফেসে একটু হাওয়া বেরুল শুধু। ঘাড় নাড়ল।

কি আশ্চর্য! আমি তো চিনতেই পারিনি প্রথমে, তুমি এখানে।···কলকাতাতেই থাকো নাকি?

ধীরাপদর বাক্যস্ফূর্তি হল না এবারও, মাথা নাড়ল।

হাঁ করে দেখছ কি, চিনতে পেরেছ তো আমাকে না কি?

ধীরাপদ হাসতে চেষ্টা করল একটু। ঘাড় নেড়ে জানালো চিনেছে।

বলো তো কে?

চারুদি।

যাক্। হাসলেন। কতকাল পরে দেখা, এখানে কি করছ, রেকর্ড কিনবে নাকি? ও বাজনা শুনছিলে বুঝি, আর শুনতে হবে না, ওদিকে দাঁড়িয়ে কথা কই এসো।

ওদিকে অর্থাৎ মোটরের দিকে। চারুদি আগে আগে রাস্তা পার হলেন। ধীরাপদ পিছনে। এমন যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এমন যোগাযোগ ঘটবে বলেই বোধহয় দেখার এত সমারোহ আজ। কিন্তু কালের কাণ্ডর মধ্যে এ আবার কোন্ অধ্যায়? ধীরাপদ খুশি হবে কি হবে না তাও যেন বুঝে উঠছে না। কিন্তু চারুদি'কে ভালো লাগছে। আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছে চারুদি, তবু ভালই লাগছে।

মোটর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে চারুদি বললেন, তারপর খবর বলো, আমাকে তো চিনতেই পারনি তুমি, ভাগ্যে আমি এসে জিজ্ঞাসা করলাম।

জিজ্ঞাসা করার আগে তাঁর চকিত বিড়ম্বনাটুকু ভোলেনি ধীরাপদ। বলল, আমি ঠিকই চিনেছিলাম, তুমি পালাচ্ছিলে।

তা কি করব! অপ্রস্তুত হয়েও সামলে নিলেন, ভাবলাম কে না কে, এতকাল বাদে তোমাকে দেখব কে ভেবেছে! তার ওপর চেহারাখানা যা করেছ চেনে কার সাধ্য! চোখ দেখে চিনেছি, আর কপালের ওই কাটা দাগ দেখে।

কপালের কাটা দাগের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত ধীরাপদর মায়ের কথা মনে হল চারুদির। মায়ের হাতের তপ্ত খুন্তির চিহ্ন ওটুকু। ছেলেবেলার দস্যিপনার ফল। পাথর ছুঁড়ে খুড়তুত ভাইয়ের মাথা ফাটালেও এমন কিছু মারাত্মক হয়নি সেটা। কিন্তু ওই চারুদি না আগলালে ওকে বোধহয় মা মেরেই ফেলত সেদিন। খুন্তির এক ঘায়েই আধমরা করেছিল। একটু হেসে চারুদি জিজ্ঞাসা করলেন, মাসিমা কোথায়? এখানে? আর শৈল! সব এখানে?

তাঁর মুখের ওপর চোখ রেখে আঙুল দিয়ে শুধু আকাশটা দেখিয়ে দিল ধীরাপদ।

আ-হা, কেউ নেই! চারুদি অপ্রস্তুত। একটু বিষণ্ণও। কি করে আর জানব বলো, কারো সঙ্গেই তো—

থেমে প্রসঙ্গ বদলে ফেললেন চট করে, তুমি আছ কোথায়? কি করছ আজকাল? সাহিত্য করা ছেড়েছ না এখনো আছে? নাম-টাম তো দেখিনে…

শেষের প্রশ্নটা সব ক'টা প্রশ্নবই জবাব এড়ানোর পক্ষে অনুকূল। তা ছাড়া এক সঙ্গে একাধিক প্রশ্নের সুবিধে এই যে একটারও জবাব না দিলে চলে। ও-গুলো প্রশ্ন ঠিক নয়, এক ধরনের আবেগ বলা যেতে পারে। দ্বিধা কাটিয়ে সামনে এসে দাঁড়ানোর পর থেকেই চারুদির এই আবেগটুকু লক্ষ্য করছে ধীরাপদ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেও একটু হেসেই জবাবের দায় এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি যাবে কদ্দূর?

অনেক দূর। সাগ্রহে আরো একটু কাছে সরে এলেন চারুদি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? চলো না—গাড়িতে গেলে কতদূর আর। চলো, আজ তোমাকে সহজে ছাড়ছি না, ড্রাইভার তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে'খন—তাড়া নেই তো কিছু?

ধীরাপদ তাড়া নেই জানাতে একেবারে হাত ধরে গাড়িতে তুললেন তাকে। নিজেও তার পাশে বসে ড্রাইভারকে হিন্দীতে বাড়ি ফেরার নির্দেশ দিলেন। এমন দামী গাড়ি দূরে থাক, মোটরেই শেষ কবে চড়েছে বলে মনে পড়ে না ধীরাপদর। মখমল কুশনের আরামটা প্রায় অস্বস্তিকর। নরম আদরের মত। ধীরাপদ অভ্যস্ত নয়। সেই সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ একটু পার্শ্ববর্তিনীর সুচারু প্রসাধনে রুচি আছে বলতে হবে। আরো বুকভরে নিঃশ্বাস টানতে ইচ্ছে করছিল ধীরাপদর, কিন্তু কোন্ সংকোচে লোভটুকু দমন করল সেই জানে।

গাড়িতে উঠেই চারুদি হঠাৎ চুপ করেছেন একটু। বোধহয় এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের কথাই ভাবছেন। বোধহয় আর কিছু ভাবছেন। ভিড় কাটিয়ে গাড়ি চৌরঙ্গীতে পড়তেই সময় লাগছে। মোড়ের মাথায় আবার লাল আলো। ধীরাপদ তাড়াতাড়ি ঝুঁকে সেই বাস-ষ্টপের দিকে তাকালো। ওই মেয়েটা নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। কালই দেখতে হবে ছবিটা—বীটার রাইস—কোথায় হচ্ছে কে জানে। মনে মনে এখনো নামটার জুতসই একটা বাংলা হাতড়ে বেড়াচ্ছে ধীরাপদ।

তার এই দেখার আগ্রহটা চারুদি লক্ষ্য করছেন।

…নেই। ধীরাপদ অবাকই হল একটু। সঙ্গী পেল? ওই ক্ষীণ তনু আর উগ্র প্রসাধন সত্ত্বেও! শুকনো মুখখানা অবশ্য টানে। কিন্তু সে তো অন্য জাতের টান, সঙ্গী জোটানোর নয়। ধীরাপদরই ভুল। নারীতে যা স্বাভাবিক শিল্পের তা নিকটবর্তী বটে। কিন্তু এই রাতের চৌরঙ্গীতে শিল্প খুঁজছে কে? এখানে নারীতে যা অস্বাভাবিক বাসনায় তা আরো নিকটবর্তী। নিজের কথা মনে হতেই ধীরাপদর হাসি পেয়ে গেল। ওই মেয়েটা সঙ্গী পেয়েছে আর…ও নিজেও কি সঙ্গিনী পেল! চারুদির মত সঙ্গিনী! এও তো অবাক হবার মতই—

নীল আলো দিয়েছে। গাড়ি ডাইনে ঘুরল।

কি দেখছিলে অমন করে?

পিছনের কুশনে শরীর এলিয়ে দিল ধীরাপদ। সেই রকমই ঈষদুষ্ণ অস্বস্তিকর নরম স্পর্শ। কিছু না—

কাউকে খুঁজছিলে মনে হল?

না, এমনি দেখছিলাম—

চারুদি টিপ্পনী কাটলেন, আগের মত সেই ড্যাবড্যাব করে দেখে বেড়ানোর অভ্যেসটা এখনো আছে বুঝি!

চারুদি যদি জানতেন এত কাছ থেকেও একেবারে ঘুরে বসে তাঁকেই নির্নিমেষে খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছেটা ধীরাপদ কি ভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে, তাহলে বোধহয় এই ঠাট্টা করতেন না। তার অভ্যেসের খবর জানলে চারুদি হয়ত গাড়িতে টেনে তুলতেন না তাকে। হয়ত প্রথম দর্শনে গ্রামোফোন দোকানের সামনে তাকে চিনে ফেলার পর দ্বিধা আর সঙ্কোচ কাটিয়ে কাছে না এসে শেষ পর্যন্ত না চিনেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যেতেন। অন্তত সেই রকমই ধারণা ধীরাপদর নিজের সম্বন্ধে। চারুদি আর একটু হাসলে, আর একটু ঘুরে বসলে, ওই মিষ্টি গন্ধটা আর একটু বেশি ছড়ালে ধীরাপদ ওই দেখার প্রলোভন আর বেশিক্ষণ আগলে রাখতে পারবে না। চারুদি হয়ত তখন গাড়ি থামিয়ে নামিয়ে দেবেন ওকে। অবাক হয়ে নিজেকেই দেখছে ধীরাপদ। চারুদিকে আজও ভালো লেগেছে তার। চারুদি অনেক বদলেছে, তবু। অনেকটা মোটা হয়েছে, তবু। এত ভাল লেগেছে, কারণ চারুদিও এখন বিশ্লেষণ করে দেখার মতই। কিন্তু ওর বিশ্লেষণ অন্যের বরদাস্ত হওয়া সহজ নয়। তাই ভয়ে ভয়ে সরেই বসল আর একটু তারপর জবাব দিল, অভ্যেসটা আরো বেড়েছে।

তাই নাকি! ভালো কথা নয়। চারুদি ঘুরে বসলেন। যতটা ঘুরে বসলে ধীরাপদর মুশকিল, ততটাই। বিয়ে করেছ?

সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পড়তে ছোট মেয়ের মতই হেসে উঠলেন। মনে পড়েছে ধীরাপদরও। অল্প হেসে মাথা নাড়ল।

ও মা, এখনো বিয়ে করোনি! বয়েস কত হল?…দাঁড়াও, আমার এই চুয়াল্লিশ, আমার থেকে ন' বছরের ছোট তুমি—তোমার পঁয়ত্রিশ। এখনো বিয়ে করোনি, আর করবে কবে? আবারও বেশ জোরেই হেসে উঠলেন চারুদি। বললেন, ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে এখনো?

মৃদু হেসে ধীরাপদ পিছনের দিকে মাথাও এলিয়ে দিল এবার। উত্তর কলকাতার পথ ধরে চলেছে গাড়ি। ধীরাপদর ঘুম পাচ্ছে। মাথা টলছে না আর গা-ও ঘুলোচ্ছে না—রাজ্যের অবসাদ শুধু। শরীরটা শুধু ঘুম চাইছে। চারুদি কখনো থামছেন একটু, কখনো অনর্গল কথা বলছেন। কখনো এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করছেন। ধীরাপদ কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। কখনো হাসছে, কখনো বা হাঁ-না করে সাড়া দিচ্ছে একটু। কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। চারুদির চুয়াল্লিশ হয়ে গেল এরই মধ্যে! চৌত্রিশ বললেও তো বে-মানান লাগত না। ওর ছেলেবেলার কথা মনে হতে চারুদি হেসে উঠেছেন। হাসিরই ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য, চারুদির মনে আছে এখনো!

ধীরাপদ ভোলেনি। তার সেই ছেলেমানুষি সঙ্কল্পের ওপর অনেকবার অনেক দস্যুবৃত্তি হয়ে গেছে। তবু না। কালে জলে কতই তো ধুয়ে-মুছে গেল কিন্তু এক-একটা স্মৃতির পরমায়ু বড় অদ্ভুত। চোখ বুজলেই সব যেন ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। কত হল তার? পঁয়ত্রিশ? অথচ তার আর একটা বয়েস যেন সেই কবেকার

পদ্মাপারের ওখানেই আটকে আছে। এক একসময় এমনও মনে হয়, বয়েস কি মানুষের সত্যিই বাড়ে ? চারুদির বেড়েছে ?

পদ্মাপারের মেয়ে চারুদি।

মোটা ছিল না এমন। বেতের মত দোহারা গড়ন। জলজলে ফর্সা, একমাথা লালচে চুল। সেই চারুদিকে এক একসময় আগুনের ফুলকির মত মনে হত ন' বছরের ধীরাপদর। পাশাপাশি লাগালাগি বাড়িতে থাকত। ফাঁক পেলেই পালিয়ে এসে চারুদির গা ঘেঁষে বসে থাকত। ইচ্ছে করত ওই লাল চুলের মধ্যে নিজের দু' হাত চালিয়ে দিতে। ওকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখলেই চারুদি খুব হাসতেন।

কি দেখিস তুই ?

তোমাকে।

আমাকে ভালো লাগে তোর ?

খুব।

এর দু'বছর আগেই সে ঘোষণা করে বসে আছে, বিয়ে যখন করতেই হবে একটা, চারুদিকেই বিয়ে করবে। এটা সাব্যস্ত করার পর থেকেই চারুদির ওপর যেন অধিকারও বেড়ে গিয়েছিল তার। ওর বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে চারুদি হেসে ফেলেছিলেন এই জন্যেই।

শুধু এই নয়, আরো আছে। চারুদির বিয়ের রাতে মস্ত একটা লাঠি হাতে বিয়ের পিঁড়ির বরকে সরোষে তাড়া করেছিল ধীরাপদ। এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করতে পারেনি সেদিন। ধরে না ফেললে একটা কাণ্ডই হত বোধ হয়। জামাইয়ের মাথা যে কাটত কোনো সন্দেহ নেই।

বিয়ের পর চারুদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। এই কলকাতায় শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু ধীরাপদর কাছে কলকাতা তখন রূপকথার দেশ। মা আর তার নিজের দিদির মুখে চারুদির স্বামী জীবটির অনেক প্রশংসা শুনত। শুনে মনে মনে জ্বলত। মস্ত বড় লোক শ্বশুর, মস্ত বাড়ি গাড়ি—চারুদির বরও নাকি বিলেত ফেরত ডাক্তার। অমন রূপের জোরেই নাকি অমন বর পেয়েছেন চারুদি। ঘর বাড়ি গাড়ির কথা জানে না, চারুদির বর লোকটাকে দৈত্য গোছের মনে হত, ধীরাপদর। যেমন কালো তেমনি থপথপে। রূপকথার দেশ কলকাতা থেকে সেই দৈত্য বরকে বধ করে চারুদিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার বাসনা জাগত ওর। নেহাত ছোট, আর ঢাল তলোয়ার নেই বলেই কিছু করতে পারত না।

বছরে একবার দু'বার আসতেন চারুদি। খবর পেলে তিন রাত আগের থেকেই ঘুম হত না। পেয়ারা কামরাঙা পেড়ে পেড়ে টাল করে রাখত। চারুদিকে দেবে। কিন্তু সেই চারুদি আর নেই। একবার কাছে ডাকতেন কি ডাকতেন না। অথচ সারাক্ষণ কাছে কাছেই ঘুর ঘুর করত সে। কাছে গেলে আদর অবশ্য করতেন। কিন্তু ধীরাপদর অভিমানও কম ছিল না। না ডাকলে বেশি কাছে ঘেঁষত না। লোভ হলেও না। লোভ তো হবেই। রূপকথার দেশে থেকে আরো ঢের ঢের সুন্দর হয়েছে চারুদি। আগুনপানা রঙ হয়েছে প্রায়। আগুনপানা রঙ আর আগুনপানা চুল।

কিন্তু দুটো বছর না যেতে একদিন ধীরাপদ অবাক। এ বাড়িতে মা গম্ভীর, দিদি গম্ভীর। ও-বাড়িতে চারুদির মায়ের কান্নাকাটি। ক্রমে ব্যাপারটা শুনল ধীরাপদ। চারুদির স্বামী লোকটা মারা গেছে। ধীরাপদ ভাবল বেশ হয়েছে। এবারে চারুদি এলে আর তাকে কেউ নিয়ে যাবে না।

এবারে চারুদির আসায় আনন্দটা শুধু যেন একা তারই। চারুদি আসছে অথচ কারো একটুও আনন্দ নেই, মুখে এতটুকু হাসি নেই।

চারুদি এলেন। কিন্তু ধারে কাছে ঘেঁষার সুযোগ পেল না ধীরাপদ। আসার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেল আবার। ধীরাপদর মনে হত খামখা কি কান্নাই কাঁদতে পারে চারুদির মা। শুধু কি তাই। কান্নাটা যেন একটা মজার জিনিস। এ বাড়ি থেকে মা আর দিদি পর্যন্ত গিয়ে গিয়ে কেঁদে আসছে। কান্না কান্না খেলা যেন।

অথচ দু'তিন দিনের মধ্যে চারুদিকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পেল না ধীরাপদ। যখনই যায় চারুদির ঘর বন্ধ। অভিমানও কম হল না। স্বামী মরেছে কিন্তু ও তো আর মরেনি ! এ কেমন-ধারা ব্যবহার ! ধীরাপদও দূরে দূরে থাকতে চেষ্টা করল ক'টা দিন কিন্তু কেমন করে যেন বুঝল হাজার অভিমান হলেও চারুদি এবারে নিজে থেকে ডাকবে না ওকে। তাই ঘর খোলা দেখে পায়ে পায়ে ঢুকেই পড়ল সেদিন।

একটু আগে দিদি ঢুকেছেন। শৈলদি। তাই দেখতে পাওয়ার আশা নিয়েই এসেছিল ধীরাপদ। কিন্তু এমনটি দেখবে একবারও ভাবেনি। দেখে দু'চোখে যেন পাতা পড়ে না। মেঝেতে মুখ গোঁজ করে বসে আছেন চারুদি। পাশে দিদি বসে। দিদির চোখে জল ঝলমল। দু'জনেই চুপচাপ। ধীরাপদ ঘরে ঢুকেছে টের পেয়েও একবারও মুখ তুললেন না চারুদি। নাই তুলুক। তবু চোখ ফেরাতে পারছে না ধীরাপদ। চারুদির পরনে কোরা থান। লালচে রঙের সঙ্গে যে মিশে গেছে। আর তার ওপর একপিঠ তেল-না-পড়া লালচে চুল। এই বেশে এমন সুন্দর দেখায় কাউকে ভাবতে পারে না। পায়ে পায়ে দিদির কাছে এসে দাঁড়াল। যেমনই হোক, একটা শোকের ব্যাপার ঘটেছে অনুভব করেই একটু সান্ত্বনা দেবার ইচ্ছে হল তারও। বলল, তোমাকে এখন খুউব সুন্দর দেখাচ্ছে চারুদি।

সঙ্গে সঙ্গে দিদির হাতের ঠাস করে একটা চড় গালে পড়তে হতভম্ব। অপমানে চোখে জল এসে গেল, ছুটে পালাল সেখান থেকে।

ভেবেছিল, স্বামী মরেছে যখন, চারুদিকে আর কেউ নিতে আসবে না। স্বামী ছাড়াও যে নিতে আসার লোক আছে জানত না। চারুদি আবারও চলে গেলেন। এর পরে তাঁর বছরের নিয়মিত আসায় ছেদ পড়তে লাগল। শেষে দু'তিন বছরেও একবার আসেন কি আসেন না। বুদ্ধিতে আর একটু বড় হয়েছে ধীরাপদর। শুনেছে, চারুদির আসায় শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো বাধা নেই। যখন খুশি আসতে পারেন। কিন্তু নিজেই ইচ্ছে করে আসেন না চারুদি।

এ-ধরনের ইচ্ছা-বৈচিত্র্য ধীরাপদর ধারণাতীত।

ম্যাট্রিক পাস করে ধীরাপদ কলকাতায় পড়তে এলো। বোর্ডিংএ থেকে পড়া। অবিশ্রান্ত স্বাধীনতা।

কিন্তু কলকাতাকে আর রূপকথার দেশ মনে হয়নি তখন। শুধু

চারুদি আছেন কলকাতায় এটুকুই রূপকথার রোমাঞ্চের মত। ধীরাপদ প্রায়ই আসত চারুদির সঙ্গে দেখা করতে। চারুদি খুশি হতেন। আগের মতই হাসতেন। তাঁর থান পোষাক গেছে। মিহি শাদা জমির পাড়ওলা শাড়ি পরছেন। বেশ চওড়া নক্সাপেড়ে শাড়ি। হাতে বেশি না হলেও গয়না থাকতই। গলায় সরু হার আর কানে দুলও। ধীরাপদর তখন মনে হত ঠিক ওই টুকুতেই সব থেকে বেশি মানায় চারুদিকে।

চারুদি গল্প করতেন আর জোরজার করে খাওয়াতেন। আগের সম্পর্ক নিয়ে একটু আধটু ঠাট্টাও করতেন। তার কাঁচা বয়সের লেখায় ব্যক্তিকটা একদিন কেমন করে যেন টের পেয়ে গেলেন চারুদি। টের পাওয়ানোর চেষ্টা অবশ্য অনেকদিন ধরেই চলছিল। এখানে আসার সময় সম্ভ সম্ভ সব লেখাই ধীরাপদর পকেটের সঙ্গে চলে আসত। চারুদির উৎসাহে আর আগ্রহে সে ছোটখাট একটি লেখক হয়ে বসেছে বলেই বিশ্বাস করত।

মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আর একজন অপরিচিতের সাক্ষাৎ পেত ধীরাপদ। সুশ্রী, সুউন্নত পুরুষ। ধীর গম্ভীর, অথচ মুখখানা সব সময়ে হাসি হাসি। ফর্সা নয়, সুন্দর নয়, কিন্তু পুরুষের রূপ যেন তাকেই বলে। মার্জিত, অনমিত। গলায় স্বরটি পর্যন্ত নিটোল ভরাট। চল্লিশের কিছু কমই হবে বয়েস। কিন্তু এরই মধ্যে কানের দুপাশের চুলে একটু একটু পাক ধরেছে—এই বয়সে ওটুকুরও ব্যক্তিত্ব কম নয়।

শুধু চারুদিকেই গল্প করতে দেখত তাঁর সঙ্গে, আর কাউকে নয়। মোটরে এক আধদিন বেড়াতেও দেখেছে তাঁদের। একদিন তো চারুদি ওকে দেখেও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন—যেন দেখেন নি। তারপর আর এক সপ্তাহ যায়নি ধীরাপদ। চারুদি চিঠি লিখতে তবে গেছে। চারুদি না বললেও ধীরাপদ জেনে নিয়েছিল, তাঁর স্বামীর সব থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক।

কিন্তু এ নিয়ে মনে কোনরকম প্রশ্ন জাগেনি ধীরাপদর। সতের আঠের বছর বয়েস মাত্র তখন। ছেলেদের মুক্ত বয়েস ওটা। আর ওই নিয়ে ছেলেবেলার মত ঈর্ষাও হত না। সেই হাস্তকর ছেলেবেলা আর নেই। তাছাড়া সেদিক থেকে ভদ্রলোকের তুলনায় নিজেকে এমন নাবালক মনে হত যে তাঁকে নিয়ে মাথাই ঘামাত না বড় একটা। শুধু চারুদির একটু আদর যত্ন পেলেই খুশি। সেটুকুর অভাব হত না।

এক বছর না যেতে সেই নতুন বয়সের গোড়াতেই আবার একটা ধাক্কা খেল ধীরাপদ। দিন দশ বারো জ্বরে পড়ে ছিল, কিন্তু চারুদি লোক পাঠিয়ে বা চিঠি লিখে একটা খবরও নেন নি। অসুখ ভালো হবার পরেও অভিমান করে কাটালো আরো দিন কতক। ধীরাপদ বলে কেউ আছে তাই যেন ভুলে গেছেন চারুদি। শেষে একদিন গিয়ে উপস্থিত হল চারুদির শ্বশুরবাড়িতে।

শুনল চারুদি নেই।

কোথায় গেছেন, কি বৃত্তান্ত কিছুই বুঝল না। বাড়ির লোকের রকমসকম দেখে অবাক হল একটু। কেউ কখনো দুর্ব্যবহার করেন নি তার সঙ্গে। এ ত দুর্ব্যবহার ঠিক নয়। তবু কেমন যেন।

এর পর আরো দু'তিন দিন গেছে। সেই এক জবাব। চারুদি নেই। কোথায় গেছেন কবে ফিরবেন কেউ কিছু জানে না।

ধীরাপদ হতভম্ব।

ছুটিতে বাড়ি এসে চারুদির কথা তুলতেই মা বলেন, চুপ চুপ! দিদি বলেল, চুপ চুপ।

এই চুপ চুপের অর্থ অবশ্য বুঝেছিল ধীরাপদ। চুপ করেই ছিল। কিন্তু ভিতরটা তার চুপ করে ছিল না। কলকাতায় এসেও অনর্থক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে। অন্যমনস্কের মত দু'চোখ তার কি যেন খুঁজেছে। আর মনে হয়েছে, এই রূপকথার দেশে কি যেন তার হারিয়ে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

চারুদির কথায় চমক ভাঙল ধীরাপদর। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে একটা একতলা বাড়ির সামনে—ছোট লন-এর ভিতরে। রাত বলে ঠিক ঠাওর না হলেও বাড়িটা সুন্দরই লাগল চোখে।···কিন্তু সে কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কোথায় এলো? কি বলেছিলেন চারুদি এতক্ষণ!

এই বাড়ি?

এই বাড়ি। নামো।

চারুদি আগে নামলেন। পিছনে ধীরাপদ। বাবুকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে তাকে নিয়ে চারুদি ভিতরে ঢুকলেন। সামনের ঘরের আলো জ্বলছিল। দোর-গোড়ায় একজন বুড়ী মত মেয়েছেলে বসে। কর্ত্রীর সাড়া পেয়ে উঠে ভিতরে চলে গেল।

বোসো, এক্ষুনি আসছি।

রেকর্ড হাতে চারুদিও অন্দরে ঢুকলেন। এই অবকাশে ধীরাপদ ঘরের ভিতরটা দেখে নিল। ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো ঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট। নরম গদির সোফা সেট। বসলে শরীর ডুবে যায়। বসে যেন অস্বস্তি বাড়ল ধীরাপদর। ঘরের দু' কোণায় দু'টো কাচের আলমারি। নানারকম শৌখিন সরঞ্জাম তাতে। উল্টো দিকের দেয়ালের বড় আলমারিটা বইএ ঠাসা। এই রকম ঘরে আর এই রকম জোরালো আলোয় নিজের মোটামুটি ফর্সা জামা-কাপড় পর্যন্ত বেখাপ্পা রকমের স্থূল আর মলিন ঠেকছে ধীরাপদর চোখে।

দিনের বেলা এসো একদিন, ভালো করে বাড়ি দেখাব তোমাকে—বাগানও করেছি। ভালো ডালিয়ার চারা পেয়েছি, মস্ত ডালিয়া হবে দেখো।

চারুদি ফিরে এসেছেন। ওকে ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে দেখেই হয়ত খুশি হয়ে বলেছেন। বড় একটা সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন তিনি। কাব্য করে বললে বলতে হয়, অলস শৈথিল্যে তনুভার সমর্পণ করলেন। ধীরাপদ দেখছে, এরই মধ্যে শাড়ি বদলে এসেছেন চারুদি। মিহি সাদা জমির ওপর টকটকে লাল ভেলভেট পাড় শাড়ি। আটপৌরে ভাবে পরা। মুখে চোখে জল দিয়ে এসেছেন বোঝা যায়। মুছে আসা সত্ত্বেও ভিজে ভিজে লাগছে। কপালের কাছের চুলে দুই এক ফোঁটা জল আটকে আছে মুক্তোর মত। ঘরের সাদা আলোয় ধীরাপদ লক্ষ্য করল, চুল আগের মত অত ভকনো লাল না হলেও লালচেই বটে। এই ঘরে ঠিক যেমনটি

মানায় তেমনিই লাগছে চারুদিকে। ভারী স্বাভাবিক। শিল্পের কাছাকাছি প্রায়।

কিন্তু এই শিল্প উপলব্ধি করার মত রসিক ধীরাপদ নয়। নয় যে, এই প্রথম টের পেল। কোনো কিছুরই কাছে আসতে পারছে না সে। বাড়ি না, গাড়ি না, বাগান না, ডালিয়া না—এমন কি চারুদিও না। এমন হল কেন! মাথাটা কি টলছে আবার? গা ঘুলোচ্ছে? কিন্তু তাও তো এখন টের পাচ্ছে না তেমন।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করেই বোধহয় চারুদি বললেন, মুখ-হাত ধুয়ে এলাম—ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল না দিয়ে পারিনে, মাথা গরম হয়ে যায়।

শুনে একটু খুশি হল কেন ধীরাপদ?…এই একটি কথায় মাটির সঙ্গে যোগ আছে বলেই বোধ হয়। কালো মোটাসোটা কম বয়সের আর একটি মেয়েছেলে ঘরে এসে দাঁড়াল। এও পরিচারিকা বা রাঁধুনী হবে। হুকুমের প্রতীক্ষায় কর্ত্রীর দিকে তাকালো।

তোমাকে চা দেবে তো?

ধীরাপদ মাথা নেড়েছে। কিন্তু হাঁ বলেছে না না বলেছে? বোধহয় না-ই বলেছে। মাথা নাড়ার সময় খেয়াল ছিল না, মেয়েছেলেটিকে দেখছিল। পরিচারিকা হোক আর রাঁধুনী হোক, আসলে বোধহয় রক্ষিনী হিসেবেই এই পুরুষশূন্য গৃহে বহাল আছে সে। একেবারে বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মত আধময়লা শাড়ি না পরলে পাহাড়িনী ভাবত। অনুমান মিথ্যে নয়, ইঙ্গিতে তাকে বিদায় দিয়ে চারুদি হেসে বললেন, কেমন দেখলে আমার বডিগার্ড?

ভালো। কিন্তু ওর গার্ড দরকার নেই?

চারুদি হাসলেন খুব। অত হাসবেন জানলে বলত না।

ধীরাপদর মনে হল অত হাসলে চারুদিকে ভালো দেখায় না। খুব যেন সহজ মনে হয় না।

চারুদি বললেন, কি মনে হয়, দরকার আছে? ধারে-কাছে ঘেঁষবে কেউ? আগে শহরের মধ্যে থাকতুম যখন, দুই-একজন ঘুরঘুর করত বটে—তাদের একজনের সঙ্গে ডাব-কাটা দা নিয়ে দেখা করতে এগিয়েছিল পার্বতী। তারপর থেকে আর কেউ আসেনি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে পার্বতী সমাচার শুনতে হল ধীরাপদকে। পারুল-গোছের পার্বতী নয়। পাহাড়ী পার্বতীই বটে। বছর দশেক বয়সে চারুদি শিলঙ পাহাড় থেকে কুড়িয়েছিলেন ওকে। সেই থেকে এই পনের বছর ধরে চারুদির কাছেই আছে। এখন এক বাংলা ছাড়া আর কিছু বড় বোঝেও না, বলতেও পারে না।

তারপর তোমার খবর বলো দেখি, শুনি। পার্বতী-সংবাদ শেষ করে প্রসঙ্গান্তরে ঘুরলেন চারুদি।—কিছুই তো বললে না এখনো। যাচ্ছেতাই চেহারা হয়েছে, থাকার মধ্যে শুধু চোখ দুটো আছে—সেও আগের মত অত মিষ্টি নয়, বরং ধার ধার—কে দেখে শোনে?

চারুদি হাসলেন। ধীরাপদও। দেখা-শোনার কথায় কেন জানি সোনাবৌদির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ফলে আরো বেশি হাসি পেল ধীরাপদর। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে হলেই যত বিড়ম্বনা।…বেশ তো নিজের কথা বলছিল চারুদি। এবারের বিড়ম্বনাও কাটিয়ে দিল পার্বতী ঘরে ঢুকে। জানালো, টেলিফোন এসেছে। কর্ত্রী যাবেন না ফোন এখানে আনা হবে?

কর্ত্রীই গেলেন। ফিরেও এলেন একটু বাদেই। ধীরাপদ ঠিকই আশা করেছিল। কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন চারুদি ভুলে গেছেন। চারুদি শুনতে চান না কিছু, বলতে চান। বলে বলে আগের মতই হাল্কা হতে চান আর সহজ হতে চান। ধীরাপদর সেই রকমই মনে হচ্ছে। মনে হয়েছে, মনের সাধে কথা বলার মত লোক চারুদি বোধহয় এই সতেরো-আঠারো বছরের মধ্যে পাননি। শেষ দেখা কতকাল আগে?…সতেরো-আঠারো বছরই হবে।

ফিরে এসেই চারুদি গল্প জুড়ে দিয়েছেন আবার। অসংলগ্ন, এক-তরফা।…শহরের হাটের মধ্যে পাগল পাগল করত সর্বদা, তাই এই নিরিবিলিতে বাড়ি করেছেন। মনের মত বাড়ি করাও কি সোজা হাঙ্গামা, বিষম ধকল গেছে তাতেও। টাকা ফেললে লোকজন পাওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাস কাউকে করা যায় না। যতটা পেরেছেন নিজে দেখেছেন, বাকিটা পার্বতী। কেনা-কাটার জন্যে সপ্তাহে দু'তিন দিন মাত্র শহরে যান—তার বেশি নয়।

শুনতে শুনতে ধীরাপদর আবারও ঝিমুনি আসছে কেমন। পা-এলাতে সাহস হয় না আর।

—অমুক রেকর্ড পছন্দ, অমুক অমুক লেখকের লেখা। ধীরাপদ লেখে না কেন, বেশ তো মিষ্টি হাত ছিল লেখায়—লিখলে এতদিনে নামডাক হত নিশ্চয়। অমুক ফুলের চারা খুঁজছেন, নিউ মার্কেট তন্ন তন্ন করে চষেছেন—নামই শোনে নি কেউ। তবে কে একজন আনিয়ে দেবে বলেছে।…মালীটা ভালো পেয়েছেন, বাগানের যত্ন-আত্তি করে। ড্রাইভারটাও ভালো—তবে ওদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা কইতে হয় বলেই যত মুশকিল চারুদির। হিন্দীর প্রথমভাগ একখানা কিনেছেনও সেই জন্য, কিন্তু ওলটানো আর হয়ে ওঠে না। এখন বিশ্বস্ত একজন বন্দুকঅলা গেট-পাহারাদার পেলেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন চারুদি। পার্বতীকে নাকি বলেছেন দেখেশুনে পছন্দ মত একজনকে জুটিয়ে নিতে—ঘর-জামাই হয়ে থাকবে আর বন্দুক কাঁধে বাড়ি পাহারা দেবে।

চারুদি হেসে উঠলেন। কিন্তু এবারে শ্রোতার মুখের দিকে চেয়ে একটু সচেতনও হলেন যেন।—ও মা, আমি তো সেই থেকে একাই বকে মরছি দেখি, তুমি তো এ পর্যন্ত সবসুদ্ধ দশটা কথাও বলোনি।…কথা বলাও ছেড়েছো নাকি? শুধু দেখেই বেড়াও?

কি যে হল ধীরাপদর সেও জানে না। ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল একেবারে। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। চোখে চোখ রেখে হাসল একটু। যেন মজার কিছু বলতে যাচ্ছে।—না, কথাও বলি। তবে, বড় গদ্য কথা।…আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো?
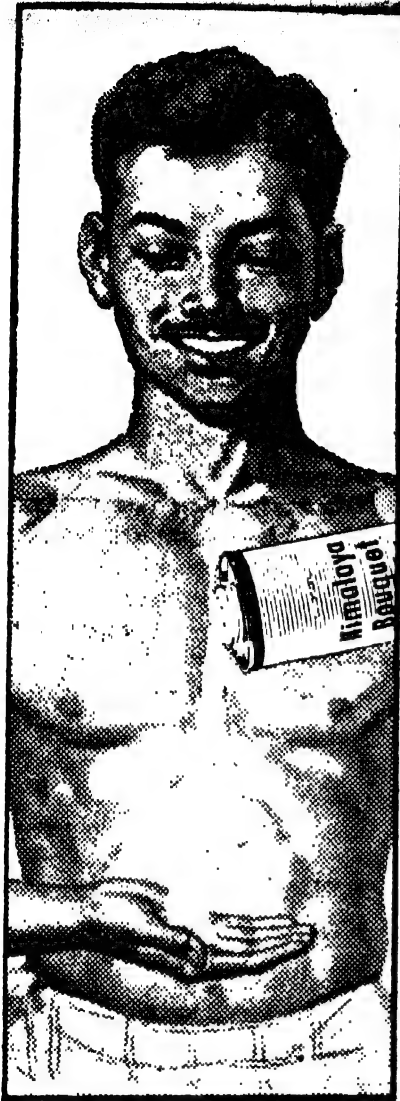
[ক্রমশঃ।
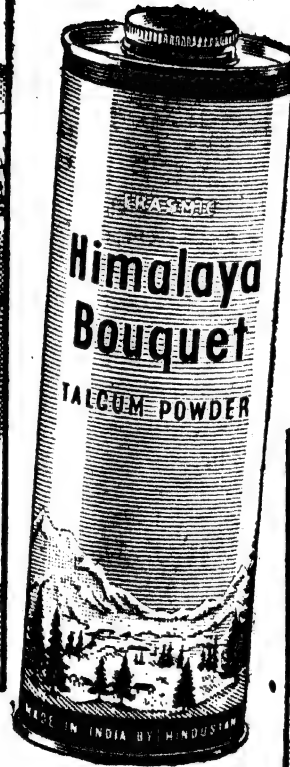
ভবানী মুখোপাধ্যায়

তেত্রিশ

ফরাসী সাহিত্যিক আঁরি বারবুস লেখক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, আবিষ্কারক, গায়ক প্রভৃতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি বিশ্বজনীন যুদ্ধবিরোধী সংস্থা গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই সংস্থার রাজনীতিকদের স্থান নেই। বার্ণার্ড শ'র হাতে যখন বারবুসের চিঠিখানি এ্যায়টে এসে পৌঁছালো, ঠিক সময়েই টি, ই, লরেন্সের ১৯৩১-এর ২৫শে সেপটেম্বর তারিখে একখানি চিঠি পেলেন সার্জেন্ট সেই চিঠিতে লেখা ছিল—In one world I would put the creatures that create (and G. B. S. crowned amongst them) while in another world, working for them would be the cooks and shoe makers and boatmen and soldiers, who might swell a chest only for the hour after they had been of use to them.

এর ফলে বার্ণার্ড শ' সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অবজ্ঞা প্রকাশের একটা সুযোগ পেলেন। তিনি বারবুসকে লিখলেন যে চিরদিনই লক্ষ্য করেছেন তথাকথিত সৃজনীমূলক প্রতিভার অধিকারীদের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি কিঞ্চিৎ কম। ফেবিয়ান সোসাইটির যে ক্ষতি এইচ, জি, ওয়েলস করেছিলেন তা পরিষ্কার করতে তাঁকে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এর জবাবে আঁরি বারবুস জানালেন—যে তিনি ইতিমধ্যে অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন, টমাস ম্যান, আপটন সিনক্লেয়ার, ম্যাকসিম গোর্কী, রমাঁ রলাঁর সমর্থন পেয়েছেন, বার্ণার্ড শ'র সহযোগিতা লাভ করলে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় সহায়তা হবে।

এর এক মাস পরে লণ্ডনে এলেন মহাত্মা গান্ধী, রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগ দিতে। মহাত্মা গান্ধীর ওপর বার্ণার্ড শ'র শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। তিনি সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

নাইটসব্রিজে গান্ধীজীর সঙ্গে দশ মিনিটের জন্য আলাপ করার অনুমতি পাওয়া গেল।

গান্ধীজী মাটিতে বসে তাঁর সেই অতি পরিচিত ভঙ্গীতে সুতো কাটছিলেন। মাটিতেই বসলেন বার্ণার্ড শ,' চরকার ঘরঘর শব্দের মধ্যেই দুজনের কথাবার্তা শুরু হল।

বার্ণার্ড শ' স্মরণ করিয়ে দিলেন—আপনার সঙ্গে আমার আগে আর একবার আলাপ হয়েছিল মনে পড়ে?

মহাত্মাজী স্মরণ করতে পারলেন না।

শ' বললেন—আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন কোথায় ভালোভাবে নাচ শিখবার সুবিধা হতে পারে। আপনার নিখুঁত নর্তন পদ্ধতির প্রতি আগ্রহ ছিল।

গান্ধীজী হেসে বললেন—রীতিমত কেতাদুরস্ত ইংরাজ জেন্টেলম্যান হওয়ার বাসনা আমার মনে প্রবল ছিল। আমি ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য ইংলণ্ডে এসেছিলাম, সেই সঙ্গে সভ্যতার সব আশীর্বাদ (graces of civilization)। আচ্ছা, আপনাকেই কি প্রশ্ন করেছিলাম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ দরজির নাম কি?

বার্ণার্ড শ' হাসলেন।

গান্ধীজী আবার বললেন—আমি এ কথাও জানতে চেয়েছিলাম, কি ভাবে ইংরাজী উচ্চারণ উন্নতি শুদ্ধ করা যায়, শিক্ষকের সাহায্যে ইংরাজীনবীশ হওয়ার বাসনা ছিল সেদিন।

বার্ণার্ড শ' বললেন—ভাগ্যক্রমে আমরা উভয়েই 'সভ্যতার আশীর্বাদ' থেকে সরে আসতে পেরেছি। সভ্যতার কবল থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি।

দেখতে দেখতে দশ মিনিট কেটে গেল।

১৯৪৮-এ গান্ধীজীর মৃত্যু ঘটলো আততায়ীর গুলীতে। এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সের টেলিফোন সেদিন মুহুর্মুহুঃ বাজতে লাগল। সবাই চায় বার্ণার্ড শ'র মুখ থেকে মহাত্মাজীর মৃত্যু সম্পর্কে কিছু শুনতে। এর কিছু দিন আগেই দেবদাস গান্ধীর সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র দেখা হয়েছিল। তখন পরিহাস করে বার্ণার্ড শ' বলেছিলেন—তোমার বাবা আমার কাছে শিশু, আমি বুড়ো হয়েছি, তোমার পিতৃদেব উপবাস প্রভৃতির দ্বারা শরীরটা যেভাবে সুস্থ রাখছেন, তিনি এই প্রার্থনা আর উপবাসের ফলেই অন্ততঃ দুশো বছর বাঁচবেন। তাঁকে আমার কথা জানিয়ো।

তার পরেই এল এই নিদারুণ দুঃসংবাদ। বার বার সবাই তাঁর শোকোচ্ছ্বাস জানতে চাইছে। বার্ণার্ড শ' টেলিফোনেই জানালেন—

I always said that it was dangerous to be good!

বার্ণার্ড শ'র শোকের সঙ্গে কিছু কৌতূহলও ছিল। তিনি বার বার জানতে চাইলেন আততায়ীর কি শাস্তি হল? তাকে কি ক্ষমা করা হবে? গান্ধীজীর অহিংসা ধর্ম কি ভাবে সম্মানিত হবে, এই তাঁর চিন্তা!

এই বছরের ২১শে ডিসেম্বর সার্জেন্ট আর বার্ণার্ড শ' কেপটাউন ভ্রমণে যাত্রা করলেন। এই সফরে কোনোরকম বক্তৃতাদি করবেন না স্থির করলেও সেখানে উপস্থিত হয়ে নবীন রাশিয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন। পোর্ট এলিজাবেথের পথে এক দুর্ঘটনায় দু জনেরই প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা ঘটেছিল। বার্ণার্ড শ'র ধারণা ছিল, তিনি

গাড়ি চালাতে অতিশয় দক্ষ, পথে এক জায়গায় নিজে ড্রাইভ করার ঝোঁক ধরলেন। বেশ জোরে চালিয়ে চলেছেন, হঠাৎ এক জায়গায় আমার প্রয়োজন হওয়ায় ব্রেকের বদলে একসিলেটরে পা দিলেন, এটা তাঁর বদ অভ্যাস ছিল। নেহাৎ ভাগ্যক্রমে গাড়িবোঝাই মানুষ বেঁচে গেল। ওয়াইলডারনেস্ নামক জায়গায় পৌঁছে তাঁদের প্রায় মাসাধিক কাল থাকতে হল। সার্জেণ্টের অবস্থা অতি গুরুতর হয়েছিল, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

সার্জেণ্ট পিছনের সিটে ছিলেন বলেই তাঁর আঘাতটা বেশী হয়েছিল। জ্ঞান হতেই তিনি সর্বপ্রথম জানতে চাইলেন শ' কেমন আছেন? যখন মিসেস সার্জেণ্ট শ'কে ক্লিসনা নামক শহরে নিয়ে যাওয়া হল তখন তার টেম্পারেচার উঠেছে ১০৮' ডিগ্রী।

রয়্যাল হোটেল ক্লিসনা থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ এই তারিখে লেডী এ্যাষ্টরকে পেনসিলে লেখা এক চিঠিতে শ' লিখেছেন—

সামান্য একটু-আধটু আঘাত ছাড়া আমার তেমন কিছু হয়নি, আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তাঁরও নয়, গাড়িটারও নয়। কিন্তু, আহা বেচারী সার্জেণ্ট। মোটঘাটের স্তূপ থেকে তাকে যখন উদ্ধার করছি তখনই মনে হল বিপত্নীক হলাম, এমন সময় আমরা আহত হয়েছি কি না জানতে চাইল। ওর মাথাটি ভেঙেছে, চশমার রিম চোখে ঢুকেছে, বাঁ হাতের কব্জি মচকেছে, পিঠটা ছড়ে গেছে বিশ্রীরকম, আর ডানদিকের পায়ের গোড়ালিটায় একেবারে গর্ত হয়েছে। এখান থেকে হোটেল পনের মাইল।

এ সব আট দিন আগেকার ঘটনা, এখন আর তেমন উদ্বেগ নেই। তবু এখনও উনি শয্যাশায়ী, পায়ের সেই গর্তটার যন্ত্রণা, কাল ১০৩' জ্বর উঠেছিল (আমার প্রাণ একেবারে জিভের ডগায় এসেছিল), যাক, আজ অবস্থা ভালো, জ্বর ১০০ 'ডিগ্রীতে নেমেছে। বড়ই কাহিল হয়ে আছে। এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছানোর আগেই হয়ত আমরা ওয়াইলডারনেসে গিয়ে হাওয়া বদল করবো। আমি তার না করলে জেনো আমরা সব কুশলেই আছি।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন, এইখানে এক মাস কাল সার্জেণ্ট শয্যা আশ্রয় করে রইল, আমি প্রতিদিন স্নান করতাম আর The Adventures of the Black Girl in her search for God লিখতাম।

এইটি বার্ণার্ড শ'র স্বল্পায়তন গ্রন্থাবলীর অন্যতম। পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বাইবেলের একটি ঘটনা সার্জেণ্টের রোগশয্যায় বসে তাঁর মনে হল। তিনি ঈশ্বরতত্ত্বের একটি সূক্ষ্ম সূত্র ধরে গ্রন্থটি রচনা করলেন। ১৯৩২-এর ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হওয়ার পর এই গ্রন্থ এক বছরে ২০০,০০০ খণ্ড বিক্রী হয়েছে।

আফ্রিকার নগ্নদেহা কালো মেয়ে মিশনারী মহিলার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল বাইবেল, সে ঈশ্বর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। তাঁকে ধরা সহজ নয়, তিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জেনেসিসে ঈশ্বরের সন্ধান যখন পাওয়া গেল তখন তিনি ধূলায় মিলিয়ে গেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তখন লুপ্ত। জবের ঈশ্বর জেনেসিসের ঈশ্বরকে ধ্বংস করে, তার হাতে নষ্ট হয় মিকার ঈশ্বর।

বিবর্তনশীল ঈশ্বরের বিচিত্র দুর্গতি! কালো মেয়ে তত্ত্ব আর তথ্যের ধূম্রজাল ভেদ করে যেখানে পৌঁছায় সেখানেও তার প্রশ্নের জবাব মেলে না। ঈশ্বরান্বেষণ অসম্পূর্ণ থাকে। ঈশ্বরকে পাওয়া

তার না, যখন তাঁকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, আর সেই অনাবিষ্কৃত দেবতা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। বার্ণার্ড শ'র মতো একজন মানুষকে বিবাহ করে বহু সন্তানের জননী হয়ে সে সুখে দিন কাটায়। ইডেন উদ্যানে আদিজননী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার চেয়ে এক ফোঁটা বেশী জ্ঞান লাভ তার অদৃষ্টে ঘটে না।

বার্ণার্ড শ' তাঁর বক্তব্য পরিবেশনে কালো মেয়ে নির্বাচন করেছিলেন, তার কারণ বাইবেল সম্পর্কে তার মন সংস্কারমুক্ত,—an unbiassed contemplation of the Bible with its series of gods marking Stages in the development of the conception of God from the monster Bogey-man, the everlasting Father to the Prince of Peace.

তাই কালো মেয়ে এক মাইল যাওয়ার পর দেখে জনৈক ধীবর কাঁধে নিয়ে চলেছে এক বিরাট গির্জাঘর।

দৌড়ে যায় কালো মেয়ে তাকে সাহায্য করতে, বলে—হুঁশিয়ার, তোমার কাঁধটা না ভেঙ্গে যায়।

প্রাচীন ধীবর হেসে বলে—ভয় নেই, আমি হলাম পাহাড়, আমার ওপর এই চার্চ গড়া হয়েছে।

উদ্বিগ্ন কালো মেয়ে বলে উঠে—কিন্তু সত্যিই ত' তুমি আর পাহাড় নও, এই গির্জা অতিশয় ভারী, তুমি কি করে বইবে?

তার মনে সর্বদাই ভয়, লোকটি এই গুরুভারে ধ্বসে পড়বে।

ধীবর মধুর ভঙ্গীতে হেসে বলে—ভয় নেই, কিছু হবে না, এই গির্জাটা কাগজের তৈরী।

এই বলে সে নৃত্যের তালে তালে চলে যায়, চার্চের সব ঘণ্টাগুলি বেজে ওঠে।...

The Adventures of the Black Girl in her search for God-এ বার্ণার্ড শ' দেবত্বের বিভিন্ন ক্রমবিকাশ দেখিয়েছেন। এই সবেরই পরিণতি কিন্তু ভুল বা অতিশয়োক্তিতে পরিপূর্ণ। বার্ণার্ড শ'র ঈশ্বরের ব্যক্তিস্বরূপ স্বল্প এবং তিনি এখনো চরমতম পর্যায়ে পৌঁছে সর্বাঙ্গসুন্দর হননি। মাথার চুল গণনা করা বা পাখির মৃত্যু লক্ষ্য করার মত অবসর তাঁর নেই। আসল কথা, তিনি এখনও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠেন নি। তিনি বিবর্তনশীল ঈশ্বর, আমরা যেমন পদে পদে ভুল করে শিখি, তিনিও এখনো শিখছেন, ক্রটী সংশোধন করছেন। বার্ণার্ড শ'র মতে তাই ঈশ্বরেরও ভুল হয়। Man and superman সম্পর্কে যখন টলষ্টয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময় হয় তখন টলষ্টয় তাই বার্ণার্ড শ'কে লিখেছিলেন—You seem yourself to recognise a God who has definite aims comprehensible to you—শ'র চটুলতায় বিরক্ত হয়ে তিনি সেদিন অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বার্ণার্ড শ' চটুল নন, এবং তাঁর ঈশ্বরও টলষ্টয়ের বিশ্বাস মাফিক বদ্ধ নন। Methuselah প্রকাশিত হওয়ার পর বার্ণার্ড শ'কে প্রশ্ন করা হয়—do you believe there must be somebody behind something? তার জবাবে সেদিন তিনি বলেছিলেন—No. I believe there is something behind the somebody. All bodies are product of the Life force.

তাই বার্ণার্ড শ' নির্দেশ দিয়েছেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বর কে? উঠে দাঁড়িয়ে বলবে—আমিই ঈশ্বর! এই সেই ঈশ্বর! এই ঈশ্বর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এখনও ক্রমবিকাশের পথে।

কালো মেয়ে আইরিশ ভদ্রলোককে প্রশ্ন করে—তাহলে তুমি ঈশ্বর অনুসন্ধানে আসোনি?

আইরিশ ভদ্রলোক—সন্ধান চুলোয় যাক, ঈশ্বরের যদি প্রয়োজন থাকে তিনি আমাকে সন্ধান করে নিন। আমার নিজের ধারণা তিনি তা নন যা হতে চান। এখনো তাঁকে ঠিকমত গড়া হয়নি, তিনি অসম্পূর্ণ। আমাদের অন্তর্নিহিত কোনো বস্তু তাঁর দিকে চলেছে আর আমাদের অন্তর-বহির্ভূত কোনো পদার্থ তাঁর অভিমুখী হয়ে আছে। এ কথা সুনিশ্চিত। আর একথাও সত্য যে, তাঁর অভিমুখী হতে গিয়ে অনেক ভুল ভ্রান্তি ঘটছে। আমাদের সাধ্যমত একটা পথ খুঁজে বার করা উচিত। কারণ অনেক লোক নিজেদের উদর ভিন্ন আর কোনো কিছুর কথা ভাবেই না।

এই কথা বলে নিজের হাতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে তিনি খনন কর্মে ব্যস্ত হলেন।

বার্ণার্ড শ'র সেক্রেটারি শ্রীমতী ব্লাঞ্চি প্যাচ বলেছেন, ডিসেম্বর মাসে (১৯৩২) এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, ভীষণ সাফল্য লাভ করল, বড়দিনের উপহার হিসাবে প্রশস্ত হল। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই পাঁচ বার মুদ্রিত হল। জন ফারলে অঙ্কিত সুন্দর কাঠ খোদাই বইটির সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছিল। এই সময় জনৈক ক্যাথলিক বার্ণার্ড শ'কে বললেন—এই গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করুন। বার্ণার্ড শ' বললেন—১০০,০০০ কপি ইতিমধ্যেই বিক্রী হয়েছে, পঠিত হয়েছে, সুতরাং যদি কোনো ক্রটী হয়ে থাকে তা হয়েছে। তিনি বললেন, দেবত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা। তিনি সেই নিরামিষবিরোধী দেবতাকে বিশ্বাস করেন না—যিনি সমগ্র মানবজাতিকে প্লাবনে ধ্বংস করে পোড়া মাংসের গন্ধে তৃপ্ত হয়েছিলেন।

বাইবেলে আছে—And Noah builded an altar unto the Lord; and took of every clean beast, and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled a sweet savour.

বার্ণার্ড শ' বিশ্বাস করেননি যে নোয়ার ভগবানের কোনো অস্তিত্ব ছিল, বা থাকতে পারে।

বার্ণার্ড শ' ক্যাথলিকের অভিযোগের উত্তরে লিখলেন—You think you believe that God did not know what he was about when he made me and inspired me to write the Black Girl, for what happened was that when my wife was ill in Africa God came to me and said—'There are women plaguing me night and day with their prayers for you. What are

you good for any how ?' So I said I could write a bit but was good for nothing else. God said then 'take your pen and write what I shall put on your silly head'—and that was how it happened.

বার্ণার্ড শ'র ঈশ্বর খৃষ্টানের ঈশ্বর নয়, মানবিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়া মানবিক দেবতা। যা আনন্দ তাই ঈশ্বর, ঈশ্বর আনন্দের প্রতীক, আদর্শের প্রতীক।

চৌত্রিশ

বার্ণার্ড শ'র নতুন নাটক Too True To Be Good লেখা হয়েছিল 'ম্যালভাবন ফেষ্টিভ্যালে'র অনুরোধে। এই ম্যালভাবন নাট্য উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা বার্মিংহাম রেপার্টরি থিয়েটরের স্যার ব্যারী জ্যাকসন। মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে তার জন্য প্রতিমা চাই, স্যার ব্যারী জ্যাকসনও তাই ভেবেছিলেন বার্ণার্ড শ'র নাটককে কেন্দ্র করে ম্যালভাবন উৎসব জমিয়ে তুলবেন। এর আগে তিনি Back to Methuselah মঞ্চস্থ করে বার্ণার্ড শ'র প্রীতি অর্জন করেছিলেন, তাই বার্ণার্ড শ' সানন্দে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বাল্যে সঙ্গীত ও ছবি মনকে যেমন নাড়া দিত এই উৎসবে সেই পুরাতন স্পর্শ ফিরে পাবেন, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশে সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

ম্যালভাবন উৎসবের উদ্দেশ্য নতুন কিছু করার। তাঁরা প্রতি বছর বার্ণার্ড শ'র একটি করে নতুন নাটক অভিনয় করবেন। পরবর্তী কুড়ি বছর এমনই চলবে, এই তাঁদের আশা ছিল। তখন বার্ণার্ড শ'র বয়স তিয়াত্তর। বার্ণার্ড শ'র প্রতিভার প্রতি এ এক বিচিত্র প্রশস্তি, বুড়া বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা। বার্ণার্ড শ' এদের জন্য প্রথম নাটক রচনা করেন Apple cart তার কথা আগে বলা হয়েছে।

নতুন নাটক Too True To Be Good নাটকে বার্ণার্ড শ' দেখাতে চেয়েছেন অতিমানব যে কোনও অবস্থার মধ্যে পড়লেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। টি, ই, লরেন্সের মতো যে নিম্নতম পদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তার ওপরওলাদের চালিত করবে। এই জাতীয় মানুষ বার্ণার্ড শ' ডকশ্রমিক, খনিশ্রমিক, রেলকর্মী ও কেরাণীদের মধ্যে দেখেছেন। তারা সেই নিম্নতম অবস্থা থেকে শক্তি ও প্রেরণা দিয়েছে।

আগস্টস জন অঙ্কিত বার্ণার্ড শ'র ছবির মাধ্যমে টি, ই, লরেন্স ও জর্জ বার্ণার্ড শ'র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই সময় আগসটস জন ও এই বিখ্যাত মানুষের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। লরেন্সেরই সাতখানি ছবি আগসটস জন এঁকেছিলেন, আর বার্ণার্ড শ'র তিনখানি। তার মধ্যে একটি ইংলণ্ডের রাণী কিনেছিলেন, স্যার সিডনী ককার একটি নিয়েছিলেন কেম্ব্রিজের ফিজউইলিয়াম মুজিয়ামের জন্য আর একটি এ্যাষ্টরের বাসভবনে ছিল। যেদিন এডেলফী-টেরাসের বাসায় এই ছবিটি নিতে এসেছিলেন স্যার সিডনী (২৫শে মার্চ, ১৯২২) তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন টি, ই, লরেন্স। বার্ণার্ড শ'র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু দূরে থেকেই বড়মানুষ দেখা ভালো, লরেন্স এই নীতির সমর্থক ছিলেন। তাই প্রথমে যেতে চান নি। আশা করেছিলেন শ' হয়ত বাড়ি থাকবেন না, কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখা গেল শ' বেরোবার উদ্যোগ করছেন।

প্রথম দর্শনেই প্রেম—'friends from the first' বলেছেন স্যার সিডনী। এই দিনটির পর সেপ্টেম্বর মাসে 'Seven Pillars of wisdom' নামক লরেন্সের বিখ্যাত-গ্রন্থ এসে হাজির। পাণ্ডুলিপিটি বার্ণার্ড শ'কে পড়তে অনুরোধ করেছেন লরেন্স। আরবে ১৯১৪-র যুদ্ধে লরেন্সের বিচিত্র ভূমিকা এই গ্রন্থের উপজীব্য। ৩০০,০০০ শব্দবিশিষ্ট এই বিরাট পাণ্ডুলিপি পড়া কঠিন। দশ সপ্তাহের মধ্যে একটি লাইনও পড়েননি শ' কিন্তু লরেন্সের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত সবটুকু পড়ে ফেলে বড়দিনের সময় লিখলেন—a great book। বার্ণার্ড শ' অনেক পরিবর্ত্তন করেছেন, মিসেস প্রুফ দেখে দিয়েছেন, লরেন্স বলেছেন—Left no paragraph without improvement—মিসেস শ' লরেন্সের এই গ্রন্থে অনেক মূল্যবান মন্তব্য ও উপদেশ দিয়েছেন। প্রুফের যুগেও সাহায্য করছেন, তাই উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য থাকলেও একটি মধুর অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিল। এ্যাষ্টর থেকে লরেন্সের ঠিকানায় নিয়মিত চিঠিপত্র আসত।

Too True To be good নাটকে অনেকগুলি কার্যকরী পরিবর্তনের উপদেশ দেন লরেন্স, বার্ণার্ড শ' তাঁকে প্রতিটি অঙ্ক পড়ে শুনিয়েছিলেন। প্রাইভেট মিক চরিত্রটি লরেন্সের ব্যক্তিমানসের রূপায়ণ। লরেন্স এই নাটক শোনার চাইতে অভিনয় দেখে আরো সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

কর্ণেল লরেন্স যখন টি, ই, শ' হয়েছিলেন তখন অনেকে মনে করেছিলেন যে, তিনি বার্ণার্ড শ'র আত্মীয়। লরেন্স সম্পর্কে শ'-দম্পতির অনুরাগ ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছিল, সার্লট শ' এবং লরেন্সের বন্ধুত্ব ঐতিহাসিক, লরেন্স তাঁকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তা বৃটিশ মিউজিয়ামে রাখা আছে।

লরেন্স করাচী থেকে ফেরার পর বার্ণার্ড শ' ও সার্লট একটি মোটর-সাইকেল উপহার দিয়েছিলেন পরিচয় অজ্ঞাত রেখে। সেই মোটর-সাইকেলই লরেন্সের মৃত্যুর কারণ হল, তার ছ' বছর পরে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় টি, ই, লরেন্সের মৃত্যু শ'-দম্পতির কাছে পুত্রশোকের মর্মান্তিক জ্বালা বহন করে এনেছে।

[ক্রমশঃ

বিদেশে

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)

ক্যামাক ষ্ট্রীটের একটি তেতলা বাড়ীর একতলা ফ্ল্যাট। সামনে বড় একটি সাজানো বাগান। একটি গোলাকার লাল সুরকির রাস্তা গেট হইতে গাড়ীবারান্দা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৃত্তের মাঝে নানা প্রকার ফুলের গাছ, সুন্দর করিয়া সাজানো। বৃত্তের বাহিরে একদিকে একটি টেনিস লন, অপরদিকে ছোট একটি বাগানের ওপারে পাঁচিল ঘেঁষিয়া চাকর বাকরদের থাকিবার জন্ত একটি একতলা ব্যারাকের মত বাড়ি। পাঁচিলের গায়ে পর পর তিনটি গ্যারেজ। তিনতলায় তিন ফ্ল্যাটের অধিবাসীদের এক একখানি গাড়ী এখানে থাকে।

একতলা ফ্ল্যাটের অধিবাসী মাত্র তিন জন। বৃদ্ধ মিঃ চ্যাটার্জি বাতে অর্ধপঙ্গু। ধীরে ধীরে এঘর ওঘর করেন। সিঁড়ি ভাঙিতে পারেন না। বাড়ীর বাহিরেও হাঁটিয়া বেড়াইতে পারেন না। মাঝে মাঝে গাড়ীতে চড়িয়া গড়ের মাঠে গিয়া একটু আধটু পায়চারি করেন। এ বাড়ীতে আর আছেন মিঃ চ্যাটার্জির কন্তা নন্দিতা আর তাহারই একটি শিশু পুত্র বীরেন্দ্র, ডাক নাম খোকা। বয়স মাত্র দুই বৎসর। খোকার জন্ত আয়া আছে। সর্বদাই দেখা যায়, খোকাকে প্যারামবুলেটরে শোয়াইয়া বা বসাইয়া আয়া তাহার সহিত বেড়াইতেছে বা খেলিতেছে, কখনও বারান্দায়, কখনও লনে, আবার কখনও লাল সুরকির রাস্তায়। একটি বয় আছে, ঝাড়-পোঁছ করে, বাজার করে, ফাই ফরমাস খাটে আর ঘুমায়। একটি পাচক বা বাবুর্চি আছে, রান্না-বান্না করে, আবার বয়ের অনুপস্থিতিতে এটা-ওটা করে। ড্রাইভার গাড়ী চালায়, গাড়ীর যত্ন করে, আবার দরকার হইলে ডাকঘরে যায়, ব্যাঙ্কে যায়, মার্কেটে যায়। এমনি করিয়া ধীর মন্থরগতিতে চলে এই শান্ত ছোট পরিবারটির দিনগুলি।

একদিন বিকালে ডাইনিং রুমে টেবিলের উপর তিন জনের জন্ত চায়ের সরঞ্জাম সাজান হইয়াছে। চার-পাঁচটি পাত্রে নানা প্রকার খাবার টেবিলের মাঝখান বরাবর রাখা হইয়াছে। প্লেট, চায়ের কাপ, প্রভৃতি সবই নন্দিতা নিজে সাজাইয়া রাখিয়াছে। খোকা আয়ার সহিত লনে বেড়াইতেছে। নন্দিতা এক একবার বারান্দায় আসিয়া গেটের দিকে চাহিয়া আবার নিজের কাজে মন দিতেছে। মুখে যেন একটু উদ্বেগের ছায়া। তবে মনে হয় যেন তেমন বেশি কিছু নয়।

একটু পরেই গেটের বাহিরে মোটরের হর্ণের শব্দ শোনা গেল। নন্দিতা বয়ের দিকে চাহিতেই সে তাড়াতাড়ি গিয়া গেটের দরজা খুলিয়া দিল। একখানি নূতন হিলম্যান গাড়ী ধীরে ধীরে আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। গাড়ীর নম্বর-প্লেটের পাশেই আর একখানি প্লেট। তাহাতে ইংরাজিতে লেখা জি. বি। গাড়ী যিনি চালাইতেছিলেন, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া বারান্দায় উঠিলেন এবং নন্দিতাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এই যে, সব খবর ভাল তো? আমার চিঠি পেয়েছিলেন? কালই কলকাতায় পৌঁছেছি। এসেই আপনাকে ফোন করেছি।

নন্দিতা বলিল, আসুন, একেবারে চায়ের টেবিলেই বসা যাক। বাবা বার বার ওঠা বসা করতে পারেন না। ওঁকে কোনমতে চায়ের টেবিলে এনে বসিয়েছি। আচ্ছা মিঃ গাঙ্গুলি, আপনার বন্ধুর খবর কি? তিনি এলেন না?

মিঃ চ্যাটার্জি টেবিলের পাশেই বসিয়াছিলেন। বলিলেন, এই যে অনিল, এস। খবর সব ভাল?

নন্দিতা ও অনিল চেয়ারে বসিল, প্রায় মুখোমুখী। নন্দিতার বাঁদিকে তাহার বাবা।

অনিল বলিল, হ্যাঁ, খবর সব ভালই। মোহিতকেও বলেছিলাম, চল দিন কতকের জন্ত কলকাতায় বেড়িয়ে আসি। কিন্তু তার ওই এক কথা, পরীক্ষাগুলো শেষ না করে আমি যাব না। ওর বুঝি আর একটা পরীক্ষা বাকী আছে, সেটা শেষ করতে প্রায় এক বছর লাগবে।

মিঃ চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কত দূর? ক'টা পরীক্ষা আর বাকী?

অনিল একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আমার আরো তিনটে বাকি। মানে প্রিলিমিনারিটা পাশ করবার পর আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। অসুখের জন্ত একটা পরীক্ষা দিতে পারলুম না। আর একটা পরীক্ষার সময় দেখি, পড়াশুনা যা হয়েছে, তাতে পরীক্ষা না দেওয়াই ভাল। এবারও দিতে পারলুম না, দেশের জন্ত বড্ডই মন কেমন করতে লাগলো।

নন্দিতা বলিল, আপনি এর মধ্যে দু'বার এসে গেলেন। অথচ উনি একবারও এলেন না! আপনি বললেন, উনিও লিখেছেন, সামনের পরীক্ষার এখনও এক বৎসরের বেশি দেরি আছে। এবার একবার কেন এলেন না, তাই ভাবছি। এখন যাতায়াতের সময় কত কমে গেছে।

নন্দিতা একটু যেন গম্ভীর হইয়া গেল। অনিল বলিল, আপনি খুব ভাবছেন। আমিও যে না ভাবছি, তা নয়।

নন্দিতা এক একবার স্যাণ্ডউইচের প্লেট, কেকের প্লেট, সন্দেশের

প্লেট অনিলের সামনে আনিয়া ধরিতে লাগিল। অনিল কিছু কিছু তুলিয়া লইয়া থ্যাঙ্কস্ বলিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

চা-পর্ব্ব শেষ হইলে মিঃ চ্যাটার্জি বয়ের কাঁধে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়া একখানি ইজিচেয়ারে বসিলেন। বয় একটি বার্মা চুরুট ধরাইয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিল।

অনিল ও নন্দিতা ডাইনিং হল হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দিতা অনিলের গাড়ীর দিকে এমন ভাবে তাকাইল, যেন অনিল এখন গাড়ীতে গিয়া উঠিবে। কিন্তু অনিল সেদিকে না চাহিয়া নন্দিতাকে বলিল, চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি। এবার এই গাড়ীখানা কিনেছি—ঠিক আসবার আগে।

থাক, মিঃ গাঙ্গুলি।

কেন? আমরা কি আগে কখনো গাড়ী করে বেড়াতে যাইনি?

নন্দিতা একটু কুণ্ঠিত হইয়াই বলিল, মিঃ গাঙ্গুলি, এখন ওসব কথা তোলা কি বিসদৃশ নয়?

অনিল বলিল, আপনার মনটা আজ ভাল নেই, মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আজ আসি তাহলে?

নন্দিতা একটু যেন ব্যগ্রতার সঙ্গেই বলিল, আচ্ছা, সত্যি বলুন তো, উনি বেশ ভাল আছেন?

হ্যাঁ, বেশ ভালই আছেন।

মনে কোন অশান্তি নেই? আপনার কাছে উনি সব কথাই বলেন নিশ্চয়? উনি মাথা-ঢাকার লোক নন। বিদেশে আপনাকে পেয়ে উনি কত খুশি হয়েছেন, কত নিশ্চিন্ত হয়েছেন, একথা বার বার আমাকে লিখেছেন।

অনিল বলিল, বিদেশে বন্ধু বন্ধুর কাজ করবে, এটা স্বাভাবিক। আমি এমন আর বেশি কি করেছি। তবে—

তবে কি?

না, এমন কিছু নয়।

কি যেন বলতে গিয়ে বলছেন না। বলুন না?

আচ্ছা, আজ আমি আসি। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খাবার কথা আছে।

ডিনারের এখন অনেক দেরি।

এমন আর বেশি দেরি কি? আচ্ছা, আমি কাল আবার আসব।

নিশ্চয়ই আসবেন?

নিশ্চয়ই আসবো।

হ্যাঁ, যে ক'দিন কলকাতায় আছেন, একবার করে এখানে আসবেন। বুঝলেন? আমার বড্ড ইচ্ছে করে, ওখানকার সবার সব কথা শুনতে। কাল আসছেন তা'হলে?

হ্যাঁ, আসব। তবে চায়ের পরে। আমার এক বন্ধু কাল চায়ের নিমন্ত্রণ করেছে। আচ্ছা, আসি।

অনিল গাড়ীতে উঠিয়া ধীরে ধীরে গেটের বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে ডিনারের পর শোবার ঘরে গিয়া নন্দিতা খোকার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যেন সুন্দর একটি ফুল! কি চমৎকার ওই বোজান চোখ দুটি, যেন পদ্মের পাপড়ি! খোকার দিকে একটু চাহিলেই নন্দিতার সব উদ্বেগ, সব ভাবনা যেন কোথায় চলিয়া যায়। কিন্তু আজ যেন কিছুতেই তার মন শান্ত হইতেছে না। একখানি বই হাতে করিয়া তার পড়ার টেবিলে গিয়া টেবিল-ল্যাম্পের পাশে বই রাখিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মন দিতে পারিল না।

উঠিয়া গিয়া ড্রয়ার হইতে কতকগুলি পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। পত্রগুলি পড়িয়া তাহার মুখে-চোখে যেন একটু খুশির আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিতে লাগিল, এর মানে কি? কেন সে একবার আসে না? পত্রে অবশ্য লিখিয়াছেন, 'পরীক্ষা ক'টা শেষ করেই বাড়ী যাব। তুমি একটু ধৈর্য ধরে থাক। আমি পড়াশুনার জন্য ভীষণ পরিশ্রম করছি', ইত্যাদি। চিঠিগুলিতে সবই আছে, অথচ কেমন যেন একটু, কি বলিব, উদাসীনতা? না, অন্য কিছু? কিংবা নন্দিতার নিজেরই মনের ভুল? মোহিত যে পড়াশুনা লইয়াই অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে, তাহা নন্দিতার অজানা নাই। পর পর পরীক্ষাগুলি যেমনভাবে পাশ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রমাণ। তবু কেন উদ্বেগ আসে মনে?

নন্দিতা আলো নিবাইয়া একখানি মোড়া লইয়া জানালার পাশে গিয়া বসিল। বাহিরে শান্ত প্রকৃতি। আকাশে তারার বিন্দু ছড়ান। এক পাশে আধখানি চাঁদ নীরবে হাসিতেছে। গাছের পাতার মধ্যে কোন কোন স্থানে পাখীর ডানা ঝাপটার শব্দ শোনা যাইতেছে। বোধ হয় গেট বন্ধ করার শব্দ একটু কানে গেল। চাকরদের ব্যারাকে দুই একবার মোটা গলায় কথা শোনা গেল। লনের মধ্যে ডালিয়া প্রভৃতি ফুলগুলির মুখ যেন আবছা জ্যোৎস্নায় একটু ভিজিয়া উঠিল।

নন্দিতার মন একটু পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। কলেজে পড়ার সময় মিঃ চ্যাটার্জির বন্ধুর পুত্র অনিলের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়। তার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার সান্নিধ্য, তাহার বন্ধুত্ব নন্দিতা চরম আগ্রহে উপভোগ করিয়াছে। তাহার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের বিমুগ্ধ চেতনার সম্মুখে অনিল তাহার কাছে অনিন্দ্যনীয় মাধুরী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাদের মিলন প্রায় অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিঃ চ্যাটার্জি বাঁকিয়া বসিলেন। একটি দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট মোহিতের সংবাদ পাইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিলেন। মোহিতের সহিত নন্দিতার পরিচয় হইল। মোহিত অনিলেরও পরিচিত। দুইজনের স্থলে তিনজন হইল। তাহারা প্রায়শঃই একসঙ্গেই বেড়াইত, পিকনিকে যাইত। এমন কি একদিন একসঙ্গেই সিনেমাও দেখিয়া আসিল। মোহিতের সঙ্গে পরিচয়ের পর হইতেই নন্দিতার মনে ঝড় উঠিল। দুই জনের প্রকৃতি ভিন্ন, কিন্তু দুই জনই তাহার কাছে বেশ ভাল। মিঃ চ্যাটার্জি যেন ইচ্ছা করিয়াই নন্দিতাকে দুইজনের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করেন। মনের ইচ্ছা, নন্দিতা নিজেই তাহার শ্রেয়ঃ পথ চিনিয়া লইতে পারিবে।

ইহাদের মধ্যে পার্থক্য নন্দিতার চোখে এবং মনে রেখাপাত করিত। অনিল লঘুচিত্ত, মোহিত অপেক্ষাকৃত গম্ভীর। অনিল চঞ্চল, মোহিত ধীর। অনিল অধ্যয়নবিমুখ, মোহিত পুস্তকের কীট। এই সকল বাহিরের পার্থক্যবাদ মর্মের দিক হইতে নন্দিতা ইহাদের মধ্যে কোন বিভেদ বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহার সহিত ব্যবহারে উভয়েই সমান সম্ভ্রমশীল, সমান আন্তরিকতাপূর্ণ, সমান আগ্রহশীল।

নন্দিতার মনে মনে ভয় হইল, যদি তাহার বাবা তাহার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সে কি বলিবে? অনিলকেই গ্রহণ করিবার পক্ষে মত দিবে, না মোহিতকে? বহু দিন ধরিয়া চলিয়াছিল এই মানসিক দ্বন্দ্ব। তবে শেষ নির্বাচনের সময় নির্দিষ্ট ছিল না বলিয়া নন্দিতা জোর করিয়া একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার চেষ্টা করে নাই। মাঝে মাঝে মনে দ্বন্দ্ব উঠিয়াছে, আবার তাহা স্বাভাবিক দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে সমতা লাভ করিয়াছে। এমনি করিয়াই তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল।

নন্দিতার মনে পড়িল, একদিন সকালে পিওন একখানি এনভেলপের চিঠি দিয়া গেল। নন্দিতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াও লেখক কে, তাহা অনুমান করিতে পারিল না। চিঠি মিঃ চ্যাটার্জির নামে। নন্দিতা চিঠিখানি তাহার পিতার হাতে দিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়াই মিঃ চ্যাটার্জি একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন। নন্দিতা লক্ষ্য করিল, তাহার বাবার মনে যেন আকস্মিক আঘাত লাগিয়াছে। সে কোন কথাই পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল না। মিঃ চ্যাটার্জি সমস্ত দিন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়া মিঃ চ্যাটার্জি বয়কে ইশারায় ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। পরে নন্দিতাকে পাশের চেয়ারে বসাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, অনিলের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করো না।

কেন বাবা?

সে কথা থাক। আমি ওকে এ-বাড়ীতে আর আসতেই বারণ করে দিতাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম, সেটা হয়তো নিরাপদ হবে না। মাঝে মাঝে আসে আসুক, কিন্তু ক্রমে ওর সংস্পর্শ ত্যাগ করতে হবে।

অনিল সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা না করিলেও নন্দিতা পূর্বেই একটু আভাস পাইয়াছিল, যে অনিল সম্পর্কে তাহার পিতার মনোভাব ভাল নয়। আজ হইতে তাহার মনে আর দ্বিধা রহিল না। কিন্তু এত দিনের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় কেমন করিয়া সে ভুলিয়া যাইবে, তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিল না।

যাহা হউক, মূল সমস্যা অর্থাৎ তাহার বিবাহের সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। পিতা আর নন্দিতার মত চাহিলেন না। কয়েক দিন পরেই কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মোহিতের পিতার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অতি আনন্দের সহিতই এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। আরো কিছুদিন পরে যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। নিকট বন্ধু হিসাবে অনিল অতি তৎপরতার সঙ্গেই বিবাহের সকল প্রকার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যোগদান করিল। বিবাহের সময়ে নিজের মনের কোণে কোন দ্বন্দ্বের আভাস নন্দিতা খুঁজিয়া পাইল না। মোহিতকে সে সর্বান্তঃকরণেই গ্রহণ করিল।

নন্দিতা জানালার বাইরে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইল চাঁদটি যেন একটু সরিয়া গিয়াছে। গাছের যে ডালটির মাথার কাছে ছিল, সেখানে নাই। রাস্তা দিয়া হুস করিয়া একখানি মোটর গাড়ী চলিয়া গেল। চাকরদের ব্যারাক প্রায় নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে। নন্দিতার স্মৃতির সূক্ষ্মস্রোত বহিয়া চলিয়াছেন। খোকা নীরবে ঘুমাইতেছে। জানালা দিয়া একটু চাঁদের আলো তাহার ছোট বিছানার উপর পড়িয়াছে, একটু পরেই বোধ হয় উহার মুখের উপর আসিয়া পড়িবে।

মোহিতের বিলাত যাওয়া স্থির হইল। নন্দিতা যুগপৎ আনন্দিত ও বিমর্ষ হইল। একদিন মোহিত নন্দিতার চোখের কোণে জমা অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া তাহার অনাগত সন্তানের কল্যাণ কামনা করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিল। অনিল ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়া তাহাকে সী-অফ করিল। নন্দিতাকে সান্ত্বনা দিল।

মোহিত চলিয়া যাইবার পর অনিল প্রায়শঃই যায় নন্দিতার কাছে। গল্প করে। পূর্বের মত তাহাকে লইয়া গাড়ীতে বেড়াইতে যাইবার বা সিনেমায় যাইবার প্রস্তাব করে। নন্দিতা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। মিঃ চ্যাটার্জিও অনিলের প্রতি একটু ঔদাসীন্যের সঙ্গেই কথাবার্তা বলেন। কিছুদিন পরে অনিল আসিয়া নন্দিতাকে বলে, সে-ও বিলাত যাইতেছে, কি যেন কি একটা পড়িবার জন্য। তাহার পিতার অগাধ টাকা। তাহার বিলাত যাইতে বাধা কি? যাত্রার প্রাক্কালে নন্দিতা বলিল, লণ্ডনেই তো থাকবেন। আপনার বন্ধুর একটু খোঁজ-খবর নেবেন। ওঁর স্বভাব জানেন, বই নিয়ে অজ্ঞান হয়ে থাকেন। শরীরের দিকে পর্যন্ত একটু নজর নেই।

অনিল বলিল, নিশ্চয়ই। আপনি একটুও ভাববেন না।

দুই বন্ধুই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নন্দিতা একা পড়িল। কয়েক মাস পরে খোকা আসিয়া তাহার একাকীত্ব ঘুচাইলেও, তাহার মন সম্পূর্ণ ভরিল কই? এই কয় বৎসরে মোহিতের মনের কি কিছু পরিবর্তন হইল না কি? মানুষের মন! কিন্তু মোহিত—মোহিত তেমন ছেলে নয়। নন্দিতা আর ভাবিতে পারে না। ঘুম যেন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। খোকা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেই তাহার কাছে গিয়া বিছানা বদলাইয়া, ইজের বদলাইয়া, তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নন্দিতা শুইয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে তাহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

পরদিন অনিল যথাসময়ে নন্দিতাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী রাখিয়া বারান্দায় উঠিতেই নন্দিতার সঙ্গে দেখা। নন্দিতা বলিল, চলুন ওইখানে গিয়ে একটু বসা যাক। নন্দিতার মুখখানি উদ্বেগে ও আশঙ্কায় ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। লনের মধ্যে দুইখানি বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া কয়েক মিনিট তাহারা দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। তারপর অনিল বলিল, আমাকে বাধ্য হয়েই একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর কথা উত্থাপন করতে হচ্ছে।

নন্দিতা একটু কঠিন সুরেই বলিল, যা বলবেন, সংক্ষেপে এবং সোজা কথায় বলুন। আমি বেশিক্ষণ এখানে বসতে পারবো না। খোকার শরীরটা তেমন ভাল নেই। শীগগিরই আমাকে যেতে হবে তার কাছে।

অনিল একটু ঢোক গিলিয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই বলছি। মানে, মোহিত ওখানেই একটি মেয়েকে ভালবেসেছে। তার সঙ্গেই বিয়ে প্রায় ঠিক। কিন্তু শুধু আপনার জন্যই ইতস্তত করছে। আপনি তাকে ছেড়ে দিলেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

নন্দিতা রুদ্ধ আবেগে বলিয়া উঠিল, আমি তাঁকে ছেড়ে দেব? ছেড়ে দিলেই তিনি—উঃ!

অনিল বলিল, আপনার বাবা প্রথম থেকেই ভুল করেছেন। মোহিতকে আমাদের দুজনের মধ্যে টেনে না আনলেই আর কোন অশান্তি হত না।

নন্দিতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে। ওকে আপনি ছেড়ে দিন। আমরা আবার আগের মতই—

থামুন। আমাকে এখুনি উঠতে হবে।

আচ্ছা, এক কাজ করুন। আপনি নিজেই গিয়ে সব ব্যাপারটা দেখে আসুন। তা'হলে আমাকে আর দোষ দিতে পারবেন না।

নন্দিতা বলিল, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনি আজ আসুন।

এই কথা বলিয়াই নন্দিতা উঠিয়া গেল। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অনিলও উঠিয়া গেল।

কয়েক দিন পরে অনিল আবার নন্দিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিল, আমি পরশু ফিরছি। প্যাসেজ বুক করেছি।

নন্দিতা বলিল, ও!

অনিল বলিল, আমি আমাদের দুজনের ভালর জন্যই এ সব

কথা আপনাকে বলেছি। আপনি একটু মন স্থির করতে পারলে মোহিতের সমস্যাও মিটে যায়, আমাদের সমস্যাও মিটে যায়।

আমাদের সমস্যাটা কি, বুঝতে পারছিনে।

দেখুন, আর নিজের মনকে ঠকাবেন না।

আমার নিজের মনের কথা আমি বেশ জানি। সে সম্বন্ধে আপনার উদ্বেগের কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করিনে।

ও কথা এখন থাক। আপনি সুবিধে মত একবার একটা রিটার্ণ প্যাসেজ বুক করে ঘুরে আসুন।

দেখা যাবে।

আচ্ছা, নমস্কার।

নমস্কার।

লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলের একটি চারতলা বাড়ীর দোতলায় একটি ছোট সাজানো ফ্ল্যাট। বৈকালিক চা-পানের পর অনিল তাহার ড্রইং-রুমে বসিয়া আছে। দরজায় দুই-তিনটা টোকা শুনিয়া অনিল উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মোহিত ঘরে ঢুকিল। অনিল বলিল, এই যে এস। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। চা খাবে?

মোহিত বলিল, না। আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে। বার বার চা খেলে আমার রাত্রে ভাল ঘুম হয় না।

তা' হলে একটা ড্রিঙ্ক কিছু?

না, কিছুই দরকার নেই। তুমি কি জন্য ডেকেছ, তাই বল।

একটু বস, বলছি।

অনিল বসিয়া ছিল একখানি সেটির এক কোণে। মোহিত বসিল তারি পাশে একখানি সোফায়। অনিল প্রায় শেষ-করা একটি সিগারেট অ্যাস-ট্রে-তে ফেলিয়া দিল। তার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভাই, আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে।

মোহিত বলিল, বিপদ? কি বিপদ হ'ল?

দেখ, লুসির সঙ্গে থাকা আর চলে না।

সে কি? এই তো মাত্র এক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে। এরি মধ্যে—

না, আর চলছে না।

এ ভারি আশ্চর্য। কই, মিসেসকে দেখছি না যে?

তিনি এখানে নেই।

সে কি! কেন?

এখান থেকে চলে গেছে।

না, তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ। কি আশ্চর্য! আমার অবশ্য লুসির সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ আলাপ নেই। কিন্তু যতদূর দেখেছি আর শুনেছি তোমার কাছে, অপরের কাছেও, তাতে সে বেশ ভাল মেয়ে বলেই মনে হয়েছে। শেফিল্ডের গ্র্যাজুয়েট। তাছাড়া একেবারে রাস্তার মেয়েও সে নয়। পড়াশুনায়' পরে খুব ঝোঁক, তুমিই আমাকে কত বার কত প্রশংসা করেছ। ও সব চিন্তা রাখ। লুসি ভারতবর্ষে যেতেও রাজি, যা খুব কম মেয়েরই হয়ে থাকে। তুমি বরঞ্চ এদেশ এখন ছাড়। লুসিকে নিয়ে দেশে যাও। সেখানে গেলে তোমার এ সব উদ্ভট খেয়াল সেরে যাবে।

না, আমার এদেশ ছাড়া চলবে না।

কেন? তুমি এখানে এলে কেন, তা আমি এখনো বুঝতে পারি নি। এগজামিনগুলো হয় দিচ্ছ না, না হয় দিয়েও ফেল করছ। সমস্ত দিন প্রায় তোমার রেস্তোরাঁয়, বিলিয়ার্ডরুমে, না হয় নাচঘরে কাটে। ছুটি হলেই কন্টিনেন্টে ছোট, না হয় সী-সাইডে। সে সব অবশ্য তোমার খুশি। কিন্তু এ কি! একটা মেয়েকে এমন করে নির্যাতন কেন করবে?

আমার সংকল্প স্থির হয়ে গেছে। তুমি কিছুতেই আমার মত বদলাতে পারবে না।

কি আর বলব, বল?

তোমাকে কিছু বলতে হবে না। শুধু আমাকে একটুখানি সাহায্য করতে হবে।

আমি কি সাহায্য করতে পারি তোমাকে? আমার আর্থিক অবস্থা ত জান? স্কলারশিপের পরে নির্ভর। একবার যে দেশে একটু বেড়িয়ে আসব, তাও পারিনে।

কেন, তোমার শ্বশুরমশায়কে লিখলেই পার।

তেমন দরকার হ'লে লিখতে বাধা নেই। কিন্তু শুধু বেড়ানর জন্য—বোঝই তো।

অনিল বলিল, সে কথা থাক। আমি টাকা চাইনে তোমার কাছে। কলকাতা থেকে যা আসে, তা আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মোহিত বলিল, কি রকম কি সাহায্য তুমি আমার কাছে আশা কর?

মানে, লুসিকে ডাইভোর্স করব। এ জন্য তোমার একটু সাহায্য চাই।

আবার সেই কথা? দেখ আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে এসব আলোচনা। আমি উঠি।

না, না, তোমাকে একটু সাহায্য করতেই হবে। নইলে—

নইলে হয়তো আমাকে আর জীবিত দেখতে পাবে না।

কি সাংঘাতিক কথা! তোমার মনে যে এত সব ভয়ানক কল্পনা উঠেছে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তোমাকে আবার অনুরোধ করছি, তুমি লুসির সঙ্গে একটু শান্ত মনে বোঝাপড়া কর। স্বামি-স্ত্রীর ঝগড়া—কথায়ই আছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনিল বলিল, ব্যাপারটা একেবারেই ওরকম নয়। তুমি আর আমাকে বোঝাতে চেও না।

আচ্ছা, লুসি কি কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছে?

না, অবশ্য করেনি কিন্তু—

আবার কিন্তু?

অনিল দৃঢ় স্বরে বলিল, তোমাকে আমি বলছি, আমাকে আর বোঝাতে চেষ্টা কর না। আমি বুঝব না।

তা' হলে আমার আর কি বলবার আছে? আমি—আমি—এখন।

না, আমাকে একটু সাহায্য করবে, বল?

বড়ই মুস্কিলে ফেললে, দেখছি! যে কাজটা আমি একেবারেই অনুমোদন করিনে এবং কোন দরকারও মনে করিনে, তা নিয়ে তুমি অনর্থক এত বড় অশান্তি সৃষ্টি কেন করবে?

ওসব কথা শেষ হয়ে গেছে। এখন, তোমার সাহায্যটা আমি চাই।

কি করতে হবে আমাকে ?

বিশেষ কিছুই না। একদিন সন্ধ্যার পর একটা হোটেলে তোমাকে লুসির সঙ্গে একটু একা থাকতে হবে।

কি সর্বনাশ। এমন একটা প্রস্তাব তুমি করতে পারলে ? তুমি আর লোক পেলে না ? শেষে আমাকে দিয়েই এমন একটা জঘন্য কাজ করাবে ?

অনিল বলিল, তোমাকে সত্যিই কিছু করতে হবে না। আমি লাঞ্চ টাক্সি সব ব্যবস্থা করব।

মোহিত বলিল, আমার দ্বারা এসব হবে না। আমি চললুম।

এই কথা বলিয়া মোহিত উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু অনিল কিছুতেই ছাড়ে না। সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইল।

মোহিত কাতরকণ্ঠে বলিল, অনিল, তুমি আমাকে ছাড়।

তোমাকে ছাড়তে আমি পারিনে, মোহিত। এটুকু উপকার তোমাকে করতেই হবে।

এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া উঁহাদের বাদানুবাদ চলিল। মোহিতের সরল বিশ্বাসানুরাগী মনের উপর যে কশাঘাত চলিতে লাগিল।

অনিল বুঝাইতে লাগিল, লুসি তোমার একেবারে অপরিচিত নয়। তার সঙ্গে একদিন একটু ঘনিষ্ঠতার অভিনয় করিলে তোমার কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। তুমি আর না ব'ল না। আমাকে বাঁচাও মোহিত।

শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বেরই জয় হইল, মোহিত সম্মতি দিয়া ফেলিল। অনিল মোহিতের দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, তুমি আমাকে বাঁচালে। আমি তোমার কাছে চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে থাকব। আমি স্থান-কাল সব ঠিক করে তোমাকে জানাব। ঠিক হয়ে থেকো। দেখো, শেষ মুহূর্তে যেন আবার ভেঙে প'ড় না।

মোহিত কোন কথা বলিল না। কোন মতে নিজেকে যেন টানিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল এবং কনকনে শীতে ওভারকোটের কলার চাপিয়া ধরিয়া নিজের বাসার দিকে যাত্রা করিল।

নন্দিতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। মিঃ চ্যাটার্জি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কি হইয়াছে। মোহিতের চিঠি পাইয়াছে কি না, সে কেমন আছে, সব খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু নন্দিতার উদ্বেগের কারণ বুঝিতে পারেন না।

নন্দিতা কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না, মোহিত তাহাকে প্রতারণা করিতে পারে। অথচ অনিলের এমন স্পষ্ট এবং সহজ কথাগুলিই বা সে কেমন করিয়া মুছিয়া ফেলে ? মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ একবার উপ্ত হইলে তাহা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতে থাকে, তাহাতে শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হইতে থাকে। নন্দিতা ঘুমাইতে পারে না, খাইতে পারে না, এমন কি খোকাকে ভাল করিয়া আদর করিতে পারে না। সর্বদা উঠিতে বসিতে তাহার মনের মধ্যে যেন কাঁটা বিঁধিতে থাকে। এইরূপ মনের অবস্থা লইয়া তাহার পক্ষে দিন যাপন যেন অসম্ভব হইয়া উঠিল।

একদিন ডাইনিং টেবিলে বসিয়া নন্দিতা ছুরি-কাঁটা নামাইয়া বলিল, বাবা !

মিঃ চ্যাটার্জি বলিলেন, কি মা ?

আমি কয়েক দিনের জন্য একবার লণ্ডন যাব, স্থির করেছি।

তা, যাও। কিন্তু দাদুর কষ্ট হবে যে ?

একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তোমারও কিন্তু কষ্ট হবে কয়েকটা দিন।

আমার জন্য ভেবো না। এরা সব আছে, পুরানো লোক। দেখেছ তো, আমাকে কত যত্ন করে এরা। তুমি সে জন্য ভেবো না।

কথা এখানেই স্থির হইয়া গেল। নন্দিতা তাহার এক বিধবা মাসিমাকে কয়েকদিনের জন্য এ বাড়ীতে আনিয়া রাখিবে, স্থির হইল। আয়াটিও খুব ভাল। নিজের ছেলের মত খোকাকে যত্ন করে।

প্লেনে যাওয়াই স্থির হইল। প্যাসেজ ঠিক করিয়া নন্দিতা অনিলকে জানাইয়া দিল। মোহিতকে কিছু লিখিল না। অনিলও তাহাই পরামর্শ দিয়াছিল। তবে এক বিষয়ে নন্দিতা অনিলের সহিত একমত হইতে পারে নাই। অনিল চাহিয়াছিল, নন্দিতা তাহার ফ্ল্যাটেই ওঠে। একটি ঘর তাহার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া রাখিবে। কিন্তু নন্দিতা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সে বলিয়াছে, তাহার জন্য অন্য কোন একটা হোটেল বা লজিং ঠিক করিয়া রাখিবে। অনিলকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইয়াছে।

নন্দিতা নির্দিষ্ট সময়ে পিতার নিকট এবং মাসিমার নিকট বিদায় লইয়া, খোকাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া আদর করিয়া, পুনরায় পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মোটরে উঠিল। ড্রাইভার বিষণ্ণ মনে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিল। নন্দিতার জীবনে এই প্রথম ক্যামাক ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে একা-একা বাহির হওয়া। ইহার পূর্ব্বে অনেকবার এখানে ওখানে বেড়াইতে গিয়াছে। সব সময়ই তাহার বাবা ছিলেন সঙ্গে। যতদিন মা বাঁচিয়া ছিলেন—সে অনেক দিনের কথা—মায়ের আঁচল ছাড়িয়া সে কখনও বাড়ীর বাহির হয় নাই। আজ এক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত কারণে সে একা কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাত্রা করিতেছে। তাহার বুক দুরু দুরু করিতেছে। কি দেখিবে সে সেখানে গিয়া ? অনিল কেমন ব্যবহার করিবে ? বিদেশে একাকী পাইয়া কোন অশোভন আচরণ করিবে কি না কে জানে ? আর মোহিত ? সে কি করিতেছে ? কি ভাবিতেছে ? তাহাকে না জানাইয়া সহসা লণ্ডনে উপস্থিতিতে সে কি মনে করিবে ? নন্দিতা অনিলের কাছে যাহা শুনিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয় ? কি ভয়ানক কথা, সে যেন সে পরিস্থিতি ভাবিতেই পারিতেছে না। আর যদি সব মিথ্যা হয় ? ভগবান তাই যেন করেন। সব যেন মিথ্যা হয়।

প্লেনের সীটে কোমরে স্ট্র্যাপ বাঁধিয়া শুইয়া মাঝে মাঝে এদিক ওদিক একটু দোল খায়, হোষ্টেসের হাতে কিছুক্ষণ পর পরই এটা ওটা খায়, কোন বার ফেরৎও দেয়। কখনো ছবিওয়ালা খবরের কাগজের উপর চোখ বুলায়। কখনও পাশের জানালা দিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখে। এই নূতন যাত্রা, নূতন যাত্রা তার কাছে অপূর্ব সুন্দর হইয়া উঠিত, যদি তার মনের মধ্যে উদ্বেগের বোঝা না থাকিত। মাঝে মাঝে ভাবে, খোকা যেন কি করিতেছে, আয়া তাহাকে ঠিকমত যত্ন করিতেছে কি না, মাসিমা খোঁজ খবর করিতেছেন কি না, বাবার বাঁ পায়ের ব্যথাটা এর মধ্যে আবার বাড়িয়া না যায়।

বিরাট আকাশের গায়ে একটি দুরন্ত পতঙ্গের মত ভাসিয়া উড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে প্লেনখানি। তাহারই মধ্যে অন্য বহু যাত্রীর সহিত

বসিয়া নন্দিতা আপন মনের চিন্তার জাল বুনিতেছে আর লণ্ডনে পৌঁছিবার জন্ত আকুল হইয়া উঠিতেছে।

প্লেন লণ্ডনের মাটি ছুঁইতেই নন্দিতা নামিয়া পড়িল এবং যথারীতি কাগজপত্র দেখাইয়া অনিলের সহিত বাহিরে আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিল।

নন্দিতার লণ্ডনে পৌঁছিবার যে তারিখ, ঠিক তার পরদিনই নির্দিষ্ট হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে মোহিত এবং লুসি উপস্থিত হইয়াছে। মোহিত অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া আছে। লুসিও তাই। লুসি বলিল, মিঃ মুখার্জি, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, আপনার মত লোককে ওই গাঙ্গুলি এমন একটা ভয়ানক বিশ্রী পরিস্থিতিতে এনে ফেলল। মোহিত সম্পূর্ণ নীরব। মাথা নীচু করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। পাশে একটি সেটিতে লুসি হেলান দিয়া আধ-শোয়া অবস্থায় বসিয়া আছে।

তখন বোধ হয় রাত্রি নয়টা সাড়ে নয়টা হইবে। দরজায় দুইটি টোকা শুনিয়া দুই জনেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। লুসি সেটির উপরে সোজা হইয়া বসিল। মোহিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। এমন সময়ে আবার দুইটি টোকা। লুসি বলিল, দরজাটা খুলেই দাও। হয়তো হোটেলের কোন লোক হবে। কোন কিছুর দরকার বোধ হয় আছে। মোহিত ধীরে ধীরে গিয়া দরজার হাতল ঘুরাইয়া একটু ফাঁক করিতেই চমকাইয়া উঠিল এবং দেখিতে পাইল, নন্দিতা দরজার ফাঁক দিয়া তাহার দিকে এবং লুসির দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াই ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। মোহিত যেন পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লুসিও প্রাণপণে দরজার ফাঁকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে মোহিতকে বলিল, একজন ইণ্ডিয়ান মহিলা যেন মনে হ'ল। ব্যাপার কি? এলই বা কেন, আবার অমন করে চলেই বা গেল কেন? কিছুই তো বুঝতে পারছি নে?

মোহিতের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। অতিকষ্টে বলিল, ও আমার স্ত্রী।

লুসি আকাশ হইতে পড়িল। আপনার স্ত্রী? আপনি বিবাহিত? অনিল আমাকে সে কথা বলেনি। কিন্তু ঠিক এমনি সময়ে এ জায়গায় ইনি এলেন কেমন করে?

লুসি একটু ভাবিল। তার পরই দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, হাঁ, বুঝেছি। সব বুঝেছি। এখন চলুন এখান থেকে। চলুন, লাউঞ্জে গিয়ে একটু বসা যাক। তার পর আমরা আমাদের বাসায় চলে যাব।

মোহিতের মূঢ়ভাব তখনো কাটে নাই। লাউঞ্জে ঢুকিয়া দুইজনে পাশাপাশি বসিল। মোহিত বলিল, মিসেস গাঙ্গুলি, কি ব্যাপার বলুন দেখি? আমার স্ত্রী এখানে এলেন, অথচ আমিই জানতে পারলুম না! কবে এলেন, কেন এলেন, ঠিক এখানে এসে অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে গেলেন! সবই আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। কোথায় রয়েছেন তাও জানিনে যে গিয়ে খোঁজ নেব।

লুসি এতক্ষণে বেশ সরল, স্বাভাবিক ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। চোখ-মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোন সন্দেহ, দ্বিধা বা অনিশ্চয়তা নাই। লুসি বলিল, এতক্ষণে আমার কাছে সব দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই স্কাউণ্ড্রেল, ওই গাঙ্গুলি এক ঢিলে দুই পাখী মারবার চেষ্টায় আছে। তোমার সাহায্যে আমাকে ডাইভোর্স করবে, তারপর তোমার স্ত্রীকে দিয়ে তোমাকে ডাইভোর্স করিয়ে তোমার স্ত্রীকে বিয়ে করবে, এই ওর অভিসন্ধি। ও অনেকবার আমাকে বলেছে, ও একটি ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বহুকাল ধরে ভালবেসেছে। তাকেই বিয়ে করবে। সব ঠিক হয়ে আছে। শুধু আমি সরে দাঁড়ালেই তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

কি সর্বনাশ! এমন কাজ অনিল করতে পারে? কিন্তু এখন উপায়? আমার স্ত্রী কোথায় আছেন, কেমন করে জানবো? তাঁর সঙ্গে এখুনি দেখা না করতে পারলে, হয়তো অনিলের ষড়যন্ত্রই সফল হয়ে যাবে। তাঁকে দেখে আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, যে তখনি তাঁর সঙ্গে কথা বলবার বা তাঁর পিছনে ছুটে যাবার চেষ্টা পর্যন্ত করতে পারিনি।

লুসি বলিল, আপনি বাড়ী যান। আমি এখনই যাচ্ছি অনিলের কাছে। কাল সন্ধ্যার সময়ে আপনি অবশ্য আসবেন আমার বাসায়। আমার সঙ্গে চা খাবেন। আশা করছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মোহিত বলিল, নন্দিতার খোঁজ পাবার উপায় কি? অনিল কি বলবে, তিনি কোথায় আছেন?

লুসি বলিল, আপনি বাড়ী যান এখন। আমিই আপনার স্ত্রীকে খুঁজে বের করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মনে থাকে যেন, কাল সন্ধ্যার সময়ে অবশ্য আসবেন আমার ওখানে।

নিশ্চয়ই যাব।

উহারা দুজনেই হোটেল হইতে বাহির হইয়া পরস্পরের কাছে "গুড নাইট" বলিয়া নিজেদের বাসার দিকে যাত্রা করিল।

নন্দিতা যখন হোটেল হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মাথা রীতিমত ঘুরিতেছে। কোনক্রমে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিল। পাশে অনিল।

ট্যাক্সি চলিতে লাগিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। একটু পরে অনিল বলিল, এখন আর কোন দ্বিধা নেই মনে?

চুপ করুন।

এখনও চুপ করে থাকব?

নন্দিতা সীটের এক কোণে সরিয়া গিয়া পিছনে হেলান দিয়া দুই হাতে মাথাটা ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনিল বলিল, তা'হলে আজ আমার ফ্ল্যাটেই চলুন না? আপনার মনটা ভাল নেই। বাসায় একা-একা থাকবেন?

নন্দিতা সহসা উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া ড্রাইভারকে বলিল, ড্রাইভার, এইখানেই ট্যাক্সি থামাও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, এখানে কোথায় থামব?

এখানেই থাম, প্লীজ, শীগগির থামো।

গাড়ী থামিল। ড্রাইভার গাড়ী হইতে নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল। নন্দিতা ওভারকোটটা ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া ফুটপাথ বাহিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

অনিলও তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া তাহার সহিত চলিতেই নন্দিতা বলিল, আর এগুলে আমি এখুনি চেঁচিয়ে লোক জড় করবো। শীগগির গাড়ীতে উঠে সরে পড়ুন।

আপনি পথ চেনেন না। একা কোথায় যাবেন?

আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

নন্দিতার দৃঢ় স্বর শুনিয়া অনিল আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। ট্যাক্সিতে উঠিয়া চলিয়া গেল। লণ্ডনের শীত ও কুয়াসার মধ্যে নন্দিতা একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তখনও পথে অবিরাম লোক চলাচল করিতেছে। একটু অগ্রসর হইয়াই একজন কনেষ্টবলকে দেখিয়া তাহার কাছে গিয়া নিজের বাসার ঠিকানা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ট্যাক্সি কোথায় পাওয়া যেতে পারে? সে নিকটবর্তী একটি মোড়ের কথা নন্দিতাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিল, ওখানে গেলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

নন্দিতা বাসায় ফিরিয়াছে। শরীর ভাল নাই, এই অজুহাতে বাড়ীতে বলিয়া দিল, সে ডিনার খাইবে না। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ওভারকোটটা আর হাতের দস্তানা দুইটি খুলিয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে একটি পাতলা ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়াইয়া চিমনির পাশে বসিয়া আগুনটা একটু খোঁচাইয়া দিল। চেয়ারে বসিয়া হাত-পা একটু গরম করিয়া লইয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া স্লীপিং স্যুট পরিয়া বিছানায় গা এলাইয়া দিল। গায়ের উপর চারিখানি লেপ, পায়ের কাছে একটি গরম জলের ব্যাগ। এগুলি পূর্ব হইতেই বাড়ীর গিন্নী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ঘরখানির তিন দিকই বন্ধ। একদিকে একটি জানালার উপরের দিকে একটু ফাঁক। সেইখান দিয়াই বাতাস আসে ঘরে। নন্দিতার মনের উদ্বেগ, ভাবনা প্রবল ভাবে তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ কি ভয়াল পরিস্থিতি! যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে একা এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে কি না, বুঝিতে পারিতেছে না। এদিকে তাহার চোখের সামনে সে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, ওঃ! মোহিত এমন কাজ করিতে পারিল? বিদেশে আসিলেই কি মানুষ সহসা এমন অমানুষ হইয়া যাইতে পারে? নাঃ, কিছু একটা গোলমাল যেন কোথায় আছে। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখিল, তার সঙ্গে অনিলের কথা ঠিক মিলিয়া যাইতেছে। তা মিলুক। হয়তো মোহিত একটা সাময়িক মোহে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। নন্দিতা মনে মনে প্রার্থনা করিল, ভগবান, তাই যেন হয়। মোহিত তাহার মোহ কাটাইয়া উঠিয়া আবার যেন সুস্থ হয়। নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে, ভয়, সন্দেহ, আশা ও নিরাশার দোলায় দোল খাইতে খাইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে লুসি হোটেল হইতে সোজা অনিলের বাসায় গিয়া তাহার দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলিল। অনিল বলিল, ভিতরে এস। কিন্তু এমন সময়ে? হোটেল থেকে এখনই চলে এলে যে!

বিশেষ দরকার আছে বলেই এসেছি। মিসেস মুখার্জি কোথায়? এখানেই আছেন নাকি?

মিসেস মুখার্জি! কোন মিসেস মুখার্জি?

ন্যাকামো ক'র না। তোমার কোন কথা জানতে আমার বাকি নেই। শীগগির বল, তিনি এখানে আছেন কি না।

যদি না বলি?

বলতেই হবে। নইলে পুলিশ ডাকবো।

দেখ, অস্থির হয়ো না।

চুপ কর। মিসেস মুখার্জি এখানে আছেন কি না, আমি এই মুহূর্তে জানতে চাই।

না, তিনি এখানে নেই।

তার ঠিকানাটা?

কি দরকার তোমার?

দরকার আছে। তার ঠিকানাটা আমাকে দাও।

অনিল দেখিল, আর লুকোচুরি করিবার পথ নাই। মোহিত এবং লুসি দুজনেই নন্দিতাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। নন্দিতা যতটা সাবধানতা অবলম্বন করিবে অনিল আশা করিয়াছিল, অত্যধিক উত্তেজনা বশত নন্দিতা তাহা পারে নাই। সুতরাং এখন আর কথা বাড়াইয়া কোন ফল হইবে না।

অনিলের নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া পরদিন অতি প্রত্যুষেই লুসি নন্দিতার বাসায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অপরিচিত একটি মহিলাকে এত সকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিতে দেখিয়া নন্দিতা একটু অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সাধারণ সৌজন্য বশতঃই বলিল, আপনি কাল আপনার স্বামীর সঙ্গে যাঁকে দেখেছিলেন, আমিই তিনি।

নন্দিতা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লুসি বলিল, আপনি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান?

নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু ব্যাপারটা যে কিছুই বুঝতে পারছি নে? আপনি নিজেই এসেছেন আমার কাছে একথা বলতে?

আপনি আজ সন্ধ্যার সময়ে আসবেন আমার বাসায়। সেখানেই মোহিতের সঙ্গে দেখা হবে।

কিন্তু আপনার বাসায় কেন? মোহিত কি সত্যই আমাকে ত্যাগ করবে স্থির করেছে, আর আপনাকে—

আপনি একটুও উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনার মোহিত সম্পূর্ণ আপনারই আছে। ওঁকে আমি নিজের সহোদরের মতই শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি।

নন্দিতা বলিল, অথচ—

আপনি একবার আসুন না আমার বাসায়। যদি নিতান্ত আপত্তি থাকে, তাহলে না হয় আমরাই এখানে আসব।

না না। আমিই যাব আপনার ওখানে। তাই যখন আগে থেকে ঠিক করেছেন, তাই হবে। আমার মনে হচ্ছে, আমি আপনাকে সত্যিই বোধ হয় কোনরকম ভুল বুঝেছি। কি জানি, আমি কিছুই সহজ করে ভাবতে পারছি নে।

লুসির বাসা। বেশ সাজানো ছোট একটি ড্রইংরুম। সোফা, সেটি, রেডিও, পিয়ানো সবই আছে। সোফা ও সেটি কয়টির মাঝখানে একটি গোল টেবিল, সুন্দর একখানি টেবিল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। তার মাঝখানে চীনামাটির একটি ভাস। আর ভাসটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনটি প্লেট, কাঁটা, চামচ ইত্যাদি সাজানো হইয়াছে। একটু পরেই এখানে চায়ের আয়োজন করা হইবে। এপাশে একটি বড় জানালা। তার দুই পাশ জুড়িয়া একজোড়া সুন্দর লেসের কাজকরা পর্দা। একপাশে একটি ছোট শেলফের উপর অনেকগুলি বই রহিয়াছে।

সন্ধ্যার উপক্রম হইতেই লুসি এই ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। মেডকে বলিয়া দিয়াছে, অভ্যাগতেরা আসিলেই যেন চায়ের ব্যবস্থা করে। মেড আস্তে আস্তে চায়ের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সব ক্রমে ক্রমে আনিয়া গুছাইতে লাগিল এবং তিনটি স্থানের পাশে তিনখানি ছোট হাতহীন চেয়ার আনিয়া রাখিল। লুসি একটি সেটির এক কোণে বসিয়া প্রতীক্ষমান দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে দরজার দিকে চাহিতে লাগিল।

যথাসময়ে মোহিত দরজায় টোকা দিয়াই নব ঘুরাইয়া ঘরে ঢুকিল। লুসি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে লইয়া তাহার পাশেই বসাইল। তাহার সহিত দুই চারটা কথা বলিতে বলিতেই দরজায় আবার টোকা। লুসি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই নন্দিতা ঘরে ঢুকিল।

লুসি বলিল, আসুন, আমরা একবারে চায়ের টেবিলেই বসে পড়ি। চা খেতে খেতে কথা হবে।

খাবারের আয়োজন দেখিয়া মোহিত বলিয়া উঠিল, ওরে বাপ, এ যে একেবারে হাই-টি।

তাহারা চেয়ারে বসিল, মেড খাবারের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

লুসিই প্রথম কথা বলিল, মিঃ এবং মিসেস মুখার্জি, আপনারা আশা করি ব্যাপারটা সব বুঝেছেন?

নন্দিতাকে একটু চিন্তান্বিত দেখিয়া লুসি বলিল, আপনি এখনও বোধ হয় সংশয়ান্বিত রয়েছেন। শুনুন, আপনার স্বামী অত্যন্ত সজ্জন। এমন সজ্জন লোক সংসারে অল্পই আছে। আমার স্বামী ওই অনিল, ঠিক ওর উল্টা। আমি তার স্ত্রী হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বিদেশী ছাত্ররা এদেশে এসে যে সব বদভ্যাস অর্জন করে, সবই সে অর্জন করেছে। সে সব তো আছেই, তার পরে কিছুদিন থেকেই আমাকে বলছে, ইণ্ডিয়ায় আমার আসল স্ত্রী আছে। তার সঙ্গে বিয়ে না হলেও, আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসি। তোমাকে ডাইভোর্স করে আমি তাকেই বিয়ে করব। সে মেয়েটি যে কে তা আমি এখন বুঝতে পারলুম। ও এত বড় পাষণ্ড যে ওর এই দুরভিসন্ধি সাধনের জন্যে এই সব ষড়যন্ত্র করেছে। মিঃ মুখার্জিকে আমি আমার ভাইয়ের মতই শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। শুধু ওই বন্ধুর কবলে পড়েই উনি এমন একটা বিসদৃশ অভিনয় করতে রাজি হয়েছিলেন। মিসেস মুখার্জি, আমার কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না। মোহিত এবং নন্দিতা হয়তো নিরিবিলি কথা বলিতে চায়, এইরূপ অনুমান করিয়া লুসি বলিল, আমি একটু আসছি ওঘর থেকে। ডিনারের ব্যবস্থাটা মেডকে একটু বুঝিয়ে দিয়ে আসি, আপনারা কিন্তু এখানেই আজ ডিনার খেয়ে যাবেন। কোন আপত্তি শুনবো না। লুসি চলিয়া গেলে নন্দিতা এবং মোহিত একটি সেটিতে আসিয়া বসিল।

মোহিত বলিল, বড় অন্যায় করে ফেলেছি। আমায় ক্ষমা কর।

অন্যায় তুমি করনি। তবে অমন একটা বন্ধুর পাল্লায় পড়ে আমাকে একটু হয়রাণি করালে, এই যা।

তারপর উহাদের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ যে সকল কথা হইল, তাহাতে বুঝা গেল, উহাদের মন বেশ হালকা হইয়া গিয়াছে। নন্দিতা বলিল, আমি ভেবেছি, খোকাকে এখানে নিয়ে এসে তোমার কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এখানেই তোমার সঙ্গে থাকব।

মোহিত বলিল, আর বৎসর খানেক মাত্র বাকি। এর মধ্যে আর ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমার আর কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্ত থেকো। তবে কালই তোমাকে ছাড়ছিনে কিন্তু।

খোকাকে ছেড়ে আমি বেশি দিন থাকতে পারবো না।

আমাকে ছেড়ে তো বেশ ছিলে?

যাও।

আচ্ছা, দিন পনের থাক, এর মধ্যে আমি তোমাকে এদেশের অনেক কিছু দেখিয়ে দিতে পারব। দেশটাও একটু ঘুরে দেখতে পারবে।

যা হয় কর।

লুসি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল, সব ঠিক হয়ে গেছে, কেমন?

নন্দিতা বলিল, হ্যাঁ। কিন্তু তোমার?

আমার কথা থাক। ওর মতি-গতি না বদলান পর্য্যন্ত আমাকে এ দুর্ভোগ সইতেই হবে। তবে যত দিন ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে ও যাতে আপনাদের কোন অশান্তির কারণ না হয়, তা আমি দেখব।

নন্দিতা বলিল, এ আপনার অত্যন্ত উচ্চহৃদয়ের পরিচয়। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাদের অশান্তিও দূর হয়ে যাক।

সে আমার কপাল।

আপনার মত স্ত্রী পাবার সৌভাগ্য যার হয়েছে, সে যে হীন হ'তে পারে, তা কল্পনা করতেও বাধে। আমাদের খুব বিশ্বাস, ও একদিন সত্য সত্যই অনুতপ্ত হবে।

কথা আর বেশি হইল না। রেডিওর চাবি খুলিয়া কতকগুলি গান, সংবাদ ইত্যাদি শোনা হইল। আরো কিছুক্ষণ গল্প-গুজবের পর মেড আসিয়া খবর দিল, ডিনার তৈরী হইয়াছে।

ডিনারের পালা শেষ করিয়া মোহিত এবং নন্দিতার যাইবার সময়ে লুসি বলিল, আমার আজ সত্যই খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনাদের একটা মস্ত অশান্তি কেটে গেল। আর আমিও আপনাদের মত লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলাম। আশা করি, মিসেস মুখার্জি যত দিন এখানে থাকবেন, মাঝে মাঝে দেখা করবেন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমরাও যে কত আনন্দিত হয়েছি, তা মুখে বলে বোঝাতে পারব না। আচ্ছা, আজ আসি। গুড নাইট্।

গুড নাইট্।

মজলিস

শ্রীগণেশচন্দ্র দাস

চলমান জনতার একটা প্রবহমান স্রোত ট্রাফালগার স্কোয়ারের প্রশস্ত রাজপথটার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটু চোখ মেললেই দেখা যাবে ফিনিশ, আফ্রিকান, ফ্রেঞ্চ থেকে আরম্ভ করে ইজিপ্সিয়ান, ভারতীয় ইত্যাদিদের। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় লোকের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র এই—কসমোপলিটান সেণ্টার—ট্রাফালগার স্কোয়ার। আমরা তিনজন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছু দিনের জন্যে লণ্ডনে এসেছি। আমরা তিনজন—আমি মোহন আর সনৎ যেন গতিশীল ভাবেই পার্শ্ববর্ত্তী সকলের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে এগিয়ে চলেছি। লণ্ডনের মনোরম রাস্তা-ঘাট দর্শন ছাড়াও ইণ্ডিয়ান মজলিসের শ্রোতা হিসেবে যাচ্ছিলাম কিন্তু হোটেল ছেড়ে বেরিয়েই শুনলাম, যে কোন কারণে বিতর্ক-সভার আয়োজন আজকের মতো স্থগিত রাখা হয়েছে। ভাবলাম হোটেলে ফিরে গেলে ঠিক হবে না, কারণ কবিগুরুর অমোঘ বাণী মনে পড়ে গেল—'সময় যখন হয়েছে এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে।' তাই সময়ও যখন হয়েছে আর বাঁধন যখন ছিঁড়েছি তখন পুরোনো আস্তানায় ফিরে যাওয়াটা ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপাততঃ যদিও তিনজন উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলেছি, এতটা সময়ের কি করে অপব্যয় করা হবে তা নিয়েই পরস্পরের মধ্যে উঠেছে মহাতর্ক। সঙ্গের পুঁজি যখন সামান্য, আর ক্ষুধার তাড়নাটাও যখন প্রবল তখন মনোরম পারিপার্শ্বিকতার হাতছানি যেন মনকে প্রলুব্ধ করতে পারলো না। আমি প্রস্তাব করলুম, সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লর্ডসের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ দেখতে গেলে কেমন হয়? লাঞ্চের পর থেকে নিম্নশ্রেণীর টিকিট অনায়াসেই পাওয়া যাবে। এখান থেকে লর্ডসের ক্রিকেট গ্রাউণ্ড কতটুকু বা দূর?

কিন্তু অপর দু'জনের কাছ থেকে পেলাম তীব্র প্রতিবাদ। তাই আবার মোহন যখন লণ্ডনের সিনেমা-পাড়া লিষ্টার স্কোয়ারে গিয়ে রিচমণ্ড সিনেমায় এম, জি, এম প্রযোজিত ও হলিউডের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো অভিনীত কৌতুক-চিত্র বাস-ষ্টপ, দেখবার প্রস্তাব এবং সনৎ উইম্বলডনে গিয়ে টেনিস খেলা দেখবার প্রস্তাব করলো তখন আমিও প্রত্যুত্তরে ছোটো পাওয়ার প্রয়োগে দ্বিধা করলুম না। এই ভাবে চলেছিলো প্রস্তাব উত্থাপন আর বাতিলের পালা। সামনেই এসেছে জেণ্টেলম্যানস রেণ্ডেভু (Rendezvous) উন্মুক্ত তোরণদ্বারের পাশের গ্লাস কেসে একটা যন্ত্রচালিত প্রকাণ্ড পুতুল ঠিক একটা জীবন্ত রিসেপসানিষ্টের মতো অদ্ভুত কায়দায় হাত নেড়ে পথচারীদের ভিতরে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে। একজন প্রিয়দর্শন যুবক জাতিতে বোধ হয় ফ্রেঞ্চ হবে, তারই একজন সঙ্গীকে ইংরিজি ভাষায় বললো—রিসেপসানিষ্টকে জিজ্ঞাসা করতো বুভুক্ষুদের অন্নদানের ব্যবস্থা আছে কি না শুনে সজোরে হেসে উঠলাম—সেও হেসে উঠল।

দেখতে দেখতে কুইন অফ দি সাউথ পার্কের রাস্তায় এসে পড়লাম। অদূরে দেখা যাচ্ছে বৃটেনের ভূতপূর্ব্ব বিজয়ী নৌসেনাপতি নেলসনের প্রতিমূর্ত্তিসহ বিজয় স্তম্ভ। ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ানের প্রতাপশালী সৈনিকবৃন্দকে পরাভূত করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার দ্বারা স্বদেশবাসীর হৃদয়ে তিনি যে আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারই প্রতীকস্বরূপ সতেরো ফিটের লম্বা নেলসনের ব্রঞ্জের প্রতিমূর্ত্তি একশো ষোল ফিট স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান থেকে পার্শ্ববর্ত্তী সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানছে। স্তম্ভের নিচের চারদিকে রয়েছে ট্রাফালগার যুদ্ধের চারটি দৃশ্য—এগুলি যুদ্ধে অধিকৃত ফরাসী কামানগুলিকে গলিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের অনতিকাল পরেই নিচের চারদিকে চারটি প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহ সংযোজিত হয়েছে। এদের প্রকাণ্ড সর্ব্বগ্রাসী মুখের হাঁ আর চোখের তীক্ষ্ণ চাহনি যেন তাদের জীবন্ত জন্তুর চেয়েও মারাত্মক করে তুলেছে। মোহন বলে ওঠে—নেলসন নৌযুদ্ধে জয়লাভ করে যে খ্যাতি, যশ ও মানের অধিকারী হয়েছিলেন তার এতটুকু অংশ না হয় নাই বা পেলাম কিন্তু সম্রাট তৃতীয় জর্জ্জ তাঁর বিজয়ী সৈনিককে সম্মানিত করবার জন্যে যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন তার একটা ক্ষুদ্র অংশ পেলেও অন্ততঃ আজকের মতো দিনে ধন্য হতাম। ইতিহাসের ছেলে মোহন কবে, কোথায়, কি কি খাদ্য সামগ্রী সমেত যে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিলো তা সেই ভালো জানে। ওতে আমার এতটুকু প্রলোভন নেই। এই ট্রাফালগার স্কোয়ারের ঠিক মাঝে দণ্ডায়মান নেলসন স্তম্ভ দেখতে দেখতে হঠাৎ তিনজনের মাথায় একই প্ল্যান এলো—আজকের দিনটা প্রবীরদার বাড়ীতে গিয়ে উঠলে কেমন হয়? তিন মতই যখন এক তখন আর সময় নষ্ট না করে একটা ক্যাব ভাড়া করে উঠে বসা গেল। তাছাড়া ঈশাণ কোণে বাধা-বন্ধনহারা পুঞ্জ মেঘ আড়ম্বরের সঙ্গে সমবেত হয়ে গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করছে।

প্রবীরদা হচ্ছেন একজন খ্যাতনামা ধনপতি ব্যারিষ্টারের ছেলে। প্রেসিডেন্সি কলেজে আমরা একই সঙ্গে পড়তুম। কিন্তু ঠিক সহপাঠী বলা চলে না। কারণ তিনি যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন সবেমাত্র আমরা কলেজে প্রবেশ করি। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা, ডাগর ডাগর চোখ আর চাপা পুরু ঠোঁট দেখলে মনে হয় তিনি নিতান্ত স্বল্পভাষী কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে, বাস্তবিক পক্ষে তিনি এমনই অজস্র কথা-

বলতেন আর সুন্দর যুক্তিতর্ক করতেন যে—যার ফলে তিনি বার কয়েক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর পর প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্যারিষ্টার হবার জন্যে বছর সাতেক আগেই লণ্ডনে এসেছিলেন। দেশে থাকার সময় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বন্ধুত্বটা পাকাপাকি করে ফেলেছিলাম। হ্যাঁ, এই তো সেদিন পর্য্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান মজলিসের ডিবেটিং সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন কিন্তু কেন জানি না, হঠাৎ তিনি এই সম্মানজনক পদ কিছুদিন আগে ত্যাগ করেন বিনা কারণেই একরকম।

প্রবীরদার বাড়ীটা ছিলো সেণ্ট জারমেন এ্যাভিনিউতে—ট্রাফালগার থেকে মাইল দুয়েকের পথ। পিকাডালিতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বারিপাত সুরু হয়েছে। আর বেশীক্ষণ দেরী নেই, প্রবীরদার বাগানবাড়ীটা দেখতে দেখতে এসে গেল। প্রকাণ্ড বাড়ীটায় মাত্র দু'টি প্রাণী—প্রবীরদা আর বাটলার স্মিথ। ধনীর পুত্র, তাই তিনি আমাদের মত ল্যাণ্ডলেডীর কৃপাপ্রার্থী না হয়ে আর পদে পদে ল্যাণ্ডলেডীর সন্তুষ্টিবিধান ও জবাবদিহি থেকে রক্ষে পেয়ে আরামে দোতলা বাড়ীটায় বসবাস করছেন। কিন্তু গিয়ে বিফল-মনোরথ হলাম। কারণ বাটলার স্মিথ জানালো যে তিনি কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছেন। শুধালাম কোথায় গেছেন? সে বললো—মনিবের তো আড্ডাখানা হচ্ছে ওই ভনক্রাম ক্যাফে, সেখানে একবার খোঁজ নিন না। আপাততঃ সেই দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। পিকাডালির একটা সেরা রাস্তা সেণ্ট জারমেন এ্যাভিনিউ, তারই একধারে ভনক্রাম ক্যাফে। বিভিন্ন রঙের আলোকমালা সজ্জিত প্রকাণ্ড ক্যাফেটাতে ঢুকে পড়েছি, বুকটা দুরুদুরু করে কাঁপছে সঙ্গের পুঁজির কথাটা ভেবে—যদি প্রবীরদাকে না দেখতে পাই তবে এক কাপ করে কফি নিয়েও যে "পানপাত্রে তুফান তুলে" (Storm over a cup of tea) খানিকটা সময় কাটাবো তাও হবে না। কারণ এই খ্যাতনামা জার্ম্মাণ ক্যাফেটার চার্জ্জ এতই বেশী যে আমাদের মত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেরা তার নাম শুনলেই যেন চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে। একগুলো ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার দৃষ্টির সামনে দিয়ে মাথা হেঁট করে চলে যেতে হবে। একস্ট্রা লাউড স্পিকারের মারফৎ রেডিওগ্রামের মাধ্যমে জনপ্রিয় জার্ম্মাণ অরকেষ্ট্রা বাজছে।

কিন্তু ভাগ্যদেবী শেষে প্রসন্ন হয়েছেন। কসিনুকের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা স্থানে প্রবীরদা বড় একটা ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে বসে আছেন এবং অন্যমনস্ক ভাবে কফির কাপকে উপেক্ষা করে জাহাজের টাইম টেবিল দেখছেন। গিয়েই সকলে একসঙ্গে বলে উঠলাম, প্রবীরদা ভালো আছেন তো? অনেকদিন বাদে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। একটা ছোট্ট হ্যাঁ বলে কফিতে মনোযোগ দিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্রবীরদার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় কিন্তু তার এমন গম্ভীর রূপটি কখনো দেখিনি।

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম—প্রবীরদা, আপনার হাতে জাহাজের টাইম টেবিল কেন?

তিনি গম্ভীর ভাবেই বললেন—সামনের বুধবার দিন বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।

সকলেই একেবারে হতভম্ব। একে প্রবীরদার এইরকম অস্বাভাবিক মূর্ত্তি, তারপর এই সুদীর্ঘ সাত বছর লণ্ডনে থাকার পর বিনা পরোয়ানায় হঠাৎ কলকাতায় ফিরে যাওয়াটা যেন এবার রহস্যটাকে ক্রমেই ঘনীভূত করে তুলছিলো। আমরা সকলেই একসঙ্গে বললাম, কেন?

তিনি যেন এবার একটু ধাতস্থ হয়ে চারটে জার্ম্মাণ ডিমের অর্ডার দিয়ে বললেন—স্বদেশযাত্রার আগে তোমাদের সবকিছু বলে যেতাম—যাহোক্ এখানে যখন কষ্ট করে এসেছো তখন এখানেই শুরু করা যাক্। একটু থেমেই বললেন হ্যাঁ, তোমাদের ভেতর জহরকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আমি বললাম সে তো আমাদের সঙ্গে থাকে না, সে তো পরশু থেকেই টেষ্টম্যাচ উপভোগ করছে। তিনি বললেন—টেলিভিশানে দেখলে হতো না বুঝি? ওই তো T V সেটে দেখো না ভারতীয় দল কেমন ইনিংস পরাজয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সত্যিই দেখলাম চা-পানের বিরতির পর খেলা সুরু হয়েছে। যাক্ সে সব কথা, তবে জহরকে সব কথা জানিও।

অনেক ভূমিকার পর প্রবীরদা শুরু করলেন, তোমরা বোধহয় জানো পড়ালেখার ব্যাপারে ও অন্যান্য নানা কারণে প্রায়ই আমাকে উষ্টারকাউণ্টিতে যেতে হতো। মাঝে মাঝে বেশ কিছুদিন করে থাকতাম ওখানে—আমার কাকামণির বাড়ীতে। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে কালক্রমে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম—তাছাড়া কাকামণি প্রদত্ত মোটাসোটা চাঁদার খাতিরে আমি কিছুদিনের মধ্যেই স্থানীয় গ্রন্থাগারের ও ডিবেটিং সোসাইটির সেক্রেটারি, মেটারনিটি হাসপাতালের অনারারি ভিজিটার, জনকল্যাণ সমিতির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইত্যাদি আবোল-তাবোল কত কি সম্মানসূচক পদে অবলীলাক্রমেই অধিষ্ঠিত হলাম। ডিউক ডিবেটিং সোসাইটির কথাই আজ বলবো। সেটাও ছিলো আজকের মতোই গ্রীষ্মের একটা ধূসর ম্লান পাংশুটে শনিবার। সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবস স্থানীয় মেয়র থেকে আরম্ভ করে গণ্যমান্য সকলেই এসেছেন সবচেয়ে পুরোনো ডিবেটিং সোসাইটির রজত-জয়ন্তী প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে। বিতর্ক-সভার বিষয়বস্তু ছিলো "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য," তোমাদের মতো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে দল গঠন করলুম। অবশ্য তারা সকলেই ভারতীয় ছিলো। বিপক্ষে ছিলো বেশ শক্তিশালী দল। মহামান্য মেয়রের সঙ্গে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। 'গ্রীণ হিল অপেরা সেণ্টারে' বেশ জমকালো পরিবেশের মধ্যে এবার সভার কাজ শুরু হলো। বিপক্ষদল প্রথমে শুরু করলো—"মুহূর্ত্তেই উঠলো ধূলোর ঝড়" সমগ্র এসিয়াবাসী প্রধানতঃ ভারতীয়েরা কুসংস্কারগ্রস্ত, প্রাচীনপন্থী, উচ্চভাবাদর্শহীন, চরিত্রে বীরত্বের অভাব, গৃহমুখী স্বভাব, বিজ্ঞানের ভাবধারায় অপরিপুষ্ট—ইত্যাদি আরো কতো কি? শীঘ্রই প্রাচ্যের লোকগুলোকে যেন তীব্র বিষমাখানো শর দিয়ে ধরাশায়ী করলো—শ্রোতাদের মুহুর্মুহুঃ করতালি যেন ভারতীয়দের বিদ্রূপের মাত্রাটাকে বাড়িয়ে তুলেছিলো। প্রায় শ'দুয়েক মাননীয় শ্রোতার মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় ছিলো ভারতীয়, তবে বুঝতেই পারছো আমাদের অসহায় অবস্থার কথা। অনর্গল বকবকানীর উপর ঘণ্টা দেড়েক পরে যবনিকার রেখা পড়লো।

এবারে আমাদের পালা। দুর্নিবার গতিতে "হিটব্যাক" করবার সংকল্প নিয়েই মাইক্রোফোনের সামনে গেলুম। রাগে-অপমানে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে, মনে হচ্ছিলো যদি হাতে কোন ভুবনবিজয়ী মারণাস্ত্র থাকতো তবে শীঘ্রই সকলকে বশীভূত করতাম। যাই হোক্ আরম্ভ করলাম—প্রাথমিক সম্ভাষণের পর :—

বন্ধুরগাত্র ইংলণ্ড। ঠিক সমতল নয়, অযুত-সমতল। মাটি যেন Law আর Order এর ধার ধারেনা, সব ঋতুতেই বর্ষা। রাত্রি-সন্ধ্যা, দিমে-দুপুরে, শুভলগ্নে-অশুভলগ্নে সব সময়ই বর্ষা কিন্তু হলে কি হবে—বর্ষার জল দাঁড়াবার মত অসমতল সেখানে নেই। আর সে বর্ষা যে কখন রুটিন মাফিক কাজ আর মেজাজ বিগড়ে দেবে তারও কোন স্থিরতা নেই। বহিঃপ্রকৃতিতে Law আর Order এর অভাব—ইংলণ্ডের মানুষের মনকে Law আর Orderএর জন্যে এত ব্যাকুল করে তুলছে। শয়নে-স্বপনে ভোজনে-বিলাসে শৃঙ্খলাকে মেনে চলাই যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। আর জীবনে সেই শৃঙ্খলাকে মেনে চলাই যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। আর জীবনে সেই শৃঙ্খলাকে বজায় রাখতে গিয়ে প্রাণে মনুষ্যত্ববোধ, মমত্ববোধ ও মানবিকতার উচ্চ আদর্শের সুরটাকে আপনারা ফেলেছেন হারিয়ে। ফলে আপনাদের জীবন্ত হৃদয়টা হয়েছে নীরস ও নিষ্করুণ পাষাণের মতো।

মনুষ্য সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়টা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। মানুষে মানুষে সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই সংগ্রামের সূচনা। সেই পুরোনো দিনের সুর ধরেই মানুষ আজও মানুষকে সহযোগিতা করে আসছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ঠিক তার একটা মহৎ বৈপরীত্য দেখা যায়—এখানে সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার নেশাটাই বেশী—স্ত্রী-পুরুষে, শিশুতে-যুবকে, আর প্রধানে-নবীনে প্রতিযোগিতার ফলে আপনাদের জীবনের ক্ষিপ্রতাটা বেড়ে গেছে দ্বিগুণ। কতকটা রেসের মাঠে ঘোড়াগুলোর মতো—কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনাটা হয়েছে লুপ্ত। ফলে পাশ্চাত্যের লোকেরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অসম্ভবকে পাবার জন্যে—কিন্তু পায়নি এবং পাবেনও না।

পুরুষদের মতো মেয়েরাও যেন এক একটা Type আমাদের দেশের মেয়েদের মতো কল্যাণকামী মূর্ত্তিটা তাঁদের মধ্যে নেই বরং রুদ্রমূর্ত্তিটাই অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট। গৃহজীবনের শান্তিময় পরিবেশ তাহাদের কাম্য নয়—পাতিব্রত্যকে উপেক্ষা করে ডাইভোর্সের নেশার ঘোরে মত্ত। Western, ideas, ideas—of individualism—তাঁদের স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দিয়েছে—কিন্তু উপদেশ দিয়েছে অশান্তিকে মনের মধ্যে পোষণ করে শান্তির জন্যে মেকি ভণ্ডামির বৃথা চেষ্টা করতে—আর তার জন্যেই বোধ হয় জীবনের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের সীমার মধ্যে তাঁরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সব সময় সব কাজ করতে প্রস্তুত—একটু এদিক ওদিক হলেই দেখে নোব ভাবটাই যেন আজ তাঁদের মজ্জাগত হয়ে উঠেছে। এদেশের সুদীর্ঘ সভ্যতার ইতিহাস—আমাদের দেশের সীতা-সাবিত্রী-বেহুলার মতো একটা নিদর্শনও মিলবে না। মিললেই বা কি সেটা কি তারা অনুকরণ করতেন? কবে সেই "ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলে'র দৃষ্টান্ত ঘটে গেছে—আজও তার জল ধুয়ে খাচ্ছে, আর যুগ যুগ ধরে খাবেও। জীবনে সমস্যা এঁরা সহ্য করতে পারেন না কিন্তু এঁদের জীবনেই সমস্যার প্রাচুর্য্যটা বেশী।

এই কথা না বলতে অতিথিদের মধ্যে যাঁরা মহিলা ছিলেন তাঁদের গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটা তীব্র অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেলো। একটু শান্ত হতেই আবার সুরু করলাম।

অসমতল ইংলণ্ডের বৃষ্টির জল যেমন সমতল খুঁজেছে কিন্তু পায় নি। তেমনি যুগে যুগে এঁরা সাম্যের জন্যে চেষ্টা করেছেন এবং এখনো করছেন কিন্তু পায় নি এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবার আশা নেই। তাই সাম্যের জন্যে hanker করার অভ্যাসটাই যেন আপনাদের হৃদয়ের পাঁজরা হয়ে উঠেছে।

নিত্য অনিশ্চিতের মধ্যে বাস করে আপনাদের জীবনের Philosophy গেছে পাল্টে। সুখের সময় দুঃখ, দুঃখের সময় আনন্দ, কান্না দিয়ে হাসিকে এবং দারিদ্র্য দিয়ে ধনিকের উচ্চাভিলাষকে চাপা দেবার চেষ্টাই যেন আপনাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে।

প্রাচ্যের যে গুণগুলি আছে পাশ্চাত্যের তা নেই। আবার পাশ্চাত্যের যা আছে প্রাচ্যের তা নেই। কর্মের পরিণতির আকাঙ্ক্ষায় আমরা ভাবমুখীন ও বিশ্বাসী, Prefectionএর সাধনায় আপনারা দিনে স্বপ্ন দেখেন। পাশ্চাত্যের মানুষেরা অর্থাৎ আপনারা beautyর কাছে Utilityকে বলি দিয়েছেন আবার brutalityর জন্যে beautyকে ফাঁসির মঞ্চে সমর্পণ করেছেন। কলেজ-জীবনে ইকনমিক্সের ক্লাসে Law of Diminishing and Increasing Utilityর কথা শুনেছি এবং পড়েছি কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকেরা এত তাড়াতাড়ি Law of Increasing Brutalityর সূক্ষ্ম তত্ত্বটা আবিষ্কার করেছেন, তা বিলাতে পদার্পণ করবার আগে জানতাম না। যার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলো তাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্যে সুবিদিত হয়ে পড়েছেন। আর তারই কৃপায় পাশ্চাত্যদেশ আজ তার আশেপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে অশান্তির বিষ আর নিজেকেও জ্বালিয়েছে বিদ্রোহের আগুনে। সব কিছু থেকেও যেন কিছুই নেই—এই ভাবটাই যেন জাতীয় জীবনে শেকড় গেড়ে বসেছে।

প্রয়োজনের কাছে পরাজিত হয়ে অপ্রয়োজনের কোন অস্তিত্ব নেই—কিন্তু সে অভাব পূরণ করেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সেই রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে সুরু করে সামান্য কর্মক্ষেত্রের আওতার ওপর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সীমাহীন প্রভাব বিরাজমান। হাউস অফ কমন্সের সিট থেকে আরম্ভ করে সামান্য কেরাণীর চাকরির জন্যে চলেছে যেন এক অবিশ্রান্ত নির্বাচনের পালা। ভাবপ্রবণতা এ জাতটার ধাতে নেই—কিন্তু তাঁর শূন্যস্থান নিয়েছে—ভোগবিলাসিতা। যোগ্যতমের উর্দ্ধতনে আমাদের একান্ত বিশ্বাস কিন্তু শারীরিক শক্তিকেই আপনারা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন।

প্রকৃতির কাছে আনুকূল্য না পেয়ে আপনারা অভিনব আবিষ্কারের নেশায় উন্মত্ত হয়ে বিজ্ঞানের অন্ধকারময় পাষাণগুহায় হাতড়ে মরছেন। আর সেই ল্যাবোরেটারির সালফিউরিক নাইট্রিক এ্যাসিড ও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড মাংশক্ষম গ্যাসের হৃদয়বিদারক পরিবেশে আরও অন্যান্য যাতে বিনাশ হয়, সেই জন্যে শত্রু-মিত্র সকলকে আহ্বান জানাচ্ছেন। এই ভাবে আপনারা কলঙ্ক গোপন করবার বৃথা চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভারত পরোপকারধর্ম্মী প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে দুঃখক্লিষ্ট বিশ্ববাসীকে শোনাচ্ছে তাঁর পবিত্র তপোবনের আশ্বাস ও শান্তির চিরন্তন বাণী।

আমরা রাগীও বটে, অনুরাগীও বটে কিন্তু বৈরাগী নয়—কিন্তু আপনারা রাগী বটে, কিন্তু অনুরাগী নন—আবার ধনশোষণের আশা তিরোহিত হলেই যাজকের পদ নিয়ে বৈরাগী সাজেন।

একটু থামতেই প্রচণ্ড কোলাহল উঠলো—নানারকম প্রশ্ন আমাকে জর্জরিত করে ফেললো—কোন রকমে ফের শুরু করলাম—ইউরোপ হাড়ে হাড়ে পুরুষকার হতে চেষ্টা করেছে ধর্মকে ঠেকিয়ে রেখে কিন্তু আমরা হাড়ে হাড়ে দৈব। আপনাদের নীতি হচ্ছে একা খাটো, খেলো আর খাও—আমাদের নীতি খাটো পরের জন্যে, খেলো অনেকের সঙ্গে এবং খাও সকলের সঙ্গে। আপনারা নিজেদের সমর্পণ করছেন একনায়কতন্ত্রের কাছে, আমরা গণতন্ত্রকে সানন্দে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব—মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি করাই আমাদের কামনা কিন্তু আপনাদের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব শত্রুভাবের সাধনায় আপনারা সত্যের উপলব্ধি করতে চান। ভারতের চরিত্রের মূলকথা সমন্বয়, আপনাদের জীবনের মূলমন্ত্র বিনিময়। আমরা দরজা উন্মুক্ত করে সবাইকে গৃহে আহ্বান করি, আপনারা সবাইকে ঠেলে পথে বার করে দেন। আপনারা সব কিছুই খোঁজেন আমরা খোঁজার শেষ বলে দিই। আপনারা সব কিছুই প্রশ্ন করেন কি কেন? আমরা কি কেনর জবাব দিই। রক্তে কৌলীন্যের মোহে আপনারা যেন মিউজিয়ামের নির্বিকার মমির মতো হতে চলেছেন। আমরা কিন্তু পথের শেষ জেনে শান্তির অগ্রদূত সেজে বসে আছি।

প্রবীরদা এমন উত্তেজিতভাবে ধারা বিবরণ দিয়ে চলেছেন, যেন মনে হচ্ছে তিনি সত্যি সত্যিই মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছেন আর ক্যাফের যেন অগণিত লোকজন তার শ্রোতা। দু-একজন মাঝে মাঝে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েও দেখছেন কিন্তু সেদিকে প্রবীরদার ভ্রূক্ষেপ নেই।

আবার তিনি শুরু করলেন—আপনাদের ছেলেদের মধ্যে আছে পুরুষ হবার কামনা কিন্তু সাধনা নেই—মেয়েদের মধ্যে আছে কল্যাণকামী জননী না হয়ে পুরুষদের সঙ্গে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা। আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আছে যেটা রয়-সয় তার পেছনে ঘোরার অভ্যাসটা। আপনারা দেশে বেকার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দেশের লোকগুলোকে একটা না একটা কাজে জুড়ে দিচ্ছেন বেতন পাক আর নাই পাক। কিন্তু আপনারা জানেন অথচ বুঝতে চান না যে—বলদকে বেশী দিন অনাহারে রাখলে কেবল ঘানিই ঘুরবে এবং ভাঙবে কিন্তু তেল বেরুবে না। আমরা যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু না হওয়া পর্য্যন্ত সব কিছুই পেতে চাই না। পরের সমৃদ্ধিতে আপনাদের গলগ্রহ—যে খেলার মাঠ থেকে রাজনীতির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই নীতি অপ্রতিহত। দেখছেন না অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ্যাসেজ' হেরে কেমন আপনারা আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেছেন? এবারে হৈ চৈ আর থামলো না—শেষে বাধ্য হয়েই মঞ্চ থেকে নামলাম। পুরুষ আর নারীর দল আমাকে ঘিরে ধরে একবার এদিকে একবার ওদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—নানা রকম শ্লেষপূর্ণ তীব্র প্রতিবাদ আর "ক্যাটকল" (Catcall) উঠেছে। কার কথার যে উত্তর দেবো কিছু ভাবতে পারছি না। কোন রকমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন প্রাণে বেঁচে যাই। সত্যি কথা বলতে কি, নিজেকে যেন মনে হচ্ছিলো উইম্বিলি ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এফ, এ, কাপের (F. A. Cup) ফাইনাল খেলায় আমি কোন বিজয়ী টিমের গোলকিপার। বিপক্ষ দলের ফরোয়ার্ডরা চারিদিক থেকে অবারিত সট করছে আমার দিকে আর আমি সিটাডেল (Citadel) রক্ষে করতে গিয়ে পেনাল্টি বক্সে কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কি করে যে বেরিয়ে রাস্তায় এসেছিলাম ঠিক তাও মনে নেই।

তারপর মাসখানেক ধরে স্থানীয় পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতি-সমালোচনা চলতে লাগলো। ভেবেছিলাম, ইউরোপীয়দের ধৈর্য্যহীনতা সম্বন্ধে একটা চিঠি কাগজে বার করবো, যে একজন বক্তাকে তার ভাষণ সম্পূর্ণ করতে না দেওয়াকে কি বলে? চিঠির খসড়াটাও করে ফেলেছিলাম কিন্তু ওই পর্য্যন্তই, আর এগুতে সাহস হয়নি। আবার যদি একটা বিভ্রাট ঘটে।

কাকামণি রেগে বললেন—এমন বদনাম ছড়াবার জন্যে তোমাকে লণ্ডনে নিয়ে আসা হয়নি। মনে দুঃখ পেলাম, আর তাই চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে এই শপথ করছি আর কোন দিন কোন সম্মেলন বা বিতর্কসভায় যোগদান করবো না, এমন কি শ্রোতা হিসেবেও নয়।

বড় হাসি পেলো কিন্তু প্রবীরদার সামনে হাসতে পারলাম না। এতক্ষণে "ইণ্ডিয়ান মজলিসের" ব্যাপারটার পদত্যাগের কারণ স্পষ্ট হয়ে গেল। সনৎ বলে ওঠে, আর সেই অনারারি পোষ্টগুলো কি আপনি ছেড়ে দিলেন?

প্রবীরদা বললেন আরে ভাই, এত কাণ্ডের পর কি আমায় আর রাখে, সেই রাত্রেই আমাকে বাতিল করা হয়েছে। মোহন বলে উঠলো প্রবীরদা, আপনি রাগের মাথায় সবই বাজে কথা বলছেন?

প্রবীরদা বললেন, তা জানি না, তবে এর বেশীর ভাগটাই যে সত্য নয় এটা তুমি নিশ্চয় জেনো। হঠাৎ প্রবীরদা বললেন, আমি খুব জোরে কথা বলে ফেলেছি, না? আমরা বললাম কেন? প্রবীরদা বললেন, যদি কেউ শুনে নেয়? আমরা বললাম, আপনি তো বাঙলায় বলেছেন। তিনি বললেন, তা হোক কাছেই * * * সোসাইটির একটা ব্রাঞ্চ আছে। যদি কেউ সভ্য * * * আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে।

আমি পুনরায় বললাম প্রবীরদা, ঘটনাটা কবে ঘটেছিল আর তারপর কি কখনো আপনি উষ্টার কাউন্টিতে গেছেন?

প্রবীরদা বললেন, সেটা প্রায় মাস দেড়েক আগে ঘটেছে আর তারপর খুব একটা জরুরি কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে বাধ্য হয়েছি উষ্টার কাউন্টিতে। সে-ও এক মহা বিভ্রাট, যতই উষ্টার কাউন্টি কাছে আসছে আর দূরের ইমপিরিয়াল ক্যাথিড্রাল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে, ততই যেন হৃৎপিণ্ডের প্রতিক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে আসছে। ঠিক হয়ে না বসতে পেরে উসখুস করছি দেখে একজন অষ্ট্রিয়ান সহযাত্রী বলে উঠলেন, আপনার কি অসুস্থবোধ হচ্ছে? নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললাম, হ্যাঁ। তৎক্ষণাৎ তিনি এয়ার হোষ্টেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—যত তিনি কাছে এসে সহানুভূতি দেখিয়ে অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করেন ততই যেন মনে হয় হ্যাঁ একেও যেন সেই ভিড়ের মধ্যে দেখেছিলাম—মুখ খিঁচিয়ে কি জিজ্ঞাসা করেছিলো। কি জানি বাবা, সমবেদনা দেখাতে গিয়ে মিছরির ছুরি মারবে না তো?

অকাজের কাজ

সুবোধ রায়

আবছা আলো। অস্ফুট। সূর্য ওঠেনি তখনো বালিগঞ্জের আকাশে। মৃদু মৃদু ঝির-ঝির বাতাসে শীতের আমেজ। পুজো আসছে, তারই পূর্বাভাস। হোস পাইপের জল ঝকঝকে কালো, পীচের রাস্তায় তখনো শুকোয়নি।

প্রাতর্ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছিলাম। রোজ বেরোই। হঠাৎ থমকে থেমে গেলাম। কৌতূকোদ্দীপক দৃশ্যই বটে! তা ছাড়া সর্ব ব্যাপারে আমি আবার একটু বেশি মাত্রায় কৌতূহলী। এমনতর আগ্রহাতিশয্য ভালো কি মন্দ ঈশ্বর জানেন! তবে বরাবর লক্ষ্য করেছি আমার অস্থিতে মজ্জায় মিশে আছে ঔৎসুক্যের অন্তঃসলিলা ফল্গু। কৌতূহলের দুর্নিবার নেশা।

অতএব দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়ালাম নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। ইচ্ছাসত্ত্বেও আর একটি পা-ও অগ্রসর হতে পারলাম না। কি ব্যাপার! কে লোকটি?

যথাসম্ভব নিজেকে আড়াল করে লোকটা বসেছে একটা গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে। কোলের ওপর খাবারের একটা মস্ত চ্যাঙারি। কচুরি, নিমকি, শিঙাড়া, জিলিপী, রসগোল্লা, রসকদম্ব আরও কতো কি যে রকমারি খাবার! ঠাসা চ্যাঙারি ফাঁক নেই কোথাও। একেবারে রাজসিক, রাজকীয় খাবারের আয়োজন। কিন্তু আশ্চর্য!

এত রকমের লোভনীয়, মুখরোচক খাবার সামনে অথচ লোকটা খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। খাচ্ছে সাবধানী হাতে। কৃপণের মতো। হাতের কাছে অমন সব সরেস জিনিস। কোথায় টপাটপ গপাগপ এক ধারসে সাঁটিয়ে যাবে, তা না, খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে শুধু চিলকে আর গুঁড়ো গুঁড়ো ফুলকিগুলো। জিলিপী হাতে নিয়ে খাচ্ছে শুধু জিলিপীর বাড়তি প্যাঁচ আর ক্ষুদে দাঁড়াগুলো। রসগোল্লা মুখে ফেলে, মুহূর্তের জন্য রাখছে শুধু মুখের ভেতর। তারপর আবার উগরে ফেলছে, আস্ত, গোটা রসগোল্লাটাই। লেডিকেনি-ও তাই।

কি অদ্ভুত! এ আবার কোন দেশী খাওয়া? এমন ঠাস বুনোন, উজবুক ত' আর দেখিনি কখনো, লোকটা পাগল নাকি? কিন্তু চেহারা আর সাজ-পোশাক দেখে ত' একেবারে ভিখিরি কিম্বা পাগল বলেও মনে হয় না। তবে? এক চ্যাঙারি এতো রকমের ভালো-মন্দ খাবার। এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে কি সোজা কথা! বলিহারি শখ বটে! কিম্বা হতে পারে, বোধহয় ক'দিনের জমানো পয়সা খরচ করে আজই একটু খাচ্ছে প্রাণের আশ মিটিয়ে। বোধহয় কোনো কারখানার মিস্ত্রি। রেষ্টুরেণ্ট কিম্বা হয় ত কোনো মিষ্টির দোকানের কর্মচারী। ঠিক তাই। চুরি করেছে। লোপাট করেছে। খিড়কি দুয়োর দিয়ে পাচার করেছে মাল। এ নির্ঘাত হাত সাফাই।

আবার ও কি কাণ্ড! শালপাতার মোড়ক নয়, এবার অধৈর্য ক্ষিপ্রতায় হাঁটুর কাপড়টা তুললো লোকটা। দগদগে ঘা। জানুসন্ধি থেকে উরুপ্রান্ত পর্যন্ত। অসংখ্য বিজবিজে মাকড়সার ডিমের মতো ঘা। ঈষৎ হরিদ্রাভ। খোস পাঁচড়া? দাদ? কে জানে! কাউর-ঘাও হতে পারে।

আহার ছেড়ে এবার সুরু হল চুলকানি। ঘসর ঘসর সে কি বিরামহীন, প্রাণান্তকর চুলকানি! একান্ত তন্ময়। সম্পূর্ণ তুরীয় ভাব। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। আরও আরও জোরে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দু হাত দিয়ে পাগলের মতো চুলকোচ্ছে ত চুলকোচ্ছেই। চিড়বিড়ানি বোধহয় বেড়েই চলেছে ক্রমশঃ। পোড়া ঝামা কিম্বা একটা কোবরা পালিশের ঢাকনা যদি পেত হাতের কাছে। কিম্বা হাতের নখগুলি যদি ভয়ঙ্করী শূর্পনখার মতো ক্ষুরধার হত—একেবারে কুরিয়ে কুরিয়ে মনের সুখে লোকটি বোধহয় চুলকোতো তা'হলে।

এইবার—আঃ, এতোক্ষণে নিষ্কৃতি। এবাম তুষ্ণী ভাব। মুখে চাপা স্বগীয় হাসি। যেন ভোর হয়ে এলো দুর্যোগের রাত্রি। ফ্যাকাশে, জোলো রক্ত চুয়ে পড়ছে উরু বেয়ে, দাগড়া দাগড়া ঘাগুলো থোপ থোপ হয়ে ফুলে উঠেছে। কষানি গড়াচ্ছে। রোগা, শীর্ণ আঙুলগুলোতেও মাখামাখি।

নখাগ্রে আঠার মত আটকে আছে পাঁশুটে রঙের ঘায়ের খোসা। হাতের নীল নীল শিরার জটগুলি আরও রুক্ষ, প্রখর হয়ে উঠেছে। ইলেকট্রিক-পোষ্টের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছি সব। নির্নিমেষ, রুদ্ধশ্বাস, ঐ আবার। একটা রসগোল্লা টপ করে পুরে দিল মুখে। বার করলো খানিক বাদেই। তেমনি গোল, আস্ত রসগোল্লা। রসের খুরিতে একটা রাখে আরেকটা মুখে পোরে! কখনো চমচম, কখনো বা রাজভোগ। আবার রাখে আবার খায়।

ভারি মজা! এ এক আশ্চর্য রগড় বটে! চর্বণে অনিচ্ছা। ভক্ষণে অরুচি। রসে টই-টম্বুর রসগোল্লা আর রাজভোগের কুহরে কুহরে যে পুঞ্জিত রস। শুধু তার রসাস্বাদনেই লোকটার তৃপ্তি বোধহয়!

আলতো টোকা দিয়ে আঙুলের মৃদু চাপে এবার মুচড়ে দেয় মুচমুচে নিমকি আর শিঙাড়া। শিঙাড়ার পেট কেটে শুধু ধোঁয়া নয়, মশলামাখা হলদে হলদে আলুর টুকরোও বেরিয়ে পড়ে। একেবারে টাটকা। মানে হাতে-গরম।

নিমকির ভাঙা পাপড়ি আর ঘায়ের পাঁশুটে রঙের খোসা একাকার হয়ে যায় সব। কিছু কিছু সেঁটেও যায় রসগোল্লা আর লেডিকিনির গায়ে।

কুৎসিত ন্যক্কারজনক দৃশ্য! বিরক্ত লাগে। গা ঘিনঘিন করে। তবু আশ্চর্য! তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে দেখি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম, রাত্রি প্রায় আটটা বাজে। সকলে একসঙ্গে প্রবীরদার জ্যাগুয়ার গাড়ীতে উঠে বসেছি। পিকাডালি বিভিন্ন রঙের নিওন সাইনের আলোকমালায় সজ্জিত হয়ে অপরূপ রূপের মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। অবিশ্রান্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টি পথচারীদের রেণকোটে মুড়ে দিয়েছে। বাড়ীর কাছে ছেড়ে দিয়ে প্রবীরদা চলে গেলেন, আকাশটা আরও গাঢ় লাল হয়ে আসছে। বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে সনৎ বলে উঠলো, প্রবীরদা যে এত ভীতু লোক তা জানতাম না, আহা বেচারা!

আমি বললাম আরে থামো থামো, ইণ্ডিয়ান মজলিসে না গিয়ে ভালোই করেছি, প্রবীরদার জার্ম্মান ডিস আর লেকচারের দৌলতে বেশ ভালো ভাবেই জমে উঠেছিল ক্যাফের মজলিসটা।

এখন আর রাস্তা তেমন জনবিরল নয়। চকচকে গাছের পাতায় আলোর অরুণিমা। সিঁদুর-রাঙা সূর্য উঠেছে পূব-আকাশে। শুরু হয়েছে লোকচলাচল। এক বিশালকায় অ্যালসেসিয়ান নিয়ে যাচ্ছে এক তন্বী আধুনিকা। আঁটসাঁট ঝকমকে যৌবন। রোজ যায় এই সময়। ছটফটে অ্যালসেসিয়ানকে কিছুতেই সামলাতে পারে না মেয়েটা, হিমসিম খায়। কুকুরটাকে কাছে আসতে দেখেই বোধ হয় লোকটা হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়ায়। ছড়ানো শালপাতাগুলো কুড়িয়ে নেয় মাটি থেকে। তারপর চ্যাঙারিটা শালপাতায় ঢেকে শুরু করে পথ চলা।

একটু ব্যবধান রেখে আমিও অনুসরণ করি যন্ত্রচালিতের মতো। রাসবিহারী এভিনিউ ছাড়িয়ে লেকভিউ রোড। তারপর দক্ষিণমুখী সাদার্ণ এভিনিউর দিকে কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে বেঁকে যায় লেক রোড। হাল ফ্যাসানের মস্ত বাড়ি। মোজেইক করা বেঁটে গোল গোল মসৃণ কালো থাম। ভেতরের নয়নাভিরাম বাঁকা সিঁড়ি ছবির মত দেখায় বাইরে থেকে। আর ঝুলবারান্দার কিনারে সারি সারি কতো রকমের যে ফুলের টব। পিটুনিয়া, ডায়ানথাস, ভার্বেনা, হলুদরঙা কসমস, ক্যালেণ্ডুলা আর হেলিয়ানথাস।

গেট খুলতেই প্রতীক্ষমান ছেলে-মেয়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। একেবারে ঘিরে ধরে; ছেঁকে ধরে লোকটিকে। ভবানী এসেছে—ভবানী এসেছে রাঙাদি, ফুলদি, বাবলু, মিণ্টু আয় শীগগির। পর্দা সরিয়ে ঘুম ঘুম চোখে শ্লথবাসা ছুটি তরুণীও আসে পিছন পিছন। হাতে জড়ানো ফাঁপানো আলগা খোঁপা। ছু-এক গাছি চূর্ণকুন্তল ছুলছে কপালে। খোঁপার নিচে মসৃণ শ্বেতাভ গ্রীবা। আরেকটি মেয়ে এলোকেশী। তারপর হুড়োহুড়ি, টানাটানি, কাড়াকাড়ি। কে আগে পায়। কে বেশি পায়। সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে ওঠে রাঙাদির বোধ হয়।

দাঁড়া, দাঁড়া, আমি ভাগ করে দিচ্ছি। এই পণ্টু—মীনা কোথায় রে? ঠুচকান, বুলবুল, শম্পা, চিত্রা তোরা সব দাঁড়া ঠিক হয়ে। কে কার কথা শোনে। খাওয়ার নেশায় তখন মত্ত সব। কোলাপসিবল গেট পেরিয়েই কৌচ, সোফা ছড়ানো অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা। সেখানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই চ্যাঙারির খাবার ছত্রখান হয়ে পড়ে।

এ কি, আজও যে দেখছি ভাঙাচুরো খাবার! খিঁচিয়ে ওঠে রাঙাদি: কোনদিন কুকুরে তাড়া করে, কোনদিন তোর রিক্সায় ধাক্কা লাগে—খানায় পড়িস, কোনদিন বা হোঁচট খেয়ে—আজ কি হয়েছে শুনি?

রসগোল্লাটা টপ করে মুখে ফেলে দিয়ে রাঙাদি আবার কঠিন কণ্ঠে বলে: আজ কি হয়েছে বল শীগগির।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে আমতা আমতা করে প্রায় কান্নার সুরে বলে ভবানীচরণ: চিলে ছোঁ মেরেছিল দিদিমণি!

একেবারে দিনকে রাত! রাগে রী রী করে ওঠে আমার সর্বাঙ্গ। বটে রে হারামজাদা! মিথ্যুক শয়তান! বদমাইসি করবার আর জায়গা পাও নি?

ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জলে উঠেছে আমার: পুলিশে দেব। খুন করবো। হাড় ভেঙে তোর গুঁড়ো ক'রে দেব হারামজাদা, শূয়ার কা বাচ্চা!

তাই ত কি করা যায়! হুট ক'রে যাওয়াটা সমীচীন হবে কিনা তাই ভাবছি। যাবো? ক্ষতি কি? যাই, বলেই আসি। একবার মনস্থির করি, আবার পিছিয়ে আসি লজ্জায়। দোষটা কোথায়? স্বচক্ষে যা কিছু দেখেছি, সব খুলে বলবো। আমি ত আর বানিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিনে?

কিন্তু ওরা যদি—

বয়ে গেল। আমার কর্তব্য ত আমি করে যাই। নাঃ, অনর্থক দেরি হচ্ছে। এধারে খাওয়াও প্রায় ওদের শেষ হ'য়ে এল।

ঐ আবার। ভুয়েশাড়ি একসঙ্গে মুখে পুরেছে ছু'-ছুটো রসগোল্লা। এলোকেশীও তাই। মুখ চলছে সবার।

নাঃ, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। কৃতসংকল্প। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমি। বুকে অপরিসীম সাহস সঞ্চয় ক'রে ছু' পা কেবল এগিয়েছি, এমন সময়—

এমন সময় তীরবেগে নিক্ষিপ্ত হ'ল সেই মর্মবিদারী, মোক্ষম মারণাস্ত্র। লোকটা কি বেহায়া দেখেছিস? তখন থেকে হাঁ করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। জুতিয়ে লাট ক'রে দিলে তবে জব্দ হয়।

বলে কি? কি সর্বনাশ! এ যে তাজ্জব কাণ্ড! যার জন্তে চুরি করি, সেই বলে চোর! কিন্তু আমাকেই কি? না বোধ হয়। অন্য কাউকে। মনগড়া সান্ত্বনা লাভের আশায় চারদিকে নির্বোধের মতো ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকাই খানিক। না। আশেপাশে আর ত' কেউ নেই কোথাও। বিষোদ্গীরণ আমারই উদ্দেশ্যে। লক্ষ্য বস্তু আমিই। নির্দ্বিধায় নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি পরক্ষণেই। চিলকণ্ঠে কে যেন বলে: দিতে হয় চোখ ছুটো গেলে, তবে ঠিক হয়। অসভ্য লোফার! জুতোটা ছুঁড়বো নাকি? ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। আলুথালু বেশ। রাগের চোটে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মেয়েটি। পারে ত' লাফায় আর কি। জুতোটা এবার সত্যিই খুলেছে পা থেকে। আর সে কি বিকট দাঁতখিঁচুনি: হাঁ ক'রে গিলছে ছাখ না? যেন বাপের জন্মে মেয়েমানুষ ছাখেনি। রাস্কেল—জানোয়ার কোথাকার।

এর পর এখানে আর দাঁড়াবে কোন্ আহাম্মক? এর পর যা ঘটবে, সে ত জলের মতো স্পষ্ট। সে কথা জানতে কারো দিব্যদৃষ্টি কিম্বা অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আসবে ঠাকুর, চাকর, দরোয়ান। হকিষ্টিক হাতে স্পোর্টসম্যান দাদার দল এবং সেই গোঁয়ার-গোবিন্দ ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বিপুল উৎসাহে এগিয়ে আসবে অগণিত পাড়াতুতো দাদাবাহিনী। গুণ্ডা, বোম্বেটে, রকবাজ। তার পর মেরে তক্তা বানিয়ে দিতে আর কতোক্ষণ? কে বুঝবে সেই মারমুখো অক্ষৌহিণীর সঙ্গে? সব সাইকোলজি আমার জানা আছে। কে শুনবে? কে তখন বিশ্বাস করবে আমার কথা? স্ত্রীলোকের পক্ষে ওরা যাবেই যাবে। আগে এলোপাথাড়ি, বেধড়ক মার, তার পর অন্য কথা। ফাঁসি আগে, তার পর বিচার।

অতএব চোঁচা দৌড় ছাড়া উপায় কি?

তাই করলাম। ছুটলাম ঊর্ধশ্বাসে। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। ল্যান্সডাউন পেরিয়ে মহারাজা নন্দকুমার রোড, তার পর যতীন দাস, জনক রোড—সর্দার শঙ্কর দিয়ে এঁকে-বেঁকে ঝড়ের বেগে ছুটেছি। পায়ে তখন আমার অলিম্পিক-বিজয়ী সর্দার মিলখা সিং-এর শক্তি। লেক-মার্কেটের সামনে এসে তবে নিশ্চিন্ত। বাঁচলাম হাঁপ ছেড়ে। ঘর্মাক্ত শরীর। দ্রুত নিঃশ্বাস। বুকটা তখনও আমার ধড়ফড় করছে। করুক। জবর একটা ফাঁড়া কাটলো যাহোক।···কিন্তু তাই ত', কি সর্বনাশ! শুধু ইজ্জত নয়, খোয়া গেছে আরও একটি মূল্যবান জিনিস। আবার হাতড়ালাম পকেট। না কোথাও নেই। আমার অতো সাধের লাইফটাইম পার্কার। হায় রে, কোথায় কখোন যে ছিটকে পড়লো!

পঁচাত্তর টাকা দিয়ে কিনেছিলাম কলমটা এই সেদিন!

কান্নায় কান্ড

[Fulton Ourslerএর 'Modern Parables' থেকে]

(সত্য ঘটনা)

অমিয় ভট্টাচার্য্য

কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। চারদিকে বোমা-বৃষ্টি। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সহর থেকে সহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে। বিভীষিকা, আতঙ্ক।

গ্রামপ্রান্তে বিল আর ষ্টেলার ছোট্ট কুটিরখানি। বড় সুখেই ছিল তারা। কিন্তু সেই শান্তির কুটিরেও আগুন লাগলো। ছাই হয়ে গেল সুখের সংসার·····

বিল তখন তার সঙ্গীদের সঙ্গে পাহারা দিচ্ছিল এক ঘাঁটিতে। বুম্-বুম্-বুম্। সুরু হ'ল ধ্বংসলীলা। বিলের সাথীরা উড়ে গেল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে।

বিল কিন্তু মরলো না। বাড়ী থেকে যাত্রা করবার সময় ষ্টেলাকে সে বলে এসেছিল, ভয় নেই ডার্লিং, আমি ফিরে আসবেই। তাই বুঝি বিলের জীবন কেড়ে নিতে পারলো না সর্ব্ববিধ্বংসী বোমা।

ডাক্তার, নার্স, সবাই কিন্তু বললো, বিল মরেছে। হ্যাঁ, মৃত্যু নয় তো কি? কি থাকলো বিলের? পক্ষাঘাতে সম্পূর্ণ পঙ্গু, চলচ্ছক্তিহীন, ঘাড় নড়াতে পারে না, মুখের বাণী চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ এই জীবন।

ষ্টেলা কাজের শেষে সন্ধ্যায় এসে বসে স্বামীর শয্যার পাশে। মাঝে মাঝে বিলকে ডাকে। বিস্ফারিত চোখে বিল দেখে ষ্টেলাকে, অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেজে ওঠে কণ্ঠে, তারপর অবসাদে ঢলে পড়ে শয্যায়। বিলকে নিয়ে এমনি ক'রে জীবন ও মৃত্যু অকরুণ খেলা খেলতে থাকে।

ষ্টেলার মনিব বড় ভালো মানুষ। বিপত্নীক প্রৌঢ়। ষ্টেলাকে সান্ত্বনা দেন। পার্কে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যান। সিনেমায় নিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। না ভুললে, নিজের হাতে ষ্টেলার চোখের জল মুছে দেন।

এক রাত্তে—পার্কের আলোগুলো ম্লান হয়ে এসেছে আকাশে। ফিকে জ্যোৎস্না এক মোহময় পরিবেশ রচনা করেছে। ষ্টেলার নরম হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে মনিব বললেন, বৃথা চেষ্টা! ষ্টেলা! তোমার সেবা, তোমার স্বামিভক্তি, সব কিছু তুচ্ছ করলো করাল নিয়তি। কোন আশা নেই। বিল কোনদিনই আর ভালো হবে না। ঐ জীবন্মৃত অবস্থায় তাকে হয়ত দীর্ঘকাল থাকতে হবে। তুমি কি তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করতে চাও অকারণ প্রতীক্ষায়? তোমার সম্মুখে অফুরন্ত সম্ভাবনা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তুমি অকালে নিঃশেষ হতে চাও পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য স্বামীর সেবা ক'রে?

ষ্টেলা যেন পাষাণ! সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে যেন অনাগত ভবিষ্যৎকেই নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

ষ্টেলা অবশেষে বুঝলো, মনিব ওকে বিয়েই করতে চান। বিনিময়ে ষ্টেলা পাবে অগাধ ঐশ্বর্য্য, আর বিপত্নীক প্রৌঢ়ের ভুক্তাবশিষ্ট ভালবাসা। ষ্টেলা যেন জীবন-পথের এক বাঁকে এসে পড়েছে। দুই দিকে পথ। একটা পথ তাকে বেছে নিতে হবে।

তারপর এলো সেই ভয়ঙ্কর রাত। স্বামীর পাশে বসে ষ্টেলা ভাবছে। সত্যই তো, নতুন জীবন, উদ্ভিন্ন যৌবন, অফুরন্ত আশা, রঙীন স্বপ্ন, সবই সে বিসর্জ্জন দেবে এক পঙ্গু, অথর্ব্ব স্বামীর নিষ্ফল সেবায়? কি ক্ষতি হয়, যদি সে নিঃশেষে মুছে ফেলে দেয় স্বামীকে তার জীবন থেকে? অবোধ জড়পিণ্ড, ওর কাছে না এলেই বা কি ক্ষতি? ও তো দেখতেও পায় না, বুঝতেও পারে না। ওই তো মড়ার মত পড়ে আছে বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে।

ষ্টেলা উঠলো। বিলের মুখের দিকে একবার তাকালো। 'না—না।' হঠাৎ হৃদয় মথিত ক'রে এক আকুল কান্না বেজে উঠলো তার কণ্ঠে। বিল যে তার জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে আছে। দুই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মত কেঁদে উঠলো ষ্টেলা।

আর ঠিক সেই সময়েই বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিতে পট পরিবর্ত্তিত হলো। অতীতের সেই সুখের জীবনে বিল ষ্টেলার কান্না মোটেই সইতে পারতো না। অভিভূত হয়ে পড়তো, ষ্টেলার চোখে জল দেখলে সেও কান্নায় ভেঙ্গে পড়তো ষ্টেলার সঙ্গে—

আজ আবার যেন সেই দিন ফিরে এলো। স্ত্রীর কান্না শুনে হঠাৎ নড়ে উঠলো বিলের নিথর দেহটা। এক অব্যক্ত কান্নায় গোটা অঙ্গ দুলে উঠলো, মুখ থেকে বেরুলো এক তীব্র আর্ত্তনাদ আর সঙ্গে সঙ্গে—

হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও। কথা বলে উঠলো বিল—যেন শান্ত সমুদ্রে ঝড় উঠলো, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ গর্জ্জন ক'রে উঠলো,—'ষ্টেলা, ষ্টেলা, তুমি ফিরে যাও, ফিরে যাও, তুমি সুখী হও।

তারপর আবার কঠিন স্তব্ধতায় ঢলে পড়লো বিল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, পাণ্ডুর মুখে নামলো মৃত্যুর ছায়া—চেঁচিয়ে উঠলো ষ্টেলা, 'নার্স, ডাক্তার, কে আছ, শীগ্ গির এসো, সব বুঝি শেষ হয়ে গেল—'

ডাক্তার, নার্স এসে ষ্টেলাকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে গেলো।

ষ্টেলা পাগলের মত বলতে বলতে চলেছে, 'ভগবান্, ওকে কেড়ে নিয়ো না, ও যে আমার কান্না শুনেছে—ও যে আমাকে চিরকাল ভালোবেসে এসেছে, তাই তো আমার কান্না সইতে পারে না, তাইতো আমাকে ও যেতে বলেছে।

কিন্তু যেতে বললেও তো যাওয়া যায় না? চিরকাল যারা ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা, তাদের ছাড়াতে তো ভগবানও পারেন না।

যাদুমন্ত্র নয়, সে দিন চলে গেছে। কিন্তু বিশ্বাস, প্রেম, নিষ্ঠা তো আজও মরে নি? তাইতো অঘটন আজও ঘটে। তাই তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিল উঠে বসলো, হাঁটতে শিখলো—ষ্টেলার হাত ধ'রে অপরাজিত প্রেমিক দু'ধারে আনন্দ ছড়িয়ে ফিরে গেলো চির-নতুন প্রেমের নীড়ে।

খ্রীস্টাঞ্জলি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ]

চীন ও জাপান

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে ও উইলি পিয়ার্সনকে নিয়ে জাপান যাত্রা করলেন। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমি কবির সঙ্গে এই প্রবাসযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম। চীন ও জাপান,—এই দুই দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে যুগ যুগ ধরে মানব সভ্যতার উদার প্রবাহ,—এই দুই দেশ দেখার আগ্রহ আমি অনেকদিন থেকেই মনে পোষণ করে আসছিলাম। এই দুই দেশের জীবনাদর্শ ও ধ্যানধারণার অতি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। কোনো প্রতীচ্য দেশবাসী যদি মানব সভ্যতার বিবর্তনকে অনুধাবন করতে চান তাহলে প্রাচ্য জগতের এই দুই দেশকে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তাছাড়া আমার আগ্রহের আরো কারণ ছিল। বহু প্রাচীন কাল থেকে চীন ও জাপান বৌদ্ধ-ধর্মের একনিষ্ঠ অনুগামী, এবং এই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকেই চীন জাপানে প্রচারিত হয়েছিল। জাপানী লেখক ওকাকুরার কাছ থেকে এই দূর প্রাচ্য সংস্কৃতির অনেক শিক্ষা আমি লাভ করেছিলাম। ভারত ও চীন-জাপানের সাংস্কৃতিক মৈত্রীর যোগসূত্র আমি লক্ষ্য করব,—এই ছিল আমার প্রধান অভিলাষ।

প্রাচ্য জগতের বৌদ্ধসভ্যতা ও প্রতীচ্য জগতের খৃষ্টান সভ্যতা নিয়ে গত কয়েক বৎসর ধরে আমি পড়াশুনা ও চিন্তা করছিলাম। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানবজাতির ইতিহাস ও বিকাশ এক সুসমঞ্জস অগ্রগতির পথে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মমতের ঊর্ধ্বে মানব ধর্মের গভীরে এক মৌলিক ঐক্য বর্তমান, এ-ও সত্য। দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে আমি ভারতের সেই মহান্ আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, যার নাম অহিংসা। এই আদর্শ বুদ্ধের পরম বাণী। ভারতের অহিংসা ধর্ম ও খৃষ্টের প্রেমধর্মের মধ্যে মৌলিক বন্ধনকে আমি দিনে দিনে উপলব্ধি করেছিলাম। আমার কেবল মনে হোতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মবোধের এই মানবিক ঐক্যকে যদি অন্তর দিয়ে মানুষ বিশ্বাস করে তাহলেই অন্তর-মন্দিরে জীবনদেবতার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়, তাহলেই ভবিষ্যৎ মানব সমাজ যেন বিভেদ বিহীন এক মহান ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপিত করতে পারে।

আতিথেয়তা বিষয়ে জাপানীদের সম্মান বোধ, বীরত্ব ও নৈতিক শক্তির কথাও আমি অনেক শুনেছিলাম। ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষ থেকে আমন্ত্রিত কবিকে জাপানীরা মন-প্রাণ দিয়ে বুঝতে পারবে, অকুণ্ঠ হৃদয়াবেগের সঙ্গে অভ্যর্থনা করবে।

ভবিষ্যতে দূর প্রাচ্যে আরো কয়েকবার ভ্রমণের পর আমি দেখেছি যে আমার ধারণা সত্য। কিন্তু কবি যখন এই প্রথমবার দূর প্রাচ্যে গেলেন, তখন নিতান্ত প্রতিকূল সময়েই তিনি গেলেন। রণোন্মাদনার তাপ তখন শিখরে উঠেছে। যে সব কারণে পাশ্চাত্য সমাজের ভিত্তি মূল পর্যন্ত বিনষ্ট হতে বসেছে, সেই সমস্ত কারণকে জাপান তখন অন্ধ আবেগে অনুকরণ করছে।

কবি ও উইলি পিয়ার্সনের সঙ্গে একদিন আমি কোবে শহরে এক শিশুবিদ্যালয় দেখতে গেলাম। ছোট ছোট শিশুরা ইউনিফর্ম পরে মিলিটারি ড্রিল করছে। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা আমার বেশ কৌতুককর লাগল। কিন্তু কবির গভীরতর হৃদয়ানুভূতিতে প্রচণ্ড বেদনা বাজল এই দৃশ্যে। যুদ্ধের উত্তেজনায় শিশুচিত্তকে কী ভাবে কলুষিত করা হচ্ছে তা তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। যুদ্ধ বিজয়ের নানা নিদর্শন বিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। সেইগুলির প্রতি কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জাপানের প্রতিটি শহর তখন কঠোর যুদ্ধপ্রস্তুতির কর্কশ নির্ঘোষে ধ্বনিত হচ্ছে। সৈন্যবাহিনী করছে অবিরাম কুচকাওয়াজ। প্রতিটি সংবাদপত্র প্রতিদিন ছড়াচ্ছে মুঠো মুঠো জঙ্গী উত্তেজনা। দেশের সমস্ত আবহাওয়া যুদ্ধের দূষিত বাষ্পে ভরপুর। কবির সঙ্গে প্রধান প্রধান জাপানী নাগরিকরা সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁদের আমরা এ কথা বললাম। উত্তরে তাঁরা বললেন যে এই রণোন্মাদনা অত্যন্ত দুঃখকর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। পাশ্চাত্য জগতের রণপ্রস্তুতি যতো দিন বর্ধিত থেকে বর্ধিততর হবে ততো দিন প্রাচ্যের কোনো দেশের পক্ষেও এই একই পন্থা অনুসরণ করা ছাড়া রক্ষা নেই।

ওদেশে কিছু দিন কাটাবার পরই অবশ্য আমরা বুঝতে পারলাম যে জাপানের সে সময়কার বাহ্যিক রূপটা যতো কুৎসিতই দেখাক না কেন, এই কদর্যতা বেশি দূর গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি, বিনষ্ট করতে পারেনি জাপানের জাতীয় আত্মাকে। জাতীয় সভ্যতার নিহিত প্রাণকেন্দ্র ঠিকই আছে, অপরিবর্তিত অম্লান।

একটি গভীর হৃদয়স্পর্শী ঘটনা উল্লেখ করি। জাপানের পার্বত্য অঞ্চলে আমরা ভ্রমণ করছিলাম। রেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে

একটি ক্ষুদ্র অখ্যাত ষ্টেশনে আমাদের গাড়ি থামল। দেখি একদল বৌদ্ধ পুরোহিত সেখানে অপেক্ষা করছেন, পরনে তাঁদের ধর্মীয় পোশাক। কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে উপহার হাতে তাঁরা এগিয়ে এলেন। কারুণ্য-বেদনার বলিরেখায় পুরোহিতদের মুখমণ্ডল আকীর্ণ। করুণাঘন প্রভু বুদ্ধের প্রেমফল্গু তাঁদের অন্তরে প্রবহমান, বিশ্বের বেদনাবঞ্চনার ভারে মন্থর তাঁদের হৃদয়। এই বৌদ্ধ সাধুদের সৌম্য মণ্ডলীকে ঘিরে দাঁড়াল জঙ্গী পোশাকপরা জাপানী সামরিক কর্মচারীর দল। এদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন কবি—অন্য জগতের এক আশ্চর্য মহাপুরুষ। মুখে তাঁর করুণার প্রেমের ও সহানুভূতির এক অপূর্ব অনুপম দিব্যভাতি। বৌদ্ধ সাধুদের শান্ত ছায়াঘন মুখের বিনম্র শ্রদ্ধা কবির মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল গৌরবের আশীর্বাদে আনন্দোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এইখানে জাপানের অজ্ঞাত পথপ্রান্তের এই অখ্যাত ষ্টেশনে যে দৃশ্য আমি দেখলাম, তাতে আমার মনে হোলো, আমার পরমকারুণিক প্রভু খৃষ্টের উপস্থিতিকেই যেন আমি অনুভব করছি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় অহিংস সত্যাগ্রহীদের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক এমনি ভাবেই খৃষ্টের উপস্থিতিকে আমি অনুভব করেছিলাম। এই দুই অনুভূতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিশ্বমানবের বেদনার আসনে আমার প্রভুর স্থান।

ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে কবি কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতামালা প্রসঙ্গে জাপানী সংবাদপত্র এমনই এক দায়িত্বহীন উক্তি করল যে কবির অবস্থান কালেই জাপানী জঙ্গীবাদ প্রবলতম আকার ধারণ করল। কবি তাঁর বক্তৃতায় জাপানের বর্তমান আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবোধকে ধিক্কার দিলেন—বললেন, এর সঙ্গে জাপানের প্রকৃত সভ্যতার সৌন্দর্য নষ্ট হতে চলেছে। সেই উত্তপ্ত মুহূর্তে এমনি বক্তব্য কবির পক্ষে অত্যন্ত সাহসের কাজ হয়েছিল। কিন্তু সত্য ভাষণের অদম্য সাহস ছিল কবির মনে। কবির এই সমালোচনার বিরুদ্ধে উগ্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে কালবিলম্ব ঘটল না। জাপানী সংবাদপত্র দেশবাসীকে এই বলে সাবধান করে দিল যে কবি "পরাজিত জাতির গুরু,"—তাঁর কথা যেন কেউ না শোনে,—যদি শোনে তাহলে ভারতবর্ষ যেমন বিদেশীর যূপকাষ্ঠে নিজের স্বাধীনতাকে বলি দিয়েছে, জাপানেরও সেই দশা হবে।

জাপানী জাতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ নিয়ে কবি এদেশে ভ্রমণে এসেছিলেন। যে প্রেমের অমৃতবাণী দিয়ে ঈশ্বর কবির অন্তর ভরে দিয়েছিলেন, সেই বাণীই তিনি ঘোষণা করতে এসেছিলেন জাপানে। সেই সঙ্গে জাপানবাসীদের কাছ থেকে তিনি নূতন করে শিখতে এসেছিলেন বুদ্ধের বিশ্বজনীন অহিংসা মন্ত্র। তাঁর আগমনের প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি জাপানবাসীদের কাছ থেকে অতুলনীয় অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। একমাত্র টোকিয়ো ষ্টেশনে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণের জন্য আড়াই লক্ষ জনসমাবেশ হয়েছিল। কিন্তু যখন প্রকাশ পেল যে তিনি বর্ণ বৈরিতা ও উগ্র জাতীয়তার পরিপন্থী, যুদ্ধ তাঁর কাছে ঘৃণ্য,—তখন তাঁর বাণীর বিরুদ্ধে জাপানী সংবাদপত্র কুৎসা প্রচার আরম্ভ করল। কয়েক দিন যেতে না যেতেই আমরা দেখলাম, মাত্র কদিন পূর্বে যে দেশের লোকে উন্মাদ আগ্রহে তাঁকে বরণ করেছে, সেখানে তিনি বন্ধুপরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ।

জাপানী যুদ্ধবাদীরা তাঁর স্বদেশকে বলেছিল পরাজিত দেশ। এই নিন্দা তাঁর কোমল অন্তরে গভীর ভাবে আঘাত হেনেছিল। কিন্তু এই আঘাতকে কবি অচিরে জয় করলেন, পরাজয়কে গৌরবান্বিত করলেন তিনি, তাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হোলো পরাজিতের গান—

THE SONG OF THE DEFEATED

My Master has bid me, while I
stand at the road side, to sing
the song of Defeat, for that is
the Bride whom he woos
in secret ;

She has put on the dark Vail.
hiding her face from the crowd,
but the jewel glow on her
breast in the dark ;

She is silent, with her eyes
downcast ; she has left her
home behind her ; from her
home has come that wailing
in the wind.

But the stars are singing the love song
of the eternal to a face sweet
with shame and suffering.

The door has been opened in the
lovely chamber, the call has
sounded, and the heart of
darkness throbs with awe
because of the coming tryst.

["Fruit gathering"]

কবির সেই মুহূর্তের নিদারুণ অন্তর্বেদনা আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। আর একটি "পরাজিত জাতির" কথা আমার মনে পড়েছিল। সেই পরাজিত জাতির ক্রোড়েই জন্মলাভ করেছিলেন আমার প্রভু যীশুখৃষ্ট। কতো মানুষের কতো অবজ্ঞা তিনি সহ্য করেছিলেন,—কতো দুঃখের ধারা, কতো অপমানের কালিমা বর্ষিত হয়েছিল তাঁর উদার ললাটে।

আর একবার সমুদ্রযাত্রা করলেন কবি। এবার যাত্রা চীনদেশে। কবির এই ভ্রমণেও কিছুদূর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পিকিন শহরে উপস্থিত হয়ে কবি অকুণ্ঠ উদাত্ত কণ্ঠে গভীর সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন প্রতীচ্যের বস্তুতান্ত্রিক জয়োন্মাদনার বিরুদ্ধে। চীনা ছাত্রদের সভায় তিনি বললেন,—

পাশ্চাত্য দেশ তোমাদের শিখিয়েছে পাশব শক্তিই সত্য, এই শক্তির উপরে আর কিছু নেই। বলো তোমরা, বুকে হাত দিয়ে বলো, এই সত্যই কি চরম সত্য? বহু শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন ভারতের এক
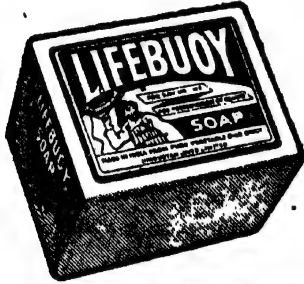
মহৎ ঋষি ঘোষণা করেছিলেন—অজ্ঞানের দ্বারা মানুষ তার বাসনার বিলাস তার মাৎসর্যের পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু তার আত্মার মর্মমূল, তাতে বিশুষ্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। বস্তুতান্ত্রিক ক্ষমতার শিখরে নৈতিক সত্যকে স্থান দেয়নি বলে পৃথিবীর কতো প্রাচীন সভ্যতা বিস্মৃতির অন্ধকার লুপ্ত হয়েছে। সেই অবলুপ্তির বিপদের সম্মুখে আজ প্রতীচ্য পৃথিবীর আধুনিক সভ্যতা। এই প্রতীচ্যের ধর্মগুরুই কি প্রশ্ন করেনান মানুষ যদি সমস্ত পৃথিবীকে জয় করেও তার বিনিময়ে আপন আত্মাকে হারায় তাহলে কী তার লাভ? এমন কী কাংক্ষিত সম্পদ আছে যার বিনিময়ে মানুষ আপন আত্মাকে বিলিয়ে দিতে পারে?

সে সময়ে চীনদেশের জনসাধারণের মনেও উত্তেজনার অভাব নেই। সেই পরিস্থিতিতে কবি যেভাবে যে সুস্পষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর অন্তরের সত্যকে চীনাজাতির সামনে ঘোষণা করেছিলেন তা কেবল তাঁরই মতো মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব। যে অভিজ্ঞতা, যে অনুভূতি ও যে সত্যদর্শনের ফলে এ যুগের ঘনায়মান সভ্যতার সংকটের বিরুদ্ধে তীব্রতম সাবধান বাণী উচ্চারণ করা যায়, তার একমাত্র অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ চীন ও জাপানের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় মাধুর্যে ও নৈতিক মহত্ত্বে এই দুই প্রাচ্যদেশ অভিভূত হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখনই তিনি আবার এই দুই দেশে গেছেন, প্রকৃত সত্যদ্রষ্টারূপে তিনি সম্মানিত হয়েছেন, সশ্রদ্ধ সৌজন্যের সঙ্গে দেশবাসী তাঁর কথা শুনেছে।

দুরন্ত অসুস্থতার জন্যে আমি ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। এল্‌হার্স্ট পিয়ার্সনকে সঙ্গে নিয়ে কবি আমেরিকা যাত্রা করলেন। একটি জাপানী জাহাজে আমি স্থান পেলাম। প্রত্যাবর্তনের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কোনো সঙ্গী নেই, শুধু নিজের মন নিয়েই আমার কাটল। মানব সভ্যতার যুগ-যুগান্তের ইতিহাসে ধর্মের কি স্থান, এই একটি বিষয় নিয়েই আমি অহরহ চিন্তা করতে লাগলাম। অনন্ত অতীত থেকে বর্তমান মানব সভ্যতার বিবর্তনে ধর্মের অবদান কী? ভবিষ্যৎ মানব-সমাজকে কী অনুপ্রেরণাই বা ধর্ম দেবে? বিভিন্ন ধর্মমতের নানা কোলাহলের মাঝখানে সত্যের পরম ধ্বনিটি মানবাত্মার কানে কবে বাজবে?

এই সমুদ্রযাত্রার পথে এবং পরে আরো একবার আমি যবদ্বীপে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলাম। সেখানকার বিখ্যাত মহাবুদ্ধশিলা বোরো-বুদুর আমি দেখতে যাই এবং এই মন্দিরছায়াতলে কয়েকটি আবেগস্তব্ধ নিঃসঙ্গ দিন যাপন করি। এখানকার ভাস্কর্য আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এক আশ্চর্য সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। বিশ্বমানবের ধর্ম-ইতিহাসের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান ছিল আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই মানুষ এক, মনুষ্যত্ব এক,—মানবতার মূল্যায়ন এক, এই ছিল আমার বিশ্বাস। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোলো, এই বিশ্বাস জয়ী হোলো। এই মন্দিরের অলিন্দের পর অলিন্দ পরিভ্রমণ করতে করতে ও ভাস্কর্যের অগণিত নিদর্শন দেখতে দেখতে আমি সেই সুপ্রাচীন অতীতের ধর্মকাহিনীকে প্রত্যক্ষ বাস্তবে অবলোকন করলাম।

ভাস্কর্যের এক সুবিশাল সংগ্রহশালা এই বোরোবুদুর। মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রতিটি কোণায় কোণায় শান্ত সৌম্য বুদ্ধের মূর্তির পর মূর্তি। শিলাময় ভাস্কর্যের রেখায় রেখায় বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি প্রস্তরচিত্রে বুদ্ধের করুণাঘন মহত্ত্বের প্রকাশ। কোথাও প্রেমময় প্রশান্ত বুদ্ধকে ঘিরে রয়েছে মূক পশুপক্ষীর দল, তারাও শুনছে তাঁর করুণার বাণী। কোথাও তাঁর শিষ্যরা আরণ্যক আদিবাসীদের মধ্যে তাঁর করুণার বাণী প্রচার করছেন। অসংখ্য শিলাচিত্রে মূর্তিমতী করুণা। আমি বুঝলাম, প্রতীচ্য জগতের কৃষ্ণযুগে যীশু খৃষ্টের শুভ প্রভাব যেভাবে ইউরোপকে বর্বরতা থেকে মানবতার পথে পরিচালিত করেছিল তেমনি যুগযুগান্ত পূর্বে বুদ্ধের করুণাও প্রাচ্য জগতের মানবতাকে বিকশিত করেছিল।

মানবতার পরম বাণী এই ভাবেই যুগে যুগে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। এই বাণীর অমৃত মানব-হৃদয়ের গভীরতম কন্দরকে নিষিক্ত করে মানব-জীবনকে মধুময় করেছে,—অতীন্দ্রিয় প্রেরণায় মানবভাগ্যকে আশ্চর্য বিবর্তনের পথে অগ্রসর করে নিয়ে গেছে। এই বাণীর প্রেরণা সমাজের নৈতিক উজ্জীবনের প্রাণবন্যা। প্রেমই কল্যাণ, প্রেমের শক্তির কাছে পাশব শক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত,—এই অমোঘ অঙ্গীকার এই বাণী। কখনো প্রাচ্যে কখনো প্রতীচ্যে যুগে যুগে এই বাণী ঘোষণা করেছে যে বিশ্বমানবের কল্যাণে অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জন মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ অবদান।

সাধু জন তাঁর পত্রাবলীতে এক প্রাচীন নির্দেশ ঘোষণা করে বলেছেন যে এই নির্দেশ পুরাতনতম আবার এই নির্দেশ চিরনূতন। কর্মের মধ্যে করুণার প্রকাশ—এই হোলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তু। এই শ্রেষ্ঠত্ব চিরকালের। ক্ষণিক ভঙ্গুর, প্রেম চিরন্তন। তাই বৃদ্ধ জন বলছেন,—হে প্রিয়তমগণ, এস আমরা পরস্পরকে প্রেম করি। কারণ, প্রেম ঈশ্বরের আশীর্বাদ। যে প্রেম করে, সেই ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান, সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে। যে প্রেম জানে না, সে ঈশ্বরকেও জানে না, কারণ ঈশ্বরই প্রেম।

এর পর আমাকে আরো বহুবার দেশান্তর যাত্রা করতে হয়েছে। সমুদ্রপথে বা স্থলপথে পৃথিবীর দূর দূর দেশে আমি ভ্রমণ করেছি। কখনো আমি গিয়েছি কবির সঙ্গে কখনো বা প্রবাসী ভারতীয়দের প্রয়োজনে আমি গিয়েছি।

বর্তমানে কেনিলওয়ার্থ কাস্‌ল জাহাজে চড়ে আমি দক্ষিণ-আফ্রিকায় চলেছি। এই নিয়ে দক্ষিণ-আফ্রিকায় আমার সপ্তমবার যাওয়া হোলো। দক্ষিণ-আফ্রিকাকে যতোটা চিনেছি পূর্ব ও মধ্য-আফ্রিকাও আমার প্রায় ততোটাই পরিচিত। এই সমস্ত দেশান্তর ভ্রমণের মাঝে মাঝে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করেছি। দিনে দিনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী নানা অন্যায় ও নানা অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হয়েছে, প্রতিকারহীন নিত্য নিষ্পেষণের কলঙ্ক তাঁর মুখের জীর্ণ বলিরেখায়। কিন্তু তাঁর অন্তরের নিভৃত মণিকোঠায় নিত্য অনির্বাণ সৌন্দর্য-প্রদীপ জ্বলছে, অম্লান তাঁর অতীন্দ্রিয় মাধুরী। ভারতবর্ষের অন্তরদেবতার সেই চিরন্তন সৌন্দর্যস্বরূপকে আমি শান্তিনিকেতনের শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আমার সমগ্র জীবন ভরে খৃষ্ট আমাকে কী দিয়েছেন, কী অপরিশোধ্য অকল্পনীয় ঋণে খৃষ্টের প্রতি আমার জীবন সমর্পিত, সেই কথাটিই নানা ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। আমার কর্মব্যস্ত জীবনে খৃষ্টের করুণাধারার বিবরণী লিপিবদ্ধ করতে আরো অনেক পরিচ্ছেদের প্রয়োজন। জীবনে যদি সুযোগ পাই তাহলে পরবর্তী কোনো সময়ে সে সব কাহিনী লিখব। আমার এই সামান্য জীবনকে আমার প্রভু তাঁর অঙ্গুলি-নির্দেশে অভিজ্ঞতার নব নব পথে আহ্বান করে নিয়ে গেছেন, এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রেমের গভীরতাকেই দিনে দিনে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছি। এই পরম উপলব্ধির কথাই আবার নূতন করে আমি লিখব।

আফ্রিকার একটি ঘটনার কথা এখন আমি বলব। এই কাহিনীটি আমি এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলাম, কেন না এই কাহিনী সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

পূর্ব-আফ্রিকার উগাণ্ডা রাজ্যের রাজধানী কাম্পালার ঠিক উপরে নামিরেমির হাসপাতালে তখন আমি আছি। দৃষ্টির সামনে ভিকেটারিয়া নায়াগুহা হ্রদ। জীর্ণ দেহ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হচ্ছে। এখানকার খৃষ্টান মিশনারীদের স্নেহ মমতা আমাকে গভীর শান্তি ও আনন্দ দিয়েছে। তরুণ বাগাণ্ডা খৃষ্টানদের সংস্পর্শে আমি এসেছি, তারা বন্ধু বলে আমাকে তাদের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

কাম্পালা থেকে আমি ঠিক হ্রদের ধারে জিঞ্জা নামক একটি স্থানে গেলাম। অনতিদূরে রিপন জলপ্রপাত। সেখানকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনুরোধে আমি ইগাংগা নামক এক ক্ষুদ্র শহরে গেলাম। সে শহরে মুষ্টিমেয় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের স্থান নিয়ে অসুবিধায় পড়েছে। তাদের যদি কিছুটা সাহায্য করতে পারি সেই জন্যে এই যাত্রা।

মোটরে আমরা ইগাংগা যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে দু'জন হিন্দু ও একজন পার্শী বন্ধু। অনেক দূর পথ অতিক্রম করার পর বন্ধুরা আমাকে পথ ছেড়ে অরণ্যে প্রবেশ করতে অনুরোধ করলেন। সেখানে নাকি শ্বেতকায় মিশনারীদের একটি আশ্রম আছে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আশ্রম। সেখানে রয়েছেন এক বৃদ্ধ রোমান ক্যাথলিক সাধু। আর রয়েছে দু'জন বৃদ্ধা দরিদ্র-সাধিকা। তাঁদের ঘিরে রয়েছে স্থানীয় শিশুর দল। সভ্যতার সামান্যতম আলোকও সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেনি। শুধু প্রাগৈতিহাসিক দুরন্ত বর্বরতা, উদ্দাম নির্লজ্জ নগ্নতা। সেই কঠোর বন্যতার মধ্যে সভ্য জীবনযাত্রার সামান্যতম উপচারও নেই। সেই আদিম আরণ্য পরিবেশের মধ্যে এই সাধুগোষ্ঠী তাঁদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করছেন। এখান থেকে ফিরে যাবার বিন্দুমাত্র বাসনা তাঁদের মনে নেই। সভ্য জগত তাঁদের ভুলে গেছে। জীবনের সায়াহ্ন উপস্থিত। এখানেই তাঁরা দেহরক্ষা করবেন, অবজ্ঞাত সমাধির উপর হয়তো বা কিছুদিন জেগে থাকবে এক একটি সামান্য ক্রুশ-চিহ্ন।

সভ্যতার সীমানা থেকে বহু দূরে অসভ্য মানব-সমাজের মাঝে মাঝে এমনি অখ্যাত খৃষ্টান সেবামন্দির আরো নানা স্থানে আমি দেখেছি। আমি দেখেছি খৃষ্টান সেবাধর্মের অনুপ্রেরণা দুর্বল মরণশীল মানবচিত্তকে কী বিপুল আত্মদানে উদ্বোধিত করে, সমস্ত সুখ সমস্ত বাসনা কামনাকে অবহেলা করে আনন্দের কী অনির্বচনীয় আবেগে খৃষ্টভক্ত মানুষ প্রেমের আহ্বানে কল্যাণের আদর্শে উৎসর্গ করে নশ্বর জীবন।

আমার হিন্দু ও পার্শী সঙ্গীরা আমাকে জানালেন যে, ব্যবসা উপলক্ষে তাঁদের নিত্য নিয়মিত ইগাংগাতে যেতে হয়। প্রতিবারই তাঁরা বড় রাস্তা থেকে নেমে এই আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখা করে যান। এঁদের আকর্ষণ এড়িয়ে সোজা শহরে চলে গেছেন এমন ঘটনা একটি বারও ঘটেনি।

বৃদ্ধ ক্যাথলিক ফাদার আমাকে বললেন, এই হিন্দু ও পার্শী বণিকরা তাঁদের কতো বড়ো বন্ধু! কতো সাহায্য তাঁরা করছেন, আশ্রমবাসীদের ও আশ্রিত অসভ্যদের রোগ ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে কতোবার তাঁরা রক্ষা করেছেন। এই প্রবাসী ভারতীয়দের বন্ধুত্বের কথা বলতে বলতে চিরপ্রবাসী বৃদ্ধ সাধুর চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তাঁর কথার উচ্চারণ শুনে বুঝলাম, আয়ারল্যাণ্ড তাঁর মাতৃভূমি। বাল্যকাল তাঁর অতিবাহিত হয়েছিল আইরিশ ভূমি-ক্রোড়ে। সেই প্রেমমধুর মাতৃক্রোড়ে তাঁর বাল্যহৃদয় যে সে অমৃতময়ী করুণায় অভিষিক্ত হয়েছিল, আজও এই সুদূর প্রবাসে তাঁর পরিণত চিত্তে সেই করুণাধারা নিত্য প্রবাহিত।

আমাদের সঙ্গ পেয়ে বর্ষীয়সী দরিদ্র-সাধিকাদের আনন্দের যেন শেষ নেই! সামান্য তাঁদের সঞ্চয়, তবু তাঁদের কাছ থেকে কিছু আমাদের খেয়ে যেতেই হবে। বিত্তহীন সেই আতিথেয়তার অমূল্য ঐশ্বর্য! আমাদের কুণ্ঠা হোলো পাছে আমাদের খাওয়াতে গিয়ে তাঁদের সামান্য খাদ্যটুকুও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের সেই অকুণ্ঠ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করি কী করে? কৃষ্ণকায় শিশুর দল নিঃশঙ্ক নির্ভয়ে আমাদের ঘিরে ধরল। সাধু ও সাধিকাদের তারা একান্ত আপনার জন বলে মনে করে। আমাদেরও আপন করে নিতে তাদের দেরি হোলো না।

পূর্ব-আফ্রিকার অসভ্য অরণ্যরাজ্যে এই খৃষ্টান আশ্রম ও এই সাধুদের দেখে আমার মনে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠরোগীদের নিত্যসেবক ফাদার ডামিয়েনের কথা। মনে হোলো এমনি কতো মহাপ্রাণ মানবব্রতী সমস্ত পৃথিবীর দুর্গম গহন-প্রান্তে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে জীবনকে তিলে তিলে দান করছেন, খৃষ্টের নামে খৃষ্টের প্রেরণায় তাঁরা উদ্বোধিত, মানবপুত্রের নামে বিশ্বমানবের সেবায় তাঁদের জীবন উৎসর্গিত।

একবার আমি তখন অক্সফোর্ডে। এক ভারতীয় ছাত্র অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিল। সে বলেছিল,—দেখুন, স্বদেশপ্রেমের প্রেরণাকে আমি বুঝতে পারি, যে প্রেরণায় নরনারীরা স্বদেশের জন্যে মহা বীরত্বব্যঞ্জক কাজ করতে পারে। কিন্তু একটি জিনিষ আমি বুঝতে পারি না, আপনি বুঝিয়ে দেবেন?

আমি বলেছিলাম,—কী তুমি বুঝতে চাও?

ছাত্রটি বললে,—কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ফাদার ডামিয়েনের জীবন-যাত্রার কাহিনী আমি পড়েছি। এখানে অক্সফোর্ডে এসে আমি অনেক জ্ঞানী গুণী নরনারীর কথা শুনেছি যাঁরা নিতান্ত অখ্যাত ভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিবেশে জীবন দান করেছেন সেখানকার আদিম অসভ্য অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্যে। কিসের আকর্ষণ এদের

কাজ তাঁরা করতে পেরেছেন? যীশুর নামে তাঁরা এমনি ভাবে নিঃসংশয়ে আত্মবিসর্জন করেছেন, কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে যীশু তাঁদের এমনি পরম আত্মবিলুপ্তির পথে টেনেছেন?

এই ছাত্রটিকে আমি কেবল আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম খৃষ্ট প্রাচীন নন, খৃষ্ট মৃত নন। চিরজীবী খৃষ্টকে যে ভক্ত প্রতিদিন অন্তরে অনুভব করে, প্রত্যক্ষরূপে প্রতিদিন সে তার হৃদয়ে তাঁর প্রেমস্পর্শ লাভ করে। সেই প্রভুর নিত্যপ্রেমের বিনিময়ে আপন প্রেমকে মানবসন্তানের মধ্যে বিসর্পিত করে দিতে পারে। কেননা খৃষ্ট বলেছেন,—আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আমি তৃষার্ত ছিলাম, রুগ্ন নগ্ন আবদ্ধ শৃংখলিত ছিলাম আমি বন্দিশালায়। আমার যারা ভ্রাতা তাদের যাকেই তুমি সামান্যতম সাহায্য করেছ, সেই সাহায্য করেছ আমাকে।

ইগাংগার ক্যাথলিক ফাদার ও ঐ সেবিকা দুইজন তাঁদের প্রতিদিনের প্রেমসাধনার মধ্যে নিবিড়তম বাস্তব রূপে খৃষ্টের জীবন্ত সান্নিধ্যকে অনুভব করতেন, তাই পৃথিবীর অবজ্ঞাত অন্ধসীমান্তে বাস করেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আনন্দের উদ্ভাসিত আলোকে তাঁদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। দিন শেষ হয়ে আসছিল, ফুরিয়ে আসছিল জীবন-সায়াহ্নছায়ায় তাঁদের মুখে ফুটে উঠছিল অন্ত রাজ্যের স্বর্গীয় বিভা।

টেনিসন তাঁর এক কবিতায় প্রভুর এই নিত্য উপস্থিতির কথা বড়ো সুন্দর ভাবে অংকিত করেছেন। শিশু-হাসপাতালের একজন নার্স, তাকে রূঢ়ভাষায় এক ডাক্তার বিদ্রূপ করে বলেছে যে যীশু সে শত শত বৎসর পূর্বেকার একজন ক্রুসবিদ্ধ মৃত মানুষ। কোথায় আবার যীশু? কোথায় পুনরাবির্ভাব?

পরিত্রাতা খৃষ্টের প্রতি অন্তরের একনিষ্ঠ প্রেম নিয়ে সেবিকাটি উত্তর দিচ্ছে।

কে বলে প্রাচীন? কে বলে মৃত? এই তো সবে নব প্রভাত। এই তো আগমনী।

যদি মিথ্যা হোতো নবজীবনের স্বপ্ন, নবীন জগতের আদর্শ যদি হোতো দুরাশা, তাহলে কেমন করে আমি হাসপাতালে কাজ করতে পারতাম?

কেমন করে সহ্য করতে পারতাম রোগের বীভৎস দৃশ্য আর পূতিগন্ধ, যদি না প্রভুর বাণী আমার কানে বাজত, যে সেবা তুমি এদের করো সেই সেবা তুমি করো আমাকে।

পরমপ্রভু যীশুখৃষ্টের নিত্যস্পর্শ মনুষ্যজাতির প্রাণে যুগ যুগ ধরে এক অপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত করে এসেছে, এই প্রেরণা সেবার, এই প্রেরণা কল্যাণধর্মে অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জনের। খৃষ্টের অমৃত মন্ত্রের এই প্রেরণা থেকে যদি আমরা বঞ্চিত হতাম, তাহলে মানব ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গভীর অতলে তলিয়ে যেত। যে অতল থেকে উদ্ধারের আশা নেই।

খৃষ্ট আমার সর্বস্ব

আমরা যারা খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ক্রোড়ে জন্মলাভ করেছি এবং বহু শতাব্দীব্যাপী খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েছি, খৃষ্টের মহিমা প্রতি যুগে মানবজাতির মধ্যে কী অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করে, তা আমরা নিবিষ্ট মনে উপলব্ধি করতে পারি। খৃষ্ট করুণার অলৌকিক উজ্জীবনী মন্ত্র পিতা থেকে পুত্রে, পুত্র থেকে পৌত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, মৃত্যুহীন সেই মন্ত্র প্রতি যুগে নবীন আশার উৎসুকে নরনারীকে অনুপ্রাণিত করে। এই অমৃতমন্ত্রের জয়যাত্রা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রবাহিত।

এই মন্ত্রের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাও প্রতি যুগে। খৃষ্টানভক্ত প্রতি যুগে অকুতোভয় আত্মদানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সপ্ত আর পরীক্ষার দাহনে খৃষ্টীয় আদর্শ যুগে যুগে নিষ্কলুষ সুবর্ণরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

খৃষ্টের সমসাময়িক শিষ্য পল বলেছিলেন, মহান্ যুদ্ধে আমি নিজেকে ব্রতী করেছি, সম্পূর্ণ করেছি আমার ব্রত। বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হইনি মুহূর্তের জন্যেও।

অ্যাপোক্যালিপসতে উল্লিখিত আছে তাঁদের কথা, যাঁরা নৃশংসতম ক্লেশের যন্ত্রণা অতিক্রম করেছেন, যাঁরা মেষ-রক্তে তাঁদের পোষাক ধৌত-শুভ্র করেছেন। সেই সব শ্বেতাম্বরধারী শহীদদের কথা অবিস্মরণীয়, যাঁরা নীরো ও ডায়োক্লেটিয়ানের অবর্ণনীয় অত্যাচারকে সহ্য করেছিলেন। মানুষের সহনশীলতার শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে তাঁরা মানুষের অশেষ মহত্ত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন।

পরম আনন্দে ইগনেশিয়াস রোম মহানগরীতে যাত্রা করলেন, সেখানে সম্রাটের নির্দেশে হিংস্র বন্য পশুর দল তাঁর দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। বিন্দুমাত্র ভয় নেই তাঁর প্রাণে, উল্লসিত আবেগ ভরে তাঁর অন্তর গান করে উঠল, এতো দিনে আমি প্রভুর প্রকৃত শিষ্যত্বের পথে পা বাড়ালাম।

আর একজন অখ্যাত খৃষ্টান নারী পার্পিতুয়া। তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিন্নভিন্ন করেছিল সম্রাটপালিত নরখাদক সিংহকুল। তিনিও ভয় পান নি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জপ করেছিলেন সর্বভয়হারী খৃষ্টনাম। এঁরা ছিলেন খৃষ্টবিশ্বাসের প্রথম সন্তান। এঁদের আবির্ভাবের জন্যে পৃথিবী বুঝি তখনো প্রস্তুত ছিল না, সমসাময়িক সমাজ এঁদের আসন দেয়নি, রাজশক্তি এঁদের ধ্বংস করতে চেয়েছে। এঁরা ছিলেন পরিচয়হারা স্বাস্থ্যহারা অপাংক্তেয়, নিপীড়িত নির্যাতিত, প্রভুর নামে উন্মুখ হৃদয়ে এঁরা শত নিষ্ঠুরতম সহস্র মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন।

এমনি কতো কাহিনী আমরা জানি, কতো কাহিনী আবার বিলুপ্ত হয়েছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। কিন্তু যুগে যুগে সব কাহিনীর পিছনেই সেই একই সংবেদন, একই প্রেমের সেই অলৌকিক রোমাঞ্চ। যা ছিল দুঃখের কালো তা হয়ে উঠেছে আনন্দের আলো। যা ছিল মৃত্যুর হতাশ অন্ধকার, তা রূপান্তরিত হয়েছে উদ্ভাসিত আশার পুনরুজ্জীবনে।

অকুতোভয় আত্মবিসর্জনের কতো উজ্জ্বল কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। আরো আছেন কতো শত সংখ্যাতীত নরনারী, কোনো ইতিবৃত্তকার যাঁদের স্মরণ করেনি, কাল যাঁদের ভুলে গেছে, যাঁরা শুধু প্রভু খৃষ্টের নামে খৃষ্টের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাপ্রেমের আবেগে নীরবে সর্বস্ববিহীনতাকে বরণ করেছেন, নিঃশব্দ আত্মনিবেদনে খৃষ্টনির্দিষ্ট সেবাধর্মে অঞ্জলি দিয়েছেন জীবন। প্রতি শতাব্দীতে প্রতি যুগে এই সমস্ত আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মানবভাগ্যকে পবিত্র করেছেন।

তাঁরা পরিচয়হারা গোত্রহীন, দীন তাঁদের জীবনযাত্রা, মূক তাঁদের প্রার্থনা, তাঁরা বিশ্বের বেদনাকে অনুচ্চারিত তপস্যার আপন বক্ষে বহন করেছেন, তাঁদের ধর্মে ও কর্মে ধ্যানে ও উদাহরণে মানব সমাজের পুঞ্জীভূত অসুন্দরকে খৃষ্টের ক্ষমাসুন্দর চরণছায়ায় উত্তীর্ণ করে নিয়ে গেছে।

কোথা থেকে এতো শক্তি তাঁরা পেয়েছেন? এই শক্তির উৎস আনন্দ, সর্বদুঃখ জয়ের আনন্দ। প্রাচীন সাধুরা সবচেয়ে উৎপীড়িত হয়েছিলেন' এবং নৃশংসতম উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে খৃষ্ট-প্রেমের গভীরতম আনন্দকে উপলব্ধি করেছিলেন। এই শক্তির রহস্য তারা তাঁদের অমর প্রেমগাথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁরা যে গান গেয়েছেন সে গানের সমাপ্তি নেই, যে মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন সেই মন্ত্র অবিনশ্বর। একমাত্র প্রভু খৃষ্টের বাণীর পরেই সাধুগণের এই সব গাথার স্থান। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে এই সব গাথা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির অসংখ্য নরনারীর প্রাণে অমিত আনন্দের সঞ্চার করেছে। সাধু বার্ণার্ডের গীতিগুচ্ছ, সাধু ফ্রান্সিসের পুষ্পস্তবকাবলী, সাধু টমাস কেম্পিসের খৃষ্টানুসরণ, এগুলি অমর সৃষ্টি, এরা বারে বারে ঘোষণা করে যে ক্রুসের অত্যাচারের পিছনে আনন্দ ও শান্তির নূতন রাজ্য সমাসীন। এই রাজ্য কোনো অবাস্তব স্বর্গরাজ্য নয়। এরা বলে পরমানন্দের অক্ষয় রাজ্যলাভ এই মরজগতেই সম্ভব। খৃষ্ট যুগে যুগে আহ্বান করছেন, বলছেন, আমাকে অনুসরণ করো। যারা প্রেমিক যারা সর্ববন্ধনহারা নির্ভীক খৃষ্ট-পথযাত্রী, তারাই এই রাজ্যের স্বর্ণসিংহদ্বারে উত্তীর্ণ হয়।

আমাদের এই বর্তমান যুগেও খৃষ্ট-পথানুসরণের অতৃপ্ত পিয়াসার পরিচয় আমরা দিকে দিকে লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছি। প্রভু যীশুর জন্যে আত্মোৎসর্গকারীর অভাব এ যুগেও নেই। প্রবল জ্বরাক্রান্ত দেহে নতজানু হয়ে সম্মুখে নিউ টেষ্টামেন্ট গ্রন্থ স্থাপন করে মধ্য আফ্রিকায় নিঃসঙ্গ মৃত্যু বরণ করেছেন লিভিংষ্টোন। যাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন মিলানেসিয়ার সেই অজ্ঞ আদিবাসীদের হাতেই নিষ্ঠুর মৃত্যুবরণ করেছেন কোলরিজ প্যাটারসন। উগাণ্ডাতে হ্যানিংটনের ভাগ্যেও জুটেছে একই প্রকার আত্মবলিদান। সাধু সুন্দর সিং জীবন-পণ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছেন তিব্বতে। জাপানের দীনতম দীনজনের দুর্গতির অন্ধকারকে দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আপন জীবনকে জ্বলন্ত শিখার মতো দাহন করছেন। কাগাওয়া। বর্ণবৈরিতার নিষ্ঠুর আঘাত-জর্জর আফ্রিকান জাতির দুঃসহ ক্ষতযন্ত্রণা খৃষ্টপ্রেমের প্রলেপে বিদূরিত করার জন্য অনির্বাণ অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন আগ্রে। আর উগাণ্ডার ঐ সব খৃষ্টবিশ্বাসী তরুণদল, যারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিত্রাতার জয়গান গেয়ে খৃষ্টের নামে জীবনাহুতির সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেছে। আরো আছে কতো অসংখ্য অপরিচিত নরনারী, বৃদ্ধ তরুণ ও শিশু, তারা নিতান্ত সম্প্রতি কালেও খৃষ্টে বিশ্বাসের পরম দাবীকে পালন করছে প্রতিদিনের কল্যাণব্রতে। তারা রয়েছে আমাদের আশেপাশেই, হাত বাড়ালেই তাদের প্রিয় করস্পর্শ আমরা লাভ করি, তাদের মুখ থেকেই আমরা শুনতে পাই কী তাদের মন্ত্র, কী তাদের জীবনী শক্তির রহস্য-উৎস। এ রহস্য কোনো গোপন রহস্য নয়, এ শুধু ভক্ত-হৃদয়ের একটি মাত্র চিরন্তন পরম অঙ্গীকার, যে প্রভু আমার জন্য জীবন দান করেছেন, এ জীবনকে নিবেদন করেছি শুধু তাঁরই জন্যে, তাঁরই পথে তাঁরই ব্রতে এ জীবনের সারাৎসার।

এই গ্রন্থের শেষে এই যে সব মহান সর্বরিক্ত সাধকদের নাম করলাম, এই সঙ্গে আরো দু'জনকে আমি স্মরণ করি। আত্মোৎসর্গ ও প্রেমব্রতের জীবন্ত উদাহরণে সর্বপ্রথম তাঁরাই খৃষ্টপ্রেমের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের প্রতি আমার দৃষ্টি উন্মোচন করেছিলেন। যীশুখৃষ্টের প্রতি আমার যা ঋণ, সেই ঋণ আমার তাঁদের প্রতিও। তাঁরাই আমার খৃষ্ট-নিবেদিত জীবনের জনক-জননী, আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী।

অনুবাদক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সমাপ্ত

বিষাদ

(ডি, এইচ, লরেন্স)

দু' আঙুলে চেপে-ধরা
　　ভুলে-যাওয়া সিগারেট থেকে
একটি ধূসর ধোঁয়া ভেসে যায়,
　　—কী অশান্তি মনে।
শুনবে? বুঝবে তুমি:
আমার মায়ের ব্যাধি সুরু হল
　　মৃদু পক্ষাঘাতে;

সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে
　　ফাঁকা দেহখানি তার,
আমার কোটের বুকে ছড়িয়ে জড়িয়ে গেল
　　কয়গাছি পাকা চুল,
আমার শান্তিকে ক'রে মৃদু তিরস্কার:
কালো চিমনি দিয়ে দেখি,
　　একে একে শূন্যে গেল ভেসে।

অনুবাদক—অমিয় ভট্টাচার্য্য

ভূস্বর্গ পরিক্রমা

শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ
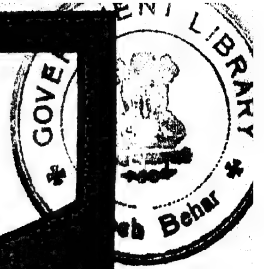
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কল্যাণী। বললাম—পাকৌড়ি খাবে?

এবার চোখে খুসির ঝিলিক। দুজনে রাস্তার ওপাশে যেয়ে তেলেভাজার শ্রাদ্ধ করলাম। বাঙ্গালীদের মত কাশ্মীরীরাও তেলে-ভাজা খেতে খুবই ভালবাসে। তাই যত্র-তত্র এখানে তেলেভাজার দোকান দেখতে পাওয়া যায়। পাকৌড়ি প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ল। অনন্তনাগে সদলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ দেখি একটা তেলেভাজার দোকান। স্তব্ধ হয়ে গেলাম—পাকৌড়ির রূপে নয়—যিনি বসে বিক্রী করছেন তাঁকে দেখে। কালো শাড়ী পরে যিনি বসে আছেন তাঁর মুখের লাবণ্য—টিকোলো· আর্য নাক, "চকিত-প্রেক্ষণা" কালো দুটি ভ্রমর-চোখ আর পাতলা টুক্‌টুকে (লিপষ্টিক্-মাখা নয়) ঠোঁট ম্যাগনেটের মত আকর্ষণ করলো। পাকৌড়ি কিনতে এগিয়ে গেলাম। সঙ্গিনীরা কলহাস্যে ভেঙ্গে পড়লেন।

পরের দিন প্রথমেই আমরা মহিলাদের স্কুল আর কলেজ দেখতে গেলাম। শ্রীনগরের স্কুল-কলেজগুলি রেসিডেন্সী রোডের পার্কটির ধারে কাছে। ঝিলামের ওপারে বিশ্ববিদ্যালয়। মেয়েদের কলেজটির পরিবেশ চমৎকার না হয়ে যায় না। এমন চিনার আর পপ্‌লারের দেশে শিক্ষার পরিবেশ মনোরম হতে বাধ্য। কলেজটি ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রীসংখ্যা সাত শ'। সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা আছে। মার্চ্চের শেষে বা এপ্রিলে সমাপ্তি পরীক্ষা হয়। বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে একটি নূতন ব্লক নির্ম্মাণ করা হয়েছে। লেকচার-হলটি সুসজ্জিত আর সুবৃহৎ। ল্যাবরেটরীও গড়ে উঠছে, তবে কলকাতার কলেজের তুলনায় যন্ত্রপাতির অভাব। সংস্কৃতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মনমোহিনী কাউল আমাদের নিয়ে সব বিভাগগুলি দেখালেন। অধ্যক্ষার সঙ্গেও পরিচয় হল। অধিকাংশ অধ্যাপিকাই পাঞ্জাবী। এও অনুভব করলাম যে, কাশ্মীরী মেয়েরা এখনও অবরোধের বাধা সরিয়ে উচ্চশিক্ষা তেমন ভাবে নিতে পাচ্ছেন না। শ্রীমতী কাউল পাঞ্জাবী হিন্দু হলেও, জন্ম কাশ্মীরেই, নিবাসও শ্রীনগরেই। নামে আর কাজে এমন মিল খুব কমই দেখেছি। সুন্দর চেহারার সঙ্গে মধুর ব্যবহারে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

কলেজ-সংলগ্ন মেয়েদের স্কুল। শ্রীমতী কাউল প্রধানা শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এক হাজার ছাত্রী এখানে পড়ে। স্কুল-ফাইনালে প্যাশের সংখ্যা গড়-পড়তা ৭৫%। প্রধানা শিক্ষিকা পাঞ্জাবী হিন্দু। শ্রেণীগুলি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ভদ্রতার মধ্যে পড়াশোনা চলেছে। বিস্তৃত কক্ষ, রমণীয় উদ্যানময় পরিবেশ। ধ্যানের ভাব আপনা হতেই আসে। বিশ জনের যায়গায় পঞ্চাশ জন ছাত্র বা ছাত্রী ঢুকিয়ে ব্ল্যাকহোল ভর্ত্তি করলে ট্রাজেডি ত হবেই! দেখলাম প্রাইমারি ক্লাসগুলি বাগানের মাঝে উন্মুক্ত আকাশের তলায় নেওয়া হচ্ছে। কাছাকাছি এক একটা শ্রেণী বসেছে কিন্তু গোলমাল নেই।

শ্রীমতী কাউলকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাশ্মীরী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক আছে কি? স্কুলে কি ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয়?

তিনি বললেন—পাঞ্জাবের গুরুমুখীর মত কাশ্মীরী ভাষাও আগে কথ্যভাষাই ছিল, লেখ্যভাষা ছিল না। এখন কাশ্মীরীভাষায় প্রাইমারী পর্য্যন্ত বই লেখা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের বইগুলি এখনও ইংরাজী আর উর্দ্দুতে লেখা। পড়াবার মাধ্যম কাশ্মীরী আর উর্দ্দু—দুই-ই। মাধ্যমিক পুস্তকগুলিকে কাশ্মীরীভাষায় লেখার চেষ্টা চলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কাশ্মীরী ভাষাটি আসলে কোন্ ভাষা? মৌলিক ভাষা না মিশ্রণ-জাত? লিপিটিই বা কি ধরণের?

শ্রীমতী কাউল বললেন—সংস্কৃত আর পারসিক ভাষার সংমিশ্রণে কাশ্মীরী ভাষার জন্ম। মুসলিম-বিজয়ের আগে হিন্দু-আমলে সংস্কৃতই ছিল পাঠ্যভাষা আর কথ্য ভাষা ছিল সংস্কৃতজাত প্রাকৃত। কাশ্মীরী লিপি উর্দ্দ হরফকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠছে।

বললাম—আপনাদের ভাষা বুঝি না, কিন্তু শুনে মনে হয়েছে বড়ই শ্রুতিমধুর, যদিও উচ্চারণে কিছুটা কলকাতাই স-এর ছড়াছড়ি আর আফগানী টানও আছে। আপনার কথা শুনে বুঝলাম, কাশ্মীরী ভাষার লালিত্যের মূলে আছে পৃথিবীর তিনটি সুললিত বা লিকুইড্ ভাষার দুটি—সংস্কৃত আর পারসিক। চর্চ্চা চললে এ ভাষায় ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল।

শ্রীমতী কাউল হেসে বললেন—হ্যাঁ, এদেশের মাটির আর রমণীয় পরিবেশের সঙ্গে ও-ভাষাটা বেশ খাপ খায়। এর ভবিষ্যৎ আছে বলে আমিও বিশ্বাস করি।

শেফালীদিকে বললেন—আপনারা যদি একদিন আগে থেকে খবর দিতেন, মেয়েদের দিয়ে নাচগানের ব্যবস্থা করে আপনাদের একটু আনন্দ দিতে পারতাম। আফশোষ রয়ে গেল।

শেফালীদি বললেন—ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। আর একবার কি না এসে পারব? মনটাকে আপনাদের দেশে ফেলে গেলাম।

বললাম—রাজা দুষ্যন্তের অবস্থা আমাদের। শকুন্তলাকে

ছেড়ে যেতে মন চাইছে না, কিন্তু নগরে রাজাকে যেতেই হবে। "গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ"—শরীর যাচ্ছে নগরপানে কিন্তু চঞ্চল মন চলেছে পশ্চাতে ধেয়ে!

সংস্কৃতের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কাউল হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু ফটকের কাছে এসে আমরা ছলছল চোখেই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

এস্. পি. কলেজ বা শ্রীপ্রতাপ কলেজ শ্রীনগরের সবচেয়ে বড় কলেজ। প্রাচীনতমও বটে। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুত নূরউদ্দিন জিলানী কাশ্মীরেরই অধিবাসী। আগে শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার ছিলেন, সম্প্রতি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন। আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। দলের মহিলাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা জানবার জন্তে উৎসাহ দেখে খুসী হয়ে বাঙ্গালী মেয়েদের নানা প্রশংসা করলেন।

অধ্যক্ষ নূরউদ্দিন সঙ্গে করে বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখালেন। কলেজের পাঠাগারটিতে বই কম নেই—সবই বেশ সাজান গুছোন। ইংরেজী, হিন্দী, সংস্কৃত, উর্দ্দু, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী—এই ছটি ভাষায় নানা বই আছে। গ্রন্থাগারিক সবিনয়ে বললেন—স্থানের অভাবে বইগুলোকে তেমন সাজিয়ে রাখতে পারেন নি। অধ্যক্ষ বললেন—কলেজে ছাত্রসংখ্যা বড় বেশী হয়ে গেছে—কলেজের ঘর না বাড়ালে আর চলছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের এখানে ছাত্রসংখ্যা কত?

অধ্যক্ষ জানালেন—১৩৪০।

বললাম—এতেই, এত বড় বাড়ী নিয়েও বিব্রত বোধ করছেন? কলকাতার কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যার কথা শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবেন। তিন সিফ্‌টে সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। ছাত্রছাত্রী মিলিয়ে এক একটি কলেজে ১৫।১৬ হাজারও আছে। একটা ক্লাস যখন চলতে থাকে তখন আর একটা ক্লাস রাস্তায় পানবিড়ির দোকানে আড্ডা জমায়। সরকারী রাস্তা ছাড়া এত বড় কমনরুম পাওয়া যা'ব আর কোথায়? হরি ঘোষের গোয়ালে কত গরু ছিল জানিনা, তবে কর্তৃপক্ষেরা কলেজগুলিকে তাই করে তুলেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আপনারা হয়ত এখানে সত্যিকার কিছু ছেলেদের মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করেন, আমাদের ওখানে ইচ্ছে থাকলেও তা করবার উপায় নেই। অধ্যাপকেরা হিমসিম খেয়ে যান—ক্লাস কণ্ট্রোল করবেন না তত্ত্ব আলোচনা করবেন—সুতরাং বেণাবনে মুক্তো ছড়ান চলেছে। বেশীর ভাগ কোর্স ই অপঠিত থাকে, ছেলেমেয়েদের পড়ে নিতে হয়।

অধ্যক্ষ অবাক হয়ে বললেন—বলেন কি? আপনাদের দেশে ত কলেজ অনেক, তবু এত ভিড় কেন?

বললাম—কলেজ অনেক সত্যি তবে প্রয়োজন অনুপাতে নয়। তা ছাড়া নতুন কলেজ গড়বারও উপায় নেই। সরকার নিজের খরচে কলেজ গড়তে চান না—অর্থাভাবের অজুহাত দেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ কিছু টাকা ঢাললে তাঁরাও কিছুটা ঢালেন। সম্প্রতি সরকার স্পনসর্ড কলেজের স্কিম গ্রহণ করেছেন। অচলায়তনের শম্বুকগতি শুরু হয়েছে।

নূরউদ্দিন বললেন—মেয়েদের কলেজের অবস্থা কেমন?

বললাম—পুরুষদের কলেজের মত ওভারক্রাউডেড না হলেও, আসন একটাও খালি থাকে না। তবে আগামী ২।৪ বছরের মধ্যে পুরুষদের অবস্থাই ঘটবে। মেয়েরা অতি উৎসাহে এগিয়ে আসছে। বেশীর ভাগই জীবিকার প্রয়োজনে, কেউ কেউ বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত সময় কাটাবার জন্তে। তবে শিক্ষার হার বেড়েই চলেছে। এটা আখেরে ভালই করবে।

অধ্যক্ষ বললেন, কলেজগুলোকে মফঃস্বলে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছেনা কেন?

বললাম—সে চেষ্টা যে সুরু হয়নি তা নয়। আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে। তবে কলকাতার জনসংখ্যাকে যতদিন না মফঃস্বলে আর সহরতলীতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততদিন কলেজগুলি হরি ঘোষের গোয়াল হয়ে থাকবেই।

পুষ্প জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের এখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি? এ-দেশের মেয়েরা শিক্ষায় কেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে?

অধ্যক্ষ বললেন, সহ-শিক্ষার প্রচলন এই কলেজেই আছে। শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহ যথেষ্ট। এখনও তারা ছেলেদের উজিয়ে যেতে পারেনি, তবে যাবে হয়ত।

বললাম—সে সুদিন যেন সর্ব্বত্র আসে; তবে যদি ছেলেদের মধ্যে পৌরুষ জাগে!

মেয়েরা হেসে উঠলেন।

কয়েকটি প্রশ্ন করে জানলাম যে, এস, পি, কলেজে অনার্স আর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসও নেওয়া হয়। ইংরাজী আর অর্থনীতিতে মাত্র অনার্স পড়ানো হয়। উর্দ্দু, হিন্দী আর ইংরেজীতে এম, এ পড়ার ব্যবস্থাও আছে। ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ার জন্তে এই কলেজকে ভেঙ্গে ১৯৪২-এ আর একটি কলেজ—এ, এস কলেজ গড়া হয়েছে। ১৯৬১ সাল থেকে তাঁর কলেজে ৩ বছরের ডিগ্রী কোর্স চালু হবার সম্ভাবনা।

অধ্যক্ষ জিলানীর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ৯০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। ৬টি সরকারী ডিগ্রী কলেজ, ২টি সরকারী কলা ও বিজ্ঞান কলেজ, ২টি এডেড কলেজ, ৪টি ইণ্টারমিডিয়েট, ২টি ট্রেণিং এবং ১টি বেসরকারী কলেজ আছে। একটি পলিটেক্‌নিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৯-এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জম্মুর ট্রেণিং কলেজে এম, এড্ পড়ারও ব্যবস্থা আছে।

অধ্যক্ষ দুঃখ করে বললেন যে, শিক্ষা বিনা বেতনে দেওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র কর্ম্মীরা তার সুযোগ গ্রহণ করতে চায় না। তাদের ভয়, লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েরা বাপ-ঠাকুর্দ্দার কাজ আর করবে না, বেকার হয়ে ঘুরবে নয়ত বাবু হয়ে যাবে। অনেক কষ্ট করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্কুলের জন্তে ছেলেমেয়ে যোগাড় করতে হয়। তবে ক্রমশঃ ভুল ভেঙ্গে যাচ্ছে, উৎসাহও আসছে।

সহজে আমাদের ছাড়লেন না তিনি। ধরে নিয়ে গেলেন সরকারী আর্ট এম্পোরিয়ামে। কাশ্মীরের নানা শিল্পজাত দ্রব্যের স্থায়ী প্রদর্শনী এটি। মনোরম উদ্যানময় পরিবেশের মধ্যে একটি অট্টালিকাতে অবস্থিত। ঘুরে ঘুরে আমরা সব বিভাগগুলি দেখলাম। এর একটি শাখা আছে কলকাতার চৌরঙ্গীতে। জিনিষপত্র এখানে কেনাও যায়। বাজার-মূল্যের তুলনায় দাম কিছু বেশী হলেও,

জিনিষগুলি সবই খাঁটি। অধ্যক্ষ জিলানী পেপারমাসির উপর সুন্দর কাজ-করা কয়েকটি জিনিষ সঙ্গিনীদের উপহার দিলেন—অধমকেও। ফেরবার পথে রেসিডেন্সী রোডের এক বড় রেস্তোরাঁয় আর এক দফা আপ্যায়ন করে তবে বিদায় দিলেন। এঁর আর শিক্ষা-দপ্তরের অধিকর্ত্তাদের বিনয়-নম্র আন্তরিকতা আমাদের শুধু আনন্দ দেয়নি, কাশ্মীরের প্রতি আমাদের মনকে শ্রদ্ধালুও করেছে।

ফেরবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। আমরা সবাই কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। শাল-দোশালা, পেপারমাসি ইত্যাদি না নিয়ে গেলে দেশে মান থাকবে না। তা ছাড়া বাংলা দেশে পশমের জিনিষ এত সস্তায় মেলেনা। কয়েকদিন ধরে শ্রীনগরের বাজারে ঘুরে ফিরে দাম সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমাদের হয়েছিল। ঝিলামের ওপারে সরকারী একটা বড় মার্কেট খোলা হয়েছে। শুনেছিলাম, দাম সেখানে সস্তা, মূল্য নির্দ্ধারিত। দেখলাম—একদাম ঠিকই তবে সস্তা নয়। রেসিডেন্সী রোডের বা আশপাশের দোকানগুলির মত এত বৈচিত্র্যও নেই। পশ্চিম বাংলার "কল্যাণী"র মতই তার দুর্দ্দশা। ৮টায় বন্ধ হবার কথা, ৬টাতেই অর্দ্ধেক দোকান বন্ধ হয়ে যায়। বেশী ক্রেতা নাকি সেখানে যায় না। তবে পরিবেশ দেখে মনে হ'ল উন্নত করার সুযোগ আছে প্রচুর।

রেসিডেন্সী রোডের পরিবেশ অনেকটা আমাদের চৌরঙ্গীর মত। শাল, পেপারমাসি, আখরোট কাঠের জিনিষ, বেতের ঝুড়ি ইত্যাদির দোকান আছে। রেস্তোরাঁ, হোটেলও প্রচুর। মেয়েদের খুঁতখুঁতে মনকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে পশমের কারবারীরা প্রচুর আয়োজন রাখে। শ্রীনগরে আর কলকাতার শালের দামে তফাৎ খুবই—প্রায় দুগুণ।

শ্রীনগরের সবাই রসিক কিনা বলা শক্ত। তবে দোকানদারও যে রসিক হয় তার প্রমাণ পেয়েছি। একটি বড় রেস্তোরাঁয় আমরা প্রায়ই দু'বেলায় আহার সমাধা করতাম। চা-লস্যিও পাওয়া যায়। প্রতিদিনই সাত আটটা প্লেটের অর্ডার দিয়ে এগারো জনে ভাগ করে খাওয়া হোত। এক প্লেটের ভাত একজনের পক্ষে খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয় বলেই এ ব্যবস্থা মেয়েরা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এতে খরচের দিক থেকেও সাশ্রয় হোত। একদিন শেফালীদি এক গ্লাস লস্যির অর্ডার দিলেন। যথারীতি তা এল। দেখা গেল গেলাসে দুটি স্ট্র দেওয়া আছে।

শেফালীদিকে বললাম—ব্যাপার কি ? খাবেন ত আপনি একা ! দুটো স্ট্র কেন ?

তিনি হেসে বললেন—ওরা বোধ হয় ভেবেছে এরও অংশীদার আছে। দু বেলা প্লেট ভাগাভাগির ব্যাপারটা দেখে একটা ব্রেণ-ওয়েভ এসে গিয়েছে হয়ত।

মনোজ বাবু বললেন—মেওয়ার দেশ কি না, রস ত থাকবেই।

বললাম—অন্ততঃ রসটা মার্জ্জিত, ঢাকার কুট্টিদের মত হাড়-জ্বালানো নয়।

গ্যামার আর্ট বড় শালের কারবারী। কলকাতায় চৌরঙ্গীতে ত বটেই লণ্ডনেও শাখা আছে। এঁদের বিরাট কার্পেট কারখানা আছে শ্রীনগরে। একদিন কারখানা দেখতে আমাদের নিয়ে গেলেন। বন্ধ

তাঁত, আড়াইশো কারিগর। ম্যানেজার নক্সা বিভাগে নিয়ে গেলেন।

বললেন—কার্পেট তৈরীর আগে কাগজে নক্সা তৈরী করতে হয়। স্কেল মেপে নিখুঁত কাজ। অঙ্কশাস্ত্রের নির্ভুল হিসাব। প্রত্যেকটি নক্সার সঙ্গে নানা রং-এর পশমের নমুনাও এঁটে দেওয়া হয় যেখানে যেমনটি দরকার। নক্সা তৈরীর পর সেটিকে বীজগণিতের মত একটা ফরমূলায় ফেলা হয়।

আমরা কাগজের ওপর সেই ফরমূলাও দেখলাম। সেই আঙ্কিক হিজিবিজি আদৌ বোধগম্য হল না।

ম্যানেজার বললেন—আপনারা পি, আর, এস বা পি, এচ, ডি হলেও ওসব বুঝবেন না। ও হচ্ছে একটা আলাদা বিদ্যা।

বললাম—অস্বীকার আদৌ করছি না। সেজন্যে অভিমানও আমাদের নেই। এই বিপুল বিশ্বের কতটুকুই বা জানি আমরা!

তাঁতঘরে যেয়ে দেখি, প্রত্যেকটি তাঁতের ঠিক মাঝামাঝি ফরমূলাটি লাগান আছে। কারিগররা তাই দেখে দেখে বিড় বিড় করে কি বলছে আর হাত চালিয়ে যাচ্ছে।

ম্যানেজার বললেন—কার্পেট তৈরীর রহস্য পোরা আছে ঐ কাগজটুকুতে। ওর ভাষা ওরা বোঝে। তাই দেখে হিসাবমত কাজ করে যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এক একটা তাঁতে তিন-চারজন করে দেখছি কেন?

বললেন—এক একটা কার্পেট এক একটি পরিবারের হাতে থাকে। বাপ ছেলেদের নিয়ে বা কয়েক ভাইয়ে মিলে এক একটি তাঁত চালায়। এদের অভিজ্ঞতা বংশগত। ছেলেবেলা থেকে বাপ-খুড়োর সঙ্গে কাজ করতে করতে এরা দক্ষ হয়ে ওঠে, যেমন উঠত আপনাদের দেশের মসলিনের কারিগররা। এক একটা পরিবারের এক একটা বিশেষ ধরণের কার্পেট তৈরীর অভিজ্ঞতা আছে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম—বেশীর ভাগ কার্পেটই বোখারা বা পার্শিয়ান নক্সা ও রীতি অনুসারে তৈরী হয়। কারিগররা সকলেই কাশ্মীরী মুসলমান। ৩।৪ জনে পরিশ্রম করেও প্রতিদিন আধ ইঞ্চির বেশী তৈরী করতে পারে না। রং-এর সঙ্গে রং মিলিয়ে, নক্সার চুলচেরা হিসাব ঠিক করে তৈরী করতে হলে এর বেশী সম্ভবও নয়। একটা ৬ × ৩ হাত কার্পেট তৈরী করতে সময় লাগে কমপক্ষে আড়াই মাস। খাঁটি পশমী আর মিশেলী—দু'রকম কার্পেটই তৈরী হয়। একটা ৬ × ৩ হাত খাঁটি পশমীর দাম কমপক্ষে আড়াই শো টাকা।

ম্যানেজার বললেন—আড়াই তিন হাজার টাকার কার্পেট আমরা হামেশাই তৈরী করছি। দেশভাগের আগে ভূপালের নবাব তাঁর ছবি দিয়ে একখানা কার্পেট তৈরী করিয়েছিলেন। দাম পড়েছিল দশ হাজার টাকা। বিদেশেও আমাদের কার্পেট চালান যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম—কারিগরদের মজুরি কত? দৈনিক কত ঘণ্টায় রোজ হয়?

বললেন—বারো ঘণ্টায় রোজ, মজুরী তিন চার টাকা।

—পরিবার-প্রতি না জন-প্রতি?

—পরিবার-প্রতি।

অবাক হলাম। বারো ঘণ্টা খেটে এরা প্রতি পরিবার ৩।৪ টাকা রোজগার করে! এর নাম পোষণ না শোষণ? বেকারত্ব এদের নেই কিন্তু দারিদ্র্য ঘুচে না কেন, বুঝতে কষ্ট হয় না। শালের কারখানাতেও দেখেছি, চোখ নিচু করে যারা দক্ষ হাতে ছুঁচসুতো চালিয়ে যাচ্ছে, আট ঘণ্টা খেটেও তারা দশ আনা থেকে দেড় টাকা দু' টাকার বেশী মজুরী পায় না। কাশ্মীর সরকার আজও এদের মজুরী বাড়াতে পারেন নি।

শীতকালে তুষারপাতের সময়ও শ্রীনগরে কার্পেট আর শালের কারখানা বন্ধ হয় না। অবশ্য কাজ চলে তখন ঢিমে তালে। দারুণ শৈত্যে আঙুল অসাড় হয়ে যায়, মজুরীও যায় কমে।

কাশ্মীরের শিল্পকে যারা জগতে সমাদৃত করছে, তাদের ভাগ্যে কি খিন্ন জীবনের আয়োজন!

এক কারিগরের পাশে একটি পাঁচ বছরের ফুটফুটে ছেলে বসেছিল। হঠাৎ তার বাবা গালে দিলে এক চড় কষে।

বললাম—মারলে কেন শুধু শুধু?

উত্তর এল—বাবু, চোখ ঠিক রাখছে না। আমার হাতের দিকে নজর রাখতে হবে। কেমন করে আমার হাত চলছে তা ওকে দেখতে হবে।

বললাম—ঐটুকু ত ছেলে! ও বোঝেই বা কি আর মনোযোগই বা কতটুকু? এ তোমাদের অত্যাচার! আর, নজর রেখে লাভ কি?

—এই বয়েস থেকে নজর না রাখলে, কাজ শিখবে কি করে? এখন দু' তিন বছর নজর রাখবে, তারপর আমার সঙ্গে কাজ করতে করতে শিখবে। এ কাজে মনোযোগই আসল। না থাকলে হিসেবে ভুল হবে।

—বিনা বেতনে ত লেখাপড়া শেখান যায়। স্কুলে দাওনা কেন?

—কি হবে তাতে? দুঃখ ঘুচবে? ও লেখাপড়া শিখতে গেলে আমার সহায় হবে কে? এমনিতেই ত পেট চলে না, তখন ত শুকিয়ে মরতে হবে। আর, লেখাপড়া শিখে এসব কাজ শিখতে পারবে না—ইচ্ছেও হবে না।

বুঝলাম অধ্যক্ষ নুরউদ্দিন কেন বলেছিলেন, নানা লোভ দেখিয়ে পড়ুয়া সংগ্রহ করতে হয়।

শ্রীনগর সহরটির কথা বলেছি। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কলকাতার ধারে কাছে যায় না। কিন্তু সৌন্দর্য্যে এর তুলনা নেই। তেরতলা আঠারতলা বাড়ী আর ফ্যাসন প্যারেড্ দিয়ে এর আভিজাত্যের নখরটুকুও স্পর্শ করা যায় না। ডাল, ঝিলাম, পর্ব্বতমালা আর চীনারকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই সহর। টাকার লেনদেন নগণ্য হলেও, দিনের বেলার কর্ম্মব্যস্ততা বড়বাজার বা ডালহৌসী স্কোয়ারের চেয়ে কম নয়। বাড়ী-ঘরগুলি অবশ্য এখনও উন্নতির অপেক্ষা রাখে—বিশেষ করে ঝিলামের তীরের। পথ প্রশস্ত আর পিচ-ঢালা হলেও সহরের উপকণ্ঠে আর সেতুগুলির কাছে সুবিধের নয়।

শ্রীনগরে কাশ্মীরী আর পাঞ্জাবী ব্যবসায়ীই আখছার চোখে পড়ে। আনোখীলালদের দেখিনি। দাক্ষিণ ভারতের মত কাশ্মীরীরাও ঐ জাতটিকে বর্জন করে চলেছে। শাল-কার্পেটের সঙ্গে হোটেল-রেস্তোরাঁর ব্যবসা এখানে ভালভাবেই চলে। বাঙালী একটিমাত্র ব্যবসায়ী আছেন—শ্রদ্ধেয় নিয়োগী মশাই। ছেচল্লিশ বছর আগে ইনি এখানে আসেন ভাগ্যান্বেষণে। এখন ইনি শ্রীনগরের সম্ভ্রান্ত

বড় মোটরগ্যারাই কারখানা—বেঙ্গল মোটর ওয়ার্কস-এর মালিক। বাড়ীও করেছেন নিজস্ব। ডাললেকের নেহেরু পার্কের কাছে গাগরিবালে আর এক বিশিষ্ট বাঙ্গালী পরিবার আছেন। পরিবারের কর্তা বিশ্বাস সাহেব স্বর্গত। তাঁর বাড়ীটির পরিবেশ রমণীয়। এঁর এক ছেলে কাশ্মীর বিধানসভার স্পিকারের পি-এ।

নিয়োগীবাবু আর বিশ্বাস সাহেবের পরিবারের সবাই বাঙ্গালী পেলে আদর আপ্যায়ন করতে ছাড়েন না। নিয়োগীবাবুর কাছে শুনলাম, কাশ্মীর সরকার এখন আর কোনও অকাশ্মীরীকে জমি কিনে বাড়ী করতে দেন না। কাজটা নিন্দনীয় বলে মনে হয় না। বিশ্ব-প্রেমের একটা সীমা আছে। বাঙ্গালী এই উদারতা নিয়েই মরতে বসেছে। "নিজবাসভূমে পরবাসী"। কলকাতা ত গেছেই, বাঙ্গালীর কল্পিত স্বর্গ দুর্গাপুরও অবাঙ্গালীদের খপ্পরে পড়ে যেতে বসেছে। কাশ্মীরের মানুষ মুখ নীচু করে ছুঁচে সুতো গলিয়ে যাবে আর অকাশ্মীরীরা চোরাকারবারের টাকার জোরে বড় বড় বাড়ী গাড়ী হাঁকিয়ে চলবে—তাদেরই বুকের উপর বসে তাদের দাড়ি ওপড়াবে, এতো আর চলতে পারে না! বাঙ্গালীর মত কাছাখোলা জাত ছাড়া অতটা উদার বা মূর্খ হবে কে?

কাশ্মীর চিরকালই রক্ষণশীল। ইউরোপে প্রাশানরা বা প্রাচীন ভারতে আর্য্যরা যেমন বর্ণসঙ্করের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, কাশ্মীরীরাও তেমনি রক্ত-সংমিশ্রণের চিরবিরোধিতা করেছে। পীরপঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণীর মত দুস্তর বাধাও বাইরের মানুষকে সহজে কাশ্মীরে আসতে দেয়নি। এই ভৌগোলিক সংস্থানই কাশ্মীরকে রক্ষণশীল করেছে। পাঠান আর মোগল আমলে মুসলমান হলেও, অবাধ রক্তসংমিশ্রণ ঘটতে এরা দেয়নি। তাই এ-দেশের হিন্দুমুসলমান অধিবাসীর মধ্যে এখনও একটা দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যেটা "শকহুণদল-পাঠান-মোগলের" একাকারত্বে অন্যান্য রাজ্যে নেই। নৃতাত্ত্বিক নই, কিন্তু লক্ষ্য করেছি কাশ্মীরী বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে এদেশবাসীর সুগঠিত নাসিকায়। চ্যাপটা নাক চোখে পড়েনি। এই রক্ষণশীলতার জন্যেই কাশ্মীরবাসী বিচলিত হয়েছিল যখন ১৯৪৮-এ পাক্ হানাদারেরা এসে সুন্দরীদের দিকে নজর দিতে সুরু করেছিল। মুসলমান হলেও রক্তে এরা শুনতে পায় হাজার হাজার বছর আগেকার মর্ম্মধ্বনি। তাই মুসলমান গোসানর বলেছিলেন—বাবু, আমরা ব্রাহ্মণ গোঁসাই ছিলাম, তরোয়ালের জোরে ধর্ম্ম বদলেছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাই বলুন, ঐতিহাসিক আর নৃতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন যে, বর্ণসঙ্কর না হলে দুনিয়ার সংস্কৃতিতে নূতন নূতন অবদান কেউ রেখে যেতে পারে না। তাঁদের মতে রক্ষণশীল বলেই কাশ্মীরীরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষ কিছু দিতে পারেনি। পাহাড় ভেদ করে সুড়ঙ্গপথে ট্রেণ নিয়ে যাবার মতলব হচ্ছে। এক কাশ্মীরী বন্ধু বললেন, ট্রেণ শ্রীনগর পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারলে, দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে। হয়ত তাই। টুরিষ্ট তখন লাখে লাখে যাবে, কলকারখানা গড়ে উঠবে, টাকা ছড়িয়ে যাবে দেশময়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যাবে চীনারের লাল ঐশ্বর্য্য, দেবদারু আর পাইনের শ্যামলিমার বিস্তার। আর উন্নত নাক কি তখন উন্নতই থাকবে? সেদিন হয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে হবে—"হাউ গ্রিণ ওয়াজ, মাই ভ্যালি!"

কাশ্মীর নিয়ে দুনিয়া জুড়ে এত হৈচৈ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে, এ দেশকে রাজনীতি থেকে বাদ দিয়ে দেখা যেন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন—কেমন দেখলেন? গণভোট হলে টিকবে ত? অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই যে, খবরের কাগজ আর চায়ের পেয়ালা হাতে আমরা কাশ্মীর নিয়ে যতটা মাথা ঘামাই, কাশ্মীরবাসীরা ততটা আদৌ করে না। রাজনৈতিক হৈচৈ নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে মুসলিম লীগ সভা করলেও, উত্তাপের সঞ্চার করতে পারে না। শ্রীনগরের সাপ্তাহিক খবরের কাগজগুলিতে স্থানীয় সমস্যা নিয়েই আলোচনা বেশী হয়।

১৯৪১-৪৯ সালে শ্রীনেহেরু ম্যাকনটন্-প্রস্তাবে অর্থাৎ কাশ্মীরে গণভোটে রাজী হয়েছিলেন। এখন মত বদলেছেন। কাজটা বুদ্ধিসম্মতই হয়েছে। শ্রীনগরে পুরাতন ভারতীয় বাসিন্দাদের কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম— গণভোট হলে ফল কি হবে? তাঁদের উত্তরের সারমর্ম্ম এই যে, শতকরা বিশজন যে-কাশ্মীরী ভারতীয় পর্য্যটকদের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন, কেবলমাত্র তাঁরাই ভারতের পক্ষে ভোট দেবেন আর আশী ভাগ ভোট দেবেন পাকিস্তানের পক্ষে। শেষোক্তদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, দরিদ্র, অবহেলিত মজুর বা কৃষক। কলকাতাতেও সুধীমহলে এমনিধারা কথা শোনা যায়। কিন্তু পার্সেণ্টেজের এতো সাফ হিসাব করা সোজা নয়। নেহরুর মিটিং-এর পঞ্চাশ হাজারকে পাঁচ লাখ করার মত এও সোজা হিসেব হয়ত! পহলগামের চারপাশের গ্রামেও দেখেছি ভারতের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব। রক্ষণশীলতা এদের মজ্জাগত—অন্ততঃ ইতিহাস সেই কথা বলে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হলে কাশ্মীরী বিবিদের কি দুর্দ্দশা হবে, তার পরিচয় ত '৪৮ সালেই মিলেছে। তার পরেও পাকিস্তান-প্রীতিতে ডগমগ থাকা সম্ভব নয়, বিশেষ করে গিলগিটে যে অত্যাচার চলেছে, তার কাহিনী জেনে। কয়েকজন ভারতীয়ের কাছে শোনা গেল, শেখ আবদুল্লাকে যখন কয়েক মাস আগে ছাড়া হয়েছিল, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্যে সারা শ্রীনগর আলোকমালায় সেজেছিল। তা হতে পারে। শের-ই-কাশ্মীরের জন্যে দরদ থাকতে পারে। তার অর্থ পাকিস্তান-প্রীতি নাও হতে পারে। আবদুল্লার আসল মনোভাব এখনও সুস্পষ্ট নয়—অন্ততঃ ভারতীয় জনসাধারণের কাছে। তিনি স্বাধীন কাশ্মীর চেয়েছিলেন কেন? পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে, না ওপারের বৃহৎ শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবার জন্যে? এ হেঁয়ালির উত্তর আজও পাওয়া যায়নি।

শোনা যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রিন্স বুরহানুদ্দিন আজও নাকি পাকিস্তানের জেলে বন্দী। তিনি চিত্রলের রাজার ভাই। রাজনৈতিক চেসবোর্ডে কি খেলা যে ওস্তাদরা খেলচেন, বোঝা শক্ত। পাঁচটা দেশের সীমান্ত যে-দেশে এসে মিশেছে, সেখানে বড়ের চাল চলবেই।

আবদুল্লাকে বন্দী করা অবশ্য ভালই হয়েছে। আগুন নিয়ে খেলা বা খেলতে দেওয়া, দুটোই নিরাপদ নয়। তাঁকে মাঝখানে ছাড়াও ভাল হয়নি। কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়কে কাশ্মীরে এ মন্তব্য করতে শুনেছি। এঁকে ছাড়ার পর আবার জেলে পাঠানোর ফলে, কাশ্মীরীদের মনে একটা বিদ্বেষ ভারতের বিরুদ্ধে জাগান হয়েছে বলে মন্তব্য অনেকে করলেন। কাশ্মীরের মত

জায়গায় কোনও চাল আমাদের না নেওয়াই উচিত, যেমন নিচ্ছেন না চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতে।

একটা বিষয়ে ভারতীয় গণমতের জয় হয়েছে। গণভোট রূপ পোকাটা আর সরকারী মস্তিষ্কে কিলবিল করছে না। ১৯৪৮ সালের ভূত নেহেরুর মাথা থেকে নেবে গেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট হলে ভারতের সর্ব্বনাশ হবেই। ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তারা টাকার থলে খুলে, গুণ্ডা লাগিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেই। কাশ্মীরীদের শতকরা ৮০ ভাগ ভারতের পক্ষপাতী থাকলেও তখন সুবিধে হবে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধুত্বে বিশ্বাস থাকলে গণভোটে জার্ম্মাণী, কোরিয়া বা ইন্দোচীন রাজী হত।

কাশ্মীরে ভারত সরকার যথেষ্ট সতর্ক। সীমান্তে সজাগ প্রহরী। পূর্ব্ব সীমান্তের মত কাছাখোলা অবস্থা নয়। ছোট বড় প্রত্যেকটি সেতু সুরক্ষিত, আলোকচিত্র নেওয়াও নিষিদ্ধ। তবু আশঙ্কা হয়। কারণ, এ দেশের সুরক্ষা নির্ভর করছে বিমানবাহিনীর উপর। গিলগিটে যদি মার্কিণ ঘাঁটি বানানো হয়ে থাকে ("ব্লিৎস"-এর খবর এবং এপ্রিলে নেহেরুর স্বীকৃতি) তাহলে বিপদের কথা। আয়ুব খাঁ আর তাঁর ছ'জন সাকরেদ ফতিমা জিন্নার কাছে গত বছর নভেম্বরের গোড়ার দিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, কায়েদে-আজম্ জিন্নার শেষ ইচ্ছা তাঁরা পূর্ণ করবেন অর্থাৎ কাশ্মীর থেকে আগ্রা পর্য্যন্ত তাঁরা দখল করবেন। বোম্বাই-এর "নেহেরু-পন্থী" ব্লিৎস্-এ এ-সংবাদ বেরিয়েছিল। একে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে না দিয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কাশ্মীর চলে গেলে শুধু ভূস্বর্গই আমরা হারাব তা নয়, তামাম্ উত্তর-ভারত বিপদগ্রস্ত হবে। অবশ্য এ-সব সমস্যা আদৌ উঠত না যদি না আমাদের প্রধান মন্ত্রী মাউণ্টব্যাটেনের কথায় বিশ্বাস করে, যুদ্ধে সাফল্যের মুখে বিরতি ঘটাতেন। "দি কারেন্ট" পত্রিকার সম্পাদক ডি, এফ, কারাকা তাঁর "দি বিট্রেয়ল্ ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, নেহেরু সরকার যুদ্ধ-বিরতি-রেখা ইচ্ছে করেই টেনেছেন। আর চার পাঁচ দিনের যুদ্ধের পর সারা গিলগিট ভারতের হাতে আসত। ভারতের সীমানা তখন হত রাশিয়া আর চীনের সীমানার লাগাও। এটা কর্তাদের আদৌ কাম্য ছিল না। কারণ, সে-অবস্থায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতি রুশ-চীনঘেঁষা হত। এ-দেশের ধনিকদের তথা বৃটিশ-মার্কিণ ধনিকগোষ্ঠীর তা মনঃপুত ছিল না। তাই তৎকালীন ভাইসরয় (স্বাধীনতার পরেও) লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নেহেরুকে দিয়ে একটা গোঁজামিল সমাধান করলেন। সমস্যার উদ্ভব এখানেই। সর্দ্দার প্যাটেল ইনস্ট্রুমেণ্ট অফ এ্যাক্সেসান বিল পাশ করিয়ে যদি ছশো একটি দেশীয় রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করতেন, তাহ'লে ঐ ছশো একটি বৃশ্চিক দংশনের ফলে আমাদের কি দুর্দশা হত তাই ভাবি! ক্রুশ্চেভ-বুলগানিন কাশ্মীর সফরে যেয়ে বলেছিলেন—তাঁরা পাহাড়গুলোর ওপারেই আছেন, ভারতের প্রয়োজনে ডাক দিলেই ছুটে আসবেন। আমরা কাউকেই ডাক দেবার পক্ষপাতী নই। তবে অর্থ আর শস্ত্রের সহায়তা চাই বৈকি! আত্মবিক্রয় না করে যতটা সম্ভব নেওয়া উচিত। এ-বিষয়ে ভারত সরকার নির্ব্বিকার। তাঁরা চেঁচাচ্ছেন—আমেরিকা পাকিস্তানকে সমর-সম্ভার দিচ্ছে, আমাদের দিচ্ছে না! ওরা যদি না দেয় অন্য দরজা খোলা আছে। কিন্তু এঁদের তাতেও ভয়। আমেরিকা-বৃটেন চটে যাবে, যুদ্ধ ঘাড়ে পড়বে। শান্তিবাদ ভাল কিন্তু অত্যন্তটা গর্হিত। কাশ্মীর নিয়ে হেস্তনেস্ত একদিন করতেই হবে—সেকথা নেহেরু সরকার জানেন। তবে যত তা বিলম্বিত হয়, ততই ভাল—মনকে চোখ ঠারা আর কি! ইতিহাসের চাকা চলেছে এবং চলবেও। বুদ্ধ আর গান্ধীর দোহাই দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

কাশ্মীরের শিক্ষিতরা ভারতকে শ্রদ্ধা করে ব .ই মনে হয়। একজন মৌলবীর সঙ্গে শ্রীনগরে আলাপ হল। তিনি কলকাতাতেও কিছুকাল কাটিয়ে গেছেন।

বললেন—কাশ্মীরীরা হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করে না। তাদের কাছে সবাই সমান।

বললাম—এখানে এসে তার আভাষ পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।

মৌলবী জিজ্ঞাসা করলেন, এন, সি, চ্যাটার্জিকে চিনি কি না। উত্তরে জানালাম, নামের সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচয় আছে, প্রত্যক্ষভাবে নেই।

বললেন—শ্রীযুত চ্যাটার্জি কাশ্মীরে এসেছিলেন।

বললাম—লোক হিসেবে খুবই ভাল। বিচক্ষণ আইনজীবী, পণ্ডিত আর জাঁহাবাজ পার্লামেণ্টারিয়ান। তবে তাঁর মতবাদে আমাদের বিশ্বাস নেই। মুসলিম লীগের দাওয়াই হচ্ছে হিন্দু মহাসভা। আমরা মহাজাতির একনিষ্ঠ তপস্বী নেতাজীর আদর্শে বিশ্বাসী। আমাদের কাছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান ভেদাভেদ কিছুই নেই

মৌলবী যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশ্যে যেন নমস্কার করলেন। শ্রদ্ধামিশ্রিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন আর একটি কথাও না বলে। কাশ্মীরের দুজন উচ্চপদস্থ মুসলমান ভদ্রলোককেও বলতে শুনেছি, নেতাজী এলে জমানা বিলকুল বদলে যাবে।

আমাদের পাততাড়ি গুটোবার দিন এলো। সেকালে কেউ বিদেশ যাবার সময় প্রণাম করলে আচার্য্যরা বলতেন—পুনরাগমনায় চ। ভূস্বর্গ থেকে বিদায় নেবার সময় আমাদের মনে হল, কাশ্মীরের হাস্যময়ী প্রকৃতির অন্তর থেকে যেন উৎসারিত হচ্ছে সেই পুরাতন কথাটি—পুনরাগমনায় চ। দুশো মাইল পীরপঞ্জালের বুক চিরে ফেরার সময়ে বার বার সেই কথাই মনে পড়েছে। মনে হয়েছে—আমরা আর আসতে না পারলেও, আমাদের দেশের শতসহস্র বাঙালীর মাধ্যমে সে আহ্বানের সাড়া মিলবেই।

শেষ

ওরে ভয় নাই—নাই স্নেহমোহবন্ধন
ওরে আশা নাই—আশা শুধু মিছে ছলনা
ওরে ভাষা নাই—নাই বৃথা বসে ক্রন্দন
ওরে গৃহ নাই—নাই ফুলশেজ রচনা
আছে শুধু পাখা—আছে মহানভঅঙ্গন
ঊষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা
ওরে বিহঙ্গ—ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোর না পাখা।

—রবীন্দ্রনাথ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

সূর্য্য-সম্ভবা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পূরবী চক্রবর্ত্তী

মায়ের চোখের জলের অনুরোধ আর পরিজনদের অশ্রান্ত উপরোধকে আর অগ্রাহ্য করতে পারলাম না আমি। তাই এক কন্যাপক্ষের সাদর নিমন্ত্রণকে স্বীকার করে নিলাম একদিন। আমি সুদর্শন দর্শন চ্যাটার্জ্জী এক তথাকথিত ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কোনও শাখা-অফিসের কর্ণধার বিশেষ। বিশেষতঃ প্রখ্যাত বিজনেস্ ম্যাগনেটের অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র। হাই সোসাইটিতে এক উজ্জ্বল রত্নের মর্য্যাদা আমার অবশ্য প্রাপ্তব্য। পুরুষের চরিত্রগত সাধারণ ত্রুটিবিচ্যুতি এক্ষেত্রে মনে নেয় না কেউ! অপরপক্ষে পাত্রী সুমিলিতা ব্যানার্জী ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের এক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর একমাত্র কন্যা। শুধু সুশোভনা নয়—বহু গুণের আধার বলেও তার খ্যাতি আছে। পিতার প্রবাসে অবস্থানকালে এখানেই কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার এই দক্ষিণাঞ্চলেরই কোথাও এক নবনির্ম্মিত আবাসে গৃহপ্রবেশ হয়েছে তাদের। অর্থ কৌলীন্যে ঠিক সমগোত্রীয় না হলেও বংশ মর্যাদায় সমভাবাপন্ন—তাই বিঘ্ন দেখা দেয়নি কোনও। মা আর বাবার মনোমত হয়েছে মেয়ে। এখন শুধু আমার মনোনয়নের অপেক্ষা। তাই সাময়িক ভাবে অবসর নিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে কলকাতায়। বৌদি কিছুদিন অন্তরিত হয়েছিল দাদার কর্ম্মস্থানে। সুসংবাদের সঙ্কেতে ছুটে এসেছে এখানে। তারও অদেখা রয়ে গেছে সেই মেয়ে। তাই আমার কন্যাসন্দর্শনের পথে সহযাত্রিনী হবে সেও।

মেয়ে দেখা—সনাতন ভারতের অতি বিস্ময়কর এক অসহন আর অশোভন রীতি। প্রগতির পথে অভিযাত্রা করেও তাদের সব মর্য্যাদার গতি যে পাত্রপক্ষের নির্ব্বাচনের মুখাপেক্ষীতায় প্রতিহত হয়ে অপমানের গ্লানিতে রেণু রেণু হয়ে ধরণীর ধূলিতে মিশিয়ে যায়—সে কথা বুঝি আজও মহাভারতের ভবিষ্যগরবিনী মাতৃকারা ভুলে আছে। তাদেরই একজন আজ রূপ যৌবন আর গুণের ভরা বেসাতি নিয়ে আমার মনের অঙ্গনে ধর্ণা দিতে চেয়েছে। তাতে ক্ষতি কি! চিরদিন নারীর দু' হাত ভরে শুধু কামনা আর কলঙ্কের পঙ্কভার তুলে দিয়েছি পরম উপেক্ষায়। এক অনাহত যৌবনার কাছে অমনোনীতার অগৌরব কি তারও চেয়ে বেশী দুর্ভার হবে! আমার অমতে বিয়ে হবে না জানি। তবু শুভার্থী শ্রদ্ধাভাজনের সঙ্গে মতদ্বৈধতা দেখা দেবে না—এই তাঁদের বিশ্বাস। সে আশ্বাসের আয়োজনকে ভ্রান্ত আর ব্যর্থ করে দিতেই হবে আমাকে। অন্যমত হবে আমার। আর অনাদৃত হয়ে যাবে ঐ মেয়ের জীবনের সব আশা আনন্দের মুকুলসম্ভার। না, স্পষ্ট করে বিয়েতে অনিচ্ছা জানিয়ে পরিবারে অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে তুলতে চাই না আমি। তাই তো এই সুন্দর ছলনার আকিঞ্চন! শুধু চোখে দেখা আর মনে না ধরার আশ্চর্য্য এক অভিনয়ের চতুরতায় স্নেহের অভিলাষ বারে বারে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। আর অনুকূল পরিবেশের মাঝে প্রিয় প্রতীক্ষার প্রহর গুণে চলব আমি, অতন্দ্র তিতিক্ষায়। হয় তো কত হতমানা গরবিনীর ব্যথাজর্জ্জর মনের নীরব আকুতির বন্ধুরতায় যন্ত্রণাক্ত হয়ে যাবে আমার চলমান গতি। তবু সেই কঠিন ব্রতচারণার শেষেই তো দেখা দেবে সেই মেয়ে—যার পুণ্যের প্রভায় সব ছলনার পাপ দূর হয়ে আলোকচঞ্চল হয়ে যাবে আমার জীবনের অনাগত সুন্দর দিনগুলির অনুক্ষণ।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়েই সামনে দেখে থমকে থেমে গেলাম আমি। বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের দিকে চেয়ে কোন অদেখা আঘাতে যেন বিক্ষত হয়েছে—আর রক্তাক্ত হয়ে গেছে অপরার সমস্ত বুক। সে বেদনার রক্তিমাভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে দিকে দিগন্তরে—আকাশের নীলিমায় আর ধরণীর ধূসরতায়। নিখিল বিশ্বের সব আনন্দচেতনা আর আলোক অনুভবের মধুরতা মুহ্যমান হয়ে গেছে আহত ব্যথার গভীরে। শুধু বিষণ্ণ সন্ধ্যা ধীরে অতি ধীরে শিশুতর মত তার ধূপছায়া অঞ্চল বিস্তার করে রক্তরঞ্জিতা সে দুঃখমূর্ত্তিকে দৃষ্টির অন্তরাল করে দিচ্ছে। মুহূর্ত্তে কোন অতলান্ত ব্যথায় যেন আচ্ছন্ন হল আমার মন। জীবনের সব স্বপ্নসুন্দর কল্পনা বুঝি অর্থহীন হয়ে গেল সেইক্ষণে আর অসার্থকতার অন্ধকারে একটি একটি করে হারিয়ে গেল অদেখা ভবিষ্যৎ পরিণতির যত সুখময় সম্ভাবনাগুলি। আকাশের বুকের ঐ রক্তসঙ্কেত ডেঞ্জার সিগন্যালের মত কি যেন এক আসন্ন দুর্ব্বিপাকের কথা জানিয়ে গেল মনে মনে। আকস্মিকতার তীব্র অভিঘাতে আবেগের এক অস্থির অনুরণন উঠল আমার স্নায়ুতে। আর তার পরেই সব শেষ। আশা, আনন্দ, ধৈর্য্য, উৎসাহ লুপ্ত হয়ে গেল আমার চেতনা থেকে। অবলুপ্ত হয়ে গেল এই বাস্তবের পৃথিবী। অপরিসীম ক্লান্তিতে এক রিক্ত সর্ব্বহারার মত এলিয়ে পড়লাম আমি সিটের ওপর। তারও পরে—কতক্ষণ পরে বুঝি আত্মস্থ হলাম বৌদির ডাকে।

ছবির মত এক বাড়ী—আর চিত্রলেখার মতই এক মেয়ে। নম্র ভদ্রতার অভ্যর্থনা, মধুর আলাপন আর [illegible]

অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ—বিস্মৃতপ্রায় হয়েছি বুঝি আমি। স্মরণাতীত হয়ে আছে শুধু সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে ফ্লুওরেসেণ্ট ল্যাম্পের কৃত্রিমতায় ধরা ভোর আকাশের নীলাভ রঙ—আর তারই মাঝে দেখা অরুণবসনা এক সুতন্বকায় লজ্জিত যৌবনের বিহ্বল মদিরতা। এক অপূর্ব্ব স্বপ্নের শেষে যেন জেগে উঠেছি আমি। তার রেশটুকু এখনও আছে। কিছু ভুলেছি আর কিছু ভুলিনি। যেটুকু মনে আছে তাই নিয়েই খেলা করছি আপন মনে। বিশ্লেষণ করছি তার সব ভাল আর সব মন্দটুকু। কাম্য কি আর কাম্য কে যেন জানতে চাইছি তাই। খুশী হয়েছ তো?—বৌদির সহাস প্রশ্নে ছেদ পড়ল আমার চিন্তাধারায়। তিথি আজ থাকলে—। না, তিথি আজ কাছে নেই। পরের ঘরনী হয়ে দূরে গেছে সে। নির্ব্বাক হয়ে গেলে যে একেবারে। ধীরে ফিরে চাইলাম বৌদির দিকে। কি যেন দেখল আমার মুখে আর বিস্ময়ে বাক্‌হারা হয়ে গেল সেও। ফেরার পথের স্তব্ধতা এরপর আর ভাঙ্গল না কেউ।

রাত্রি গভীরতর হয়েছে এখন। শান্ত হয়েছে ধরিত্রী। শুধু অশান্ত হয়ে উঠছে আমার মন। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভরে গেছে ঘরটা। পাখার হাওয়ায় যেন আগুন ছুটছে। জানলাগুলোও বুঝি খুলতে ভুলে গেছে ওরা। ব্যাচেলারের ঘর—অত খেয়াল রাখবার দায় আছে কার। তিক্ত হেসে উঠে গেলাম—জানলাগুলো খুলে দিলাম—আর তারও পরে আবারও একটা সিগারেট ধরিয়ে এসে বসলাম বিছানায়। টেবলের ওপর থেকে কোলে টেনে নিলাম গীটারটা। বেডসুইচটা অফ করে সুরের মধ্যে এবার নিবিষ্ট করতে চাইলাম নিজেকে। বড় অগোছাল হয়ে আছে মনটা—সবকিছুই তাই কেমন এলোমেলো হয়ে যেতে চায়। একাগ্রতার সাধনা বিচলিত হয় বারেবারে। ভাবনার অতলে আবার তলিয়ে গেলাম আমি। অবহেলায় ধরা সিগারেটটা শুধু ধূপের মত জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে চলল আর সৌরভভ্রান্ত হয়ে গেল আমার ঘরের বাতাস।

কখন যেন বৌদি এসেছিল। অভিভাবকদের অনুরোধে জানতে চেয়েছিল আমার অভিমত। অনেক আশা আর আনন্দ নিয়েই সে এসেছিল। কিন্তু ফিরে গেল নীরবে—বিস্ময় বেদনা আর ব্যর্থতার অবসাদে। না, এ বিয়ে অন্তত হবে না—হতে পারে না। জানি আমি, ক্ষুব্ধ হবে দুই পরিবারের মন আর অশ্রুবিচল হয়ে যাবে ঐ মেয়ের আশার প্রতীক্ষার অবশেষ। তবু সব ত্রুটি আর বিচ্যুতির কথা জেনেও কেমন করে ওকে গ্রহণ করব আমি জীবনে!

একজন আরতি। অন্য জন রতি—শ্রদ্ধা আর লিপ্সা, মধুরতা আর মদিরতার অনন্ত বিচ্ছেদ এ দুইয়ের মধ্যে। তবু এরা এক—অভিন্নঅন্তর! নিয়তির নির্বন্ধের মত এই বিস্ময়ের অভিজ্ঞান আমার জীবনের এক আখ্যান ভাগকে দুর্ব্বার গতিতে বিয়োগান্ত
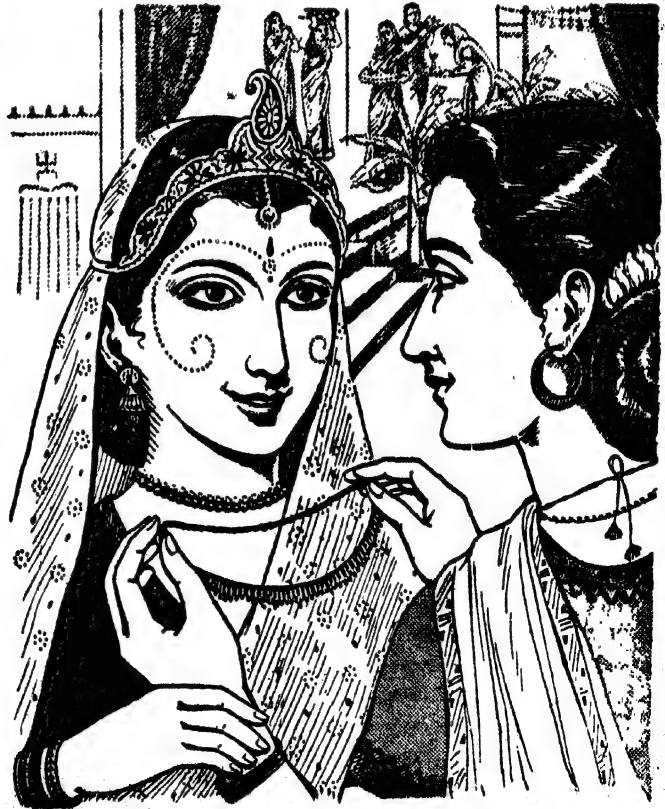
পরিণতির পথে নিয়ে চলেছে। নবোদিত অরুণের স্নেহের কিরণে রুচিরা যে তরুণীর মধুর লাবনিকে একদিন অনুরাগের অভিনন্দন জানিয়েছিলাম আমি—আজ সেই এসেছে সুচারু সজ্জার মনোহারিণী এক মদিরেক্ষণার মত কামনার ব্যাকুলতা নিয়ে আমার চোখে ধরা দিতে। আকাশের কোনও রক্তরাগের প্রসাধন নয় আর—রুজ, লিপষ্টিক, কসমেটীকের প্রসাধনে রঞ্জিত হয়েছে সে। তরুণ সূর্য্যের আলোর আশীষ নয়—পুরুষসান্নিধ্যের আবেশ এবার আরক্ত করেছে তাকে। তনুদেহে ছন্দায়িত হয়েছে আত্মসমর্পণের আকুল আবেদন। আয়ত নয়নের শান্ত অনাগ্রহ কখন মুছে গেছে। অপলক আঁখিতারায় ফুটে উঠেছে তার মর্ম্মবাণীর স্বরূপ। আমার গ্রহণে সফল আর সার্থক হতে চায় ও মেয়ের জীবন যৌবন। নির্নিমেষ দৃষ্টির রতিতে তাই ক্ষুণ্ণ হয় না কুমারীর নিষ্পাপ শুচিতা। তাকেই পুরুষের প্রীতির আরতি জেনে ভুল করে আর সুখী হয়ে যায় ঐ তৃষ্ণার্ত্ত মনের আকুলতা।

ঐ অধঃপতন আমি সইব কেমন করে! দেবতার মেয়ে এসেছে মোহিনীর বেশে এক মর্ত্ত্যের মানুষের মন ভোলাতে! অনেক প্রস্তুতির আয়োজন আর তপস্যার আচরণের শেষে যাকে কাছে পাওয়ার আশা করতে হয় সে এসেছে ভিখারিনীর মত আমার অনুগ্রহে নিজেকে পূর্ণ করে নিতে! ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে গেছি আমি। দু' নয়নে রোষের বহ্নি জেলে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছি ঐ রূপের মায়াকে। কিন্তু কি যেন এক মোহের ভুলে বিরাগের সে অগ্নিদাহ আর একজনের প্রদীপ চোখে অনুরাগের আলো হয়ে উজলে উঠেছে! তাই দেখে ব্যথাহত আমি পালিয়ে এসেছি দূরে। সুমিলিতার মত রূপবতী, গুণবতী আর বিদূষী মেয়ে অনেক মিলবে। আমার আশেপাশে, পরিবেশে, পরিচিত আর বন্ধুমহলে এমন আশা আশঙ্কায় গড়া সহজ সাধারণ মেয়ে অনেক আছে। কিন্তু আজ দিনের অন্তে আমার মনের আকাশ বেদনায় রাঙিয়ে সবিতার সঙ্গে যে সূর্য্যতনুজা বিদায় নিয়ে গেল—কোনও সুপ্রভাতের উদয়াচলকে আলোকোদ্ভাসিত করতেই সে আর ফিরে আসবে না। এক গোপন অপরাধবোধে ভরে উঠল আমার মন। মনে হল, আমার অবচেতন কামনার তীব্র আকর্ষণেই স্বর্গের অধিবাস থেকে বাসনার জগতে নেমে এসেছে আর নিষ্প্রভ হয়ে গেছে বুঝি সুরলোকবাসিনীর দীপ্তশ্রী। কিন্তু এ লুপ্তসত্তা হৃতগৌরব বিসদৃশের প্রতিদিনের সন্নিধি যে অনুশোচনার অন্তর্দাহনে পলে পলে আমার প্রাণশক্তিকে হরণ করে জীবনমৃতের পর্য্যায়ে নিয়ে যাবে আমাকে। তাই তো পলায়নী মনোবৃত্তির নিশ্চিন্ত অবরোধে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছি আমি। সব চাওয়া পাওয়ার ইতি করে দিয়েছি এক কথায়—স্বেচ্ছায় আর সাগ্রহে।

শব্দের তরঙ্গভঙ্গে রজনীর অন্ধ নীরবতাকে বিচূর্ণ করে গীটার বেজে চলেছে—অতন্দ্রায়। ক্ষিপ্রহাতের তাড়নায় অসংলগ্ন কত নতুন সুরের সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। আবার অনবহিতির মাঝেই হারিয়ে গেছে তারা। শুধু সিগারেটের ধোঁয়া, সুরের ইন্দ্রজাল আর চিন্তার অবগাহন। তারই মাঝে একসময়ে চমকে উঠলাম আমি। অমিয়ক্ষরা এক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার আবিষ্কার হল আমার যন্ত্রে। আর সেই উদ্ভাবনের উদ্ভাসনায় তখনই এক অভিনব উপলব্ধিকে চিনে নিলাম নির্দ্বন্দ্বে।

মর্ত্ত্যের কোনও লাঞ্ছিত কামনাকে ক্ষমা করে না আর সিদ্ধার্থ করতে পারে না বুঝি অমৃতের কন্যার দৃপ্ত গরিমা। তাই সাধারণীর রূপ-আবরণে এক সযত্ন প্রতারণার প্রকরণে অভীপ্সার মনের কাছে অনাধিগত থেকে যেতে চেয়েছে, ঐ দুরভিলষিতার জীবন দর্শন। সব ভুলের শেষে হল এতক্ষণে—সব জ্বালার নিরসন। পেয়ে হারানর ব্যথা ভুলে গেলাম নিমেষে। দর্শনকে চোখের দেখায় চিনেছে কি চেনেনি এক বিচিত্ররূপিনীর আঁখিকোণ—সে কথা অপ্রকাশই থাক। তবু আমি তো চিনেছি, জেনেছি আর বুঝেছি তাকে অসংশয়ে। আমার মনের ঘন আঁধার ঘুচিয়ে আনন্দ-অনুভূতির আলোকচর্চ্চিতা প্রেয়সী যে আমার ফিরে এসেছে। প্রেয়সীর রূপে তার নব অভ্যুদয়ের নিশ্চিত আভাস দেখেছি খোলা জানালার পথে পূব আকাশের ঐ অনূদয়ের রক্তলেখায়।

আর দ্বিধা নেই কোনও। ভাবীকালের দিনগুলির কল্পনাচরণ এবার শেষ হয়েছে। ব্যর্থকাম—তবু তো ব্যর্থ প্রেম নই আমি। প্রীতিবিলাপেরও তাই প্রয়োজন নেই আর। ঈপ্সিতাকে একান্ত করে না পাওয়ার আর্ত্তিতে আমরণ অপরিগ্রহে দিনাতিপাত করে যাব—এমন মনের অসারতা আমার নেই। স্ব শ্রেণী আর সমাজ থেকে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত এক মেয়েকে খুঁজে নেব আমি অন্যদের সহায়তায়। আর তাকেই আমার বেটার হাফের মর্য্যাদা দেব নির্ব্বিচারে। তার পর সকলের সুখ আর শুভৈষণায় আকীর্ণ পথে শুরু হবে আমাদের সহর্ষ মিলনযাত্রা। বৃহত্তর সংসারের ক্ষেত্রে আধুনিক আদর্শ দম্পতির ত্রুটিহীন আর অনুকরণীয় এক স্বর্ণময় দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা করে যাব নির্ব্বাধ সাফল্যে। পূর্ব্বরাগ নয় আর—বিবাহোত্তর প্রেমের দীক্ষা নেব এবার নিয়মের অনুক্রমে।

আকাশের অস্তরাগেই তো সব আশার অবসান নয়—সে যে তরুণ দিনের অরুণ আলোর ইশারা। বালার্কের রাগরূপে আর কাকলীর প্রভাতী বন্দনায় সেই সত্যই আজ প্রতিভাত হয়েছে আমার সংজ্ঞায়। দ্রুততর হয়েছে হাতের গতি। সুরধ্বনির সুরধুনি থেকে মনের ময়ূরপঙ্খী বেয়ে সুরলোকের মন্দাকিনীতে এসে পড়েছি কখন। আর অসীম আনন্দের ধারায় মুক্তিস্নান করে—বাসনার ক্লিন্নতা, বেদনার খিন্নতা থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে—শুভসত্ত্ব হয়ে গেছি আমি। দিব্যদৃষ্টিতে দেখে নিয়েছি আমার দেবোপমা জীবন নায়িকাকে। না, আর শঙ্কা নেই কোনও। মিলনান্ত না হোক—বিষাদ করুণও হবে না এ কাহিনীর পরিণতি। কুঙ্কুমের বর্ণচ্ছটায় সোহাগিনী প্রাচীকে অনুরঞ্জিত করে সপ্তাশ্বের রথে দিবাকর এবার এসে দাঁড়িয়েছেন ধরণীর শিয়রদেশে। তার কল্যাণকরস্পর্শে সোনার হাসিতে উছলে উঠেছে বসুধার মুখ। চেয়ে চেয়ে দেখছি আমি তাই। এখন আমি নিচে যাব। গিয়ে দাঁড়াব আমার বাহির দুয়ার প্রান্তে। হৃদয় পাত্রখানি পূর্ণ করে নেব রূপ ঝরোঝরো প্রকৃতির ঐ গন্ধে বর্ণে ছন্দে গানে আর আনন্দের অভিধায়ে। আজ আর কোনও ময়ূখ-বিচিত্রা বরবর্ণিনী আসবে না তপন-নন্দিনীর গৌরবে ঐ তপদীপ্ত পথ বয়ে আমার নয়নকে আকুল করে যেতে। কিন্তু সে তো আছে প্রতিক্ষণে আমার মনে—অনুরাগের নিরজনে।

মর্ত্ত্যের প্রগলভ অভিরুচীর অর্থিত অভিহত হয়ে গেছে ঐ গরীয়সী দেবদুলারীর প্রথমস্বর্গের প্রাঙ্গণে। নিঃসীম আমার অপরাধ—
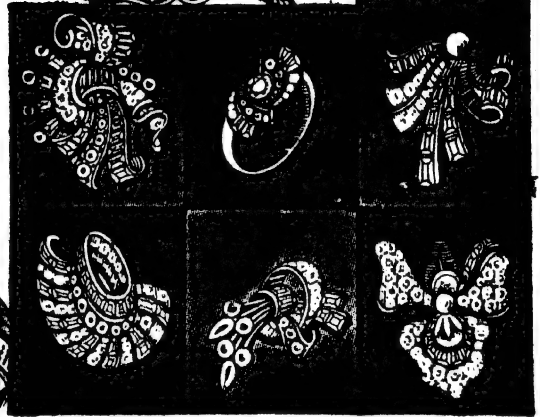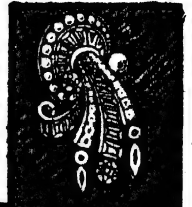
অন্তহীন বুঝি তার প্রায়শ্চিত্ত! তবু সেই সর্বোত্তমার বিভাসার সঙ্গে সঙ্গেই তো মনের আদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল একদিন—সব অবিদ্যা আর অনাচারের তমসা থেকে স্বভাবের অজ্ঞাত দিকটার উন্মোচন হয়েছিল আমার—আর নব জাগরণের অধ্যায় সংযোজিত হয়েছিল জীবনে। সেই প্রথম উন্মেষের পরম মুহূর্তটি যে প্রতিদিনের অন্তরে সুচির হয়ে গেছে—সে কথা আমি অস্বীকার করব কেমন করে! এক মাটির মেয়েকে নিবিড় আশ্লেষে বুকের মাঝে ধরেও হৃদয়ের সঙ্গোপনে যে এক অপার্থিব অপ্রাপনীয়ার স্পর্শন আবেশেই উথল হব আমি—এর চেয়ে সত্য তো আর কিছু নেই। আগামী দিনের কত অলস অবসরে, অবসাদের চিত্তবিক্ষেপে মানসলোকের উন্মুখতায় নিঃশব্দচরণে অবতীর্ণ হবে এক অতনুকা মেয়ে। সান্ত্বনার হাসিতে স্নিগ্ধ শান্তির চন্দন অবলেপে জুড়িয়ে দেবে আমার সর্বদেহের, তাপদগ্ধ অন্তরের যত প্রখরতার জ্বালা—আর জীবন তখন উদ্দীপিত হয়ে যাবে নতুন প্রেরণার উজ্জ্বলতায়।

সূর্য্যসম্ভবা, কাছের চাওয়ায় তোমাকে আমি পাইনি—কিন্তু ধ্যানের পাওয়ায় যে তুমি ধরা দিয়েছ আমার মনে। যোগ্যজনের অনুষঙ্গে প্রীত হও তুমি, অনিন্দিতা। আমার জীবনে অনির্বাণ হয়ে থাকুক শুধু তোমার দিব্যজ্যোতির অরূপ লেখা।

গঙ্গার ধার

কল্যাণী বসু

গঙ্গার ধার!

সামান্য দু'টি শব্দ। কিন্তু এ শব্দ দুটোই অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই গঙ্গার ধারটাকেই নিশিকান্ত বাবু শেষ বয়সের বন্ধু বলে মেনে নিয়েছেন।

ভোরে উঠে ঘণ্টাখানেকের জন্যে তিনি গঙ্গার ধারে গিয়ে বসেন, বিকালের দিকেও বেশ খানিকক্ষণ, দেহের যতো ক্লান্তি মনের যতো গ্লানি সব দূর হয়ে যায় গঙ্গার মিষ্টি হাওয়ায়। সময়টাও কাটে ভালই। একে একে চার পাঁচ জন জুটিও মিলে যায়।

এঁরা নিশিকান্ত বাবুর গঙ্গার ধারেরই বন্ধু। গঙ্গার ধারে এঁদের বন্ধুত্ব আবার গঙ্গার ধার থেকেই এঁদের বিদায়।

কোন কোন দিন তাসের আড্ডা বসে বিকালের দিকে, কোন কোন দিন গল্প,—সংসারের কথা, দেশের কথা। বর্ত্তমান যুগ নিয়ে আলোচনা। ঠাকুর দেবতাও বাদ পড়ে না এ থেকে।

দলের মধ্যে নিশিকান্ত বাবুই প্রথমে এসে বসেন এখানে।

এই গঙ্গাকে আনবার জন্য ভগীরথকে তপস্যা কোরতে হয়েছিল। এই গঙ্গার জলে স্নান কোরে লোকে মুক্তি পায়। গঙ্গার হাওয়া কেমন বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী।

গঙ্গার সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন জেগে উঠে নিশিকান্ত বাবুর মনে, তার পর একে একে এসে জমা হয় সাঙ্গোপাঙ্গরা।

একটা চাতাল অধিকার করে বসেন নিশিকান্ত বাবুর দল।

বিকালের দিকে নিশিকান্ত বাবু যখন একলা বসে থাকেন দেখতে পান কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বেড়াতে এসেছে এই গঙ্গার ধারে। বৃদ্ধের দলও মন্দ নয়।

সন্ধ্যার দিকে আসে সবাই জোড়া জোড়া, স্বামি-স্ত্রী কেউ কেউ বা অন্য কিছু। ছেলে ছোকরার দলও বেশ আসে।

সেদিন গঙ্গার ধার থেকে ফিরতে বেশ রাত হল নিশি বাবুর। বাড়ীর সবাইএর ভাবনা হয়নি যে তা নয়। কি একটা কথা কাটাকাটি হয়েছিল বিকেলের দিকে স্ত্রী সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে।

তাই সহজেই তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন দেরী করে ফেরার কারণ,—কারণটা যতটা সহজ মনে হয়েছিল ততটা সহজ নয় কিন্তু। বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে গঙ্গার ধারেরই ঘটনা বলা চলে।

নিশিকান্ত বাবু বলতে লাগলেন, রাত তখন আটটা হবে। অল্প অল্প শীত তখন পড়েছে। গঙ্গার ধার প্রায় খালি খালি। নিশিকান্ত বাবু উঠে আসছেন বাড়ীর উদ্দেশ্যে। এমন সময় একটি মেয়ে এসে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, কোলে একটি মাস ছয়েকের শিশু।

এত রাত্রে এমনভাবে আসার কারণ জিজ্ঞেস কোরলেন নিশিকান্ত বাবু। মেয়েটি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো।

গল্প শুনতে শুনতে ডিবে থেকে একখিলি পান খেয়ে নিলেন সৌদামিনী দেবী। তারপর আবার মনোযোগ দিলেন।

নিশিকান্ত বাবু আবার বলে চলেছেন। গায়ের লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে তাঁর। মেয়েটি ধাতস্থ হয়ে বলতে আরম্ভ কোরলে। গলার স্বরটা কিন্তু তখনও ভাঙা ভাঙা। মেয়েটির অবস্থা দেখে নিশিকান্ত বাবুর মন গলে গেল। সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু তখনও রহস্যময় হয়ে রয়েছে। সৌদামিনী দেবী আবার একখিলি পান নিলেন। তারপর উঠে বসলেন খাটের উপর।

মেজছেলে মানিক তখন ওঘরে ঘুমোচ্ছে অঘোরে। খাওয়া-দাওয়ার পাট সবারই চুকে গেছে।

নিশিকান্ত বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। আবার আরম্ভ করলেন ঘটনাটা। শিশুটিকে তাঁর হাতে তুলে দিল মেয়েটি। নিশিকান্ত বাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। হয়ত কোন বিপদে পড়েছে।

কি সাহায্য চাও আমার কাছে? প্রশ্ন করলেন নিশিকান্ত বাবু।

সাহায্য? সাহায্য নয়, অনুগ্রহ, অধিকার এই বলেই মেয়েটি আবার কাঁদতে আরম্ভ করলো। রাত্তির তখন অনেকটা গাড়িয়ে গেছে। নিশিকান্ত বাবু বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হলেন।

কান্না থামিয়ে মেয়েটি তখন বললে আইনতঃ আমি আপনার দ্বিতীয় পুত্রবধূ। আর শিশুটি আপনার বংশধর। এইটুকু জানিয়ে তখনকার মত মেয়েটি চলে গেল শিশুটিকে নিয়ে।

ঐ শীতেও নিশিকান্ত বাবুর কপালে ঘাম দেখা গেল। কাহিনী শুনে সৌদামিনী দেবী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

Doubt thou the stars are fire,
Doubt that the sun doth move,
Doubt truth to be a liar,
But never doubt I love.

—*Shakespeare*
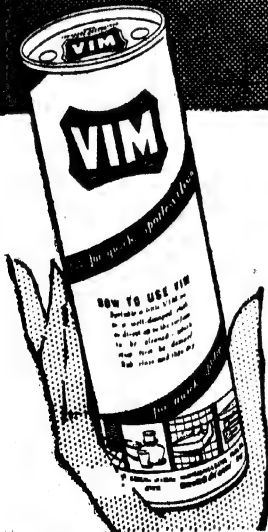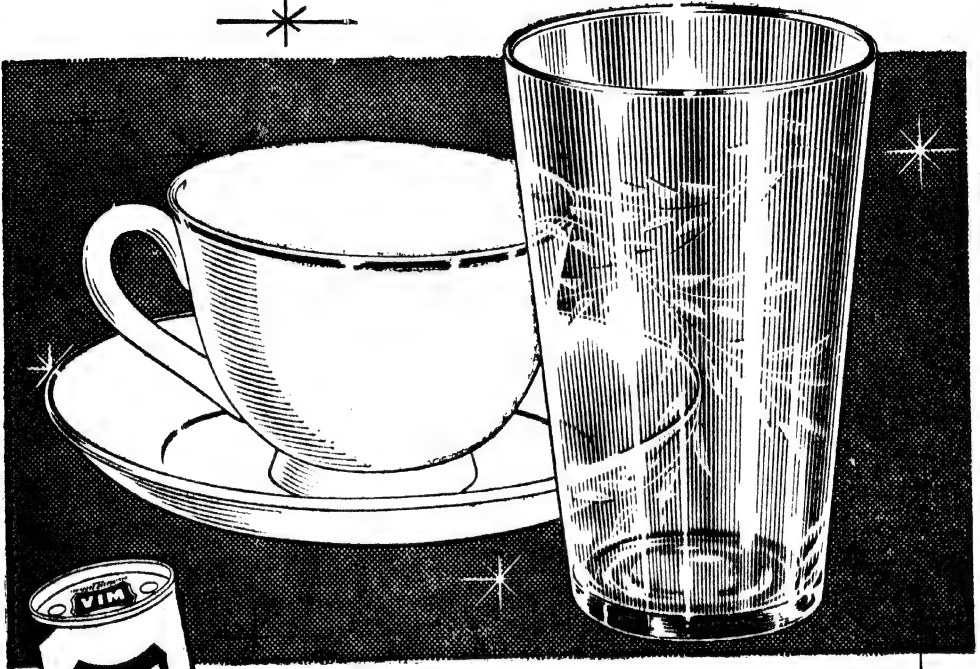
ছোটদের আসর

৪

চক্রান্ত

সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরল কমলেশ। কে এই পত্রলেখক, অমিতাভর সঙ্গে তার সম্বন্ধটাই বা কি ?

বাড়ী ফিরে দেখে প্রশান্ত খাটের ওপর আরাম করে বসে মন দিয়ে গল্পের বই পড়ছে। কমলেশকে আসতে দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, কি রে কমল দেরী করলি যে ?

—কাজ ছিল। কমলেশ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

—আবার সেই বুড়োর পাল্লায় পড়িসনি তো ?

—কে বললে ?

—এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।

কমলেশ জামা কাপড় ছেড়ে সহজ হয়ে বসে বলে, একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে রে।

কমলেশের গলার স্বর শুনে প্রশান্ত মুখ তুলে চায়, কি ব্যাপার ?

—চল দিদির কাছে চল। ঐখানেই সব বলব।

প্রশান্ত আর দেরী করে না, তাড়াতাড়ি চটি পায়ে দিয়ে কমলেশের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

রেণুকা তখনও ঘরে বসে পড়াশুনো করছিল, প্রশান্ত আর কমলেশকে এই সময়ে আসতে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারে না, পড়াশুনো নেই বুঝি, আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিস যে ?

প্রশান্ত উত্তর দেয়, কমল কিছু বলবে বলে এসেছে, নিশ্চয় কোন সিরিয়াস ব্যাপার। যে রকম মুখখানা থমথমে করে রেখেছে।

—কি হয়েছে রে কমল ?

কমল একে একে সব কথা বলে গেল, বুড়োর বাড়ীর ভেতরে যাওয়া, জল খেতে চাওয়া, অমিতাভর চিঠি কেড়ে যাওয়া, যা কিছু। প্রশান্ত আর রেণুকার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এর কিছু বুঝতে পারছ ? বুড়োর সঙ্গে কার যোগাযোগ থাকতে পারে ?

প্রশান্ত বলে, অমিতাভর ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে, ছেলেদের মধ্যেও যে ও গোলমাল পাকাতে চাইছে সে তো আমরা আগেই দেখেছি। নিশ্চয় ওর পেছনে কোন লোক আছে।

—কিন্তু কে সে ?

—তাকেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

দিন কেটে যায়। নিয়ম মত কাজও চলছে কিন্তু আগের সে উদ্দীপনা যেন নেই। বেশীর ভাগ ছেলেরাই মনমরা হয়ে বসে থাকে, পড়াশুনো করে কিন্তু হাসে না। কমলেশ বোঝে এর কারণ অবশ্য সদাশঙ্কর, সদাশঙ্কর সদাহাস্যময় পুরুষ, কখনও তাঁকে মুখ ভার করে থাকতে দেখেনি কমলেশ, হৈ হৈ আনন্দের সে প্রতীক, কিন্তু এ ক'দিন তাকে বড় বিমর্ষ লাগছে। সব সময় চিন্তাগ্রস্ত, ছেলেদের সঙ্গে ভাল করে কথা পর্য্যন্ত বলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে বেড়ান।

রাত্রিবেলা কমলেশের ঘুম ভেঙ্গে গেল, প্রশান্ত পাশের খাটে শুয়ে আছে। বাইরে চাঁদনী রাত, বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসছে। মিঠে দেহাতী সুর।

কমলেশ জানালার কাছে উঠে এসে দাঁড়ায়, বড় চমৎকার লাগছে বাইরেটা দেখতে। জ্যোৎস্নার আমেজে রূপোলী রাংতায় মোড়া গাছপালা, সাদা সাদা ফেনার মত পাতলা কুয়াশা। কমলেশ একদৃষ্টে মাঠের দিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ মনে হল, কে যেন মাঠের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে। প্রথমটা মনে সন্দেহ জাগলেও, ভাল করে দেখে নিয়ে বুঝল, সে আর কেউ নয়, শঙ্করদা। কমলেশের মনে হল সদাশঙ্কর-এর সঙ্গে কথা বলার এই তার পরম সুযোগ। আশে পাশে কোন লোক নেই, নির্বিঘ্নে সে কথা বলতে পারবে।

দ্রুত পায়ে কমলেশ নীচে নেমে আসে। সদাশঙ্কর-এর কাছে গিয়ে ডাকির স্বয় !

—শঙ্করদা।

দিন আগত ঐ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

—কে কমল ? এত রাত্রে উঠে এলি যে ?

—ঘুম হচ্ছিল না। আপনি কি কচ্ছেন ?

সদাশঙ্কর হাসে, আমারও ঘুম আসছিল না, তাই বাঁশীর সুর শুনে চলে এলাম। কি মিষ্টি বাঁশী বাজাচ্ছে না রে কমল ?

কমলেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করব শঙ্করদা ?

—কি কথা কমল ?

—আজকাল আপনি বড় গম্ভীর হয়ে থাকেন। আগের মত আর হাসেন না। কি হয়েছে আপনার ? শরীর ঠিক আছে ?

সদাশঙ্কর হেসেই উত্তর দেয়, দিব্যি খাচ্ছি রোজ, শরীরের আবার কি হবে ?

—তবে কি হয়েছে বলুন ?

—কিছুই হয়নি তো।

—না আপনি বলতে চাইছেন না।

—তাহলেই বোঝ, কেন আমি বলতে চাইছি না। বলে কোন লাভ নেই বলেই তো। একটু থেমে কলোনীর বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে স্থির গলায় সদাশঙ্কর বলে, নিজের হাতে কোন জিনিষ গড়ে যদি আবার তা ভাঙ্গতে হয় তাহলে যে বড় কষ্ট।

—ভাঙ্গতে হবে কেন ?

—তা তোদের কি করে বোঝাব। ভাঙ্গায় মানুষের লোভ, ভাঙ্গায় মানুষের স্বার্থ। যাক্ গে ওসব কথা, অনেক রাত হ'ল শুয়ে পড়।

কমলেশ তবু ছাড়ে না, আমাদের সব কথা খুলে বলুন না, দেখি যদি কিছু করতে পারি।

—যদি কখনও দরকার হয় নিশ্চয় বলব। সদাশঙ্কর কমলেশের কাঁধের ওপর হাত রাখে, গাঢ় গলায় বলে, তোরাই আমার সবচেয়ে বড় ভরসা, জানি আমার পাশে তোরা সব সময় এসে দাঁড়াবি।

ঘরে ফিরে এসেও কমলেশ ঘুমুতে পারে না।

সেদিন শনিবার। মাঠে খেলা শেষ করে ছেলের দল বাড়ী ফিরছিল। কলোনীর কাছ বরাবর এসে দেখে কয়েকটা জীপ আর লরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিদ্যাভবন-এর পূর্বদিকে যে বিরাট মাঠটা পড়ে আছে, যেখানে চাষীরা মাঝে মাঝে ফসল বোনে, সেখানে জন পনের লোক ব্যস্ত হয়ে মাপ জোক করছে। ছেলেদের কৌতূহল হয়, এগিয়ে যায় তাদের দিকে।

নীল রঙের কাগজে আঁকা একটা নক্সা দেখে এরা কাজ করছে। সাহেবী পোষাকপরা দু'জন ভদ্রলোক যে রকম হুকুম করছেন সেই রকম কাজ করছে অন্যেরা।

প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে, এরা কারা রে ?

কমলেশ উত্তর দেয়, যারা নক্সা দেখছে ওরা নিশ্চয় ইঞ্জিনীয়ার।

—কিন্তু এখানে কি করছে ?

—তা তো বুঝতে পারছি না। কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়।

একটি রোগা, লম্বা লোক ফিতে হাতে করে এক কোণায় দাঁড়িয়েছিল, কমলেশ তারি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসের মাপ নিচ্ছেন আপনারা ?

লোকটি উত্তর দেয়, এখানে বাড়ী ঘর সব তৈরী হবে যে।

—কাদের জন্যে ?

—এক মস্ত বড় কোম্পানী, তারা এখানে চিনির কল বসাচ্ছে।

—চিনির কল ?

—হ্যাঁ, সুগার মিল। বিরাট ব্যাপার হবে। দেখতে দেখতে এ জায়গা সহর হয়ে যাবে। দোকান পত্তর, সিনেমা-হল কত কি। কম লোক তো এখানে কাজ করবে না।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় থাক ?

—ঐ স্কুলের হোষ্টেলে।

—স্কুলের চেহারাও বদলে যাবে। মিল টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। দেখবে কত বড় ইস্কুল হয়ে যায়।

লোকটি কথা শেষ করতে পারে না, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব মাপ নেবার জন্যে ডাকায় সে চলে যায়। ছেলের দলও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে আসে। অনেকে বলে, এ কিন্তু বেশ ভালই হল, খুব চিনি খাওয়া যাবে, বাড়ীর পাশেই চিনির কল, কি মজা !

অমিতাভ জোর দিয়ে বলে, ভালতো হবেই, সহরে যাবার আর আমাদের দরকারই হবে না। এখানটাই তো সহর হয়ে যাবে। প্রত্যেক রোববার আমরা সিনেমা দেখব, কি মজা।

কমলেশ কিন্তু গম্ভীর স্বরে বলে, আমার কিন্তু ভয় লাগছে, আমি সহরের ছেলে কি না।

অমিতাভ রুখে ওঠে, ভয় আবার কিসের ?

—যে শান্তির মধ্যে আমরা পড়াশুনো করছি। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে মধুর সম্পর্ক তা সব নষ্ট হয়ে যাবে। আমরাও কলকাতার ছেলেদের মত শুধু হৈ হৈ নিয়েই মেতে থাকব। পড়াশুনো আর কিছু হবে না।

—শুধু পড়াশুনো নিয়েই থাকলে তো হবে না, বাইরের জ্ঞান আমাদের কি করে হবে ? বাইরের জগতের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক আমাদের। এখানে বেশীদিন থাকলে আমরা তো কূপমণ্ডুক হয়ে যাব।

কমলেশ রাগের সঙ্গেই বলে, পাঁচটা রাজনৈতিক আন্দোলন করলেই বাইরের জ্ঞান হয় না, ছাত্রদের পড়তে হবে, হাতে কলমে গঠনমূলক কাজ করতে হবে, যা আমরা এখানে করছি। দুঃখীর দুঃখে কাঁদতে হবে, সুখীর আনন্দে হাসতে হবে, সেই যেন আমাদের আদর্শ হয়।

অমিতাভ খ্যাক খ্যাক করে ওঠে, ওতো সব শঙ্করদার কথা, তুই কপচাচ্ছিস কেন ?

কমলেশ ধীরস্বরে উত্তর দেয়, উনিই যে আমার গুরু।

অমিতাভর সঙ্গে দু' একজন ঠাট্টা করে হেসে উঠলেও বাকী সবাই চুপ করে শোনে, তারা বোঝে কমলেশের কথাগুলোর মধ্যে শুধু গুরুভক্তিই নয়, কতখানি আন্তরিকতা লুকিয়ে রয়েছে।

বাড়ী ফিরে কাপড় জামা বদলে কমলেশ আর প্রশান্ত গেল রেণুকার কাছে। রেণুকা বাড়ী ছিল না, কিন্তু মণিকাদি তাদের ভেতরে ডাকলেন, হ্যাঁরে, শঙ্করদাকে দেখেছিস ?

—কই না তো !

—কোথায় যে চলে গেলেন।

কমলেশ উদ্বিগ্ন হয়, কেন কি হয়েছে ?

—ক'দিন থেকেই শরীর খারাপ, ওষুধ পত্র কিছু খাচ্ছেন না। আজ একবার এলেন, কি যে বিড় বিড় করে বলতে বলতে চলে গেলেন কিছু বুঝতে পারছি না।

কমলেশ গম্ভীর গলায় বলে, আমি ক'দিন থেকে তাই দেখছি। অথচ জিজ্ঞেস করলে কিছু বলেন না। আপনি নিশ্চয় সব কিছু জানেন মনিকাদি। আমাদের সব খুলে বলুন। কি হয়েছে শঙ্করদার, কেন এত ভাবছেন ?

মনিকাদির বলবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু কমলেশ আর প্রশান্ত এত বেশী পীড়াপীড়ি সুরু করল যে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, বললেন, বলছি, কিন্তু কাউকে একথা বলিস না, এমন কি শঙ্করদাকেও না। যদি শোনেন আমি তোদের বলেছি তাহলে বিরক্ত হবেন।

—না, না, আমরা কাউকে বলব না।

মনিকাদি জানালার কাছে উঠে গিয়ে পুবদিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ঐ মাঠের ওপর বিরাট এক কল বসবার কথা হচ্ছে।

—সে আমরা জানি, ইঞ্জিনীয়াররা মাপ-জোক করছে।

—যদি ঐ কল বসে যায় তাহলে শঙ্করদার এতদিনের পরিশ্রম সব নষ্ট হবে। এ আদর্শ স্কুল আর থাকবে না। সেই জন্যেই ওঁর মনে এত কষ্ট।

কমলেশ অসহায় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, এই কল বসান বন্ধ করা যায় না ? তার কি কোন উপায় নেই ?

—উপায় নেই তা বলব না, তবে তা এক রকম অসম্ভব।

—কি, তা বলুন ?

—ঐ যে পুবদিকের জমি, ওটা হ'ল ঐ যক্-বুড়োর। সে ভারি সাংঘাতিক লোক, আমাদের মোটেই ভাল চোখে দেখে না, তাই ঐ জমি যখন আমরা কিনতে চেয়েছিলাম দেয়নি। এখন শুনছি চিনির কলওয়ালাদের নাকি বিক্রী করছে।

কমলেশ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, বিক্রী এখনও হয়নি তো ?

—না।

—দেখি, আমি যদি কিছু করতে পারি।

মণিকাদি ম্লান হাসেন, তুই কি করবি, সে একটা পিশাচ আর শুধু তো ঐ বুড়ো নয় আমাদের মধ্যে থেকেও কেউ ঐ কলওয়ালাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

—কি করে বুঝলেন ?

—তা না হলে হঠাৎ এই কলোনীর পাশে বিশেষ করে যেখানে এত বড় ছেলেদের স্কুল রয়েছে সেখানে কি মিল বসতে পারে ? আমাদেরই মধ্যে থেকে কেউ কলোনীর বাসিন্দাদের রাজী করিয়েছে, তাদের কাছ থেকে মিল বসাবার অনুমতি পেয়েছে কোম্পানীর মালিকরা।

—কিন্তু কে সে ?

—তা আমি জানি না। হয়ত শঙ্করদা জানেন, কিন্তু কাউকে বলতে চান না।

—আমরা তাকে খুঁজে বার করব। এ স্কুল আমরা ভাঙ্গতে দেব না। যে রকম করে হোক শঙ্করদার আদর্শকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব।

মনিকাদির বাড়ী থেকে কমলেশরা বাড়ী ফিরল না। দু'খানা টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শহরের রাস্তায়। যেতে যেতে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করে, বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে রে কমল, এখন কোথায় যাচ্ছিস ?

—সেই যক্ষপুরীতে।

—এত রাত্রে গিয়ে কি লাভ হবে ?

—যক্-বুড়োর সঙ্গে আজ আমি সরাসরি কথা বলতে চাই। এ জমি আমি তাকে কিছুতেই বিক্রী করতে দেব না।

হন্ হন্ করে পা চালিয়ে তারা যখন যক্ষপুরীর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে। বাইরের গেট দিয়ে না ঢুকে কমলেশ সেদিন বুড়োর সঙ্গে বেড়ার যে ফাঁক দিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকেছিল সেই পথ দিয়ে চলতে সুরু করল। নীচু গলায় প্রশান্তকে বলে, খুব সাবধানে পা ফেলিস, বেশী শব্দ যেন না হয়। তাহলেই বুড়ো টের পেয়ে যাবে।

প্রশান্ত ভয়ে ভয়ে বলে, এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না রে কমল, আরো লোক নিয়ে আসা উচিত ছিল। যদি একবার বুড়ো ধরে ফেলে তাহলে আর প্রাণ নিয়ে পালাতে পারব না।

খিড়কীর দরজার কাছে এসে কমলেশ আস্তে ঠেলে দেখে দরজা খোলা। প্রশান্তকে কাছে টেনে নিয়ে বুঝিয়ে বলে, আমি ভেতরে ঢুকছি, তুই ঐ বড় গাছটায় পেছনে লুকিয়ে থাক, যদি আমার ফিরতে দেরী হয় শঙ্করদাকে গিয়ে খবর দিস।

—আমি কি একলা থাকতে পারব ?

—খুব পারবি।

কমলেশ মৃদু পায়ে যক্ষপুরীর ভেতরে ঢোকে, প্রকাণ্ড বারান্দায় ডানদিকের ঘরে আলো জ্বলছে, আর সমস্ত বাড়ীটায় অন্ধকার। কমলেশ ধীর পদক্ষেপে সেই দিকে এগিয়ে যায়। টুকরো কথাবার্তা কানে ভেসে আসে। বুড়োর গলা সে চেনে, খনখনে গলায় কাকে যেন জিজ্ঞেস করছে, সকলের মত আপনি পেয়েছেন ? পরে কেউ আপত্তি করবে না ? দৃঢ়স্বরে কে উত্তর দিল—না।

—জমি আমি বেচব না ঠিক করেছিলাম। তবে এত টাকা যখন দিচ্ছে, দশগুণ টাকা, তার ওপর ঐ লোকটার দম্ভ চূর্ণ হবে। সেই যে সদানন্দর না কে ? আমাকে হুমকী দিয়ে বলেছিল, ভাল চানতো জমি আমাদের বিক্রী করে দিন, পরে আর লোক পাবেন না কেনবার। তখন আমরাই জোর-দখল করে বসব। এখন সে কি বলে।

—মুখ শুকিয়ে চুণ হয়ে গেছে।

—হবে না ? সব বড় বড় কথা, আদর্শ। এইবার কি করে ইস্কুল চালায় আমি দেখব। ঠিক আছে, আমায় আর কয়েকটা দিন সময় দিন, এই শেষ মাসটা কেটে যাক। তাহলেই সই-সাবুদ করে দেব।

—আপনি যখন কথা দিয়েছেন আর আমাদের ভাবনার কিছু নেই। সামনের শনিবার এই সময় এসে আমি সব কাগজপত্র আপনাকে দেখিয়ে যাব।

—ঠিক আছে।

কমলেশ কান খাড়া করে থেকেও অনেকক্ষণ আর কোন কথা

রাতের কলকাতা

॥ আ লো ক চি ত্র ॥

দিনের কলকাতা

গিরিরাজ —রাধাগোবিন্দ বসাক

খাদ্যকীট —বাসুদেব মুখোপাধ্যায়
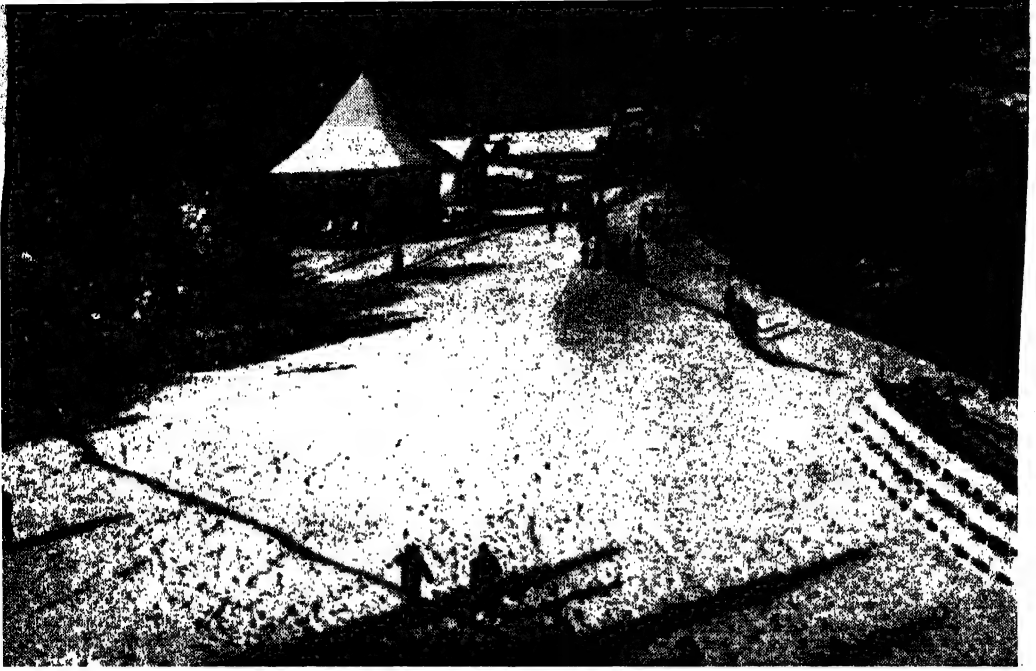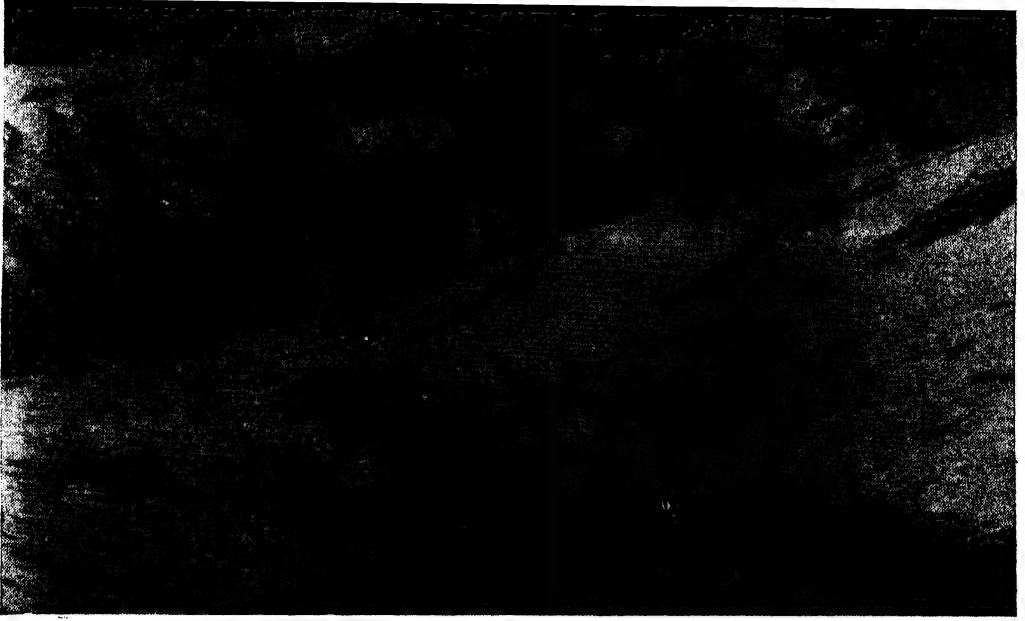
সিমলা পর্বত —শান্তিকুমার গুপ্ত

রাজগীর তীর্থ —কেশবরঞ্জন পাল

আলোক-ঝর্ণা —ব্রজকিশোর রায়

শুনতে পায় না, বোধে বুড়ো বোধহয় ভদ্রলোককে নিয়ে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধির কাজ হবে না ভেবে কমলেশ খিড়কীর দরজা দিয়ে আবার বেরিয়ে আসে। প্রশান্তকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, বুড়োর সঙ্গে কাউকে বেরুতে দেখেছিস ?

প্রশান্ত চুপিস্বরে বলে, দূরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি, মনে হচ্ছে সদর রাস্তা দিয়ে কারা যাচ্ছে।

—তুই এক কাজ কর, আমরা যে রাস্তা দিয়ে এলাম সেই রাস্তা দিয়েই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যা, হয় ত লোকটাকে ধরতে পারবি। শুধু মুখটা চিনে রাখলেই হবে।

—আর তুই ?

—আমি এখন এখানেই থাকব, যক-বুড়োর সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না।

—যদি কোন বিপদ হয় ?

—ভগবান আছেন।

আর কোন কথা না বলে কমলেশ আবার খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকে যায়। প্রশান্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মনস্থির করে ফেলে। সদর দরজার কাছে মিলিয়ে যাওয়া পায়ের শব্দকে লক্ষ্য করে দ্রুতপায়ে হাঁটতে সুরু করে। [ক্রমশঃ।

কেন টাক পড়ে

শ্রীছায়া চৌধুরী

তোমাদের কারও মাথায় কি টাক পড়েছে ? তোমরা বলবে, নিশ্চয়ই না। কিন্তু টাক পড়েছে এমন মানুষ নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। টাকওলা মানুষের কথা মনে পড়ে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব হাসি পাচ্ছে। কিন্তু হেসো না। যে কোন মানুষেরই টাক পড়তে পারে। অতএব, সাধু সাবধান !

কিন্তু টাক পড়ার কারণ জানো কি ? এবার সেই কথাই বলবো।

সাধারণতঃ কোন আঘাত অথবা গভীর দুঃখ হলে মাথার চুলগুলো সব উঠে যায়। আমেরিকায় পেন্‌সিলভানিয়াতে ডাক্তারদের এক সভায় পিটস্‌বার্গের Dr. Charles L. Schmitt এ তথ্যকে স্বীকার করেছেন। তাঁর মতেও হঠাৎ কোন গুরুতর আঘাতে মাথায় টাক পড়ে।

তাঁর কাছে যে সমস্ত রোগীরা এসেছেন—তাঁদের শুধু মাথার চুলই পড়ে যায়নি—এর সঙ্গে সঙ্গে ভুরু, চোখের পাতা সব ঝরে পড়ে গেছে। পঞ্চাশ জন রোগীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক রোগীরই চুল পড়ে যাওয়ার কারণ হল, শারীরিক অথবা মানসিক কোন আঘাত।

সব চাইতে অদ্ভুত প্রমাণ পাওয়া গেছে একজন রোগীর কাছে। তিনি নৌবহরের একজন চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। একবার তিনি খুব জোরে একটা নৌকো চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা যে কখন ধাক্কা খেয়ে ফেটে গেছে তা তিনি লক্ষ্যও করেন নি। এত বেগে তিনি চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ একসময়ে জলের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে তিনি ভীষণ অবাক হয়ে যান।

এরই ঠিক আঠারো দিন পরে, এক সোনালী সকালে উঠে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর মাথার সব চুল বালিশের উপরে পড়ে আছে। শুধু কপালের সামনের দিকটায় সামান্য কিছু চুল তখনও অবশিষ্ট আছে। ভাবো তো একবার তাঁর অবস্থাটা।

এর প্রায় ছয় মাস পরে, কোন চিকিৎসা না করলেও, আবার তাঁর চুল গজাতে থাকে। টাকও ঢেকে যায়। এর কয়েক বছর পরে, বরফের উপর 'স্কী' করার সময়ে হঠাৎই তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে একটা পাথরের উপর জোর ধাক্কা খান। এর ঠিক উনিশদিন পরে, আবার তাঁর সব চুল ঝরে যায়, অবশ্য কয়েক মাস পরে আবার তাঁর চুলগুলো যথাস্থানে ফিরে এসেছিল।

Dr. Schmitt-এর মতে নারী-পুরুষ সকলেরই টাক পড়ার একই রকম কারণ। বাইশ বছরের এক স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী তরুণী বিমান-বাহিনীর এক সৈন্যকে বিয়ে করে। বিয়ের নয় মাস পরে, হঠাৎ একদিন তার কাছে সংবাদ এল, 'কার্য্যরত অবস্থায় তোমার স্বামী যীশুর সান্নিধ্য লাভ করেছেন।'

দু'-সপ্তাহ পরে তার স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দিল। এর পরেই তার সমস্ত চুল উঠে গেল। মাথায় দেখা দিল মস্ত টাক।

এদিকে বাস্তবিক তার স্বামী মারা যায়নি শুধু বন্দী হয়ে বিপক্ষ শিবিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। স্ত্রীটি শীঘ্রই এ খবর পেল। কিছুদিন পরে, যুদ্ধ থামলে, তার স্বামী ঘরে ফিরে এল—আর আশ্চর্য্য, তার মাথার চুল আবার আপনা-আপনিই গজাতে শুরু করলো। কিন্তু শাশুড়ীর অত্যাচারে গভীর দুঃখে আবার মেয়েটির মন ভেঙে পড়লো। আবার তার চুল সব উঠে গেল। কিন্তু এক বছর পরে, যখন সে স্বামী নিয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গেল আবার তখন চুল বাড়তে লাগলো।

এসব ঘটনাই পরীক্ষিত সত্য। কাজেই ভাবো তো, একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাথায় হাত দিয়ে দেখলে চুলগুলো সব আপনা-আপনি উঠে বালিশের উপর পড়ে আছে, তাহলে কেমন হয় ?

অভিশপ্ত ম্যমি

দেবব্রত ঘোষ

বিংশ শতাব্দীর অতিমাত্রায় বিজ্ঞান-সচেতন ও জড়বাদী মানুষ তার বিচার বুদ্ধির সাহায্যে আজ পর্য্যন্ত যে কয়টি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কোন সমাধান করতে পারেনি মিশরের "পিরামিড রহস্য" হল তাদের মধ্যে অন্যতম। কথিত আছে, তিন হাজার বছর আগে ফ্যারাওদের সমাধি অর্থাৎ পিরামিডের দ্বার রুদ্ধ করবার সময় মিশরীয় পুরোহিতরা এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ উচ্চারণ করেছিলেন—যারা পিরামিড বিকৃত অথবা অপবিত্র করবে দেবতার অভিশাপে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত ; পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য প্রাচীনকালের মিশরীয় পুরোহিতদের এই অভিশাপকে আজকের দিনে নিছক কুসংস্কার বলেও হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কারণ পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে উৎসাহী যাঁরাই এ যাবৎ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিশরের পিরামিড খোঁড়াখুঁড়ি করেছেন তাঁরাই অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এমন কি, পিরামিড লুণ্ঠনকারী দস্যুরাও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি।

বিশ্বস্তসূত্রে যতদূর জানা যায়, এই অভিশাপের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বলি হলেন আরবের মরুচারী বেদুইন দস্যুসর্দার হালেফ ইবন আব্বাস। তিনি ধনরত্নের লোভে তাঁর দলবল সহ অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী সম্রাজ্ঞী তাকাচৌত-এর পিরামিড লুণ্ঠন করেন। কিন্তু তারপরই শুরু হয় এক রহস্যময় মৃত্যুলীলা। প্রথমেই লুণ্ঠিত ধনরত্নের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে নিজেদের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধের ফলে দলের প্রায় অর্দ্ধেক লোক প্রাণ হারায়। অবশিষ্ট যারা জীবিত ছিল তাদের মধ্যে সাতজন কলেরায়, তিনজন জলপিপাসায় ও একজন সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একমাত্র হালেফ ইবন আব্বাস জীবিতাবস্থায় কোনক্রমে লুবিয়া মরুভূমির ওয়াদি হাফার পর্য্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। সেখানে তিনি এক অনুগত সর্দারের মরূদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে তাঁরও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে ও তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে মরুভূমির মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট হন।

১৯১৩ সালে বিখ্যাত জার্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ হাইনৎস্ কোহলার-এর নেতৃত্বে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্যের ফলে লাক্সারে ফ্যারাও-প্রেয়সী ভুবনমোহিনী সুন্দরী নেফারত্তিতির ম্যমি আবিষ্কৃত হয়। কয়েক মাস পরে জার্মাণীতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ডাঃ কোহলার। কিছুদিন পরে তাঁর সহকারী হেরন এগোন স্নাইডমান অজ্ঞাত কারণে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। সর্ব্বশেষ, মিশরতত্ত্ববিদ প্রফেসর নিদার কুর্ট ডুসেলডর্ফে এক ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনায় নিহত হন। এইভাবে ডাঃ কোহলার-এর দলের সকলেই একে একে দেবতার অভিশাপে প্রাণ হারান।

এর পর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃটিশ পুরাতত্ত্ববিদ মিঃ হাওয়ার্ড কার্টার অষ্টাদশ মিশরীয় রাজবংশের বালক-রাজা টুটেনখামেনের ম্যমির সন্ধানে মিশরের লাক্সারে আসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, মিঃ কার্টার তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসন্ধানকারী ডাঃ কোহলার-এর দলের "রহস্যজনক কাহিনী" বেশ ভালো ভাবেই জানতেন। তবুও এতগুলি মৃত্যুকে তিনি কাকতালীয় (accidental) বলে উপেক্ষা করে বালক-রাজা টুটেনখামেনের ম্যমি আবিষ্কারের আশায় লাক্সারে সমাধি খননকার্য্য শুরু করেন।

কিন্তু ছয় বৎসর ধরে অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করেও যখন টুটেনখামেনের সমাধির কোন হদিশ পাওয়া গেল না তখন ভগ্নোৎসাহ হয়ে মিঃ কার্টার মনস্থ করলেন, বন্ধ করে দেবেন এই নিষ্ফল অনুসন্ধান কার্য্য। আর ঠিক সেই সময়ে যেন ইচ্ছে করেই সুপ্রসন্ন হলেন ভাগ্যদেবী।

সেদিনটা ছিল ১৯২২ সালের ৪ঠা নভেম্বর। খর্ব্বকায়, পক্বকেশ, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মিঃ কার্টার একাই লাক্সারে প্রাচীন মিশরের রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রে (Royal Necropolis) খননকার্য্য পরিচালনা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল ষষ্ঠ রামেশিসের সমাধির কাছে একসার চুণা পাথরের সিঁড়ি। ছত্রিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে খননকার্য্য চলার পরে জানা গেল ষষ্ঠ রামেশিসের সমাধির কাছাকাছি আরো একটি সমাধি আছে। তবে তার প্রবেশপথ প্রাচীরে প্রস্তরনির্মিত কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। রুদ্ধ কপাটের গায়ে উৎকীর্ণ রাজকীয় প্রতীক। তিন হাজার বছরের ধুলো-মাটির স্তরে বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু ঝানু পুরাতত্ত্ববিদ মিঃ কার্টারের চোখ সহজে প্রতারিত হবার নয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জরুরী কেব্‌ল্ গ্রাম করলেন ইংল্যাণ্ডে লর্ড কারনারভনের কাছে। তিনি তখন দেশে বিষয়-সম্পত্তির তদারক করছিলেন। যাই হোক, কেব্‌লগ্রাম পেয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে মিশরে ফিরে এলেন লর্ড কারনারভন। ২৬শে নভেম্বর নথিপত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করলেন, ওইটাই বালক-রাজা টুটেনখামেনের সমাধি। অবশ্য এ সংবাদটি প্রথম দিকে তিন দিনের জন্য বিশেষ কারণে গোপন রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে মিঃ কার্টার ও লর্ড কারনারভন তাঁদের কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকারীর সাহায্যে সমাধির বহিঃস্থ কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করতে সমর্থ হন। তার পর ভূগর্ভস্থ গুপ্ত কক্ষের সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সুতীব্র টর্চের আলোয় তারা যে দৃশ্য দেখলেন তিন হাজার বছরের মধ্যে কোন মানুষের চোখ সে দৃশ্য দেখেনি। নিস্তব্ধ প্রহরীর মত দণ্ডায়মান অসংখ্য পূর্ণাবয়ব প্রস্তরমূর্ত্তি, স্বর্ণসিংহাসন, রথ, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য সম্বলিত পেটিকা, আলবাষ্টার-নির্ম্মিত পাত্র, বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত মৃন্ময় আধার, বহুমূল্য কিংখাব ও আরো নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। নবাবিষ্কৃত মহাদেশে এসে অভিযাত্রীর দল যেমন মুগ্ধবিস্ময়ে মূক হয়ে চেয়ে থাকে তেমনি এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়েছিলেন মিঃ কার্টার, লর্ড কারনারভন ও তাঁদের দলবল। ভুলে যাওয়া এক অতীত ইতিহাসের সন্ধানে এ তারা কোথায় এসে উপস্থিত হলেন?

১৯২২ সালের ৩০শে নভেম্বর এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের সংবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হলে সারা পৃথিবীর পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হয়। সকলেই জানতে পারলেন—মিঃ কার্টারের নেতৃত্বে নীল নদের পশ্চিম তীরে রাজন্যবর্গের উপত্যকায় অষ্টাদশ মিশরীয় রাজবংশের বালক-রাজা টুটেনখামেনের সমাধি-সৌধ আবিষ্কৃত হয়েছে।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। যেদিন টুটেনখামেনের সমাধির মূল কক্ষটি উন্মুক্ত করা হল সেদিন আবার ঝলসে উঠল পুরাতাত্ত্বিকের ছদ্মবেশে বিংশ শতাব্দীর ধনলোভী মানুষের চোখ। কক্ষের অভ্যন্তরে দারু-পেটিকায় কোটি কোটি টাকা মূল্যের হীরা-জহরৎ, এক সার বেদিকা ও লক্ষ্মীর ঝাঁপির মত দেখতে একটি সুদৃশ্য আলাবাষ্টার-নির্মিত পাত্র পাওয়া গেল। পাত্রের ঢাকনাটি খুলতেই মন মাতানো গোলাপ-গন্ধে (aroma of roses) প্লাবিত হয়ে গেল কক্ষ। লর্ড কারনারভন আগ্রহ সহকারে হাতে তুলে নিলেন পাত্রটি। সত্যিই তারিফ করবার মত তার গঠনসৌকুমার্য্য ও স্বচ্ছতা। সামান্য দেশলাই কাঠির আলো পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল পাত্রটির ভিতর দিয়ে। লর্ড কারনারভন ও তাঁর সহকর্মীরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়েছিলেন পাত্রটির পানে। কিছুক্ষণ পরে নিছক কৌতূহলের বশেই তিনি হাত দিলেন পাত্রটির ভিতরে। মাত্র এক সেকেণ্ড। তার পরই তীব্র আর্ত্তনাদ করে হাত বার করে নিলেন লর্ড কারনারভন। তাঁর আঙুলের ডগায় ক্ষুদ্র এক বিন্দু রক্ত। সাত সপ্তাহ পরে তিন দিন যাবৎ জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোদুল দোলায় দুলে ১৯২৩ সালের ৫ই এপ্রিল মারা গেলেন লর্ড কারনারভন। বৃটিশ অনুসন্ধানকারী দলের প্রথম বলি। সকলেই বললেন—টুটেনখামেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনকারী

পুরোহিতদের অভিশাপ। হয়ত তাই। কারণ পরবর্তী তেরো বৎসরের মধ্যে দেখা গেল সমাধি খননকার্য্যে প্রথম উদ্যোগী একুশ জনের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া আর সকলেই অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। অধিকাংশই দুর্ঘটনা, অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা ও হার্লে স্ট্রীটের ডাক্তারদের কাছেও অজ্ঞাত এমন ধরণের রোগে মৃত্যু। অথচ মৃত্যুকালে এঁরা সকলেই মধ্যবয়স্ক, সুস্থ ও সবল ছিলেন। কাজেই এতগুলি মৃত্যুকে কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

যাই হোক, স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বিয়োগবিধুরা লেডী কারনারভন তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাবার জন্যে কায়রো থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত যে জাহাজে প্যাসেজ বুক করেছিলেন বহু যাত্রীই সেই জাহাজে ভ্রমণ করবার পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। কারণ, তাঁরা সকলেই সংবাদপত্রে পড়েছিলেন প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলেই নাকি লর্ড কারনারভনের মৃত্যু হয়েছে। তাই প্রাচীন অভিশাপের ছোঁয়াচ এড়াবার জন্যে তাঁরা এই পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

লর্ড কারনারভনের পর আবার যিনি অভিশপ্ত মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তিনি কিন্তু লেডী কারনারভন নন। তিনি হলেন লে: কর্ণেল অওব্রে হার্বাট। পার্লামেন্টের জনৈক রক্ষণশীল সদস্য ও পরলোকগত লর্ডের ভ্রাতৃভ্রাতা। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে (একটি অপারেশন-এর পর) তাঁর মৃত্যু হয়। লাক্সারে টুটেনখামেনের সমাধি খননের সময় তিনি পার্শ্ববর্ত্তী এক দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বলেছিলেন—আমাদের পরিবারে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে।

অভিশাপের তৃতীয় বলি মার্কিণ মুলুকের বিশিষ্ট রেল-শিল্পপতি ও লর্ড কারনারভনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মি: জর্জ জে গুড। তিনি গোড়ার দিকে সমাধি খননকার্য্য দেখতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ মারা যান মি: গুড রহস্যময় তাঁর মৃত্যু! কারণ আজো জানা যায়নি।

কয়েক মাস পরে ১৯২৪ সালে মি: কার্টার ইংরাজ রেডিয়োলজিষ্ট স্যার আর্চিবল্ড ডগলাস্ রীড-কে আহ্বান জানান টুটেনখামেনের ম্যমি এক্স-রে করার জন্য। কয়েক দিন পরে তিনিও মারা যান। তাঁর বয়স তখন বাহান্ন।

এক মাস পরের ঘটনা। সমাধির মধ্যে বসে কাজ করছিলেন কলেজ অ ফ্রান্সের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পল ক্যাসানোভা। কাজ করতে করতে হঠাৎ সেখানেই মারা গেলেন তিনি। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন—মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ। পুরোহিতরা বললেন অভিশাপ।

সাত মাস পরে বিখ্যাত পণ্ডিত ও মিশরতত্ত্ববিদ মি: এইচ, জি, এভলিনহোয়াইট অজ্ঞাত কারণে একটি ট্যাক্সির মধ্যে রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করলেন। তাঁর পোর্টফোলিয়োর কাগজপত্রের মধ্যে একটি চিরকুট পাওয়া গেল। তাতে তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন—আমি জানতাম আমার উপর একটা অভিশাপ ছিল।

অভিশাপের পরবর্ত্তী বলি মিশরের অভিজাত বংশীয় প্রতিপত্তিশালী জমিদার প্রিন্স আলি কাহমী বে। তিনি লাক্সারে টুটেনখামেনের সমাধি-সৌধ দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে খননকার্য্যের সুবিধার জন্য প্রচুর অর্থও দান করেছিলেন। কিছুদিন পরে একদা নিশীথ কালে তাঁরই স্ত্রী তাঁকে গুলী করে হত্যা করেন। অবশ্য বিচারে মুক্তি পান প্রিন্সেস। জুরীরা এই বলে রায় দেন—তিনি আত্মরক্ষার্থে গুলী চালিয়েছিলেন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই মারা যান প্রিন্সের একান্ত সচিব হাল্লাহ বেন। তিনিও টুটেনখামেনের সমাধি দেখতে লাক্সারে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুও রহস্যময়।

এই ভাবে বছরের পর বছর ধরে চলল এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু-কাফিলা। প্রতিটি মৃত্যুর পর ভীতি-বিহ্বল, ত্রস্ত পৃথিবী উন্মুখ হয়ে থাকতো, এর পর কার পালা? টুটেনখামেনের অভিশাপের পরবর্ত্তী বলি কে?

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনারেবল রিচার্ড বেথেলকে লণ্ডনের বাথ ক্লাবের একটি ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর বাড়ীতে কয়েকবার আকস্মিক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল এবং প্রতিবারই তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন। সমাধি খননকার্য্যের সময় মি: বেথেল ছিলেন মি: কার্টারের সেক্রেটারী।

চার বৎসর পরে। ১৯২৮ সালে মার্কিণ মুলুকের টেক্সাস রাজ্যে এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হলেন আ'রা দু'জন পুরাতত্ত্ববিদ। আর্থার মেস ও ডা: জোনাথন ডব্লিউ কার্ভার। এঁরা দুজনেই ছিলেন কার্টারের সহকর্মী।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মি: কার্টারের দলের আর একজন সদস্য লর্ড ওয়েষ্টবেরী লণ্ডনে সেণ্টজেমস্ স্কোয়ারে তাঁর ফ্ল্যাটের জানলা থেকে ৭২ ফুট নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখে রেখে গিয়েছিলেন—এই আতঙ্ক আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এমন কি তাঁর শবদেহবাহী শকটের ধাক্কায়ও একটি আট বৎসরের বালক নিহত হয়।

ওয়েষ্টবেরীর মৃত্যুর পর আরো একটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হল। টুটেনখামেনের সমাধি উন্মুক্ত হবার পর ছ'জন ফরাসী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সেটি দেখতে গিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা সকলেই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবার সেই বছরই মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা গেলেন মিশর তত্ত্ববিদ মি: মারভিন হার্বাট। চার বৎসর পরে অভিশাপের মৃত্যুবাণে বিদ্ধ হলেন প্রফেসর আলবার্ট লিথগো। ইনি সর্ব্বপ্রথম টুটেনখামেনের সমাধির সন্ধান পেয়েছিলেন।

অভিশাপের মৃত্যুঘাতী শক্তির যেন কোন শেষ ছিল না। ফলে সমাধি-দর্শকদের মধ্যেও অভিশপ্ত মৃত্যুর বীভৎস তাণ্ডবলীলা শুরু হল। বিশিষ্ট মার্কিণ মহিলা এভলিন ওয়াডিংটন ক্রৌলি লাক্সার থেকে চিকাগোয় ফিরে গিয়েই আত্মহত্যা করলেন অজ্ঞাত কারণে। আমেরিকান ফটোগ্রাফার চার্লস নিকোলস নিউইয়র্কের এক গগনচুম্বী হোটেলের জানালা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন। তাঁর মৃত্যুও রহস্যময়।

লণ্ডনে এই অভিশাপকে কেন্দ্র করে নাট্যকার লুই সিগগিন একটি রোমাঞ্চকর নাটক লিখেছিলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হবার এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে ভীত প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দেন উক্ত নাটক।

এখন অনেকের মনেই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, এতগুলি মৃত্যু কি সত্যিই কাকতালীয় না সম্রাট টুটেনখামেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনকারী প্রধান পুরোহিতদের অভিশাপ? যাই হোক না কেন, একজন কিন্তু এ সমস্ত কিছুই বিশ্বাস করতেন না। তিনি হলেন হাওয়ার্ড কার্টার। টুটেনখামেনের সমাধির মূল আবিষ্কর্তা। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে স্বাভাবিক ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাহলে সত্যিই ব্যাপারটা কী? এ নিয়ে অবশ্য অনেক লেখালেখি ও আলোচনা গবেষণা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে ইতালীর আণবিক বিজ্ঞানী ডাঃ লুই বুলবারিনি বলেন—আমি নিঃসন্দেহ যে, সমাধির দ্বার রুদ্ধ করবার আগে মিশরীয় প্রধান পুরোহিতরা সেখানে সামান্য পরিমাণে ইউরেনিয়াম লবণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে দিতেন। এর অর্থ এই যে, হাজার বছরের মধ্যে কেউ সমাধিতে প্রবেশ করলে তার শাস্তি মৃত্যু। আর তার পরে যারা প্রবেশ করবে তারাও নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে, তবে ধীরে ধীরে।

বিশিষ্ট প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ডাঃ মারডাস্ ১৯৩০ সালে ঘোষণা করেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচীন মিশরীয়রা সাত হাজার বছর ধরে মমিগুলিকে একটা গভীর শক্তি (Dynamic Force) দিয়ে ঘিরে রাখার গুপ্ত কৌশল জানতেন। যার সামান্যতম অস্তিত্ব ছাড়া আমরা আর কিছুই অনুমান করতে পারি না।

Coincidence or curse? Radio-activity or some equally deadly supernatural force? The arguments go on—and always in the background is the unexpected trail of death that followed the invasion of Tutenkhamen's tomb.

অর্থাৎ—কার্য্যকারণ সম্বন্ধহীন ঘটনা-সমষ্টি না অভিশাপ? তেজস্ক্রিয়তা না ঠিক ওই জাতীয় কোন মারাত্মক অতিপ্রাকৃত শক্তি? টুটেনখামেনের সমাধি অনুসন্ধানকারী দলের এই ব্যাখ্যাহীন মৃত্যুলীলা সম্পর্কে তর্ক ও গবেষণার আজো শেষ হয়নি।

★

লেখা ও লেখক

"সাহিত্যরচনার গোটাকতক নিয়মকানুন আছে। দেখতে হয়, রসবস্তু অশ্লীলতা-পর্য্যায়ে এসে না পড়ে। শ্লীলতা অশ্লীলতার মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্মরেখা আছে, যার এক ইঞ্চি ওদিকে পা পড়লেই সব vulgar—নষ্ট হয়ে যায়। একটু পা টললেই আর রক্ষা নাই। অবশ্য আমি রসিক লোকের কথাই বলছি। vulgar সাহিত্য সব সময়ে বর্জ্জনীয়। মনোরঞ্জনের জন্য আমি কখনও মিথ্যা কথা বলবো না। এ জিনিষটা আমি পারতপক্ষে করি না। কঠোর সমালোচনা আমি খুবই পেয়েছি। গালাগালির বন্যা বয়ে গেছে। দেশ আর দেশবাসীর অনেকে বোঝে না, গ্রন্থকার কবি চিত্রকর—এঁদের জীবন সাধারণ থেকে একেবারে ভিন্ন। এদেশের লোকে তা বোঝে না। জানে না যে, এঁদের স্নেহের প্রশ্রয় দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মানুষ চায়—এদের অভিজ্ঞতাও লাভ হোক আর আমাদের মত শান্তশিষ্ট জীবনও যাপন করুক। তা হয় না। আর সবচেয়ে ব্যথার বিষয়, আমাদের দেশের সমালোচনার মধ্যে ব্যক্তিগত ইঙ্গিতই থাকে বারো আনা। এ-সব সমালোচনা হয় মানুষটার, বইটার নয়।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

★

কেনাকাটা

অর্থ-বিনিয়োগ—কয়েকটি বিধি

উদ্যমশীল লোক বা ব্যবসায়ী অর্থ-বিনিয়োগ করে থাকেন আশায়, এ জানা কথা। কিন্তু এই বিনিয়োগ ব্যাপারে মুনাফার কয়েকটি সাধারণ বিধি অনুসরণ না করলে নয়। কেন না, খেয়ালখুশি মতো অর্থ-বিনিয়োগে কার্যক্ষেত্রে আশাহত হবার সম্ভাবনাই থাকে বেশি রকম।

ব্যবসা-বাণিজ্যের আসল কথাই হলো—মূলধন অক্ষুণ্ণ রেখে এগিয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে বাজারের সাথে নিবিড় পরিচিতি চাই আর সেটি সর্বসময়ের জন্যে। ছোট হোক কি বড়ই হোক, ব্যবসা-সংস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুনাম যাতে ক্রমেই বেড়ে যায়, অর্থ-বিনিয়োগকারীর প্রধান লক্ষ্য থাকতে হবে এই। লাভ বা মুনাফা অর্থবিনিয়োগের যা হলো নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত লক্ষ্য, সেটি তখন দেখা যাবে আপনি পূরণ হচ্ছে।

পুঁজি নিয়ে নিজেই ব্যবসায়ে নামা যেতে পারে, আবার অপরের ব্যবসায়েও পুঁজি-বিনিয়োগ করা চলতে পারে। শিল্প বা ব্যবসায়ে অংশীদাররাও অর্থ-বিনিয়োগের একটি চিরাচরিত মাধ্যম। মোটের ওপর, ব্যবসা পরিচালনার লাগামটি যাঁর হাতে থাকে, অর্থ খাটানো ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা কিংবা কোন্ সূত্র ধরে চললে বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে প্রাপ্তি হবে অধিক, সেইটি দেখার প্রাথমিক দায়িত্ব তাঁরই। লোকসান খেতে হবে বুঝলেই হুঁসিয়ার হয়ে যেতে হবে এবং জেনে নিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে কোন পথটি আসলে শ্রেয়।

ব্যবসায়ী যে শিল্প বা মাল নিয়ে কাজ-কারবার করবেন, সে সবের কেনাবেচার প্রশ্নে সতর্কতা চাই বিশেষ রকম। কখন কি দামে কতটা পরিমাণ জিনিস ক্রয় করে মজুত করা সঙ্গত হবে, এ যেমন দেখা দরকার, তেমনি ঠিক কোন সময়টিতে ন্যায্য মূল্য পেয়ে মজুত জিনিস ছেড়ে দিতে হবে, তা-ও ভালরকম না বুঝলে নয়! বাজারের চাহিদার মুহূর্তটিতে সরবরাহের নিশ্চয় ব্যবস্থা থাকলে আর সরবরাহকৃত সামগ্রী নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন হলে, অর্থের বিনিময়ে অর্থ ঘরে আসবেই।

অর্থ-বিনিয়োগের একটি বড় কেন্দ্র হলো ষ্টক-এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার। শিল্পসমৃদ্ধ সকল দেশেই নগরী সমূহে এই বাজার রয়েছে, আমাদের কলকাতা মহানগরীতেও। শেয়ার বাজারে শেয়ারের দাম ওঠা-নামা করছে প্রতিমুহূর্তে। সুতরাং শেয়ার কেনা-বেচা করে পুঁজি বাড়াতে হলে হিসেব-জ্ঞান চাই খুব বেশিরকম আর তার চেয়েও বেশি চাই সতর্কতা। অর্থ বিনিয়োগের সঙ্গে লাভালাভের প্রশ্নটি জড়িত আছে বলেই অর্থনীতিবিদরা এই দাবী রেখে আসছেন বিশেষভাবে।

শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী লগ্নীকৃত অর্থের ওপর লাভ চাইবেন, এ খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটি বড় প্রশ্ন—লাভ যেন লোভের নামান্তর হয়ে না দাঁড়ায়। অতি মুনাফা কোন অবস্থাতেই সমর্থযোগ্য হতে পারে না—আইনতও ইহা গ্রাহ্য নয়। বরং কম মুনাফা রেখে কাজ কারবার করে চললে প্রতিষ্ঠানের সুনাম যেমন বর্দ্ধিত হবে, পরিশেষে দেখা যাবে মুনাফার মোট পরিমাণও দাঁড়িয়েছে অনেক। অপর দিকে অর্থ ঘরে যেন বেশি সময় আটকে না থাকে, সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। একটা টাকাকে যতবার খাটানো সম্ভবপর, ততবার খাটাতে পারলেই টাকার সদ্ব্যবহার হয়, শ্রমেরও হয় সার্থকতা।

যে কোন উদ্যমের আসল মূলধন নিষ্ঠা ও সততা। শুধু অর্থ-বিনিয়োগ করলেই হল না—ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্যের জন্য সর্বোপরি এ দুটি পুঁজি না হলেই নয়। শেয়ারে যেখানে অর্থ-বিনিয়োগের আগ্রহ হবে, সেখানে সংশ্লিষ্ট সংস্থা সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজখবর নিতে হবে আগেভাগেই। ঘরের টাকা আরও কিছু নিয়ে ঘরে ফিরে আসবে, এ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার মূল্য খুব বেশি। সহজ কথায়, নিছক আশাবাদী হলেই হবে না, অর্থ-বিনিয়োগের ব্যাপারে বেশ ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ করাই যুক্তিসঙ্গত।

এদেশে কারিগরী শিক্ষা

আধুনিক শিল্পায়নের যুগে কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব খুব বেশি। দেশকে নতুন করে গড়বার জন্য বিজ্ঞানী যেমন চাই, তেমনি চাই বহুসংখ্যায় যান্ত্রিক কলা-কৌশলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা টেকনিসিয়ান। টেকনিক্যাল ট্রেনিং বা কারিগরী শিক্ষা ব্যতিরেকে এই দাবী মিটতে পারে না কখনই। ভারতেও এই শিক্ষার আরও দ্রুত সম্প্রসারণ একই কারণে না হলে নয়।

কারু-বিজ্ঞানে ভারতীয় কারিগরগণের দক্ষতার স্বাক্ষর অতীত যুগের বিচিত্র শিল্প ও ভাস্কর্যে লক্ষ্য করা যায়। সে যুগে অবশ্য নির্দ্ধারিত স্কুল বা কলেজে টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এর (কারিগরী শিক্ষা) ব্যবস্থা ছিল না এখনকার মতো। এতে একটা বড়রকম অসুবিধা ছিল এই—প্রয়োজন হলেও শিক্ষা-সম্প্রসারণ সম্ভবপর হতো না। আজকের দিনে কারু-বিজ্ঞানীর চাহিদা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, তারই সাথে সাথে কারিগরী শিক্ষালয়েরও।

এ দেশে নিয়মিত পর্য্যায়ে কারিগরী শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছে,

...দী আগে মাত্র। আজ কলকাতা, বাঙ্গালোর, পুণা, খড়্গপুর প্রভৃতি নানা স্থানে কারিগরী তথা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল-কলেজ চালু। সিভিল, মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল কারু-শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছেন এখন পূর্বের চেয়ে বেশি। কিছুদিন আগে অবধি দেশ ছিল বিদেশী শাসনাধীন। তখনকার শাসন-কর্তৃপক্ষের ভারতীয়রা এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে পারদর্শিতা অর্জন করুক, সেটি খুব কাম্য ছিল না। এক্ষণে জাতীয় সরকার জাতীয় প্রয়োজনেই কারিগরী শিক্ষার দিকে খানিকটা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন, এ অবশ্য ঠিক।

দেশের শিল্পায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন বহু পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এর ভেতর। কিন্তু এ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সে পরিকল্পনাগুলোর বাস্তব রূপায়ণের জন্য কারুবিজ্ঞানী বা ইঞ্জিনীয়ার পাওয়া চাই-ই। বিদেশ থেকে যন্ত্রবিদ সরবরাহ করে ব্যাপক শিল্পায়নের কাজ সম্পন্ন করা একটি কঠিন ব্যাপার। সুতরাং এ পরিষ্কার যে, দেশের অভ্যন্তর থেকেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত কারিগর বা ইঞ্জিনীয়ার যথাসম্ভব সংগ্রহ করতে হবে।

বিগত বছর দশেকের মধ্যে ভারতে কারুবিজ্ঞানীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, এ অনস্বীকার্য। কারণ, হিসাব করলে দেখা যাবে, যে সকল সরকারী বা বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এক্ষণে চালু, সেগুলোতে বেশির ভাগ কারিগরী কর্মীই ট্রেনিংপ্রাপ্ত আর এ ট্রেনিং বা শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন ভারতীয় ট্রেনিং-কেন্দ্রগুলোতে। এর অর্থ এই যে, কারু-বিজ্ঞানী তথা টেক্‌নিসিয়ান ও ইঞ্জিনীয়ারের প্রয়োজন এদেশে কমে গেছে। পরন্তু উল্টো দিকে বলা চলে, এই প্রয়োজন এখনও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে—টেক্‌নিসিয়ান ও ইঞ্জিনীয়ারের অভাব নানাক্ষেত্রে প্রকট।

দেশে কারু-বিজ্ঞানী বা কারিগরী-কর্মীর যে অভাব রয়েছে, প্রধান মন্ত্রী নেহরু থেকে আরম্ভ করে অনেক নেতাই একথা বলে আসছেন। কিন্তু দেশে এ যাবৎ যত সংখ্যক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পলিটেকনিক স্থাপিত হয়েছে, এতে সে অভাব সামান্যই মিটতে পারে। এর জন্য প্রচুর অর্থ, সরঞ্জাম ও প্রযত্নের প্রয়োজন, সন্দেহ নেই। তবু বলতে হবে, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য থেকে শিল্পায়ন যেখানে চাই, সেখানে শিল্পায়নের পথে যে যে বাধা আসবে, তার অপসারণ ব্যবস্থাও চাই। কারুবিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে সরকারী উদ্যোগ ও সহযোগতা এমনি সীমিত হলে চলবে না।

সরকারী তথ্য ও পরিসংখ্যান পর্য্যালোচনা করেই জানা যায়—দেশে কারিগরী-কর্মীর অভাব যেমন রয়েছে, কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের অভাবও তেমনি বিদ্যমান। কি ভাবে তাড়াতাড়ি এই অভাব মিটতে পারে, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মিগণকে সেইটি বিশেষভাবে না ভাবলে নয়। এই ব্যাপারে দেশের শিল্পপতিদেরও সহযোগিতা থাকতে হবে অনেকখানি। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বা পলিটেকনিক যেখানেই থাকুক, নিকট অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কারখানা থাকলে খুব ভালো হয়। কারণ, কারুশিক্ষার্থীদের সেক্ষেত্রে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার ওপরই নির্ভর করতে হবে না, হাতে-কলমে শিক্ষালাভের সুযোগও তাঁরা পাবেন।

কারিগরী শিক্ষার দিকে তরুণরা যাহাতে আকৃষ্ট হতে পারে, সেজন্য সরকারের দিক থেকে আরও উৎসাহ জোগান নিশ্চয়ই উচিত। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন, কম নয়। তাঁরা উদ্যোগী ও কৃতী ছাত্রদের জন্যে নানা ধরণের বৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারেন—যাতে শুধু তাদের পড়াশুনোর মাহিনা সমেত সকল ব্যয়ই নির্বাহ হতে পারে। আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলো টেকনিক্যাল শিক্ষা সম্প্রসারণে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকেন। সে সব রাষ্ট্রের মেধাবী কারু-শিক্ষার্থীদের শিক্ষানবীশ অবস্থাতেই ভালরকম রোজগারের ব্যবস্থা আছে। ভারতে এই ধরণের ব্যবস্থা নামমাত্র আছে—সরকার ও শিল্পপতিদের মনোযোগ সেজন্যেই দাবী করা হচ্ছে বেশি রকম।

আধুনিক দুনিয়া ও শিল্প-বিপ্লব

বিজ্ঞান ও কারুবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবও ঘটে চলেছে সারা বিশ্বময়। আগে যে ধরণের শিল্প মানুষের রুচি ও প্রয়োজন মেটাতো, এখন ঠিক তেমনটি হলে চলে না। সব দিকেই উন্নততর ব্যবস্থা না হলে যুগের সাথে তাল রেখে চলা কঠিন হতে বাধ্য।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিল্প-পরিস্থিতি কি দাঁড়িয়েছে, তা জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বৃটেনের কথাই ধরা যাক—একদিন যে দেশের প্রাধান্য ছিল সারা দুনিয়ায়। অল্পকাল আগে অবধি বিশ্বের বহু অনগ্রসর দেশ বৃটিশ পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আমাদের ভারতও ছিল বৃটেনের নানাবিধ শিল্প ও দ্রব্য-সামগ্রীর একজন বড় ক্রেতা। কিন্তু আজ অবস্থান্তর ঘটেছে বড়রকম—অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও শিল্প-বিপ্লব হয়ে চলেছে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই।

জাপান, জার্ম্মাণ, আমেরিকা প্রভৃতি শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ থেকেও ভারতে এককালে কম পণ্য আসতো না। বহু প্রসাধন ও বিলাস-সামগ্রী ও খেলনাজাতীয় জিনিষ বাহির থেকে আমদানী হতো এখানে। কিন্তু এখানে দেশের চাহিদা দেশের অভ্যন্তর থেকেই মেটাবার চেষ্টা হচ্ছে। ফলে একসময়ে যাদের বাজার ছিল বিস্তৃত, সেই সব শিল্পোন্নত দেশসমূহের বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে অনেকটা। রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোতেও প্রকাণ্ড শিল্প-বিপ্লব ঘটেছে—যার প্রভাব অনুভূত হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ায়।

একটা জিনিস আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে আজিকার বিশ্বে, কোন দেশের পক্ষেই একটা শিল্প তৈরী করে নিশ্চিন্তে বসে থাকা সম্ভব নহে। কেন না, শিল্পটি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তার বাজার পাওয়া গেলেও, কিছুদিন বাদে সে বাজার হুবহু টিকে থাকবে না। এর কারণটি স্পষ্ট—বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সহায়তায় সেই শিল্পটি প্রয়োজনীয় হলে অপর দেশেও ইত্যবসরে তৈরী হয়ে যাবে। সেজন্য নিত্যনতুন শিল্প উদ্ভাবন ছাড়া এ যুগে বাজার বজায় রাখা একরূপ অসম্ভব।

আধুনিক যুগে দুনিয়াব্যাপী যেখানে শিল্প-বিপ্লব ঘটে চলেছে, সে অবস্থায় ভারতকেও সব সময় সজাগ না থাকলে নয়। ভারীশিল্পের যন্ত্রপাতি এখনও তাকে বহুল পরিমাণে আমদানী করতে হয় বাইরে থেকেই। কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ীভাবে চলবে, এমনটি হতে পারে না। বরং এখানেও শিল্প-বিপ্লব ঘটাতে হবে, সকল দিক থেকে। লক্ষ্য রাখতে হবে, শুধু আভ্যন্তরীণ শিল্প চাহিদা মেটালেই যথেষ্ট হবে না, বহির্দেশে উন্নত মানসম্পন্ন শিল্পের রপ্তানী মারফত যথেষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন করতে হবে। বাইরের দুনিয়ার সাথে তালে তালে পা ফেলে স্বাধীন ভারত এগিয়ে যাক,·শিল্প-জগতে সে যুগান্তর আনয়নের সফলতা অর্জন করুক, এই প্রত্যাশা যেন অতিরিক্ত বলে না হয়।

বিজ্ঞান বার্ত্তা

গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের কথা

সোভিয়েট রকেট চাঁদকে ছুঁয়েছে হয়তো তাতে কাব্যের চাঁদের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। চাঁদের একদিককার আলোকচিত্র সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, তাতে যে চাঁদের সঙ্গে মহাকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' উমার মুখের তুলনা করেছিলেন সে চাঁদের চাঁদত্ব আর কি বজায় আছে আগের মত? প্রিয়ার মুখের সঙ্গে, এমন কি প্রিয়ার সঙ্গে চাঁদের তুলনা, এ নিয়ে প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য মশগুল। কবি ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়ে, প্রিয়াকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন: moon of my delight that knowest no wane, the moon of the heavens is rising again প্রিয়াকে সন্তুষ্ট করবার মনোবৃত্তি নিয়ে কবি এখানে "চলৎচিত্তং চলৎবিত্তং চলৎজীবনযৌবনম্" এই শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে তাঁকে অনন্তযৌবনা বলে কল্পনা করেছেন। কিন্তু অমন যে চাঁদ আজকে মানুষ তার সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে অনেকাংশে অপমান করেছে, তাকে দূর আকাশ থেকে একেবারে সাধারণের পর্য্যায়ে টেনে এনেছে।

তবু চাঁদে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের (intelligent life এর) অস্তিত্ব আছে কিনা, বৈজ্ঞানিকরা অনেক চেষ্টা করেও সে সম্বন্ধে এখনও মনস্থির করতে পারেন নি। এ্যামেরিকার কোন একটি বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ পৃথিবী থেকে ১৬টি light year অর্থাৎ ১........ মাইলের মধ্যে যে ৪২টি নক্ষত্র অবস্থিত তার মধ্যে মাত্র তিনটে নক্ষত্রে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের সন্ধান পেয়েছেন।

এই তিনটি গ্রহের মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের সূর্য এবং অন্য দুইটি এগারো এবং বারো light year এর মধ্যে অবস্থিত। একটির নাম Eridani (এরিডানি)। অন্যটির নামকরণ করা হয়েছে toucell (টাউসেল)।

উপরিউক্ত জ্যোতির্বিদ আধুনিকতম জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী শুধু পাঁচটি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন। তাঁর আবিষ্কার সাধারণ নাক্ষত্রিক ক্রমবিবর্ত্তন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তিনি আমাদের পৃথিবীতে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবন (intelligent life) সম্ভব হতে কত দিন লেগেছে এই বিষয় নিয়ে ১......... বৎসর আগে পর্য্যন্ত গবেষণা করেছেন। এবং উপরিউক্ত বর্ষসংখ্যা থেকে যে সমস্ত নক্ষত্রের বয়স কম, তাদের তিনি বাদ দিয়েই, তার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

তারপর তিনি উপরিউক্ত প্রত্যেকটি গ্রহ উপগ্রহকে বেষ্টন করে জীবনের পক্ষে যে বাসোপযোগী অঞ্চল (Habitable zone) আছে সে গুলির সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। অর্থাৎ ঠিক কতখানি শক্তি গ্রহ উপগ্রহে এই বাসোপযোগী অঞ্চলে আছে যাতে বুদ্ধি-আশ্রিত প্রাণ ধারণ করা সম্ভব, তার গবেষণাগারে বসে তিনি এই তথ্যই বার করবার চেষ্টা করেছেন। এই যে জীবনের পক্ষে বাসোপযোগী অঞ্চলের পরিধি, এটা তাঁর মতে নির্ভর করে গ্রহ উপগ্রহ কতখানি আলো (luminosity) বিকীর্ণ করতে পারে, অতএব যে সব গ্রহের যত বেশী আলো, সেখানেই বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের বেঁচে থাকার মত তত বড় পরিধি এবং ঠিক এই কারণেই নিষ্প্রভ নক্ষত্রকে বাদ দিয়েই গবেষণা করেছেন উপরিউক্ত জ্যোতিবিদ।

তিনি পৃথিবীর কাছাকাছি যে সব গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ আছে সেই সবগুলিই প্রথমে পরীক্ষা করেছেন। পৃথিবী থেকে যোলটি light year-এর মধ্যে যে সব গ্রহ উপগ্রহ আছে তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষা তাদের নিয়েই। পূর্বেই বলা হয়েছে সূর্য্য ও Eridani এবং toucell এর মধ্যেও তিনি আবিষ্কার করেছেন যে এই তিনটি গ্রহে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবন ধারণের উপযোগী অঞ্চল রয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত দুইটি গ্রহেরই আলো সূর্য্যের আলোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, অতএব তাদের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনের থাকার মত অঞ্চল সূর্য্যের চেয়ে নিশ্চয়ই কিছু ছোট।

এর পরে উক্ত বৈজ্ঞানিক আর এক কাজ করেছেন, তিনি আমাদের জানা জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি নিয়ে সৌর জগতের বাইরের গ্রহ উপগ্রহকে পরীক্ষা করেছেন। তাঁর গবেষণায় এইটাই প্রমাণ হয়েছে যে ঐ কাজ সম্যক ভাবে করতে গেলে যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সেগুলি মানুষ এখনও তৈরী করতে পারেনি।

মনের ওপর প্রভাবের কথা

পেটের ঘা (Duodenal ulcer) যাদের হয় তাদের সম্বন্ধে একটা কথা বললে হয়তো সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। কথায় বলে, কর্ত্তা যেথায় সং গিন্নি যেথায় সার, তার নাম সংসার। কথাটা অত হালকা করে না বললেও মা বাবার চেয়ে যেখানে বেশী শক্তিসম্পন্না ও প্রভাবশালিনী তাঁদের ছেলে-মেয়েরাই ঐ আন্ত্রিক ঘা (Duodenal ulcer) এ ভোগে।

একদল গবেষণাকার ২৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগে কতকগুলি রোগীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাঁদের জননীরা বেশ প্রবল ও সবল প্রকৃতিসম্পন্ন এবং তাঁদের সংসারে তাঁদের মত ও কথাই বেশী চলে। তাঁদের নিন্দা করবার কোন কারণ নেই। কেন না তাঁদের কর্ত্তব্য জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর এবং নিজের সংসার সম্বন্ধে খুব গর্ব্বিত ও নিয়মানুবর্ত্তিতা খুব বেশী পছন্দ করেন। তাঁদের মধ্যে তিনটে খুব প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়:—তাঁরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের অত্যন্ত বেশী রক্ষা করার চেষ্টা করেন এবং তাদের খুব বেশী শাসন করেন কিম্বা খুব বেশী রকম আদর দেন।

গবেষণাকারগণ ষোল এবং ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে বত্রিশ জনকে পরীক্ষা করেছেন যাঁদের ঐ জাতীয় পেটের ঘা আছে। এবং অপর পক্ষে ঐ বয়সের আরও বত্রিশ জনকে পরীক্ষা করেছেন যাঁদের ঐ রকম ঘা নেই।

অন্যান্য কারণের মধ্যে ঐ রোগীদের পিতাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্যানুসন্ধান করা হয়েছে। বিবরণে প্রকাশ, ঐ পিতার দল বহুলাংশে স্থির প্রকৃতির এবং নিজেদের জাহির করবার জন্যে তাঁরা মোটেই ব্যস্ত নন।

কোন প্রকার শারীরিক বেদনা কি বার্দ্ধক্যের ফল?

যাঁরা পরিণত বয়সের তাঁরা অল্পবয়স্কদের চেয়ে শারীরিক যন্ত্রণা সহজে সহ্য করতে পারেন।

যে অসুখে অল্পবয়স্করা এক কথায় ডাক্তারের সাহায্য নিতে চান তা যদি কোন প্রকার দৈহিক বেদনা হয়, তো'হলে বয়স্করা ব্যাপারটাকে নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁরা মনে করেন ঐ বেদনা তাঁদের পরিণত বয়সের অপরিহার্য্য লক্ষণ।

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দশ জনের মধ্যে নয় জন রোগীই মনে করেন বার্দ্ধক্য হলেই নানা রকম দৈহিক বেদনাই অবশ্যম্ভাবী। উপরিউক্ত চিকিৎসক আবিষ্কার করেছেন যে প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে কুড়ি জনের মধ্যে সতের জনই বাড়ীতে প্রায় এক মাসের ওপর অসুস্থ হয়ে থাকেন। তাঁরা ডাক্তারের কাছে যান না। তার প্রধান কারণ রোগী নিজের রোগের চিকিৎসকের মতই নিজেই সুব্যবস্থা করতে পারেন।

দম্পতিরা সাধারণতঃ কি বিষয়ে কথা বলেন?

এ কথার উত্তর দিতে হলে আগে জানতে হয় স্বামি-স্ত্রীর বয়স কত, এবং কত দিন তাঁরা বিবাহিত জীবন যাপন করছেন।

বিবাহের প্রাথমিক অবস্থায়, অর্থাৎ তাঁদের সন্তানাদি হবার পূর্বে পরস্পরে বেশী কথা কন—বেশী দিন বিবাহ হয়ে গেলে কথার স্রোত কমে আসে। প্রথম জীবনে তাঁরা মানসিক ব্যাপারে (Subjective subjects) কথা কন বেশী, অর্থাৎ পারস্পরিক উচ্ছ্বাস, যৌন জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় কথা বেশী বলেন।

একটু বেশী বয়স হয়ে গেলে, অর্থাৎ মাঝামাঝি বয়সে যাঁদের অন্তত দুইটি সন্তান হয়েছে, তাঁরা পরস্পরে মন জানাজানি কমই করেন। তাঁরা বেশীর ভাগ শিশু সন্তানদের সম্বন্ধে এবং সংসারের সম্বন্ধে কথা বলেন, বিশেষ করে সন্তানদের যখন কোন স্কুলে দেওয়া হয়নি। সন্তানরা একটু বড় হলেই স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সামাজিক ব্যাপার নিয়েই বেশী আলোচনা হয়।

পঁচিশ বৎসর যাঁদের বিবাহ হয়ে গেছে তাঁদের কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁরা বেশী আনন্দ পান, যদিও অল্পদিন যাঁদের বিবাহ হয়েছে তাঁদের কথোপকথনই সকলের চেয়ে বেশী আনন্দপ্রদ হয়।

যাঁদের বার্দ্ধক্য হয়েছে তাঁদের কথাবার্ত্তা খুব কমে যায়। তাঁরা দিনের মধ্যে পরস্পরে এক ঘণ্টাও কথা কন না এবং বেশীর ভাগ তাঁরা বন্ধুদের কথা বা সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা করেন।

যিনি এই সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তিনি জানিয়েছেন কুড়িজন বিভিন্ন বয়সের দম্পতির সঙ্গে তিনি কথা কয়েছেন, তাঁরা বেশীর ভাগই সহরে লোক, একবারই বিবাহ করেছেন এবং সকলেই কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

পরিণত বয়সের নরনারীর পক্ষে কর্মতৎপর হওয়া বিশেষ প্রয়োজন

ডাক্তাররা বলেন, ৬৫ বৎসরের নরনারী আগামী ১৫ বৎসরের জন্যে নিজেকে কর্মতৎপর ও উপযোগী করে রাখেন। জীবনের প্রথম বৎসরগুলি বাস্তব কর্মের জন্যে ব্যবহৃত হয়—বার্দ্ধক্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে সকলে অতীতকে সক্রিয় করে তোলে।

বার্দ্ধক্যের দিনগুলো পড়াশোনা দিয়ে কাটানো উচিত—তাতে স্মৃতি ও স্নায়ুর দুষ্ট প্রভাব নষ্ট হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ বয়সে লঘু কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম না করলে জীবনে বিরক্তি এসে পড়ে।

৪০ বৎসর বয়স থেকে শরীরের গ্রন্থিগুলিকে সুস্থ রাখতে হলে লঘু কর্ম নিয়ে দিন কাটানো বিশেষ আবশ্যক। নানা রকম শখ (hobby) নিয়েও মনকে সক্রিয় করে রাখা উচিত।

বৃদ্ধ বয়সে নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করলে ভালো হয়:—

(১) খাবারে সব উপাদান থাকা উচিত। প্রোটিন, ভাইটামিন, পানীয় এবং তাপ উৎপাদক আহার্য্যগুলি।

(২) অন্ত্রে কোন ময়লা জমতে দেওয়া উচিত নয়।

(৩) শরীর ও মনের প্রচুর বিশ্রাম প্রয়োজন।

(৪) মন যাতে ভাল থাকে এই রকম কার্যকলাপ খুব উপকারী।

(৫) অত্যধিক মানসিক উচ্ছ্বাস সর্বদা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

(৬) বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সম্প্রীতি রাখবেন এবং যে কাজ করবেন তাতে বিরক্তির পরিবর্ত্তে গর্ব বোধ করবেন।

(৭) সামাজিক কাজ করা ভালো।

(৮) পড়াশুনো, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি আপনার পরমায়ু বৃদ্ধি করবে।
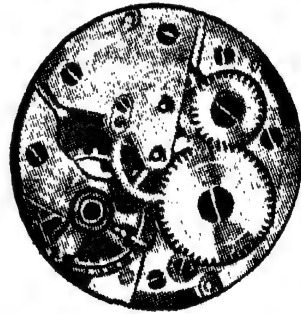
নাচ গান বাজনা

উত্তরবাংলার ময়নামতীর গান

কোন এক স্মরণাতীত কাল হ'তেই উত্তরবাংলার ময়নামতীর গান বাংলার পূর্ব্বপ্রান্ত হ'তে শুরু করে বাংলার বাইরে ভারতের অধিকাংশ স্থানে গীত হ'ত। উত্তরবাংলার রংপুর জেলায় আজও এই গানের সর্ব্বাধিক প্রচলন চোখে পড়ে। এই গানের বহুলাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন প্রায় স্তিমিত সেই সময়ে এক সুন্দর কাহিনী অবলম্বনে ময়নামতী গানের উদ্ভব ঘটে, কোথাও বা নাথ যোগীদের ধর্ম্মমত এই গানের সংগে সুস্পষ্ট ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নাথ যোগীদের 'মহাজ্ঞান' ধর্ম্মমত অবলম্বনেই ময়নামতী গানের সূচনা। বৌদ্ধপ্রভাব ছাড়া ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব থাকার ফলেই ময়নামতীর গান এক সুদীর্ঘ পরমায়ু নিয়ে বেঁচে রয়েছে।

রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদের সন্ন্যাস অবলম্বন কাহিনী নিয়েই ময়নামতী গানের সৃষ্টি। এ'র সর্ব্বপ্রথম রচয়িতা ও রচনা-কাল সঠিক ভাবে নির্ণীত না হ'লেও এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন মতের অবতারণা ঘটলেও, তা' যে রংপুর অঞ্চলের গ্রাম্যকবি দ্বারা পর-চৈতন্যযুগে রচিত, সন্দেহ নেই। কোন কোন গানে শ্রীচৈতন্যদেবের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ভবানী দাস রচিত গোপীচাঁদের পাঁচালীতে এমনি ধরণের বহু স্বাক্ষর বিদ্যমান।

"কেশব ভারতী গুরু কথা কইতে আইল।
কি না মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল॥"

যে অদ্ভুত কাহিনী নিয়ে ময়নামতী গানের বিকাশ, তা বর্ত্তমান যুগের মানুষের কাছে সম্ভাব্য ঘটনা বলে মনে না হ'লেও, তা'র মধ্যে তৎকালীন যুগের ইতিহাস, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইত্যাদির সুস্পষ্ট আলেখ্য নিহিত রয়েছে। একমাত্র ধর্ম্মতত্ত্ব ও দার্শনিকতাই এই কাহিনীকে এক অমূল্য অর্থ ও তাৎপর্য্যপূর্ণ করে তুলেছে। এর গানগুলি সেকালের গ্রাম্যকবিদের রচনা হ'লেও তা'তে কোন আড়ম্বরতা নেই। দুর্ব্বোধ্য ভাষার সংস্পর্শ হ'তে গানগুলি সম্পূর্ণ মুক্ত। গ্রাম্যকবিদের বর্ণনারীতিও অত্যন্ত সাবলীল।

ময়নামতীর গানগুলিতে গ্রাম্যকবির অত্যন্ত কাব্যিক ধর্ম্ম-প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। তৎকালীন সমাজজীবনের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি ভাবধারা গ্রাম্যকবিদের সুনিপুণ লেখনীতে অত্যন্ত সরল ও সুন্দর ভাষাবিন্যাস গানগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাই এ'গুলি লোকসংগীত পর্য্যায়ের পল্লীগাথা হিসেবে পল্লীবাংলার আকাশ-বাতাসকে যুগ যুগ ধরে মুখরিত করে রেখেছে।

করুণ অথচ মধুর রসমিশ্রিত ময়নামতীর গানগুলি আজো পল্লীবাংলার মানুষের মনে অপূর্ব্ব দোলা দেয়। নাথধর্ম্মাধিপতি গোরক্ষনাথ, ময়নামতীর বাল্যকালে তাঁর পিতৃগৃহে আগমন করে শিশু ময়নামতীকে মহাজ্ঞানে দীক্ষিত করেন। পরে বিবাহিতা ময়নামতী তাঁর স্বামী মাণিকচন্দ্রকেও এই দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু স্ত্রীর নিকট হ'তে দীক্ষা গ্রহণে মাণিকচন্দ্রের ঘোরতর আপত্তি থাকায় স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ ঘটে এবং মাণিকচন্দ্র ময়নামতীকে পরিত্যাগ করেন। কিছুকাল পরেই পুত্র গোপীচাঁদ মাতা ময়নামতীর আদেশে হাঁড়ি সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বারো বছরের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। গোপীচাঁদের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের সময় তাঁর স্ত্রী অদুনা-পদুনার হৃদয়ের করুণ ও মর্ম্মান্তিক কাহিনী নিয়েই ময়নামতী গানের অবতারণা।

গৃহ হ'তে রাজার যাত্রার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে অদুনা-পদুনার হৃদয় নিঃসৃত বেদনা অত্যন্ত সরল ও কাব্যিক প্রতিভার মাধ্যমে গ্রাম্য কবি পল্লীবাংলার মানুষের মনে তুলে ধরেছে। স্মরণাতীত যুগের সেই করুণ আবেদন আজো বাংলার জল-মাটি আকাশ-বাতাসকে অনুরণিত করছে :—

না যাইও, না যাইও রাজা দূর দেশান্তর
কার লাগিয়ে বান্ধিলাম শীতল মন্দির ঘর।
শীতল পাটি বিছাইয়া দিমু, বালিশে হেলান পাও,
হাউস রসে৷ খাঁটিমু তোমার রক্ত পাও,
গ্রীষ্মকালে বসনোত্ত দিমু দণ্ডপাখা বাও,
মাঘ মাসের শীতে যেঁবিয়া রমু গাও।

অদুনা-পদুনার মনের খুব গোপন অথচ প্রকৃতিগত ও স্পষ্ট কথাগুলি গ্রাম্যকবির নিপুণ লেখনী, প্রাঞ্জল ভাষা ও বর্ণনা মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এই গানগুলির প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক করুণ রসের উৎস ছড়িয়ে রয়েছে। তৎকালীন সমাজ ও কৃষ্টিগত প্রথার জন্মভূমির বুকেই জন্মমৃত্যু বরণ করে ঘর বেঁধে থাকবার এক দুরন্ত প্রতিজ্ঞা এই গানগুলির বিষয়বস্তু। সামাজিক বন্ধনকে না এড়িয়ে, সভ্যতার প্রতীক নিয়ে স্বজন পরিবারের মধ্যে একত্র বসবাস করার এক দুর্দ্দাম প্রয়াস, তৎকালীন যুগধর্ম্ম হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, সে যুগের কবির রচনায় ছত্রে ছত্রে।

অদুনা-পদুনার প্রাণের করুণ ব্যথা উপলব্ধি করে গোপীচাঁদ যোগ-জীবনের বিভিন্ন রকম দুঃখ ও বাধা-বিপত্তির কাহিনী শুনিয়ে তাঁদেরকে তাঁর সংগ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। তৎকালীন যুগে নিষ্ঠা ও পবিত্রতার সংগে ধর্ম্ম অবলম্বনে যে বিরাট আত্মত্যাগের উল্লেখ রয়েছে তা এ যুগে দুষ্প্রাপ্য ও অলৌকিক বলে মনে হয়। ষড়রিপুর বুকে কশাঘাত করে আত্মোপলব্ধিতে অতি-মানবতার উন্মেষ, তৎকালীন যুগের গ্রাম্যকবি রচিত এই গানগুলিতে আজো অক্ষুণ্ণ আলেখ্য হয়ে বেঁচে রয়েছে। অতিপ্রাকৃতের স্পর্শযুক্ত এই প্রাচীন বাংলা কাব্য সাহিত্যের এক নতুন

অধ্যায়ের অবতারণা আজ চোখে পড়ে, যা বর্তমান যুগধর্মে নিছক অলৌকিক বলে মনে হয়। এক গভীর দার্শনিকতার ছাপ গানগুলিতে অংগাংগীভাবে মিশে রয়েছে :—

আমার সঙ্গে যাবু বাণি, পন্থের শোন কাহিনী।
খিদা লাগলে অন্ন পাবু না, পিয়াস লাগলে পানী।
খাইবে না খাইবে বাঘে ফ্যালাবে মারিয়া।
বৃথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে যাইয়া।

গোপীচাঁদের এই কথাগুলি অদুনা-পদুনার মনে ত্রাস সৃষ্টি করলেও পরক্ষণেই তাদের মনে অন্য এক চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এমনি সময় তাঁরা সমস্ত ভয় ত্রাস মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন একমাত্র রাজার সারাটি মন প্রাণের সংগে নিজেদেরকে বিলীন করে দিয়ে। স্বামী গোপীচাঁদের প্রতি স্ত্রী অদুনা-পদুনার ঐকান্তিক অকৃত্রিম প্রেমাবেগ গ্রাম্যকবিদের সুনিপুণ লেখনীতে অভিব্যক্তি পেয়ে শীর্ষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। স্বামীর প্রতি বংগ কুলনারীদের পবিত্র প্রেম ও মমত্ববোধ ভক্তিমূলাত্মক রসে পরিণতি লাভ করেছে, যা'র অধ্যাত্মবাদ থেকে পৃথকীকরণ চলে না। সেই যুগীয় বংগ কুলনারীদের এক নিষ্কলঙ্ক, সতীত্বের স্বাক্ষর মিলেছে গ্রাম্যকবি রচিত এই গানগুলির ভাব-গভীরতায়।

থাক্ না ক্যানে বনের বাঘ তার না করি ডর।
নিষ্কলঙ্ক মরণ হউক স্বোয়ামীর পদের পর।

পল্লীকবির অভিনব লেখনী স্পর্শে কোথাও বা অদুনা-পদুনা বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত শ্রীরাধিকার রূপ গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হ'তে মথুরা প্রস্থানের সময় শ্রীরাধিকার হৃদয় বিগলিত ব্যাকুল প্রেমাবেগ সাধারণ মানুষ হ'তেও অনেক ঊর্দ্ধে এক অতিমানবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। এমনি এক পরিবেশের উদ্ভব ঘটেছে, গোপীচাঁদের উদ্দেশ্যে অদুনা-পদুনার হৃদয় নিঃসৃত আকুল প্রেম নিবেদনে। বিরহিনী শ্রীরাধিকা যেমন বলেছেন :

মাস মাস করি বরষ গমাওল,
ছোঁড়লু জীবনক আশা।

এমনি ভাবেই বিরহিনী অদুনা-পদুনার করুণ বিলাপ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে ফুটে উঠেছে পল্লীকবি রচিত গানের সুরে ও ঝঙ্কারে :

কতকাল রাখিব যৌবন অঞ্চলে বান্ধিয়া।
যাহের হৈল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া !!

রাজা গোপীচাঁদের সংসার ত্যাগের পর অদুনা-পদুনা যে বিরহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তাঁদের সেই করুণ রূপ ময়নামতীর গানের ঝঙ্কারে আজো বেঁচে রয়েছে। কতো যুগ যুগ পরে আজো সেই হৃদয়ভেদী সুর পল্লী-বাংলার আকাশে বাতাসে ও মাটির কণায় কণায় মিশে রয়েছে। বাঙালী মানুষের কোমল প্রাণবীণায় করুণ সুরের সেই লহরী, থেকে থেকে আচমকা বেজে ওঠে। প্রাচীন বাংলার সুখ দুঃখ, হাসি আনন্দ, করুণা-বিষাদ ইত্যাদিতে ভরপুর সেই গানের ছত্রগুলি বর্তমান প্রগতিশীল বাংলার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে এক অসাধারণ স্থান লাভ করেছে। প্রাচীন বাংলার এমনি লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে আরো যে কত সহস্র রকমের লোকগীতি বাংলার প্রতিটি ধূলিকণার সংগে অখ্যাত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তা' বলা সুকঠিন।

—সুশীল মুখোপাধ্যায়।

রেকর্ড পরিচয়

এবার "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়ার যে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

এন ৮২৮৪০—মান্না দে'র কণ্ঠে আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪১—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪২—শ্রীমতী উৎপলা সেনের দু'খানি আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৩—দু'খানি পল্লীগীতি গেয়েছেন সনৎ সিংহ।

এন ৮২৮৪৪—শ্যামল মিত্রের আধুনিক ও পল্লীগীতি।

এন ৮২৮৪৫—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৬—মহম্মদ রফির গাওয়া আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৭—বাসবী নন্দীর কণ্ঠে আধুনিক গান।

এন ৮২৮৪৮—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ ও পবিত্র মিত্র অভিনীত কৌতুক নক্সা।

এন ৮২৮৪৯—শ্রীমতী ইলা চক্রবর্তীর (বসু) দু'খানি আধুনিক গান।

কলম্বিয়া

জি-ই ২৪৯৬৬—দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।

জি-ই ২৪৯৬৭—আশা ভোঁসলের আধুনিক গান।

জি-ই ২৪১৬৮—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান।

জি-ই ২৪১৬৯—আধুনিক গান—গেয়েছেন গীতা দত্ত (রায়)।

জি-ই ২৪১৭০—পান্নালাল ভট্টাচার্য্যের কণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত।

জি-ই ২৪১৭১—গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে কীর্ত্তন গান।

জি-ই ২৪১৭২—দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন শ্রীমতী লতা মুঙ্গেশকর।

জি-ই ২৪১৭৩—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে পল্লী ও আধুনিক গান।

জি-ই ২৪১৭৪—তালাত মামুদের গাওয়া আধুনিক গান।

আমার কথা (৫৮)

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য

ধ্রুবপদ—ধ্রুবক—ধ্রুপদ—এক জিনিষ। ধামার তাল ছিল ধ্রুপদের। এখন ধামার হয়েছে হোলী। সারাভারতে বর্ত্তমানে মাত্র কয়েকজন আছেন খাঁটি ধ্রুপদগায়ক। তন্মধ্যে পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক ধ্রুপদী শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যতম।

মধ্য কলিকাতায় তাঁহার ঘরে বসে ভট্টাচার্য্য মহাশয় জানালেন :

২৪ পরগণা জিলার হরিনাভি গ্রামে বাবার মাতুলালয়ে ১২৯১ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার আমি জন্মাই। হরিনাভির জমিদার ঘোষবংশের সহিত আমাদের পারিবারিক বন্ধুতা বহুদিনের। বাবা ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নর্ম্মাল সঙ্গীতবিদ্যালয়ে গান শিখিতেন। সহপাঠী হিসাবে পেয়েছিলেন সঙ্গীতরত্নাকর ৺অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী (তাঁর আদি শিষ্য), ৺গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কয়াসডাঙ্গার ৺তমাল অধিকারী, আলীবক্স, অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। তখন সঙ্গীতকেশরী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও সঙ্গীতবিদ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাসচিব ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মা ৺মোক্ষদা দেবী ছিলেন ছোট জাগুলিয়ার উপাধ্যায় বংশের তনয়া। মামা ৺ক্ষেত্রমোহন উপাধ্যায়ের সহিত ছোট জাগুলিয়ার ৺নারায়ণ চন্দ্র বসু (বোসজা) ও ৺হেম বিশ্বাস (অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের পিতামহ) মহাশয়দ্বয়ের গৃহে খুবই যেতাম। খুব ভালবাসা পেয়েছিলাম দুজনের, নারায়ণ বাবু ও তাঁহার পত্নীর আদরযত্নের কথা কখনও ভুলির না। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি Anglo Sanskrit স্কুলে প্রথমে পড়ি। হরিনাভিতে তখন অভিনয় ও সঙ্গীতের খুব বড় আসর বসত প্রায়ই। পরে বাবা কলিকাতার বহুবাজারে বাসা করায় স্থানীয় বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি হই ও তথা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১১০২ সালে মেলাতচন্দ্র ইন: হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করি। কিছুদিনের মধ্যে কলিকাতা কম্পট্রোলার অব পোষ্টাফিসের দপ্তরে চাকুরী লই এবং ১১৩৬ সালে নাগপুর হইতে অবসর গ্রহণ করি।
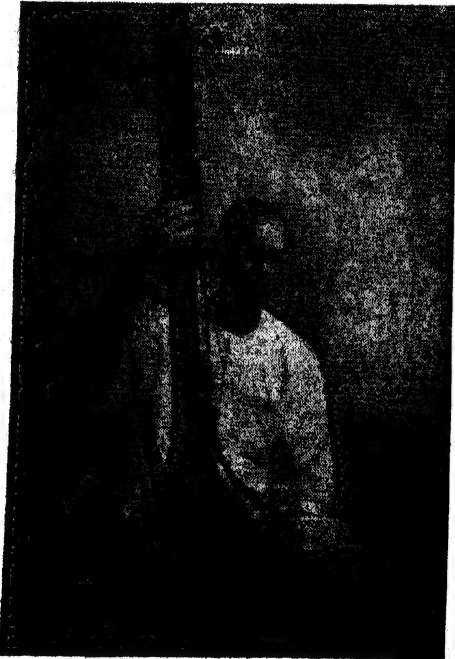
বাবা গান করতেন ও ছাত্রদের শেখাতেন। স্বাভাবিকভাবে গানের দিকে ঝোঁক এসেছিল আমার। কিন্তু বাবার কঠোর নির্দ্দেশ ছিল পড়াশুনা করার। মনে মনে গুন্‌গুন্ করতাম। কলিকাতা বহুবাজারে থাকার সময় জমিদার সরকার বাবুদের (গোবিন্দ সরকার লেন) বাড়ীতে প্রায়ই সঙ্গীতের আসর বসত। সেখানে আসতেন অঘোরনাথ, পাখোয়াজী বরদা দত্ত, ত্রিগুণা দত্ত, সারেঙ্গী রমজান খাঁ। কাছেই ছিল ধরবাবুদের ৺জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ী। সেখানে গান শুনতুম মিয়া মুরাদ আলি খাঁ, মিয়া আলি বক্স, টপ্পাবিদ ভোলানাথ দাস প্রভৃতির। সরকারবাবুদের সহিত ঘনিষ্ঠতার কারণ ছিল গোবিন্দচন্দ্রের গৃহিণী হরিনাভি গ্রামের ঘোষবংশের কন্যা—তাঁকে আমি পিসিমা বলে ডাকতুম। এই সময় আশাতীতভাবে গান শেখার সুযোগ এল। সরকারবাড়ীর নরেনবাবু আমাকে গান শেখানর জন্য বাবাকে পরামর্শ দিলেন। বাবা আমাকে একদিন ডেকে আমার কণ্ঠ পরীক্ষা করেন ও স্বরলিপি সাধন প্রণালী অবহিত করান। নর্ম্মাল সঙ্গিত-বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর আমার বাবা, অঘোরনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন মিয়া আলিবক্স সাহেবের শিষ্য হন। গজা খাবার নাকি গায়কের পক্ষে উপযোগী বস্তু—তজ্জন্য গুরুকে এঁরা গজা খাওয়াইতেন—অর্থের দরকার হত না খাঁ সাহেবের। এঁদের মধ্যে আলিবক্স সাহেব অঘোরনাথকে তাঁর সমস্ত সঙ্গীতসম্পদ অর্পণ করেন। পরে সেই ভারতবরেণ্য সঙ্গিতসাধক অঘোরনাথকে আমি সঙ্গীত-গুরু হিসাবে পাই এবং তাঁর সঙ্গে বহু বিশিষ্ট আসরে উপস্থিত থাকিতাম। পাথুরিয়াঘাটার রাজপ্রাসাদে একবার আমি ভূপালী রাগের 'নৈনন বিশাল' 'বাজত ডকবীণ' দু'টি ধ্রুপদ ও ধামার গান করি—সঙ্গত করেন কাশীর মৃদঙ্গী ভুতরাম। উপহার পাই কঠিন স্বরগ্রাম সাধন প্রণালী সম্বলিত একটি পুস্তক। রাজচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় আমাকে তাঁর সুবৃহৎ হারমনিয়মটি দেন। বাবার কাছে শেখা

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য

বিষ্ণুপুর ঘরাণার গানগুলি কিছুটা সংস্কার করে ও স্বরচিত গান আমায় শেখাতেন অঘোরনাথ। তাঁর নিয়মিত শিক্ষাধীনে এসে সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্রে আমি সার্থকতার পথ খুঁজে পাই। বাবার মৃত্যু ও অঘোরনাথের ৺কাশীধামে যাওয়ার পর আমি প্রসিদ্ধ ধামারী বিশ্বনাথ রাওজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। আমি প্রায়ই ৺কাশীধামে যেতাম—তথায় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মিঠাইলালজী, আসগর আলী খাঁ, মিয়া আসাক আলী খাঁ প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞগণের সান্নিধ্যে আসি। চাকুরীস্থলের শ্রদ্ধেয় সতীশ দত্ত (দানী বাবু) ও প্রখ্যাত মৃদঙ্গ-বাদক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে সঙ্গীত চর্চ্চায় সাহায্য করিতেন। এগার ঘণ্টা নিয়মিত সঙ্গীত সাধনা করেছি—বর্ত্তমানেও বহুক্ষণ করে থাকি। নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রথম থেকে যুক্ত আছি। নাগপুর সঙ্গীতাসরে কয়েক বৎসর ও কাশী সঙ্গীত-সমাজ সম্মেলনে ১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে অংশ গ্রহণ করি। সেখানে ছোট ও বড় রামদাসজী, আনোখীলাল, কণ্ঠে মহারাজ, ওঙ্কারনাথ প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়। আন্তঃ-কলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ঘত্রিশ বৎসর বিচারক হিসাবে রহিয়াছি। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাস হইতে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের আমি একজন নিয়মিত গায়ক। ১৯৫৮ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক—অধ্যাপক (সঙ্গীত) রূপে শান্তিনিকেতনে ছিলাম। ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত-নাটক আকাদেমী আমাকে সঙ্গীতে (ধ্রুপদ) অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। বারাণসীর ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল আমাকে "সঙ্গীতরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করেন। সাতনা (রেওয়া ষ্টেট) উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের তনয়া ষষ্ঠী দেবীকে ১৮৯৮ সালে বিবাহ করি। সেখানে আমায় সঙ্গীত জলসায় যোগ দিতে হয়। ওস্তাদ দিলওয়ার খাঁ খেয়াল গাইতেন। একবার তথায় সত্যবালা দেবী আমার গানের সঙ্গে বীণা বাজান।

তিনি বলেন যে, প্রতি বৎসর কলিকাতায় যে গানের আসরগুলির অধিবেশন হয়, তা থেকে বাংলা দেশের সঙ্গীতশিল্পী ছেলেমেয়ের বিশেষ কিছু শেখা হয় না।

চলে আসার আগে তিনি জানালেন যে, বাবা ও অন্যান্য যে সমস্ত গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলাম—তাঁদের স্নেহ, ভালবাসা, দরদ পেয়েছি—তাঁদের সাধনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি—কিন্তু বোধ হয় পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারিনি। তার জন্য আমার মনে নেই কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ, কোন আত্মাবমাননা। কারণ আমার সঙ্গীতজগতে চলার পাথেয় হয়েছে তাঁদের সকলের আশীর্ব্বাদ।

গ্রহের গতি

শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণে রাতের হাওয়ায় বিজলীর সজল পরশ,
পৃথিবীতে ঘুম নামে, মনে হয় সবাই অলস।
সময়ের শিহরণ
কি জানি কখন
দিয়ে গেল দোলা।

শ্লেটের কালিমামাখা ঘন মেঘে
বিজলীর খেয়ালী আঁচোড়ে
সুরের মেখলা।

দু'একটি নামহীন তারা
কেন অত দিশাহারা ?
সিক্ত শাড়ীর আড়ালে
বুটিদার ব্লাউজের কোলে,
জরির কারুকার্যে বুঝি
প্রকাশের প্রসব বেদনা।

নামহীন ! গোত্রহীন !
তবু
অনন্তের কক্ষপথে নিবু নিবু চোখে,
উতলা মেঘের কোন অরক্ষিত ফাঁকে,
বিস্ময়ে দেখেছিল পৃথিবীকে।

সভ্যতার রত্নপণ্যভারে বোঝাই জাহাজ—
কীর্ত্তির কেতন আর শতাব্দীর ইতিহাস আলোয় ;
সাগরের তুহিন আঁধারে কোন পথে যায় ?

সাহারা মরুভূ-বুকে মরীচিকা পিছে,
পথভোলা দলহারা বেদুইন বণিকের বেশে,
একাকী চলেছ কোন নীহারিকালোকে !

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

বড় বড় মামলার তদন্ত কার্য্যে মধ্যে মধ্যে তদন্ত দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই সময় রক্ষীকুলকে একদিকে যেমন ভেবে দেখতে হয় যে এই হত্যাকার্য্যে অপরাধীরা এই কার্য্য কেন করেছিল, তেমনি তাঁদের এ'ও ভেবে দেখতে হয় যে এই কার্য্য তারা করতে পারতো কিন্তু তা সত্ত্বেও তা তারা কেন করে নি? এই ভাবে বিষয়বস্তুর সম্যক আলোচনার পর রক্ষীকুলকে তদন্ত কার্য্যের জন্য তাদের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করতে হয়েছে। এই জন্য থানায় ফিরে কিছুক্ষণের জন্য এই দুরূহ তদন্ত কার্য্যে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা একটি পরামর্শ সভায় তদন্ত দ্বারা সংগৃহীত তথ্য সকল সম্বন্ধে আরও গভীর ভাবে চিন্তা করে আমরা নিম্নলিখিত রূপ এক সুচিন্তিত অভিমতে উপনীত হই।

খোকাবাবু, গোপীবাবু, কেষ্টোবাবু সুবোল, কালী প্রভৃতি কয়েকজন খোকাবাবুর নেতৃত্বে ৪ঠা সেপ্টেম্বার রাত্রি ৮-৩০ এর সময় সোনাগাছি হতে পাগলাকে পাকড়াও করে কুমরটুলির ঐ মেথর গলিতে এনে রাত্রি নয়টা আন্দাজ সময় তাকে ছুরিকাহত করে সেখানে ফেলে রাখে। এর পর গোপীবাবু খুব সম্ভবতঃ খোকার অনুমতি পেয়ে নিজের বাড়ীতে চলে গিয়েছিল। এর পর খোকা তার সাকরেদ কালী ও সুবোল প্রভৃতিকে তার রক্ষিতা মলিনাকে তার ডেরা থেকে তুলে নিয়ে তাকে উষার বাড়ীতে রেখে আসবার জন্য আদেশ করে। কালী সুবোল প্রভৃতি ঘটনাস্থল ত্যাগ করলে খোকাবাবু কেষ্টোকে নিয়ে তাদের কৃপানাথ লেনের বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে সেই বাড়ীতে সবার অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছিল। ঐ বাড়ীর রূপজীবিনী নারীরা তাদের প্রাত্যাহিক রেওয়াজ অনুযায়ী জীবিকার জন্য শিকার সংগ্রহার্থে ঐ বাড়ীর সদর দরজার গলিতে দাঁড়িয়েছিল। এই জন্য খোকাবাবু প্রথমবারে যখন তাদের সেই বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল তখন তারা কেউ তাকে দেখতে পায়নি। কেষ্ট বাবুও সম্ভবতঃ এই সময় খোকাবাবুর সঙ্গে পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য খোকাবাবুর বাড়ীতে এসে থাকবেন। এরপর তারা তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্ত্তন করে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ীর ঐ পিছনের দরজা দিয়েই ঐ বাড়ী হতে বেরিয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ পক্ষে ঐ বাড়ীর পিছনের দরজা হতে অন্য এক আঁকা বাঁকা গলির পথ ধরে বড় রাস্তায় বেরিয়ে আসা যায়। এর পর তারা পথের মধ্যে কোনও পানের দোকান হতে পান কিনে তা খেয়েছে। উত্তেজনার বশে বেশী পান খাওয়ার জন্যে খোকাবাবুর নীল সার্টে পানের পিচ লেগে গিয়ে থাকবে। এর পর তারা একবার ভূপেনের বাড়ী এসে মলিনা সেখানে এসেছে কিনা তা একবার দেখে যায়। এরপর সেখান থেকে খোকাবাবু কেষ্টবাবুকে নিয়ে ঐ মেথর গলিতে পুনরায় ফিরে গিয়ে পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। খোকাবাবু একাই সম্ভবতঃ এই মুণ্ড কর্ত্তন রূপ কার্য্যটি সমাধা করে। এই জন্য মাত্র তার জামাতেই রক্ত লাগে। এই জন্য খোকাবাবুকে পুনরায় পোষাক পরিবর্ত্তন করতে হয়েছিল। কেষ্টবাবু এই সময় দূরে দাঁড়িয়ে থাকায় তার জামা কাপড়ে রক্ত লাগে নি। এই জন্য খোকার সঙ্গে সে দ্বিতীয়বার কৃপানাথ লেনে এলেও পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য খোকার সঙ্গে ঐ বাড়ীতে না ঢুকে সে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। পাগলার মুণ্ডকর্ত্তন করে ঐ মুণ্ড সহ তারা সম্ভবতঃ প্রথমে গঙ্গার ধারে আসে এবং তার পর তারা গঙ্গার জলে ঐ কাটা মুণ্ডটা ফেলে দিয়ে চলে আসে। সম্ভবতঃ মুণ্ড কর্ত্তনের সময় খোকাবাবুর জুতাজোড়াটিও রক্ত রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এই জন্য পোষাক পরিবর্ত্তনের জন্য তার কৃপানাথ লেনে ফিরে আসবার সময় সে তার জুতা দুটো কোথাও ফেলে দিয়ে নগ্নপদে সেখানে ফিরে এসেছিল। এই জন্য সাক্ষী দেবেন বাবু খোকাবাবুকে ঐ সময়ে নগ্নপদে ফিরে আসতে দেখেছিল। দেবেন বাবু খোকা বাবুর সার্টে এই সময় রক্তের দাগও দেখেছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বার না হলে তা খোকার সার্টে লাগতে পারে না। অথচ মৃত ব্যক্তির গাত্র হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত উপরে উঠে না। কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট হতে আমরা জেনেছি যে ছুরিকাহত হয়ে বেহুঁস হলেও পাগলা তখনও মরেনি। বস্তুতঃ পক্ষে জীবিত অবস্থাতেই পাগলার দেহ হতে তার মুণ্ডটা বিচ্যুত করা হয়েছে। এই জন্য তার দেহ হতে ফিনকী দিয়ে রক্ত উঠে খোকার সার্টটি রক্তরঞ্জিত করেছিল। দুই বার এদের রক্তরঞ্জিত পোষাক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হওয়ায় আমরা দুই প্রস্থ রক্তরঞ্জিত পোষাক পরিচ্ছদ খোকার নিজ বাড়ী এবং তার ধোপার বাড়ী হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি।

আমরা উপরোক্ত রূপ এক স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেও তখনও পর্য্যন্ত উহার অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারি নি। কয়েকটি সূত্রের উপর নির্ভর করে আমরা মাত্র এইরূপ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কিন্তু সূত্র সমূহ সকল ক্ষেত্রে প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয় নি। সূত্র সমূহ অনুমানের সাহায্যে অপরাধ নির্ণয় কার্য্যে সহায়ক হয় মাত্র। উহার দ্বারা কোনও এক অপরাধ কখনও প্রমাণিত হয় না। বস্তুতঃপক্ষে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা সাক্ষ্য প্রমাণের সহিত কিছুটা অনুমানের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই জন্য আমরা আমাদের এই পরিকল্পনা বা থিওরীটি প্রমাণের জন্য আরও তদন্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করি।

যে কোনও কারণেই হোক আমাদের সহজাত বুদ্ধি বা ইনিষ্টিংক্ট বলছিল যে গোপী বাবুই ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সেকেণ্ড ইন্ কম্যাণ্ড এবং কেষ্টো বাবু ছিলেন থার্ড-ইন্ কম্যাণ্ড। আমাদের অন্তরাত্মা এ'কথাও বলছিল যে খুব সম্ভবতঃ

গোপী ও কেষ্টো পাগলাকে দুই দিক হতে শক্ত করে ধরে রেখেছিল এবং খোকা বাবু নিজে তাকে ছুরিকাহত করে হতচেতন করে দিয়েছিল। আমাদের আরও মনে হচ্ছিল যে সুবোল, ভূপেন প্রভৃতি দলের অন্যান্য ব্যক্তি ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে শুধু পাহারারত ছিল।

বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ইনটেলিজেন্স বা বুদ্ধিবৃত্তি ভুল করলেও মানুষের সহজাত বুদ্ধি বা ইনস্টিঙ্কট ভুল করে নি। মানুষের প্রোফেস্যনেল বা পেশাগত ইনস্টিঙ্কট সম্বন্ধে এ'কথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। এমন অনেক ডাক্তার আছে যাঁরা কেবলমাত্র রোগীকে পরীক্ষা না করে শুধু তাকে দেখে বলে দিতে পেরেছে যে তার এই এই রোগ হয়েছে। পরে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর তাঁদের এই অনুমান সত্য রূপে প্রতীত হয়েছে। এমন বহু ফুল বিক্রেতাকে আমি জানি যে খরিদ্দারকে দেখামাত্র বলে দিতে পেরেছে যে সে ফুল নেবে কিনা এবং নিলে সে এর জন্য কতো দাম দিতে পারবে। এমন বহু পুলিশ অফসার আছেন যাদের কাছে ১২ জন সন্দেহমান গৃহ-ভৃত্যকে হাজির করার পর তিনি তাদের মুখের দিকে শুধু কয়েকবার মাত্র তাকিয়ে বলে দিতে পেরেছেন যে এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দিন ঐ বাড়ীতে চৌর্য্যকার্য্যে লিপ্ত ছিল। পরে ঐ লোকটির কাছ হতে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ঐ লোকটিই যে চোর ছিল তা তিনি জানলেন কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঐ অফিসারটি শুধু এইমাত্র বলেছেন যে তাঁর মন (ইনস্টিঙ্কট) বলছিল তাই তিনি এই কথা বলেছেন। কোনও পুলিশ অফিসার যদি উকিল ব্যবসায়ী, ডাক্তার প্রভৃতির ন্যায় পুলিশি কার্য্যকে শুধু চাকুরী হিসাবে গ্রহণ না করে শুধু উহাকে তাদের একটি প্রফেসন রূপে মনে করেন তাহলেই মাত্র তাঁরা এইরূপ প্রফেস্যনাল ইনস্টিঙ্কট অর্জ্জন করতে সক্ষম হবেন।

এইরূপ এক ইনস্টিঙ্কট বা সহজাত প্রেরণা আমি ও সুনীল বাবু বারে বারে অনুভব করছিলাম। অন্ধকারে পথ খুঁজে না পেলে এই ইনস্টিঙ্কটের সাহায্য নেওয়া আমাদের নিকট অপরিহার্য্য ছিল। আমাদের এই ইনস্টিঙ্কট যেন আমাদের নির্দ্দেশ দিল, সর্ব্বাগ্রে এই মামলার অন্যতম খুনী আসামী কেষ্টোবাবু এবং গোপীনাথকে সর্ব্বপ্রথম খুঁজে বার করবার জন্যে। আমাদের মন বারে বারে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিল যে এই দুইজনের একজনের বিবৃতির উপরেই সমগ্র মামলাটির সাফল্য নির্ভর করছে। ইতিমধ্যেই আমরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলাম যে এদের প্রত্যেকেরই এক একজন করে রক্ষিতা আছে। এরা সাধারণতঃ তাদের ওখানেই রাত্রিবাস করে থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বে মলিনা প্রভৃতি সাক্ষীর মুখে শুনেছিলাম যে ভূপেন বাবুর রক্ষিতার বাড়ীতে খোকাবাবু মলিনাকে রেখে বেরিয়ে যায় এবং তারপরে সেখানে রাত্রি ১টার সময় পুনরায় ফিরে আসে। এরপরে প্রত্যুষে উঠে খোকা মলিনাকে তাদের উত্তরপাড়ার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে রেখে আসে। এই কারণে আমরা অনুমান করে নিতে পারলাম যে গোপীবাবুও নিশ্চই এই রাত্রে একটার সময়ই তার রক্ষিতার বাটিতে ফিরে এসেছিল এবং তারপর প্রত্যুষে উঠে সে তার রক্ষিতাকে নিয়ে অন্য কোথায় চলে গিয়েছে। এইরূপ এক অনুমানের উপর নির্ভর করে আমরা মধ্য ও উত্তর কলিকাতার বেশ্যা পল্লী অঞ্চলে খোঁজ করতে লাগলাম যে ঐরূপ কোনও নারী ঐদিন ভোর রাত্রে তার উপপতির সহিত তাদের ঘরে তালা বন্ধ করে অন্য কোথায়ও চলে গিয়েছে কিনা? আমাদের অনুমান আদপেই মিথ্যা হয়নি। বহু অনুসন্ধানের পর আমাদের ইনফরমার তিনকড়ির সাহায্যে গোপীনাথ সেন লেনের এক বাসিন্দা বলাই দাস নামক রূপজীবিনী বিলাসী জনৈক ব্যক্তির নিকট আমরা এইরূপ একটি ঘটনা ঐ খুনের দিনে ভোর রাত্রে ঘটেছে বলে জানতে পেরেছিলাম। নিম্নে সাক্ষী বলাই দাসের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ লিপিবদ্ধ করা হলো।

আমার নাম বলাইচন্দ্র দাস। আমি ৺নরেন দাসের পুত্র। ৫ই সেপ্টেম্বার (খুনের রাত্রে) রাত্র একটায় গোপীনাথ সদর দরজায় ধাক্কাধাক্কি করতে থাকায় আমি বাড়ীউলী মানদারাণীর নির্দ্দেশে নীচে নেমে উহা খুলে দিলে গোপীনাথ ঐ গৃহে প্রবেশ করে। গোপীনাথ এই বাড়ীর এক অন্যতম বাসিন্দা ডলিরাণীর উপপতি। সে ডলির সঙ্গে বসবাস করলেও প্রায়ই রাত্রে গরহাজির থাকে। অন্যথায় সে রাত্র দশটার মধ্যেই ডলিরাণীর ঘরে ফিরে আসে। এই রাত্রে তার জামার উপর আমি রক্তের দাগ দেখি। আমি এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বলে মদের ঝোঁকে পড়ে গিয়ে সে আহত হয়েছে। এর পর সে তড় তড় করে সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠে যায়। এক বাড়ীউলী ছাড়া এ বাড়ীর আর সব মেয়েদের বাঁধা বা টাইমের বাবু আছে। এখানকার কোনও মেয়ে ছুটা করে না। গোপীবাবু ডলিরাণীর বাঁধা-বাবু। অন্য কেহ ডলির ঘরে আজকাল আসে না। এ বাড়ীর সদর দরজা রাত্র ১২ টার পর বন্ধ হয়ে যায়। এর পর কেউ এলে আমি নীচে নেমে দরজা খুলে দিই। গোপীবাবুকে আমি ঐ রাত্রে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখলেও সকালে কখোন এ বাড়ী ছেড়ে সে চলে গেলো তা আমি দেখিনি। ওখানকার মেয়েদের মুখে শুনেছি যে সকাল ৫ টায় সে ডলিরাণী ও তার মাকে নিয়ে এবাড়ী থেকে চলে গেছে। আপনাদের ইনফরমার তিনকড়ি আমার বন্ধু। তার অনুরোধে আমি গোপনে থানায় এসেছি। ও বাড়ীর বাড়ীউলী সহ সকল মেয়েরা গোপী বাবুর নিকট বহুভাবে উপকৃত। দায়ে অদায়ে গোপীবাবু টাকা দিয়ে তাদের সাহায্য করে থাকে। এই জন্য ওখানকার মেয়েরা মরে গেলেও তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবে না। আমি বাড়ীউলীর ঘরে থাকি। তেনাই আমার ভরণ পোষণ করেন। বাড়ীউলীর বয়স ৩৬ এবং আমার বয়স এই ২০ হলো।

এই সাক্ষী বলাইচন্দ্র দাসের উপরোক্ত বিবৃতিটি আসামী গোপীনাথের বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ঐ বাটীর বাসিন্দা রূপজীবিনীদের কয়েকজন তাকে সমর্থন করলে তো আর কথাই নেই। এই জন্য আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নিই। নিম্নে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরগুলি এই বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

প্রঃ। বাঁধা, টাইম, ও ছুটা কাকে বলে? তুমিই বা বাড়ীউলীর বাড়ী থাকো কেন। তুমি নিজে কি কাজ করো। কোনও বিষয় গোপন না করে সত্য কথা বলো।

উঃ। এখানকার পেশাবতী নারীদের তিন রকমের উপপতি বা বাবু আছে। যথা, (১) ছুটা অর্থাৎ যারা যাকে তাকে অর্থের বিনিময়ে কক্ষে স্থান দেয়। (২) টাইমের, অর্থাৎ যারা দুই বা তিন ব্যক্তিকে মাত্র আমল দেয়। অর্থাৎ একজন হয়তো এলো সোম ও মঙ্গল বার এবং অপর জন হয়তো এলো বুধ ও শুক্রবার এবং তৃতীয় জন হয়তো এলো শনি ও রববার। এমনি নিয়মমত এদের বাবুরা আসা যাওয়া করে। অজানা ও অচেনা কাউকে এরা কক্ষে স্থান দেয় না। (৩) বাঁধা, অর্থাৎ যারা স্বামি-স্ত্রীর মতন থাকে। এক কথায় একজনেরই মাত্র ভাত খায়। অন্ত কাউর দিকে এরা ফিরেও তাকায় না। তবে আমার সঙ্গে বাড়ীউলীর অন্ত রকমের সম্পর্ক। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসি। আমার কোনও চাকুরী বাকুরী নেই। বাড়ীউলী আমাকে তা করতেও দেয় না। এর বেশী আমি আপনাদের আর কিছু বলতে পারবো না। আপনারা আমার নমস্য গুরুজনস্থানীয়। এ' সব কথা তাই আপনাদের কাছে বলতে আমার লজ্জা করে। বেশ্যানারীরা বেশ্যা হলেও তারা নারী। এই জন্ত তাঁদেরও মধ্যে মধ্যে মনের মানুষের প্রয়োজন হয়। এর বেশী আর আমাকে আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে বাড়ীউলী ওপরের ঘরে থাকেন বলে তিনি গোপী বাবুদের সম্বন্ধে কোনও খোঁজ খবর রাখেন না। তাঁকে আর এই সব ব্যাপারে আপনারা জড়াবেন না। সাক্ষী টাক্ষী যা দেবার তা তাঁর হয়ে আমিই দেবো, বাবু।

উপরের এই সংবাদ অনুযায়ী আমি তৎক্ষণাৎ ঐ বাড়ীতে এসে ওখানকার বেশ্যা নারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকি, কিন্তু এরা এ'ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করতে থাকে মাত্র। বহু পীড়াপীড়ি করেও এদের নিকট আমি একটি মাত্রও প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি নি। আমার এই অক্ষমতা সম্বন্ধে ঐ দিনের মামলা সম্পর্কীয় স্মারকলিপিতে আমি একটি বিবৃতিও লিপিবদ্ধ করি। আমাদের ইনেস্পেক্টার সুনীল বাবু ছিলেন একজন প্রাচীনতম অফসার। তিনি আমার নিকট হতে এই সব কথা শুনে বললেন, ঠিক আছে। তুমি গিয়েছিলে সেখানে পুলিশ অফসার রূপে। এই জন্ত তারা কেউই তোমার কাছে কোনও স্বীকারোক্তি করে নি। এইবার আমি সেখানে যাবো ছদ্মবেশে তাদের একজনের উপপতিরূপে। এইবার দেখবো তাদের কাছ হতে প্রকৃত সত্য সংগ্রহ করা যায় কিনা? আমি অবাক হয়ে ইন্সেপেকটার সুনীল রায়কে বলেছিলাম, সে কি স্তার! এরা আমাকে কিছু বললো না, কিন্তু এরা আপনাকে সব কথা বললো—এই তথ্য আদালতে পেশ করলে তো জুরীরা আমাদের দুজনার কাউকেই বিশ্বাস করবে না। অবশ্য যদি আপনি আদালতে বলতে পারেন যে সেখানে আপনি তাদের উপপতিরূপে গিয়েছিলেন তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা। কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ইনসপেক্টার রায় আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন য়ুরোপে যদি যুবতী নারীরা শত্রুপক্ষের জেনারেলদের উপপত্নী হয়ে থেকে স্বদেশের জন্ত গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসে স্বদেশবাসীর নিকট বরণ্য হতে পারেন তাহলে একটি সাংঘাতিক মামলার কিনারা করার জন্ত এইরূপ এক ব্যবস্থা যদি আমি গ্রহণ করি তাতে আর আমার লজ্জার কি আছে? তা ছাড়া আমি একজন পুলিশ অফসার ও সেইসঙ্গে একজন পুরুষ মানুষও তো বটে। এই দিনই ইনসপেক্টার রায় দিশী ধুতি, হীরার অঙ্গুরী, ও সোনার ঘড়ি পরে ও সিল্কের পাঞ্জাবী ও ওড়না গায়ে দিয়ে ও লপেটা পামসু পরে সারা গায়ে উগ্র সেণ্ট মেখে হাতীর দাঁতের ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে ঐ বেশ্যাবাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিলেন। এর পর সেখানে সারারাত্র বাস করে সেখানকার তিনটি বেশ্যানারীর নিকট হতে নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি সংগ্রহ করে তবে ফিরে এসেছিলেন।

"আমরা তিন জনেই এই বাড়ীতে নিজ নিজ ঘরে পেশা করি। আমাদের বাঁধা বাবু নেই। টাইমের বাবু দু'জন থাকলেও মাঝে মাঝে আমরা ছুটাও করে থাকি। আমরা সকলেই গোপী বাবু নামে একজন ফরসা রঙের মানুষকে চিনি। সে ঐ উত্তর দিককার একখানা ঘরে তার বাঁধা স্ত্রীলোক ডলিরাণীকে নিয়ে বাস করতো। ৫ই সেপ্টেম্বর (খুনের রাত্রে) ১৯৩৬ ভোরবেলায় আমরা ডলিরাণীকে একটি জামা ও একটি ধুতি তার ঘরের বারান্দায় বালতির জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করতে দেখেছি। ঐ বালতির সব জলটা লাল হয়ে উঠছিল। ডলিরাণীকে জিজ্ঞেস করায় সে বলে গোপীর অর্শের রোগ আছে। এর কিছু পরেই গোপী ডলিরাণী ও তার মা'কে নিয়ে তাদের দু'টা ঘরেরই তালা বন্ধ করে কোথায় চলে গিয়েছে। তাদের এখনকার বাড়ীর ঠিকানা সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলতে পারবো না।"

পরদিন সকালবেলা আটটার সময় ইনস্পেক্টার সুনীল রায়ের নিকট হতে উপরোক্ত সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর নির্দেশ মত আসামী গোপীনাথের রক্ষিতার ঐখানকার ঘর দুইটি তল্লাস করবার জন্ত যথাশীঘ্র রওনা হয়ে গেলাম। ঘর দুইটি তালাবদ্ধ থাকায় তালা ভাঙবার জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু ঐখানে উপস্থিত হয়ে ঐ ঘর দুইটির তালা ভাঙবার আমার কোনও প্রয়োজন হয় নি। আশাতীত ভাবে আমি দেখতে পেলাম যে ওদের দুইটি ঘরই খোলা এবং সেখানে ডলিরাণী ও তার মাতাঠাকুরাণী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পুটলী পোঁটলা বাঁধছেন। একটু দেরী করলে এরা একেবারে আমাদের নাগালের বার হয়ে যেতো আর কি? আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ঐ ঘরে উপবিষ্টা মসীবর্ণা কুরূপা যুবতীর নামই ডলিরাণী। ঐরূপ একটি কুৎসিত নারীর ঐরূপ একটি সুন্দর নাম আমার সেইদিনকার তরুণ মন আদপেই পছন্দ করেনি। আমি একরকম ক্ষেপে উঠে বলে উঠেছিলাম, কে তোমার এই নাম রেখেছে? ভীতত্রস্তা হয়ে ডলিরাণী বলে উঠলো, আমার মা। 'এ্যাঁ তোমার মা' অলক্ষ্যে আমার মুখ হতে বেরিয়ে এলো 'এই পাকড়ো ইনকো।' আমার এই হুহুঙ্কার অভিনয়ের ফল ফলতে একটুও দেরী হয়নি। ভীতা ত্রস্তা হয়ে একরকম কাঁপতে কাঁপতেই ডলিরাণীর বৃদ্ধা মাতা বলে উঠলো আমাদের কেন ধরবে বাবা। আমরা তোমাদের গোপীর হাওড়ার নূতন বাসা এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এইবার একটু দোটানায় পড়ে গেলাম। এক্ষুণি এদের নিয়ে হাওড়ায় চলে যাবো, না প্রথমে ডলিরাণীর একটি বিবৃতি এখানেই লিপিবদ্ধ করে নেবো। পরিশেষে চিন্তা করে ডলিরাণীর নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

'৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ রাত্র আন্দাজ এক ঘটিকায় সময় [ইং মতে রাত্র ১২টার পর তারিখ বদলায়] আমার দয়িত গোপীবাবু আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলো। এই সময় আমি দেখতে পেলাম যে সে প্রচুর মদ্যপান করেছে। এই অবস্থায় তাকে আমি দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা! তোমার ফিরতে আজ এতো দেরী হলো কেন? আমার এই প্রশ্নে গোপীবাবু ক্ষেপে উঠে উত্তর করলো, চুপ কর শালী। একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে খবরের কাগজে দেখতে পাবি। পরদিন প্রত্যূষে আমি তার ধুতিতে রক্তের দাগ দেখতে পাই। এই থেকে আমি বুঝতে পারি যে রাত্রে একটা খুনখারাপি হয়ে গিয়েছে। গোপীবাবুর অনুরোধে আমি কাপড়খানা এক বালতি জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে ফেলি। এর পরই গোপী আমাকে নিয়ে হাওড়ার একটা বাসাবাড়ীতে এনে তুলে। আমার মাও আমার সঙ্গে চলে আসে। এর পর এই দিন আমি মার সঙ্গে এখানে এসেছি এখানকার জিনিসপত্র সব ও বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে। ঐ কাপড়টা আমি ধোবার বাড়ী না দিয়ে হাওড়ার বাড়ীতে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এ ছাড়া ঐ খুন সম্বন্ধে আমরা আর কোনও খবরই আপনাদের দিতে পারি না।'

এর পর আমি সাক্ষীদের সামনে গোপীর ঘর দু'টি ভালো করে তল্লাস করি কিন্তু সেখানে আপত্তিকর কোনও দ্রব্য পাওয়া যায়নি। এর পর ডলি ও তার মাকে নিয়ে আমি নেমে আসছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম যে একটি ফরসা রঙের ছোকরা উপরে উঠছে। ছোকরাটি আমাদের দেখামাত্র দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তার পিছু পিছু তাড়া করে তাকে ধরে ফেললাম। তার গায়ের রঙ ও চেহারা দেখে ইতিপূর্ব্বেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, সে গোপীবাবুর ছোট ভাই সুদাম। ডলি ও তার মার ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে গোপী তাকে এখানে খবর নেবার জন্যে পাঠিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ ডলি ও তার মাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায় রেখে মাত্র সুদামকে নিয়ে হাওড়ায় রওনা হয়ে পড়ি। থানায় ফিরে এসে সেখান থেকে এক ট্রাকভর্ত্তি সশস্ত্র শান্ত্রীও সঙ্গে নিয়েছিলাম।

গোপীর ভাই সুদাম নিজেই আমাদের পথ দেখিয়ে তার দাদার হাওড়ার নূতন বাসা-বাড়ীটি দেখিয়ে দিয়েছিল। এই ভাবে তার দাদাকে ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া তার অন্য উপায়ও ছিল না। তা ছাড়া এতে তার দাদার কিরূপ বিপদ ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে তার কোনও সঠিক ধারণা ছিল না। আমরা ত্বরিতগতিতে সশস্ত্র সিপাহী-শান্ত্রীর সাহায্যে গোপীর ঐ বাড়ীটা ঘেরোয়া করে ফেললাম। বাড়ীর দরজা বার হতে খোলাই ছিল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, গোপীনাথ একটা তক্তপোষের উপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আমরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ামাত্র সে তড়াং করে উঠে পড়ে তক্তপোষের পাশ হতে একটা ভোজালী বার করে আমাদের দিকে তেড়ে এলো। আমরা পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত থাকায় তিন-চারটা টোটা-ভরা রিভলভার ক্ষণিকের মধ্যে তার দিকে উঁচিয়ে ধরতে পেরেছিলাম। বেগতিক বুঝে গোপীনাথ ভোজালীটা বিছানার উপর রেখে ধরা দেবার জন্যেই যেন আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু আমরা আমাদের পিস্তল কয়টি পুনরায় পকেটে পুরামাত্র সে আমাদের উপর শুধুহাতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। এর পর আমাদের মধ্যে সুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি। এতে আমাদের মধ্যে দুই-একজন আহত হলেও গোপী নিজেই অধিক আহত হয়েছিল। কিন্তু সে যে সেদিন ইচ্ছে করেই আহত হয়েছে, তা আমি সেই দিন আদপেই বুঝতে পারিনি। পরদিন হাকিমকে নিজের দেহের আঘাত দেখিয়ে পুলিশ হেপাজতি এড়িয়ে জেল হেপাজতিতে যাবার জন্যে সে সুপরিকল্পিত ভাবে এইরূপ ধস্তাধস্তিতে আহত হতে চেয়েছিল। পাছে পুলিশ হেপাজতিতে থেকে তাকে একটা স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দিতে হয়, তার জন্য তার এ ছিল একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। যাই হোক, আমরা দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে গোপীবাবুর ঐ বাড়ীর ঘর কয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তল্লাসী করে একটি বাক্সো থেকে তার রক্ত-ধৌত কাপড়খানি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। তখনও পর্য্যন্ত (ধোয়া সত্ত্বেও) তাতে সামান্য সামান্য রক্তের চিহ্ন লেগে ছিল। এ ছাড়া ঐ ঘরের অপর একটি বাক্সো থেকে আমরা একটি গণৎকারের ছক-আঁকা কাগজও উদ্ধার করতে পারি। এই পত্রিকাখানি হতে বুঝা যায় যে গোপীবাবু ইতিমধ্যে এক গণৎকারের কাছে ভাগ্য গুণিয়ে এসেছে। ঐ কাগজের টুকরাটিতে লেখা ছিল যে অতো তারিখের মধ্যে গোপীবাবু পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে তার আর কোনও বিপদের আশঙ্কাই থাকবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্ব্বেই গোপীবাবুকে আমাদের হাতে ধরা পড়তে হলো।

গোপীবাবুকে সঙ্গে করে থানায় এনে দেখলাম ইনেস্পেক্টার রায় নিবিষ্ট মনে এই মামলার কল্যকার তদন্ত সম্পর্কে স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ করতে মহাব্যস্ত। আমাদের তাঁর কক্ষে ঢুকতে দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, 'যাক্। পেয়ে গিয়েছো ওকে তাহলে। তুমি ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করে দাও। আমি ততক্ষণ এই মামলার লেখাপড়ার কাজটা সেরে ফেলি।' আমি গোপীকে তাঁর নিকট পেশ করে বললাম 'তা হলে তো ভালোই হতো। কিন্তু আসামী ভীষণ ভাবে জখম হয়েছে। ওকে একবার হাসপাতালে পাঠানো এখুনি দরকার। এছাড়া আমরাও তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে আহত হয়ে পড়েছি। শেষে কি টাটেনাস হয়ে মারা যাবো। প্রত্যেক পুলিশ অফিসারেরাই ফার্ষ্ট এইড সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকে। ইন্সপেক্টার রায় তাড়াতাড়ি আলমারী খুলে তুলো আইডিন প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের একটু প্রাথমিক শুশ্রূষা করে বললেন আচ্ছা। তাহলে যাও। হাসপাতালটা ঘুরে এসো।' হাসপাতাল থেকে যথারীতি নিজেদের ও সেই সঙ্গে আসামীকেও পটি ধরিয়ে ফিরে এসে আমি গোপীবাবুর জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলাম। কিন্তু কিছুতেই সে এই খুনের তদন্তে আমাদের সাহায্য করতে রাজী হলো না। তবে সে একবার মাত্র দম্ভোক্তি করে বলেছিল, 'আজ্ঞে হাঁ। আমি ও কেষ্টো পাগলার দুই হাতে চেপে ধরি। আর সেই সুযোগে খোকা সম্মুখ থেকে তার বুকে ছুরি বসায়। আমাদের সঙ্গে সুবোল ও কালী প্রভৃতি আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা সাক্ষাৎ ভাবে খুনের ব্যাপারে কোনও প্রকারে আমাদের সাহায্য করে নি। তবে পাগলাকে ট্যাক্সি করে ধরে আনবার সময় তারা আমাদের সাহায্য করেছিল।' এইটুকু মাত্র স্বীকার করে হঠাৎ কি ভেবে গোপী বাবু তড়াং করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। আশে পাশের

সিপাহীরা সতর্ক হয়েই তাকে ঘিরে রেখেছিল। পালাবার কোনও উপায় না দেখে সে আমাদের গাল পাড়তে পাড়তে চীৎকার করে বললো 'না না না। আমি আর একটি কথাও আপনাদের বলবো না।' এর পর আমরা তাকে অনেক বুঝালাম ও অনুনয় করলাম, কিন্তু ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়। আমরা কিছুতেই তার কাছ হতে খোকা বাবু ও কেষ্ট বাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারলাম না। আমি তখন গোপীকে লক-আপে পুরে দিয়ে আমার সহকারীদের বুঝিয়ে বললাম, যে এর কাছ হতে এক্ষণে আর একটি কথাও বার করা যাবে না। একে এখোন খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিরর্থক। এ জন্য আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

আমার এইরূপ অভিমতের মধ্যে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত ছিল। অভিজ্ঞতা হতে আমি জেনেছিলাম যে এই সকল পুরাতন অপরাধীরা এক অসাধারণ মানসিক অবস্থার সন্তুতি। এদের বিবিধ সুকুমার বৃত্তি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে এদের মধ্যে মাত্র অলসতা ভাবপ্রবণতা দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা রূপ বৃত্তি চতুষ্টয় স্থুল ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। এরা উত্তেজিত হলে এদের এই বৃত্তি চতুষ্টয় এদের মনের পথে উঠা নামা করে, অর্থাৎ কখনও এরা থাকে অলস, কখনও এরা হয় ভাবপ্রবণ, কখনও বা এরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। এখোন নিদারুণ উত্তেজনা একে এর মনের দাম্ভিকতার রাজ্য থেকে নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এনে ফেলেছে। এই জন্য আমি বুঝতে পারলাম যে পুনরায় ভাবপ্রবণতার রাজ্যে উপনীত না হলে এর কাছে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় অসম্ভব। এই জন্য আমি বিবৃতির জন্য গোপীনাথকে আর একটু মাত্রও পীড়াপীড়ি করা উচিত মনে করি নি।

আমার এই ধারণা অমূলক ছিল না। এই জন্য পরদিন আদালতে তাকে হাজির করার সময় পর্য্যন্ত তার নিকট হতে আর একটি সংবাদও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ তখনও পর্য্যন্ত সে তার মনের দাম্ভিকতার রাজ্যেই অবস্থান করছিল। আদালতে সে তার জখমের জন্য পুলিশকে দোষী করে একটি বিবৃতিও দেয়। এর পর হাকিম বাহাদুর তাকে পুলিশ হেপাজতিতে না রেখে জেলহাজতে প্রেরণ করায় তাকে আর আমরা এই তদন্ত সম্পর্কে বিশেষ কোনও কাজে লাগাতে পারিনি। এ ছাড়া এই সময় পর্য্যন্ত খুন সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে অকাট্য কোন প্রমাণও আমরা দাখিল করতে পারিনি। এইজন্য আদালতের এই আদেশ আমাদের মেনে নেওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায়ও ছিল না। তবু এই মন্দের ভালো এই যে, গোপীবাবু জামীনে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এই কারণে আমরা বরং খুশী হয়েই সেইদিন আদালত হতে থানায় ফিরেছিলাম। কিন্তু তদন্তকার্য্যে আর দেরী করা যায় না। তাই আমি ফিরে এসে দু' মুঠো মাত্র অন্ন মুখে পুরে সুবল ও কালীর সন্ধানে পুনরায় থানা হতে বেরিয়ে পড়লাম।

এই সুবল ও কালীর ডেরা খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে কঠিন হলেও তা অসম্ভব হয়নি। এদের জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য স্থানে হানা দেওয়ার পর আমরা পরিশেষে মানিকতলা অঞ্চলের একটি বস্তী গ্রামের মধ্যস্থলে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে যখন আমরা পৌছলাম রাত্রি তখন একটা বেজে গিয়েছে। সাবধানে সারা বস্তীটি বেষ্টন করে উহার মধ্যকার উঠানে এসে দাঁড়ালো মাত্র আমরা সহসা একটা ঝুপ করে আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাদের অন্যতম ইনফরমার রাধানাথ আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে একটি ঘরের চালের উপর দণ্ডায়মান একটি মনুষ্যাকৃতির প্রতি আঙুল দেখিয়ে একরকম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেই বলে উঠলো, হুজুর! খাঁদা—আ। আমাদের সকলেরই জানা ছিল যে, খাঁদা ওরফে খোকার হাতে সকল সময়েই একটি গুলী-ভরা পিস্তল থাকে। আমাদের এ-ও জানা ছিল যে, সে নিমেষে শত্রুনিধনে সর্ব্বদাই তৎপর থাকে। একথা সত্য যে বিপদে ধৈর্য্যহারা হওয়া বিচক্ষণ পুলিশ অফিসারের পক্ষে অনুচিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মুখ হতে বার হয়ে এলো, ফায়ার। আমাদের থানার সার্জেন্ট গ্রাণ্ট সাহেব আমার ডান পার্শে দাঁড়িয়ে ছিল। হুকুম পাওয়া মাত্র সে তার পেটী হতে টোটাভর্ত্তি পিস্তল বার করে লোকটিকে লক্ষ্য করে উপর্য্যুপরি দুইবার গুলী করলো। চারিদিককার রাত্রিকালীন নিস্তব্ধতা ভেদ করে আওয়াজ হলো, দড়াম, দড়াম। আমরা সকলে লক্ষ্য করলাম যে চালের উপরকার লোকটা উপর থেকে ঝুপ করে নীচের উঠানে গড়িয়ে পড়লো। আমরা লোকটাকে ঘিরে তার উপর টর্চের আলো ফেলায় পর আমাদের ইনফরমার জানালো যে লোকটা আদপেই খাঁদা নয়। এমন কি ঐ লোকটা খাঁদার কোনও সাকরেদ কি'না তাও সে জানে না। আমি বিব্রত হয়ে সার্জেন্ট জি গ্রাণ্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি না দেখে গুলী করলে কেন? গ্রাণ্ট সাহেব তার সকল দায়িত্ব

এড়িয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললো, আপনি তো গুলীর জন্য হুকুম দিলেন। তাই তো আমি একে গুলী করে মেরে ফেলেছি। এইরূপ বিপদে আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও পড়িনি। খুনের তদন্ত করতে এসে নিজেই খুনের দায়ে পড়ে যাবো তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমাদের সঙ্গে গৃহতল্লাসীর জন্য বাহির হতে সাক্ষিরূপে আনা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিল। পূর্ব্বে তিনি কোনও এক জমিদারীর নায়েবরূপে বহুদিন কাজ করেছিলেন। এক্ষণে তিনি জনৈক মোক্তারের মুহুরীর কাজ করেন এবং এই বস্তিরই বহির্দেশের একটি দুইটি কক্ষে সপরিবারে বাস করেন। ভদ্রলোক আমার এই বিপদ দেখে একটি ছুরি কিনে মৃত ব্যক্তির হাতে গুঁজে দিয়ে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্সের একটা প্রমাণ তৈরী করার জন্য উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁকে আমি সুস্পষ্ট রূপেই জানিয়ে দিলাম যে, যে কার্য্যের জন্য আমি দায়ী তার সম্মুখীন আমি নিজেই হবো কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এইরূপ কোনও জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় কিছুতেই নেবো না। এর পর আমরা মৃতমন্য ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করা মাত্র সে ধড়মড় করে উঠে বসে আমাদের সকলকে অবাক করে দিলে। আসলে সে ভয়ে কিছুক্ষণের জন্য বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, পিস্তলের একটি গুলী তার গায়ে লাগেনি। এমন কি সে এজন্য মৃত্যুমুখেও পতিত হয় নি। লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে নিম্নস্বরে জানালো যে সুবল ও কালী ঐ বাড়ীরই একটা ঘরে শুয়ে আছে। তাদের নির্দ্দেশ মত সে সারা রাত্রি বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতো। পুলিশ দেখলে আগে ভাগে তাদের খবর দেবার জন্য তার উপর নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু আমরা অতর্কিতে এসে পড়ায় সে পালাবার জন্যে চালের উপর উঠে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, এই লোকটির বিবৃতি অনুযায়ী সুবল ও কালীকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের একটু মাত্রও দেরী হয়নি। তবে এদের ঘর তল্লাসী করে খুন সম্পর্কে কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।

থানায় আনার পর খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে এরা স্বীকার করেছিল যে তারা পাগলাকে ধরে ঐ মেথর গলি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে মাত্র। এর পর খোকা গোপী, কেষ্ট ও পাগলাকে সেখানে রেখে খোকার নির্দ্দেশে ঐ স্থান থেকে তারা না'কি চলে এসেছিল। যে কোনও কারণেই হোক আমার মনে হয়েছিল যে, এরা মিথ্যা বলছে। কিন্তু জানিনা কেন ইনেসপেক্টার সুনীলবাবু তাদের এইটুকু বিবৃতিই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে এদের আর পুলিশ হেপাজতীতে না নিয়ে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। খোকা ও কেষ্ট ধরা পড়ার পর এদের পুনরায় পুলিশ হেপাজতে নিলেই হবে। সেই সময় সত্য নিরূপণার্থে প্রকৃত বিবৃতি প্রদানের জন্য তাদের পীড়াপীড়ি করা যেতে পারবে আখুন। ইনেসপেক্টার সুনীল বাবুর মতে এরা কোনও ক্রমেই খোকাবাবুর দলের কোনও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হতে পারে না। এ'ছাড়া এমনি কতকগুলি আনইম্পটেণ্ট আসামী দ্বারা থানা ভর্ত্তি করে রেখে তদন্তের ব্যাপারে সময় নষ্ট করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। অগত্যা ইনেসপেক্টার সুনীল রায়ের উপদেশ শিরোধার্য্য করে তাদের জেল হেপাজতীতে পাঠিয়ে আমি কেষ্টবাবু ও খোকাবাবুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলাম। কিন্তু তাদের সন্ধান আমাকে কে বলে দেবে? ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বর্ত্তমান দলটি খেঁদার অধীনস্থ বহু উপদলের মধ্যে একটি মাত্র উপদল। খোকাবাবু ইতিমধ্যে বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যারও কয়েকটি স্থানে তার অপকার্য্যের জাল বিস্তার করেছে। অপকার্য্যের সুবিধার জন্য সে এখানে ওখানে কয়েকটি সুরক্ষিত ঘাঁটিও স্থাপন করেছে। খোকা বা খেঁদাকে যারা যারা জানে বা চিনে তারা সকলেই একমত যে, কয়েকটি প্রাণের বিনিময়ে তাকে মাত্র মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব। বিনা যুদ্ধে যে খোকাবাবু গ্রেপ্তার বরণ করবে না তা আমারও জানা ছিল। কিন্তু এইরূপ একটা নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। [ক্রমশঃ

পূর্ণ যদি, শূন্য হবো

পরেশ মণ্ডল

জলে আলপনা এঁকে স্থায়িত্বের সাধে
মরেছ কেবল। এই ঘাসগুলো বেশ!

এসো, আজ ঘাসে-জলে এক ফালি রোদে
নিবন্ত প্রদীপখানা উজ্জ্বলি তুলি
রঙে-রসে। আমি আর তুমি পরিশোধে!

আবিষ্কার করি এক আশ্রয়ের ঝুলি
কোনখানে—কোন নূতন অপরাধে
তুচ্ছ হওয়া বেভুলের আন্তরিক দেশ!

পূর্ণ যদি, শূন্য হবো। ত্যাগমন্ত্রে ছুয়ে
গড়ে নোবো নীড় কোনো অঞ্জলিতে রুয়ে।

সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

চাঁইবুড়োর পুঁথি

আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার জনকরূপে ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের অমরত্বের দাবী অনস্বীকার্য। সাহিত্যেরও একটি বিশেষ অধ্যায় গঠনে তাঁর অবদানের গুরুত্ব বিচার করলে তাঁর জনকত্বের প্রতিবর্ণ পাওয়া যায় না এবং সে ক্ষেত্রে তিনি শুধু জনকই নন, তিনি এককও। অবনীন্দ্রনাথের তুলির সূক্ষ্ম টানে ভারতীয় শিল্প যেমন নবজন্ম লাভ করল তেমনই তাঁর লেখনীর নৈপুণ্যে বাঙলা-সাহিত্যের একটি নতুন পথের শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন ঘটল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরপ্রভাবমুক্ত। অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যে অভিনব আঙ্গিকের সৃষ্টি করলেন—বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তা প্রভূত সহায়তা করল। এক কথায় বাঙলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। সাহিত্যাচার্য অবনীন্দ্রনাথের অনবদ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্রন্থগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করল সম্প্রতি প্রকাশিত চাঁইবুড়োর পুঁথি। এর পটভূমিকা লঙ্কাপুরী—রাবণরাজা এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী এবং সেই সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ সীতা এবং বানরবাহিনী অপরূপ ভঙ্গিমায় চাঁইবুড়োর পুঁথির মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যাংশেও ছন্দের ঝঙ্কার। বর্ণনায় ব্যঞ্জনায় বিন্যাসে অবনীন্দ্রনাথের গৌরব "চাঁইবুড়োর পুঁথি" অক্ষুণ্ণ রেখেছে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম দু'টাকা মাত্র।

স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা

সুকুমার কলাগুলির মধ্যে স্থাপত্যশিল্পের গুরুত্ব ও প্রাধান্য উপেক্ষণীয় নয়—ঐ শিল্পে বাঙালীর ব্যুৎপত্তি কারো থেকে কোন অংশে কমও নয়—আর এ ক্ষেত্রে তার পারদর্শিতা আজকের নয়—বহুকালের (স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূধরের ভিত্তি—সত্যেন্দ্রনাথ)। বাঙলা ভাষায় শিল্পকলা সম্বন্ধে অসংখ্য গ্রন্থ এ তাবৎ আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন বিশদ আলোচনাগ্রন্থ একরকম আত্মপ্রকাশ করে নি বললেই চলে। পরলোকগত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এ অভাব দূর করে গেছেন। লেখক গতায়ু হয়েছেনও বহুকাল পূর্বে ১৯২৬ সালে। এই গ্রন্থে স্থাপত্যবিদ্যা সম্বন্ধে নিখুঁত বিস্তারিত ও তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটি প্রণয়নে লেখককে বহু শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে লেখকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়। সুধীমহলে এবং সংশ্লিষ্ট মহলে এই গ্রন্থ সমান সমাদর লাভ করবে। লেখকের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মানবজীবনে স্থাপত্যবিদ্যার প্রভাব সম্পর্কে লেখকের 'ধারণা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন কালে, যুগে, সময়ে স্থাপত্যবিদ্যার ক্রমবিকাশ বর্ণনায় লেখক প্রভূত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি আলোকচিত্রের সংযোজন এবং অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসুর ভূমিকা গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। প্রকাশক—পুরোগামী প্রকাশনী ১০০।১ ভূপেন্দ্র বোস অ্যাভিনিউ। দাম—চার টাকা মাত্র।

নৃত্যবিজ্ঞান (মুদ্রা)

চৌষট্টি কলার মধ্যে নৃত্য অন্যতম প্রধান কলা। মানব-জীবনে নৃত্যের প্রভাবও যথেষ্ট। নৃত্যশিল্পের মাধ্যমে বহু জ্ঞানী ও গুণীর আবির্ভাব ঘটেছে। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীদের তালিকায় প্রহ্লাদ দাসেরও নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষরস্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। নৃত্যের মুদ্রার ভঙ্গী, কৌশল বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করে এই বিরাট শাস্ত্রের দুরূহ অংশগুলিকে সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন প্রহ্লাদ দাস তাঁর এই গ্রন্থটিতে। মানবজীবনে নৃত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রহ্লাদ দাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যানুরাগী এবং উচ্চ বিদ্যাসম্বন্ধীয় পাঠগ্রহণকারীর দল এই গ্রন্থ পাঠে যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হবেন, এ আশা আমরা রাখতে পারি। প্রকাশক—প্রভাত কার্য্যালয়। ২-সি নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা—৯। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

সাধক কমলাকান্ত

রাজর্ষি রামমোহনের অভ্যুদয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে যে যুগটি শেষ হ'ল (মধ্যযুগ) তার ইতিহাসের পাতায় বলতে গেলে শেষ উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব সাধক কমলাকান্ত। অষ্টাদশ শতাব্দী যখন সমাপ্তির দিকে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছে—সেই রকম কোন এক সময়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনের রঙ্গমঞ্চে ভক্তশ্রেষ্ঠ কমলাকান্তের আবির্ভাব। বাঙলা শাক্তপদাবলী সাহিত্য যাঁদের কল্যাণে গড়ে উঠেছে তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত অন্যতম। মায়ের এই মানস সন্তানের পরমপুণ্য জীবনকাহিনী গ্রন্থাকারে রূপ নিয়েছে। লেখক শ্রীনবকুমার তাঁর মুখবন্ধেই প্রকাশ করেছেন যে এটি জীবনীও নয়, উপন্যাসও নয়। তিনি এ্কে জীবনোপন্যাসের পর্যায়ে ফেলেছেন। গ্রন্থে কমলাকান্তের বাল্যলীলাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং প্রসঙ্গতঃ বর্ধমানের রাজপরিবারের

প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে। আজকের বিশ্বজোড়া হাহাকারের দিনে কমলাকান্ত প্রমুখ সাধকশ্রেষ্ঠদের জীবনী যত প্রসার ও প্রচার হয় দেশ ও দশ উভয়ের পক্ষে ততই মঙ্গল। গ্রন্থটি রচনায় লেখক যথেষ্ট পরিমাণে নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—এস, চক্রবর্তী য়্যাণ্ড সান্স, ২-বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বন্দরের কাল

কলকাতার ডক অঞ্চল মহানগরীর একটি বিরাট ও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বন্দর হিসেবে কলকাতার জগৎব্যাপী খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি সম্বন্ধেও নতুন করে কিছু বলার নেই, এ তথ্য বিশ্ববিদিত। এই বন্দরের আশেপাশে যে কত বৈচিত্র্য, কত জিজ্ঞাসা, শিল্পসৃষ্টির কত উপাদান ছড়িয়ে আছে তা সম্যক উপলব্ধির জন্যে সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন। এই বন্দরকে কেন্দ্র করেই বাঙলার তরুণ সাহিত্যসেবী শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য পরম সুপাঠ্য উপরোক্ত গ্রন্থটি রচনা করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। তাঁর লেখনীতে বন্দরের ইতিকথা, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবনের সুখ দুঃখ তথা ঘাত প্রতিঘাত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সব মানুষদের লেখক কেবলমাত্র চোখ দিয়েই দেখেন নি, দেখেছেন হৃদয় দিয়ে তাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তাদের চরিত্র-চিত্রণ সার্থকতায় পর্যবসিত হতে পেরেছে! বন্দরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী—উপন্যাসটি তাঁদের কৌতূহলও নিরসন করার ক্ষমতা রাখে। তীব্র হৃদয়ানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে এই বলিষ্ঠ উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে লেখক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পাঠকমহলে উপন্যাসটি যথেষ্ট সমাদর পাবে এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। প্রকাশক—পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮৯ গান্ধী রোড। দাম—চার টাকা মাত্র।

রাজা ও মালিনী

আজকের দিনের বাংলা উপন্যাস নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে আর সেই পরীক্ষার গতি যে সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে তার অন্যতম প্রমাণ বারীন্দ্রনাথ দাসের রাজা ও মালিনী। বারীন্দ্রনাথ দাসও শক্তিমান লেখকরূপে অনেককাল পূর্বেই আলোচ্য উপন্যাসটির মাধ্যমে সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠার আসন লাভ করেছেন। একটি শান্ত-মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে বারীন্দ্রনাথ দাসের লেখনী সর্বতোভাবে সমর্থ হয়েছে। উপন্যাসের পাতায় পাতায় লেখকের অন্তরের স্নিগ্ধতা ও স্বচ্ছতার ছাপ পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটি সব চেয়ে বেশী আনন্দ দেবে কবিতানুরাগীদের। কারণ অসংখ্য কবিতার উদ্ধৃতিতে উপন্যাসটি পরিপূর্ণ। উপন্যাসটির পরম রমণীয় সর্বশেষ কবিতা দুটি আয়তনে দীর্ঘ এবং লেখকের কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। সমগ্র উপন্যাসটি যেন কবিতার আবরণে আরও শোভনীয় হয়ে ওঠে। নায়ক-নায়িকা চরিত্র দুটিই যেন দুটি কবিতা। দুটি অপূর্ব কবিতা—আর এই আশ্চর্য চরিত্র দুটির রূপদানে লেখক অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন যে, উপন্যাসটি গতানুগতিক ছাঁচে গঠিত নয়—যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের স্পর্শও বহন করে। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

গীতিমুখর ভিয়েনা

সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যে ললিতকলায় যে সকল নগরী পৃথিবীকে শোভাময়ী করে তুলেছে ভিয়েনা তাদের মধ্যে অন্যতম। ভিয়েনার জন্য বিশ্বের দরবারে সারা ইউরোপ গর্ববোধ করতে পারে। ভিয়েনার প্রধান সম্পদ সঙ্গীত। সুরে ছন্দে গানে বাদ্যে ঝঙ্কারে ভিয়েনা মধুময়ী। ভিয়েনা সম্বন্ধে বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকার সামনে একটি পরম সুখপাঠ্য গ্রন্থ তুলে ধরেছেন শ্রীমতী শেফালি নন্দী। শ্রীমতী নন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবাগতা নন, ইতিপূর্বে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। গ্রন্থটিতে শ্রীমতী শেফালি অষ্ট্রীয়ার আনুপূর্বিক ইতিহাস যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। ভিয়েনার সুরসম্পদ সম্পর্কে তাঁর আলোচনাও মনোরম। গ্রন্থটি ঐ দেশ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যের আকর। লেখিকার রচনাশৈলী মনকে আকৃষ্ট করে। তাঁর রচনার মধ্যে এক শান্ত মধুর ভাবের ছায়াপাত লক্ষণীয়। তাঁর ভাষা যথেষ্ট জোরালো, সতেজ ও স্পষ্ট। কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রন্থের শোভাবর্ধন করছে। প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন শ্রীপ্রেমভূষণ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী, ১০৫।১-বি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম দু' টাকা মাত্র।

নববৃন্দাবন

সাহিত্যজগতে রম্যরচনার মাধ্যমে নীলকণ্ঠের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটলেও উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা অসীম। উপন্যাস রচনায় তাঁর দক্ষতার চিহ্ন বহন করছে নববৃন্দাবন। আজকের দিনের সমাজের আশেপাশে এমন একটি বিষাক্ত পরিবেশ গড়ে উঠেছে যার বিষবাষ্প এক একটি পরিবারকে সর্বনাশার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কিছুকাল আগেও যেখানে ছিল সম্ভাবনার উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি সেখানে আজ ব্যর্থতার গহন অন্ধকার, আর এই ধ্বংসমুখীন রূপান্তরণের মূল রহস্যের উৎস সন্ধানে লেখকের চিত্ত ব্যাকুল। আজকের মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনাকে নিখুঁতভাবে সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তুলতে নীলকণ্ঠ সিদ্ধহস্ত। জগদীশ, অনুপম, সৌমিত্র, এক-একটি আশ্চর্য চরিত্রসৃষ্টি। লেখনী ছাড়াও আরও দুটি বিরাট সম্পদের অধিকারী—দরদ ও অনুভূতি—নববৃন্দাবনই এ উক্তির শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। জীবনের অনেক কিছু ফাঁকা শূন্যতা, রিক্ততা নীলকণ্ঠের সন্ধানী চোখকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সৌমিত্রের মায়ের চরিত্র অঙ্কনে নীলকণ্ঠ অভিনন্দনীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। আজকের দিনে সাহিত্য-জগতে যে গ্রন্থগুলি আত্মপ্রকাশ করছে নীলকণ্ঠের নববৃন্দাবন তাদের মধ্যে অবশ্য উল্লেখনীয় একটি বিস্ময়কর সাহিত্যসৃষ্টি। প্রকাশক—সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯ রায়বাগান ষ্ট্রীট। দাম—পাচ টাকা মাত্র।

ফরিয়াদ

যাঁদের উপন্যাস পাঠক-পাঠিকার দরবারে একটি বিশেষ আসন অধিকারে সমর্থ হয়েছে দীপক চৌধুরী তাঁদেরই অন্যতম। দীপক চৌধুরীর মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্য একটি তেজোদৃপ্ত লেখনীর সন্ধান পেয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। রজতপঙ্ক ব্যতিরেকে আজকের

দুনিয়া যে অচল এ কথাও যেমনই সত্য, তেমনই অর্থ অনেক কিছু অনর্থেরও মূল, এ কথাও মিথ্যা নয়। এই পটভূমিকে ভিত্তি করে উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে দীপক চৌধুরী এক অভিনব আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন। নায়ক প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার। বিত্তবান কিন্তু তাঁর সব কিছু হারিয়ে গেছে, প্রিয়তমা সহধর্মিণীও, তাঁর মনও এই অর্থ আর সেই সব হারানোর পর যে জীবন শুরু হল আর যেখানে তার পরিণতি দীপক চৌধুরীর লেখনী সেই অধ্যায়টি ফুটিয়ে তুলেছে ব্যারিষ্টার জগতের বিচারমঞ্চে আইনব্যবসায়ী নন—সেখানে তিনি ফরিয়াদী আর সে মামলা অর্থের বিরুদ্ধে। উপন্যাসটি রচনার প্রসাদগুণে একটি সার্থক ও বৈশিষ্ট্যবান উপন্যাসের পর্যায়ে স্থানলাভ করেছে। লেখকের বর্ণনভঙ্গী ঘটনার ধারারক্ষণ চরিত্রের রূপায়ন প্রশংসার দাবী রাখে। জীবনের যে বিরাট প্রশ্ন, বিরাট সমস্যা, বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্ব—যার অভিনয় প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে জীবনের রঙ্গমঞ্চে তার সম্যক প্রস্ফুটন ঘটেছে সাহিত্যের পাতায় দীপক চৌধুরীর লেখনীর কল্যাণে। প্রকাশক—নাভানা। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। দাম—চার টাকা মাত্র।

সমান্তরাল

বর্তমান কালের বাঙলা সাহিত্যকে সার্থকতার অভিমুখে অগ্রগমনে যাঁদের বলিষ্ঠ রচনা সহায়তা করে চলেছে, প্রশান্ত চৌধুরী তাঁদের সগোত্র। তাঁর উপরোক্ত উপন্যাসটি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রধানতঃ চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসটির কাহিনী রূপ নিয়েছে। আর এই চিরন্তন চাওয়া পাওয়া থেকে যে আনন্দ বেদনা হাসি-কান্নার উদ্ভব তার যথাযথ প্রকাশও ঘটেছে সমান্তরালের মধ্যে। জীবনের একটি বিশেষ দিকের মর্মোদ্‌ঘাটন করেছেন প্রশান্ত চৌধুরী এই উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে। লেখক তাঁর উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর উদার মনোভাবের ও দরদী অন্তঃকরণের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করে রাখলেন উপন্যাসটির মধ্যে। তাঁর ভাষা লাবণ্যময়, বর্ণনা মনোরম, বক্তব্য মর্মস্পর্শী। প্রচুর সংখ্যক চরিত্র আবির্ভূত হয়ে উপন্যাসটিকে ভারাক্রান্ত করেনি, সংখ্যার দিক দিয়ে অল্প হলেও প্রতিটি চরিত্র মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। গ্রন্থের নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অনিকেতা

সত্য শিব ও সুন্দরের জগৎ আজ ছেয়ে গেছে বঞ্চনায়, শুধু বঞ্চনাই নয় এখানে প্রতারণার অংশও অনেকখানি, আর এই প্রতারণার সর্বগ্রাসী বজ্রমুষ্টিকে উপেক্ষা করে যাওয়ার মত শক্তি না থাকায় মানুষ আজ নিঃস্ব, রিক্ত, শূন্য। সীমাহীন সমুদ্রের বুকে দিশাহারা মানুষ আজ ভেসে বেড়াচ্ছে—খুঁজে চলেছে অন্তত পা দুটো ছোঁয়াবার মত কোথায় পাওয়া যায় একটুখানি মাটি। এই পটভূমিকে আশ্রয় করেই আলোচ্য উপন্যাসটি জন্ম নিয়েছে মিহির আচার্যের লেখনী থেকে। জীবনের এই ভয়াবহ অথচ সম্পূর্ণ বাস্তব চিত্রটি উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন। জয়শীলা, দেবপ্রিয় প্রিয়ব্রত, রজত, স্নেহলতা, বীরেশ্বর, সুষমা প্রভৃতি চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়েই লেখক নিজের ধারণার রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের চিন্তাশীল মনের ছাপ উপন্যাসের খাতায় পাতায় ফুটে ওঠে আর তাঁর চিন্তাধারা অসারও নয়। যথেষ্ট সারবান এবং তাৎপর্যপূর্ণ। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়, বক্তব্য সুস্পষ্ট, আবেদন মনকে বিশেষ ভাবে স্পর্শ করে। পরিবেশ গঠনে তিনি যথোচিত নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন, তাঁর বর্ণনভঙ্গী মনোরম, ভাষা প্রাঞ্জল, বাধাবন্ধহীন, সমগ্র উপন্যাসটি সাবলীলতায় পরিপূর্ণ। উপন্যাসটির সারমর্ম পাঠিকাচিত্তে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জুগিয়ে তোলে। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

গোয়েন্দা ভূত মানুষ

শিশু ও কিশোর-সাহিত্যের যাদুকর বলে বর্ষীয়ান সাহিত্যশিল্পী হেমেন্দ্রকুমার রায়কে অভিহিত করলে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না। সাহিত্যে এবং অন্যান্য কয়েকটি ললিতকলা সকল বিভাগে হেমেন্দ্রকুমারের অবারিত গতিবিধি। শিশু ও কিশোর-সাহিত্য হেমেন্দ্রকুমারের অবদানে যে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোন কারণ নেই। হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল যে নাবালকদের মনকে তিনি যথেষ্ট বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলেছেন। হেমেন্দ্রকুমারের রচনার প্রভাবে বালকমন রীতিমত সাহসী, যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী হয়ে ওঠে। বহু বিষয়ক প্রচলিত অন্ধ কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে হেমেন্দ্রকুমার তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে নিজের রচনাকে যথেষ্ট মর্যাদাযুক্ত করেছেন। তাঁর রচনা পাঠকচিত্তে যুগপৎ ভাবে রোমাঞ্চ ও শিহরণ সৃষ্টি করে। তারই কয়েকটি রচনা সংকলিত হয়ে আলোচ্য গ্রন্থটির রূপ নিয়েছে। ছোট ও বড় উভয় সম্প্রদায়কেই রচনাগুলি সমপরিমাণ আনন্দ দেবে। সরস, প্রাঞ্জল, বর্ণনধর্মী রচনাগুলি তাঁর লেখনীর সারবত্তাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করে না, পাঠকচিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং বিশেষ করে ছোটদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম দু' টাকা মাত্র।

দুটি চোখ দুটি মন

রমাপদ চৌধুরী—বাঙলা সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। প্রায় আঠারো বছর আগে লেখকরূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব—সেই থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যের মানোন্নয়নে ইনি নানাবিধ সহায়তা করে চলেছেন। তাঁর সার্থক রচনার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ—দুটি চোখ দুটি মন। প্রণয়-মধুর একখানি মনোরম উপন্যাস। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যে প্রণয়ের বিকাশ—তারই সার্থক শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর দ্বারা। তিমিরকে রত্না জীবনের দোসররূপে চেয়েছিল—ঠিক পাওয়ার মুহূর্ত্তে কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল—তিমির হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে—তারপর বহুবিধ ঘটনার বেড়াজাল অতিক্রম করে এক পুণ্য প্রভাতে সে শুনল যে তিমিরের পাশেই তার স্থান করে দিচ্ছেন উভয়পক্ষের অভিভাবকেরা। সুন্দর গল্পটি চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন লেখক। তাঁর রচনার মধ্যে আন্তরিকতা, স্নিগ্ধতা লালিত্যের ছাপ মেলে। তাঁর বক্তব্য অন্তর স্পর্শ করে। গতির দিক দিয়েও এই মনোমুগ্ধকর উপন্যাসটি যথেষ্ট বেগবান। রচনার ভাষা কাব্যময় হওয়ায় উপন্যাসটি এক অনুপম মাধুর্যে ভরে উঠেছে। সাহিত্যানুরাগীদের দরবারে উপন্যাসটি সাদরে গৃহীত হবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

খেলাধূলা

ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়া দলের ভারত ও পাকিস্তান সফরে ক্রিকেট আসর এখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন দিলে বোধ হয় অন্যায় হবে না। অধিনায়ক রিচি বেনড সফর আরম্ভের পুর্ব্বেই বলেছেন যে অষ্ট্রেলিয়া দলটি বিশেষ শক্তিশালী এবং এই দলের খেলোয়াড়রা বিশ্বের যে কোন দেশে যে কোন অবস্থাতেই খেলতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন যে গত বছর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের পর দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন।

পাকিস্তানে তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে দু'টি "নারিকেল দড়ির" ম্যাটিং উইকেটে ব্যবস্থা থাকায় বেনড বলেছেন—তাতে দলের খেলোয়াড়দের খুব বেশী অসুবিধা হবে'না। অষ্ট্রেলিয়াতে "তৃণাচ্ছাদিত" (টার্ফ) উইকেটে টেষ্ট খেলা হলেও দলের খেলোয়াড়রা "নারিকেল দড়ির" উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত। অষ্ট্রেলিয়ার সকল স্কুল ও জুনিয়ার ম্যাচ ম্যাটিং উইকেটে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়ার দলের খেলোয়াড়দের কাছে ম্যাটিং উইকেট অজানা নয়।

বেনড খেলার পুর্ব্বে যে মন্তব্য করেছেন—এরই মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাকিস্তানে দু'টি টেষ্টে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া দল "রাবার" লাভ করেছে।

পাকিস্তানের প্রথম টেষ্ট খেলাটি ঢাকায় "নারিকেল দড়ির" ম্যাটিং উইকেটে হয়। দলের খেলোয়াড়দের এইরূপ উইকেটে খুব বেশী অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী হয়। লাহোরে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা "তৃণাচ্ছাদিত" (টার্ফ) উইকেটে হয়। এই খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়লাভ করে। পর পর দুটি টেষ্টে পরাজিত হলেও পাকিস্তান প্রমাণ দিয়েছে যে তারা ক্রিকেট খেলায় খুব বেশী পিছিয়ে নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া দল যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়, তা তাদের বহুদিন স্মরণ থাকবে। খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে খেলার ফলাফল নির্দ্ধারিত হয়। পাকিস্তানে আর একটা টেষ্ট খেলার পর অষ্ট্রেলিয়া ভারত সফরে আসবে।

অষ্ট্রেলিয়া দল ছোটখাটো কয়েকটা খেলা ছাড়া ভারতে পাঁচটি (দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও কলকাতা) টেষ্ট খেলায় যোগদান করবে। এই খেলার আসর গরম হওয়ার কয়েকদিন আগে ভারতের ক্রিকেটের রাজনীতির আসর বেশ গরম হয়ে উঠেছিলো। আন্তর্জ্জাতিক মহলে ভারতীয় ক্রিকেটকে সুপ্রতিষ্ঠা করার দোহাই দিয়ে যাঁরা রাজনীতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন—তাঁরাই আবার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্ণধার হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সাম্প্রতিক সাধারণ বার্ষিক সভায় সেই পুরাতন কর্ম্মকর্ত্তারাই আবার নির্ব্বাচিত হয়েছেন। রাজনীতির খেলা করে যাঁরা গত ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেটকে অপদস্থ করেছেন সেই সব ধুরন্ধর ব্যক্তিরাই আবার খেলোয়াড় নির্ব্বাচনী কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। গতবার এই কমিটিতে অমরনাথ ও এম, দত্তরায়ের রাজনীতির বেড়াজালে দু'জন সদস্যকে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো। এবার গোপালন ও বিজয় হাজারেকে এই দলে ভিড়াবার চেষ্টা করলেও হাজারে মানে মানে সরে পড়েছেন। ফুটবল জগতের নাটের গুরু এম, দত্তরায়কে নেওয়ার জন্য ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় সুঁটে ব্যানার্জীকে ভোটের জোরে বাদ দেওয়া হয়েছিলো। এখন আবার হাজারের জায়গায় সুঁটে ব্যানার্জীকে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অনেকে এরও মধ্যে কোন অভিসন্ধি আছে বলে সন্দেহ করছেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। তার রিপোর্টও পাওয়া গিয়েছে। এই সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক, এটাই সকলে দাবী করেন। তা না হলে ভারতের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার বলে মনে হয়।

গত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে শারীরিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত খেলোয়াড় গোলাম আমেদকে অধিনায়ক করে নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সকলের হাস্যাস্পদ হয়েছিলেন। গোলাম আমেদ সব টেষ্ট শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করে তাঁদের মুখে চুণকালি মাখিয়ে দেন। অধিনায়ক নিয়ে অনেক তামাসা দেখা যায়। এবারও অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্ব্বাচন নিয়ে বেশ রাজনীতির খেলা চলে।

পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্টের ফলাফল।

পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়া দলের দু'টি টেষ্ট খেলার ফলাফল নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম টেষ্ট

পাকিস্তান ১ম ইনিংস ২০০, (হানিফ মহম্মদ, ৬৬, ডানকান সার্প ৫৬, সৈয়দ আমেদ ৩৭, ডেভিডসন ৪২ রাণে ৪ উইঃ ও বেনড ৬১ রাণে ৪ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ২২৫, (নীল হার্ভে ৯৬, গ্রাউট নট আউট ৬৬, ফজল মহম্মদ ৭১ রাণে ৫ উইঃ, নসিমুল গণি ৫১ রাণে ৩ উইঃ ও ইসরার আলি ৮৫ রাণে ২ উইঃ)।

পাকিস্তান ২য় ইনিংস ১৩৪, (ডানকান সার্প ৩৫, ম্যাকে ৪২ রাণে ৬ উইঃ ও বেনড ৪২ রাণে ৪ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংস (২ উইঃ) ১১২, (ম্যাকডোনাল্ড নট আউট ৪৪ ও নীল হার্ভে ৩০)।

অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়ী।

দ্বিতীয় টেষ্ট

পাকিস্তান—১ম ইনিংস ১৪৬ (হানিফ মহম্মদ ৪১ ; ডেভিডসন ৪৮ রাণে ৪ উইঃ, ম্যাকিফ ৪৫ রাণে ৩ উইঃ ও বেনড ৩১ রাণে ২উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস (ও'নীল ১৩৪, ম্যাকডোনাল্ড ৪২, নীলে হার্ভে ৫৪, ফ্যাভেল ৩২, ডেভিডসন ৪৭, বেনড ২১ ; হাসিব ১১৫ রাণে ৩৬উইঃ)।

পাকিস্তান—২য় ইনিংস ৩৬৬ (সৈয়দ আমেদ ১৬৬, ইমতিয়াজ আমেদ ৫৪, সুজাউদ্দিন ৪৫ ; ক্লিন ৭৫ রাণে ৭ উইঃ)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস (৩ উইঃ) ১২২ (ভার্ডে ৩৭, ও'নীল নট আউট ৪৩ ; মহম্মদ মুনাফ ৩৬ রাণে ২ উইঃ)। অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী।

খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার অভিনব পন্থা।

টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলা সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ার এক তামাক ব্যবসায়ী-সংস্থা ৮,০০০ ষ্টার্লিং (প্রায় ১,০৬,৬০০ টাকা) পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। ভারত ও পাকিস্তান সফরের জন্য উক্ত ব্যবসায়ী-সংস্থা ১৬৪০ ষ্টার্লিং (প্রায় ২৪,৮৬০ টাকা) বরাদ্দ করেছেন। উপরে উল্লিখিত টাকা তাহারই একাংশ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম দু'টি টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভের ফলে অষ্ট্রেলিয়া দল ৩২০ ষ্টার্লিং (প্রায় ৪,২৬০ টাকা) পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তান সফরে টেষ্ট খেলার জন্য উক্ত ব্যবসায়ী-সংস্থা ১৬৪০ ষ্টার্লিং (প্রায় ২৪,৮৬০ টাকা) পুরস্কার বরাদ্দ করে রেখেছেন। খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার সত্যই অভিনব পন্থা। ভারতের ব্যবসায়ী মহলের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সকলেই খুসী হবেন।

সন্তরণ

বোম্বাইয়ের মহাত্মা গান্ধী সুইমিং পুলে জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। বারটি রাজ্য দলের পুরুষ বিভাগে ১০৭ জন ও মহিলা বিভাগে ২২ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। সার্ভিসেস দল ১০৪ পয়েন্ট পেয়ে উপর্য্যুপরি তিনবার পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। বোম্বাই দ্বিতীয়, বাঙ্গালা তৃতীয় ও কেরালা চতুর্থ স্থান পায়, মহিলা বিভাগে বোম্বাই ২১ পয়েন্টে পেয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে, বাঙ্গালা দ্বিতীয় স্থান পায়।

এবারকার প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দলের রামদেও সিং, রাম সিং, রূপচাঁদ ও বজরঙ্গি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। পুরুষ বিভাগে বাঙ্গালার কোন প্রতিযোগী সুবিধা করতে পারেন নি। মহিলা বিভাগে কল্যাণী বসু ও মীরা কারিয়াপ্পা তবু কিছুটা বাঙ্গালার মুখ রক্ষা করেছেন। ওয়াটার পোলো ফাইনালে বাঙ্গালাকে বোম্বাইয়ের নিকট পরাজয় বরণ করতে হয়।

বাঙ্গালা দলের এবারকার প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার কারণ কি ? কর্ম্মকর্ত্তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য বাঙ্গালার সন্তরণ জগতের জল এবার বেশ ঘোলা হয়ে উঠে। এই কোন্দলকে কেন্দ্র করে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নির্ব্বাচিত সাঁতারুদের মধ্যে যাত্রার পূর্ব্বে অনেকে যাবেন না বলে বেঁকে বসেন। শেষ পর্য্যন্ত অনেক মারপ্যাঁচ করে কয়েকজনকে পাঠাবার ব্যবস্থা হলেও বাঙ্গালা দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু সন্ধ্যা চন্দের বোম্বাই যাত্রা সম্ভবপর হয় নি। সন্ধ্যা চন্দের অনুপস্থিতিতে ক্রীড়া মহলে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। এর পিছনে যে রহস্য রয়েছে—তা আজও উদ্ঘাটন হয় নি। সন্ধ্যা চন্দকে পাঠাবার জন্য ফুটবল জগতের কূটনীতি বিশারদ এম, দত্ত-রায়কে ডাকা হয়। বাঙ্গালার মান রক্ষার জন্য তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দেন। বিমানে পাঠাবার টোপ ফেলা হ'লেও তাতে কোন ফল হয় নি। সেন্‌ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষরা পাঠাবার ব্যাপারে বেশ কিছুটা রসিকতা করেছেন। পাঠাতে কোন আপত্তি নেই বলে সন্ধ্যা চন্দের শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে তাঁরা সরে পড়েন। সন্তরণ' জগতের কর্ম্মকর্ত্তাদের রাজনীতির খেলায় বাঙ্গালার একজন উদীয়মান সাঁতারু যেভাবে বলি পড়েছেন এটা সত্যই লজ্জার কথা। এই বিষয়ে তদন্ত দাবী করাটা অন্যায় হবে বলে মনে হয় না।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় নূতন রেকর্ড

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার বিগত অনুষ্ঠানে নিম্নোক্ত ছয়টি রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :—(১) ১৫০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে ২০মিঃ ২২'৫ সেকেণ্ডে রাম সিং (সার্ভিসেস দল) (২) ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল ৫মিঃ ৯'১ সেকেণ্ডে রাম সিং (সার্ভিসেস দল) (৩) ২০০ মিটার বুক সাঁতারে ২ মিঃ ৪৭'১ সেকেণ্ডে রামদেও সিং (সার্ভিসেস দল) (৪) ১০০ মিটার বুক সাঁতারে ১ মিঃ ১৭'৩ সেকেণ্ডে রামদেও সিং (সার্ভিসেস দল) (৫) ৪×২০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলেতে ১০ মিঃ ৫'৩ সেকেণ্ডে সার্ভিসেস দল (৬) ৪×১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল রিলেতে ৪ মিঃ ১১'১ সেকেণ্ডে বোম্বাই দল।

কলকাতায় ডেনমার্কের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়

ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় আয়ল্যাণ্ড কপস সম্প্রতি পূর্ব্বভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইন্যালে পাকিস্তানের আক্রম বেগকে পরাজিত করে উপর্য্যুপরি দুইবার চ্যাম্পিয়নশিপ পান। পুরুষদের ডাবলসের ফাইন্যালে রঞ্জিত ব্যানার্জী ও অরুণ ব্যানার্জী ষ্ট্রেট গেমে পাকিস্তানের আক্রম বেগ ও মাসুদ খানকে পরাজিত করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। জুনিয়ার সিঙ্গলসের ফাইন্যালে প্রত্যুষ বসু সহজেই গোবিন্দ দে'কে পরাজিত করেন।

ব্যাডমিণ্টন খেলার উন্নতিকল্পে শোভাবাজার ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের অবদান সত্যই প্রশংসনীয়। এই সংস্থা প্রতি বৎসর বহু অর্থব্যয়ে বিদেশী খেলোয়াড়দের এখানে আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন এই সংস্থার সঙ্গে মোটেই সহযোগিতা করেন না, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের এই মহৎ প্রচেষ্টা বানচাল হবার উপক্রম হয়েছে। আশা করা যায়, নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন এই সংস্থাকে উৎসাহিত করবে। ভারতের সেরা খেলোয়াড়দের এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের যে অভাব রয়েছে, তা অবিলম্বে দূর হবে।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

ঠিক সেই সময়ে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হরেনদা নিয়ে এলেন উত্তর-ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব। উদ্দেশ্য, উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের সম্প্রদায় কর্তৃক নৃত্যকলার প্রদর্শন। 'মীনাক্ষী' শেষ হতে সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলুম। মধু লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দূর যাওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভবপর হয়ে উঠল না, নতুন একটি ছবির চিত্রনাট্য তৈরীর ব্যাপারে তাকে বেশীদিন কলকাতার বাইরে রাখতে পারা গেল না—অগত্যা লক্ষ্ণৌ থেকে সে কলকাতার দিকে মুখ ফেরাল, আমাদের দৃষ্টি তখন উত্তর থেকে উত্তরে স্থিরনিবদ্ধ। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। লক্ষ্ণৌ থেকে মধু ফিরে এল আবার লক্ষ্ণৌতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন হরেনদা—সিমলা পর্যন্ত তাঁর সাহচর্য পাওয়া গিয়েছিল, তাঁকেও আমাদের সহযাত্রিত্ব ত্যাগ করতে হল; কারণ অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে E. N. S. A. র সঙ্গে তিনি আগে থাকতেই চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, সেই জন্যেই।

তিমিরবরণ এবং আমি—আমরা অতিথি হলুম মিঃ খান্নার। ইনি সেই মিঃ খান্না, যাঁর খান্না টকীজে আমরা অনুষ্ঠান করেছিলুম। পৃথ্বীরাজ কাপুরেরও ইনি নিকট আত্মীয়—সম্পর্কে ভাই। আমাদের সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে তিনি অনেকখানি সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি যে সিমলা থেকেই হরেনদাকে আমরা বিদায় দিয়েছিলুম—সিমলায় কালীমন্দিরেও আমরা অনুষ্ঠান করলুম—প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে এই কালীমন্দিরের নামকরণ হয়েছে আমার ননদ লেডী প্রতিমা মিত্র মহাশয়ার নামানুসারে।

একটা কথা এখানে আগেই বলা উচিত ছিল কিন্তু একেবারে ভুলে গেছি—ভোলাটাও বোধ হয় খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। বিলীয়মান এই পার্থিব জীবনের অনেক ঘটনা অনেক কাহিনীর সমন্বয়ে পুষ্ট হয় স্মৃতির মিছিল—কয়েকটি ঘটনা বা কয়েকটি কাহিনী কখনও বা পংক্তিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে স্মৃতির এই মিছিল থেকে—কখনও বা পরেরটা এগিয়ে আসে আগে আবার কখনো বা আগেরটা পিছিয়ে যায় পরে—সেই কারণেই তাদের যথাযথ সম্পাদনের দায়িত্বের গুরুভারও কম নয়। হ্যাঁ—যে প্রসঙ্গে এতগুলি কথা বললুম সেই প্রসঙ্গেই ফিরে যাওয়া যাক। আমরা তখন দেরাদুনে, একটি ট্রাঙ্ক কল পেলুম বোম্বাই থেকে—সে কল এসেছিল আমার পূর্বতন প্রযোজক চিমনলাল দেশাইয়ের কাছ থেকে—বক্তব্য, তাঁর পুত্র সুরেন্দ্র দেশাই কর্তৃক পরিচালিত তাঁর আগামী ছায়াচিত্রে আমাকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এক এক করে সমগ্র পাঞ্জাব এবং উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি আমরা ঘুরলুম—আমাদের ভ্রমণসূচী থেকে মুখ্য মুখ্য পার্বত্যনগরগুলিও বাদ পড়ল না। সেই সব ভ্রমণের ছবিগুলো যখন আজকের অপরাহ্ণগুলিতে ভেসে ওঠে, জীবন পায় আর জীবনের প্রতিটি পাতায় করে চলে ছায়াপাত—তখন সব চেয়ে মনে পড়ে কাশ্মীরের কথা। ভূস্বর্গ কাশ্মীর! সারা পৃথিবীর বিস্ময় কাশ্মীর, যেখানে প্রকৃতির অকৃপণ দান মুঠো মুঠো ছড়িয়ে রয়েছে—যার আকাশ বাতাস অভিনব সৌন্দর্যের স্পর্শবাহী, যার ফুল জগতের পুষ্প-সম্পদকে করেছে সমৃদ্ধ, যার নিসর্গ শোভা কত পথিককে আকর্ষণ করে এনেছে তার কোলে সেই কাশ্মীর ভারতের গৌরব—আমাদের সমগ্র ভ্রমণতালিকায় উজ্জ্বল হয়ে আছে কাশ্মীরের স্মৃতি—তার কারণ কাশ্মীর ভ্রমণই হয়ে উঠেছিল আমাদের সব চেয়ে মনোরম।

তখনকার কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপ আজকের তুলনায় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সেদিনকার কাশ্মীর আজকের মত ছিল না, সে কাশ্মীর ছিল স্বতন্ত্র এক করদরাজ্য। কাশ্মীরের প্রথম সবাক প্রেক্ষাগৃহ অমরেশ টকীজ আমার ব্যালে দিয়ে তার উদ্বোধন হয়েছিল—অমরেশ টকীজের আগে সারা কাশ্মীর রাজ্যে সবাক ছবি দেখানোর কোন প্রেক্ষাগৃহ ছিল না। অমরেশ টকীজের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজা শ্রীহরি সিং এবং তাঁর পরিবারবর্গ। সে কি সাঙ্ঘাতিক ভীড় সেদিন! জনতা যেন বাধা মানতে চায় না, কোন সীমা বা বেড়াজাল দিয়ে যেন তাদের আর আটকে রাখা যায় না, সব কিছু বাধা সীমা প্রতিবন্ধক উপেক্ষা করে তারা যেন এগিয়ে আসতে চায়, ঠেকানো যেন আর তাদের যায় না। বিপুল সম্বর্ধনারও ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন কর্তৃপক্ষ। আমাদের অনুষ্ঠান আনন্দের সঙ্গে বলছি মুগ্ধ করতে সেদিন সক্ষম হয়েছিল মহারাজা এবং তাঁর আত্মজনদের, তাঁরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন সেদিন আমাদের নৃত্যানুষ্ঠান দেখে। অনেককাল আগের কথা তো, আঠারো বছর তো হতে চলল—তাই আজকের দিনের কাশ্মীরের যিনি সদর-ই-রিয়াসৎ সেই যুবক করণ সিং সেদিন ছিলেন বালক যুবরাজ—তখনকার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে কাশ্মীরের ভাবী অধীশ্বর। বছর বারো তখন তাঁর বয়েস। সঙ্গীতের তথা অন্যান্য ললিতকলার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা বর্তমানে সর্বজনবিদিত—সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আসক্তির পরিচয় তখনই পাওয়া গিয়েছিল। অমিয়কান্তি ভট্টাচার্যের সেতার এবং তিমিরবরণের স্বরোদ সেদিনই তাঁকে এতদূর অভিভূত করে ফেলেছিল এবং তাঁর অন্তরে তা এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে শেষ পর্যন্ত মহারাজা আমাদের প্রস্তাব পাঠালেন যে দু'জনের অন্ততঃ একজনকে যুবরাজকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত যেন সেখানে রেখে আসি কিন্তু এই দুই গুণী প্রতিভাধর শক্তিমান শিল্পীর একজনকেও অনিশ্চিতকালের জন্যে অন্ততঃ রেখে আসা সম্ভবপর ছিল না। কারণ

স্বর্ণপট

তাঁদের অভাব সভাগারের মধ্যেই বহুল পরিমাণে শূন্যতার সৃষ্টি করবে —এই আশঙ্কাই ছিল আমাদের সব চেয়ে বেশী। এই সব কারণেই মহারাজের অনুরোধ অর্ধ্বকস্তই রয়ে গেল, তা রক্ষা করা সম্ভবপর হল না আমার দ্বারা।

শ্রীনগরে দেখা হল আমাদের পুরোনো বন্ধু শ্রীব্রীজলাল নেহরু, (ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকটতম আত্মীয়) শ্রীমতী নেহরু এবং তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে। আমাদের "লিলি কটেজ" তাঁরা ভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। প্রায় একটি বছরের কাছাকাছি সময় পর্য্যন্ত তাঁরা লিলি কটেজের বাসিন্দা ছিলেন। আমার সম্মানার্থে পাঞ্জাব সাহিত্য-সংস্থা (পাঞ্জাব লিটারারি লীগ,) যখন সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন শ্রীব্রীজলাল নেহরু। দিল্লী এবং তার আশে-পাশে সমাজসেবিকা হিসেবে শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু তো যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারিণী। আজকের দিনের দেশবাসীর কাছে রামেশ্বরী নেহরুর সমাজসেবা সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার নেই। বর্তমান কালে সাধারণ্যে তাঁর কীর্তি যথেষ্ট প্রচারিত।

ঠিক ভূরি ভোজন বলতে আমরা—বাঙলা ভাষায় ঠিক ভূরিভোজন বলতে যে পরিমাণ খাদ্য বোঝানো হয় সেই পরিমাণ প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আমার জন্যে প্রস্তুত হল তাঁদের শ্রীনগরের বাড়ীতে। ভোজ্যবস্তু বঙ্গদেশীয় বা সাগরপারের নয় খাঁটি কাশ্মীরী—সোজা কথায় কাশ্মীরী খানা স্বভাবতঃই গুরু খাদ্য। খাওয়াও হয়ে গেল যথেষ্ট প্রচুর মাত্রাতিরিক্ত। সেই দিন আবার আমার নাচের অনুষ্ঠানও ছিল, অনুমান করুন সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠান আর সেই মধ্যাহ্নে ঐ রকম গুরু ভোজন আর ঐ রকম গুরু ভোজনের পর মঞ্চের উপর নৃত্যপরিবেশন করা কি খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার? কি করা যায়, কিংকর্ত্তব্যম্? শেষকালে সময়টি কিছু পিছিয়ে দিলুম, মূল সময়টি অবশ্য যথাযথই রইল। অনুষ্ঠানসূচীর কিছু অদলবদল করতে হল, অন্যান্য চার পাঁচটি টুকরো অনুষ্ঠান আমার নাচের আগে এগিয়ে দেওয়া হল, ঐ টুকরো অনুষ্ঠানগুলির পর আমার নাচ শুরু হল—কি আর করা যায়, এ পরিবর্তন ছাড়া উপায় কি ছিল? বিশেষতঃ যখন নৃত্যের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের প্রশ্ন গভীরভাবে জড়িত।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাতের অন্ধকারে

কলকাতার আরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সংযোগ দীর্ঘকালের। সুনামের সঙ্গে আরক্ষা বাহিনীর মাধ্যমে জনসেবা তিনি করেছেন দীর্ঘকাল। জীবনে বহু বিচিত্র ও চমকপ্রদ ঘটনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে একাধিক বার, প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে হয়েছে সঞ্চিত। জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি স্বয়ং লেখনীর মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন 'রাতের অন্ধকারে' নাম দিয়ে—যার চিত্ররূপ শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন রায়বাহাদুরের পুত্র শ্রীসরোজ-মুখোপাধ্যায়।

একটি হত্যাকে কেন্দ্র করেই ছবির গল্পাংশ গড়ে উঠেছে—একটি বাঈজী নিহত হয়—স্বভাবতঃই অনেকের উপরই এ বিষয় সন্দেহ হয় বিশেষতঃ যারা রাণী বাইজীর সংস্পর্শে এসেছিল এবং এই নিয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান তল্লাসী চালানো হয়—এদিকে আসল যে খুনী সে দিব্যি মুখোশ এঁটে সমাজে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর একটি হত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আসল খুনী পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং মৃত্যুশয্যায় তার শেষ জবানী দিয়ে যাওয়ার সময় দর্শকের চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় কে প্রকৃত খুনী।

এই হল সংক্ষিপ্ত গল্প। পরিচালনা দোষমুক্ত নয়—ছবির বিন্যাস এবং গল্পের গতি আড়ষ্টতার দোষ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। একটি রহস্যচিত্রে যে পরিমাণ থমথমে ভাব আনা দরকার—সারা ছবিতে সে ভাব অনুপস্থিত, শেষাংশে দেখা গেল যে শহরের একজন শীর্ষস্থানীয় পুরুষ বলে যিনি স্বীকৃত, সমাজের একটি বিশিষ্ট আসন যাঁর অধিকারভুক্ত—নগরের বড় বড় মহলে যাঁর অবারিত গতিবিধি—প্রকৃত হত্যাকারী এবং তিনি অভিন্ন—আরও জানা গেল যে লোকটি বর্তমানে এত খ্যাতিমান তাঁর পূর্বজীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন—তিনি আন্দামানের একটি কয়েদ-পালানো খুনে ফেরারী আসামী। এখন প্রশ্ন এই যে, একটি আসামী আন্দামান থেকে নিঃস্ব রিক্ত কপর্দকশূন্য অবস্থায় এ দেশে এসে, কি করে কোন পথে—কোন উপায়ে সে এত বিরাট যশ অর্থ, প্রতিপত্তির অধিকারী হ'ল? দু'টি গাড়ী থেকে পরস্পরকে লক্ষ্য করে অসংখ্য গুলী ছোঁড়া চলছে—মজার ব্যাপার এই—একটা গুলীও কি কাউকে লাগছে না? প্রত্যেকটি গুলীই বার বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে, আশ্চর্য! ব্যোমকেশ এই হত্যার ব্যাপারে যখন নিরপরাধ তখন কি কারণে সে হত্যার রহস্যানুসন্ধানের সংবাদ অত গোপনতা সহকারে নিচ্ছে—এ গোপনতার কি অর্থ? সবচেয়ে বিরক্তিকর যে জিনিষটি ছবিতে পরিবেশিত হয়েছে তা হচ্ছে হেলেনের নাচগুলি—যে নাচকে "খিচুড়ি নৃত্য" বলেই যথাযথভাবে অভিহিত করা যায়। ঐ বিভিন্নজাতের নৃত্য এক অপরাধধর্মী ছবির মধ্যে ঢুকিয়ে ছবির গাম্ভীর্য বা ছবির মূল রস যে কতখানি নষ্ট করা হয়েছে তার তুলনা নেই। নাচ দেখছি না ভেলকী দেখছি না ম্যাজিক দেখছি, আসলে কি যে দেখলুম সেইটেই তো বোঝা গেল না। বিভিন্ন নাচের আসরে যে সব দর্শকদের বেশভূষা ঐ সব আসরের উপযোগী নয়—বাজারের মধ্যে চায়ের দোকানের বেঞ্চির উপযোগী।

অভিনয়ে খুব একটা উল্লেখযোগ্য অভিনয় কেউই করেন নি, সকলেই আপন আপন চরিত্রগুলির রূপ দিয়ে গেছেন মাত্র। অগ্রণী পরিচালিত এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ডাঃ হরেন, ধীরাজ দাস, রাজা মুখোপাধ্যায়, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় বিশ্বাস (ছবি বিশ্বাসের পুত্র), সুনীত মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা সেন, সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই), হেলেন, রাজলক্ষ্মী ও রাণী প্রভৃতি।

শুভবিবাহ

সচরাচর কেউ কেউ "শুভ" বলতে যা মনে করেন অন্তের জীবনেও যে তার অভ্যুদয় শুভস্মৃতি নিয়েই ঘটবে, এমন কথা কখনই জোর করে বলা যায় না, কিন্তু অপরে বুঝলেও তাঁরা নিজেরাই একথা কিছুতেই বুঝতে চান না বা এ যুক্তি মেনে নেওয়ার মত শক্তি তাদের নেই—আর সেই নিয়েই সমাজের মধ্যে বিদ্রোহের আবির্ভাব। বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে যখন ভুল পথ থেকে একজনকে সরানো যায় না তখন নিজেকে সেই সর্বনাশা ভুলের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে সরিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন হয় বিদ্রোহের। শুভবিবাহ ছবিটির গল্প এই পটভূমির উপর রচিত। বংশমর্যাদা, অর্থগত কৌলীন্য, সামাজিক রীতি-নীতির চেয়ে হৃদয়ে ধর্মের আসন যে অনেক উচ্চে—এবং তার আলোয় যে এরা ম্লান, সেই দিকেই বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই ছবিটির মাধ্যমে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র ইতিপূর্বে 'একদিন রাত্রে'র মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, চিত্রামোদীদের কাছে 'শুভবিবাহ' তাঁদের দ্বিতীয় উপহার—তাঁদের পূর্বসুনাম শুভবিবাহ একটুকু ম্লান করবে বলে মনে হয় না। যে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় এঁদের প্রথম ছবিতে এঁরা দিয়েছিলেন—আনন্দের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, তার ছাপ এ ছবিতেও অক্ষুণ্ণ আছে, গল্পটি বলার মধ্যে ভঙ্গীর দিক দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। চরিত্রগুলি সুকল্পিত এবং সুরূপায়িত। ছবিটির সংগঠন অর্থাৎ চিত্র নির্মাণের দিক দিয়েও পরিচালকেরা অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

গায়ত্রী এর নায়িকা। অভিভাবকেরা নিজেদের সম্মানের কথা চিন্তা করে বিয়ের ঠিক করলেন তার. সে চায় অরুণের জীবনসঙ্গিনী হতে, তার বাবা সম্মান-প্রতিপত্তি-অর্থসম্পদাদির কথা চিন্তা করে অরুণের সঙ্গে গায়ত্রীর বিয়ে হতে পারে না বলে সিদ্ধান্ত দিলেন—এবং অরুণেরও বাড়ী আসা বন্ধ হল—বিয়ের দিন ভোরবেলায় গায়ত্রী নিখোঁজ হল—অরুণের ওখানে উঠল—সেখান থেকে কি ভাবে কি পরিবেশে সে বাড়ী এল এবং কেমন করে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সে অরুণেরই হাত ধরে নতুন জীবনের পথে পা দিল ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে।

ছবিটির সময়সীমা মাত্র একবেলা—সকাল থেকে বিকেল। গানের বালাই নেই—ছবিটিকে অযথা ভারাক্রান্ত করা হয়নি গান ঢুকিয়ে। দেওজীভাই আলোকচিত্রায়ণে পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অভিনয়াংশে অভাবনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন বাঙলার সার্থকনাম্নী অভিনেত্রী শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র। শ্রীমতী মিত্র বাঙলার অভিনয়-জগতের এক বিরাট সম্পদ, তাঁর অনন্যসাধারণ অভিনয়দক্ষতা ছবিটিকে মর্যাদাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তাঁর পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, শম্ভু মিত্র ও অমর গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনেই যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন। এঁরা ছাড়া ছবিটিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, গঙ্গাপদ বসু, শান্তি দাস, নির্মল চট্টোপাধ্যায় পঙ্কজ মিত্র, ছায়া দেবী, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কমলা মুখোপাধ্যায়, মুক্তি গোস্বামী, রেবা দেবী, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, তারা ভাদুড়ী প্রভৃতি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' বাঙলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সম্পদ। অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায় এর চিত্রায়ন হচ্ছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, শিশির বটব্যাল, দীপ্তি রায়, সুচরিতা সান্যাল, সীতা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি। সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। * * * বাঙলার সুখ্যাত পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়কে বেশ কিছুদিন বাদে 'রায়বাহাদুর' ছবির পরিচালকরূপে দেখা যাবে। 'রায়বাহাদুর' একটি সুপঠিত রচনা। বিভিন্ন অংশে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, জীবেন বসু, সমীরকুমার, জহর রায়, মালা সিন্হা, রেণুকা রায় প্রভৃতি। * * * 'দুই বেচারা' ছবিটি পরিচালনা করেছেন দিলীপ বসু। গানের সুর দিচ্ছেন ভূপেন হাজারিকা। এই ছবিটির অভিনয়াংশে যে সব শিল্পীদের আপনারা দেখতে পাবেন তাঁদের মধ্যে কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। * * * সুনীলবরণ পরিচালিত অজানা কাহিনী'তে অভিনয় করছেন বলে যাঁদের নাম জানা গেছে তাঁদের মধ্যে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, দীপক মুখোপাধ্যায়, অমর মল্লিক তরুণকুমার, সমীর মজুমদার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নমিতা সিংহ, চিত্রা মণ্ডলের নাম উল্লেখনীয়। * * * প্রখ্যাত পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে যে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে তার নাম 'যেখানে আঁধার নেই।' কাহিনী লিখেছেন বিজয় গুপ্ত। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন রায় (বাঘা যতীন খ্যাত) অনুপকুমার, মলিনা দেবী, করবী মুখোপাধ্যায় ও বাণী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ও খ্যাতনাম্নী শিল্পিবর্গ।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে জনৈকা বাঙালী-কন্যার আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীসত্য পাল।

◎ দেশে-বিদেশে ◎

কার্তিক, ১৩৬৬ (অক্টোবর-নভেম্বর, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা কার্তিক (১১শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের বন্যা সমস্যা সম্পর্কে নিবিড় পর্য্যালোচনার জন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নদী বিশেষজ্ঞদের লইয়া কমিটি গঠনের সরকারী সিদ্ধান্ত—সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২রা কার্তিক (২০শে অক্টোবর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সহ হেলিকপ্টার যোগে রাজ্যের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন।

৩রা কার্তিক, (২১শে অক্টোবর) : বন্যা-বিধ্বস্ত বাংলাকে বাঁচাইবার জন্ত জাতির প্রতি ব্যাকুল আহ্বান—বিমানযোগে বিপন্ন অঞ্চলসমূহ পরিদর্শনান্তে রাজভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি।

৪ঠা কার্তিক (২২শে অক্টোবর) : নাগা পাহাড় তুয়েনসাং প্রশাসন এলাকাধীন কোহিমা জেলায় চাকাসাং অঞ্চলে নাগা বিদ্রোহিগণের অতর্কিত আক্রমণে নয়জন ভারতীয় সৈন্ত নিহত।

৫ই কার্তিক (২৩শে অক্টোবর) : দিল্লী ও ঢাকায় পাক্-ভারত বৈঠকান্তে পূর্ব্ব-সীমান্তের প্রধান তিনটি বিরোধ সম্পর্কে মতৈক্য হইয়াছে বলিয়া উভয় রাষ্ট্রের যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা।

ভারতীয় এলাকায় (দক্ষিণ লাডাক) চীনা ফৌজের আক্রমণে ১৭জন ভারতীয় টহলদার পুলিশ নিহত হওয়ার সংবাদ সরকারীভাবে প্রকাশ—চীনাদূতের নিকট ভারতের প্রতিবাদজ্ঞাপন।

৬ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর) : লাডাকের ঘটনার ফলে চীন-ভারত সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিয়াছে—মীরাটে বিরাট জনসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৭ই কার্তিক (২৫শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বন্দর হলদিয়ায় শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানীর সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি অব্যাহত থাকিবে—কলিকাতায় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের উক্তি।

৮ই কার্তিক (২৬শে অক্টোবর) : দণ্ডকারণ্যে প্রতি মাসে ছয় শত করিয়া উদ্বাস্তু কৃষক পরিবারকে প্রেরণকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি কেন্দ্রের নির্দেশ দান।

পূর্ব্ব লাডাকের সংঘর্ষে নয়জন ভারতীয় সীমান্ত পুলিশ নিহত—ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চীন কর্তৃক প্রেরিত নোটে সর্বশেষ সংবাদ।

৯ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর) : নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজ্যপালদের বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন দেশের অর্থনৈতিক ও খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা।

ভারত সরকারের অধীনে স্বায়ত্ত শাসিত 'নাগাভূমি' (স্বতন্ত্র রাজ্য) গঠনের দাবী মককচুং-এ অনুষ্ঠিত নাগা সম্মেলনের প্রস্তাব।

১০ই কার্তিক (২৮শে অক্টোবর) : নয়াদিল্লীতে রাজ্যপাল সংকালে ভারতের উত্তর ও উত্তর পূর্বসীমান্তে রক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বনের উপর গুরুত্ব আরোপ।

১১ই কার্তিক (২৯শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র দক্ষিণাংশে অবিরাম ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত।

১২ই কার্তিক (৩০শে অক্টোবর) : চীনা হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নূতন নীতি সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে দেশরক্ষা দপ্তর ও পররাষ্ট্র দপ্তরে উর্দ্ধতন পর্য্যায়ে আলোচনা।

১৩ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর) : পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ট্রাম কোম্পানীর ভাড়াবৃদ্ধির (প্রতি টিকিটে এক নয়া পয়সা) সিদ্ধান্তের বিরোধিতা।

১৪ই কার্তিক (১লা নভেম্বর) : ভাষার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মিথিলা রাজ্য পুনর্গঠনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার উদ্যোগে দাবী দিবস পালন—এই উপলক্ষে ময়দানে মহানগরীর মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান।

১৫ই কার্তিক (২রা নভেম্বর) : বোম্বাই-এর হাসপাতালে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডাঃ জন মাথাই-এর জীবনদীপ নির্বাণ।

ট্রামওয়ে কোম্পানীর ঘোষণা অনুযায়ী ট্রামের ভাড়া প্রতি টিকিটে এক নয়া পয়সা বৃদ্ধি।

১৬ই কার্তিক (৩রা নভেম্বর) : কানপুরে এক হেড কনষ্টেবল কর্তৃক জনৈকা স্ত্রীলোক নিগৃহীত হওয়ার পর কয়েক সহস্র লোকের এক উত্তেজিত জনতার থানা আক্রমণ—এই সময় পুলিশের গুলীচালনায় ১১জন নিহত ও প্রায় ১৪০জন আহত।

১৭ই কার্তিক (৪ঠা নভেম্বর) : পূর্ব্ব লাডাকের ঘটনা সম্পর্কে চীনের নিকট ভারত সরকারের ক্ষতিপূরণ দাবী ও চীনা নোটে বর্ণিত অভিযোগ সমূহের তীব্র প্রতিবাদ সহ লিপি প্রেরণ।

১৮ই কার্তিক (৫ই নভেম্বর) : প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক পাক-ভারত যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব অগ্রাহ্য।

১৯শে কার্তিক (৬ই নভেম্বর) : খাদ্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন সচিব শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট পেশ।

২০শে কার্তিক (৭ই নভেম্বর) : খিদিরপুর ডকে হলদিয়া হইয়া আগত বর্মী চাউল বোঝাই 'ভারতরাণী' জাহাজ বয়কট—পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডক শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট।

২১শে কার্তিক (৮ই নভেম্বর) : সিকিম সীমান্ত বরাবর বিপুল চীনা সৈন্তের সমাবেশ—বিরাট বিরাট ঘাঁটি স্থাপন ও বহু পরিখা খননের সংবাদ।

২২শে কার্তিক (৯ই নভেম্বর) : ভারত-চীনের সীমারেখা ম্যাকমোহন লাইনের দুই দিকে ২০ কিলোমিটার (প্রায় ১২ মাইল) দূরে নিজ নিজ দেশের সৈন্ত সরাইয়া লওয়ার জন্ত চীন কর্তৃক ভারতের নিকট প্রস্তাব পেশ।

২৩শে কার্তিক (১০ই নভেম্বর) : কেন্দ্রীয় রেল সচিব শ্রীজগজীবন রাম কর্তৃক চন্দ্রপুরা হইতে মুরি পর্য্যন্ত নূতন রেলপথের উদ্বোধন।

২৪শে কার্তিক (১১ই নভেম্বর) : ভারতে আক্রমণ চালাইয়া

চীন মারাত্মক ভুল করিয়াছে এবং ইহার জন্ত চীনকে শাস্তি পাইতে হইবে—ভুবনেশ্বরের জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব পন্থের উক্তি।

২৫শে কার্তিক (১২ই নভেম্বর): বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মিশনের পক্ষ হইতে বৃহত্তর কলিকাতায় জল সরবরাহ, আবর্জনা পরিষ্কার ও জল নিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণাদি ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কোটি টাকার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে পেশ।

২৬শে কার্তিক (১৩ই নভেম্বর): ভিলাই ইস্পাত কারখানায় ব্লুমিং মিলগুলির কাজ আরম্ভ—ব্লুমিং মিলসমূহ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিলাই কারখানাটির কাজ চূড়ান্ত পর্য্যায়ে সুরু।

২৭শে কার্তিক (১৪ই নভেম্বর): হট স্প্রিং এর নিকটে চীনা সৈন্যদল কর্তৃক একদল ভারতীয় পুলিসের হাতে পুলিস অফিসার শ্রীকরম সিং সহ দশজন আটক ভারতীয় পুলিষ ও নয়জন নিহত পুলিসের মৃতদেহ প্রত্যর্পণ।

২৮শে কার্তিক (৫ই নভেম্বর): কলিকাতার জনসভায় নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক সভাপতি শ্রীহেমন্তকুমার বসু, এম্-এল-এ'র ঘোষণা—ফরওয়ার্ড ব্লক ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত একযোগে আর কোন আন্দোলনে যোগ দিবে না।

২৯শে কার্তিক (১৬ই নভেম্বর): চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্ত চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই-এর প্রস্তাব অবাস্তব ও গ্রহণের অযোগ্য—লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

ভারত-চীন বিরোধ প্রসঙ্গে লোকসভায় শ্রীনেহেরু কর্তৃক দ্বিতীয় শ্বেতপত্র পেশ।

৩০শে কার্তিক (১৭ই নভেম্বর): ১৫ মাস পাকিস্তানী দখলে থাকার পর ভারতীয় গ্রাম কাছাড় জেলার টুকেরগ্রাম মুক্ত।

বহির্দেশীয়—

১লা কার্তিক (১১শে অক্টোবর): সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়ক কর্তৃক বি-বি-সি'তে নূতন মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের জন্ত বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকী প্রদান।

২রা কার্তিক (২০শে অক্টোবর): পূর্ব্ব সীমান্তের প্রশ্নাবলী সম্পর্কে ঢাকায় পাক্-ভারত সম্মেলনের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশনের পরিসমাপ্তি।

৪ঠা কার্তিক (২২শে অক্টোবর): তিব্বতের ঘটনাবলীতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদে মালয় ও আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্থাপিত প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত।

৬ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর): নিউইয়র্কে এক ভোজসভায় ভারতের দেশরক্ষা সচিব শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা—চীনকে ভারতীয় এলাকা ছাড়িয়া যাইতেই হইবে।

৮ই কার্তিক (২৬শে অক্টোবর): জাকার্তায় কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত ২১টি সদস্য রাষ্ট্রের তিন সপ্তাহব্যাপী অধিবেশন সুরু।

পাক্ প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খান কর্তৃক সমগ্র পাকিস্তানে 'মূল গণতান্ত্রিক বিধান' প্রবর্ত্তন।

৯ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর): কম্যুনিষ্ট চীনের ক্রিয়াকলাপ বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক—আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের যৌথ ইস্তাহারে মন্তব্য।

১২ই কার্তিক (৩০শে অক্টোবর): নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের নিকট ভারতীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রীভি, কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা—আপন অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় ভারত বদ্ধপরিকর।

১৩ই কার্তিক (৩১শে অক্টোবর): মস্কো-এ সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের উক্তি—ভারত-চীন সীমান্তের ঘটনাবলীর জন্ত রুশীয়রা অত্যন্ত দুঃখিত।

১৪ই কার্তিক (১লা নভেম্বর): বেলজিয়াম কঙ্গোয় অব্যাহত দাঙ্গাহাঙ্গামা—দুই দিনে ৭০জন নিহত ও দুই শতাধিক আহত।

১৫ই কার্তিক (২রা নভেম্বর): ১৯শে ডিসেম্বর প্যারিসে পশ্চিমী (আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্ম্মানী) শীর্ষসম্মেলনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে পশ্চিমী মহলের ঘোষণা।

ভারতের সঙ্কটে কমনওয়েলথ দেশগুলি প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে প্রস্তুত—ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের পত্র।

১৬ই কার্তিক (৩রা নভেম্বর): রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের মূল রাজনৈতিক কমিটিতে নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত ৮২টি রাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১৭ই কার্তিক (৪ঠা নভেম্বর): ওয়াশিংটনে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের ঘোষণা—ভারত সফরকালে ১১ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে তিনি আন্তর্জাতিক কৃষিমেলায় মার্কিণ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবেন।

১৮ই কার্তিক (৫ই নভেম্বর): বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক দলের সদস্য শ্রী ফিলিপ নোয়েল বেকারের বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৫৯) নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভের খ্যাতি অর্জ্জন।

১৯শে কার্তিক (৬ই নভেম্বর): ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসায় রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভকে প্রভাব বিস্তারের অনুরোধ—আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার পক্ষ হইতে তার প্রেরণের সিদ্ধান্ত।

গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ অভিযানকারী সমগ্র জাপানী অভিযাত্রী দল নিখোঁজ।

২১শে কার্তিক (৮ই নভেম্বর): ২০০১ সালের মধ্যে মানুষের পরমায়ু দেড়শত হইতে দুই শত বৎসর বৃদ্ধি করা যাইবে—জনৈক সোভিয়েট বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী।

২৪শে কার্তিক (১১ই নভেম্বর): বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দলগত রাজনীতি, ব্যবসা এবং মন্দিরের জমি পরিচালনা হইতে দূরে রাখার সুপারিশ—সিংহল সরকার নিযুক্ত সাসানা কমিশনের রিপোর্ট।

২৬শে কার্তিক (১৩ই নভেম্বর) সাংবাদিক বৈঠকে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ক্রিশ্চিয়ান হার্টারের বিবৃতি—আমেরিকা মনে করে যে, চীনের সহিত সীমান্ত বিরোধের ভারতের দাবী সম্পূর্ণ বৈধ।

সাহারায় আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা যেন না চালান হয়, সেই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের প্রতি রাষ্ট্রসংঘ রাজনৈতিক কমিটির আহ্বান।

২৮শে কার্তিক (১৫ই নভেম্বর): ভারতীয় এলাকা হইতে চীনাদের হটাইতে শক্তি প্রয়োগ হইতে পারে—বিভিন্ন ভারতীয় দূতের নিকট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর পত্র প্রেরণের সংবাদ।

৩০শে কার্তিক (১৭ই নভেম্বর) রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য মূলক নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত—প্রস্তাবের পক্ষে ৬২টি রাষ্ট্রের বিপক্ষে ৩টি সদস্য রাষ্ট্রের ভোটদান।

ধারাবাহিক রচনা

অধস্তন পৃথিবী
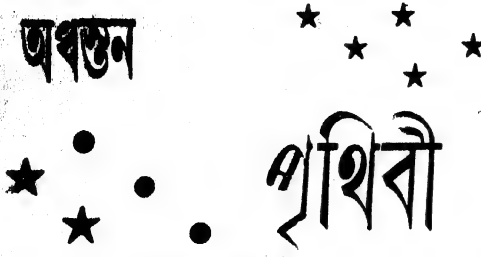
ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

রাত্রি আটটা বেজে আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। প্রণব বাবু ও চিরঞ্জীব বাবু উৎসুক হয়ে বড়বাবুর জন্য তখনও পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। ইতিমধ্যে খোদ ডেপুটি সাহেব দু'দু'বার বড়বাবুকে টেলিফোনে খুঁজেছেন, কিন্তু তিনি যে এখন কোথায় তা থানার কেউই বলতে পারেনি। অফিসাররা খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে, মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য সন্ধ্যাবেলা তিনি বড়সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তার পর তিনি সেখান থেকে কোথা যে চলে গিয়েছেন তা কেউ বলতে পারেনি। এমন কি মণ্টু মল্লিকের বাড়ীতে লোক পাঠিয়েও তাঁর কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। অথচ ডেপুটি সাহেব বলে দিয়েছেন যে থানায় ফিরলেই তিনি যেন তাঁকে ফোন করেন। বড়বাবুর সাময়িক অবর্ত্তমানে সেকেণ্ড অফিসার প্রণব বাবু স্বাভাবিক ভাবেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করে থাকেন। সেই কর্তৃত্বের বলে তিনি অন্যান্য অফিসার রহমন সাহেব ও সমর বাবুদের উপর হুকুম চালিয়ে তাঁদেরও বড়বাবুর খোঁজে পাঠিয়েছিলেন। তারাও সকলে সম্ভাব্য সকল স্থানে বড়বাবুর তাঁবেদার সিপাহী-জমাদারদের সাহায্যে তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে একে একে ব্যর্থমনোরথ হয়ে থানায় ফিরে এসেছেন।

সময়ের ব্যবধানে মানুষের উদ্বেগ স্বভাবতই হাল্কা হয়ে যায়। তা'ছাড়া বড়বাবুর প্রতি তাদের যা কিছু ছিল তা কর্তব্য কার্যে সুষ্ঠ ভাবেই সমাধা করা হয়েছে। তবুও বড়বাবুর জন্য তাদের কারুরই চিন্তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়নি। এঁদের মধ্যে সমরবাবু বড়বাবুর সর্ব্বাধিক অনুগত ছিলেন। প্রণব ও চিরঞ্জীববাবু এবং রহমন সাহেবের মত তাঁর আদর্শের বালাই ছিল না। একটু বিরক্তির সহিত গলা খেঁকরে সমরবাবু বললেন, 'এই যত কিছু গণ্ডগোল চিরঞ্জীববাবুর ফর্জ্জে।টর জন্য। এলাকায় জুয়া চলা না চলার যা কিছু দায়িত্ব তা বড়বাবুর। খামকা আপনি উদ্‌যোগী হয়ে জুয়া ধরতে গেলেন কেন বলুন তো মশাই? এখোন আপনার ভুলের জন্য আমাদের সকলকে ক'দিন ধরে যে সাবধানে থাকতে হবে তা কে জানে? বায়স্কোপ থিয়েটারে যাওয়া তো আমাদের একেবারে বন্ধ। পুরানো পুলিশকে রিফর্ম করবেন আপনি একা? এলাকার জুয়া কোকেন একেবারে বন্ধ হোক তা আপনারাও চান আর আমাদের বড়সাহেবও মনে প্রাণে তাই চান। কিন্তু তা সত্বেও আপনারা সকলে একযোগে কাজ করতে পারছেন না। উপরন্তু বড়সাহেব যা চান তাই করতে গিয়ে আপনি তারই বিরাগভাজন হয়ে গেলেন। কোনও ভালো কাজ করতে হলে প্রথমে বর্জন করতে হবে নিজেদের মনের অন্তর্নিহিত দম্ভ। ভুলে যাবেন না যে পৃথিবীতে দাম্ভিক ভালো লোকেদের দ্বারা যত ক্ষতি হয়েছে ততো ক্ষতি মন্দ ব্যক্তিদের দ্বারা কোনও যুগেই সমাধা হয়নি। আমি বা বড়বাবু মন্দ লোক হতে পারি কিন্তু আমাদের দ্বারা মানুষের যা ক্ষতি হয় তা সীমাহীন নয়। আমাদের দ্বারা কৃত ক্ষতি সকল সময়েই একটা সীমানার মধ্যে থাকে। এই তুমি আর প্রণব যত গণ্ডগোল আরম্ভ করেছো আমাদের এই থানায়, ঠিক ততো গণ্ডগোল আরম্ভ করেছেন পার্শ্ববর্ত্তী জোড়াবাগান থানায় তোমাদের বন্ধু প্রশান্ত বাবু ও তার দলবল। এখোন তোমরা নিজেরা পুকুর কেটে গরল তুলে তাতে স্নান করে নিজেরাই এক অশান্তির আগুনে পুড়ছো। আর সেই সঙ্গে আশে পাশে আমরা যারা নির্দোষ মানুষ আছি তাদেরও তোমরা জোর করে সেই আগুনে অকারণে পুড়াতে চেষ্টা করছো। কে তোমাদের পুলিশে ভর্ত্তি হতে বলেছিলো? যাও বাইরে গিয়ে মাষ্টারী বা প্রফেসারী করে প্রথমে জনসাধারণকে রিফর্ম করোগে যাও। যদি পারো তা হলে দেখবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পুলিশও আপনা হতেই রিফর্মও হয়ে গিয়েছে। আমরা কেউ হনলুলু বা ক্যামাসকাটকা থেকে আসিনি। আমরা এসেছি এই দেশেরই দোষগুণ সম্বলিত জনতার মধ্য থেকে। প্রত্যেক ভালো বা মন্দ কাজের জন্য একটা উপযুক্ত সময় আছে। সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে কাজে এগুলে বিপর্য্যয় আসতে বাধ্য। অসময়ে কাজ আরম্ভ করে তোমরা আমাদের বড় সাহেব ও ডিপুটি সাহেবের মধ্যে একদিকে বিভেদ এনেছো। অপরদিকে তোমরা তাদের মধ্যে শুধু একটা স্থায়ী বিবাদের সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হওনি। সেই সঙ্গে তোমরা তোমাদের হঠকারিতা ও আনপ্ল্যানড কার্য্যের দ্বারা তোমাদের বড়সাহেব ও নিজেদের মধ্যেও একটা বিভেদের সৃষ্টি করেছো। তোমাদের এই সব রিফর্মের কাজ গায়ের জোরে কোনও দিনই সমাধা হবে না। এ জন্য ভালোমন্দ নির্ব্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে ভালোবাসতে হবে ও দীর্ঘদিন ধরে তাদের সেবাও করতে হবে। এ'ছাড়া কিছুকাল যাবৎ তাদের অন্যায় অত্যাচারও তোমাদের সহ্য করতে হবে। রাশি রাশি মন্দের মধ্য হতে ভালটুকু খুঁজে বার করে তা তুলে নিতে হবে। এখানে প্রয়োজন হচ্ছে ইভোলিউশনের, রিভোলিউশনের নয়। এ সব কাজের জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার। তোমাদের স্বল্পমেয়াদী নীতির জোর এখানে অচল।

সমর বাবুর সুদীর্ঘ ও অসংলগ্ন বক্তৃতার মধ্যপথে প্রণব বাবু লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর চোখ দুটো জবাফুলের মত টকটকে লাল। বড়বাবুকে খুঁজতে গিয়ে সুবিধা মত কোথা থেকে তিনি অতি আবশ্যকীয় পানীয় পান করে এসেছেন। সমর বাবুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে প্রণব বাবু অনুযোগ করে বললেন, আবার আপনি সমরদা দিনের বেলা এসব খেলেন? বড়বাবু কতোবার আপনাকে এ জন্য বকাবকি করেছেন না? আমাদের বড়বাবুও তো এ সব

একটু আধটু খান। কিন্তু আপনার মত যখন তখন তো তিনি খান না? দেখছেন যে চারদিকে এখন আগুন জ্বলছে। এর মধ্যে নূতন কোনও গণ্ডগোল বাধাবেন না। হাত জোড় করে আপনাকে বলছি।

এতো কথা সমর বাবুকে বলবার প্রণব বাবুর একটা কারণও ছিল। সেই দিন রাত্রে রাউণ্ড সেরে এসে জেনারেল ডাইরীতে নেশার ঝোঁকে তিনি লিখে ফেলেছিলেন, চ্যালেঞ্জড কনেষ্টবল নম্বর ৮৭২ গ্রাট ক্যাংসন অফ কনজাংশন। তাই নিয়ে শুধু এক মাত্র সমর বাবুকে নয়, বড়বাবুকেও দশ বার কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে। এখনো পর্যন্ত তাঁদের বিপক্ষে একটা বিভাগীয় মামলা বিচারাধীন। বড়বাবু সেদিন তাঁকে সাবধান করে বলে দিয়েছেন, বাপু হে, মদ যদি খেতে হয় আমার সঙ্গে খেয়ো। তোমার দিক থেকে একটা পয়সাও এই ব্যাপারে খরচ করতে হবে না। অন্যদিকে আমিও তোমাকে মাত্রাদোষ হতে রক্ষা করতে পারবো। সেদিন তাদের বড়বাবু স্নেহের সঙ্গে তাঁকে আরও বলেছিলেন, 'মদ তুমি তোমার ইচ্ছামত খাও কিন্তু দেখো মদে তোমাকে না খায়।' সমর বাবু সেদিন বড়বাবুর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে তিনি তাঁর উপদেশানুযায়ী কাজ করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব বুঝেও জেনেও ফাঁক পাওয়া মাত্র সমর বাবু কিনা কোথা থেকে বেশ একটু লালপানির মৌতাত করে ফিরলেন।

সমর বাবুর কিন্তু তখন অপ্রস্তুত হবার মত মনের অবস্থা ছিল না। নেশাটা ইতিমধ্যেই তার ভালো ভাবে জমে এসেছে। সমগ্র মন তাঁর তখন তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ। অবচেতন মনের জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে তিনি তার বক্তব্য সকলকে শুনিয়ে দিতে চা'ন।

একটা স্নেহের হাসি হেসে সমর বাবু বললেন, এ্যাঁ! কেন আমি মদ খেলাম! আচ্ছা, বলছি। শোন তাহলে। 'না আমরা কিছু শুনবো না', প্রণব বিরক্তির সহিত উত্তর করলেন।

প্রণব বাবু শুনতে না চাইলেও সমর বাবু তাঁকে শুনাবেনই। সমর বাবু তখন যাকে বলে নাছোড়বান্দা। চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'এ্যাঁ! শুনবেন না মানে? কৈফিয়ৎ যখন আপনি চেয়েছেন, তখন কৈফিয়ৎ আমি দেবোই। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে কেন আমি মদ খাই? এই একটা কথা তো আপনারা শুনতে চান? এর উত্তর হচ্ছে এই যে মদ একমাত্র বস্তু যা কারো সঙ্গে কখনও বেইমানী করে না। মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু সকলেই বেইমানী করে। মাত্র দুটো জিনিস পৃথিবীতে কখনও বেইমানী করে না। এদের একটা হচ্ছে ভূমি বা জমি আর অপরটা হচ্ছে এই পরম বন্ধু মদ।'

সামান্য একটু জমি কোথাও কিনে রাখুন, দেখবেন কিছু না কিছু সে আপনাকে দেবেই। তারপর হচ্ছে এই মদ খান এক পেগ। সব দুঃখ কষ্ট জ্বালা ও যন্ত্রণা আপনাকে সে ভুলিয়ে দেবে। অন্ততঃ এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে সে একটুও বেইমানী করবে না। তবু শুধু বড়বাবুর কাছে দেওয়া কথা বজায় রাখবার জন্যে আমি ধীরে ধীরে এটা ছাড়বো ঠিক করেছি। কিন্তু একবার ধরলে কি সহজে একে ছাড়া যায়? বড়বাবুর কাছ থেকে বদলী হয়ে অন্য কোথাও চলে গেলে চাকরী যে আমার থাকবে না তা আমি জানি। কিন্তু সব বুঝেও এই অতি প্রয়োজনীয় ঔষধটা আমি ছাড়তে পারছি না।

আমি আত্মহত্যা করতে চাই। আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে একটা জীবনের শেষ দেখে যেতে চাই। এই উদ্দেশ্যেই শুধু আমি ভাই মদ খাই। চাকরী যাবার ভয় তোমরা আমাকে দেখিও না। মা ষষ্ঠী রাগ করলে ছেলে কেড়ে নেবে। এর বেশী তো তেনা কিছু করতে পারবেন না। আসল কথা এই যে, আমি নিজে চাকরী ছাড়তে চাই না। তার চেয়ে বরং ওরা আমাকে চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিক। কিন্তু এই চাকরীতে বহাল না থাকলে মানুষের জীবনের শেষ দেখার এতো সুযোগ আমি আর পাবো না। তাই যত দিন পারি এই চাকরীতেই আমি থেকে যেতে চাই।

সমর বাবুর আসল ব্যথা কোথায় তা উপস্থিত সকলের জানা ছিল। মধ্যে একমাত্র প্রণব বাবুর জানা ছিল। প্রণববাবু জানতেন যে পুলিশে ঢোকার পূর্বে সমর বাবু ছিলেন একজন গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী শিক্ষক। একজন জনহিতব্রতী যুবক ব'লে তিনি সুনাম অর্জনও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনে নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছে একটা নিদারুণ আঘাত পেয়ে তিনি না ভেবে চিন্তে দুটো কাজ করে ফেলেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি যা কিছু ছিল তা নিঃশেষে বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একজন এম, এ ডিগ্রীধারী হওয়া সত্ত্বেও দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুলিশে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি এই ভাবে মদ্যপান শুরু করেন নি। পুলিশের কাজে যতদূর সম্ভব তিনি সাধ্যমত পূর্ব্বের ন্যায় জনতার সেবা করে চলতেন। এর পর একদিন রামবাগানের বেশ্যাপল্লী অঞ্চল হতে তদন্ত সেরে এসে সমরবাবু তাঁর অফিসের আসনে এসে গুম হয়ে ব'সে পড়লেন। প্রণববাবু সেই দিন নিকটেই বসে একটা জটিল মামলার ডাইরী লিখছিলেন। সমর বাবুর দিকে লক্ষ্য পড়তেই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকী ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। নিকটে এসে প্রণববাবু দেখতে পেলেন সমরবাবু ভারতীয় দণ্ডবিধির পাতা উল্টিয়ে—হত্যা সম্পর্কীয় আইনের ৩০২ ধারাটি নিবিষ্ট মনে পড়ে দেখছেন। এর পর অন্য কোনও থানায় বদলী হবার জন্যে একটা দরখাস্ত লিখে তিনি প্রণব বাবুকে বলেছিলেন, একটা দশ টাকার নোট ধার দিতে পারো ভাই? প্রণববাবুর জানা ছিল একাধারে কুক বা ভৃত্য ভিখুরাম ছাড়া ত্রিভুবনে তাঁর আর কেউ নেই। তাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে তিনি বলে উঠেছিলেন, আজকেই তো সকালে আপনি মাইনে পেলেন। এর মধ্যে অতোগুলো টাকা কোথায় পাঠালেন? সমরবাবু তাঁর ঠোঁট দুটো আপ্রাণ কামড়ে ধরে ধীরস্থির ভাবে প্রণববাবুর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, মুদির দোকানের মাসিক দেয় টাকা আর আমার চাকরটির মাইনে দিয়ে বাকি টাকাটা আমাদের পল্লীর কয়েকটা জনহিতকর কাজের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। তা' ছাড়া আমাদের মুন্সীবাবু বদীরুদ্দিনের ছেলের অপারেশনের জন্য আমার মাইনের বাকী টাকা একটু আগেই তাকে আমি দিয়ে দিয়েছি। সমর বাবুর কথায় প্রণববাবু সেদিন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। যে কাব তাদের সকলের মিলিত ভাবে করা উচিত তা সমরবাবু একাই করে

বাজালেন। একটু অপ্রস্তুত হয়ে প্রণববাবু অকস্মাৎ পকেট থেকে দুইখানা দশ টাকার নোট তাঁকে বার করে দিয়েছিলেন। এই টাকা দিয়ে মদ কিনে সমরবাবু সেই দিন প্রথম তা পান করেন। সেই থেকে অবিধে পেলেই একটু আধটু তিনি খেয়েই চলেছেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের অন্য দিক ছিল এতো গরিমাময় যে এই জন্য তাঁকে কখনও কেউই ঘৃণা করতে পারে নি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কেউ তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের প্রকৃত কারণ জানতে পারেন নি। তবে সেই দিন থেকে সমরবাবু রামবাগান ও তৎসন্নিহিত সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ অঞ্চলের কোনও তদন্ত নিজে হাতে নিতে রাজী হন নি। তার পরিবর্ত্তে এলাকার অন্যত্র তিনি দ্বিগুণ ত্রিগুণ মামলা নিজে হাতে নিয়ে তাঁর সতীর্থদের ভারমুক্ত করেছেন।

সমরবাবু জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে না জানা তথ্যের কোনও মীমাংসা আজও হয় নি—সেই না জানা তথ্যের কথা সেদিনকার সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ প্রণববাবুর স্মৃতিপথে উদিত হলো, সমর বাবু যে একজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি তাতে কারুর দ্বিমত ছিল না। সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় সমরবাবুর মুখ-নির্গত বহু বাণী ঋষিবাক্যের ন্যায় প্রণববাবুদের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনের কার্য্যে সহায়ক হয়েছে এ কথা প্রণববাবুরা মুখে না বললেও মনে মনে তা স্বীকার করে থাকেন। সমর বাবুর প্রতি তাঁর এই দিনের এই বিসদৃশ ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে উঠে প্রণব-বাবু সমরবাবুকে বললেন, মাপ করবেন সমরবাবু! আমি মাত্র এই কথা বলছিলাম কি? এই গোলমালের সময় একটু সাবধানে থাকাই ভালো। এ'থানার কাউর কোনও দোষ পেলে বড়সাহেব তাকে আর ছাড়বেন না। তবে মদ তো ধরে আবার অনেকে ছেড়েও দেয়।

এত দূর এগিয়ে এসে কাযটা বড় শক্ত হবে প্রণববাবু! আমি ছাড়লেও মদ আমাকে ছাড়বে না। ভুলে থাকবার জন্য আরও নিকৃষ্ট পন্থা তা'হলে আমাকে বেছে নিতে হবে, একটু ম্লান হাসি হেসে সমরবাবু উত্তর করলেন, আমার ছাত্রাবস্থায় আমার এক সহপাঠী ধনীর দুলাল বন্ধু ছিল। হঠাৎ সে একদিন মদ ধরলো। দিন রাত ঘরে বসে সে শুধু মদ খায়। কাউর কোনও উপদেশ সে কানেও তুলে না। একদিন বাড়ীর লোক নাচার হয়ে তাদের কুলগুরুকে খবর পাঠালে। গুরুদেব এসে তাকে বহু ধর্ম্মোপদেশ দিলে। পৃথীবীটা একটা ধোঁকর টাটি ইত্যাদি চোখা চোখা মনভোলানো 'কথা তিনি তাকে শুনালেন। পরিশেষে তাদের বিরক্ত হয়ে আমার বন্ধু গুরুদেবকে বললে বেশ আমি মদ ছাড়বো। আপনাকে এক সহস্র মুদ্রা প্রণামীও দেবো। আমার বাড়ীর লোকে যা আপনাকে দেবে তা বাদ দিয়ে এই মুদ্রা আপনি পাবেন। কিন্তু এসব দেওয়া হবে এক সর্ত্তে এই যে আপনি সাত দিন এই ঘরে আমার জায়গায় বসে আমার মত মদ্য পান করবেন। অতোগুলি মুদ্রার লোভ পরিত্যাগ না করতে পেরে গুরুদেব এই ভাবে মদ খেতে রাজীই হয়েছিলেন। সেই দিন হতে আমার বন্ধু মদ আর একটুকুও ছোঁয় নি। কিন্তু শুনেছি যে তার গুরুদেব আজও পর্য্যন্ত ঐ অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। মদ খাওয়ার অভ্যাস একা এলে তা ছাড়া যায়। কিন্তু লোভ অহমিকা বেদনা, শোক বা দুঃখের সঙ্গে তা এলে তাকে ছাড়া শক্ত হয়ে পড়ে। মদ ছেড়ে দেবার মত মনের জোর আমার আছে। কিন্তু তা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ভগ্নস্বাস্থ্য, উম্মাদনা বা মৃত্যু, এই তিনটির একটি বরণ করে নিতে হবে। তোমরা তা না চাইলেও আমাকে তাই একদিন বেছে নিতেও হবে। কিন্তু তার আগে বেঁচে থেকে আমি একটি মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর শেষ দেখে যেতে চাই। তাই এখুনি এই মদ খাওয়াও আমি ছাড়তেও পারছি না।

উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হয়ে অপরাধীর মত এক রকম গিলে গিলেই সমর বাবুর কথাগুলি শুনছিলেন। তাঁর এই সকল কথার কোনও উত্তর কাউর মুখেই যোগাচ্ছিল না। এমন সময় সকলকে সচকিত করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন পার্শ্ববর্ত্তী জোড়াবাগান থানার নূতন সেকেণ্ড অফিসার সুশান্ত বাবু। বিভাগীয় বড় সাহেব মহীন্দ্রবাবু তাঁকে টেলিফোনে ডেকে পাঠিয়ে একটা বিশেষ কাজের জন্য তাঁকে এই থানার প্রণব বাবুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার জন্য পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার সমর বাবুর মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন। তার পর রহমান সাহেব ও চিরঞ্জীব বাবুর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সামনের একখানা চেয়ার প্রণব বাবুর দিকে টেনে এনে একটু এদিক ওদিক চেয়ে উসখুশ করতে করতে প্রণব বাবুকে বললে, এই এসে পড়লুম। এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম তাই। তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল, ভাই। এর পর সকলের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে তিনি আবার বললেন, যাক তার পর আপনাদের সব খবর কি বলুন? একেবারে এখানে যে একটা জমাটি মিটিং বসিয়ে ফেলেছেন!

অন্যদিন প্রশান্ত বাবুর সাহচর্য্য রহমন সাহেব, চিরঞ্জীব বাবু ও প্রণব বাবুর কাম্য মনে হলেও এইদিন এখানে তিনি হঠাৎ এসে পড়ায় তাঁরা একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাদের মনের মধ্যে কর্ত্তব্য-বোধ এবং বন্ধুত্ব ও তৎসহ আনুগত্যের যেন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো। সকলেরই মনে হলো আজকে তিনি চলে গেলেই ভালো হয়। তাঁরা ভাবছিলেন প্রশান্ত বাবুকে এখন তাঁরা কি বলবে। সহসা তাঁরা তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের হয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন সমর বাবু। তার চোখ দুটো দুই হাতের মুঠি একবার মুছে নিয়ে সমর বাবু বলে উঠলেন, আরে! এতো ভণিতা না করে সোজা কথা বললেই তো হয়? আসল কথা হচ্ছে বড় সাহেব দূত করে আপনাকে পাঠিয়েছে এখানকার খবর নিতে। এখন আপনার দরকার গোপনে প্রণব বাবুর সঙ্গে দুটো কথা বলবার। বড় সাহেবের আনুকূল্যে আপনি এই থানার প্রণব বাবু, রহমন সাহেব ও চিরঞ্জীব বাবু এবং অন্যান্য থানার ওদের মত আদর্শবাদী ছোকরা অফসারদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য আপনাদের পুলিশের পুরানো যুগকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে এখানে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করে সমস্যার আশু সমাধান করা। আমি অবশ্য আপনাদের নবীনপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যবর্ত্তী মধ্যপন্থীর লোক। এই জন্য আমরা এই উভয় পন্থীদেরই চক্ষুশূল। উভয় দলেরই অত্যাচার আমরা যেমন মুখ বুজে সহ্য করি তেমনি উভয়কে উভয়ের রুদ্ররোষ থেকে আমরা রক্ষা করি। তা আমাকে না হয় আপনি বিশ্বাস করতে নাই পারলেন। কিন্তু আপনার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে চিরঞ্জীব বাবু ও রহমন

সাহেবকেও এখুনি আপনার মনের কথা আপনি বলতে যেন নারাজ। আপনি প্রণব বাবুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে নিজের মনের কথা বলতেও পারছেন না। আমাদের এখানে চলে যেতে বলবারও আপনার সাহস নেই। প্রাচীনপন্থীদের মত আপনারা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতেও পারেন না। তাঁদের মত আপনাদের কোনও সুসংবদ্ধ দলও নেই। পুলিশকে রিফর্ম করতে যত আপনারা চান তার চেয়ে অধিক পরিমাণে চান আপনারা বড় সাহেবকে খুশী করতে। তাও আপনারা পৃথক পৃথক ভাবে একে অপরের অজ্ঞাতে একের সঙ্গে অপরে পাল্লা দিয়ে করে থাকেন। আপনাদের কয়েকজনের মধ্যে যে আণ্ডার কারেন্ট চলছে তার যে খবর আমি না রাখি তা নয়। আপনাদের উপর এ বিষয়ে আমার যে একেবারে সহানুভূতি নেই তাও নয়। তবু আমি বলবো, এই যে এই সব দুরূহ কাজে হাত দেওয়ার আগে নিজেদের চরিত্রের সব দিকটা সমান ভাবে গড়ে নিতে হবে। মনে রাখবেন যে একটা অন্যায় দিয়ে অপর একটা অন্যায়কে কখনও ঠেকানো যায় না।

বড়সাহেবের বলে বলীয়ান সুশান্ত বাবু এতোক্ষণ দাঁতে দাঁত দিয়ে সমর বাবুর কথাগুলি হজম করে যাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় বড় বাবু এসে দরজার সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলেন 'বাহারকো কোহি আদমী ইহাপরি আয়ে থে?' প্রত্যুত্তরে একটা সেলাম ঠুকে সিপাহীজী উত্তর দিলে 'দোসরী কোহী ইঁহিপর নেহী আয়া। লেকেন জোড়াবাগান থানাকে সিকিণ্ড অফসার সুশান্ত বাবু অফিসকো অন্দরমে বৈঠকে বাতচিত করতা হায়।' সিপাহীর এই শেষ জবাবে মুখ বেঁকিয়ে বড় বাবু প্রণব বাবুদের ঘরের পর্দার আড়ালে এসে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সমর বাবুর এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি শেষ হওয়া মাত্র তিনি ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, এই যে সুশান্ত যে! তা কতক্ষণ? শুনেছি আমি কিছুটা আড়াল থেকে। তা' সমর ঠিকই বলেছে। এখোন এখানে পারচেস্ করলেন কতোটা? আর সেল্ করলেই বা কতোখানি? তা বাবু স্পাইগিরী করে কি আর পুলিশকে রিফর্ম করা যায়?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একি আপনি বলছেন স্যার! আমি এমনিই এসেছিলাম এদিকে, তাই প্রণবের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলাম, সুশান্ত বাবু সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর করলেন, 'আপনি মিছামিছি আমাকে সন্দেহ করছেন। আপনি প্রণব বাবুর মত আমাকেও বিশ্বাস করতে পারেন। প্রণব বাবুর মতই আমিও আপনার একজন অনুগত অফিসার, স্যার।'

'তাই নাকি?' প্রত্যুত্তরে ভ্রূ কুঁচকে বড়বাবু বললেন তা কবে আসছো এই থানার ভার নিতে? এ কি বলছেন আপনি, স্যার? এ থানার ভার নোবো মানে? সুশান্ত বাবু যেন চমকে উঠে বলে উঠলেন, আপ ন তো, স্যার, আছেন এখানে।

হ্যা। আছি তো আমি এখনো। তবে কতদিন থাকবো তা জানি না, বড় বাবু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে উপবেশন করতে করতে বললেন, 'কিন্তু তুমি এতে অবাক হচ্ছো কেন? এই একটু আগে তো বড় সাহেব তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'কি সুশান্ত! সুধীর বাবুকে বদলে দিলে তুমি জোড়াসাঁকো

খাতা চালাতে পারবে তো ? আর তুমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিয়ে এলে, হা স্যার ! নিশ্চয়ই পারবো'। তা ওতে তুমি কোনও অপরাধ করো নি। তুমি অপরাধ করেছো এই আমার ও তোমার বন্ধুদের কাছে মিথ্যা কথা বলে। এই মিথ্যা কথা তুমি আত্মরক্ষার্থে বা নিজের বা আর কাউর উপকারের জন্যও বলো নি। সেই জন্য একে আমি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা কথাই বলে অভিহিত করবো। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলে যে, ওখানে একজন বাইরের লোকও উপস্থিত ছিল। তোমার চরিত্রের সঙ্গে সেই বাইরের লোকটির চরিত্রের আমি কোনও তফাৎ দেখছি না। তবু সে আমার কাছে এসে প্রয়োচিত ভাবে সত্য কথা বলে গেছে। আর তুমি বিনা কারণে অযাচিত ভাবে এদের কাছে মিথ্যা বলে যাচ্ছো। আমরাও অবশ্য মিথ্যে কথা প্রয়োজন হলে বলি। কিন্তু তা বলে আমরা প্রবঞ্চনা কাউর সঙ্গে করি না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তোমার চুপ করে থাকা উচিত ছিল। আগে তোমরা নিজেদের ক্যারেকটার বাংলায় যাকে বলে চরিত্র তা গঠন করো। তার পর তোমাদের এই তথাকথিত বিফর্মের কাজে হাত দিতে যেও। এই ডিপার্টমেন্টের আমি বহু দিনের লোক। তোমাদের বড়সাহেবের পিতাও এখানে বড়সাহেবী করে রিটায়ার করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কিছুদিন কাজ করেছি। আমি তোমারও বাবার সঙ্গে একত্রে কেরাব স্কুলে কিছুকাল পড়েও ছিলাম। সংসার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তোমাদের 'চেয়ে বেশীই হবে। আজ পর্য্যন্ত এই শহরে যা কিছু পরিবর্তন আমি দেখেছি তা যুগ বা সময় করেছে। এই সব ভালো বা মন্দ পরিবর্তন কোনও মানুষের দ্বারা হয়নি। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের মাধ্যমে যুগ বা সময়ই তাদের করণীয় কার্য্য করে দিয়েছে। এই থানার এলাকায় ৩১০ জন পুরাতন দাগী চোর বাস করে। তাদের মধ্যে আবার ৩০৭ জন স্ব স্ব গৃহে হাজির থাকে। তুমি কি মনে করো একদিনেই শুধু শাসন দ্বারা এই সব চোরেদের ও এখানকার অগণিত বেশ্যানারীদের তাদের স্বধর্ম্ম থেকে তাদের বিরত করবে ? তোমরা যা ভালো মনে করো তা তারা ভালো মনে করে না। কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা তাদের বোঝাবার মত তোমাদের ধৈর্য্য সময় বা সুবিধেও নাই। যে চোর সে চুরি করবেই, মাতাল মদ খাবেই, বেশ্যা বেশ্যাবৃত্তি করবেই, জুয়াড়ী জুয়া খেলবেই। এখোন দেখতে হবে শুধু নূতন কোনও জুয়াড়ী, বেশ্যা, চোর বা মাতালের সৃষ্টি না হয়। নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করে মন্দ হবার সুযোগ ও সুবিধা নষ্ট করে তবে এ বিষয়ে তোমরা সফল হতে পারো। অন্যথায় তোমরা শুধু এদের এক স্থান হতে অপর এক স্থানে সাময়িকভাবে শুধু তাড়িয়ে দিতে পারো। কিন্তু এতে মূল সমস্যার কোনও দিনই সমাধান হবে না। আমি প্রণববাবুদেরও এই কথাই বারে বারে বুঝাতে চেয়েছি।

সুশান্তবাবু বুঝেছিলেন যে আজ আর তাঁর এখানে কোনও কাজ হবে না। তাই একটু কিন্তু কিন্তু করে তিনি বললেন, স্যার ! আজকে তাহলে উঠি। বড়বাবু বুঝতে পেরেছিলেন যে সুশান্ত বাবু এবার সরে পড়বার চেষ্টা করছেন। তিনি এইবার একটু স্নেহের সুরে বলে উঠলেন, আরে, বসো বসো। হঠাৎ এতো লজ্জা কেন ? এসেছো যখন একটু চা টা খেয়ে যাও। এই ডিপার্টমেন্টে আমাদের আর ক'দিন। তোমারাই তো এবার কাজকর্ম বুঝে নেবে।

এর পর বড়বাবু দরজার সিপাহীর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠে বললেন, এই সিপাহীহ ভাই ! থোড়া লসী উসী কি চা'উ তো ভাই মাঙাও। বড়বাবুর গলার স্বর কানে যেতেই দরজার সিপাহী এগিয়ে এসে সেলাম করে বললো, জী হুজুর। আভি মাঙায় দেতা—

চা পান করে সুশান্তবাবু বিদায় নেওয়া মাত্র সকলে যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সবাই এবার নির্নিমেষ নয়নে শুধু বড়বাবুর দিকে চেয়ে থাকে। তাঁরা সকলেই শুনতে চান তাঁর মুখে একটু সুখবর। কিন্তু বড়বাবু কোনও কথা না বলায় প্রণব বাবুকেই প্রথমে কথাটি পাড়তে হলো। একটু ইতস্তত করে প্রণব বাবু বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, বড় সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছিলেন স্যার ?

হাঁ ভাই গিয়েছিলাম। কিন্তু সুবিধে হলো না। ভদ্রলোকের শুধু লম্বা লম্বা কথা। মনে করছেন এতোদিন পরে হাতী খাদে পড়েছে, ভ্রূ দুটো বার দুই কুঁচকে নিয়ে বড় বাবু উত্তর করলেন, ভদ্রলোক বলেন কিনা আমি ডিস্‌অনেষ্ট ও ঘুষখোর। আমিও দিয়ে এলাম দু'কথা শুনিয়ে। যাবার আগে একটু মৌতাত করে গিয়েছিলাম। তাই বলতে কিছু মুখে বাধে নি।

কি বললেন স্যার, আপনি, ব্যস্ত ভাবে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ঝগড়া টগড়া করে আসেন নি তো ?

আরে ওপরওলার সঙ্গে ঝগড়া করে কি আর পারা যায় ? উত্তরে প্রসন্ন মনে বড় বাবু বললেন, আমি শুধু তাঁকে মনে মনে বলে এলাম, 'মশাই ! আপনার বাবা ঘুষ খেয়ে অনেক টাকা রেখে গেছেন। তাই তাঁর ছেলে আপনি আজ হতে পেরেছেন অনেষ্ট। এখোন আমি যদি এই ভাবে কিছু টাকা রাখতে পারি তা' হলে আমার ছেলেও ওঁর মত অনেষ্ট অফিসারই হবে। হুঁ ! শান্তিভাঙ্গা রোডের বাড়ীখানা ওঁদের কি ভাবে তৈরী হলো তা কে না জানে ? আমিই ওর জন্য কতো ইট যোগাড় করে দিয়েছি। ছাত্রাবস্থায় রকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা উনি দেখতেন। এখোন সব জেনে শুনে কই উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া বাড়ীখানার জন্যে তো উনি না দাবী দিচ্ছেন না ? একে তো অনেষ্ট বলা যায় না ? বরং একে আত্মপ্রবঞ্চনা বলা যেতে পারে। যাক, আমি অন্য এক ব্যবস্থা করে এসেছি।

'কিন্তু স্যার', প্রণব বাবু এইবার বললেন, 'ডেপুটি সাহেব যে আপনাকে দু'তুবার খুঁজেছিলেন'। 'তা আমি জানি', মৃদু হেসে বড়বাবু উত্তর করলেন, 'আমি একজায়গা থেকে ফোনে ওঁর সঙ্গে কথা কয়ে নিয়েছি। মণ্টু মল্লিক তাদের বাড়ীতে কাল রাত্রে ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছে। তাই উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন সেখানে তাঁর যাওয়া উচিত হতে কিনা। আরে মণ্টু মল্লিকের মারফৎ ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা তো আমিই করিয়ে এলাম। তিনি যে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে চেয়েছেন সে খবর আমি ঠিক সময়েই পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই এক জায়গা থেকে ফোন করে তাঁকে আমি বলে দিলাম 'নিশ্চয়ই সেখানে যেতে পারবেন স্যার। লোক ওরা খুব ভালো। আমিও গেটে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবো এখন। এখোন দেখা তো যাক কি হয়। এতে সুবিধে না হলে পরে অন্য আর একটা ব্যবস্থা করা যাবে আখুন, দেখ তো খামকা একটা বে'হিসেবী মিথ্যা কথা বলার জন্য কি যে গেরো পোয়াতে হচ্ছে। একেই না বলে আর ষাঁড় গুঁতবি আয়। এ যেন ষাঁড়কে ডেকে গুঁতোবার বন্দোবস্ত করা হলো। [ক্রমশঃ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশীয় শিল্প

"শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ আয়েঙ্গার বলিয়াছেন, 'ভারতে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় স্তরেই শ্রমশিল্পের দিক দিয়া ইদানীং আমলে যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমরা ন্যায্যতঃই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি।' ভারতে ইদানীংকালে বহু নূতন নূতন কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শিল্প উৎপাদনও যথেষ্ট বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃটিশ আমলে ভারতকে প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে রাখিয়া দিবার যে ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার জের কাটাইয়া আমরা শিল্পবিপ্লবের পথে প্রথম পদাক্ষেপ যে মোটামুটি ভালভাবেই করিতেছি, তাহাতে ভারতবাসীর নিশ্চয়ই গর্ব্ববোধের কারণ আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে এই অগ্রগতির একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়াও উপায় নাই। এক দিকে যখন ভারতে শিল্পোৎপাদন বাড়িতেছে, অন্য দিকে তখন শিল্পজাত জিনিষপত্রের দাম কমিবার বিশেষ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থার যদি প্রতিকার না হয়, তবে দেশের লোক শিল্পোন্নতির প্রকৃত সুফল যে ভোগ করিতে পারিবে না—তাহাতে ভুল নাই।"

—দৈনিক বসুমতী।

কঠোর দণ্ড চাই

"বাসে, ট্রামে, পথে, হাটে, মাঠে, অফিস কলকারখানায় প্রায় সর্বত্রই আজকাল দেখা যায় মানুষের অসহিষ্ণুতার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। অপরের সুবিধা অসুবিধার চিন্তা অপেক্ষা নিজের স্বার্থ সুখ-সুবিধার প্রশ্নই বড় হইয়া উঠে। চারিদিকের অস্বস্তিকর অবস্থা ক্রমাগত হয়রাণি কিম্বা হতাশার ফলেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, এই ক্রোধ ও উত্তেজনার দৃশ্য অহরহই দেখা যায়। আমেদাবাদ জেলার ঢোলকা তালুকের গুপ্তি গ্রামে দুইদল লোকের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে পাঁচজন লোক নিহত এবং ত্রিশ জন আহত হইয়াছে। কতকগুলি গৃহপালিত পশু কয়েকজন চাষীর ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিলে উহা লইয়া বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমশঃ উহা লইয়া দুই দলে দাঙ্গা বাধে। ক্ষেতের ফসল নষ্ট করা লইয়া দাঙ্গা যদিও আমাদের দেশে এবং সব দেশেই বহু পুরাতন ব্যাপার, তথাপি পারস্পরিক সহানুভূতি যেখানে বিষয়টির মীমাংসা সহজ করিতে পারিত, সেখানে উভয় পক্ষের উত্তেজনা ও ক্রোধের ফলে পাঁচজন নিহত এবং ত্রিশ জন আহত হইয়াছে, হাঙ্গামার সময় বন্দুক, লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার পরে আবার মামলা মোকদ্দমা, অশান্তি, উদ্বেগ, অর্থব্যয় কত চলিতে থাকিবে। গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু যথেচ্ছভাবে ছাড়িয়া দিয়া কত লোক যে কত গৃহী বা চাষীর অনিষ্ট সাধন করে, এবং উহা লইয়া যে কত অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। পশুচারণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে জমি নির্দিষ্ট করিয়া না রাখার ফলেই সাধারণতঃ এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে। সরকার বহু ব্যাপারে বহু পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছেন, কিন্তু এই বিষয়ে সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। বহু পরিশ্রমে যাহারা ক্ষেতে ফসল ফলায় বা গৃহের আশে পাশে শাক-সব্জীর বাগান করে, তাহা যদি গরু ভেড়া ছাগল প্রবেশ করিয়া নষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে মানুষের আত্মসম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। এই ধরণের উৎপাত উপদ্রব এত বেশী হইতেছে যে, যদি প্রয়োজন হয়, কঠোর দণ্ডের বিধান দ্বারা আইন প্রণয়ন করিয়াও ইহা দমনের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

—যুগান্তর।

স্বখাত সলিলে

"সোমবারে লোকসভায় সংবিধান সংশোধনের জন্য উত্থাপিত বিলটি বিবেচনার প্রস্তাবের উপর ভোটগ্রহণে অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব পাশ করাইবার জন্য যে বিশেষ বিধি আছে সে-অনুযায়ী প্রথমতঃ উপস্থিত সদস্যগণের মোট সংখ্যারও ⅔ অংশের ভোট চাই এবং সেই সঙ্গে লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যারও সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন চাই। লোকসভার মোট সদস্যসংখ্যা ৫০৫, কাজেই বিশেষ বিধির দ্বিতীয় নির্দেশ অনুসারে সংবিধান সংশোধনের স্বপক্ষে ২৫৩টি ভোট প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে গণনায় দেখা যায়, সংশোধন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ২৪২ জন সদস্যের ভোট পড়িয়াছে। স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিল উত্থাপন করিয়াছেন লোকসভায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও সে বিল প্রয়োজনীয় ভোটের সমর্থন পাইল না, ইহা কেবল অভূতপূর্ব নয়, অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। এরূপ ঘটিবার জন্য দোষ কাহার স্বভাবতঃই সে প্রশ্ন উঠিয়াছে। লোকসভার কংগ্রেস সদস্যগণ সংবিধান সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধী নিশ্চয়ই নহেন। লোকসভার কোন কোন কংগ্রেস সদস্য অভিযোগ করিয়াছেন যে, ভোট দিবার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে তাঁহাদের ভোট রেকর্ড হয় নাই। অর্থাৎ বিপাক ঘটাইয়াছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা। বেচারা যন্ত্রের উপর দোষ চাপাইয়া কিন্তু এই অভিনব পরিস্থিতির কারণ নির্ণয় করা যায় নাই। দেখা গেল, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে মাত্র ছয়জন সদস্যের ভোট রেকর্ড করিতে গোলমাল হইয়াছে। এই ছয়টি ভোট যোগ দিলেও বিশেষ বিধান অনুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হইত না। যন্ত্রের ত্রুটি নহে, কংগ্রেস-সদস্যগণ প্রয়োজনমত যথেষ্ট সংখ্যায় ভোট দিবার সময়ে লোকসভায় উপস্থিত হন নাই। অর্থাৎ লোকসভার অনেক সদস্য এইভাবে তাঁহাদের কর্তব্য অবহেলা করিয়াছেন। কংগ্রেস দলেরই কিছুসংখ্যক সদস্যের অনুপস্থিতির ফলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপদস্থ হইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা এবং ইহা দ্বারা দলীয় শৃঙ্খলার অভাবও সূচিত হইয়াছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

আজগুবী খবর

"চীন-ভারত সীমান্তে ম্যাকমোহন লাইন বরাবর চীনা ফৌজ মাইন পাতিয়াছে এবং শুধু পাতে নাই, ইতিমধ্যেই মাইন বিস্ফোরণের ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া কোন কোন 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকায় ফলাও করিয়া সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী নেহরু তাজ্জব বনিয়া গিয়াছেন। লোকসভায় তিনি কথাটা বলিয়াও ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার তাজ্জব বনিবার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। ইতিমধ্যেই এই ধরণের 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকা "ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস"-এ প্রকাশিত কাম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটি, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের যুক্ত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশ ও মিছিল সম্পর্কে একটি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন রিপোর্ট একেবারে খাঁটি বেদবাক্যের মত বিশ্বাস করিয়া প্রধানমন্ত্রী কমিউনিষ্ট পার্টির উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া লইয়াছেন। তবু প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মন্তব্যে 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রগুলি কিছুটা বিব্রত বোধ করিতেছেন, বোধ হয় রুষ্টও হইয়াছেন। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে দাবাইবার এবং কমিউনিষ্ট চীনকে জব্দ করিবার জন্যই তাঁহাদের মোটা মাহিনার সুশিক্ষিত ভৃত্যবৃন্দ রাত্রি জাগিয়া কত পরিশ্রমে রোমহর্ষক সংবাদ বানাইয়া দিতেছে, তবু নেহরু একেবারে লোকসভায় কথাটা ফাঁস করিয়া দিলেন!"

—স্বাধীনতা।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

"বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের খপ্পর হইতে মেদিনীপুরবাসীরা বাহির হইয়া আসিয়াছেন, এই বৃহৎ জেলার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা পাইয়াছে। উত্তরপাড়া আপত্তি করিয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই, তার কারণ মেদিনীপুর কোমরে যে জোর নিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছে আর কেহ তাহা পারে নাই। বর্দ্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উহার আইন যে ভাবে কয়েকটি ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার মতলবে রচিত হইয়াছে তাহাতে উহার বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীব্র এবং কঠোর প্রতিবাদ বর্দ্ধমান হইতেই আসা উচিত ছিল। কতকগুলি গ্লোরিফাইড কেরাণী এবং কতকগুলি কারখানার হুকুম বরদার একটা 'বিশ্ববিদ্যালয় চালাইবে, এত বড় ধৃষ্টজনোচিত কল্পনা ডাঃ বিধান রায় করিতে পারেন, কিন্তু হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া তাহা সহ্য করিবে কেন? একটা বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র একটি টেকনিক্যাল স্কুল নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই তার কাজ থাকিবে অধ্যাপনা এবং গবেষণা। উহা চালাইবে কয়েকটি কারখানার ম্যানেজার এবং সরকারী সেক্রেটারীর মনোনীত গুটি-কয়েক ধামাধরা অধ্যক্ষ? ডেমোক্রাসির চাপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি দেখিয়া উহা বাদ দেওয়াই যদি স্থির হইল তবে এই ধরণের এক উদ্ভট বস্তু খাড়া না করিয়া স্যর মরিস গয়ার প্রণীত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি অনুসরণ করিলেই হইত? সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ হয় তাহা তো বিশ্বভারতীতেও দেখা যাইতেছে। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিণামে ইলেকট্রিক ট্রেণ উল্টা চলিবে ইহা আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। এখন কলিকাতার ছেলেরা মফঃস্বল কলেজে পড়িতে যায়, তখন মফঃস্বলের ছেলেরা কলিকাতায় আসিবে। কলিকাতার ভিড় আরও বাড়িবে। একটা কথা, এই জাতীয় লজ্জাজনক একটা বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের কি কোন বক্তব্য নাই? একজন জমিদারের বাড়ী কেনা এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এসের চাকুরি সংস্থানের জন্য একটা গোটা ডিভিসনের ছেলেমেয়েদের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে? বিশ্ববিদ্যালয় হউক, কিন্তু তাহা মার্টিন কোম্পানীর ব্রাঞ্চ কারখানা (ভূতপূর্ব্ব আই, সি, এসের ম্যানেজারিতে) কেন হইবে?"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

দারিদ্র্য

"আজ দলের নিশান উড়াইয়া জনসেবায় ব্রতী হইতে দেখিলে আমরা বেদনা বোধ করি এইজন্য যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা দলের সেবা না জনসেবা। দলে বিভক্ত দেশে জনসাধারণের তাই মোটেই ভরসা নাই। আমরা বিস্মিত হই এই জন্য যে, দুর্গত দুঃস্থ জনসাধারণকে যে দৃষ্টি লইয়া দেখা প্রয়োজন সেই দৃষ্টি আমাদের উচ্চ মহলে আদৌ নাই। তাই মনে হয় যত কথা, যত বড় বড় বুলি সমস্তই ফাঁকা ও অসার। দেশের দারিদ্র্য দূর না হইলে এবং যে দারিদ্র্য দুর্নিবার গতিতে চলিয়াছে তাহা বন্ধ না হইলে আমরা দেশের কোন ভরসা দেখিতে পাই না। বিস্মিত হই ইহা দেখিয়া যে, সামান্য পরিবর্তন, সামান্য ব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য অদল বদল করিতে পারিলে যেখানে বহুলোকের কল্যাণ করিতে পারা যায় সেখানেও ইহার অভাবে কিছুই হয় না। কল্যাণজনক ব্যবস্থা চোখের সম্মুখে ব্যর্থ হইতে দেখা যায়। এই ব্যর্থতার গ্লানি সারা দেশকে বহিতে হয়। এই যে গ্লানিময় অবস্থা ইহা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। এই দেশ ধনী ও দরিদ্র সকলেরই দেশ। ধনের প্রাবল্যে সর্ব্বগ্রাসের স্পৃহা দেশে কি পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সামান্য লক্ষ্য করিলেই দেশ ও দেশবাসীর দারিদ্র্যের কারণ অবগত হওয়া যায়।"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

শোক-সংবাদ

নিরঞ্জন পাল

মনস্বী রাষ্ট্রনেতা স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয়ের পুত্র ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতের বিরাট পুরুষ নিরঞ্জন পাল গত ২২শে কার্ত্তিক ৭০ বছর বয়সে বোম্বাইতে পরলোকগত হয়েছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র-জগতের পুষ্টির ইতিহাসে এঁর অবদান অবিস্মরণীয়। চিত্রনির্ম্মাতা হিসেবে ভারতীয় ছায়াছবির মানোন্নয়নে ইনি যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রায় আদিযুগ থেকে ইনি তার সঙ্গে জড়িত থাকায় চলচ্চিত্রলোক নানাভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে চিত্রজগতের এক বিরাট অভাব ঘটল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

মাননীয় মহাশয়, আপনার সুসম্পাদিত মাসিক বসুমতী বর্ত্তমানে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা, এ বিষয় সন্দেহ নাই। ইহার আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি এবং আশা করি অদূর ভবিষ্যতে তা দেখে যেতে পারবো। তবে একটি জিনিষ আমার প্রায়ই মনে হয়। বহু শ্রদ্ধেয় গুণীজন আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁদের নামের সঙ্গেও অনেকের পরিচয় নেই। বিশেষত ছোটদের সেটা একান্ত দরকার বলে আমার মনে হয়। ছোটদের আসরে এটাকে একটা নিয়মিত প্রবন্ধে প্রচার করা উচিত। প্রতি মাসে বিভিন্ন মনীষীর জীবনী প্রকাশিত হলে দেশের উপকার হয় বলে আমার বিশ্বাস। যেমন জীবিতদের নিয়ে 'চারজন' গায়ক বাদক নর্ত্তককে নিয়ে 'আমার কথা', তেমনি ছোটদের আসরে বাংলার মনীষীদের একটা রেখাচিত্র মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। তাঁদের কর্ম্মময় জীবন থেকে ছোটরা রস রূপ গন্ধ আহরণ করে গড়ে উঠুক, ইহাই আজ সর্ব্বোচ্চ কামনা। আপনার পত্রিকার প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, এমনি প্রবন্ধ আরও প্রকাশ করলে সাধারণের মননশীলতা বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যে প্রবন্ধগুলি বেরোয় সেগুলিও অত্যন্ত যত্ন সহকারে লেখা। শক্ত জিনিষকে সহজে বুঝাবার একটা চেষ্টা আছে আর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। বিজ্ঞানবার্ত্তা সত্যই আমাদের আগ্রহের। নাচ-গান-বাজনার মধ্যে সুরের অনুরণণ একটু কম মনে হচ্ছে। আগের মত সতেজ ঝঙ্কার যেন আর পাইনা। 'চার জন' আরও সুচিন্তিত হওয়া উচিত নয় কি? শিশির বাবু সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করি। ঐ টুকিটাকিতে মন ভরে না। আপনার পত্রিকার একটি অনুরাগী পাঠক বলে সমালোচনা করলাম। যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তো মার্জ্জনা করবেন। আমার সর্ব্বশেষ কথাটি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আমার মনে হয়, ধারাবাহিক লেখা নেবার সময় কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার একটা চুক্তি থাকা উচিত। কেন না প্রায়ই দেখা যায় সুষ্ঠু জিনিষটি ক্রমশর ধাক্কা সামলিয়ে আর সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না। ইন্দ্রনাথ মিত্র,—মাদ্রাজ।

মাসিক বসুমতী আমার অতি আপনজন। তার প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে দুর্ল্লভ সাহিত্য সংগ্রহ আর উৎকৃষ্ট রচনাসম্ভার। অসীম আপনার ধৈর্য্য, ভিন্নরুচির লোকের জন্যে এত বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা চয়ন করা বোধ করি সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য নয়। আমার মনে হয়, বর্ত্তমানে বাঙলা উপন্যাসের অন্ধকার না হোক প্রায়ান্ধকার যুগ চলছে। কেন না, সুচিন্তিত ও সম্পূর্ণ উপন্যাস আর সচরাচর চোখে পড়ে না, যদিও বা পড়ে তো কেন জানি না দেশী বিদেশী অন্য কোন একটি উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য অতি সহজেই মনে আসে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসশ্রেণীর মধ্যে এই ব্যতিক্রমটাই বেশী চোখে পড়ে। তবে এখানে একটি কথা না বলে পারছি না—আপনার লেখকশ্রেণীর মধ্যে মৌলিকত্ব সুরুচি সৌন্দর্য্যবোধ আর বলিষ্ঠবান ভঙ্গী যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও নেই থামার মাত্রাজ্ঞান। মানুষের জীবন অশেষ, কারণ এক যায় এক আসে। স্বীকার করছি মানুষের জীবনের অনুলিপি হচ্ছে সাহিত্য কিন্তু তার ধারাবাহিকতার সীমা আছে। সে সীমাবোধ যাঁর যত সুষ্ঠু তাঁর লেখা তত রসোত্তীর্ণ। থামতে জানাই লেখার শেষ জানা। সব নাম না করলেও আপনার দীর্ঘমেয়াদী লেখাগুলির মধ্যে থেকে আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্যদের চিনে নিতে নিশ্চয় আপনার অসুবিধা হবে না। বিপ্লবের সন্ধানে, শিশির সান্নিধ্যে, অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ খুব ভালো লাগে। ছোট ছোট গল্প বা রচনাগুলি বাদাবনকে বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভাল থাকে সাধারণতঃ। বিদেশিনী আমাদের মন হরণ করেছে তবে একটু বিলম্বিত লয়। বর্ত্তমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'চম্পা তার নাম' সম্পর্কে কিছু লিখব না। 'ভালো লাগে চমৎকার,' একথাগুলো জলো লাগছে যেন; তাই বলার বাইরেই রাখলাম ওটা। ভালো ও বিখ্যাত সাহিত্যের অনুবাদ পড়তে খুব ভালো লাগে কিন্তু প্রায়ই নীরস বোধ হয়। ভালো একটা আরম্ভ করুন না? চিত্রসমালোচনাটা বন্ধ করলেন কেন, শুধু গল্পটাকে কি সমালোচনা বলে? ঐ সঙ্গে বিদেশী বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদের শিল্প-জীবন। রম্য রচনা ও ভ্রমণ-কাহিনীর স্থান শূন্য আর কতদিন থাকবে? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্যের যে সমালোচনা মাঝে থাকে সেগুলি খুব ভালো লাগে। ঐ রকম সাহিত্য আলোচনার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথায় আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। ইতি—ভবদীয়া প্রকৃতি রায়, মুঙ্গের।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মহাশয়,

বিশেষ কারণে ও ইচ্ছের তাগিদে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। মাসিক বসুমতী—আমার প্রিয় পত্রিকা। গত চার মাস যাবৎ মাসিক বসুমতীর সংস্পর্শে আসতে পারিনি। কারণ চার মাস হোল ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে বিদেশে এসেছি। নানারূপ প্রবল চিন্তার পর অবশেষে মনস্থির করে আপনাকে চিঠি লিখছি।

মাসিক বসুমতীকে আমি গত চার মাস থেকে চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করিনি—অথচ আমি নিয়মিত পাঠিকা। যাই হোক আমি পুনরায় শুধু নিয়মিত পাঠিকা নয়, গ্রাহিকা হতে চাই। গত বৈশাখ মাস থেকে সম্পূর্ণ বছরের গ্রাহিকা হতে হলে আমাকে কত টাকা দিতে হবে জানালে বিশেষ বাধিতা হবো। বার্ষিক চাদাটি আমাকে পাউণ্ড শিলিং পেন্সের হিসেবে জানাবেন। আমি সেইমত এখান থেকে মনিঅর্ডার করবো। সম্পূর্ণ বছরের চাদার সাথে গত শারদীয়া সংখ্যারও দামটা যোগ করে দিতে ভুলবেন না। রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে পাঠালেই ভাল হয়। আপনার কাজের ভীড়ে আশা করছি আমার মাসিক বসুমতীর পাউণ্ড শিলিং পেন্সের হিসাবটা হারিয়ে যাবে না। অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে আপনার চিঠির আশায় থাকলাম। আপনার চিঠির উত্তর পেলে আমি আগামী ডিসেম্বরের প্রথমে আপনাকে সম্পূর্ণ চাদা পাঠিয়ে দেবো। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন ও অন্যান্য কর্মিগোষ্ঠীকে জানাবেন।—Mrs. Anjana Lahiri, 8, Castellain Road, Maida-Vale, London W-9 U. K.

দয়া করে আপনাদের মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাদা Air Mail সহ কত জানালে উপকৃত হব। উত্তর পেলে এক বৎসরের চাদা আমি M. O. করে পাঠিয়ে দেবো।—Amal Kumar Sinha, Tavilon Street, London.

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৬ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ মাসের চাদা বাবদ ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—অণিমা রায়, হাজারিবাগ।

Subscription to Monthly Magazine sent herewith.—Janakinath Mitra, Balasore.

এই সঙ্গে মাসিক বসুমতীর জন্য এক বৎসরের চাদা পাঠাইলাম।—Saummya Nandi, Digboi, Assam.

I have remitted by M. O. Rs. 15/- being the advance subscription for M. Basumati for one year. If copy of Aswin is not available, you may send from the month of Kartick.—Sm. Suparna Devi, Saharanpur.

আমি আপনাদের মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে চাই। সমস্ত নিয়মাদি সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ দাস-মণ্ডল, মেদিনীপুর।

আশ্বিন মাসের বসুমতী ভি, পি, পিতে পাঠাইবেন। পাইবার পর পরবর্ত্তী ৬ মাসের গ্রাহক হইবার টাকা মণি অর্ডারে পাঠাইব।—শ্রীএস, সি, গুহ, Hirakud Colony, Sambalpur.

আমেরিকাতে বাস করছেন আমার এমন এক বন্ধুকে মাসিক বসুমতী পাঠাতে চাই Sea Mail, Book Post ডাকের খরচ ও পত্রিকার মূল্যসহ বার্ষিক চাদা কত পড়ে, জানালে খুবই বাধিত হবো।—রণজিৎকুমার দত্ত, Calcutta.

I want to be a regular subscriber of your monthly Basumati. Please let me know the subscription rate of the periodical.—Ram Chandra Das, Keonjhar.

আমি আপনার মাসিক বসুমতী কার্ত্তিক মাস থেকেই নিতে ইচ্ছা করি, নিয়মাদি বিশদভাবে সত্বর জানাবেন।—আড়বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়।

১৩৬৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত মাসিক বসুমতীর সব কয়টি সংখ্যা অনুগ্রহপূর্ব্বক V. P. যোগে পাঠাইয়া আমাকে এক বৎসরের জন্য গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীসুকুমার নাথ, Narsingpur, Cachar (Assam).

এই কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে আমাকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা করিয়া লইলে বিশেষ বাধিত হইব।—শ্রীমতী উষা দেবী, পাটনা।

Please let this office know the rate of annual and half-yearly subscription of your Magazine. I intend to be a subscriber for Information Bureau at Block Head Quarter.—Assistant Project Officer, Salchapara Developement Block.

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	২৪৲
ষাণ্মাষিক "	—	১২৲
প্রতি সংখ্যা "	—	২৲

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	—	১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক	—	৭·৫০

ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	—	১·৭৫

পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	—	২১৲
ষাণ্মাসিক " " "	—	১০·৫০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	—	১·৭৫

● মাসিক বসুমতী কিনুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন ●

সূচীপত্র

৩৮-শ বর্ষ] ১৩৬৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম খণ্ড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

মনে রাখিও, কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ।

যাহাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাহাই পাপ বা অধর্ম, আর যাহাতে তাঁহার মত হইবার সাহায্য করে, তাহাই ধর্ম।

কারণ বিনা কার্য হয় কি ? পাপ বিনা সাজা মিলে কি ?

সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্।

—সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুইটি বাক্য আছে—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়। সত্য নয় কি ?

সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।

যে বলে আমি মুক্ত হইব, সেই মুক্ত হইবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হইবে। দীনহীনভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা।

আসল কথা, ঐ কাপুরুষত্বের অপেক্ষা পাপ নাই ; কাপুরুষের উদ্ধার হয় না—ইহা নিশ্চিত।

যত প্রকার দুর্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় (Weakness is sin)। এই দুর্বলতা হইতেই হিংসাদ্বেষাদির উন্মেষ হয়। তাই দুর্বলতা বা Weakness-এরই নাম পাপ।

এই সকল পাপ দুঃখ আর কি ?—এগুলি ত দুর্বলতারই ফল। লোকে ছেলেবেলা হইতেই শিক্ষা পায় যে, সে দুর্বল ও পাপী। জগৎ এরূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমন কি, যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহাতে তাহাদিগকে সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের একটা যথার্থ হিত হইবে। দুর্বলতা ও অবসাদকারক চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রদূত—ভিলাই

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

দেশজোড়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের নেতাদের সঙ্গে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের হাতে দিতে বাধ্য হয়। তারপর কাউকে কাউকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ আর সাম্রাজ্যবাদ নেই।

যাই হোক, সে কথায় বিশ্বাস করলে মানতে হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী-চিতাবাঘ গায়ের চামড়া থেকে কালো ফুটকিগুলি মুছে ফেলে আজ নির্ভেজাল হয়ে গিয়েছে। স্বেচ্ছায় ও সদিচ্ছায় সে আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।

হ্যাঁ স্বাধীন আমরা হয়েছি—স্বাধীন হয়েছি রাজনীতির ক্ষেত্রে। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবমত এখনো ভারতে ৩০ কোটি পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন খাটছে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতে বৃটেনের ১৮২ কোটি টাকা মূলধন খেটেছিল। তাছাড়া প্রতি বছর বৃটেন নানা আকারে ১০০ কোটি টাকা ভারত থেকে পাচার করে।

ভারতের লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে এবং কয়লা শিল্পে বৃটিশ মূলধন এখনো জেঁকে বসে আছে অথচ সেই সব শিল্পে আধুনিক যন্ত্র-কৌশল চালু করেনি, যার ফলে ভারতীয় খনিমজুরের কয়লা উৎপাদন ক্ষমতা বৃটিশ মজুরের সিকি ভাগ মাত্র।

ভারতবর্ষের পাঁচ সালা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ায় বৃটেন সাহায্য করা তো দূরের কথা, প্ল্যানিং কমিশনের ভাষায় বৃটেন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে দেরি করায় পরিকল্পনার সব কাজ ঠিকমত শেষ করতে পারা যায়নি। অবশ্য একা বৃটেনকে কেন দোষ দিই। আমেরিকাও কিছু কম যায় না। আমাদের দেশে মূল শিল্প গড়ে তোলা বা যন্ত্রকর্মীদের তালিম দেওয়ার রাস্তা মাড়াতে তারা রাজী নয়। যন্ত্রকৌশল সম্পর্কে তারা গোপনীয়তা রক্ষা করে, পচা মাল চালিয়ে দিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে। সেই সঙ্গে কারিগরী সাহায্য দেবার সময় তারা নানারকম সর্ত চাপিয়ে দেয় আমাদের ওপর। যেমন ধরুন 'বার্মা শেল' ও 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম' কোম্পানীর সঙ্গে আমরা তৈল পরিশোধনাগার নির্মাণের যে চুক্তি করেছি তাতে ২৫ বছর সেগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করা চলবে না, বিনা শুল্কে অশোধিত তৈল আমদানী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে তাদের এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার অধিকার ভারত সরকারের হাতে থাকবে না। মার্কিণ সরকার আমাদের মূল শিল্প প্রসারের জন্য এক পয়সাও ধার দেননি। যা দিয়েছেন সবই তথাকথিত কমিউনিটি প্রোজেক্টের জন্যে, যার এক্তিয়ার গ্রামোন্নয়ন ও কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আমাদের ২য়-পাঁচসালা বন্দোবস্তের সাফল্যের জন্য দেড়শো কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রার দরকার ছিল। কিন্তু আমেরিকা ঋণ দেয় মাত্র সাড়ে ২২ কোটি ডলার, যদিও ঐ একই সময়ে সে ১১৩ কোটি ডলার ঋণ দেয় তার সিয়াটো জোটের অংশীদারদের।

একটি মাত্র ক্ষেত্রে মার্কিণ ডলার আমাদের দেশের গাড়নী ক্ষমশিল্পের পিছনে ঢালা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রটি হচ্ছে টাটা কোম্পানী। সেই ঋণ দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য খোলসা করে মার্কিণ "ফরেন রিপোর্ট বুলেটিন"-এ বলা হয় যে ঐ ঋণ রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে—যার ফলে ভারত মূলধনের জন্যে রাশিয়ার দিকে ঝুঁকবে না।

১৯৪৫ সালের ১৫ই নভেম্বর ভারতে বৃটিশ মূলধনের মুখপত্র 'ক্যাপিট্যাল' মন্তব্য করে :—

এই দেশটি থেকে কেটে পড়বার কোন অভিপ্রায় বৃটিশ ব্যবসায়ী মহল পোষণ করে না।

ক্যাপিট্যালের এই উক্তির প্রতিধ্বনি হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্স-এর সভাপতি স্যার রেনউইক হ্যাডোর নিম্নলিখিত মন্তব্য :—

বৃটেনে এমন অনেক শিল্পপতিই আছেন, যাঁদের ভারতে কল-কারখানা তৈরি করতে আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁরা এমন অবস্থায় টাকা দিতে রাজী নন যাতে সেই টাকার ওপর অন্য কারো অধিকার জন্মাতে পারে বা সেটা অন্য কেউ খরচ করতে পারে।

কিন্তু তবু আজ দুর্গাপুরে বৃটিশ কোম্পানী ইস্পাতের কারখানা তৈরি করতে রাজী হোল কি করে এবং কেন? রাজী হোল সোভিয়েতের সঙ্গে টেক্কা দেবার জন্যে এবং পাছে গোটা ভারতবর্ষের মানুষ সোভিয়েতকেই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু বলে ভাবে সেই ভয়ে। বৃটিশ ও জার্মাণ কোম্পানী দুটি বহুকাল ধরে গড়িমসি করছিল, শতকরা ১০।১২ ভাগ সুদ দাবি করছিল। কিন্তু সোভিয়েত যখন শতকরা মাত্র ২½ ভাগ সুদে ১২ বছরে শোধ দেওয়ার সর্ত্তে ভিলাই কারখানা নির্মাণের জন্য ঋণ দিল তখন বৃটিশ ও জার্মাণদের সুদের মাত্রা অন্তত কিছুটা না কমিয়ে আর উপায় রইল না এবং টালবাহানা বন্ধ করে জমিতে নামতে হল। কিন্তু আমরা সুদ দিচ্ছি জার্মাণদের (রাউরকেল্লা কারখানার জন্যে) শতকরা ৬ ভাগ এবং দুর্গাপুরের বসে-যাওয়া কারখানার জন্যে শতকরা ৫ ভাগ।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের সুযোগ নিয়ে এই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধনকুবেরগোষ্ঠী নিজেদের মুনাফার রাস্তা পরিষ্কার করতে চায়। যেমন ধরুন আন্তর্জাতিক ব্যাংক মিশনের সদস্য মিঃ রাল্ফ রেনেট ১৯৫৮ সালে ভারত সফরের পর মন্তব্য করেন :

ভারতবর্ষ যদি মূল সাজ সরঞ্জাম আমদানীর লাইসেন্স ব্যবস্থা আমূল বদলাতে রাজী হয়, তবেই সে ঋণ পাবার আশা করতে পারে। এ যদি আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলানো না হয় তবে নাক গলানো কা'কে বলে?

এবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যটা কি রকম সেটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। ভিলাই কারখানা দেখতে গিয়ে এই বছরের গোড়ার দিকে সোভিয়েত নেতা মিঃ আন্দ্রিয়েক এক বক্তৃতায় বলেন :

দীর্ঘকাল উপনিবেশবাদীদের শাসনের ফলে আপনাদের দেশে শিল্পপ্রসার হয়নি। এখন আপনাদের অল্প সময়ে লম্বা রাস্তা পার হতে হবে। কিন্তু আমরা জানি, সেই অসাধ্য আপনারা সাধন করতে পারবেন।

সোভিয়েত সরকারী প্রতিনিধিদলের সদস্য মিঃ মুহিদ্দীনভ সেই সময়ে বলেন : প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করার পিছনে সোভিয়েতের কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতলব নেই। সোবিয়েত সরকার এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় সাহায্য করতে চান। ভিলাই কারখানার প্রথম অংশটির উদ্বোধন ভারতবাসীর এক বিরাট সাফল্য, কারণ ধাতুশিল্প হচ্ছে যে কোন দেশের উন্নতি করার ভিত্তির ভিত্তি।

শুধু ভারতবর্ষ কেন, ইন্দোনেশিয়া বা ব্রহ্ম বলুন, মিশর, আবিসিনিয়া বা ঘানা বলুন, নতুন স্বাধীনতা পাওয়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে সোভিয়েত সরকার মাত্র শতকরা ২'৫ ভাগ সুদে ১২ বছরের মেয়াদে ঋণ দিচ্ছেন এবং সেই টাকা দিয়ে সোভিয়েতের যন্ত্রকৌশল ও যন্ত্রবিদ্‌দের সাহায্যে যে সব শিল্পায়তন তৈরি হচ্ছে সেগুলি তৈরি হয়ে যাবার এক বছর পর থেকে কিস্তিতে ধার শোধ করার ব্যবস্থা। সেই ধার শোধ করার জন্যে ডলার বা ষ্টার্লিং ব্যালান্সে বা সোনায় টান পড়বে না। দেশীয় মুদ্রা দিয়ে এবং ভারতীয় পণ্য সোভিয়েতে রপ্তানী করে সেই ঋণ পরিশোধ করা চলবে। আমরা চা, পাট, চামড়া, লাক্ষা ইত্যাদি সরবরাহ করে সেই দেনা ১২ বছর ধরে মেটাতে পারব। সোভিয়েতের সাহায্যে যে সব প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে বা হতে চলেছে' সেগুলি তৈরি হবার সময়ের এবং তৈরি হয়ে যাবার পর পরিচালনার ষোল আনা দায়িত্ব ভারত সরকারের। যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা, কারখানা তৈরি করা, পরামর্শ দেওয়া এবং কর্মীদের কাজ শেখানো ছাড়া সোভিয়েত তরফের আর কোন দায়িত্ব নেই। ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে তাঁরা সর্ব ব্যাপারে সমাসনে প্রতিষ্ঠিত, কোথাও কোন প্রভেদ নাই, সাদা ও কালোর বৈষম্য নেই। সব শেষে কারখানা তৈরি হয়ে গেলে সোভিয়েতের কোন রকম স্বত্ব তার ওপর থাকবে না। সেটি হবে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।

আমরা ভিলাই কারখানাটিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে বিচার করব। প্রথমে ভারতের শিল্পের ইতিহাস একটু দেখা যেতে পারে। মিঃ ডি বুকানন তাঁর "ডেভালাপমেণ্ট অফ ক্যাপিট্যালিষ্ট এণ্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া" বইখানিতে লিখেছেন (১৯৩৪ সালে):—

ভারতে অস্ত্র তৈরির জন্য ইস্পাত ব্যবহার করা হোত, অন্যান্য যন্ত্রপাতিও তৈরি হোত এবং সেগুলি খুবই উঁচু দরের—এমন কি দামাস্কাস তরোয়ালের জন্যও হায়দ্রাবাদের ইস্পাত দিয়ে তৈরি হোত।

সুতরাং বৃটিশ লেখক স্বীকার করছেন যে, তাঁদের রাজত্বের আগেও আমরা উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরি করতাম। কিন্তু ১৯৪৪ সালেও বিড়লাজী "ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট" পত্রিকা আক্ষেপ করে :—

সব কিছুই তৈরি করবার সামর্থ্য আমাদের ছিল কিন্তু তবু কিছুই তৈরি করতে পারিনি। যে কোন জিনিষের, সব জিনিষের যোগানদার আমরা কিন্তু কোন জিনিষেরই কর নেওয়ালা নই। তবে কি আমাদের শিল্প গড়ে তোলার মত প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না? এই সম্পর্কে ১৯৪২ সনের মার্কিণ কারিগরী মিশনের উক্তি তুলে দিই :—

ভারতের আকরজ লৌহসম্পদ বোধ করি অন্য যে কোন দেশের চেয়ে বেশি এবং সেই লোহা অত্যন্ত সরেশ। ধাতুশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কোক্ উৎপাদনের উপযোগী ৫০ কোটি টন কয়লা ভারতের ভূগর্ভে আছে।

কমিয়ে ধরলেও ভারতের খনিতে ৩০০ কোটি টন লোহা আছে। বৃটেনের আছে ২২৫ কোটি টন। কিন্তু বৃটেন যে ক্ষেত্রে ভারত স্বাধীন হবার আগের বছরে ১ কোটি ৬২ লক্ষ টন ধাতু উৎপাদন করত, সেক্ষেত্রে ভারত উৎপাদন করত ১৫ লক্ষ টনের মত অর্থাৎ পোল্যাণ্ডের চেয়েও কম। বৃটিশ শাসনের ২০ বছরে ভারতের কয়লা উৎপাদন ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন হয় এবং ভারত তার সবে ধন নীলমণি টাটা কোম্পানীর দৌলতে বছরে মাত্র ৮ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করত। সেক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৭ সালে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা এবং ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করে, যদিও সোভিয়েত ১৯৩৭ সালের আগে আমাদেরই মত অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। একটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতির এবং অন্যটি সমাজতান্ত্রিক নীতির ফল। আমাদের তখন সব থেকেও কিছুই ছিল না। ২০ কোটি লোক নিয়ে সোভিয়েত তার ইস্পাত-শিল্পকে যে স্তরে নিয়ে গেল ৪০ কোটি লোক নিয়ে আমরা তার ১৯ গুণ পেছিয়ে রইলাম। এই সব দেখে সোভিয়েত দেশ ঘুরে এসে আমাদের কবি লিখলেন : 'বণিকরাজের লোভ ভারতের ধন-উৎপাদনের বিচিত্র শক্তিকেই পঙ্গু করে দিয়েছে। বাকি রয়েছে কেবল কৃষি, নইলে কাঁচা মালের জোগান বন্ধ হয় এবং পণ্যের হাটে মূল্য দেবার শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।'

ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়ে যখন শিল্প প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের রাস্তায় পা বাড়াবার জন্যে

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে হাত পেতে কোন ফল পেল না, তখন সোভিয়েত দেশ প্রস্তাব করে যে সে ভারতের শিল্প প্রসারে সাহায্য করতে রাজী আছে। সেই প্রস্তাবের প্রথম বাস্তব রূপায়ণ ভিলাই কারখানা। পশ্চিমী মহল এবং তাঁদের ভারতীয় মোসায়েবরা তখন ধুয়া তুলে ছিলেন যে সোভিয়েতের কলকব্জা আধুনিক নয় এবং যন্ত্রকৌশলে সে অনেক পেছিয়ে আছে। সুতরাং ভারতের শিল্প প্রসারে সাহায্য করার যোগ্যতা তার নেই। এই প্রচারের জবাব পাওয়া যাবে একবার ভিলাই ঘুরে এলেই। আমি সেপ্টেম্বরে ভিলাই দেখে এসে এই প্রবন্ধ লিখছি। যা দেখলাম তা চোখে না দেখলে ধারণা করা যায় না। ১ বর্গমাইল জুড়ে এই নির্মীয়মান কারখানা। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কারখানার প্রথম বাত্যাতাড়িত চুল্লী গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে লোহার চৌপল উৎপাদন করছে। আপাততঃ এই রকম তিনটি চুল্লী নির্মাণ করার কথা ১৯৬০ সালের মধ্যে, যেগুলি মিলিয়ে বছরে ১২ লক্ষ টনের মত ইস্পাত উৎপাদন হবে যদিও পরিকল্পনা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ১০ লক্ষ টন। প্রথম চুল্লীটিতে কাজ শুরু হবার পর প্রথম মাসে সেটি ২৪ হাজার টন চৌপল উৎপাদন করে। কিন্তু রাউরকেল্লা কারখানার চুল্লীটি সমান মাপের হওয়া সত্ত্বেও সেই মাসে অর্থাৎ মার্চ মাসে তার উৎপাদনের পরিমাপ ছিল মাত্র ১২৬০০ টন। আর দুর্গাপুর কারখানা তো আজও কোক ছাড়া আর কিছু পয়দা করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে যে, ভিলাই কারখানায় সোভিয়েতের সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশলে কাজ হয় কিন্তু রাউরকেল্লায় হয় জামশেদপুরের মত সেকেলে পদ্ধতিতে। বাত্যাতাড়িত চুল্লীর মাথার দিকে হাওয়ার অর্থাৎ অক্সিজেনের অত্যধিক চাপ দিয়ে (হাই টপ প্রেসার) লোহা উৎপাদন করার কৌশল পৃথিবীতে এক সোভিয়েত ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এতে শতকরা ১০ ভাগ কোক কয়লার মিতব্যয় হয় এবং উৎপাদন বেশি হয়। এর পরে সিণ্টারিং প্ল্যাণ্ট বসানো হলে কয়লা মিতব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ৩০ ভাগ এবং এখন যে প্রচুর চুণে পাথর দরকার হয় ঝাপ্টা দেবার গ্যাস তৈরি করার জন্য তা আর লাগবে না। তখন চুল্লী ও কোক ব্যাটারীর গ্যাসকেই ঝাপ্টা দেবার কাজে লাগানো যাবে। এখনকার হিসাব মত ভিলাই কারখানায় বছরে ২৫ লক্ষ টন আকরজ লোহা, ২০ লক্ষ টন কয়লা এবং প্রায় ৮ লক্ষ টন চুণে পাথর দরকার। "হাই টপ প্রেসার" ও সিণ্টারিংপ্ল্যাণ্টের কল্যাণে এই সব কাঁচামালের খরচ অনেক কমে যাবে অথচ উৎপাদন বাড়বে। আকরজ লোহার গুণগত উন্নতি করার জন্যে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা ভিলাই থেকে ৫৬ মাইল দূরে রাজহারা খনিটি যন্ত্রচালিত করছেন। সেখানে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টন লোহা আছে। কয়লা ও কাঁচা ধাতু বোঝাই করা থেকে চৌপল লোহা উৎপন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ স্বয়ংচালিত। একজন মাত্র রাশিয়ায় শিক্ষিত বাঙালী যুবক কন্ট্রোল ঘরে বসে একটি যন্ত্রের হরেক রকম আলোক সংকেতের সাহায্যে গোটা কাজটার তদারক করে। এমন কি, সে সেখানে বসে গল্পের বই পড়তে পারে।

চৌপল লোহা উৎপাদনের সময় অত্যধিক উত্তাপে কয়লার অঙ্গারীকরণের ফলে তাই থেকে অ্যামোনিয়া, আলকাতরা, বেনজল, ন্যাপথ্যালেন, ফেনল ও সালফিউরিক অ্যাসিড পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলির মোট ওজন বছরে ৫১২১৫ টন, যার মধ্যে এ্যাসিডের ১২ হাজার টন।

প্রতিটি বাত্যাতাড়িত চুল্লীর জন্যে একটি করে ২৫। ফুট লম্বা, ৪৬ ফুট চওড়া এবং ৩১ ফুট উঁচু কোক ব্যাটারী। সেটিও স্বয়ংচালিত। প্রতিটি কোক ব্যাটারী ২০।২৫ বছর গরম থাকবে এবং বছরে ১২৬৮০০০ টন কোক উৎপাদন করবে।

গত ১২ই অক্টোবর ভিলাই-এর প্রথম উন্মুক্ত চুল্লীতে ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ হয়েছে দিনে ২৫০ টন করে। সেটিও পুরোপুরি স্বয়ংচালিত।

সম্প্রতি ভারত সরকার ভিলাই কারখানা সম্প্রসারণ করে তার উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টনে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেছেন। এর জন্যে মোট ৫টি বাত্যাতাড়িত চুল্লী নির্মাণ করা হবে, যেগুলির মধ্যে ৩টি চালু হয়ে যাবে ১৯৬০ সনে।

বাত্যাতাড়িত ও উন্মুক্ত চুল্লী ছাড়াও যেসব ব্লুমিং মিল, রোলিং মিল, বিলেটিং মিল ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে সেগুলি নিচের জিনিষগুলি উৎপাদন করবে :—

বছরে—১১০০০০ টন রেলের লাইন
" —২৮৪০০০ টন অন্যান্য ভারি জিনিষ
" —৯০০০০ টন স্লীপার
" —১৫০০০০ টন বিলেট

এবং অন্যান্য জিনিষ।

সোভিয়েত যন্ত্র-কৌশলের বিরুদ্ধে অনুন্নত অবস্থার কলঙ্ক মুছে দেবার পক্ষে যা বললাম তাই যথেষ্ট।

আর একটি কুৎসা আছে। অনেকে বলেন, সোভিয়েতের পুঁজিবাদী ভারতকে সাহায্য করার পিছনে কোন মতলব আছে। মতলবটা কী রকম? আমাদের আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং শিক্ষা দিয়ে তাদের কোন মতলব হাসিল হবে? এ পর্যন্ত আমাদের ৫০০ জনেরও বেশি ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্রকর্মীকে সোভিয়েতে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরাই আমাদের শিল্প ভবিষ্যতের আশা।

ভিলাই কারখানার মাত্র তিনভাগের এক ভাগে কাজ হচ্ছে। কিন্তু সেইটুকু থেকে আমরা কি পেয়েছি, পাচ্ছি বা পাব? ১৯৬০ সালে মোট ১১১৮০০০ টন চৌপল লোহার ৩ লক্ষ টন বেচে আমরা ৬০ কোটি টাকা পাব (এক টনের দাম ২০০ টাকার মত)। লোহার বাজারের ইতিমধ্যেই উন্নতি দেখা যাচ্ছে। গত ১৫ই অগাষ্ট পর্যন্ত ১৩১৪২৫ টন ভিলাই-এর লোহা দেশের প্রায় ৫০০টি প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করে ভারতের রাজকোষের ২৮২৫৬৩৭৫ টাকা লাভ হয়েছে এবং বর্তমানে দৈনিক ২ লক্ষ টাকা মূল্যের চৌপল লোহা উৎপন্ন হচ্ছে। ভারতের মত এতদিনকার অনুন্নত দেশ আজ জাপানের মত শিল্পোন্নত দেশের কাছ থেকে পর্যন্ত লোহার অর্ডার পেয়েছে। এ কথা কি কেউ কোন দিন ভাবতে পেরেছিল? আজ বিদেশী পণ্যের হাটে ভারতীয় শিল্প পণ্য দিয়ে মূল্য দেবার শক্তি ফিরে পাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে ভারত সোভিয়েত সাহায্যের কল্যাণে।

আমাদের কবি পরাধীন ভারতের প্রসঙ্গ সোভিয়েত রাষ্ট্রের শৈশবের অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিলেন :—

আরহেনিয়ুস শতবার্ষিকী

নীলরতন ধর (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়)

বিখ্যাত রসায়নবিদ সোন্‌তে আরহেনিয়ুস সুইডেনের ভিক্ নামক শহরে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। হল্যাণ্ডের জে, এইচ ভাণ্টহফ ও জার্ম্মাণীর এমিল ফিশার-এর পর ইনিই রসায়নশাস্ত্রে তৃতীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি ষ্টকহলম্ এবং উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, উপসালা পাঁচ শত বৎসরের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার গ্রন্থাগার সারা বৎসর দিবারাত্রি খোলা থাকে।

ইহার ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রবন্ধের বিষয় ছিল Electric conductivity of different solutions at various temperatures. এই সূত্রে ইহার প্রকৃষ্ট আবিষ্কার যে electric conductivity সল্যুশনকে যত তরল করা যায়, ততই একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে এবং chemical activity ও electric conductivityর মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহাই প্রমাণ করেন যে salts, strong acids ও bases ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম ionsএ বিভক্ত হয় এবং এই ionsগুলি বৈদ্যুতিক শক্তির বাহকে পরিণত হয়।

ইঁহার আবিষ্কার ফরাসী রসায়নবিদ এফ, এম, রাউল্টের অগ্রবর্ত্তী গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাউল্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, salts, strong acids ও bases জলে মিশিলে তাহার freezing point নিম্নাভিমুখী হয় ও boiling point বাড়িয়া যায় কিন্তু চিনি urea ইত্যাদি non-electrolytesএর সল্যুশনে এইরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। আরো যেসব সল্যুশনের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করা যায় তাহাদের osmotic pressure অন্যপ্রকার সল্যুশনের চেয়ে বেশী হয়। ডাচ্ physical chemist Vant Hoff এই বিশিষ্টতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিখ্যাত জার্ম্মাণ রসায়নশাস্ত্র অধ্যাপক Wilhelm Ostwald সল্যুশনে Law of Mass Actionএর প্রয়োগ সর্বপ্রথম আলোচনা করেন।

আরহেনিয়ুস ১৮৮৩-৮৪ সালে তাঁর electrolytic dis-socialism বিষয়ক প্রবন্ধ উপ্‌সালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রদান করেন কিন্তু তাঁহার বিষয়টি এতই নূতন ও যুগান্তকারী ছিল যে পি, টি, ক্লীভের (P. T. Cleve) ন্যায় জগদ্বিখ্যাত রসায়নবিদ্ ও উপ্‌সালার প্রধান অধ্যাপকও ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং আরহেনিয়ুসকে মাত্র একটি তৃতীয় বিভাগের পি এইচ ডি ডিগ্রী দেওয়া হইল। এই অবিচারের ফলে আরহেনিয়ুসের সুইডেনে মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইল বটে। কিন্তু Ostroald, vant Hoff এবং Kohlrausch ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদের প্রশংসা পাইয়া আরহেনিয়ুসের আবিষ্কার সারা ইয়োরোপ ও আমেরিকায় উচ্চ স্বীকৃতি লাভ করিল। ভবিষ্যতে নোবেল পুরস্কার কমিটিকেও আরহেনিয়ুসের আবিষ্কারের মর্য্যাদা স্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং প্রফেসার পি, টি, ক্লীভকে নোবেল কমিটির সভাপতি হিসাবে নোবেল পুরস্কার প্রদান করিবার সময় তাঁহাকে তৃতীয় বিভাগের Ph. D. degree দিবার অবিচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। কিছুদিন পরে একটি Physico Chemical Laboratory ষ্টকহোলম্ স্থাপনা করা হয় ও আরহেনিয়ুসকে তাহার কর্ত্তা নিয়োগ করেন। বিদেশের বহু ছাত্র এখানে আসিয়া আরহেনিয়ুসের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনে শিক্ষালাভ করেন।

আরহেনিয়ুস চিকিৎসা ও জীববিদ্যা শাস্ত্রের জটিল তথ্যগুলিতেও তাঁহার applied physico chemical principlesগুলি প্রয়োগ করেন এবং নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি problem of Immunity বিষয়ে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক পল এহরলিক P. Ehrlich যিনি সালভারসন আবিষ্কার করেন তাঁহার সহিত গবেষণা করিয়াছিলেন। আরহেনিয়ুসের আর এক ছাত্র টি মাডসেন যিনি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসেন কোপেন-হাগেনের Serum Instituteএর প্রথম ডাইরেক্টর ছিলেন। আরহেনিয়ুস immuno chemistry বিষয় একটি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন।

জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়াও জাগতিক নিয়ম সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আরহেনিয়ুস Physics and Chemistry of the Universe বিষয় একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি নিজের মাতৃভাষার ন্যায়ই ইংরাজী ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন যে বিদেশী ভাষা বলিবার জন্য শতকরা পাঁচভাগ সে বিষয়ে জ্ঞান ও পঁচানব্বই ভাগ সাহসই যথেষ্ট।

তিনি অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং বিদেশে ভ্রমণ ও প্রবন্ধ পাঠ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালী উচ্চমানের ছিল এবং তিনি ফরাসী মদের একজন সমঝদার ছিলেন, তাঁহার ফরাসী বন্ধুরা বলিতেন il bois se'e (তাঁহার জন্য মদে জলের দরকার হয় না)

আরহেনিয়ুসের ভারতবর্ষের বিষয় জানিবার আগ্রহ ছিল ও তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের History of Hindu chemistry যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

কাজের জন্য এদের প্রভূত টাকার দরকার। ইউরোপীয় বড় বাজারে এদের হুণ্ডী চলে না। তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিনছে।

আমাদের দেশেরও এই দশাই ছিল। সোভিয়েতের সাহায্যে আমরা আজ এই দশা কাটিয়ে ওঠার ভরসা পাচ্ছি। কিন্তু এই সাহায্য করায় উদ্দেশ্য কী? সেই উদ্দেশ্য আমাদেরই কবির ভাষায়:—

'এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত: এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে।...স্বজাতির সমস্যা সর্বত্র মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা।...এরা বিশ্বকর্মা। অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই।'

১৯১৬ সালে তিনি Journal of nobel Institute-এ প্রকাশিত আমার লিখিত The theory of solutions প্রবন্ধের উপর একটি বড় নিবন্ধ প্রকাশ করেন এবং আমি যখন তাঁহাকে জানাইলাম যে আমি তাঁহার ইনষ্টিটিউটে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করি, তখন তিনি জানাইলেন যে North Sea-তে ডুবো জাহাজের তৎপরতার জন্য জীবনের আশঙ্কা আছে এবং সুইডেনে খাদ্যাভাবও আছে এবং মাছ ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং আমার যাওয়া স্থগিত রাখিতে হইল।

আরহেনিয়ুস দুই বার বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র ডাঃ ওলাফ আরহেনিয়ুস আমার একজন বিশেষ বন্ধু ও সুইডেনের একজন বিশিষ্ট ভূমিবিজ্ঞানবিদ। Stockholm-এর নিকটে তাঁহার বড় form-এ আমি কয়েক বার থাকিয়াছি। ডাঃ ওলাফ আরহেনিয়ুস অনেক বার বলিয়াছেন যে তাঁহার ত্যাগ ও বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা অনেকাংশে সুইডেনের মহত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে।

স্বর্গীয় ডাঃ শান্তিস্বরূপ ভটনাগর Indian science congress-এর রসায়ন বিভাগে তাঁহার সভাপতির ভাষণে আমাকে Founder of Physical Chemistry in India বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। এখন যখন পৃথিবীর সকল physical chemist সুইডেনের এই মহান ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছেন তখন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে আমারও কর্তব্য যে এই অমর বৈজ্ঞানিকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

সুইডেন আয়তনে বড় হইলেও তাহার লোকসংখ্যা মাত্র বাহাত্তর লক্ষ কিন্তু সুইডেনে অনেক বড় বড় নেতা ও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জন্মস্থান। অষ্টাদশ শতকের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক শেল লিনিয়াস (Scheele Linuens) একজন শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদবিজ্ঞানবিদ, Berzelius, Swedenborg, Arrhenius, Svedberg Siegbohn ও আছে ইহারা সকলেই সুইডেনের গৌরব ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ডেলি প্যাসেঞ্জার

দর্শন সেন

ঐ—ঐ ওরা কারা, বর্ষালী বন্যার জলের মত
এই দিকে এলোমেলো আসছে এগিয়ে ?
সকালের ঘুমভাঙ্গা আবছা আঁখিতে অচেনা হলেও
সমষ্টিগত ওরা সকালের বহু চেনা—'ডেলি প্যাসেঞ্জার'।
সকলে জানে, চাকার চক্রেই ওরা প্রতিদিন চলে
সময়ের নির্ভুল মান-চক্র হাতে জড়িয়ে

'পৃথিবীটা ঘুরছে'—পরীক্ষিত এই সত্য কথা—
সম্ভবতঃ ওরাই তা সঠিক জানে।
যেহেতু, যখন ঘুমে শুকতারা ক্লান্ত আঁখি বোজে,
জাগরুকে চিরজীবী রেখে ওরা জেগে উঠে বসে
নির্দিষ্ট সময়ের সচল চাকীতে।

তারপর ?—তারপর কি যে হয় ওর। তা জনেও জানে না।
শুধু জানে এইটুকু—সাইবেরিয়ার মত কনকনে শীত
কোথা থেকে লাগে যেন বেঁকে-ওঠা মেরুদণ্ডতে।

হায় রে আকাশ ! বুঝি সে-ই বোঝে শুধু সেই বৃত্ত
দীনদের চোখের ভাষা।
তারার প্রদীপ জেলে তাই ডাকে—"চলা, নিয়ে চলি
তোমাদের নশ্বরী সীমার কোকোণে।
যদিও সেখানে দুখ—অভাবের হিম্র হাঙর,
স্বস্তি তবু, অন্ততঃ মেলে মানে হীন জীবনের
খাদিকটা মানে।"

সাগরবেলায়

শ্রীমতী সবিতা সরকার

আমরা দুজনে এসো আগামী দিনের আলোর
কুড়াবো অশান্ত ওই সাগরবেলায় ঝিনুকের রাশি।
বালির বুক থেকে খুঁজে খুঁজে
ছড়াবো তোমার রঙে রঙিন আঁচলের কোলে।

পাহাড়ের মতো ফুলে ওঠা সাগরের ঢেউ
মায়ের কোলে উঠে আসা ছেলের মত যেখানে শান্ত সুন্দর
সেখানে রুমাল পেতে আমরা বোসবো।
শুনবো, দূরে ক্ষুব্ধ সাগরের গর্জন
আর তোমার কোল থেকে এক একটি ঝিনুক ছাড়িয়ে
দেখবো, মুক্তো আছে কি না !

খুঁজতে খুঁজতে এক সময় একটি মুক্তো পেয়ে বলবো—
আমরা দুজনে যেনো একটি ঝিনুকের দু'টি পাতা,
ওই অশান্ত সমুদ্র বিচিত্র সংসার
রুমালখানা আমাদের ছোট্ট ঘর।

কোথা হ'তে এসেছি জানি না, কেন জানি না, শুধু জানি
আমরা দুজনে এসে ডুব দিয়েছি সাগরের মাঝে।
এখন গড়তে হবে দুজনের মাঝখানে
এমনি এক সুন্দর, পবিত্র, মুক্তোর মতো প্রেম।

বঙ্গরমণীর মৌন বিক্রম

[দ্বিতীয় পর্ব]

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

যে সময়ে বঙ্গরমণীর অন্তঃপুরে অন্তরধারণ করিবার আবশ্যকতা ছিল না, সে সময় তাঁহাদের সকল সাধনা, সকল চিন্তা, সকল কার্য্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সাহিত্য সমাজের পদ প্রতিষ্ঠার মন্দিরতলে সমবেত হইত। তাঁহাদের এই শান্তিময় জীবনের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কুলক্রমাগত বাহুবল তাঁহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। রণদুন্দুভি তাঁহাদের সে বিক্রম ঘোষণা করে নাই—অস্ত্রের ঝনঝনাও তাঁহাদের সে শক্তির পরিচয় প্রদান করে নাই; কিন্তু তাঁহাদের সে মৌন বিক্রম আজিও স্বজাতি ও বিজাতি কর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে।

নারী জাতির রূপাপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে, লক্ষগুণে, কোটি গুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতিপুত্রের জন্য জীবন বিসর্জন, ধর্মের জন্য বাহ্য সুখ বিসর্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দংশ বুঝিয়াছেন যে কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বাস করে। তাঁহাদিগের অসাধারণ মৌনবিক্রম প্রতিদিন প্রতিগৃহে গোপনে প্রকাশ পায়, তাহার সহিত জয়নিনাদের সম্পর্ক নাই। আত্মপ্রচারের চেষ্টা নাই। পাছে আর একজনের কৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভয়েই উহা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

এদেশের কয়েকখানি পুরাণে বহু মহীয়সী মহিলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু রমণী পুরুষের মতই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মের জন্য সুখ-স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়াছেন, ভিক্ষুনী হইয়া কঠোর সাধনা করিয়াছেন। তাহার পরে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কেহ কেহ দূর বিদেশে সাগরপারেও চলিয়া গিয়াছেন। মধ্যভারতে প্রথম সংখ্যক সাঞ্চীস্তূপের প্রতোলী বা তোরণ নির্ম্মাণের ব্যয় যাঁহারা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালার পুণ্ড্র বর্দ্ধননগরের একজন মহিলার নাম উল্লিখিত আছে। লিপিটি এই—'ধমতায় দানং পুণ্ডবদনীয়ায়' অর্থাৎ পুণ্ড্র বর্দ্ধনের ধমতা বা ধর্ম্মদত্তার দান। ইনি গৃহী উপাসিকা ছিলেন। সেকালে বৌদ্ধ তাপসীগণ জনসমাজে বহুমানের পাত্রী ছিলেন। তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধিনীতি কৌশল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে গতিবিধি তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় মালতীমাধব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও পুণ্যবলে শ্রমণপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন, এমন কি তিনি অর্হৎ হবারও অধিকারিনী ছিলেন। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে ভিক্ষুনীসঙ্ঘের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। ভিক্ষুনীগণ প্রচলিত রীতি ও নিয়মানুযায়ী নিজেদের সঙ্ঘের পরিচালনাকার্য্য নিজেরাই সম্পন্ন করিতেন।

বৌদ্ধযুগের পরে, বৈষ্ণবযুগেও বঙ্গরমণীগণের কীর্ত্তিগাথা অবগত হওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে কয়েকজন ভক্তিমতী ও তেজস্বিনী নারীর জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। তাঁহারা স্বামীকে ভালবাসিয়াছেন, স্বামীর সেবাও করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, অন্তরস্থিত বিশ্বাসে অটল থাকিবার জন্য তাঁহারা স্বামীর কুসংস্কারপূর্ণ মতের বিরুদ্ধে চলিতে এবং অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে মোটেই ভীত হন নাই। এজন্য প্রথমে তাঁহারা বহুবিধ নির্য্যাতনও ভোগ করিয়াছেন কিন্তু তাহার পরে ঐ সকল সাধ্বী নারীদিগের মনের বল, অন্তরের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও ভগবানের প্রতি ভক্তি দেখিয়া বিরুদ্ধপক্ষীয়েরাও তাঁহাদের মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বৈষ্ণব সমাজে পণ্ডিতা রমণীর অভাব ছিল না—জাহ্নবী দেবী, শিখি মাইতির ভগিনী মাধবী প্রভৃতি অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

রাজসাহী জেলার খেতুরী গ্রামে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতারত্ব প্রচার বাঙ্গালার ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। বৃন্দাবন হইতে সমাগত শ্রীনিবাস আচার্য্য বিগ্রহের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। অবধূতাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর তখন তিরোভাব হইয়াছে; তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় সহধর্ম্মিণী ঈশ্বরী জাহ্নবী দেবী খড়দহ হইতে খেতুরীগ্রামে শুভাগমন করিয়া এই বৈষ্ণব মহা সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহা হইতে তৎকালে যোগ্যতানুসারে ধর্ম্মজগতে এবং বিজ্ঞজন সমাজে স্ত্রীলোকগণ নিজ নিজ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত অনুমান না-ও হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় বঙ্গরমণীর অবদান শ্রদ্ধানত শিরে স্মরণ করিবার যোগ্য।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা দেবী পিতার জীবৎকালেই বৈষ্ণব সমাজে নেতৃত্বের অধিকারিনী হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে বৈষ্ণব আচার্য্য বাড়ির মহিলাগণ অনেকেই ভাল রকম শিক্ষালাভ করিতেন;—নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রবধূ সুভদ্রাদেবী সংস্কৃতে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—অনঙ্গকদম্বাবলী। হেমলতা দেবীর রচিত পদও পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রেমিকা রামীরও অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত "কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়" নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ভাবদেবী (বা ভাবাকদেবী) এবং নারায়ণলক্ষ্মী নাম্নী দুইজন মহিলা বঙ্গ কবির নাম পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন পুঁথি 'চর্য্যাপদের' দুইটি পদের ভাষা ও ভাব দেখিয়া মনে হয় নারীর রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনন্দময়ী দেবী একজন সুপণ্ডিতা মহিলা ছিলেন। তিনি বেদ হইতে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনেক বৃত্তান্ত ও যজ্ঞকুণ্ডের আকার প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্রালোচনায় প্রিয়ম্বদা দেবী ও বৈজয়ন্তী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সকল বৃত্তান্তই বঙ্গরমণীর মৌন বিক্রমেরই পরিচায়ক।

মুসলমান নবাবের কাটোয়ার ফৌজদার দেবকীনন্দন রায় ধনী এবং প্রবল অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী গৃহস্থ বৈষ্ণবের কন্যা, বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী ও ধর্ম্মশীলা। পিতৃগৃহে থাকিতেই তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু ছিলেন পরমভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য। গুরুর নিকট তিনি যে শুধু শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন তাহা নহে,—তিনি পুরুষদিগের সহিত রীতিমত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার করিবার শিক্ষাও পাইয়াছিলেন। স্বামীর তান্ত্রিক বামাচার ধর্ম্মের সুরাপান ও আনুষঙ্গিক সকল ব্যাপার তাঁহার ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। ইহার প্রতিকার চেষ্টা করিলে—

"স্বামী তাহা শুনি বহু ভর্ৎসনা করয়।
তুই মোর গুরু হইলি কহিয়া কহয়।"

কিন্তু গুরু না হইলেও এই দৃঢ়চিত্ত তেজস্বিনী রমণীর প্রভাব তিনি বেশী দিন অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। দেবকীনন্দনের পত্নী কিন্তু গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। গৃহই তাঁহার ভক্তি সাধনের ক্ষেত্র ছিল। তিনি যখন বর্ষীয়সী, তখন ভগবানের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহার গভীর ভক্তি ও উন্নত ধর্ম্মজীবন দেখিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে আদর্শ রমণীরূপে বরণ করিয়া লইল।

বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট অঞ্চলে দরবেশ মহিলা বিবি চামেলীর কাহিনী আজিও জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে এই মহীয়সী মুসলমান রমণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তৎকালে পশ্চিমবঙ্গের নির্জ্জন নিভৃত পল্লীপুরের বুকে বসে তিনি যেভাবে ইসলাম ও মানবতার খেদমৎ করে গিয়েছেন মুসলমান ও ভারতের ইতিহাসে আজও তার তুলনা নেই। কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের নিবিড় সংযোগ সাধন ক'রে তিনি তৎকালে সুন্দর সমাজ গড়বার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, চেয়েছিলেন সে স্বপ্নকে মুসলিম জাতির মধ্যে রূপায়িত করতে, চেয়েছিলেন মানবতার কল্যাণকামী একটি খোদমতগার তৈরী করতে। তা পরিপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি সত্য, কিন্তু তাঁর মহান আদর্শের কথা চিন্তাশীল মানুষেরা আজও বিস্মৃত হয়নি। যখন বিবি চামেলী অবসর সময়ে গ্রামের মুসলিম জেনানাদেরকে শরিয়তে ইসলামে মছলা মছায়েল এবং বিধি-বিধান শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে ধর্ম্মের কুসংস্কার ও শের্ক বেদাতের কালো অন্ধকার সাফ হয়ে সেখানে ফুটে উঠল তাওহিদের উজ্জ্বল আলো আর ইসলামের অপরূপ রূপ। তাঁর মিষ্টিমধুর ব্যবহার এবং সেবা সাধনায় শুধু মুসলমান জেনানারাই আকৃষ্ট হয় না। বহু অমুসলমান নারীও তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ল। তাঁর প্রচেষ্টায় এতদঞ্চলের বহু অন্ধকার গৃহে জ্বলে উঠেছিল ধর্ম্ম ও শিক্ষার আলো, গড়ে উঠেছিল একটি সেবাব্রতী দল। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দুঃস্থ নরনারী এবং অনাথ আতুরের সেবা করতেন তাঁরা। তিনি নিজে একজন কামেল দরবেশ ছিলেন। আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ অধিকার। হাদিস ও কোরাণশরীফ তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন বেশ ভাল ভাবেই। কাটোয়া মহকুমার যে সকল তেজস্বিনী নারীর পরিচয় আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাঁদের মধ্যে হানেফা বিবি চামেলী ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিতা এবং মনোহরবামা। তিন শত বৎসর পূর্ব্বের একজন বাঙ্গালী মুসলমান রমণীর এই গৌরবগাথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণযোগ্য।

দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যিনি জগতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট যাঁহার নাম সুপরিচিত, সিপাহী বিদ্রোহকালে সেই রাণী রাসমণিও একদিন অসিহস্তে দেবমন্দির রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গোরা সৈন্যগণ রাণীর জানবাজারস্থ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা লুঠ করে—দ্বারবানেরা যথাসাধ্য বাধাপ্রদান করিয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে পরাস্ত হয়, কিন্তু রাণী এই সময়ে শাণিত কৃপাণ-করে ৺রঘুনাথ জীউর মন্দিরে ভৈরবী মূর্ত্তিতে মন্দির রক্ষা করিয়াছিলেন।

রাণী অত্যন্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিতায় এবং বিক্রমে 'বাঘে-গরুতে জল খায়' বলিয়া লোকে বলিত। এক কথায় রাণী ছিলেন রজঃ ও সত্ত্বের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। অশেষ গুণ-সম্পন্না রাণী একহস্তে প্রভূত সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপর হস্তে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। এত বড় সম্পত্তির অধিকারিনীবুদ্ধি ও তেজস্বিতায় অদ্বিতীয়া রাসমণির হৃদয় যে কত মহৎ ছিল ও কত উদার ছিল, তাহা অনুমান করা যায়। নিজ মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণের ঈশ্বরপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অভিপ্রেত সকল কার্য্য অনুমোদন করান। এই দিক দিয়া বিচার করিলে রাণী রাসমণিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের মূল কারণ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানকালে যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের প্রচারিত ধর্ম্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষিগণের মনোরাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাঁহার আবির্ভাবের মূল কারণ হওয়া নারীর পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়। রাণী রাসমণি সাধারণ নারী ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেবীর অষ্টনায়িকার অন্যতমা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা, গুণগ্রাহিতা ও ধর্ম্মভাবে তিনি নারীজাতির শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। পুণ্যবতী রাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় দেবীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করা হইলে সম্মুখে কতকগুলি আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া তিনি সহসা বলিয়াছিলেন—"সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ওসব রোশনাই আর ভাল লাগছে না; এখন মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হ'য়ে উঠছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে তথা ভারতের নবজাগরণে এই মহীয়সী নারীর দান চিরস্মরণীয়।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী-গুরু গ্রহণ প্রমাণ করিতেছে যে, পুরুষের ন্যায় নারীও সাধন প্রভাবে ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চস্তরে উপস্থিত হইতে পারেন। অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্না ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার যেমন ছিল শাস্ত্রজ্ঞান, তেমনই ছিল সাধনশক্তি। চৌষট্টিখানা তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্র তাঁহার কেবল অধিগত ছিল না, তিনি ঐ সকল সাধনে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ রমণী মাত্রেই মাতৃভাব সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল তন্ত্র সাধনা এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের পঞ্চ ভাবের সাধনায় একে একে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে যোগেশ্বরী ভৈরবীই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নানা পথ দিয়া সমন্বয় সাগরে লইয়া গিয়াছিলেন। একজন রমণীর পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায়

অপ্রাকৃতপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তিশালী অবতার পুরুষের গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ সাধন শিক্ষাদান সমগ্র নারীজাতির পরম শ্লাঘার বিষয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাকে রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু প্রথমে মানসিক বিকার বলিয়া মনে করিয়া উহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া এই দেবমানবের শরীর ও মনের লক্ষণ সমূহের সহিত শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্যদেবের মহাভাবের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদের নিকট ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। এই মহিমময়ী নারীই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে ঘোষণা করেন এবং বলেন, এবার 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।' আজ দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র নরনারী যাঁহাকে অবতাররূপে পূজা করিতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম চিনিয়াছিলেন যোগেশ্বরী ভৈরবী। ইহা স্মরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ তাঁহাকে তথা সমগ্র নারীজাতির উদ্দেশ্যে চিরকাল শ্রদ্ধার অর্ঘ প্রদান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননী সারদাদেবী, ভক্তিমতী গৌরী মা প্রভৃতি রামকৃষ্ণভক্তগণের কাহিনী বঙ্গরমণীর অপরিসীম গৌরবের কাহিনী। ইহাদের সকলের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে পারিলে একখানা সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইবে এবং উহাতে বঙ্গরমণীর মৌনবিক্রমে দশদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ভরসা করি কোন যোগ্য ব্যক্তি এ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিবেন।

ধাত্রী পান্নার নাম রাজপুতনার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালাদেশেও যে ঐরূপ প্রভুভক্তিপরায়ণা কোন রমণী ছিলেন, বাঙ্গালী সে কথা আজ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস বলিয়া থাকে, বিদ্রোহী হস্তে মেদিনীপুর অঞ্চলের মুণ্ডাজাতীয়দের সর্দ্দার ত্রিভুণ সিংহের মৃত্যু হইলে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়াও তাঁহার শিশুপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য এক নারী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নিজ সহায়-সম্পদ, স্বামী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া শিশু রাজপুত্রের জীবনরক্ষা তিনি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, বীরেন্দ্র-সমাজ বরণীয়া এই রমণীর নাম ইতিহাসে লিখিত হয় নাই। কিন্তু মুণ্ডাগণ আজিও তাঁহার স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে এক বাঙ্গালী বালিকার মৌনবিক্রমের এক অপূর্ব্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আফিসকক্ষে বসিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিলাম। সম্মুখে একটি অসামান্যা রূপসী চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা উপস্থিত হইল। সে কুলীন ব্রাহ্মণকন্যা। সেই বাদিনী, তাহার অভিযোগ—সে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত তাহাদের কুটীরের সম্মুখে প্রান্তে উঠানে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। এমন সময় বিবাদী ৫০ জন লাঠিয়াল সহ তাহার বাড়িতে উপস্থিত হইল। বিবাদী সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণ হইলেও অকুলীন এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কাছাকাছি। সে নবযুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বাদিনীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও উপরোক্ত কারণে বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। চিল যেরূপ পায়রার শাবক লইয়া যায়, সে ৫০ জন লাঠিয়ালের দ্বারা তাহাকে বলপূর্ব্বক অনুমান ১০ মাইল পথ লইয়া গিয়া একেবারে বিবাহবেদীতে উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলে চতুরা ও প্রখরা বালিকা অবগুণ্ঠন ফেলিয়া সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'আপনারা কাহার সঙ্গে আমার বিবাহ করাইতেছেন? চাটুয্যা (বিবাদী) আমার ধর্ম্মতঃ পিতা।' ব্রাহ্মণগণ তখন রাম! রাম! বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং বিবাহও সেখানে শেষ হইল। তখন বালিকা বিবাদীর নীলকণ্ঠের বিষ হইয়া পড়িল। এ চতুরাকে রাখা অসাধ্য। ছাড়িয়া দিলেও বিপদ। তাহাকে ৭ দিবস যাবত নীলকুঠির কয়েদীর মত স্থানে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল এবং বহু অর্থের বহু সুখের প্রলোভন দেখাইয়াছিল। কিন্তু গর্ব্বিতা বালিকা তাহা তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়াছিল।

"সে ত এজাহার দিতেছিল না। একটি দলিত ফণা ফণিনী যেন ক্ষোভে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বিষ উদ্গীরণ করিতেছিল। তাহার দুই আরক্ত আয়ত নয়ন হইতে অনর্গল বারিধারা পড়িতেছিল। এবং সে পরিপূর্ণ বিশাল নয়ন হইতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। সমস্ত কক্ষ নীরব। আমলা, উকিল, মোক্তার তাহার অদ্ভুত উপাখ্যান, গর্ব্বিত ভাব ও তেজস্বিনী বুদ্ধির ক্রীড়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। বালিকা এজাহার শেষ করিয়া বলিল যে পুলিশ যে সাক্ষী আনিয়াছে তাহা তাহার সাক্ষীও নহে। ধনী ব্রাহ্মণ বিবাদীর কাছে বিশেষ দক্ষিণা পাইয়া একটা মোকদ্দমা গড়িয়া তুলিয়াছে। যদি আমি নিজে তদন্ত করিতে যাই। কিম্বা একজন বিশ্বাসী পুলিশ ইন্স্পেক্টর পাঠাই, তাহাকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল, যে যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে সকলেরই চিহ্ন রাখিয়াছে, সকলই দেখাইয়া দিতে পারিবে এবং তাহার সকল কথা প্রমাণ করিতে পারিবে।

"পুলিশের সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াও বুঝিলাম যে, বালিকার আশঙ্কা অমূলক নহে। যাহাতে বিবাদী অনায়াসে অব্যাহতি পায়, পুলিশ কিছু গুরুতররূপে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া এ ভাবেই মোকদ্দমাটা চালান দিয়াছে। কেবল বালিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এবং তেজস্বিতার ভয়েই যেন চালান দিয়াছে এবং যাহা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে তাহার যেন ব্যতিক্রম না করে, তৎসম্বন্ধে তাহাকে খুব শাসাইয়া দিয়াছে। বালিকা যে সকল কথা পুলিশের মুখের উপর ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল। তালমন্দ কিছু না বলিয়া মোকদ্দমাটি পর দিবসের জন্য স্থগিত রাখিয়া রাত্রি ১ টার সময় আমার একজন আরদালী পাঠাইয়া বালিকাকে ও তাহার পিতাকে ডাকাইয়া আনিলাম এবং তাহাদিগকে নৌকায় উঠিতে বলিলাম। ব্রাহ্মণ তাহার কুলীনত্বের এক দীর্ঘ কাহিনী আরম্ভ করিল; কিন্তু প্রখর বুদ্ধি বালিকা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, তুমি কেন এরূপ করিতেছ? হাকিমের সঙ্গে যাইব তাহাতে ভয় কি? মাদারীপুর ছাড়িয়া গেলে বালিকাকে কুমার নদীর যে ঘাটে পার করিয়া লইয়াছিল, সেই ঘাটে নৌকা রাখিতে বলিলাম। প্রভাতে সেই ঘাটে পঁহুছিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—সেই ঘাট পার করিয়া তাহাকে লইয়াছিল। সে বলিল অদূরে একটা কালীবাড়ি আছে। কিছুক্ষণ পরে যথার্থই সে একটা কালীবাড়িতে লইয়া উপস্থিত করিল। তাহার পর তাহাকে কোন দিকে লইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া একটা গ্রামে গিয়া

উপস্থিত করিল। এক এক বাড়িতে প্রবেশ করে এবং সে বাড়ি নহে বলিয়া আর একবাড়িতে আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল। একটা বাড়ি শেষে চিহ্নিত করিলে দেখিলাম সমস্ত পুরুষ পলায়ন করিয়াছে। একটা বৃদ্ধা মাত্র আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল কথা অস্বীকার করিল। তখন বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের ছোটবৌ যে আমাকে ঐ জায়গায় স্নান করাইয়াছিল সে কোথায়? বৃদ্ধা তাহার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া বলিল—সে তাহার বাপের বাড়ি গিয়াছে। ধরা পড়িয়া বুড়ি আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জবানবন্দী দিল। পরে পুত্রেরা আসিয়াও সাক্ষ্য দিল।

বালিকা তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছিল যে একবাড়িতে একটি বউ তাহাকে বলিয়াছিল বিবাদী তাহাকে আর লুকাইয়া না রাখিয়া একেবারে কাশী পাঠাইয়া দিবে। বালিকা তাহাতে ভীত না হইয়া বলিয়াছিল যে তাহার শরীর পাঠাইলে তাহার মন ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। সে লেখাপড়া জানে—সে হাকিমের কাছে পত্র লিখিয়া সংবাদ দিবে। তাহাতে বউটি তাহার কলিকাতাবাসী স্বামীর একখানা পত্র আনিয়া পড়িতে দিলে বালিকা বলিয়াছিল বউ! আমি আজ কয় দিন পর্য্যন্ত কিছু খাই নাই। আমার মন বড় অস্থির। আমি যাইবার সময় তাহার পত্র পড়িয়া দিয়া যাইব। আমি তাহা শুনিয়া বালিকা কি লেখাপড়া জানে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল যে লেখাপড়া জানেনা। কেবল অক্ষর লিখিতে শিখিতেছিল। তবে লেখাপড়া জানিলে যদি ভয়েতে আসামীরা তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, সে জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছিল যে সেই পত্রখানি সে সেই বাড়ির বেড়াতে গুঁজিয়া রাখিয়াছে। সেই বাড়িতে আমাকে লইয়া গেল। যখন বাড়ির লোকেরা সকল কথা অস্বীকার করিল, তখন বালিকা চুপে চুপে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে ডাকিল এবং আমি গেলে আমাকে সে পত্রখানি বেড়া হইতে আনিয়া দিল। তখন বাড়ির লোকেরা অপ্রতিভ হইয়া সকল কথা স্বীকার করিল। কোন কোন গ্রামে গিয়া কোন বাড়িতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, রাত্রিতে আসা-যাওয়ার দরুণ বাহির হইতে চিনিতে না পারিয়া সে সে কখন ভিখারিণী, কখন বা বৈরাগিণী বলিয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট বাড়িতে লইয়া গেল। এ এক নূতন সাক্ষীর প্রমাণ লইয়া মোকদ্দমা সেসনে অর্পণ করিলাম। বালিকার রূপের ও বুদ্ধিমত্তার গল্পে সমস্ত জেলা তোলপাড় হইল। সেসন বিচারে স্মরণ হয়, চাটুয্যা ও তাহার সহচরবর্গের পাঁচ বৎসর করিয়া এ অপূর্ব্ব বিচারের বাসরবাসের আদেশ হইয়াছিল।"

বিবাদী পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপিল করিলে এই বীর বালিকার আত্মমর্য্যাদা ও সতীত্বরক্ষার অপূর্ব্ব কাহিনীতে হাইকোর্টের উকিলদিগের মধ্যে তোলপাড় উঠিয়াছিল এবং তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া ৬।৭ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বালিকাটির বিবাহ দেওয়াইয়া দিয়াছিলেন। সামাজিক কোন বাধা ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে নাই। এই বীর বালিকার অসাধারণ যৌনবিক্রমের ইতিহাস শুধু যে নারীহরণ প্রপীড়িত বঙ্গদেশের রমণী সমাজের পথনির্দ্দেশের কাজ করিবে এবং হৃদয়ে আশা আনিয়া দিবে তাহা নহে। ইহা পৃথিবীর সকল জাতির, সকল কালের রমণী-শৌর্য্যের ইতিহাসে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে।

বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার মহম্মদ আমিনপুর পরগণার উটুয়ো বা আবাজি দুর্গাপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের বৈকুণ্ঠ চৌকিদারের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী দ্রবময়ী স্বামীর চাকুরী পাইবার জন্য বর্দ্ধমানের পুলিশ-সাহেবের নিকট আবেদন করিল। দরখাস্ত পাইয়া পুলিশ-সাহেব মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের কাছে খবর দিলেন, এক বাঙ্গালী মেয়ে লাঠিখেলার পরীক্ষা দিয়া তাহার স্বামীর চৌকিদারী লইতে আসিয়াছে। জেলায় মহা গোল উঠিল। দুই কর্ত্তায় দু'খানা কেদারা আনিয়া কাছারীর মাঠে বৈঠক করিলেন।

দ্রবময়ী কোমরের কাছে কাপড় বাঁধিয়া মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাহেবকে অতি বিনীত স্বরে বলিল—হুজুর! একলা ত লাঠি খেলা হয় না। কে আমার সঙ্গে খেলিবে, আসুক। কেহই আসিতে চায় না। আওরতের সঙ্গে খেলিয়া কি সম্ভ্রম নষ্ট করিবে? শেষে পুলিশ সাহেবের সঙ্কেতে একজন কনষ্টেবল্ অগ্রসর হইল। ঠকাঠক, ঠকাঠক—কনষ্টেবল্ বড় ধূর্ত্ত; কাণ্ডখানা একটা প্রহসনের মত করিয়া তুলিল। সর্দ্দারনী তাহা বুঝিল; বলিল—হুজুর! আমাকে কি সঙ সাজাইয়া তামাসা দেখিতেছেন? একি লাঠিখেলা হইতেছে? পুলিশ-সাহেব আবার আর এক সঙ্কেত করিলেন। ঘড়ি দেখিলেন—দশ মিনিট খেলা হইল—সর্দ্দারনীর লাঠি কনষ্টেবলের লাল পাগড়ি স্পর্শ করিল। সাহেব খেলা বন্ধ করিয়া সর্দ্দারনীর প্রশংসাবাদ করিলেন। সর্দ্দারনী কিন্তু এখনও সন্তুষ্ট নহে; করযোড়ে বলিল—খেলোয়াড় দুইজন আমাকে মারিতে আসুক; দেখুন আমি নিজেকে সামলাইতে পারি কি না। তাহাই হইল—দুই দিক হইতে দুইজন আক্রমণ করিতে আসিল। দ্রবময়ী দুইগাছা লাঠি দুই হাতে লইয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে সাহেব খেলা বন্ধ করিলেন। দ্রবময়ী স্বামীর চাকুরী পাইয়া বকশিস লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিল। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, এইরূপ কত শত দ্রবময়ীর ইতিহাস এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

বঙ্গরমণী যে একদিন বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ব্যাঘ্র বধ করিয়াছিলেন, সে কথা এখন বলিলে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু প্রাচীন সংবাদপত্র পাঠে জানিতে পারা যায় যে ১২২৮ সালেও কলিকাতার পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতি জয়নগরের নিকট চৌর মহল গ্রামের এক গৃহস্থ গৃহে বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহে প্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গৃহস্থের স্ত্রী ব্যাঘ্রের ঐ সমস্ত উদ্যোগ দেখিয়া ভীতা হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোনদিকে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উঠাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল; কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাতের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল। এই সময় ঐ স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত-নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া অল্পে অল্পে ব্যাঘ্রের অঙ্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জ্জন স্বরূপ বার বার বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল। ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব স্ব গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে ক্রমে গৃহদাহ

না হয়, কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজসাহী সহরের সিপাহীপাড়ার বিন্তা গোয়ালিনীর গোয়ালগৃহে ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া গাভী আক্রমণ করিলে গাভীদিগের ভীত চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিন্তা গোয়ালিনী গোয়ালঘরে আগমন করে। কিন্তু ব্যাঘ্র দেখিয়া ভীতা না হইয়া রামদা দিয়া ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করে। রামদায়ের আঘাতে ব্যাঘ্র নিহত হয় এবং এই ঘটনায় সমুদয় রাজসাহী সহর তোলপাড় হয়। বঙ্গরমণীর এই প্রত্যুৎপন্নমতি ও মৌন বিক্রম অনেক আগ্নেয়াস্ত্রধারী সাহসী বীরপুরুষেরও অনুকরণযোগ্য!

প্রাচীন বাঙ্গালার পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে মনে হয়, লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, বসুধার মত সর্ব্বংসহা, স্বামিব্রতনিরতা নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্তাদর্শ, এবং বিশ্বস্তা, সহৃদয়া, বন্ধুসমা এবং স্থৈর্য্য, শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপ স্ত্রী হওয়াই ছিল তাঁহাদের একান্ত কামনা। স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিণী হওয়াই তাঁহাদের বাসনা এবং শামুক যেমন প্রসব করে মুক্তা তেমনই মুক্তাস্বরূপ বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই সকল বাসনার চরম বাসনা। লিপির পর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আদর্শ নানাপ্রসঙ্গে বার বার ব্যক্ত হইয়াছে। উচ্চকোটি সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্য্যাদা এই জন্যই বেশ উচ্চই ছিল, সন্দেহ নাই। লিপিগুলিতে উভয়েরই সশ্রদ্ধ ও সসম্মান উল্লেখ তাহার সাক্ষ্য; কোনো কোনো রাজকার্য্যে রাজ্ঞীর অনুমোদন গ্রহণও তাহার অন্যতম সাক্ষ্য।

সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র-গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্ম্মাদি তো করিতেন, মাঠে-ঘাটেও তাঁহাদের খাটিতে হইত সংসার-জীবন নির্ব্বাহের জন্য, হাট-বাজারেও যাইতে হইত, সওদা কেনা-বেচা করিতে হইত, আবার স্বামি-কন্যা পরিজনদের পরিচর্য্যাও ক'রতে হইত। মোটামুটি ইহাই ছিল পরবর্ত্তীকালের বঙ্গরমণীর অবস্থা, অন্যান্য অনেক বিষয়ের সহিত ছুতারের, দরজীর, জুতা প্রস্তুত, মৃৎশিল্প, সূচিকর্ম্ম এবং চরখা কাটিয়াও সংসার পরিচালনা করিতে হইত। অনেক রমণী স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারের কার্য্যেও দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও স্বামীর মৃত্যুর পরে চরকা কাটিয়া সসম্ভ্রমে সংসার প্রতিপালন ও দুই-তিনটি কন্যার বিবাহ দিবার বিবরণও সমসাময়িক সংবাদ-পত্র হইতে অবগত হওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সেকালের কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হইবে না। ১২৩৪ সালের সমসাময়িক সংবাদ-পত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোচজাতির স্ত্রীলোকেরা যুবতী না হইলে বিবাহ করে না এবং কন্যা আপনি কন্যাযাত্র বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ স্ত্রীলোক লইয়া বিশেষতঃ যত যুবতী একত্রিতা হইয়া কন্যাকে বেষ্টন করিয়া বরের বাটীতে বিবাহ করিতে যায় এবং কন্যা স্বয়ং বরের ভরণ-পোষণ করিবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বরকে বিবাহ করে। এই প্রথা প্রাচীন সমাজের রমণী বিক্রমেরই স্মৃতি বহন করিবে সন্দেহ নাই।

১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা সহরে যখন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শোচনীয় দাঙ্গা আরম্ভ হয়, তখন ঢাকার কায়েতটুলির বিখ্যাত নন্দী-পরিবারের গৃহ মুসলমানগণ আক্রমণ করে। এই সময় ভবেশের দুই বোন ও ভ্রাতৃজায়া উপর থেকে ইট ছুঁড়ে আক্রমণে বাধা দিতে থাকে। তাঁহারা দীর্ঘকাল দু'-তিনবার মুসলমানের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও ইজ্জত রক্ষা করেছে। অনিন্দবালা সম্মুখে ছিল, সে দুর্ব্বৃত্তগণের লাঠিতে আহত হয়। নিখিল-ভারত হিন্দুমহাসভার পক্ষ হইতে বীররমণী অনিন্দবালাকে তাহার বীরত্ব ও ধৈর্য্যের জন্য একটি স্বর্ণপদক প্রদান করা হইয়াছে।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে এক নিশীথ রাত্রে ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ মহকুমার রামনগর গ্রামের কৃষ্ণকুমার সাহার গৃহে প্রায় কুড়ি জন দস্যু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ করে। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের কয়েকজন গোয়ালা লাঠি লইয়া দস্যুদলকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় তাহাদিগের ভগিনী হেমলা। ভ্রাতৃগণ লাঠি হস্তে দস্যুদলকে আক্রমণ করিয়াছে—ঠকাঠক শব্দে লাঠি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দস্যুদলকে সাহায্য করিবার কেহ নাই, কিন্তু ভ্রাতৃগণকে হেমলা লাঠি সরবরাহ করিতে লাগিল এবং একখণ্ড বস্ত্রে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ঐ স্থান আলোকিত করিয়া তুলিল। পুনঃপুনঃ বাধা পাইয়া এবং আহত হইয়া দস্যুদল পলায়ন করিতে থাকে। গোয়ালাগণও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এবারও হেমলা মশাল হস্তে ভ্রাতৃগণকে আক্রমণ করিতে সাহায্য করে। ভ্রাতা ও ভগিনীর সমবেত প্রচেষ্টায় ও বীরত্বে একজন দস্যু বন্দী হয়। মোকদ্দমার বিচারকালে ঢাকার এডিশন্যাল জজ গভর্ণমেণ্টকে হেমলার জন্য পুরস্কার প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

বরিশাল জেলার কদমতলা গ্রামের মীরজান বিবির গৃহে কয়েকজন দস্যু প্রবেশ করিলে মীরজানের পুত্রবধূ জোলেখা দা হস্তে দরজার পিছনে দাঁড়াইল। এক ব্যক্তিকে রামদা লইয়া আসিতে দেখিয়া সে তাহার মাথায় দা দ্বারা আঘাত করিল। সে দৌঁড় দৌড়। আর একজন ডাকাত বাঁশ হস্তে বারান্দায় ঢুকিতেছিল, বীর রমণী তাহার মাথাও এক দায়ের ঘা লাগাইল; সে ব্যক্তিও পলায়ন করিল। তৎপরে জোলেখা শাশুড়ীকে এক ব্যক্তি উৎপীড়ন করিতেছে দেখিয়া সেখানে যাইয়া ডাকাতের পৃষ্ঠে এক ঘা বসাইল। রমণীর আক্রমণে ডাকাতগণ পলায়ন করিল।

পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীন চরসনন্দা গ্রামে এক নিশীথ রাত্রে ২০।২৫ জন ডাকাত লাঠি, সড়কি ও মশাল লইয়া মহিরন্দীর বাটী আক্রমণ করে। দস্যুদলের আক্রমণে মহিরন্দী আহত হইলে মহিরন্দীর স্ত্রী একখানা দা লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হয় এবং এক আঘাতে এক ডাকাতের দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলে। ডাকাত চিৎকার করিয়া বাহিরে আইসে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ছুটিতে থাকে। বিশৃঙ্খল দেখিয়া সমুদয় ডাকাত বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বিপদের সময় রমণীর এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বীরত্ব পুরুষেরও অনুকরণীয়। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কত শত বীরাঙ্গনার কীর্ত্তি কাহিনী জানিতে পারা যায়। তাহাদের কোন ধারাবাহিকতা না থাকিলেও সাহসে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও বীরত্বে তাহা সাধারণ রূপে পরিগণিত হইয়া আজিকার অধঃপতিত সমাজে নূতন উৎসাহ আনয়ন করিবে, নিস্তেজ হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগ্রত করিবে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্গরমণীর এই সকল মৌনবিক্রম কাহিনীর মূল্য অপরিসীম ও অনন্যসাধারণ।

ভারতীয় ডাকবাংলোর ইতিকথা

ডি, আর, সরকার কর্তৃক সংকলিত

ভারতবর্ষের ডাকবাংলো—তার পেছনে রয়েছে বহু পুরানো এক ইতিবৃত্ত। প্রাচীনকালে পান্থশালার অস্তিত্বের সন্ধান খুব অল্পই পাওয়া যায়। আর যে সকল বিশ্রামগৃহগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়েছিল, পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ এখন হ'তে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে "জন কোম্পানী' সেই বিশ্রামগৃহগুলির সংস্কারসাধন করেন। উপরন্তু যে সকল পায়ে-হাঁটা-পথে লোকজনের বিশেষ সমাগম ছিল, সে রাস্তার পাশে নতুন নতুন পান্থশালাও নির্ম্মাণ করেন। এই বিশ্রামগৃহগুলিকে ডাকবাংলো নামে অভিহিত করা এবং তাদের তত্ত্বাবধানের ভার ভারতীয় ডাক বিভাগের উপর ন্যস্ত করা জন কোম্পানীরই কাজ। তখনকার কালে রেলগাড়ী কিংবা পায়ে-চলা পথে ভ্রমণ, ডাক চলাচল ও তারবার্ত্তা প্রেরণ—সবকিছুর দায়িত্ব ছিল সেই একই বিভাগের উপর। আজকাল ডাকবাংলোর সঙ্গে ডাক অথবা ডাকঘরের কোন সম্পর্ক নেই। একথা ভাবলে কৌতুকপ্রদ বলে মনে হয়। ডাকবাংলোর এই 'ডাক' কথাটি আজও কালের সংঘাতে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে যেন ডাকবাংলোর ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, তখনকার পায়ে-চলা পথে ভ্রমণ ও পথচারীদের বিশ্রামগৃহের সঙ্গে ভারতের ডাকঘরের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সেই স্মৃতিকে মনে জাগিয়ে তোলে।

রোমাঞ্চকর অনুভূতি

লোকালয়ের বাইরে শীতের রাত্রে অথবা বৃষ্টি-বাদলের দিনে এই ডাকবাংলোগুলিতে অবস্থানের সময় পথিকদের মনে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি জেগে উঠত। পান্থশালাগুলিতে অবস্থানকালে হয়ত বিশ্রামকারীদের মন ঘুরে বেড়াত অতীতের আনাচে কানাচে—হয়ত বা মনে হত কত না অজানা পথিক এই আশ্রয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করে গেছে। তার সাক্ষ্য শুধু ডাকবাংলোর এই ইট-পাথরগুলো। নৈশভোজনের সময় দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ খানসামাগুলো নানা রকম আজগুবি গল্প বলতে বলতে হয়ত শুরু করে দিত কোন এক সাহেবের রাত্রি যাপনের কাহিনী, আর তাঁর নিদ্রাবস্থায় কোন এক অশরীরীর সঙ্গে সংঘাতের কথা। এই সকল কাহিনী নতুন আগন্তুকদের মনে জাগাতো আলোড়ন। এই অনাহূত অশরীরী প্রাণিগুলো দ্বারা যাতে বিশ্রামকারীদের কোনরকম নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, তার জন্য এই খানসামাগুলো থাকত কড়া প্রহরায়। অন্তে তাদের কিছু বাড়তি মুনাফাও হত।

ডাকবাংলো ও ধর্ম্মশালা

ডাকবাংলো ও ধর্ম্মশালার মধ্যে প্রভেদ শুধু এইখানে যে, শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি হল ধর্মীয় সংস্থা, ধর্মপ্রাণ, দানশীল ব্যক্তিগণ তার নির্মাতা। ধর্ম্মশালায় রয়েছে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ ডাকবাংলো হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থা, সেখানে কোনপ্রকার বিধিনিষেধ নেই। স্ত্রী-পুরুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে, দিনে-রাত্রে সকল সময়ে সকল প্রকার পরিশ্রান্ত পথিকদের নিকট ছিল ইহার দ্বার উন্মুক্ত।

পথচলা ও পাল্কী

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের ভ্রমণ ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিক [illegible] ডাকঘরগুলোর উপর। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখাও প্রয়োজন যে, ডাকঘরগুলোর এলাকা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধান ও কিছু বড় বড় রাস্তাগুলোর মধ্যে। যে সকল রাস্তার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার ডাকঘরের উপর লিপ্ত ছিল, তাদের সংখ্যার চেয়ে ডাকঘরের নিয়ন্ত্রণ এলাকার বাইরের রাস্তার সংখ্যা ছিল বহুগুণে বেশী। ডাকঘরের নিয়ন্ত্রণ-এলাকার বাইরের রাস্তাগুলোতে যাতায়াতের সময় ভ্রমণকারীদের নিজ নিজ গাড়ী ও পথপ্রদর্শকের ব্যবস্থা করতে হ'ত। ডাকঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা মনস্থ করলে, নির্দিষ্ট দিনের দুই তিন দিন পূর্ব্বে ভ্রমণকারীকে তাঁর ভ্রমণের পূর্ণ বৃত্তান্ত ও নিজ নিজ প্রয়োজন সম্বন্ধে স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার বা ডাকমুনশীকে জানাতে হ'ত। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর পোষ্টমাষ্টার বা ডাকমুনশী মহাশয় ভ্রমণকারীদের যাত্রার নির্দিষ্ট দিন অথবা নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি প্রস্তুত করে রাখত।

চার-চাকার গাড়ী যাকে ঘোড়া টেনে নিয়ে যেত, তাকে বলা হ'ত অশ্বচালিত ডাক। তাদের চলাচল নিবদ্ধ ছিল বড় বড় বাঁধানো রাস্তাগুলোর মধ্যে। তাছাড়া, অন্যান্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের একমাত্র পন্থা ছিল পাল্কী। কেবল মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাতায়াত সমাধা করা ছাড়া আর কোন ব্যতিক্রম ঘটত না। পাল্কীগুলো দেখতে ঠিক একটি কাঠের বাক্সের মত, তার ভিতরে আছে প্রচুর জায়গা, একজন ভিতরে বসে, এমন কি শুয়ে পর্য্যন্ত থাকতে পারে। আর বাইরের দিকে চার প্রান্তে থাকে চারটি কাষ্ঠ-দণ্ড, চারজন বাহক কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে যায়।

পাল্কীচড়ার আনন্দের কথা বিশপ হিবার (Bishop Heber) ও তৎকালীন অন্যান্য ভ্রমণকারীরা বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন। অধিকাংশ অভিজাত লোকেরা নিজস্ব পাল্কী রাখত, বিশেষতঃ বাড়ীর মেয়েদের যাতায়াতের জন্য। যাতায়াতের সময় পাল্কী সরবরাহ করার দায়িত্ব ডাকঘরের উপর ন্যস্ত ছিল না। পাল্কী সংগ্রহ ভ্রমণকারীদের নিজেদের করতে হ'ত। পাল্কী ভাড়া পাওয়া যেত। আর ডাকমুনশী সরবরাহ করত আটজন পাল্কী-বাহক বা পাল্কীবর্দার। রাত্রে যাতায়াতের সময় ডাকমুনশী দুইজন মশালচি বা আলো-বাহকের বন্দোবস্ত করতেন। যাত্রীদের সঙ্গে মালপত্র থাকলে, দুইজন মালপত্র-বাহকও দেওয়া হ'ত। সেই বাহকদের বলা হত বাহাঙ্গি-বর্দার, কারণ তারা জিনিষপত্রগুলি বাহাঙ্গির সাহায্যে বহন করে নিয়ে যেত। বাহাঙ্গি হ'ল লম্বা বংশখণ্ড। বাহকেরা কাঁধে ফেলে নিয়ে যায়। আর তার দুইপাশে ঝুলানো থাকে জিনিষপত্রগুলি। গ্রামাঞ্চলে এই বাহাঙ্গিগুলিই হ'ল মাল-পত্র বহন করে নিয়ে যাওয়ার সুপরিচিত ও জনপ্রিয় মাধ্যম। কিন্তু খুব ভারী জিনিষ উহা দ্বারা বহন করা চলে না। আটজন পাল্কী-বাহক, দুইজন মশালচি ও দুইজন বাহাঙ্গি বর্দার—এই সমগ্র দলের প্রতি মাইলে মজুরী ছিল এক শিলিং বা প্রায় বারো আনা। মজুরী তাদের অগ্রিম দিতে হ'ত। যাতায়াতের সময় যদি কোন ভ্রমণকারীর কোনস্থানে নির্দিষ্ট সময়ের অধিক অবস্থান করার দরুণ বাহকদের সীমাতিরিক্ত সময় ব্যয়িত হ'ল, তাদের অতিরিক্ত মজুরী দিতে হ'ত।

অশ্বচালিত 'ডাক' বা ঘোড়ায় 'ডাক'

সমগ্র রাস্তায় মাঝে মাঝে ঘোড়া স্থাপন করে ডাক চলাচলের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব ছিল পোষ্টমাষ্টার বা ডাক-মুনশী মহাশয়ের উপর। কারণ, বহু দূর-পাল্লার যাতায়াতে একদল বাহক বা একই ঘোড়ার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। রাস্তার মাঝে মাঝে বাহক বা ঘোড়া বদলী করা হ'ত। এই ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার জন্য যে স্থান হ'তে যাত্রা শুরু হ'ত সেখানকার স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার মহাশয় পথিমধ্যে ডাকঘরগুলিতে পূর্ব্বে জানিয়ে দিত, যাতে নির্দিষ্ট সময়ে ঘোড়া বা বাহকের ব্যবস্থা প্রস্তুত থাকে। গড়ে প্রায় দশ মাইল পর-পর ঘোড়া এবং বাহকদল বদলী করা হ'ত, আর সেই রাস্তাটুকু যেতে সময় নিত প্রায় তিন ঘণ্টা। এক একটি বিশ্রাম-স্থানের শেষে বারজনের বাহকদলকে বদলী করে অনুরূপ আর একটি দলকে ডাকবহনের কাজে দেওয়া হ'ত, এবং প্রথমোক্ত বাহকদল ফিরে আসত তাদের নিজেদের ডাকঘরে, যার অধীনে তারা কাজ করত।

পান্থশালা বা বিশ্রামগৃহ

পথিমধ্যে ভ্রমণকারীদের অবস্থানের জন্য পনের বা বিশ মাইল দূ'র দূরে অবস্থিত বিশ্রামগৃহ বা ডাকবাংলোগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল ডাকঘরগুলির উপর, আর এই ডাকবাংলোগুলোর অবস্থিতি নির্ভর করত লোক চলাচলের উপর। ডাকবাংলোতে অবস্থানকারী যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেওয়ার জন্য প্রত্যেক ডাকবাংলোতে থাকত একজন খিতমতগার যাকে বলা হ'ত ভৃত্য। কিন্তু এই খিতমতগার বা ভৃত্যগুলি হ'তে কাজ ও সুখসুবিধা আদায় করতে হলে, অবস্থানকারীকে মাঝে মাঝে তাদের নিজেদের হাস্যরসে যোগ দিতে হ'ত, এবং সবচেয়ে বড় পন্থা ছিল তাদের বকশিস দেওয়া। আদেশ অনুযায়ী রান্না করা ও পরিবেশন করার ভার ছিল খিদমতগারদের উপর। সেখানে একজন মুটে থাকত। রান্নার জন্য ও শীতের দিনে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখার জন্য যে কাঠের প্রয়োজন হ'ত, তা সরবরাহ করত এই মুটে। স্নান ও রান্নাবান্নার জন্য জলও সে সরবরাহ করত। ঘরটি ব্যবহার করার জন্য ভ্রমণকারীকে নির্দিষ্ট ভাড়া দিতে হ'ত।

খড়ের ছাওয়া ঘর

ডাকবাংলোগুলো নির্ম্মিত হ'ত খড়ের ছাউনিতে। ঐ ঘরগুলি ছিল একতলা, কিন্তু তাতে দুটো থেকে তিনটে কোঠা থাকত, আর প্রত্যেকটি কোঠার সংলগ্ন ছিল একটি করে স্নানাগার। প্রত্যেকটি কোঠার দরজায় পর্দা লাগানো হ'ত, আর এক একটি কোঠায় থাকত একটি নতুন বিছানা, দুটো চেয়ার এবং একটি টেবিল। যে সকল রাস্তায় ডাকাতের উৎপাত ছিল বেশী—আর তাহা সংখ্যায় খুব অল্পও ছিল না—সেখানকার ডাকবাংলোতে সুদৃঢ় প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। মথুরা ও দিল্লীর মাঝামাঝি এইরূপ দৃঢ় প্রহরাযুক্ত একটি ডাকবাংলোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সেখানে একদা জন সুরমন সাহেবের দূতদের সঙ্গে ডাকাত দলের একবার সংঘর্ষ হয়। জন সুরমন (John Surman) সাহেবের নেতৃত্বাধীনে দূতগণ পাটনা থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী ফারুকীয়ার (Farukshiyar) রওয়ানা হ'ন। মিরাট ও দিল্লীর মাঝে রাস্তাঘাট ছিল জনমানবশূন্য, কেবলমাত্র লুণ্ঠনকারীদেরই রাজত্ব চলত সেইখানে। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড দুর্গাকৃতি সরাইখানা দেখা যেত। তাদের দেওয়ালগুলি ছিল ছিদ্রবিশিষ্ট, যাতে তোপ দাগবার সুবিধে হয়, আর ছিল উচ্চ চূড়া, এবং সুউচ্চ প্রবেশদ্বার। সেখানে ভ্রমণকারীরা রাত্রে আশ্রয় নিত।

প্রতিরক্ষার এত সব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও রাস্তাঘাটগুলি প্রায় পাঁচ শত সৈন্যের কম একটি দলের পক্ষে নিরাপদ ছিল না বলা চলে। জন সুরমন (John Surman) ও তাঁর দূতদল চৌমুহা (Choumuha) নামক স্থানে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাযুক্ত একটি বিশ্রামশালায় রাত্রিযাপনের সময় সশস্ত্র দস্যুদল তাহাদিগকে পর পর তিনবার আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাঁহারা দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাতে তাঁদের দলের প্রায় পাঁচজন আহত হয়।

বর্ত্তমানকালে বিশ্রামগৃহগুলিকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ফেলা যায়—কতকগুলি ডাকবাংলো আছে যাহার দায়িত্ব ও তত্ত্বাবধানের ভার থাকে স্থানীয় কোন সংস্থার উপর। অফিসাররা এমন কি সাধারণ লোকও এই ডাকবাংলোগুলো দৈনিক ভাড়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আর কতকগুলি বাংলোকে 'পরিদর্শন বাংলো' or Inspection Bungalow বলা হয়, সেইগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত আছে রাজ্য সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের উপর। এইগুলি সরকারী কর্ম্মচারীদের সফরের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর কতকগুলি আছে যাকে বলা হয় 'সার্কাট হাউস' (Circuit House)। বিশ্রামগৃহগুলির মধ্যে এইগুলিই হল উচ্চধরণের, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী বা বিশেষ সম্মানিত ভ্রমণকারীরা এই বিশ্রামগৃহগুলি ব্যবহার করতে পারেন। সার্কাট হাউস প্রত্যেক জেলার সদরে অবস্থিত থাকে। তাহার তত্ত্বাবধান করেন জেলা-অফিসার বা জেলাশাসক। সাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনেও কতকগুলি বিশ্রামগৃহ আছে। তাহাদিগকে ধর্ম্মশালা বলা হয়। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ পুণ্য সঞ্চয়ার্থে ধর্ম্মশালাগুলি নির্ম্মাণ করে থাকেন।

এই ধরণের বিশ্রামগৃহ বা ধর্ম্মশালা বিশেষভাবে দেখা যায় তীর্থস্থানগুলিতে। সেগুলি তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য নির্ম্মিত। এই সকল ধর্ম্মশালায় থাকতে হলে ঘর এর আসবাবপত্র ব্যবহার জন্য কোন ভাড়া দিতে হয় না।

"Reading maketh a full man,
Conference a ready man,
And writing an exact man."
—*Francis Bacon*

রোগপ্রতিষেধকের আবিষ্কার

সুধাংশু ঘোষাল

আজকাল আমাদের অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে যা ধারণা আছে, আগে তেমন ছিল না। আদিম মানুষ কেন, কয়েক শ' বছর আগে অসুখ সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত ছিলো। দেবদেবী ও অন্যান্য অলৌকিক শক্তির দোহাই দিয়ে বা তৎকালীন ডাক্তার কবিরাজের ওষুধ খেয়ে অনেকে আরোগ্যলাভ করতেন। কখন কখন দেখা যেত, ওষুধ না খাওয়া সত্ত্বেও অনেকে সেরে উঠেছেন। এই ঘটনা হতে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে ডাক্তার কবিরাজের ওষুধে যেমন রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা আছে, আমাদের শরীরেও তেমন রোগমুক্ত হবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য কি ভাবে রোগমুক্ত হওয়া যায়, জীবাণু বলে কিছু আছে কি না, এসব খবর জানতে অনেক বছর লেগেছে।

রোগপ্রতিষেধকের আবিষ্কারক হিসাবে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁদের মধ্যে ইংলণ্ডের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে আজ হতে ১৫০ বছর আগের কথা। তখন রোগবীজাণু সম্বন্ধে কারো কোন ধারণা ছিলো না। জেনার লক্ষ্য করেন, গরুর স্তনে এক ধরণের ক্ষত বা ঘা হয়, যেগুলি সাধারণতঃ পুঁয দ্বারা পূর্ণ থাকে। যে গোয়ালিনীরা গরুর দুধ দোহন কোরতো তাদের হাতের আঙুলেও অনুরূপ ক্ষত দেখা যেত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন সারাদেশে বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দিতো, তখন অন্যান্য সকলে বসন্ত-রোগাক্রান্ত হলেও হাতে ক্ষতবিশিষ্ট গোয়ালিনীদের মধ্যে বসন্ত রোগ দেখা যেতো না। ব্যাপারটা জেনারের কাছে বেশ অদ্ভুত ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তিনি ভাবলেন, গো-বসন্তের পুঁয (বা গো-বীজ) হাতের ক্ষতের মাধ্যমে গোয়ালিনীদের রক্তে মিশবার ফলে এমন কোন ঘটনা ঘটে যার জন্যে গোয়ালিনীরা বসন্তরোগের আক্রমণ হতে রক্ষা পায়। জেনার ভাবেন, ধারণাটা যদি সত্যি হয় তবে পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের রক্তে গো-বীজ মিশিয়ে দিয়ে ফল দেখতে ক্ষতি কি? ১৭৯৬ সালে তিনি এক গোয়ালিনীর হাতের গো-বসন্তের ক্ষত হতে কিছুটা লালাবৎ অংশ তুলে নিলেন এবং সেই তরল পদার্থটি জেমস্ ফিপ্‌স্ নামে একটি ছেলের হাতে ঘষে দিলেন। ছেলেটিকে এভাবে গোবীজের টীকা দেবার পর তিনি এক বসন্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষত হতে লালা ছেলেটির শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যদিও জেনার বা তৎকালীন চিকিৎসকেরা বীজাণুর নামগন্ধ জানতেন না, তবুও তারা সবিস্ময়ে দেখলেন যে ছেলেটির শরীরে বসন্তের কোন লক্ষণ দেখা দিলো না। জেনারের এই আবিষ্কার চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর এনে দিলো। এই আবিষ্কারের পর দেড় শ' বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে, তবুও গোবীজের টীকা দিয়ে বসন্তের আক্রমণ হতে নিষ্কৃতি পাবার সেই পূর্ব্বতন প্রথা আজও প্রচলিত রয়েছে।

জেনার বসন্তের টীকা আবিষ্কার করলেও গো-বীজ মানবদেহে প্রবেশ করে কি ভাবে বসন্তরোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করে তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। জেনারের মৃত্যুর প্রায় ৫০ বছর পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর প্রচার করেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু হতে রোগের উৎপত্তি হয়। রোগ যে বীজাণু হতে উৎপন্ন হয় তৎকালীন চিকিৎসকেরা তা এই প্রথম শুনলেন। আরোগ্যতত্ত্বের মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে পাস্তুরের দান অপরিমেয়। পাস্তুরের সুযোগ্য শিষ্য প্রথিতযশা রুশ বৈজ্ঞানিক মেচনিকফ্ এ সম্বন্ধে বহু তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করেন। পাস্তুর ও বর্ত্তমান ব্যাধিতত্ত্ববিদদের আলোচনার উপর ভিত্তি করে শরীর কি ভাবে রোগ আক্রমণ হতে রক্ষা পায় সেটা মোটামুটি ভাবে লক্ষ্য করা যাক। পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন যে, আমাদের রক্ত লাল হলেও সেটা কিন্তু লালকালি বা আলতার মতো একটা সমসত্ত্ব দ্রবণ নয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে দেখা যাবে যে এক বর্ণহীন বা ঘাসের মতো বর্ণবিশিষ্ট তরল-পদার্থে অসংখ্য কোষ প্রলম্বিত আছে। এদের মধ্যে লোহিতকণিকা ও শ্বেতকণিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিতকণিকার সংখ্যা সাধারণতঃ ৪৫ লক্ষ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫০ লক্ষ। পক্ষান্তরে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা সাধারণতঃ প্রায় ৭০০০; তবে এই সংখ্যা ছ হাজার হতে তেরো হাজার পর্য্যন্ত হতে পারে। শ্বেতকণিকার অনেক কাজ আছে। শরীরকে রোগ আক্রমণ হতে রক্ষা করা সেগুলির অন্যতম। আমাদের চারিদিকে অসংখ্য রোগজীবাণু ঘুরে বেড়ায়। এগুলো সর্ব্বদা কোন না কোন উপায়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, যার ফলে জীবাণুর সঙ্গে শ্বেতকণিকার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ধরুন, পেন্সিল কাটতে কাটতে কোন লোকের ছুরিতে হাত কেটে গেলো। ছুরিটা ধারালো ও চকচকে হলেও এর গায়ে সম্ভবতঃ হাজার হাজার রোগজীবাণু লেগে আছে। এগুলি কাটা অংশের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ কোরলো। শ্বেতকণিকার দল যেই জানতে পারলো বাইরে হতে শত্রু এসেছে, অমনি তারা সকলে সেখানে এসে জমা হলো। শ্বেতকণিকা অনেক রকমের। এখানে যে শ্বেত-কণিকাগুলো এসেছে, তারা যে শুধু অ্যামিবার মত চলাফেরা কোরতে পারে তা নয়, এরা অ্যামিবার মতো নিজের কোষটিকে স্ফীত করে শিকার ধরে গিলে ফেলতে পারে। এরা এই কাটা অংশের রোগ-জীবাণু বিশেষতঃ ব্যাক্টিরিয়া দিব্যি খোসমেজাজে খেতে আরম্ভ করে। কেটে যাবার পর অনেকে শরীর হতে কিছুটা রক্ত বের করে দিতে বলেন। কারণ কাটা অংশ দিয়ে যে রোগজীবাণু প্রবেশ করেছে তারা আংশিক বা সমগ্রভাবে বেরিয়ে যায় রক্তস্রোতের সঙ্গে। বৈজ্ঞানিকদের মতে বাহির হতে শরীরে যে জীবাণু (অথবা সাপের বিষ) প্রবেশ করে তারা সকলেই প্রোটিন। এই বহিরাগত প্রোটিন (যাকে অ্যান্টিজেন বলে) রক্তে প্রবেশ করা মাত্র রক্তের শ্বেতকণিকাগুলি উত্তেজিত হয়। খাদ্যদ্রব্য খাবার পর পাকস্থলী ও খাদ্যনালী উত্তেজিত হওয়ার ফলে যেমন পাচকরস নির্গত হয়, তেমন শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করায় শ্বেতকণিকা উত্তেজিত হবার জন্য এক বিষম রাসায়নিক পদার্থ (অ্যান্টিবডি) বের হয়। নির্দিষ্ট অবস্থায় এই বিষম পদার্থটি রোগজীবাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে হারিয়ে ফেলতে পারে।

কখন কখন দেখা যায় যে কোন লোক রোগাক্রান্ত অবস্থায় ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য না নিয়ে দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা এই রোগজীবাণু শরীরে যাবার পর এত অ্যাণ্টিবডি তৈরী হয়েছে যে তার দ্বারা সমস্ত রোগজীবাণু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, শরীরের মধ্যে যদি রোগের সঙ্গে লড়তে পারে এমন পদার্থ তৈরী হয়, তবে টীকা বা ইন্জেকশন নেবার দরকার কি? রোগজীবাণু প্রবেশ করলে বিষঘ্ন পদার্থ তৈরী হয় বটে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদার্থটি তৈরী হতে সময় লাগে আবার কোন কোন ব্যক্তিবিশেষে এই পদার্থটি খুব কম পরিমাণে তৈরী হয়। এইরকম আরও কয়েকটি কারণে শরীরের মধ্যে রোগজীবাণু জয়লাভ করেও রোগ দেখা দেয়। সুতরাং শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করার আগে যদি আমরা কৃত্রিম উপায়ে দেহের মধ্যে বিষঘ্ন পদার্থ সঞ্চিত রাখি, তবে রোগের হাত হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আমরা টীকা বা ইনজেকসন দিয়ে (শরীরে নির্দ্দিষ্ট পদার্থ প্রবেশ করিয়ে) শ্বেতকণিকাকে উত্তেজিত করি। সেজন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিষঘ্ন পদার্থ তৈরী হয়। এবারে জেনারের পদ্ধতিতে টীকা নিয়ে আমরা বসন্তরোগ আক্রমণ হতে কি ভাবে রক্ষা পাই সেটা একটু দেখা যাক। বসন্তরোগটি যে জীবাণু হতে সংক্রমিত হয়, সেগুলি সাধারণ জীবকোষ হতে বহুগুণ ছোটো। এদের বসন্তরোগের "ভাইরাস" বলে। জীবাণুটি গরুর (বা অন্য কোন ইতর প্রাণীর) দেহে প্রবেশ কোরলে, তার রোগ উৎপাদন শক্তি কিছুটা কমে যায়। গরুর দেহ হতে যদি রক্তের লালাবৎ স্বচ্ছ অংশটি বের করা যায়, তবে সেই লালায় এই হতবীর্য বীজগুলি পাওয়া যাবে। টীকা দিয়ে মানুষের রক্তে এই লালা মিশিয়ে দিলে, লালার মাধ্যমে হতবীর্য বীজগুলি শরীরে প্রবেশ করে। সেজন্যে প্রচুর পরিমাণে বিষঘ্ন পদার্থ তৈরী হয়, যা বহিরাগত বসন্তরোগের জীবাণুকে নির্ব্বংশ করতে পারে।

জেনারের মৃত্যুর প্রায় ৩০ বছর পরে প্রথিতযশা ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন আলোকপাত করেন। পাস্তুর প্রথম প্রচার করেন, রোগ নির্দ্দিষ্ট জীবাণু হতে জন্মায়। জেনারের মতো পাস্তুরও রোগজীবাণু বিভিন্ন ইতর প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করিয়ে হতবীর্য্য কোরতে থাকেন, এবং তাই দিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা আরম্ভ করেন। জলাতঙ্ক রোগের টীকা তিনি এইভাবে আবিষ্কার করেন। বসন্তরোগের মতো জলাতঙ্ক রোগটির উৎপত্তি হয় এক ভাইরাস হতে। যখন কোন জলাতঙ্করোগগ্রস্ত কুকুর মানুষ (বা অন্য কোন সুস্থ কুকুর) কে কামড়ায়, তখন ক্ষতস্থানের মধ্য দিয়ে উক্ত প্রাণীর শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করে। পাস্তুর এই টীকা দিয়ে সুস্থ কুকুরের উপর পরীক্ষা করেন। তিনি দেখেন যে, টীকা দেবার পর সুস্থ কুকুরটিকে যদি কোন পাগলা (জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত) কুকুর কামড়ায়, তবে সুস্থ কুকুরটি স্বাভাবিক ভাবেই বেঁচে থাকে। তার দেহে জলাতঙ্কের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় না। পাস্তুর মানুষের উপর পরীক্ষা কোরবেন ঠিক করেন। তবে কার উপর কোরবেন সেটাই হলো সমস্যা। ১৮৮৫ সালে তিনি এক বন্ধুকে চিঠি লেখেন—"আমি কুকুরের উপর নবাবিষ্কৃত টীকা দিয়ে রোগ দূর করতে সক্ষম হয়েছি। ভাবছি এবারে মনুষ্যের উপর পরীক্ষা চালাবো। যদি মানুষ না পাই তবে নিজের উপর পরীক্ষা কোরবো, কারণ, আমার স্থির বিশ্বাস আমি সফলকাম হবো।" এ ঘটনার প্রায় মাস তিনেক পরে লোকেরা পাস্তুরের সামনে ন'বছর বয়স একটি ছেলেকে নিয়ে এলো। ছেলেটির নাম জোসেফ মেষ্টার, তাকে পাগলা কুকুরে বহু বার কামড়েছে। পাছে ছেলেটি চিকিৎসভাবে মারা যায় এই ভেবে তিনি ছেলেটিকে পর পর বারো বার ইনজেকসন্ দিলেন। শোনা যায়, যতদিন ছেলেটি তাঁর চিকিৎসাধীনে ছিলো তত দিন রাতে তাঁর ভালো ঘুম হতো না। তন্দ্রার ঘোরে বিছানায় শুয়ে তিনি প্রায়ই ছেলেটির কথা স্মরণ কোরতেন। দু'মাস পরে ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

পাস্তুরের মৃত্যুর পর চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাধিতত্ত্ব বিষয়ের গবেষণা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট রোগে নির্দ্দিষ্ট প্রতিষেধক ব্যবহার করা হয়। টাইফয়েড রোগটির উৎপত্তি হয় টাইফয়েড ব্যাসিলা হতে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, বসন্ত বা জলাতঙ্করোগের হতবীর্য্য জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার ফলে যেমন ব্যাধিঘ্ন পদার্থ তৈরী হয়, তেমন মৃতরোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে অনুরূপ ভাবে বিষঘ্ন পদার্থ তৈরী হতে পারে। শেষোক্ত পদ্ধতিতে টাইফয়েডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার রসদ তৈরী করা হয়। হতবীর্য্য বা মৃত জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার অ্যাণ্টিবডি তৈরী হয়। মনে করুন, যদি আমরা মৃত বা হতবীর্য্য জীবাণুর বদলে শরীরের মধ্যে সরাসরি বিষঘ্ন পদার্থ ঢুকিয়ে দিই, তবে কি হবে? একজন ব্যাধিতত্ত্ববিদ বললেন যে অ্যাণ্টিবডি যদি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, তবে এইরকম পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করা উচিত। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেলো যে রক্ত হতে কণিকাগুলি পৃথক করা সম্ভব হলেও এই বিষঘ্ন পদার্থ পৃথক করা সম্ভব নয়। রামায়ণের যুগে হনুমান বিশল্যকরণী গাছ খুঁজে না পেয়ে গন্ধমাদন পাহাড় নিয়ে এসেছিলো। এক্ষেত্রেও তেমন ইতর প্রাণীর রক্ত হতে বিষঘ্ন পদার্থ পৃথক না করে, ঐ প্রাণীর রক্তলালা মানবদেহে প্রবেশ করানো হয়। কারণ রক্তলালাতে অসংখ্য অ্যাণ্টিবডি থাকে। এই ইতরপ্রাণী হতে সংগৃহীত ব্যাধির রক্তলালাকে "অ্যাণ্টিটক্সিন" বলে। ডিপথেরিয়া রোগের চিকিৎসা এই ভাবে করা হয়। প্রথমে একটি ঘোড়ার দেহে ডিপথেরিয়ার টীকা দিয়ে পর্য্যাপ্ত বিষঘ্ন পদার্থ তৈরী করা হয়। পরে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় অশ্বদেহ হতে রক্তলালা নিষ্কাশিত করে সংরক্ষণ করা হয়। ডিপথেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে এই ব্যাধির রক্তলালার ইনজেকশন্ দেওয়া হয়। রাণাপ্রতাপের মতো চৈতকের কাছে ঋণী না হলেও, এইভাবে রোগমুক্ত লোকটি যে কোন এক অজ্ঞাত ঘোড়ার কাছে ঋণী—তা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

টাইফয়েড রোগটির চিকিৎসাপদ্ধতির আবিষ্কারে রাইট সাহেবের দান অবিস্মরণীয়। রাইট সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য হলেন পেনিসিলিনের আবিষ্কারক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। ফ্লেমিং-এর লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ বহু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রোগ উৎপাদনকারী ব্যাক্টিরিয়াকে কি ভাবে শ্বেতকণিকা প্রতিহত করে এটা তাঁর প্রথম প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ। চোখের জল বা অশ্রু নিয়ে পরীক্ষা করার সময় তিনি দেখান যে আমাদের চোখের জলে "লাইসোজাইম্" নামে এক রাসায়নিক পদার্থ আছে। এই পদার্থটি বহু রোগজীবাণু

বিনষ্ট করতে পারে। এজন্ত আমাদের চোখে অহরহ রোগজীবাণু ধুলোবালির সঙ্গে পড়লেও, কার্য্যতঃ চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফ্লেমিং এক পাত্রে অসংখ্য ব্যাক্টিরিয়া পূর্ণ দুধের মত ঘোলাটে এক তরল পদার্থ নেন। তরল পদার্থটিতে মানুষের চোখের জল দিয়ে তিনি মাত্র ৩০ সেকেণ্ড ঈষৎ উষ্ণ রাখলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি সবিস্ময়ে দেখেন যে ঘোলাটে তরলপদার্থটি স্বচ্ছপ্রায় তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে তিনি বুঝলেন, বরফ যেমন গলে জল হয়ে যায়, ব্যাক্টিরিয়াগুলি কতকটা সেই ভাবে গলে তরল হয়ে গিয়েছে।

ফ্লেমিং তখন লণ্ডনে সেন্টমেরী হাসপাতালে পুঁয উৎপাদনকারী জীবাণু (ষ্ট্রেফাইলোকক্কাস্) নিয়ে পরীক্ষা করছেন। এমন সময়ে তাঁকে পুঁযজীবাণু নিয়ে এক প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। এজন্তে তিনি আর একবার পুঁযজীবাণু সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি করতে লাগলেন। জীবাণুগুলি কাচের ডিসে ঢাকা দিয়ে রাখা হতো। ঢাকাটি এত সতর্কতার সঙ্গে দেওয়া হতো যাতে কোন বহিরাগত পদার্থ ঐ ডিসে না পড়ে।

জবীাণুগুলিকে এক পুষ্টিকর খাদ্যপদার্থের (আগার) উপর রাখা হলো। এটা ১৯২৮ সালের কথা। সে বছর লণ্ডনে দারুণ শীত। স্যাঁতস্যাঁতে আর্দ্রতার জন্তে আমাদের জুতোয় বা ভিজে পাঁউরুটির উপর ছাতা বা ছত্রাক গজায়। সে সময় এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। একদিন জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করার সময় তিনি যখন ঢাকাটি খুললেন, তখন হঠাৎ কোথা হ'তে একজাতীয় ছাতার অংশবিশেষ (স্পোর) ডিসটিতে এসে পড়লো। জিনিষটি কি, বা কোথা হতে উড়ে এসেছে, তিনি প্রথমে তা বুঝতে পারেননি। সম্ভবতঃ কোন গৃহস্থের ভাঁড়ার ঘর বা রান্নাঘরের ভিজে রুটি বা পনীর হতে ছাতাটি উড়ে এসেছিল। ফ্লেমিং সবিস্ময়ে দেখেন, ছাতাটি যে স্থানে পড়েছে তার আশেপাশের সব জীবাণু অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। তিনি এই ছাতাটি একটি পুঁয-জীবাণুপূর্ণ পাত্রে রাখলেন এবং এই একই ফল লক্ষ্য করেন। (তাঁর এই প্রথম ডিসটি আজও তাঁর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।) পরে তিনি জানতে পারেন ছাতাটির নাম "পেনিসিলিয়াম নোটেটাম্"—এক খুব নিম্নস্তরের উদ্ভিদ। এই গাছটি হতে তিনি যে নির্যাস বের করেন, গাছটির নামানুসারে তার নাম দেন পেনিসিলিন।

পেনিসিলিন নিয়ে এর পর বহু পরীক্ষা চালানো হয়। দেখা গেলো যে, পেনিসিলিন যে কেবল পুঁযউৎপাদনকারী জীবাণু বিনষ্ট করে তা নয়, রোগজীবাণুও (যেমন নিউমোনিয়া, ম্যানিনজাইটিস, ডিপথেরিয়া ইত্যাদি) নষ্ট করতে পারে। ফ্লেমিং ভাবেন, পেনিসিলিন দিয়ে বহু রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন হলো, পেনিসিলিন শরীরের মধ্যে গিয়ে রোগজীবাণু নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে দেহমধ্যস্থ কোষ ও রক্তের কণিকার কোন ক্ষতি করে কিনা। কারণ যদি ক্ষতি করে তবে মানুষের পক্ষে এই ওষুধটি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ফ্লেমিং একটা পাত্রে রক্তের শ্বেতকণিকা, রোগের ব্যাক্টিরিয়া ও পেনিসিলিন মিশালেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ব্যাক্টিরিয়াগুলি বিনষ্ট হলেও শ্বেতকণিকার কোন ক্ষতি হলো না। এর পর মানুষ ও বহু প্রাণীর দেহে পেনিসিলিন প্রবেশ করিয়ে তিনি কোন ক্ষতিকর বিষক্রিয়া দেখলেন না। ফ্লেমিং-এর আবিষ্কারের ঠিক তেরো বছর পরে ১৯৪১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী মানুষের উপর প্রথম পরীক্ষা করা হয়। এক পুলিশের ক্ষত দিয়ে পুঁযউৎপাদনকারী জীবাণু শরীরে প্রবেশ করেছিল এবং সেগুলি রক্তে রক্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোন চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় তাকে ক্রমাগত পাঁচ দিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওষুধটি ফুরিয়ে যাওয়ায় সে ওষুধের অভাবে মারা যায়। ফ্লেমিং দুঃখিত হলেন, কিন্তু দমলেন না। তিনি চিকিৎসকদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন মজুত রাখতে অনুরোধ করেন।

এবারে পনেরো বছর বয়সের একটি বালকের উপর পরীক্ষা করা হয়। বালক আরোগ্যলাভ করে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পেনিসিলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। এ যুগের বিস্ময়—পেনিসিলিন-এর আবিষ্কারক হিসাবে ফ্লেমিং বহু লোকের শুভেচ্ছা ও অভ্যর্থনা পেয়েছেন। তিনি বিনীত ভাবে বলতেন, "লোকে আমায় ধন্যবাদ দেয়, তারা বলে আমি তাদের বাঁচিয়েছি। কিন্তু আসলে হাজার হাজার বছর ধরে যে গাছটি আমাদের সামনে ছিল, সেটি কোন এক মুহূর্তে আমার ডিসে এসে পড়ে, আর আমি এক আবিষ্কারক হয়ে গেছি।"

ফ্লেমিং ১৯৫৫ সালে ৭৩ বছর বয়সে মারা যান। বর্তমানে বিভিন্ন ছাতা ও শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা হচ্ছে। ষ্ট্রেপটোমাইসিনও অনুরূপ এক ভেষজ পদার্থ। সম্প্রতি বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্তে বিভিন্ন রেডিও আইসোটপও কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করা হয়েছে। সেই অতীতের ভূত, প্রেত, দেব-দেবী হতে গাছগাছড়া ও তারপর আজকের মানুষ—এদের কত তফাৎ। আজ তবুও অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি, সিরাম, রেডিও আইসোটপ নিয়ে মানুষের রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ হয়নি। নতুন নতুন গবেষণা ও ফলাফলের জন্তে পৃথিবী অপেক্ষা করে রয়েছে। নতুন নতুন রোগ প্রতিষেধক বিশ্বের সমস্ত মানুষকে সুস্থ ও সবল করুক, এটাই আমাদের কামনা।

সেথা আছে এক জীর্ণ পুরী

[জার্মান কবি Karl Bulcke-র কবিতা 'There is an old city' অবলম্বনে]

এ বড় নগর হতে বহুদূরে আছে সেথা এক জীর্ণ পুরী,
বাতাস যেথায় গর্জিয়া যায়, সাগর লাফায়, দেয় কি তুড়ি!

সেথা রয় এক জীর্ণ আবাস—দোর বারো মাস বন্ধ থাকে,
আগাছায় ভরা দেওয়ালেতে তার সবুজ লতারা চিত্র আঁকে।

সেথা আছে এক সাথীহারা প্রাণ—কি যে নির্জন, আতঙ্কিত,
বাল্যস্মৃতির পাইন-ছায়ায় কত না নিভৃতে লুক্কায়িত!

অনুবাদ : মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বনকেটে বসত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

পঁচিশ

চেষ্টার কসুর নেই। দুই গরুতে টানছে, আর জগন্নাথও ঠেলছে পিছন থেকে প্রাণপণে। কাদা মেখে ভূতের চেহারা। গাড়ি হাত দশেক এগুল এমনি ভাবে। জল আরও বেড়েছে। তার পরে কাদায় চাকা এমনি এঁটে গেল, ধাক্কাধাক্কিতে আর এক চুল নড়ে না। প্রমথর ভিতরটা রাগে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু পথের মাঝখানে বিপদ—ঐ ছোঁড়া ছাড়া অন্য কোন মানুষ কাছে পিঠে নেই। অতএব ঠোঁটে কুলুপ এঁটে আছেন তিনি, এবং বাপু-বাছা করছেন। একবার কোন রকমে চৌধুরি-আলার চৌহদ্দির ভিতর নিয়ে তুলতে পারলে হয়। তখন নিজ-মূর্তি ধরবেন, ক্যা-ক্যা করে হাসার মজা দেখিয়ে দেবেন।

কি হল রে বাপধন?

এতখানি কাদা, আগে ঠাহর হয় নি। নোনা কাদা কি না—চাকা একেবারে কামড়ে ধরেছে। যেন কুমিরের কামড়, ছাড়ছে না।

প্রমথ বললেন, ঘুর হয় হোকগে। সোজা সড়কে কাজ নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে নে তুই বাবা। তেলিগাতির পুল হয়ে যাব।

জগা হেসে ওঠে: বললেন ভাল কথাটা। চাল বাড়ন্ত—আচ্ছা, তবে ভাতে-ভাতই চাপিয়ে দিগে। গাড়িই যদি ঘুরবে, আর দশ হাত এগুলেই তো কাদা পার হওয়া যেত।

নিবারণ হাত-মুখ নেড়ে বলে, বলিহারি গাড়োয়ান তুই বাপু। যেন মাংনা সোয়ারি তুলেছিস। খালের মাঝখানে গাড়ি নামিয়ে বলে, আর নড়বে না। আমরা এখন কি করব, সেটা বল তবে।

জগা বলে, ঘাবড়ান কি জন্যে? পৌঁছেই তো গেছেন। চৌধুরিগঞ্জ কতই বা হবে—দু-ক্রোশ কি আড়াই ক্রোশ বড় জোর। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে যান দিব্যি ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়। গাড়ি-গরুর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

প্রমথ সকাতরে বলেন, যে এই চাপড়াশি মশায় পারবে। সমন নিয়ে জল-জাঙাল ভাঙা অভ্যাস, গায়ে লাগবে না। আমার তো বাপু ফরাসে বসে হুকুম ঝাড়া কাজ—কলের ইঞ্জিন নই যে কল টিপলে অমনি পোঁ করে বেরিয়ে পড়লাম।

জগা দেশলাই জেলে একটা বিড়ি ধরাল। কাঠিটা ধরে প্রমথর দিকে চেয়ে থাকে। বলে, সে কথা একশ' বার। ফরাসে বসে বসে গতর পর্বত হয়েছে। এতখানি গতর আমি বুঝিনি, গরুও বোঝেনি। গাড়ি তা হলে খালে নামাত না। এ্যাদ্দিন ঘর করছি ওদের নিয়ে, হেন অবিবেচনার কাজ ওরা কখনো করে নি।

প্রমথ বলেন, গরু একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল মনে হচ্ছে। হাল ছেড়ে দিসনে বাপু, পিঠে দু-চারটে বাড়ি দে, আর খানিক টানাটানি করে দেখুক।

জগা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল: না, হুজুর, ঠিক উল্টো। বিগড়ে যাবে গরু। ডাইনের এই ম্যানেজারকে দেখেন—বেটা বিষম মানী। মান করে শুয়ে পড়বে জলের মধ্যে। গাড়িও কাত হয়ে পড়বে, শুয়ে বসে জুত হবে না হুজুরদের। তার চেয়ে যেমন আছেন চুপচাপ থাকুন। গরু ঘাঁটাতে যাবেন না, ওরাও এমনি স্থির হয়ে থাকবে।

আবার বলে, থাকুন একটু বসে। আমি বরঞ্চ লোকজন ডেকে আনি। আর জোয়ার অবধি থাকতে পারেন তো, নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হয়ে যাবে। জল বেড়ে গিয়ে কাদার আঁটাআটি থাকবে না। দু-দশ ঠেলায় গাড়ি উঠে যাবে। ঠেলতেও হবে না, গরু দু-জনে টেনে তুলে ফেলবে।

প্রমথ বলেন, আরে সর্বনাশ—জোয়ার অবধি ঠায় বসিয়ে রাখবি? লোক ডেকে নিয়ে আয় তুই।

নিবারণ বলে, লোক কদ্দুর?

তার কোন ঠিকঠিকানা আছে? চৌধুরি-আলা অবধি যেতে হতে পারে, আবার পথেও মাছমারা লোক পেতে পারি।

জগাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও দেখা যায় না কিছু। প্রমথ পৈতে বের করে ফেললেন: দেখ বাবা, ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি। ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়ছিস নে, পা ছুঁয়ে দিব্যি করে যা। তবে ছেড়ে দেব। ছুটে যাবি আর ছুটে চলে আসবি—কোনখানে জমে যাবি নে। কেমন বাবা, এই কথায় রাজি?

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলে, মানবেলায় যাচ্ছিস তো চিঁড়ে-মুড়ি যা-হোক কিছু নিয়ে আসবি। খালি হাতে আসিস নে। দুপুরবেলা কখন সেই গদাধরের হোটেলে গণ্ডা কয়েক ভাতের দানা পেটে পড়েছিল, তারপরে গরুর গাড়ির ধকল—খিদেয় নাড়ি পটপট করছে।

হুড়ুক-হুড়ুক হুড়ুক-হুড়ুক ড্যাডাং-ডাং ড্যাডাং-ড্যাং—ঢাকের বাজনায় জোর দিয়েছে এখন। জগা ছুটল সেই বাজনায় কান রেখে। কালীতলায় বাজনা সন্দেহ নেই। নিশিরাত্রে করালীর কূলে বাতাসের বড় জোর, বাজনা তাই একেবারে কাছে মনে হচ্ছে। তীরের মতন ছুটেছে জগা বাঁধের নিচে দিয়ে—কাদার মধ্যে পড়ছে, কাঁটাবনে গিয়ে পড়ছে। তা সে উপায় নেই—সরু বাঁধের উপর দিয়ে ছোটা যায় না, পড়ে গিয়ে এতক্ষণে হাড়গোড়-ভাঙা দ হয়ে থাকত। ব্রাহ্মণ-সন্তান প্রমথর কাছে কথা দিয়ে এসেছে, সেই জন্তেই কি ছুটাছুটি এত ?

সাঁইতলা এসে গেল। পাড়ার মধ্যে পা দিল কত দিনের পর। কী আশ্চর্য, কেউ নেই। পুরুষ না হয় জালে চলে গেছে, কিন্তু বউ-ঝিরা ? ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে গেছে কেউ কেউ। বেশির ভাগ ঘরে আবার দরজাই নেই। ভদ্রপাড়া হলে চোর-ছ্যাঁচোড়ের মজা বেধে যেত। পাড়া ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলেও তো কথা বলার কেউ নেই। কিন্তু বাদারাজ্যের পাড়ায় চোর আসে না। ধন-সম্পত্তির মধ্যে মাটির হাঁড়ি-কলসি, কলাইয়ের বাসন দু-একখানা, আর কাঁথা-মাদুর। ঝাঁটপাট দিলে দেদার ধুলো মিলবে, অন্ত-কিছু নয়। দিন আনে, দিন খায়। চাল-ডাল নুন-তেল ঘরে কিনে মজুত করে রাখে না। কপাল জোরে বেশি লভ্য হলে খাওয়াটা ভারিক্কি-রকমের হবে সেদিন, দুটো পয়সা বাঁচল তো কর্পূর কিনে জলে দিয়ে খাবে। কম হল তো সেদিন আধপেটা খাওয়া। না হল তো কাঠ-কাঠ উপোস। চোরকে তাই খোসামোদ করেও পাড়ার মধ্যে নেওয়া যাবে না। কিন্তু বৃত্তান্ত কি ? পুরুষ না হোক, মেয়েরা সব গেল কোথায় ?

গগনের নতুন-আলার দিকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। সেখানেও চুপচাপ একেবারে। ছাড়া বাড়ির মতো। আগে কত দিন তো পুরাদমে কীর্তনানন্দ চলেছে এমনি সময় অবধি। জগা ছিল না—এরই মধ্যে রাক্ষস এসে মেরে ধরে রূপকথার রাজবাড়ির মতো করে রেখে গেল নাকি ? তাল হয়, চারুবালাকে ঘাড় মুচড়ে রেখে গিয়ে থাকে যদি—মুখ দিয়ে দেমাকের বকবকানি না বেরোয় আর কখনো !

ঢুকে পড়ল জগা আলা . ঘেরের মধ্যে। যেতেই হবে। এত ছুটোছুটি করে এল ওদেরই জন্তে তো—গগন দাসের কথা মনে করে। নিজের কোন গরজ ভেবে নয়। তাকিয়ে দেখে, কামরার ভিতরে যেন আলো। বন্ধ কবাটের জোড়ের ফাঁক দিয়ে আলো আসে। আলো যখন, মানুষও তবে ভিতরে আছে। এবং খুব সম্ভব ননদ-ভাজ মেয়েলোক দুটি। জগা তখন ডোবার ধারে। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে কাদা মাখা দেহটার দিকে হঠাৎ নজর পড়ে যায়। অতিশয় বিশ্রী দেখাচ্ছে। এতদিন পরে এসেছে—নেয়ে ধুয়ে ওদের সামনে হাজির হওয়া উচিত। চারুটা নয়তো হি-হি করে হাসবে। বলে বসবে হয়তো কি কথা—রক্ত চড়ে যাবে জগার মাথায়।

নেয়ে ধুয়ে ভিজা কাপড়ে জগা আলাঘরে উঠল। এদিক ওদিক তাকাল একবার। গগন, নগেনশশী, এমন কি ব্যাপারিদেরও একজন কেউ নেই কোনদিকে। দরজায় ঘা দিল। সাড়া নেই। জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। অবশেষে ভিতর থেকে কর্কশ করে উঠল—আবার কে ?—চারুবালা।

এসে জুটেছ কালীতলা থেকে ? যা ভেবে এসেছ, একলা নই। সড়কি আছে। যে ঠ্যাংখানা আছে, সেটাও নেব আজকে।

ঠ্যাঙের কথা তুলেছে, মধুবর্ষণটা অতএব নগেনশশী সম্পর্কে। আনন্দে জগা থই পাচ্ছে না। একদল হয়ে ওরা বাদাবনে চড়াও হয়েছিল, দলের মধ্যেই এখন ঝুটোপুটি বেধে গেছে। কবাটে জোরে জোরে করাঘাত করে জগা বলে, আমি গো, আমি জগন্নাথ। বয়ারখোলায় পড়েছিলাম, যাত্রা গাইতাম কারও কোন ক্ষতি-লোকসান করিনি, আমার কেন ঠ্যাং ভাঙতে যাবে গো ? দোর খোল, বড্ড জরুরি খবর, সেজন্ত ছুটতে ছুটতে এসেছি।

চারুবালা দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াল : তুমি কোথা থেকে হঠাৎ ?

কাপড়ের জলে তোমাদের নিকানো ঘর কাদা-কাদা হয়ে গেল। আগে শুকনো কাপড় দাও। বলছি সব।

চারু খোঁজাখুঁজি করল একটুখানি। বলে, ধুতি পাচ্ছি নে। দুর বড়ুইয়ের সঙ্গে দাদা সদরে গেল। একটা ধুতি পরনে, আর পুঁটলি বেঁধে নিয়ে গেছে গোটা দুই।

নগনা-খোঁড়ার ধুতি নেই ?

ওর জিনিসে হাত দিতে ঘেন্না করে আমার।

ভারি খুশি জগন্নাথ। অনেকদিন পরে আজ আলাঘরে পা দেওয়া অবধি নগেনশশী সম্পর্কে চারুর মনোভাব পাওয়া যাচ্ছে, বড্ড রস লাগছে তার কথাবার্তা। জগা সায় দিয়ে বলে, ঠিক বলেছ। পাজি লোক।

কিন্তু কাপড়ের কি করা যায় ? কালা-পেড়ে শাড়ি আমার—এটাই পর। শাড়ি পরে বউ হয়ে বোসো, আর কি হবে।

ফিক করে হেসে রসান দেয়, জগন্নাথ নয়, জগমোহিনী।

জগন্নাথ বলে, দু-বেটাকে রেখে এলাম খালের মধ্যে। পলোয়ানা নিয়ে তোমাদের এখানে শিল করতে আসছে। বড়দা নেই—কিন্তু তার কাছেই এসেছি। চৌধুরি বাবুরা বড় মোকর্দমা সাজিয়েছে। বলাবলি করছিল, গাড়ি চালাতে চালাতে, কানে গেল।

চারু বলে, দাদাও তো গেল ওই মোকর্দমার ব্যাপারে। গোপাল জমাদার এসে দেখেশুনে গেল, সে-ই সব শয়তানি করছে। খবরটা আবার চৌধুরি-আলা থেকেই বেরুল। কালোসোনা শুড়পাচ্ছিল : এপারের সমস্ত নাকি চৌধুরিদের খাস এলাকা, করালীর খাল-পারে সাপ-বাঘের মুখে নাকি ছুঁড়ে দেবে আমাদের। দুর বড়ুই বলল, সদর ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, সাপ-বাঘও নেই সেখানে। কালোসোনার মুখে ঝাল না খেয়ে নিজেরা সেরেস্তায় খোঁজখবর করে আসিগে।

জগা বলে, নগনাটা গেল না যে। তারই তো এই সবে মাথা খেলে ভাল।

সে যাবে রাজ্যিপাট ছেড়ে—বয়ে গেছে ! দশজনে তোমরা যোগাড়যন্তোর করে দিলে, দাদা তো মালিক শুধু নামেই ! তৈ রাজ্যটি কর্তা দিচ্ছে ওই লোক এখন !

চোরার মুখে ধর্মের কাহিনী—এ সব কী বলে চারুবালা ! গগন দাসের দশ জন হিতার্থীর একজন ভবে অন্তত জগন্নাথ। চারু তা স্বীকার করল। আর নগেনশশীকে তো দাঁতে-দাঁতে চিবাচ্ছে। আনন্দে কী করবে জগা ভেবে পায় না। আগেকার দিন হলে মনেও না ভাবতে পারত না, সেই কাজ সে করে বসল। খাওয়ার কথা বলল চারুবালার

কাছে। নিবারণ যা বলে দিয়েছে—প্রায় সেই কথারই আবৃত্তি করে বলে, ক্ষিদেয় নাড়ি পটপট করছে। চাট্টি ভাত বাড় চারুবালা। খেয়েদেয়ে তারপরে কাজ আছে বিস্তর খাটনির কাজ।

ভাত কোথা? ছ-মাস পরে আজকে আসা হচ্ছে, খবর দেওয়া ছিল কি কাউকে দিয়ে?

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে জগা বলে, জানব কেমনে যে বাদারাজ্যের মধ্যে মশায়রা শহুরে বাবু হয়ে গেছেন। সন্ধ্যের ঝোঁক না কাটতে রান্না-খাওয়া খতম। আগে তো দেখি গেছি, হরির লুঠের হরিধ্বনি পড়তে পোহাতি তারা উঠে যেত।

চারিদিক ইতস্তত তাকিয়ে দেখে আবার বলে, আসর বসে না আজকাল? বড়দা সদরে, তা বউঠাকরুন গেল কোথা? চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নগেন-কর্তাও তদ রক করছে না। ব্যাপার কি বল দিকি?

চারু বলে, রটন্তীপুজো কালীতলায়। বাজনা শুনতে পাওনা? পাড়াশুদ্ধ সব সেখানে। বউদিদির উপোস, সে তো বিকাল থেকে সেখানে পড়ে থেকে গোছগাছ করছে। রান্নাবান্না হয় নি, ভাত দিই কোথা থেকে? ও-বেলার চাট্টি পান্তা ছিল, তাই খেয়ে আমি ঘরে দুয়োর দিয়ে রয়েছি।

জগা বলে, রান্না হয়নি তো হোক এখন। হতে বাধা কিসের? চৌধুরিদের ম্যানেজার চাপড়াশি আর মানুষজন নিয়ে ভোরের মুখে শিল করতে এসে পড়বে। তার আগে খাটনি আছে সারা রাত্তির ধরে। পেটে না খেয়ে খাটতে পারব না।

পাড়াগাঁয়ের লোকের—পুরুষ হোক, আর মেয়ে হোক—শিল কথাটা বুঝতে দেরি হয় না। আদালত-ঘটিত ব্যাপার—সাধুভাষায় যার নাম অস্থাবর ক্রোক। দেনার বাবদ ডিক্রি হয়ে আছে—চাপড়াশি এসে দেনদারের মালপত্র ধরবে, সেই সমস্ত নিলামে বিক্রি হয়ে টাকা আদায় হবে। রাত্রে বাড়ি ঢোকবার নিয়ম নেই। অতএব ভোরবেলা এসে নিশ্চয় তারা হানা দেবে। আর এই পক্ষের কাজ হল, ঘরের যাবতীয় জিনিষপত্র এবং গোয়ালের গরু-বাছুর রাতারাতি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা। জগন্নাথ এই খাটনির কথাই বলছে। ম্যানেজার সদলবলে এসে দেখবে, বাড়ির জিনিষপত্র সব পাচার হয়ে গেছে, মানুষ ক'টি আছে কেবল। মানুষেরা ক্যা ক্যা করে হাসবে, বেকুব হয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে সরে পড়বে পাওনাদারেরা। খালি পেটে এত সমস্ত হবে কেমন করে?

চারু বলে, চিঁড়ে খেয়ে নাও। ঘরে চিঁড়ে আছে।

চিঁড়ে তো দোকানেও থাকে। চিঁড়ে খাব তো গৃহস্থবাড়ি এসে উঠলাম কেন? চিঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে মাড়িতে খিল ধরে, পেটের কিছু হয় না। চিঁড়ে আমি খাইনে।

চারু বলে, চিঁড়ে কুটতে গিয়ে ঢেঁকিতে হাত ছেঁচে গেছে। রাঁধা বাড়া করি কেমন করে বল।

হুঁ, বুঝলাম—

কি বুঝলে শুনি?

দুয়োর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ডেকে তুলেছি। ঘুমের ঝোঁক কাটেনি। ঘুম-চোখে ছাই ঘেঁটে উনুন ধরাতে মন নিচ্ছে না।

ভারী গলায় চারু বলে, মরছি হাতের যন্ত্রণায়—বলে কিনা ঘুম! ঘুমোবার জো থাকলেও তো দিত না ঘুমোতে। তবে আর বলছি কি! নগনা-খোঁড়া দু-বার এর মধ্যে এটা-ওটা ছুতো করে কালীতলা থেকে এসে চুঁ মেরে গেছে।

চারুবালা কাপড়ের নিচে থেকে ডান হাত বাড়িয়ে ধরল। বলে, হাত ফুলে ঢাক হয়েছে, দেখ—

খাল-পারে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ, হাল্কা জ্যোৎস্না দোর-গোড়া অবধি এসে পড়েছে। নগেনশশীকে দোষ দেওয়া যায় না, বাদাবনের নির্জন রাত্রে এই মেয়ে দেখে মাথার ঠিক রাখা দায়।

বলছে, হাতের টাটানিতে বসে বসে পিদিমের সেঁক দিচ্ছিলাম। নইলে ঘরে থাকতাম বুঝি! তল্লাটের সব মানুষ কালীতলায়, আমি একলা পড়ে থাকবার মানুষ!

জগা বলে, টাটানি-জ্বলুনি বাইরের লোকে দেখে না। আস্ত একখানা কাপড় জড়িয়েছ তো হাতে—সত্যি বটে, ও-হাত উঁচু করে তুলে ধরে বসে থাকতে হয়, কাজকর্ম হয় না ও-হাত দিয়ে।

দেখাচ্ছি তবে খুলে। মানুষকে রেঁধে খাওয়ানোর ব্যাপার—তাই নিয়ে কেউ ছুতো ধরতে যায়!

গরগর করতে করতে চারুবালা ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতে গেল। জগা হি-হি করে হাসে। হাত ধরে ফেলে বলে, একটুখানি ক্ষেপিয়ে দেখলাম তোমায়। ঝগড়া না করলে মেয়েমানুষের বাহার খোলে না। মেনি-বিড়ালের মতো মিন-মিন করছিলে, চেনা তখন মুশকিল। ভাবছিলাম, বড়দা'র বোন কি এই—না অন্য কেউ?

আবার বলে, আন চিঁড়ে—চিঁড়ে ভিজিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর, নয়তো নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবে। খালের মধ্যে সে দু-বেটা পেটের জ্বালায় এতক্ষণ আমায় বাপান্ত করছে।

রান্নাঘরে গিয়ে চারুবালা জগাকে ডাকল। আয়োজন পরিপাটি। চিঁড়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। নলেনের সুগন্ধ পাটালি। কলাগাছের নতুন ঝাড়ে কাঁদি পড়ে পেকেও গিয়েছে এক কাঁদি মর্তমান-সবরি। এর উপরে কড়াইতে সর-আঁটা দুধ আছে। ভাত নেই, তা বলে খাওয়ার কোন অসুবিধা গৃহস্থ-বাড়ি?

জগা খিঁচিয়ে ওঠে: রোগা না খোকা যে আমি দুধ খেতে যাব?

এমনি সময় ডোবার জলে পরিষ্কৃত হয়ে তিন জোড়া পা চলে এল উঠানের উপর। জগা তাকিয়ে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, আরে ব্যস, বড়দা এসে পড়েছে, আর ভাবনা কিসের? বড়দা'কে না বলতে পেরে কথাগুলো টগবগ করে ফুটছিল গলা পর্যন্ত এসে।

গগন বলে, জগন্নাথ নাকি? আচ্ছা, উঠছ কেন খাও। চৌধুরি বাবুদের কাণ্ড শুনেছ? নতুন ঘেরির খাজনা' বলে তিন-শ বাইশ টাকার একতরফা ডিক্রি করেছে আমার নামে। সাজের থেকে উচ্ছেদের নালিশ করেছে। দেওয়ানি আর ফৌজদারিতে তিন নম্বর এক সঙ্গে রুজু করেছে।

জগা বলল, জানি। আরও যা-সব করবে বলে মনে মনে মতলব ভাঁজছে, তা-ও জেনে ফেলেছি বড়দা।

গগনের সঙ্গে হর বড়ুই। আর একটা নতুন লোক—নিতান্তই অস্থিসর্বস্ব, বিধাতা হাড়ের উপর মাংস ছোঁয়াতে ভুলে গেছেন, লোকটিকে দেখে তাই মনে হয়। নতুন লোক দেখে জগন্নাথ বলতে বলতে থেমে গেল।

গগন বলে, চক্কোত্তি মশায়। সদরের পুণ্ডরীকবাবু উকিল—তাঁর সেরেস্তায় বসেন। টোর্নিগিরি করেন। বরাপোতায় কিছু জমিজিরেত আছে, অবরে-সবরে এসে থাকেন। আমরা চক্কোত্তি মশায়কে এই অবধি টেনেটুনে নিয়ে এলাম। রাতটুকু থেকে বরাপোতা কাল সকালে যাবেন। মামলা-মোকর্দমা আমরা কিছু বুঝিনে। নগেনশশী পাটোয়ারি মানুষ—তার সঙ্গে সামনাসামনি পরামর্শ হোক চক্কোত্তি মশায়ের, সে কি বলে শোনা যাক। নগেনও বুঝি কালীতলায় পড়ে আছে? খেয়ে নাও জগা, আমরাও চলে যাই চক্কোত্তি মশায়কে নিয়ে। তুমি কি জেনে এসেছে, তা-ও সকলে মিলে শোনা যাবে।

চারু তিক্ত কণ্ঠে বলে, যেতে হবে না দাদা। চুপচাপ থাক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই-ই কতবার চক্কোর দেয় দেখ।

জগা বলে, কি গো চারুবালা, ভাত রান্নার তো উপায় নেই—টোর্নি চক্কোত্তি মশায়কে বড়দা ডেকে নিয়ে এলো, এরাও চিঁড়ে খেয়ে রাত কাটাবে নাকি?

চারুবালা হারবার মেয়ে নয়। চোখ-মুখ নাচিয়ে সে বলে, ভালই তো হল চক্কোত্তিকে ডেকে এনে। বামুন মানুষ উনি রাঁধবেন, নিচু জাতের আমরা মজা করে খাব।

ছাব্বিশ

এরা তো বেশ হাসাহাসি করছে চালের নিচে জমিয়ে বসে। মুশকিল ওদিকে—খালের মধ্যে প্রমথ আর নিবারণের নড়াচড়ায় গাড়ির চাকা আরও অনেকখানি বসে গেছে। জগা লোক ডাকতে গেছে তো গেছে। ক'ঘণ্টা কিম্বা ক'দিন লাগায় তাই দেখ। পৈতেধারী সদ্‌ব্রাহ্মণের কাছে কথা দিয়ে গেল, তা বলে দৃক্‌পাত নেই। গরুর গাড়ি ঠেলাঠেলির পর রাত দুপুরে কোনখানে গুটি-সুটি হয়ে গড়িয়ে পড়ল নাকি? কোন কিছুই বিচিত্র নয় জঙ্গলে ঐ বিচ্ছুগুলোর পক্ষে।

নিবারণ, কি করা যায় বল তো?

গুর্-র্-র্ করে নাক ডেকে নিবারণ জবাব দিল। বিচালির আঁটি ঠেশ দিয়ে আরামে দিব্যি সে গা ঢেলে দিয়েছে। রাগে প্রমথর গা জ্বালা করে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে খালের জলে। কিন্তু আদালতের চাপড়াশি হলেও সরকারি মানুষ। সমীহ না করে উপায় কি।

নিবারণ, তুমি বাপু নরদেহে নারায়ণ। থই-থই ক্ষিরোদ সমুদ্দুর—তার মধ্যে নাক ডেকে ঘুম দিচ্ছ। বালিশ অভাবে নারায়ণ একটা পটোল মাথায় দিয়েছিলেন, তোমার কিছুই লাগে না।

বাইরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেন প্রমথ। আরে সর্বনাশ, মহাপ্রলয় আসন্ন। কিছুই ঠাহর করেননি এতক্ষণ। জোয়ার এসে গেছে, খালের জল হু-হু করে বাড়ছে। খরস্রোত আবর্তিত হয়ে ছুটেছে। গাড়ির পাটাতনের উপর বসে তাঁরা—জলতা অনতিপরেই ছোঁব-ছোঁব করবে। ব্যাটা গাড়োয়ান ডুবিয়ে মারবার ফিকিরে এইখানে গাড়ি আটকে সরে পড়ল নাকি? মতলব করে খালে এনে ফেলেছে?

ওহে নিবারণ, উঠে দেখ কাণ্ড। জীবন নিয়ে সঙ্কট, এখনো তুমি চোখ বুজে পড়ে আছ?

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর নিবারণ অবশেষে চোখ কচলে খাড়া হয়ে বসল।

ডাঙায় চল নিবারণ। আর খানিকক্ষণ থাকলে টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

তাই তো বটে!

তড়াক করে নিবারণ গাড়ির পাটাতন থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। এবং হালকা মানুষ—পাড়েও উঠে পড়ল পলকের মধ্যে। কিন্তু ম্যানেজার প্রমথর পক্ষে সহজ নয় ব্যাপারটা। নিবারণের পুরো দেহখানা পাল্লায় তুলে দিলে যা ওজন দাঁড়াবে, ম্যানেজারের শুধুমাত্র ভুঁড়িখানাই বোধ করি তাই। তার উপর সাঁতারের কায়দাকানুন জানা নেই। আর জানলেই বা কি—হিমালয় পর্বত জলে ভাসবে না যত কায়দাই করা যাক না কেন।

শুকনো ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে নিবারণ হাঁক পাড়ছে: হল কি ম্যানেজার মশায়। পা চালিয়ে চলে আসুন। জায়গাটা গরম বলে মালুম হয়। বদখত একটা গন্ধ পাচ্ছেন না নাকে?

যেখানে বাঘের চলাফেরা, তেমনি সব জায়গাকে গরম বলে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে প্রমথর কি অসাধ? কিন্তু এক একখানা পা ফেলছেন, ভারী দুরমুশের মতো গিয়ে পড়ছে—সেই পা তারপরে টেনে তোলা দায়। নিরাপদ ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে নিবারণ ভয় ধরাবে না কেন—তার পালানোর মুশকিল কিছু নেই।

ডাঙার কাছাকাছি হতে নিবারণ খানিকটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে হিড়-হিড় করে প্রমথকে টেনে তুলল। ভালমানুষের মতো বলে, গন্ধ কেন বেরোয়, জানেন তো ম্যানেজার মশায়?

বিরক্ত মুখে প্রমথ খিঁচিয়ে ওঠেন: না, জানিনে বাপু। রাত দুপুরে কে তোমায় ওসব মনে করিয়ে দিতে বলছে?

নিঃশব্দে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ নিবারণ দাঁড়িয়ে পড়ল। বার কয়েক সশব্দে নাক টেনে বলে, গন্ধটা বেশি-বেশি লাগে। আর এগোব না। ওই দিকে আছেন হয়তো ওৎ পেতে।

কিন্তু একা নিবারণই গন্ধটা পাচ্ছে, প্রমথর নাকে কিছু লাগে না। রাগ করে তিনি বলেন, পথের উপরে কু-ডাক ডাকছ, হয়েছে কি বল তো চাপড়াশি?

নিবারণ বলে, একটা-কিছু উপায় দেখবেন তো! চুপচাপ এগিয়ে চলব, আর পথের উপর থেকে জলজ্যান্ত দুটো প্রাণী টুক করে ওঁরা জলযোগ সেরে যাবেন, আপোষে তা-ই বা কেমন করে হতে দিই?

একটা উঁচু কেওড়াগাছ তাক করে বলে, আমি মশায় দোডালার উপর উঠে বসি গে। যদি কিছু দেখতে পাই, বলব বরঞ্চ আপনাকে। সমন নিয়ে রাত্তিরবেলা জঙ্গল ঠেলে পায়ে হাঁটতে হবে, এমনি কি কথা ছিল? বলুন।

দীর্ঘ গুঁড়ি—ডাল উঠেছে অনেকটা উপর থেকে। প্রমথ অসহায়ভাবে তাকান গাছের দিকে। জায়গা নিরাপদ, সন্দেহ নেই। নিবারণের বড় সুবিধা—দেহ নয়, যেন লিকলিকে বেত একগাছা, যেদিকে যেমন খুশি নোয়ানো যায়। মালকোঁচা মেরে সে গাছে ওঠার জোগাড় করছে?

প্রমথ কাতর হয়ে বলেন, দু-জনে একসঙ্গে আছি। আমার

বাঘে খাবে, আর ডালের উপর বসে বসে মজা করে দেখবে তুমি। এই বাপু ধর্ম হল? ভাল লাগবে দেখতে?

নিবারণ হাঁ-হাঁ করে ওঠে: সর্বনাশ, কী করলেন, অসময়ে বড়-মিঞার নাম ধরে ডেকে বসলেন! গাছ তো কেউ ইজারা নিয়ে নেয় নি, সবাই উঠতে পারে। আপনিও উঠে পড়ুন না মশায়।

প্রমথ মুখ ভেংচে স্বরের অনুকৃতি করে বলেন, উঠে পড়ুন না মশায়! এমনি হবে না, মশায়কে উঠতে হলে কপিকলে খাটাতে হবে গাছের মাথায়। উঠেও তার পরে পলকা ডাল ভর সইতে পারবে না, মড়মড় করে ভেঙে পড়বে।

যে-কেউ সেটা আন্দাজ করতে পারে। অলক্ষ্যে নিবারণ হাসি চেপে নিল। অদূরের জঙ্গলটায় কি-একটা শব্দ এমনি সময়। ভয়ার্ত কণ্ঠে নিবারণ বলে, পচা গন্ধ পাচ্ছেন তো এবারে? বড্ড যে কাছে এসে গেল।

প্রমথ পিছনে তাকিয়ে বলেন, তুমি ঢিল ছুঁড়লে নাকি নিবারণ? আমায় ভয় দেখাচ্ছ?

নিবারণ কথা শেষ হতে দেয় না: দৌড়ন মশায়। এলো। এবং গাছে না উঠে দিল সে চোঁচা দৌড়। এ কর্মেও ওস্তাদ—দুই পায়েও ঈশ্বর এত ক্ষমতা দিয়েছেন! সাঁ-সাঁ করে ছুটছে। প্রমথ কি করেন—বিপুল দেহ নিয়ে তিনিও যথাসাধ্য ছুটেছেন পিছন ধরে। ব্যবধান বাড়ছে ক্রমেই—এমন হল, ভাল করে নজরেই আসে না এখন। তবে জঙ্গলটা গিয়ে ফাঁকায় এসে গেছেন এবার। দু-পাশে বাঁধা ঘেরি, মাঝখানে বাঁধ। এতক্ষণে সাহস পেয়ে প্রমথ হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকছেন: একটুখানি দাঁড়াও চাপড়াশি। আর পারছি নে। ফাঁকার মধ্যে আর এখন তেড়ে আসবে না।

নিবারণ বলে, আসবে না কি করে বলেন? কপালে যদি থাকে, ঘরের মধ্যে দুয়োরে খিল দিয়ে তক্তাপোষের উপর ঘুমুচ্ছেন, সেইখান থেকে মুখে করে নিয়ে যায়। এমন কত হয়ে থাকে।

প্রমথ আগুন হয়ে ওঠেন: ভয় দিও না চাপরাশি, বলে দিচ্ছি। ঘোরাঘুরির কাজ তোমার, খাতাপত্তোর খুলে আমরা এক জায়গায় বসে থাকি। এমনি পেরে উঠিনে, তার উপরে আজেবাজে কথা বলে আরও ঘাবড়ে দিচ্ছ।

ঢাকের বাজনা থেমে ছিল অনেকক্ষণ, আবার বেজে উঠল। তাই তো, পাড়ার মধ্যেই এসে গেছেন একেবারে। অদূরে আলো মিটমিট করছে, ঘরবাড়ি বলেই তো মালুম হয়।

মাটির পাঁচিল। নিবারণ বলে, বাদাবনের এই রীত। ঘর হোক না হোক, পাঁচিল আগে তুলবে। পাঁচিল তুলে বাস্তুর গণ্ডি ঘিরে নেওয়া। রাতবিরেতে হাওয়া খেতে যেতে ওঁরা যাতে ঢুকে না পড়েন।

প্রমথ ঠাহর করে দেখে বলেন, কিন্তু এটা কি করেছে—সামনের দিকে আলগা কেন অতটা? পাঁচিল দেওয়ার তবে কি ফল হল—যাদের যাবার তারা তো এই পথে ঢুকে পড়বে। যেমন এই আমরা।

নিবারণ বলে, শেষ তুলতে পারেনি খানিকটা এই বাদ রয়ে গেছে। সামনের বার হয়তো শেষ করে ফেলবে। তা বলে ফল কিছু হয়নি, অমন কথা বলবেন না। বাদাবনে যত আছেন, ছপেয়ে জীবকে ভয় করেন সবাই। তা সে জন্তুজানোয়ার হোন, আর জিন-পরীই হোন। গণ্ডি ঘিরে মানুষে ঘাঁটি করে আছে, এগোবার মুখে অনেক বার আগুপিছু করবে।

দু-জনে উঠানের উপর চলে এসেছে। মৃদু কথাবার্তা আসছিল ঘরের ভিতর থেকে, মানুষ দেখে চুপ হয়ে গেল।

কারা এখানে?

আমরা—

আমরা বললে কি বোঝা যায়? আসছ কোথা থেকে? বাড়ি কোথায় তোমাদের?

শিল করতে বেরিয়ে আদালতের চাপরাশি কখনো আত্মপরিচয় দেবে না। দস্তুর এই। শিলের চাপরাশি এসেছে—খবর যেন বাতাসের আগে ছোটে! দেনদার সামাল হয়ে যায়। নিবারণ কাতর স্বরে বলে, পথ-চলতি মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসে পড়েছি। রাতটুকু কাটিয়ে যাব—খেতে চাইনে বাবা, শুধু একটু শুয়ে থাকব।

দয়া হল গৃহকর্তার। দয়া ঠিক বলা চলে না—বাদা অঞ্চলের এই রেওয়াজ। রাত্রিবেলা অতিথ এলে ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না। দিতেই হবে আশ্রয়—নইলে জানোয়ারের মুখে যাবে নাকি সে মানুষ? ঘুরতে ঘুরতে আসেও অনেক মানুষ—ভাগ্য খুঁজতে নতুন যারা জঙ্গলরাজ্যে এসে পড়েছে।

ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে প্রমথ বলেন, কোথায় এসে পড়লাম মালুম হচ্ছে না তো। কোন জায়গা, কার বাড়ি? এ দিকটা এই আমার প্রথম আসা কিনা।

সাঁইতলা ডাক এই জায়গার। অধীনের নাম শ্রীগগনচন্দ্র দাস! নতুন একটা ঘেরি বানিয়েছি বলে সকলে আজকাল ঘেরিদার গগন বলে।

কী সর্বনাশ! প্রমথ ও নিবারণে চোখোচোখি হল। তখন একেবারে ঘরের মধ্যে উঠে পড়েছেন। এবং বাইরে বেরুলেই তো নিবারণ চাপরাশির নাকে পচাগন্ধ আসবে, ও জঙ্গলে নড়াচড়া হবে। নইলে প্রমথ সেই মুহূর্তেই দুড়দাড় ছুটে বেরুতেন।

চক্রবর্তী দেয়াল ঠেশ দিয়ে আধেক চোখ বুজে ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানছিলেন। আর গণ্ডগোল সম্পর্কে নিম্নকণ্ঠে বৈষয়িক উপদেশ দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। মানুষের সাড়া পেয়ে থেমে গিয়েছিলেন। সেই মানুষ দুটো ঘরে উঠে পড়ল তো সোজা হয়ে বসলেন তিনি! প্রমথ ব্রাহ্মণ বলে নিজের মাদুরের প্রান্তের জায়গা দেখিয়ে দিলেন তাঁর। নিবারণ চাপরাশি ঘড়ুয়ের মাদুরে গিয়ে বসল!

হুঁকোর মুখ মুছে চক্রবর্তী প্রমথর দিকে এগিয়ে দিলেন: তামাক ইচ্ছে করুন।

মউজ করে এবারে আলাপ-পরিচয়।

[ক্রমশঃ।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৭

তাড়ুতের প্রতিমা ঝলমল করছে, এ মেয়েটি কে? না, বিয়ে হয়নি তো! কার মেয়ে? আমার নিমাইয়ের সঙ্গে কি মানাবে?

'তোমার বাবার নাম কী?' জিগগেস করলেন শচী দেবী।

'সনাতন মিশ্র।'

'আর তোমার নাম?'

লজ্জায় গলে গেল মেয়েটি। বললে, 'বিষ্ণুপ্রিয়া।'

'বা, বেশ নাম। কী আর আশীর্বাদ করব! সুন্দর বর হোক তোমার। বিষ্ণুর মত বর।'

লজ্জায় আরো মধুর হয়ে উঠল মেয়েটি।

তাকে আশীর্বাদ না করে কি থাকা যায়? যখনই শচী যান গঙ্গাস্নানে, দেখেন মেয়েটিও এসেছে। রোজ রোজ তারও স্নান করা চাই। শচীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই মেয়েটি এগিয়ে আসে, প্রণাম করে নম্র হয়ে। মামুলি বিধিতে নয়, হৃদয়ের ডাক শুনে। কেমন ইচ্ছে করে শচী দেবীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, দুটো মিষ্টি কথা শোনে, একটু বা আদর কুড়োয়। যদি বলেন একটু বা সেবা করে। বড় ভালো লাগে শচী দেবীকে।

আর এগারো বছরের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া যেমনি সুষমার লতিকা তেমনি লজ্জার নবমঞ্জরী। সব চেয়ে বড় কথা, ভক্তিতে ভরপুর। দিনে তিন বার গঙ্গাস্নান করে বালিকা, প্রতিবারই স্নানান্তে পুজা করে তীরে বসে।

ভগবানকে বলা হয়েছে অপবর্গ-বর্ত্ম। তার মানে তাঁর দিকে অগ্রসর হলে পথেই অপবর্গ বা মোক্ষের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু যে ভক্তি করে সে এড়িয়ে যায় মুক্তিকে। মুক্তিতে তার রুচি নেই, স্পৃহা নেই। তার স্পৃহা প্রেমে তার রুচি সেবায়। ভগবান তাকে মোক্ষ দিতে চাইলেও সে নেবেনা। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। তুমি যদি আমাকে মোক্ষ দিয়েই উড়িয়ে দিতে চাও তা বলে আমি দাঁড়াই কোথায়, তোমার সেবা করি কি করে?

এই মেয়েকে ঘরে নিয়ে গেলে কেমন হয়? নিমাইয়ের বউ করে?

'এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা।'

ঘটক কাশী মিশ্রকে ডেকে পাঠালেন শচী। এলে জিগগেস করলেন, 'সনাতন মিশ্রকে চেন?'

'চিনি বৈ কি। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পদবী রাজপণ্ডিত।'

আদান-প্রদানের ঘর। মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল শচীর।

'সম্পন্ন গৃহস্থ। চরিত্রে লোককান্ত। উদার, অকৈতব, সত্যবাদী।' কাশী মিশ্র গুণের ফিরিস্তি খুলে ধরল।

মুখ ম্লান হয়ে গেল শচীর। এত বড় কুলীন, সঙ্গতিমান, সে কি আর আমার মত কাঙালের ঘরে মেয়ে দেবে? পিতৃহীন বালককে কি সে পছন্দ করবে?

তবু মনের কথা ব্যক্ত করল শচী। বললে, 'সনাতনের একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। সুচরিতা, সুশ্রী মেয়ে। তাকে নিমাইয়ের জন্যে এনে দেবে?'

কাশী মিশ্র মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'বড় ইচ্ছে তাকে বউ করে ঘরে নিয়ে আসি।' শচী দেবী বললেন আকুল হয়ে, 'গঙ্গার ঘাটে ওকে দেখে

দেখে ওর উপর ভারি মায়া পড়ে গেছে। দেখলেই ইচ্ছে করে কোলের কাছে টেনে নিই। আদর করি।'

'বড় কঠিন কাজ দিলেন।' কাশী মিশ্র মাথা চুলকোতে লাগল। 'এক নিঃস্ব পরিবারের সঙ্গে কি সনাতন ঘনিষ্ঠ হতে চাইবেন?'

'তবু তুমি দেখো চেষ্টা করে। আমার নিমাই কি তুচ্ছ, অকিঞ্চন?'

দুর্গা বলে রওনা হল কাশী। তাকে দেখে সনাতন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, 'আসুন, আসুন। কী মনে করে?'

আসন গ্রহণ করে কাশী মিশ্র বললে, 'আপনি বিশ্বম্ভর পণ্ডিতকে চেনেন?'

'সে আবার কে?'

'বা, আমাদের নিমাই পণ্ডিত। তার নাম শোনেননি?' চমকে ওঠবার ভাব করল কাশী।

'না, না, নাম শুনেছি। কোন এক কাশ্মীরী পণ্ডিতকে তর্কে হারিয়ে দেবার পর তার নাম খুব ছড়িয়ে পড়েছে। আমার কানেও এসেছে সেকথা।'

'দেখেননি তাকে?'

'নবদ্বীপে কত লোকের বাস, সবাইকে কি আমি দেখেছি?' সনাতন উৎসুক হয়ে বললে, 'কেন দেখতে কি খুব সুন্দর?'

'সে বর্ণনার নয়। বেড়াতে বেড়াতে যাবেন একদিন গঙ্গার ঘাটে, স্বচক্ষে দেখে আসবেন। দেখবার পর কয়েক পা ফিরে এসে আবার যাবেন। ফিরবেন ঘুরবেন আবার যাবেন। শেষে আর সরতে ইচ্ছে করবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'যাব একদিন।' বললেন সনাতন।

'কী চোখে দেখবেন তা আপনিই জানেন।' কাশী মিশ্র উঠে পড়ল: 'কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে যাই। নিমাইয়ের মতন দ্বিতীয় পাত্র নেই নবদ্বীপে।'

কয়েক দিন পরে খবর দেবেন জানালেন সনাতন।

শচী ভাবলেন নিশ্চয়ই সনাতন মত করবে না। নিমাই সহায়সম্বলহীন এক টোলের পণ্ডিত, তাকে কি সনাতনের মত লোক মেয়ে দেয়?

সনাতন দেখলেন নিমাইকে। স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। এ কি মানুষ না দেবতা? দেখেই মনে হয় সমস্ত রূপই তার কৃষ্ণবিলাস, সমস্ত বিদ্যাই তার কৃষ্ণভক্তি।

শুভ ও অশুভ দুই কর্মই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। শুভকর্ম মানে পুণ্য, অশুভকর্ম পাপ। সে কি? পুণ্যও ভক্তির প্রতিকূল? হ্যাঁ, পুণ্য আর পাপ দুইই ভক্তির বিসংবাদী। কেন, পুণ্য কেন? পুণ্য লোকে করে কী আশায়? নিজের সুখের আশায়। পুণ্যের পিছনে শুধু আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির বাসনা। তাই পুণ্য শুধু ছলনা মাত্র। তাই পুণ্য কৃষ্ণভক্তির বাধক। পুণ্যের ফলে যখন সুখভোগ হয় তখন তাতে মত্ত হয়ে পুণ্যবান কৃষ্ণভজনের কথা আর মনে করে না। আর পাপের উদ্দেশ্য তো শুধু ইন্দ্রিয়তর্পণ। আর কিছুতেই তৃপ্তি হয়না। বলেই তো পাপীর যন্ত্রণা। কি করে এই যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাবে তারই জন্যে পাপী থাকে চঞ্চল হয়ে, কৃষ্ণভজনের কথা ভুলে যায়। তাই শুভ ও অশুভ দু রকম কর্মই কৃষ্ণভক্তির বিরুদ্ধ।

নিমাইয়ের সমস্ত দেহ থেকে জ্যোতি গড়িয়ে পড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু এ যেন প্রাকৃত জ্যোতি নয়, চিন্ময় জ্যোতি। যেমন জ্যোতিষ্মান বস্তু তেমনি তার জ্যোতি। সূর্য প্রাকৃত বলে তার জ্যোতিও প্রাকৃত। কিন্তু নিমাই যেন অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু আর তার জ্যোতিও অপ্রাকৃত চিন্ময়। এ যেন এক মায়াতীত অবস্থান।

সনাতনের মনে হল এ-হেন অসামান্য কি আমার মেয়েকে মনোনীত করবে?

বাড়ীতে এসে গৃহিণীকে বললে। বললে, 'মেয়েকে পাত্রস্থ করবার জন্যে পাল্টা ঘর পেয়েছি।'

'পাত্র কে?'

'জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাই।'

'করে কী?'

'প্রকাণ্ড পণ্ডিত।'

'পণ্ডিত? আহা, খুব ভালো। কিন্তু সে কি আমার মেয়েকে পছন্দ করবে?'

তখনকার দিনে ধনবানের চেয়ে বিদ্বানের দাম বেশি। কৌলীন্য কাঞ্চনে নয়, কৌলীন্য পাণ্ডিত্যে। তাই সেদিন, ধনী হয়তো দোলা করে যাচ্ছেন পথে দেখা হল এক পণ্ডিতের সঙ্গে, তক্ষুণি দোলা থেকে নামল ধনী, পণ্ডিতকে বহুমানে নমস্কার করল। তখনকার দিনে বরাসন পণ্ডিতকে, বিত্তশালীকে নয়। পণ্ডিতই অভিজাত। পণ্ডিতই সর্বজয়ী, অভিজিৎ।

কাশী মিশ্রকে খবর দিলেন সনাতন। সনাতন বললে, 'বহু পুণ্যে নিমাইয়ের মতন জামাই মেলে। আপনি শচী দেবীকে গিয়ে বলুন আমরা মেয়ে দিতে রাজি আছি। এখন তিনি যদি নেন কৃপা করে তবে আমাদের নদীয়াবসতি সার্থক হয়।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে নবদ্বীপচন্দ্রের উদয় হল। নবানুরাগে পাগলিনী হল কিশোরী। চতুর্দিকে শ্যামলকে দেখবার জন্যে নবীন মেঘের নীল অঞ্জন চোখে লাগল শ্রীমতীর। কিন্তু দুই চোখে তাকে ধরে রাখতে পারছি কই? মাধুর্যামৃতের সমুদ্র দৃষ্টির কুল ছাপিয়ে উছলে উছলে পড়ছে।

অবিদগ্ধ বিধাতাকে নিন্দা করছে শ্রীমতী। 'অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন, অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।' কোনো কিছুই ভালো করে বুদ্ধি খরচ করে সৃষ্টি করেনি ভগবান। যাকে দেখব সে অন্তহীন সৌন্দর্যের সিন্ধু জেনেও তাকে দেখবার জন্যে মাত্র দুটি নেত্র দিয়েছেন। কোথায় কোটি-কোটি চোখ দেবেন, তা নয়, কৃপণের মত দুটি শুধু চোখ। কৃষ্ণমুখ দর্শন করতে বলে, হায়, দুটি শুধু চোখ দেওয়া। আর এমনই বিধাতা অকুশল, এমনই অনিপুণ, চোখকে আচ্ছাদন করবার জন্যে দিলেন আবার পক্ষ্ম। চোখের পক্ষ্ম যদি না থাকত, যদি পলক না পড়তে পেত, তবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেখতে পারতাম কৃষ্ণকে। বিধাতা নিশ্চয়ই জড়বুদ্ধি, নিতান্তই রসবোধশূন্য। নইলে যে রূপ প্রতিক্ষণে নতুন হচ্ছে তাকে দেখবার জন্যে কিনা এই বিশীর্ণ ব্যবস্থা! কিন্তু কে না জানে কৃষ্ণদর্শন ছাড়া দৃষ্টির তৃপ্তি নেই, নেই বা একবিন্দু সার্থকতা।

না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিল আঁখি দুটি
তাতে দিল নিমেষ আচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সে সৃজন॥

শ্রীমতী বৃন্দাকে বললে, প্রিয়সখি, কোত্থেকে আসছ? বৃন্দা বললে, শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল থেকে। অসৌ কুতঃ? তিনি কোথায়? শ্রীমতী ব্যাকুল হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। বৃন্দা বললে, রাধাকুণ্ডের কাছে নির্জন বনে আছেন। তিনি সেখানে কি করছেন? নাচ শিখছেন। বলো কী! তাঁর নৃত্যশিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা বললে, তুমি। তুমিই তাঁকে নাচাচ্ছ। সে কী কথা? আমি কোথায়? তুমিই তো, তোমার মূর্তিই তো অরণ্যের সমস্ত তরুলতায় পরিস্ফুট। তোমার মূর্তিই তো উত্তম নটীর মতো শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পিছে-পিছে নাচিয়ে-নাচিয়ে ঘুরিয়ে মারছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেদিকে তাকায় সেদিকেই রাধাস্ফূর্তি। হাওয়ায় গাছের শাখা দুলছে, লতা দুলছে, শাখা-লতার ছায়া দুলছে, আর শ্রীকৃষ্ণ ভাবছে—সদানন্দবিধায়িনী রাধিকাই বুঝি নৃত্যপরা। নৃত্যগুরুর অনুকরণে শিক্ষার্থী নট যেমন নাচে তেমনি শ্রীকৃষ্ণও নাচছে তালে-তালে। বাজিকরের ইঙ্গিতে পুতুলের মত।

'রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥'

আমি পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণানন্দ। সমস্তরসাশ্রয়। আমি চিন্ময়, স্বপ্রকাশ। আমাতে কোনো অভাব নেই, অভাব পূরণের জন্যে চাঞ্চল্যের অবকাশও নেই, অথচ দেখ, রাধাপ্রেমের কী অচিন্ত্য শক্তি, আমাকে বিহ্বল করছে, উন্মত্ত করছে, কত অদ্ভুতরূপে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি সর্বনিয়ন্তা হয়েও প্রেমে নিয়ন্ত্রিত। আমি সর্বেশ্বর হয়েও আভীরবালিকার পদপ্রান্তে পড়ে বলি, দেহি পদপল্লবমুদারম্। তার চরণযুগল অলক্তরাগে রঞ্জিত করেছি। সকল ভয়ের ভয়স্বরূপ হয়েও জটিলা-কুটিলার ভয়ে মরি। সত্যস্বরূপ হয়েও ছদ্মবেশ ধরি। গোপপল্লীতে দেয়াশিনী নাপিতানী সেজে কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষে করে বেড়াই।

আর কিছু নয়, একমাত্র প্রেমই আমার পরিচালক। 'কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেম, ভক্তেরে নাচায়।'

বারে বারে গঙ্গাস্নান করতে আসে বিষ্ণুপ্রিয়া, যদি একবার স্থূল চোখে দেখতে পায় তার বরকে, তার গৌরাঙ্গসুন্দরকে। শচীকে দেখতে পেলেই ছুটে আসে কাছটিতে। প্রণাম করে। প্রণাম সারবার পরেও সরে যায় না। অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ স্নেহাঞ্চলচ্ছায়া ছেড়ে যাব কোথায়? যেন বলে, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমার আরাধনার মন্দিরে। আমার চিরজীবনের নিবেদনে।

গণক ঠাকুর চলেছে সনাতনের বাড়ি। পথে নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা।

'এ কি, এত হনহন করে চলেছেন কোথায়?'

'বলো তো কোথায়?' গণক ঠাকুর মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

'তা আমি কী করে জানব!'

'তা তো ঠিকই। যাচ্ছি সনাতন মিশ্রের বাড়ি।'

'সেখানে কেন?'

'তার মেয়ের বিয়ে হবে। বিয়ের দিনক্ষণ লগ্ন ঠিক করতে যাচ্ছি।'

'ভালো কথা।'

নিমাইয়ের কথার সুরটা যেন কেমন লাগল। চলে

যাচ্ছিল, ডাকল তাকে গণক ঠাকুর। বললে, 'মেয়ের বিয়ে কার সঙ্গে হচ্ছে জানো না?'

'কী করে জানব?' নিমাই অবাক মানল।

'সে কি! তোমায় বিয়ে আর তুমিই কিছু জানো না?'

'আমার বিয়ে?' হাসতে লাগল নিমাই। আমার বিয়ে অথচ, কি আশ্চর্য, আমি কিছুই জানিনা!' চলে গেল হাসতে হাসতে

গণকের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সনাতনের বাড়িতে পৌঁছে নিরুদ্যমের মত বসে রইল চুপচাপ।

সনাতন বললে, 'পাঁজি-পুঁথি দেখুন। লগ্ন স্থির করুন।'

ম্লানমুখে গণক বললে, 'এই খানিক আগে পথে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা হল'—

'সত্যি?' উৎসাহিত হন সনাতন। 'কথা হল?'

'হল।'

'কী বললে নিমাই?'

'যা বলল তাতে মনে হল এ বিয়েতে তার মত নেই। বিয়ের কোনো খবরই সে রাখেনা। আকাশ থেকে পড়ল বিয়ের কথা শুনে। তার মানেই এ মেয়েতে মন উঠছে না। গণক আরো ব্যাখ্যা জুড়ল: 'বিয়েতে যে মত নেই এ ভাবে পরোক্ষ ব্যক্ত করাটাই বোধহয় সম্ভ্রান্ত।'

মাথায় হাত দিয়ে মুখ নামিয়ে বসল সনাতন। নিমাই এখন বড় হয়েছে, তার নিজের স্বাধীন মত থাকাটাই তো স্বাভাবিক। শচী দেবীর প্রতিশ্রুতির দাম কী! ছেলের মতই প্রবল হবে। আর, ছেলের যখন মত নেই তখন এ বিয়ে আর হলনা।

অন্তঃপুরে খবর পাঠাল সনাতন। গৃহিণী কাঁদতে বসল। আর বিষ্ণুপ্রিয়া? মলিন মৌনে নিমগ্ন হয়ে গেল। কী হবে আর গঙ্গাস্নানে, কী হবে ঠাকুরঘরে দিন কাটিয়ে? কী হবে বা দেখা দিয়ে শচী দেবীকে? তার দিকে চাইবার আর চোখ কোথায়! হায়, বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলাম, বালি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে চেয়েছিলাম সমুদ্র বাঁধতে!

এর প্রতিকার কী? সনাতন পথ খুঁজে পেলনা। আত্মীয়বন্ধুরা বললে, এর কোনো প্রতিকার নেই। শচী দেবীকে মোকাবিলা করেও লাভ হবেনা। নিমাই তেজীয়ান পুরুষ, তার মতের স্বাতন্ত্র্য আছে, আর সে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার নয়।

সনাতনের সমস্ত সংসার শোকশয্যা নিল।

কে একজন অতিথি এল সনাতনের ঘরে। বললে, 'আমি নিমাইয়ের কাছ থেকে আসছি। আমাকে নিমাই পাঠিয়েছে।'

'কেন? কী খবর?' উঠে বসল সনাতন।

'সে বলে পাঠিয়েছে বিয়ের উদ্যোগ করুন।'

'সত্যি?' সনাতন দাঁড়িয়ে পড়ল। তবে যে শুনেছিলাম'—

'ভুল শুনেছিলেন। শচী দেবী যে নিমাইয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছেন তা তখনো নিমাইকে জানাননি শচী দেবী। তাই গণক ঠাকুরকে অমনি করে বলেছিল নিমাই।'

'এখন বুঝি জানতে পেরেছে?' ঢোঁক গিলল সনাতন: 'কিন্তু তার তো একটা স্বতন্ত্র মত আছে?'

'না, নেই।' আগন্তুক বললে, 'তার মায়ের মতই তার মত। নিমাই তার মায়ের আজ্ঞাবহ। তার মা যা স্থির করেছেন তাই সে আনন্দে নেবে মাথা পেতে। সুতরাং আবার ডাকুন গণক ঠাকুরকে। দিনক্ষণ ঠিক করুন।'

সনাতনের গৃহিণী উলু দিয়ে উঠল।

আর বিষ্ণুপ্রিয়া? সে শুধু বাঁশি শুনছে, আর কিছুই তার কানের মধ্যে ঢুকছে না। 'আন কথা নাহি শোনে কান।' সে বাঁশির শব্দ একবার যার কানে ঢুকেছে আর কোনো শব্দই পথ পায় না সেখানে। অবিচ্ছিন্ন সেই বাঁশির স্বরেই কান ভরে থাকে। যদি বাঁশি স্তব্ধ হয় ধ্বনি স্তব্ধ হয় না। যদি অন্য শব্দ হয়, তবুও সেই শব্দে সেই বংশীধ্বনিই বেজে চলে। শব্দে-অশব্দে শুধু এক নাম, শ্রীগৌরাঙ্গ।

শুনেছেও গৌর বলছেও গৌর। গৌর ছাড়া মুখে কথা নেই। মনে ভাবনা নেই। চোখে স্বপ্ন নেই। বুকে নিশ্বাস নেই।

আমি গৌরগতচিত্ত। গৌরপাদপদ্মই আমার প্রাণধন।

নিমাইয়ের সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছে এ খবর রাষ্ট্র হতেই সমস্ত নবদ্বীপ মেতে উঠল। কায়স্থ জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ বললে, 'এ বিয়েতে যত খরচ লাগে, আমি দেব।'

মুকুন্দসঞ্জয়, যার বাড়িতে নিমাইয়ের টোল, বললে, 'না, সব আপনি দেবেন কেন? ব্যয়ভারের কিছু অংশ আমি নেব।'

নিমাইয়ের পড়ুয়ারা বললে, 'আমরাও হাত গুটিয়ে থাকব না।'

[ক্রমশঃ।

পত্রগুচ্ছ
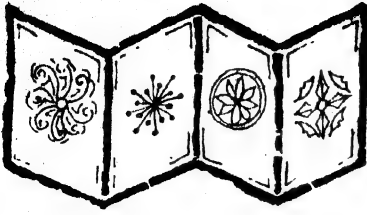
ফিটজেরাল্ডের প্রথম উপন্যাস

[বিখ্যাত মার্কিণ ঔপন্যাসিক এফ, স্কট ফিটজেরাল্ড প্রথম জীবনে মার্কিণ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর (১৯১৭ সালে) প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশক স্ক্রিবনারের দ্বারস্থ। সেই উপন্যাস সম্পর্কে সানি লেসলির কয়েকটি পত্র-বিনিময় হয়েছিল। এখানে তার দুখানা চিঠি প্রকাশ করা হল।]

১৭নং ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার, ক্যাম্পমোরিডান

প্রিয় মিঃ লেসলি,

এই সঙ্গে ষোড়শ অধ্যায় 'দি ডেভিল' এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠালাম। গল্পটা না জেনেও আপনি যাতে বিষয়টা বুঝতে পারেন, সেই জন্যই আমি এই অধ্যায় দুটো মনোনীত করেছি। আশা করি আপনি এটা পড়ে আপনার মতামত জানাবেন। দ্রুততায় এবং ষ্টাইলের সামান্যতায় এটা আধা নভেল গোছের।

এখন আমি এক সপ্তাহের ছুটিতে আছি। বইটা নতুন করে লেখবার জন্য প্রিন্সটনে যাচ্ছি; ওয়াশিংটন দিয়া যাবার সময় ৭ই অথবা ৮ই অথবা ৯ই ফেব্রুয়ারী আমি এই নভেল সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দেখা করব। ঐ তিন দিনের মধ্যে কবে আপনাকে বিকেলবেলায় একলা পাওয়া যাবে জানাবেন কি? আমার পক্ষে ওর যে কোন দিনই সুবিধাজনক হবে। আপনাকে দেখাবার জন্য আমি উপন্যাসের গোটা ছ'য়েক অধ্যায় নিয়ে যাব। স্ক্রিবনার এই বই ছাপবে কিনা সেটা আপনার কাছে জানতে চাই।

সব জিনিষ যখন থেকে সুরু হয়, এই নভেলেরও সুরু সেখান থেকে এবং সব কিছু যেখানে শেষ হয়, এই নভেলেরও শেষ সেই যুদ্ধে। ত্রয়োদশ অধ্যায় আলাদা ভাবে পড়লে খাপছাড়া লাগবে। ২৬শে সোমবার আমি যাত্রা করছি। তারপর আমার ঠিকানা হবে—কটেজ ক্লাব, প্রিন্সটন।

কোন দিন বিকেল বেলায় আমার সঙ্গে দেখা করা আপনার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক হবে, সেটা জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

বিশ্বস্ত

এফ, স্কট ফিটজেরাল্ড

একটা অদ্ভুত মিল আপনার নজরে পড়েছে কি? বার্ণার্ড শ'র বয়স ৬১ বছর, এইচ জি ওয়েলস-এর ৫১, জি-কে-চেষ্টারটনের ৪১, আপনার ৩১ আর আমার ২১। বিশ্বের সমস্ত বড় বড় লেখকই গাণিতিক অগ্রগতির পথে রয়েছেন।

এফ-এস-এফ

(২)

৪৫নং ইন্‌ফ ক্যাম্প গর্ডন পা

৮ই মে, ১৯১৮

প্রিয় মিঃ লেসলি,

আপনার পত্র আমার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য বিষয়ক আবেগ সৃষ্টি করেছে···আমার প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে আপনিই প্রথম মতামত প্রকাশ করেছেন।

এটা যে অসংস্কৃত এবং কোথাও কোথাও অবিশ্বাস্য রকমের স্থূল সেকথা অপ্রিয় হলেও সত্য। কেন যে আমি প্রথম ভাগে শৈশবের একঘেয়েমি নিয়ে আবল তাবল বকেছি, তা বুঝতে পারি না। দুষ্ট এপেণ্ডিসাইটাসের মত ওটা কেটে উড়িয়ে দিলেই ভাল হয়। —প্রিন্সটনের অংশে বড় বেশি চরিত্র আমদানী করা হয়েছে এবং বড় বেশি স্থানীয় সামাজিক রীতিনীতির বর্ণনা করা হয়েছে।

যাই হোক, আপনার আগ্রহের জন্য এবং স্ক্রিবনারের কাছে অমন চমৎকার একখানা চিঠি লিখে দেবার জন্য আমি অত্যন্ত বাধিত হয়েছি। সে যদি মনে করে বইখানা সংশোধন করলে প্রকাশের উপযোগী হবে, তাহলে আমি তাই করব। আর যদি সে অপছন্দ করে, তাহলে আমাকে কোনকম রক্ষণশীল প্রকাশকের দ্বারস্থ হতে হবে।

আপনি কি মার্টিন লুথারের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত আছেন? তরুণ চরিত্র নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখুন। "চেঞ্জিং উইণ্ডো"র বাসি স্বাদ ভুলিয়ে দিন। অথবা আধ-ছদ্মবেশী একখানা আত্ম-জীবনী লিখুন।

আমি বইয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠছি কিন্তু একখানাও পাচ্ছি না। বিশেষ ধরণের উপন্যাসের ক্ষুধা মেটাবার জন্য আমি আমার উপন্যাস লিখেছি (ষ্টিভেনসন যেমন লিখেছিলেন ট্রেজার আইল্যাণ্ড)। পাঁচ বছর আগেকার নভেল (টোনো বাঙ্গি, ইউথস্ এনকাউণ্টার, ম্যান এলাইভ, দি নিউ ম্যাকিয়াভেলি) সব গেল কোথায়? যুদ্ধ কি সমস্ত সাহিত্যকে গল্স্‌ওয়ার্থী ও জর্জ মুরের বেড়াজালে আটক করেছে······

ভগবান করুন, সেণ্ট রবার্ট (বেনসন) স্বপ্নে স্ক্রিবনারের চোখে ধরা পড়ুন।

বিশ্বস্ত

এফ, স্কট ফিটজেরাল্ড

মধুসূদনের ইংরেজী পত্রাবলী হইতে

[মাদ্রাজ হইতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাককে ইংরেজী ভাষায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন. সেই পত্র হইতে কিছু অংশ নিয়ে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হইল]

"আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের ছাত্র অপেক্ষাও অধিক কার্য্যে ব্যস্ত। আমার কর্ম্মসূচী এইরূপ—সকাল ৬ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত হীব্রু ; ৮ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য ; বেলা ১২ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তেলেগু এবং সংস্কৃত ; অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত ল্যাটিন ; এবং ৭ ঘটিকার পর হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইংরাজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না ?"

[১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সাই-এ থাকাকালীন মাইকেল মধুসূদন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে অনুবাদ করা হইল]

"হে আমার পরম বন্ধু, আপনি মনে করিবেন না যে আমি আলস্যে দিন অতিবাহিত করিতেছি। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষাকে আমি আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছি—এক্ষণে জার্মাণ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, এই ভাষাগুলি কোন শিক্ষকের সাহায্য না লইয়াই শিক্ষা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি—ইহার পর স্পেনের কিম্বা পর্ত্তুগালের সাহিত্যে প্রবেশে আর বাধা থাকিবে না।

"—লোকে যাকে বলে দেশাচার আমি তার শত্রু।—আমি জগৎকে একটা নূতন কিছু শিক্ষাদান করিতে চাহি। ইহাতে তুমি বিরূপ হইও না। দেখ, আমি অমিত্রচ্ছন্দেই এক 'সনেট' লিখিয়াছি। ইহা কি অসাধারণ পরীক্ষা নহে ? উহার দৃশ্য শনিগ্রহে ; কারণ, পার্থিব পদার্থমাত্রকেই আমি ঘৃণা করি।"

[—মধুসূদনের ১৭।১৮ বৎসর বয়সের রচনা]

"তোমরা 'রামনারায়ণে অনুবাদ' বলিয়া যাহা বুঝিয়া থাক, তাহা আমাকে নিরাশ করিয়াছে। আমি তাহার সাহায্য লইব না বলিয়া স্থির করিয়াছি। আমাকে চলিতে হইলে নিজের পায়ের উপর ভর করিয়াই চলিতে হইবে। যদি পড়িতে হয়, তবে নিজেকেই পড়িতে হইবে। আমার লেখার পংক্তিগুলি আমূল পরিবর্ত্তনের অধিকার রামনারায়ণকে দিই নাই—কখনই তাহা দিই নাই। আমি রামনারায়ণকে দিয়া কেবল আমার লেখার কোন ব্যাকরণ ভুল থাকিলে ঐ সমস্ত সংশোধন করিতেই চাহিয়াছিলাম। তুমি জান, মানুষের রচনানীতির মধ্যে তাহার মন-প্রাণের প্রতিবিম্বটাই পড়ে। তোমাকে বলিতে কি, আমাদের বন্ধুর সঙ্গে এই অধমের কোন দিক থেকেই কোন কিছুরই মিল নাই। তবে আমি তাঁহার কয়েকটি সংশোধন গ্রহণ করিব।"

[১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ]

"মনে রাখিও, আমি এই নাটক এমন সকল লোকের জন্যই লিখিয়াছি, যাহারা আমার ভাবেরই ভাবুক ; যাহারা ন্যূনাধিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য নিয়মেই চিন্তা করে। প্রাচীন সংস্কৃতি-আদর্শের দাসত্বশীল অনুসরণ হইতে আমাদের চিন্তা শক্তির চরণে যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, উহাকে সর্ব্বপ্রথমে দূর করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"তোমাকে বলিয়া রাখি, ইহাতে বেশী আশঙ্কারও কারণ নাই—এই নাটকে আমি তোমার প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিব।"

[গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ।]

"আমি রক্তের আস্বাদ পাইয়াছি। আমি পুনরায় আর একটি নাটক রচনায় লাগিয়া গিয়াছি।

"আমি জানি বন্ধু যে আমার এই নাটকে কিছু না কিছু বিদেশী ছায়া থাকিবেই। কিন্তু ভাষা যদি বিশুদ্ধ হয়, ভাব যদি অনার্য্য এবং প্রাঞ্জল হয়, উহার ঘটনা যদি চিত্তাকর্ষক হয়। চরিত্রাঙ্কন যদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার মধ্যে বিদেশী আবহাওয়া থাকিলেই বা কি আসে যায় ? মুরের কবিতায় প্রাচ্যভাবের আধিক্য বলিয়া, বায়রণের কবিতায় এশিয়ার বাতাস আছে বলিয়া, কিম্বা কার্লাইলের লেখায় জর্মণী ভঙ্গী আছে বলিয়া কি কেহ অশ্রদ্ধা করে ?"

[—গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রাংশ]

"তুমি জান, এখনও জাতীয় থিয়েটার বলিয়া কোন সংস্থা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অর্থাৎ এখনও আমরা যথেষ্ট সংখ্যায় নাটক, সুস্থির শিল্প আদর্শের এবং উন্নত আদর্শের নাটকই রচনা করিতে পারি নাই—যাহাতে দেশের সুরুচি গঠন এবং পরিচালনা করিতে পারে। আমাদের এখনও প্রহসন রচনা করার সময় আসে নাই।"

— রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ]

"তিলোত্তমা শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, তাহা কয়জন পাঠ করিবে ? দুঃখের বিষয়, তুমি এখন কলিকাতায় নাই। তুমি কলিকাতায় থাকিলে এ বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা না দেওয়াইয়া ছাড়িতাম না।···আমার আশঙ্কা হইতেছে, তুমি উহার লেখার ধরণ কঠিন বলিয়াই মনে করিবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি কখনও জবরদস্ত হইবার জন্য চেষ্টাই করি না। যেমন বর্ত্তমানকালের অধিকাংশ অ-রসিকেরা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া থাকেন সাহিত্যের এই নবচেতনার যুগে। শব্দগুলি অযাচিত ভাবে, যেন স্রোতের মতই ভাসিয়া আসে—উহাকে 'অন্তরাদেশ' নাম দিতে পারি। প্রকৃত অমিত্রচ্ছন্দকে তিনি ইংরেজী গৌরবেই মনুষ্যচিত্ত আকর্ষণ করা চাই এবং অমিত্রচ্ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি যিনি তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা "কঠিন" কবি বলিয়াও অভিহিত করা যায়—আমি মিল্টনের কথাই বলিতেছি। ভার্জিল বা হোমার—সরল কবি বলিতে যাহা বুঝিতে পারা যায়, ইহাদের কেহই তাহা নহেন। যাহাই হউক, তুমি বন্ধুর প্রথম কবিতার বহু দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। আমি খেলার ছলে কবিতাটি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, উহাতে এমন কিছু করিয়া বসিয়াছি, যাহাতে আমাদের কাব্য সাহিত্যকে উন্নতির দিকে একটা প্রবল প্রেরণাই দিতে সক্ষম হইবে। অন্ততঃ উহা ভবিষ্যতের বাংলার কবিগণকে কৃষ্ণনগরের সেই ব্যক্তির (ভারতচন্দ্র।) কণ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটা সুরেই শিক্ষা

তিনি এদেশে একটা স্বতন্ত্র রকমের কাব্য প্রণালীরই জন্মদাতা, যদিও তাঁহার প্রতিভা ছিল সুন্দর।"

[—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাংশ]

"আমি আরও তিন চারিটি 'ক্লাসিক' আদর্শের নাটক রচনা করিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে আমার দেশবাসী বুঝিতে পারে উন্নত নাট্যসাহিত্য কাহাকে বলা যায়। ইহার পরেই ঐতিহাসিক এবং অন্য বিষয়ে হাত দিব। তুমি 'জাতীয় কাব্য' রচনার পক্ষে যে বিষয়টির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, বলিতে পারি, উহা সুন্দর, অতি সুন্দর! কিন্তু আমার এখনও সন্দেহ আছে, উহাকে গ্রহণ করিবার উপযোগী শিল্পশক্তি আমার জন্মিয়াছে কি না। তোমাকে আরও কয়েকটি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে আমি আমার প্রিয় ইন্দ্রজিতের মৃত্যুগান রচনা করিতে যাইতেছি। ভয় নাই বন্ধু, আমি পাঠকবর্গকে 'বীররসে' আক্রান্ত করিতে যাইব না। আমাকে এইরূপে আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করিতে দাও। আমার হাত পাকা হউক।"

[—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাংশ]

—"ইন্দ্রজিৎ মহৎ, কিন্তু তাই বিভীষণের জন্য তিনি বানরসৈন্যকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। কবিগুরু যদি তাঁহার রামচন্দ্রকে কেবল কতকগুলি মনুষ্য-অনুচর দিতেন, তাহা হইলে মেঘনাদের মৃত্যুতে ইলিয়ডের মত মহাকাব্য রচনা করিতে সক্ষম হইতাম।"

[রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ]

"আমি আশা করি মেঘনাদবধ কাব্যে যতদূর সম্ভব হিন্দুর মহনীয় আদর্শের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। আমি তোমার নিকট কিছু গোপন করিতে চাহি না, যাহাতে তুমি কখনই চলিতে পারিবে না—যাহা আমি বলি মেঘনাদ একটা মহিমাময় কাব্য হইতে চলিয়াছে। ইহার অমিত্রচ্ছন্দও সঙ্গীতের তত্ত্বকে অপূর্ব্ব ভাবেই আয়ত্ত করিতেছে। আমার এই ছন্দ যেমন ভার্জিলের ছন্দের মতই মধুরতায় বহিয়া চলিয়াছে। তেমন সরল এবং কোমল ভাবাকেও অবলম্বন করিতেছে। তুমি এই কাব্যের মধ্যে 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র সেই দুর্দান্ত সমুন্নতি আর দেখিতে পাইবে না।"

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

"তোমার নিকট গোপন করিব না, এই কাব্যের শুভবিশেষ আমার হৃদয়কে আত্মশ্লাঘাতেই পূর্ণ করিয়াছে। হে আমার বন্ধু, আমার মাতৃভাষা আমার হস্তে এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার দিবেন বলিয়া তো কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। আমার মধ্যে চিন্তা এবং কল্পনার উদ্রেক মাত্রই যেন ভাষা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—এমন সমস্ত কাণ্ড, যাহা কখনও জানিতাম না বলিয়াই মনে করি নাই। ইহা একটা গভীর রহস্য—তোমাকে বলিলাম।"

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

"যে কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে, যে কবি কোমল-মধুর এবং করুণ রসে মনুষ্যের হৃদয়কে সমুন্নত ভাবলোকে উন্নীত করিতে পারে, সে কবির তরণী কালস্রোতে আপনার বৈজয়ন্তী উড়াইয়া চলিয়া যায়। পাঠক সমাজ একত্র হইয়াই সে কবিকে প্রীতি—পূজার অর্ঘ দান করে। সংস্কৃতের কালিদাস, লাটিনের ভার্জিল এবং ইটালীর ট্যাসোর দিকে চাহিয়া দেখ—আমার বিশ্বাস, ইংরাজী-সাহিত্যে ইঁহাদের সমকক্ষ একজন কবিও নাই। ইংলণ্ডের মিল্‌টন মহত্তর জীব। তাঁহার নিজের শয়তানের মতই মিল্‌টন উচ্চতম ভাবে ভরপুর। কিন্তু 'মধুর' বলিতে যাহা বুঝায়, মিল্‌টনে তাহার লেশ মাত্র নাই। মিল্‌টন—মনুষ্যের চিত্তকে উচ্চতম ভাব শিখরে তুলিয়া ধরিতে পারেন ; কিন্তু মনুষ্য হৃদয়কে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন না বলিলেই হয়। উহার ফল কি হইয়াছে! মিলটনের নাম পরম উজ্জ্বল হইয়া আছে—কিন্তু তাহার পাঠকসংখ্যা কত পরিমিত। মিলটন তাঁহার শয়তানের মতই অতুলনীয়। আমাদের স্বীকার করিতেই হয় যে, মিলটন সম্পূর্ণ উন্নত ক্ষেত্রের জীব—কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত যোগাযোগ নাই। তাঁহার স্বর্গীয় কণ্ঠগীতি আমরা ভয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত দেহে শুনিতে থাকি, যেন গভীর বনের নির্জ্জন গুহা হইতে সিংহের গর্জ্জন কানে আসিতেছে।"

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

"আমার কাব্য পাঠ করিতে প্রথমতঃ দেখিবে উহার চিন্তাধারা ; দ্বিতীয়তঃ, যে ভাষায় ভাব এবং চিন্তাধারা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বাক্যশ্লোকের গতি এবং উদ্দেশ্য। সমগ্রের ক্রটিফলের জন্য চিন্তাই করিও না—কাল উহার বিচার করিবে। যদি আমি উক্ত সকল দিকেই সাফল্যলাভ করিয়া থাকি, অর্থাৎ যদি গ্রন্থটিতে প্রকৃত কবিত্ব থাকে, ভাবমধুর এবং বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি উহার ভাষার মধ্যে প্রকৃত সঙ্গীত থাকে, তবে বন্ধুগণের উহার জন্য চিন্তিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আজ না হয়, না হয় ত্রিশ বৎসর পরে আমার কাব্য স্বীকৃতি পাইবেই।"

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

"আমি জগৎসিংহকে ইতিহাসে যেমন পাইয়াছি, তেমনি করিয়াছি—ক্ষুদ্রচেতা এবং বিলাসী ব্যক্তি। ভীমসিংহ বিষণ্ণ প্রকৃতি এবং গম্ভীর চরিত্রের লোক ; রাণা ভীমসিংহের মহিষীও তাঁহার মতই বিষণ্ণ চরিত্র এবং গম্ভীর না হইয়া পারেন না।"

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

"ইহা যখন বিবাদান্ত নাটক, আমি কেবল হাস্যরসের উদ্রেকের উদ্দেশ্যে কোন দৃশ্যের অবতারণা করি নাই। উহাতে নাটকটির স্থায়ীভাব বিনষ্ট করিত। কিন্তু চলিবার পথে যখন কোন হাস্যকর কথা সহজে আসিয়া গিয়াছে, তাহাকেও উপেক্ষা করি নাই। এ বিষয়ে আমার উপদেশ এই হইতে পারে যে বিয়োগান্ত নাটকে ইচ্ছা করিয়াই হাসি তুলিবার চেষ্টা করিও না, তবে যদি কোন হাসির কথা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তা' হইলে গৌণ দৃশ্যগুলিতে উহাকে উপেক্ষাও করিবে না, উহাতে বরং একটা আনন্দজনক বৈচিত্র্যই আসিবে। সেক্সপীয়রের তাহাই ছিল প্রণালী। তাঁহার শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটকগুলিতে সেক্সপীয়র কখনও ইচ্ছা করিয়া হাস্যরসিক হইতে যান নাই।"

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

"প্রিয় কি, আমি এখানে তোমাকে বলিতে চাহি, আশা করি তুমি আমাকে অনুমোদন করিবে। আমরা এসিয়াটিক জাতি,

ইউরোপীয়দের চাইতে আমরা ভাবপ্রবণ। তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেক্সপীয়রের মহিমময় নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি প্রদান কর। 'Mid-Summer Night's Dream' এবং 'রোমিও জুলিয়েট' ও অপর দুই একটা ব্যতীত এমন নাটক নাই যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 'রোমান্টিক' বলা যায়। রোমান্টিক কি না, যে ভাবে 'শকুন্তলা' রোমান্টিক। উচ্চশ্রেণীর ইউরোপীয় নাটকে তুমি মনুষ্যজীবনের কঠোর সত্যসমূহের চিন্তাধারা দেখিতে পাইবে, সমুন্নত ভাবুকতা এবং ভাবধর্মী বীরাচারই পূর্ণ পরিমাণে পাইবে। আমাদের মধ্যে কেবল মধুরতা, কেবল কোমলতা, কেবল 'রোমান্স' আমরা জগতের সত্যমূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া কেবল পরীরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেই লাগিয়া আছি। এদেশে প্রকৃত নাটক এখন সামান্যমাত্রও উন্নতি কিম্বা পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের কাব্য নাটকীয়। এমন কি আমাদের প্রাচীন ভাষার বিদেশী সমর্থক মিঃ উইলসনও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।"

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

"শর্ম্মিষ্ঠা নাটকে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কবির ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, কবিত্বের অনুরোধে আমি সত্যকে বিস্মৃত হইয়াছি। বর্ত্তমান নাটকে আমি নিজের দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমি কবিত্বের জন্য চারিদিক খোঁজ করিয়া চলিব' না—অবশ্য আপনা আপনি আসিয়া পড়িলে আমি উহাকে ছাড়িয়াও যাইব না। তবে, ঐভাবে চলিতে গিয়া কবিত্বের সঙ্গে অনেকবার দেখা পাইব, আশা করি। আমি এমন সকল চরিত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব, যাহারা স্বাভাবিক ভাবেই কথা কয়, কেবল কবিত্ব রূপ চাতেই চায় না। সেক্সপীয়ারের উহাই ত আদর্শ ছিল।"

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

"হে বন্ধু বিশ্বাস কর, আমাদের বাংলা ভাষা সত্যই অতি সুন্দর। প্রতিভাবান লোক কর্ত্তৃক সংস্কার সাধন মাত্র ইহার প্রয়োজন। আমাদের শৈশবের শিক্ষার খুঁত থাকার জন্য ইহার সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানিতাম। এবং উহা অবজ্ঞা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভুল। বাংলা ভাষায় বৃহৎ ভাষার উপাদানগুলি সমস্তই রহিয়াছে। আমি আশা করি, উহার উন্নতি বিধানে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু তুমি অবগত আছ যে সাহিত্যিকের জীবন যাপন করার জন্য যে অর্থ ও সামর্থ্যের প্রয়োজন আমার তাহা নাই। আমি দরিদ্র এবং সর্ব্বদা দারিদ্র্যতা বরণেই গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকি। এ দেশে টাকা ব্যতীত কোন সম্মান নাই। তোমার যদি টাকা থাকে তাহা হইলেই তুমি বড় মানুষ, যদি টাকা না থাকে তবে কেহই গ্রাহ্য করিবে না। এ জাতি এখনও অধম অবস্থা অতিক্রম করে নাই। এ দেশে বড়লোক কে? চোরবাগান এবং বড়বাজারের অস্তিত্বহীন ব্যক্তিসমূহ। টাকা চাই ভাই, টাকা। যদি মনে কর, আমি সাহিত্যে কিছু করিয়া যাইতে পারিতাম আমার শক্তি ছিল। কিন্তু আমি অবস্থাগতিকে শক্তিকে চূড়ান্ত ভাবে কাজে লাগাইতে পারিলাম না। আমি যাহা করিয়া গেলাম, হে আমার স্বদেশ, উহাতেই সন্তুষ্ট হও।"

[ভার্সাই হইতে গৌরদাস বসাককে লিখিত]

"আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়া রাখ, অমিত্রচ্ছন্দ বঙ্গভাষায় মহীয়ান হইবে। কালে, আধুনিক ইউরোপীয়দের ন্যায়। আমরা প্রাচীন 'ক্লাসিক' কবিগণকে অতিক্রম করিতে পারি বা না পারি, অন্ততঃ তাহাদের সমকক্ষ হইব। আমাদের সাহিত্যে ইদানীং এমন সকল লোকের প্রয়োজন, যাহাদের প্রাণে উন্মাদনা আছে, যাহারা উৎসাহের সহিত 'তপঃখেদ' বরণ করিতে পারে। নিজেদের মধ্যে যদি প্রতিভা না থাকে, আমরা অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়াই যাই। কখনও কি ম্যাকভিলির নাম শুনিয়াছ? ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার রচিত 'গরবোডাক' নাটকই প্রথমতঃ ইংরাজী অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন করে—পরবর্ত্তীকালে সেক্সপীয়র যে ছন্দকে মহীয়ান করিয়াছেন। বাত্তি আলো—আলো ভাই, নিজে জ্বালিয়া যাও। ইহাই আমার আদর্শ।"

নদীটি এখন শান্ত

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীটি এখন শান্ত : পাশে ক্লান্ত এলায়িত বালিয়াড়ি চর,
সারা দেহে আঁকাবাঁকা, কী অধীর পরিণত বয়সের রেখা,
সমুদ্র-সঙ্গম স্বপ্নে অনর্থক কল্পনার প্রভূত-বছর—
কান্নার করুণ-পথে কেটে গেছে প্রণয়ীর প্রিয় রূপ দেখা।

আজো সে সমুদ্র খোঁজে, ধ্যান করে লজ্জায় আরক্ত-রঞ্জন,
এখনো সে উন্মুখ, রূপের গরবে অন্ধ, উচ্ছল-ফেনিল-মদির,
নিঃশব্দে মর্মর তোলে লোভনীয় প্রেমাশ্রুর মায়াবী-অঞ্জন
পরস্পর ঢেউ হবে, এই স্বপ্নে আজীবন ব্যাপক—গভীর।

অথচ বিচ্ছেদ-নদী ভাবেনি অন্তরে বুঝি এত ক্লান্ত এত ক্লান্ত সে,
কোমল পীতাভ দেহে বাঁচার আনন্দ কত না পেয়ে জীবনসীমায়,
সারা গায়ে শীতস্রোত নিমীলিত প্রদোষের স্মৃতিকে কাঁপায় ;
পারে না পাগল হতে অভিলাষী জীবনের ঘটনা-বিশেষ।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

এর পর আরও কয়েকটি দিবস অতিবাহিত হয়ে গেল। আমাদের বেতনভুক গোয়েন্দারা কলিকাতা ও হাওড়ার বহুস্থানে গিয়ে খোকা ও কেষ্ট বাবুর জন্য খোঁজাখুঁজি করলো, কিন্তু তাদের গোপন আস্তানা সম্বন্ধে তারা কোনও সংবাদই সংগ্রহ করে উঠতে পারলো না। হঠাৎ এই সময় আমার থাঁদার বন্ধু হরিপদর নামটি মনে পড়লো। সাক্ষী দেবেনের মুখে এই হরিপদ সরকারের নাম আমরা ইতিপূর্ব্বে শুনেছিলাম। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, সকাল সাতটার সময় আমরা হরিপদ বাবুকে লোক মারফৎ ডাকিয়ে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলাম। হরিপদ থাঁদার ও কেষ্টোর গ্রেপ্তারের জন্য আমাদের সাহায্য করতে দুইটি বিশেষ সর্ত্তে রাজী হয়েছিল। তার প্রথম সর্ত্ত ছিল এই যে, যদি প্রয়োজন হয় তো খোকা বাবুর গ্রেপ্তারের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত তাকে থানায় আশ্রয় দিতে হবে। তার দ্বিতীয় সর্ত্ত ছিল এই যে, সদাসর্ব্বদা তার সঙ্গে একজন সশস্ত্র সিপাহীকে তার দেহরক্ষী করে নিযুক্ত করতে হবে। আমরা তার এই উভয় সর্ত্তেই রাজী হওয়ায় সে এই মামলার তদন্তে সাফল্যের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতে সম্মত হয়েছিল। এই সময় আমি আমার কোয়ার্টারে একাই বসবাস করতাম। আমার অনুরোধে হরিপদ বাবু এই দিনই তাঁর বিছানাপত্র-সহ আমার কোয়ার্টারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে আহার করতেন এবং সারারাত্র আমাদের সঙ্গে আসামীদের সন্ধানে হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতেন।

আরও দিন দশেক এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা ইন্সপেক্টার সুনীল রায়ের সঙ্গে এই মামলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। সুনীল বাবু আমাদের খুনের রাত্রের এক ঘটিকার সময়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর মতে এই খুনের পারিবেশিক প্রমাণের জন্য এই রাত্রি এক ঘটিকা সময়টির মূল্য অসাধারণ। এই রাত্রে এক ঘটিকায় খোকা মলিনাকে নিতে আসে এবং এই রাত্রি এক ঘটিকাতে গোপীও ডলির বাড়ী ফিরে আসে। ইন্সপেক্টার এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রমাণের কথা আমাদের বুঝিয়ে বলছিলেন, এমন সময় কুমরটুলী অঞ্চল হতে জন দশ বারো লোক হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে জানালো যে, খোকাকে তারা ওখানেতে সেই মেথরগলির খুনের জায়গাটার দিক হতে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। থানার বাইরে বড়রাস্তার উপর সশস্ত্র সিপাহী সহ লরীটা তৈরী করে রাখা ছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ সেই লরীটাতে উঠে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুমরটুলীতে এসে উপস্থিত হলাম। সেইখানে তখন পথচারীরা ভীত হয়ে ইতস্তত ছুটা-ছুটি করছিল। ইতিমধ্যে সেখানকার বাসিন্দারা আতঙ্কে তাদের বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুসন্ধানে আমরা জানলাম যে, খোকা তার খুনের জায়গাটিতে তো এসেছিলই, তা ছাড়া স তাদের কৃপানাথ লেনের বাসা-বাড়ীতে এসে সেখানকার সাক্ষী ও সাক্ষিনীদেরও ধমকা-ধমকি করেও গিয়েছে। আমরা কিন্তু সারা রাত্রি ধরে কুমরটুলী অঞ্চলের প্রতিটি অলি-গলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও থাঁদার কোন সন্ধানই পাইনি। পরদিন সকাল বেলা আমরা খবর পেলাম যে খোকাকে হাওড়ার একটা বস্তীর একটি ঘরে জনৈক গোয়েন্দা দেখে এসেছে। বলা বাহুল্য যে আমরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্রবাহিনী দ্বারা ঐ বাড়ীটি ঘেরোয়া করে ঐ ঘরটির দরজা ভেঙে সেইখানে ঢুকে প'ড়ি। এই দিন হরিপদ অসুস্থ থাকায় সে আমাদের সঙ্গে আসতে পারিনি। তবে থেঁদাকে চেনে এমন একজন গোয়েন্দা আমাদের সঙ্গে সেথানে এসেছিল। ঘরে ঢুকেই আমরা জনৈক ব্যক্তিকে সেখানে একটি খাটিয়ার উপর শুয়ে থাকতে দেখতে পাই। তাকে দেখামাত্র আমোদের সেই গোয়েন্দা দুই পা' পিছিয়ে এসে চীৎকার করে বলে উঠে, হুজুর! থেঁদাবাবু ঐ—আমরা তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে গুলীভরা পিস্তল উঁচিয়ে তার উপরে ঝাপিয়ে পড়লাম। আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে, তখুনি একটা খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে এবং আমাদের দলের অন্তত: দুই একজন সেই যুদ্ধে প্রাণ হারাবে। খোকাবাবুকে বিনা যুদ্ধে একজন শান্ত-শিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধরা দিতে দেখে আমাদের সন্দেহ হলো হয়তো আদপেই সে থেঁদাবাবু নয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গের একজন অফিসার, দুইজন সিপাহী ও আমাদের সেই লোকটা নিঃসন্দেহ রূপেই তাকে থেঁদাবাবু বলেই সনাক্ত করলো। খোকাবাবুর ফটো-চিত্র সম্বলিত একটি পুলিশ গেজেটও আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই গেজেটে প্রকাশিত থেঁদাবাবুর সম্মুখের ও পার্শ্বদেশের ফটো-চিত্রের সহিত আমাদের এই ধৃতাকৃত আসামীর সম্মুখের ও পার্শ্বের চেহারার হুবহু মিলও আমরা দেখতে পেলাম। এই গেজেটে খোকার বাম হাতে উল্কীর দ্বারা একটি নারকেল গাছে জড়ান একটি সাপ এবং তার ডান হাতে একটি গোলাপ ফুল ও তার নিম্নে 'প্রাণের থেঁদা'—এই বাক্যটি উল্কীর দ্বারা উৎকীর্ণ আছে বলে লেখা আছে। এ'ছাড়া ঐ গেজেটের পাতায় খোকার বাম দিক্‌কার কপালের জ্রর নিকট একটি কাটা দাগ ও তার নিম্নের ঠোঁটটি কাটা ও সেলাই করা আছে বলে লেখা আছে। শুধু তাই নয়, ঐ গেজেটে তার গাত্রবর্ণ ও উচ্চতার মাপ ও অন্যান্য বিবরণের সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করা ছিল আমরা পুলিশ গেজেটে উল্লিখিত ঐ সকল বিবরণের সঙ্গে ধৃতীকৃত আসামীর দেহের আকৃতি ও অন্যান্য চিহ্নের সহিত তুলনা করে দেখলাম যে, উভয়ের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রতিটি বিষয়ে হুবহু মিল আছে। কিন্তু এতো সত্বেও আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে, থেঁদাবাবুকে এতো সহজে গ্রেপ্তার করা

সম্ভব হতে পারে। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে আমরা অকুস্থলে নিজেদের মোতায়েন রেখে কয়েকজন সিপাহীসহ আমাদের ট্রাকটিকে খোকার বাল্যকালের বন্ধুদ্বয় দেবেন ও হরিপদকে আনবার জন্ত কোলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম। দেবেনবাবু বাড়ীতে উপস্থিত না থাকায় আমাদের লোকজনেরা কেবলমাত্র কলিকাতা থেকে হরিপদ বাবুকে নিয়ে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আমাদের কাছে তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলে। অতর্কিতে ধৃতীকৃত আসামীকে সেখানে দেখে হরিপদবাবুও ক্ষণিকের জন্ত সভয়ে দুই পা পিছিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরে তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর হরিপদবাবু—নিশ্চিন্ত-মনে আসামীর দিকে এগিয়ে এসে আমাদের জানালো যে, ধৃতকৃত ব্যক্তি আদপেই সেই খোকা ওরফে খেঁদাবাবু নয়। তবে সে খোকাবাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তার একজন দলের লোকও বটে। এই সম্পর্কে হরিপদ আমাদের কাছে ঐ দিন যে উল্লেখযোগ্য বিবৃতিটি দিয়েছিল তা নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি, দেবেন, খোকা, কেষ্ট ও গোপী—এই কয়জনে এককালে একটি স্থানীয় হাইস্কুলে কিছুকাল পড়েছিলাম। খোকাই সাধারণতঃ আমাদের ক্লাসের মধ্যে পড়াশুনা ও খেলা ধূলার মধ্যে ফার্ষ্ট বয় বলে প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে সে ঐ স্কুল ছেড়ে চলে আসে এবং ঐ স্কুলের ছাত্র কেষ্টো ও গোপীকে দলে ভিড়িয়ে একটা ডাকাত দলের সৃষ্টি করে। প্রথমে তারা দেশ উদ্ধারের জন্ত একটি মুক্তি-সেনা সৃষ্টি করার জন্ত এই দলটির সুচনা করে। কিন্তু উহাতে পরে বহু পুরান পাপীকে ভর্ত্তি করার ফলে ধীরে ধীরে উহা একটি সাধারণ ডাকাত দলে পরিণত হয়ে পড়ে। এরা এই খুনটি ছাড়া আরও বিশ ত্রিশটি খুন করেছে বলে আমার শুনা আছে। তবে পাগলা ও শিউচরণ হত্যার জন্যে যে একমাত্র এরাই দায়ী তা আমি হলপ করে বলতে পারি। এরা আমাকে ও দেবেনকে দলে ভর্ত্তি করবার জন্ত বহুবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের ঐ সকল অপকার্য্যে যোগ দিতে আমরা রাজী হইনি, তবে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনরা তাদের অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারের জন্ত আমাদের কাছে কেঁদে পড়লে এদের সাহায্যে আমরা কয়েকবার তাদের চুরি যাওয়া ও হারানো দ্রব্যাদি উদ্ধার করে দিতে সমর্থ হয়েছিলাম। এক বৎসর পূর্ব্বে কুমুরটুলীর বিখ্যাত জমীদার অমুক বাবুর বাড়ী থেকে একটি টোটা ভর্ত্তা রিভলবার সমেত ৫০ হাজার টাকা মূল্যের গহনা যে এরাই তালা ভেঙ্গে চুরি করেছিল তা আমার অজানা ছিল না, তবে এই সম্বন্ধে আমি থানায় কোনও সংবাদ দিলে আমাকে তার পরদিনই আপনাদের ইনফরমার শিউচরণিয়ার মত ইহসংসার পরিত্যাগ করে চলে যেতে হতো। আমি এও জানি যে এদের দলে ৭০ বা ৮০ জন লোক সংযুক্ত আছে, এবং এরা একাধারে ডাকাতি, খুন ও রাহাজারী বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা ও ঐ তিনটি প্রদেশের রেলওয়ে সমূহে সমাধা করে থাকে। কাহারও এদের অপকার্য্যে সামান্ত রূপও প্রতিবন্ধক হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র থাকলেও এরা নির্ব্বিচারে এদের ছলে বলে হত্যা করে এই মরজগৎ থেকে তাদের সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে। আমার সঙ্গে খোকাবাবুর পৃথিবীর এই সহরের ওপরতলা ও নীচের তলা—এই উভয় পরিবেশেই বহুবার দেখা হয়েছে। কিন্তু এই কথা আমি আমার বাল্য বন্ধু এক দেবেন ছাড়া আর কাউকেই কোনও দিন প্রকাশ করতে সাহসী হই নি। কয়েক মাস সে সমাজের ওপর তলায় বাস করে পুনরায় সে কয়েক মাসের জন্ত উহার নীচের তলায় ফিরে গিয়েছে। যখন সে সমাজের ওপর তলায় খুশমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আপনারা বৃথাই তাকে সমাজের নিম্নতম স্থানে খুঁজে বেড়িয়েছেন।"

এর পর আমি হরিপদ বাবুকে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য তার কাছ হতে জেনে নিই। নিম্নের প্রশ্নোত্তর হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

প্রঃ—আপনি সমাজের উপরতলা ও নীচের তলা বলতে কি বুঝাতে চান? খোকাবাবু একাই সমাজের এই উভয়তলার অধিবাসী না তার সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গদেরও সমাজের এই উভয় স্তরে আনাগোনা আছে?

উঃ—খোকাবাবু মধ্যে মধ্যে তার দলের ভার গোপী বা কেষ্টবাবুর উপর ছেড়ে দিয়ে সকলের অজ্ঞাতে কিছুকালের জন্ত কোথায় উধাও হয়ে যায়। এই সময় পুলিশের ন্তায় তার দলের লোকেরাও তার কোন হদিশই পায়নি। এই সময় সে সহরের উন্নত অংশে ফ্ল্যাট ভাড়া করে সেখানকার ভালো ভালো লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। এমন কি, সে এই সময় বিলাতী স্যুট পরে সে গণ্যমান্ত লোকের ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মেম্বার হয়ে বিবিধ পার্টি ও মিটিংএ যোগদান করেছে এবং ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি ক্রীড়া ও অন্যান্ত সভ্যজন-সুলভ আমোদ-প্রমোদেও সভ্য ও নিরপরাধ মানুষের ন্তায় যোগদান করেছে। এর কয়েক মাস পরে হঠাৎ সে একদিন পুনরায় লুঙ্গী ও ছেঁড়া গেঞ্জী পরে সহরের পঙ্কিল বস্তীর মধ্যে অবস্থিত তাদের ডেরাতে ফিরে এসে তার সাথী চোর-ডাকাতদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমার মনে হয়, আপনারা তাকে কোনও মামলার ব্যাপারে বেশী খোঁজাখুজি করতে সুরু করলে সে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্ত এইভাবে সমাজের ওপরতলায় এসে গা ঢাকা দিতো। এই অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে তাকে চিনেও চিনতে না পারবারই কথা।

প্রঃ—হুঁ, বুঝলাম। খুউব সম্ভবতঃ তার মধ্যে অবস্থিত দ্বৈত ব্যক্তিত্বের জন্যই সে প্রয়োজন মত এই ভাবে ভোল বদলাতে সক্ষম ছিল। কিন্তু এই ধৃতীকৃত আসামী সুধীরকে সে পেলো কোথায়? তুমি কি ইতিপূর্ব্বে কখনও এই আসামীটিকে কোথাও দেখেছিলে?

উঃ—আজ্ঞে স্যার! ওকে মাত্র একদিন আমি খোকা বাবুর সঙ্গে ব্ল্যাক স্কোয়ারে দেখে ছিলাম। দু'জনকে একত্রে দেখে সত্য সত্যই সেইদিন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা জানি যে, কখনও কখনও দুইজন মানুষের মুখ ও দেহের মধ্যে একপ্রকার আদল দেখা যায়। কিন্তু এদের মত হুবহু এক রকমের চেহারার মানুষ ইতিপূর্ব্বে আমি দেখিনি। পরে আমি খোকার মুখে শুনেছিলাম যে, তার মত একই রকম চেহারার এই মানুষটির সন্ধান পেয়ে তাকে বহু চেষ্টায় তার ঐ অপদলের মধ্যে ভর্ত্তি করে নেয়। তাদের দলের জন্ত একজন ডুপ্লিকেট খোকা তৈরী করে তাকে কয়েকটি কাজে লাগাবার জন্ত সে এইরূপ কার্য্য করেছিল। পূর্ব্বে সুধীর

বাবুর দেহে খোকার দেহের অনুরূপ ঐরূপ কাটাকুটি ও উল্কি চিহ্নাদি ছিল না। পরে খোকা বাবুর নির্দেশে সুধীর বাবু ঐগুলি নিজ দেহে ধারণ করেছিল। এমন কি সে ধরা পড়ে জেলে গেলে সে থানায় খোকার নাম লিখিয়েই জেলে গিয়েছে। আপনাদের এই পুলিশ গেজেটে যে খোকার প্রতিকৃতি দেখছেন, আসলে ওটা এই সুধীর বাবুরই প্রতিকৃতি। এই জন্য সুধীর জেলে থাকলে আপনারা মেনে নিয়েছেন যে খোকাই জেলে আছে। এই জন্য এই সময়ের মধ্যে সমাধিত কোনও অপকার্য্যের জন্য স্বভাবতঃই আপনারা খোকা বাবুকে দায়ী করতে পারেন নি। তা'ছাড়া অয়েলপেণ্টিং এর ন্যায় ফটোচিত্রে মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্র পুরাপুরি প্রস্ফুটিত করা যায় না। এইজন্য দুইটি মানুষের ফটো বহু ক্ষেত্রে একটি মানুষের মত অবিশেষজ্ঞদের কাছে প্রতীত হয়ে থাকে।

আমরা সকলে হরিপদবাবুর এই বিবৃতি শুনে সত্য সত্য আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গিয়েছিল। ধৃতীকৃত আসামী সুধীরকে থানায় এনে ইন্সপেকটার সুনীল বাবুর কাছে তাকে পেশ করে আদ্যোপান্ত ঘটনাটি তার নিকট বিবৃত করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, হুম্! তাহলে একে এখুনিই হাকিমের কাছে পেশ করে নির্দোষ বলে তাকে বেকসুর খালাস করে দেবার জন্য সুপারিশ করা দরকার। সুনীলবাবুর এইরূপ অভিমতে একটু বিরক্ত হয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম, সে কি স্যার। এতো কষ্ট করে এই লোকটাকে আমরা ধরে আনলাম। খুনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও লোকটা এদের এই গ্যাঙের একজন মেম্বার, তা ছাড়া এ একটা ইন্‌ট্যারেসটিং ক্যারেক্টারতো বটে। অভিজ্ঞ ইন্সপেকটার সুনীল রায় খেঁকরে উঠে আমার এই উক্তির উত্তর বললেন, কিন্তু একে এই মামলায় জড়িয়ে রাখলে তুমি মূল আসামী খোকাকে কিছুতেই বিচারে সাজা দেওয়াতে পারবে না। এই মামলার বিচারের সময় জুরীদের মনে সন্দেহ জাগবে যে, এই নিরীহ সুধীর না এই দুর্দ্দান্ত খোকাবাবুই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূলে হত্যাকারী। এই অবস্থায় দোদুল্যমান চিত্তে তারা খোকাবাবুকে সন্দেহের অবকাশ বা বেনিফিট অফ ডাউট্ দিয়ে খালাস করে দিয়ে দিতে পারে। এইরূপ একটা বিচার প্রহসনের ঝোক্কি আমি নিতে আদপেই রাজী নয়। এ পাপ বাপু এখুনিই আমাদের এই মামলার ছন্দো থেকে তুমি বিদেয় করে দাও। এর পর আমরা সকলে ইন্সপেকটার সুনীল রায়ের এই যুক্তির তারিফ না করে থাকতে পারি নি। এই জন্য এই মামলার জন্য অকারণে কোনও জটিলতা সৃষ্টি না করে আমরা সুনীল বাবুর উপদেশ শিরোধার্য্য করে এই মামলার সহিত সম্পর্ক রহিত আসামী সুধীর বাবুকে জামীনেই মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। এর পর স্বভাবতঃই আমরা খোকা বাবুর পিছনে আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অপরদিকে খোকা বাবুও এদিকে আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। যে স্থানটিতে এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছিল সেই স্থানে প্রতিটি রাত্রে সে বারে বারে ফিরে এসেছে। বৈজ্ঞানিকরা বলে থাকেন যে, মানুষের শোণিততৃষ্ণা বা অপরাধ স্পৃহার তার একটি আদিম স্পৃহা। একদিন আদিম মানুষ তাদেরও পূর্ব্বপুরুষ হিংস্র জীবজন্তুর ন্যায় রক্তপানে অভ্যস্ত ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে কালক্রমে ধীরে ধীরে আমরা আমাদের সেই আদিমতম অভ্যাস পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু তা সত্বেও তা আমাদের মনের অন্তর্দেশে বিভিন্ন মাত্রায় নিহিত আছে। অভ্যাস দ্বারা একবার উহা অতিমাত্রায় নির্গত হয়ে এলে উহাকে সহজে নিবৃত্ত করা যায় না। সময় বিশেষে এই রক্তপানের নেশা রক্ত দর্শনের নেশাতেও রূপান্তরিত হতে দেখা গিয়েছে। এইজন্যই খুনের পর খোকা বাবুর মধ্যে উদ্‌গত এই উগ্র শোণিতস্পৃহাই বোধ হয় তাকে বারে বারে হত্যাস্থলটি দেখে আসতে বাধ্য করছিল।

খোকাবাবুকে যখনই কেউ রাত্রে কুমুরটুলি অঞ্চলে দেখতে পেয়েছে, তখনই ভীত পথচারীরা ও নিরীহ দোকানদাররা চারিদিকে ছুটাছুটি করেছে। পুলিশও তার আগমন সম্পর্কে খবরাখবর পাবামাত্র অকুস্থলে ছুটে গিয়েছে কিন্তু সেই হত্যাস্থল সহ আশে-পাশের বস্তীঅঞ্চল ও অলিগলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার কোনও হদিসই তারা পেতে পারি নি। শেষের দিকে ঐ অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকগণ খোকা বাবুকে এক অশরীরী জীব মনে করে তার অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোনও সংবাদই আর পৌঁছে দিত না। এইসব কারণে আমরাও বহুদিন রাত্রিকালে ঐ এলাকায় আর রাউণ্ড দেবার জন্য বহির্গত হই নি। শেষে এইরূপ সরগরম ভাবটি কথঞ্চিৎ কমে এলে এক রাত্রে রাউণ্ডে বেরবার জন্য দরোওয়াজার সিপাহীকে একটা রিক্সা ডাকতে বলে আমি অফিসে বসে তৈরী হচ্ছিলাম। সিপাহী ভাইটি আমার জন্য রিক্সাটি আনার পর আমি সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এক উকীল গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বারগ্রাহী মামলার আসামীর জামীনের জন্য আবেদন করতে এলেন। এই মামলাটি জামীন-গ্রাহ্য না থাকায় আমি কিছুতেই উহার আসামীকে জামীন দিতে চাইলাম না। তাঁর সহিত এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে আমার রাত্রিকালীন রাউণ্ডের সময় এক ঘটিকা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এর পর বিরক্ত হয়ে আমি আমার নিজের চেয়ারে এসে বসলাম এবং উকীল বাবু গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাগে গজগজ করতে করতে থানা হতে বার হয়ে আমারই জন্য আনা রিক্সাটিতে চেপে বসলেন। এর দশ মিনিট পরে আমাদের ঐ প্রতিবেশী উকীল বাবু হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে একটি অদ্ভুত এবং ভীতিপ্রদ বিবৃতি প্রদান করলেন। তাঁর এই অত্যদ্ভুত বিবৃতিটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আপনি আজ বড্ড বেঁচে গেছেন পঞ্চানন বাবু। আপনাকে আমি সাবধান করে দেবার জন্য থানায় ছুটে এসেছি। আজ রাত্রে রাউণ্ডে বেরুলে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই রিক্সাটায় চড়ে বসা মাত্র রিক্সাপুলার মাথা নাড়তে নাড়তে দ্রুতগতিতে শ্যামবাজারের রাস্তা ধরে চলতে সুরু করলো। এমনি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমি তাকে আমাদের বাড়ীর দিককার রাস্তার দিকে বেঁকতে বলা মাত্র সে অবাক হয়ে এই সর্ব্বপ্রথম আমার দিকে চেয়ে দেখলো। এর পর সে আমাকে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পর রিক্সা থেকে নেমে তাকে আমি ভাড়ার পয়সা মিটাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে পয়সা না নিয়ে খাড়া হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, আমাকে চিনতে পারছেন গোপাল বাবু। আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমিই হচ্ছি খোকা। পঞ্চানন বাবুকে বলবেন যে,

[৩৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

—ধীরেশ ভট্টাচার্য্য

অচলায়তন

॥ আলোকচিত্র ॥

—মঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

অতিথি এসেছে দ্বারে

পিকাডেলী সার্কাস (লণ্ডন)

—অজয়কুমার দে

ভাস্কর্য

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিজ —নীলু পাল

অপত্যস্নেহ —বিশ্বরূপ সিংহ

নিকোবর ইতিবৃত্ত
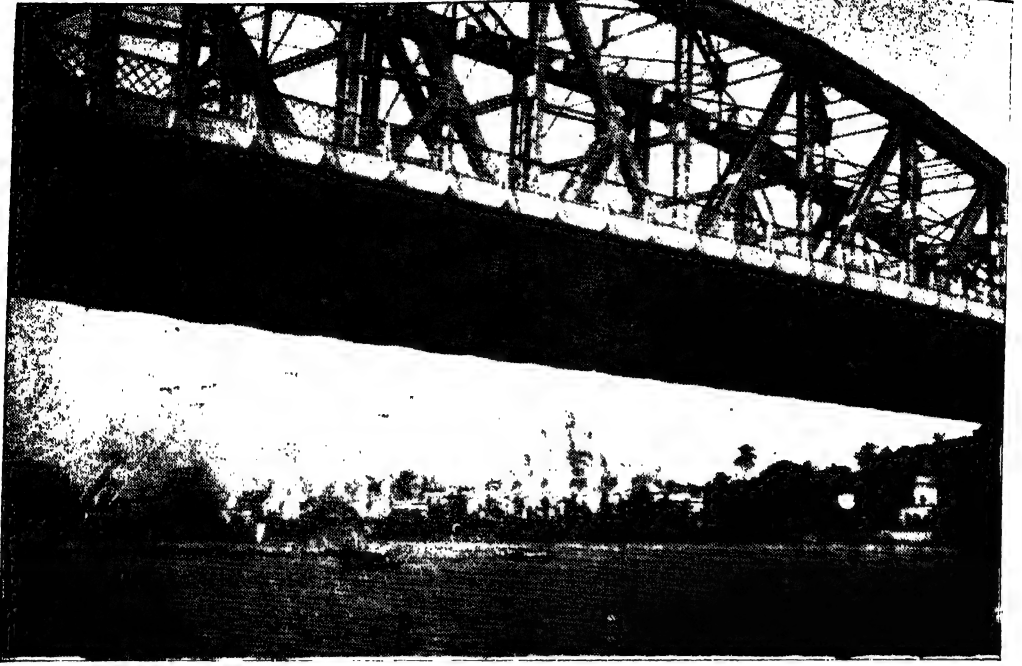
শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা

প্রকৃতির রম্য-লীলা-নিকেতন নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালার সমষ্টি। দ্বীপগুলির কোন কোনটি আবার এত ক্ষুদ্র যে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয় বললেই হয়। অবস্থান তার দিগন্ত-বিস্তৃত বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে। দ্বীপপুঞ্জটির আয়তন স্বল্প হ'লেও প্রাকৃতিক শোভা তার অতীব মনোরম। দূর থেকে মনে হয় অন্তহীন জলধির নীল জলে যেন হর্ষভরে নৃত্যরত একদল প্রফুল্ল জলকমল;—দেখলে মন ভ'রে ওঠে, আনন্দে চোখ জুড়িয়ে যায় পুলকে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-প্রান্ত থেকে সুমাত্রা দ্বীপের অব্যবহিত উত্তর-পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাগরবক্ষ জুড়ে অতিশয় নয়নাভিরামরূপে বিরাজিত দ্বীপমালাটি কোথাও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, কোথাও বা একটু বিচ্ছিন্নাবস্থায়। রমণীয় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্য দ্বীপমালাকে বলা হয় দ্বীপরাজ্যের মুকুটমণি। বিচিত্র মনোহর শোভা সমন্বিত দ্বীপপুঞ্জটি নিসর্গ জগতের এক বিস্ময়ের বস্তু। শৈল-কানন-কুন্তলা ঘন সন্নিবিষ্ট গুবাক নারিকেলাদি বিবিধ বিটপিশ্রেণী সমাচ্ছন্ন, নানা জাতি বনবিহঙ্গ কূজন-মুখরিত; সাগরবারিকণ নিষিক্ত সুখস্পর্শ সমীরণ হিল্লোলিত দ্বীপপুঞ্জের অনুপম সৌন্দর্য্য, অতুলনীয় সুষমা সত্যই অনির্ব্বচনীয়, অবর্ণনীয়। ঝলমল রবিকর আর স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক এর অফুরন্ত শ্যামলিমার সঙ্গে মিশে রচনা করে এক অপূর্ব্ব মায়ালোক! এমন সৌন্দর্য্যের ক্রীড়াভূমি, এমন প্রাণ-মন খোলা আত্মভোলা আসল মানবের বাসভূমি জগতে বুঝি বিরল। রমণীয় বনরাজিনীলা দ্বীপপুঞ্জের মনোহর সৌন্দর্য্য দর্শনে একদা সৌন্দর্য্যপিয়াসী পাশ্চাত্য নাবিকগণ হয়েছেন বিস্মিত, মুগ্ধ পুলকিত। প্রাতে সাগর-সলিল-স্নাত নবোদিত সূর্য্যের স্বর্ণকিরণ, আর দিবাবসানে পশ্চিম দিগন্তে বিলীয়মান সান্ধ্য রবির রক্তাক্ত রশ্মিমালার অপরূপ ইন্দ্রজাল এই শ্যামল দ্বীপপুঞ্জকে পরিণত করে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে। দ্বীপময় বিরাজমান গুবাক নারিকেল তরুর স্বভাব-সুন্দর সুসমঞ্জস বিন্যাস অতিশয় প্রীতিপ্রদ, অতিশয় নয়নানন্দ দায়ক। সমুদ্র-সৈকতের কূলে কূলে পর্ণ কুটীর পূর্ণ শান্ত-শীতল পল্লী সমূহ যেন পটে আঁকা মনোহর ছবি! বৈচিত্র্যময় ষড় ঋতুর যাদু স্পর্শে এর কূলে কূলে, এর শাখায় শাখায়, এর পুষ্পে পুষ্পে লীলায়িত হয় এক অভূত-পূর্ব্ব, অচিন্তনীয়, বিস্ময়ের স্বপ্ন। দুরধিগম্য উন্মুক্ত নীলাম্বু বক্ষে এক নগণ্য দ্বীপভূমিতে যে এমন দুর্ল্লভ শোভা-সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, মনোলোভা সবুজের এমন পারিপাট্য, এমন প্রাকৃতিক শোভার সমারোহ, আলোছায়ার এমন রহস্যময় লুকোচুরি সম্ভব, তা' ভাবলে মানব-মন স্বতঃই অবনত হয় বিশ্বশিল্পীর চরণতলে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময়ে।

এই স্বভাবসুন্দর, রহস্যজালাবৃত দ্বীপরাজ্যের প্রকৃত পরিচিতি কী,—সভ্য জগতের সহিত তার ঐতিহ্যের যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা কত দিনের, তা একপে ঐতিহাসিকের ভাববার বিষয় বটে। আলোচনা করলে সন্ধান মিলে যে, একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মহা পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ দাক্ষিণাত্য-সম্রাট দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলের দুর্দ্ধর্ষ নৌশক্তি বাহিনী কর্তৃক বঙ্গোপসাগরস্থ আন্দামানাদি অন্যান্য দ্বীপরাজ্য সহ আলোচ্য দ্বীপপুঞ্জ অনায়াসে বিজিত হয় একদিন। তদবধি কয়েক শতাব্দী কাল তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে ভারতীয় অধিকার। ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় কৃষ্টি ও ভারতীয় ভাবধারা প্রভাবে দ্বীপবাসী হ'য়ে যায় ভারতীয় ভাবাপন্ন সর্ব্ব প্রকারেই। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগ তার ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন—আবার যে তিমিরে সেই তিমিরেই। নৌশক্তি বিহীন প্রায় মুসলমান আমলে ভারতীয় অধিকার তদঞ্চলে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না আর। ইত্যবসরে ভারতীয় যোগসূত্রহারা অসহায় দ্বীপমালা হারিয়ে ফেলে তার আত্মপরিচয়, হারিয়ে ফেলে তার সমুজ্জ্বল আত্মগরিমা, হারিয়ে ফেলে তার শিক্ষা-দীক্ষা, হারিয়ে ফেলে তার ধর্ম্ম-জ্ঞান। যখন ঘনিয়ে আসে এমনি দুর্দ্দিন তার, তখন আসে আর এক গুরুতর পরিবর্ত্তনের উত্তাল তরঙ্গ পশ্চিম জগত থেকে। ঐ তরঙ্গানীত পাশ্চাত্য বণিকগণ আসতে আরম্ভ করে দলের পর দল। প্রাচ্যাভিমুখে বিশেষ করে ধন-ধান্য ভরা ভারতভূমির অন্বেষণে, বাণিজ্য ব্যপদেশে। সেই যুগে পর্টুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ প্রভৃতি দুঃসাহসিক নাবিকগণ ভারতভূমির দক্ষিণ জলপথের দ্বারমুখে উপনীত হয়ে স্তব্ধ-বিস্ময়ে আকৃষ্ট হন এই দ্বীপমালার প্রতি, প্রথমতঃ এর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে, দ্বিতীয়তঃ এর অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা লক্ষ্য করে। তাই প্রলুব্ধ বণিকগণ কালবিলম্ব না ক'রেই অবতরণ করেন এই দ্বীপ-ভূমিতে। অনায়াসেই সমগ্র দ্বীপরাজ্যের অধিকার লাভও সম্ভব হ'য়ে ওঠে তাঁদের। নানা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বণিকদের নানা অভিসন্ধির, নানা প্রয়োজনের বিবিধ উদ্যোগ আয়োজনও চলতে থাকে অবিরাম দ্রুত গতিতে। নৌঘাঁটি স্থাপনের চিন্তাও উদিত হয় তাঁদের মনে। অবশেষে তদঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্নও দেখেন সুযোগ পেয়ে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় না কোন দিকেই, নানা প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হয় তাঁদের সমস্ত আপ্রাণ প্রচেষ্টার পথে। অগত্যা ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে তল্পিতল্পা গুটাতে হয় তাঁদের একদিন। তারপর আসে আর এক যুগান্তর। যেদিন ভাগ্যবান ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাতারাতি ভারতের রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হ'ল সহসা কোন যাদু বলে তখন স্বল্পকাল মধ্যেই দ্বীপাঞ্চলটিও বাধ্য হল বৃটিশ ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হ'তে অর্থাৎ ইংরাজের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হ'তে। আশ্চর্য্য এই দীর্ঘকাল ধ'রে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীন থাকা কালে কোন উন্নতিই হয়নি দ্বীপবাসীদের। দ্বীপরাজ্যের পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয় স্বাধীন ভারত। আজ আর নিকোবর নহে অবহেলিত অথবা পদদলিত। আজ ঐ দ্বীপবাসী স্বাধীন ভারতের অংশীদাররূপে পরিগণিত। আত্মসচেতন ভারত আজ সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'য়েছে নগণ্য নিকোবরের রাজনৈতিক গুরুত্ব। ক্ষুদ্র হ'লেও ইহা যে সমুদ্রমেখলা ভারতরাজ্যের দক্ষিণ জলপথের গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম প্রবেশদ্বার তা' ভারতবাসীর আর অজ্ঞাত নয়। আজ এই অনুন্নত

দ্বীপবাসীর আশার বিষয় যে, বিরাট ভারত রাষ্ট্রের প্রগতিমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত এক সূত্রে গ্রথিত তাদের ভাগ্য। বুঝতে পেরেছে তারা যে বৃহৎ ভারতই তাদের মাতৃভূমি।

এই দ্বীপরাজ্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হ'ল নিকোবর, নানকৌরি ও কার নিকোবর। অধিকাংশ দ্বীপই গিরিপর্ব্বতসংকুল। কোন কোন পর্ব্বত আবার বেশ উচ্চও বটে। কতিপয় মাত্র দ্বীপ সমতল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, প্রায় সকল দ্বীপই—সবুজপত্র-পল্লব শোভিত নানা জাতীয় তরু-লতা-গুল্মাদি সমাচ্ছন্ন। কোন কোন জাতীয় বৃক্ষ অতিশয় বিশালকায়। দ্বীপমালার পর্ব্বত—সানুদেশ হ'তে আরম্ভ ক'রে সমস্ত উপত্যকাংশ জুড়ে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষের অসীম অগণিত শ্রেণী। তদঞ্চলে তরুলতার এমন নিবিড় ও ঘন সন্নিবেশ পরস্পরের এমন জড়াজড়ি এমন মেশামেশি যেন স্নেহ ও প্রীতিভরে দৃঢ়ালিঙ্গনাবদ্ধ সবাই। সমগ্র বনভূমি বৃক্ষলতা রচিত ঘন জালে আবৃত। তার অভ্যন্তরভাগ ও তলদেশ নিবিড় তমসাচ্ছন্ন—চিরান্ধকারময়। দিনের পর দিন—অন্ধকারপূর্ণ বনভূমিতল—বৃক্ষপতিত পত্র-পল্লব ফল-পুষ্প গলিত হয়ে এমন দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে পড়েছে যে, কুত্রাপি মনুষ্য-বাসপোযোগী থাকে না। দ্বীপবাসীরা তাই বনভূমি সন্নিহিত অঞ্চলে বাস করে না; বাস করে তারা সমুদ্রতীরে—উন্মুক্ত তটভূমিতে। বনভূমির গভীরতম প্রদেশে এমন গগনস্পর্শী বিশালকায় বৃক্ষ জন্মায় যে, তাদের গোলাকৃতি গুঁড়ির পরিধি বিংশতি হস্তেরও অধিক পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে। এই জাতীয় বৃক্ষের সারাংশ এমন দৃঢ় ও কঠিন যে, তা নৌশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই কাষ্ঠের ব্যবসায়ও খুব লাভজনক বটে।

মহাদেশীয় ভূভাগের ন্যায় এখানে হস্ত্যাদি বৃহদাকার জন্তু জানোয়ারের অভাব থাকলেও সাধারণতঃ ব্যাঘ্র, চিত্রক, দ্বীপি, শৃগাল, কুক্কুর, শূকর, গো, মহিষাদি এবং শিকারোপযোগী নানা পশুপক্ষী যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয় এখানে। পূর্ব্বকালে দ্বীপাঞ্চলে গো-মহিষের বাস ছিল না। পাশ্চাত্য বণিকগণই স্বকীয় প্রয়োজন বশতঃ তাদের মাতৃভূমি থেকে কতিপয় সংখ্যক উভয় জাতীয় গো-মহিষ এই দ্বীপাঞ্চলে আনয়ন করেন। যখন তাঁরা দ্বীপভূমি ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন ঐ গবাদি জন্তুকে মুক্ত করে দিয়ে যান বনাঞ্চলের দিকে। পরবর্ত্তীকালে স্বাভাবিক নিয়মের ফলে তাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হতে থাকে এবং কালক্রমে তাদের সংখ্যা বড় কম হয় না। নানা জাতীয় সর্পের বাসও আছে সব দ্বীপেই, তবে তেমন বিষাক্ত সর্প নেই বললেই হয় এখানে, এর চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদ্রজলে বাস করে অসংখ্য বিশালাকার কুম্ভীর হাঙ্গরাদি জলজন্তু। বিচিত্রবর্ণের নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শঙ্খ শম্বুকাদিও দৃষ্ট হয় প্রচুর পরিমাণে দ্বীপের কূলে কূলেই। এই সকল সামুদ্রিক প্রাণী স্বল্পায়াসে ও স্বল্প সময়ের মধ্যেই সংগৃহীত হ'তে পারে।

অধিকাংশ দ্বীপেরই ভূমি উর্ব্বর ও নানা জাতীয় তরুলতা বৃক্ষাদি পরিশোভিত। ইহা 'সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা'—বঙ্গভূমির ন্যায় 'শস্য-শ্যামলা মাতৃদেবীর' প্রতীক বলেই মনে হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, অতিশয় উর্ব্বর হলেও কৃষি-শিল্প কিছুমাত্র উৎকর্ষতা লাভ করেনি এখানে। কৃষিজ দ্রব্যের অপেক্ষা বরং স্বভাবজাত বনজ দ্রব্যের উপরই নির্ভরশীল এই দ্বীপবাসীরা। এই দ্বীপপুঞ্জকে 'কদলী রাজ্য' বলা হয়। ইহা যে নারিকেল সুপারির জন্মভূমি তা সর্ব্বজন-বিদিত। কদলী, আনারস, পেঁপে, লেবু, প্রভৃতি বিবিধ রসাল ও সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয় এখানে যথেষ্ট পরিমাণে। তেঁতুল ও এক জাতীয় পিষ্টক ফলের বৃক্ষও (mellary) অসংখ্য। পিষ্টক ফল দ্বীপবাসীদের প্রধান ও প্রিয় খাদ্য। ইহা যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর। কৃষির দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চুবড়ি আলু ও নানাপ্রকার কন্দই প্রধান। ম্যাঙ্গাষ্টিন্ (mangasteen) প্রভৃতি আরও বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষও ছড়িয়ে আছে দ্বীপময়। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়,—ক্ষুদ্র বৃহৎ—নানা জাতীয় বৃক্ষ—এমন কি ভেষজ জাতীয় তরুলতা গুল্মাদিরও অভাব নেই কিছুমাত্র এ দ্বীপভূমিতে। স্থানে স্থানে অরণ্য প্রদেশ এমন গভীর ও নিবিড় যে, তৎপ্রদেশে সূর্য্যালোক প্রবেশ করতে পারেনা কস্মিন কালেও।

দ্বীপ সমূহের গ্রামবিন্যাস অতি চমৎকার। সাগরোপকূলে ক্ষুদ্র বৃহৎ বালুকাস্তূপের ওপর (বালিয়াড়ির শীর্ষদেশে) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরগুলি ছবির ন্যায় সুদৃশ্যও চিত্তাকর্ষক রূপে প্রতীয়মান হয়। কোন গ্রামেরই অধিবাসীর সংখ্যা অধিক নয়—পঞ্চাশ ষাট, কি বড় জোর এক শত হবে। অকূল সমুদ্রের পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গরাশি অহরহ কুটিরশোভিত টিলাভূমির তলদেশে পৌঁছে দেয় কি যেন এক অব্যক্ত মনের কথা, বুঝি অস্পষ্ট ভাষায় চলে তাদের কত কানাকানি—হাসাহাসি—মনের গোপন কথার বিনিময়! বড় মধুর দৃশ্য! সমুদ্রের সঙ্গে অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—অন্তরঙ্গতা—পরস্পরের অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন। প্রকৃতি মাতার স্নেহের দুলাল দ্বীপবাসীরা। উন্মুক্ত আকাশের তলে—বিস্তার বিহীন সমুদ্রক্রোড়েই জন্ম তাদের! অনন্ত বালুকাকীর্ণ সাগর-বেলাই তাদের শৈশবের ক্রীড়াভূমি,—যৌবনের উচ্ছলতার রঙ্গালয় তার শেষের দিনেরও শান্তিময় শয্যা, চিরনিদ্রার সুখময় স্বপ্ন! অসীম সমুদ্রতটে, প্রকৃতি মাতার স্নেহাঞ্চলতলে বাস করে তারা পরম সুখে, মনের আনন্দে বিভোর হ'য়ে; নেই কোন দুঃখ কষ্ট, নেই কোন নিদারুণ অভাবের নিপীড়ন। অট্টালিকা বা ধন সম্পদের অধিকারী নয় তারা কোনদিনই কিন্তু নেই তাদের তা বলে কোন অভিযোগ। মানুষের যা সবার ওপর শ্রেষ্ঠ সম্পদ—শ্রেষ্ঠ কাম্য—স্বাস্থ্য আর মনের সন্তোষ—তা উপভোগ করে তারা ষোল আনাই—মনের সুখে। বিলাস ব্যসনের সর্ব্বনাশক বন্যা পৌঁছেনি কোনদিন তাদের দ্বারে। তাই সুস্থ সবল দৃঢ় পরিপুষ্ট সুগঠিত দেহ তাদের। পুরুষেরা বরং অলস ও শ্রমবিমুখ কিন্তু নারীরা কঠোর শ্রমপরায়ণা। আশ্চর্য্য যে, যে কেশদাম রমণীর শিরোশোভা সেই প্রিয় কেশের ছেদনে কিছুমাত্র দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হয় না এদেশের নারী। চিরাচরিত নিয়মে নারী জাতির মস্তক মুণ্ডিত অথবা মস্তকের কেশ ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তিত থাকে। অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ এই জাতি। এদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ যে এরা অতিশয় সৎ ও সত্যবাদী। সত্য কথনের খ্যাতি এ জাতির চিরদিনের; বোধ হয় আদিমযুগ থেকেই এরা সদাচারে অভ্যস্ত। দস্যুতা বা নরহত্যা যা সভ্য সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা—তার সঙ্গে অপরিচিত এই স্বভাব সরল—বর্ব্বর জাতি। কিন্তু সভ্যতাগর্ব্বী পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে সংসর্গ দোষে—এদের নির্ম্মল চরিত্রে এসেছে পঙ্কদ। কিছু অপরাধ প্রবণতা। বন্ধুর ছদ্মবেশে এসে কলঙ্কারোপ

পরিবর্ত্তে দুর্দ্দশার একশেষ করেছে তারা—একেবারে নিঃসঙ্কোচেই দ্বীপবাসীর ; এমন কি—দ্বীপরাজ্য থেকে কতিপয় শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন পর্য্যন্ত অবলুপ্ত ক'রে দিয়েছে পাশ্চাত্য বণিকগণ। দ্বীপবাসীরা স্বভাবতঃ পানাসক্ত হলেও ঘৃণনীয় উত্তেজনা বা মত্ততার দাস নয় তারা কস্মিন্ কালেও। এদের পানের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অনাবিল আনন্দ এবং নির্দ্দোষ আমোদের মধ্য দিয়ে জীবনকে মধুময় করে উপভোগ করা। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহচর্য্য ও পাশ্চাত্য অনুকরণের বিষ-ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ নানারূপ দুষ্কার্য্য সাধনের প্রবৃত্তি—এমন কি কদাচিৎ নরহত্যার ন্যায় ভয়াবহ গর্হিত আচরণের কিছু কিছু সংক্রমণও প্রবেশ করেছে এই নিরীহ জাতির রক্তে। বেশভূষার দিক দিয়েও এরা হয়েছে কতকটা পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়। নিত্যব্যবহার্য্য কতিপয় ইংরেজী শব্দ প্রবেশলাভ করেছে এদের মাতৃভাষায়। চল্লিশোর্দ্ধ সংখ্যা গণনে অজ্ঞ নিকোবরবাসী এদের সংসর্গে 'ডলারের মূল্য জ্ঞান' অর্জ্জন করেছে কিয়ৎকাল মধ্যে।

গভীর পরিতাপের বিষয় যে, এই সরল জাতিকে প্রতারিত করতে বা শোষণ করতে কিছুমাত্র কসুর করেনি কেউ। প্রতিবেশী দেশবাসীরাও করেছে এদের সর্ব্বনাশ সুযোগ সুবিধা পেলেই। মালয়, চীন ও ব্রহ্মদেশীয় জলদস্যুগণ সাধু নাবিক বা সরল বণিকের ছদ্মবেশে হানা দিয়েছে যখন তখন দ্বীপগুলিতে খাদ্যোপযোগী পক্ষী অন্বেষণের অছিলায়—অবশেষে করেছে দ্বীপবাসীদের সর্ব্বস্বাপহরণ ছলে, বলে বা কৌশলে। অকথ্য অবমাননা,—অশেষ অপদস্থ, অমানুষিক অত্যাচার এবং নির্দ্দয় উৎপীড়নও করেছে নির্লজ্জের ন্যায় নির্ম্মমভাবেই। বন্ধু সেজে এসেছে শূন্য জাহাজ নিয়ে—প্রত্যাবর্ত্তন করেছে জাহাজ পূর্ণ করে—দ্বীপের উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার দ্বারা ;—অবশ্য মূল্য হিসাবে বিশেষ কিছু না দিয়েই। এইভাবে হয়ে এসেছে অসহায় দরিদ্র দ্বীপবাসীর সর্ব্বনাশ দিনের পর দিন।

দিনেমার জাতি—উপনিবেশ স্থাপনের ব্যর্থ প্রয়াস প্রণোদিত হয়ে বার বার করেছে অভিযান এই দ্বীপপুঞ্জে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁরা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন কয়েকটি দ্বীপে। সাময়িকভাবে কত আশা আকাঙ্ক্ষায় উৎফুল্ল হয়েও ওঠেন তাঁরা। তাঁরা দ্বীপপুঞ্জের নূতন নামকরণ করেন—'ফ্রেডারিক' দ্বীপপুঞ্জ। কিন্তু তাঁদের সকল প্রচেষ্টা সকল প্রয়াস হয় স্বল্পকাল মধ্যে বিফলতায় পর্য্যবসিত নানা কারণ বশতঃ। দ্বীপের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর প্রভাবে নিদারুণ মহামারীর প্রকোপে অধিকাংশ বণিককেই প্রাণ হারাতে হয় দ্বীপভূমিতে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার নীতি সহ বাণিজ্য পরিচালনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা গৃহীত হয় পুনরায় নূতন উৎসাহ ও নবীন উদ্যমে। অবশেষে এ উদ্যোগও হয় ব্যর্থতায় পরিণত একই দুর্ব্বিপাক হেতু। উভয় দলের অধিকাংশ দিনেমারকেই মৃত্যু বরণ করতে হয় এবারেও। পূর্ব্বোক্ত বর্ষে সম্মিলিত দলের মাত্র ২জন দিনেমার এবং ১৪জন মালাবার জাতীয় ভৃত্য জীবিতাবস্থায় এখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করে শেষ পর্য্যন্ত। এই দুঃসাহসিক পাশ্চাত্য জাতি এতেও পশ্চাদপদ না হয়ে পুনরায় তৃতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এবারেও পূর্ব্ববৎ ব্যর্থকাম হয়ে—চিরতরে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় তাদের এই রাজ্যে পরিকল্পনা। অতঃপর প্রাচ্য দেশে বাঙ্গালদের পথে—উক্ত জাতির বাণিজ্যতরী সমূহ বিশ্রামার্থ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বীপপুঞ্জে সাময়িকভাবে নোঙ্গর করত মাত্র।

দিনেমার জাতির প্রত্যাবর্ত্তনের ফলে দ্বীপবাসীরা একদিক দিয়ে যেমন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে—তেমনি আর একদিক দিয়ে তাদের সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতেও হয়েছে। ব্রহ্মদেশীয় নাবিকগণ মৎস্য-শিকারীর মুখোশ পরে তখন থেকে আসতে থাকে দলে দলে, আর অপহরণ বা জোর জবরদস্তি করেই নিয়ে যেতে আরম্ভ করে অধিবাসীদের শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবজন্তু।

প্রসিদ্ধ ভূপর্য্যটক মার্কোপলোর ভ্রমণ কাহিনীতে (১২৯৫ খৃঃ) এই দ্বীপপুঞ্জের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বীপবাসীদের চারিত্রিক বিশেষত্ব এই যে, তারা স্বভাবতঃ শান্ত, সরল, শিষ্টাচারী ও অনাক্রমণীয়। ধ্বংসকারী কোন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে তারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও অনভ্যস্ত। মৎস্য শিকার এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময়ই এদের প্রধান উপজীবিকা। স্ত্রীজাতির অবশ্য কর্ত্তব্য হল গৃহস্থালী ও কৃষিকার্য্য পরিচালন করা।

ইউরোপীয় বণিকগণের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায়—দ্বীপবাসীরা ইউরোপীয় বণিকদের নিকট প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য যথা—বস্ত্র, লৌহদ্রব্য প্রভৃতি এবং দ্বীপভূমির উৎপন্ন কতিপয় দ্রব্যের আন্তর্দ্বৈপী বাণিজ্য পরিচালন কার্য্যে অভ্যস্ত। নারিকেল, সুপারি, গৃহপালিত মুরগী শূকর, পাখীর বাসা, 'সামুদ্রিক মোম' (ambergris), কচ্ছপের দেহাবরণ, শম্বুকাদি এদের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। রেঙ্গুনগামী জাহাজ এখান থেকে নিয়ে যায় প্রচুর নারিকেল। নারিকেলের উৎপাদন যেমন প্রচুর, তেমনি সস্তাও খুব। একটি মাত্র তামাকপাতার পরিবর্ত্তে চারিটি নারিকেল বিনিময় হয়ে থাকে। এক হস্ত পরিমিত নীলাভ বস্ত্রের পরিবর্ত্তে একশত পর্য্যন্ত নারিকেল মিলে। দ্বীপভূমিতে কাঁঠাল জাতীয় একপ্রকার সুমিষ্ট, রসাল এবং পুষ্টিকর ফল (mellari) উৎপন্ন হয় প্রচুর। পর্টুগিজদের ইহা অতি প্রিয় ও উপাদেয় খাদ্য। তাঁরা এই ফল নিয়ে যান স্বদেশে জাহাজ বোঝাই করে। এখান থেকে বন্য দারুচিনিও দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান—ভেষজ বৃক্ষত্বক্ সংগ্রহ করে চালান করেন স্বদেশে। এখানকার নারিকেল ও সুপারি এত কোমল এবং সুস্বাদু যে কুকুর শূকর পর্য্যন্ত তা ভক্ষণ করে পরম তৃপ্তি সহকারে। দ্বীপাঞ্চলের বাণিজ্য পরিচালনের একমাত্র মাধ্যম হল তামাকপাতা।

এদের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কোন গ্রামেরই কুটির-সংখ্যা ১৫ বা ২০ থেকে অধিক নহে। গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজনকে গ্রামপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। তার মাধ্যমেই জাহাজের সহিত বাণিজ্য কার্য্য পরিচালিত হয়ে থাকে। এতে অবশ্য তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, গ্রামবাসীর স্বার্থ সংরক্ষণই তার প্রধান কর্ত্তব্য। তার প্রতি ত্রিবিধ দায়িত্ব ভার ন্যস্ত করা হয়। সে একাধারে পুরোহিত, চিকিৎসক এবং ঐন্দ্রজালিক (ওঝা)। বিশেষ কোন ধর্ম্মই এরা পালন করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে এদের বিশ্বাস ও ধারণা দুর্ব্বোধ্য। এদের ভাষাও তেমনি দুর্ব্বোধ্য। বিদেশী ইউরোপীয় বণিকদের সহিত এরা মনোভাব বিনিময় করে আকারে ইঙ্গিতে, নানারূপ সংকেত প্রয়োগে। জড়স্বভাব হেতু এরা স্বল্পবাক বরং নির্ব্বাক বললেই ঠিক হয়। এদের জাতীয় ভাষার শব্দসংখ্যাও খুব অল্প। তবে এজন্যই এরা কতকটা নিয়ন্ত্রিত-বাক। নারীজাতির

মুখগহ্বর সব সময়ে দোক্তাপূর্ণ থাকে এবং এই হেতু তাদের মুখ দিয়ে শব্দোচ্চারণ স্বতস্ফূর্ত্তভাবে হ'তে পারে না। এদের প্রকাশভঙ্গিও অত্যন্ত দ্রুত এবং অস্পষ্ট। এই হেতু এদের মনোভাব নবাগতের নিকট সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়। অধিকন্তু শব্দোচ্চারণ কালে এদের মুখ থেকে প্রচুর নিষ্ঠীবন নির্গত হয়। ইংরাজী এবং মালয় ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ প্রচলিত আঞ্চলিক-শব্দবহুল ভাষা এই দ্বীপবাসীর অপভাষা।

প্রাণ-প্রাচুর্য্যে সতত ভরপুর এই দ্বীপবাসীরা। সতত প্রাণ-চাঞ্চল্যে উচ্ছল, অনাবিল আনন্দে মাতোয়ারা এরা। এরা পানাসক্ত সত্য, কিন্তু এদের পানের উদ্দেশ্য মত্ততা নয়, জীবনকে আনন্দ দিয়ে উপভোগ করা। নেই এদের কোন সাহিত্য—নেই এদের কোন সংস্কৃতি—নেই উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকলা (কারণ এরা এক্ষণে সর্ব্বহারা); কিন্তু এদের নৃত্যে, গীতে, আমোদে, প্রমোদে সতত আনন্দমুখর এই দ্বীপভূমি। প্রকৃতি মাতা নিপুণ হস্তে সাজিয়ে দিয়েছেন এই দ্বীপাঞ্চল অফুরন্ত শ্যামলিমা দিয়ে—অতুলনীয় সুষমা দিয়ে স্বহস্তে প্রিয় সন্তানদের জন্য যেখানে যা দিলে হয় সুশোভন, মনোহর, তেমনি করেই। দিয়েছেন এর কুঞ্জে কুঞ্জে মধুর বিহগ-কূজন-গীতি, দিয়েছেন এর বনে বনে পুষ্পভরা শাখী, দিয়েছেন এর বায়ুমণ্ডলে স্নিগ্ধ শীতল নির্ম্মল সমীরণ, দিয়েছেন এর মস্তকোপরি আলোঝলমল স্বচ্ছ আকাশ। এসকলই এদের স্বর্গীয় সম্পদ! হোক এরা দরিদ্র, হোক এরা মূর্খ, হোক এরা অর্দ্ধনগ্ন—এদের ন্যায় ভাগ্যবান কারা? স্বর্গের নন্দন ত অবাস্তব;—শুধু কবিকল্পনা, কিন্তু এ হ'ল মর্ত্যভূমির বাস্তব-নন্দন। অকূল সমুদ্রবক্ষে—অন্তহীন—বিস্তার হীন জলরাশি নাবিকদের মনে যখন এনে দেয় অবসাদ, চক্ষে যখন এনে দেয় ক্লান্তি; যখন তাঁদের ক্ষুধিত নয়ন এখনও শ্যামল ভূভাগ দর্শনের জন্য করে ছটফট, তখন সহসা সবুজের সমারোহপূর্ণ এই দ্বীপপুঞ্জেরা নিকোবর তাঁদের নিকট প্রতীয়মান হয় এক অপরূপ রঙিন আনন্দালোকরূপে। তখন অপূর্ব্ব পুলকের দোলা দিয়ে যায় তাদের শ্রান্তহৃদয়ে—ক্লান্ত নয়নে এই শ্যামলিমামাত নিকোবর।

অপরিমিত সম্পদ, অজস্র ঐশ্বর্য্য পুঞ্জীভূত আছে দ্বীপমালার জলে স্থলে, বনে জঙ্গলে। এর নারিকেল-সুপারি, এর বৃহদায়তন বৃক্ষসমূহ, এর বিবিধ ভেষজ উদ্ভিদ, এর অগণ্য শঙ্খ শম্বুকাদির শিল্প দ্বারা প্রভৃত ধনাগমের সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত ক'রতে হবে। ঐ সকল মূল্যবান সম্পদ দ্বারা আধুনিক উপায়ে শিল্প গড়ে তুলতে পারলে ভারতরাষ্ট্রের ধনাগার স্ফীত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা আজ চিন্তার বিষয় বটে! আশা করা যায়, কৃষির উন্নয়ন ও শিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই নগণ্য দ্বীপপুঞ্জ অচিরে হ'য়ে উঠবে ধনে সম্পদে সমৃদ্ধ, সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ। আজ ভারতরাষ্ট্রের কর্ত্তব্য—এই দ্বৈপ ভ্রাতৃগণের পিপাসিত হৃদয়ে প্রবাহিত করা আনন্দরসের উৎস। এই মূক ভাষাহীন ভ্রাতৃগণের কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলা মধুর বাণী। এই বধির ভ্রাতৃগণের শ্রুতিবিহীন কর্ণকুহরে দান করা সুস্বর-সঙ্গীত-ঝঙ্কার শ্রবণের শক্তি। ভারতরাষ্ট্রকে দিতে হবে এদের আকুল হৃদয়ে ভ্রাতৃত্বের মাধুর্য্য ঢেলে, দিতে হবে এদের প্রাণে নব নব আশা, দিতে হবে এদের কুটীরে কুটীরে নব-জ্ঞান বিজ্ঞানের সমুজ্জ্বল দীপশিখা প্রজ্বালিত ক'রে। তবেই সার্থক হবে ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের সাম্য ন্যায়ের গণতন্ত্র।

ব্যর্থতা

[*Wilfred Owen*-এর FUTILITY কবিতার ভাবানুবাদ]

ওকে রৌদ্রে নিয়ে যাও
মৃদু রৌদ্রের পরশ
আর ক্ষেতের সরস
মাটি, আজকে কি তারা জাগাও—
ঘুম থেকে জাগাতো তাকে যারা?
শস্যক্ষেত্রে বীজ যে ছড়ান বাকি:
সকালে সূর্য করতো ডাকাডাকি
কানে,—আজকে দিনটা ছাড়া।
আজকে যদি ঘুমটা তার ভাঙে,
বৃদ্ধ দরদী সূর্যের আলো বাগে।

ভেবে দেখ, সূর্যের তাপে বীজেরা ঘোমটা খোলে,
কি ভাবে একদা প্রাণ জেগেছিল শুষ্ক মাটির কোলে।
মানুষের দেহ, সুস্থ, অঙ্গ, সবল স্নায়ু ও পেশী,
এখনো যাতে রক্ত উদাম,—এমন কি কাজ বেশী
তাতে প্রাণ সঞ্চার করা? হেন পরিণতি হবে যদি অবশেষে
তবে মাটির শরীর বেড়েছিল কেন ধীরে ধীরে তিলে তিলে?
আর কেন বা এতদিন ধরে নির্বোধ-হাসি হেসে
ভাঙিয়েছিল পৃথিবীর ঘুম আঁধার দুয়ার খুলে?

অনুবাদক—দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের লিপিকলা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো লিপিকলার প্রসঙ্গটিও অত্যন্ত বিতর্কিত। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ আছে। উপাদানের অপ্রতুলতার জন্য উৎপন্ন এই সব বিভিন্ন মতের সবিস্তার আলোচনা না করে মোটামুটি কয়েকটি প্রধান মত নিয়ে আলোচনা ও ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব নির্ধারণ বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

ম্যাক্স মুলার, বার্ণেল প্রমুখ উনিশ শতকের প্রাচীতত্ত্বজ্ঞদের মতে ভারতীয় লিপিকলার সূচনা খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম অথবা চতুর্থ শতকের আগে সম্ভব নয়। তাঁদের পরে ডক্টর বুহ্লার, যিনি ভারতীয় লিপিকলা সম্পর্কে পথিকৃৎ-প্রতিম ও স্মরণীয় গবেষণা করে গেছেন, দীর্ঘদিনের গবেষণা-অন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সর্বপ্রাচীন ভারতীয় লিপি অর্থাৎ 'ব্রাহ্মী'-র বিবর্তন খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অথবা তারও আগে, আনুমানিক ৮০০ অব্দে সম্পূর্ণ হয় এবং তাহলে 'ব্রাহ্মী' লিপির প্রবর্তন-কাল খৃষ্টপূর্ব দশম শতক অথবা তারও আগে বলে ধরা যেতে পারে।

এই শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতদের গবেষণার পর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য ও উপাদান পাওয়া গেছে। এই তথ্যের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতার অস্তিত্ব। প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে যে বিশিষ্ট এক ধরণের লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা 'ব্রাহ্মী' লিপির আদিরূপ কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা না গেলেও এটুকু বলা যায়, ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব খৃষ্টপূর্ব দশম শতকের বহু আগে পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্ব, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-ধৃত ঐতিহ্য থেকে সপ্রমাণ হয়। নারদ-স্মৃতির (খৃষ্টীয় ৫ম শতক) সাক্ষ্যে এবং বৃহস্পতির উক্তিতে ('আহ্নিকতত্ত্বে' উদ্ধৃত) মনে হয় ভারতীয় সাহিত্যের জন্ম-সময় থেকেই ভারতবর্ষে লেখার চল ছিল। বৃহস্পতির উক্তিতে আরও প্রমাণ হয়, লেখার সর্বপ্রাচীন এবং সর্বপ্রচলিত উপাদান ছিল তালপত্র, ভূর্জপত্র জাতীয় 'পত্র' বা পাতা। জৈন-গ্রন্থ 'সমবায়ঙ্গসূত্র' ও 'পন্নবনাসূত্র' এবং বৌদ্ধগ্রন্থ 'ললিতবিস্তর' লিপিকলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সরব। মহাকবি কালিদাসও 'রঘুবংশে' বলেছেন, লিপিকলায় যথার্থ জ্ঞান থাকলেই সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডারের সামীপ্য লাভ করা যায়। ভারতীয় শিল্পকলার প্রাচীন নিদর্শন সমূহেও (যেমন, বাদামি-তে ব্রহ্মার ভাস্কর্যে) দেখা যায় তালপত্রের স্তবক বা গ্রন্থের প্রতীকের উপস্থিতি। সরস্বতীর হাতে বই থাকার রীতিও খুব প্রাচীন। সুতরাং ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতে লিপিকলা অনেক দিন আগে থেকেই প্রচলিত ছিল; প্রাচীন ভারতীয়রা যে সব জিনিস মুখস্থ করে রাখত কিছুই লিখত না, এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য নিয়ে আর একটু বিশদ আলোচনা করলে এ তত্ত্ব সপ্রমাণ হয়। রামায়ণে ও মহাভারতে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই যাদের মোটামুটি চেহারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলে ধরা হয়, 'লিখ্,' 'লেখ,' 'লেখন' প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায় এবং ব্যাসদেব যে মহাভারত রচনার সময় গণেশকে লিপিকার হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, এ কিংবদন্তী তো সর্বজনবিদিত। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' (খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক), সূত্র-সাহিত্য (খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতক এবং দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে যার উৎপত্তি ও বিবর্তন) পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতক) যাস্কের 'নিরুক্ত' (পাণিনির কিছু পূর্ববর্তী), 'উপনিষদ' 'আরণ্যক' ও 'ব্রাহ্মণ' সমূহ এমন কি 'বেদ' সমূহের সাক্ষ্যেও লিপিকলার প্রাচীনত্ব নিরূপিত হয়। 'উপনিষদ' 'আরণ্যক' ও 'ব্রাহ্মণ' সমূহের অধিকাংশই গদ্যে লিখিত; দার্শনিকতা-সমৃদ্ধ আচার-আচরণ সম্বলিত এই বিরাট গদ্য-সাহিত্যের পুরোটাই যে শুধুমাত্র স্মৃতির মাধ্যমেই বংশ-পরম্পরায় রক্ষিত হতো, এমন কথা মনে হয় না। শিক্ষণ ও স্মরণের জন্য অন্ততঃ এদের কিছু অংশ লিখিত হতো, এমন ধারণা অস্বাভাবিক নয়। 'উপনিষদ-আরণ্যকে'র আগের যুগে অর্থাৎ বেদের সময়ও যে লেখার চল ছিল, এ কথা 'বেদ'-সমূহের সাক্ষ্যেই মনে হয়। যেমন, ঋগ্বেদে (১০, ৬২, ৪) আছে, সাবর্ণি রাজা যে এক হাজার গরু দান করেছিলেন, তাদের কানে '৮' সংখ্যাটি লেখা ছিল। যজুর্বেদের 'বাজসনেয়ী সংহিতা'র পুরুষমেধ-সংক্রান্ত লোকজনদের মধ্যে গণক বা জ্যোতির্বিদকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া 'তৈত্তিরীয় সংহিতা'র 'অযুত' 'প্রার্ধ' প্রভৃতি বিরাট বিরাট সংখ্যা বা 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র দিন-রাত্রির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ, বা ঋগবেদ যজুর্বেদে নানাবিধ ছন্দের উল্লেখ থেকে মনে হয়, বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতাগণ লিপিকলার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাব-নিকাশ (অযুত— ১,০০,০০,০০,০০,০০০ ; প্রার্ধ— ১০,০০,০০ ০০,০০,০০০) প্রভৃতি তার প্রমাণ ইত্যাদি করতে হলে লিখতে জানা চাই, ছন্দ মাত্রা যতি ইত্যাদির তাত্ত্বিক বিচার লিপিকলার জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান যাঁদের আছে তাঁরাই এ সব বিচার করতে পারেন এবং লিখিত সাহিত্য ছাড়া এ সব বিচার করবার মতো জ্ঞানার্জন অসম্ভব।

বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ ঘাঁটলেও ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের প্রাচীনতম স্তর মোটামুটি ভাবে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতকের মধ্যে রচিত বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। 'সুত্তান্ত'তে 'অক্ষরিকা' নামে এক ধরণের খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়; একজনের পিঠে আঙুল দিয়ে লেখা অক্ষর চেনা ও বলতে পারাই ছিল শিশুদের এই খেলার বিষয়। ভিক্ষুরা এ খেলা খেলতে পারত না। অন্য পক্ষে 'বিনয়পিটকে' লেখন বা লিপিকলাকে নির্দোষ গণ্য করে ভিক্ষুদের কাছে অনুমোদন করা হয়েছে। 'জাতক' সমূহে ব্যক্তিগত ও সরকারী চিঠিপত্র, রাজকীয় ঘোষণা, পত্রক বা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি প্রসঙ্গেই শুধু লেখার উল্লেখ নেই, পরন্তু লেখার উপাদানরূপে বর্ণক নামক দারু-লেখনী ও দারু-ফলকেরও উল্লেখ আছে। 'মহাবগগে' লেখ অর্থাৎ লেখা গণনা অর্থাৎ গণিতবিদ্যা এবং

রূপ অর্থাৎ ফলিত গণিতবিদ্যা বিশেষতঃ মুদ্রা-সংক্রান্ত গণিতবিদ্যা বিদ্যায়তনের পাঠক্রম হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। এদের পরবর্তী 'ললিতবিস্তর' নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেবকে লিপিশালায় (অর্থাৎ যেখানে লিখতে শেখানো হতো) গিয়ে বিশ্বামিত্র নামক শিক্ষকের কাছে লিপিশিক্ষা করতে হয়েছিল। এ ভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহের সাক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং চতুর্থ শতকের মধ্যেই লিপিকলা সম্পর্কে ভারতবাসীরা উল্লেখ্য রকমের জ্ঞানার্জন করেছিল এবং খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অনেক আগেই লিপিকলার প্রবর্তন হয়েছিল। জৈনদের গ্রন্থেও যে ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা আছে, তার উল্লেখ নিবন্ধের গোড়ার দিকে করা হয়েছে।

শুধু ভারতীয় সাহিত্য নয়, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় যে কয়েকজন গ্রীক লেখক তাঁর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের রচনা থেকেও ভারতে লিপিকলার প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে। আলেকজাণ্ডারের অন্যতম সেনাপতি নিয়ার্কাসের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ভারতীয়রা তুলো এবং ছেঁড়া কাপড় থেকে কাগজ তৈরী করতে জানে এবং তারা কাগজ তৈরি করত, নিশ্চয়ই লেখার জন্য। মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে রাস্তায় সরাইখানার দূরত্ব-নির্দেশক খোদাই করা পাথরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুইন্টাস কার্টিয়াস লেখার উপাদান হিসাবে এক ধরনের গাছের নরম ছালের কথা বলে গেছেন। কেউ কেউ কার্টিয়াস-প্রোক্ত এই ছালকে প্রাচীন-সাহিত্য উল্লিখিত ভূর্জপাতা বলে মনে করেন। গ্রীক লেখক ছাড়া, অন্যান্য বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণীও এ সম্পর্কে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। যেমন, প্রখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ এবং আরব পণ্ডিত আল-বিরুণী ভারতীয় লিপিকলার প্রাচীনত্বের কথা বলে গেছেন। চৈনিক মহাকোষ 'ফ-ওয়ান-সু-লিন'-এ আছে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে লিখতে হয় যে ব্রাহ্মী লিপি তা 'ফন' বা ব্রহ্মা কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং লিপি হিসাবে তা সর্বোত্তম।

এতক্ষণ শুধু গ্রন্থ-প্রমাণ বা পরোক্ষ-প্রমাণের কথা বলা হলো। এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রসঙ্গে আসা যাক। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হলো লেখ-মালা। অশোকের শিলা ও স্তম্ভলেখসমূহের পূর্ববর্তী কয়েকটি লেখ এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করে। এরানে (সওগর জেলায়, মধ্যপ্রদেশ) প্রাপ্ত একটি মুদ্রার লেখ, ভট্টিপ্রোলু লেখমালা, তক্ষশীলায় প্রাপ্ত মুদ্রার লেখ, মহাস্থানগড়ে (রাজসাহী জেলার বগুড়ায়) প্রাপ্ত শিলা-লেখ, সোহগৌরা তাম্র-লেখ, পিপরাওয়া বৌদ্ধ পাত্র-লেখ, বড়লিতে প্রাপ্ত (আজমীরে) লেখ ইত্যাদি অশোক-পূর্ব লেখসমূহ এবং অশোকের লেখমালা থেকে সপ্রমাণ হয়, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে লিপিকলা বর্তমান ছিল এবং ব্রাহ্মীলিপি নামক সে সময়কার এই লিপির বিবর্তন হতে নিশ্চয়ই আরো বেশ কয়েক শতক লেগেছিল।

অশোকের লেখ-সমূহে অক্ষরগুলির আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে বুহ্লার বলেছেন যে, আঞ্চলিক চরিত্রের এত বিভিন্ন অক্ষর এবং দ্রুতহস্তা যুক্ত অক্ষর এত বেশি এই কথাই প্রমাণ করে যে অশোকের সময়ের লিপিকলার ইতিহাস দীর্ঘদিনেও এবং সেই সময়ে অক্ষরগুলি পরিবর্তনশীল স্তরে ছিল। একটি লেখতে অশোক বলছেন, অনুশাসন পাথরে খোদাই করার কারণ পাথর দীর্ঘস্থায়ী; একথার তাৎপর্য অচিরস্থায়ী জিনিসেও সে সময় লেখার কাজ চলত। বৌদ্ধ শ্রমণ ও সাধারণের পাঠ ও আবৃত্তির জন্য ধর্মশাস্ত্রসমূহও যে অশোক নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তা তাঁর আর একটি শিলা-লেখ থেকে জানা যায় এবং ঐ ধর্মশাস্ত্রসমূহ নিশ্চয়ই পাতা, গাছের ছাল, কাগজ ইত্যাদিতে লেখা হতো। যাঁরা প্রশ্ন করেন, ভারতবর্ষে লিপিকলার ইতিহাস খুব প্রাচীন হলে তার নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? তার উত্তরও এখানেই নিহিত। অর্থাৎ পাতা, গাছের ছাল ইত্যাদি বিনাশশীল পদার্থ বলেই তাদের উপর কোন সুপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া, প্রাচীন ভারতে বিশেষত বৈদিক যুগে স্মৃতিশক্তির উপর জোর দেওয়া হতো। শাস্ত্র-পারঙ্গমতা বলতে তখনকার দিনের ভারতীয়রা বুঝতেন, অধীত শাস্ত্রে স্মৃতি-নির্ভরতা। যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষায় লিখিত শাস্ত্র দেখে শিক্ষাদান অসম্মানজনকরূপে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু স্মৃতি-নির্ভর ছিলেন বলে ভারতীয়রা শাস্ত্রাদি লিখতেন না বা লিখতে আদৌ জানতেন না, এটা কোন যুক্তি নয়। সদ্যোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপরি-উল্লিখিত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসমূহ—ভারতীয় সাহিত্য-প্রসঙ্গ ও বিদেশীদের বিবরণী প্রসঙ্গ এবং লেখমালা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে লিপিকলার ইতিহাস অতিশয় প্রাচীন।

হঠাৎ পাওয়া

কুমারী শিখারাণী সিংহ-রায়

নিথর নিস্তব্ধ রাত।
ঘুম-জাগা চোখে শুয়ে আছি,
হঠাৎই কি যেন পেয়েছি মনে
খেলেছি অনেক কানামাছি
অজান্তে তোমার মনের মতন।
আজ পেলাম হঠাৎ—কি আনন্দ!

অস্থির মনে ছাদে বসলাম।
মাথার 'পরে একথালা জোনাকী জ্বলছে
ওদের প্রতিভূ বায়ু কানে কানে বলছে
তোমারই কথা অতি সঙ্গোপনে
ফিরে তাকালাম, অস্থির মনে
চারিদিকে লেখা শুধু তোমার নাম।

বাঙলা অভিধান সঙ্কলন

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

"সংবাদ অরুণোদয়" সংবাদপত্রের সম্পাদক জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত অভিধানের নাম 'নূতন অভিধান'। অভিধানখানি 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মুদ্রাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত। প্রকাশ-সাল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২০ ও শব্দসংখ্যা ১২০০০। এই অভিধানখানি প্রায় ১৮ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (১৭৭৮ শকাব্দে) পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহায়তায় বহু শব্দ যোজনা হয়ে পুনর্মুদ্রিত হয়। তখন পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫৮।

এই ১৮৩৮ সালেই আরও দু'খানি অভিধান দেখা যায়। একখানি পারসিক অভিধান। সঙ্কলয়িতার নাম অজ্ঞাত। অপরখানির নাম 'বঙ্গাবিধান'।

হলধর ন্যায়রত্ন 'বঙ্গাভিধানের' সঙ্কলয়িতা। এতে ৬২৬৪টি শব্দ আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ১০০। এখানিতে কেবলমাত্র বাঙলা ভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত প্রসিদ্ধ শব্দগুলি দেওয়া আছে। কিন্তু সেগুলি প্রচলিত শব্দ বলে তাদের অর্থ দেওয়া হয়নি। কৈফিয়ৎস্বরূপ ন্যায়রত্ন ভূমিকায় বলেছেন "...অন্য অন্য অভিধানের রীতি মত ইহাতে শব্দের অর্থ দেওয়া গেল না আমার এই ত্রুটি বিজ্ঞ মহাশয়েরা গ্রাহ্য করিবেন না, যে হেতুক ইহাতে যে যে শব্দ লিখা গেল সেই সেই শব্দের অর্থবোধ এতদ্দেশীয় সমস্ত বিশিষ্ট লোকেরি আছে, তবে ইহার অর্থ লিখনে কেবল পুস্তক বৃদ্ধি মাত্র হয় তবে এই পুস্তকের এই মুখ্য প্রয়োজন যিনি শুদ্ধ ভাষা লিখিতে ও কহিতে চেষ্টা করেন তাঁহার উত্তম উপকার এবং বালকদের শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত উপকার হয় ইতি। শ্রীহলধর ন্যায়রত্নস্য।"

হলধর ন্যায়রত্নের আর একখানি অভিধান 'শব্দার্থ-প্রকাশাভিধান'। ইহা ১৮৪৩-৪৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

এরই কিছু আগে কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার 'অমর ভাষা' নাম দিয়ে 'অমরকোষে'র বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন (১৮৩০-৪০) 'করেছি অমর ভাষা শব্দ অনুমান।' তর্কালঙ্কার মহাশয় হরিনাভি গ্রামে মুখোপাধ্যায় বংশে আনুমানিক ১৭৯৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৪৫এর কাছাকাছি। তাঁর কবিখ্যাতি ছিল এবং কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন।

বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অম্বিকা-নিবাসী পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি (১৮১২—১৮৮৫) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন (১৮৪৫—১৮৭৩)। অধ্যাপনা করার আগে তিনি বহুবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। স্বকৃত অভিধানও করেন। নাম—'শব্দার্থরত্ন'। প্রকাশ-কাল—ভাদ্র ১৭৭৩ শক (১৮৫১); 'শব্দস্তোম'—১ম খণ্ড প্রকাশ হয় ১৮৬১; 'লিঙ্গানুশাসন'। তৎপরে তিনি এক বৃহদাকার অভিধান সঙ্কলনের মনস্থ করেন। ১২ বছর কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করে এক সুবৃহৎ অভিধান 'বাচস্পত্যাভিধান' তৈরী করেন। ইহা ৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৮৭৩—৮৪), পৃষ্ঠাসংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮৮২। এত বড় ব্যয়বহুল অভিধান তৎকালে বিরল বললেও চলে।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় (?—১৮৫০) বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। প্রথমে হিন্দু কলেজে ও পরে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি স্কুলের পণ্ডিত হন (১৮৪৩—৬০)। তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সহায়তায় বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তন্মধ্যে তিনখানি অভিধান প্রকাশ করেন।

(১) শব্দাম্বুধি। অর্থাৎ বিবিধ কোষ হতে সঙ্কলিত বহুতর সংস্কৃত শব্দ সহকৃত গৌড়ীয় সাধু ভাষান্তর্গত বহুল শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ। শকাব্দ ১৭৭৫ (১৮৫৩ খৃঃ)। পৃঃ ৬০৪।

(২) নূতন অভিধান। পূর্বে বলা হয়েছে। সন ১৭৭৮ (১৮৫৬ খৃঃ)।

(৩) অমরার্থদীধিতি। অর্থাৎ কবিবর অমরসিংহ কৃতাভিধানস্থ শব্দ সকলের নাম লিঙ্গ প্রকাশিকা। পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্তৃক কোলব্রুকের অভিধান হতে সঙ্কলিত। সন ১২৬৩ (১৮৫৬) পৃষ্ঠা ১২৫+১১০।

১৮৫৬ সালে 'কবিতা-কুসুমমালা' রচয়িতা বেণীমাধব দাস 'শব্দার্থমুক্তাবলী' নামে একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন।

১৮৬০ সালে ২৪-পরগণার রাজপুর গ্রামের গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮২২—১১০৩) 'শব্দসার' নামে একখানি ব্যুৎপত্তিযুক্ত সংস্কৃত-বাঙলা অভিধান প্রকাশিত হয়। তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও পরে অধ্যাপক হন। অভিধান ব্যতীত আরও কয়েকখানি বই তাঁর ছিল।

বিদ্যোৎসাহী রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের (১৭৮৪—১৮৬৭) নাম বাঙলা সমাজে বিশেষ পরিচিত। তিনি তাঁর বিরাট গ্রন্থ সংস্কৃত অভিধান পর্যায় শব্দ সমেত 'শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলন আরম্ভ করেন ১৮২২ সালে। দীর্ঘ ৩০ বছর কঠোর পরিশ্রম করে উহা শেষ করেন ১৮৫২ সালে। রাধাকান্ত দেবকে শুধু আভিধানিক বললে তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে বোঝা যায় না। তৎকালীন রেনেশাঁস যুগে রাধাকান্ত দেব বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙলা, আরবী, ফার্সী, ইংরেজি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' পণ্ডিত সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। অভিধানখানি প্রকাশ হয় খণ্ডাকারে। ১ম কাণ্ড ১৮২২ সালে। ২য় কাণ্ড ১৮২৭, ৩য় কাণ্ড ১৮৩২, ৪র্থ কাণ্ড ১৮৩৮, ৫ম কাণ্ড ১৮৪৪, ৬ষ্ঠ কাণ্ড ১৮৪৮ ও ৭ম কাণ্ড ১৮৫২। পরে এর পরিশিষ্ট সংযোজন করেন ১৮৫৮ সালে।

এর পরে ১৮৬৬ সালে 'প্রকৃতিবাদ অভিধান'-এর আবির্ভাব হয়। সঙ্কলন করেন প্রসিদ্ধ রামকমল বিদ্যালঙ্কার। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তৎকালীন সংস্কৃত বাঙলা অভিধানের মধ্যে প্রকৃতিবাদ অভিধানের প্রশংসা ও প্রচলন হয় খুব বেশী। এর শব্দসংখ্যা ২৭০০০। তার মধ্যে প্রায় ৮০০ দেশজ শব্দ আছে। এই অভিধানের ৩টি পরিশিষ্টে অকারাদিক্রমে দ্রব্যগুণ, পৌরাণিক জীবনচরিত, ঐতিহাসিক জীবন-চরিত আছে। অভিধানের মধ্যে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়ার সূত্রপাত এই অভিধান থেকেই দেখা যায়। তার পরে বহু অভিধানে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়ার রীতি লক্ষিত হয়

ঢাকা থেকে ১৮৬১ সালে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত 'মেদিনীকোষ' সম্পাদন করেন। বহু পুঁথি থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিভিন্ন

গ্রন্থখানি সম্পাদিত। দেব-নাগরী অক্ষরেই মুদ্রিত। গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই আখ্যা পত্র আছে—"মেদিনী। শ্রীমন্মেদিনী কর প্রণীতা। শ্রীসোমনাথ শর্ম্মণা পরিশোধিতা। কলিকাতায়াং। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতা। সংবৎ ১৯২৫।" ইংরেজি আখ্যা পত্র "Medini । or । a Dictionary of Homonymous word । By । Medini Cara । Edited by Somanath Mukhopadhyaya. । Calcutta : । New Sanskrit Press. । 1869. ।

এই সালেই শ্রীরামপুর থেকে স্কুলছাত্রদের জন্য একখানি ইংরেজি বাঙলা অভিধান প্রকাশ হয়। মুদ্রাকরের নাম থাকে বি, এম, সেন, শ্রীরামপুর ১৮৬৯।

স্কুল বুক সোসাইটি থেকেও একখানি ছোট বাঙলা অভিধান বেরোয় এই সালে। সেখানি নাকি খুব ভাল ছিল। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য।

১৮৭০ সালে রাধামাধব শীল একখানি অভিধান সংকলন করেন। এই বৎসরেই কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার কৃত 'শব্দার্থপ্রকাশিকা' নামে একখানি অভিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৩৩।

১৮৭৪ সালে জে সাইকস (J Sykes) নামে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক 'English and Bengali Dictionary'র এক পরিবর্তিত সংস্করণ বের করেন। রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এই সালে 'নূতন শব্দার্থপ্রকাশিকা' নামে এক সংস্কৃত ও বাঙলা অভিধান প্রকাশ করেন।

১৮৭৬ সালে যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অম্বিকাচরণ বিশ্বাস এই তিনজনে মিলে একখানি অভিধান সঙ্কলন করেন। এখানির নাম 'শব্দসারমহানিধি'।

১৮৮১তে গোপালচন্দ্র মিত্র বাংলা-ইংরেজি, অভিধান 'A Dictionary in Bengali & English প্রকাশ করেন।

১৮৯০ সালে শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় 'বাংলা অভিধান' এবং ১৮৯২ সালে বলরাম পাল দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ 'প্রকৃতিবিবেক অভিধান' প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ সালে রাধিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'ভারত দর্পণ' নামে অভিধান প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ সালে তারানাথ বাচস্পতির পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর 'মেদিনীকোষ'-এর (নানার্থশব্দ কোষ) এক সুসংস্কৃত সংস্করণ বার করেন। বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০১।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 'সমর্থকোষ' নামে একখানি বাঙলা অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধানখানি ২ খণ্ডে ডিমাই ১।৪ সাইজ। তিন কলমে ছাপা। ১ম কলমে সংস্কৃত ইংরেজি অভিধান, ২য় কলমে ইংরেজি-ইংরেজি ও বাঙলা অভিধান, ৩য় কলমে উদ্ভিদ ও দ্রব্যগুণের অভিধান। ৫৫২ পাতার পর থেকে পৌরাণিক চরিতাভিধান। ১ম খণ্ড ও ২য় মিলে প্রায় ১৫০০ পাতা। প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্র এইরূপ—

"সমর্থকোষ।" বাঙ্গালা অভিধান। English and Bengali Dictionary, । গার্হস্থ্য-দর্পণ বা দ্রব্যগুণাভিধান। এবং পৌরাণিক চরিতাভিধান। বিবিধ প্রসিদ্ধ ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শব্দার্থবোধক গ্রন্থাবলম্বনে গঠিত। Vol. I. প্রথম খণ্ড। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ৬১ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, সমর্থকোষ প্রেসে। শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত। তারিখ পাওয়া যায়নি কারণ আমার হাতে যে খণ্ডটি এসেছে সেটির আখ্যাপত্র ব্যতীত কয়েকটি পাতা ছেঁড়া।

নানা রকমের অভিধান সংকলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষাকে পুষ্ট করার জন্য বাঙলা শব্দ সঙ্কলনের একটা রেওয়াজ হয়। অনেকেই এই শব্দ সংকলনে হাত দেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় খাঁটি বাঙলা শব্দ সংকলনের প্রয়াস পান। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একখানি খাঁটি বাঙলা অভিধান করার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু উহা ঘটে ওঠে নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি 'প' পর্যন্ত ছেপেছিলেন। তিনি কিঞ্চিদধিক ১০০০ বাঙলা ও সংস্কৃত শব্দের একটা সঙ্কলন করেন এবং সেগুলি অ-কারাদিক্রমে সাজান। তাতে 'হ' পর্যন্ত শব্দের সংগ্রহ থাকে কিন্তু সেগুলি তার জীবদ্দশায় হস্তলিখিত কাগজেই থেকে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্তে লিখিত শব্দ সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দান করেন। উক্ত পত্রিকায় (১৩০৮ বঙ্গাব্দের ২য় সংখ্যায়) উহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু হ-কারাদি শব্দগুলির হাতে লেখা পাতায় কতক অংশ কপি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে উহা অসম্পূর্ণই থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খাঁটি বাঙলা শব্দগুলির কিছু নমুনা নীচে দেওয়া যেতে পারে—অকাহুয়া, অচিনা, অজজ্বল, অঠেল, আবাদ, অবুঝ, অমনি, আওন, আউল, আএব, আত্রএবি, আত্রএস, আকাট, আগনা, উদমাদা, উপজ, একসা, এলথেল, ওগারহ, ওড়নপাড়ন, ওলদ, ওসার, কড়খা, কাণ্ডুই, কাতার, কাতুকুতু, কারচোপ, কারিন্দা, খড়ু, খিলখিল, গপগপ, ঘড়াঞ্চি, মারখেকুড়া ছোঁ-আচ, টসটস, টপ্কান, ঠাঁঠঁও, ঠাকুরাণি, ঠাড়, ডিডান, ঢেমনা, তাউই ইত্যাদি।

খাঁটি বাঙলা শব্দ সংগ্রহের সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দগুলি এর পর থেকে সঙ্কলন হতে থাকে। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার পুরানো খণ্ডগুলির এবং পঞ্চপুষ্প প্রভৃতি মাসিক পত্রগুলির মধ্যে অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সতীশচন্দ্র ঘোষ—গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ, রজনীকান্ত চক্রবর্তী—মালদহের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ, রাজকুমার কাব্যভূষণ —গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য শব্দ, মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য— যশোহরের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ, পরমেশপ্রসন্ন রায়—ঢাকার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার গ্রাম্য শব্দের অভিধান, দেবেন্দ্রনাথ বসু—নদীয়া ও ২৪-পরগনা জেলার কতকগুলি গ্রাম্য শব্দ, দেবনারায়ণ ঘোষ—ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার লেখ্য ও কথ্য শব্দ, কৃষ্ণনাথ সেন—ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইলের অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার অভিধান, সুরেশ দাশগুপ্ত—বগুড়া জেলার প্রচলিত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দ, মোল্লা বহীউদ্দীন আহম্মদ—শব্দ সংগ্রহ, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী—ফরিদপুর কোটালিপাড়ার গ্রাম্য শব্দ, গৌরীহর মিত্র— বীরভূমের প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ, রাখালরাজ রায়—গ্রাম্য শব্দ ইত্যাদি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও কিছু শব্দ সঙ্কলন করেছিলেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ৪র্থ ভাগে উহা প্রকাশ হয়। এই যে আঞ্চলিক শব্দাভিধান সঙ্কলন এতে অভিধানকারদের অনেক দায়িত্ব ও শ্রম হ্রাস পেয়েছে।

প্রকৃতিবাদ অভিধানের সংকলনের রীতি এবং অধ্যায় বিন্যাস এবং

বিভিন্ন শব্দ-সঞ্চয়ের কল্যেই আভিধানিকদের মনে একটা নতুনত্বের সুর বাজল। তাঁরা নতুন ঢঙে বৈজ্ঞানিক রীতিতে অভিধানগুলিকে সাজাতে লাগলেন বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি দিয়ে। এখন আর শুধু সংস্কৃত শব্দের অভিধান নয়। সংস্কৃত ও অসংস্কৃত উভয় শব্দ মিলিয়ে। এই প্রকৃতিবাদকে অনুসরণ করে সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' প্রকাশ করেন ১৯০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে। ১ম সংস্করণে সাধারণ সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দার্থ ছাড়াও ভাষাবিচার, অর্থবিচার, হিন্দু সঙ্গীত প্রভৃতি পরিশিষ্টে কয়েকটি বিষয় পৃথকভাবে প্রকাশিত। কিন্তু ২য় সংস্করণে (১৯০৭) ইহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়—তাতে পরিশিষ্টে ৬টি ভাগ সংযোজিত হয়। (১) শব্দার্থ ও জীবনচরিত, ধাতু প্রকৃতি, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি। (২) প্রায় ৭০০ বাঙলা ও সংস্কৃত বইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (৪) বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মৈথিলী বা প্রাকৃত শব্দার্থ। (৫) সংস্কৃত প্রবাদ (পরবর্তী সংস্করণে বাঙলা প্রবাদও সংযোজিত হয়)। (৬) অপ্রচলিত আরবী, ফারসী ও ইংরেজি ভাষায় ব্যাখ্যা ও অনুবাদ।

১৯০৭ সালে রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদের 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' প্রকাশিত হয়। এই অভিধানে বাঙলা শব্দই দেওয়া হয়। এতে সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অ-তৎসম বাঙলা শব্দ দেওয়া হয়।

এই সালে বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় "Beginner's Dictionary of English Words, Phrases and Indioms done into Bengali' (১৯০৭) একখানি অভিধান প্রকাশ করেন।

১৯০৮ সালে সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'An up to date Bengali to Bengali Dictionary' (২য় সং) প্রকাশ করেন।

১৯১৩ সালে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে প্রকাশ করেন। 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' প্রকাশের পর যোগেশচন্দ্র অসীম সাহসে বাঙলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সঙ্কলন করেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের পরিচয় শুধু আভিধানিক বলে নয়—তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ্, গণিতবিদ্, সমাজতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক, ও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ছিলেন। অভিধান সঙ্কলনের ইতিহাসে আচার্য যোগেশচন্দ্রের নাম স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যের মত আপন ঐশ্বর্যে দীপ্যমান। পূর্ববর্তী অভিধানকার যেমন বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে বাছা বাছা শব্দগুলিকে অভিধানে স্থান দিয়েছেন—তেমনি আচার্য যোগেশচন্দ্র একটা মূল উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর অভিধান থেকে ঐ সব বাছা বাছা শব্দগুলিকে বিসর্জন দিয়েছেন। এই অভিধানের শব্দগুলি সমস্তই অ-তৎসম বাঙলা শব্দ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭১। এই অভিধানের বানান ও ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"বাঙলা ভাষায় বহু বহু সংস্কৃত শব্দ চলিতেছে, বস্তুত বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙলা সাহিত্যে চলে। যে সকল শব্দ স্পষ্ট সংস্কৃত, উচ্চারণে না হইলেও বানানে সংস্কৃত, সে সকল শব্দের নিমিত্ত সংস্কৃত শব্দকোষ আছে। কিন্তু বাঙলা প্রয়োগে যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে সে সকল শব্দ এই কোষে পাওয়া চাই।" এই কোষে বর্ণ বিন্যাস রীতি, বানান, নতুন অক্ষর, শব্দ বিন্যাস, ব্যুৎপত্তি প্রত্যেকগুলি বহু গবেষণায় তিনি সাজিয়েছেন। উচ্চারণের জন্য নতুন অক্ষরের প্রচলনও করেন।

অভিধানকারের দায়িত্ব সম্বন্ধে আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেছেন—সত্যিকারের অভিধানকারের দায়িত্ব দু'টি—একটি হচ্ছে শব্দের অর্থকে বেঁধে দেওয়া, আর হচ্ছে তাকে প্রকাশ করা। অভিধানকারকে শুধু শব্দার্থ প্রকাশ করলেই চলবে না—শব্দার্থের ঔচিত্য-অনৌচিত্য, তার প্রয়োগের সীমা অভিধানকারকেই নির্ণয় করে দিতে হবে। শব্দার্থের প্রয়োগের সীমা বেঁধে দিতে গিয়ে আর একটা জিনিস দেখতে হবে—অনেক অপপ্রয়োগ, অনেক গ্রাম্যতা, অনেক শব্দুরেপনা ভাষায় অনর্গলভাবে ঢুকে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত যার জোর বেশী তা টিকবেই; কিন্তু অভিধানকার সহজে এই শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেবেন না—এ বিষয়ে তাঁকে গোঁড়া না হয়ে দৃঢ় হতে হবে। বানানের বেলাতেও অতিরিক্ত শব্দুরেপনা, মাত্রাতিরিক্ত কথ্য ঢঙ্ এমনি নানা জিনিস প্রশ্রয় পাচ্ছে, এগুলোকে একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিতে হবে—অযথা অনুনাসিক, অযথা ওকার, অযথা য-ফলা, অযথা হস্ চিহ্ন এসব বর্জনীয়।—অভিধানের শাসন সত্ত্বেও ভাষার আপন প্রণেতা তার পথ তৈরী করে যাবে। অভিধানকার ভাষার নির্মাতা নন, নিয়ামক মাত্র।"

১৯১১ সালে সুবলচন্দ্র মিত্রের 'The Students Bengali English Dictionary" প্রকাশ হয়। এতে বাঙলা, সংস্কৃত এবং বৈদেশিক শব্দ যেগুলি সাধারণতঃ বাঙলাভাষার মধ্যে চলে আসছে—যেমন ইংরেজি, পর্তুগীজ, ফার্সী, আরবী, হিন্দী প্রভৃতি—সেগুলিও দেওয়া আছে। গ্রাম্যভাষা, প্রবাদ প্রভৃতির ইংরেজি অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। উপরন্তু এতে ভারতীয় অনেক গাছ গাছড়ার ইংরেজি নাম দেওয়া আছে।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রকাশ হয় ১৯১৭ সালে। বইখানিতে ৭৫,০০০ শব্দ থাকে। এতে দেশী, বিদেশী, সংস্কৃত, অসংস্কৃত, গ্রাম্য, প্রাদেশিক, তৎ-সম, তৎ-ভব, মিশ্র-শব্দ সব স্থান পায়। বহু পারিভাষিক শব্দও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শব্দোচ্চারণ দেওয়া আছে। ১ম সংস্করণের ২০ বছর পরে বৃহদাকার নিয়ে এই বইখানির ২য় সংস্করণ হয়। শব্দসংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১,১৫০০০। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩১৮+৮১। এর এক বিরাট পরিশিষ্ট আছে তার অনেকগুলি ভাগে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া আছে। যেমন—সমোচ্চার্য শব্দাভিধান, বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত দৃষ্টান্ত স্থানীয় পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক ব্যক্তির নাম ও পরিচয়, ধাতু ও ধাত্বর্থ, বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত, হিন্দী, ইত্যাদি অবঙ্গীয় প্রবচন ও শব্দাদির অর্থ, বঙ্গীয় হিন্দু মুসলমান নরনারীর প্রচলিত নাম সংক্ষেপ ও উচ্চারণ সহ ডাক-নাম বোধক শব্দাভিধান, বাঙ্গালা সাহিত্যে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ স্থানের ভৌগোলিক সংস্থান, প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা, পরিমাণ, সংখ্যা ও পরিমাণবাচক শব্দাভিধান, মুদ্রা বিনিময়ের হার, প্রুফ সংশোধন, সাংকেতিক বর্ণমালা, বিদেশী নামের প্রতিবর্ণী-করণ, বাংলা বানানের নিয়ম।

১৯১৯ সালে ঢাকা থেকে চারুচন্দ্র গুহ ৩ খণ্ডে এক ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করেন। অভিধানখানিতে প্রায় ১০০০ উদাহরণস্বরূপ ছবি আছে। পূর্ণ নাম—The Modern Anglo Bengali Dictionary, A Comprihensive Lexicon of Bi-lingual literary, scientific and technological words and terms, with over one Thousand illustrations, Bengal library, Dacca, 1919.

১৩২৯ সালে রাজশেখর বসু মহাশয় অভিধান সঙ্কলনে শব্দ নির্বাচনের একটা পথ দেখালেন 'চলন্তিকা' প্রকাশ করে। তিনি শব্দ সংগ্রহকে প্রাধান্য দেননি যেমন যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয় শব্দ নির্বাচনে জোর দেন বেশী। শব্দগুলির সব রকম মানে দেবার চেয়ে তিনি চলতি মানে দেওয়ার রীতি করেন। 'চলন্তিকার' আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এর পরিশিষ্টে অনেক ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা দেওয়া আছে। অভিধানে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বিভাগীয় ভাবে একত্র সংযোজন এই অভিধানেই প্রথম মনে হয়। অবশ্য বর্ণানুক্রমিক শব্দের মধ্যে অনেক অভিধানে বৈজ্ঞানিক নাম ও তার পরিভাষা দেওয়া আছে যেমন চারুচন্দ্র গুহ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতির অভিধানে আছে। চলন্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৫০, শব্দসংখ্যা ২৬,০০০ কিছু বেশী।

১৩৩২ সালে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' প্রকাশ হয়। বইখানি সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দের প্রকাণ্ড অভিধান ৫ খণ্ডে। এক এক খণ্ডে প্রায় ৮৫০ পৃষ্ঠা। গত জানুয়ারি মাসে তিনি দেহ রক্ষা করেছেন। তিনি আজীবন একটা সুষ্ঠু সর্বোপযোগী অভিধান রচনার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন ১৩০৫ সালে এবং তাহা উদ্‌যাপন করেন ১৩৪৬ সালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন এই কার্যে, আর গ্রন্থের প্রথম প্রকাশে বলেছিলেন, 'তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহার সমর্থন করিবেন।' এই অভিধানে প্রাচীন ও নবীন বাঙলা গদ্য, পদ্য, নাটক প্রভৃতি থেকে উল্লেখযোগ্য শব্দ, ব্যুৎপত্তি, প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত শব্দের রূপ, বিদেশী ভাষান্তরের রূপ, শব্দগুলির অর্থ [illegible]নের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃতি প্রয়োগ, বাঙলায় [illegible] শব্দ, বিভিন্ন শব্দ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক বাঙলা শব্দ সমূহ রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের আদর্শানুযায়ী সংযোজিত হয়েছে। বইখানি [illegible]মে খণ্ডাকারে প্রকাশ না হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যাকারে প্রকাশ হয়। [illegible] সংখ্যা প্রকাশ হয় আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

আশুতোষ [illegible]বের প্রচলিত কতকগুলি অভিধান আছে 'আশুবোধ' 'ছাত্রবোধ' 'প্রকৃতিবোধ' 'শব্দবোধ' প্রভৃতি তন্মধ্যে 'নূতন বাঙ্গালা অভিধান' নামে একখানি বড় অভিধান প্রকাশ হয় ১৩৩৭ সালে। এই অভিধানে আছে শব্দার্থের পর চরিতমালা, সাহিত্য পরিচয়, প্রবচন, বিবিধ জ্ঞাতব্য, পরিশিষ্টে ব্যাকরণ। বানান প্রভৃতির নিয়ম।

১৩৫৩ সালে কাজী আবদুল ওদুদ 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' নামে একখানি সাধারণ্যে প্রচলিত চলতি শব্দের অভিধান প্রকাশ করেন।

১৩৫৪ সালে ঋষি দাস 'আধুনিকী' অভিধান বার করেন। ইনি অনেক ক্ষেত্রে চলন্তিকার অনুসরণ করেন।

এর পর ১৩৫৫ সালে 'সংসদ বাঙলা অভিধান' সঙ্কলন করেন শৈলেন্দ্র বিশ্বাস এবং ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত উহা সংশোধিত করেন। এই অভিধানখানিতে শব্দসংখ্যা ৪০ হাজার। বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০০। বইখানিতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আছে।

এত বিভিন্ন ধরণের অভিধানের মধ্যে ১৩৬৫ সালে 'মাসিক বসুমতী' সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের সংক্ষিপ্ত সমসংজ্ঞক অভিধান 'রত্নমালা' প্রকাশ হয় এক নতুন বৈশিষ্ট্যে। এতে একটি শব্দের প্রচলিত অনেকগুলি সমশব্দ দেওয়া আছে। প্রাচীনকালে এই পর্যায় শব্দ গ্রন্থের নাম ছিল নিঘণ্টু এবং তা বিদ্যার্থীরা কণ্ঠস্থ রাখত। 'অমরকোষে'ও সমার্থক শব্দ আছে, 'মেদিনীকোষে, 'শব্দকল্পদ্রুমে' ও 'ব্যুৎপত্তিমালাতে'ও আছে কিন্তু তাদের ব্যবহারের রেওয়াজ এখন উঠে গেছে। অথচ লেখকদের রচনাক্ষেত্রে একটি সমার্থক শব্দের জন্য বৃথা কালক্ষেপ করতে দেখা যায়। এরকম একখানি অভিধান হাতের কাছে থাকলে শব্দ নির্বাচন সহজতর হয়। এই পকেট সাইজের বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪৮। আকারে ক্ষুদ্র হওয়ায় ইহা সহজ ব্যবহারযোগ্য।

প্রবন্ধের পরিশেষে আমি জানাচ্ছি, যতগুলি অভিধানের নাম ও পরিচয় এই প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে সম্পূর্ণ ঐ তালিকা নয়। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত দুষ্প্রাপ্য অভিধানের মধ্যে কয়েকটি অভিধান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রবন্ধে শুধু বাঙলা দেশের অভিধানের কথাই বেশী বলা হয়েছে। বাঙলার বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও বহু সংস্কৃত ও প্রাদেশিক অভিধান সঙ্কলিত হয়েছে—তাদের আলোচনা এখানে হয়নি। অভিধান সঙ্কলন যাঁরা করে গেছেন তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যে মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তা অবর্ণনীয়, বিদগ্ধ সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র তাঁরা—এই কথা বলে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করলুম।

সমাপ্ত

প্রহরের প্রার্থনা

মঞ্জুলিকা দাশ

আশ্বিন-শিউলিগুলো ঝরে গেছে মাঠে, দরদীয়া—আকাশে
মেঘের থেকে নেমে আসে শীতকম্প্র সন্ধ্যার প্রহর, ক্রমে গাঢ়-বিধুরতা
বিষণ্ণ-মননে। বন্ধ্যা-দিন চাওয়া-পাওয়া শেষ করে
ফিরে গেছে দারুণ হতাশে।
বটগাছ একা সাক্ষী হয়ে থাকে তবে, পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার
আলো নিবে গেলে
স্মৃতি হয়ে থাক শুধু গাছের ছায়ারা,
দেখবো, পথিক-চোখে অতীতের পাওয়া—
মায়াদীঘি হয়ে কোনদিন ভরে ওঠে কি না।

আকাশের নীলতারা ভালবাসা হয়ে থাক,
দেখবো, তৃষিত বুকে তৃপ্তির কলসখানি
—কারও দুটো স্নিগ্ধ হাত ঢেলে দেয় কি না,
প্রত্যাশা গভীর হয়, দেখি চেয়ে,—
একখানি তৃণময় মাঠ সবুজ সম্পদ—
নিয়ে আসে নাকি
পথ ভুলে বালি-সাহারায়। নইলে, বুঝতে হবে,
ভালবাসা অতর্কিতে দেখা—পাওয়া
আলেয়ার ফাঁকি।

কাল তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দুই

সুখী রাজার প্রাসাদের লাগোয়া এক কামার বাড়ি। রাজার ষোলকলা সুখের মধ্যে পনের কলা পূর্ণ। কিন্তু বাকি এককলা যেন রাহুর মত ওই পনেরকলা গ্রাস করতে চলেছে।

তার কারণ, কামারের হাতুড়ি। রোজ ভোর না হতেই সেই হাতুড়ির ঘায়ে রাজার সুখ-নিদ্রা টোটে। কিন্তু রাজা বড় দয়ালু। রাজা কি করেন ?

কি আর করবেন। কোনরকম কষ্ট না দিয়ে রীতিমত আদরযত্ন করে কামারকে শূলে চড়ালেন। তারপর অবশ্য সুখের ষোলকলা পূর্ণ হওয়ায় একঘেয়ে ক্লান্তিতেই রাজা শেষ পর্যন্ত পনের আনা সুখই ছেঁটে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। রাজার ষোল আনা সুখের মতই ধীরাপদর একরাতের রাজকীয় সুখনিদ্রার শেষ তৃপ্তিটুকু খান্‌খান্‌ হয়ে গেল শকুনি ভটচাযের পাঁজর ত্তমড়নো প্রভাতী কাশির শব্দে। প্রথম ভোরে নাকি সর্বত্র স-কলরবে পাখি জাগে। এই সুলতান-কুঠির প্রথম ভোরে স-কাশি শকুনি ভটচায জাগেন। বারোয়ারী কলতলায় এক বালতি জল নিয়ে বসে বিপুল বিক্রমে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কাশেন। অন্ধকারে শুরু হয়, আলো জাগলে শেষ হয়। রোজই শোনে, শুনতে শুনতে আবার পাশ ফিরে ঘুমোয়। কিন্তু এই একটা রাত সুলতানের মতই সুলতান কুঠিতে ঘুমিয়েছিল ধীরাপদ। ঘুমের থেকেও বেশি। সুপ্তি ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল।

একটানা ঠনঠন কাশির শব্দে ঘোর কেটে গেল। সেই কাশির ঘায়ে সারা রাতের সর্বাঙ্গ-জড়ানো নরম অনুভূতিটুকু মিলিয়ে যেতে লাগল। দুই চোখ বন্ধ রেখেই হাতড়ে হাতড়ে অনুভব করে নিল, গা-ডোবানো পালঙ্ক নয়—সে শয়ান মেঝের শতরঞ্চি-শয্যায়। দুই চোখ শক্ত করে বুজেই সেই বিস্মৃতির অতলে ডুবতে চেষ্টা করল আবারও। কিন্তু সাধ্য কি। এই প্রথম ধীরাপদও ভাবল, কোনরকম কষ্ট না দিয়ে সেই কামারের মত শকুনি ভটচাযকেও শূলে চড়াতে পারলে, অর্থাৎ, এই বাড়ি থেকে নির্বিঘ্নে তাড়াতে পারলে কাজ হত।

ধীরাপদ চোখ মেলে তাকালো। আবছা অন্ধকার। খুশি হল। সুলতান কুঠির বাস্তবের ওপট আলোকপাত হয়নি এখনো। এক ওই বেদম কাশি ছাড়া। সোনাবউদি বলে ঘাটের কাশি। ···সোনাবউদিকে নিয়ে চারুদির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে কেমন হয় ? মিলের কতটা কাছাকাছি হয় তাহলে ? মনে মনে ওই দুজনকে মুখোমুখি দেখতে চেষ্টা করে ধীরাপদ হেসে ফেলল। সোনাবউদির বয়েস বছর তিরিশ, আর চারুদির চুয়াল্লিশ। কিন্তু মেয়েদের আসল বয়েস নাকি যেমন দেখায় তেমন। সোনাবউদির বয়েস যখন যেমন মুখ খোলে, তখন তেমন।

শুয়ে শুয়ে ধীরাপদ গত রাতের ব্যাপারটাই ভাবছে এখন, আর বেশ কৌতুক অনুভব করছে। এ-রকম একটা কাণ্ড করে বসল কেন ! ও-ভাবে খেতে চাওয়ার পরে চারুদির মুখের চকিত কারুকার্য ভোলবার নয়। আগে চারুদি অনেক খাইয়েছেন, কালও যদি ও সহজভাবে বলত, চারুদি খিদে পেয়েছে, কি আছে বার করো—কিছুই মনে করার ছিল না। এতক্ষণ না বলার জন্য মৃদু তিরস্কার করে তাড়াতাড়িই খাবার ব্যবস্থা করতেন তিনি। কিন্তু তার বদলে অপ্রস্তুতের একশেষ একেবারে। স্বপ্নরাজ্য থেকে তাঁকে যেন একেবারে রূঢ় বাস্তবে টেনে এনে আছড়ে দিয়েছে ও। চারুদি একেবারে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ছিলেন মুখের দিকে। এতক্ষণের মধ্যে সেই যেন প্রথম দেখলেন তাকে। তারপর ত্রস্তে উঠে চলে গেছেন। একটি কথাও বলতে পারেন নি। ক্ষুধার্তকে অতক্ষণ ধরে খাদ্যের বদলে কাব্য পরিবেশনের লজ্জা ভোগ করেছেন। খাবার আসতে সময় লাগেনি খুব। পার্বতীর পক্ষ-তত্ত্বাবধানে উগ্র রকমেরই হয়েছিল খাওয়াটা। কি লাগবে বা কতটা লাগবে একবারও জিজ্ঞাসা করেনি। সরাসরি দিয়ে গেছে। ভিতর থেকে কর্ত্রীর সেই রকমই নির্দেশ ছিল বোধহয়। পার্বতী স্বল্প ইঙ্গিতে যে-টুকু জানিয়েছে, তার মর্ম, কর্ত্রী নিজে হাতে খাবার তৈরি করে পাঠাচ্ছেন।

চারুদির ওই ভর-ভরতি আত্মমগ্নতার মধ্যে ও-ভাবে খেতে চেয়ে দু'জনের ব্যবধানটা হঠাৎ বড় বিসদৃশভাবেই উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে এসেছে সে। এর পরেও চারুদি আর তেমন সহজ হতে পারেন নি। চেষ্টা করেছেন। পারেন নি। ব্যবধান থেকেই গেছে। অন্তরঙ্গ আগ্রহে চারুদি তার ঠিকানা নিয়ে রেখেছেন, বার বার যেতে বলে দিয়েছেন, গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়েছেন—তবু। গাড়ি অবশ্য বাড়ি পর্যন্ত আনে নি ধীরাপদ। আগেই ছেড়ে দিয়েছে। সুলতান কুঠির আঙ্গিনায় সে ওই গাড়ি নিয়ে ঢুকলে অত রাতেও বাড়িটার গোটা আবহাওয়া চকিত বিস্ময়ে নড়ে-চড়ে উঠত। কিন্তু এতকাল বাদে দেখা চারুদির সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড করে বসল কেন সে ? জঠরের চাহিদা তো অনেক আগেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। আর বললেও ওভাবে বলল কেন। অমন খুশির

মুখে এভাবে অপ্রস্তুত করতে গেল কেন চারুদিকে ? অথচ, বেশ জেনে শুনেই করেছে। হঠাৎ কেন জানি রূঢ় ছন্দপাতন ঘটানোর লোভটা সংবরণ করতে পারেনি কিছুতে। চারুদির কথা-বার্তা, হাসি-খুশি, চিন্তা-ভাবনা, ঘরের আবহাওয়া এমন কি তাঁর বসার শিথিল সৌন্দর্যটুকু পর্যন্ত যেন কি একটা প্রতিকূল ইন্ধন যুগিয়েছে ওকে। ক্ষুধার চিন্তাটা ঠিক ওই ভাবেই প্রকাশ না করে পারেনি।

কিন্তু হঠাৎ এমন হল কেন ?

ধীরাপদ নিজের মনেই হাসতে লাগল, সোনাবউদির বাতাস লাগল গায়ে ?

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো স্পষ্টতর। ধীরাপদ ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে উঠে বসল। আর শুতে ভালো লাগছে না। জানালা দিয়ে চুণবালি খসা দাগধরা দেয়ালের ওপর ভোরের প্রথম আলোর একটা তির্যক রেখা এসে পড়েছে। দুপুরে অনেক সময় ওই ভাঙা দেয়ালের দাগ ধরে অনেক কিছু কল্পনা করে সময় কাটে। যেমনটি ভাবে, ভাঙা দেয়ালের দাগে দাগে জোড় লেগে তেমনি একটা ছাপ পড়ে দেয়ালের গায়ে। ছেলেবেলায় মেঘে মেঘে অমনি জোড় লাগাতো ধীরাপদ। অভ্যাসটা এখনো যায়নি। ঘায়ের মত ওই বড় চাপ-ওঠা জায়গাটার ওপরে চোখ পড়লে মনে হয়, মস্ত একটা ঈগল ছোঁ মারছে। কল্পনায় ঈগল দেয়ালে দানা বাঁধার পর এখন আর ততো কুৎসিত লাগেনা ভাঙা দেয়ালটা। ওটার ওপর সোনালী আলোর রেখা পড়তে সকালের ঠাণ্ডা মাথায় এখন কোনো রূপের কাল্পনিক কলানো যাচ্ছে না। শুধু ভাঙাই লাগছে।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। এই সুলতান কুঠিরও সকালের প্রথম রূপটা মন্দ নয় যেন। দেখা বড় হয় না ধীরাপদর, বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আর ওই মজাপুকুরটাও যেন এই ভোরের আলোয় শুচিস্নান করে উঠেছে। স্নিগ্ধ নম্রতাটুকু চোখে পড়ার মতই। দুই একজন অতিবৃদ্ধকেও সুন্দর লাগে। সকালের এই সুলতান কুঠির পরিবেশটিও তেমনি। বুড়িয়ে গেছে, কিন্তু একেবারে যতিশূন্য হয় নি যেন।

খানিক বাদেই এই রেশটুকু আর থাকবে না। ঊষাবর্ণের ওপর আর একটু আলো চড়লেই সুলতান কুঠির অতি বৃদ্ধ হাড়-পাঁজর শিরা-উপশিরাগুলো গজগজিয়ে উঠবে। মানুষগুলো একে একে জেগে উঠলেই নিষ্ক্রিয় হবে সুলতান কুঠির হৃৎপিণ্ড—কুৎসিতই মনে হবে তখন। শকুনি ভটচায জেগে উঠেছেন, কিন্তু তিনি কল-পারে কাশছেন বলে এদিকটার মৌন ছন্দে ছেদ পড়েনি। পড়বে—ওই কদমতলার বেঞ্চিতে হুঁকো হাতে একাদশী শিকদার এসে বসলেই। শকুনি ভটচাযের পর তাঁর জাগার পালা। গায়ে একটা বিবর্ণ তুলোর কম্বল জড়িয়ে ওই বেঞ্চিটাতে বসে গুড়গুড়িয়ে তামাক টানবেন আর অপেক্ষা করবেন।

অপেক্ষা করবেন খবরের কাগজের জন্যে।

তাঁর সেই সতৃষ্ণ প্রতীক্ষা নিয়ে সোনাবউদি অনেক হাসাহাসি করেছে, টিকা-টিপ্পনী কেটেছে। অবশ্য ধীরাপদর কাছে। ধীরাপদ নিজের চোখেও দেখেছে দুই একদিন। খবরের কাগজ পড়ার জন্যে এই বয়সে আর এমন নিষ্ক্রিয় জীবনে এত আগ্রহ বড় দেখা যায় না। তামাক টানেন আর পুকুরধারের সাইকেল-রাস্তাটার দিকে চেয়ে থাকেন। কাগজ-অলার লালরঙা সাইকেলটা চোখে পড়ামাত্র সাজুহে দুমড়ানো মেরুদণ্ড সোজা করে বসেন। জানালা দিয়ে সোনাবউদির ঘরে কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে যায় কাগজওয়ালা। হুঁকো হাতে শিকদার মশাই ঘুরে বসেন একেবারে। সামনের বন্ধ দরজার ওপর দুচোখ আটকে থাকে। আহাররত গৃহস্বামীর মুখের দিকে যেমন করে চেয়ে থাকে ঘরের পোষা বেড়াল—তেমনি। একটু বাদে দরজা খুলে যায়। একটা ছোট ছেলে বা মেয়ে কাগজ দিয়ে যায় তাঁকে। কাগজ নয়, উপোসী লোকের পাতে রাজভোগ দিয়ে যায় যেন। হুঁকো বেঞ্চির কোণে রেখে শশব্যস্তে কাগজ খোলেন শিকদার মশাই।

কিন্তু আরো অবাক কাণ্ড, এত আগ্রহের পরে কাগজখানা পড়ে উঠতে পুরো দশ মিনিটও লাগে না তাঁর। পড়লে ঘণ্টাখানেক লাগার কথা। কিন্তু তিনি পড়েন না, দেখেন। দেখা হলে কাগজখানা ভাঁজ করে পাশে রেখে দেন। ওই ঘর থেকে আবার কোনো বাচ্চা-কাচ্চা বেরিয়ে এলে দিয়ে দেবেন। ধীরে সুস্থে শিথিল হাতে তামাক সাজেন আবার। একটা বাদামী রঙের ঠোঙায় বাড়তি টিকে তামাক মজুত থাকে পাশে। ওদিকে কল-পারের কাশিপর্ব সম্পন্ন করে শকুনি ভটচায ব্রাহ্ম স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে আরো খানিক ভগবানের নাম করেন। পাশাপাশি ঘরের বাসিন্দাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন। অতঃপর খেলনা-বাটির মত খুব ছোট একটা এনামেলের বাটি হাতে জবাকুসুম সংকাশ উপলব্ধি করতে করতে কদমতলার বেঞ্চএ এসে বসেন শকুনি ভটচায।

বাটিতে গঙ্গাজল।

শিকদার মশাই তাড়াতাড়ি হুঁকো এগিয়ে দেন। গঙ্গাজলে হুঁকো শুদ্ধি করে নিয়ে তামাক খেতে খেতে শকুনি ভটচায সেদিনের খবরের কাগজের খবরবার্তা শোনেন। দশ মিনিটে পড়া কাগজের মর্ম দু'ঘণ্টা ধরে বলতে পারেন একাদশী শিকদার। কিন্তু তাঁর বলা না বলাটা শ্রোতার আগ্রহের উপর নির্ভর করে। আলোচনা জমে উঠলে হুঁকো হাতাহাতি হতে থাকে ঘন ঘন, নতুন করে সাজা হয় তামাক। ছোট্ট বাটির গঙ্গাজলে হুঁকো শুদ্ধ হতে থাকে বারবার। ইতিমধ্যে শ্রোতা এবং হুঁকোর ভাগীদার আর একজন বাড়ে। কোণা-ঘরের রমণী পণ্ডিত। রোজ না হোক, প্রায়ই আসেন তিনিও। প্রায় অপরাধীর মতই গুটিগুটি এসে বেঞ্চির একেবারে কোণ-ঘেঁষে বসেন। বয়েস এঁদের থেকে কিছু কমই হবে। বাত্তিক দার্শনিক বৈষয়িক অথবা ঘরোয়া আলোচনার সব কিছুতেই তাঁর অনুজসুলভ বিনয়-নম্র আগ্রহ। বোবা-মুখে বসে বসে তত্ত্বকথা শোনেন, আর মাঝে মাঝে একটু-আধটু নিরীহ সংশয় অথবা নির্বোধ বিস্ময় প্রকাশ করে বসেন। আলোচনাটা তখনি জমে। শকুনি ভটচায আর শিকদার মশাইয়ের রসনা চড়তে থাকে। কারণ, রমণী পণ্ডিত মানুষটা যত নিরীহ হোন, তাঁর মুখের অজ্ঞ সংশয়ের হাবভাবটুকু খুব সহজে বিলুপ্ত হয় না। ফলে অন্য দুজনের মন্তব্য আর টিপ্পনী প্রায় কটূক্তির মত শোনায়। কিন্তু অভিজ্ঞজনের শ্লেষ গায় বেঁধে না রমণী পণ্ডিতের। শুনে শুনে জ্ঞানার্জন করেন তিনি, এবং আরো বার দুই তিন তামাক সাজার কষ্টটা তিনিই করে যান। তিন হাতে তখন হুঁকো বদলাতে থাকে আর গঙ্গাজলে শোধন হতে থাকে।

শকুনি ভটচাযের ঘরে পতিতপাবনীর অনিঃশেষ অনুগ্রহ।

সুলতান কুঠি থেকে গঙ্গা অনেক দূর। ধীরাপদর ধারণা পুণ্যও। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে পুণ্য চয়ন অথবা গঙ্গাজল সংগ্রহে বেগ পেতে হয় না একটুও। গঙ্গোদক এবং পুণ্যদানের ভাণ্ডারীও শকুনি ভটচায। ত্রিসন্ধ্যাশ্রয়ী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। পুণ্যের ইকিই হলেও হতে পারেন। কিন্তু গঙ্গাজল? ধীরাপদ বোকার মতই ভাবত আগে, অত গঙ্গাজল আসে কোথা থেকে?

এ বাড়ির যে-কোনো মহল্লায় বা যে-কোনো ঘরের বারমাসি আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত গঙ্গাজল শকুনি ভটচায সরবরাহ করে থাকেন। এ বেলায় মুক্তহস্ত তিনি। পাত্র হাতে এসে দাঁড়ালেই হল। এমনকি আশেপাশে কোনো পরিবারের সূতিকা-ঘর পরিশোধনের জন্য একসঙ্গে দু'তিন বালতি গঙ্গাজল দরকার হলেও সেটা অনায়াসলভ্য। অথচ ন'মাসে ছ'মাসে কোনো বিশেষ যোগ-তিথি এলেই শুধু শকুনি ভটচাযকে কমণ্ডলু হাতে গঙ্গাস্নানে যেতে দেখা যায়। যাবার সময় খানিক হেঁটে, খানিক ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে যান। ফেরার সময় কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল নিয়ে হেঁটেই ফেরেন। ট্রামে বাসে চাপলে গঙ্গাজল অশুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর গঙ্গাজলের কমণ্ডলুটাও কি মধুসূদনদাদার দইয়ের ভাঁড়ের মতই!

ধীরাপদর অজ্ঞতা দেখে সোনাবউদি একদিন হেসে সারা। এমন বুদ্ধি না হলে আর এই অবস্থা হবে কেন—এক সের দুধের সঙ্গে দু'সের জল মিশিয়ে তিন সের খাঁটি দুধ হয়, আর এক কমণ্ডলু গঙ্গাজলের সঙ্গে কলের জল মিশিয়ে দশ বালতি খাঁটি গঙ্গাজলও হতে পারে না?

ওই রকমই কথা-বার্তা সোনাবউদির। সোজা কথা সোজা ভাবে বলে না বড়। তবু ব্যাপারটা বুঝেছে ধীরাপদ। কিন্তু গঙ্গাজলের সমস্যা যখন এত সহজেই মিটতে পারে, শকুনি ভট্টাচার্যের ঘরের গঙ্গাজলের ওপরেই এত নির্ভর কেন সকলের সেটুকুই শুধু বোঝেনি।

ভূমি-শয্যায় উঠে দাঁড়িয়ে ধীরাপদ একচুপি বাইরেটা দেখে নিল। তারপর আবার বসল। একাদশী শিকদার এখনো আসেন নি। বেঞ্চিটা খালি। শীতের সকাল আর একটু তাজা না হলে হাড়ে কুলোয় না বোধ হয়। আজ এত ভোরে উঠেই পড়েছে যখন তাঁর মুখখানা একবার দেখার ইচ্ছে আছে ধীরাপদর। ফলে আজ আহার না জোটে না-ই জুটুক। ভদ্রলোকের নাম একাদশী নয়, শকুনি ভটচাযের নামও শকুনি নয়। সুলতান কুঠির নামকরণ ও-দুটো। কুঠির এক দঙ্গল ফাজিল ছেলের আবিষ্কার। প্রায় আট দশ বছর ধরে এই নাম দুটো প্রচার হয়ে হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। ওই নামে তাঁদের কাছে ডাকে চিঠি পর্যন্ত পাঠিয়েছে দুষ্টু ছেলেরা। কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় ভদ্রলোকদের সব রাগ গিয়ে পড়েছিল ধীরাপদর ওপর। তাঁদের ধারণা সেই পালের গোদা। কারণ, ও তখন ওই বাউণ্ডুলে ছেলেগুলোকে একত্র করে একটু আধটু সংস্কার কাজে মন দিয়েছিল। খবরের কাগজ হাতে থাকলে এই সুলতান কুঠির সংস্কার সাধনই বলাও প্রশস্তিদীপিত। কিন্তু সে সব পুরনো কথা। সংস্কারের ঝোঁক বেশিদিন টেকেনি। ছেলেগুলোর বেশির ভাগই চলে গেছে। ওই অক্ষয় নাম দুটি রেখে গেছে।

নামহানির অমর্যাদায় ও বেদনায় ক্রুদ্ধ এবং কাতর হয়ে দুজনেই তাঁরা গোপনে একে একে ধীরাপদর কাছেই আবেদন আর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু ধীরাপদ প্রতিকার কিছু করতে পারেনি। ফলে বিদ্বেষ। এতদিনে ওঁদের আসল নাম সকলেই ভুলেছে। এমন কি ওই নামে বাইরে থেকে কেউ খোঁজ করতে এলেও তাঁরাই বেরিয়ে আসেন। কিন্তু বিদ্বেষটুকু থেকেই গেছে। এক কুঠিতে ধীরাপদ তাঁদের সঙ্গে বাস করে আসছে ট্রেনের এক কামরার নিস্পৃহ যাত্রীর মতই। যোগ আছে, তবু বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সে নিস্পৃহ থাকলেও তাঁরা নিস্পৃহ নন সকল সময়। তার নিস্পৃহতাও সম্ভবত ক্ষোভের কারণ তাঁদের। ধীরাপদর কাছে সেটুকুও উপভোগের বস্তু।

আজ সকালে উঠে একাদশী শিকদারের মুখখানি দেখার বাসনার পিছনে কারণ আছে একটু। গত তিন দিন ধরে আগের মতই আধ মাইল পথ ঠেঙিয়ে একটা ষ্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কাগজ পড়ে আসতে হচ্ছে ভদ্রলোককে। সোনাবউদি সুলতান কুঠিতে ডেরা নেবার আগে যেমন পড়তেন। গত দু'বছর ওই মেহনত আর করতে হয়নি। বাড়ির আঙিনায় বসে কোলের ওপর কাগজ পেয়েছেন, দুটো বছরে বয়েসও দু'বছর বেড়েছে। এতদিনের অনভ্যাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাগজ দেখার ধকল সয় না। ষ্টলের সামনে হাঁটু মুড়ে বসতে হয়েছে তাঁকে। সেই অবস্থায় তিন দিনের মধ্যে দুদিনই ধীরাপদর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেছে। দুর্দশা দেখে দুঃখও হয়েছে, হাসিও পেয়েছে। সোনাবউদিই বা এরকম কেন। পাঠিয়ে দিলেই তো পারে।

গত তিন দিন ধরে সোনাবউদির ঘর থেকে কদমতলার বেঞ্চিতে কাগজ যাচ্ছে না। গেলে আর ফুটপাথে বসে কাগজ পড়বেন কেন শিকদার মশাই। মুখ ফুটে তিনিও চেয়ে পাঠাতে পারেননি বোধহয়।

সুলতান কুঠিতে একমাত্র সোনাবউদির ঘরেই রোজ সকালে খবরের কাগজ আসে।

একখানা নয়, দু'খানা আসে। একটা ইংরেজি একটা বাংলা।

গণুদা, অর্থাৎ গণেশবাবু খবরের কাগজের অফিসের পাকা পোক্ত প্রুফ রিডার। ইংরেজি বাংলা দু'খানা নামকরা কাগজ বেরোয় সেই দপ্তর থেকে। গণুদা বাংলার প্রুফ রিডার হলেও দু'খানা কাগজই বিনে পয়সায় পায়।

আর খানিক বাদেই হয়ত শিকদার মশাই বেঞ্চিতে এসে বসবেন। তার একটু পরে কাগজওয়ালা জানালা দিয়ে কাগজ ফেলে যাবে সোনাবউদির ঘরে। নেশাগ্রস্তের মত চনমনিয়ে উঠবেন একাদশী শিকদার। ঘুরে বসে বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে থাকবেন অনির্নিমেষে। দরজা এক সময় খুলবে ঠিকই, কিন্তু কেউ কাগজ দিয়ে যাবে না তাঁর কাছে।

তারপর শকুনি ভটচায আসবেন। খবরের কাগজের খবর নিয়ে কথা উঠবে না নিশ্চয়ই। শিকদার মশাইয়ের প্রাতঃকালীন খবর পাঠে একটু বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে তিনিও জানেন। দু'দিন ধরে সকালের আসরে রমণী পণ্ডিতকে দেখা যাচ্ছে না। এঁদের মন মেজাজ বুঝেই হয়ত কাছে ঘেঁষতে সাহস করছেন না।

অবশ্য সবই ধীরাপদর অনুমান। অনুমান, ভটচায এবং শিকদার মশাই গণুদাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে কিছু আলোক দান এবং কিছু পরামর্শ দান করেছেন। সংসারাভিজ্ঞ শুভার্থী প্রতিবাসীর কর্তব্য-বোধ তো এখনো জগত থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি একেবারে। তার ওপর গণুদা নির্বিজিক মানুষ, কোনো কিছুর

সাতে-পাঁচে নেই। সকলেই জানে গণুদা ভালো মানুষ। নিজের আপিস নিয়েই ব্যস্ত সর্বদা। কোনো সপ্তাহে সকালে ডিউটি, কোনো সপ্তাহে বিকেলে, কোনো সপ্তাহে বা রাত্তিরে। রাত্তিরে অর্থাৎ সমস্ত রাত। এর ওপর আবার বাড়তি রোজগারের জন্য মাসের মধ্যে দু'সপ্তাহ ডবল শিফট ডিউটি করে। ঘর দেখার ফুরসত কোথায় তার?

কিন্তু তার নেই বলে কি আর কারো নেই। গুণী ব্যক্তি নিজের ঘরের দিকে তাকাবার ফুরসত না পেলেও আর দশ ঘরের নাড়ীর খবর রাখে। আর, কর্তব্য-চেতন গুণী পড়শী নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখে। এতো এক বাড়ির ব্যাপার। অতএব কর্তব্যবোধেই ভটচায আর শিকদার মশাই ভালো-মানুষ গণুদার জটিলা রমণীটির হালচালের ওপর খর দৃষ্টি রাখবেন সেটা বেশি কিছু নয়। আর কর্তব্যবোধেই তাঁরা ভালো মানুষটিকে একটু আধটু উপদেশ দেবেন তাই বা এমন বেশি কি।

তবে তাঁদের এই কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে একটু আভাস ধীরাপদ রমণী পণ্ডিতের কাছ থেকে আগেই পেয়েছিল। কিন্তু ধীরাপদ তখন তলিয়ে ভাবেনি কিছু। অনর্থক অমন অনেক কথাই বলেন রমণী পণ্ডিত। কাঁক-মত সকলের সঙ্গেই একটু হৃদ্যতা বজায় রেখে চলতে চেষ্টা করেন। ধীরাপদ সেদিন কুঠির দিকে আসছিল আর তিনি যাচ্ছিলেন কোথায়। পথে দেখা। বাড়িতে দেখা হলে না দেখেই পাশ কাটিয়ে থাকেন। পথটা বাড়ির থেকে অনেক নিরাপদ বলেই হয়ত দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হাসিমুখে যে ভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন, মনে হবে, অন্তরঙ্গ পরিচিত জনের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা। শেষে বলেছেন, আজ এরই মধ্য বাড়ি ফিরছেন?···তা কি-ই বা করবেন, যে-রকম বাজার পড়েছে চট করে কিছুই আর হয়ে ওঠে না···অনেক দিন ভেবেছি আপনার হাতখানা একবার দেখব, তা আপনার তো আর ও-সবে বিশ্বাস টিশ্বাস নেই—তবু দেখাবেন না একবার, আপনার তো আর পয়সা লাগছে না।

ধীরাপদ হাসিমুখেই মাথা নেড়েছিল বোধহয়।

যাচ্ছেন? আচ্ছা যান··পুকুর ধারে শিকদার আর ভটচায মশাইকে দেখলাম বসে গণু বাবুর সঙ্গে গল্প-সল্প করছেন—

অকারণে বোকার মত একটু বেশিই যেন হেসেছিলেন পণ্ডিত। গণুদাকে বাড়ির কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতে দেখে না কেউ। কখন থাকে না থাকে হদিশ পাওয়াই ভার। সেই গণুদার সঙ্গে মজা পুকুরের ধারে বসে গল্প করছেন একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচায··ভাবলে ভাবার মত কিছু ছিল বই কি। পণ্ডিত সেদিন বোকার মত হাসেন নি। বোকার মত সে-ই বরং ওই পণ্ডিতের দুরাশার কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরেছিল। বড় আশা ভদ্রলোকের শহরের জাঁকজমকের মধ্যে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে পসার খুলে বসবেন। জ্যোতির্বার্ণব হবেন। মস্ত সাইনবোর্ড ঝুলবে। দু'-পাঁচ জন সাগরেদ থাকবে, রীতিমত অফিস হবে—চকচকে ঝকঝকে দু'-পাঁচটা গাড়িও এসে দাঁড়াবে দোরগোড়ায়। সবই হত, অভাব শুধু মূলধনের। সম্বলের মধ্যে অনেকগুলো ছেলেপুলে আর রুগ্না স্ত্রী। হাঁড়িতে জল ফোটে, দোকানে চাল। তবু আশা পোষণ করেন রমণী পণ্ডিত।

তাঁর দোষ নেই। আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।

পণ্ডিতের সেই বোকা-হাসির অর্থ ধীরাপদ পরে বুঝেছিল। এখানে দিন যাপনের একটানা ধারাটা আচমকা ধাক্কায় ওলট-পালট হয়ে যাবার পরে। বাকিটুকু বুঝেছিল, সেই সঙ্গে সকালে একাদশী শিকদারের খবরের কাগজ বন্ধ হতে দেখে। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ অনুমান করা কঠিন হয়নি। অনেক কিছুই অনুমান করা সম্ভব হয়েছে তারপর। সেদিন দাঁড়িয়ে শুনলে রমণী পণ্ডিত হয়ত আরো খানিকটা আভাস দিতেন। কারণ এর আগে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের কর্তব্যবোধের ধকলটা তাঁর ওপর দিয়েই গেছে। ছেলেমেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক কোণা-ঘরে পালিয়ে বেঁচেছেন।

সচকিতে জানালার দিকে ঘাড় ফেরাল ধীরাপদ। কদমতলায় যাঁদের আশা করেছিল তাঁরা নয়। তার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে সোনাবউদি। মুখে-চোখে সদ্য ঘুম-ভাঙা জড়িমা। চুপচাপ দেখে যেতে এসেছিল বোধহয়। ধরা পড়ে অপ্রতিভ একটু, কিন্তু এত সকালে কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যায় ও-ভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক আরো বেশি। এগিয়ে এসে এক হাতে জানালার গরাদ ধরে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার। কার ধ্যান হচ্ছে?

কম্বল ফেলে ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু দরজার দিকে এগোবার আগেই সোনাবউদি বাধা দিল আবার, থাক্ দরজা খুলতে হবে না, এই সাত সকালে ও-ঘর থেকে আমাকে বেরুতে দেখলে ঘাটের কাশি একেবারে ঘাটে পাঠিয়ে ছাড়বে।

হেসে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে কদমতলার দিকটা দেখে নিল একবার। তারপর ঈষৎ কৌতুকভরা দু' চোখ ধীরাপদর মুখের ওপর এসে থামল। শুধু কৌতুকভরা নয়, সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন সন্ধানীও। গায়ে কম্বল না থাকায় একটু শীত শীত করছে ধীরাপদর। কিন্তু সোনাবউদির শীতের বালাই নেই। শাড়ির আঁচলটাও গায়ে জড়ানো, অস্ত শৈথিল্যে কাঁধের ওপর পড়ে আছে। রাতের নিদ্রায় মাথার চুলও কিছুটা আবিন্যস্ত। তিনটি ছেলেমেয়ের মা সোনাবউদিকে রূপসী কেউ বলবে না। গায়ের রঙ ফর্সাও নয়, কালোও নয়। নাক মুখ চোখ সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়! স্বাস্থ্য খুব ভালও নয়, তেমন মন্দও নয়। তবু ওই ভারী সাধারণের মধ্যেও অন্য কিছু যেন আছে যা নিজের অগোচরে ধীরাপদ অনেক সময় খুঁজেছে। আজকের প্রথম উষায় জরাজীর্ণ সুলতান কুঠিরও একটা ভিন্ন রূপ দেখেছে। ধীরাপদর লোভ হল, এই সকালে সোনাবউদির মুখটির দিকে ভালো করে তাকালেও সেই অন্য-কিছু হয়ত চোখে পড়বে। কিন্তু সোনাবউদি যে-ভাবে দেখছে ওকে, ওর পক্ষে ফিরে সেই ভাবে তাকে দেখা সম্ভব নয়।

বিব্রত মুখে ধীরাপদ দাগধরা দেয়ালটার দিকে চেয়ে হাসল শুধু একটু।

একেবারে রাত কাবার করেই ফেরা হল বুঝি?

হালকা সুর, হালকা প্রশ্ন। মাঝের এই ক'টা দিন ছেঁটে ফেলতে পারলে একেবারে স্বাভাবিক! ঘাড় ফিরিয়েও ধীরাপদ মুখের দিকে তাকাতে পারল না ঠিক মত। কারণ, সোনাবউদির দু'চোখ তখনো ওর মুখের ওপর বিশ্লেষণরত। নিরুত্তর দৃষ্টি তার কাঁধ-ঘেঁষে কদমতলায় খালি বেঞ্চিটার ওপরে গিয়ে পড়ল। ফলে

সোনাবউদি চকিতে আরো একবার ফিরে দেখে নিল সেখানে কেউ এসেছে কি না।

রাত্তটা কোথায় ছিলেন কাল ?

ধীরাপদ জবাব দিল, এই ঘরেই।

এলেন কখন, মাঝ রাতে ?

সোনাবউদির গলায় বিদ্রূপের এই সুরটা শুনতে বেশ।—না, গোড়ার রাতেই।

ওমা, আমি তাহলে কি কচ্ছিলাম। জেগে ঘুমুচ্ছিলাম বোধ হয়। বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা, তারপর পলকে আর একবার আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে বলল, ঘণ্টাখানেক বাদে একবার ঘরে আসবেন, একটু কাজ আছে।

সোনাবউদি চলে যাবার পরও ধীরাপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। ভাবছে, মাঝের এই ক'টা দিন কি মিথ্যে ? কিছুই ঘটেনি ? মিথ্যে নয়। ঘটেছেও। কিন্তু যা ঘটেছে তার থেকেও ধীরাপদ আজ অবাক হল আরো বেশি। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘরে যেতে বলে গেল ওকে। ঠিক আদেশও নয়, অনুরোধও নয়। ওই রকম করেই বলত আগে। কিন্তু আগের সঙ্গে তো এখন অনেক তফাত। আবার কি তাহলে আপস হবে একটা ! ধীরাপদ আর তা চায় না। সোনাবউদির সব মানায়, আপস মানায় না।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ যেতে আর ভাবা হল না। হুঁকো আর তামাকের ঠোঙা হাতে শিকদার মশাই আর গঙ্গাজলের বাটি হাতে শকুনি ভটচায এক সঙ্গেই এসে কদমতলার বেঞ্চিতে বসলেন। আর কাগজ আসে না বলেই বোধহয় শিকদার মশাইয়ের আগে আসার তাড়া নেই। হাত বদলে বদলে প্রথমে চুপচাপ খানিকক্ষণ তামাক টানলেন তাঁরা। তারপর একটা দুটো কথা। কি কথা ধীরাপদ এখান থেকে জানবে কি করে। কিন্তু কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বসে দুজনেই তাঁরা বাড়িটার দিকে তাকালেন। প্রথমে গণুদার ঘরের দিকে, তারপর এদিকে। জানালার এধারে ওর ওপর চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি ফিরে বসলেন আবার।

কিন্তু মুখ দেখে খুব রুষ্ট মনে হল না ধীরাপদর। বরং তুষ্ট যেন কিছুটা। একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগল হঠাৎ। ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসলে কি হয় ? সম্পত্তি তো নয় কারো। বসুক না বসুক, ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে লাল সাইকেল হাঁকিয়ে কাগজওয়ালার আবির্ভাব। একাদশী শিকদারের হুঁকো টানা বন্ধ হল। কাগজওয়ালা কাগজ ফেলে দিয়ে প্রস্থান করল। সতৃষ্ণ নেত্রে ঘরের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। তাঁর হাত থেকে হুঁকো টেনে নিলেন শকুনি ভটচায খেয়াল নেই। পাশের ঘরের দোরগোড়ায় ধীরাপদ দাঁড়িয়ে আছে তাও না। কাগজ পাবেন না জেনেও এ-ভাবে ভদ্রলোক প্রতীক্ষা করেন নাকি রোজ !

কিন্তু সুলতান কুঠির আজকের এই দিনটাই যেন অন্য সব দিনের থেকে আলাদা। দু'-চার মিনিটের মধ্যেই যে-দৃশ্যটি দেখল, ধীরাপদ নিজেই হতভম্ব। আধ হাত ঘোমটা টেনে কাগজ হাতে ঘর থেকে বেরুল স্বয়ং সোনাবউদি। কুলবধূর নম্র-মন্থর চরণে কদমতলার বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেল। শিকদার মশাই বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শশব্যস্তে। সঙ্গে সঙ্গে শকুনি ভটচাযও। কাগজখানা হাতে নিয়ে একাদশী শিকদার সসঙ্কোচে বললেন কিছু। হয়ত নিজে কাগজ নিয়ে আসার জন্যেই বললেন কিছু।

এটুকু দেখেই ধীরাপদ অবাক হয়েছিল। পরের কাণ্ডটা দেখে দুই চোখ বিস্ফারিত তার। গলায় শাড়ির আঁচল জড়িয়ে দু'জনকেই একে একে প্রণাম করে উঠল সোনাবউদি। যেমন তেমন প্রণাম নয়। ভক্তি-ললিত প্রণাম।

বিস্ময়াভিভূত শিকদার-ভটচাযের যুগপৎ আশিস-বর্ষণ শেষ হবার আগেই তেমনি ধীর-নম্র চরণে ফিরল আবার।

আধ-হাত ঘোমটা সত্ত্বেও ধীরাপদকে দেখেছে নিশ্চয়। কিন্তু কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে গেল।

বিমূঢ় মুখে ধীরাপদ নিজের বিছানায় এসে বসল।

ছোটখাট একটা ভোজবাজি দেখে উঠল যেন। এ পর্যন্ত সোনাবউদির অনেক আচরণে অনেকবার হকচকিয়ে গেছে ধীরাপদ। সে সবই তার স্বভাবের সঙ্গে মেলে। এ একেবারে বিপরীত।

—সোনাবউদি কড়াপাকের সন্দেশ রে, লাগলে মাথা ফাটে, আসলে খারাপ নয়।

খট করে 'রণুর কথা ক'টা মনে পড়ে গেল ধীরাপদর। রণু বলত। রণেশ। গণুদার ছোট ভাই। এদের সঙ্গে যোগাযোগের অনেক আগেই এই সোনাবউদিটির কথা শোনা ছিল ধীরাপদর। মস্ত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মেয়ে নাকি। কিন্তু পণ্ডিত হলে হবে কি, ইস্কুলমাষ্টারের আর আয় কত। তার ওপর মেয়েও একটি নয়। তাই তাদের মত ঘরে এসে পড়েছে, নইলে সোনাবউদির মত···

তখনকার এই অদেখা সোনাবউদিকে নিয়ে ধীরাপদ ঠাট্টাও কম করেনি।

হঠাৎ রণুর কথা মনে হতে ধীরাপদ জোরে বাতাস টানতে চেষ্টা করল একটু। বিরক্তই হল। মনে পড়ে কেন। এত নিস্পৃহতা সত্ত্বেও এখনো বুকের কোথায় এ-ভাবে টান পড়ে কি করে।

দু'ভাইকে পাশাপাশি দেখলে সহোদর ভাবা শক্ত। বেঁটে-খাট গোলগাল চেহারা গণুদার—ধপধপে ফর্সা রঙ। সুখী আদল। রণু ঠিক উল্টো। কলেজে পড়তেই ধীরাপদর কেমন মনে হত ছেলেটা বেশিদিন বাঁচতে আসেনি। খুব দূরের কিছুর সঙ্গে কেমন যেন যোগ ওর। আধময়লা, রোগা লম্বা চিররুগ্ন মূর্তি। কথাবার্তা কম বলত, বেশিদিন টিকবে না নিজেই বুঝেছিল বোধহয়।

সোনাবউদির সঙ্গে ধীরাপদর সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হাসপাতাল থেকে রণুকে বাড়ি নিয়ে আসার পরে। গণুদার বাড়ি বলতে তখন এক আধা ভদ্র-বস্তির দু'খানা খুপরি ঘর। হাসপাতাল থেকে জবাব হয়ে গেছে। একটা চেষ্টা বাকি। পিঠের ঘুন-ধরা হাড়ের গোটা অংশটা কেটে বাদ দেওয়া। সে-অপারেশনও তখন মাদ্রাজের কোথায় হয়, এখানে হয় না। চিকিৎসা বলতে টাকার খেলা।

গণুদা ঘাবড়ে গিয়েছিল। আরো বেশি ঘাবড়েছিল রোগীকে আপাতত: বাড়ি নিয়ে যেতে হবে শুনে। ঢোঁক গিলে দ্বিধা প্রকাশ করেছিল, কি যে করি, ইয়ে···আমার ওখানে একটু অসুবিধে আছে।

বিপদের সময় সেই মিনমিনে ভাব দেখে ধীরাপদ চটে গিয়েছিল। জোরজার করে রণুকে সে-ই একরকম ওখানে এনে তুলেছিল। বলেছে, অসুবিধের কথা পরে ভাবা যাবে। সোনাবউদি মুখ বুজে

সেই দু'ঘরের এক ঘরে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে ধীরাপদর মনে হয়েছিল কাজটা ভালো হল না। আর মনে হয়েছিল, গণুদার অসুবিধার কারণ বোধহয় ইনিই। হাসপাতালেও কোনদিন দেখেনি মহিলাকে। রণুর মুখের দিকে চেয়ে মায়া হত বলেই কোনদিন তার কথা জিজ্ঞাসা করেনি। নইলে ধীরাপদর মনে হত ঠিকই।

শুধু মনে হওয়া নয়, তারপর কানেই শুনতে হয়েছে অনেক কিছু। হাসপাতাল থেকে রণুকে নিয়ে আসার দিন তিনেক পরের কথা। বিকেলের দিকে ওর বিছানায় পাশে ধীরাপদ বসেছিল। পাশের ঘর থেকে নারীকণ্ঠের চাপা তর্জন শোনা গেল। শোনাতে হয়ত চায়নি, কিন্তু যেমন ঘর না শুনে উপায় নেই। যেখান থেকে হোক টাকা যোগাড় করে পাঠিয়ে দাও, টাকা নেই বলে কি এখন গুষ্টিসুদ্ধ মরতে হবে।

আঃ, লোক আছে ও-ঘরে। গণুদার গলা।

থাক্ লোক। আর দুটো দিন সবুর করে যেখানে পাঠাতে বলছে ওরা একবারে সেখানে পাঠালেই হত, সাত তাড়াতাড়ি এখানে এনে তোলায় কি দরকার ছিল?

ক্লান্তিতে দুচোখ বোজা ছিল রণুর। কানে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু একটুও বিব্রত বোধ করেছে বলে মনে হল না। বরং ধীরাপদই না বলে পারেনি। হালকা ঠাট্টায় ফিসফিস করে বলেছে, তোর বউদি কড়াপাকের ছানার সন্দেশ না ইটের সন্দেশ রে?

চোখ মেলে রণু অল্প একটু হেসেছিল মনে আছে। নির্লিপ্ত মুখে বলেছিল, টাকা আদায় করার জন্য ও-ভাবে বলছে। ধীরাপদ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু রণুর বিশ্বাস দেখে অবাকই হয়েছিল। সেই বিশ্বাসে এতটুকু দ্বিধা নেই।

অবাক ধীরাপদ আরো হয়েছিল। সেটা তার পরদিনই দুপুরের দিকেই এসেছিল—যেমন আসে। কিন্তু ঘরে ঢোকার আগেই সোনাবউদি এগিয়ে এলো। বলল, ও ঘুমুচ্ছে, এ-ঘরে আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে—

সংকোচ কাটিয়ে ধীরাপদ তাকে অনুসরণ করে অন্য ঘরটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। এ ঘরটা আরো অপরিসর। মেঝের একদিকে ছোট দুটি ছেলে-মেয়ে ঘুমুচ্ছে, অন্যদিকে একটি চার পাঁচ মাসের শিশু শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। কোণ থেকে একটা গোটানো মাদুর নিয়ে সোনাবউদি আধখানা পেতে দিয়ে বলল, বসুন—

অনতিদূরে নিজেও মেঝেতে বসল পা গুটিয়ে। দুই এক পলক ওকে দেখে নিল তারই মধ্যে। বিপদের সময় আর লজ্জা করে কি হবে, তাই ডাকলুম। আপনার সঙ্গে ঠাকুরপোর অনেকদিনের পরিচয় শুনেছি, আপনার কথা প্রায়ই বলত—

গরমে হোক বা যে জন্যেই হোক, ধীরাপদ ঘেমে উঠেছিল। সোনাবউদি আর এক নজর দেখে নিল ওকে। ধীরাপদর মনে হল, কিছু বলবার আগে যেন যাচাই করে নিল আর এক প্রস্থ।

আপনি কি করেন?

কথা আছে বলে ঘরে ডেকে এনে বসিয়ে এ আবার কি প্রশ্ন! ধীরাপদ ফাঁপরে পড়ল। তেমন কিছু না···

সে তো জানি, তেমন কিছু করলে আর এ বাড়ির সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে কেমন করে! ভাবল একটু, তারপর সোজাসুজি তাকালো মুখের দিকে। বন্ধুর চিকিৎসার জন্য শ'পাঁচেক টাকা আপনাকে কেউ ধার দিয়েছে শুনলে লোকে বিশ্বাস করবে?

ধীরাপদর মুখের অবস্থা কেমন হয়েছিল কে জানে। কারণ তার দিকে চেয়ে সোনাবউদি হেসেই ফেলেছিল।—ভয় নেই, আপনাকে ধার করতে বেরুতে হবে না, কাল একটু সকাল সকাল আসুন, বিশেষ দরকার আছে···আর, কাউকে কিছু বলবেন না।

সকাল সকালই এসেছিল পরদিন। এসে দেখে সোনাবউদি কোথায় বেরুবার জন্য প্রস্তুত। বাচ্চাগুলো ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছে আগের দিনের মতই। বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে ঘরের শিকল তুলে দিল।—আসুন।

তিনটে বাচ্চাকে এইভাবে ঘরে বন্ধ করে কোথায় যেতে চায় ধীরাপদ কিছুই বুঝল না। জিজ্ঞাসা করারও ফুরসত পেল না। রাস্তায় এসে সোনাবউদি নিজে থেকেই বলল, ভালো একটা গয়নার দোকানে নিয়ে চলুন, কলকাতায় থাকলেও কিছুই চিনি না—।

ধীরাপদও তেমনিই চেনে গয়নার দোকান। তবে দুই একটা দেখেছে বটে।

সোনাবউদি গয়না বিক্রি করল। সেকেলে আমলের ভারী গোট হার একটা। সোনার দাম চড়া। মোটা টাকাই পেল। চুলচেরা হিসেব বুঝে নিয়ে, খাদের সম্ভাব্য পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে অনেক ঝকাঝকি করে তারপর টাকা নিল। তবু সংশয় যায় না, ঠকল কি না সারাপথ চুপচাপ তাই ভাবছিল বোধহয়।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বলল, ঠাকুরপো বা কাউকে কিছু বলবেন না···অবশ্য এটা ওরই জিনিস, তবু শুনলে দুঃখ পাবে।

গয়নার দোকানে সোনাবউদির দর কষাকষি কেন জানি ধীরাপদর ভালো লাগছিল না। বাচ্চাগুলোকে ওভাবে ঘরে বন্ধ করে আসাটাও না। রণুর জিনিস শোনামাত্র মনটা বিরূপ হবার সুযোগ পেল যেন। রণুর মা-ঠাকুমা খুব সম্ভব ওর নামে রেখে গেছেন। বিক্রির জন্য সেটা বিশ্বাস করে ধীরাপদর হাতে না ছেড়ে দিতে পারাটা অন্যায় নয়। কিন্তু ও-কাজটা তো গণুদাকে দিয়েও হত। এত অবিশ্বাস আর এত গোপনতা কিসের! রণুর পাশে এসে বসা মাত্র সে জিজ্ঞাসা করল, কি রে হার বিক্রি করে এলি?

ধীরাপদ অবাক্। সামলে নিয়ে বলল, করব না তো কি, হার ধুয়ে জল খাবি? তুই জানলি কি করে?

হাসল একটু।—আমি হাসপাতালে থাকতেই জানতুম এবার ওটা খসবে। ধীরাপদ বিরক্ত হচ্ছিল, কিন্তু পরের কথাটা শুনে বিস্ময়ে থমকে গেল। রণু বলল, ও-টকুই ছিল সোনাবউদির—

সোনাবউদির! কিন্তু তিনি যে বললেন ওটা তোর?

বলল, না। খুশিতে গোটা মুখ ভরে উঠেছিল রণুর।—সোনাবউদি ওই রকমই বলে। প্রথম অসুখে ওটা বার করে বলেছিল, এই দিয়ে চিকিৎসা করো। আমি বলেছিলাম দরকার হলে পরে নেব। সেই থেকে ওটা আমার হয়ে গেছে।—ওটা ওঁর দিদিমার দেওয়া।

ধীরাপদর মনে আছে সুলতান কুঠির এই ভূমিশয্যায় সেই একটা রাতও প্রায় বি-নিদ্র কেটেছিল তার। সমস্তক্ষণ কি ভেবেছে আবোল-তাবোল, আর কেমন যেন ছটফট করেছে। আর থেকে থেকে মনে হয়েছে, রণুর মত সে-ও যদি ঠিক অমনি করে সোনাবউদি

বলে ডাকতে পারত। পারলে বলত, সোনাবউদি তোমার ওপর বড় অবিচার করেছিলাম। দোষ নিও না।

রণু মারা গেছে।

ভিতরে ভিতরে ধীরাপদ আবারও একটু নাড়াচাড়া খেয়েছিল। মারা গেছে বলে নয়। যাবে জানতই। কিন্তু এমন নিঃশব্দ বিদায় কল্পনা করেনি। যেন কোনো যাত্রাপথের মাঝখানে দিন-কতকের জন্য থেমেছিল। সময় হল, চলে গেল। তারপর কেউ এলো খবর করতে। খবর পেল, নেই—চলে গেছে।

ধীরাপদও খবরটা পেয়েছিল অনেকটা সেইভাবেই। রণুকে মাদ্রাজে পাঠানোর পর আর রোজ আসত না। পাঁচ সাত দিন পরে পরে এসে খোঁজ নিয়ে যেত। কথাবার্তা গণুদার সঙ্গেই হত। একটা অপারেশান হয়ে গেছে—আরো একটা হবে—তাও হয়ে গেল—হ্যাঁ ভালই আছে বোধহয়—ও, তুমি জান না বুঝি? আজ চারদিন হল মারা গেছে।

গণুদার অফিসের তাড়া—তাই ছেড়ে নিজে মরলেও প্রেস অপেক্ষা করবে না। ঘরের মধ্যে ছেলে আর মেয়েটা হুটোপুটি করছে, কোলের শিশুটা শুয়ে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে! সোনাবউদি কলতলায় জামাকাপড় কাচছে।

···যে নেই, তার দাগও নেই।

গণুদা বসতে বলে গেছে তাকে, সোনাবউদির কি কথা আছে নাকি।

এককালে রবি ঠাকুরের কিছু কবিতা পড়েছিল ধীরাপদ। স্বর্গচ্যুত কোনো শাপভ্রষ্ট দেবতার যখন মাটিতে টান পড়ে—শোকহীন হৃদিহীন স্বর্গভূমি নিস্পলক উদাসীন তখনো। কিন্তু মাটির শেকল-ছেঁড়া মানুষের শোকে বসুধরার আকুল কান্না। কবির চোখে সেই শোক হৃদয়ের সম্পদ। স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের এইটুকুই তফাত।

ধীরাপদর হাসি পাচ্ছিল, তফাত ঘচতে খুব দেরি নেই।

আদুড় গায়ে শাড়িটা বেশ করে জড়িয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সোনাবউদি এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা এবারে শেষ হল বোধহয়?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিল। নিজের অগোচরে শোকের দাগ খুঁজছিল হয়ত···গাম্ভীর্যই দেখাচ্ছে বটে। ছেলে-মেয়ের চেঁচামেচিতে মহিলা একবার শুধু ফিরে তাকাতেই সভয়ে ঘর ছেড়ে পালালো তারা। ভয়টা স্বাভাবিক মায়ের হাতে তাদের নিগ্রহ ধীরাপদ নিজের চোখেই দেখেছে। সোনাবউদির দু'চোখ তার মুখের ওপর নিবদ্ধ হল আবার। আপনার দাদা বলেন, মস্ত বড় বাড়িতে নাকি থাকেন আপনি, আর, একটু চেষ্টা করলে আমাদেরও সেখানে জায়গা হতে পারে। তাঁর ধারণা আমি আপনাকে বললে আপনি সে চেষ্টা করবেন—বলছি না বলে রাগ। কিন্তু, বন্ধু থাকতেই করেননি যখন এখন আর কেন করবেন বুঝছি না।

ধীরাপদ হাঁ করেই চেয়েছিল খানিকক্ষণ। ষ্টেশানে রণুকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত অফিস কামাই করেও গণুদা মাঝে মাঝে সুলতান কুঠিতে আসত বটে। ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে পরামর্শ করত, মিনমিন করে নিজের সুবিধে-অসুবিধের কথা বলত। বাড়িটাও একদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিল মনে পড়ে।

ঠিক এই মুহূর্তে এই স্বার্থের কথাগুলো না শুনলে ধীরাপদ কিছু মনে করত না। এমন কি, রণুর প্রসঙ্গে দু'-চার কথা বলার পরেও যদি বলত তাহলেও খারাপ লাগত না। কিন্তু সব সত্ত্বেও সোনাবউদির বলার ধরনটা বিচিত্র মনে হয়েছিল।

গণুদা মনস্তাত্ত্বিক নয়, খবরের কাগজের প্রুফ রিডার। সোনাবউদি বললে সে চেষ্টা করবে এটা বুঝেছিল কি করে? কিন্তু যে-করেই হোক, বুঝেছিল ঠিকই। ধীরাপদ চেষ্টা করেছিল। যে চলে গেছে তার শোক আঁকড়ে কে ক'দিন বসে থাকে? স্বার্থ কার নেই···। রণুর জায়গা দখল করার একটুখানি প্রচ্ছন্ন লোভ কি ওর ভিতরেও উঁকিঝুঁকি দেয়নি? না দিলে সোনাবউদির কথাগুলো অলক্ষ্য ভাগিদের মত অমন অষ্টপ্রহর মনে লেগে থাকত কেন। আর, তাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য ধীরাপদ অমন এক অদ্ভুত কাণ্ডই বা করে বসেছিল কি করে।

বরাতক্রমে কোণা-ঘর দুটো খালিই ছিল তখন। বাসের অযোগ্য নয়; তবে সুলতান কুঠির অন্যত্র ঠাঁই পেলে ওখানে সাধ করে ঠাঁই নেবেও না কেউ। সপরিবারে গণুদাকে ওখানেই এনে তোলা যেত। আর ভদ্রলোক হাঁফ ফেলে বাঁচত তাহলেও।

কিন্তু ধীরাপদর বাসনা অন্যরকম।

রমণী পণ্ডিতকে ওখানে চালান করার সুযোগটা ছাড়েনি সে। ধীরাপদ নিজের মনে হেসেছে আর নিজেকেই পাষণ্ড বলে গাল দিয়েছে।

তার পাশের ঘরেই সোনাবউদির সংসার—সেখানে তখন থাকতেন রমণী পণ্ডিত। অনেকগুলো ছেলে-মেয়ের মধ্যে মেয়েটি বড়। বড় বলতে বছর তের চৌদ্দ বয়েস তখন। রমণী পণ্ডিতের সাধ ছিল মেয়ে লেখাপড়া শিখবে, চাই কি আই-এ বি-এ পাস করবে। ছেলের থেকেও আজকাল লেখাপড়া জানা মেয়ের কদর বেশি। ধীরাপদ অনেকবার তাঁকে বলতে শুনেছে, মেয়ের হাতটিতে বিদ্যাস্থান বড় শুভ। কিন্তু মেয়েকে বিদ্যার খোঁয়াড়ে ঠেলে দিতে না পারলে সরস্বতী ঠাকরোন যেচে এসে হাতে বসবে না। আশা পূরণের একটাই উপায় দেখেছিলেন রমণী পণ্ডিত। ঘষে মেজে ধীরাপদ যদি মেয়েটাকে প্রথম ধাপ অর্থাৎ, স্কুল ফাইন্যালটা পার করে দিতে পারে তাহলে বাকি ধাপগুলো মেয়ে নিজেই টপাটপ টপকে যাবে।

ধীরাপদ রাজি হয়েছিল। রাজি হয়ে অথৈ জলে পড়েছিল। মেয়ের হাতে বিদ্যাস্থান যত শুভ, মগজে তেতো নয়। রোজই পড়তে আসত। মুখ বুজে পড়ত বা পড়া শুনত। চৌদ্দ বছরের মেয়ে কুমুর ধৈর্যের অপবাদ দিতে পারবে না ধীরাপদ। সে অপবাদটা বরং ওর নিজেরই প্রাপ্য। সে নিজেই হাল ছেড়েছিল।

কিন্তু কুমুর হাতে বিদ্যাস্থান যে বড় শুভ, রোজ সকালে একগাদা বই হাতে তার আগমন ঠেকাবে কি করে? দিনকে দিন ধীরাপদ নিজেই হতাশ হয়ে পড়ছিল।

নি-খরচায় মেয়ের বিদ্যালাভের ব্যবস্থা করার সময় সুলতান কুঠির নীতির পাহারাদার দু'টির কথা মনে হয়নি রমণী পণ্ডিতের। একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের কথা। দিনকতক চুপচাপ দেখলেন তাঁরা, তারপর ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। ধীরাপদর অবশ্য টের পাওয়ার কথা নয়, ক্ষোভের মাথায় রমণী পণ্ডিতই প্রকাশ করে দিয়েছেন। কি রকম মানুষ ওঁরা বলুন তো—ওই

কটি মেয়ে—আর আপনি এমন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, কারো সাতে নেই পাঁচে নেই, আমার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে দয়া করে মেয়েটাকে পড়াচ্ছেন একটু—তাতেও ওদের চোখ টাটায়! নীচ নীচ, একদম নীচ। বুঝলেন? আমি নিজে হাত দেখেছি ওদের—কোথাও কিছু ভালো নেই, বুঝলেন?

বুঝে একটু আশ্বস্ত হয়েছিল ধীরাপদ। কিন্তু পরদিনও যথাপূর্ব বিদ্যাস্থানে বিদ্যার বোঝা সহ কুমুকে এসে দাঁড়াতে দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। একভাবেই চলছিল। ঠিক একভাবে নয়, একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের টিকা-টিপ্পনী আর গঞ্জনার মাত্রা যে বাড়ছে সেটা ধীরাপদ অনুমান করেছিল রমণী পণ্ডিতকে দেখে। মেয়ের পড়ার সময়টায় প্রায়ই বারান্দায় পায়চারি করতেন তিনি, অকারণে এক-আধবার ঘরেও ঢুকতেন। কদমতলার বেঞ্চির শুভার্থী দু'জন ভালয় ভালয় তাঁকে কোণা-ঘরে উঠে যেতে পরামর্শ দিচ্ছেন, এ খবরটাও কেমন করে যেন ধীরাপদর কানে এসেছিল।

ঠিক এই শুভ-মুহূর্তে সোনাবউদির মারফত গণুদার সেই ঠাইয়ের তাগিদ।

ঘর খালি থাকলে সুলতান কুঠিতে কাউকে এনে বসাতে হলে কোনো বাড়ি-অলার কাছে দরবার নিষ্প্রয়োজন। যাকে খুশি এনে বসিয়ে দাও আগে, পরের কথা পরে। কার বাড়ি কে মালিক সে খবর এখনো ভালো করে জানা নেই কারো। বাড়ির তদারক করে বিহারী দরোয়ান শুকলাল। কুঠি-সংলগ্ন একটা পোড়ো-ঘরে থাকে সে। ভাড়াটেদের ফাইফরমাস খেটেও দু'-পাঁচ টাকা বাড়তি রোজগার হয় তার। সুলতান কুঠিরক্ষক দরোয়ানের মেজাজ নয় শুকলালের। ঠাণ্ডা মেজাজের ভালো মানুষ। পুরানো বাসিন্দা হিসেবে ধীরাপদর সঙ্গে খাতিরও আছে। মাসকাবারে মনি-অর্ডার ফর্ম লেখানো বা মাঝেসাজে খাম-পোষ্টকার্ডে ঠিকানা লিখে দেওয়ার কাজটা তাকে দিয়েই হয়।

কাজেই সেদিক থেকে ধীরাপদ নিশ্চিন্ত। কিন্তু সোনাবউদির জন্য ওই কোণা-ঘর দু'টো তার পছন্দ নয়।

হঠাৎ তার পড়ানোর চাড় দেখে শুধু ছাত্রী নয়, ছাত্রীর বাবা পর্যন্ত হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

সকালে বই হাতে কুমু এসে হাজির হবার আগেই তার ডাকাডাকি শুরু হল। কাকভোরে ওঠা আর সকাল সকাল পড়তে বসার সুবর্ণ ফল-প্রসঙ্গে মুখ বুজে মেয়েটাকে অনেক বক্তৃতা শুনতে হয়েছে। পড়ানোর সময় কল্পিত গোলযোগের কারণে ঘরের দরজা চারভাগের তিনভাগ আটকানো হয়েছে। ছাত্রী পড়া না পারার ফলে ধীরাপদর হাসিটা বাইরে রমণী পণ্ডিতের চকিত কানে অনেকবার গলিত শিসার মত গিয়ে ঢুকেছে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ দান আর ঘরে বসে সুবিধে হয়নি তেমন। ওই মজাপুকুরের ধারে একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের চোখের নাগালের মধ্যে ছাত্রীসহ বিচরণ করতে করতে সেই পাঠ সম্পন্ন হয়েছে। ক'দিনে অনেক শিখেছিল বিস্ময়-বিমূঢ় চতুর্দশী কুমু। কেমন করে আকাশে মেঘ হয়, মেঘ গর্জায় কেন, সকালের বাতাসে স্বাস্থ্যোপযোগী কি কি উপাদান আছে, কোনটা উপকারী কোনটা নয়, গাছ-পালা বেঁচে থাকে কি করে—এমন কি, মজাপুকুরের শেওলা দেখে শেওলা আসে কোথা থেকে, হাসিমুখে সে-সম্বন্ধেও নিজের মৌলিক গবেষণামূলক কিছু তথ্য শোনাতে কার্পণ্য করেনি ধীরাপদ।

সেই বেপরোয়া পড়ানো দেখে ছাত্রী হতভম্ব, ছাত্রীর বাবা হতচকিত, কদমতলার বেঞ্চির শুভার্থীরা নির্বাক। বেগতিক দেখলেও ভরসা করে মুখ খুলবেন রমণী পণ্ডিত, তেমন খোলামুখ নয় তাঁর। কিন্তু শেষে রাত্রিতেও অঙ্ক পাঠ সমাপনের জন্য পাশের ঘরে মেয়ের ডাক পড়তে তাঁর অঙ্কের হিসেবটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। সেই রাতে অঙ্ক শেখা শেষ করে শ্রান্ত ছাত্রী ঘরে ফিরে যেতে না যেতে ও-ঘরের চাপা রোষ চাপা থাকে নি। এ-ঘর থেকেও তার কিছু আভাস পাওয়া গেছে। মারধরও করেছে বোধহয়, মেয়েটা কান্না চাপতে পারেনি।···সেই রাতে সত্যিই নিজেকে একেবারে পাষণ্ড মনে হয়েছিল ধীরাপদর।

এর দু'দিনের মধ্যেই সপরিবারে রমণী পণ্ডিত কোণা-ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন।

দুড়দাড় পায়ের শব্দে ধীরাপদর চমক ভাঙল। গণুদার আট বছরের বড় মেয়েটা ঘরে ঢুকল। ধীরুকা' মা ডাকছে। জলদি—!

তলব জানিয়েই যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

বাইরে রোদ চড়েছে। কদমতলার বেঞ্চি থেকে শিকদার আর ভটচায মশাইও কখন উঠে গেছেন··।

[ক্রমশঃ

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪ সালে আমরা ধরা পড়ার আগে দুই দফায় যে ২২ জন বিপ্লবী নেতা ধরা পড়ে রাজবন্দী হয়েছিলেন—১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ১৭ জন, এবং ১৯২৪ সালের জানুয়ারীতে ৫ জন—তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রথমে মেদিনীপুরে স্টেট ইয়ার্ডে ছিলেন। সেখানে পরস্পরের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিজ্ঞতার আলাপ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল—তার মধ্যে ২।৪ জন অনুশীলন পার্টির নেতাও ছিলেন।

আমাদের ধরা পড়ার পর লর্ড লিটন মালদহে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলার দুটো বিপ্লবীদলেরই সারাদেশে দলগড়ার কাজ রীতিমত চলছিল—একটা দল অবিলম্বে কিছু করার মৎলব করছিল, এবং আর একদল তখনই কিছু করার বিরোধী ছিল এবং সংগঠন আরো শক্তিশালী করার পরে কাজে নামার পক্ষপাতী ছিল। লিটনের ইঙ্গিতের প্রথম দলটা অনুশীলন এবং দ্বিতীয় দলটা যুগান্তর পার্টি।

কিন্তু তখন পর্যন্ত কার্যত সকলেই সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কার্যকলাপ এড়িয়েই চলছিলেন। সুতরাং তাঁদের গ্রেপ্তারের কারণ সৃষ্টির জন্যে সরকার এজেন্ট প্রোভোকেটর দিয়ে এখানে সেখানে ২।৪ জন করে বৈপ্লবিক ভাবপ্রবণ তরুণকে রিভলভার দেখিয়ে রিক্রুট করে বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরী করে তাদের দিয়ে কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী কাজ করাবার বন্দোবস্ত করেছিল।

দাদারা বন্দুক-পিস্তল সব গায়েব করে রেখেছিলেন, তরুণরা ছটফট করে বেড়াচ্ছিল, কেমন করে একটা রিভলভার হাতানো যায়। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, যার হাতে একটা রিভলভার আছে, সেই একটা দল তৈরী করে ফেলছিল। একটা রিভলভারের জন্যে নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি সুরু হয়েছিল। শান্তি চক্রবর্তী খুন হয়েছিল এমনি কারণেই। সন্তোষ মিত্রের দলও এই অবস্থার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল।

এদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে দাদারাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং সন্তো'ষ মিত্র বিপিনদার চেলা হিসাবে বিপিনদা'র নেতৃত্বের দোহাই দিত বলে দাদারা বিপিনদা'র উপরও চটে গিয়েছিলেন। বিপিনদা' বলতেন—ওর ওপর আমার হাত নেই—এবং তাকে নিরস্ত করারও চেষ্টা করতেন না।

বিপিনদা' এবং জ্যোতিষ ঘোষ (মাষ্টার মশাই) সন্তোষ মিত্রের দুই নেতা—এঁরাও ছিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে সকলের অভিজ্ঞতার stocktaking এর পর তাঁরা নিঃসন্দেহে বুঝেছিলেন, ছোকরা সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের পিছনে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের এজেন্ট প্রোভোকেটরদের হাত আছে। শুধু তাই নয়, তাঁরা দুজনকে এজেন্ট প্রোভোকেটর বলে সিদ্ধান্তও করেছিলেন—একজন হচ্ছে শিশির ঘোষ—তার কথা আগে বলেছি—আর একজন, ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের বইয়ে (বিপ্লবের পদচিহ্ন) যার নাম দেওয়া হয়েছে টুনু সেন (ছদ্মনাম—আসল নামটা বলার বাধা আছে)।

২৪ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ আমার রসগোল্লা খেয়ে, জীবন, ভূপেন বাবু, পূর্ণ দাশ, সতীশদা' (চক্রবর্তী), বিপিনদা' এবং মাষ্টার মশাই বার্মায় বদলী হন—জীবন ও ভূপেন দত্ত যান বেসিন সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে দুজনে পরামর্শ করেন যে, এজেন্ট প্রোভোকেটরদের ব্যাপারটা দেশের লোকদের জানিয়ে দেওয়া দরকার। তদনুসারে তাঁরা Memorial to White-Hall নামক বিখ্যাত ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিবরণী লিখে গোপনে বাইরে পাঠান এবং সারা দেশে তাই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। তারই একটা কপি দেশবন্ধুর কাছে যায়, এবং তিনি মহাত্মাজীকে সেটা দেখালে, মহাত্মাজী সেটা পড়ে বিবৃতি দেন যে, স্বরাজপার্টিকে বেকায়দা করার জন্যেই যে সরকার মিথ্যা অজুহাতে তার শ্রেষ্ঠ কর্মীদের বিনাবিচারে আটক করেছে, সে বিষয়ে তাঁর আর সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজপার্টির নেতা শ্রী মতিলাল নেহেরুও সেটা প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে শ্রী শরৎ বসু কর্তৃক প্রকাশিত Lawless Laws নামক বইয়ে সে বিখ্যাত বিবরণীটাও দেওয়া হয়েছিল।

কলকাতার ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার, এবং তাঁর পরে আলিপুর সেণ্টাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল মুলভেনি রিটায়ার করে বিলেত গিয়ে ১৯১৬—২০'সালের রাজবন্দীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সরকারী এজেন্ট প্রোভোকেটর নিয়োগ এবং তাদের কাজের ধারা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন, এবং জীবন ও ভূপেন বাবু তাঁদের memorial to whitehallএ তাঁদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বেসিন জেলের কর্তাদের এ নিয়ে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। তখন জীবনরা বদলী হয়েছেন মান্দালয় জেলে। পরে জীবন ও ভূপেন বাবুকে পৃথক করা হয়—ভূপেন বাবুকে মান্দালয় জেল থেকে বদলী করে। এ ব্যাপারগুলো ঘটে ২৪ সালের শেষাশেষি।

এদিকে স্বরাজপার্টি প্রথম সংগ্রামী অবস্থা পার হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকপ্রদ বৈপ্লবিক ধরণের বাণীগুলোও যথাশাস্ত্র ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে আসছিল এবং ধনিক জমিদারদের প্রভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট আকার ধারণ করছিল। দেশবন্ধু এক সময় বলেছিলেন, তাঁর স্বরাজের আদর্শ শতকরা ৯৮ জনের জন্য স্বরাজ। ক্রমশঃ এসব কথাও তাঁর মুখ থেকে শোনা যেতে লাগলো যে,—কৃষকদের প্রতি সুবিচার অবশ্যই চাই, কিন্তু তার জন্যে জমিদারদের প্রতি অবিচার করলে চলবে না। মতিলাল নেহেরু টাটা কোম্পানির জন্যে বরাবর লড়েছেন, কিন্তু শ্রমিকদের জন্যে কিছুই করেননি।

স্বরাজপার্টির উদ্ভবের পর নীতিটার নাম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, কাউন্সিলের ভিতর থেকে সরকারকে "বাধাদান নীতি"—obstructionist policy—কথাটার নেতিবাচক সুরের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস-নেতারা—এন, সি, কেলকার, মাধবরাও আনে, ডক্টর মুঞ্জে প্রভৃতি কাউন্সিলপন্থী হয়েও পৃথক একটা দল খাড়া করে বললেন, সরকারের সব কাজে বাধাদান ঠিক নয়, আমরা দরকারমত সরকারের সঙ্গে ভাল কাজে সহযোগিতাও করবো। তাঁদের নীতিটার নাম হল Responsive Co-Operation!

কাউন্সিলপন্থী কংগ্রেসীদের মধ্যে এই তেজটাও যথাশাস্ত্র ক্রমশঃ ভোঁতা হয়ে এল এবং ১৯২৫ সালের মে মাসে যখন বিলেতে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড বলছেন,—তিনি ১০০ বছরের মধ্যেও ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব মনে করেন না, তখন দেশবন্ধুর ফরিদপুর কনফারেন্সের বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আপোষ ও সহযোগিতার কথা শোনা গেল। বার্কেনহেডের সঙ্গে দেশবন্ধুর নাকি এক রাউণ্ড-টেবল্ কনফারেন্সের কথা চলছে, এমন কথাও শোনা গেল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই দার্জিলিংয়ে হঠাৎ দেশবন্ধুর মৃত্যু হল।

যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—সারা দেশ শোকাচ্ছন্ন—বাংলার কংগ্রেস মহল কিংকর্তব্যবিমূঢ়—দাদাদেরও প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রের প্রধান অবলম্বন যেন ভেঙ্গে পড়লো। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে জে, এম, সেনগুপ্তের মাথায় দেশবন্ধুর তিন মুকুট পরিয়ে দিয়ে গেলেন—কাউন্সিলে লীডার, প্রাদেশিক কংগ্রেসে সভাপতি, কর্পোরেশনে মেয়র। সুতরাং দাদাদের ভরসাটা চেপে পড়লো সুভাষ বাবুর ওপর—যেন অন্ধের নড়ি। এসব ঘটনা আমার মেদিনীপুর যাওয়ার ঠিক পরের কথা।

যাই হোক, মেদিনীপুরে পড়াশুনোর যথেষ্ট সুযোগও ছিল, ভাল ভাল বইও অনেক ছিল, আমি এ সুযোগ পুরো মাত্রায় গ্রহণ করলুম। ইকনমিক্সের জ্ঞান প্রয়োজন, এটা তীব্র ভাবে অনুভব করতে সুরু করেছিলুম। মনোরঞ্জনদা'র কাছে Kale র Indian Economics ছিল, বললুম পড়তে চাই, আপনাকে পড়াতে হবে। তিনি খুসী হয়ে পড়াতে লাগলেন। আমি ছাত্র বরাবরই ভাল, এবং ভাল ছাত্র পেয়ে মনোরঞ্জনদা'রও যে উৎসাহ বেড়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি রীতিমতন খেটে বইটা পড়িয়ে ছেড়ে দিলেন। আমার জীবনে একটা নতুন দিকের বিকাশ সুরু হল। মনোরঞ্জনদার ঋণ আমি জীবনে ভুলতে পারি না।

ক্রমে তাঁর সঙ্গে আর একখানা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ের বই পড়লুম রাজনীতি ও অর্থনীতির ওতপ্রোত মিশ্রণ, প্রকৃত প্রস্তাবে applied economics বলা যেতে পারে—Reverse council Bills and other organised plunders—একজন মারাঠী অর্থনীতিবিদের লেখা, নামটা মনে নেই, কৃষ্ণস্বামী আয়ার হতে পারে। ২০ সালের শাসন সংস্কার দানের মূল্য হিসেবে বৃটিশ সরকার কেমন করে ভারতের ৮০০ কোটি টাকা গাঁড়া মেরেছে, তারই বিশদ বিবরণ। আমার ভাল করে economics পড়াটা হয়ে গেল।

তারপরে পড়লুম পুরকায়স্থের Indian Finance, বৈদ্যনাথের Railway Finance প্রভৃতি। বারট্রাণ্ড রাসেলের Roads to Freedom ব্রেলসফোর্ডের Russion workers' Republic ও পড়লুম। এ বইগুলো মনোরঞ্জনদা'র কাছে ছিল। আমি নিজে কিনলুম Factory Legislation in India, আর কে দাসের তিনখানা বই—Labour movement in India, Hindusthani workers in the pacific coast (America), এবং Production. এই বইটাতে শতখানেক চার্ট ও টেবল ছিল দুনিয়ার Comparative production সম্বন্ধে। আমি অনেক টেবল-চার্ট ভেঙ্গে তিনটে বড় টেবল তৈরী করে দুনিয়ার নানা দেশের তুলনায় ভারতের সর্ববিধ উৎপাদনের তুলনামূলক তথ্য দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম আমাদের "হাতে-লেখা" মাসিক 'ভাঙাকুলোতে'। অন্য বই দুটো অনুবাদ করে রেখেছিলুম। যাদুদা' একখানা মিলিটারী বই যোগাড় করেছিলেন, Contour and Map Reading—আমি তাঁর সঙ্গে সে বইটাও পড়লুম। প্রায় বছরখানেক ছিলুম—পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতন খেটে পড়েছি—শিখেছি, আনন্দ পেয়েছি—মেদিনীপুর জেল জিন্দাবাদ!

"ভাঙাকুলোতে" ২।১জন ছাড়া সকলেই লিখতে হ'ত—আমিও লিখতুম—এবং এ সম্পর্কে এত রকমারি ও মনোহারী ঘটনা আছে, যা লিখতে গেলে একটা বই হয়ে যায়। আমি এখানে তার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই।

ভূপতিদা' গান লিখতেন, আমি সুর দিয়ে গাইতুম। একটা নমুনা—

> কে জানে সাঙ্গ হবে কোন দিনে ভাই—
> মোদের এই চলেই চলা অবিরত।
> কবে যে সাঙ্গ হবে কে জানে ভাই—
> আমাদের এই জীবনের সাধা ব্রত।
> আগের যত যাত্রী গেছে,—চরণরেখা রেখে গেছে—
> তাই জেনেছি এই পথেতেই মিটবে আশা মনোমত—
> শুধু যে লক্ষ্যে যেতে শোন্ বলি ভাই—
> সহে না ব্যাকুলকরা দেরী এত।

সুভাষ বাবুকে মুক্ত করার নানা চেষ্টার মধ্যে শরৎ বসু মহাত্মাজীকে এক চিঠি লিখে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি অনেক কথার পর শরৎ বসুকে নিয়মিত ভাবে চরকা কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভূপতিদা' এক কবিতা লিখলেন—

> হয়েছে এক মহৌষধির আবিষ্কার
> মাঝে মাঝে একটি ডোজে সর্বব্যাধি পরিষ্কার
> * * * * শীত কনকন্ পেটের ব্যথা
> মিনিট দু-চার কেটো সুতো, আরাম পাবে সত্যিকার।

তখন আমরা খাদি প্রতিষ্ঠানের গিরধোড় পিওর খদ্দরের

কাপড়-জামা পরি। ভূপতিদা' বললেন, no-changerরা এইবার আমাদের জব্দ করেছে। চরকা ও খদ্দরের ওপর মনোরঞ্জনদা'র এবং আমার ভক্তি তখনও আর সকলের চেয়ে বেশী। ভূপতিদা'র কবিতা পড়ে আমরা দুজনেই প্রাণে একটু ব্যথা পেলুম। তার পরের মাসে আমার এক প্রবন্ধ বেরুলো এবং ভূপতিদা'র কবিতার প্রতিবাদে তাতে লেখা হল, চরকাপন্থীরা যদি আমাদের ঠাট্টা করে কবিতা লেখে,—

হয়েছে এক মহৌষধির আবিষ্কার—
মাঝে মাঝে একটি ডোজে সর্বব্যাধি পরিষ্কার
বন্যা, মারী কি দুর্ভিক্ষে মরছে মানুষ লক্ষে লক্ষে,
"ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডির" বিপক্ষে কসে কয় যে চীৎকার।
শিক্ষা খাদ্য অন্নহারা, কুসংস্কারে দেশটা ভরা—
ডাকাতি টিকটিকি মার এসব রোগের প্রতিকার।
গান্ধীবাটীর নিজে করে চরকা-বিষের চালাও জোরে
বাসায় গিয়ে থাকবে মরে' বৃটিশসিংহ দুরাচার।

তাহলে কেমন হয়? চরকা কাটলে স্বরাজ না হোক, বর্তমান অবস্থায় আমাদের বিলিতী কাপড় বয়কটের এবং বস্ত্রসমস্যা সমাধানের আংশিক সাহায্য যে হচ্ছে, একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে?

মনোরঞ্জনদা' দেখে হাসিমুখে তিরস্কারের সুরে বললেন, এটা কি করেছেন। ভূপতিদা' চটে গিয়ে আমায় বুঝিয়ে দিলেন, আমি একটি আকাট,—আমার একটুও রসবোধ নেই। কিন্তু আমার ওপর ভূপতিদা'র মমতাও যে বেড়ে চললো, তাও টের পেতে থাকলুম, যত দিন একসঙ্গে ছিলুম।

একটা দুর্বুদ্ধি মাথায় এল। আমাদের মাসিক পত্রে সবই আছে, নেই শুধু প্রেমের কবিতা—একটা প্রেমের কবিতা লিখতে হবে। চললো একটা মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ব্যাপার। কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা, দুদিকেই দারিদ্র্য—কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তি করে যা বেরুলো, নেহাৎ নিন্দের নয়।

প্রণয় যদি টুটেই সখা, দুঃখ কি—
দুঃখ তো হায় আছেই জীবন ভরিয়ে
জীবনটা তো অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামই
প্রণয় সেথা দুদণ্ডেরি বিরাম যে!

কাজের মানুষ, কাজের জগৎ?—হায় সখা
জগৎ, মানুষ তৈরী শুধুই ইট-কাঠে?
বুক ঠেলে ঐ প্রাণের নাচন যায় দেখা
গন্ধে মনও মাতিয়ে জগৎ ফুল ফোটে।

হৃদয় মধু, শোভা, সুবাস বিলিয়ে চায়
একটি দিনেই জীবন যদি শুকিয়ে যায়
মুগ্ধ অলি নাইবা যদি ফিরেই চায়
জগৎ যদি অবহেলায় পায় দলেই—
হৃদয় টুটে, ধূলায় লুটে,—নাই ক্ষতি
একটি দিনের আদর-সোহাগ স্বর্গ সেই।

একটা চমৎ!—ভূপতিদা' appreciate করে বললেন,—ছেড়েছো একটা!

মেদিনীপুরের সন্ধ্যার আগের পশ্চিম আকাশে মেঘের রঙের যে সমারোহ দেখেছি, আর কখনো কোথাও তা দেখিনি। মনোরঞ্জনদা' হাঁ করে বসে বসে দেখতেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনিও এক কবিতা লিখে ফেলেছিলেন—

রাঙা মেঘ ছড়িয়ে পড়ে আকাশের গায়
সূর্যিমামা ডুব ডুব অস্তাচলে যায়—ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়, মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমাকে চুপি চুপি বললেন,—এটাকে গানের মতন সুর দিয়ে গাওয়া যায় না? আমি একটু সুর করে গেয়ে তাঁকে শুনিয়ে দিলুম, তাঁর মৌতাত হয়ে গেল—ও দিকে আর বেশী দূর এগোলেন না।

বাঙ্কদা' এবং নরেশদা' (চৌধুরী) লিখতেন গল্প বা নক্সা। মনোরঞ্জনদা', প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, সতীশ পাকড়াশী লিখতেন প্রবন্ধ। গিরীনদা' লিখতেন মুসলমানযুগের ধারাবাহিক ইতিহাস। অমৃত সরকার আর্টিকল নিপুরী ভ্যানডাম বাংলা অনুবাদ করতেন—হাতমক্স হিসেবে। গণেশ ঘোষ ওখানে যাওয়ার পর তাকে ধরে-বেঁধে লেখানো হল—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখলো এবং দেখা গেল, নতুন লেখক হিসেবে লেখার হাত চমৎকার!

অনুকূলদা' ছিলেন একজন ভাল আর্টিষ্ট, হয়ত অনেকেই জানেন না। তিনি ছবি আঁকতেন water colour রঙের বড় বাক্স এবং সব রকম সরঞ্জামই ছিল—রবী সেন লেখা এড়াবার মতলবে অনুকূলদা'র কাছে ছবি আঁকা শিখতেন এবং শেষ পর্যন্ত শিখেছিলেনও বেশ।

নিরঞ্জন সেন ওখানে যাওয়ার পর তাঁকেও লিখতে বাধ্য করা হল, এবং তাঁর প্রথম লেখাটা থেকে বোঝা গেল, তিনি কয়েকটি school boy মেয়েকে যে বে-ওয়ারিশ অবস্থায় ফেলে এসেছেন, সেজন্যে তাঁর মনটা রীতিমতন উতলা।

লেখাপড়া, খেলাধূলার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু সকলেরই মনের একটা দম আটকানো ভাব হঠাৎ উদ্দামভাবে হাঁফ ছাড়তো—দিনের পর দিন একই ব্যাপারের পুনরুক্তি আর পুনরাবৃত্তি, একই সেট লোকের মুখ অহরহ দেখতে দেখতে যেন হঠাৎ দড়ি ছেঁড়ার জন্য প্রাণটা লাফ দিয়ে ওঠে। যেন সকলেরই একটু পাগলের ছিট।

গিরীনদা'কে যাঁরা জানেন, তাঁরা কি কল্পনা করতে পারেন যে, তিনি এক হাত কোমরে রেখে আর এক হাত মাথার ওপর তুলে ঘুরে ঘুরে নাচতে পারেন? এবং তার সঙ্গে গান—ডিসকা ফাটে, উসকা ফাটে, ধোবীকা কেয়া ভাই!

অনুকূলদা' রোজ বেলা দশটার সময় ঘরের বাইরে গিয়ে তাঁর খাটের সামনের জানালার ধারে এসে আপন মনে ডাকেন—অনুকূল বাবু বাড়ী আছেন?

পাঁচ দিন দেখতে দেখতে আমি একদিন ভেতর থেকে বললুম, তিনি বেরিয়ে গেছেন। অনুকূলদা' সটান বললেন, কার সঙ্গে? কাজেই আমাকে বলতে হল,—লোম্যানের সঙ্গে।

সতীশ পাকড়াশীকে যাঁরা জানেন তাঁরাও ধারণা করতে পারবেন না, মেদিনীপুর জেলে তিনিও গান গাইতেন। তবে সে এক লাইন মাত্র—'সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে,—কে তারে বাঁধলো অকারণে?'

অতুল বাবুর সঙ্গে আমার আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে টেনে নিয়ে একটা জানালার ধারে একান্তে বসে গান শুনতে চাইতেন—আর একটা, আর একটা করে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক কাটাতেন। আমি বুঝতুম, কোন কারণে মনটা উতলা হয়েছে—সেটা ভোলবার জন্যে চেষ্টা করছেন।

রবী সেন এবং অমৃত সরকারের সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়েছিল। রবী সেন ছিলেন কেটারিং ম্যানেজার, অনুকূলদা' রান্নায় ওস্তাদ—মাঝে মাঝে feast হ'ত, সবচেয়ে বেশী খাইয়ে তিনজনের মধ্যে আমি ছিলুম থার্ড—ওঁরা দুজন ছাড়া আর সবাই আমার নীচে।

একবার ওঁরা ঠিক করেছেন, বাজার থেকে দুধ আনিয়ে ঘরে ছানা কাটিয়ে সন্দেশ বানাবেন, কারণ বাজারে সন্দেশের দর অত্যধিক। আধ মণ দুধ এসেছে এবং ছানা-কাটানো হয়েছে। হরি হরি! সাত পোয়া ছানা হয়েছে! আমাদের অ্যালাউয়েন্স দেখে যাঁরা মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করেছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই লজ্জা হচ্ছে।

অমৃত সরকার আমাকে বলতেন নারুদা', আর আমি তাঁকে ডাকতুম আমিত্তিদা' বলে। বাঙ্গালরা অমৃতি জিলিপীকে বলে আমিত্তি। একবার তাঁর পায়ে একটা চোঁচ ফুটেছে, তিনি একটা ছুঁচ নিয়ে গোড়ালী খোঁচাচ্ছেন। এমন অবস্থায় যা হয়ে থাকে—একে একে অনেকে এসে "আমি দেখি" বলে কিছু কিছু খুঁচিয়ে গেছেন, আমি তখনও বাকি, এমন সময় চোঁচটা বেরিয়ে পড়েছে। আমি বললুম, বা রে! আমার ভাগের খোঁচানিটা মারা যাবে, তা হবে না। তাই নিয়ে বেশ খানিক ধস্তাধস্তি করে ছুঁচ কেড়ে নিয়ে গোড়ালীতে ফুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লুম।' আমাকে ভাল না বেসে উপায় আছে?

এত সব খুচরো পাগলামির পরও এক একদিন রাত্রে হঠাৎ সবাই মিলে পাইকিরী পাগলামি সুরু হত—যাদুদা' মণ্ডপায় থেকে এক ব্যাণ্ড পার্টির প্রোশেশন হত তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে। যাদুদা' extempore যা মুখে আসে তাই গান বেঁধে এক লাইন করে গাইতেন, সকলে প্রাণপণে গলা ছেড়ে কোরাসে সেটা repeat করতো। গানের নমুনা হচ্ছে—

চুরি করে কত কাল কাটাবে রজনী—
গোকুলে গোপিনী কাঁদে যশোদা-জননী!

ছোকরারা যে দাদাদের আর মানতে চায় না,—এই ব্যথাটা নিয়ে যাদুদা' এক গান বেঁধেছিলেন লক্ষ্মণ বর্জন—যার মোদ্দা কথা হচ্ছে রামচন্দ্র বনবাসে গিয়ে নিজে পক্ষী মেরে খেতেন—সে পক্ষীর নাম রামপাখী—আর লক্ষ্মণকে খেতে দিতেন কলা-মূলো। লক্ষ্মণ কাজেই রাগ করে চোদ্দ বছর উপোস করেই থাকলো। রাম সেটা টের পেয়ে রাগ করে লক্ষ্মণকে বর্জন করলেন। শেষ কথা হচ্ছে—অতএব কেউ ক'রো না আর দাদার সেবা অকারণ!

যারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না,—অন্নই তাদের ধ্যান জ্ঞান, —তারা মনে করতে পারে, এরা বেশ খেয়ে পরে' সুখে আছে,—কিন্তু পেটের ক্ষিধে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মাত্র—সেটাই সব নয়। তারপর আছে মনের ক্ষিধে। তারও ওপর যাদের থাকে একটা আদর্শ ও সাধনা,—তারও একটা দাবী আছে। বিনা বিচারে যাদের বন্দী করে রাখা হয়, তাদের স্বাধীন চলা-ফেরা ছাড়া আর সবই যোগাবার দায়িত্বও নিতেই হয়। কিন্তু বন্দিজীবনের অস্বাভাবিকতার মার কেউ এড়াতে পারে না।

শুধু তাই নয়, আমাদের ভাতাগুলোর মূল্য যে বাজারদরের চেয়ে কম, তা তো ঐ আধ মণ দুধে সাত পোয়া ছানা দেখেই কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছেন। এখন বিষয়টার আর একটা দিকের চিত্র দেখুন।

আমাদের কুচোকাচা জিনিসের প্রয়োজনের তখন কোন নির্দিষ্ট ভাতা ছিল না—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পাশ করলেই কন্ট্রাক্টর সেগুলো সরবরাহ করতো। সেগুলোর দাম বা বিল পাশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানার বালাই ছিল না। হঠাৎ I. G. of Prisons এর এক হুকুম এল—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কোন জিনিসই দিতে পারবেন না—আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়োজনের কথা I. G.-র কাছে দরখাস্ত করে মঞ্জুর করিয়ে আনতে হবে। কারণ ঐ কুচোকাচা জিনিসের বাবদ নাকি অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। হবে না কেন? দু'পয়সার একটা জিবছোলা সরবরাহ করে ঘটা করে tongue scraper লিখে যদি বারো আনা বিল করা হয়, এবং সে বিল নির্বিবাদে পাশ হয়ে যায়, —তাহলে ১৫।১৬ জন লোকের তেল-সাবান থেকে ছুঁচ-সূতো পর্যন্ত যোগাতে যে অনেক টাকা খরচ হবে, সে আর বিচিত্র কি?

আমরা সকলে মিলে দরখাস্ত করলুম অসুবিধা জানিয়ে এবং অনাবশ্যকভাবে বিবাদ টেনে আনা ঠিক নয় বলে—কিন্তু কোন ফল হল না। সুতরাং আমরা পরামর্শ করে এক অভিনব লড়াই সুরু করলুম—দরখাস্তের লড়াই।

একটা রুটিন তৈরী করে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল—রোজ তিনখানা করে দরখাস্ত পাঠানো চাই—সোমবার অমুক তিনজনের পালা, মঙ্গলবার অমুক তিনজনের, ইত্যাদি। ঠিক হল, দরখাস্ত লিখতে হবে বাংলাভাষায় এবং I. G. of Prisons-এর কাছে বা নামে নয়, খোদ Additional Deputy Secretary Govt. of Bengal-এর নামে, যিনি আমাদের দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। তারপর চললো এক রীতিমত কম্পিটিশন—কে কত মজাদার দরখাস্ত লিখতে পারে। I. G-র পার্শোন্যাল অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের মাথায় বাড়ি—তাঁকে এই সব দরখাস্ত ইংরেজীতে অনুবাদ করতে হবে, কিম্বা note লিখে I. G.-কে বুঝিয়ে দিতে হবে। তাঁর মঞ্জুরী এলে, তবে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন।

যাদুদা' এক দরখাস্ত লিখলেন,—"কুলগাছে আঁচল বাধিয়ে ঝগড়া"—"পাড়া-কুঁদুলীর মতন" ইত্যাদি। ভূপতিদা' এক দরখাস্ত লিখলেন—তিন পাতা সাহিত্যিক শুদ্ধভাষা—"প্রাচীনকালে যখন মানুষ জুতার ব্যবহার জানিত না" থেকে সুরু করে কেমন করে জুতার আবিষ্কার হল, জুতা মানুষের কত উপকারী, কত রকমের জুতা কত সুখপ্রদ, ইত্যাদি এক প্রবন্ধ লিখে, তার উপসংহারে লিখলেন—"কিন্তু, অহো দুর্দৈব, আমার জুতার সুখতলা খুলিয়া গিয়াছে এবং আমি আজ তিনদিন যাবত কি রূপ মনোকষ্টে কাল কর্তন করিতেছি, তাহা মহাশয়কে কেমন করিয়া বুঝাইব? অতএব মহাশয় অবিলম্বে আমাকে চারিটি কণ্টককীলক (কাঁটাপেরেক) সরবরাহ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন। কিমধিকমিতি—"

এইভাবে কেউ চাইলেন সার্টের জন্য ঝিনুকের বোতাম, কেউ ছুঁচ-সুতো, কেউ কানখুস্কী কিন্তু দরখাস্ত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড।

Additional Deputy Secretary-র বাংলা হল "অতিরিক্ত উপসম্পাদক"। "মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত"—"অধীনের বিনীত নিবেদন" প্রভৃতি লিখে আমি এক দরখাস্তে লিখলুম, ব্যয় সংক্ষেপই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আপনি পদত্যাগ করুন,—আপনার কাজ ৫০টাকা বেতনের একজন কেরাণীই পারিবে। ইত্যাদি—আমি লিখেছিলাম "আবশ্যকাতিরিক্ত অপ-সম্পাদক।"

কয়েক দিনের মধ্যেই লড়াই ফতে—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতেই ক্ষমতা ফিরে এল, এবং পরে মাসিক ৭ টাকা ভাতা নির্দিষ্ট হল।

যাই হোক, গণেশ ঘোষের কাছে তার দ্বিতীয় কীর্ত্তির গল্প শুনলুম। আমাদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক মিটে যাওয়ার পর গণেশকে আবার বাঁকুড়ায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল—কলকাতায় চোখ পরীক্ষার পর। বাঁকুড়া জেলে হাসপাতালে আমাদের খানা রেঁধে ঘরে দিয়ে যেত মানভূমের একজন প্রৌঢ় পুরানো চোর কয়েদী। তাকে দিয়ে গণেশ বাইরে থেকে একটা লোহাকাটা করাত সংগ্রহ করেছে, এবং আমাদের ঘরের সংলগ্ন পায়খানার যে গরাদে-দেওয়া জানালায় কম্বল ঢাকা দেওয়া ছিল, তার একটা গরাদের ভুমুড়ো কেটে খুলে ফেলেছে। তারপর খাটের একটা লোহার ডাণ্ডা বেঁকিয়ে ইংরিজী এস (S) অক্ষরের মতন একটা প্রকাণ্ড হুক বানিয়েছে। তারপর দুখানা কাপড় বেঁধে রসি করেছে। খাটের একটা সরু লোহার ছত্রীর এক মুখ বেঁকিয়ে নিয়েছে, যাতে বড় হুকটাকে জেলের দেওয়ালের ওপর আটকে দেওয়া যায়।

তারপর এই সব সাজ সরঞ্জাম নিয়ে পায়খানার জানালা দিয়ে রাত্রে বেরিয়েছে। জেলের ঐ প্রান্তে দেওয়ালের ধারে একটা সেকেলে পাকা জোড়াপায়খানা ছিল। তার পাশে জেলের দেওয়ালের ধারে যে গলিটুকু ছিল, সেখানে গিয়ে ছত্রীর ডগায় কাপড়ের রসি-বাঁধা হুকটাকে তুলে দেওয়ালের মাথায় আটকে কর্তা রসি বেয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর ভারে কাঁচালোহার ডাণ্ডার হুকের এক মুখ সিধে হয়ে গিয়ে কর্তা ঢিপ করে পড়ে গেছেন, এবং সাজসজ্জা নিয়ে পালিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকে কাগজের গুঁজি দিয়ে কাটা-গরাদেটা সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন। পরের দিন আবার একটা চেষ্টা করার ইচ্ছে।

কিন্তু, অহো দুর্দ্দৈব! সকালে মেথর পায়খানায় চুণের পোঁচড়া দিতে এসে হঠাৎ সেই কাটা গরাদেটাই চেপে ধরেছে, এবং গরাদেটা খুলে গেছে। মেথরের তো চক্ষু স্থির!

সুতরাং কীর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়লো। বাবুরা বললেন, আমরা কিছুই জানিনা। মন্নুয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করলো। সে জানতো, কিন্তু কিছুই বললো না—মুখ বুজে মার খেলো। তারপর রাঁধুনীকে প্রহার দিতেই সে সব বলে দিলে। তারপরই গণেশের মেদিনীপুরে আগমন।

মেদিনীপুরে বেশ সংসার পাতিয়ে প্রেমানন্দে আছি। ক্রমে ক্রমে বাড়ী থেকে খবর আসছে ভাগ্নীর কালাজ্বর, যথোচিত চিকিৎসা হচ্ছে না, শয্যাশায়ী অবস্থা, ক্রমে খারাপ হচ্ছে।

প্রভাস লিখলে, মুন্সীগঞ্জ ন্যাশান্যাল স্কুল উঠে গেছে, ভাগ্নেকে জিতেন কুশারী তাঁর বাহেরকের সত্যাশ্রমে নিয়ে গিয়ে রেখেছেন—প্রভাস কলকাতায় চলে এসেছে, এবং কংগ্রেস-কর্ম্মিসংঘের বাড়ীতে আছে। সুরেশ মজুমদার, মাখন সেন এবং তার সঙ্গে যুগান্তর দলের সুরেশদা' (দাস) মিলে কংগ্রেসকর্ম্মিসংঘ গড়েছেন।

ক্রমে খবর এল, ১৬০০০ টাকার দাবীতে আমার মহাজন নালিশ করেছেন—বাড়ী বুঝি যায়। দরখাস্ত করি, আমাকে কোর্টে হাজির হতে দাও,—দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না। নিয়মিত ভাবে চিঠি আসে, প্রভাস উকীল দিয়ে মামলা স্থগিত করাচ্ছে, সময় নিচ্ছে, আমিও দরখাস্ত করে চলেছি—একটা dead lock চলছে।

ওদিকে ভাগ্নীজামাই I. B. Officeএ ঘোরাঘুরি করে দরবার করে, তারা হাঁকিয়ে দেয়, সে আমাকে চিঠি লেখে, আমি সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, লেখাপড়া এবং খেলাধূলোয় মন দিতে চেষ্টা করি।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল, মনোরঞ্জনদা', ভূপতিদা', নরেশদা', প্রতুলবাবু, রবী সেন, অমৃত সরকার প্রভৃতিকে বদলী করা হয়েছে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন জেলে। তাঁরা চলে গেলেন। আমাদের সংসারে ভাঙ্গন ধরলো। মনোরঞ্জনদা' যাওয়ার সময় আমাকে দুখানা বই দিয়ে গেলেন—Roads to Freedom এবং Russian workers Republic—আমি বললুম, আমি বই দুটো বাংলায় অনুবাদ করবো।

ওঁদের যাওয়ার দিন feast হল এবং বিদায় অভিনন্দন জানানো হল। ভূপতিদা' গান বাঁধলেন এবং আমি গাইলুম—

ঝড় তুফানের সঙ্গী মোরা, মোদের যে এই পরিচয়
জীবন ভরে মনের মাঝে সকল কাজে জেগে রয়
হয়ত কঠিন যাত্রাপথে, হয়ত ঘন আঁধার রাতে
কঠোর কারা শৃঙ্খলেতে বর্ষ যুগও গত হয়
যতক্ষণের হোক না দেখা, আমরা সবাই চিরসখা
স্মৃতির বুকে রয় যে আঁকা সবার ছবি প্রেমময়।

আমার প্রেমময় ছবিটা যে তাঁর স্মৃতির বুকে এখনও আঁকা আছে, সেটা এখনও মাঝে মাঝে টের পাই।

অনুকূলদা' রোজ সিদ্ধি খেতেন—লেখালেখি করে সরকারী মঞ্জুরী এবং সাপ্লাই—accustomed—medical grounds. সেদিন আমি একটু চেয়ে নিয়ে খেয়েছিলুম এবং প্রায় বেহাল হয়ে পড়েছিলুম। গান আর থামে না—এক দাদা বললেন, তোমার আজ হয়েছে কি! আমি বললুম অনুকূলদা'র প্রসাদ পেয়েছি। অনুকূলদা' বললেন এই, খবরদার, confess করছো! সুযোগ পেয়ে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ক্রমে আমাদের জেলের সংসারের ভাঙ্গন বেড়ে চললো। ওঁর যাওয়ার পর যাদুদা' মাঝে মাঝে একা গান ধরেন—

'বাড়ীর পাশে আরসী নগর (ও তাতে) পড়শী বসত করে
একদিনও না দেখিলাম তারে—'

"রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী" গানটার একটা প্যারডি লিখেছিলুম—

রাত দুপুরে বাজায় কাঁসি ঝালাপালা কান
পথে যেতে পড়ে চলে কি করেছে পান
শ্বশুরবাড়ী আমার বেলা
কি খাওয়ালে.....শালা
রাত দুপুরে তারি ঠেলায় প্রাণ করে আনচান

অনে আমার কত হুটুম নোজই আসেন যান
খণ্ডোবণ্ড, মেরে কুত্তো, কেউ বা থেবম খান
নেশার মুখে দেবার তরে
কি চাট আছে তোমার ঘরে—

এই পর্যন্ত লিখে শেষ লাইনটা মনের মতন করে মেলাতে পারছিলুম না—বাঘুদা' শুনে পেয়ে মিলিয়ে দিলেন—

সঙ্গে আছে যেটুকু মাল হবে দু'-চার টান।

একজন কয়েদী নাপতের কাজ করতে আসতো, বাঘুদা' তাকে নিয়ে মেদিনীপুরী ভাষায় অনেকক্ষণ গল্প করে কাটাতেন। তার নাম "মহেস্" (মহেশ)—বাইরে হালচাষ করতো—শুনে বাঘুদা' বল্লেন—সেটা তোমার কামাবার হাত দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। আমাদের সেকটি রেজাব দিয়েই কামিয়ে দিতো—বলতো কামাবার যড়যন্ত্র (সরঞ্জাম)।

একদিন সে বলছে—সাড়াজোলের রাজার ছেলে হয়েছে—জেলখানাটা রাজার কিনা, তাই রাজা গরমেণ্টকে বলেছে ১০০০ কয়েদী ছেড়ে দিতে হবে—না হলে আমার জেল ছেড়ে দাও। —ছুতোর নাতায় ওরা মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

সেই সময়ে কুইন আলেকজাণ্ড্রা মারা যাওয়ার খবর এসেছে—মহেস বাঘুদা'কে জিজ্ঞাসা কললে—ছরাদ হবে তো? বাঘুদা' বললেন, ছরাদ হবে নি? ছরাদ হবে, বেবুসো উচ্ছুগ্যু হবে,—পণ্ডিতদের এক এক ঘড়া ভরে টাকা বিদেয় দেবে।

মহেস জিজ্ঞাসা করলে,—রাজারা নাকি খিস্তান?—বাঘুদা' বললেন, হ্যাঁ—তা হলই বা খিস্তান—মায়ের কাজটি করতে হবে নি? —মহেস বললে—বটে বইকি বাবু!

হঠাৎ একদিন বাঘুদা'র সমন এল—কলকাতায় বদলী। ক্রমে ক্রমে গিরীনদা' অনুকূলদা', অংশুবাবুও চলে গেলেন।

বাড়ীর চিঠি পাই প্রভাসের চিঠি পাই, দরখাস্ত করি, কিছু হয় না। মনে মনে কল্পনা করি—ভায়া ম'লো,—মহাজন বাড়ী বেচে নিলো—ভায়ীজামাই শিশুপুত্র নিয়ে—

ছুত্তোর বলে সব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে মনে করলুম, এসা দিন নেহি রহেগা। মনটা চাঙ্গা হল—একটা কবিতা লেখায় মনঃসংযোগ করলুম —এসা দিন নেহি রহেগা—

আসিল সন্ধ্যা নিবিড় আঁধার বরণী
দিনের আলোক ছাড়িল শ্যামল ধরণী—
তাই বলে তুই কাঁদিস কেন লো কমলে?

বিরহ বেদনা ঘুচায়ে মধুর মিলনে
দিনমণি পুনঃ হাসিবে নূতন কিরণে—
হাসিবি আবার গরবে সোহাগে হেলেদুলে।

নিদাঘ সাঁঝের তপ্ত আকাশ ঘেরিয়া
বদ্ধ বায়ুর স্তব্ধ আকার হেরিয়া
কাঁদিসনে—ওলো নিরাশ হস্‌নে চাতকী—

আসিবে বরষা নবীন নীরদ সঙ্গে—
ঢালিবে অমৃত পিপাসিত তোর অঙ্গে—
চিরদিন তোর কণ্ঠ শুষ্ক রবে কি?

ছাই কবিতা, কিন্তু সেদিন এই ছাই-ই আমার মুখরোচক লেগেছিল—এসা দিন নেহি রহেগা—

শেষে একদিন দরখাস্ত করলুম, আমাকে কলকাতার জেলে বদলী করা হোক,—যাতে আমি বাড়ীর মামলার তদ্বিরকারকের সঙ্গে দরকারমত দেখা করে উপদেশ দিতে পারি। না হলে আমার বাড়ী গেলে গভর্ণমেণ্টকে অন্ততঃ আয়ত দায়ী হতে হবে।

কিছু দিন কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ খবর এল, দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে—আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলীরও হুকুম এসে গেল। চললুম আবার আলীপুরেই।

গণেশ ঘোষ তখন ড্যানব্রীন পড়ে লাফাতে সুরু করেছে—এই রকম একটা কাণ্ড করতেই হবে। ৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে অনেক নেতার নাম শোনা গেছে (মায় চারুবিকাশ দত্ত পর্যন্ত) কিন্তু আমার এ বিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না যে, গণেশ ঘোষই ছিল কাণ্ডটার prime mover—স্বয়ং শ্রীগণেশ ঘোষ অস্বীকার করলেও আমি মানবো না।

[ক্রমশঃ।
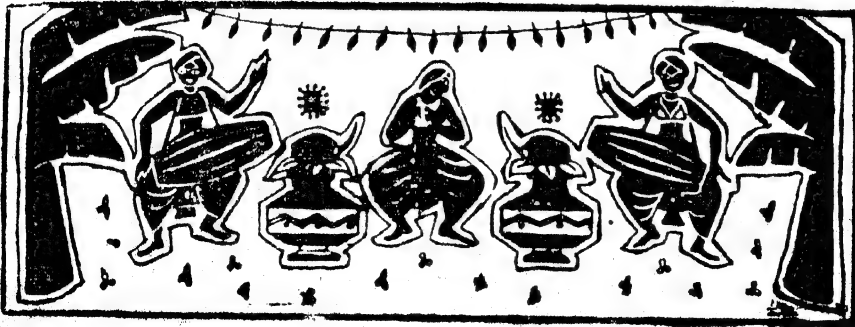
ভেরা ফিগ্‌নার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমল সেন

একটা ঠেলাগাড়ীতে করে ভেরাকে পুলিশের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হ'ল। পুলিশের কর্তারা তো মহা খুসি।

ওর 'বডি সার্চ' করো—

একটা প্রাইভেট ঘরে ভেরাকে ঢোকানো হ'ল। সংগে দুজন স্ত্রীলোক।

ভেরা লোকচরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। দেখেই বুঝতে পারলো, এরা নেহাৎ কাঁচা। এ ব্যাপারে বিশেষ হাত পাকেনি।

যেমনি বোঝা, আর কি—চটপট পকেট থেকে রসিদ আর নোটবুকের সেই কাগজখানা নিয়েই মুখের ভিতর।

স্ত্রীলোক দুটো চীৎকার করে উঠলো। পুলিশরা ছুটে এসে বললো, কি? কি? ব্যাপার কি? পকেট থেকে তুলে কী একটা মুখে দিল। একটা পুলিশ এসে গলা চেপে ধরলো ভেরার। ভেরা খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

অনেক রকম হাসি আছে দুনিয়ায়। এ হচ্ছে সেই হাসি যা খুব স্পষ্ট করে বলে মানুষকে, বন্ধু, ভারি ঠকে গেছ এবার।

এ হাসি দেখে পুলিশদের সন্দেহই রইলো না যে, কাগজটা তাদের আসার আগেই পেটে তলিয়ে গেছে। অপ্রতিভ হয়ে ফিরে গেল তারা।

ভেরার গালে কিন্তু তখনো সেই কাগজ। শুকনো কাগজ গেলা যায় কখনো? এইবার ভেরা তা নষ্ট করে ফেললো।

রিপোর্ট লেখার পালা। জনৈক পুলিশের কর্তা এসে কী লিখতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, তোমার নামই ভেরা ফিগ্‌নার?

ভেরা মুচকি হেসে বললে, কি মনে হয় আপনার?

কর্তা রেগে টেবিল চাপড়ে বললে, ইয়ারকি রাখো, এটা থানা, ক্লাব নয়।

ভেরা বললে, ওঃ থানা! আমি ভাবলুম ক্লাব।

কেন, এটা থানা বলে মনে হয় না?

ভেরা গম্ভীরভাবে বললে, কি করে হবে? থানার লোকরা কি এতো অপদার্থ যে, ভেরা-ফিগ্‌নারকে ধরে এনে আবার তার নাম জিজ্ঞেস করবে!

পুলিশের কর্তা বললে, তাহলে তুমি কবুল করছো, তোমার নাম ভেরা ফিগ্‌নার?

না বলে কি আর করি?

কেমন আছেন? নমস্কার! ভেরা চেয়ে দেখে মার্কুলভ। ঘৃণায়, রাগে তার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠলো।

দুনিয়ায় শয়তান বলে যদি কিছু থাকে তো তা এই কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকের দল।

ভেরা চীৎকার করে উঠলো, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক! কি অগ্নিময় দৃষ্টি ভেরার চোখে! মার্কুলভ ভয়ে পালিয়ে গেলো। তারপর, হাজত-পর্ব। এ হাজতের একটু বৈচিত্র্য আছে।

অন্যান্য দেশে—মোকদ্দমার জন্য প্রস্তুত হ'তে যে-কদিন দেরি হয় সেই কদিন অভিযুক্তকে হাজতে থাকতে হয়। অন্ততঃ তাই নিয়ম। রুশিয়ায় নিয়ম তা ছিল না। সেখানে হাজতবাসও ছিল একটা শাস্তি। শুধু শাস্তি নয়, খুব বড় রকমেরই একটা শাস্তি। বিপ্লবীদের প্রায় প্রত্যেককেই প্রথমে দু'বছর হাজতবাস করতে হ'ত। তারপর আদালতে তার বিচার। তারপর জেল।

হাজত আর জেলে তফাৎ থাকা উচিত, কিন্তু তা ছিল না। রুশ সরকার একে নাম দিয়েছিল প্রাথমিক বন্দিত্ব।

ভেরাকে এবার তার জন্য প্রস্তুত করা হ'ল। কয়েদীর পোষাক। তারপরেই একবাটি দুধ।

দুধ কেন? এতো আদরে কাজ নেই।

জনৈক কর্তা বললে, খেতেই হবে।

কেন?

কর্তা পকেট থেকে ভেরার টাকার থলেটা বের করে তার তলা থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো কি বের করে বললে, এ কি?

ভেরা দেখলো, হলদে পটাশিয়াম, অদৃশ্য কালি করার জন্য সংগে সংগে রাখতো সে। কিন্তু এদের কাছে বলা হবে না কিছু। আমি কি জানি?

পুলিশের কর্তা ব'ললে, কিন্তু আমি জানি। এটা পটাস্‌-সায়ানাইড। তীব্র বিষ। আমার সন্দেহ সত্য কি না, তাই বোঝার জন্য এই দুধ খেতে হবে তোমায়।

অগত্যা ভেরা দুধ খেলো।

পরদিন সকালে পুলিশের কড়া পাহারায় ভেরাকে রাজধানীতে চালান করা হ'ল।

পেত্রোগ্রাদে—পুলিশের হাজতে এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেলো। একটা সেলে ভেরাকে চাবি দিয়ে রাখা হ'ল।

পরদিন রবিবার—নরকেও বোধ হয় ছুটি কারণ নরকের চাইতেও ভীষণতর পুলিশ-হাজতেই সেদিন ছুটি।

কর্মহীন দিবস। বৈপ্লবিক জীবনেরও হয়তো আজ শেষ। দীর্ঘকাল পরে বিচারের প্রহসন হবে। তার পরেই ফাঁসি।

ভেরা কল্পনা-নেত্রে দেখলো, সে ফাঁসিকাঠে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে নাচতে নাচতে, পুলিশদল, সরকার পক্ষ পৈশাচিক উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না যেন। ফাঁসির দড়ি গলায় প'রেছে, ঝুলবে, এমন সময়ে আকুল কণ্ঠ বেজে উঠলো পশ্চাতে, ভেরা!

এ মায়ের কণ্ঠস্বর। ভেরার একমাত্র দেবী! ভেরার জন্য চোখের জল ফেলার একমাত্র জন।

ভেরার প্রাণ মায়ের জন্য কেঁদে উঠলো। মাকে একবার যদি দেখতে পেতো!

পরদিন একজন এসে বললো, চলো—

কোথায়?

স্টুডিওতে। তোমার ফোটো নিতে হবে।

ফোটো তোলা হ'ল—অনেক কপি। কর্তারা ফোটোগুলি বারে বারে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন।

ভেরা হেসে বললে, অতো কি দেখছেন? জলজ্যান্ত লোকটাই তো খাড়া আপনাদের সামনে।

জনৈক কর্তা বললে, একজনকে পাঠাতে হবে।

কা'কে?

যাকে সবচেয়ে ভালো জিনিষটি পাঠাতে হয়।

ওঃ, জারকে। আমি মনে করলুম, আমার হবু বরের জন্য পাঠাচ্ছেন বুঝি?

তোমার এমন মনে করার কারণ?

যথেষ্ট। শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি।—আগে বিয়ে হবে না?

কর্তা ব'ললেন, হাঁ, বিয়ে হবে। তবে বরের সংগে নয়, শৃঙ্খলের সংগে।

সে ফোটো জারের কাছে পাঠানো হ'ল। সরকার পক্ষের আজ মহাসমারোহ। জার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন, ভগবানকে ধন্যবাদ! ভয়ঙ্কর স্ত্রীলোকটা এতোদিনে ধরা পড়লো।

দলে দলে সরকারী কর্মচারী পুলিশ-অফিসে গিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো—ম্যাজিক দেখতে লোকে যেমন ভিড় করে। সবার চোখেই উৎকণ্ঠা। না জানি সে কেমন। রক্তপাত করতে করতে তার হাত লাল হ'য়ে গিয়েছে। তার চোখ দিয়ে হয়তো আগুনই ছোটে। দেখতে হয়তো সে তাড়কা রাক্ষসী। এমনি সব জল্পনা-কল্পনা দর্শনার্থীদের মধ্যে।

ভেরা এসে ঢুকলো যখন অফিসঘরে, কারুরই যেন বিশ্বাস হয় না, এই সেই ভীষণা বিদ্রোহিনী? এ যে সুন্দরী, অত্যন্ত সুন্দরী! যৌবন যে এখনো এর অংগে অংগে উছলে পড়ছে। কী শান্ত-সমাহিত ভাব!—এ যে ভয়ংকর একটা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এর নিশ্চিন্ততা দেখলে তা কল্পনাও করা যায় না।

আশ্চর্য! ভেরা-ফিগনার যে এমন, তা তো ভাবে নি কেউ!

পুলিশের কর্তা একসারি চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে রুক্ষভাবে বললেন, বোসো।

ভেরা নীরবে ব'সে পড়লো।

কর্তা বললেন, এবার বোধহয় বুঝতে পারছো বিপ্লবীরা পুলিশদের কিছুই ক'রতে পারবে না। তুমি অনর্থক ছাত্রসমাজকে ক্ষেপিয়ে দেশের অনিষ্ট ক'রছো।

ভেরা হেসে বললো, আপনারা দেখি সবাই সবজান্তা!

কর্তা বললেন, কেন, তুমি দেশময় ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের কানে বিপ্লবমন্ত্র দাওনি? আমরা যতো ছাত্র ধরেছি তারা সবাই তোমার নাম ক'রেছে।

বটে!

হ্যাঁ, এবার ঠাণ্ডা হ'লে তো! অনেক আগেই তোমার এ শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল।

ভেরা হেসে বললে, ঠিক, ঠিক! কিন্তু কি করবো? আপনারা উদ্যোগ করলেন না এখন আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কর্তা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, মনে হচ্ছে জীবনযুদ্ধে তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ।

কেন বলুন তো?

নইলে মরণের জন্য কেউ এতো আনন্দিত হয়?

ভেরা খিল খিল ক'রে হেসে বললে, যা-ই বলুন, খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি কিন্তু আপনাদের!

টলষ্টয় ব'লে একটি সরকারী কর্মচারী ছিলেন সেখানে। ইনি নিশ্চয়ই সেই জগৎপূজ্য ঋষি টলষ্টয়ের বংশসম্ভূত নন্। এঁর কেরামতি অনেক। প্রথমে ছিলেন শিক্ষা-মন্ত্রী। এর হাতে তখন বিশ্ববিদ্যালয় হ'য়ে উঠেছিল একটা ফার্স—কলেজের ছেলেদের তো ইনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছেলেন। হালে ইনি ইন্‌টিরিয়ার মন্ত্রী—বিপ্লবীদের যম!

অথচ আত্মম্ভরিতা আছে ষোলো আনা ছেড়ে আঠারো আনা। তিনি ভেরার সংগে আলাপ জুড়ে দিলেন নেহাৎ গায়ে পড়ে।

পুরানো শিক্ষা পদ্ধতি খুবই ভালো ছিল। নয় কি? অথচ তোমরা বিপ্লবীরা তা পছন্দ করতে না। একবার আমার প্রাণনাশ করবার উপক্রমও করেছিলে তার জন্য। এ-রকম নরহত্যা কি ভালো? বিশেষতঃ মহামান্য সম্রাট—তাঁকে—ছিঃ! ছিঃ!—আর এতে লাভই কি হ'ত তোমাদের? একজন জার গেলে আর একজন জার যখন হবেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠাকুর্দা যেন কচি দুষ্টু নাতনীকে বকছেন, বোঝাচ্ছেন। কিন্তু নাতনীটি যে একেবারে চুপ, কোন কথায়ই হাঁ-না বলে না। এরকম একতরফা কতক্ষণ কথা-বাজি করা চলে? কাজেই ভেরাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলো?

কিছুই না।

অর্থাৎ তুমি আমার একটা কথাও স্বীকার কর না?

ভেরা একটু হাসলো মাত্র।

টলষ্টয় নিরাশ হ'য়ে বললো, কি করবো? সময় নেই। নইলে আমার যুক্তির সারবত্তা দেখিয়ে তোমায় আমার মতে আনতে পারতুম।

ভেরা গম্ভীর হ'য়ে বললো, বটে! আমার কিন্তু খুব বিশ্বাস আপনিই বরং আমাদের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিতেন।

টলষ্টয় রেগে সেখান থেকে চলে গেলেন।

জনৈক পুলিশের কর্তা হেসে জিজ্ঞেস করলো, এটা কি আপনি সত্যি-সত্যিই বললেন?

কোন্‌টা?

ঐ যে, ওঁকে বিপ্লবদলে টানা?

হাঁ।

এও কি সম্ভব?

কেন নয়? যারা শুধু তর্ক করেই ক্ষান্ত হয় না, তর্কের সিদ্ধান্ত মেনে চলে, তাদের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করবার পক্ষে যুক্তি আমাদের দিকেই প্রবল।

এ বিপ্লবীদের কথা। তারা বলে, মানুষ—ভয়, স্বার্থ যে কোনো প্রবৃত্তির বশেই হোক না কেন—যা সত্য বলে বোঝে তাই করে না। মনে স্বীকার করলেও মুখে সে স্বীকার করে না।

তা যদি করতো তবে জাতির মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় বলে জেনে বিপ্লবকেই তারা অবলম্বন করতো। ভেরা এই বিশ্বাসের বশেই ও-কথা বললো।

এর পরে ভেরাকে হাজতবাসের জন্য 'সেণ্ট পিটার এণ্ড পল' জেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

'সেণ্ট পিটার এণ্ড পল' জেলে ভেরা বন্দিনী। নির্জন সেলে একাকিনী দিন কাটে তার। প্রায়ই পুলিশ-অফিস থেকে ডাক আসে তার। ভেরা পুলিশ-অফিসে উপস্থিত হলে সরকারী এটর্নীর জেরা করতে বসে। ভারি বিরক্তিকর ব্যাপার এ।

ভেরা একদিন বললে, দেখুন, আমি যা বলার লিখে দেব। আমায় আর এখানে এনে জ্বালাতন করবেন না আপনারা।

সব লিখে দেবেন?

হাঁ। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত বিপ্লবান্দোলন সম্বন্ধে আমার যা কিছু জানা আছে, সব লিখে দেব।

ভেরা জেলে ফিরে এলো। জনৈক কর্মচারী এসে কাগজ-কলম-কালি দিয়ে গেলো। ভেরা ধীরে ধীরে রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেলো। এখন তো আর কোনো বাধা নেই বলার। লুকানোরও কোনো আবশ্যকতা নেই। গুপ্তচরের কল্যাণে তা পুলিশ প্রায় সবই জানে। যাদের নিয়ে বিপ্লব শুরু তারা তো অনেক আগেই হয় প্রাণ দিয়েছে, নয় নির্বাসিত বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তার এ বর্ণনায় কারো কোন বিপদ হবে না। বরঞ্চ এ তার কর্তব্য। অধুনালুপ্ত এই বিশেষ বিপ্লবীদল রুশের জনসাধারণের জন্য কতো কি করে, তার ভীষণ অথচ গৌরবময় ইতিহাস তাকে প্রকাশ করে যেতেই হবে। সে ইতিহাসকে বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হতে দেওয়া যায় না। সেই দলের শেষ সভ্য হিসাবে এ তার কর্তব্য।

ধীরে ধীরে প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে, ভাষার সমস্ত অলংকার প্রয়োগ করে বিপ্লবীর বুকের রক্তে রাঙা বিপ্লবের ইতিহাস ফুটিয়ে তুললো ভেরা-ফিগনার। এবং যথাসময়ে তা কর্তাদের কাছে গেলো।

কয়েক দিন পরে ভেরার সে কাহিনী সকলের মুখে। উপন্যাসের মতো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলেছে সবাই—এমনি বিচিত্র, এমনি ভীষণ সে কাহিনী!

মাসখানেক পরে এক ভদ্রলোক এসে ভেরার ঘরে হাজির। চেহারা বেশ তাঁর, একটা বিশিষ্টতা আছে। পরিচয় দিয়ে বললেন, আমার নাম শেরেদা। সৈন্যবিভাগে বিপ্লবীদের কাজ সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য সরকার কর্তৃক আমি নিযুক্ত।

ভেরা কোনো কথা বললো না। শেরেদা একবার চাইলেন ভেরার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাতখানা তুলে নিলেন। ভেরা বাধা দিতে গেলো, কিন্তু তার আগেই শেরেদা নুয়ে পড়ে হাতখানিতে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, এতো সুন্দর আপনার স্বভাব, অথচ এতো দুর্ভাগা আপনি! একটি সন্তান পর্যন্ত আপনার নেই?

ভেরা শেরেদার এ অদ্ভুত ব্যবহারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। অন্য কথা পাড়লো, আপনিই তাহ'লে সৈন্যবিভাগের বিপ্লবীদের বিচারের জন্য উপস্থিত করছেন।

হাঁ।

সকলেরই শাস্তি হ'চ্ছে তা হ'লে?

না। সবাইকে জড়িয়ে একটা মস্তবড় কাণ্ড বাধানো আমার ইচ্ছে নয়। দেখুন, অযথা নির্যাতনের পক্ষপাতী আমি নই। পুলিশদের এ অত্যাচার আমি আদৌ সমর্থন করি না।

ভেরা বললে, তাহলে সরকারের গোলামী করছেন কেন?

শেরেদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, ঋণের দায়ে। নইলে এখানে থেকে এ বেদনাময় কর্তব্যের ভার বহন ক'রতে হত না। কিন্তু, তাও বলি। এ গুপ্তহত্যা পছন্দ করি না আমি।

কী পছন্দ করেন তা হ'লে?

খোলাখুলি লড়াই। হারজিত যা-ই হোক্‌।

ভেরা চুপ করে রইলো।

শেরেদা আবার বললেন, হাঁ, ভালো কথা, আপনার বিপ্লবকাহিনী পড়লুম আমি, চমৎকার! ইচ্ছে হল, লেখিকার সংগে একবার দেখা করে জীবন সার্থক করি।

শেরেদা চলে গেলেন। ভেরা একাকিনী বসে রইলো। অফুরন্ত অবসর চিন্তার। দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি আসে, যায়,—অনন্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে। খেয়াঘাটে বসে যাত্রী কড়ি গোণে। সমস্ত দিনের লাভ লোকসান, পথের ব্যথা, আশা নিরাশা, সব বড় হয়ে জাগে তার মনে।

ভেরাও আজ জীবনপথের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, অতীত জীবনের কথা বায়স্কোপের ছবির মতো মনে জাগে, মন হাসে, মন কাঁদে, মন গলিত ধাতুস্রোতের মতো টগবগ করতে থাকে, মন নবীন যুগের নব সূর্যোদয়ের দিকে চেয়ে নিজের ব্যথার জয়-জয়কার করে। কথা কইবার সংগী নেই।

মা ও ছোট বোন দেখতে এসেছে ভেরাকে। দু হপ্তায় একবার করে দেখতে দেওয়া হয় তাদের। কুড়ি মিনিটের দেখা। যে মায়ের কোলে মাথা রেখে প্রহরের পর প্রহর কাটতো, তাকে আজ মাত্র কুড়ি মিনিট পেয়ে খুসি থাকতে হবে!

আর, তাও কি পাওয়া? না, মা ও সন্তানের সম্পর্কের উপর নিষ্ঠুর পরিহাস! মায়ের কোলে মাথা রাখা দূরের কথা, মায়ের হাতখানিতে চুমু খাওয়ার উপায়ও নেই। মা নাগালের বাইরে। মাঝখানে দু সারি লোহার রেলিঙ।

একদিন। হৃদয় যেন আর কিছুতেই বাধ মানছিল না।

মায়ের স্পর্শ পাবার আকাংখায় উদ্গ্রীব চিত্ত নিয়ে পুলিশ-অফিসারকে বললে, একবার মায়ের হাতখানায় চুমু খেতে দিন।

পুলিশ-অফিসার গম্ভীরভাবে বললে, হুকুম নেই।

শুধু একবার।

হুকুম নেই। বারে বারে সেই একই উত্তর, হুকুম নেই। সন্তান মায়ের কাছে যাবে একটি বার, তারও হুকুম নেই?

ভেরার হৃদয় গভীর নিরাশায় ভ'রে গেলো।

একদিন বোন ফুল নিয়ে এলো। দিদি ফুল ভালোবাসে, তাই টাটকা ফুলে ভরা একটা লতা নি.য় এসেছে সে, ভেরাকে দেবে।

হুকুম নেই।

কি হুকুম নেই?

ও দেবার।

আচ্ছা, ফুলগুলি নয় ছিঁড়েই দিচ্ছি, লতা দেব না?

ফুল দেবারও হুকুম নেই। কোন কিছুই বাইরে থেকে দেবার হুকুম নেই।

ভেরা মনে মনে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। এ তো জেলখানা নয়, এ জীবন্ত সমাধি।

মা দিন কয়েক পরে দেশে ফিরে গেলেন। বোন গেলো জুরিখে চিকিৎসার জন্ত। ভেরার জীবনে আবার বাক্যহীন দিনরাত শুরু হ'ল। নীরব, নীরব, সম্পূর্ণ নীরব। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

একদিন ভেরা শুনতে পেলো, পাশের ঘরে কে প'ড়ছে। হয়তো তারই মতো হতভাগ্য কোন বন্দী। নিজের কণ্ঠস্বরকে কথা বলে অটুট রাখার জন্ত জোরে জোরে পড়ছে।

ভেরার মনে হল, তার কণ্ঠস্বর লুপ্ত হয়ে গেছে। গলা যেন অসাড় হয়ে গেছে, কথা ফোটে না।

একদিন পাশের ঘরের সেই পাঠরত বন্দীর কাহিনী জানতে পেলো। সেণ্টপিটার্সবার্গে ১৮৪৯ সালে পিত্রাভেস্কির বাড়ী ঘেরাও করে কয়েকজন যুবককে বন্দী করে। বিপ্লবী বলে তাদের কঠোর দণ্ড হয়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডষ্টয়ভস্কিও ছিলেন সেই দণ্ডিতদের মধ্যে একজন। এ বন্দী যুবকও তাদেরই একজন।

একদিন ভেরা কথা বলতে চেষ্টা করলো। ক্ষীণ শব্দ—তার সে উদাত্ত কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর যেন আর নেই। যাক্, সব চলে যাক্। গভীর নীরবতা নেমে আসুক জীবনে। নীরবতাই এখন তার জীবনের সাধনা।

শরতে মা আবার এলেন

রক্ষী এসে বললে, মা দেখা করতে এসেছেন।

ভেরার মনে হল, এ নীরবতার অন্তরাল ভাঙলে সে আর বাঁচবে না। মা—মা—এখন মা তার—কিন্তু তাঁকেও যেন দেখতে সাহস হচ্ছিল না তার। মা কেন এলেন? বেশ তো চলছিল জীবন অন্ধকারে, মৃত্যুর মতো স্নিগ্ধ নীরবতার কোলে। কেন তার মাঝখানে এলে মা তুমি? না, যাবো না, যাবো না। তার পরেই মনে হল,—মা, যোন তাহ'লে যে বড় আঘাত পাবে মনে, বড় চিন্তিত, বড় দুঃখাকুল হবে।

ভেরা ধীরে ধীরে দেখা করার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। আবার মায়ে-সন্তানে, বোনে-বোনে সেই বেদনাময় দৃষ্টি-বিনিময়। ব্যথাতুর অনিচ্ছাময় বিদায়।

তারপর আবার—দীর্ঘ, সুদীর্ঘ কারাবাস। হঠাৎ একদিন পুলিশ-অফিস থেকে ডাক এলো আবার। একটা ঘরে টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজপত্তর নিয়ে ব'সে আছেন দোত্রিভস্কি এবং শেরেদা।

ভেরা ঢুকতেই একটা অ-বাঁধানো নোটবই দেখিয়ে দোত্রিভস্কি বললেন, লেখা কার চিনতে পারেন?

ভেরা দেখে বললো, না।

দোত্রিভস্কি তখন প্রথম পৃষ্ঠা খুলে ভেরার চোখের সামনে তুলে ধ'রলেন।

ভেরার মুখ বেদনায় পাংশুবর্ণ হয়ে গেলো। এ কী দেখছে সে? সার্জি ডিগায়েভ! না, না, এ হতে পারে না। ডিগায়েভ,—যাকে এতো বিশ্বাস ক'রেছে সে—সে বিশ্বাসঘাতক! অসম্ভব! কিন্তু প্রমাণ—জলজ্যান্ত প্রমাণ সামনে।

ভেরা নোটবুকখানা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো। পড়ছে, আর তার মুখে ফুটে উঠছে ঘৃণার ছবি। বিশ্বাসঘাতক পশু—সব লিখে রেখেছে এতে—প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেক বিপ্লবীর নাম, প্রত্যেকটি ফন্দি-ফিকির। এতো জঘন্য হ'তে পারে মানুষ? এতো নীচ?

ভেরা নোটবইখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের উপর। তারপর পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহিনীর মতো ঘরময় পাইচারি করে বেড়াতে লাগলো।

ডিগায়েভ! ডিগায়েভ্! ডিগায়েভ বিশ্বাসঘাতক!

দোত্রিভস্কি একটু হেসে বললেন, আরও আছে। এই বলে একতাড়া কাগজ দিলেন ভেরার হাতে। সেগুলি দক্ষিণী সৈন্ত-বিপ্লবীদের বর্ণনাপত্র।

পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়লো, 'আমার ভ্রম বুঝতে পেরে নিম্নলিখিত বর্ণনা দাখিল করছি আমি।'

ঘৃণায় ভেরা আর একটা পাতা ওল্টালো, ঐ একই কথা, একই গৎ। সকলেই নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে দলের সকল কথা অকাতরে পুলিশকে জানিয়েছে। অথচ এদের উপর কত নির্ভর, কত বিশ্বাস করেছিল সে! কত বড় একটা ভবিষ্যৎ এদের নিয়ে গড়তে যাচ্ছিল। শপথ করে একদিন স্বেচ্ছায় বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল এরা, প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল, সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করবে—কুতঘ্নের দল।

কিন্তু তবু এরা ডিগায়েভের মতো নয়। সে কৃতঘ্নের রাজা। তার যোগ্য বিশেষণ নরকের অভিধানেও মেলে না।

ভেরার মনে হ'ল মানুষের এই কৃতঘ্নতা দেখার চাইতে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

মরতে চাই, আমি মরতে চাই! তবু মরা হবে না তার। এখনও কাজ বাকি।

পুত্র পিতার মুখাগ্নি করে। ভেরাও যেন এই কৃতঘ্নতার মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে আছে, তার শেষ কাজ—অগ্নিবর্তিকা তুলে মৃত বিপ্লবের সত্য স্বরূপ জীবন্ত ক্রী বিশ্বের সমস্ত বিপ্লববিরোধী নরনারীকে দেখাবার জন্ত।

তাকে বাঁচতেই হবে। কিন্তু এ কৃতজ্ঞতা ভুলবে কী করে?

হাতের কাছে আর কোন কাজ না পেয়ে ভেরা-ফিগনার ইংরাজি শিক্ষায় লেগে গেলো—ঠিক নেশাখোরের মতন। ইংরাজি সে কিছু কিছু শিখেছিল আগে, এবার ভালো করে শিখতে লাগলো। বই পড়ায় বরাবরই তার খুব আনন্দ। একদিন দেশের ডাকে সে আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল সে। আজ আবার ডুবে গেলো তাতে। তার মনে হল, এই প্রিয়সংগীদের ভয়ে আসন্ন মৃত্যুও ভয়ে পিছিয়ে গেছে।

একদিন একটা আঙুল ফুলে উঠেছে, ভয়ানক ব্যথা। ডাক্তার এলেন। ডাক্তারটির নাম উইলম্স্। পাথরের দেয়াল, আর লোহার গরাদে দেখে তার মনটাও হয়ে গিয়েছিল অমনি কঠিন।

ভেরাকে দেখে তার মনটাও যেন গলে গেলো। বললেন, অপারেশন করতে হবে।

ভেরা বললো, করুন।

অপারেশন করা হল। ভেরাও ক্রমে সুস্থ হয়ে এলো।

ডাক্তারবাবু তখন হাঁফ ছেড়ে বললেন, বাঁচা গেলো। আমার খুবই ভয় হয়েছিল ধনুষ্টঙ্কার হয় না কি।

ভেরা একটু মৃদু হাসলো। এ কি ডাক্তারের মুখে। জেলখানার ডাক্তার, যারা কয়েদীর প্রাণের দাম এক কানাকড়িও দেয় না, তাদেরই একজন—

ভেরার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে ডাক্তার সহসা বলে উঠলেন, অ্যাঁ, এ কি ঘর বাবা! অন্ধকার, ড্যাম্প, নোংরার একশেষ! এখানে কী করে আছো মা?

ভেরা হেসে বললে, যেমন করে আমার আগে হাজার হাজার বন্দীরা এখানে থেকে গেছেন।

ডাক্তারবাবু মাথা নাড়লেন, যেন এতো দীর্ঘকাল জেলের ডাক্তারি করে, এ ঘর দেখে দেখে, আজ হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—এ ঘর ড্যাম্প, এ ঘর মানুষের অযোগ্য। বললেন, তোমার তো এখানে থাকা হতে পারে না মা! আমি বন্দোবস্ত করছি।

তার পরদিনই ভেরা একখানা শুকনো ঝরঝরে পরিষ্কার ছোট্ট ঘর পেলো। দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা, জানালা খুললেই একটা বারান্দা। বারান্দার একটু দূরেই দেয়াল, সূর্য দেখা যায় না,—কিন্তু দুপুরে তার তির্য্যক আলো এসে খেলা করে ঘরের জানালায়।

ঘরের এক কোণে আঁটা একটা লোহার টেবিল, তার উপর দাঁড়িয়ে একটা ছিদ্র দিয়ে বাইরের খানিকটা দেখা যায়—কঠিন পাথরের উপর ছোট্ট একটা চারাগাছ। রোজ তাই দেখে ভেরা।

গাছটির সংগে যেন তার কতদিনের বন্ধুত্ব। একদিন দেখে, তার শাখায় শাখায় কুঁড়ি ফুটেছে। বুঝলো, বসন্ত এসেছে।

বসন্ত এলো। পাথরের বুকে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে পড়লো।

ভেরার মনে পড়লো বহুদিন আগেকার কথা—ফুল অমনি করেই ছড়িয়ে পড়তো তার সর্বাংগে—কিন্তু আজ? জীবনব্যাপী শিশির-নিশা সন্মুখে তার। কবে এর অবসান হবে? সে কবে? সে কবে?

একুশ মাস প্রাথমিক কারাবাস। তারপরে কোর্টমার্শাল—

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ সাল। ভেরাকে অভিযোগপত্র দেওয়া হল। মোট চৌদ্দজন আসামীর বিচার হবে। সকলেরই উকীল নিযুক্ত হয়েছে। ভেরার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন উকীল এলো।

ভেরা হাসিমুখে বললো, ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আমি তো উকীল নিযুক্ত করবো না?

করবেন না? তাহ'লে যে—

ভেরা বললে, আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার যা বলবার, আমি নিজেই বলবো।

উকীলবাবু দেখলেন, প্রহরীরা একটু দূরে। এদিক-ওদিক চেয়ে স্বর নামিয়ে বললেন, শুনেছেন, পুলিশের গুপ্তচর, দানব সুদেকিন খুন হয়েছে।

সে কি? কে খুন করলো তাকে?

ডিগায়েভ। খুন করেই পালিয়েছে।

ডিগায়েভ! ভেরার চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন দুলে উঠলো। মন তার অস্থির—যেন বুঝতে পারছে না, হাসবে কি কাঁদবে।

ডিগায়েভ! ডিগায়েভ! কি সে? কে সে?

না:, মানুষের চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়!

কিন্তু এর মধ্যে কোন কারসাজ নেই তো?

২১শে সেপ্টেম্বর। একজন রক্ষী এসে ভেরাকে একটা কোট আর টুপি দিয়ে বললে, চলো।

কোথায়?

অন্য হাজতে।

ভেরা প্রস্তুত হল। অন্য একটা জেলের একটা সেলে তাকে এনে আটকে রাখলো।

রাত হয়েছে। তবু ঘুমোবার যো নেই। সমস্ত রাত দুটো রক্ষী গল্প করলো তার সেলের সামনে দাঁড়িয়ে।

পরদিন দশটায়—অন্ধকার সরু জেলের অলিগলির গোলকধাঁধা ঘুরিয়ে একটা প্রশস্ত ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

ভেরা চেয়ে দেখে, আর তেরোজন আসামী হাজির, আর প্রত্যেক আসামীর দু-পাশে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে দু'জন রক্ষী। বন্ধু বন্ধুকে আলিংগন করা তো দূরের কথা, স্পর্শও করতে পারে না। কী করুণ মূর্তি তাদের! চোখে জল আসে! শীর্ণ, মলিন মুখ, বেদনার ভারে শরীর যেন ভেঙে পড়েছে! অথচ এরা দু বছর আগে ছিল—যৌবনদীপ্ত, সুন্দর, সবল, জীবনাবেগপূর্ণ। আজ এরা তারই ধ্বংসাবশেষ।

ডিগায়েভ্! ডিগায়েভ্! এই তোমার কীর্তি!

ভেরা যেন রাগে গর্জাতে লাগলো মনের ভিতর, কিন্তু বাইরে সে শান্ত, ধীর, স্থির, গম্ভীর।

আদালত লোকে লোকারণ্য। সেরা আসামী ভেরা ফিগ্‌নার। সকলের চোখ তার দিকে নিবদ্ধ। বিচারের অভিনয় শুরু হল। সরকার পক্ষে সাক্ষী অসংখ্য,—প্রমাণ অপর্যাপ্ত।

আসামীরা কেউ প্রতিবাদ করে না। পেমেনজোভা শুধু তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করলো।

লুদমিলার ভাব যেন, যা হবার তা তো হবেই। তবে আর কি? একটু গল্প করে নিই। কাজেই গল্প শুরু—

সভাপতি গর্জে উঠলেন, আসামী লুদমিলা, কথা বন্ধ কর।

মিনিটখানেক চুপচাপ। আবার শুরু গল্প, এবার একটু চাপা সুরে।

আসামী লুদমিলা, ফিস-ফাস বন্ধ কর। স'রে ব'স।

লুদমিলা লক্ষ্মী ছেলের মতো স'রে ব'সলো। এক মিনিট যেতে না যেতেই আবার শুরু। এমনি চ'ললো।

ভেরা জড়ের মতো ব'সে সব শুনছিল।

মা ও বোন এলেন। ভেরার রুদ্ধ অশ্রু এবার যেন-উথলে প'ড়লো পরম প্রিয়জনের দর্শনে। মা, মা, তুমি যাও, আমি সইতে পারছি না।

মা বুঝলেন মেয়ের অন্তরের ব্যথা। কত বড় ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়েছে আজ তার মেয়ে! তিনি নীরবে আশীর্বাদ ক'রতে লাগলেন মেয়েকে।

বোন একজোড়া গোলাপ হাতে দিলো। কী সুন্দর গন্ধ, কী চমৎকার বর্ণ! কিন্তু কতক্ষণ স্থায়ী এ?

ঠিক মানুষের জীবনের মতো। অমনি সুন্দর হ'য়েই ফোটে সে, গন্ধ বিলায় সে, তারপর ঝ'রে প'ড়ে ধীরে ধীরে।

ভেরারও তো অমনি ক'রে ঝ'রে পড়ার দিন শুরু হ'য়েছে। ভেরা ফুলগুলি বুকে চেপে ধরলো। আঃ, কি আরাম! পরম প্রিয়জনের ভালোবাসা যেন সমস্ত দেহ দিয়ে অনুভব করছে সে।

জনৈকা ফরাসী মহিলা এতোক্ষণ একদৃষ্টে ভেরাকে দেখছিলেন, এইবার যেন নিঃসন্দেহে চিনতে পেরে সানন্দে বলে উঠলেন, ভেরা-ফিগ্‌নার, আমায় চিনতে পারছো না?

হাঁ, আপনি মাদাম ভলদন। রডিওনস্কি স্কুলে আমায় পড়িয়েছেন।

মাদাম খুসি হয়ে বললেন, আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি।

কিন্তু আশীর্বাদ কী করলেন, তা শোনা গেলো না—সকল আশীর্বাদ তো আর মুখ ফুটে প্রকাশ করা চলে না। শুধু তার দুচোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়ে গেলো। কি মনে করে তা তিনিই জানেন।

আসামী ভেরা-ফিগনার, তোমার কী বলবার আছে?

ভেরা উঠে দাঁড়ালো।

চারিদিকে কবরের মতো শীতল নিস্তব্ধতা, শিশুর মতো আগ্রহ, এই বিদ্রোহিনী নারী না জানি কি-ভীষণ কাহিনী ব্যক্ত করে।

অবিচলিত কণ্ঠে ভেরা-ফিগ্‌নার বলে চললো তার বক্তব্য—

কোর্ট ১৮৭১ সাল থেকে আমার বিপ্লব-জীবনের আলোচনা করেছেন। সরকারী উকীল বিস্মিত হয়েছেন আমার বিপ্লবজীবনের ভীষণতা এবং ব্যাপকতা দেখে।

কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আমার এ বিপ্লব-জীবন আকস্মিক নয়, ১৮৭১ সালে একদিন ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা নিইনি আমি। এর পিছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

আমার অতীত জীবনের কথা ভালো করে ভেবে দেখেছি—আমি ইচ্ছে করে বিপ্লব-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনি, লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারীর ভাগ্যসূত্র যার হাতে সেই রুশ সরকার আমায় বিপ্লবী হতে বাধ্য ক'রেছে। আর কিছু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমার জীবন-নাটকের প্রথম অংক ছিল আনন্দে ভরা। অন্ন-জল-স্নেহ-বিলাসিতা, শিক্ষা-দীক্ষা-বংশগৌরব, আভিজাত্য,—কোন কিছুরই অভাব ছিল না আমার। নিজের আনন্দে মনে করতুম, দুনিয়ার ঘরে ঘরেই বুঝি এমনি আনন্দের হিল্লোল।

একদিন ভুল ভাঙলো। দেখলুম, আমারই পাশে পাশে শত শত নরনারী পশুর মতো জীবন-যাপন করে, পেট ভ'রে খেতে পায় না, পরিধেয় শতচ্ছিন্ন, কুটীর অর্ধভগ্ন।

আর আমি ডুবে আছি বিলাস-প্রবাহে! কে যেন কশাঘাত করলো প্রাণে। ভাবলুম, এঁদের এই শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্য আমিও দায়ী,—সকল অভিজাতই দায়ী। এদের সেবা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো—এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডাক্তারি শিখলুম।

আরও একটা কথা শিখলুম,—শুধু ডাক্তারিতে রোগ যায় না। রোগের আসল কারণ দারিদ্র্য। আর দেখলুম, লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনের ওপর দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়ে তার পর উৎসবে মত্ত হয়েছে যে সেই হচ্ছে রুশ সরকার। রুশ সরকারকে ধ্বংস না করে মানুষের দুঃখ দূর করা যাবে না। সমাজতন্ত্রবাদে আমার সেই থেকেই দীক্ষা, আর সেই থেকেই আমি কায়মনোপ্রাণে বিপ্লবী।

আমি ইচ্ছে করে বিপ্লব করিনি। রুশ সরকার নিজে অত্যাচারের রক্তগংগা বইয়ে আমায় বিপ্লবের দিকে ভাসিয়ে দিয়েছে।

ভেরা তার জবানবন্দী শেষ ক'রে বসে পড়লো। তারপর বিচার-ফল—ভেরা এবং আর সাত জনের ফাঁসি। ভেরা বেশ সহজ ভাবে গ্রহণ করলো সে দণ্ড। জেলে জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তার সংগে দেখা করতে এলো।

কি চান?

একটা পরামর্শ। দণ্ডিত আসামীরা স্থির করেছে আপীল করবে। কিন্তু ব্যারণ ষ্ট্রোমবার্গ কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনি এ বিষয়ে কি উপদেশ দেন, তাই তিনি জানতে চান।

ভেরা দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আপনি তাকে বলবেন, ভেরা-ফিগ্‌নার নিজে যা করে না, অন্যকেও তা করতে উপদেশ দেয় না।

ভেরার আপীল করায় মত নেই জেনে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বললেন, কি নিষ্ঠুর আপনি!

ফাঁসির আসামী।

মা আর বোন দেখা করতে এলেন। শেষ সাক্ষাৎ! কারুর মুখে কথা নেই, শুধু গভীর হৃদয়ভেদী দৃষ্টি। অবিরল অশ্রু-বর্ষণ! স্বপ্নাবিষ্টের মতো বিদায়—চিরবিদায়!

ওঃ, অসহ্য! সশব্দে দোর বন্ধ হয়ে গেলো। ভেরা অভিভূতের মতো ব'সে রইলো। তার মনে হল যেন সে আবার ছোট মেয়েটি হয়েছে, মায়ের আদর কাড়বার জন্য লোলুপ, কী সুন্দর তুমি মা! কতো ভালোবাসি তোমায়। মা শুনে আদর ক'রছেন তাকে।

বোন ফুলের তোড়া নিয়ে এসেছে—এবারকার গোলাপ আরও সুন্দর, আরও সুগন্ধি।

হঠাৎ তালা খোলার কড়-কড় শব্দে স্বপ্ন ভেঙে গেলো। ঘরে ঢুকলো রক্ষিসহ ইয়াকোলেভ।

তোমাকে কয়েদীর পোষাক পরাতে হবে। পাশেই একটা ঘর

ছিল। কয়েদীর পোষাক নিয়ে একটি স্ত্রীলোক সেখানে হাজির। ভেরা সেখানে গিয়ে পোষাক বদলে এলো।

তারপর অতীতের চিন্তা, আর মহাভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা।

মৃত্যু! কত সুন্দর! কত গরিমাময়, কত আকাঙ্ক্ষিত। প্রস্তুত, সম্পূর্ণ প্রস্তুত সে। ফাঁসির তিথি। ধীরে ধীরে তালা খুলে গেলো ঘরের। ভেরাও হেসে উঠে দাঁড়ালো। চলুন।

আগন্তুক বাধা দিয়ে একখানা কাগজ প'ড়ে গেলো।

মহামান্য সম্রাট অসীম অনুকম্পার বশবর্তী হয়ে তোমার মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করেছেন।

ভেরার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে এলো।

অনুকম্পা! তোমার এ অনুকম্পার চাইতে মৃত্যুও যে ভালো জার! এ তিলে তিলে মরণের চেয়ে ফাঁসির দড়ি অনেক, অনেক বেশী লোভনীয়।

ভেরার মনে হল, সে নববধূর বেশে অভিসারে চলেছিল মরণ-বঁধুর সংগে। জার তার অভিসার ব্যর্থ করেছে। কবে কোন্ পথ দিয়ে, কোথায় আবার সে বঁধুর সংগে দেখা হবে, কে জানে!

'সেণ্ট পিটার এণ্ড পল' জেলখানা।

একটি সেলের কাছে ভেরাকে নিয়ে আসা হল। গার্ড দোর খুলে দিল। ভেরা ঢুকতে গেলো।

হ্যাঁ, শোনো একটা কথা, এখানে গান গাওয়া নিষেধ।

ভেরা অবাক হল। বেশ একটু কৌতুকও বোধ করলো। বলে কি? এই কি গান গাওয়ার স্থান, না সময়? কতো স্বদেশপ্রেমিক বন্দীর অশ্রুজলসিক্ত পবিত্র স্থান এ। এখানে গান গাওয়ার কথা মনেই তো আসে না।

তবে, ওর সতর্ক করে দেওয়ার মানে? লোকটা বোধহয় গানের ওপর ক্ষ্যাপা।

১২ই অক্টোবর। ভেরা তখনও বিছানায়। একজন এসে একটা চামড়ার কোট আর একজোড়া বুট বিছানার উপর ফেলে দিয়ে বললে, ওঠো, চটপট পোষাক পরে চলো।

কি হয়েছে? ব্যাপার কি? কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

জবাব নেই।

অগত্যা পোষাক প'রে ভেরা চললো সেই গার্ডের সংগে।

তার জন্য বুঝি ফাঁসিকাঠেরই ব্যবস্থা হয়েছে আবার!

কিছুদূরে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো। জনৈক রক্ষী বললে, হাত দেখি।

ভেরা হাত বাড়িয়ে দিল, কিছু বুঝতে পারলো না, কী এদের উদ্দেশ্য? এরা কি ডাক্তার? নাড়ী দেখছে?

তারপর যা দেখলো তাতে তার দেহের রক্ত চন্‌চন্ করে উঠলো। একটা লোহার শিকল। মানুষ সে, তাকে বাঁধবে ঐ লোহার শিকল দিয়ে! এতো বড় স্পর্দ্ধা! এরা মনে করেছে কি? শিকল দিয়ে তার হাত বাঁধতে পেরেছে ব'লে কি তার মনকেও বাঁধতে পারবে?

না, না, না। যেন এই কথাটাই বোঝাবার জন্য সক্রোধে মাটিতে পদাঘাত করে রক্ষীকে বললে, মাকে বলো—যত অত্যাচারই আমার ওপর হোক না কেন, আমার মত কখনো বদলাবে না।

বেশ, বলবো।

আর বলো, আমার জন্য কাঁদেন না যেন তিনি। দু-চারখানা বই, আর মাঝে মাঝে তাঁর সংবাদ পেলেই আমি আনন্দে থাকবো।

আচ্ছা, সবই বলবো। [ক্রমশঃ।

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পাঁচ

পরের দিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে টর্কি ছেড়ে রওয়ানা হলাম—'লু'র অভিমুখে। সেই রকমই স্থির ছিল। একটু সকাল-সকালই ব্রেকফাষ্ট খেতে গিয়েছিলাম—সে লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম—বলাই বাহুল্য।

* * * *

সকালবেলা উঠেই দেখলাম—মনটা ভারী হয়ে আছে, লাউঞ্জে কাল রাত্রের ব্যাপারটার গ্লানি মন থেকে তখনও যায়নি। বুলা! এতদিন এদেশে বাস করছি—এরকম স্পষ্টাস্পষ্টি অবজ্ঞা ও ঘৃণার ইঙ্গিত কোনও ইংরেজের কাছ থেকে কোনও দিন পাইনি। মোটের উপর সহৃদয়তাই পেয়ে এসেছি। নানারকম যুক্তির দিক দিয়ে মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম এবং যুক্তির অভাবও হল না। লোকটা ইতর, লোকটা মাতাল, প্রকৃতিস্থ ছিল না—এ সব কথা সহজেই মনে এল। অতএব ও লোকটিকে অবজ্ঞা করার শক্তি আমার থাকা উচিত। এবং কাল রাত্রে লাউঞ্জের বাকী সকলেই লোকটি বেরিয়ে গেলে ঐ কথা বলেই আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও মনটা ঠিক সহজ হচ্ছিল না—কোথায় যেন একটা কি কাঁটা ফুটেই রইল।

কাঁটাটা যে ও লোকটির ব্যবহারের দিক দিয়ে মোটেই নয়, অন্য দিক দিয়ে ফুটেছে—একথা হঠাৎ পরিষ্কার হল ঝকঝকে সূর্য্যের আলোয় গাড়ী চালাতে চালাতে, টর্কি ছাড়িয়ে মাইল তিনেক যেতে না যেতেই। মার্লিন। মার্লিন কি আমার উপর নির্ভর করে না যে ভাবে স্ত্রীর স্বামীর উপর নির্ভর করা উচিত? কাল রাত্রে লোকটি যখন মার্লিনকে স্পষ্টই অপমান করল, মার্লিন উঠে দাঁড়াল—মার্লিন ত আমাকে কিছু বললে না, আত্মরক্ষার আবেদন জানাল অন্যের অন্য ইংরাজদের কাছে। কেন? সর্ব্বদিক দিয়ে মার্লিনকে রক্ষা করার পূর্ণ সামর্থ্য কি আমার নাই এবং মার্লিনেরও কি তাই বিশ্বাস? আমার কি উচিত ছিল, মার্লিনের আবেদন জানাবার পূর্ব্বেই উঠে গিয়ে লোকটাকে সংযত করা? কেন করিনি? তাই কি মার্লিন আমার প্রতি ভরসা হারাল? কিংবা—ভাবতে মনটা খিঁচিয়ে উঠল মস্তিষ্কের বিপদে মানুষ আপনার লোকের কাছেই ছুটে যায়—মনের গভীরে রক্তের টানে ইংরেজই কি মার্লিনের বেশী আপনার? আজ যদি মার্লিনের স্বামী একটি মানুষের মতন মানুষ ইংরেজ হত, তাহলে হয়ত মার্লিনকে অন্য ইংরেজদের কাছে আত্মরক্ষার আবেদন জানাতে হত না—এই কথা মনে হতেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস আমার বুক ছাপিয়ে পড়ল। মার্লিন ত গাড়ীতে আমার পাশেই বসেছিল। মৃদু হেসে বলল, বাবা! দীর্ঘনিশ্বাসে উড়ে যাচ্ছিলাম যে!

হেসে বললাম, লীনা! কাল রাত্রের ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না।

মার্লিন বলল, কেন তুমি ও নিয়ে অত ভাবছ? একে লোকটাকে মানুষ বলেই ধরা চলে না—তার উপর মাতাল। ওর কথার কি কোনও মূল্য আছে?

বললাম, তা ঠিক। কিন্তু তোমাকে অপমান করার পর, লোকটাকে আমার একটা ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল।

মার্লিন বলল, না—না। তুমি যে কিছু করনি, ভালই করেছ। লোকটা গুণ্ডা। হয়ত তোমাকে ভীষণ প্রহার দিয়ে বসত এবং তোমাদের দু'জনার দ্বন্দ্বে কোনও ইংরেজই বোধ হয় এগিয়ে আসত না।

শুধালাম, ওঃ, তাই বুঝি তুমি ইংরেজদের কাছে আবেদন জানালে?

হেসে আমার বাঁ বাহুতে মাথাটি রেখে বলল, হ্যাঁ, পরখ করে নিলাম—কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যায় কি না।

মনটা অবশ্য শান্ত হল, কিন্তু আমার মনের কাঁটাটি একেবারে উঠে গেল কি?

* * * *

লু!—কর্ণওয়ালের সমুদ্রতীরে ছোট্ট সহরটি—সেই লু! যেখানে আমার ছাত্রজীবনে পনেরোটা দিন কী আনন্দেই না কাটিয়েছিলাম। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর সেই হেডল্যাণ্ড হোটেলেই গিয়ে উঠলাম। বুলা! দোতালায় সমুদ্রের দিকেই ঘর পেলাম। সেই ম্যানেজার—মাথার চুলটা অবশ্য অনেকটা পেকে গেছে—আমাকে

দেখেই চিনতে পেরে এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। মার্লিনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম।

আমাকে বলল, আপনি চিঠিতে সেই ঘরখানিই চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার যে আপনারা তুজন, তাই পাশের তুজনার উপযুক্ত একটা বড় ঘর রেখেছি।

লু'তে প্রায় একটা মাস কী অনাবিল শান্তিতেই না কাটল! সেই সেবারকার মতন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে তুজনে বেরিয়ে যেতাম, সমুদ্রের ধার দিয়ে পাহাড়ের উপরের রাস্তাটি ধরে লোকালয় ছাড়িয়ে দূরে—বসতাম গিয়ে নির্জ্জন বনভূমিতে। পাহাড়ের পায়ের তলায় অনেক নীচে বিশাল সমুদ্র এসে বারে বারে জানিয়ে যেত প্রণাম—মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম। বিকেলেও বেড়াতাম—মনে হত, আকাশ বাতাস ভুবন আলোও যেন আমাদের তুজনকে বিশেষ করে ভাল বেসেছিল সেই সময়টা কর্ণওয়ালের সমুদ্রতীরে।

লু'তে যাওয়ার প্রায় পনের দিন পরে একদিন সকালবেলা মিঃ লালকাকার চিঠি এল—তিনি গ্রেসকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন সেল-এ। চিঠিখানি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিনন্দনে ভরা। মার্লিনও চিঠিখানি পড়ে খুবই খুসী হয়ে উঠল।

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে তুজনে গিয়ে বসলাম—সহর ছাড়িয়ে নির্জ্জন বনভূমিতে—সামনেই সমুদ্র। দিনটা উজ্জ্বল ছিল না—মেঘলা। এবং একটি হাওয়াও ছিল—সেটা অবশ্য এদেশের প্রায় বারোমাসের নিত্যকারের ব্যাপার। তবে হাওয়াটি উত্তর-পূর্ব্ব কোণের নয়—যে হাওয়াটি শীতকালের দিকেই বেশী বয়—এবং যা বাইরে বসে সহ্য করা অসম্ভব। হাওয়াটি ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের, সেটা মোটের উপর তত খারাপ লাগে না—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। মার্লিন বসেছিল আমার গা ঘেঁষে আমার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে—যেভাবে বসতে সে চিরদিনই ভালবাসত এবং আজও বাসে। আমি একটি হাত দিয়ে মার্লিনকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম।

মার্লিন বলল, যাক। গ্রেসের দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

বললাম, হ্যাঁ। আপাততঃ।

শুধাল, কেন?

বললাম, তুমি যাই বল, গ্রেসের যে লালকাকার প্রতি একটি সুগভীর ভালবাসা আছে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। প্রাণের উত্তাপ হয়ত তার খুব বেশী কিন্তু তাই বলে লালকাকাকে নিয়েই যে সে উত্তাপ—তা না-ও হতে পারে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমার কথা যদি মেনেও নি, আর সে ভুল করবে না। একবার মুখ পুড়িয়ে বুঝেছে পোড়ার কি জ্বালা।

বললাম, তা কি বলা যায়? এবার যাকে নিয়ে মুখ পোড়াল সে ওর আসল মানুষই নয় তাই সহজেই জ্বালা টের পেল। ওর সত্যিকারের মানুষটি যদি কখনও আসে ওর জীবনে, প্রাণের প্রবল উত্তাপে আবার হয়ত বেহুঁস হবে।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, না। বয়স ত ক্রমেই বাড়বে বৈ কমবে না। মনের উত্তাপ কমেই আসবে, বেহুঁস আর হবে না। তার উপর ববও বড় হয়ে উঠছে।

গ্রেসের কথা ছেড়ে দিয়ে শুধালাম, আচ্ছা লীনা! তুমি যদি কোনদিন দেখ আমি তোমার প্রতি দারুণ উদাসীন—

কথা থামিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ হেসে বলল, সেই মুহূর্তে এই পাহাড়ের উপর থেকে ঐ নীচে সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।

বললাম, কেন? এত করে গ্রেসকে বোঝালে—ভারতীয়দের মন অন্তর্মুখী, অনুভূতির প্রকাশ অনেক কম ইত্যাদি?

শুধাল, তাই কি?

শুধালাম, তবে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে কেন? আমার অন্তরে ডুব দিয়ে একবার দেখবে না?

বলল, তা ত দেখবই, তবে সেখানে যদি মণির সন্ধান না পাই—সমুদ্রে ডুব দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

হেসে বললাম কেন? গ্রেসের মতন—

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, না—না। তা আমি পারব না। তাহলে শুধু ত আমার মুখ নয়, তোমার মুখও যে পুড়বে—তা আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

কথাগুলি বলে আরও যেন আমার বুকের মধ্যে এল সরে।

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম, আচ্ছা লীনা! তোমার কথাটা কি ঠিক?

শুধাল, কোন কথা?

বললাম, ঐ যে গ্রেসকে বলেছিলে—ভারতীয়দের মন অন্তর্মুখী ইত্যাদি।

বলল, কেন? তুমি নিজে জাননা?

বললাম, ঠিক বুঝতে পারি না।

বলল, সোজা কথাটাই ধরনা—তুমি আমাকে লীনা বলে ডাক। ক'বার ডার্লিং বা ডিয়ারেষ্ট বল? অথচ এ দেশে স্বামি-স্ত্রীর পরস্পর ঝগড়া এমন কি মারামারির মধ্যেও সম্বোধনে—ডার্লিং। বলে নিজের মনেই হেসে উঠল।

* * * *

এবারেও একদিন পলপেরো বেড়াতে গেলাম। বুলা! মনে আছে ত সেই পাহাড়ঘেরা ছোট্ট জেলেদের গ্রামখানি? বাইরের জগতের সঙ্গে যেন তার কোনও সম্পর্ক নাই। সেবার নামটা লিখতে একটু ভুল করেছিলাম—নামটা পরপেলো নয় পল্‌পেরো।

সেবারের মতন এবারেও সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে লু থেকে মোটরবোটে পলপেরো রওয়ানা হলাম। জানই ত লুর মাঝখান দিয়ে একটি ছোট্ট নদী বয়ে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। নদীর যে পারে আমাদের হোটেল সেই পারেই পাহাড়—সমুদ্রের ধার দিয়ে পাহাড়ের উপরের রাস্তাটা এবং তার ধারে ধারে পাঁচ সাতখানা বড় বড় বাড়ী, বেশীর ভাগই হোটেল, হেডল্যাণ্ড হোটেল তারই অন্যতম। এই রাস্তাটি ঘুরে গিয়ে নদীর উপরের একটি সাঁকো পেরিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। ওপারে সরু সরু সব বাঁধান রাস্তার ধারে ধারে সব ছোট ছোট দোকান এবং নদীর ধারে ধারে সব জেলেদের কুটীর। সমুদ্রের ধারটা বেশ চওড়া করে বাঁধান—সারি সারি বসবার বাঁধান বেঞ্চ রয়েছে—বসে সমুদ্রের শোভা উপভোগ করার জন্য এবং এই পারেই লোকের ভিড়। বাঁধান জায়গাটির নিচেই নদী এবং সমুদ্রের সংযোগ স্থলে বাঁধান ঘাট এবং এইখান থেকেই মোটরবোটে উঠতে হয়—আমরাও তাই উঠলাম।

যতদূর মনে পড়ে, বোটে লু থেকে পলপেরো যেতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে—সমুদ্রের উপর দিয়ে হেলতে দুলতে বোটখানি যায় [illegible]

না বেঁধে বেঁধে। এবারে বোট চলার নিয়মে একটু পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখলাম—একবারই যায়, সকাল ১০টায় ছাড়ে, এবং বিকেল ৩টায় পলপেরো ছেড়ে ৫॥টা আন্দাজ লু'তে ফিরে আসে। অন্য অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ১০টায় আমি ও মার্লিন বোটে উঠলাম—তবে এবার যাত্রীর ভীড় মোটেই বেশী ছিল না।

পলপেরো গিয়ে পৌঁছলাম। দুটি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের জল ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে, সৃষ্টি করেছে পাহাড়-ঘেরা ছোট্ট একটি জলাশয় এবং তারই ধারে ধারে পাহাড়ের মধ্যে ঘুমন্ত ছোট্ট পলপেরো গ্রামখানি। জলাশয়ের পাড় দিয়ে সরু একটি বাঁধান রাস্তা এবং তারই ধারে ধারে জেলেদের সব ছোট ছোট কুটীর, আর কিছু নাই। জলাশয়ের চারিদিকে জেলেদের সব জাল শুকোচ্ছে।

জলাশয় থেকে কিনারায় উঠে মার্লিন একবার গ্রামখানির দিকে চেয়ে দেখল। আমার দিকে চেয়ে বলল, বিকো! সেবার যা দেখেছিলাম—এবারেও তাই, একটুও ত এগোয়নি।

বললাম, এগোবে কি করে। এ কি জগতের সঙ্গে পা ফেলে চলে? এ যে নিজেরই দৈন্যে সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোন রকমে বাঁচে।

বলল, বরং যেন আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে—সেবারে ত একটা-আধটা জলখাবারের দোকান দেখেছিলাম। এবারে ত কিছুই দেখছি না।

বললাম, ভাগ্যে হোটেল থেকে কিছু লাঞ্চ সঙ্গে এনেছিলে—নইলে এখানে ত কিছুই পাওয়া যেত না।

আমরা আসার সময়ে হোটেল থেকে কাগজের বাক্সে মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী কিছু খাবার সঙ্গে এনেছিলাম। মার্লিন চারিদিকে চেয়ে চেয়ে বলল, তা যেন হল, কিন্তু তোমার ত চা নইলে চলে না—চা পাবে কোথায়?

বললাম, চল, খুঁজলে ভিতরে একটা কিছু পেয়েই যাব।

বলল, এর ত ভিতর-বার কিছুই নাই। সব গ্রামখানিই ত একনজরে দেখতে পাচ্ছি।

বললাম, কোন জেলেদের বাড়ী গিয়ে বলব—আমাদের চা খাওয়াও।

মার্লিন যেন নিজের মনেই বলল, হোটেল থেকে ফ্লাস্কে কিছু চা সঙ্গে নিয়ে এলেই হত। কিন্তু একটাও যে চায়ের দোকান পাওয়া যাবে না—সেটা ত বুঝিনি। সেবারে ত ছিল।

• • • •

যাই হোক, গ্রামখানি ঘুরে আমরা গ্রাম ছাড়িয়ে একপাশ দিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠলাম, বসলাম গিয়ে একটি নিরিবিলি এলম্ গাছের তলায়—সেখান থেকে বাইরের খোলা সমুদ্র স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রামের মধ্য দিয়ে বেড়াবার সময় একদল ছোট ছোট জেলেদের ছেলে-মেয়ে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল, যতক্ষণ গ্রামের মধ্যে ছিলাম চলেছিল পিছু পিছু—অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, সেটুকু লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় এর পূর্ব্বে তারা কালো লোক দেখেনি। চলতে চলতে মার্লিন হেসে মাঝে মাঝে তাদের দু'-এক জনার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের কাছ থেকে হ্যাঁ-না ছাড়া বিশেষ কোনও সাড়া পায়নি।

গাছতলায় বসে মার্লিন শুধাল, সেবারেও এইখানটিতে বসেছিলাম—না?

বললাম, তা ত ঠিক মনে নাই, তবে এই দিকটাতে বটে।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল দেখ, সৃষ্টির সবই রহস্য। কিন্তু মানুষের জীবনের রহস্য কোনও রহস্যের চেয়েই কম নয়।

শুধালাম, তার মানে?

বলল, মানুষের জীবনের গতির মধ্যে একটা নিবিড় রহস্য আছে। তার ধারা কোনদিক দিয়ে কি ভাবে যায় আগে থেকে কেউ জানেনা, ধারণাও করতে পারেনা।

শুধালাম, হঠাৎ একথা তোমার মনে হল?

বলল, সেবারেও ত তোমাকে নিয়ে এইখানে এসে বসেছিলাম। তখন তুমি ছিলে আমার পর। অন্তরে তোমাকে যত আপনারই করিনা কেন, বাইরের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আড়াল ছিল, তাকে ভাঙবার কোনও উপায় ছিল না সেদিন। সেদিন কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম যে তুমি একদিন অন্তরে বাইরে একান্ত আমারই হয়ে আমার পাশটিতে এইখানে এসে বসবে?

আমার হাতখানি তুলে নিল হাতে। হেসে বললাম, লীনা! তোমার ভাবুক মন সেদিনও পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল আমাকে একান্ত আপনার করবার।

শুধাল, কি রকম?

বললাম, মনে নাই, সেদিন কি বলেছিলে? বলেছিলে—জগৎটার দিকে একেবারে পিছন ফিরে তোমাকে নিয়ে এই পলপেরো গ্রামে এসে আমি কেন জেলে হইনা।

মার্লিন খিলখিল করে হেসে উঠল।

• • • •

ক্রমে বেলা দুটো বাজল। লাঞ্চ খাওয়া আমাদের শেষ হয়ে গেছে। মার্লিন সেই গাছতলায় আমার পাশটিতে শুয়ে পড়েছে—আমি পা ছড়িয়ে আছি বসে, ধরে আছি মার্লিনের একখানি হাত। মাঝে মাঝে মার্লিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখছি, মার্লিন কি ঘুমিয়ে পড়ল? নিশ্চিন্ত অবশ মুখখানা, চোখ দুটি বোজা।

চারিদিকে চুপচাপ নিস্তব্ধ—আমাদের ডাইনে কিছুদূরে পাহাড়ের তলায় পলপেরো গ্রামের ছোট ছোট কুটীরগুলির চাল দেখা যাচ্ছে, ঘিরে আছে সেই নীল জলাশয়টিকে, আমার সম্মুখে পায়ের তলায় সুদূর-বিস্তারিত নীল সমুদ্র।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, গ্রামের দিক থেকে একটি লোক উঠে আসছে পাহাড়ের উপরে। আমরা যেখানে ছিলাম তার সামান্য কিছু নীচু দিয়েই একটি পায়েচলা পথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ের উপরের দিকে উঠে গিয়েছে—লোকটি সেই পথেই আসছিল। ক্রমে লোকটি এল আমরা যেখানে ছিলাম, তার কাছাকাছি।

লোকটি আমাদের দিকে ফিরে তাকাল—মনে হল, হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল মার্লিনের মুখের দিকে। মার্লিন তখনও সেইভাবেই চোখ বুজে ছিল শুয়ে।

লোকটিকে দেখে পলপেরো গ্রামের জেলে বলেই মনে হল। বয়স বেশী নয়—চল্লিশ হবে। মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম—সুপুরুষ, সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই, তবে মুখে পাতলা পাতলা রুক্ষ দাড়ী ও গোঁফে মুখের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যটুকু যেন ঢেকে দিয়েছে। মাথার উপর লাগান একটি গোল কাল টুপী। পরিধানের পোষাক এদেশের গরীবদের পোষাকেরই মত। একটু ধূসর রংয়ের মরলা

ছিন্ন ট্রাউজার পরিধানে—তার কোনও ইস্ত্রীর বাহার নাই, পায়জামা বলা যেতে পারে। গায়ে একটি জীর্ণ কাল কোট—গলায় একটি সুতির গলাবন্ধ জড়ান। নাতিদীর্ঘ একহারা গড়নেও শরীরের স্বাভাবিক ছন্দ ও স্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকটি খানিকক্ষণ মার্লিনের মুখের দিকে একদৃষ্টে রইল চেয়ে।

আমিও লোকটির দিকে চেয়ে আছি, ভাবছি—মার্লিনের স্বাভাবিক রূপের মাধুর্য্য লোকটিকে আকৃষ্ট করেছে। থাকে ত পলপেরো গ্রামে—এত রূপ বোধ হয় দেখেনি কখনও! ক্রমে লোকটি চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইল। তারপর ঈষৎ হেসে এগিয়ে এল আমাদের কাছে। মাথার টুপীতে হাত দিয়ে শুধাল, আপনারা বুঝি পলপেরো বেড়াতে এসেছেন?

এদেশের জেলেদের কথা বলার ধরণ ত শুনেছি—লোকটির শুদ্ধ কথা বলার উচ্চারণে একটু অবাক হলাম।

বললাম, হ্যাঁ। লু থেকে এসেছি। এই চারটের বোটেই ফিরে যাব।

হঠাৎ মার্লিন ধড়মড়িয়ে উঠে বসল—একদৃষ্টে চেয়ে রইল লোকটির মুখের দিকে।

লোকটি একটু চুপ করে থেকে আবার শুধাল, মাপ করবেন—আপনারা কি স্বামি-স্ত্রী?

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি আর কোনও কথা না বলে চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। কিন্তু এবার আমার বা মার্লিন কারও প্রতিই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়। নিজের মনে যেন তন্ময় হয়ে কি ভাবছে।

আমিই কথা কইলাম। শুধালাম, আপনাদের গ্রামে কি চা খাওয়ার কোনও জায়গা আছে?

লোকটি চাইল আমার দিকে। বলল, চা খাবেন? মিনিট দশেক অপেক্ষা করুন। আমি এখনই ঘুরে আসছি। তারপর যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে—আমার বাড়ীতে আপনাদের নিয়ে যাব।

বললাম, বেশ ত। আমাদের আর আপত্তি কি? এই বলে পাহাড়ের উপর দিয়ে চলতে লাগল।

মার্লিন স্তম্ভিতের মতন বসে আছে। মুখে কোনও কথা নাই। বললাম, দেখলে ত, চা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। মার্লিন কোনও কথা বলল না।

* * * *

লোকটি সত্যই মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল—কাঁধে এক বোঝা শুকনো কাঠ, একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। আমাদের কাছে এসে বলল, চলুন।

আমি ও মার্লিন উঠলাম। চললাম লোকটির সাথে সাথে গ্রামের দিকে। সত্যই চা খাওয়ার জন্য তখন আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছে। মুখে বললাম, আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন—আমরা অযথা আপনার অসুবিধার কারণ হলাম। লোকটি শুধু বলল, এটা আমার গভীর আনন্দ।

ক্রমে আমরা গ্রামে এসে পড়লাম। যে রাস্তাটি জলাশয় ঘিরে রয়েছে লোকটির বাড়ী সে রাস্তার উপর নয়। তারই এক বাঁকে আর একটি সরু গলি যে পাহাড়ের ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে, এর পূর্ব্বে লক্ষ্য করিনি। লোকটি সেই গলির মধ্যে আমাদের নিয়ে ঢুকল। নেহাত সরু বাঁধান গলি—কোনও রকমে দুজন পাশাপাশি যেতে পারে। সেই গলি দিয়ে কিছু দূরে একটি জীর্ণ কুটীরের সামনে লোকটি দাঁড়াল। সদর দরজায় কড়া নেড়ে ডাকল, হেটী, হেটী।

একটি বছর কুড়ি-বাইশের মেয়ে এসে দরজা খুলে দিল। মেয়েটির দিকে চেয়ে ভালই লাগল—গোলগাল গড়ন, মুখখানির মধ্যে হাসিখুশীর ভাবে মাধুর্য্য পাওয়া যায়। পরিধানে পোষাকের দৈন্য সহজেই চোখে পড়ে। দরজা খুলে মেয়েটি অবাক হয়ে আমাদের দিকে রইল চেয়ে। আমার দিকে চেয়ে লোকটি বলল, আমার স্ত্রী।

আমি নতমস্তকে অভিবাদন জানালাম। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, শীঘ্র চায়ের ব্যবস্থা কর। মা কোথায়?

মেয়েটি বলল, মা ঘুমুচ্ছেন।

মেয়েটির কথার মধ্যে এদেশী জেলেদের কথার টান সুস্পষ্ট। এবং অবাক হয়েছিলাম কিনা মনে নাই, যখন শুনলাম মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে লোকটির কথার মধ্যেও সেই টান সুস্পষ্ট ফুটে উঠল।

লোকটি আমাদের দিকে চেয়ে বলল, আসুন ভিতরে।

ভিতরে গেলাম। একটি ছোট ঘর—খানকয়েক মোটা মোটা কাঠের চেয়ার রয়েছে, মাঝখানে একটি গোল টেবিল। বুঝলাম—এইটেই বোধ হয় এদের বসবার এবং খাবার ঘর, পিছনে বোধ হয় শোবার ঘর আছে। ঘরখানির চারিদিকে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর ছাপ সুস্পষ্ট। বসে শুধালাম, এ বাড়ীতে আপনারা কে কে থাকেন?

বলল, আমি, আমার স্ত্রী ও আমার মা। তবে আমার মা'র যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং তিনি অন্ধ—বেশীর ভাগ বিছানায় শুয়েই থাকেন।

শুধালাম, আপনার পরিচয়টা ত পেলাম না?

বলল, আমার নাম বুলার—জন্ বুলার।

আমি বললাম, আমরা চৌধুরী। আমি ডাক্তার।

শুধাল, কোথায় ডাক্তারী করেন?

বললাম, সেল-এ—ম্যাঞ্চেষ্টারের কাছে। কিছুদিন ছুটি নিয়ে লুতে বেড়াতে এসেছিলাম।

লোকটিকে ক্রমেই আমার ভাল লাগতে লাগল। কথাবার্ত্তা লোকটি খুব বেশী বলে না কিন্তু ব্যবহারে ভদ্রতার ত্রুটি নাই। মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম—কালো দুটি চোখ, অসাধারণ গভীর।

শুধালাম, আপনিও কি মাছ ধরেন?

মৃদু হেসে বলল, ধরি বৈ কি—আমার একটা নৌকা ও দুখানা জাল আছে।

হঠাৎ ভিতর থেকে ছোট শিশুর কান্না শোনা গেল। এবং একটু পরেই সেই মেয়েটি একটি শিশুকে কোলে করে ঘরে ঢুকে পুরুষটির কোলে দিয়ে বলল—ও উঠে পড়েছে, তুমি ওকে সামলাও, আমি ততক্ষণ চা করছি।

এতক্ষণ মার্লিন যেন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে চুপচাপ বসেছিল—কোনও কথা বলেনি, হঠাৎ যেন জেগে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পুরুষটির কাছে গিয়ে পুরুষটির মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে শিশুটিকে তার কাছ থেকে নিজের কোলে নিল তুলে।

শিশুটিকে একটু আদর করে পুরুষটিকে শুধাল, তোমার মেয়ে ?

পুরুষটি মাথা দুলিয়ে জানিয়ে দিল, হাঁ।

মার্লিন শুধাল, বয়স কত ?

পুরুষটি বলল, এই মাস ছয়েক হবে।

মার্লিন শিশুটিকে নিজের বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। শিশুটিও স্থির ধীর ভাবে মার্লিনের বুকের মধ্যে রইল শুয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটি ট্রেতে চা এবং কেক নিয়ে এল ঘরে—টেবিলের উপর রাখলো সাজিয়ে। দুটি চায়ের পেয়ালা এবং দুটি কলাইকরা ছোট মগ। একটি এ্যালুমনিয়ামের কেটলীতে তৈরী করা চা।

তারপর মার্লিনের কাছ থেকে শিশুটিকে নিজের কোলে নিল তুলে। হেসে শুধাল, এতক্ষণ জ্বালাতন করেছে ত ?

মার্লিন সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে মেয়েটির হাত ধরে তাকে বসাল নিজের কাছে। শুধাল, তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ?

বলল, এই গ্রামেই। আমার বাবা ভাইরা মা সবই আছে। তাদের মস্ত বড় মাছের ব্যবসা। জলের ধারেই তাদের বাড়ী।

দেখলাম—মেয়েটি কথা বলার সুবিধা পেলে কথা কইতে ভালবাসে।

মার্লিন শুধাল, কতদিন তোমার বিয়ে হয়েছে ?

বলল, এই বছর দুই হবে।

মার্লিন শুধাল, তাহলে ছেলেবেলা থেকেই তুমি তোমার স্বামীকে চিনতে ?

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বলল না—না। জনরা ত এ গ্রামের আদিবাসী নয়। এই বছর দশেক হল, মা ও ছেলে এসে এ গ্রামে বসবাস সুরু করল। আমার ত তখন মাত্র ১৪ বছর বয়স।

পুরুষটি ইতিমধ্যে চা ঢেলে আমাদের দিয়েছিল—চা খাওয়ার পর্বও সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। দুটি পেয়ালাতে আমাকে ও মার্লিনকে চা ঢেলে দিয়ে দুটি মগে নিজেদের চা নিল ঢেলে।

হঠাৎ একটা অত্যন্ত কর্কশ ভাঙ্গা গলায় পাশের ঘর থেকে ডাক এল, হেটী! হেটী! খালি বরের সঙ্গে প্রেম করলেই হবে না, বুড়ো শাশুড়ীটাকেও দেখতে হবে।

হেটী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু পুরুষটি ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে হেটীকে বলল, তুমি গল্প কর—আমি দেখছি। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হেটী হেসে হেসেই বলতে লাগল, একে চোখে দেখতে পান না, তার উপর মাথারও ঠিক নাই। আমি জনের সঙ্গে একটু কথা বলছি দেখলেই রেগে যান। বলেন—খালি দুটোতে পরামর্শ করছে, আমাকে বিষ খাইয়ে মারবে।

মার্লিন শুধাল, তা জন্ বুঝি মায়ের খুব যত্ন করে ?

মেয়েটি বলল, ও বাবা! এত যে মা-তা বলেন কিন্তু একটি কথা বলার উপায় নাই। এ রকম মা-অন্ত প্রাণ আমি ত আর দেখিনি। আমার মাও ত বুড়ো, কই আমার ভাইরা ত তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন শুধাল, তা জনরা ত এ গ্রামের আদিবাসী নয়—কোথা থেকে এসেছিল এ গ্রামে, জান ?

মেয়েটি বলল, শুনেছিলাম—ফয়ী থেকে।

মার্লিন শুধাল, ফয়ী—সে কোথায় ?

মেয়েটি হেসে বলল, তা ত জানি না।

আমার জানা ছিল। ফয়ী কর্ণওয়ালেরই সমুদ্রের ধারে আর একটি ছোট সহর—লু থেকে বেশী দূরে নয়। ডেভন্ কর্ণওয়াল মোটরে বেড়াবার জন্য ম্যাপ দেখে দেখে এসব জায়গার সঙ্গে ম্যাপেই আমার পরিচয় ঘটেছে।

বললাম, ফয়ী কর্ণওয়ালেরই সমুদ্রের ধারের আর একটি ছোট সহর—লু থকে বডানিক ফেরীতে নদী পেরিয়ে যেতে হয়।

মার্লিন আবার চুপ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে পুরুষটি ঘরে এসে ঢুকল। বসল চেয়ারে। আমাকে শুধাল, সেলে ত আপনি ডাক্তারী করেন—ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে কতদূর ?

বললাম, কাছেই। বাসে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে তিন কোয়ার্টার আন্দাজ লাগে। ট্রেণেও যাওয়া যায়।

লোকটি চুপ করে গেল। আমিই বললাম, ১৭নং ওক্ হল লেনে আমার বাড়ী—যদি কখনও ওদিকে যান—যাবেন।

লোকটি কোনও জবাব দিল না।

হঠাৎ মার্লিন মেয়েটিকে প্রশ্ন করল, তা তোমার মেয়ের নাম কি রেখেছ ?

মেয়েটি হেসে বলল, মার্লিন। ও নামটা জনের বড্ড পছন্দ। জন্ বলে—ও রকম মিষ্টি নাম আর একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সকৌতুকে চাইলাম মার্লিনের দিকে। দেখলাম—মার্লিন মাথাটি নিচু করে চুপ করে বসে আছে, মুখে কোন ভাবেরই আভাস পেলাম না।

* * * *

ফিরে যাওয়ার সময় বোটে যখন উঠি, জন্ এল বোট পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে বলল, যদি সুবিধা হয়, আর একদিন যেন লু থেকে পলপেরো বেড়াতে আসি।

বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আর ত মাত্র পাঁচ-সাত দিন আছি লুতে—বোধ হয় সুবিধা করে উঠতে পারব না।

বোট ছাড়ল।

মার্লিনকে বললাম, খাসা লোকটি—না ?

মার্লিন শুধু বলল, হুঁ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, মার্লিন ভীষণ গম্ভীর। সেই অতলস্পর্শী কালো দুটো বিষণ্ণ চোখ মেলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে—নিজের ভাবেই তন্ময়।

কিছুক্ষণ পরে শুধালাম, লীনা! কি হল তোমার ?

বিষণ্ণ চোখের নিচে মৃদু হাসি মাখিয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, কিছু না।

শুধালাম, অত গম্ভীর ?

একটু চুপ করে থেকে বলল, একটা যেন স্বপ্ন দেখে উঠলাম বলে মনে হচ্ছে।

শুধালাম, এ কথার মানে ?

সংক্ষেপে উত্তর দিল, কি জানি—ভেবে বলব। [ক্রমশঃ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১২

১৮৫৭-র সে ইতিহাসের পাতা উলটে গেলে পরবর্তী দিনের অনুসন্ধানী মনে একটি কথাই বার বার মনে হবে। তা হলো—দুই জাতির পরস্পর সম্পর্কে সুগভীর অজ্ঞতা। সুগভীর অজ্ঞতাই যেন ইন্ধন জুগিয়েছিলো জতুগৃহের সে বহ্ন্যুৎসবে।

বৈশাখ পেরিয়ে জ্যৈষ্ঠ এসে পড়লো। উদ্বেগে অস্থির এক উত্তেজনা সওয়ার ও ফৌজের মধ্যে সংক্রামিত। কি প্যারেডের সময়ে—কি অন্য সময়ে—শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের চোখে-মুখে কি যেন খোঁজে তারা। হয় তো ব্যবহারে কোন ঔদ্ধত্য আছে কি না, তা-ই খোঁজে। দেখে, কোনভাবে তাদের ছোট করা হলো কি না। চোখের সে কথা বুঝতে পারেন না কেউ।

ক্যান্টনমেন্ট বাদেও কানপুরের সিভিল লাইন্‌স-এ এক সুবৃহৎ শ্বেতাঙ্গ বসতি। দৈনন্দিন জীবনে তারাই ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসে বেশী। হুইলারের কাছে তারাও যাওয়া-আসা সুরু করলো, প্রয়োজনে নিরাপত্তা চাই। নৌকার খোঁজখবরও চলতে লাগলো। এক হরপিয়ারা আহীরেরই ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দেড়শো নৌকা আছে। মাঘ মাসে প্রয়াগে স্নানে যায় তীর্থযাত্রীরা, নৌকা ভাড়া দিয়ে তখন আহীর বেশ কিছু রোজগার করে। দেখা গেল, এবার নৌকা ফুরণের তাগাদাটা বেশী। ভাড়া নিয়ে কোন দরদস্তুর নেই। আগাম টাকা নিয়ে নৌকা রং করতে আর ফুটোফাটা সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো আহীর। খবর পেয়ে তার ঘরে গিয়ে শাসিয়ে এলো কয়জন। তার মধ্যে সম্পূরণও ছিলো। একে গরম পড়েছে। তাতে আজকাল নেশাটা জমছে ভালো। সম্পূরণের ভাষাটা খুব ভব্যতার ধার ঘেঁসে গেল না। প্রথমেই সে গালি পেড়ে বসলো গুজব রটনাকারীদের, তাদের সঙ্গে স্ত্রীর সূত্রে নিকটতম সম্পর্কটি পাতিয়ে নিয়ে বললো—শালে লোগ কি বলে জান?

—কি বলে?

—বলে আহীর নৌকা ফুরণে দিচ্ছে ঐ তাচিরা পুরবিয়া মাঝিদের। সাহেবদের প্রয়াগ নিয়ে যাবে। আমি বলছি তা কখনো হয়? রাম রাম, আহীর তা করতে পারে কখনো? তা হ'লে ঐ সারস্যর নৌকা একসঙ্গে জ্বালিয়ে দেবে না মানুষ?

আহীরের এক পা খোঁড়া। ছোটখাটো কালো মানুষটি। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কানমাথা দিয়ে এক প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা। তার ছোট ছোট চোখ দুটো ভয়ে মিটমিট করে। বলে—সে কি কথা?

—কথা ঐ রকমই।

বলে সম্পূরণ আরো কতকগুলো গালি পাড়ে। বলে—এ শহরের মানুষগুলোকে তুমি বিশ্বাস কর? এদের ভাবগতিক কি রকম, দেখছ না?

আহীর তাড়াতাড়ি লাঠি আর ছাতি নিয়ে বেরোয়। আবগারী কুঠির বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যায়। বলতে যায়, না—নৌকা সে দিতে পারবে না।

বসন্তের পর সমারোহ ক'রে গ্রীষ্ম আসে। অসুখ বিসুখ দেখা যায় এখানে সেখানে। হনুমানজীর ধ্বজা উড়িয়ে ঘিঞ্জিবসতিতে মহামারীর আশঙ্কায় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা চলে।

মগনলালের সে গুদামবন্দী আটা এ হাতে সে হাতে বাজার ভরে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্টনমেন্টে বাজার-চৌধুরী সস্তায় ছাড়তে থাকে আটা। অন্যদিকে যখন দ্রব্যমূল্য বাড়ছে ছাড়া কমছেনা, আটার দর নেমে যায়। টাকায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সের মিলতে থাকে। আগুনে পড়ছে রুটি থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। শুধু রুটি আর ডাল যাদের খাদ্য, তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বাজার-চৌধুরীর কাছে গিয়ে তারা হল্লা লাগায়। বলে—কি খাওয়াচ্ছ আমাদের? আমরা বুঝতে পারিনা? এ আটা কোনো মানুষে খায়? আমরা কি জানোয়ার?

চৌধুরীও চ্যাচামেচি করে। বলে—আমার ক্ষেতের গমের আটা? আমার ওপর হল্লা করছ কেন?

ভারতীয় কোনো বড় অফিসার এসে সে গোলমাল সাময়িক ভাবে মেটান—আবার নতুন করে আটা খরিদ করতে যায় বাজার-চৌধুরী। তবে গুজব ওড়ে প্রথম বর্ষায় ফড়িংয়ের মতো ঝাঁক বেঁধে—পাখা মেলে। শহরে, বাজারে, ক্যান্টনমেন্টে—কোথাও আর জানতে বাকি থাকেনা যে জাতমারবার জন্যে এই কাণ্ড করছে সাহেবরা। সাহেবের ধমকে বাজার-চৌধুরী বলতে সুরু করে অবশ্য,—এ শুধুই বানিয়াদের দোষ।

কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়না। পুরবিয়া আর পশ্চিমিয়া যেসব সিপাহী জন্ম থেকে 'বুদ্ধু' গালি শুনে আসছে, তারাও চালাক হয়ে গিয়েছে। তারা দুই কান জুড়ে বিশ্রী চালাক চালাক হেসে বলে—বানিয়াদের যদি ষোলআনা দোষ হবে, তবে তুমি সে দোষ কাটাবার জন্যে দোরে দোরে ঘুরছ কেন? নির্দোষী লোক কি নিজের ঢাক নিজে বাজায়?

• • • •

লক্ষ্ণৌ থেকে আউধ ইরেগুলার-এর দুইশো চল্লিশ জন সওয়ার আর পঞ্চান্ন জন সাহেবকে রেখে ক্ষেপে যায় রেজিমেণ্ট। কেন তাদের বিশ্বাস করে না সাহেবরা? তাদের সরিয়ে দিয়ে সাহেবদের সে জায়গায় আসবার কি কারণ? নতুন আমদানী সওয়ারদের তারা টিটকারী দেয়।

ইভান্স বুঝতে পারেনা হুইলার কি চান। যদি ইংরেজদের আত্মরক্ষার এবং নিরাপত্তার জন্তই গড় দিতে হয়, তবে বেশ সুদৃঢ় করে কেন দেওয়া হবে না প্রাচীর, সে বুঝতে পারে না। হুইলার শুধু তার কাছে ভারতীয় চরিত্র বোঝান। বলেন, এমন কিছু করা চলবে না, যাতে সন্দেহ হয় ভারতীয়দের মনে।

ইভান্স বোঝাতে চেষ্টা করে বার বার। বলে—একটা ব্যারাক তুললেও বা সন্দেহ হবে, একাধিক নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করলেও তাই-ই হবে।

হুইলারও নিজেকে বোঝাতে পারেন না। তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেকে বড় বেশী জড়িয়েছেন। তিনি ভারতীয় ফৌজ, সওয়ার সহরের গণ্যমান্ত লোক, এদের কাছে বড্ড বেশী প্রিয় বলে যে গর্ব করতেন, তা সত্যি। তাঁর সে ভুল হয়নি। হ্যাঁ—হাঙ্গাম হয়েছে দমদমে, বহরমপুরে, মীরাটে। হাঙ্গামার সে খবর পেয়েও তিনি অবিশ্বাস করেননি তাঁর রেজিমেণ্টকে। তাদের নাড়ী-নক্ষত্র তিনি জানেন—তাদের উৎসবে আমোদে প্রমোদে তিনি যোগ দেন। উৎসাহ দেবার জন্তে লক্ষ্ণৌ, বেনারস, মীরাট, দিল্লী থেকে ভাল কুস্তিগীর, বা জাহুকর বা নাচ-গানের মেয়ে এলে তিনি তাদের অনেক টাকা দিয়ে রেজিমেণ্টে এনে বায়না দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়ে সিপাহীদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো কুস্তিগীর তৈরী করেছেন। রাজপুত মেজর, সুবেদার, হাবিলদারদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, সে কি প্রভু-ভৃত্যের? সে তো বন্ধুর সম্পর্ক।

কিন্তু সব যেন বদলে গেল। এত বছরের সম্পর্ক, যা হৃদয়ের আদান-প্রদানে কতদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিলো, তা যেন তাঁর হাতের মুঠো থেকে পিছলে পিছলে সরে যাচ্ছে। পচা আটার ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে, তা কি তিনি ভেবেছিলেন? হাবিলদার মেজর নেকনিহাল সিং-কে তিনি একটু ভং সনাই করলেন। বললেন—সমস্ত ব্যাপারটা এতখানি হবার আগে আমাকে জানাতে পারেননি আপনি? আমি গোড়া থেকে অনুসন্ধান করতাম?

—কি লাভ হতো? বলে নেকনিহাল চুপ করে রইলেন। হুইলারের বয়স হয়েছে। মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। দুটো চারটে কড়া কথা বলতে তিনি বাধ্য হলেন। নেকনিহাল কিছু না বলে শুধু শুনে গেলেন। হুইলার কি হাবিলদার মেজরের চোখের ভাষা বোঝেননি? যাবার সময়ে চোখ তুলে একবার চেয়ে অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন নেকনিহাল। সে চোখে লেখা ছিলো একটা দূরত্ব। একটা অবিশ্বাস—একটা আশ্চর্য ভাব—যেন হুইলারকে নতুন করে চিনছেন নেকনিহাল।

এই অবিশ্বাস ও এই দূরত্ব সকলের চোখেই দেখছেন হুইলার। আঘাত লেগেছে মনে। বিয়ে করলেন এ দেশের মেয়ে, ভালবাসলেন এ দেশের মানুষ, তবু, পঞ্চাশ বছর বাদে যেন মনে হচ্ছে তাঁর,
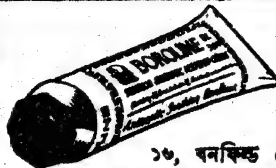
এদের মনের কাছে তিনি পৌঁছতে পারেননি। এ-ও এক ধরণের পরাজয় বই কি!

হুইলার তাই চেষ্টা করছেন এদের বিশ্বাস অর্জন করতে। এদের তিনি চটাতে চান না। নইলে সেদিন সে দুর্বিনীত সওয়ার কাওরাজের পর মুখে মুখে উদ্ধত তর্ক করেছে তার অফিসারের সঙ্গে। তাকে শাস্তি ত দেননি তিনি। তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। সে জন্ত খেতাঙ্গ অফিসাররা অসন্তুষ্ট হলো। তা হোক। কিন্তু ভারতীয়দের তিনি খুশী করতে পারলেন কি? মনে ত হচ্ছে না।

আর নিরাপত্তার জন্ত এই ব্যারাক তোলা। তিনি এটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে মিউটিনী ডেকে আনতে চাননা। ইভান্সকে তিনি বোঝান আস্তে আস্তে। বালকের সঙ্গে বৃদ্ধ যেভাবে কথা বলে। বলেন—নিরাপত্তার তেমন দরকার করবে না। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছে সাহায্য। আবার কলকাতা থেকেও আসবে দরকার হ'লে। দরকার হলে আমরা নানাধুন্ধুপন্থ-এর কাছ থেকেও সাহায্য পাব। আসলে ভয় পেয়েছে সিভিলিয়ানরা। তারা রাত্তে এসে থাকবে এখানে। সেই রকমই একটা কিছু খাড়া করো। ইটের গাঁথনী শুকিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, যে গরম পড়েছে।

এমনি করে তৈরী হয় ব্যারাক। তাতে খড়ের ছাউনী পড়ে। বিকালে চলে আসে সেখানে শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা।

কিন্তু হুইলার পারেন না পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে। মিউটিনীর কথা মাথায় নিয়ে গরম হয়েছিলো তাঁর অফিসাররা। মত্ত অবস্থায় একদিন অধিক উৎসাহী একজন বন্দুক চালিয়ে বসেন প্রহরারত 2nd. Cavalry-র সওয়ারদের উপর।

ক্ষেপে যায় সওয়াররা। শাস্তি দেওয়া উচিত সাহেবকে, এই নিয়ে কথা হয়।

কোন শাস্তি হয় না সে অফিসারের। মাঝরাতে মাথায় কয় বালতি জল ঢালতেই নেশার সঙ্গে সঙ্গে মিউটিনীর ভূতটাও নেমে যায় মাথা থেকে। নেহাৎই ছেলেমানুষ অফিসার। ধমক দিয়েই কাজ সারেন তাঁর অফিসার।

এবার গাঁজা আর ভাঙ খেয়ে রক্তচক্ষু সিপাহীসওয়ার চেঁচিয়ে যা বলে, তাও কানে আসে যথাসময়ে। তারা বলে—আমরা যদি এ কাজ করতাম, তাহ'লে ফাঁসীতে লটকে যেতাম। না হয় জানে মরেনি, তবু হাতখানা তো ভেঙে গেল? পাঁজরায় জখম হয়ে পড়ে তো রইলো বিক্রম সিং! তাদের সে জখমের দাম কে দেয়?

বিক্রম সিংয়ের পাঁজরার চেয়েও ঘোড়ার শোক লেগেছে বেশী। আহত সে ঘোড়াকে শেষ অবধি গুলী করে মারতে হলো। বড় সখের ঘোড়া। তার শোকটাই সে ভুলতে পারে না।

আর এরই ওপর লক্ষ্ণৌ-এর মিউটিনীর খবর আসে। লক্ষ্ণৌ থেকে যে অফিসাররা এসেছিলো, তাদের ফেরৎ পাঠান হুইলার।

এখন আর বুঝতে বাকি থাকে না কারু, যে জতুগৃহ রচনা সমাপ্ত হয়েছে—অগ্নিসংযোগ হলেই হয়।

মনে যে কি অস্থিরতা হয়, কি সংশয় জাগে, বলতে পারে না ইভান্স। চম্পা বলে—তুমি এ রকম বদলে যাচ্ছ কেন? ইভান্স বলে—গাদাবন্দুক, আর মরচেপড়া তলোয়ার নিয়ে এরা সাহেবদের তাড়াতে যায়? নিজেদের রাজ কায়েম করতে চায়! এরা কি পাগল'?

চম্পা বলে—সে সব শুনে তোমরা অস্থির হচ্ছ কেন? তোমরা কি এদের ভয় পাও?

—না। ভয় পাব এদের? এরা ত' ভীতু। শারীরিক যন্ত্রণাকে ভয় পায়। দুই ঘা বেত খেলে কাঁদে।

চম্পার দিকে চেয়ে সে বলে—তোমার কথা আলাদা। তুমি ত' ওদের মত নও!

—আমি কি?

—তুমি, তুমি-ই চম্পা।

কিছুক্ষণ অস্থির হয়ে আদর করে চম্পাকে ইভান্স। ভাবে, এতে বুঝি বা শান্তি পাবে। কিন্তু কি যে আছে চম্পার মধ্যে, চম্পা শান্ত করতে পারে না ইভান্সকে। আরো যেন অশান্ত হয়ে ওঠে ইভান্স। বলে—যে রকম দিনকাল, হঠাৎ যদি চলে যাই কোথাও, তোমাকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগবে চম্পা!

প্রেমের স্বীকারোক্তি শুনলেই হাসি পায় চম্পার। বলে—বেশ তো, যখন ফিরবে, খবর পাঠিও—আমি সেজেগুজে তোমার জন্তে দাঁড়িয়ে থাকব রাস্তায়।

—শুধু উপহাস!

—বাজনা বাজাব সাহেব, গান গাইব—তুমি যে পথ দিয়ে আসবে, ফুল দিয়ে ঢেকে দেব।

—তোমরা ফুল ভালবাস না। ফুল দিয়ে শুধু পূজা করতে জান। আর কিছু জাননা।

—কেন, তোমার জন্তে সাজতে জানি না?

—চম্পা, তুমি বড় হাল্কা। শুধু হাসতে পার।

চম্পার কাছে ছুটো মন-প্রাণের কথা বলে হালকা হতে চায় ব্রিজদুলারী। সে-ও সেই একই অভিযোগ করে। বলে—বড় তুমি হাস চম্পা—সব কথায় এত হাসা কি ভাল?

—কাঁদব কেন বল? আমার কি কোন দুঃখ আছে?

না। কোন দুঃখ নেই চম্পার। দুঃখ মনে নিয়ে কেউ এমন সহজ হয়ে হেসে বেড়াতে পারে? এমনি সময়ে—যখন যে কোন মুহূর্তে ক্ষেপে যাবে সিপাহীরা আর কেটে কুচিকুচি করে সাহেবদের গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। চম্পা বলে—ভয় পাবে তুমি। তোমাকেও ওরা ছাড়বেনা।

ব্রিজদুলারী হাসে। বলে—তুমি ভাব, আমি ভয় পাই? আমার মতো মানুষের জানের কি দাম আছে চম্পা? আমি মরলে কারু কিছু এসে যাবে না।

—সকলের জানেরই দাম আছে, নেই?

—সকলের কথা আমি জানি না।

—এত ভাব কেন? আমার মতো থাকতে পার না?

মাথা নাড়ে ব্রিজদুলারী। না, সে পারে না। কিছুক্ষণ বসে এমনিই চেয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টিতে। মনে হয় চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে যেন দেখছে ব্রিজদুলারী কোন অন্তরঙ্গ বেদনার ছবি। তারপরে যে কথা বলতে এসেছিলো, জিজ্ঞাসা করে ব্রিজদুলারী। বলে—চন্দন কবে আসবে চম্পা? জান?

চম্পা বলে—কেমন করে জানব? জাননা, ওদিকের কি হাল? এদিকে নৌকা যদি না পায় তো হেঁটে আসতে হবে।

—ও।

আর প্রশ্ন করে না ব্রিজদুলারী। চলে যায় ঘরে। হতভাগ্য এই মেয়েটার দিকে চেয়ে চম্পার শুধু দুঃখ হয়, করুণা হয়। মনে হয়, এমনধারা শরীরমনে রিক্ত সে কারুকে দেখেনি। সম্পূরণকে সে না বলে পারেনা—বুড়া, তোমরা ওর টাকা আর গহনার জাঁকজমটাই দেখলে আর কিছু চোখে পড়লো না তোমাদের। মেয়েটা বড় দুঃখী, তা জান ?

—তা, ছেড়ে এলেই পারে ওর সাহেবকে ?

—ছাড়ব বললেই ছাড়া যায় বুড়া ?

—যায় না ?

—না।

তুই নিজেকে দিয়ে বিচার করিস চম্পা—ওই সব মেয়েকে তুই কেমন করে বুঝবি ?

—বুড়া, তুমি সব বুঝতে পার না।

ব্রিজদুলারীকে ব্রাইট-ই ছেড়ে যায় ক'দিন বাদে। লক্ষ্ণৌএ যে কি হয়েছে, সঠিক খবরের চেয়ে গুজব আসে বেশী। তবে হুইলার এটুকু বোঝেন—লক্ষ্ণৌ বেহাত—কানপুর এখনো তাঁর হাতে আছে। দুইজন অফিসার আর পঞ্চাশজন সওয়ার পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় রাতারাতি। যতজন সাগ্রহে নাম দিতে আসে নিজেদের—সকলকে তিনি ছাড়তে চান না। এই একবার স্বার্থপর হতে চেষ্টা করেন হুইলার। ব্রাইট এবং ইভান্স সম্পর্কে তাঁর কোন আপত্তি হয় না। তারা দুজন এখানে খুব প্রয়োজনীয় কি না, সে সব কথাই মনে মনে নাড়াচাড়া করেন বার বার।

চলে যাবার প্রাক্কালে ইভান্সের এত বেশী উৎসাহ দেখা যায় যে চম্পা না বলে পারে না—

—এই তোমার ভীষণ দুঃখ ?

—দুঃখ করবার কি আছে? যাচ্ছি চল্লিশ মাইল দূরে। মিউটিনি করে সিপাহীগুলো বলছে আমরা বাগী সিপাহী—তাদের জব্দ করে আসতে আর ক'টা দিন লাগবে ?

Desperate time needs desperate action—জরুরী এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার উদ্ভব যখন হলো—হুইলার সব কিছুই করলো। কিন্তু কোথায় যেন দেরী হয়ে গেল।

এদিকে লক্ষ্ণৌ, মীরাট, দিল্লী—ওদিকে খবর এলো যমুনা পেরিয়ে দক্ষিণে ঝাঁসি থেকে। সেখানে-ও রুখে গিয়েছে ফৌজ। ইংরেজরা অবরুদ্ধ দুর্গে।

শেষ অবধি ট্রেজারী থেকে আনা হলো এক লক্ষ টাকা। ঝুড়ি ঝুড়ি রসদ এনে বোঝাই করা হলো সেই ব্যারাকে। ইভান্সের ছেলেমানুষী উৎসাহের কথাগুলি মনে করে করে সৈন্যাধ্যক্ষ কি হাত কামড়ালেন না? এই ইটের গাঁথনী অনেক মজবুত হতে পারতো—পাঁচিল হতে পারতো উঁচু। হালকা কামানগুলি আনা যেত ভেতরে। আর্মারি থেকে বন্দুক এনে সিভিলিয়ানদেরও দেওয়া যেতো।

কিছুই সম্ভব হলো না। বিঠুর থেকে পেশোয়ার যে তিনশো মারাঠা সৈন্য পাঠালেন, তারা গিয়ে যোগ দিলো বাগী সিপাহী সওয়ারদের সঙ্গে।

জমিদার শেঠ, ঠাকুরসাহেব, ছোটোখাটো রাজা নবাবদের তালাবন্ধ চোরঘর থেকে বেরুলো বাপদাদা পরদাদার আমলের তুলেরাখা অস্ত্রশস্ত্র। পলতে দিয়ে ধরাবার গাদাবন্দুক—লম্বা লম্বা ভারী তরোয়াল—বহুকাল তারা অবহেলিত ছিলো। বৃদ্ধ ঠাকুরসাহেব ও তালুকদাররা ঝুলেপড়া কপাল ও ভ্রূ তুলে ধরে পাগড়ী দিয়ে বেঁধে রওনা হলেন কল্যাণপুর নারায়ণপুরের পথ ধরে।

কানপুরের খেতাঙ্গরা সবাই ব্যারাকে।' তখনো কিছু কিছু রেজিমেণ্ট বিশ্বস্ত রইলো। কিন্তু কোণঠাসা হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গেল শাসকসম্প্রদায়। ৫-ই জুনের রাতে, ব্যারাকের বাইরে যখন রান্নার জন্ম উনোন জ্বালিয়েছে 53rd রেজিমেণ্ট—গুলী করে বসলো তারা তাদেরই ওপর।

তারপর আর কারুকেই রুখে রাখা সম্ভব হলোনা। হিন্দু সিপাহীরা হর হর মহাদেও বলে রক্তচিহ্নিত পতাকা তুললো—মারাঠা ফৌজ নিয়ে এলো তাদের ভগবাঝাণ্ডা—মুসলিম সিপাহীরা ওয়ার দীন দীন শব্দে বাদশাহী পতাকা তুলে তার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো।

চলতে লাগলো ফৌজ ও টাকা সংগ্রহ। সাহেবদের পরিত্যক্ত কুঠি লুঠ হয়ে গেল রাতারাতি। ব্রাইটের কুঠি লুঠ করেই ক্ষান্ত হলোনা সিপাহীরা—জ্বালিয়ে দিলো কুঠি। ব্রিজদুলারীকে মাথা মুড়িয়ে শহরছাড়া করবার একটা সাধু সংকল্প ছিলো তাদের—তবে ব্রিজদুলারীকে কোথাও পাওয়া গেলনা। আর টাকা মিললোনা সিন্দুকে। এখানে অনেক টাকা পাবার আশা ছিলো।

ব্রিজদুলারী মাথায় গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে চলে এলো চম্পার বাড়ী।

সম্পূরণ ঘরে ফিরতে মাঝরাত হলো। আঁধার ঘরে প্রেতমূর্তির মতো কে বসে আছে? বাতি জ্বাললো সে। দাঁড়ালো ব্রিজদুলারী।

খাটিয়ার ওপরে লাল একটা কম্বলে ঢেলে দিলো তোড়া-বাঁধা টাকা, গহনা সব। নিজেকে নিরাভরণ করে টেনে টেনে খুললো হাত, কান, গলার গহনা। এক অর্থলোভী মদমত্ত স্বর্ণসঞ্চয়ী পুরুষের অনেক পাপের সঞ্চয়। বললো—যা ছিলো, সব দিয়ে দিলাম সম্পূরণ। টাকার দরকার তোমাদের—এখানে অনেক টাকা আছে

আশ্চর্য হয়ে সম্পূরণ চেয়ে রইলো ব্রিজদুলারীর দিকে। আজকে ব্রিজদুলারী নিঃসঙ্কোচে হাসতে পারলো। আত্মকরুণার হাসি নয়। গর্বিত উজ্জ্বল হাসি। বলতে পারলো—জানটাও তুলে দিলাম। রাখতে চাও রাখবে—নষ্ট করতে চাও, নষ্ট করবে—ঐ গহনাগুলোর মতোই এই প্রাণটাও আমার কাছে ঝুটা হয়ে গিয়েছে সম্পূরণ। আমি ভয় করি না।

কিছুক্ষণ কাটলো চুপচাপ। তারপর উঠে দাঁড়ালো ব্রিজদুলারী। বললো—আমি এখন চললাম চম্পা।

—কোথায় ব্রিজদুলারী ?

—হয়তো যাব বেনারস।

—সেখানে তাদের পাবে না।

—আবার খুঁজব, এখানে সেখানে—যেখানে হোক। আর দেরী করব না চম্পা।

বেরিয়ে গেল ব্রিজদুলারী। আঁধারে গা মিলিয়ে বহুদিন পর গর্বিত মাথা উঁচু ক'রে ঐ যে মেয়েটি চলে যাচ্ছে, চম্পার মনে হলো তাকে সে এই প্রথম চিনলো—আগে কোন দিনও জানেনি।'

ঐ গহনাগুলো যেন আড়াল করে রেখেছিলো ব্রিজদুলারীকে—ব্রাইটের প্রতিভূ হয়ে।

[ক্রমশঃ।

জীবন-গীতা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীগৌতম সেন

গুরুর প্রয়োজন কেন ?

গুরুর প্রয়োজন শিক্ষার জন্যে নয়। ব্যাখ্যা রয়েছে তোমারই ভেতরে। তাকে বিকশিত করবে তুমি নিজে। কেউ অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় না—নিজেকে নিজে শিক্ষা দিতে হয়। বাইরের আচার্য্য দিতে পারে শুধু উদ্দীপনা। দিতে পারে তোমাকে জাগাবার মন্ত্র। যে জাগে, সে নিজেকে দেয়। দেওয়াই তো যজ্ঞ।

যজ্ঞ ছাড়া কর্ম নাই

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, যজ্ঞ কি ?

যজ্ঞ হলো নিজেকে দেওয়া। দেওয়া কি ? কর্মের সমুদয় ফল ভগবানে অর্পণ করা। যা কিছু দেখছো, অনুভব করছো—শুনছো যা করছো, সব তাঁরই জন্যে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজেরও ফল কামনা করবে না। কি পেলাম চিন্তা করাই তো কামনা। নিন্দা-স্তুতি তোমার নয়, সবকিছু অর্পণ করো তাঁকে। অর্পণ করো তোমার পাপপুণ্য সব কিছু। সকল কাজই তো তাঁর।

যা কিছু করো, যা কিছু ভোজন করো, যা কিছু হোম করো, যা কিছু দান করো, যা কিছু তপস্যা করো সমুদয়ই আমাতে অর্থাৎ ভগবানে অর্পণ করো। অর্পণ করো শরীর মন সবকিছু অনন্ত বলি-রূপে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে নয়, নিজের অহংকে দিবারাত্রি আহুতিরূপে প্রদান করে তুমি তোমার মহাযজ্ঞে সম্পূর্ণ করো। জগতে ধন-অন্বেষণে গিয়ে তোমাকেই একমাত্র ধনরূপে জেনেছি, তাই তোমাতে আমি আত্মসমর্পণ করলাম। জগতে একজন প্রেমাস্পদ খুঁজতে গিয়ে দেখলাম তুমিই একমাত্র প্রেমাস্পদ, তাই ওগো প্রেমের আকর, আমাকে তুমি গ্রহণ করো—আমি আমাকে অর্পণ করলাম। আমার জন্যে কিছু নয়—শুভ নয়, অশুভ নয়, কোনো বস্তুই আমার জন্যে নয়—আমি চাইও না ঐ মিথ্যাবস্তু, আমি আজ সবকিছুই সমর্পণ করলাম তোমাকে।

এই তো দেওয়া। দিতে পারলেই তো হয়ে গেলো। কর্ম বলো, জ্ঞান বলো, ভক্তি বলো—সকল তপস্যার শেষ কথা নিজেকে দেওয়া। কিন্তু দেবে কাকে ? সেই আমি। আমাকেই দেবে। ভগবানকে। আমিই প্রকৃতিরূপে সর্বত্র বিরাজ করছি। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এরাই হলো আমার প্রকৃতি। অপরা নয়, যিনি পরা—চেতনাময়ী, তিনিই তো জগত-ধারণ করে আছেন। সেই আমি বিশ্বের পরম কারণ, একমাত্র কারণ। আমিই প্রলয়কর্তা। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। রস-রূপে সলিলে আমি, সূর্য-চন্দ্রে আমিই তেজ, সর্ববেদে আমিই ওঙ্কার—আমিই আকাশে শব্দ, আমিই পুরুষের পরাক্রম। পৃথিবীতে আমিই সুগন্ধ, অগ্নিতে আমিই তেজ—সর্বভূতে জীবনরূপেও সেই আমি। আমিই তপস্বীর তপস্যা, হে পার্থ, সকল জীবের সনাতন বীজই হচ্ছি আমি।

আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ—আমিই কাম-রাগ-বর্জিত বলবানের বল, ধর্মানুগত কামও আমি। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যা কিছু ভাব দেখছো, সবই আমার থেকে উৎপন্ন। তারা আমারই অধীন, আমি তাদের অধীন নই।

এই ত্রিগুণাত্মক ভাবে মুগ্ধ-মানব আমাকে জানতে পারে না। সত্ত্ব রজঃ তম এই তিনটিই তো আচ্ছন্ন ক'রে আছে মানুষকে। ঐ তো মায়া ; আমাকে আশ্রয় করো, মায়া দূর হবে।

মায়ার কথা শুনে অর্জুন চমকে উঠলেন। কে এই মায়া ?

ভগবান বললেন, এই মায়াই জ্ঞান অপহরণ করে। যাকে পারে না সে তো জ্ঞানবান। জ্ঞানবান ব্যক্তিই আত্মার স্বরূপ। জ্ঞানবান কে ? যে জানে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সকল কালকেই আমি জানি। কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।

আমি যজ্ঞের সংকল্প, আমি যজ্ঞ। যজ্ঞের বনস্পতি আমি, মন্ত্রও আমি। আমি আহুতি, আমি অগ্নিহবন দ্রব্যও আমি।

আমি জগতের পিতা, আমি মাতা, আমি ধারণকারী—ধারণ ক'রে আছি সব-কিছু। কেউ কি তা জানে ! আমি পবিত্র ওঙ্কার। আমিই ঋক-সাম-যজুর্বেদ।

আমি গতি, আমি পোষক। আমি প্রভু, আমি আশ্রয়, হিতেচ্ছু। আবার উৎপত্তি-নাশও আমি, স্থিতিও আমি। আমি ভাণ্ডার, অব্যয়-বীজও আমি।

আমি উত্তাপ দিই, আবার বর্ষণও দিই—প্রয়োজনে সেই বৃষ্টি সংহরণও করি'আমি। আমি অমরতা, আমি মৃত্যু। আমিই সৎ, আমিই অসৎ। তাই হে অর্জুন,—

"যা কর আর যা কিছু খাও
যা ভাব আর যা কিছু দাও
সকল কাজেই আমায় স্মরি
দাও আমারে ফলের ভার !"

অর্জুনের মনকে জাগ্রত করতে যাচ্ছেন ভগবান, কিন্তু অর্জুনের মন থেকে সংশয় যায় না।

জীবন-যুদ্ধে মানবাত্মার চির-সারথি শ্রীকৃষ্ণ মানুষেরই কল্যাণে তাঁর নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করছেন। এই প্রকাশের মধ্যে একটি সুর তিনি সকল সময়েই ধরে রেখেছেন—সেটি পরম ভগবানের তত্ত্ব। তিনি মানুষের মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে বাস করছেন, কিন্তু তিনি মানুষ ও প্রকৃতি থেকে মহত্তর। আত্মার নির্ব্যক্তিক ভাবের ভিতর দিয়ে তাঁকে পেতে হয়, জানতে হয়। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মাই তাঁর সমগ্র সত্য নয়।

তবে সত্য কোথায় ?

একই ভগবান যিনি বিশ্ব-আত্মায়, মানুষে ও প্রকৃতিতে—সেই একই ভগবান রথারূঢ় অর্জুনের সারথি, সেই একই ভগবান যিনি গুরু, যিনি বন্ধু।

তিনি বলছেন, আমি তোমার অন্তরে রয়েছি—মানব-শরীরে রয়েছি। আমার জন্যেই সবকিছুর অস্তিত্ব, সকল কর্ম-চেষ্টার মধ্যেও আমি।

অর্জুনের সম্মুখে আত্মজ্ঞানের উচ্চতর আলোক এবং ভগবান ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান যতই বেশি উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে ততই তাঁর বুদ্ধির সংশয় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেবল বুদ্ধির সংশয় পরিষ্কার হলেই তো তাঁর চলবে না—তাঁকে দেখতে হবে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, যা তাঁর বহির্মুখী মানবীয় দৃষ্টিকে আলোকিত করবে—যাতে তিনি কর্ম করতে পারেন সমগ্র সত্তার সম্মতির সঙ্গে, তাঁর প্রতি অঙ্গের পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে। দেখতে হবে, তাঁর মধ্যে যে আত্মা তাঁর জীবনের অধীশ্বর, সেই আত্মাই বিশ্বের কি না—বিশ্ব-জীবনের অধীশ্বর কি না!

অহং নয়, সোঽহম্

ভগবান বললেন, তোমাকে বাঁচতে হবে—কর্মের মধ্য দিয়েই বাঁচতে হবে। বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে—সেই কর্ম, যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারো সোঽহম্। এ শক্তি অর্জন করতে হয়।

আমার যে ব্যক্তিগত আমি তাকে ব্যাপ্ত ক'রে আছে বিশ্বগত আমি। যে আমি সকলের, সেই আমি আমারও। এটা সত্য। কিন্তু এই সত্যকে আপন করাই মানুষের সাধনা। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার ব'লে সকলের মধ্যে জানা।

কিন্তু জানতে দিচ্ছে, কই? রিপু এসে এই সোঽহম্ উপলব্ধিকে ভাগ করে দিচ্ছে। এই বিচ্ছেদের ফলেই অহং মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

লোভ করো না। লোভ বিশ্বের মানুষকে ভুলিয়ে বৈষয়িক মানুষ করে দেয়। যে ভোগ মানুষের যোগ্য তা সকলকে নিয়ে—তা বিশ্বভৌমিক।

আমার ভোগ সকলের ভোগ। এই কথাটা অতিথিকে দিয়ে গৃহস্থ স্বীকার করে। তার ঐশ্বর্যের সংকোচ দূর হয়। সংকোচ দূর হয় ঘরের। ব্যক্তিগত মানবের ঘরে সর্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে আসে অতিথি। তার গৃহসীমাকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। একেই বলা হয়েছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই আতিথ্যের মধ্যেই আছে সোঽহম্ তত্ত্ব। অর্থাৎ আমি তাঁর সঙ্গে এক যিনি আমার চেয়ে বড়ো। আমি তাঁর সঙ্গে মিলে আছি, যিনি আমার এবং আমার অতিরিক্ত।

আমার মন আর বিশ্বমন একই। এই কথাই সত্য-সাধনার মূলে, আর ভাবান্তরে এই কথাই সোঽহম্।

অহং নিয়েই তো অহংকার। সে তো পশুতেও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। ভূমা আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়, ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পুজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধি-নিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনার চিন্তায় আপনার কর্মে পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না, যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়, তবেই অহংকে পেরিয়ে আত্মাতে পৌঁছোন যায়।

অহং লোপ করার অর্থ, সজ্ঞানে জড়ের মতো নিরহংকার হওয়া। আমি কর্মি না, আমি দ্রষ্টা মাত্র—প্রকৃতিই কর্তা, গুণই কর্তা। গুণের বশে সব কিছু হচ্ছে, এই জ্ঞান নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করো, অহং লোপ পাবে। এর নাম নির্লেপ—কর্ম করেও লিপ্ত না হওয়া।

বৃক্ষের মধ্যে তার পত্রে-পুষ্পে যে কৌশল ও সৌন্দর্য রয়েছে—বৃক্ষ কোনোদিনই বলে না, সে সুন্দর। বলতে পারে না ব'লে বলে না তা নয়—তার সে জ্ঞানই নেই। সে জানেও না, সে কেমন দেখতে। মানুষ জানে। তাই মানুষকে জেনেও, না-জানতে হবে—তাকে নির্লিপ্ত হতে হবে। তাকে অনুভব করতে হবে, এই দেহ, দেহের সৌন্দর্য যা কিছু তা তার দেহেরই, আত্মার নয়—প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনে তা সৃষ্টি করেছে।

পিপীলিকা যুগ-যুগান্তর থেকে একই ভাবে গৃহ-কার্য সম্পন্ন ক'রে আসছে। তার লোভও আছে, ক্রোধও আছে, কামও আছে। আবার সে যুদ্ধও করছে, বাস করবার গৃহও নির্মাণ করছে। সে গৃহ-নির্মাণে তার কি পরিকল্পনা, কি নিপুণ তার গঠন! তবু মানুষের জ্ঞান কিন্তু পিপীলিকাতে নেই। তার অহংজ্ঞানও আবছা, সত্ত্বগুণও অস্পষ্ট। শুধু রজসের তাড়নায় তার জন্ম, প্রজনন যা কিছু।

মানুষকেও ঐ নিপুণতার সঙ্গে অথচ উদাসীনভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে—নিরন্তর, অপ্রমত্ত, অবিচলিত, নিরহংকার হয়ে কাজ করতে হবে।

মানুষ যখন মানুষের মতো বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজ করতে পারবে, ভালো-মন্দ বিচার ক'রে কর্মের ফলাফল স্থির করতে পারবে, বৃক্ষের মতো বা পিপীলিকার মতো নয়, পরিপূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থেকে কর্ম করতে পারবে—অথচ প্রকৃতিকে তার কর্তা ব'লে জানবে, তখনি তার 'অহং' লোপ পাবে।

ভগবান বললেন, মানুষের আছে 'অহং', কিন্তু জড়ের নেই।

অর্জুন বললেন, এই যে জ্ঞান, মানুষের ভেতরে, না বাইরে?

জ্ঞান কোথায়?

ভগবান বললেন, জ্ঞান অন্তরে। কোনো জ্ঞানই বাইরে থেকে আসে না—জ্ঞান আছে ভেতরে, অন্তরের অন্তস্তলে। তাকে আবিষ্কার করাই হলো জানা।

চকমকির আগুনকে বাইরে থেকে জানা যায় না—ঘর্ষণ করলে জানা যায়। মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, একেও জানতে হয় বাইরের আঘাত থেকেই। এই আঘাতই হলো কর্ম। আত্মার অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকে প্রকাশ করতে, জ্ঞানের আলোককে বিচ্ছুরিত করতে যে মানসিক আঘাত সে-ও কর্ম। শারীরিক মানসিক সকল ক্রিয়াই কর্ম। এই কর্ম বলে মানুষ জগতের সকল শক্তিকে সে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে নিচ্ছে—তাকে আত্মস্থ ক'রে আবার তাকে প্রক্ষেপ করে দিচ্ছে।

অর্জুন জানতে চাইলেন, এ প্রক্ষেপ করার অর্থ কি?

তার কাজের প্রবাহকে জগতে রেখে যাবার জন্যেই সে প্রক্ষেপ করছে। একটা ঢিল ফেলো, দেখবে তরঙ্গের সৃষ্টি হলো। প্রক্ষেপ করলেই তার তরঙ্গ আছে। তুমি কথা বলছো এ-ও তো প্রক্ষেপ—তারও আছে তরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ। জগতে কোনো তরঙ্গই নষ্ট হয় না—দাগ রেখে যায়। শব্দতরঙ্গ, জলতরঙ্গ, বায়ুতরঙ্গ, সাধন-তরঙ্গ এমনি অসংখ্য পরবর্তী প্রয়োজনের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। একজন চলে যায়, তার প্রক্ষিপ্ত শক্তিতরঙ্গ পরবর্তী জীবনে কাজ করে। তাই কাজের প্রবাহ চলেছে জীবন থেকে জীবনান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

তুমি বলছো আজকের কাজ, আমি বলছি ওর পিছনে রয়েছে জন্মান্তরের ইতিহাস। আজ যে-কাজ সম্পূর্ণ হলো, সে-কাজ মুসলমানদের চিন্তার প্রকাশ, ইচ্ছার প্রকাশ। এ-ইচ্ছা, তার চরিত্র-উদ্ভূত। যার যেমন চরিত্র। কর্মানুযায়ী চরিত্র—যেমন কর্ম, ইচ্ছার প্রকাশও সেইরকম।

ভগবান বললেন, জ্ঞান যেমন আছে ভেতরে, অনন্ত শক্তিও রয়েছে তেমনি তোমার মধ্যে। শক্তি বাইরে থেকে আসে না। কে বলে শক্তি আছে থাকে? শক্তি তোমার মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে অব্যক্তভাবে। তাকে জাগরিত করো, বিকশিত করো; শক্তি পাবে।

মায়া

অর্জুন বললেন, মায়া কি?

মায়া মানুষের চারদিকে ঘিরে রয়েছে। এই মায়াকে অতিক্রম ক'রে তাকে কাজ করতে হবে। এই অতিক্রম করার মধ্যেই আছে পথ, পথ নেই মায়ার মধ্যে।

ভগবান বললেন, প্রকৃতিকে সাহায্য করতে তো মানুষ জন্মগ্রহণ করেনি। মানুষ তার প্রতিবাদী।

প্রকৃতি বলছে, বনে গিয়ে বাস করো। মানুষ তা করলো না, বানালো বাড়ি। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এ নিয়ত সংগ্রাম। এ তার জাতির ইতিহাস, জয়লাভ করার ইতিহাস। অন্তর্জগতেও সেই একই যুদ্ধ চলছে—পশুমানুষের সঙ্গে, আধ্যাত্মিক মানুষের সংগ্রাম। আলোকের সঙ্গে অন্ধকারের সংগ্রাম।

তবু লক্ষ্য সেই মৃত্যু। মৃত্যু সকলের লক্ষ্য। জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, ধর্মের লক্ষ্য। সাধুও মরে, রাজা-ভিক্ষুকও মরে। সকলেই এগিয়ে যাচ্ছে সেই মৃত্যুর দিকে। তবু নিশ্চিত মৃত্যুকে জেনেও জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে মানুষ। এ তার মমতা—জীবনের প্রতি মমতা। কেন সে জানে না, ত্যাগ করতে পারে না কেন, তাও সে জানে না। তবু মমতা। এই মায়া।

অর্জুন বললেন, মানুষ চেষ্টা তো করছে তবে পারে না কেন?

পারে না মায়ার জন্যে। মায়াই তো আচ্ছন্ন করে আছে মানুষের সকল কাজে।

এ মায়া কি?

মমতা। সন্তানের প্রতি মাতার মমতা। পুত্রের কাছে নিগৃহীত হয়েও, তাকে সে ত্যাগ করতে পারে না। এ স্নেহ নয়, এক অপরিজ্ঞেয় শক্তি তার স্নায়ুমণ্ডলীকে অধিকার করে আছে। যা তা দূর করতে পারে না—চেষ্টা করেও পারে না সে বাঁধন ছিঁড়তে। এই মায়া।

তবে সত্য কি? অর্জুন বললেন।

বৈরাগ্য এবং ত্যাগ জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু। চেষ্টা করেও তুমি দ্বিতীয় উপায় খুঁজে পাবে না। ত্যাগ করো, আনন্দ পাবে, ভোগ করো—ভোগের স্পৃহা বেড়ে যাবে। ঐ স্পৃহাই তো দুঃখের মূল। কাম্যবস্তুর উপভোগে কখনো বাসনার নিবৃত্তি হয় না—আগুনে ঘি দিলে আগুন বেড়েই চলে। সকল আনন্দ, সকল সুখই তাই মিথ্যা—মায়ার অধীন। সব কিছুই এই সংসারপাশের মধ্যে, তাকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। অনন্তকাল ধরে মানুষ ছুটেছে তারই মধ্যে দিয়ে—শেষ পায়নি।

অর্জুন বললেন, এই মায়াপাশ থেকে যখন অব্যাহতিই নেই, তখন ভোগ থেকে বঞ্চিত করাই বা কেন?

জীবন কাকে বলো? সে কি শুধু ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই আবদ্ধ? ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানে মানুষ পশু থেকে কতটুকু ভিন্ন? সেখানে পশু মানুষ একই। মানুষ ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু আত্মা তো নয়।

এই আত্মাই মহৎ আদর্শ ও পূর্ণতার দিকে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই জীবন শুধু ভোগাভিমুখী নয়, সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে সে বেরিয়েছে আদর্শ-অন্বেষণে।

অন্বেষণ করো, সত্যের অন্বেষণ করো—নিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে, এই নশ্বর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, তুমি অন্বেষণ করো। এই দেহ, যা কতকগুলি অণুর সমষ্টিমাত্র—তার মধ্যে কিছু কি সত্য আছে? মানুষের মনে এই তত্ত্ব নিয়ত জিজ্ঞাসিত হচ্ছে।

বহু নয় এক

কয়েকটা অণুর সমষ্টি যদি দেহ হয়, তবে এই দেহকে চালায় কে?

ভগবান উত্তর দিলেন, দেহকে চালায় দেহাতীত আর কিছু।

এই 'আর কিছুই' হলো আত্মা। আত্মা মন নয়, মনের ওপর সে কাজ করে। মনের মধ্য দিয়ে শরীরের ওপরও কাজ করে এই আত্মা। আত্মার নেই আকৃতি। যার আকৃতি নেই, সে সর্বব্যাপী।

অর্জুন বললেন, সর্বব্যাপী বলেই তাকে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

এই সর্বব্যাপীকে জানতে হলে, দেশ কাল নিমিত্তকে জানতে হবে। এই দেশ-কাল-নিমিত্ত তো মনের অন্তর্গত।

কাল মনের পরিবর্তনের সঙ্গে নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায়, স্বপ্নে যেমন মুহূর্তের মধ্যে কয়েক মাস অতীত হয়ে যাচ্ছে।

তবে এ কাল কি?

তোমার মনের অবস্থার ওপরেই তা নির্ভর করছে। দেশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। দেশের স্বরূপ কি কেউ জানতে পারে? তবু সে রয়েছে। কোনো পদার্থ থেকে সে পৃথক হয়ে থাকতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্য-কারণ ভাবও তাই। তুমি কি এমন দেশের কথা ভাবতে পারো, যার কোনো রং নেই, সীমা নেই—চারদিকের কোনো বস্তুর সঙ্গে যার কোনো সংস্রব নেই? পারো না। দেশের কথা ভাবতে হলেই, দুটি সীমার মধ্যস্থিত অথবা তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের কথাই ভাবতে হবে। তার মানে দেশের অস্তিত্ব অন্যবস্তুর ওপর নির্ভর করছে। কাল সম্বন্ধেও তাই। কালের ধারণা করতে হলেই একটি আগের, একটি পরের ঘটনা নিতে হবে। নিমিত্ত বা কার্যকারণ ভাবের ধারণা এই দেশ-কালের ওপরই নির্ভর করছে। তার স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই। আবার ওরা কিছুই নয়, একথাও বলা যায় না। কারণ, ওদের ভেতর দিয়েই জগতের প্রকাশ হচ্ছে।

ভগবান বললেন, এই কাল ছাড়া কার্যকারণ ভাব থাকতে পারে না। আবার ক্রমবর্তিতার ভাব ছাড়া কার্যকারণভাবও থাকে না। তাই দেশ-কাল-নিমিত্ত মনের অন্তর্গত—আত্মা মনের অতীত এবং নিরাকার, সুতরাং দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত। আত্মা যখন দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত, তখন অনন্ত। অনন্ত কখনো দুটো হয়

না। তাই আত্মা অনন্ত এবং এক। আত্মা দেহও নয়, মনও নয়—কারণ তাদের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। শরীর ও মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। নদীর জল-পরমাণু সাদা চঞ্চল, কিন্তু নদী সেই এক। দেহের প্রত্যেক পরমাণুই নিয়ত পরিবর্তনশীল হয়েও এক-শরীর। মনও তাই। ক্ষণে সুখী, ক্ষণে দুঃখী—ক্ষণে সবল আবার ক্ষণে দুর্বল। তাই মন আত্মা হতে পারে না। আত্মা অনন্ত। পরিবর্তন হয় সসীম বস্তুর। অনন্তের পরিবর্তন হয় না। তাই অনন্ত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—অপরিণামী, অচল, পূর্ণ। সুতরাং অনন্তের ভেতরেই সত্য আছে, সান্তের ভেতরে নয়। তুমি সকলের ভেতর দিয়েই কাজ করছো। তোমার চরণ আর অপরের চরণ পৃথক নয়, তোমার মুখ আর অপরের মুখ ভিন্ন নয়। তুমি সকলের মুখ দিয়েই কথা বলছো।

ভগবান বললেন, যার জীবন জগতব্যাপী সেই জীবিত। মৃত্যু-ভয় মানুষ তখনই জয় করতে পারে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে সে সকলের মধ্যেই রয়েছে। সেই 'আমি' সকল বস্তুতে। সকল দেহের মধ্যে 'আমি'—সকল জন্তুর মধ্যেও 'আমি।' 'আমি'ই এই জগত। সমুদয় জগতই আমার শরীর। একটি পরমাণুর অস্তিত্ব, আমারই অস্তিত্ব।

অর্জুন প্রার্থনা করলেন, আমাকে সেই উপলব্ধিই করাও, সেই জ্ঞানই আমাকে দাও।

এই জগতকে জানি আপন বোধ দিয়ে। যে জানে সেই আমার আত্মা। সে আপনাকেও আপনি জানে। এই স্ব-প্রকাশ আত্মা একা নয়। আমার আত্মা, তোমার আত্মা, তার আত্মা—এমন কত আত্মা। তারা যে-এক-আত্মার মধ্যে সত্য, সেই তো পরমাত্মা। ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

তিনিই ব্রহ্ম। ভগবান বললেন, তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা। সমুদ্রও দেখো, সমুদ্রের তরঙ্গও দেখো। তরঙ্গটা কি সমুদ্র থেকে পৃথক? ওটা একটা রূপ। তরঙ্গও চলে যায়, রূপও থাকে না। তরঙ্গ ছিলো ব'লেই রূপ ছিলো। ওটা মায়া। ব্রহ্ম হলো সেই সমুদ্র। তুমি, আমি, সূর্য—সকলেই সেই সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ। সমুদ্র থেকে তরঙ্গগুলোকে পৃথক করে কে? ঐ রূপ। রূপ দেশ-কাল-নিমিত্ত। সেই দেশ-কাল-নিমিত্তও আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের ওপর নির্ভর করছে। তরঙ্গও চলে যায়, তারাও অন্তর্হিত হয়।

জীবাত্মাও যখন মায়া পরিত্যাগ করে তখন আর সে তা থাকে না, সে মুক্ত হয়ে যায়।

এই দেশ-কাল-নিমিত্তই তো নিয়ত বাধা দিচ্ছে—সেই বাধা ঠেলে তোমাকে মুক্ত হতে হবে।

মানুষ এই চেষ্টাই করছে। সারা জীবন ধ'রে চেষ্টা করছে, কি ক'রে মনকে সবল করা যায়। দুঃখে গ'লে গেলে চলবে না, দুঃখকে জয় করতে হবে। নীতি কি? নিজেকে দৃঢ় করা। ক্রমশঃ সকল অবস্থাকে সইয়ে নেওয়া, তবেই তো জয় হবে।

ভগবান বললেন, মানুষের জয়যাত্রা এখানেই শেষ হয়নি—সে প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েছে। কিন্তু বাইরের বিষয়বস্তুতে কোনো পরিবর্তন এনে প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। ছোট মাছ জলের শত্রুর কাছ থেকে নিয়ত আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, শেষে আর কিছু না পেরে, ডানা বিস্তার ক'রে আকাশে উড়ে যায়। এ চেষ্টা—চেষ্টাতেই সে এই পরিবর্তনকে আনলো। কোনো পরিবর্তনই বাইরে থেকে আসে না। পরিবর্তন সর্বদাই নিজের ভেতরে হচ্ছে। জীব-জগতের ক্রমবিকাশও হচ্ছে ঠিক এই নিয়মে। নিজের পরিবর্তনের ভেতর দিয়েই প্রকৃতিকে জয় করছে মানুষ। [ক্রমশঃ।

জাতিস্মর
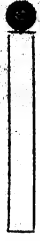
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

বাড়ী ফিরতে ওদের প্রায় দুটো বেজে গেলো। সুদাম উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলো—মিতা এসো শীগগির। দেখো কাকে ধরে এনেছি।

কোমরে কাপড় জড়ানো, খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো সুমিতা। আগুনের আঁচ লেগে মুখখানা আপেলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে। কপালে চিক্ চিক্ করছে বিন্দু বিন্দু ঘাম —ও মা! ছোট মামা তুমি? কি মজা, সকাল থেকে তোমার কথাই অনেকবার ভেবেছি, বিশ্বাস করো।

তাই নাকি? তোর হতভাগা মামাকে হঠাৎ ভাবতে গেলি কেন? তোকে আজ দেখে ভারি অবাক লাগছে রে মিতু। এমন সুগৃহিণীর বেশে আগে কখনও দেখিনি তো!

শুধু তোমাকে নয় গো, আজ সবাইকে অবাক করে দিয়েছি। সহাস্যে বললো সুমিতা। তোমাকে ভেবেছি কেন বলছি—তুমি যে খেতে বড় ভালোবাসতে ছোট মামা, দিদিমা তোমার জন্যেই রোজ নতুন খাবার তৈরী করতেন, আমি আর ছোটমামীও কতদিন করেছি ওঁর সঙ্গে। তাই আজ যখন রান্না করতে এলাম, সবার আগে তোমার জন্যেই মনটা কেমন করে উঠলো।

শুধু তোমরা দুজন কেন? দাদা কৈ? আমার স—ব রান্না শেষ হয়ে গেছে, খালি চপগুলো ভাজছিলাম।

তোমার দাদা এখুনি আসছেন—মানে জানেন তো বাজিতে হার হবেই, তাই খোকনের পেরাম্বুলেটার নিয়ে তবে বাড়ী ঢুকবেন। তোমার খোকনের জিনিষপত্তোর সব এনে দিয়েছি, এবারে মিলিয়ে নাও, আর পছন্দ হলো কি না বলো। আমি আর তোমার দাদা মার্কেট চষে ফেলে তবে জিনিষগুলোর নাগাল পেলাম। কখনও এ ব্যাপার হয়নিতো, সবে হাতেখড়ি। ছোট মামাকেও দেখলাম মার্কেটে ছুটোছুটি করছেন,—আর ছাড়ে কে? পাকড়াও করে নিয়ে তবে এলাম। হাসতে হাসতে বললো সুদাম। এবারে খেতে দাওতো, বড্ড খেটেছি তোমার খোকার জন্যে মিতা!—প্রচণ্ড ক্ষিদের আগুন জ্বলছে পেটে, দেখো যেন আবার আধপেটা খাইয়োনা, আমি কিন্তু আজ ভীষণ খাবো বলে রাখছি আগের ভাগে।

তোমার খাওয়া আমার জানা আছে গো? খাও না কত খাবে। ঘাড় বেঁকিয়ে মিষ্টি হাসির সঙ্গে জবাব দিলো সুমিতা।

আমারও ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে মিতু! আগে খেতে দে, তার পর তোর খোকাকে দেখবো। সত্যি কথাটাই মনে করে দিয়েছিস রে মিতু। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বললো অনিল, কত দিন যে মায়ের হাতের রান্না খাইনি—এখন বাবুর্চির হাতের একঘেয়ে খাবার খেতে খেতে মাঝে মাঝে আমার চোখে জল আসে রে।

তোমরা ওপরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বসো ছোট মামা, এখুনি আমি তোমাদের খাবার নিয়ে যাচ্ছি। চোখের জল চাপতে চাপতে ছুটে রান্নাঘরে চলে গেলো সুমিতা।

কোমরে কাপড় জড়িয়ে পরম উৎসাহভরে ওদের পরিবেশন করলো সুমিতা। যমুনা দেবীও মাঝে মাঝে ওর সহায়তা করছিলেন, কিন্তু অনিরুদ্ধ হৈ হৈ করে তাঁকে বাধা দিয়ে বললো—তা হবে না মাসীমা, আমি যখন বাজি হেরেছি, মিতা তেমনি একলা হাতে সব করবে।

পেরাম্বুলেটারের ভেতর ভেলভেটের বিছানা পেতে সুন্দর সাদা সিল্কের ফ্রক পরিয়ে খোকাকে শুইয়ে রেখেছেন যমুনা দেবী। সেদিকে চেয়ে চেয়ে এক অনাস্বাদিত আনন্দে মনটা কানায় কানায় ভরপুর হয়ে উঠেছিলো সুমিতার। সেই উচ্ছল আনন্দ ওকে সজীব চঞ্চল করে তুলেছে।

ওঃ, ভারি তো খাইয়ে বসেছেন দু'জন? ঠোঁট ফুলিয়ে বললো সুমিতা, ভাগ্যিস ছোট মামা এসেছিলো, তাই আমার এত পরিশ্রমের জিনিষগুলো নষ্ট হলো না, তা না হলে সবই ফেলা যেতো দেখছি।

মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে ওর দিকে চাইলো সুদাম। সুমিতার আগের রূপের সঙ্গে আজকের রূপের যেন কোনো মিল নেই। ঝিরঝিরে পাহাড়ী ঝরণা যেন আজ বিপুল জলোচ্ছ্বাসে উচ্ছলা, দুকূলপ্লাবিনী তরঙ্গময়ী মহানদীতে পরিণত হয়েছে।

তোমার প্রত্যেক রান্নাটাই চমৎকার সুস্বাদু হয়েছে মিতা, তবে এত রকম একসঙ্গে যদি না করতে, তাহলে ভালো করে খাওয়া যেতো। প্রত্যেক জিনিষ একটু করে চাখ্‌তে চাখ্‌তে যে পেটটা ফুটবলের মতো ফুলে উঠলো, তার কি করি বলো? নিরামিষ রান্না যে এত উত্তম, তা এই প্রথম জানলাম। এবারে দেখছি বাবুর্চি তাড়িয়ে খাঁটি খোট্টা বামুন রাখতে হবে আর তাকে তোমার চেলা করে দেব মিতা—তাহলেই এই সব দেবভোগ্য সুস্বাদু, সুপেয় খাবারগুলো রোজ খেতে পাবো। সহাস্যে বললো অনিরুদ্ধ।

হাতা-খুন্তির সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, তা তো জানতাম না মিতা! কৌতুকভরা গলায় বললো সুদাম—এমন চমৎকার রান্না শিখলে কবে? কোন্‌টা রেখে যে কোন্‌টা খাবো, এমন মুস্কিল বাধিয়েছো তুমি, সব রান্নাগুলো ভালো ক'রে।

কলকণ্ঠে হেসে উঠলো সুমিতা। তুমিই তো বলেছো দামীদা' আজ তোমার অবাক দিন। খালি পর পর অবাক হয়ে যাবে। এও সেই রকমই আর কি। একটু-আধটু দিদিমার সঙ্গে জোগাড় দিয়েছি বটে, তবে হাতা-খুন্তি নিয়ে কসরত করে রান্নার প্রথম হাতেখড়ি আজই আমার কাকীমার কাছে। দেখছো তো উপযুক্ত গুরু পেলে একদিনেই সিদ্ধিলাভ করা যায়?

তোমার বামুনের অবশ্য সিদ্ধিলাভে বিলম্ব হবে দাদা, কারণ গুরুগিরি করবার যোগ্যতা আমার কোনো দিন হবে কি না সন্দেহ! এই একদিন তো হাতা-খুন্তি ধরলাম, আবার সব চুপচাপ। তখন হবে কি জানো? রকমারী রান্নার নিয়মগুলো আমার মাথার মগজে বসে থেকে থেকে মরচে ধরে ভেঙে টুকরো হয়ে মিশে সব এক হয়ে যাবে। সেই সময় তোমার বামুনকে—একেবারে রান্নায় আমি ওস্তাদ করে তুলবো, সব রান্নার হবে একটা টেস্ট।

হো, হো, হা, হা, হি, হি,—সমবেত কণ্ঠের মিলিত হাসির তুফান বয়ে গেলো খাবার টেবিলে।

অনিল এতক্ষণ নিঃশব্দে বসে খাচ্ছিলো। তৃপ্তির আভা ওর চোখে-মুখে। একটি একটি করে বাটি টেনে নিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছিলো কোনো কথা না বলে।

তোমার ভালো লাগছে ছোট মামা? তুমি তো মাছ-মাংস ছাড়া কিছু খেতে পারতে না, আজ তোমার খাওয়ার অসুবিধা হল তো? বললো সুমিতা।

না রে মিতু অসুবিধে নয়, বড় ভালো লাগলো খেয়ে। চোখ তুলে সুমিতার দিকে চাইলো অনিল।

কি গভীর ক্লান্তি চোখ দুটোতে ওর! যেন কতদিন অসুখে ভুগেছে—তেমনিধারা বসে যাওয়া চোখ দুটো পাংশু বিবর্ণ।

সুমিতার সারা অন্তরটা যেন হায় হায় করে উঠলো ছোট মামার জন্যে। কি স্ফূর্তিবাজ আনন্দ-চঞ্চল ছিলো ছোট মামা। এই ক'টা বছরে ও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোন্ এক মর্ম্মান্তিক বেদনার দুর্ব্বহ বোঝাটাকে বহন করে গভীর ক্লান্তি ভারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

আরেকটু ছানার কালিয়া আর দুখানা চপ আমাকে দে তো মিতু! ভারি চমৎকার হয়েছে রান্নাগুলো—খেতে, খেতে আজ খালি মা'র কথাই মনে পড়ছে রে—ধরাগলায় বললো অনিল।

এই যে আনছি ছোট মামা। তুমি আস্তে আস্তে খাও। চঞ্চল পদক্ষেপে চলে গেলো সুমিতা।

মিতার জীবনের পরম রমণীয় মুহূর্ত্তগুলো খরচ করে দিয়ে ঘড়ির কাঁটা সন্ধ্যা ছ'টার ঘরে গিয়ে পৌঁছোলো। ওরা সকলে গল্প করছিলো সুদামের ঘরে বসে। খোকার পরিচর্য্যায় ছিলেন যমুনা দেবী।

কোথায় গো আমার মিতু দিদি? কার ভারি গলার ডাক্ শুনে বিস্ময় ভরে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সুমিতা। ওর সামনে দাঁড়িয়ে ছোট মাসী আর দিদিমা।

দিদিমা? অবাক চোখে ওঁর দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললো সুমিতা—দিদিমা আপনি এসেছেন? হেঁট হয়ে দিদিমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলো ও।

ওকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন দিদিমা।

ওরে আমার ননীর পুতলী; এত দুঃখু বরাতে ছিলো তোর! ওমা, তুই শিব গড়তে বাঁদর গড়লি। বাছা রে, কি হাল হয়েছে তোর?

সব আমার বরাতের দোষ দিদিমা। কান্নাভরা গলায় বললো সুমিতা।

বরাতের দোষ নয় রে দিদি! সব দোষ আমার। অভিমানে অন্ধ হয়েছিলাম। তোর দিকে ফিরে চাইনি রে, তাই একটা হিংস্র জন্তু এসে তোকে চুরি করে নিয়ে গেলো। তোকে তো তোর বাপ আমার হাতেই দিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কি মতিচ্ছন্ন হয়েছিলো আমার। মহাপাপ করেছি আমি দিদি। তার প্রতিফলও পাচ্ছি। আমার অনিল, আমার বড় আদরের ধনকে ডাইনীতে ধরে নিয়ে গেছে।

ভারি অপ্রস্তুত ভাবে একপাশে দাঁড়িয়েছিলো অনিরুদ্ধ। সেই খবর দিয়ে এসেছিলো ওঁদের এখানে আসবার জন্য। আজ কতদিন বাদে মিতার সঙ্গে ওদের দেখা হবে, ভারি খুসি হবে মিতা। কিন্তু একি হলো?

করবী এসে সুমিতার হাতটা ধরে টান দিয়ে বললো—ওমা, এতদিন বাদে দেখাটা হলো কি শুধু কাঁদবার জন্যে? আয় আয়, ঘরে বসিগে, কত কথা যে জমা হয়ে আছে তোর জন্যে।

যমুনা দেবী এসে প্রণাম করলেন দিদিমাকে। শান্ত গলায় বললেন তিনি—আপনি তো অনেক বোঝেন মা! দুঃখ দিয়ে ভগবান পরীক্ষা করেন মানুষকে। দুঃখের আগুনে সব খাদ পুড়িয়ে, খাঁটি সোনা করে নেন আমাদের। তাই মহাভারতে কুন্তি দেবী বলেছিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি সদা সর্ব্বদা আমাকে দুঃখ দিও। তাহলে আমিও তোমাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে পারবো। সুখের মোহ আমাদের তোমায় ভুলিয়ে রাখে।—এ সব তো আপনার জানা আছে মা, তাঁরা আমাদের শিক্ষার জন্যেই এসব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আঁচলে চোখ মুছে যমুনা দেবীর চিবুক ধরে চুমো খেলেন দিদিমা। গদগদ স্বরে বললেন—এত অল্প বয়সে এমন জ্ঞান কোথায় পেলে মা? তোমার কথা শুনলে যে বুকটা জুড়িয়ে যায়। আমার না হলো এদিক না হলো ওদিক। সারা জীবন শুধু অন্ধকারে হাতড়ে মলাম—তা শুনলুম অনিরুদ্ধর মুখে, মিতু না কি রাস্তার জঞ্জাল থেকে একটা ছেলে কুড়িয়ে এনেছে? কোন জাতের ছেলে কে জানে মা? কোন নষ্ট মেয়ের কুকীর্ত্তি। মুখ বিকৃতি করলেন তিনি, যেন আচমকা কিছু নোংরা বস্তু মাড়িয়ে ফেলেছেন।

সুদাম উঠে এসে দাঁড়িয়েছিলো মায়ের পেছনে। জবাব সেই দিলো।

শিশুর কি জাত আছে দিদিমা? সে যে ফুলের মতই পবিত্র। ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব বলেছিলেন, "ভগবানের জাত নেই ভাই, তোদের কেন জাতের বালাই।" বলতে বলতে এগিয়ে এসে দিদিমাকে প্রণাম করলো সুদাম।

কে? চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখলেন দিদিমা।

ওমা, এযে আমার দামুদাদা! কতকাল পরে তোমার চাঁদমুখখানি দেখতে পেলাম ভাই! কান্নাভরা গলায় বললেন তিনি, তোমার জিনিষ তোমার হাতে দিতে পারলাম না সুদাম, চিরকাল অপরাধী হয়ে রইলাম তোমাদের কাছে।

আর ওকথা কেন মা? উত্তকণ্ঠে বললো করবী—মানুষ যা স্থির করে সব ক্ষেত্রে তা কি সফল হয়েছে কখনও? কপালে যার যা থাকে তাই হয়।

আমার কপালে কি সবই বিপরীত হলো মা! রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বললেন মায়া দেবী। বড় সাধ ছিলো সুদামের হাতে মিতুকে তুলে দেব, আর ভালো একটি জামাই আর মনের মত একটি বৌ আনবো—কিন্তু বিধাতা আমার সব আশায় এমন করে ছাই ঢেলে দেবেন স্বপ্নেও তো ভাবিনি কখনও। আমার খোকা আমার অনিলকে হারিয়ে আমি আজও কি আগুন বুকে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি, কে বুঝবে আমার যন্ত্রণা?

চোখের জলে ভেসে গেলো তাঁর মুখখানা। ওঁর হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন যমুনা দেবী। সেখানে চেয়ারে বসেছিলো

অনিল, টেবিলের ওপর দুহাতের কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে গভীর চিন্তায় যেন মগ্ন হয়েছিলো সে।

অনিল! খোকা! বাবা তুই এসেছিস? ব্যাকুলভাবে দুহাত বাড়িয়ে ওর দিকে গেলেন মায়া দেবী।

মা, মা গো! বলতে বলতে অনিল উঠে এসে জড়িয়ে ধরলো তাঁকে।

ওরে আজ কার মুখ দেখে রাত প্রভাত হয়েছিলো আমার। তোদের সকলকার চাঁদমুখগুলো একসঙ্গে দেখতে পেলাম। ভেউ ভেউ করে আবার কেঁদে উঠলেন তিনি।

স্থির হও মা! কেঁদোনা। তোমাকে ছেড়ে আমিও বড় কষ্ট পেয়েছি মা!

ফিরে যাবো,—আমি আবার তোমার কোলেই ফিরে যাবো মা, ব্যাকুলকণ্ঠে বললো অনিল।

তাই ফিরে আয় বাবা! তোর মায়ের কুঁড়ে ঘরে তুই ফিরে আয়। তোকে ছেড়ে আমি কি আর বেঁচে আছি বাবা?

অনিলের হাত ধরে তাকে সোফায় বসিয়ে পাশে বসলেন তিনি। রুমালে চোখ-মুখ মুছে লাল লাল চোখ দুটো মেলে সকলকার মুখগুলো ভালো করে দেখে বললেন—

আমার কি কথা দিনরাত মনে হয় জানো তোমরা? মনে হয় চিরটা কালই আমি ভুল পথে চলেছি, তাই নিজেও কখনও সুখ পেলাম না আর তোমাদের কারুকে সুখী করতে পারলাম না।

ওঃ! কি আক্ষেপ, কি অনুতাপের আগুন যে দিনরাত আমাকে পুড়িয়ে মারছে, তোমাদের বোঝাতে পারবো না তার জ্বালা কি! তোমরা সবাই আমাকে ক্ষমা কোরো।

মহাবিস্ময় ভরে দেখছিলো সুদাম দিদিমাকে। এই কি সেই এটিকেট-দুরস্ত ক্ষমতাগর্বিতা, লালকুঠির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী!

এ যে একজন অসহায়া শোকার্ত্তা সামান্যা বৃদ্ধা মাত্র। কোথায় গেল তাঁর বিপুল ক্ষমতার একচ্ছত্র সিংহাসন? বৃদ্ধার প্রতি সমবেদনায় মনটা ভরে উঠলো ওর।

ওসব কথা বলে আমাদের আর অপরাধী করবেন না দিদিমা! গভীর স্বরে বললো সুদাম, বাবার কাছে শুনেছি ঈশ্বর পরম মঙ্গলময়। যা তিনি করেন, তা আমাদের মঙ্গলের জন্যেই। তবে তাঁর কর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বোঝবার শক্তি আমাদের মত সাধারণ মানুষের নেই;—তাই আমরা দুঃখ পাই। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে যা কিছু অমঙ্গল, অশুভ, তারই ভেতরে হয়তো মহাজীবনের পরম কল্যাণের সূচনা রয়েছে। এই আমার মনে হয় দিদিমা!

সে বিশ্বাস থাকলে কি আর এত কষ্ট পাই দাদা? সারা জীবনটা তো খালি সংসার সংসার করে মলাম, সংসার তো আমায় দিলে শুধু ছাই। এবারে মনে বড় সাধ হয়েছে তীর্থভ্রমণ করবার, কিন্তু কার সঙ্গেই বা যাই। বয়স হয়েছে, একা যেতে বড় ভয় পাই। সখেদে বললেন দিদিমা।

খুব ভালো কথা বলেছেন দিদিমা, বললো সুদাম। সামনের বৈশাখী পূর্ণিমায় কাকাবাবুর কমলা সেবাসদনের উদ্বোধন করতে গুরুদেব তো আসছেন। তিনি দিন তিনেক পরেই পুরীতে যাবেন, আপনি অনায়াসে যেতে পারবেন তাঁর সঙ্গে। তীর্থভ্রমণ, সাধুসঙ্গ একসঙ্গে দুটোই হবে।

আমাকেও সঙ্গে নিও মা! সিনেমা টিনেমা সব এবারে ছেড়ে দেব, শুধু তোমার কাছে থাকবো—আর কাউকে চাই না আমার মা। মায়ের কাঁধের ওপর মাথাটি রেখে ক্লান্ত স্বরে বললো অনিল।

আর আমি বুঝি বানের জলে ভেসে এসেছি? ভুরু তুলে বললো করবী।

পরম আনন্দের আভা বিচ্ছুরিত হলো মায়া দেবীর চোখে-মুখে। খুশিভরা গলায় বললেন তিনি—এই তো চাই। আবার সকলকে ফিরে পাবো, সকলকে তোমাদের যত্ন করবো, খাওয়াবো, এর চেয়ে বড় সাধ আমার কোনোদিন ছিলো না। তুমিও চলো না দাদা! মিতুর ওপর তো আর অধিকার নেই আমার। ওকেও যদি পেতাম সঙ্গে, তাহলে আর কোনো দুঃখই থাকতো না আমার।

আপনার সঙ্গে আমিও যাবো দিদিমা! কখনও সমুদ্র দেখিনি, ভীষণ ইচ্ছে হয় দেখবার। বাধা আমি আর মানবো না—আমি যাবোই। আস্তে করে বললো সুমিতা।

আর তোর বাচ্ছাটা? সে যাবে না? খোকনকে কোলে এনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন যমুনা দেবী।

দেখি! দেখি! ছুটে গিয়ে ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললো করবী—ও মা! কি চমৎকার! ঠিক যেমন মিতার সেলুলয়েডের ডল্‌টা আছে আলমারীতে তেমনি দেখতে। গায়ের রংটা মিতুরই মতো সাদা—চোখ দুটো নীল। টুকটুকে লাল গাল আর ঠোঁট! কে বলবে এ মিতার ছেলে নয়!

দেখি তো—দে আমার কোলে, বললেন দিদিমা দু' হাত বাড়িয়ে। করবী খোকাকে মায়ের কোলে নামিয়ে দিলো।

ও মা তাই তো! এ যে একেবারে রাজপুত্তুর দেখছি! উঁহুঁ! যা ভেবেছিলাম, তা নয়। হেঁজি-পেঁজির পেট থেকে পড়েনি,

কোনো বড়-ঘরের জিনিষ এ। যাক্ এ এক রকম ভালোই হলো। তুমিই সাচ্চা কথা বলেছো সুদাম,—ভগবানই মিতুকে দিয়েছেন এমন পদ্মফুলের মতো খোকাটি। ওর জীবনে আর কি সুখ আছে বলো? একে বুকে করে তবু শান্তি পাবে।—দু' হাতে খোকাকে নাচাতে নাচাতে বললেন তিনি—তুমিও আমার সঙ্গে যাবে তো সাহেব?

এক পশলা শোকের জল-ঝড় হয়ে গিয়ে সকলকার মনের ঘন মেঘ অনেকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। খুসির আলো ঝিলিক দিচ্ছে ওদের চোখে-মুখে, কথাবার্ত্তায়। আশ্বস্ত হয়ে এতক্ষণে কথা বললো অনিরুদ্ধ।

সকলকে পুরী যাবার জন্তে নেমন্তন্ন করলেন দিদিমা, ক্ষুদে সাহেবটাও বাদ গেল না শুধু বাতিল হলো এই কালা আদ্‌মীটা।

ওমা, সে কি কথা বাবা? তোমায় বাদ দেব? তুমি যে আমার দুর্দ্দিনের সহায়। তোমায় না পেলে আমার চাঁদের হাট মিলাবে কেম বাবা!—আমি নিজে গিয়ে তোমাকে আর তোমার মাকে নিয়ে আসবো। গদগদ কণ্ঠে কথা ক'টি বলে,—গলার সুর পাল্টে আবার বললেন দিদিমা—অজিতার তো খুব ভালো বিয়ে দিলেন দিদি,—তা বিজির বিয়ের কি হলো বাবা? সে-ই তো বড়!

—ওর কথা আর বলবেন না দিদিমা, মস্তো মুস্কিল বাধিয়ে গেছেন আমার বাবা! মেয়েদের নামে, পঞ্চাশ হাজার করে টাকা আর একখানি ক'রে বাড়ী দিয়ে গিয়ে। অলকাপুরীর মাসীমা এমন শাঁসালো মাল কোনো দিন হাতছাড়া করেন না, তাই একটিকে একেবারে গ্রাস ক'রে ফেললেন। অজিটা চিরকেলে ভীতু আর ভালোমানুষ গোছের;—তাই বেঁচে গেছে ওঁর খপ্পর থেকে—আমাদের পছন্দ মত ঘরে বিয়ে দেওয়াও সম্ভব হলো।—কিন্তু ঐ বিজিটার মাথা উনি একেবারেই খেয়েছেন। এখন ওকে সিনেমায় নামিয়েছেন। তার উপযুক্ত শিক্ষা দিচ্ছেন। দিনরাত এখন সে সিনেমার স্বপ্ন দেখছে আর কি!

আহা—হা। তোমার মায়ের তো তাহলে মনস্তাপের সীমা নেই। আক্ষেপের সুরে বললেন দিদিমা। একেবারে সাক্ষাৎ রাক্ষুসী তোমাদের ঐ মাসীমাটি। কত ছেলে-মেয়ের কচি-কচি মাথাগুলো খেয়েছেন তিনি তার আর হিসেব নেই গো। আগে জানলে কি মিতাকে তার আড্ডায় যেতে দিতাম বাবা। ওরে ছদ্মবেশী ডান্, তা কি বুঝেছি আগে?

তা তিনি এখন আছেন কোথায়?

আছেন ভালোই—ধনপতি ক্ষেত্রির বরানগরের বাগান-বাড়ীতে আছেন। রোজ গঙ্গাস্নান করেন, কোঁটা-তিলক কাটেন। সন্ধ্যেবেলায় ক্ষেত্রিকে খঞ্জনী বাজিয়ে কীর্ত্তন শোনান। শুনছি এবারে উনি একটি খাঁটি কীর্ত্তনীয়ার দল তৈরী করবেন।

ঝাঁটা মারো, মুখে আগুন দাও, অমন কীর্ত্তনীর। উঃ! কি কালসাপ, শুধু বিষ ঢালতে জানে। বিকৃত কণ্ঠে বললেন দিদিমা।

ও প্রসঙ্গ আর নয় মা। একটু ভুলে থাকতে দাও। আর্ত্তকণ্ঠে বললো অনিল। তারপর একটু করুণ হাসির সঙ্গে বললো—আমার আজ কি মনে হচ্ছে জানো মা। আমরা যেন সাত বছর পিছিয়ে গেছি।

সুদাম বিলেতে যায়নি, আমিও শুকতারাকে বিয়ে করিনি, অসীমও মিতাকে দখল করেনি, তুমি আর রুবিও বাড়ী থেকে চলে যাওনি। আমরা ঠিক সেই আগের মতোই আছি। সেই যে ছোটবেলায় পড়েছিলাম—'হারাধনের সাতটি ছেলে গিয়েছিল বনে।' তবে তারা ধনরত্ন নিয়ে বাড়ী ফিরেছিলো, আর আমরা ফিরেছি জঞ্জাল কুড়িয়ে, এই যা তফাৎ।

জঞ্জালটাকে শুধু আমিই ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছি অনিল বাবু। সে দিক থেকে তাহলে আমাকে লাকি বলতে হবে। হা-হা শব্দে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অনিরুদ্ধ। ঘরশুদ্ধ সকলে যোগ দিলো ওর হাসিতে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে হাসি থামালো সুমিতা। বিষন্নকণ্ঠে বললো, ন'টা বেজে গেছে—এবারে যেতে হবে দামীদা'।

তাড়া কিসের, বাজুক না ন'টা। আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, বললো অনিল।

সেই ভালো। হাসিমুখে বললে সুমিতা। জানো ছোট মাসী, কত ভালো রান্না শিখেছি কাকীমার কাছে? চপ, রাধাবল্লভী, মলো, ছানার কালিয়া, সব আছে। একটু গরম করে নিয়ে আসি, খেয়ে বলো কেমন হয়েছে। আপনাকেও খেতে হবে দিদিমা।

খাবো বৈ কি দিদি! তোমার হাতের মিষ্টি খাবার অবশ্যই খাবো। একমুখ হেসে বললেন দিদিমা।

রাত্রি সাড়ে দশটা। সুমিতা আর অনিলকে লালকুঠির গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো অনিরুদ্ধ, দিদিমাকে পৌঁছে দেবার জন্ত।

অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সুমিতা। সামনেই অসীম। দুহাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ করে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ভারি থমথমে মুখ নিয়ে নিঃশব্দে পায়চারী করছে বারান্দায়।

বাহমহলের প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমটা এখন অসীমের শোবার ঘর হয়েছে। রাত্রে সাধারণত: সে সেখানেই থাকে,—ভেতরে আসার প্রয়োজন মনে করে না। পাশের ঘরটি তার ড্রয়িংরুম—আর তার পাশে ওর খাবার ঘর। বাড়ীর ভেতর মহলের বাঁদিকের ঘরগুলো ব্যবহার করে সুমিতা। বাকি ঘরগুলো চাবি দেওয়া থাকে। নিচের প্রকাণ্ড হলঘরটা আগের মতোই সুসজ্জিত আছে। ডানদিকের নিচের তিনখানি ঘরে অনিল আর শুকতারা থাকে।

অনিল ভাড়া দিতে চেয়েছিলো; কিন্তু অসীম নেয়নি। উদ্দেশ্য, তার দিদিমাকে আর রুবীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে শুকতারাকে কাছে রাখা। শুকতারা ওর হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবে, এ হতেই পারে না, অনিলের সাধ্য কি ঐ আগুনকে হজম করে? সে শক্তি একমাত্র তারই আছে।

মাঝে মাঝে সুমিতার ঘরে আসে অসীম। কথার জালে জড়িয়ে ওকে, হাতছাড়া সম্পত্তির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে।

কপট প্রেমের অভিনয়ও করতে হয় ওকে। যদি মিঠে বুলি দিয়ে ভোলানো যায়, নির্ব্বোধ মেয়েটার মনটিকে।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ভুলের বিষ একবার পান করেছে সুমিতা। অনির্ব্বাণ দাহজ্বালা তার তিলে তিলে দহন করছে ওকে! আর

ভুল করবে সে কোন প্রাণে ? তাই যখন মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনায় ওকে অসীম, তখন ভাবি ভয় করে ওর। ওর হিংস্র কুটিল, নিষ্ঠুর রূপটি তার পরিচিত। কিন্তু যখন সে শান্ত হৃদয়বান প্রেমিকের ছদ্মবেশ ধারণ করে আসে ওর কাছে তখনই মনে হয় ওর, বাঘ এসেছে হরিণের চামড়ায় আত্মগোপন করে। তখন ওর মনটাও অজানা ত্রাসে সজাগ হয়ে ওঠে। বুঝতে ওর দেরী হয় না যে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে লোকটা !

কোনো দিন ওকে একটু আদর করে বলে অসীম—আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো মিতা ! অতগুলো টাকা, আর বাড়ী তোমার বাবা অনায়াসে বিলিয়ে দিলেন তোমাকে বঞ্চিত করে ? তুমি একবার বলো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমায়, আইনের জোরে ও-সব আদায় হয় কি না। আইনই বলবে এসবের একমাত্র মালিক তুমি।

খোলা জানলার দিকে মুখ তুলে, ধু ধু করা আকাশের পানে চোখ দুটি মেলে কি ভাবে সুমিতা ! হাসে অসীম। সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে টান দেয়। ওকে ভাবতে সময় দেয়।

কিন্তু বেশীক্ষণ ধৈর্য্য থাকে না ওর। একটু ঝাঁঝের সঙ্গে আবার বলে, কি রাজি তো ?

—হ্যাঁ। চোখ ফেরায় সুমিতা। শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলে, অনেক আছে তো আমার। এর বেশী সম্পত্তির আর প্রয়োজন কি ?

দাঁতে দাঁত ঘষে ওর দিকে রুক্ষ দৃষ্টিপাত করে অসীম। দপ দপ করে জ্বলে ওঠে মাথার ভেতরের নিবিয়ে রাখা বাতিগুলো।

গলায় স্বরে বিষ ঢেলে বলে—তোমার দরকার নেই, আমার আছে। তোমাকে বিয়ে করেছিলাম কিসের জন্যে ? কি আছে তোমার মধ্যে ? তোমার চেয়ে ঢের বেশী লোভনীয় ছিলো আমার কাছে শুকতারা সেন। এটা মনে রেখো, আমারও ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। তোমার এই আহাম্মুকিত্তা আর জেদ কি করে ঘোচাতে হয়, দেখিয়ে দেবে অসীম হালদার। দুম, দুম করে পা ফেলে মেদিনী কাঁপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অসীম। এর পর দিন পনেরো কুড়ি আর ভেতরে আসে না। আবার হয়তো কোনো দিন আসে,—সেকেলে এত বড় বাড়ীটা রেখে কি হবে ? অত সোনা-রূপোর ঝাড় লণ্ঠন, আসাসোটা, বাতিদান আতরদান, আর কোন প্রয়োজনে লাগবে ? সব বেচে দিয়ে হাল-ফ্যাসানের ছোট একখানি বাড়ী করলে, ওদের দু জনের অনায়াসে চলে যাবে। আর প্রচুর টাকাও হাতে থাকবে। ধীরে সুস্থে কথাগুলো বলে অসীম—সুমিতাকে।

কিন্তু একটি জবাবই বার বার সে পেয়েছে সুমিতার কাছ থেকে—বাবা যতদিন আছেন, ততদিন এসব থাক। তাঁর অবর্ত্তমানে যা ইচ্ছে হয় কোরো, বাধা দেব না।

খেঁকটি কেটে বলেছে অসীম—তিনি আবার কোনোদিন মরবেন নাকি ? অমর হয়ে ফূর্ত্তি লোটবার জন্যেই নাগাবাবাদের পেছু নিয়েছেন।

প্রথম প্রথম এ ধরণের গালাগালি শুনলে কেঁদে ভাসিয়ে দিতো সুমিতা। কিন্তু এখন আর কাঁদে না। সয়ে গেছে সব। মাঝে মাঝে প্রাণটা তার ছটফট করে বাণ-বেঁধা পাখীর মতো। কত দিন ? আর কত দিন বইতে হবে এ দুর্ব্বহ জীবনের বোঝাটাকে ?

চিঠি লেখেন সোমনাথ মাঝে মাঝে, ওকে আর ভুলাবেন। "কমলা সেবাসদনের" উদ্বোধনের সময় আসবেন, জানিয়েছেন। সেই আশায় দিন গুণছে সুমিতা। এবারে বাবা এলে, তাঁর দুটি পা জড়িয়ে ধরে বলবে সে—আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি আজও হয়নি বাবা ? এবারে আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। আপনার মত কঠোর সাধনা আমিও করবো। তাহলে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়ে আমিও আপনার মতো শুদ্ধশান্তি লাভ করতে পারবো। আমার সারা মন প্রাণ, যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে বাবা ! আমাকে এ জ্বলন্ত নরক থেকে মুক্তি দিন।

আজ অসীমকে এমন সময়ে ভেতরে দেখে মনে মনে যথেষ্ট ভীতা হলো সুমিতা।

ওর পাশ কাটিয়ে ঘরের দিকে কয়েক পা যেতেই, শুনতে পেলো অসীমের হুঙ্কার,—দাঁ-ড়া-ও।

ফিরে দাঁড়ালো সুমিতা। ওর সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো অসীম। দুচোখে জ্বলছে ওর বিদ্বেষবহ্নি।

রাত প্রভাত না হতেই দেখছি অভিসারে যাওয়া সুরু হয়েছে ? পূর্ব্ব-পিরীত ভুলতে পারোনি আজও ? উত্তপ্ত লাভা ঝরে পড়ছে যেন অসীমের কণ্ঠ থেকে।

মুখ তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ালো সুমিতা। হঠাৎ একটা দুঃসাহস সাপের মতো ফণা তুলেছে ওর অন্তরে। চিরকালের শান্ত নীরব চিত্ত আজ চন্‌মন্ করে উঠলো উচিত মত একটা কিছু জবাব দেবার জন্যে।

—কি, মুখে কথা জোগাচ্ছে না বুঝি ? চাপা গর্জ্জনের সঙ্গে বললো অসীম—গিয়েছিলে তো, সেই স্কাউণ্ড্রেল সুদামটার কাছে ? বৃথা আর লুকোচুরি কেন ?

হ্যাঁ তাই। দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো সুমিতা, লুকোচুরি করবো কেন ? পূর্ব্ব-পিরীত তুমিই কি ভুলতে পেরেছো ? বাড়ীর ভেতরে বসে অবাধে চালিয়ে যাচ্ছো সব কিছু। সেকথা অজানা আর কার আছে ?

স্তম্ভিত হয়ে গেলো অসীম ওর মুখে স্পষ্ট জবাব শুনে। এ কি অসম্ভব ব্যাপার। হাজার কুৎসিত গালাগালি যে ভীরু মেয়েটা নিঃশব্দে হজম করে গেছে, আজ ওর মুখের ওপর জবাব দেবার মত এমন দুঃসাহস পেলো কোথা থেকে ?

চিৎকার করে কয়েক পা এগিয়ে এলো অসীম—ওয়াণ্ডারফুল ! সুদামের মন্তোর দেবার শক্তিকে তারিফ না করে উপায় নেই। শয়তানটা একদিনেই তোমাকে শয়তানী বানিয়েছে। হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! হাঃ ! বিকট হাসির ঝড় বইয়ে দিয়ে বললো অসীম—কিন্তু সে জানে না যে, শয়তানের ওপরও বাবা শয়তান আছে।

শুকতারাকে ভুলবো ? কোন দুঃখে ? পেতাম তোমার বাবার সম্পত্তিটা সব—সব ভুলতে পারতাম। কিন্তু তা তো হোল না। সন্ন্যাসিটা যে আমার বাড়াভাতে ছাই দিলে। তোমার মতো একটা জোলো মেয়েতে কি মন ভেজে অসীম হালদারের। তার চাই তাজা শ্যাম্পেন ঐ শুকতারাকে। তবে এ-ও সাবধান করে দিচ্ছি তোমায়, আমার বাড়ীতে বসে—আমার বকে ছুরি চালানো তোমার চলবে না মিতা !

তুমি আর তোমার বাপ যেমন আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছো, তেমনি চিরটাকাল তোমার সুখের পথে আমি কাঁটা হয়ে জেগে থাকবো। কিন্তু যে আমার চলার পথে বাধা দেবে, তাকে এমনি করে পায়ের তলায় পিষে মারবো। সে হিম্মৎ একমাত্র আছে এই অসীম হালদারের।

দুহাতে বুক বাজিয়ে বীরত্ব প্রকাশ করলো অসীম হালদার।

অ্যাল্‌কোহলের উগ্রগন্ধে ভারি হয়ে উঠলো সেখানকার বাতাস।

ধীরে, বন্ধু ধীরে। চমকে উঠলো অসীম। একটু দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনিল।

দুই ভুরু কুঁচকে মহা বিরক্তিভরে বললো সে—আমাদের পার্সোনাল ব্যাপারে আর কারুর মাথা গলানো পছন্দ করি না অনিল। তুমি যেতে পারো।

কয়েক পা এগিয়ে এসে ওর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো অনিল। জলন্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর ঘৃণাভরা কণ্ঠে বললো—তোমার বাড়ী বলে শাসাচ্ছিলে কাকে বেয়াকুব? যার বাড়ী তাকেই? আর কোন্ মেয়ের সঙ্গে যেন তার তুলনা দিচ্ছিলে আর কাকে যেন শয়তান বোলে, পায়ে পিষে মারবার জন্যে আস্ফালন করছিলে? ঘৃণিত পশু! আজ বুঝলাম, আমি যত বড় পাপীই হই না কেন, তোমার তুলনায় আমি দেবতা।

দাঁতে দাঁত ঘষে দু' হাত মুষ্টিবদ্ধ করে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো অনিল—তোমাকেও আমি সাবধান করে দিচ্ছি অসীম হালদার, গুলী-খাওয়া বাঘ হয় যেমন ভয়ঙ্কর, তার মরণ কামড়ও তেমনি অব্যর্থ! এইটুকু মনে রেখো সুস্মিতা, আজ থেকে নিঃসহায় নয়। তার মর্য্যাদারক্ষার জন্য, তার হতভাগা মামার এই লোহার সাঁড়াশির মত হাত দুটো সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

চতুর অসীম হালদার, কাষ্ঠহাসি হেসে মোলায়েম স্বরে জবাব দিলো—আচ্ছা, আচ্ছা মানছি তোমার সব কথা। কিন্তু কি আরম্ভ করেছো বল দেখি? এটা একটা অভিজাতপল্লী—ভদ্র সংসার, সব যে রাগের মাথায় বিস্মরণ হয়েছো দেখছি? নিজের স্ত্রীর সঙ্গে একটু রাগ-অভিমান করারও কি অধিকার নেই আমার, বলতে চাও?

স্ত্রী? কে তোমার স্ত্রী? সুস্মিতা? কখনই নয়। স্ত্রীর কোন্ অধিকার, কোন্ মর্য্যাদা তুমি দিয়েছো তাকে? তাকে ফাঁদ পেতে ধরে এনেছো তুমি, আর তোমার সেই জঘন্য কাজে সাহায্য করেছে তার এই হতভাগা মামা। ভদ্র সংসার? কে বললে এটা ভদ্র সংসার? যে সংসারে বাস করে একজন কুলাঙ্গার অভিনেতা, একটা কুলটা ব্যভিচারিণী অভিনেত্রী, একজন প্রতারক নীচ শয়তান, সেটা কি একটা ভদ্রসংসার? হো-হো করে হেসে উঠে বললো অনিল একখানা হাত নেড়ে—আমি চ্যালেঞ্জ করছি অসীম, যদি সৎসাহস থাকে তো আমার কথার প্রতিবাদ করো।

—সুস্মিতা এগিয়ে এসে অনিলের হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললো—তোমার পায়ে পড়ি ছোট-মামা। আর কথা বোলো না, বড্ড উত্তেজিত হয়েছো তুমি, যাও ঘরে গিয়ে একটু শান্ত হবার চেষ্টা করো। দু'চোখের জলের ধারা ওর, ঝর ঝর করে ঝরতে লাগলো অনিলের হাতের ওপর।

অভিনেতা মামার ভাগ্নীও চমৎকার অভিনয় জানেন দেখছি! শ্লেষোক্তি করলো অসীম। ষ্টেজে খুব ভালো মানায় ওগুলো, অনেক হাততালি মেলে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো অনিল, ফিরে দাঁড়ালো ওর কথাগুলো শুনতে পেয়ে—জলো দিশমাল, বিলাত শ্যাম্পেন হবার চেষ্টা করছে বুঝেছো? মানে তার দিকেই তোমার লোভটা বেশী কি না। তবে ওতেও তোমায় আর মানাবে না অসীম হালদার, এবারে তোমার দরকার সেঁকো বিষ। উচ্চকণ্ঠে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে অবজ্ঞাভরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো অনিল।

সুস্মিতা চট করে ঘরে ঢুকে দড়াম করে খিল লাগিয়ে দিলো বন্ধ দরজায়। অপমানের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে হিংস্র শ্বাপদের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রশস্ত বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো অসীম হালদার। মনের পর্দায় অঙ্কিত হতে লাগলো তার রকমারী ধরণের প্রতিশোধ প্ল্যান। [ক্রমশঃ।

লিপিকা

জগন্নাথ ঘোষ

আড়ালে লুকালে মুখ। হৃদয়ের যতো স্বপ্নসাধ
দু' হাতে ছড়িয়ে দিলে। প্রতীক্ষার প্রান্তে এসে
মুহূর্ত্তের তীব্রতায় কেটে দিলে যন্ত্রণার বাঁধ।
আতপ্ত যৌবন ভারে, একদিন কলকণ্ঠে হেসে
আমাকে জানিয়েছিলে হৃদয়ের স্বাগত সম্ভার।
যে ছিল স্বপ্নের দেশে অশ্রুধূরে কাঁপিয়ে মেদিনী
সে এল অতর্কিতে, বুকে নিয়ে সমুদ্র উচ্ছ্বাস।
মায়ামন্ত্রে জেগে ওঠে কবেকার কুমারী বন্দিনী
একদা পরমক্ষণে। হে নারী, তোমাকে বার বার
চাইনি নায়িকারূপে। তুমি হও কল্যাণী প্রেয়সী।
বসন্তে আসিনি আমি। বর্ষার এনেছি উপহার।
দু হাতে নিলে না তুলে। আজন্মের হলে না প্রেয়সী।

আমার চাতক-চোখ

সমরাদিত্য ঘোষ

চাতক আকাশে চায় মেঘমুক্ত জলের সন্ধানে
আমার চাতক-চোখ চেয়ে থাকে দূর পথ পানে।
সবুজ ঘাসের বুকে এক ফালি পায়েচলা পথ
যেখানে দিগন্ত শেষে ভিড় করে শিরিষ-অশথ।
একটা দীঘির পাড়, ঝাউ গাছ দেয় হাতছানি
ওপাশে শুঁটির ক্ষেতে বেগুনী ফুলের আমদানি।
এখানে কাজের তাড়া ওখানে বিরাট অবসর
মধ্যাহ্নে নিমের ছায়া, রাতে সেথা জ্যোৎস্না-আসর।
এখানে অভাব শুধু শুমি রাশি রাশি অভিযোগ
ওখানে উদ্বেগ-হীন রূপময়ী প্রকৃতি সম্ভোগ।
আমার চাতক-চোখ কাতরায় সবুজ তৃষায়
এখানে কাজের চাপে সকরুণ জামা কাপড়টায়।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৭৯। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আভীরেরা দল বেঁধে এলেন। চেষ্টা পরিশ্রমের কিছুই বাকি রাখলেন না। যখন পারলেন না তখন চারদিকে তাঁরা চাইলেন। ঐ তো, ওখানে তাঁদেরি দুঃখহারী পুত্রেরা গলায় হার নাচিয়ে খেলে বেড়াচ্ছেন! দেখাও যেই, অমনি তাঁদের মধ্য দিয়ে ধেনুদের বাৎসল্যের চেয়েও সমধিক প্রবাহিত হয়ে গেল বাৎসল্যরস। তাঁরা যেন পান করতে লাগলেন সৌন্দর্য্য। দৌড়ে গেলেন সেখানে। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে পুত্রদের তুলে নিলেন বুকে। মাথায় ঠেকল নাক, মুখ মুখে, চোখের জলে ধুয়ে যেতে লাগল বুক। যেন একখানি পটে-আঁকা ছবি।

ব্যাপার দেখে কেমন একটু যেন অল্প সন্দেহের আবির্ভাব হল—বলভদ্রের নিজের দেহেও তিনি অনুভব করলেন হর্ষ ও বিস্ময়ের সঞ্চার। ধেনু, রাখাল ও রাখালবালকদের সকলের দিকেই আর একবার চেয়ে দেখলেন। ক্ষণকাল আলোচনা চালাল তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য।

এ কি ব্যাপার! আগে তো এমনটি কখনও দেখিনি! দুধ ছেড়েছে যে বাছুর তার উপর এখন যে বাৎসল্যের বন্যাটা দেখছি,—দুধ টানছে যে বাছুর তার উপরে তো এতটা—আগে দেখিনি ব্রজধেনুদের। আভীরদের মধ্যেও তো এত শিশুস্নেহ আগে দেখিনি! আমার নিজের মধ্যেও তো এত স্নেহ অনুভব করিনি! এ নিশ্চয় আমার প্রভুটিরই কোনো মায়ার খেলা। মায়াই ঘটাচ্ছে। তা না হলে, চক্রপাণিশ্চায়ং শ্রীকৃষ্ণের আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার সামনে সাহস দেখাতে আসে কিনা দৈবী বা আসুরী একটা মায়া? ঘোর মায়াবি-চক্রের যিনি চূড়ামণি তাঁর কাছেই যাই, তাঁকে প্রশ্ন করাই মঙ্গল।

৮০। ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীবলরাম। বললেন—

বলি, ও মহোন্নতবুদ্ধি, এ সব কী কাণ্ড দেখছি, এ সব যে আমারও বুদ্ধির অগোচর হয়ে দাঁড়াল। সম্প্রতি আমার বুদ্ধি বলছে, এই সহচরগুলি হচ্ছেন পাপজয়ী অমরশ্রেষ্ঠের দল, আর এই বাছুরগুলি নীতিশাস্ত্রজ্ঞ মুনিসঙ্ঘ। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত, দিব্যি দিয়ে বলতে পারি—এ ক্ষেত্রে শ্রীমানই এইসব। তত্ত্বটি আমাকে এখন বলুন।

শ্রীবলরামের প্রশ্ন শুনে শ্রীযশোদাকুমার তখন ইতিহাসের মত করে আনুপূর্ব্বিক বলে চললেন সমস্ত ঘটনা। বলতে বলতে চলতে রইল খেলা। অনন্ত খেলা।

৮১। পূর্ণ একটি বৎসর চলল এই বৎস-রক্ষণের উৎসব-কৌতুক। কমলাসনে সমাসীন হয়ে এতকাল ব্রহ্মাই প্রবৃত্ত ছিলেন ভগবানের মহিম-হিল্লোলের গণনায়। সহসা তাঁর মনে পড়ল—তিনি নিজে একদিন বাছুর ও রাখালদের চুরি করেছিলেন। সত্যিই তো, কি হোলো তারপর? আর কিই বা হল তাঁর, যাঁর কুলকিনারা নেই লীলায়?

নির্ভীক একটি সাধু-সাধু ভাব অবলম্বন করে পৃথিবীতে নেমেছিলেন ব্রহ্মা। এসেই দূর থেকেই দেখতে পেলেন,—যেমনকার সব তেমনই রয়েছে, সেই বাছুর খেলছে, সেই রাখাল ছুটছে! বিস্ময়ে ব্রহ্মার হারিয়ে গেল হাসি, বিমনা হয়ে পড়লেন, ভাবলেন—

সেখান থেকে এরা এখানে এল কেমন করে? এরা কি তাহলে ভিন্ন? যাদের চুরি করেছিলাম সত্যিই কি এরা তারা? বাস্তবিক এরা কি তবে অবাস্তব? সমস্তই অলীক? হায় রে, পদ্মাসনের আজ গলে গেল সব গর্ব্ব?

নিজেকে গঞ্জনা দিতে দিতে তিনি তখন পরমমায়াবী শ্রীভগবানে নিবেদন করে দিলেন নিজের মায়া। শাস্তি হল আহত্যের। কিন্তু তত করেও আত্মপ্রীতি লাভ করতে পারলেন না তিনি।

৮২। অনাভিজ্ঞ যেমন নিজের দোষে ব্যর্থ হয়ে নিজের মায়ার ফাঁদে নিজেই আটকা পড়ে যায়, তেমান হল ব্রহ্মার এই কীর্ত্তিটিরও দুর্দশা। বৈফল্যের দ্বারে মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল।

৮৩। এবার ব্রহ্মা যখন পুনর্বার তাঁদের দিকে ভালো করে চাইলেন তখন, দেখলেন—

সকলেই শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী,

সকলেই শ্রীমৎ চতুর্বাহু,

সকলেই অনন্ত আনন্দঘন চৈতন্যময়; সকলেই ঝলমল করছেন। কোটি সূর্য কোটি ইন্দু পরকাশ। আর তাঁদের লীলোল্লসিত লোমকূপের কুহরে, ডুবছে-ভাসছে ভাসছে-ডুবছে, ঘর্মজলের অজস্র কণিকার মত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের সব অসংখ্যতা। এমনকি—তাঁরা—

সকলেই শ্যাম, সকলেই কুণ্ডল মণিমুকুটধারী। সকলেরই হাতে কেয়ূর সকলেরই গলায় নিষ্কহার; কঙ্কন বাজছে কুনকুন, মেখলা বাজছে কনকন, নূপুর বাজছে ঝুনঝুন।

আর সকলেরই কণ্ঠে, আজানুলম্বিত ভ্রমরঝঙ্কৃত তুলসীর মাল্য, সকলেরই চেলীতে, বিদ্যুৎ-বিজয়িনী শ্রী।

৮৪। আর দেখলেন—তাঁদের প্রত্যেককেই মূর্তিগ্রহণ করে উপাসনা করছেন এক পরমেষ্ঠি, দুই অশ্বিনীকুমার, তিনগুণ, চতুর্বেদ, পঞ্চ তন্মাত্র, ষড় ঋতু, সপ্ত ঋষি, অষ্টাসাঙ্গ ও বসু, নব নিধি ও গ্রহ, দশ বিশ্বদেব, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বহিরন্তর ইন্দ্রিয়ের ত্রয়োদশ অধিষ্ঠাতৃদেব, চতুর্দ্দশ মনু, পঞ্চদশ তিথি, এবং ষোড়শ বিকার। অপরিমেয় সকলেই। এবং দেখলেন,—তাঁদের প্রত্যেকেরি নয়নকোণে ঢেউ তুলেছে কৃপা, আসন পেতেছে সৌন্দর্য্যের সমস্ত সম্পদ।

৮৫। দেখতে দেখতে ব্রহ্মার জ্ঞান হল—তাহলে ত সমস্তই বাসুদেবময়! এবং তখন তিনি তাঁদের মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁকে, যাঁর হাতে ছিল দধি-অন্নের গ্রাস, বলকারক রসায়নের মত যিনি হৃদয়রঞ্জন করছিলেন সখাদের, মনে যাঁর সন্তোষ ছিল না, আগের মতই যিনি নিজের শ্রীঅঙ্গটিকে ক্লিষ্ট করছিলেন বাহুল্যে, সন্ধানে ফিরছিলেন বাছুরদের, রাখালদের, কক্ষে যার বেত্র বিষাণ, জঠরপটে মুরলী, অলীক মনোবেদনায় যিনি বিমনা বিরস হয়ে এদিকে ওদিকে চাইছিলেন, বিচরণ করছিলেন একাকী। তাঁকে দেখেই ব্রহ্মার মনে হল, তিনি মূর্তিমন্ত বিকশিত, দেখতে পেলেন একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম এই মহার্থটিকে। প্রগাঢ় অপরাধে অপরাধীর মত, পরাভূত হয়ে পড়লেন চতুর্মুখ। এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে দণ্ডবৎ হয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন ভূতলে। চক্ষুসোদ্ভূ ধর্ম-পর্বতের যেন পতন হল।

৮৬। অতঃপর তিনি দেখলেন,—যিনি সকল গুণাধার তিনি স্থগিত করেছেন নিজের সত্তায়, এবং তাকে ঘিরে ফেলেছে অভূতপূর্ব এক গাম্ভীর্য্য। বিবিধ শক্তি যে নাট্যে নর্ত্তকীর মত নাচন সে নাট্যের তিনিই যেন সূত্রধার। তমালতরুর অঙ্কুরের মত তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিশ্চল।

৮৭। চতুর্মুখের চতুর্মুকুটের মহামণীন্দ্র থেকে ভেসে এল, জ্যোতিস্তরঙ্গের দল। ভগবানের চরণকমলের স্পর্শকামনায় তারা যেয়ে গেল, কিন্তু অনধিকারী বলে বাধা পেল ভগবানের চরণনখর, মণিমঞ্জরীর নিকটে। নিবারিত হয়ে যখন তারা কুণ্ঠিত হল, তখন ব্রহ্মা প্রকাশ করলেন নিজের সত্যদীপ্তি, এবং বারংবার উঠে উঠে নত হয়ে হয়ে অপরাধ স্বীকার করে স্তব করে উঠলেন নন্দদুলালের—

হে ব্রজপুরন্দর-নন্দন, জয় হোক, তোমার জয় হোক। তোমার হাতে রয়েছে দধি-অন্নের গ্রাস; বেণুবিষাণ; তোমার মাথায় রয়েছে ঘনকান্তি চন্দ্রকের নীলস্তবক, গুঞ্জার হার; তোমার গলায় রয়েছে চঞ্চল বনমালা। কী অদ্ভুত রসৈকময় তোমার শ্রীঅঙ্গ। ঐ রসেই অবরোধন হয় জ্ঞানের। জয় হোক তোমার জয় হোক।

নানাপ্রকারে আমাকে অনুগৃহীত করবার উদ্দেশ্যে হে প্রভু, তুমি প্রকট করেছ তোমার এই অদ্ভুত বাছুর রাখালময় তনু। সে মহিমার কণামাত্রও গ্রহণ করতে পারেনি আমার বুদ্ধি। সে কেমন করে প্রণিধান করবে তোমার এই হেন লক্ষ লক্ষ বিকাশের ও বিকারের কলধারা?

এই বাছুর এই রাখালের দল—এরা সকলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, সকলেই চতুর্ভুজ, ঘনরস চিন্ময়, সকলেই নিখিল ঐশ্বর্য্যের আধার। কিন্তু হে অজিত, তুমিই কেবল বিভুজ, ধারণ করে রয়েছ ললিত গোপের তনু। হে বিশ্বকারণ, তোমার প্রকৃতির বিকৃতি নেই।

অভিরসবর্ষিণী তোমার ঐ পদাম্বুজভক্তির প্রণালীটিকে পরিত্যাগ করে যিনি প্রয়াসী হন জ্ঞানের, পরিশ্রম ব্যতীত তিনি অণুমাত্রও লাভ করতে পারেন না অন্তফল। তুষ বা বুষ ঝেড়ে ফলের আশা করা কি দুরাশা নয়?

যে সব সুধিবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানের বিধান নিয়ে সাধনপথে অগ্রসর হন তাঁদের একদিন বিসর্জন দিতে হয় সাধনা। তাঁরা সকলেই চান তোমার ঐ শ্রীচরণের কমল হতে। স্বাধীন ও অতিকৌতুকী হওয়া সত্ত্বেও তখন কিন্তু চঞ্চল হয়ে উঠে তোমার কৃপাসমুদ্রের তরঙ্গ। হে অপরাজিত প্রভু, তখনি তুমি বশ্যতা স্বীকার কর, তাঁদের কাছে তুমি হার মানো।

পুরাকালে মাত্র কয়েকটি পরমহংসাবতংসই জন্মেছিলেন। যাঁরা তাঁদের সন্ন্যস্রাগের সমস্ত বিলাস তোমার শ্রীপাদপদ্মে সঁপে দিয়ে কেবল চরিতামৃতের শ্রবণ কীর্ত্তন ও চিন্তনমূলেই, সুখপ্রয়াণ করেছিলেন তোমার সনাতন পায়ে।

তাহলেও হে পুণ্যাঙ্গেন্দ্র দ্বি, নির্গুণ তোমার মহিমা বোঝা ভার। যাঁদের আত্মা শুদ্ধ তাঁদের পক্ষেও তা সহজ নয়। তোমার প্রকৃতির বিকৃতি নেই, অন্যের বিবোধ্যও তুমি নও; তাই কেবল অনুভবের মধ্য দিয়েই জানতে হয় তোমার মহিমার স্বরূপ। যদি হয়, তবেই হয়, নচেৎ নয়। অন্য উপায় নেই।

হে ঈশ্বর, হিতব্রতে তুমি অবতীর্ণ হয়েছ। কালবশে সম্ভব হতেও পারে ধরণীর ধূলিকণার, আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের তুষারের কণিকারাশির গণনা, কিন্তু হে গুণসাগর, কার সাধ্য আছে তোমা একটিমাত্র গুণেরও আনন্ত্য্য গণনা করে শেষ করে?

যে পথ দিয়ে তোমার অনুগ্রহ আসে সেই পথের পানে চোখ রেখে নিজের নিজের নিয়তিক্রমে যাঁরা উপভোগ করেন দুঃখ-সুখ এবং কায়মনোবাক্যে অনুসন্ধান করেন তোমার শ্রীপাদপদ্ম, তাঁরাই কৃতার্থ হন। তোমার সনাতন ধামে তাঁরাই বহে নিয়ে যান যৌতুক।

অতএব হে নাথ, ধ্বংস করুন আমার এই জগদ্বিরল অভব্যতা আপনি পরমেশ্বর, প্রক্ষিত মায়াবিৎগণের আপনি কিরীটমণি। আপনি যে ক্ষেত্রে বিরাজমান সেখানে আমি এসেছিলেম, হায় রে, মায়া রচনা করতে? শেষে নিজের মায়াতেই বিমোহিত হয়ে গেল নিজেরি বুদ্ধি! কোথায় স্ফুলিঙ্গ আর কোথায় মহাপ্রলয়ের আগুন!

হে অসীম কৃপাময়, আমার অপরাধ মহান্ হলেও ক্ষমাযোগ্য আপনার। আমার মধ্যে রয়েছে সহজাত রাজসিকতা, আমার মধ্যে বিবৃত রয়েছে পৃথক ঈশ্বরভাব, আমি 'অজ'—এই অহঙ্কারই আমার মধ্যে নিয়ে এসেছিল মহতী দুর্বুদ্ধি। 'এ আমার কাঙাল'—এখন এই ভেবে হে প্রভু বর্ষণ করুন আপনার কৃপা।

কোথায় এই মহৎ এই অহঙ্কার এই ক্ষিত্যপ, তেজ মরুৎ ব্যোম দিয়ে ঘেরা জগদণ্ডভাণ্ডের অন্তর্গত সপ্তবিতস্তি তনু আমি, আর কোথায় আপনার ঐ ঈশ্বরতা যার রোমকূপের পথ দিয়ে পরমাণু-তুল্য অমন কত যায় কত আসে পরার্দ্ধ সংখ্যক সৃষ্টি।

মায়ের পেটের মধ্যে শিশু যদি পা ছোঁড়ে তাতে জননীর কাছে অপরাধী হয় না শিশু। হে বিষ্ণু, আপনার উদরের মধ্যেও রয়েছে এই বিশ্বনিখিল জীব-ঘটা। অতএব আপনিই জগৎ-প্রসবিতা। আজ আমার প্রত্যক্ষ হয়েছে এই অনুভব।

আপনার জলশায়ী ও ভাগবত তনু থেকে যেহেতু আমি সত্তা লাভ করেছি, সেইহেতু আমারও আপনি পিতা। পুত্রেরা যদি অসৎ হয়, অপরাধও যদি করে তাদের কখনও পরিহার করেন না পিতা। স্বভাবতই বাৎসল্যকুশল হন পিতা।

নিখিল দেহধারীদের আপনি আত্মা, তাই নর-সমাজের আপনি অয়ণ। ঐ শব্দশক্তির বৈশিষ্ট্যেই আপনি নারায়ণ। অতএব হে অধীশ, আত্মজ হলেও আমি আপনার আত্ম-ভব। করুণা করুন হে প্রভু, ক্ষমা করুন আমার অপরাধ। অনন্ত আপনার ধৈর্য্য।

হে ভগবন্, জলশায়ী আপনার তনু,—এ কথা পরম সত্য। কিন্তু সেই তনুই যে নিয়ত সলিল-পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে এমন তো না-ও হতে পারে। তারপর আমি তো আপনাকে একবারই দেখেছিলাম, আরতো দেখা পাইনি। সেও আপনারি কৃপা আপনারি অকৃপার মহিমায়।

প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কেমন করে আপনার জননী আপনার জঠরের অভ্যন্তরে থেকে দেখতে পেলেন এই বিশ্বজগৎ? উত্তরে বলব,—হে অধীশ, এই বাইরের জগৎ অসৎ বলেই প্রতিভাত হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য, আপনার জঠরগত জগতের অসৎ-প্রতীতি নেই। কোথায় ঘন-চৈতন্য আর কোথায় জড়-প্রলেপের সম্ভাবনা!

আপনার জঠরবর্ত্তী যে জগৎ স্ব-সহিত এখানে আপনি দেখেছিলেন, সে জগৎ এই বহির্জগতের প্রতিবিম্ব হতে পারে না।

যদি হয়, তাহলে এই জগৎ আপনার উদর-গত জগতের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে। যেন আর সে মায়িক নয়। দর্পণে কি দর্পণ দেখা যায়? হে অসীম কৃপাময়, অনিবার্য্য আপনার এই বিনোদকলা।

আপনি নিজে যেমন জ্ঞানরসৈকময় বিগ্রহ গ্রহণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন, তেমনি ঐ বাছুর ও রাখালেরাও হে বিভু, জ্ঞানরসৈকময় মূর্ত্তি নিয়ে একে একে আবির্ভূত হয়েছে। যদি তাদের জড়ত্বের প্রমিতি থাকে তাহলে তারাও মায়িক। তাদের জড়ত্ব স্বীকার করা অনুভবসিদ্ধির বিরুদ্ধ।

অতএব, দৃশ্যমান এই সব কিছুই আপনি কোনো সম্প্রসারণ (ইয়ত্তা)। আপনার ঐ ত্রিভুবন-মোহন ঐশ্বর্য্য তাই এত নিরুপম। মানবতারূপ বলে নয়, ঘনরসচিন্ময় বলেই বহুবিধ হন আপনি। অন্য যোগীদের ও আপনার মধ্যে এইখানেই মহান্ ভেদ।

প্রথম আপনি এককরূপেই সত্তাবান হয়েছিলেন, তারপরে আপনিই হলেন বহু, তারপরে আপনিই আবার হলেন এই সচর এই বাছুর। আমি উৎপন্ন হয়েছিলেম চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে, প্রতি জীব আমার স্তুতি পেয়েছে। কিন্তু আপনি সেই একই রয়ে গেছেন। এও আপনার কৌতুক, কুহক নয়।

আপনার এই পদবী যারা অবগত নন, তাঁদের মনঃকুহরে আপনি পৃথক পৃথক রূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকেন। সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী একক আপনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এইটিই হে ঈশ্বর, আপনার কুহক।

সুর-মুনি-মানবদের মধ্যে আপনার বামনাদিরূপে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাধুদের হিতসাধন এবং অসাধুদের অহিতসাধন। সেই সমস্ত অংশতঃ হলেও হে বিভু, কুহক নয়। অবয়বীর অবয়বগুলি কি কখনও বিরূপ হয়?

হে নাথ, তুমিই পরাৎপর, তুমিই সকলশক্তি-কারণময়। পরমৈশ্বর্য্যশালী বলেই তুমি নিখিল ঈশ্বরদের শিরোমণি। দুর্ঘট তুমি ঘটাও, সুঘটও তুমি ঘটাও। আমার মত অধমের বাণীর বিষয় হতে পারে না তোমার মহিমা।

হে ভগবন, বস্তুতমের মধ্যে তুমি উত্তম, পরমাত্মনিষ্ঠ যোগীদের মধ্যে তুমি পরম। কে আছেন এমন এই পৃথিবীতে যিনি তোমার লীলা বুঝতে পারেন? এক কণাও কেউ পারেন না। কে জানে, কোথায়, কবে, কেমন করে, কতরূপে তুমি বিহার কর! তোমার ঐ যোগ-কলার বিস্তার মূলে শিব-ব্রহ্মারও অসাধ্য লীলা প্রকট করতে করতে বিহার কর।

হে ঈশ্বর, নিখিল জগৎ যদিও নশ্বর, বহুতর দুঃখপ্রদ এবং পরিণাম-বিরস, তবুও তোমার ঐ রসবোধনিত্য দেহে প্রকট হয়ে বিলাস করতে করতে জগৎও শাশ্বতিক হয়ে ওঠে—তোমার নিত্যধামের মতই।

তুমি অনন্ত পুরাণ-পুরুষ। নিজেই আত্মতেজোরাশির প্রসারণ মূলে নিগূঢ় ভাবে অধিরোহণ করে রয়েছ সমগ্র ঈশ্বর-ঘন। তুমিই ঘনসুখ, তুমিই চৈতন্য-রস, রসের বিলাসে তুমি বৈশিষ্ট্যময়। অসীম তোমার করুণা! তুমি কি কাউকে কটাক্ষ করতে পারো?

নিরুপাধি চিৎরসের আবেশে সৌন্দর্য্য নাচ'ছ তোমার দেহে। বিশ্বের তুমি উপাস্য। তাই তোমার মত গুণনিধির চরণকমলে

ভজন করে জেনে সুধীজনের মত নির্মলাশয়। সদ্গুরুর করুণায় তোমার ভজনা করেন তাঁরা।

তোমার চরণ-কমলের অনুগ্রহ লাভ ক'রে যাঁর নির্মল হয়েছে প্রজ্ঞা, হে প্রভু, সেই পরম সুকৃতিমান পুরুষই বিদিত হন তোমার নিজতত্ত্ব। কিন্তু যিনি নিগম-আগমাদি অখিল শাস্ত্র-বিচারণের মাধ্যমে তোমাকে জানতে চান, তিনি প্রজ্ঞাবান হলেও, সুনিপুণ হলেও মহান হলেও,—ব্যর্থ হন।

অনেক ভাগ্যের ফলেই এই সমস্ত জন্মেছে এই বৃন্দাবনে। যেখানে তোমার আপন জনেরও পায়ের ধুলো পড়ে সে স্থানও ধন্য হয়। কারণ তুমিই যে তোমার আপনজনের জাতি শীল কুল-মান ধন সব। সমগ্র বেদ তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমার চরণ-ধূলি। সে অনুসন্ধানের অবধি নেই।

হে প্রভু, আমারও যেন জন্ম হয় এই বৃন্দাবনে। এই মনুষ্য-যোনিতেই যেন জন্ম হয় আমার। যদি না হয়, তবে যেন এই বৃন্দাবনের তরুলতা পশু বা পাখী হয়েও আমি জন্মাই। তোমার চরণকমলসেবীদের অনুসরণ করে তবেই তো আমি নিরহঙ্কার হয়ে ভজনা করতে পারব তোমার চরণপদ্ম।

ব্রজবাসীদের কী অপূর্ব মহোন্নত সৌভাগ্য! যিনি বৃহৎ, যিনি চিৎ-রসময়-তনু, যিনি মহত্তত্ত্বের, অহংতত্ত্বের, এমন কি প্রকৃতিপুরুষেরও অতীত তিনি তাঁদের পরম সুহৃত্তম। এত নিরুপম হয়েও তুমি তাঁদের এত আপন।

বিশ্বের অতুলনীয়া এই সুদর্শনা গাভীদের কথাই বা কী বলব? ওরা ধন্য হয়ে গেছে। আপনি জগতের অধীশ হয়েও ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হয়েও, বাছুর ও রাখালময় তনু গ্রহণ করেও আশ্চর্য্য, গাভীদেরও পান করেছেন অত্যুৎকৃষ্ট দুগ্ধ।

ব্রজভূমে—যাঁরা মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করে রয়েছেন, জানি আমরাই তাঁদের ইন্দ্রিয়গ্রামের আশ্রয়স্থল। কিন্তু হে প্রভু, বিস্ময়ে হতবাক্ হতে হয় যখন দেখি, তারা পান করছেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের মধু আর আমরা লাভ করছি তার অবশেষটুকু।

একদিন স্তনে বিষ মাখিয়ে সুন্দর মাতৃবেশে আপনার কাছে এসেছিলেন পূতনা। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বকাসুরের সঙ্গে তিনি লাভ করেছিলেন আপনার শুভধাম। আর এই ব্রজবাসিগণ, যারা আপনাতে সমর্পণ করেছেন তাঁদের ধন জন জীবনাদি সমস্ত তাঁদের যে আপনি কী বর দেবেন, ভাবতেও লোপ পাচ্ছে আমার বুদ্ধি।

হে পরমেশ্বর, মনুষ্যের লোভ ক্রোধ মদ মাৎসর্য্য কাম ততক্ষণই মালিন্য ছড়ায়, মনুষ্যের গৃহও ততক্ষণই কারাগার হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে মানুষ আপনার চরণকমলে নিবেদন করে দিচ্ছেন তাঁর সেবা।

যাঁরা সুকৃতিমান, যাঁরা অতিবিদগ্ধ ধীমান, তাঁরা চিরদিন বিচার করুন আপনার মহিমা। তা নিয়ে আমাদের বিবাদ নেই। তাঁদের প্রতি আমাদের ঘৃণাও নেই। কিন্তু প্রভু, আমি শুধু এই জেনেছি, আমার এই দেহের এই হৃদয়ের এই বাণীর অগোচর আপনার মহিমা।

হে কৃপাবৎসল, এখন আমাকে অনুমতি দিন, আমি যাই সেই সত্যলোকে, যেখানে আপনারি কৃপাতেই চলেছে আমার পরমেষ্ঠীদের সৃষ্টি ব্যবসায়। আপনি এক-চিৎ, এক-রস, অখিল জগদাধার আপনি অন্তরবিৎ। এবং আমার হৃদয়ও আপনি জানেন। হে দেব, হে প্রভু, গ্রহণ করুন আমার প্রণাম।

৮৮। স্তব শেষে প্রস্থান করলেন স্বয়ম্ভু। এবং তৎপর চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ দেখতে পেলেন, সুবিমল ব্রজভূমিতে পূর্ব্বের মতই বাছুরের দল লাফাচ্ছে, নবতৃণাঙ্কুর খাচ্ছে, চরে বেড়াচ্ছে উদার আনন্দে।

৮৯। মনুজাকৃতি পরব্রহ্ম তখন চলন-সঙ্কেত দিলেন তাঁর বাছুরদের। কী কোমল, কী মধুর, কী গভীর সেই হাম্-হাম্ রাবী সঙ্কেত। আর সেই ধ্বনির ফাঁকে-ফাঁকে কী অপূর্ব সেই আলতো আলতো বাতাস বুলিয়ে ছড়ি ঘোরানোর নৈপুণ্য, সসম্ভ্রমে চলতে লাগল বাছুরের দল। তাদের মুখ থেকে ঝরে-পড়া অর্দ্ধচর্ব্বিত তৃণাঙ্কুরে খচিত হয়ে গেল বনতল। পাছু-পাছু চললেন নন্দদুলাল পূর্ব্বের সেই বনভোজনের স্থলে। ব্রহ্মমোহনের অব্যবহিত পরেই শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্তরমণীয় রহস্য দেখে হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না পরমোপযোগী যোগীরাও।

৯০। তাঁকে দেখেই সহচরদের কোথায় যেন মিলিয়ে গেল তাঁকে না-দেখার উৎকণ্ঠিত চিন্তা ও বেদনা। ক্ষণার্দ্ধ বলে তাঁদের প্রতীতি হল ঐ একটি বছরের অন্তর্ধানকে। সর্পদর্পহারী মুগ্ধচরিত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা চোখ মেলে দেখেন, আর তাঁদের মনের বিস্ময় বলে ওঠে—উঃ, সখার সত্যিই মহিমা বোঝা ভার, অতুল্য এঁর মহিমা। তাই তিনি নিকটে আসতেই তাঁরা ছুটে গিয়ে বললেন, শত্রুসৈনিক বিধ্বস্ত করে এলেন তো আমাদের সখা! আপনাকে ছেড়ে একটি গ্রাসও মুখে তুলিনি কিন্তু আমরা। বলতে বলতে তাঁরা যেন নিজেদের অধরেই ফুটিয়ে ফেললেন মাধুর্য্যের মঞ্জরী। চৌদিক থেকে তাঁরা তখন ছুটে এসে ঘিরে ফেললেন, ধরণীর ভারহরণকারী বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণকে।

৯১। মধুরতম বাণীর আস্তরণে তাঁদের হৃদয়গুলিকে ছেয়ে ফেলে প্রণয়ভরে দনুজদমন তখন বললেন—তোমরা চিরদিনই আমার প্রণয়লোভী। আমার উপর তাই আমার সখাদের ভালবাসা—সৌরভের মতই এত হৃদয়হারী।

বলতেই এক পলকে যেন খণ্ডিত হয়ে গেল সখাদের অখিল তারা। লতার বলয়-পরা তাঁদের হাতগুলি অধীর আবেগে ধরে ফেলল শ্রীভগবানের করকমল। তারপরে তাঁরা যখন সমস্বরে বলে উঠলেন, এবার ভাই তাহলে শেষ করে ফেলা যাক বনভোজনের ভোজ। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার ওপারে চল যাই।

তখন তাদের কৌতুক বোধ করলেন নন্দদুলাল এবং আনন্দে আনন্দ মিলিয়ে বলে উঠলেন—

"তাহলে এখন বনভোজন উৎসবের পরিসমাপ্তি করা হউক।"

৯২। যখন শান্ত হল সকলের ভোজন-রসিকতা, তখন আকাশে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। বিলাস করে খেলে অলস হবেই অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণেরও হল তাই। তিনি প্রয়োজন বোধ করলেন ক্ষণকাল বিশ্রামের। খেলায় খেদ মিটিয়ে খররোদ থেকে সরে এসে আশ্রয় নিলেন প্রচ্ছায়-শীতল তরুমূলে। গলায় বনফুলের উদার হার, সহচরের উরুমূল মাথার বালিশ শুয়ে পড়লেন, তিনি যেন লুটিয়ে পড়ল শ্রীমতী রমণীয়তা দেবীর সর্বস্বধন।

৯৩। ক্রমে গগনাঙ্গনে দেখা গেল—পশ্চিম দিগ্বধূর মুখ অস্তরাগ-রঞ্জন অবলোকন করে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সূর্য্যদেব। প্রথরের এমনি মহিমা তাঁরি গৃহে আতিথ্যের আশায় পা বাড়ালেন দিনমণি। বিশ্বতাপনবিধি স্থগিত হওয়ায় অসন্তোষে মলিন হয়ে গেলেন কমলিনী।

ক্রমে যখন সূর্য্যবিম্বটিকে দেখতে হল—গগন-পারাবার-পাড়ি-দেওয়া একক খেয়ানৌকার মত, তখন দিগ্বলয় ধ্বনিত হয়ে উঠল বেণু-বিষাণের ধ্বনিতে। ঘরমুখী হল সহচরদের উদাসী মন। হৃদয়রাজকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সকলেই ডাক দিয়ে দিয়ে জড় করে ফেললেন বাছুরদের। আনন্দের আবেগে ব্রজের দিকে তাঁরা ধেয়ে চললেন, শ্যামল মেঘের সঙ্গে যেমন ভেসে চলে শ্রাবণ মাসের দিনগুলি।

যেতে যেতে পথের বাঁকে তাঁরা দেখতে পেলেন সর্পাসুরের পূর্ণবিস্তার শরীর। সেই শরীর দেখে তাঁদের সীমা রইল না কৌতুকের। হেসে হেসে বলাবলি করতে লাগলেন—

"কী আশ্চর্য্য, কী অদ্ভূত, বুঝলে হে, এটি এবার আমাদের মনোজ্জ্বল ক্রীড়াগহ্বর হয়ে রইল।"

ঔষধের মত যিনি ব্যথাহরণ, সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে নিয়ে তাঁরা সকলে উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজপুরের উপান্তে।

৯৪। এবং সেখানে এসে পৌছতেই অবাক কাণ্ড, মন্থর হয়ে গেল সমস্ত বাছুরদের গতিবেগ! মাতৃস্তন্য পান করবার আশায় তাদের সামনের পা-গুলি এগিয়ে ছুটতে চায়, কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব, তাদের যে পিছনে আসছেন—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, যিনি রণজয়ী খেলোয়াড়। তাই তাদের পিছনের পাগুলো যেন পিছিয়ে থাকতে চায়।

একদিকে ত্বরা, অন্যদিকে অত্বরা, দুয়ের মাঝখানে পড়ে সহজেই মন্থর হয়ে গেল তাদের গতিবেগ।

৯৫। ব্রজপুরে প্রবেশ করেই ব্রজেন্দ্রনন্দন বাজিয়ে দিলেন তাঁর মুরলী। আধো আধো মধুর মধুর সেই মুরলীরবের মধুধারা যেন ভিজিয়ে দিয়ে গেল ব্রজবাসীদের কান, যেন বিলিয়ে দিয়ে গেল এক তৃপ্তিগাঢ় আহ্লাদের অন্তহীন মধুরতা। প্রাণের মতই শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করলেন ব্রজবাসীদের দেহে। স্নেহাতিশয্যে গলে গেল শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার হৃদয়। মুরলীরবের গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা নেমে এলেন প্রস্তোলীতলে।

৯৬। চরাচরগুরু দনুজদমনের এই বৎসরব্যাপী কীর্ত্তিটি সত্যিই সহচরেরা মনে করেছিলেন—যেন আজই সব ঘটেছে। তাই তাঁদের গায়ের ধুলো যখন ঝেড়ে দিতে লাগলেন জননীর দল, তখন অনন্ত আহ্লাদে তাঁরা বলে যেতে লাগলেন—

"জানো মা, আজ এক ভীষণ মজার কাণ্ড করেছেন আমাদের সখা। সে সে কাণ্ড নয়, মানুষের চোখ কপালে ওঠে, আশায় হাসিও পায়। অসম সাহস। ভীষণ মজা। বিষম বিষ। আগুনের মত হল্কা। আমরা তো সবাই পুড়ে মরেছিলুম। সখাই আমাদের টপ করে বাঁচিয়ে ফেললেন। একটি ফোস্কাও পড়েনি গায়ে। চতুরদের শিরোমণি বটে।" বৎসরা যাঁদের কাছে ঋণ, বৎস-পালনে যাঁরা সুনিপুণ, সেই সব রাখালশিশুরাও তাঁদের মায়েদের কাছে আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করতে লেগে গেলেন অঘকার অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা।

৯৭। ঘোষরাজের দক্ষিণ-করের আদেশ পেয়ে রাজোচিত পরিচ্ছদ হাতে নিয়ে এগিয়ে এল পরিচারকের দল। অরুণ-নয়ন সুচারু-বয়ান কীর্ত্তিমহান প্রভু তনয়কে তারা স্নানপানাহারাদির সেবা দিয়ে, দূর করে দিল তাঁর দৈহিক খেদ।

মা যশোদা তখন ছেলের সর্বাঙ্গে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, এত গণগণে রোদে পোড়া কি আমার ছেলের সয়? শিরীষফুলের মত তুলতুলে তোর গা, লক্ষী চাঁদ আমার, আর বাসনে রোদে খেলতে। ঘোষরাজ তখন বিশ্রামের আদেশ দিলেন পুত্রকে।

৯৮। যাঁর ভাব ও লীলা সহস্র অধ্যবসায়ের ফলেও অপ্রণিধেয়, যোগীন্দ্রবৃন্দের অসাধ্যকর্মও যিনি অবলীলাক্রমে সাধন করে বসেন, সেই শ্রীভগবান যখন গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করেছেন, তখন ব্রজনাথ সাহসে বুক বেঁধে এবং বেশ একটু উৎসাহভরেই মহিষীকে বললেন—

৯৯। বলি ও কৃষ্ণের মা, দাসদাসী আর সাজপোষাকের মতই কৃষ্ণের জন্যে এবার একটি আলাদা বাড়ী তৈরী করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ এই কথা শুনে হেসে ফেললেন শ্রীকৃষ্ণজননী। বললেন—কত দিনেরটি আর হয়েছে। এই তো সেদিন জন্মাল। নিজের গায়ের লালা এখনও নিজে মুছতে পারে না। কোল খালি করে আমি থাকতে পরাব না।

১০০। অতি কোমল এবং অমল ভাষায় ব্রজরাজ বললেন—মহিষী, তুমি বুঝতে পারছ না। এখনও তুমি তো বিজ্ঞা হয়ে উঠনি। অবিজ্ঞদেরও একটি সামান্য অভিমানসুখ থাকে। ছেলে জন্মালেই সম্পন্ন বাপ-মা চায়, ছেলের ধন হবে বাড়ী-ঘর-দোর হবে। এও তো একটা সুখ। কোল খালি হবে কেন তোমার এতে?

মুচকি হেসে চুপ করে রইলেন জননী। তূষ্ণীর অর্থই—অনুমোদন। অতএব আনন্দে ভরে উঠল মহারাজের মন।

পরের দিন থেকেই তিনি কৃষ্ণের জন্যে নিজ প্রাসাদতুল্য আর একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাতে উদ্যোগী হয়ে উঠলেন।

রাজপুরীর সংলগ্নেই গড়ে উঠল কৃষ্ণপুরী।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৌমার-লীলা বিস্তারে বৎসক-বকাঘাসুর-বধ-পুলিনভোজন ব্রহ্মমোহনো নাম সপ্তমঃ স্তবকঃ।

[ক্রমশঃ।

"Some books are to be tested others to be swallowed, and some to be chewed and digested."

—*Francis Bacon*

বিজ্ঞান বার্তা

রকেট ও মহাশূন্যচারী যান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। দুস্তর মরুদেশ, অতল সমুদ্রগর্ভ, হিমশীতল মেরুপ্রদেশ প্রকৃতির রহস্য আজ আর মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয়, কিন্তু অসীম রহস্যময় মহাকাশ আজও মানুষের মনে অপার বিস্ময়ের অনুভূতিই শুধু এনে দেয়। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার শক্তি ও সাধনা কেন্দ্রীভূত করল মহাশূন্য সন্ধানে। রকেট আবিষ্কার এ কাজে মহাসহায়ক হল। অবশ্য এই সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল আরও পূর্বেই। বিমান নির্মাণশিল্পের সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের ওপর অর্পিত হল নতুন দায়িত্ব। মহাশূন্যচারী যাননির্মাণে তাঁদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি কাজে লাগল। তাঁরা দেখলেন বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্রের মূল কৌশলগুলি এই নভোচারী যানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যাই হোক, রকেট-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল, তাঁদের একনিষ্ঠ চেষ্টায়।

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে সুরুতেই এই প্রশ্ন ওঠে যে, রকেট কি? রকেটকে কি ক্ষেপণাস্ত্র বলা যায়? মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, যে অস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় তাকেই ক্ষেপণাস্ত্র বলা যায়। তাহলে এই অর্থে রকেটকেও তো ক্ষেপণাস্ত্র বলা চলতে পারে? কিন্তু আধুনিক সমরবিজ্ঞান অনুসারে ক্ষেপণাস্ত্র হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংচালিত। এই অর্থে রকেট মাত্রেই ক্ষেপণাস্ত্র নয়, কারণ বহু রকেট অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় না। আবার অনেকগুলি রকেটই পরিচালিত হবে মানুষের দ্বারা, কাজেই সেগুলিকে স্বয়ংচালিতও বলা চলবে না।

সকল ক্ষেপণাস্ত্রকেও রকেট বলা যায় না। কারণ, আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলি রকেটচালিত, এগুলিকে অবশ্য রকেট নামে অভিহিত করা যায়। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেপণাস্ত্র জেটচালিত। প্রশ্ন উঠবে, জেট ও রকেটের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? জেটগুলি তাদের জ্বালানি প্রজ্বলিত করার জন্য বাতাসে যে অক্সিজেন রয়েছে তা ব্যবহার করে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, শূন্যে আবহমণ্ডলে যতদূর পর্যন্ত অক্সিজেন পাওয়া যায় জেটগুলির ঊর্ধ্বগতি সেই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু রকেট তার নিজের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ইত্যাদি নিজেই বহন করে। কাজেই মহাশূন্যে যেখানে যেখানে অল্প বাতাস আছে অথবা আদৌ বাতাস নেই, রকেটগুলি সেখানেও কর্মক্ষম থাকে।

আধুনিক কালে এই রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে সত্য, কিন্তু বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বেও যে এগুলি মানুষের কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল না তার প্রমাণেরও অভাব নেই। বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ) মহাশূন্যের মানচিত্রাঙ্কনবিদ্যার প্রবর্তন করার দু'শতাব্দী পূর্বে স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংচালিত রকেট জাতীয় অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

নির্ভরযোগ্য প্রাচীনতম প্রমাণ যা পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় যে ১২৩২ সালে চীনারা কাইফাংফু নামক সহর অবরোধকালে মোঙ্গলীয়দের বিরুদ্ধে রকেট ক্ষেপণাস্ত্র বা "উড়ন্ত অগ্নিবাণ" ব্যবহার করেছিল। প্রায় ঐ সমসাময়িক কালেই ইউরোপে রকেট প্রবর্তিত হয়েছিল এবং তা মধ্যযুগীয় বিভিন্ন যুধ্যমান জাতির সামরিক বাহিনীর ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

অবশ্য আরও উন্নত ধরণের রকেট আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৭৮০ সাল নাগাদ এবং তা হয়েছিল ভারতেই। ১৭৯২ সালে মহীশূর যুদ্ধে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে রকেট ব্যবহার করে মহীশূরের টিপু সুলতান পরিস্থিতি তাঁর সৈন্যবাহিনীর অনুকূলে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৃটেনেও স্যার উইলিয়াম কনগ্রেভের কৃতিত্বে আরও দূরপাল্লার রকেট উদ্ভাবিত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রকেট ব্যবহারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮১২ সালের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী জাহাজ থেকে ম্যাকহেনরী দুর্গের ওপর রকেট নিক্ষেপ করেছিল। এর ঐতিহাসিক প্রমাণও রয়েছে ফ্র্যান্সিস স্কট কী-র লেখা কবিতায়।

১৮৩০ সাল নাগাদ উইলিয়াম হেল নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক রকেটের প্রান্তভাগে পাখনার মত বস্তু জুড়ে দিয়ে রকেটগুলিকে আরও মজবুত করে তুললেন। পরবর্তী বিশ বছরে এর আরও উন্নতি হল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের গবেষণার ফলে ক্ষেপণাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট যদিও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে সরাসরি কোন গবেষণা করেন নি, তবে ব্যোমযান নিয়ে তাঁরা যে গবেষণা করেছিলেন ক্ষেপণাস্ত্রের অগ্রগতির পথে তা প্রচুর সহায়তা করেছিল।

নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করল ১৯১৫ সালে। এর মূলে ছিল মার্কিণ নৌবাহিনী ও একটি বেসরকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের যৌথ প্রচেষ্টা। "শূন্যচারী টর্পেডো" নামে অভিহিত এই ক্ষেপণাস্ত্র একটি পূর্বনির্দিষ্ট পথেই বিচরণ করত। পরে এর পরিচালনার জন্য বেতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিণ সৈন্যবিভাগ "বাগ" নামে বেতার-নিয়ন্ত্রিত চালকবিহীন বিমান নিয়ে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা-কার্য্য চালায়। পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এর ফলে বেতার-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলেছিল, অবশ্য এর অধিকাংশই প্রধানতঃ বিমানের স্বার্থেই করা হয়েছিল। বেতার-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম যুগে পিষ্টন ইঞ্জিন ব্যবহার করা হত। তার পর আতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে টার্বোজেট ইঞ্জিন সংযুক্ত হল। বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে গ্রেট বৃটেনের ফ্র্যাঙ্ক হুইটল্ ও জার্মাণীর হ্যান্স ভন ওহেন এই টার্বোজেট ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন।

১৯১৩ সালে ফ্রান্সে র‍্যামজেট ইঞ্জিনের পেটেন্ট দেওয়া হয়। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ দিকে ও চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে ফ্রান্স ও হাঙ্গেরীতে র‍্যামজেট ইঞ্জিন সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল, তবে তা বিশেষ ফলপ্রদ হয় নি। প্রথম সাফল্যজনক র‍্যামজেট আবিষ্কার করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। এর কৃতিত্ব জন্‌স্ হপকিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা গবেষণাগারের। ১৯৪৫ সালে পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন হয় ও তা সফল হয়। আধুনিক রকেটের গবেষণা শুরু হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে। ঐ সময় ডাঃ রবার্ট গডার্ড এমন একটি নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী কঠিন জ্বালানি আবিষ্কার করলেন যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না।

কিন্তু ডাঃ গডার্ডের অনুসন্ধিৎসা এখানেই শেষ হল না। আরও অধিক শক্তির জন্য তিনি অবিরাম গবেষণা চালিয়ে গেলেন। মহাশূন্যযান চালানার উপযোগী জ্বালানির সন্ধানে তাঁর দৃষ্টি পড়ল তরল জ্বালানির প্রতি। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে তিনি তরল জ্বালানি চালিত রকেট মহাশূন্যে প্রেরণ করলেন। এটিই বিশ্বের সর্বপ্রথম সফল রকেট যা তরল জ্বালানি দ্বারা চালিত হয়েছিল। জার্মানরাও অনুরূপ গবেষণা চালাচ্ছিল এবং তারাও ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করে।

জার্মাণরা ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে সর্বাধিক উন্নত হয়েছিল সত্য, তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাদের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল না। জাপানী বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। রকেটের ক্ষেত্রে তাঁদেরও কিছু অবদান আছে।

জার্মাণীর মত অতখানি উন্নত না হলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নিয়ন্ত্রিত অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কিছু গবেষণা করেছে।

জার্মাণ বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এই উভয় দেশের বিজ্ঞানীরাই যুদ্ধোত্তরকালে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন।

মার্কিণ বিমানবহর ১৯৪৬ সালে আন্ত-মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করে, কিন্তু ১৯৪৭ সালে প্রতিরক্ষা দপ্তরের বাজেট ব্যাপক হ্রাসের ফলে এ কাজের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে। অতঃপর একটি বিমান কারখানা গবেষণার উদ্দেশ্যে স্বীয় অর্থে এ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

১৯৫০ সালের পর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে আমেরিকার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরিকল্পনা নানা কারণে যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে। এখন মহাশূন্য সন্ধানে আমেরিকার যে গবেষণা চলছে ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলী সেই কাজে অনেকখানি সাহায্য করছে।

রকেটগুলি কি ভাবে কাজ করে

রকেটগুলির তীব্র গতিবেগ আসে কোথা থেকে আর কি ভাবেই বা এগুলি মহাকাশে উত্থিত হয়? প্রশ্নটি খুবই সরল, কিন্তু সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এমন ভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রকেট ইঞ্জিনীয়ারগণও হিমসিম খেয়ে যা'ন।

আইজ্যাক নিউটনের আবিষ্কৃত সূত্রটি আমাদের সকলেরই জানা আছে। সূত্রটি হল, প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানের এই মৌলিক সূত্রই রকেট নির্মাণের
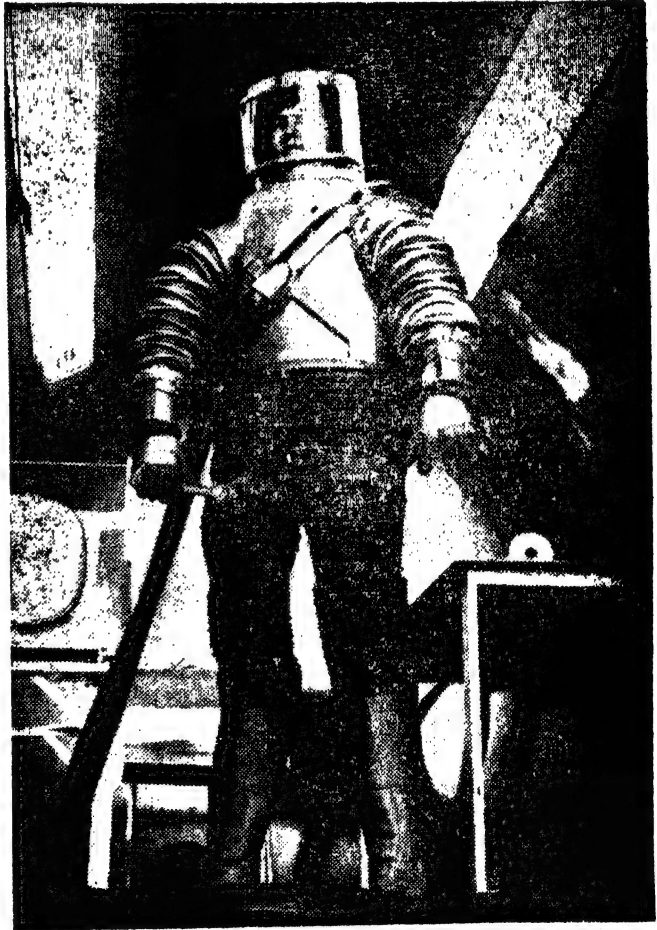
স্পেস সুট—এই স্পেস সুট নামক পোষাকটি লিটন ইনডাসট্রিস ভ্যাকুয়াম লেবরেটরিতে পরীক্ষিত। এই সংরক্ষক পোষাকের উপরকার অংশটি হস্ত এবং বাহু সঞ্চালনের যোগ্য করিবার জন্য খুলিয়া রাখা হইয়াছে

ভূমিতে। জ্বালানির দহনের ফলে উষ্ণ গ্যাস প্রবলবেগে সম্প্রসারিত হয় এবং রকেটের একটি নির্গমন পথ দিয়ে তীব্রবেগে নির্গত হয়। যে ক্রিয়ার ফলে এই গ্যাস পিছন দিকে ধাক্কা খায়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা রকেটটিকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রকেটাভ্যন্তরস্থ গ্যাস রকেট থেকে নির্গত হয়ে পিছনে বাতাসে ধাক্কা দেওয়ার ফলে রকেটটি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে যে চলতি ধারণা আছে তা যথার্থ নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এই গ্যাস রকেটটিকেই ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। বিমানাকার রকেটে এই ধাক্কার শক্তি পাউণ্ডে নয়, টনের ওজনে পরিমাপ করা হয়। পিছনে বাতাসেও রকেটাভ্যন্তরস্থ গ্যাস ধাক্কা দেয়, তবে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ নির্গত গ্যাসের বেগ কমিয়ে দেওয়াই এই বাতাসের কাজ, অর্থাৎ এই গ্যাস রকেটকে সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য যে ধাক্কা দেয়, বাইরে বাতাস থাকায় সেই ধাক্কার বেগ প্রশমিত হয়। তাই যেখানে বাতাস নেই রকেট সেখানে ভালভাবে চলতে পারে। রকেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যীন জেট ইঞ্জিনে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এ নিজেই বহন করে নিয়ে যায়, কাজেই আবহমণ্ডলে যেখানে বাতাস নেই সেখানেও এগুলি অকেজো হয়ে যায় না।
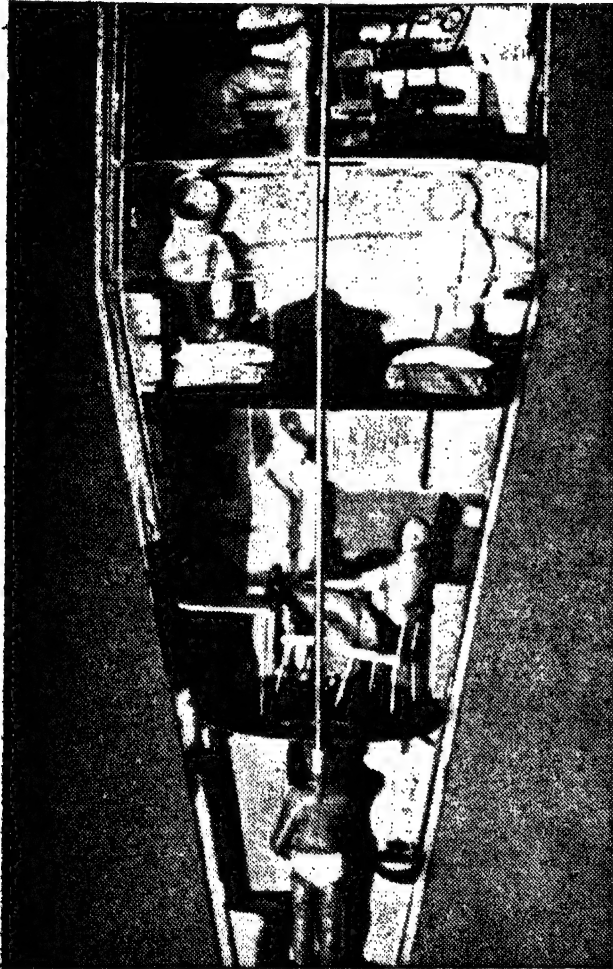
চার জনের উপযুক্ত স্পেস ষ্টেশন। জেনারেল ডিনামিকসের কনভেয়র ডিভিসন নামক এটলাস ইনটার কনটিনেণ্টাল ব্যালিষ্টিক মিসাইলস নামক ক্ষেপণাস্ত্রের প্রস্তুতকারক পৃথিবী হইতে চার শত মাইল উপরে এই স্পেস ষ্টেশন পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করিবেন।

রকেটের কঠিন জ্বালানি ও কোন কোন তরল জ্বালানির মধ্যেই অক্সিজেন থাকে। সুতরাং অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেই তা প্রজ্বলিত হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ তরল জ্বালানির মধ্যে অক্সিজেন নেই, যেমন অ্যালকোহল ও গ্যাসোলিন। এক্ষেত্রে তরল অক্সিজেন সরবরাহ করতে হয়। সুতরাং তরল জ্বালানি বিশিষ্ট অধিকাংশ রকেটের মধ্যেই দু'প্রকার তরল পদার্থ রয়েছে—একটি জ্বালানি ও একটি অক্সিডাইজার।

প্রজ্বলিত জ্বালানি গতি সঞ্চালক যন্ত্র বা মোটরের দহন কক্ষে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বৎসরে আয়ন-মণ্ডলে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের জন্য এই ধরণের উচ্চচাপ বিশিষ্ট তরল জ্বালানি রকেট ব্যবহার করা হচ্ছে।

এরূপ তরল জ্বালানি রকেটের দহনকক্ষে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে ধাতু ও অনেক মৃৎপাত্রও বিগলিত হতে পারে এবং রকেটাভ্যন্তরস্থ গতিসঞ্চালক যন্ত্রের বা মোটরের গাত্রাবরণ শীতল করার কোন ব্যবস্থা না থাকলে একটি রকেট মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যই এই তাপ সহ্য করতে পারে।

বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে যুগপৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও জার্মাণীতে এর প্রতিকার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এর কৃতিত্বলাভ করলেন জেমস ওয়াইল্ড। ইনি পূর্বে রিঅ্যাকশন মোটরসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ওয়াইল্ডের পদ্ধতি অনুসারে গতিসঞ্চালক যন্ত্রের গাত্রাবরণ দ্বিগুণ পুরু হল।

রকেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য এর স্বয়ংক্রিয় পরিচালন ব্যবস্থা। রকেটের মধ্যে কোন চালক থাকে না, থাকলেও মানুষের পক্ষে রকেট চালনা সম্ভব নয়। কারণ যে

দ্রুততার সঙ্গে রকেট নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কোন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। রকেটের মধ্যে স্থাপিত জাইরস্কোপ যন্ত্রই রকেট পরিচালনার কাজ করে। জাইরস্কোপ প্রদর্শিত পথে রকেট চলতে থাকে। চলার পথে রকেট কোন সময় যদি তার নির্দিষ্ট গতিপথ পরিবর্তন করে তাহলে জাইরস্কোপ তার সেই ভুল সংশোধন করে এবং গতি সঞ্চালক যন্ত্রকে সংবাদ দেয় যাতে এই ত্রুটি সংশোধন করে রকেটটিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা হয়। জাইরস্কোপ হচ্ছে রকেটের মস্তিষ্ক, আর মোটরটি হচ্ছে তার মাংসপেশী।

মহাশূন্য সন্ধান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে কারিগরি বিজ্ঞান দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকায় বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাতাদের ওপর একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ল এই দায়িত্ব হল মহাশূন্য সন্ধানের কাজে সহায়তার জন্য মহাশূন্যচারী যান নির্মাণ করা।

বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের কাজে পঞ্চাশ বৎসরাধিক কালের অভিজ্ঞতায় যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল তা থেকে এই নতুন কাজে অমূল্য সহায়তা লাভ করা গেল। কারণ বিমান ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের মূল উপাদানগুলি প্রায় একই।

অবশ্য গবেষণা যত এগিয়ে চলবে এই উপাদানগুলিরও বহুল পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। মনুষ্যচালিত প্রথম মহাশূন্যযান আধুনিক জেট জঙ্গী বিমানের প্রায় অনুরূপ, তবে মানুষ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের যত গভীরে প্রবেশ করবে ততই এই মহাশূন্যযানের গঠন, পরিকল্পনা ও পরিচালন যন্ত্রপাতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।

কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, চন্দ্রে রকেট প্রেরণ, সূর্যবেষ্টনকারী উপগ্রহ, এ সমস্তই নিঃসন্দেহে আধুনিক বিজ্ঞানের অতুলনীয় অবদান, কিন্তু মহাশূন্যের বিশালত্বের কথা বিবেচনা করলে এই অবদানও তুচ্ছ বলে মনে হবে।

মহাশূন্য বিজয়ের কথা মানুষ যখন বলে তখন সে অনেক কিছুই চিন্তা করে। যে সৌরজগৎ অবিরাম সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, আমাদের পৃথিবী সেই সৌর জগতের পঞ্চম বৃহত্তম গ্রহ। সূর্যের এই মাধ্যাকর্ষণের বলেই সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এরূপ দূরপ্রসারী যে ৩৬৮ কোটি মাইল দূরবর্তী প্লুটোকেও সে সৌরমণ্ডলের মধ্যে আকর্ষণ করে রেখেছে। সূর্য থেকে সব থেকে দূরবর্তী গ্রহ হল প্লুটো, আর সব থেকে নিকটবর্তী হল বুধ গ্রহ। সূর্য ও বুধের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ হল ৩,৬০,০০,০০০ মাইল।

এই দুটি গ্রহ "ছায়াপথ" নামে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। ১০,০০০ কোটি নক্ষত্রের সমবায়ে গড়ে উঠেছে এই ছায়াপথ। এর আয়তন এত বিশাল যে আলোকের গতিতে অগ্রসর হলে ছায়াপথ পরিক্রমায় লাগবে এক লক্ষ বৎসর। আমরা জানি, আলোকের গতি হল সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ বিরাজ করছে এই ছায়াপথ তাদেরই অন্যতম।

আমাদের নিজেদের সৌরমণ্ডল অনুসন্ধান করলেই দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা জন্মায় তা আমাদের কল্পনার বাইরে। পৃথিবীর
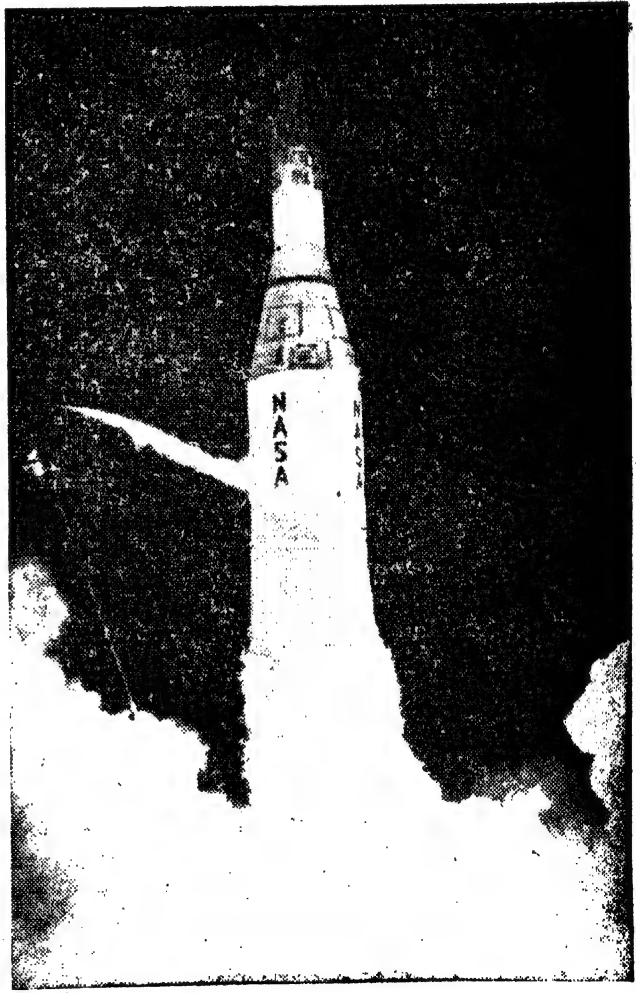
জুনো ২নং—যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর প্রথম অন্তরীক্ষ সন্ধানী যন্ত্র: যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হইতেছে

সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্রের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ২,৫৭,০০,০০০ মাইল। আলোকের গতিতে ভ্রমণ করলে এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে অবশ্য মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে, কিন্তু মানুষের আকাশযাত্রায় এ পর্যন্ত সর্বাধিক যে গতিবেগ অর্জন করা গেছে তা হল সেকেণ্ডে ৭ মাইল। এই গতিতে ভ্রমণ করলে ঐ পথ অতিক্রম করতে তিন মাসকাল সময়ের প্রয়োজন হবে।

মনুষ্যচালিত কোন মহাশূন্যযানকে এই পথ পাড়ি দিতে হলে তার যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কতখানি কারিগরি পরিপূর্ণতা প্রয়োজন হবে তা চিন্তা করে দেখার বিষয়। দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট গতিবেগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা, মহাশূন্যে বস্তুনিচয়ের সংঘাতে বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাতে বৈমানিকের কোন বিপর্যয় না দেখা দেয়, সেজন্য বিমানের দেহটি আরও অনেক মজবুত করে গড়ে তোলা। আশ্চর্যরকম নির্ভুল পরিচালন ব্যবস্থা করা, বৈমানিকের জন্য বিমানের মধ্যেই পৃথিবীর অনুরূপ পরিবেশ গড়ে তোলা, এবং পৃথিবী থেকে কোনরূপ সহায়তা না পেয়েও বিমানের প্রতিটি অংশ যাতে দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে পারে, সেইরকম নির্ভরশীলভাবে বিমানটি নির্মাণ করা—এ সমস্তই কারিগরিবিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা সূচিত করে।

মহাশূন্য জয় করা যে সহজ নয় তা বলা বাহুল্য। মহাশূন্যসন্ধানে আংশিক সাফল্য লাভ করতে হলেও দীর্ঘ সময়, প্রচুর অর্থ এবং কারিগরি ক্ষেত্রে অক্লান্ত শ্রমস্বীকারের প্রয়োজন আছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সন্ধানের যে পরিকল্পনা মানুষ করেছে মানুষের কাছে তা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে আনন্দের কথা, শ্রমশিল্প, শ্রমশিল্পের মালিক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, সরকার সকলেই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে আর জনসাধারণের আগ্রহে ও সমর্থনে তা দ্রুত সাফল্যের পথে এগিয়ে চলেছে।

শেষের কবিতা

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

রাতের কবিতা শেষ করে দাও কবি,
বনঘাসে ঝরে যাক্
আধফোটা ফুলের মঞ্জরী
গন্ধরাজের কান্না ছড়াক
শেষ রাতের ছায়ায় তন্বী।

নিবিড় গভীর ঘুমে জড়িয়ে থাক্
অপরাহ্নের যত স্বপ্নের চকমকি
সাগরের বালুবেলায় পড়ে থাক্
কত শত ঝিনুকের খনি।

কালের তেপান্তর ছেড়ে, হে কবি,
মানুষের নির্ভুল গুহাচিত্র যতগুলি
সে ত' মুহূর্তের অসম্পূর্ণ ছবি—
পাশবিক শিষ্টাচারে
আর প্রকৃতির ভূমিকম্পে
মনে হয় ভুল হয়ে গেছে কবিতার তুলি।

পিছনে পড়ে থাক অসম্মান, অপমৃত্যু
আর জীবনের যত কালি
ভীরু মনে তুল না কোলাহল
ভুল না জীবনের চোরাবালি।

রাতের কবিতা শেষ করে দাও কবি,
মধুমাস চলে যাবে, জগৎ মিথ্যের ছবি।

অভিজ্ঞান

শ্রেয়কণা রায়

এই নিঃসঙ্গ বাসী বিছানাটা রোজ শেষ রাত্রে
নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো আমায় মুঠি থেকে খুলে দেয়
সাদা চার দেওয়ালের বুকে।
মনে হয় তখুনি দম আটকে আসবে
তবু বেঁচে থাকি সময়কে করাঙ্গুলে গুণে,
কখন সকাল আসবে, কখন কখন ?
নার্স আসে বিধবার বেশে, খাস্ত সাদা দুধ।
জীবনের রঙ যেন জলে-ধোওয়া তুলির আঁচড়।
মৃত্যুর কান্না শুনতে পাই না—রোগ তো কানেরও।
সেবিকার অর্থহীন হাসি আমার চোখে
কখনও ভুলে ছায়া ফেলে না—
চোখের চশমায় যে আর পাওয়ার বাড়ানো চলে না।
তবু মাঝে মাঝে পুষ্ট বুকের বোতামের দিকে
চাইতে চেষ্টা করি, সে ভাবে বুঝি জল চাইছি।
একটু একটু করে ঢেলে দেয়।
জোর করে দাঁত চেপে থাকি
পাশ দিয়ে পড়ে যাক সেই ভালো,
মুছিয়ে দেবে হাতে ধরে।
আঁচল নেই বিশ্রী পোষাক।
একদিন বাধ্য হয়ে উঠতে হলো
নইলে ওরা তাড়িয়ে দেবে।
অথচ আমার শুয়ে থাকাই ভালো।
স্নান করার ঘরটাতে গিয়ে কি দেখলাম—
ওরা কি আমায় মেরে ফেলবার চেষ্টা করছে !
দু' হাতে মুখ ঢাকলাম।
জানালায় একটা কাচ ফেটে গেছে
সেটা একটা কাগজ দিয়ে জোড়া—হলদে কাগজ।
হলুদের নাম মৃত্যু।

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

৬

এবার ঠিক করলেন পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের কোন বই পড়বেন। ওঁর আলমগীর নিয়েই শিশিরকুমার প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করেন। কাজেই ওঁর সম্বন্ধে মনে মনে হয়তো কিছু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু নাটক পড়ার সময় বললেন 'ভীষ্ম' পড়বেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ভীষ্ম পড়তে এলেন। এই সাত দিনের ভিতর অনেক দিনের পর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এখানকার সভ্যদের সঙ্গে 'বিজয়া' করেছেন। পুরানো পরিবেশে তাঁর অভিনয় দেখতে ভীষণ ভীড় হয়। প্রথমেই সেই কথা বললেন—ইনস্টিটিউটে খুব ভীড় হয়েছিল, তা দু-তিন হাজার লোক হবে, হাওয়া বেরোবার রাস্তা পর্যন্ত নেই, ভীষণ অবস্থা। বললুম—এ যে death trap করেছ। ঢাকায় একবার ঐ অবস্থায় একদিনে দুখানা বই করার পর অজ্ঞান হয়ে যাই। শেষ দৃশ্যে শেষ কথা বলার পরই আমাকে তুলে আনতে হয়, ডাক্তারও ডাকতে হয়েছিল। ঢাকায় আমি বেশ ভাল পয়সা পেয়েছি। ওখানকার ব্যবস্থা যিনি করতেন, ভদ্রলোকের নামটা মনে নেই, তাঁর সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল খরচ খরচা বাদ দিয়ে ৩০—৭০ ভাগ হবে। তা যা দিতেন তাই নিতুম, তবে তাও খুব কম নয়। একবার পাঁচ রাত্রির জন্যে 'রীতিমত নাটক' করতে গেছি, পাঁচ রাত করার পরও করতে বললেন।

বললুম—তা কি করে হয়? শনি রবিবার কোলকাতায় করবার কথা রয়েছে। তাতে বললেন—কত বেশী দিতে হবে?

কোলকাতায় তখন মোটে বিক্রী নেই, কাজেই কিছু বেশী দিতেই আরো তিন রাত করলুম।

সেটা ১৯৩৭-৩৮ সালের কথা। তখনও খুব বুড়ো হইনি। একদিনে তিন জায়গায় বক্তৃতা। তার মধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও একবার ছিল। তার পর ৬টা থেকে ৯টা, আবার ৯টা থেকে ১২টা দুটো নাটক করেছি। অবশ্য তার ফলে কষ্ট যা আমাকেই পেতে হয়েছে। কম বয়সীদের বিশেষ কিছুই হয়নি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভারী মজা হয়েছিল। আমায় আবৃত্তি করতে বললে। একটা কবিতা দু-চার লাইন পড়ার পর বললুম, এইটে বলবো? সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যা, হ্যা নিশ্চয়ই পড়ুন। বললুম—কোন বইতে আছে বল? তা সবাই চুপ। এমনি বার কয়েক হবার পর তখন যিনি ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন—মুসলমান ভদ্রলোক, নামটা বোধ হয় রহমান, হ্যা রহমান, বললেন, তুমি যা হয় আবৃত্তি কর, ওদের আর legpull কোরো না। সেদিনকার উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে মোহিতলাল, সুশীল দে এরা সব ছিল। এদের যে বইগুলো পড়া ছিল না এমন নয়। কিন্তু আসল কথা কি জান, হঠাৎ একটা কথা জিগ্যেস করলে সব নার্ভাস হয়ে পড়ে, তাছাড়া যে বইগুলো ছাত্রপাঠ্য সেগুলো ছাড়া অন্যগুলোর ভাল করে চর্চাই থাকে না।

অমল বাবুর স্মৃতিসভার সভাপতি হ'ল তারাশঙ্কর। তা নামকরা লোক না ডাকলেই বা চলে কি করে। আমাদের আবার এক এক নতুন রোগ হয়েছে, বছর বছর শ্রাদ্ধ করা। ওদের দেশে অমন হয়না, এক সেক্সপীয়রের ক্ষেত্রে ছাড়া। তা তারও করে টাকা পায় বলে।

ইস্কুলে পাঠশালে ভাল করে ছেলেমেয়েদের পড়ানো দরকার। এখন ত তারা কিছু শেখেনা। গিরিশবাবু নাটক লিখতে শুরু করলেন যখন আর নাটক পেলেন না। তিনি সব কিছু পারতেন ত। বিরাশীখানা নাটকের মধ্যে শেষ ১০ বছরে ৫ খানার বেশী লেখেননি। বাকী সাতাত্তরখানা ১৮৮২ থেকে ১৯০১ সালের মধ্যে লিখেছেন। তার মধ্যে কতকগুলো অবশ্য ভাল নয়।

একজন মন্তব্য করলে—প্রফুল্ল ত একটা অস্বাভাবিক বই।

বললেন—প্রফুল্লকে অস্বাভাবিক বলছ, অস্বাভাবিক কোনখানটা বলতে পারো? ঐ যে মন্দা মেয়েটা—কি নাম যেন, জগমণি না চিন্তামণি, হ্যা জগমণি অস্বাভাবিক, রমেশ ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যেলোকে ত ও মারতে চায়নি, but the leader is some time led, জগমণি কোম্পানীর জন্যেই ত মারতে গিয়েছিল। তাও শেষ পর্যন্ত বললে—দাও, এক ফোঁটা জল দাও।

এই সময় একটু আলোচনা হল, যার মূল কথা হল—সমাজের values যখন rapidly change করছে, তখন চিরন্তন নাটক রচনা সম্ভব নয়। সবায়ের কথা শুনে বললেন—তোমরা বলছ আজকের এই Changing values এর সময় চিরন্তন নাটক লেখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সেক্সপীয়র আজও Popular কেন? ওদের স্ট্রাটফোর্ড অন অ্যাভন এ এখনও এত টাকা আয় হয় যে কল্পনাও করা যায় না।

ওঁর অভিনীত 'জীবনরঙ্গ' নাটকটা সদ্য ছাপা হয়েছে, তার কথাতেই বললেন—জীবনরঙ্গ নাটক হিসাবে খুব ভাল কিছু নয়, কিন্তু অভিনয়ের সময় জমে। নাটকটা যেমন অভিনয় হয়েছিল, তেমন ছাপা হয়নি। ছাপাটা ত আর আমার হাতে নয়। কাটা বইটা আমার কাছেই ছিল, কিন্তু আমাকে ত বলেনি, তা হলে না হয় দেখে শুনে দিতুম। নাটকটা বড্ড বেশী ব্যক্তিগত।

—নাটক আর আজকের দিনে লেখা হচ্ছেনা। গিরিশবাবুর নাটক খুব ভাল নয় বটে, কিন্তু দ্বিজু বাবুর সামাজিক নাটক তার চেয়েও খারাপ। অথচ ওরকম নাটকই-বা লেখা হচ্ছে কই?

'জীবনরঙ্গের' নায়ক শচীন তার স্ত্রী চলে গেছে এই কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলছে বলে একজন অনুযোগ করলেন—ওখানটা কি সহজ করে বলা যেত না ?

বললেন—বৌ বেরিয়ে গেছে—বলতে পারলে কথাটা খুবই জোরালো হয়। তবে, বলতে না পারাটাও খুবই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে বৌ-এরা বের হয়ে যায় না, তাদের বের করে দেওয়া হয়। মোহের বশে আমাদের মেয়েরা ক'জন ঘর ছাড়ে ? বরং শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারে অনেক বেশী মেয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।

পশ্চিমের দেশে মানুষ Individualistic অনেক বেশী আর আমাদের দেশে family unit অনেক বেশী দৃঢ়। ওদের ছেলেমেয়েরা ১৭।১৮ বছর বয়েস হলে আর বাপের ভাত খায় না। আমাদের দেশের ছেলে সাঁইত্রিশ বছর বয়েসেও বলে,—এখানে বসে দাও, ওখানে বসে দাও। না বসে দিলে চলবে কি করে ?

একটু থেমে হঠাৎ বললেন—একটা নাটক লেখা উচিত মাঝবয়সী কোন মেয়েকে নিয়ে। সারাজীবন সে ত্যাগ স্বীকার করেছে স্বামী ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, এখন আর তার কোন কাজ নেই ; সে শুধু দুটো কথা শুনতে চায়, স্বামী ছেলেমেয়ের জন্তে যা করেছে তা যে তারা জানে, এইটুকুই বুঝতে চায়।

আর একটা নাটক লেখা যায়, একটি বুড়ো মানুষের নিঃসঙ্গতা নিয়ে। নিজের কথায় এলেন এবার—অভিনয় করার ঝোঁক আমার বরাবরের। তখনকার নাটকের production-এর দোষগুলো আপনা থেকেই মনে হয়েছে আর দূর করতেও চেষ্টা করেছি। কিন্তু পেশাদার মঞ্চে নামবো এ ইচ্ছে কখনো হয়নি। পেশাদার মঞ্চে নামাটা সম্পূর্ণ accidental.

আর একজন নিজে অভিনয় না করলেও অভিনয় বুঝতেন। অভিনয়ের দোষ-ত্রুটি বুঝিয়ে দিতেন, তবে মানুষটি বড় conservative ছিলেন। বিলেত-টিলেত যাওয়া পছন্দ করতেন না। স্বামীজির আমেরিকা যাওয়াও তাঁর পছন্দ ছিল না। অবশ্য বিবেকানন্দে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল না।

বরদার নাটক ত বেশ ভাল চলত। ওঁর একটা নাটক আছে, নাম বলব না—অপূর্ব। তাতে বেশী বয়েসের আমার জন্তে বেশ ভাল একটা পার্ট আছে।

এবার ভীষ্মের প্রসঙ্গে এলেন—ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম দ্বিজুবাবুর ভীষ্মের চেয়ে অনেক ভালো। দ্বিজুবাবুর পৌরাণিক বইগুলো কোনটাই আর আমার ভাল লাগেনি, এক পাষাণী ছাড়া। ওটাতেই অভিনয় করেছি। ভীষ্ম হিন্দু হোস্টেলে অভিনয় করিয়েছি, আর তখন ভাল লাগেনি বলেই ইনষ্টিটিউটে বা মঞ্চে অভিনয় করিনি। দুর্গা অনেকবার বলেছিল তাও করিনি (কারণটা অবশ্য বলব না)। ক্ষীরোদবাবুকে চালাতে পারলে খুব বড় নাট্যকার হতে পারতেন। সংস্কৃতও বেশ ভাল পড়া ছিল—কালী সিংহের মহাভারত পুরোপুরি কণ্ঠস্থ ছিল। তাই তো বলেছিলুম তুকের নরনারায়ণ লিখতে।

ওঁর নরনারায়ণ সত্যিকারের ভাল বই। অনেকে ভাবেন বাঁধী করছি। কিন্তু নরনারায়ণ নবটা আমার বাড়িতে বসে লেখা। ওখানে খাওয়া দাওয়া করতেন, বসে বসে লিখেছেন আর আমরা তিনজনে কেমন হয়েছে বলেছি। ওঁর লেখা পোষ্টকার্ড আমার কাছে আছে, বলেছেন—যা ভাল বোঝো কোরো।

হঠাৎ বললেন,—নতুন কপিরাইট আইনে কি গোলমাল বেটেছে! শরৎদার বই করা যাবে ?

আবার ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রসঙ্গে ফিরলেন—একবার আমরা পুরুলিয়া যাচ্ছি, উনি বললেন,—আমি ত' বাঁকুড়া যাব, আমার একটা টিকিট কেটে দাওনা ভায়া।

চললেন আমাদের সঙ্গে। গাড়ীতে খাবার হালুয়া টালুয়া চেয়ে খেলেন, তারপর বললেন—এ ত বেশ ভাল ব্যবস্থা, তা আমিও কেন তোমাদের সঙ্গে পুরুলিয়া যাইনা ভায়া। রাত তিনটের সময় বাঁকুড়ায় আর নামলেন না।

উনি ছিলেন আবার কৌল—তান্ত্রিক। আমারও তখন ঐ দোষই বল আর গুণই বল ছিল। সেদিন রাতে আমার থেকে ভাগ নিলেন। তারপর পুরুলিয়ায় নেবে সনতকে বললেন—দেখ ভায়া, আমার জন্তে একটু আলাদা নিরিবিলি জায়গা দিও, আর একটা বোতলের ব্যবস্থা কর—একটু মায়ের পুজো করবো। তোমরাও ভোগ পাবে।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮, ভীষ্মের শেষ অংশ পড়তে এলেন। প্রথমে ঘরে ঢুকেই বললেন—ঘরটায় ঢুকলেই কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ লাগে, অবশ্য হাওয়া বেরোবার রাস্তা নেইও। পুবদিকে একটা জানলা কর না কেন ?

বলা হল পেছনে বাড়ী আছে। একটু আশ্চর্য হলেন—পেছনে বাড়ি ? একটা গলি ছিল না ?

জানালাম গলিটা বাড়িটার পরেই। আপন মনেই বললেন—তা হবে। রাস্তা সব ভুলে গেছি। অথচ এককালে রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে বহুদিন ছিলুম।

এবার আমাদের বললেন—কলকাতা সহরটা ঠিকভাবে বাড়তে পেলোনা। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট করে প্রথমেই সাবার্বসে জমি কিনে বাড়ি-টাড়ি বানানো উচিত ছিল। তা নয়, প্রথমেই গেল বড়বাজার অঞ্চলে, সেণ্ট্রাল এভিনিউ তৈরী করতে।

দু-চারদিন আগে কাগজেই দেখেছিলাম অথবা নিজেদের মধ্যে তর্ক হয়েছিল—মনোমোহন থিয়েটার বর্তমান বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস প্রাঙ্গণে না সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর ওপর। ওঁকে এ সম্বন্ধে মধ্যস্থ মানা হল। বললেন—মনোমোহন থিয়েটার ছিল এখন যেখানে সেণ্ট্রাল এভিনিউ মিশেছে বিডন ষ্ট্রীটের সঙ্গে—তারই উত্তর অংশে। বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিসে ছিল বেঙ্গল ন্যাশানাল থিয়েটার।

ঐ-টাই একমাত্র থিয়েটার যা গিরিশবাবুকে বাদ দিয়েও চলেছে। ওরা বেশ পয়সাও করেছিল, বিশেষ করে এলোকেশীর গল্প নিয়ে নাটক লিখিয়ে।

ওটা ছিল ছাতুবাবুদের জমি, থিয়েটারটাও ছিল ওঁদেরই। ক্ল্যাসিক বাবার পর অমর দত্ত ওখানে কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন। ক্ল্যাসিক ছিল মনোমোহনের পুরোনো নাম, তারও আগে ওর নাম ছিল এমারেল্ড থিয়েটার।

আগের দিনই বোধ হয় ট্রাম কোম্পানী ভাড়া বাড়ানোর নোটিশ দিয়েছে, তারই প্রসঙ্গ তুললেন,—দেখ দেশাত্মবোধ আমাদের হয়নি। এই দেখ না, ট্রাম ভাড়া বাড়ানোর কথায় সরকারের ব্যবহারটা কেমন নীচতার পরিচায়ক। সরকার না জানলে কি ট্রাম কোম্পানী হট করে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারে ?

আমাদের এই দান পাওয়া স্বাধীনতার জন্যেই আমরা দেশকে বড় করে দেখতে শিখলুম না। একজন লোককে ডেকে বললে—ওহে আমরা চললাম, তার মেরে ত নাও আর তার নিয়ে নিলে। তাতে কি আর কিছু হয়। স্বাধীনতা যদি বিপ্লবের পথে আসতো ত ফল ভাল হত। দু চার জন ক্যাড্ বলে তারা বিপ্লব করবে কিন্তু তারা কিছু করতে পারছে না।

কোন কিছু করতে হলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকা চাই। বাইবেলে কার কথা আছে—হাজার বছরে এমন একজন মানুষ আসে যার জন্যে দেশ, সমাজ, ধর্ম, ধর্মনায়ক সবাই পথ করে দেয়—আমার সে ভাগ্য ছিল না। চার্চিলের সে ভাগ্য ছিল। নেপোলিয়ন লোকটা খুবই পাজী ছিল—কিন্তু তাকেও সারাটা জীবন বিরূপ ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে।

ধর্মের চেয়ে দেশ বড়। নিতাই ভটচাজকে বললুম, ঐ নিয়ে একটা বই লিখতে। Religion বলতে যা বোঝায় ধর্মত ঠিক তা নয়। ধর্ম অর্থে ধারণা করা। নাটকের কাহিনীটা বলেছিলুম হিন্দুর আর বৌদ্ধধর্মের দ্বন্দ্বের দিক। একজন প্রেক্ষা পত্রিকার পক্ষ, হবেকে—শেষ পর্যন্ত একজন সেনাপতির মুখে মূল কথাটা বলে দেওয়া। মানব ধর্মের চেয়ে দেশ যে বড় একথাটা ঠিক বলা হ'লনা, কিন্তু ভাবটা থাকল। তা সে পারল না। একজন সত্যিকারের ভাল নাট্যকার পেলুম না। এক হতে পারতেন ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ—যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল তাঁর, বুদ্ধিও ছিল কিন্তু চালাতে হত। তিনজনের জন্য তা হলনা—ওঁর দুই ছেলে আর মহেন্দ্র বাবু।

মহেন্দ্র বাবু আমার আত্মীয় ছিলেন। তাঁর কাছে আমার ঋণের সীমা-পরিসীমা নেই। খুব ভালমানুষ ছিলেন, মনোমোহন পাঁড়েকে দাদা বলতেন বলে নালিশ পর্যন্ত করলেন না। তাঁর নিমন্ত্রিতার বাড়ীতে গিয়ে আরাম করে আসেনি এমন অভিনেতা তখনকার দিনে ছিল না। কিন্তু হলে কি হবে, নাটকের তিনি কিছু বুঝতেন না।

ওই তিনজনের জোরে ক্ষীরোদবাবু ভাবলেন—কে ভেঙ্গে ভেঙ্গে শিশির ভাদুড়ি যে'তার কথা শুনতে হবে।

—ক্ষীরোদবাবুর 'আলমগীর' পাবার গল্প ভারী মজার। বইটা অপরেশ বাবু নিয়েছিলেন। মদন কোম্পানীর ওখানে আমি কোন বই-ই পছন্দ করছিনা ওরাও আমাকে তাড়াতে তৈরী; এমন সময় মহেন্দ্র বাবু বললেন—ক্ষীরোদবাবুর নাটক প্লে কর।

খোঁজ করাতে উনি বললেন, বই ত আছে, কিন্তু সেটা যে অপরেশবাবুর কাছে রয়েছে। বললুম—পড়াতে পারেন ?

কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমলঃ কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়ঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলেছো কি কুড়িখান ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমলঃ ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে "জ্বালা আলা" বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমলঃ মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদাঃ বাঃ বাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও জল পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়ঃ বলুন কি চাই আপনার—ওভালটিন? হাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) তাজা ঝুরঝুরে হাওয়া। বিমল আর বিনয় একেবারে চুপসে গেল।
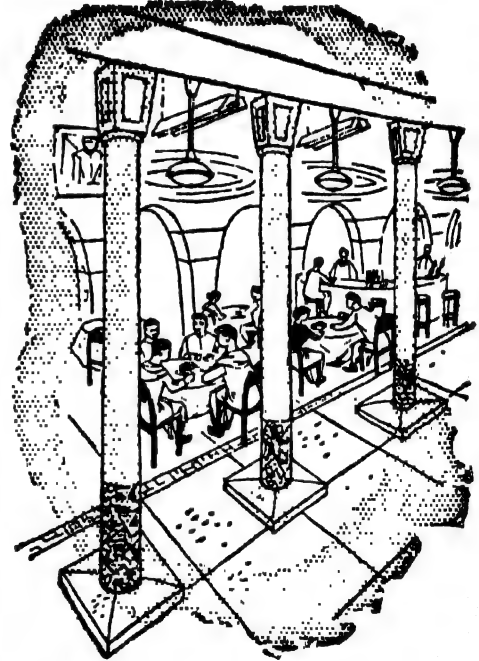
ভুতোদাঃ সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটির গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

তাতে উনি বললেন—লেখা ত আমার কাছেই আছে।

পড়া হল, খুব খারাপ লাগলো না। ওঁকে বললুম—কিছু কাটাছাঁটা দরকার।

বললেন—না তারা কেটো ছেঁটোনা।

আমি আর ললিত মিলে বেশ করে কাটলুম। তখন বইটার নাম ছিল 'ভীমসিংহ'। এখন যা লেখা আছে তাছাড়া আরও চারটি দৃশ্য ছিল—ভীম সিংহ জয়সিংহের ঝগড়ার কারণটা তাতে বর্ণনা করা ছিল। রাজসিংহ যে মহিষীর প্রেমে পড়ে অন্যায় করেছিলেন তারও বর্ণনা ছিল।

যাই হোক, অভিনয় করার ব্যবস্থা হল। মহেন্দ্রবাবু পাঁচশ টাকা দিয়ে right কিনে নিলেন। কিন্তু সবাই বললে—ও বই দাঁড়াবে না। কিন্তু প্রথম দিনেই বথম দৃশ্য থেকে বইটা আলোড়ন তুলল।

মহেন্দ্রবাবুর গলা খুব ভাল ছিল। আজকের দিনে আমার ছাড়া অমন গলা কারো নেই। তবে সামাজিক নাটকে খুব সুবিধে করতে পারতেন না। গলা ছিল অমৃত মিত্তিরের। অনেক বয়সেও গলা একই রকম ছিল। তবে, খেলাতে পারতেন না। ওঁর তুলনায় গিরিশবাবুর গলা নিরেস ছিল। তবে, অমৃত বোস মশায় বলেছিলেন—বয়েস কালে গিরিশবাবুর গলা ত শোননি তোমরা! অমৃতর চেয়ে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু তিনি যে গলা দিয়ে দিয়েছিলেন। লোকে যেমন জগন্নাথকে ফল বা হাত দেয়, উনি তেমনি গলা দিয়েছিলেন। আমার মনে হয় অত্যধিক মদ্যপানে গলা নষ্ট হয়েছিল ওঁর।

অমৃতবাবু আবার ঐসব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাস করতেন। গিরিশবাবু ওঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন না, ছিলেন spiritual গুরু। ওঁর হাঁটুতে হাত দিয়ে কি সব যেন ঘটিয়েছিলেন। উনি আবার আমায় খুব স্নেহ করতেন। বলতেন—সব কথা তোমাকেই বলে যাব। তুমিই তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী।

আমাকে স্নেহ করার কারণ ছিল। আমি ছাড়া ত ওঁকে কেউ ডাকেনি। নাট্যমন্দির খোলার পর, দোল পূর্ণিমার রাতে 'বসন্তলীলা' অভিনয়ে ওঁকে নিমন্ত্রণ করে কপালে ফাগ মাখিয়ে দিলুম ষ্টেজে ঢুকিয়ে। দানীবাবুকেও ডেকে এনেছিলুম, কিন্তু তিনি ষ্টেজে নামলেন না। বললেন—আমি কিন্তু থাকবো না আমার কাজ আছে। পেছনে আবার হ্যাকপ্যান্ট দাঁড়িয়ে, বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ ওঁর কাজ আছে। গিরিশবাবুদের সময় গিরিশবাবু, দুই অমৃত আর অর্দ্ধেন্দুবাবু ছাড়াও দু'-পাঁচজন অভিনেতা ছিলেন যাঁদের ক্ষমতা ছিল না কিন্তু অশিক্ষিত-পটুত্ব ছিল। আমার ভাই তারাকুমারেরও ঐ পটুত্ব ছিল। একটা ভূমিকা দু'-চারবার পড়ার পরেই জিনিষটা বুঝতে পারলে করতে পারতো। অভিনেতার কতকগুলি মূল বিষয় জানতে হয়। প্রথম কথাই হচ্ছে, ভূমিকাটার অর্থ ধরা আর সেই অনুযায়ী অভিনয় করা। এর জন্য কিছু লেখাপড়া করা দরকার। আগেকার দিনে লেখাপড়ার চর্চ্চা অনেক বেশী ছিল। আমাদের বাড়ীতে এত বেশী ছিল যে অল্প বয়সেই বেশ পাকা হয়ে উঠেছিলুম। আমার এক মাষ্টার ছিলেন—বি-এর ছাত্র, আর এক দাদা ছিলেন যাঁর কাজ ছিল বি-এ ফেল করা।

শৈলেন (চৌধুরী) ভাল অভিনেতা ছিল। কিন্তু অকালে মরে ওঠার মুখেই মারা গেল। বিশুও বেশ ভালই অভিনয় করতো।

ক্ষীরোদবাবুর কবিতা খুবই ভাল। রবীন্দ্রনাথের সমানই প্রায়। রবিবাবু আমাদের দেশের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা, সমগ্র সৌরমণ্ডল বটে, কিন্তু পৃথিবীর চিন্তাধারায় তাঁর দান কতটা? শেলী আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের যা মূল্য আছে, রবিবাবুর লেখাতে কি তা আছে?

আমার এক আত্মীয়ও খুব ভাল অভিনয় করতেন, অথচ সামাজিক নাটকে সুবিধে হত না। কিন্তু অভিনয়ের প্রকৃত পরীক্ষা হয় সামাজিক নাটকে।

আমার বড়মামা বোলপুরে থাকেন, ওঁর খুব কবিতা পড়ার ঝোঁক। সেদিন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির বই পাঠালুম—তা পড়ে লিখেছেন—কি সুন্দর লেখা, আজ-কাল ত' কই এমন লেখা হয় না।

দ্বিজুবাবুর লেখার দোষের কথা বললে মণ্টু আবার দুঃখ করবে। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর 'ভীষ্ম' মহাভারতের অনুসরণ, কাজেই বেশ ভাল লেখা হয়েছে। লেখাটা যদিও সবটাই কবিতা নয়, তবু মাঝে কিছুটা অংশ সত্যি সত্যি কবিতা হয়েছে। নরনারায়ণ ত' আরও ভাল লেখা।

ক্ষীরোদবাবুর রঘুবীর মদন কোম্পানীতে করিয়েছিল। খুব ভাল সাজগোজ ক'রয়েছিল, রঘুবীরকে মাথায় পালক-টালক পরিয়েছিল, কিন্তু রঘুবীর যে ব্রাহ্মণ সে কথা ভুলে গিয়েছিল।

—একজিবিসনে 'সীতা' করার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বইটা ইনষ্টিটিউটে করবার কথা হয়েছিল। কিন্তু রিহার্স্যালের দিন তিন-চারজনের বেশী কেউ এল না। ইতিমধ্যে একজিবিসনের কর্তারা এসে বললেন—সাত দিনে চারটে বই করতে হবে। আমি জানি ওসব হবে-টবে না। সীতাই রিহার্স্যাল দিলুম। ষ্টেজ কিন্তু খুব ভাল সাজানো হয়েছিল। দৃশ্যপট অপূর্ব হয়েছিল। প্রত্যেক দিন হল ভর্ত্তি থাকত।

ষ্টেজে ১৯২৪ থেকে ১৯২৮।২৯ পর্য্যন্ত আমার বোধহয় কোন বই ফ্লপ করেনি। পাষাণীতে শেষ দিনেও সাতশ (৭০০৲) টাকা বিক্রী হয়েছিল। কিন্তু অন্য কারণে অভিনয় বন্ধ করতে হয়েছিল। (আগের কোন বই-ই দুদিনের বেশী লাগেনি, ভীষ্ম কিন্তু তিনদিন পড়তে লাগল। ১৮ই সেপ্টেম্বর পড়া শেষ করলেন বইটা।)

সেদিন প্রথমে এসেই বললেন হাতটা বড় কষ্ট দিচ্ছে। আমরা বললাম—ডাঃ চন্দ্রকে দেখান না কেন?

বললেন—ডাঃ চন্দ্রর সঙ্গে দেখা করিনা, ভদ্রলোককে শুধু শুধু ব্যস্ত করা হবে বলে। উনি মানুষ ভাল, রোজ রাত্তির দশটা সাড়ে দশটায় সময় ওপরে ওঠার আগে আমার সঙ্গে গল্প করে যেতেন। এদিকে বিকেলে সাড়ে চারটার সময় কাজকর্ম সেরে ঘুমোতে যেতেন, উঠতেন সাতটা স'সাতটায়; তারপর আবার কাজ সুরু করতেন। কাজ ত খুবই করছেন কিন্তু শেখালেন কাকে? উনি যেমন অন্যলোকের কাছে শিখেছিলেন তেমনি নিজের শিষ্যশ্রেণী করলেন কই? সাহেব ডাক্তাররা কিছু চেষ্টা এ বিষয়ে বরং করেছিলেন। ওদের দেশে এ জিনিষটা অনেক বেশী আছে।

—আমাদের দেশে সত্যিকারের বড় নাট্যকার হল না। ক্ষীরোদবাবু হতে পারতেন কিন্তু তাঁর জিনিয়াসটা হতে দিল না।

ওর ছেলেরা ত' নিজেদের জিনিয়াস বলে মনে করত। বোঝাত, এ দৃশ্য দেখ, ও দৃশ্য দেখ ; এখানে এ কথা দাও, ওখানে ও কথা দাও ; আর তুমি এত বড় নাট্যকার তোমার কি না ছেড়ের ছেড়ে শিশির ভাদুড়ির কথা শুনে চলতে হবে।

লোকে বলে—আমি সেকেলে পুরোনো বইতেই অভিনয় করতে ভালবাসি। কিন্তু আজকালকার দিনে নাটক কই ? নতুন নাটক বলতে তো কম্যুরা বোঝে নীলদর্পণ কিন্তু নীলদর্পণও ১৮৭২ সালে অভিনয় হয়েছে।

গিরিশবাবুর 'শ্রীবৎসচিন্তা' পড়ে দেখ মনে হবে আজকের দিনের ঘটনা নিয়ে লেখা। অথচ মনে রেখো বইটা লেখা হয়েছে ১৮৮২-৮৩ সালে, ঠিক কোন বছরে লেখা হয়েছে মনে নেই, স্মৃতিশক্তি আজকাল বড় কম হয়ে যাচ্ছে।

ছেলেদের পড়াশোনা করানো দরকার। তার জন্য মাষ্টার মশায়ের Sincerity প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসাররাও Sincere নন।

শশীবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন না, এখন রামতনু অধ্যাপক। আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে গেলেন ছেলেদের কাছে কিছু বলার জন্যে। গিয়ে দেখি শম্ভু বসে আছে। তাকে যে আমি আসব এ কথা বলা হয়নি বুঝলুম।

যাই হোক, আমি উঠে দাঁড়িয়ে দু'-চারটে বাঁধিগৎ দিলুম—ছেলেদের নাটক পড়া দরকার, যত নাটক পড়বে তত জ্ঞান বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলার পর শশীবাবু এসে বললেন—চলুন এবার একটু চা-টা খাবেন।

বললুম—শম্ভু যাবে না ?

তা ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—না মানে উনি এখন কিছু বলবেন। বললুম—কেন ? শম্ভু আমার সামনে বলতে পারে না ?

তা শম্ভু কিছু বললেও না। উঠে শুধু বললে—উনি যা বলেছেন তারপর আমার বলা সাজে না। উনি যা বললেন তাই করা দরকার। এর পর আবার "মহাপ্রস্থান"-এর কথা উঠল, বললেন—এ বই লিখতে পারতেন ক্ষীরোদবাবু। শিশিরবাবু লিখলে অন্য রকম দাঁড়াতো। সত্যেন বাবু যে মহাপ্রস্থান লিখেছেন তার সুরটা ছিল বড় চমৎকার।

আমরা প্রশ্ন করলাম—ওটা লেখাতে আপনি কিছু সাহায্য করেছিলেন কি ?

বললেন—সাহায্য করেছিলুম কি না কি করে বলব বল, প্রমাণ কোথায় ? বললে আমার কথা কে বিশ্বাস করবে ? প্রমাণ অবশ্য সবই ছিল কিন্তু এমন সব লোক দিয়ে চারপাশে পরিবৃত ছিলুম, যে কারুকে দিয়ে কোন কাজই হয়নি। মহাপ্রস্থানের অভিনয়ে পার্ট আমার কাছে নেই, আর ছাপা বইটা অভিনীত নাটক থেকে অনেক পৃথক।

'লীলাবসান' করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বাইশটা মেয়ে আর পেলুম না। তোমরা আমাকে তিন-চারিটি মেয়ে আর সাত-আটটি ছেলে দাও, একটা কিছু করি। এত দিন ধরে কি আর করেছি, কত করবার ছিল। কত দিন আর বাঁচব একটা বাড়ি দাও, কিছু করি।

পটল প্রথমে গান্ধারী করেছিল, ভালই করেছিল কিন্তু অন্যদের পছন্দ হল না। তাই দ্বিতীয় দিন থেকে নীহারকে দেওয়া হ'ল। নাহার কিন্তু তত ভাল করেনি। এখন দিলেই কাগজে আগুন লেগে যাওয়ার কি চেঁচামেচি, বলে—ভগবানকে শাপ দিয়ে, আমার এই দুরবস্থা। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণকে আমার দিয়ে শাপ দেওয়ালে, কত বড় পাপ করালে।

ডাঃ অধিকারী এতক্ষণ চোখ বুজে সিগারে টান দিচ্ছিলেন—এবার গম্ভীর ভাবে শেষটুকু যোগ করে দিলেন—হ্যাঁ, বলেই হাউমাউ করে সে কি কান্না। ভীষ্ম পড়া খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছিল। নিত্যকার মত চা খাবার পর কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। ডাঃ অধিকারী বললেন—কবিতা আবৃত্তি করুন না। একটু আপত্তি করে রাজী হয়ে গেলেন। পাশের ঘর থেকে পূরবী এল, তার থেকে সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতাটি পড়ে বললেন—এই কবিতাটি অত্যন্ত সুন্দর। এর পর 'আবাহন' কবিতাটি আবৃত্তি করে বললেন—কবিতাটিতে যে মানসসুন্দরীর কথা আছে তা কোন নারীর কথা নয়। কবির inspiration অনেক দিক থেকে আসতে পারে আর তারই রূপ হ'ল মানসসুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় শেলীর প্রভাব বেশ দেখা যায়, কিন্তু গভীরতার দিক থেকে শেলী অনেক বড়। শেলীর Hymn to intellectualityতে যে গভীরতা আছে রবিবাবুর লেখায় তা দেখা যায় না। লোকে অবশ্য বলে, রবিবাবুর গান আর গীতিকবিতা খুব ভাল, কিন্তু গভীরতার দিক থেকে তিনি পৃথিবীকে কতটা দিয়েছেন সে কথা কেউ বলে না। [ক্রমশঃ।

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বাইশ

হঠাৎ শাপিরোর কাজের চাপ বেড়ে গেল। পর পর পাঁচ-ছয় দিন ও সন্ধ্যায়ও ফিরতে পারল না। শুধু সকালে একটিবার দেখা হত প্রাতরাশে।

দিন সাতেক অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শাপিরো শয্যা নিল। মাথার যন্ত্রণায় সে তাকাতে পারত না—আনুষঙ্গিক জ্বর ও বমি। পল্লব হোটেলে নিজের খরচে একটি বড় ঘর নিয়ে শাপিরোকে আনিয়ে তার পাশের বিছানায় শুত। শাপিরো মাঝে মাঝে 'জল জল' ক'রে চিৎকার করলে তার কাজ ছিল তাকে জল দেওয়া ও হাওয়া করা।

তিন চার দিন বাদে সে বিছানা থেকে উঠতে পল্লব বলল: শাপিরো, সাত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ করলে মারা যাবে। চলো তার চেয়ে ছুটি নিয়ে সাত আট দিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে—ভেনিসে বা সুইজর্লণ্ডে বা আর কোথাও—যেখানে তোমার ইচ্ছা।

শাপিরো ম্লান হেসে বলল যে তার হাতে টাকা খুবই কম ব'লে কোথাও বেড়াতে যাবার সময় খরচ-সঙ্কুলান করা তার সাধ্যায়ত্ত নয়।

ধনী পিতার একমাত্র বংশধরের অসুস্থতার পরেও অর্থাভাবে কোথাও বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব ভেবে পল্লবের চোখের পাতা ভিজে উঠল। সে বলল: শাপিরো, তুমি জানো এক্সচেঞ্জের সুবিধের দরুণ আমাদের কাছে ইতালির লিরা এখন সস্তা। তাই তোমার কোনও আপত্তি আমি শুনব না। আমার—তোমার বন্ধুর—অতিথি হ'য়েই তোমাকে যেতে হবে। যদি 'না' বলো তাহলে বুঝব বন্ধুত্ব তোমার কাছে বড় নয়, বড় সেই সামান্য টাকা, যাকে তুচ্ছ করতে শিখেছ বলে তুমি কথায় কথায় বড়াই করো।

অসুস্থ শাপিরোর চোখ ছলছল করে উঠল। সে আর একটিও কথা না বলে রাজি হল। কেবল বলল: একটি বার ভেনিস দেখবার আমার অনেক দিন থেকে সাধ।

* * * *

ট্রেণে উঠে শাপিরো ও পল্লব একটি কুপেতে পাশাপাশি বসে গেল। শাপিরো হঠাৎ বলল: সংসারে আশ্চর্য জিনিষের তাই অবধি নেই। কিন্তু তবুও আশ্চর্যদের মধ্যে একটি সেরা আশ্চর্য কী বলো তো?

পল্লব হেসে বলল: তোমার কাজ থেকে ছুটি নেওয়া?

শাপিরোও হাসল: বটে। কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার ভাব। ভেবে দেখ: কোথায় তুমি আর কোথায় আমি? তুমি ভগবান মানো, আমি মানি না। বলশেভিকদের তুমি নিষ্ঠুর ও ভ্রান্ত মনে করো, আমি মনে করি মানুষের বন্ধু ও জ্ঞানী। শাস্ত্রবাক্যে তোমার আস্থা আছে, আমার নেই। নিরীহতাকে তুমি ধর্ম মনে করো, আমি মনে করি অধর্ম। অথচ তোমার আমার মধ্যে মিলন হল—এর চেয়ে আশ্চর্য কী হতে পারে বলো তো? স্নেহ ভালোবাসায় আমি বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম, হৃদয় আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছিল। শুধু তোমার ছোঁওয়ায় মনে হচ্ছে মরা গাছের ডালে কের ফুল ফুটল না!

তেইশ

ভেনিসে ট্রেণ পৌঁছল সন্ধ্যাবেলা। এপ্রিল মাস—বসন্তকাল, তার উপর শুক্লপক্ষ। পল্লব ও শাপিরো ভেনিস দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শাপিরো বলল সগর্বে: দেখ, মানুষের কীর্তি

কীর্তিই বটে! মনে হয় সত্যিই কল্পনার ভেলায় ওরা এসে পড়েছে কোন অচিন-চেনা স্বপ্নরাজ্যে!

সন্ধ্যা আটটায় ওরা দুজনে একটি গণ্ডোলা ভাড়া করে বেরিয়ে পড়ল। জলের রাস্তা, দুধারে সার সার বাড়িগুলিতে যেন দেয়ালি দিয়েছে। এখানে কি প্রতিরাত্তেই উৎসব দীপালি? বলল পল্লব। শাপিরো বলল: সত্যি, সৌন্দর্যে ভুলিয়ে দেয় জীবনের যত দৈন্য, গ্লানি।

পল্লব হেসে বলে: তবে যে কথায় কথায় বলো মুক্তি চাওয়া ভুল? মানুষ প্রতিদিনই চায় লক্ষ বন্ধন থেকে মুক্তি। আমরা থিয়েটার দেখে ভুলে থাকি, উৎসবে ভুলে থাকি, কোনো চমৎকার বই পড়তে পড়তে ভুলে থাকি। তবু দুর্নাম রটাবে তোমরা ধর্মের! যত অপরাধ করেছে সেই।

শাপিরো উত্তর দিল না। কেবল চেয়ে চেয়ে দেখে। পল্লব ও দেখে। কথার রেশ যেন আপনা আপনি থেমে যায় স্বপ্নাবিষ্ট তন্ময়তায়।

মাথার উপরে নির্মল আকাশে চাঁদ হেসে গড়িয়ে পড়ছে। দুপাশে শ্যামাভ হর্ম্যরাজি কৃষ্ণাভ জলের বুকে দাঁড়িয়ে কোন এক অপরূপের স্বপ্নে বিভোর! মাঝে মাঝে এক একটা মেঘের ছায়া জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে সামনে, পিছনে, কাছে দূরে। আশে পাশে ছোট বড় গণ্ডোলা। কোনোটায় কেউ গাইছে। কোনোটায় বাজছে ম্যাণ্ডোলিন, গিটার বা বেহালা। কোনোটায় যুগলমূর্তি পাশাপাশি ব'সে পরস্পরের কটি বেষ্টন ক'রে। এখানে ওখানে কেউ বা প্রিয়সঙ্গিনীকে চুম্বন করছে। কোথাও বা একটি মাত্র যাত্রী অর্ধশায়িত হ'য়ে শুয়ে—চাঁদের দিকে চেয়ে। এক একটা বড় গণ্ডোলায় মিলিত রূপালি হাসির বান ডেকে যায়।

ওরা জলপথ অতিক্রম ক'রে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। ওপারে লিডো নগরী। সেখানে একটি কাফেতে দু পেয়ালা কফি খেয়ে ফিরে ওরা গণ্ডোলায় এসে বসে—ভেনিসে ফিরবে। মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে ষ্টিমার সাইরেণ বাজিয়ে হু হু ক'রে চলে যায়। যাত্রীদের কোরাস গান বাতাসে ভেসে আসে। অদূরে ভেনিসের তটের কালো রেখার উপরে লক্ষ দীপমালার ঝিকিমিকি. ওরা চুপ ক'রে মুগ্ধ নেত্রে দেখে চেয়ে চেয়ে।

হঠাৎ পাশের একটি গণ্ডোলায় নারীকণ্ঠের কলহাস্য। পল্লব তাকাতেই দেখে একটি শুভ্রবসনা একজন পুরুষের পাশে ব'সে হাসতে হাসতে গণ্ডোলায় প্রায় শুয়ে পড়ে আর কি। সঙ্গে তার দুটি সঙ্গিনী। পুরুষটি ইতালিয়ান ভাষায় মেয়েটিকে বলে: কী করো? গণ্ডোলা ডুবিয়ে দেবে না কি?

বলতেই অর্ধশায়িতা ফের হেসে উঠে বলে: তোমারো এত ভয়? তুমি না বিখ্যাত সাঁতারু? পল্লবের বুকের রক্ত যেন স্থির হয়ে গেল। আর তো সন্দেহের পথ নেই! এ হাসি এ জগতে

কেবল একজনই হাসতে পারে—এ স্বর তো আর কারুর হতে পারে না। এ হাসি, এ স্বর আহারে-বিহারে যে ও চলতে-ফিরতে শুনেছে দিনের পর দিন—স্বপ্নেও শুনেছে রাতের পর রাত। যার সান্নিধ্য কামনাকে জপ করে এসেছে ওর প্রতি রক্তবিন্দু—না, না—এ কি সম্ভব? এখানে আইরিন কেমন ক'রে আসবে এ ভাবে, আর একজন পরপুরুষের সঙ্গে? এ পারে শুধু বিলাসিনী, বিরহিনী নয়। উত্তেজনায় ও গণ্ডোলায় উঠে দাঁড়ালো।

হঠাৎ সুহাসিনীর চোখ পড়ল ওর পানে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার ক'রে উঠল। ফেরাও গণ্ডোলা—ফেরাও।

মাঝি আশ্চর্য হ'য়ে বলল: কেন? ভেনিস তো এই দিকে।

আইরিন বলল: হোক্—ফেরাও।

পল্লবের মাথার মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। ও বসে পড়ল।

চব্বিশ

আইরিনদের গণ্ডোলা ফিরে লিডোর দিকে চলে গেল। পল্লব বিহ্বলের মতন চুপ ক'রে বসে ঐ ম্লানায়মান গণ্ডোলাটির দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। মিনিট পাঁচেক পরে নৌকাটি একটি ছোট বিন্দুর মতন দেখায়—পরে তাও মিলিয়ে যায়।

আর সংশয়ের পথ কোথায়? আইরিন তাকে ভুলেছে নিশ্চয়ই এই নবলব্ধ প্রণয়ীটির টানে। সব পরিষ্কার হ'য়ে গেল। প্রথম দিকে ছোট্ট ছবি-কার্ড পাঠালো, পরে তাও বন্ধ। নাতাশা নিশ্চয়ই মুন্নুককে সব বলেছে, সে ওকে ব্যথা দিতে চায়নি বলেই কিছু লেখেনি।

পল্লবের মন এক দুর্বিষহ তিক্ততায় ভরে উঠল: এরই নাম রমণীর প্রেম! স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—

শাপিরো ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল, কিন্তু কথা কইল না।

পল্লব গাঢ় কণ্ঠে বলল: শাপিরো—আমি—কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায়।

আইরিন? তোমার ভুল হয়নি?

ভু—ল?

শাপিরো ফের নিশ্চুপ।

একটু পরে পল্লব বলল: এ কি ভাবা যায়, শাপিরো?

কী?

যে আইরিন আমায় ভালোবাসেনি শুধু ভালোবাসার অভিনয়—

শাপিরো ওর হাতের উপর চাপ দিয়ে বলে: ছিঃ, ভাই! এমন অনুচিত মন্তব্য আমি অন্তত তোমার কাছে আশা করিনি।

অনুচিত?

নয়? আমি জানি না—ঐ পুরুষটিই ওর প্রণয়ী কিনা। হ'তেও পারে—যদিও না-ও হ'তে পারে, এই কথাটিও ভুলো না। কিন্তু যদি হয়ও—আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ওর জন্যেই আইরিন তোমাকে ত্যাগ করেছে, তাহলেও কেমন ক'রে তুমি জোর ক'রে বলতে পারো যে, যখন তোমাকে ও ভালোবেসেছিল তখন সেটা শুধু অভিনয়ই ছিল?

পল্লব কঠিন হেসে উঠল: এ তোমার মন-ভোলানো কথা শাপিরো! সত্যি ভালোবাসাও অনেক সময়ে স্থায়ী হয় না, শুনেছি —কিন্তু তাই ব'লে এত ঠুনকো হয় না—হ'তে পারে না। দু'দিনও তর সইল না?

শাপিরোর মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে: ভাই, সংসারে কিসে যে কী হয় কেউ কি জানে? আমরা কয়েকটা থিওরি খাড়া ক'রে চলি নিজের ইচ্ছা বা সুবিধার অদৃশ্য ইঙ্গিতে বৈ তো নয়! পরে যখন দেখি যে, সংসারে সে থিওরি খাটে না তখন অকারণ ক্ষুব্ধ হই সংসারের উপর—এইটি না বুঝে যে, সংসারকে আমরা জানতে, বুঝতে চিনতে শিখি না ব'লেই ঘা খাই। তোমাকে একটি মাত্র উদাহরণ দেব।

সোনিয়ার কথা তোমাকে বলেছি। আজ আমার মনের বাসনার সব কুয়াশা কেটে গেছে ব'লে আমি ভাবি, অনেক সময়েই যে তাকে কোনো দিনই আমি সত্যি ভালোবাসি নি—যেহেতু তার স্মৃতি আমার মনে আর এতটুকুও ক্ষোভ কি পুলক জাগায় না। কিন্তু একদিনের কথা বলি শোনো। আমরা তখন পরস্পরের প্রতি তেমনি আনন্দে চেয়ে থাকতাম, যেমন আনন্দে ঐ চাঁদ চেয়ে আছে এই সমুদ্রের পানে। আমাদের মনে হ'ত যে, একজন দু'দিনের জন্যেও অপরের চোখের আড়াল হ'লে এ জীবন উভয়ের পক্ষেই হ'য়ে দাঁড়াবে শুধুই বেঁচে থাকা—শূন্য অর্থহীন। বিজ্ঞরা শুনে মৃদু হেসে বলবেন হয়ত যে, এরি নাম উচ্ছ্বাসের মায়া—যে নয়কে হয় করে। কিন্তু সে টানকে নিছক উচ্ছ্বাসের মিথ্যে মায়াই বা বলি কেমন করে? যে টানের ফলে—কিন্তু ভণিতা রেখে বলি ঘটনাটা।

সোনিয়াকে নিয়ে সেদিন সকালে আমি বেরিয়েছিলাম বনভোজন করতে—ভল্গার তীরে এক মাঠে। চারদিকে ফুল ফুটেছে। নির্মেঘ আকাশ নরম আলোয় ছেয়ে গেছে। গাছে গাছে কত পাখিই যে তান ধরে দিয়েছে, কী বলব? আমার মন গান গাইছে—স্বর্গ শুধু কবির কল্পনা, কে বলে? এই তো স্বর্গ—ধরা দিয়েছে প্রেমের ডাকে। আর মাস ছয়েক বাদেই বাগদত্তা হবে পরিণীতা—তখন কী হবে ভাবতেও আমরা আত্মহারা। যাক।

আমরা বনভোজনের পর হাতধরাধরি করে চলেছি—এমনি লক্ষ্যহীন আনন্দে—এমন সময়ে হঠাৎ হৈ হৈ শব্দ! চেয়ে দেখি কি —সামনের মাঠে একটা দারুণ বলদ হঠাৎ ক্ষেপে ছুটেছে। তার কর্তা কৃষক তাকে ধরতে যেতেই বলদটা ফিরে তার তলপেটে এমন গুঁতো দিল যে সে পড়ে গেল। সোনিয়া ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বলদটা ছুটে এল ওরই দিকে হয়ত আরো এইজন্যে যে, সোনিয়া পরেছিল টকটকে লাল পোষাক।

বলদটা ছিল অতিকায়, আর তার শিং ছুটো ধারালো। দেখলাম, দু'শো হাত দূরে ভূমিশায়ী কৃষকটার চারিদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত—সে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে, আর আশপাশের লোকে ভয় পেয়ে ছুটছে যে যেদিকে পারে। এমনি সময়ে সোনিয়ার চীৎকার শুনে বলদটা শিং নীচু করে ওর দিকে ছুটে এল। সোনিয়া ভয় পেয়ে ছুটল—বলদটাও গোঁ গোঁ করতে করতে ওর পিছু নিল। চক্ষুর নিমেষে ঘটে গেল কাণ্ডটা। আমার মাথা ঘুরে উঠল—কিন্তু দু'-তিন সেকেণ্ডের জন্যে। তারপরেই দেখি, সোনিয়ার মাত্র আট দশ হাত দূরে সেই বলদটা। আমি পাগলের মত ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পিছন থেকে ধরলাম লেজ। সঙ্গে সঙ্গে সে বিকট হাম্বারব করে ফিরল সোনিয়াকে ছেড়ে আমার দিকে। আমি ধরলাম ওর শিং। কিন্তু আমি তো পালোয়ান নই,

দুর্দান্ত ষণ্ডের সঙ্গে পেরে উঠব কেন? তার ঠেলায় পড়ে গেলাম। তারপরেই হঠাৎ ডান কাঁধে এসে বিঁধল ওর শিঙ। চলল ও আমাকে শিঙে করে ঠেলে কয়েক পা। ভাগ্যক্রমে সেখানে ছিল একটা ছোট ডোবা মতন। আমি পড়ে গেলাম ডোবার জলে। তারপর আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল—দেখলাম আমি হাসপাতালে শুয়ে। পাশে সোনিয়া, কেঁদে কেঁদে ওর চোখ-মুখ ফুলে উঠেছে। তিন মাস হাসপাতালে থেকে মুক্তি পাই। ঐ ডোবাটা না থাকলে হয়ত প্রাণে বাঁচতাম না সেদিন। সোনিয়া বলল: আমি ঝপাং করে জলে পড়ে যেতেই বলদটা সেই শব্দে চমকে ভয় পেয়ে ছুটে গেল আরেক দিকে। তারপর আশেপাশের কৃষাণরা আমাকে নিয়ে আসে হাসপাতালে। হ্যাঁ শুনলাম যে অন্ধ কৃষাণটা ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই মারা যায়।

বলে একটু থেমে: এখন কী বলবে? যে, সে সময়েও সোনিয়াকে আমি ভালোবাসিনি, শুধু মোহের টানেই ওকে বাঁচাতে ছুটেছিলাম—প্রাণের ভয় ছেড়ে। বলবে কি যে শুধু উচ্ছ্বাসের বশে মানুষ আর একজনের জন্যে পারে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে? যদি বলো, তাহলে আমি উত্তরে শুধু বলব যে এর নাম যদি মোহও হয় তবে সে প্রেমের এমনি যমজ—যে কে প্রেম কে মোহ চেনার কোনো উপায়ই নেই।

পল্লব মুখ নিচু ক'রে ভাবে। শাপিরো ব'লে চলে: এতটাই যখন বললাম তখন আরো একটু বললামই বা। সোনিয়ার দিক দিয়েও দেখা যাক ব্যাপারটাকে। তোমাকে বলেছি, সে আমার আংটি ফিরিয়ে দিয়েছিল ভয় পেয়ে। তার বাবা ছিলেন হোয়াইট রাশিয়ান—বলশেভিকদের 'পরে তাঁর হাড়ের রাগ। তিনিই সোনিয়ার মনে ভয় ঢুকিয়ে দেন যে আমাকে বিবাহ করলে সর্বনাশ, দু'দিন বাদে বলশেভিকরা হারবেই হারবে—তখন? সোনিয়াও বলশেভিকদের পছন্দ করত না, কাজেই বাপের কথায় রাজি হ'তে তার বাধে নি। আমার আংটি ফিরিয়ে দিতে আমি ক্ষুব্ধ হ'য়ে তাকে বললাম যে সে আমাকে কখনোই সত্যি ভালোবাসে নি। সে জবাব না দিয়ে কেঁদে বেরিয়ে গেল। আমার মনে এল দুর্জয় ঘৃণা—এরি নাম ঐকান্তিকার প্রেম! ধিক্!

তারপর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। কারণ সোনিয়ারা সবাই বলশেভিকদের ভয়ে ষ্টকহলমে পালিয়ে গেল আমার বাবার কাছে। বছর দুই পরে বাবা আমাকে লিখলেন যে সোনিয়ার ষ্টকহলমে বিয়ে একটি সুইডের সঙ্গে। এর এক মাস পরে বাবা লিখলেন—বিয়ের পরে সোনিয়ার হিষ্টিরিয়া হয় ও কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে প'ড়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। একটি সোনার হারে লাগান লকেট সর্বদাই ঝুলত তার বুকে। সে দমাস ক'রে মাটিতে প'ড়ে যেতেই লকেটটির ঢাকনাটি খুলে যায়। বাবা লিখলেন: লকেটের মধ্যে একটি ছবি—তোমার। এই মেয়েকে তুমি ত্যাগ করলে এক মিথ্যে বুলির মোহে!

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করল: সোনিয়া এখন কোথায়?

ষ্টকহলমে সে এখন একজন নামজাদা বণিকের আদরিণী স্ত্রী। বাইরে থেকে দেখতে সে সুখীই বলব। একটি ছেলেও হয়েছে।

কিন্তু—বাবা আমাকে লিখেছেন—একদিন সে তাঁকে কেঁদে বলেছিল যে সে স্বামীকে ভালোবাসতে পারে নি 'শুধু আমাকে ভুলতে পারে নি ব'লেই।

পল্লব কথা কইল না। শাপিরো বলল: খৃষ্টদেবের কোনো কথাই আমার মন নেয় না ভাই, কেবল একটি কথা ছাড়া: যখন তিনি বলেছিলেন সেই পতিতা মেয়েটিকে দেখে যে, 'জীবনে যে কখনো কোনো পাপ করে নি শুধু সেই যেন তাকে ঢিল ছুড়ে শাস্তি দিতে সাহস করে'।

পঁচিশ

পল্ল ডানিয়েল্লি হোটেলে ফিরেই তার পেল এলিওনোরার যে সালভিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই রোমে ফিরছেন। সামনের মাসে ওদের বিবাহ—পল্লব যেন তার আগেই ভেনিস থেকে ফেরে। ও ঠিক করল সামনের রবিবারে ফিরবে রোমে।

ঠিক এই সময়ে শাপিরোর নামেও এক তার এল রোম ঘুরে। তারটিতে ছিল—ওর বাবা হঠাৎ পক্ষাঘাতে শয্যা নিয়েছেন, শাপিরো যেন তার পেয়েই উড়ে ষ্টকহলম চলে আসে।

শাপিরো পল্লবকে বলল—সে দিন সাতেকের মধ্যেই ষ্টকহলম থেকে রোমে ফিরবে।

পল্লব ওকে ষ্টেশনে তুলে দিতে গেল—রোম থেকে ও প্লেন নেবে। ট্রেন ছাড়বার আগে শাপিরো ওকে আলিঙ্গন করে বলল: তোমাকে কখনো কোনো অনুরোধ করি নি ভাই, কেবল একটি অনুরোধ আজ না করে পারছি না: সে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চায় তবে তাকে ফিরিয়ে দিও না। মনে রেখো তোমারি গান: 'তোমার কাছে জিতিলে হারি হারিলে সে-ই জয়।' এ-গানটি আমি কোনোদিন ভুলব না।

পল্লব একা হোটেলে ফিরে এল। শাপিরো চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে বিষাদ এল ছেয়ে। সেই ভেনিস, সেই গণ্ডোলা, সেই চাঁদের আলো সবই আছে কেবল এসবে যে আনন্দ শুষে নিত প্রতি রোমকূপ দিয়ে সেই আশায় যদি আইরিনের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়। নিজের পরে ওর খুব রাগ হ'ল: এত দুর্বল! যে মেয়ে চায় না তার আশাপথ চেয়ে থাকা! ধিক্! কিন্তু তবু কোনোমতেই পারল না ভেনিস ছেড়ে যেতে। এই ভাবে আরো চার পাঁচ দিন কাটাল।

এমনি সময়ে এল কুঙ্কুমের এক চিঠি রোম ঘুরে। পল্লব পড়ল সাগ্রহে:

'ভাই পল্লব,

আমাকে ওরা কেন ছেড়ে দিয়েছে। দিত না হয়ত, যদি না ওদেরি ডাক্তার বলত যে আমার এবার খুব শক্ত অসুখ—পাঠানো দরকার কোনো টি-বি-নার্সিং হোমে। তিনজন ডাক্তার একমত যে যক্ষ্মার ক্ষুদ্রপাত হয়েছে—কাজেই ওরা একরকম বাধ্য হ'য়েই ছেড়ে দিয়েছে আমাকে।

আমার বন্ধুরা সবাই আমাকে সুইজর্লণ্ডে যেতে বলছেন। কিন্তু আমি রাজি হই নি, কারণ আমার এ আদৌ ভালো লাগে না। গরিবদের যখন যক্ষ্মা হয় তখন কে তাদের সুইজর্লণ্ডে পাঠায় শুনি? আমাদের দেশের গরিবদের জন্যে যে-ব্যবস্থা আমার জন্যেও সেই ব্যবস্থাই হোক। বাবার টাকা আছে ব'লেই তার সুবিধে নিয়ে আমি সুইজর্লণ্ডে যেতে পারব না। 'আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতেই মরি।'—একশোবার।

আমি খুব দুর্বল—দু পা হাঁটতেও পারি না। হয়ত মদন পল্লীর যক্ষ্মা স্যানিটোরিয়ামে আমাকে যেতে হ'তে পারে। কিন্তু আমি তাও চাই না। আমার মনে হয়, মধুপুর কি গিরিডি গেলেই আমি সেরে উঠব। তাছাড়া এখানে শুয়ে শুয়েও তো কিছু কাজ করতে পারি। অনেক কর্মী দেখা করতে আসেন—তাঁদের বলতে পারি কত কথা যা বলা দরকার। সবার উপর, দেশবন্ধু আছেন। তাঁরও শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে। তাঁকে ছেড়ে কোথাওই আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু বাজে কথা থাক। তোমার খবর কি? কবে ফিরবে ভাই? তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। তুমি মোহনলালকে তোমার শেষ চিঠিতে লিখেছিলে যে সালভিনির সঙ্গে দেখা করেই দেশে ফিরবে। দেখা হয়েছে কি তাঁর সঙ্গে? যদি হয়ে থাকে তবে এবার ফিরে এসো ভাই! দেশের অনেক কাজ আছে। তাছাড়া এখন আমার হাতে অখণ্ড সময়—শুয়ে শুয়েই দিন কাটে, তুমি এলে তোমার মুখে গান শুনব, গল্প শুনব—কোথায় কী দিগ্বিজয় করলে গান গেয়ে। প্রার্থনা করি—আমাদের গানের চারণ হয়ে যেন তুমি আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করো। তোমার কাছে আমার অনেক আশা ভাই! ওখানে জড়িয়ে পোড়ো না। ইতি

তোমার স্নেহার্থী কুঙ্কুম।'

পল্লব চোখের জলে চিঠি পড়তে পারে না। তবু বার বার পড়ে। ওর আদর্শ কুঙ্কুম, বন্ধু কুঙ্কুম, দেশের বরপুত্র কুঙ্কুমের যক্ষ্মা! ও তৎক্ষণাৎ এলিওনোরাকে তার করে দিল: Kumkum e ammalato. Urgente. Devo partire subito. Addio [১]

তার পরের প্রশ্ন: জাহাজ? ও ছুটল ভেনিসে আমেরিকান এক্সপ্রেস আপিসে। তারা সদুঃখে মাথা নেড়ে বলল: এক মাসের আগে কোনো জাহাজেই বার্থ খালি পাওয়া যাবেনা। কী সর্বনাশ! এক মাস অপেক্ষা করতে হবে—যখন কুঙ্কুমের যক্ষ্মা? ছুটল লয়েড ত্রিয়েস্তীনো আফিসে। ওদেরও সেই এক কথা—এখন বড়ই ভিড়, তবে সিঙ্গোরে যদি জেনোয়ায় গিয়ে অপেক্ষা করেন তো সাত আট দিন বাদে সেখান থেকে 'নাপোলি' বলে যে জাহাজ ছাড়বে তাতে একটা বার্থ পেলেও পেতে পারেন। শেষ মুহূর্তে এক-আধজন যাত্রী আসতে পারেন না—তাদের বদলি হয়ে। তবে সেজন্যে বিধি হচ্ছে জেনোয়াতে গিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা। পল্লব সেই দিনই জেনোয়া রওনা হল।

[ক্রমশঃ।

১। কুঙ্কুমের অসুখ। জরুরি। এখুনি রওনা হতেই হবে। বিদায়।

ভবানী মুখোপাধ্যায়
পঁয়ত্রিশ

১৯৩৩-এ ম্যালভারণ ফেসটিভ্যালে বার্ণার্ড শ' কোনো নতুন নাটক দিতে পারলেন না। স্যার ব্যারী জ্যাকসন সেই বছর জেমস ব্রিডি নামক জনৈক তরুণ নাট্যকারের A Sleeping Clergyman মঞ্চস্থ করলেন। সেই নাটক সফল হল। বার্ণার্ড শ'র সেই বছরের নাটক On The Rocks লণ্ডনের উইনটার গার্ডেন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল। এই নাটকে বার্ণার্ড শ' আঘাত করলেন গণতন্ত্রকে। প্রধানমন্ত্রী স্যার আর্থার চ্যাভেণ্ডার এই নাটকের প্রধান চরিত্র, তিনি তেমন জবরদস্ত সমাজসেবক নন বলে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই নাটকের ভূমিকায় বার্ণার্ড শ লিখলেন যে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে 'খতম' (extermination) করা সম্পর্কে নাটকে যে কথা তিনি বলেছেন, সে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত, নিছক রসিকতা মাত্র নয়। রাশিয়া ভ্রমণকালে শ' শুনেছিলেন, জনৈক কবি কমিশার যানবাহন বিভাগের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হ'ন, যে সব ষ্টেশন মাষ্টার তাঁর আদেশ এবং নির্দেশ পালন করেন নি, তাঁদের তিনি স্বহস্তে গুলী করেন। এই 'লৌহমানবীয়' ভঙ্গী বার্ণার্ড শ'কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। তিনি বলেছেন—If we desire a certain type of civilization and culture we must exterminate the sort of people who do not fit in it.

যাই হোক, বার্ণার্ড শ'র এই উপদেশ পৃথিবীর সর্বত্র গৃহীত হয়নি, তাহলে এক পারস্পরিক নিধন-যজ্ঞে যাকে যার অপছন্দ হত তাকে বলি দেওয়া হত, এবং তার হাত থেকে বার্ণার্ড শ' স্বয়ং হয়ত নিষ্কৃতি পেতেন না।

সমুদ্রপথে ভ্রমণকালে Man and superman-এর ভঙ্গীতে একটি ক্ষুদ্র নাটক Village wooing রচনা করলেন। বার্ণার্ড শ'র প্রতিভায় স্বতোৎসারিত স্বচ্ছ ধারা এতদিনে শুকিয়ে এসেছে। এই নাটকের সংলাপ ক্লান্তিকর এবং গতি অতি ধীর। এই নাটক তাই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেনি।

এর পর শ'-দম্পতি নিউজিল্যাণ্ড সফরে বেরোলেন। এই সময় বার্ণার্ড শ' সার্লোটের জনৈকা বান্ধবীর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বলেই নাকি দেশান্তরের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই সফর অবশ্য উভয়ের তেমন তৃপ্তিকর হয়নি, তবে প্রখর সূর্যকিরণ সার্লোটের ভারী ভালো লেগেছিল। এই কালে বার্ণার্ড শ' The Millionairess নাটক রচনায় হাত দেন, এই নাটকের নায়িকা চরিত্রে তাঁর এক বান্ধবীর প্রকৃতি রূপায়িত করা হয়েছে। কাজ বেশী অগ্রসর হয়নি, কারণ এই সময় বার্ণার্ড শ'র শরীর অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়ে।

The Simpleton of the unexpected Isles নামক পরবর্তী নাটক রচনা করেন বার্ণার্ড শ' ১৯৩৫—এই নাটকের বিষয়বস্তু আবার সেই প্রজনন সমস্যা। আয়ের সমতা যদি থাকে, যদি অবাধ বিবাহ চালু হয়, তার ফলে জাত সন্তান কেমন হবে? প্রাচ্য দেশ ভ্রমণের পর বার্ণার্ড শ' প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে এক নব অতিমানবের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন।

এই নাটক নিউইয়র্কের থিয়েটার গিলডে প্রযোজিত হয় এবং ম্যালভারণেও মঞ্চস্থ হয়। আমেরিকায় তেমন সাফল্য লাভ করেনি এই নাটক। ম্যালভারণে অবশ্য বার্ণার্ড শ'র এই নাটক অভিনন্দিত হল। প্রতীকধর্মী নাটক হিসাবে আদর্শস্থানীয় বিবেচিত হল। কারণ সেখানকার সবাই বার্ণার্ড শ'র গুণমুগ্ধ ভক্ত।

আশীর কোঠায় পৌঁছে বার্ণার্ড শ' নাটকের বিষয়বস্তুর জন্য মগজে সন্ধান না করে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকেই নাটকীয় ঘটনা চয়ন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড যখন সিংহাসন-ত্যাগে বাধ্য হলেন মার্কিনী সাধারণ রমণী এবং ডিভোর্সি মিসেস সিম্পসনের পাণিপীড়নের লোভে, তখন বার্ণার্ড শ' সেই ঘটনা অবলম্বন করে এক কল্পিত সংলাপ রচনা করে Evening Standard পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। তাঁর সহানুভূতি ছিল সম্রাটের দিকে। এই সংলাপে তিনি সম্রাটকে করেছেন কিং ম্যাগনাস। সেই ম্যাগনাস আর্চবিশপকে স্তম্ভিত করে দেন তাঁর চমকপ্রদ উক্তিতে—

As she was an American, She had been married twice before and was therefore likely to make excellent wife for a King who had never been married before.

পশ্চিমে আবার মহাযুদ্ধের ঘনঘটা, সর্বত্র একটা সন্ত্রস্তভাব। আঁরি বারবুস এই সময় বার্ণার্ড শ'কে আবার অনুরোধ করলেন বিদগ্ধজনের একটা আন্তর্জাতিক সমিতি গড়ে তুলতে, যাঁরা যুদ্ধ-বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে পারবেন। বার্ণার্ড শ'র ধারণা, বাতুলে পরিপূর্ণ সংসারে যে কয়জন মানুষ এখনও সজ্ঞানে আছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তাঁর নতুন গ্রন্থ 'Geneva' এক বিচিত্র পরিকল্পনায় রূপায়িত। আন্তর্জাতিক বিচারশালায় পৃথিবীর সকল মতের রাজনৈতিক নেতাদের তিনি জড়ো করলেন, এমন কি ডিক্টেটররাও বাদ রইলেন না। সেই নিদারুণ সংকটময় মুহূর্তে এমন আন্তর্জাতিক দুঃসময়কে ব্যঙ্গ করার মত সাহস ও শক্তি শুধু বার্ণার্ড শ'রই ছিল। মানবজাতির প্রতি বার্ণার্ড শ'র সকল করুণা ও মমতা এতদিনে শুষ্ক, ছিল শুধু মানসিক দৃঢ়তা। তাই তিনি বললেন—

'God has sent certain persons to His call.

They are not chosen by the people ; they must choose themselves, that is part of their inspiration.

যা ঈশ্বরের কর্ম, কঠিনতম কর্ম, রাজনৈতিক কর্ম সে ত' আর সবাই করতে পারেনা, তাদের সে মস্তিষ্ক নেই, অবসর নেই, আর দৈববলও তারা পায়নি, সুতরাং—

বার্ণার্ড শ'র সমর্থক বন্ধুরা ত বিস্মিত। তিনিও স্বয়ং বললেন নাটক দেখে—It made me quite ill. It is a horrlble play. এমন কি বার্ণার্ড শ' বলতে বাধ্য হলেন যে পৃথিবীর ওপর যে কৃষ্ণ-যবনিকা নেমে আসছে তা হাসি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এই নাটক য়ুরোপের মদমত্ত ডিক্‌টেটরদের যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। বার্ণার্ড শ' এই নাটক শেষ করেই শয্যাশায়ী হলেন কঠিন রক্তাল্পতা ব্যাধিতে।

ডীন ইনজ (Inge) বার্ণার্ড শ'র এই নাটক পড়ে বার্ণার্ড শ'কে লিখলেন—I read it aloud to my wife and we were as much amused as it is possible to be in this ghostly time ! কিন্তু বার্ণার্ড শ'র ভক্ত এবং তাঁর নাট্য-সমালোচক ডেসমণ্ড ম্যাকার্থী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে লিখলেন—The books of the old are apt to be ramshackle, garrulous and repetitive.

বার্ণার্ড শ'র এর জবাবে শুধু বললেন—

Old age is not enough ; Youth is not enough ; Patriotism is not enough ; Wisdom is not enough ; What is enough ; Faith to go through life without losing ones faith.

বার্ণার্ড শ'র মতে মানব-জীবনের সব অসাফল্য, সব বিচ্যুতির মূল কারণ আমাদের মানসিক অপূর্ণতা। শুধু মাত্র বিশ্বাস, বিশ্বাসে অবিচল থাকলে মানবিক মানসিকতা সম্পূর্ণতা লাভ করে।

Geneva সংক্রান্ত বাদানুবাদ অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা সৃষ্টি করেছিল। বার্ণার্ড শ'র অনুরাগী বন্ধু লরেন্স ল্যাংনার বিশেষ করে হিটলারের ইহুদী দমন নীতি সম্পর্কে লঘু মন্তব্যে বিশেষ বেদনাবোধ করেন। এবং বার্ণার্ড শ'কে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। চিঠিখানি অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক। লরেন্স ল্যাংনার প্রণীত The Magic Curtain গ্রন্থে এই চিঠি ও বার্ণার্ড শ'র উত্তর একত্রে দেওয়া আছে।

বার্ণার্ড শ' পরবর্তী সংস্করণে একটি চতুর্থ অঙ্ক যোগ করেন, সেই অঙ্কে অনেক ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে!

Geneva নাটকের পর লিখিত হয় মনোরম নাটিকা 'In Good King Charles's Golden Days', এই নাটিকাটি দুটি অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই নাটিকায় বহু মূল্যবান উক্তি আছে। প্রথম অঙ্কটির স্থান স্যার আইজাক নিউটনের বাসগৃহ এবং সুদীর্ঘ, দ্বিতীয় অঙ্ক ক্যাথরিন অফ ব্রাগান জা'র প্রকোষ্ঠে এবং সংক্ষিপ্ত। এই নাটকে বার্ণার্ড শ' তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রতিভার ভাণ্ডার যে শূন্য হয়নি, এই নাটক তার প্রমাণ। কিন্তু শরীর তাঁর জীর্ণ হয়ে আসছে, মানসিক তিক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে, অতি সহজেই তিনি মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। কাজ-কর্মে স্পৃহাও অনেক কমে গেছে। অথচ একদা তাঁর মানসিক প্রশান্তি বন্ধুজনের কাছে প্রশংসা পেয়েছে। সার্লোট অতিশয় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন স্বামীর এই শারীরিক অবনতিতে। ১৯৪০-এ বার্ণার্ড শ'র এই রোগ ডাক্তাররা 'Pernicious anamea' বলে সিদ্ধান্ত করলেন।

স্বামীর অক্লান্ত সেবা করে সার্লোট বার্ণার্ড শ'কে সুস্থ করে তুললেন। কিন্তু তাঁর শরীরও জীর্ণ হয়ে এসেছিল। তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। স্মৃতিশক্তি ভীষণ ক্ষীণ হয়ে এল, শ্রবণশক্তি দুজনেরই ভীষণ কমে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালটিতে বার্ণার্ড শ' লিখেছেন—Everybody's political what's what,—এতদিন ধরে যে কথা বলেছেন এ যেন তারই সঙ্কলন। কার জন্ম লিখছেন সে কথা বার'বার ভেবেছেন শ'। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালের পাঠক আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পাঠক এক নয়।

এতদিন বার্ণার্ড শ' মনে-প্রাণে তরুণ ছিলেন, সেই ভাব তাঁর আচরণে এবং বক্তব্যে, কিন্তু এখন তাঁর উক্তি বৃদ্ধের বচন। যে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে সে শুধু অতীতের কথা বলে। ১৯৪৩-এর এপ্রিল মাসে বিয়েট্রিস ওয়েবের মৃত্যু ঘটে। সংবাদটি শুনে বিচলিত হলেন শ'। এই মহিলাটি তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না, তা ছাড়া তিনি নিয়মিত ডায়েরী লিখতেন। কি যে লিখে গেছেন বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে কে জানে?

সার্লোটকে এই মৃত্যু সংবাদ দিলেন না। কারণ, সার্লোট

এবং মিসেস ক্লিস ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সার্লোটের তখন শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে।

সেই বছরই ওঁরা এ্যারটের বাসা ছেড়ে লণ্ডনে এলেন। সার্লোট রোগশয্যায়। বার্ণার্ড শ' পথে পথে ঘুরে সমর-বিধ্বস্ত বিরাট প্রাসাদগুলি দেখে বেড়ান শিশুর মত কৌতূহলে।

সার্লোট আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি নানারকম অলৌকিক ভয় পেতে সুরু করলেন, তাঁর মনে হত শয্যার আশপাশে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বললেন—এঁদের আসা বন্ধ করে দেওয়া হোক।

একদিন সকালে সার্লোটকে বড়ো সুন্দর মনে হল, এমনটি অনেকদিন দেখা যায়নি, যেন বয়স কত কমে গেছে। শ' মনে করলেন যে লণ্ডনে এসে ভালো হয়েছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। সন্ধ্যার দিকে তাঁকে ঘরে রেখে বার্ণার্ড শ' বেড়াতে গেলেন।

পরদিন ভোরে দাসী এসে দেখে বিছানার নীচে সার্লোট পড়ে আছেন, হাতে একটি ঘড়ি ধরা রয়েছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। মিসেস ক্লিসের মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, সার্লোট এই ভাবে পরপারে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে দেখা করতে এসেছিলেন মিস এলিনর ও'কনেল। শ'-পরিবারের তিনি বন্ধু, আর ছিলেন মিঃ জন ওয়ার্ডরপ। তাঁর সঙ্গে কপিরাইট সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন শ'। সহসা বলে উঠলেন—

—এলিনর, আজ কিছু নতুনত্ব লক্ষ্য করছ ?

মিঃ ওয়ার্ডরপ বললেন—নতুন জুতো পরেছেন দেখছি।

শ' বললেন—না না, ও জুতো আজ দশ বছর পরছি। আমার সব পোষাকেরই বয়স ঐ রকম। আমি ভেবেছিলাম আমার মধ্যে কিছু নতুনত্ব দেখবে তোমরা, কাল রাত আড়াইটের সময় আমি বিপত্নীক হয়েছি।

সবাই স্তম্ভিত। বার্ণার্ড শ' বলতে লাগলেন—শুক্রবার একটু পরিবর্তন দেখেছিলাম। বেশ হাসিখুসী ভাব। আমাকে বললেন কোথায় ছিলে দু'দিন ? দেখিনি কেন ? আমি যখন বললাম—সবসময়েই পাশে ছিলাম তোমার। তখন একটু হাসলেন। অল্প বয়সে যেমন সুন্দর হাসতেন, সেই হাসি। আমি দেখলাম তাঁর সৌন্দর্য্য ফিরে আসছে, বললাম এইবার তোমার অসুখ সেরে যাবে। তিনি অনেক অসংলগ্ন কথা বললেন। সব কথার অর্থ হয় না। তারপর এ্যারটের বাড়িতেই আছেন মনে করে বললেন, ওপরে নিয়ে চলো। আমি কিছু না বলে ওঁকে হাত ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটু আগেই বলা যায়। উনি প্রতিবাদ করলেন না। ভোরে দাসী আমাকে ডেকে তুলে বলল—উনি বিছানার নীচে পড়ে আছেন, কপালে রক্ত। আমরা গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। নার্স এল। বড় কষ্ট পেলেন। শ্বাসকষ্ট। কিন্তু সৌন্দর্য অদ্ভুত ভাবে ফিরে আসছিল, উনি জানতেন না শেষ সময় আসন্ন। অনেক কথা হল। বেশ খুশী হলেন। আজ সকালবেলা নার্স আমার ঘুম ভাঙিয়ে খবর দিল—আপনার স্ত্রী রাত আড়াইটের সময় মারা গেছেন। দেখতে গেলাম, যেন এক শীর্ণা তরুণী ঘুমিয়ে আছেন। আমার মনেই হল না, তিনি চলে গেছেন। অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলাম ওঁর ঠোঁট দু'টি নড়ছে কি না। আমার কেমন যেন মনে হল উনি কিছু বলছেন।

গোল্ডার্স গ্রীনে সার্লোটের অন্ত্যেষ্টি সমাধা হল। পোড়ানোর সময় দেখতে গেলেন না বলে হতাশ হলেন শ'। সঙ্গে ছিলেন সেক্রেটারি ব্লানচ প্যাচ আর লেডী এ্যাষ্টর। সমাধি কালে প্রথমে হ্যাণ্ডেলের Largo সুর বাজানো হল, তার পর প্রার্থনা সঙ্গীত—I know that my Redeemer liveth—গীত হল। বার্ণার্ড শ' বাহু প্রসারিত করে মৃদু গলায় গান গাইলেন। হোয়াইট হল কোর্টে ফেরার পথে লেডী এ্যাষ্টর তাঁর বাড়ি যাওয়ার জন্য আহ্বান করায় বললেন—তোমার বাড়িতে গিয়ে শান্তি কোথায়, অন্ততঃ ত্রিশজন মেয়ে বসে আছে। আর এই মুহূর্তে লণ্ডন সহরে আমার মত পাত্র ক'টি আছে ?

সার্লোট বলেছিলেন, যদি বার্ণার্ড শ'র আগেই তিনি মারা যান, তাহলে যেন তাঁর ভস্মরাশি আয়ার্লাণ্ডে থি রক্ মাউনটেনে ছড়ানো হয়। এর মধ্যে যুদ্ধ সুরু হল। আয়ার্লাণ্ড যাত্রা সহজ নয়। তাই বার্ণার্ড শ' বললেন—আমি নিজেই তোমার ছাই রেখে দেব। আর নির্দেশ দিয়ে যাব আমার মৃত্যুর পর আমাদের দুজনের ছাই একত্র মিশিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

বার্ণার্ড শ' The Times পত্রিকার ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বিভাগে একটি বিজ্ঞাপন দিলেন অসংখ্য সমবেদনা পত্রের উত্তরে। 'প্রতিটি চিঠির জবাব দেওয়া আমার সাধ্যাতীত তাই এই বিজ্ঞপ্তি। সুদীর্ঘ জীবনের সুখে ও শান্তিতে অবসান ঘটেছে। এখন আমি আমার পালার জন্য প্রতীক্ষমান।'

ছত্রিশ

শ' স্থির করলেন যে মৃত্যুর পর তাঁর বসতবাড়ি ন্যাশানাল ট্রাষ্টকে দেওয়া হবে। সমগ্র ব্যাপারটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি সেণ্ট জোনের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি তাঁর বাগানে প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। মূর্তিটি সাধারণ আকারের চাইতেও বড়ো হবে।

প্রতিদিন বাতায়নপথে যে ইংলণ্ডীয় গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য বার্ণার্ড শ' দু চোখ ভরে পান করেছেন সেই দৃশ্যের দিকে থাকবে জোনের দৃষ্টি। যে শিল্পী তাঁর ছবি এঁকেছিল সেই সময় সেই শিল্পীকেই আমন্ত্রণ জানালেন শ', মূর্তিনির্মাণের ভার দিলেন তার হাতে।

মূর্তিটি গড়া শেষ হলে বার্ণার্ড শ' লিখলেন—

Europe is crowded with images of Joan of Arc, and this is by far the best statue of the Maid I have ever seen, and the only one I would let into my garden to live with.

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে The Author নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হল বার্ণার্ড শ' তাঁর উইল তৈরী করছেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জাতির জন্য দান করছেন, আর ৪২টি অক্ষরবিশিষ্ট বৃটিশ বর্ণমালার সংস্কার সাধন করা তাঁর উদ্দেশ্য। ধ্বন্যাত্মক উচ্চারণ প্রত্যেক বোঝানোর পক্ষে এই বর্ণমালা সহজ। বর্তমান ২৬টি অক্ষরের

পরিপূর্ণ ভাবে সেই ধ্বনির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না। এই বর্ণমালা গৃহীত হলে সময়, শ্রম এবং খরচ বাঁচবে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, কলেজ, স্কুল, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে এই বিষয়ে অগ্রণী হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। সে আহ্বান কিন্তু উপেক্ষিত হল।

বার্ণার্ড শ'র এই আজীবন সঙ্কল্প কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষের মনে এতটুকু দাগ কাটেনি। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেন, ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ কঠিন কর্ম। তবে তাঁরা কোনও পরিবর্তন পছন্দ করেন না। বার্ণার্ড শ' ছাড়বার পাত্র নন। তিনি অঙ্ক কষে দেখলেন শুধু মাত্র ইংরাজী —Though কথাটির শেষ তিনটি অক্ষর বাদ দিলে বহু সময় এবং শ্রম বাঁচবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ভাবে অর্জিত সময় কিভাবে ব্যয়িত হবে phonetics যদি বানানে চালু হয়, তাহলে ছেলেরা কেউ আর বানান শিখবে না, শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করবে না। তবে আর একটি দিক আছে, নর্থ আমেরিকায় বার্ণার্ড শ'র পদ্ধতিতে কোটি কোটি ঘণ্টা সময় বাঁচে, সেখানে বানান সমস্যা সরল করা হয়েছে।

বার্ণার্ড শ'র উইলে বলেছেন—স্বর্গীয় হেনরী সুইট (অক্সফোর্ডের ফনেটিক্সের অধ্যাপক) প্রবর্তিত মাত্র ৪২টি ধ্বনিতে যদি বর্ণমালা তৈরী করা যায় ত' ভালো, নতুবা আমার মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে আমার সঞ্চিত অর্থ অন্য কোনো প্রয়োজনে ব্যয়িত হবে।

জর্জ বার্ণার্ড শ' জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছেন। স্ত্রীবিয়োগের পর শরীর আর তেমন নেই, বন্ধুরাও একে একে পরপারে গেছেন। কানে কম শোনেন, এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সে দর্শনপ্রার্থীর ভীড় ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তাঁর জীবনীকার ও বন্ধু হেসকেথ পীয়রসন আর ভক্ত মিস এলিনর ও কনেল মাঝে মাঝে আসতেন, তাঁরা কিছু কিছু মূল্যবান উক্তি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, আর আছে তাঁর সেক্রেটারী মিস ব্ল্যানচ প্যাচ লিখিত ত্রিশ বছরের ইতিহাসে।

হেসকেথ পীয়রসন একদিন বললেন—আচ্ছা, শুনেছি যে মিসেস ক্যামবেল আপনাকে The Apple cart নাটকের ওরিনথার মত বাড়ি যেতে বাধা দিতেন, সত্যি?

—নিশ্চয়ই।

—সত্যি, কোনোদিন আটকাতে পেরেছিলেন?

—ম্যাগনাস এবং ওরিনথার মেজে গড়াগড়ি দেওয়ার দৃশ্যটা জীবন থেকেই নেওয়া।

অনেক ইতস্ততঃ করে আর এক সময় প্রশ্ন করলেন পীয়রসন, আচ্ছা, আকৃতির দিক থেকে মিসেস বেসাণ্ট কি আপনাকে আকৃষ্ট করেছিলেন?

শ' বললেন—না, তাঁর কোনো রকম যৌন আবেদন ছিল না। আমি কি বলিনি Arms and the Man নাটকের চরিত্র Raina চরিত্র মিসেস বেসাণ্টের?

হেসকেথ পীয়রসন আরেকটি সন্দেহ ভঞ্জন করতে চান। সবিনয়ে বললেন—লোকে যে বলে ইসাডোরা ডানকান আপনাকে বলেছিলেন যেহেতু আপনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর

তিনি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। আপনাদের সন্তান সর্বাঙ্গসুন্দর হবে, আর আপনি নাকি তাতে বলেছিলেন—আমার আকৃতি ও তোমার প্রকৃতিও ত হতে পারে। কথাটি কি ঠিক?

বার্ণার্ড শ' বললেন—দেখ ধূমাৎ বহ্নিঃ—ধূম থেকে আগুন, আগুন থেকে ধোঁয়া। আমার মনে হয় একটি ঘটনার পর এই মুখরোচক রটনা সুরু হয়েছে। লেডী কেনেট অফ ডেনে একদিন একটা পার্টি দিয়েছিলেন। সেখানে এক চকোলেট মার্কা রমণী দেখলাম, তিনিই ইসাডোরা। পরিচয় হল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাহু প্রসারিত করে বললেন—I have loved you all my life. —Come। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশেই বসলাম। একত্রে দুজনে এক সোফায় বসেছিলাম। পার্টির সবাই ভেঙে পড়ল, যেন নাটকাভিনয় দেখছে। তারপর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন—একদিন তাঁর কাছে যেতে, তাহলে তিনি নিরাবরণ দেহে নৃত্য করবেন। আমি রাজী হয়েছিলাম, পরে ভুলে গেছি। এই পর্যন্ত।

হেসকেথ পীয়রসন কি ভাবে লেডী এষ্টরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় জানতে চান। বার্ণার্ড শ' বলেন—প্রথম প্রথম তিনি আমাকে যত নিমন্ত্রণ করতেন আমি প্রত্যাখ্যান করতাম। তারপর একদিন কোনো এক বন্ধুর বাড়ি দেখা হয়ে গেল। দেখলাম মানুষটি ভালো। সেই থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ কখনো প্রত্যাখ্যান করিনি।

পীয়রসন বলেছেন, লেডী এষ্টর বার্ণার্ড শ'র জীবনে বিশেষ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর কাজ করেছেন। The Times পত্রিকায় জর্জ বার্ণার্ড শ' লিখিত চিঠিপত্র প্রকাশের মূলেও লেডী এষ্টরের প্রভাব ছিল। বার্ণার্ড শ'র কাছে এই সম্মান রাজসম্মানের চাইতে বেশী। ব্রিটিশ পদের চেয়েও মূল্যবান।

শ'র বিশেষ বন্ধু সিডনী ওয়েব (পরেলর্ড প্যাসফিল্ড) ১৯৪৭-এর শরৎকালে পরলোকগমন করলেন। তৎক্ষণাৎ বার্ণার্ড শ' The Times পত্রিকায় লিখলেন,—May I claim Westminister Abbey for the ashes of Sydney Webb, even should st: Paul's demand him as our greatest cockney? বার্ণার্ড শ'র এই প্রচেষ্টা সার্থক হল, সিডনী ও বিয়েট্রিশ ওয়েবের ভস্মাবশেষ ওয়েষ্ট মিনিষ্টারে রাখা হ'ল। এর পরের বছর মার্চ মাসে এলিনর ও' কনেল বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ' মিস ও' কনেলকে প্রশ্ন করলেন—আমেরিকা যাচ্ছ কেন?

—বর্তমান ইংলণ্ডের চাইতে সেখানে বেশী স্বাধীনতা। আমি তাই চাই।

—একমাত্র রাশিয়ায় তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব ষ্টালিন, আর একজন ছিলেন মাসারিক, সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। রাশিয়া আর যুদ্ধ চায় না। খবরের কাগজে যা পড়ো তা ঠিক নয়। ষ্টালিন জানেন যে আর একটি যুদ্ধ মানে রাশিয়ার ধ্বংস, তিনি ভুল করবেন না, কারণ সে ভুলের চরম মূল্য তাঁকে দিতে হবে। রাশিয়ার মানুষ তাঁকে গুলী করে মারবে। বললেন বার্ণার্ড শ'। মিস ও' কনেল বললেন—আপনি যদি ইংলণ্ডে না থেকে রাশিয়ায় কাটাতেন এতদিনে কবে গুলী খেতেন।

বার্ণার্ড শ' জবাবে বললেন—ষ্টালিন একজন খাঁটি ফেবিয়ান।

এই আলাপাচার ক্রমশঃ ব্যক্তিগত আলোচনায় পৌঁছল। সহসা বার্ণার্ড শ' বলে উঠলেন—I am waiting to die, I have nothing more to do. And I am very tired.

১৯৪৯-এর আগষ্ট মাসে ম্যালভারণে এসমে পারসি তাঁর নতুন নাটক Buoyant Billions সুন্দরভাবে প্রযোজিত হল। এই নাটক পাঁচ সপ্তাহ চলেছিল। সেই বছর অক্টোবরে লণ্ডনে মঞ্চস্থ হল।

এই ১৯৪৯-এ Farfetched Fables প্রকাশিত হল সেই বছরেই প্রকাশিত Sixteen Self Sketches—শেষোক্ত গ্রন্থটিতে অনেক আত্মজীবনীমূলক তথ্য আছে। এর পরবর্তী গ্রন্থ Shakes versus Shaw, এই ছোট্ট নাটক অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন।

তাঁর শেষতম রচনা Why she should not বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। ষষ্ঠ দৃশ্যের যেটুকু পর্যন্ত লিখেছেন তার শেষ কথা—The world will fall to pieces about your ears.

১৯৫০ এর ১০ই সেপ্টেম্বর, সেদিন রবিবার, বার্ণার্ড শ' বাগানের একটি গাছের ডাল ধরে টানছিলেন, বাগানে নিয়মিত কাজ করা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিছল। এই ডালটি একেবারে শুকনো থাকায় সহসা খসে পড়লো। বার্ণার্ড শ' টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলেন। তাঁর হাঁটুতে আঘাত লাগল, ভেঙে গেল। তাঁকে এম্বুলান্সে Luton and Dunstable Hospital এ পাঠানো হল। সোমবার রাতে অপারেশন করা হল তাঁর পায়ে। বার্ণার্ড শ' একটু সুস্থ বোধ করলেন—রসিকতা করে ডাক্তারকে বললেন—আমি সেরে উঠলে তোমার ত' তেমন সুবিধে হবেনা। ডাক্তারের খ্যাতি বাড়ে কি করে জানো, কতজন খ্যাতিমান তাঁর হাতে পরপারে গেছে সেই হিসাবে।

এলিনর ও' কনেল দেখা করতে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—কেমন আছেন?

শ' বললেন—সবাই ওই কথা বলে। এখন আমি মরতে চাই, কিন্তু এমনই আমার শরীরের সামর্থ্য যে কিছুতেই আমাকে মরতে দেবেনা।

—আপনি কি মরতে চান?

—নিশ্চয়ই। যদি মরতে পারতাম (If only I could die) এ সবই অপচয়, সময়ের অপচয়, আহার্য্যের অপচয়, ইত্যাদি।

৪ঠা অক্টোবর তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। জীবনের শেষ মাসটি শান্তিতে কাটালেন। এই সময়টা তিনি খুব বেশী ঘুমাতেন। তারপর ২রা নভেম্বর ১৯৫০ তাঁর ঘুম আর ভাঙলো না।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে ভারতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত হল, ব্রডওয়ের আলো ম্লান করা হল। The Times পত্রিকায় প্রথম সম্পাদকীয় রচিত হল তাঁর সম্বন্ধে। এই মহামানবের মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবী সেদিন আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছিল।

শেষ

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

একটি চিঠি ও তার উত্তর

বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্বোধনের আগেই ইতিতে চোখ যায় সমাদ্দার সাহেবের। শুরুর চেয়ে শেষটায় আগ্রহ বেশি। যেন শেষটা দেখে তারপর শুরুটা শুরু করবেন কি না চিন্তা ক'রে তবে অগ্রসর হওয়া। নাম ধাম, পরিচয় বলতে যা কিছু সবত ঐ ইতিতেই। সুতরাং দরকারী চিঠি ছাড়া কাজে ব্যস্ত মানুষের গোটা চিঠিটা পড়ার সময় কৈ? ধৈর্য্যই বা কোথায়? আর এমন পুরোপুরি দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ধরে চিঠি পড়ার? ইতিতে নাম চিনলেন না। সম্বোধনে নামেও খটকা লাগল। আর ঐ খটকা লাগার দরুণ ঈষৎ কৌতূহলী হ'য়ে প্রথম লাইন দুটো পড়লেন তিনি। কাজের চিঠি ছাড়া অদরকারী চিঠি বেশি বড় হ'লে বিরক্তিতে তাঁর মোটা ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে। এ আবার শুধু বড় নয়, একটা খামে বাড়তি মাশুল দিয়ে যতটা ধরে ছাপাছাপি প্রায় ততটা।

লাইন দুটোর উপর চোখ বুলাতে বুলাতে তাঁর সেই বিরক্তিতে কৌতূহলে জোড়া ভ্রূ কখন সমান্তরাল হয়েছে; সে জায়গায় বিস্ময় জেগেছে চোখে। তার ওপরে একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছে, উপরে আবছা ভাসা ভাসা একটা ছবিও যেন ভেসে উঠল। যেন বছর বার-তেরর কালো রোগা হিলহিলে একটি অসুন্দর কিশোরী মেয়ে হাতের মুঠোয় একটা ডাঁসা পেয়ারা এগিয়ে ধরে তাকে সাধছে, —ভিখু খাবি? নে।

এই নাম। নামটা চিনতে পারেন নি ব'লেই তলার নামটা চিনতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। নইলে ইতিতে নিরুপমা লিখে বন্ধনীর ফাঁদে পুঁটি লিখে দিতে ওর ভুল হয়নি। তবু চিনতে প্রথমটা পারলেন কোথায়! নিজের নামকেই যে বেমালুম ভুলে যেতে পারে, অন্যের নাম তার অত সহজে মনে আসবে কি করে?

বিশেষ ক'রে পুঁটির মত কালো কুৎসিত একটা গ্রাম্য বোকা মেয়েকে! এই দীর্ঘ চব্বিশ পঁচিশ বছর পর।

বাইরে তিনি মিষ্টার সমাদ্দার। সমাদ্দার সাহেব। বন্ধু জনের কাছে সুরঞ্জন। আত্মীয় স্বজনের নিকটও তাই। ঘনিষ্ঠ জনের কাছে রঞ্জন। জীবিত যে দু'-চারজন গুরুজন ব্যক্তি এখনও আছেন, তাঁরাও আর তাঁর ছোটবেলার নাম ধরে ডাকেন না। বুঝি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ছোটকালের ছোট নামটা এমনি ক'রেই লোপ পায়। গুরুজনরা পর্য্যন্ত এখন তাকে পুরো নামে সম্বোধন করেন।

এই নিয়ে তাঁর মনে কোন কি ক্ষোভ ছিল?

না, ও সব বাজে সেন্টিমেন্টালের ধার ধারেন না তিনি। প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। কাজের মানুষ। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী। রাশভারী। দাম্ভিক। কৃতী পুরুষের দম্ভ। গম্ভীর স্বল্পবাক।

চিঠিটা হাতেই ধরা ছিল। শুধু সম্বোধনে ভিখু আর ইতিতে পুঁটি এই দুটো নামেই ওঠানামা করল চোখ কয়েক বার। গোটা গোটা অক্ষরে পরিষ্কার সমান লেখা। পড়তে কষ্ট হয় না। স্বভাবগম্ভীর মুখে হাসি ফুটল। হেলান চেয়ারটায় গা ঢেলে দিয়ে বেশ আরাম ক'রে বসে নিয়ে চিঠি পড়ায় মন দিলেন ভারতলক্ষ্মী অটোমোবাইল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার এস, কে, সমাদ্দার। অল্প একটু স্বগতোক্তিও বেরুল মুখ দিয়ে—"আশ্চর্য্য, এত দিন পর!"

'ভাই ভিখু,

আমায় চিনতে পারছিস কি? সেই জাবদাপোতার নিরুপমাকে? না, নিরুপমাকে তুই চিনবি না। ওটা আমার পোষাকী নাম। সেই রোগা, কালো, সামনের দুটো দাঁত উঁচু বল্লিপাড়ার পুঁটিকে? তুই যার নাম দিয়েছিলি গাবগাছের পেত্নী? চিনবি কি? তুই সুন্দর ছিলি কি না, তাই অহঙ্কারে অল্প অসুন্দর মানুষদের বিচ্ছিরি সব নাম দিয়ে দিয়ে ভেংচি কাটতিস। মনে আছে তোর?

খুব অবাক হবি। আমি স্পষ্ট বুঝছি। বিরক্তও কি হবি? আমি ঠিক বুঝছি না। আমি পঁচিশ বছর আগের ভিখুকে জানি। সে নিশ্চয়ই বিরক্ত হোত। আমার এই পত্র লেখাকে সে ধৃষ্টতা ব'লে মনে করত। আর শুধু মনে করাই নয়, সামনাসামনি যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করতেও কসুর করত না। কিন্তু সে ত অনেক দিন আগের একটা অবুঝ, অশান্ত, অহঙ্কারী কিশোর বালক। এই দীর্ঘ সময়ে তার বয়সের সাথে সাথে চরিত্রেরও কি পরিবর্ত্তন আসে নি? আমি সঠিক জানি না।

মাণিককে তোর মনে আছে?

সেই দত্তপাড়ার হিরণ কবিরাজের ছেলে মাণিক? ও মাঝে মাঝে আসে আমাদের বাড়ী। আমার শ্বশুরবাড়ীর দিক দিয়ে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে ওর সাথে।

আর ও এলেই জানিস, আমরা দুজন জাবদাপোতার সেই পুরোনো জীবনে ছুটে যাই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এ-হেন লোক নেই যার কথা আমরা বলাবলি না করি। সত্যিই যেন আমরা বয়সটাকে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে আবার সেই জাবদাপোতার দুটো কিশোর-কিশোরী হ'য়ে উঠি। কি যে আনন্দ, ভাষায় তা আর আসছে না।

আমার ঘরসংসার কাজকর্ম্ম সব প'ড়ে থাকে। আমার ছেলেমেয়ে দুটি হেসে কুটি কুটি হয়। বলে—মা, তুমি কি ছেলেমানুষ, যেন এখনও সেই ভুবন রায়ের তের বছরের বোকা অবোধ মেয়েটি আছ! ছেলেমেয়েরা আমাকে তাদের বন্ধুর দলে স্থান দিয়েছে। আমিই তাদের সে সুযোগ দিয়েছি। গুরুগম্ভীর মা হওয়া কি আমার সাজে? তুই বল।

তোরা বলতিস খোসামুদে, বোকা। ওরা বলে ছেলেমানুষ, সরল। এইটুকুই যা তফাৎ। আসলে স্বভাবে আমি বোধ হয় সেই পুরোন পুঁটিই আছি।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আমাদের আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে তোর কথা উঠবেই উঠবে। প্রথম ত, আমি আর মাণিক দুজনেই তোর রূপমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ ছিলাম; তার উপর তুই এখন কৃতী ব্যক্তি। তোর কথা ত আসবেই ঘুরে ফিরে।

মাণিক সেদিন বলছিল—আমাদের সময়ে যে ক'টি ছেলে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার মধ্যে আমার মনে হয় সুরঞ্জন সমাদ্দারই শ্রেষ্ঠ।

আমি তোর পোষাকী নামটা টপ ক'রে ধরতে পারিনি। জানতাম, তবু চট করে মনে আসে না। আমি ভেবেছি, মাণিক বুঝি দত্তপাড়ার সুরেন সমাদ্দারের ছেলে কেষ্টদার কথা বলছে। ওর ভাল নামও ত সুরঞ্জন সমাদ্দার। মনে নেই তোর? সেই যে বিলেত থেকে ব্যারিষ্টারি পাশ ক'রে এলো? কত হৈ-চৈ হোল গাঁয়ে?

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠেছি—কেন, আমাদের ভিখুও ত মস্ত হয়েছে।

এ কথায় মাণিক হেসেই সারা হোল। বলল—তুই চিরকাল এক রকমই রয়ে গেলি, আর ভিখুর নামই তো সুরঞ্জন। ভুলে গেলি? ভারতলক্ষ্মী অটোমোবাইলের জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার এস, কে, সমাদ্দার।

আমার ছেলেটি চোখ বড় করে বলল—সে কি? সেই তোমার ভিখু? এত যাঁর গল্প কর? তাঁকে কে না চেনে মা? মস্ত লোক।

ভিখু, তুই যে সত্যিই এত বড় হয়েছিস্, সর্ব্বজনে তোর নাম জানে, এ বুঝি আমার কল্পনায়ও আসেনি। ছেলের কথায় গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। আমি ঈষৎ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলেছিলাম—ও সব যত গালভরা নামই থাক্ না কেন, ভিখু আমাদের কাছে ভিখুই। না রে মাণিক?
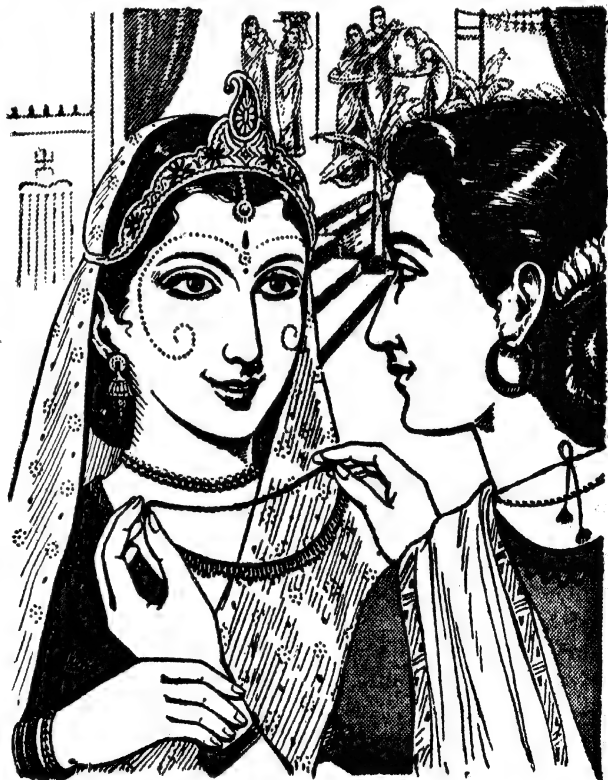
মাণিক কিছু না ব'লে হেসেছিল, হাসির অর্থটা আমি ঠিক ধরেছিলাম। ও হাসি দিয়ে এই বলতে চেয়েছিল 'ভিখুর তোষামোদ ক'রেই তোর দিন গেছে, ভিখু বিন্দুমাত্র তোকে পাত্তা দেয় নি'। এ ত আমরা চোখেই দেখেছি। তবে কা'কে তুই কি বলছিস ?

ভিখু, ওরা তোর চোখের জলের ইতিহাস জানে না। আমি বলিনি। মাণিকের হাসিটাকে আমি তাই অনায়াসেই অগ্রাহ্য করতে পারলাম।

তোর একনায়কত্ব আমরা সবাই মেনে নিয়েছিলাম। কেন ? কি ছিল তোর মধ্যে ? এক মাত্র বাপের টাকা আর নিজের চেহারা ছাড়া ? তুই ছিলি স্বভাবনিষ্ঠুর খেয়ালী, অহঙ্কারী বিশ্ববখাটে। বড় লোক বাপের একমাত্র পুত্র ব'লে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলও। সেই চোদ্দ পনের বছর বয়সেই সিগারেট খেতে শিখেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাদের সামনেই খেতিস। কারণ তুই পরিষ্কার জানতিস তোর ভয়ে আমরা কেউ মুখ খুলব না

দেখ, একদল মানুষ অন্যের উপর প্রতিপত্তি করার মত শক্তি নিয়েই জন্মায়। আবার তার উল্টোটাও আছে। বিপরীত শক্তি নিয়ে আরেক দল মানুষ আনুগত্য স্বীকারটাকেই তাদের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলে মেনে নেয়। ভিখু, একমাত্র চেহারা ছাড়া তোর আনুগত্য স্বীকারের অন্য কোন আকর্ষণ ছিল না। তুইয়ে তুইয়ে আমরাই তোর গুমর বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। চটছিস ? এখন আর তোকে ভয় কি বল্? তুই পঞ্চাশ বছরের এক প্রৌঢ়, জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সুখী, আমি পঞ্চাশ ধরব ধরব এক প্রৌঢ়া, আত্মবিশ্বাসে অটল। অন্য আর সব বিষয়ে যত আকাশ পাতাল তফাতই থাকুক না কেন, বয়স আমাদের কারুকেই ছেড়ে কথা কয়নি।

তাই তুই কিছুতেই আর স্পর্দ্ধা ভেবে কিল উঁচিয়ে ছুটে আসতে পারিস না আগের মত। আমিও আর আগের মত সে নিষ্ঠুরতা মুখ বুজে সহ্য করতে পারি না। সময় আমাদের অনেক কিছু নিয়েছে। তবু এখনও অমন একটা দৃশ্য কল্পনা করতে আমার মোটেই খারাপ লাগছে না। তোর ?

আমার মেয়ে বলে—মা, আসলে তোমার বয়সটাই বেড়েছে। মনটা তাল রেখে তার সাথে বাড়তে পারেনি। সেই জাবদাপোতায়ই স্থিতধী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

হয়ত। কিন্তু তাতে কার কি অসুবিধে হচ্ছে ? আমি আমার সেই মনটা নিয়েই যদি মশগুল থাকি, কার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে ?

আসলে আমার ছেলেমেয়ে দুটি আমার এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের মায়ের ছেলেবেলার গল্প শুনতে আনন্দ পায়। খুশীতে একেক সময় জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে—মা, তুমি কি সাংঘাতিক ভাল ছিলে মা। ভিখু, এমন কথা তোরা কেউ বলিসনি কোন দিন।

নিজের চেহারার দৈন্যে এমনিতেই আমি নীচু হ'য়ে থাকতাম তোদের কাছে। তার ওপর আমার বাবাও ছিলেন দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার। আমার ওপর নির্য্যাতনটা তুই তোর অধিকার বলে ধরে নিয়েছিলি। আমি ত ওটা আমার প্রাপ্য ব'লেই মেনে নিতাম। শান্ত, নিরীহ, বোকা বলে প্রতিবাদ করার শক্তিও ছিল না।

তুই আঘাত দিয়ে দিয়ে কথা বলে মজা লুটতিস, আমি ম্লান মুখে তাই সইতাম। ভিখু, কি বোকা ছিলাম আমি! বাড়ীর গাছের আম, জাম, পেয়ারা আমি কক্ষণো তোকে না দিয়ে খাইনি। মা আমায় এর জন্যে কত বকুনি দিয়েছেন। বলেছেন—ভিখুর জন্য কি অত ? ও বড় লোকের ছেলে, ওর সাথে তোমার কি অত খেলা ? বড় হয়েছ এখন আর বাইরে ছুটে ছুটে যাবে না।

বার তের বছরের মেয়েকে বাইরে বেরোতে নেই বললেই কি সে মানে ? আমি লুকিয়ে লুকিয়ে শাড়ীর তলায় আম পেয়ারা নিয়ে ছুটে যেতাম তোদের খেলার মাঠে

সবাইকে কম কম দিয়ে তোকে অনেকটা দিতাম। ভিখু, সে সব দিন কি তোর মনে আছে ? এক দিন তোরা চোর-চোর খেলছিলি। তুই, মাণিক, পচা, ভূপতি, পুশি, লতু, মনু।

আমায় দেখেই পুশি চেঁচিয়ে উঠল—ভিখু, ঐ দেখ পুঁটি আসছে। ভিখু, তুই হঠাৎ খেলা বন্ধ করে আমার সামনে হনহন করে এগিয়ে এলি।

তোর মুখ দেখে আমার ভয় হোল। কাছে এসে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলি—এই পুঁটি, তুই নাকি লুশিকে বলেছিলি আমার ছোট পিসীর চোখ ট্যারা ?

ভয়ে আমার গলা কাঠ হ'য়ে আসছিল। কোন রকমে মাথা নেড়ে অস্বীকার করতে চাইলাম, লুশি চোখ পাকিয়ে তেড়ে এলো —এই মিথ্যুক, তুই বলিস নি ?

তুই ঠাস করে আমার গালে চড় কষিয়ে দিয়ে মুখ ভেংচে বললি—নিজে কি ? কেলে সুন্দরী। গাবগাছের পেত্নী। যা ভাগ।

ওরা উচ্চরোলে হেসে উঠল। আমি চোখে হাতচাপা দিয়ে ছুটে এলাম বাড়ীতে। ভিখু, মনে পড়ে ?

আরো আছে, শোন। বাবা, মা, আমার বিয়ের জন্য অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন। তেরয় পেরিয়ে চোদ্দয় পড়লাম। সম্বন্ধ অনেক এলো। কতজনে দেখে গেল, কিন্তু পছন্দ আর হোল না কারো। এ নিয়েও তুই আমায় আঘাত দিয়ে দিয়ে কত কি বলেছিলি।

সেদিন আমি মায়ের আচারের বোয়ম থেকে তেঁতুলের আচার চুরি ক'রে তোদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। তুই আদেশ করেছিলি আমায় তেঁতুলের আচার আনতে। বৃষ্টি পড়ছিল ঝির ঝির। তোদের দক্ষিণখোলা বারান্দায় তুই আর পচা দাঁড়িয়েছিলি। আমায় দেখে তরতর ক'রে নেমে এলি। আমি সবটা তোর হাতে তুলে দিলাম। তুই পচাকে দিলি, আমাকেও একটু।

খুব রসিয়ে রসিয়ে খাচ্ছিলি। পচা এক সময় বলল—ভিখু, কাল পুঁটিকে দেখতে এসেছিল যে। জানিস না তুই ?

তুই চোখ বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বললি —সত্যি নাকি ? তা বরটি কি ? ভূত না রাক্ষস ? না ভূতই। ভূত-পেত্নী। একটু আগের তেঁতুলের আচার তখনও টাগরায় ফেলে টাস টাস শব্দ করে খাচ্ছিস। আমার চুরি করে আনা তেঁতুলের আচার।

ভিখু, সত্যিই তুই অসাধারণ। সেই ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু তোর শুধু যদি ঐ চেহারাই আমার স্মৃতির সম্বল হয়ে থাকে তবে কি আজ দীর্ঘ কাহিনী লেখার প্রেরণা পেতাম নিজের অন্তর

থেকে ? তা নয়। তোর পরিবর্তন অনেক দেখলাম আমি। একবার শৈশব অবস্থায় আমি একদিন খোঁড়া ভিক্ষুককে খোঁড়া বলে ক্ষেপিয়েছিলাম, তুই আমায় নিষেধ করেছিলি। বলেছিলি—খোঁড়াকে খোঁড়া ও কানাকে কানা বলতে নাই। আমি বইতে পড়েছি। সেই তুইই আবার আর একটু বড় হয়ে কা'কে কি না বলেছিস ?

ভিখু, সবচেয়ে যে ছবিটা আজও স্পষ্ট জলজলে হয়ে বার বার ফুটে ওঠে, যেদিন থেকে আমি তোকে আমার কাহিনী শোনাব বলে স্থির করেছিলাম, সেই দিনটার কথা বলি। সেই তোর চোখের জলের দিনটির কথা। ভিখু, চোখের জলের উল্লেখে কি লজ্জা পাচ্ছিস ?

বিয়ে আমার হোল। পাশের গাঁ ক্ষেত্রপুরের অবনী রায়ের ছেলের সাথে। বিয়ে মিটল। পরের দিন শ্বশুরগৃহে যাত্রা। আমার চোদ্দ বছরের জীবনে বাবা, মা, ভাইবোন, আমার খেলার সাথী তোদের সবাইকে ছেড়ে যেতে জীবনের সব চেয়ে বেশি কান্না আমি কাঁদলাম।

বিকেলের দিকে পাল্কী করে রওনা হয়েছি। স্বামী হেঁটে চলেছেন। কিছুটা এগিয়েও গেছেন। আমার পাল্কীর সাথে সাথে হেঁটে চলেছে আমার ছোট ভাই অমূল্য। ভিখু, তাকে তোর মনে আছে? সে আর বেঁচে নেই। গত বছর মারা গেছে।

গাঁয়ের শিবমন্দিরটা ছাড়িয়ে 'এসে আমরা সবে বড় মাঠটায় নেমেছি। হঠাৎ অমূল্য আমার পাল্কীর দরজাটা একটু ফাঁক করে বলল—দিদি, ভিখুদা'।

আমি তখন আর কাঁদছিলাম না। ভাবছিলাম স্বামীর কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা। অমূল্যর কথায় চমকে আমি দরজাটা আরো একটু ফাঁক করে মুখটা বাড়িয়ে দিলাম। একটা সাইকেল সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। তোর নূতন কেনা সাইকেল।

থামল। তুই নামলি সাইকেল থেকে আমার পাল্কীও থামল। স্বামী এগিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানেই থেমে দাঁড়ালেন।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে তুই কি কতকগুলো তুলে আনলি। হাতটা সামনে ধরে বললি—বিন্তিতি আমড়া। তুই খেতে চেয়েছিলি। নে।

ভিখু, জীবনে অনেক পেয়েছি, জানিস? স্বামীর অগাধ ভালবাসা। ছেলেমেয়েদের অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা। কিন্তু সেদিন তুই যা দিয়েছিলি তার বুঝি আর তুলনা নেই। সে ছবিটা আমি একটু ভাবলেই চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করি। হুবহু। একটুও কষ্ট হয় না। ভাবি, এমনি ছোট দু-একটা কথায়ই একটা মনের কতটা দেখা যায় ; আমি তার সবটা দেখেছিলাম।

আমড়াগুলো হাতে নিয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। তোর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অবহেলা, বিদ্রূপ আমার চোখের জল টেনে আনতে পারেনি।

আজ তোর দুটো সাধারণ কথা আমায় যেন বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ধরাগলায় তুই বললি—কাঁদিস না পুঁটি, কাঁদিস না। এই ত কাছেই। ইচ্ছে হলেই চলে আসবি। আমিও সাইকেলে চড়ে চলে যাব সাঁ সাঁ—কাঁদছিস কেন ?

বলতে বলতে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছলি তুই। মনে পড়ে ভিখু, মনে পড়ে ? এর পরে ফুলশয্যের রাতে স্বামী আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছেলেটি কে ?

আমি শুধু সে রাতে তোর কথাই বললাম। কত তোরা বড়লোক। কত তোদের দাপট। কত তুই সুন্দর।

স্বামী হেসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন—তোমার খেলার সাথী ত তবে মস্ত লোক। ভিখু, বিশ্বাস করবি ?

খুব আশ্চর্য্য হচ্ছিস ? ভাবছিস এত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা এত দীর্ঘদিনের ব্যবধানে স্মরণ থাকে কি করে ?

ভিখু শোন, ভগবান বাইরে যাদের কিছু দেন না, অন্তরে তাদের এমনি দু একটি সদ্‌গুণ দিয়ে দেন, নইলে অসুন্দর মানুষরা জীবনে সুখী হয় কি করে বল ?

মোটা চুনীকে মনে আছে ? সেই যে ছোটবেলায় যাকে ক্যাবলা কার্ত্তিক বলে ক্ষ্যাপাতিস ? ওর সাথে হঠাৎ সেদিন ট্রামে দেখা। জোর করে টেনে আনলাম বাড়ীতে। অনেকের খবর পেলাম। কে কোথায় আছে, কি করছে।

তোর কথাও বলল। বলল—ভিখু আজকাল বড়লোক হয়ে ছোটবেলার বন্ধুদের চিনতে চায় না। ও নাকি ওর সেজ ছেলেটির জন্য তোর কাছে চাকরির উমেদারী করতে গিয়েছিল। তুই নাকি বলেছিস ম্যাট্রিক ফেল ছেলের কোন চাকরী আপাততঃ তোর হাতে নেই। থাকলে জানাবি। আর বলেছিস, যোগ্যতর ছেলে হলে নিশ্চয়ই চাকরি হবে। শুধু খাতিরে তুই চাকরি দিস না। সত্যি ? ভিখু, সত্যি ? চুনী খুব রেগে গিয়েছিল তোর ওপর। অনেক কিছু বলল কড়া কড়া। কিন্তু আমার শুনে কি যে ভাল লাগল—'

এটা পত্র নয়। এটা কাহিনী।

পড়তে খুব বেশি বিরক্তিকর লাগছে? ধৈর্য্যের শেষ সীমায় এসে রাগে বিরক্তিতে কি কেটে পড়তে চাইছিস?

আর নেই। অল্পই। ধৈর্য্য ধরে আর একটু শোন। এর পরেও দু-চারবার জাবদাপোতায় গিয়ে তোকে দেখেছি।

তুই তখন গাঁয়ের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় কলেজে পড়ছিস। লেখাপড়ায় খুব ভাল হয়েছিস। সবাই খুব অবাক হয়েছে। আমি হইনি। আমি তোর পরিবর্ত্তন সেই শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পথেই দেখে গেছি। আর একটা মোড় ঘুরেছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি বুঝেছিলাম।

শুধু ভাবতাম, ভাল-মন্দর মোড় ঘোরাঘুরির শেষটা কি? ভাল না মন্দ? অনেকের মুখে শুনি তুই খুব দাম্ভিক। অহঙ্কারী।

আমি বলি, দম্ভ ভাল নয়। তবে অহঙ্কার করার মত সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে সে অহঙ্কারে নিন্দে কি? কৃতী পুরুষের অহঙ্কার ত একটা ভূষণ।

এর পর ধাপে ধাপে তুই কোথায় উঠে গেলি। আমিই কি পড়ে রইলাম? না ভিখু, আমিও নীচে রইলাম না। আপন সংসারে সবার উপরে আমার প্রতিষ্ঠা হোল।

শ্বশুর-শাশুড়ী'র স্নেহে, স্বামীর প্রেমে, ছেলেমেয়েদের ভালবাসায় আমি পরিপূর্ণ হয়ে উঠলাম।

কিন্তু সুখ কি কারো চিরকালের? শ্বশুর-শাশুড়ী গেলেন। তার চার বছর পর স্বামী। দুটি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি একেবারে অগাধ সমুদ্রে পড়লাম। হাবুডুবু খেলাম, কিন্তু ডুবলাম না। আত্মবিশ্বাসের যে মূল শিকড়টি আমার মনে গেঁথে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার স্বামী, তার জোরে আমি স্থির বিশ্বাসে অটল রইলাম। দুটো পাশও দিলাম। খুঁজে পেতে চাকরি যোগাড় করলাম। তারপর দীর্ঘ বার বৎসর ধরে সংসারতরণীটি বাইয়ে নিয়ে চলেছি। ঝড় আসে, তুফান আসে, বৃষ্টি বাদলা। তরী এ পাশে হেলে, ও পাশে কাত হয়, জল ওঠে। কিন্তু ডোবে না। শক্ত হাতে আমি যে তরীর হাল ধরে আছি।

এত দীর্ঘ কাহিনী শোনালাম কেন তোকে? কি লাভ? ভিখু, জীবন কি একটা লাভ-ক্ষতির হিসাব খাতা? এ একটা নেশা। গল্প শোনানর নেশা। আমি নিজেকেই নিজের গল্প শোনাই। ছেলেমেয়েদের শোনাই। তোকেও শোনালাম। কেন? আমার ছেলেবেলার গল্পে তুই যে অনেকটাই জুড়ে আছিস। তোকে শোনানর সুযোগ খুঁজছি আমি অনেকদিন থেকে। সেই—সেদিনের চোখের জলের দিনটি থেকে। আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ এসে গেল। সেটাই বলি।

ছেলেটি বড়। বি-এ, পাশ ক'রে একটা চাকরির জন্য আকাশ পাতাল খুঁজে মরছে। পাচ্ছে না।

সেদিন দুপুরে কোথা থেকে ঘুরে এসে ক্লান্ত হ'য়ে আমার পাশে ধপাস ক'রে বসে পড়ল। ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বরে বলল—না, মা, আজকালকার দিনে মুরুব্বী ছাড়া চাকরি হয় না। অনেক দেখলাম, অনেক খুঁজলাম। হবে না। কি করি মা, কি করি?

ওর ভেঙ্গে-পড়া চেহারাটা আমার মনে সমুদ্র-ঢেউয়ের মত আছড়াচ্ছিল। আমার ছেলেমেয়ে দুটি প্রাণবন্ত। শত অভাব অনটনও ওদের প্রাণচাঞ্চল্যকে ম্লান করতে পারেনি। আমি ওর মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে কি একটা সান্ত্বনা-আশ্বাসের কথা বলতে গেলাম। তার আগেই ও একান্ত হতাশ গলায় স্বগতোক্তি করে উঠল—একজন বড়লোক আত্মীয়ও আমাদের নেই, যাকে একটা ধরা যায়—

আর তক্ষুণি, আশ্চর্য্য, সেই মুহূর্ত্তেই তোকে মনে পড়ল ভিখু! শুধু মনে নয় মুখ ফস্কে আমার বেরিয়ে এলো ভিখুকে বললে— কথাটা, খোকন আমাকে শেষ করতে দিল না। প্রবল আপত্তি জানিয়ে ভুরু কুঁচকে বলতে লাগল—না, না, না। কক্ষণোও না। খবর্দার না!

ভিখু, তোকে ওরা দেখেনি। কিন্তু আমার মুখে তোর এত কথা শুনেছে যে, মায়ের ছোটবেলার নির্য্যাতনগুলো যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে পারে ওরা। ওর অশ্রদ্ধা অভক্তির বহর দেখে আমি আশ্চর্য্য হোলাম, ক্ষুব্ধ হোলাম, ব্যথিত হোলাম।

আমি কি শুধু তোর একদিকই তুলে ধরেছি ওদের চোখের সামনে? তার চেয়ে অনেকটাই বেশি ক'রে গল্প বলেছি যে সেদিনের সেই চোখের জলের।

খোকন আমার দিকে রাগ করে তাকাল—কক্ষণো তুমি ও কাজ করবে না।

ও ঘর থেকে মেয়েও ছুটে এলো। সব শুনে বিরক্ত চাপা স্বরে বলল—ছি ছি ছি! ভিখুর তোষামোদ করা কি ইহজীবনে ঘুচবে না তোমার? ভিখু, ওদের কথার কোন জবাব দিলাম না আমি। কি দেব? ওদের অল্প বয়স, বাইরের চেহারাটা দেখে। তলিয়ে দেখার বয়স, মন ওদের এখনও আসেনি। ওরা ত তোর বাইরের চেহারাও দেখেনি। শুধু শোনা কথায় ক'টা লোকে আস্থা রাখে বল?

পারিস্ কোন ব্যবস্থা করতে? একটি সাধারণ ভাবে বি-এ, পাশ করা ছেলের যোগ্যতা অনুযায়ী কোন চাকরির সন্ধান আছে তোর কাছে?

ওরা ঘুমিয়ে আছে। আমি চুপি চুপি লিখছি। ওরা জানলে রাগ করবে, দুঃখ পাবে। এই নিঃসাড় রাতে আমি যেন চলে গেছি সেই জাবদাপোতায়। পাকিস্থান হ'য়ে গেছে। আর যাওয়া হবে না। বড় দুঃখ হয়। হঠাৎ একটা খটকা আমায় সূঁচের মত ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল।

ভিখু, তুই কি ভাবছিস খোকার চাকরির উমেদারি করতে এত পূর্ব্বস্মৃতি টেনে আনলাম তোর সামনে? আমার মেয়ে যা বলেছে, সেই খোসামোদই করছি বলে কি ভাবছিস তুই?

না, না, ভিখু, তা নয় তা নয়। খোকার চাকরি একটা উপলক্ষ্য, একটা সুযোগ।

দীর্ঘ পঁচিশ বছরে চিঠি লেখার সুযোগই আমি খুঁজেছি। আজ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হোল মাত্র। খোকা বি-এ পাশ করেছে। উদ্যোগী ছেলে। আজ হোক, কাল হোক, চাকরি ওর হবে। যোগাড় ও করবেই।

এ শুধু গল্প বলা, কাহিনী শোনান। নেশা। আমি আর আমাতে নেই। জাবদাপোতার ভুবন রায়ের তের বছরের কালো মেয়ে পুঁটি হয়ে একটা ছেঁড়া ময়লা শাড়ী সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে একটা
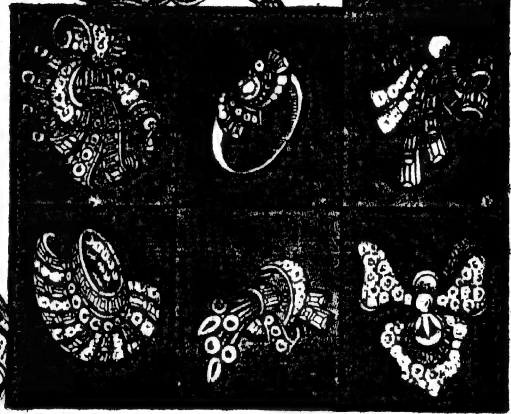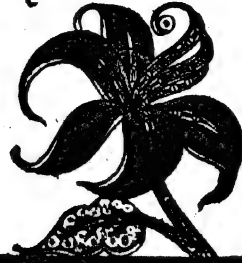
টুকটুককে কামরাঙ্গা তোর সামনে ধরে সাধছি—নে ভিখু! আমাদের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের গাছের কামরাঙ্গা। খুব মিষ্টি। নে, খা।

সময়ের অনেকটা অপব্যয় হোল বলে খুব বিরক্ত হয়ে হাতের কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠছিস? বিরক্ত চাপা স্বরে কি বলছিল—যত্ত সব?

না, ভিখু, আমার তা মনে হয় না। মোড় ঘুরাঘুরির শেষটা যে আমি তোকে অন্য রকম ভাবছি।

তোর ক'টি ছেলে-মেয়ে? কে কি করছে? খুব জানতে ইচ্ছে হয়। তোর স্ত্রী শুনেছি খুব সুন্দরী বিদুষী মহিলা। ভিখু, নইলে তোর কাছে মানাবে কেন?

তোর গল্প শোনার আশায় রইলাম। এখনকার গল্প। ভগবানের নিকট তোদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি। ছেলে-মেয়েদের আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিস। স্ত্রীকে আমার ভালবাসা জানাস। তুই আমার আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করিস। ইতি—

নিরুপমা রায় (পুঁটি)

মাইনাস ফাইভের নীচে দৃষ্টিটা ঝাপসা ঠেকছে। ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান লুপ্ত হয়ে মন ছুটে গেছে সেই অতীতে। জাবদাপোতায়। কৈশোরবেলার একটা ছবি যেন অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। ঝাপসা দৃষ্টির ভেতর দিয়ে আবছা আবছা একটা ছবি যেন ফুটে উঠছে। যেন বিকেল গড়িয়ে একটা সন্ধ্যা। আলো আঁধারে। ঐ দূরে মাঠের মাঝ দিয়ে দুলকি চালে একটা পাল্কী চলেছে। অল্পবয়সী একটি কিশোর বালক পাল্কীর পাশে পাশে হেঁটে চলেছে।

পাল্কীর দরজাটা অল্প একটু ফাঁক হোল। আরো একটু। কনে চন্দনে সাজান একটি কিশোরী মেয়ের মুখ আবছা আবছা ভাসছে।

দু'চোখের জলে চন্দন প্রসাধন একাকার। প্রসারিত হাতে কি কতকগুলো। পাল্কী আবার চলল। দরজাটা কিন্তু খোলাই রইল। পুরোপুরি।

দড়াম। চমকে বিস্মৃতির অতল থেকে বাস্তবে ফিরে এলেন মিঃ সমাদ্দার। কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে গিয়েছিলেন বুঝি সেই শৈশববেলায়। পুঁটি ঠিকই লিখেছে, চেষ্টা করলে সে সব দিন মনের অতল তল থেকে তুলে আনা যায়।

কিন্তু শব্দটা কিসের? উঠলেন। রেলিং ঝুঁকে তাকালেন নীচে। বিরাট ক্যাডিলাকটা এসে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী নেমে দরজাটা বন্ধ করেছে। তারই শব্দ।

হেসে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। আজই উত্তর দেবেন। ঠিক এই মন এই ইচ্ছা থাকতে থাকতে। কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষের অনেক জ্বালা। ভুলে যেতে পারেন। কলমের খাপ খুলে আরম্ভ করলেন—ভাই পুঁটি—

রাঙ্গামাটি

বিভা সরকার

ছুটলো গাড়ী বর্দ্ধমান—রাঢ়ের এ রাঙ্গামাটি কি সের শার রক্তে রাঙ্গা? জাহাঙ্গীরের কলঙ্কে কি এ প্রান্তর উদাসী? দূর গাঁয়ের পথে পাল্কী চলেছে হৃদয়াবেগে কা'কে নিয়ে কোন দিকে?

এমনি করেই কি একদিন সের আফগানপত্নী সদ্যবিধবা মেহেরউন্নিসা চোখের জলে এ রুক্ষ মাটি ভিজিয়ে দিল্লীর পথে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন পতিঘাতী বাদশাহের মহলে?

একদা নর্ম্মসহচর যুবরাজ সেলিম সেদিন শাহনশাহ জাহাঙ্গীর। সেই জাহাঙ্গীর কি সেদিন তাঁর নয়নে আর প্রিয়তমের রূপ ধরে শ্রদ্ধা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন?—ইতিহাস এর বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। বহু প্রতীক্ষার পর যুবরাজ যখন ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলেন বাদশাহ রূপে অন্যায়ের বিনিময়ে তাঁর প্রেমাস্পদাকে—চমকে দেখলেন যে এল এ ত তাঁর সেই কবে হারিয়ে যাওয়া আকাঙ্খিতা নয়! কালস্রোতে সে চিরদিনের মতই ভেসে গেছে—সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সের আফগানের সদ্যবিধবা, স্বামিহত্যার বিচার চায়। বিচার চায় লায়লির জননী অকারণে লায়লিকে অনাথ করার অপরাধের। নিদারুণ ব্যথায় চমকে উঠলেন জাহাঙ্গীর, মাথা নত করে ফিরে গেলেন রাজমহলে—সেদিন তাঁর ধর্ম্মঘণ্টা কলঙ্কধ্বনিই করেছিলো। বর্দ্ধমানের লোকের মুখে আজও জেগে আছে এক অদ্ভুত কিংবদন্তী সের আফগানের সমাধি ঘিরে। আজও নাকি নিশীথ রাতে শোনা যায় কোনও রমণীর ক্ষীণ পদধ্বনি চাপা ক্রন্দনের স্বর, এই সমাধি মন্দিরে।

তবু মনে হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের এ কলঙ্ক সবটাই তাঁর কলঙ্ক নয়। মহামান্য আকবরের ইচ্ছায় নওরোজার বাজার বসত মোগল হারেমে—এর ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয় উজীর ওমরাহ অথবা রাজঘরের ঘরণী বা কন্যা। এই প্রস্ফুটিত পদ্মবনে একমাত্র সূর্য্য বাদশাহ বা যুবরাজ। কত ঘরের কত সর্ব্বনাশ কত অঘটনই না ঘটেছিলো এই নওরোজার বাজারে, তার সত্য ইতিহাস আজ কালের কবলে লুপ্ত। তবু কিছু কিছু আজও শোনা যায় লোকমুখে কিংবদন্তীর আশ্রয়ে।

এমনি এক নওরোজার বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন যুবরাজ সেলিম—ফুলওয়ালী মেহেরউন্নিসার ঘোমটা গেল খুলে স্বেচ্ছায় বা দৈবেচ্ছায়, তা শুধু জানা রইল অন্তর্য্যামীর। চারি চক্ষুর মিলন হল—আরম্ভ হল সেই চিরন্তন লুকোচুরি খেলা। লুকিয়ে নিত্য হয় দেখা-সাক্ষাৎ—ফুলওয়ালী মিহর আসে ফুলের গহনা নিয়ে মহালে মহালে রাজমহিষীদের সাজাতে, পথ আটকায় সেলিম—বলে ভালবাসি তোমাকে, তুমি না হলে এ জীবন বিফল। প্রশ্রয় বুঝি বা পান—সময়ে অসময়ে প্রতীক্ষায় থাকেন সেলিম—শূন্য হাওয়ার কার আসার আশায় ব্যর্থ পদধ্বনির মরীচিকায় উদভ্রান্ত হন? মহামান্য সম্রাটের কর্ণগোচর হল এ কাহিনী। নির্ম্মম হস্তে তিনি বাধ সাধলেন—হায়, বহু অভিজ্ঞ সম্রাট জানতো নাকি প্রেমের বিচিত্র গতি! তোমার হুকুমে সে যে কোনও রমণীকে গ্রহণ করতে পারে পত্নীরূপে কিন্তু ভাল যদি অপরাকেই বাসে দোষ দেবার কিছু নেই—চিত্তদৌর্ব্বল্যের কাছে মানুষ যে চিরশিশু!

সম্রাট তাঁর আশার আশা ছিনিয়ে নিয়ে জোর করে সে ছিন্ন মুকুল পাঠিয়ে দিলেন বাংলামুলুকে সের আফগানের ঘরণী করে। নিষ্ফল আক্রোশে যুবরাজ হলেন স্তব্ধ। সে অনিদ্র বিরহীর অতল বিরহের খবর কেউ রাখল না, বিফল বেদনায় বার বার বুঝি সে শূন্য বাতাসকে জানিয়ে কাঁদে—আমায় ভুল না। ভুল না মেহেরউন্নিসা!

সেদিনের অসহায় রাজপ্রতিনিধি ভবিষ্যের সম্রাট, মনে মনে বুঝি প্রতিজ্ঞা করলেন—মেহের আজ আমার পথ লৌহযবনিকায় হারিয়ে গেছে—আমার প্রাণপ্রবাহ কঠিন পাষাণে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে, আজ আমার জীবন বন্ধন-কণ্টকিত জটিল তবু জেন, একদিন সব কণ্টক পায়ে দলে আমি তোমার দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াবো—সেদিন তুমি এস সব গরল মন্থন করা অমৃতপাত্র হাতে নিয়ে—আজ শুধু রইলুম প্রতীক্ষায় সেই পরম মুহূর্ত্তটির—কিন্তু এ সংসারে যা যায় তা চিরদিনের জন্যই যায়। সেদিনের সে প্রেমিক কণ্টক পায়ে দলে দলে দয়িতার দুয়ারে গেল না—গেল রাজদত্ত অন্যায়ের অত্যাচারের পথ ধরে—তাই কি বিমুখ হল মেহেরউন্নিসা ?

কালস্রোতে যুবরাজ সম্রাট হলেন—একে একে হারেম তাঁর পূর্ণ হল বহু রমণীতে—মহালে তাঁর রূপসীদের সমারোহ—জাহাঙ্গীর বাদশাহের মন তবু শূন্য, চিত্তের হাহাকার তবু মিটল না—কবে সেই কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে দেখা মানুষটির জন্য অন্তরে তাঁর বিরহ জেগেই রইল—দিবারাত্র সম্বল করলেন সুরাপাত্র। শূন্য নিশীথে আনমনা মুহূর্ত্তে হৃদয় তাঁর আতুর হয়ে উঠত কা'কে কামনা করে ?

* * * *

জাহাঙ্গীর বাদশাহ যে এত সুরাপান করতেন, সে ত মনে হয় মহামান্য আকবরেরই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে। যুবরাজ সেলিম ছিলেন সুকবি প্রেমিক আপনভোলা দিলদরিয়া মানুষ। বার বার প্রেমের স্বপ্ন ভগ্ন না হলে—এমন মর্ম্মান্তিক আঘাত না পেলে হয়ত তিনি ইতিহাসে রেখে যেতে পারতেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—হয়ত হতে পারতেন স্বনামধন্য আদর্শ পুরুষ। ইতিহাসে নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে নিয়ে এই যে কলঙ্ক—রাঢ়ের মাটিতে এই যে ভুবনজেতা জাহাঙ্গীরের কালো কালিমা, এর জন্য দায়ী কে ? এ কার কলঙ্ক ? এক দিন যুবরাজের প্রিয়তমাকে ছিনিয়ে নিয়ে পরের ঘরণী করিয়ে দিয়েছিলেন—রাজকীয় গর্ব্বে ক্ষমতার অন্ধ অপব্যবহারে পুত্র ও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করল বিধির বিধানে অদৃষ্টের পরিহাসে।—হে সম্রাট আকবর, তুমি একবার নয় বার বার পুত্রের হৃদয় নিয়ে ছেলেখেলা করেছিলে, তাকে দিয়েছিলে নির্ম্মম আঘাত। তার আকাঙ্ক্ষিতাদের সে তোমার অভিশাপেই পায়নি।

অগ্নে অর্পিত-হৃদয় যুবরাজ—চলে গেল ফতেপুর সিক্রী তোমার ইচ্ছায়। বিরহী মনে তার সুখ নেই, নেই কোথাও সান্ত্বনা রাজমহলের এই বৈভবে! সারা বিশ্ব তার দেউলে হয়ে গেছে—

ফতেপুর সিক্রীর রাজমালঞ্চে বসে আছেন যুবরাজ অন্যমনা—একটি একটি করে পায়রা উড়ে আসছে উড়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে আবার আসছে। যুবরাজ বড় কবুতরপ্রিয়—কত যে তাঁর কবুতর, সীরাজি, মুখথি লক্কা—উড়ন পায়রা, লোটন পায়রা, গিরেবাজ পায়রা, কেউ বা এসেছে কাবুল থেকে। কারু বা জন্মস্থান বোগদাদে কেউ বা পারস্যদেশীয়। আবার লক্ষ্ণৌ দিল্লী লাহোর থেকেও এসেছে পায়রা—কান্দাহার পেশওয়ার থেকেও কত বিদেশী বণিক দিয়েছে কত ভিনদেশীয় কবুতর সম্রাটপুত্রকে। একদিন এমনি কবুতর নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন যুবরাজ। হঠাৎ তাঁর ডাক পড়ল বিশেষ জরুরী কাজে—কাছে ছিলেন বালিকা মেহেরউন্নিসা। ফুল দিতে এসে কবুতর খেলা দেখছিলেন সহজ কৌতুকে। তারই হাতে দিয়ে গেলেন এক জোড়া পায়রা গচ্ছিত। কিছু পরেই ফিরে এসেছেন ব্যস্ত-ত্রস্ত। দেখেন হাতে মেহেরের এক পায়রা। চোখ পাকিয়ে তেড়ে গেলেন রাজার ছেলে—আর এক পায়রা কই ? নির্ভয়ে কিশোরী উড়িয়ে দিল অন্য পায়রাটি—বললে—উড়ে গেছে এমনি করে!—মুগ্ধ যুবরাজ তর্জ্জন করবেন কি—বার বার চেয়ে দেখলেন এই নিঃশঙ্কিতার পানে। কেউ কি সেদিন অনুমান করতে পেরেছিল সম্রাটকে করতলগত করে এই মেয়েই এক দিন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন করবে ?—নানা বিগত বিস্মৃত স্মৃতির চিন্তায় মগ্ন যুবরাজ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন রাজমালঞ্চে। অন্তরে তাঁর অসহায় আতুর দীর্ঘশ্বাস হাহাকার করে উঠছে। হঠাৎ কে দ্রুত পায়ে পাশ দিয়ে চলে গেল—যেন চলন্ত ফুল!

বিরহীর টনক নড়ল—জাগল মনে কৌতুক। আবার পরদিন এসে বসলেন মালঞ্চে। একটু আড়ালে। বাগানে ফুল তুলতে আসে এক ইরাণী মেয়ে। বৃদ্ধ বাপের নয়নমণি, শৈশবে মাতৃহারা। ঠাঁই তাদের এক পুরানো মসজিদে—রাজ-অনুগৃহীত তারা।

একদিন এই কন্যাকে বাদশাহ আকবরের দরবারে উপঢৌকন দিয়েছিলেন এক বণিক। পিতাপুত্রীকে পথে কুড়িয়ে পেয়ে এনেছিলেন, সঙ্গে করে ইরাণের এক ফুটন্ত ফুল। রূপমুগ্ধ সম্রাট নাম দিলেন 'অনারকলি' অর্থাৎ ডালিমের ফুল। নিতান্তই নাবালিকা, নয়ত বা ঠাঁই পেত রাজমহালে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন যুবরাজ সেলিম—মেহেরউন্নিসা ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতলে। বিস্মৃতির সে কপাট বন্ধ হয়ে গেল কিছুদিনের মত। মন মেতে উঠলো অনারকলির জন্য। হায় রে রাজপুরুষ—যেন মধুকর!

একদিন দেখলেন দাদীর ঘরে সে কোরাণশরিফ পাঠ করে দাদীকে শোনায়—ছলনাময়! হঠাৎ তারও ধর্ম্মানুরাগ বেড়ে গেল। যখন তখন দাদীর ঘরে যাতায়াত হল সুরু। গরবিণী হমিদাবানু সম্রাট বেগম। রাজমাতা মনে মনে মহাখুসি। নাতির বুঝি টান হয়েছে দাদীর প্রতি, ভক্তি হয়েছে কোরাণশরিফে।

অন্তর্য্যামী হাসলেন অলক্ষ্যে। বক্তাশ্রোতা বসেন পরস্পরের মুখোমুখি—দৃষ্টিবিনিময় হয়। সুরু হয় মন দেওয়া-নেওয়া। অবুঝ কিশোরী আত্মদান করল। ভবিষ্যৎ দণ্ডমুণ্ডের যিনি বিধাতা সামান্য দরিদ্রকন্যা করল তাঁকেই আরাধনা। ছিন্ন হল সে মুকুল রাজরোষে। পদদলিতা হল অস্ফুট-কলিকা সেই অনারকলি। জীয়ন্তে হল তার কবর রাজচক্রান্তে বা ভাগ্যের অন্য কোনও বিড়ম্বনায়, নেই তার কোনও প্রমাণ। ব্যথায় বেদনায় হাহাকার করে উঠলেন যুবরাজ—হলেন জ্ঞানহারা। পড়লেন জীবন-সংশয় পীড়ায়।

সম্রাট বুঝি বা ভুল বুঝলেন—অধীর হলেন পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়। সান্ত্বনা স্বরূপ যুবরাজকে আদেশ দিলেন অনারকলির মকবরা বানাতে। হায়! যুবরাজ—তুমি অভিশপ্ত, ভালবেসে কখনও শান্তি পেলে না কার যেন অদৃশ্যহস্ত পিতৃআজ্ঞা রূপে বার বার তোমার অমৃতপাত্র দূরে নিক্ষেপ করল।

অনারকলির জীবনকথা—আজ শুধু আখ্যায়িকা। শুধু লোক-প্রবাদ। কিংবদন্তী। ইতিহাস তাকে একেবারেই ভুলেছে, নেই তার সম্বন্ধে কোনও কৌতূহল। আমার কৌতূহলী মন বারংবার বলেছিল লাহোরে অনারকলি বাজারের মধ্যে অনারকলির মকবরা

বা কবরে দাঁড়িয়ে—ওগো মৃত্যু! একবার তোমার অবগুণ্ঠন খোলো, হে স্তব্ধ অতীত! তোলো তোমার এ নীরব রহস্য যবনিকা। হে অনাদ! কথা কও। শোনাও তোমার জীবনের সংঘাতময় নির্মম কাহিনী।

এক নিঃশ্বাসে আঁকা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

শিমলা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ক্ষীণা বিষণ্ণা সরস্বতী নদীর তীরে তীরে। ওপারে ধানের ক্ষেত দেখতে দেখতে। এপারে গ্রামের এবড়ো খেবড়ো উঁচু নীচু পথে হোঁচট খেতে খেতে। রোদটাও উঠেছে বেশ চড়া। জলের পাশে যেতে যেতে তেষ্টা যেন আপনা থেকেই পেয়ে বসছে—পা আর চলছে না, অনভ্যাসের খোঁটা আর বলে কাঁকে! খুঁজছি বিশ্রাম, খুঁজছি আরাম—ঠাণ্ডা জল এক গেলাস।

কিন্তু না, ভ্রমণ কাহিনীর মত হ'য়ে যাচ্ছে লেখাটা। ভ্রমণ কাহিনী লিখতে তো বসি নি! লিখতে বসেছি দুটি মেয়ের কথা আর দুটি মায়ের—একটি মা একটি মেয়ে এই গ্রামেরই—আরেকটি মা আরেকটি মেয়ে—সে কথা পরে বলছি।

তেষ্টা, তেষ্টা, তেষ্টা—বিশ্রামের, আরামের, জলের তো বটেই!

একটা বাড়ীও নেই ছাই—খালি ক্ষেত আর ক্ষেত—প্রায় জ্বলে-যাওয়া মটরশুঁটির, আলুর আর কপির—শেষ ফসলের কৃপণতার ছাপ অবয়বে মাখা টম্যাটোর—এমনি টুকিটাকি, টুকিটাকি—হয়ত বা বেগুনের নয়ত বা আখের।

দেখতে দেখতে অবশেষে এক চোখজুড়োন কুটির—আহা, নিকোন ঝকঝকে উঠোন, বিরাট মাচার তলে ছায়াস্নিগ্ধ স্থানে কি আরামের নিকেতনই না গড়ে রেখেছে! আমাদের অপেক্ষায়ই বুঝিবা—তাই বলা নেই কওয়া নেই একেবারে অবতীর্ণ হওয়া গেল মাঠের আল টপকিয়ে।

একটি স্ত্রীলোক মহিলা নয়—বসে বসে কলাগাছ কুঁচোচ্ছে উঠোনের এক পাশে—মাথায় কাপড় রয়েছে কিন্তু গায়ে ও বালাই নেই—আমাদের দেখে উঠে এল—গায়ের কাপড়ের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। মনে মনে সকলেই বললাম—কি অসভ্য—পাড়াগেঁয়ে ভূত একেই বলে। একগাল হেসে কার উদ্দেশ্যে আদেশ জারী করল, ওলো পিঁড়ি, বাইরে আয়, দেখসে—বাবাঃ—যেমন শিক্ষাদীক্ষা তেমনি নাম রাখার ছিরি, পিঁড়ি, আবার ভাবলাম আমরা। তারপর আমাদের জিজ্ঞাসা করল—বেড়াতে আসা হয়েছে, তা বেশ, বেশ, ওলো ও পিঁড়ি, এ'ল হারামজাদী। আঃ কি সম্ভাষণ!

এবার ঘরখানার দিকে তাকালাম—বছর চোদ্দ পনেরর একটি একহারা কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে চট করে বেরিয়ে আমাদের দেখে নিয়ে কুলুঙ্গী থেকে একখানা ছোট আয়না বার ক'রে নিমেষের মধ্যে একটা সিঁদুর টিপ পরে মুখটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

হাসি এল—খালি গা—ছেঁড়া ঠ্যাংঠেঙে কাপড় পরা—তাইতে আবার সিঁদুর টিপ! পিঁড়ি এসে একটা চাটাই বিছিয়ে দিল আমাদের—তারপর টিপ টিপ ক'রে প্রণাম করল সকলের পায়ের কাছে—ওর মা সমানে দাঁড়িয়ে আছে বত্রিশ পাটি দন্ত বিকশিত করে, কন্যার কার্য্যকলাপ সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছে—কি অমার্জ্জিত, না ভেবে পারি না—যেমন সাজসজ্জায় তেমনি কার্য্যকলাপে কি শিথিল এরা? পিঁড়ি তো চাটাই পাতছে কতবার যে কাপড়ের কশি গুঁজল তার নেই ঠিক।

তেষ্টা পেয়েছে শুনে বাটি ক'রে জল আর কলা পাতায় ক'রে গুড় নিয়ে এল পিঁড়ি—ওর মা ততক্ষণে খেজুরগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী ঘাট বেয়ে তর তর করে নেমে সরস্বতী নদী থেকে এক ঘড়া জল এনে দিয়েছে আমাদের মুখ-হাত ধোবার জন্য।

ওদের উঠোনে মাত্র চারগাছা আখ ছিল নিটোল পুষ্ট—তাই কেটে দিল তারপর আমাদের খাবার জন্য। বলল, আর কি খেতে দোব মা কেষ্টার সময়—আম কাঁটালের দিনে এলে কত দিতাম।

পিঁড়ির দিদি এসেছে পাশের গাঁ থেকে মায়ের কাছে বেড়াতে—ওদের টাটকা ভাত এখনও রান্না হয় নি—বেলা দুপুরেও—তাই ছেলেপিলে নিয়ে সে গরাস গরাস পান্তা ভাত আর বাসি মাছের টক খাচ্ছে—মা জল খেতে দিয়েছে।—খাওয়ার ভঙ্গীটা কি কদর্য!

দিদি খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বোকা বোকা মুখ ক'রে হাসতে লাগল সমানে।

জলটল খেয়ে সুস্থির হ'য়ে আমরা আবার বেরোলাম—পিঁড়ি তার মা আর দিদি ছেলেপিলে নিয়ে যতক্ষণ দেখা যায় দেখল—যেন আমরা চলে যাচ্ছি ব'লে কত বিষণ্ণ লাগছে ওদের মুখগুলো। মিনতি বলল, দূর, ওদের সে বোধ আছে নাকি—দেখছ না—বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও কি অবস্থা ওদের?

ভাবলাম তাই তো! অজ্ঞতার অন্ধকারে সভ্যতার অন্তরালে থেকে আজও এরা প্রায় পশুর জীবনই যাপন করছে—শিক্ষার আলো, সভ্যতার আস্বাদ না পেলে মানুষ মানুষপদবাচ্যই হয় না।

ট্রেণে অতিরিক্ত ভিড়। কোন থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ওঠা শিবের অসাধ্য। অগ্রপশ্চাৎ ভাববার সময় না থাকায় একটা প্রায় খালি ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টেই উঠে পড়া গেল অগত্যা। যদিও থার্ড ক্লাসেরই টিকিট আমাদের। কিন্তু এ গাড়ীতে না গেলে বাড়ী ফিরতে অনেক রাত।

গাড়ীতে এক মহিলা আর একটি মেয়ে। সাজসজ্জায় চেহারায় তাকিয়ে দেখবার মত। সংকোচে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে পড়লাম।

থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে ফার্ষ্ট ক্লাসের গদীআঁটা সিটে বসতে কেমন সংকোচ লাগতে লাগল, সেজন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যাব স্থির করলাম, অনেকটা পথ যদিও বা।

মিনতিটা খালি বসতে গেল। মেয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, না না, এটা রিজার্ভ গাড়ী, মা এক্ষুণি শোবেন—বলেই আদ্ধেক গুটিয়ে রাখা হোলডল শুদ্ধ বিছানাটা বেশ করে বিছিয়ে দিল সিটের ওপর। আর অন্য সিটটায় রাজ্যের জিনিষ ছড়িয়ে মা মেয়ে বসে রইল।

তার পর মায়েতে মেয়েতে ইংরেজীতে কথা আরম্ভ হল—এত টাকা খরচ করেও শান্তিতে যাবার উপায় নেই—রেলের লোকগুলো হয়েছে যেমন—প্যাসেঞ্জারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখবে তা নয়—কাঁড়ি করে টাকা যাবে আর—

তার পর মা জোর দিয়ে বললেন, এ সবই উইদাউট টিকিটের যাত্রী—পুলিশে হাণ্ডওভার করে দেওয়া উচিত—হুড়মুড় করে উঠে পড়েছে আবার হুড়মুড় করে নেমে পড়ে টিকিট ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বে।

মেয়ে বলল, কোলকাতা ফিরেই ষ্টেটসম্যানে একটা চিঠি লিখব—রেলওয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের এই সব গাফিলতির বিরুদ্ধে।

আমরা ওদের ইংরেজী শুনে গদোগদো। বিষয়বস্তু সেই তন্ময়তায় নিমজ্জিত। এম, এ, বি, এ পাশ করেও অত সুন্দর ইংরেজী বলতে পারি না—উঃ এরা কি সুন্দর ইংরেজী বলে!

মা-মেয়ের ফ্লাস্ক খুলে চা খাওয়া হল অতঃপর। প্রণতির ছোট্ট বোন রীণ্টুটা তাই দেখে। জল খাব—জল খাব করতে লাগল—লজ্জায় মরে গেলাম আমরা—সোরাইএ জল ছিল ওদের—প্রণতি নিরুপায় হয়ে দু'-একবার তাকাল সেদিকে কিন্তু মা মেয়ের কানে রীণ্টুর তুচ্ছ কথা পৌঁছুলই না।

একবার গাড়ীটা হেঁচকা মারতে মল্লিকা মায়ের কোলের ওপর ঝুঁকে পড়ল—তিনি ভুরু নাক সিটকে আড়ষ্ট হ'য়ে সিটের ঠেসানে লেপটে গেলেন—তার পর মল্লিকা সামলে নিতে কোলের কাপড় ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন—আহা, কত নোংরাই লেগে গেছে ওঁর কাপড়ে মল্লিকার কাপড়ের সংস্পর্শে। এদিকে উনি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকায় ওঁর জুতো গাড়ী দোলার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাঁটুতে অনবরত আঘাত করে চলেছে, উনি নির্বিকার!

শেষে মেয়ে বাদামভাজা খেতে লাগল। কোলে একখানা তোয়ালে বিছিয়ে কাপড় ঢেকে। খোলাগুলো কিন্তু গাড়ীর মেঝেয়ই ফেলল। আর খোসাগুলো ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে লাগল। বার বার আমাদের কাপড়ে গায়ে এসে অধিষ্ঠান করতে লাগল সেগুলো। দাঁড়িয়ে রইলাম—ঝেড়ে ফেলে দেবার মত সাহসটুকুও হ'ল না।

বাদাম ভাঙবার পদ্ধতি—খাবার রকম—চিবোবার কায়দা—সবই যেন অনবদ্য সুন্দর! মানুষ কতখানি শিক্ষা পেলে খাওয়ার মত বাজে ব্যাপারটাকেও কত সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করতে পারে তাই দেখতে লাগলাম মুগ্ধ হ'য়ে। মনে পড়ল পিঁড়ির দিদির খাওয়ার কথা—সত্যি শিক্ষা মানুষকে—

চিন্তায় বাধা পড়ল। মিনতির ভাইটাকে মা তখন ঠাস ঠাস ক'রে চড়াতে লেগেছেন—ছেলেটা ওঁদের পাতা বিছানায় বসে পড়েছে' কোন এক সময়। যত সব জাটি নোংরা—বিছানার ওপর বসতে এসেছে—জংলী ভূত—মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে মা'র—হাঁপাচ্ছেন, এক হেঁচকায় মিনতির ভাইকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে এ্যাটাচি কেস খুঁজে স্মেলিং সল্টের শিশি বার ক'রে মার নাকের কাছে ধরল—নাও, নাও, চুপ কর—তোমার আবার ব্লাডপ্রেসার—অজ্ঞান না হ'য়ে পড়—যত সব অসভ্য অশিক্ষিত জুটেছে—পয়সা খরচ ক'রেও শান্তি পাবার উপায় নেই—হাদেখলা ভূতেরা এসে জুটবেই, জুটবে—অনর্গল বলতে লাগল মেয়ে—বাংলা ভাষায়ই—কিন্তু উচ্চারণ করবার কি কায়দা।

মা একটা পোজ দিয়ে বিছানায় আধশোয়া হ'লেন—আরও লাল হ'য়ে উঠেছে মুখ—রঙের ছোপ মেয়েরও মুখে—কি সুন্দর লাগছে দেখতে, কি সুশ্রী!

গাড়ী শ্রীরামপুরে এলে মেয়ে বলল, নেমে যেতে হবে এখানে—শীগগিরী না হ'লে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব। নামছি আমরা—মেয়ে বলছে, অশিক্ষা আর জোচ্চুরী যত দিন থাকবে—আমাদেরও সুখ-শান্তি নেই তত দিন!

বাবা, নিশ্বেস ফেলে বাঁচলাম—আপদগুলো বিদায় হ'লো এতক্ষণে, মা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়না বার করে মুখ দেখতে দেখতে বলছেন—

রাত অনেক হ'ল। দুটো-তিনটে বাচ্চা সঙ্গে। পিঁড়ি আর পিঁড়ির মায়ের কথা মনে পড়ল আমার শ্রীরামপুর ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে—এ গাড়ীটা তো নামতে নামতেই ছেড়ে দিল—অন্য কামরায় আর ওঠা হ'ল না—পরের গাড়ী ঘণ্টাখানেক পরে!

নবান্ন উৎসব

পঙ্কজিনী বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার বাংলায় আজি নবান্ন উৎসব
গুঞ্জরিত মৃদুস্বরে নব আশা রব।
ক্ষুধায় পীড়িত যত অভাগার দল
নবান্নে উদর পূরি পাবে নব বল।
স্বর্গ হ'তে লক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরথে চড়ি
সবাকার অন্নপাত্র পরমান্নে ভরি,
স্বর্ণশস্যে ভরে দিতে সবার ভাণ্ডার
শস্য-শ্যামল দেশে আসিবে আবার?

দুরাশার ছলনায় ক্ষুধিতের দল
শীর্ণ দেহে অশ্রু মাত্র লইয়া সম্বল,
উর্দ্ধ দৃষ্টে চেয়ে আছে আকাশের পথে
ওই বুঝি লক্ষ্মীদেবী নামে স্বর্ণরথে।
এদের ব্যাকুল আশা হবে কি নিষ্ফল
অনাহারে ফিরিবে কি ক্ষুধিতের দল?
অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা এস কৃপা করি
সবাকার অন্নপাত্র পরমান্নে ভরি।

বাঁচাও ক্ষুধিত যত ভারতসন্তানে
জাগুক ভারত পুনঃ দেব-গুণগানে।

নাচ গান বাজনা

বাংলার সংস্কৃতিতে গৌড়ীয় সাহিত্য ও সংগীত

প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হ'তে আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা দেশ পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সমতট ও বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত ছিল। একসময় পূর্ববঙ্গ ব্যতীত বাংলা দেশের প্রায় অধিকাংশ ভূভাগ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। এই গৌড়ভূমিতেই কত কাব্য, সাহিত্য, সংগীত ও শিল্প গ'ড়ে উঠেছে, তৎকালীন রাজা বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বৈষ্ণব ও শক্তি-সাধনার সমন্বয়-ক্ষেত্র এই গৌড়-বঙ্গ শ্রীচৈতন্যধর্মের প্রেমধর্ম প্রথম সত্য মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল এই গৌড় দেশে। গৌড়ীয় কাব্য, সাহিত্য ও সংগীতে বিদ্বেষবিহীন আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি, মানুষের প্রতি এমন উদার মনোভাব ভারতের মধ্যে আর কোথাও ছিল না। বাংলা সংস্কৃতির এটাই হ'ল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুপ্রাচীন কাল হ'তে অগণিত রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের আঘাতেও তা ভেঙ্গে পড়েনি। বাংলা সংস্কৃতির সব চেয়ে বড় পরিচয় মিলবে, বাঙালীর আনুষ্ঠানিক ধর্মে। তা ছাড়া, অশনে, বসনে, আচারে, বিচারে আর বিশেষ ক'রে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে সর্বত্রই অম্লান হ'য়ে আছে সংস্কৃতির স্পর্শ।

প্রাচীন কালে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রধানত গ'ড়ে উঠেছিল রাজা-বাদশাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। যে ভারতীয় সংস্কৃতি ভাগীরথীর পুণ্যস্রোত বেয়ে এসেছে এই বাংলা দেশে, তারই কেন্দ্রস্থল ছিল গৌড় ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড় এককালে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ ও বাণিজ্য প্রভৃতিতে বঙ্গভূমির শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল এবং এর প্রভাব সুদূর আর্য্যাবর্তে বিস্তৃত হয়েছিল।

দশম শতকে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষার নব রূপায়ণে সৃষ্টি হ'ল বাংলা ভাষার। ক্রমে এই ভাষা বাংলা দেশ ব্যতীত মগধ, বৈশালী, চম্পা, মিথিলা প্রভৃতি স্থানেও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র গৌড়কে আশ্রয় করেই প্রাচীন ইতিহাস, আদি মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীকাব্যের অভ্যুদয়। তা ছাড়া, রামায়ণ ও মহাভারতের মত মহাকাব্যেরও বঙ্গানুবাদ হয়েছিল এই গৌড় রাজদরবারে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে স্বাধীন গৌড়রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। এই রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তাঁর রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গ হ'তে আরম্ভ করে উৎকল পর্যন্ত এই রাজ্য সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করেছিল। তখন গৌড় নামটির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। রাজা শশাঙ্কের রাজত্বকালে কনৌজরাজ যশোবর্মার সভাকবি বাক্‌পতিরাজ গৌড়নগরের কাহিনী অবলম্বনে 'গৌড়বহ' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর পর প্রায় একশো বছর অন্ধকারময় যুগ অর্থাৎ মাৎস্যন্যায়। পরবর্তী কালে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যপাদ হ'তে দ্বাদশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত বাংলা দেশে পালরাজগণ রাজত্ব করেছিলেন। সেই সময়ে গৌড় সাম্রাজ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশলাভ ঘটেছিল। ধর্মপাল বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর সময়ের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গৌড়পাদ রচিত 'গৌড়পাদকারিকা' একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ।

নয়ন পালের রাজত্বকালে তাঁর মহানসাধ্যক্ষ নারায়ণদেবের পুত্র চক্রপাণি দত্ত ১০৬০ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত 'চক্রদত্ত' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি দ্রব্যগুণ সর্বসারসংগ্রহ, চরকটীকা, শব্দরত্নাবলী নামক অভিধান, মাঘ কাদম্বরী এবং ন্যায়শাস্ত্রের টীকা রচনা করে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করেছিলেন। চক্রপাণি দত্ত এবং সন্ধ্যাকর নন্দী, পাল যুগের সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দশম একাদশ শতকে গৌড়রাজ দ্বিতীয় ধর্মপালের রাজত্ব সময়ে রমাই পণ্ডিতের আবির্ভাব প্রাচীন সাহিত্য ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় ঘটনা। তিনি ধর্মদেবতার পূজা প্রকরণ উপলক্ষ্যে 'শূন্যপুরাণ' রচনা করে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগ্রন্থগুলিও তৎকালে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ তৎকালীন গৌড়ীয় সাহিত্যের মুখপত্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। একাদশ শতকের চতুর্থপাদে ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল 'রমাবতী' বা 'রমতী'র উল্লেখ দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের প্রথমপাদ হতে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমপাদ পর্যন্ত বাংলার সেনবংশীয় রাজাদের রাজত্বকাল। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বাংলার তথা গৌড়ের শেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতি। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। গীতগোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ মিশ্র, শ্রীধরদাস, উমাপতি ধর প্রভৃতি তৎকালীন বিচক্ষণ পণ্ডিত ও মনীষিগণ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। সেন যুগকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণময় যুগ বলা যেতে পারে। তৎকালীন রচিত বৌদ্ধ দোঁহাগুলির মধ্যেই সাহিত্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

তৎকালীন চর্যাপদগুলির সংখ্যাল্পতা হেতু ঐ যুগের চর্যাপদের কবিগণ কর্তৃক রচিত দোঁহা এবং অসংখ্য বৌদ্ধতন্ত্রকে অনুপূরকভাবে গ্রহণ করতে হয়েছে। এই বৌদ্ধতন্ত্র, দোঁহা এবং চর্যাগানগুলিকে একত্র করে দেখলে একটি গোষ্ঠী দ্বারা রচিত ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। চর্যাগানগুলির মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বকে রূপায়িত করা হয়েছে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত অসংখ্য বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্যে নিহিত আছে তারই প্রচার ও ব্যাখ্যা। চর্যাপদ

রচয়িতা লুই ও রামচরিত রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী ঐ সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাজা বল্লাল সেন নিজেই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁর রচিত 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' সেই যুগের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। লক্ষ্মণ সেন ও কেশব সেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক বহু কবিতা রচনা করেছিলেন। এই যুগেই মনসামঙ্গল রচিত হয়েছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যযুগের পরবর্তী কালেই মনসামঙ্গল কাব্যযুগের অভ্যুদয় গৌড়ীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সংযোজন। তৎকালীন শ্রীধর দাস রচিত 'সুক্তিকামৃত' উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। বাঙালী মনীষী কবি জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' ছিল সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। এই অনুপম কাব্য সাহিত্যজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ভক্ত কবি জয়দেবের অমরকাব্য তাঁকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। আজও তাঁর কাব্যের সুরমূর্চ্ছনা বিংশ শতাব্দীর আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে তাঁর অনবদ্য কাব্যসৃষ্টিকে সার্থক করে রেখেছে।

তাছাড়া, সে সময় ব্যাকরণ, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও তন্ত্রশাস্ত্রের এতটা উন্নতি হয়েছিল যে, তার প্রভাব সর্বভারতীয় স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। এই শতকের কবি মাণিক দত্তের রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও সেকালের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। গৌড়ের 'দ্বারবাসিনী' দেবী সম্বন্ধে বহু অলৌকিক ঘটনা শোনা যায়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দেবী অর্চনা বিষয়ক বিবরণ উল্লিখিত আছে।

প্রাচীন কালে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রধানত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। চতুর্দশ শতক গৌড়ীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত হ'য়ে আছে। সে যুগের গৌড়-অধীশ্বর রাজা কংস (গণেশ) এবং তাঁর পুত্র যদুর (জালালুদ্দিন) রাজত্ব সময়ে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটেছিল। কংস রাজার পুত্র যদু মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হ'য়েও গৌড়-রাজ-দরবারে যে রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, তা থেকেই বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মাননা একটি বিশিষ্ট রীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

গৌড় সুলতানের রাজকার্য প্রধানত ন্যস্ত ছিল হিন্দুর হাতে। রাঢ়-বরেন্দ্রীর বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গৌড়দরবারে উচ্চপদ অধিকার ক'রেছিলেন। এঁদের সাহায্যে গৌড়ীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্দ্ধে বিশেষভাবে পুষ্টি লাভ করেছিল। পঞ্চদশ শতকে গৌড়দরবারে আবির্ভূত হলেন অদ্বৈত মহাপ্রভু। তিনি মধুর বৈষ্ণব পদাবলী রচনা ক'রে বৈষ্ণব সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করলেন। তার পর ঐ শতকের শেষার্দ্ধে ফতেশার রাজত্ব কালে সুসাহিত্যিক ধ্রুবানন্দ মিশ্র 'মহাবংশাবলী' রচনা করে সাহিত্যের ভাণ্ডারে আর একটি রত্ন সংযোজিত করলেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে গৌড়াধিপতি হোসেন শাহের রাজত্বকালে বহু হিন্দু উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে পরম বৈষ্ণব শ্রীরূপ ও সনাতন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌড়-অন্তর্গত রামকেলি গ্রামে তাঁহারা বাস করতেন। সে সময় এ স্থান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রস্থল ছিল। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন গমন কালে এই স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। হোসেন শার রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে এক পরম গৌরবময় যুগ। এই সময় সর্ববিষয়ে গৌড়ের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সে কালের কবি চতুর্ভুজ কর্তৃক রচিত হয়েছিল 'হরিচরিত' কাব্যগ্রন্থ।

হোসেন শার প্রধান অমাত্য ও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত-শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামী 'উদ্ধবসন্দেশ' ও 'হংসদূত' প্রভৃতি কাব্য, বিদগ্ধমাধব, ললিত-মাধব প্রভৃতি নাটক এবং ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি গীতাবলী গ্রন্থাদি রচনা করে অসামান্য রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনাচাতুর্যের নিদর্শন দেখা যায় বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এবং তাঁর প্রৌঢ় পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের তত্ত্বের ছাপ সুস্পষ্ট দেখা যায় তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ দুটিতে। তা ছাড়া, সঞ্জয় কবিশেখর, জগন্নাথ সেন, কেশব ভট্টাচার্য, মুকুন্দ ভট্টাচার্য, গোবিন্দ ভট্ট, মাধব চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, কেশব ছত্রী প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিক সে যুগের সাহিত্যাকাশের এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক এবং বাংলার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

ষোড়শ শতকে শ্যামানন্দ রচিত 'শ্রীরাধানৃত্যপদাবলী' ও জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গল গৌড়বংগে প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছিল। কবিরাজ শ্রীধর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগ্রন্থ তৎকালীন একটি আদর্শ গ্রন্থ। রামকেলি নিবাসী ন্যায়বাচস্পতি রচিত ভ্রমরদূত কাব্যগ্রন্থ এক সুমহান পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়াধিপতি হোসেন শার সময়ে কবি পরমেশ্বর

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং সেই কাব্য গৌড়রাজ-সভায় পাঠ করা হত। পরাগলের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি সাহিত্য অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন। উক্ত পরাগলের বিদ্যোৎসাহিতায় চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের প্রচার ভালই হয়েছিল। এককালে গৌড় যে রাধাকৃষ্ণ লীলা সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, তা সর্বজনস্বীকৃত। কি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য, কি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী, উভয় ধারারই উৎস যে গৌড়, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্রীরূপ ও সনাতন সেবিত মদনমোহন বিগ্রহ ব্যতীত এই অঞ্চলে প্রাপ্ত বহু মূর্তি ও চিত্রশিল্পেও এ সবের প্রচুর নিদর্শন আছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে যুগ যুগ ধরে যে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল ষষ্ঠ শতক থেকে গৌড়নগর ধ্বংস পর্যন্ত কাব্য, সাহিত্য ও সংগীতানুরাগী রাজন্যবর্গ। তৎকালীন গৌড়ীয় কাব্যরীতি ভারতগ্রাহ্য বৈদর্ভীরীতি মানের পার্শ্বে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে।

গৌড়ীয় সংগীতের ঐতিহাসিক আলোচনা করা হয়েছে সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে। রত্নাকর বলেছেন :—গৌড়ী গীতিগুলি ছিল, গাঢ়, ত্রিস্থানে গমকযুক্ত এবং স্থানত্রয়ে অখণ্ডিত স্থিতি ওহাটিযুক্ত ললিতস্বরে রচিত। এ প্রসঙ্গে টীকাকার কল্লিনাথের উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গৌড়-গীতির উৎস ছিল এই গৌড়ে। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। আলোচ্য গৌড়গীতিকে আশ্রয় করে আছে তিনটি গ্রামরাগ,—যথা গৌড় কৈশিক মধ্যম, গৌড় পঞ্চম এবং গৌড় কৈশিক। উক্ত গ্রামরাগের আলাপ প্রকারকে বলা হয়ে থাকে ভাষা। ভাষা রাগের আবার চারিটি প্রকারভেদ আছে, যথা—মুখ্যা, স্বরাখ্যা, দেশাখ্যা, এবং উপরাগজা। এই আলাপ প্রকারের অর্থই হল গাইবার নানা প্রকার ভঙ্গী। এই গায়ন রীতি বা ভঙ্গীর দেশকাল ভেদে যা পরিবর্তন হয়েছিল, সেই পরিবর্তিত রূপটিই হচ্ছে ভাষা। এই ভাষা রাগের জনক পনেরটি গ্রামরাগ। এই গ্রামরাগের ভাষাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও গৌড় ও বঙ্গালের উল্লেখ দেখা যায়। ক্রমে এগুলি দেশীরাগের পর্যায়ে এসে চারিটি ভাগে বিভক্ত হল, যথা—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ। এই ভাবে বহু মিশ্রণের ফলে পুনরায় দুই অংশে বিভক্ত করা হল, পূর্বপ্রসিদ্ধ ও অধুনা-প্রসিদ্ধ নামে। এ দু'টি অংশের অধুনা প্রসিদ্ধ রাগের মধ্যে গৌড় ও বঙ্গাল শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

রাগাঙ্গ :—বঙ্গাল, গৌড়

ক্রিয়াঙ্গ :—গৌড়কৃতি

উপাঙ্গ :—গৌড়মল্লার, কর্ণাট গৌড়, দেশবাল গৌড়, তুরস্কো গৌড়, দ্রাবিড় গৌড়।

এতদ্ব্যতীত, গৌড় কৈশিক, গৌড় পঞ্চম গ্রামরাগ, গৌড়ীহিন্দোল, গৌড়ী মালব কৈশিক, বঙ্গালী মালব কৈশিক, বঙ্গালী ভিন্নষড়জ প্রভৃতি গ্রাম রাগগুলির উল্লেখও দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া, এ সংগীতগুলি কি ভাবে গাওয়া হত তা জানবারও কোন উপায় নেই। তবে মোটামুটি প্রমাণ করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত-সংস্কৃতির প্রাধান্য বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। এ ছাড়াও একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, ক্রিয়াঙ্গ গৌড়কৃতি, উপাঙ্গ কর্ণাট গৌড় এবং দেশবাল গৌড় রাগগুলির প্রধান স্বর 'ষড়জ' অর্থাৎ গাম্ভীর্য প্রকাশক ও বীর রসাত্মক। এই স্বরপ্রয়োগ থেকে অনুমান করা হয় যে, গৌড়ীয় গীতিগুলি ওজস্বিনী ছিল এবং এগুলি নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতে যেভাবে সাংগীতিক বিবর্তন ঘটেছে সেই ভাবে ঘটেছে এই বাংলা দেশে। বাংলা দেশ থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এই সংগীতগুলি মিশ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন মালব কৈশিক বাংলায় এসে গৌড়ী ভাষার সৃষ্টি করেছে। অনুমান করা হয় যে উক্ত মালব কৈশিক এর ভাষা ও হিন্দোলের ভাষা এবং রাগ বঙ্গালের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কারণ এই তিন ক্ষেত্রেই গ্রহ অংশ ও ন্যাস স্বর 'ষড়জ'। এদিকে কর্ণাট ও দ্রাবিড় পদ্ধতির সঙ্গেও স্থাপিত হয়েছিল বাংলার সংগীত-সংস্কৃতির অতি নিবিড় সম্পর্ক। এই বিরাট সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্তী কালে কি ভাবে এই পদ্ধতিগুলি নানা মিশ্রণের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেল, তা জানবার মত কোন ঐতিহাসিক তথ্য এখনও সংগৃহীত হয়নি।

বর্তমানে সংগীত-সংস্কৃতি মৃতপ্রায়, পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি চলেছে দিকে দিকে। সংগীতের এই অবনতির মূলে 'আছে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং গোষ্ঠীবদ্ধতা ও প্রাদেশিকতা। শিল্পীমন নিয়ে এবং ভেদাভেদ ভু'লে উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন যেমন শিল্পীদের, তেমনই আমাদের কর্তব্য কলা কৃষ্টি ও সাহিত্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। আজকাল নানা প্রকার শিল্প ও কারিগরী শিক্ষার উপর যেমন জোর দেওয়া হ'চ্ছে, তেমন হ'চ্ছে না এই সব কলা কৃষ্টির অগ্রগতির উপর। তাই আজও সাহিত্য এবং কলাশিল্পের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে পিছনের সারিতে। শিল্পী ও সাহিত্যিকদিগের সম্বর্দ্ধনার চেষ্টা কিছু কিছু যে না হচ্ছে তা নয়, তবে সেটা অতি নগণ্য। —শ্রীকালীপদ লাহিড়ী।

আমার কথা (৫৯)

শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা

"দ-ক্ষি-ণী" কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্তে মনোরম পরিবেশে এক সুষ্ঠু ও পবিত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শান্তিনিকেতনী ধারায় নৃত্যকলা শিক্ষণের প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যমণি হলেন কবিগুরুর আশীর্বাদপ্রাপ্ত আকৈশোর শান্তিনিকেতনের সহিত সংযোগরক্ষাকারী, বিনয়নম্র ও বাংলার সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা। শীতের সকালে 'দক্ষিণী ভবন' এ কথায় কথায় জানালেন :—

বরিশাল বানরিপাড়ার গুহঠাকুরতা-বংশের সন্তান, তথাকার জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও বহুবিধ জাতীয় ক্রিয়াকলাপের উদ্যোক্তা ৺প্রসন্নকুমার এবং কাকরধা গ্রামের তনয়া ৺যামিনী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হিসাবে আমার জন্ম হয় ১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই। দেড় বৎসর বয়সে বাবাকে হারানর পর আমাদের খুবই অর্থকষ্টে পড়িতে হয়। মার শরীর ভাল না থাকায় বিধবা দিদি পঙ্কজবালা বসু সংসারের ভার গ্রহণ করেন এবং আমি তাঁহাকে মায়ের ন্যায় যথাবৎ ভক্তি করেছি। ছয় বৎসর বয়সে

কলিকাতায় আসি। ১১৩৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজে আই, এস, সি, পড়ি কিন্তু সেই সময় চাকুরী লই। ১১৩৭ সালে পুনরায় বিদ্যাসাগর কলেজে কমার্সের ছাত্রহিসাবে ভর্ত্তি হইয়া ১১৪১ সালে তথা হইতে গ্র্যাজুয়েট হই।

ছেলে-বয়স থেকে ছোড়দা' নির্ম্মল গুহঠাকুরতার প্রচুর ভালবাসা পাই। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি আমায় একটি পিয়ানো দেন। তিনি উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ও পিয়ানো বাজনায় নিপুণ ছিলেন। আমারও ঝোঁক হয়েছিল এই দুইটির দিকে। ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় দুই মাস অসুস্থ ছিলাম। তখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি কিনে নিজেই গান করতুম এবং ক্রমশঃ ঝুঁকে পড়ি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দিকে। শান্তিনিকেতনে আমরা যাতায়াত করতুম বরাবর। সেইখানে ঘনিষ্ঠ সহযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হল শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীমতী কণিকা দেবীর সহিত। তাঁরা এখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে একনিষ্ঠ-প্রাণ। আমার খুবই সুবিধা হল তাঁদের সাহচর্য্য, কারণ আমি তখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রাজ্যে নব প্রবেশপ্রার্থী। কবিগুরুর মৃত্যুর পর শৈলজারঞ্জন জানান, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন 'শুভর গান সাধারণে নিলে না।' জবাবে বলি, বি, কম, পরীক্ষার পর কলিকাতা সহরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রসার ও প্রচারের জন্য যথাসাধ্য করব আমি। তবুও নিজগৃহে একটি সভা ডাকি—প্রারম্ভিক অর্থব্যয় করি—নতুন নাম দিই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র 'গীত-বিতান'—১১৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর খুব সাহায্য করেন এ প্রচেষ্টায় ৺সুজিতরঞ্জন রায়, আর এগিয়ে আসেন নিঃস্বার্থভাবে শৈলজারঞ্জন ও কণিকা দেবী। তথায় প্রধান পরিচালক হই—কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠ এই সঙ্গীতায়তনে দেখা দিল মতবিরোধ। ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি অপেক্ষা সুদৃঢ় সংস্থার মূল্য বেশী, তাই ছয় বৎসর পরে সেখান থেকে বিদায় লই। তার আগে 'সঙ্গীত-ভারতী' ও 'গীত-বিতানে'র বিল্ডিং ফাণ্ড গঠন করি।

১৩৫৫ সালের ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিনে রবীন্দ্র-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'দক্ষিণী'র প্রতিষ্ঠা হল। রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও রবীন্দ্রানুগ নৃত্যকলা—এই দুটি বিষয়ে প্রায় এক হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখানে শিক্ষাধীন। কোন একক বিষয়ের সঙ্গীতবিদ্যালয়ে বোধ হয় এত শিক্ষার্থী নাই। কোনরূপ সরকারী বা বেসরকারী বৃত্তি ব্যতীত উহার উদ্বৃত্ত তহবিল ও অনুষ্ঠানের আয় হইতে ১১৫৫ সালে আজকের এই নিজস্ব ভবন নির্ম্মিত হয়। "গীতভানু" হল উহার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে শিক্ষার সাথে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সময়ানুবর্ত্তিতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

'দক্ষিণী' ভবনের বিশেষত্ব হল ইহার 'সাঙ্গীতিক গ্রন্থাগার'—দেশী ও বিদেশী ভাষায় সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্য সম্বন্ধে লিখিত বহু মূল্যবান পুস্তকের আহরণ। বহু গবেষণাকারীও সেখানে নিয়মিত আসেন। এ ছাড়া 'রেকর্ড-লাইব্রেরী' ইহাতে আছে প্রায় এক হাজার টেপ রেকর্ডার, বেতার ষ্টুডিও রেকর্ড ও গ্রামোফোন রেকর্ড।

ইহার 'সেবামিত্র' হলে বৎসরে বারোটি মাসিক সাংস্কৃতিক অধিবেশন হইয়া থাকে। সদস্যসংখ্যা হল ২২৫।

আমার প্রথম রেকর্ড হয় আমার পঠদ্দশায় রবীন্দ্রনাথের 'হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী'। ১১৩৭-৪২ সাল পর্য্যন্ত আমি কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেছি। গত পনর বৎসরে আমার পরিচালনায় উক্ত কেন্দ্র হতে বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতানুষ্ঠান, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার একষট্টি বৎসর, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ছন্দ-বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিচার, বহু নাটকাভিনয় ও Song-programmes হইয়াছে। জানি না, শ্রোতারা সেগুলি কিরূপভাবে গ্রহণ করেছেন।

আমি বেতারকেন্দ্রে স্থানীয় অডিশন বোর্ডের সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিক বোর্ডের ও সিলেবাস কমিটির সভ্য এবং রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতিও উহার ফেষ্টিভ্যাল কমিটির সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত। "রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা" নামক একটি বই আমি লিখিয়াছি।

আমার সহধর্ম্মিণী হলেন ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্তর কন্যা—রেকর্ড এবং বেতারশিল্পী শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবী। ১১৪৩ সালে আমাদের বিবাহ হয়। 'দক্ষিণীর' উদ্যোগে ও আমাদের ব্যবস্থাপনায় গত ১১৪৮ সাল হইতে ত্রৈবার্ষিক রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন হইতেছে। ভারত ও পাকিস্তানের গায়ক-গায়িকারা উহাতে যোগ দেন। ১১৬০ সালের জুন মাসে উহার পঞ্চম অধিবেশন হইবে। পাঁচ দিনে সঙ্গীত-রসিকেরা শুনবেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সামগ্রিক আবেদন—উহার সুগভীর ব্যাপ্তি—উচ্চাঙ্গ ও লঘু রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনা—আর আলোচনা উদাহরণসহ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য।

আমি পেশাদার শিল্পী বা শিক্ষক নহি। ছোড়দা'র উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহায্যে এবং শ্রোতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমার প্রতিষ্ঠা। আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল যতটুকু সম্ভব—যতদিন সক্ষম—যতটা সামর্থ্য—আপ্রাণ চেষ্টা করব কবিগুরু লিখিত সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচার ও দীর্ঘ প্রসার। কিন্তু বেদনা জাগে যখন মনে পড়ে যে, "বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতি" আমার উদ্দেশ্যের প্রধান অন্তরায়।

সুশীল চ্যাটার্জ্জি, কলিম সরাফী, তড়িৎ চৌধুরী ও ঋতু গুহ-ঠাকুরতা, রমা ভট্টাচার্য, ইলা সেন প্রভৃতি শিল্পী 'দক্ষিণীতে' শিক্ষা-প্রাপ্ত। এ ছাড়া আরও কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ উজ্জলতর।

শ্রীশুভ গুহ-ঠাকুরতা

কে না কা টা

জনসংখ্যা বনাম কর্ম্মসংস্থান

জনসংখ্যা ও কর্ম্মসংস্থান এই দুই-এর ভেতর সব সময়ই একটা সামাপ্য থাকা দরকার। যেখানে কর্ম্মসংস্থান জনসংখ্যার অনুপাতে বা তুলনায় কম, বুঝতে হবে সমস্যা সেখানে জটিল। বেকারী, অশান্তি ও উদ্বেগ সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ না থেকে পারে না। এ অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখার জন্য কর্ম্মসংস্থান বাড়াবার উপায় খুঁজে না পেলেই নয়।

অন্য দেশের কথা বাদ দিয়ে ভারতের কথাই পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক্। ভারতে বেকারী খুব ব্যাপক, এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থা এখনও কেন থাকবে? সেই প্রশ্ন স্বতঃই উঠতে পারে। সোজা বা সাধারণ উত্তর যেটি হবে—জনসংখ্যা ও কর্ম্মসংস্থানের ভেতর এখানে সামঞ্জস্যের দারুণ অভাব। সরকার বলতে চাইবেন ভারতে জনসংখ্যাই বেশি, তাই দেশের লোকের বেকারী ঘুচছে না। জনসাধারণের দিক থেকে অবশ্য বলা হবে—রুশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসংখ্যাটাকে কোন সমস্যাই ধরা হয়না। সুতরাং ভারতেও সমস্যাটি আসলে জনসংখ্যার নয়, কর্ম্মসংস্থানের। এই সমস্যা মিটাবার বহু সুযোগ এখনও রয়েছে, এই তাঁদের বিশ্বাস বা অভিমত।

সমগ্র ভারতে আজ লোকসংখ্যা দাঁড়াবে ৪২ কোটির মতো। বিগত আদমসুমারীর সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে ভারতীয় নর-নারীর শতকরা প্রায় ৪০ জন কার্য্যক্ষম। এই হার বা হিসাব মেনে নিলে এক্ষণে এদেশে কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা হবে প্রায় ১৭ কোটি। পূর্ব্বেকার দশ বছরে (১৯৪১-৫১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কার্য্যক্ষম লোকের সংখ্যাও আপনা বাড়ে আর এই বর্দ্ধিত সংখ্যা (কার্য্যক্ষম লোক) প্রায় দুই কোটিতে দাঁড়িয়ে যায়। আনুপাতিক হারে দেশে কর্ম্মসংস্থান বেড়ে যায় নি, দেশবাসীর অভাব ও বেকারী ক্রমেই হচ্ছে তাই আরও প্রকট।

একটা কথা প্রসঙ্গতঃ বলতে পারা যায়। শিল্পায়নের জন্য ব্রতী হলেও ভারত আজও কৃষিপ্রধান দেশ। এই বিশাল দেশের অধিবাসীদের একটা বড় অংশ কৃষিজীবী অর্থাৎ কর্ম্মক্ষম লোকদের অধিকাংশেরই উপজীবিকা চাষাবাদ। অপিস-আদালতে (সরকারী ও বেসরকারী) এবং কল-কারখানা সমূহেও অবশ্য অসংখ্য নর-নারী কর্ম্মনিযুক্ত রয়েছেন। দারিদ্র্য ও বেকারীর বিরুদ্ধে বিদেশী আমলে অভিযান চালাবার অবকাশ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু এক্ষণে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় জাতীয় সরকার এই মৌল দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না।

বেকারী দূরীকরণ তথা কর্ম্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অনুকূল কতকগুলো পরিকল্পনা দরকার। নতুন নতুন শিল্প-সংস্থা ও কল-কারখানা গড়ে তুলতে হবে দেশের মাটিতে আর সে সুযোগ আছে এখানে এখনও অনেক। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যম একই লক্ষ্য থেকে হওয়া প্রয়োজন আর সে লক্ষ্যটি হতে হবে—দেশের সমৃদ্ধি ও দেশবাসীর স্বাচ্ছন্দ্যবিধান। বিপুল সংখ্যক লোককে কৃষিকাজে নিবদ্ধ রেখে দিলেই চলবে না, শিল্পক্ষেত্রে তাদেরও অনেককে টেনে আনতে হবে। জাতীয় সম্পদ ও মাথা-পিছু আয় বাড়াবার জন্য দেশকে শিল্পমুখী করে না তুললে নয়। সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে, কর্ম্মসংস্থানও বেড়ে চলেছে আপনি—জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা ততটা কঠিন হয়ে আর নেই।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, স্বাধীন হবার পর ভারত শিল্পায়নের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে এবং পর পর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও করে চলেছেন দেশের কর্ণধারগণ। এর ভেতর দেশে বহু নতুন কর্ম্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, এ-ও স্বীকার করতে হবে। তবুও কর্ম্মসংস্থান আরও কোন্ কোন্ পথে বাড়ানো যেতে পারে, সেই নিয়ে পর্য্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বিশেষ জরুরী। জনসংখ্যার চাপ সব সময়ই থাকবে, এই ধরে নিয়েই ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় চিন্তা করা দরকার। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সমূহের জাতীয়করণ এবং মাথা ভারী শাসন-ব্যবস্থার রূপান্তর মারফৎ এই প্রশ্নের কতটা কি সুরাহা হতে পারে, তা-ও নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। আসল কথা যেটি দাঁড়াচ্ছে—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কর্ম্মসংস্থানের সামঞ্জস্য যে ভাবে রক্ষিত হতে পারে, সেইটির সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে চলতে পারে না।

তৈল-সম্পদ ও ভারত

আধুনিক শিল্পায়নের যুগে যে কয়টি সম্পদ একান্ত ভাবে চাই, এদেরই একটি প্রধান পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তৈল। এই অমূল্য সম্পদ যে দেশের যত অধিক পরিমাণে করায়ত্ত, সেই দেশই সাধারণ ভাবে অগ্রগতির দাবী রাখতে পারে। তৈল-সম্পদের দিক থেকে ভারত আজ কোন পর্য্যায়ে, সেটি তাই নিবিড় ভাবে আলোচনার বিষয়।

পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকা, রুশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক ও ইরাণ এবং ব্রহ্ম, কানাডা প্রভৃতি দেশের নাম বিশেষ ভাবে করা চলে। ভারতের কথা যদি এই প্রসঙ্গে তোলা হয়, দেখা যাবে, খনিজ তৈলের উৎপাদন এখানে আজও খুবই অল্প পরিমিত। একটি

নির্ভরযোগ্য হিসাব অনুসারে সমগ্র বিশ্বে আজকের দিনে তৈল ব্যবহার হয় বছরে প্রায় ১০ কোটি মেট্রিক টন। এক্ষেত্রে ভারতের বার্ষিক তৈল উৎপাদনের হার তুলনায় অতি নগণ্য—শতকরা ০·১ ভাগের বেশী নয়।

ভারতের তৈল বা পেট্রোলিয়াম উৎপাদন যাতে বাড়ে, তার জন্য সরকারী তত্ত্বাবধানে অবশ্য চেষ্টা চলেছে কত কাল থেকেই। এই রাষ্ট্রের ডিগবয়, ডিব্রুগড়, ডিগবয় (আসাম) অঞ্চলেই তৈলের কয়েকটি খনি বিদ্যমান। সুর্মা উপত্যকার স্থানে স্থানেও পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চলেও খনিজ তৈলের সন্ধান মিলেছে এর ভিতর—এ অবশ্য ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অব্যাহত প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফল। ডিগবয় খনিগর্ভ থেকে বছরে যে তৈল উত্তোলিত হয়, তার মোট পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি গ্যালন।

একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না, ভারতীয় তৈলে ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কিছুতেই মেটে না। পেট্রোলিয়াম (খনিজ তৈল) বা পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের ব্যবহার অন্য দেশের ন্যায় এখানেও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাইরে থেকে আমদানীর দ্বারাই এই বিপুল চাহিদা মেটানো হয়ে আসছে এযাবৎ। ইরাক, ইরাণ, কোয়েটা, মাস্কাট থেকে তো বটেই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকেও তৈল সরবরাহ হয় এখানে। পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাত পণ্য আমদানী খাতে ভারতের এখনও অর্থব্যয় করতে হয় বছরে ৭০ কোটি টাকার মত।

আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাধীনে তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির কয়েকটি পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন। বোম্বাই, পাঞ্জাব, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যের অঞ্চল-বিশেষে নতুন করে খনিজ তৈল পাওয়ার উদ্যম নিবদ্ধ রয়েছে। এখন অবধি আবিষ্কৃত খনিগুলোতেও কাজের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে আগের চেয়ে বেশী। এই অবস্থায় খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়ামের উৎপাদন এখানে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হবে, এটুকু আস্থা রাখা যায়।

খনিগর্ভ থেকে উত্তোলিত মোটা তৈল শোধন করবার নিজস্ব ব্যবস্থার দিকেও ভারত আজ অনেকটা সজাগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবাদান (বিশ্বের বৃহত্তম শোধনাগার যেখানে রয়েছে) থেকে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং তখনই ভারত সরকার ভারতের অভ্যন্তরে শোধনাগার বা রিফাইনারী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন বিশেষভাবে। ইতোমধ্যে বোম্বাইয়ে দুইটি এবং বিশাখাপত্তমে একটি আধুনিক শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। আরও এক দুইটি রিফাইনারী বা শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে এবং তার জন্যে আবশ্যক উদ্‌যোগ আয়োজনও চালিয়েছেন তাঁরা। ডিগবয়ে (আসাম) পূর্ব্ব থেকেই যে শোধনাগারটি চালু আছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা চলেছে তাতেও। সিনথেটিক পেট্রোলিয়াম বা কৃত্রিম তৈল উৎপাদনের জন্যেও ভারতে সরকারী পর্য্যায়ে উদ্যম লক্ষ্য করা যায় এবং এ সকলই নিঃসন্দেহে আশার কথা। মোটের ওপর, শিল্পায়নের পরিকল্পনা সার্থক করতে হোলে খনিজ তৈল-সম্পদের ক্ষেত্রে ভারতের স্বয়ংসম্পন্নতা অর্জন সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

কিশোরদের হাতে টাকা-পয়সা

টাকা-পয়সা এমনি জিনিস, এ হাতে পেতে চায় সকলেই, কিশোররাও। কিন্তু টাকা-পয়সা পাওয়াটাই বড় কথা নয়, বড় কথা এর সদ্ব্যবহার, এর সঞ্চয়।

বয়স যতক্ষণ কম থাকে, পুরো দায়িত্ববোধ তখন অবধি হয় না। আর দায়িত্ববোধ সম্যক্ না হলে টাকা-পয়সার ওপর মমত্বও যথোচিত হবার নয়। তাতে অর্থের অপব্যয় ও অপচয় হবার আশঙ্কা থেকে যায় বেশিরকম। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, কত কিশোর হয়ত প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হলো, কিন্তু সে সম্পত্তি অধিক সময় টিকে থাকলো না। দলে ভিড়বার দরুণই হোক্ কি নিজের দুর্বুদ্ধি বা বোকামির জন্যেই হোক্—টাকা-পয়সা সব চলে গেলো কোথায় দেখতে দেখতে! এমনি অপব্যয় অপচয় হতে পারে বলেই কিশোরদের হাতে টাকা-পয়সা থাকার সমূহ বিপদ।

অবিবেচনার ফলে বা আবশ্যক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কিশোরদের হাতে পড়ে কত অর্থ বিনষ্ট হয়, সে হিসাব কে রাখে? অথচ বুঝে শুনে খরচ করলে এই অর্থেই ভালো কাজ হতে পারতো বা হতে পারে অনেক। সহরাঞ্চলে বসবাসকারী কিশোর-কিশোরীরা গ্রামাঞ্চলবাসীদের চেয়ে একটু আলাদা। সহরে হাত-খরচের নাম করে হলেও কিছু অর্থ চাই ছোট বড় সকলেরই। কাজেই এখানে সতর্কতা ও তত্ত্বাবধান বেশিরকম না থাকলে নয়।

কিশোর ও তরুণরা টাকা-পয়সা হাতে পেয়ে কি ভাবে উড়িয়ে দেয়, এই নিয়ে বিলেতের চিন্তাশীল মহলে সম্প্রতি বেশ আলোচনা গবেষণা হয়েছে। একথা ঠিক—আজকের দিনে অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা যতটা টাকা-পয়সা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ পাচ্ছে, আগেকার দিনে তেমনটি ছিল না। কাজেই এই প্রসঙ্গে অভিভাবক মহলের সেদিকে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগও ছিল এখনকার চেয়ে কম।

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ের একটি হিসাব। বৃটেনে সে সময়ে ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার। এর ভেতর বিবাহিত দেখতে পাওয়া যায় ১৫ লক্ষের মতো আর বাকি প্রায় ৫০ লক্ষ তরুণ-তরুণী অবিবাহিত। অবিবাহিতদের মধ্যে ৮০ লক্ষ জনকে স্কুল-কলেজ কিংবা সেনাবাহিনীতে শিক্ষারত দেখা যায়। এদেরও বাদ দিয়ে যে ৪২ লক্ষ তরুণ-তরুণী থাকলো, তারা কোথাও চাকুরী করে, এইটি পরিদৃষ্ট হয়। সবটা অর্থই যে তারা পরিবারে দিয়ে দেয়, এমন হিসাব পাওয়া যায়নি। কাজেই স্পষ্ট যে, তারা প্রাপ্ত বা অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করে থাকে নানা ভাবে।

গোড়াতেই বলা হ'ল, কিশোর বয়সে টাকা-পয়সা হাতে এলে অপচয় হবার আশঙ্কাই থাকে বেশি। সিনেমা-থিয়েটার, খেলার মাঠ, রেস্তোঁরা, কফি-হাউস, সাজ পোষাক—এ সবের পিছনে কম অর্থ ব্যয় করে না তারা না বুঝে। টাকা-পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেললে অমঙ্গল এসে হাজির হয়—এই জিনিসটি তারা যতক্ষণ না বুঝতে পারবে, ততক্ষণ আশঙ্কা দূরীভূত হবে না। সেজন্য অভিভাবকগণ এবং আশে-পাশে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের সকলকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে—কিশোরদের হাতে টাকা-পয়সার যেন অপচয় না হ'তে পারে কখনই।
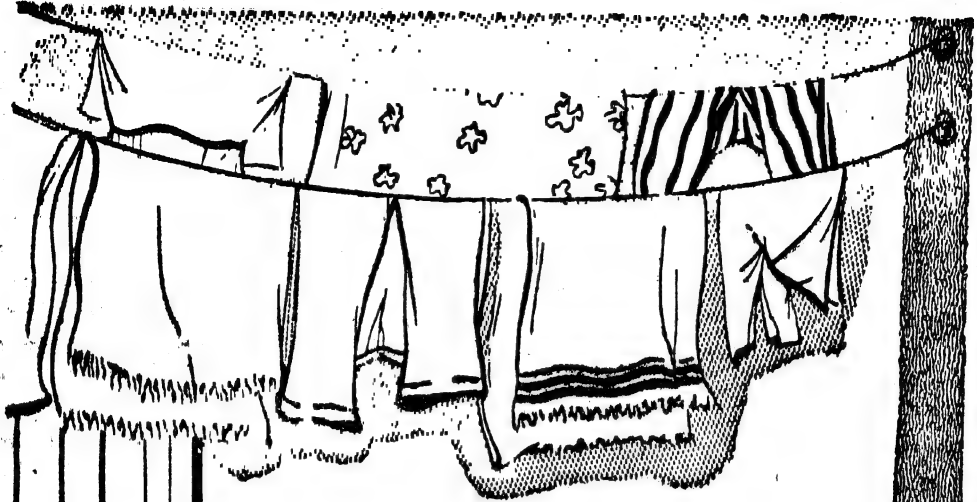
আমার মা নির্ম্মলার সুন্দর চেহারা ও মিষ্টি ব্যবহারে খুব খুশী হলেন। সহুরে শিক্ষিতা বৌ সংসারের কাজ কর্ম্ম করবে না ভেবে যেটুকু দুশ্চিন্তা ছিল সেটাও কেটে গেলো যখন নির্ম্মলা সংসারের সবকাজেই নিজে থেকে এগিয়ে গেলো।

মা সবথেকে খুশী হতেন যখন সব মেয়ে বৌয়েরা নির্ম্মলাকে দেখতে আসতো আর নির্ম্মলা তাদের নিয়ে বসে দেশবিদেশের পাঁচ রকম গল্প শোনাতো। মা তাঁর শিক্ষিতা বৌ সম্বন্ধে খুবই গর্ব্বিত হলেন।

সবে গত কালই ও পাড়ার লক্ষী মাকে বলছিলো "আমরা ভাবতাম লেখাপড়া শেখা মেয়েরা ঘর গেরস্থালীর কাজকর্ম্ম পারেনা কিন্তু তোমার বৌমা সেধরনের মেয়েই না।"

"কাজের কথাই যখন তুললে তখন শোন বৌমা সকাল থেকে কি করেছে—রান্নাবান্না সেরেছে, ঘরদোর ঝাঁট দিয়েছে, জিনিষ পত্তর গোছগাছ করেছে, সেলাই নিয়ে বসেছে, দুটো চিঠি লিখেছে—এ সব সেরেও চান করতে যাওয়ার আগে একগাদা কাপড় কেচেছে" বলে মা দড়ীর ওপর টাঙ্গানো একরাশ কাপড় দেখালেন। লক্ষী কাপড়গুলো দেখে অবাক". ওঃ মা এসব তোমার বৌমার কাচা—এমন কি বিছানার চাদর পর্য্যন্ত। কি রকম ধবধবে সাদা হয়েছে। আর আমি যখন কাপড় কাচি কাপড় থেকে ময়লা বার করতে আমার প্রানান্ত হয়। তবে হাজার হোক আমাদের নির্ম্মলা হলো গিয়ে লেখাপড়া জানা মেয়ে।"

নির্ম্মলা তখন চান সেরে বেরুচ্ছিলো— লক্ষীর কথা তার কানে গেলো—"মাসীমা, এর সাথে লেখাপড়া শেখার কি যোগ আছে। ঠিক মতন সাবান ব্যবহার করলেই কাপড় পরিষ্কার হবে।"

"কি সাবান বাছা আমার বলতো?" "কেন, সানলাইট সাবান, আপনি জানেন না?" লক্ষী তো অবাক্‌ "সত্যিই সানলাইট্‌ কাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কারণ অল্প একটু ঘষলেই প্রচুর ফেনা হয় যাতে সুতোর ভেতর থেকে ময়লার প্রতিটী কণা বার করে দেয়।"

নির্ম্মলার কথাগুলো যেন সকলকে একটু নতুন নতুন খবর জানালো। মা বললেন "এতে আরও সুবিধা যে এ সাবানে কাপড় আছড়াতে হয়না একদম—অল্প একটু ঘষলেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যায়। শুধু খাটুনীই বাঁচেনা কাপড়গুলোও বেশীদিন টেঁকে।"

"কিন্তু এ সাবানটীর দাম বড় বেশী না কি?" এ প্রশ্নে মা চুপ করে গেলেও নির্ম্মলা বল্লো "সত্যি কথা বলতে এটা মোটেই বেশী খরচা পড়েনা কারণ এতে এত ফেনা হয় যে এক গাদা কাপড় কাচা যায়।

দেখুন টাঙ্গানো কাপড়গুলো—ছোটবড় মিলিয়ে প্রায় ২০টা কাপড় এগুলো সব কাচতে একটা সানলাইটের আধখানা লেগেছে। তবুও কি আপনি বলবেন বেশী খরচা পড়ে।"

লক্ষীর মুখ হাসিতে ভরে গেলো, ও বললো, "বেঁচে থাকো মা, তোমার গুনের শেষ নেই। রোজ তোমার কাছ থেকে আমরা কত কিনা শিখছি।"

SUNLIGHT SOAP

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

S/P. 5B-X52 BG

তিনটি ঋণ

রজত সেন

গাড়িটা আস্তেই যাচ্ছিল। সস্ত-কেনা প্যাকার্ড ; নূতন বলেই এখনও কুলীন, অভিজাত, এখনও নিস্পৃহ আর নির্বিরোধ। তার চালক রতন সিংকে দেখে মনে হয়, সে-ও গাড়িটার একটা অংশ। খাকি প্যান্ট আর সাদা সার্ট। গাড়িতে বসে ষ্টিয়ারীং হুইলে হাত রাখলেই তার আর কোনো সত্তা নেই, কোনো অস্তিত্ব নেই।

থিয়েটার রোডে রতন সিং জানতে চেয়েছিল বাড়ি ফিরবে না কি ?

পিছন থেকে উত্তর পেয়েছিল : বাড়ি ত ফিরবেই, কিন্তু সার্কুলার রোডে থামতে হবে।

তখনদিনে কলকাতার রাস্তায় সারবন্দী বৈদ্যুতিক আলোর পাহারা সুরু হয়নি, গ্যাস-বাতির স্নিগ্ধ, স্তিমিত আলোয় তখনও ছায়ার মন্ত্রণা।

ক'টা বাজল একবার দেখবে ?

তখনও এক হাতে চুড়ি অন্য হাতে ঘড়ি পরবার রেওয়াজ হয়নি। তাই সোনার ঘড়ির সংগে সোনার চুড়ির রিনিঝিনি শোনা গেল। ড্যাস বোর্ডের আলোর দিকে হাত বাড়িয়ে রমলা বলল, তোমার দেরি হয়ে গেল, না ?

গাড়িটা আস্তেই যাচ্ছিল ; আর চৈত্রের বাতাস। পিছনে হাত ঘুরিয়ে ব্লাউজের একেবারে উপরের হুক দুটো লাগিয়ে রমলা আবার বলল, আজও তোমার হষ্টেলে ফিরতে দেরি হয়ে গেল, রোল-কলের সময় আজও ফাদার প্রেরিরা তোমায় পাবেনা।

চুপ কর, মলি।

রমলা সতর্ক হল, দু'হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানবার চেষ্টা করল : কিশোর, তবু পুরুষ, তবু একজন পরিপূর্ণ মানুষ। বয়সে এক বছরের ছোট, তবু দীর্ঘদেহ, বলিষ্ঠ একজন ভালবাসার মানুষ।

সত্যি নিবারণ, ফাদার প্রেরিরা তোমায় এক-ঘর ছেলের সামনে অপমান করবে—এ অসহ্য !

কিন্তু নিবারণ হষ্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ফাদার প্রেরিরার কথা একবারও ভাবেনি ; সাতটায় রোল-কল হল, সাড়ে সাতটা নিশ্চয় হয়ে গেছে, সে-জন্য উদ্বেগ নেই তার, কিন্তু প্রতিদিন ছাড়াছাড়ি হবার আগের মুহূর্তে শাস্তি আর অপমানের কথা কেন স্মরণ করিয়ে দেয় মলি ? এ কি তার ভালবাসার মান-নির্ণয় ?

হষ্টেল-গেট ছাড়িয়ে কিছু দূরে বড় গাছটার ছায়াঘন অন্ধকারে গাড়ি থামাল রতন সিং, গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরল। নিবারণ নামল, চওড়া কাঁধ, ঋজু-দেহ, চতুর্থ বার্ষিকের ছাত্র নিবারণ দাশগুপ্ত গাছের ছায়ায় কাঁচা ফুটপাতে একটুখানি দাঁড়াল, একবারও মনে পড়লনা হষ্টেলের নিয়ম-ভংগের অপরাধ, বি-এ পরীক্ষার আড়াই মাস বাকি, আর পিতৃবন্ধু রাধিকাপ্রসাদের কাছে যাবে অভিযোগ-পত্র, প্রেরিরার নিজের লেখা।

গাড়ির ইঞ্জিন তখনও ধুকপুক করছে, রমলা গাড়ির বাইরে হাত বাড়াল।

কিন্তু এক-পা এগিয়ে এলনা নিবারণ, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলনা রমলার হাত। শরীরটাকে আর একটু ফিরিয়ে গাড়ির ঠাণ্ডা ইস্পাতে বুকটা চেপে রাখল রমলা, চৈত্রের বাতাস-ছোঁয়া পাতায় অস্পষ্ট মর্মর শুধু, ফুটপাতের প্রান্তে গ্যাস-বাতির নিরাশ্রয় আলোর ম্লান দ্যুতি শুধু। মৃদু দীর্ঘশ্বাসটা রমলারও হতে পারে, বাতাসেরও হতে পারে।

মুখ ফিরিয়ে রমলা রতন সিংকে নির্দেশ দিল, বাড়ি। সাদা, শক্ত দাঁত দিয়ে পাতলা ঠোঁট কামড়ে ধরল সে ; আমি তোমাকে ভেঙে ফেলব নিবি। ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলব। ঠোঁটের নরম মাংসে দাঁতের গভীর দাগ বসে গেল। বুকের উপর আঁচলটা বিন্যস্ত করতে লাগল সে।

পাঞ্জাবীর আস্তিন আরও খানিকটা গুটিয়ে লোহার গেট খুলে ভিতরে ঢুকল নিবারণ। করিডোরের বাঁ-দিকেই ফাদার প্রেরিরার ঘর ; দরজায় টোকা দিল সে।

কাম ইন্। ভিতর থেকে সাড়া এল।

টেবিলের উপর রাশীকৃত ছড়ানো বই আর খাতা ; নিবারণ টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। বইটা বন্ধ করে তাকাল ফাদার প্রেরিরা। ছোট, নীল চোখ, মাঝখানের তারা দুটি বাতির আলোয় চকচক করছে, টিয়া-নাক ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, পুরু গোঁফ-জোড়াকে পাহারা দিচ্ছে। ছোট কপাল, আর চওড়া কাঁধের উপর মাথা-ভর্তি চুল, আর একটুখানি ছাগল-দাড়ি। আবার চোখ নামাল প্রেরিরা। নিবারণ ঘরটার চারদিকে দেখতে লাগল, বিশেষ কোনো আসবাব নেই। একটি লোহার খাট আর দরজার পাশে বইয়ের আলমিরা। দেয়ালে ক্রুশবিদ্ধ যীশু।

ইউ ! প্রায় চেঁচিয়েই উঠল প্রেরিরা।

নিবারণ মুখ ফিরাল, আরও একটু এগিয়ে এল ডান দিকে চেয়ারটার কাছে।

তোমার অবাধ্যতা আর বেয়াদপী ক্ষমার অযোগ্য। চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রেরিরা, চেয়ারটা উল্টে গেল মাটিতে। প্রেরিরার নীল চোখে সবুজ আগুন জ্বলছে। না, নিবারণ তুলে দেবেনা চেয়ার। ঢিলে-হাতা আলখাল্লার আস্তিন কনুই পর্য্যন্ত গুটিয়ে নিল প্রেরিরা ; চওড়া কব্জিতে লাল ঘন লোম ; মোটা, বলিষ্ঠ আঙুল, নিবারণের চাইতে মাথায় কিছু লম্বা।

নিবারণ কোনো উত্তর দিল না।

এ্যাণ্ড, আবার বলল প্রেরিরা, ইউ এ্যানয় মি লাইক দি আনপ্লেজেন্ট ওডার অফ এ ডগ।

নীল চোখের সবুজ আগুন আরও দপদপ করে উঠল, অন্য কোনো ছাত্র হলে আমি এ মুহূর্তে হষ্টেল থেকে তাড়িয়ে দিতাম, তা জান ? তোমার বিষয় তত্ত্বাবধান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমার

আঞ্চলকে। কি ব্যাপার? সত্যি করে বল, রাজনীতি না মেয়ে?

মেয়ে।

হোয়াট এ সেম! বেতের ঝাড়নটা নাচাতে লাগল সে, ঠোঁট কাঁপল বার কয়েক।

প্রচণ্ড শব্দে মোটা অভিধানটার উপর বেত দিয়ে আঘাত করল প্রেরিরা।

না, নিবারণ চমকায়নি।

আমার অধ্যাপক-জীবনে অনেক শক্ত ছেলেকে আমি নরম করেছি, অনেককে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছি, তাদের তুলনায় তুমি কিছুই নয়।

তোমার বক্তব্যে অস্পষ্টতা নেই, ফাদার!

যেমন করে ঘাতকের ছুরি লাফিয়ে ওঠে শূন্যে, তেমনি প্রেরিরার বেত এক নিমেষের জন্য শূন্যে লাফিয়ে উঠল, ঘরের বাতাস দু'ভাগ হয়ে গেল, একটা উন্মত্ত সাপ হিস্ করে ছোবল মারল যেন।

বেতের আঘাতে চামড়া কেটে যায়—এ-গল্প নিবারণ আগে শুনেছে কিন্তু আজ হাতের দিকে তাকিয়ে সত্যি বিস্মিত হল সে, কাটা চামড়ার ফাঁক দিয়ে রক্ত দেখা দিয়েছে, মনে হল প্রেরিরার হাতের জোর আছে।

ঘর থেকে যাবার আগে দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল নিবারণ।

বোতাম-আঁটা সার্টের পকেট থেকে হালকা নীল রঙের খামটা বার করে এগিয়ে দিল রতন সিং।

তুমি যাও।

রতন সিং গেল না ; জানাল : জবাব নিয়ে যেতে বলেছে।

সেই চেনা গন্ধ, ক্যালিফর্নিয়ান পপী! সার্কুলার রোড থেকে ঝাউতলা রোডে রমলার শোবার ঘর পর্যন্ত যে-গন্ধটা ছড়িয়ে আছে।

তুমি যাও, জবাব পাঠিয়ে দেব।

রতন সিং তলোয়ারের মত কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে পিছন ফিরল।

দুপুরবেলা য়্যুনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে রমলা এক লহমায় দুপাশের ফুটপাতে চোখ বুলিয়ে নিল, না, নিবি কোথাও অপেক্ষা করছে না ; ভ্রূ কুঁচকাল সে, বইগুলি আঁকড়ে ধরল শক্ত করে ; তার গাড়ি অপেক্ষা করছে কলুটোলা স্ট্রীটে।

পাশেই ছোট ষ্টেশনারী দোকানটায় ঢুকে পড়ল সে, ব্লাউজে আটকানো কলমটা খুলে এগিয়ে দিয়ে বলল, আবার গোলমাল করছে কলমটা।

ছোকরা দোকানদার ব্যস্ত হয়ে উঠল, বলেন কি? এই ত পরশু দিন সারিয়ে দিলাম, দেখি? কলমটা পরীক্ষা করল সে, সাদা কাগজে কবিতার একটি পংক্তি লিখতে গিয়ে সামলে নিল, কি অসুবিধা হচ্ছে বলুন ত?

রাস্তা থেকে মুখ না ফিরিয়েই রমলা বলল, অনেক অসুবিধা, ভয়ানক অসুবিধা! এক পা সিঁড়ির উপর নামিয়ে দিয়ে রাস্তার দুই প্রান্ত দেখতে লাগল যতদূর চোখ যায়।

পিছন থেকে দোকানদার বলল, দেখুন।

রমলা মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল, আপনি দেখুন, ভাল করে দেখুন না ? মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বার করে কলমটা ঠিক করবার চেষ্টা করুন না কেন।

দিন, দিয়েছি দেখে।

হাত বাড়িয়ে কলমটা নিল রমলা, ব্লাউজে আটকাতে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল ?

ছোকরা দোকানদার একটু হাসল, বলল, কিছুই হয়নি, লেখায় আপনার মনোযোগ ছিল না ; না, কিছু দিতে হবে না !

রমলা কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে নামল, কলমটা বাঁ-হাতের মুঠোয়। লেখার কেন ? কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছে না সে, খেতে পারছে না, যা খাচ্ছে হজম হচ্ছে না, রাত্রে দু'ঘণ্টার বেশী ঘুমোতে পারে না, আর—সে জানে, শরীরের ওজনও কমে যাচ্ছে ; হয়ত, শেষ পর্যন্ত, এমন কাঁচা সোনার রঙ তার নষ্ট হয়ে যাবে। প্রথমে দাঁতে দাঁত ঘসল সে, পরে ঠোঁট কামড়াল। রাস্তা না হলে সে ঠোঁটের রক্ত বার করে দিত। খুব জোরে হেঁটে সে এল কলুটোলা ষ্ট্রীটে, উঁকি দিয়ে দেখল রতন সিং ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই গাড়িতে।

সার্কুলার রোড।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেন্ট-জ্যাভিয়ার্স হষ্টেলের কাছে গাছের ছায়ায় গাড়ি থামল। ডেকে নিয়ে এস।

দু'মিনিটেরও কম সময়।

নিবারণ এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে।

সারা বিকেল তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি, নিবি, তুমি কেন এলে না ?

পড়ছিলাম, প্রেরিয়া তোমার বাবার কাছে নালিশ-পত্র পাঠিয়েছে।

তোমায় ভাবতে হবে না তার জন্য ! এস। রমলা দরজা খুলে দিল।

কপাল থেকে চুল পিছনে সরিয়ে নিবারণ বলল, না, আমি ভাবছি না !

চল, ইডেন গার্ডেন্‌স্ কিংবা গংগার ধারে, সাড়ে ছ'টার মধ্যেই ফিরব, এস। মিনতি, অনুরোধ ; রমলা যেন ভেঙ্গে পড়ল। ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছল সে ; সুগন্ধ ছড়ালো বাতাসে ; আসবে না ?

খানিকটা বাতাস ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে এল, গাছের পাতা মর্মরিত হল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

রতন সিং ! প্রায় চীৎকার করে উঠল রমলা।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, বাঁ দিকে মোড় ঘুরল।

নিতান্তই অস্পষ্ট কয়েকটি কথা : নিবি, এর জন্য ক্ষমা করব না তোমায়, তোমায় আমি ছিঁড়ে ফেলব ! নাক তার স্ফীত হতে লাগল বার বার।

হষ্টেলের রোল-কল হয়ে গেছে ; নিবারণ বই গুছিয়ে পড়বার উদ্যোগ করছিল ; রতন সিং খবর নিয়ে এল তাকে বাড়ি যেতে হবে, জরুরী দরকার, সাহেব অপেক্ষা করছেন।

খোলা কলমটা তখনও তার হাতে ছিল, ক্যাপটা কলমে লাগিয়ে সে উঠে বসল গাড়িতে।

ইউক্যালিপটাস আর মোটা পাম-গাছে-ঘেরা বনেদী বাড়িটা দূর থেকে দেখা যায়, উঁচু দেওয়াল, উঁচু লোহার গেট।

গাড়ি থামল। কেয়ারী-করা ফুলের বাগান। বাঁ দিকে দুটি গ্যারেজ, পাশে তেমনি একটি বড় ঘর ; এক সময়ে রাধিকাপ্রসাদের পিতাঠাকুর অম্বিকাপ্রসাদ ল্যাণ্ড-অ গাড়ি আর জোড়া টাট্টু রাখতেন।

চওড়া বারান্দাটা পার হয়ে নিবারণ সরাসরি বৈঠকখানায় ঢুকল। বিপত্নীক, ধনবান রাধিকাপ্রসাদ ল্যাজারাসের দোকান থেকে কেনা ঘোরানো চেয়ারে বসে টেবিলের চিঠিপত্র নাড়াচাড়া করছিল। ঢেউ-খেলানো ঘন চুল, সাদার আভাস দেখা দিয়েছে ; উজ্জ্বল, বনেদী গায়ের রঙ, উন্নত নাকের দু'পাশে চামড়ার উপর বয়সের রেখা, গিলে-করা মসৃণ পাঞ্জাবীতে হীরের বোতাম লাগানো।

এদিকে এস। একবার মাত্র মুখটা তুলে নামিয়ে নিল রাধিকাপ্রসাদ।

নিবারণ টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল ; রাধিকাপ্রসাদ একখানি ভাঁজকরা চিঠি ছুঁড়ে দিল তার দিকে। চিঠি তুলে নিল সে ; ফাদার প্রেরিবার অভিযোগপত্র, অপরাধের ফিরিস্তি। একবার চোখ বুলিয়ে চিঠিটা রাখল সে টেবিলের উপর, তাকাল।

কি বলবার আছে তোমার ?

কিছু না।

রোজ সন্ধ্যার পর তোমাদের কি এমনি বায়ুসেবন চলে ?

নিবারণ চুপ করে রইল।

রাধিকাপ্রসাদ একটু নড়েচড়ে বসল, তুমি যে এমনই উচ্ছৃংখল হবে এ আর আশ্চর্য কি ? তোমার বাপটিও এমনি লোফার ছিল।

এবারে যেন সে শুনতে পেল রাধিকাপ্রসাদের কথা, যেন কেউ তাকে ধাক্কা দিল, বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকে ; আর শিরার যত রক্ত সব এক মুহূর্তের জন্য দৌড় দিল হৃৎপিণ্ডের দিকে ; আমার বাবা লোফার ছিলেন না, বড়লোক হতে চাননি !

চুপ কর ! রাধিকাপ্রসাদের গর্জনটা এখনও জোরালো, গরীবের ছেলে গরীবের মতই থাকা উচিত ছিল, টাকা-পয়সার আওতায় তারা মাথা ঠিক রাখতে পারে না, আমার মুখে মুখে জবাব দেবার স্পর্দ্ধা আজ পর্যন্ত কারুর হয়নি, তোমার মোটা গর্দানটা বাঁকা করতে আমাকে চাকর-দরোয়ান ডাকতে হবে না।

নিবারণ তাকাল, ভাল করে তাকাল এবার বাবার বন্ধুর দিকে। বাঁ-দিকের কপালে একটা শির ফুলে উঠেছে ; সাবান আর স্নো-মার্জিত মুখ, সুগন্ধি তেলমাখা চিকণ চুল, সুপুরুষ আগে নাকটা হয়ত আর একটু উঁচু ছিল ; ক্লান্ত চোখে তখনও লালসার আভা, পাতলা ঠোঁটে ধূর্ত হিসাব।

তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, প্রথমবার এবং শেষবার, তোমাকে ভাঙতে, ভেঙ্গে টুকরো করতে খুব বেশি সময় আমার লাগবে না, যাও।

নিবারণ বেরিয়ে এল।

বারান্দার প্রান্তে রমলা তার পথ আটকাল, দাঁড়াও। ঘরে এস, এক মিনিট।

নিবারণ হাসল, স্বচ্ছন্দ, প্রাণখোলা হাসি।

মুগ্ধ চোখে রমলা বলল, নিবি, অনেক দিন এমন হাসতে তোমায় দেখিনি।

নিবারণ তার অনাবশ্যক উন্নত বুকের উপর চোখ রেখে বলল, সত্যি ?

ও কি ! চলে যাচ্ছ ? দাঁড়াও এক মিনিট।

নিবারণ সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পাঞ্জাবীর একটা বোতাম এঁটে দিল।

রতন সিং তবু আসে দিনে দু'বার—ক্যালিফর্নিয়ান পপীর সুগন্ধ মাখানো চিঠি নিয়ে, তাজা গোলাপের তোড়া নিয়ে। বই থেকে মুখ তোলে না নিবারণ, পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে। এক দুপুরে রমলা এসে হাজির হল, ঠোঁট উল্টে বলল, আমি কি অপরাধ করেছি নিবি ? বই নাবিয়ে টেবিলের উপর উঠে বসল সে।

কাদার প্রেয়িরা জানতে পারলে হস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেবে। নিবারণ দেখতে পেল জামার বোতাম লাগায়নি রমলা, মুখে রক্তাভা ; হস্টেলে থাকবার তোমার দরকার নেই, তোমার বাড়ি আছে, বাড়ি চল।

ঘরে যাও, মলি।

না, আমি যাব না। রমলা দু'হাত বাড়িয়ে তার মাথাটা টেনে নিল বুকের মধ্যে।

নিবারণ ধাক্কা দিল ওকে, রমলা টেবিল থেকে ছিটকে পড়ল মাটিতে, ঘড়ির কাচ ভেঙ্গে গেল তার, কনুইতে চোট লাগল ; সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, পথের ভিখারি তুমি, বাবা তোমায় দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন, কিসের তোমার এত গর্ব ? তোমাকে আমি ভাঙতে পারি, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারি। রমলা জোরে একটা চড় লাগাল নিবারণকে। যাবার সময় চৌকাঠে হোঁচট লেগে জুতার ষ্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল তার, ভ্রূক্ষেপ করল না সে।

পরীক্ষার আর একটি পেপার বাকি।

পৌনে বারোটার সময় বই বন্ধ করল সে। কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না। লোহার গেট খুলে রাস্তায় এল সে ; নির্জন পথ, রাত্রির বাতাসে সে যেন আজ প্রথম মুক্তির স্বাদ অনুভব করল ; এই রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত সে অনুভব করতে চায় তার রক্তে, তার হৃদয়ে। আর—শেষ বোঝাপড়ার এই ত রাত্রি।

বাতাসের ধাক্কায় গাছের পাতা মর্মরিত হয়ে উঠল ; এমন রাত্রি। এ রাত্রির কোনো বন্ধন নেই, কোনো উদ্বেগ নেই, এমন কি কোনো উন্মাদনাও নেই। রমলা কি হতে পারে না আর এক নারী ? অন্য এক নারী ?

নিবারণ হাঁটতে লাগল। শুধু তার চটির শব্দ। আর কোনো শব্দ নেই, আর আছে মন্থর বাতাসের কাকুতি।

সেই পাম আর ইউকালিপ্টাস্ গাছে ঘেরা বড় বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নিবারণ। ইউক্যালিপটাস্ গাছের পিছনে ভাঙ্গা চাঁদ, তারাগুলি কাঁপছে। নিবারণ হাত দিয়ে দেখল লোহার গেটে আজ তালা লাগানো নেই, কিংবা হয়ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জাদু !

চওড়া বারান্দায় উঠে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে, আবছা অন্ধকারে উপরে উঠবার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে, জুতোর শব্দ হতে পারে, এ কথা তার খেয়াল হল না।

উপরে উঠে এল সে, আবার সেই চওড়া বারান্দা। মলির ঘরের জানালা দিয়ে নরম, নীল আলো বারান্দায় এসে পড়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে রমলা এল চৌকাঠের বাইরে, দুটো হাত বাড়িয়ে দিল। না, এ আর কোনো রমণী নয়, অন্য কোনো রমণী নয় ; এ রমলা, মাত্র রমলা। নিবারণ কঠিন হাতে রমলার বাহুর বন্ধন আলগা করে তাকে ধাক্কা দিল। রমলা ছিটকে পড়ল শক্ত, ঠাণ্ডা মেঝেতে। মুখ তুলে দেখল : নিবারণের শরীরটা মিলিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির নিচে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টার মত দাঁড়াল রমলা, এক নিমেষে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, বাবা ! বাবা !

পাশের ঘর থেকে দরজা খুলে বেরিয়ে এল রাধিকাপ্রসাদ। ভয়ার্ত্ত গলায় রমলা বলল, বাবা, কেউ যেন আমার দরজা ঠেলছিল।

রাধিকাপ্রসাদ ঘুমের ঘোরে তাকাল এদিক সেদিক, রেলিং-এর কাছে গিয়ে তাকাল নিচে, বাগানে। সাদা পাঞ্জাবী আর পাজামা দেখে চিনতে দেরি হলনা তার, নিবারণ ততক্ষণে গেটের কাছে এসে পড়েছে, চাপাগলায় ডাকল রাধিকাপ্রসাদ নিবারণ।

নিবারণ দাঁড়ালনা।

বাবা, তুমি ওকে চলে যেতে দিলে ?

টাট্টু ঘোড়ার চাবুকটা কোথায় ?

আস্তাবলে।

রাস্তা থেকে দেখতে পেল নিবারণ প্রেয়িরার ঘরে আলো জ্বলছে, করিডোরের সামনে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে প্রেয়িরা।

কোথায় গিয়েছিলে ?

রাস্তায়, ভাল লাগছিল না।

তুমি জাননা রাত্রে হষ্টেলের বাইরে যাবার নিয়ম নেই ?

জানি।

আবার অবাধ্যতা ? নিয়ম ভাঙ্গার অপরাধ! আবার—

সব জানি, ফাদার, আমি অপরাধ স্বীকার করছি, আমায় ক্ষমা কর, তা ছাড়া এই ত শেষ, কালকেই তোমাদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক শেষ, ইচ্ছে করলে এমন তুচ্ছ আর অপ্রীতিকর কাহিনী তুমি স্বচ্ছন্দে ভুলে যেতে পার।

তুমি ক্ষমার অযোগ্য, তোমাকে আমি সবাইর সামনে চাবুক লাগাব।

নিবারণ হয়ত একটু হাসল, অন্ধকারে বোঝা গেলনা ঠিক, বেশ! তাই হবে, তোমাকে আমি সুযোগ দেব, নিশ্চয়। সুতরাং গুড নাইট, ফাদার! নিবারণ প্রেরিয়ার পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল হষ্টেলে।

পরদিন শেষ পরীক্ষার খাতা দিয়ে নিবারণ যখন ইসলামিয়া কলেজ থেকে ওয়েলেসলীর ফুটপাতে এসে দাঁড়াল তখন পাঁচটা দশ। হষ্টেলে এল সে, ফাদার প্রেরিয়াকে পাওয়া যাবে এসময়ে। গেটের কাছে উবু হয়ে বসে জাহাঙ্গীর বাবুর্চি বিড়ি ফুঁকছিল, খবর নিয়ে জানল, প্রেরিয়া সাহেব তাঁর ঘরেই আছেন।

দরজায় টোকা দিয়েই ঘরে ঢুকল নিবারণ।

বাইবেল বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল প্রেরিয়া, ভাল করে তাকাল, নীল চোখে আগুনের ফুল্‌কি ঝলসে উঠল, কি চাও, তুমি ?

একটা হিসাব ঠিক করার 'আছে। আরও এক পা এগিয়ে এল নিবারণ।

গেট আউট। প্রেরিয়া মোটা বেতটা তুলে নিল।

চোখের নিমেষে নিবারণ প্রেরিয়ার হাত থেকে বেতখানি ছিনিয়ে নিল, যাবার আগে গরমিল হিসাবটা ঠিক করে ফেলা উচিত নয় কি ?

কাগজ কাটবার ছুরিটা তুলে নিয়ে ফাদার প্রেরিয়া ক্ষিপ্র এক ভংগিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর সংগে সংগে ধাক্কা দিয়ে নিবারণ তাকে বসিয়ে দিল চেয়ারে। নিতান্ত অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে প্রেরিয়া তাকিয়ে রইল; ইউ সোয়াইন। আরও কি বলতে যাচ্ছিল প্রেরিয়া, কিন্তু—বাতাসে এক মুহূর্ত্তের জন্য হিস্‌ হিস্‌ করে উঠল সেই উদ্যত সাপটা। নিবারণের হাতেও জোর আছে, প্রেরিয়ার কপালের সোনালী চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল, গড়িয়ে পড়ল তার সাদা আলখাল্লায়। ঝাড়নের একটি মাত্র তামাটে পালক বাতাসে উড়ে আটকে রইল প্রেরিয়ার ঘাড়ের উপর।

অপ্রত্যাশিত আর অভাবনীয়! প্রেরিয়া ভাবল: এমন কি করে সম্ভব ? সতেরো বছর ইণ্ডিয়াতে আছে সে। ছুরিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে বদল করল সে, টেবিলের উপর পিতলের ভারি পেপারওয়েটটি আড়চোখে দেখে নিল, কিন্তু নিবারণ আরও ক্ষিপ্র, প্রেরিয়ার হাত পৌঁছিবার আগেই সে ছোঁ মেরে পেপার-ওয়েট তুলে নিল। প্রেরিয়ার নীল চোখে খুনের নেশা। আর এটাও বুঝতে তাঁর দেরি হল না ঘটনাটি সহজ নয়। আচমকা চেয়ারে ধাক্কা খেয়ে কয়েক হাত পেছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রেরিয়া। চোখের নিমেষে চেয়ারটা তুলে নিল মাথার উপর, কিন্তু পলক পড়বার আগেই আর একখানি চেয়ার প্রচণ্ড বেগে প্রেরিয়াকে আঘাত করল।

মাটিতে পড়বার আগে প্রেরিয়ার লম্বা শরীরটা কয়েক বার টলল, মাথার উপর আর একখানি চেয়ার না থাকলে মাথাটি আস্ত থাকত না। নারকেল ছিবড়ের মাদুরে একরাশি তামাটে চুল, বন্ধ নীল চোখ, মানচিত্রে দাক্ষিণাত্যের মত ছাগল-দাড়ি, পূর্ব-ঘাটের পাশ দিয়ে অতি ক্ষীণ, লোহিত ধারা, তামাটে-চুলের পাশে চেয়ারের একটা পায়া, ক্রুসের ছোট কাঠটি। নিবারণ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। জাহাঙ্গীর মিঞাকে পাঠাল হষ্টেল-ডাক্তারের কাছে, এখুনি যেন আসে, ফাদার প্রেরিয়া অসুস্থ।

সেই পাম আর ইউক্যালিপটাস গাছে-ঘেরা বনেদী বাড়ি। লোহার গেট খুলে ভিতরে ঢুকল সে, প্রায় দশটি বছর এ-বাড়িতে কাটিয়েছে নিবারণ। ভরদ্বাজ মালী বড় কাঁচি দিয়ে মেহেদী গাছের ডাল ছাঁটছিল; কালো-রং, অতিকায় বৃদ্ধ মানুষটি; কঠিন, কর্কশ পেশী; কিন্তু মনে মনে ওর হাসির হিসাব না করে পারলনা নিবারণ, তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে ? বিছানা কৈ ? চলে যাবে নাকি আবার ? ফুল নিয়ে যেও, তাজা গোলাপ।

নিবারণ বাগান পেরিয়ে চওড়া বারান্দায় উঠল।

রাধিকাপ্রসাদ কাগজ পড়ছিল, পায়ের শব্দে কাগজ সরিয়ে তাকাল।

নিবারণ টেবিলের কাছে এল; কাল রাত্রে ডাকছিলেন ?

কাল রাত্রেই তোমাকে গুলী করে মারতাম—হাতের কাছে যদি বন্দুকটা থাকত।

নিবারণ হাসল, হ্যাঁ, গুলীর আর এমন কি দাম বলুন ?

চোপরাও, উল্লুক! রীতিমত চেঁচিয়েই উঠল রাধিকাপ্রসাদ।

এবারে হাসলনা নিবারণ, হাসির একটা ভংগী করল মাত্র। এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই, খেই হারিয়ে যাবে।

অন্য দরজা দিয়ে রমলা ঢুকল, তাকাল নিবারণ, তেমনি শ্বেত-শুভ্র পোষাক, সাদা শাড়িতে জামায় তেমনি মন-ভোলান পরিচ্ছন্নতা, একটি বাড়তি ভাঁজ নেই কোথাও। ঠোঁট উল্টে বলল, বাবা, তুমি এই রাসকেলটাকে সহজে ছেড়ে দিও না আজ।

রাধিকাপ্রসাদ দাঁড়াল, যতখানি উচ্চতা তার চাইতে একটু বেশিই লম্বা করল শরীরটাকে, বুকটাকে আর একটুখানি প্রসারিত করল; ডায়াবেটিস আর হুইস্কীর প্রকোপে গত কয়েক বছর কাঠামোটা অনেকখানি ঢিলে হয়ে গেছে, কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা আর মনে রইল না তার। এস, আমার সংগে। আদেশ দিল রাধিকাপ্রসাদ।

ঘরের বাইরে এল ওরা; আগে রাধিকাপ্রসাদ, পিছনে নিবারণ, কিছুটা ব্যবধান রেখে তারও পিছনে রমলা।

বারান্দা পার হয়ে, বাগানের পাশ দিয়ে আস্তাবল-ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রাধিকাপ্রসাদ, টান দিয়ে দরজার একটা পাল্লা খুলে ফেলল, আঙুল উঁচিয়ে নিবারণকে ভিতরে ঢুকবার নির্দেশ দিল। নিবারণ ঢুকল ভিতরে, পিছনে রাধিকাপ্রসাদ আর রমলা। প্রশস্ত ঘর, একপাশে তেরপল-ঢাকা ল্যাণ্ডো গাড়ি, দেওয়ালের গায়ে ঝুলানো জোড়া টাট্টুর জীন আর লাগাম। রাধিকাপ্রসাদ নীচু হয়ে চাবুকটা তুলে নিল, টাট্টুর চাবুক নয়, অম্বিকাপ্রসাদের বিলিতী

চামড়ার চাবুক, আরও নরম চামড়া কাটাবার, মানুষের নরম চামড়া।

রমলা ইতিমধ্যে আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে, বাবা, গায়ের জামাটা ওকে খুলে ফেলতে বল, ভরদ্বাজকে ডাকব? অম্বিকাপ্রসাদ যে চোখে একদিন কাটা চামড়ার ফাঁকে চুইয়ে-পড়া রক্তের ধারা দেখছে, আজ বহু বছর পরে তারই এক উত্তরাধিকারিণীর চোখে তেমনি লাল রক্তের নেশা, ঠোঁট কাঁপল তার, আর কাঁপল জামার নিচে স্তবকাকার স্তন,—আদিম উল্লাসের স্পন্দন।

একটা রাস্তার কুকুরকে সায়েস্তা করতে আমায় ভরদ্বাজকে ডাকতে হবে? ছোঃ! রাধিকাপ্রসাদ হাত তুলল, আর বিদ্যুতের মত ছিটকে এল চাবুক।

কিন্তু নিবারণ ধরে ফেলল চাবুকের প্রান্তটি; আর তখনই সে বুঝতে পারল চামড়ার ঐ বিনিটা কত শক্ত আর কত মজবুত! জোরেই টান দিল সে, বেশ জোরে। রাধিকাপ্রসাদ আর কিছু করবার আগেই দেখতে পেল চাবুকটা দোল খাচ্ছে নিবারণের হাতে।

বাতাসে 'সাঁই' শব্দ করে উঠল চাবুক, একটু বাতাস রাধিকাপ্রসাদের কান ছুঁয়ে গেল মাত্র। কিন্তু ঐ সংকেতটুকুই যথেষ্ট। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল সে। নিবারণ আবার চাবুক ছুঁড়ল বাতাসে, রাধিকাপ্রসাদ আবার কাঁপল, মনে হল, বুকের নিচে ধুক-পুক শব্দটা এমন কষ্টকর, জীবনে আর কোনোদিন বোধ করেনি সে। কি হল? একটা সামান্য চাবুককে এত ভয়? হাতে বন্দুক থাকলে আপনার ঐ পায়রা-বুকের নিচে নির্জীব হৃৎপিণ্ডটা ত ধর্মঘট করে বসত। কথা শেষ করে নিবারণ হেসে উঠল। মুখ ফিরাল রমলার দিকে, বলল, না, তোমার নিবি তোমাকে জামা খুলতে বলবে না—তাহলে হয়ত কোনো ভবিষ্যৎ প্রণয়ীকে তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। বাতাসে চাবুকের সেই ক্ষিপ্র, নির্মম শব্দ। রমলা দু'হাতে মুখ ঢাকল, কিন্তু ততক্ষণে তার গালের চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

চাবুকটা রাধিকাপ্রসাদের গায়ের উপর ছুঁড়ে মারল, বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে।

গেট খুলে বাইরে এল সে।

পাম আর ইউক্যালিপটাস্ গাছে-ঘেরা বনেদি বাড়িটার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। কি পাখি?

অতৃপ্ত তৃষা

(পাঞ্জাবী গল্প)

কেশর সিং আজিজ

সেই আলো ঝলমল দিনটার কথা বার বার কুলবীরের মনে পড়ে যায়। কুলবীর আর সুরজিৎ সেদিন কী হাসিটাই না হেসেছিল। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কুলবীরের ঠোঁটের যে এক চিলতে হাসিটুকুন ফুটে উঠল, তা যেন সেদিনের হাসিটার প্রতি ব্যঙ্গ। কুলবীর মৃত্যুপথযাত্রী, ডাক্তার বলেছে বড় দেরী হয়ে গেছে। তাই অসম্ভব। তবে চেষ্টার ত্রুটি নেই। তবু কুলবীর বুঝতে পারে—দিন তার ফুরিয়ে এসেছে। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে বুঝতে পারে। বলে—আমার পম্পুকে আজও আনলে না? সুরজিৎ কপট অপ্রস্তুতের ভঙ্গী করে বলে—ঐ যাঃ! একেবারে ভুলে গেছি।

পম্পু ওদের একমাত্র ছেলে। সুরজিৎ আর ওর মা রত্নী পম্পুকে নিয়ে সহরতলীর একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকে। সুরজিৎ পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টরের কাজ করে। তাই তাকে প্রায়ই কর্মব্যপদেশে বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। তবু যখনই সে সময় পায় হাসপাতালে গিয়ে বসে। স্ত্রীর গায়ে হাত বুলতে বুলতে বলে ভয় কী? সেরে উঠবে শীগ্‌গির। কিন্তু কুলবীরের সেই এক কথা পম্পুকে নিয়ে আস না কেন? তাকে যে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। সুরজিৎ ভুলে যাওয়ার ভান করে। কোনদিন বা বলে একেবারে অফিস থেকে আসছি কি না, আচ্ছা কাল আনবো।

দু'-তিন মাস কেটে গেল। কিন্তু কুলবীরের ইচ্ছে আর পূর্ণ হোল না। কুলবীরের শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না। সে বেশ বুঝতে পারে শেষের দিন আর বেশী দূরে নেই। সেদিন সে রাগ করে সুরজিৎকে বলল, দ্যাখ কাল যদি তুমি পম্পুকে না আন তবে যেমন করে হোক—আমি নিশ্চয়ই এখান থেকে পালিয়ে যাব। ওঃ পম্পুকে কত দি—ন দেখিনি।

সুরজিৎ তাকে বোঝায়। না কেঁদোনা সোনা। তুমি ভাল হয়ে ওঠ, নিশ্চয়ই পম্পুকে নিয়ে আসব। তুমি তো জান—মানে—

সুরজিৎ কথা শেষ করতে পারে না, মাতৃস্নেহে অন্ধ কুলবীর বলে—বুঝেছি। কিন্তু তাকে আমি ছোঁব না। একবার মাত্র দেখব। আমার পম্পু সোনাকে আমি একবার মাত্র দূর থেকে দেখব।

সুরজিৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ। অপরদিকে এই ছোঁয়াচে রোগের ভয়। না না, পম্পুকে সে কিছুতেই আনবে না। তাদের একমাত্র ছেলে পম্পু। যদি পম্পুরও—নাঃ পম্পুকে আনা অসম্ভব।

সেদিন সুরজিতের সঙ্গে কুলবীর কোন কথাই বলল না। সুরজিৎ ফলগুলো টেবিলের ওপর রেখে বলল—তাহলে আসি। কুলবীর সাড়া দিল না।

দুপুর বেলা। হঠাৎ ফাঁক পেয়ে কুলবীর হাসপাতাল থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ল, কেউ জানল না। কেউ দেখল না তাকে। বেলা গড়িয়ে গেল দিগন্তে। কুলবীর বাড়ীতে পৌঁছে দেখে বিরাট এক তালা ঝুলছে দরজায়। হতাশায় আর ক্লান্তিতে ওর মুখটা কালো হয়ে গেল। একটা আশার প্রদীপ যেন হঠাৎ কে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল। কুলবীরের রুগ্ন বুকটা থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল কাঁপতে কাঁপতে। কোনক্রমে দেয়ালে হাত দিয়ে সে দেহভার রক্ষা করল।

ওরা কোথায় গেছে জান ভাই? কুলবীর পাশের বাড়ীর একজনকে জিজ্ঞাসা করল অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত স্বরে।

—ভাই সাহেব (সুরজিৎ) তো ডিউটি গেছে। আর কালকে সন্ধ্যেবেলা রতনীবাঈ পম্পুকে নিয়ে আম্বালা চলে গেছে। তোমার কি ছুটি হয়ে গেল বহিন?

—হ্যাঃ। প্রশ্নটাকে এক কথায় থামিয়ে দিয়ে কুলবীর বলল একটা কাজ করবে ভাই? কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর সেকথা কাউকে বলবে না।

—তুমি কী বলছ! তোমার কাজ করতে আমার আপত্তিই বা কি? তুমি বল কী সে কাজ। আচ্ছা আমি না হয় প্রতিজ্ঞাই করছি।

—তোমার কাছে হাতজোড় করে পম্পুর নামে ভিক্ষে চাইছি তুমি আমায় দশটা টাকা ধার দাও। আমার বড় দরকার।

—আরে এটা কী কোন শক্ত কাজ? তুমি না হয় কুড়ি টাকাই নাও। তাতে কী! কিন্তু কি করবে তুমি বহিন?

—আমাকে আজই আম্বালা যেতে হবে ভাই! পম্পুকে না দেখে আমি আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচবনা।

—কিন্তু এত তাড়াতাড়ির কি আছে? পাশের বাড়ীর মেয়েটি বললে। রুটি হয়ে গেছে। তরকারীও হচ্ছে। আর এর মধ্যে ভাই সাহেবও (সুরজিৎ) এসে যাবে।

—না বহিন আমি আগে পম্পুকে দেখবো—জলস্পর্শ করবো তার পর। দাও ভাই যা দেবে। বিশ্বাস কর আমায়। আমি নিশ্চয়ই তোমার টাকাটা শোধ করে দোব।

অত কিন্তু হবার কী আছে। আচ্ছা আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি। এই বলে রান্না-বান্না হাতটা কাপড়ে মুছতে মুছতে ঘরের ভেতর চলে গেল পাশের বাড়ীর মেয়েটি।

ট্রেণ থেকে নেমে আর চলবার সামর্থ নেই কুলবীরের। মনে হচ্ছে বার বার, সময় বুঝি ফুরিয়ে এসেছে ওর। প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে জোরে একবুক নিঃশ্বাস নিল ও। চোখ দুটো অসম্ভব জ্বালা করছে। ঠোঁট দুটোর স্বাদ নোনতা। কপালের রুখু চুলগুলো সরিয়ে ও গায়ে উড়নিটা একবার ভাল করে জড়িয়ে নিল। টাঙ্গা করে বাড়ী পৌঁছুলো যখন তখনও সূর্য্য মাথার ওপর ওঠেনি। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ঢাকা সূর্য্যরশ্মি। সূর্য্য না দেখা গেলেও বেলা হয়েছে বেশ। বাড়ীর সামনের সরু গলিটার মোড় ফিরতেই প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো এগিয়ে এল। বৌদি এসেছে বৌদি এসেছে। কেউ বা দুহাত হাতেই জড়িয়ে ধরল কুলবীরকে।

ততক্ষণ বাড়ীতে খবর পৌঁছে গেছে, রতনীবাই দাঁতে দাঁত চেপে মরণ কামনা করল কুলবীরের। তারপর পম্পুকে নিয়ে খিড়কি দোর দিয়ে দূরের একজনদের বাড়ীতে চলে গেল।

কুলবীর তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছে চারদিকে তাকাচ্ছে। কই সে কোথায়? তার পম্পু?

সুরজিতের বোন পাশো বেরিয়ে এল, আরে বৌদি নাকি? তা অসুখ বুঝি একেবারে সেরে গেছে! পাশোর কণ্ঠে শ্লেষ।

ওর বিদ্রূপ কানে নিল না কুলবীর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আমার পম্পু কই?

—অ্যাঁ। পম্পু! কই সে তো এখানে নেই। দ্বিধাহীন কণ্ঠে পাশো মিথ্যা কথাটা বলে গেল।

—না না ও কথা বোল না। পম্পু আছে। হ্যা নিশ্চয়ই সে এখানে আছে। তাকে একবারটি আমি দেখবো।

—আরে আমি কী মিথ্যে কথা বলছি। পম্পু এখানে, একথা তোমায় কে বললে? বস, খাও, এই যে আমি চা করছি। পাশো ভোলাতে লাগল কুলবীরকে।

—কিন্তু ওসবে তো আমার প্রয়োজন নেই ভাই। দয়া করে পম্পুকে একবার আমায় দেখতে দাও। কতদিন তাকে দেখিনি। জোরে জোরে ফোঁপাতে লাগল কুলবীর। তার শীর্ণ শরীরটা [illegible] কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল।

পম্পুও শুনেছে তার মা এসেছে। কোনরকমে দাদীর কোল থেকে নেমেই সে নিজেদের বাড়ীর দিকে দৌড়ল। মা—মা গো, আমি তোমার কাছে যাব।

বৌদি! বৌদি! ও বৌদি। আরে বৌদি কী হোল তোমার? শুয়ে পড়লে কেন? এ কী এমন করছ কেন বৌদি! না না ভয় নেই পম্পু এখানে আছে। শোন বৌদি তুমি—আমি,—হ্যা পম্পুকে নিয়ে—মা। ওমা ছুটে এস। ওগো তোমরা এস। বৌদি কেমন করছে। আয়রে পম্পু, দ্যাখ তোর মা—ওরে!

পম্পু আসার অনেক পরে রতনীবাঈ এসে পৌঁছল।

অনেক দূরে সুরজিৎ অফিসে কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে একটা আলপিন আঙুলে ফুটিয়ে ফেলল। যন্ত্রণায় উঃ করে উঠতেই যেন ওর চমক ভাঙ্গল। আঙুলের ডগায় এক ফোঁটা লাল রক্ত দেখে শিউরে উঠল।

পম্পুকে মায়ের বুক থেকে তখনও কেউ ছাড়াতে পারছে না।

অনুবাদক—মিহিরকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দাসমহাপাত্র

পূজোর ছুটিতে হাজারিবাগ বেড়াতে এসেছে প্রদোষ চ্যাটার্জ্জি। কলকাতার কোন এক সাহেবী কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকরী করে সে। সহরের কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে হাঁপিয়ে-ওঠা জীবনকে ছুদিনের জন্য অবসর দিতে এসেছে এই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ছোট সহরে। মনটা খুশীতে ভরে উঠেছে। হাজারিবাগের এই নির্জ্জন বাড়ীর মাঝে' হারিয়ে গেছে সাহেবী কোম্পানীর মিঃ চ্যাটার্জ্জি।

খুশি হয়েছে স্মিতাও। কতদিন পরে এলো কলকাতার বাইরে। বিয়ের পর সেই একবার গিয়েছিল পুরী, ছিল কয়দিন, সমুদ্র দেখেনি এর আগে, তাই নিয়ে গিয়েছিল প্রদোষ পুরী। অবাক হয়েছিল স্মিতা যেমন ঐ বিশাল নীল জলরাশি দেখে, খুশীও হয়েছিল তেমনি। তারপর এই চার বছরের ভিতর তো কলকাতার বাইরে যাওয়াই হয়নি। কাজে ব্যস্ত প্রদোষ, ছুটি নেবার সময় নেই তার, তাই মহানগরীর 'নাগপাশ থেকে বেরোতে পারেনি তারা। স্মিতার অনেক অনুরোধে এক মাসের ছুটি নিয়ে কাছাকাছি বেড়াতে এসেছে এই হাজারিবাগে। অফিসেরই এক বন্ধুর বাড়ী উঠেছে, ছোট সুন্দর বাড়ী, সহর ছাড়িয়ে একটু দূরে। এই নির্জ্জনতা ভালই লাগে স্মিতার, কলকাতার বাঁধাধরা জীবনের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠা প্রাণ শান্তি পেয়েছে যেন। তাই প্রদোষের অনুযোগ সত্ত্বেও তার কথায় কান দেয়নি স্মিতা। বিয়ের পর সেই ক'দিনের জন্য পুরী গিয়েছিল, তার সদ্যবিবাহিত, সঙ্কুচিত, লজ্জিত মন প্রদোষের বেশী কাছে যেতে পারেনি, আর সে লজ্জা ভেঙ্গে প্রদোষও তাকে কাছে টেনে নেয়নি। তার পর কলকাতার কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে সে ফাঁক আর পূর্ণ হয়নি।

প্রদোষ তার অফিস, ক্লাব এই নিয়ে সদা ব্যস্ত, তাই বলে স্মিতাকে সে অবহেলা করেছে, একথা স্মিতা বলে না। প্রদোষের সঙ্গে সব জায়গাতেই সে গিয়েছে, তার মতন স্ত্রী পেয়েছে বলে প্রদোষ যে গর্ব্বিত, এ কথা তো তার কাছে সে নিজেই স্বীকার করেছে। তবুও যেন প্রদোষের সম্পূর্ণ কাছে সে যেতে পারেনি, কি যেন মনের কোণে একান্ত নিজের করে রেখে দিয়েছে প্রদোষ। স্মিতার অধিকার নেই সেখানে প্রবেশ করার। কতদিন স্মিতা মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে দেখেছে পাশে প্রদোষ নেই, জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ও, ঘুম আসছে না তাই, তুমি ঘুমাও। তাই একান্ত করে স্বামীকে পাবার আশাও তার কম নয়, ভেবেছে হয়ত এই শান্ত পরিবেশে যে চিন্তা তার স্বামীকে অশান্ত করে তুলেছে, তার পরিসমাপ্তি ঘটবে। অবশ্য প্রথম ক'দিন প্রদোষের এই নির্জ্জনতা ভাল না লাগলেও ক্রমশঃ ভাল লেগে গেছে, প্রদোষ যেন স্মিতার খুবই কাছে এসে গেছে, যে ফাঁক তাদের মাঝে ছিল, ক্রমশঃ তা দূরে সরে যাচ্ছে।

সেদিন সকালে বেড়িয়ে ফিরে চায়ের টেবিলে যখন গিয়ে বসলো প্রদোষ, স্মিতা তখন একটি ফুটফুটে বছর পাঁচেকের ছেলের সঙ্গে গল্পে মশগুল। প্রদোষকে দেখে ছেলেটি চুপ করে গেল, গা ঘেঁষে সরে দাঁড়াল স্মিতার। স্মিতা তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো প্রদোষকে, বসো চা নিয়ে আসতে বলি। প্রদোষ জিজ্ঞাসা করে স্মিতাকে, ছেলেটি কে ?

—থাকে আমাদের বাড়ীর কাছেই। গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল, কাছে ডাকতেই বললো, আমাকে একটা ফুল দেবে ? বললাম দেবো, তবেই ভেতরে এসেছে, কথা শেষ করে স্মিতা। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রদোষ—কি নাম তোমার খোকা ? কোন উত্তর না করে স্মিতার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেটি। স্মিতা বলল, কই নাম বলো তোমার ?

—অশুতোষ চ্যাটার্জ্জি কিন্তু মা তাকে বাবলু বলে—সঙ্কুচিত স্বরে উত্তর করে ছেলেটি।

—বাঃ সুন্দর নাম তো তোমার, তোমার বাবার কি নাম, কোথায় থাক তোমরা ? প্রশ্ন করে প্রদোষ।

—ঐ তো, ঐ ছোট লাল রঙের বাড়ীটা আমাদের। মা, আর লখিয়া মাসী থাকে, বাবা তো থাকে না—উত্তর করে বাবলু।

—বোধ হয় বাবা নেই, তোমার বাবার নাম জান বাবলু ? বলে স্মিতা।

—হ্যাঁ—শ্রীপ্রদোষ চ্যাটার্জি।

চমকে উঠে প্রদোষ আর স্মিতা, খানিকটা চা চলকে পড়ে যায় প্রদোষের কাপ থেকে টেবিলের ওপর। স্মিতা হেসে বলে, সত্যি, কি আশ্চর্য, তবে একই নামের লোক তো কতই আছে! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় প্রদোষ, বলে হ্যাঁ, সে তো কতই আছে। যাই, আমাকে আবার ক'খানা চিঠি লিখতে হবে। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে।

বাবলুই এতক্ষণে বলে ওঠে, আমি বাড়ী যাবো। স্মিতা বলে—হ্যাঁ চলো, ফুল নেবে না তুমি ? বাগানের দিকে এগিয়ে যায় বাবলু আর স্মিতা।

নিজের ঘরে অস্থির হয়ে পায়চারী করে প্রদোষ। এ কেমন করে সম্ভব, এ নিজেরই তার মনের ভুল—একই নামের তো কত লোকই আছে! তবে এত অস্থির হয় কেন মন, যা সম্ভব নয়, যা হারিয়ে গেছে অনেক দিন, বার বার তাই কেন মনে আসে ? বেরিয়ে পড়ে প্রদোষ বাড়ী ছেড়ে।

কাশির মূলকারণ দূর করুন

SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract

সিরোলিন খান

নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ

সিরোলিন কেবল যে কাশি 'থামিয়ে দেয়' তা নয়—কাশির মূলকারণ দুষ্ট-জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

একমাত্র পরিবেশক: ভলটাস লিমিটেড

পরের দিন রাত্রে। খাওয়া সেরে শুয়েছে প্রদোষ। ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে স্মিতা বলে, আজ দুপুরে গিয়েছিলাম বাবলুদের বাড়ী, যে ছেলেটি কাল সকালে এসেছিল।

—ও! তাই বল—নিরুৎসাহের সুরে বলে প্রদোষ।

—ওর মায়ের সঙ্গে আলাপ হল, বেশ মেয়েটি, অনেক গল্প বললো। তবে বড় দুঃখী মেয়েটা—সমবেদনার সুরে বলে স্মিতা। ও, তাই তোমার সারা দুপুর পাওয়া যাচ্ছিল না! বলে প্রদোষ।

—হ্যাঁ জানো, মেয়েটির মামার বাড়ী তোমাদের গ্রাম যেখানে সেই একই জায়গায়।

—একই জায়গায়? চমকে ওঠে প্রদোষ।

—হ্যাঁ, কে এক পরেশ বাবু ছিলেন, তাঁর ভাগ্নী। ছোটবেলায় বাবা মা মারা যায়, তাই মামার বাড়ীতেই মানুষ। নাম বললে কাকলি, ভারী সুন্দর নাম, তাই না? তোমার বাবার নামও বললো। চেনে বললো। টেবলল্যাম্পটা হাত বাড়িয়ে নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে ক্লান্ত গলায় বলে, ও! পরেশ বাবুর ভাগ্নী কাকলি, সে এখানে আছে?

—এখানেই তো থাকে এখন, মিশনারী স্কুলে ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়ায়।

—কিন্তু এখানে—এখানে এলো কি করে!

—সে অনেক কথা। মামার বাড়ীতে থাকতো, তবে মামী বিশেষ সুনজরে দেখতেন না।

—হ্যাঁ, শুনেছিলাম তাই। যে বছর আমি বি-এ, পাশ করি, বাবা পাঠিয়েছিলেন, দেশের বাড়ীতে দেখাশুনা করে আসার জন্য। তখনই দেখেছিলাম কাকলিকে। মামীর অত্যাচার ছিল, তবে মামার স্নেহে টিকে ছিল কাকলি। মামাই জোর করে লেখাপড়া করিয়ে সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ান। সেও তো আজ প্রায় ছ' বছর আগের কথা—শেষ করে প্রদোষ।

—হ্যাঁ, তারপর বিয়ে হয় এই প্রদোষ চ্যাটার্জির সঙ্গে।

—কিন্তু চ্যাটার্জির সঙ্গে—পরেশবাবুরা তো কায়স্থ ছিলেন।

—হ্যাঁ, সুন্দরী বলে কাকলিকে নিজের বাবা-মা'র অমতে বিয়ে করেছিল ভদ্রলোক কিন্তু বিয়ের মাস চারেক পরে উধাও হয়ে যান তিনি আর কাকলি তখন সন্তানসম্ভবা। অবশ্য তার স্বামী সে খবর জানতো না। মামা-মামীকে এই বিপদের হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কলকাতা যাবে বলে ট্রেনের মেয়েদের কামরায় উঠে এক ক্রীশ্চান ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন হাজারিবাগে। এই মিশনারী স্কুলে ছোটদের পড়াবার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি নিজেও এই স্কুলের বহুদিনের পুরোনো টিচার ছিলেন। তবে আজ বছর দেড়েক হল তিনি মারা গেছেন। নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে স্মিতা।

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে প্রদোষ, অস্ফুট স্বরে শুধু বলে কাকলি—কাকলি! চোখের সামনে ভেসে উঠে তার ছ'বছর আগের দৃশ্য—যাকে ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ভুলে থাকতে পারছে না। শত কাজের মধ্যে নিজেকে ঘিরে রাখলেও পলাশপুরের সে ক'টা দিনকে কিছুতেই দূরে ঠেলে দিতে পারছে না। স্মিতাকে বিয়ে করে কিছুটা ভুলেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কাকলিকে মন থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারেনি। অনেক চেষ্টাই-তো সে করেছিল, কিন্তু তখন পারেনি, আজ যে সময় কাকলিকে মন থেকে নিশ্চিহ্ন করার সব থেকে প্রয়োজন, কাকলির সঙ্গে তখনই এ ভাবে দেখা হয়ে যাবে, এ তো সে স্বপ্নেও ভাবেনি। স্মিতা কি কিছু সন্দেহ করেছে? আর বাবলু—সে তার, এ যে কল্পনারও বাইরে—দুহাতে কপালটা চেপে ধরে প্রদোষ। ছ' বছর আগের কথা ছবির মতন ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে।

বি-এ পাশ করে বসে ছিল প্রদোষ। আশুতোষ বাবু ছেলেকে পাঠালেন গ্রামে, পলাশপুরে, যা কিছু সম্পত্তি আছে তার দেখা-শুনা করার জন্য। পলাশপুরে বাবা-মার সঙ্গে এসেছিল প্রদোষ কয়েকবার, কিন্তু বড় হয়ে এই প্রথম সে এলো। অনেকদিন পরে সহর থেকে গাঁয়ে এসে ভারী ভাল লাগলো তার। কয়েকদিনের জন্য এসে তিন চার মাস থেকে গেল। তখনই তো আলাপ হয়েছিল তার কাকলির সঙ্গে, তার কলি। ওদের বাড়ীর পাশেই থাকতো পরেশ দত্ত, তারই ভাগ্নী কাকলি। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন কাকলিকে পরেশ বাবু, সখ করে কাকলি নাম তাঁরই দেওয়া কিন্তু তাঁর স্ত্রী চারুবালার এসব মোটেই পছন্দ ছিল না। নিজেরই তিনটি মেয়ে একটি ছেলে, তাদের কি করে মানুষ করেন তার ঠিক নেই, এর ওপর এসে জুটেছে এই আপদ। তাঁদের অবস্থা খুব ভাল নয়, কিছু জমিজমা আছে, আর গাঁয়ে হোমিওপ্যাথি করেই তাঁর দিন চলে। এতে নিজেরই সংসার চলে না ভাল করে, তার ওপর আবার এই এক ভাগ্নী এসে জুটেছে। মামীর রাগের কারণও অবশ্য ছিল। নিজের তিনটি মেয়ে একটিও কাকলির রূপের কাছে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। আর পাঁচটি বাঙালী মেয়ের মতন শ্যামলী ছিল তারা, কাকলির পাশে সত্যি তাদের আরও নিষ্প্রভ লাগতো। সত্যি ভারি সুন্দর ছিল দেখতে কাকলি পরেশ বাবু বলেন, তাঁর বোন নাকি এমনই সুন্দরী ছিলো। টক্‌টকে ফরসা রঙে টানাটানা চোখ, ভুরু, টিকোলো নাক, আর মাথাভর্তি কালো চুল। যে একবার দেখতো সেই ফিরে তাকাতো। নিজের মনে বলে উঠতো, বাঃ কি সুন্দর, দেখে শুনে জ্বলে উঠতেন মামীমা, পরেশ বাবুর কাছে গিয়ে বলতেন, কি বিয়ে দিতে হবে না, অত বড় মেয়ে ঘাড়ে নিয়ে বসে থাকতে লজ্জা করে না তোমার? পরেশ বাবু বলতেন, অতবড় মেয়ে আবার কোথায়? এইতো সবে ষোলয় পা দিয়েছে—মায়া আর ওতো একবয়সী। এইবার প্রাইভেট পরীক্ষাটা দিচ্ছে, দিক্ না, কি অসুবিধা হচ্ছে তোমার?

মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন মামীমা। মায়া পরেশ বাবুর বড় মেয়ে, কাকলিরই সমবয়সী। রূপ না পেলেও বাবার স্বভাব পেয়েছে সে, ভারী ভাল মেয়ে। কাকলির সঙ্গে তার খুব ভাব। দুজনেই তৈরী হচ্ছিল প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু মামা নিশ্চিন্ত থাকলেও, মামী চুপ করে ছিলেন না। গাঁয়ের ঘটকী ঠাকরুণকে তাগাদা দিয়ে পাত্র জোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তিনি জানতেন, যদি কাকলিকে আগে পার করতে পারেন তবে তাঁর নিজের মেয়েদের বিয়ে হবে। কারণ, কাকলির রূপের পাশে তার মেয়েরা—

যথাসময়ে পরীক্ষা হয়ে গেল দুজনের, আর মামী কোমর বেঁধে লাগলেন মেয়েদের বিয়ের চেষ্টায়। পাত্র জোগাড়ও হল, কলকাতায়

—এম, গঙ্গোপাধ্যায়

॥ আলোকচিত্র ॥

শি
শু
ম
হ
ল
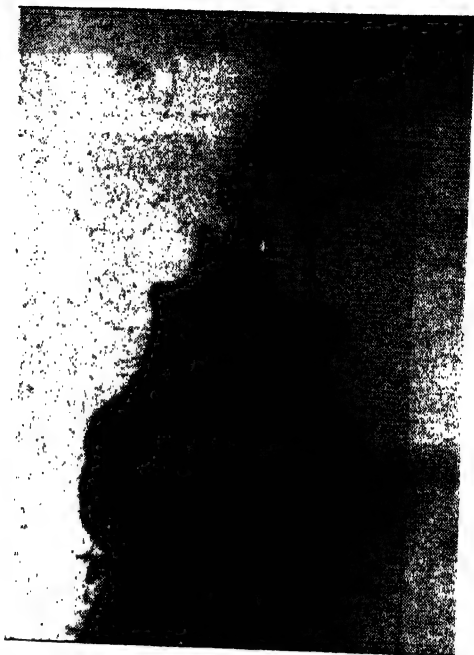
ভক্তরাজ (নেপাল) —দিলীপ মুখোপাধ্যায়

—শ্রীগৌর (কৃষ্ণনগর)

—শ্যামল চট্টোপাধ্যায়

দুই প্রকৃতি

—নিতু সরকার

মুখচ্ছবি

—আর্, কে, ঘোষ

জলকে চল্

—বপ্না সাহানা
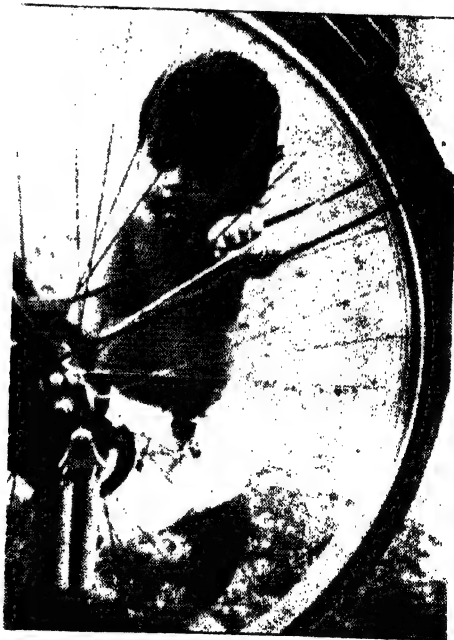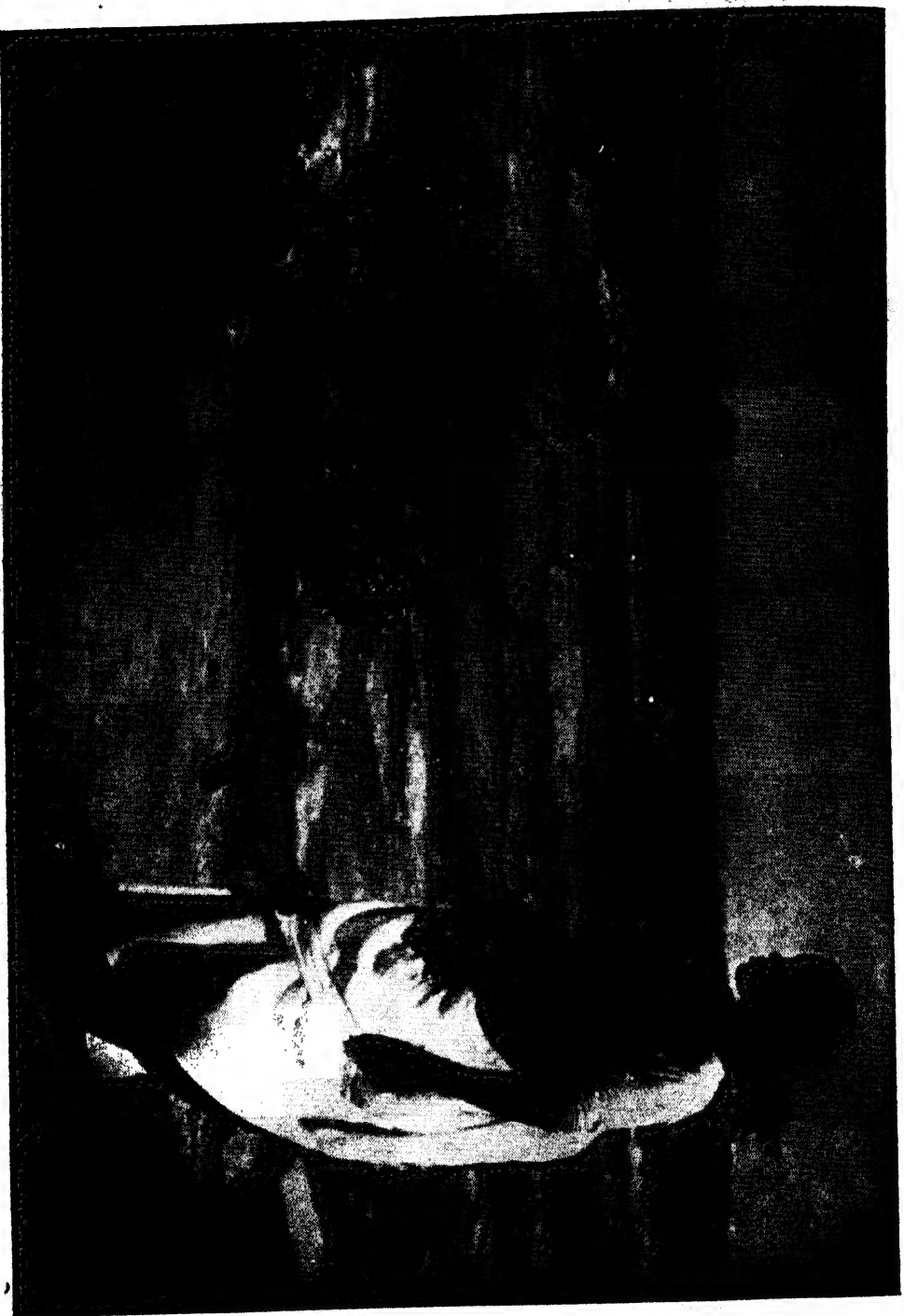
থাকে ছেলে, বি-এ পাশ করে চাকরীও করে মোটামুটি ভাল। এই একই মাত্র ছেলে, বাপের কিছু সম্পত্তিও আছে, আর পাশের গাঁয়েই তাদের বাড়ী। খুব পছন্দ হল মামীর এ সম্বন্ধ, মামাও আপত্তি করার কারণ খুঁজে পেলেন না কিছু। যথাসময়ে পাত্রী দেখতে এলেন ছেলের বাবা ও মামা। কাকলিকে দেখা মাত্র এবং তার মিষ্টি কথা শুনে, তাঁরা পাকা কথা দিয়ে গেলেন তখনই। শুধু বললেন সামনে ছেলের জন্মমাস, সেই মাসে হবে না, তার পরের মাসে হবে।

খুশী হয়ে চলে গেলেন, ছেলের বাবা ও মামা। পরেশ বাবু খুশী হয়ে উঠলেন, শুধু মামী, যাঁর খুশী হবার কথা সব থেকে বেশী, তিনি হয়ে গেলেন গম্ভীর। পরেশ বাবুর উচ্ছ্বসিত কথার মধ্যে থেকে উঠে গেলেন তিনি। এ সম্বন্ধ তার পছন্দ হয়েছিল খুবই। তার ওপর পাত্রপক্ষের সুন্দর ব্যবহারে, তার মনে অন্য একটা ইচ্ছা বার বার উঁকি দিয়েছিল। মায়া তো কাকলিরই বয়সী, লেখাপড়া সেও শিখেছে, কাজে কর্মে কিছুতেই সে কম যায় না, তবে কেন এখানে তার বিয়ে হতে পারে না? মনে মনে ভাবতে থাকেন তিনি।

এই সময় পলাশপুরে এলো প্রদোষ। সহর থেকে গ্রামে এসে সে মেতে উঠলো। পুকুরে মাছ ধরা, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে থিয়েটার করা, এই সব নিয়ে সময় তার পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছিল আর তার সব থেকে বড় আকর্ষণ ছিল কাকলি। পরেশ বাবুর বাড়ীতে যেদিন সে প্রথম দেখা করতে যায়, ঘরের দরজার আগে দেখা হয়েছিল কাকলি আর মায়ার সঙ্গে, সন্ধ্যেবেলায় গা ধু' ঘরের কাজ সেরে পরেশ বাবুর ঘরে তুজনে মিলে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় কি যেন সেলাই করছিল আর গল্প করছিল। সেই আধো আলো, আধো ছায়ায় কাকলিকে অপূর্ব্ব সুন্দর লাগলো প্রদোষের। থম্‌কে দাঁড়ালো প্রদোষ। দরজার দিকে মুখ করে, মাথা নিচু করে সেলাই করছে কাকলি। আর তার উল্টো দিকে, প্রদোষের দিকে পিছন করে বসে আছে মায়া। লণ্ঠনের মৃদু আলো মুখে পড়েছে কাকলির। কপালের ওপর ছোট কুমকুমের টিপ আর এক গোছা অবাধ্য চুল এসে পড়েছে, মৃদু হাসি তখনও লেগে রয়েছে তার মুখে। অপূর্ব্ব! মনে মনে বলে প্রদোষ, কাকলির এই সৌন্দর্য্য স্বাতী-নক্ষত্রের মত জ্বলতে থাকে প্রদোষের মনে। এ যেন সুগভীর নীলাকাশে একমাত্র তারা জ্বল-জ্বল করছে। কাকলিই প্রথম দেখতে পায় তাকে। মুখ তুলে তাকিয়ে দরজার সামনে অপরিচিত একজন যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থমকে যায়, মায়াও পেছন ফিরে তাকায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, কা'কে চান?

কাকাবাবু মানে, পরেশ বাবু আছেন? তিনি আমাকে আসতে বলেছেন। মায়া আর কাকলি উঠে দাঁড়ায়—মায়া বলে বসুন, আমি বাবাকে খবর দিচ্ছি। সেলাইর সরঞ্জাম গুটিয়ে তুই বোন বাড়ীর ভেতর পা বাড়ায়। হাত-পা ধুয়ে পরেশ বাবু জলযোগে বসেছিলেন, মায়ার কথা শুনে বললেন, ও বোধ হয় প্রদোষ এসেছে। আমি আসতে বলেছিলাম। তোরা গিয়ে একটু গল্প কর, আমি এখুনি আসছি! পরেশ বাবুর স্ত্রী বলে উঠলেন, থাক থাক, আর যার-তার সঙ্গে বসে মেয়েদের গল্প করতে পাঠাতে হবে না। জলের গ্লাসটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে রেখে বলেন পরেশ বাবু, যার-তার সঙ্গে কি! ও তো আমাদের আশুতোষের ছেলে প্রদোষ, কলকাতা থেকে এসেছে, ক'দিন গাঁয়ে থাকবে।

মামীমার মুখ প্রসন্ন হল। ওমা প্রদোষ, যা ওকে ভেতরে নিয়ে আয়, দেখি কত বড় হয়েছে। মায়া গিয়ে ডেকে নিয়ে আসে প্রদোষকে। প্রণাম করে পরেশ বাবুর স্ত্রীকে, বলে কেমন আছেন কাকীমা! চারুবালা হাসিমুখে বলেন, ওমা কত বড় হয়ে গেছে আমাদের প্রদোষ! এর আগে যখন এসেছিলে, তখন তো বার-তের বছরের ছেলে।

পরেশ বাবু বলেন, হ্যাঁ, এখন কিন্তু প্রদোষ বি-এ পাশ করে গেছে, সে ছোটটি আর নেই। প্রদোষ হাসিমুখে বলে, হ্যাঁ সে তো আজ নয়-দশ বছরের কথা, তারপর মায়া-কাকলির দিকে তাকিয়ে বলে, আর এরা নিশ্চয়ই বোনেরা, এরাও তখন কতটুকু ছিল, এখন কত বড় হয়েছে।

পরেশ বাবু বলেন—হ্যাঁ, এই আমার বড় মেয়ে মায়া আর এ আমার ভাগ্নী কাকলি, এরা তু'জনেই এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। কই, আর সব কোথায় গেলি, বলে ডাক দেন তিনি। আরও তু'টি মেয়ে আর একটি ছেলে ছুটে বেরিয়ে আসে, এই আমার মেজ মেয়ে ছায়া এই ছোট সুপ্রিয়া আর ছেলে কুশল। পরিচয় দেন পরেশ বাবু।

বাঃ, বেশ নামগুলি তো সবার, বলে প্রদোষ। হ্যাঁ তোমার কাকাবাবুর নামের বাহার খুব আছে—বলেন চারুবালা, তাঁর মুখ আবার অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিন্তু এড়ায় নি যে, প্রদোষের মুগ্ধ চাহনি বার বার ঘুরে ফিরে কাকলিকে দেখছে।

তিনি বকে ওঠেন—মায়া কাকলি, যাও না প্রদোষের জন্য একটু চা জলখাবার নিয়ে এসো, সেই কখন এসেছে। রান্নাঘরে ছুটে যায় দু'বোন। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে চায়ের জল বসাতে বসাতে বলে কাকলি, বেশ লোক, না রে, কলকাতায় থাকে, অত বড় লোকের ছেলে, কোন অহঙ্কার নেই! চায়ের কাপ-ডিস্ নামিয়ে রেখে মায়া বলে—হ্যাঁ, আর দেখতেও ভাল। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলে কি? বলে কাকলি। একটু অসভ্য আর আদেখ্লা আছে।

—কেন?

—বা রে, তোকে কি রকম দেখছিল, যেন গিলে খাবে। লজ্জা পেয়ে কাকলি বলে যা: কি যে বলিস। সত্যি কথা। কিন্তু তোর ব্যাপারও বিশেষ ভাল নয়, তুই বা ওরকম করে ওকে দেখছিলি কেন, দেখিস সাবধান, অন্য জায়গায় আর একজন কিন্তু হাঁ করে বসে আছে তোর অপেক্ষায়।

হয়েছে, হয়েছে, তোকে আর বেশী সাবধান করে দিতে হবে না। তাড়াতাড়ি ডিসে খাবার সাজিয়ে নে, নইলে মামীমা এখনি বকবেন। চায়ের কাপ আর খাবার নিয়ে দুই বোনে আবার বেরিয়ে আসে।

সেদিনের সেই দেখা যে পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হবে, তা কে জানতো! সেই প্রথম দিনেই তো, চারুবালা বলে দিয়েছিলেন যে কাকলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এ তো তাকে সাবধান করে দেবার জন্যই। কিন্তু তাও তো সে কাকলিকে ভুলতে পারলো না। দু'মাসের জায়গায় সে চার মাস থেকে এলো সে কিসের জন্য? কাকলিও তো তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তাকে দূরে ঠেলে দেয়নি। গ্রামের পথে, কত সময় তার কাকলির সঙ্গে দেখা হয়েছে, মিষ্টি হেসেছে সে, আর প্রদোষের মনে দোলা দিয়ে যেত বার বার। তারপর সেই ফুল গাছের নিচে, চুপ করে বসেছিল কাকলি, হঠাৎ তাকে চমকে দিয়েছিল প্রদোষ পেছন থেকে গিয়ে। সেদিনের কথা আজও মনে আছে তার, ভিজে গলায় বলেছিল কাকলি, হ্যাঁ তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করবো। আরও বলেছিল, যেখানে তার বিয়ের ঠিক হয়ে আছে সে বিয়ে সে করবে না। কিন্তু এখানেই তো সে ঘনিষ্ঠতার শেষ হয়নি! সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নিজেকে কাকলি সমর্পণ করেছিল তার কাছে, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় যে পরিণতি হয়েছিল তার ক্ষণকাল পরে লজ্জিত হয়েছিল প্রদোষ। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল, কিন্তু সঙ্কুচিত হয়নি কাকলি। পরম বিশ্বাসে প্রদোষের কাছে নিজেকে ধরা দিতে পেরেছে বলে ধরা গলায় স্পষ্ট বলেছিল, এ তো তোমার আমার ভালবাসার স্বাক্ষর। এতে নিজেকে দোষী মনে করার তো কিছু নেই, আর এইখানেই তো এর শেষ নয়? তুমি তো বিয়ে করে নিয়ে যাবে আমাকে তোমার পাশে। স্বীকার করেছিল প্রদোষ। মুহূর্ত্তে সব দ্বিধাকে সরিয়ে দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছিল কাকলিকে, বলেছিল—সে দিন তো আর বেশী দূরে নেই, কলকাতা গিয়েই বাবা মাকে বলে সব ব্যবস্থা করবো আমি।

চলে এসেছিল প্রদোষ কলকাতাতে কিন্তু রাজী হননি প্রদোষের বাবা-মা, ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে কায়স্থর মেয়ের বিয়ে, এ তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি, তার ওপর প্রদোষ একমাত্র ছেলে। বাবার সঙ্গে অনেক কথাই তার হয়েছিল, অনেক যুক্তিতর্ক হয়েছিল, কিন্তু মায়ের চোখের জলের কাছে, কোন কিছুই টিকলো না। রাগ করে প্রদোষ চলে গেল বোম্বাইতে চাকরী নিয়ে। দু'বছর পরে ফিরে এসেছিল মায়ের অসুখের খবর পেয়ে। কিন্তু পৌঁছবার পূর্ব্বেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনি।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাবার পর প্রদোষ গিয়েছিল পলাশপুরে কিন্তু কোন খোঁজ পায়নি কাকলির। নায়েব মশাইর কাছেই সব শুনেছিল সে। বিয়ের রাত্রে হঠাৎ কাকলিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সবার অলক্ষ্যে কোন সময় বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ী থেকে। এদিকে বর এসে গেছে কিন্তু ক'নের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না! চোখে আঁধার দেখে বসে পড়লেন পরেশ বাবু, ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়লেন। একটু পরে মায়া এসে একটুকরো কাগজ দিয়ে গেল, বললো তার বালিশের তলায় ছিল, কাকলির চিঠি। দু' লাইন মাত্র লেখা, 'এ বিয়ে আমি করতে পারবো না, তাই চলে যাচ্ছি। প্রণাম।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলেন পরেশ বাবু!

পরেশ বাবু ভেঙে পড়লেও, চারুবালা কোমর বেঁধে লেগে পড়লেন। মায়াকে নিয়ে যান ঘরের ভেতর, তারপর দরজা বন্ধ করে নিজেই সাজাতে বসলেন ক'নে। শেষ রাত্রের লগ্নে, যখন গ্রামের লোকেরা সকলে প্রায় চলে গেছে, আবক্ষ ঘোমটা টেনে মায়াকে দান করলেন। সকলকে বললেন, মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাই প্রথম লগ্নে বিয়ে দিতে পারলুম না। মায়াকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজা আগলে বসে ছিলেন, বললেন শুয়ে রয়েছে ক'নে থাক, শেষ লগ্নে বিয়ে হবে। শেষ রাত্রে ক'নেকে যখন নিয়ে আসা হল বিয়ের আসরে, অর্দ্ধেক বরযাত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে, ঘুমচোখে বরের বাবা উঠে এলেন, মাথা নীচু করে এসে বসলেন পরেশ বাবু, বিয়ে হয়ে গেল। বাসরঘরে বর-কনে এলো বসতে। নিজে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন চারুবালা।

পাশ ফিরে কাঠের মতন শুয়ে পড়েছিল মায়া, কিছুক্ষণ পরে নতুন বর অজয় জিজ্ঞাসা করেছিল মায়াকে, যে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল, তার কি হল? চমকে উঠেছিল মায়া, চকিতে উঠে বসেছিল, বলেছিল, কোন সুন্দরী নয়, আমার সঙ্গেই বিয়ের কথা ছিল, হয়েছেও।

সঙ্গে সঙ্গে হেসে অজয় বলেছিল, তাহলে আমার বাবাকে অন্য মেয়ে দেখিয়েছিলে বল? চুপ করে গিয়েছিল মায়া, তারপর মৃদু স্বরে সবই স্বীকার করেছিল তাদের এই ছলনার কথা। কিছু বলেনি অজয়, শুধু মায়াকে কাঁদতে দেখে কাছে টেনে নিয়েছিল, বলেছিল, তোমার তো কোন দোষ নেই, কিছু ভয় নেই তোমার। আমার বাবা-মা'র ভার আমি নিলাম, তুমি কেঁদ না।

সকাল হতেই চারুবালা বলেছিলেন মেয়েকে, কি বললো জামাই, সবই খুলে বলেছিল মায়া। গোপন করেনি কিছুই। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন চারুবালা, কিন্তু একটা খটকা ছিল মনে, কি বলবে শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েকে। বর-ক'নে চলে গেলে পর, পরেশ বাবু শয্যা নিলেন, কিন্তু কোন দুঃসংবাদ এলো না বরের বাড়ী থেকে। কিছু দিন পরে গ্রাম ছেড়ে চলে যান চারুবালা স্বামী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিজের বাপের বাড়ী। সেখানেই পরেশ বাবু মারা যান। মায়াকেও তার শ্বশুরবাড়ী থেকে আসতে দেয়নি বিয়ের পর, শুধু এসেছিল তার বাবার মৃত্যু সংবাদে। এত সব খবর জেনেছিলেন নায়েব মশাই, তাঁর স্ত্রীর কাছ

থেকে। মাঁয়াকে ক'নের পিঁড়িতে বসিয়ে বিপদের হাত থেকে তখনকার মতন রেহাই পাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন চারুবালাকে।

ফিরে এসে প্রদোষ কলকাতাতে বিয়ে করেছে স্মিতাকে। ভারী ভাল মেয়ে স্মিতা, সব দিক দিয়ে তাকে সুখী করে রেখেছে, পরিপূর্ণ করে রেখেছে তার জীবন। তবু কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে, স্মিতার কাছ থেকে দূরে রয়েছে সে। পাশ ফিরে শুলো প্রদোষ, দেখলো স্মিতা ঘুমিয়ে রয়েছে। জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। তাকিয়ে থাকে প্রদোষ, সে কি স্মিতাকেও ঠকিয়েছে—অসুখী করেছে তাকে? অস্থির হয়ে উঠে পড়ে সে নিঃশব্দে জামাকাপড় বদলে বেরিয়ে পড়ে। এসে দাঁড়ায় কালো ছোট গেটের কাছে, ছোট লাল বাড়ীটার সামনে। দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কাকলি—ঠিক তেমনি সুন্দর আছে সে, চোখের ভাষায় সে আনন্দোজ্জ্বল ছায়া হারিয়ে বিষণ্ণ এক ছাপ, আর ভোরের আলো সেই মুখকে আরও সুন্দর আরও করুণ করে তুলেছে। গেট খুলে পায় পায় এগিয়ে যায় প্রদোষ, ডাকে—কলি। চমকে ওঠে কাকলি। পায় পায় এগিয়ে যায় প্রদোষ। হাত বাড়িয়ে মাথাটা জড়িয়ে ধরে কাকলি, বলে—কে? ঘুরে দাঁড়ায় সে, আরও জোরে চেপে ধরে বলে, কে, কি চান আপনি?

—আমায় চিনতে পারছো না কলি, আমি প্রদোষ।

না চিনি না আপনাকে, কি চান আপনি? থরথর করে কাঁপে কাকলি।

—তোমার অনেক খোঁজ করেছি কলি, কিন্তু কেউ তোমার খবর বলতে পারলো না। কি অশান্তিতে যে দিনগুলো কাটিয়েছি—যদি আমি জানতাম বাবলুর কথা, তবে।

প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠে কাকলি—আপনার কোন কথাই আমি শুনতে চাই না, আপনি যান। কেন আপনি আমার শান্তি নষ্ট করতে এসেছেন?

—আমি তোমার শান্তি নষ্ট করতে আসিনি কাকলি, তোমায় শুধু দেখতে এসেছি, আর তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি, জানিনা তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কিনা—ভাঙাগলায় বলে প্রদোষ।

ঘরের দিকে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ায় কাকলি, বলে—আমার প্রদোষের মৃত্যু হয়েছে, আর মৃতের প্রতি কোন বিদ্বেষই আমার নেই—তাকে আমি অনেক দিনই ক্ষমা করেছি। আপনি যান, আমার কাজ আছে। ঘরের দিকে পা বাড়ায় কাকলি।

ব্যাকুল হয়ে প্রদোষ বলে—বাবলুকে একটু দেখবো না?

দৃঢ় গলায় বলে কাকলি, তার বাবা মারা গেছে—দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় সে।

ঘণ্টা তিনেক পরে বাড়ী ফিরে এসে প্রদোষ দেখে, সব গোছগাছ করছে স্মিতা। অবাক হয়ে বলে, কি ব্যাপার, সব গোছাচ্ছ যে?

সুটকেশে কাপড় রেখে বলে স্মিতা—আজই কলকাতা যাবো তাই, অনেক দিন তো হয়ে গেল।

কই কাল তো এ কথা বলনি? জিজ্ঞাসা করে প্রদোষ।

—বাঃ, আজই সকালে মনে হল। তারপর মুখ তুলে বলে, এখানে থাকলে তো তোমার রাতের পর রাত ঘুম হবে না, শরীর-মন দুই-ই ভেঙ্গে পড়বে, তার থেকে কলকাতাই ভাল।

চকিতে মুখ তুলে বলে প্রদোষ, রাত্রে আমি ঘুমাইনি তুমি জান?

হ্যাঁ জানি বই কি, তোমার মনে যে অশান্তির ঝড় বইছে, তা কি আমি টের পাই নি? এখান থেকে তোমায় সরিয়ে না নিলে, তুমি যে পাগল হয়ে যাবে; বলে স্মিতা।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছো, কলকাতাই ভাল, তবে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, আর কোন দ্বিধা বা সংশয় আমার মনে নেই।

—হ্যাঁ, কাকলি তার বাবলুকে নিয়ে নতুন জীবন বেঁধেছে, সেখানে তোমার কোন অস্তিত্ব নেই, তার প্রদোষের মৃত্যু হয়েছে—বলে স্মিতা।

হাত বাড়িয়ে স্মিতাকে কাছে টেনে নেয় প্রদোষ—তুমি সব বুঝতে পেরেছ, সব জেনেছ, তবুও আমার ওপর রাগ নেই তোমার, নেই কোন দ্বিধা, কোন সংশয়?

মৃদু হেসে বলে স্মিতা পাগল, তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। এই জেনে এখন আরও নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, এবার থেকে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে পাবো, আগে যে দূরত্ব ছিল তোমার মাঝে, সব ধুয়ে-মুছে গেছে, অনেক বেশী কাছে পাবো তোমায়।

স্মিতাকে বুকে চেপে ধরে বলে প্রদোষ—আজ আমি সত্যি শান্তি অনুভব করছি। তোমার ক্ষমা পেয়েছি, কাকলির ক্ষমা পেয়েছি, আমার আর কোন কিছুই চাই না। আমি আর কিছু চাই না।

আমাদের দ্বারে

বকুল বসু

জীবনের তাড়া নিয়ে সে আসে,
সে আসে ভাগ্যের পরিহাসে।
জীবনের রথ তারে টেনে নিয়ে চলে যায় হোঁচট খারে,
হাত পেতে কেবলি সে করুণার দৃষ্টি মেলে ধরে।

ব্যস্ত এ বাস্তবে হায়
তার পানে কেহ নাহি ফিরে চায়,
ব্যথায় কাতর কেহ তার পাশে এসে
লয় না তো কাছে টেনে তারে ভালবেসে।

সে আসে বারে বারে
আমাদের দ্বারে।

খেলাধূলা

বিশ্বের ক্রিকেট জগতের শ্রেষ্ঠ দল অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাকডোনাল্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩৪ রাণ করে জেসু প্যাটেলের বলে উইকেটরক্ষক তামানে কর্ত্তৃক ষ্টাম্পড আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে রচিত হ'ল এক নূতন অধ্যায়। কানপুরের গ্রীন পার্কের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হ'ল। এখানেই ভারত দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলকে ১১৯ রাণে পরাজিত করে। সারা ভারতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। প্রতিটি লোক এই সংবাদে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বিশ্বের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো ভারতের বিজয়বার্ত্তা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক জি, এস, রামচাঁদের কাছে পৌঁছাল শত শত অভিনন্দন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসগুলিতে নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই ছুটির আদেশ হ'ল। সকলেই বিজয় উৎসবে মেতে উঠলেন। সত্যি স্মরণীয় দিন ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯। সাবাস, ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়রা! তোমাদের সাফল্যে ভারতবাসী গর্ব্ব অনুভব করছে। তোমরা সকলের অভিনন্দন গ্রহণ কর।

২৪শে ডিসেম্বর সবচেয়ে বেশী আনন্দ অনুভব করেছিলেন অধিনায়ক জি, এস, রামচাঁদ। তিনি বলেছেন যে, এই দিন তাঁর জীবনের স্মরণীয় দিন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, গত ইংলণ্ড সফরে রামচাঁদ নির্ব্বাচিত হননি। এ সম্বন্ধে নির্ব্বাচন কমিটিই বলতে পারেন। তবে এখানকার খেলাধূলা জগতের কর্ম্মকর্ত্তাদের এই বিষয়ে বেশ কিছুটা কৃতিত্ব আছে। তাঁরা কা'কে কখন সামনে নিয়ে আসবেন, তা বলা কঠিন। গত বছর তাঁরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে অধিনায়ক নির্ব্বাচন নিয়ে বেশ কিছুটা রসিকতা করেছেন। ইংলণ্ড সফরে হঠাৎ দেখা গেল, ডি, কে, গাইকোয়াড়কে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করা হয়েছে। যাই হোক, বর্ত্তমান নির্ব্বাচন কমিটি এবারে নাকি তরুণ খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন। উদ্দেশ্য মহৎ। সত্যিই তরুণ খেলোয়াড়রা সুযোগ না পেলে কখনই খেলাধূলার উৎকর্ষতা বাড়তে পারে না। তবে দেখা যাক, দলীয় স্বার্থের খাতিরে খেলোয়াড় নির্ব্বাচনী কমিটির উদ্দেশ্য কতখানি কার্যকরী হয়।

একমাত্র ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ব্যতীত ভারত পৃথিবীর সমস্ত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দলকেই পরাজিত করেছে। ভারত এর পূর্ব্বে ইংলণ্ডকে একবার পাকিস্তানকে দুবার ও নিউজিল্যাণ্ডকে দুবার পরাজিত করার যোগ্যতা লাভ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে এখনও কোন খেলা হয়নি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল—অষ্ট্রেলিয়া সাম্প্রতিক ইংলণ্ড ও পাকিস্তানের সঙ্গে টেষ্ট খেলায় যোগদান করে কোন খেলায় পরাজয় বরণ করেনি। ভারতের কাছে অষ্ট্রেলিয়াকে এই প্রথম পরাজিত হতে হল। ভারতের এই সাফল্য সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'লেজে গোবরে' হয়ে গত ইংলণ্ড সফরে ভারতকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি ভারতের বিরুদ্ধে যেন জেহাদ ঘোষণা করেছিলো। দিনের পর দিন তাঁরা প্রচার চালান যে ক্রিকেটে ভারত এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। ভারতের পাঁচ দিন টেষ্ট খেলার যোগ্যতা নেই। ভারতের সঙ্গে পাঁচ দিন খেলার ব্যবস্থা করা সময়ের অপব্যবহার। তবে আজ ভারত সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছে ইংলণ্ডকে নাজেহালকারী অষ্ট্রেলিয়া দলকে পরাজিত করে।

ভারতীয় দলের এবারকার সাফল্য দলগত চেষ্টার নিদর্শন বলা যেতে পারে। তবুও যেশু প্যাটেল, উম্রীগড় ও নরি কন্‌ট্রাক্টরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তার সঙ্গে বলতে হবে রামচাঁদের দৃঢ় মনোবল ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। যেশু প্যাটেল এই টেষ্টে ১২৪ রাণে ১৪টি উইকেট পেয়েছেন। তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় যে প্রথম ইনিংসে ৬৯ রাণে ৯টি উইকেট লাভ। উম্রীগড় ২৭ রাণে ৪টি উইকেট পেয়ে প্রমাণ করেছেন যেন তিনিও একজন উঁচুদরের বোলার। নীল হার্ভে ও নরম্যান নীলের মতন খেলোয়াড়কে আউট করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। নরি কন্‌ট্রাক্টর দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৪ রাণ করে সত্যিই ভারতের জয়লাভের পথ সুগম করে দেন।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় প্রথম প্রয়োজন হয় ফিল্ডিং-এর দক্ষতা। এ বিষয়ে ভারতের ত্রুটি থাকলেও এবারকার খেলায় কিছুটা উন্নতি দেখা গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ১৫২ রাণ ও ২৯১ রাণে সকলে আউট হয়ে গেলেও সুনিপুণ বোলিং ও দৃঢ়তাপূর্ণ ফিল্ডিং দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়া দলকে ২১৯ রাণে ও ১০৫ রাণে আউট করে নিজেদের জয়পতাকা তুলে ধরেন বিশ্বের ক্রিকেট জগতে।

ফুটবল—

ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের নাম শুনলেই ভারতের ক্রীড়ামোদীদের মনে এক উন্মাদনা এনে দেয়। প্রায় সারা বছরই ভারতে ফুটবলের আসর জমাট বেঁধে থাকে। কলকাতার মাঠ থেকে বিদায় নিয়ে রোভার্স কাপের জন্য বোম্বাইয়ে আসর জমে উঠে। এখন ডুরাণ্ড কাপের জন্য দিল্লীর আসর বেশ গরম হয়ে উঠছে। এবারে কিন্তু দক্ষিণ ভারতের এর্ণাকুলামের মতন একটি ছোট্ট জায়গা বেশ জমে উঠেছিল। এখানে এশীয় কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চল লীগের খেলার ব্যবস্থা হয়। ভারত আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান এই প্রথম। ভারত পাকিস্তান, ইসরাইল ও ইরাণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। লীগ প্রথায় উভয় দলের সঙ্গে দুবার করে খেলার ব্যবস্থা হয়। ইসরাইল "চ্যাম্পিয়ন শিপ" লাভ করে। ইরাণ "রানার্স আপ" হয়। পাকিস্তান তৃতীয় স্থান পায়। ভারত সর্ব্বনিম্ন

স্থান লাভ করে। বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান খুব উঁচু না হ'লেও ভারত বিগত অলিম্পিকে ফুটবলে বেশ কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। ভারতে ফুটবল খেলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা কোনটারই অভাব নেই। ফুটবলের জন্য ক্রীড়ামোদীরা যে কোন অর্থ ব্যয় করতেও কার্পণ্য করেন না। কিন্তু দিন দিন ভারতে ফুটবলের মান এতই নিম্নস্তরে এসে দাঁড়াচ্ছে তাতে সকলেই এই বিষয়ে আশঙ্কা বোধ করছেন। ফুটবলের উন্নতির জন্য এখানকার কর্মকর্তাদের না আছে কোন সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা বা উদার মনোভাব। তাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের জন্য ভারতের ফুটবলের মান কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে—সেই দিকে তাঁদের মোটেই দৃষ্টি নেই। হ্যাঁ, কয়েক দিন আগে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত বলেছেন—ফুটবলের জন্য একটা কিছু করা দরকার। তিনি রাজ্য এসোসিয়েশনগুলিকে উপদেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা দলীয় স্বার্থের দিকে নজর দিয়ে ফুটবলে উন্নতির জন্য কাজ করেন। সাধু শ্রীগুপ্ত। তাহলে বোধ হয় তাঁর ঘুম এতদিনে ভেঙেছে। কিন্তু যে সকল উপদেশ দিয়েছেন—তিনিই তো তার নাটের গুরু। ক্রীড়া জগতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি তো একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। তার উপর জুটেছেন ক্রীড়া জগতের কূটনীতিবিশারদ শ্রীবেচু দত্তরায়। গুরুশিষ্য মিলে ফুটবলকে এমন পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছেন—যাতে করে ভারতের প্রতিটি ক্রীড়ামোদীই চাইছেন—তাঁরা মানে মানে সরে পড়ুন। এই দু'জনকে না সরাতে পারলে ভারতে ফুটবলের অবস্থা অন্ধকার—এই বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যায়াম শিক্ষাশিবির

রবীন্দ্র-সরোবর (লেক ময়দান) যেখানে হয়েছে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তিসঙ্ঘের ত্রয়োদশ বার্ষিক রাজ্য ব্যায়াম শিক্ষাশিবির। স্বয়ংসম্পূর্ণ এক তাঁবুনগরী। নাম "ব্যায়ামনগর।" সত্যিই নগরই বটে। এখানে কোন কিছুরই অভাব নেই। রন্ধনশালা, ভোজনাগার, স্নানাগার, সভাগৃহ, পাঠাগার, অভিপ্রদর্শনী ও খেলাধুলা প্রদর্শনীর জন্য ষ্টেডিয়াম, চিত্ত বিনোদনের জন্য সুসজ্জিত মঞ্চ, আর ডব্লিউ এ, সি, পরিচালিত লেক হাসপাতাল, শ্রীঅরবিন্দ এ্যাম্বুলেন্স ডিভিসন পরিচালিত প্রতিবিধান কেন্দ্র, ডাক ও তার বিভাগ পরিচালিত "ডাকঘর"। টেলিফোনেরও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া সঙ্ঘের মহিলা বিভাগের শিল্পসম্ভারে পূর্ণ বিপণি, সঙ্ঘ পরিচালিত ক্যান্টিন ও তৎসংলগ্ন সুন্দর পুষ্পশোভিত ও আলোকমালায় সজ্জিত অঙ্গন। খেলাধূলা, স্বাস্থ্য, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সামাজিক শিক্ষার প্রাচীর পত্রিকার প্রদর্শনী। এ ত গেল পারিপার্শ্বিক বর্ণনা। এই "ব্যায়ামনগরে" হাজির হয়েছেন পশ্চিম বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলা থেকে এক হাজার ছেলেমেয়ে। এখানে নয় দিন ধরে তাঁদের নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল, কুচকাওয়াজ, সমষ্টি ব্যায়াম, ব্রতচারী, প্রাথমিক প্রতিবিধান, কুটীরশিল্প, সমবেত সঙ্গীত ও অন্যান্য জনকল্যাণ-মূলক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। এই "ব্যায়ামনগর" শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকজন শিক্ষক ও দার্জ্জিলিং থেকে কয়েকজন ছাত্রকেও হাজির হতে দেখা গেছে। শিবিরের কাজ আরম্ভ হয় সকাল পাঁচটায় আর রাত্রি সাড়ে দশটায় তার পরিসমাপ্তি। সামরিক ও বেসামরিক ও সঙ্ঘের শিক্ষকরা শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে এতগুলি ছেলেমেয়েকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে দেখে সব সময়েই মনে জেগেছে, কে বলে বাঙ্গালীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে? জাতীয় চরিত্রের অবনতির জন্য তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে এনে দেয় উচ্ছৃঙ্খলতা। নৈতিক অবনতি ঘটায় আর কদাচারে দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি-সঙ্ঘের কয়েকজন আদর্শবাদী, প্রগতিশীল দুঃসাহসী যুবক জাতিগঠনে বাঙ্গলার তরুণ সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করার যে প্রচেষ্টা করেছেন তা সত্যিই প্রশংসা পাবার যোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানে কর্ণধার শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিকের কর্মকুশলতার তারিফ করতে হয়। এরূপ সুযোগ্য কর্মীর নেতৃত্বে জাতির তরুণ সমাজ এগিয়ে যাক, এটাই সকলে আশা করে।

ছোটদের আসর

৫

অন্দরমহল

কমলেশ এসে দাঁড়াল বুড়োর ঘরের সামনে, কিন্তু ভেতরে ঢোকবার তার সাহস হোল না। চার দিক নিস্তব্ধ, দরজার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে বারান্দার ওপরে। কমলেশ কান খাড়া করে থাকে, শুনতে পায় দূর থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, কাছে কাছে, আরো কাছে।

অন্য দরজা দিয়ে বুড়ো এসে ঢুকল তার ঘরে, দেরাজের মধ্যে কয়েকটা কাগজ চাবী বন্ধ করে রেখে মৃদু পায়ে বেরিয়ে আসে। দরজার কাছে কমলেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুড়ো চমকে ওঠে, তুমি! এ বাড়ীর মধ্যে ঢুকলে কি করে?

কমলেশ ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়, ঐ খিড়কীর দরজা দিয়ে।

—তুমি তো আচ্ছা ছেলে? তোমাকে কত বার বারণ করেছি না, এ বাড়ীতে ঢুকবে না, তবু কেন আস?

—আমি একটা কথা বলতে চাই।

বুড়ো বিদ্রূপ করে হাসে, আমার সঙ্গে এমন কি কথা যে এত রাত্রে এসে বলতে হবে?

কমলেশ একটু থামে, ভেবে নিয়ে সব কথা একসঙ্গে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করে, আমাদের স্কুলের পাশে, জমিটা শুনলাম আপনি কোন চিনির কলের মালিককে বিক্রী করে দিচ্ছেন? তারা ওখানে কারখানা বসাবে, আমি বলতে এসেছি জমি ওদের বিক্রী করবেন না।

বুড়ো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে? সেই সদাশঙ্কর?

—না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি। আমি জানি, আমার কথা আপনি রাখবেন।

বুড়ো হাসে, সে বড় অদ্ভুত হাসি, এ বিশ্বাস তোমার হ'ল কি করে যে আমি তোমার কথা শুনব?

—সবাই আপনাকে ভয় করে, বলে আপনি নাকি কারুর কথা শোনেন না। আপনি খামখেয়ালী। আপনি স্বার্থপর। কিন্তু আমার তা মনে হয় না।

—কেন মনে হয় না? বুড়োর কণ্ঠস্বর দূর থেকে ভেসে আসে। অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন সে ভাবছিল।

যে ক'দিন আপনাকে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে ইচ্ছে করে আপনি বাইরেটা শক্ত করে রাখেন, সহজে কারুর কাছে ধরা দিতে চান না।

বুড়ো এবার হো-হো করে হাসে, তুমি দেখছি বড়দের মত কথা বলছ, তবে যদি শুধু ঐ কথা বলতেই এসে থাক, তাহলে যেতে পার। আমার আর কিছু বলার নেই, জমি আমি বিক্রী করব বলে কথা দিয়ে দিয়েছি। তারা অনেক টাকা দেবে।

কমলেশ বাধা দিয়ে বলে, কথা তো আপনি এখনও দেন নি?

বুড়ো চমকে ওঠে, কি করে জানলে?

একটু আগে আপনি ঘরে যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি বাইরে থেকে শুনেছি। সামনের শনিবার সে আবার আসবে, তার পর আপনি কথা দেবেন, তাই না?

—তুমি তো আচ্ছা ছেলে! এখানে গোয়েন্দাগিরি করছ, কার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম বুঝতে পেরেছ?

কমলেশ দৃঢ় স্বরে বলে, না, তবে তার গলার স্বরটা শুনে রেখেছি। আবার কোথাও সে কণ্ঠস্বর শুনলে আমি তাকে ঠিকই চিনতে পারব।

—যাও, আর ফাজলামী করতে হবে না, জমি আমি ওদের কাছেই বিক্রী করব, তারা অনেক টাকা দেবে বলেছে।

—আপনার তো অনেক টাকা, আর টাকা নিয়ে কি হবে?

বুড়ো আর সহ্য করতে পারে না, রুক্ষ স্বরে বলে, তুমি বিদেয় হও দেখি।

—আপনি বুঝতে পারছেন না, আমাদের সকলের মন খারাপ, শহর থেকে পালিয়ে, শান্তির মধ্যে লেখাপড়া করার জন্যে এখানে

দিন আগত ঐ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

এসেছিলাম, পাশেই যদি চিনির কল বসে, সব নষ্ট হয়ে যাবে, সদাশঙ্করদা'র আদর্শকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারব না।

—আদর্শ, আদর্শ, আদর্শ, আগ্নেয়গিরির যেন বিস্ফোরণ হয়, বুড়ো চীৎকার করে ওঠে, জমি বিক্রী করার আমার খুব দরকার ছিল না, ইচ্ছে করে করেছি, যাতে তোমাদের ঐ আদর্শের বুলি বন্ধ করা যায়, সদাশঙ্করের দম্ভকে ভেঙ্গে চুরমার করা যায়। যতবার আমার সঙ্গে দেখা করেছে কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, এবার দেখি কি করে ও ইস্কুল চালায়।

কমলেশেরও রাগ হয়, বুড়োর যুক্তিহীন কথাবার্তাতে সে প্রতিবাদ না করে পারে না। শঙ্করদা'কে আপনি চেনেন না, তাই যা-তা বলছেন। দেশ ছাড়া সে কিছু বোঝে না। নিজের স্বার্থের দিকে সে ফিরেও তাকায় না। বেশ দেখব, আপনি কি করে জমি বিক্রী করেন। আমরা, ছাত্ররা এসে আপনাদের বাড়ী ঘেরাও করব। প্রয়োজন হলে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব।

—কি, তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ?

বুড়ো ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে একটা লোহার রড বার করে আনে। রাগে তার শরীর থরথর করে কাঁপছে। আজ এই খানেই তোর জ্যান্ত কবর দেব। বলে বুড়ো রডটা দিয়ে কমলেশকে আঘাত করার চেষ্টা করে, কমলেশ তৈরী ছিল, সরে যায়। রডটা গিয়ে লাগে বারান্দার থামে। বুড়ো টাল সমলাতে পারে না! মাটিতে পড়ে যায়।

কমলেশ ভয়ে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়েছিল। সন্তর্পণে কাছে এগিয়ে আসে। বুঝতে পারে বুড়ো অজ্ঞান হয়ে গেছে। একবার ভাবে সে পালিয়ে যাবে কি না, কে জানে বুড়ো হয়ত জ্ঞান ফিরে এলে আবার রাগারাগি করবে। কিন্তু পরক্ষণেই তার জন্তে আমার মমতা হয়। কে বলতে পারবে এই নির্জন প্রাসাদ পুরীতে এ অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে গেলে হয়ত কোনদিনই আর বুড়ো চোখ খুলবে না। স্বার্থবাদী মন। ভেতর থেকে হঠাৎ যেন কথা বলে ওঠে, সে তো ভাল, বুড়ো মরে গেলে আর কোন ঝামেলাই থাকবে না। চিনির কলও বসবে না। কমলেশ কিন্তু এই নিষ্ঠুর চিন্তা মনে স্থান দিল না। ঘরের মধ্যে থেকে জল এনে বুড়োর চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিল, মাথার কাছে বসে বুড়োর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হল।

অল্পক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এলো বুড়োর। অস্ফুট স্বরে বলল, আমি—কি হয়েছে আমার, এখানে কেন?

কমলেশ সহজ গলায় বলে, আপনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

বুড়োর এবার মনে পড়ে, আমি তোমায় মারতে গিয়েছিলাম, না?

—হ্যাঁ। এই যে সেই লোহার রড, কমলেশ রডটা বুড়োর হাতের কাছে দেয়।

বুড়ো একদৃষ্টে কমলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, সত্যিই বুঝি তোমার প্রাণের ভয় নেই? তোমাকে আমি মারতে গিয়েছিলাম জেনেও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ?

কমলেশ হেসে বলে, বাঃ, আপনাকে দেখতো কে তাহলে?

—আমি হ'লে কিন্তু শত্রুকে ছেড়ে দিতাম না। এই ডাণ্ডা মেরেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করতাম।

বুড়োর চুলের মধ্যে আঙুল বোলাতে বোলাতে কমলেশ বলে, শঙ্করদা' আমাদের কি বলেন জানেন, মেরে ফেলা খুব সোজা, বাঁচানোটাই শক্ত।

—আশ্চর্য্য কথা।

—মানুষটাই যে আশ্চর্য্য।

বুড়োর বুকের মধ্যে কষ্ট হয়, হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে বলে, ওষুধ খেতে হবে। বড় ব্যথা।

কমলেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ওষুধ কোথায়?

—পুলুর কাছে।

—কে পুলু?

—আমার নাতি। ঐ ঘরে থাকে, চাবি—বুড়ো কোমরে-বাঁধা চাবিটা দেখায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার অজ্ঞান হয়ে নেতিয়ে পড়ে।

কমলেশ আর সময় নষ্ট না করে, বুড়োর কোমর থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে। বিরাট হল-ঘর, বদ্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ায় গা শিরশির করে ওঠে, দরজায় জানলায় নীল কাচ বসো বাইরে থেকে আলো ঢুকতে পারে না। কমলেশের মনে হল, সে যেন আরব্য উপন্যাসের কোন এক বাদশার প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মার্বেল পাথরের নক্সাকাটা মেঝে, সারা দেওয়ালে তেলের রঙের ছবি। চারদিকে লাল ভারী মখমলের পর্দা। তিনখানা আলোর ঝাড় ঝুলছে। টুকরো টুকরো কাচের মধ্যে দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে চারদিকে, কোথাও বা রামধনু রঙের আভা।

বাইরে থেকে ভাঙা পুরোনো বাড়ীর চেহারা দেখে কে বুঝবে, যে তার ভেতরের ঘরগুলো এত সাজানো, এত চমৎকার! বেশ কিছুক্ষণের জন্তে কমলেশ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর হঠাৎ বুড়োর কথা মনে হতেই চেঁচিয়ে ডাকে—পুলু, পুলু আছো?

কোন উত্তর শোনা যায় না। শুধু তার ডাকের প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। কমলেশ আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়, হল-ঘর পেরিয়েই গোল সিঁড়ি উঠে গেছে। দোতলায়। তারই নিচে দাঁড়িয়ে আবার সে জোর দিয়ে ডাকো পুলু আছো পুলু?

ওপর থেকে ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যায়, কে ডাকে?

আমি—নীচে এস।

একটু পরে পুলু সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে, কমলেশকে দেখে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ভাল করে দেখে। জিজ্ঞেস করে, কে তুমি?

—আমার নাম কমলেশ। এখানকার স্কুলে পড়ি।

—এ অন্দরমহলে ঢুকলে কি করে?

তার বিস্ময়ের বহর দেখে কমলেশ বুঝতে পারে, বাইরের লোক এ অন্দরমহলে ঢুকতে পারে না।

—তোমার দাদুর বুকে ব্যথা করছে, আমি তাই খবর দিতে এলাম।

পুলু ব্যস্ত হয়ে পড়ে, দাদু কোথায়?

—ঐ যে সামনের বারান্দায়।

পুলুর মুখ শুকিয়ে যায়, বলে, আমাদের তো বাইরে যাবার হুকুম নেই, তুমি ভাই কোন রকমে ওঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এস।

কমলেশের মনে পড়ে যায়, বলে, উনি কি ওষুধ খুঁজছিলেন।

পুলু দেরাজ থেকে ওষুধ বার করে এনে কমলেশের হাতে দেয়,

মিনতিভরা স্বরে বলে—তুমি কিন্তু বাইরে থেকে চলে যেও না, নিশ্চয় ভেতরে এস।

—আসব।

কমলেশ বাইরে এসে বুড়োকে ওষুধ খাওয়ায়, সুস্থবোধ করলে তাকে ধরে ধরে অন্দর মহলের ভেতরে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে অন্দর মহলের অনেক অধিবাসী পুতুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ছেলে-মেয়ে অনেকেই, আশ্চর্য্য তাদের চেহারা! কমলেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখ, মুখে কোন ভাষা নেই, এই পুরোন সেকেলে আবহাওয়ার মধ্যে এদের খাপছাড়া মনে না হলেও বোঝা যায় পাঁচটা মানুষের মাঝখানে পড়লে এদের অদ্ভুত লাগবে।

বুড়োকে ওরা ধরাধরি করে শুইয়ে দিলে একটা খাটের ওপর, সকলে মিলে লেগে গেল তার সেবা করতে। শুধু পুলু এসে দাঁড়াল কমলেশের কাছে। বলে, তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে, কতদিন বাদে একজন বাইরের লোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। রোজ একবার করে তুমি এস ভাই, আমরা বসে বসে গল্প করব, কথা বলব।

—যদি আমাকে ঢুকতে না দেয়?

—একবার যখন ঢুকতে পেরেছ, আর তোমায় দাদু বারণ করবেন না। কিন্তু বাইরে কারুর কাছে আমাদের কথা বোল না। শুনতে পেলে উনি রেগে যাবেন।

—না বলব না।

—নিশ্চয় এসো। দরজার চাবীটা তুমি নিয়ে যাও, কমলেশ যেতে যেতে বলে। বেশ, কাল আমি আবার আসব পুলু! তোমার দাদুরও খবর নিয়ে যাব, তোমাদের সঙ্গেও বেশ আলাপ করা যাবে, আজ রাত হয়ে গেছে, বাড়ী যাই।

কমলেশ হোষ্টেলে ফিরে এসে দেখে, প্রশান্ত তখনও ঘুমোয়নি, ওরই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। কমলেশকে ঢুকতে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, এত দেরী হল যে, কোথায় ছিলি?

—ওই বুড়োর বাড়ীতেই, সে অনেক কথা, পরে বলব। তোর খবর কি বল। বুড়োর বাড়ী থেকে যে লোকটার পিছু নিয়েছিলি, পারলি বুঝতে সে কে?

—না। লোকটা এত জোরে জোরে হাঁটছিল, কিছুতেই তাকে ধরতে পারলাম না।

—কোন দিকে গেল?

—এল তো আমাদের এই কলোনীর দিকেই। কিন্তু কোথায় যে ঢুকে গেল বুঝতে পারলাম না।

কমলেশ চিন্তিত স্বরে জিজ্ঞেস করে, কতদূর পর্য্যন্ত তাকে দেখতে পেয়েছিলি?

—যতদূর মনে হয়, মিহিরদা'র ডিস্পেন্সারী পর্য্যন্ত তাকে দেখলাম, তারপর যে কোথায় মিলিয়ে গেল!

শুনেই কমলেশ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে।

—আবার কোথায় যাচ্ছিস্?

—এখুনি আস্‌ছি। বলেই কমলেশ দ্রুত বেরিয়ে যায়।

কোথাও না থেমে কমলেশ সোজা এল মিহির-এর ডিস্পেন্সারীতে। মিহিরদা' জেগেই ছিল, জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কমলেশ?

—শরীরটা ভাল লাগছে না মিহিরদা', একটা ওষুধ দিন।

—কি হয়েছে?

—গা-হাত-পায় বড় ব্যথা। ঘণ্টাখানেক আগে একবার এসেছিলাম, আপনাকে পেলাম না। মিহিরদা' নাড়ী দেখতে দেখতেই বলে, আমি বেরিয়েছিলাম।

মিনিট পনের কথা বলে একটা ওষুধ নিয়ে কমলেশ মিহিরদা'র ডিস্পেন্সারী থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেখান থেকে সে নিজের ঘরে গেল না। হাজির হল সদাশঙ্কর-এর দোরগোড়ায়। সদাশঙ্কর টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কি বই পড়ছিল। কমলেশকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করে, চোখে বুঝি ঘুম নেই ছেলের?

কমলেশ প্রথমে কথা বলতে পারে না। উত্তেজনায় চোখ-মুখ থম থম করে। বলে, শঙ্করদা', আমি বুঝতে পেরেছি কে আপনার আদর্শকে নষ্ট করতে চাইছে, কে এই সামনের জমিতে চিনির কল বসাবার মতলব করেছে।

সদাশঙ্কর চমকে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, কে?

—তিনি আপনার পরম বন্ধু।

—কার কথা বলছ?

—মিহিরদা'।

—মিহির! সদাশঙ্কর বিশ্বাস করতে পারে না, এ কি পাগলের মত বকছিস? সে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমার ডাকে এখানে এসেছিল—

কমলেশ থামিয়ে দিয়ে বলে, সে সব কথা আমরা জানি। কিন্তু আজ আমি তাকে কথা বলতে শুনেছি সেই বদ্ধ বুড়োর সঙ্গে। ওই জমির বিষয়ে, চোখে না দেখলেও, গলার স্বর আমি ঠিক চিনেছি।

সদাশঙ্কর তখনও মাথা নাড়ে, না, না, তা হতে পারে না। মিহিরের সঙ্গে আমার অনেক সময় মতের অমিল হয় বটে, সে চায় স্কুলকে আরও বড় করতে, কলোনীকে আরও বিরাট করে গড়ে তুলতে, কিন্তু তাই বলে এ রকম কোন কাজ সে করবে না যাতে আমাদের আদর্শ ভেঙে যায়।

—বিশ্বাস না করেন আগামী শনিবার আমি হাতে নাতে ধরিয়ে দেব, মিহিরদা'র যাবার কথা আছে ওই বুড়োর কাছে।

—এ যদি সত্যি হয় তাহলে নিজের ওপরই ক্রমে সন্দেহ জাগবে, মুখোসপরা মানুষকে চিনব কি করে? কি সাংঘাতিক কথা!

কমলেশ ধীর স্বরে বলে, আমি কিন্তু আপনাকে কথা দিচ্ছি শঙ্করদা', এ জমি আমি কিছুতেই বিক্রী হতে দেব না। আপনার আদর্শকে আমরা বাঁচিয়ে রাখবই।

সদাশঙ্কর ম্লান হাসে।

—বিশ্বাস করছেন না? কমলেশ দৃঢ় স্বরে বলে, যে লোকটাকে আপনারা কেউ ভাল চোখে দেখলেন না। যাকে বদ্ধ বুড়ো বলে ঠাট্টা করলেন, আমার মনে হয় সেই আমাদের কথা শুনবে।

—কি করে বুঝেছিস কমল?

কমলেশ কেমন যেন আচ্ছন্ন স্বরে বলে, আমি আজ তার অন্দর মহলে ঢুকেছি, সেই ভাঙা প্রাসাদের মধ্যে কি আলোর রোশ্‌নাই, শঙ্করদা', ওই বুড়োর মুখেও একটা মুখোশ। নিষ্ঠুর মুখোশ। যদি তা আমরা খুলে দিতে পারি, তাহলে বোধ হয় তার আসল চেহারাটা দেখতে পাব।

—সে কি আর সম্ভব হবে?

—হবে শঙ্করদা'। কেন জানি না, আমার বার বার মনে হচ্ছে, দিন এগিয়ে আসছে।

কতক্ষণ তারা দু'জনে কথা বলেছে নিজেদের খেয়াল ছিল না। রাতের অন্ধকার ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এসেছে। ভোরের আলো নতুন দিনের খবর নিয়ে হাজির হয়েছে প্রকৃতির দরবারে। পাখীদের মৃদু কলরবের সঙ্গে মিশে দূর থেকে ভেসে আসছে আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের সমবেত কণ্ঠের প্রভাত ফেরীর গান, 'দিন আগত ঐ।'

সদাশঙ্কর আর কমলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, বিস্তৃত মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তাদের বুকও আনন্দে ভরে ওঠে, কবির গান, ভবিষ্যৎ বাণীর মতই শোনায়। তারাও গেয়ে ওঠে, 'দিন আগত ঐ।'

[ক্রমশঃ।

থট্‌রীডিং

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

অভ্যাগতবৃন্দ মঁদমসেল জিলের চোখ বেঁধে দিলেন আচ্ছা করে—তুলো আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে। ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে সবাই নিশ্চিত হলেন যে দেখার কোন পথই খোলা নেই। এর পরে আমি আরম্ভ করলাম আমার ম্যাজিকের খেলা: হাতের যা কিছু পেলাম তারই দিকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি মঁদমসেল জিলেকে প্রশ্ন করতে থাকলাম এক এক করে—এটা কী? ওটা কী?

চোখবাঁধা অবস্থাতেই অবলীলাক্রমে মঁদমসেল জিলে জবাব দিতে থাকলো নির্ভুল ভাবে। কাণ্ডকারখানা দেখে তো সবাই অবাক! চোখ বন্ধ—তবু কেমন ক'রে না দেখে সব জিনিষের নাম বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে? মাদাম মিলোঁর হাতে ছিল একটি গ্লাস—তিনি সেটা তুলে ধরলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, মাদাম মিলোঁর হাতে এটা কী জিনিষ? জিলে জবাব দিল, কাচের গ্লাস!

ঘরের কোণে রাখা ছিল একটি ফরাসী পতাকা, সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বলতো ঘরের কোণে যে জিনিষটা রয়েছে সেটা কী? সঙ্গে সঙ্গে মঁদমসেল জিলে জবাব দিল, ফরাসী পতাকা। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক ছাতা হাতে। তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, এখন যে ভদ্রলোক এলেন তাঁর হাতের মধ্যে কী? সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম, ছাতা। এমনিধারা আমার প্রতিটি প্রশ্নেরই নির্ভুল উত্তর পেলাম মঁদমসেল জিলের কাছ থেকে। ঘটনাটা ঘটেছিল সে বার প্যারিসের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি বাগানবাড়ীর হলঘরে। বাগানবাড়ীটির মালিক ফরাসীদেশের এক ধনকুবের। ধনকুবের মঁসিও এতোয়ান ছিলেন আমার বিশেষ ভক্ত। তাঁরই একান্ত অনুরোধে সেদিন ভোজসভায় যোগ দিয়েছিলাম আমি আমার ফরাসী সহকারিণী মঁদমসেল জিলেকে সঙ্গে নিয়ে। ভোজপর্ব্ব সুরু হবার অল্প আগে মঁসিও এতোয়ান আমাকে অনুরোধ করলেন একটিমাত্র যাদুর খেলা দেখানোর জন্যে। তাঁর অনুরোধেই এই খেলা দেখানো। কেমন করে এই আজব খেলাটি সেদিন দেখানো সম্ভব হয়েছিল সেই কথাই বলি শোন। দেখতে খুব কঠিন মনে হলে কি হবে, খেলাটার কৌশল কিন্তু তত কঠিন নয় মোটে। যে প্রশ্নগুলো আমি জিজ্ঞেস করছিলাম সেই সব প্রশ্নের মধ্যেই লুকনো ছিল তাদের জবাবগুলো। প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই ছিল ভিন্ন ভিন্ন রূপ আর এদের এক একটি প্রশ্নে এক একটি জিনিষকে বোঝাচ্ছিল। আগে থেকেই মঁদমসেল জিলের সঙ্গে তালিম দিয়ে আমি কতকগুলি প্রশ্ন আর তার জবাব ঠিক করে মুখস্থ করে নিয়েছিলেন।

এটা কী?	জবাব—রুমাল
আমার হাতে কী?	লাঠি
এখন হাতে কী?	পেন্সিল
এখন আমার হাতে কী?	পেন
এখন হাতে এটা কী জিনিষ?	গ্লাস
জিনিষটা রয়েছে সেটা কী?	পতাকা
হাতের মধ্যে কী?	ছাতা
এবার হাতের মধ্যে কী?	টাকা

ইত্যাদি ইত্যাদি

এখন বুঝতে পারলে তো? তোমরা নিজেরাই এখন এমনধারা নানা রকমের প্রশ্ন আর তার সঙ্গে সঙ্গে জুৎসই জবাব তৈরী করে নিয়ে এই খেলা দেখাতে পারবে। তবে হ্যাঁ, সহকারীর সঙ্গে ঠিকমতন তালিম দিয়ে—ভালভাবে অভ্যাস করে তবেই এ খেলা দেখাতে যাবে। ভালভাবে দেখাতে পারলে এই খেলা দিয়ে খুব নাম করতে পারবে তোমরা।

ইংরেজী মাসের নামের অর্থ

গোপালচন্দ্র সাঁতরা

রোমানরা তাঁহাদের দেবতা এবং সম্রাটগণের নামানুসারে মাসের নামকরণ করিয়াছেন। ইংরেজী মাসের নাম রোমানদিগের নামানুসারে হইয়াছে। (১) জানুয়ারী—দেবতা জেনাসের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। রোমানরা কোন শুভ কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই দেবতার পূজা করিতেন, এই

দেবতার দুইটি মুখ। (২) ফেব্রুয়ারী—প্রাচীনকালে রোমানরা এই সময়ে ফেব্রুয়া নামক এই উৎসব করিতেন। এই উৎসবের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। এই উৎসব করিবার পর রোমানরা আপনাদিগকে শুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। (৩) মার্চ্চ—রণদেবতা মারসের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। এই সময়ে দেশে খুব ঝড়-বৃষ্টি হইত। (৪) এপ্রিল—এপ্রিল শব্দের অর্থ খুলিয়া দেওয়া। এই সময়ে রোমদেশে বসন্তকালের আবির্ভাব হইত এবং বৃক্ষলতা পুষ্পসম্ভার লইয়া ঝলমল করিত। নির্মেঘ আকাশ, শ্যামল প্রান্তর দেখিয়া মনে হইত যে, পৃথিবীর কুজ্ঝটিকার আবরণ কাটিয়া গিয়াছে। তাই রোমানরা এই মাসকে এপ্রিল বলিতেন। (৫) মে—'মেইকা' নাম্নী প্রাচীন রোমানদের উপাস্য দেবতার নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। ইনি এটলাসের কন্যা। রোমানদের বিশ্বাস ছিল যে, এটলাস দেবতা সমগ্র পৃথিবীটা স্কন্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। (৬) জুন—'জুনো' দেবীর নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। (৭) জুলাই—রোমের বিখ্যাত জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে এই মাসের নাম হইয়াছে। সিজারের পূর্ব্বে রোমানদের বৎসর মার্চ্চ মাস হইতে গণনা করা হইত, কিন্তু তিনি জানুয়ারী মাস হইতে গণনার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি যে মাসে এই পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন সেই মাসের নাম দিলেন জুলাই। (৮) আগষ্ট—সম্রাট আগষ্টাসের নামানুসারে এই মাসের নামকরণ হইয়াছে। (৯) সেপ্টেম্বর—পূর্ব্বে যখন মার্চ্চ মাস হইতে বৎসর গণনা করা হইত তখন এই মাসটা ছিল সপ্তম, তাই এই মাসের নাম হইয়াছিল 'সেপ্টেম্বর'। সিজার সংস্কার করাইয়া মাসগুলিকে বদলাইলেন, কিন্তু মাসের নাম বদলাইলেন না। (১০) অক্টোবর—'অক্টোবর' শব্দের অর্থ আট। পূর্ব্বে এই মাসটি অষ্টম ছিল বলিয়া ইহার নাম অক্টোবর হইয়াছে। (১১) নভেম্বর—নভেম্বর শব্দের অর্থ নয় এবং পূর্ব্ব নামকরণ অনুসারে এখনও নভেম্বর রহিয়া গিয়াছে। (১২) ডিসেম্বর—'ডিসেম্বর' অর্থ দশ। এই মাস পূর্ব্বে দশম মাস ছিল বলিয়া এই মাসের নাম ডিসেম্বর হইয়াছে।

কিশোর সুভাষ

[নাটিকা]

শ্রীসুরুচিবালা রায়

স্থান—কটক, সময়—সন্ধ্যা।

ড্রয়িংরুমে একাকী বসে আছেন জানকী সাহেব, (এই নামেই ইনি কটকে পরিচিত) সম্মুখে টেবিলের উপর সেদিনকার খবরের কাগজ ছড়ানো। সহসা সম্মুখের দরজার পানে তাকিয়ে সহর্ষে বলে উঠলেন—

—এই যে আসুন, আসুন, আপনারই কথা ভাবছিলাম এতক্ষণ।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন রায়বাহাদুর গোপাল গাঙ্গুলী।

গাঙ্গুলী সাহেব। কেন বলুন দেখি, কি ব্যাপার?

জানকী সাহেব। ব্যাপার কিছুই নয়, Dull করেছে সন্ধ্যেটা, ভাবছিলুম, আপনি এলে হয়, কিছু গল্প গুজব করি।

—সম্মুখে কাগজ দেখছি আজকের, পড়েছেন না কি?

—হ্যাঁ, তাই ত ভাবছিলুম, কি হোল বলুন দেখি দেশটার, আজ একে মারছে, কাল ওকে মারছে, এদিকে ওদিকে যেন খেলা চলছে বন্দুক নিয়ে, বোমা নিয়ে। যেন এমনি করেই তাড়িয়ে দেবে সাহেবদের, কি সব ছেলেমানুষী! মাথাওয়ালা লোক কিন্তু রয়েছে এর ভেতর একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু ভালো কাজে তা না লাগিয়ে, আত্মঘাতী খেলা খেলছে সব বাচ্চা ছেলেগুলোকে নিয়ে, এ দেশটার উন্নতি হবে কি করে?

—হ্যাঁ দেখছিলুম কোন ছেলেটির যেন ফাঁসি হয়ে গেল, দেখি, দেখি নামটা—

—হ্যাঁ, গীতা হাতে নিয়ে বন্দে মাতরম্ বলতে বলতে এগিয়ে গেল ফাঁসিকাঠের দিকে, এ সব কচি কচি প্রাণগুলোকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা চলছে, এ সব করাচ্ছে কারা বলুন দেখি? আরে ক্ষতিটা কাদের হচ্ছে? ওদের না তোদের?

—তাই ত! নিজেদের অস্ত্র নেই, যুদ্ধে লড়বার লোক নেই, ক'টা বোমার ভয়ে পালিয়ে যাবে না কি এই সব মহাপ্রভুরা!

—সেই যে একটা কবিতা পড়েছিলুম—

"হঠাইয়া দিব যত পাষণ্ড ইংরেজে—"

গাঙ্গুলী হেসে—তা' আপনার আমার ভাবনা কি? কোলকাতার আদর্শ থেকে ত' অনেক দূরেই আমরা।

জানকী। তা'হলেও ভাবনার আছে বৈ কি রায়বাহাদুর, ছেলেরা বড় হবে, কলেজে পাঠাতে হবে, তা'ছাড়াও ওখানকার হাওয়া এখানে আসতেও বেশি সময় কি আর লাগবে?

গাঙ্গুলী। তা' বটে, কিন্তু উপায় নেই, কালের গতির মুখেই ছেড়ে দিতে হবে সব, আপনার আমার কিছুই থাকবে না করবার, শুধু দেখে যাওয়া ছাড়া। (একটু হেসে) একটা কথা মনে পড়ল বোস সাহেব, একদিন ঘরে বসে কি একটা পড়ছি, শুনছি, খেলা টেলার পর তিন বন্ধুতে আমার বাগানে বসে কথা বলছে। আমার ছেলে চারু, আপনার সুবি, আর সেই যে এখানকার জমিদারের ছেলে জগন্নাথ চৌধুরী—চারু বলছে আমি ভাই বড় হয়ে জজ হব, সুবি বলছে আমি ভাই হব এ্যাডভোকেট জেনারেল, তুমি জজ হবে, বিচার করবে, কিন্তু আইন ত' দেখিয়ে দেবো আমিই! আর তুমি জগন্নাথ? জগন্নাথ বলছে, আমি ওসব কিছুই হবো না ভাই—আমার পড়াশুনো করতেই ভালো লাগে, আমি হবো ভাই প্রোফেসর, সারা জন্ম কেবল পড়তেই থাকবো, কেবল বই, বই আর বই।

(হেসে উঠলেন দু'জনেই)

জানকী। জানেন ত, সুবিকে প্রথমে এখানকার প্রোটেষ্টান্ট য়ুরোপীয়ান স্কুলে দিয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ ছেলে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, ও স্কুলে ও আর পড়বে না, কারণ স্কুল বসবার সময় যে গান হয়, 'গড সেভ্ দি কিং;' ও গান ও গাইবে না, তা' ছাড়া খৃষ্টান আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলেরাই শুধু বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারবে, সেটিভরা তা' পারবে না। তাতে নাকি এই বয়সেই ওর অপমান বোধ হচ্ছে। মার কাছে এসে রেগে কেঁদে কেটে অস্থির, বলে, মা, আমরা ইণ্ডিয়ানরা ওদের চেয়ে ছোট হলো কেন, ওরা আমাদের অবজ্ঞা

করে আমাদের অপমান করবে? আমি ওদের স্কুলে পড়বো না। তারপর দিলুম ভর্ত্তি করে এই ম্যাডেলা স্কুলে। এখানে এসে পোষাকটাও বদলে ফেলেছে দেখেছেন? বলে, ওদের পোষাক পরবো না, এই ধুতিই ত আমাদের জাতীয় পোষাক। কী আর বলবো বলুন?

গাঙ্গুলী। খুবি আপনার চমৎকার ছেলে হবে বোস সাহেব। ওকে বলবার বিশেষ কিছু দরকার হবে না। নিজের ভেতরের একটা অদ্ভুত শক্তিই ওকে তৈরী করে নেবে। আমি ওর শান্ত চেহারার ভেতরেও একটা দীপ্তি দেখতে পাই। বাগানে হাজার গাছের ভেতরেও একটা ছোট চারা দেখলেই কোন গাছ তা চেনা যায়। আচ্ছা, চলি আজ।

২

বেলা প্রায় দেড়টা। ম্যাডেলা স্কুলের টিফিনের ছুটি। ছোট ছোট ছেলেদের ছুটোছুটি, হা ডু ডু ডু বা অন্য কোন খেলা, হৈ চৈ গোলমাল সকল কিছু থেকে সরে গিয়ে উপরের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে একটা গাছের নীচে ঘাসের উপর গিয়ে বসলো, এবং ধীরে ধীরে ওদের কথোপকথন শোনা যেতে লাগলো।

সত্যব্রত। শরীরটা আজ ভালো নেই, জ্বর-জ্বর হয়েছে, মা আসতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু না এসে পারলুম না, হেডমাষ্টার মশায়ের ক্লাসটা বাদ দিতে কিছুতেই পারি না ভাই!

নির্ম্মল। আমি ত ওঁর জন্যেই প্রোটষ্টান্ট য়ুরোপীয়ান স্কুল ছেড়ে দিলাম। শুনছি, আরোও কত ছেলে আসতে চাইছে, কিন্তু ওদের গার্জেনরা মত দিচ্ছেন না।

নরেন। জানিস ভাই, পড়তে পড়তে কাল রাত্তিরে হঠাৎ শুনতে পেলাম, বাবা কা'কে বলছেন,—দিয়ে দিন এই স্কুলে ছেলেকে। বেণীমাধব বাবুর হাতে পড়ে, কত খারাপ ছেলে ভালো হয়ে যাচ্ছে, মুখে মুখেই ছেলেদের কত কিছু শিখিয়ে দিচ্ছেন, শুধু বই পড়ে যা কোন কালেই হোত না, ইতিহাস বিজ্ঞান, প্রাচীন ভারতের ধর্ম ঐতিহ্য কোন জিনিষ তাঁর শেখাবার ধরণ থেকে বাদ যায় না, কোন জিনিষ ওঁর ভুল হয় না কক্ষনো। কে রামকৃষ্ণ ছিলেন, বিবেকানন্দ কোন বক্তৃতায় কি বলেছেন, শ্রীঅরবিন্দের বাণী, নানক, কবীর, আমি মশায় একদিন কি একটা উপলক্ষে ঐ সময়টায় স্কুলে গিয়ে হেডমাষ্টার মশায়ের পড়ানো শুনে অবাক হয়ে গেছি।

সত্যব্রত। শুনছি ভাই ওঁকে না কি ট্রান্সফার করাতে পারে।

—কেন ভাই?

—ওঁর ত এই স্কুলে অনেকদিন হয়ে গেল, তাই আর কি।

—সর্ব্বনাশ। তাহলে ভাই, আমরাও ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ওঁর স্কুলে যাবো।

—তা কি আর হবে? আমাদের গার্জেনরা আমাদের ছাড়বেন কেন?

—ওই যে মাষ্টার মশায় লাইব্রেরীতে যাচ্ছেন, সঙ্গে ওরা তিন জন ঠিক আছে, বরুণ, চারু, জগন্নাথ—

—চল আমরাও যাই।

(স্কুলের ভিতর)

প্রধান মাষ্টার বেণীমাধব। টিফিনের ছুটিতে ছেলেরা খেলা করলে না আজ। এখনো ত ঘণ্টা পড়েনি চলে এলে কেন?

—স্যার, আপনি কিছু বলুন, আমরা শুনবো।

মাষ্টার। (খুশী হয়ে) শুনবে তা বেশ ত, ভালো কথা নিয়ে আলোচনা করতে তোমাদের এত ভালো লাগছে দেখে ভারী খুসী হোলাম। আচ্ছা, আজ এমন কিছু শোনাবো, যা আমাদেরও মনে একটা নোতুন নেশা জাগিয়েছিল। দেশের দুঃখ দুর্দশা দূর করবার জন্যে যাঁরা নিজেদের সুখ চিরদিনের জন্যে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন তাঁরা চিরদিনই আমাদের নমস্য। শ্রীঅরবিন্দের কথা তোমাদের আমি আগেও বলেছি, আজ তাঁরই একটা উপদেশ শোন—

—আমার অন্তরের একমাত্র বাসনা আমি দেখতে চাই, অন্ততঃ তোমরা কয়েকজনও সত্যিকারের মহাজীবনকে বরণ করে নিয়েছ, তোমার নিজের জন্য নয়, ভারতবর্ষের জন্য; ভারতবর্ষ যাতে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, তারই জন্য তোমাদের মহৎ হতে হবে, তোমাদের মধ্যে যারা দরিদ্র পরিচয়হীন, তোমাদের সেই দারিদ্র্য সেই পরিচয়হীনতা দিয়েই দেশজননীর সেবা কর।

Work that she might prosper
suffer that she might rejoice

কিন্তু, এই যে দেশজননী কে এই দেশ? দেশের কি কোন আলাদা রূপ আছে? এই পাহাড় পর্ব্বত এই সব নদ-নদী, গ্রাম-সহর, এত সব জীবজন্তু, এবং সকলের উপরে মানুষ, এই সব মিলিয়ে যে একটি রূপ তাই তোমার ভারতবর্ষ, তোমার দেশ। প্রকৃতিকে ভালোবাস, জীবজন্তুকে দয়া কর, দীন হীন দুঃখী মানুষকে তাদের দীনতা হীনতা থেকে টেনে তোল, তোমরা নিজেরা নানা রকমের জ্ঞান অর্জ্জন করে, দেশের মানুষের শিক্ষা লাভের পথ দেখিয়ে দাও। এই ত হবে তোমার দেশের সেবা—দেশভক্তি। বিবেকানন্দ বলেছেন,—বহু রূপে তোমার সম্মুখে তোমার ভগবান জীবদেহ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সেই জীবের সেবা, মানবের সেবা সে-ই ত তোমার আরাধনা।

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'

ভারতবর্ষকে, তোমার দেশকে, তোমার ভগবানকে একই রূপে ভাবতে চেষ্টা কর, সেই তোমার পথ।

৩

জানকী সাহেবের বাড়ী।

জানকী সাহেব। কত রাত হোল, ছেলেরা সবাই পড়ছে, খুবিকে দেখছি না ত?

সুভাষ-জননী। আজকাল প্রায়ই দেখছি দেরী করে ফেরে, চারুদের বাড়ী বসে বই টই পড়ছে হয়ত।

—তা হলেই বা এত দেরী হবে কেন? ঠিক সন্ধ্যের আগেই বাড়ী এসে পড়তে বসা উচিত, বলে দিও আজ।

মা চিন্তিত ভাবে। বেশি কথা টথা ত' বলে না, খুবি কেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে আজকাল।

জানকী সাহেব। হ্যাঁ, কি রকম একটু অন্যমনস্ক বেন হয়েছে, আমারও ক'দিন মনে হচ্ছে সে কথা, সেদিন দেখি খবরের কাগজ

থেকে কেটে নেতাদের মানে, স্বদেশী হুজুগের সব লিডারদের ছবিগুলো কেটে, ওর পড়বার ঘরে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। দেখে ত চমকে গেলাম! তক্ষুণি বেয়ারাটাকে ডেকে তুলে ফেললাম সেগুলো, সুবিকেও সাবধান করে দিলাম, ভবিষ্যতে আর যেন না হয় ও রকম। চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা। ঐ যে এসেছে, যাই দেখি গে।

জানকী। সারদা আছে ত' ওখানে? ওকে দেখাশুনো করে ত?

মা। হ্যাঁ, সারদা ওকে বড্ডো ভালোবাসে, সুবির সমান ওর একটা ভাইপো আছে দেশে, সেজন্যে সুবির উপর ওর বড্ডো টান। সব সময় দেবতা দেবতা বলে আদর করে ডাকে, আর কী যত্নই করে। যাই দেখি গে—

সুভাষের পড়বার ঘর।

মা। হ্যাঁ রে সুবি, এত দেরী করলি'কেন? এত রাত অবধি খেলা করিস না কি? এসেও আবার বই সামনে নিয়েই বসে পড়লি টেবিলের সামনে? ওঠ, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে দেয়ে পড়তে বস, পরীক্ষার ত' আর দেরীও বেশি নেই, সারদা, দে ওর ব্যবস্থা করে সব। [প্রস্থান।

সারদা। দেবতা, বড্ডো রাত করলে আজ, ওঠ দেখি, তোমার জন্যে জলটল সব ঠিক করে রেখে এসেছি স্নানের ঘরে, ওঠ চল। আর, ঐ যে দেখেছো ত? তোমার জন্যে এ ঘরেই একটা খাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মা, তুমি মাকে বলেছিলে বুঝি অনেক রাত অবধি পড়লে, এ ঘরেই শোবার ব্যবস্থাও করতে পারলে ভালো হয়, তাই তোমার বিছানাও করে রেখেছি ওখানে।

রাত অনেক হয়েছে।

সুভাষের শয্যাপ্রান্তে ছোট একটি টেবিলের উপরে স্বামী বিবেকানন্দের একখানি ফটো। ফুল দিয়ে সযত্নে সেখানি সাজানো। ক্লাসের পড়ার বইগুলোর আগামী কালের পড়াগুলো বার কয়েক দেখে নিয়ে সুভাষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামীজির একখানি বই কাছে টেনে নিল। তার পর পাতার পর পাতা উল্টে পড়তে লাগল—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে দয়া করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ। হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে, সুভাষের চোখ দুটি আগুনের মত জলছে। বই বন্ধ করে, করযোড়ে মুদিত নয়নে সুভাষ বসে রইল কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল কতক্ষণ ধরে স্বামীজির ফটোকে। ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার বলতে লাগল—

—হে গুরু, আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর আমায়, তোমারই ইচ্ছায় আমার জীবন, তোমারই ইচ্ছায় আমার সকল শক্তি বলি দিলাম মায়ের পায়ে, ভারতমাতার পায়ে।

তার পর জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সুভাষ।

ভোরবেলা। জানকী সাহেব বেরিয়ে এলেন বাগানের ভিতর —প্রায় অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কে বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ী থেকে, কে?

—কে যাচ্ছে রে? সুবি নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোথায় যাচ্ছিস? (নিরুত্তরে মাথা নীচু করে রইল সুভাষ) কি রে? যাচ্ছিস কোথায়? এই ভোরবেলা, কাউকে বলা নেই, কওয়া নেই, কোথায় যাচ্ছিস?

—ও পাড়ায় ভীষণ অসুখ-বিসুখ হচ্ছে, ডাক্তার দেখাতে পারে না ওরা, সেবা করতেও জানে না, তাই যাচ্ছি ওদের নার্সিং-এর জন্যে। বেশিক্ষণ থাকব না, ঘণ্টাখানেক মাত্র।

—কি বললি? নার্সিং-এর জন্যে? কি সর্বনাশ! তোকে কে দেখে তার ঠিক নেই, তুই যাচ্ছিস ও পাড়ায় নার্সিং-এ। ওসব হবে না, যা, ঘরে যা। ম্যাট্রিকের মাত্র ক'মাস বাকী, পড়াশুনো নেই, কেবল বাইরে বাইরে ঘোরা। অত রাত্তিরে বাড়ী ফিরিস রোজ রোজ, যাস কোথায়? যা, পড়তে বস্ গে।

মাথা নীচু করে সুভাষ ঘরে গিয়ে দ্বার বন্ধ করে পড়তে বসল। সম্মুখে দেয়ালে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দিন হিসাব করতে লাগল সুভাষ।

সুভাষ। ক'দিন বাকী আর? মাত্র দু'মাস? মাত্র? তা হোক, ভয় কি? কত যত্ন করে পড়ালেন মাষ্টার মশায়েরা, বৃথা যাবে নাকি সব? হতেই পারে না। চারু বলছে, ফার্স্ট হবি তুই, দেখি চেষ্টা করে—

(সেদিন রাত্রে জানকী সাহেব বলছেন স্ত্রীকে)

অদ্ভুত হয়েছে ছেলেটা। যা বলছি, তাই করছে, কক্ষণো অবাধ্য হয় না, সারাদিন দোর বন্ধ করে রেখে একমনে পড়ে যাচ্ছে। সবই ভালো ছেলেটার, কিন্তু মনে হয়, কি যেন ভাবছে সারাক্ষণ, মনটা যেন অন্যমনস্ক। কি যেন একটা যুদ্ধ চলছে ওর মনের ভিতর। ছেলেটা ভাবিয়ে তুললে কিন্তু। পরীক্ষার পর ওকে কোলকাতায় একা একা পাঠাবোই বা কি করে, যে অবস্থা চলছে দেশের।

মা। তা ঠিক, কিন্তু ওর মনটাকে ত আঁচল দিয়ে চেপে ঢেকে রাখতে পারব না, সারদা বলে কত রাত অবধি স্বামীজির ছবিটিকে পুজো করে ঘুমোয়, চোখ মুখ ওর আগুনের মত জলতে থাকে পুজোর সময়, ডাকলে সাড়া পর্য্যন্ত দেয় না, এমনি তন্ময় হয়ে যায়! শুনে আমার ভয় করে।

জানকী। পরীক্ষার পর দিনকতক একটু ঘুরে আসুক বাইরে, একটু পরিবর্তন হতে পারে।

পরীক্ষার পর—বন্ধুদের সঙ্গে—

সুভাষ। খুব খেটেছি ভাই শেষ ক'টা দিন। আশা করি ভালই কোরব।

চারু। ভালো মানে? মাষ্টারমশায়রা ত বলছেন, উপরের দিকেই টাও করবে তুমি।

সুভাষ। রেজাল্ট বেরুতে ত দেরী আছে, চলো না বাইরে ঘুরে আসি কোথাও। বাবার পারমিশান ত পেয়ে গেছি।

চারু। আমি ভাই জানি না পাবো না কি, চেষ্টা করব।

সন্ধ্যার পর, পিতার কক্ষে—

সুভাষ। একলাই পারব বাবা, ভয়ের কি আছে? বড় হয়েছি ত?

জানকী। সঙ্গে একটা চাকর যাক, দেখা-শুনো করতে পারবে ত?

সুভাষ। কিছু দরকার হবে না বাবা, বেশি দিন ত দেরী হবে না, রেজাল্ট বেরুবার আগেই চলে আসবো।

যাত্রার পূর্ব্বে—

সুভাষ। (হেসে) এখনই তোমার চোখ ভিজে উঠছে মা? আমি বিলেত গেলে তুমি থাকবে কি ক'রে?

মা। ছেলেদের মঙ্গলের জন্তে মায়েরা সব কষ্ট সহ্য করে বাবা, সব পারবো আমি, তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো বাড়ী।

জানকী। যা' যা' নেবার, নিয়েছ ত সব ঠিক করে?

—নিয়েছি বাবা!

—সময় হয়ে এলো, ঐ যে চারুরা আসছে, ষ্টেশনে যাবে বোধ হয় ওরা?

চারু, জগন্নাথ। এই যে Ready হয়েছ, চল, আমরা ভাই See off করতে এলাম তোমায়, চল।

সুভাষ। চলি মা?

মা। এসো, বাবা, (ওর চলার পথের দিকে তাকিয়ে) ঘর ছেড়ে এই ওর প্রথম বাইরে যাওয়া সুরু হোল, তার পরেই ত পাঠাচ্ছো কোলকাতা, তারপর বিলেত। এমনি করেই ছেলেদের ঘরের সঙ্গে যোগ কমে যায়।

জানকী। সুবির বাইরের নেশাটাই বড্ডো বেশি, ঘরের চেয়ে। অনেক দিন থেকেই আমি তা' বুঝতে পারছি। বাইরে ঘোরার নেশা হলে, ঘরে কি আর মন টেঁকে? ঠিক সাধারণ ছেলের মত ও নয়, ওর জন্তে আমার ভারী একটা ভাবনা রয়েছে।

দিন কয়েক পরে—সুভাষের বন্ধুরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে একখানা চিঠির উপর ঝুঁকে পড়েছে, মাঝখানে বসে একজন পড়ছে সে চিঠি।

—সুভাষের চিঠি এসেছে ভাই, সবারই নাম করে লিখেছে, আমি পড়ছি শোন সবাই—

—ঘুরে বেড়াচ্ছি হরিদ্বারে, হিমালয়ে উঠবার সিঁড়িতে। কী রূপ এখানকার, তোমরা দেখলে না, দেখলে পাগল হয়ে যেতে। আমিও পাগল হয়ে গেছি। মনের ভেতরে নতুন দৃষ্টি খুলে গেছে আমার। দেখতে পাচ্ছি, আমার ধ্যানের যে ভগবান, যাঁকে আমি দিন-রাত ধ্যান করেছি প্রতিদিন মনে মনে তাঁর থেকে কিছুমাত্র পার্থক্য নেই আমার চোখে-দেখা এই ভারতবর্ষের। যখনি একটু শান্ত স্থির হয়ে ধ্যানে বসতে যাই ভগবানের, মনে মনে অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে ফুটে ওঠে আমার এই ভারতমাতার রূপ। এই বৃক্ষ-লতা গিরি-নদ-নদী, সহর-গ্রাম, মানুষ জীব জন্তুতে গড়া এই বিশাল ভারতবর্ষের রূপ। আমি ধ্যান ভুলে যাই, পূজো ভুলে যাই, মন আমার আকুল হয়ে চীৎকার করতে থাকে।

মা, মা মা, মা—আমার জননী জন্মভূমি আমার ভগবান!

[ক্রমশঃ

কাজ

স্মৃতি নাহা

আমি কে? প্রশ্ন জাগে মনে,
উত্তর নাহি মেলে।
মনে হয়—কোন এক অকালের কালরাত্রে
জন্ম যদি আমার,
তবু কেন উত্তর মেলে না একবার!
প্রশ্ন—তোমার
এ কি হেঁয়ালি? শুকনো পাতা, ঝরা ফুল
জলের ছিটেয় তাজা—
না, শুধু মনের ভুল
বা উল্টোরথে চড়া!
কাজের বেলা হল সারা
মন তবু কাজছাড়া
জিজ্ঞাসি, মন তুমি কাঁদবে কতক্ষণ
অজন্তার কারুমূর্ত্তি
তা তো তোমার গড়া।
তবে কেন গড় না একবার
থাকু প্রশ্ন, কাজ তুমি আর আমি হই একাত্মায়।

সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রবীন্দ্র-জীবনকথা

প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "রবীন্দ্র-জীবনী" একটি অমর কীর্তি। বাঙলার সাহিত্য-ভাণ্ডারে রবীন্দ্র-জীবনীর মত গ্রন্থের সংযোজন যে কতখানি মূল্যবান, তা বর্ণনাকরা দুঃসাধ্য। রবীন্দ্র-জীবনী মূলতঃ জীবনীগ্রন্থ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ঘটনাপঞ্জী দিয়ে পরিপূর্ণ নয়—একটি যুগের, একটি সমাজের, একটি জাতির পরিপূর্ণ ইতিহাসরূপে রবীন্দ্র-জীবনীকে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। চারটি বিরাট খণ্ডে লিখিত রবীন্দ্র-জীবনীর সংক্ষেপিত সংস্করণ বলে এ গ্রন্থটিকে গণ্য করলে ভুল করা হবে। ঐ বৃহদায়তন চার খণ্ড জীবনীর একটি সারসংকলন (শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী কৃত) অবলম্বন করে প্রভাতকুমার নতুন করে এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটি একটি খণ্ডেই সমাপ্ত। গ্রন্থের সবচেয়ে বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থটি আদি থেকে অন্ত চলতি ভাষায় লেখা। গ্রন্থের শেষাংশে একটি সংক্ষিপ্ত বংশলতিকা, রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী ও রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। বাঙালীর রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অপরিহার্য এবং গ্রন্থটি সাহিত্যজগতে প্রভাতকুমারের এক অনবদ্য অবদান, যার তুলনা হয় না। অসংখ্য জ্ঞাতব্য তথ্যে ভরপুর এই মহাজীবনীগ্রন্থটি বাঙলার সুধী-সমাজে যে প্রভূত সমাদর ও সাধুবাদে বিভূষিত হবে, একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৬.৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। দাম—ছ'টাকা মাত্র।

কবি তরু দত্ত

বাঙলার কালজয়ী সন্তানদের কল্যাণে দেশের সাহিত্যভাণ্ডার পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়েছেই—সাগরপারের সাহিত্যসম্পদও যথেষ্ট পরিমাণে ভরে উঠেছে এবং এক্ষেত্রে বাঙলার ছেলেদের তুলনায় বাঙলার মেয়েদের অবদানও কোন অংশে কম নয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে তরু দত্তের নাম। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পৃথিবী তরু দত্তকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারে নি। মাত্র বাইশটি ফাল্গুন প্রত্যক্ষ করেই ধরণীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তরু দত্তকে। অত্যন্ত অকালে এই বিরাট প্রতিভাকে সাহিত্য-জগৎ হারিয়েছে। আজকের দিনে তরু দত্তের অনবদ্য রচনার সঙ্গে কার কতখানি প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে সে বিষয়ে মনের সন্দেহ মুছে ফেলা যায় না। উপরোক্ত গ্রন্থটি রচনা করে শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গ্রন্থে কবির সচিত্র জীবনী কাব্য, উপন্যাস সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা এবং কবির "বোগাডা উমা" কবিতাটির বঙ্গানুবাদ স্থান পেয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে গ্রন্থকর্তার নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দক্ষতার ছাপ ফুটে ওঠে। যে দেশেই কবিজীবন অতিবাহিত করুন, যে ভাষাতেই তিনি তাঁর সাহিত্যকে রূপ দিন আসলে তিনি বাঙালী, বিশুদ্ধ বাঙালী-রক্ত তাঁর শিরায় ধমনীতে প্রবহমান—তাই তাঁর রচনার মধ্যে চিরন্তন বাঙালীসত্তাই বার বার উঁকি মারে, ফরাসী উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী তরু দত্তই দেখা দেন—এবং রচনাগুলি যেন বিদেশী ভাষায় লেখা বাঙলা রচনাই—এই মতবাদকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে লেখক তাঁর আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। লেখকের উপরোক্ত ধারণা সম্পর্কে বিজ্ঞ পাঠক দ্বিমত হবেন না, এ আশা রাখি। তরু দত্ত প্রায় বিস্মৃত হতে চলেছেন—এই সময়ে তাঁর সম্পর্কীয় আলোচনার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। লেখকের আলোচনভঙ্গী ভাষা ও রচনাশৈলী প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী—এ—১৩২ ও ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর

বাঙলা দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ নাম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সাহিত্যের কল্যাণে তাঁর আত্মনিয়োগের বিষয় সকলেরই সুবিদিত। উনিশ শ' পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ-রহিত আন্দোলনের যুগেও তাঁর অবদান অতুলনীয়। রামেন্দ্রসুন্দর এক আশ্চর্য প্রতিভা, বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। সুসাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা) রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট-আত্মীয়। রামেন্দ্রসুন্দরের দেহান্তের সময়ে ধীরেন্দ্রনারায়ণ বাইশ বছরের যুবক। সুতরাং এই বাইশ বছরের সময় পরিধিতে রামেন্দ্রসুন্দরের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন ধীরেন্দ্রনারায়ণ. ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দরের যে আলেখ্য ধীরেন্দ্রনারায়ণের চোখে ধরা পড়েছে সেই আলেখ্যকে কেবলমাত্র স্মৃতির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে লেখনীর মাধ্যমে তিনি সাহিত্যরূপ দিয়েছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যক্তিত্ব, মনীষা, স্বাজাত্যাভিমানের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি রচনার মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের সম্বন্ধে এবং তাঁকে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বহু তথ্য গ্রন্থটিকে সর্বতোভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে এই জাতীয় তথ্যপূর্ণ তথা মূল্যবান গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ছিল, ধীরেন্দ্রনারায়ণ সে অভাব পূরণ করলেন। রচনার ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

(১) বিভূতিভূষণ এবং (২) বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প

বাঙলা সাহিত্যে এমন একটি দিক আছে, যার দিক্‌পাল বলা চলে অমর কথাশিল্পী স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যুগস্রষ্টা, দিকপাল, পথনির্মাতা প্রমুখ বিশেষণগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁদের নামের সঙ্গে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়, বিভূতিভূষণ তাঁদেরই অন্যতম। বিভূতিভূষণ যে কত দিক দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর রচনা সাহিত্যকে একটি বর্ণের রূপদানে সমর্থ হয়েছে, তাঁর লেখনী বাঙলা সাহিত্যকে এক অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যে ভরিয়ে তুলেছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্য, সাহিত্যাদর্শ, সাহিত্যচেতনা সম্পর্কে উপরোক্ত আলোচনাগ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয়েছে। উভয় গ্রন্থেই সারগর্ভ আলোচনা পরিবেশিত হওয়ার ফলে বিভূতি-সাহিত্যের স্বরূপ সাধারণ পাঠকের সামনে অনুদ্‌ঘাটিত নয় আর। যে ভিত্তির উপর বিভূতিভূষণের সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, তার গভীরে অবগাহন করতে সমর্থ হয়েছে লেখকদ্বয়ের সন্ধানী মন। লেখকদ্বয় যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের আলোচনা স্পষ্ট, দুর্বোধ্যতামুক্ত। তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাগ্রন্থ দুটি পণ্ডিতমহল ও গবেষকমহলে যথেষ্ট সমাদর পাবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। প্রথম গ্রন্থটির রচয়িতা চিত্তরঞ্জন ঘোষ। প্রকাশক—বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, ২০ গ্রে স্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা মাত্র এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটির রচয়িতা গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। প্রকাশক—বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিঃ, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। দাম তিন টাকা মাত্র।

অদ্বিতীয় ঘনাদা

অল্পকাল পূর্বে পাঠক-পাঠিকার দরবারে রীতিমত আলোড়ন জাগিয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ঘনাদার গল্প" এ তথ্য সাহিত্যানুরাগীদের সুবিদিত। ছোট বড় উভয় মহলেই অভাবনীয় সমাদর লাভ করেছিল "ঘনাদার গল্প"। প্রচলিত ধাপ্পা যে বিরাট পটভূমি জুড়ে বিস্তৃত হতে পারে বা কতখানি শিল্পকলামণ্ডিত ও কল্পনাসমৃদ্ধ হ'তে পারে তার উজ্জ্বল নিদর্শন ঘনাদার গল্পগুলি। বন্ধুমহলে নানাবিধ মিথ্যাভাষণের মাধ্যমে নিজেদের জন্যে স্থায়িত্বহীন গৌরবময় এক উচ্চ আসন কথায় কথায় যাঁরা গড়ে তোলেন ঘনাদা তাঁদেরই প্রতীক। গল্পগুলির সবচেয়ে বিশেষত্ব যা চোখে পড়ল তা এই বিশ্বজোড়া পটভূমিকার উপর নানাবিধ রোমাঞ্চকর ঘটনার সমন্বয়ে যে গল্পগুলির সৃষ্টি, তাদের মূল হচ্ছে অতি সামান্য সামান্য কয়েকটি বস্তু। সামান্য একক বস্তুকে কেন্দ্র করে জগৎজোড়া পটভূমির উপর গল্পগুলি গড়ে উঠেছে। ঘনাদার গল্পে যে গল্পগুলি আমরা পড়েছি সেই জাতীয়ই আরও দু'টি গল্প (ঐ ঘনাদাকেই কেন্দ্র করে) আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ঘনাদা সিরিজের দ্বিতীয় গ্রন্থ বলে বইটিকে অভিহিত করা চলে। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরস সমান ভাবে পরিবেশন করে গেছেন বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। বইটিকে এক অত্যুজ্জ্বল সাহিত্যসৃষ্টি বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। গল্পগুলি যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের, স্বকীয়তাপূর্ণ এবং রসসমৃদ্ধ। সাবলীলতায় মনকে যথেষ্ট পরিমাণে ভরিয়ে তোলে। প্রচ্ছদচিত্রটি অপূর্ব। এর জন্যে যথেষ্ট প্রশংসার দাবী করতে পারেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—দু' টাকা মাত্র।

অগ্নিসাক্ষী

বাঙলাদেশের কথাশিল্পীদের দরবারে প্রবোধকুমার সান্যাল একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর সেবায় বঙ্গসাহিত্য বহুলাংশে উপকৃত হয়েছে। 'অগ্নিসাক্ষী' তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি করল। একটি আলোকপ্রাপ্ত, সংস্কারমুক্ত, উজ্জ্বল মেয়ের সান্নিধ্যপ্রভাবে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কার বশীভূত, ভীরু প্রকৃতির তরুণ কেমন করে ধীরে ধীরে জড়তা, অন্ধতা, কুসংস্কার ভীরুমনোভাব, পলায়নমনোবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি পেল সেই কাহিনী অভিনব দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটির মাধ্যমে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে ওঠায় গ্রন্থটি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ভাষায়, বর্ণনায়, পটভূমিকায় সব দিক দিয়ে গ্রন্থটি প্রবোধকুমারের কুশলতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষরবাহী হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

সীমন্ত সরণি

প্রতিভাধর সাহিত্যশিল্পী সুবোধ ঘোষের সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া এখনকার দিনে ধৃষ্টতারই নামান্তর মাত্র। আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁর সাম্প্রতিক সাহিত্যকীর্তি। অসংখ্য বাধাবিপত্তিরূপী আবর্জনা যখন একটি তরুণী বিধবার জীবনের চলার পথ রোধ করে দাঁড়াল এবং চোখের সামনে প্রকৃত পথ না পেয়ে সে যখন জীবনের গণ্ডীর মধ্যেই দিশাহারা হয়ে বেড়াচ্ছে তখন কেমন করে সমস্ত আবর্জনা তথা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে দিশাহারাভাব কাটিয়ে প্রকৃত পথের তথা প্রকৃত জীবনসঙ্গীর সন্ধান পেল এবং জীবনের প্রকৃত পথ অবলম্বন করে নিজেকে পূর্ণ করে তুলল, সেই কাহিনীই সুবোধ ঘোষের বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে উপন্যাসের রূপ পেয়েছে। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে নিজের বক্তব্যকে ব্যক্ত করে গেছেন লেখক অথচ তারই মধ্যে অভাবনীয় প্রকাশ নৈপুণ্যের স্বাক্ষরও তিনি রেখে গেছেন। ঘটনা পরম্পরায়, বিন্যাসে, চরিত্রসৃষ্টিতে গ্রন্থটি সর্বতোভাবে লেখকের কৃতিত্বের স্বাক্ষরযুক্ত। জয়দেব একটি অপূর্ব চরিত্রসৃষ্টি। যেমনই বৈশিষ্ট্যবান, তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। সারা গ্রন্থে কোথাও কোনরূপ জটিলতা চোখে পড়ে না। সহজ সরলভাবে মূল বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করার ফলে গ্রন্থটি মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। একাকীর জীবনজিজ্ঞাসা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের কোমল-কঠিন বৃত্তিগুলি গ্রন্থে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে লেখক বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থের নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র;

রিক্সার গান

সাহিত্যজগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী। সাহিত্যিক প্রসিদ্ধি ছাড়াও বহু জনের শ্রদ্ধা ইনি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। বহু সারবান সাহিত্যের

স্রষ্টা তিনি। এক অভিনব পটভূমিকা আশ্রয় করে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে আলোচ্য উপন্যাসটি রূপ পেয়েছে। কর্মের মধ্যেই জীবন আর জীবনের মধ্যেই কর্ম। শ্রমের মর্যাদা কথাটির সত্যতাকে বিভূতিভূষণ উপন্যাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক বলছেন যে কোন কাজই ছোট নয়, শ্রমসাপেক্ষ কর্ম কখনও ছোট হয় না। শ্রম-সাপেক্ষ কর্মে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদা কখনও নষ্ট হয় না বরং সেই ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদা আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের নায়ক একটি রিক্সাচালক। বাংলার বাইরে সে রিক্সা চালিয়ে জীবিকা অর্জন করে. রিক্সাচালকের জীবিকা গ্রহণ করে জীবনের চলার পথ সে তৈরী করে নিচ্ছে, এরই মধ্যে তার ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধেও যথাযথ আলোকপাত করা হয়েছে। হাসি, কান্না, ঘাত, প্রতিঘাত, অনুভূতি, প্রেম প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি পরিপূর্ণ মানুষের আলেখ্য বিভূতিভূষণের দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসটি কালোপযোগী এর আবেদন হৃদয়ে রেখাপাত করে, লেখকের বক্তব্য যেমনই বলিষ্ঠ তেমনই স্পষ্ট। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

চুলচেরা শোধবোধ

শিশুদের সাহিত্যজগতে শিবরাম চক্রবর্তী একটি অবিস্মরণীয় নাম। ছোটদের আসরে শিবরাম চক্রবর্তীর প্রভাব অমলিন, বিশেষ করে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর যেন নিবিড় যোগ। সবদিক দিয়ে তিনি শিশুদের মনের মানুষ। তাঁর রচনার মধ্যে শিশুরা নিজেদেরই দেখতে পায়, নিজেদের কথাই যেন শুনতে পায়, তাদের ছোট মনের ধ্যান ধারণা, চিন্তা কল্পনা ছোটদের উপযোগী গল্পে ফুটিয়ে তোলায় অনবদ্য ক্ষমতা শিবরাম চক্রবর্তীর অধিকারভুক্ত। বর্তমানে তাঁর কয়েকটি ছোট গল্প একত্রে সংকলিত হয়ে উপরোক্ত শিরোনামায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ছেলেমেয়েরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করবে গল্পগুলির মাধ্যমে, গল্পগুলি প্রত্যেকটিই হাস্যরসাশ্রিত। যে রস পরিবেশনে শিবরামের দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত, রচনার প্রসাদগুণে প্রতিটি গল্প পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম দু'টাকা মাত্র।

হাসির গল্প

সাধারণতঃ গল্প উপন্যাস লেখক হিসেবে পাঠকসমাজে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় পরিচিত হলেও সরস গল্প রচনাতেও যে তাঁর লেখনী অপটু নয়—এতথ্য অনেকেরই সুবিদিত। প্রবীণ কথাশিল্পী অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি হাসির গল্প একত্রে সংকলিত হয়ে উপরোক্ত গ্রন্থের রূপ নিয়েছে। গল্পগুলি নিছক হাসির গল্প বললে তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না—হাসির আড়ালে অনেক চিন্তার খোরাক পরিবেশন করে গেছেন দক্ষ সাহিত্যিক। গল্পগুলি বিদ্রূপাত্মক লেখাগুলির মধ্যে আজকের সমাজকে খুঁজে পাওয়া যায়—লেখক তাঁর দরদী অনুভূতি সম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় প্রত্যেক পাতায় পাতায় রেখে গেছেন। গল্পগুলির মধ্যে একাধারে আনন্দদান অন্যদিকে চিন্তার খোরাক পরিবেশন করে লেখক যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

তীরভূমি

শক্তিমান কথাশিল্পিরূপে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজকের দিনের পাঠক পাঠিকা মহলে সুপরিচিত। এক অবসরপ্রাপ্ত পাইলটের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি লিখিত। নায়কের দুই স্ত্রীই জীবিত—প্রথমা শ্বেতাঙ্গিনী—দ্বিতীয়া এদেশিনী। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না নিয়ে যে বিরাট দেনা-পাওনার সৃষ্টি তারই হিসাব মেলাতে নিমগ্নচিত্ত উপন্যাসের প্রধান পুরুষ সুধীর মুখোপাধ্যায়। শ্বেতাঙ্গিনী সুজাতা তার মেয়ে সোমাবুকে তার পিতৃভূমি ভারতবর্ষ হওয়ায় কেমন করে পরিপূর্ণ ভারতীয় আদর্শে তার জীবন গড়ে তুলল সে সম্পর্কে সুন্দর একটি আলেখ্য পরিবেশন করে গেছেন শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃষিত পিতৃহৃদয়ও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য পাঠক-সাধারণকে আকৃষ্ট করবে। বর্ণনভঙ্গী মনোরম, পটভূমিকার অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

নীলাঞ্জনছায়া

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনী উপন্যাস রচনার মতই গল্প রচনাতেও সমনিপুণ। তাঁর এতীব সুখপাঠ্য আটটি ছোট গল্প একত্রে সংকলিত হয়ে উপরোক্ত শিরোনামায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি, খুঁজে ফেরা আলো, রাণীগলির একটি রাত্রি, সেই অচেনা মেয়েটির, নীলাঞ্জনছায়া, একটি ধানের শীষ, প্রেম ও সূর্যাপুত্র সাবর্নি শীর্ষক গল্পগুলি গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে। গল্পগুলি বৈশিষ্টপূর্ণ, উপভোগ্য, এবং চিত্তাকর্ষক। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব সাধুবাদার্হ। চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ রচনায় এবং পরিবেশ গঠনে লেখক যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

প্রবেশ নিষেধ

চিত্রামোদীদের কাছে এ তথ্য সুপ্রচারিত যে, বাঙলা মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে প্রবেশ নিষেধও একটি। সেই ছবিটির কাহিনী বর্তমানে নাটকাকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। নাটকটিতে আজকের দিনের মধ্যবিত্ত সমাজের একটি আভ্যন্তরীণ চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মধ্যবিত্তদের আজকের দিনের পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যে কত বড় একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের রূপ নিয়েছে নাট্যকার সেই দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মধ্যবিত্তদের জীবনে আজকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা যেমনই বাস্তব তেমনই ভয়াবহ। তারই স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন নাট্যকার এই নাটকের মাধ্যমে। নাটকটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সকল দিক দিয়েই নাট্যকার মিহির সেনের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, দরদী মনোভাব এবং সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় বহন করছে। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

আগামী শীর্ষ-সম্মেলনের পটভূমি—

আরও একটি বৎসর চলিয়া গেল, আরম্ভ হইল নূতন আর একটি বৎসর। বার্লিণ-সমস্যা লইয়া আর একটি মহাযুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল ১৯৫৯ সাল। কিন্তু বৎসরের শেষে আর একটি শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। নূতন ১৯৬০ সালে শীর্ষ-সম্মেলনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে—এই আশার মধ্যে আরম্ভ হইল নূতন বৎসর। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভায় শীর্ষ-সম্মেলনের পর ১৯৬০ সালের বসন্তকালে আবার শীর্ষসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। প্যারীর Elysee প্রাসাদে এবং Rambonillet-এ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং পশ্চিম-জার্ম্মানী—পশ্চিমীশিবিরের এই চারিটি বৃহৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ গত ১৯শে হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া যে সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শীর্ষ-সম্মেলন অন্যতম। এই পশ্চিমী চতুঃশক্তি সম্মেলন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর সহিত শীর্ষ-সম্মেলনে সমবেত হওয়া সম্পর্কে একমত হইয়াছেন। এই শীর্ষ-সম্মেলন আগামী ২৭শে এপ্রিল আরম্ভ হওয়ার প্রস্তাব করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার, জেনারেল দ্যগল এবং মিঃ ম্যাকমিলান মঃ ক্রুশ্চেভের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। সোভিয়েট ইউনিয়নও বসন্তকালে শীর্ষসম্মেলনে যোগদানের জন্য পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে। শুধু সম্মেলনের তারিখ সম্বন্ধে রাশিয়া স্বতন্ত্র প্রস্তাব করিয়াছেন। শীর্ষ-সম্মেলনের প্রথম বৈঠক ২১শে এপ্রিল অথবা ৪ঠা মে আরম্ভ হওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। তারিখ সম্পর্কে একটা মীমাংসা সহজেই হইবে। কিন্তু এই শীর্ষ-সম্মেলনের ফলে আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ কতখানি প্রশস্ত হইবে, তাহা লইয়া গবেষণা করা নিষ্প্রয়োজন। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভায় চারি বৃহৎ রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন বিশ্বশান্তি সম্পর্কে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। এই আশা সুদৃঢ় হয় ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানীন এবং রুশ কমুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী মঃ ক্রুশ্চেভের বিলাত ভ্রমণে। মার্শাল টিটোর রাশিয়া ভ্রমণ এবং উহারই প্রাক্কালে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলটভের পদত্যাগও বিশ্বশান্তির অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করিয়াছিল। আর একদিকে নিরপেক্ষতা-নীতির ক্রম প্রসারের ফলেও শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। এশিয়া-আফ্রিকারাষ্ট্র গোষ্ঠীর সংহতিও ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইতেছিল। কিন্তু মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজখাল রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর মোড় আকস্মিক ভাবে ঘুরিয়া গেল।

পোল্যাণ্ডের বিক্ষোভের কথাও এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন। পোল্যাণ্ডের সঙ্কট কাটিতে না কাটিতেই হাঙ্গেরীতে আরম্ভ হয় ব্যাপক রক্তাক্ত অভ্যুত্থান। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক মিশর আক্রমণ আন্তর্জ্জাতিক আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। পোল্যাণ্ডে বিক্ষোভ, হাঙ্গেরীতে প্রতিবিপ্লব বৃটেন ও ফ্রান্সের মিশর আক্রমণের সম্মুখে ম্লান হইয়া গিয়াছিল। মিশর আক্রমণ করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স অবলোত করিলেও আন্তর্জ্জাতিক চাপে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পোর্ট সৈয়দ হইতে সৈন্য অপসারণের হীনতা স্বীকার করিতে হয়। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং নেহরু-আইক আলোচনা যখন নূতন আশার সঞ্চার করিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরেই ১৯৫৭ সালের ৫ই জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার মধ্যপ্রাচীর রাষ্ট্রগুলির আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্যনিয়োগের এক পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। উহা আইসেনহাওয়ার ডক্‌ট্রিন নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতাকেই শুধু বৃদ্ধি করে নাই, উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই অবস্থার মধ্যে আরম্ভ হয় ১৯৫৭ সাল। এই বৎসর ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই বৎসরই বৃহৎ চারিরাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে আর একটি সম্মেলন হইতে পারে, এইরূপ একটা আশারও সঞ্চার হয়। এপ্রিল (১৯৫৭) মাসে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলিয়াছিলেন যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহা ১৯৪৫ সাল অপেক্ষাও আশাপ্রদ। মিঃ ডালেস বলিয়াছিলেন, নিরস্ত্রীকরণ, তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির প্রতি ব্যবহার এবং জার্ম্মাণীকে ঐক্যবদ্ধ করণ সম্পর্কে রাশিয়া কি করিতে প্রস্তুত তাহারই উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে নূতন সম্মেলন আহ্বান করা নির্ভর করিতেছে। তদানীন্তন রুশ প্রধান মন্ত্রী বুলগানীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের নিকট যে ব্যক্তিগত পত্র দেন, তাহাও শীর্ষ-সম্মেলন সম্পর্কে আশার সঞ্চার করে। কিন্তু ১৯৫৭ সাল এবং ১৯৫৮ সালে এই আশা আলেয়ার আলোর মত ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতে থাকে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রথম স্পুটনিক মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। ইহার একমাস পরেই রাশিয়ার দ্বিতীয় স্পুটনিক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। উহার সামরিক তাৎপর্য্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৫৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোন কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করিতে পারে নাই। ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী প্রথম এক্সপ্লোরার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। প্রথম ভেনগার্ড ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ্চ মহাকাশে প্রেরিত হয়। ন্যাটোর বৈঠকের শেষে ৩রা মে (১৯৫৭) যে চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয় তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আটলাণ্টিক মৈত্রীর বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ হইলে তাহার সম্মুখীন হওয়ার জন্য যাহাতে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা

অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্যে ১৯৫৭ সালের শেষ হয়, ১৯৫৮ সালেও উহার তীব্রতা হ্রাস পায় নাই। ১৯৫৮ সালের যে সকল ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তন্মধ্যে ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল, লেবাননে মার্কিণ সৈন্য ও জর্ডানে বৃটিশ সৈন্য অবতরণ এবং ফ্রান্সে জেনারেল দ্য গলের সর্ব্বময় ক্ষমতা লাভ, কুময় দ্বীপপুঞ্জে চীনের গোলাবর্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলি যে ঠাণ্ডা যুদ্ধকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিবার আশঙ্কা বৃদ্ধি করে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্যান আরব গঠনের প্রচেষ্টায় মিশরের প্রেসিডেণ্ট আবদুল জামাল নাসেরের উদ্যোগে ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৫৮) মিশর ও সিরিয়াকে সংযুক্ত করিয়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ২রা মার্চ (১৯৫৮) ইয়েমেনও উহাতে যোগদান করে। উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ইরাক ও জর্ডান লইয়া ফেডারেশন গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইরাকে ঘটনার স্রোত অন্যরূপে প্রবাহিত হইল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল করিম এল কাসেমের নেতৃত্বে ১৪ই জুলাই (১৯৫৮) যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাহাতে ইরাকের রাজা দ্বিতীয় ফৈজল এবং যুবরাজ নিহত হন, প্রধানমন্ত্রী নুরী এস সৈয়দ স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া পলায়ন করেন। ব্রিঃ জেঃ কাসেমের নেতৃত্বে ইরাকে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরদিনই অর্থাৎ ১৫ই জুলাই লেবাননে মার্কিণ সৈন্য অবতরণ করে। ১৭ই জুলাই দুই হাজার বৃটিশ সৈন্য জর্ডানে অবতরণ করে। মধ্যপ্রাচী একটি বারুদস্তূপে পরিণত হয়। ফ্রান্সে জেনারেল দ্য গলের ক্ষমতা লাভ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সের পঞ্চবিংশতিতম প্রধানমন্ত্রী মঃ ফ্লিমলিন প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৪ই মে (১৯৫৮) বলেন যে, "আমরা বোধহয় এক গৃহযুদ্ধের কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।" ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার এই উক্তির কয়েকঘণ্টা পূর্ব্বে আলজিরিয়াস্থিত ফরাসী সামরিক অফিসারগণ অসামরিক কর্তৃপক্ষের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লয় এবং ফ্রান্সেও সামরিক অভ্যুত্থান প্রসারিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। আলজিরিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃবর্গ দাবী করেন যে, জেঃ দ্য গল ফ্রান্সের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করুন। তিনি তাহাতে সম্মত হন। সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ জেঃ দ্য গলকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। অতঃপর জেঃ দ্য গল যে নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করেন তাহা ২৮শে সেপ্টেম্বর বিপুল গণভোটে গৃহীত হয়। এই প্রসঙ্গে অক্টোবর মাসে (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাও উল্লেখযোগ্য। ৮ই অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট মীর্জ্জা শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া সামরিক শাসন কায়েম করেন এবং জেঃ আয়ুব খাঁ প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত হন। অতঃপর প্রেঃ মীর্জ্জা নিজেই বিতাড়িত হন এবং জেঃ আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট হন। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৮) ব্রহ্মদেশে প্রধান মন্ত্রী উ নু পদত্যাগ করেন এবং জেঃ নে উইন কর্ত্তৃক নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের কথাও এখানে স্মরণীয়। ১৭ই নভেম্বর (১৯৫৮) সুদানী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইব্রাহিম আবুদ সুদানের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। কয়েকটি দেশে সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ১৯৫৮ সালের তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া অবশ্য অনুমান করা সহজ নয়, কিন্তু ১৯৫৮ সালের শেষার্দ্ধে সুদূর প্রাচ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ যে কুময় ও মাৎসু দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুময় ও মাৎসু দ্বীপপুঞ্জ চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে ৫ মাইল দূরে ফরমোসা প্রণালীতে অবস্থিত। এই দ্বীপ দুইটি ফরমোসার চিয়াং সরকারের অধীনে রহিয়াছে। চিয়াংয়ের ১০ হাজার সৈন্য কুময় দ্বীপে অবস্থিত। অর্থাৎ চিয়াংয়ের সৈন্যবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশই এই দ্বীপে রাখা হইয়াছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। এই দ্বীপ হইতে আক্রমণ করিয়া পুনরায় চীন দখল করার স্বপ্ন চিয়াং কাইশেকের আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফরমোসা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। এই দায়িত্বের মধ্যে কুময় দ্বীপপুঞ্জ পড়ে কি না, তাহা সুনির্দ্দিষ্টভাবে বলা হয় নাই। কম্যুনিষ্ট চীন ফরমোসা দ্বীপ চীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করে। ১৯৫৮ সালের ২৮শে আগষ্ট হইতে চীন কময় দ্বীপের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করায় অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ফরমোসা প্রণালীতে নৌশক্তি বৃদ্ধি করে। কিন্তু কুময় লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহা কি চীন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেহই চায় নাই। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৮) আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা সুরু হয়। মীমাংসা হয় নাই বটে, সুদূরপ্রাচ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা প্রশমিত হয়।

১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালের উল্লিখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক। ১৯৫৭ সালের শেষভাগ হইতেই সোভিয়েট রাশিয়া শীর্ষ-সম্মেলনের দাবী করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন সুনির্দ্দিষ্ট ফল পাওয়া না গেলে পশ্চিমী শক্তিবর্গ শীর্ষ-সম্মেলনে সম্মত নহে। এইরূপ অবস্থায় ২৭শে নভেম্বর (১৯৫৮) রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভ পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিকট এক নোটিশ প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন যে,

ছয় মাসের মধ্যে বার্লিন শাসন পরিচালনা সম্পর্কে চুক্তি হইতে রাশিয়া সরিয়া যাইবে, যোগাযোগের সমস্ত ব্যবস্থার ভার অর্পণ করিবে পূর্ব্বজার্ম্মানীর সরকারের হাতে। রাশিয়া আরও প্রস্তাব করে যে, ইঙ্গমার্কিণ ফরাসী নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিম বার্লিনকে অসামরিক স্বাধীন নগরীতে পরিণত করিতে হইবে। ইহা লইয়া আবার ঠাণ্ডাযুদ্ধ উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ পররাষ্ট্র সচিব পর্য্যায়ে সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। রাশিয়া তাহা অগ্রাহ্য করে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৯) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান আমন্ত্রিত হইয়া রাশিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি রাশিয়াকে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে যোগদানে সম্মত করাইতে সমর্থ হন। শীর্ষ-সম্মেলনের উদ্দেশ্য লইয়া এই সম্মেলন হইবে, ইহাও স্থির হয়। ১৫ই মে (১৯৫৯) পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন আরম্ভ হয়, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়াই এই সম্মেলনের অবসান হয়। এই সম্মেলন চলিতে থাকা অবস্থায় মার্কিণ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডালেসের মৃত্যু হয় এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রত্যক্ষভাবে মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫৯ সালে রুশ সহকারী প্রধানমন্ত্রী মঃ মিকোয়ান এবং কোজলভ মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান। মার্কিণ সহকারী প্রেসিডেণ্ট নিক্সন রাশিয়া সফরে গিয়াছিলেন। এই যাতায়াত ও আলোচনার ফলে মিঃ ক্রুশ্চেভের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরের পথ প্রশস্ত হয় এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৯) তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। আইক-ক্রুশ্চেভ আলোচনা এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলনের চেষ্টায় শীর্ষ সম্মেলন হওয়া সম্পর্কে আমেরিকা সম্মত হয়। জেঃ দ্যগল উহার পথে যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন প্যারীতে গত ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমী চতুঃশক্তির সম্মেলনে তাহা অপসারিত হইয়াছে।

আগামী বসন্তকালে শীর্ষ-সম্মেলন হইবে। কিন্তু এই সম্মেলনে প্রধানতঃ নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে। এই সম্মেলনে বার্লিণ সমস্যা আলোচিত হইতে ডাঃ এডেন্যুরের আপত্তি। একটি শীর্ষ-সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা, বার্লিণ সমস্যা, সমস্তই আলোচিত হইতে পারিবে ইহা আশা করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য একাধিক শীর্ষ সম্মেলন প্রয়োজন। আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনেই যে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, ইহাও আশা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এইরূপ সম্মেলন ঠাণ্ডাযুদ্ধের প্রকোপ হ্রাস করিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করিবে, ইহাই আশা করা যাইতে পারে। গত ২১শে ডিসেম্বর (১৯৫৯) বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র দূতগণ আগামী ১৬ইমে (১৯৬০) প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের নিকট পেশ করিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট আইকের শুভেচ্ছা ভ্রমণ—

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফর এবং প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎকারের মতই মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের এগারটি দেশ ভ্রমণ ১৯৫৯ সালের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের ভ্রমণের দৃষ্টান্ত খুব বিরল বলিয়াই প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের এই ভ্রমণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। বোধ হয় প্রেসিডেণ্ট ট্যাফ্‌ট্‌-ই সর্ব্বপ্রথম মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তের বাহিরে গিয়াছেন। তিনি ১৯০৯ সালের ১৬ই অক্টোবর মেক্সিকোর রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন। মার্কিণ প্রেসিডেণ্টদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে গিয়াছেন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন। মার্কিণ প্রেসিডেণ্টদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন বোধ হয় প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। নয় বৎসরে তিনি ১৫টি দেশে গিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান পট্সডাম সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য ইউরোপে গিয়াছিলেন। গত ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এগারটি দেশ ভ্রমণ করায় তিনি যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভ্রমণকারী মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট হইলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫৯) তিনি ওয়াশিংটন হইতে যাত্রা করেন এবং রোম, আঙ্কারা, করাচী এবং কাবুল হইয়া ৯ই ডিসেম্বর তিনি ভারতের রাজধানী দিল্লীতে আগমন করেন। ১৪ই ডিসেম্বর তিনি ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং তেহরাণ, এথেন্স, টিউনিশিয়া হইয়া তিনি প্যারীতে যান। প্যারীতে পশ্চিমী চতুঃশক্তির সম্মেলনে যোগদান করিয়া রাবাত হইয়া তিনি ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ১৯৫৫ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ-সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বারমুডায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের সহিত তাঁহার সম্মেলনও উল্লেখযোগ্য। গত আগষ্ট মাসে (১৯৫৯) তিনি প্যারীতে, বনে এবং লণ্ডনে গিয়াছিলেন।

ভারত তথা বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এগারটি দেশে শুভেচ্ছা ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের ফলে ভারতে একটা বিক্ষুব্ধ মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাক্তন মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ জন ফষ্টার ডালেস পৃথিবীকে যুদ্ধের কিনারায় আনিবার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকা যদিও সামরিক জোট গঠনের নীতি ত্যাগ করে নাই, তবু শীর্ষ-সম্মেলনের জন্য উদ্যোগী হইয়া পৃথিবীকে যুদ্ধের কিনারা হইতে সরাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা প্রেঃ আইক করিতেছেন। তিনিও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ মীমাংসার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ভারতে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যদের যুক্ত অধিবেশনে সেই কথাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অস্ত্রসজ্জার সমর্থনও তিনি করিয়াছেন, বলিয়াছেন—বৃহৎ সামরিক শক্তিপুষ্ট এক বিজাতীয় মতবাদ হইতে উদ্ভূত এক আক্রমণাত্মক অভিপ্রায় প্রতিরোধের জন্য অস্ত্রসজ্জার আয়োজন করা হইয়াছে। কিন্তু অস্ত্রসজ্জার যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহার পরিণতি বোধ হয় তিনিও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের যুগে একান্ত প্রয়োজন।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ১১ই ডিসেম্বর সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। চীন সম্পর্কেও সাধারণ ভাবে আলোচনা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি-ভবনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ মার্কিণ রাষ্ট্রপতিকে গজদন্ত ও চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত কতকগুলি উপহার প্রদান করেন। উপহারগুলির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার গজদন্ত নির্ম্মিত রথের কারুকার্য্যের প্রশংসা করিতেছেন।

কিন্তু কাশ্মীর তাঁহাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয় নাই। চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যদি নেহরুজীর নীতির বাহিরে যাইতে না চান, তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। নেহরুজীকে সামরিক জোটে যোগদান করাইতে সম্মত করা সম্ভব নয়। প্রকাশ যে, রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়াছিলেন, তখন আসন্ন শীর্ষ-সম্মেলনের স্বার্থে ভারত-চীন বিরোধকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আওতায় টানিয়া না আনিতে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং মঃ ক্রুশ্চেভ নাকি একমত হইয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত ভ্রমণের শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, চারিদিন ধরিয়া আলোচনার সময় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুকে জানান যে, তিনি যে সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন সেই সকল দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁহার নিকট এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্যা যে ধরণেরই হউক না কেন, শান্তিপূর্ণ আপোষের পদ্ধতিতে উহার সমাধান করা যাইতে পারে।.....ইহা আশাপ্রদ এবং তাঁহার নিজের চিন্তাধারার সহিতও ইহাতে পূর্ণ-সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত দর্শনের ফলে ভারত-মার্কিণ সম্পর্কের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ—

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৫৯ সালের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে: একটি ঠাণ্ডা যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস এবং আর একটি চীন কর্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন। ১৯৫৮ সালের শেষ ভাগে বার্লিন সমস্যা লইয়া যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৫৮) রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ গ্রোমিক সুপ্রীম সোভিয়েটের যুক্ত বৈঠকে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "Berlin question will unleash a big world-war if our proposals are not accepted by the Western Powers" অর্থাৎ 'পশ্চিমী শক্তিবর্গ যদি বার্লিন সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বার্লিন সমস্যা হইতে একটি বৃহৎ বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে।' তিনি বার্লিন সমস্যাকে সারাজেভো (Sarajevo) ঘটনার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। সারাজেভোতে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হওয়ায় প্রথম বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৫৯ সালে বার্লিন সমস্যা সমাধানের পথের কোন সন্ধান পাওয়া না গেলেও আর একটি শীর্ষ-সম্মেলন হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পাইয়াছে। চীন কর্তৃক ভারতের সীমানা লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত তিব্বত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে

একথা মনে করিলে বোধ হয় খুব বেশী ভুল হইবে না। তিব্বতে খাম্পাদের বিদ্রোহের সংবাদ ১৯৫৯ সালের প্রথম ভাগে বিলাতী সংবাদপত্র সমূহে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই। মার্চ্চ মাসে (১৯৫৯) আমরা সর্ব্বপ্রথম একথা জানিতে পারি। গত ২৩শে মার্চ্চ প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু তিব্বতের হাঙ্গামা সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই হাঙ্গামার পরিস্থিতিতে দলাইলামা ভারতে আগমন করেন এবং ভারত সরকার তাঁহাকে আশ্রয়দান করেন।

তিব্বতের ঘটনাবলীতে ভারতে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এখানে আমরা পাইব না। এই বিক্ষোভের ফলে চীন-ভারত মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর ফলে সীমান্ত লইয়া ভারত ও চীনের মধ্যে যে গুরুতর বিরোধ সৃষ্টি হয়, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আগষ্ট মাসের শেষভাগে আমরা সর্ব্বপ্রথম চীনা সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক ভারতীয় সীমানা লঙ্ঘন এবং নেফায় (উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী) খাম্বাদের সহিত তাহাদের গুরুতর সংঘর্ষের কথা আমরা জানিতে পারি। গত ২৮শে আগষ্ট (১৯৫৯) প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারতের নেফা অঞ্চলের ভারতীয় রক্ষা-ঘাঁটিতে চীনা সৈন্যরা হামলা করিয়াছে এবং লাডাকে সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া চীন ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পুনরায় চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায়। এই সংঘর্ষে একজন ভারতীয় নিহত হয়। চীন ভারত সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু পার্লামেন্টে এক শ্বেতপত্র পেশ করেন। চীন ভারত সীমান্ত সম্পর্কে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই এবং পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে যে সকল পত্রালাপ হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নাই। গত অক্টোবর মাসে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু চীনের প্রধান মন্ত্রীকে এক পত্রে জানাইয়া দেন যে, ম্যাকমোহন লাইনই চীন ও ভারতের সীমা-রেখা। তিনি আরও জানাইয়া দেন যে, আগে সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে, তারপর সীমান্ত বিরোধের আলোচনা করা হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে সীমান্ত বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। দক্ষিণ লাডাকে চীনা সৈন্যের আক্রমণে নয় জন টহলদারী পুলিশ নিহত হয়। এই সংবাদ ২৩শে অক্টোবর আমরা জানিতে পারি।

উল্লিখিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও চীনের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে যে পত্রালাপ হয়, সে সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে মাত্র। চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ৭ই নভেম্বর (১৯৫৯) তারিখের পত্রে নেহরু-চৌ বৈঠকের জন্য প্রস্তাব করেন। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে সীমান্ত সংঘর্ষ বাহাতে না ঘটে তাহার জন্য দুই দেশেরই সৈন্যদল সীমান্ত এলাকা হইতে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বার মাইল সরাইয়া নেওয়ারও প্রস্তাব তাঁহার পত্রে করা হয়। নেহরুজী ঐ পত্রের উত্তরে নেহরু-চৌ বৈঠকে সম্মতি প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু সীমান্ত এলাকা হইতে উভয় দেশের সৈন্য ২০ কিলোমিটার সরাইয়া নেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া উহার পরিবর্ত্তে একটি প্রস্তাব করেন। চীন-ভারত সীমান্তের লাডাক অঞ্চল সম্বন্ধে তিনি প্রস্তাব করেন যে, চীনের মানচিত্রে আন্তর্জ্জাতিক সীমারেখা বলিয়া যাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার পশ্চিমে ভারতীয় বাহিনীকে সরাইয়া আনিতে নেহরুজী স্বীকৃত আছেন, কিন্তু ভারতীয় মানচিত্রে যে আন্তর্জ্জাতিক সীমারেখা দেখানো হইয়াছে, চীনা সৈন্যবাহিনীকে তাহার পূর্ব্বে সরাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে চীনের স্বীকৃত সীমারেখা এবং ভারতের স্বীকৃত সীমারেখার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল no man's land-এ পরিণত হইবে। নেহরুজী ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, চীনা সৈন্য যতদিন লংজু দখল করিয়া থাকিবে ততদিন কোন ব্যবস্থাতেই ভারত রাজী হইতে পারে না। সেই সঙ্গে তিনি উভয় দেশের সীমান্ত ঘাঁটি হইতে অগ্রগামী টহলদারবাহিনী প্রেরণ বন্ধ করার প্রস্তাবও করিয়াছেন। চীনের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ১৮ই ডিসেম্বরের পত্রে অগ্রগামী টহলদারবাহিনী প্রেরণের প্রস্তাবই শুধু গ্রহণ করিয়াছেন। লংজু ও লাডাক সংক্রান্ত প্রস্তাব কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বন্দী ভারতীয় পুলিশের উপর অত্যাচারের কথাও পত্রে অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি এই পত্রে ২৬শে ডিসেম্বর চীনের কোনও স্থানে বা রেঙ্গুণে সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য নেহরু-চৌ বৈঠকের প্রস্তাব করেন। তাঁহার এই পত্র পাওয়ার পূর্ব্বে লাডাকে ধৃত ভারতীয় পুলিশবাহিনীর উপর চীনাদের অত্যাচার সম্পর্কে শ্রীকরম সিং-এর বিস্তৃত বিবৃতি গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু লোক সভায় পেশ করেন। এই বিবৃতিতে অসহায় বন্দীদের উপর অত্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। ২৬শে ডিসেম্বর নেহরু-চৌ-বৈঠকের জন্য মিঃ চৌ এন লাই যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, আলাপ-আলোচনা দ্বারা মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবনের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু তথ্য সম্বন্ধে যেখানে এত মতানৈক্য সেখানে নীতি বিষয়ে মীমাংসা হইতে পারে না।

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের পরিণতি কি হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। চীন হয়ত আর ভারতীয় এলাকা আক্রমণ বা অনুপ্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে না। কিন্তু আর যদি আক্রমণ না করে তাহা হইলেও চীন যে সকল স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে সেগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে? কাশ্মীরের অর্দ্ধাংশ যেমন পাকিস্তানের দখলে রহিয়াছে, চীন যে সকল ভারতীয় এলাকা দখল করিয়াছে সেগুলিও হয়ত তেমনি মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত চীনের দখলেই থাকিয়া যাইবে। আন্তর্জ্জাতিক বৃহৎ শক্তিবর্গও যুদ্ধের পথ ছাড়িয়া আলাপ-আলোচনার পথই গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা করিতে চায়। চীনও আলাপ-আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু আলোচনার আবহাওয়া এখনও সৃষ্টি হয় নাই।

সিংহল কোন্ পথে—

সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ সলোমন বন্দরনায়ক গত ২৫শে সেপ্টেম্বর আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়া তৎপর দিন পরলোক গমন করার পর তাঁহার হত্যাকাণ্ডকে ঘেরিয়া যেমন এক গভীর রহস্যজালের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে তেমনি সিংহলের

রাজনীতিও ডিকটেটরশিপের পথে চলিয়েছে, এইরূপ আশঙ্কা করিবারও যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। মিঃ বন্দর নায়ক নিহত হওয়ায় সঙ্গে সিংহলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্তের তথ্য সংবাদ প্রকাশ সম্বন্ধেও সেন্সর প্রথা প্রবর্ত্তন করা হয়। শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়ক সিংহলের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। এদিকে বন্দরনায়কের হত্যাকাণ্ডের সহিত যে গভীর রহস্য জড়িত আছে, তাহা ক্রমে বুঝা যাইতে লাগিল। সিংহলের মন্ত্রিসভায় একমাত্র মহিলা মন্ত্রী শ্রীমতী বিমলা বীজ বর্দ্ধনকে প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীর আসন হইতে অপসারিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই সংবাদ সম্পর্কে সেন্সরের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। অতঃপর গত ১১শে নভেম্বর (১৯৫৯) শ্রীমতী বিমলা বীজবর্দ্ধন এবং তৎকালীন অর্থমন্ত্রী মিঃ ষ্টানলী ডি জয়সার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মিঃ ডিক ডি জয়সাকে পুলিশ বন্দরনায়কের হত্যাসম্পর্কে গ্রেফ্‌তার করে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্ব্বে যে পাঁচজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা হয়, তাহাদের মধ্যে কোনিয়াস্থিত ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান ধর্ম্মযাজক বেভারেণ্ড বুদ্ধরক্ষিত থেরো অন্যতম। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীজয়সা ইন্দোনেশিয়ায় গিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার মন্ত্রিসভায় থাকার বিরোধিতা করায় তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সিংহলের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী দলগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী দহনায়কের পদত্যাগ এবং পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন সে সম্বন্ধে ভরসা করা কঠিন ছিল। এমন কি সিংহলের যে-তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কিছুমাত্র একমত হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারাও মিঃ দহনায়কের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীদহনায়কের কৌশলের সম্মুখে সবই ব্যর্থ হইয়া গেল।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কয়েকদিন পরেই মিঃ দহনায়ক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিন মাসের মধ্যে তিনি সিংহলবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়া দিবেন। তিনি যে তাহা করিতে পারিয়াছেন ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। বিরোধীদলগুলি পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী করিয়াছিলেম। তাঁহারা হয়ত মনে করিয়াছিলেন পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলে মিঃ দহনায়কের প্রধানমন্ত্রিত্বও আর থাকিবে না। কিন্তু মিঃ দহনায়কের পরামর্শ অনুসারে গবর্ণর জেনারেল গত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৫৯) পার্লামেণ্ট বাতিল করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু মিঃ দহনায়ক প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিলেন না। পার্লামেণ্ট বাতিল করার সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশ অবশ্য জারী করা হইয়াছে যে, আগামী ১৯শে মার্চ্চ (১৯৬০) সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে এবং নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবে ৩০শে মার্চ্চ। অতঃপর ৭ই ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতায় আসীন দল শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির সহিত তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানান যে, তিনি একটি নূতন দল গঠন করিবেন। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি অবশ্য তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে পার্লামেণ্ট বাতিল হওয়ায় তিনি পার্লামেণ্টের ক্ষমতার আওতা হইতে মুক্ত হইয়াছেন। দল হইতে বহিষ্কৃতই হউন আর দলের সহিত সম্পর্কই ছিন্ন করুন, ফল উভয় ক্ষেত্রেই সমান। অর্থাৎ তিনি দলের ক্ষমতার আওতার বাহিরে চলিয়া গেলেন। ইহার পর ৯ই ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়, মন্ত্রিসভার পাঁচজন বিদ্রোহী মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত করা হইয়াছে এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাঁহাকে পুনরায় মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে মন্ত্রিসভাতেও তাঁহার একছত্র কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তিনি কি করিবেন, ইহা-ই প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তিনি কি গবর্ণর-জেনারেলের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন, না সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন, না নিজেই ডিক্টেটর হইবেন, তাহা বলা কঠিন। তিনি যদি নিজেই ডিক্টেটর হইয়া বসিতে চান তাহা হইলে সিংহলে গৃহযুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে।

বৎসরের সেরা মানুষ—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'টাইম ম্যাগাজিন' এবার প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে বৎসরের সেরা মানুষ (man of the year) নির্ব্বাচন করিয়াছেন। উক্ত পত্রিকার বর্ষান্ত সংখ্যায় বলা হইয়াছে— ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা পরিভ্রমণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সর্ব্বাধিক পরিজ্ঞাত এবং সর্ব্বাধিক আদৃত হইয়াছেন। সাময়িক পত্রিকাখানি ১৯২৭ সাল হইতে প্রতিবৎসর বৎসরের সেরা মানুষ (man of the year) নির্ব্বাচন করিয়া আসিতেছেন। এই পত্রিকা ১৯৩৮ সালে হিটলারকে বৎসরের সেরা মানুষ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। স্যার উইন্‌ষ্টন চার্চ্চিল ১৯৪০ সালে এবং ১৯৪৯ সালে পৃথিবীর সেরা মানুষ নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। এই পত্রিকা ১৯৫৮ সালে মঃ ক্রুশ্চেভকে সেরা মানুষ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এবারে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সেরা মানুষ নির্ব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান, ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য-গল এবং পশ্চিম জার্ম্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেন্যুর হইয়াছেন 'রাণার্স আপ্‌।'
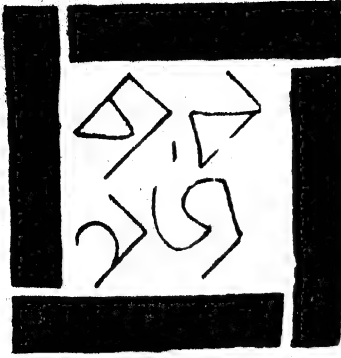
শ্রীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জী

[প্রাচ্যশাস্ত্রবিদ ও গবেষক]

সমগ্র জীবন ধরেই চলেছে এঁর জ্ঞানচর্চা ও প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে নিবিড় গবেষণা। অশীতিপর বৃদ্ধ এই পণ্ডিত মানুষটিকে দেখলে সেজন্যে আপনি শ্রদ্ধাভাব জাগে। বলতে কি, শ্রীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জী নিজেই যেন একটি মস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

১৮৭২ সালে বীরভূম জেলায় এই পণ্ডিতপ্রবর জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূমে জন্ম হলেও এঁর ছাত্রজীবনের প্রারম্ভিক বছরগুলো কাটে মুর্শিদাবাদের জেমো ও কান্দীতে। জেমো ও কান্দীর যে বিদ্যালয়ে বালক জগদীশচন্দ্রের পড়াশুনো হয়, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও

শ্রীজগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জী

ছিলেন সেখানকারই একজন ছাত্র। তবে রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্যালয়ে এঁর চেয়ে বছর খানেকের সিনিয়র ছিলেন।

মুর্শিদাবাদের কান্দী ও জেমোতে পড়াশুনো সমাপ্ত করে শ্রীচ্যাটার্জী চলে আসেন কলকাতায়। প্রবল জ্ঞানপিপাসা নিয়ে তিনি ভর্ত্তি হন সরকারী সংস্কৃত কলেজে। এখানকার শিক্ষা শেষ হতে না হতেই বিদেশ সফরের জন্যে তাঁর প্রাণে ব্যাকুলতা দেখা দেয়। এবং সে-ও বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের দুরন্ত তাগিদেই, এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার।

ইউরোপ ও আমেরিকার দু'টি মহাদেশের বহু জায়গা ঘুরেছেন জগদীশচন্দ্র। যৌবনের সূচনাতেই সর্বত্র তাঁর বিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পেতে থাকে। যেখানেই তিনি গেছেন, ভারতের ঐতিহ্য সম্পর্কে জোরালো বক্তৃতায় মুগ্ধ করেছেন সকলকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অতীত ভারত কতটা সমুন্নত ছিল, বিশ্ব সমক্ষে এইটি প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁর মুখ্য লক্ষ্য।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে শ্রীচ্যাটার্জীর ব্রাসেলসে প্রদত্ত ভাষণ সেদিনে সুধী-সমাজের প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করে। এই ঐতিহাসিক ভাষণটি সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী, জার্মাণ, স্পেনীয়, রুশ, পোল প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপক প্রচার পায়।

পণ্ডিত জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এমনি। রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাদর আমন্ত্রণ আসে তাঁর নিকট—সেখানে তিনটি বক্তৃতা করতে হবে। বক্তৃতা দেওয়া যখন শেষ হলো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। তখনই তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন বিষয়ে একটি নতুন চেয়ার সৃষ্টি করেন এবং তাঁকেই সেই সম্মানিত পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

অল্পদিনের ভেতরই অবশ্য শ্রীচ্যাটার্জী রোম থেকে একটিবার দেশে ফিরে আসেন। এই সময় ডাঃ অ্যানি বেশান্তের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার খাতিরে তিনি এই বিদুষী মহিলার আমন্ত্রণে কাশ্মীরে যান। তৎকালীন কাশ্মীররাজ প্রতাপ সিং জগদীশচন্দ্রকে দেখামাত্র তাঁর গুণে আকৃষ্ট হন। সরকারী উদ্যোগে কাশ্মীরে তখন একটি প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণা ও পুরাতত্ত্ব বিভাগ খোলা হয় এবং এই বিভাগের ভারার্পণ করা হয় জগদীশচন্দ্রের ওপর। কাশ্মীরে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বাবধানে বহু গবেষণা চলে সেই থেকে।

কাশ্মীরে থাকা অবস্থায় শিক্ষানুরাগী জগদীশচন্দ্র যে শ্রমসাধ্য কাজ করেন, সত্যি তা অতুলনীয়! অবন্তীপুরে খননকার্য্য মারফৎ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে তিনিই নিয়েছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। কাশ্মীর প্রসঙ্গে সেই সময় তিনি ধারাবাহিকভাবে মূল্যবান পুঁথি-পুস্তক (সংস্কৃত ভাষায়) রচনা করেন। ত্রিক শাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর 'কাশ্মীর শৈববাদ' নামক গ্রন্থখানি শুধু কাশ্মীরেই নয়, বাইরেও মর্য্যাদা পেয়েছে প্রচুর।

১৯১১ সালে পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র আবার চলে যান ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং আত্মনিয়োগ করেন আগেকার পরিত্যক্ত কাজেই। বিদেশের মাটিতে এই সময় তিনি বেদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি আন্তর্জাতিক বিদ্যায়তন গড়ে তোলেন। এই শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দ্রটিতে তাঁর স্থায়ী অবদান ও মনীষার স্বাক্ষর রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধলে পর শ্রীচ্যাটার্জীকে আপন জন্মভূমিতে ফিরে আসতে দেখা গেলো। প্রাচ্যশাস্ত্র সম্পর্কিত কঠিন গবেষণায় তিনি কখনও নিরস্ত হলেন না। কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ইতিহাস রচনায় তিনি ব্যাপৃত হন সঙ্গে সঙ্গে। কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সফলতা লাভ করেছেন, এ কম যোগ্যতার পরিচায়ক নয়।

পণ্ডিত জগদীশচন্দ্রকে একটি দরদী ও পরদুঃখকাতর-প্রাণ বলে অমনি চেনা যায়। দেশ ও দশ তাঁর দৃষ্টিতে বরাবরই অনেক বড়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলককে মান্দালয় জেল থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রণী। সেদিনের তাঁর ব্যাকুল আবেদন ম্যাক্সমুলারের হৃদয় স্পর্শ করেছিল—বৃটিশ পার্লামেণ্টের সমক্ষে তিলকের আশু মুক্তির দাবী জানিয়েছিলেন তিনি (ম্যাক্সমুলার) এরই কারণ।

হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শন বিষয়ে কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ তার রয়েছে সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায়। অল্প দিন মধ্যেই তিনি ৮৮ বছরে পদার্পণ করবেন, কিন্তু তাঁর লেখনী এখনও যথেষ্ট ক্ষিপ্র ও সক্রিয়। 'A Vedic Version of the Biblical Exodus' ও 'Vedic view of Man and Universe' নামে দুইটি বিশিষ্ট বৈপ্লবিক গ্রন্থ রচনায় তিনি আজও ব্যাপৃত। এই জ্ঞানতপস্বীর কাছে আরও পাওয়ার প্রত্যাশা রয়েছে এবং সেটি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবার নয়।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশিষ্ট বামপন্থী রাজনীতিজ্ঞ]

একটু আলাপেই ধরা পড়ে—এই মানুষটি তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন—বাচনভঙ্গিতে রয়েছে এঁর একটা বিশিষ্টতা। রাজনীতিকে ইনি বরণ করে নিয়েছেন সমগ্রতা দিয়ে আর সেটি বামপন্থী তথা বিপ্লবাত্মক রাজনীতি। আর, সি, পি, আই, নেতা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন-প্রিয়তার মূল কারণটি বোধ হয় এই।

বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতির পীঠস্থান জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সৌম্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৯০১ সালের ৮ই অক্টোবর। তাঁর পিতৃদেব সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলার একজন প্রখ্যাত কবি ও গল্পলেখক এবং সে যুগের 'সাধনা'র সম্পাদক। সৌম্যেন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন স্বপ্ন-প্রয়াণের স্রষ্টা, বাংলা রেখালিপির উদ্ভাবক, স্মরণীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড় ছেলে)। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর খুল্লপিতামহ, যাঁর কাছে তিনি নানাভাবে ঋণী। পরিবারের সকলের কাছ থেকেই অফুরন্ত স্নেহ জুটেছে তাঁর ছেলেবেলায়, যে-স্মৃতি সৌম্যেন্দ্রনাথ আজও নিয়ে থাকেন।

কলকাতার দর্জিপাড়ায় সেকালে একটি বিদ্যালয় ছিল—নাম প্রোভেল ইন্‌ষ্টিটিউট। বালক সৌম্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন সুরু হয় সেই বিদ্যালয়েই। তারপর তিনি পড়াশুনো করেন মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশনে আর এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯১৭ সালে। কলেজ-জীবনের চারটি বছর তাঁর কাটে প্রেসিডেন্সি কলেজে—সহপাঠীদের অন্যতম ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ (পরলোকগত জননায়ক স্যার আশুতোষের মুখার্জী)। এই কলেজ থেকে ১৯২১ সালে তিনি বি-এ পাশ করেন অর্থনীতিশাস্ত্রে অনার্স সহ।

কলেজে পড়াশুনো শেষ হতে না হতেই সুরু হয় সৌম্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বা দেশসেবা। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দেবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তখন ভারতময় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চলেছে। একজন সৈনিকরূপে তিনিও এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

কিছুকালের ভেতরই গান্ধীবাদের সাথে বিপ্লববাদে বিশ্বাসী যুবক সৌম্যেন্দ্রনাথের সংঘাত বাধে। ক্রমে তিনি সোস্যালিজম বা সমাজ-তান্ত্রিক মতধারায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বাংলায় সেদিনে শ্রীঅতুল গুপ্ত, কবি নজরুল ইসলাম, হেমন্ত সরকার ও মুজফফর আমেদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্ট পার্টি নামে যে রাজনৈতিক সংগঠনটি গঠিত হয়, তাতে তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। ১৯২৭ সালে তিনিই এই পার্টির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ এইখানেই অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। আপন রাজনৈতিক জীবনাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর মাঝে চঞ্চলতা দেখা দেয়। তিনি ইউরোপ সফর করে চলেন—ফ্রান্স থেকে জার্মাণী, জার্মাণী থেকে রুশিয়া এই সব স্থানে। রুশিয়ায় তিনি সে সময় কাটান পর পর দুটি বছর। ১৯২৮সালে মস্কো-এ কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের যে ষষ্ঠ বিশ্ব-কংগ্রেস হয়, তাতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন সৌম্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং। ইতোমধ্যে মাদাম সান-ইয়াৎসেনের সভানেত্রীত্বে মস্কো-এ এশিয়ার নির্য্যাতিত দেশগুলির একটি সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনও ভারতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন এম্ এন্ রায়ের (মানবেন্দ্রনাথ) সঙ্গে যুবক সৌম্যেন্দ্রনাথ।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুবক্তা হিসাবে সৌম্যেন্দ্রনাথের মর্য্যাদা আজও যেমন রয়েছে, পূর্ব্বেও তেমনি ছিল। ইউরোপ সফরকালে তিনি সর্ব্বত্র বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন আর সেসব বক্তৃতা বা ভাষণের সারমর্ম্মই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বপক্ষে বিশ্বজনমত গঠন। ১৯৩৩ সালে হিটলার যখন জার্ম্মাণীর ক্ষমতা করায়ত্ত করেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ অমনি গ্রেপ্তার হন এবং কিছুদিন মিউনিক জেলে আটক জীবন যাপন করেন। পরে জার্ম্মাণী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি যান ফরাসী দেশে—সেখানে রলাঁর সঙ্গে হয় তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। প্যারিসে অবস্থানকালে ফরাসী ভাষায় গান্ধীবাদের তিনি এমনি যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করেন, যার জন্যে কংগ্রেসী নায়ক পণ্ডিত জওহরলালেরও (বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী) সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল সেদিকে।

১৯৩৪ সালে সৌম্যেন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরে আসেন ইউরোপের মাটি থেকে। এদিকে ১৯২৮ সাল নাগাদ মাদ্রাজে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়ে যায়—সৌম্যেন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকলেও তাঁকে এই দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজন সদস্য করে নেওয়া হয়। দেশে ফিরিবার পর সি, পি, আই'র সাথে মতবিরোধ হয় তাঁর প্রচণ্ড। এই সময় কম্যুনিষ্ট লীগ নাম দিয়ে তিনি একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন—অল্পদিন মধ্যেই নাম পাল্টিয়ে একেও করা হয় কম্যুনিষ্ট পার্টি। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' গণ-আন্দোলন কালে তাঁর পার্টির নতুন নামকরণ হয় ভারতীয় বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টি বা আর, সি, পি, আই।

সেই থেকে নিজ হাতে গড়া পার্টির নেতৃত্ব করে চলেছেন বিপ্লববাদী সৌম্যেন্দ্রনাথ। বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁকে বহু বার গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছে এযাবত। তিনি বরাবর আপোষহীন সংগ্রামের পথে চলে এসেছেন। সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সঙ্গে মতের অমিল ছিল বটে কিন্তু যোগাযোগ ছিল নিবিড়—এই উক্তি সৌম্যেন্দ্রনাথের নিজেরই। ফ্যাসিজমবাদ-বিরোধী আন্দোলনকল্পে ভারতে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে যে কমিটি গঠিত হয়, সৌম্যেন্দ্রনাথই ছিলেন সে কমিটির সম্পাদক, আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে ১৯৩৬ সালে এবং জননায়ক শরৎচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বাংলার রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ১৯৩৮ সালে যে দুইটি কমিটি গঠিত হয়, উভয় ক্ষেত্রেই সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয় সৌম্যেন্দ্রনাথকে।

রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক জীবন রয়েছে সৌম্যেন্দ্রনাথের। তাঁর বাগ্মিতার যেমন একটি ঢং আছে, রচনারও তেমনি আছে একটি বিশেষ রূপ—যা সত্যি মনীষার পরিচায়ক। তাঁর বিচিত্র রচনাবলীতে সেটি লক্ষ্য করতে পারা যায় অনায়াসেই। প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "বৈতানিক"-এর তিনিই প্রাণকেন্দ্র।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা উল্লেখ করা হয়ত অবান্তর হবে না। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক রুশিয়া সফরকালে তাঁর বিশ্বস্ত সহযাত্রী ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথই। নতুন আদর্শে জাগ্রত ঐ বিশাল দেশে কবিগুরুর পরিক্রমা যেন সার্থক হয়, সেদিকে তাঁরই প্রযত্ন ছিল খুব বেশি আর সে গোড়া থেকেই।

দেশসেবা ও রাজনীতিতেই মূলতঃ সৌম্যেন্দ্রনাথের জীবন উৎসর্গীকৃত, বলতে দ্বিধা নেই। তিনি নিজকে একজন খাঁটি কম্যুনিষ্ট বলে দাবী করেন—ষ্ট্যালিনবাদের সঙ্গে তাঁর আজও বিরোধ বা মতদ্বৈধতা। অনুসৃত মত ও পথের ওপর তাঁর পুরো আস্থা আর সে থেকে নড়চড় হতে তিনি কখনই রাজী নয়। উদ্যমের অভাব নেই সৌম্যেন্দ্রনাথের একটুকু—আপন সাফল্য সম্পর্কেও তিনি পোষণ করে চলেছেন আশাবাদীর মনোভাব।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

[ভারতখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক ও বিধান সভার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সাধারণ সম্পাদক]

জনশ্রুতি যে, পিতামহ ব্রহ্মা জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে পঞ্চম বেদ আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করেন। তিনি উহা দেন প্রজাপতিকে—তাঁর কাছ থেকে নেন অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়—তাঁহারা দেন দেবরাজ ইন্দ্রকে। তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করেন ঋষি ভরদ্বাজ—তিনি শেখান আত্রেয় পুনর্ব্বসুকে—শেষোক্ত উহা তুলে দেন অগ্নিবেশ প্রভৃতি তাঁর ছয় শিষ্যকে। অন্যদিকে আদি শল্য-চিকিৎসক প্রবর্ত্তক হলেন ভগবান ধন্বন্তরি—তাঁর প্রপৌত্র কাশীরাজ দিবোদাস নিজে আয়ত্ত করিয়া সুশ্রুত প্রভৃতি আটজন প্রসিদ্ধ শিষ্যকে শেখান। সুশ্রুতই উহা পূর্ণভাবে প্রচার করেন। কায়, শল্য, শালাক্য, ভূত, রসায়ন, বাজীকরণ, বিষচিকিৎসা ও কৌমারভৃত্য—এই আটটি প্রধান ভাগের জন্য আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গ নামে প্রচারিত।

বহুকাল অবহেলিত থাকার পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আয়ুর্ব্বেদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন তদানীন্তন রাজধানী মুর্শিদাবাদের পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়। তন্মধ্যে বঙ্গের বরেণ্য সন্তান ও পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত চুপী গ্রামের তন্ত্রসাধক ৺অন্নদাপ্রসাদের পুত্র পরলোকগত কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়। সেই সময় অর্থাৎ ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর (২১শে অগ্রহায়ণ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) তাঁহার ও নৃসিংহ-ধন্বন্তরি বংশের বৈষ্ণনপাড়ার ৺শ্রীপ্রসন্ন চৌধুরীর তনয়া ৺সুষমাসুন্দরী দেবীর প্রথম পুত্র বিমলানন্দ কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন। ৺শ্রীপ্রসন্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র আইনজীবী ৺ব্রজরাজ চৌধুরী, নেতাজী-পিতা ৺জানকীনাথ বসু প্রভৃতি কতিপয় বাঙ্গালী কটক সহরে প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

বংশের প্রথানুযায়ী বাল্য ও কৈশোরে বিমলানন্দ সংস্কৃত ভাষা শিখিতে থাকেন। আদ্য ও মধ্য পরীক্ষার পর তিনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে আই-এস-সি পড়েন। কিছু দিন পরে কাশীধামে যাইয়া রামানুজ-সম্প্রদায়ের "ভয়ঙ্কর-প্রতিবাদী"কে পরাজয়কারী বামাচরণ ন্যায়াচার্য্যের ছাত্র হিসাবে তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই সঙ্গে তথায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্ব্বেদ বিভাগীয় অধ্যক্ষ ৺বরদাদাস কবিরাজের নিকট উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের কাছে পড়িয়া সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'তর্কতীর্থ'

উপাধি গ্রহণ করেন ও পিতার নিকট কবিরাজী পাঠ সমাপ্ত করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তীকালে সুখ্যাত চিকিৎসকরূপে বিমলানন্দের প্রতিষ্ঠার মূলে আছে স্বনামধন্য পিতা বাচস্পতি মহাশয়ের গুরুজনোচিত শিক্ষা, অনুপ্রেরণা ও সাহচর্য্য। তাই ১৩৪১ সনে পিতৃদেবের তিরোধান তাঁহার জীবনে চরমাঘাত হানা সত্বেও বাচস্পতি মহাশয়ের উদার ও সুনিপুণ বিচারমূলক মতবাদ তিনি সুষ্ঠু ও নিপুণভাবে প্রয়োগ করিতে থাকেন।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনের অন্যতম অঙ্গ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুপ্রেরণায় বাচস্পতি মহাশয়ের বিরাট আন্তরিক প্রচেষ্টা বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামে জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপ্রতিষ্ঠা হইলে দ্বিতীয় বর্ষ হইতে সম্পাদক, সভাধ্যক্ষ ও সর্বদা সুপরিচালনা করেছেন তর্কতীর্থ মহাশয়। এঁরই উদ্যোগে ১৩৪০ সালে নিখিলবঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মহা সম্মেলনের মাধ্যমে সমস্ত কবিরাজগণ এক মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হন। ইহার পর বিভিন্ন প্রান্তের ষ্টেট ফ্যাকাল্টী বা কাউন্সেলগুলির বিভিন্ন কর্মধারার সামঞ্জস্য বিধান ও সর্ব্বভারতীয় সম্মেলন (Convention of All India State Boards) গঠিত হয়, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ঔষধ প্রস্তুতকারীদের নিখিল ভারত সংস্থার (A. I. Pharma Congress), কলিকাতা ও দিল্লী অধিবেশনদ্বয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাখার সভাপতিরূপে তিনি পৌরোহিত্য করেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও জামনগর সেন্ট্রাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট ইত্যাদির আয়ুর্ব্বেদ বিভাগের সহিত কোন না কোনরূপে তিনি সংযুক্ত ছিলেন বা আছেন।

সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং উহার প্রচার ও প্রসারের জন্য সংগ্রামী মনোভাব থাকায় তিনি গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা সংস্কৃত এ্যাসোসিয়েশন, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, নিখিল ভারত সংস্কৃত সম্মেলন, সরকারী সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদ প্রভৃতির সহিত সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন বা আছেন। ইহা ছাড়া ভারতসেবক সমাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বিবেকানন্দ মিশন, ওয়ার্কিং মেনস্ ইনঃ প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে। তর্কতীর্থ মহাশয়ের উদ্যোগে কিছুকাল পূর্ব্বে নবদ্বীপ (বিদ্যালয়ের) সর্ব্বভারতীয় বৈষ্ণব সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী নামক মাসিক পত্রিকার পরিচালক থাকা কালীন তিনি Journalists Asscn. (অধুনা ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের) সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিমলানন্দের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশের সময় ছিল এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। ১৯২১ সালের দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলন—বিপুল বৈভব ও বিরাট পশার ছাড়িয়া প্রখ্যাত আইনজীবী চিত্তরঞ্জন তখন দেশবন্ধু নামে জনগণের নেতা—পরিকল্পনা করেছেন গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যায়তনের—সহকারিরূপে পেয়েছেন সুভাষচন্দ্র (নেতাজী), কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতিকে। এই মহান নেতা সাক্ষাৎ করলেন আর এক দিকপালের সঙ্গে—তিনি হলেন দেশবিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিত শ্যামাদাস বাচস্পতি। গড়ে উঠল অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ। যুবক বিমলানন্দ সেই সময় তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহারই নেতৃত্বে ১৯২২ সালে কংগ্রেসে ও স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এক যোগে কাজে লিপ্ত হন। ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে যশোহর কেন্দ্র হইতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচিত হন এবং উহা বয়কটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তথা হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে এক উপনির্ব্বাচনে কলিকাতা করপোরেশনের সদস্য হন।

১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী কেন্দ্র হইতে বিধান-সভার সদস্য হন। বর্ত্তমানে তিনি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সাধারণ সম্পাদক। নিজ এলাকার সহিত তিনি সর্ব্বদা ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন।

বিশিষ্ট এটর্ণী রসুলপুর নিবাসী শ্রীনবদ্বীপ রায়ের পৌত্রী ও প্রতাপ রায়ের কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুত্র শিবানন্দ স্বর্গগত, দ্বিতীয় পুত্র ব্রহ্মানন্দ এখন জার্ম্মাণীতে গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত।

১৯৫৬ ও ১৯৫৯ সালের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সহকর্ম্মীদের সহিত তাঁহার পরিভ্রমণ ও আর্ত্তত্রাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা—তথাকার বাসিন্দাদের মনে আস্থা ফিরাইতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাঁহার কলিকাতার গৃহে দুঃস্থদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা ও ভরণপোষণ অনেকের নিকট অজানা রহিয়াছে। তাঁহাদের বংশগত ধর্ম্ম অতিথিসেবা আজিকার দিনেও ম্লান হয় নাই। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পণ্ডিতাচার্য্য প্রভৃতির সভাপতিত্বে বহু সঙ্ঘ কর্ত্তৃক তাঁহার জন্মতিথি পালনও তাঁহার লোকপ্রিয়তার পরিচয়।

নমস্য পিতার সুযোগ্য তনয়—অর্থাগম যথেষ্ট—উন্নতির শীর্ষে অবস্থান—সুবিদিত বংশগরিমা—তথাপি বিমলানন্দ তর্কতীর্থ হলেন সাদাসিদা, আত্মভোলা, সৎপথযাত্রী, নির্লোভী ও বিপদাপন্নের সহায়।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ

শ্রীপরেশচন্দ্র বসু

[উড়িষ্যার বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজসেবী]

বাল্যে ও ছাত্রজীবনে যিনি অর্থাভাবে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন—পাঠ্যদশায় যিনি পরের আহৃত পুস্তকে পাঠ সমাপন করেছেন—অবসর সময়ে যিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকার একাংশ সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন—পরবর্ত্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ আয়ের এক বৃহদংশ অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয়িত করেন উড়িষ্যার অন্যতম বিশিষ্ট আইনবিদ মানবদরদী শ্রীপরেশচন্দ্র বসু।

পরেশচন্দ্র ১৮৯৬ সালের ৪ঠা আগষ্ট স্বগ্রাম গোনাড়ায় (কাঁথি মহকুমা) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺কুমেদাচরণ বসু ও মাতা হলেন ভগবানপুরের বিশিষ্ট বাসিন্দা ৺হরিচরণ দেবের তনয়া ৺মোক্ষদাসুন্দরী দেবী। ছয় ভ্রাতা ও দুই ভগিনী মধ্যে পরেশচন্দ্র হলেন সপ্তম সন্তান। প্রথমে মেদিনীপুর, পরে বালেশ্বর জিলা স্কুলে ও শেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্ম্মস্থল বারিপদা শ্রীরামচন্দ্র হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন প্রথম শ্রেণীর (ক্লাস টেন) মাহিনা ছিল আট আনা। বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন ৺প্যারীচরণ সরকারের পুত্র বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৺শৈলেন্দ্রনাথ সরকার ও ৺গিরিশচন্দ্র লাহাকে। তিনি ১৯১৫ সালে মেদিনীপুর কলেজ হইতে আই-এ ও ১৯১৭ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। এই সময় পরেশচন্দ্র ময়ূরভঞ্জ রাজমাতা মহারাণী সুচারু দেবীর ও পরে অধ্যাপক (নাট্যাচার্য্য) পরলোকগত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের গৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। পরে ময়ূরভঞ্জ রাজবংশের শ্রীশরৎচন্দ্র ভঞ্জদেওর গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থাভাবে এক বৎসর পড়াশুনা বন্ধ রাখিয়া তিনি ১৯২০ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পাশ করেন। বিদ্যালয় ও কলেজের সহধ্যায়ীদের মধ্যে শ্রীনীলমণি সেনাপতি আই. সি. এস. ভূতপূর্ব্ব সিভিলিয়ান বর্ত্তমানে টাটা কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর শ্রী এস, এম, ধর ও ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রী রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে এক বৎসর শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। ১৯২৪ সালে শ্রী বসু সসম্মানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হইতে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দুই বৎসর মেদিনীপুর কোর্টে নিষ্ফল প্রয়াসের পর পরেশচন্দ্র ১৯২৭ সালে ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে সুনাম অর্জ্জন করেন এবং বিহার-উড়িষ্যার অন্যতম বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট হিসাবে পরিগণিত হন। কলিকাতা বারের প্রখ্যাত আইনবেত্তাদের সহিত তিনি বহু মামলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উন্নতির মূলমন্ত্র হল একাগ্রমনে আয়ত্ত আইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবেচনা, দর্শন ও প্রয়োগনৈপুণ্য।

প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের বেদনাবোধ থাকায় শ্রীবসু অর্থহীন ব্যক্তিদের বহু জটিল মামলা পরিচালনা করেছেন নিজব্যয়ে অথবা নিজ প্রাপ্য না লইয়া। অর্থ রোজগার শুধু তাঁহার কাম্য নয়—

শ্রীপরেশচন্দ্র বসু

গৃহীত মামলায় বিজয়মাল্য লাভ তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার গৃহে রক্ষিত নিজস্ব গ্রন্থাগার শুধু আইনের পুস্তক নহে—সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমৃদ্ধ।

তিনি বলেন যে, ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বিচার বিভাগ আদর্শস্থানীয় ছিল। বহু বিশিষ্ট আইনজীবী এই রাজ্যের বিচারপতিরূপে কার্য্য করিয়াছেন। ইহার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান পরলোকগত ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন ও শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর সহিত পরেশচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ছিল।

১৯২২ সালে তিনি বসিরহাটের অন্যতম জমিদার ৺হরিমোহন মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী সুধীরা দেবীকে বিবাহ করেন। শহীদ দীনেশ মজুমদার, ভারতসভা ভবনের সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, এল, সি এবং বসিরহাটের ভূতপূর্ব্ব পৌরাধিপতি ও এম, এল, সি শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার হলেন শ্রীমতী বসুর ভ্রাতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও উড়িষ্যার প্রবীণতম আইনজীবী শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রীমতী বসুর মাতুল। নেতাজী-শিক্ষাগুরু ৺বেণীমাধব দাস শ্রীমতী বসুর কলিকাতাস্থ পিতৃগৃহে থাকিতেন। সেই সময় পরেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়—ফলে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। বেণীমাধব বাবুর দুই কন্যা কল্যাণী ও বীণা দেবীর সহিত শ্রীমতী বসুর অন্তর সম্পর্ক ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত "সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক" পরেশচন্দ্রের ভ্রাতৃবধূর স্মৃতিচিহ্নিত।

নবাগতদের বর্ত্তমানে আইন ব্যবসায়ে কোনরূপ সুযোগের আশা নাই এবং উড়িষ্যার অনাদৃত খনিজ-সম্পদকে কার্য্যে প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া শ্রী বসু মনে করেন।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

ফিরে এলুম কলকাতায়। পার্ক স্ট্রীটের উপর স্ক্রিকেন কোর্টের অবস্থিতি। স্ক্রিকেন কোর্টেরই একটি ফ্ল্যাটে আমরা থাকতুম। ফ্ল্যাটটিকে সাজালুম সম্পূর্ণ শিল্পরুচিসম্মত করে—শিল্পবোদ্ধা, রুচিবান ও সৌন্দর্যরসপিপাসু প্রমুখ বিশেষণগুলি যাঁদের প্রতি ব্যবহার করা চলে অনায়াসে—আমাদের সেই বন্ধুরা অন্তত এ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগে এঁদের আধিপত্য, কেউ ক্যামেরার হাতল ঘোরান, কারো কারবার রঙ আর তুলি নিয়ে—কেউ বা লেখনীর মাধ্যমে সেবা করে চলেছেন বাকদেবীর আবার কেউ কেউ বা সামাজিক জীবনে যথেষ্ট প্রভাবশালী। সেই শিল্পোৎসাহীর দলই বলতেন যে ফ্ল্যাটটির অলঙ্করণ-কর্ম নাকি অনেকখানি শিল্পমূল্য বহন করে। তবে এ কথা মিথ্যে নয় যে ফ্ল্যাটটি ছেড়ে যখন আমরা চলে গেলুম তখন স্পষ্ট অনুভব করেছি যে বেদনার এক বিরাট বোঝা সমস্ত মন-প্রাণ যেন একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ফ্ল্যাটটির আভ্যন্তরীণ সজ্জা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারার পরিচয় বহন করত। 'পদ্মগম' ছবিটির সঙ্গে তখন আমি চুক্তিবদ্ধা—তার চিত্রায়ণের নির্ধারিত সময়টি দ্বারদেশে করাঘাত করায় স্ক্রিকেন কোর্টের অবস্থিতির যবনিকা টানতে হল।

আকর্ষণীয় বলুন বা বন্ধনই বলুন—যাই বলুন, কলকাতা শহরে আমার কাছে এই আকর্ষণ বা বন্ধন ছিলেন আমার বাবা। বাবার খুব আদুরে মেয়ে ছিলুম আমি। কথা নিলুম বাবার কাছ থেকে যে তিনি বোম্বাই আসবেন এবং শুধু আসা নয়, থাকবেনও আমাদের কাছে।

বাবার কথা মনে পড়ছে। সেই স্নেহময় পুরুষের অনন্ত সন্তান-বাৎসল্যের কাহিনী, সেই সব অসংখ্য কাহিনী যেন জীবন্ত হয়ে আছে স্মৃতির রোজনামচায়—যত বাবাকে কেন্দ্র করে এই সময়টার কথা মনে পড়ছে ততই বার বার একটি ঘটনার স্মৃতি ঘুরে-ফিরে নানাভাবে কেবলই মনের মধ্যে ভেসে উঠছে; আর বেদনায় মনকে কেবলই বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর করে তুলছে। তাকে স্মৃতি বলব কি অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বলব, আজও তা ঠিক করে উঠতে পারছি না। এই বিশেষ স্মৃতিটি বেঁচে আছে করুণ রসকে ভিত্তি করে।

যেদিন কলকাতা ছেড়ে যাই, হাওড়া স্টেশানে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার কথাই এখানে বিবৃত করছি—আমরা কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছি—বাবা এসেছেন আমাদের বিদায় দিতে। এসেছেন অসংখ্য অনুরাগী বন্ধুর দল। শেষোক্তদের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনায় সেদিন প্রায় সবটুকু সময়ই দিয়েছি—আর বাবা? বাবার প্রতি সেদিন দেখিয়েছি যথেষ্ট ঔদাসীন্য—এ আচরণ নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন ছাড়া আর কি? ট্রেণ ছেড়ে দিল, লৌহবপু থেকে তার হুঙ্কার বেরোল, ধীরে ধীরে তার সর্বাঙ্গে আসতে লাগল গভীর এক দুর্দমনীয় বেগ। স্থাবর রূপান্তরিত হল জঙ্গমে। প্ল্যাটফর্ম থেকে যখন মনে হয় যে ট্রেণটা বুঝি বা ঠিকই আছে, প্ল্যাটফর্মটাই হয়তো চলছে পিছিয়ে—বহুদূরে দৃষ্টিশক্তি পৌছতে পারে [illegible] ব্যবধান [illegible]

স্বর্ণপট

শুভ্রবর্ণ রুমালটি নাড়ায়। তখন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি যে কথা দেওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বোম্বাইতে গিয়ে আমার কাছে থাকা বাবার পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না। বাবাকে বোম্বাইতে নিজের কাছে রাখবার বহুযত্নপোষিত বাসনা নিষ্ফল রূপ নিয়ে দেখা দেবে—ঘুণাক্ষরেও কি এ কথা ভাবা বা এ বিষয়ে চিন্তা করতে আমার পক্ষে সেদিন সম্ভবপর হয়েছে যে এই রুমাল নাড়িয়ে বিদায় জানানোর মধ্যেই চিরবিদায়ের ইঙ্গিতটি লুকিয়ে রয়েছে। পার্থিব জীবনে পিতা-পুত্রীর মধ্যে সেই শেষ সাক্ষাৎ, নশ্বরদেহে বাবাকে দেখার সেই চিরকালীন সমাপ্তি। চিরকালের জন্যে বাবাকে যে সেই শেষবারের মত দেখছি এ চিন্তা করাও কি আমার পক্ষে তখন সম্ভবপর ছিল?

বারোটি মাস দিয়ে তৈরী এক একটি বছর—যখন তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় বিদায় নেয় তখন খতিয়ে দেখলে দেখা যায়, যে কত কি সে রেখে গেছে আবার কত কি সে নিয়েও গেছে; জগৎকে নানাদিক দিয়ে পূর্ণ সে করে তোলে যেমনই পৃথিবীকে আবার নানাদিক দিয়ে শূন্য করতেও তার বিরাম নেই। তেমনই ১১৪৩ সাল আমাদের পারিবারিক জীবনে এল এক সর্বনাশা ইঙ্গিত নিয়ে। তখন তো তেতাল্লিশ প্রায় শেষ হতেই চলেছিল, তেইশটি দিন পার করে দিলেই বিংশ শতাব্দী চুয়াল্লিশে পা দিত কিন্তু যা হবার তা তেইশ দিন থাকতে থাকতেই হয়ে গেল। ১১৪৩ সালের ৮ই ডিসেম্বার বাবার দেহান্তর ঘটল। অনিত্য পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে পৃথিবীকে শেষবারের মত বিদায় নমস্কার জানিয়ে গেলেন বাবা। আমরা চিরকালের জন্যে হারালুম পরম স্নেহময়, দরদী, সহানুভূতিশীল আমাদের বাবাকে।

আমার কাছে বোম্বাইতে এসে থাকবেন বাবা, এই রকম কথা ছিল। আগেই বলেছি যে কোন কারণেই হোক—কারণটা অবশ্য এখানে অনুক্তই থেকে যাক—তবে এইটুকু শুধু লিপিবদ্ধ থাক যে শেষ পর্যন্ত বাবা সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি। বাবার এই সব কথা যত মনে পড়ছে অশ্রু যেন ততই ভিতরকার সমস্ত বাঁধন অস্বীকার করে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

বোম্বাইতে শ্রীএস, মি দেশাইয়ের নেতৃত্বে আমি 'পদ্মগম' ছবিটিতে কাজ করি। [illegible]

লিমিটেড। এর পর চুক্তিবদ্ধা হলুম প্রখ্যাত প্রযোজক শ্রীচান্দুলাল শার সঙ্গে. তাঁর রঞ্জিত ফিল্ম কোম্পানীতে তখন প্রায় প্রত্যেকটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সে এক অভাবনীয় সমাবেশ, যেমন নিউ থিয়েটার্সের দেবদাসখ্যাত অবিস্মরণীয় শিল্পী স্বর্গীয় কুন্দনলাল সায়গল, অশেষ যশের অধিকারিণী কণ্ঠ ও অভিনয়শিল্পী শ্রীমতী খুরশীদ, অন্যতম লোকপ্রিয় চিত্রনায়ক সুরেন্দ্র এবং আরও অনেকেই। সেখানে আমি দু'খানি ছবিতে অভিনয় করি। 'শঙ্কর-পার্বতী' ছবিটিতে আমার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন অভিনেতা অরুণ। ইনি সাগর মুভিটোনের একজন ভূতপূর্ব শিল্পী। আমার মতে রাজনর্তকীর পর আমার শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে শঙ্কর-পার্বতী একটি। অবশ্য এ বিষয়ে অন্যের মত অন্যরকমও হতে পারে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে অরুণ শঙ্করের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল। এই ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীচতুর্ভুজ দোশী। এর পরের ছবি বিষকন্যা। পরিচালনা করেছিলেন শ্রীকেদার শর্মা। এঁর আগমনও নিউ থিয়েটার্স থেকেই (পরবর্তীকালে ঝাঁসী কী রাণী খ্যাত সোরাব মোদীর সহধর্মিণী সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেহতাব অভিনীত 'চিত্রলেখার' মাধ্যমে দর্শকসমাজ থেকে যিনি প্রভূত সাধুবাদ অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন) বিষকন্যায় আমার বিপরীত ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন দুজন বিখ্যাত অভিনয়শিল্পী সুরেন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ। একটি নারীকে কেন্দ্র করে মানুষের সনাতন দ্বন্দ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় গড়ে উঠল ছবির গল্পাংশ।

বিষকন্যার প্রসঙ্গে অনেক ঘটনাই মনে পড়ছে। অভিনয়ের মধ্যে অভিনয়ের বাইরে কত ঘটনার টুকরো টুকরো স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠছে জীবন্ত মূর্তি নিয়ে। বিষকন্যা চিত্রায়নের সময় কয়েকটি ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখ করা আশা করি অসমীচীন হবে না, এবং আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্রও কিছু কম নয়। বিষকন্যার সেটে প্রচুর হাস্যকৌতুকের মধ্যে দিয়ে সময় কাটত আমাদের। বিষকন্যার নামকরণ নিয়ে পরিচালক কেদার শর্মা, সুরেন্দ্র, পৃথ্বীরাজ ও আমার মধ্যে যথেষ্ট কৌতুকাদি হোত। কৌতুকাদির উৎস বিষকন্যার নামকরণ। বিষকন্যার ইতিহাস সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েরা প্রায় অনেকেই সুবিদিত। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের পাতায় বিষকন্যাদের নানাস্থানে নাম উল্লেখ আছে। তখনকার রাষ্ট্রনায়করা রাষ্ট্রের (বা নিজেদেরও) স্বার্থের খাতিরে বিষকন্যাদের সাহায্য গ্রহণ করতেন। তবুও বিষকন্যার গল্প যাদের জানা নেই তাঁদের অবগত্যার্থে বলছি যে বিষকন্যা আসলে নারী ছাড়া কিছুই নয়. আকৃতিতে, দৈহিক গঠনে, সংলাপে অন্যান্য সাধারণ নারীর সঙ্গে কোথাও তাদের কোনরকম বৈসাদৃশ্য নেই। এমনি সাধারণভাবে অন্যান্য নারীর তুলনায় তাদের কোন বিশেষত্বই বলুন বা স্বাতন্ত্র্যই বলুন চোখে পড়বার নয়, তবে তাদের যা কিছু স্বাতন্ত্র্য যা কিছু বিশেষত্ব অন্যান্য নারীর সঙ্গে তাদের যা কিছু পার্থক্য তার বীজ নিহিত ছিল তাদের চুম্বনে এবং সে বড় সর্বনাশা পার্থক্য, ভয়ঙ্কর স্বাতন্ত্র, ভয়াবহ বৈশিষ্ট্য। বিধাতার সৌন্দর্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নারী। সৌন্দর্যের এমন অপরূপ আধারের মধ্যে মৃত্যুর এমন ভয়াবহ সম্ভাবনা থাকতে পারে তা কি কল্পনাও করা যায়? বিষকন্যার একটি চুম্বন চুম্বিত পুরুষকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে দেবে। তার একটি [illegible] দেহ নীল হয়ে উঠবে, [illegible] থেমে যাবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠবে। শিরায় শিরায় থেমে যাবে রক্ত সঞ্চালন, চোখের তারা হবে দ্যুতিহীন, সমগ্র শরীর উঠবে বিষিয়ে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নিজের শেষ নিঃশ্বাসটি উপহার দেওয়ার লগ্ন তার হবে দারস্থ। চুম্বনে তার বিষ। রূপেতে তার আগুন কেশে তার ঢেউ খেলানো মেঘের মিছিল, নয়নে তার ভুবনভোলানো মোহ, হাসিতে তার আনন্দের ঝিলিক, গানে তার লালিত্যের ঝঙ্কার, দেহে তার লাবণ্যের সুষমা কিন্তু চুম্বনে তার পুঞ্জীভূত গরল।

বিচিত্র, বিচিত্র, বিচিত্র, বিধাতা! বিচিত্র তুমি নিজে, বিচিত্র তোমার জগত, বিচিত্র তোমার সৃষ্টি! [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পি এ (পার্সোন্যাল য়্যাশিষ্টেণ্ট)

একটি হাসির গল্প। একটি সামাজিক কাহিনী হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। সাধারণতঃ হাসর বা হাসানোর নাম করে যে জাতীয় নোংরামি বা অশালীনতা তুলে ধরা হয়, পি, এ ছবিটিকে আমরা বলতে পারি তার ব্যতিক্রম। একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রুবাণী চেয়েছিল তার পি-এ পদের কোন মেয়েকেই বহাল করতে কিন্তু যোগ্যতায় সব মেয়েকেই পরাজিত করে রমা গুপ্ত সেই পদে নিযুক্ত হল। রমা গুপ্ত আসলে মেয়ে নয় পুরুষ, সম্পূর্ণ নাম তার রমাপদ গুপ্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুবাণী নিযুক্ত করল মিনতি মিত্র ছদ্ম নামধারী সাহিত্যিক রমা গুপ্তকে। তারপর নানাবিধ ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্প এগিয়ে চলতে থাকে বিভিন্ন অংশে প্রচুর কৌতুক রস পরিবেশন করতে করতে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় রুবাণী চাকরী দিতে গিয়ে হৃদয় দিয়ে ফেলেছে রমাকে। শেষে সেই গতানুগতিক ভুল বোঝাবুঝি, সর্বশেষে সর্বসাধারণের অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু জয়ের প্রচেষ্টায় ঔপন্যাসিক হিসেবে রমার সানুকূল স্বীকৃতি লাভ ও সর্বপ্রকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান এবং রুবাণী-রমার শুভমিলনের ইঙ্গিত দিয়ে ছবির সমাপ্তি।

একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সমস্ত মেয়ে কর্মীর মাঝখানে একটি মাত্র পুরুষের অবস্থিতিই তো দর্শক মহলে যথেষ্ট হাসির সঞ্চার করে। তারপর দর্শককে আরো হাসিয়েছে রমার সংলাপাংশ (অবশ্য এতে শিল্পীর কৃতিত্বও কম নয়) ছবিটির মধ্যে একটি অংশে কল্পনা প্রাচুর্যের তথা উদ্ভাবনী শক্তির অপূর্ব পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পিয়ানোকে টাইপ মনে করে বাজিয়ে তার মধ্যে থেকে নতুন ধরনের এক সুর সৃষ্টি করার কল্পনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। নোটেশানের পরিবর্তে একটি অফিসিয়াল চিঠি দেখে টাইপ করার মত পিয়ানোর রীডগুলি বাজিয়ে যাওয়া হয়েছে—কেবলমাত্র এই একটি অংশ সমস্ত ছবিটিকে বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। সঙ্গীতাংশ ভালো। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ। পরিচালনা করেছেন চিত্রক।

গল্পটি হরিনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেখনীজাত। সংলাপ ও অতিরিক্ত সংলাপ রচনা করেছেন যথাক্রমে জ্যোতির্ময় রায় ও কুমারেশ ঘোষ। অভিনয়াংশে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন প্রধান দুটি চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের অভিনয় সর্বতোভাবে ছবিটিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। রুবাণীর বান্ধবী, জয় ও নারীসঙ্গ-পিপাসু বিপরীত প্রকাশকের ভূমিকায় যথাক্রমে পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার ও তুলসী চক্রবর্তীর সুন্দর অভিনয়ও [illegible]

উল্লেখের দাবী রাখে। এঁরা ছাড়া অমর মল্লিক, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, খগেন পাঠক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা মণ্ডল, সুব্রতা সেন, মল্লিকা ঘোষ, শেফালি নায়েক প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

ক্ষণিকের অতিথি

সুপরিচালক হিসেবে তপন সিংহের সুখ্যাতি সম্বন্ধে আজকের দিনের চিত্রামোদীদের কাছে নতুন করে কিছুই বলার নেই। তপন সিংহের প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। ছবিকে যথাসাধ্য বিশিষ্টতায় ভরিয়ে তুলতে তপন সিংহ আপন কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আসছেন। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি "ক্ষণিকের অতিথি"। প্রেম ছবিটির গল্পের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকলেও সেই তার মুখ্য উপজীব্য নয়। ছবির মুখ্য উপজীব্য হচ্ছে এক তরুণ ডাক্তার তার পূর্বপ্রণয়িনীর পঙ্গু সন্তানকে সুস্থ সবল করে তোলার উদ্দেশ্যে অনলসভাবে সাধনা করে চলেছে। এই ডাক্তার আর নীতা প্রথম জীবনে পরস্পর পরস্পরকে জীবনের দোসর রূপে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সামাজিক জাতিভেদই তার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, বিচ্ছেদ ঘটল দু'জনের—নীতার মামা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুন্দর সব দিক দিয়ে আকর্ষণীয় একটি সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে নীতার বিয়ে দিলেন—প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় নীতার স্বামী প্রাণ হারালেন, শিশুপুত্রকে নিয়ে বিধবা নীতা এল মামার আশ্রয়ে, মামার তখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে, মামা তুলে দিলেন কলকাতার বাস, সেই থেকে নীতার ভাগ্যের কালোমেঘ আরও ঘনিয়ে এল। দুর্বিপাকে তার শিশুপুত্রও পঙ্গু হয়ে পড়ল—তারপর ডাক্তারের কাছে পুত্রের জন্য সাহায্যপ্রার্থিনী হয়ে নীতা দেখা দিল। ছবির প্রকৃতপক্ষে এইখান থেকেই শুরু, তাদের প্রেমকাহিনী ডাক্তারের অতীত স্মরণের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে এবং নীতার স্বামিবিয়োগ ও কঠোর জীবন-সংগ্রাম নীতার অতীত স্মরণের মধ্যে দিয়ে দেখান হয়েছে। নীতার সন্তানকে সুস্থ করে তোলার সঙ্কল্প গ্রহণ করল ডাক্তার, তারপর কেমন করে, কি ভাবে নানা ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও অজস্র প্রতিকূল অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেও কি করে সে খোকনকে ভাল করে তুলল সেই কাহিনীই এখানে পরিবেশিত হয়েছে। ছেলে যখন রোগমুক্ত হয়ে উঠল—ছেলের হাত ধরে নীতা বিদায় গ্রহণ করে ডাক্তারের কাছে, সেখানে থাকার কাজ তো তার ফুরিয়েছে। ছবিটিতে হাসপাতালের দৃশ্যগুলিতে রোগীদের মাধ্যমে কৌতুকরস পরিবেশন করা হয়েছে। ছবিতে একটিমাত্র গান সন্নিবেশিত করা হয়েছে, গানটি অতুলপ্রসাদের রচনা, একটি গানই সমস্ত ছবিটিকে ভরিয়ে রেখেছে। সারা ছবিতে বেশ একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন পরিচালক। সারা ছবিতে পরিচ্ছন্নতায় একটি সুন্দর ছাপ পাওয়া যায়। ছবিটি হৃদয়কে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে। যে কোন হৃদয়বান দর্শকের অন্তরে এই ছবির বক্তব্য আবেদন জাগাতে সক্ষম হবে। ছবির কাহিনী স্বীকার করতে বাধা নেই, যেমনই বলিষ্ঠ তেমই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

নির্মলকুমার সেনগুপ্তের রচনার নিদর্শনবাহী এই কাহিনীর চিত্রায়ণে সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নির্মলকুমার ও রুমা গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে অল্প আবির্ভাবে মনে দাগ রেখে গেছেন ছবি বিশ্বাস ও রাধামোহন ভট্টাচার্য। রাধামোহন বাবুর অভিনয় এর আগে শেষবারের মত দেখা গেছে তপন সিংহের দ্বারাই পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালা" ছবিতে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে স্বর্গতঃ তুলসী লাহিড়ী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রসরাজ চক্রবর্তী, রবীন বন্দ্যোঃ, দেবী নিয়োগী, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অতনু ঘোষ, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, গীতা দাস, প্রভাবতী জানা, অজন্তা কর প্রভৃতিকে। ছবিটির কৌতুকাংশও মাঝে মাঝে এমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যার আবেদন হৃদয়কে বিশেষরূপে অভিভূত করে তোলে, অবশ্য এ ক্ষেত্রে এই কৃতিত্বের অনেকখানি অংশ শিল্পীরাও দাবী করতে পারেন। ছবিটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্বর্গতঃ শিল্পী তুলসী লাহিড়ীর স্মৃতির উদ্দেশে।

নতুন নাটক : রঙমহলে

রঙমহলে এক মুঠো আকাশের সাফল্যপূর্ণ অভিনয় সমারোহে চলছে। বর্তমান কর্তৃপক্ষ আরও একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নতুন নাটকটি প্রতি শনি ও রবিবার মঞ্চস্থ হচ্ছে এবং এক মুঠো আকাশের অভিনয় হচ্ছে প্রতি বৃহস্পতিবার। নতুন নাটকটির নাম "এক পেয়ালা কফি"। এই রহস্যঘন অপরাধমূলক নাটকটিরও রচয়িতা, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা শ্রীতরুণ রায় ওরফে ধনঞ্জয় বৈরাগী। তরুণ রায় ব্যতীত আর যে সকল শিল্পী ভূমিকালিপিকে ভরিয়ে তুলেছেন তাঁদের মধ্যে রবীন মজুমদার, বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, পিকলু নিয়োগী, দীপান্বিতা রায়, কেতকী দত্ত ও কবিতা রায়ের নাম উল্লেখনীয়।

নতুন নাটক : মিনার্ভায়

ওথেলো, ছায়ানট ও নীচের মহলের পর মিনার্ভার বর্তমান নাট্যগোষ্ঠী আরও একটি নতুন নাটক দর্শক দরবারে নিবেদন করলেন। বর্তমান নাটকের নাম অঙ্গার। নাটকটির স্রষ্টা, পরিচালনকার ও মুখ্য শিল্পী উৎপল দত্ত। অন্যান্য ভূমিকাগুলির রূপ দিচ্ছেন শোভা সেন, নীলিমা দাস এবং লিটল থিয়েটারের শক্তিমান অভিনয়শিল্পিগণ। নাটকটির এ ছাড়া বিরাট আকর্ষণ সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত। এই দু'টি বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে রবিশঙ্কর ও নির্মল চৌধুরীর মত বাঙলার দুই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান।

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি তিননরী মুক্তাহারের আলোকচিত্র
[illegible]ত হইয়াছে। আলোকচিত্র অজয়কুমার দে গৃহীত।

পাগলা হত্যার মামলা

(২১৬ পৃষ্ঠার পর)

তাঁর বদলে আপনি রিক্সায় উঠেছিলেন বলে ভগবানের দয়ায় আজ তিনি বেঁচে গেলেন। তবে তাঁকে বলবেন যে, তাঁর জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।"

এর পর দিন আমরা আমাদের গুপ্তচরদের মুখে সংবাদ পেলাম যে, খোকা বাবু আমাদের থানার উপরকার কোয়ার্টারের দেওয়ালের থাম্বা বেয়ে উঠে জানালার মধ্য দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে আমাদের হত্যা করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এই সংবাদ ইন্সপেক্টার সুনীল বাবু কলিকাতা পুলিশের উত্তর বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীনটবর জোনসকে জানালে তিনি আমাদের কোয়ার্টারের জানালাগুলি অয়ার-নেট বা তারের জাল দ্বারা আবৃত করে দেবার ব্যবস্থা করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এর পর হতে খোকা বাবুকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবার জন্য আমরাও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে একরকম মরিয়া হয়েই কাজে লেগেছিলাম। এর কারণ এই যে, আমরা জানতাম, পিছিয়ে আসবার আর আমাদের উপায় নেই। এবং আমরা যদি তাকে মারতে না পারি তো সেই আমাদের এক সময় না এক সময় মেরে দেবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, তাকে জীবিত ধরবার চেষ্টা না করে তাকে দেখা মাত্র গুলী করে মেরে ফেলাই শ্রেয় হবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। আমাদের মতে এইরূপ কার্য্য হত্যাকাণ্ডেরই সামিল। তবে তাকে খুঁজতে বেরুবার সময় আমরা আমাদের জামার তলায় লৌহবর্ম্ম পরিধান করতাম। কোনও বাটি তল্লাসের সময় মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরে ডান হাতে আবক্ষ-পরিমাণ লৌহসিল্ড এবং বাম হাতে টোটা-ভরা পিস্তল সহ আমরা অগ্রসর হতাম। এই সকল সাজসরঞ্জাম ইংরাজ আমলে সশস্ত্র বিপ্লবীদের আবাস রেইড্ করবার জন্য পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে মজুত রাখা হতো। এই মামলার জন্য বিশেষ হুকুম নিয়ে এইগুলি আমরা লালবাজার থেকে আনিয়ে নিয়েছিলাম।

এমনি ভাবে আরও পক্ষাধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু এই মামলার অন্যতম আসামী খোকা ও কেষ্টোকে আমরা বৃথাই সন্ধান করে চলেছি। আমাদের সকল আততায়ীকে আমরা চিনি না, কিন্তু আমাদের প্রতিটি আততায়ী-ই আমাদের চেনে। হঠাৎ তাদের কেউ অতর্কিতে আমাদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরার পর আমাদের পকেট থেকে আমাদের পিস্তল বার করা বা না করা সমান কথা। সত্য কথা বলতে কি, আমরা আমাদের জীবন খরচের খাতাতেই লিখিয়ে দিয়েছিলাম। তবে সর্ব্বক্ষণই আমাদের মনোবল আমরা অটুট রেখেছিলাম। এইদিন রাত্রি এগারোটার সময় থানায় খবর এলো যে, খোকা বাবু চিৎপুর রোডের একটি বেশ্যাবাড়ীর ত্রিতলের একটি কক্ষে অধিবেশিত একটি গানের জলসায় তার দলের লোকদের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হচ্ছে। এইরূপ গোলমালের মধ্যে খোকাবাবুর পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে থানার এতো নিকটের এক স্থানে গানের জলসায় যোগদানের কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা কালবিলম্ব না করে সেইখানে সশস্ত্র অভিযানের ব্যবস্থাও করেছিলাম। ঐ বেশ্যা-বাড়ীর ত্রিতলে এসে আমরা দেখলাম যে, ঐ ঘরটি ভিতর হতে অর্গল-বদ্ধ থাকলেও তার ভিতর হতে ঘুঙুরের শব্দ ও গানের আওয়াজ আসছে। আমরা আর কালবিলম্ব না করে সকলে মিলে সবুট পদাঘাতে দরজাটি ভেঙে ফেললাম। এর পর হুড়মুড় করে গুলীভরা পিস্তল হাতে ঐ ঘরে ঢুকে পড়া মাত্র দেখলাম যে, এক ব্যক্তি ঐ ঘরের রাস্তার দিককার খোলা জানালা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়লো। আমাদের অধুনাতম এবং খোকাবাবুর পূর্ব্বতন বন্ধু হরিপদ সরকার অন্যদিনের ন্যায় এই দিনও আমাদের সঙ্গে ছিল। সে তাকে দেখে তারস্বরে চীৎকার করে বলে উঠলো, স্যার ওই যে খেঁদা—এখুনি ওকে গুলী করুন। কিন্তু আমাদের কোনও প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্ব্বেই সে জানালা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। আমাদের সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে, খেঁদাবাবু অতো উঁচু হতে লাফিয়ে নীচে ফুটপাতে পড়ে এতক্ষণে তার ইহলীলা শেষ করে সে তার এ মরজীবনের অবসান ঘটিয়েছে। এইজন্য উপরে আর একটুও অপেক্ষা না করে আমরা তড় তড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তায় এসে দেখলাম যে, খোকা ওরফে খেঁদাবাবুর লাস সেখানে পড়ে নেই। সামনেই একটি পানের দোকান অত রাত্রেও সেখানে নিয়মমত খোলা ছিল। পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, তার গাল দুটো টকটকে লাল ও তার ওই গাল দুটোর উপর পাঁচ আঙুলের ছাপ। পানওয়ালা হাবুস নয়নে কাঁদছিল ও সেই সঙ্গে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলও। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিল। তার সেই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য বিধায় তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি এই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি খরিদ্দারের সঙ্গে কথা কইছিলমে। হঠাৎ একটা সর্-র্-র আওয়াজ শুনে উপরে তাকিয়ে দেখি ভল্ট খেতে খেতে একটা লোক নীচের দিকে পড়ছে। সে আমার দোকানের ঝাপির উপর ঠক্কর খেয়ে নীচের ফুটপাতের উপর আছড়ে পড়লো। আমাদের মনে হলো যে তার হাত পা গুলো তার পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাত দিয়েই নিজের হাত পা গুলো টেনে টেনে সোজা করলো। এরপর সে আমার সম্মুখে এসে আমার বাম গালে সজোরে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, দে বেটা একটা সিগরেট। আমি—তার ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা সিগরেট তার মুখে তুলে দিলাম। এর পর সে আমার ডান গালে আর একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,—এই দে বেটা এখুনি এটা ধরিয়ে। আমি তাকে খেঁদা বাবু বলে চিনতে পেরেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি সভয়ে দেশলাইয়ের কাঠী জ্বেলে তার সিগরেটটা ধরিয়ে দেওয়া মাত্র সে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আমার সাইকেলটা টেনে নিয়ে সেটাতে চড়ে বসে সিস্ দিতে দিতে পাশের গলিটার মধ্যে অগ্রসর হয়ে গেল।"

আমরা কেহই পানওয়ালার এই বিবৃতিটির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী হতে পারলাম না। বেশ্যাপাড়ার পানওয়ালারা মদ বেচে

ও পুরানো পাপী ও বেস্তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। প্রায়শঃ ক্ষেত্রে তারা সহজে কখনও সত্য কথা বলেনি। ইন্সপেক্টার সুনীলবাবু অভিমত প্রকাশ করলেন যে, খোঁদা নিশ্চয়ই দেওয়ালের খড়া বা পাইপ ধ'রে নীচে নেমে এসেছে। খোকা তাকে বোধহয় সতর্কিত করবার জন্যে তাকে মারধর করে গিয়েছে। এই জন্যে পানওয়ালা ভয়ে সত্য কথা গোপন করে মিথ্যার অবতারণা করেছে। আমাদের মধ্যে একজন অফসার তাকে খোকারই জনৈক দলের লোক ব'লেও সন্দেহ করে তাকে গ্রেপ্তারের প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু পানওলার পালানোর সম্ভাবনা না থাকায় তখনকার মত তাকে রেহাই দিয়ে আমরা খোকাবাবুর আশু গ্রেপ্তারের জন্য ঐ স্থানটি ঘেরাও করে সেখানকার প্রতিটি গৃহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখাই সমীচীন মনে করলাম। কিন্তু ভোর রাত্রি পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি ও ঐ বেশ্যা-পল্লীর বাড়ী বাড়ী হানা দিয়েও সেইদিন কোথাও তাকে আমরা খুঁজে বার করতে পারিনি।

আসামী সুধীর এই মামলার সহিত সম্পর্ক-রহিত থাকলেও আমাদের এই মামলার দায় হতে মুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে সে আমাদের একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়ে গিয়েছিল। সে আমাদের জানালো যে, এই সময় খোকা বাবু আত্মগোপনের জন্য শান্তিনিকেতনের বিদেশী অতিথিভবনে বসবাস করছে। আমরা এই সংবাদটিকে অবিশ্বাস্য মনে করলেও খোকার পূর্ব্বতন বন্ধু হরিপদ উহা অবিশ্বাস্য মনে করে নি। পুলিশ বিভাগে এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা প্রতিটি সংবাদ বিশ্বাস করে পরে তদন্ত করে দেখে যে উহা সত্য সত্যই বিশ্বাস্য কি না, আবার সেখানে এমন লোকও আছে যারা কোনও এক সংবাদ পাওয়ার পর উহা অবিশ্বাস্য মনে করে তদন্ত করে দেখে যে উহা সত্যসত্যই অবিশ্বাস্য কি না। আমরা ছিলাম শেষোক্ত শ্রেণীর অফসার। তাই আমরা স্থির করলাম যে, হরিপদ বাবুকে নিয়ে একবার শান্তিনিকেতনে ঘুরে এলে হয়। পরিশেষে এই দুরূহ কার্য্যের ভারও আমাকেই নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে হয়েছিল। এদিকে কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের নির্দ্দেশ দিয়ে বসলেন যে, খোকা বাবুকে সেখানে পেলেও তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ করা না হয়। কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন আশ্রম থেকে তাকে ফলো করে এসে তাকে ঐ আশ্রম বা বিদ্যায়তনের বাইরে এসে যেন ধরি। ঐ আশ্রম বা বিদ্যায়তনের মধ্যে খোকা বাবুর সহিত গুলী-বিনিময় করা আমাদেরও মনঃপুত— ছিল না। উপরন্তু বিশ্বকবি এই সময় ঐ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। আমি ও হরিপদ বাবু একদিন সন্ধ্যায় এসে এই আশ্রমের ভারতীয় অতিথিভবনে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। বলা বাহুল্য ছদ্মবেশে আমরা সেখানে এসে আমাদের পর্য্যটক বলে সেখানে সকলের নিকট পরিচয় প্রদান করি। এর পরদিন খোকা বাবুকে চকিতের জন্য আমরা দূর হতে উত্তরায়নের নিকট রাস্তার উপরে একবার মাত্র দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু দ্রুতগতিতে আমরা সেখানে এসে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে অন্তর্ধান হয়ে যায়। আমরা শান্তি-নিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বোলপুর ষ্টেশনের নিকট বহুবার খোঁজা খোঁজা করেও তার আর কোনও সন্ধানই পাই না। অগত্যা আমাদের কোলকাতাতেই আবার ফিরে আসতে হয়। কোলকাতা শহরে তদন্ত দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, খোকা বাবু কোলকাতায় ফিরেননি। কিন্তু তা'বলে আমরা একটি দিনের জন্যও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকিনি। বরং আমরা প্রতিটি রাত্রে সন্দেহমান প্রতিটি স্থানে একবার করে খোকা বাবু ও তার বন্ধু কেষ্টো বাবুর সন্ধানে হানা দিয়ে চলছিলাম।

এই ভাবে দিনের পর দিন ব্যর্থ অভিযান চালানোর পর অবশেষে ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) তারিখে আমাদের ভাগ্য কথঞ্চিৎ সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। এতোদিন মলিনাকে আমরা সশস্ত্র শান্ত্রী-দ্বারা সুরক্ষিত করে রেখেছিলাম। এই জন্যই বোধ হয় কেষ্টো বা খোকা এতোদিন সেখানে হানা দিতে সাহসী হয়নি। কিন্তু মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে আমরা ইচ্ছা করেই খোকার প্রেয়সী মলিনার বাটী হতে আমাদের মোতায়েন সশস্ত্র শান্ত্রী উঠিয়ে নিয়ে সেখানে মাত্র সাদা পোষাক-পরা সিপাহী মোতায়েন করে দিই। কিন্তু আমাদের চালাকী না বুঝতে পেরে এইদিন খোকার নির্দ্দেশে কেষ্টো মলিনার বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে গোপনে খবর নিতে এসে সত্য সত্যই আমাদের গোয়েন্দা পুলিশের হাতে অতর্কিতে ধরা পড়ে গেল। সত্য সত্যই এইদিনকার এই সাফল্যের কারণে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

কেষ্টোকে থানায় এনে আমাদের নিকট হাজির করা হলে আমি নিবিষ্টমনে এই আসামী কেষ্টোকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। খোকার মত কেষ্টো কোনও এক স্বভাব বা মধ্যম অপরাধী ছিল না। যতদূর বুঝা গেল, তাকে একজন অভ্যাস অপরাধীই মনে হলো। এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেও কুসঙ্গের কারণে ধীরে-ধীরে অভ্যাসজনিত সে একজন অপরাধীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এইজন্য যে রীতিতে একজন স্বভাব বা মধ্যম অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, সেই রীতিতে একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোনও লাভ হবার কথা নয়। এইজন্য এর সঙ্গে আমি ভিন্নরূপ ব্যবহার করার প্রয়োজন মনে করেছিলাম।

[ক্রমশঃ

দেশে-বিদেশে

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ (নভেম্বর-ডিসেম্বর, '৫৯)

অন্তর্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর) : ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি পৃথক নাগা রাজ্য গঠনই নাগাদের ন্যূনতম দাবী—শিলং-এ নাগা কনভেনশনের সভাপতি ডাঃ ইনকানলিবার ঘোষণা।

২রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভায় লাডাক সীমান্তে চীনা বাহিনীর আক্রমণের কঠোর নিন্দা।

লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—কালিম্পং ও অন্যান্য সীমান্ত এলাকায় ভারত বিরোধী যে প্রচার-কার্য্য চলিতেছে, উহার সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে ভারত সরকার বদ্ধপরিকর।

৩রা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর) : ভারতীয় এলাকা হইতে চীনা সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে—বিরোধ মীমাংসার জন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাই-এর নিকট শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) বিকল্প প্রস্তাব।

৪ঠা অগ্রহায়ণ (২১শে নভেম্বর), দেশরক্ষা সচিব শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেনন কর্ত্তৃক ভারতীয়দের প্রতি দলে দলে আঞ্চলিক বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান।

৫ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) : দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা চলে না।

৬ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বিহার ও আসামের কয়েকটি এলাকা পশ্চিমবঙ্গভুক্তি দাবী।

৭ই অগ্রহায়ণ (২৪শে নভেম্বর) : চেক সরকার কর্ত্তৃক ভারতকে ২৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঋণদানের ব্যবস্থা—দিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৮ই অগ্রহায়ণ (২৫শে নভেম্বর) : চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে বিতর্ককালে লোকসভায় তুমুল হট্টগোল।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক কোচিনে দ্বিতীয় জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা স্থাপনের আয়োজন।

৯ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর) : ভারতের সীমান্ত রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে—চীন-ভারত সীমান্ত প্রশ্নে দ্বিতীয় শ্বেতপত্রের উপর লোকসভায় বিতর্ক কালে দেশরক্ষা সচিব শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর) : ভারত-ভূমিতে চীনা আক্রমণ ও রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত।

১১ই অগ্রহায়ণ (২৮শে নভেম্বর) : সকল অবস্থায় সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে—জাতির প্রতি প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর আহ্বান।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর) : আসানসোলের নিকট ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৫০ জন নিহত ও শতাধিক আহত হওয়ার সংবাদ।

১৩ই অগ্রহায়ণ (৩০শে নভেম্বর) : কেন্দ্রীয় পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৪ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর) : আইনের ফাঁক ও শাসন বিভাগের দুর্নীতি প্রত্যক্ষ কর ফাঁকির কারণ—কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটির রিপোর্টে অভিযোগ।

১৫ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) : দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যকে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব—কংগ্রেস নিযুক্ত বোম্বাই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ।

১৬ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর) : নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা—আক্রমণের ক্ষেত্রে নেপাল ও ভারত একত্রে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

বোম্বাইকে দুইটি রাজ্যে বিভক্ত করার প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদন।

অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর) : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের খাদ্য নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা।

১৮ই অগ্রহায়ণ (৫ই ডিসেম্বর) : কলিকাতার প্রাক্তন মেয়র ও হিন্দু মহাসভা নেতা শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরীর জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

বিখ্যাত টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ও নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি মহারাজ কে, এস, দলীপ সিংজীর পরলোক গমন।

১৯শে অগ্রহায়ণ (৬ই ডিসেম্বর) : প্রধান মন্ত্রীর শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে শ্রমজীবিনী শ্রীমতী বুধনী মেঝেন কর্ত্তৃক পাঞ্চেৎ বাঁধের (ডি-ভি-সি'র বৃহত্তম বাঁধ) উদ্বোধন।

২০শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর) : দেশরক্ষা-সচিব শ্রী ভি, কে কৃষ্ণমেননের সতর্কবাণী—ভারতের কোন শক্তিজোটে যোগদানের অর্থই হইবে স্বাধীনতার বিলুপ্তি।

পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া পশ্চিম-বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক লোক নিয়োগ—কমিশনের রিপোর্টে (১৯৫৬-৫৭) গুরুতর অভিযোগ।

২১শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) : পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বিল বিনা বাধায় গৃহীত।

মহীশূরে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ—১ জন নিহত ও ৫ জন আহত।

২২শে অগ্রহায়ণ (৯ই ডিসেম্বর): ভারতে 'শান্তি-সফর' উদ্দেশ্যে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নয়াদিল্লী উপস্থিতি—সম্মানিত অতিথির সর্বত্র বিপুল সম্বর্দ্ধনা।

২৩শে অগ্রহায়ণ (১০ই ডিসেম্বর): বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে দিল্লীতে নেহরু-আইসেনহাওয়ার প্রথম দফা বৈঠক।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইকের ঘোষণা—বিশ্ব মানবের শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর): ক্ষুধার বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম আহ্বান—দিল্লীতে বিশ্ব কৃষিমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ভাষণ।

২৫শে অগ্রহায়ণ (১২ই ডিসেম্বর): সমগ্র মধ্য প্রদেশে সরকারী কর্মচারীদের (তৃতীয় শ্রেণীর) ধর্মঘট—এ যাবত শতাধিক ধর্মঘটী গ্রেপ্তার।

দিল্লীতে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর মধ্যে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর): আইক-নেহরু আলোচনান্তে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার—শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল বিরোধ মীমাংসা ব্যাপারে উভয় পররাষ্ট্রনেতার মতৈক্য।

২৭শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর): ভারতে পাঁচদিন ব্যাপী শুভেচ্ছা সফরের পর মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের দিল্লী হইতে তেহরাণ যাত্রা।

বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সম্মিলিত আট দফা দাবীর ভিত্তিতে পশ্চিম বঙ্গে দুই লক্ষ চটকল শ্রমিকের প্রতীক ধর্মঘট।

২৮শে অগ্রহায়ণ (১৫ই ডিসেম্বর): ভারতীয় বন্দীদের প্রতি চীনের দুর্ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ—চীনের নিকট ভারত সরকারের লিপি প্রেরণ।

নিম্ন পর্য্যায়ের চাকুরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অত্যাবশ্যক নয়—শ্রীরামস্বামী মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে গঠিত সরকারী চাকুরী (লোক নিয়োগের যোগ্যতা) কমিটির সুপারিশের উপর সরকারী সিদ্ধান্ত।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর): পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাকে লইয়া স্বতন্ত্র খাদ্য-অঞ্চল গঠনের কাজ কার্য্যত: সম্পন্ন—লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রীএস কে পাতিলের ঘোষণা।

বহির্দেশীয়—

১লা অগ্রহায়ণ (১৮ই নভেম্বর): রুশ-চীন অভিযানের আশঙ্কায় পাক্ প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁন কর্ত্তৃক বৃটেন ও আমেরিকার নিকট অর্থ ও অস্ত্র প্রার্থনার সংবাদ।

২রা অগ্রহায়ণ (১৯শে নভেম্বর): প্রধান মন্ত্রী বন্দরনায়কের হত্যা প্রসঙ্গে সিংহলের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী বিমলা বিজয়বর্দ্ধন গ্রেপ্তার।

৩রা অগ্রহায়ণ (২০শে নভেম্বর): আণবিক রাষ্ট্রগুলির নিকট আণবিক পরীক্ষা বন্ধের আবেদন সম্বলিত ভারতীয় প্রস্তাব রাষ্ট্র-সংঘ রাজনৈতিক কমিটিতে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত।

৫ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর): চীন-ভারত-সীমান্ত বিরোধে চীনা পদ্ধতিতে যুগোস্লোভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটোর নৈরাশ্য প্রকাশ।

৬ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর): পশ্চিম জাভায় (ইন্দোনেশিয়া) চীনা বিতাড়ন অভিযোগে সৈন্য নিয়োগ।

৯ই অগ্রহায়ণ (২৬শে নভেম্বর): আফগানিস্তান কর্ত্তৃক মধ্য সামরিক জোটে (সেণ্টো) যোগদানের পাক্ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

চন্দ্র প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ প্রেরণের মার্কিণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ।

১০ই অগ্রহায়ণ (২৭শে নভেম্বর): পাকিস্তানকে বাদ দিয়া চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যার মীমাংসা চলিবে না—লণ্ডনে পাক্ প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের ঘোষণা।

১২ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর): উত্তর ব্রহ্মে পুনরায় কুওমিণ্টাং চীনা (চিয়াং) বাহিনী পুনরায় উৎপাত সুরু করিয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম সরকারের দাবী।

১৪ই অগ্রহায়ণ (১লা ডিসেম্বর): হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট-সম্মেলনে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা—যে কোন সময় ও যে কোন স্থানে সোভিয়েট ইউনিয়ন শীর্ষ-সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রস্তুত।

১৬ই অগ্রহায়ণ (৩রা ডিসেম্বর): সিংহলে নয় সপ্তাহব্যাপী জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত।

১৭ই অগ্রহায়ণ (৪ঠা ডিসেম্বর): সিংহলের গভর্ণর জেনারেল সার অলিভার গুণতিলক কর্ত্তৃক সিংহল পার্লামেণ্ট বাতিল।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ঐতিহাসিক 'শান্তি সফরের' সূচনায় রোম উপস্থিতি।

২০শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর): দুই দিনের সফরে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের করাচী (পাকিস্তান) আগমন।

২১শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর): করাচীতে পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সহিত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইকের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক।

২৪শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর): ইন্দোনেশিয়ায় চীনা-বিরোধী অভিযানের জের ইন্দোনেশীয় সরকারের নিকট চীনের প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ।

২৬শে অগ্রহায়ণ (১৩ই ডিসেম্বর): ইন্দোনেশিয়া কর্ত্তৃক চীনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ।

২৭শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর): বাগদাদ চুক্তির স্থলাভিষিক্ত 'সেণ্টো' 'সেণ্টো' জঙ্গী চুক্তি (মধ্যপ্রাচ্য) সমর্থন—ইরাণী পার্লামেণ্টে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইকের ভাষণ।

২৯শে অগ্রহায়ণ (১৬ই ডিসেম্বর): কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান না হইলে ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই বিপদ—পাক্ প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের বক্তব্য।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমাদের পরিসংখ্যা

"কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার এক হিসাবে প্রকাশ, ভারতে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতের জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৮ লক্ষ হইবে এবং আরও ৫ বৎসর পরে জনসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৭ কোটি ১৬ লক্ষ। জনসংখ্যার হার এইভাবে বাড়িতে থাকিলে দেশে যে নানারূপ সমস্যা দেখা দিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার মারফৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইবার চেষ্টা যে এ-পর্য্যন্ত আশানুরূপ হয় নাই, তাহা সুবিদিত। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধিই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হিসাবে রহিয়া যাইতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় যদি শুধু কৃষিজই নয়, শিল্পজ উৎপাদন বেশি হারে বৃদ্ধি না পায়, তবে আগামী ১০ বৎসরে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে বাধ্য।"

—দৈনিক বসুমতী।

লেখাপড়া করে যে

"জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের ৩৪তম অধিবেশন দাবী করিয়াছেন,—দেশের সমস্ত নিরক্ষর কারখানা শ্রমিককে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। তাঁহারা সমস্ত রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক শ্রমিককে সমাজ শিক্ষা দিয়া সার্টিফিকেটের উপযোগী করিয়া তোলার অনুকূল পরিবেশ যাহাতে কারখানাগুলিতে সৃষ্টি হয়, কারখানা মালিকদের এখনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইহা সুপ্রস্তাব। দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যাই হইলেন কৃষক ও কারখানা শ্রমিকরা এবং তাহাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন প্রায় মেলে না বলিলেই চলে। কৃষকরা তবু মৃত্তিকার সঙ্গে যুক্ত, তাই সমাজ পরিবেশ হইতে তাঁহারা কিছুটা শিক্ষা-সংস্কৃতি লাভ করেন। কিন্তু কারখানা মজুররা নোংরা বস্তীতে অনেকটা লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন এবং দেহ ও মন কোনদিকেই তাঁহাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল পটভূমি নাই। এই সমস্ত মানুষকে চলনসই রকম লেখাপড়া শেখানো প্রয়োজন এবং তাহাদের নিজ নিজ কাজের সঙ্গেই বিনা ব্যয়ে যাহাতে সে ব্যবস্থা হয়, তা এখনি করা প্রয়োজন। কিন্তু দেশের নাবালক ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেককে অবশ্য নির্বিশেষে অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া শেখানোর কথাটা সর্বাগ্রে ভাবিতে হইবে। যেহেতু জাতির ভাবী দিনের ভালো-মন্দ নির্ভর করে জাতির উপর।"

—যুগান্তর।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

"আশা করিতেছি যে, চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি থাকিলেও খাদ্যের অভাব হেতু অথবা মজুতদার ও চোরাচালানকারীদের কারসাজির ফলে অদূরভবিষ্যতে এই রাজ্যে খাদ্যসমস্যা জটিল আকার ধারণ করিবে না। তবে সুদূরভবিষ্যতে কি হয় বলিতে পারি না। আগামী ১৯৬০-৬১ সনে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের অবস্থা যদি সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে উড়িষ্যা ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য সত্ত্বেও চলতি ১৯৫৯-৬০ সনের শেষের দিকে রাজ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য চড়িয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বাজারে বহুসংখ্যক ছোট-বড় মজুতদারও গজাইয়া উঠিয়া অবস্থা অধিকতর গুরুতর করিয়া তুলিতে পারে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে আগামী ১৯৬০-৬১ সনেও যাহাতে চলতি ১৯৫৯-৬০ সনের মত এবং সম্ভব হইলে অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় তৎপক্ষে এখন হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবহিত হওয়া আবশ্যক। শুনা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিকল্পনা বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। উহা জানিয়া আমরা আতঙ্ক বোধ করিতেছি। অবিলম্বে এই দ্বন্দ্বের অবসান হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ খাদ্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় বিপদ অনিবার্য্য হইবে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

কেরালায় নির্বাচন

"কেরালায় আবার যদি কমিউনিষ্টপার্টি বিজয়ী হইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে তবে কি কংগ্রেস পুনরায় জনগণের রায় উপেক্ষা করিয়া তাহাকে বাতিল করিয়া দিবে? এই প্রশ্ন মানুষের মনে জাগা স্বাভাবিক। সারা ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষ চাহে—নির্বাচিত সরকারকে নিশ্চয়ই কাজ করিতে দিতে হইবে। এই প্রশ্নের সমাধানের উপর ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। ভারতবাসী ভাল করিয়াই জানে যে, গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিলে আমলাশাহীর পথে দেশকে টানিয়া নামানো হইবে। কেরালায় নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টির জয়ের অর্থ ভারতের চরম প্রতিক্রিয়ার পশ্চাদপসরণ। কেরালা নির্বাচনে কমিউনিষ্টপার্টির জয়ের অর্থ ভারতে গণতন্ত্রের অগ্রগতি। কেরালার কমিউনিষ্টপার্টি দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও জনস্বার্থ-বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই লড়িতেছে। এ লড়াই সারা ভারতের লড়াই। দেশের মানুষ চায়—শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ন্যায়-নির্বাচনে কেরালার মানুষকে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিতে দেওয়া হউক। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন চলিলে কেরালার সাধারণ মানুষের জয় অনিবার্য, তাহারা নিজেদের পার্টি কমিউনিষ্ট পার্টিকে নির্বাচনে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবেই। গণতন্ত্র ধ্বংসকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্ত পরাস্ত হউক—ইহাই সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরের কামনা।"

—স্বাধীনতা।

জীবিতের স্মৃতি

"আর একটি সংবাদ—শ্রীনেহেরু আমিনগাঁওএ এসে ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে প্রস্তাবিত পুল নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করবেন। বছর খানেক আগে থেকেই পুল নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, পর্য্যায়ক্রমে কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে তাও মাঝে মাঝে সগৌরবে প্রচারিত হয়ে আসছে। যে কাজ শুরু হয়েছে এক বছর আগে তার ভিত্তি স্থাপন হবে এখন—শ্রীনেহেরুর হাতে। এখানেও গুরুবাদের অভিনব সংস্করণ। নেহেরুর হস্তস্পর্শ না পেলে কোনও কিছুরই মর্য্যাদা লাভ হয় না। হয়ত নেহেরুর নামের

সঙ্গিনী সংযুক্ত হয়ে ব্রহ্মপুত্র পুলও ধন্য হয়ে উঠবে—সেই নামকরণ এখনও প্রচারিত হয়নি, আমরা আভাসে জানিয়ে রাখলাম। কাজ যতদূর অগ্রসর হবার পরে যদি ভিত্তি স্থাপন উৎসব চলতে পারে তবে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেও মানুষের নামকরণ উৎসব করা চলে হয়ত। আমাদের অতটা জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে কবিকে দিয়ে নিজের একটা নূতন নামকরণের কথা হয়নি।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

কা কস্য পরিবেদনা

"তমলুকে এখন আটা-ময়দা-সুজীর অভাব নাই। সেজন্য রেশনকার্ডে বরাদ্দানুযায়ী প্রত্যেককে দেওয়া ছাড়াও খাবার দোকান গুলিকেও তাহাদের চাহিদা মত আটা ময়দা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। খাবার দোকানীগণ মহকুমা কণ্টোলার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলেই উহা পাইবেন। কিন্তু চিনির এ যাবৎ কোন সুরাহা হইল না। পক্ষাধিককাল হইতে শুনিতেছি স্থানীয় লাইসেন্সীর চিনি আসিতেছে। আসিলেই তাহা নির্দ্ধারিত মূল্যে রেশন কার্ডানুযায়ী দেওয়া হইতে থাকিবে। কিন্তু কোথায় কি? মহকুমাবাসীদের আজও অতিরিক্ত মূল্য দিয়া কলিকাতার চিনি খাইতে হইতেছে। সরকারের এই আধা নিয়ন্ত্রণের জন্য চিনিকল ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীগুলি সুখ পাইতেছে বলিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রতিবাদ জানাইয়াছি। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা।"

—প্রদীপ (তমলুক)

সেচ ব্যবস্থা

"পূর্ব্বস্থলী থানার সমগ্র অঞ্চলেই ক্যানেলের কোন ব্যবস্থা নাই। অদূর ভবিষ্যতে ক্যানেলের কোনরূপ ব্যবস্থা হইবার সুযোগও দেখা যাইতেছে না। অথচ এই থানায় মাটি স্বর্ণপ্রসূ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধান, পাট, গম, কলাই, তরিতরকারী ও ফল-ফুলের চাষ এখানে বিরাটভাবে হইত। সেচনের অভাবে উৎপাদন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। ইহা তো গেল এই থানার অভাবের একটি দিক। অপর দিকে আবার এই থানার মধ্য দিয়া দুই তিনটি নদী প্রবাহিত হওয়ায় প্লাবনের জলে এই থানাটিকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। প্রকৃতির এই রোষের হাত হইতে থানাটিকে বাঁচাইতে না পারিলে এই থানার লক্ষাধিক জনসংখ্যা অসহায়ের ন্যায় দিন যাপন করিবে। ক্যানেলের ব্যবস্থা যখন সম্ভবই নয় তখন নলকূপ অথবা পাম্পের সাহায্যে এই থানার সেচকার্য্যের ব্যাপক বন্দোবস্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

—বর্ধমান।

পীচ রাস্তার সংস্কার ব্যবস্থা

"কাঁথি সহরতলী অংশে গান্ধীরোড রাস্তাটিকে সম্প্রতি প্যাচ রিপেয়ারীং ব্যবস্থার দ্বারা সংস্কার করা হইয়াছে। সহরের মুখে কাঁথি-তমলুক রাস্তার এক মাইল অংশটিরও সংস্কার কার্য্য চলিয়াছে। কিন্তু এই কার্য্যটি এত মন্থর গতিতে চলিয়াছে যে, উহাতে পথচারী ও যানবাহনাদির ঐটুকু পথ যাতায়াতে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ রাস্তার গর্ত্ত অংশগুলির সংস্কার সাধনে অল্প অল্প পাথরকুচি ও পীচ দিয়া যে ভাবে চলনসই করা হইতেছে তাহাতে মোটর বাস যাতায়াতে ব্যাঘাত না ঘটিলেও লোকজন চলাচলের পক্ষে বিষম কষ্ট দেখা দিয়াছে। সাইকেল ও রিক্সাগুলির চলাচলে মাঝে মাঝে এমন ধাক্কা খাইতে হয় যাহাতে রাস্তা হইতে ছিটকাইয়া পড়ার উপক্রম হয়। বড় বড় পাথরকুচিগুলি ক্ষুরধার হইয়া রাস্তার মধ্যে পথচারীদের পাগুলিকে জখম করিতেছে। খালিপায়ে চলা মুস্কিল। কাঁথি সহরের পার্শ্বে ঐপথ গুলিতে প্রতিনিয়ত যেরূপ স্কুল ছাত্রছাত্রী ও লোকজন চলাচল ঘটিয়া থাকে, তাহাতে ব্যবস্থাপক কর্ত্তৃপক্ষের রাস্তার ঐ বন্ধুর অংশগুলিকে রোলার দিয়া সমতল করার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ নজর দিবেন কি?

—নীহার (কাঁথি)

জাহান্নমের পথে

"সর্ব্বোপরি যে গণতন্ত্রের বুলি কপচাইয়া কংগ্রেস জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছে, কেরালায় সেই গণতন্ত্রকেই যে তাহারা টুঁটি টিপিয়া হত্যা করিয়াছে—এই সত্যটি শত চেষ্টাতেও কংগ্রেসীরা ঢাকিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। কেরালায় কমিউনিষ্টদের সম্পর্কে জনমত জানিবার বহু পন্থা ছিল। তৎসত্বেও প্রায় ৪ মাস পূর্ব্বে, অর্থাৎ আরেকটি সাধারণ নির্ব্বাচনের যখন দেড় বৎসরেরও কম সময় বাকী, তখন সেখানে, পূর্ব্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া, আরেকটি উপনির্ব্বাচন তথা লক্ষ লক্ষ টাকা অপব্যয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইল,—যে টাকাগুলি সাশ্রয় হইলে হয়ত ভারতের কোন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণ সম্ভব হইত। কংগ্রেসীরা কি দাবী করিতে পারেন যে, বিগত ১২ বৎসরে তাহারা দেশকে জাহান্নামের যে স্তরে নিয়া পৌঁছাইয়াছেন, কেরালায় আর দেড়টি বৎসর কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম থাকিলে, তাহার চাইতেও ক্ষতিকর কিছু হইতে পারিত?"

—রুদ্রবীণা (আগরতলা)

আগের কাজ আগে

"ধান ও চালের দাম নিম্নগতিতে চলিয়াছে। চলুক, আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু গোটা বছরের সব সময়ে এ চলা অব্যাহত থাকিবে কি না—এইখানেই আমাদের আশঙ্কা। প্রতি বছর ঠিক এমনি সময়েই ধান ও চালের দর নিম্ন অভিমুখে ধাবিত হয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত চাষী এই সময়ে দেনার দায়ে, খাজনার দায়ে করের দায়ে উদ্বৃত্ত প্রায় সমস্ত ধানই বাজারে নিম্নমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শস্যের মূল্য যখন দ্বিগুণ হয় তখন তাহাদেরই উৎপন্ন শস্য মুনাফাখোর এবং মজুতদারদের আড়ত হইতে বাহির হইয়া আসে। পেটে গামছা বাঁধিয়া সেই চাষীকেই সেই ধান্য দ্বিগুণ কড়িতে কিনিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ তখন থাকে না। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষককুল যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহাদের উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য মূল্য পাইতেছে, সাধারণের জীবনযাত্রার মান ততদিন অবধি উন্নত হইবার আশা নাই, বক্তৃতা বা পরিকল্পনার ছবি দেখাইয়া তাহা হইবে না। সরকারী পরিকল্পনাকে সেই দিকেই সর্বাধিক নিয়োজিত করা উচিত। খাদ্যশস্যের উৎপন্ন বৃদ্ধিও যেমন প্রয়োজন উৎপন্নকারী তাহার ন্যায্য মূল্য পাইতেছে কিনা তাহাও দেখা ঠিক ততখানি প্রয়োজন। নচেৎ অধিক উৎপন্ন করিতে আগ্রহ জন্মিবে না। সমবায় খামার এবং সমবায় বিপনন সমিতি মারফৎ-ই এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হইতে পারে।"

—বীরভূমের ডাক

বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ

"বহু আবেদন, নিবেদন ও সম্মেলনে প্রস্তাবাদি গ্রহণ করিয়া এবং আম্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিতে মালদহে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র (Air strip) নির্মিত হয়। কিছুদিন বিমান নিয়মিত যাতায়াতও করিল। কিন্তু বর্তমানে বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে একমাত্র ঘুঘু চরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার কারণ যাঁহারা এই লাইনে বিমান চালনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট এই লাইনটি ব্যবসায়ের দিক হইতে অলাভজনক বলিয়া ঘোষিত হয় এবং তাহারা বিমান চালনার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন। অথচ ইহা নির্মিত হইবার কালে সারা ভারতে ঢাক পেটান হইয়াছিল—লক্ষ লক্ষ টাকার আম্র এই লাইন দিয়া আসামে ও ভারতের অন্যত্র যাইবে। প্রয়োজনে ভারতের বাহিরেও যাইবে। কিন্তু আম্র ব্যবসায়ীরাও মূল বাণিজ্যিক পরিবহন হিসাবে বিমান পথকে 'অচল' বলিয়া ঘোষণা করিয়া রেলপথকেই লাভজনক মনে করিতেছেন। ইহার কারণ রেল অপেক্ষা দ্বিগুণ ভাড়া বিমান পথে আম্র পরিবহনে প্রয়োজন হয়। ফলে এত আশার বস্তুটি বর্তমানে মালদহবাসীর নিকট সম্পূর্ণ "দিল্লীকা লাড্ডু" বলিয়া মনে হইতেছে। এ সম্পর্কে জেলা কর্তৃপক্ষ, আম্র ব্যবসায়ী বা কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলি যে একটা বিশেষ কিছু করিতেছেন—তাহাও মনে হয় না। অথচ এই পরিস্থিতির অবিলম্বে পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।"

—উদয়ন (মালদহ)।

বাঙ্গালী কি বাঁচিবে ?

"মোটরচালক ও বাস কণ্ডাক্টররূপে শিখের স্থান, রেল-ইঞ্জিনের চালকরূপে অবাঙ্গালীর স্থান বাঙ্গালী ক্রমশঃ লইতেছে। বাঙ্গলাদেশের পুলিশ বাহিনীতে ক্রমশঃ বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়িতেছে, রিক্সাচালকরূপে বাঙ্গালীর দেখা কম মিলিতেছে না; কিন্তু ষ্টেশনের কুলিরূপে, কলিকাতার ভিস্তিওয়ালা ও জলকলের মিস্ত্রীরূপে তাহার দেখা এখনও পাওয়া যাইতেছে না। খিদিরপুর ডকে অবাঙ্গালী বিশেষ করিয়া অবাঙ্গালী মুসলমানের প্রাধান্য। উঁহারা সঙ্কটের সময় বাঙ্গলাদেশের ব্যবসায়ের উপর চরম আঘাত হানিতে পারে। ডকের কর্তা বাঙ্গালী হইলেও, তিনি এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা ইহাদের ভয়ে তটস্থ। কলিকাতা ও খিদিরপুরের বন্দরে বাঙ্গালী কুলি ও মাল-খালাসদারের স্থান অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বন্দর মেদিনীপুরের গেঁওখালিতে অবাঙ্গালীর স্থান যেন কোনওমতেই না হয়, সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা জনসাধারণের কর্তব্য। এখানে বলা প্রয়োজন, বাঙ্গালী বলিতে শুধু বাঙ্গালী হিন্দু নহে, বাঙ্গালী মুসলমানেরও সকল কার্য্যে সমান অধিকার আছে, একথা বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টাতেই অবাঙ্গালীর হাত হইতে একে একে কাজগুলি বাঙ্গালীর হাতে আসিবে।"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

ইঁদুর

"ইঁদুরের আক্রমণ এমন একটা বিরাট ব্যাপার নয় যাহা নিয়া মাথা ঘামান দরকার আছে—এই রকমই একটা ধারণা একশ্রেণী সরকারী কর্মচারীর মনে ছিল এবং আছে। পাঁচ শতাধিক পরিবার

গৃহত্যাগী হইয়াছে, ইহাও হয়ত তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ফসল ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথেই জুমিয়াগণ গৃহ ত্যাগ করে নাই। তাহারা নিশ্চয়ই গৃহত্যাগের পূর্ব্বে স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত উপায় না দেখিয়াই গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে গৃহের মায়া ত্যাগ করা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপেই মানুষ গৃহত্যাগ করে। গৃহত্যাগ যদি এত সহজেই করা যাইত, তবে পূর্ব্ববঙ্গে এখনও ৮০ লক্ষ হিন্দু পড়িয়া থাকিত না, তাহারা দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে চলিয়া আসিত। মনে হয় স্থানীয় প্রশাসন কর্ত্তৃপক্ষ জুমিয়াদের বিপর্য্যয়ের ব্যাপারটিতে মোটেই গুরুত্ব আরোপ করেন নাই অথবা গুরুত্ব আরোপ করিতে চান না। নতুবা যে সমস্ত অঞ্চলের ফসল ইঁদুর কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলে আর্থিক সাহায্য এবং সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সরকার করিতেন। সংবাদে প্রকাশ ইঁদুর আক্রান্ত অঞ্চলের সমস্ত জুমিয়াই অন্যান্য স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় নাই। লুসাই পাহাড়েও তদ্রূপ ইঁদুরের উপদ্রবে ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। আসাম সরকার তথায় খাদ্য সহ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রেরণ করিয়া জুমিয়াদের রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন। ত্রিপুরা প্রশাসন কর্ত্তৃপক্ষ কী গৃহত্যাগী জুমিয়াদের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারেন না?"

—সেবক (আগরতলা)

খাদ্যাঞ্চল গঠনে সমস্যা সমাধান ??

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্যে ঘাটতি রাজ্য এবং একথা সর্ব্ববাদীসম্মত এবং সর্ব্বজনস্বীকৃত। বৎসরের পর বৎসর এই সমস্যা লাগিয়াই আছে, কোন সমস্যার সমাধান বা নিবৃত্তি দেখা যায় নাই। কি আকাল আর কি ফসল, যে বৎসর যাই হোক্ এ সমস্যা যেন এঁটুলীর ন্যায় রাজ্যগাত্রে তথা সমাজগাত্রে বিরাজমান। এ সমস্যা রাজ্যের সাধারণ তথা মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষকে সময়ে সময়ে হতচকিত করিয়া তুলিতেছে,—সময়ে বুভুক্ষুর কাতর আর্ত্তনাদ আকাশ বাতাস মথিত করিয়াও তুলিতেছে। এই সমস্যায় জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যু যে সংঘটিত হইতেছে না এমন নয়। সরকারী দপ্তর যেন তেন ভাষ্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যরূপ বুঝাইতে চাহিলেও মানুষ অন্নাভাবে মরিয়াছে,—মরিতেছে। উৎপাদন বৃদ্ধি, বেশী ফলাও আন্দোলন ইত্যাদি হরেক রকম জোরদার তথা যোগানদার আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, বাণীতে বাণীতে মন মথিত করিয়াছে কিন্তু 'যথা পূর্ব্বং তথা পরম্' প্রবাদ বাক্যকে ফলপ্রসূ করিয়া সমস্যা একরূপই আছে।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে সমস্যা থাকিলেও ঠিক এমন ছিল না, অবশ্য তার কারণও বর্ত্তমান ছিল। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যেমন বাধা নিষেধের বেড়াজাল ছিল না, তেমনি বাংলার শস্য ভাণ্ডার পূর্ব্বাঞ্চল ছিল, বর্দ্ধমানের খণ্ডিতরূপ ছিল না। আজ রাজনৈতিক কারণে যেমন পূর্ব্বাঞ্চল হাতছাড়া তেমনি বৈষয়িক বুদ্ধি প্রণোদিত নেতৃবৃন্দের কলকাঠিতে ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্যে বাধা নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। একই রাষ্ট্রের হরেক নিয়ম, হরেক কানুন, বেচারা পশ্চিমবঙ্গ তাই অত্যধিক জনসংখ্যা আর শস্যের আমদানী হীনতায় মৃতপ্রায়। গত বৎসরও দেখা গিয়াছে যখন অন্নের অভাবে মানুষ হাহাকার করিতেছে, যখন চাউলের দর চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করিতেছে, তখনও মধ্যপ্রদেশ বা উড়িষ্যার চাউলের মণ পনেরো হইতে সতেরো বা আঠারো টাকা মাত্র। একই রাষ্ট্রে এ ব্যাপার শুধু কৌতূহলই উদ্রেক করিবে না উপরন্তু অন্তরের হাসি ও দুঃখের একই সঙ্গে উদ্রেক ঘটাইবে। এই ব্যাপার আমাদের পারস্পারিক প্রীতিবোধ হীনতাই বোঝাইবে—জাতিত্ববোধে বোধহীনই বাইরের লোক বলিবে।"

—বীরভূম বার্তা

শোক সংবাদ

মহারাণী সুচারু দেবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের তৃতীয় কন্যা ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী মহাশয়া গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ৮৬ বছর বয়সে লোকান্তরিতা হয়েছেন। যশস্বিনী কবি ও শক্তিময়ী শিল্পী হিসেবে মহারাণী সুচারুর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত, অজস্র জনপ্রিয় কবিতা ও চিত্র তাঁর সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন বহন করছে। বাঙলার প্রথম শ্রেণীর সমাজ-সেবিকাদের মধ্যেও তিনি এক বিশেষ আসনের অধিকারিণী। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান তাঁর অবদানে ও সেবায় পুষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলা তথা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপতি শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৪ই অগ্রহায়ণ ৭০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। স্বীয় অভূতপূর্ব প্রতিভার কল্যাণে দেশের একজন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ীরূপে অটল প্রতিষ্ঠার ইনি অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতের বহু বড় বড় বাঁধ নির্মাণে এঁর কুশলী হাতের স্পর্শ রয়েছে (তন্মধ্যে শঙ্কর বাঁধের নাম উল্লেখযোগ্য) হিন্দুস্থান কনষ্ট্রাকশান কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আসনে ইনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ও প্রস্তাবিত কলকাতা স্পোর্টস্ ষ্টেডিয়ামেরও ইনি অন্যতম ট্রাষ্টী ছিলেন।

সনৎকুমার রায়চৌধুরী

কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ৭৬ বছর বয়েসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরীর অগ্রজ ছিলেন। বঙ্গীয় আইনসভায় অন্যতম সদস্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সম্পাদক ও সহকারী সভাপতি এবং আলীপুর বার য়্যাসোসিয়েশনের সভাপতির আসন এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। হিন্দু সৎকার সমিতিরও ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সনৎকুমারের মৃত্যুতে বাঙলাদেশ একজন জাতির একনিষ্ঠ, কল্যাণকামী ও দরদী সমাজসেবীকে হারাল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাঠক-পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বসুমতী বর্ত্তমান বাঙলা ও বাঙালীর গর্ব্বের সামগ্রী হিসাবে আমরা গণ্য করি। কয়েকটি লেখা (যা সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে), বাঙলা সাহিত্যের অভাব শুধু পূরণ করেনি, বাঙালীর সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ইতিহাসে চিরকালীন কীর্ত্তিরূপে দেশবাসী গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। বাঙলা পত্র-পত্রিকার শ্রেণীবিভাগ আমরা করতে চাই না, কিন্তু নানা কারণে মাসিক বসুমতীকে মনে হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জীবন্ত ও প্রাণবন্ত তাই বসুমতীর জন্যে আমাদের যত আবেগ আর অনুরাগ। ক্ষণেকের অদর্শন সহ্য করতে পারি না। মাসিক বসুমতীকে আমাদের শয্যাসঙ্গী করেছি। তৃপ্তি আর আরামের আকর এই পত্রিকাটির গৌরব দিনে দিনে বর্দ্ধিত হোক। বাঙলা ও বাঙালীর অগ্রগতির প্রতীক মাসিক বসুমতী ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করুক। এখন লেখাগুলির নামোল্লেখ করি। যেমন 'শিশির-সান্নিধ্যে' স্মৃতিরচনা। নটনটী ও নাটক সম্পর্কে এমন সারগর্ভ লেখা সহজে খুঁজে মেলে না। লেখাটিতে লেখকদ্বয়ের অপরিসীম নিষ্ঠা ও ধৈর্য্যের প্রশংসা করতে হয়। লেখকদ্বয় বাঙালী জাতির অভিবাদন গ্রহণ করুন। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিপ্লবের সন্ধানে'। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কোন প্রামাণ্য বই এখনও রচিত হয়নি। যা হয়েছে তার অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট ও অভিসন্ধিমূলক লেখা। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার চিহ্ন তাদের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বাঙলার বিপ্লব কাহিনী পৃথিবী বিখ্যাত। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথে (দিল্লীর সরকার স্বীকার করুন চাই নাই করুন) বাঙালীর দান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। লিখবেন হয়তো কোন সৎ ও সজ্জন ঐতিহাসিক। 'বিপ্লবের সন্ধানে' লেখায় যেন কোন ফাঁক ও ফাঁকি নেই। গোপনতা নেই। এমন সহজ সরল নিঃস্বার্থ গল্পরচনা আমরা বহুকাল পড়তে পাইনি। কত অজানা তথ্য, যা হয়তো কখনও জানতে পেতাম না। কত অসংখ্য চরিত্র ও মানুষ—তারা হয়তো বিস্মৃত থাকতেন চিরকাল। কেউ তাঁদের সন্ধান জানতো না। 'বিপ্লবের সন্ধানে' বাঙলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে নিশ্চয়ই। লেখক ব্রাহ্মণ, আমাদের শত সহস্র প্রণাম গ্রহণ করুন। মাসিক বসুমতীর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ (আমাদের কাছে) 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগটিতে। বিখ্যাত মনীষীদের সংস্পর্শে আসার এমন বিস্ময়কর মাধ্যমকে কোন পত্রিকায় দেখতে পাই না। 'পত্রগুচ্ছ' সঙ্কলনটি যেন চিরনূতন। প্রতি মাসের প্রতীক্ষা আমাদের ব্যর্থ হয় না। সে ঠিক আসবেই। 'পত্রগুচ্ছ' আসে যেন মাসে মাসে এক অনন্ত দয়িতের মত। আমরাও মনে মনে জানাই 'সুস্বাগতম্'।

আমাদের সঙ্গে যাদের পরিচয়, জীবনপথে চলতে চলতে যাদের দেখা পাই, পরিচয় পাই, তাদেরই বলি আমরা একটি কথা, 'মাসিক বসুমতী' পড়ুন। বাঙলা তথা ভারতবর্ষকে জানতে ও চিনতে চান তো 'মাসিক বসুমতী' পড়ুন। মাসিক বসুমতী আমাদের জাতির 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলিকা'। সনমস্কার ইতি—শ্রীমতী বিমলা দেবী। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪।

সচিত্র সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা আমাদের দেশে একান্তই নগণ্য। স্রেফ নিউজ প্রিণ্টে ছাপা সাময়িক পত্রিকাগুলিতে ছাপা ছবি দেখতে দেখতে আমাদের সত্যিই হাসি পায়! না আছে কোন পরিকল্পনার বালাই, না আছে কোন শিল্পবোধ। যা খুশী তাই, যা ইচ্ছা তাই ছবি ছেপে দিতে পারলেই ঝামেলা চুকে যায়। ইদানীং আবার কয়েকটি পত্রিকায় যে সব ত্রিবর্ণ ছবি প্রকাশিত হচ্ছে, তাদের বিষয়বস্তু, রঙ-ব্যবহার, ছাপার টেকনিক দেখলে মনে হয়, বাঙলা দেশে যথার্থ শিল্পী নেই বললেই হয়। কাগজ ও রঙের এমন অপব্যবহার কেন যে করেন পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। লাইনের ড্রইং বা রেখাচিত্র তবুও যা হোক কিছুটা স্পষ্ট, কিন্তু গল্পের মাথায় ছবি মানেই কি নায়ক-নায়িকার ছিন্নমুণ্ডের সঙ্গে লেখার হেডিং? অথচ বিদেশে লেখা ও রেখার সংমিশ্রণ ক্রমে কত উন্নত পর্য্যায়ে উঠেছে, শিল্পী ও সম্পাদকরা কি দেখতে পান না? হাফটোন ছবির কথা না বলাই ভাল। লাল, নীল, সবুজ, কালো কালিতে ছাপা চিত্রতারকাদের ষ্টুডিও ফটো দেখতে দেখতে কি হাসি সম্বরণ করা যায়?

আর্ট ডাইরেক্টর বলতে আমাদের পত্র-পত্রিকার কোন কেউ থাকেন কি না, আমরা সঠিক জানি না। তবুও আমরা প্রশংসা করতে পারি বাঙলা দেশের চারটি পত্রিকাকে। 'মাসিক বসুমতী' আনন্দবাজার ও যুগান্তরের 'রবিবাসরীয় সংখ্যা' এবং 'দেশ' পত্রিকার শিল্পরুচির যথেষ্ট পরিচয় থাকে। মাসিক বসুমতীর রঙীন ছবি, গল্পের illustration এবং বিভাগীয় হেডিংগুলি সত্যি সত্যি শিল্পরুচি-সম্মত। মাসিক বসুমতীর রঙীন চিত্রসমূহের বিষয়বস্তু এবং টেকনিক আমাদের চোখ ও মনকে বেশ তৃপ্তি দেয়। গল্পের illustration এবং lettering চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক নয়। আলোকচিত্র আরও ভাল ছাপা হওয়া সমীচীন। মাসিক বসুমতীর প্রচ্ছদপটের বেশ অভিনবত্ব থাকে। পত্রিকার শিল্পিবৃন্দ এবং সম্পাদককে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। সুলেখা সেনগুপ্তা ও বন্যা মুখোপাধ্যায়। (গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী)। কলিকাতা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Remitted Rupees seven and annas eight for six months. Please acknowledge the amount and credit it to my account.—Sm. Krishnakumari Debi, P. O. Rata, Birbhum.

আমার দেয় চাঁদা পাঠালাম। সংবাদ দিয়ে সুখী করবেন। Sm. Aradhana Ghose. Sarada Cottage, Patna—4.

Herewith I am sending subscription for Masik Basumati—Sm. Latika Chatterjee.

C/o Miss K. Chatterjee, Artist. D. C. M. Silk Mills, New Delhi.

Please accept subcription for monthly Basumati.—Sri J. N. Dey. Civil Supplies Office. Balasore.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য পাঠালাম। নমস্কারান্তে ইতি—তৃপ্তি বসু। 33, Nayagaon. Lucknow. U. P.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ সাড়ে সাত টাকা পাঠালাম। কালীতারা দেবী। ৭১, অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেন; কলিকাতা—৩৬।

১৩৬৬ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র মাসের গ্রাহকমূল্য পাঠালাম। অবিলম্বে কার্তিক সংখ্যাখানি পাঠাবেন। অভিবাদন গ্রহণ করুন। শ্রীমতী অনিমা শেঠ। Choukidingipara. Dibrugarh. Assam.

Please send Monthly Basumati to the following address. Mrs, Namita Choudhury, G. P. O. Box No 191. Bangkok. Thailand.—S. Choudhuri. Sector No 18, Rourkela—3.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠালাম, প্রাপ্তি জানাবেন। —সতী দেবী। Post Box No 17. Raxaul. Champaran.

কার্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত গ্রাহিকা হইতে চাই। টাকা পাঠালাম।—শ্রীমতী বীণাপাণি বিশ্বাস। Dhalkar. Jalpaiguri.

ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠালাম।—শ্রীমতী শুক্র ঘোষ। রাণীগঞ্জ। বর্দ্ধমান।

I am sending herewith Rupees seven and annas eight being the renewal subscription.—Mrs. Amala Mukherjee, Kamtaul. Darbhanga.

বসুমতীর গ্রাহিকা মূল্য পাঠালাম। বসুমতী পাঠিয়ে বাধিত করবেন।—শেফালী রায়। Nazerbagh. Lucknow.

এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য পনেরো টাকা পাঠাইলাম। দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়। কস্তুরবা রোড। Bangalore.

ছয় মাসের চাঁদার টাকা পাঠালাম। কার্তিক মাস থেকে পত্রিকা পাঠাবেন।—নিলীনা আব্রাহাম। Emokulam, Kerala.

শ্রাবণ মাস থেকে ছয় মাসের চাঁদা পাঠালাম। শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা একত্রে পাঠালে ভাল হয়। নমস্কার। শ্রীমতী কনক দে। Sekhbazar, Cuttack.

চাঁদা বাবদ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—মুকুল চৌধুরী। Malleswaram, Bangalore.

Remitting Rupees 7·50 n. p. being half-yearly subscription of my above quoted name—Nilima Bose. Thanjhora Tea Estate, Thanjora.

This is the subscription of the Monthly Basumati—D. K. Laha. Tilak Nagore Thana, Bombay.

I am sending Rupees fifteen in advance for monthly Basumati—Mrs, Kalpana Basu. Kopri Colony. Thana Bombay.

কার্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আমাকে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিবেন।—অর্পিতা দাশগুপ্তা, Secy, Bengali Mahila Samiti, Byronbazar, Raipur.

ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর অগ্রিম মূল্য পাঠালাম। নিয়মিত বসুমতী পাঠাবেন।—শ্রীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায়। Po. Guraru Mills, Gaya, Bihar.

Please continue sending me Monthly Basumati for another six months.—Dr. (Mrs.) H. Misra. Hirakud Hospital, Orissa.

Being the half-yearly spbscription for Monthly Basumati.—Mrs. Alo Sengupta. 254. Sion Road, Bombay-22.

বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠালাম। নমস্কার।—শৈলবালা দেবী। Harem Road, Ranchi.

মাসিক বসুমতীর চাঁদার জন্য সাড়ে সাত টাকা পাঠালাম। —ইলারাণী পাল। Poona.

Sending Rupees fifteen being our renewal subscription for one year.—Kalyani Roy-Choudhury. Armapur, Kanpur.

আমাদের বদলীর ঝামেলার দরুণ সময়মত টাকা পাঠাতে না পারায় বিশেষ লজ্জিত এবং দুঃখিত।—শ্রী অপর্ণা সান্যাল। Barhi, Hazaribagh.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা পাঠালাম।—মঞ্জু বসু। Monoharpur, Singhbhum, S. E. Rly.

আমি মাসিক বসুমতীর একজন গ্রাহিকা। বসুমতীর ১৩৬৬ সালের কার্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ মাসের চাঁদা ৭৷৷০ টাকা পাঠালাম (গ্রাহিকা নং ৫২৭৮২) ছোটবেলা থেকেই মাসিক বসুমতীর সঙ্গে আমার পরিচয়। মাসিক বসুমতী পাঠ করে আমি খুব আনন্দ পাই। অতএব নিয়মিত পত্রিকা পাঠাতে ভুলবেন না। —Mrs. Alo Chatterjee C/o Dr. N. C. Chatterjee, 155, Basant Lane, Paharganj. New Delhi.

Please receive Rs 7·50 N. P. as subscription of Monthly Magazine Basumati for the period from Kartick to Chaitra 1366 B. S. and arrange to send the same as usual. The delay in sending the subscription is regretted.—Protiva R- Gupta. Thana Health Centre, Ranibar. Bankura.

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। কথামৃত	(যুগবাণী)		৩৬১
২। সন্ত কবীর	(জীবনী)	যামিনীকান্ত সোম	৩৭০
৩। সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	অনামী	৩৭৫
৪। ইংরাজি কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়	৩৭৭
৫। অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ	(জীবনী)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৮৪
৬। বিপ্লবের সন্ধানে	(কারাকাহিনী)	নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৮
৭। মুক্তি	(কবিতা)	মঞ্জু দাশগুপ্তা	৩৯৪
৮। আধুনিক বঙ্গদেশ	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু	৩৯৫
৯। একটি বছর	(কবিতা)	বন্দে আলী মিয়া	৪০০
১০। চার জন	(বাঙ্গালী-পরিচিতি)		৪০১
১১। ঝাঁসীর রাণী	(কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী	৪০৫
১২। পত্রগুচ্ছ			৪০৬

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কুট্টনীমতম্

শ্রীকাশ্মীর মহামণ্ডল মহমণ্ডল

রাজা জয়াপীড় মন্ত্রিপ্রবর

দামোদর গুপ্ত কবি বিরচিত

মূল বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনীসহ

প্রায় ১১৫০ বৎসরের সুপ্রাচীন ভারত-বিখ্যাত এই কাব্য এদেশে এতদিন প্রায় অপ্রচলিত ছিল। ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে প্রাচীনতম বঙ্গাক্ষরে লিখিত এই কাব্যের যে পুঁথি আবিষ্কার করেন (যাহা বর্ত্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাকারে রক্ষিত), তাহার সহিত বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংস্কৃত ভাষায় সংস্করণ মিলাইয়া অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল কাব্যের সম্পাদন ও অনুবাদ করিয়াছেন।

এই বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে বাৎস্যায়নের কামসূত্রের বৈশিক অধিকরণটি প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত। ইহাতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের ভারতীয় দর্শননীতি ও অর্থশাস্ত্র, নাট্য; সঙ্গীত ও কামশাস্ত্রাদির নিপুণ চিত্র চিত্রিত। [মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের পাঠ্য]

মূল্য চারি টাকা

নূতন প্রকাশিত হইল

বিশ্ববিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ্

হ্যাবেলক এলিসের

যৌন-মনোদর্শন

STUDIES IN THE PSYCHOLOGY OF SEX

মহাগ্রন্থের ভারতীয় ভাষায় প্রথম অনুবাদ

অনুবাদক—ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, এল-এল-বি,

প্রথম খণ্ড	(১ম ভাগ)	[লজ্জার ক্রমবিকাশ]	৩৲ টাকা
"	(২য় ভাগ)	[স্বয়ং রতি]	৪৲ টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড	(১ম ভাগ)	[কামাবেগের বিশ্লেষণ]	৩৲ টাকা
"	(২য় ভাগ)	[প্রেম ও পীড়া]	৪৲ টাকা

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

গ্রন্থাবলী

●

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরদের
বিশ্ব-প্রসিদ্ধ রচনার সমাবেশ

●

টলষ্টয়ের—ক্রুৎসার সোনাটা
এ-যুগের অভিশাপ

গোর্কীর— মাদার
মা

রেনে মারার—বাতোয়ালা

ভেরকরসের—কথা কও

চক্র ও চক্রান্ত

রুশ বলশেভিক বিপ্লব ও সোভিয়েট পত্তনের মাঝামাঝি কয় বৎসরের রোমহর্ষক কাহিনী।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

সেই বিখ্যাত ও বহু প্রয়োজনীয় মহাগ্রন্থ

বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণম্

বা

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্

বাল্মীকি-মহর্ষি প্রণীতম্

ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের চির উজ্জ্বল মুকুটমণি; সর্ব্বজনের অনায়াসলভ্য জ্ঞানশাস্ত্র; সর্ব্ব-সংহিতার সার; শ্রুতি নামে অভিহিত এই মহারামায়ণ শ্রবণে মানবজাতির মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। সর্ব্বাপেক্ষা সহায়ক ও চিত্তাকর্ষক এই মহাগ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ। কথোপকথনের ছলে নানা আখ্যায়িকার মাধ্যমে মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষলাভের উপায় বিষয়গুলি সবিস্তারে বিবৃত ও বর্ণিত হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানের নীরসতার অভাবই যোগবাশিষ্ঠের চমৎকারিত্ব। মানুষের কাম্য ও প্রার্থনা—চতুর্ব্বর্গলাভ। মোক্ষ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। মোক্ষের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এই মহারামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়। মূল সংস্কৃতের সঙ্গে সহজ গদ্য অনুবাদ।

প্রথম খণ্ড: বৈরাগ্য ও মুমুক্ষু প্রকরণ

মূল্য সাড়ে সাত টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড: স্থিতি প্রকরণ

মূল্য সাত টাকা

বসুমতী সাহিত্য মন্দির: ১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১২

মাসিক বসুমতী

॥ পৌষ, ১৩৬৬ ॥

(জলরঙ)

নবান্ন-বরণ

অরুণকুমার পাইন অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা কার্যকারণের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া অবশ্যই মুক্তস্বভাব।

আত্মা যেমন অনন্ত আনন্দস্বরূপ, উহা তেমনি লিঙ্গবর্জিত। আত্মাতে নর-নারীভেদ নাই। দেহসম্বন্ধেই নর-নারীভেদ। অতএব আত্মাতে স্ত্রী-পুংভেদারোপ ভ্রমমাত্র—শরীর সম্বন্ধেই উহা সত্য। আত্মার সম্বন্ধে কোনরূপ বয়সও নির্দিষ্ট হইতে পারে না; সেই প্রাচীন পুরুষ সর্বদাই একরূপ।

আত্মা স্বভাবতঃ জ্ঞাতা নহেন। 'সচ্চিদানন্দ' সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, 'নেতি নেতি' সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করে।

এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞানলাভ করি—সমুদয় জগতের জ্ঞানলাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপ-বাক্য মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও, সমুদয় জগৎই উড়িয়া যাইবে; আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আসে, অতএব ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমি' যাহাকে তুমি 'আমি' বল।....সেই অনন্তের উপর যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে আর উহার কতকাংশ এই 'আমি'-রূপ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনন্তের অংশ। বাস্তবিকপক্ষে অসীম কখনও সসীম হন না—সসীম কথার কথামাত্র। অতএব এই আত্মা নর-নারী, বালক-বালিকা, এমনকি পশু-পক্ষী সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা ক্ষণমাত্রও জীবনধারণ করিতে পারি না। সেই সর্বেশ্বর প্রভুকে না জানিয়া আমরা এক মুহূর্তও শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত ফেলিতে পারি না; আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন—সকলই তাঁহারই পরিচালিত।

আত্মা জানেন তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা যে সুখী তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ। যে সুখী তাহার সুখ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব। যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা প্রতিবিম্বস্বরূপ। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে, সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন্দ—এগুলি আত্মার ধর্ম নহে, উহারা আত্মার স্বরূপ। —স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

সন্ত কবীর

যামিনীকান্ত সোম

[১]

কবীরের নাম কে না জানেন? নূতন করে বলবার কিছু নেই। তবু কিছু বলবার আগে শুধু এই বলি যে, সন্ত কবীরের মতো মহাকবি, মহাসাধক আর একজনও কি ছিলেন? তাঁর বিষয়ে যত বলা হয়, ততই ভাল।

গান বা কবিতা বা দোঁহা সর্বসাধারণের কতই না প্রিয়। একটি গান যেমন:

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব ঘুচিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান কোথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি।

এই অপরূপ গানটি হল কবি রবীন্দ্রনাথের। অনেকেই তাঁকে দেখেননি। তেমনি, যাঁর কথা আজ বলবো, আমরা কেউ-ই তাঁকে দেখিনি। তিনি হলেন সন্ত কবীর।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ যেমন গানের রাজা, কবীরও ছিলেন তেমনি গানের রাজা। কবীরের কত যে শব্দ, কত যে দোঁহা, শাখী, চৌপাই আছে, তার সীমা-পরিসীমা নেই। কবীর এত বিখ্যাত ছিলেন, এত সব গান, শব্দ, দোঁহা প্রভৃতি গেয়ে গেছেন যে, তার সীমা-সংখ্যা করবার মতো লোক এখন নেই। কবীরের গানে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কতকগুলি গান সংগ্রহ করে একখানি বই করেছেন। এই বইখানির নাম—"কবীরের শত গান," "One Hundred Poems of Kabir"। বইখানি অবশ্য ইংরেজীতে।

অধ্যাত্মমার্গে কবীর ছিলেন একজন পরম সত্যদ্রষ্টা পুরুষ। তাঁর সাধনার মার্গ ছিল অভিনব, অর্থাৎ তাঁর আবির্ভাবের আগে এই সাধন-মার্গ ছিল না ছিল গুপ্ত। কবীর ছিলেন সন্ত। তিনিই এই সত্যমার্গের প্রবর্তক। বাণীর মধ্যে আছে:

রহ. করনী কা ভেদ হৈ
নহিঁ বুদ্ধি বিচার।
বুদ্ধি ছোড় করনী করো
তৌ পাও কুছ সার।

'করনী' করতে হবে অর্থাৎ সাধন-ভজন করতে হবে। সে সব করবে কে? সে মনোবৃত্তি কি আছে? যার আছে, সে ভাগ্যবান। সাধন-ভজনের প্রবৃত্তি নেই, অথচ প্রবৃত্তি আছে শুধু উপর-উপর বোঝবার। এতে ফললাভ আর কি হতে পারে?

কবীর ছিলেন পরম সাধক ও সত্যদ্রষ্টা। তাঁর বাণী-বচন তো শুধু কথার কথা নয়। তিনি যে সকল তত্ত্ব বা বস্তু উপলব্ধি করেছেন—ধ্যানবলে দেখেছেন, বুঝেছেন—যে অবর্ণনীয় শব্দ শ্রবণ করেছেন, সে সকল তিনি মধুরভাবে প্রকাশ করেছেন, নিজের সরল ভাষার মধ্য দিয়ে। যাঁরা সাধক নন, কেবলমাত্র "বাচকজ্ঞানী", অর্থাৎ শুধু পুঁথি-পড়া-জ্ঞান যাঁদের, তাঁরা সন্ত কবীরের বাণী-বচন জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধির স্তরেই বুঝতে পারেন। সাধনার স্তরে উঠে প্রকৃত সত্য বা গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে বা বুঝতে সমর্থ হবেন কিরূপ?

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যেমন অতি গূঢ় ইঙ্গিত সকল আছে, সন্ত কবীরের বাণীর মধ্যেও তেমনি অতি উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম-সাধনার ইঙ্গিত সকল আছে। পণ্ডিত বা জ্ঞানীরা সে সকল এখন অনুধাবনের জন্য চেষ্টা ও যত্ন করছেন, এ এক বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা।

কবীর জন্মেছিলেন ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৫৬০ বৎসর পূর্বে পুণ্যভূমি কাশীতে। তখন এই ভারতবর্ষ ছিল অদ্ভুত রকমের। ভারতবর্ষে তখন ধর্মমত নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে এত বেশী মতভেদ, এত রকমের দলাদলি, মনকষাকষি ছিল যে, তার হিসেব করা যায় না। এই দেশটি তখন খুব পেছিয়ে ছিল। সেই পেছিয়ে থাকা যুগেই হয় কবীরের আবির্ভাব। কবীর নানা ধর্মমতের ঐক্য করবার চেষ্টা করেন। এইটি ছিল তাঁর বিশেষত্ব। এ বিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান। সেই সকল কথাই আলোচিত হচ্ছে।

সে হল তখনকার কাল, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচশ বছরেরও আগেকার কাল। তখনকার ইতিহাস প্রভৃতি মুখে মুখেই চলতো। সেই মৌখিক কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয়, কবীর জন্মেছিলেন কাশীতে এক জোলার ঘরে। আবার এমন কথাও শোনা যায় যে, ছোট একটি শিশু কাশীর সন্নিকটে লহরতালাও নামক সরোবরে এক পদ্মপাতার উপর ভেসে যাচ্ছিল। এক জোলা দম্পতি তাকে কোথায় পায়, দেখতে পেয়ে তুলে এনে তাকে প্রতিপালন করে।

গল্পটি এই। লহরতালাও ছিল কাশীর দক্ষিণপ্রান্তে অতি প্রাচীন-কালের এক বৃহৎ সরোবর। লহর অর্থে ঢেউ, তালাও অর্থে সরোবর। পাঠান আমলে কাশীর ঐ অঞ্চল লোকালয়শূন্য এবং ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বন-জঙ্গল-পূর্ণ ঐ স্থানটি তখন কুঞ্জকাননের ন্যায় শোভমান ছিল। ঐ সরোবরে তখন অসংখ্য কমল-কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়ে থাকতো। দৃশ্য ছিল অতীব মনোহারী।

ঘটনাটি এই রকম। একটি সুন্দর শিশু সরোবরের জলে পদ্মপাতার উপর ভাসছে। সে সময় নীমা ও নীরু নামে এক জোলা-দম্পতি বিবাহের নিমন্ত্রণ সেরে সে পথ দিয়ে আসছিল। তারা ঐ শিশুটিকে দেখতে পেয়ে অবাক হল। চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো, ভাবতে লাগলো। তারপর অতিযত্নে শিশুটিকে তুলে নিয়ে আনন্দমনে বাড়ীতে এনে নিজেদের ছেলের মতো প্রতিপালন করতে লাগলো। এই দম্পতি ছিল অপুত্রক।

তারপর যথাসময়ে এক মৌলবীকে ডাকা হল শিশুর নামকরণের জন্য। এই দৈবপ্রাপ্ত শিশুর জ্যোতির্ময়রূপ দেখে মৌলবী অবাক হলেন। খুললেন পুণ্য পুঁথি কোরাণ। নাম বেরুলো 'কবীর' অর্থাৎ পরমেশ্বর। 'কবীর' আরবী শব্দ—অর্থ মহান, অতি বৃহৎ বা পরমেশ্বর দ্বিতীয়বার কোরাণ খুললেন, আবার বেরুলো ঐ 'কবীর' নাম।

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে আরো গল্প আছে। বললুম, তখনকার ইতিহাস মুখে মুখেই চলতো। এও মুখের কথা। এ গল্পও শোনাই। তিনি পূর্বজন্মে ছিলেন এক সাধক ব্রাহ্মণ। গেছলেন কাপড় কিনতে এক জোলার ঘরে। কিন্তু কাপড় না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। বাড়ীতে এসেই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। মরবার সময় জোলার কথা, কাপড়ের কথাই তাঁর মনে ছিল। আর সেই হেতু পরজন্মে তিনি এলেন জোলার ঘরে। তখনকার এই জোলারা নামে মাত্র মুসলমান। তাঁত বোনা এদের জীবিকা। জোলারা মুসলমান হলেও অন্য মুসলমানদের সঙ্গে এদের মৌলিক প্রভেদ বিস্তর। এই সব জোলা নাথ-পন্থী যোগী-সমাজ থেকে উদ্ভূত। আদিতে নাথ-পন্থীরা যোগসাধনা করতেন। তাঁরা বেদ, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-শাস্ত্র—এ-সব মানতেন না। তাঁরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার মানতেন না, বর্ণাশ্রম মানতেন না, ছুঁৎ বিচার করতেন না। তাঁদের উপাসনা ছিল নিরাকারের উপাসনা। মধ্যযুগে এই নাথ পন্থী যোগীদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যান বাধ্য হয়ে। এঁরাই হলেন জোলা।

কবীর বড় হতে লাগলেন। হিন্দু পাড়ায় তাঁর বাস। হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে খেলা-ধূলো করতেন। তাঁর খেলা ছিল, ভগবানের পূজা আর ভগবানের নামকীর্তন। লোকে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো, কেননা তিনি জোলা অর্থাৎ তাঁতী। কবীর এর উত্তরে বলতেন :

কবীর তেরে জাত কো, সব কোঈ হাসন হার।
বলিহারী ওয়া জাত কো, জো সিমরে সিরজন হার।

ওরে কবীর, তোরে উপহাস বিদ্রূপ করে লোকে, তোর জাতের জন্য। বলিহারী সেই জাতকে, যে সৃষ্টি কর্তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ, সৃষ্টিকর্তা ভগবান একজন মহাতাঁতী।

তাঁর জাতির কাজ হল কাপড় বোনা। সেই কাপড় বোনা কাজই হল তাঁর ভরণ-পোষণের উপায়। কবীর তাঁতও বুনতেন, আর সেই সঙ্গে তত্ত্ব-কথাও বলে যেতেন। বলতেন তিনি :

সব্ সে হিলিয়ে, সব্ সে মিলিয়ে
সব্ কা লিজিয়ে নাউ।
হাজী হাজী সব, সে কিজিয়ে
বৈঠে অপনা গাঁউ।

সকলের সঙ্গে হেল-মেল করবে, সকলের নাম নেবে। সকলকেই করবে—হাজী হাজী, কিন্তু নিজের ঠাঁইয়ে ঠিক বসে থাকবে।

কবীর ছিলেন দরিদ্র। পরিবার পোষণের ভার তিনি ঈশ্বরের উপর অর্পণ করে নিশ্চিন্ত।

বলেছেন তিনি :

দীন দয়াল ভরোসে তেরে।
সভ পরবার চঢ়াইয়া বেড়ে।

হে দীনদয়াল, তোমারই উপর আমার ভরসা। আমার সর্ব পরিবারকে তোমারই নৌকায় চড়িয়ে দিলুম।

এক গল্প শোনাই। একদিন কবীরের ঘরে ছিল না অন্ন। কবীরের মা তাঁর হাতে একখানি কাপড় দিয়ে হাটে বিক্রী করতে পাঠালেন। সে সময় শীতকাল। ভারি শীত। পথে দেখলেন, একটি কাঙাল-গরীব শীতে জড়সড় হয়ে পড়ে রয়েছে পথের ধারে। এই দেখে তার কষ্টে কবীরের মন গলে গেল। তিনি কাপড়খানি সেই কাঙালের গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিলেন। দিয়ে, তার কষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে গেলেন। বাড়ীতে এসে দেখেন, তাঁর মা তাঁর জন্য রান্না করছেন। এই দেখে কবীর আশ্চর্য্যি হলেন। বললেন, মা খাবার তৈরী করছো কি করে? কিছুই তো ছিল না। মাও এই কথায় অবাক হলেন। বললেন, সে কি! এই যে তুমি সব কিনে-কেটে এনে আমার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় গেলে! এই শুনে কবীর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, মা তুমি খুব ভাগ্যবতী। ভগবান আমার রূপ ধরে তোমায় দর্শন দিয়ে গেছেন। কাপড় তো আমি বিক্রী করিনি। এক কাঙালকে দান করেছি।

এটি হয়তো নিছক গল্প নয়। কবীর ছিলেন ভক্ত। ভক্তের উপর ভগবানের অনুগ্রহ এভাবে হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

কবীর ছিলেন গুরু রামানন্দের শিষ্য। তাঁর তখন অনেক শিষ্য। অনেকেই তাঁরা পতিত জাত। যেমন, তাঁর এক শিষ্য, নাম সেনা। তিনি হলেন জাতিতে নাপিত। আর এক শিষ্য ছিলেন ধন্না, জাতিতে ইনি জাঠ চাষা। আর এক শিষ্য রবিদাস জাতিতে চামার। কবীর হলেন জোলা। জাতিতে কি হয়? এঁরা ছিলেন মহাভাগবত :

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনা যে
চাণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠাঃ
হরিভক্তি-পরায়ণাঃ।

যে জন বিষ্ণুভক্তি-বিহীন, সে চণ্ডাল বলে পরিকীর্তিত হয়। আর হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডালও হয় শ্রেষ্ঠ।

মেয়েরা তখন হীন বলে গণ্য হতেন। গুরু রামানন্দ কিন্তু মেয়েদেরও শিষ্যা করেন। মেয়ে শিষ্যার মধ্যে পদ্মাবতী ছিলেন প্রধানা। আর একজন শিষ্যা ছিলেন, নাম তাঁর সুরসরী। রামানন্দের ৮৪ জন শিষ্য ও ভক্তের মধ্যে নীচজাতি ছিলেন অনেক। কবীরও এই শিষ্যদের একজন। এই ছিল তখনকার ধারা। তবে এ সকল কি হঠাৎ হয়েছিল?

গোড়াতেই বলেছি, তখন ধর্মমত নিয়ে ছিল খুব বেশী দলাদলি। আর কবীর সমস্ত দলের ভেতর ঐক্য আনবার চেষ্টা করতেন।

কবীরের কাছে জাতির বিচার ছিল না। অর্থাৎ এ ছোট জাত আর ও বড় জাত, এর বিচার তিনি করতেন না। অথচ তখনকার কালে জাতির বিচার ছিল এক মস্ত বড় কথা। বলেছেন কবীর :—আমি যেখান হতে এসেছি, সে দেশ হল অমর দেশ। সেখানে ব্রাহ্মণ নেই, শূদ্র নেই, সেখ্ অর্থাৎ মুসলমান নেই। সেখানে ব্রহ্মা নেই, বিষ্ণু নেই, মহেশ্বর নেই। সেখানে যোগীও নেই, জঙ্গম-দরবেশও নেই। কবীর বলছেন, আমি সেই দেশেরই বার্তা নিয়ে এসেছি। তোমরা সেই দেশে চলো।

আরো বলছেন তিনি :

জাতি হমারী বাণী
কুল করতা উর মাহি।
কুটুম্ব হমারে সন্ত হ্যায়
কোই মুরখ সমঝত নাহি॥

অর্থাৎ আমার বাণীই হল আমার জাতি, আর হৃদয়েশ্বরই আমার কুল, এবং সন্তই আমার কটুম্ব। কোন মূর্খই একথা বুঝলো না।

তাঁর গুরু হলেন রামানন্দ, কিন্তু তাঁর সত্যগুরু হলেন ভগবান স্বয়ং। তিনিই তাঁকে দিয়েছেন অসীমের তৃষ্ণা, আর দেখিয়েছেন সত্যপথ।

[২]

কবীর লিখতে-পড়তে জানতেন না। তিনি যা বলতেন সব হিন্দী ভাষায়। পাঁচ শ বছর আগে গদ্য ভাষার চলন ছিল না। তখন সব কিছুই হত পদ্যে। কবীরের ভাষা ছিল বিশুদ্ধ হিন্দী। তা ছিল সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। কবীর বলেছেন :

সংস্কৃত কূপজল
কবীরা ভাষা বহতা নীর।
যব চাহৌ তবহি ডুবো
শান্ত হোয় শরীর॥

অর্থাৎ সংস্কৃত হল কূপজল। কুয়া খোঁড়, খুঁড়লে যদি জল ওঠে। আর জল উঠলেও ঘটিতে করে জল তোল আর ব্যবহার কর। অসুবিধা কত। আর আমার ভাষা অর্থাৎ হিন্দী, ঠিক স্বচ্ছ নীরের মত প্রবাহিত হচ্ছে। তা অতি নির্মল ও পবিত্র। তাতে যখন ইচ্ছা ডুব দাও, শরীর শান্ত হয়ে যাবে। ভাষায় বলা হলে অতি সাধারণেও বুঝবে। লাভ কত?

একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। সন্ত কবীরের পর হতেই পরবর্তী যুগে ভারতের সাধু-মহাত্মারা কবীরের পন্থা অনুসরণ করে চলিত ভাষায় তাঁদের বাণী-বচন ও ধর্মপুস্তক সকল রচনা বা সংকলন করতে আরম্ভ করেন। যেমন—হিন্দুস্থানের তুলসীদাস, গুজরাটের দাদু, পাঞ্জাবের শিখগুরু নানক, মহারাষ্ট্রের তুকারাম ও রামদাস স্বামী এবং বঙ্গদেশের শ্রীচৈতন্যদেব হতে আরম্ভ করে সকলেই।

কবীরের বাণী-বচন নিয়ে কত জনে কত আলোচনা করেছেন। কবীরের ভাব অফুরন্ত, কথা অফুরন্ত। তাঁর দোঁহা, শব্দ, শাখী, গান, বাণী-বচন ভারতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। সে সকল এখন এক জায়গায় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার অর্থাৎ অসম্ভব।

এ দেশে তখন এক দলের সঙ্গে আর এক দলের ঝগড়া—কোন্দল নিয়ে বিব্রত। কবীর তাই বললেন :

হিন্দু কহত হৈ রাম হমারা,
মুসলমান রহমানা।
আপস মেঁ দোউ লড়ে মরত হৈ,
মরম কোই নহি জানা॥

হিন্দু বলছে আমার রাম, মুসলমান বলছে আমার রহিম্। দু'দলে লড়াই চলছে খুব। কিন্তু মর্ম কি, কেউ জানে না।

পুরাণ কুরাণ সব বাত হৈ,
যা ঘটকা পরদা খোল দেখা।
অনুভব কি বাত কবীর কহৈ
য়হ সব ঝুটা পেল দেখা॥

পুরাণ কোরাণ সব তো কথা আর কথা। আমি পরদা খুলে তাদের আসল রূপ দেখেছি। কবীর অনুভবের কথাই কেবল বলছে, আর এও দেখেছে যে, অন্য সব মিথ্যা—সব ভুল।

আরো বলেছেন :

যো খোদা মসজিদ মে বসত হ্যায়,
ঔর মুলুক কেহি কেরা।
তীরথ মূরত রাম নিবাসী
বাহর করে কো হেরা॥

খোদা যদি কেবলমাত্র মসজিদেই বাস করেন, তবে অন্য মুলুকগুলি কার? রাম যদি কেবল তীর্থের ভিতর ও মূর্তির ভিতর বাস করেন, তাহলে বাহিরটাকে কে দেখে?

কবীর বলছেন :

অবধু বেগম দেশ হমারা।
রাজা রংক ফকীর বাদসা,
সবসে কহৌ পুকারা।
জো তুম চাহো পরম পদে কো,
বসিহো দেশ হমারা।
জো তুম আয়ে ঝীনে হো কে,
তজো মনকী ভারা।
ঐসী রহন রহো রে প্যারে,
সহজ উতর জায়ো পারা।
ধরণ আকাশ গগন কছু নহী,
নহীঁ চন্দ্র নহীঁ তারা?
সত্য ধর্ম কী হৈ মহতাবে,
সাহব কে দরবারা।

হে অবধূত, দুঃখহীন হল আমার দেশ! রাজা, কাঙাল, বাদশা, ফকীর, সকলকে ডেকে আমি বলছি—পরম পদ যদি চাও, আমার দেশে গিয়ে বাস কর। যদি ঝীনা হয়ে অর্থাৎ সূক্ষ্মভাব নিয়ে এসে থাক, তবে মনের ভাব ত্যাগ করে যাও। হে আমার প্রিয় ভাই, এখানে এমন করে থাকো, যাতে সহজেই পার হতে পার। ধরণী, আকাশ, গগন—কিছুই নেই আমার দেশে। না আছে যেখানে চন্দ্র, না আছে তারা। আমার প্রভুর দরবারে শুধু কেবল সত্য ও ধর্মের জ্যোতি দেদীপ্যমান।

গ্রহ চন্দ্র তপন জোত বরত হৈ
সুরত রাগ নিরত তার বাজৈ।
নৌবতিয়া ঘুরত হৈ রৈন দিন সুন মেঁ
কহৈঁ কবীর পিউ গগন গাজৈ।

গ্রহ, চন্দ্র, তপনের জ্যোতি জ্বলছে, প্রেমের রাগ ও বৈরাগ্যের তান বাজছে, মহাশূন্যে সর্বক্ষণ নহবত বাদ্য চলছে। কবীর কহেন—আমার প্রিয় সখা গগনে বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত।

অধর আসন কিয়া অগম প্যালা পিয়া
জোগ কী মূল গহ জুগতি পাঈ।
পন্থ বিন জয় চল সহর বেগমপুর
দয়া জগ দেব কী সহজ আঈ।
ধ্যান ধর দেখিয়া নৈন বিন পেখিয়া
অগম অগাধ সব কহত গাঈ।

অসীমে আমার আসন করেছি, অগম্য পেয়ালা পান করেছি, রহস্যকে জেনে যোগের মূলকে প্রাপ্ত হয়েছি। বিনা পথেই সেই দুঃখহীন অগম্যপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সহজেই সেই জগদেবের দয়া লাভ হয়েছে। অগম্য অগাধ ব'লে সকলেই যাঁর গান করছে, ধ্যান ধরে তাঁকে আমি দেখেছি—বিনা নয়নে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি। সবাই বলেন, সে হল অগাধ।

রবীন্দ্রনাথের এক উক্তি এখানে উদ্ধৃত করি। ভাবুক কবি বলেছেন: "..ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে। সেইটি তার অন্তরের জিনিষ। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প, বস্তুত, এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।"

কবীর বেদ-কোরাণ জানতেন না। পুরোহিত-মোল্লা জানতেন না। মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-হজ, সন্ধ্যাহ্নিক-নমাজ, ব্রতোপবাস-রোজা—এসব কিছুই জানতেন না। তিনি মূর্তিপূজা, দেবদেবীর উপাসনা, অবতারবাদ প্রভৃতির নিন্দা করেছেন। বলেছেন:

দেবতা পত্থর ভুইয়া ভবানী।
য়হ মারগ চৌরাসী চলন কী।

অর্থাৎ সত্য সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে আছেন—মূর্তির মধ্যে নেই। তিনি যে পরম সত্য লাভ করেছিলেন, তা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। কোন রকম বাহ্যানুষ্ঠান তাঁর ছিল না। তাঁর সময়কার যুগে সবাই মায়াচক্রে পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভারতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে। সেইটি হল তার অন্তরের জিনিস। সেই জিনিস তিনি লাভ করেছিলেন। তিনি প্রচার করেছেন প্রেম-ভক্তির কথা। এই প্রেম-ভক্তিতে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। কাজেই হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই তাঁর শিষ্য হয়েছিল।

তিনি তো ছিলেন নিরক্ষর মূর্খ। শাস্ত্র-টাস্ত্র তাঁর পড়া ছিল না। তবে তিনি পরমতত্ত্ব লাভ করেন কি ক'রে? কি ক'রে?—

সন্ত ন পড়তে বিদ্যা কোই।
উনকে অনুভব সমুদ সমানী।

সন্ত যিনি, তিনি কোন শাস্ত্র পড়েন না। তাঁর অনুভূতিই হল সমুদ্রের মতো অগাধ।

এখন 'সন্ত' কথাটিকে অতি সাধারণভাবে ধরা হয়। 'সন্ত' মানে কি? 'সন্ত' মানে সত্যদ্রষ্টা। কথাটি অতুলনীয়। আর কবীর সাহেবই ছিলেন সর্বপ্রথম সন্ত।

কবীর হিন্দীভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। জড়ের সহিত চৈতন্যের, চৈতন্যের সহিত জড়ের, সাকারের সহিত নিরাকারের, নিরাকারের সহিত সাকারের সমন্বয় তিনিই করেন সর্বতোভাবে। এমন ভাব নেই, যে ভাব তাঁর মুখ দিয়ে না বার হয়েছে। কাউকে তিনি অনুকরণ করেন নি বা অনুসরণ করেন নি। তাঁর ধর্মতত্ত্ব, তাঁর কথিত বাণী সকলই মৌলিক। কবীরের বাণী তখন সাধারণের মনে ধর্ম-বিপ্লব উপস্থিত করেছিল।

কবীরের কথায় কাশীর পণ্ডিতেরা খুব বিরোধী হলেন। কবীরের উক্তি আদবেই তাঁরা মানতেন না বা পছন্দ করতেন না। অথচ কবীর অগ্রবর্তী হয়েই চলেছেন। এতে ব্রাহ্মণদের হল হিংসা। কবীরকে জব্দ করবার জন্য একদিন তাঁরা চারদিকে প্রচার করে দিলেন যে, কবীর সকলকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেছেন। নিমন্ত্রণের সংবাদ পেয়ে লোকজন এসে জমায়েত হল। কবীর তখন কি করলেন? তিনি একটি হাঁড়ির ভিতর, ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে, কিছু ভোজন-সামগ্রী রাখলেন, আর তাতে একখানা কাপড় ঢেকে দিলেন। বললেন, নিমন্ত্রিতদের সকলকে খেতে বসিয়ে দাও। আর হাঁড়ি থেকে নিয়ে পরিবেশন করতে আরম্ভ কর। পরিবেশন সুরু হল, কিন্তু খাদ্যবস্তু আর ফুরোয় না। শত শত লোক খেয়ে গেল, কিন্তু হাঁড়িটি রইলো ভরপুর। নিমন্ত্রিতেরা আকণ্ঠ খেয়ে খুসি হয়ে চলে গেল। বিরোধী ব্রাহ্মণেরা এই দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এটি গল্প কথা হলেও অবিশ্বাস্য নয়। কারণ, ভক্তজন সম্বন্ধে এরকম ব্যাপার ঘটা আশ্চর্য নয়।

কবীরের কথা বা বাণী-বচন তখন হিন্দুদেরও যেমন ভাল লাগতো না, মুসলমানদেরও তেমনি ভাল লাগতো না। মহা রাগ তাদের। মুসলমানেরা বিদ্বেষ করে অভিযোগ জানালো দিল্লীর বাদশাহ সিকন্দর শাহ লোদীর কাছে। প্রবাদ এই যে, বাদশাহের হুকুমে ভক্ত কবীরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, বাদশাহের জৌনপুরের দরবারে। বাদশাহের সামনে উপস্থিত হয়ে ভক্ত কবীর তাঁকে সেলাম করলেন না। এতে তাঁর উজীরেরা বলে উঠলেন,—"ওরে কাফের, বাদশাহ হলেন বড় পীর, তাঁকে তুই সেলাম জানালি না?"

কবীর বললেন:

কবীর তেই পীর হায়
যে জানে পর পীর।
যে পর পীর ন জানে হী
তে কাফের বে পীর।

তিনি হলেন পীর, যিনি পরের কথা অনুভব করতে পারেন। পরের বেদনা যে অনুভব করতে পারে না, সেই তো কাফের অর্থাৎ বিধর্মী।

বাদশাহ তাঁকে প্রশ্ন করলেন,—'তুমি হিন্দু না মুসলমান?'

কবীরের উত্তর—অদৃশ্য রহস্যের খেলা চলছে। হিন্দু ধ্যান করে মন্দিরে, আর মুসলমান ধ্যান করে মসজিদে। আর এই দলে কবীর ধ্যান করে এ দু'য়ের মিলনস্থানে।

বাদশাহ সিকন্দর শাহ লোদী বিচক্ষণ লোক। তিনি কবীরের কথা বুঝলেন, তাঁকে খাতির করলেন, আর তারপর তাঁকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

শুধু ধর্মমত নিয়েই কবীর আলোচনা করেছেন, তর্ক করেছেন। তাঁর তর্ক বা আলোচনা অতি চমৎকার। এতে তাঁর মনের উদারতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও হৃদয়ের গভীরতা প্রভৃতি কথায় প্রকাশ পায়।

কবীর ক্রমশঃ নূতন ধর্মমতের সৃষ্টি করেন। সে ধর্মমতের নাম হল 'সন্ত মত'। কবীর হলেন প্রথম 'সন্ত'। আগেই সে কথা বলা হয়েছে। সন্তমত হল এক নূতন ধর্মমত। কবীরের ৭১ বছর পরে গুরু নানক আবির্ভূত হন। দাদু সাহেব ১৪৬ বছর পরে। এঁরা ছিলেন কবীরের অনুবর্তী। নাভা সাহেব, মীরাবাঈ প্রভৃতি এঁরাও ছিলেন কবীরের অনুবর্তী।

কবীরকে এক জন জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের? উত্তরে কবীর বললেন :

প্রথম হি রূপ জোলহা কিন্হা।
চারি বরণ মোহিঁ কাহুঁ ন চিন্হা।
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহ।
গুরুপূজা কছু হম্ সোঁ লেহ।

প্রথমে আমি জোলা ছিলাম। চারিবর্ণের ভিতর কেউ আমাকে চিনতো না। গুরু রামানন্দ আমাকে দিলেন দীক্ষা। আমিও কিছু গুরুপূজা করলুম।

আর একজন কবীরকে জিজ্ঞাসা করলো,—কি তোমার জাতি, তা বল। কবীর উত্তর করছেন :

সন্তন জাত ন পুছো, নিরগুনিয়াঁ।
সাধ ব্রাহ্মণ সাধ ছত্তরী, সাধৈ জাতি বনিয়াঁ।
সাধন মাঁ ছত্তীস কৌম হৈ, টেঢ়ী তেরী পুছনিয়াঁ।
সাধৈ নাউ সাধৈ ধোবী, সাধ জাতি হৈ বরিয়াঁ।
সাধন মাঁ রৈদাস সন্ত হৈঁ, সুপচ ঋষি সো ভঁগিয়া।
হিন্দু-তুর্ক দোই দীন বনে হৈঁ, কছু নহিঁ পহচনিয়াঁ।

ওরে নির্গুণী, সন্তের জাত কি জিজ্ঞাসা কোরো না। সাধু ব্রাহ্মণ, সাধু ক্ষত্রিয়, আর সাধুর মধ্যে বেণেও আছে। ছত্রিশ জাত আছে সাধুদের মধ্যে। তোমার এই প্রশ্ন একেবারে টেড়া। নাপিত সাধু, ধোপাও সাধু, বারিজাতির লোকও সাধু। আবার দেখো সাধুদের মধ্যে রৈদাস হলেন সন্ত। স্বপচ ঋষি হলেন মেথর। দুইটি ধর্ম—হিন্দু আর তুর্ক অর্থাৎ মুসলমান, এদেরও আলাদা করে চিনবার উপায় নেই। সাধু সাধুই—।

একদিন এক পণ্ডিত কবীরকে প্রশ্ন করলেন :

কঁহাতে তুম জো আইয়া, কৌন্ তুম্হারা ঠাম্।
কৌন্ তুম্হারা জাতি হ্যায়, কৌন্ পুরুষ কো নাম।
কৌন্ তুম্হারা কৌন্ হ্যায়, কৌন্ তুম্হারা নাম।
কৌন্ তুম্হারা ইষ্ট হ্যায়, কৌন্ তুম্হারা গাঁব।

কোথা থেকে তুমি এসেছ? তোমার ঠাঁই কোথায়? তোমার কি জাত? বংশের কি নাম? কি ধর্ম? কি নাম? তোমার ইষ্ট কে? কোন্ গ্রামে তোমার বাস?

কবীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলছেন :

অমর লোকতে আইয়া, সুখ কে সাগর ঠাম্।
জাতি হামারী অজাতি হ্যায়, অমর পুরুষ কো নাম।
জাতি হামারী আত্মা, প্রাণ হামারা নাম।
অলখ হামারা ইষ্ট হ্যায়, গগন হামারা গ্রাম।

অমর লোক হতে আমি এসেছি। সুখসাগর আমার ঠাঁই। অজাতিই আমার জাতি। অমর পুরুষ আমার বংশ। আত্মাই আমার ধর্ম, প্রাণই আমার নাম। অলখ নিরঞ্জন আমার ইষ্টদেব। গগন (ত্রিকুটি) আমার গ্রাম।

একক ভগবানই এঁদের উপাস্য। আর গুরু ভিন্ন জগতে প্রত্যক্ষ আর কোন ঈশ্বর নেই। মানুষ ভালবাসতে পারে কেবল মানুষকেই। জড়কে বা মৃতকে ভালবাসবে কি করে? ভালবাসা হয়, প্রেম হয়—এক-জাতীয় বস্তুর উপর। কবীর বলেন,—ভগবানকে মানুষ ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনতে পারে না। সেজন্য দয়াময় ভগবান গুরুরূপ ধারণ ক'রে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

গুরু আর শিষ্য সম্বন্ধে কবীর অনেক—অনেক কথা বলেছেন। বলছেন :

কাচ পোকা জানে না ভ্রমরকে। ভ্রমর কিন্তু কাচপোকাকে যেমন নিজের মতো করে নেয়, তেমনি গুরুও শিষ্যকে নিজের সমান ক'রে নেন।

গুরু না হলে মালা জপ করেও ফল হয় না। দান করা হয় বৃথা। এ শুধু কথার কথা নয়, এ কথা শাস্ত্র-পুরাণেও বলে।

আর বললেন—গুরুর সমান দাতা নেই, আর শিষ্যের সমান যাচক নেই। কেন না, চার লোকের সম্পত্তি যে ভগবান, সেই ভগবান-রূপ অপূর্ব ও অমূল্য সম্পত্তি গুরু দান ক'রে থাকেন শিষ্যকে। কাজেই, শিষ্যের এ রকম চাই, কি গুরুকে যথাসর্বস্ব দিয়ে দেওয়া। আর গুরুরও এ রকম চাই, কি শিষ্যের কাছে কিছুই না নেওয়া।

আগেই বলেছি, কবীরের মনের উদারতা, দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও হৃদয়ের গভীরতা প্রকাশ পায় তাঁর প্রতি কথায়। ধর্মমতগুলি নিয়ে তিনি অতি চমৎকার—চমৎকার বিচার ও আলোচনা করেছেন। আর এমনভাবে বুঝিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে, সেই সকল মতের লোকেরা আগে তা ধরতে বা বুঝতে পারে নি। কত ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে যে তাঁর তর্ক হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

নানান দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। তিনি ভ্রমণে গেছেন তিব্বত, আফগানিস্থান, তুর্কিস্থান, খুরাসান, বাল্খ, বুখারা, ইরাণ ইত্যাদি দূর দূর দেশে। তাঁর 'কবীর কসৌটী' ও 'কবীর মনশুর' বইতে এই সব আছে। কবীরের অনুবর্তী অনেক যাত্রী এখনো ভ্রমণে যান এই সব দেশে।

কবীর বলেছেন,—সাধকের আবার দল কি? জাতি কি? সাধকের আবার দলাদলি হবে কেমন করে? সকল দেশের সাধকেরাই এক দলের। সবাই চায় ভগবানকে। সবাই সাধক, সবাই প্রেমী, সবাই ত্যাগী, তাই সবাই এক। কবীর ছিলেন সত্যই সাধক।

[ক্রমশঃ।

সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের গুরুদেব, সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের নেতাজী এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে দুইটি মহাপুরুষের সমগ্র জীবনের বীজ রহিয়াছে।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে কী চক্ষে দেখিতেন, তাহা জানাইবার চেষ্টা করা হইল।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে, ১৯৩৯ সালে জানুয়ারী মাসে যখন শান্তিনিকেতনে যান, তখন আম্রকুঞ্জে তাঁহার সান্দ্র সম্বর্দ্ধনার জন্য যে আয়োজন করা হয়, তাহাতে কবি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

কবি তাঁহার "তাসের দেশের" দ্বিতীয় সংস্করণ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন, "কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নতুন প্রাণসঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলাম। আজ তরুণ বাংলা তথা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুভাষচন্দ্র; তিনি আজ নির্জীব প্রাণে সংগ্রামের মন্ত্র দিতেছেন", কবির তাসের দেশের মর্ম্মকথা 'আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা', সুভাষচন্দ্র সেই বাণীর বাহক বলিয়া কবির ভরসা,—"তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের মাধ্যমে দেশের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইবে"।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্য্যাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, যে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতের যে অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে, তাহার কথা বারে বারে স্বীকার করিয়াও বলিলেন,—"তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে, এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো কর্ম্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে এবং যদি কোনো কৃতী নতুন পথ খুঁজতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞও তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তার কামনার অভিব্যক্তি—কিন্তু দূরের থেকে।"

তিনি লিখিলেন "আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধানপদ সুভাষচন্দ্রের, সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে—যে বাংলাকে আমরা বড় করব, সেই বাংলাকে বড় করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন—এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে, বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালী প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের পদে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর অমতে দ্বিতীয়বার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিয়াছিলেন, ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে যে টেলিগ্রাম করেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"The dignity and forbearance which you have shown in the midst of a most aggravating situation has won my admriation and confidence in your leadership. The same decorum has still to be maintained by Bengal for the sakc of her own self-respect and thereby so help to turn your apparent defeat into a permanent victory." [May 4, 1939, United Press]

রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন দেশের মধ্যে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্বের সময় সুভাষচন্দ্রই দেশনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি-পদত্যাগের পরই (১৯৩৯ মে) কবি 'দেশনায়ক' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াও বিশেষ কারণে, কবির জীবিতকালে প্রচার করা হয় নাই।

এইবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের অভিমত জানাইবার প্রয়াস করা যাক। একবার ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের নিকট সুভাষচন্দ্র তাঁহার কয়েকজন তরুণ বন্ধুকে লইয়া গিয়াছিলেন স্বদেশ-সেবার জন্য উপদেশ লইবার জন্য, কিন্তু তাঁহারা উদ্দীপনাময়ী বাণীর পরিবর্ত্তে গ্রাম-সংগঠনের বিষয়ে উপদেশ পাইয়াছিলেন। ঐ কথাগুলি তখন তাঁহাদের মোটেই ভাল লাগে নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি হইতে লাগিল।

পরে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তাঁহার এক ভাষণে বলেন যে, "শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্ত্তমান থাকিবে না, ইহা সত্য নয়। ইহার বর্ত্তমান আকার স্থায়ী না হইতে পারে, কিন্তু ইহার সত্য অংশ ভিন্নরূপে চিরস্থায়ী হইবে।"

সুভাষচন্দ্র মহাজাতিসদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার জন্য কবিকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মহাজাতিসদনের ভিত্তিপ্রস্তর

স্থাপনের সংবাদ পাইয়া সুভাষচন্দ্রকে কবি একপত্রে লিখিয়া পাঠাইলেন—"তোমাদের সংকল্পিত কংগ্রেসভবনের পরিকল্পনাটিই যথোচিত হয়েছে বলে মনে করি। এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক, সর্বজনের আনুকুল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।"

মহাজাতিসদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে বলেন "গুরুদেব, আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোথিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবন-শক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন্, আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে, তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি—তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এ গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"

রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশীযুগের স্মৃতিকে" উপলক্ষ করিয়া বাংলাদেশের কয়েকখানি কাগজে যে মাতামাতি সুরু হয়েছিল, তাঁর ঐ মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধটি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হীন ও নির্লজ্জ প্রচারকার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছিল লক্ষ্য করে কবি এক বিবৃতিতে বলিলেন, "অল্প কয়েক দিন হোলো আমার কোনো ভাবণে আমি দেশের লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলাম, সেটাতে বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে একটা অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে।" সেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তি বিশেষকে এরকম গঞ্জনা দেওয়া আমার স্বভাব সংগত নয়।

"মোকাবিলায় আমি সুভাষকে কখনো ভর্ৎসনা করিনি তা নয়, করেছি তার কারণ তাঁকে স্নেহ করি। কিন্তু সেদিন আমি সাধারণতঃ বাংলাদেশের এই শ্রেণীর লোককেই ধিক্কার জানিয়েছিলাম, যাঁরা কাজ করেন না, কলহ করেন, দল বাঁধতে গিয়ে দল ভাঙেন, ব্যক্তিগত ভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি।·····তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসেন এবং দেশ-বিদেশের রাজনীতি চর্চ্চা করেছেন, সেইজন্য তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবি করি তিনিও দেশকে তার বর্ত্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য-গহ্বরের উপরে সেতু বন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই শুভকামনা।"

ঐ সময়ে, হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনের জন্য সুভাষচন্দ্রকে বাংলা গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য ১৯৪১ সালে জানুয়ারী মাসে স্বগৃহে বন্দী থাকা কালীন অন্তর্ধান করেন। ঐ বৎসরেই ৭ই আগষ্ট কবির মহাপ্রয়াণ হয়। কবি এই পৃথিবী ত্যাগ করে যাইবার পূর্ব্বে, তাঁহার প্রিয় দেশনায়ক সুভাষের বিদেশে অবস্থিতির সংবাদ জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না জানি না।

সুভাষচন্দ্র বিদেশে যাইয়া স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁহার আজাদ হিন্দ বাহিনীর জন্য 'জনগণমন'কেই জাতীয় সঙ্গীত বলে নির্ব্বাচন করেছিলেন।

ভারতবর্ষের জন্য জনগণমনকেই জাতীয় সঙ্গীত বলে লোকসভায় স্থির করা হইয়াছে। পৃথিবীর জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে ফ্রান্সের এবং রুশিয়ার ছাড়া সাহিত্যিক গরিমা ও সার্বভৌম আবেদন সম্বলিত গানের খুবই অভাব—তাছাড়া কোনো দেশের জাতীয় সঙ্গীত সে দেশের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচিত নয়, রবীন্দ্রনাথ জনগণমন সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

আর নেতাজী ভারতবর্ষকে নবজীবন মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন—"জয়হিন্দ্", সবশেষে দুই মহামানবকে প্রণাম জানিয়ে প্রবন্ধ শেষ করলাম।

—অনামী

"The childhood shows the man—
As morning shows the day."

ইংরাজি কবিতার অনুবাদে সত্যেন্দ্রনাথ

ডক্টর শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায় এম. এ., ডি ফিল.

অনুবাদককে অনেকে সাহিত্যিকের সম্মান দিতে কুণ্ঠিত। কারণ ভাবের ক্ষেত্রে তাঁরা পরমুখাপেক্ষী। অনুসরণের দায়িত্ব থেকে স্বভাবতঃই কিছুটা আড়ষ্টতা এসে যায় বলে অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনায় ভাষা সাধারণতঃ ঝরঝরে। কিন্তু সাধারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য হলেও অসাধারণ অনুবাদের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ কি অসত্য হবে না? দেশ-বিদেশের সাহিত্যের মধ্যে এমন অনুবাদ কি পাওয়া যায় না যা সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে আর যা অনুবাদককে দিয়েছে অমরত্ব, দিয়েছে নিরবধিকাল ও বিপুলা পৃথ্বীর রসলোকে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা?

মানতেই হবে ভুলে থাকা ভোলা নয়। কারণ অনুবাদকে সাহিত্য স্বীকৃতি দিতে যাঁরা নারাজ, যাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদগুলিকে মৌলিকরচনার পাশে আনতে চান না, তাঁরা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যান প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের গৌরব কৃত্তিবাস, কাশীরাম, আলাওল অনুবাদকই। এঁদের রচনা মূলানুগত্য হ'তে কিছুটা মুক্ত হ'লেও নিঃসন্দেহে অনুবাদ-শাখান্তর্গত। আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্যোগপর্বের প্রধান পুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা শকুন্তলা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ভ্রান্তিবিলাস সংস্কৃত হিন্দী ইংরাজির অনুসরণ মাত্র। মূলের সঙ্গে মিল বস্তুপ্রতিবস্তুবৎ না বিম্বপ্রতিবিম্ববৎ তা বিচার না করেও বলা যায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যে (বেনামী রচনা বাদে) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জনকত্বের দাবী অনেক পরিমাণে অনুবাদাশ্রয়ী। আর যদি অভিযোগ তোলা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার সাহিত্যিক মূল্য নিয়ে, তবে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে পারি। আধুনিক বাংলার পুরুষোত্তম সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি-খ্যাতির পিছনেও কি অনুবাদের অবদান নেই। এখানে কবি অবশ্য নিজেই নিজের অনুবাদ করেছেন। ভাবের জন্য অন্নপূর্ণা বঙ্গভাষার কাছেই এসেছেন ভিক্ষাপাত্র হস্তে মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু তবু ত অনুবাদ-অনুসরণ, 'miracle of translation' এর মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে বিশ্বকবির সভায়—একথা ত অস্বীকার করার নয়। আর ফিট্‌জেরাল্ড? তিনি ত স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর অনুবাদ প্রকাশ আর কবিস্বীকৃতির মধ্যে যে কালের ব্যবধান তা মহাকালের পটভূমিকায় আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'তে পারি, এবং একথা আমরা মনে রাখতে পারি যে, রসিক ইংরাজ তাঁকে স্বীকার করেছেন কবি বলে, পারস্যের রূপকাররা তাঁকে অনুবাদক হিসেবে অস্বীকার করলেও। জয়দেবের গীতগোবিন্দ যদি মূলতঃ প্রাকৃত হ'য়ে থাকে তাহ'লে সংস্কৃত অনুবাদে কবির কবিত্ব কি ভাবে স্বীকৃত হয়, তার উদাহরণ আমাদের ঘরের মধ্যেই আছে। অবশ্য গীতগোবিন্দের বিজয় সম্বন্ধে ল্যাসেন-পিশেল এর কথা সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি। এ বিষয়ে রহস্যের উপর আলোকপাত করতে পারেন বিধাতাপুরুষ কি জানেন বা? কিন্তু পৈশাচী প্রাকৃতের হারিয়ে যাওয়া গল্প সংস্কৃতের অনুবাদের মধ্যে অমরত্ব লাভ করেছে—এ প্রমাণ ত আমাদের কাছেই রয়েছে। সুতরাং অনুবাদকে সাহিত্য বলে স্বীকার করা নানা দেশে নানা কালে হয়েছে। আর সে অনুবাদ-সাহিত্যে যদি সত্যেন্দ্রনাথ আপন অসামান্য সৃজনীশক্তির পরিচয় দিতে পারেন, তাহ'লে আশা করি, অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে কেউ আপত্তি জানাবেন না। আশা করি দূরে সরিয়ে রাখা হবে না এমন সব কবিতাকে যার মূল অন্যদেশের মাটিতে থাকলেও আমাদের সাহিত্য-নিকুঞ্জে ফুল হ'য়ে ফুটে রয়েছে। যা বাতাস করেছে সুরভিত, আমাদের দৃষ্টিকে করেছে প্রসন্ন। যার মধ্যে পেয়েছি আমরা আনন্দ, পেয়েছি পরিতৃপ্তি। যেখানে ভাবের দিক থেকে তিনি অপরের কাছে ঋণী হ'লেও রূপায়ণে তিনি যে গুণী, তার পরিচয় রেখে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ বিপুল, বিচিত্র, বিস্তৃত, বিশিষ্ট। 'মণিমঞ্জুষা', 'তীর্থসলিল' 'তীর্থরেণু'তে তাঁর সাহিত্যিক বিস্ময় ও বিস্ময়জনক সাহিত্যসৃষ্টির সংমিশ্রণ। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তিনি পৃথিবীর কবি। তাঁর সাধনা পৃথিবীর বিচিত্র আনন্দবেদনাকে বাঁশীর সুরে প্রকাশ করার সাধনা। আর সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবিতার অনুবাদক কবি। দেশ-বিদেশের কবির চিত্ত-ফুল-মধু নিয়ে তিনি রচনা করেছেন মধুচক্র। গৌড়জন তার সুধাপানে আনন্দিত হ'লেই তিনি কৃতার্থ। পৃথিবীর আর কোনও কবি দেশ-বিদেশের এত অসংখ্য ভাষা থেকে অনুবাদ করে মাতৃভাষার পরিপুষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন কি না জানিনা। অন্ততঃ পৃথিবীর যে-কয়েকটি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তার কোনও অনুবাদকের মধ্যে বিশ্ব-কাব্যানুসন্ধিৎসার এত প্রবল প্রকাশ লক্ষ্য করিনি। বলা বাহুল্য যে, চীন-জাপান থেকে সুরু ক'রে দক্ষিণ-ভারতের কবিতার অনুবাদে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই মূলের ইংরাজি অনুবাদের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক যে, কতকগুলি ভাষা থেকে তিনি সরাসরি অনুবাদই করেছেন, যেমন ইংরাজি, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী বা ফরাসী প্রভৃতি। এ-সব ক্ষেত্রে তিনি ইংরাজি অনুবাদ থাকলে দেখেছেন হয়ত, কিন্তু অনুবাদক্ষেত্রে মূলকে অনুসরণ করার কথা ভুলে যান নি। আর শুধু তাই নয়, ফরাসী—ফারসী—ইংরাজি-সংস্কৃত হ'তে ছন্দ চালাবার চেষ্টাও করেছেন। জানি না পৃথিবীর আর কোন অনুবাদকের এতগুলি সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পরিচয় ঘটেছিল, আর ঘটে থাকলেও তাঁদের হাতে মাতৃভাষায় তাদের ছন্দ পর্য্যন্ত অনুসরণের চেষ্টা হয়েছিল। আমরা সকলেই শিরোনামা থেকে জানি যে, সংস্কৃত হ'তে মালিনী, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর প্রভৃতি, ইংরাজি young lochinvar-এর ছন্দ; ফরাসী 'পান্তুম্'; আর শাজাহানের তাজ-প্রশস্তিতে মূল ফারসী ছন্দ বজায় রাখবার চেষ্টা তিনি করেছেন। এটি পুরোনো খবর অর্থাৎ খবরই নয়। কারণ news-এর মধ্যে new কিছু না থাকলে চলে না। পুরোনো খবরের মর্য্যাদা নেই তা জানি কিন্তু স্মরণ করলে সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ভুল করার হাত থেকে বা ভুলে থাকার হাত থেকে অব্যাহতি পাব। কারণ

সাধারণতঃ অনুবাদক বিদেশের ভাবসম্পদকে মাতৃভাষায় প্রকাশ ক'রে স্বদেশকে সমৃদ্ধ করতে চান। অসাধারণ অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশী ছন্দকেও স্বদেশী-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন।

বলবেন, ভাবের জগতে দেশ ও বিদেশের সাহিত্যের মধ্যে কি তিনি অনুবাদের গাঁটছড়া বেঁধে মিলন ঘটিয়েছেন। বলব, মূল বিচা'রে মূল্য বিচার অনুবাদের ক্ষেত্রে অবশ্য করণীয়, কিন্তু যেখানে মূল আমাদের হাতের কাছে নেই, সেখানে অনুবাদটি অমূল্য হয়েছে কিনা তার অনুমান করাও ত যায়। বলবেন, সে আবার কি? তার উত্তরে বলি, চীনের সাহিত্য ও ভাষা, জাপানের সাহিত্য ও ভাষা, তামিল সাহিত্য ও ভাষা আমাদের কাছে অচিনপুরের। কিন্তু অচিনপুরের কাব্য এসে অনুবাদের সোনার কাঠির মাধ্যমে যদি আমাদের অজ্ঞান অবস্থার ঘোর কাটিয়ে দেয়, তা'হলে তাকে আমরা বরণ ক'রে নেব না আমাদের চিত্তক্ষেত্রে? ধরুণ অ-চিন চীনের কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটি—

আমার আঁধার ঘরে
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাল্গুনী লীলা ভরে।
* * *
কোথায় চম্পাপুর।
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,—
শতেক যোজন দূর।
মাঝে ব্যবধান গিরি নদী গ্রাম
পথে বাধা শত শত।
সুপ্ত মু'খানি ছুঁয়ে এনু তবু,—
চকিতে হাওয়ার মত।
—(বাসন্তী স্বপ্ন : ৎ সেন ৎ সান)

অথবা—

পাখীর আকৃতি আমিও জেনেছি কিছু,
পিঞ্জরে তবু আছি করি মাথা নীচু।
—(স্রোতে : লি, পো)

চমৎকার নয় কি? রোমান্টিক মনের স্বপ্নাভিসারজনিত আনন্দ, স্বপ্নাভিসারী সুদূর পিপাসু মনের বাস্তব-বন্ধনজনিত হতাশা সুন্দর ক'রে ধরা পড়েছে উদ্ধৃত দুটি অংশে। আবার নববর্ষের আশা ও আশঙ্কা নিম্নোদ্ধৃত জাপানী কাব্যানুবাদের মধ্যে কি ধরা পড়ে নি?

দ্বারে দেবদারু শাখা,—
চিহ্ন অচিন পথে;
কারো তরে ফুলে ঢাকা,
কারো—ভিজে অশ্রুতে।
—(নববর্ষে : ই স্থ স্থ)

নিশ্চয়ই পড়েছেন তামিল হ'তে অপূর্ব "ঘুম ভাঙা"। নীচে উদ্ধৃত হ'ল একটি তেলেগু ছড়ার সত্যেন্দ্রকৃত অনুবাদ—

"খোকামণি মায়ের গলার মাদুলি।
খোকামণির বৌটি হ'ল কঁচুলি।
কঁচুলিকে খোকা সাহেব কোণে দিলেন ঠেলে,
কঁচুলিকে নিয়ে গেল খ্যাঁকশেয়ালি এসে।"

ঝিঁঝিঁর উপর নিচের পংক্তিগুলি দেখুন—

ওরে ঝিঁ ঝিঁ! এতটুকুন ঝিঁ ঝিঁ,
আনমনে কি বকিস্ হিজিবিজি?
কেমন ক'রে হ'লি এমন কালো?
মুখ ফোটেনা থাকতে দিনের আলো?
সন্ধ্যা হ'লে মিলে চাঁদের সাথে
দিন মজুরের গান কিরে গাস রাতে?

ছেলেমানুষের মন, ছেলেমানুষের কৌতূহল কি চমৎকার ভাবেই না ধরা পড়েছে? শেষের কবিতাটি ফরাসী কবিতার সরাসরি অনুবাদ কি মিস্ত্রালের ইংরাজি অনুবাদের বাংলা অনুবাদ তা আমার জানা নেই, তবে অনুবাদ যে ভাল হয়েছে সে কথা কি অস্বীকার করা যায়?

আপনারা বলবেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন? কথা ছিল সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে ইংরাজি কবিতা কি রকম দাঁড়িয়েছে তারই বিচার করবার, কিন্তু সে-আলোচনা কোথায়? উত্তরে বলব, আমি ধানও ভানছিলাম শিবের গীতও করছিলাম। আমি আপনাদের কাছ থেকে এতক্ষণ সত্যেন্দ্রনাথের হাতে (ইংরাজি হ'তে) অনুবাদ কি রকম হ'য়েছে তারই অচেতন মনের স্বীকৃতি আদায় করছিলাম। উপরে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে তার মূল হ'ল চীনা, জাপানী, তেলুগু এবং ফরাসী ভাষায়। এর একমাত্র শেষের ভাষাটি ছাড়া অন্য ভাষাগুলি সত্যেন্দ্রনাথ জানতেন না এবং অনুমান করা যেতে পারে অনুবাদ কার্য্যে তাঁকে ইংরাজি অনুবাদের সাহায্য নিতেই হয়েছিল। অর্থাৎ তিনি যা অনুবাদ করেছেন বলে আলোচনা করছিলাম, তা ইংরাজি হ'তেই করেছেন, এবং উদ্ধৃতিগুলি বিচার ক'রে সাহিত্যিক মূল্য যে এগুলির কম তা আশা করি কোনও বিদগ্ধ পাঠক বলবেন না। কাব্যসঞ্চয়নভুক্ত নিচের কবিতাটি অনেকবার আপনারা পড়েছেন—

প্রণাম শত কোটি—
ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি যাকে,
সকলি ভাল তার
কেবল—কাঁদে, আর
দাঁত তো দাও নাই তাকে!
পারে না খেতে, তাই
আমার ছোট ভাই
পাঠিয়ে দিও দাঁত, বাপু।
জানাতে এ কথাটি
লিখিতে হ'ল চিঠি।
ইতি। শ্রীবড়খোকাবাবু।

বড় খোকাবাবুর এই চিঠিটি ঝরঝরে চমৎকার হয়েছে। (আমেরিকান) ইংরাজি ভাষা হ'তে সরাসরি এ-অনুবাদ অনুকৃতির মালিন্য হ'তে মুক্ত হয়ে রসরুচিরা কবিতা হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ হ'তে পারে এতক্ষণ যে অনুবাদগুলি নিয়ে আলোচনা করা গেল তা ইংরাজি সাহিত্যের বাইরের জিনিষ বা ধার করা জিনিষ। ইংরাজি সাহিত্যের মর্ম্মমূলে প্রবেশ ক'রে তার রস পরিবেশনের ব্যাপার এ অনুবাদগুলির মধ্যে নেই। সুতরাং ইংরাজি

হ'তে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ বিচারে সে দিকে প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত ছিল। ঠিকই ত। ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ নিকট তাঁরা শ্রেষ্ঠ ইংরাজি কবিতার, বহু পঠিত ইংরাজি কবিতার সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদের মূল্যায়ন করবেন। এদিক হ'তে সত্যেন্দ্রনাথ যদি তাঁদের বিব্রত, বিরক্ত, হতাশ করেন তাহ'লে সত্যেন্দ্রনাথকে ইংরাজি কবিতার সঠিক অনুবাদক কি ক'রে বলা যায়। সত্যই ত সেক্সপীয়ার-এর "এ্যাজ ইউ লাইক ইট্"-এর "আণ্ডার দি গ্রীন উড ট্রি"র গান আর সত্যেন্দ্রনাথের—

সবুজ বনের সবুজ ছায়
আয় গো কে তোরা মেলিবি কায়,
পাখীর কণ্ঠে মিলায়ে তান,
গাহিবি মধুর মধুর গান,
আয় গো হেথা, আয় গো হেথা, আয়।
এখানে নাই
কোনো বালাই
শুধু শীত শুধু শীতের বায়।

—(বনছায়ায় : সত্যেন্দ্রনাথ)

নিঃসন্দেহে পাশাপাশি পড়া যায়না। কীটসের La Belle Dame Sans Merri-র অনুবাদ অপাঠ্য। ইংরাজি সাহিত্যের রসিক পাঠক ব্রাউনিংয়ের কবিতার অনুবাদে (স্বপ্নাতীত) আচমকা আঘাত খাবেন যখন দেখবেন সত্যেন্দ্রনাথ শুরু করেছেন এই ভাবে—

"ঢুলেছিল অচিন পাখী এই ডালের এই কেঁকড়িতে"। বিরক্ত ভাবে, বিব্রতভাবে এবং বিরাগ-ভরে তাঁরা স্মরণ করবেন হয়ত "এসেছিল বকনা গরু পর-গোয়ালে জাবনা খেতে"। ইংরাজি ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যামৃতাস্বাদের প্রচেষ্টা এবম্বিধ অনধিকার চর্চা। কিন্তু অন্যদিক হ'তে বিচার করুন সত্যেন্দ্রনাথকে। ইংরাজি অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতার ব্যর্থ অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ এ কথা সত্য। আবার এও সত্য যে ইংরাজি হ'তে সত্যেন্দ্রনাথের অসংখ্য অনুবাদও আছে যা মূলানুগ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে অর্থাৎ এককথায় অমূল্য অনুবাদ হয়েছে। মূল ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা অবলম্বনে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়ে, অনূদিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে মূলের সম্বন্ধ বিচার ক'রে মূল্যায়ন করলেই, সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের নিরসন হবে।

কীটস্-এর Happy Insensibility-র কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করুন—

In a drear-nighted December,
Too happy, happy tree,
Thy branches ne'er remember
Their green felicity :

—Happy Insensibility : Keats

এর পাশে স্থাপন করুন সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি—

"দুখ শর্বরী মাঝে
বড় সুখী তরুলতা ;
শাখে আর নাহি জাগে
শ্যামল শোভার কথা।"

শেলীর পংক্তিগুলি দেখুন—

Music, when soft voices die,
Vibrates in the memory—
Odours, when sweet violets sicken
Live within the sense they quicken.
Rose leaves, when the rose is dead
Are heaped for the beloveds' bed ;
And so thy thoughts, when thou art gone,
Love itself shall slumber on.

সত্যেন্দ্রনাথের 'স্মৃতি' এর পাশে স্থাপন করুন :—

অন্তরে কাঁদিয়া ফিরে মোহময় তান,
থেমে গেলে গান।
বকুল শুকায়ে গেলে,—তবু তার ঘ্রাণ
মুগ্ধ করে প্রাণ।
গোলাপ ঝরিলে তার পাপড়ি বিছায়
প্রিয়ার শয্যায় ;
তুমি গেলে ভালবাসা পড়িবে ঘুমায়ে
স্মৃতিটি জড়ায়ে।

শেলীর 'স্কাইলার্ক' হ'তে উদ্ধৃত নিম্নের পংক্তিগুলি ও অনূদিত পংক্তিগুলি দেখুন।

Like a rose embower'd
In its own green leaves,
By warm winds deflower'd,
Till the scent it gives
Makes faint with too much sweet those heavy-winged thieves.
Sound of vernal showers
On the twinkling grass,
Rain-awakened flowers,
All that ever was
Joyous, and clear, and fresh, thy music doth surpass.
We look before and after
And pine for what is not :
Our sincerest loughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

—To A Skylark : Shelley

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদে (চাতকের প্রতি)—

পুষ্পপত্র কুঞ্জের ভিতরে
গোলাপের মত নিমগন ;
যতক্ষণ গন্ধ না বিতরে,—
তপ্ত বায়ু করে আলিঙ্গন ;
শেষে সেই সৌরভটি তারে ক্লান্ত-পক্ষ মধুপ পবন।

বসন্তের বর্ষণের জল
কম্পন চঞ্চল তৃণপরে,—
বর্ষণ জাগ্রত ফুলে সব,—
যত সুর নিখিলে বিহরে,—
স্নেহহীন, উচ্ছ্বাসে নবীন—তব স্বরে জিনে সকলেরে।

* * *

আগে পাছে চাহি চারিভিতে
কামনা—কোথাও যাহা নাই;
আমাদের প্রাণের হাসিতে
মিশে আছে বেদনা সদাই;
সবচেয়ে সুমধুর গান—সব চেয়ে দুখের কথাই।

সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলন সঙ্কেত' শেলীর "Lines to an Indian Air" এর সার্থক অনুবাদ। বিশেষ ক'রে নিচের পংক্তি দুটি—

নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে
চলিতে চলিতে বায়ু মুরছি পড়ে,—

আর Shelleyর

The wandering airs, they faint
On the dark, the silent stream—

পাশাপাশি দেখুন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের "The Reverie of poor Susan" এবং সত্যেন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ "দিবা স্বপ্ন" সম্বন্ধে আলোচনা আমি অন্যত্র (শারদীয় মধুবাংশ, ১৩৬৬) করেছি। এখানে তার দুটি পংক্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

Green pastures she views in the midst of the dale
Down which she so often has tripped with
her pail,

সত্যেন্দ্রনাথে কি সুন্দর হয়েই না ধরা দিয়েছে—

সবুজ গোঠের ছবি, তাহার পাহাড় দুটি ধারে,
সে পথ দিয়ে গেছে কত কলসী নিয়ে ভ'রে।

সমকালীন আর একজন কবির বহুপঠিত কবিতার (T. Hoodএর The Bridge of Sighs) উদ্ধৃতাংশের অনুবাদ-কৃতিত্ব বিচার করুন। সত্যেন্দ্রনাথের "আত্মঘাতিনী" আর তার মূল পাশাপাশি দেখুন—

আরেক দুর্ভাগিনী
গেছে সংসার থেকে,
জীবন যাতনা মানি'
মৃত্যু নিয়েছে ডেকে।
ধর্ গো আস্তে ধর্
সাবধানে তোল্ বাছা
মুখখানি সুন্দর
বয়েস নেহাৎ কাঁচা।

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate
Gone to her death !
Take her up tenderly,
Lift her with care;
Fashioned so slenderly,
Young and so fair !

* * *

ভীষণ চাহিয়া আছে
মৃত্যু হতাশ আঁখি
ভবিষ্যতের পানে
যেন সে দৃষ্টি হানে
গ্লানির মাঝারে থাকি।

Dreadfully staring
Thro' muddy impurity
As when with the daring
Last look of despairing
Fix'd on futurity.

* * *

দুটি হাত ধীরে ধীরে
রাখ গো বুকের পরে
মরণ নদীর তীরে
যেন ঈশ্বরে স্মরে।

Cross her hands humbly,
As if praying dumbly,
Over her breast.

কবিতাটির মূল অপেক্ষা উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ আমার কাছে সুন্দর বলে মনে হয়। মূলের থেকে ভাল হয়েছে বললে যদি অপরাধ হয়, মূলের থেকে খারাপ হয়নি অনুবাদ এ কথায় নিশ্চয়ই অপবাদ দেবেন না। [এ কথায় মনে পড়ে গেল মেঘনাদবধ কাব্যের হিন্দী অনুবাদ প্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর হিন্দীবিভাগের একজন কর্ণধার-শ্রেণীর আচার্য্যকে। তিনি বলেছিলেন, "যদিও আমি মূল মেঘনাদবধ পড়িনি, তবু আমার মনে হয়, মেঘনাদ বধের অনুবাদ মূল অপেক্ষা ভাল হয়েছে।" এ ধরণের না-পড়ে তুলনা-মূলক বিচার যে দায়িত্বশীল লোকেরা কখনও কখনও আরও না করেছেন তা নয়।] মূল কবিতাটি কোনও গভীর করুণরস সৃষ্টি করে না, জাগায় করুণা। এই করুণা-জাগানোর কাজে সত্যেন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ আশ্চর্য্যজনক সাফল্য অর্জন করেছে বলে আমার মনে হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের হাতে ব্রাউনিং কি ভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন তার উদাহরণ পূর্ব্বেই দিয়েছি। আবার সত্যেন্দ্রনাথ যে ব্রাউনিংয়ের ভাল অনুবাদও করেছেন তার প্রমাণ হাতের কাছের "কাব্যসঞ্চয়ন"-এই আছে। রবার্ট ব্রাউনিংয়ের "Summum Bonum" ও "সংসারের সার" পাশাপাশি রেখে বিচার করুন। নিঃসন্দেহে কবিতাটি একটি সার্থক অনুবাদ বলে আপনারা সিদ্ধান্ত করবেন।

সত্যেন্দ্রনাথের হাতে টেনিসনের কোনও ভাল কবিতা অনূদিত হয়নি। একটি অনুবাদ কাব্যসঞ্চয়নে দেখেছি, কিন্তু টেনিসনের কোন্ কবিতার অনুবাদ যে "গোপিকার গান" তা এখনও বুঝতে পারিনি। টেনিসনের অপাঠ্য কোনও নাটকের গানের অনুবাদ নাকি এটি? কিন্তু টেনিসন্কে বাদ দিলেও সুইনবার্ণকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদের ক্ষেত্রে।'

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যসঞ্চয়নে স্থান পেয়েছে "ত্রিলোকী" সুইনবার্ণ হ'তে একটিমাত্র অনুবাদ। অনুবাদটি উল্লেখযোগ্য নানা কারণে—

ত্রিলোকী

অসীম ব্যোমেরে সূর্য্য কি কথা বলে?
সাগর কি কথা বলে গো হাওয়ার কানে?
কোন্ কথা চাঁদ বলে চুপি রাত্রিরে?
কোন্ জন তাহা জানে

* * * *

গোষ্ঠ গোধনে কি কহে গানের ছলে ?
কোন সুরে মধু মৌমাছি টেনে আনে ?
অতল কি গান শুনায় হিমাদ্রিরে ?
কে জানে এ তিন গানে ?
ফাল্গুন যেই লিপি লেখে চৈত্রেরে,
বৈশাখ যাহা পড়ে গো আখর চিনে,
জ্যৈষ্ঠেরে দিয়ে যায় যে লিখন শেষে,
তাহার জন্মদিনে।

Triads : A. C. Swinburne.

The word of the Sun to the sky
The word of the wind to the sea,
The word of the moon to the night
What may it be ?

* * * *

The song of the fields to the sky,
The song of the lime to the bee,
The song of the depth to the height,
Who knows all these ?

* * * *

The message of April to May
That May sends on into June
And June gives out to July
For birthday boon ;

মূল কবিতা হ'তে পরিবর্তন অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল বলে April, May, June কে চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে রূপান্তরিত ক'রে কবি ঔচিত্য বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ-জাতীয় পরিবর্তন সত্যেন্দ্রনাথ অন্যত্রও করেছেন, যেমন "দিবাস্বপ্ন"-এ Pail স্থলে "কলসী"। অন্যত্র violet স্থলে "বকুল"। অন্য ভাষা হ'তে অনুবাদেও এ ধরণের পরিবর্তন করেছেন কবি (এ প্রসঙ্গে আমার "অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ" দ্রষ্টব্য)।

সুইনবার্ণ-এর আর একটি কবিতার অনুবাদ কাব্যসঞ্চয়ন-এ স্থান পায়নি, কিন্তু এ কবিতাটি পূর্ব্বের অনুবাদের চেয়ে মূলানুগ ও মূল্যবান বলে আমার মনে হয়। ("কাব্য সঞ্চয়ন"-এ সত্যেন্দ্রনাথের অনেক ভাল কবিতার স্থল ব্যর্থ কবিতা অধিকার করেছে বলে আমার মনে হয়। অর্থাৎ সংকলয়িতাদের বয়রুচি বিষয়ে কিছুটা সংশয় জাগে গ্রন্থটির প্রচ্ছদচিত্র ও সংকলিত কয়েকটি কবিতা দেখে।) অনুবাদ ও মূল কবিতাটি পরে উদ্ধার করা হ'ল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে

ওগো ! দিনের নাবাল ছুঁয়ে,
আর রজনীর এই পারে,
কিছু ধরিয়া পাইনে ছুঁয়ে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে ;
ছায়া মোলায়েম আলো মৃদু
পথে পথে বাটে দুলে দুলে ;—
রবি ছাড়িয়ে গেছে যে শীধু,
বাদল যে ফুল গিয়েছে ভুলে।
এই নিভৃত নিমেষগুলি
সে কি বৃথাই বহিয়া যাবে ?
মরণ আছে যে মরম ভুলি
শেষে প্রেমের অবশ পাবে ?
তবে ফুলেরা দেখুক, অয়ি !
এই ভরা প্রেম নিমেষের,
ওগো ভালবাসা হ'ক জয়ী
আজ মরণের পরে ফের।

মূল কবিতাটি :—

Before Sunset : A. C. Swinburne

In the lower lands of day
On the hither side of night,
There is nothing that will stay,
There are all things soft to sight ;
Lighted shade and shadowy light
In the wayside and the way,
Hours the Sun has spared to smite,
Flowers the rain has left to play.
Shall these hours run down and say
No good things of thee and me ?
Time that made us and will slay
Laughs at love in me and thee ;
But if here the flowers may see
One whole hour of amourous breath.
Time shall die, and love shall be
Lord as time was over death.

—Before Sunset : A. C. Swinburne

চমৎকার অনুবাদ !

অথচ এটি বাদ গিয়েছে "কাব্য সঞ্চয়ন"-গ্রন্থে।

সত্যেন্দ্রনাথের আর একটি কবিতার অনুবাদে সুইনবার্ণের নাম না থাকলেও কবিতাটি সুইনবার্ণ হ'তে অনূদিত বলে আমার মনে হয়। আমি যে কবিতাটির কথা বলছি তা হ'ল "কাব্য সঞ্চয়ন"-ধৃত "সাগরে প্রেম" কবিতাটি। এটি কবি "তেয়োফিল গতিয়ে" হ'তে অনুবাদ করেছেন বলে উল্লিখিত। গতিয়ের এই ফরাসী কবিতাটির মূল আমার পড়া নেই, তবে এই মূল কবিতাটির অনুকরণে সেই সুইনবার্ণ Love at Sea নামে যে চমৎকার কবিতাটি লিখেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটি তারই অনুবাদ হ'তে পারে, অবশ্য এটি আমার এখন পর্য্যন্ত অনুমান। যদি ইতোমধ্যে মূল ফরাসী কবিতাটি আমি হাতের কাছে পেয়ে যাই তাহ'লে এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারব। আমরা নীচে প্রথমে "সুইনবার্ণের" কবিতা Love at Sea" এবং পরে সত্যেন্দ্রনাথের "সাগরে প্রেম" কবিতা উদ্ধার করছি।

Love at Sea

We are in love's land to-day ;
Where shall we go ?

Love, shall we start or stay,
Or sail or row ?
There's many a wind and way,
And never a May but May ;
We are in love's hand to-day ;
Where shall we go ?

Our landwind is the breath
Of sorrows kissed to death
And joys that were ;
Our ballast is a rose ;
Our way lies where God knows
And love knows where.
We are in love's hand to-day—

Our seamen are fledged loves
Our masts are bills of doves
Our docks fine gold ;
Our ropes are dead maids' hair,
Our stores are love-shafts fair,
And manifold.
We are in love's land to-day—

Where shall we land you, sweet ?
On fields of strange men's feet
Or fields near home ?
Or where the fire-flowers blow,
Or where the flowers of snow
Or flowers of foam ?
We are in love's hand to-day—

Land me, she says, where love
Shows but one shaft, one dove,
One heart, one hand,
A shore like that, my dear,
Lies where no man will steer,
No maiden land.

—Love at Sen : Swinburne
(Imitated from Theophile Gautier)

সাগরে প্রেম : সত্যেন্দ্রনাথ

আমরা এখন প্রেমের দেশে, তবে
বল, এখন কোথায় যাব আর ?
থাকবে হেথা ?—যেতে কোথাও হবে ?
পাল তুলে দিই ?—ধরি তবে দাঁড় ?
নানান্ দিকে বহে নানান্ বায়,
ফাগুন চিরদিনই ফাগুন হায়,
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায়
এখন বল, কোথায় যাব আর ?

তুষার চাপে যে সুখ গেছে মরি,'—
অশ্রু সুখের শেষ নিশ্বাসে ভরি,'—
প্রসাদ পবন মোদের হবে সে।
ফুলে বোঝাই হবে নৌকাখান্,
পন্থা মোদের জানেন ভগবান্,
আর জানে সেই কুসুম-ধনু যে !
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

মাঝি মোদের প্রণয় গাথা যত,
মাস্তে দু'টি কপোত প্রণয় রত,
সোনার পাটা, সোনায় মোড়া ছই.
রশারশি রসিক জনের হাসি,
নয়ন কোণে রবে রসদ্ রাশি,
রসদ্ রবে অধর প্রান্তে সই।
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা হায়।
এখন বল, যাব আর কোথায় ?

কোথায় শেষে নামাব, বল্, তোরে,—
বিদেশী সব যেথায় নিতি ঘোরে ?
কিম্বা মাঠের শেষে গাঁয়ের ঘাটে ?—
যেদেশে ফুল ফোটে অনল মাঝে ?
কিম্বা যেথায় তুষার বুকে সাজে ?
কিম্বা জলের ফেনার সাথে ফাটে ?
প্রেমের পাশে বন্দী মোরা, হায়।
এখন বল,—যাব আর কোথায় ?

কয় সে ধীরে, "নামিয়ো মোরে সেথা,
প্রেমের পাখী একটি মাত্র যেথা,—
একটি শর, একটি মাত্র হিয়া।"
তেমন পুরী যেথায় আছে, হায়,
নরের তরী যায় না গো সেথায় ;
নারী সেথায় নাম্‌তে নারে, প্রিয়া।

কবি "dead maids hair"এর ইচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছেন। সেটিকে অনুবাদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করলে এবং কবিতাটির সাহিত্যিক মূল্য বিচারে শেষের দুটি স্তবক বাদ দিলে অনূদিত কবিতাটি চমৎকার বলে মনে হয় না কি ?

এতক্ষণ ইংরাজি সাহিত্যের সেরা সাহিত্যিকদের রচনা অবলম্বন ক'রে অর্থাৎ শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ প্রমুখ কবিদের কবিতাংশ অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করলাম।

সর্ব প্রথমে আলোচনা করেছিলাম, ইংরাজিতে অনূদিত অন্য ভাষায় কবিতার সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত ভাষান্তরণের মূল্যায়ন।

এবার আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে পরিণত মনের পাশেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি করেছে শিশুমন। একদিকে তিনি বিদেশী সাহিত্য হ'তে রসের সামগ্রী এনেছেন, অন্যদিকে তিনি বিদেশী সাহিত্যের দিকে ছুটে গিয়েছেন শিশুর কৌতূহল মনে। সেখানে তাঁর মন

রচনার রসবিচার করেনি। শিশু রসনা যেমন অপরিচিতের সঙ্গে তালব্য মিলনের ক্ষেত্রে মন্ত্রপাঠ করে—

রসনাকে রসিয়েছ এর বেশী মানে
আর কে তা জানে?

সেভাবে সত্যেন্দ্রনাথের বিস্ময়-প্রবণ মন যেখানে উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে সেদিকেই যাত্রা করেছে। অর্থাৎ রসিকের রসবিচার আর শিশুর বিশ্ব-বিস্ময়, দুই তাঁর মনকে অভিভূত করেছিল। ইংরাজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-মন যাত্রা করেছে সে কেবল রস-বিচারকে লক্ষ্য করেনি, বিস্ময়কেও সঙ্গী করেছে। আর তাইত তিনি দেবেন সেনের ইংরাজি কবিতার, ওয়ারেণ-হেষ্টিংসের কবিতার (সংস্কৃত? "বন্দেমাতরম্" এর বঙ্গানুবাদও) বাংলাতে অনুবাদ করেছেন। বাংলার বিখ্যাত কবি দেবেন সেন মহাশয় ইংরাজিতে কবিতা লিখেছিলেন। সে সংবাদের উত্তেজনায় বিস্ময়-বশে অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, বিচার-বশে নয়। কঠোর শাসক ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কবিতাও অনেকের কাছে news, নিয়ের বঙ্গানুবাদে তার সংবাদ পরিবেশন করেছেন কবি, রসবিচার করেন নি—

ফৌজদার: ওয়ারেণ হেষ্টিংস

বিরক্ত বিব্রত ফৌজদার
আরামের আরাধনা করে,
দুরন্ত গরম যবে আর
কাছারিতে লোক নাহি ধরে।

এই বিস্ময়ই তাঁকে নিয়ে গেছে বিদেশী ভাষায় বাঙ্গালীর লেখা কবিতার দিকে। নিয়ে গেছে বিবেকানন্দ, অরবিন্দের ইংরাজী রচনার দিকে, তরুদত্তের ফরাসী কবিতার দিকে। ফরাসী কবিতা নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। শ্রীঅরবিন্দ-এর কবিতার দিকে সত্যেন্দ্রনাথের বিস্মিত মন যাত্রা করলেও, বিচারনিষ্ঠ মন তার অনুগামী হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের কবিতা, কবিতাই, এবং এক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ উপেক্ষিত ইংরাজি কবি শ্রীঅরবিন্দের সুন্দর কবিতার অপূর্ব অনুবাদ করেছেন। "সাগরের প্রতি" কবিতাটি কাব্যসঞ্চয়নে স্থান পায়নি। তার কয়েকটি পংক্তি দেখুন:—

হে পিঙ্গল মত্ত পারাবার
মোর তরে মন্ত্রভাষী তুমি এনেছ এনেছ সমাচার।
বিপুল বিস্তৃত পৃষ্ঠ তুলি
চলেছে তরঙ্গ-ভঙ্গ তব; মাঝে মাঝে ক্রোড় সন্ধিগুলি
অতল পাতাল-গুহা প্রায়,
তারি পরে অস্পষ্ট সুদূর তরী চলে স্পন্দিত পাখায়।
শুনি আমি গর্জ্জন তোমার,—
কহ তুমি, "তীরে বসি বিলম্ব করিছ কেন মিছে আর?..."

* * *

হে সমুদ্র দুরন্ত কেশরী
তোমারে আনিব নিজ বশে হেলায় কেশরগুচ্ছ ধরি;
নহে ডুবে যাব একেবারে,
লবণাক্ত গভীর গহ্বরে অন্ধকার অতল পাথারে।

—সাগরের প্রতি: সত্যেন্দ্রনাথ

মূল কবিতার আদর্শ পংক্তিগুলি দেখুন—

O grey wild sea
Thou hast a message, thunderer for me
Their huge wide backs
Thy monstrous billows raise, abysmal cracks
Dug deep between.
One pale boat flutters over them, hardly seen
I hear thy roar
Call me, "Why dost thou linger on the shore

* * *

I will seize thy mane,
O lion, I will tame thee and disdain
Or else bellow
Into thy salt abysmal caverns go....

—To the Sea: Aurobindo Ghose

শ্রীঅরবিন্দের আর একটি কবিতার খুব চমৎকার অনুবাদ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। কবিতাটি হ'ল 'কাব্যসঞ্চয়ন'-ধৃত বঙ্কিমচন্দ্র। এ সম্বন্ধে আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি। এখানে কেবল মূল ও তার অনুবাদ হ'তে কয়েকটি সুন্দর পংক্তি উপহার দিয়ে আলোচনা শেষ করব। সত্যেন্দ্রনাথের নিয়োদ্ধৃত পংক্তিগুলি কি সুন্দর—

"মায়াবী সে মঞ্জুবাক! গন্ধরাজ চম্পার সৌরভ
ছত্রে ছত্রে ছড়ায়েছে; ছত্রে ছত্রে হয় অনুভব
রমণীয়া রমণীর কঙ্কণের সুরম্য ঝঙ্কার;

* * *

হে বঙ্গের জলস্থল! হে চির সুন্দর! সুশোভন!
মধুর তোমরা সবে; মধুময় দক্ষিণ পবন—
বঙ্গের নিকুঞ্জবনে,—পিক কণ্ঠে আছে মধু জানি,
তা হ'তে অধিক মধু মঞ্জুবাক্ বঙ্কিমের বাণী।"

এর পাশে মূল হ'তে আদর্শ পংক্তিগুলি দেখুন—

O master of delicious words! The bloom
Of Champuk and the breath of King-perfume
Have made each musical sentence with the noise
Of women's ornaments....

* * *

O plains, O hills, O rivers of sweet Bengal,
O land of love and flowers the spring-birds call
And southern wind are sweet among your trees
Your poet's words are sweeter far than these.

—Bankim Chandra Chatterji: Sri Aurebinda

সত্যেন্দ্রনাথের অনেক অনুবাদই অক্ষম অনুবাদ নয়, অক্ষয় অনুবাদ। এই অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন:—

'অনুবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছি। কবিতাগুলি এমন সহজ ও সরস হইয়াছে যে..অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। মূলের রস কোনো মতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না। কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রসসৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য।"

সত্যেন্দ্রনাথ একই কালে অসাধারণ অনুবাদক ও কবি।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৮

গোধূলি লগ্নে নিমাইয়ের বিয়ে।

বরস্কন্যা এসে তাকে সাজাতে লাগল। তার আগে এয়োরা তাকে স্নান করিয়ে দিয়েছে। সর্বাঙ্গ মার্জনা করে মাখিয়ে দিয়েছে হলুদ আর আমলকি। গৌরাঙ্গ-অঙ্গ মার্জিত করতে গিয়ে নিজেরা মার্জিত হয়েছে। গৌরাঙ্গ-অঙ্গ নির্মল করতে গিয়ে নিজেরা নির্মলীকৃত।

ললাটে অর্ধচন্দ্রাকৃত চন্দনের কোঁটা, মধ্যস্থলে মৃগমদের তিলক। নয়নে কাজল, শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধের প্রলেপ। বাহুতে রত্নবাজু, শ্রুতিমূলে সোনার কুণ্ডল। গলায় ফুলের মালার সঙ্গে মতির মালা। ত্রিকচ্ছ করে সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র পরা, মাথায় মুকুট, ধান দূর্বা দিয়ে হাত বাঁধা, সেই হাতে দর্পণ। গায়ে পট্ট চাদর।

ব্রাহ্মণ করতে লাগল বেদধ্বনি, ভাট পড়তে লাগল রায়বার। বুদ্ধিমন্ত দোলা সাজিয়ে নিয়ে এল। সত্যিই বুদ্ধিমন্ত। কমলার সঙ্গে নারায়ণের বিয়েতে তার সমস্ত ধন নিয়োগ করল। 'কনকের দ্বারা করি মাধবের সেবা।' জোগাড় করে আনল নানা ছাঁদের নানা শব্দের বাদ্যভাণ্ড। শঙ্খ বংশী করতাল মৃদঙ্গ মাদল তো আছেই, সঙ্গে পটহ দগড় শিঙ্গা—জয়ঢাক, বীরঢাক। নাচ-কাচের লোক, নর্তক আর বিদূষকও জমেছে অনেক। বাজী পুড়ছে। দীপ জ্বলছে হাজার হাজার।

মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে গৌরহরি দোলায় এসে উঠল। আগে গঙ্গাতীরে চলো। গঙ্গাপ্রণাম সেরে সর্ব নবদ্বীপ ঘুরে পরে কন্যাঘরে উপস্থিত হব। পদাতিকেরা দুই সারি হও। তুলে নাও নানাবর্ণের পতাকা।

'অনেক বড়-বড় বিয়ে দেখেছি, এমনটি আর হয় না।' বললে জনে-জনে। আবার তারাই ব্যাখ্যা করলে: এ কি মানুষের বিয়ে? মানুষের মূর্তি?

'ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নরনারী।
মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা পাসরি॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্যভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায়, দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥'

এই সেই বৃন্দাবনের 'অপ্রাকৃত নবীন মদন।' শত পেলেও যাকে আরো-আরো পেতে ইচ্ছে করে, শত স্বাদনেও যার সাধন ফুরোয় না কোনো দিন। 'এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে, তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে।' প্রাপ্তির কামনাকে প্রতি মুহূর্তে যে নতুন করে, প্রতি মুহূর্তে যে নতুন উদ্দামতা দেয় শক্তিতে, আর প্রতি মুহূর্তে চিত্তে আনে নতুন উন্মত্ততা, সেই তো চিন্ময় কামদেব। সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ। ব্রজাঙ্গনার কাছে নটবর নবকিশোর, মাধুর্যঘনবিগ্রহ। মহাভাববতী রাধিকার মধ্যে প্রেমের সর্বাতিশায়ী বিকাশ, সেই কারণে মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী বিকাশ মহাভাবময় শ্রীকৃষ্ণে। তাই শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত নবীন মদন।

শুধু পুরুষ যোষিৎ নয়, স্থাবর জঙ্গম নয়, সেই সর্বচিত্তাকর্ষককে দেখে স্বয়ং মদন বিমোহিত। শিব মদনদহন, কিন্তু কৃষ্ণ মদনমোহন। 'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।' শৃঙ্গার বা মধুররসই সমস্ত রসের রাজা, তাই শৃঙ্গারের আরেক নাম রসরাজ। রসরাজময় যে মূর্তি তাই শ্রীকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দতনু। সর্বচিত্ত তো বটেই, আত্মচিত্ত পর্যন্ত মুগ্ধ করে বসে আছে। 'আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তহর।'

বৈকুণ্ঠের নারায়ণ আর লক্ষ্মীও কৃষ্ণভিক্ষু। দুজনের কাছেই কৃষ্ণ মধুমত্তম।

কৃষ্ণরূপে লুব্ধ হয়ে ধৃতব্রত হয়ে লক্ষ্মী তপস্যায় বসল।

কৃষ্ণ জিগ্গেস করলে, এ তপস্যার হেতু কী?

লক্ষ্মী বললে, গোপী হয়ে গোষ্ঠে বিহার করব, এই আমার বাসনা। সেই বাসনার পূর্তির জন্যেই এই তপস্যা।

কৃষ্ণ বললে, এ দুর্লভ, এ তোমার হবার নয়।

তাহলে এক কাজ করো। বললে লক্ষ্মী, তোমার বুকে সোনার রেখা করে আমাকে রেখে দাও।

কৃষ্ণ বললে, তাই হোক।

সেই থেকে লক্ষ্মী স্বর্ণরেখারূপে কৃষ্ণবক্ষে বিরাজিতা।

দ্বারবতীতে এক ব্রাহ্মণ ছিল, তার নয় পুত্র মারা গেল পর-পর। এক-একটি পুত্র মরে, রাজদ্বারে এসে অভিযোগ করে যায় ব্রাহ্মণ। রাজাকে বলে, তোমার দোষেই আমার এ পুত্রশোক। রাজাকে নিরুপায় দেখে ব্রাহ্মণ অর্জুনের কাছে সাহায্য চাইল। কৃষ্ণ-ঘনিষ্ঠ অর্জুন অভয় দিল ব্রাহ্মণকে। বললে, আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করব। দেখি কি করে যম তাকে স্পর্শ করে।

পারবে বাঁচাতে? ব্রাহ্মণ উৎসাহিত হয়ে আকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন করলে।

যদি না পারি—অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করব। অর্জুন প্রতিজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করল।

ব্রাহ্মণীর পুনর্বার গর্ভসঞ্চার হলে ব্রাহ্মণ সংবাদ দিল অর্জুনকে। অর্জুন শরজালে দিগ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করল, নিবিড় করে আবৃত করল সূতিকাগৃহ। কার সাধ্য এই শরবেষ্টনী ভেদ করে।

যথাকালে ব্রাহ্মণীর পুত্র হল। কিন্তু কয়েকবার কেঁদে উঠেই শিশু স্তব্ধ হয়ে গেল। শরজাল মৃত্যুকে অবরোধ করতে পারেনি।

ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণ অর্জুনকে তিরস্কার করতে লাগল। মিথ্যাবাদী, কপট, উদ্ধত!

অর্জুন বললে, লোকান্তর থেকে উদ্ধার করে আনব তোমার ছেলেদের। শুধু কনিষ্ঠকে নয়, এক থেকে দশ, সবগুলিকে।

যমালয়ে এসে উপস্থিত হল অর্জুন। কিন্তু, কই, সেখানে নেই ছেলেরা। যত লোক আর পুরী আছে সব খুঁজল একে-একে, কোথাও কাউকে মিলল না।

এবার তবে অগ্নিতে প্রবেশ করি। প্রতিজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হল অর্জুন।

কৃষ্ণ বললে, চলো, আমি তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। ব্রাহ্মণের ছেলেদের দেখতে পাবে সেখানে। তুমি এখুনি অগ্নিতে প্রবেশ কোরো না।

দিব্যরথে চড়ে অর্জুনকে নিয়ে বেরুল কৃষ্ণ। অনেক গিরিনদী সমুদ্র পার হয়ে মহাকাল-আলয়ে এসে উপস্থিত হল।

সেখানে আছে ভূমাপুরুষ। সে বললে, ব্রাহ্মণের দশ ছেলে আমার কাছেই আছে। তাদের সন্ধানে কৃষ্ণার্জুন আসবে, আর এলে কৃষ্ণকে আমি দেখতে পাব, সেই লোভেই ওদের অন্যত্র রাখিনি। আমার এতদিনের উৎকণ্ঠা আজ নিবৃত্ত হল। চরিতার্থ হল প্রতীক্ষা। কৃষ্ণকে দেখতে পেলাম।

এই ভূমাপুরুষ আর কেউ নয় স্বয়ং নারায়ণ।

মণিভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল কৃষ্ণ। সবিস্ময়ে বলে উঠল, এ তো কখনো দেখিনি! আমি এত মধুর। এত চমৎকারকারী! এ মাধুর্য আমি আস্বাদন করি কি করে? লুব্ধচিত্তা রাধিকা না হয়ে আমার উপায় নেই। রাধিকার ভাব না ধরলে কৃষ্ণ-মাধুর্য, আত্মমাধুর্যও বোঝা যায় না।

বর সনাতনের বাড়ি এসে পৌঁছুল। সনাতনও কম আয়োজন করেনি। তারও তুমুল বাদ্য, উচ্চণ্ড আলো। ভাট-বিপ্রও কম নয়।

নিমাইকে নামানো হল দোলা থেকে। পুষ্পবৃষ্টি লাজবৃষ্টি হতে লাগল। শঙ্খের রোল উঠল চারিদিকে। আর ললিত-কলিত হুলুধ্বনি।

অবগুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে সভায় আনা হল। সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার, স্বভাবসুন্দরী, বিনোদানন্দগম্ভীরা। কিশোরবয়সোজ্জ্বলা। লজ্জালতিকা। সর্বতঃশ্রীর প্রতিমূর্তি।

মুখচন্দ্রিকা হবে। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিঁড়ি উঁচু করে তুলে ধরা হল। বর-কন্যার মাথার উপর দেওয়া হল বস্ত্রের আবরণ। নিভৃতে এবার দেখ পরস্পরকে। নিভৃততমকে।

লজ্জায় দু চোখ বুজে আছে বিষ্ণুপ্রিয়ার। পরম-পরিচিতকে তা হলে দেখি কি করে!

'ওকি, চোখ চা।' পাশ থেকে এয়োর দল বললে

বিষ্ণুপ্রিয়াকে। 'বরের মুখ না দেখলে দোষ হয়। লজ্জা কী ! আপনজনকে দেখবি।'

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ চাইল।

মিলন হল চার চোখে। একটিমাত্র নিমেষ কিন্তু অনন্তকালের দর্শন দিয়ে ভরা।

নিমাইয়ের বাঁয়ে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। একটু বুঝি বা সাহস বেড়েছে, ঘোমটার আড়াল থেকে আড় চোখে দেখছে বরকে। কখনো-বা চোখে চোখ পড়ে যেতে ধরা পড়ার আনন্দে শিউরে উঠছে। তাকাচ্ছে পায়ের দিকে আর সমস্ত হৃদয় জলের মত ঢেলে দিচ্ছে অনর্গল। দুখানি হাত দেখছে আর ভাবছে সমস্ত সুখ বুঝি ঐ হাতের মুঠোয়। কিন্তু অত সুখ কি আমার সইবে ? ধরতে পারব দুই হাতে ?

এ কি সত্যিই ঘটছে বাস্তবে না কি এ স্বপ্ন দেখছি ? এ কার সঙ্গে কার বিয়ে ? এ কি মাটিতে আছি না কি গন্ধর্বনগরে।

সর্বগুণখনি রাধিকা। গুণৈরতিবরীয়সী। মহাভাবস্বরূপা, সর্বসাধিকা। সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা। কেশদাম সুকুঞ্চিত, দীর্ঘায়ত নয়ন দুটি চঞ্চল, বক্ষ সুশোভন, মধ্যদেশ ক্ষীণ, স্কন্ধদেশ অবনমিত, হাত দুখানি নখরত্নসুন্দর।

রাধিকা মধুরা, নববয়া, চলাপাঙ্গা, উজ্জ্বলস্মিতা। তার হাত-পায়ের রেখা খুব সুন্দর ও সৌভাগ্যের সূচক, তাই সে চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা। তার অঙ্গগন্ধে মাধব উন্মাদিত, তাই সে গন্ধোন্মাদিতমাধবা। সঙ্গীতনিপুণা, রম্যবাচী, নর্মপণ্ডিতা, বিনীতা। শুধু তাই নয়, সে করুণেক্ষণা, বিদগ্ধা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা। ধৈর্যগাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা। গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা, অর্থাৎ গুরুজনের অতিশয় স্নেহপাত্রী। কৃষ্ণবিষয়ে তৃষ্ণাবতী। সন্ততাশ্রবকেশবা, সর্বদা কেশব তার অনুগত, তার আজ্ঞাধীন।

রাধিকার দ্বাদশ আভরণ। চূড়ায় মণীন্দ্র, কানে কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে পদক, কর্ণোর্ধ্বে শলাকা, করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠমালা, আঙুলে অঙ্গুরী, বক্ষে তারকোপম হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে নূপুর, পদাঙ্গুলিতে গুঞ্জরিপঞ্চম।

রাধিকার ষোড়শ শৃঙ্গার। রাধিকা স্নাতা, নাসাগ্রে মণিরাজ, পরিধানে নীলবসন, কটিতটে নীবী, মাথায় বদ্ধবেণী, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গে চন্দনচর্চা, চিকুরে কুসুম, হাতে পদ্ম, মুখকমলে তাম্বুল, নয়নে কজ্জল, কপোলে রঞ্জন, ললাটে তিলক, গলদেশে মাল্য, অলকে কস্তুরীবিন্দু, চরণে অলক্তরেখা।

রাধিকাই কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। 'কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা—ক্রীড়ার সহায়॥' ভাবিত কী? সর্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট হলেই ভাবিত। জলের মধ্যে কর্পূর দিলে কী হয় ? জলের অণুতম সূক্ষ্মতম অংশেও কর্পূরের অনুপ্রবেশ ঘটে। জল তখন কী ? জল তখন কর্পূরবাসিত। জল তখন কর্পূরভাবিত। লোহাতে যখন আগুন প্রবেশ করে, তখন লোহার কণিকতম অংশেও আগুন। তখন লোহাতে আর আগুনে পার্থক্য নেই। তখন লোহাতে-আগুনে তাদাত্ম্য। তখন লোহা অগ্নিভাবিত। তেমনি রাধিকায় আর কৃষ্ণপ্রেমে ভেদ নেই। রাধিকার কায় মন বাক্য সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের ভাবনা। সমস্ত অস্তিত্বই কৃষ্ণপ্রেমের পরিণতি।

শ্রীকৃষ্ণের লীলায়-খেলায় সহায়কারিণী কে হবে, কে হতে পারে ? তাঁর লীলা কী? তাঁর লীলা আস্বাদন, কান্তারসের আস্বাদন। এ খেলায় সেই তাঁর সঙ্গী হবে যে তাঁর নিজের শক্তি, স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তো আত্মারাম, স্বতন্ত্র পুরুষ, তাই তিনি এমন কোনো শক্তির সাহায্য নিতে পারেন না, যা তাঁর থেকে পৃথক। তেমন সাহায্য নিতে গেলে তাঁর আত্মারামতা থাকে কোথায় ? তাই অখিলাত্মভূত শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজশক্তি, তাঁর আনন্দচিন্ময়রসের প্রতিরূপা রাধিকাকে, হ্লাদিনীকে ডাক দিয়েছেন। রাধিকা ছাড়া কে আর তাঁর খেলা জমাবে ? কে হবে তাঁর আনুকূল্যবিধায়িনী ?

বিয়ের পর বর-কনে, গৌরাঙ্গ আর বিষ্ণুপ্রিয়া, চলল বাসরঘরে। ভয়ে-আনন্দে প্রায় অবশ বিষ্ণুপ্রিয়া। চলতে পারছে না পা ফেলে। নিমাই প্রায় তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ ঝনাৎ করে একটা শব্দ হল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। ঢলে পড়ল স্বামীর আশ্রয়ে।

কী হল ? কী হল ? সবাই উৎসুক-উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠে উছট লেগেছে। এ কি, রক্ত পড়ছে যে আঙুল থেকে। কী হবে ?

আঙুলের থেকেও মর্মে বেশি যন্ত্রণা বিষ্ণুপ্রিয়ার। বাসরঘরে যেতে এ কী অমঙ্গল !

কিন্তু, এখন রক্ত থামবে কী করে ?

নিমাই তার অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষতস্থল চেপে ধরল। রক্তক্ষরণ থেমে গেল। ব্যথাবেদনা চলে গেল নিমেষে।

অঙ্গুষ্ঠে-অঙ্গুষ্ঠে প্রথম প্রেমালাপ।

কিন্তু ভয় তো যায় না। কেনই বা এই রক্তক্ষরা আঘাত? কিসেরই বা এই মধুক্ষরা উপশম?

তপন মিশ্রকে কাশীবাসের পরামর্শ দিল নিমাই। বললে, যাও, বেশি দেরি নেই, সেখানেই আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। কেন দেখা হবে? তার অর্থই, ভাবী সন্ন্যাসগ্রহণের কথা তখন নিমাইয়ের মনে ছিল। তাই যদি হবে, তবে নিমাই জেনে-শুনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করল কেন? এমন তো নয় যে, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করবার পর তার সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প হয়েছে। আগেই যখন হয়েছে, তখন লক্ষ্মীর তিরোধানের পর, গৃহত্যাগ করলেই হত। কী দরকার ছিল বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদাবার? জেনে-শুনে তার জীবনে দুর্বহ দুঃখের ভার চাপিয়ে দেবার? নিমাইয়ের কি মায়ামমতা নেই?

সন্ন্যাসের মহনীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করবার প্রয়োজন ছিল। বিরাট ত্যাগের উত্তুঙ্গ দৃষ্টান্ত রাখবার জন্যে। সন্ন্যাস না নিলে কুতর্কনিষ্ঠ ভগবদ্‌-বিদ্বেষীদের আকৃষ্ট করব কী করে? 'সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞা ছিল তাকিকাদি গণ॥' কী উপায় অবলম্বন করলে ও সব নিন্দুক পাষণ্ডীর দল আমাকে প্রণাম করবে? আর প্রণাম না করা পর্যন্ত নির্মল হৃদয়ে ভক্তির উদয় হবে কী করে? প্রণতিতেই পাপক্ষয়। আর মেঘক্ষয়ে যেমন চন্দ্রিকা তেমনি পাপক্ষয়ে ভক্তি।

> 'অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
> সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব॥
> প্রণতিতে হইবে ইহার অপরাধক্ষয়।
> নির্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়॥'

লক্ষ্মীর অন্তর্ধানের পরেই যদি নিমাই সংসার ছাড়ত, লোকে বলত, বিপত্নীক হয়েছে তাই বৈরাগ্য এসেছে। এর মধ্যে বাহাদুরি কী। বড় জোর করুণা করত, কেউ প্রশংসা করত না। ঘটত না চিত্তাকর্ষণ-চমৎকৃতি। আর যে প্রশংসিত নয় সে আকর্ষণ করবে কি করে? তা হলে নিমাইয়ের সন্ন্যাস হতনা এমন ফলদায়ী। কত বড় সে যন্ত্রণা, তরুণ বয়সের প্রেমিক স্বামী হয়ে কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে যাওয়া। বড় দুঃখ না হলে বড় প্রাপ্তি ঘটে কি করে? সাধ্য কি এ ঘটনার পর নিন্দুক-নাস্তিকের দল বিমুখ থাকে? পারবে তারা হৃদয়ের মাংস ছিন্ন করে নিতে? সাধ্য কী মূল্য না দিয়ে চলে যায়? সমস্ত বিরুদ্ধস্রোত নিমাইয়ের পায়ের উপর এনে না ফেলে।

তা ছাড়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া আর কে বইবে এই অপার বেদনা? কে জ্বালবে ভক্তিতৃপ্তির জাগ-প্রদীপ? প্রভু সন্ন্যাসী বাইরে, বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী গৃহে। প্রভুর প্রেমভক্তির বিতরণ বাইরে, আর ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধন কি করে সেই প্রেমভক্তিকে অক্ষয় করে ধরে রাখা যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের স্বরূপশক্তি যেমন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের। গৌরমুখে হরি হরি, বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে গৌর-গৌর।

'আমার কন্যা তোমার দাসী হবার উপযুক্ত নয়।' বিবাহান্তে যুগলে প্রত্যাবর্তনের সময় বললে সনাতন। 'তুমি নিজগুণে একে কৃপা করবে।'

নিমাই মনে মনে হাসল। ও কি আমার দাসী? ও আমার নিত্যকান্তা।

সর্বমান্যগণে নমস্কার করে দোলায় এসে উঠল বরবধূ। হরি-হরি বলে সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল

> স্ত্রীগণ দেখিয়া বোলে, 'এই ভাগ্যবতী।
> কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্বতী॥'
> কেহ বোলে 'এই হেন বুঝি হর গৌরী।'
> কেহ বোলে 'হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি॥'
> কেহ বোলে 'এই দুই কামদেব রতি।'
> কেহ বোলে 'ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥'
> কেহ বোলে, 'হেন বুঝি রামচন্দ্র সীতা।'
> এই মত বোলে সর্ব সুকৃতি-বনিতা॥

[ক্রমশঃ

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট • • •

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর মৃন্ময়মূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্তি-গঠনকারী ভাস্কর ও মৃৎশিল্পী শ্রীরমেশ পাল।

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬ সালের গোড়াতেই যাদুদা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরেই আমি বদলী হয়ে এলুম। তখন সবেমাত্র গলিসবেরীর স্থলে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এসেছেন কাপ্তেন মালেয়া—বোধ হয় মাদ্রাজী—গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন মাত্র—চমৎকার লোক—যাদুদার সঙ্গে খুব খাতির। তিনি রোজ সকালে রাউণ্ডে বেরিয়ে আমাদের ইয়ার্ডে এসে যাদুদাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে যেতেন।

একদিন হাসপাতালে যাওয়ার সময় তিনি যাদুদার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন—পাশে দাঁড়িয়ে শুনলুম, হাসপাতালে সেদিন মালেয়া স্বহস্তে একটা মেজর অপারেশন করবেন—অর্শ—তিনটে-ভিতরবলী কেস। আমি যাদুদাকে বললুম, আমার যে দেখতে ইচ্ছে করছে। মালেয়াকে বলে যাদুদা আমাকে সঙ্গে নিলেন। অপারেশনে মালেয়ার কেরামতি স্বচক্ষে দেখলুম।

তখন দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলার আসামীরা আমাদের দরজার পাশের ইয়ার্ডেই দণ্ডভোগ করছেন। B class (পরবর্তী কালের Div. II) কয়েদীর পোষাক—জেলের কাপড়ে তৈরী ফুল-প্যাণ্ট ও সার্ট। বোমা তৈরীর ওস্তাদ হরিনারায়ণ চন্দও আছেন। তিনিই ওদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ—প্রায় আমারই বয়সী—এবং ১১১৬ সালের শেষে ডিফেন্স অ্যাক্টে অন্তরীণও হয়েছিলেন। চুঁচুড়ার লোক—প্রোফেসর জ্যোতিষ ঘোষের (মাষ্টার মশাই) চেলা।

আমাদের ইয়ার্ডে দোতলায় যাদুদা, অমর ঘোষ, আমি, অনুকূলদা, অংশু ব্যানার্জি, রঞ্জিত ব্যানার্জি—আর কে ছিল মনে নেই। বোধ হয় মনোমোহন ভট্টাচার্যও ছিলেন। নীচের ঘরে অনুশীলন পার্টির নেতা নরেন সেন (রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী), মলঙ্গার নরেন ব্যানার্জি (বড়া কেসে দণ্ডিত), অনুশীলনের জুনিয়ার সুরেশ ভরদ্বাজ ও কিরণ দে, অম্বিকা খাঁ—(আমার হাজার স্ট্রাইকের সাথী), নৃপেন মজুমদার, পান্না মুখার্জি এবং আরো কেউ কেউ—মনে নেই।

আমাকে পেয়ে রঞ্জিত বললে, নারাণদা, কুস্তি লড়ার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? আমি রাজী হলুম। কুস্তির আখড়া হল—অনুকূলদা লড়ান—আমি, রঞ্জিত এবং সুরেশ ভরদ্বাজ লড়ি। বিকেলে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয় এবং তারপর বেড়ানো—ইয়ার্ডের বাইরে বড় পাঁচিলের কোল দিয়ে গেটের কাছ পর্য্যন্ত রাস্তায়। গেটের মুড়োয় ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে থাকে—পাহারা।

ইতিমধ্যে ১৫সালে আমি মেদিনীপুরে যাওয়ার পর নৃপেন মুখার্জি বলে যে তরুণটি ছিলেন ইয়ার্ডে উপেনদা, অমরদা (চ্যাটার্জি) ও মনোমোহন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ছিল, এবং ওঁদেরই সঙ্গে ষ্টেট ইয়ার্ডে এসেছিল, (আমাদের ইয়ার্ডের আদিনাম সিগ্রেগেশন ইয়ার্ড) সে প্রেসিডেন্সি জেলে গেছে—সেখান থেকে সন্তোষ মিত্র, ধীরেন বাগচি ও সুবোধ লাহিড়ী সেণ্ট্রাল জেলে এসেছে এবং পরে দার্জিলিং জেলে বদলী হয়েছে।

উপেনদা অকারণ জেলভোগটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। আই বি-র কর্তা রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জি জেলের অফিসে আসা সুরু করেছিলেন, এবং উপেনদা তাঁর কাছে দরবার সুরু করেছিলেন—কেন দাদা বুড়ো ব্রাহ্মণকে—এবং ব্রাহ্মণীকেও—অকারণ কষ্ট দিচ্ছ—ইত্যাদি

তিনি অমরদাকেও সামিল রেখেছিলেন এবং অতুলদাকেও (ঘোষ) রাজী করতে চেষ্টা করছিলেন—যদি একটা undertaking দিলে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে সুযোগ নেওয়ার জন্তে। অতুলদার ব্যবসা শিকেয় ওঠার উপক্রম হয়েছে—দুই ভাই-ই জেলে—তাঁর ছাড়া পাওয়ার প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী—কিন্তু তিনি undertaking দেওয়ার ideaটা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তাই উপেনদা তাঁকে বলতেন—ও একট senior তরুণ ঈশেন—old cows association থেকে ওর নাম কেটে দোব। undertaking দিয়ে বেরোবার ব্যবস্থা পকে উঠেছিল।

উপেনদা বলতেন, আমরা কি গান্ধী নাকি? পুলিসের কাছে কথা দিলে, কথা রাখতেই হবে কেন?

নরেন সেনকে (রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী) ডেকেও রায়বাহাদুর—undertaking এর কথা বলেছিলেন। তিনি জবাবে বলেছিলেন, সরকার সব চেয়ে বড় হিংসাবাদী—বিপ্লবীরা তার জবাবে হিংসার আশ্রয় নেয়। অহিংস আছেন একমাত্র গান্ধীজি। সরকার যদি তাঁর কাছে অহিংসার undertaking দেয়, তাহলে আমিও তাঁর কাছেই undertaking দিতে রাজী আছি।

—Hopeless Case বলে রায়বাহাদুর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আমি আসার আগেই উপেনদা, অমরদা এবং অতুলদাও undertaking দিয়ে মুক্ত হয়েছেন।

আমি আসার অল্পদিন পরে—বোধ হয় মার্চের শেষাশেষি

কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হল। কয়েকশো দাঙ্গাকারী গ্রেপ্তার হল—হিন্দুদের আমদো সেণ্ট্রাল জেলে এবং মুসলমানদের পাঠালো প্রেসিডেন্সি জেলে। একদিন সকালে দেখি under trial দের দুটো ইয়ার্ডভরা লোক গিজ গিজ করছে—শুনলুম দাঙ্গার কথা। সবই প্রায় হিন্দুস্থানী। তারাও স্বদেশী বাবুদের খবর পেয়েছে।

আমাদের ইয়ার্ডের পর ফাঁসির ইয়ার্ড, এবং তারপরই under trial ইয়ার্ড—সেখান থেকে তারা "বন্দেমাতরম" বলে নমস্কার করছে। ক্রমে ২।৪ জন পিছনের দরজা দিয়ে (হিন্দু ওয়ার্ডারদের মেহেরবাণীতে) আমাদের বেড়াবার রাস্তায় ইয়ার্ডের কাছে এসে বন্দেমাতরম বলে' নমস্কার করে' হাত পাতে—বিড়ি না খেতে পেয়ে ক্ষেপিয়ে উঠেছে। অনুকূলদার চেনা লোকও দেখা গেল। আমরা আমাদের stock উজাড় করে বিড়ি-দিয়াশলাই ছুঁড়ে দিলুম। তারা ভারি খুসি।

ঘোষ ইয়ার্ডের নরেন ঘোষচৌধুরীও রায়বাহাদুরের সঙ্গে জেলের দুঃখ জানাবার ছল করে' দেখা করতেন। তিনি যে নিজে জেলের ওয়ার্ডার-জমাদারদের হাত করে প্রায় একটা under-ground রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন, সেটাকে ক্যামোফ্লেজ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁদেরই কেসের ১০ বছর দণ্ডপ্রাপ্ত সাতুকুল চ্যাটার্জি বলতেন—Lifer (যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত) দের বিশ্বাস করবেন না।

নৃপেন মজুমদারও রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতো, ছুটি পেয়ে বাড়ীও যেতো। কিরণ দে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করে' করে' একাধিকবার ছুটি পেয়ে দেশে ঘুরে এসেছিলো। অম্বিকা থাঁও তাঁর সঙ্গে দেখা করতো।

এদের সকলের ওপরই আর সকলের মন ছিল অপ্রসন্ন,—কাউকে কাউকে কেউ কেউ বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতেন। অম্বিকার ওপর বিরাগটা ছিল বেশী—বিশেষতঃ আমাদের দলের। একে বে-পার্টির লোক, তায় তরুণ, সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—শান্তি চক্রবর্ত্তীর খুনের কথাটা কারো অজানা ছিল না—তার ওপর রায় বাহাদুরের সংস্পর্শ।

তাকে অনেকেই এড়িয়ে চলতো এবং সে প্রায় কোণঠাসা হয়ে ছিল। অবস্থা দেখে নরেন সেন তাকে আশ্বাস দিতেন, ওরা তোমাকে বর্জন করে তো তুমি বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ ক'রো। স্বহস্তে খুন করার মতন এলেম যে তরুণের আছে,—তাকে অনুশীলন পার্টি তখনও appreciate করতো, ঠিক যে ব্যাপারটা ছিল তখন অনুশীলন পার্টির ওপর আমাদের দাদাদের বিরাগের অন্যতম কারণ।

আমার কিন্তু তার ওপর একটা সহানুভূতির ভাব বরাবরই ছিল, সে আমার হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকের সাথী ছিল বলে। গণেশের কাণ্ডের পর বাঁকুড়ার আড্ডা ভেঙে দিয়ে গণেশকে পাঠানো হয়েছিল মেদিনীপুরে,—অজিত মৈত্রকে পাঠানো হয়েছিল বহরমপুরে, এবং রঞ্জিত ও অম্বিকাকে পাঠানো হয়েছিল আলিপুরে। অজিতের সঙ্গে ছাড়াছাড়িটাই তার বড় দুঃখ—সে অজিতকে খুব ভালবাসতো। রায়বাহাদুরের কাছে তার দরবার ছিল—অজিতকে আর আমাকে একসঙ্গে থাকতে দিন।

স্বভাবতই রায়বাহাদুর এই সুযোগে তার কাছ থেকে কিছু কথা বার করবার চেষ্টা করেছেন,—এবং অম্বিকাও, অন্তত রায়বাহাদুরকে ঠকাবার মৎলব করেও, তাঁকে সন্তুষ্ট করার মত কিছু না কিছু বলেছেই—সত্যই হোক, অর্দ্ধসত্যই হোক।

সে হঠাৎ, যেন অকারণেই, বাছা বাছা ২।১ জনের দিকে চেয়ে খুব হাসতো। যাদুদা তাকে "পাগলা" বলতেন। হাসিটা অনেক সময় যাদুদার সামনেই বেশী হ'ত। আমার মনে হ'ত—তার দৃষ্টিটা অর্থপূর্ণ—এবং সম্ভবত কারো কিছু কারচুপি বা গাঁড়াকল আবিষ্কার করেছে,—এবং কাউকে সে-কথাটা বলতে পারছে না বলে' একাই হাসছে।

শেষ পর্যন্ত একদিন দেখা গেল, অজিত মৈত্র আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বদলী হয়ে এসেছে। নীচের ঘরে অম্বিকা নিজের কাছে তার খাট পাতলো—ভারি ফুর্তি।

অজিত স্বাস্থ্যবান যুবক, ফরসা হলে তাকে সুপুরুষ বলা যেত। শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি, পড়াশুনোর ঝোঁক খুব। ছেলে রিক্রুট করা যাদের পেশা, তাদের পক্ষে লোভনীয় টার্গেট। অমর ঘোষের বিশেষ নজর পড়লো তার ওপর। "কুসঙ্গ" থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার জন্যে যাদুদার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি অজিতের পিছনে লাগলেন, এবং অজিতকে রাজী করে তাকে দোতলায় আমাদের ঘরে আনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি জানতেন না, ছেলেটা ভেতরে ভেতরে পেকে পাঁড় হয়ে গেছে।

সাধারণ হৈ-হল্লা এবং অম্বিকার Sentimental প্যাচাল ও ইয়ার্কির মধ্যে তার পড়াশুনোর ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে অজিত দোতলার অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আসার জন্যে অমরবাবুর কথায় রাজী হয়েছিল, এবং এইটেই হয়েছিল অম্বিকার সবচেয়ে মর্মান্তিক অভিমানের কারণ।

অজিতকে কেউ একথাও বলেনি যে অম্বিকাকে কেউ স্পাই বলে মনে করে—কারণ যাদের অনেকে ভাল চোখে দেখতো না, অম্বিকা ছিল মাত্র তাদের মধ্যে একজন। অমরবাবুও (ঘোষ) অজিতের পড়াশুনোর সুবিধার অজুহাতেই তাকে উপরে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। অম্বিকাকে স্পাই মনে করে তার হাত থেকে অজিতকে উদ্ধার করা হচ্ছে—এটা জানতে পারলে অজিত তাকে ছেড়ে উপরে আসতো না নিশ্চয়ই।

যাই হোক, প্রথমে অম্বিকা অজিতকে কাছে রাখার জন্যে বুঝিয়ে চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হল,—তখন যাদুদার কাছে দরবার সুরু করলে,—কারণ তিনিই লীডার। যাদুদা তাকে হাঁকিয়ে দিলেন—তিনি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—তিনি হস্তক্ষেপ করতে যাবেন কেন?—তা ছাড়া এতে হয়েছেই বা কি?—অজিত ওপরে থাকলেওতো তোমার কাছেই থাকবে!

তখন সে যাদুদার হাতে পায়ে ধরা সুরু করলে, তার খাট খানাও ওপরে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্যে। তাও হল না। সেদিন অম্বিকা কিছু খেলে না। বিকালে যখন যাদুদার সঙ্গে গলিতে বেড়াচ্ছি, তখন অম্বিকা এসে আবার যাদুদার পায়ে পড়তে লাগলো। তার মুখে কিন্তু হাসি—সে যেন কান্না চাপা দেওয়া হাসি। যাদুদা সরে সরে পাশ কাটালেন।

সমগ্র ব্যাপারটা দেখলুম। ভাবতে লাগলুম, ভালবাসার সেণ্টিমেণ্ট—যেন একটা অন্ধ জেদ চড়ে গেছে। সহকারী হার্ডল পাঁর

হয়ে এসে আবার এ কি কঠিন হার্ডল। ভাবতে লাগলুম, সারাদিন খেলে না, কারো কথা শুনলে না—বললে হাসে। ভাবতে লাগলুম, এ অবস্থায়, অজিতের ওপর নিদারুণ অভিমানে আত্মহত্যার চেষ্টা করাও বিচিত্র নয়।

রাত্রে বন্ধ হওয়ার পর খাওয়া দাওয়া করে শুয়েছি, সবেমাত্র ঘুম এসেছে, এমন সময় হঠাৎ নীচের ঘর থেকে এক বিরাট্ হৈ হৈ আওয়াজ। আপনারা বিশ্বাস করুন,—আমার সেই মুহূর্তেই মনে হয়েছে—It must be Ambika, পরমুহূর্তেই বাইরের পাহারা ওয়ার্ডার এসে বললে নীচের এক বাবু গায়ে আগুন লাগিয়েছে। নরেন ব্যানার্জিও চীৎকার করে বললে, অম্বিকা গায়ে আগুন লাগিয়েছে।

হুইস্‌ল বাজলো, পাগলা-ঘণ্টি বাজলো, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার, ওয়ার্ডারের দল ছুটে এল। আগুন তখন নেভানো হয়ে গেছে। ওরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে চলে গেল। নীচের ঘরের ওরা বলতে লাগলো ভয়ঙ্কর পুড়েছে, বাঁচে কিনা সন্দেহ।

সকালে তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নীচের ঘরে গেলুম—সব শুনলুম। দরজার পাশেই যে পর্দা ঘেরা রাত্তের পায়খানা ছিল,—অম্বিকা তার মধ্যে গিয়ে সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে (হ্যারিকেন থাকতো কয়েকটা) আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে বিরাট আগুন। যন্ত্রণায় সে বেরিয়ে পড়ে ঘরের মাঝখান দিয়ে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে গেছে। দুপাশে মশারি খাটানো—একটা মশারিতে আগুন ধরে গেছে।

নরেন ব্যানার্জি বললে—"আমি তখনো ঘুমিয়ে পড়িনি—সবেমাত্র ঘুম আসছে—চোখ বুজে পড়ে আছি—হঠাৎ একটা আওয়াজে চোখ চেয়েই দেখি একটা বিরাট আগুনের থাম ছুটে এগিয়ে আসছে। এক লাফে উঠে পড়ে 'হেই' শব্দে চীৎকার করে আগুনটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই সেটা ঘুরে আবার দরজার দিকে ছুটলো। আমি মশারির দাঁড়গুলো পটাপট ছিঁড়ে ফেলে, মশারির আগুন চাপড়ে নিবিয়ে কম্বল টেনে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনটাকে চাপা দিয়ে মেঝেয় পেড়ে ফেলেছি। একজন ফালতুও (কয়েদী attendant) কম্বল নিয়ে আমার সঙ্গে আগুনের ওপর চাপা দিলে। আগুনটা নিভিয়ে ফেলা হল। সকলে ভিড় করে হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখছে—একটু পরেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি এসে পড়লো,—এবং তাড়াতাড়ি ২।১ কথায় ব্যাপারটা শুনে নিয়ে ওকে খাটে শুইয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল।"

অম্বিকার বিছানা থেকে একটা চিঠি পাওয়া গিয়েছিল—সেটা সরিয়ে ফেলা হল। ছোট চিঠি—বেশ মনে আছে—কারণ তাতে একটা ইংরাজী শব্দ ছিল, এবং তাতে বানান ভুল ছিল। তার মধ্যে একটা কথা ছিল—"বন্ধুর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তাই এই Step নিলুম।" এই Step কথাটারই বানান ছিল Stape.

"আমি দেখি" "আমি দেখি" করে অনেকেই চিঠিটা দেখলো—সকলকে দেখতে দেওয়া হলনা—লুকিয়ে ফেলা হল। তারপর সেটাকে বক্স ইয়ার্ডের নরেন ঘোষ চৌধুরীর মারফৎ বাইরে "Forward" কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হল—সঙ্গে দেওয়া হল এক ঘোরালো বিবরণ—অম্বিকার গুপ্তচরবৃত্তির বিবরণ।—কয়েকদিন পরে "Forward" কাগজে অম্বিকার চিঠির ফোটোগ্রাফ কপি এবং সে বিবরণ ছাপা হল। দেশশুদ্ধ লোক জানলো, আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে এক রাজবন্দী স্পাই আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করেছে। অজিত ঘটিত ব্যাপার কেউ জানলো না।

যাই হোক, হাসপাতালে অম্বিকাকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের ইয়ার্ডে এসে বড়দার সঙ্গে যখন কথা কইছেন, আমি গিয়ে দাঁড়ালুম। শুনলুম, পুড়ে গেছে সর্বাঙ্গ, এবং ভীষণভাবে—বাঁচবে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড়দাকে বললেন—But I can't understand why he punished himself like that!

আমরা কেউ হাসপাতালে তাকে দেখতে যাইনি। কিন্তু তার জ্ঞান ছিল। বেলা প্রায় নটার সময় হাসপাতাল থেকে কে একজন এসে খবর দিলে—অম্বিকা অনুকূলদাকে ডেকে পাঠিয়েছে। অনুকূলদা তখন দাঁত মাজছিলেন। মুখ ধুয়ে চা খেয়ে যেতে তাঁর একটু দেরী হয়েছিল। তিনি হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বললেন—"মরে গেছে—যে আমাকে ডেকে পাঠালে, সে যে এত শীঘ্র মরবে, তা কেমন করে বুঝবো—আমাকে ডেকেছিল একেবারে অন্তিম সময়ে—তার শেষ কথাটা আর শোনা হল না—অজানাই থেকে গেল।"

অনুকূলদা বার বার আফশোষ করতে লাগলেন। আমরা কেউ তখন জানতুম না, অম্বিকার সঙ্গে অনুকূলদার বাইরে পরিচয় ছিল। তিনি ঘটনার ত্বরিত বিকাশে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চুপ করেছিলেন। এখনও চুপ করেই থাকলেন। ফরোয়ার্ডে খবর বেরোনোর পরও চুপ করেই ছিলেন।

মরবার সময় অম্বিকা অজিতকে ডাকেনি—তার স্মৃতিতেই সে আগুন লাগিয়েছিল। ঘটনার পরিণতি দেখে অজিত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেও চুপ করেই থাকলো।

আমার মনটা কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না যে, অম্বিকা স্পাই ছিল। কিন্তু এই সায় না দেওয়াটা ছিল সিডিশন-বিশেষ। আমি সামান্য লোক—পার্টিম্যান—দাদাদের বিরোধী মনোভাব মহাপাপ—মন থেকে সেটা ঝেড়ে ফেলারই চেষ্টা করলুম। কিন্তু অন্ধ আনুগত্যের অস্পষ্টতার মধ্যে যেন মাঝে মাঝে একটু আলোর ঝিলিক দেখা দেয়—দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর যেন একটু নতুন জ্ঞানের রেখাপাত আমাকে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্ক করে দেয়—আবার সে কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলি। কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা পুরোনো হয়ে বিস্মৃতির রাজ্যের এলাকায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেদিনীপুর থেকে পড়াশুনোর যে বিপুল আগ্রহ এবং অভ্যাস নিয়ে আলিপুরে এসেছিলুম,—তার জের এখানেও চলছিল—এখানেও সুযোগের অভাব ছিলনা। আমি Collectorate Library থেকে বই আনিয়ে পড়তে লাগলুম। প্রথমে পড়লুম Royal Commission-এর Report গুলো—Currency Commission, Fiscal Commission প্রভৃতি। পড়ি শুধু Recomendation গুলো। ১৬ সালের Industrial Commission-এর রিপোর্ট থেকে মালব্যের Note of dissent পড়লুম—সুবিখ্যাত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দলিল। ধীরে ধীরে একটা ধারণা গড়ে উঠছিল, দেশের অবস্থার কথা কিভাবে বিচার করতে হয়—কত কথা জানতে হয়।

বুঝি, না বুঝি, মিঠাসহকারে পড়ে যাই। মনে হয়, ভারত উদ্ধার ব্যাপারটাকে আমরা যেমন over-simplify করে বসে আছি—ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক জটিল।

ক্রমে রমেশ দত্তের Economic History of Ancient India এবং Victorian Age পড়লুম। কিছু জ্ঞান হল, আনন্দও হল। শেষে আমালুম Census Report—এবং তার নানাবিধ পরিসংখ্যানের চার্ট-টেবল নিয়ে বেশ কিছু দিন মেতে থাকলুম। একখানা মোটা এক্সারসাইজ বুক ভরে নতুন নতুন চার্ট-টেবল তৈরী করে লিখে রাখতে লাগলুম। তার একটা মনোহারী নমুনা এখানে না দিয়ে পারছি না।

১৯২১ সালের Census Report হইতে—

বিভিন্ন জাতি হিসাবে জেল-কয়েদীর সংখ্যা (বঙ্গদেশ)—

জাতি		লোকসংখ্যা		কয়েদী সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	—	১৩১৪৪৩০	—	৪২৫
কায়স্থ	—	১২৯৫১০৩	—	৫৪১
বৈদ্য	—	১০২৮৭০	—	৩৫
কৈবর্ত্ত (চাষী)	—	২২০৩৬৪৮	—	১৭০
" (জেলে)	—	৩৮০২২৫	—	৪৭
পোদ	—	৫৭৭১১৪	—	৭৮
রাজবংশী	—	১৬৬৩৯৪৮	—	১১৫
নমঃশূদ্র	—	২০০৪১১১	—	২৯৩
বৈষ্ণব	—	৩৭৭৬১২	—	৮৮
সাঁওতাল	—	৭১০৭৭৩	—	৬২
বাউরী	—	৩১৬০১৩	—	২৫
বাগদী	—	৮৮৩৮২১	—	২৩৬
ধোপা	—	২২৭২৯৫	—	৩৮
কাওরা	—	১১০১৪১	—	২৯
মুচি	—	৪১৭২২৫	—	১০৭
চামার	—	১৪৭৬৫৪	—	৬৫
হাড়ি	—	১৪৩৬১৩	—	৫০
ডোম	—	১৪৭৮৫১	—	৮৫

জাতি, লোক ও কয়েদী সংখ্যার অনুপাত ও অপরাধ-প্রবণতা—

জাতি	অনুপাত		ক্রম
ডোম—	১৭৩৯ জন প্রতি ১ জন কয়েদী	—	১ম
চামার—	২২৭১ " " " "	—	২য়
কায়স্থ—	২৩৯৫ " " " "	—	৩য়
হাড়ি—	২৮৭২ " " " "	—	৪র্থ
বৈদ্য—	২৯৩৯ " " " "	—	৫ম
ব্রাহ্মণ—	৩০৯৩ " " " "	—	৬ষ্ঠ
বাগদী—	৩৭৫৭ " " " "	—	৭ম
কাওরা—	৩৭৯৮ " " " "	—	৮ম
মুচি—	৩৮৯৯ " " " "	—	৯ম
বৈষ্ণব—	৪২৯২ " " " "	—	১০ম
ধোপা—	৫৯৮১ " " " "	—	১১শ
নমঃশূদ্র—	৬৮৪৩ " " " "	—	১২শ
পোদ—	৭৩৮৪ " " " "	—	১৩শ
কৈবর্ত্ত (জেলে)—	৮১৫৪ জন প্রতি ১ জন কয়েদী	—	১৪শ
সাঁওতাল—	১১৪৬৪ " " " "	—	১৫শ
বাউরী—	১২১২০ " " " "	—	১৬শ
কৈবর্ত্ত (চাষী)—	১২৯৭৮ " " " "	—	১৭শ
রাজবংশী—	১৪৪৬৩ " " " "	—	১৮শ

—

মন্তব্য—দেখা যাইতেছে যে, অপরাধপ্রবণতায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য অন্যান্য তথাকথিত নিম্নবর্ণকে পরাজিত করিয়া হাড়ি, ডোম এবং চামারের সঙ্গে Neck to Neck চলিয়াছে। ইহার সঙ্গে যদি ধরিয়া লওয়া যায়, উচ্চবর্ণের শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক প্রভাবের সুযোগে তাহাদের অনেক অপরাধ আদালত পর্যন্ত পৌঁছায় না, এবং অনেক অপরাধ আদালতে প্রমাণ হওয়াও কঠিন হয়,—তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, তাহারাই অপরাধপ্রবণতায়ও শীর্ষস্থানীয়।

• • •

যাই হোক, আমার সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার এই সূত্রপাত যে উৎসাহব্যঞ্জক, তা স্বীকার করতেই হবে। যা কিছু পড়ি, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি, কিছু কিছু note সংগ্রহ সুরু করলুম। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একখানা অদ্ভুত চমৎকার বই সে সময়ে বেরিয়েছিল "Our Empire in Asia"—by Torens-M P. বইটা অনেককাল আগের লেখা,—অনেকদিন Out of print থাকার পর এলাহাবাদের পাণিনি অফিস থেকে Reprint হয়ে বেরিয়েছিল। কোম্পানীর আমলে ইংরাজদের বেইমানী, বিশ্বাসঘাতকতা, জাল-জুয়ারীর ইতিহাস। একজন ইংরাজ এম পি যে এমন বই লিখতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। বইটার বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস লিখতে হলে আজও সে বইটা হবে একটা অপরিহার্য উপাদান।

প্রোফেসর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর লিখিত একখানা ছোট বই চার্বাক ষষ্ঠি (ইংরাজী) কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল। আমি সেটা কিনেছিলুম এবং পড়ে কিছু জ্ঞান এবং প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলুম।—মহামহোপাধ্যায় ভাগবত শাস্ত্রীর ভূমিকাও চমৎকার। বস্তুবাদী দর্শন যে প্রাচীন ভারতের জনজীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে বৈদিক যুগেই বৈদিক ধর্মের আদর্শ এবং আচার-অনুষ্ঠানকে বহুদিনব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছিল,—পরবর্তী যুগের দার্শনিক পণ্ডিতের দল যে একজোট হয়েও মিথ্যা অপপ্রচারের সাহায্য ছাড়া চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনকে কোণঠাসা করতে পারেনি,—"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" কথাটা যে চার্বাকের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ঐ বিরুদ্ধবাদী পণ্ডিতেরাই তাঁর উক্তি বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন,—এসব কথা বিংশ শতাব্দীর দুইজন সর্বজনমান্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের লেখায় প্রথম জানতে পেরে আমার বস্তুবাদমুখী মনোভাব ও চিন্তাধারা যেন একটা দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড়ালো। পরবর্তীকালে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের বিরুদ্ধে ধনবাদী দুনিয়ার ভাববাদী দার্শনিকদের অপপ্রচারের স্বরূপ বুঝতে তাই আমার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

এ বইটাও বাংলায় অনূদিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। আমি বইটার সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ লিখে রেখেছিলুম, সেটা আজও আছে।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার দণ্ডিত আসামীরা আমাদের পাশের ইয়ার্ডেই থাকতো, বলেছি। তাদেরই সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকজন কিছুদিন পরে ধরা পড়ে ডেটিনিউ হয়ে আমাদের ইয়ার্ডে এল, এবং নীচের ঘরে আড্ডা গাড়লো—উত্তরপাড়ার বিখ্যাত আর্টিষ্ট চৈতন্যদেব চ্যাটার্জি, ভূমেশ চ্যাটার্জি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি, তারকেশ্বরের শচীন দত্ত, ভবানীপুরের বিশ্বনাথ মুখার্জি (ইনি এসেছিলেন সকলের শেষে) প্রভৃতি।

চৈতন্যদেবের একটা প্রিয় গান ছিল "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধূলির তলে।" আমি ঠাট্টা করতুম—"ঘাড় ধরে" বলে'। একদিন এক প্যারডি লিখে ফেললুম—

(তোমার) মাথা নত করে দাও হে আমার চরণ ধূলির তলে
কানমলা খাও নাকে খৎ দাও ভাসছে চোখের জলে।
শু'নয়ে তোমার গৌ-রব তান
ঝালাপালা হল আমাদের কান
(এবার) ঘানিগাছে দিয়ে ঘুরায়ে ঘুরায়ে ভাঙ্গিব তোমার তেলে।
আপনারে আর ক'রোনা প্রচার নিজ ঢাক পিটাইয়ে
দেখাইব মজা এবার তোমায়—হয়েছে বড়ই ইয়ে!
সকলের সাথে করিয়া চালাকি
বড় বেঁচে গেছ—আমি ছিনু বাকি—
আমার চরণে লইয়া শরণ এবারে বাঁচিয়া গেলে।

একদিন গেয়ে শুনিয়ে দিলুম। বঙ্কিম কানমলা খেয়ে নমস্কার করলে—পাপকথা কানে গেছে! এখন তার গলায় তুলসীর মালা—সর্বক্ষণ হরি হরি করে।

কয়েকদিন থমকে যাওয়ার পর রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জি আবার জেল গেটে এবং ক্রমশ আমাদের ইয়ার্ড পর্যন্ত যাতায়াত সুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম জেলের নিয়ম অনুসারে তাঁর সঙ্গে একজন ওয়ার্ডার পাহারা আসতো। ক্রমে তিনি পাহারা সঙ্গে না নিয়েই আসতেন। এই বাড়াবাড়িই শেষ পর্য্যন্ত একদিন তাঁর কাল হল।

নরেন সেন ওরফে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে ওখান থেকে বদলী করা হবে,—রায় বাহাদুর তাঁকে একবার আপ্যায়িত করতে এসেছেন। নরেন সেন নামটা সরকারী কাগজপত্রে বা পুলিশের মুখে শুনলেই তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছা যেতেন। বলতেন ও নাম শুনলেই একটা ভীষণ রক্তাক্ত স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে,—আর আমার ধাতে এখন সেটা হয়েছে অসহ্য। এসব কথা এমন গম্ভীরভাবে বলতেন যে, লোকে তাঁর মস্তিষ্ক সম্বন্ধেই সন্দিহান হত'। অনেকে তাঁর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বলেই মনে করতো, এবং তিনি যেন সেটাই চাইতেন। পুলিশেরও যেন জেদ, তাঁকে কিছুতেই রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী বলবে না। এমনি চলছিল।

সেদিন বিকালে রায় বাহাদুর এসে নরেনবাবু বলে আলাপ করতেই তিনি মূর্চ্ছা গেছেন। খানিকক্ষণ থেকে রায় বাহাদুর আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েই গলিতে এক শাবলের ঘায়ে ধরাশায়ী হয়েছেন। এই সূত্রে অনন্তহরি এবং প্রমোদ রঞ্জনের (দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডে'র) ফাঁসী হয়। সে বিবরণ গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের বসুমতীতে "বিপ্লবের সন্ধানে" প্রথম লেখায় দেওয়া হয়েছে

ইতিমধ্যে সতীশ পাকড়াশী এসেছিলেন এবং নীচের ঘরেই উঠে ছিলেন। নীচের ঘরটায় রীতিমত ভিড় হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামের নির্মল সেন ও অনুরূপ সেন এসে উপরের ঘরে ছিলেন। ভূপেন চ্যাটার্জি নিহত হওয়ার পর নরেন সেন এবং নরেন ব্যানার্জিকে বদলী করা হয়েছিল। ফাঁসীর পর অতুল রায় (বর্তমানে আলিপুরে ওকালতী করেন) এবং চট্টগ্রামের চারুবিকাশ দত্ত এসে নীচের ঘরে ছিলেন। যতীন দাস এবং সূর্যসেনও এসেছিলেন এবং উপরের ঘরে ছিলেন। কিছুদিন পরে যতীন দাসকে লাহোর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে সেখানে পাঠানো হয়।

সূর্য সেনের একটু তাসখেলায় ঝোঁক ছিল, এবং তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীর খেলোয়াড়, যাঁদের Partnerদের বকাবকি করায় বাতিক থাকে। একদিন আমি বসেছি তাঁর Partner হয়ে, এবং আমি ভুল খেলেছি বলে তিনি চটে আগুন হয়ে আমাকে ideot বলে বসেছেন। আমিও তাঁকে এক পাল্টা গালি দিয়ে বসেছি। খেলাটা ভেঙ্গেই গেল। বাঙ্গুদা আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে একটু মৃদু তিরস্কার করলেন—উনি একটা পার্টির লীডার, তুমি এটা কি করলে?

এসব খুঁটিনাটি কথা অবান্তর হলেও একটা প্রয়োজন বোধে লিখছি। যথাসময়ে সেটা বোঝা যাবে।

একজন হিন্দুস্থানী ওয়ার্ডার—তেওয়ারী ছিল এক অদ্ভুত লোক। সে কখনো কারো সঙ্গে কথা কইতো না, কিন্তু নীরবে আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করতো—বাইরে থেকে রোজ "ফরোয়ার্ড" কাগজ এনে দিত। একদিন গেটে হঠাৎ তাকে সার্চ করা হল,—তার উরুতে জড়ানো "ফরোয়ার্ড" বেরিয়ে পড়লো—তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ বাবুর জন্যে কাগজ নিয়ে যায়? সে জবাব দিলে "নেই বোলেগা।" তাকে বলা হল "তুমারা জেহেল হোগা"—সে জবাব দিলে "হামারা মালুম হায়।"

মালেয়ার আমল বলে তাকে জেল দেওয়া হল না,—ডিসমিস করা হল। সে নীরবে চলে গেল।

একজন আইরিশম্যান ওয়ার্ডার এসেছিল,—মূর্খ এবং সরল,—দেশেও সে জেলের ওয়ার্ডার ছিল এবং সিনফিন বন্দী দেখেছে—বলতো, তারা অন্য রকম লোক—সেলে ঢুকেই আগে থালাবাটি ভেঙ্গে বিছানাপত্র ছিঁড়ে একাকার করতো। তোমাদের মতন নয়। বলে' সে পিছন দিকে হাত পেতে ঘুস নেওয়ার ঢংএ বলতো 'রায় বাহাদুরকে ঘুস দিয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ী যাও ট্রাঙ্ক বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে, আর ফিরে আস ছাতা হাতে করে?'

শচীন ছিল খুব চঞ্চল আর দুরন্ত—আর ঐ ওয়ার্ডার Swan তার সঙ্গে সর্বদা খুনসুড়ী করতো। শচীন ধমকাতো, চেঁচাতো,—আর Swan হাসতো। একদিন অংশু ব্যানার্জি Swanকে ডেকে চুপি চুপি শিখিয়ে দিলে "বোমাই" বললে শচীন ভারি রাগ করে। সুতরাং Swanএর ভারি সুবিধে হল,—সে শচীনকে দেখলেই খুব জোর দিয়ে বলে "বোমাই"—আর শচীন রাগের ভান করে চেঁচায়—তোমার নামে repoat করবো।

Swan তখন বাংলা বা হিন্দী একেবারেই জানে না—একটা একটা করে শব্দ শিখছে। এক হিন্দুস্থানী মুসলমান মেথরের কাজ করতো—সে ইদের দিন নমাজ পড়তে যাবে, Swanকে বলছে, দরজা খুলে দাও। Swan জিজ্ঞাসা করছে offiice? চাচা বলছে, নমাজমে যায়গা। Swan বলছে godown? চাচা হাঁ বলে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে দিলে। Swan শিখে নিলে, নমাজ মানে godown!

এই চাচা লোকটা ছিল অদ্ভুত। আমাদের ইয়ার্ডেই সারাদিন থাকতো এবং ইয়ার্ডটাকে সর্বদা পরিষ্কার ঝকঝকে করে রাখতো—কাজ না থাকলে দেওয়ালের নীচের দিকটাতে লাল রং লাগাতো—কোথাও বা চুনকাম করতো। খাঁটী honest লোক। অথচ ২৬ বার জেল খেটেছে—ছেলে বেলা থেকে বুড়ো হয়েছে। সকাল বেলা খালাস হয়েই যেখানে সেখানে কারো একটা পোঁটলা নিয়ে হাঁটা দিয়ে ধরা পড়ে ২।৪ঘা মার খেয়ে থানায় গিয়ে তাগাদা করে চালান হয়ে কোর্ট থেকে দণ্ড নিয়ে সন্ধ্যের মধ্যেই জেলে ফিরে আসতো। বলতো কেয়া করেগা!—কোই খানে দেগা? কাম দেগা?

ফাঁসির পরে আমাদের ফালতুদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নতুন এক সেট ফালতু দেওয়া হয়েছিল। সকালে দেখি এক অস্থিচর্মসার বৃদ্ধ উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। চেহারাটা ভদ্রলোকের মতন। গিয়ে আলাপ করে তার কেস শুনলুম। বিধবা স্ত্র ভ্রাতৃবধূ ছিল নষ্টচরিত্রা। একটা লোক আসাযাওয়া করতো—বৃদ্ধের জোয়ান ছেলে একদিন তাকে এক দায়ের কোপে সাবাড় করে। বৃদ্ধ গ্রামে কবিরাজী করতো—কিছু জমি এবং চাষবাসও ছিল। ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বৃদ্ধ "আমি খুন করেছি" বলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে এসেছে। জেলের কষ্টে বৃদ্ধ তখন অসুস্থ।

পরে যখন আমরা অনেক গোলমাল করার ফলে পুরোনো ফালতুদের ফেরৎ পেলুম, তখন আমরা বৃদ্ধকে ছাড়লুম না—বললুম, যা কাজ পার করবে, না হয় বসেই থাকবে। আমরা তাকে কবিরাজ মশাই বলেই ডাকতুম।

বিলেত থেকে টেগার্ট (তখন ছুটিতে ছিল) মালেরাকে prosecute করার পরামর্শ দিয়েছিল, রায় বাহাদুর সম্বন্ধে গাফিলতী করার দায়ে। সে মতলব খাটেনি। মালেরাকে বদলী করা হল,—হাচিন্স নামক এক I. C. S. Superintendent হয়ে এলেন। I. M. S. বা অন্ততপক্ষে I. M. D. ছাড়া এর আগে জেলের মধ্যে কখনো I. C. S. এর শাসন ছিল না।

ইনি এসেই, জেলের অবস্থা-ব্যবস্থা কিছুর পরোয়া না করেই যাচ্ছেতাই order চালাতে সুরু করলেন। জেলের officerরা বুঝিয়ে কূল পায় না—সকলেই অসন্তুষ্ট। আমরা রাত্রে গান গাই শুনে হুকুম দিলেন বন্দীরা জেলে গান গাইতে পারবে না। ফল হল, রাত দুপুরে সবাই মিলে গান সুরু করে দিতুম। officerরা ব্যাপারটাকে বেশী দূর গড়াতে দিলে না। হাচিন্সকে (হাচিন্স নাম দিয়েছিল) বুঝিয়ে দিলে State prisonerদের বিগড়ে দিলে তারা সমগ্র জেলের কয়েদীদের বিগড়ে দেবে—সামলাতে পারবে না।

এই সময়ে একদিন বঙ্কিম চাটার্জির পিতৃবিয়োগের খবর এল। শ্রাদ্ধ করার জন্ত বাড়ী যাওয়ার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর হল না। ইয়ার্ডের মধ্যেই হবিষ্যের জায়গা করা হয়েছিল, কিন্তু শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হতে পারে না—অথচ শ্রাদ্ধের তারিখ এসে পড়লো। হাচিন্সের সঙ্গে গোলমাল বাধলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল,—খালি female yardএ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হবে। বাইরে থেকে পুরোহিত আসবে—কিন্তু যোগাড় যন্ত্রের সাহায্যের জন্যে চৈতন্যদেব ও ভূমেশকে চাইলে বঙ্কিম। হাচিন্স আপত্তি করে আর এক দফা গোলমাল করে কিছু করতে পারলে না। ওরা গেল,—শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিভোজন না হলে শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হয় না—সে ব্যবস্থা ওখানেই করার জন্যে বঙ্কিম পীড়াপীড়ি করলে। হাচিন্স চটে গিয়ে তাকে ওখানেই আটক করে' চৈতন্য-ভূমেশকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে। ফলে বঙ্কিমের খাওয়া বন্ধ হল, এবং খবর পেয়ে আমরাও জানিয়ে দিলুম, আমাদেরও খাওয়া বন্ধ। পাকেচক্রে একটা হাঙ্গারষ্ট্রাইক লেগে গেল।

রাজবন্দীর পিতৃশ্রাদ্ধে বাধা—হাঙ্গারষ্ট্রাইক—বাইরে খবর ছড়িয়ে পড়লো—হৈ চৈ সুরু হল। হাচিন্সের প্রথম পরামর্শদাতা যে I. B. ইনস্পেক্টর পুরোহিত নিয়ে গিয়েছিল, সে গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে—হাচিন্স একা পড়ে গেছে। গভর্ণমেন্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে সারতে পারে না। আমাদের ইয়ার্ডে যখন রাউণ্ডে আসে, আমরা বিছানায় শুয়ে ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাং তুলে নাড়া দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করি। গোঁ গোঁ করতে করতে বেরিয়ে যায়। কিন্তু পরের দিন আবার আসতে হয়—duty। ওপরওয়ালারাও মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দেয়।

এমনি কয়েকদিন চলার পর একদিন অমরদা I B officeএ গিয়ে একজন officer নিয়ে জেলে এসে সকলের সঙ্গে দেখা করে ব্রাহ্মণ-ভোজনাদির ব্যবস্থা করে গণ্ডগোলটা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। হাচিন্স খানিকটা চিট হল।

আমার বাড়ীর মামলায় আমাকে কিছুতেই কোর্টে হাজির হতে দিলে না। মাঝে মাঝে প্রভাস দেখা করে যায়। তার কাছে একদিন খবর পেলুম, ভাগ্নীর অবস্থা খারাপ, একবার আমাকে দেখতে চায়। জামাই I B office এ দরবার করছে—আমারও একটা দরখাস্ত করা দরকার। আমি ভেবে-চিন্তে এক দরখাস্ত করলুম "through D.I.G. I.B. C.I.D." কয়েকদিন পরে এক order নিয়ে escort এসে হাজির—আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে, একদিনের জন্যে।

বৃদ্ধ I.B. Inspector হরিদাস মুখার্জি এবং দুজন Armed Police সঙ্গে চললো। বাড়ী গিয়ে ঘরে ঢুকছি, হরিদাস বাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকতে চান—বললেন, দোষ কি? উনি তো আমার মেয়ের মতন! আচ্ছা আচ্ছা—আমি দরজাতেই থাকছি।

ভাগ্নীর সঙ্গে কথা কয়ে একটু মাথায় হাতটাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে আসছি—হরিদাস বাবু তাড়াতাড়ি আমার পাশ কাটিয়ে আসতে গিয়ে দালানের থামের গোড়ার একটা কোণে মস্ত এক হোঁচট খেয়েছেন। ফিরে দেখি, পায়ের একটা আঙুলের নখ উল্টে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে—দেখে আমি বললুম—যাক্—বাঁচা গেল!

হরিদাস বাবু হকচকিয়ে মুখপানে চেয়ে বললেন,—বলেন কি! আমি বললুম—বিধাতা পুরুষের লেখা ছিল, আমার বাড়ীতে I.B. Officer-এর রক্তপাত হবে—অল্প সস্তায় সেরে গেলেন—

ভেবে দেখুন। তখন হরিদাস বাবু এক-গাল হেসে বলেন—তা বটে—বেশ বলেছেন!

তিনি আমাকে বাইরের ঘরে রেখে পাহারা বসিয়ে দিয়ে চলে এলেন—পরদিন বিকালে এসে জেলে ফিরিয়ে আনবেন। ওদের ওপর হুকুম, ওরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমি ওদের সঙ্গে গল্প সুরু করে আলাপ জমিয়ে নিলুম। রাত্রে যখন বাড়ীর ভেতর খেতে যাচ্ছি—ওরা বলাবলি করছে,—এখন কি আমরা বাবুর সঙ্গে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে বসবো? আর আমরা যদি না যাই, আর বাবু যদি পালিয়ে যায়, তাহলে আমরাই হব দায়ী। যেমন চাকরী, তেমনি হুকুম! ঝাড় মারো!

আমি ওদের আশ্বস্ত করে খেতে গেলুম। প্রভাস পাশের বাড়ীর পঞ্চুবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তাদের বাড়ীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে পিছনকার পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে একেবারে হঠাৎ রান্নাঘরে আমার সামনে হাজির। তার সঙ্গে সব বিষয়ে নানা কথাবার্তা হল। সে চলে গেল। আমি বাইরের ঘরে ফিরে এসে পাহারাদের খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলুম এবং শেষ পর্যন্ত কিছু খাবার আনিয়ে দিলুম দোকান থেকে।

সকালে ওদের সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে এলুম—বাড়ীর কাছেই গঙ্গা। লোকে হাঁ করে চেয়ে দেখছে, দেখে ভালই লাগলো—যেন একটা নতুন ঐশ্বর্য্য!

বিকেলে জেলে ফিরে এলুম। ২৭ সাল এসে পড়েছে। বাইরে internment-এ পাঠানো সুরু হয়েছে। হঠাৎ একদিন আমারই internment এর order এসে হাজির। বাড়ীর মামলা যেখানে ছিল, সেইখানেই রইলো। চললুম পাততাড়ি গুটিয়ে পাবনা জেলার কামারখন্দ গ্রামে।

২৪ পরগণার দুজন ছোকরা I.B. watcher সঙ্গে চললো আমাকে শিয়ালদায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসার জন্যে। ষ্টেশনে মালপত্র নামিয়ে টিকিট কিনে ট্রাঙ্কের জন্যে একটা তালা কেনার ছল করে ওদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে বৌবাজারের মোড়ে এসে ক্রমে একটু করে এগিয়ে কাঙালদার খাবারের দোকানের সামনে এসে হঠাৎ বললুম, কিছু খাবার খেয়ে নেওয়া যাক—চলে এস। আমি দোকানে ঢুকে পড়লুম—ছোকরা লজ্জায় বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো।

কাঙালদা জানতেন, আমি জেলে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার? আমি বললুম internment-এ চলেছি—পাবনায়—গাড়ীর এখনো দেরী আছে—আপনি একবার কর্মীসংঘে প্রভাসকে খবর দিন।

বলে কিছু খাবার খেয়ে ষ্টেশনে ফিরে এলুম। একটু পরেই প্রভাস এসে হাজির। যেন হঠাৎ দেখা—এমনি ভাবে আলাপ সুরু করলো।

[ক্রমশঃ।

মুক্তি

মঞ্জু দাশগুপ্তা

সামান্য পাথরের নুড়ি,—
ছোটদের খেলার ঢিপি থেকে, উঠে এলো
ভগবানের নিশ্চিন্ত আসনে।
জড়ত্ব ঘুচিল তার,
নিত্য গঙ্গাবারি সিক্ত হয়ে
পূজা উপচার ফল-মূল অর্ঘ্যে
ধন্য হয়ে,
পাথরের নুড়ি অবস্থান করে
অশথ গাছের তলায়।

তবু স্বপ্ন দেখে নুড়ি,
বুঝি দৈবদূতী কৃপায়—
অতীত জড়ত্ব-জীবনের পুলকসিক্ত
দিনগুলিতে, ফিরে যাবার আশায়
কোনও এক সমুদ্রবেলায় পড়েছিল
তারা কণা-কণা হয়ে
দুরন্ত ঢেউয়ের সাথে হেসেছে উড়েছে
কত কথা বলেছে
নিভৃতে নিরালায়।

অনিশ্চিতের ঝড় এল একদিন
বিচ্ছিন্ন হল তারা
ভেসে গেল, জীবনের আর এক
পরিণতি আশায়, আশঙ্কায়।

রৌদ্র বর্ষা শীতাতপ-বৈচিত্র্য, নিয়ে এল
নতুন বারতা
কণা কণা বালু জমে জন্ম নিল তারা
আজকে যে উঠেছে
পাথুরে দেবতায়,
শিউরে ওঠে নুড়ি
বর্ত্তমানের ধোঁকা দেওয়া জীবনটার
মুখোস টেনে ফেলে
গড়িয়ে পড়ে নীচে—
টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

তারপর।
একদমা দুরন্ত ঘূর্ণীর টানে
উড়ে যায় আদিমের সন্ধানে, সমুদ্রবেলায়—
সেই সাথে মুক্তি পায় বন্দী ভগবান,
জন্ম যার মানুষ কৃপায়।

আধুনিক বঙ্গদেশ

অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু

বাংলা দেশ উত্তর-ভারতের গাঙ্গেয় সমতলভূমির পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। ভৌগোলিক ভাবে একে তিনটি পৃথক অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। উত্তরে হিমালয় পর্বত, তার পাশে বিস্তীর্ণ অরণ্য। এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। যে নদীগুলো দক্ষিণ সমতলভূমিতে এসে পড়েছে, সেগুলো পৃথকভাবে গতি পরিবর্তন করে দেশের এই অংশে মাঠ ও খামারের ব্যাপক ক্ষতি করে। রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকভাবে দক্ষিণ-বিহারের পূর্ব মালভূমির সম্প্রসারিত অংশ। এখানে প্রাচীনকালে সৃষ্ট স্বচ্ছ জলাশয় গুলোর মধ্যে মধ্যে রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড় ও খনিজ পদার্থের স্তূপ (Schistose)। শেষোক্ত গুলোর মধ্যে আছে কয়লা। প্রায়ই দেখা যায়, এইগুলোর উপরিভাগ কাঁকর ও ঝামা মাটির দ্বারা আবৃত। এর জন্য এখানকার মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত খারাপ। বাংলা দেশের অবশিষ্ট অংশ সৃষ্টি হয়েছে পলিমাটি জমে জমে। এর কোন কোন অংশের উপর দিয়ে শীর্ণা মন্থর নদী এবং কোন কোন অংশে স্রোতস্বতী নদী বয়ে গেছে। তার ফলে ক্রমাগত নতুন নতুন পলি জমে ভূপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে উঠছে।

ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রে বাংলার অবস্থান কোথায়, তা এবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত গাঙ্গেয় সমতলভূমির মধ্যভাগ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চিরাচরিত আবাস স্থল। দাক্ষিণাত্যে এবং উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে অতীতে অসংখ্য রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। মোটামুটি ভাবে বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং তার সম্প্রসারিত পূর্বাঞ্চল আর নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যশ্রেণী উত্তর দিক থেকে এই দু'টি অঞ্চলকে পৃথক করে রেখেছে।

যে যে পথে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতের উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রবাহিত হয়েছিল তার প্রধান প্রধান কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :—

(১) একটা সড়ক গিয়েছিল পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশ থেকে চম্বল উপত্যকায় নেমে মালওয়া মালভূমি অতিক্রম করে হয় সমুদ্রের দিকে ক্যাম্বে, ব্রোচ অথবা সুরাটে অথবা পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকে। শেষোক্ত জায়গায় প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বহু রাজ্যের উত্থান পতন হয়েছে।

(২) এলাহাবাদ, মীর্জাপুর ও বারাণসীকে কেন্দ্র করে উত্তর-প্রদেশের পূর্বাংশ থেকে আর একটি পথ গিয়েছিল প্রথমটির সঙ্গে মোটামুটি সমান্তরাল রেখায় অরণ্যবিস্তৃত উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে, কেন ও বেতোয়া নদীর গতিপথে সমান্তরাল রেখায় জব্বলপুর ও নাগপুরের দিকে অথবা ছত্রিশগড় সমতলভূমির আরও পূর্বদিকে।

(৩) মনে হয় প্রাচীনকালে ছত্রিশগড় সমতলভূমি থেকে মহানদী উপত্যকা হয়ে শেষোক্ত নদীর ব-দ্বীপ পর্যন্ত দ্বিতীয় পথের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। মহানদী উপত্যকা পূর্ব উপকূলের সমতলভূমির অংশ।

(৪) চতুর্থ পথ গিয়েছিল পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে উপকূলস্থ সমতলভূমির ভাটিতে, উড়িষ্যা হয়ে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির দিকে।

দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপের ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থা এমন যে নর্মদা, তাপ্তী এবং পশ্চিম ঘাটের পশ্চিমাংশ থেকে উদ্ভূত ছোট ছোট পাহাড়ী নদীগুলো ছাড়া আর সব নদীই গোদাবরী, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মত পূর্ব সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই সমস্ত নদী এবং তাদের শাখানদীর পলিমাটি জমে ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে সক্রিয় উপকূল স্রোতের চাপে সেই পলিমাটি বিভিন্ন স্থানে আংশিকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে উড়িষ্যা থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত পূর্ব উপকূলের সমতলভূমিতে উর্বর ভূখণ্ডের সৃষ্টি করেছে। এখানকার জনসংখ্যার অতিরিক্ত ঘনত্ব উত্তরের গাঙ্গেয় উপত্যকার জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনীয়।

চওড়া-চওড়া অসংখ্য নদী এবং তাদের উপনদীগুলির দ্বারা উপকূলস্থিত সমতলভূমি বহুধা বিভক্ত হওয়ার ফলে এখানে অসংখ্য রাজ্যের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল এবং সেগুলো কিছু পরিমাণে নিরাপদেই নিজেদের পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ অঞ্চলে প্রচুর বারিপাত হয় এবং এখানকার জমিতে নদীবাহিত পলিমাটির পরিমাণ বেশি বলে খাদ্যশস্য উৎপাদন সহজসাধ্য। তাই রাজ্যগুলি আর্থিক দিক থেকে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ

পূর্ব উপকূলস্থ সমতলভূমির এই বৈশিষ্ট্য হেতু পশ্চিম বাংলার মধ্য দিয়ে যে পথটা উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়েছিল, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছিল না। সুতরাং উত্তর থেকে দক্ষিণে সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রেরণের ব্যাপারে ১নং ও ২নং পথ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, বাংলার ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

কয়েকটি সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য

তার অর্থ এই নয় যে, সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার ভাষা উত্তর ভারতের ভাষাগুলোর সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। (লেভিঃ প্রি-এরিয়ান এণ্ড প্রি-ড্রাভিডিয়ান ইন ইণ্ডিয়া, ১৯২৯) এখানকার ভাষায় বহু অনার্য শব্দ আছে। সেগুলো প্রাক্-আর্য যুগের ভাষার অবশিষ্টাংশ বলে ধরে নেওয়া হয় মোটের ওপর দক্ষিণ-ভারতের চেয়ে উত্তর-ভারতের সঙ্গেই বাংলার আত্মীয়তা বেশী। বাংলার হিন্দুরা একই জাতিভেদ প্রথার গণ্ডীতে আবদ্ধ এবং এমন ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি এবং রীতি-নীতি পালন করেন যা' উত্তর-পশ্চিম সূত্র থেকেই উদ্ভূত। এখানকার প্রাচীন মন্দিরগুলো উত্তর-ভারতের রেখা-দেউলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তবে ষোড়শ শতক থেকে এখানে মন্দির নির্মাণে এমন এক নিজস্ব কৌশল গ্রহণ করা হয় যা' আগেকার মন্দির নির্মাণ-প্রণালী থেকে পৃথক।

উত্তর ভারতের সঙ্গে সাদৃশ্যের এই সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এখানকার এমন কতকগুলি সাংস্কৃতিক লক্ষণ আছে যাতে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্নপথের সন্ধান দেয় এবং তার শিকড় সুদূর অতীতের মধ্যে গ্রথিত।

চাল বাংলা দেশের প্রধান খাদ্য ; বাংলার অধিবাসীদের ধর্মীয় আচার আচরণ এবং তুকতাক যাদুবিদ্যার ক্ষেত্রে চালের একটা বড়

ভূমিকা আছে। তেলও খাদ্যের একটি প্রধান উপকরণ। বাংলা, আসাম ও বিহার সরষের তেল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। তেলের ব্যবহার দক্ষিণ-প্রদেশের দিকে এগিয়ে ক্রমে ক্রমে কমে আসে। অথচ এই তেলের ব্যবহার বাংলা থেকে উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ এবং পূর্ব উপকূলের কেরল ও মহীশূরের মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কোথাও কোথাও সরষের তেল ব্যবহার হয়, কোথাও তিলের তেল কোথাও বা নারকেল তেল। কোন্ এলাকায় কি তেলের ব্যবহার হয় তারই ভিত্তিতে পরিষ্কারভাবে উপ-প্রদেশের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়।

ভারতে তৈলবীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতি মোটামুটি দু'রকম। এক রকম পদ্ধতিতে নিষ্কাষিত তেল নিষ্কাষণ-যন্ত্রের তলা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে কোন পাত্রের মধ্যে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তেলের বীজ হামানদিস্তা অথবা ঢেঁকিতে ছেঁচে হাতায় করে তেলটা তুলে নেওয়া হয়। তলানিটুকু কাপড়ে ভিজিয়ে নিংড়ে নেওয়া হয়।

শেষোক্ত পদ্ধতি সিংহল থেকে পূর্বে বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত এবং পশ্চিমে প্রায় গুজরাট পর্যন্ত চালু আছে। তামিল দেশে কাঠের নিষ্কাষণ-যন্ত্রের বদলে পাথরের জাঁতাকল ব্যবহার করা হয়। বিহারে তেল নিষ্কাষণকে বলে 'কোলহু' এবং তেল নিষ্কাষণ যন্ত্রকে বলে ঘানি। বাংলা দেশে তেল নিষ্কাষণকারী জাতিকে বলা হয় কলু আর নিষ্কাষণ যন্ত্রকে বলে ঘানি। (নির্মল কুমার বসু—হিন্দু সমাজের গড়ন, ১৩৫৬ সাল, ৫৪-৬১)

যাই হোক, বাংলার অধিবাসীদের ধর্মীয় আচার আচরণ এবং স্বকতাকে বৈশিষ্ট্য অর্জনকারী প্রধান দুটি খাদ্যবস্তু চাল আর তেল এমন এক সম্পর্কের নির্দেশ করে যা ভাষা ও ইতিহাসের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সারা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ভাত রাঁধার পদ্ধতি, সেলাই-বিহীন পোষাক এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরণের চটি এবং জুতো ব্যবহার ইত্যাদির দিকে নজর দিলে অনায়াসে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। বিষয়টি আর বেশী বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নেই। (বসু, ১৯৫৬)

আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। উপরে যে ক'টি বৈষয়িক সংস্কৃতি-বিষয়ক জিনিষের উল্লেখ করা হল, সেগুলির মত চাল ও তেল উত্তর ও পশ্চিম ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যকে পষ্টতর করে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। অতীতের ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা আমাদের দেখিয়েছেন যে, ভারতের অধিবাসীদের মত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেরাও পান, সুপারি ও হলুদ ব্যবহার করেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে মোষ আর মুরগী পোষেণ। এইসব দেখে মনে হয় বহু শতাব্দী আগে বৈষয়িক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান এবং সেগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করেছিল। তার ফলে উড়িষ্যার মত বাংলা দেশেও উত্তর-দক্ষিণ এবং সম্ভবত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে, অথবা বিভিন্ন সংস্কৃতির বহুমুখী মিশ্রণ সত্ত্বেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি, যে ভাষা ও ধর্মীয় সংবিধান অনুযায়ী হিন্দু বাংলা অনুশাসিত হয়, তাতে উত্তর পশ্চিমী সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে।

কথিত আছে, আদিশূর নামে বাংলা দেশের এক রাজা উত্তর-প্রদেশের কনৌজ থেকে সচ্চরিত্র পাঁচ জন মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে বাংলা দেশে বসবাসের জন্য আমন্ত্রণ করেন। দুই অথবা তিন শতাব্দী পরে বাংলা দেশ সেন-বংশের শাসনাধীন হয়। সেনেরা দাক্ষিণাত্যের কানাড়ী-ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে বাংলা দেশে আসেন। প্রবাদ আছে, এই বংশের বল্লাল সেন (১১৫৮—১১৭৮ খৃষ্টাব্দ) বাংলা দেশে কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন করেন; কিন্তু তার কোন ঐতিহাসিক নজির নেই। (দি হিস্ট্রি এণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপল: মজুমদার, ১৯৫৭: ৩৫—৩৮)। কৌলীন্য-প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণরা তাদের পাণ্ডিত্য ও গুণানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সামাজিক মর্যাদায় অপেক্ষাকৃত হেয় পরিবারবর্গ কৌলীন্য-প্রথা অনুযায়ী উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারবর্গের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত করবার চেষ্টা করত এবং এইটাই শেষে প্রথা হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে বর্ণসঙ্কর বিবাহ ও বহুবিবাহ দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত হয়। সামাজিক গুণাবলীর ভিত্তিতে পরিবারের স্তরবিন্যাসের এই প্রথা অন্যান্য জাত, এমন কি বিশুদ্ধ শূদ্রদেরও প্রভাবিত করে। এইভাবে বাংলার হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছাঁচে আমূল রূপান্তরিত হয়েছে।

বেলুচিস্থান ও কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ উপদ্বীপের শেষ বিন্দু পর্যন্ত এবং পূর্বে বাংলাদেশ ও আসাম পর্যন্ত শাক্ত সম্প্রদায়ের ৫২ তীর্থক্ষেত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান। শেষোক্ত দুটি রাজ্যে এর সংখ্যা বেশী। সেই সমস্ত তীর্থক্ষেত্রের খ্যাতি সর্বভারতীয়। (দীনেশ চন্দ্র সরকার—১৯৪৮: ১—১° দি শাক্ত পীঠস, জে, এ, এস, বি, লেটার্স, ভলুম ১৪, সংখ্যা ১) বাংলা দেশে গোঁড়া হিন্দু প্রাতঃস্নানের সময় প্রার্থনা করে 'হে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা সিন্ধু ও কাবেরী নদী, এই জলে অধিষ্ঠান হও'

ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারবিচার, ঐতিহ্য, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার-আইন এবং জাতিভেদের মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে ঐক্যের যে সূত্র আছে, তাই বাংলার অধিবাসীদের বেঁধে রেখেছে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগঠন-পদ্ধতিই এই সাংস্কৃতিক ঐক্যের মূল। বহু শতাব্দী ধরে তা এই বিরাট দেশের সকল প্রান্তে প্রচলিত রয়েছে। (গিরিজাশঙ্কর রায় রায়চৌধুরীর স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী, ১৩৩৪ সাল: ২৬১—২৮৫)।

ভিন্নমতাবলম্বন

একথা বলা যেতে পারে যে নবদ্বীপ, বিক্রমপুর অথবা শ্রীহট্টের টোলের মত বাংলা দেশে বিভিন্ন সংস্কৃত-শিক্ষাকেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও এখানে কিছু পরিমাণে উদার মত প্রচারিত ছিল। বৈদিককাল থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৃঢ় অভিমত এই যে, বাংলায় একটি বিরাট

বিশিষ্টতা আছে, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঐতিহ্যে নিমজ্জিত হবার আগে পূর্ব-ভারত (বিহার, আসাম ও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ) এমন এক সভ্যতার লীলাভূমি ছিল, যা মধ্য-গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের সভ্যতা থেকে পৃথক। (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: প্রাচীন বাংলার গৌরব, ১৩৫৩ সাল)। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম মধ্য-গাঙ্গেয় সমতলভূমির গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের পূর্ব দিক থেকে জন্মলাভ করেছে এবং উভয়েই বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে। এই দুটি ধর্মীয় প্রথায় জীবনের সমস্যায় এমন একটি সমালোচনাপূর্ণ ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, বৈদিক আচারবিচার অথবা ধর্মতত্ত্বে যার সন্ধান পাওয়া যায় না।

বোধ হয় এই মানবীয় ধর্মতত্ত্বই পরবর্তীকালে বাংলা দেশে কতকগুলি উদারমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল, তাদের কাছে মানুষের দেহই ঈশ্বরের মন্দির। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, তারা ধর্ম-উপাসক মানুষকেই দেবত্বের আসন দেয়। (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: ১৩৫৫ সাল, বৃদ্ধধর্ম, ১—১৩)। মানুষের উপর এই দেবত্ব আরোপ সম্ভবত: অবিবেচনা ও বিভ্রান্তিপ্রসূত, কিন্তু এর মূলে ছিল মানবতার প্রতি পরম মূল্যারোপ। বৈদিক আচার-বিচারে বিভিন্ন দেবতা এবং জ্যোতির্ময়কেই সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রী এই দুই সম্প্রদায়কে গু-ভজু ও দে-ভজু সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন। গু-ভজু অর্থাৎ গুরুর উপাসক আর দে-ভজু অর্থাৎ দেবের উপাসক। তিনি নেপালে এই দুটি কথার ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংস্কৃতির বহু প্রাচীন ঐতিহ্য নেপালে এখনও বিদ্যমান।

যাই হোক, ভারতের পূর্ব প্রান্তীয় সংস্কৃতির এই বহুমুখী চরিত্র প্রণিধানযোগ্য। মানবিক মূল্যবোধের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপেই এর বৈশিষ্ট্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শশিভূষণ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন, কিভাবে সহজিয়া, নাথ ও বাউল সম্প্রদায় প্রভৃতি বিভিন্ন উদার ও বিরুদ্ধবাদী ধর্মমত বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত্ত গড়ে তুলেছে। (শশিভূষণ দাশগুপ্ত: অবস্কিওর রিলিজিয়াস কাল্ট এবং ব্যাকগ্রাউণ্ডস অব বেঙ্গলি লিটারেচার, ১৯৪৬: ৫৮-৬১)। বাংলার কবি চণ্ডীদাস একদা গেয়েছিলেন, "শুন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" কেউ কেউ বলেন চণ্ডীদাসের "মানুষ"-এর সঙ্গে আমাদের এ যুগের মানবতা ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এর একটি অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য আছে, যা' আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত। সেই মানুষের আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে একীকৃত। সে যাই হোক, সবার উপরে মানুষকে স্থান দেওয়ার মধ্যেই পরোক্ষভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সৃষ্টি হয়েছে। এতেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, উত্তর-ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব প্রান্তীয় সমভূমির সংস্কৃতির বেশ একটু পার্থক্য রয়েছে।

পরবর্তীকালে এই বৈশিষ্ট্য তার সাহিত্য ও স্থপতিবিদ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। রেখা-দেউলের (উত্তর ভারতীয় মন্দির গঠন প্রণালী) গড়ন মানুষের দেহ অথবা দেবতাদের পার্বত্য বাসস্থানের প্রতীক। এর বিভিন্ন অংশের নামকরণ হয় মানুষের শরীরের হাত, পা, ঘাড়, মেরুদণ্ড, মাথায় খুলি প্রভৃতি অনুযায়ী অথবা দেবতাদের হিমালয়ের বাসস্থান অনুযায়ী। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতের দেবতাদের রাজকীয় মহিমা আছে, কিন্তু মধ্যযুগ থেকে বাংলার সন্ত ও কবিরা দেবতাদের মানুষের সঙ্গে সমান আসনে বসিয়েছেন।

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাতে শিবকে মানুষ ও পার্বতীকে যথাযোগ্য নারীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলা দেশে পার্বতীর মূর্তি শারদীয় উৎসবে মহা ধূমধামে পূজা করা হয়। ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই সময়ে পার্বতীর পূজা আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে পূজার বৈশিষ্ট্য হল, এখানে দেবীকে শ্বশুরালয় থেকে কয়েক দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগত কন্যারূপে কল্পনা করা হয়। চারদিন পূজার পরে যখন প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয়, তখন সকলেই মনে করেন যেন তাদের আদরিণী কন্যা গৃহ নিরানন্দ করে বিদায় নিচ্ছে।

বাংলার গ্রাম্য অধিবাসীরা যে ধরণের গোড়ো ঘরে বাস করে, ষোড়শ শতকের সূচনা থেকে তারই অনুকরণে এদেশে মন্দির নির্মিত হয়েছে। সেই সব মন্দিরের মাঝখানে অথবা ছাদের কোণায় কোণায় কখনও গম্বুজ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ মন্দির হচ্ছে দেবতার বাসস্থান, মানুষের অতীন্দ্রিয় দেহের প্রতীক নয়।

এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ বাংলার সংস্কৃতির কোন বড় রকমের পার্থক্য হয়ত সূচিত হয় না, কিন্তু এর থেকে বোঝা যায় বাংলার সংস্কৃতি নি:সন্দেহভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি শাখা হলেও তার কতকগুলি স্বকীয় বিশেষত্ব আছে!

এই উদার মত এবং কিছু পরিমাণে ভিন্নমতাবলম্বন বাংলার মনীষাকে গোঁড়ামির দাস না হয়ে স্বাধীনভাবে নতুন নতুন ভাবধারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ভারতের এই অংশে নতুন নতুন চিন্তাধারা ও নতুন নতুন সংস্থা গড়ে ওঠার এটা একটা প্রধান কারণ। এর ফলে বাংলার সংস্কারমুক্ত মন নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে মানবতার দিকে ঝুঁকেছে, তা সে মানবতা আধ্যাত্মিকই হোক, বৈষয়িকই হোক আর যুক্তিবাদই হোক।

মোটের ওপর বাংলাদেশে লোক বসতি দু' ধরণের। কোথাও বাঙালীরা বিক্ষিপ্তভাবে বাস করে, কোথাও করে দলবদ্ধভাবে।

দক্ষিণ জেলাগুলোয় বিশেষতঃ যেখানে নদীর মোহনায় ধীরে ধীরে নতুন নতুন দ্বীপ গড়ে উঠেছে, সেখানে কৃষকরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বাস করে, মাঠের মধ্যে গৃহনির্মাণ করে এবং বাড়ীর চারপাশে নানারকম গাছপালা লাগায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালি জেলা সম্পর্কে এই বিবরণ একেবারে সত্য। বাসগৃহে একটি খোলা প্রাঙ্গণ ঘিরে বাসের ঘর, ভাঁড়ার ঘর ও রান্নাঘর তৈরী করা হয়। বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের মাঝখানে এখানে সেখানে ছড়ানো বাসগৃহ নিয়ে এক একটি গ্রামের সৃষ্টি। কোথাও সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নেই; কৃষিক্ষেত্র সমেত সমগ্র পটভূমিকায় কুটীরগুলো প্রাধান্যলাভ করে।

বাংলার পর্বতসঙ্কুল উত্তরাংশে গোলাবাড়ী—অথবা কৃষকদের বাসগৃহ সঙ্কীর্ণ, সিঁড়ির মত ক্ষেতের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। খাড়া ঢালু জায়গার উপর অসম পরিশ্রমে তা নির্মিত হয়। যে সব এলাকায় যথেষ্ট সমতল ভূমি নেই সেখানে কয়েকজন কৃষক পরস্পরের খুব কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করে। পথের ধারে বিশেষ করে চৌমাথায় সারিবদ্ধ দোকানপাট সহ বাড়ীঘর দেখতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিছু সংখ্যক গৃহ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দূরে দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে নির্মিত হয়, কিন্তু সাধারণত অল্প বিস্তর গুচ্ছবদ্ধ ভাবেই গৃহ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। শেষোক্ত এলাকায় গ্রাম্য রাস্তাগুলো একটু বেশী গুরুত্ব লাভ করে। এই সমস্ত গৃহে বাস করে উচ্চ অথবা নিম্নবর্ণের লোকেরা। দুটি সম্প্রদায় নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের পৃথক রাখতে চেষ্টা করে।

অধিকাংশ গ্রামের অধিবাসী কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ছোট ছোট কুটীরশিল্পী। কিছু কিছু গ্রাম প্রশাসন কেন্দ্র, তীর্থক্ষেত্র অথবা শিল্প কেন্দ্র।

বোলপুর শান্তিনিকেতন থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত বাতিরি একটি জনপূর্ণ গ্রাম। সেখানে সমৃদ্ধ ভূস্বামীরা নিজেদের ইটের তৈরী বাড়ীতে এবং দরিদ্র লোকেরা খড়ের ছাওয়া মাটির ঘরে বাস করে। ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর মজিলপুরে কিছু সংখ্যক কৃষক বাস করে, কিন্তু সেখানে ভূস্বামীদের অট্টালিকা এবং কয়েকটি ইঁটের তৈরি মন্দিরও আছে।

বীরভূম জেলার বোলপুর অথবা সাঁইথিয়ার মত জায়গা ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন জনবহুল জেলায় দুটি সাপ্তাহিক বাজারের মধ্যে দূরত্ব তিন অথবা চার মাইল। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে উড়িষ্যার পুরী জেলার দক্ষিণে এই দূরত্ব গড়ে ৭ মাইল অথবা তার চেয়ে বেশী।

এই রকম গ্রামে সপ্তাহে একবার অথবা দু'বার বাজার হয়। এছাড়া গ্রামে দোকানপাট সপ্তাহের প্রত্যেক দিনই খোলা থাকে। বাংলা ভাষায় প্রথমটিকে হাট ও দ্বিতীয়টিকে বাজার বলে। নদীর পাড়ে, রাস্তার ধারে অথবা রেল ষ্টেশনের কাছের বহু গ্রাম দোকান পাট, গুদাম এবং অন্য নানারকম ঘরবাড়ী নিয়ে সহরে রূপান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যে জনপদে লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার, প্রতি বর্গ মাইলে এক হাজার লোকের ঘনবসতি এবং যেখানে অন্তত তিন চতুর্থাংশ লোক কৃষিকাজে লিপ্ত না হয়ে অন্য পেশায় নিযুক্ত—তাকে সাধারণত সহর বলে গণ্য করা হয়।

প্রাচীনকালে যে গ্রামগুলো ব্যবসায়ের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল সেখানে নানাশ্রেণীর কারিকর আকৃষ্ট হত। গরুর গাড়ী, নৌকা মেরামতের কার্যে লিপ্ত ছুতার-কামার, তাঁতি, কাঁসারী শ্রেণীর শিল্পীরা সব কাছাকাছি বসবাস করতো। বাজার থেকে সুতো সংগ্রহ করে উৎপন্ন তাঁত-বস্ত্র বাজারে পাইকারী ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রী করা তাঁদের পক্ষে সহজ হত। সমস্ত ব্যবসায়-কেন্দ্রে পাইকারী ব্যবসায়ীদের গুদামঘর থাকতো। হুগলী জেলার রাজবলহাটের লোকসংখ্যা ৫২২৫ জন, তার মধ্যে ২১২০ জন কৃষি ছাড়া অন্য বৃত্তিতে নিযুক্ত এবং ৭৬৫ জন ব্যবসা করে। এটি কার্যত একটি শিল্পসমৃদ্ধ গ্রাম, প্রধান বৃত্তি হচ্ছে তাঁত বস্ত্র তৈরী। বর্ধমান জেলার কামার পাড়ায় অসংখ্য কামার জাতির বাস। গত তিন পুরুষ ধরে তারা পিটিকরা পিতলের অলঙ্কার তৈরী করে আসছে। দেশ বিভাগের আগে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এর খুব সমাদর ছিল। গ্রামে প্রস্তুত জিনিষ, তা রাজবলহাটেই হোক অথবা কামারপাড়াতেই হোক, এক শ মাইল দূরে কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মারফতই তা প্রধানতঃ বিক্রী হয়।

উপরোক্ত ধরণের কৃষি ব্যবসা এবং শিল্পসমৃদ্ধ গ্রামের সঙ্গে আছে জমিদার অধ্যুষিত কিছুটা প্রশাসনিক অধিকারসম্পন্ন গ্রাম। প্রাচীন ধরণের কোন কোন গ্রামে আছে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রাধান্য। সেখানে প্রাচীন ধরণের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ধমান, শ্রীহট্ট ও ঢাকার কয়েকটি গ্রাম এই ধরণের। অবশ্য এর রূপ সম্প্রতি পরিবর্তিত হয়েছে। হুগলীর তারকেশ্বর অথবা বীরভূমের বক্রেশ্বর দেবস্থান। সেখানে দেশের নানাস্থান থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে এবং ব্রাহ্মণরা পুরোহিতের কাজ করে।

পরস্পর নির্ভরশীলতা

যে সমস্ত ছোট ছোট গ্রামে ক্ষেত মজুর ও ভূমিহীন মজুর আছে সেগুলো ছাড়া কোন গ্রামেই একটি মাত্র বৃত্ত নেই। কোন কোন গ্রামে দুটি এবং কোন কোন গ্রামে বহু বৃত্তি আছে। আগের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যবসা কেন্দ্রিক গ্রামগুলো শুধু নিকটবর্তী স্থানে নয়, দূরবর্তী অঞ্চলেও পণ্য সরবরাহ করে। সাপ্তাহিক হাটে বিক্রয়ের জন্য আসে গবাদি পশু। এই হাট ঘন ঘন হয় না বটে, তবে এটা এ ধরণের বাজারের স্বাভাবিক সীমারেখা অতিক্রম করে সমগ্র এলাকার চাহিদা পূরণ করে।

কৃষকরা বছরে একবার মাত্র যে জিনিষ কেনে সেগুলো তারা মরশুমী মেলা থেকে সংগ্রহ করে। কোন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে এইরকম মেলা হতে পারে, কিন্তু তা গ্রামবাসীদের আর্থিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বিশেষ করে ফসল কাটার পর এইসব মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশালের কালিসুন্দরী মেলা বিখ্যাত। সেখানে বিক্রয়ের জন্য আসে হাজার হাজার নৌকা। বীরভূমের বৈরাগীতলায় লোকে শুধু আমোদ প্রমোদের জন্য আসে না। সেখানে প্রচুর পরিমাণে ভাল লাঙ্গল, দরজা, জানালা, কড়িকাঠ কিনতে পাওয়া যায়।

একজন কৃষক তার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সপ্তায় সপ্তায় কেনে, অন্যান্য জিনিষগুলো সে বছরে একবার মাত্র ক্রয় করে। এই সমস্ত বিশিষ্ট গ্রাম, হাটবাজার এবং ধর্মস্থান বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্য দিয়ে গ্রাম-বাংলার অধিবাসীদের সেবা করে আসছে। কৃষক, ব্যবসায়ী কারিকর, পুরোহিত ও পণ্ডিতরা এইভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কাঠামোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ অথবা সুদূর সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট।

ভারতের বিভিন্ন অংশের গ্রাম্য অর্থনীতি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে জাতিভেদ প্রথা গ্রামের আর্থিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অতীত জিনিষপত্র বিনিময় করার প্রথা ছিল। এই লেনদেনে অর্থের বড় ভূমিকা ছিল না। তখন ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালখুসী অনুসারে সম্পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি হত না। স্ব স্ব গ্রাম অথবা বিশেষ একটি জাতের প্রয়োজন অনুপাতে সম্পদের আদান প্রদান হত।

যখন গ্রামে লোকসংখ্যা কম ছিল এবং গ্রামেই তাদের কাজকর্মের অভাব হত না, তখন কৃষকরা তাদের উৎপন্ন জিনিষপত্রের বিনিময়ে ছুতোর, কামার, নাপিত, কুমোর, স্কুলমাষ্টার, জ্যোতিষীদের শ্রম ক্রয় করত। এর ফলে পুরুষানুক্রমে যুগ যুগ ধরে গ্রাম্যসমাজের লোকের মধ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব বজায় ছিল।

এইরকম বিভিন্ন জাতের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মত সমান্তরালভাবে পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যেও একটা পারস্পরিক বন্ধন গড়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষকদের মধ্যে প্রথা আছে, যখন কোন কৃষক একা অথবা সপরিবারেও তার জমি চাষ এবং ফসলকাটার কাজ করে উঠতে পারে না, তখন প্রতিবেশীরা তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। তেমনি অপর কোন প্রতিবেশী কৃষকের প্রয়োজন হলে তাকেও অনুরূপভাবে সাহায্য করা হয়। উড়িষ্যার পুরীতে মুলিয়া জেলেদের মধ্যে সমগ্র গ্রামটি কতকগুলি ওয়ার্ডে ভাগ করা আছে। বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময় তারা রান্নাবান্না ইত্যাদি ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করে। জাতিগত পারস্পারিক নির্ভরতা ছাড়াও এই প্রতিবেশীমূলক বন্ধন অতীতে পল্লী-ভারতের পারস্পারিক সাহায্যের ভিত্তি ছিল। এর ফলে একই সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও একটা পারস্পরিক নির্ভরতা বজায় আছে।

পরিবর্তনের ধারা

গত দু'শত বছরে বাংলা দেশে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা পৃথকভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সরকারী নথিপত্রের ভিত্তিতে যে সমস্ত রিপোর্ট এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখা হয়েছে, তা পাঠ করলে সাম্প্রতিক কালে বাংলা দেশে কি ঘটছে, তার নির্ভরযোগ্য ছবি পাওয়া যায়। (নরেন্দ্র সিংহ: ১৯৫৬, দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ফ্রম পলাশী টু দি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট)। গ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী বিশেষ বিশেষ পরিবারের ইতিহাসের টুকরো টুকরো অংশ নিয়েও সেই কাহিনী গড়ে তোলা যায়। ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন পরিবারের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু ধনী পরিবারের ক্ষেত্রে জমি হস্তান্তরের অথবা সম্পত্তি বিভাগ সংক্রান্ত মামলার নথিপত্র থেকে উপযুক্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রায়পুরের সিংহ-পরিবারের কথা বলবো। এই গ্রামটি বীরভূম জেলার বোলপুরের চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অজয় নদের তীরে অবস্থিত। এই নদীটি বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমানা ও কাটোয়ার কাছে গঙ্গায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। এক সময়ে নদীতীরে সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র, সুসজ্জিত মন্দির ও তীর্থক্ষেত্র ছিল। কবি জয়দেব (দ্বাদশ শতাব্দী) অজয় নদের তীরে কেন্দুলিতে বাস করতেন। তাঁর সম্মানার্থে প্রতি বছর সেখানে একটি মেলা হয় এবং বাউল সম্প্রদায়ের সাধুরা প্রাচীন বটগাছের তলায় বসে ভক্তিমূলক গান করে। দেউলি ও সুপুর গ্রামে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর পাথরের ভাস্কর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ইছাই ঘোষের বিরাট ইঁটের মন্দির বোধ হয় পরে নির্মিত এবং আরও পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়। এখন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে আছে। সুপুরে একখণ্ড সামান্য উঁচু জমিকে নুনডাঙ্গা বলা হয়। সেখানে সম্ভবত বিক্রয়ের জন্য লবণ মজুত রাখা হত। কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ইলামবাজার এক সময় গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যস্থান ছিল এবং সেখানে নীলের চাষ আর গালার খেলনা তৈরী হত। এক হাজার বছর ধরে অজয় নদের তীর এইভাবে ধর্ম ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে আছে। এখানে সুরুল গ্রামের উত্তরে জন চীপ নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন এজেন্ট একটি বাড়ী তৈরী করেন।

রায়পুরের সিংহ পরিবার

রায়পুরের সিংহরা এসেছিলেন মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থেকে। তারা উত্তর-রাঢ়ী শ্রেণীর কায়স্থ। চন্দ্রকোণার লালচাঁদ সিংহ অজয় নদের তীরে প্রাচীন সুপুর গ্রামের কাছে বসতি স্থাপন করেন। কিম্বদন্তী আছে, আসবার সময় তিনি মেদিনীপুর জেলা থেকে এক হাজার তাঁতীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। লালচাঁদের ছেলে শ্যামকিশোর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন এবং ইউরোপে রপ্তানীর জন্য জন চীপকে কাপড় সরবরাহ করতেন।

কালক্রমে শ্যামকিশোর প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। "রাজা" উপাধিধারী একটি ক্ষুদ্র মুসলিম পরিবার তখন বীরভূমে জমিদারী করতেন। জেলার বর্তমান হেডকোয়ার্টার শিউড়ির কাছে রাজনগরে ছিল তখন সদর দপ্তর। বীরভূমের এই রাজা শ্যামকিশোরের কাছে ঋণ গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে তাঁর জমিদারীর শিউড়ি থেকে রায়পুর পর্যন্ত অংশ শ্যামকিশোরের হাতে তুলে দেন।

শ্যামকিশোরের চার ছেলে—জগমোহন, ব্রজমোহন, ভুবনমোহন ও মনোমোহন। বড় ছেলে জমিদারীর ভার পান, তৃতীয় ভুবনমোহন ব্যবসার অফিস তত্ত্বাবধান করতেন। ছোট মনোমোহন সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনায় সময় কাটাতেন। মনোমোহনের চার ছেলে। তার মধ্যে সিতিকণ্ঠই সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের পিতা। বৃটিশ আমলে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন একটি প্রদেশে প্রথম ভারতীয় গভর্ণর নিযুক্ত হন। শ্যামকিশোর তাঁর সময়ে ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত বলে বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁর নাতি সিতিকণ্ঠ পিতামহের মত ফারসি ভাষা ছাড়াও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন।

এইভাবে সিংহরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শুধু ব্যবসার এজেন্ট থেকে জমিদার হন। আসে-পাশে শ্রমিকের মজুরী ছিল খুব সস্তা। দুঃসাহসী ইংরেজ সওদাগররা এখানে নীল আর রেশমের ফ্যাক্টরী বানাতে শুরু করে। ডেভিড আর্সকিন নামে এক ব্যক্তি রায়পুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে জন চীপের সহায়তায় একটি নীলের ফ্যাক্টরী তৈরী করেন। চীপ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এবং ডেভিড আর্সকিন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মারা যান এবং ডেভিড আর্সকিনের ছেলে হেনরী আর্সকিন পিতার ব্যবসার মালিক হন। কথিত আছে সিতিকণ্ঠ অনতিবিলম্বে হেনরী আর্সকিনের ব্যবসার অংশীদার হয়ে যান। এর ফলে সিতিকণ্ঠ যেমন বাণিজ্য এবং জমিদারী থেকে অর্থ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদনে লগ্নী করার সুযোগ পেলেন, তেমনি হেনরী আর্সকিনও তার দলে স্থানীয় একজন শক্তিশালী জমিদারকে পেয়ে গেলেন। এটা আর্সকিনের পক্ষে কম সুবিধার কথা নয়।

পার্টনারের সাহায্যে সিতিকণ্ঠ তাঁর ছেলে নরেন্দ্র ও সত্যেন্দ্রকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠান। সত্যেন্দ্র আইনজীবীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই বিলাতে লর্ডের মর্যাদায় ভূষিত হন।

রায়পুরের সিংহ পরিবার এখনও সেখানে আছেন, কিন্তু অনেক ভগ্নদশা প্রাপ্ত। তাঁদের পরিবারভুক্ত লোকেরা এখন কলিকাতা এবং অন্যান্য সহরে চলে গিয়ে আইন, শিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। যদি তাঁরা তাঁদের বংশগত বৃত্তি—সরকারের অধীনে কেরাণী ও হিসাবরক্ষকের কাজ নিতেন, তবে সিংহ পরিবারের ইতিহাস এক রকমের হত। কিন্তু সিংহরা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলে জমিদারী ও শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়ায় পরিবারের লোকেরা বৃটিশ শাসনাধীন সহরে আর্থিক ও রাজনৈতিক সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের চেয়ে কম সচ্ছল প্রতিবেশীর তুলনায় নিজেদের উন্নত অবস্থায় তুলতে সক্ষম হন।

শান্তিপুর সহর

উপরে যে ইতিহাস দেওয়া হল, তা' চার পুরুষ ধরে অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক একশো বছরে ঘটেছে। পরিবারের এক বিরাট অংশ প্রথমে চন্দ্রকোণা থেকে রায়পুরে আসেন, তারপর রায়পুর থেকে আসেন কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে। বাংলার কয়েকটি অপেক্ষাকৃত পুরানো সহরে বহু লোক দেশান্তরী হওয়া সত্বেও পরিবারের কিছু কিছু লোক তাঁদের পৈত্রিক ভিটা আঁকড়ে আছেন। তবে সমগ্র প্রদেশের অর্থনৈতিক শক্তিগুলো পুনর্বিন্যাস হওয়ার ফলে তাঁদের বৃত্তির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে।

গঙ্গাতীরবর্তী শান্তিপুর গত পাঁচশ' বছর ধরে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার কেন্দ্র, ব্যবসা-স্থল ও তীর্থক্ষেত্র। মুসলমান শাসকদের রাজত্বকালে সহরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি ছোট ছোট কেল্লা নির্মিত হয়। উত্তর ভারত থেকে আগত পাঠান ও রাজপুত সৈন্য সেখানে ঘাঁটি করেছিল। আজ এই কেল্লার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু শেষোক্তদের বাংলা-ভাষাভাষী বংশধররা অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও এখানে বাস করছে। তখনকার মসজিদ ও কারুকার্য্য করা কবরগুলো বর্তমানে বড় বড় বৃক্ষ সমাকীর্ণ অঞ্চলে ইতস্তত সমাহিত এবং ভগ্নদশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অঞ্চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গোড়ে তোলেন। বীরভূমের মত নীল এবং সূতীর কাপড় শান্তিপুরের গুরুত্বপূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্যে পরিণত হয়। তিলি, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতিগুলো সহরের দুই-তৃতীয়াংশে বসতি স্থাপন করে। তাদের পাড়ায় বড় বড় ইটের বাড়ী অথবা উঁচু মন্দির আছে। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পণ্ডিত, কাঁসারী, সমস্ত জাতির নিজ নিজ পাড়া আছে এবং তাদের নাম অনুসারে সহরের বিভিন্ন মহল্লার নামকরণ হয়েছে।

সহরের উন্নতি ও অবনতির যথেষ্ট টানা পোড়েন হয়েছে। এক সময়ে সেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল এবং জনসংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পায় ঘরবাড়ী জনশূন্য হয়। তবে পূর্বকার জাতিগত বসতি যথাযথ ভাবেই আছে।

জাতিভেদ প্রথা এবং মানুষের জীবিকা চিত্রিত করে যদি কোন মানচিত্র আঁকা যায়, তাহলে কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বৈষম্য প্রকাশ পাবে। সহরের পশ্চিমে একটি মহল্লায় গোয়ালাদের বাস অর্থাৎ তারা গবাদি পশু পালন এবং দুধ, ঘি প্রভৃতি তৈরি করত। এখন তারা তাঁত বোনা সুরু করেছে। শান্তিপুর দুধ থেকে তৈরী মিষ্টান্নের জন্য বিখ্যাত। আগে গোয়ালারা এই ব্যবসায়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল, যেমন হয়েছে ময়রারা। বাজারের মাঝখানে তাদের দোকানপাট আছে। বিদেশী গুঁড়োদুধ আমদানী হওয়ার ফলে ময়রারা সস্তাদরে গোয়ালাদের গুঁড়ো দুধ দেয় এবং তারা এই গুঁড়ো দুধ জলে সিদ্ধ করে ঘরে পনির তৈরী করে। গোয়ালারা নিজেদের গবাদি পশুর দুধ বিক্রী করে আগে যে পরিমাণ আয় করতো, এখন এই শিল্পে তার চেয়ে আয় কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু গবাদি পশু বিক্রী হয়ে যাওয়ায় এবং বিদেশ থেকে গুঁড়ো দুধ আমদানী হওয়ায় এক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই গোয়ালারা এখন বংশগত বৃত্তির বদলে তাঁত বোনা আরম্ভ করেছে।

ব্রাহ্মণ, তিলি, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিও তাদের পেশা পরিবর্তন করেছে। এই সমস্ত জাতের লোকেরা যেখানে বাস করতো, এখন সেখানে আইনজীবি, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাধারী লোক পাওয়া যাবে। জাতের সঙ্গে সংযুক্ত বংশগত ব্যবসা—যা' পরম্পরায় গ্রথিত ছিল, তার পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু জনসমষ্টি প্রায় একই রকম আছে। [ক্রমশঃ ।

একটি বছর

বন্দে আলী মিয়া

জীবনের শাখা হতে খসে গেল একটি বছর
একটি চরণ-চিহ্ন আঁকা হলো কালের পাতায়—
অসীম প্রবাহ মাঝে মিশে গেল একটি নিশ্বাস
প্রদীপ নিবিয়া গেল রজনীর বিনিদ্র প্রহরে।

একটি বছর মোর হারাইল নিথর উষায়
সাতটি রঙের ছবি মুছে গেল মেঘের আড়ালে—
একটি বাঁশীর গান থেমে গেল আজিকে সহসা
আমার উজল দিন ইতিহাসে লেখা রয়ে গেল।

সমুখে অনাদি পথ—গতিহীন ধূসর সাহারা
পথের দু'পাশে কাঁপে পুরাতন শীতের কুয়াশা।
আমার সন্ধ্যা আসে চুপি চুপি মৃত্যুর মতন
জীবনের দিকে দিকে কেঁদে ফেরে নদীর ভাঙন।

আমার দুখের গান পেলো নাকো মনের ঠিকানা
রৌদ্র দহনে শুধু পলে পলে হলো নিঃশেষ।
একটি বছর গেল—রেখে গেল দুর্দিন পরশ—
রাতের অমানিশা তীরে চলিতেছে আমার মিছিল।

শ্রীশশীকান্ত চক্রবর্ত্তী

[প্রখ্যাত স্যানিটরি ইঞ্জিনীয়ার]

অটুট মনোবল ও পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা—জীবনে সাফল্য লাভের জন্য মূলতঃ এ দুটি জিনিস্ চাই-ই। বিশিষ্ট স্যানিটরি ইঞ্জিনীয়ার শ্রীশশীকান্ত চক্রবর্ত্তী কর্ম্মক্ষেত্রে যখন এগিয়ে আসেন, এর কোনটিরই কমতি ছিল না তাঁর। প্রত্যাশিত সুফলও পেয়েছেন তিনি তাই—অনেকের কাছেই অমনি যা বিস্ময়ের বস্তু।

শ্রীচক্রবর্ত্তীর সমগ্র ছাত্রজীবন নিরলস সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বরিশালের ঘাটপাকিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান তিনি—১৮৮৪ সালের মে মাসে তাঁর জন্ম। পিতা গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন ছিলেন তৎকালীন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। মাত্র চার বছর যখন বয়স তখনই শশীকান্ত পিতৃহারা হন। এগারো বছর বয়সে তিনি মাকেও (আনন্দময়ী দেবী) হারান। এরই মাঝখানে পড়াশুনো চলতে থাকে তাঁর, বিভিন্ন পরীক্ষায় সূচিত হতে লাগলো তাঁর বিশিষ্টতা।

ছাত্রজীবনের গোড়াকার দিনগুলো শশীকান্তের অতিবাহিত হয় মামার বাড়ীতে—বরিশালেরই গাজিপুর গ্রামে। ঐখান থেকেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হন। তারপর চলে যান তিনি বরিশাল জেলা স্কুলে, সেখান থেকে ১৯০৩ সালে এনট্রান্স পাশ করেন আর সেটি বৃত্তিসহ। ১৯০৫ সালে ঢাকা কলেজ থেকে তিনি ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেবারেও যথারীতি বৃত্তি পেলেন একটি।

বৃত্তিসহ এফ, এ পাশ করেই শ্রীচক্রবর্ত্তী শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে এসে ভর্ত্তি হলেন। মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প তখন—যে ভাবেই হোক ইঞ্জিনীয়ার হতে হবে। ১৯১০ সালে পরীক্ষা দিলেন তিনি এই লাইনে—শিক্ষা ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ বি, ই, ডিগ্রী তাঁর হাতে এসে গেলো একবারের চেষ্টাতেই।

অর্জ্জিত জ্ঞান এখন কর্ম্মজীবনে প্রয়োগ করার পালা। প্রথমটায় শশীকান্ত কিছুদিন বাংলা সরকারের অধীনে কাজ করেন প্রিন্সার্স সার্ভে ইনষ্ট্রাক্টাররূপে। বেঙ্গল স্যানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসেও (সরকারী) তিনি কিছু কাল নিযুক্ত থাকেন। তারপর কলকাতা কর্পোরেশান এসে পড়েন তিনি—এখানে ওয়াটার ওয়ার্কস-এর অন্যতম ইঞ্জিনীয়ার, রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার (ড্রেনেজ) হেড পাইপ লেয়ার (ওয়াটার ওয়ার্কস) প্রভৃতি নানা দায়িত্বশীল পদে কাজ করেন।

১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত শ্রীচক্রবর্ত্তীর জীবন এমনি ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে। হঠাৎ এক মোটর সাইকেল (নিজের চালিত) দুর্ঘটনায় পড়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। বেশ কিছুকাল চিকিৎসাধীন থেকেও সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হওয়া তাঁর হল না। উপায়হীন অবস্থায় তিনি কর্পোরেশনের চাকরি ছেড়ে দেন। ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু এর পরই মাথায় ভাবনা—এবারে কি করা যায়?

শশীকান্তের মনের বল তখনও অটুট, তাই উপায় স্থির হতে বিলম্ব হল না। প্লাম্বিং ও স্যানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত সরঞ্জামের তিনি একটা ব্যবসা শুরু করে দিলেন। ব্যবসা প্রসার হয়ে চললো তাঁর দেখতে দেখতে। স্যানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যাপারে তিনি বহু ডিজাইন আবিষ্কার করেন এবং সেগুলোর বেশির ভাগই পেটেণ্ট সার্টিফিকেট লাভ করে। শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও বিশেষ ভাবে ইংল্যাণ্ডেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে যায়। সেদিনে তিনি 'স্যানইকুইপ' লিমিটেড নামক যে কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন, আজও রয়েছে তা চলতি। এ দেশের স্যানিটরি ইঞ্জিনীয়ারিং ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক অবদান রয়েছে তাঁর।
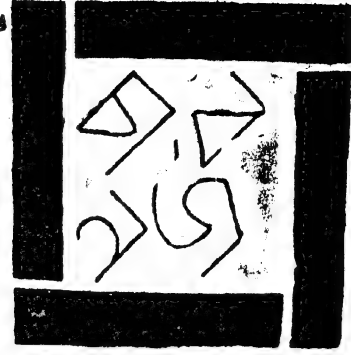
শ্রীচক্রবর্ত্তীর যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য তাঁকে মর্য্যাদা এনে দিয়েছে আরও নানা ভাবে। প্লাম্বিং সম্পর্কে মৌলিক প্রবন্ধ (থিসিস) লিখে লণ্ডন প্লাম্বার্স ইনষ্টিটিউট থেকে তিনি এম, আই, পি অনোরারী ডিগ্রীতে ভূষিত হন। ভারতস্থ ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স প্রতিষ্ঠানের তিনি পূর্ণাঙ্গ সদস্য হন ১৯২১ সালেই। প্রায় ৮ বছর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অনারারী লেকচারারের পদ অলঙ্কৃত করেন তিনি। ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনীয়ার্সের বাংলা কেন্দ্রের তিনি ছিলেন এক সময় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। দশ বৎসরের অধিককাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেটের সদস্য ছিলেন।

শশীকান্ত একজন সত্যিকারের কর্মী-পুরুষ—আপন সীমিত কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন, তুলনা হয় না। আজ তিনি ৭৬ বৎসরের

শ্রীশশীকান্ত চক্রবর্ত্তী

বৃদ্ধ, কিন্তু চোখে-মুখে রয়েছে এখনও আত্মবিশ্বাস ও কর্মপ্রতিভার ছাপ। সম্পূর্ণ আত্মচেষ্টায় গঠিত এই মানুষটি বিভিন্ন কারণে সত্যিই অনুকরণীয়।

শ্রীসাতকড়িপতি রায়

[প্রবীণ দেশকর্ম্মী ও আইনজ্ঞ]

বাংলার নেতৃত্ব যখন দেশবন্ধুর হাতে, সে সময় তাঁর একান্ত নিকট অনুগামীদের অন্যতম ছিলেন এই মানুষটি। আইন অমান্য আন্দোলনের সংগঠনে সেদিনে দেখা গেছে তাঁকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের পুরোভাগে। দেহে ও মনে কী সতেজ ও বলিষ্ঠ ছিলেন তিনি গোড়া থেকেই—উদ্যম ও দৃঢ়তার এতটুকু অভাব দেখা যায়নি কখনও। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শ্রীসাতকড়িপতি রায়ের নাম বলতে গেলে তখন বহুদূর অবধি ছড়িয়ে।

মেদিনীপুরের প্রাচীন গ্রাম জাড়ার (এককালে হুগলীর অন্তর্গত) বিখ্যাত রায়বংশের কৃতী সন্তান সাতকড়িপতি। পিতা পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় ছিলেন সেকালে মেদিনীপুরের স্বনামধন্য উকিল। মেদিনীপুর সহরেই সাতকড়িপতি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ সালের মে মাসে।

বাপ-মায়ের তত্ত্বাবধানে যথাসময়ে বিদ্যাভ্যাস সুরু হয় তাঁর। মেদিনীপুরের হার্ডিঞ্জ স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন অনায়াসেই। এই সময় পিতৃহারা হওয়ায় চলে আসতে হয় তাঁকে জাড়ায়। প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত গ্রামের স্কুলেই তিনি পড়াশুনো চালিয়ে যান। তারপর ১৮৯৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে। ফলাফল যখন বের হল, দেখা গেল তিনি বৃত্তি পেয়েছেন এবং ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করে পদক লাভ করেছেন একটি। ক্রমে এফ-এ, বি-এ, (অনার্স), এম-এ-সব কয়টি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দেন তিনি মেদিনীপুর কলেজ থেকে এবং অঙ্কশাস্ত্রে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। শেষের কয়টি পরীক্ষা কিন্তু দেন তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। ১৯০৪ সালে তিনি আইন-শাস্ত্রের পরীক্ষায় (বি-এল) উত্তীর্ণ হন—আর এইখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি।

শ্রীসাতকড়িপতি রায়

জাড়ার জমিদার বংশের ছেলে সাতকড়িপতি কর্ম্ম-জীবনেও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবেন, এ বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু বৈচিত্র্য ঘটেছে একটি ক্ষেত্রে যেখানে তাঁর তেজস্বী মন খুশি থাকতে পারে নি ধরাবাঁধা একটা বৃত্তিকে নিয়ে। আইন পাশ করে প্রথমেই তিনি ব্যবসা সুরু করেন মেদিনীপুরের আদালতে। পসারও জমে উঠল তাঁর দেখতে দেখতে কম নয়। কিন্তু বেশি দিন এতে আঁকড়ে থাকা হল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (স্বদেশী) সূচনায় তিনি এগিয়ে এসে গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ভূমিকা। কিছুদিন যেতে না যেতেই তৎকালীন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই পদে থাকা অবস্থায় তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেন, তা সত্যি অসাধারণ মনোবলের পরিচায়ক।
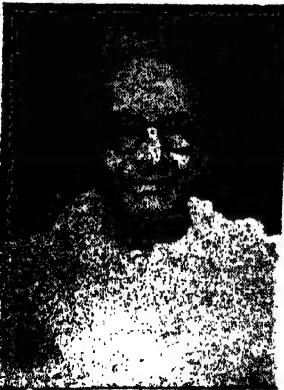
শেষ অবধি এই সরকারী পদেও সাতকড়িপতি রায়ের থাকা হল না। নীতিগত প্রশ্ন দেখা দিলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং আবার সুরু করেন মেদিনীপুরে আইনজীবীর পেশা। ১৯১৪ সালে মেদিনীপুর থেকে তিনি চলে আসেন কলকাতা হাইকোর্টে। এখানে আসার অল্পদিন মধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। সেদিনে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবিগণকে আন্দামানের নির্ব্বাসিত জীবন থেকে মুক্তিদানের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি—এই প্রশান্তি তাঁর আজও রয়েছে।

হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করার সময়েই শ্রীরায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। পরলোকগত দাশের (ব্যারিষ্টার) জুনিয়র হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি বহুদিন। একদিকে ছিল আপন যোগ্যতা, অন্যদিকে জুটেছিল এই সুবর্ণ সুযোগটি। ব্যবসায়ে অর্থ ও সুনাম পেতে তাই বিলম্ব ঘটেনি তাঁর।

প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সাতকড়িপতির পক্ষে হাইকোর্টের গণ্ডীর ভেতর নিজেকে বেশি দিন আটকে রাখা সম্ভব হল না। ইত্যবসরে নির্মম জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে—দেশময় চলেছে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আলোড়ন। ১৯২০ সাল—কলকাতা মহানগরী বক্ষে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল—গৃহীত হল সেখানে গান্ধীজির ঐতিহাসিক আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব। হাইকোর্ট থেকে অমনি বেরিয়ে পড়লেন সাতকড়িপতি এবং আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন সক্রিয়ভাবে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের মধ্যে রয়েছেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক) ও সাতকড়িপতি (কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক)। এই দুইজন সহচর মিলে মেদিনীপুরে শক্তিশালী কংগ্রেসসংস্থা গঠন করে তুলেন। অব্যাহত সংগ্রামের দরুণ ও কর বন্ধের পরিণতিতে ইউনিয়ন বোর্ডগুলো বাতিল হয়ে গেল সেখানে। ইত্যবসরে (১৯২১) শাসমল অসুস্থ হওয়ায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে শ্রীরায়ের ওপর। প্রিন্স অব ওয়েলস্ বয়কট আন্দোলন চলছে একই সাথে তখন জোর। এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য সাতকড়িপতি রায় অবিরাম খেটে চলেন—যার ফলস্বরূপ বাংলায় সেদিনে প্রায় দেড় লক্ষ স্বেচ্ছাসেবকের নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত শ্রীরায়কে নিরলস ভাবে বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করতে দেখা গেছে। এই সময় সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সঙ্গেও রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটিতে (যার সভাপতি ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র) সুভাষচন্দ্র ও সতীশ দাশগুপ্তের সাথে মিলিত

ছিলেন সম্পাদক। দেশবন্ধু গঠিত স্বরাজ্য পার্টিতে সম্পাদকের গুরু দায়িত্বও ছিল তাঁরই বলিষ্ঠ স্কন্ধে। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁকে কারাজীবন যাপন করতে হয়েছে কিছুদিন।

আপন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্ম্মজীবনে বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন সাতকড়িপতি। ১৯২৩ সালে কলকাতার বড়বাজার কেন্দ্র থেকে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের সদস্য ও কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন তিনি বেশ কিছুদিন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যপদে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন কয়েক বার। গান্ধীজির আগ্রহক্রমে তিনি বাংলার হরিজনসেবক সংঘের সম্পাদকের দায়িত্ব নেন ১৯৩৪-৩৫ সালে। স্বাধীন আমলে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তাঁরই ওপর।

স্বাস্থ্যের কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাতকড়িপতি অবসর গ্রহণ করেন বলতে গেলে ১৯৩৪ সালেই। কিন্তু এর পরও প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে দেশের ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন নি বা আজও পারছেন না। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ও তাঁকে নিজ জেলায় কাজ করতে দেখা গেছে।

অশীতিবর্ষীয় এই বৃদ্ধের মনে আজও রয়েছে প্রচুর উদ্দীপনা ও দেশ গঠনের আবেগ। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব ও আদর্শ এখনও তিনি স্মরণ করে থাকেন কথায় কথায়। ১৯২০ সালে হাইকোর্ট ছেড়ে দিয়ে আসলেও আবার পরবর্ত্তী যুগে নতুন উদ্যমে আইন ব্যবসা চালান সেখানেই। এখনকার অবসর জীবনে তিনি বহু জনসংস্থার সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট। মেদিনীপুর সম্মিলনীর তিনি আজীবন সভাপতি, কলিকাতা রিলিফ কমিটি, অরবিন্দ সেবক সমিতি, বর্দ্ধমান বিভাগীয় জেলা সম্মিলনীর নেতৃত্বও তাঁরই হাতে। দেশকর্ম্মী ও সমাজসেবী সাতকড়িপতি এক্ষণে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে জাতি আরও কিছু যদি পায়, তাতে বিস্মিত হবার নয়।

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী

[পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বনপাল]

নিম্নমধ্যবিত্ত অবস্থার বাঙালী ঘরের একটি ছেলে—সহায়সম্বল বলতে তেমন কিছুই নেই। আছে যে-টুকু, সে মনের জোর আর অধ্যবসায়। যাত্রা সুরু হয় এই মূলধন নিয়েই, সফলতাও জুটতে থাকে ধাপে ধাপে। এই অধ্যবসায়ী ও সফলকাম পুরুষটি হলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম বনপাল শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী।

পাবনা জেলার তাঁতবন্দ গ্রামে শ্রীচৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন ১৯১১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। তাঁর পিতৃদেব শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী সে সময়ে একটি ব্যাঙ্কের সহিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট। সীমাবদ্ধ আয় ছিল তখন তাঁর, অথচ পরিবার নেহাৎ ছোট ছিল না। ছেলেকে মানুষ করতে হবে, তাই পাবনা সহর স্কুলে (গোপালচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন) তাঁকে ভর্ত্তি করিয়ে দেন একটু বড় হতেই।

কুমুদনাথের পড়াশুনো এগিয়ে চলে এমনি ভাবে—স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি আপন দক্ষতা প্রদর্শন করতে থাকেন। ছেলেবেলাতেই তাঁর ওপর মায়ের (শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী) প্রভাব পড়ে খুব বেশিরকম। অফুরন্ত উদ্যম ও অধ্যবসায়ময়ী চির-উৎস তাঁর পুণ্যময়ী জননী। শ্রীচৌধুরী আজও মনে করেন যে, তাঁর মাঝে যা কিছু উদ্যম, সে তাঁর মায়ের দান।

কুমুদনাথের সমগ্র ছাত্রজীবন কৃতিত্বের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রম ও নিষ্ঠার ফলস্বরূপ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করতে সমর্থ হন আর সেটি ১৯৩৫ সাল। বৃত্তি নিয়ে তিনি পাবনা থেকে চলে আসেন কলকাতায় ও ভর্ত্তি হন এখানে রিপন কলেজে (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। এখানে সাধনা চললো আরও কঠিন—সামনে একমাত্র আদর্শ রাখা হলো 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'।

ইত্যবসরে (১৯৩৭) আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছেন শ্রীচৌধুরী। ফল যখন বের হল, দেখা গেলো তাঁর নাম উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সকলের শীর্ষে। মনে জোর পেলেন তিনি প্রচুর, ভাবলেন—অধ্যবসায় থাকলে প্রত্যাশিত সিদ্ধি না এসে পারে না। রিপন কলেজ থেকে এর পর তিনি চলে যান প্রেসিডেন্সী কলেজে—বোটানিতে (উদ্ভিদ্ শাস্ত্র) অনার্স নিয়ে তিনি সেখানে দু'বছর বি-এস-সি পড়েন। ১৯৩৯ সালে তিনি পরীক্ষা দিলেন এবং এবারেও নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার মর্য্যাদা জুটল তাঁরই।

শ্রীকুমুদনাথ যথারীতি এম-এস-সি পড়া সুরু করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অর্থ নৈতিক এমনি বড় হয়ে দেখা দিল, তাঁকে তখনই একটা ভাল কাজ না নিলে নয়। বরাবর কৃতী ছাত্র তিনি—কর্ম্মক্ষেত্রেও পিছনে থাকবেন না, এই দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর ছিল। তৎকালীন বাংলা সরকারের বন বিভাগে একটি অফিসারের পদ পেয়ে যান তিনি অল্পদিন মধ্যেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অমনি যোগদান করেন সেই কাজে ১৯৪০ সালে।

কর্ম্মজীবনেও শ্রীচৌধুরী সুনাম অর্জ্জন করেছেন, বলতে দ্বিধা নেই। প্রথমাবস্থায় দেরাদুনে গিয়ে ট্রেনিং নেওয়ার পর তিনি

শ্রীকুমুদনাথ চৌধুরী

কর্ম্মে নিযুক্ত হন জলপাইগুড়িতে—ডিভিশন্যাল ফরেষ্ট অফিসারের (বিভাগীয় বন অধিকর্ত্তা) দায়িত্ব ভার তখন তাঁর ওপর। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি চট্টগ্রাম, কলকাতা, কার্সিয়াং, বাঁকুড়া এসকল স্থানে বহুদিন কাটিয়েছেন। যখন যেখানে থেকে এসেছেন, যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে তাঁর সেখানেই। ১৯৫৩ সালে রাজ্য সরকার তাঁকে কনসার্ভেটর অব ফরেষ্টস বা বনপালের পদে অধিষ্ঠিত করেন আর তাঁর অফিস নির্দিষ্ট করা হয় কলকাতাতে। আজও তিনি সম-যোগ্যতার সঙ্গেই এই পদের গুরু দায়িত্বভার বহন করে চলেছেন।

বনবিদ্যা ও ভূমি সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্রীচৌধুরী নিজকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করতে পারেন। এবিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জ্জনের জন্য ১৯৫০ সালে রাজ্য সরকার তাঁকে পাঠিয়েছিলেন অক্সফোর্ডে। সেখান থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন, এখানে বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগের জন্য চেষ্টা রয়েছে তাঁর। তিনি মনে করেন যে, ভূমিক্ষয় নিরোধ ও বন সংরক্ষণ জাতীয় স্বার্থের দিক হতে একান্তভাবে প্রয়োজন—বন্যাবিধ্বস্ত বাংলা তথা ভারতের জনগণকে এবিষয়ে এখনও অনেকখানি সচেতন হ'তে হবে।

বনবিদ্যা ও বন সংরক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে শ্রীকুমুদনাথ মাঝে মাঝে দেরাদুন থেকে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের 'ইণ্ডিয়ান ফরেষ্টার' নামক মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি লিখেছেন এবং সেগুলি নানাদিক থেকে মূল্যবান। হরিণঘাটার যে সরকারী কৃষি মহাবিদ্যালয়টি আছে, সেখানেও বনবিদ্যা ও বন-সংরক্ষণ বিষয়ে তিনি বছরে কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা করে থাকেন। এ সকল নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচায়ক।

জরাসন্ধ

লৌহ-কারাগারের অন্তরালে যে বিস্ময়কর জগৎ—বর্ত্তমানে যাকে মুক্ত আকাশের নীচে সমাজ-নিয়ন্ত্রিত সভ্যমানুষ ধিক্কৃত, সেই চিরকাল ঘৃণাই করে এসেছে, যাদের জীবন নিরন্তর লাঞ্ছনার অভিশাপে অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী অধিবাসীদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাংখা আনন্দ-বেদনার বিচিত্র রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন জরাসন্ধ—তাঁর লৌহকপাটে।

জরাসন্ধ—লৌহকপাট। বাংলা-সাহিত্যের রাজদরবারে এই সেদিন আসন গ্রহণ করেছে এই নাম দু'টি, জরাসন্ধ সাহিত্যে নবাগত। লৌহকপাট ঐশ্বর্যে নবীন। চলতি সমাজের ধারাবাহিকতায় যে জীবন ঠাঁই পায়নি, যে চিত্তের মহৎ ঐশ্বর্য পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতায় লুণ্ঠিত, যে হৃদয়ের কামনা-বাসনা বার বার কারাপ্রাচীরের অন্ধ গায়ে ঘা খেয়ে খেয়ে রক্তাক্ত সেই সমাজ-বহিষ্কৃত পথভ্রান্ত-জীবনের রূপ-রস-ভাব-ভাষা চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধই জরাসন্ধর লৌহ-কপাটের প্রধান উপজীব্য।

জরাসন্ধ সাহিত্যে ছদ্মনাম—আসল নাম শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী। ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার ব্রাহ্মণডাঙা গ্রামে তাঁর জন্ম, চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ।

তিনি যখন তিন মাসের শিশু, তখন তাঁর পিতা অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী পরলোক গমন করেন। জমিজমা যেটুকু ছিল তার দ্বারাই

জরাসন্ধ

তাঁদের বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ চলে যেত। কিন্তু লেখাপড়ার জন্য উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছুই থাকতো না।

ফলে প্রথম কয়েক বৎসর পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁকে আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ের আনুকূল্য গ্রহণ করতে হয়েছে। এমন কি তাঁর মা নিজ হাতে কোদাল চালিয়ে তরিতরকারি করে তার কিছু কিছু বিক্রী করেছেন এবং সেই অর্থ দ্বারা চারু বাবুর বই-কাগজপত্র কেনা হয়েছে।

শিক্ষার প্রাথমিক জীবন এমনি অনিশ্চিত কষ্টের মধ্যে কাটানোর পর তাঁর তৃতীয় ভ্রাতার কর্মস্থল বসন্তপুর পাকুড়াশীদের স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা চালিয়ে তিনি এসে ভর্তি হন কোলকাতার হেয়ার স্কুলে।

১৯২০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য অনেকগুলি পুরস্কারের মধ্যে এক সেট রবীন্দ্র রচনাবলীই তাঁকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি সহ প্রবেশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজে।

আই-এ, অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি-এ, ক্রমান্বয়ে এম-এ পাশ করে ১৯৩০ সালে বি, সি, এস, পরীক্ষা দেন এবং ঢুকে পড়লেন জেলখানায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় চারু বাবু হিন্দু হোষ্টেলে থাকতেন। জীবনের সে-কটা দিন তাঁর কাছে আজও অবিস্মরণীয়। সতীর্থ যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করেছেন। আজও তাঁরা চারু বাবুর অকৃত্রিম সুহৃদ। এখানে উল্লেখযোগ্য, ৺প্রমথেশ বড়ুয়াকে তিনি সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন।

বাঙলা দেশের খ্যাতনামা অন্যান্য কয়েকজন সাহিত্যিকের মতো তাঁরও স্কুলে পড়ার সময় সাহিত্যিক প্রতিভা স্ফুরিত হয়।

পাবনায় প্রকাশিত "সুরাজ" পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রথম তাঁর লেখা বের হয়। সেটি ছিল একটি কবিতা। তখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হবার পর স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা গল্প প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ৺কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত "মালঞ্চে" 'পাড়াগাঁয়ের চিঠি' নাম দিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি লেখেন। সে রচনাগুলি তখন খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু কলেজে প্রবেশ করার পর তৎকালীন অভিভাবকদের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বিচার বিবেচনার পর ঐতিহ্য অনুযায়ী চারু বাবুকে সাহিত্য সাধনা স্থগিত রাখতে হয়। পাঠ্যজীবনে কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। তাই তাঁর অভিভাবকগণ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রভূত ধনাগমের উপযোগী পদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে দেখতে চাইলেন। ফলে স্ফুটনোন্মুখ চিত্তবৃত্তি ঢাকা পড়ল, ঝাঁপিয়ে পড়লেন চাকুরী-জীবনে—জেলের নিয়ম বাঁধা কঠোর নিয়মানুবর্তিতায়।

কলেজ-জীবনে যদিও সাহিত্যচর্চা করেননি, তবু গায়ে সাহিত্যিক গন্ধ থাকায় কলেজের বাংলা সাহিত্যসভার তিনিই সেক্রেটারী নির্বাচিত হন, এই সময় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

'লৌহকপাটের' দ্বার উন্মোচন করেই চারু বাবু সুখ্যাত সাহিত্যিক ও পাঠক সমাজে সুপরিচিত। এর আগে মাঝে মাঝে উপেন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রায়' তাঁর লেখা ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে, এবং শিশুদের দু'-তিনখানা গল্পসঞ্চয়ও স্থানলাভ করেছে। তবু কিন্তু সেগুলি লৌহকপাটের তুলনায় সমধিক গুণসম্পন্ন।

দীর্ঘকাল নিঃশব্দে চাকুরী জীবন অতিবাহিত করার পর অকস্মাৎ ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কারাজীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু লেখার তাগিদ আসে। তখন চারু বাবু কৃষ্ণনগর জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। বলা চলে তখনই লৌহকপাটের জন্ম।

অত্যন্ত দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে সাহিত্যসভায় তাঁর প্রবেশ। দীর্ঘকালের চেষ্টা কিংবা সাধ্যসাধনার প্রয়োজন তাঁর ঘটেনি। বৈঠকী আসরে তিনি রসালাপী; চাকুরী-জীবনে জবরদস্ত অফিসার, সাহিত্য আলোচনায় সিরীয়স। তবু আপন পরিচয়ের বেলায় কুণ্ঠার অন্ত নেই।

বর্ত্তমানে ইনি বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। সরকারী কোয়ার্টার্সে বসে অবসর সময়ে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন। তাঁর "তামসী" এবং "লৌহকপাট—৩য় পর্ব" ধারাবাহিক ভাবে যথাক্রমে মাসিক বসুমতী ও শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হচ্ছে। "লৌহকপাট—১ম পর্বের" চিত্ররূপ দিচ্ছেন স্বনামখ্যাত পরিচালক শ্রীতপন সিংহ।

সরকারী জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কর্ত্তব্য আর সাহিত্যিক জীবনের অনলস সুন্দরের সাধনা—এই দুই বিপরীতমুখী কর্মধারার এক আশ্চর্য সমন্বয় তাঁর জীবনে।

ঝাঁসীর রাণী

শ্রীবিভূতিভূষণ বাগচী

তুরঙ্গ-ধূসর আকাশে বিদ্যুৎলেখা শৈলতরঙ্গ হও পার—
খুরেতে স্ফুলিঙ্গ ছোটে নাসারন্ধ্রে নীলকেন আন্দোলিত সহস্র কেশর।
ঝাঁসীর তোরণমুক্ত ছিন্নভিন্ন শতাব্দীর বন্ধন দুর্ব্বার,
মালবের প্রতি প্রান্তে লেলিহান অগ্নিশিখা দীপ্ত খরতর।

ব্যারাকে ব্যারাকে বারুদের জতুগৃহে উত্তুঙ্গ শঙীন,
শক্তি বুদ্ধি পণ্য যেথা অবরুদ্ধ প্রত্যহের প্রত্যাশা রঙীন;
অবিচ্ছিন্ন বেড়াজালে নাগপাশে যে মানস নিষ্পেষণ ক্ষীণ
অনন্ত আতঙ্কভারে প্রাণশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল যেই দিন।

সেই দিনে পলাশীর শতবর্ষ পরে, আজি হ'তে শতবর্ষ আগে
কি বহ্নি জ্বালালে তুমি, হে বিদ্রোহী বীর, দেশমুক্তি রাগে!
তোমার সে প্রচণ্ড সংঘাতে চূর্ণ হোলো লৌহ-যবনিকা,
রূঢ় স্পর্দ্ধা দিগন্তে বিলীন
মুক্তির কল্লোল গানে জাগিল অনন্ত প্রাণ আশা অন্তহীন্।

সেই প্রাণবন্যায় প্লাবন কালিন্দী, জাহ্নবীকূলে, ইন্দ্রপ্রস্থে,
দোয়াবে, বিহারে
মীরাটে, লক্ষ্মণাবতী, কানপুরে, দূরবিন্ধ্য আরাবল্লী পারে।
সে বিপুল মুক্তিস্রোত ভেঙে পড়ে বেত্রোবায় চলোর্ম্মি শিপ্রায়—
চম্বল বাগেতে বন্যা কালীসিন্ধু নর্ম্মদায় প্রবাহ অপার।

দাতিয়া-ওরচা-ধর ঝাঁসী-পান্না নাগোধ-রত্নলাম্,
চারখেরী-ইন্দোর-রেওয়া, শিপ্রী-কাল্পী মোউ-মালাখান্;
সগর বুন্দেলা জাগে, বান্দা টঙ্ক পিপ্‌লিয়া পাতান্;
কোটাকী সেরাই জাগে, জাগে ধামো, বারোদিয়া বিজয়ী ঝিরাণ।

হে সৈনিক, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, মরণ মন্থন ক'রো জীবনের জয়যাত্রা পারে,
আর্ত্ত সুপ্ত শতলক্ষ বিক্ষিপ্ত চিত্তেরে পোড়াও আগুনে এ জমাট অন্ধকারে।
জ্বালাও অনল, সেই দীপ্ত মুক্তির মশাল, শতাব্দীর দ্বারে—
দিকপূর্ণ আলোর প্রবাহ, প্রতি ক্লান্তি পরে অবিচ্ছিন্ন ধারে।

মালবের কৃষ্ণমৃত্তিকার ব্যথা ছিল বক্ষ জুড়ে বহু দিন,
হে "মণিকর্ণিকা", তখন কি জানে কেহ সেই ব্যথা বহ্নিতে রঙীন
একদিন ভরে দেবে মৃত্তিকা আকাশ—সে এক স্ফুলিঙ্গ অনির্ব্বাণ,
ভারতের ভবিষ্য-দুয়ারে—সে এক ভাস্বরদীপ্ত প্রাণ অফুরান্।

আজও তাই আরাবল্লী, বিন্ধ্যশৈলে ভাগীরথী-তীরে
মধ্যভারতের সেই মালভূমি জুড়ে আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য ঘিরে
অরণ্যে প্রান্তরে ধ্বনিত খুরের শব্দ নিত্য অবিরাম;
সে ধূসর তুরঙ্গের পরে, সে মুক্তি-সৈনিক আজো তূর্ণ ধাবমান।

পত্রগুচ্ছ

দুষ্প্রাপ্য পত্রগুচ্ছ

(২১ নবেম্বর ১৮২৯ ।—৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

নামত্যাগ। শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—ইংরেজী শাস্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন২ হিন্দুরা নানা প্রকার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার ও রীতির পরিবর্ত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভদায়ক কি না তাহার ফল বর্ত্তমান যাহা দর্শাইতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা তাহাও আও ভাবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় কেননা অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গলা আরবী জানেন কিন্তু স্বজাতীয়কে চিঠী লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য২ জাতিরও বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি তাহার স্থূল লিখি যদি ইহাতে কি অভিপ্রায় ও বর্ত্তমান সুবিধা কি তোমার অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব ইহারা আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন যথা রামগোপাল রায় ইহা R. Roy ব্যবহার করেন এ কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী তাবার কৃত নাম ও গোত্র ও উপাধি দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা J. J. Bird অক্ষরে John, James, Joseph ইত্যাদি কাতপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে আর Bird গোষ্ঠির উপাধি ইহার স্ত্রীর নামও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয় যথা Mrs. Bird ; কিন্তু R. লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই রামনাথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর যদি ঐ R. Roy র স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক। আরো এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ K. Banerjee, ক্ব বানরজী লিখেন বানরজীর বা অর্থ কি। কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্য।—

(১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪)

কলিকাতার সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি।

আমরা (যাহারদের নাম নীচে লিখিত আছে) তোমার নিকট বাঞ্ছা করি যে তুমি কলিকাতার টৌনহালে কলিকাতার ব্রিটিস ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে সভায় হইতে আহ্বান কর যে সেই সভাতে এই নগরের অত্যাবশ্যক নীচে লিখিত কএক প্রকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন অথবা যদি আবশ্যকতা হয় তবে তদ্বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা করিতে পার্লিমেণ্টের নিকট দরখাস্ত দিবার উপযুক্তা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।

তৎসভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই। ইদানী কলিকাতায় যে নূতন ইষ্টাম্পবিষয়ক আইন এবং সামান্ততঃ তৃতীয় জর্জের ৫৩ সালের আইনের ১৫৫ ধারায় ৯৮ ৯৯ প্রকরণদ্বারা কলিকাতার সীমার মধ্যে টেক্স বসাইতে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। কলিকাতা নগরে হিন্দু ও মুসলমানব্যক্তিরকে যাহারা মরে তাহারদের একসেকিটার অথবা আদমিনিষ্ট্রেটরেরদের হাতে তাহারদের হিসাবি দেনার পরিশোধের কারণ তাহারদের যে ভূমি থাকে সে ভূমির দাওয়া হইতে পারে এবং যে তাহারদের স্ত্রীর তৃতীয়াংশ সে ভূমি হইতে বাদ দেওয়া না যায় ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা।

তৃতীয় প্রকরণ। ইংগ্লণ্ডদেশভিন্ন ইউরোপীয় অন্য দেশস্থ প্রজা যে কলিকাতার মধ্যে ভূমি ক্রয় করিয়া আপনারদের উত্তরাধিকারির-দিগকে তাহা দান করিতে অনুমতি পায় ইহার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

চতুর্থ প্রকরণ।—দেউল্যারদের উপকারের নিমিত্তে এবং তাহারদের উত্তমর্ণেরদের মধ্যে তাহাদের ধন সমানাংশে বিভক্ত হয় এতদ্বিষয়ে এক নূতন ব্যবস্থা প্রার্থনা করায় ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

স্বাক্ষরকারিরদের নাম।

জে পামর। আলেকজেণ্ডর কালবিন। হরিমোহন ঠাকুর। রাধাকান্ত দেব। জে ইয়ং। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।...রস্তম জি কাবাস জি।..রসময় দত্ত। রামনারায়ণ দত্ত।..জি জে গার্ডন। জে কালভর। রামগোপাল মল্লিক। রামরত্ন মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক। রামমোহন রায়। রূপলাল মল্লিক। চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবনারায়ণ ঘোষ। শাহ গোপাল দাস মনোহর দাস বং মাধুরি দাস।

(১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪)

শ্রীযুত জন পামর সাহেবের ও অন্য অন্য সভা প্রার্থকেরদের প্রতি।

লিখিতং শ্রীটি প্লৌডন সরিফ সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে কলিকাতার টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছে সে সভা ১৮১৭ সালের ১ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমত আজ্ঞা আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হয় সেমত বিস্মৃতিক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই অতএব গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর শ্রীশ্রীযুত বাইসি প্রিসিডেণ্ট ইন কৌন্সেল সে সভা অস্বীকার করিয়াছেন অতএব আমি এক ইশ্‌তেহার দিয়াছি যে সেই দিবসে সে সভা টৌনহালে বসিবে না।

দ্বিতীয়। প্রধান সেক্রেটারি শ্রীযুত লসিংটন সাহেব যখন এতদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তিনি আরো এই কহিলেন যে তোমারদের দরখাস্তের প্রথম প্রকরণে যে যে বিষয়ের ঐ সভাতে বিবেচনা হইত সে ২ বিষয়ের বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কোন সভা বসে ইহাতে শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্সের নিষেধ আছে অতএব শ্রীযুত সে নিষেধপ্রযুক্ত সভা করিতে অনুমতি দিতে পারেন না।

তৃতীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আমাকে এই কহিতে অনুমতি দিয়াছেন যে যেরূপ সভা বসিতে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সেরূপ সভা বসিবেক না বটে কিন্তু ইষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধে পার্লিমেণ্টে দিবার নিমিত্তে কোন দরখাস্ত অন্য স্থানে প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষরের কারণ টৌনহালে রাখিতে বাধা নাই।

চতুর্থ। শ্রীশ্রীযুত আরো আমাকে এই কহিতে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমারদের দরখাস্তের শেষ তিন প্রকরণের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সভার অনুমতি যদি আমার দ্বারা শ্রীশ্রীযুতের নিকট বাঞ্ছা কর তবে শ্রীশ্রীযুত সে সভা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি। কলিকাতা ১২ মে ১৮২১ সাল।

পূর্ব্ব লিখিত পত্রানুসারে টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সে সভা হইতে পারিবে না অতএব নীচে স্বাক্ষরকারিরা সকলকে জানাইতেছেন যে আগামী বুধবার ২৩ মে তারিখে দিবা দুই প্রহরের সময় একসচেঞ্জ ঘরে এক বৈঠক হইবেক এবং সরিফ সাহেবের প্রতি প্রথম দরখাস্তে যে যে বিষয় লিখিত ছিল তদ্বিষয় সম্পর্কীয় যে দরখাস্তের সে সভাতে প্রসঙ্গ হইবেক সে দরখাস্তের বিবেচনা হইবেক।

গোপাল দাস মনোহর দাস।..চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবচন্দ্র দাস। আশুতোষ দে। রাধাকৃষ্ণ মিত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।.. হরিমোহন ঠাকুর। জান পামর। রামগোপাল মল্লিক। রামরত্ন মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক। বীর নৃসিংহ মল্লিক। রামচন্দ্র মিত্র।..

(৫ জানুয়ারি ১৮২২। ২৫ পৌষ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র।—সুপ্রীংকোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত সর এর্ডর্দ হৈড ইষ্ট সাহেব ইংগ্লণ্ডে যাইতেছেন তিনি এতদ্দেশীয় অনেক লোকের অনেক মত উপকার করিয়াছেন অতএব তাঁহার তুষ্টির বিবেচনা কারণ মোং .. তার টৌনহালে ২১ দিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে অদ্যকার সভার প্রধান শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ইহাতে সভাস্থ সকলেই অনুমতি করিলেন। পরে তাঁহারা চান্দা করিয়া টাকার বিলি করিলেন যে সে টাকার দ্বারা শ্রীযুত সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হয়। এবং তাঁহাকে শুনাইবার কারণ তাঁহার এক প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু বিষ্ণুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র দস্তখত করিলেন।

(১১ জানুয়ারি ১৮২২। ১ মাঘ ১২২৮)

প্রশংসা পত্র।—কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্ লোকেরা শ্রীযুত সর এর্ডর্দ হৈড ইষ্ট সাহেবকে পত্র শুনাইতে গত মঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলায় কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পত্র দিলেন সে পত্র চর্ম্মে লিখিত চতুর্দিগে স্বর্ণ মণ্ডিত। পারসী ও বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে পত্র পাঠ করিয়া শুনান কর্ত্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান।

আমরা শুনিলাম যে আপনি আট বৎসর পর্য্যন্ত এ দেশের এই প্রধান কর্ম্ম করিয়া অতিশীঘ্র এ দেশ ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অতিশয় খিদ্যমান হইলাম ইহাতে আপনাকে স্তব করিতে আমরা সকলে একত্র আসিয়াছি। আপনার আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি এবং আপনার যথার্থ বিচারদ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কালেজ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমারদিগের বালকেরদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন আমারদিগের এই প্রার্থনা যে আমারদিগের এ দেশের কারণ আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কারণ এইখানে আপনকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি। যখন আপনি অদৃশ্য হইবেন তখন এই প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব।

ইহার পরে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা এক প্রশংসা পত্র আনিয়া দিল সে পত্র এক ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল যে আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে এইক্ষণে আপনার গমনে আমারদিগের খেদের অনেক কারণ। যেহেতুক তথায় কমি যে আমারদিগের কালেজের বিশেষ ভাল বিবরণ ইংগ্লণ্ডে করিবেন এবং এই প্রার্থনা যে এ কালেজের সৌষ্ঠব সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিবেন। এবং ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে পঁহুছিয়া পরমসুখে চিরকাল যাপন করুন। এই সকল শুনিয়া কহিলেন যে আমি তোমারদিগের প্রতি অতিসন্তুষ্ট আছি এবং তোমারদিগের প্রত্যেক জন আমার স্মরণে থাকিল। এইরূপে বালকেরদিগকে সম্মান করিয়া আপনি উঠিয়া আতর ও পান লইয়া তাবৎ ভাগ্যবান লোকের হস্তে দিয়া বিদায় করিলেন।

সমাচার দর্পণ প্রস্তুত হওন কালে এই প্রশংসা পত্রের বিবরণ পঁহুছিল অতএব অনবকাশ প্রযুক্ত ছাপান গেল না আগামী সপ্তাহে ছাপান যাইবে।

পুনর্ব্বার সমাচার আইল যে শ্রীযুত সর এর্ডর্দ হৈড ইষ্ট সাহেব ১৭ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংগ্লণ্ডে যাইবেন।

(২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮)

৩ মাঘ মঙ্গলবার বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় শ্রীল শ্রীচিফ জষ্টিস প্রধান বিচারকের সুখ্যাতিপত্র প্রদান কারণ কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদয় মর্য্যাদাযুক্ত প্রধান হিন্দু মুসলমান বড় আদালতনামক গৃহে একত্র হইলেন। সার্দ্ধেক ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ঐ গৃহে শুভাগমন করিলেন তদনন্তর চতুরস্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃঢ় নির্ম্মিত পটে সুলিখিত ইংরাজী বাঙ্গালা পারসী ভাষা ত্রয় সুযুক্তি সুকীর্ত্তিপত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব কর্ত্তৃক পাঠানন্তর শ্রীযুতে

সমর্পিত হইল। তৎপশ্চাৎ হিন্দুকালেজসংজ্ঞক বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবর্গ আর এক সুখ্যাতিপত্র প্রদান করিলেন তৎপরে ধর্ম্মাবতার করুণাসাগর বাষ্প গদগদস্বরে তাহার সদুত্তরামৃতাভিষিক্ত করিয়া সকল লোককে গন্ধ তাম্বুল প্রদান দ্বারা সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

শ্রীযুক্ত চিপ জষ্টিস সাহেবের সুখ্যাতিপত্র।

মহামহিম করুণাসাগরাসদ্বিচার তিমিরহর মিহির নানাদিগ্‌দেশীয়াশেষশাস্ত্রবেদক সকল দায়াধিকরণ কূটসংশয়চ্ছেদক সজ্জন মানস রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট দল দলন দীনগণাভিলাষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত সর এডবর্ড হৈড ইষ্ট নাইট প্রধান বিচারক দোর্দ্দণ্ডাখণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

কলিকাতা নগর নিবাসি গণের নিবেদন। ধর্ম্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের হিন্দুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপকোচ্চপদাভিষেকাবধি অষ্ট বর্ষপর্য্যন্ত সদ্বিচার বিস্তারানন্তর সংপ্রতি তদ্বিরতি বার্ত্তাকরণ নিদারুণধ্বনি শ্রবণ জন্যোৎকণ্ঠিত সুবিচার পালিত প্রজাগণের প্রত্যাশা এই যে শ্রীশ্রীযুক্তের এতদ্রাজ্যে দুষ্টদমন শিষ্টপালন পূর্ব্বক ন্যায় বিতরণ প্রভূতা সংক্রান্ত দুষ্কর ব্যাপার সুগম সুধারাকরণ চমৎকার প্রকাশার্থ এবং উপকারপুঞ্জ জনিত কৃতজ্ঞতাসূচক ধন্য ধন্যেতি গুণানুবাদ করণার্থ অনুমত্যনুসারে সমীপস্থ হই।

বিবিধ ব্যবহারাবলম্বি ভিন্ন ২ ভাষাভাষি নানাদিগ্‌দেশীয় জনগণ প্রতি ন্যায় বিতরণে তথা হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ধর্ম্মাবতারের বিচারাসনে পদার্পণ করণের পূর্ব্বে কদাচ অবধান হয় নাই তত্তদ্গ্রন্থের তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক বৈষম্যাবিধ্বংসন এবং সদ্ব্যাখ্যাকরণ জন্য ক্লেশ বাহুল্য আজ্ঞানুবর্ত্তি অস্মদাদি সর্ব্বজনের সম্যক্ সুবিদিত আছে। অপরাশ্চর্য্য এই যে এতাদৃশ বৈষম্য সমূহ কদাপি বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই বরঞ্চ তাবদ্বক্রিম বিবাদ সংক্রান্ত বাদিপ্রতিবাদিগণ এবং ধর্ম্মাধিকরণ প্রকরণ দর্শনার্থিবর্গ শ্রীশ্রীযুত সন্নিধান হইতে গমনকালে মহাশয়ের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাতিশয় পূর্ব্বক বিবেচনাক্রমে আক্রোশে অকুতোভয়ে বিচার ধর্ম্ম নিয়মাচরণে সকল বিবাদবিষয় তদাদি তদন্ত সুবোধিত সুনিশ্চিত ন্যায্যরূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ তত্তাবধারিদিগের মনোবাঞ্ছা এই যে এতদ্দেশীয় লোকের বালকেরদিগের বিদ্যানুশীলন বৃদ্ধিকরণে ধর্ম্মাবতারের সকরুণান্তঃকরণের নিরন্তর প্রবন্ধ অস্মদাদির এবং এতদ্দেশস্থ সমস্ত লোকের বাদৃশোপকার হইয়াছে তাহা সুগোচর করি। মহাশয়ের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় তাহাতে ইউরোপদেশীয় বিদ্বত্তমগণের সানুকূল্য সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঞ্চার এ প্রদেশে হইয়া এই ক্ষণে এতদ্দেশীয় বালক শিক্ষার্থ সংস্থাপিত বহুতর পাঠশালায় সহকারিতায় উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বল হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে অচিরকালের বিদ্যানীতিজ্ঞা সুখপ্রভা দেদীপ্যমানা হইবে। পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অস্মদীয় সন্তানেরদিগের বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হর্ষান্বিত লীলাস্পদ হইতে প্রস্থানানন্তর গমযমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগ্যযুক্তে কৃতপরোপকার জনিতামোঘ কলজন্য মহাসুখ ভোগে রাখিবেন। এই ক্ষণে আমরা সকলে মহাশয়ের শ্রীমুখ স্মরণার্থ এক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া ধর্ম্মাধিকরণোন্নত স্থানে সংস্থাপনের এবং অবোত্তাগে সুবিচারকারক করুণাসাগর ধর্ম্মাবতারের নিকটে বিদায় সময়ে কৃতোপকার স্মরণে অস্মদাদি সর্ব্বজনান্তঃকরণে যাদৃশ ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমারদিগের বংশ পরম্পরায় জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের প্রার্থনা করি।

শাকে রামাব্ধি শৈলেন্দুমানে হমূংকীর্ত্তি পত্রিকাং। প্রালিখন কলিকাতাস্থাস্তেষাং স্মরণকারিকাং।

সুখ্যাতি পত্রে স্বাক্ষরকারী।

হরিমোহন ঠাকুর	কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রকুমার ঠাকুর	রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
নবকুমার ঠাকুর	রামকান্ত চক্রবর্ত্তী
দ্বারিকানাথ ঠাকুর	তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিচন্দ্র তর্কচূড়ামণি
কালীপ্রসাদ ঠাকুর	গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার
কাশীকান্ত ঘোষাল	শিব রাও
..চরণ মিশ্র	জগন্নাথ দাস বাবু
শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রামকমল সেন
মতিলাল বাবু	রাজা গোপীমোহন দেব
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গোপীকৃষ্ণ দেব
রামতনু বন্দ্যোপাধ্যায়	রাধাকান্ত দেব
তারাকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	সীতানাথ বসু
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	তারিণীচরণ মিত্র
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়	মদনমোহন বসু
কালীশঙ্কর ঘোষাল	মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর
রামজয় তর্কালঙ্কার	ভুবনমোহন দেব
রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন	মহেন্দ্রনারায়ণ দেব
বৈদ্যনাথ পণ্ডিত	গঙ্গানারায়ণ দাস
লাডিলিমোহন ঠাকুর	ভগবতীচরণ মিত্র
উমানন্দ ঠাকুর	রাধাকৃষ্ণ মিত্র
কালীকুমার ঠাকুর	জগমোহন বসু
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	রামদুলাল দে
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	রসময় দত্ত
পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	গুরুপ্রসাদ বসু
রামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	রামকৃষ্ণ দে
শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	তারাচাঁদ বসু
বিশ্বনাথ রায়	চন্দ্রশেখর মিত্র
নীলকণ্ঠ হালদার	ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিশ্বনাথ রায়
দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী	লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত
চৈতন্যচরণ শেঠ	ভোলানাথ মিত্র
কৃষ্ণপ্রসাদ শেঠ	রামচন্দ্র রায়
মদনমোহন শেঠ	নীলকমল মজুমদার
প্রাণকৃষ্ণ শেঠ	বৈষ্ণবদাস মল্লিক
রামগোপাল মল্লিক	কৃষ্ণচন্দ্র রায়
মহারাজ রামচন্দ্র রায়	রাজনারায়ণ সেন
রূপচরণ রায়	স্বরূপচন্দ্র দে
রঘুনাথ চন্দ্র	মদনমোহন মল্লিক
কৃষ্ণমোহন দত্ত	হলধর দে
গোলকচন্দ্র দাস	মৌলবি আবদোল হামিদ
চন্দ্রশেখর দাস	মৌলবি দোরবেশ্যালি
বিষ্ণুলাল চৌবে	সেখ আবদোল্লা
৬উদয়করণ দাস শাহা	সৈয়দ দেলেরআলি আলি আকবর
লালা খোসালচন্দ্র	মৌলবি মহম্মদ মোরাদ
প্রাণভূষণ দাস। ইত্যাদি মহাজনবর্গ	মৌলবি মহম্মদ রাশদ
নবকৃষ্ণ সিংহ	সেখ গোলাম হাসেন
নীলমণি দত্ত	মির বন্দেআলি খাঁ
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	সেরাজদ্দীন আলী খাঁ
রামচন্দ্র বিশ্বাস	এক পয়েরা
নীলমণি দে	জান হেনুরি
পীতাম্বর ঘোষ	

বহু স্বাক্ষর করণার্থী স্থানাভাবে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

তাজমহল

—যতীন্দ্রনাথ পাল

আলোকচিত্র

ইসাবেলা থেবোর্ণ কলেজ (লক্ষ্ণৌ)

—শ্রীমতী তৃপ্তি দাস

জোনা, রাঁচি

—এফ, ক্রিশ্চেইন

যন্ত্রশিল্প

—অজয়কুমার দে

—অজিত মিত্র

বাঙলার ছেলে

ভারতীয় সাধনায় গুরুবাদ

শ্রীপ্রণবেশ্বর ভট্টাচার্য্য

ধর্ম্ম সাধনার ক্ষেত্রে একজন পথপ্রদর্শক গুরুর প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষীয় সাধক সমাজ ও শাস্ত্রসমূহে আবহমান কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"আত্মনো গুরুরাত্মৈব"—আপনিই আপনার গুরু হও। (দ্রঃ, ভাগবত—১১, ৭, ২০) সুতরাং সাধনায় অগ্রসর হইবার নিমিত্ত গুরুর প্রয়োজনীয়তা শ্রীভগবানও স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রদায়গত সাধনধারা ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু তাহাদের বক্তব্য এক। বস্তুতঃ পক্ষে—

না তহাঁ হিন্দু দেহরা ন তহাঁ তুরুক মসীতি।
দাদূ আটপ্ আপ হৈ নহীঁ তহাঁ রহ রীতি।

অর্থাৎ সেখানে হিন্দুর দেবালয়ও নাই, মুসলমানের মসজিদও নাই। সেখানে তিনি (ভগবান) আপনি বিরাজিত। ফলে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার স্থানও তথায় নাই। তাই কবীর বলিয়াছেন, 'নির্ভৈ নির্পখ হোই'—সম্প্রদায়বুদ্ধি বিমুক্ত হইয়া নির্ভয় হও। কারণ, 'মানব ইতিহাসে তাঁহার (ভগবানের) অখণ্ড বেদ উচ্চারিত।' (মন্ত্রবাণী) তন্ত্রও এই অখণ্ড বিশ্ববেদ ও মানব সমাজকে আপনার গুরুজ্ঞানে নমস্কার করিতে বলিতেছে—"গুরুবুদ্ধ্যা নমেৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্." গুরুবুদ্ধিতে সমগ্র বিশ্বজগৎকে ও মানব সমাজকে নমস্কার কর। সুতরাং ভাগবত বা তন্ত্র কেহই গুরুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে নাই!

কালক্রমে হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও ক্রমাবনতির ফলে নূতন ধর্ম্মের উদ্ভব হয়, জন্মলাভ করে বৌদ্ধধর্ম্ম। জন্মের প্রাক্কালে বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল হিন্দুধর্ম্মেরই নূতন এক সংস্করণ। কারণ ইহা হিন্দু ধর্ম্মের জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি বহু বিষয়ের ন্যায় হিন্দুর গুরুবাদকেও আত্মস্থ করে। আবার বৌদ্ধধর্ম্মের অনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডবাদ ও বৈদিক শূন্যবাদ বস্তুতঃপক্ষে একই। বেদের দশম মণ্ডলে নাসদীয় সূক্তে বৌদ্ধ শূন্যবাদের মূল রহিয়াছে বলা যাইতে পারে [দ্রঃ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শূন্যপুরাণ, ক্ষিতিমোহন সেনের, ভাঃ মধ্যযুগে শূন্যবাদ] এই শূন্যবাদের সাধনা অতি জটিল এক সাধন-প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। ইহাকে বৌদ্ধ সিদ্ধাসাধন প্রক্রিয়া বলিতে পারি। এই সিদ্ধাগণও তাহাদের রচিত চর্য্যাপদে একাধিক বার সদ্‌গুরু সন্ধানের কথা বলিয়াছেন। শান্তিপাদ নামক জনৈক বৌদ্ধ সিদ্ধার এক পদে পাই—

মা আমোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ণ পুচ্ছসি নাহা।

অর্থাৎ মায়া মোহ ভরা এই সমুদ্রের তো অন্ত নেই। ইহার থৈ পাওয়া ভার। আগে যদি কোন নৌকা দেখিতে পাও তাহা হইলে সন্ধানী লোককে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লও। এখানে 'আগের নৌকার সন্ধানী লোক' গুরু ব্যতীত আর কেহ নহেন। গুরুকে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানে দেখিবার যে অভীপ্সা তাহা এই সময় হইতেই ধর্ম্মে ও সাহিত্যে প্রকট হইয়া উঠে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা প্রায় নয় শত হইতে একাদশ শতকের শেষভাগ অবধি বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী তিন শত বৎসর ভারতীয় সাধনার ধারা অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। কারণ বৌদ্ধধর্ম্মাসক্ত পাল রাজাদের রাজত্বকালে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুরাগী সেন রাজবংশের রাজত্বকালে তাহার গতি ব্যাহত হয়, শক্তিও হ্রাস পায়, বিশেষ করিয়া ত্রয়োদশ শতকে তুর্কী আক্রমণের ফলে বাংলার মাটিতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার হইতে থাকে। এই ইসলাম ধর্ম্মের একটি শাখা হইল সুফীবাদ, সুফীবাদের সহিত হিন্দু বৈষ্ণব মতবাদ এমন কি উপনিষদের বিশিষ্ট অধ্যাত্মবাদেরও বিশেষ মিল দৃষ্ট হয়। ফলে সুফীবাদ বাংলার মাটিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সুফীবাদে মুরশীদের স্থান হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের গুরুর ন্যায়ই অতি উচ্চে। মুরশীদবাদ ও গুরুবাদ তাই সাধারণ লোকচিত্তে অভিন্ন আকৃতিতে গৃহীত হয়। বিশেষ করিয়া ক্রমক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্লাবনে দ্রুত অবলুপ্তির পথে চলিয়াছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণ তাহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্মচর্চা ও ধ্যান ধারণাকে নূতন করিয়া প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের কঠোর বিধি-বিধান অতিক্রম করিয়া তাহারা সহজে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিল না। আবার ইসলাম ধর্ম্মকেও অন্তরের সহিত গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য হইতে এই সময়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের অবসানের অব্যবহিত কাল পরেই এক নূতন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায় জন্ম লয়। নব উদ্ভূত এই ধর্ম্ম সম্প্রদায় বাউল নামে পরিচিত। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বলেন, বাউলের জন্ম চতুর্দ্দশ শতকের শেষ ভাগ কি পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগ। বাউল জন্মগ্রহণ করিয়াছে সিদ্ধা ও মুসলমান ফকীর হইতে। এই মুসলমান ফকীরেরা হইলেন সুফীবাদের পূজারী। বস্তুতঃ পক্ষে বাউল মতের মধ্যে সমভাবে কাজ করিয়াছে শূন্যবাদ, সহজবাদ (বৌদ্ধ সহজযানবাদ) ও গুরুবাদ বা মুরশীদবাদ। বাংলার বাউলের ইতিহাস সুরু হইয়াছে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিপীড়িত বৌদ্ধরাই বাউল। পরবর্ত্তী কালে এই বাউল সম্প্রদায়ের সহিত বহু সংখ্যক মুসলমান সাধকও যুক্ত হন। তাই বাউলের মধ্যেও গুরুবাদের প্রাধান্য খুব বেশী। বাউল মূলতঃ দেহকেন্দ্রিক শূন্যবাদের সাধক, কিন্তু গুরুকেন্দ্রিক সে সাধনা। শূন্যবাদ ভিত্তিক বৌদ্ধধর্ম্মেও গুরুবাদের প্রভাব অপরিসীম। বৌদ্ধ সাধকদিগের সাধনমন্ত্র ছিল তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী—চর্য্যাপদ সমূহ, বাউলের সাধনারও প্রধান অবলম্বন মরমী সাধক হৃদয়ের অন্তরনিঃসারিত গীতলহরী। বাউলের ধর্ম্মমত সম্পর্কে অন্য কোন মুদ্রিত বা অমুদ্রিত পুঁথি বাউল সমাজে প্রচলিত আছে বলিয়া জানা যায় না। চর্য্যাপদের ন্যায় এই সব গানগুলিতেও গুরুবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে গুরুবাদী বাউল সম্প্রদায় কায়সাধক শূন্যবাদী বৌদ্ধ সিদ্ধাবর্গের সাক্ষাৎ বংশধর। এই সম্বন্ধে এই দুই সম্প্রদায়ের অনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডবাদী ধর্ম্মমতের নিকট সাযুজ্য ও ঐক্য লক্ষ্যনীয়।

দুই

আমরা দেখিয়াছি, বাউল ধর্ম্ম বা মত চতুর্দ্দশ শতকের কাছাকাছি সময়ে উদ্ভূত। এই সময় বাঙলার সাধনধারা যে গুরুবাদের দ্বারা কিরূপ প্রভাবিত ছিল তাহা আমরা পশ্চাতে দেখাইব। তৎপূর্ব্বে

সমকালীন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধকবৃন্দের সহিত গুরুবাদের সম্পর্ক প্রদর্শন মানসে আমরা দু'-চার কথা বলিতেছি।

মধ্যযুগে ইসলামিক মতবাদ রাজধর্ম্মের গৌরবে যখন ব্যাপক ভাবে জনচিত্তে আঘাত হানিতে থাকে, সেই সময়ে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি স্ব স্ব মতবাদের ভিত্তিকে সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হন। এই সব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুসারিগণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, 'সম্প্রদায় না হইলে সাধনা সুরক্ষিত হয় না।' আবার এই সময়েই আবির্ভূত হন সকল প্রকার সম্প্রদায়-চিন্তা-বিমুক্ত সাধক কবীর, দাদু, তুলসী, য়্যারী, তাজ, কায়ম ইত্যাদি সন্তের দল। ইঁহারাও গুরুবাদেরই সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা সম্প্রদায় ভিত্তিতে আপনাদের ধর্ম্মকে খণ্ডিত করেন নাই। ইঁহারা হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলকে স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে গুরু নির্ব্বাচন ও ধর্ম্মাচরণের নির্দ্দেশ দিতেন। ফলে ইঁহাদের মধ্যে অনেক মুসলমান সাধকেরও হিন্দু ব্রাহ্মণ শিষ্য রহিয়াছে দেখা যায়। আবার বহু মুসলমানও হিন্দুর সাধনাকে অন্তরে বরণ করিয়া লন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সন্তান সাধক তুলসী একই কালে লিখিয়াছেন, 'সবি ঘটমে হরি বসেতরৈমেঁ গিরিন্দুতমেঁ' এবং 'সব খুদা ভরপুর হৈ, রুহ মেঁ নিরখ দিল দেখ জাই'—'খোদা আছেন সব পরিপূর্ণ করিয়া, আত্মার মধ্যে দেখ খুঁজিয়া, হৃদয়ের মধ্যে দেখ যাইয়া।' এই তুলসীও ছিলেন গুরুবাদের পথিক। তিনিও বলিতেন, "পরিপূর্ণ সমর্থ গুরুর সঙ্গে যুক্ত হ, যে গুরু সত্যের, সন্তোষের ও ধৈর্য্যের সাধনায় সিদ্ধ। তিনি তোকে মিলন-নাড়ী পাইবার সন্ধান দিবেন।" আবার মুসলমান সাধক কায়ম ও য়্যারী হোলির গান রচনা করিয়াছেন। এবং ইঁহারাও ছিলেন গুরুবাদেরই পথিক। বস্তুতঃ পক্ষে, এই সব সাধক সম্প্রদায়ের নিকট 'হিংদু তুরুক ন হইয়া সহিব সেতী কাজ'—প্রশ্ন হিন্দু-মুসলমানের নয়, ভগবানকে পাওয়াই হইল কাজ। আর তাই কায়মকে আমরা গাইতে শুনি—

গুরু বিনে হোরী কোন খেলাবৈ।
কোঙ্গ পংথ নমাবে।
করৈ কৌন নির্মল যাজী কো
মায়া মন তেঁ ছুড়াবৈ।

গুরু বিনে কে খেলাইবে হোলী, দেখাইবে পথ? কে করিবে জীবন আমার নির্মল, ছুটাইবে মন হইতে মায়া? সত্যই গুরুহীন সাধনা "ব্যর্থম্ উষরে বপনম্ যথা।" পবিত্র কোরাণ শরীফও বলেন, 'মানলায় শা লাহুশয়খো ফশয় খুপুশ শয়তানে' অর্থাৎ যাহার পীর নাই তাহার পীর শয়তান (হারামণি-মুঃ মনসুর উদ্দীন)। গুরুবাদ এই ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই স্ব স্ব সাধনগুরুর স্থান স্বীকৃত হইয়াছিল।

তিন

এইবার আবার বাউল ধর্ম্ম ও বাংলার গুরুবাদী সাধনার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিতেছি। আমরা দেখিয়াছি, কোরাণ সরীফ বলেন, পীরহীনের পীর শয়তান। এই ইসলামী মতবাদ সুফীবাদের মধ্য দিয়া বাংলার বাউলকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। কমল বাউলকে আমরা গাইতে শুনি—

যাহার মুরশেদ নাই সে নাই কোনদিনে।
অবশ্য লইবে তারে ধরিয়া শয়তানে।

অর্থাৎ বাউল গুরুকে শুধু আশ্রয় করিতেই চাহে না। গুরুহীনের সাধনাকে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ বলিয়া মনে করে সে। গুরু তাহার সাধনায় প্রথম ও প্রধান কথা। গুরুই তাহার আরাধ্য—প্রথম অনুসন্ধানের বিষয়। 'মনের মানুষ' সন্ধানেরও আগে তাই প্রয়োজন পাটনী ঠিক করা। তাই বাউলকে গাইতে শুনি—

ধরবি রে অধর জানবি রে অধর
ধরবি সে আলেক মানুষ,
আগে তার পাটনী ঠিক কর।

পাটনীই হইল বাউলের সাধনায় সেই গুরু—যাকে অবলম্বন করিয়া সে 'জাইব পুন জিনউয়ারা'। (সিদ্ধা ডোম্বীপাদ) গুরু তাই 'আলেক নিরঞ্জন' সাধনায় আগেই নির্ব্বাচন প্রয়োজন। এই মত শুধু বাউল নয়, হিন্দু-মুসলমান এমন কি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সাধকগণের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করিয়া হিন্দু-মুসলিম সকল বাউলই এই মতের পথিক। তাই 'অধীন পাঞ্জু' যেমন বলে,

মুরশিদ, আমায় ফেল না, চরণ দিতে ভুল না
আমি পদে পদে অপরাধী গো।

তেমনি হীরালাল বাউলও বলে—

দয়াল গুরু আমায় পারে লয়ে চল,
তুমি দীনহীন কাঙ্গালের বান্ধব,
কে আছে আর বল বল।

এখানেও গুরুকে সেই পারের কাণ্ডারীরূপেই দেখা হইয়াছে। গুরুর সাধন শক্তি অবিজ্ঞাত। তিনি শুধুই পারের কাণ্ডারী নহেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর সমান। তাই তো বাউল গায়—

গুরুরূপে যে দিয়েছে নয়ন
যে জেনেছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝে গুরুরূপে সেই নিরঞ্জন।

অর্থাৎ গুরু শুধুই পারের কাণ্ডারী নহেন—সাধ্যের সঙ্গে অভিন্ন তিনি। মামুদ সুকুরের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসে' সিদ্ধা হারিপাদ রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন—

সর্ব্ব দেব হইতে বাছা গুরুদেব বড়।
গুরু ভজ, জ্ঞান শিব, মায়াজাল ছাড়।

স্মরণ থাকিতে পারে, মামুদ সুকুর উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের লোক ছিলেন। তিনিও গুরুকে সাধ্যের সঙ্গে এমন পরিষ্কার ভাবে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুরুবাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। গুরুকে এই ভাবে 'আলেক মানুষ' নিরঞ্জনের সহিত এক করিয়া দেখা সুফীবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। বাউল এই সুফীবাদকে আশ্রয় করিলেও গুরুর সম্পর্কে বাউলের চিন্তার ধারা আরও ব্যাপক। হিন্দুকুলজাত নদীয়ার বাউল লালন ফকীর বলিতেন, 'গুরুকে যে মনুষ্য জানে তার অধঃগতি নরকে স্থান।' গুরুকে মনুষ্য কল্পনায় নরকস্থিতির বিধান প্রকৃতপক্ষে ভক্তহৃদয়ের আকুতিটুকুকেই প্রকাশ করিতেছে। ভক্ত মনে করিবে, 'যে হরি সেই গুরু, ভক্তের কল্পতরু, কর্ণধার সদ্গুরু।' (গোবিন্দ বাউল) আর তাই—

মুরশিদ নাই যার সঙ্গের সাথী
এ জগতে সে অনাথী,
ঘাটে বেয়ে যে দুর্গতি সে বলিবার নয়।
(গোপাল বাউল)

আর তাইতো বাউলের সাধনায়, আর শুধু বাউল কেন, সকল সাধনারই প্রথম কথা হইল, 'গুরুচরণ চিনে ভজ রে তারে।' সত্যই ভক্তের কাছে 'গুরু বলে যার প্রাণ কাঁদে তার তুলনা আছে কোই?'

গুরুকে সাধ্যের সঙ্গে একাত্ম করিয়া দেখিবার রীতি বাউলের অসংখ্য গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইলেও বাংলার অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধনাতেও এই গুরুবাদের ভূমিকা অপরিসীম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈষ্ণব সমাজে গোস্বামিগণের প্রভাব ও সাধারণ গৃহস্থ হিন্দুসম্প্রদায়ের জীবনে কুলগুরুর স্থানের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চার

ভারতীয় সাধনধারার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা গুরুবাদের প্রভাব দেখাইলাম। গুরুবাদের এই প্রভাব ভারতীয় সাধনার ধারাকে যেমন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের একটি ধারাও এই গুরুবাদের মহিমা কীর্ত্তনের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। আমরা ভারতীয় সাধন সাহিত্যের কথাই বলিতেছি। ভারতীয় সাধকগণের মধ্যে অসংখ্য মরমী কবি সাহিত্যিক ইত্যাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব সাধনার অঙ্গ হিসাবেই দেখিয়াছেন সঙ্গীত ও সাহিত্যকে। এই সব সাধকেরা তাঁহাদের অন্তরের বিচিত্র ভাবরাশিকে মহামূল্য কাব্য-সঙ্গীতের আকারে অক্ষয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন উত্তর-সূরীদিগের জন্য। এই সৃষ্টির একটি বৃহৎ অংশই হইল গুরুবাদের মহিমা কীর্ত্তনে ভরপুর।

গুরুবাদের প্রভাবে যেমন হিতসাধন হইয়াছিল তেমনি একথাও সত্য যে, গুরুবাদ সময় সময় ইশাককেও অতিক্রম করিয়া সাধনা ও সাহিত্যের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছে। ভক্তের আকুতির সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর 'ধর্ম্ম-পথিক' ধর্ম্ম ব্যবসায়ী হইয়া উঠে। ফলে ধর্ম্মের সহজ সরল রূপ ক্রমবিকৃতির মধ্য দিয়া কালক্রমে বহিরঙ্গের আচার-সর্বস্বতায় পরিণত হয়। ইহার ফলে এক শ্রেণীর সাধক গুরুবাদের প্রভাব হইতে ধর্ম্মকে মুক্ত করিবার জন্য প্রচার করিতে থাকেন, গুরুবাদের বিরুদ্ধবাদী। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধ সিদ্ধাদিগের আমল হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সিদ্ধারা এই গুরুকরণের পক্ষে যেমন ছিলেন, তেমনি তাঁহাদের মধ্যে বিরুদ্ধবাদীরও অভাব ছিল না। একটি চর্য্যাপদে পাই—'ঘরে আছই বাহিরে পুচ্ছই। পই দেকখই পড়িবেশী পুচ্ছই।'—ঘরে যে রহিয়াছে তাহাকে বাহিরে কি খোঁজ করিতেছ? আগে ঘর না দেখিয়া প্রতিবেশীদিগেরই বা কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? তাহাদের মতে যে প্রতিবেশীকে সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানে জিজ্ঞাসা কর, সেই সর্ব্বজ্ঞ 'পণ্ডিঅ সঅল সত্য বক্খানই'—বাহির হইতেই সেই পণ্ডিতেরা সত্যের ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আসল ভেদের কথা জানেন না ; তাঁহারা এমনিই চারি বেদ পড়িয়া যান—"বম্হণেহি ন জানও হি ভেউ। এবই পড়িঅউ এ চচ বেউ।" অথচ তাঁহাদের সেই বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া সাধারণ মনুষ্যের দল প্রকৃত পক্ষেই সত্য-ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া নানা ভাবে বিভ্রান্ত হয়—'করেহিঁ খুমখুসাই জণ ধন্ধী।' পরবর্ত্তীকালে এই বিরুদ্ধ স্বর ক্রমে ক্রমে "মন্দির-মসজিদ-গুরু-মুরশেদ" সকলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে সকল শ্রেণীর সাধক সমাজেরই কণ্ঠে। এই ভেদের কথা স্মরণ করিয়াই সহজিয়া পথের পথিক মরমী বাউল মদনকে আমরা গাইতে শুনি—

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।
ডুইয়্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় তাতেই যদি জগৎ-পুড়ায়
বলতো গুরু কোথায় দাঁড়ায়, অভেদ সাধন-মরল ভেদে।
তোর দুয়ারেই নানান তালা পুরাণ কোরাণ তসবী মালা
ভেক-পন্থই তো প্রধান জ্বালা, কাঁইদে মদন মরে খেদে।

পাঁচ

গুরুবাদের এই বিকৃতি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার ফলে সম্পূর্ণ হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় দেব-দেউল-ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। ফলে, 'ধর্ম্ম নয় সম্পদের হেতু, নহে সে সুখের সেতু, ধর্ম্মেই ধর্ম্মের শেষ'—ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই যে সনাতন বোধ ও সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের হাতে পড়িয়া তাহা ক্রমশঃই বিনষ্ট হয়। এই সম্প্রীতি ও বিনষ্টির মূলে রাজনৈতিক কারণও যে কাজ করিয়াছে, যবন-হরিদাসের নির্য্যাতনের কাহিনী হইতে তাহা জানিতে পারা যায়।

এ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে, খুব সম্ভবত 'মুলুকের অধিপতি স্থানে' যবন হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাষণ্ডীরাই আনেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা হরিদাসকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাঁহাদের বৈষ্ণব-হিংসা চরিতার্থ করেন। বিশেষ করিয়া ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল জনৈক মুসলমান কাজীর অলঙ্ঘ্য অভিযোগ, 'হরিদাস যবনকুলে অমহিমা আনিবেক' অর্থাৎ রাজার হাতের prestige নষ্ট করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মীয় এই উভয়বিধ কারণেই ধর্ম্ম খণ্ডিত ও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সব সম্প্রদায়গুলি তাহাদের স্ব স্ব নিয়ম আচারের দ্বারা ধর্ম্মকে ক্রমেই সঙ্কুচিত করিয়া আনেন এবং কালক্রমে দেখা যায়, 'বেড়াদীনহী খেতকো বেড়াহী খেত খায়' যে বেড়া দেওয়া হইল ক্ষেত্র রক্ষার নিমিত্ত তাহাই অবশেষে ক্ষেত্র ভরিয়া তুলিল, ধর্ম্মের এই আচারসর্বস্বতা দূর করিয়া তাহার প্রকৃত রূপ পুনরুদ্ধারের জন্য রামমোহন রায় পরবর্ত্তীকালে চেষ্টা করেন। ইহাতে ধর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশ কতটা হইয়াছিল তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে, নবজাগরণের যুগে ধর্ম্ম সম্বন্ধে রামমোহনের উদার নৈতিক মতবাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

সর্ব্বশেষে গুরুবাদ সম্পর্কে একটি কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল অসঙ্গতি ও অত্যাচারকে ছাড়াইয়া গুরুবাদ ভারতীয় সাধক সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছিল। এবং তাহারই ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের কাল হইতে গুরুবাদবিরোধী ধারার জন্ম হইলেও আজিও তাহা গুরুবাদকে নির্মূল করিতে পারে নাই। আজও গুরুবাদ অব্যাহত গতিতেই চলিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন গুরুবাদী সাধনার সহিত বর্ত্তমান গুরুবাদের পার্থক্য নিঃসন্দেহে একটি লক্ষণীয়

বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমানে গুরুকরণ অভীপ্সার গতি-প্রকৃতি দেখিয়া বলা যাইতে পারে, হিন্দু সমাজে বর্ত্তমানে সন্ন্যাসীকেই মন্ত্রদাতা গুরুরূপে গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। গৃহী কুলগুরুকরণ প্রথা আজ ক্রমশঃই অবলুপ্তির দিকে চলিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর গুরুকরণ রীতি আজও অব্যাহত রহিয়াছে। আজও শত সহস্র ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে গুরুর অপার মহিমা—

বস রে মন গুরুর কাছে
ও সে, গুরুবিনে ভবে কি ধন আছে।

ও যে গুরু বস্তু চিনলি না রে মন,
ও অবোধ মন বস রে গুরুর কাছে।

ও সে গয়া গঙ্গা কাশী, তীর্থ বারাণসী,
সকল তীর্থ গুরুর শ্রীচরণে আছে।

গুরু ছাড়া শিষ্য বাঁচে কিসে ?
বস রে মন গুরুর কাছে।

ও সে গুরু বিনে ভবে কি ধন আছে ?
যে জন সাধন করেছে, গুরু ধরেছে,
অধর মানুষ ধরে বসে আছে
ও সে বস রে মন গুরুর কাছে।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

১। হারামণি—মহম্মদ মনসুর উদ্দীন, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত।
২। হিন্দুমুসলমানের যুক্ত সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী।
৩। প্রাঃ বাং সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান—প্রমথ চৌধুরী, ঐ।
৪। শূন্যপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। বন্ধুবর মুহম্মদ সাহেব।
৬। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।
৭। তুলসীদাসের দোঁহা।

শেষ বেলা

শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায়

জীবন যখন অস্তগমন পথে শেষবার তাকাবে
এ ধরাপানে
শেষবেলাকার সূর্য, তোমার তরে রেখে যাবে
তার সবশেষ ভালবাসা।
মনে করিবে কি, তোমার আলোর রঙ্গে,
কত দিন তার কত হাসি কত গানে
অমরাবতীর স্বপ্ন ছুঁয়েছে তারে, জাগায়েছে মনে
সুদূর বিথার আশা ?

এই ধরণীর আলোছায়া কতদিন, তারার দেশের
ইশারা-মুখর-রাতি,—
এ সবে তাহার কত লেগেছিল ভাল,
কতবার করে মেখেছে তাহার নেশা,
দূরের আকাশ শুধু জেনেছিল তাহা,
আর জেনেছিল গৃহকোণে সাঁঝবাতি
হে বসুধা, বলো স্মরিবে কি ক্ষণকাল,
ছোট সে জীবনে হাসি-অশ্রুতে মেশা ?

তটিনি, তোমার মঞ্জুল কলগীতি পাতাঝরা
কত বেতসবনের ছায়ে
ছলছল কত না-বলা-কথার সুরে
ভাসায়ে নিয়েছে তাহার হৃদয়-ভেলা।
আলোর চুমকী বসান রূপালী শাড়ি,
গহন বনের ছায়া উত্তরী গায়ে ;
ভালোবেসেছিল সে তোমারে, ভুলোনা গো,
তোমার সাথেই ছিল তার যত খেলা।

আর মনে রেখো, দিগন্তে শুকতারা,
সাঁঝ-আকাশের কপালে রূপালী টিপ,
আঁখি-জলে-ভেজা কত যে সন্ধ্যা হায়,
তোমা পানে চাহি কেটেছে সংগোপনে ;
তার জনহীন গৃহ-অঙ্গনতলে জ্বলিত না যবে
সোনার সন্ধ্যাদীপ
তুমি ভুলায়েছ তার সে আঁধার-ব্যথা,
মিতালি করেছ তার সাথে মনে মনে।

জীবন-গীতা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীগৌতম সেন

জগত সৃষ্টি করলো কে?

অর্জুন জানতে চাইলেন জগতের সৃষ্টিকর্তা কে, আর এই সৃষ্টির রহস্যই বা কি?

ভগবান বললেন, এ প্রশ্ন তোমার, এ প্রশ্ন সকলের। একটা উদ্ভিদের দিকে চেয়ে দেখো, সে ধীরে ধীরে মাটি ঠেলে উঠছে। একদিন দেখা গেলো, সেদিনের সেই ছোট গাছটি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সে বৃক্ষও একদিন মরলো। মরবার সময় রেখে গেলো তার বীজ। এই বীজ থেকেই বৃক্ষ—বীজে তার পুনঃ পরিণাম। ডিম থেকে পাখি হয়, রেখে যায় সেই ডিম—ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। প্রত্যেক পদার্থেরই মূল উপাদান হলো বীজ। সূক্ষ্ম আকার থেকে স্থূলরূপে, আবার সূক্ষ্মরূপেই তার লয়। বৃষ্টির একটি ফোঁটাই বরফ হয়, আবার সেই বরফ জল হয়ে সমুদ্রে মিশছে। প্রকৃতির সকল বস্তুই এই একই নিয়মে চলছে। নদীর স্রোত পাহাড়কে গুঁড়ো করে বালিতে পরিণত করে—সেই বালি যাচ্ছে সমুদ্রে, স্তরে স্তরে জমে উঠছে, আবার পাহাড়ে পরিণত হচ্ছে। আবার পাহাড় গুঁড়ো হবে, আবার শক্ত হবে। বালুকা থেকেই শৈলমালার উদ্ভব, আবার বালুকাতেই তার পরিণতি। আকাশের নক্ষত্রও এসেছে সেই এক ধারাকে অনুসরণ করে। এসেছে পৃথিবীও, নীহারিকাময় পদার্থ-বিশেষ থেকে—শীতল থেকে শীতলতর, তারপর ভূমিরূপা ধরিত্রী, আবার সেই তুহিন-শীতলেই তার লয়। প্রতিদিন ঘটছে এই ঘটনা—স্মরণাতীত কাল থেকে। একই ইতিহাস মানুষেরও, প্রকৃতিরও।

পর্বতের উৎপত্তি বালুকা থেকে, বালুকাতেই তার পরিণাম। বাষ্প থেকে নদী, যায় আবার বাষ্পেই, উদ্ভিদ আসে বীজ থেকে, বীজই তার পরিণাম। মানব-জীবন আসে মনুষ্য-জীবাণু থেকে, যায় আবার সেই জীবাণুতেই। গ্রহ-উপগ্রহ নদ-নদী যে অবস্থা থেকে এসেছে, সেই অবস্থাতেই আবার ফিরে যাচ্ছে। অর্থাৎ স্থূল অবস্থা তার কার্য, সূক্ষ্মভাব তার কারণ। 'নাশঃ কারণো লয়ঃ।' পৃথিবী ধ্বংস হলে, যে ভূতে তার আকার তাতেই সে পুনরাবর্তন করবে। একেই নাশ বলে—কারণ লয়। কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নয়—কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র।

অর্জুন বুঝতে পারছেন, কোনো কিছুই কারণ ছাড়া আসে না। কারণ কার্যের ভিতরেই সূক্ষ্মরূপে বর্তমান।

ভগবান বললেন, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডও এসেছে সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড থেকে। যেমন বীজ থেকে বৃক্ষ এসেছে। বীজেই সে বর্তমান ছিলো পরে ব্যক্ত হয়েছে! এই সূক্ষ্ম থেকে স্থূলে যাওয়ার নামই ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশ যখন আছে, তখন ক্রমসংকোচও আছে। প্রত্যেক বস্তুর ক্রমবিকাশের আগে তার ক্রমসংকোচের প্রক্রিয়া রয়েছে।

অর্জুন বললেন, সে তো অনুমান।

না, প্রত্যক্ষ সত্য। যে ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হলো, তা ঐ মহাপুরুষেরই ক্রমসংকুচিত ভাব। সূক্ষ্ম অব্যক্ত ভাবে গতি, [illegible]ভাবে [illegible]। সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রম-সংকোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই ক্রম-সংকুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিলো। বীজ থেকে বৃক্ষের উদ্ভব, আবার বীজে তার পরিণাম। সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম সমান। পৃথিবীর উৎপত্তি তার কারণ থেকে, আবার কারণেই তার লয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই এক কথা—আদি অন্ত উভয়েই সমান। আরম্ভ জানতে পারলেই তার পরিণাম জানা যায়, আবার অন্ত জানতে পারলেই তার আদিও যায় জানা। এই ক্রম-বিকাশশীল জীব-প্রবাহের—যার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণমানব, তারা একই বস্তু। অন্তে যখন পূর্ণমানব, আদিতেও তাহলে তিনি। জীবাণুও তাহলে উচ্চতম চৈতন্যের ক্রম-সংকুচিত অবস্থা। এই ক্রম-সংকুচিত চৈতন্যই আপনাকে ব্যক্ত করবার আগ্রহে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলাই ধর্ম।

জগত সম্বন্ধেও সেই এক কথা। জগতের শেষ পরিণামও তাহলে চৈতন্য। জাগতিক ক্রমবিকাশের ফলে চৈতন্যই যদি সৃষ্টির শেষ হয়, তাহলে সৃষ্টির কারণও চৈতন্য। চৈতন্যই জগতের শেষবস্তু—সৃষ্টি-ক্রমের শেষ বিকাশ। অন্ত যখন আছে, তখন আদিও আছে। চৈতন্য ছাড়া জগত নয়—কোথাও ব্যক্ত, কোথাও অব্যক্ত। এই সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। সেই ক্রমসংকুচিত বিশ্বজনীন চৈতন্য নিজেকে ব্যক্ত করছেন যতদিন না তিনি পূর্ণতা লাভ করছেন।

সবই ঘুরে আসে

ভগবান বললেন, জগতে কিছুই ধ্বংস হয় না। নতুনও কিছু নেই—কিছু হবেও না। সেই একই জিনিস বারে বারে ঘুরে আসছে। জগতে যত গতি আছে সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠছে, একবার পড়ছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ থেকে প্রসূত হচ্ছে, আবার স্থূলরূপ ধারণ করছে। পুনরায় লয় হয়ে সূক্ষ্মভাব ধারণ করছে। এই সূক্ষ্ম থেকে স্থূল—স্থূল থেকে কারণে গমন। এই নিয়ম।

কিন্তু যায় কি? যায় রূপ, যায় আকৃতি।

একটিমাত্র প্রাণ, একটিমাত্র জগত। মনে হয় বহু, কিন্তু বহু নয়। লোকও বহু নয়, জীবনও বহু নয়—বহু সেই একেরই বিকাশ। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করছেন।

ভগবান বললেন, আত্মার কথা শোনো—দিবারাত্রি শোনো যে, তুমিই সেই আত্মা। দিন-রাত তা আওড়াতে থাকো—যে পর্যন্ত না ঐভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরা-ধমনীতে খেলতে থাকে, যে পর্যন্ত না তোমার মজ্জাগত হয়ে যায়। সমস্ত দেহটাকেই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করে ফেলো—আমি অজ, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্যজ্যোতির্ময় আত্মা। দিন-রাত্রি চিন্তা করো, চিন্তা করো যে পর্যন্ত না তোমার প্রাণে গাঁথে চিন্তা করো, ধ্যান করো! হৃদয় পূর্ণ হলেই মুখ কথা বলে, হৃদয় পূর্ণ হলে হাতও কাজ করে।

যোগের পথে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এর পর অর্জুনকে বললেন, হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। কারণ, জ্ঞানে ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। সাধনা ছাড়া সিদ্ধি নেই। যোগ মানেই তো অভ্যাস। অভ্যাস করলেই মানুষ সব পারে। অভ্যাসে দেহের পেশীকে যখন ইচ্ছামত চালনা করা যায়, তখন দেহের অভ্যন্তরস্থ যে-মন এবং প্রাণ তাদের ইচ্ছামত চালনা করা যাবে না কেন? এই মন এবং প্রাণকে ইচ্ছামত চালনা করাই হলো যোগ।

অর্জুন বললেন, এই সাধনায় হয় কি?

ঈশ্বরকে জানা যায়। জানে কে? মন। এই মনকে বাঁধো, তবে তো জানবে। তোমার চঞ্চল-মনকে বাঁধবার জন্তেই এত আয়োজন। মনকে কেন্দ্রাভিমুখ করতে হবে। একাগ্র হয়ে চিন্তা করো—সেই চিন্তা, যাকে তুমি চাও। সেই তো ধ্যান। ধ্যান মানেই তো মনকে স্থির করা। কোথায় স্থির কর? আত্মায় মন স্থির করো। কিন্তু মনকে স্থির করা কি সহজ কথা? চিন্তার চক্রকে জোর ক'রে না থামালে একাগ্রতা কোথা থেকে আসবে? বাইরের চক্র হয়তো থামানো যায়, কিন্তু ভিতরের চক্র? সে যে নিরন্তর চলতেই থাকে। তবে?

এই 'তবে'র কথাই অর্জুন জানতে চাইলেন।

এই জন্তেই দরকার জীবনের পরিমিততা। নিয়মিত আচরণই হলো জীবনের পরিমিততা। আর চাই সমদৃষ্টি। সমদৃষ্টি কি? শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টি লাভ না হলে চিত্ত একাগ্র হয় না। সর্বত্র মঙ্গল দেখার অভ্যাস করো। দেখবে, চিত্ত আপনা থেকেই শান্ত হবে।

ভগবান বললেন, মনের এই একাগ্র-শক্তিকে বাড়ানোই যোগীর কাজ। প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করো, প্রকৃতি নিজে তার রহস্তের দ্বার খুলে দেবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাইলেন। ভগবান হাসলেন, বললেন, একে জানাই তপস্তা। মানুষের এই মনের শক্তির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। মন যতই একাগ্র হয়, ততই তার শক্তি একটি লক্ষ্যের ওপর আসে। এই মনকে বহির্বিষয়ে স্থির করা সহজ, কারণ, মন স্বভাবতই বহির্মুখী।

এই মনই হলো আসল বস্তু। কারণ, মনই তো জানে। জানা মানেই তো অন্বেষণ—মনস্তত্ত্বের অন্বেষণ। মনই সেই মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করবার কর্তা।

এই মনের এমন একটা ক্ষমতা আছে, যে-ক্ষমতা দ্বারা সে নিজের ভেতরে যা হচ্ছে দেখতে পায়।

ভগবান বললেন, এই যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আমার এই 'আমি'ই আর-একজন লোক হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে যা করছি তাকে জানছি, শুনছি। তুমি একই সময়ে কাজও করছো, চিন্তাও করছো। কিন্তু তোমার মনের আর-এক অংশ, সেই সময় তুমি যা চিন্তা করছো তাই দেখছে। মনের এই সমগ্র শক্তি একত্র ক'রে মনের ওপরেই প্রয়োগ করতে হবে। মনই তোমার অন্তরতম রহস্য প্রকাশ করে দেবে। তখনই জানতে পারবে আত্মা আছেন কি না, ভগবান আছেন কি না।

এই মনের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ কি?

মন কেবল শরীরের সূক্ষ্ম অবস্থা-বিশেষ মাত্র। মন যখন শরীরের ওপর কাজ করে, তখন শরীরও মনের ওপর কাজ করে। শরীর অসুস্থ হলে, মন অসুস্থ হয়। আবার শরীর সুস্থ থাকলে, মনও সুস্থ সতেজ থাকে। দেখোনি, মনের অস্থিরতায় শরীর অসুস্থ হয়?

এই মনকে ইচ্ছামত নিয়োগ করা মানেই, শরীর ও মন উভয়কেই জয় করা।

অর্জুনের মনে বহু প্রশ্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি একটি করে তার খণ্ডন করেন। বলেন, তোমার শরীর ও মনের ওপর অধিকার স্থাপন করো। সাধনা তো ঐখানেই। এই সাধনায় শরীর ও মনকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনা যায়। মনকে আয়ত্ত করতে পারলেই তাকে ইচ্ছামত কাজে লাগানো যায়। তাকে একমুখী করা যায়।

অর্জুনের কৌতূহল বর্ধিত হলো।

ভগবান বললেন, মন সদা পরিবর্তনশীল। সে সবসময় একদিক থেকে অন্তদিকে দৌড়চ্ছে, কখনো বা সে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোতে সংলগ্ন থাকছে, আবার কখনো একটিতেই যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো ইন্দ্রিয়তেই নেই—এমনো তো হচ্ছে।

তুমি শব্দ শুনছো, চোখ খোলা রেখেও শুনছো। কিন্তু তুমি শুনতেই পাচ্ছো, কিছু দেখতে পাচ্ছো না। এই দেখতে না-পাওয়ার কারণ, তোমার মন তখন দর্শন-ইন্দ্রিয়ে নেই। ঠিক এই নিয়মেই মন সকল ইন্দ্রিয়ে একই সময়ে সংলগ্ন হতে পারে। মনের এই শক্তি শুধু বাইরের জগতেই নিবদ্ধ নয়, তার অন্তর্দৃষ্টিশক্তিও আছে। এই অন্তর্দৃষ্টিশক্তির বিকাশ-সাধন করাই যোগীর কাজ।

অর্থাৎ যোগের দ্বারা সূক্ষ্মানুভূতি লাভ। অর্জুন বললেন।

হাঁ। ঐ সূক্ষ্মানুভূতিতেই মানসিক অবস্থাগুলিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মানসিক অবস্থাগুলোকে পৃথক করে দেখো! কেমন করে তোমার দেখার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে—চক্ষু-যন্ত্র কেমন করে মনের কাছে সেই আঘাত পৌঁছে দিচ্ছে, মন কি ভাবে তা গ্রহণ করছে এবং কি ভাবেই বা বুদ্ধিতে গমন করছে, তারপরেই বা কি হচ্ছে, এইগুলোকে পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষ করাই যোগীর কাজ।

ভগবান বললেন, বলতে পারো, এ প্রত্যক্ষ করায় ফল কি? ফল, প্রকৃতিকে জয় করা। যোগের দ্বারা এ জয় সম্ভব।

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আপনার অধীন করাই মানুষের লক্ষ্য। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে হবে, প্রকৃতিকে তোমার ওপর প্রভুত্ব করতে দিলে চলবে না। শরীর বা মন কিছুই যেন তোমার ওপর আধিপত্য করতে না পারে। শরীর তোমার, তুমি শরীরের নও।

প্রাণশক্তি

কিন্তু মনের সঙ্গে শরীরের সম্বন্ধ জানতে হলে শরীরকে আগে জানতে হবে। তাই ভগবান বললেন, দেহ তো একটা খাঁচা। তার ভেতরেই রয়েছে আসল রহস্য। শরীরকে খাড়া রেখেছে কে? মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডের চারদিকে আছে অসংখ্য তন্তুজাল। এরাই বহন করে নিয়ে যায় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ। এ শক্তি বিদ্যুৎশক্তি।

কিন্তু আসল হলো প্রাণশক্তি। ভগবান বললেন, সমুদয় জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তারই নাম প্রাণ। জগতে যা কিছু দেখছো, যা এক স্থান থেকে অপর স্থানে গমনাগমন করছে, অথবা যার জীবন আছে, সবই এই প্রাণের বিকাশ। সমগ্র জগতে যত শক্তি প্রকাশিত হয়েছে, তার সমষ্টিই হলো প্রাণ।

ভগবান বললেন, এই প্রাণ যুগোৎপত্তির প্রাক্কালে গতিহীন অবস্থায় ছিলো, সৃষ্টির সঙ্গে হলো ব্যক্ত।

প্রাণ কি? গতিরূপে যা প্রকাশিত, তাই প্রাণ। স্নায়বীয় গতিরূপেও এই প্রাণ। এই প্রাণই প্রকাশিত হচ্ছে চিন্তায়, অন্যান্য শক্তিতেও। সমুদয় জগত এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি। মানুষের দেহও তাই। যা কিছু দেখছো, অনুভব করছো, সকল পদার্থই আকাশ থেকে উৎপন্ন। আর প্রাণ থেকেই উৎপন্ন হচ্ছে বিভিন্ন শক্তি। এই প্রাণকে বাইরে ত্যাগ করা ও ধারণ করার নামই প্রাণায়াম।

ভগবান বললেন, প্রাণ বলতে শ্বাস-প্রশ্বাস নয়। যে শক্তিবলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হয়, যে শক্তিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রাণস্বরূপ, তাই প্রাণ। কিন্তু প্রাণের অর্থ শক্তি নয়, কারণ, শক্তি ঐ প্রাণের বিকাশস্বরূপ। শক্তি তো প্রাণ থেকেই আসে।

অর্জুন নির্বাক-বিস্ময়ে চেয়ে আছেন—একটু একটু করে তাঁর চোখের সম্মুখে রহস্যলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

ভগবান বললেন, এই শক্তিও বিভিন্ন গতিরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। মন যন্ত্রস্বরূপ হয়ে চারদিক থেকে প্রাণকে আকর্ষণ করছে এবং এই প্রাণ থেকেই শরীররক্ষার কারণীভূত ভিন্ন ভিন্ন জীবনী শক্তি সৃষ্টি করছে। চিন্তা, ইচ্ছা, অন্যান্য শক্তিও ঐভাবে সৃষ্ট হচ্ছে। প্রাণায়াম দ্বারা মানুষ তার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শক্তি প্রবাহগুলিকে বশে আনতে পারে।

অর্জুন স্থির দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে। ভগবান বললেন, জগতে যতরকমের তেজ বা শক্তির বিকাশ আছে, সব ঐ প্রাণের সংযম থেকে তৈরি হচ্ছে।

তবু এই প্রাণের শক্তি দেহের সর্বত্র সমান নয়। কোনো দিকে বেশি, কোনো দিকে কম। এটা অসামঞ্জস্য, অনিয়ম। রোগোৎপত্তির কারণও এই। এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্যেই প্রাণায়ামের প্রয়োজন।

প্রাণায়ামের দ্বারা মানুষের অনুভব-শক্তি বাড়ে—মন তখন বুঝতে পারে, কোথায় কতটুকু প্রাণ আবশ্যক।

তারপর ভগবান বললেন, সমুদয় শক্তিগুলিকে সংযম করা মানেই দেহস্থ প্রাণকেই সংযম করা। ধ্যান করার মধ্যেও রয়েছে সেই প্রাণের সংযম।

সাধনা ও তার প্রয়োজন

অর্জুন যখন বললেন, সাধনার প্রয়োজন কি, আমাকে বলো। উত্তরে ভগবান বললেন, মহাসমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে, সেখানে রয়েছে অসংখ্য তরঙ্গ—বড় ছোট নানা তরঙ্গ। তরঙ্গ আছে, বুদ্‌বুদও আছে। কিন্তু ওদের সকলের পশ্চাতে রয়েছে এক অনন্ত মহাসমুদ্র। ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদও সেই অনন্ত সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত, আবার তরঙ্গগুলিও যুক্ত। তেমনি এক মহাশক্তির সঙ্গে জীবমাত্রেরই জন্মগত সম্বন্ধ। যেখানেই দেখবে জীবনীশক্তির প্রকাশ, জানবে তার পেছনে রয়েছে অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার।

একটি ব্যাঙের ছাতা—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিন্তু সে-ও অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার থেকে ক্রমশ শক্তি সংগ্রহ ক'রে আর এক আকার ধারণ করছে। কালে তা একদিন উদ্ভিদের আকার নেবে। উদ্ভিদ আবার একদিন পশুর আকার নেবে, পশু হবে মানুষ—এই মানুষই হবে একদিন ঈশ্বর।

ভগবান বললেন, প্রাকৃতিক নিয়মে এই রূপান্তরে পৌঁছুতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাচ্ছে। রূপান্তর হবেই। কারণ, এই নিয়ম। তবে মানুষ সাধনার দ্বারা সেই ক্রমকে এগিয়ে নিচ্ছে।

অর্জুন সেই সাধনার কথাই এর পর জানতে চাইলেন, যে-সাধনায় ঈশ্বর-উপলব্ধি হয়।

ভগবান বললেন, সাধনার প্রথম কথা একাগ্রতা। একাগ্রতা কি? শক্তি-সঞ্চয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি ক'রে সময়কে সংক্ষেপ ক'রে আনা। কিন্তু সেই শক্তি-লাভ করতে হলে তোমার দেহকে জানো—দেহকে খাড়া রেখেছে যে মেরুদণ্ড, সেই মেরুদণ্ডকে জানো। তার স্বরূপকে জানো, জানো তার ক্রিয়াকে।

ভগবান বললেন, এই মেরুদণ্ড—যার দুই পাশে আছে দুটি স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ, ইড়া এবং পিঙ্গলা। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা। আর মধ্যে মেরুদণ্ডের মধ্যনাড়ী—তিনিই সুষুম্না। এই সুষুম্নাকে নিয়েই যোগীর তপস্যা। তপস্যা হলো সুষুম্না-নাড়ীর বন্ধ দরজাকে উন্মুক্ত করা—যে দ্বার সর্বদাই বন্ধ থাকে।

অর্জুন বললেন, বন্ধ থাকাটাই যখন নিয়ম তখন তাকে খোলা কেন?

ভগবান বললেন, এইখানেই সকল রহস্যের চাবিকাঠি। যুগ-যুগান্ত ধরে ঋষিরা এই চাবি-কাঠির সন্ধান করেছেন—তাঁরাই জানালেন, এই পথে সন্ধান করো, পাবে।

অর্জুন সেই পথের কথা জানতে চাইলেন।

ভগবান বললেন, সুষুম্না হ'লো নালী-পথ—যে নালী-পথ মস্তিষ্ক থেকে মূলাধার পর্যন্ত নেমে এসেছে। নেমে এসেছে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত অবধি। এই মূলাধারে আছে কুণ্ডলিনী-শক্তি, যিনি নিদ্রিতা। যোগী সেই নিদ্রিতা-শক্তিকে জাগরিত করেন। এ শক্তি, তড়িৎ-শক্তি। জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তি সুষুম্নার নালী-পথ বেয়ে ঊর্ধ্বমুখে মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়। শক্তি যত ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে, মনের স্তরও একটির পর একটি খুলে যায়। এই কুণ্ডলিনী-শক্তি সর্বশেষ ধাপ মস্তিষ্কে এসে পৌঁছুলে যোগীর সাধনা সম্পূর্ণ হয়। তখন তিনি শরীর ও মন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যান।

অর্জুন এবার একটি একটি ক'রে প্রশ্ন করেন—দেহ কি? দেহ-যন্ত্রই বা কি, তাদের চালায় কে এবং মনের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে কার কতটুকুই বা সম্বন্ধ?

ভগবান সান্নিধ্যে অর্জুন দিবালোকের মতো সমস্তই প্রত্যক্ষ করলেন। প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলেন, অভিভূত হলেন এবং যিনি এই অপরূপের স্রষ্টা তাঁকে বার বার জানালেন প্রণাম। বললেন, এদের কাজ কি বলো?

এই যে কুণ্ডলিনী, মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন মূলাধার—এখান থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যে পথ, সেই পথের মাঝে মাঝে রয়েছে কেন্দ্র, যে কেন্দ্রের সঙ্গে রয়েছে স্নায়ুগুলির যোগ। অসংখ্য এই স্নায়ু—যা তুমি এইমাত্র প্রত্যক্ষ করলে।

ভগবান বললেন, এই স্নায়ু দু-রকমের। অন্তর্মুখী প্রবাহ আর বহির্মুখী প্রবাহ। একটি জ্ঞানাত্মক, অপরটি গত্যাত্মক। একটি

কেন্দ্রাভিমুখী, অপরটি কেন্দ্রাপসারী। অর্থাৎ কেউ মস্তিষ্কাভিমুখে সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ মস্তিষ্ক থেকে সেই সংবাদ অঙ্গের সর্বত্র নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে যাই করুক, যোগ রয়েছে মস্তিষ্কের সঙ্গে সকলেরই।

অর্জুন বললেন, মস্তিষ্কই যখন সব তখন স্নায়ুকেন্দ্রের প্রয়োজন কি ?

স্নায়ুকেন্দ্রগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করে। স্নায়ু-প্রবাহের ওপরেও তাদের প্রভাব আছে।

অর্জুনের জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠলো। এই স্নায়ু-প্রবাহের কাজ কি ?

নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি উত্থাপিত করলে দেখতে পাবে, শরীরের সব পরমাণুগুলির গতি এক দিকে হয়েছে। তখন নানাদিকগামী মন নানাদিকে না গিয়ে, একমুখী হবে একটি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরূপে পরিণত হচ্ছে। স্নায়ু-প্রবাহও পরিবর্তিত হয়ে বিদ্যুৎগতি লাভ করছে। যখন শরীরের সমস্ত গতিগুলো একমুখী হয়, তখন ইচ্ছাশক্তিও হয় প্রবল বিদ্যুতের আধার।

তাইতো ভগবান অর্জুনকে বললেন, তুমি যোগী হও। তাহলে সব-কিছু জানতে পারবে। বললেন, কুণ্ডলিনীকে জাগানাই তত্ত্ব-জ্ঞান—জ্ঞানাতীত অনুভূতি বা আত্মানুভূতির একমাত্র উপায় এই কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

কুণ্ডলিনী জাগে কিসে ? অর্জুনের উৎসুক প্রশ্ন।

তাকে জাগাতে হয়। এই জাগানো-ক্রিয়ার নামই প্রাণায়াম। প্রাণায়াম ছাড়াও জাগে—মহাপুরুষের স্পর্শে। সে ভাগ্যের কথা।

অর্জুন জানতে চাইলেন, এই প্রাণায়ামের কাজ কি ?

সুষুম্নার দ্বার উদ্‌ঘাটন। দ্বার খোলা পেলেই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ ওপরে উঠবার চেষ্টা করে—চিত্তও তখন উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করে। একেই বলা হয় অতীন্দ্রিয় রাজ্য।

ভগবান বললেন, প্রাণায়ামের কাজ হলো ফুসফুসের গতিকে জয় করা। গতি জয় হলেই সূক্ষ্মতর-গতিও তখন আয়ত্তে আসে।

কিন্তু আসন ছাড়া প্রাণায়াম হয় না। ভগবান বললেন, সেই আসনই আসন, যে আসনে বসে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করো।

প্রাণায়াম মানে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া নয়। শ্বাস-প্রশ্বাস হলো একটা উপায়। প্রাণায়ামের অর্থ—প্রাণের সংযম। প্রাণকে জয় করতে হবে।

ভগবান বললেন, এই প্রাণশক্তিকে জানবার আগে, আকাশকে জানো। আকাশ কি ? আকাশ সর্বব্যাপী সর্বানুস্যূত একটি সত্তা। এই আকাশকে নিয়েই জগত তৈরি হয়েছে। আকাশই বায়ু হয়, তরল পদার্থ হয়, আবার কঠিন পদার্থও হয়। এই আকাশই সূর্য, পৃথিবী তারা ধূমকেতুর রূপ পরিগ্রহ করছে।. সর্বপ্রাণীর শরীর—তাও এই আকাশ থেকেই হচ্ছে। জগতে যা কিছু—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যা অনুভব করা যায়, সকল বস্তুই এই আকাশ থেকে নির্মিত। অথচ আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানবার উপায় নেই। অনুভূতির অতীত সূক্ষ্ম সে। তার স্থূল রূপকেই দেখা যায়—দেখা যায় না সূক্ষ্ম রূপকে। সৃষ্টির আদিতে এই আকাশই ছিলো একমাত্র। এই আকাশেই আবার লয় পাবে জগতের যা কিছু সব। আবার সৃষ্টি হবে, আবার হবে লয়। এই পরিক্রমণই সৃষ্টিরহস্য।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ শক্তির প্রভাবে আকাশ হচ্ছে জগত ?

সে শক্তি প্রাণের শক্তি। আকাশ যেমন এই জগতের কারণীভূত অনন্ত সর্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণও সেই রকম জগৎ-উৎপত্তির কারণীভূতা অনন্ত সর্বব্যাপিনী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সকল বস্তুই যেমন আকাশে বিলীন হচ্ছে, জগতের সমস্ত শক্তিও তেমনি প্রাণে লয় হচ্ছে। পরকল্পে আবার এই প্রাণ থেকেই সকল শক্তির বিকাশ হবে।

ভগবান বললেন, এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হয়েছে, আবার এই প্রাণেই আছে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি, চুম্বক-আকর্ষণের শক্তি। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তিপ্রবাহরূপে, চিন্তা-শক্তিরূপে—দৈহিক সকল ক্রিয়ারূপেও এই প্রাণ প্রকাশিত হয়েছে। সকল শক্তিই প্রাণের বিকাশ।

ভগবান বললেন, যখন কিছু ছিলো না, তখন আকাশ ছিলো—গতিশূন্য আকাশ। প্রাণের প্রকাশ ছিলো না, কিন্তু তার অস্তিত্ব ছিলো।

অর্জুন নিরুত্তর। শিষ্যের মতো গুরু-পদপ্রান্তে বসে তিনি শুনছেন।

ভগবান বললেন, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হয়েছে, তাদের সমষ্টি চিরকাল সমান। তারাই কল্পান্তে শান্ত এবং অব্যক্ত থাকে, আবার তারাই একদিন ব্যক্ত হয়ে আকাশের ওপর কাজ করে। এই আকাশ থেকেই যা কিছু সাকার বস্তুর উৎপত্তি। ভগবান বললেন, এই আকাশ পরিমাণ প্রাপ্ত হতে আরম্ভ করলে, প্রাণও নানারূপ শক্তিতে পরিণত হয়। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা ও তাকে সংযম করবার চেষ্টাই প্রাণায়াম।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, এই প্রাণকে জানলেই কি আমার সকল জানা সম্পূর্ণ হবে ?

ভগবান বললেন, হাঁ, প্রাণকে জানলেই ঈশ্বরকে জানবে।

কিন্তু প্রাণ তো ঈশ্বর নয় ?

ভগবান বললেন, প্রাণ শক্তি। কি করে এই প্রাণশক্তিকে জয় করা যাবে, প্রাণায়াম তাই বলেছে। প্রাণায়ামের যা কিছু সাধন, যা কিছু উপদেশ সেই একই উদ্দেশ্যে। নিজের অত্যন্ত নিকট যা তাকেই জয় করা। নিকট কে ? দেহ। দেহই মানুষের সবচেয়ে নিকট, আবার মন তার চেয়েও নিকট।

কিন্তু তার চেয়েও নিকট কে ? ভগবান বললেন, যে প্রাণ জগতের সর্বত্র ক্রীড়া করছে, তার যে অংশটুকু এই শরীর ও মনকে চালাচ্ছে, সেই প্রাণ মানুষের আরো নিকটে। এই যে ক্ষুদ্র প্রাণতরঙ্গ—যা মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তি, তা অনন্ত প্রাণসমুদ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তরঙ্গ। মানুষ যদি প্রাণসমুদ্রকে জয় করতে পারে, তবে সমুদয় প্রাণশক্তিকে জয় করতে পারে।

এই জয় করাই হলো সিদ্ধিলাভ। তখন আর কোনো শক্তিই তার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে না। তখন এই মানুষই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হতে পারে।

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ছয়

লুতে ফিরে গিয়ে দু-তিন দিন কেটে গেল কিন্তু মার্লিনের সেই গম্ভীর অন্যমনস্ক ভাবটি কাটল না। প্রশ্ন করলে কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাই না—কথাটি যেন উড়িয়ে দেয়।

লু ছেড়ে রওয়ানা হওয়ার আরও সাত-আট দিন বাকি, এমন সময় একদিন সকালবেলা মার্লিন বলে বসল, বিকো! লুতে আমার আর একেবারে ভাল লাগছে না – চল ফিরে যাই।

বললাম, ফিরে যাওয়ার আর ত মাত্র সাত-আট দিন বাকি।

বলল, চল, কাল কি পরশুই চলে যাই।

শুধালাম, কি হল তোমার বল দেখি—লুর প্রতি হঠাৎ এত অরুচি হল কেন?

সংক্ষেপে বলল, অনেক দিন ত হয়ে গেল।

হেসে বললাম, তাই অরুচি হল? এ ত সাংঘাতিক কথা! কিছুদিন পরে সেল-এর বাড়ীতে অরুচি হল। এ ত সাংঘাতিক কথা! কিছুদিন পরে সেল-এর বাড়ীতে অরুচি হলে তখন কি উপায় করব?

বলল, নিজের বাড়ী, নিজের সংসারে মেয়েদের কখনও অরুচি হয় না।

শুধালাম, লু—তোমার এত প্রিয় লু—তা-ও গেল?

একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখলাম—নিজের ঘরে নিজের মানুষটিকে নিয়ে নিরিবিলি থাকার মধ্যেই শান্তি। বাইরের জগতের সঙ্গে বেশী সংঘাত ভাল নয়। তাতে শান্তিভঙ্গই হয়।

মার্লিনের কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমার চোখের আড়ালে কিছু কি ঘটেছে? হেডল্যাণ্ড হোটেলে অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা থাকে, তাদের মধ্যে কেউ কি মার্লিনকে কিছু বলেছে? মনে পড়ে গেল টর্কীর সেই অসভ্য লোকটির কথা। আমাকে বিবাহ করার দরুণ সেই ধরণের ইঙ্গিত কি কেউ আবার দিয়েছে মার্লিনকে?

শুধালাম, লীনা! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে। হোটেলে কি কেউ কিছু বলেছে তোমাকে?

বলল, না না। হোটেলের সবাই খুব ভদ্র।

শুধালাম, লুতে হঠাৎ তোমার এ রকম মনোভাব হল কেন?

একটু সরে এসে আমার বুকে মাথাটা রেখে বলল,—বিকো! আমার জীবনের সমস্ত শান্তি এই বুকটার মধ্যেই রয়েছে—কি দরকার আমার বাইরে গিয়ে?

হেসে বললাম, তা তোমার লুকোন ধন ত এখানেও তোমার কাছেই রয়েছে।

বলল, তবুও ভয় করে—যদি লুঠ হয়ে যায়। নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত নাকি?

কথাটার তাৎপর্য্য একেবারেই বুঝতে পারলাম না।

* * * *

এই কথাবার্ত্তার পরের দিন লু ছেড়ে রওয়ানা হলাম। সত্যই মার্লিন যেন অস্থির হয়ে উঠল লু ছেড়ে যাওয়ার জন্য। তাই আমিও আর পীড়াপীড়ি করিনি।

পরের দিন, অর্থাৎ যেদিন রওয়ানা হই তার আগের দিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট সেরে মার্লিন বলল, বিকো! চল আজ সেইখানটাতে বেড়াতে যাই। শেষবারের মতন একটু বসে আসি।

শুধালাম, সহর ছাড়িয়ে সমুদ্রের ধারের সেই গাছতলায়?

বলল, হ্যাঁ।

দুজনে গেলাম সেখানে। বসলাম, যে রকম করে বসতে মার্লিন ভালবাসে—অর্থাৎ আমার কাঁধের উপর মাথা রেখে আমার পাশ ঘেঁষে। আমিও এক হাত দিয়ে মার্লিনকে জড়িয়ে ধরে রইলাম। দিনটা খুব পরিষ্কার ছিল না—একটু মেঘলা মেঘলা ভাব। পাহাড়ের নীচে পায়ের তলায় সমুদ্রের জল যেন আরও গভীর নীল বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ মার্লিন ডাকল, বিকো!

শুধালাম, কি লীনা?

বলল, তুমি আমাকে কোনওদিন ভুল-বুঝবে না ত?

শুধালাম, হঠাৎ এ প্রশ্ন?

বলল, জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বলে একটা সাংঘাতিক জিনিষ আছে—একটা দুরন্ত ব্যাধির মত। জীবনটাকে ক্ষতবিক্ষত করে কলুষিত করে দেয়। সেটাকে আমি বড় ভয় করি।

শুধালাম, লীনা! হঠাৎ তোমার মনে এ সব কথা [illegible]

একটু চুপ করে থেকে বলল, বিকো! তোমাকে নিয়ে আমার জীবনটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কোথাও এতটুকু অভাব নাই—তাই ভয় পাই।

শুধালাম, কেন?

জিজ্ঞাসা করল, এত পরিপূর্ণতা কি জীবনে সইবে?

বললাম, কেন সইবে না লীনা?

বলল, মানুষের ভাগ্যবিধাতা যে হিংসুক—জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি তিনি সইতে পারেন না।

চুপ করে গেলাম। মার্লিনের কথা শুনে আমার মনটাও যেন খারাপ হয়ে গেল। কেন জানি না, চমকে মনে পড়ে গেল—সুধার কথা। তার শেষ নিঃশ্বাসের অভিশাপ—তার মূল্য কি আমাকে সত্যিই দিতে হবে?

মুখে বললাম, লীনা! লীনা! ও সব কথা ভেব না। আমাদের দুজনের ভালবাসার জোয়ারের পরিপূর্ণতায় কোনও দিন ভাঁটা পড়বে না।

মৃদু হেসে বলল, তাই যেন হয়। নইলে আমি বাঁচব না।

* * * *

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে লু ছেড়ে রওয়ানা হতে বেলা প্রায় এগারটা বাজল। সমস্ত দিন গাড়ী চালিয়ে রাত্রে আশ্রয় নিলাম—ডার্টমুরের টু ব্রিজেস হোটেলে। (Two Bridges Hotel) হোটেলটি দেখে খুসী হলাম—বেশ বড় হোটেল, দোতলায় আমাদের শোবার ঘরটিও বেশ বড়, সুন্দর সাজান। রাত্রে সামান্য কিছু জলযোগ করে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্ত ছিলাম নিশ্চয়ই—সহজেই পড়লাম ঘুমিয়ে।

সকালবেলা উঠে তৈরী হয়ে আমি ও মার্লিন নীচে নেমে এলাম ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার জন্য। তখন বেলা ন'টা বেজে পনর মিনিট। দিনটা বড় সুন্দর ছিল, সূর্য্যের তরুণ আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছিল দিক-দিগন্ত। নীচে নেমে মার্লিন বলল, সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত ত ব্রেকফাষ্ট, চল জায়গাটা আশে-পাশে একটু ঘুরে দেখে আসি।

আমার তখন ব্রেকফাষ্টে চা খাওয়ার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠেছে। মুখে বললাম চল, কিন্তু মিনিট পনর'র বেশী নয়। আমার কিদে পেয়ে গেছে।

মার্লিন হেসে বলল, তাই হবে।

দুজনে বাইরে এসে হোটেলের প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম। দু'পা এগিয়ে গিয়ে চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্তম্ভিত হলাম!

বুলা! সত্যিই প্রকৃতির এ রূপ এর পূর্ব্বে আমি কখনও দেখিনি। এ এক অদ্ভুত রূপ! যতদূর দৃষ্টি যায় চারিদিকে থৈ-থৈ করছে নাতি-উচ্চ পাহাড়ের তরঙ্গ—চুপচাপ নিস্তব্ধ, কোনও দিকে জনমানবের বাড়ীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করার মত গাছ নাই, লতা নাই, দূরে নীল আকাশের দিগন্ত পর্য্যন্ত পাহাড়গুলি যেন একটি সবুজ ঘাসের প্রলেপে ঢাকা—আর কিছু নাই। মনে হল—এ যেন এক নগ্নদেহ রিক্ত সন্ন্যাসী নিজের স্তব্ধ ধ্যানের পরিপূর্ণতায় নিজেই মগ্ন।

এই পাহাড়গুলির উপর দিয়ে একটি রাস্তা এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে দূর হতে দূরে এবং এই রাস্তাটির একটি মোড়ে একটু নীচু জায়গায়—টু ব্রিজেস্ হোটেল। এইখানে একটি ছোট্ট ঝরণা বেঁকে গিয়েছে বয়ে—টু ব্রিজেস্ হোটেলটার তিন পাশ দিয়ে। রাস্তা থেকে ঝরণাটার উপর দিয়ে দু'পাশে দুটি সেতু—হোটেল-প্রাঙ্গণে যাওয়ার জন্য। তাই বোধ হয় হোটেলটার নাম—টু ব্রিজেস্ হোটেল।

বললাম, সত্যিই বড় সুন্দর!

মার্লিন বলল, ডার্টমুর ত ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত জায়গা—এর পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। অনেকে দেখতে আসে।

শুধালাম আচ্ছা! এখানে এত বড় একটা হোটেল করেছে কি জন্য? চারিদিকে যতদূর দেখা যায় জনমানবের ত বসতি নেই?

মার্লিন বলল, পথিকদের আশ্রয়ের জন্য। দেখছ না—কত গাড়ী—বাইরে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে।

* * * *

ব্রেকফাষ্ট খেতে বসেছি—একতলায় মস্ত বড় সুন্দর খাবার ঘর যেমন হয়, চারি দিকে ছোট ছোট খাবার টেবিল ধবধব করছে সাদা চাদর ঢাকা। আশে-পাশে কিছু কিছু লোক বসে খাচ্ছে—আমরা চার জনের মত একটি টেবিলে বসেছি, দু' জনার মতন টেবিলগুলি তখন সবই ভরা।

হঠা'ৎ মার্লিন আমার হাতের উপর হাত রেখে বলল, দেখ দেখ!

অবাক হয়ে শুধালাম কি?

মার্লিন বলল মিঃ রোলাণ্ড না?

শুধালাম, কৈ?

মার্লিন বলল, ঐ যে ঘরে ঢুকলেন।

খাবার ঘরে ঢোকার একটি দরজার দিকে চেয়ে দেখি, সত্যিই মিঃ রোলাণ্ড, খাবার ঘরে ঢুকে চারি দিকে চেয়ে দেখছেন, কোন টেবিলে বসবেন। ক্রমে তাঁর দৃষ্টি পড়ল আমাদের দিকে। তিনিও একটু অবাক হয়ে যেন চাইলেন। মার্লিন হাত তুলে মিঃ রোলাণ্ডকে অভিবাদন জানাল। তিনিও এগিয়ে এলেন আমাদের টেবিলের দিকে। আমরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করলাম। সেই মিঃ রোলাণ্ড বুলা। মনে আছে ত? সেই ইংল্যাণ্ডের বনেদী বড়লোক সার হেনরী রোলাণ্ডের ছেলে। সুদর্শন, সুমার্জ্জিত, সুশিক্ষিত রোলাণ্ড। মনে আছে ত লংভেল গ্রামে মার্লিন যখন তার মা'র সঙ্গে বাস করত এই রোলাণ্ড, মার্লিনের কাছে প্রেম নিবেদন করে মার্লিনকে বিবাহ করার প্রস্তাব করেছিল, মার্লিন রাজী হয়নি। কেন, সবই ত জান।

রোলাণ্ডের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। অনেক দিন ত তাকে দেখি না। দেখলাম, চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি, তবে একটু যেন ভারি হয়েছেন। তার দরুণ চেহারায় আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য আরও বেড়েছে বই কমেনি।

রোলাণ্ড বললেন কি আশ্চর্য্য! আপনাদের সঙ্গে যে এখানে দেখা হবে এ ত একেবারেই ভাবিনি।

মার্লিন বলল, আপনি এই টেবিলেই বসুন না।

'অনেক ধন্যবাদ' বলে মিঃ রোলাণ্ড আমাদের টেবিলেই বসলেন। ক্রমে তাঁর ব্রেকফাষ্ট এল।

মিঃ রোলাণ্ড শুধালেন, তা আপনারা এখানে? ডার্টমুর বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

বললাম, ঠিক তা নয়। আমি ত সেলে ডাক্তারী করি। ছুটি নিয়ে কর্ণওয়ালে লু বেড়াতে গিয়েছিলাম—ফিরে যাচ্ছি।

মার্লিন শুধাল, তা আপনি কি বেড়াতে এসেছেন?

হেসে বললেন, না। বছরে অন্ততঃ একবার আমাকে এখানে আসতে হয়—প্রিন্সটাউনে জেল দেখবার জন্য।

মার্লিন সহজভাবেই শুধাল, কেন?

বললেন পার্লামেন্টের একটি কমিটি আছে—তাদের কাজ দেশের বিভিন্ন জেল দেখে নিজেদের মতামত গভর্ণমেন্টের কাছে পেশ করা।

মার্লিন শুধাল, তা আপনি কি পার্লামেন্টের সভ্য হয়েছেন নাকি? মৃদু হেসে বললেন হাঁ,—বছর তিনেক হল।

মনে হল—মার্লিন যেন সশ্রদ্ধ মুগ্ধদৃষ্টিতে রোলাণ্ডের দিকে চেয়ে রইল।

মার্লিন শুধাল, তা আপনি কি একলাই এখানে আছেন? মার্লিনের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, হ্যাঁ। দোকলা আর কোথায় পাব?

মার্লিনের কথাটা সহজ করে আমি শুধালাম, তা আপনার বিষয় সব জানতে বড্ড ইচ্ছে করে—সেই ডাভংটন হাসপাতালে ত আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

মৃদু হেসে মিঃ রোলাণ্ড শুধালেন, কি জানতে চান?

সোজাই প্রশ্ন করলাম, যদি কিছু মনে না করেন—আপনি বিবাহ করেন নি?

মাথা নীচু করে বললেন, না।

মার্লিনের দিকে চাইলাম। মনে হল—মার্লিন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

মিঃ রোলাণ্ড শুধালেন, তা আপনারা এখানে কত দিন আছেন?

বললাম, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি, আজই লাঞ্চ খেয়ে রওয়ানা হব ভাবছি।

শুধালেন, প্রিন্সটাউন দেখেছেন? যেখানে জেল?

বললাম, না। তবে ফিরে যাওয়ার সময় ত প্রিন্সটাউনের মধ্য দিয়েই যাব।

মার্লিন শুধাল, প্রিন্সটাউন এখান থেকে কত দূর?

রোলাণ্ড বললেন, বেশী দূর নয় এই পাঁচ-ছ' মাইল হবে।

চলুন না, ব্রেকফাষ্ট খেয়ে, যদি আপনাদের অসুবিধা না হয় আপনাদের প্রিন্সটাউন বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আমাকে ত একবার যেতেই হবে আজ সকালে।

বুলা! কথাটায় মন সায় দিল না। রোলাণ্ডের সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি খুসী হয়েছিলাম কি না জানি না। তবে তার সঙ্গে বেশী মেলামেশায় মন সঙ্কুচিত হচ্ছিল। কেন, সঠিক তোমাকে বলতে পারব না। মনে হচ্ছিল ধনে, মানে, এমন কি রূপেও বোধ হয় রোলাণ্ড ত সব দিকেই আমার চেয়ে বড়। তাই কি আজ বিশেষ করে নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল রোলাণ্ডের সামনে মার্লিনের কাছে? রোলাণ্ডকে বিবাহ করা ইংল্যাণ্ডের যে কোনও মেয়ের পক্ষে গৌরবের কথা অথচ মার্লিন একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, আত্মীয়-স্বজন এমন কি নিজের মা'রও মতের বিরুদ্ধে আমারই জন্য। তাই কি এখন আমার ভয় হল পাছে মার্লিনের মনে এতটুকুও অনুশোচনার দাগ লাগে অতীতের দিক দিয়ে? তাই কি মন রোলাণ্ডকে এড়িয়ে চলতে চায়? পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। বুলা! কিন্তু ঠিক কারণটি খুঁজে পাইনি। মুখে বললাম, অনেক ধন্যবাদ কিন্তু ক্ষমা করবেন। আমাদের ত লাঞ্চ খেয়েই বেরুতে হবে তাই—

মার্লিন শুধাল, আপনি এখানে কত দিন থাকবেন?

রোলাণ্ড বললেন, আরও দিন দুই আছি।

মার্লিন শুধাল, তারপর কি হাইটনে ফিরে যাবেন?

বুলা! লংভেল গ্রামের কাছাকাছি হাইটন গ্রামে রোলাণ্ডদের বিরাট প্রাসাদ ও বিস্তীর্ণ বাগান ও জঙ্গলের একটা দেখার জিনিষ, জানই ত?

রোলাণ্ড বললেন, না। লণ্ডনে ফিরে যাব, সেখানে অনেক কাজ।

শুধালাম, লণ্ডনেও ত আপনাদের বাড়ী আছে?

বললেন, হ্যাঁ।

ক্রমে ব্রেকফাষ্ট খাওয়া শেষ হল। খাবার ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে এসে বসলাম লাউঞ্জে। একটু পরেই রোলাণ্ড উঠলেন, বললেন, এইবার আমাকে প্রিন্সটাউন যেতে হবে।

মার্লিন শুধাল, তা লাঞ্চ খাওয়ার মধ্যে ফিরে আসবেন ত?

হেসে বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।

রোলাণ্ড বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রোলাণ্ডের প্রকাণ্ড গাড়ী ও উর্দ্দিপরা ড্রাইভার ইতিমধ্যে হোটেলের ফটকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

মার্লিন বলল চল, আমরাও একটু হেঁটে বেড়িয়ে আসি।

বললাম, চল।

* * * *

বেড়াতে বেড়াতে মার্লিন বলল, কি সুন্দর শান্তিপূর্ণ জায়গা, খুব ভাল লাগছে বিকো!

বললাম, সত্যিই ভাল।

মার্লিন বলল, তোমার ত ছুটী আরও কয়েক দিন আছে, এস, দিন দুই তিন এখানে থেকে যাই।

মনটা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। লুতে মার্লিন বাড়ী যাওয়ার জন্য কি রকম ব্যগ্র হয়েছিল—ভুলিনি ত। সেই অনুসারেই বন্দোবস্ত হয়েছিল পথে কোথাও বৃথা অপেক্ষা করব না, সোজা বাড়ী ফিরব। হঠাৎ এখানে এসে মনের পরিবর্ত্তন হল কেন? তবে কি রোলাণ্ডকে—

মনকে চাবুক মেরে বললাম, ছিঃ ছিঃ, এ তোমার কি দৈন্য? মুখে বললাম, তা তুমিই ত বাড়ী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলে?

বলল, এমন জায়গা পাব ত ভাবিনি। এখানে বড় ভাল লাগছে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, বেশ! তোমার যদি ইচ্ছে হয়ত তাই হবে।

আমার হাতটা ধরে বলল বিকো! তোমার তুলনা নাই!

* * * *

দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার জন্য খাবার ঘরে ঢুকে দেখি—মিঃ রোলাণ্ড ইতিমধ্যেই খাবার ঘরে এসে টেবিলে বসে আছেন, সেই সকালের টেবিলে। মার্লিন রোলাণ্ডকে দেখেই হেসে এগিয়ে গেল, আমিও গেলাম পিছনে।

যথারীতি সম্ভাষণের পর, বসে মার্লিন বলল, আপনি ত খুব শীগ্‌গিরই ফিরে এসেছেন। রোলাণ্ড বললেন, কাজও বেশী ছিল না—সামান্য। মার্লিন শুধাল শেষ হয়েছে?

রোলাণ্ড বললেন না—পরশু আর একবার যেতে হবে।

মার্লিন বলল জানেন—আমরা ঠিক করেছি, আমরাও দিন দুই তিন এখানে থাকব।

রোলাণ্ড হেসে বললেন চমৎকার! এখানে আপনাদের সঙ্গ পেলে আমার সময়টা খাসা কাটবে।

ক্রমে মনে হল মার্লিন যেন রোলাণ্ডকে পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠল। বহুদিন পরে হারিয়ে-যাওয়া একান্ত আপনার লোকের সঙ্গে দেখা হলে কথায়-বার্ত্তায় মানুষ যেমন হয় কতকটা সেই রকম। লুর শেষের দিকে মার্লিনের সেই মুষড়েপড়া ভাব রোলাণ্ডকে পেয়ে যেন গেল কেটে।

মার্লিনের এই ভাবান্তরে মনটা কি আমার খুসী হয়েছিল?

মার্লিন কথায় কথায় একটু যেন আবদারের সুরে বলল, আমাদের একদিন প্রিন্সটাউন দেখাতে নিয়ে যাবেন না?

রোলাণ্ড বললেন নিশ্চয়ই—আনন্দের সঙ্গে। আজই চলুন। —লাঞ্চের পরে যাই।

বললাম, না না। আজ থাক। আজ আপনি সকালে ঘুরে এসেছেন—আবার বিকেলে কেন?

বললেন, তাতে কি হয়েছে?

মার্লিন বলল, আজ থাক। কাল সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে যাওয়া যাবে।

রোলাণ্ড বলল, বেশ, যা আপনাদের সুবিধা হয়।

এমন সময় হোটেলের কর্ত্রী একটি বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গী মহিলা খাবার ঘরে ঢুকে আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন। এসে রোলাণ্ডকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বললেন সার আর্থার! আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।

ক্ষমা করবেন—এখুনিই আসছি বলে রোলাণ্ড টেবিল ছেড়ে চলে গেলেন।

মার্লিন বলল, সার আর্থার! তাহলে সার হেনরী মরে গেছেন বোধ হয়। উত্তরাধিকারী সূত্রে উনিই নাইট হুড পেয়েছেন।

বললাম, হবে।

দুজনেই খা'নকক্ষণ চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, দেখ লীনা! ওরা বড়লোক। আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না। ওদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করাই ভাল।

মার্লিন বলল, কিন্তু ওঁর মধ্যে ত বড়লোকী ভাব কিছুই নাই?

বললাম, সেটা ওঁর ভদ্রতা—বাইরের মুখোস। মার্লিন যেন ঈষৎ একটু উত্তেজিত ভাবে বলল।

এ কথা বলা তোমার অন্যায়। ওঁকে ত অনেক দিন ধরেই জানি—ভদ্রতাটা ওঁর স্বাভাবিক, মুখোস একেবারেই নয়।

মার্লিনের কথায় কি রাগ হল? মনের মধ্যে একটু একটু রাগ কি ইতিমধ্যেই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল? বলি বলি করে শেষ পর্য্যন্ত বলেই ফেললাম

তাছাড়া অতীতে তোমার সঙ্গে ওঁর যা ব্যাপার ঘটেছিল তাতে করে ওঁর সঙ্গে তোমার সহজ মেলামেশায় একটা লজ্জা হওয়াই স্বাভাবিক।

মার্লিন চুপ করে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল বেশ, তাই যদি তোমার মনে হয়—ওর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।

বললাম, আমি ত সে কথা বলছি না। আমার মতে বাড়াবাড়িটা শোভন নয়।

বুলা। হাজার হলেও ত আমার ভারতীয় মন—ভারতীয় মাপকাঠিতেই সব বিচার করি। ইতিমধ্যে ভারতীয় মাপকাঠিতেই মার্লিনকে যাচাই করে নিয়ে একথা আমার বারে বারে মনে হয়েছে—ভারতীয় মেয়ে এ অবস্থায় রোলাণ্ডকে এড়িয়ে চলত, সহজ মেলামেশায় লজ্জা পেত। তাই কি রোলাণ্ডের সঙ্গে মার্লিনের সহজ আগ্রহ ভরা ব্যবহারে আমার মন সায় দেয়নি?

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। মার্লিনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, অসাধারণ গম্ভীর মুখে বিষণ্ণ চোখ দুটি যেন একটু সজল হয়ে উঠেছে। মার্লিনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্রমে আমার মনে মার্লিনকে কথাটা ওভাবে বলার দরুণ একটা লজ্জা এল।

হাতের উপর হাত রেখে ডাকলাম লীনা! চোখ তুলে আমার দিকে চাইল।

বললাম লীনা! আমাকে ভুল বুঝ না। মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বলল, না।

অতি সহজভাবে এই 'না' কথাটি বলার দরুণ আমার মনটা যেন একেবারে গলে গেল। হাতখানি চেপে ধরে বললাম, লীনা! আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি দুঃখিত।

সেই বিষণ্ণ গভীর চোখ দুটি তুলে খা'নকক্ষণ চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে—ঠোঁটে মাখান ছিল সেই মৃদু হাসিটি।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, বিকো! তুমি একটি ডার্লিং।

এমন সময় রোলাণ্ড ফিরে এল। এসে বললেন, আমি দুঃখিত। এতক্ষণ আপনাদের বসতে হয়েছে।

বললাম, না না। তার জন্য কি?

কথায় কথায় মিঃ রোলাণ্ড বললেন, তাহলে কাল ত প্রিন্সটাউনে যাব সকালবেলা। আজ চলুন, বিকেলবেলা গাড়ী করে ডাটিমুরটা বেড়িয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি বললাম, বেশ ত। কিন্তু বিকেলে আমার গাড়ী নিয়ে বেরুব—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

হেসে বললেন, বেশ—যদি তাই আপনার ইচ্ছে হয়।

* * * *

বিকেলে চা খেয়ে যথাসময়ে বেড়াতে বেরুন হল আমার গাড়ীতে। মার্লিন অবশ্য তার ব্যবহারে আবার খুব সহজই হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার সেই হাসিখুশী ভাবটা যেন আর নাই—একটু শান্ত সমাহিত ধরণ-ধারণ।

আমার গাড়ীর ত ড্রাইভার নাই—তাই আমাকেই বসতে হ'ল ড্রাইভারের আসনে। ড্রাইভারের পাশে দুজনার বসা চলে না, তাই একজনকে বসতে হয়। মিঃ রোলাণ্ড বাইরের দরজা খুলে মার্লিনকে অনুরোধ জানাল আমার পাশে বসবার জন্য। মার্লিন অতি সহজ ভাবেই বলল, না, চলুন আমরা দু'জনে ভিতরে বসি।

মিঃ রোলাণ্ড হাসিমুখে 'অনেক ধন্যবাদ' বলে মার্লিনকে নিয়ে ভিতরে বসলেন। আমি অবশ্য একটি কথাও বলিনি। আমাদের ভারতীয় মনের গতি যাই হোক, এদেশের ভদ্রতার দিক দিয়ে মার্লিনের কাজে ত্রুটি ধরা চলে না কিন্তু তবুও মনটা যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নাই। ফলে যদিও

অনেক দূর পর্যন্ত ডাউন্সুরের উপর দিয়ে বেড়িয়ে এলাম, ভিতরে ওদের কথাবার্ত্তায় আমি তেমন কানও দিই নাই, কিংবা বিশেষ যে যোগ দিয়েছিলাম, এমন কথা বলতে পারি না।

ক্রমে মনটাকে পেয়ে বসল—দুপুরে লাঞ্চের সময় মার্লিনের সঙ্গে আমার যে কথা হয়েছিল তাই নিয়ে। মনে হল, আমার মনের কথাটা মার্লিনকে ঠিক বুঝিয়ে যেন বলা হয়নি বরং এমন একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলাম—যার জন্য মার্লিন আমাকে কি ভাবল কে জানে! এ কথাটা ভাবতে একটা গ্লানি এল মনে। ভেবে ঠিক করলাম, আজ রাত্রে মার্লিনের সঙ্গে একটু বিস্তারিত কথা বলতে হবে—জিনিষটা পরিষ্কার করে ফেলা দরকার।

কিন্তু কি পরিষ্কার করব? আমার মনের কথাটা ঠিক কি? ভাবতে গিয়ে কোনই কূল-কিনারা পেলাম না, সবই কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল।

* * * *

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মার্লিনকে বললাম, লীনা! তুমি ঠিকই বলেছিলে, বাইরের জগতের সঙ্গে বেশী সংঘাত ভাল নয়। তাতে শান্তিভঙ্গই হয়।

মার্লিন শুধাল, হঠাৎ তোমার একথা মনে হচ্ছে কেন?

বললাম, লু-তে তোমার যে রকম হয়েছিল আমারও তাই হচ্ছে। মনটা আকুল হয়ে উঠেছে আমাদের সেই নিরিবিলি শান্তিপূর্ণ 'বিকোনীনা'য় গিয়ে বাস করবার জন্য।

মার্লিন বলল, তাই ত যাব।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, লীনা! দুপুরে তোমাকে যে ভাবে কথাটা বলেছি—ভুল করেছিলাম।

মার্লিন বলল, ও কথা আর কেন?

বললাম, কথাটা কি জান—রোলাণ্ডকে এবার আমার সে রকম ভাল লাগছে না।

শুধাল, কেন?

বললাম কি জানি—ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারব না। ডভি'টনে প্রথম আলাপে যে রকম মুগ্ধ হয়েছিলাম—সে জিনিষ ঠিক যেন ওঁর মধ্যে পাচ্ছি না।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, তোমার যদি ভাল না লাগে, দরকার কি ওঁর সঙ্গে মেলামেশা করার?

বললাম, না! দু'-একদিন যা আছি ভদ্রতাটা বজায় রেখে চলাই ভাল।

মার্লিন বলল বেশ। যা তোমার ইচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, কথাটা কি জান লীনা, আমিও ত খুব বড় বনেদী বংশের ছেলে—জান ত সবই। কিন্তু আমি ত সেই গর্ব্বে দেশে ফিরে গিয়ে স্ফীত হয়ে উঠিনি। সেই দেশকেই অনায়াসে ছেড়েছি, তোমারই জন্য। তোমাকে প্রাণ-মন দিয়ে ভালবাসি বলে।

মার্লিন চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না।

একটু পরে আমিই বললাম, কিন্তু রোলাণ্ডের মধ্যে সেই আদর্শের দিকটা এখন আর যেন নেই। নিজের উন্নত অবস্থায় সে যেন ভারি হয়ে উঠেছে, নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার শক্তি যেন হারিয়েছে। তাই ওর সঙ্গে আমার মনের সুর মিলছে না।

মার্লিন বলল, ওঁর সঙ্গে মনের সুর মেলাবার কি দরকার?

বললাম, আমার মনের সুর মিলছে না—তাই বোধ হয় আশা করেছিলাম তোমারও মনের সুর মিলবে না। তোমার আমার মন ত এক সুরেই বাঁধা।

মার্লিন চুপ করেই রইল। বললাম, তোমাকে ত আমি জানি লীনা! তুমিও ত বিশিষ্ট ভদ্রঘরের মেয়ে। তোমার বাবা ব্ল্যাকপুলের বিখ্যাত লোক ছিলেন—মেয়র হওয়ার কথা হচ্ছিল। তোমার বংশ কলঙ্কহীন।

কলঙ্কহীন এই কথাটা যেন বিশেষ ক'রে ব্যবহার করেছিলাম। কেন? বুঝা! মনে আছে ত রোলাণ্ডের বংশে, তার একজন পূর্ব্বপুরুষ একটি বিবাহিত স্ত্রীলোককে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় পালিয়ে যান এবং সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। রোলাণ্ডের বংশের এই কলঙ্কটির কথা তখন কি আমার মনে বিশেষ করে সজাগ হয়ে উঠেছিল? মার্লিনকে একটু ঘুরিয়ে সেদিকেরও একটু ইঙ্গিত দেওয়ার প্রবৃত্তি কি জেগেছিল মনে?

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস মার্লিনের বুক ছাপিয়ে পড়ল।

আবার বললাম, তাই তোমাকে বিবাহ করে আমি ত আমার বংশমর্য্যাদায় কোনও ত্রুটি ঘটাইনি! সেইটুকুই আমার মনের আভিজাত্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট। আর আমি কিছু চাইনি। অনায়াসে সব ছেড়েছি তোমার জন্য। তাই ত আমাদের প্রেম এত মধুর হয়ে উঠেছে।

মার্লিন চুপ করেই রইল। একটু চুপ করে থেকে বললাম, লীনা! আসল কথাটা হচ্ছে ত্যাগের মধ্য দিয়েই জীবন মধুর হয়, ভোগের মধ্য দিয়ে নয়। রোলাণ্ডের মধ্যে সেই ত্যাগের—

কথা থামিয়ে দিয়ে মার্লিন যেন একটু বিরক্তির সুরে বলল, রোলাণ্ডের কথা থাক না বিকো!

কথাটায় কি মনে লাগল? অভিমান হল। আর কিছু বলিনি, ক্রমে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * * *

পরের দিন সকালবেলা উঠে দেখলাম—মনটা ভাল নাই। কারণ খুঁজে নিতে দেরী হল না। কাল রাত্রে মার্লিনের কাছে কি যা-তা আবোল-তাবোল সব বকেছি, ভাবতে মনটা যেন একটা দৈন্যে ভরে গেল। কিছু না বললেই ভাল হত।

পাশে চেয়ে দেখলাম—মার্লিন ঘুমুচ্ছে বলে মনে হল। মার্লিনকে না ডেকে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরে যখন আমি তৈরী হয়েছি তখনও মার্লিন চোখ বুজে শুয়েই আছে। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—পৌনে ন'টা বেজে গেছে। মনে প'ড়ে গেল—ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আজ সকালে প্রিজটাউন যাওয়ার কথা। মার্লিনের কাছে গিয়ে সস্নেহে মার্লিনকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম লীনা! লীনা! ন'টা বাজে উঠবে না?

মার্লিন চোখ মেলে চাইল—লক্ষ্য করলাম, চোখ দুটি লাল হয়ে রয়েছে।

বলল, আমার শরীর ভাল নেই—বড্ড মাথা ধরেছে। আমি আজ আর ব্রেকফাষ্টে নামব না।

ব্যাকুল ভাবে বললাম, জ্বর হল নাকি? কপালে হাত দিয়ে দেখলাম—কপাল ঠাণ্ডা।

মার্লিন বলল, না না। একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

বললাম, আজ যে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে প্রিন্সটাউন বেড়াতে যাওয়ার কথা।

বলল, এ বেলা ত পারবই না পরে দেখা যাবে।

শুধালাম, এ্যাসপ্রিন খাবে—দেব?

বলল, দাও।

মার্লিনকে এ্যাসপ্রিন খাইয়ে আমি নীচে নেমে এলাম। মার্লিন শুয়েই রইল। যাওয়ার সময় বলে এলাম, আমি তোমার ব্রেকফাষ্ট উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মার্লিন বলেছিল, শুধু চা ও একখানা টোষ্ট—আর কিছু নয়।

বৃথা। তখন কি একটুও টের পেয়েছিলাম যে একটা মানসিক দ্বন্দ্বে মার্লিন প্রায় সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেনি?

* * * *

সকালবেলা ব্রেকফাষ্টে টেবিলে রোলাণ্ডকে যখন মার্লিনের অসুস্থতার কথা বললাম, রোলাণ্ড সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে উঠলেন। বললেন, তাহলে আজ উনি সমস্ত দিন বিশ্রামের উপরেই থাকুন।

বললাম, না—না। তেমন কিছুই নয়, বোধ হয় লঞ্চের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

হলও তাই। মার্লিন যখন লাঞ্চে নেমে এল, তখন সে সুস্থ হয়ে উঠেছে—শুধু একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। লাঞ্চ টেবিলে মিঃ রোলাণ্ড কথায় কথায় মার্লিনকে বললেন, আপনাকে এখনও একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ আপনি বিশ্রাম করুন। যদি সুস্থ বোধ করেন কাল সকালে প্রিন্সটাউনে বেড়াতে যাওয়া যাবে।

মার্লিন সহজ ভাবেই বলল, না। আমি এখন বেশ ভাল আছি। যদি আপনার অসুবিধা না হয়—আজই চলুন লাঞ্চ খেয়ে প্রিন্সটাউনটা দেখে আসি।

সেই কথাই ঠিক হল। লাঞ্চ খেয়ে মিঃ রোলাণ্ডের গাড়ীতে আমরা প্রিন্সটাউন রওনা হলাম।

টু ব্রিজেস্ হোটেল থেকে মাইল পাঁচ-ছয় ডার্টমুরের উপর দিয়ে গেলে প্রিন্সটাউন পাওয়া যায়। প্রিন্সটাউন ছোট একটি সহর, বেশী লোকজনের ভিড় নাই। একটি মাত্র প্রধান রাস্তা—তার ধারে দু-একটি বড় বড় বাড়ী দেখলাম, আর সবই ছোট ছোট বাড়ী চারিদিকে ছড়ান, তা-ও খুব বেশী নয়।

এই রাস্তাটির উপর কয়েকটি ছোট ছোট দোকানও চোখে পড়ল। কিন্তু প্রিন্সটাউনের বিশেষত্ব হচ্ছে—তার জেল। সহরের একটা পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীরে বহুদূর পর্য্যন্ত ঘেরা প্রিন্সটাউনের বিখ্যাত জেল। মিঃ রোলাণ্ডের কাছে শুনলাম, এইটেই ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান জেল। খুনী, ডাকাতি প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধের জন্ম যাদের দীর্ঘকাল মেয়াদের শাস্তি হয়, তাদের প্রিন্সটাউনেই রাখা হয়।

প্রিন্সটাউনে পৌঁছে রোলাণ্ড শুধালেন, জেলের ভিতর দেখবেন? আমি আপনাদের জেলের ভিতর নিয়ে যেতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে মার্লিন উত্তর দিল, না। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে আমি ও মার্লিন দুজনেই অবাক হলাম। সহরের চারিদিকে কয়েদীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং কাজ করছে—কেউ কেউ বা পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ কেউ বা কয়লা-বোঝাই গাড়ী নিয়ে যাচ্ছে ঠেলে—ইত্যাদি। এক একটা দলের সঙ্গে হয়ত এক একটা জেলের পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু কোনও কোনও কয়েদীকে একা ঘুরে বেরিয়ে কাজ করতেও দেখলাম, তাদের পোষাক দেখে তারা যে জেলের কয়েদী, চিনতে আমাদের দেরী হয়নি। আমাদের গাড়ী যখন এই সব কয়েদীর পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল—কেউ কেউ বা আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের দিকে চেয়ে বিকৃত মুখভঙ্গীও করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু অনেকেই মার্লিনের দিকে চেয়ে হেসে নিজেদের মনে বিড় বিড় করে কি যেন বলছিল।

হঠাৎ মার্লিন বলল, আমার এ সব দেখতে ভাল লাগছে না। চলুন কোথাও গিয়ে একটু চা খাওয়া যাক।

মিঃ রোলাণ্ড একটু হেসে বললেন, বেশ ত।

মিঃ রোলাণ্ডের নির্দ্দেশে তাঁর ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে একটা চায়ের দোকানের সামনে রাখল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে দোকানে ঢুকলাম—চা খাওয়ার জন্ম।

দোকানটি ছোট, তবে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারিদিকে সার্সির জানালা এবং ঘরের মধ্যে দরজা, জানালার পর্দাগুলিও ভাল। চারিদিকে সাজান ছোট ছোট চেয়ার, টেবিলগুলোও বেশ ভাল ভাবেই রাখা হয়েছে।

চা এল—চা খেতে খেতে আমি ও রোলাণ্ড কথাবার্ত্তা বলছিলাম—মার্লিন গম্ভীর। কথায় কথায় রোলাণ্ড বললেন, মিসেস চৌধুরীর আজ না এলেই ভাল হত, শরীরটা ত—

মার্লিন কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, না না, আমার শরীরের কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

শুধালাম, তবে এত চুপ করে আছ?

বলল ভাবছি—কি দুর্বিবহ নিদারুণ এদের জীবন!

রোলাণ্ড বললেন, আমরা ওদের জীবনকে একটু আনন্দময় করার জন্ম অনেক ব্যবস্থা করেছি। সন্ধ্যের পরে জেলে খেলাধূলো, এমন কি সিনেমা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখান হয়।

মৃদু হেসে মার্লিন বলল, তাতে করে আর কতটুকুই বা হয়।

একটু চুপ করে থেকে রোলাণ্ড বললেন, আর কি করা যায় বলুন? সমাজে অপরাধের শাস্তি ত নিতেই হবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মার্লিন বলল, এদের মধ্যে কত নিরপরাধী আছে—বিচারের ভুলে এই শাস্তি পাচ্ছে—নয় কি?

রোলাণ্ড বললেন হয়ত বা আছে। কিন্তু তার আর কি উপায় আছে বলুন?

মার্লিন চুপ করেই রইল—একথা নিয়ে আর আলোচনা করল না। আমিও চুপ করেই গিয়েছিলাম। পিতামহ সুশান্তশর্মা'র কথা কি আমার মনে পড়েছিল?

হঠাৎ মার্লিন শুধাল আচ্ছা, এরা পালায় না? যে রকম স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনায়াসে ত পালাতে পারে?

মৃদু হেসে রোলাণ্ড বললেন, ডার্টমুর থেকে পালান সোজা নয়। চারিদিকে মাইলের পর মাইল থৈ থৈ করছে 'মুর'—জনমানবের বসতি নেই। পালালে না খেতে পেয়েই মরে যাবে কিম্বা

রাত্রে ঠাণ্ডায় যাবে জমে। তাও দূরে দূরে গ্রামগুলিতে পুলিশের পাহারা আছে। এইজন্যই ত বিশেষ করে ডার্টমুরে প্রধান জেল তৈরী করা হয়েছে।

মার্লিন শুধাল, কেউ কি কখনও পালায়নি ?

রোলাণ্ড বললেন, আমি যতদূর এ জেলের ইতিহাস জানি—বছর নয়-দশ আগে একটি লোক পালিয়েছিল। তার আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বোধ হয় ডার্টমুরেই প্রাণ দিয়েছে।

মার্লিন চুপ করে গেল। পরে হঠাৎ শুধাল, আচ্ছা, আপনি ত জেলের আইন সব জানেন ?

হেসে রোলাণ্ড বললেন, সব জানি না—তবে কিছু কিছু পড়তে হয়েছে।

মার্লিন শুধাল, আচ্ছা, যদি জেল থেকে পালানো লোকের কেউ সন্ধান পায়, সে কি করবে ?

রোলাণ্ড বললেন, তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেবে।

শুধাল, আর যদি না দেয় ?

রোলাণ্ড বললেন, সে বিষয়ে আইন বড় কড়া। তাহলে দারুণ শাস্তি পেতে হবে। পলাতক কয়েদীর খবর জেনে চেপে রাখা গুরুতর অপরাধ।

মার্লিন চুপ করে গেল। আর কোনও কথা বলল না।

* * * *

প্রিন্সটাউন থেকে ফিরে এসে মার্লিন সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিছানার পাশে বসে শুধালাম, লীনা! তোমার শরীর কি আবার খারাপ বোধ হচ্ছে ?

বলল, না। একটু ক্লান্ত লাগছে।

বললাম, আজ তোমার না গেলেই ভাল হত।

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, বিকো! চল এখান থেকে চলে যাই। আমার আর ভাল লাগছে না।

বললাম, বেশ ত। তোমার যা ইচ্ছে—

বলল, চল। কাল সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়েই যাই চলে।

তাই ঠিক হল। মার্লিনের এই চলে যাওয়ার আগ্রহে আমার মনটা কেন যে খুশী হয়ে উঠল—জানি না।

ক্রমে ডিনার খাওয়ার সময় এল। বললাম লীনা! তুমি বিশ্রাম কর। তোমার ডিনার আমি উপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলল, না—নীচেই যাই। মিঃ রোলাণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। কাল সকালে ব্রেকফাষ্টে দেখা না-ও হতে পারে।

মিঃ রোলাণ্ডের কাছ থেকে বিদায়—এমন কি একটা বড় ব্যাপার যার জন্য মার্লিনকে ক্লান্ত শরীরে নীচে যেতে হবে ? মন সায় দিল না।

বললাম, তার কি দরকার। আমি না হয় তোমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে রোলাণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব।

বলল, না। চল আমিও যাই।

খেয়ে-দেয়ে রাত্রে বিছানায় শুয়ে অনায়াসেই ঘুমিয়ে পড়লাম—আবার ভোরে উঠে গোছগাছ করে রওয়ানা হতে হবে।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—যেন শুনতে পেলাম, পাশেই একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। চমকে মাথা তুলে চেয়ে দেখি, মার্লিন পাশেই বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে চুপচাপ, নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ মার্লিনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম—ঘুমুচ্ছে বলেই ত মনে হল। আমারই ভুল—এই মনে করে আবার বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। [ক্রমশঃ।

স্থবির রাত্রির মাঝে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জীবনের কথা যত অশ্রুজলে হোলো লেখা
একে একে হারায়েছে দুরন্ত সমীরে।
ছায়াভরা গোধূলিতে দিক্চক্রে ছিন্ন রেখা
দেখেছিনু বর্ণময় নীল সিন্ধুতীরে।

ভঙ্গুর স্বপ্নের সাথে অতীতের স্মৃতি ভাসে
দূর হোতে ডেকে গেল যাযাবর পাখী ;
স্থবির রাত্রির মাঝে সময় ঝিমায়ে আসে
অধীর দুরাশা লয়ে কেন জেগে থাকি ?

ভয়-ভয় হৃদি মোর, কণ্ঠে স্বর যায় থেমে,
অতৃপ্তির হাহাকারে ডুবে গেল চাঁদ।
স্রোতের বিদ্রূপ শুনি মেঘেরা এসেছে নেমে,
ঘনায়েছে বালুচরে ক্লান্ত অবসাদ।

অসহায় এ অন্তরে একা থাকা অবকাশ,
স্মরণের নীরবতা ঘিরেছে আমারে।
ভেঙ্গে গেছে মধুশাখা—মাধবীলতার ত্রাস,
বীথিকার আর্ত্তনাদ-সঙ্কুল আঁধারে।

অবসন্ন দীর্ণচিত্তে নৈরাশ্যের নিশাচর
বিচলিত করে কেন অশান্ত আবেগে ?
মনের ভূগোলে ঝড় উঠিতেছে নিরন্তর,
উৎসবের অবসর নাহি আর জেগে।

আগামী দিনের নীড়ে প্রভাতী কূজন-ধ্বনি
পশিবে কি কানে মোর রজনীর সাথে রণি ?

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ছাব্বিশ

পল্লব জেনোয়ায় পৌঁছল সেদিনই রাতে। গ্র্যাণ্ড হোটেলে রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালে উঠেই গেল সোজা লয়েড ত্রিয়েস্তীনো অফিসে। তারা খাতাপত্র দেখে একগাল হেসে বলল: এক আমেরিকান আজই তার করেছে রোম থেকে যে তিনি নাপোলিতে যেতে পারবেন না তাঁর বার্থটি পেতে পারেন—Signore e fortunato, ma deve Comprarlo ligliett—Subito—di prima class... ১

পল্লব বাধা দিয়ে যথাবিধি Molti graxic ২

হোটেলে ফিরে স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রথমেই তার করে দিল কুস্থমকে। তার পরে লিখল—এলিওনোরাকে, য়ুসুফকে, ফ্রাউ ক্রামারকে ও পাপিরোকে। প্রত্যেককেই লিখেছিল—নাপোলি জাহাজে রওনা হচ্ছে ঠিক এক সপ্তাহ পরে—এর মধ্যে আশা করি উত্তর পাবে...ইত্যাদি

য়ুসুফের চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে শুধু জুড়ে দিল: খুব লোক কিন্তু! কথা দিয়েও কথা রাখলে না—জানালে না কোনো খবর। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি—হঠাৎ—সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। কী ভাবে বলব না—তুমি যখন বলো না কিছু, আমিই বা বলব কেন? শুধু বলি—ভালোই হ'ল যে আইরিন সময়ে টের পেয়েছে তার পথ আলাদা, আমার পথ আলাদা। যাকে ভালোবেসেছে সে যেন ওকে পূর্ণতার দিকে ঠেলে দেয়। ও সুখী হোক—এই প্রার্থনা।

* * * *

তিন দিন পরে প্রথম উত্তর এল য়ুসুফের কাছ থেকে।

'প্রিয় পল, তোমার চিঠি পেয়েছি। আইরিন দিন দুই হ'ল ফিরেছে ভেনিস থেকে। তোমাদের কী ভাবে দেখা হয়েছিল তাও শুনলাম। এ সম্বন্ধে আমি কিছু লিখতে চাই না; কারণ আইরিন সম্ভবত তোমাকে নিজেই লিখবে। কিন্তু যদি না ও লেখে তবে ব'লে রাখি—তাকে ভুল ভেবে মিথ্যে কষ্ট পেয়ো না। দেশে ফিরে তোমাকে সব বলব—মানে যদি সে নিজে না লেখে। কেবল আর একটা কথা: বাইরের যোগাযোগে অনেক সময়েই মানুষের এমন ছবি ফুটে ওঠে যা তার স্বরূপ নয়। এর বেশি আজ আর বলব না।

প্রার্থনা করি—তুমি সফল হও, সার্থক হও। তোমার কাছে আমি যে কতখানি ঋণী তা তুমি জানো না।

আজ ক'দিন থেকে তোমার একটি গান কেবলি ফিরে ফিরে আমার কানে বাজছে—যে-গানটি তুমি আইরনের কাছে শেখা একটি রুশ গানের ছন্দে সুরে অনুবাদ ক'রে গাইতে—তোমার ভাবে ভরা কণ্ঠে:

'কে বা তখন জানিত বলো মুদূর করে সজল
সমীপে যে-বাণী নাহি জানে?
আজ যে বেদনা মেঘ আনে কাল তারি বরদানে
জাগে ফল ফুল গানে গানে।
ইতি। য়ুসুফ।'

সাতাশ

একদিন—দু'দিন—তিনদিন কেটে গেল—কিন্তু কই আইরিনের প্রত্যাশিত চিঠি? মনের মধ্যে ওর ব্যথা ওঠে গুম্‌রে গুম্‌রে—সময়ে সময়ে ক্ষোভের বলে তাকে পারে দাবিয়ে রাখতে—কিন্তু আবার জেগে ওঠে—নিরাশার সঙ্গে আশা, রুক্ষতার সঙ্গে কোমলতা! আইরিনকে ও ভুল বুঝেছে? কিন্তু কেমন ক'রে? স্বচক্ষে দেখে নি কি?

এল সোমবার। আজ সন্ধ্যা সাতটায় জেনোয়া থেকে নাপোলি ছাড়বে। পল্লব সকালে হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করল: কোনো চিঠি?

ম্যানেজার একগাল হেসে বললে: Si, Signore! ৩ খামে ষ্টকহল্‌মের ছাপ।

'প্রিয়, পল! তোমার চিঠি পেলাম। তুমি যে এত হঠাৎ দেশে ফেরা স্থির করবে ভাবি নি। কিন্তু তোমার প্রিয়তম বন্ধুর এমন কঠিন অসুখ—তুমি অপেক্ষা করবেই বা কেমন ক'রে? এদিকে আমার বাবারও অসুখ কঠিন। কবে সারবে—বা আদৌ সারবে কি না—কেউ বলতে পারে না। তোমাকে আরো অনেক কথা বলবার ছিল—হ'ল না। আমার অদৃষ্ট! হয়ত—ফের একদিন দেখা হবে—কোথায় কে জানে?

কিম্বা হয়ত কোনদিনই আর আমাদের দেখা হবে না। ভাবতে এখনো ব্যথা বাজে। আমি মাস কয়েক আগেও ভাবতাম যে বন্ধুত্বের পর্ব আমার জীবনে শেষ হ'য়ে গেছে—কর্মের মধ্যেই আমাকে খুঁজতে হবে—কী যে সে ইষ্টার্থের নাম—এখনো জানি না। কেবল এইটুকু জানি যে যদি নিজের কাছে খাঁটি থাকি তবে একদিন না একদিন জানতে পারবই পারব।

এক একবার ভাবি—তোমার সঙ্গে দু'দিনে যে-স্নেহবন্ধনটি এমন স্বচ্ছন্দে গ'ড়ে উঠেছিল—মাঠে ঘাটে আপনা থেকে ফুটে ওঠা ঘাসের ফুলের মতনই—তার সার্থকতা কোথায়? জানি না। কেবল একটা কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না: যে এ সম্বন্ধের মধ্যে যে সুষমাটি আমাদের কারুর কোনো চাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই ফুটে উঠেছিল নিটোল হয়ে—সে আকস্মিক অর্থহীন কোনো কিছু হ'তে পারে। মনে হয়—তোমার সংস্পর্শের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যে ভাবে পেয়েছিলাম, তোমার আদর্শের মধ্যে দিয়ে তাকে পাব হয়ত আরো নিবিড় করে, পূর্ণ করে। তাই হে আমার জীবনপথের পথিক বন্ধু, তুমি যে আমার অচিন পথ-চলার মাঝে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে এসেছিলে সে জন্যে তোমার উদ্দেশে নমস্কার করি।

তোমার স্নেহকৃতজ্ঞ বন্ধু পাপিরো।'

পল্লবের চোখ জলে ঝাপসা হ'য়ে আসে।

১। মহাশয় সৌভাগ্যবান্‌, কিন্তু আপনাকে এখনি টিকিট কিনতে হবে—প্রথম শ্রেণীর।

২। বহু ধন্যবাদ।

৩। আজ্ঞে মহাশয়

আটাশ

সন্ধ্যা সাতটা। ভোঁ—

জাহাজ ছাড়ল। পল্লব একদৃষ্টে ইতালির ম্লানায়মান তীরের দিকে চেয়ে থাকে—রেলিঙের উপর হেলে।

হঠাৎ চমকে ওঠে: সিনিয়োর বাক্‌চি!

হ্যাঁ।

ষ্টুয়ার্ড ওর হাতে একটি চিঠি দিল।

অবশেষে খামে ঠিকানা: নাপোলি, জেনোয়া। ওর বুকের রক্ত দুলে উঠল আইরিন!

চিঠিটি খুলতে ওর হাত কেঁপে ওঠে।

'প্রিয় পল,

জানি না তোমাকে কী লিখব আজ। শুধু একটা তীব্র ব্যথা আমার সমস্ত মনকে ছেয়ে আছে। তাই কী লিখতে কী লিখব বলতে পারি না।

সেদিন ভেনিসে তোমাকে গণ্ডোলায় দেখার পরদিনই আমি বার্লিনে ফিরে আসি—যদিও ভেনিসে গিয়েছিলাম মাসখানেক থাকব ভেবে।

সেদিন সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি। জানি না একথা বিশ্বাস করবে কি না। তবু দু-চারটে কথা আজ লিখব—বিশ্বাস না করো—নিরুপায়।

কুঙ্কুমকে যে চিঠি লিখেছ প'ড়ে হাসি এল। গণ্ডোলায় সে-ভদ্রলোকটি আমার প্রণয়ী নয়—আমার দাদা, মাত্র সেদিন মস্কো থেকে বার্লিন এসেছেন।

অথচ তুমি ধরে নিলে আমি তোমাকে ভুলে গেছি আর একজনের জন্যে? কেমন ক'রে ভাবতে পারলে? না—হয়ত ভাবাটা অস্বাভাবিক নয় তোমার পক্ষে। কিন্তু আমার মন ব্যথিয়ে ওঠে ভাবতে যে এমন কথাও তুমি মনে ঠাঁই দিতে পারলে—যে-তোমাকে আমি আমার স্বপ্নেও ভুলতে পারি না?

তবু কেন তোমাকে ছাড়লাম? কী মূর্খতা এ? বলব আজ, যদিও বিশ্বাস করবে না হয়ত। তবু না লিখে পারছি না।

প্রথমে ভেবেছিলাম—আমি বা স্থির করেছিলাম সেই সংকল্পই বজায় রেখে ধীরে ধীরে তোমার মন থেকে লুপ্ত হয়ে যাব—আমার অস্তিত্বের কোনো স্মারকই তোমাকে পাঠাব না—কোনো অছিলায়ই না। কিন্তু পারলাম না সে-সংকল্প বজায় রাখতে। এমনি দুর্বল মন আমাদের: ভাবি অনেক কিছুই পারি, কিন্তু করতে গেলে দেখি—অসম্ভব। দেখ না: আমাকে তুমি ভুলে যাও এইই তো আমি চাই? অথচ আমাকে তুমি তাই ভাববে যা আমি নই—এ চিন্তা আমাকে অশান্ত করে তুলেছে। বিজ্ঞেরা বলবেন: এরি নাম—উচ্ছ্বাস, দুর্বলতা। হয়ত তাই, কিন্তু তবু বলব এ-দুর্বলতা আমার শুধু লজ্জাই নয়, গৌরবও বটে। তুমি কী জাদুতে দুদিন আমার হৃদয় জুড়ে বসলে আমি আজো জানি না—জানতে চাইও না—কী হবে জেনে? কেবল এইটুকু না চেয়ে পারছি না আজ যে তুমি অন্তত আমাকে অসার ভেবো না, ভেবো না আমি তোমাকে ভালোবাসিনি কোনো দিনও। একদিন যে-তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে তার জোরে এটুকু চাওয়াও কি বড় বেশি দাবি? কিন্তু না—দুর্বল উচ্ছ্বাস রেখে যা লিখতে আজ কলম ধরেছি, বলি।

তুমি চলে যাবার পরদিনই ফ্রাউক্রামারের কাছে পড়তে গিয়ে তোমার সম্বন্ধে সব কথাই ব'লে ফেলেছিলাম খোলাখুলি। এখন সময়ে সময়ে মনে হয়—কেন বলতে গেলাম?

ফ্রাউক্রামার আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করলেন। খুব কোমল স্বরেই কথা কইলেন। কেবল শেষে বললেন শুধু একটা কথা ভালো করে শান্ত হয়ে ভেবে দেখতে: যে, আমাকে নিয়ে যদি তুমি এখন দেশে ফেরো তা হ'লে ফলটা কী দাঁড়াবে। বললেন: এখন তোমাদের দেশে ঘোর স্বদেশীর যুগ, বিদেশী কাপড়-চোপড় পর্যন্ত 'বন-ফায়ার' করে পোড়ানো হচ্ছে। বললেন: কুঙ্কুম একদিন তাঁকে হেসে বলেছিল—ফ্যাশন কী রকম বদলায় রাতারাতি—'মেমসাব' সম্বোধনটি এখন সম্ভ্রমের নয়—ঘৃণার। তাই, বললেন ফ্রাউক্রামার, এ সময়ে আমি তোমার সঙ্গে দেশে ফিরলে শুধু তোমার আত্মীয়-স্বজন নয়, তোমার বন্ধুরাও মুখ ফেরাবে। বিশেষ করে নিরাশ হবে—তোমার প্রিয়তম বন্ধু কুঙ্কুম—যে আজ বাংলা দেশের হিরো ও এখন জেলে। কিন্তু যদি সে তোমার আমার প্রতি বিমুখ না-ও হয় তা হলেও এই সময়ে, যখন সারা দেশে বিজাতিবিদ্বেষের বান ডেকেছে, হয়ত আমাকে নিয়ে হবে তোমার উভয় সংকট—আমাকে না পারবে ছাড়তে, না রাখতে।

সেদিন সারা রাত আমি বিছানায় শুতে পর্যন্ত পারি নি, ঘুমনো তো দূরের কথা। সত্যি কি তোমাকে ছাড়তেই হবে তোমার মঙ্গলের জন্যে? একবার মনে হ'ল—যাই তোমার কাছে ছুটে। এ ইচ্ছাকে যে কেমন করে দমন করলাম আজও আশ্চর্য হয়ে ভাবি সময়ে সময়ে! শুধু এই চিন্তাই আমাকে জোর দিয়েছে যে তোমার কাছে গিয়ে পড়লে তুমি আমাকে উপদেশ দেবে নিজের কথা ভেবে নয়—আমার কথা ভেবে, অথচ আমি কিছুতেই পারব না তোমার কথা ভেবে তোমাকে ঠেলতে।

কিন্তু ভাবব কী—যত ভাবি তত বুক ঠেলে ওঠে কান্না: কেন এমন হল···কেন এমন হল?

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে ঘিরে রাখব—সব আঘাত থেকে বাঁচাব। কিন্তু মনে হল ফের ফ্রাউক্রামারের কথা: পুরুষের জীবন শুধু প্রেমকে নিয়ে ভরে করতে পারে না—যেমন নারী'রা পারে। পুরুষের সার্থকতার জন্যে চাই কর্মের ক্ষেত্র, দেশসেবার সুযোগ, উচ্চাশার সফলতা—হয়ত আরো অনেক কিছু যা আমার অজানা। তোমাদের সার্থকতার কতটুকুই বা আমরা কল্পনা করতে পারি বলো?

হঠাৎ একটা গভীর কঠিন স্বর যেন বুক ঠেলে উঠল, বলল: এর একটি মাত্র সমাধান আছে—তোমার বিকাশের জন্যেই তোমাকে বিসর্জন দেওয়া। এ স্বরটি শুনবামাত্র একদিকে যেমন অকূল-পাথারে পেলাম কূল, অন্যদিকে বুকের মধ্যে যে কী করে উঠল—কেমন করে বোঝাব তোমাকে? আমি একলা নিজের ঘরে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম: এ আমি পারব না, পারব না, পারব না।

তাই তো তোমাকে খোলাখুলি লিখতে পারলাম না, ভাবলাম—সময় নিই একটু, দেখি মাসখানেক তোমাকে চিঠি না লিখে। যদি একান্ত না পারি তো তোমার শরণ নেওয়ায় শেষ সমাধান জো

আছেই। আর যদি এর মধ্যে তোমার মনে আমার প্রতি বিমুখতা জেগে ওঠে তাহলে হয়ত তোমাকে ছাড়া আমার পক্ষে একটু সহজ হয়ে আসতেও পারে।

ভাবতে ভাবতে আমি অসুখে পড়লাম। জ্বর দেখতে দেখতে বিকারে দাঁড়ালো। নাতাশা ভয় পেয়ে দাদাকে তার করল। তিনি এসে পড়লেন। শুনলাম, প্রলাপের মধ্যে কেবলই বলেছি—পারব না পারব না পারব না তোমাকে ছাড়তে। তাই তো ওরা সবাই জেনে ফেলল—ব্যাপার কী।

নাতাশা ও ক্রাউক্রামারের সঙ্গে পরামর্শ করে দাদা স্থির করলেন, আমি সেরে উঠলেই আমাকে মস্কো ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তুমি তখন রোমে—আমি মস্কো ফিরি কোন প্রাণে? ভাবো কী অসঙ্গতিতে ভরা আমাদের জীবন! যদি তোমার অদর্শনেই কাটাতে হয় তবে আমি মস্কোতেই থাকি বা বার্লিনেই থাকি একই কথা তো? কিন্তু ঐ যে একটা আশার আলোকণা মনের আঁধার কোণে তখনো জ্বলছিলো—হয়ত বা তোমার সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। হয়ত তুমি হঠাৎ আসবে ফিরে বার্লিনে। দেখ দুর্বল মনের কারসাজি—ছেড়েও পারে না ছাড়তে—বিদায় দিয়েও চায় আরো আঁকড়ে ধরতে!

কিন্তু তার পরেই জেগে উঠল আত্মগ্লানি—এ কী থিয়েটার করছি! যদি তোমাকে ছাড়তেই চাই তবে এভাবে নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলার মানে কী? ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম—বার্লিনে আর থাকা নয়। দাদাকে বললাম—টিরোল ও সুইজর্ল্যণ্ড দেখার আমার বড় সাধ, তারপরে যাব মস্কো। দাদা সানন্দেই রাজি হলেন। আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসেন বললেন: ভালোই তো, একটু হাওয়া বদল হবে।

কাতয়া ও মাশাকে নিয়ে আমি হলাম দাদার সহযাত্রী। গেলাম প্রথম ইনস্ব্রুক। সেখান থেকে সুইজর্ল্যণ্ড। তোমাকে কার্ড-চিঠি পাঠালাম, নৈলে হয়ত তুমি বার্লিনে এসে পড়তে—আর তাহলে আমার সব সঙ্কল্পই যেত ভেসে—বানের জলের সামনে বালির বাঁধের মতনই। তোমাকে কার্ড-চিঠি দেবার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল—আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি বলে তুমি আমাকে ধরতে পারবে না।

যা ভয় করেছিলাম তাই হল: কয়েকটি বড় চিঠি লিখে তুমি চিঠি লেখা বন্ধ করলে শেষ চিঠিতে শুধু লিখে: আমি বার্লিনে ফিরে তোমাকে বড় চিঠি লিখলে তবে তুমি আমাকে চিঠি দেবে, নৈলে নয়।

আমি আর পারলাম না। গভীর রাত্রে উঠে তোমাকে একটি সুদীর্ঘ পত্রে লিখলাম সব খুলে—আর পারছি না, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তুমি ফিরে এসো, যা হবার হবে।

ঠিক পরদিনই নাতাশার এক চিঠি পেলাম। সে লিখল, য়ুসুফ বার্লিনে ফিরেছে ও তার সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্তা হয়েছে। লিখল: য়ুসুফ যদিও আন্তর্জাতিক বিবাহে বিশ্বাস করে, তবু মনে করে যে, হয়ত একটু অপেক্ষা করা ভালো, কেন না ঠিক এসময়ে আমাকে নিয়ে দেশে ফিরলে তোমাকে উঠতে বসতে আঘাত সইতে হবে ঘরে-বাইরে। তাছাড়া—লিখল নাতাশা—য়ুসুফকে তুমি মোহনলাল ও কুসুমের যে-চিঠি দেখিয়েছিলে সে নিয়ে ওরা অনেক আলোচনা ক'রে স্থির করেছে যে তোমাদের দেশকে যদি আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসতে না পারি তবে আজকের দিনে শুধু যে আমিই সুখী হব না তাই নয়, তোমাকে করব আরো অসুখী—ঠিক যে-কারণে মোহনলাল ও রিতা অসুখী হয়েছে। এরও পরে আর একটা কথা ভাববার আছে: কুসুম এখন অসুস্থ, বিষম ঘা খাবে। নাতাশা এ-ও লিখল যে রিতা না কি এতই অসুখী হয়েছে যে হয়ত তাকে মাস খানেকের মধ্যে একলাই ইতালি কিম্বা সুইজর্ল্যণ্ড পাঠাতে হ'তে পারে—কে জানে?

নাতাশার এ-চিঠি টি প'ড়েই আমি আমার চিঠিটি ছিঁড়ে ফেললাম। পণ নিলাম—আর গড়িমসি নয়—তোমার জন্যেই আমাকে চাইতে হবে যে তুমি আমাকে ভুলে যাও। দাদাকে বললাম—তখন আমরা জেনেভাতে—চলো ভেনিস—তারপরই সোজা মস্কো ফিরব।

ভেনিসে পৌঁছে মন আমার একটু শান্ত হ'ল। কিন্তু কেন শুনলে তুমি হ'সবে: তুমি কাছেই আছ ভেবে। কেবলই মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করতাম—হয়ত যাব রোমে, হয়ত দেখা হবে, কে বলতে পারে? বলবে হয়ত—কী উলটো-পালটা কথা! সত্যিই তাই। অথচ মিথ্যা নয়—বিশ্বাস কোরো। কিন্তু থাক এসব বাজে কথা। যা বলতে কলম ধরা—বলি।

ভেনিসের সৌন্দর্যেও আমার মন খানিকটা জুড়িয়ে এল। তা ছাড়া একটু একটু করে বলও তো পাচ্ছিলাম। শোক হাজার তীব্র হ'লেও ধীরে ধীরে ক'মে আসেই আসে—নৈলে কি মানুষ বাঁচতে পারত এ-জগতে? কিন্তু ঐ জোর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে জমে উঠল একটা গভীর ঔদাসীন্য নির্বেদ, যা হয় হোক কী যায় আসে? অনেক দিনের পর আমি একটু যেন শান্তির আভাস পেলাম। তোমার জন্যেই তোমাকে ছাড়ছি ভাবতে ব্যথা বাজলেও মনে হ'ল ঠিকই করেছি—নিজের সুখ-স্বার্থের কথা না ভেবে তোমার মঙ্গল চিন্তাকেই আঁকড়ে ধরে। বেদনার মধ্যে জেগে উঠল একটা মধুর বৈরাগ্য।

ঠিক এই সময়েই হঠাৎ তোমার সঙ্গে ভেনিসে দেখা। আর কোথাও যদি দেখা হ'ত হয়ত পারতাম না নিজেকে রুখতে। কিন্তু তবু আজো ভেবে পাই না কেমন ক'রে এ পারলাম?

জানি না, এখন আমার প্রতি তোমার মনের ভাব কী। তবে আশা করি আমার স্মৃতি তোমার মনে এতদিনে ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে, তাই তুমি যদি দয়া বোধ করো ব্যথা বেশি পাবে না। অথচ এ কথা ভাবতেও আমার মন অস্থির হ'য়ে ওঠে—দেখছ আমাদের দুর্বল মনের অসঙ্গতি: যাকে ব্যথা দিতে চাই না সে ব্যথা পাবে না ভাবতেও বাজে। কিন্তু থাক, মিথ্যে উচ্ছ্বাস, শেষটুকু বলি।

ভেনিসে তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে বিদায় নেবার পর আমার মনের মধ্যে শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে একটা—কী বলব, রিক্ততা মতন জেগে উঠল: মনে হল যেন জীবনটা একটা ছায়াবাজি।

কেবল একটা গভীর সান্ত্বনার আলো আমার মনে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল যে, আমি তোমাকে ছেড়েছি, ব্যথা দিয়েছি শুধু তোমারি কথা ভেবে। অবশ্য অভিমান ক'রে হয়ত তুমি বলতে পারো, কেমন ক'রে আমি জানলাম যে তোমার আমার মিলন অকৃতার্থ হ'তই হ'ত? এ প্রশ্নের উত্তর নেই শুধু এই ছাড়া যে আমরা পথ চলি যেটুকু জানি তাকেই সম্বল ক'রে—কিসে কী হয় তার কতটুকুই বা জানি বলো?

তারপর? তারপর আর কী? বাইরের দিক থেকে আমি সেই

আইরিনই আছি। কিন্তু সময়ে সময়ে নিজের অন্তরের দিকে যখন তাকাই চিনতে পারি না নিজেকে। আমার মধ্যে কই সে আমি-আমি ভাব? সর্বত্রই যে তুমি! তোমার মুখ, তোমার হাসি, তোমার অপরূপ কণ্ঠ থেকে থেকে মনে পড়ে স্বপ্নে ভেসে আসা হারানো সুধা-স্বাদের স্মৃতির মতন।

আমি কেবল একটা কথা আজও ভেবে পাই না: তোমার জন্যেই তোমাকে ছাড়তে হবে, আমার এ পণ আমি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারলাম কিসের জোরে? আমি তো জানি, আমি ভিতরে ভিতরে কী দুর্বল! এ-প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর আছে: এ বল আমি পেয়েছি তোমাকে সত্যি ভালোবেসেছি ব'লে; তুমি বলতে না—মেয়েরা 'শক্তি'। হ'তে পারে, কিন্তু এ শক্তি তারা নিজের সাধনায় জাগাতে পারে না। তাই বলব, তুমিই জাগিয়ে তুলেছ আমার সুপ্ত শক্তি, মহৎ শক্তি। সেই তোমাকে আজ চিরবিদায়ের দিনে অন্তর থেকে জানাই প্রণাম।

কিন্তু বল পেয়েও তবু আমরা কী দুর্বল ভাবো? আমি খুব ভালো করেই জানি যে, তোমাকে এ চিঠি লেখা আমার উচিত ছিল না। ভালো হত যদি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়েই তুমি দেশে ফিরে যেতে, কেন না তাহলে আমাকে ভুলে যাওয়াও তোমার পক্ষে সহজ হত। কিন্তু সেদিন ভেনিসে গণ্ডোলায় তোমার উঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকার স্মৃতি আমাকে এত অস্থির করে তুলেছে যে আমি কিছুতেই তোমাকে না জানিয়ে থাকতে পারলাম না যে আমাকে তুমি সেদিন যা ভেবেছিলে—যে কথা যুসুফকে লিখেছ—আমি তা নই। তুমি আমাকে ভুলে যাবে, এ চিন্তায় ব্যথায় আমি অধীর হয়ে পড়লেও সে-ব্যথা সইবার ও বইবার শক্তি আমি ব্যথার মধ্যে দিয়েই অর্জন করেছি: কিন্তু তুমি আমাকে ভুল ভেবে ঘৃণাকেই সম্বল করে এদেশ থেকে বিদায় নেবে, এত বড় শেল সহ্য করবার মতন কঠিন বুক বিধাতা আমাকে দেন নি। তাই বার বার এ-চিঠি ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও পারি নি।

তোমাকে আমার আরো কত কথাই যে বলবার ছিল—কত আশা-স্বপ্ন, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, সাধ-আকাংখা—তোমার কাছে আমার প্রতি কামনা-বাসনার নিবেদনে দিনে দিনে কত কী পাথেয় পেয়েছি জানাবার জন্যে আমার মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি, কেমন করে বোঝাব তোমাকে?

হয়ত তুমি বলবে—কেন চাই বোঝাতে যখন আমি নিজেই তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি? এ প্রশ্নের উত্তর আছে কি না আমি জানি না। শুধু জানি যে আমি ধন্য যে দু'দিনের জন্যেও তোমাকে কাছে পেয়েছিলাম—স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিনের জন্যেই জমিয়ে রেখে দিতে।

তোমার আইরিন।

* * * *

সামনেই পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু পল্লব জলভরা চোখ ফিরিয়ে নেয়। এত হাসি কিসের জন্যে? এ কি পরিহাস নয়?

হঠাৎ সামনে চোখ পড়ে। দু'টি ইতালিয়ান বালিকা হাততালি দিয়ে ডেকের উপরেই নাচ সুরু করে দিয়েছে লেওপার্দির বিখ্যাত গানের সঙ্গে:

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?[৪]

ঘুরে ঘুরে গায় ওরা এই দু'টি চরণ। পল্লব চোখের জল মোছে: এই গানটিই একদিন আইরিন উচ্ছল হ'য়ে গেয়েছিল ব্যাগনিতে। সে গানের আনন্দরেশ আজ কোথায়? আজ মনে হয় সব আনন্দই পরিহাস···নীরব চাঁদ করছে কী—শুধু হাসছে দেখে মাটির মানুষের মিথ্যে উচ্ছ্বাস।

গান থেমে যায়···ডিনারের ঘণ্টা বাজে···পল্লব ওর ডেকচেয়ারে শুয়েই চেয়ে থাকে আকাশের পানে···কিন্তু চাঁদের দিকে নয়—একটি তারার দিকে। কী সুন্দর!

কখন যে ও ঘুমিয়ে পড়ে···স্বপ্ন দেখে বড় বিচিত্র!

এলিওনোরা যেন গাইছে পল্লবের একটি অতি প্রিয় গান—তার ঘরে মারিয়ার প্রিয় ভার্জিন মেরির প্রতিমার দিকে চেয়ে:

"Ach, im Traumen und im wachten
Shwebt mir vor Sein liebes Bild:
Und in Schlummerlo″ sen Na″chten
Qua″lt mich Sehnsucht ungestillt..."

ধীরে ধীরে এলিওনোরা যেন রূপান্তরিত হয়ে যায়···গাইছে ঐ গানটিই আইরিন···পিছনে পল্লব দাঁড়িয়ে অথচ আইরিন জানে না···গেয়েই চলে: Ach, im Traumen und im wachten... সঙ্গে সঙ্গে পল্লব যেন ধরে দেয় এই বিখ্যাত রুশসুরে রচিত জর্মন গানটির বাংলা প্রতিরূপ:

"জাগরে স্বপনে ভেসে ওঠে শুধু
সুন্দর বঁধুর মধুর ছবি:
ঘুমহারা এই নিশীথেও মধু
তারি অতৃপ্ত কামনা জপি।"

ফের স্বপ্ন যায় বদলে···আইরিন মিলিয়ে যায়—সামনে কুঙ্কুম···বিছানায় শুয়ে। পল্লবকে দেখে কোনোমতে উঠে ওকে আলিঙ্গন করে। পল্লবের সব তাপ যেন জুড়িয়ে যায়···কিন্তু এ কী!···এ তো কুঙ্কুমের বাহুবন্ধন নয়!···আইরিনের। সে বলে হেসে: কেমন? বাঁধন কাটাতে চেয়েছিলে না?··যতই আমাকে ঠেলবে দূরে—ততই আসব কাছে···গাও···

এবার ওরা দু'জনে ধরে এক সঙ্গে:

জাগরে, স্বপনে ভেসে ওঠে শুধু···

* * * *

বৃষ্টির ছাটে ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

আকাশে চাঁদের চিহ্নও নেই···ঝড় উঠেছে···চারিদিকে শুধু কালো ঢেউ···

ষ্টুয়ার্ড বলে: Scusi, Signore..uragano..[৫]

পল্লব দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ওঠে: Grazie..[৬]

৪। ঐ আকাশে করছ কী গো, চাঁদ! বলো আমায়—করছ তুমি কী—ও নীরব চাঁদ?

৫। ক্ষমা করবেন··ঝড়···। ৬। ধন্যবাদ।

সমাপ্ত

কাল তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

তিন

পাশের ঘরের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়ালেই সোনাবউদির গোটা সংসারটা চোখে পড়ে।

মস্ত ঘর। আধা-বস্তির যে-দুটো ঘরে থাকত এই একটাই তার চারগুণ। কালের জরায় ঘরের জলুস গেছে, কাঠামো যা আছে তাও তাক লাগার মত। ধীরাপদর মনে আছে ঘর দেখাতে এনে সোনাবউদির দুচোখে আনন্দের বন্যা দেখেছিল। রাজ-পুরুষের আমলে এটা নাকি ছিল মজলিস কোঠা। ভিতরের দরজা দিয়ে লাগোয়া একটা খুপরি ঘর। এটার তুলনায় বে-খাপ্পা ছোট। সোনাবউদি আরো খুশি, এটা মজলিস ঘর আর ওটা কী?

ওটা কি বা কেন, ধীরাপদ ভাববার অবকাশ পায়নি তখনো। কি করেই বা পাবে, একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের গঞ্জনায় আর ওর ছাত্রী পড়ানোর দাপটে নাজেহাল হয়ে তার আগের দিন মাত্র মজলিস ঘরের অধিবাস তুলেছেন রমণী পণ্ডিত। আর তার পরদিনই গণুদা আর সোনাবউদিকে ঘর দেখাতে নিয়ে এসেছিল ধীরাপদ। সোনাবউদির আনন্দ দেখে তারও আনন্দ হয়েছিল। বলেছিল, এটা বোধহয় রসদ-ঘর, মজলিসের রসদ মজুত থাকত…।

এই রসদ-ঘর এখন গণুদার শয়ন-ঘর।

প্রথম দিন থেকেই সেই ব্যবস্থা সোনাবউদির। প্রস্তাবনাটা ধীরাপদ আজও ভোলেনি। গণুদার দিকে চেয়ে বেশ হালকা করেই বলেছিল, যে-রসদই হোক যোগাচ্ছ যখন—তুমি ওই ঘরটাতেই থাকো!

যে ঘরে এতকাল থেকে এসেছে সে-তুলনায় ওই খুপরি ঘরও স্বর্গ। তবু এমন গড়ের মাঠের মত জায়গা পড়ে থাকতে তাকে ওখানে ঠেলার ব্যবস্থাটা গণুদার মনঃপূত হয়নি। মৃদু আপত্তিও করেছিল, এত জায়গা থাকতে আবার ওখানে কেন, ও-ঘরে জিনিস-পত্র—

শেষ করে উঠতে পারেনি। কাচের সরঞ্জামগুলো মুছে মুছে সোনাবউদি তাকের ওপর তুলে রাখছিল। সেখানে থেকেই ফিরে তাকিয়েছিল শুধু। গণুদা আমতা আমতা করে বলেছে, ও-ঘরটায় তেমন বাতাস লাগবে না বোধহয়—

থাক্, আর বেশি বাতাস লাগিয়ে কাজ নেই।

ধীরাপদর কানে ঠাণ্ডা বিদ্রূপের মত লেগেছিল কথাগুলো। ওর চোখে চোখ পড়তে সোনাবউদি হেসে ফেলে তাড়া দিয়েছে, সং-এর

[illegible]

একটু আগে বেশি ব্যস্ত হওয়ার জন্য তাই তাড়া খেয়ে ধীরাপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

সোনাবউদি ঘরণী পটু। এতবড় ঘরটাকে বেশ সুবিভক্ত ভাবে কাজে লাগিয়েছে। একটা দিক ভাগ করে নিয়ে গৃহস্থালি পেতেছে, অন্যদিকে নিজের আর ছেলেমেয়েদের শোবার জায়গা। মাঝখানটা ফাঁকা। তার ওধারে একফালি ঢাকা বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা।

ধীরাপদ ঘরে ঢুকল। এক কোণে ঘাড় গুঁজে মেয়ে উমারাণী হাতের লেখা মকস করছে। ঘরের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে মুখ দিয়ে একটা কল্পিত এঞ্জিন চালাচ্ছে পাঁচ বছরের টুনু। আর তার পরের বাচ্চাটা দিদির পাশে বসে নিবিষ্টচিত্তে একখণ্ড কাগজ বহু খণ্ডে ভাগ করছে।

ওদিক ফিরে বসে সোনাবউদি বাটিতে দুধ ভাগ করছিল। কারো পদার্পণ অনুমান করেই ফিরে তাকালো হয়ত। তোলা উনুনে ছোট জলের কেটলিটা চাপিয়ে দিয়ে ঘরে এসে মেয়েকে বলল, খেয়ে নে গে যা, ওদের নিয়ে যা—

ধীরাপদর দিকে ফিরল। আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

না…।

সেই কখন থেকে তো উঠে বসে আছেন দেখলাম, এতক্ষণ কি করলেন?

আপনার প্রণামের ঘটা দেখে ভক্তিতত্ত্বের কূলকিনারা খুঁজছিলাম—

হেসে ফেলেও সামলে নিল। পেলেন?

না। চৌকির একধারে বসল সে।

পাপী-তাপী মানুষ, পাবেন কি করে—অমন সৎ ব্রাহ্মণ, পায়ের ধুলো পাওয়াও ভাগ্যি—বসুন, চা করে আনি।

উনুনে কেটলি চাপাতে দেখে মনে মনে ধীরাপদ এই ভয়টাই করছিল। যতটা সম্ভব সহজভাবেই বাধা দিল, চা থাক, কি কাজ আছে বলছিলেন?

দু' বছরের মধ্যে সম্ভবত এই প্রথম চায়ে অরুচি। বাধা পেয়ে সোনাবউদি দাঁড়িয়ে গেল। প্রচ্ছন্ন কৌতুকাভাস। দুই এক মুহূর্ত মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, চা থাকবে কেন, এ ক'টা দিন দিইনি বলে?

এই প্রসঙ্গ ধীরাপদ এড়াতে চেয়েছিল। আজ এই ঘরে আবার

[illegible]

নয় বলেই বাইরের সহজতাটুকু বজায় রাখার তাগিদ। তাছাড়া, দিন তার একেবারে খারাপ যাচ্ছে না সেরকম একটু আভাস সোনাবউদি পাক, কেন জানি তাও খুব অবাঞ্ছিত নয়। নির্লিপ্ত জবাব দিল, কাল রাতের খাওয়াটা বড় বেশি হয়ে গেছে···এখনো ভার ভার লাগছে।

সোনাবউদি সেখান থেকেই মেয়েকে নির্দেশ দিল চায়ের কেটলিটা উনুন থেকে নামিয়ে রাখতে। তারপর ঠোঁটের ডগায় হাসি চেপে বেশ সাদাসিধেভাবেই জিজ্ঞাসা করল, কাল রাতের খাওয়াটা অমন বেশি হয়ে গেল কোথায়?

আর কথা বাড়াতে আপত্তি নেই ধীরাপদর।—অনেককাল বাদে এক দিদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তার ওখানে।

আপনার দিদি আছে জানতুম না তো!

নিজের দিদি নয়।

পাতানো দিদি? হেসে ফেলেও চট করেই গম্ভীর আবার। প্রাতরাশ শেষ করে ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকেছে। সোনাবউদি মেয়েকে আদেশ দিল বাপের খুপরি ঘরে বসে পড়তে। মায়ের মেজাজ মেয়ে, ছেলে, এমন কি ওই দু'বছরের বাচ্চাটাও বুঝতে শিখেছে। বোনের সঙ্গে সঙ্গে তারাও সরে গেল। সোনাবউদির উৎফুল্ল হাসি তারপর।—আপনার যদি একটুও জ্ঞানগম্যি থাকত, পাতানো বউদি দেখেও শিক্ষা হল না, আবার পাতানো দিদি!

ধীরাপদ হাসিমুখেই জানিয়ে দিল, পাতানো দিদিটি তিরিশ বছর আগের।—কি বলবেন বলুন, একটু বেরুব—

দিদির ওখানে যাবেন?

না···।

বেশ একটু চিন্তিতমুখেই সোনাবউদি ওকে ডাকার কারণটা ব্যক্ত করল এবার। বলল, এমন দিনেই ব্রত সাঙ্গ হল, সৎ ব্রাহ্মণ দু'জন আহার করবেন, কিন্তু কাকে দিয়েই বা ব্যবস্থা করি।

ধীরাপদ অবাক।—ভটচায মশাই আর শিকদার মশাই?

মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত সোনাবউদির চিন্তাটা বাহ্যিক। হাসি চেপে জবাব দিল, হ্যাঁ, কপাল গুণে ওঁরাই আজ গোপাল ঠাকুর।

আমাকে গিয়ে নেমন্তন্ন করতে হবে?

ওকে আঁতকে উঠতে দেখে সোনাবউদি এবারে হেসেই ফেলল।—আপনার নেমন্তন্ন ওঁরা নেবেন কেন? সে কাজটা আপনার দাদা কাল রাতেই সেরে রেখেছেন। কিন্তু বাজারটা করাই কাকে দিয়ে, আপনার আবার দিদি জুটে যাবে জানলে ব্রতটা আপাতত সাঙ্গ না করলেও হত।

ভোরবেলার ব্যাপারটা স্পষ্ট হল এতক্ষণে। তিন দিন কাগজ না পাওয়ার পরেও একাদশী শিকদারের আজ কাগজ পাবার প্রত্যাশা। সোনাবউদির নিজের হাতে কাগজ দিয়ে আসা আর ভক্তিভরে প্রণাম। শেষের ঠাট্টাটা ওকেও খেতে বলার আভাস বোধহয়। সদাচারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে, ব্রত-পার্বণ পালন অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবু কেমন দুর্বোধ্য লাগছে ধীরাপদর। দু বছরের মধ্যে কোনরকম আচার-অনুষ্ঠান দেখা দূরে থাক, এ-সবে মতি আছে বলেও মনে হয়নি কখনো।

কিসের ব্রত ছিল?

তোরঙ্গ থেকে টাকা বার করে এনে সোনাবউদি ঠাট্টার সুরেই ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ক'টা ব্রত আপনার জানা আছে? নিন, আর দেরি করবেন না।

টাকা নিয়ে ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল। কি আনতে হবে?

হাতী ঘোড়া বাঘ ভালুক যা পান—হেসে ফেলল, যা ভালো বোঝেন আনবেন, নিজে না হলেই হল, আর একটু বেশি বেশিই আনবেন—

বাজার করা এই প্রথম নয়, সপ্তাহে তিন চারদিনই করতে হত। কিন্তু টাকার সঙ্গে কি আনতে হবে না হবে তারও একটা চিরকুট থাকত সোনাবউদির। আজ নেমন্তন্নের দিনেও সেটা নেই কেন অনুমান করা খুব শক্ত নয়। বাজারের পথে যেতে যেতে ধীরাপদ সেই কথাই ভাবছিল।···ওর ওপর নির্ভরতা দেখালো। আজ অনেক কিছুই দেখিয়েছে সোনাবউদি। সকালে প্রণামের ঘটা, দুপুরে আবার ওই দুজনেরই নেমন্তন্ন।···একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচায—তাঁরা এখন থেকে তুষ্টই থাকবেন বোধহয়। ধীরাপদ বাইরে শান্ত, কিন্তু ভিতরটা তার তুষ্ট নয় একটুও। তার সঙ্গে নতুন করে এই আপসের চেষ্টা কেন সোনাবউদির, সে-ও কি ওঁদেরই একজন! ডাকলে কাছে আসবে, ঠেলে দিলে দূরে সরে যাবে? সোনাবউদির ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সহজতার মুখোশটা আপনি খসে গেছে। কি করবে স্থির করে নিতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি।

বাজার নিয়ে কুঠি-সংলগ্ন দারোয়ানের পোড়ো ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। এখান থেকেও তাদের ঘর বেশ খানিকটা পথ। ডাকল, শুকলাল আছ?

মাঝ-বয়সি দারোয়ান শুকলাল তক্ষুনি বেরিয়ে এলো। নোমস্কার ধীরুবাবু, কি খোবর বলেন—

খবর ভালো, আমার বিশেষ তাড়া আছে, তুমি এগুলো একটু পৌঁছে দিয়ে এসো তো—

ওনেক বাজার দেখি! হৃষ্টচিত্তে শুকলাল থলে দুটো নিল। কোন ঘরে কার কাছে পৌঁছে দিতে হবে তার জানাই আছে।

নিশ্চিন্ত মনে ধীরাপদ বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল আবার। ভিতরে ভিতরে তারও এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে বইকি। বাজার পৌঁছে দিয়েই শুকলাল ফিরে আসবে না। রান্নার বারান্দার কাছেই গ্যাঁট হয়ে বসবে। বাজার দেখে তারিফ করবে। তাই থেকেই জিনিস-পত্রের দুর্মূল্যের কথা উঠবে, দিন-কালের কথা উঠবে। দুটো আলু, একটা বেগুন, এক টুকরো কুমড়ো ইত্যাদি তার দিকে এগিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ওঠার তাড়া দেখা যাবে না। কিন্তু মুখ ফুটে চাইবে না কিছু, দিলে বরং সলজ্জ আপত্তি জানিয়েই গ্রহণ করবে সেগুলো।

সে এসে বসলেই সোনাবউদি হাসে।

···আজ হাসবে?

ধীরাপদ খুশি হতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তবু কোথায় যেন অস্বস্তি একটুখানি। মাঝে মাঝে বিমনাও হয়ে পড়ছে। নিজের ওপরেই বিরক্ত হল সে, যা করেছে বেশ করেছে—ও নিয়ে আর মাথা ঘামানো কেন, তার এখন অনেক কাজ।

কাজের তাগিদে দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

কাজ বলতে বিজ্ঞাপন লেখার কাজ। সেও বাঁধাধরা কিছু নয়, যখন জোটে। আর বিজ্ঞাপন বলতেও বলাও কোনো ব্যাপার নয়। ছোট ছোট দুটো কবিরাজের দোকান আর একটা পুরনো বইয়ের দোকানের সঙ্গে কি করে একদিন যোগাযোগ হয়েছিল আজ আর মনেও নেই। বাইরে থেকে দেখলে ওই দোকানের আয়ে মালিকের নিজেরই ভরণপোষণ চলে কি না বোঝা শক্ত। হয়ত চলে না বলেই ধীরাপদ যে-রকম বিজ্ঞাপন লেখে সেই রকম বিজ্ঞাপনের দরকার। কবিরাজদের নতুন নতুন ওষুধ উদ্ভাবনে রোগ সারুক আর না সারুক, বিজ্ঞাপনের চটকে যে কাজ হয় সেটা নিজের চোখেই দেখেছে। রোগীও তুষ্ট চিকিৎসকও তুষ্ট। তাছাড়া, প্রকাশ্য রোগের থেকেও অপ্রকাশ্য রোগের সংখ্যা কম নয়। ওষুধের সংখ্যাই বা কম হতে যাবে কোন দুঃখে। চিকিৎসা না হোক, চিকিৎসার আশা তো। সেই আশাহতর সংখ্যাই কম নাকি?

বিজ্ঞাপন আশা-সঞ্জীবনী।

ওষুধ পুরনো হলে পুরনো বিজ্ঞাপনও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নতুন করে লিখতে হয় আবার। নতুন বিজ্ঞাপন লেখার পারিশ্রমিক দু'টাকা হলে পুরনোর আট আনা। নতুন পাওয়ার আশায় অনেক সময় বিনা পারিশ্রমিকেও করতে হয় সেটা।

বইয়ের দোকানের বিজ্ঞাপন লেখার কাজটা একটু অন্যরকমের হলেও মনে মনে ধীরাপদর সেটা আরো অপছন্দ। পুরানো বইয়ের দোকানে পুরানো বই মেলেই—সেই সঙ্গে বটতলার কাগজে ছাপা রঙ-বেরঙের মলাট দেওয়া নতুন বইও মেলে অনেক। স্বর্গ-দরজার কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার মত আচার অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কলাপ বিধি-বিধানের পুস্তিকাও আছে, আবার সম্মোহন বশীকরণ দেহ-বিজ্ঞান নব যৌবনলাভের সুলভ তথ্যের রসদও মজুত। দোকানের মালিক নিজেই পছন্দমত লেখক সংগ্রহ করে সুযোগ সুবিধেমত এ ধরনের দুই-একখানা করে বই ছেপে ফেলেন।

ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখতে হলে ওষুধ খেতে হয় না, কিন্তু বইয়ের বিজ্ঞাপন লিখতে হলে বইগুলো পড়তে হয়। এই জন্যেই এ কাজটা ধীরাপদর ততো পছন্দ নয়। পড়ার পরে আর লিখতে মন সরে না। এখানকার বিজ্ঞাপন স্ফুলিঙ্গের পতঙ্গ কারা সেও নিজের চোখেই দেখেছে। দেখে দেখে ধীরাপদর এক এক সময় মনে হয়েছে, এই কালটাই ব্যাধিগ্রস্ত।

বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু বলেন মন্দ না। আভাসে ইঙ্গিতে অনেকবার টসটসে জোরালো কিছু একটা লেখার প্রেরণা দিয়েছেন তাকে। জোরালো বিজ্ঞাপন নয়। জোরালো আর কিছু। শেষে হাল ছেড়ে বলেছেন, আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না—আরে মশাই, যে মদ খায় সে খাবেই, এ দোকানে না পেলে অন্য দোকানে খাবে—কোথাও না পেলে নিজে তৈরি করে খাবে—তাহলে দোকান খুলে বসতে দোষ কি!

স্বচ্ছ দৃষ্টি।

জোরালো অন্যকিছু না হোক, সে-দিন জোরালো বিজ্ঞাপন লিখে অন্তত দে-বাবুকে খুশি করেছিল ধীরাপদ।

মশাই যে! কবে ফিরলেন?

প্রত্যাশী জনের প্রতি অম্বিকা কবিরাজের স্বভাবসুলভ বিদ্রূপ। তাঁর নিজের যেখানে প্রত্যাশা সেখানে হাত জোড় করতেও বাধে না। তাঁকে আর একটু খুশি করার জন্যেই ধীরাপদ সবিনয়ে বলল, কোথাও যাইনি তো, এখানেই ছিলাম···

এখানেই ছিলেন! দু'সপ্তাহ দেখা নেই দেখে ভাবলাম দিল্লী-দিল্লী চেপেই গেলেন বুঝি।

ধীরাপদ আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করল, কাজ ছিল নাকি?

না। এই ছা-পোষা দোকানের কি আর কাজ—পাঁচজনে এসে জ্বালাতন করে, তবু পুরনো লোককে না খুঁজে পারিনে বলেই যত ঝামেলা—কাল একবার আসবেন।

অম্বিকা কবিরাজ ঘুরে বসলেন, যেন আর তার মুখদর্শনও করতে চান না।

ধীরাপদ বেরিয়ে এলো। এ-রকম অভ্যর্থনা গা-সওয়া। কাজ থাক বা না থাক, অনুগ্রহভাজনেরা দিনান্তে একবার এসে দেখা না দিয়ে গেলে নিজেরাই একটু দুর্বল বোধ করেন বোধহয়। দ্বিতীয় কবিরাজের দোকানেও কাজ নেই কিছু, কিন্তু ক'টা দিন একেবারে ডুব দেওয়ার ফলে সেখানকার মালিকও তার কাজকর্মের নিষ্ঠার প্রতি সন্দিহান। বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবুর অন্য অভিযোগ। কাজ তো আছে মশাই, কিন্তু আপনাকে দিয়ে হবে কি না ভাবছি···আপনার লেখাগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে, আর তেমন টানে না।

তারপর রয়ে সয়ে যে সুসংবাদ জ্ঞাপন করলেন তার মর্ম, এবারে যাকে বলে টাকা বর্ষানো বই-ই বার করছেন তিনি—সরল যৌগিক ব্যায়ামের বই একখানা, মাইনর পাস বিদ্যে নিয়েও ও-বই অনুসরণ করলে মনের জোরে পাহাড় টলবে আর অনেক অপচয়েরও পূরণ হবে। ছাপা প্রায় আধাআধি শেষ, চারখানা মলাটের ওপর এবারে এমন কিছু লিখতে হবে যাতে করে একবার হাতে নিলে ও-বই আর হাত থেকে না নামে। ভিতরে ভিতরে অন্য বইয়েরও বিজ্ঞাপন থাকবে কিছু কিছু—আর, খবরের কাগজের অনুকূল মন্তব্যও কিছু পাওয়া দরকার।—তারা লিখবে না কেন, এ তো আর খারাপ বই কিছু নয়, কি বলেন?

গণুদার সহায়তায় একবার তাঁর কি একটা বইয়ের দু'-লাইন সমালোচনা ধীরাপদ কাগজে বার করিয়েছিল। এবারে একটু নিরীহ রসিকতার লোভ ছাড়তে পারল না। বলল, তা লিখবে না কেন, ভালো বই-ই তো···বিজ্ঞাপনের কাজটাও অন্য কাউকে দিয়েই করিয়ে দেখুন না, অন্যহাতে অন্যরকম তো কিছু হবেই।

ভুরু কুঁচকে ঝপ করে কাগজ-পত্রে মন দিলেন দে-বাবু। ধীরাপদ উঠে দাঁড়াতে মুখ তুললেন আবার।—ব্যবসায় নামলে পাঁচটা দিক ভাবতেই হয়, বুঝলেন? সামনের হপ্তায় একবার আসবেন—

আপাতত পাঁচটা টাকা দেবেন?

টাকা চাইলেই বিরক্তিতে মুখখানা যে-রকম করে ফেলেন, অভ্যাসবশত দে-বাবু সেই রকমই করলেন প্রথম। সে-শুধু মুহূর্তের জন্যে। এ-যাচনা অবাঞ্ছিত নয় খেয়াল হল বোধহয়। স্থির চোখে দেখলেন একটু।—কথা শুনে তো মনে হচ্ছিল আপনার দু'পকেট ভরতি টাকা!

কাঠের টেবিলের ড্রয়ার খুলে আধময়লা একটা পাঁচ টাকার নোটই

পাঠিয়ে ফেলে দিতেন। সাধারণত পাঁচ টাকা চাইলে বড় জোর তিন টাকা মেলে।

বাইরে এসে হাঁপ ফেলল ধীরাপদ। মুখে এঁরা যে যাই বলুন নিজের কদরটাও মনে মনে ভালই জানে সে। এত শস্তায় আর এমন মুখ বুজে কাজ করার লোকও সব সময় মেলে না। হঠাৎ চারুদির কথা মনে পড়তে হাসি পেয়ে গেল, সাহিত্য করা ছেড়েছে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল, সাহিত্য কোথায় এসে ঠেকেছে জানলে কি বলত?

কাজ পাক না পাক, এদিকে এলে আরো দু'-পাঁচটা দোকানে ঘোরে সাধারণত। কিন্তু আজ আর ভালো লাগছে না। বেলা বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে জঠরের তাগিদও বাড়ছে।···সেই পরিচিত হোটেলেই যেতে হবে, নতুন করে আবার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে। দশ বছরের পুরনো খদ্দের সে। সাত পয়সার 'মিল' দু'বছর আগে দু' আনায় ঠেকেছিল। এই দু'বছরে সেটা কতয় দাঁড়িয়েছে জানা নেই।

হোটেলের ম্যানেজার পুরনো খদ্দেরকে দেখেই চিনলেন। আদর যত্নও করলেন একটু। পুরনো খদ্দেরের খাতিরে নিজে থেকেই আট আনায় মিল রফা করলেন। আর, হৃদ্যতাসূচক রসিকতাও করলেন একটু, চেহারা-পত্র তো দিব্বি ফিরে গেছে আপনার, দেখেই মনে হয়েছিল বে-থা' করেছেন বুঝি—।

চেহারা কেন ফিরেছে সেটা বলে ফেললে আর ম্যানেজারের খাতির জুটবে না। খেতে বসে ধীরাপদ খাওয়ার তাগিদটা অনুভব করছে না তেমন। এ দু' বছরে মুখ বদলে গেছে। আজ ভালো না লাগলেও দু' দিন বাদে এই বেশ লাগবে। সে জন্যে নয়, শুকলালের হাতে বাজার পাঠানোর পরের সেই অস্বস্তিটাই আবার উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে, নিজের অগোচরে কিছু একটা ভুল হয়ে গেল। কোনো কারণ নেই, তবু সেই রকমই অনুভূতি একটা। শুকলালের হাতে বাজার পাঠাতে দেখেই সোনাবউদি যা বোঝার বুঝে নিয়েছে। আর সেটুকু তাকে বোঝানো দরকারও ছিল। তা' ছাড়া ও তো আর তার ব্রত-সাঙ্গর ব্রাহ্মণ নয়। ধীরাপদ নিজেকেই চোখ রাঙালো, আসলে এ ওর নিজেরই দুর্বলতা···ভিতরে ভিতরে নিজেই প্রার্থী এখনো···।

দু' বেলার খাওয়াটা সোনাবউদির ওখানেই বরাদ্দ ছিল। ধীরাপদই বরং তাতে আপত্তি করেছিল প্রথম প্রথম। সোনাবউদি শোনেনি। বলেছে, যে টাকাটা আপনি খাওয়ার পিছনে খরচ করেন, সে-টা বরং আমাকে দেবেন। তার আগে অবশ্য হোটেলে সে কি খায় না খায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শুনে নিয়েছিল। আর বলেছিল, হোটেলের থেকে ভালো খাওয়াব ভয় নেই।

প্রথম ক' মাস ছেলে পড়ানোর টাকা হাতে এলেই তার থেকে কুড়িটি করে টাকা সোনাবউদির হাতে দিয়েছে। সম্প্রতি গণুদার চাকরির মোড় ঘুরেছে হঠাৎ। সাংবাদিক রাজ্যের নতুন বিধি ব্যবস্থার ফলে মাইনে রাতারাতি অনেক বেড়ে গেছে। প্রুফ রীডারও নাকি সাংবাদিকের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু তখন বেশ অনটনই ছিল। ফলে সোনাবউদির মেজাজ বিগড়াতো প্রায়ই। গণুদাকে যে ভাবে খোঁচা দিয়ে কথা বলত, এক এক সময় ধীরাপদর এমনও মনে হয়েছে সে-গোচা শুধুই গণুদার উদ্দেশ্যেই নয়। আর, সে রকম একবার মনে হলে তার গ্লানিও কম নয়। এরকম দুই একবার শোনার পর ধীরাপদ ছেলে পড়ানোর তিরিশ টাকাই সোনাবউদির হাতে তুলে দিয়েছে। অনুপস্থিতির দরুন মাইনে দু'-চার টাকা কাটান গেলে পরে তাও উশুল করে দিয়েছে। বিজ্ঞাপন লিখে মাসে গড়পড়তা বিশ পঁচিশটা টাকা আসেই।

প্রথমবার টাকা বেশি দেখে সোনাবউদি অবশ্য একটু অবাক হয়েছিল। তিরিশ টাকা কেন?

ধীরাপদ বলেছে, রাখুন না, তিরিশ টাকাই বা কি এমন···।

সোনাবউদি খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল শুধু, আর কিছু বলে নি। আপত্তিও করেনি।

পরোক্ষেও অনটনের গঞ্জনা আর শুনতে হয়নি। এর থেকে সোনাবউদি যদি সরাসরি ওকে এসে বলত, ধীরুবাবু, কুলিয়ে উঠতে পারছি না, আরো কিছু দিতে পারেন কি না দেখুন—ধীরাপদ খুশি হত। সেটা অনেক সহজ হত, সুশোভনও হত। তবু সে গ্লানি কেটে যেতে দুদিনও লাগেনি। সুলতান কুঠির এই রঙ্গভূমিটুকুতে এ পর্যন্ত অনেক কৃপণতা দেখেছে, অনেক সংকীর্ণতা দেখেছে। সেখানে সোনাবউদির আসাটা উষর রিক্ততার মধ্যে একটুখানি সবুজের আভাসের মতন। নিজের অগোচরে অল্প আলোয় আর অল্প কিছু মায়ায় ধীরাপদর শুকনো বুকের অনেকটাই ভরে উঠেছিল। সেখানে ওইটুকু ছায়ার অবকাশ না থাকলে তেমন ভালও লাগত না বোধহয়।

কিন্তু এক ধাক্কায় সব তচনচ হয়ে গেছে। ধীরাপদর মোহ ভেঙেছে। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসেছে শেষ পর্যন্ত। যা হবার তাই হয়েছে, যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। উপোসী মনের তাগিদে সে একটা মায়ার জাল বুনছিল শুধু। সেটা ছিঁড়েছে ভালই হয়েছে। ও মোহ তো রোগের মোহর মতই। আবার সে ওতে জড়াতে যাবে কেন? ফিরে আবার ডাকলই বা সোনাবউদি···।

খাওয়া অনেকক্ষণ সারা। খেয়াল হতে উঠে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে বাইরের সরু বারান্দায় হাতল-ভাঙা একটা কাঠের চেয়ারে এসে বসল। পড়তি বেলায় হোটেলের কর্মব্যস্ততা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

ধীরাপদও সুস্থ বোধ করছে একটু।

না, শুকলালের হাতে বাজার পাঠিয়ে দিয়ে সে কিছু অন্যায় করেনি। সোনাবউদির পরোক্ষ আমন্ত্রণ এ ভাবে প্রত্যাখ্যান করাটা কিছুমাত্র অন্যায় হয়নি তার।

···সোনাবউদি নিজে একদিন তার সংসারে ডেকে নিয়েছিল ওকে। আর, বিদায় করেছে গণুদাকে দিয়ে।

বিদায় করেছে একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচাযের ভয়ে? আর যেই বিশ্বাস করুক ধীরাপদ বিশ্বাস করে না। গণুদা বিশ্বাস করেছে কিন্তু ও করেনি। বক্তব্য পেশ করতে এসেও বিড়ম্বনার একশেষ গণুদার। তিনবার ঢোঁক গিলে তবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন।···তোমার বউদির মেজাজ তো জান ভাই··· একেবারে ক্ষেপে গেছে, আর এ-সব শুনলে কে-ই বা··· পাঁচজনের সঙ্গে বাস, বুঝতেই তো পারছ···তোমাকে ভাই ওই দু'বেলার খাওয়ার ব্যবস্থাটা আবার···

আর বলার দরকার হয়নি। বলতে পারেওনি গণুদা।

কথা হচ্ছিল ধীরাপদর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। স্ত্রীর উদ্দেশে গণুদা হঠাৎই একটা হাঁক দিয়ে বসেছিল তার পর। কই গো, শুনছ—

আসবে ধীরাপদ ভাবেনি। কিন্তু সোনাবউদি তার দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই থমথমে মুখের দিকে ধীরাপদ নির্দ্বিধায় তাকাতেও পেরেছিল। ডেকে ফেলে বরং একটু বিব্রতবোধ করেছিল গণুদা নিজেই।···ধীরুকে বুঝিয়ে বললাম সব···ও আপনজন বুঝবে না কেন। কই আজ ওকে চা দিলে না এখনো?

চায়ের বদলে দুচোখে আগুন ছড়িয়ে সোনাবউদি আবার ঘরে ঢুকে গেছে।

গণুদার ভাষায়, তার ঘরনী ক্ষেপে যে গেছে, সেটা নিজের চোখে দেখেও ধীরাপদ বিশ্বাস করেনি। করেনি কারণ, অনুভূতির রাজ্যে যুক্তি অচল। ওর সেই অনুভূতির ইশারাটা অন্যরকম। শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের রসনার বক্র আভাস শুরু হয়েছিল তাদের সংসারটিকে ওখানে এনে বসানোর দিনকতকের মধ্যেই। সোনাবউদি সে-সব গায়ে মাখা দূরে থাক, হাসি-বিদ্রূপে নিজেই পঞ্চমুখি। বলেছে, তিন ছেলে-মেয়ের মা তাতে কি, মেয়েরা মেয়েই—কদর দেখুন একবার! চোখ পাকিয়ে তর্জন করেছে, আপনি নাকি রমণী পণ্ডিতের চোদ্দ বছরের মেয়েটার দিকে পর্য্যন্ত চোখ দিয়েছিলেন? অ্যাঁ?

দু'-বছরে এই নিরুদবেগ-সম্প্রীতি বেড়েছে বই কমেনি। ওই শিকদার আর ভটচায মশাই বরং হাল ছেড়েছিলেন। বদ্ধ জলাতেই আলগা আগাছা পচে, কিন্তু স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যায়। তাঁদেরও উদ্যম ফুরিয়েছিল। এত দিন পরে রাতারাতি হঠাৎ আবার তাঁরা এমন সবল হয়ে উঠলেন কোন্ মন্ত্রবলে? হলেও সোনাবউদি গণুদাকে দিয়ে এভাবে বলে পাঠাতো না। নিজেই এসে বলত। বলত, আর পারা গেল না ধীরুবাবু, এবার নিজের ব্যবস্থা নিজে দেখুন। সেই রকমই ধরন-ধারন তার। আসলে যা ঘটেছে, সেটা কোনো অপবাদের ভয়ে নয়। ভয় যা করে, সেটা আজ তার প্রণামের বহর দেখে, আর বেছে ওই বৃদ্ধ দুটিকেই নেমন্তন্ন খাওয়ানোর ব্যবস্থা থেকে আরো ভালো করে বোঝা গেছে। এত সহজে এমন কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন সোনাবউদির দ্বারাই সম্ভব।

অপবাদ উপলক্ষ মাত্র। আর কোনো হেতু আছে যা প্রকাশ্যে বলার মত নয়, যা ধীরাপদ অনেক ভেবেও সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেনি। যে স্থূল কারণটা বার বার মনে আসে সেটাই সত্যি বলে ভাবতে এখনো ভেতরটা টনটনিয়ে ওঠে। গণুদার অনেক মাইনে বেড়েছে, অনটনের দুর্ভাবনা গেছে·· বাইরের লোক এখন বাড়তি ঝামেলার মতই।···তাই কি?

হোটেলে বিকেলের সাড়া জাগতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। সন্ধ্যায় একেবারে ছেলে পড়ানো শেষ করে ঘরে ফিরবে। শীতকালের বেলা, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হবে। ধীরাপদ চৌরঙ্গীর দিকে পা চালিয়ে দিল। অন্যমনস্ক তখনো। গণুদার চাকরির উন্নতিতে সেও মনে মনে খুশি হয়েছিল। সোনাবউদি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ভাবতে ওর নিজেরই হাল্কা লেগেছিল।

মায়ের কথা মনে পড়ছে ধীরাপদর।

বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে পর্য্যন্ত পরিচয় ছিল না, ভালো করে একখানা
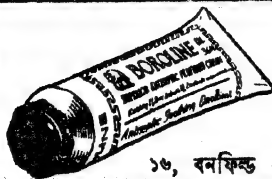
চিঠিও পড়ে উঠতে পারত না। বাবা বড় না হোক, ছোটখাট উকীল ছিলেন। আর সংসারেও প্রাচুর্য না থাক, অনটন ছিল না। সেই সংসার মা চালাতো। কিন্তু হিসেবপত্র ঠিক মত রাখতে পারত না, কি দিয়ে কি করছে না করছে সব সময়ে মনেও থাকত না। ফলে এক এক সময় বাবার ওকালতি-জেরার পড়ে মাকে প্রায়ই ফাপরে পড়তে হত। বাবা কখনো বিরক্ত হতেন, কখনো বা মায়ের বিদ্যে-বুদ্ধি নিয়ে প্রকাশ্যেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। এরই মধ্যে মফঃস্বল ইস্কুলের চাকরি খুইয়ে সপরিবারে কাকা তাদের ওখানেই এসে উঠেছিলেন। কাকিমাকে বোধ হয় তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন শহরে গেলেই চট করে কিছু একটা জুটে যাবে। কিন্তু শিগগীর জোটেনি। বাবা মুখে কিছু বলতেন না, কিন্তু মাসের খরচ ঠিক মত কুলিয়ে উঠতে না পারলে বেশ গম্ভীর হয়ে যেতেন। মা তার বিপরীত, কাকা কাকিমা এসে আছেন এ যেন তাঁদেরই অনুগ্রহ। কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে আর একজনের কাঁধে ভর করে অনুগ্রহ দেখানোর বাসনা কাকিমার অন্তত ছিল না। কাকাকে প্রায়ই গঞ্জনা দিত। অশান্তি আর খিটিরমিটির লেগেই থাকত দু'জনায়। আর তাই শুনে মা কোথায় পালাবে ভেবে পেত না।

সেই অশান্তির অবসান হয়েছিল। দু' মাস না যেতে কাকিমার মুখে হাসি ফুটেছিল। সামান্য হলেও সংসার খরচের জন্য কিছু টাকা মায়ের হাতে তুলে দিতে পারছে সেই আনন্দে। মাকেও উৎফুল্ল মুখে টাকা নিতে দেখেছে ধীরাপদ আর বলতে শুনেছে, ঠাকুরের পায়ে ভরসা রাখ, ঠাকুর মুখ তুলে তাকাবে না তো কি?

কাকিমার সেই টাকা দিতে পারার রহস্যটা ধীরাপদ অনেক পরে জানতে পেরেছিল। বাবার মুখে শুনেছিল।

তখন মা নেই।

বাবার কাছেই মা ধরা পড়েছিল। কাকিমার হাত দিয়ে দেওয়ার জন্য কাকার হাতে মায়ের টাকা গুঁজে দেওয়াটা বাবার কাছেও ফাঁকি দিয়ে সারতে পারবে এমন চৌকস মা নয়। ধরা পড়ে তাই দ্বিগুণ ফাপরে পড়তে হয়েছিল মাকে। হাসিমুখে নিরক্ষরা স্ত্রীর সেই কাণ্ডকারখানার কথা বলতে বলতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বাবা কি একটা ওকালতির বই খুঁজতে শুরু করেছিলেন। দিদিটা পালিয়েছিল। আর ও নিজেও ঝাপসা চোখে খবরের কাগজে কি একটা খুঁজছিল যেন।

সে যুগ তো গেছে। সেই কাল তো গেছে। তবু খেদ কেন? সেই অজ্ঞ যুগের হৃদয়ের বস্তু আজও ঠিক তেমনি করেই হৃদয়কে নাড়া দেয় কেন?

গড়ের মাঠের একটু নিরিবিলি দিক বেছে নিয়ে ধীরাপদ বসল। খুব তাড়াতাড়িই হেঁটে এলো বোধহয়। এখনো দিনের আলো স্পষ্ট। এত তাড়াতাড়ি গেলে ছাত্রের দেখা পাবে না। কিন্তু শীত শীত করছে। সোনাবউদির ব্রাহ্মণ ভোজনের বাজার করা আর বাজার পৌঁছে দেওয়ার গরমে বিকেলের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরুনোর কথাটা মনে ছিল না।

কি একটা বইয়ে ধীরাপদ পড়েছিল, প্রথম কৈশোরে মেয়েদের টান বাপের দিকে আর ছেলেদের টান মায়ের দিকে বেশি হয়। তার পর নতুন বয়সের শুরু থেকেই নাকি নিজের অগোচরে তারা [illegible]

বিরাম নেই। সে ব্যাপারে সামঞ্জস্য না হলে অনেক সময় মনের দিক থেকে বড় রকমের গণ্ডগোলও বেঁধে যায়। আর সে ব্যাপারে ধাক্কা খেলে চট করে নাকি সয়ও না।

সোনাবউদিকে দেখে কখনো কি নিজের মায়ের কথা মনে হয়েছিল ধীরাপদর? মনে পড়ে না। তবে রণুর অসুখে গোট-হার বিক্রি করার পর সুলতান কুঠির সেই বিনিদ্র রাতে একটা বড় প্রাপ্তির সন্ধানে ভিতরটা ভরে উঠেছিল। কিন্তু তা বলে মায়ের মত করে ভাবতে গেছে তাকে? দিদির মতও না। আরো কাছের কারো মত ভাবা আরো হাস্যকর। তাহলে কার মত? ওই সকলকে মিলিয়ে আরো শক্ত সবল কারো মত কি? তারই নাম মনের জন আর সেইজন্যেই ওখান থেকে ধাক্কাটা এমন করে বুকে লাগছে?

ধীরাপদ হাসতে লাগল। তাই যদি হবে ভুলটা গোটাগুটি ওর নিজের ছাড়া আর কার? ওর প্রত্যাশার জন্য দায়ী আর কাকে করতে যাবে!

হঠাৎ থমকে গিয়ে একদিকে চেয়ে রইল ধীরাপদ। একটি মেয়ে একটি পুরুষ। এদিকেই আসছে। পড়ন্তি দিনের ঘোলাটে আলোয় দূর থেকে চেনা শক্ত। তবু ধীরাপদ এক নজরেই চিনেছে। সেই চোখ-তাতানো ছাপা শাড়ি, সেই উৎকট লাল সিল্কের ব্লাউস, সেই সমর্পণমুখি ক্ষীণাঙ্গী তনু।

বাস-ষ্টপের সেই মেয়েটা।

সঙ্গীর হাতে হাত জড়ানো। হাসছে খুব। মুখখানা ততো শুকনো লাগছে না আজ। তেমন দুর্বলও মনে হচ্ছে না। বেশ হালকা পায়েই হেঁটে আসছে। ধীরাপদ চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। মেয়েটাকে দেখে নয়, তার সঙ্গীকে দেখে। কোথায় দেখেছে? দেখেছে নিশ্চয়ই। কোথায়? পরনে ঝকঝকে স্যুট, হাতে খাস-বড়া সিগারেটের টিন, চঞ্চল হাবভাব—কোথায় দেখল?

মনে পড়েছে। চেকলুঙ্গি পরা সেই অদ্ভুত-মূর্তি ঢ্যাঙা মুসলমানটার প্রতীক্ষায় কার্জন পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখেছিল। সেই লোকটার কথা শুনে একেই দু'হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে দেখেছিল আর তারপর মানিব্যাগ খুলে সাতখানা দশটাকার নোট বার করে দিতে দেখেছিল।...সে-ই তো!

পাঁচ সাত হাত দূর দিয়ে তারা পাশ কাটিয়ে গেল। যাবার আগে দু'জনেই ফিরে তাকালো একবার। শীতের আসন্ন সন্ধ্যায় এমন নিরিবিলিতে কাউকে একা বসে থাকতে দেখাটা খুব প্রত্যাশিত নয় বোধহয়। মেয়েটির কটাক্ষে তনু বিরক্তির আভাস। হ্যাংলার মত কেউ হাঁ করে চেয়েই আছে দেখলে ঘরের মেয়েরা যেমন রমণী-সুলভ কোপ প্রকাশ করে, অনেকটা তেমনি। সঙ্গীর কাছে হয়ত নিজের কদর বাড়ল একটু। দু'পা এগিয়ে গিয়ে সঙ্গী হয়ত রসালো কিছু মন্তব্য করেছে, কারণ হাসিমুখে মেয়েটা আবারও তার দিকে ফিরে তাকালো একবার। চেনেনি নিশ্চয়, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের সেদিনের সেই হতাশাও মনে করে বসে থাকার কথা নয়। পথ্য-পথে কতজনের আনাগোনা, কতজনের যাচাই বাছাই। ক'জনকে মনে রাখবে?- সঙ্গীর রসিকতার সুযোগে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখার ফাঁকে এবারে বোধহয় ওকে চিনে রাখতেই- [illegible] [illegible]

বাঁটার রাইস। কি আশ্চর্য, ছবিটার কথা আর মনেই ছিল না ধীরাপদর। এখন ক'টা বাজে, আর সময় আছে? ঘাড় ফিরিয়ে দূরের সেই ঘাড় বাড়ির দিকে তাকালো। এই আলোয় এত দূর থেকে ঘাড়টাই চোখে পড়ে না। আজ আর সময় নেই বোধহয়, কোথায় হচ্ছে ছবিটা তাই জানে না।··তেতো চাল···কষা চাল···কটু চাল···বাঁটার রাইস। স্যাকরার ঠুকঠুক কামারের এক ঘা। বাংলা হয় না।

কিন্তু আর একটা কথাও জাগছে সেই সঙ্গে। কথা ঠিক নয়, বিপরীত অনুভূতি। তেতো হোক, কষা হোক, কটু হোক—দুনিয়ায় বেঁচে থাকার শক্তিটাও বড় অদ্ভুত।

শীত করছে বেশ। ছোট বেলা, দেখতে দেখতে অন্ধকার। ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল, ছাত্র পড়ানো আছে। দূরের রাস্তায় আলো জ্বলছে, ওখানে পৌঁছুতে হলেও অন্ধকার মাঠ অনেকটা ভাঙতে হবে। দে-বাবুর পাঁচ টাকার বেশির ভাগই অবশিষ্ট আছে, ট্রাম-বাসে যাওয়া যাবে। কিন্তু ছেলে পড়ানোর নামে মাঠ ভেঙে ওই রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছুতেও পা দুটোর বেজায় আপত্তি। তার ওপর শীত। শীত করছে মনে হতেই ধীরাপদ ধুপ করে বসে পড়ল আবার। এই অবস্থায় ছেলে পড়াতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। ঠাণ্ডায় সে হি-হি করবে আর ছেলেটা অবাক হবে। ভাববে হয়ত, মাষ্টার ছেঁড়া চাদরটাও বেচে দিলে নাকি!

আজকের মতও থাক ছেলে পড়ানো। শীতের প্রতি কৃতজ্ঞ। মাস কাবারে সোনাবউদির হাতে তিরিশ টাকা গুনে দেবার তাগিদ তো আর নেই। নিশ্চিন্ত। ছেলে পড়াতে যাবে না ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডাটা আর তেমন কনকনে লাগছিল না। তবু বিবেকের কাছে চক্ষুলজ্জা আছে একটু—কাপড়ের খুঁটটা টেনে জামার ওপর দিয়েই গায়ে জড়িয়ে নিল। আর একটু বাদেই ওঠা যাবে, তাড়া নেই।

···সোনাবউদি, না সোনাবউদি থাক। চারুদি। সকাল থেকে সোনাবউদির কাণ্ডকারখানায় চারুদিকে আর মনেই পড়েনি। ঠিকানাপত্তর নিয়ে রেখেছে চারুদি, বার বার আসতে বলেছে আবার, সম্ভব হলে আজই যেতে বলে দিয়েছিল। ওইভাবে খেতে চাওয়ার ধাক্কা সামলে সহজ হবার জন্যে চারুদির সেই অন্তরঙ্গ আগ্রহ দেখে ধীরাপদ বেশ কৌতুক বোধ করেছিল মনে মনে। কালকের মত আজও অমনি একটা যোগাযোগ হয়ে গেলে কেমন হয়! শীতের সন্ধ্যার ধোঁয়াটে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে একা ওকে এইভাবে বসে থাকতে দেখলে আঁতকে চারুদি উঠত বোধহয়। বাড়িতে অন্তত আর আমন্ত্রণ জানাত না তাহলে···।

কিন্তু হঠাৎ আঁতকে উঠল ধীরাপদ নিজেই। গায়ের সমস্ত লোমে লোমে কাঁটা দিয়ে উঠল। এক ঝটকায় একেবারে উঠে দাঁড়াল সে। বিকৃত উত্তেজনায় বলে উঠল, কে? কে তুমি?

খানিক দূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একটি মেয়েই। না চারুদি নয়। ধীরাপদর হঠাৎ মনে হয়েছে প্রেতিনীর মত কেউ যেন। অন্ধকারে দশ হাত দূরেও ঠিকমত চোখ চলে না, কখন এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি।

জবাব না দিয়ে মেয়েটা কুণ্ঠিতচরণে আরো দু'পা এগিয়ে এলো।

ধীরাপদ চিনল। বাস ষ্টপের সেই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটাই। ক্ষণিকের সঙ্গীর হাতে হাত মিলিয়ে খানিক আগে যে এইখান দিয়ে গেছে। স্বাভাবিক স্থলে এইটুকু এক মেয়েকে দেখে স্নায়ু এতটা বিড়ম্বিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অন্ধকার মাঠের মধ্যে হঠাৎ এই পরিস্থিতিতে পড়ে ধীরাপদ উত্তেজনা দমন করতে পারল না। শীতের বদলে ঘেমে ওঠার দাখিল। বিকৃত রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই?

দ্বিধান্বিত কাতর আবেদন কানে এলো, রাস্তার ওই আলোর ধার পর্যন্ত একটু এগিয়ে দেবেন···

ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে চলে যাও না, এগিয়ে দিতে হবে কেন?

অস্ফুট জবাব শুনল, বড্ড অন্ধকার···অনেক রকম লোক থাকে···।

ধীরাপদ আবারও রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, অনেকরকম লোক থাকলেও তোমার অসুবিধে কিসের?

তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে ফেরার জন্য নিজেই তাড়াতাড়ি পা বাড়াল। কিন্তু পারল না। বিকেলে সঙ্গী-লাভের প্রগলভ চপলতা নয়, বাস-ষ্টপের সেই শুকনো মুখটাই মনে পড়ে ধীরাপদর। এই অন্ধকারে মুখ অবশ্য দেখতে পায়নি, তবু গলা শুনে সেই মুখই মনে পড়েছে। ওই মুখের মতই নিরুপায় আর কচি।

ধীরাপদ ঘুরে দাঁড়াল। আমার পিছনে আসতে পারো—কোনরকম চালাকি করতে যেও না, তোমাদের আমি চিনি।

হনহনিয়ে মাঠ ভেঙ্গে রাস্তার দিকে এগলো সে। একবারও ফিরে তাকালো না। তার সঙ্গ ধরে আসতে হলে মেয়েটাকে যে প্রায় ছুটতে হবে সে খেয়ালও নেই। স্নায়ুগুলি বশে আসেনি তখনো। অন্ধকারে কোনো লোক চোখে পড়েনি। চোখে পড়তে পারে সেভাবে চোখ ফেরায়ওনি কোনদিকে। অন্ধকারের গর্ভবাস থেকে আলোর কাছে আসার এমন তাগিদ আর বুঝি কখনো অনুভব করেনি ধীরাপদ।

মাঠের ধারের দিকটা অত অন্ধকার নয়। খানিকটা পর্যন্ত রাস্তার আলো এসে পড়েছে। ধীরাপদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। উত্তেজনা কমে আসছে। গতি মন্থর হল। রাস্তার একটা লাইট-পোষ্টের কাছে এসে তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে।

পিছনে পিছনে মেয়েটাও এসেছে। নির্ঝঞ্ঝাটে আসার তাড়নাতেই এসেছে। এসে হাঁপাচ্ছে। কিন্তু মুখের ওপর চোখ পড়তেই ধীরাপদ আবারও বেশ বড় রকমের ধাক্কা খেল একটা। মেয়েটা শুধু হাঁপাচ্ছে না, সেই সঙ্গে কাঁদছেও। কাঁদতে কাঁদতেই এসেছে। চোখের জলে মুখের উগ্র প্রসাধন থককে কুৎসিত দেখাচ্ছে। ওই মুখে জীবন ধারণের বিড়ম্বনা আর বুকভাঙা হতাশার ছাপ শুধু। ধীরাপদ বিমূঢ় মুখে চেয়েই রইল কিছুক্ষণ। তারপর এক নিমেষে বুঝল ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, পসারিনীর পসারই শুধু লুঠ হয়েছে, দাম মেলেনি। এছাড়া অমন অশ্রুবিকীর্ণ হতাশার আর কোনো কারণ নেই।

ধীরাপদর সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো যেন কাঁপছে আবারও। অন্ধকারের শ্বাপদ মানুষদের হামলার ভয়ে প্রাণের দায়েই ওর সঙ্গ নিয়েছে বোঝা যায়। মেয়েটা কাছে এসে মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়েছিল, এবারে মুখ তুলে তাকালো। একটু কৃতজ্ঞতা, আর সেই সঙ্গে একটু আশা। আশা নয়, আশার আকৃতি। যেন আজকের মত বাঁচন-মরণটা ওরই অনুকম্পার ওপর নির্ভর করছে। চোখের জলে ভেজা রঙ-পালিশ করা মুখে হালছাড়া ক্লান্তি।

নিজের অগোচরে ধীরাপদ পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল। দে-বাবুর দেওয়া টাকা কটা আঙুলে ঠেকেছিল। তারপরেই সচেতন হয়ে হাত বার করে নিয়েছে। এক ঝটকায় অনেক দূরে চলে এসেছে। কোথাও যাবার তাড়ায় যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে চলেছে সে। ভেতরে কেমন একটা আলোড়ন হচ্ছে, কিছুতে থামানো যাচ্ছে না। লোকজন আসছে যাচ্ছে, কারো দিকে কারো চোখ নেই। ধীরাপদ কি করবে? হাসবে হা হা করে? না কি এক-একজনকে ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, মশাই বীটার রাইস ছবিটা কোথায় হচ্ছে বলে দিতে পারেন?

কিছুই না করে সোজা একটা বাসে উঠে বসল। জানালা দিয়ে মাথাটা বাইরের দিকে বার করে দিল। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া দুই কানের ভিতর দিয়ে যেন মগজে ঢুকতে লাগল। ধীরাপদ আরামে চোখ বুজল।

সন্ধ্যা পেরুলেই সুলতান কুঠির রাত গভীর। কোনো ঘরেই ইলেকট্রিক নেই, লণ্ঠন ভরসা। তেল খরচ করে সেই লণ্ঠনও অকারণে জ্বালায় না কেউ। বড় বড় গাছগুলো যেন আরো বেশি করে অন্ধকার ছড়ায়। অভ্যস্ত পা না হলে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খেতে হয়।

কে, ধীরুবাবু নাকি?

ধীরাপদ অন্যমনস্ক ছিল বলেই চমকে উঠল। নইলে চমকাবার মত কেউ নয়, রমণী পণ্ডিতের গলা। কদমতলার বেঞ্চিতে বসে আছেন। অন্ধকারে বসে আছেন বলেই ওকে দেখতে পেয়েছেন, ধীরাপদর তাঁকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেঞ্চির সামনে এসে দাঁড়াল, এই ঠাণ্ডায় বসে যে! এমনি—ঘরে কি আর নিরিবিলিতে হাত পা ছড়িয়ে দুদণ্ড বসার জো আছে!···তা, এই ফিরলেন বুঝি, বেরিয়েছেন তো সেই সকালে?

হ্যাঁ···।

বসবেন? বসুন না একটু, দুটো কথা কই, কি আর এমন ঠাণ্ডা—

সুলতান কুঠির এলাকায় বসে রমণী পণ্ডিত ইদানীংকালের মধ্যে ওর সঙ্গে গল্প করার বাসনা প্রকাশ করেছেন বলে মনে পড়ে না। রাতে একাদশী শিকদার আর শকুনি ভটচায নিজেদের ঘরের বাইরে গলা বাড়াবেন না এটুকুই ভরসা বোধহয়। ধীরাপদ বলল, না আর বসব না, ঘরে যাই।

ও, আচ্ছা—খুব ক্লান্ত বুঝি? যান তাহলে, আর আটকাবো না।

কিন্তু একেবারে কিছু না বলার জন্তে যে ডাকেন নি তাও বোঝা গেল। ধীরাপদ ঘরের দিকে পা বাড়ানোর আগেই নিরর্থক হাসলেন, তারপর চাপা গলায় বললেন, ইয়ে—এদিকে তো আজ খুব ঘটা করে হঠাৎ এক ব্রতভঙ্গ হল শুনলাম, ভটচায মশাই আর শিকদার মশাইকে খুব খাইয়েছেন নাকি। আবারও হাসলেন একটু, এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে—যে রাজ্যে গাছ নেই সেখানে আড় গাছও গাছ—সুলতান কুঠিরও ব্রাহ্মণ বলতে ওঁরাই। তা বলিহারী বুদ্ধি মশাই। ব্রততত্ত্বর কথা কিছু জানতেন নাকি? গণুবাবুর সঙ্গে এত কথা···মানে, কত সময় কথা হয়, ব্রততত্ত্বর কথা তো কখনো শুনিনি! ধীরাপদকে নিস্পৃহ দেখে সামাল দিতে চেষ্টাও করলেন, অবশ্য নিজের কিছু নেই, আত্মানং সততং রক্ষেৎ—আত্মরক্ষা তো করতেই হবে, যে-ভাবে পিছনে লেগেছিলেন ওঁরা, তাছাড়া থাকতেও পারে ব্রত—কি বলেন?

কিছু না বলে ধীরাপদ ফেরার উদ্যোগ করল। কিন্তু রমণী পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হয়নি তখনো। হঠাৎই যেন মনে পড়ল এইভাবে সামনের দিকে আর একটু ঝুঁকে বললেন, আপনাকে আবার শোনাচ্ছি কি, আপনি তো সবই জানেন। আপনিই তো সকালে বাজার করে দিয়ে গেছেন শুনলাম, কে যেন বলছিল—শুকলাল··· শুকলাল বলছিল আপনি নাকি অনেক বাজার করে দিয়ে গেছেন। ব্যবসার জন্তে একটা ঘরের খোঁজ করার কথা বলতে গেছলাম শুকলালকে—ওই বলল। তা আপনারও তো তাহলে নেমন্তন্ন ছিল, অথচ ফিরলেন তো দেখি একেবারে সন্ধ্যা কাবার করে।

ধীরাপদ কিছু বলার আগেই সাগ্রহে আরো হাতখানেক সরে এসে উৎফুল্লকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, জবাব দিলেন বুঝি? অ্যাঁ? বেশ করেছেন। আপনাকেও ওঁদের মতই হা-ভাতে ভেবেছে আর কি। হাত না দেখলেও কপাল দেখেই বুঝতে পারি আমি, আপনার অনেক হবে—আমার কথা মিলিয়ে নেবেন এখুনি।

আচ্ছা ঘরে যান আপনি, আর বিরক্ত করব না, আমিও উঠব ভাবছি।

ঘরে ঢুকে ধীরাপদ হাঁপ ফেলে বাঁচল। কষ্ট করে আলো জ্বালার তেমন দরকার ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না। তবু ঘরে ঢুকেই ঘরের কোণের হারিকেনটা জ্বেলে নিল। গড়ের মাঠের সেই অন্ধকারটাই যেন চেপে বসে আছে। এখানকার এই অন্ধকারের জাত আলাদা অবশ্য, তবু অন্ধকার অন্ধকারই।

ভূমিশয্যা পাতাই আছে। পাতাই থাকে। সরাসরি কম্বলের নিচে ঢুকে পড়ল। এখন শীত করছে বেশ।···বেচারা রমণী পণ্ডিত। ছুটো লোককে নেমন্তন্ন করে এই একটা লোককে বাদ দিল কেন সোনাবউদি! ওর বদলে না হয় তাঁকেই বলত। সব জেনে শুনেই এরকম এক একটা কাণ্ড করে সোনাবউদি। বললেই ঝামেলা চুকে যেত। ঘরের খোঁজে আর তাহলে শুকলালের কাছে যেতেন না ভদ্রলোক, এই ঠাণ্ডায় বাইরেও বসে থাকতেন না হয়ত। ক্ষোভ হতেই পারে, ওই অন্ত দু'জনের থেকে একটু ঠাণ্ডা মেজাজের বলে নেমন্তন্নের বেলায়ও অবহেলা!

দরজা ঠেলে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল আট বছরের উমারাণী। ঘরের বাসিন্দাটি ফিরেছে টের পেয়ে শুভাগমন। রাতে তাড়াতাড়ি ফিরলেই ও গল্প শুনতে আসে। গত ক'টা দিনের মধ্যে আজই সকাল সকাল ফিরেছে ধীরাপদ। কিন্তু আজ যেন ঠিক গল্প সোনার তাগিদে আসা নয় উমারাণীর। ডাগর ডাগর চোখ দু'টিতে কিছু একা কৌতূহল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মানুষটা চেয়ে আছে দেখেও সরাসরি একেবারে বিছানায় না এসে একটু দূর থেকেই জিজ্ঞাসা করল, ধীরুকা ঘুমুচ্ছ নাকি?

ধীরাপদও প্রায় গম্ভীর মুখেই জবাব দিল, কি মনে হয়, ঘুমুচ্ছি?

না।

আয়, বোস্—

ইচ্ছে ষোল আনা, কিন্তু ঠিক যেন সাহসে কুলোচ্ছে না। ফিরে আধা-ভেজানো দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর আর একটু এগিয়ে এসে বলেই ফেলল, মা যদি বকে?

এইটুকু মেয়েও জানে কিছু একটা গোলযোগের ব্যাপার ঘটেছে। ধীরাপদ হাল্কা সুরেই জিজ্ঞাসা করল, মা বকবে কেন?

উমারাণীর আর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। মাটির ধার ঘেঁষে শয্যায় এসে বসল। তারপর অনুযোগের সুরে বলল, তুমি যে আজ খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছ—

এর পর আর কথা বাড়ানো উচিত কি অনুচিত ভাবার আগেই পরের প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কি রকম খারাপ কাজ?

উমারাণী গড়গড়িয়ে বলে গেল, তুমি খেতে এলে না, তাই মা-ও খেল না। বাবা তখন মাকে বকল আর মাও বাবাকে খুব বকল। বাবা তারপর অফিসে চলে গেল আর মা সমস্ত দিন না খেয়ে শুয়ে থাকল—কত কি খাবার হয়েছিল আজ, জানো?

কাকা একটা ভালো রকমের ভোজ ফসকেছে এটুকুই বক্তব্য।

কিন্তু শেষটুকু আর কানে যায়নি। সকালের সেই অস্বস্তিটাই মুহূর্তে দ্বিগুণ হয়ে উঠল। শুকলালের হাতে বাজার পাঠানোর পর থেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেই কিছু একটা ভুল করে ফেলার অস্বাস্ত। কিন্তু তা বলে এ-রকম পরিস্থিতি দাঁড়াতে পারে ধীরাপদর কল্পনার বাইরে। বিব্রত বোধ করছে বলেই বিরক্ত আরো বেশি। নিজেরা ঝগড়া-ঝাঁটি করে যত খুশি না খেয়ে থাকুক, ওকে নিয়ে টানাটানি কেন।

মেয়েটাকে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে ধীরাপদ দরজার দিকে তাকালো।···সোনাবউদি। গম্ভীর। মায়ের গা ঘেঁষেই মেয়ে ছুটে পালালো। সেইদিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকালো সোনাবউদি, মেয়ের যাওয়া দেখো না, যেন ওকে কেউ মারতে এলো—।

ধীরাপদ গায়ে কম্বল জড়িয়েই উঠে বসল। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল ও সেই রকমই ভেবেছে।

ওর দিকে চোখ রেখে সোনাবউদি দরজার কাছ থেকে দুই এক পা এগিয়ে এলো। নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞাসা করল, আপনি কতক্ষণ?

এই ঠাণ্ডা চাউনি আর বাঁকা কণ্ঠস্বর ধীরাপদ চেনে। এরই থেকে মেজাজ-গতিক ভালই বোঝা যায়। কিন্তু মেজাজ সম্প্রতি ধীরাপদরও খুব ঠাণ্ডা নয়। তেমনি সংক্ষেপে জবাব দিল, এই তো···।

আপনার সেই দাদির বাড়ি গেছলেন?

না। একটা জুতসই জবাব দিতে পারলে ভালো লাগত, তবু সে চেষ্টা না করে জবাবটাই দিল শুধু।

সোনাবউদির এবারের ব্যঙ্গোক্তি আগের থেকে একটু হালকা শোনালো। আমি ভাবলাম আজও বুঝি দাদির ওখানে ভারি খাওয়া হয়ে গেল, তাই সাত তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়েছেন, আর নড়তেচড়তে পারছেন না।

ধীরাপদ কথার পিঠে চট করে কথা ফলাতে পারে না। এই একজনের সঙ্গে অন্তত পারে না। ভিতরে ভিতরে তপ্ত হলেও চুপচাপই বসে রইল। কিন্তু মহিলা তারও আভাস পেল বোধহয়। আরো হালকাভাবে ক্ষতর ওপর এবারে যেন নুন ছড়িয়ে দিল একপ্রস্থ।—আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত শুধু মাঠের হাওয়া খেয়েই কাটল তাহলে?

এইবারে জবাব দিল ধীরাপদ, বলল, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার তো তাও জোটেনি শুনলাম—

কাজ হয়েছে। থতমত খেয়েছে একটু। হারিকেনের অল্প আলোয় মুখখানা কঠিন দেখাচ্ছে আবার।—ওই মুখপুড়ি মেয়ে বলে গেল বুঝি!

এক্ষুনি গিয়ে বোধহয় মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরবে। সেই ভয়েই ধীরাপদ এবারে একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলল, মেয়েটার দোষ নেই, অতটুকু মেয়ে—না বললেই বরং ভাবনার কথা হত। আপনাদের বোঝাপড়াটা এবার থেকে ওদের চোখ-কানের আড়ালেই করতে চেষ্টা করবেন।

সোনাবউদির মুখভাব বদলাল আবার। দুই চোখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া, ঠোঁটের ফাঁকে হাসির মত। মেয়েটার ফাঁড়া কাটল বোধহয়। চুপচাপ দেখল খানিক, তারপর লঘু বিদ্রূপের সুরেই বলল, পুরুষমানুষের ঠমক তো একটু-আধটু আছেই দেখি, তবু এমন অবস্থা কেন?

চকিতে মুখ তুলে তাকালো ধীরাপদ আর সঙ্গে সঙ্গে সুর পালটে সোনাবউদি ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রায়, দয়া করে উঠে হাত-মুখ ধোবেন না সব ভেনে ঢেলে দিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হব?

মুহূর্তে একটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে ধীরাপদ একেবারে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। এইখানেই সোনাবউদির জিত আর এইখানেই ধীরাপদর হেরেও আনন্দ। এইটুকু যেতে বসেছে বলেই যত যন্ত্রণা। তবু থাক, হৃদয়ের এ-বস্তুর ওপর আর ভরসা করে কাজ নেই। সেই লোভে ভিক্ষার গ্লানি। যাতনা কেমন মর্মে মর্মে জেনেছে। এই একটা দিনের ব্যাপার এক দিনেই শেষ হোক, মিছিমিছি ওকে উপলক্ষ করে আর একজনও না খেয়ে থাকবে কেন।

আপনি যান, আমি আসছি।

থাক, অত কষ্ট করে কাজ নেই, এখানেই নিয়ে আসছি।

ধীরাপদ উঠে হাতমুখ ধোবার কথাও ভুলে গেল। আধঘণ্টাখানেক বাদে সোনাবউদি আসন পেতে খাবার সাজিয়ে দিতে তাড়াতাড়ি উঠে হাতটা ধুয়ে এলো শুধু। আগে হলে এত খাবার দেখে খুশিতে আঁতকে উঠত। সবই গরম করে আনা হয়েছে সেই জন্যও মহিলার একটু স্তুতি প্রাপ্য। কিন্তু সহজ আলাপের চেষ্টা ছেড়ে ধীরাপদ শুধু মাথা গোঁজ করে খেতেই লাগল।

তাও অস্বাস্তকর। অদূরে বসে সোনাবউদি চুপচাপ দেখছে। খানিক বাদে ধীরাপদ সহজভাবেই খোঁজ নিতে চেষ্টা করল, আপনার নিমন্ত্রিতরা খেয়ে খুশি হলেন?

ওঁরা আপনার মত নয়, ষেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস—খেয়ে দেয়ে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেলেন।

আগে মুখ তুলে তাকালে ধীরাপদ দেখত ওদিকের গাম্ভীর্য অনেক আগেই তরল হয়েছে। ফলে নিজেও সহজ বোধ করল একটু। মুখের গরাস জঠরে চালান করে সেও এবার হাসি মুখেই বলল, ওঁদের আশীর্বাদ না হয় আপনার দরকার ছিল কিন্তু আমাকে নিয়ে এ-ভাবে টানা-হেঁচড়া কেন?

জবাবে সোনাবউদি চোখে চোখ রেখে একটু চুপ করে থেকে হাসি চাপতে চেষ্টা করল বোধহয়। একটা ছদ্ম নিঃশ্বাস ফেলল তারপর। বলল, সখা যার সুদর্শন, তার সঙ্গে কি সাজে রণ—

আহারের দিকেই ঝুঁকতে হল আবারও। সোনাবউদি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মেয়ে শুনেছিল। সুলতান কুঠিতে সংস্কৃত বুলি দুই একটা শকুনি ভটচায আর রমণী পণ্ডিতই আওড়ায়। কিন্তু সোনাবউদির বাংলা বচনের ভাণ্ডারটি বড় ছোট নয়। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে কথায় কথায় ছড়া পাঁচালির ঘায়ে অনেককেই নাজেহাল করতে পারে। এমন অনেক শুনেছে ধীরাপদ। তবু আজ অবাক হল একটু, ওর আজকের আচরণে মহিলার শেষ পর্যন্ত খুশির কি কারণ ঘটল!

নিরীহ মুখে এবারে সোনাবউদিই জিজ্ঞাসা করল, ওঁদের আশীর্বাদ আমার দরকার ছিল কেন?

প্রণাম আর নেমন্তন্ন দেখে ভাবলাম—

হুঁ:!

যে-ভাবে ভুরু কুঁচকে শব্দটা বার করল, তার সাদা অর্থ, বুদ্ধির দৌড় তো এই!

ধীরাপদর ঠিক বিশ্বাস হল না, তবু এ নিয়ে কথার বাড়াবাড়ি না।

হঠাৎ রমণী পণ্ডিতকেই মনে পড়ে গেল কেমন। বলল, যে জন্তেই নেমন্তন্ন করুন, আর এক বেচারীকেই বা বাদ দিলেন কেন? দুঃখ করছিল।

দু'চোখ প্রায় কপালে তুলে ফেলল, কা'কে বাদ দিলুম, ওই বিটলে গণৎকারকে?

মাঝখান থেকে এই লোকটার ওপর এমন বিরূপ কেন, ধীরাপদ বুঝল না।—হ্যাঁ, এই ঠাণ্ডাতেও কদমতলার বেঞ্চতে চুপচাপ বসেছিলেন দেখলাম, শোকটা ভুলতে পারেন নি। মনে বড় লেগেছে।

শোনামাত্র চকিতে সোনাবউদি বাইরের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটা দরজা ভেজানো ছিল, চোখের পলকে উঠে গিয়ে সেটাও সটান খুলে দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ধীরাপদ অবাক।—এতক্ষণে উঠে গেছেন···

দরজা খোলা রেখেই সোনাবউদি ফিরে এলো। মুখ এরই মধ্যে গম্ভীর আবার। বলল, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বাজি রাখছি, গিয়ে দেখে আসুন এখনো ঠিক বসে আছে। আপনাকে আসতে দেখেও উঠে যাবে। কতটা যত্ন আত্তি করছি দেখবে না—জায়গামত জ্যোতিষী ফলাবে কি করে তাহলে! দেখুক, ভালো করে দেখুক।

রাগের মাথায়ও হেসেই ফেলল। হাঁ করে দেখছেন কি? ফাঁক পেলেই পুকুর ধারে ফিসফিস ফিসফিস—গণনায় চাকরির ডবল উন্নতিটা ফলেছে, স্ত্রীর অবনতিটাই বা ফলবে না কেন? মস্ত জ্যোতিষী যে! বড় জ্বালা ঘরের জ্বালা, নইলে ওই দুই বুড়োকে আমি কেয়ার করি ভাবেন নাকি।

ধীরাপদ চেয়ে আছে আর হাঁ করেই আছে নির্বাক।

খাওয়া হয়ে গেছে। জায়গাটা মুছে দিয়ে থালা-বাটি নিয়ে সোনাবউদি চলে গেল। ধীরাপদও উঠেছে, হাতমুখ ধুয়ে আবার শয্যায় এসে বসেছে। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত যেন তখনো।

এমন এক ওলট-পালটের মধ্যে গণুদার কথা তো একবারও মনে হয়নি তার! একটু স্বার্থপর হলেও সাদাসিধে মানুষ বলেই জানে। কিন্তু আসল ঘা'টা এসেছে সেখান থেকেই! তারই কান বিষিয়েছে রমণী পণ্ডিত!

তাই তো স্বাভাবিক, ধীরাপদ ভাবেনি কেন!

রমণী পণ্ডিত শোধ নিয়েছেন ও-ই তো চক্রান্ত করে কোণা-ঘরে ঠেলেছে তাঁকে, ওই দুই বুড়োর কাছে নাজেহাল করে ঘর-ছাড়া করিয়েছে। রাগ আর তাঁর কার ওপর!

ভাবনায় ছেদ পড়ল সোনাবউদি আবার এসেছে। হাত কতক দূরে বসে ভনিতা বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলল, কথা আছে, মন দিয়ে শুনুন—

মন দিয়ে শোনার মত মনের অবস্থা নয়, ধীরাপদ তাকালো শুধু।

—এভাবে শরীর মাটি করে ক'টা দিন আর চলবে, কালই একটা কুকার কিনে নিন, কিছু শক্ত কাজ নয়, দুই একদিন দেখলেই পারবেন—এই টাকাটা রাখুন।

হাত বাড়িয়ে একটা পুরনো খাম এগিয়ে দিল। সেটা নেওয়া দূরে থাক, শোনামাত্র ধীরাপদ সংকোচে তটস্থ।

খামটা সোনাবউদি তার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, লজ্জা করতে হবে না, আমি দান-খয়রাত করতে বসিনি—ওটা আপনারই টাকা। মাস খরচ বাবদ দশ টাকা করে বেশি দিতে শুরু করেছিলেন কেন, কথাবার্তাগুলো বিঁধত বুঝি? সেই টাকা সরিয়ে রেখেছি, আপনার কাছে থাকলে কি আর থাকত। অবশ্য আমারও খরচা হয়ে গেছে কিছু, দেড়শ' টাকা আছে ওখানে, গোটা তিরিশেক টাকা আপনি আরো পাবেন—

এত বড় ঘরে ওই লণ্ঠনের আলোটুকুও কি বড় বেশি জোরালো মনে হচ্ছে ধীরাপদর? দুই হাতে করে নিজের মুখটা ঢেকে ফেলতে ইচ্ছা করছিল বার বার। নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হলে বিষম লজ্জা। যাবার আগে সোনাবউদি আবারও কুকারের সম্বন্ধে কি বলে গেল কানে ঢোকেনি।

একসময় খেয়াল হতে দেখে, শূন্য ঘরের শয্যায় স্থাণুর মত বসে আছে সে। উঠে আলো নিবিয়ে কম্বল টেনে সটান শুয়ে পড়ল। আর কোনো ভাবনা নয়, কিচ্ছু না। স্নায়ুর ওপর দিয়ে আজ অনেক ধকল গেছে, কাল ভাববে। কাল—

কিন্তুর জোর করে ঘুমের চেষ্টা বিড়ম্বনা। ঘুরে ফিরে সেই ভাবনার মধ্যেই আবার তলিয়ে গেল কখন। বাইরে একটানা ঝিঁঝির ডাকে নৈশ স্তব্ধতা বাড়ছে। আর, ওর আচ্ছন্ন চেতনা যেন সজাগ হয়ে উঠছে ক্রমশ।···রমণী পণ্ডিত ভুল বলেন নি, সোনাবউদির ব্রতটত কিছু নয়, কিন্তু ভুল তাঁর অন্যত্র হয়েছে। নেমন্তন্ন করে খাইয়ে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদারের মুখ বন্ধ করতে চায়নি সোনাবউদি, মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে রমণী পণ্ডিতেরই। শুধু গণুদার কানেই বিষ ঢেলে ক্ষান্ত হননি ভদ্রলোক, ওই দু'জনকেও রসদ যুগিয়ে এবারে উনিই সক্রিয় করে তুলছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। সোনাবউদি কেয়ার করে না, কিন্তু গণুদা করে। সেই জন্যেই অমন প্রণামের বহর আর সেই জন্যেই অমন অভিনব ব্যবস্থা।

···আর সব কিছুই শুধু ওরই জন্য, শুধু ধীরাপদরই জন্য।

কম্বল ফেলে দিল। গরম লাগছে। ঘরের বাতাসও যেন কমে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে অস্বস্তি। বালিশের নিচে টাকার খামটা···। হাতটা যেন পঙ্গু হয়ে ছিল, তুলে ওটা ফেরত দিতেও পারেনি। থেকে থেকে ওটাও যেন মাথায় বিঁধছে।—ঘরের মধ্যে নিঃশব্দচারী কার যেন আনাগোনা।

. কে? কে রে তুই? রণু?

বোবা আলোড়ন। ধীরাপদর মনে হল রণু এসে বসেছে তার শিয়রের কাছে। যেমন ও বসত তার রোগশয্যায়। মেরুদণ্ডে ঘুণধরা রণু নয়, নিঃশঙ্ক তরতাজা। নিটোল দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দু'চোখ টান করে চেয়ে রইল ধীরাপদ। কান পাতল। একটানা ঝিঁঝির ডাক, আর ফিসফিস জিজ্ঞাসা, কি হে, সোনাবউদি কেমন?

[ক্রমশঃ।

প্রবাহকন্যা

সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ-ফোঁড়া পর্বত-চূড়ায়
তুলা-শুভ্র জমানো জল
সোনালি রোদের প্রভায় গলে
মরা আগ্নেয়গিরির
জ্বালামুখের দিকে ছুটে চলল।
সৃষ্টি হল একটা হ্রদ।

কোনো এক সুপ্ত মুহূর্তে
পাষাণপ্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে
একটা ক্ষীণ প্রবাহ-শিশু
হামাগুড়ি দিয়ে নামতে লাগল
সবুজ মাটির দিকে
বনানীর সজীবতা,
মাটির কোমলতা
আর চন্দ্রকলার স্নেহালোকে
পুষ্ট হল একটি অনবদ্য শিশু।

আলতো পায়ের
আঁকা-বাঁকা পদচিহ্ন রেখে
নম্রা হরিণীর চোখের দিকে তাকিয়ে
কাঁখে কলসী, ঘোমটা দেওয়া
পল্লীবধূর দিকে পিছন ফিরে,
চলতে লাগল সে
টলমল করে।

সুখ-দুঃখের সাগর-সঙ্গমে
মিতালি পাতালো হাসি-কান্না।
হাড়-কনকনে শীত আর
জিভ-শুকানো গরমের সন্ধি ঋতুতে
অতলান্তের কল্লোলরা,
জোয়ার-ভাঁটার মালা পরে,
হাতছানি দিয়ে বলল,
আয়, আয়, আয়।

ভেরা ফিগ্‌নার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অমল সেন

মার্চ !

বন্দিনী চ'লেছে মার্চ ক'রে—শৃংখল বাজছে ঝন্‌-ঝন্‌। ছ'পাশে রক্ষীদল···বিবেক যারা বিক্রয় ক'রেছে জারের কাছে।

শুধু একজন···ভেরা তার দিকে চেয়ে দেখলো। খর্বাকৃতি, মুখের বর্ণ তামায়-রক্তে মেশানো, বাঁ-গালে বড় একটা দাগ চোখের পাশ দিয়ে কপাল পর্যন্ত গিয়েছে। চোখে তার অসীম দরদ। নীরব ভাষায় যেন ব'লছে, নারী, নারী, কেন যাচ্ছো তুমি মরণের পথে ? জীবন যে মধুর, বড় মধুর !

ও হয়তো জানে না—

"ঘরের মংগল-শংখ নহে তোর তরে
নহে সন্ধ্যার দীপালোক।"

ভেরা চমকিত হ'ল। কিন্তু ঘৃণা সওয়া যায়, অত্যাচার সওয়া যায়, কিন্তু এই দরদ···এ যে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতে চায়। যেন সে কাঁদতে পারলে বাঁচে।

আবার সেই লোকটির দরদভরা দৃষ্টি। এবার যেন ব'লছে, কেঁদো না, ওগো কেঁদো না। কেঁদে সকলের উপহাসের পাত্র হ'য়ো না।

ভেরা উদ্গত অশ্রু রোধ ক'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। বিদায়ক্ষণে মানুষের এই দরদ তার মনে গেঁথে রইলো।

গাড়ী চললো।···জাহাজঘাট পর্যন্ত।

তারপরে জাহাজ। জাহাজ এসে থামলো এক ভীষণ জেলের সম্মুখে। শ্লুশেলবার্গ জেল।

ভেরার হাতের শিকল খুলে দিয়ে তাকে একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। একজন স্ত্রীলোক আর ডাক্তার বসে সেখানে। ডাক্তার ভেরার দিকে পিছন দিয়ে বসলো। স্ত্রীলোকটি একে একে ভেরার সকল কাপড়-চোপড় খুলে নিল।

ডাক্তার তখন বেশ ক'রে দেখতে লাগলো, তার দেহের কোথায় কোন্ বিশেষ চিহ্ন আছে।

ভেরা কোনো কথা বললো না, কোন বাধা দিল না—কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তার প্রাণ যেন কোথায় আত্মগোপন করেছে। যে দেহটা পড়ে আছে তার অনুভূতি নেই, লজ্জা নেই, কিছুই নেই।

তার বোন ইভজিনিয়াকে গ্রেপ্তার ক'রে দু'জন কর্মচারী একদিন এমনি ভাবে অপমানিত করে। ভেরা করে তার প্রতিবাদ। রুশ সরকার আজ বুঝি তাই এমনি ভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে সেই প্রতিবাদকারিণীর উপর।

ডাক্তার চলে গেলো। ভেরাও এলো কুঠরীতে। ছোট ছোট কুঠরী···সারি সারি সাজানো···অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন। তারই ছাব্বিশ নম্বর কুঠরী ভেরার। অন্যান্য কুঠরীগুলিও সব বিপ্লবী কয়েদীতে ভর্তি।

সে ভীষণ জেলের কাহিনী ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মানুষ সেখানে পাগল হয়ে যায়, আত্মহত্যা করে, লোহার গরাদেতে মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা রক্তাক্ত ক'রে তোলে। সেখানে প্রবেশ করে যৌবনের প্রথম সাহস···আর বেরিয়ে আসে রিক্ত-যৌবন, শংকাতুর শ্মশানযাত্রীর বেশে।

ভেরা আজ তারই অধিবাসিনী।

ভয় নাই, ভেরা ভয় নাই। চিত্তকে দৃঢ় করো, তুমি কোন্ ব্রত উদ্‌যাপনে এমন জীবন বরণ ক'রে নিয়েছ, তাই মনে করো। তোমার জাতি—লক্ষ লক্ষ রুশ নরনারী, কী শোচনীয় জীবনযাত্রা তাদের। তুমি তাদের মুক্তি-দীপ যোগাবার ব্রত নিয়েছ নিজের জীবনকে—সুখ-দুঃখ, হাসি-গান, প্রেম-উচ্ছাস। মেশানো তোমার সমগ্র জীবনকে—বর্তিকার মতো জ্বালিয়ে দিয়ে। দুনিয়ায় সবচেয়ে হতভাগ্য যারা, পরিশ্রমক্লান্ত, রোগাতুর দেহ, আনন্দহীন মর্যাদাহীন জীবন, অন্নহীন দারিদ্র্য, তাদের কথা আজ মনে করো ভেরা !

তুমি এ অধঃপতিত জাতির একনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা। এই আপাত পরাজয়ে চোখের জল ফেলো না, শোক করো না সেই সংগীদের জন্য, যারা মুক্তি-যুদ্ধে আত্মবলিদান করেছে। ভেরা, মৃত্যু তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে, কিন্তু তাদের আত্মার আগুন নেবাতে পারেনি। এই পাষাণকারার স্তব্ধ, ভীষণ, সর্বব্যাপী অন্ধকারে কান পেতে শোনো, তোমারই মতো কত যোদ্ধা এই কারার কক্ষে কক্ষে মৃত্যুর তপস্যা করছে। তুমি একা নও, একা নও ভেরা !

চিন্তার স্রোত ভেরার হৃদয়তটে আছড়ে পড়তে লাগল এমনি ভাবে। এ কারাগারে বসে মনে হয়, জীবন যেন একটা সুদীর্ঘ স্বপ্ন, স্বপ্নকে সত্যিকারের জীবন ব'লে ভুল হয়।

ভেরা ঘুমুতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ঘুম আসে না। কেবল স্বপ্নের পর স্বপ্ন।

কী ভয়াবহ !

সে যেন জেল ভেঙে পালিয়েছে। জেলের পাগলা ঘন্টার শব্দ,

রক্ষীদের কোলাহল, ঘোড়ার খুরধ্বনি, রক্ত-খেকো কুকুরের আকস্মিক ঘেউ ঘেউ, বন্দুকের গুলী, গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেলো সে।

ভেরা বুকে হাত দিয়ে চীৎকার করে জেগে উঠলো। তারপর আবার স্বপ্ন।

গুপ্তকথা ব্যক্ত করার জন্য নির্যাতন! একটা বড় খাঁচায় সে বন্দিনী, তপ্ত বাষ্প খাঁচাকে প্লাবিত করেছে—কী দাহ! লক্ষ লক্ষ সূচ এক সংগে ফুটিয়ে দিচ্ছে কে যেন দেহে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছুটে যায়, কিন্তু নাই, নাই,—পালাবার উপায় নাই, চারিদিকে লোহার গরাদে। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলো। তাতেও রেহাই নেই। সভ্য জাতির সভ্য ব্যবস্থা।

কে যেন তাকে নিয়ে কাঠের চেয়ারে বসিয়েছে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারে না। অন্তরাল থেকে কে যেন কল টিপে দিচ্ছে, আর বিদ্যুতের স্রোত কাঁটার মতো শরীরের প্রতি অণু পরমাণুকে বিঁধে বিঁধে বয়ে যাচ্ছে, অস্বাভাবিক স্পন্দনে পায়ের মাংসপেশী হয়ে উঠেছে লোহার মতো শক্ত। কাঁদার উপায় নেই, সইবার উপায় নেই, প্রতিবিধান করার উপায় নেই।

শেষ দৃশ্য—

তাকে শৃংখলাবদ্ধ করে ফাঁসির মঞ্চে তুলে দেওয়া হয়েছে, চারিদিকে উত্তপ্ত বিক্ষুব্ধ অথচ একান্ত অসহায় জনস্রোত! সময় হল, ফাঁসির দড়ি মরণ-বঁধুর দেওয়া বরণ-মালার মতো ধীরে ধীরে তার অংগ স্পর্শ করছে, প্রেমের কঠিন আলিংগনে নিষ্পেষিত করছে।

কী আরাম! কী আরাম! এমনি করে রাত কাটে।

নীরব, নিস্তব্ধ,—কবরের মতো। হঠাৎ হয়তো একটা শব্দ জাগে, অমানুষিক, ভয়ংকর। চকিতে আসে, চকিতে মিলিয়ে যায়। বন্দীর মনে আতংক জাগে।

ঐ, ঐ আবার ও কিসের শব্দ! ফোঁস-ফোঁস! একটা সাপ আসছে গর্জাতে গর্জাতে—এই লোহার খাঁচায় নিঃসহায় শিশুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে হবে তার! কিন্তু না, ও কি না, ও যে জলের শব্দ। পাইপ চুঁইয়ে জল বেরুচ্ছে, তারই আওয়াজ। কিন্তু কী ভীষণ!

কে ঐ ক্ষীণস্বরে কাঁদছে না? যেন হিমাচলের শৃংগ ভেঙে প'ড়েছে বুকের উপর, ঠেলে ফেলে সরিয়ে দিয়ে উঠতে পারছে না। উঃ, কি হয়েছে তোমার? কি হ'য়েছে? বন্দী, ওতো পাষাণ-চাপার ব্যথা নয়—তার চেয়ে ভীষণ ব্যথা, মৃত্যুপথযাত্রী ক্ষয়রোগীর শেষ অবলম্বন—যার মা কাছে নেই, স্ত্রী কাছে নেই, বোন্ কাছে নেই,—যাকে শেষ-বিদায় নিতে হবে অন্ধকারের মুখ দেখে দেখে!

উঃ, অসহ্য!

ঝন্-ঝন্, ঝন্-ঝন্! ও কিসের শব্দ? কে তুমি মুক্তি-উন্মাদ বন্দী, লোহার গরাদেতে সবলে আঘাত ক'রে শৃংখল ছেঁড়ার নিষ্ফল চেষ্টায় নিজের দেহকে রক্তাক্ত ক'রে তুল্‌ছো? বন্ধু! মুক্তি নাই, মুক্তি নাই। এ কবর, জাহান্নম্, এ কংকাল তৈরির কারখানা!

কিন্তু, ওতো শৃংখল-ধ্বনি নয়, বাসন পড়ার ঝন্-ঝন্ শব্দ।

এমনি শব্দ, এমনি স্বপ্ন, এমনি অন্ধকার, এমনি বিভীষিকাকে সংগী ক'রে ভেরার জীবনযাত্রা শুরু হ'ল।

বাইরের সংগে কোন সম্পর্ক নেই, গাছপালা, পশুপাখী, নদী নির্ঝর, চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-আলোক, গিরি-সমুদ্র,—মা-বাপ, ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন,—সর্বরিক্ত জীবন! সময় আর কাটে না। ঘড়ি নেই,—শুধু রক্ষীদের পাহারা বদলের শব্দ—তাই থেকে সময় আন্দাজ ক'রে নিতে হয়। চিঠিলেখারও উপায় নেই, চিঠি পাওয়ারও উপায় নেই।

দুনিয়ায় রুশ-সরকার ছাড়া আর কেউ জানে না কে কোন্ কবরে সমাহিত!

একবার ভেরার মা গিয়ে কেঁদে প'ড়লেন এক কর্তার কাছে, একটিবার বলুন, আমার মেয়ে কোথায় আছে? কেমন আছে? একটা খবর বলুন তার।

কর্তা জবাব দিলেন, হাঁ, খবর তার পাবে। একেবারে শেষ খবর, শ্মশানযাত্রার খবর।

কী পৈশাচিক আঘাত! মাতৃত্বের কী দারুণ অবমাননা!

শ্লুশেলবার্গ জেলখানা। ও কে পাগলের মতো ছুটাছুটি ক'রছে কুঠরীর ভিতর? কংকালসার দেহ, সর্বাংগে যন্ত্রণার চিহ্ন! অস্থির! উন্মাদ! শান্তিহারা!

কবি মিনাকভ! রাজরোষে আজ তার এই অবস্থা!

বন্দী ক'রে প্রথম তাকে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়। মিনাকভ সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আবার ধরা পড়ে। শেষটা এই জেলে আসে। অর্থাৎ নিশ্চিত-মৃত্যুর কাছে এসে দাঁড়ায়।

এ অসহ্য! পংক-নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ডের মতো প'চতে প'চতে মরা। আমি মানুষ, আমায় মানুষের মতো বাঁচতে দাও,—চিঠি লিখতে দাও, প্রিয়পরিজনদের সংগে দেখা ক'রতে দাও, বই দাও, ধূমপান করতে দাও।

নিষ্ফল দাবী। ক্রুদ্ধ হ'য়ে মিনাকভ অনশন শুরু ক'রলো। কিন্তু পারলো না অনশন চালাতে। ক্ষুধায় নাড়ী পর্যন্ত হজম হচ্ছিল তার। নিরুপায়ের মতো সেই অনাদরের অন্ন আবার গ্রহণ ক'রতে হ'ল তাকে।

তার পর ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে আজ উন্মাদের লক্ষণ। খাবার আসে, খায়—মুখে অরুচি, ভালো লাগে না। নিশ্চয় বিষ মিশিয়ে দেয় ওরা। তাকে মারবে ব'লে।

মিনাকভ্ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। আজ—আজ একটা কিছু করা চাই তার।

ইন্সপেক্টার এসে কুঠরীতে ঢুকছে—মিনাকভ্ সবলে মুষ্ট্যাঘাত ক'রলো তার মুখে।

এর শাস্তি হ'ল মৃত্যু। বন্দী, যদি ক্ষমা চাও।

ক্ষমা! মিনাকভ্ গর্জে উঠলো, ক্ষমা চাইব? অত্যাচারিত চাইবে অত্যাচারীর কাছে ক্ষমা? পদাঘাত করি, পদাঘাত করি, ও ক্ষমায়।

তবে মৃত্যু।

মিনাকভ্ চুপ ক'রে দাঁড়ালো। মাঝে মাঝে হেসে ওঠে হো-হো করে। বিষ খাইয়ে মারবে ভেবেছিলে বাছু—

কথা শেষ হল না।···এক সংগে অনেকগুলি এসে কবির জীবন-ছন্দ সমাপ্ত করে দিল।

ভরা খাবার খেতে যাচ্ছে, হঠাৎ হাত কেঁপে উঠলো, থালা পড়ে গেলো হাত থেকে।

ও কে, বুকফাটা ক্রন্দনে কারাকক্ষ ভরিয়ে তুলেছে? ওগো কশাই, আর মেরো না, আর মেরো না। আমায় খুন কর, খুন কর, আমি তা সইতে পারবো। আমায় মেরো না।

কে ও? কেন ভাগ্যে ওর আজ এত্তো নির্যাতন?

ওর নাম মিস্কিন। সমস্ত জীবন কারাগারে নির্যাতনে কাটিয়েছে ও। বাল্যেই বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ছাপাখানা ছিল একটা, তাতে বিপ্লব-পুস্তিকা ছাপানো হত। কাজেই পুলিশের রোষদৃষ্টি পড়লো। মিস্কিন সেখান থেকে পালালো।

তার পর নির্বাসিত নেতা শার্নিশেভ্স্কিকে গোপনে মুক্ত ক'রবার ফন্দি ক'রে পুলিশের ছদ্মবেশে জেলখানার কর্তার কাছে একখানা চিঠি নিয়ে গেলো। শার্নিশেভ্স্কিকে এক সংগে পিটার্সবার্গে পাঠিয়ে দাও। জেলের কর্তার সন্দেহ হ'ল। দু-জন সৈন্যের সংগে গভর্ণরের কাছে যেতে বললো। মিস্কিন দেখে, সর্বনাশ! ধরা পড়ে বুঝি। কিন্তু ঘাবড়ালো না। পথে গুলী চালালো, একটা সৈন্য মারা গেলো, আর একটা পালালো।

অনেক দিন পরে ১৯৩ বিচারে মিস্কিন ধরা পড়লো। ১৯৩ জন বিপ্লবী একটা বিপ্লবাত্মক বর্ণনা দেবে স্থির করে মিস্কিনকে তাদের মুখপাত্র করলো। মিস্কিন অগ্নিগর্ভ ভাষায় সে বিপ্লব বর্ণনা ক'রে গেলো।

বিচারে হ'ল তার দশ বছর কারাদণ্ড। দু' বছর পরে মিস্কিন জেল থেকে পালানো—ভ্লাদি ভোষ্টকের দিকে। সেখানে যাতায়াতের কোন সুবিধা নেই, পাগলের মতো ছুটাছুটি করেও সে পথ পেলো না। কাজেই ধরা প'ড়লো।

এবার জেলে গিয়ে সবাইকে বিদ্রোহী ক'রে কর্তাদের মেরে, জেল ভেঙে পালাতে উত্তেজিত করতে লাগলো।

তারপর এই শ্লুশেলবার্গ কবরখানায়।

মিস্কিন বিরক্ত হয়ে গেছে এই ঘৃণ্য জীবনে। এর চেয়ে মৃত্যু ভালো! মৃত্যু চাই, মৃত্যু চাই···

একদিন দেখলো, জেল-ইন্সপেক্টার কয়েদীদের উপর অত্যাচার করছে। মিস্কিন বাঘের মতো আড়ি পেতে রইলো। যেই ইন্সপেক্টারের তারস্বরে আসা, অমনি দমাদ্দম মার।

ইন্সপেক্টার ঐ তার পাল্টা জবাব দিচ্ছেন মিস্কিনকে মেরে। মিস্কিন চীৎকার করছে, আমি মৃত্যু চাই, আমায় মৃত্যু দাও, মৃত্যু তো আছেই···

মিনাকভ যেখানটিতে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিংগন করেছে, ঠিক তিন মাস পরে সেইখানটিতে দাঁড়িয়ে মিস্কিনও প্রাণ দিলো। মরবার মুখে চীৎকার করে বলে গেলো বন্দীদের উদ্দেশ করে,

বন্ধুগণ। আমি পথ দেখিয়ে গেলুম, তোমরা একযোগে আমার মতো প্রতিবাদ কর, মরো যদি একসংগেই সবাই মরবে।

এই তার শেষ বিপ্লববাণী।

সেই অন্ধকার কবর দীপ্ত করে একদিন আলোর বিভীষিকা জলে উঠলো। সংগে সংগে ক্ষীণ আর্তনাদ! এক হতভাগ্য বন্দী আজ নিজের গায়ে আগুন দিয়ে ঈপ্সিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

নাম তার প্রোশেভস্কি। আবাল্য বিপ্লব-ভক্ত, দেশসেবক। এই অপরাধে প্রথমতঃ দু'বার জেল হয় তার। তারপর নির্বাসন।

কর্তৃপক্ষের চোখে ধূলো দিয়ে জেল ভেঙে সে পালিয়ে আসে রাজধানীতে। বিপ্লবদলে যোগ দিয়ে বিস্ফোরণ—বোমা, ডিনামাইট তৈরির কারখানা খোলে গোপনে।

একদিন ধরা পড়লো। বিচারে হল প্রাণদণ্ড। কেন জানা গেলো না, তা কমিয়ে করা হল যাবজ্জীবন কয়েদ।

বাঘ যেমন বন্দী হয় কিন্তু বশ মানে না, গর্জন করে, প্রতিবাদ করে—সেও তাই শুরু করলো জেলে এসে।

কিন্তু প্রতিবাদ নিষ্ফল দেখে আহার ত্যাগ করলো। আঠার দিন যায়, তবু অচল অটল। কর্তৃপক্ষ গোলমালের ভয়ে তাকে দূরে অন্য একটা কুঠরীতে নিয়ে গেলো।

সেখান থেকে জেলারদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করে পুলিশের কর্তার কাছে এক চিঠি লিখলো। পুরানো আসামীরা চিঠি লিখতে পারতো। কিন্তু এই অপরাধে তার কাগজ কালি কলম বন্ধ হয়ে গেলো—সে চিঠি তো যথাস্থানে পৌঁছোলই না।

কত আর সহ্য করা যায়। নাঃ, এবার কাউকে অপমান করা যাক। তা হলেই কোর্টমার্শাল হবে। তখন সব ব্যক্ত করা যাবে।

জেল-ডাক্তারকে সেদিন সে ভীষণভাবে আঘাত করলো। কিন্তু কোর্টমার্শাল হল না।

সে নাকি পাগল! হ্যাঁ, পাগলই বটে,—তবে মৃত্যুর জন্য। এই মৃত্যুপাগল বন্দী তাই গায়ে কেরোসিন মাখিয়ে নিজের প্রাণ নিজের হাতে নিয়েছে।

লাল টকটকে তাজা রক্ত। মুখ থেকে কেশে ফেলছে আর ধীরে ধীরে পা বাড়াচ্ছে ইমারেভ্। মুখে তার ঘনায়মান মৃত্যুর রেখা, চোখে তার অপূর্ব হাসি। উন্মাদ! যক্ষ্মারোগী। বিদায়-পথের পথিক।

কাশির শব্দ, যেন শূন্যগর্ভ পাত্রে থেকে থেকে কে আঘাত করছে!

ভেরার মনে হ'ল, ও-শব্দ যেন তার নিজের বুকেও এসে লাগছে প্রবল বেগে। উঃ, ভাবতেও পারা যায় না, সেই যুবক ইমারেভ আজ এই সামনে দাঁড়িয়ে তার।

ছোট উঠান···শাদা গোলাপের পাপড়ির মতো তুষার এসে ছেয়ে ফেলেছে—তার উপর রক্তের ছাপ—কেউ তা পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছে না, বরফ দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে না, এ যেন এক তীর্থযাত্রীর মহাযাত্রা মরণযাত্রা—রক্তগোলাপ দুপাশে ছড়িয়ে জানিয়ে যাচ্ছে—এ কৃষ্ণায়মান রক্ত যেমন আর লাল হবে না, তেমনি হে বন্ধু, হে বান্ধবি, আমিও চ'লেছি চিরবিদায় নিয়ে—আর ফিরবো না, আর ফিরবো না। বিজ্ঞান আমায় রুখতে পারবে না, ক্রন্দন আমায় রাখতে পারবে না, শক্তিগর্বিত রুশ-সরকারও আমায় রাখতে পারবে না।

বিদায় বন্ধু! বিদায় বান্ধবি! বিদায়। বিদায়।

ভেরা সভয়ে চোখ বুজলো। উঃ, কোন্‌দিকে চাইবে? যেদিকে চায় সেই দিকেই রক্ত! কেউ নেই ও রক্ত ঢেকে দেয় বরফ দিয়ে?

আর ইমারেভ্! কে ওর বন্ধু আছো? ওকে এক কৌটা বিষ দিয়ে দাও! ওর মৃত্যুর পথ সহজ হোক, ও ম'রে বাঁচুক।

ওঃ, কেউ নেই! কেউ নেই বিপ্লবীর বন্ধু!

অন্ধকার রাত—দ্বিপ্রহর। কাতর আর্তনাদ, ক্ষীণ বিদায় বাণী—তারপর—সব চুপ! অভিশপ্ত বন্দী সংগ লভেছে তার মরণ-বঁধুর। এই মৃত্যু—এই নির্যাতন চোখের উপর দেখে ভেরা। আর নিজেকেও প্রস্তুত করে এই নিশ্চিত এবং নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের জন্য। মাঝে মাঝে মায়ের জন্য কাঁদে। এতোদিন অন্য কাজের ব্যস্ততায় মাকে কাছে পেয়েও পায়নি সে। আজ ভেরার সারা অন্তর জুড়ে মা। অজ্ঞাতে চোখের জল পড়ে তার জন্য।

কিন্তু অনুতাপ নেই ভেরার হৃদয়ে। যা ক'রেছে সে ভালো ক'রেছে। এখন যদি মুক্তি পায়, আবার তাই করে। অনুতাপ নেই।

আছে শুধু একটা শূন্যতা—মহাশূন্যতা। তা পূর্ণ করবার মতো কিছু নেই এ কারা-জীবনে।

এমনি ক'রে দু'বছর কাটলো। তার ব্যবহারে খুসি হ'য়ে কর্তারা তাকে একটা সুবিধা দিলেন। লুদামিলা তার পাশের কুঠরীতেই থাকে—তার সংগে বেড়াতে পারবে রোজ। ভেরা সঙ্গিনী পেয়ে খুসি হ'ল। রোজ বেড়ায়—কুঠরীর সামনেই ছোট্ট উঠান—সেইখানে।

দিন কয়েক পরে লুদামিলা ব'ললে, ভেরা, এই সংগী নিয়ে বেড়াবার সুবিধাটা দু-চারজনকে দেওয়া হ'য়েছে, তা দেখেছ?

হাঁ।

যে সুবিধা আমাদের বন্ধুরা পাবে না, তা কি আমাদের ভোগ করা উচিত?

কক্ষনো নয়। আমরা আজ প্রতিবাদ ক'রবো এর।

ইন্‌স্পেক্টার এলে ভেরা ব'লতে গেলো, আমাদের যে সুবিধা দিচ্ছেন আমাদের বন্ধুদের—

বন্ধু! ইন্‌স্পেক্টার দাঁত খিঁচিয়ে বললে, এখানে বন্ধু-টন্ধু নেই, নিজের কথা বলো।

না, আমি আমার বন্ধুদের কথাই বলবো।

বলতে পারবে না।

পারবো।

ইন্‌স্পেক্টার রেগে চলে গেল।

ভেরা লুদামিলা দুজনেই বেড়ানো বন্ধ ক'রে দিল। দেড় বছর কেউ বেড়ায় না সংগি-সংগিনী সহ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অচল অটল।

বিপদে পড়লে বুদ্ধি বেরোয়। এখানেও তাই হ'ল।

যদি আপনি জীবনযাত্রার মান উঁচু করতে চান

—প'ড়ে দেখুন!

আজকাল ভালভাবে বাঁচবার কত স্থযোগ হয়েছে—তবু পুরণো সংস্কার আর সেকেলে ধারণা আঁকড়ে থেকে কত লোক সে সব স্থযোগ নষ্ট করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের খাবার অভ্যাসের কথাই ধরুন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ দু' আউন্স স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। বনস্পতির ভেতর এই স্নেহপদার্থ আমরা সহজেই পাই। তবুও বনস্পতি দিয়ে রান্না করতে এখনো অনেক লোকের সংস্কারে বাধে। তারা মনে করে যে এই উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ কেবল ভারতেই তৈরী হয়—কিন্তু মোটেই ভেবে দেখে না যে সারা পৃথিবীতেই স্বাস্থ্যবান লোকেরা বিশেষ প্রণালীতে তৈরী উদ্ভিজ্জ স্নেহ দিয়ে রান্না করা পছন্দ করেন। এমন কি ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও আমেরিকার মত পৃথিবীর মধ্যে নামকরা মাখনের দেশেও দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের চেয়ে বনস্পতির মত উদ্ভিজ্জ স্নেহের ব্যবহার ঢের বেশী। কেন বলবো? কারণ লোকে জেনেছে যে এই সব উদ্ভিজ্জ স্নেহ দুগ্ধজাত স্নেহপদার্থের মতই পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এতে খরচও কম।

পুরোপুরি পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বনস্পতি চিনাবাদাম ও তিলের তেলে তৈরী। কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত কারখানায় বিশেষ প্রণালীতে বনস্পতি তৈরী হয়—যাতে আপনার কাছে তা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ ও ঘনীভূত উপকারিতার আকারে পৌঁছয়। উপরন্তু, বনস্পতির প্রতি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বক ও চোখ ভাল রাখবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

যে সব লোকের জীবনযাত্রার মান খুব উঁচু তাঁরা রান্নার জন্যে বিশুদ্ধ স্নেহজাতীয় পদার্থ পছন্দ করেন—আপনারও বনস্পতি ব্যবহার সুরু করা উচিত নয় কি?

বনস্পতি — বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

নিস্তব্ধ রাত্রি। হঠাৎ শব্দ হচ্ছে, টক্-টক্, টক-টক্-টক।

রক্ষীরা ভ'বে, কে আবার পাগলামি ক'রছে। বন্দীরা সচকিত হ'য়ে শোনে সেই শব্দ। শব্দের-ভাষা ঠিক করে নিয়ে তারা এমনি ক'রে কথা বলে একে অন্যের সঙ্গে, একের প্রাণের ব্যথা অন্যকে জানায়।

রক্ষীরা একদিন কিন্তু বুঝলো ব্যাপারটা। খুব কড়া পাহারা লাগিয়ে দিল। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে শব্দ ওঠে, টক্-টক্-টক। রক্ষীরা রাগে পাগলের মতো খুঁজে বেড়ায় দেয়ালে শব্দ করে কে? খোঁজ পায় না।

একদিন ভেরা শ্রান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ শব্দ শুরু হ'ল।

শব্দের ভাষায় কথা! ভেরা, জেগে আছো?

হাঁ।

আমি পোপোভ, ঘুম আসছে না।

না, ঘুমোও, রক্ষীরা এক্ষুণি ধেয়ে আসবে।

আসুক। তবু তোমার সংগে কথা ব'লবার লোভ ছাড়তে পারবো না।

তার পর শব্দ বন্ধ।

হঠাৎ পোপোভ্‌কে আসতে দেখে ভেরা শব্দ ক'রে জিজ্ঞেস করলো পোপোভ্!

উত্তর নেই।

তার পরেই ইন্‌স্পেক্টারের ক্রুদ্ধ গর্জন,—শয়তান, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে রাখবো যেখানে কোনো জীবিত প্রাণী তোমার সাড়া পাবে না। তার পরেই নির্মম প্রহার। মারতে মারতে পোপোভ্‌কে পিউনিটিভ সেলে নিয়ে গেলো।

পোপোভের গায়ের প্রত্যেকটি আঘাত ভেরার বুকে এসে বাজলো একশো গুণ হয়ে। ওরা পশু, সবাই মিলে পোপোভ্‌কে মেরে ফেলবে। আমিও যাবো পিউনিটিভ সেলে। পোপোভকে একা থাকতে দেবো না।

ভেরা দোরে ঘা দিতে লাগলো।

একজন রক্ষী এসে বললে, দোরে ঘা দিচ্ছ কেন? কি চাও?

ইন্‌স্পেক্টারকে।

রক্ষী ইন্‌স্পেক্টারকে ডেকে নিয়ে এলো। দোরের ছোট জানালাটা খুলে বাইরে দাঁড়িয়েই ইন্‌স্পেক্টার কড়া সুরে বললে, কি চাই তোমার?

আমায়ও পিউনিটিভ সেলে নিয়ে চলুন।

কেন?

কথা দুজনে বলেছি। একজনেরই শুধু শাস্তি হবে কেন?

বেশ! বেশ!

রক্ষী এসে দোর খুলে ভেরাকে বের ক'রে আনলো। ভেরাকে বের করা হ'ল দেখে সব বন্দী চীৎকার ক'রে উঠলো, আমাদেরও নিয়ে যাও, আমাদেরও নিয়ে যাও। সমগ্র কক্ষের লোহার গরাদেগুলি ঝন্-ঝন্ করে উঠলো—উত্তেজিত কয়েদীদের পদাঘাতে।

নিরর্থক সে বিক্ষোভ।

রক্ষী একটা ক্ষুদ্র, ড্যাম্প, আলোহীন কক্ষে ভেরাকে এনে চাবি দিয়ে চ'লে গেলো। শূন্য মেঝে, বিছানা নেই। খাবার নেই। সমস্ত রাত অনাহার অনিদ্রায় কাটালো।

পরদিন খাবার এলো—এক টুক্‌রো পুরানো, শক্ত, কালো রুটি। বিছানা আজও এলো না।

ঐ রুটির একটুখানি ভেঙে মুখে দিতেই বমি এলো। খাওয়া হ'ল না। বড় দুর্বল, না শুয়ে আর পারা যায় না। পায়ের জুতো খুলে তাই শিয়রে দিয়ে সেই অনাবৃত মেঝের উপর শুয়ে রইলো সে। কতক্ষণ এ-রকম আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলো, তা ঠিক ছিল না তার। হঠাৎ একটা শব্দে সে সচকিত হ'য়ে উঠলো।

ধস্-ধস্-ধস্। ভেরা ফিগনার!

ভেরা উঠে বসলো। বুঝলো, পোপোভের কাণ্ড এ। এখানে এসেও টেলিগ্রাফ চালিয়েছে সে। কিন্তু আর সাড়া নেই কেন?

কান্ পেতে শুনলো, রক্ষীদের কোলাহল, প্রহারের শব্দ, শৃংখলের ঝন্-ঝন্। উঃ, ওরা নিষ্ঠুরের মতো মারছে পোপোভকে!

ভেরা জোরে ঘা দিয়ে চীৎকার করতে লাগলো, থামো, থামো, তোমরা কি মানুষ নও? একেবারে মেরে ফেলতে চাও?

কিছুক্ষণ পরে গোলমাল থামলো। ভেরা শুয়ে পড়লো।

আবার শব্দ—ধস্-ধস্-ধস্—ভেরা ফিগনার—ঐ পর্যন্ত!

আবার সেই রক্ষীদের কোলাহল, আবার সেই প্রহার, হতভাগ্য পোপোভ! কী তোমার বলার আছে, তা কিছুতেই ওরা তোমায় বলতে দেবে না।

পোপোভ বেপরোয়া। মারো যতো খুসি। জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত এ শব্দের ভাষায় কথা বলে যাবো।

ধপ্-ধপ্-ধপ্, ভেরা ফিগনার! আমার সর্বশরীরে ব্যথা কিন্তু মন আনন্দে ভরা। ভেরা ফিগনার, তুমি খেয়েছ?

ভেরা উত্তর দিতে গেলো—কিন্তু তার আগেই রক্ষীরা পোপোভের ঘরে ঢুকে পোপোভকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে লাগলো।

ভেরা দোরের কাছে গিয়ে আবার চীৎকার শুরু করে দিল, ইন্‌স্পেক্টার! ইন্‌স্পেক্টার! ওকে মেরো না, ওকে মেরো না, ও ম'রে যাবে। ইন্‌স্পেক্টার ভেরার ঘরের কাছে গিয়ে বললেন, চেঁচাচ্ছ কেন তোমরা?

ওকে তোমরা আর মারতে পারবে না।

কে মারছে? ওকে বাঁধা হচ্ছিল, ও বাধা দিচ্ছিল, তাই।

না, তোমরা ওকে মেরেছো, আবার মারবে, আমি জানি বেশ।

ভেরা এবার হতাশকণ্ঠে বললে, না, না, আর মেরো না ওকে। আমি ওকে বলবো ও আর শব্দ করবে না।

আচ্ছা। ইন্‌সপেক্টার চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পরে ভেরা শব্দ করলে ধপ-ধপ-ধপ। পোপোভ!

উত্তর নেই।

পোপোভ!

এবার ক্ষীণ শব্দ—ধধ্-ধধ-ধধ—ভেরা ফিগ্‌নার, আমার হাত-পা বাঁধা, ভালো করে শব্দ করতে পারছি না।

পোপোভ্। শোনো! তোমায় ওরা মারে, আমি সইতে পারি না। আর শব্দ করো না পোপোভ!

তা হয় না ভেরা ফিগ্‌নার।

কেন পোপোভ?

তা হলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

না, না, আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না পোপোভ ?

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর উত্তর এলো—আচ্ছা ভেরা ফিগনার, ভেরা ফিগনার, ভেরা ফিগনার !

তারপর মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধতা শুরু।

ভেরা আবার আচ্ছন্নের মতো এলিয়ে পড়লো নিস্তব্ধতার কোলে। একদিন সেদিনও সে এমনি ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়ে আছে। অন্ধকার যায়নি ভালো ক'রে—উষা উঁকি দিচ্ছে দূর থেকে সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে এক মধুর কণ্ঠ ধীরে ধীরে বেজে উঠছে। কী সুন্দর গান ! কী শুভ মুহূর্ত !

কিন্তু কে গাইছে ?

এ পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে যে গান বাজে, তা তো ব্যথার গান, মরণের গান, বিদায়ের গান—সুরহীন গান।

এ তো তা নয় ! এ যে বাস্তব গান ! কে তুমি ভক্ত ? সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে আরাধ্যের উদ্দেশে অর্পণ করছো গানের অঞ্জলি। কে তুমি ?

এ তো পরিচিত স্বর। বন্দীদেরই একজন। পাষাণ-কারার তীব্র শাসন তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে পারেনি।

ভেরা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলো।

দু' দিন পরে ভেরার ঘরের দোর খুলে গেলো। চলো, তোমার আগের ঘরে।

ভেরা ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে বললো, না, আমি যাবো না।

কেন ?

আমার বন্ধুকে আগে নিয়ে চলো।

রক্ষী একটু হেসে বললো, তাকে আগেই নেওয়া হ'য়েছে।

ভেরা আর আপত্তি করলো না।

বন্দিজীবনের পাঁচ বছর কেটে গেছে।

কর্তারা বাণ্ডিল-কে বাণ্ডিল শাদা কাগজ আর কালি এনে দিলেন বন্দীদের হাতে।

এগুলো লিখে দিলে আরো পাবে।

লিখে দিলে তার মানে লেখা পুলিশরা প'ড়বে। কি লেখা যায় ? বেশ চমৎকার কোন কিছু। গল্প, কবিতা, উপন্যাস কি লিখলে ভালো হয়।

বন্দীদের ইতিমধ্যে একটি লাইব্রেরী তৈরি হ'য়েছিলো। ভেরা তারই দু-চারখানা কবিতার বই-এর বাছাবাছা লাইন খাতায় তুলতে লাগলো।

একদিন এক বন্ধু এক টুকরো কাগজ ঢেলে দিলে তাকে, ভেরা তুলে দেখে, লোপাটিন কবিতার ভাষায় জিজ্ঞেস করছে—

কোন সে অশুভ লগ্নে জানি না
পার হ'য়ে এনু কারার দ্বার।
পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকে মরে
মুক্তির আলো বারম্বার।
কোন সে অশুভ তিথিতে জানি না
জন্মিনু আমি ধরার'পর ?
কেন মাতা মোরে রাখিল বাঁচায়ে
দুঃখ সহিতে দুখের পর।

ভেরা বুঝলো, লেখক এ জীবনকে, এ বন্দিত্বকে দুর্ভাগ্য মনে ক'রে নিরন্তর কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু সে তো এতে দুঃখিত নয়। পৃথিবীতে জ'ন্মেছে ব'লেও সে দুঃখিত নয়, বন্দিনী হ'য়েও তো তার দুঃখ নেই। ব্যথা সে যা সইছে সে তো স্বেচ্ছাকৃত। তা স্বার্থের জন্ম নয়, দেশের জন্য তাতে আনন্দ আছে, গ্লানি নেই। মৃত্যু আছে, অনুতাপ নেই। কাজেই ভেরা জবাবে লিখলো,—

মুক্তির লাগি জীবন সঁপিয়া
ধন্য হ'য়েছি, ধন্য ভাই !
আসুক বেদনা, আসুক মৃত্যু,
মা ভৈঃ বন্ধু, দুঃখ নাই।
ধীরে ধীরে—ওই আসে মহানিশা,
আসুক, তা ব'লে বন্ধুদল
কাঁপিব কি ভয়ে মেষের মতন ?
ফেলিব কি শোকে অশ্রুজল ?
মৃত্যু আসিছে মায়ের মতন
স্নিগ্ধ, শীতল, সৌম্য কোল,
ধীরে ধীরে তার কোলে দাও ধরা
শোক ভোল ভাই, দুঃখ ভোল।
যে গান আমরা গেয়ে গেনু ভাই
নীরব কণ্ঠে জীবন-ময়।
পাষাণ-প্রাচীরে কে রুধিবে তারে ?
মেঘে কে রুধিবে সূর্যোদয় ?
শুনিবে এ ডাক নব-বীরদল
মুক্তি ন্যায়ের যুদ্ধে ভাই !
ঝাঁপ দিবে তারা। হে বন্দীদল,
আয় সেদিনের বিদায় গাই !

সবাই এ কবিতা প'ড়ে ব'ললো, হাঁ, হাঁ, এই ঠিক কথা। রুশের পূর্বাকাশে শীঘ্রই নবীন সূর্য উঠছে। সেদিন প্রমাণ হবে, আমরা বৃথা লড়িনি, বৃথা মরিনি।

এর পর থেকে কবিতার ছড়াছড়ি। নেহাৎ যে গদ্যময় লোক সে-ও কবি হ'য়ে উঠছে কালি-কলমের দৌলতে।

ভেরা প্রায়ই মা-বোনকে উদ্দেশ ক'রে কবিতা লেখে।

আজ এক বন্দীর জন্মতিথি উৎসব। লোপাটিন, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলো,—

কবরখানায় বন্দী হ'লেও
শোন হে স্যাডাৎ ! বন্ধু প্রিয় !
প্রেম আমাদের ঘিরে আছে তোমা,
সেই প্রেম আজি তুলিয়া নিয়ো।
নাহি মন্দির, নাহি দীপমালা,
আত্মীয় কেহ কাছে তো নাই—
না থাকুক তাতে কিসের বেদনা ?
বন্ধু মোরা তো র'য়েছি ভাই !
কে বলে বন্ধু সবহারা তুমি
কে বলে গো তুমি রিক্ত দীন ?
বন্ধু মোরা তো রয়েছি তোমার,
প্রেম তো রয়েছে অন্তহীন।

এমনি করে পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান চলে কবিতায়।

দুর্গভো,—পুলিশ-বিভাগের ডিরেক্টার,—এলো একদিন কারাগার পরিদর্শন করতে। লাইব্রেরিতে ঢুকেই দেখে, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস। রেগেই আগুন। এসব এ'লা কোত্থেকে? এ রাখতে পারবে না।

বইখানা বাজেয়াপ্ত হল। শুধু ওখানা নয়, আরও বহু।

বন্দীরা তো ক্ষেপে গেলো। এ অন্যায়ের প্রতিবাদ-কল্পে একটা কিছু করা চাই।

অনশন-ব্রত অবলম্বন করা যাক। এ নিয়ে মতভেদ হল। অধিকাংশ লোকের অমত। কিন্তু অল্পসংখ্যকরা রেগে বিরুদ্ধদলকে কাপুরুষ বলে অনশন শুরু করে দিলে। তারপর সবাই শুরু করলো —তিন-চারজন রোগী আর দুর্বল বন্দী বাদে।

ভেরাও অনশন-ব্রত গ্রহণ করলো।

কিন্তু এ-ব্রত কারুরই টিকলো না বেশী দিন। সবাই একযোগে অনশন ত্যাগ করলো বাধ্য হ'য়ে।

অবশ্য এর কিছুদিন পরেই গংগার্ট বলে একজন কর্মচারীর সহায়তায় আবার তারা অনেক বই পেলো পড়তে। শুধু বইপড়া নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠেরও সুবিধা পেলো অনেকে।

ভেরা ডাক্তারী, এবং সংগে সংগে বিজ্ঞান-শিক্ষায় মন দিলো।

কবিতা লেখাও চলেছে সংগে সংগে। একদিন একটা কাগজে সে লিখে রাখলো—

এলো বসন্ত উষ্ণ উজ্জল
আলোক-ধারায় নেয়ে,
চেয়ে আছে ধরা বধূটির মতো
পাখী ওঠে গান গেয়ে।
বন্ধু, আমারই দুঃখের কেন
হল না কো অবসান?
নির্মল-নীল সৌম্য আকাশ
কেন করে ব্যথা দান?
বেদনা-আতুর শ্রান্ত দিবস
আসে যায় অবিরাম,
এই যে রবির কনক-কিরণ
সুন্দর অভিরাম,
তারই তলে কেন শুধু আমি ম্লান
রিক্ত আনত-চোখ?
কারার আঁধারে কেন ছুটে যাই
ত্যাগ করে এ আলোক?

লিখে চাপা দিয়ে অন্য কাজে মন দিলো ভেরা। এ কবিতার কথা আর তার মনেই রইলো না।

অনেক দিন পরে দেখে কাগজের ওপিঠে তার উত্তর।

ব্যথা যখন বড়ই বাজে বুকে
উথলে যখন ওঠে চোখের জল,
তখন বন্ধু স্তব্ধ হয়ে শুয়ে
এই কথাটা ভেবো অবিরল—
তোমার লাগি প্রীতির ডালি হাতে
তোমারই পথ চাহি অনুক্ষণ
বসে আছে বন্ধু তোমার যতো,
বসে আছে প্রাণের প্রিয়জন।
আশার বাতি নিবিয়ো না কো সখি!
মরণ-নিশা আরও অনেক দূর—
এখনো যে আছে তোমার তরে
যৌবন আর প্রণয় সুমধুর!
কাঁদবে কেন? এই আঁধারের বুকে
ঐ দেখ সই, জাগছে দূরে আলো,
ছায়ার কায়া মিলিয়ে গেলো কেঁপে,
বন্ধু, আজি আশার বাতি জ্বালো।
তলায় স্বাক্ষর—এম্।

মিথায়লোভ্স্কি লিখেছে তাহলে। ভেরার প্রাণ আনন্দে ভরে গেলো। এমন বন্ধু পেয়ে সে ধন্য। কিন্তু বন্ধু, বৃথা তোমার এ সান্ত্বনা। যৌবন, প্রণয়, আশা আর তার ভাগ্যে নেই। সে যে চিরবন্দিনী।

একদিন কয়েক জনের মুক্তির খবর এলো। তাদের মধ্যে একজন লুদামিলা—ভেরার সংগিনী।

বন্দিজীবনের সর্বপ্রিয়জন আজ চলেছে মুক্ত হ'য়ে। কিন্তু তা যেন আনন্দের না হয়ে হয়ে উঠলো একটা শোকের ব্যাপার। লুদামিলার কান্না যেন কিছুতে থামে না। ভেরা অনেক কষ্টে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় দিলো।

জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের শেষবার দেখতে দেখতে লুদামিলা মুক্ত আলোয় এসে দাঁড়ালো।

ভেরার জীবনে এমন দিন কি আসবে কখনো? সে যে যাবজ্জীবনের জন্য বন্দিনী।

ভেরা এখন চিঠি লিখতে পারে—ছ-মাস অন্তর একখানা। চিঠি পায়ও আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু পড়া হয়ে গেলেই কর্তারা কেড়ে নেয়।

আজ তেরো বছর সম্পূর্ণ নীরব থাকার পর কী বলে শুরু করবে সে? বোনের একখানা চিঠি এল ১৬ পৃষ্ঠা।

ভেরা তা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো।

কিন্তু চিঠি লিখতে ইচ্ছা হয় না তার। কী লিখবে? লেখার কী আছে? আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে আজ যেন সে দূরে—বহু দূরে সরে গেছে। দীর্ঘ তেরো বছর কেটেছে। আরো কাটতে লাগলো। অধ্যয়ন, বাগানের কাজ, এ সবের মধ্য দিয়ে তার জীবন-প্রবাহ বয়ে চললো ধীরে ধীরে।

১৮ বছর। যৌবন-সূর্য অস্তমান। অলক্ষ্যে ছেয়ে আসছে জরার অন্ধকার ছায়া। কারা-জীবনে যেন আর কোন কষ্ট নেই! অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে এ জীবনে। সেই শান্ত সমুদ্রে একদিন তরংগ উঠলো।

পাঁচটা পর্যন্ত বেড়িয়ে যে-যার কুঠরীতে এসে ঢুকেছে। খানিক পরে ইনস্পেক্টারের সাড়া পাওয়া গেলো। প্রথমেই সে ভেরার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সংগে তার দু-তিনজন রক্ষী। মুখে ক্রোধের ভাব। যতদূর সম্ভব গম্ভীর অনুচ্চ কণ্ঠে ভেরাকে বললে, কর্তা এখানকার বিশৃংখলা দেখে রেগে গেছেন। আর তা চলবে না। এখন থেকে পুরোপুরি নিয়ম মেনে চলতে হবে।

কর্তার এ আকস্মিক উত্তেজনার কারণ না বুঝতে পেরে ভেরা বললে, কি হয়েছে ? বিশৃংখলা কিসের ? কই, আমাদের তো কোন অপরাধের কথা বলোনি এর আগে ? হঠাৎ এ কথা বলার মানে কি ?

ইন্‌স্পেক্টার রেগে বললে, মানে আবার কি ! কর্তার হুকুম।

এমন হুকুম হবার কারণ কি ?

আর কিছু বলার হুকুম নেই।

জেলের বাইরে তা হলে কিছু হয়েছে নাকি ?

জানি না।

তুমি তো কিছুই জানো না। এ হুকুম কোত্থেকে এসেছে জানো ? রাজধানী থেকে ? না, এখানকার কর্তাদের মর্জি ?

এখানকার কর্তাদের হুকুম।

ইন্‌স্পেক্টার ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো। ভেরা বাধা দিয়ে বললে, শোনো, আমরা এ হুকুম মানতে পারি না।

কেন ?

আমরা মানুষ, কাঠের পুতুল নই। তোমরা আমাদের হাত-পা বেঁধে রেখেছো, নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে দাও না, আমরা কি করে মানবো তোমাদের নিয়ম ?

না মানলে শাস্তি কি জানো ?

হাঁ, পিউনিটিভ সেল তো ? আমরা যাবো। তাই খুলে রাখো তোমরা।

দরকার হলে রাখবো বই কি।

ইন্‌স্পেক্টার অন্য কুঠরীতে চলে গেলো। ক্রমে সবাই শুনলো এ হুকুম। সবার মনেই বিক্ষোভ। এ এদের কারসাজি। উপরওয়ালাদের জানালে প্রতিবিধান হতে পারে। কিন্তু জানাবার উপায় কি ?

আচ্ছা, একটা চিঠি লেখা যাক। এমন ভাষায় রচনা করতে হবে যেন উপরওয়ালাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভেরা লিখলো,—

'মা গো,

তোমার চিঠির জবাব দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটলো জেলে। সব ওলট-পালট হয়ে গেলো। তুমি মন্ত্রী বা ডিরেক্টারকে এসে আমাদের তদন্ত করে যেতে অনুরোধ করো।

—তোমারই ভেরা।'

এক বন্ধু বললে, এ চিঠি তো ওরা পাঠাবে না ভেরা !

দেখা যাক।

কয়েক মিনিট পরে ইন্সপেক্টার এসে হাজির। তোমার এ চিঠি যাবে না। নতুন চিঠি লেখো।

কেন ? কেন যাবে না ? নিশ্চয় যাবে। যাবে না যাবে তা যাদের উপর চিঠি পরীক্ষা করার ভার, তারা বুঝবে।

প্রথমে আমরা দেখবো।

কি দেখবে ?

শুধু নিজের কথাই লিখেছ কিনা। নিয়ম হচ্ছে তাই।

নিয়ম আমি খুব ভালো করে জানি। তোমরা চিঠি পাঠাও।

পারি না। আমি নিয়ম এনে দেখাচ্ছি তোমায়।

ইন্সপেক্টার একটা বই এনে পড়ে শোনালো নিয়ম।

ভেরা চীৎকার করে বললে, গোল্লায় যাক তোমাদের নিয়ম। চিঠি পাঠাতে হবে। উপরওয়ালারা বিচার করবে।

উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করো না। আমি ভদ্রভাবে কথা কইছি। তুমিও ভদ্রতা রক্ষা করে চলো।

ভদ্রতা ! তোমরা গলা টিপে মারবে, আর আমরা একটু জোরে প্রতিবাদও করতে পারবো না তার ? তা হবে অভদ্রতা !

অনর্থক চীৎকার না করে আর একখানা চিঠি লেখো, পাঠাচ্ছি।

আর কোনো চিঠি লিখবো না।

তা হলে আর লিখতেও পাবে না কোন দিন। লেখার সুবিধা কেড়ে নেওয়া হবে।

কেন ? আমি তো কোন অপরাধ করিনি ?

করেছ। তুমি হুকুম মানছো না।

কি হুকুম ?

বলছি চিঠি লেখো।

ও :!

আর চিঠি লিখতে পাবে না কোনো দিন।

ভেরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেলো রাগে। ইন্সপেক্টার ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলো, কী করছো তুমি ? তারপরে চলে গেলো।

ভেরা ভাবলো, এইবার কর্তৃপক্ষের কানে যাবে। সত্যিই গেলো। জোর তদন্ত হল। ইন্সপেক্টার এবং অন্যান্য অনেক কর্মচারী বদলি হল।

সংগে সংগে গুজব শোনা গেলো, রক্ষীরা তক্তা নিয়ে যাচ্ছে উঠানে। ফাঁসিকাঠ তৈরি হচ্ছে বুঝি।

কার জন্য ? নিশ্চয়ই ভেরার জন্য। সবাই মনে মনে ভাবলো, এইবার ভেরাকেও বিদায় নিতে হবে। ভেরাও প্রতীক্ষায় রইলো মৃত্যুর।

৪ঠা মে—সে ফাঁসির মঞ্চে অন্য একজনের ফাঁসি হয়ে গেলো। ভেরা মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে মরতে পারলো না। কিন্তু কোন শাস্তিই কি আসবে না ? কর্তারা কিছুই বলবে না তাকে ? এ কখনও সম্ভব ?

একদিন জেলের কর্তা রক্ষিসহ ভেরার কক্ষে ঢুকলেন।

ভেরা প্রস্তুত হল।—এতোদিন পরে তাহলে শাস্তি দিতে এসেছে !

কর্তা কিন্তু একটা কাগজ বের করে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

'মহামান্য সম্রাট বন্দিনীর মায়ের আবেদনানুযায়ী অনুগ্রহপূর্বক তার কন্যা ভেরা ফিগনারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কমিয়ে কুড়ি বছর করলেন। তদনুযায়ী তার মুক্তি হবে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ সাল।'

কর্তা চলে গেলো। ভেরার কানে কে যেন তরল বহ্নিধারা ঢেলে দিলো ! কেবল ঘুরে ফিরে বাজতে থাক মনে—মায়ের আবেদনানুযায়ী—হায় মা ! এ কী করেছ তুমি ? কন্যার দুঃখ দূর করতে গিয়ে তার জীবনে অপযশের কালিমা লেপন করে দিয়েছ ? একদিন কারাযাত্রী মেয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে না মেয়ের জন্য কোন অনুগ্রহ'ভিক্ষা চাইবে না রুশ সরকারের কাছে ? সে প্রতিজ্ঞা তুমি ভংগ করলে ? এ দুঃখ রাখবার যে ঠাঁই নেই মা ! ভেরা মনে মনে মায়ের উপর বিরক্ত হল।

তারপর এক'দন খবর এলো, মা নেই। স্নেহময়ী কন্যাকে আশীর্বাদ করতে করতে বিদায় নিয়েছেন।

ভেরার জীবন এক পলকে শূন্য হয়ে গেলো—অনন্ত শূন্য। মা নেই। সব শেষ, আজ সব শেষ। সব আশা-আকাংখা আজ সমাধি মায়ের সংগে-সংগে।

মুক্তির দিন। ২১শে সেপ্টেম্বর, ৪টা। ভেরা অন্ধ কবর থেকে সংগীদের কাছে চোখের জলে বিদায় নিয়ে, চললো মুক্তির পথে। তার পা কাঁপছে। দেয়াল যেন ক্রমাগত দূরে স'রে যাচ্ছে, বাইরের মুক্ত আলোর বেরুতে যেন ভয় হচ্ছে তার। কী প্রখর, কী আশ্চর্য, কী নূতন এই আলো। ভেরা এই প্রথম কেঁদে ফেললো জীবনে,—আমি চ'লতে পারছি না। দেয়াল সরে যাচ্ছে।

মূর্ছা যাবার উপক্রম। রক্ষীরা ধরে ফেললো। হঠাৎ মুক্ত হাওয়ায় এসে পড়ার দরুণ এ রকমটা হ'য়েছে।

ভেরা সুস্থ হ'য়ে আবার চ'লতে লাগলো। এই লোহার খাঁচা, এই অন্ধকার, এই জাহান্নম,—এ যে বড় প্রিয় ছিল তার। এ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছে সে? আসন্ন মুক্ত-জীবনের কথা ভাবতে যেন ভয় হ'তে লাগলো তার।

চা পান করবেন ভেরা ফিগনার?

না, ধন্যবাদ!

ভেরা ফিগনার। ভেরা ফিগ্‌নারই বটে। কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছর এ নাম কারু তো মনে পড়েনি তোমাদের? তোমাদের চোখে আমি ছিলুম, ১১ নম্বর। আর আজ? ভেরা ফিগনার! চাই না আমি চা তোমাদের। তোমাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ।

বহু রক্ষিসহ ভেরাকে সে জেল থেকে বের করে রাজধানীতে 'সেণ্ট পিটার এণ্ড পল' জেলে আনা হল।

ভাই-বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দেখা করা ঘরে এসে ব'সেছিল তারা। ভেরা এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে। কারু মুখে কোন কথা নেই, সবাই নীরবে চেয়ে আছে পরস্পরের দিকে।

এই ভাই, এই বোন, কুড়ি বছর আগে যখন সে বিদায় নিয়েছিল এদের কাছ থেকে, তখন এরা কত ছোট, কত তরুণ, কত সুন্দর ছিল!

আর আজ?—সে যুবক নেই, সে বালিকা নেই, সে সৌন্দর্য নেই। সব ভাই বোন আজ পূর্ণবয়স্ক। হয়তো ভেরাকে ভুলে গেছে অনেকে। আজ যেন অপরিচিতদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ভেরা নীরবে চেয়ে রইলো।

কী গভীর, ভাবময়, আবেগসুন্দর সে দৃষ্টি! তার প্রাণের সমস্ত আশীর্বাদ যেন সে উজাড় করে দিল ঐ দৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তার ভাইবোনদের মাথার উপর।

টাইম হ'য়ে গেছে।

যেমন এসেছিল, তেমনি উঠে চ'লে গেলো ভেরা—নীরবে শুষ্ক চোখে।

তার পর রুশ-সরকার একদিন তাকে চালান দিলো সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। লোকালয় থেকে দূরে, বহুদূরে। ভেরা ফিগনার নীরবে বিদায় নিলো।

সেদিনও কেউ তার চোখে এক বিন্দু অশ্রু দেখতে পেলো না!

সাইবেরিয়ায় দশ বছর নির্বাসিতের জীবন কাটিয়ে ভেরা ফিগ্‌নার সোভিয়েট যুগে মুক্তিলাভ করেন।

মুক্তির পরে সোভিয়েট রাশিয়ার নিভৃত পল্লী-নিকুঞ্জে ভেরা ফিগনার তার শেষ জীবন অতিবাহিত করেছেন। এখানে তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা ক'রেছেন।

কয়েক বছর আগে এঁর মৃত্যু হ'য়েছে।

সমাপ্ত

অনুভব

অধীর সরকার

যে-অশ্রুতে কান্নার বান ডাকে
সে-বানের জলে সারা দিন নিজে নিজে
কী মধুর সুখে আনমনে খেলা কর
খেলা কর তুমি কান্নার জলে ভিজে।

যে-যন্ত্রণায় সারা রাত আমি কাঁদি
যে-আগুনে পুড়ে জ্বলি' সারা নিশিদিন,
সে-যন্ত্রণার আগুনে দেখেছি তুমি
কেমনে বাজাও তোমার প্রাণের বীণ।

দুঃখেও তব চোখে জল আসেনাক'
আনন্দে দেখি হওনিক' উতরোল;
বেদনায় তুমি স্তব্ধ নীরব থাক
প্রেমেও কি তবে জাগাবে না কল্লোল?

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

দিন কয়েক পরের এক রবিবারে বাগানের কাজে লেগেছে সুদাম। রবিবারে হসপিটালে তার সকালে ডিউটি নেই, তাই ঐ প্রিয়টি গাছপালাদের বিশেষ ভাবে দেখা-শোনা করে।

সকাল থেকেই আকাশে জমেছে ঘন কালো মেঘের স্তূপ। হু হু করে বইছে জোলো বাতাস। গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে যেন কার চাপা রোষবহ্নি গুমরে উঠছে,—আর তার সঙ্গে ঝিকিমিকি বিজলীর বক্ররেখায় চমকে উঠছে তার কুটিল ভ্রূকুটি। বড় বড় ফোঁটায় চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামলো।

কার বুকচাপা দীর্ঘশ্বাসে হাহাকার করে উঠলো—পূবালী বাতাস। কোন্ বেদনাময়ীর অশান্ত ক্রন্দনরোলে মুখরিত হয়ে উঠলো ধরণীর দিগদিগন্ত? হতাশ চিত্তে হাতের খুরপীটা ফেলে বাগান ছেড়ে সুদাম চলে এলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বারান্দায়।

কার ভারি গলার আওয়াজে থমকে দাঁড়ালো মায়ের ঘরের দরোজার সামনে। একটু মুখটা বাড়িয়ে দেখলো, চেয়ারে পেছন ফিরে বসে আছে অসীম।

ভারি আশ্চর্য্য তো? প্রায় দেড় বছর সে ফিরে এসেছে। একদিনও তো আসেনি কাকা। হঠাৎ আজ? ঘরের ভেতরে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সুদাম অসীমের কথা শুনে।

—চমৎকার! চমৎকার বৌদি! মায়ে-ব্যাটায় মতলব করেছো বেশ জুৎসই। এখনও বোলতে চাও, মিতা ছেলেটাকে ডাষ্টবিন্ থেকে কুড়িয়ে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে?

—ছিঃ! ছিঃ! ঘাড়ে চাপিয়েছে, বলিনিতো আমি ঠাকুরপো! ব্যথিত কণ্ঠে বললেন যমুনা দেবী—সেদিন এখানে আসবার পথে রাস্তায় ছেলেটিকে কুড়িয়ে পেয়ে মিতা সোজা এখানেই এনেছিলো, সে ছেলে মানুষ করতে শেখেনিতো, তাই আমাকে দিয়ে গেছে একটু বড় করে দেবার জন্যে। এতে বিরক্ত হচ্ছ কেন ভাই? কি চমৎকার দেখতে বাচ্ছাটা দেখোনা? একটু শক্ত-সামোথ করে তোমাদের জিনিষ, তোমাদেরই দিয়ে দেব। সোনার চাঁদ ছেলে, তোমাকে বাবা বলে ডাকবে—পাঁচ ছ' বছর বিয়ে হয়েছে একটাও তো হলো না মিতুর। এই খোকনই মা বলে ডাকবে ওকে।

—থাক্। থাক্ ঢের হয়েছে, খেঁকিয়ে উঠলো অসীম। বুঝলে বৌদি, অসীম হালদার কচি খোকাটি নয় যে তাকে আমড়া দেখিয়ে ল্যাংড়া আম বলবে। বাবা আমাকে বোলবে কেন তোমার নাতি? বাপ বোলবে ঐ রাস্কেল সুদামটাকে!

বলো তো একবার, ভেতর ভেতর তলে তলে মিতার কাছে কত দিন আনাগোণা করছে শয়তানটা, ওঃ! এবারে বুঝেছি মিতা দিনরাত অমন ঘরের কোণে শুয়ে বসে থাকতো কেন? আর সেদিনই [illegible] রাত থাকতে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছিলো৷ [illegible] কি জন্যে? কোন দাইকে ঠিক করেছিলো? তুমি যা বলবে খবর আমি ঠিকই পাবো বুঝেছো? তবে তোমার ছেলেই তো ডাক্তার, বাইরের লোক ডেকে জানাজানিটা বোধ হয় হতে দাওনি মনে হচ্ছে। ধূর্ত্তোমিতে তুমি স্বয়ং মহাভারতের শকুনি মামাকেও হার মানাতে পারো, এ সার্টিফিকেট তোমার দেওয়া যায় বৌদি!

—চুপ করো, চুপ করো ঠাকুরপো! কান্না উথলে উঠছে যমুনা দেবীর কণ্ঠস্বরে—অমন মিথ্যে ধারণায় মনকে ভেবো কোরোনা। যা সত্যি তাই বলেছি তোমায়। যা তুমি ভেবেছো মহাভুল, মহাপাপ, মহামিথ্যে।

—হাঃ! হাঃ! হাঃ, হাঃ! অসীমের বিদ্রূপপূর্ণ উৎকট হাসিতে থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো! ঘুমন্ত শিশুটি। ককিয়ে কেঁদে উঠলো বিছানায়।

দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে, বিছানা থেকে খোকাকে তুলে নিয়ে বুকে ফেললো সুদাম। আস্তে আস্তে পিঠ চাপড়ে ওকে শান্ত করলো। তারপর মায়ের কোলে ওকে নামিয়ে দিয়ে কাকার সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ধীর-গম্ভীর স্বরে বললো —আপনি আমার কাকা। পিতৃতুল্য। কোনোদিন আপনার কাজের বা কথার প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আজ আপনিই তা করতে আমায় বাধ্য করিয়েছেন। ইতর ভাষায় আমার মাকে যথেষ্ট অপমান করেছেন, আর একটি বর্ণও উচ্চারণ না করে আপনি চলে যান। যা সত্য তাই বলেছেন আমার মা। বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা।

—চমৎকার! মুখ বিকৃত করে জবাব দিলো অসীম, একেবারে যুধিষ্ঠিরের যুধিষ্ঠির! সত্যিকথার মহাজন। হারামজাদা, বেইমান। আমার শ্বশুরকে ঠকিয়ে বাড়ী আদায় করেছিস, আমার সম্পত্তিতে জবরদস্তি করে ভাগ বসিয়ে, সেই বাড়ীতে বাস করে আমারই সর্ব্বনাশের ফন্দি আঁটছো দিনরাত্তির মায়ে-ব্যাটায়? আবার একটা ভাগীদারকেও খাড়া করেছিস খুদ কুঁড়ো যা আছে তা দখল করবার জন্যে!—দু' হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে লাগলো অসীম।

ঘন ঘন বিদ্যুৎশিখা আকাশের বুক চিরে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো। বজ্রহুঙ্কারে থরথর করে কেঁপে উঠলো বিশ্বচরাচর। কামানের গোলা যেন পর পর দুটো ছিটকে পড়লো মহাশূন্যের গহ্বর থেকে।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিলো সুদাম। অমন কুৎসিত ভাষায় প্রত্যুত্তর মুখে তার জোগাচ্ছে না আর।

ওর মুখের ওপর জ্বলন্ত দৃষ্টিপাত করে স্ফীত বক্ষে দাঁড়িয়েছিলো অসীম ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘের মতো। সুযোগ পেলেই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ের রক্ত চুষে খাবে।

—হো, হো, হো, হো! কার প্রমত্ত হাসির ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলো ওরা দুজন!

দরোজার সামনে ভিজে সপসপে হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে অনিল। ওর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর। যেন বাইরের বৃষ্টিকে ঘরে ডেকে এনেছে ও।

—এক ফোঁটা [illegible] [illegible]। ঐ [illegible]

বুঝলে অসীম হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাসির ধমকে এঁকেবেঁকে উঠছে ওর দেহটা—মিতার ছেলে, ব্যস্, আর ওর কোনো পরিচয় নেই। এবার জ্বলে মরো। শুধু আগুন জ্বালিয়েছো এতদিন, এবারে নিজে জ্বলে-পুড়ে মরো।

ক্রুদ্ধ সাপের উদ্যত ফণায় যেন সুদক্ষ সাপুড়ে বিষহরি শেকড় ছোঁয়ালো। মুখে-চোখে পরিহাসের ছোপ লাগিয়ে ওর কাছে এগিয়ে এসে বললো—তুমি দেখছি একেবারে জাত অভিনেতা। ঠিক ঠিক জায়গায় ভুঁইফোঁড় হয়ে আবির্ভাব তোমার, চমক লাগায় দর্শকদের মনে। এ বড় কম শক্তির পরিচয় নয় হে!

—কতক্ষণ এসেছেন? বললো সুদাম। ভীষণ ভিজে গেছেন যে। ছেড়ে ফেলুন ভিজে কাপড়-জামা। আমি আনছি আমার কাপড়।

—আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত ব্যস্ত কেন? কাল মিতার ভারি মন খারাপ লাগছিলো খোকার জন্যে, তাই সকালেই বেরিয়েছিলাম ওর খবর নিতে। বাস থেকে নেমে এইটুকু পথ আসতে আসতে ভিজে গেলাম।

—হ্যাঁ, কি বলছিলে অসীম? অভিনেতা? ভুল হল বন্ধু! অভিনেতা নয়, ওঝা। সাপের গন্ধ পেলেই যে ওঝাকে দৌড়তে হয়। তা মিতার খোকাটিকে কেমন দেখলে, বলো?

—দেখলাম মানে? চোখ পিট পিট করে জবাব দিলো অসীম —নিয়ে যাবো। মিতার খোকা এখানে মানুষ হবে কোন্ দুঃখে? তার বাড়ী-ঘর নেই, না আমার পয়সা নেই আয়া রাখবার। দাও বৌদি ওকে আমার কোলে—বাইরে গাড়ী আছে, নিয়ে যাবো। যতটা মন্দ ভাবছো আমায়, ততটা নই, হৃদয় নামক পদার্থটা আমারও আছে।

—সত্যি নিয়ে যাবে ঠাকুরপো? আঃ, বাঁচলুম! তোমাদের জিনিষ তোমাদের কাছেই যাবে বৈ কি। আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যমুনা দেবী—দে রে দামী, খোকার জিনিষগুলো গাড়ীতে তুলে—বাড়ী যাবে আলোক বাবু।

আশ্চর্য্য হয়েছিলো অনিলও খুব। অবাক হয়ে দেখছিলো হঠাৎ বদলে-যাওয়া মানুষটার মুখখানা এখন কি শান্ত, কোমল। চোখে-মুখে স্নেহসিক্ত হাসি। খুশি হয়ে বললো সে সুদামকে—দাও তো একখানা ধুতি আর তোয়ালে চট করে? খোকন বাবুর জিনিষপত্তর আমিই তুলে দিচ্ছি গাড়ীতে।

স্থির দৃষ্টি মেলে দেখলো সুদাম অসীমের মুখখানা। যেন কোন অলিখিত রহস্য পাঠ করলো ওর চোখ দুটোতে। তার পর বললো —আজ খোকা যাবে না মা! যার গচ্ছিত জিনিষ তুমি হাত পেতে নিয়েছো, তুলে দিও তারই হাতে।

—বেশ, বেশ, তাই হবে। মিতাই আসবে ওকে নিতে। আচ্ছা আজ চলি। মশ মশ করে জুতো বাজিয়ে নিচে নেমে গেলো অসীম।

পরদিনই বিকেলে এলো সুমিতা অসীমের গাড়ীতে, সঙ্গে ওর একজন নেপালী আয়া।

—খোকনকে নিতে এলাম কাকীমা! যমুনা দেবীর গলা জড়িয়ে ধরে হাসিমুখে বললো সুমিতা, জানেন! কাকীমা, আপনার দেওরের বড্ড ভালো লেগেছে ওকে—তিনিই আয়া ঠিক করে আমাকে জোর [illegible] দিয়েছেন, খোকাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

—বেশ তো। ছেলেপুলে হয়নি, ইচ্ছেও তো করে। আমার ভারি ভয় হয়েছিলো হয়তো কত রাগারাগি করবে ঠাকুরপো, ওকে যখন তুই নিয়ে যাবার কথা বলবি। তা ও নিজেই যখন নিয়ে যেতে চাইছে, মনে হয় পদ্মফুলের মত ছেলেটার ওপর ওর মায়া পড়েছে! ভালোই হবে রে মিতু। এই রকম স্নেহ-মমতা মনে জাগলে মানুষের রুক্ষ ভাব চলে গিয়ে মন খুব কোমল হয়। ঠাকুরপোরও তাই হবে।

গত কালের অযথা ইঙ্গিতপূর্ণ অসীমের কথাবার্ত্তাগুলো ভুলে গেলেন যমুনা দেবী সুমিতার কাছে। আহা বেচারী, শুনলে বড় আঘাত পাবে মনে।

আলোককে কোলে নিয়ে খুশি উপচে-পড়া কণ্ঠে বললো সুমিতা— এই ক'টা দিনেই কত বড় হয়ে গেছে খোকন, আরো সুন্দর হয়েছে। ওকে নিয়ে গেলে আপনার মনটা খুব খারাপ লাগবে না কাকিমা?

—তা একটু লাগবে বৈ কি? অনেক কাল বাদে ওকে পেয়েছিলাম কি না। শুধু আমার কেন যতক্ষণ বাড়ী থাকে তোর দামীদা', ওকে নিয়েই থাকে। একটা বিয়ে-থাও যদি করতো, কচি-কাচা ঘরে আসতো দু-একটা। কিন্তু তা আর হলো কই?

—কেন হবে না কাকীমা! খুব ভালো দেখে একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিন না দামীদা'র। আপনাকেও দেখাশোনা করতে পারবে বউ এলে।

—চেষ্টা কি করিনি রে। করেছিলাম কিন্তু ফল হয়নি। বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন সুদাম-জননী। তারপর ব্যস্ত হয়ে বললেন, একটু বসবি তো। দামী এখনও ফেরেনি, ফিরতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। রাতে একেবারে খেয়েই যাবি—তবে ঠাকুরপো আবার রাগ করবে না তো।

—না, না কাকীমা। মেজাজ এখন খুব ভালো আছে, আমি রাতে খেয়েই যাবো।

যমুনা দেবী গেলেন রান্নাঘরে। খোকনকে আয়ার কোলে দিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে মেঘলা দিনের কলাপী ছন্দে ছুটে নেমে গেলো বাগানের দিকে সুমিতা।

সূর্য্যাস্তের রঙিন আলো ঝিল মিল্ করছে ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দুলে দুলে ফুলে ভরা লতাগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে।

যুঁই, চামেলী লতার ঝাড়ে কে যেন মুঠো মুঠো শাদা খৈ ছিটিয়ে দিয়েছে! ওর সঙ্গে মিতালী করেছে বেগুনি রং ব্যাগনভেলিয়া। ওরা চাইছে দু জন, দু জনাকে। ব্যাকুল বাহু ওদের দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পরস্পরকে পাবার জন্যে। কিন্তু নাগাল পায় না কেউ কারুর। ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে ওরা ব্যর্থ বেদনা বুকে নিয়ে। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে ওদের পানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো সুমিতা। অজস্র ফুলের রাশ বিছিয়ে রয়েছে ওর পায়ের কাছে। এক মুঠো যুঁই তুলে নিলো হাতে। ঝরে গেছে তবুও অপূর্ব্ব সুরভিটুকু উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে বিদায়বেলায়।

কত নরম, কত ক্ষুদ্র, কি অল্পায়ু এই ফুলগুলো, কিন্তু কি মহাসুরভি ভরা এই ছোট্ট জীবনটুকু! ক্ষণিকের জীবন, তবুও তো ব্যর্থ নয়!

আহা, আমিও যদি পারতাম ওদের মতো নিজেকে উজাড়

ঝরে দিতে কোনো মহান কাজে। আমার এই ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর জীবনটা যদি এই ফুলের মতোই পারতো জগৎকে কিছু দিয়ে যেতে। অঞ্জলিভরা ফুলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে সুমিতা।

একপা, একপা, করে ধীর পায়ে দাঁড়ালো গিয়ে গোলাপ গাছের পাশে। রক্ত-লাল ছোট-ছোট গোলাপ কুঁড়ির পাশেই,—ফুটন্ত গোলাপ মনোহর রূপে, গন্ধে ঝলমল করছে। আর ঠিক তারি পাশে ঝরা গোলাপ দু'তিনটি। ঝুর, ঝর, করে হাওয়ার দোলা লেগে ঝরে পড়ছে ওদের পাপড়িগুলো। প্রতিটি শ্বাসে শ্বাসে ওরা ঢেলে দিচ্ছে মধুর গন্ধ বাতাসে।

এই তো জীবন। ক্ষণিকের চাওয়া-পাওয়াটাই সত্যি নয়; ত্যাগের ওপরের সত্য জনকল্যাণে, বিশ্বযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেওয়া।

বিভোর হয়ে গেছে সুমিতা কোন এক মহাভাবে। ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতর যেন সে আর বদ্ধ নেই। অনন্ত মহাকাশে ছড়িয়ে গেছে তার ক্ষুদ্র জীবনের সত্তাটুকু। হু-হু করে বইছে বন্ধনহীন উদার বাতাস, ওর সমস্ত মনটা যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ঐ মহাবায়ু।

মহাজীবনের মাঝে যেন ঘটেছে তার আত্মবিলোপ। তাই আকাশে, বাতাসে, ফলে ফুলে, অনন্ত সৃষ্টির মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে সে। একাকার হয়ে গেছে সবার সঙ্গে, আলাদা কিছুই নয়, একটি প্রাণের সূতোয় যেন অনন্ত বিশ্বচরাচর গাঁথা রয়েছে। সেই মহাসত্যের প্রত্যক্ষ অনুভবটি পাওয়াই বোধ হয় চরম পাওয়া।

নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করে কখন চলে গেছেন সূর্য্যদেব। সন্ধ্যার ম্লান আঁধার চুপি চুপি এসে ছেয়ে ফেলেছে ছোট্ট বাগানটিকে। দিনের আলোর শেষ হাসিটুকু এখনও মুছে যায়নি আকাশপট থেকে। শিমুলগাছের ঘন পল্লবের ভাঁজে-ভাঁজে ঘরে-ফেরা পাখীদের আনন্দ-কাকলী ধ্বনিত হচ্ছে। একটা কাঠবেড়ালী সর-সর করে সুমিতার পায়ের ওপর লাফিয়ে ছুটে চলে গেলো পাঁচিলের ওপারে।

চমকে উঠে চারিদিকে চাইলো সুমিতা। একটু দূরে চাঁপা গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুদাম।

—বাঃ। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো দামীদা'? আমায় ডাকোনি কেন? ওর সামনে এগিয়ে এসে মৃদুকণ্ঠে বললো সুমিতা।

—অনেকক্ষণ এসেছি মিতা। তুমি যে অঞ্জলিভরা ফুল নিয়ে ধ্যানমগ্ন ছিলে, তাই ডাকিনি তোমায়। কোন দেবতার আরাধনা করছিলে মিতু?

শুনবে দামীদা'? আমার আলোকের মতো শত শত শিশুভগবানের পুজো করছিলাম আমি মনে-মনে। আমি যেন দেখছিলাম,—ঐ লালকুঠির প্রকাণ্ড দরোজা-জানলাগুলো সব খুলে গেছে। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, পাখী ডাকছে। আর ঘরে বারান্দায়, বাগানে খেলা করছে ফুলের মত কচি কচি ছেলে-মেয়ের দল। আর আমি ওদের সেবার ভেতর দিয়ে পুজো করছি সেই শিশুদেবতার।

—চমৎকার। এ কি অপূর্ব্ব সাধনার তৃষ্ণা তোমার মনে জেগেছে মিতা? পারবে, তুমিই পারবে এমন পুজো করতে—সেদিন আমাকেও দিও একটু অধিকার তোমার সঙ্গে ঐ মহাপূজায় যোগ দেবার।

—একি কথা বললে দামীদা'? অধিকার তোমায় দেব আমি? যদি কোন দিন আমার এ স্বপ্ন সফল হয়, সেদিন এ পুজোর পুরোহিত তো তোমাকেই হতে হবে। তুমিই আমাকে শেখাবে ঐ সাধনার মন্ত্র। আমি যে কিছুই জানি না,—তুমিই হাত ধরে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। গভীর বেদনাভরা কণ্ঠে বললো সুমিতা— আমার আর কে আছে বলো দামীদা'। সকলেই চেয়েছে নিজের স্বার্থ; কেউ চায়নি আমায়। কারুর কাছেই আমি পাইনি কিছু, শুধু একমাত্র তোমার কাছেই পেয়েছি দামীদা'। তোমার দানেই আমার জীবন ভরে আছে; সেখানে কিছুমাত্র ফাঁকি নেই। তাই সেই শিশুকাল থেকে আমি তোমার ওপরই শিখেছি নির্ভর করতে ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা সব আমার ঐ একটি জায়গাতেই ঝরে পড়ছে সে যে আর কোনো ঠাঁই পায়নি দামীদা?'

—মিতা। ধরাগলায় ডাকলো সুদাম।

—বলতে দাও, আমায় দামীদা'। জীবনের এই পরম চাওয়া আর হয়তো পাবো না আমি। আজ এই মহাকাশের তলায় দাঁড়িয়ে মনের গহন অন্ধকারে হঠাৎ আমি দিব্যজ্যোতির দর্শন পেয়েছি। কত মিথ্যে আমাদের এই বাইরের নাম, রূপ, সম্বন্ধ। সবার ওপরে আছে যে মহাসত্য,—তাকে উপলব্ধি করতে হলে, আগে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা চাই।

তাই আজ নতুন করে বুঝলাম, সেই পরম-করুণাময় যে আমায় দুঃখ দিয়েছেন, আমার জীবন রিক্ত, শূন্য করেছেন,—তা আমার মঙ্গলের জন্যেই। ছোট্ট খেলাঘর আমার ভেঙে দিয়ে তাঁর বিরাট বিশ্বখেলাঘরে যেন তিনি হাত বাড়িয়ে ডাকছেন আমায় দামীদা।'

স্তব্ধ-বিস্ময়ে ওর কথাগুলো শুনছিলো সুদাম। দুহাতের বদ্ধ অঞ্জলিতে ফুল নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমিতা। দুটি চোখের দৃষ্টি তার সুদূর মহাকাশে নিবদ্ধ। যেন অচঞ্চল, উজ্জ্বল দুটি আরতিপ্রদীপ জ্বলছে অনন্তদেবের উদ্দেশে।

—তোমার এই মহৎ সঙ্কল্প সার্থক হোক মিতা। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার সফলতা কামনা করছি। সুগভীর কণ্ঠে বললো সুদাম। চরম দুঃখের তুমি যে পরম কল্যাণময় রূপটির দর্শন পেয়েছো, ঐখানেই জীবনের সার্থকতা লাভ করেছো তুমি।

তোমার ঐ আলোর মতো, কত আলো যে অকালে নিবে যায় কে তার সন্ধান রাখে মিতা? হাসপাতালে প্রতিদিনই দেখতে পাবে মাতৃহীন অনাথ শিশুদের। রাস্তায় ফুটপাথে, বস্তিতে, আবর্জ্জনায়, এমনিধারা কত ফুল, ফোটবার আগেই ঝরে যায়, একটু স্নেহ-যত্নের অভাবে। এদের তুমি মাতৃস্নেহে বাঁচিয়ে তোলো মিতু। কিন্তু এ কাজের জন্যে যে চাই প্রচুর টাকা, অনেক ধৈর্য্য আর পরিশ্রম। তার ওপরে চাই তোমার ব্যক্তিস্বাধীনতা। কাকা কি রাজি হবেন লালকুঠিতে এ কাজ করতে দিতে?

—বোধ হয় রাজি করাতে পারবো দামীদা'। কেন বলছি শোন—আমাকে কাল বলছিলেন—ছেলে চাই তো আমাকে বলোনি কেন? ঐ রকম কত ছেলে রাস্তায় ঘাটে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা কেন? একগোটা এনে দিচ্ছি। এই সব অনাথ শিশুদের নিয়ে তুমি একটা আশ্রম তৈরী করতে পারো। লালকুঠিটা বিক্রি করলে প্রচুর টাকা পাবে। তা ছাড়া সোনা রূপো, মূল্যবান অন্যান্য আসবাব বেচলেও অনেক টাকা আসবে, ঐ দিয়ে ছোটোখাটো বাড়ী কিনে আশ্রম করা যাবে।

—কিন্তু [illegible]

তোমাকে বলছি, আর কেউ জানে না বাবা ছাড়া—আমার ঠাকুমার আর বাবার ঠাকুমায়ের প্রচুর গহনা আছে। দেওয়ালের ভেতর খাঁজ কেটে তার ভেতর সব রেখে এমন ভাবে বন্ধ করা আছে যে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। আরো আছে সোনার ইট অনেকগুলো, এসব বাবা আমায় গোপনে দেখিয়ে গেছেন। বাবাই বলেছিলেন, নিজের ব্যবহারের জন্য এতে হাত দিও না। জনকল্যাণে উৎসর্গ কোরো, তাঁর ঠাকুরমা এই আদেশ দিয়ে গেছেন তাঁকে। তোমার কাকা জানলে লুঠ করে নিতেন। আমার শোবার ঘরে খাটের পাশে দেয়ালে যে প্রকাণ্ড আয়নাটা ঝুলছে তারি পেছনের দেয়ালে আছে এ সব। আরো কিছু দিন যাক, তুমি আর অনিরুদ্ধদা', ওগুলো বিক্রি করে টাকার যোগাড় করে নিও। তারপর আমার বাচ্ছাদের খুঁজে তুমি আনবে দামীদা। তুমিই লালকুঠি সাজাবে তাদের জন্যে মনের মত করে। আর আমাকে রাখবে তোমার পাশে, তোমার সঙ্গে আমিও কাজ করবো। ছোট মাসী আর দাদা থাকবে, দিদিমা, আর কাকীমা থাকবেন, সকলে মিলে আমরা গড়ে তুলবো শিশুনারায়ণের মন্দিরটা। তখন কিন্তু ঐ লালকুঠি নামটা বদলে খুব ভালো একটা নাম দিতে হবে দামীদা'।

—বাঃ। এই তো সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো মিতু! কমলা সেবাসদনের উদ্বোধন হবে, সামনের বৈশাখী পূর্ণিমায়—মাঝে তো মাত্র মাস দেড়েক সময়, কাকাবাবুকে জানিয়েছি, গুরুদেবকে নিয়ে তিনি আসবেন।

—ব্যস—তার পরেই লেগে যাবো, তোমার নারায়ণের মন্দিরের কাজে। নাম? হ্যাঁ নাম তো ওর তুমিই ঠিক করে রেখেছো মিতু!

—আমি ঠিক করেছি? কবে দামীদা'? কি নাম? বিস্ময়ভরা চোখ দুটি তুলে শুধালো সুস্মিতা।

—সেই যে, সেদিন বলছিলে তুমি মিতা—

—প্রায়ই স্বপ্নে দেখি এক ভীষণ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছি আমি, দূরে দেখি অস্পষ্ট বাতিঘরটা, তার উজ্জ্বল আলোর দিকে প্রাণপণ সাঁতার দিয়ে যেতে চাই কিন্তু সে যেন ক্রমেই দূরে সরে যায়, আমি ঐ বাতিঘরটায় কিছুতেই যেতে পারি না দামীদা'। কি রহস্যময় স্বপ্ন!

—রহস্য নয় মিতু! ঐ বাতিঘর সত্যিই তোমায় ডাকছে। কত হাজার হাজার প্রাণ ঐ ভয়াবহ সমুদ্রে যখন অসহায় ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে, বাতিঘর থেকে তখনই সবাই যায় তাদের মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্যে। বাতিঘরের ঐ উজ্জ্বল আলো মহা দুর্য্যোগের প্রলয় অন্ধকারে হতাশ মানুষের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। সেই রকমই এই সংসার-সমুদ্রে অকালে প্রাণ হারায় যে শিশুরা, তাদেরই জীবন রক্ষা করবার জন্যে তুমি যে মন্দির স্থাপনা করবে মিতু! তার নাম থাকবে "বাতিঘর"।

—দামীদা'। সত্যিই আমি বাতিঘরে পৌঁছুতে পারবো? ব্যাকুলকণ্ঠে শুধালো সুস্মিতা।

—পারবে বৈ কি মিতু! আলোর তীর্থ যে তোমারই জন্যে। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জবাব দিলো সুদাম।

—আমার আলোর দেশের দিশারী তুমিই দামীদা,' তাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, অনন্ত ভালোবাসা আমি তোমাকেই নিবেদন করলাম। হেঁট হয়ে অঞ্জলিভরা ফুলগুলো সুদামের পায়ের ওপর ঢেলে দিয়ে ওকে প্রণাম করলো সুস্মিতা।

চিত্তসায়রে জেগেছে এ কি অদ্ভুত আলোড়ন? মহাপুলক আর বেদনার ঊর্ম্মিমালা উত্তাল তরঙ্গে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে সুদামের বুকের ভেতর। ওরা সকল মিথ্যা সংস্কারের বাঁধ ভেঙে চুরমার করে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ক্ষুদ্র লাভ-ক্ষতির ধূলোমাটিকে।

মহাকাশ যেন নেমে এসেছে মহাসাগরের বুকে। এক রং এক রূপের মাঝে বিলোপ হয়ে গেছে দুই-এর সত্তা। শুধু জেগে আছে এক মহাসত্যের প্রত্যক্ষ অবিনশ্বর অনুভূতি। আর সেই অনুভূতি, অজস্র আনন্দধারা ঝর-ঝর করে সুদামের দুটি চোখ বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো সুস্মিতার মাথার ওপর।

লালকুঠি আলো করেছে সুস্মিতার আলোককুমার। ঘুমন্ত প্রাসাদের বুকে যেন হঠাৎ প্রাণচাঞ্চল্য জেগেছে! রুক্ষ পাষাণের বুকে যেন সহসা ঝাঁপিয়ে পড়েছে কলনাদিনী ঝর্ণার সহস্রধারা।

কোন ফাঁক দিয়ে দিনরাতগুলো হু হু করে পালিয়ে যাচ্ছে, আজ কাল জানতেই পারে না সুস্মিতা।

—আর এই কিছুদিন আগের সময়গুলো কি বিষম পাষাণ-ভার নিয়ে চেপে বসতো ওর বুকে—পল, অনুপল, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা সবগুলো ওর বুকে দাগ কেটে কেটে তার পর যেত একটা দিন—আসতো সেই অসহ্য রাত্রি। সেই ঘুটঘুটে কালো ভুতুড়ে রাতটা তার ঝুলির মুখটা খুলে, মুঠো মুঠো ঘুম বার করে ছড়িয়ে দিতো সব মানুষের চোখে। আর ওর চোখে নিক্ষেপ করতো কোন এক জ্বালাময়ী চূর্ণ। উঃ কি অসহ্য জ্বালা তার? সারা রাত ধরে চোখের জল ঝরিয়েও নেবানো যেত না সেই দুঃসহ জ্বালাকে। যদিই বা ঘুমের ছিটেফোঁটা কখনও লাগতো চোখ দুটোতে ওর, অমনি ঐ ডিংসুটে রাতটা ওর স্বপ্নের জালে আটকে দিতো কত রকমারী বিভীষিকার ছবি। সভয়ে ঘুমটা পালাতো ওর দু চোখ ছেড়ে, তাই প্রাণটা ছটফট করে উঠতো ওর, কখন পোয়াবে গো এ অজগর রাতটা! কখন ফুটবে ভোরের আলো। আবার নিঃসঙ্গ দিনের ব্যর্থ মুহূর্ত্তগুলো যখন পাথরের সমাধি রচনা করতো ওর ওপর তখন আবার-অবসাদ ভারাক্রান্ত মনটা বলতো—দিন যে আমার কাটে না গো!

সেই দিন-রাতগুলো কেমন করে এমন সুধাময় হয়ে উঠলো? আলো হাসে, কাঁদে, হাত-পা নেড়ে খেলা করে অপলক চোখে পাশে বসে দেখে মিতা। হাতে থাকে কাঁটা উল, বোনে খোকনের জাম্পার। নিজের হাতে ওকে খাওয়ায়, স্নান করায়। পাউডার মাখিয়ে, দশ বার ওর জামা পাল্টে, দু-চোখ ভরে দেখে-দেখে আশ আর মেটে না মিতার। চাকররা এসে ভিড় করে দাঁড়ায় খোকনের কাছে, সবার মুখে সন্তোষের হাসি। বুড়ো ভজন সিং থপ থপ করে লাঠি ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে সেদিন এসেছিলো ওপরে ওকে দেখবার জন্য। দু হাতে ওকে তুলে নিয়ে ওর সে কি নাচন!

—মেরে লাল। মেরে গোপাল, মেরে যশোদা মাঈকি দুলাল। আকাশের চাঁদ, সোনেকা চিড়িয়া।

হেসে লুটিয়ে পড়েছিলো সুমিতা ওর নাচ দেখে—ভাগ্যিস খোকন এসেছিল, তাই তোমার নাচ দেখতে পেলাম ভজনদা। তুমি যে এত ভালো নাচতে জানো, তা তো আগে জানতে পারিনি ?

—এ নাচ তো নাচই নয় রে দিদি! নাচবো সেই দিন, যেদিন আমার রাজাবাবু হাত্তি চড়ে বৌ আনতে যাবে, তার সাথে জরির হাইলেণ্ডার পোষাক পরিয়ে নাচতে নাচতে যাবে এই বুড়ো ভালুকটা। সোবাই এ বাথ বলবে, এইস্যা নাচ কভি নেহি দেখা। ঘুরে ঘুরে থপথপিয়ে নেচে বললো রামভজন সিং।

—ওরে বাপ রে, উচ্চরোলে হেসে উঠে বললো সুমিতা—অতদিন তুমি এখনও বেঁচে থাকবে ভজনদা'? নাচ দেখাবার জন্যে ?

—কেনে রে দিদি? কটা দিন? তোর দাদুর বিয়ে এই তো সেদিনের কথা, চোখ মুদলে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাই—হামার লালাবাবুর সাদি ওমনি দেখতে দেখতে হোয়ে যাবে।

সুমিতার অমন উচ্চরোলের হাসি শোনেনি অসীম এর আগে। তাই কৌতূহলী হয়ে সে-ও এসেছিল সুমিতার ঘরে। ওকে দেখে ঘর ছেড়ে চলে গেলো সকলে।

খোকাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে ঘরের এক পাশে, বসে হাঁফাতে লাগলো রামভজন।

অসীম এসে দাঁড়ালো খোকনের খাটের পাশে হেঁট হয়ে দেখলো খোকনকে।

স্নেহে আনন্দে ছলছল করছে সুমিতার অন্তরটা। সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে সহাস্যে বললো সে—কেমন দেখছো? দিনে, দিনে খোকন আরো সুন্দর হয়ে উঠছে, তাই না ?

—তা তো হবেই। শ্লেষভরা কণ্ঠে জবাব দিলো অসীম, মা, বাপ, কারুর চেহারা তো মন্দ নয়। ওই বা না হবে কেন ?

ওর বিষ ছড়ানো কথাগুলোর অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে বিস্ময়ভরা চোখ-দুটি তুলে চাইলো সুমিতা ওর মুখের দিকে।

দুই চক্ষু মুদিত করে অসীমের কথাগুলো শুনছিলো রামভজন সিং। কালো কোঁচকানো মুখখানা ওর আরো কুঁচকে গেলো। ঝলে পড়া তুলোর মত শাদা ভুরু দুটো টান করে তুলে ধরে কোটরগত চোখ-দুটোকে অসীমের চোখের ওপর বিস্ফারিত করে দিয়ে শুধালো সে—ই, লাল বাবুর মা বাপকে আপ দেখিয়েছে জামাই সাব? এ বাচ্ছিকা বাপ কৌন হ্যায় ?

বৃদ্ধের চোখে কোটর থেকে যেন দুটো সার্চলাইটের তীব্র শিখা ঠিকরে এসে পড়লো অসীমের চোখের ওপর।

গর্জ্জন করে উঠলো বল্লমের খোঁচাখাওয়া বাঘ।—শালা বান্দা, সে খবরে তোর কি দরকার? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ? জুতিয়ে মুখ থেঁতো করে দেব। মনিবের সঙ্গে বাত চিত করতে শেখোনি উল্লুক কাঁহাকা ?

—ভজনদা'! আর্ত্তকণ্ঠে ডাকলো সুমিতা। তুমি নিচে যাও ভজনদা'।

—যাচ্ছি দিদিভাই! লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ভজন সিং। তারপর বুক বাজিয়ে একটা হুঙ্কার দিয়ে বললো—জামাই সাব!

—আপকো বান্দা হামি না আছে জামাই সাব। আপনাকো একটুকরা রোটি খাইনি হামি। এ হাত কভি আপকো পাশ ভিখ

মাঙ্গে নি। মহারাজা রামনাথ ত্রিবেদীর বান্দা আমি—কুমার ইন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, কুমার সোমনাথ ত্রিবেদীর বান্দা আমি জামাই সাব। উঁাদের পায়ের কুর্ত্তা আমি। এঁদের ছাড়া এ ছুনিয়ার আউর কোনো মরদকে পরোয়া করে না এ বান্দা! আর কারুর কাছে শির নামায় না। আপকো নকরি হামি করি না জামাই সাব। মহারাজার বান্দা হামি; আপনার নই।

—দারুণ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিলো বুড়ো। সুমিতা ছুটে গিয়ে ওর হাত ছুটো জড়িয়ে ধরে কান্নাভরা গলায় বললো—জানি ভজনদা' সে কথা জানি আমি, তুমি বান্দা নও, তুমি যে আমার দাদাভাই, তোমার মর্য্যাদাহানি হলো আমার জন্তে আজ। ক্ষমা করো ভজনদা' ক্ষমা করো।

—ঢের হয়েছে ন্যাকামি। থাক। খেঁকিয়ে উঠলো অসীম,—চাকরের গলা জড়িয়ে দাদাভাই! দাদাভাই! ইতর কোথাকার।

—দিদিভাই! কাঁপাগলায় বললো রামভজন, যা ভাই রাজাবাবু কানছে কোলে নে। এ বুড়ো অনেক দাগা পেয়েছে—ও ছুটো কথায় আর কিছু হবে না।

মিতার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে একবার ওর মুখখানা বুকে চেপে ধরে, বুকভাঙা একটা নিঃশ্বাস ফেললো বুড়ো। তারপর ঠুক ঠুক করে লাঠির শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

চোখের জল মুছে খোকনকে কোলে তুলে নিলো সুমিতা। অসীম কপালের ঘাম মুছে একটা সিগারেট ধরালো।

—হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ শুনে চমকে উঠলো সুমিতা। একটা কোনো ভারি জিনিষ যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেলো।

কি হোল? কি হোল? মৃদু চীৎকার করে আলোককে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চললো সুমিতা।

সিগারেটটা আরাম করে টানতে টানতে অসীমও মহা বিরক্তি নিয়ে নামতে লাগলো ওর পেছন পেছন।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় স্থবির দেহটাকে সামলাতে পারেনি রামভজন সিং। গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে একেবারে সিঁড়ির তলায় ব্রোঞ্জের ষ্ট্যাচুটার ওপর। ষ্ট্যাচুর একটা কোণের ওপর সজোরে পড়েছে মাথাটা—রক্তের ধারায় লাল হয়ে উঠেছে সৈনিকের পা ছুটো।

—উঃ মা গো, একি হল? কেঁদে উঠলো সুমিতা, ভজনদা।' ও ভজনদা'! ব্যাকুল হয়ে ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো সুমিতা।

—কেঁদে লাভ কি? বিরক্ত হয়ে বললো অসীম, চাকরদের পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর মাথায় জল ঢালুক, ঠিক হয়ে যাবে। পাকা ঝানু হাড়, সহজে কিছু হয় না ওদের। যত্তো সব বাজে ঝামেলা।

—ডাক্তারকে একবার ফোন কর না—কোনো সাড়া—শব্দ নেই যে! ব্যাকুল ভাবে বললো সুমিতা।

—তাই করছি। কপালে আছে অর্দ্ধদণ্ড খণ্ডাবে কে? বাইরে চলে গেলো অসীম। টেলিফোন আছে ওর নিজের শোবার ঘরে।

চাকররা এলো। জল, বরফ, পাখা, তারপর ডাক্তারও এলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হার্টফেল করেছিলো ও।

অপমানের গুলী খেয়ে বীর সৈনিকের মতো, সৈনিকের প্রতিমূর্ত্তির পায়ের তলায় প্রাণত্যাগ করলো লালকুঠির পরম বিশ্বস্ত চিরঅনুগত শেষ ভৃত্য রামভজন সিং।

বুকভাঙা কান্নার সঙ্গে ওকে বিদায় দেবার সময় দেখলো সুমিতা, সিঁড়ির ছু'ধারের ছু'টি নীরব সৈনিককে। ওরা যেন, ওর আবাল্য সাথী, ছায়ার মত নিত্যসঙ্গী, গভীর স্নেহ-মমতার আকর, প্রপিতামহর শেষ অনুচর রামভজন সিংকে ঈষৎ নত হয়ে কপালের কাছে হাত টান্ করে তুলে স্যালুট করে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছে।

[ক্রমশঃ।

বেদনা

বকুল বসু

আমার আকাশে আজি মেঘ—
প্রেরণার সব বেগ
রুধিয়াছে হৃদয়-পাথরে,
বিলয়ের পথে আপনারে
হারায়ু আমি আপন উদ্দেশে
অজানার দেশে

ওগো হৃদয়!
তোমার অগণিত সঞ্চয়
তীব্র বেদনায় হেথা
হারায়েছে ভাষা, হারায়েছে কথা,
প্রাণ হ'য়ে আছে লীন,
যাহা ছিল সব হ'য়েছে বিলীন।
পথহীন প্রান্তরে আজি
শুষ্ক ফুলে সাজায়েছি সাজি।

বাঁচার অতীত তীরে
যত বার যাই ধীরে ধীরে
কত আশা-খেয়া আসি ভিড়ে
নয়ন অশ্রুধারে।
স্মৃতির অনলে হায়
এ প্রাণ দগ্ধ হ'য়ে যায়।
এ নিরালা সাঁঝে
কেবল জমাট আঁধার জমায়ে আছে।

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

অষ্টম স্তবক

১। ধীরে ধীরে অন্তর্ধান ঘটল শ্রীকৃষ্ণের কৌমার-লীলার, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যুত্তম পারিপাট্যের বিস্তার-মুখে প্রকট হল তাঁর পৌগণ্ড-লীলা। উড্ডমর গণ্ডের শিখরে টল্‌টল্‌ করে উঠল মন্দহাসির ঢেউ।

শ্রীকৃষ্ণ ভুলে গেলেন ধুলোখেলা, মেতে উঠলেন কন্দুক-খেলায়। ভ্রমর বসলে যে ফুল ফোটে সেই ফুলের মঞ্জরী হল তাঁর খেলার গোলা। আর তাঁর আনন্দঘনরস-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল সকলের এবং তারি কৃপায় যেন উৎসবে মেতে উঠলেন ধরণী। বছর ঘুরতেই শ্রীকৃষ্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে দিলেন অমলপ্রাণ সহচরদের নিয়ে তাঁর বাছুর চরাণোর উৎসব; এবং তার বদলে বিস্তার করলেন ধেনুপালন-লীলাবলীর লাবণ্য।

২। কৈশোরের প্রাক্‌ভাবের মতই পৌগণ্ডেও শ্রীকৃষ্ণের ধীরে ধীরে বিরল হয়ে এল তরলতা। তাঁর চলন দেখে মনে হল শ্রীচরণ দুটি যেন এই আরম্ভ করেছেন গাম্ভীর্য্যের স্বাধ্যায়। শৈশবকলা-স্বরূপিণী সহচরীর বিরহে হঠাৎ ম্লানমুখী হয়ে পড়ল লোমলতিকা।

"কোথায় গেল এঁর বাল্যচাপল্য?"···ভাবতে ভাবতে সুহৃদ-বিচ্ছেদেই যেন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল কটিদেশ। "কোথায় গেল এঁর শৈশব-তারল্য?"···খুঁজতে খুঁজতে যেন চাপল্য অভ্যাস করতে লেগে গেল যুগল চোখ। এবং সুকবির কাব্যের মত তাঁর বাক্যে রহিত হয়ে গেল অস্থান-পদপ্রয়োগ ও পদৈকদেশ-দোষ।

দেখতে দেখতে অপূর্ব সুন্দর হয়ে ফুটে উঠল শ্রীকৃষ্ণের দেহ-কুসুম। বসন্তের দিনে নবীন তমাল-গুঁড়ির গাঁটে গাঁটে সৌন্দর্য্যে ফেটে পড়ে যে নবাঙ্কুর তার সৌন্দর্য্যকেও হার মানিয়ে দিল এই রূপের ফুল। প্রতি-প্রত্যঙ্গে তরঙ্গ তুলল এর রঙ্গিণী মাধুরী। যেন এই ফুল তার অন্তরের মকরন্দ আর পরাগ নিয়ে পেতে চায় ভ্রমরের ভালবাসা, অথচ মুকুল-বিধায় সে কিছু সাবধানী। রূপের-ফুল···না জানি কেমন করে আবার রূপের ফল হয়ে দাঁড়াল শ্যামলতার লতায়। সে ফল যেন পাকল না, অথচ কষায়ও রইল না, মৃদুমধুর হয়েও লোভনীয় হয়েই রইল।

রত্নের লাবণ্য যেমন রত্নান্তরের বিশেষ লাবণ্যকে পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে বাড়তেই থাকে, তেমনি আপনা থেকেই শ্রীকৃষ্ণের শরীরও ভরে উঠতে লাগল লাবণ্যের অনন্ত-বন্যায়। তাঁর ঈষৎ-স্থূল বক্ষঃস্থলে অভিনব আলোড়ন নিয়ে এল নব-বিত্তা। বক্ষের লম্পট ভঙ্গিমায় ও স্কন্ধের মাংসলতার মাধুরী দেখে সকলের মনে হল, এ দেহ যেন সে দেহ নয়। এ যেন এক অসমান-মঞ্জুল বিশ্বনয়ন-চমকানো অন্য দেহ। চমকে উঠলেন ব্রজবাসীরা।

৩। ইত্যবসরে ধরণীতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন শ্রীভগবানের প্রিয়তমারা। শ্রীভগবানের উপমান যদি হয় নীলমণি, মেঘ ও নীলোৎপল, তাঁদেরও উপমান তাহ'লে কনক, বিদ্যুৎ ও চম্পক। কেউ মাস কেউ পক্ষ পরে হয়েছিলেন অবতীর্ণা। তাঁদের সৌন্দর্য্যের কাছে, হিমালয়-কন্যা পার্বতীর সৌন্দর্য্যও যেন স্বল্প। তাঁরা ছিলেন শ্রীভগবানের নিত্যসঙ্গিনী এবং তাঁর শৃঙ্গার-রসের অঙ্গিণী। তাঁরা নেমে এসেছিলেন নির্ঝরধারার মত রসের।

৪। তাঁদের কাছেও যখন বিদায় নিয়ে গেল কৌমার, তখন প্রথমে সরল হয়ে বেড়ে উঠে পরে মঞ্জরীর মত বেঁকে নুয়ে পড়ল তাঁদের দৃষ্টি; হেমন্তের দিনগুলির মত হ্রাস পেল হাসি; কাব্যের গুণবিশেষের মত বাক্যার্থেও একটি পদেরই প্রয়োগ করতে লাগল আলাপ। ঘরের ছাঁচ থেকে ঝরে পড়া বিন্দু বিন্দু বর্ষণ—জলের মত ধীর অতি ধীর হয়ে গেল চলন; দীনের মহারত্ন লাভের মত··· লোক-লোচনের সঙ্কোচে আচ্ছন্ন হয়ে গেল বক্ষ এবং খোঞ্চেপোষে ঢাকা নৈবেদ্যের থালার মত গুণ্ঠনাবৃত হয়ে গেল তাঁদের শিরোভাগ।

কৌমার বিদায় নেওয়াতে তাঁদের মানসের দশা হল অন্তর্বর্ত্তি-রত্ন শলাকা মৃণালখণ্ডের মত; না জানি কোন দেবতা এসে তাঁদের টুকরো মনকে যেন জুড়তে বসেছেন সেবা দিয়ে। যে সব বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল কৌমারে, সেগুলিকে এখন অপরিচয়ের কোঠায় ফেলে দিতে তাঁদের নব-জ্ঞানের আর বাধল না এবং আশ্চর্য্য, নটি গ্রহই যেন এক এক করে গ্রহণ করলেন তাঁদের বরাশ্রয়। কারণ, তাঁদের করতলে প্রকাশ পেল রবির আরুণ্য, বদনবিম্বে চন্দ্রের জ্যোৎস্না, অনঙ্গে মঙ্গলের অঙ্গদান, দৃষ্টিপাতে বুধের সৌম্যতা, শ্রোণীতে বৃহস্পতির গুরুত্ব, বচনে শুক্রের কাব্যতা; চরণে শনৈশ্চরতা, কেশপাশে রাহুর তামসিকতা এবং গুণাবলীতে কেতুর কেতনতা।

৫। এমন কি—চরণের চাঞ্চল্যটিকে চুরি করে নিয়ে গেল নয়ন, কটির গৌরবটিকে শ্রোণীভার। জ্ঞানের কৃশতাটিকে উদর এবং বাক্যের প্রাচুর্য্যটিকে মাধুর্য্য। হায় রে শৈশবের অধিকার নষ্ট হয়ে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে কি অঙ্গগুলির মধ্যে আসে পরগুণ লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি!

৬। এমন কি, অষ্টসিদ্ধিও তখন প্রাদুর্ভূ্তা হয়ে গেলেন তাঁদের পরিবেশে। কটিতে উদয় হলেন অণিমা, শ্রোণীভারে মহিমা, বাণীতে লঘিমা, লজ্জায় প্রাপ্তি, মানসে কামাবশায়িতা, লাবণ্যে ঈশিতা, অপাঙ্গে বশিতা, এবং মাধুর্য্যে প্রাকাম্য।

৭। হঠাৎ যেন কোথা থেকে বলা নেই, কওয়া নেই, তাঁদের হৃদয়ে হৃদয়ে তার পর জন্ম নিয়ে বসল এক মোহন বিকার। আর সেই বিকারের কৃপাতেই যেন ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠল ব্রজনগর, রঙীন হয়ে গেল বিশ্ব, সফল হয়ে গেল পুষ্পধনুর জন্ম, শোধিত হয়ে গেল শৃঙ্গার রস, মার্জ্জিত হয়ে গেল সর্বভাব, সরসীকৃত

হল শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস, কৃতার্থীকৃত হল কবিদের বাক্য-নির্মাণ। এবং সেই হৃদয়-বিকারের অনুগ্রহেই প্রিয়তমাদেরও মনে ফুল ফুটল উৎকণ্ঠার, মনোভূমে ঠাঁই নিলেন মনোভূ, মানসপথেই ছুটতে লাগল মনোরথ, নিতান্ত দীর্ঘ হল রতি, পারশূন্য হল লজ্জা, একান্ত অল্প হয়ে গেল জনশঙ্কা, দ্রুত ও তীক্ষ্ণ হল অনিবৃত্তি, দুশ্চিকিৎস্য হল অনুৎসাহ এবং মনে মনেই শিকল দিয়ে রইল মনান্তর।

৮। কিন্তু এই হৃদয়-বিকারটি ভিতর-পাকা হলেও বহির্বিকাশী হল না,—ষাটশালি ধান্যের মত। পরিজনদের হাজার অনুযোগেও মুখ লুকিয়ে রৈল। রস কি কখনও শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায়? মুখ্যার্থের মত এটিও অলক্ষ্যাই রৈল সর্বদা। নিরূঢ়-লক্ষ্যার্থের মতই ব্যঞ্জনার বা ব্যঙ্গের রৈল বাইরে। অন্তর্বিঘূর্ণমান হলেও সুস্থিরতার কিন্তু অভাব ঘটল না এটির। উদ্বেগ জন্মাল সত্য, কিন্তু এর নিজের কোথায় উত্তেজনা। কেবল সান্নিপাতিক জ্বরের মত অস্থিসন্ধি পিষে দিল, নিয়ে আসতে লাগল নিত্যতৃষ্ণা।

৯। কাঁচা বাঁশের মধ্যে ঘুণের মত প্রেমিকাদের অন্তরটিকে কুরতে লাগল, এই বিকারের মোহনতা।

১০। এই হৃদয়-বিকারের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীভগবানের প্রিয়তমাদের কপোলতল্ল লবলী ফলের মত হলদেটে-সাদা হয়ে গেল, ওষ্ঠাধরের চেহারা হয়ে গেল রোদে-ঝলসানো নতুন পাতার মত টুকটুকে। দুনয়নের আকৃতি—যেন হিমে-ঢাকা নীলপদ্মের পাপড়ি।

বৈশাখ-বাসরের মত তপ্তদীর্ঘ হল নিঃশ্বাস। অজ্ঞ জনের হৃদয়ের মত অন্তঃশূন্য হয়ে গেল চাহনি। সব কিছুই কেমন যেন বদলিয়ে গেল।

আত্মারামের প্রস্থানের মত উদ্দেশ্যশূন্য হল পদ-চারণ। কী বলতে গিয়ে কী যেন তাঁরা বলে ফেলেন, গ্রহগ্রস্তের মত আচরণ হল বচনের। ঘরের কাজে আর মন বসে না, আচার-ব্যবহার হল নির্বিণ্ণ মানুষের স্বভাবের মত, মরতে পারলেই যেন বাঁচেন।

শ্রীভগবানের প্রতি তাঁদের এই মনোভাব ক্রমে যখন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল, যখন তীব্র হয়ে উঠল তাঁদের স্বরের প্রতি ঘৃণা, যখন এই মনোভাবের আলোর ভাষাটি নতুন ব'লে লক্ষ্যমান হলেও প্রকাশ্যে কোথাও আর বক্ষ্যমান হয়ে উঠল না, তখন একদিন তাঁদের সহচরীরা আর থাকতে না পেরে কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন—হঠাৎ। নিজের নিজের প্রিয়সখীর, হ্যাঁ, হৃদয় যে তাঁরা জানতেন এ কথা নিশ্চয় ঠিক, তবু ঠিকটি যে কতখানি ঠিক সেটি জানবার আগ্রহই বোধ হয় তাঁদের মাথার মধ্যে নিয়ে এল এই বুদ্ধি।

তখন প্রসাধনের সময়। তাঁরা তাঁদের প্রিয়সখীদের সামনে এনে ধরলেন,—ইন্দ্রনীলমণির অলঙ্কার, সুরঞ্জন নীলাঞ্জন ও কান-পাশার স্থলে আমোদিত নীলপদ্ম। সব কটিতেই শ্রীকৃষ্ণের তনু-প্রভার সাদৃশ্য। বললেন—"বলি ও প্রিয়সখীরা, এবার জুড়োক তাহলে আপনাদের দুনয়নের জ্বালা। গৌরবরণ গায়ে এই গয়নাই মানায়। কৃষ্ণের লাবণ্যের মতই এগুলি সুন্দর।"

কৃষ্ণাঙ্গবর্ণের মত সেই উপচারগুলিকে দেখেই, এবং শ্রুতিপথে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করতেই, প্রিয়সখীদের পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠল সর্বাঙ্গ, চোখে টলটল করতে লাগল কাজলধোয়া জল, প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল নিঃশ্বাস। তাঁদের দশা দেখে এক সহচরী প্রণয়-পরিহাস উড়িয়ে আর এক সখীকে বললেন—

১১। "আঃ কি কষ্ট লো সই কি কষ্ট! আমার হৃদয়ে নিশ্চয় ময়লা জমেছে। শুধু একবার দেখ তাতেই কিনা তোমার এই অঞ্জন জলের ঝাপটা মেরে চোখের পথটাকে ঝিমিয়ে দিলে গো! পরতে না পরতেই এই ইন্দ্রনীলমণির গয়নাটা কিনা পুলকে শিউরে দিলে গা! শুঁকিও নি, তাতেই কিনা দূর থেকেই ঐ নীলপদ্মগুলো নাক ভরিয়ে দিলে গন্ধে! আমাদেরি চোখে নাকে এমন ঘটাল, না জানি এঁদের আবার কি ঘটায়। রীতিনীতি কিছুই জানিনে সই, আমার মত সখী-মানুষের এ আবার কি হল? ওমা, তোমারও যে সেই দশা। মুষড়ে পড়লে নাকি? তুমিই এখন বল ভাই, তত্ত্ব-কথাটি শোনাও, এ সব কি এইগুলোর কোনো শক্তি বিশেষ না আপনাদেরি মহিমাময় মনের কোনো বিকার।"

পরিহাসের ভাষা যাঁরা কানে তুললেন, তাঁরা সকলেই আবার বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সমস্ত কৃষ্ণানুরাগিণীদের পরমগুণোত্তরা সহচরীর দল। হ্যাঁ, তাঁরাও কেউ কম রূপসী নন। লক্ষ্মীকেও তাঁরা হার মানিয়ে দেন সেবার স্বাভাবিকতায়।

তাঁদের উরুদেশ রম্ভাদের আরম্ভটিকেও হতশোভা করে। তাঁদের শ্রোণীর তুলনায় শ্রীকামদেবের সিংহাসনও হাস্যজনক। ডমরুর মাঝখানটিকেও ধিক্কৃত করে তাঁদের কটিদেশ। আর তাঁদের কুচ-কোরকগুলির সৌন্দর্য্য! বিকল হয়ে যায় ডালিম-লতার ফল। ঠোঁটগুলিও অনুপম যেন তারা আত্মসাৎ করেছে বাঁধুলি ফুলের রক্তিমার ও সৌরভ্যের আত্মা। মানিক্যজয়ী দশন। নাসাপুটের শোভার কাছে ও কটাক্ষের ভঙ্গির কাছে অপমানে অধোমুখ হয়ে যায় শ্রীমদনের তূণীর ও ধিষণা। আর তাঁদের নয়ন। মন থেকে মুছিয়ে দেয় কালিন্দীর নীল জলে সুখের ভোমরা ভোলা নীল পদ্মের দোলার ছবি। আর তাঁদের চন্দ্রায়মান বদন। অজস্র ভাসা পদ্ম বনের যেন স্বপ্নের কম্পন।

এই হেন রূপসী সহচরীরা আপন আপন যূথেশ্বরীর মুখের দিকে চেয়ে নির্ভয়ে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন তাঁদের ভাব।

১২। কিন্তু ভাবের পরীক্ষা করা কি এতই সহজ? শ্রীভগবানের প্রিয়তমারা যে নিত্যসিদ্ধা, তাঁদের রস-রীতিটিও যে নিত্যসিদ্ধা। সে রসরীতির পক্ষে কি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অনুন্মুখীনতা থাকতে পারে? যেমন পারে না, তেমনি এই রসরীতির জন্মও দায়ী হতে পারে না এবং তার ইতিকর্তব্যতার জন্যও দায়ী হতে পারে না প্রাকৃত লোকেদের মত লৌকিক বয়েস। অতএব কৈশোর সমাগমে তাঁদের এই অনুরাগ-মেদুরতায় অবকাশ কোথায় বিস্ময়ের? তাঁদের জন্মকালের সমকালেই যে জন্মেছিল এই রাগ-নিবিড়তা। কৈশোরে যে কোনো সময়ে তাই তার অভিব্যক্তি। এই এর রহস্য।

এবং তাই সহচরীদের বিহ্বলতা দেখে, অমৃতবল্লীর শাখার মত বিচলিতা হয়ে উঠলেন সুন্দরী বিশাখা। বিদগ্ধভাব মুগ্ধমধুরা নিজের প্রিয়সখী রাধাকে লঘুভাষায় তিনি বললেন—

"মুখটিতো সুন্দর করে রেখেছ, তবে মনে হঠাৎ এই বিকার এল কেন? বলি, সখীদের যে প্রাণ যায় যায় অবস্থা! জন্মালও যেই পাকলও সেই, এমন বিকার যে চতুরদের অগম্য তর্কের।

কোথায় গেল তোমার অধ্যয়নের কৌতুক? শুক-শারীকে পাঠ

দেওয়া নেই, ময়ূরকে নাচ-শেখানো নেই, বীণায় ঝঙ্কার তোলা নেই, হাসি-ঠাট্টাতামসা নেই, প্রিয়সখীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি নেই! ···বলি সই তবে কি বনমালী···তোমার মনের মাণিকটিকে চুরি করে সরেছেন?

১৩। অসম্ভব না-ও হতে পারে। সত্যিই তো চাঁদ না থাকলে কি খুসী হয় কুমুদিনী? সূর্য না থাকলে তো পদ্মিনীকে হতেই হবে ম্লান। মেঘের গান ছাড়া অন্তগীতে আনন্দ কোথায় চাতকীর? মেঘের কোল ছাড়া শোভা কোথায় দামিনীর?

ওলো সখী, তুমিই বল,—মধুমাস না এলে কি গন্ধ ছোটে মাধবীর? উন্মনা হয় কি কোকিলা? শুক্লপক্ষ চাই, তবেই না খোলে জ্যোৎস্না: পদ্মদীঘি চাই, তবেই না ভোলে রাজহংসী; কষ্টিপাথর চাই, তবেই না নিজেকে চিনতে পারে কনকরেখা। কত আর বলব বল, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, চাঁদেই কেবল জ্যোৎস্না থাকে, রত্নেই থাকে প্রভা, ফুলেই থাকে মউ।

আর তাও বলি সই, আমার কাছেই বা লুকিয়ে রেখে তোমার লাভ কি? মণির যারা বণিক, তাদের কাছে কি অগোচর থাকে মণির মনের খবর? লুকিও না সই, বলেই ফেল। ভালবাসায় সব কিছুই বলায়।

১৪। বিশাখার কথা শেষ হতে না হতেই সর্বগুণললিতা ললিতাসখী পরম প্রণয়ভরে বলে উঠলেন—

"সই, বিশাখাটি আমাদের উদার প্রণয়তরুর শাখা কিনা, তাই ভাষায় ফুল ফোটানোয় তিনি বিচক্ষণ। তবে যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন। বিচিত্র নয় সেটি। চাঁদের কৃপাতেই তো আরও রূপসী হয়ে ওঠেন রাত্রি। তাকে ছাড়া আর কাকেই বা বল বরণ করবে চকোরী?

১৫। শ্রীরাধা উত্তর দিলেন—বড্ড যে সাহস বেড়ে গেছে আপনাদের, অসম্ভাব্যকেও সম্ভাব্য করে তুলতে চান আপনারা! বৈশাখের বিশাখার মত—মাধবের (মাধবঃ কৃষ্ণঃ পক্ষে বৈশাখ) শ্রীসহায়িনী হয়ে মিলনের ভাবটিকে কিছুতেই আর ত্যাগ করতে পারছেন না দেখছি আমাদের বিশাখা।

১৬। কথা শুনে প্রফুল্ল হয়ে উঠল ললিতার মন। তিনি পুনর্বার বলে উঠলেন—ওলো সুন্দরি, যা হবার তা চিরকাল ধরেই হবে। তা, সই তোমার নামটিও তো রাধা, অর্থাৎ বৈশাখ। রাধা আর বিশাখা যেহেতু এক পর্য্যায়ের, সেইহেতু রাধাই এখন তাঁর সহায়।

১৭। রাধার অমৃতমধুর হাসিখানি বলে উঠল—ললিতে, আকাশলতার ফুল আর কাশলতার ফুল কি কখনও সমান হয়? মিথ্যে বিতণ্ডা তুলে আমাকে আর বোঝাবার চেষ্টা করিসনে ভাই স্লথমুখে।

১৮। ইত্যবসরে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন সখী 'শ্যাম'। রাধাকে আরাধনা করতে প্রতিদিনই তাঁর আসা চাই। হৃদয়ের টান। শীতকালে তাঁর শরীর উষ্ণ হয় আর গ্রীষ্মে হয় শীতল—এই লক্ষণেই তাঁর এই শ্যামা-নাম। রাধার্পিত তাঁর হৃদয়।

তিনি আসতেই কোমল-হৃদয়া শ্রীরাধিকার হৃদয়খানি মুগ্ধ হয়ে গেল, মুদিত হয়ে গেল, অতিস্নিগ্ধ হয়ে গেল।

১৯। তারপরে যখন কলাবতীরা পরস্পর মিলিত হয়ে এক

জায়গায় বসে পড়লেন তখন একটু মুচকি হেসে এবং একটু গম্ভীর হয়ে এবং একটু মুখের হাবভাব গোপন করে শ্রীরাধা বললেন—বলি ও পদ্মফুল, বলি ও প্রিয়সই শ্যামা, আমার মনের গুঞ্জনখানি কি এবার কানে নেবেন ? আমার দেখা দিয়ে কর্পূরের পিদিম জেলেছ সই আমার দুনয়নে। তারপরে—এই যে আমার সখীরা কী যেন সব কান-ভোলানো কথা বলছেন তাও কি একটু কানে নেবেন ? এই বলে শ্রীরাধা শ্যামার কাছে প্রকাশ করে দিলেন বিশাখা ও ললিতার কথোপকথন।

২০। শুনে শ্যামা বললেন—

"হরিণের মত সরল-সরল চোখ ক'রে মিছে আর দোষ দেবেন না সখীদের। গোকুলের কুলললনাদের আপনি ললাটভূষণ। আপনারি গুণ গাইতে গিয়ে এই গান-গাওয়ার, যত ব্যাপারটি ঘটেছে। যা ঘটেছে তা ভালই ঘটেছে। চাঁদ আর কুমুদিনীর মত তাঁর আর তোমার সই সেই স্বভাবটাই ভাব। সারা গোকুল নগরী মাতিয়ে সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে সেই ভাবের।

২১। রাধার মুখে চলকে উঠল হাসি; বললেন—সত্যিই তো, সেই মানুষটির উপর দেখছি আপনারো তাহলে লোভ পড়েছে। তা না হলে আর নিজের কথা অন্যের বলে আপনি যেন চালিয়ে, ফুটে ওঠেন ষোলকলায়। এইই বা কেমন করে সম্ভব হয় ? জিজ্ঞাসা করি, এমন কোন্ রমণী রয়েছেন যিনি চাঁদ বা সূর্য্যকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যান ? কাচমণি দিয়ে মহামণি বদলাতে চান ? সমুদ্রের সমস্ত বস্তু হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে চান ? বলি, সাপের মাথায় যখন ডগমগ করে মাণিক, কোনো রমণী কি সেটির লোভে তখন ফণা ধরতে ছোটেন ? কিশোর সিংহের কেশর ছিঁড়ে কেউ কি চুল বাঁধে সই ? ও সব সখী ঠকানো মিথ্যে গল্পের ঢের হয়েছে সই ঢের হয়েছে।

২২। শ্যামা বললেন—"তোমার হৃদয়টি যে সত্যিই শ্যামাহৃত, বেশ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে তোমার কথায়। আর প্রতারণায় কাজ কি সই।

২৩। শ্যামার কথা শুনে আতুর হয়ে উঠল রাধার প্রতারণ-চাতুরী। নিজের আলোয় ফুটে উঠল তাঁর স্বভাবের ভাব-প্রবণতা, ভাবের কুশলতায় আবার যেন সৌভাগ্যে চিতিয়ে উঠল তাঁর হৃদয়ের বৃন্তিদল। রোমাঞ্চের শোভায় বঙ্কিম চটুল হয়ে গেল কপোল। কপোল-পালিতে ধীরে জমল এসে দু'নয়নের কাজল-ধোয়া জল। যেন দু-নয়নের পদ্মকোণ থেকে বেরিয়ে এল কৃষ্ণকান্তির মধু; আর যেন সেই গালের বাটি দুটিই হল তাঁর সুতীব্র কৃষ্ণানুরাগ-সৌন্দর্য্য ধারণের শ্রেষ্ঠ আধার। নিখিল সৌভাগ্য-সম্পদের বিজয়িনী পতাকার মত কাঁপতে লাগলেন শ্রীরাধা। তাঁকে দেখে দ্রব হয়ে গেল সখীদেরও হৃদয়। তাঁদের আশ্বস্ত করে শ্রীরাধা হঠাৎ বলে উঠলেন—শ্যামা, বলতে পারিস, কোথায় আমায় কনকন করে বাজছেন সেই সৌভাগ্য-কঙ্কণ ? ওলো সই, ওর চিন্তামণি বেজায় দামী ; লোকোত্তর মণীন্দ্রদেরও সেটি বন্দনীয়। আর আমার সেই অনুরাগ···তৃণমণির মত কেবল খড় টেনেই বেড়ায়। সে মণি কেনবার মত মূলধন কোথায় তার ? বলতে বলতে কাঁদতে লাগলেন রাধা।

২৪। শ্যামা বললেন—কেঁদে কেঁদে অমন সুন্দর চোখ দুটি আর কোলাতে হবে না সই। আমার মত সখীর কথাগুলো কখনও মিথ্যে হয় না। নির্ভুল বলেই বিশ্বাস করে নিও। আশ্বস্ত হও। তোমার অনুরাগের মন্ত্র থেকেই পরিচয় পাচ্ছি তাঁরও মনোমাণিক্যের।

এমনও কোনো কোনো লতা আছে যায় আপনা হতেই নিধিপ্রদেশে ঝুরি নামে। তখন আর দুর্জ্ঞেয় থাকে না নিধি। সই, যে তাকে পেল সেইই জানল।

২৫। বিশাখা আর ললিতা দু'জনেই তখন বলে উঠলেন—

"শ্যামা, বলিহারি যাই তোমার দর্শনের। এর আগে নিশ্চয়ই তোমার আর তাঁর মধ্যে এমন কিছু একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে যাঁর দৌলতে আজ তোমার ঠোঁটে ঝরছে এমন বাক্যের মধু। অত আর মিষ্টি মিষ্টি হাসতে হবে না। নিশ্চয়ই গোপন কিছু খবর···তোমার কানে অতিথি হয়ে রয়েছে।"

শ্যামা বললেন—

যদি খবরটি বলি সে বড় সাহসের কাজ হয়—

২৬। দু'জনেই তখন বলে উঠলেন—

আমাদের মাথার দিব্যি শ্যামা, তোমায় বলতেই হবে। রসান্তর ঘটলেও বলতে হবে অসঙ্কোচে। ফুলচন্দন পড়ুক তোমার মুখে।

[ক্রমশঃ।

অনুভব

মধু গোস্বামী

অনেকেই অনেকের মত
চোখের জলের দিকে ফিরে
অকালে নিহত।

ভেবেছে সবাই :
মাঠের ঘাসের নীচে
ঘাস ফড়িংয়ের মত
সহজ সকাল যেন পাই।

দেখেনি'ক মোটে,
সে-সকালও ব্যর্থ হয়
শালিক কি চড়ুইয়ের ঠোঁটে।

তাই, চোখের জলের দিকে ফিরে
অনেকেই অনেকের মত
অকালে নিহত।

শুধু ছয় সেকেণ্ডের প্রয়াস

আমাদের অনেকের কাছেই শারীরিক ব্যায়াম একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। কিন্তু দেহকে সবল ও কর্মঠ করা এবং সেই জন্য মাংসপেশীগুলির যথোপযুক্ত উন্নতি সাধন, ইচ্ছা করলেই এই কাজকে আনন্দপ্রদ ও মনোরম করে তুলতে পারা সকলের পক্ষেই সম্ভব। ব্যায়ামাগারে গিয়ে কঠিন ব্যায়াম করে গলদঘর্ম হবার প্রয়োজন নেই, শরীরকে সুস্থ ও কর্মঠ করে রাখবার জন্যে দিনে বা রাতের এমন সময়গুলি ব্যবহার করা যেতে পারে যখন আপনাকে কোন না কোন কারণে অলস হয়ে থাকতেই হবে—এই ধরুণ না, আপনার মোটর গাড়ীর সুমুখে লাল আলো জ্বলে উঠেছে, অতএব আপনার গাড়ীর গতিবেগ রুদ্ধ করে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সেই সময়ে, কিম্বা যখন টেলিফোন করতে গেলে আপনার লাইন পেতে দেরী হচ্ছে সেই অবসরে, কিম্বা যখন "কিউ"-এর মধ্যে আপনি অলস হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই সুযোগে।

একটা জার্মাণ পরীক্ষাগারে গবেষণা করে জানা গেছে, মাংসপেশীর বেড়ে ওঠার একটা নিয়ম আছে এবং অত্যন্ত অল্প ব্যায়ামে মাংসপেশী বেড়ে উঠতে পারে। দিনের মধ্যে মাত্র ছয় সেকেণ্ড যদি আপনি আপনার মাংসপেশী সঙ্কুচিত করতে পারেন তা হলে সেটা যতশীঘ্র গড়ে ওঠা সম্ভব ঠিক সেই সময়ের মধ্যে ততখানি গড়ে উঠবে।

প্রতিদিন ছয় সেকেণ্ডের অবসর সকলেরই আসে। এবং ইচ্ছা করলে এই অল্প সময়কে আপনি আপনার জীবনে প্রচুর প্রভাব সৃষ্টি করবার শক্তি দিতে পারেন। পেটটা ভেতরের দিকে টেনে ধরুন, চিবুককে সোজা অবস্থায় খাড়া করে তুলে ধরুন। সমস্ত শরীরটাকে নিয়ে আড়মোড়া ভাঙুন। হাই তুলুন, বসে বসে যতখানি শোয়া যায় তার চেষ্টা করুন। হঠাৎ একটু সময় পেলে এই সব ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করুন। প্রতিদিনের অন্তত: ছয় সেকেণ্ডকে প্রাণময় করে তুলুন।

আগেকার heavy weight boxing champion Gene Tunney বলেছেন: কঠিনসাধ্য ব্যায়াম করার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু নিয়মিত লঘু ব্যায়াম করলেই শরীরকে সুস্থ ও সবল করে রাখতে পারা যায়। যেমন দাঁত পরিষ্কার করেন তেমনি প্রতিদিন একটু আধটু ব্যায়াম করবেন।

চিত্রতারকারা ঠিক এই রকম ছোট ছোট সেকেণ্ডগুলিকে শরীর মনের উন্নতির জন্যে ব্যবহার করে থাকেন। টেলিভিসনে কথা কইবার সময় কোমরের নিচে এক হাত মুঠো করে অন্য হাতের ওপরে চেপে ধরেন। এতে হাতের মাংসপেশীগুলির শক্তিবৃদ্ধি হয়। জেন পাওয়েল, ফ্রাঙ্কিলেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়কগণ লাল আলোর সুমুখে পথের ওপরে যখন তাঁদের গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে সেই কটা সেকেণ্ড ব্যায়াম করে নেন। যৌগিক ব্যায়ামের মত বসে বসেই তাঁরা ভেতরের দিকে পেট টেনে ধরে এবং পরে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তবে এরূপ ব্যায়ামও খুব সতর্ক হয়ে করতে হবে। মিস পাওয়েল এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছেন: আস্তে আস্তে আরম্ভ করুন, তবে প্রতিদিন নিয়মিত অভ্যাস করে যান। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুসমঞ্জস করবার ও উদরের মেদ হ্রাস করবার এর চেয়ে ভালো উপায় আমার জানা নেই।

বিজ্ঞান বার্তা

মাংসপেশীকে সবল করার জন্যে কোন একজন বিশেষজ্ঞ স্নান করবার পর কয়েক সেকেণ্ড তোয়ালে দিয়ে গা মোছবার সময় কতকগুলি ব্যায়াম করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তোয়ালেটা দৈর্ঘে প্রস্থে ঘাড়ের ওপরে রেখে চিবুক তুলে দক্ষিণে বামে পরিচালিত করুন, তোয়ালের শেষের দিক দুটো ধরে ঘাড়ের ওপর জোর দিয়ে চাপুন কিন্তু এ প্রক্রিয়া ছয় সেকেণ্ডের বেশী করবার প্রয়োজন হবে না। পিঠ দিয়ে তোয়ালেটা নীচের দিকে টেনে উদর ও নিতম্বের মাংসপেশীগুলি সংকুচিত করুন। এই রকম করতে করতে মনে মনে ছ'বার গুনুন। পায়ের তলায় তোয়ালেটা দিয়ে দু'হাত দিয়ে টানুন সেই সঙ্গে গোড়ালি দিয়ে তোয়ালেটাকে নাবিয়ে ফেলতে চেষ্টা করুন। এই ব্যায়াম পরের পর দুটো পা দিয়েই করতে হবে শুধু ছয় সেকেণ্ড ধরে। যাঁরা সাবমারিনের অল্প পরিসর জায়গায় আবদ্ধ থাকেন, তাঁরা কেবল মাত্র কয়েক ইঞ্চি নড়ে চড়ে নিজের শরীরকে কর্মঠ রাখেন, তাঁরা বাঙ্কের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুটো মাথার তলায় রাখেন এবং ঘাড় দিয়ে চাপতে চাপতে মাথাটা তুলতে থাকেন যতক্ষণ না চিবুক এসে বুকের ওপরে ঠেকছে। তারপর তাঁরা মাথাটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নাবিয়ে ফেলেন। কিম্বা শোয়া অবস্থা থেকে আস্তে আস্তে উঠে বসবার চেষ্টা করেন তারপর আবার আগেকার মত শুয়ে পড়েন। এই ব্যায়ামগুলি যে কোন লোকের পক্ষেই উপকারী।

এ ব্যাপারে আপনিও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। রাত্রির বেলা বিছানার ওপরে হাত পা বেশ ভালো করে ছড়িয়ে আরাম করে শুয়ে পড়ুন। তারপর গোড়ালি থেকে আরম্ভ করে চোখের পাতা দুটো পর্য্যন্ত সক্রিয় করে তুলুন—প্রত্যেক মাংসপেশী একবার সংকুচিত করে তারপর সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসুন। কতক্ষণই বা সময় লাগবে এ ব্যায়াম করতে। কিন্তু হয়ত দেখবেন তার পরই বেশ আরামে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সকাল বেলায় একটু নিঃশ্বাসের ব্যায়াম করলে আপনি নিজে থেকেই প্রাণময় হয়ে উঠবেন, সমস্ত আড়ষ্ট ভাব এক মুহূর্তে আপনা থেকেই কেটে যাবে। আধো ঘুমে আধো জাগরণে যখন আপনি বিছানার ওপরে পড়ে আছেন তখন বেশ গভীর ভাবে নিঃশ্বাস টেনে শ্বাসযন্ত্রকে হাওয়া দিয়ে ভরে তুলুন। তারপর মুখ ও নাক বন্ধ করে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে শুয়ে থাকুন। ক্রমশ: দেখবেন আগে যতটা পারতেন তার চেয়ে দ্বিগুণ সময় আপনি নিঃশ্বাস ধারণ করে থাকতে পারেন। এবং পরে যখন আপনি নিঃশ্বাস ছাড়বেন, দেখবেন আপনি অসাধারণরূপে প্রাণময় ও কর্মঠ হয়ে উঠেছেন।

তা' ছাড়া আরও অন্য ব্যায়াম করতে পারেন। বিছানার ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দু'টো ওপর দিকে বেশ প্রবল ভাবে ছড়িয়ে ধরুন যতক্ষণ না কোমর পর্য্যন্ত মাংসপেশীগুলির টান অনুভব করেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হাত দু'টো ধীরে ধীরে নাবিয়ে ফেলুন। তারপর পা দু'টো উঁচু করে ব্যায়াম করুন। পরে পা নিচু করবার সময় সতর্ক থাকবেন যেন আপনার গোড়ালি বিছানা না স্পর্শ করে। এই প্রক্রিয়া ক'বার করলেই দেখবেন আপনার পেটের পেশীগুলির ওপরে টান পড়ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যায়াম করলে পেটের মেদ কমে গিয়ে আপনার শরীরের মধ্যভাগটা বেশ সবল হয়ে উঠবে।

পোষাক পরবার সময় এক পায়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরবেন ও জুতোতে ফিতে বাঁধবেন। প্রথম প্রথম এই রকম করার সময় দেয়াল ধরে অভ্যাস করবেন। পরে দু'-চার দিন করবার পরই দেখতে পাবেন দেয়াল না ধরেই এ কাজ আপনি অনায়াসেই করতে পারছেন।

ভেবে দেখলে আশ্চর্য হবেন, প্রতিদিনের কতগুলি অলস কর্মহীন সেকেণ্ড আপনাকে নষ্ট করতে হয়। কোথাও যাচ্ছেন, কোন দোকানের কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে আছেন, কাজ করতে করতে আর ভালো লাগছে না, চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন, বা বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে, তাই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন খানিকক্ষণ। এই সব অলস মুহূর্তগুলিকে আপনি ইচ্ছে করলেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন করে তুলতে পারেন।

—বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়।

একাডেমি অব ফাইন আর্টসের শিল্প-প্রদর্শনী

অশোক ভট্টাচার্য

চিত্রামোদী মাত্রই প্রতীক্ষা করে থাকেন বছরান্তে আয়োজিত একাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীটির জন্যে। এবার হয়তো তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়েছেন একাডেমির নিজস্ব নিকেতনে এই প্রদর্শনী উন্মোচিত হয়েছে জেনে। কিন্তু প্রদর্শিত শিল্পসম্ভার দেখতে গিয়ে তাঁরা কতটা তৃপ্ত হবেন সে বিষয়ে সন্দিহান হতে হয়।

অবশ্য উদ্যোক্তারা প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্যে ভারতের বিশিষ্টতম শিল্পীদের কিছু কিছু সৃষ্টিকেও সাজিয়ে ধরেছেন। তবু একথা না বলে পারা যায় না যে, নবীন শিল্পীদের শিল্পনিদর্শনগুলি কোনোক্রমেই আশানুরূপ নয়। তুলনামূলক ভাবে তবু মূর্তি বিভাগের কাজ নজরে পড়ে।

আচার্য নন্দলাল বসুর দুটি চিত্র প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ—'সন্ধ্যাদীপ' ও 'প্রোক্তের মাছ'। সন্ধ্যাদীপ ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, রেখায় যিনি অতুলনীয় সেই মহান শিল্পী কী অসামান্য দক্ষতার সঙ্গেই না ঘন জলরঙে পশ্চিমী ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পীদের নৈপুণ্যে একটি নেহাত বাঙালী বিষয়বস্তুকে শিল্পায়িত করেছে। দ্বিতীয় ছবিটি টাচের কাজ—জাপানী পদ্ধতিকে স্মরণ করায়।

এর পরই আসে গোপাল ঘোষ, রামকিঙ্কর বেইজ, গণেশ হালুই প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদের কথা। গোপাল বাবুর প্যাষ্টেলে আঁকা ছ'টি নিসর্গ চিত্র টাঙ্গানো হয়েছে। প্রতিটি ছবিতেই শিল্পীর গীতিধর্মী মন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দিনের বিশেষ এক মুহূর্তের আলো ছায়া ও রংকে শিল্পী বাঙ্ময় করে তুলেছেন বস্তুসংস্থাপনায় Composition ও রঙের আবেগদীপ্ত প্রয়োগে। বিষয়বস্তুতে নয়, রচনাপদ্ধতিতেই ব্যক্ত হয় গোপাল বাবুর স্বাতন্ত্র্য। রামকিঙ্কর বেইজের ছবিতে এক অন্য জগত প্রতিভাত হয়েছে। প্রকৃতির সাদৃশ্যকে অতিক্রম ক'রে আধুনিক কিউবিজমের ধারায় রেখা ও বর্ণের ছন্দ সৃষ্টি করেছেন তিনি। সাধারণের অনধিগম্য তাঁর শিল্প-নিদর্শনগুলিতে তৃপ্ত হবেন তাঁরা যাঁরা সৌন্দর্যকে পরিহার করেও চান আকৃতি বা রূপের (form) সেবা। গণেশ হালুই রচিত ছবিগুলির মধ্যে সব থেকে মনোরম হলো 'অমরত্বের জন্য' (১২৭)।

বাংলার বাইরের যে সব শিল্পীদের চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য আলমেলকর। তাঁর পাঁচটি ছবির মধ্যে সব থেকে ভালো লাগলো 'সাথী' ছবিটি—রঙের ব্যবহারে সংযমের জন্যে। 'বোটজেটি' ছবিটির কম্পোজিসন সুন্দর কিন্তু অবিরিক্ত চড়া রং চোখে লাগে। মনহার মাকোয়ানের 'গরুর বাজার', কান্তির 'সৌরাষ্ট্রের গোয়ালিনী', শ্রেণিক জেনের 'পানিহরুন' এবং মুদেশ্বরের 'নির্জন নৌকা' ভালো লাগে, কিন্তু কানওয়ালের ছবি মনে দাগ কাটে না।

বাংলার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে সব থেকে মনোহর মনে হয় মণিলাল দত্তগুপ্তের 'বাজনদার'। দিলীপকুমার দাসের 'ঘরমুখো' এবং সুকমল শাসমলের একটি স্কেচ (২৫২) ও চিত্ত সরকারের একটি কাঠখোদাই (২৪১) উল্লেখযোগ্য।

সামগ্রিক ভাবে জলরঙের কাজ তেলরং বা প্রাচ্যরীতির (ওরিয়েণ্টাল) বিভাগ দুটির তুলনায় উজ্জ্বলতর। ওরিয়েণ্টাল বিভাগের গুণগত ও সংখ্যাগত দৈন্য থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আজকের শিল্পী আর কোন এক বাঁধাধরা রীতিতে চিরাচরিত বিষয়বস্তু এঁকে যেতে রাজি নয়। নতুন বিষয় ও নতুন আঙ্গিকের প্রতি তার লক্ষ্য—সে লক্ষ্যে পৌছনো কষ্টসাধ্য হলেও।

মূর্তিগুলির মধ্যে রামকিঙ্করের বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ও মধুর সিং-এর প্রতিকৃতি ছাড়া চিন্তামণি করের 'প্রতিকৃতি' এবং প্রণব দত্তের 'ইউনিট' সবিশেষ উল্লেখ্য। কণিভূষণ ও সুনীল পালের কাজও আনন্দদায়ক।

পরিশেষে একথা না বলে পারছি না যে, উদ্যোক্তারা চিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে আরও একটু কঠোর হলে হয়তো বাংলার একাডেমির মান ঠিক থাকতো।

...রকার। এই প্রবন্ধের শিরোনামা যাই থাক না

সূর্য্য ...ংশে ... করব প্রাচীন বাংলার সমাজে নারীর স্থান কেমন

প্রিয়...। সম্বন্ধে দু'-চার কথা। তখনকার দিনে মেয়েরা

রূপথকে। ...ন ছিল তা সঠিক জানা যায় না। 'পবনদূতের'

আলোকসজ্জা। ...জগণের রাজধানী বিজয়নগরের যে বর্ণনা করেছেন

দিব্যেন্দু ...ষ নারীর অবাধ মিলনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সময় সে নিজের ...নারীর মিলন সম্বন্ধে তখনকার নীতি ও ধারণা যে

সবই সাজ্য আসরের ভিন্ন ছিল এবং আজকাল যাকে আমরা বিদেশী

গল্পগুজব করে বাং... করি তা যে প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, এ

অভিমান করে বলে, ...না। নারী সম্বন্ধে সেকালের ও একালের

দিব্যেন্দু হয়তো চেসে ...ের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

চিত্তকুসুমকে এক মল্লিকা... দাক্ষিণাত্যের মত মন্দিরে দেবদাসী

পারে না। ...ই নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন

দিব্যেন্দু-মল্লিকার এক ...দ ছিল। এই সব দেবদাসীরা মুখ্যত:

বিবাহের গাঁটছড়া নেহাৎই শক্ত...র ব্যবসায় করতো। কাশ্মীররাজ

দৈব সন্তুষ্টই ছিল দিব্যেন্দুর উপর। ...র কথা কবি কহ্লন অসঙ্কোচে ও

লাভ করেছে একটি কন্যা। মেয়েটি ...া স্বীকার করতেই হবে যে,

হয়েছে। ...ক ছিল না। এমন কি,

প্রতিদিনের মত সরস মন আজকে ছিল না দিব্যে... পঙ্কেও গ্লানির

বই হাতে করে চুপিসাড়ে ওপরে উঠতে যা... যে উচ্চ

এড়ায় না। বলে ওটা কি বই? ...মনে করি,

রাশি রাশি গল্পের বইয়ের পাঠিকা হিসাবে মল্লিকাকে নি...

গ্রন্থকীট আখ্যা দিতে পারা যায়। স্বামীকেও তাই গোটা দুয়া

লাইব্রেরীর মেম্বার হতে হয়েছে নেহাৎই পরার্থে। অর্দ্ধ-অঙ্গের

অধিকারী হিসাবে মল্লিকার স্বামী হয়েছেন সভ্য, পত্নী পাঠিকা।

যাই হোক, আজ ছিল বই বদলের দিন। লাইব্রেরীতে বড় ভীড়

ছিল। নতুন বই নেওয়া আর হলনা। দিব্যেন্দু বন্ধুর কাছ থেকে

পাওয়া বইখানা শক্ত করে ধরে গৃহে ফেরে। বাস্তব আজ তার কাছে

বড় জাগ্রত, তার তীব্র নখর ভয়াবহ মুখভঙ্গী। নাটক নভেলের

ন্যাকামি আজ অসহ।

—হ্যাঁ গো ওটা কি বই? মল্লিকার সোৎসুক প্রশ্ন। উঃ!

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে কি ফাঁকী দেবার উপায় আছে?

দিব্যেন্দু গম্ভীর মুখে জানায় ওটা গল্পের বই নয়—জরুরী ডাক্তারী

বই। মল্লিকার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে। শারদীয়া

সংখ্যাজাতীয় হাল্কা বই কি কখনও একটা ডাক্তারী বই হয়?

দিব্যেন্দুর অবসর নেই কোনদিকে দৃষ্টিপাত করার। সে নিজের

ঘরে চলে যায়

নরেনটা একেবারে রাস্কেল। কি দরকার ছিল ওকে দেখানর

"দীপালোক"খানা? এত বই আছে হতভাগার চোখে ধরা পড়ল

ঠিক ঐটা! নরেন শত্রু তার, হ্যাঁ একেবারে শত্রু।

সারারাত ছটফট করে অনেক সকালেই উঠে পড়েছে দিব্যেন্দু।

সাধারণত: ন'টার আগে সে গৃহসংলগ্ন ডিসপেনসারিতে নামে না।

সকাল সাড়টা। দিব্যেন্দু পোষাক পরে তৈরী হয়।

মল্লিকা ব্যস্ত হয়ে বলে ও কি, এত সকালে কোটপ্যান্ট পরেছ

কেন? আজকের দিনে বাঙ্গালীর সাজ নিতে হয়। তুমি বুঝি

ভুলে গেছ?

ব্রহ্মচর্য্য পালন করতো। লোকে অবশ্য তাদের সঙ্গ অকল্যাণকর

বলেই মনে করতো এবং কোনো শুভ কাজে বা অনুষ্ঠানে তাদের

যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। শাস্ত্র ও সমাজ মৃত স্বামীর

সঙ্গে সহমরণে যাবার জন্যই তাদের উৎসাহ দিত। মেয়েদের

বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তারা যে মোটামুটি

জানতো এবং চিঠিপত্র লিখতে পারতো তার প্রমাণ আছে। অনেক

মেয়েরা আবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ দিয়ে আজীবন ভিক্ষুণীর

ব্রতপালন করতো। এদের নিষ্ঠা, সংযম ও চরিত্রের পবিত্রতার

কথা চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিংয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়।

এ ছাড়া হিন্দুদের নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার রীতিনীতি বিষয়ে

সমসাময়িক গ্রন্থে ও তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে। ভট্টদেব প্রভৃতির

গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন শাস্ত্রোক্ত

নিয়ম প্রণালী দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল। শিশুর মাতৃগর্ভে স্থান পাওয়ার

সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই পিতামাতা সম্পন্ন

করতেন। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই 'জাতকরণ' করার

বিধি ছিল। তার ছয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন হোত।

এ ছাড়া এক বছরের মধ্যে নামকরণ অনুষ্ঠিত হোত। নামকরণের

সময় পিতা হোম যজ্ঞ ইত্যাদি করার পর, শিশুর যে নাম রাখা

স্থির হোত, তাই মাতা শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করতেন। এ ছাড়া

উপনয়ন এবং গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করা এ সবও তখন

আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই মনে করা হোত। স্বামীর বিদেশ

যাত্রার সময় মেয়েরা তাঁদের মঙ্গল কামনায় নানা রকম ব্রত করতো।

কিন্তু স্বামী আবার অন্যদের চোখে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য স্ত্রীকে

'জয়পত্র' লিখে দিয়ে যেতেন। তাই প্রাচীন সাহিত্যে দেখি,

মা... যখন রাজার আদেশে সিংহলে বাণিজ্যে যাচ্ছেন তখন

সিন্ধে... গর্ভবতী খুল্লনাকে 'জয়পত্র' লিখে দিয়ে গেছলেন।

কপালে অনেক "তোরে আশীর্ব্বাদ মোর পরম পীরিত।

বসে থাকে।

এ কি! চমকে ওঠে দিব্যেন্দু। কখন মল্লিকা এসে তার

গলায় মালা পরিয়ে দিল, সে খেয়ালই করেনি। মল্লিকা পায়ের

ধুলো নিয়ে প্রণাম করছে তাকে। আড়ষ্ট কণ্ঠে দিব্যেন্দু বলে—থাক।

সুরভিত কুসুমদাম অনাদরে টেবিলে রেখে বলে, আর এসব করবার

মত আমাদের বয়স আছে মল্লিকা? আর ধর, আমি প্রতিবারের মত,

তোমাকে যদি এটা পরিয়ে দিই, তোমার কি ভাল লাগবে? নেহাৎ

ডাল-ভাতের মতই একঘেয়ে স্বামীর কণ্ঠের মালা।

মল্লিকা থতমত খেয়ে যায়। দিব্যেন্দু কি রসিকতা করছে তার

সঙ্গে? কিন্তু এই সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করা কি ঠিক?

বিচিত্র হাসি হেসে বলে দিব্যেন্দু—ঠিকই বটে মল্লী—পতিব্রতা

স্ত্রী কি কখনও স্বামীর দেওয়া মালাকে অবহেলা করতে পারে?

আমি রসিকতাই করছিলাম।

দুপুরে আহারের পর দিব্যেন্দু ঘরে খিল এঁটে "দীপালোক"খানা খুলে

বসে। মল্লিকার মায়ের ছবি—ত্রিশ বছর আগেকার। ঠিক মল্লিকার

মত। কণিকা রঙ্গমঞ্চের নামকরা অভিনেত্রী। কেবলমাত্র অভিনয়-

কুশলীই নন, কণিকা নৃত্যপটীয়সী। এই যে নৃত্যদৃশ্যের ছবি রয়েছে,

দিব্যেন্দু লজ্জায় চোখ বোজে। পূজনীয়া শ্বশ্রুমাতার জীবন-কাহিনী

পড়তে থাকে। বিধবা লজ্জাশীলা কণিকা সিনেমা-জগতে প্রবেশ করেন।

তা' ছাড়া আরও অন্য ব্যায়াম করতে পারেন। বিছানার ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দু'টো ওপর দিকে বেশ প্রবল ভাবে ছড়িয়ে ধরুন যতক্ষণ না কোমর পর্যন্ত মাংসপেশীগুলির টান অনুভব করেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই হাত দু'টো ধীরে ধীরে নাবিয়ে ফেলুন। তারপর পা দু'টো উঁচু করে ব্যায়াম করুন। পরে পা নিচু করবার সময় সতর্ক থাকবেন যেন আপনার গোড়ালি বিছানা না স্পর্শ করে। এই প্রক্রিয়া ক'বার করলেই দেখবেন আপনার পেটের পেশীগুলির ওপরে টান পড়ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ব্যায়াম করলে পেটের মেদ কমে গিয়ে আপনার শরীরের মধ্যভাগটা বেশ সবল হয়ে উঠবে।

পোষাক পরবার সময় এক পায়ে দাঁড়িয়ে জুতো পরবেন ও জুতোতে ফিতে বাঁধবেন। প্রথম প্রথম এই ব্যাপারে দেয়াল ধরে অভ্যাস করবেন। পরে দু'-চার দিন দেখতে পাবেন দেয়াল না ধরেই এ কাজ আপনি অনায়াসে পারছেন।

ভেবে দেখলে আশ্চর্য হবেন, প্রতিদিনের কতো ... কর্মহীন সেকেণ্ড আপনাকে নষ্ট করতে হয়। ... কোন দোকানের কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে আছেন, কাজ ... ফেলে আর ভালো লাগছে না, চেয়ারে চুপ করে ব... থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে, তাই ... উঠেছেন খানিকক্ষণ। এই সব অলস মুহূর্তগুলিকে ... করলেই প্রাণশক্তিসম্পন্ন করে তুলতে পারেন।

একাডেমি অব ফাইন আর্টসের শিল্প-প্রদর্শনী

অশোক ভট্টাচার্য

চিত্রামোদী মাত্রই প্রতীক্ষা করে থাকেন বছরান্তে আয়োজিত একাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীটির জন্যে। এবার হয়তো তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়েছেন একাডেমির নিজস্ব নিকেতনে এই প্রদর্শনী উদ্মোচিত হয়েছে জেনে। কিন্তু প্রদর্শিত শিল্পসম্ভার দেখতে গিয়ে তাঁরা কতটা তৃপ্ত হবেন সে বিষয়ে সন্দিহান হতে হয়।

অবশ্য উদ্যোক্তারা প্রদর্শনীকে আকর্ষণীয় করে তোলবার ... ভারতের বিশিষ্টতম শিল্পীদের কিছু কিছু সৃষ্টিকেও সাজিয়ে ... তবু একথা না বলে পারা যায় না যে, নবীন শিল্পীদের ... কোনো ... তৈরী করেছে।

কই প্রতিবারের মত তো হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠল না দিব্যেন্দু? না চোখের ভুল—দিব্যেন্দুর মত স্বামীর ভালবাসায় সন্দেহ কেন তোমার? চিন্তামগ্না মল্লিকা চমকে ওঠে—এ কি, তোমার খাওয়া হ'য়ে গেল—লক্ষীটি তোমার পায়ে পড়ি, বল তোমার কি হ'য়েছে?

ঠিক মনে হচ্ছে মল্লিকা অভিনয় করছে। ক'দিন আগে দেখা 'বাড়াজবা' ছবিটা দিব্যেন্দুর চোখের সামনে জেগে ওঠে। নায়িকা স্বামীকে পীড়াপীড়ি করছে আর একটু আহার করার জন্যে অথচ মন তার চঞ্চল হ'য়ে আছে কখন স্বামী বিদায় নেবে।

দিবেন্দু মল্লিকার দিকে তাকায়—অশ্রুসজল ওর মন-পদ্ম নয়ন। মল্লীর চোখে জল—ইচ্ছা করে ওর অশ্রুসিক্ত মুখখানা বুকের মধ্যে টেনে নেয়। নাঃ নেহাৎই বোকা সে। পিতৃপরিচয়হীন কণিকার মেয়ের চোখের জলে ভুলবে না আর, কতরকম ছলাকলা জানে ওরা।

একবার ডাঃ গুপ্তকে ডাকাই—হয়তো ভেতরে ভেতরে জ্বর হচ্ছে, উদ্বেগাকুল কণ্ঠ মল্লিকার।

—এ রোগ আমার কেউ সারাতে পারবে না—বৃথা ভেবে কষ্ট পেও না।

... মল্লিকার কাজকর্ম সাজসজ্জা সবকিছুই ... কে বুঝবে? ... তো অবাঞ্ছিত বিদায় ... ওতো চেয়েই দেখেনি। ... সেই অশুভ পত্র, যেখানে ... প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে আছে ... ওঠে দিব্যেন্দুর—তার পর কখন ... ইতিহাসের গর্ভে।

... তথা দুটি চরণসঞ্জাত নূপুরের কিঙ্কিণী শোনার চান আকাঙ্ক্ষা এবার শিল্পিবৃন্দ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে আর ছবিগুলির মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্যে হয়তো দিব্যেন্দুকেও লজ্জিত ... আর বলা যায় না, মল্লিকার শিরা ধমনীর মধ্যে যে উগ্র ... স্রোত বইছে সেও তাকে ডাকছে এস এস। সুমতি কুমতির দ্বন্দ্বে হয়তো সুমতিরই জয় হবে কিন্তু এমন একদিন আসতে পারে যেদিন মল্লিকা এ সবের মোহজাল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে না কিন্তু সেদিনের দুঃখ সইবে কি করে দিব্যেন্দু?

হাজার পাঁচেক টাকা মল্লিকার নামে ট্রান্সফার করে দিল দিব্যেন্দু। মল্লিকার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে দিব্যেন্দু হেসে বলে,—তুমি তো আমাকে খেয়ালী বল—মনে কর এও একটা খেয়াল। কোলকাতার বাড়ীও মল্লিকার নামে কেনা। এত বড় বাড়ীর কিয়দংশ ভাড়া দিলেই অনায়াসে চলে যাবে মল্লিকার। অবশ্য হয়ত দিব্যেন্দুর টাকারও দরকার হবে না ওর। সে যাক—অগ্নিসাক্ষী করে যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছে তার উপর স্বামীর তো একটা কর্তব্য আছে? তারপর ছন্দাকে নিয়ে চলে যাবে এমন এক জায়গায় যেখানে প্রলোভনের উগ্রতা নেই।

রাত্রি একটা। দিব্যেন্দু ছোট একটা চিঠি লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখে। খাটে শায়িতা পত্নী, দিব্যেন্দু নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে তার দিকে—ঝর ঝর করে ক'ফোঁটা জল ঝরে আসে চোখের কোল বেয়ে।

তার পর সে নিদ্রিতা কন্যাকে বুকে করে নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল অজানার পথে।

প্রাচীন নারী ও আচার-অনুষ্ঠান

বেলা দে

সমাজে নারীর জীবন দেশের একটি প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ কোন দেশ সভ্যতার কোন স্তরে উন্নতি লাভ করেছিল তা জানতে হলে সেই দেশের নারীর মর্য্যাদা ও জীবনযাত্রা প্রণালী কেমন ছিল তা

সকলেরই জানা দরকার। এই প্রবন্ধের শিরোনামা যাই থাক না কেন, আমি সুরু করব প্রাচীন বাংলার সমাজে নারীর স্থান কেমন ছিল, আগে সে সম্বন্ধে দু'-চার কথা। তখনকার দিনে মেয়েরা কতটা পর্দানশীন ছিল তা সঠিক জানা যায় না। 'পবনদূতের' কবি ধোয়ী সেন-রাজগণের রাজধানী বিজয়নগরের যে বর্ণনা করেছেন তাতে পুরুষ ও নারীর অবাধ মিলনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মোটের উপর নরনারীর মিলন সম্বন্ধে তখনকার নীতি ও ধারণা যে একালের থেকে ভিন্ন ছিল এবং আজকাল যাকে আমরা বিদেশী অনুকরণ বলে মনে করি তা যে প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। নারী সম্বন্ধে সেকালের ও একালের মনোবৃত্তির গুরুতর প্রভেদের আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সেকালের বাংলা দেশে দাক্ষিণাত্যের মত মন্দিরে দেবদাসী রাখার প্রথা ছিল। এদের অনেকেই নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন সুকুমার শিল্পে বিশেষ পারদর্শিনী ছিল। এই সব দেবদাসীরা মুখ্যতঃ না হলেও গৌণতঃ রূপোপজীবিনীর ব্যবসায় করতো। কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সঙ্গে কমলার যে সম্বন্ধের কথা কবি কহ্লান অসঙ্কোচে ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই শ্রেণীর মেয়েরা তখন সমাজে খুব ঘৃণিত ছিল না। এমন কি, প্রকাশ্যভাবে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা রাজাদের পক্ষেও গ্লানির বিষয় বলে গণ্য হতো না। মোটের উপর, নারীর শুচিতার যে উচ্চ আদর্শকে আমরা নারীর একমাত্র মর্য্যাদার বিষয় বলে মনে করি, প্রাচীনকালের আদর্শে তা বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না।

তখনকার দিনে মেয়েরা কতটা পর্দানশীন ছিল, তা সঠিক জানা যায় না। পবনদূতের কবি ধোয়ী সেন-রাজগণের রাজধানী বিজয়নগরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। আর এটি যে কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণী অথবা দুশ্চরিত্র নর-নারীর গোপন অভিসারের চিত্র তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। অন্ততঃ রাজকবি ধোয়ী সাধারণ ভাবেই বাঙ্গালী নরনারীর চরিত্র এঁকেছেন এবং তার চিত্রটি যে অতিরঞ্জিত বা অসাধারণ, এমন কোনো ইঙ্গিতও করেন নি। বিজয়নগরের নাগরিক ও নাগরিকারা ফুলের মালা পরে উপবনে দোলনায় চড়তো, দীঘির জলে জলক্রীড়া করতো, এমন অনেক রকম আমোদ প্রমোদেরও উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন জায়গায় দেখা যায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা চিকের আড়ালে থেকে বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ করছেন, কিন্তু রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে মেয়েদের ফুল যোগাবার জন্য নগর-ব্রাহ্মণদের অবাধ গতি ছিল। বাৎস্যায়নের এই উক্তি থেকে মনে হয় না যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারেরও পর্দাপ্রথা খুব কঠোর ছিল।

কুলবধূর জীবন ও আদর্শ যে এখনকার মতই খুব উঁচু ছিল, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হিন্দুযুগের শেষকালে মেয়েদের সাধারণতঃ অল্প বয়সেই বিবাহ হোত, তবে বেশী বয়সের বিবাহের কথাও কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা সুতো তৈরী করে কাপড় বুনে ও নানারকম শিল্পের দ্বারা স্বামীর সাহায্য করতো। নৃত্যগীত জলক্রীড়া প্রভৃতি উৎসব গৃহস্থবধূর পক্ষেও অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা এখনকার মতই সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা ত্যাগ করে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করতো। লোকে অবশ্য তাদের সঙ্গ অকল্যাণকর বলেই মনে করতো এবং কোনো শুভ কাজে বা অনুষ্ঠানে তাদের যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। শাস্ত্র ও সমাজ মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার জন্যই তাদের উৎসাহ দিত। মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তারা যে মোটামুটি জানতো এবং চিঠিপত্র লিখতে পারতো তার প্রমাণ আছে। অনেক মেয়েরা আবার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ দিয়ে আজীবন ভিক্ষুণীর ব্রতপালন করতো। এদের নিষ্ঠা, সংযম ও চরিত্রের পবিত্রতার কথা চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিংয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়। এ ছাড়া হিন্দুদের নানাপ্রকার আচার-ব্যবহার রীতিনীতি বিষয়ে সমসাময়িক গ্রন্থে ও তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে। ভট্টদেব প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুর জীবন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম প্রণালী দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল। শিশুর মাতৃগর্ভে স্থান পাওয়ার সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানই পিতামাতা সম্পন্ন করতেন। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই 'জাতকরণ' করার বিধি ছিল। তার ছয় মাস বয়সে অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন হোত। এ ছাড়া এক বছরের মধ্যে নামকরণ অনুষ্ঠিত হোত। নামকরণের সময় পিতা হোম যজ্ঞ ইত্যাদি করার পর, শিশুর যে নাম রাখা স্থির হোত, তাই মাতা শিশুর কর্ণে উচ্চারণ করতেন। এ ছাড়া উপনয়ন এবং গুরুগৃহে গিয়ে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করা এ সবও তখন আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবেই মনে করা হোত। স্বামীর বিদেশ যাত্রার সময় মেয়েরা তাঁদের মঙ্গল কামনায় নানা রকম ব্রত করতো। কিন্তু স্বামী আবার অন্যদের চোখে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য স্ত্রীকে 'জয়পত্র' লিখে দিয়ে যেতেন। তাই প্রাচীন সাহিত্যে দেখি, ধনপতি যখন রাজার আদেশে সিংহলে বাণিজ্যে যাচ্ছেন তখন ছয় মাসের গর্ভবতী খুল্লনাকে 'জয়পত্র' লিখে দিয়ে গেছলেন।

"তোরে আশীর্বাদ মোর পরম পীরিত।
সন্দেহ ভাজন পত্র হইল লিখিত।
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে যাই পরবাস।"

বহুবিবাহ প্রথা তখনো ছিল এবং স্বামীর দুই তিন স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতেও দেখা যেতো। এমন কি, দুই সতীনের ঝগড়ার অনেক কাহিনী আমরা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করলে দেখতে পাই। বিশেষ করে লহনা ও খুল্লনার মধ্যে আমরা সেই চিরন্তন কোন্দলের রূপ দেখি।

গৃহকর্মকে মেয়েরা কোনদিন অবহেলা করেনি। সে যুগের মেয়েরা শত ব্যাপারের মধ্যেও গৃহকর্মকে ভুলত না। সকল রকম সামাজিকতা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই সেকালের মেয়েরা একটা শুভ্র রুচির পরিচয় দিয়ে এসেছে।

মাতৃজাতি কোন্ পথে?

শ্রীমতী কণা দেবী

মা সন্তান-জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, আর সেই ভিত্তির ওপর অভিভাবকদের সাধনা গড়ে অট্টালিকা। ভিত্তি প্রতিষ্ঠা যদি সার্থক হয়, তবেই তার ওপর প্রাসাদ আশানুরূপ স্থায়ী

হ'তে পারে, নয়তো শিল্পীর সকল সাধনা নিতান্ত অসময়ে সমাধিস্থ হ'য়ে যায় ভগ্নস্তূপের তলে।

সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছিলেন—'মা হওয়া কী মুখের কথা।' বড় সত্য কথাই বলেছিলেন কবি। মা হওয়া মুখের কথা নয়। সন্তান মায়ের কাছ থেকেই জীবনের বীজমন্ত্র শেখে, শেখে পথ চলতে। সেই আদি-শিক্ষা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তা হ'লে সন্তানের জীবনের উদ্দেশ্য হ'য়ে যায় ব্যর্থ এবং সেই ব্যর্থতায়, মানব-জীবনের চরম অপচয়ের জন্য মুখ্যত: দায়ী সন্তান-জননী। এই দোষ ক্ষালনের কোন পথ নেই।

কিন্তু মাতৃজাতির এই ত্রুটিপূর্ণ কাজের জন্য মাতৃজাতিই কী দায়ী? এখন অনায়াসে বলা চলে—না। এ-দেশের মাতৃজাতিকে পিতৃজাতি সে কোন অশুভক্ষণ থেকে মানবীর অযোগ্য জীবন দিয়ে রেখেছেন। যুগের পর যুগ এমন দুর্ভাগ্যের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে এ দেশের সাধারণ মায়েরা ভুলে গেছেন নিজের জন্ম-উদ্দেশ্যের কথা। তাই কল্যাণ সৃষ্টি না করে তাঁরা সৃষ্টি করছেন অকল্যাণ। দুর্ভাগা এ-দেশ তাই আজো।

মা নিজে শালীনতার আস্বাদ পাননি, নিয়মানুবর্তিতার কথা তাঁর অজানা। তাই তাঁর সন্তান অবিনীত, উচ্ছৃঙ্খল। এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, ভারতের সকল মা ও সন্তান ঐ পর্যায়ভুক্ত নয়, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আ'ছ। কিন্তু তা নগণ্য। রাজ্যের রাজধানী আর গুটিকতক শহরের বাইরে যে শত শত পল্লীগ্রাম—শিক্ষা সভ্যতার স্পর্শ আলোকহীন লোকালয় আছে, সেখানে মানবতার আর্তস্বরই ধ্বনিত হয় রাত্রিদিন। মা সেখানে নিজের অকল্যাণব্রতী জীবনধর্ম পালন করে যান, যা থেকে সন্তান যোগ্য উত্তরাধিকারই লাভ করে চলে। যে জাতি জননীদের দেশের সুসন্তান সৃষ্টিকারিণীরূপে তৈরীর সুযোগ সৃষ্টি করে থাকেন, সেই জাতির মা ও সন্তানদের সঙ্গে এ দেশের বিশেষ পরিবেশের মা ও সন্তানদের তুলনা করলেও আমরা সহজে বুঝতে পারি যে, আমরা কোথায় পড়ে আছি!

কয়েক বৎসর আগে এক সন্ধ্যায় কলকাতার কার্জন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছি। মরসুমী ফুল ফুটেছে এখানে ওখানে। কত স্ত্রী পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ভারতের ও বাইরের। একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিশু, বছর তিনের হবে, একটি ঝ'রে পড়া কলকে ফুল কুড়িয়ে, যত্ন করে ধরে, হাসিমুখে দেখতে দেখতে চললো, অদূরে দাঁড়ানো তার মায়ের কাছে। শিশুর শিশু-সঙ্গীরা ফুল দেখে বড় খুসী। কিন্তু মায়ের চোখে ঐ দৃশ্য পড়াতেই তিনি সন্তানের দিকে স্নেহপূর্ণ শাসনের দৃষ্টিতে তাকালেন। আর শিশু সহজ ভাবেই গিয়ে ফুলটিকে যথাস্থানে সযত্নে রেখে এলো। সঙ্গীরা নীরবে সাহায্যই করলো তাকে। আমাদের কাছেই বসেছিলেন এক ভদ্র, সুখী তরুণ দম্পতি, সঙ্গে একটি তিন-চার বছরের সুকুমার ছেলে। দম্পতিও দেখলেন ঐ শিশুদের কাজ। কিন্তু তখনই তাঁদের সন্তান মায়ের হাতের বাঁধন ছাড়ানোর জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার চঞ্চল দৃষ্টি ঐ ফুলের রাজ্যে। এক সময় সে মুক্তি পেল এবং ছুটে গেল সামনের কেয়ারির কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই তুলে ফেললো ক'টা ফুল। মুহূর্তের মধ্যে মালী এলো ছুটে, অভিযোগ জানাতে থাকলো, শিশু ততক্ষণে ফুলগুলি ছিঁড়ে চটকিয়ে ফেলেছে। মায়ের মুখে প্রথমে হাসি; পরে মালীর কথায় বিরক্তি দেখা দেয়। ভদ্রলোক বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েন। তিনি ছেলেকে সরিয়ে আনতে গেলে ছেলে কেঁদেই অস্থির, আর মা অস্থির ছেলের দুঃখে।

সাধারণ ঘরে কী দেখি? ট্রেন ছুটেছে যাত্রী নিয়ে। অদূরে দাঁড়িয়ে কতকগুলি শিশু, বালক-বালিকা। হঠাৎ তারা সবাই ট্রেনের দিকে পা তুলে লাথি দেখাতে থাকে—মুখ ভেঙাতে থাকে। একটি মা তার শিশুকে নিয়ে এলেন কুটিরের বাইরে, গাড়ি দেখতে। পাশের শিশুদের অনুকরণ করার শক্তি এই শিশুর তখনো হয়নি; মা জোর হাসি হাসতে হাসতে তাই তাঁর শিশুর পা তুলে ধরলেন গাড়ির দিকে। শিশু পরে নিজে নিজে পা নাড়তে থাকে। আমাদের কামরায় হাসির রোল উঠলো।

একখানি চায়না সাময়িক-পত্র একবার দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। একখানি ছবি ছিল তাতে—দরিদ্র পল্লীর পাশ দিয়ে রেলগাড়ি যাবার ছবি। শীতের দিন, সকাল বেলা। গরীব মা-বাপের ছেলেদের গায়ে যোগ্য শীতবস্ত্র নেই। একটি খামারে কতকগুলি ছেলে রোদ পোহাতে এসেছে। বর্ষীয়সী মহিলাও ক'জন আছেন। ট্রেন যেতে দেখে শিশুরা দেশীয় রীতিতে যাত্রীদের নমস্কার জানাতে লাগলো। এক প্রৌঢ়া দেখেন বুঝি তাঁর সন্তান নিষ্ক্রিয়, তাই তিনি তাকে তার সঙ্গীদের অনুকরণ করতে শেখাচ্ছেন। আর যাত্রীরা? তাঁরা 'স্যালিউট' করছেন শিশুদের, আনন্দের হাসি হেসে।

আমাদের দেশের মা ও সন্তানদের ছবি আর বিদেশের মা ও সন্তানদের ছবি দেখা গেল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাতায় বেঙ্গল অ্যাকাডেমী ও ব্রাইটন স্কুলের ছাত্রদের যে ছবি আঁকা আছে, তা থেকেও পূর্ববর্ণিত বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়—একটি কল্যাণকর এবং অন্যটি অকল্যাণকর। বেঙ্গল অ্যাকাডেমীর ছাত্ররা হাতের তেলোয় কালি দিয়ে ass লিখে 'হেলো' ব'লে আদরের ভান করে, তাঁর পিঠে ঐ কথা ছেপে দিত, আর ব্রাইটনের স্কুলের ছাত্ররা লুকিয়ে তাঁর পকেটে লেবু, আপেল প্রভৃতি ফল দিয়ে দিত। এ শিক্ষা তারা জন্মের সঙ্গে আনেনি, এ শিক্ষা পেয়েছে তারা ঘরে—প্রধানত: মায়ের কাছেই। মায়ের কাছেই যে সন্তানের সব কিছুর হাতেখড়ি হয়। তার ওপর রঙ ফলিয়ে থাকেন পরবর্তী-কালের শিক্ষাদাতারা।

আমাদের দেশের মা ও ভাবী-মা, অর্থাৎ সাধারণ নারীজাতির মধ্যে চৈতন্য-উদ্দীপক গণশিক্ষার প্রসার আজ তাই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে-শিক্ষাদানের জন্যে পল্লীতে পল্লীতে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হবে না, প্রয়োজন—গণশিক্ষাদাত্রী সেবিকার। আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন যদি কাম্য হয়, তবে নারীজাতিকে আত্মসচেতন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে দেশ বড় হয়েছে—সে দেশে নারীজাতি অজ্ঞানের অন্ধকারে, আত্মচেতনাহীন ধূলিশয্যায় নেই পড়ে। সেখানের সকল নারীই বিশেষ জীবন যাত্রা পরিচালনা শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, তাঁরা জানেন—নারীজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কী, নারীজীবনের সার্থকতা আসে কিসে। ভারত আজও যেন ঐ দিকে অমনোযোগী, সমষ্টিকে উপেক্ষা করে ব্যষ্টির উন্নয়নের দিকেই প্রধানত: কর্মশক্তিকে নিযুক্ত করা হচ্ছে।

কিন্তু এ তো কাজের কাজ হচ্ছে না? মহামানবের তীর্থ ভারত—অতীতের এই নাম ভাঙিয়ে এই চঞ্চল যুগে আর প্রতিষ্ঠা

মিলবে না। যোগ্য সাধনায় ভারতকে আবার মহামানবের তীর্থ করেই তুলতে হবে, তাই গোড়া কেটে আগায় জল না ঢেলে, গোড়াতেই জল দেওয়া সমীচীন। নারীদের আত্মশক্তিতে সচেতন করে না তুললে ভারতে সুসন্তান জন্মাবে না। নিষ্প্রভ নক্ষত্রে আকাশ ভরে গেল—চাঁদ নেই!

মেঘমল্লার

সাধনা বসু

যথারীতি রাউণ্ড শেষ করে আলস্য-মন্থর পায়ে বিশ্রাম নিতে চলেছি, চোখের পাতাগুলোয় একটু ঘুমের আভাস—আলো-আঁধারী বারান্দা পেরিয়ে কোণের ঘরটায় ঢুকতে যাবার মুখে পিছন থেকে ভেসে এলো অতি পরিচিত মেয়েলি জুতোর মসৃণ সংগত। ফিরে দাঁড়াতেই মানুষটাকে চোখে পড়লো। একটু এগিয়ে এসে দ্রুত গলায় বলল—ডক্টর চৌধুরী, সতেরো নম্বর কেবিনে একবার আসুন, তাড়াতাড়ি।

এবার বিস্মিত হবার পালা আমার। সে কি, একটু আগেই যে ওই পেসেন্টকে দেখে আসছি, কোয়াইট নর্মাল।

নার্সের গলায় প্রচ্ছন্ন মিনতি ঝরে পড়ে—কিন্তু আমি এখনই ওখান থেকে আসছি ডক্টর, একবার চলুন।

স্টেথো গলায় নামিয়ে দেহ-মনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে নার্সের সঙ্গে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

হাসপাতালের রাতগুলিকে যেন অতীতের বিশাল একটি শবাধার বলে মনে হয় আমার। শ্রেণিবদ্ধ শয্যার মৃতকল্প স্তব্ধতার গহ্বর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠা যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের আর্তি যেন প্রাগৈতিহাসিক স্থবির কোন জীবনের দুরধিগম্য মন্ত্রোচ্চারণের মতো রুগ্ন আবহমণ্ডলের অখণ্ড নৈঃশব্দকে বার বার বিদীর্ণ করে দিতে থাকে। জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি অন্ধকার স্তব্ধ সমুদ্রে আমরা, ডাক্তারেরা জেগে আছে একমুঠো বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ হয়ে। কিন্তু সৃষ্টির অমূল্য নাড়ীস্পন্দনকে বিজ্ঞানের মহৎ আবিষ্কৃতি দিয়ে সব সময় কি ফিরিয়ে আনতে পারছি? তাহলে পৃথিবীতে এত অশ্রু কেন ঝরে? এত বেদনা কেন জমে ওঠে?

নার্সের আহ্বানে চিন্তার রেশটুকু ছিঁড়ে যায় সহসা—ডক্টর, আপনি ভিতরে যান, সিষ্টার দাশ ওখানেই আছেন।

পর্দার একটি কোণ তুলে ভিতরে ঢুকতে প্রতীক্ষমানা সিষ্টার চোখের ইঙ্গিতে রোগিণীর প্রতি আমার বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বেডের কাছে এগিয়ে এসে প্রথমেই মেয়েটির পালস পরীক্ষা করলাম। নাড়ীস্পন্দনের গতিপথে কোথাও কোনরকম

অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে প্লাষ্টারকরা হাতটা সন্তর্পণে বিছানার উপর নামিয়ে রেখে মেয়েটির দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করি—আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বলুন তো ?

কেবিনের অটুট নৈঃশব্দের বুক থেকে খসে পড়লো একটি বিষণ্ণ সুরের পল্লব—ডক্টর আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি ঘুমোতে চাই।

মেয়েটির মুখের জ্যোতি কিন্তু আশ্চর্য স্বাভাবিক—তার অনিদ্রাজনিত কষ্টস্বীকারের কোন পরিচয়ই সেখানে মুদ্রিত নয়। শুধু চোখের নীলাভ মণি দুটো যেন অন্তরের কোন পুঞ্জীভূত রহস্যময়তাকে ঘিরে মাঝে মাঝে কেমন বাষ্পময় হয়ে উঠছে।

সিষ্টারকে মরফীয়া ইনজেকশনের ব্যবস্থা করতে বলে যখন প্রস্তুত হতে যাচ্ছি, আবার ঘর-ভরানো সেই বেদনার্ত্ত স্বর জেগে উঠলো—ডক্টর, আমার মরফীয়ার দরকার নেই, ওতে আমার ঘুম আসে না।

এবার শুধু বিস্ময় নয়, একটু বিরক্তি এলো মনে। অদ্ভুত স্বভাবের এই মেয়েটি কি বলতে চায় ? আমার রোগাশিকারী দৃষ্টিকে সিষ্টারের মুখের উপর কয়েক মুহূর্ত মেলে দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলাম সতেরো নম্বর কেবিনের অভাবনীয় তাৎপর্যটুকু। কিন্তু সেখানেও শুধুই অর্থহীন শূন্য দৃষ্টির কুয়াশা ঘনীভূত হতে দেখে পিছু হটে এসে আবার সহজ হবার চেষ্টা করলাম—মরফীয়া আপনার সুট না করে আরো অনেক রকম নারকোটিক ড্রাগস আছে, তাই না হয় একটা ট্রাই করি। অযথা কষ্ট পেয়ে লাভ কি বলুন ?

মেয়েটির নীলাভ চোখের অতলান্ত চাউনিটা কেমন যেন স্তিমিত ও নিস্তব্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। টানা চোখের কিনারায় মনে হলো, একটি বোবা কান্না মুক্তার মত অলক্ষিতে জমাট বেঁধে উঠছে। কয়েকটি উপন্যাস-কল্প মুহূর্ত নিঃশব্দে পার হয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। সারাদিন খাটুনির পর দুপুরের দিকে একটু বিশ্রামের অবসর পেয়েছিলাম, আবার রাত আটটা থেকে ডিউটি শেষ করে ক্লান্তির বোঝা নিয়ে শুতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এমন অকল্পনীয় মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মাঝে আমাকেই যে আজ ছুটে আসতে হবে এবং কর্ত্তব্য করতে হবে, একথা মনে হতেই সমগ্র মানসিক পরিমণ্ডলটি অহেতুক ভাবনায় ছেয়ে গেল। মেয়েটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবিনের শাদা দেওয়ালের গায়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে বলি—আপনি বরং একটু চিন্তামুক্ত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার চেষ্টা করুন, ঘুম আপনিই এসে যাবে। মিষ্টার দাশ তো আছেনই, কোন দরকার পড়লে নিঃসংকোচে ওঁকে জানাবেন। আর স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই দেখেছি।

কেবিনের দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই আবার বাধা পেলাম—ডক্টর, আমার একটি অনুরোধ রাখবেন ?

ফিরে এলাম বেডের কাছে। দেখি, নীলাভ দুটি চোখের সমুদ্র জুড়ে অবাক্ত ব্যাকুলতার অজস্র ঢেউ ভাঙছে, কিন্তু পাৎলা ঠোঁট দুটি ঘিরে 'ল্যাগুন'র নিটোল প্রশান্তি।

মেয়েটি তার প্লাষ্টারকরা ডান হাতটি বাড়িয়ে আমার একটি হাত ধরে আস্তে আস্তে বলল—ডক্টর চৌধুরী, আমাকে গল্প শোনাবেন আপনি ? গল্প শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।

রাত্রির মধ্যযামে হাসপাতালের কেবিনে এক অবিবাহিতা তরুণীর কাছ থেকে এ ধরণের অনুরোধ শুনে প্রথমে একটু বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়লেও পরমুহূর্তে সামলে নিলাম। এক্ষেত্রে বর্ত্তমানিষ্ঠ চিকিৎসকসুলভ মৃদু ভর্ৎসনা মেয়েটিকে করা যায় না। কারণ, চোখে-মুখে তার আভিজাত্যের ছাপ এবং কেবিনে চিকিৎসিত হচ্ছে প্রায় তিন মাস ধরে, আবার হাসপাতালের পরিবেশগত শোভনতার দোহাই দিয়েও সরে আসতে পারি না। কারণ মিষ্টার দাশের উপস্থিতিতেই মেয়েটি আমার সঙ্গে শালীনতা বজায় রেখে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করে গেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা যখন সিষ্টার মারফৎ বাইরে যাবে, সহকর্মী বন্ধুবান্ধব এবং প্রবীণ ডাক্তারেরা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ গল্পালোচনা হিসেবে একে গ্রহণ করবেন না, এই ভেবে ইতস্তত করতে লাগলাম। অপাঙ্গে একবার সিষ্টারের দিকে চেয়ে দেখি, পুরু ঠোঁটের কোলে চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলছে। গভীর শ্রান্তি ও অবসাদে দেহমন আমার ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। তার উপর সিষ্টারের ঐ অভব্য হাসি যেন আমার শিরা-উপশিরাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিল। কতকটা জিদ করেই যেন আরো রোগিণীর অনুরোধ রাখতে তৎপর হয়ে উঠলাম। বেডের সামনে রাখা টুলটায় বসে মেয়েটির দিকে চেয়ে মৃদুকণ্ঠে বলি—দেখুন, আমি ডাক্তার মানুষ—কথাশিল্পী তো নই, আমার জীবনে এমন কোন ঘটনাই ঘটেনি যা দিয়ে গল্প তৈরী করা যেতে পারে। যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা সাধারণ মানুষের জীবনে অহরহ ঘটে থাকে, সে সব গল্প হয়তো আপনার ভালো লাগবে না।

মেয়েটি কি এক গভীর প্রশান্তিতে চোখ দুটি বন্ধ করে ফেলে আস্তে আস্তে বলল—ভালো লাগবে, আপনি বলুন।

ঘড়ির কাঁটা যখন দুটোর ঘরে, আমি সুরু করলাম আমার কর্মময় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাঘেরা নানা কাহিনী। এক ঘণ্টাও কাটেনি, লক্ষ্য করলাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে মেয়েটি। টুল ছেড়ে সন্তর্পণে উঠে গিয়ে সিষ্টারকে বাইরে ডেকে এনে বললাম—মনে হয়, পেশেণ্ট আর এখন জাগবে না। যদি কোন কারণে জেগেই ওঠে, আপনি আমাকে আর ডাকবেন না, বড় টায়ার্ড আমি, ডক্টর রায়কে কল করবেন। ওর ডিউটি আছে সকালের দিকে এই ব্লকে। উনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

রাত শেষ হতে তখন আর বড় দেরী নেই। বাইরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের স্তূপে যেন একটু একটু করে আবছা আলোর কাঁচা রঙ ধরছে। বারান্দা পেরিয়ে যেতে যেতে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে অবসন্ন দেহটাকে যেন মুহূর্তের আরাম দিয়ে গেল।

ডক্টরস রুমে ঢুকে একটু গড়িয়ে নিতে যাচ্ছি, পাশের শয্যা থেকে সহকর্মী ডাক্তার অরূপ সেন বলে উঠল—শ্যামল না ? কোথায় ছিলি সারারাত ? কোন ইমার্জেন্সী কেসে অ্যাটেণ্ড করলি নাকি ? জুতো জোড়া কোনক্রমে খুলে ফেলে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঘুম-ভরে-আসা গলায় জবাব দিলাম—কেবিন নাম্বার সেভেনটীন···

মুখ থেকে কথা সম্পূর্ণ খসেও নি, আচমকা লাফ মেরে স্থানচ্যুত হয়ে আমার কাছে এসে বলল অরূপ—অর্থাৎ সুইট সেভেনটীন ? শেষে তোকেও পাকড়াও করল ? অবিশ্যি ও তোদের মত সুন্দর লোকদেরই হান্ট করে বেঁচে আছে আজো···নইলে যেভাবে এসেছিল হাড়গোড় ভেঙে, বাঁচতে আর হতো না।

অরূপের কথাগুলি আমার ঘন-হয়ে-আসা ঘুমের মধ্যে কেমন

যেন ছায়াশরীর ধারণ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চোখের পাতায় ঘুমন্ত মেয়েটির ছবি একবার ভেসে উঠলো। তারপরই গভীর ঘুমে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

রাতের অন্ধকারে যা ছিল গোপন, দিনের আলোয় তাই স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেরী হলো না। এ বিষয়ে আমাকে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হতে দেখে সিনিয়র হাউস সার্জেন মল্লিক আমার কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন—ইয়ং ডক্টর, ডোন্ট বি সো শেকি। ওরা যাই বলুক, তুমি কান দিও না। ডু ইয়োর ওন্ ডিউটী এ্যাণ্ড হ্যাভ ইয়োর প্রফিট। আমরা ডাক্তার, পেশেন্টের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ শুধুই কি ওষুধ, ইনজেক্‌শন আর অপারেশনের? পেশেন্টের কাছে রোগ ছাড়া আমরা কি আর কিছু আশা করতে পারি না? কেবিন সেভেনটীনে আমারও মাঝে মাঝে ডিউটী পড়ে, অদ্ভুত লাগে মেয়েটিকে! অথচ মাসখানেক ধরে দেখছি এতটুকু বেচাল দেখিনি। এই জন্যই ওর নিরীহ আবদারটুকু বোধ হয় মেনে নিতে পারছি তোমাদের সিনিয়র হয়েও।

ডক্টর মল্লিকের দীর্ঘায়ত, সুন্দর চেহারার মধ্যে এমন যে একটি সুন্দর মন বাস করছে, এর আগে তার পরিচয় নানাভাবে পেয়েছি সত্যি, কিন্তু ঐ রোগিণীকে কেন্দ্র করে তিনি যে নিরপেক্ষ স্বচ্ছ মতামত আমার মত এক তরুণ চিকিৎসকের কাছে ব্যক্ত করলেন, এতে যেন নতুন করে তাঁকে চিনে নিলাম।

এর পর অবশ্য সহকর্মী ডাক্তার বন্ধুদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমি উপেক্ষা করেই চলতাম অধিকাংশ সময়। সপ্তাহে দু-তিন দিন ওই কেবিনে ডাক পড়তো এবং রাউণ্ড শেষ করে ফিরবার সময় মেয়েটিকে গল্প শুনিয়ে বেশ রাতেই বিশ্রাম নিতে যেতাম। কিন্তু একদিন সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম, এভাবে এক অসুস্থ ও মানসিক রোগগ্রস্তা তরুণীর সামান্য অনুরোধ রাখতে গিয়ে আমি ক্রমশঃ সহকর্মী বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় মহলে আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছি, যা আমার কর্মজীবনের বিকাশ লাভের পক্ষে আদৌ সহায়ক নয়। অতএব এই ব্যাপারের সত্বর অবসান ঘটানোই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ বলে মনে হলো।

সেদিনও যথারীতি রাউণ্ড শেষ করে ফিরে এসেই শোবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় দরজার বাইরে শোনা গেল নার্সের চিরপরিচিত আহ্বান—ডক্টর চৌধুরী, কেবিন সেভেনটীন আপনাকে একবার ডাকছেন। ঘুম আসছে না তাঁর…

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিশ্রামরত ডাক্তার বন্ধুর দল নানা রকম অভব্য টিপ্পনী কেটে উঠলো। একজন তার মধ্যে মিহি গলায় গান ধরলো—

'হয়তো কিছুই নাহি পাবো
তবু ত তোমায় আমি দূর হতে ভালবেসে যাবো।'

একজন নার্স বাইরে দাঁড়িয়ে আর তার উপস্থিতিতে এদের এমন অদ্ভুত ব্যবহার আমাকে কিছুক্ষণের জন্য নিঃসাড় করে দিল। পরে বেরিয়ে এসে প্রতীক্ষমানা নার্সকে কঠিন সুরে বললাম—কেবিন সেভেনটীনের পেশেন্টকে বলে দিন মাসের পর মাস একজন হাউস সার্জেনের পক্ষে রোগীকে ঘুম পাড়াবার জন্য নিজের বিশ্রাম আর ঘুম বাদ দিয়ে অবান্তর গল্প বলার মতো পাগলামি করা সম্ভব নয়, শোভনও নয়। দ্বিতীয় দিন যেন আর আমাকে এই অন্যায় অনুরোধ না করা হয়। যান—

ঘরে ঢুকে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম দেখে দু'-একজন ফিকে রসিকতা করতে গিয়ে সুবিধা করতে না পেরে থেমে গেল। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মন থেকে ক্ষণপূর্বের বিষাদ স্মৃতিটুকু ঝেড়ে নিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সে রাত অবশ্য নির্বিঘ্নে কেটে গেল, পরদিন কয়েকজন ডাক্তার ও নার্সের মুখে খবর পেলাম মেয়েটির অবস্থা নাকি গত রাত থেকে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন ডাক্তারকে ওর কেবিনে ঢুকতে না দেওয়ায়—ডক্টর মল্লিক নিজেই নাকি দেখাশোনা করছেন।

খবরটা শুনে মনের মধ্যে একটা দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। মেয়েটি শুনেছিলাম অন্যমনস্কতার দরুণ চারতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে কয়েক মাস আগে হাসপাতালে এসেছিল চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায়। হয়তো বা বিত্তবান পিতামাতার একমাত্র মেয়ে, কাজেই একটু বেশী মাত্রায় খেয়ালী ও আবদেরে হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু সেজন্য গতরাত্রে আমার অতটা রূঢ় হওয়া মোটেই উচিত হয়নি। ডক্টর মল্লিকই বা কি ভাবছেন, যদি শুনে থাকেন সব কথা?

আমার কাছে কিছু গল্প শুনে যদি মেয়েটা একটু আনন্দই পেতো, আর ঘুমোতে পারতো—আমি কেন স্বার্থপরের মতো নিজের কথা ভেবে ওর রোগের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিলাম? মনের মধ্যে যে চিন্তাটুকু এলো, মস্তিষ্কের উপলব্ধি-কোষে তাই অসংখ্য হয়ে আমার সমগ্র চেতনাকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেললো। জোর করে নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম—যাতে ওসব অপ্রত্যাশিত স্মৃতি আমায় আর ভাবাক্রান্ত করে না তোলে। রাতের ডিউটি-চার্ট বেরুলে দেখা গেল আজ আমার জায়গায় ডক্টর অশোক মৈত্রকে বহাল করা হয়েছে। একটা অন্যায় করে ফেলে আর ও-মুখো হবার ইচ্ছেই ছিল না। সেজন্য মনোগত অভিলাষকে এত সত্বর কার্যকরী হতে দেখে বুক থেকে ভার নেমে গেলেও মনের দ্বন্দ্ব কিন্তু ঘুচল না।

রাতে আর কোন ডিউটি না থাকায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সোজা কোয়ার্টারে চলে গেলাম। পরদিন সকালে ডিউটি দেবার জন্য হাসপাতালে এসে ঢুকতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হলো অশোক মৈত্রের সঙ্গে। আমাকে দেখে ভদ্রলোক ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন—এই যে শ্যামল বাবু, শুনুন আপনাদের সুবিখ্যাত সতেরো নম্বর কেবিনের কীর্তি! ওই ধরণের মেয়েরা রোগের চিকিৎসা করাতে এসে পরে আমাদেরই এক একটা রোগী বানিয়ে দিয়ে যায়, বুঝলেন? আপনাদের আর কি, ভগবান একখানা চেহারা দিয়েছেন, সেই দৌলতে আপনারা সবখানেই রাজা-বাদশা বনে গেছেন—যত গণ্ডগোল আমাদের মত হতভাগাদের নিয়েই। না পেয়েছি হীরো হবার মত চেহারা, না পেলাম জীবনে কোন চান্‌স্। আমাদের সমস্ত জীবনটাই ট্র্যাজেডি, মশাই!

দেহের উচ্চতাসহ ভদ্রলোকের চেহারা সুদূর কঙ্গো বেসিনের অধিবাসীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় সত্যি, কিন্তু তার জন্য চিকিৎসায় আটকাবে কেন?

মৃদুস্বরে প্রশ্ন করি—কি ব্যাপার বলুন তো?

অশোক মৈত্রের রুদ্ধ অভিমান এবার গলিত তুষারের মত ঝরে পড়তে থাকে—এরকম অভদ্র পেসেন্ট আমি আর দেখিনি, জানেন? কাল রাতে ন'টা নাগাদ যথারীতি ঐ ব্লকটায় রাউণ্ড

দিয়ে যেমন ঢুকেছি সতেরো নম্বরে, মেয়েটি একেবারে ভূত দেখার মত বিকট চীৎকার করে উঠে সিষ্টার দাশের মত সিনিয়র নার্সকে কী বকুনীটাই লাগাল। আর আমাকে দেখে তার চোখ মুখ জুড়ে কি রাগ আর বিরক্তি, যদি দেখতেন! এদিকে সমস্ত দেহটা প্লাষ্টারে মোড়া, উঠ বসতে গিয়ে জখমও হয়েছে, তবু আমাকে কাছে ঘেঁসতেই দিল না। বলে কি জানেন, আমার প্রাণ বেরিয়ে গেলেও আপনার হাত থেকে কোন সেবা আমি নেবোনা। আপনি চলে যান এখান থেকে, নয়তো আমি আবার চীৎকার করবো। অগত্যা সম্মান নিয়ে পালিয়ে বাঁচি। উঃ কি ক্রুয়েল নেচার্ড মেয়ে বাবা! শরীরের হাড়গোড় ভেঙেছে বলে কি মনের দয়ামায়া ভালবাসাগুলোও গুঁড়িয়ে গেছে?

অশোক মৈত্রের কাছ থেকে সরে এসে লিফটে চেপে উপরে এলাম। ডক্টর মল্লিক ও আরো দুজন সিনিয়র হাউস-সার্জেন লিফটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আমায় দেখে মল্লিক একটি আশ্চর্য সংবেদনাময় সূক্ষ্ম হাসি হাসলেন। ওর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলাম সেখান থেকে। কিন্তু গোপন বেদনার কত মনের মধ্যে জেগে রইল মল্লিকের হাসিটুকু। আমার অন্যমনস্কতা ধরা পড়লো অরূপের কাছে—কি রে শ্যামল, তোকে আজ এমন বিমর্ষ দেখছি কেন? শরীর খারাপ না মন উধাও?

গম্ভীরভাবে জবাব দিই—তোর কি মনে হয়?

পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া একটি তরুণী নার্সের দিকে চোখ রেখে মৃদু হেসে অপরূপ বলে—তুই এত দিন পরে সত্যি সত্যি প্রেমে পড়েছিস শ্যামল, ভাবতে বেশ লাগছে কিন্তু। অরূপের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললাম—জানিস কেবিন সেভেনটীনে আমি আর যাই না গল্প শোনাতে? তারপরও এ ধারণা করতে পারছিস?

প্রথম সূর্যোদয়ের মত রহস্যময় হাসির আভা খেলে যায় ওর ঠোঁটে, সেইজন্যই তো বলছি।

সঙ্গে সঙ্গে একটি সিনিয়র নার্স এসে দাঁড়ায় আমাদের কাছে। চোখে-মুখে একটা চাপা হাসির ছোপ—ডক্টর চৌধুরী, আপনি এখানে? ওদিকে ডাঙায় উঠে যে মাছে খাবি খাচ্ছে তার খোঁজ রাখেন?

বিগতযৌবনা হতশ্রী নার্সটির কালো মুখের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি হেনে কঠিনকণ্ঠে বললাম—আপনারা হসপিটালের সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, আপনাদের কাছ থেকে এ ধরণের অন্যায় রসিকতা প্রত্যাশা করি না। একজন হতভাগ্য, নিরীহ পেশেন্টের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে আপনারা কি সুখ পাচ্ছেন বলতে পারেন, মিস বোস?

অরূপ ও নার্সটি কিছু বলার আগেই দ্রুত পদক্ষেপে সেখান থেকে সরে গিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

সপ্তাহখানেক পর একদিন ঐ ব্লকটিতে আমার রাউণ্ড শেষ করে ফিরে চলেছি, সতেরো নম্বর কেবিনের কাছাকাছি আসতেই চোখ পড়লো ঐ কেবিনের নতুন সিষ্টার জয়া ঘোষ হাত ইসারায় আমাকে ডাকছে। এগিয়ে যেতে পর্দার বাইরে এসে চাপা গলায় বললে—ডক্টর চৌধুরী, পেশেন্ট এখনো ঘুমোননি, বড় ছটফট করছেন, ক্লোভ হয় খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

গম্ভীরভাবে বলি—ঠিক আছে, আমি ডক্টর মল্লিককে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ততক্ষণ—

কথা শেষ না হতেই পর্দার ওপার থেকে ভেসে এলো একটি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সিষ্টার—সিষ্টার—

জয়া ঘোষ ক্ষিপ্রপদে ভিতরে ঢুকে যেতে আমি দ্রুতপায়ে সেখান থেকে চলে এসে ডক্টর মল্লিকের খোঁজ করতে গিয়ে শুনি, তিনি ঘন্টাখানেক ধরে লেবার রুমে একটা এ্যাবনরমাল ডেলিভারী কেস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। সুতরাং তাঁর আশা ত্যাগ করে অরূপের শরণাপন্ন হলাম—ভাই আজকের রাতটা তুই একটু স্পেয়ার করবি কেবিন সেভনটীনের জন্যে? মেয়েটি নাকি এখনো ঘুমোয় নি।

কড়া সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ঢেকে ফেলে নিস্পৃহ গলায় অরূপ জবাব দিল—তোর অনুরোধমত গেলেই তো হবে না শ্যামল, ওঁর পছন্দমত লোক হওয়া চাই।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন সিনিয়র হাউস সার্জেন ডক্টর হিমাংশু অধিকারী। চল্লিশোর্দ্ধ বয়স, কিন্তু দেহ এখনও যুবকের মত নিখুঁত। দীর্ঘায়ত সুপুরুষ ব্যক্তি, সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সুনাম না থাকার জন্য পরিচিত মহলে ভদ্রলোক ততটা জনপ্রিয় ছিলেন না। আমার চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে মৃদু হেসে প্রশ্ন করেন—what's wrong with you, doc?

আমার কিছু বলার আগেই অরূপ মুখের সিগারেটটা ছাইদানে ফেলে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কেবিন সেভনটীনের কথা। পরমুহূর্তে দরজার বাইরে নার্সের গলা শোনা যায় ডক্টর চৌধুরী, সেভেনটীনের পেশেন্ট সিংক করছে, শীগগির চলুন।

মুহূর্তের মধ্যে হিমাংশু অধিকারীর বড়ো বেশী গভীর আর কালো চোখের তারায় ফসফরাসের চকিত দীপ্তি ঝলসে ওঠে। হাতের ষ্টেথোটা গলায় ফেলে দ্রুত পায়ে চলে যান। আমি শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের জমাট অন্ধকারের দিকে চেয়ে রয়েছি দেখে অরূপ আমার কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বলে শ্যামল, হিমাংশু অধিকারীর মত ডাক্তারই ওই সব মেয়ের ঠিক ওষুধ, দেখিস এবার মেয়েটার সব রোগ সেরে যাবে আর কেবিনও শীগগির খালি হয়ে যাবে। আমরাও বাঁচবো।

পরদিন থেকে আমার শরীরটা জ্বর হয়ে বেশ খারাপ হয়ে পড়ায় হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে কয়েক দিন কোয়ার্টারে পড়ে রইলাম। একটি বিকেলে ডক্টর মল্লিক এলেন আমায় দেখতে। দু চার কথা বলার পর সামনের দেবদারু গাছের বুকে ঘন হয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন চৌধুরী, সতেরো নম্বর কেবিনের পেশেন্টটি আজ একটু আগেই চলে গেল জানো? প্রায় পাঁচ মাস ছিল, না?

মনে মনে ভয়ানক চমকে উঠলাম। অরূপের কথাই কি তবে সত্যি হয়ে গেল? কিন্তু ওকে যে আমি দেড় মাস ধরে দেখছি, কোনদিন এতটুকু অসংযমী বা অশালীন হতে দেখিনি? অথচ মেয়েটি সুন্দরী, মার্জিত কথাবার্তা সহজ স্বচ্ছন্দ আচরণ কিন্তু ওই পেলব সৌন্দর্যসুষমার অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল ভ্রষ্ট নারীত্বের চিরায়ত আদিম সংস্কার? মাঝ রাতে গল্প শুনতে চাওয়াটা তবে ওর একটা সুন্দর কেমোফ্লাজ? অনিদ্রার যন্ত্রণা শুধুই অলীক ভান মাত্র? কিন্তু মন বিশ্বাস করতে চায় না অমন বিষণ্ণ, সরল স্বচ্ছ চোখের চাহনি বিষাক্ত

কামনায় পঙ্কিল হয়ে উঠতে পারে, সুদীর্ঘ দিনের ক্ষণস্থায়ী সাহচর্যে মেয়েটিকে মনে হয়েছিল ধ্বনিময় একটি সুন্দর কবিতা, কিন্তু আজ? আজ সে কবিতা হারিয়ে গেল না কি গদ্যকবিতায় তরাইয়ে?

আমার মৌনতা ডক্টর মল্লিককে স্পর্শ করলো কি না জানি না, কিন্তু তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর গম্ভীর সুরে বললেন—চৌধুরী, আমার দীর্ঘকালের চিকিৎসক জীবনে এমন ঘটনা আর ঘটেনি, জানো? মেয়েটির সম্বন্ধে আমরা নিজেদের মধ্যে কত বিদ্রূপ-পরিহাস করেছি, অভদ্রতাসূচক মন্তব্য করতেও দ্বিধা করিনি, কিন্তু কোনদিন ভেবে দেখিনি ওই গল্প শোনার পেছনে, ওই সুন্দর চেহারার আড়ালে জমা হয়ে আছে কতখানি ব্যথা আর কান্না! শী ইজ ক্যারিয়িং এ ট্র্যাজিক লাইফ! হিমাংশু মেয়েটির গল্প শোনার ইচ্ছেটাকে তাঁর বায়োলজীকাল থিওরী দিয়ে যাচাই করতে চেয়েছিলেন, এ্যাণ্ড হি ইজ রাইটলি সার্ভ্‌ড। এসব দেখে শুনে কি মনে হয় জানো? মনে হয়, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত ও মার্জিত মনের আড়ালে বাস করছে যে প্রকৃতি আরণ্যসত্তা, যে সহজাত পশুপ্রবৃত্তি—সুযোগ পেলেই সেটা তার থাবা উঁচিয়ে নখদন্তশুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর। তুমি জানো, আজ প্রায় তিন মাস ধরে আমি পার্সোনালি মেয়েটির কেস এ্যাটেণ্ড করেছিলাম, এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছে শুনেছি, কিন্তু কান দিইনি। আমি জানি, হাসপাতালের মস্ত রুগ্ন জগতে বাস করার ফলে ওদের মনটাও এমনি অসুস্থ আর পঙ্গু হয়ে গেছে যে আর একজনের সুস্থ-সহজ আচরণটুকু পর্যন্ত তারা স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারে না। রাতে ঐ ব্লকে আমার ডিউটি যেদিন না-ও থাকত, কতদিন নার্সরা আমার কোয়ার্টারে গিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেছে। লক্ষ্য করেছি আমায় দেখামাত্র গল্পশোনার আগ্রহে ঐ বিষণ্ণ সুন্দর মুখ জুড়ে নামত কি অসীম পরিতৃপ্তি, একটার পর একটা গল্প বলে গেছি আর তাই শুনে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে স্ত্রীর কাছে মেয়েটির কথা বলতাম, ও-ও ঠিক বুঝত না, নারীসুলভ ঈর্ষা আর অহেতুক অভিমানের জ্বালায় আমায় ভুল বুঝে নিজে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু বাইরের কোন আঘাত, কোন ঘটনাই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

সপ্তাহখানেক আগে মেয়েটির কাছে গিয়ে প্রথম নিজে থেকে প্রশ্ন করেছিলাম—আপনি তো রোজই অন্যের কাছ থেকে গল্প শুনছেন, আজ আমাকে আপনি গল্প শোনাবেন? জবাবে ও কি বলল জানো? আমার গল্প ফুরিয়ে গেছে বলেই আমার ঘুমও হারিয়ে গেছে ডক্টর, আপনাদের কাছ থেকে তাই গল্প শুনে ঘুমকে ডাকি। মেয়েটির মনে যাতে আঘাত না লাগে, এমন ভাবে আবার প্রশ্ন করেছি—আচ্ছা, আমাদের মধ্যে কার কাছে গল্প শুনতে আপনার ভালো লাগে, বলুন তো? তেমনি সহজ গলায় জবাব দিয়েছে—সুন্দর যাঁরা, তাঁদের কাছেই গল্প শুনতে আমি ভালবাসি। কিন্তু তাঁরা অনেকে আমার কাছে গল্পের ভয়ে আসতে চান না, সেজন্য অধিকাংশ রাতে আপনাকে এবং সিষ্টার দু' একজন ছাড়া আর কাউকে পাই না।

মেয়েটিকে আর একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিলাম—ডক্টর চৌধুরীকে আপনার মনে আছে? এস চৌধুরী? মনে হলো এবার মেয়েটি একটু ব্যথিত হয়েছে। একটু স্তব্ধ হয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে জবাব দিয়েছিল—তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

এর পর যথারীতি গল্প একটা সুরু করে ওকে ঘুম পাড়িয়ে ফিরে এসেছিলাম কোয়ার্টারে। গতকাল রাত্তে, শুনলাম হিমাংশু ওর কেবিনে গিয়েছিলেন। And that was the mistake। সিষ্টার ঘোষকে কিছুক্ষণের জন্য off করে অধিকারী একাই মেয়েটিকে নিয়ে deal করতে গিয়েছিলেন। তার পর মিনিট পনেরো না যেতেই কেবিন থেকে বিকট চীৎকার শুনে ওয়ার্ড নার্স রমা গুপ্ত ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে উত্তেজিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে এবং অধিকারী নাকি রাগত ভাবে কেবিন থেকে চলে যান। এরপর মেয়েটি কোনক্রমে রমার কাছে আমার নামটা বলেই নাকি সেন্সলেস হয়ে বেডের উপর পড়ে যায়। রমা একজন ওয়ার্ডবয়কে দিয়ে জয়াকে ডাকতে বলে আমার খোঁজ নিতে শোনে আমি লেবার রুমে—জয়া এসে হাতের কাছে অশোককে পেয়ে যেতে তাকেই কেবিনে ডেকে আনে। অশোক আসবার আধ ঘণ্টা পর ওর জ্ঞান যদি বা ফেরে, কিন্তু ডাক্তারের আকৃতি দেখেই নাকি প্রচণ্ড আর্তনাদ করে ওঠে—আপনাকে আমি সহ্য করতে পারছি না, দয়া করে আমার সামনে থেকে আপনি চলে যান।

অশোক বরাবরই মেয়েটির প্রতি বেশ অপ্রসন্ন ছিল। এবার সুযোগ পেয়ে তার সমস্ত রাগ এক মুহূর্তে ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ, একজন নার্সের উপস্থিতিতে তার চেহারা সম্বন্ধে মেয়েটির এ হেন মন্তব্য ওকে আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে। ও নাকি চীৎকার করে বলে ওঠে—আপনার রোগ শুধু সুন্দর লোকের মুখ দেখে আর মিষ্টি মিষ্টি গল্প শুনে ভালো হবে না। এটা হাসপাতাল, বাড়ী নয়, নাইট ক্লাবও নয়—কেন মিছিমিছি চারদিকে একটা স্ক্যাণ্ডাল করছেন এভাবে?

মেয়েটি নাকি ওর কথা শুনে অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পরে সেই যে চোখ-মুখ বন্ধ করেছে, আর খোলেনি। কিছু খায়ওনি। আজ সকালে নটা নাগাদ ওই কেবিনে গিয়ে একইভাবে মেয়েটিকে শুয়ে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ ওয়েট করছিলাম। সিষ্টার দেশাই মেয়েটির কানের কাছে মুখ নামিয়ে আমার নাম করতে মেয়েটি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের পাতা খুলে দৃষ্টি মেলে ধরেছিল আমার মুখের দিকে—মনে হল, একটা অসহ্য না বলা যন্ত্রণায় ওর ভিতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার পর বালিশের তলা থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে আমার হাতে তুলে দিল। দেখি শিক্ষিত হাতের অক্ষরে ইংরিজিতে লেখা নর্থের একটি ফোন নাম্বার। প্রশ্ন করলাম—কি বলতে হবে বলুন। চোখ বন্ধ করে শুধু জবাব দিল—আপনার নাম বলবেন। তাহলেই হবে। কেবিন থেকে বেরিয়ে ঐ নাম্বারে ডায়াল করতে এক ভদ্রলোক ধরলেন, তার পর আমার নাম শুনে একটি প্রশ্ন করলেন—স্বাতী কাল রাতে ঘুমিয়েছিল কিনা জানেন? উত্তরে বলেছি, সিষ্টার গত রাতে পেশেন্টকে খুব একসাইটেড অবস্থায় রাত কাটাতে দেখেছে। ভদ্রলোক আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন ছেড়ে দিয়েছেন এবং আমিও মেয়েটির কাছে ফিরে গিয়ে আমাদের কথাবার্তা জানিয়ে চলে এসেছি, কারণ ও সেটাই চাইছিল আজ।

বিকেলে ভিজিটিং আওয়ারে আমার কোয়ার্টারে এলেন একজন সুপুরুষ ও সুবেশ ইয়ংম্যান। চেহারায় ও কথাবার্তায় আভিজাত্যের

ছাপ। ড্রইংরুমে তাঁকে বসিয়ে শুনে গেলাম একটি অকালবৃন্ত জীবনের ট্রাজেডি—স্বাতী এলাহাবাদের এক বিশিষ্ট আইনজ্ঞের একমাত্র মেয়ে ও সন্তান, সতেরো বছর ওখানেই মানুষ হয়েছে, সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করার পর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী ডাক্তারী পড়বার জন্য বাপ-মায়ের সম্মতি নিয়ে কলকাতার মাসীর বাড়ীতে এসে উঠে। মেসোও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, তায় নিঃসন্তান, সুতরাং স্বাতীকে তাঁরা কন্যা-প্রতিম স্নেহ ভালবাসা দিয়েই ঘিরে রেখেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়বার সময় স্বাতী ফোর্থ ইয়ারের একটি ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ডাক্তারী পড়লেও ছেলেটির প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ এবং সহজাত সাহিত্যিক প্রতিভা স্বাতীকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তার অবস্থা মোটেই ভাল নয়, এজন্য যথেষ্ট কৃচ্ছ সাধন করে ছেলেটিকে পড়াশোনা করতে হতো। যা হোক; স্বাতী ওকে একদিন নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি পরিচিত ইঙ্গিত করলে ছেলেটি প্রথমে হেসে উড়িয়ে দেয়। কারণ প্রথমত, দুজনের অবস্থাগত বিপুল বৈষম্য, দ্বিতীয়তঃ সহায়সম্বলহীন এক বেকার ডাক্তারের হাতে একমাত্র মেয়েকে সমর্পণ করার দুঃসাহস বা প্রবৃত্তি স্বাতীর বাবা-মার হবে না। হলেও তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি চিরদিনের মতই নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা কারোর পক্ষেই সুখকর হবে না। স্বাতী একটু চাপা মনের মেয়ে, তাই ওর আবেগ-অনুভূতিগুলিও অত্যন্ত গভীর। দু একবার ছেলেটিকে বলবার পর যখন বুঝতে পারে যে তার আশা পূর্ণ হবার নয়, এ নিয়ে আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে রোগে পড়ে যায়—মেনিনজাইটাস।

মাসী বা মেসো এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। টেলিগ্রাম পেয়ে এলাহাবাদ থেকে বাপ-মা এসে মেয়ের অবস্থা দেখে উপলব্ধি করেন, তার মনের কোথাও একটা গভীর ভাঙন ধরেছে, যার বহিঃপ্রকাশ এই মারাত্মক রোগের মাধ্যমে দেখা দিয়েছে। সহপাঠী ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের কাছ থেকে জানলেন তাঁরা কিছু ঘটনা। ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে স্বাতীর অবস্থা দেখিয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হতে বললেন। ছেলেটি দুদিন সময় নিয়ে তৃতীয় দিনে এসে জানালো—আপনাদের মেয়ে যাতে ভালো হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা আমি করছি, কিন্তু স্বাতীকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আজ আপনারা মেয়ের মুখ চেয়ে আমার মত এক গরীব ছেলেকে যে সম্মান দিতে চাইছেন, আমি জানি বিয়ের পর তা আপনা হতেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

স্বাতীর বাবা-মা ছেলেটির চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ ও নিজেদের সামাজিক প্রতিপত্তি বা প্রেষ্টিজের কথা ভেবে তার প্রস্তাবই মেনে নিলেন। এর পর সুরু হলো এক আশ্চর্য জীবন। কলেজ ফেরৎ ছেলেটি আসতো স্বাতীর কাছে, প্রাণঢালা সেবা আর হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগ দিয়ে স্বাতীর মুমূর্ষু প্রাণে জাগিয়ে রাখলো প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন। রাতে তার লেখা এক একটি গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ী ফিরে যেত সে। তার একটা টুইশনী গেল, বন্ধু বান্ধবমহলে জুটলো ঈর্ষাকাতর নিন্দাবাদ কিন্তু সে দমল না এতটুকু। প্রিয়জনের আন্তরিকতাময় সেবা আর প্রাণঢালা ভালবাসার স্পর্শে কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাতী সেরে উঠলো। ছেলেটি তখন স্বাতীর বাবাকে জানালো ওকে কিছুদিনের জন্য বাইরে কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যেতে, তাহলে শরীর [illegible] একই সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে।

স্বাতীর বাবা মা ছেলেটিকে তার নিঃস্বার্থ কর্তব্যনিষ্ঠার বিনিময়ে প্রতিদানের বিষয় উল্লেখ করলে সে গোপনে জানালো, বাইরে থেকে ফিরে এসে স্বাতীকে নিয়ে তাঁরা যেন অবিলম্বে এলাহাবাদে চলে যান এবং তারপর তার উপযুক্ত বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

যাবার আগের দিন স্বাতীর কাছে বিদায় নিতে এলে স্বাতী তার বুকে মাথা রেখে কেঁদে বলল—তুমি আমায় কেবলই নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চাও, এবার ফিরে এসে দেখবো, তোমায় চিরদিনের মত বেঁধে ফেলতে পারি কিনা।

এ কথা শুনে ছেলেটির বুকেও সেদিন ঝড় উঠেছিল, কিন্তু বাইরে তার একবিন্দু প্রকাশ দেখেনি কেউ।

স্বাতীরা চলে গেলে ছেলেটি ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকল। কিন্তু মনের কোণে দেখা দিয়েছিল যে বিরাট শূন্যতা, তারই ভারে সে যেন ক্রমাগত আচ্ছন্ন ও কঠিন হয়ে পড়লো। বন্ধুবান্ধবেরা তাকে হ্যামলেট আখ্যা দিয়ে মজা করত। অবশেষে ফাইন্যাল পরীক্ষার কয়েক মাস আগে এলাহাবাদ থেকে স্বাতীর চিঠি এলো পরীক্ষান্তে তাকে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করবার অনুরোধ জানিয়ে। ছেলেটি চিঠির জবাব না দিয়ে পড়াশোনায় ডুবে রইল। ইতোমধ্যে আরো কয়েকখানা চিঠি এবং শেষে একটি প্রিপেড টেলিগ্রাম আসাতে তার উত্তরে জানাল—বিশেষ ব্যস্ত আছি। সময় নেই চিঠি লেখবার। পরীক্ষার দু সপ্তাহ আগে স্বাতী জানাল তার বাবা মা তাকে অন্যত্র পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলেটি কোন জবাব না দিয়ে দিবারাত্রি পড়াশোনা আর প্র্যাকটিকাল নিয়ে ভুলে রইল। পরীক্ষা শেষ হবার পরদিন একটি চিঠিতে স্বাতীকে সব কথা জানিয়ে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে চলে গেল সে। তারপর অবশ্য স্বাতীর কাছ থেকে আর কোন সাড়াই পাওয়া যায়নি।

পরীক্ষার রেজাল্ট অবশ্য ভালই হয়েছিল, এজন্য সময়মত কাজ পেয়ে যেতেও অসুবিধা হলো না। মাস কেটে ক্রমে বছরে গড়িয়ে গেল, নিরবচ্ছিন্ন কর্মস্রোতের প্রবাহে অতীতের স্মৃতি এলো ম্লান হয়ে—তবু প্রথম প্রেমের মাধুর্য কি চিরদিনের মত হারিয়ে যায়? হারিয়ে যেতে পারে বিস্মৃতির গহন অরণ্যে?

চার বছর পর স্বাতীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তিতে দেখে এই প্রশ্নই জাগলো তরুণ ডাক্তারের মনে। চার বছর আগেকার স্বাতী হারিয়ে গেছে আজ নিদারুণ মানসিক বিপর্যয়ের সর্বনাশা প্লাবনে—অতীত তার কাছে বিস্মৃত, গল্পহীন রাত ওর অনিদ্রায় কাটে, নারীত্বের স্বাভাবিক আবেগ অনুভূতি, মস্তিষ্কের সহজাত উপলব্ধি কোষগুলি পর্যন্ত শিলীভূত হয়ে গেছে। ওর বাবা এলাহাবাদের বহু বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে মাত্র এই আশাটুকু পেয়েছেন যে, কোন না কোন সুন্দর পুরুষ অথবা নারীকে রাতের পর রাত ধরে স্বাতীকে গল্প শুনিয়ে যেতে হবে—কারণ সৌন্দর্যের সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির একটি গভীর যোগসূত্র বর্তমান। এই ভাবে যদি কোনদিন ওর মানসিক সাম্য ও সহজ উপলব্ধি ফিরে আসে, তবেই ও আবার ভালো হয়ে ওঠে সংসারী হতে পারে। স্বাতীর সুন্দর-সানন্দময় জীবনে চার বছর আগে যে প্রতিশ্রুতি তাদের

অভিশাপ দেখা দিয়েছিল, তাই ওর কোমল, আত্মকেন্দ্রিক মনের মধ্যে সুদীর্ঘকাল লালিত হয়ে অবশেষে অন্ধকারের বীভৎসতা ও কালিমার রঙে মিশে ওকে অসুন্দর সমস্ত ব্যক্তি ও বস্তুর উপর বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। ওর ধারণা, সুন্দর লোকেদের কাহিনী বা প্রিয়দর্শন কোন বস্তু তাদের বাহ্যিক সত্তার সঙ্গে মিলে গিয়ে অন্তরে ও বাইরে ফুল বা প্রজাপতির মতই ফুটে ওঠে, সেই মসৃণ সৌন্দর্য্য-মাধুরীটুকুই স্বাতীর মৃত প্রাণে সাড়া জাগায়। আর এই কারণেই সমস্ত অসুন্দর ব্যক্তি ও বস্তুর প্রতি ওর সীমাহীন বিতৃষ্ণা।

বোধ হয় এইজন্য, কয়েকজন কুরূপা সিষ্টার ওর কেবিনে নিয়োগ করায় স্বাতী একদিন ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং তার পর থেকে অপেক্ষাকৃত সুশ্রী নার্সদেরই ওর কাছে পাঠানো হয়। মাস দুয়েক আগে—ওকে কলকাতায় রেখে চিকিৎসা করাবার জন্য ওর বাবা-মা এলাহাবাদ থেকে চলে এসেছেন। কয়েক মাস আগে এক বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেয়ে তাদের বাড়ীর চারতলার ছাদ থেকে স্বাতী পড়ে যায় তার স্বাভাবিক অন্যমনস্কতার ফলে। বাঁচবার কোনই আশা ছিল না, শরীরের অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ অস্থি-উপাস্থিগুলি ভয়ঙ্কর জখম হয়েছিল—তার উপর মাথাতেও বেশ চোট লাগায় সেখানকার শিরা-উপশিরাগুলিও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অবস্থায় ওর হতভাগ্য বাবা-মা ওকে কোনক্রমে এই হাসপাতালে রেখে দিয়ে যান। প্রায় পাঁচমাস ধরে চিকিৎসা করার পর ওর শরীরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে এলেও কয়েকদিন ধরেই সে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে অনুযোগ করতো এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য, কেননা ওর প্রতি রাত্রে গল্প শোনার অভ্যাসের জন্য ডাক্তার ও সিষ্টাররা অনেকেই নাকি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হতেন। অথচ এক রাত গল্প না শুনলে ওর শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অসম্ভব বেড়ে যায়। গতরাত্রে ওকে গল্প শোনাবার নাম করে ডক্টর অধিকারীর মত সিনিয়র হাউসসার্জেন যে অন্যায় ও অশোভন কাজ করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে ওর মনের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, যার জন্য ও আজ হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে চলে গেল। ভদ্রলোক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা, এই যে উনি সুন্দর লোকেদের কাছে গল্প শুনতে চান, এর ফলে যদি কোনদিন ওঁর মনে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ভালবাসার অনুভূতি জন্মায়, তবে নিশ্চয়ই উনি আগের মত সেনসিটিব ও ভাইটাল হয়ে উঠবেন?

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, জানো? তারপর বিষন্নভাবে বললেন—ডক্টর মল্লিক, স্বাতী জীবনে একজনকেই ভালবেসেছিল। আর সেই ভালবাসার পাত্রের হাত থেকেই পেয়েছে সবচেয়ে বড়ো শাস্তি। আজ ওর মানসিক মৃত্যুর পরে ও বেঁচে আছে সেই বিস্মৃত অতীতের একটি ক্ষীণসূত্র ধারণ করে, গল্প না শুনলে ওর কষ্ট বেড়ে যায়। কেননা, এই গল্প শুনিয়েই একদিন ছেলেটি তাকে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। সেদিন ছিল ভালবাসার প্রগাঢ় অনুভূতি—আজ সেখানে পঙ্গু স্নায়বিক চেতনার অসাড় অস্তিত্ব। তাই অপরের কাছে গল্প শুনে শুনে সে তার নৈসর্গিক দাবীটুকু মেটায়। ছেলেটির স্মৃতি স্বাতীর কাছে চিরদিনের মতই লুপ্ত হয়েছে, আছে শুধু তার গল্পের স্মৃতি, যেদিন হারিয়ে যাবে, সেদিনই ঘটবে ওর শারীরিক মৃত্যু।

লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের গভীর চোখ দুটি নিঃসীম ব্যথায় কালো মেঘে অতলস্পর্শী হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ পল্লবগুলিতে কত যুগের বেদনার অভিশাপ জড়ানো—সুন্দর মুখের পটভূমি জুড়ে যেন একটি বিয়োগান্ত জীবনের সাঙ্কেতিক ছবি আঁকা। আস্তে আস্তে উঠে এসে তাঁর কাঁধে একটি হাত রাখতে ফিরে চাইলেন আমার দিকে। সেই নিঃশব্দ মুহূর্ত ক'টির কোন ব্যাখ্যাই করতে পারবো না চৌধুরী, মুখর অতীতের অনেক স্মৃতিকেই সেখানে স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখলাম—যে ট্রাজেডির নায়ক উনি নিজে—

ভদ্রলোক একসময় উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আর একবারও আমার দিকে না চেয়ে ঘর থেকে বাইরের আলো-আঁধারী পথে নেমে গেলেন। চৌধুরী, আমার তখন কি মনে হচ্ছিল জানো?

জীবন আর মৃত্যুর মাঝামাঝি অন্ধকার স্তব্ধ সমুদ্রে আমরা, ডাক্তারেরা জেগে আছি একমুঠো বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ হয়ে। কিন্তু সৃষ্টির অমূল্য নাড়ীস্পন্দনকে বিজ্ঞানের মহৎ আবিষ্কৃতি দিয়ে কি সর্বসময় ফিরিয়ে আনতে পারছি? তাহলে পৃথিবীতে এত অশ্রু কেন ঝরে? এত বেদনা কেন জমে ওঠে?

চিরন্তনী

মাধবী ভট্টাচার্য

শাশ্বত কালের এক ধোঁয়াটে আকাশে
বক পাখীদের মতো ডিমের স্বপ্নে
আর জড়বাদী স্নায়ুধর্মী অজস্র সত্তায়—
বেসাতি করে ফিরি হাটে, নগরে, গ্রামে ও বন্দরে।

দু' দণ্ড যে বসবো অবসর নেই।
দু' দণ্ড যে কথা শুনবো তারই বা অবকাশ কই?

তবু বিদ্রোহী মন আস্ফালন করে—
জঙ্ঘায় আর নিতম্বে তোলে অনুরণন,
আয়ুষ্মান হবার ক্ষণিক সাধনা থেকে
আনে বিচ্যুতি।
আনে বিভ্রান্তি।

মনে হয় আরো আছে।
আরো আছে অরণ্য সকাল,
আরো আছে রোদ-সাগা, শীত-ঝরা হিমাক্ত বিকেল।
আর আছে না-পাওয়ার বেদনা-রাঙানো সবুজ বাসর—
একটি বিজন ঘর,
একটি বিনিদ্র প্রহর,
এবং সব-চাওয়া শেষ-হওয়া একটি অশান্ত বিবেক।

তাই যত ঘুরি তত ভাবি:
পুঁজিহীন সঙ্করপুষ্ট অবসাদে
বিষন্ন বিকেলে
ঘরের কড়িকাঠ গোণা আধেক শেষ না হোতেই
অফুরন্ত ভাবনার স্রোতে
ভেসে বেড়াই।

বেড়াই বিচিত্র খেয়ালে
আর পিপীলিকার পাখা দেখি ঘরের দেয়ালে।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিংগ ফেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই চন্দন চাইলো কানপুরে ফিরে যেতে। চম্পার কাছে ফিরে যাওয়া দরকার, এইমনে হলো তার।

উত্তর-ভারতের সব শহরেই ক্যান্টনমেণ্ট শহর থেকে দূরে—তবে বেনারসে যেন মনে হয়, সামনা-সামনি দুই বিভিন্ন যুগকে দেখা যাচ্ছে পাকাপাকি। ক্যান্টনমেণ্টের সুন্দর প্রশস্ত সড়ক, বাংলো বাড়ী, বড় বড় গাছ—বাজনা বাজে তো উর্দির বাজনা, নয় তো ক্লাবঘরে নাচের বাজনা। শহরটা আদ্যিকালের সাতরঙা চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে ত্রিকালজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো। শঙ্খ-ঘণ্টার বাজনা-বাদ্যিতে তার আকাশ মুখর। গলিপথের দুই পাশে সুউচ্চ পাথরের বাড়ীতে জীবন চলে একেবারেই অন্য ছাঁদে। ভারতের প্রাচীনতম নগরীতে জীবনযাত্রার ছন্দ কয়েক শতাব্দী ধরে আর বদলায়নি। শুধু লক্ষ্য করা যায় বারাণসীধামে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে বাঙালীরা এক নূতন সংযোজন।

ক্যান্টনমেণ্টের ময়দানে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলো বটে ফৌজ, কিন্তু কেমন যেন দুটো দল হয়ে গেল। শহরে না হোক, জৌনপুর, সুলতানপুর, আজমগড়, ফৈজাবাদ ও মির্জাপুরের ছোটবড় ভূস্বামীদের দেরী হলো না। সাতকেলে গাদাবন্দুক, আর বড় বড় তরোয়াল নিয়ে ফৌজ সংগ্রহ করতে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শহরের মান্যগণ্য মানুষদের মধ্যে সে একতা দেখা গেল না। সারদা মিত্র কুলদা মিত্র প্রমুখ ধনী ও কৃতী বাঙালীরা বিদ্রোহের কথাটাকে আমল-ই দিলেন না। সুপ্রতিষ্ঠ ধনী বারাণসী শাড়ী ব্যবসায়ী কুন্দনলাল মিশ্রকে বললেন—মিশ্রজী, কটা সিপাহী রুখে ইংরেজদের হটিয়ে দেবে আর আপনারা নিজের রাজ কায়েম করবেন, এ যে গল্প কথা হয়ে গেল?

বললেন, বেনারস কলকাতা থেকে কতটুকু বা দূরে? কলকাতা তাদের রাজধানী—সেখানে জাহাজে করে তারা আরো ফৌজ আমদানী করবে। নতুন নতুন কামান আনবে। মিশ্রজী, ইংরাজজাতি সকল দিকে শ্রেষ্ঠ। কোম্পানীর আমলে আমি আপনি সুখে আছি। কেন আপনি সকলের কথা শুনে মিছামিছি বালকের মতো চঞ্চল হচ্ছেন?

কুন্দনলাল মিশ্রের সুগৌর মুখ ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠলো। কাঁচাপাকা ভ্রূর নিচে সন্ধানী দুই চোখে বাজপাখী যেমন শিকারকে নখে বিঁধে খেলা করে তেমনই মিত্রজার চোখে চোখ রেখে তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—মিত্র বাবু! আমরা চিরদিন জানছি আপনারা সাহেবদের সঙ্গে এককাট্টা. সেই কথাই আবার নূতন করে জানলাম। পুরনো কথাই নূতন করে জানলাম—নূতন কোন কথা জানলাম না। তবে আপনি জানবেন, আপনি যা ভেবে নিশ্চিন্ত আছেন, তাই শেষ কথা নয়। সাহেবদের কথা বলছেন? কানপুরের কথা শোনেন নি? দিল্লীর খবর রাখেন না?

মিত্রজা অর্থ বৈভবে কুন্দনলালের চেয়ে খুব কম যান না। তাই এ কথার পরেও সমানে সমানে কথা কইতে লাগলেন। বললেন—কে রাজা হলো তাতে আমার আপনার কি মিশ্রজী? আমরা চাই শান্তিতে বাস করতে। অশান্তি চাই না।

—আপনার কথার সঙ্গে আমার কথা জড়াবেন না মিত্র বাবু! আমার সাতপুরুষেও কোম্পানীর চাকরী করেনি কেউ। আমার পরদাদাকে চৈৎসিংহের বাবা কবালা দিয়েছিলেন—সেই থেকে আমাদের ব্যবসা সুরু। আমরা কোম্পানীর বেনিয়ানী স্বীকার করিনি—অন্য কথা দূরে থাক্।

কুন্দনলাল চাকরের হাত হতে সিংহের মাথা বাঁধানো রূপার লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ান। মিত্রজাকে বলেন—আপনার সুবিধার জন্য বলছি—যদি ধকন চৌধুরী লছমণ সিং বা হীরাচাঁদ ক্ষেত্রী বা বাজোরিয়াদের কোন ভাই এসে টাকা চায়, তাদের যেন ফিরিয়ে দেবেন না। যে গরম সময় বলা যায় কি? কিসে কার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়?

কুন্দনলালের কিছুক্ষণ আগেকার কথাতে মিত্রজার যে অপমান হয়েছে এখনো তার জের মেটেনি। মিত্রজা তাই চট করে সহজ ভাবে জবাব দিতে পারেন না। তবে মনে মনে জ্বলতে থাকেন। টাকা দিতেহয় দেবেন তিনি কিছু। তবে বুঝতে ত বাকি থাকছে না, এ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে। নামে 'ধশে বিদ্রোহীদের সাহায্য করে রাজদ্রোহিতা করতে পারবেন না তিনি।

১৮৫৭তে বেনারসে যে ইতিহাস রচিত হলো, তার তুল্য কলঙ্কিত অধ্যায় আর কোথায়?

কর্তৃপক্ষের আশঙ্কাই সেদিনের ঘটনাবলীর প্রধান কারণ। এত ভয় কেন? জেলার জজ গাবিন্স, কলেকটর লিণ্ড বা কমিশনার টাকার কি যথেষ্ট যোগ্য ছিলেন না? আত্মবিশ্বাস ছিল না তাঁদের? কি জন্য তবু তাঁদের কলকাতার দিকে চেয়ে থাকতে হয়েছিলো? আরো সুযোগ্য, সুকঠোর এক শাসকের প্রয়োজন হয়েছিল?

পাটনা ও এলাহাবাদের মধ্যে অবস্থিত বেনারস। মাত্র গতবছরই সাঁওতালরা ক্ষেপে উঠেছিল বিহারে। সাঁওতালদের সে বিক্ষোভ সে নির্মম নিষ্ঠুরতায় নিষ্পিষ্ট হয়েছিলো, তা দেখে থেকে বিক্ষুব্ধ হয়ে

আছে বিহারের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ। সে অসন্তোষ গিয়ে পৌঁছিয়েছে ভূ-স্বামীদের মধ্যেও। তাই কি ভয় পেয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ? ভেবেছিলেন এই টাল-মাটালের দিনে যদি ক্ষেপে যায় তারা, পাটনা থেকে বেনারসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করে, তাহলে তাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হবে।

সম্ভবত: তাদের সেই আশঙ্কার জন্যই নীলকে বেনারসে আসতে হলো।

নীল এলেন মাদ্রাজ থেকে কলকাতা। ফৌজ নিয়ে হাওড়া থেকে রওনা হবার প্রাক্কালে রেলওয়ে কর্মচারীদের উদ্ধত সঙ্গীনের ভয় দেখিয়ে ত্বরান্বিত করলেন কাজ। সমস্ত সময়সূচী ওলোট-পালোট করে স্পেশাল ট্রেণ ছাড়লো নীলের ফৌজ বোঝাই হয়ে।

বেনারসে অবস্থিত 37th N. I. রেজিমেণ্ট যতই বিক্ষুব্ধ হোক তখনো তারা রুখে ওঠেনি। তখন সবে ৩রা জুন। লক্ষ্ণৌএ ঘোষিত হয়েছে জেহাদ। অযোধ্যার নবাবসাহী পুন:প্রতিষ্ঠার জিগীর শোনা যাচ্ছে সেখানে। আজমগড়, ফৈজাবাদ, ও জৌনপুরের অবস্থাও সঙ্গীন।

নীলের মনে হলো, কিছু ঘটবার আগেই তিনি অবলম্বন করবেন চূড়ান্ত ব্যবস্থা। ক্ষেপে উঠবে এই সব সাত টাকা মাইনের সিপাহী আর রিসালাদারগুলো। দুঃসহ এই স্পর্ধাকে তিনি দমন করবেন। এই অন্ধকার অসভ্য মহাউপনিবেশের কালো কালো মানুষগুলোর নগ্ন বুকের তলায় যে বিক্ষোভ বাসা বেঁধেছে, যে অবিশ্বাস জেগেছে শাসক শক্তির প্রতি—নীলের অভিযান তারই বিরুদ্ধে। তারা কিছু করবে কি না, সে পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন কেন?

বিচলিত হলেন টাকার নীলের এই মনোভাব দেখে। কিন্তু নীল তখন কি সামরিক কি সিভিল—কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলাই মানতে রাজী নন। তাঁর সম্ভবত ধারণা হয়েছিলো, সিংহের থাবায় সুরক্ষিত বৃটিশ-মুকুটের মর্য্যাদার ভার শুধু তাঁরই হাতে দিয়েছেন বিধাতা। সেই সর্বশক্তিমানেরই প্রতিভূ। তাঁর শক্তিও কম নয়।

তৈমুরলঙ্গ ও নাদির শাহ—চেঙ্গিজ খাঁ ও মহম্মদ ঘোরী তাঁরা আর কি ইতিহাস রেখে গিয়েছেন? নীল তাঁর এই সব পূর্বসূরীদের নাম মুছে ফেলতে তৎপর হলেন। টাকারকে তিনি বললেন—37th N. I.-কে নিরস্ত্র করতে হবে?

—কেন? তাদের কম্যাণ্ডার মেজর ব্যারেট ত' তাদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দিহান নন?

Just to set an example. এই হলো নীলের কথা।

সিপাহীর কাছ থেকে উর্দি আর অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া—সে এক চূড়ান্ত অবমাননা তার পক্ষে। প্রকাশ্য ময়দানে নগ্ন করে ফেলবার মতোই অবমানিত হয় তার পৌরুষ বিনা দোষে নিরস্ত্রীকরণ করলে।

তবু 37th N. I. আপত্তি করেনি। সিপাহীর জীবন উর্দি পরেই কেটে যায়। গ্রাম থেকে আসা, গ্রামের দর্জির হাতে বানানো সে জীর্ণ জামাকাপড়ের খোঁজ ত' ছুটিতে ঘর যাবার আগে ছাড়া আর কখনো মনে পড়ে না। এলো 37th এর ছয় কম্প্যানী সৈন্যদল। নামিয়ে রাখলো উর্দি ও অস্ত্র সুশৃঙ্খলে।

তখন এগিয়ে এলো ইউরোপীয় ট্রুপ—সঙ্গীন কাঁধে—বন্দুক উঁচিয়ে। সিপাহীরা তখন জানতে চাইলো পল্টনবির কাছে।

নূতন সাহেবকে তারা জানে না। পজনবি তাদের পুরনো ক্যাপ্টেন। তাঁর কাছে তারা জানতে চায় এই আচরণের মানে কি?

উত্তর সত্যিই নেই। তাই অসহায় বোধ করেন পজনবি। তিনি গোঁজামিল দিয়ে উত্তর দেন—যা অর্ডার, তাই মানতে হবে। 37th-কে কেউ বেইমান বলছে না। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় সিপাহী সওয়াররা যা করেছে এ-তারই শাস্তি।

হায় আল্লা—হায় বাবা বিশ্বনাথ—এ কেমন কথা? কেন এই রেজিমেন্টের সৈন্যরা কবে কোন বেইমানী দেখিয়েছে? যে আজ সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তারা নিরস্ত্র হবে? তবে বুঝি পাঞ্জাবের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে এখানে? তারা ত' জানে—যে পাঞ্জাবে যেই ফৌজকে নিরস্ত্র করা হলো, অমনই সশস্ত্র গোরাফৌজ গুলী চালাতে শুরু করলো? না। এখানে তাহ'লে সিপাহীরা সে ভুল করবে না। তারা বলে—হটিয়ে নিয়ে যাও গোরাফৌজ। আমরা নিরস্ত্র হচ্ছি।

তবু এগিয়ে আসতে থাকে ইউরোপীয় সেনাদল। শিক্ষিত ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে এগোয়। চারিপাশে তাকিয়ে চূড়ান্ত অসহায় বোধ করে সিপাহীরা। উর্দি খুলে নিয়েছ সাহেব, হাতের বন্দুক নামিয়ে রেখেছি ঐ সামনে। এখন আমরা নিজেরাই অসহায় বোধ করছি। ঐ উর্দি আর বন্দুকের জোরে আমরাও যে জোর পাই। মনে হয় আমাদের একটা পরিচয় আছে। খুলে নিলে মনে হয়, অখ্যাত গ্রামের অবজ্ঞাত অবহেলিত সেই কিষাণের মতোই নামগোত্রহীন হয়ে গেলাম। তবে কেন সশস্ত্র ঐ ফৌজ দিয়ে ঘিরে ফেলছ?

মরিয়া কোনো বুদ্ধিতে কয় জন এগিয়ে আসে। ছটফট করে তুলে নিতে চায় বন্দুক। হাতে থাকুক বন্দুক। নইলে ঐ যে গোরা ফৌজ ক্রমেই বেষ্টনী ছোট করে ঘিরে আসছে, তাদের চোখে চোখে যেন ইস্পাতের শাণিত নিষ্ঠুর ঝলক।

যেমন সিপাহীরা কয়জন বন্দুক তুলে নিতে চায় অমনিই যে ব্রিগেডিয়ার পজনবি এই রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার তার সমস্ত ওজর আপত্তি দূরে ঠেলে ফেলে নীল এগিয়ে আসেন। নীলের আদেশ বন্দুকের মতোই গর্জন করে ওঠে আর সগর্জনে ঝলকে ওঠে গোরা ফৌজের হাতের বন্দুকগুলো। নয়শো গজ পাল্লা নেওয়া এনফিল্ড প্রিচেট উপনিবেশ রক্ষার্থে বৃটিশের নবতম আবিষ্কার নতুন হাতিয়ার বার বার গরজে গরজে ওঠে নিরস্ত্র ছত্রভঙ্গ এক বিমূঢ় জমায়েতের ওপর। তাজারক্ত ফিনকি দিয়ে ছোটে। আর্তনাদ, গোরা ফৌজের বিজয়োল্লাস, মানুষের ছোটাছুটি, ঘোড়ার হ্রেষারব এক বীভৎস ঐকতান রচনা করে নিমিষে!

—শুধু নিরস্ত্রীকরণের জন্য এই নির্বুদ্ধিতার কোন প্রয়োজন ছিল? কমিশনার টাকারের এই প্রশ্নের কোন জবাব-ই দিতে পারেন না বৃগেডিয়ার পজনবি। আফগান ফেরৎ এই প্রাজ্ঞ যোদ্ধা যুদ্ধ বোঝেন যুদ্ধ করতে জানেন—কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড-কে কি বলবেন তিনি? কোন উত্তরই মুখে জোগায় না তাঁর। নিজেকে পরাজিত বোধ করেন তিনি।

শিখ ও ইরেগুলার সৈন্যদল এসেছিলো প্যারেড করতে। গুলী লেগে তারাও হতাহত হয়। তারাও পালটা গুলী ছোঁড়ে আত্মরক্ষার জন্য।

এমনি করে বিশ্বস্ত সৈন্যদের করে তোলা হয় বিদ্রোহী। তারপর শুরু হয় নীলের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

কমিশনার জজ, বা বৃগেডিয়ার—কারু কর্তৃত্ব-ই থাকে না। সব কর্তৃত্বের ভার নীলের হাতে। মানুষের রক্তের স্বাদে বৃটিশ সৈন্যরা ক্ষেপে ওঠে আর মানুষ যখন অমানুষ হয় সে দৃশ্য পশুর হিংস্র মূর্তির থেকে অনেক বীভৎস হয়। ক্যান্টনমেন্টের রাস্তার দুই পাশের গাছে গাছে তৈরী হয় ফাঁসীমঞ্চ। কি ফৌজের সিপাহী, কি সাধারণ নাগরিক সকলকে তাড়িয়ে এনে বিনা বিচারে গাছে লটকে দিতে থাকে নীলের সৈন্যদল। দুরন্ত গরম। তার উপর সুরার নেশায় আগুন জ্বলে মাথায়। আর অসহায় বালক, যুবক ও বৃদ্ধের দেহ ঝটপট করতে করতে নিশ্চল হয়ে ঝুলে পড়ছে, এ দৃশ্য গোরাফৌজের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে দেয় টাটকা আগুন।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে শহর। বিশ্বনাথ ও শত-সহস্র দেব-দেবী অধ্যুষিত পবিত্র ধাম বারাণসীতে এমন ভীষণ দৃশ্য বুঝি কালাপাহাড়ও রচনা করেননি। ভীত, ত্রস্ত জনতা আর্ত্ত ক্রন্দনে প্রাণ বাঁচাতে চায়। উন্মত্ত গোরাদের হাত থেকে কিশোর পুত্রকে ছিনিয়ে নিতে গিয়ে ঘোড়ার খুরের তলায় পিষে যায় কোনো মায়ের বুক। ভারতের এক অর্ধনগ্ন দরিদ্র মায়ের বুকের রক্তও যে কতখানি লাল, তা চেয়ে দেখে না কেউ। দেবতার কাছে মানুষ বৃথাই আর্তনাদ করে মরে। এই ভয়ঙ্কর নারকীয় লীলা দেখেও আর্তত্রাণে নেমে আসেন না কোন সুদর্শনচক্রধারী নারায়ণ। বণিকের দোকান লুঠ হয়ে যায়। তৈজসপত্র গড়াগড়ি যায় রাজপথে।

নীলের সৈন্যদল ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে। নিরীহ মানুষকে গরু-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে এনে ফাঁসী দেয় তারা। যে মরবার আগে এক ঘা ফিরে মারতে চায়—তাকে কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এ এক চূড়ান্ত শাস্তি! মানবদেহের সে দলিত ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শৃগাল-শকুনেই খুঁজে খুঁজে খাবে—সে বিদ্রোহীর কোনো গতি হবে না—না আল্লার বেহস্তে—না হিন্দুর বৈকুণ্ঠে।

তাতেও কি সম্পূর্ণ হলো না শাস্তি? না। তাতেও তো অবনমিত হলো না এরা। আরো যেন রুখে উঠছে সবাই। কারা যেন সাহায্য করছে এদের। ছত্রভঙ্গ মানুষকে সংঘবদ্ধ করছে। হাতিয়ার দিচ্ছে—দিচ্ছে টাকাকড়ি।

নীল এবার এমন অভিনব এক পন্থা বেছে নেন, যাতে বৃটিশের নামের ওপর এক চিরকলঙ্কের মসীলিপ্ত হয়।

সাত, আট, দশ বছরের বালকরা—যারা বড়জোর হল্লা করে—জলদি ভাগ, জলদি ভাগ অংরেজ বেইমান—এই গান গেয়ে নাচানাচি করেছে, আর ঘোড়ার খুরের শব্দ পেতেই এ বাড়ী ও-বাড়ীতে লুকিয়ে পড়েছে—নীল ধরে আনেন তাদেরই।

বেনারসের মাটিতে এবার নির্বিচার শিশুহত্যার অনুষ্ঠান হয়। ভীত, মূক, মূঢ় সেইসব গ্রাম্যশিশু—তাদের ধরে এনে নিজের তত্ত্বাবধানে নীল ঝোলাতে থাকেন ফাঁসীতে। ভয়ে তাদের দেহ মাকড়ার মতোই লটপট করে। হাসতে হাসতে তাদের তুলে টাঙিয়ে দিতে থাকে গোরাসৈন্যরা।

মায়েদের আর্তনাদে আকাশ ফেটে যায়। পিতা ও ভ্রাতারা তাকিয়ে দেখে নিষ্ফল ক্রোধের আগুন চোখে নিয়ে।

নীলের এই নারকীয় হত্যালীলার খবর পৌঁছে যায় বাতাসের

মুখে। বর্ষা নামবার আগে যে পুবালী বাতাস বয়—তাতে এই খবর চলে যায় এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর।

নীলের এই কীর্ত্তির জন্য প্রাণ হারাতে বাধ্য হয় ইংরেজ নরনারী শিশু, সেই সব জায়গায়।

নিজের কীর্ত্তিতে উৎফুল্ল নীল এবার অগ্রসর হতে থাকেন এলাহাবাদের দিকে। আর বেনারস থেকে এলাহাবাদের পথের দুই পাশে রচিত হতে থাকে মহাশ্মশান।

নীলের সে সেনাদলের সঙ্গে ভবানীশঙ্করও আছেন। চন্দন, বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাতেই ভবানীশঙ্করের দাদার আশ্রয় ছেড়ে চলে গিয়েছিলো কুন্দনলালের ভাতিজা বাঁকালালের আশ্রয়ে। ভেলুপুরাতে বাঁকালালের তিনতলা বাড়ী। বাড়ীর নিচে তহখানায় আর একটা সম্পূর্ণ মহল। কাঠের সিঁড়ি ধরে নেমে এসে, সিঁড়ি নামিয়ে রেখে দরজা ফেলে দিলে তহখানার এ মহলের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ থাকল না ওপরের। বাঁকালালের এ তহখানা, এ সময়ে ভারতীয় যোদ্ধাদের বড় কাজে লাগলো। প্রায় দুই মাস ধরে অকাতর অর্থব্যয় ও অসীম পরিশ্রমে এখানে জমা করা হয়েছে বন্দুক, রাইফেল, সঙ্গীন, বেয়নেট, তরোয়াল, ছোরা ও গোলাবারুদ।

শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে তখনই দুই সুনির্দিষ্ট ভাগ হয়ে গিয়েছে। মিত্রজা প্রমুখ বর্ধিষ্ণু বাঙালী ও কতিপয় ব্যবসায়ী, ভূস্বামী ও ধনী লোক সাহায্য করছেন ইংরাজদের। আপাতত শুধু টাকা দিয়ে—তবু নিজেদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে হাজারটা প্রতিশ্রুতি জানিয়ে এসেছেন—প্রত্যক্ষে'ও পরোক্ষে।

কুন্দনলাল প্রমুখ শহরের সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা—তাঁরা যে সহযোগিতা করছেন অপর পক্ষের তা অজানা রইল না কারো। তবে তাঁদের প্রতি সন্দেহটা রইল মনে মনে। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কিছু বলা চললো না।

তিন চার দিন ধরে তহখানা থেকে অস্ত্র সরবরাহে ব্যস্ত রইলো চন্দন। তারপর দেখা করলো ভবানীর সঙ্গে। ভবানী যখন বললেন, তাঁর স্ব-ব্রিগেডের বা মেডিক্যাল অফিসারের অভাবে তিনি এখানেই যোগ দিচ্ছেন, তখন তাঁর কথাগুলি যেন দ্বিধাগ্রস্ত ও বিস্মিত শোনালো। চন্দন কিছু বললো না। ভবানী বললেন—কি জান, আমি চাকরী করি—এ আমার কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য মনে করছি, তাই যেতে হচ্ছে।

—কিন্তু ডাক্তার সাহেব!

—কি চন্দন?

কথা হচ্ছিলো দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণ দিকে—বড় বড় ভাওলোকার আড়ালে শুকনো কাদার ওপর দাঁড়িয়ে। নদী এত নিকটে—তার অপর তীরের বাড়ীগুলির আলো আজ পড়েনি। ঘাটে রোজ এ সময় কত পুণ্যার্থী, কত বিশ্রামেচ্ছু নরনারী এসে বসেন। কয়দিন ধরে সমস্ত নগরীতে নেমেছে বিপদের কালো ছায়া। বাড়ীতে আলো জ্বলে না—মানুষ সহজ ভাবে চলাফেরা করে না, কথা কয় না—পথঘাট জনবিরল। নিষ্প্রদীপ নদীতীর—তবু তারকাখচিত আকাশের ছায়া বুকে ধরে গঙ্গা এক মৃদু আভা বিকীরণ করছে আজ। দুজনেই দুজনের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। আলো নেই—আঁধারও নেই—একটা অদ্ভুত তরল অবস্থা।

চন্দন বলে—আপনি কত সময় আমাকে কত কথা বলেছেন, শিখিয়েছেন—অন্যায়কে আপনি কত ঘৃণা করেন।

—তাই কি চন্দন?

—এখন এতবড় অন্যায়টা আপনার সে কলিজায় এতটুকু দাগা দিচ্ছে না, সেই কথা ভাবি! ভাবি যে এত অন্যায় এত অত্যাচার দেখেও আপনার রক্ত গরম হয় না—আর আপনি কেমন ঠাণ্ডা মাথায় আবার গিয়ে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন! ভাবি যে আপনিও কেমন ওদেরই দলে অথচ ভালো ভালো কথা বলে, সুন্দর করে কথা সাজিয়ে, আমাকে কতই না ধোঁকা দিয়েছেন। ভাবি আর অবাক মানি ডাক্তার সাহেব!

নিজেকে বোঝাতে পারেন না ভবানীশঙ্কর আর চন্দন যে তাঁকে দুর্বলচিত্ত এক মানবধর্মবিচ্যুত কাপুরুষ জেনে চলে যাবে, সেটাও সহ্য করতে পারেন না! বলেন—হ্যাঁ, সাহেবরা অন্যায় করছে জানি—কিন্তু ঐ যুদ্ধের পরিণতি কোথায় চন্দন? নেতা কোথায়? কে এই মানুষগুলোর রাশ টানবে? সাহেবরা এই যে দোষী-নির্দোষীকে এক সঙ্গে মেরে শেষ করে ফেলছে, নির্দোষীদের পাশে কে এসে দাঁড়াচ্ছে? কে তাদের বাঁচাচ্ছে বল? সাহেবদের অনেক শক্তি। তারা গোটা দুনিয়াটার অর্দ্ধেকের মালিক। তাদের রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। হিন্দুস্থানে বিপদ হয়েছে—জাহাজ বোঝাই করে ওরা কতজনাকে এনে ফেলে দেখ। ওরা কি হজম করবে ভেবেছ? এই বেনারস দিয়ে দেখছ না?

এ সংসারে, এ বিভ্রান্তি কি চন্দনেরই মনের অতলে পীড়া দেয় না? বাঁকালালের তহখানার আঁধার নির্জনতায় বসে বসে তার কি বার বার মনে হয় না, যে তারপরে কি, তারপরে কি? কিন্তু সে কথাকে প্রশ্রয় দেয় না চন্দন। বলে—ডাক্তার সাহেব, ভাল যে আমি আপনার মতো লিখিপড়ি মানুষ নই। আজ আপনাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে।

—চন্দন!

—দুঃখ হচ্ছে ডাক্তার সাহেব—যে যখন আমার দেশের মানুষ হাজারে হাজারে মরে যাচ্ছে, তবু রুখে উঠছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে সাহেবদের কারখানা, দোকান, কুঠি নিজের ধর্মে নিজের রাজ কায়েম করতে চাইছে, তখনও আপনি বিচার করছেন। বিচার করছেন, কি ভালো কি মন্দ, কি হবে, কি হবে না। না ডাক্তার সাহেব—আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক ভাগ্যবান। মরতে হয়তো মরবো ডাক্তার সাহেব—এমন সুযোগ আর পাব না। জীবন একবারের। নয় কি? লেখাপড়া শিখে নয়। হৃদয়ের প্রজ্বলন্ত বিশ্বাসে কথা বলে চন্দন, আর এই স্থির সঙ্কল্প তরুণ যুবকের মুখে মৃত্যুকে এমন তুচ্ছ করে দিতে দেখে নিজেকে কেবলই ছোট মনে হয় ভবানীর। মনে হয়, মৃত্যুটাকে ও যে মহনীয় করে তুলতে পারে একটা দরিদ্র ভারতীয় কৃষাণ—সে শিক্ষাটা তাঁর অনেক বই পড়া বাংলা ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যার চেয়ে অনেক মূল্যবান।

চন্দন এবার আরো কাছে আসে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে তার। বলে—গিয়েছিলেন ক্যান্টনমেন্টের পথে? গিয়েছেন অসিঘাট ছাড়িয়ে চৌধুরীদের আমবাগানে?

—না।

—এক একটা মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে গোল পাকিয়ে তবে তাকে ফাঁসী দিয়েছে ওরা। গাছের গায়ে ঝুলছে মানুষগুলো, মুখ দিয়ে তাদের থুথ আর রক্ত গড়িয়ে পড়ে ভিজে গিয়েছে মাটি। ডাক্তার সাহেব, একটা মানুষ মরতে কতক্ষণ লাগে? এক মিনিটে লটকে দিয়ে যন্ত্রণাটা শেষ করে দেওয়া যায় না তার? আপনি ত' এত জানেন—বলতে পারেন?

—চন্দন!

চন্দনের গলা আরো নিচু। সে বলে, সেই মাটির সামনে এখনো উটগুলো বসে আছে আর পাশে কানাতে ঘুমুচ্ছে ওরা। মদ খেয়ে ঘুমুচ্ছে।

—চুপ কর চন্দন।

গঙ্গার জল আসছে। না কি জলের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা? চন্দন বলে—

এত কথা বলতাম না আপনাকে আজ। ডাক্তার সাহেব, এই ছোরা আপনার বুকে ভুঁখে দিয়ে চলে যাব, এই ছিল হুকুম।

ভবানী চেয়ে থাকেন চন্দনের দিকে। মনে কোন ভয় হয় না। চন্দন হাসে। হাসিটা সামান্ত ঝিলিক দেয় তরল আঁধারে। চন্দন বলে—আপনার সঙ্গে আমি বড্ড মিশেছি হঠাৎ কিছু ব'লে দেন সে ভয় ছিলো। কে না জানে সুবিধে মতো খবর জোগাতে পারলে অনেক টাকা পাবেন আপনারা পরে—কোম্পানী নাকি আপনাদের রাজা বানিয়ে দেবে। তবে মারলাম না আপনাকে, কেন জানেন?

—না।

—মারলাম না এইজন্যে, যে জেনেছি আপনাকে ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছে টকার সাহেব আজ দুপুরে। আপনাকে নিজেদের গার্ড পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল সাহেব। বার বার আপনাকে শুধিয়েছে—আপনার সঙ্গী সে ছোকরা কোথায় গেল? আপনি কিছু জানেন না কি? আপনি সব অস্বীকার করেছেন। বলেছেন কিছু জানেন না। আমাকে বার বার সবাই বলেছে, আপনি বেইমানী করবেন, আর কেঁসে যাব আমি ও অক্রুরা—তা এখন দেখছি আপনাকে চিনতে বিশেষ ভুল করিনি আমি। মানুষ আপনি অনেকের চেয়ে সাচ্চা। আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, চলি আমি!

—চন্দন, তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

—না সাহেব!

গলাটা গম্ভীর হয় চন্দনের। বলে—কেমন করে হবে? তুমি চলবে ওদের সঙ্গে—আমার পথ আলাদা। নীল সাহেব, ঐ শয়তানের বাচ্চা, ও নিজে হাতে আমার বাপভাই বাচ্চাদের লটকে দিয়েছে ডালে ডালে। সাহেব, মুসলমানের মুর্দা জ্বালিয়ে দিয়েছে—হিন্দুর মুর্দা দিয়েছে গোর। তাদের ঠাঁই হবে না কোথাও, না বেহস্ত, না বৈকুণ্ঠ। সাহেব, আমার জানের জন্ত খুব মায়া ছিল বলছি তোমায়। এই সেদিন পর্যন্ত। কিন্তু সব যেন মরে গিয়েছে। সাহেব, কপালে থাকে জিতি যাব লড়াইয়ে নইলে আর কি হবে? মরে যাব? না ডাক্তার সাহেব, মরতে আমি আর পরোয়া করি না। তবে—

—তবে কি?

চন্দন ভবানীশঙ্করের দিকে তাকায়। ঘৃণা নয়, তাচ্ছিল্য নয়, একটা বিস্ময় গলায় ফোটে তার। যেন এই মানুষটার মধ্যে যে এত খামতি, এত ঘাটতি আছে—সে কথা সে আগে জানেনি, এখন নতুন করে জানছে। বলে—সাহেব, কানপুরে সাহেবদের কুঠি জ্বালিয়ে দিয়েছে, সাহেবরা গড়বন্দীতে আটকা আছে। চম্পা বলতো তুমি ব্রাইট সাহেবের দুলারীবিবিকে ভালবাসো। কি রকম তোমার কলিজা ডাক্তার সাহেব, আমি সেই কথা ভাবি—জানো না যে তার ওপর সিপাহীদের কত রাগ? তাকেই বুঝি আগে টুকরা করে ফেলবে ওরা। আচ্ছা চলি।

এতক্ষণে চোখে পড়ে ভবানীর—আরো কয় জন এসে দাঁড়িয়েছে। নীরবে অপেক্ষা করছে পিছনে। এবার তারা নেমে আসে। ওঠে নৌকায়। নৌকা গঙ্গা পেরিয়ে যায়। লগি ঠেলে ঠেলে মাঝি নৌকাকে তীর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। নৌকায় বাতি নেই। মানুষগুলো ছায়ার মতো নিশ্চুপ। একলা ফিরে আসেন ভবানী।

ভদ্রলোকের ভদ্রমানস, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন, নানান গোঁজামিলে ভরা। হয়তো ইংরেজীশিক্ষা ও সভ্যতাপুষ্ট নবসৃষ্ট মধ্যবিত্ত সমাজের প্রথম পুরুষের মানুষ। তবু তাঁরই মনে কি কম জোড়াতালি, কম সংশয়? যে জটিল বিবেকবোধ, টাকার সাবেবের বাংলোয় তাঁর মুখ চেপে ধরেছিল—অনেক জেনেও কোন কথা বলতে পারেননি তিনি—সেই বিবেকবোধ বার বার কশাঘাতে রক্তাক্ত হলো ইংরেজ মালিকের অসহনীয় অত্যাচার দেখে। সেই বিবেক-ই তাঁকে করলো বিদ্রোহধর্মী। শতসহস্র সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানের মহান্ রূপও তাঁকে এই সঙ্কীর্ণ

বিবেকের খোলস থেকে টেনে আনতে পারলো না। এই বিভ্রান্ত অভ্যুত্থানের পরিণাম কি, কি হবে এর পরে—এই বিচার করতে লাগলো তাঁর মন। বাইরে যখন ঝড়ে ভেঙে যাচ্ছে সব—তখন নিজের ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে অটুট রাখবার মতো-ই নিরর্থক তাঁর এই প্রয়াস। নিজের রেজিমেণ্টের অভাবে—নীলের সেনাদলের সঙ্গেই চললেন তিনি। দেখতে দেখতে চললেন এক নূতন মহাশ্মশানের দৃশ্য।

এমন দৃশ্য কি আর কেউ দেখেছে কখনো ? শুধু কি গোরাসৈন্য ? কসাইয়ের হাতে নিহত পশুর কবন্ধ যেমন আর এক পশুত্বে-ই টানে—নীলের গোরা সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে রইলো বেতনভুক কিছু দেশী সৈন্য। কোম্পানীর কাছে নিজের আনুগত্য প্রমাণের জন্য কতিপয় ভারতীয় ভূস্বামীর সরবরাহ করা নিজস্ব সেনাদল। চলতো সঙ্গে সঙ্গে ডোম ও মুর্দফরাস।

পথের দুই পাশে বড় বড় গাছ। এই পথ তৈরী করেছিলেন একদিন নবাব সেরশাহ। সেদিন তিনি উত্তর-ভারতের মানুষের গমনাগমনের সুবিধার কথাই ভেবেছিলেন। কোনদিন কি এমন কথা ভেবেছিলেন, যে এই পথ দিয়ে একদিন শ্বেতাঙ্গ মালিকের কুচ চলবে ? পিতৃপুরুষের স্মৃতি অক্ষয় করবার জন্য পুণ্যার্থী হিন্দু মুসলমান একদিন এই পথের দুই পাশে জমি খরিদ করে এক একটি করে বৃক্ষ রোপণ করেছেন। নামকে অক্ষয় করে রাখতে চাননি তাঁরা। তাই তাঁদের নাম কেউ জানলো না। তবু পথের পাশে এই গাছগুলি বীজ থেকে মহীরুহ হয়েছে। শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে। সে তরু যখন কিশোর ছিলো, কৌতূহলে কোনোদিন কোন তরুণী গ্রামবধূ পাল্কী চড়ে ঢাকঢোল বাজিয়ে এসে, আষাঢ়ের প্রথম মেঘসঞ্চারের দিনে সে গাছের পাশে যুঁই চামেলির চারা বসিয়ে দুই গাছের বিবাহ দিয়েছে। গাছকে জড়িয়ে উঠেছে লতা—তারপর সে গাছ দিন থেকে দিনে হয়ে উঠেছে সুবিশাল সমুন্নত। তার সে লতিকাবধূ হয়তো তার পায়ের কাছে জড়িয়ে শান্ত হয়ে থেকেছে। মৃদু বর্ষণে সে প্রস্ফুট ফুলের গন্ধ ছড়িয়েছে শীতল বাতাসে—মনোরম সে কুঙ্কুমসুবাস ভীরু এক গ্রাম্য কিশোরীর হৃদয়ের সরমাবনত প্রেমের মতোই স্নিগ্ধ ও সলজ্জ। তারপর কবে সে লতা মরে গিয়েছে—মহীরুহ হয়তো সে কথা মনেও রাখেনি। তার ছায়াতে এসে বিশ্রাম করেছে কত শ্রান্ত পথিক, কত রাখালবালক। কত পাখি পুরুষানুক্রমে তার শাখায় বেঁধেছে নীড়। ঝড়বাদলের দিনে এই বনস্পতি তার আশ্রিত প্রাণগুলিকে রক্ষা করেছে।

আজ সেই গাছ হয়েছে ফাঁসীমঞ্চ। গ্রাম তাড়িয়ে মানুষ ধরে আনছে সৈন্যরা। তারপর হাসতে হাসতে তুলে দিচ্ছে সেই গাছের ডালে। গলায় দড়ি পরাচ্ছে মুর্দফরাস। পায়ের নিচ থেকে হাতী বা উটের গাড়ী সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় আক্ষিপ্ত হতে হতে থেমে যাচ্ছে অসহায় শরীরগুলো। কোন বৃদ্ধকৃষাণ, কোন তরুণ কিশোর প্রাণভয়ে মিনতি করলে টিটকারী দিয়ে হাসছে সবাই নেটিভ বদমাস আর নিগারগুলোর আচরণ দেখে। প্রাণের জন্য কেঁদে কেঁদে মিনতি জানাতে লজ্জা করে না ? নীলের এ আচরণ

কিন্তু মহম্মত কোন স্বেচ্ছাচারীর উন্মত্ত নরকোল্লাস নয়। এই আচরণের পেছনে না কি নীতি আছে। সে নীতিও নীলেরই বিরচিত। এই কঠোরতা দ্বারা নীল একটা আদর্শ রেখে যেতে চান। যা দেখে নিগারগুলি সতর্ক হয়ে সমঝে যায়। সমঝে গিয়ে তারা স্বীকার করে যে হ্যাঁ ভুল হয়েছে তাদের।

নীলের এই নীতির ফলে কানপুরে অবরুদ্ধ ইংরেজ নরনারী শিশুর ভাগ্যলিপি লেখা হয়ে যায় কালো অক্ষরে।

নীল তা জানতে পারেন না। তাঁকে অনুসরণ করে আকাশপথে উড়ে চলে শকুনির পাল। তারা বুঝতে পারে, যে তাদের খাদ্য জোগাবে ঐ মানুষগুলি।

সৎকারের অভাবে গাছের ডালে ডালে ঝুলতে থাকে মৃতদেহ। সাধারণ দরিদ্র কৃষাণ যে নিজের ভাগ্যের প্রতিবাদ না করে দুইবেলা সামান্য ভাত-রুটি ও লবণ মাত্র পেলে সন্তুষ্ট থাকতো—তাদের সে শান্তি কামনার কোন মূল্যই থাকে না। তারাও যে পিতা, ভ্রাতা, পুত্র—সে পরিচয়ও বোঝা যায় না সে গলিত বিকৃত শবদেহ দেখে।

* * * *

কানপুরে যা ঘটে তাতে নানাধুন্ধুপন্থের প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা ছিল কি না, সে প্রসঙ্গ একান্ত অবান্তর হয়ে যায়। সতীচৌড়াঘাটে যখন নৌকা জমায়েত করা হয়েছিলো, আর ইংরাজ বন্দীদের তোলা হয়েছিলো—সিপাহীরা দেখছিলো পাড়ে দাঁড়িয়ে। ততদিনে এলাহাবাদে পৌঁছিয়েছেন নীল। আর দুঃসংবাদ শুনে শুনে রক্ত গরম হয়ে আছে সিপাহীদের।

স্বেচ্ছাচারী এই শ্বেতাঙ্গ মালিকদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা নখর জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছিলো মনে। বেনারসে ও এলাহাবাদে নীলের নির্বিচার নরহত্যার কাহিনী তারা শুনেছে। তারা জেনেছে যে একবার মুক্তি দিলে একবার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিতে পারলে—এই সব বন্দীরাই নীলের সঙ্গে হাত মেলাবে।

সম্ভবতঃ এই সব যুক্তি কাজ করেছিলো মনে। তারই ফলে সতীচৌড়াঘাটে সে সকালে অনুষ্ঠিত হলো এক শোচনীয় ঘটনা। বন্দী নরনারীর রক্তে লাল হলো গঙ্গার জল। রমণী ও শিশুদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বটে বিবিঘরে—কিন্তু সেও মরণেরই জন্য।

চম্পার বিশ্বস্ততার জন্য, নিজের জীবনের কথা না ভেবে, সে যে মূল্যবান খবর সরবরাহ করেছিলো, সে জন্য মগনলাল প্রমুখ কয়জন তাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। অর্থ বা অলঙ্কারে দাম দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চম্পা তাঁদের পুনর্বার বিস্মিত করলো। না, সে পুরস্কার চায় না। তার আচরণের পেছনে কোন প্রলোভন ছিল না। অলঙ্কার? তার নিজের যা ছিলো, তাই তো সে তুলে দিয়েছে সম্পূরণের হাতে। কিছু চায় না চম্পা। সে কাজ করতে চায়। কোন কাজ?

কানপুরে এখন পেশোয়ার রাজত্ব কায়েম। তবু কানপুরের উপর ভরসা না রেখে যমুনার দক্ষিণে কাল্পীতে তৈরী হচ্ছে বাগী সিপাহীদের ঘাঁটি। কামান তৈরী করবার কারখানা, গোলা, বারুদ, রসদ সব জমা বলে- ভয় ছিলো। কে সেখানে। আরো দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ড টালমাটাল। অনেক টাকা পাবেন ... মারদের স্বর্গ সেখানে। রাজা বানিয়ে দেবে। য অনেক কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখে চম্পাকে। নইলে —না। বোবা হয়ে বুকে চেপে বসতো চম্পার।

সম্পূরণ আর তার সহযোগীরা চম্পার বাড়ীটাকে বলে হল্ট। এইখানে তারা জমা করে বন্দুক, গোলা বারুদ, সেখান থেকে নিয়ে চলে যায় কাল্পী। এখানে সেখানে যুধ্যমান তাঁতিয়ার সৈন্য প্রয়োজন মাত্র-ই কাল্পী থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারবে ঘাটতি সাজসরঞ্জাম ও রসদ। তা ছাড়া ছাড় চিঠির দফতর খুলে বসেছে এক নওজোয়ান মুনসী। প্রয়োজনে যাতে সে ছাড় চিঠি দেখিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় শত্রুবেষ্টনী থেকে। আরো কত চিঠিপত্র ছোট্ট শীলমোহরে রুটি ও পদ্মফুলের ছাপ। বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণে না কি শাদার ওপরে উদ্যত একখানা লালরঙের হাত—এই হয়েছে ভারতীয়দের ছাপ। সিপাহীদের লেখাপড়ার বালাই ত' কোনদিনও ছিল না—এত চিঠিপত্র আসে কোথা হতে?

সম্পূরণ চম্পাকে বলে, এইগুলো তোর হেফাজত। তুই দেখবি—আর দরকার হলে নষ্ট করে ফেলবি, খেয়াল থাকে।

কখনো বলে, যদি এসে পড়ে অংরেজ—তুই নিজের গাঁয়ে পালিয়ে যাস চম্পা।

—যাব।

মনে মনে চম্পা ভাবে, গেলে একা ত' যাব না। চন্দনের আগমনের প্রতীক্ষা করে চম্পা। প্রতীক্ষাটা যে এমন হবে, তার সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো শক্ত হাতে টেনে রাখবে, যন্ত্রণায় টনটন করবে সব—থেকে থেকে সব ভুল হবে যাবে, কথা শুনতে শুনতে কথা হারিয়ে যাবে কান থেকে, সবিস্ময়ে একবার বক্তার মুখের দিকে চাইবে, আর একবার নিজের হাতের দিকে চেয়ে মনে করতে চেষ্টা করবে কি কথা, কোন কথা, তা জানতো না চম্পা।

জানতো না, যে আজকাল এত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেকে শুধু একলা মনে হবে—প্রত্যাগত কোন সৈনিককে দেখলেই ছুটে গিয়ে জানতে চাইবে সে, দেখেছে কি সে সৈনিক চন্দনকে? জানতো না, যে রাতে শুয়ে ক্ষণিক বিশ্রামের মধ্যেও মনটা শুধু স্বপ্ন দেখবে সেই গ্রামের নদী, সেই বটগাছ, সেই বনভূমির। তার মায়ের মুখখানি আজকাল কেন মনে পড়ে? যে সব কথা এতদিন মনে হয়নি, সে সব কথা কেন আজ মনে হয়? মায়ের কোলের কাছে শুয়ে তাদের ভাঙা ঘরের জানলা দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে রূপকথার সবটুকু শোনা হয়নি চম্পার। আজকাল কেন সেই রূপকথার বাকিটুকু শুনতে সাধ যায়! মনে হয় বেণী বাঁধা সেই ছোট্ট চম্পা হয়ে সন্ধ্যেবেলা ছুটে এসে মায়ের কোলে ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে বলে—বড় ভয় পেয়েছি মা গো। মাতার কাছে এমন আঁধার—আজ আর কাজ করিস না মা—আজ আমাকে তুই গল্প বল!

মায়ের মুখখানিতে ঝিকমিক লালচে আলো পড়ে কেমন মানাতো দেখাতো যামনবমীতে জানকীমাঈয়ের মুখের মতোই সুন্দর।

সেই সব কথা মনে হয়। আর মনে পড়ে সে আর চন্দন হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে বটগাছের নিচে। চন্দন তার কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। আবার মনে হয়, এ সেই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ শৈশবের দিন। সে আর চন্দন ছুটে চলেছে—গ্রামের রাস্তায় বাঁদরওয়ালা এসেছে। খেলা দেখাচ্ছে। দুইজনের হাতে হাতে ধরা। পুবদিকের বাতাসে মুখ-চোখ ধুয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে বিদায় নেবার আগের দিনের কথা। তার এই ঘরে—এমনি সময়—

বাতি জ্বালেনি চম্পা। চন্দনের বুকে মাথা রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। আজ আর তার চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছে না চন্দন। দুই বাহুতে ধরে আছে তাকে। নিবিড় সে আলিঙ্গনে দুজনে যেন নিশ্চল দুই পাষাণ প্রতিমা।

মনে পড়ে সব। মনে পড়ে আর নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। বড় একলা মনে হয়। চন্দন কেন আসে না? কবে চন্দন আসবে? চন্দন এলে সে সম্পূরণের কাছ থেকে ছুটি নেবে। সে আর চন্দন ফিরে যাবে তাদের গাঁয়ে—তাদের ডেরাপুরে। গ্রাম তাকে রাখতে চায়নি—সেও অভিমানে তার গ্রামখানির কথা ভাবেনি এত দিন। কিন্তু কোথায় ঘুমিয়েছিলো তার নাড়ীর বন্ধন। এখন সেই গ্রাম, তার মাটি, তার নদী, তাকে বার বার ডাকছে।

সহসা বদলে গেল হাওয়া। বিভ্রান্ত ক্লান্ত সৈনিকরা দলে দলে ফিরে আসতে লাগলো কানপুরে। রাস্তায় ধুলো উড়তে লাগলো মানুষের পায়ে পায়ে। ফিরে আসছে বাঘাসিপাহীরা। বৃদ্ধ, তরুণ ও যুবক—সকলেরই পোষাকে নাগরার ধুলো—ধুলোর জাল সমস্ত শহর ভরে ফেললো। তারা নিয়ে এসেছে চরম বিপদের সংবাদ। কানপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে হ্যাভলকের বিজয়ী ফৌজ। সতীচৌড়া ও বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে প্রতিশ্রুত সমস্ত ইংরাজ। নিহত ইংরাজের মাথা-প্রতি কত শত ভারতীয়কে প্রাণ দিতে হবে তার হিসাব তারা ঠিক করে নিয়েছে। শোনা গেল এবার যা হবে, তার কাছে নীলের হত্যাকাণ্ডও তুচ্ছ হয়ে যাবে। খবর এলো উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে। বিদ্রোহের সূচনার ইঙ্গিত পেতেই সেখানে কুপার পাঁচ শতাধিক সিপাহী ও গ্রামবাসীকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে। নৌকা বোঝাই করে নদীতে ডুবিয়ে, গুলী করে, ফাঁসী দিয়ে এবং কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে। একটি কুয়োতে হত ও আহত, জীবিত ও মৃতকে একই সঙ্গে সমাধিস্থ করেছে কুপার। সগর্বে ঘোষণা করেছে—There is a well at Cawnpore, but there is also one at Ujnalla!

সাতান্ন সালের হাওয়া বদলাচ্ছে দ্রুত। বিদ্রোহের ক্ষেত্র আর উত্তর-ভারত নয়—বুন্দেলখণ্ডের দিকে যেতে হবে। কাল্পীকে করতে হবে প্রধান ঘাঁটি। কানপুরের নাম চলে গিয়েছে কালো খাতায়।

কানপুরের আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। কানপুরের মানুষ গরুর গাড়ী, উটের গাড়ী, অথবা কাঁধে বোঝাই দিয়ে জিনিসপত্র শহর ছেড়ে সরে যেতে লাগলো। দোকানী দোকান বন্ধ করবার কথা ভাবলো না—গৃহী ঘর বন্ধ করতে ভুলে গেল—মরিয়া হয়ে প্রাণের আতঙ্কে তারা চলে যেতে লাগলো। ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা শহরের মানুষের আচরণ দেখে আরো দূর-দূরান্তের গ্রামে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করলো। সাধারণ শান্তিকামী মানুষ প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কারু কোন কথা মনে রইলো না। গরু, ছাগল, ভেড়া—গৃহপালিত জন্তুগুলিকে তারা ছেড়ে দিয়ে গেল। কোন পিছুটানের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয় এখন।

সম্পূরণ ও তার দলবল অস্ত্রশস্ত্রের সকল সঞ্চয় নিয়ে চললো কাল্পী অভিমুখে। সেখান থেকে দরকার হয় আরো দক্ষিণে ঝাঁসী যাবে—নয়তো ছড়িয়ে পড়বে ছোট ছোট দলে—বান্দার নবাব বা বাণপুর ও শা'গড়ের রাজার দলে যোগে দেবে।

আতঙ্কিত নরনারী শিশুর হট্টগোলে আকাশ-বাতাস মুখর। চম্পাকে সম্পূরণ বললো—সব ফেলে রেখে চল।

—আমি যাব না;

—যাবি না?

—না বুড়া।

চম্পাকে গালি দিতে সুরু করলো সম্পূরণ। বললো—তোকে রেখে যাব এখানে? মারতে মারতে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে যাব।

—আমি যাব না।

—হতভাগী, অংরেজ ক্ষেপে গেলে কি চেহারা ধরবে তা জানিস? তোকে ছেড়ে দেবে?

—না দিলো।

—ফাঁসীতে মরবি? কামানের মুখে মরবি?

চম্পা সম্পূরণের কাঁধে হাত রাখলো নিঃসঙ্কোচে। বললো—বুঢ়া, আমার জানের এখতিয়ার তোমাকে কবে দিয়েছি? আমি যাব কেন?

—দেখছ না, যে যা পাচ্ছে কাগজপত্র এখানে ফেলে রেখে যাচ্ছে? সেগুলির ব্যবস্থা কে করবে? মগনলালের ভাতিজা আনতে গেল তোমাদের নক্সা আরো কাগজপত্র। মগনলালরা সবাই চলে যাচ্ছে জয়পুর, জান?

—হারামী।

—পয়সাওয়ালা মানুষ কবে বিপদে পড়ে বল? তুমি কি ভেবেছিলে পড়ে পড়ে মার খাবার জন্যে সে বসে থাকবে এখানে?

—তোকে একলা কেমন করে রেখে যাব চম্পা?

চম্পা সম্পূরণের দিকে চেয়ে হাসে। বলে—কেন? আমার সাহেব আসবে না? অংরেজ ফৌজ যদি আসে তার সঙ্গে আমার সাহেবও আসবে।

—ঠাট্টা করিস না চম্পা!

—কে ঠাট্টা করছে? আর আমি কেন যাব বুঢ়া? আমি ত কোনো অন্যায় করিনি? তুমি একটা কাজ করে যাও।

—কি?

—আমিও পালাব ঠিকই। তবে যদি অসুবিধা হয়? তুমি জালচিঠি আর ভুয়াখবরের কাগজগুলির পেটিটা আমাকে আলাদা করে দাও। দেখালে পরে হয়তো সাহেব বিশ্বাস করবে আমাকে। বিশ্বাস করবে যে আমি এখনো তাকেই সাহায্য করছি, আমি কোনদিনও তার বেইমানী করিনি।

সে পেটি দেয় সম্পূরণ। তবে সমবেদনায় দুঃখ-মলিন হাসে। বলে—সাহেবরা মূর্খ নয় চম্পা। তোর এ ধোঁকা বাচ্চার খেলার মতো। এক নিমিষে ধরে ফেলবে তারা।

—ততক্ষণে আমি ঠিক বেরিয়ে যাব। ভুল বোঝ কেন, বুঢ়া? আমি মরতে চাই না। বাঁচতেই চেষ্টা করব।

সেই রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে চলে গেল সম্পূরণ। চম্পার অনেক দিনের সঙ্গী। একলা যৌবনের অভিশাপ নিয়ে বিপদে পড়বে চম্পা, তাই ভেবে সম্পূরণ একদিন তার সঙ্গে এসেছিলো। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে কেটেছে দিনগুলো। আজ বিদায় নেবার সময়, সম্পূরণের পাষাণ বুকখানার নিচে একটা অজানা অনুভূতি ঘা দিতে লাগলো। অবাক হয়ে গেল সম্পূরণ। এরই নাম যে

স্নেহমমতা তা সম্পূরণ জানে না। চম্পা কাঁদলো। কাঁদবার সময় এ নয়। গুছিয়ে নিলো বিছুয়া, পাপথুব। জামার ভেতরে আঙিয়াতে রাখলো ছোট্ট একটি পিস্তল। রূপোর তৈরী বিলাতী জিনিব বহু মূল্য। চামড়ার খাপে ভরে তাকে রাখলো উত্তপ্ত বুকের ঠিক ওপরে। তারপর বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো মণ্ডীতে।

সব্জীমণ্ডীতে বড় বড় ঘাসের সব্জী! পলায়নপর নাগরিক ও সিপাহীদের কাছ থেকে ঘাস বিকিয়ে সোনার দাম নিতে পারতো সব্জীওয়ালা। আজ সেখানে কোন বিক্রেতা নেই। সেখানে যে খুসী আসছে, যথেচ্ছ তুলে নিচ্ছে ঘাস—চলে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে এলো বাড়ীতে।

আবার গেল বিকালে—রাত অবধি বসে থাকলো—চলে এলো আবার।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতে আকাশ ঝেঁপে গড়িয়ে গড়িয়ে এলো মৌসুমী মেঘ। কালো মেঘে আকাশ মেদুর হলো মানে বর্ষা আসছে। বর্ষা এলে সুগম হবে নদীপথ। আর পাহাড়ী নদীগুলি যদি ফুলে ফেঁপে ওঠে, তবে বাধা পাবে বৃটিশ ফৌজের অগ্রগতি।

ঠাণ্ডা বাতাস বইতে সুরু করলো। এ হলো বর্ষণের অগ্রদূত। চম্পা বসে বসে সম্পূরণদের সমস্ত কাগজপত্র পোড়ালো একদিন। বৃটিশ কুঠি লুণ্ঠনরাজের আসবাব, এটা সেটা, ক্যান্টনমেন্টের বাজারে মাঝপথে আজও পড়ে আছে। সেগুলি ওরা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি কেন?

ধীরে ধীরে সহর ফাঁকা হয়ে গেল। তারাই রইলো, যারা বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছে, যারা লুকিয়ে খবরাখবর দিয়েছে ইংরেজদের। আর রইলো কিছু শান্তিকামী মানুষ। তারা কিছুতেই ছেড়ে গেল না সাতপুরুষের ভিটে। বললো, কি দোষ করেছি? পিতৃপুরুষের বাড়ী ছেড়ে যাব কেন?

বাড়ী মানে ত চালাঘর, বড় জোর একটা নিমগাছ, কি দুটো আমগাছ, সেই সঙ্গে কাকু বা ইঁদারাও আছে। সে সম্পত্তি ছেড়ে যেতে এতই কি কষ্ট?

সে সব মানুষকে বোঝানো গেল না। তারা যাবে কেন? তারা ত কোন দোষ করেনি।

বর্ষা আসবার আগেই দুঃসংবাদ এলো। এলাহাবাদে অকথ্য অত্যাচার। এলাহাবাদের আর কানপুরের মাঝে আটকে গিয়েছে চন্দন। চন্দন আর বেঙ্গল রেজিমেন্টের ভাঙাচোরা কিছু ফৌজের জনা চল্লিশ সওয়ারের একটা দল। এখন কানপুরে আসা মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ডেকে আনা। কোন মূর্খ কানপুরে আসে এখন?

তবু চন্দন কানপুরে আসবার চেষ্টা করছে। সব্জীমণ্ডীতে এই কথা শুনে চম্পা চেয়ে রইলো বক্তার দিকে। বক্তা এক প্রৌঢ় সিপাহী। সে ফিরছে জওরারা—তার গ্রাম। সে গ্রামে এখন যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু সেখানে তার স্ত্রী-পুত্র আছে। স্বজনের কাছে তাকে যেতেই হবে।

চোখ ছোট করে জামাকাপড় থেকে ধুলো উড়িয়ে সে চম্পাকে বললো—খেতে দিতে পার কিছু?

হালুইকরের দোকানে আজ তিন দিন ঝাঁপ ফেলা। পিঁপড়ে-মাছি ভনভন করছে। বেসনের লাড্ডু মিললো ক-টা। তাই বাইরে থেকে নোংরা অংশটুকু চেঁছে ফেলে খেলো লোকটা। জল দিলো চম্পা জনশূন্য পাড়ার ইঁদারা থেকে তুলে। যাবার কালে লোকটা বললো—সবাই চেষ্টা করছে দক্ষিণে পালিয়ে যাবার। চন্দন সে সব বুঝেছে বলে মনে হলো না। মনে হলো সে কানপুরে আসবেই। তোমাকে হয়তো চিঠি দিতো। সে ঝামেলা আমি নিতে পারলাম না। গোঁয়ার ছোকরা—এলে পথেই হয়তো মরতে হবে—তা সে সব কথা সে বুঝল না। ঘোড়া জখম হলো, ঘোড়া পাল্টাচ্ছে, কানপুরে না কি তাকে আসতেই হবে।

সে সিপাহী চলে যাবার পরেও চম্পা দাঁড়িয়ে রইলো একা। জনশূন্য পথঘাট। গোরু-ছাগলগুলো চরছে একটা দুটো। পথের ধুলোর ওপর মাছি বসছে, মাছি উড়ছে। ঢিল মেরে জ্বালাবার একটা ছেলে-ছোকরাও নেই, তাই একটা কুকুর আর একটা কুকুরের সঙ্গে নিরুদ্বেগে খেলা করছে। প্রেম করবার নিশ্চিন্ত অবসর তাদের। আকাশে উড়ছে ধূমলরঙের চিল—কাঁ-কাঁ—তীব্র সে ডাকে যেন কোন্ অশুভ সঙ্কেত। আর দুঃসহ উত্তাপ, মেঘচাপা গরম—কিন্তু এত গরমেও চম্পা উত্তাপ পেল না। শঙ্কার একটা ঠাণ্ডা হাত যেন কলজেটাকে মুঠো করে ধরেছে। কি যেন বিপদ হবে!

[ক্রমশঃ।

কপালকুণ্ডলা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অয়ি চির উদাসিনী নারী চিরন্তনী
মূর্ত্তিমতী মধুরতা,—কে তোমারে ধনি,
গৃহকোণে বাঁধি রাখি প্রণয়-বন্ধনে,
জীবন-দয়িতা করি রাখিবে গোপনে?

তব তরে নহে নীতি সমাজ-শাসন,
ছলা-কলা রমণীর বিলাস ব্যসন
তব তরে নহে কিছু; বিযুক্ত শৃঙ্খলে
অপ্রমত্তা তুমি সতী আপনার বলে।

সহজ সংযমপূত বনপুষ্প সমা
চিরশুদ্ধা তুমি দেবি, চির-মনোরমা,
তাই তুমি বুঝ নাই সমাজের নীতি,
সন্দেহ-খাঁচায় পোষা মানুষের প্রীতি;

তাই তব পরাজয়; ধূলার ধরায়
স্বরগের দেবী কভু স্থান নাহি পায়।

ছোটদের আসর

ছয়

বাইরের ডাক

কমলেশ ক'দিনের ছুটী চেয়ে নিল সদাশঙ্করের কাছ থেকে। ঐ ক'দিন সে স্কুলে যাবে না।

শঙ্করদা হেসে জিগ্যেস করে, সারা দিন করবি কি ?

—আমি পুলুর কাছে যাবো।

—কে পুলু ?

—ঐ বুড়োর নাতি। তাকে দেখে অবধি কি রকম যেন আশ্চর্য্য লেগেছে আমার।

—কেন ?

কমলেশ নিজের মনেই বলে, চোখে তার স্বপ্ন, কি করুণ মিনতি। সত্যিই সে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

শঙ্করদা কিন্তু সাবধান করে দেয়, খুব সাবধান, বুড়ো বিশেষ সুবিধের লোক নয়, আমার উপর তো হাড়ে হাড়ে চটা, তোর না কোন ক্ষতি করে।

—সে ভয় নেই শঙ্করদা, নিজেকে সামলে চলতে ঠিক পারবো। যদি কোন বিপদে পড়ি সময়মত খবরও পাবেন।

স্কুলের থেকে ছুটী নিয়ে ঐ ক'দিন কমলেশ সারাক্ষণই প্রায় কাটিয়েছে পুলুর সঙ্গে। সকাল থেকে পুলু তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কমলেশকে দেখলেই তার চোখ আনন্দে নেচে উঠে। খুশি হয়ে বলে, ঠিক সময়ে এসে গেছ, তোমার জন্তেই যে বসে আছি। কমলেশ মৃদু হাসে, তুমি তো আগে আমায় চিনতে না। এত সহজে আমাকে কাছে টেনে নিলে কি করে ?

পুলু উদাস স্বরে বলে, কি জানি, তোমাকে আমার খুব চেনা-চেনা মনে হয়, কোথায় যেন আগে দেখেছি।

সত্যিই যক্ষপুরীর অন্দরমহল এক স্বপ্নরাজ্য ! কমলেশ অবাক হয়ে ঘুরে বেড়ায় পুলুর সঙ্গে, চারদিক দেখে। নিখুঁত ছবির মত সাজানো ঘর, বহুমূল্য কিংখাবের উপর দামী দামী সেকেলে আসবাব। কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, ঝকঝকে পরিষ্কার।

কমলেশ খুশি হয়ে বলে, কি চমৎকার বাড়ী তোমাদের পুলু ! আমার তো লোভ হচ্ছে, এখানে থাকবার জন্তে।

পুলু সানন্দে লাফিয়ে ওঠে, থাক না ভাই আমাদের সঙ্গে, তাহলে তো আমি বেঁচে যাই। একলা একলা যে আমার দিন কাটতে চায় না।

—তোমার বন্ধু এখানে আর কেউ নেই ?

—না শুধু ঐ দাদু।

—তোমার বাবা, মা ?

—মারা গেছেন।

পুলুর জন্তে কমলেশের দুঃখ হয়। বলে, সত্যিই আমি চেষ্টা করবো তোমার কাছে থাকবার, আমার মা-বাবাকে চিঠিতে জিগ্যেস করবো। যদি ওরা—

পুলু থামিয়ে দিয়ে বলে, না আমি তোমার থাকতে বলবো না।

ঐ কথায় কমলেশ অবাক না হয়ে পারে না, কেন ?

—এখানে থাকলে তুমি শুকিয়ে যাবে।

—কি বলছো তুমি ?

—আমি ঠিকই বলছি। একবার একটা পাখী খোলা দরজা পেয়ে এই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আমি তাকে ধরে ফেলি। পুষি। কিন্তু সে বাঁচলো না, শুকিয়ে মরে গেল।

—কেন পুলু ?

—এ বাড়ীর বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে কেউ বাঁচতে পারে না।

—তা হলে তোমরা বেঁচে আছো কি করে ?

পুলু ধীর স্বরে বলে, আমরা যে এখানেই মানুষ। থাক সে কথা, চল তোমায় অন্ত ঘরগুলো দেখাই।

পুলু কমলেশকে নিয়ে গেল এক ঘর থেকে আর এক ঘরে। দামী কাঠের আলমারীতে বোঝাই করা বই দেখে কমলেশ প্রশ্ন করে, এটা বুঝি তোমাদের পড়বার ঘর ?

দিন আগত ঐ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

—হাঁ। আমার ঠাকুরদার বাবার আমল থেকে এঘরে পড়াশুনো করা হয়।

কমলেশ ঘুরে ঘুরে বইগুলো দেখে, এ যে সব বহু পুরোনো বই। আজকালকার কোন বই বুঝি এখানে নেই

পুলু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ।

—কেন ?

—দাদু আনতে দেন না, বলেন, তাহলেই নাকি আমি নষ্ট হয়ে যাবো। বাবা মারা যাবার পর থেকে—পুলু বলতে বলতে থেমে যায়।

কমলেশ কৌতূহল নিয়ে জিগ্যেস করে, বল, থামলে কেন ?

—না বলা ঠিক হবে না, দাদু জানতে পারলে বকবে।

—কেউ কিছু জানতে পারবে না, তুমি বল

পুলু চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে বলে, প্রাচীন জমিদার-বংশের ছেলে আমরা। মস্ত বড় জমিদারী। বাবা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন কলকাতায়। ছাত্র অবস্থা থেকেই দেশের কাজ করতে ভালবাসতেন। তাই স্বদেশী দলে নাম লিখিয়েছিলেন। দাদু জানতেন না। তারপর—

—কি হোল তারপর ?

পুলুর চোখে জল এসে পড়ে, বাবাকে জেলে ধরে নিয়ে যায়।

—জেলে ?

—হাঁ। সেইখানে তাঁর অসুখ করে। মারাও যান। কমলেশ চমকে ওঠে, সে কি, তোমার তখন বয়স কত ?

—এক বছর। সেই থেকে দাদুর মাথা একরকম খারাপ হয়ে গেছে বললেই হয়। একমাত্র ছেলের শোক সহ্য করতে পারলেন না। তাই আমাকে এই বদ্ধ ঘরে মানুষ করছেন। বাইরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে দেন না।

—এ যে আর এক জেলখানা।

—ঠিক তাই। এ জেলখানার মধ্যে মা বাঁচতে পারলেন না। মারা গেলেন। আমি শুধু বেঁচে আছি। চোদ্দ বছর বেঁচে আছি।

কমলেশ কি ভেবে নিয়ে জিগ্যেস করে, তবে আর যাঁরা রয়েছেন তাঁরা কারা ?

—ওঁরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন। কেউ বা নায়েব গোমস্তা। পঞ্চাশ জন লোক ছিল, এখন কমতে কমতে পনের জনে দাঁড়িয়েছে।

—এরাও বেরুতে পারে না ?

পুলু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না, কারুর বেরুবার হুকুম নেই। একমাত্র দাদুই যা মাঝে মাঝে বাইরে যান। এখন তো ওঁরও শরীর খারাপ।

কমলেশের এতক্ষণে মনে হয় পুলুর দাদুর কোন খবর করা হয়নি, প্রশ্ন করে, উনি এখন কি রকম আছেন ?

—আজ অনেক ভালো। যাবে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে ?

—চল।

বুড়ো খাটে শুয়েছিল। কমলেশকে দেখে মৃদু হেসে বলে, কখন এলে ?

—এইতো একটু আগে।

—পুলুর সঙ্গে ভাব হয়েছে ?

—হাঁ, ও আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ী দেখাচ্ছিল।

কথা শুনেই বুড়ো কি রকম চমকে উঠে, সে কি পুলু, ওকে তেতলার ঘরে নিয়ে যাসনি তো ?

পুলু হেসে উত্তর দেয়। ওঘরে কি করে যাবো, চাবি তো তোমার কাছে।

বুড়ো কোমরে বাঁধা চাবিটার উপর হাত দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, না ওঘরে তোমরা কেউ যেও না। ভয় পাবে।

কমলেশ না জিগ্যেস করে পারে না, কিসের ভয় ?

বুড়োর চোখ দুটো জল-জল করে উঠে। সে কথায় তোমার দরকার কি ? খবরদার ওঘরে কেউ ঢুকবে না। একটু থেমে আবার বলে, আমার মত আমি বদলাইনি, তোমাদের ইস্কুলের পাশে চিনির কলই বসবে।

কমলেশ মাথা নীচু করেই বলে, সে আপনার যা ইচ্ছে, শুধু দুঃখ হয় এই ভেবে যে, এমন চমৎকার একটি স্কুল নষ্ট হয়ে যাবে।

—যাক, তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না, পুলু, ওকে নিয়ে যাও অন্য ঘরে।

অগত্যা কমলেশ পুলুর সঙ্গে অন্য ঘরে চলে যায়, পুলু তার হাতটা ধরে বলে, দাদুর কথায় কিছু মনে কোর না ভাই, কখন যে কি বলেন তার ঠিক থাকে না।

কমলেশ সহজ গলায় উত্তর দেয়, না, না, আমি কিছু মনে করিনি।

পুলু কি যেন ভাবছিল, অন্যমনস্ক স্বরে প্রশ্ন করে, তোমাদের তো মস্ত বড় স্কুল, তাই না ?

—হ্যাঁ। অনেক ছেলে পড়ে।

—আমার বড় ইচ্ছে করে দেখতে, কি রকম তোমরা পড়াশুনো কর ?

—বেশ তো, চল না আমার সঙ্গে।

পুলু ভয়ে ভয়ে বলে, দাদু যে বেরুতে দেবে না।

কমলেশ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, দাদুকে না বলে যেতে পারো না ?

পুলু ইতস্ততঃ করে, না বলে ? কি জানি, কখনও তো যাইনি।

—চল না আমার সঙ্গে, কেউ জানতে পারবে না, চট করে ঘুরে আসব।

—তাহলে আর একটু পরে, দাদু আগে ঘুমিয়ে পড়ুক।

বুড়ো ঘুমিয়ে পড়লে কমলেশ আর পুলু আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে যক্ষপুরীর বাইরে। বিরাট আকাশের নীচে ফাঁকা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে পুলু জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। চোখে মুখে তার কি আনন্দ, চারদিকে ছুটে বেড়াতে তার ইচ্ছে করে, বার বার বলে, সত্যি ভাই কমলেশ, এরকম আনন্দ আমি জীবনে পাইনি। বাড়ীর মধ্যে বসে থেকে শরীর মন দুটোই যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, এ যেন নতুন জীবন !

কমলেশ পুলুর পিঠ চাপড়ায়, সত্যি তোমায় দেখে মনে হচ্ছে অন্ধকারে থাকা নেতিয়ে পড়া গাছের চারা, যেন সূর্য্যের আলো পেয়েছে, চল, তোমায় আমাদের স্কুলে নিয়ে যাই, সেখানে গেলে তুমি আরো খুসী হবে।

সত্যিই বিত্তাশ্রমের বাড়ীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে পুলুর আর আনন্দের সীমা থাকে না। বলে, তোমাদের সঙ্গে যদি আমি

পড়তে পেতাম তাহলে এরকম দুঃখ করে জীবনটা কাটাতে হত না।

কমলেশ ভরসা দিয়ে বলে, তোমার দাদুকে বলে এখানে তোমার ব্যবস্থা আমি করব।

পুলু ম্লান হাসে, তার আর কোন উপায় নেই। দাদু এখানে আসতে দেবে না, উনি ভাবেন একবার বাইরে এলে আর আমি ভেতরে যাব না, তারপর হঠাৎ হয়ত একদিন বাবার মত উধাও হয়ে যাব।

অন্য ছেলেদের সঙ্গে কিন্তু পুলু আলাপ করতে চাইল না। কমলেশকে বুঝিয়ে বলে, এদের সঙ্গে ভাব করলে নিজেরই কষ্ট হবে, একলা একলা ফিরে যেতে। তোমাদের মত আমারও খুব কাজ করতে ইচ্ছে করে।

—বাড়ীতে তুমি কাজ কর না?

—করি, কিন্তু তাতে কোন প্রাণের সাড়া পাই না। সে বড় একঘেয়ে কাজ, কর্তব্যের তাগিদই সেখানে বেশী। কিন্তু আর দেরী করব না, চল ফিরে যাই। দাদু যদি জানতে পারে আমি তোমার সঙ্গে বেরিয়েছি, তাহলে আর রক্ষে রাখবে না।

অতি সন্তর্পণে তারা আবার যক্ষপুরীতে ফিরে আসে, বুড়োর ঘুম আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তবে ভাগ্য ভাল পুলুর। দাদু তার কোন খোঁজ খবর করেননি এর মধ্যে। বাড়ীর লোকেরাও কেউ বলে দেয়নি।

বুড়ো কমলেশকে এক সময় একলা পেয়ে কাছে ডেকে বসায়, বুঝিয়ে বলে, পুলু যদি এবাড়ীর বাইরে যেতে চায়, তুমি কিছুতেই নিয়ে যেও না।

—কেন?

—বাইরে গেলে ওর অসুখ করবে। বড় দুর্ব্বল শরীর ও খোলা হাওয়া সহ্য করতে পারে না। একটু থেমে বুড়ো আবার বলে, জানতো, ঐ পুলুই আমার একমাত্র বংশধর, ওর কোন ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

কমলেশ ভালো ছেলেটির মত বলে, আপনি যখন বারণ করছেন কেন নিয়ে যাবো?

—বাইরের গল্পও বেশী করো না ওর কাছে। তাহলেই ওর বাইরে যেতে ইচ্ছে করবে।

—করবো না।

বুড়ো হাত দিয়ে ভুরু পাকাতে পাকাতে বলে, আর একটা কথা। তুমি যে এ বাড়ীর অন্দর মহলে ঢুকেছো, জানতে পেরেছো এখানকার কথা, তা কাউকে বলবে না, এমন কি তোমাদের শঙ্করদাকেও না।

কমলেশ যে বুড়োর কাছে শুধু মুখের কথা দিয়ে এলো তাই নয়, সত্যিই সে যক্ষপুরীর অন্দরমহলের কথা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করেনি। এমন কি, পরদিন পুলু যখন বলেছে, চল না কমল, আজ আবার বেড়িয়ে আসি—

কমলেশ জানিয়েছে, না ভাই, তা হয় না।

—কেন?

—তোমার দাদু বারণ করেছেন।

পুলুর চোখে জল এসে পড়ে। কাল তোমার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যে কি ভালো লেগেছিল, খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে কত বেশী শক্তি পেয়েছিলাম।

—তোমার দাদু যে বলছেন বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে?

পুলু মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে, এই জেলখানার মধ্যে থাকলেই আমার শরীর ভেঙ্গে যাবে; তখন দাদু বুঝতে পারবেন।

কথা ভুল নয়, কয়েক দিনের মধ্যেই পুলু অসুখে পড়ে। মন তার খারাপ, চুপচাপ খাটের উপর শুয়ে থাকে। কারুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না। কমলেশ এলে তবু পুলু একটু ভালো থাকে, অন্য সময় আরও যেন নেতিয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে কাঁদে। অন্দরমহলের ডাক্তার কিছুতেই পুলুকে সুস্থ করে তুলতে পারে না। বাড়ীর সকলের ভাবনা। বুড়োও যে ভেতরে ভেতরে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে তা কমলেশ জানতে পারলো দু'দিন পরেই।

সেদিন রাত্রে পুলুকে ঘুম পাড়িয়ে কমলেশ অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এল, মনটা তারও খারাপ। পুলুর চোখে সে দেখেছে কেমন যেন এক উদাস দৃষ্টি, নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে ভারী গলায় বুড়ো ডাকল, কমলেশ, শোন।

কমলেশ বুড়োর কাছে এগিয়ে যায়, কিছু বলছেন?

বুড়ো কমলেশের কাঁধে হাত রেখে বলে, পুলুকে বাঁচাতেই হবে, ও দেখছি তোমার কথাই যা একটু শোনে।

—সেজন্যে আমি তো রোজই আসছি।

—জানি তুমি পুলুকে ভালবাস, তাই বলছি, আমি আর কোন বাধা দেব না, যা করলে মনে হয় ওর ভাল হবে, তুমি কর।

কমলেশ একটু ভেবে নিয়ে বলে, আমার ইচ্ছে করছে দু'-একজন বন্ধুকে নিয়ে আসতে, তাদের সঙ্গে গল্প করলে হয়ত পুলুর মন ভাল হবে, ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠবে।

বুড়ো কমলেশকে কথা শেষ করতে দেয় না, সাগ্রহে বলে, তোমার যদি তাই মনে হয় তাদের নিয়ে এস, আমার কোন আপত্তি নেই।

কমলেশ হোষ্টেলে ফিরেই প্রশান্তকে নিয়ে গেল রেণুকার কাছে, তিন জনে মিলে বসল তাদের ঘরোয়া বৈঠক। পুলুর বিষয়ে সব কথা জানিয়ে কমলেশ বলল, ওকে আমাদের বাঁচাতেই হবে, বড় ভালো ছেলে, কাল সকালে তোমরাও চল আমাদের সঙ্গে।

রেণুকা সায় দিয়ে বলে নিশ্চয় যাব, কিন্তু এখানকার কাজগুলো কে করবে?

সে আমি শঙ্করদাকে বলে ব্যবস্থা করে দেব। রেণুকা নিজের মনেই বলে, আমি পুলুর জন্যে ফুলের তোড়া নিয়ে যাব। বাইরের ফুল দেখলে সে নিশ্চয় খুসী হবে। প্রশান্ত বলে, আমি নিয়ে যাব বই, আজ লাইব্রেরী থেকে বেছে রাখব ভাল ভাল বই, যা পড়তে ওর খুব ভাল লাগবে।

পরদিন সকালবেলা যক্ষপুরীতে যেন নতুন জীবনের সাড়া এল। কমলেশ রেণুকা আর প্রশান্ত এসে ঢুকলো অন্দর মহলে, বুড়ো তাদের সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল পুলুর কাছে। নতুন বন্ধুদের দেখে পুলুর সে কি আনন্দ। সারা মুখে হাসি, চোখে আনন্দাশ্রু। সাগ্রহে

বলে, এস ভাই তোমরা বোস আমার কাছে। তুমি নিশ্চয় দিদি, তোমার কথা কমলেশের কাছে কত শুনেছি। তুমি ভাল ছবি আঁকতে পার, তাই না?

রেণুকা নীরবে সম্মতি জানায়, পুলুর শীর্ণ কপালে স্নেহের হাত বুলিয়ে দেয়।

পুলু প্রশান্তর দিকে হাত বাড়ায়, তুমি নিশ্চয় প্রশান্ত খুব ভাল খেলতে পার?

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বলে, এবার থেকে তুমিও যে আমাদের সঙ্গে খেলবে।

—আমি কি পারবো?

—ঠিক পারবে। একবার সেরে ওঠ, দেখ না তোমায় কি করি। আমাদের দলে যখন পড়েছ—

এতক্ষণে পুলুর নজরে পড়ে ফুলের তোড়া, রেণুকা যা সযত্নে বেঁধে নিয়ে এসেছে। সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, কি সুন্দর ফুল, কত রকম রঙ। কি চমৎকার!

রেণুকা হেসে বলল, আমি তোমার জন্যেই নিয়ে এসেছি। রোজ এমনি নিয়ে আসব।

—তোমরা রোজ আসবে আমার কাছে, আমরা এ রকম বসে বসে গল্প করব।

—নিশ্চয় আসব।

রেণুকা কিন্তু এই বদ্ধঘরের মধ্যে অস্বস্তিবোধ করে। চারদিকে তাকিয়ে বলে, এ কি, সব জানালা-দরজা বন্ধ কেন? এতে কখনও অসুখ সারে? খুলে দাও সব—

পুলু দাদুর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, না থাক, আমার যদি আবার ঠাণ্ডা লাগে।

—মোটেই ঠাণ্ডা লাগবে না, খুলে দাও সব। পুলু কিন্তু সত্যি ভয় পায়, বোঝে দাদু হয়ত অসন্তুষ্ট হয়ে এদের বার করে দেবে। তাই মিনতিভরা চোখে দাদুর দিকেই তাকায়। আশ্চর্য্য, দাদু কিন্তু আজ রাগ করেননি, শুকনো হাসি লেগে রয়েছে তাঁর মুখে, ধীর স্বরে তিনি বললেন, তাই কর কমল, জানালা খুলেই দাও।

শুধু এই কথাটুকুর জন্যেই যেন কমলেশরা অপেক্ষা করছিল, ছুটে গিয়ে খুলে দিল জানালা, সরিয়ে দিল বিরাট ভারী মখমলের পর্দ্দা, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল এক ঝলক রোদ আর তারই সঙ্গে ঠাণ্ডা মিষ্টি প্রভাতী হাওয়া। এক মিনিটের মধ্যে সারা ঘরের চেহারা গেল বদলে, সেই হিমেল ঠাণ্ডা ঘরে ফিরে এল জীবনের উষ্ণতা। পুলু সাগ্রহে খাটের ওপর কনুই-এর ভর দিয়ে উঠে বসে। হাতজোড় করে প্রণাম করে বাইরের আলোকে, হাওয়াকে, অন্তরের সবটুকু ভক্তি দিয়ে।

সকলের মুখেই হাসি। আস্তে আস্তে বাড়ীর লোকেরা সবাই এসে হাজির হয়, সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, চোদ্দ বছর বাদের এই নিয়মের ব্যতিক্রম, আরও অবাক হয় তারা বুড়োর দিকে তাকিয়ে, শান্ত, সৌম্য সে চেহারা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন পুলুর দিকে। চোখে তার অকৃপণ স্নেহ।

[ক্রমশঃ।

ফিতে কেটে জুড়ে দেওয়া

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

একটা সিল্কের ফিতের ঠিক মাঝখানটাতে বসিয়ে দেওয়া হল কাঁচির এক পোচ—কচ্ করে কেটে গেল ফিতে দু' টুকরো হয়ে। এর পরে ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লাম—

চট্‌পট্ চট্‌পট
লাগ লাগ ভেল্‌কী
ফিতে কেটে জুড়ে দেওয়া
শুধুই তা' খেল কি?
জুড়ে যা জুড়ে যা
কাটা ফিতে ঝট পট
চটপট যাদু লাগ
যাদু লাগ চট পট

ফুস মন্তরে জুড়ে গেল ফিতেটা। দেখে তো সবাই অবাক! কেমন করে এই আজব কাণ্ডটা ঘটে গেল সবার চোখের সামনে বলতে পার? এই খেলাটা দেখাতে হলে আগে থেকেই ফিতেটার ভেতরে একটু কারসাজি করে রাখতে হয়। করতে হয় কি জানো? —একটা হাত দুয়েক লম্বা সিল্ক অথবা সূতীর রঙীন ফিতে নিয়ে তার ধার থেকে আঙুল ছয়েক লম্বা একটা টুকরো কেটে নিতে হয়। এর পরে একটুখানি মোম (মৌচাকের) নিয়ে তার ছোট্ট দু'টো ঢেলা বানিয়ে তা লাগাতে হয় এই টুকরো ফিতের দু'প্রান্তে একই পিঠে। যে ফিতেটা দিয়ে খেলা দেখাবে তার ঠিক মাঝখানটাতে ছবিতে যেমন দেখানো আছে তেমনি করে এখন বসিয়ে দিতে হবে এই ফিতের টুকরোটাকে আঙুল দিয়ে চেপে। ধারে মোম লাগানো থাকার ফলে সহজেই এটা বড় ফিতটার সঙ্গে সেঁটে যাবে। টুকরো ফিতের মাঝখানটা কিন্তু থাকবে আলগা। খেলা দেখানোর সময়ে বড় ফিতের এক প্রান্ত ধরে এমন উঁচু করে ধরতে হবে যাতে এই টুকরো ফিতে লাগানো দিকটা থাকে দর্শকদের উল্টো দিকে। ফিতেটাকে ভাঁজ করে যখন মাঝখানটা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের উপরে তুলবে তখন কিন্তু আসল ফিতের মাঝখানটা না তুলে

টুকরোটার মাঝখানটা তুলে ধরবে আর সেইটাতেই কাঁচির পোচ লাগাবে। আসল ফিতের মাঝখানটা বাঁ হাতের আঙুলের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকায় ফলে দর্শকেরা কিছুই বুঝতে পারবে না। কচাকচ কাঁচি চালিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ফিতের টুকরোটাকে আর সঙ্গে সঙ্গে আঙুলের টানে মোমের ঢেলার সঙ্গে লাগানো ফিতের অবশিষ্টাংশ ছুটোও ফেলে দেবে। [তোমাদের সহকারী যেন সঙ্গে সঙ্গেই এই টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়]

বাকীটুকুন তো খুবই সহজ। হাত পরিষ্কার দেখিয়ে ফিতেটাকে খুলে ধরা। মোম খুব কাঁচা হলে ফিতের গায়ে চটচটে দাগ পড়ে যেতে পারে। কাজেই জুড়ে যাওয়া ফিতেটা দর্শকদের হাতে দিতে সাবধান।

ব্যারোমিটার

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ব্যারোমিটারের নাম তোমরা সকলেই শুনেছ। আবহাওয়ার খবর আমরা ব্যারোমিটারের সাহায্যেই জানতে পারি। আজ তোমাদের আর একরকম ব্যারোমিটারের কথা বলছি। এ ব্যারোমিটার তোমরা নিজেরাই তৈরী করতে পার। এর নাম দেওয়া যেতে পারে ফুলের ব্যারোমিটার।

এর জন্যে চাই রঙীন টিস্যু কাগজ। সরস্বতী পুজোর সময় যে কাগজ দিয়ে চারিদিক সাজানো হয়। আর চাই সামান্য কোবল্ট ক্লোরাইড (Cobalt Chloride) এর দামও খুব বেশী নয়।

বেশ বড় দেখে দুখানা টিস্যু কাগজ যোগাড় কর। একখানা ফিকে গোলাপী (Pink) রঙের আর একখানা নীল (Blue) রঙের।

এইবার এই কাগজ দিয়ে ফুল তৈরী করতে হবে। যতগুলি খুশী ফুল তৈরী করতে পার। তবে তার অর্ধেকটা ঐ ফিকে গোলাপী রঙের, বাকি অর্ধেকটা নীল রঙের হওয়া চাই।

আচ্ছা, এইবার যে কোনো রঙের কাগজ থেকে ৩৬ ইঞ্চি লম্বা আর ৩ ইঞ্চি চওড়া করে একটি ফালি কেটে নাও।

এই ফালির ধর এক প্রান্ত ক অন্য প্রান্ত খ। এইবার ঐ ফালিটির মাঝখানে ভাঁজ কর, যেন ক প্রান্ত খ প্রান্তের ওপর পড়ে। ঐভাবে আবার মাঝামাঝি ভাঁজ কর। মোট চারটে ভাঁজ করা চাই। এইবার ঐ ভাঁজকরা প্রান্তের শেষ দিকের মাথাটা কাঁচি দিয়ে ভাল করে কেটে দাও। তারপর সমস্ত ভাঁজটা খুলে ফেল। কাগজটা খুললে গোলটা ইংরাজী "ইউ"এর মত মাথা (উল্টানো অবস্থায়) পাবে। এইবার ঐ ফালি কাগজটি আঙুলে ধরে আস্তে আস্তে জড়ানো বেশ সুন্দর একটি ফুল তৈরী হবে।

এই ভাবে দু রঙের কাগজে ৬টা করে ১২টা ফুল তৈরী কর।

এখন ঐ কোবল্ট ক্লোরাইডের মেশানো জলে ডুবিয়ে শুকিয়ে নাও। অন্ততঃ দুবার ভিজিয়ে নিলে ভাল হয়।

এখন ঐ ফুলগুলি টেবিলের ওপর ফুলদানিতে রেখে দাও। যখন আবহাওয়া ভিজে বা স্যাঁতস্যাঁতে থাকবে, যেমন বর্ষাকালে, তখন ঐ ফুলগুলির রঙের কোনো পরিবর্তন হবেনা অর্থাৎ ফিকে গোলাপী রঙের ফুলগুলির ঐ রঙই থাকবে আর নীল রঙের ফুলগুলিও নীল রঙের থাকবে। কিন্তু যখন আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে যেমন গ্রীষ্মকাল কিংবা শীতকালে, তখন ঐ ফিকে গোলাপী রঙের ফুলগুলি আস্তে আস্তে গাঢ় লাল রঙ হতে থাকবে আর নীল রঙের ফুলগুলি সবুজ হয়ে যাবে। বেশ মজার ব্যাপার না ?

এর ফলে ঐ ফুলগুলি দেখেই তোমরা বলতে পারবে আবহাওয়া শুকনো থাকবে না জল-বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

যেভাবে ফুল তৈরী করবার কথা বললাম, তাতে অসুবিধা হলে অন্য যে ভাবে ইচ্ছা ফুল তৈরী করে নিতে পার। আর ইচ্ছা করলে ছোট পাতার মত সবুজ কাগজ কেটে লাগিয়ে আরও বাহারী করতে পার। ফুলগুলি সরু তারের সঙ্গে গেঁথে নিলে নাড়াচাড়া করবার সুবিধা হবে।

এখন কেন ফুলগুলির রঙ বদলায় সে কথা বলছি। কোবল্ট ক্লোরাইডের গুণ হচ্ছে বাতাসে আর্দ্রতা কমবেশী হওয়ার সঙ্গে ওর রঙ বদলায়। টিস্যু কাগজের রঙগুলি খুব হাল্কা। জলে ভেজালেই দেখবে রঙ উঠে আসবে। এখন কোবল্ট ক্লোরাইডে ভেজানো ফুলগুলোর ওপর ঐ ক্লোরাইডের একটা পর্দা পড়ে যায়। বাতাসের আর্দ্রতার পরিবর্তনে তাই ফুলের রঙও বদলায়।

পরের বারে তোমাদের আর এক রকম ব্যারোমিটার তৈরী করা শেখাবার ইচ্ছে রইল।

খুকুর চাঁদ ধরা

শ্রীনন্দদুলাল সরকার

খুকুমণি ছুটছে, ছুটছে—খুব ছুটছে। আগে আগে ছুটছে একটা দুধে-বেড়াল—তার পেছনে পেছনে ছুটছে খুকুমণি। আর তারও পিছু পিছু তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাতে লাফাতে ছুটছে পপি, খুকুর পোষা কুকুরছানাটা। তিন জনে মিলে সে কি ছুটোছুটি! কে কাকে ধরতে ছুটছে কে জানে? যেন রীতিমত রেস শুরু হয়ে গেছে। ছুট ছুট ছুট ছুট—

রোজ ভোরবেলায় ননী গোয়ালা যায় বড় বাড়ীতে দুধ যোগান দিতে। আজও যাচ্ছিল সে। হঠাৎ সাত সকালে খুকুমণিকে এই রকম ভাবে দৌড়তে দেখে সে তো অবাক। বললে, বলি ও খুকুমণি! এই সক্কালবেলায় এমনিধারা ছুটছো কেন? বলি যাচ্ছো কোথায় ?

খুকুমণি থমকে দাঁড়ালো। বললো, চাঁদ ধরতে। বলেই দৌড়—

চাঁদ ধরতে? ও মা, সে কি গো? চাঁদ কি কখনো ধরা যায় না কি? কে কার কথা শোনে! খুকু তখন অনেক দূরে দৌড়ে চলে গেছে। নিজের মনেই ননী বললে, বোকা মেয়ের কাণ্ড দেখ দেখি? চাঁদ কি কখনো ধরা যায় রে বাপু? মেয়েটা মিথ্যেমিথ্যি ছুটে ছুটে হয়রাণ হবে, তেষ্টা পাবে। চটপট বড় বাড়ীতে দুধ দিয়ে যেটুকু বাঁচবে আ-হা-হা! যাই, সেটুকু খুকুমণিকেই দিয়ে আসি। ননী পা চালালো তাড়াতাড়ি।

খুকু তখন ছুটছে ময়রা পাড়ার ভিতর দিয়ে।

রসময় ময়রা যাচ্ছিল মিঠাই মণ্ডা নিয়ে বিক্রী করতে শহরে। সামনে দিয়ে হঠাৎ খুকুমণিকে দৌড়তে দেখে সে চিৎকার করে উঠলো, আরে আরে খুকুমণি যে! ছুটে ছুটে যাচ্ছো কোথায়?

চাঁদ ধরতে।

এঁ্যা, চাঁদ ধরতে? কি কাণ্ড! চাঁদ কি গাছের ছোট্ট ফল না কি? যে টুপ করে পেড়ে আনবে? কিন্তু খুকুমণি তখন সোজা দৌড়ুচ্ছে। কথা তার কানে গেলে তো! রসময় বড্ড ভালো লোক। সে মনে করলে মিছেমিছি ছুটে ছুটে মেয়েটা ক্ষিধে-তেষ্টায় কষ্ট পাবে। যাই ওকে ছুটো মিষ্টি দিয়েই না হয় শহরে যাবো। রসময় খুকুকে ধরতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো।

বড় রাস্তা দিয়ে খুকুমণি তখন পাঁই পাঁই ছুটছে পছিবাগানের দিকে।

বেড়িয়ে ফিরছিলেন ভূগোলের মাষ্টার ভুবন বাবু। পাশ দিয়ে খুকুমণিকে দৌড়ে যেতে দেখে তিনি ডাকলেন, খুকুমণি! ও খুকুমণি! ভোর না হতেই ওদিক পানে কোথায় ছুটে যাচ্ছো?

খুকুমণি দৌড়ুতে দৌড়ুতেই উত্তর দিলে, চাঁদ ধরতে।

সে কি খুকুমণি? চাঁদ কি এই হাতের কাছে না কি? চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে। বুঝলে? কে তার কথা কানে নেয়। খুকু তখন ছুটছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। ভুবন বাবু ভাবলেন ছোট্ট মেয়ে খুকু। চাঁদ যে পৃথিবী থেকে ২,৩১,০০০ মাইল দূরে, তা তো আর সে জানে না। যাই, তাকে সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আসি। তিনিও তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলেন খুকুকে ধরতে।

পছিবাগানের শিউলি তলায় খুকু তখন বসে। তার চার পাশে শিশির-ভেজা ঘাসের উপর সাদা সাদা শিউলি ফুল ছড়ানো। সকালের বাতাসে ভেসে আসে মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে ভুবন বাবু, রস, ননী তিন জনেই সেখানে এসে হাজির। ননী বললে, চাঁদ ধরার সখ মিটলো তো? এবার এই দুধটুকু খেয়ে ফেলো দেখি।

বললে রস, খুকুমণি! চাঁদ ধরার খেয়াল তো মিটেছে এখন এই মিষ্টি ক'টা খেয়ে নাও।

সবার শেষে ভুবন বাবু শুধালেন, কি গো খুকুমণি! চাঁদ ধরতে পারলে?

হুঁ। পেরেছি। এই তো। বলে ঘাড় নেড়ে খুকু দেখালো কোলের দিকে। কোলে তার সাদা ধবধবে মোটাসোটা সেই দুধে-বেড়ালটা।

ঐ যা!। বলতে একদম ভুল হয়ে গেছে। চাঁদ খুকুমণির ঐ দুধে-বেড়ালটার নাম। তোমরাও জানতে না, ভুবন বাবুও না।

কিশোর সুভাষ

[নাটিকা]

শ্রীসুরুচিবালা রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৪

দুই মাস পরে।

সুভাষ। ফিরে এলুম ভাই, ভারতমাতার যে রূপ দেখে এলুম গঙ্গার পারে পারে, হিমালয়ের গায় গায়, এখানে ঘরে বসে থেকে যে রূপ তোমরা দেখতে পেলে না।

বন্ধুরা। (হেসে) আমরা ভাবছিলুম, তুমি বোধহয় সন্ন্যাসী হয়ে ওখানেই থেকে গেলে।

—হয়ত থাকতুম, কিন্তু বাঙ্গালীকে ওখানকার হিন্দুস্থানীরা 'মছলী খাতা বাঙ্গালী' বলে যে রকম ঘেন্না করে ভাই, সইতে পারলুম না। পারলুম না থাকতে।

—ওদের ধন্যবাদ, তাইত তোমায় আমরা ফিরে পেলুম।

চারু। শোন সুভাষ, এই যে ছেলেটি, এর নাম হেমন্ত, কেষ্টনগর স্কুল থেকে মাষ্টার মশায়ের চিঠি নিয়ে এসেছে তোমার কাছে।

সুভাষ। তাই বুঝি? মাষ্টার মশায়ের চিঠি? দাও, তুমি কোথায় পেলে ভাই?

—আমি যে তাঁর কাছে পড়ি। কত তোমার কথা শুনেছি তাঁর কাছে। কী ভালোবাসেন তিনি তোমায়, এই নাও চিঠি।

সুভাষ চিঠি খুলে পড়তে লাগল, কিন্তু দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে এলো চোখভরা জলে।

চারু। দে আমায় দে, আমি পড়ি তুই শোন।

—তোমার হরিদ্বার থেকে লেখা চিঠিখানি আমি পেলাম, কাজ কাজ করে তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন?

এখন নয়, এখনো সময় হয়নি, এখনো তোমার তত বয়স হয়নি বাবা, আগে পড়াশোনা শেষ কর, জ্ঞান অর্জ্জন কর, তার পরে কাজ। তোমার জ্ঞান এবং বিবেকই তোমায় কাজের সন্ধান বলে দেবে। ততদিন অপেক্ষা করতেই হবে। মনে রেখো ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টান্তে তোমরা শ্রদ্ধাশীল হও, দেশের কুসংস্কার ভেঙ্গে নতুন সংস্কৃতির রূপদান কর। তাই হবে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। মনে রেখো, শুধু ডাল ভাত রুটিতে মানুষ বাঁচতে পারে না, সে রকম বাঁচা পশুর বাঁচা। সত্য এবং ন্যায়ের পথ ধরে, জীবন এবং জাতিকে সতেজ করে তুলতে তুলতে এগিয়ে যেতে হবে বিশ্বসভায়। মনে রেখো, সে বাঁচাই হবে সত্যিকারের বাঁচা।

চারু। কী সুন্দর চিঠি লিখেছেন, মনে হচ্ছে কাছে বসে মুখে যে ভাষায় উপদেশ দিতেন, এ যেন সে রকমই শুনছি, বুকে দাগ কেটে যায়।

সুভাষ। এসো ভাই, মনে মনে আজ পণ করি সবাই, বাঁচতে হবেই আমাদের, সত্যিকারের বাঁচা।

মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে থেকে মনে প্রাণে সকলেই সে কথাটা অনুভব করতে লাগল।

সুভাষ। তোমার নামই বুঝি ভাই হেমন্ত? কেষ্টনগরে পড়?

—হ্যাঁ ভাই, হেমন্তকুমার সরকার, শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে, এখানে চেঞ্জে এসেছি চারুদের বাড়ী। মাষ্টার মশাই তোমার সঙ্গে আলাপ করে যেতে বলেছেন আমায়।

(দুই হাতে চেপে ধরলো সুভাষ হেমন্তর দু'টি হাত)

এসো ভাই আমাদের বাড়ী, আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ করবে চল। এসো, চারু।

(বাড়ীর পথে যেতে যেতে রাস্তায়)—চারু—সুভাষ আমাদের ছেড়ে এবারে কত দূরে চলে যাবে ভাই, ভাবতে কী মন খারাপ হয়ে যায়, হেমন্তর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে নাও ভাই, কোলকাতায় বন্ধু হবে তোমার। ঐ যে দেখা যাচ্ছে ঐটেই আমাদের বাড়ী।

—বাঃ কি সুন্দর বাগান তোমাদের ভাই? ঐ ফুলগুলোকেই ত ফরগেট মি নট বলে?

—কমলেট যে দাই তুলটাকে নিয়ে একটা ভারী মিষ্টি গল্পো আছে, জানো ত ?

—তাই বুঝি ? বলো ত গপ্‌পোটা। (ছোট্ট ঘরখানার ভিতর প্রবেশ করে) এইটে বুঝি ভাই তোমার পড়ার ঘর ? বাবাঃ এত সব বই, সব তোমার ? সব পড়েছ ? সব ? তাহলে ত কত কি তোমার জানা হয়ে গেছে, কত জ্ঞান হয়েছে তোমার।

সুভাষ। (হেসে) আরে না না, বই আছে বলেই কি সব পড়া হয়ে গেল ? পড়বার ইচ্ছেটা অবিশ্যি খুবই আছে সত্যি, কিন্তু সব পড়বার সময় কোথায় ? জ্ঞানসমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে রত্ন তোলার স্বপ্নই দেখছি, কোন কালে স্বপ্ন সত্য হবে ভগবান জানেন।

চারু। তুই ভাই, কথায় কথায় বড্ডো গম্ভীর হয়ে যাস।

সুভাষ। (হেসে) একটু গুরু মশায়দের মত কথা বলে ফেললাম, না রে ?

হেমন্ত। মাষ্টার মশায় একদিন বলছিলেন তোমরা হও নতুন যুগের অগ্রদূত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে দেশ ছেয়ে আছে, আলোর নিশান নিয়ে পথে বেরিয়ে পড় তোমরা, তবেই দেশ জাগবে। তারপর কি বললেন জানো ? সেই আলোর নিশান আমি দেখেছি জ্বলছে সুভাষের চোখে।

সুভাষের চোখ দুটিতে বিদ্যুৎ জ্বলতে লাগল, যে বিদ্যুৎ আলো করবে সুভাষের অন্তর, সুভাষের গৃহ সংসার সুভাষের দেশ, যে বিদ্যুৎ দাহ করবে রিপুর প্রমত্ত তেজ।

রাত্রি গভীর হয়েছে, ছটফট করছে সুভাষ শয্যায়, ঘুম আসছে না। কাচের জ্যাগ থেকে জল খেয়ে সুভাষ, খাটের পাশে ছোট টেবিলটিতে যেখানে স্বামীজির ছবিখানি বাইরের জ্যোৎস্না এসে আলোময় হয়ে আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে করযোড়ে একান্ত মনে আবেদন জানালো,—হে গুরু, হে দেবতা, তুমি আজ বেঁচে নেই, চঞ্চল মনে জীবনের পথ খুঁজে পাচ্ছি না, তোমার দেবলোক থেকে তুমি আমায় পথ দেখাও।

চারু। আচ্ছা সুভাষ, কি তুই ভাবিস বলদিকি দিনরাত, কি জিজ্ঞেস করি, কি বলি, শুনতেই পাস না নাকি বুঝতেই পারি না আমরা, হেমন্তও তা'ই বলছিলো, কি ভাবিস বল দিকি, রেজাল্টের কথা ?

সুভাষ (হেসে) বা রে, তোরা বুঝি ভাবিস নে তা ? যত দিন এগিয়ে আসছে, ভাবনা ত' হচ্ছেই।

হেমন্ত। সবাই কিন্তু বলে ভাই, তুমি First হবে সমস্ত ইউনিভারসিটিতে।

সুভাষ। First হই বা নাই হই, পাস করলেই, কোলকাতায় যেতে পাবো সেই আমার আনন্দ, তুমি সেদিন বলছিলে হেমন্ত,—কোলকাতায় তোমাদের লিডার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর কথা আরও ভালো করে বলত ভাই, বড্ডো শুনতে ইচ্ছে করছে।

হেমন্ত। পাশ করে এবারে কোলকাতায় চল, নিজেই ত' দেখতে পাবে, কী অদ্ভুত রকমের মানুষ সুরেশদা, সুরেশদা পণ করেছেন, ডাক্তারী পাশ করে, দেশের কাজেই লাগাবেন তাঁর সেই বিদ্যে। সুরেশদা বলেন, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, দেশের কাজই করে যাবেন। বলেন, সমস্ত দেশটাই হবে আমার সংসার, এত সব গরীব দুঃখী ভাই বোন আমার, যাদের খিদেয় ভাত জোটে না, অসুখে ওষুধ মেলে না, শীতে কাপড় পায় না, তাদের সেবাই হবে আমার কাজ। সুরেশদার সঙ্গে তাঁর আরও কত বন্ধুরা ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করবার পণ করেছেন সবাই। চল এবারে নিজের চোখেই ত সব দেখবে।

অবশেষে একদিন ছেলেদের বহু আকাঙ্খিত পরীক্ষার ফল বেরুলো।

প্রথম দেখা হতেই সুভাষ বললো বন্ধুদের—শুনেছিস হেমন্ত first হয়েছে।

—আর তুই সেকেণ্ড ?

—হ্যাঁ।

—কোন দুঃখ হয়নি সেজন্যে তোর ?

—ভাই, হেমন্ত first হয়েছে, সেটাও আমাদের আনন্দ।

—এখন ত' কোলকাতায় চললি তাহলে আমাদের ছেড়ে ?

—যাচ্ছি নতুন পথের সন্ধানে, যাচ্ছি বৃহত্তর কর্ম্মযজ্ঞের ভিতরে।

কটকের কলেজেও নতুন বছর আরম্ভ হয়েছে, দেশ বিদেশ থেকে আগত অনেক নতুন নতুন বন্ধু, উঁচু স্তরের অনেক রকম বই, মহা-উৎসাহে ছেলেরা কলেজের নতুন জীবনে প্রবিষ্ট হোল, এমনই দিনে একদিন সুভাষের চিঠি নিয়ে চারু বন্ধুদের শোনাতে এলো

(চিঠি)—নতুন দেশ, নতুন সব মুখ, নতুন রকমের কথাবার্ত্তা, অভিভূত হয়ে গেছি ভাই ! স্কুলজীবনের বহু বাধা-বিপত্তি বহু নিষেধ এবং কড়াকড়ির গণ্ডী অতিক্রম করে অতি প্রশস্ত সীমাহীন একটা রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছি। সুরেশদা'র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, একটা বিস্ময়কর বিপ্লবের প্রতিমূর্ত্তি। পরিচয় হয়েছে আরও অনেকের সঙ্গে, যাঁরা সবাই নিয়েছেন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। সুরেশদা বলেন, ভিক্ষের ঝুলিতে কেউ চিরদিনের রাজঐশ্বর্য্য ঢেলে দেয় না, ভিক্ষের ভাতে চিরদিনের ক্ষিধে দূর হয় না, দেশের দারিদ্র্য যাতে দূর হয় সে উপায় বের করে নিতে হবে। দেশের সকল লোক নিজের মুখে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অভিযোগ জানাতে যাবে রাজদরবারে। সে রকমের যোগ্যতা লাভ করতে হবে। স্বাধীন মত প্রকাশ করতে হলে স্বাধীন মনও তৈয়ের করতে হবে। সেই স্বাধীনতা লাভ করবার চেষ্টাই আমরা করছি, তার জন্যে যত ত্যাগই স্বীকার করতে হয় আমরা করব। সকল রকমের দুঃখই বরণ করে নিতে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করে নিচ্ছি—এই আমাদের জীবনের ব্রত।

একদিন হেমন্ত জিজ্ঞেস করল—কেমন লাগছে ভাই নতুন জীবন ?

সুভাষ। অদ্ভুত লাগছে, কলেজের ট্রেনিং কোরে ভর্ত্তি হয়ে বন্দুক ধরতে শিখেছি, জীবনের মস্তো বড় একটা কামনা পূর্ণ হোল ভাই। মত এবং মন দুইই দৃঢ়তর হচ্ছে।

—ক'দিন যে ঘুরে এলে বাইরে, পলাশীর মাঠ দেখে এলে, লিখেছো চারুকে ?

—লিখেছি, কি লিখেছি, জানো ?

: হায় মা, ভারতভূমি কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে ?
আফ্রিকার মরুভূমি, সুইস পাষাণ হতে যদি, তবে মাতঃ।
তোমার সন্তান হইত না এইরূপ ক্ষীণ কলেবর।
ধমনীতে প্রবাহিত হোত উগ্রতর রক্তস্রোত।

হোত বঙ্গ বীর্য্যের আধার।
আজি এ ভারতভূমি হইত পূরিত সজীব পুরুষরত্নে।
দিগদিগন্তর ভারতগৌরবসূর্য্য হোত বিভাসিত।
বাংলার ভাগ্য আজি হোত অন্যতর।

হেমন্ত (হেসে)—একেবারে কবি নবীনচন্দ্র ?

—হ্যাঁ, পলাসীর মাঠ দেখে এসে আর কোন ভাষা মনের মত হোল না ?

—সে কথা যাক, পড়া হচ্ছে কেমন ?

—মনের মত নয়।

—সে কি ?

—হ্যাঁ ভাই, এত সব অন্য রকম মনের মত জিনিষে মন ভর্ত্তি হয়ে আছে, ক্লাশের জিনিষগুলো মনে ঢুকতেই পারছে না।

—দিন কিন্তু আর নেই বেশি

—হ্যাঁ, আজ তোরে উঠেই মনে হোল, প্রায় আঙুলে গোণায় ঠেকেছে, সুতরাং এবারে পড়ায় একটু মন দিতে হবে।

মাস দুই পরে। পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেরা পরস্পর আলাপ আলোচনা করছে,—

—বাবা। বেঁচেছি, মাথায় যেন যমদণ্ড ঝুলছিলো।

—কোশ্চেনপেপার খুলে, একটি ছেলে। আচ্ছা, এটার কি লিখলে বল দেখি ?

—আঃ, এখন আর ওসব নয়, রেখে দাও পকেটে ও কাগজগুলো।

—হ্যাঁ রে, রেখে দে, রেখে দে, রেজাল্ট বেরুলেই জানা যাবে, এখন আর ও-চিন্তাই নয়।

—চল্ রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে সিনেমায় যাই।

—বাড়ী না গেলে আবার ভাববে যে সব।

—আর বাড়ী গেলেই যখন জিজ্ঞেস করবে সব, কি লিখেছিস বল্! বাবাঃ ও-মুখো এখন যাবোই না, সিনেমা-টিনেমা দেখে সেই রাত বারোটার আগে বাড়ী নয়।

—চল্ চল্ তবে, শীগগির চল্—

(হৈ হৈ করতে করতে একদল বেরিয়ে গেল।)

(একান্তে দাঁড়িয়ে সুভাষ এবং আরও কয়েকটি ছেলে)

—কেমন হোল সুভাষ ?

—শেষের দিকটায় মাস দুই খানিকটা খেটেছিলুম ভাই, তারই জোরে পাশ করে যাবো নিশ্চয়ই, তবে যাঁরা আশা করেছিলেন আমার উপর, তাঁরা নিরাশ হবেন একটু, ভেবে দুঃখ হচ্ছে। (কোশ্চেনপেপার দেখে আলোচনা করতে লাগল ছেলেরা।)

আরও ক' মাস পরে—আই-এ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, সুভাষের ফল আশানুরূপ হোল না। মনে খানিকটা অতৃপ্তির ভাব নিয়ে এসে ভর্ত্তি হোল প্রেসিডেন্সি কলেজে। ক্লাসের পর ছেলেরা আলোচনা করে—কেমন লাগছে বল ত ?

সুভাষ। প্রোফেসররা এক একজন যেন এক একটি পুলিশ কমিশনার।

হেমন্ত। বেশ বলেছিস ত!

অনঙ্গ। ওঁরা বেয়নেটের খোঁচা দিয়ে দিয়ে মনের ভেতরটায় আর যা কিছু আছে, সবই একেবারে নির্ম্মূলভাবে ধ্বংস করে দিতে চান। তার পর কলেজ-জীবন শেষ করে যখন বাইরে বেরিয়ে আসে সব, বেশির ভাগই হয়ে যায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কথায়, ভাবে চালচলনে, পোষাক পরিচ্ছদে, এমন কি নামে পর্য্যন্ত। যেমন বাবার এক বন্ধু ছিলেন নীলবরণ, মেম বিয়ে করে পরে হয়েছেন মিঃ নেইল ব্যারণ—

হেসে উঠলো সবাই।

—অসম্ভব। সে দিনের ঘোড়া চলে গেছে, আর তা' হবে না।

—কিন্তু এখন কি করা যায়, বল দেখি—ওটেনের ব্যবহার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

—কংগ্রেসকে আর হিন্দুধর্ম্মকে কি বিশ্রি ভাষায় গালাগালি করে, আজ কংগ্রেসের লিডারদের কি সব যা' তা' বলে গালাগালি করছিল ওটেন শুনেছিলে ত ?

অনেকে একসঙ্গে—আমরা ভাই আর ক্লাস করবো না কাল থেকে, যদি না ওটেন তার কথা ফিরিয়ে নেয়, দুঃখ প্রকাশ না করে।

হেমন্ত। আমারও তাই ইচ্ছে, সুভাষ কি বলিস ? আর তোমাদের সবারই ত' এই মতই ভাই, কাজের সময় পিছিয়ে যাবে না ত' কেউ ?

সকলে সমস্বরে। নিশ্চয় না, নিশ্চয় না কাল থেকে আমরা ধর্ম্মঘট সুরু করে দেবো। ওটেন তার কথার জন্য দুঃখ প্রকাশ যদ্দিন না করে, তদ্দিন ত নিশ্চয়ই।

সুভাষ। আমি কি ভাবছি শোন, তার আগে চল আচার্য্য বোসের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আগে সব জানাই, তিনিও ত আমাদের প্রোফেসর, নিশ্চয় আমাদের তিনি সহানুভূতি জানাবেন, কি করা উচিত আমাদের, তাও আমাদের বলে দেবেন।

—আচার্য্য বোস ধর্ম্মঘট করতে পরামর্শ দেবেন না আমাদের।

—তবু একবার জিজ্ঞেস করা কর্ত্তব্য।

সেদিন ছেলেদের কাছে সব শুনে আচার্য্য বোস বললেন —অন্যায় গালাগালি কক্ষণো সহ্য করবে না, কিন্তু যা অন্যায় তাও তোমরা করতে যেয়ো না।

ক'দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা—

সুভাষ। হেমন্ত, চল একবার সুরেশদার কাছে

হেমন্ত। হ্যাঁ ভাই আমিও ভাবছিলাম,

সুরেশদার ঘরে—

সুভাষ। সুরেশদা, ওটেন তার কথা ফিরিয়ে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে। আমাদের ধর্ম্মঘটও ভেঙ্গেছে, আজ ক'দিন আমরা ক্লাশ করছি, কিন্তু আবার মাঝে মাঝে যা তা কথা বলে বসছে—

হেমন্ত। আমাদের উপর ওর ভয়ানক রাগ। নিজস্ব সব কিছুই বিসর্জ্জন দিয়ে, একান্ত ভাবে ওদের অনুগত হোতে পারলেই ওরা খুসী, কিন্তু আমাদেরও অসহ্য হয়ে উঠেছে সুরেশদা, কি করব বলে দিন।

সুরেশদা। (হেসে) নিজেদের প্রেসক্রিপসন নিজেরাই বেছে করবে, আমি বলে দেবো না কি ?

সুভাষ। কাল আবার মিটিং হবে আমাদের সুরেশদা, ছেলেরাও ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, অনঙ্গ কি বলে জানেন ? জন বুলের বুলডগি গোঁ। আবার হাসলেন সুরেশদা।

—আপনি কেবল হাসছেন সুরেশদা, কি করতে হবে আমাদের বলে দিন না ?

সুরেশদা। না, আমি কিছু বলবো না, আমি শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছি তোমাদের শক্তি, নিজের শক্তি আর নিজের বিবেক এর চেয়ে বড় নেতা নেই ভাই।

নতমস্তকে উভয়েই খানিকক্ষণ চুপ করে রইল—

তার পর উঠে দাঁড়িয়ে—আচ্ছা, আজ আমরা যাই সুরেশদা কাল মিটিং-এর পর আপনাকে জানিয়ে যাবো সব।

কেটে গেল আরও দু'-তিন দিন।

ওটেনের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি চলেছে অব্যাহত ভাবেই।

হঠাৎ একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ভীষণ ভাবে একটা আঘাত পেয়ে ওটেন সাহেব মাথা ঘুরে সেখানেই বসে পড়ল। সমস্ত কলেজের ভিতর একটা হুলুস্থুল কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল জেমস্ সাহেব ক্রোধে উন্মাদের মত হোয়ে উঠলেন। হুকুম হোল আয়েডেণ্টিফিকেসান প্যারেডের।

কিন্তু অফিসের বেয়ারার সাক্ষ্যে ধরা পড়ল সুভাষ। সুভাষ যাবজ্জীবনের জন্ত রাষ্টিকেটেড হয়ে গেল। কটক যাবার আগে চিঠি লিখল বন্ধুদের—

—ফিরে যাচ্ছি কটক। জীবনটা যেন তীব্র একটা ঝড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু যেন দুমড়ে ভেঙ্গে না পড়ি আমার গুরুর কাছে, এই আমার প্রার্থনা। ফিরে যাচ্ছি —আত্মীয় স্বজন দুঃখিত হয়েছেন, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্য এসেছে তাঁদের মনে, তোমরাও দুঃখিত হবে, কিন্তু ভাই আমার কি সান্ত্বনা জানো? ঔদ্ধত্য এবং দম্ভ যে আমরা মেনে নি না, এবং নেবো না, সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে যাচ্ছি প্রভুদের।

আবার সেই কটক, সেই সমস্ত প্রিয় পরিবেশ এবং প্রিয় ঘরখানি! পথ চলতে চোখে পড়ে কত কালের কত চেনা সব, কত যেন প্রিয় সবাই! কেউ হেসে সাদরে কত প্রশ্ন করে, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসু হয়ে এটা সেটা বলেন। তারপর, সারাদিনের পর, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সেই আগেকারের মত ধ্যানে বসে কেটে যায় তার স্বামীজির পায়ের নীচে কেবল এক চিন্তা তার, একই ধ্যান—পথ দেখাও, পথ দেখাও!

দিনকতক পরে সুভাষ চিঠি লিখছে হেমন্তকে—

—ভাই, মনের ভিতর একটা বিপ্লব চলেছে, সেটা কি রকম, তোমায় আমি তা বোঝাতে পারবো না। মনে হয়, কোলকাতা ত্যাগ এ একরকম ভালোই হয়েছে, মনের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে বসে কার্য্যপন্থা স্থির করে নেবো। আবার গুরুজনদের আমার সম্বন্ধে একটা নৈরাশ্যের বেদনা, সেটাও মনে একটা ব্যথা দেয়।

সম্প্রতি, কতগুলো কাজ বেছে নিয়েছি, গড়ে তুলেছি একটা ছাত্র সমিতি, একটা পাঠাগার, একটা ব্যায়ামাগার সকল কিছুরই সর্ব্বাধ্যক্ষ আমি। স্বামীজির বাণী নিরন্তর অন্তরের ভিতর আহ্বান দিচ্ছে,—দেশকে গড়ে তুলতে হবে, দেশকে গড়ে তুলতে হবে!

আমাদের জাতটা বড় দুর্ব্বল, তাই, সবল দেশের রাজার-জাত এসে আমাদের উপর অত্যাচার করে। বিকেলের দিকে কুচকাওয়াজ করতে করতে বারাং ও নারাজের জঙ্গল পর্য্যন্ত যাই, আবার মার্চ্চ করতে করতে ফিরে আসি সহরের ভিতর। সবাই মিলে, গান গাইতে গাইতে মার্চ্চ করা, গায়ে এবং মনে একটা জোর এনে দেয়। তোমার মনে আছে কি আমরা সেই নৌকোয় করে গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে গাইতাম—

"আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি ত' মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার
আমার দেশ।"

জীবনটা ভাই, একটা উত্তেজনার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু এটা কাম্য নয়! অন্ধকার ভবিষ্যতের ভিতর একটুখানি আলোর রেখা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কটক, জানকী সাহেবের গৃহ।

আপন পাঠকক্ষে বসে কি একখানা বই নিয়ে সুভাষ তন্ময় হয়ে আছে পাঠে। পিতার প্রবেশ সে জানতে পারল না। টেবিলের উপরের বইগুলির নাম দেখে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে ডাকলেন।

—সুবি!

—ওঃ বাবা? (সুভাষ উঠে দাঁড়াল)।

—কি পড়ছিলে? কি নামটা? ভক্তিযোগ? বিবেকানন্দের ভক্তিযোগ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ ভালো বই ওগুলো পড়, কিন্তু এখন থেকে কলেজের বইতেও একটু মন দিতে হবে। রায় বাহাদুর তোমার কলেজে ভর্ত্তি হওয়া নিয়ে যে রকম চেষ্টা করছেন, মনে হচ্ছে হয় ত' হয়ে যাবে, তা' হলে যত শীগগির সম্ভব চলে যেতে হবে কোলকাতা।

—যাবো।

বছর দেড়েক পরের কথা।

প্রেসিডেন্সি কলেজের হোষ্টেলে ছেলেরা যখন কেউ বা পাঠে কেউ বা গানে গল্পে মসগুল হয়ে আছে, তেমনই সময়ে সহসা সকলকে সচকিত করে দিয়ে সুভাষ এসে দাঁড়াল সকলের সম্মুখে।

—এ কি এ কি, এ যে সুভাষ! কোত্থেকে এলি রে সুভাষ? কটক থেকে?

একজন গানের সুরে—এ কি স্বপ্ন এ কি মায়া, এ কি ছলনা!

—এ্যাই, থাম্ থাম্ শুনি আগে, কি হোল ভাই সুভাষ? মিটে গেল সব? কলেজ নেবে তোকে?

সুভাষ। না ভাই, এই রাজপ্রভুদের আশ্রয়ে নয়। এঁরা নিজেরা ত' নিলেনই না, অন্য সব কলেজেও যাতে ভর্ত্তি না হতে পারি সে চেষ্টাই এঁরা করেছেন ক্রমাগত। আমায় নিচ্ছেন স্কটিশের আর্কহার্ট সাহেব। এঁরা খৃষ্টান মিশনারী, স্কচ পাদরী, এঁরা ত ভয় পান না কাউকে, ইনিই আমায় নিচ্ছেন।

—আমাদের সকলের অপরাধের বোঝা একলা তুই বয়ে বেড়াচ্ছিস, ভাবতে এত মন খারাপ লাগে।

—না ভাই, সেটা কোন দুঃখের কথা নয়, আমাদের ইচ্ছেশক্তির যে একটা জোর আছে আমাদের যতটুকু ক্ষমতা, ততটুকু যে করতে পেরেছি, সেটাই আমার আনন্দ, আর ওঁরাও যে তা ভালো করেই বুঝেছেন, সেটা আমার মহা আনন্দ।

—তুই আমাদের গুরু, তুই আমাদের সমস্ত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার মত শক্তি চিরদিন তোর অটুট থাকুক, আমরা তোকে অনুসরণ করে চলবো।

—কি যে বলিস! সবাই সব করতে পারে ভাই, সবারই সমান শক্তি আছে, তবে একজোট হওয়া চাই।

—তা ঠিক, সবারই হয়ত সব শক্তি আছে, সবাই পারে ওসব, কিন্তু ভাই তবুও একথাও ঠিক যে সবাই কিছু সুভাষ হোতে পারে না!

বি, এ পরীক্ষা ভালোই হোল। আত্মীয় স্বজনের একান্ত আগ্রহে সুভাষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে রওনা হয়ে গেল বিলেতে।

বন্ধুরা বললে। মাত্র আট মাস সময় আছে, এত অল্প সময়ে পাশ করা, সুভাষ এ শুধু তোতেই সম্ভব! তার পর সিভিল সার্ভিস পাশ করে এসে সিভিলিয়ান হয়ে বসলে, তোর সঙ্গে আমাদের তখন আকাশ পাতাল পার্থক্য হবে সুভাষ।

সুভাষ। না ভাই ও কথা বলো না, আমি যাচ্ছি জীবনের আরও কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতে। ওরা কোন ক্ষমতা গুণে ভারতবর্ষকে রেখেছে ক্রীতদাস করে, ওদের কোন মহাশক্তির বলে আজ দু'শ বছর ধরে ভারতবাসী নিঃস্ব নিরন্ন ক্লীব ও পঙ্গু! নিরস্ত্র জনতার উপর ওরা অপ্রতিহত ভাবে কামান চালায়, নিজের স্বদেশ, নিজের মাতৃভূমিকে মা বলে ডাকলে ওরা বেয়নেট চালায়, দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে ঘাড়ে ফুটিয়ে দেয় সূঁচ,—কোন্ মহাশক্তির বলে ভাই, সে কথা আমি ভাবি মাঝে মাঝে। যাচ্ছি সেখানে পড়তে, পরীক্ষা দিতে, ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তর সেখানে এই প্রবল শক্তিমান বৃটিশের বৃটিশত্বের উৎস কোথায় তারি সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে—রাত্তিরে মাঝে মাঝে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় ভাই, আমার হিন্দু ভারতের সাধের দিল্লী মোগল বাদশার লালকেল্লা সেখানে বসে শাসনচক্র ঘোরাচ্ছে বৃটিশের বড়লাট, আর লালচামড়া গোরা সৈন্য বন্দুক হাতে পাহারা দিয়ে রক্ষা করছে বৃটিশের ধন জন প্রাণ। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, কী করে এটা সম্ভব হোল।

—সুভাষ, ভীষণ এক্সাইটেড (Excited) হয়ে গেছিস ভাই! আমরা তোকে একটুও ভুল বুঝি নি, মনে কিছু করিস নি ভাই! তোর স্বপ্ন সফল হোক, তুই সার্থক হয়ে ফিরে আয়, আমরা সে প্রার্থনাই করব চিরদিন। তোর চেষ্টায় এই দুর্ব্বিষহ দাসত্ব থেকে মুক্ত হোক ভারত।

অবশেষে একদিন, সমুদ্রে ভাসলো সুভাষের জাহাজ। তরঙ্গের পর তরঙ্গের ধাক্কায় জাহাজ এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের বুকে। বিদায় দিতে আসা প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-শঙ্কিত আকুল দৃষ্টিগুলি অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর এবং ক্রমে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। সুভাষের মনটাও বিষন্ন হয়ে রইলো। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা। ভবিষ্যতের উন্নতির আশায়, পুত্রকে সম্মানের উচ্চাসনে আসীন দেখবার আশায় কত বিচ্ছেদের দুঃখ সহ্য করেন পিতা মাতা। সুভাষ তার কতটুকু পূর্ণ করতে পারবে?

রাত্রিতে চিঠি লিখতে বসল সুভাষ বন্ধুদের:

—খুব যে একটা খারাপ লাগছে, তা নয়, সবচেয়ে অপূর্ব্ব লাগছে সমুদ্রটাকে, চঞ্চল, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল'। অসংখ্য অলজ্য ফণা তুলে তুলে পৃথিবীটাকে যেন গ্রাস করে ফেলতে চলছে। সম্মুখের কোন বাধা একে রোধ করতে পারে না, আপন তেজে এগিয়ে সম্মুখের সকল কিছু ধ্বংস করতে করতে চলে! মনে মনে ভাবছিলাম, এই শক্তির আরাধনা করা কি যায় না?

মনের ভিতর ভাবনার খুব স্থিরতাও কিছু একটা নেই! আই-সি-এস ফেল করব কিংবা পাশ করব তা জানি না। কিন্তু আই-সি-এস-এর স্বর্ণশৃঙ্খল আমায় কতখানি বেঁধে রাখতে পারবে তা জানি না। কোন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকা কি করে বেশি দিন সম্ভব হতে পারে, আমি তা ভেবে পাই না।

একটু আগে স্বামীজির একখানা বই-এর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। ছেলেবেলায় যেটা প্রতিদিন মন্ত্রের মত পড়ে যাওয়া আমার জীবনের আদর্শ ছিল। আজ বার বার তারই একটা কথা মনে পড়ছে, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

এ প্রার্থনা তোমাদেরও জীবনের কাম্য হোক।

দীর্ঘ দিন সমুদ্রভ্রমণের পর শেষ হোল সুভাষের যাত্রা। আই-সি-এস পরীক্ষার্থী সুভাষ বিলাতের মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াল।

সুভাষের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হোল কিটস উইলিয়াম হলে। প্রথম অবসরে সুভাষ চিঠি লিখতে বসল চারুকে।

—ভাই, ইংরাজ আমার জুতা সাফ্ করে দিচ্ছে, যখনই দেখি আমার আনন্দ হয়। ভারতবর্ষে আমরা এর বিপরীত দেখতেই অভ্যস্ত।

পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। কিন্তু, আই-সি-এস পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হলে কি যে করব, আরও কোন বিশেষ পরীক্ষার জন্য তৈরী হবো কি না এখনো স্থির করতে পারছি না। কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে কাজ করতে পারবো অনেক বেশি, সে ভাবনাই হয়েছে এখন বড়।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আট মাস পড়েই সুভাষ সমস্ত পরীক্ষার্থীর ভিতরে চতুর্থ স্থান অধিকার করে পাশ করল। কিন্তু পাশ করার পরেও, আরও একটা ছোটখাটো পরীক্ষা দিতে হোত, সেই ছোটখাটো পরীক্ষা দিতে গিয়েই সুভাষের জীবনে একটা মস্ত বড় বিপর্য্যয় ঘটে গেল, জীবনে যা কেউই কখনো করে নি, সুভাষ সে কাজই করে বসলো, আই-সি-এস চাকরী ত্যাগ করল সুভাষ।

অত্যন্ত চঞ্চল এবং উত্যক্ত মনে বাড়ী ফিরল সুভাষ, (কিটস উইলিয়াম হলে ওর প্রবাসের বাসস্থানে।) সম্মুখেই দেখা হলের প্রভোষ্টের সঙ্গে।

—এসো সুভাষ, তোমায় কংগ্র্যাচুলেশন করছি, তোমার এই আশ্চর্য্য রকমের কৃতকার্য্যতার জন্যে, এত অল্প সময় পড়ে—

—না, সার, আমি দুঃখিত আপনাকে হতাশ করছি বলে, আমি চাকরী ত্যাগ করে এলাম।

—বলছ কি সুভাষ, এ রকম একটা অসম্ভব ব্যাপার যে আমি কল্পনাও করতে পারছি না, কিন্তু কেন, বল দেখি?

—দেখুন সার, বই-এর এই লাইনগুলো, বিনা কারণে আমার দেশের সমস্ত নিম্নজাতীয় লোকগুলোকেই অসাধু পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, এত ভীষণ অন্যায় আমার সহ্য হোল না।

—ওঃ, এই লাইনটা? এটা কিছু ভেবে ত লেখা হয় নি, এমনি একটা কথা মাত্র, এর জন্তে তুমি নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে? তা তুমি লাইনটার জন্তে একটা প্রতিবাদ করলে ত পারতে?

—করেছিলাম, কিন্তু এক্সামিনাররা বললেন, ভবিষ্যতে ওটা উঠিয়ে ফেলা যেতে পারে, এখনই ওঠানো সম্ভব নয়, আমায় অনুরোধ করলেন ওঁরা পরীক্ষা দিয়ে দিতে, কিন্তু সার, আমার এত অপমান বোধ হচ্ছে, পরীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হোল না। সিভিল সার্ভিস পাশ করে যে সমস্ত ইউরোপীয়ান আমাদের দেশ শাসন করতে যায়, তারা প্রথমেই এটা জেনেই যায় ভারতবর্ষীয় নিম্ন জাতীয় লোকরা সকলেই অসাধু? স্যার, আমি ভাবতে পারছি না, আমার রক্ত গরম হয়ে গেছে।

—শান্ত হও সুভাষ, এসো ভেতরে এসে রেষ্ট নাও, অন্যায় চিরদিনই অন্যায়, সেটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু, তবু...I was surprised that an Indian could give up an appointment in the I.C.S, I was sorry that you gave up the job over a trifling matter. But I am glad that a man of your calibre has been freed from the shackles of service.

সেদিন গভীর রাত্রি পর্যান্ত শান্ত হতে পারল না সুভাষ। উদ্বেল মনে বহুক্ষণ সারাঘরে পায়চারী করে অবশেষে চিঠি লিখতে বসল চারুকে—পরাধীনতার গ্লানি সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাই, কর্ত্তব্যের আহ্বানে এত সহজে I. C. S. চাকরী ইস্তফা দিয়ে এসেছি। আমাদের একটা বই পড়তে হোত, তাতে আছে Indian syce is dishonest আমি ঐ Sentence সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করি, কারণ ঐ Sentence পড়ে পাঠকের মনে ধারণা হবে যেন ভারতবাসীরা dishonest, কর্ত্তৃপক্ষ next edition এ কথাটা তুলে দেবেন বলেন। আমি বলি, যখন জিনিষটা অন্যায়, আমি ঐ লাইন পড়ব না। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, তোমায় পড়তেই হবে। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম আমি তাহলে চাকরী ছেড়ে দিলাম। ভাই, যদি কখনো আমার জন্ত প্রার্থনা কর, তাহলে এই প্রার্থনাই করো। যেন নীচতা ও স্বার্থপরতা আমার মনকে কলঙ্কিত না করে, তা হলেই আমি জীবনে সুখী হবো। ভাই, Power prosperity, wealth (ক্ষমতা, সমৃদ্ধি ও অর্থ) সবই আমার হাতে এসেছে, কিন্তু আমার মনের অন্তরতম স্থল থেকে আহ্বান আসছে যে এ সবে আমার কোন সুখ নেই। আমার একমাত্র আনন্দ। আমার জীবনতরীটিকে অনন্ত সাগরের উর্ম্মিমালার মধ্যে ভাসিয়ে দিতে।

ফিরে আসছি দেশে কিন্তু কি করব বল ত? একবার মনে হচ্ছে কবির নিকট বিশ্বভারতীতে থাকবো। একবার মনে হচ্ছে Journalist হবো। আবার কখনো ভাবছি সন্ন্যাস নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনেই চলে যাই। জীবনটা ভেসে বেড়াচ্ছে যেন গভীর সমুদ্রে, মাটিতে দাঁড়াবার ঠাঁই পাচ্ছি না। সব চেয়ে বেশি কি মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, আর কোথাও নয়, চলে যাই আমেদাবাদে বাপুজীর পায়ের কাছেই। মনে হচ্ছে ওখানেই যেন আমার প্রকৃত আশ্রয়। মনে হচ্ছে ঐ মহাঋষির গভীর দুটি চোখের পানে তাকালেই আমি যেন আমার সকল জিজ্ঞাসার জবাব পেয়ে যাবো।

কিন্তু তবু কেন মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ মিশনের গৈরিক পতাকা স্বপ্নের ঘোরে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে?

কিন্তু, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সে আহ্বানের যে অন্ত নির্দ্দেশ ছিল, সুভাষ সেদিন তা বোঝেন নি। কৈশোরের যে আদর্শ ধূমায়িত হয়ে ছিল এতদিন বুকের ভিতরে, আজ যৌবনে তাহাই ধিকি ধিকি করে জ্বলে উঠছে বুকের ভিতরেই। বিবেকানন্দের নির্দ্দেশের সেটাও যে একটা অন্ত রূপ সুভাষ সেটা সেদিন বোঝেন নি।

চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে যখন ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র দেশে, তখন সর্ব্বাঙ্গ তাঁর দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে সেই আগুনের দাহে। গৈরিকের নিশান তুলতে মিশন তাঁকে আর আহ্বান দেয়নি।

সেদিন তাঁর চোখে আলো জ্বলছে স্বাধীনতার শ্রীঅরবিন্দের বাণী মন তাঁর সেদিন উচ্চারণ করছে বার বার—

Work that she might prosper.
Suffer that she might rejoice.

সেদিন মন তাঁর আকুল আগ্রহে, দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লীর লাল কেল্লার দিকে, সেদিন তিনি আর ছোট্ট সুবি বা বন্ধুদের প্রিয়তম সুভাষ নন, সেদিন তিনি বাংলার এবং ভারতের নেতাজী! গৈরিক নিশান তুলতে মিশনে চলে যেতে হয়নি সুভাষকে, আপন ইচ্ছে মত সমস্ত বিশ্বময় মিশন গড়ে তুলেছেন সুভাষ। তাঁরই মিশনের পতাকা উড়ে চলেছে দেশ দেশান্তরের আকাশে। মালয়, ব্যাঙ্ককে, জাভায়, ব্রহ্ম, কোহিমায়। সুভাষের পতাকা চমকিত করে দিয়েছে সেদিন সারা বিশ্ব।

সেদিন তাঁর আকুল আহ্বান—'চলো দিল্লী।'

য-ব-নি-কা

জুজুবুড়ির গপ্পো

মুস্তাফা নাশাদ

জুজুবুড়ির নাম শুনেছ জুজুবুড়ির নাম?
ফুজুডাঙার গুজুপাড়ায় জুজুবুড়ির গ্রাম।
রাতদুপুরে উঠে বুড়ি মাথায় পরে সিঁদুর,
তাক্ ধিনাধিন্ নাচে সখে—হাসে নেংটি ইঁদুর।

নাচতে নাচতে যখন বুড়ি হয়ে পড়ে কাবু,
সানলাইটের সিরাপ দিয়ে খায় বার্লি-সাবু।
ঘোঁতঘোঁতানি শোরের পিঠে ওড়াক্ করে ওঠে,
ধাঁই কিড়কিড় ধাঁই করে সে আকাশ পানে ছোটে।

টিকিট বিনা চড়ার দোষে শুব্‌রেরা দেয় গুঁতো,
মুখ থুবড়ে পড়ে বুড়ি কিচ্ছুটি নয় ছুতো।
পয়সা বাঁচল চড়া হ'ল যোতা হ'ল বেশ,
কর মজায় জুজুবুড়ি ভয় পেও না যেন।
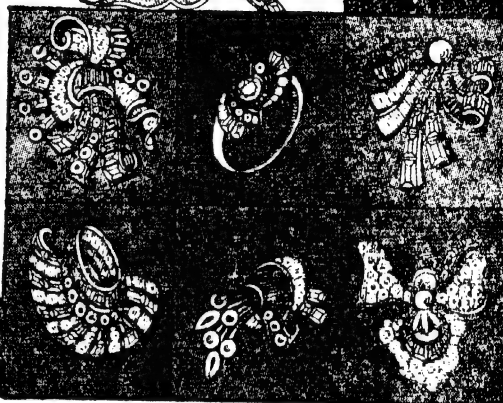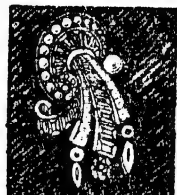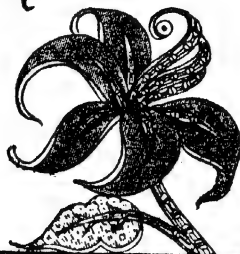
প্রতিমা দাশগুপ্ত

বোগদাদের রাজপথে দাঁড়িয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা মানোয়ার বিবি একটা খরবোজা খাচ্ছিল। পরনে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত লম্বা গাউনের মতো একটা কুর্ত্তা, তার উপর গোলাপী রেশমী উড়না, তার হাশিয়াতে বড় বড় সোনালী জরির ফুল। তেলবিহীন রুক্ষ চুলের ভার কাঁধের দুইদিকে কুঞ্চিত বেণী বদ্ধ। তার সামনে দাঁড়িয়ে ইজার, চোগা, ফেজ পরিহিত একজন যুবক অনুনয় করে বলছিল, ত্থাখো বিবি আমার জানে আর কুলায় না। বাদশাহের নিত্যি নতুন ফর্মাইশ খাটতে খাটতে কাহিল হোয়ে গেলাম।

চোখ মুখের এক অপরূপ ভঙ্গী করে মানোয়ার বিবি বললো, তোমার বাদশাহের ফর্মাইশ খাটতে খাটতে তোমার জান কাহিল হবে তাতে আমার কি? আমার জান তো তাতে কমজোরি হবে না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঈশাক বললো, দুনিয়ার রেওয়াজই এই। কারুর দুঃখে কারুর দিল নরম হয় না।

মুখভর্ত্তি খরবোজা নিয়ে অস্পষ্টস্বরে মানোয়ার বললো, ত্থাখো মিঞা, আমার কাজ কাম ফেলে তোমার বাকচাতুরী শুনতে তো এখানে আসিনি। যদি কাজের কথা কিছু থাকে তো বল আর না হোলে বল আমি ফিরে যাই।

অনুনয়ের স্বরে ঈশাক বললো, বিবি, দড়বড় করোনা, জেরা মগজ ঠাণ্ডা করে আমার বাত শোনো। হামেহাল বাদশাহের খিদমৎগিরি করতে করতে আমার হাড্ডিতে কালী পড়ে গেল, আর এখন জানে কুলায় না। বদাশাহের হামামের জন্য রোজ নিত্যি নতুন হুরী কোথা থেকে আমদানী করি বল দেখি?

দূর ওজবেক। হামাম না বলে হারেম বল।

না গো বিবি হামাম। বাদশাহের খেয়াল তার হামামে রোজ একজন করে খুপ সুরৎ আওরত তার গুসল-এর সরঞ্জাম তৈয়ার রাখবে, গুসল-এর সময় যখন যা দরকার হাতের কাছে এগিয়ে দেবে, সময় সময় গা-ও দলাই মলাই করে দেবে। তবে এক আওরতের দুদিন আসা চলবে না।

মানোয়ার উড়নার নীচে মুখ লুকিয়ে খুকখুক করে হেসে উঠলো, তোমার বাদশাহ দেখছি বহুৎ সমঝদার আদমী।

আস্তে বিবি আস্তে। তোমার বাত কারুর কানে গেলে তোমার আমার দুজনেরই গর্দানা যাবে। তা দেখ কত লোনেকা চিড়িয়া কা মাফিক কুর্দিস্তান কা আওরাৎ, বরফ কা মাফিক সফেদ রুখকা ইরানী আওরৎ, কেতনা ইহুদী আওরৎ মিসৃকা গাও মে গুলাবি রঙকা জেন্না এনে এনে হাজির করিয়েছি বাদশার হামামে। এখন সারা বোগদাদ আর বাকি নেই, আর আমিও হয়রাণ হোয়ে গেছি, আর তালাশ করতে পারি না।

মানোয়ার অধৈর্য্য কণ্ঠে বললো, তা এসব বাত আমাকে শুনিয়ে তোমার কোন ফাইদাহ হবে?

বিবি খাফা হোয়ো না, আমার ফাইদাহ তো তোমার হাতেই। টাইগ্রীসের পানির ভেতর নিজের মুখখানা একবার দেখে এসো তো তোমার চেয়ে খুপসুরৎ আওরত সারা বোগদাদের মধ্যে আর কেউ আছে না কি?

ধেৎ বেল্লহল বেউকুফ, অবশিষ্ট খরবোজার টুকরোটা ঈশাকের গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে মানোয়ার দৌড়ে পালালো। ঈশাক কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে দুঃখিত মনে বিপরীত পথে হাঁটতে লাগলো।

বাগদাদের গোলক ধাঁধাঁর মত গলির পর গলি পার হোয়ে মানোয়ার নির্জ্জন সরু এক গলিতে এসে পৌছলো। সেই গলির মোড়ে বহু পুরানো একখানা বাড়ীর সামনের রোয়াকে বসে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কুরসী টানছিল। মানোয়ারকে দেখে কুরসীর নল মুখ হতে নামিয়ে বললো, কোথায় গিয়েছিলি এই রোদ্দুরে?

তার পাশে ধপ করে বসে পড়ে মানোয়ার বললো, নানী, সে এক মজার বাত। ঈশাককে মনে আছে তোর? সেই যে মুবারক চাচার লেড়কা, বাচ্চা উমরে আমাদের বাড়ী খেলতে আসতো।

ওয়াহিদান বিবি কপাল কুঁচকে বললো, মুবারক চাচা ঈশাক?

মানোয়ার রাগত সুরে বললো বুড়ো হোয়ে তোর দিমাগ খরাব হোয়ে গেছে নানী। মুবারক চাচা তোর ইয়াদ নেই? যে বড় শালার লেড়কীকে শাদি করলো?

ও: হো, গুলসানের মরদ? তাই বল। তা কি হোয়েছে তার?

তার কিছু হয়নি, তার লেড়কা ঈশাক বাদশার নফর, কাল রাতে আমাকে খবর পাঠিয়েছিল আজ ফজিরে তার সাথে মুলাকাত করতে। সেখানে যেতে সে আমাকে এক মজার কিসসা শোনালো, হাসতে হাসতে মানোয়ার প্রায় গড়িয়ে পড়লো।

ওয়াহিদান বিবি কুরসীর নল দিয়ে সপাং করে তার পিঠে একটা বাড়ি দিয়ে বললো, আ মর ঢং দেখনা ছুঁড়ীর। বলি মজার বাতটা কি তাই বল না। মানোয়ারের কাছে সব শুনে ওয়াহিদান বিবি বললো তা তুই কি জবাব দিলি?

জবাব আবার কি দেবো? বললাম, তুই একটা বেল্লহলবুরবক।

ওয়াহিদান বিবি গুড়ুক গুড়ুক করে বার কয়েক কুরসী টেনে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল বুরবকটা কে? তুই না ঈশাক?

মানোয়ার বলল কেন? কি বুরবকি করলাম আমি?

নয়তো কি। তোর শাদি হোয়েছে তো শুধু নাম কা ওয়াস্তে। যখন রূপায়ার জরুরৎ পড়ে তখন শুধু তোর মরদ আসে কিছু

রেস্ত যোগাড় করতে, তার পর তো আর তোর কোন তল্লাশও নেয় না। আশমান ফুঁড়ে যদি কিছু বিনা তকলিফে তোর হাতের মুঠোর ভেতর আসে তাকে তুই নাকচ করিস কোন নজিরে? বুড়ীর ঘাড় ভেঙ্গে আর কতদিন বসে খাবি?

ভাখ নানী, বে-অকলএর মতো বাত বলিস না। আমার মরদের কানে যদি এ বাত ঢোকে তবে আমাকে তো কেটে দু' টুকরো করবেই, তোকেও বাদ দেবে না।

ওয়াহিদান বিবি তার লম্বা বাঁকা নাকটা এক ইঞ্চি উঁচু করে বলল, মাথাই নেই তার মাথা ব্যথা। তোর মরদ মাহিনায় ক' বার করে আসে শুনি যে তোকে দু' টুকরো করতে যাবে? তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খেদ্ করে ওয়াহিদান বিবি বলতে লাগলো: খানদান ঘর দেখে শুনে অল্প উমরে তোর শাদি দিলুম, তা ছোঁড়া বাপ মরবার পর কাঁচা রূপায়া সব হাতে পেয়ে বাউণ্ডুলের মতো উড়িয়ে দিয়ে এখন মুসফিরের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুদা তোর নসিবে সুখ লেখেনি।

অধৈর্য্য হোয়ে মানোয়ার বলল: তোর ঐ পুরনো বকবকানি শুনতে শুনতে তো কান ঝালাপালা হোয়ে গেছে। বকুনি ছেড়ে কাজের বাত যদি কিছু থাকে তো বল।

আরে সেই বাতই তো বলতে যাচ্ছি, তা তুই শুনছিস কই? খালি দড়বড় করছিস। মগজ ঠাণ্ডা করে বসে শুনবি তবে তো। যা যদি গুসল করিস তো করে আয় তার পর খেয়ে দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে আমার কাছে এসে বোস। বাকি তার আগে—বলতে বলতে ওয়াহিদান বিবি কুর্তার খানিকটা তুলে ধরে পাজামার গিঁট খুলে কোমরে বাঁধা সরু একটা থলি বের করে আনলো। চারদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে থলির বাঁধন খুলে সন্তর্পণে একটি দীনার বের করে মানোয়ারের হাতে দিয়ে বললো: যা, একবার বাজার ঘুরে আয়। এটা ভাঙ্গিয়ে সেরটাক দুম্বার গোস্ত, থোড়া মৈদা আউর আটা, চানেকা ডাল, থোড়া পনীর, কুছ খাজুর আর খানিকটা মধু কিনে নিয়ে আয়।

মানোয়ার অবাক হোয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললো তোর কি হোয়েছে বল দেখি? না হোলে তোর হাত দিয়ে পানি গলে না, বেমক্কা হুট করে এত খরচ করে ফেলছিস?

হেসে ওয়াহিদান বিবি বললো, বেমক্কা নয় রে ক্ষেপী, কাইদাহ আছে। সে সব বাত পরে হবে এখন তোকে যা করতে বলছি কর না। গোস্ত লেকিন আজমলের দুকান থেকে আনবি না। ও বকরীর গোস্ত দুম্বা বলে চালিয়ে দেয়। আমজাদের দোকান থেকে আনিস।

গোস্তের নাম শুনে মানোয়ারের মনটা বেশ খুশি হোয়ে উঠলো—বললো: আসবার সময় দেখে এলাম আমজাদ তন্দুরে মোঠা পরাঠা সেঁকছে। তোর আর আমার জন্য দু'খানা নিয়ে আসবো?

ওয়াহিদান বিবি ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকটা ভেবে নিয়ে বললো—আচ্ছা, নিয়ে আয় না হয়, তোর যখন খাওয়ার দিল্ হোয়েছে। তা' দুখানার বদলে চার খানাই নিয়ে আয়, এত খরচ করছি, না হয় আর কিছু জিয়াদতীই যাবে। মানোয়ার বাজারের দিকে রওনা হোলো, পিছন থেকে ওয়াহিদান বিবি বললো, কিছু মেশাস্তা আর মেওয়াও নিয়ে আসিস, বুঝলি? মানোয়ার যেতে যেতে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালো।

বোগ্দাদের আমীর আবু সাদাৎ দাবুর খানের খাস্ খোজা—মরুক ঈশ্শাক সন্ধ্যায় নিজের বাড়ীর খাইবের ঘরে মেঝের ওপর গালে হাত দিয়ে চিন্তিত মনে বসেছিল। ঘরের চেহারা দেখলে মনে হয় মালিকের অবস্থা স্বচ্ছল। ঘরটি বেশ প্রশস্ত। মেঝে ও দেয়ালের অর্দ্ধেক নানা রকমের টালি দিয়ে ছাওয়া। এক কোণে নীচু একখানা তক্তাপোশের ওপর হালকা একখানা জাজিম মিহি মসলন্দ দিয়ে ঢাকা। দেওয়ালের চারদিকে গাঁথা চারটি বড় বড় তাক। তার একটির ওপর রাখা মাঝারি আকারের একটি গোলাব পাশ ও আতর দান, আর একটির ওপরে দু'-তিনটি চড়া রং-এর কাগজের ফুলের ঝাড় আর দুটির ওপর দুটি মাটির তৈরি পরী দু'হাতে ফুলের মালা নিয়ে ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে কোমর বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকের দেওয়ালে পেরেক দিয়ে আটকানো জ্বলন্ত একটি দেওয়ালগিরি।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে চোখে মুখে ভীষণ একটা ভ্রূকুটি করে দাঁতে দাঁত চেপে ঈশাক বলে উঠলো, ধ্যাৎ তেরি তেরা নৌকরি—সঙ্গে সঙ্গে পিচ করে খানিকটা থথু ফেললো মেঝের ওপর—ঠিক সেই সময় তার বিবি মাসুদা বেগম পাঁচবারের বার তাকে প্রশ্ন করতে এলো এইবারে তার খানা দেওয়া হবে কিনা! ধৈর্য্য হারিয়ে ঈশাক প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলো, ছাখো বিবি, দফা দফা যদি এরকম দিগদারী দিতে আসো তো ভালো হবে না বলে দিচ্ছি: বলে দিলাম না তখন যে আমার ভুখ নেই, তোমরা খানাপিনা চুকিয়ে নাও।

মাসুদা বিবি সভয়ে তিন পা পিছিয়ে গিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে যেতে আপন মনে বলে উঠলো, মর্দানা কি মিজাজ দেখোনা, যেন গনগনে তন্দুর।

তার চলার পথে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঈশাকের মুখের কঠিন ভাব একটু নরম হোলো, কি একটা কথা তন্ময় হোয়ে ভাবতে ভাবতে নিজেকেই উদ্দেশ করে বলল, বিবির আমার গায়ে গোস্ত একটু বেশী থাকলে হবে কি, চলার রকমটা ভারী সুন্দর। মগর মুখটাই একেবারে মেরে রেখেছে। ঠিক যেন একখানা তোলো ভেগচির মাফিক—বলতে বলতে জিভ ও তালু দিয়ে চুক চুক করে আক্ষেপ করে উঠলো ঈশাক। তা একটু ঘষে মেজে ঠিকঠাক করে নিলে নেহাত অকেজো সায়াদ না হোলেও হোতে পারে। কিছুক্ষণ পর সে উঠে আস্তে আস্তে রসুইখানার দিকে এগিয়ে গেল, চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ক্যায়া বিবি খানা হো চুকা ?

মাসুদা বিবি তখন রসুইঘরের কাজকর্ম শেষ করে খানার বর্তন চর্তন শোওয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। সেখানে তাকে না পেয়ে ঈশাক শোওয়ার ঘরে ঢুকলো। দেখলো বিবি শোওয়ার ঘরের তক্তাপোশের উপর চাদর বিছিয়ে খাওয়ার উপক্রম করছে। ঈশাকের পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে বললো আভি ভুখ লাগ গিয়া ?

হেসে নরম সুরে ঈশাক বললো, বিবিজান, পহলে তো বাৎলাও তুম গুসসা নেই কিয়া ? মুখ ফিরিয়ে মাসুদা বিবি জবাব দিলো, গুস্‌সা করবো কেন ? সেটা তো তোমারই একচেটিয়া।

আবার হেসে ঈশাক বললো নেহি, নেহি গুসসা তো মত করনা বিবিজী, মেরাই কসুর হো গয়া, কি কি খানা আছে নিয়ে এসো আজ দোনো একসাথ খানা খাঈঙ্গা।

মাসুদা বিবি কথা না বলে তার থালির পাশে আর এক খানা থালি পাতলো, তারপর জলভর্তি বদনা ঈশাকের কাছে এগিয়ে দিল ওজু করবার জন্য। ঈশাক বাইরের চবুতরায় দাঁড়িয়ে বদনার জলে হাত মুখ ধুয়ে এলো, পরে ঘরে এসে তোয়ালেয় হাত মুখ মুছতে মুছতে মাসুদাকে উদ্দেশ করে বললো, কি বিবি খানা ঠিক করেছো ?

মাসুদা উত্তর দিল, খানা তো কখন তৈয়ার হোয়ে আছে। এতক্ষণে তো বোধ হয় জুড়িয়ে পানি হয়ে গেল।

যাক যাক একদিন না হয় ঠাণ্ডা খানাই খেলাম—বলতে বলতে তক্তাপোষের ওপর পা মুড়ে বসলো ঈশাক।

তার থালিতে বড় চমচহ দিয়ে খাবার তুলে দিতে দিতে মাসুদা বললো, কিই বা খানা আছে ? সেই বাদামী রংয়ের বড় মুরগাটা দিয়ে হাঁড়ি গোরেল করলুম আর কাল রাতের বাসী গোস্ত দিয়ে ডাল পাকালাম।

ঠিক আছে ঠিক আছে বিবি ! যে খানা তুমি তোমার নিজের হাত দিয়ে তৈয়ার করেছো তা থোড়া হোলেও আমার কাছে নবাব-বাদশাহের চেয়েও জাস্তি।

মাসুদা বিবি অবাক হয়ে ঈশাকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো তোমার কি হোয়েছে বলতো জনাব ? হঠাৎ এমন মিঠা বাত ধরছো কেন ? এই খানিক আগেই তো দেখলাম তোমার দুসরা মিজাজ।

হেসে ঈশাক বললো, বিবি মিজাজের কি কায়েদা ঠিক থাকে ? আমার গরম মিজাজ যদি তুমি মাফ না কর তবে তামাম দুনিয়ায় আর কে করবে ? বারকোশের মতো বড় রুটি থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ডালে ডোবাতে ডোবাতে ঈশাক বললো, ছ্যাখো আমাদের শাদি হয়েছে মোটে দো বরষ। তোমার মত কাঁচা উমরের লেড়কীদের মনে কত সাধ আহ্লাদ থাকে, কোনটাই বা তার আজ পর্য্যন্ত মেটাতে পারলুম ? খেতে খেতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো ঈশাক পরে আবার শুরু করলো তাই ভাবছি কাল সাঁঝে তোমাকে নিয়ে বেরোব হাওয়াখানায়। তারপর খানাপিনা বাইরে চুকিয়ে ফিরবো। কাল সাঁঝে ঘরে আর কোন খানাপিনার হাঙ্গামা করোনা।

ঈশাকের কথা শুনতে শুনতে মাসুদা বিবির দুই চোখ তার রান্না মুর্গীর ঝোলের ভেতর আস্ত আলুর আকারের মত ধারণ করছিল। কিছুক্ষণ পর বললো কি তাজ্জব কী বাত ! দু' বরষ আগে সেই যে তোমার কুঠিতে ঢুকলুম তারপর আর এক বেলার জন্যও কোথায়ও পা বাড়াতে পারলাম না। গহরারহের রোজ কারবালার মেলাতে যেতে চাইলুম, তা পর্য্যন্ত যেতে দিলেনা, বললে আমরা খানদানী আদমী। আমাদের আওরং এর আঁখের সাথে দুসরা আদমীর আঁখ মিললেই সে আওরৎ কে তালাক দিতে হবে, এই আমাদের খানদানী দস্তুর। তুমি ইয়ার দোস্ত নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে ফুর্ত্তি করে মেলা দেখতে গেলে আর আমি মুখ চুপ করে বেকুবের মতো বসে রইলুম।

হেসে ঈশাক বললো, আরে তুমি এখনও সে বাত ইয়াদ করে বসে আছে ? হাওয়া কি হরবখত একদিক দিয়েই বয় বিবিজী ? মাঝে মাঝে তার রকম ফেরও আছে। কাল যে বাত বলেছি আজ সবেরে সুরুয উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাতও আমার বদলে গেছে কাল রাতের আঁধারের মতো। দুনিয়ার দস্তুরই এই। সে যাক তা হোলে এই ঠিক রইলো, পাক্কা বাত। কাল আমি থোড়া জলদি কাম থেকে ফিরবো, তুমি তৈরি থেকো, আমি এসেই তোমাকে নিয়ে বেরুবো। যেখানে তুমি যেতে চাও যাবে, যা তুমি কিনতে চাও কিনবে, তার উপর কোন বাত আমি বলবো না। সব সে বড়িয়া শিলওয়ার কামিজ কাল পরবে আর শাদির সময় যে মতিয়ার মালা, কানফুল, নাকফুল পেয়েছিলে সেগুলোও পরবে। আমি কাল ভালো এক শিশি ইত্তরও নিয়ে আসবো তোমার জন্য বহুৎ খুশবুওয়ালা।

ভেতরে ভেতরে মাসুদা বিবির মনটা আহ্লাদে গলে যাচ্ছিল, ঈশাকের কথা শুনে নকল অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে বললো : বলে দিলে এক বাত। বড়িয়া দিলওয়ার কামিজ পরবে, মতিয়ার মালা লাগাবে। ঐ পুরনো বে-ইস্তিরি জবরজং শিলওয়ার কামিজ আর তোমার নানীর আমলের মতিয়ার মালা গায়ে চড়িয়ে বাইরে বেরুলে খানদানী আদমীর মানটা বুঝি বহুত বজায় থাকবে ? আজই শুধু সোহাগ জানাতে এসেছো, না হোলে এই দু বরষের ভেতর কোন একটা চীজ হাতে করে বয়ে নিয়ে এসেছো আমার ওয়াস্তে ? অসল বাত কি তা আমার জানা আছে। তোমার দিল কোথায় পড়ে আছে তা আমি জানি। খুদা আমাকে খুবসুরৎ করেনি তা কি আমার কসুর ? তোমার বুড়ো আব্বার ওপর ভার না দিয়ে তুমি নিজে দেখে শুনে তোমার পসন্দমত শাদি করলে না কেন ?

মাসুদা বিবি উদ্গত আঁচল চোখে চাপাবার উপক্রম করতে

ঈশাক মনে মনে প্রমাদ গুনলো, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ঝুটমুট কেন দুখ টেনে আনছো বিবি? আঈনীতে আগে নিজের মুখ দেখে এসো তারপর বোলো খুদা কাকে সুরং দিয়েছে, তোমাকে না আমাকে? মুখে খশ আমোদ করে দুটো বাত বলি না বলেই ভেবেছো তুমি খুপসুরৎ নও? মনে রেখো বিবি যার চিহ্‌রায় তে সুরং সব চেয়ে বেশী আদমী লোগ তারই খুশ আমোদ সবচেয়ে কমতি করে।

এতক্ষণ মনের খুশী জোর করে চেপে রাখছিল মাসুদা বিবি। এবার ঈশাকের কথা শুনে নকল কান্না থেমে গিয়ে খুশীর গমকে ঝলমল করে উঠলো তার সারা মুখ। মুখ ফিরিয়ে সে ভাব ঈশাকের কাছে গোপন করবার চেষ্টা করে মাসুদা বিবি বললো আচ্ছা, আচ্ছা, হোয়েছে, মোলায়েম বাত রেখে আগে খেয়ে নাও দেখি। কিন্তু কাপড়া উপড়া, গয়না গাঁটির কি বন্দোবস্ত করবে?

ঐ দিয়েই এবারকার মতো চালিয়ে নাও, এত তাড়াতাড়ি কি বন্দোবস্ত করবো? কাল না হয় আমাকে একবার তোমার সব চিজ দেখিও, দেখি কি বন্দোবস্ত করা যায় বলতে বলতে চিন্তিত মনে ঈশাক আর-এক গ্রাস চাপাটি গোস্ত মুখে পুরলো। মাসুদা বিবি প্রত্যুত্তরে কি বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। সদর দরজায় কার মোলায়েম করাঘাত হোলো টকটক অস্পষ্ট ভাবে। ঈশাকের কান তার বিবির চেয়েও সজাগ। রুটি চিবোনো বন্ধ করে বলল দরওয়াজায় কে ঘা দিচ্ছে না? তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দরজায় নির্ভুল করাঘাত হোলো। মাসুদা বিবি দরজা খুলে দেবার জন্ত উঠতেই ঈশাক বলল, তুমি যাচ্ছো কেন? যব কোই মর্দ্দানা উর্দ্দানা হোয় তব? বলতে বলতে ডাল তরকারি মাখা হাত পাজামায় পেছনে চট করে মুছে ফেলে ঈশাক নিজে এগিয়ে গেল দরজা খুলে দিতে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে দাঁড়ানো আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা মূর্ত্তিটির দিকে তাকিয়ে ঈশাকের দুই ঠোঁট এক ইঞ্চি ফাঁক হোয়ে গেল। সারা শরীরে বিচিত্র এক দোল খেলিয়ে বোরকা পরিহিত মূর্ত্তিটি ঈশাককে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল, প্রকাণ্ড একটা কাঠের থালা দুই হাতে ধরে। তার এই চলার ভঙ্গী থেকেই ঈশাকের মনে একটা সন্দেহ দেখা দিল, পরক্ষণেই ভাবলো ধেৎ সে কি সম্ভব? সকালেই এত গালিগালাজ করে গেল। ততক্ষণে বোরকাধারিণী হন্‌ হন্‌ করে বিনা দ্বিধায় তার শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেছে। কাঠের বড় থালি তক্তাপোশের ওপর ঠক্‌ করে নামিয়ে দিয়ে সে মুখের বোরকার ঢাকান খুললো। ঈশাক তার পেছন পেছন আসছিল বোরকাধারিণী বিবির সামনা-সামনি এসে তার মুখের দিকে চোখ পড়ামাত্র সবিস্ময়ে বলে উঠলো শুভান্‌ আল্লা! আর মাসুদা বিবি মুখের গ্রাস মুখে রেখেই সক্‌ড়ি হাতে হাঁ করে সেই দিকে চেয়ে রইলো। তাদের খাওয়ার বাসন কোসনের দিকে তাকিয়ে চুক্‌ চুক্‌ করে আক্ষেপ করে মনোয়ার বলল, এঃ হে, তোমাদের খানাপিনা হোয়ে গেল? নানী আবার তোমাদের জন্ত আজ কিছু ভালো-মন্দ রসুই করে পাঠিয়ে দিল আমাকে দিয়ে।

এতক্ষণে ঈশাকের মুখে কথা যোগালো। বললো, ব্যাপার কি বাত্‌লাও তো মানোয়ার বিবি?

ব্যাপার আবার কি ? কাঠের থারির ওপর কুর্শিকাঁটার কাজ করা লেসের ঢাকনা খুলতে খুলতে মানোয়ার বললো, নানী আজ শখ করে কয়েকটা চিজ পাকালো—বললো, দিয়ে আয় কিছু ঈশাকদের, মুবারকের লেড়কা আমাদের আপনা আদমিই তো বটে।

ঈশাক মনে মনে হেসে বললো, বহুৎ মেহেরবানি নানী কা— তার পর থারির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হোয়ে বলে উঠলো, ইয়া আল্লা, এ যে নবাব-বাদশার সমুচা রসুইখানা এনে হাজির করেছো। আজ কি নানীর জনম কা দিন নাকি ?

ফিক্ করে হেসে মানোয়ার বললো, তা তো পুছ্ করিনি। যা হোক্ মেহনৎ করে এসব চিজ বয়ে নিয়ে এলাম, কিছু কিছু তো মুখে দাও।

জরুর জরুর ঈশাক বলে উঠলো, তুমি একটা রাস্তা এত বড় ভারি থারি বয়ে নিয়ে এলে আর আমরা থোড়া মেহনত করে খেতে পারবো না ? তার পর মাসুদার দিকে তাকিয়ে বললো, যাও তো বিবি ঝুটা বর্ত্তনগুলো রসুইখানায় রেখে আর এক দফা সাফা বর্ত্তন লে আও।

মাসুদা বিবি মানোয়ারকে কোন কালেই সহ্য করতে পারতো না, এত রাত্রে তাকে দেখে প্রথমটা অবাক হোয়েছিল, পরে তার ঠাণ্ডা মেজাজ আবার গরম হওয়ার উপক্রম করছিল। তার উপর ঈশাক আবার বাসনপত্র টেনে আনবার প্রস্তাব করতে তার বিরক্তির আর সীমা রইলো না। তবে মাসুদা একটু বোকাসোকা হোলেও বাইরের লোকের সামনে নিজেদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে চলতে পারতো, না হোলে ঈশাক এতক্ষণে মহা বিপদে পড়তো। মাসুদা বিবি গম্ভীর চালে রসুইখানার দিকে চলে গেল, আর ঈশাক ফিস ফিস করে মানোয়ারকে প্রশ্ন করলো, কি বিবি, নসীব কি আমার তবে খুললো ? মত বদলেছো ?

মানোয়ারের মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হোলো না। উদাসীন ভাবে উত্তর দিল, মত বদলানো আর না-বদলানোর কি ? তখন তোমাকে এক বাত জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম। একটু ইতস্ততঃ করে সে বললো, আজ ফজিরে তুমি সব বাত বললে, লেকিন আমার ইনামটা কি রকম মিলবে, তাতো কিছু বাত্‌লালে না ?

খুশিতে মুখ ভরপুর করে ঈশাক বললো, সেজন্য কিছু ঘাবড়িওনা বিবি, আমি জামিন রইলুম। কমসে কম দো বরষ পায়ের উপর পা দিয়ে বোসে খেতে পারবে।

মানোয়ার বললো, তবু একটা আন্দাজ দাও তো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ঈশাক মানোয়ারের কানে কানে কি বললো।

মানোয়ার তার উত্তরে বললো—বেশক। মগর শুধু মুখের বাতে হবে না, নিয়ে এসো সি আহি, কলম আর কাগজ লিখে দিতে হবে তোমাকে।

দু'দণ্ড ঈশাক তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো— মানোয়ার বিবি, এ জরুর তোমার নানীর বাত। তোমার কাঁচা মগজে এখনও এমন পাকা বুদ্ধি গজায়নি।

মানোয়ার শক্ত গলায় জবাব দিলো—সে যার বাতই হোক, লিখে তোমাকে দিতেই হবে, আর না হোলে বল আমি ঘরে ফিরি।

দ্বিধা ভরে ঈশাক বললো : মগর এ লিখবার বাত বাদশাহর, তারই তো কৃপায়, আমি কি করে লিখি বল ?

মানোয়ার উঠবার উপক্রম করতে করতে বললো : তা হোলে আমি উঠি।

ব্যাকুল হোয়ে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঈশাক বললো—আচ্ছা বিবি আচ্ছা। তুমি যখন বলছো তোমার বাত মানতেই হবে।

নিয়ে আসছি আমি সি-আহি, কলম আর কাগজ। তুমি উঠো না—তার কথা শেষ না হোতেই মাসুদা দেখা দিল দরজার কাছে এক গোছা পরিষ্কার বাসন দু'হাতে ধরে।

তাড়াতাড়ি কথা পালটে নিয়ে ঈশাক বললো—এই যে সাফা বর্ত্তন এসে গেছে। তোমাকেও লেকিন মানোয়ার বিবি আমাদের সঙ্গে কিছু মুখে দিতে হবে।

মানোয়ার হেসে বললো—আরে আমি আগে পেট ভর্ত্তি করে তবে তো তোমাদের জন্য খানা নিয়ে এসেছি।

ঘাড় নেড়ে ঈশাক বললো—তা বললে শুনছি না—বলতে বলতে নিজেই বড় চম্‌চহ দিয়ে তিনটি থারিতে মানোয়ারের আনা খানা ভাগ করতে লাগলো আর তার ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগলো আরে বাহবা কি বাহবা ! মানোয়ার বিবি আজ খান্ জাহান খাঁর সমুচা রসুইখানা উজাড় করে ঢেলে নিয়ে এসেছে। পরাঠা, কাবাব, কোফতাহ, কোর্ম্মা, গুটকা, হাড়িয়া তোফা তাফা। হাত চালাও মাসুদা বিবি ! বরষে দুবার এমন খানা বরাতে জোটে না।

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে মানোয়ার বললো—আমার আর কি ? সবই তো নানী রসুই করে গুছিয়ে ঠিক ঠাক করে দিল।

বহুত বরষ আউর জিন্দা রহে নানীজি—একটি থারি মানোয়ারের সামনে এগিয়ে দিতে দিতে ঈশাক বললো। আর একটি থারি মাসুদার দিকে এগিয়ে দিতেই সে ভারি গলায় বলে উঠলো— আমার আর ভুখ নেই আর তবিয়ৎও আচ্ছা লাগছে না। আর বসে থাকতে পারছি না, তোমরা যদি কিছু মনে না কর তবে আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি। ঈশাক এতক্ষণ তাই চাইছিল তাই দরদ ভরা গলায় তাড়াতাড়ি উত্তর দিল জরুর জরুর। আজকে তোমাকে একটু কেমন যেমন কাহিল কাহিলও দেখাচ্ছে। আর দের না করে শুয়ে পড় গিয়ে। মানোয়ার বিবির বর্ত্তন টর্ত্তনগুলো আমি কাল না হয় পৌঁছে দিয়ে আসবো।

—খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে ঈশাকে আর মানোয়ারের কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো, তার পর খাওয়ার শেষে চিলম্‌চিতে হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে ঈশাক মানোয়ারের পাশে বসলো। প্রশংসার সুরে বললো : বহুৎ বড়িয়া খানা বানিয়েছো বিবিজী ! বহুৎ খো আস্তাহ পরাঠা হোয়েছে। মানোয়ার আগেই খাওয়া শেষ করে বসেছিল। এবার একটু অধৈর্য্য হোয়ে বললো, রাত বেড়ে যাচ্ছে মিঞা, কাজের কাজটা চুকিয়ে ফেলো, আমি বাড়ী যাই।

আরে সবুর বিবি সবুর। এতদিন পর এসে গরীবের ডেরায় না হয় দু' দণ্ড বসলেই। বলতে বলতে ঈশাক উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো দয়াত কলম আর এক ফালি কাগজ হাতে নিয়ে। মানোয়ারকে লক্ষ্য করে বললো বাতলাও বিবি কি লিখতে হবে।

মানোয়ার বললো, আমি আবার কি বাতলাবো ? এইমাত্র তুমি যা বললে তাই লেখো। তবে ইয়াদ রাখো বাদশাহ যদি এতে গয়র রাজী হয় তবে তুমি মউকুফ পাবেনা। এর গুনাহগার তোমার নিজের দিতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঈশাক বললো আর বিবি, গরজ যখন আমার তখন তোমার সব বাতই মেনে নিতে হবে।

দেওয়ালগিরির আলোর সামনে কাগজ ধরে খসখস করে খানিকক্ষণ কি লিখে মানোয়ারের সামনে কাগজখানা মেলে ধরে ঈশাক। বললো, এই নাও আমার রাজীনামা। দেখে নাও ঠিক আছে কিনা।

এইবার ঈশাক এক চাল চাললো। লেখাপড়ার সঙ্গে মানোয়ারের সম্পর্কটা যে কতদূর ছিলো তা ঈশাকের অজানা ছিলো না, আর তার নানী বুড়ির এ সম্বন্ধে কে , প্রশ্নই আ স না। আবার এ এমন একটা ব্যাপার যে পাড়াপড়শীর কাউকে দিয়ে পড়াতেও পারবো না, তাই তার মুকলচাহের সংখ্যার মধ্যে একটা ফাঁক রেখে দিল। ভাবলো বাদশার কাছে রুপায়া গুণে নেবো ঠিকই তারপর কাজ খতম হোলে মানোয়ার বিবিকে—আচ্ছা সে পরের কথা পরে দেখা যাবে।

মানোয়ারের লেখাপড়া সামান্য যা জানা ছিলো তাই দিয়ে ঈশাকের টানা লেখাকে কোনমতেই আয়ত্তে আসতে পারলোনা। কিন্তু সে কথা সে ঈশাকের কাছে বলে ছোট হতে যাবে কেন ? তাব একদৃষ্টে পড়বার ভঙ্গী করে খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো : এখন তো ঠিকই আছে মনে হোচ্ছে, পরে যদি কোন খটকা লাগে তবে কাল সবেরে তোমার কাছে ফের আসবো।

তামাম ঠিক আছে বিবিজী, ঘাবড়াও মৎ। তা হোলে কাল সাঁঝে তোমার বাড়ীতে বাদশাহের তাঞ্জাম যাবে। সাজ পোশাক একটু ভালো করে করতে হবে, সে কথা ভুলোনা। যদি কম থাকে তবে বল, কাল সবেরে একপ্রস্থ সাজ-পোশাক কিনে আনবার বন্দোবস্ত করবো।

আচ্ছা কাল আমি তোমাকে জানাবো। এখন আমি যাই, অনেক রাত হোলো, বলতে বলতে মানোয়ার উঠে দাঁড়ালো।

ঈশাক বললো আমি তোমায় পৌছে দিয়ে আসি ?

না না, না, এই তো এতটুকু পথ, আমি একাই যেতে পারবো, বোরখাটা ভাঁজ করে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে উড়নায় মুখ ঢেকে মানোয়ার বেরিয়ে গেল। এক হাতে জ্বলন্ত চিরাগ ধরে অন্য হাতে উড়না সামলাতে সামলাতে দ্রুত গতিতে মানোয়ার পথ চলছিল, হঠাৎ পেছন থেকে তার দোল খাওয়া লম্বা বিনুণিটাতে হ্যাঁচকা একটা টান পড়লো। পড়তে পড়তে টাল সামলে নিল মানোয়ার, হাতের চিরাগটা মাটিতে পড়ে দপদপ করে দু-একবার জ্বলে নিবে গেল।

অন্ধকারের মধ্যে কার বিদ্রূপভরা গলার আওয়াজ শুনতে পেলো। কি ধার সে সফর খতম কর আতি হো মানোয়ার বিবি ?

তার গলার আওয়াজ শুনে এক লহমার মধ্যেই সে বুঝতে পারলো লোকটা কে। অন্ধকারের মধ্যে আবার তার কথা শোনা গেল, কি মুখে যে বাত নেই ? বলি এই আঁধারে দুপুর রাতে ঘুরে বেড়ানোর তবিয়ৎটা কি শাদির আগ থেকেই ছিলো নাকি মানোয়ার বিবির ? এইবার মানোয়ার উঁচু গলায় জবাব দিল, যেখানেই সফর করতে যাইনা কেন তাতে তোমার কি ?

আমার তাতে কি ? দাঁতে দাঁত চেপে লোকটা বললো, একদম জানসে খতম কর দুঙ্গা। আঁধারে মিট্টিতে পুঁতে ফেলবো, একটা চিড়িয়াও জানতে পারবেনা।

মুখ ভেঙ্গিয়ে মানোয়ার বললো : ইঃ ডর দেখাতে এসেছে. জানসে খতম কর দুঙ্গা। খানা, কাপড়া দেবার মুরাদ নেই, বাত আছে লম্বা চৌড়া। এত দিন বাদে কোথা থেকে হাজির হোলে ? জেবে বুঝি বখেয়া সেলাই ছাড়া আর কিছু বাকি নেই ?

মানোয়ারের মরদ আজিজ দুরবাণী অসহিষ্ণু স্বরে উত্তর দিল মস্করা করোনা। তোমাদের বাড়ী যেতে তোমার নানী বলল, তুমি তোমার চাচী আম্মার বাড়ী গিয়েছো। কোথায় যে তোমার চাচা, খালা আন্দাজ করতে পারলুম না। সদর রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে এগিয়ে গেলাম। ফিরে আসবো ভাবছি তখন দেখলুম ঈশাক মিঞার বাড়ী থেকে বেরুচ্ছো। ঈশাকের আম্মা কবে মরে জিন হোয়েছে, তবে কোন চাচী আম্মার কাছে ফির্ণী খেতে গিয়েছিলে ?

ভয়ে মানোয়ারের বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল, শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে চেটে বলল, দ্যাখো রাস্তায় দাঁড়িয়ে হল্লা করো না, বাড়ী ফিরে যা বলবার বলো।

কিছুক্ষণ কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে আজিজ তুররাণী বললো, বেশ তাই চল।

বাড়ী ঢুকে মানোয়ারের কাঁধ থেকে বোঝখাটা পর্য্যন্ত নামাবার অবসর না দিয়ে আজিজ বললো, এইবার তো বাড়ী ঢোকা গেছে, এখন বল।

বাড়ী এসে মানোয়ারের সাহস বেড়ে গেল, বাড়ীতে নানী আছে, যার পাকা মাথার বুদ্ধি আজিজের মত তিন জনকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে। তাই মুখ থেকে উড়নাটা খুলতে খুলতে নির্ভীক গলায় উত্তর দিলো : কি বলবো ?

ঠাণ্ডা গলায় আজিজ বললো, বলো কত দিন থেকে ঈশাক মিঞার সঙ্গে তোমার আশনাই চলছে ?

দপ করে চটে উঠে মানোয়ার বললো, জিয়াদা বাত মৎ করো।

ওয়াহিদান বিবি কোথায় বসেছিল, তাদের চড়া গলার আওয়াজ শুনে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলো। মানোয়ারকে ধমক দিয়ে বললো, কি লাগিয়েছিস ? এত দিন পর আজিজ ঘরে এলো, কোথায় আদর করে ওজু করবার পানি দিবি, খানাপিনা ঠিক করবি, না ঝগড়া লাগিয়েছিস।

মানোয়ার বলল, আমি কোথায় করছি ? ঐ তো শুরু করেছে ঝগড়া ঝাঁটি বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই।

জরুর করেঙ্গে, তক্তাপোশ থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ গলায় আজিজ বলে উঠলো, পুছো উসকো নানীজী রাতকো আঁধার মে ক্যায়া জরুরৎ থা ঈশাককা পাশ ?

ওয়াহিদান বিবি মিষ্টি হেসে আজিজের মাথার উপর হাত রেখে বললো, আরে শির তো মৎ গরম কর না ভাইয়া! ঈশাকের আওরৎ এর সঙ্গে ওর দোস্তি আছে; তাই আজ রাতে এক সাথে থোড়া খানা পিনা করতে ডেকেছিল, এর মধ্যে ওর কসুরটা হোয়েছে কোথায় ? যাও শির ঠাণ্ডা করে হাতে বদনে পানি দিয়ে এসো, তার পর ঘরে যা কিছু খানা আছে তাই খাও।

আজিজ আপন মনে গজগজ করতে লাগলো। ওয়াহিদান বিবির পিছন পিছন মানোয়ারও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রসুই-খানায় ঢুকে মানোয়ার আর ওয়াহিদান বিবি দু'জনে একবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো আর মানোয়ার বলল, নানী যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই ঘটলো।

ওয়াহিদান বিবির মুখেও চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে এসেছিলো, মুখে তা প্রকাশ না করে শুধু মানোয়ারকে বলল যা, এক লোটা পানি দিয়ে আয় আগে তার পর ভাবা যাবে কি করা যায়। লেকিন ঝগড়াঝাঁটি করবি না। ও কড়া বাত বললেও চুপ করে থাকবি। মেজাজ গরম করে সব ভেস্তে দিবি না।

নানী, ও আমাকে ডর দেখিয়েছে খুন করে ফেলবে বলে। আর্ত্ত সুরে মানোয়ার বলল।

আচ্ছা, আচ্ছা তোকে এমন ডরাতে হবে না। খুন করা অমনি মুখের বাত, বললেই হোলো আর কি।

বলতে বলতে ওয়াহিদান বিবি একটা চ্যাটালো বর্ত্তনের থেকে খানকয়েক রুটি বের করে একটা বড় থারিতে রাখলো, কলাই করা বড় বাটি থেকে খানিকটা চানার ডাল আর একটা ছোট বাটিতে ঢাললো। তার পর খানিকটা হালুয়া, কয়েকটা খেজুর থারির পাশে রাখলো। ছোট বাটিতে করে খানিকটা মধুও ঢাললো। তার পর মানোয়ারকে বলল দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বললুম না এক লোটা পানি দিয়ে আসতে ? তুই এগো, আমি খানাগুলো গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

মানোয়ার বলল : শুধু এই দিবি ? আরো তো কত খানা বেঁচেছে।

বুদ্ধি দেখোনা হারামজাদীর! চাপা রাগের সুরে ওয়াহিদান বিবি বলল, দুপর রাতে ঘর থেকে পোলাও, কোর্ম্মা, পরাঠা বের করলে তোর মরদ তোকে খুব সোহাগ করবে না ? খানিক আগে ওকে বললাম না ঈশাকের আওরৎ তোকে খানা খেতে ডেকেছিল ? আর কোন কথা না বলে পানির লোটা হাতে নিয়ে মানোয়ার বেরিয়ে গেল।

ওয়াহিদান বিবি খানার থারি হাতে করে ঘরে ঢুকে দেখলো মানোয়ার একা দাঁড়িয়ে আছে। নানীকে দেখে বলল, অজু করতে গেছে।

আর কোন কথা কাটাকাটি করিস নি তো ?

নীরবে মানোয়ার ঘাড় নাড়লো। খানার থারি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওয়াহিদান বিবি ক্লান্ত হোয়ে হাতের থারি মেঝেতে রেখে তক্তাপোশের একধারে বসে পড়লো। মানোয়ারের চোখ ঘুমে ঢুলে আসতে লাগলো. আজিজ অজু করে আর ফিরে এলো না। আবার দু'জন চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। গতিক বড় আমি সুবিধার বুঝছি না নানী—বলতে বলতে মানোয়ার দরজার বাইরে একবার উঁকি দিল। কারুর কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখতে পেলো না। ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বললো, কি হবে নানী ? ও যখন আসে এমনি তো চলে যায় না, কিছু রেস্ত যোগাড় করে তবে যায়।

ওয়াহিদান বিবিও মনে মনে যথেষ্ট ভয় পাচ্ছিল, মানোয়ারের কথার উত্তরে বললো, খুদা যা করে তাই হবে। যা এখন শুয়ে পড় গিয়ে—বলতে বলতে খানার থারিটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে শোওয়ার ঘরে ঢুকলো। ঘরের এক কোণে থারিটা রেখে ছোট একটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতে রাখতে ওয়াহিদান বিবি বলতে লাগলো, সবই নসীব। না হোলে এত দিন পর, দিন বুঝে বুঝে আজই বা আসতে যাবে কেন ?

কিন্তু নানী কাল যদি ও আবার আসে ?

সে ভাবনা আমার, ওয়াহিদান বিবি ধমকে উঠলো, বক্ বক্ না করে এখন ঘুমো দেখি—তারপর গলার স্বর নামিয়ে বললো, ঈশাকের কাছ থেকে লিখিয়ে এনেছিস ?

হ্যাঁ, এই নাও। অন্ধকারের মধ্যে কুর্ত্তার ভেতর হাত চালিয়ে মানোয়ার একটুকরো কাগজ ওয়াহিদান বিবির হাতে গুঁজে দিল।

নিশ্চিন্ত মনে পালঙ্কে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল ঈশাক, হঠাৎ কিসের আওয়াজ পেয়ে তার এমন মিঠা ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কান খাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করলো আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে, চোর-চামার ঢুকলো নাকি ? বালিশ থেকে মাথা উঁচু করলো ঈশাক কিন্তু আওয়াজটা ঘরের ভেতর থেকে আসছে না, আসছে বাইরে থেকে। আর চোর চুরি করতে এসে বাইরের দরজায় ঠোকর দিয়ে ঘরের মালিককে এমন

তাবে ডাকে না। সেই ক্রমাগত টোকার আহ্বান উপেক্ষাও করা যায় না, তাই আরামের ঘুম ছেড়ে উঠতেই হোলো ঈশাককে। আন্দাজ করলো নিশ্চয়ই মানোয়ার বিবি। আবার কি মনে পড়েছে তার নানীর, তাই ছুপুর রাতে আবার পাঠিয়েছে তাকে। বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করলো ঈশাক, তার পর বিছানা ছেড়ে এগিয়ে গেল সদর দরজার দিকে। একেবারে হাট করে খুলে না দিয়ে অল্প একটু ফাঁক করে জিজ্ঞাসা করলো, কে ?

বাইরে ফিস-ফিস করে পুরুষের গলার আওয়াজ ভেসে এলো, ঈশ শাক মিঞা! থোড়া মেহেরবানি কর বাহার মে আনা। মুঝে আপকো সাথ ভারী জরুরৎ হ্যায়।

ঈশাক আশ্চর্য্য হোলো, ভয়ও পেলো সেই সঙ্গে। তার ইতস্ততঃ ভাব টের পেয়ে বাইরে আবার সেই গলার আওয়াজ শোনা গেল। ডর তো মৎ করনা জনাব, মুঝে আপকা দোস্ত হ্যায়।

এবার দরজাটা অর্দ্ধেক ফাঁক করে শুধুমাত্র মুণ্ডুটা বের করে ঈশাক প্রশ্ন করলো, কোন হ্যায় আপ ?

এইবার লোকটা একেবারে দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললো, মেরা নাম আজিজ হুররাণী মানোয়ার বিবি কী মরদ হুঁ।

সভয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল ঈশাক কিন্তু ততক্ষণে আজিজ শক্ত হাতে দরজার পাল্লাটা চেপে ধরেছে আর এক হাতে ঈশাকের কাঁধটা চেপে ধরে সে নরম সুরে বললো, ম্যয় তো পহলেই বোলা চুকা আপকো দোস্ত হৈ কুছ নোকসান আপকো নেহি করুঙ্গা।

ঈশাক একটা ঢোঁক গিলে বললো, ক্যায়া জরুরৎ হ্যায় আপকা মেরা সাথ ? এইবার সরাসরি ভিতরে ঢুকে গেল আজিজ। তারপর ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললো আজ তোমার ঘরে কি ছিল ? রাতে মানোয়ার বিবিকে খানা খাওয়ার জন্য তোমার বেগম সাহেবা দাওয়াত দিয়েছিল কেন ?

ঈশাকের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল আমার ঘরে মানোয়ার বিবিকে খানার দাওয়াত কই না তো।

এক দণ্ড চুপ করে থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলো আজিজ হুররাণী—নিজের মনে বলে উঠলো, আমি ঠিক আন্দাজ করেছিলাম সব ঝুট বাত। এইবার তুমি বল দেখি ঈশাক মিঞা, তোমার বিবিকে যদি ছুপুর রাতে আমার ঘর থেকে বেরুতে দেখতে তা'হলে তুমি কি ভাবতে ?

ব্যাপারটা চট করে ধরে নিতে পারলো ঈশাক কিন্তু মুখের কথা আর হাতের ঢিল একবার বেরিয়ে গেলে আর তো ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। সহসা আজিজ হুররাণীর ভীষণ হাসি থেমে গেল। তার চেয়েও জোরে হেসে উঠেছে ঈশাক। হাসির গমকের ফাঁকে ফাঁকে তার মুখ দিয়ে বেরুলো সমঝ গিয়া কিধার ভুমহারা দিল তড়পতা। লেকেন মেরা উপর তো নারাজ মৎ হোনা ভাইয়া। তারপর হাসি থামিয়ে গলার স্বর নীচু করে বললো আজিজ মিঞা, কসম খাচ্ছি, আমার কোন কসুর নেই। যদি বল তো তোমার সামনে কান মলাও খেতে পারি। মানোয়ার বিবির ও কোন কসুর নেই, যদি কসুর কারুর থেকে থাকে তবে তা তোমার।

স্বর্গীয় শেঠ ঘনশ্যামদাস ভগৎ কলিকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উচ্চস্তরের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজ চেষ্টায় ও কঠোর পরিশ্রমে সামান্য অবস্থা হইতে বিরাট ধন ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি নৈহাটী জুট মিলস্ কোং লিঃ, মথুরা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিঃ-এর পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন এবং ক্যালকাটা ফ্লাওয়ার মিলস্, লক্ষ্মী অয়েল মিলস্ ও আরও বহু প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন। তিনি খুব ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছুইটি ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গত প্লাবনের সময় তিনি বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মারফৎ দৈনিক ছুই হাজার পাঁউরুটী বন্যার্ত্তদের বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গত ১০ই জানুয়ারী ১৯৬০ তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার স্ত্রী, একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ কালীচরণ ভগৎ, পৌত্র-পৌত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমার ? আজিজ আশ্চর্য্য হোয়ে বললো।

জরুর তোমার। এত বড় খানদানী ঘরের লেড়কা হয়ে তুমি জানোনা ঘরকা জরু আউর বাহারকা গরু দোনো এক সমান। ছুটোরাই বাস আপসা করেছো কি তাবা বিগড়েছে।

আজিজ তুসরাণীর হাতের মুঠো শক্ত হোয়ে উঠলো, বললো—মিঞা, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন গোলমেলে ঠেকছে, একটু খুলাসাহ করে বল।

বলবো। মগর এখন নয়। এ রাতের আঁধারে বলবার মত কথা নয়, দিনের আলোয় দু' চোখ দিয়ে দেখবার মত ব্যাপার। তাই তোমাকে দেখাবো। কাল তুমি মোলাকাত করো আমার সাথে সাঁঝ হবার খানিক আগে। আমার ঘরে নয়, বাদশাহের ইমারতে। তুমি সাবাদ জানো আমি বাদশাহের খাস খিদমৎগার। কাল সাঁঝ হবার আগে বাদশাহের মন্‌জিলের পেছনে শনের দোচালা ঘরে থাকে সাহিদ বিহিশতীওয়ালা, সেখানে গিয়ে তাকে আমার নাম শুধাবে, সে আমাকে ডেকে দেবে। তখন আমি তোমার সাথে মোলাকাত করবো, যা বলবার বলবো, যা দেখাবার দেখাবো। এখন যাও!

আজিজ তুররাণী বললো, কাল সাঁঝ হোতে তো বহুৎ দেরি ঈশশাক মিঞা। এখনই তোমার যা বলবার বলে ফেলো না, না হোলে সারারাত দো আঁখের পাত এক করতে পারবো না।

থোড়া সবুর করো। যা শুনতে চেয়েছিলে তার চেয়ে বেশি দেখতে পাবে—লেকিন কসম্ খেয়ে যাও গুস্সার মাথায় মানোয়ার বিবির ঘরে গিয়ে খুন্‌খারাপি করে বসবে না, আজ এত রাতে ওখানে পা-ই দেবে না। মসজিদেই আছে বাদশাহের মুসাফিরখানা। সেখানে গিয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দাও। ফোর্ট-ক্লিয়ংসে মানোয়ার বিবির ঘরে আজ আর কাল এই দুদিনের মাঝে উঠবে না।

আজিজ চুপ করে খানিকক্ষণ কি ভাবলো, পরে বললো : বেশক্ তাই হবে, ইন্‌শাল্লাহ!

ইন্‌শাল্লাহ!

সাহিদ বিহিশতীওয়ালা তার লম্বা পাজামার পা দুটো হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত গুটিয়ে, নীল কুর্ত্তার হাত দুটো কনুই-এর ওপর পর্য্যন্ত উঠিয়ে মাথার টুপি খুলে, গামোছাটাকে মাথায় পাগড়ির মত জড়িয়ে ঘর থেকে মশকগুলি একটার পর একটা বাইরে বের করে রাখছিল। ঠিক সেই সময় দিনের পড়ন্ত আলোয় তার উঠানে একটি লোক এসে দাঁড়ালো—প্রশ্ন করলো সাহিদ বিহিশতীওয়ালা ?

ম্যয় হুঁ। আপ ঈশশাক মিঞা কি সাথ মোলাকাত করনে মাঙতে হেঁ ?

লোকটি ঘাড় নাড়লো। হাতের মশক মাটিতে রেখে সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে সে বললো, চলিয়ে মেরা সাথ।

কলের পুতুলের মত লোকটি সাহিদ বিহিশতীওয়ালার পেছন পেছন চললো। প্রথম খানিকটা খোলা জায়গা পার হোয়ে তারপর গলির পর গলি এঁকেবেঁকে পার হোতে লাগলো। গলির দুপাশে বড় বড় উঁচু ইটের দেয়াল—তার মাঝে মাঝে বড় লোহার ফটক আর দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার। প্রায় পনরো মিনিট চলার পর হঠাৎ ভোজবাজির মতো অন্ধকার দূর হোয়ে গেল, পড়ন্ত সূর্য্যের এক ঝলক রঙিন আলোয়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেল তার কালো পর্দাটা। প্রথমটা চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিলো আজিজ তুররাণীর। হঠাৎ সে শুনতে পেলো সালাম আজিজ ভাইয়া।

চোখ রগড়ে ভালো করে চেয়ে দেখলো সাদা পাথরের তৈরি ছোট একটি ঘরের ভিতরে সে দাঁড়িয়ে আর তার সামনে দাঁড়িয়ে ঈশাক হাসছে, ঠিক সময়েই এসেছো আজিজ মিঞা, একটুও দেরি হয়নি।

বিমূঢ় অবস্থায় আজিজ এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, পরে বললো, বেশি সময় আমি নষ্ট করতে পারবো না, কি বলবে বলেছিলে বল, কি দেখাবে বলছিলে দেখাও।

ঐ তোমার দোষ! অনুযোগের সুরে ঈশাক বললো—থোড়াও সবুর করতে পারোনা, যখন জবান দিয়েছি তখন জেনো তার নড়চড় কখনও হবেনা। আগে চলো বাদশাহের ইমারত তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাই! জানো তো কত বড় নসীব হোলে বাইরের লোক বাদশাহের মনজিলে ঢুকতে পায় ?

আজিজ খানিকটা হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল, তাই কোন কথা না বলে ঈশাকের পেছন পেছন চলতে শুরু করলো আর বিড়বিড় করে যা বলতে লাগলো তার মর্ম্মার্থ এই—বাদশাহের মন্‌জিল দেখার কপাল সকলের হয়না তা তার জানা আছে কিন্তু তার মনের অবস্থাটা এখন এমন যে, তার এত বড়িয়া নসীব ফেলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচে।

ঈশাক তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো বার বার, সবুরে মেওয়া ফলে মিঞা। কিছুদূর চলার পর এদিক ওদিক চেয়ে ফিসফিস করে ঈশাক বললো আজিজ, কে বাদশাহের সারদাব দেখবে ? শুধু আমি বলেই তোমাকে দেখাবার হিম্মৎ করছি। বাইরের লোক বাদশাহের সারদাবে ঢুকলে তাকে আর 'জান' নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবেনা। তবে আমি তোমার সজে আছি, কোন ভয় নেই তোমার। আজিজের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তার হাত ধরে প্রায় একরকম টেনেই নিয়ে যেতে লাগলো ঈশাক।

একটা মাঝারি রকমের ঘরে এসে তারা দাঁড়ালো—ঘরের প্রান্তদেশ ঢালু হোয়ে খাঁজকাটা সিঁড়িতে নেমে গেছে। তেরো চোদ্দটি সিঁড়ি নেমে তারা পৌঁছলো প্রকাণ্ড একটা ঘরে, যার এক প্রান্তে দাঁড়ালে আর এক প্রান্ত দেখা যায় না। ঘরটির মেঝে আগাগোড়া দুধের মতো সাদা মার্ব্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। দেয়ালের রং হালকা সবুজ রংয়ের। মেঝের ওপর বিছানো দশ বারোটা মোটা গালিচা, হাতীর দাঁতের তৈরি সরু, তার উপরে মখমলের ঢাকা পাতালো নানা রকমের ও নানা ধরণের অসংখ্য গির্দ্দা। ঘরের কোণে কোণে কতকগুলি শ্বেত পাথরের তৈরি চৌকিও বসানো রয়েছে। ঘরটির একটি মাত্র দরজা, কোন জানালা নেই। ছাতের ওপর নয় দশটি খিলান তাদের মাঝখানে ছ্যাঁদা করে বড় বড় চোঙা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলির ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতর হাওয়া যাতায়াত করে।

আজিজের ভড়ভড় ভাব দেখে ঈশাক বেশ আমোদ অনুভব করলো। মনে মনে হেসে বললো কেমন দেখছো বাদশাহের সারদাব ভাইয়া ? গরমি কালের দুপুরে বাদশাহ এ ঘরে থাকেন। দেখেছো কোনখান দিয়ে এ ঘরে বাইরের গরম হাওয়ার হল্‌কা ঢুকবার উপায় নেই।

আজিজ কিন্তু মুখের হাঁ টুকু ঈকি কাঁক করে চেয়েছিলে ঘরের একটা দিকে—যেখানে কতকগুলি মানুষ-প্রমাণ শ্বেত পাথরের নারীমূর্ত্তি সাজানো রয়েছে। ঈশাকের কথা শুনে হুঁশ হোলো তার। সে দিক থেকে চোখের দৃষ্টি তার চলে গেল দেয়ালে টাঙানো পারস্য দেশীয় চিত্রগুলির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পিচ করে থুথু ফেললো মেঝের উপর আজিজ দুররাণী আর বলে উঠলো, তোবা, তোবা, ক্যায়া বেওমিজ তস্‌বির——

শিউরে উটে চট করে পায়ের তলা দিয়ে থুথুটা মুছে ফেলে নীচু চাপা গলায় ধমকে উঠলো তাকে ঈশাক। শিরটা এখানেই রেখে যাওয়ার ইচ্ছে আছে না কি? তারপর জোরে ঠ্যালা দিয়ে তাকে ঘরের বার করে আনলো ঈশাক।

আর এক ধাপ সিঁড়ি নামতে নামতে বললো, মুখে থোড়া লাগাম তো কভী আজিজ মিঞা! জানো বাদশার ইমারতে এক দেয়ালের হাজার কান আছে।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো আজিজ ম্যয় আউর কোই তরফ নেহি যাউঙ্গা।

আরে চল, চল, কি হোলো আবার?

ঈশাকের কথায় বাধা দিয়ে আজিজ বললো, কভি নেহি। যবতক্‌ তুম্‌ মুঝে বো বোলাথা উ নেহি দেখাও তো ম্যায় এক পাও ভি নেহি চলেঙ্গে।

বিরক্ত সুরে ঈশাক বললো, আরে তাই তো দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

সাঁচ?

জরুর সাঁচ।

আর কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেল ঈশাক আজিজকে নিয়ে। এক ঝলক মৃদু উষ্ণ হাওয়া দু' জনকে একবার ছুঁয়ে গেল, সেই সঙ্গে ভেসে এলো প্রাণমাতানো অতি মিষ্টি একটা সুগন্ধ যেন হাজার হাজার গুলবাগ থেকে, লাখ লাখ পাপিয়া মুখরিত বুঁস্তা থেকে ছেঁকে নিয়ে আসা হোয়েছে সেই সুগন্ধ। যেখানে ঈশাক আজিজকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছিল বাদশাহের হামামের তলদেশ। অপরিসর ছোট একটি ঘরে স্তূপাকারে খসের মূল, মেরলম চীনি, মুসব্বর, রুমী মস্তগী, খেজাব প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি জিনিস জ্বালিয়ে সুরক্ষিত করা হোচ্ছিল উপরে বাদশাহের হামাম। ধিকিধিকি জ্বলছিল সেই সুগন্ধি শুকনো মূলগুলো। আজিজকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আরও দু'ধাপ সিঁড়ি নেমে গেল ঈশাক। তারপর গায়ের জোরে একটা ভারী লোহার পোয়ানো দরজার মোটা কড়া দু-হাতে ধরে হ্যাচকা টানে উঠিয়ে ফেললো সেটা তার পর আজিজকে ডাকলো ইধার আও। দ্বিধা ভরে আজিজ এগিয়ে গেল সেখানে। দরজাটা সেই রকম দু হাতে ধরে থাকতে থাকতে ঈশাক বলল তাকে: দেখো নীচু হোকে যো দেখনে মাঙ্গা থা।

আজিজ নীচের দিকে তাকালো, ঘন ধোঁয়ার বাষ্প ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলোনা। প্রবল উষ্ণতার ছোঁওয়া পেয়ে তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিয়ে বললো কোই কুছ ভি তো নেহি দেখা।

আরে দেখো থোড়া নজর কর।

হুজুর! একটা গুরুভার শব্দে যেন দুনিয়ার বুক ভেদ করে ঢুকে গেল আর ওপরে একটা ভারী ধাতব আওয়াজ শোনা গেল ঝটাং।

বোগদাদের আমীর তৃতীয় আবু সালাং দাবুদ খাজের হামাম তারাম দুনিয়ার সমস্ত প্রকারের বিলাস উপকরণ দিয়ে তৈয়ারি। নানা রকমের ও নানা আকারের মার্ব্বেল পাথর দিয়ে গড়া এই হামাম। বিশাল ঘরের চোদ্দটি জানালা নানা আকারের। কোনটি বিশেষ ধরণের পাখীর আকৃতির, কোনটি ফুলের মত কোনটি সিংহের মুখের মতো। কোনটি বা মৎস্যনারীর আকারের ঘরের ধপধপে সাদা দেয়ালের কোণে কোণে নানা ধরণের জাফরিকাটা, তার চার পাশে তেল-রং দিয়ে নানা রকমের ফুলফল, লতাপাতা আঁকা। ঘরের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি কতকগুলি শ্বেত পাথরের তৈরি চৌবাচ্চা। তার কোনটি গুলাব, কোনটি কেওড়াগন্ধি জলে পূর্ণ। অন্যগুলি কোনটি গাধার দুধে, কোনটি বরফ-শীতল ঠাণ্ডা জলে, কো-টি উষ্ণ জলে ভর্ত্তি। ঘরের মাঝখান খুঁড়ে একটি তালাবের মতো তৈরি করা হোয়েছে, তাতে ভাসছে গুলাবের পাপড়ি আর তার মাঝখানে একটি ফোয়ারা থেকে ক্রমাগত উর্দ্ধমুখী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হোচ্ছে। ঘরের চার কোণে অসংখ্য মিনাকরা রূপার ফুলদানিতে অজস্র ফুল। দেওয়ালের জাফরি কাটা কাজগুলোর ভেতর দিয়ে সূর্য্যের পড়ন্ত আলো হামাম ঘরের দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে আটকানো মানুষ প্রমাণ আয়নায় প্রতিফলিত হোয়ে ছোট ছোট বিন্দুর আকার ধারণ করে মেঝের পড়োছল। মনে হোচ্ছিল বাদশাহের বেগম যেন তার মতির মালা অভিমান ভরে ছিঁড়ে সারা ঘরময় ছড়িয়ে ফেলেছেন। সুগন্ধে ঘরটি ভরপুর হয়েছিল। হামাম ঘরটির চারপাশে জায়গায়

জায়গায় অদৃশ্য ছিদ্র থেকে নীচে তলদেশের সুগন্ধ বাষ্পকুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উত্থিত হচ্ছিল।

চার জন বিশাল দেহ খোজা মখমলের গদি মোড়া তাঞ্জামে চড়িয়ে আমীরকে হামামে এনে উপস্থিত করলো। সাবধানে তাঞ্জাম মাটিতে নামালো। হামামের খাস নফর দৌড়ে এলো, তার সাহায্যে উত্তীর্ণ প্রৌঢ়সীমা অতি মাংসল আমীর তাঞ্জাম থেকে নেমে জরির কাজ করা পুরু গদি আঁটা একটি গালিচায় কমখোআবের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নফর তার সামনে শ্বেত পাথরের তৈরি একটি ছোট চৌকি এনে তার ওপর একটি স্ফাটিক নারগিলা রাখলো। আর একজন সরবৎ ভর্ত্তি একটি সোনার পানপাত্র সেই নারগিলার পাশে রাখলো, আর এক পাশে রাখলো গোল রূপার পাত্রভর্ত্তি বরফ। রেশমী সুতো আর জরির তার দিয়ে মোড়া লম্বা নল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ খাম্বিরা তামাক চোখ বুজে সেবন করলেন আমীর—পরে মেহদি রঙ্গে রাঙ্গানো দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ভারী গলায় আওয়াজ করলেন হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে হামামের বাইরে এক সঙ্গে একশো কোয়েল যেন গেয়ে উঠলো, এমনি শব্দ হোলো অতি মিঠাসুরে টুং টাং টুং টাং।

হামামের দরজা খুলে গেল—একটি নারীমূর্ত্তি ভীরুপায়ে অতি সঙ্কুচিত ভাবে পা ফেলে এগিয়ে এলো ঘরের ভিতর। স্ত্রীমূর্ত্তিটির দামী রেশমী পোষাকের উপর চিকণ মসলিনের একটা আবরণ। সেই আবরণ যাতে খুলে না পড়ে যায়, সেজন্ত গলার নীচে খানিকটা কাপড় জড়ো করে একটা পিন দিয়ে আটকে রেখেছে, তার উপর বসানো একটা ফিরোজা রং-এর পাথর। সূক্ষ্ম বস্ত্রের আচ্ছাদন ভেদ করে দেখা যাচ্ছিল স্ত্রীলোকটির গোলাপ ফুলের মত গায়ের রং আর নধরদেহের পরিপূর্ণতা।

আমীর তার দুই চোখের দৃষ্টি দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করতে করতে জোর গলায় বললেন, ইধার আও তুরন্ত। স্ত্রীলোকটি চলতে চলতে হঠাৎ থমকে থেমে পড়েছিল—আমীরের গলার আওয়াজ শুনে থরথর করে একবার কেঁপে উঠলো, পরে এক পা দু'পা করে আবার এগুতে লাগলো। চীৎকার করে আমীর আবার বলে উঠলেন, মুখকা কাপড়া উতারো। পেছন থেকে জোরালো কার দুটি হাত স্ত্রীলোকটির মুখের ওড়না নামিয়ে দিল। সোৎসাহে আমীর গালিচার উপর সিধা হোয়ে বসলেন। হামামের চার ধারে গম্ গম্ করে উঠলো তার চীৎকারের প্রতিধ্বনি, সাবাস! ঘরের জোরালো বাতিটা দপ করে নিবে গেল—এক মিনিট সব অন্ধকার—তারপর জ্বলে উঠলো গাঢ় নীল রং-এর একটা আলো।

রাত্ত বারোটায় আমীরের গুসল্ শেষ হোলো।

মানোয়ার বিবি হামামের বাইরে এলো ঈশাকের সঙ্গে। তাকে লক্ষ্য করে মানোয়ার বললো, ঈশাক মিঞা, এবার আমার ইনামটা দিয়ে দাও, আমি বাড়ি ফিরি।

ঈশাক অবাক হোয়ে বললো, এই দুপুররাত্তে?

শক্তভাবে মাথা নেড়ে মানোয়ার বললো, জরুর। সেটা আমার হাতে এসে না পৌঁছান পর্য্যন্ত এখান থেকে নড়ছি না।

মুখ নীচু করে ঈশাক খানিকক্ষণ কি ভাবলো। পরে বললো, বেশক্ তাই হবে। তুমি এখানে একটু বোসো, আমি নিয়ে আসছি।

শিউরে উঠে ঈশাকের কামিজের আস্তিনটা চেপে ধরে মানোয়ার বললো, নেহি, নেহি, ঈশাক মিঞা, মুঝে একেলা ছোড় কর তো নেহি যানা। আমাকে ও শাসিয়ে রেখেছে রাতের আঁধারে খুন করে মাটিতে পুঁতে ফেলবে—একটা চিড়িয়াও জানতে পারবে না।

তার কথা শেষ না হোতেই হো হো করে হেসে উঠলো ঈশাক। তারপর মুখ নীচু করে মানোয়ারের কানে কানে কি বললো—শুনে ফুর্ত্তিভরা সুরে মানোয়ার বিবি জবাব দিলো, বহুৎ আচ্ছা কিয়া; মরণে দেও হারামী কো জল্‌দি।

শুধু এই অনুরোধ

প্রতিভা রায়

শুধু এই অনুরোধ ভুল না আমায়।

এখন নতুন পথ সম্মুখে তোমার
সেখানে অনেক স্বপ্ন। অনেক শানাই
কত না বিভিন্ন সুরে বাজে চার ধার।
সেখানে তো ব্যথা নেই অথবা অতীত
প্রাণভরা ব্যথা নিয়ে গা'বে নাকো গান।
তবুও সে পথে যদি মিলন-সঙ্গীত
তুমি গাও আনমনে।—ফুলের উদ্যান
দেখে যদি মনে জাগে, কোন একদিন
এমনি সবুজ ঘাসে বসে দু'জনায়
গেয়েছি অনেক গান। তবু সেই ঋণ
ভুলে যেয়ো ক্ষতি নেই; কেবল আমায়
নতুনের পাশে দিয়ো একটুকু স্থান,
হারিয়ো না আমি যেন তোমার সভায়।

মেয়রের শীতের ওভারকোট

পিটার নানজেন

[মূল জার্মাণ থেকে]

দু'বছর পূর্বে মৃত মেয়রের কাগজপত্র ইত্যাদির মধ্যে একখানা শিলকরা বড় খাম পাওয়া গেল। খামটির উপরে লেখা ছিল, এর মধ্যেকার লিখিত কাহিনী আমার মৃত্যুর পরে বার্লিনের অথবা ডেনমার্কের কোন দৈনিক কাগজে কিম্বা সরকারী কাগজে ইহা প্রকাশিত হইবে।

যতদূর জানা যায়, এই লেখাটা এখনও কোন কাগজেই প্রকাশিত হয়নি। লেখাটি ঠিক যেমনটি ছিল—ঠিক তেমনি ভাবেই দেওয়া হল।

: আমি চাই সমস্ত নীতি উপদেশ এবং আমাদের আইন আদালতের কাছে একটা চুরির অপরাধের স্বীকারোক্তি লিখতে। যে অপরাধটা আমি আমার জীবনের চল্লিশ বছর বয়সে করেছিলাম। যে ঘটনার এক বছর পরে, মহারাজা আমাকে এই সুন্দর সহরের মেয়র করে দিয়েছিলেন। যেখানে কিছুদিন আগে বহু জনগণের সঙ্গে তাদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতায়, আমার পঁচিশবছর কাল রাজকীয় কার্য্য পরিচালনার জন্য, আমার বাহাত্তর বছর বয়স কালের সময়ে সেই কার্য্যের জুবলী উৎসব অনুষ্ঠান সম্পাদিত করিয়েছি। কিন্তু আমার আজকের এই কাহিনীটি তৎকালীন কাউন্সিলার হেরলিনিয়ের বাড়ীতে, তাঁরি দেওয়া ভোজসভায় ঘটিত। বহুদিন পূর্বে পরলোকগত কাউন্সিলার চেম্বার লেনালিয়ে, তাঁরি বাড়ীর এক ভোজসভা। গণমান্য ব্যক্তিগণ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে।

সেই ভোজসভায় এই ব্যাপারটা যখন ঘটে, তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন গৃহকর্তা চেম্বারলেন লিলিয়ে, জেলার ডাক্তার ফেরকলবাইন, ব্যারণ অর্ণইয়েলেম আর আমি। আমরা একত্রে হুইষ্ট খেলছিলাম। খেলার ঘরে বেশ উত্তেজনা এসে গিয়েছিল আর টেবিলে বেশ মত্ততা বোধ হচ্ছিল যদিও টেবিলের চার পাশের মত্ততা আরো বেশী হয়েছিল। আমরা যারা খেলছিলাম, সকলে পানীয় হিসাবে কোন্যাকই চাইছিলাম। কেউ কেউ সার্জেন্টের কোন্যাক অতি চমৎকার বলে মন্তব্য প্রকাশ করছিলেন। খেলা আর পান করা অবিরত ভাবেই চলেছিল। ব্যারণ অর্ণইয়েলেম অতিরিক্ত পান করার জন্য বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। ক্রমশঃ তিনি এমন ভাবের কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন যাকে ঠিক ভদ্রোচিত আর সংযত বলা চলে না।

তিনি তাঁর ঘোড়ার ব্যবসায়ে বিখ্যাত হওয়া এবং দক্ষতা সম্বন্ধে দম্ভ প্রকাশ করছিলেন, যে সদ্য সেই দিনই সকালে তিনি একজন বোকা গ্রাম্য পাদ্রীকে দুটো বুড়ো ঘোড়া দিয়ে ঠকিয়েছেন। ঘোড়ার সত্যিকারের দামের চেয়ে খুব কম করেও একশ টালেরের মত লাভ করেছেন। ব্যারণ তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়ে তেলচিটেধরা মানিব্যাগটা বার করলেন আর একজন বিজয়ী ব্যক্তির মত নোটের পুরো বাণ্ডিলটা দেখালেন। যে দ্রব্যটা নিয়ে তিনি ওই বুড়ো পাদ্রী বেচারীর তার লাভ করেছেন। এর পর ব্যারণ একটা মোটা হাভানা চুরুট বার করে ধরাতে আরম্ভ করলেন।

যদিও আমি বেশ নেশা করেছিলাম তবুও অন্য সকলের তুলনায় আমি ঠিকই ছিলাম, এমন কি সত্যি কথা বলতে গেলে তখনও কোন্যাক্ আমার ভালই লাগছিল। তখন পর্য্যন্ত আমার মাথা পরিষ্কার ছিল। আমি যা বলছিলাম বা করছিলাম সঠিক জেনেই করছিলাম। এই সময়েই গৃহকর্ত্তা হেরলিনিয়ে তাঁর অন্য কাজে উঠে যান, সকলকে দেখাশোনা, পরিচর্য্যার ত্রুটি না ঘটে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য তাঁকে ব্যস্ত হতে হয়। তখন আমরা একজন ডামী নিয়ে খেলতে আরম্ভ করছিলাম।

আমি আমার চেয়ারটা টেবিল থেকে একটু সরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে বসতেই আমার নজর পড়লো টেবিলের তলায়। কি একটা যেন পড়ে আছে সেখানে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখলাম সেটা একখানা পঞ্চাশ টালেরের নোট। সেই মুহূর্ত্তেই আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে ব্যারণই ওটা হারিয়ে ফেলেছেন, যখন তিনি তাঁর মানিব্যাগটা বার করে খুলেছিলেন।

আমি মনে করলাম, নোটখানা কুড়িয়ে ব্যারণকে ফেরত দিয়ে দেব। তাই নীচু হওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে কথাগুলি পর পর আমার মনে হয়েছিল তার জন্যেই ঠিক তখুনি নীচু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। নোটখানা ব্যারণকে ফেরত দেওয়ার কথা ভাববার পরমুহূর্ত্তেই একটা দুর্দ্দমনীয় বাসনা আমাকে পেয়ে বসলো, যে ওটা আত্মসাৎ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাগুলোও আশ্চর্য্য ভাবে আমার মনে হয়েছিল যে আমি কখনও আমার মাইনে ছাড়া এক পয়সা বেশী পাইনি। যদিও আমার মত দায়হীন একক যুবকের পক্ষে অতি সাধারণ ভাবে সেটা যথেষ্ট ছিল তাহলেও সেটা খুব বেশী টাকা নয়। আর একেবারে গোণা টাকা। আমার মত সরকারী চাকুরের চাকুরীর খাতিরে যেটুকু ব্যয় করা প্রয়োজন ঠিক সেই মতই ছিল টাকাটা। আমার সমস্ত রকম সখ, চাল মিটাবার জন্যে আমাকে অত্যন্ত হিসাব করে চলতে হত। তাছাড়া ছাত্রজীবনের দরুণ আমার নিজস্ব কিছু ধার ছিল। মোট কথা, পঞ্চাশ টালের আমার কাছে একটা বেশ কিছু টাকা ছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে ঐটুকু সময়ের মধ্যে আমার মাথায় এই হিসাবটাও করা হয়ে গিয়েছিল যে এটা দিয়ে আমি একটা ওভারকোট করাতে পারি। এই জিনিষটা আমার অতি প্রয়োজনীয় ছিল। ওভারকোটটার চিন্তাতে আমি একটু স্বস্তিও পেয়েছিলাম তেমনি একটু কেঁপেও উঠেছিলাম, তাহলে তো চোর হতে হবে!

এ কথা ভাববার পরেও আমি তড়িৎ গতিতে আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিয়েছিলাম, ওটা আমার চাই। এই চিন্তাটা আমাকে কত উত্তেজিত করেছিল যে নোটটা সংগ্রহ করবার উপায়টা আমি বেশ ঠাণ্ডা মাথাতেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম। এমন কি, এত নিপুণ ভাবে পারবো ভেবে একটা গোপন গর্ব অনুভব করেছিলাম।

আমি খেলায় প্রতি অতি মনোযোগ দেওয়ার ভান করলাম। একটা নতুন সিগার বার করে তার গোড়াটা কাটলাম কিন্তু অমনোযোগ ভরে ছুরিটা ফেলে দিলাম। অন্য সকলে সক্রিয় ভাবে খেলাতে এবং আনুসঙ্গিক পানীয়ের মাদকতায় এত বিভোর ছিলেন যে তাঁদের কোন একজনও আমার ছুরিটা তুলে দিয়ে ভদ্রতায় বাহাদুরী দেখালেন না।

আলাফজ.—এই খেলার একটা শব্দ উচ্চারণ করলাম, যেন এই

বিরক্তিকর ঘটনার জন্ত আমি অলাধিকু দুঃখিত হয়েছি। আমার এর জন্তে কতই অসুবিধা হচ্ছে, এই ভাবে অবহেলার সঙ্গে নিজেকে নীচু করলাম। পড়ে যাওয়া ছুরিটা তুলে আনতে বিরক্তি ও অলসতা ভরে সময় নিচ্ছিলাম। আসলে সময়টা নিচ্ছিলাম নোটটা হস্তগত করতে। তারপর নোটটা হাতে নিয়ে নীচু অবস্থায় ভাঁজ করে জুতোর মধ্যে পায়ের তলায় লুকিয়ে রাখতে বেশ যত্ন নিয়েছিলাম। নোটখানা পায়ের তলায় টাইট করে চেপে, ট্রাউজারটা টেনে ভাল করে গোড়ালী পর্য্যন্ত ঢেকে দিলাম। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড, তার মধ্যেই কাজটা সারা হয়ে গেল ভাল ভাবেই। ছুরিটা তুলে নিয়ে আমি যেন শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সিগারটা ধরিয়ে আরাম দায়ক টান দিয়ে, খুশী মনে ধোঁয়া ছেড়ে আবার খেলার প্রতি অতি মনোযোগী হয়ে গেলাম। বিশেষ করে ব্যারণের খেলার সমালোচনা করতে আরম্ভ করলাম।

এর পর এল সেই উদ্বেগ-আগ্রহপূর্ণ সময়। এখন দেনা-পাওনার হিসাব হবে। ব্যারণ বার টাকের হেরেছিলেন। তিনি তাঁর সেই মানিব্যাগটা বার করলেন। টাকা দেনার জন্য তিনি তাঁর সব টাকাই টেবিলের উপর ঢেলে দিলেন আর হিসাব করে তুলতে লাগলেন টাকাগুলো। তখনও আমি মনে মনে বলেছিলাম, এই শয়তানটা লক্ষপতি, এর সামান্য কিছু ক্ষতি করাও উচিত কাজ করাই হবে। আমি অতি অনাগ্রহ ভরে এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা গেলাস তুলে নিয়ে এগিয়ে এসে আমার বন্ধু ডের কলবাইনের স্বাস্থ্য পান করলাম। তারপর তাঁকে অনুরোধ করলাম ফ্রাউ কলবাইনের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিতে। তখনও গেলাসটা আমার মুখেই ধরা রয়েছে, ব্যারণকে বলতে শুনলাম হুঁ এটা হচ্ছে—ডাস ইস্ট ডক ডেস টয়ফেলস। (Das ist doch des Teupels) শয়তানের কাছে আমি পঞ্চাশ টালের পাচ্ছি না।

আমি ধীরভাবে গেলাস খালি করলাম ও গেলাসটা নামিয়ে রাখলাম, তারপর টেবিলের কাছে এসে বললাম, না ব্যারণ টয়ফেলস নয়, (শয়তানের কাজ নয়) হয়তো আপনি নিজেই এই কাজটা করেছেন, তবে হাঁ এটাও একটা ভ্রান্তি। অথবা কাউন্সিলারের কোন্যাক আপনার উপর এমন ক্রিয়া প্রকাশ করেছে, সেটা আমাদের উপরকার ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। আমরা ক্রমশঃ সব জিনিষ দ্বিগুণ দেখছি। আর তেমনি ভাবেই মাতাল হওয়াতে আপনি দ্বিগুণ হয়েছেন বলে আমাদের উল্টা দেখছেন অর্থাৎ অর্দ্ধেক দেখছেন।

না ব্যারণ বলে আমার বলা কথাগুলো সকলের কাছে একটা উচ্চাঙ্গের ঠাট্টা বলে মনে হয়েছিল। এমন কি,. ব্যারণের নিজের কাছেও। অল্পক্ষণ পরে তিনি যখন নোটের তাড়া থেকে ফের এক একখানা করে গুণে শেষ করলেন তখন বললেন, না এটা আর ভুল নয়, আমার পঞ্চাশ টালের সত্যিই খোয়া গিয়েছে। ব্যারণ এইবার গৃহকর্ত্তা হের লিলিয়েকে ডেকে বললেন কাউন্সিলার মশায়, আপনি আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করুন, আমার নোটগুলো আপনি একবার গুণে দিন। আমি যখন আমার বাড়ী থেকে বার হই, তখন আমার আটখানা পঞ্চাশ টালেরের নোট, একশখানা পনেরো টালেরের নোট ছিল। এখন পঞ্চাশ টালেরের নোট মোটে সাত খানা রয়েছে।

খেলার শেষের সাধারণ হৈচৈ-এর মধ্যেই কাউন্সিলার লিলিয়ে নোটের বাণ্ডিলটা গুণলেন, পঞ্চাশ টালেরের নোট সাতখানাই ছিল দেখা গেল। আমার বন্ধু ডাক্তার কলবাইন, যদি আমার মৃত্যুর পর এই কাহিনী জানার সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন তাহলে যে তিনি খুব চেঁচামেচি করবেন, তা আমি বুঝতে পারছি। নোটগুলো গোণা শেষ করে হের লিলিয়ে বললেন, সত্যিই দামী নোট সাতখানাই রয়েছে দেখছি। তার পর যথাযথ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন ব্যারণ, আপনি কি নিশ্চিত যে এ নোট আর একখানা বেশী থাকাই উচিত ছিল?

—Ja (yes) হাঁ কাউন্সিলার মশায়। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যারণ বলতে লাগলেন। আমি যতই মাতাল হই না কেন, স্বর্গের দেবতার দিব্বি যে আমার ওই নোট আটখানাই ছিল, আমি বাড়ী থেকে বার হওয়ার সময়ে ভাল করে গুণে দেখেছিলাম।

ব্যারণ এই কথা বলার পর দু'-এক মিনিট নীরব ভাবে কাটল, অবশেষে কাউন্সিলার বললেন, ব্যারণ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি তবে টাকাটা যখন এখানে ছিল তখন সেটা খুঁজেও পাওয়া যাবে।

হের লিলিয়ের এই কথায় আমার মনে একটা বিবেচনা বোধ এসেছিল, তবে সেটা ব্যারণের জন্য দুঃখিত হয়ে নয়, ভদ্র সদাশিব কাউন্সিলারের জন্য। তাঁর বাড়ীতে এমন একটা ঘটনার জন্য তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন যেন সেটা তাঁরই একটা ত্রুটি। আমি যেন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, যেন সব ব্যাপারটাই আমার দিক থেকে একটা ঠাট্টাসূচক ব্যাপার বলে বুঝিয়ে দিয়ে নোটটা ফেরত দিয়ে দিতে। কিন্তু কার্য্যকালে তা কিছুই না করে স্থির হয়ে রইলাম। কারণ টাকাটা একবার পাওয়ার পর, সেটা আমি

রাখতেই চেয়েছিলাম। তাই কয়েকটা ক্ষণ আমার অবস্থা হল, দুঁদিকে সমান, একদিকে একটা অপরাধবোধ, অন্যদিকে পাওয়া টাকাটা হারাবার জ্বালা, দুই-এর মিলিত এক অদ্ভুত দংশন। এই কথার পর সকলের মধ্যেই একটা গুঞ্জন, সন্দেহ ও প্রশ্ন জেগে উঠলো। অনেকেই নানাভাবে ব্যারণকে প্রশ্ন করতে থাকলেন—নোটটা কি পকেট থেকে অন্যভাবে হারাতে পারে না?

আপনি কি, আসবার পথে কোনও দোকানে যাননি? সেখানা কি আপনার অন্য কোন কোটের পকেটে থাকা সম্ভব নয়?

এই ভাবে নানা প্রশ্ন শুনতে শুনতে ও উত্তর দিতে দিতে ব্যারণ ক্রমশঃ স্থিরমস্তিষ্ক হয়ে আসছিলেন এবং সত্যিকারের বন্ধুত্বপূর্ণ গলাতেই বললেন, না, এ রকম কোন ভুল তিনি করেননি।

শেষকালে দরদী বন্ধুর মত ব্যঙ্গের সুর মিশিয়ে, ঠাণ্ডা অথচ কড়া গলাতে আমিই বললাম, দেখুন ব্যারণ, আপনার জিনিষটা সম্বন্ধে আপনি যখন এতই নিশ্চিত তখন আমাদের মানে আপনার বন্ধু ও খেলার সঙ্গীদের দিক থেকে, নিজস্ব ও পৃথকভাবে বলবার কিছুই নেই আমাদের, একমাত্র নিজেদের সার্চ করতে দেওয়া ভিন্ন, তাই আমি আমার পুলিশী ক্ষমতার বলে, নিজেকে সমেত ধরে, এখন কেবল ব্যারণের হুকুমের অপেক্ষা করছি।

আমার এই কথায় যে ফল হবে ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল। ব্যারণ বুঝতে পারলেন, কাউন্সিলারের মত সম্মানিত লোকের বাড়ীতে এই ব্যাপারটাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তখন তিনি তাঁর জমিদারসুলভ চাল ও মর্য্যাদা দেখিয়ে বললেন, এই ব্যাপারটা মোটেই গণ্য করবার মত নয়, আর এত তুচ্ছ যে একটা বাজে ঘটনা বলেই ধরা যায়। হয়তো কালই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, টাকাটা এখানে যখন পেলেন না তখন বাড়ীতেই পাবেন নিশ্চয়। এছাড়া খেলার পঞ্চাশ টালেরে না পাওয়া গেলে তাঁর কিছুই যায় আসে না।

তথাপি সকলের মধ্যেই এক গোপন অস্বস্তিকর ভাব রয়েই গেল। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা ভঙ্গ করে সকলেই একে একে বিদায় নিলেন। হলের সামনে দিয়ে আমি যখন যাচ্ছিলাম, তখন হের জিজিরে আমাকে বললেন, কাল সকালে একবার আমার সঙ্গে দেখা হলে তিনি খুসী হবেন। ডাক্তার কলবাইন ও আমি একত্র যাচ্ছিলাম। পথে চলবার সময়ে, দু জনেই ব্যারণের ব্যবহারের জন্য অনুযোগ করছিলাম। তিনি অতটা মাতাল হয়ে না পড়লে অপরের কথা বুঝতে পারতেন, আরো বুঝতেন যে তিনি যে ব্যবহার করেছেন, তাতে সকলেই তাঁকে তিরস্কার করতে পারতেন। কার্য্যতঃ তিনি কাউন্সিলার ও তাঁর নিমন্ত্রিত বন্ধুগণকে অপহারক বা নগণ্য চোর এটা মনে করাবার কারণ সৃষ্টি করেছেন।

আমি প্রতিটি মুহূর্ত্তে নিজেকে বেশ উৎসাহ সহকারে সাহসী রেখেছিলাম, সেই ভাবে কথাবার্ত্তা বলে চলেছিলাম। আমার সজ্জন বন্ধু কলবাইন সমস্ত ঘটনাটা একটা হাস্যকর ভাবে শেষ করলেন, তিনি বললেন—আচ্ছা 'হের কোন্টস্ যদি সত্যি সত্যিই আপনি বা আমি, যে নোটখানা হারাবার কথা হচ্ছে, ওটা নিয়ে নিতাম তাহলে কি একটা সংকাজ করতাম না? ওই অসভ্য ব্যারণের অসাধু উপায়ে অর্জ্জন করা টাকা থেকে সামান্যই নেওয়া হত, আর সেই চুরিটা একটা ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ নেওয়াই হত না কি? প্রত্যাবিত পাদ্রী কি ভগবানের নামে আমাদের আশীর্বাদ করতেন না তাহলে

আমি বললাম, করুণাময় ভগবানকে আমাদের এই খেলার ব্যাপার থেকে দূরে রাখা যাক। আমার মতে চুরিটা সাধারণ নীচ কাজ। আমি স্বীকার করি যে কেউ রাগের বশে একটা খুন করতে পারে তার মধ্যে অনেক সময় উচ্চদরের মনোবৃত্তি থাকে। সে রকম স্থলে অর্থাৎ ক্ষুধার তাড়নায় বা দারিদ্র্যের শোচনীয় অবস্থায় চুরি করাকেও আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু কেবল মাত্র লোভের দ্বারা প্রলোভিত যে চোর, সেটা অতি হীন অপরাধ। আমি যখন এই কথাগুলি বলছিলাম তখন আমার নিজের কথার স্বরের অকপটতায় আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আমার বলার মধ্যে নিজস্ব মতের দৃঢ়তা, আমি ভাল ভাবেই প্রকাশ করতে পেরেছিলাম। এই একই সঙ্গে আমি ভেবেছিলাম, পঞ্চাশ টালেরের নোটটা ঠিক আছে তো, হাঁটবার সময়ে কোন ক্রমে বার হয়ে পড়ে যায়নি তো?

বাজারের কাছাকাছি থেকে আমাদের পথ পৃথক হল। এবার দু জনকে দুদিকে যেতে হবে। কলবাইন অন্য পথ ধরে বাড়ীর দিকে গেলেন। একা হওয়ার মুহূর্ত্তেই, আমি নীচু হয়ে পরীক্ষা করলাম নোটটা ঠিক যায়গায় আছে কি না। তারপর নিশ্চিন্ত মনে সেখানা বার করে এনে পকেটের নিরাপদ স্থানে রাখলাম। এর পর বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে শিষ দিতে দিতে বাড়ীর পথে চলতে লাগলাম। তখনও ভাবছিলাম, যে পয়লা তারিখের আগে তো ওখানা ভাঙাতে পারবো না। ওই সময়ে সহরের ব্যাঙ্ক থেকে আমি দামী নোট ভাঙিয়েই থাকি। বাড়ীতে পৌঁছবার পর, নিজের ঘরে এসে বেশ ভাল করে আলো জেলে দিলাম, আধ বোতল উৎকৃষ্ট ম্যাডাইরা নিয়ে বসে ভাল সিগার ধরালাম আর মনে হল, ব্যারণও হয়তো এখন এমনি ভাবেই সিগার ধরিয়ে বসেছেন। তিনি কি মানুষ হিসাবে আমার চেয়ে ভাল, এইটাই ভাবছিলাম।

আমার মনে কোন দ্বিধা ছিল না, বরং খুব কম সময়ই আমার মন এত ভাল থাকে। টেবিলে মদের গেলাসের পাশেই ফেলে রেখেছি পঞ্চাশ টালেরের নোটখানা। নোটখানা দেখতে বেশ আর্থিক সাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলাম। এটা দেখে এত আনন্দ হওয়ার কারণ এটা একেবারে বিনা কষ্টে পাওয়া, আর একটা বড় খরচ পূরণ হবে এ দিয়ে, শয়ন করতে যাওয়ার আগে, ওখানা একটা বড় খামের মধ্যে রেখে আমার কাগজপত্র রাখার স্যুটকেসের মধ্যে রেখে দিলাম।

পরের দিন সকালে গন্তব্যস্থল ছিল প্রথমে এক নামকরা দর্জ্জির বাড়ী যাওয়া। বলতে গেলে শীতের এই ওভারকোটটা যখন একটা উপহার পাওয়ার মতই পাওয়া যাচ্ছে তখন, এটা মনের মত হবে না কেন? আমি অতি উৎকৃষ্ট গরম কাপড় আর সিল্কের লাইনিং দিয়ে তৈরী করে ডেলীভারি দেওয়ার নির্দ্দেশ দিয়ে এলাম। দর্জ্জির বাড়ী থেকে গেলাম কাউন্সিলারের বাড়ী। তাঁকে তাঁর অফিসরুমে পেলাম। আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন তথাপি তাঁর মুখে দুঃখের ছাপ ছিল। তিনি আমাকে 'প্রিয় মেয়র' বলে সম্বোধন করলেন (Lieber Biirger Meister) যেটা আমার ভবিষ্যৎ পদ বলে তিনি জানতে পেরেছিলেন।

হের জিজিরে বললেন, কাল সন্ধ্যার ওই বিশ্রী ঘটনাটার বিষয়ে আপনার কি ধারণা? আমাকে এর জন্য আপনি কি করতে বলেন, কি করবো ব্যাপার বলুন তো। কাউন্সিলার একটু থেমে বললেন একমাত্র আমার পুরানো চাকর, লাবস্ কিংবা কীজানা, এদের

স্ট্যাচু সার্কেল

(জয়পুর)

—যতীন্দ্রনাথ পাল

আলোকচিত্র
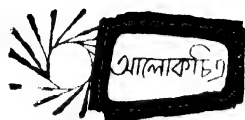
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

(কামারপুকুর)

—সুব্রত মুখোপাধ্যায়

সুরের পিয়াসী

—বিমল মিত্র

অপত্য স্নেহ

—কুমারকান্তি রাউত

॥ শিশু-মহল ।

—শ্রীমতী শেফালিকা ঘোষ

—রাধাকান্ত বাসু

—শুচিব্রত দেব

—ইনা

—জ্যোৎস্নাকুমার বসু

বিশ্রাম

—বপ্পা সাহানা

দুজনের মধ্যেই কেউ নোটখানা নিয়ে থাকবে, কারণ তা না হলে নোটখানা যাবে কোথায়? তবে কি জানেন, আমি নিজে ওদের সৎচরিত্রের বলেই জানি, এতদিন ধরে ওরা আমার পরিবারের সেবা করে আসছে, কোন দিন বিশ্বস্ততার কোন ত্রুটি পাইনি, কিন্তু নোটখানা বিপক্ষে রয়েছে তাই, ভাবছি ওদের আর কোন অসুবিধার মধ্যে আনতে চাইনা। কোন গণ্ডগোল না করেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই। আমি ঠিক করেছি, ব্যারণকে একটা চিঠি লিখবো যে আড্ডা ভেঙ্গে যাওয়ার পর ওই ঘরেই নোটখানা খুঁজে পেয়েছি, আর সেখানা এই চিঠির সঙ্গেই পাঠালাম। আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনিও কি ঠিক এই কাজ করতেন না? আমার মনে হয়, এইটাই সবচেয়ে ভাল পন্থা। এতে কি কেউ সন্দেহ করবে? আপনিই আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু (Mein quter Faeund) মেইনগুইটের ফ্রেউণ্ড, আমি আপনার পরামর্শ চাইছি।

সকলে জানে, মৃত কাউনসিলার লিলিয়ে কত ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি ধনী ছিলেন না, সৎভাবে জীবন যাপন করে, স্বচ্ছল ভাবে সংসার চালিয়ে তিনি কেবল একটা বাড়ী করতে পেরে ছিলেন। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে তিনি প্রতিবেশীদের প্রিয় ছিলেন। যাদের তিনি বড় অফিসার ছিলেন, যারা তাঁকে প্রবীণ বলে গণ্য করতেন সকলেই তাঁকে তাদের গৌরব বলে মনে করতেন, বন্ধু বলে ভাবতেন, তাঁর মত সজ্জন ব্যক্তি দুর্লভ।

হের লিলিয়ের প্রস্তাবটা আমাকে আহত করেছিল! যে ধনী ব্যারণের কাছে এ টাকাটা কিছুই নয়, তাকে তিনি দিয়ে দেবেন এমন অঙ্কের টাকা, যার জন্য তাঁর নিজস্ব বাজেটের অনেকটা কম করতে হবে। আমি বললাম বন্ধু চেম্বারলেন, আপনার অন্তর বোধে আপনি এই ব্যাপারটাকে খুবই গুরুতর ভাবে নিয়েছেন, তবে আমার দিক থেকে বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিনি যে ব্যারণ আদৌ কিছু হারিয়েছেন কি না। সে রাত্রে উপস্থিত প্রত্যেকেই জানেন যে, ব্যারণ মোটেই স্থিরমস্তিস্ক ছিলেন না। আমার অনুরোধ, আপনি ঘটনাটা অন্যদিক থেকে লক্ষ্য করুন। সরল হৃদয় চেম্বারলেনকে সহজ করবার ব্যাপারে আমি তখনকার মত কৃতকার্য্য হয়েছিলাম। তিনি শান্ত হয়েছিলেন।

আমি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ব্যারণের বাড়ীতে গেলাম। আমার অনুমান ঠিকই হল, তিনি তখনও ঘুম থেকেই ওঠেন নি। আমার মত ব্যারণও অবিবাহিত ছিলেন, আমি তাঁর শয়নকক্ষেই গিয়ে দেখা করলাম। আমি কালকের কথাটা তুলে বললাম, দেখুন ব্যারণ এটা নিয়ে ধরুন যদি এনকোয়ারীই হয় আপনি কি জোর করে বলতে পারবেন যে, ঘোড়া কেনা-বেচার পর থেকে আর চেম্বারলেনের বাড়ীর ডিনার পর্য্যন্ত আপনি নানা স্থানে ছিলেন না, যেখানে একখানা নোট হারিয়ে যেতে পারতো।

ব্যারণ কিন্তু তাঁর বিশ্বাসে অটল রইলেন, যে সেখানে অন্য কোথাও হারিয়ে যায়নি। তথাপি ছোট সহরের মধ্যে এই কথা রটে যাওয়া, আর অমায়িক বন্ধু চেম্বারলেনকে এক অস্বস্তিকর অবস্থার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য, ব্যারণ আর আমি খুব শীঘ্রই একটা বোঝাপড়ায় এসেছিলাম। ব্যারণ নিজে থেকেই একটা চিঠি লিখে দিলেন হের লিলিয়েকে, যে নোটখানা চুরি গিয়েছে বলে ভেবেছিলেন, সেখানা বাড়ীতে অন্য কোটের পকেটে ছিল। তাঁর আগেকার ব্যবহারের জন্য তিনি খুব দুঃখিত এবং লজ্জিত, তার জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

সমস্ত ঘটনাটা বেশ সাফল্য সহকারে আরম্ভ ও শেষ করতে পেরেছিলাম। ব্যারণের দরুণ পঞ্চাশ টালের দিয়ে সংগ্রহ করা ওভারকোটটা ছিল খুব দামী ও সৌখিন জিনিষ। তাই ওভারকোটটা, আমার নামের ওপর যশের কাজ করেছিল অর্থাৎ আমি একজন বিত্তশালী ও সৌখিন ব্যক্তি। সেই কারণে, তখনও নীচু গ্রেডের অফিসার হওয়া সত্ত্বেও মেয়র হওয়ার আগেই, আমি সুন্দরী স্ত্রী লাভ করতে পেরেছিলাম। যাঁকে নিয়ে পরে দীর্ঘ কুড়ি বৎসর অতি সুখেই কাটিয়েছিলাম। আমার বিবাহিত জীবন অতি সুখের ছিল। কুড়ি বছর পরে ফুসফুসের অসুখে আমার জীবনসঙ্গিনী পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত বিদায় নেন।

ওই ওভারকোটটা, ওটা যখন আর বাইরের পোষাক হিসাবে পরবার অবস্থায় রইল না, তখন ওটাকে আমি ড্রেসিং গাউন মত করে ব্যবহার করতাম। ঠাণ্ডার দিনে ওটা গায়ে দিয়ে বাইরে ঘরে বসতাম। ওই কোটটা আমাকে প্রেরণা দিত, বহু ছিঁচকে চোরকে অপেক্ষাকৃত লঘু সাজা দিতে। তারপরেও ওই জীর্ণ কোটটা আমার ঘরে কেবল টাঙ্গান থেকেছে। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আমার জীবনে এত সুখ উন্নতি আর ঐশ্বর্য্য এনেছিলেন যে আমার কোনও অভাব বোধ হয়নি বা কোন অসাধু বাসনা আমাকে কোনদিন উত্তেজিত করতে পারেনি। আমার সুখ ও ঐশ্বর্য্যময় বিবাহিত জীবনের স্মৃতিই আমাকে সেই ঘৃণিত চুরির লিখিত স্বীকার কাহিনীর অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, আমার মৃত্যুর পরে, যারা আমাকে অতি সামান্যও জানে তারাও এ কথা প্রচার করবে যে আমি একজন অকলঙ্ক সজ্জন অফিসার ছিলাম। কোন রকম দোষ আমাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি। আমি নিজেও জানি, আমি সেই রকমই ছিলাম। একমাত্র আমার নিজের স্বীকৃত এই চুরি ছাড়া কোন দোষ আমার ছিল না।

কিন্তু আমার মৃত্যুর শোক সংবাদ ও বর্ণিত গুণগুলির মধ্যে, এটাও কেন থাকবে না? আমার সমস্ত প্রশংসার চেয়েও আমার সম্বন্ধে বলবার জন্য এটা কি আরো আকর্ষণীয় হবে না? সদয় মনোবৃত্তি নিয়ে যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে কি এটা উপদেশমূলক ভাবে বলা চলেনা? আমার এই লিখিত স্বীকার কাহিনী কি সেদিক দিকে নেওয়া চলে না?

আমি আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠক-পাঠিকার কাছে এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করবার ভার দিলাম।

অনুবাদিকা—রেণুকা দেবী

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

৭

রবিবাবুকে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা যত ছোট করেছে অন্যরা কেউ মোটেই এতটা করেনি। 'অমিয় চক্রবর্ত্তী ত প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন রবিবাবুর লেখায় কিছু নেই।

ওরা আমার অন্য কাউকে সহ্য করতে পারতো না। রবিবাবুর অসুখের সময় রাম যেত বলে একজন একদিন বলছে—রাম অধিকারীকে আবার কোথা থেকে জোটালেন? আমি পেছনে বসেছিলুম, ডেকে বললুম—কি হয়েছে তাতে? তা বললে, আপনি শিশির ভাদুড়ি না—বলেই সরে পড়ল।

আবার ভীষ্মের প্রসঙ্গে ফিরলেন—ভীষ্ম প্রথম অভিনয় হয় ১৯২২।২৩ সালে মনোমোহনে। প্রথমে হাম্বা (অম্বা) আর শিখণ্ডী করেছিল চারুশীলা—খুব ভাল করেছিল।

নরনারায়ণ আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালের ১লা ডিসেম্বর। বুধবারে শুরু হলেও শনি রবিবার অভিনয় হয়েছিল। বুধবারে আরম্ভ করার কারণ—প্রথম সপ্তাহে চারটি অভিনয় হতে পারত।

তখন বুধবার, শনিবার আর রবিবার অভিনয় হত। বুধবার আর শনিবার ম্যাটিনিতে অভিনয় হত। বৃহস্পতিবারে অভিনয়টা ত যুদ্ধের পর থেকে চালু হয়েছে। ঐ দিনটায় কাপড়ের দোকান-টোকান বন্ধ থাকে, তাই পপুলার হয়েছে।

নরনারায়ণের ভূমিকাটা ক্ষীরোদবাবুর মেজ ছেলে ডেকর লেখা। ওকে ঘুরিয়ে আমাকে এক হাত নিয়েছে। ক্ষীরোদবাবুর সংস্কৃত জ্ঞান খুব ছিল, জায়গায় জায়গায় সংস্কৃত কথাগুলো খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছেন।

শচীনরা বলে, আমি ক্ষীরোদবাবুর ওই সব ট্র্যাশ করি আর ওদের লেখা করি না। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুর লেখার মধ্যে কত ভাল জিনিস আছে তা ওরা দেখে না। থিয়েটার প্রসঙ্গে—থিয়েটারের ডেপথ থাকা দরকার। মিনার্ভায় আগে ছিল ৪৫ ফুট, এখন কমিয়ে দিয়েছে। অন্ততঃ ৬০ ফুট গভীরতা থাকলে তবে নাটক ভাল করা যায়।

একজন বললে—আমেরিকার ব্রডওয়েতে কোন কোন ষ্টেজের গভীরতা ১০০ ফুট। বললেন—অতটা দরকার হয় না। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল থিয়েটার ওল্ডভিকে ডেপথ বোধ হয় ৭০ ফুট। তবে ১০০ ফুটের মধ্যে বোধ হয় ৪০ ফুট একটা রিভলভার (ঘূর্ণায়মান মঞ্চ) রাখবে। তাহলে সামনে ৩০ ফুট, মাঝখানে ৪০ ফুট রিভলবার আর পেছনে ৩০ ফুট খুব খারাপ হবে না। পেছনে অনেকটা জায়গা সুবিধে হ'ল, সিনারি ষ্ট্যাক করা যায়।

যাবার সময় ঠিক হল পরের দিন নরনারায়ণ পড়বেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর এসে সুরু করলেন বিজয়ার কথা। বললেন—বিজয়া "মিসট্রেস অব রাজিনা কোর্ট" থেকে নেওয়া বা ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত।

গৃহদাহও খুব ভাল বই। একটা জায়গায় শুধু একটু গোলমাল আছে। এই যে বড় লোক, বড়'বড় বাড়ি ঘর দোর—এর একটা আকর্ষণ আছে, চিরকাল থাকবে—শরৎবাবুর এই কথাটা হিন্দু সমাজের সম্বন্ধে ষোল আনা প্রযোজ্য। এবার নরনারায়ণ সম্বন্ধে কথা তুললেন—বইটা খুবই ভাল কিন্তু ছেলেদের জন্য গোলমাল হয়ে গেছে। এই দেখ, আমার কাছে ওরিজিন্যাল লেখা রয়েছে আর এই বই—মিলিয়ে দেখ যেখানে সেখানে দু-চার লাইন ঢুকিয়ে দেওয়া আছে। এমন কি, চৌদ্দটা অক্ষর করার জন্যে দু'-একটা অক্ষরও ঢুকিয়েছে। এগুলো ওঁর জিনিয়াস পুত্রদের কাজ। যখন যেখানে যা পেরেছে লিখিয়েছে। নিজের কথা বলতে লজ্জা করে, কিন্তু আমার থিয়েটার না থাকলে ক্ষীরোদদা' এ বই লিখতে পারতেন না। উনি তো আরো বই লিখেছেন—আলমগীর, রঘুবীর, ভীষ্ম—কিন্তু কোন বইটাকে মেনটেন করতে পেরেছেন? এর জন্যে দুদিন ওঁকে আবদ্ধ করে রাখতে হয়েছিল।

এর পর হেনরী আরভিং-এর কথায় বললেন—মার্টিন হার্ভে আর লুই বলো বারো বছর অ্যাপ্রেণ্টিস থাকার কথা লিখেছেন, এর মধ্যে পেয়েছেন মাসে ২ পাউণ্ড থেকে ৫ পাউণ্ড। বারো বছর ধরে অ্যাপ্রেণ্টিস করে শিখত কত? বাইরে বেরোলেই সকলকে বড় বড় পার্ট দিতেন আর নিজে ছোট নিতেন। কখনও একদল লণ্ডনে আর একদল বাইরে পাঠাতেন। বাইরের দলে নতুন ছেলেদের বড় বড় পার্ট দিয়ে পাঠাতেন।

আরভিং সত্যি নাটক খুব ভাল বুঝতেন। নাটকের উন্নতির জন্যে অনেক করেছেন তিনি। তাঁকে ফাদার অব ইংলিশ ষ্টেজ বলা যায়।

এইবার নাটক পড়তে সুরু করলেন—প্রথম দিকের কর্ণের কথাগুলো যেন মনে হয়—you know my mind, come and do your best. এই ধরণের!

এর পর আছে বিশ্বরূপ দর্শন। আমরা প্রথম থেকেই ওটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলুম। বইতে কিন্তু ঠিক ঢুকিয়েছে।

নরনারায়ণে কৃষ্ণভামিনী করত পদ্মা আর চারু দ্রৌপদী। দুজনেই অপূর্ব্ব অভিনয় করেছিল। যেখানে দ্রৌপদী বলছে—

> সেই আমি, এই মুক্ত কেশরাশি লয়ে
> সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি
> অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
> বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন—

সেখান থেকেই জমে যেত। এর পর দর্শকরা আর নিশ্বাস ফেলতে পেত না।

বিনয়দা' তর্ক আরম্ভ করলেন—এত বেশী উপমা ব্যবহার করেছেন যে বুঝতে কষ্ট হয়।

শুনে বললেন—উপমার কথা বলছ, অভিনয়ের গুণে সেগুলো চোখের সামনে দেখতে পাবার মত হবে। দেখবে যেন চোখের সামনে পাখা গজে ছড়িয়ে যাবে। তাই যদি না পারল ত' অভিনয়

কি হল? আর এতেই যদি বোঝার কষ্ট হচ্ছে, বলত তপতীর বেলায় কি করবে?

একজন বললেন—নরনারায়ণে আপনি ত' কর্ণ করতে পারেন।

হাসলেন—আমি এখনো কর্ণ করলে হয়? কিন্তু কমবয়েসী ছেলে একটি পেলে ভাল হত। এখন দম কমে গেছে। তাছাড়া যৌবনের সে কণ্ঠ পাব কোথায়? এখন তিনটে কি বড় জোর চারটে দৃশ্য পড়ার যে কষ্ট হচ্ছে তাতে পুরো নাটক করতে পারি। পড়াতে ত আর ফাঁক নেই, তাছাড়া pouse দিচ্ছে পারছি না, তার জন্যে মনের মধ্যে মোচড় দেয়। একজন বললে. অপরের কি মনোভাব হয় সেটা তো বোঝান দরকার।

বিনয়দা' বললেন—আমাদের কারো ত আপনার মত দম নেই?

বললেন—তোমাদের দম নেই বলছ, তোমরা ত' অভ্যেস করনি। আমি যে ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করেছি। যখন যাকে পেয়েছি ডেকে এনে পড়ে শুনিয়েছি। সবাই সেইজন্যে ভয় কোরত আমায়। বাইরে অবশ্য পারতুম না, সাহস ছিল না। বাড়ীতে অনেক লোকজন ছিল, তাদের সবাইকে পড়া শুনিয়েছি। কত ছোট বয়সে জনা দেখেছিলুম, আর তারপরে জনা পড়ে সবাইকে তিনকড়ির সুর নকল করে শুনিয়েছি।

ডাঃ অধিকারী সাধারণতঃ কিছু না কিছু বলেন, হাসাহাসি করেন। সেদিন একেবারে চুপচাপ বসে। তাই হঠাৎ বললেন—কি রাম, এত বিমর্ষ কেন, শরীর ভাল ত?

তিনি বললেন—হ্যাঁ!

তখন হেসে বললেন—তাহ'লে একটু লাইট হও। সঙ্গে সঙ্গেই জুড়ে দিলেন—অবশ্য শরীরের দিক থেকে লাইট হতে বলছি না। ডাঃ অধিকারী সমেত সকলেই হেসে উঠলেন।

অপরেশবাবুর কর্ণার্জ্জুনের কথা তুললেন কে একজন। সে কথার উত্তরে বললেন—অপরেশবাবু ক্ষীরোদবাবুর অনেক পরে লিখেছেন। তাছাড়া দুজনের তুলনা করাও উচিত নয়। সেক্সপীয়রের কথা বাদ দিচ্ছি, কেননা, বড্ড বড় হয়ে যায়। ও'র সঙ্গে সি, এইচ, মনরোর কি তুলনা হয়?

ক্ষীরোদবাবুর ড্রামাটিক সেন্স বড় ভাল ছিল, ঠিক জায়গা মাফিক প্যাঁচগুলো দিয়েছেন। নাটক পড়ার কথায় বললেন—নাটক পড়লে লাভও হয়। ডিকেন্সও ঐ ভাবে পড়ে প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন, তবে তাঁর পড়া ছিল রীতিমত অভিনয়। রবীন্দ্রনাথও রীতিমত পড়তেন। তাঁর শেষের দিকের বইগুলো পড়েছেন বিচিত্রা ভবনে। কিন্তু প্রথম দিকের গুলো কখনো প্রমথ চৌধুরীর বাড়ী আর কখনও বা অন্য অন্য জায়গায় পড়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ—বিশেষ করে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলো অপূর্ব্ব!

বিনয়দা' আপত্তি করলেন—না রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব আছে, তাছাড়া বড্ড বেশী উপমা ব্যবহার করেছেন।

ওঁর কথা শুনে বললেন—বিদ্যাসাগর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলোতে বোধ হয় ধোঁয়াটে ভাব নেই। আর একবার পড়ে দেখোত। ভাষার সাহিত্যিক মূল্য ত আছেই—সেদিক দিয়ে উনি অতুলনীয়। আর উপমার কথা বলছ, উপমা না দিয়ে উনি কথাই বলতে পারতেন না। পাঁচ মিনিট কথা বলতে না বলতে—লতা যেমন সূর্য্যের দিকে যায়, ইত্যাদি উপমা উনি সর্ব্বদাই ব্যবহার করতেন।

ওঁর সঙ্গে তখন নতুন চেনা, বলেছিলুম (অবশ্য আবদার করে) ওদেশে যেমন Critical literary appreciation লেখা হয় তেমনি ২০০।২৫০ পাতার এক একখানা বইতে পুরোনো লেখকদের সম্বন্ধে যদি লেখেন—

তাতে বললেন—আমার বই কে পড়বে?

মণিলালকে চুপি চুপি বললুম—লেগে থাকো না।

মণিলাল বললে—খেয়ালী লোক! লেগে থেকে কিছু হবে না।

প্রবন্ধ লেখায় অতুলনীয় হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের রিপোর্ট লিখে লিখেই বোধ হয় লেখাটা এত রপ্ত হয়েছিল।

কে একজন বলে বসল—কই অন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের ত হয়নি?

হাসলেন—কথাটা অবশ্য বলেছ ঠিক; ভেতরে না থাকলে আর হবে কোথা থেকে।

কথা পাল্টালেন—রবীন্দ্রভারতীতে বিজয়া করছি, সঙ্গে সব ইনষ্টিটিউটের ছেলেরা। শরৎসাহিত্য উৎসবে। ওদের একজন আমার কাছে গিয়েছিল; (ওদের আমি নাম দিয়েছি শরৎশশী।) —বলতেই বললুম—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবো। কেন করব না? টাকার আমার বড় দরকার। ফেল কড়ি মাখ তেল তুমি কি আমার পর!

তাতে বললে—শরৎচন্দ্রের স্মৃতি উৎসবেও আপনি পয়সা নেবেন?

বললুম—কেন নেব না? শরৎদা' কি আমায় কিছু ছেড়েছেন কখনো? একবার কিছু টাকা দিতে দেরী হয়েছিল বলে অনেক কটুকথা বলেছিলেন।

এই সময় বিনয়দা' বললেন—আবার দেনা-পাওনা আর ষোড়শী পড়লুম। নাটকে আর উপন্যাসে ত অনেক তফাৎ। নাটকে অনেক নতুন নতুন কথা বলেছেন যা উপন্যাসে ছিল না।

বললে—দেনা-পাওনার চেয়ে ষোড়শীতে জিনিষগুলো গুছিয়ে বলা আছে তা সত্যি, কিন্তু সবই ত ওতে ছিল নইলে আমি পেলুম কোথা থেকে? ওতে জমিদারী চলে যাবে একথা পরিষ্কার লেখা আছে। জীবানন্দর মৃত্যুর কথাটা অবশ্য আমিই বলি। বললুম—জমিদারী চলে যাবে আর জমিদার থাকবে, তা হয় না।

প্রথমে ত কিছুতেই মানবেন না, তারপর অনেক তর্ক করে অনেক বুঝিয়ে তবে মনে নেওয়াতে পারি।

বিনয়দা' আবার বললেন—ষোড়শীর মনে কিন্তু একটা পরিবর্ত্তন এসেছিল। জীবানন্দ ওকে ধরে নিয়ে যাওয়াতেই বোধ হয় পরিবর্ত্তনটা শুরু হয়।

তখন বললেন, ষোড়শীর মনে কোন পরিবর্ত্তন হয়েছিল কি না সেটা ঠিক বোঝাননি। হৈমবতীকে দেখে তার মনে দুর্ব্বলতা এসেছিল একটু, সংসার করবার সখ হয়েছিল। বিজয়াতে নরেন ছবি আঁকে, মাছ ধরে, আবার মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কাজও করে। এই দেখে তোমাদের আশ্চর্য্য লাগছে, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ওঁর নিজের মনের ইচ্ছেটাই উনি প্রকাশ করেছেন। ওঁর ধারণা ছিল চেষ্টা করলেই উনি ভাল ছবি আঁকিয়ে বা বৈজ্ঞানিক হতে পারতেন।

ষোড়শী নাটকটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, ওই নৃপেনের জন্তে। আমার ঘরে বসে লিখছেন এমন সময় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো নৃপেন। ব্যস, উনিও উঠে পড়লেন আর লিখলেন না। বললেন, না ভায়া, ওরা গিয়ে বলে বেড়াবে, তুমি বলে যাচ্ছ আর আমি ডিক্‌টেশান নিচ্ছি, তা আমার সহ্য হবে না।

আমি কত বোঝালুম—ওতে আপনার কোন সম্মানই যাবে না। আপনি যে কি সে ত সবাই জানে।

তা কিছুতেই কোন কথা কানে নিলেন না।

ইনষ্টিটিউটের কথা উঠল, বললেন—লায়ন্স সাহেব একবার গোলদীঘিটা বুজিয়ে ওখানে ইনষ্টিটিউটের বাড়ী করে দিতে চেয়েছিলেন। গুরুদাসবাবু আর ম্যাকফার্সন সাহেব আপত্তি করাতে শেষ পর্যন্ত হল না। ম্যাকফার্সন সাহেব আমাদের ডেকে বললেন—ঐখানেই একমাত্র তোমাদের স্বদেশী মিটিং হতে পারে, সেটা বন্ধ করবার জন্যেই বাড়ী করতে চাইছে। তোমরাও কি তাই চাও ?

একটা প্রশ্ন বহুকাল ধরে আমাদের মনে উঠেছে, এই সুযোগে সেটা জিজ্ঞাসা করে বসলাম—গোলদীঘিকে গোলদীঘি বলে কেন, ওটা ত চৌকো ?

হেসে বললেন—গোলদীঘি ত আগে গোলই ছিল, '১২-১৩ সালে মাটি ফেলে বুজিয়ে চৌকো করে ফেলেছে। ওখানে আমরা আড্ডা মেরেছি। গোলদীঘির ধারে আমরা কিৎকিৎ খেলতুম।

৬নং বাড়িটা কে যেন বলেছে—কেষ্টবাবুর। বললেন—কেষ্টবাবুর হবে কেন, এটা ডেভিড হেয়ারের। ওপাশের বাড়িগুলো ছিল ঘোষালদের।

ইবসেনের নাটক সম্বন্ধে বললেন—আজকাল যে ইবসেন আর চলে না এই কথাই আমাদের দেশের লোকেরা ভুলে গেছে। ইবসেন কেন শ'ও চলে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় স্যার চার্লস মেরিয়টের লেখা পড়ে দেখ! একটা দল করে পুরোনো সব বই পর পর করা দরকার। কতকগুলো ছেলে যদি পেতুম। আগেকার দিনে ত কেমন শিখত!

কিছুদিন আগে জেনেছিলাম ২রা অক্টোবর ওঁর জন্মদিন আর সেইজন্তেই ২রা এলে ওঁর জন্মদিনের উৎসব করা হবে তা আমরা ক'জনে মিলে স্থির করে ফেলেছিলাম। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা তথা উৎসাহী হ'ল লালমোহন দত্ত ও দেবকুমার বসু।

আমরা এটা বেশ ভাল করেই জানতাম যে, জানতে পারলে সমস্ত প্ল্যানটা শিশিরকুমার ভেস্তে দেবেন। তাঁকে নিয়ে নাচানাচি করাটা পছন্দ করতেন না তিনি। তাই সব বন্দোবস্ত চুপি চুপি করতে হল।

জন্মদিনের চেয়ে আগেই তাঁকে আনতে যাওয়া হল। অথচ তাঁর দেখা নেই। আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। যথাসময়ের পরেই এসে পৌছলেন তিনি, তবে একা, বললেন আজ ত দেবু সকাল সকালই গিয়েছিল। আমিও তৈরী হয়ে নিলুম। ব্যস, তারপর পঞ্চাশ মিনিট ওর কোন খোঁজখবর নেই। বাড়ীর লোকেদের খোঁজ করতে পাঠালুম, তারা গাড়ী ডেকে নিয়ে এল কিন্তু তখনো দেবুর দেখা নেই। শেষ পর্য্যন্ত ওরা বললে আপনি চলে যান। রাস্তায় দেখা হলে তুলে নেবেন। তাই চলে এলুম।

উপস্থিত লোকেদের মধ্যে দু-একজন বললেন, কি হ'ল দেবুর, পুলিশে ধরেনি ত ?

হাসলেন—পুলিশে ধরবে ? না, তা ধরবে না আর ধরলেও আজকের দিনে ছেড়ে দেবে। আজকে কার জন্মদিন জানতো ? আজকের দিনে সব কিছুই অহিংস। এই দেখনা আমাদের দেশে মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয় আর আমরা অহিংস বসে অই দেখি। অবশ্য গান্ধীজি অমন কথা বলেন নি। নারীর ওপর অত্যাচার তিনি সহ্য করতে বলেননি। আর যাই হোক, তিনি কাওয়ার্ড ছিলেন না। মরে সে কথা প্রমাণ করে গেছেন।

এবার নরনারায়ণ বইটা খুললেন। পড়া আরম্ভ করার আগে বললেন—ক্ষীরোদবাবুর ছেলে বইটাতে ঘুরিয়ে লিখেছে, তিনি মস্ত বড় লেখক ছিলেন; কিন্তু অন্য নাটকগুলোতে লেখা তাঁর পূর্ণতা পেতে পারেনি নানা কারণে—এই বইটাতে পেয়েছে। কিন্তু তোমরা পড়ে দেখ যেখানে সেখানে কত বাজে লাইন ঢুকিয়েছেন। এই খাতাতে যা লেখা দেখছ—এইটাই প্রথম লেখা।

অনেক লেখক আছেন যাঁদের লেখা প্রথমেই ভাল হয়। পরে পরিবর্তন করলে ফলটা তত ভাল হয় না। নাটকটা পড়তে শুরু করলেন। সন্ধির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণ হস্তিনা থেকে ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পর তাঁর সঙ্গে দ্রৌপদীর আলাপে রত অংশটা পড়ে বললেন—এখানে দ্রৌপদী আর কৃষ্ণের মধ্যে একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি হচ্ছে। পরস্পর পরস্পরের সখা আর সখী ত।

আগের দিন পড়েছিলুম, মনে আছে বোধ হয়, সন্ধির কথায় দ্রৌপদী বলছে—

> অগ্নিশিখা মুখে যদি
> জনম আমার উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
> কোন দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?
> আমি সব।···
> কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি।

এই বলে অভিমন্যুদের নিয়ে বেরিয়ে গেছল। তারপর কৃষ্ণ হস্তিনায় সন্ধির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে।

তাই দ্রৌপদী ঠাট্টা করে বলছেন—ওরা তোমায় বাঁধতে এসেছিল বলে শেষ পর্যন্ত বিরাট হতে হয়েছিল। এত ভয় তোমার।

কথায় কথায় সন্ধি না হওয়ায় নিজের আনন্দের কথা বললেন।

কৃষ্ণ তখন বলছেন যে, ধর্ম্মরাজের সন্ধি স্থাপনের সব চেষ্টা তোমার উষ্ণ নিঃশ্বাসে মিলিয়ে গেল।

তারপরের এক জায়গায় পড়তে পড়তে বললেন—এই যে এখানে বলছে—

> জাতি যবে মরে অনশনে
> সদা হয় নারীর লাঞ্ছনা।

এই কথাগুলো বোধ হয় আজকাল সত্যি নয়। জাতিও অনশনে মরছে। নারীর লাঞ্ছনা ত অহরহই ঘটছে, কিন্তু কই ভগবান ত কিছু বলেন না ?

দ্রৌপদী যখন পুরোনো কথা বলছেন, বলছেন কুরু রাজসভায় তাঁর অপমানের কথা, সেই অংশটা পড়ার পর বললেন—এখানে দ্রৌপদীর কথাগুলো কেমন ধাপে ধাপে সাজানো দেখ। শেষ কথাটা দ্রৌপদী বলছে—পাণ্ডবসখা! লক্ষ্য কর—পাণ্ডবসখা এই হচ্ছে কৃষ্ণের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

সেদিন টাসের করেস্‌পন্ডেন্ট আন্তানিয়াভিচ এসেছিলেন। দেবুদা

তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে বললেন, ও টাসের করেসপনডেণ্ট, ইংরেজী বোঝে ত ? তার পর তাঁকে বললেন—I saw some of yours actors—Pudovkin and others. Some I saw in 1952, others later on.

আবার পুরোনো প্রসঙ্গে চললেন—চারুর উচ্চারণে কতকগুলো দোষ ছিল, তবে চেষ্টা করলে কি করা যায় দ্রৌপদীতে তারই প্রমাণ দিয়েছিল। "হে কেশব, তুমি নাকি বিরাট হইয়াছিলে কুরু সভাস্থলে," এই কথাগুলোর প্রত্যেকটার মূল সুর সে ফোটাতে পেরেছিল।

গুরুকে বিশ্বাস করে যদি দু'টো নাটকও ঠিক ঠিক গুরুর অনুসরণ করা যায় তাহলে ভাল অভিনেতা হওয়া যায়।

তখনকার দিনে অভিনেতাদের সকলেরই অভিনয়ে উচ্চারণের দোষ ছিল। দানীবাবুরও ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব—তারই জোরে দর্শকদের টেনে রাখতে পারতেন। জীবনের শেষ ক'বছর, মানে গিরিশবাবু মারা যাবার পর থেকেই তিনি আর ভাল অভিনয় করতে পারেন নি।

তখনকার দিনের অভিনেত্রীদের একটা মস্ত বড় দোষ ছিল, তারা কোন কিছু চিন্তা করত না। তারাসুন্দরী পড়ত ব্যতিক্রমদের দলে—কিন্তু সেও কতকগুলো বাঁধা ছকের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

তারার সঙ্গে অনেকবার অভিনয় করেছি। মারা গেছে' ৫০ সালে ত তাহলে '৪৬ সাল পর্যন্ত করেছি। শেষের দিকে শুধু রিজিয়া করেছে।

রিজিয়াতে বক্তিয়ার একটি অপদার্থ চরিত্র। আমরা কেটে ছেঁটে যেমন দাঁড় করিয়েছি, তাতে তবু চলত। রিজিয়াতে অর্দ্ধেন্দু বাবু ঘাতক করতেন, তাঁর জন্যেই চলত। প্রতাপাদিত্যে উনি দু'টি ভূমিকা করতেন, প্রথম দিকে বিক্রমাদিত্য আর রডা। রডার পোষাক ছিল হাস্যকর। টকটকে লাল কোট আর প্যাণ্ট, তার ওপর একটা অ্যাডমিরালের টুপি। কিন্তু উনি যখন কথা বলতে আরম্ভ করতেন, তখন পোষাকের কথা মনে থাকত না কারো। এই সময় লালমোহন দত্ত এসে হাজির হল ফটোগ্রাফার নিয়ে। ফুলমালা ইত্যাদি দেওয়া হল ওঁকে, নানাজনে নানা উপহার দিলেন। একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন—ব্যাপারটা কি ?

বললাম—আজ যে আপনার জন্মদিন।

বললেন—আমার জন্মদিন ত তারিখ মিলিয়ে মানি না, মানি তিথি মিলিয়ে। সবাই তাঁকে তখন জিনিষপত্র দিচ্ছে তাই বললেন—কিন্তু এসব কি ?

বললেন—আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে ওরা, জানাতে দিন না।

বললেন—আচ্ছা বলছ যখন দাও। তোমরা শ্রদ্ধা করে যা দিচ্ছ তাই নেব।

একটু যেন অনমনা হয়ে পড়লেন—জন্মদিনের সঙ্গে কতকগুলো দুঃখাবহ ঘটনা মিলিয়ে আছে, তাই এই সব করলে কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে, তাই যা বলার দরকার তা বলতে পারছি না। তোমরা মনে করে নিও আমি বলেছি। এমনিতে ছবি তুলতে দেন না। সেদিন এক কথাতেই রাজী হয়ে গেলেন। প্রথমে ওঁর একক ছবি তোলা হল। তারপর সবাইকে একসঙ্গে টেনে নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলালেন। এবার সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হল।

এই সময় টাসের করেসপণ্ডেণ্ট প্রশ্ন করলেন যে, তিনি কখনো দেশের বাইরে গেছেন কিনা ? উত্তরে বললেন—No, I have been never out of this country except once when I have been to Newyork, I stayed there for six month. সবায়ের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে—ওঁকে আবার পড়তে অনুরোধ করা হল।

বললেন—না, এর পর আর পড়া যাবে না। মনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। নাটক পড়া বন্ধ হয়ে গেল ত, সুরু হল নাটক সম্বন্ধে আলোচনা। বিনয়দা' বললেন—নরনারায়ণের সাহিত্যিক মূল্য যাই হোক না, নাটক হিসাবে এর মূল্য literary value-র জন্যেই কমে গেছে।

বললেন—বিনয়, তুমিই প্রথম বলছ নাটকের literary valueর জন্যেই তাকে বোঝা যায় না। বোঝাই যদি না গেল তাহলে অভিনেতা আছে কি করতে। অভিনেতার সেইটাই সবচেয়ে বড় গর্ব্ব যে সে দর্শককে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে মেলেছে। নিজের ইচ্ছামত তাকে সে নাচাতে পারে, কাঁদাতে পারে।

আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাতে বললেন—আধুনিক কবিতা আমি বিশেষ পড়িনি। সত্যিই আধুনিক কবিতা বোঝা যায় না। তবে তোমার ভাল না লাগলেও জিনিষটা যে ভাল নয় একথা বলা যায় কি করে ? আমার টেনিসন ভাল লাগত না, লাগত না কেন এখনও লাগে না। ঐ যে তার ইমেজারি—'মন জমে বরফ হয়ে গেছে, চাপড়ে ভাঙ্গছে' এসব যেন কেমন ধরণের লাগে। কিন্তু তাই বলে টেনিসন খারাপ বলা যায় কি ?

এই সময় একজন বললে—বাঙলা সাহিত্য সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছে আজকাল।

বললেন—বাঙলা সাহিত্য বলছ সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধিশালী, কোন্‌দিকটায় দেখাও ত। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে কি শেলী বা কীটস্‌-এর কবিতার গভীরতা আছে ?

এবার ইবসেন সম্বন্ধে বললেন—ইবসেনের নাটকের আর দিন নেই। আমি তাঁর প্রতিভাকে খর্ব্ব করতে চাই না, কিন্তু তবু বলব তিনি dated হয়ে গেছেন। ইবসেন নাট্যকারই ছিলেন না শুধু, ছিলেন ষ্টেজ ম্যানেজার আর অভিনেতা। তাঁর নাটকের গঠনে ষ্টেজ ম্যানেজারের ছাপ পুরোপুরি দেখা যায়। কথা বলা না-বলার ভঙ্গী সব কিছুতেই নাটকের ছকুকাটা ভাবটা দেখা যায়। তাঁর Wild Duck খুব ভাল বই।

একজন বললে—নাটক ভাল না হলে কি অভিনেতার গুণে নাটক দাঁড়ায় ?

বললেন—অভিনেতার গুণে নাটক দাঁড়ায় না ? এই যে আলমগীর, ওতে নাটকীয়তা কি আছে ? আসলে ত ওটা নাটকই নয়। অথচ খুব জমে গেছে, পয়সাও দিয়েছে। ওই যে ভূতের ভয় আছে। দর্শকরা ঐ ভূতুড়ে দৃশ্য দেখতে যেত। আগে ঐ উদীপুরী আর আলমগীরের দৃশ্যটা ৩৮ মিনিটে করতুম, আজকাল করি ১৩ মিনিটে। রোজ রোজ অভিনয়ের সময় চরিত্রের ভেতর নতুন কিছু

দেখতে পেতুম ; আজকাল আর পাই না। গত দু' বছরে বিশেষ করে হাত ভাঙার পর থেকে কেমন যেন বুড়িয়ে গেছি।

হঠাৎই প্রশ্ন করলেন—ইনষ্টিটিউটে বই করলে বিক্রী কেমন হয় ?

একজন বললে—হলে লোক বোধ হয় খুব বেশী ধরে না।

বললেন—কেন, হলে'ত লোক ভালই ধরে। ১১০০—১১৫০ হবে—যে কোন থিয়েটারের সমান। ওখানে আর একবার বিজয়া করবার কথা হচ্ছে। মহাজাতি সদনের হলটা বেশ ভাল হয়েছে। লোকও ধরে ২৫০০ জন। Acous খুব ভাল। আস্তে আস্তে কথা বললেও শেষ পর্যন্ত শোনা যায়। প্রম্পট্ করবার অবশ্য অসুবিধে হয়। কিন্তু প্রম্পটার থাকা উচিত নয়। অভিনয় করার আগে অভিনেতাদের পুরো মুখস্থ থাকা উচিত। তাই আমি দু'মাস ধরে রিহার্স্যাল দিই। আর আজকাল দু'দিন রিহার্স্যাল দিয়ে বই নাবানো হয়। কাজেই প্রম্পটারের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি ? কিন্তু প্রম্পটার কি কম বিপদে ফেলে! বার্ণপুরে না কোথায় অভিনয় করছি, সবে বলেছি—আত্রেয়ী মা, এতদিন কোথায় ভুলে ছিলি। দেখত কাত্যায়ন—

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ফু-রু-রু আর কার্টেনস্।

মহাজাতি সদনের হল ভাল, কিন্তু ষ্টেজ সুবিধের নয়। আড়ে ছোট, ডেপথ্ও নেই। ওরা ত যারা জানে, তাদের জিগ্যেস করবে না। যাক্, যা করেছে, ভালই করেছে। সুভাষের পুণ্যফলেই ঘটেছে ব্যাপারটি। তবে আটশ' টাকা ভাড়াটা বড্ড বেশী।

আজকালকার অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলতে বলায় বললেন—অভিনয়ের কথা আর কি বলব বল। আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে কিছু বলতে লজ্জা করে। সেদিন একজন ডাক্তারকে ডাকতে বাইরে গেল, ঢুকল অন্দরের দিক থেকে। বললুম, এটা কি হ'ল! ডাক্তার কি অন্দরমহল থেকে ঢুকবে নাকি ?

তা বললে—ভুল হয়ে গেছে।

এ রকম ভুল কি হয় নাকি ?

কান্তিবাবু কাল গিয়েছিলেন। ওঁর ইচ্ছেতেই আবার বিজয়া অভিনয় করছি। উনি দয়াল খুব ভাল করেন না, তবে জমে যায়। বইটার অভিনয় যা হচ্ছে, তা আর কি বলব! তবু কিন্তু জমে! জমে অবশ্য নাটকের গুণে আর শরৎদার ভাষায়।

নরেন জানে বিজয়ার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়ে আছে। তার বাবা তাকে পড়িয়েছেন। কিন্তু রাসবিহারীরা অন্য রকম বুঝিয়েছে, তাই ভাবছে হয়ত মত বদলেছিলেন।

বিজয়ার এদিকে রাসবিহারীকে প্রথম থেকেই ভাল লাগে না, তাড়িয়ে পর্যন্ত দিচ্ছে কিন্তু মনের কথাও বলছে না।

দয়াল প্রথম শুনে বলছে—তুমি নলিনীকে ভালবাস শুনে খুব খুশী হলাম। তার পরে বুঝতে পেরে বলছে—ও, বুঝেছি।

এটা বড় সুন্দর করতেন—শীতলবাবু। নিজেকে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিতেন চরিত্রের সঙ্গে।

[ক্রমশঃ।

তাপসী-প্রতীক্ষিতা

শ্রীঅরুণা ঘোষ

হে রামতপস্বিনি,
শ্রীরামের লাগি আঁখিদীপ জ্বালি
বসে আছ একাকিনী।
পলে পলে দিন যায়,
হৃদয়-বেদিকা নিতুই ধুয়েছো
তব আঁখি-জলে হায়!
এই বুঝি আসে রাম,
এই বুঝি আসে প্রাণের ঠাকুর
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম।
কত দিন আসে যায়,
কোথায় তোমার চির-আরাধ্য
বুঝি বা এলো না হায়!
তবু তো হওনি ম্লান,
হে উপবাসিনি, আশার শিখাটি
আজো তব অম্লান।
অন্তরতম তরে,
নয়নের জলে আলপনা আঁকি
চাহিয়া রয়েছো দ্বারে।
শুনি মর্ম্মর ধ্বনি,
ভেবেছো, এসেছে পাতকী-তারণ
তোমার সে রঘুমণি ?
মঙ্গলঘট ভরি,
নিত্য রেখেছো দুয়ারের পাশে
রাতুল চরণ স্মরি।
ব্যথার প্রদীপ হয়ে,
শ্রীরামের লাগি জ্বলিয়াছ শুধু
দহনের ব্যথা সয়ে।
জীবন ঘনায়ে আসে,
জরা আর ব্যাধি ঘিরে ফেলে দেহে
তবু আছ রাম-আশে।
আঁখিপল্লব হতে,
বিদায় দিয়েছ নিদ্রাদেবীরে
শ্রীরাম-প্রতীক্ষাতে।
শবরী এসেছে রাম,
সীতা অন্বেষণে তোমার দুয়ারে
এলো লীলা অভিরাম।
"এসেছো কি তুমি রাম ?"
"এসেছি শবরি, করিতে আশীষ
পূরাতে মনস্কাম।"
প্রতীক্ষাই তব ধ্যান,
তাই তো অতিথি পর্ণ-কুটীরে
পতিতপাবন রাম।
তাপসী-প্রতীক্ষিতা,
তপস্যা তোমার চিরপ্রতীক্ষা
অয়ি ভক্তিস্মিতে!

নাচ গান বাজনা

ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ

কাজী নজরুল ইসলাম

ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর অকাল মৃত্যুতে আজকের এই সভা আহুত হয়েছে। এই সভায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের তিরোধানে শোক প্রকাশ করা হবে, শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আমার আশা ছিল, দেশের একজন খ্যাতনামা জননায়ককে এই সভার সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হবে, এবং তা করলে শোভনও হত। আমি ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের একজন দীন ভক্ত সাগরেদ। আমি নিজে, গোলাম মোস্তফা, ও আব্বাসউদ্দীন তাঁর কাছে গান শিখেছি। বাংলার হিন্দু মুসলমান তরুণ গায়করা, যাঁরা সঙ্গীত-জগতে নাম কিনেছে, তাঁরা প্রায় সবাই ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের শিষ্য। কেউ হয়ত বলবেন: জমিরুদ্দীন ছিলেন পাঞ্জাবী, বাঙ্গলার তিনি কেউ ছিলেন না। এ উক্তি শুধু উক্তিই, এর মধ্যে যুক্তি নেই। আমি বলি, গানের পাখী উড়ে বেড়ায়, নীড় বাঁধে না। কোকিল পাহাড়ে থাকে, সে আসে বসন্তকালে, তার গান আমাদের মুগ্ধ করে। তারপর গান গাওয়া শেষ হলে আবার সে চলে যায়। সুরের আবেদন সমানভাবে সকল মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। জমিরুদ্দীন পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে। বাংলাদেশে ছোটবেলায় তিনি এসেছিলেন, বাংলাকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায়ই তিনি কথা বলতেন এবং নিজেকে তিনি বাঙ্গালী বলেই পরিচয় দিতেন এবং এজন্য গর্ব অনুভবও করতেন।

আজ সঙ্গীতলোকের একজন গুণীর শোকসভায় আমরা সমবেত হয়েছি, এটা এ দেশের পক্ষে অভিনব। শরিয়তের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ হয়ত এই সভার সঙ্গে সহানুভূতি দেখাতে চাইবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন, যে সারা জীবন গান গেয়েই গেল, ধর্মের কাজ সে করলো কোথায়? তার জন্য মুসলমান শোকসভা কেন করবে? তাদের কথা নিয়ে আমি বিতর্কে যোগ দিতে চাইনে। আমি শুধু বলতে চাই যে, বেহেশতের পাখী যখন গান করে তখন পৃথিবীর ধুলো থেকে সে উর্দ্ধে উঠে যায়। ফকীর দরবেশ যখন সেজদা করে, তখন তার মন মাটি থেকে উর্দ্ধে উঠে যায়। এই সুরের পথ ধরেই মানুষ মুক্তির পথ পেয়েছে। হজরত ইসমাইলের পায়ের দাপে মরুভূমির বুক চিরে পানি উঠেছিল; সেই পানি মানুষের জন্য আবে-জমজমের পানি হয়ে আত্মার শান্তিদান করে। সুরের আঘাতেও মনের পানি উথলায়। সুর কখনও খারাপ হয় না। খারাপ মনের পাত্রে পানি রাখলে সে পানি হয়ত দূষিত হয়, কিন্তু তাই বলে পানিকে দোষ দেওয়া যায় না। পানি মানুষের জীবন বাঁচায়; আবার বন্যা হয়ে মানুষের ধ্বংসও আনয়ন করে; তাই বলে পানিকে ত আমরা খারাপ বলতে পারিনে? সুরের সঙ্গে ফুলের তুলনা করা যেতে পারে। ফুল দিয়ে কোথাও কোথাও পূজা হয়। সেই ফুল নগরবিলাসিনীদের কণ্ঠেও শোভা পায়। তাই বলে ফুল খারাপ, এ কথা বলা যায় কি? শরিয়ত হয়ত গানের খারাপ দিকটাকেই খারাপ বলতে পারে। কিন্তু সুর কখনো খারাপ নয়।

এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, মানুষের মারফতে দুনিয়ায় বুকে আল্লার রহম নেমে আসে। সুরও আল্লার রহমরূপে দুনিয়ায় নাজেল হয়েছে। কিন্তু সব মানুষের মুখ দিয়ে ত সুরের রহমত বের হয় না। যাঁদের মুখ দিয়ে সুর বেরোয় তাঁদের উপর আল্লার রহম আছে। শরিয়তের তর্ক আমি তুলতে চাইনে। হাফিজের মৃত্যুর পর কেউ তার জানাজা পড়তে চায়নি। কিন্তু হাফিজ তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন যে, আমার বইয়ের পাতা খুলে প্রথম যে চরণ তোমাদের চোখের সামনে পড়বে, তাতেই তোমরা আমার কাম্য খুঁজে পাবে। শিষ্যরা হাফিজের মৃত্যুর পর এক অন্ধকে দিকে তাঁর বইয়ের পাতা খুলে দেখলো, লেখা রয়েছে: "আল্লাহ, আমার লাশ কেউ দাফন করবে না জানি, কিন্তু এও জানি, তুমি তোমার দরবারে আমায় গ্রহণ করবে।"

যুগের প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হয় এবং এই প্রয়োজন মেনে নিতে হয়। এই পরিবর্তনের জন্যই যুগে যুগে মোজাদ্দেদ আসেন। মানুষের পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধার ন্যায় মনের ক্ষুধাও আছে; এ ক্ষুধা মেটাতে হয়। ইদের দিনে মানুষ কোর্মা-পোলাও ফিরণী খায় পেটের ক্ষুধা মিটাতে; কিন্তু আতর খোসবুও মাখে: এটা হল মনের বিলাস। গানও তেমনি মানুষের মনের ক্ষুধা মিটায়। যাঁরা সাহিত্যিক, কবি ও গায়ক, তাঁরা মানুষের মনের ক্ষুধা মিটান। বাইরের ক্ষুধা যাঁরা মেটান, আমরা তার দাম দিই। কিন্তু মনের ক্ষুধা যাঁরা মেটান, তাঁদের দাম আমরা দিই না। তাঁরা মানুষের নিকট থেকে তাঁদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা পান না। তাঁরা প্রচ্ছন্নই থেকে যান। স্রষ্টা যে, তাঁর সৃষ্টিতেই সুখ। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে সৃষ্টির সুখেই তিনি মশগুল থাকেন।

দেশের জন্য যাঁরা নির্যাতন ভোগ করে তাঁ'রা ফুলের মালা পায়। কিন্তু যাঁরা এদেরকে ফুলের মালা পাওয়ার মত করে গড়ে তুললেন, তাঁরা তো মালা পান না। তাঁরা সব সময়েই থাকেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। আল্লাহ যে এত বড় স্রষ্টা, তিনিও তাই মানুষের দেখার অতীত, কল্পনার অতীত। তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, তাই তিনি সবচেয়ে বেশী গোপন।

বসন্ত বনে হিল্লোল জাগায়, মনে আনন্দ-শিহরণ তোলে। দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাবেই। তাকে নিন্দা করলেও সে বয়ে যায়,

প্রশংসা করলেও বয়ে যায়। কোকিলের গানকে খারাপ বললেও কোকিল গান গাইবেই। গায়কও তাই; সে সৃষ্টির আনন্দে গান গেয়ে যায়। কারো নিন্দা-প্রশংসার সে অতীত।

জমিরুদ্দীন যে দান বাংলায় রেখে গিয়েছেন, তার দাম বাংলার অনেকেই জানে না। আজ আমরা যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখাচ্ছি, এতে তাঁর রুহ উপর থেকে তৃপ্তি লাভ করছে।

জমিরুদ্দীন খান সাহেব ছিলেন খান্দানী গাইয়ে। তিনি ঠুংরী-সম্রাট। ওস্তাদ মইজুদ্দীন খানের পর, তাঁর মত ঠুংরী-গাইয়ে আর কেউ ছিলেন না, এখন ত নাই-ই। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, গজল, দাদরা, সব সুরেই তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে তিনি হাজার হাজার সুর রেখে গিয়েছেন। যে কোন সুর তিনি adopt করতে পারতেন। বহু নূতনতর সুর তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন। ইনি লোকের যে কতটা শ্রদ্ধার পাত্র, তা বেঁচে থাকতে জানতে পারেন নি। এতদিন তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করতে পরিনি, কাজেই আজকের সভায় তার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করতে পেলাম। তাঁর নামকে অক্ষয় করে রাখতে হলে ইউনিভার্সিটির সাহায্য নিয়ে একটা Classical music চেয়ার সৃষ্টি করা দরকার, কিংবা তাঁর নামে ইউনিভার্সিটি থেকে একটা মেডেল ঘোষণা করা দরকার। সেজন্য যে টাকা প্রয়োজন, তা একটা কমিটি গঠন ক'রে সংগ্রহ করতে হবে। তাঁর হিন্দু-মুসলমান হাজার হাজার কৃতী ছাত্র রয়েছে। আমরা যদি এ কাজ করি, তবে, একটা কাজের মতো কাজ করা হবে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তবে সেদিন জমিরুদ্দীনের কদর হবে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী যুগে আমাদের বংশধররা যেন সেদিন মনে করবার অবসর না পায় যে, আমরা নির্বোধ ছিলাম, গুণীর আদর করতে জানতুম না। কেবল রাজনৈতিক নেতাদিগকে শ্রদ্ধা জানালে চলবে না, যারা তিলে তিলে আপনাদের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিল, সেই সব কবি গায়ক ও সাহিত্যিকদিগকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আপনাদের আনন্দ দানের জন্য যিনি তিলে তিলে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই জমিরুদ্দীন খানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা আপনাদের জন্য একান্ত ফরজ। আপনারা তাঁর শোকসভা ক'রে তাঁর প্রতি আপনাদের কর্তব্যই করলেন। *

তুষুগীত

দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক যান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শুরু হবার লগ্নেই সংবেদনশীল কবিচিত্তে ঠিকই ধরা পড়েছিল:

"লক্ষ্মীমেয়ে যারা ছিল
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া, চড়বে ঘোড়া!
ঠাট ঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া!!"

---

* ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান ইন্তেকাল করেন। ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তাঁর শোকসভার সভাপতিরূপে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই অভিভাষণ প্রদান করেন।

আর তার ফলে প্রকৃতির কোলে পল্লীবাংলার সুপ্রাচীন স্মৃতি-সংস্কার বিজড়িত সমাজের সংস্কৃতি, 'কোন্ সে কালের কণ্ঠ থেকে' উৎসরিত যে প্রকৃতিসন্তান মানব-মানবীর বিস্ময়বিমুগ্ধ প্রাণের স্বপ্নকল্পনার মায়াকাজল মাখানো দৃষ্টির এ সুন্দর ভুবনে বাঁচবার ও আধিভৌতিক কামনার মধুর-সুতীব্র ও সুস্পষ্ট আকুতির বাঙ্ময় প্রকাশ ব্রতগুলি ধীরে ধীরে কালগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে তার বিষাদময় স্বীকৃতিও শুনতে পাই:

"আর কি এরা এমন করে,
সাঁজসেঁজুতির ব্রত নেবে?
আর কি এরা আদর করে
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
কপালে যা লেখা আছে,
তার ফল তো হবেই হবে।"

ব্রতগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করেছেন একমাত্র শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলতে পারি জীবনশিল্পী; জগতের বুকে জীবনের মর্মমূল থেকে যে শিল্প স্বতোৎসারিত তার মর্ম্মোপলব্ধি করে গেছেন তিনি, "বাংলার ব্রত" গ্রন্থে তার স্বচ্ছ পরিচয় মিলবে। পুরনো এবং বলা কথাকেই নিজের ভাষায় প্রকাশ করা সাধারণ প্রবন্ধের ধর্ম; আমার প্রয়াস তা নয়, তাই পূর্বোক্ত কথাকে রচনাকারের ভাষাতেই প্রকাশ করা যাক। "ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন সবুজের আড়ালে পক্ষি-মাতার মধুর কাকলি"—এর চেয়ে স্বল্প কথায় ব্রতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যায় না। আর এর মাধ্যমে "একের কামনা দশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে একটা অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে।" সে অনুষ্ঠানটির স্বরূপ কি?—"প্রত্যেক ঋতুর ফুলপাতা, আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এই সব অশাস্ত্রীয় অথচ একেবারে খাঁটি ও আশ্চর্য্য রকম সৌন্দর্য্যরসে ও শিল্পে পরিপূর্ণ বাঙালীর সম্পূর্ণ নিজের ব্রতগুলির যে গভীর যোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে করে এগুলিকে ধর্মানুষ্ঠান বলব, কি ষড়ঋতুর এক একটি উৎসব বলব, ঠিক করা শক্ত।" এর বাহ্যিক প্রকাশ সম্পর্কে বলেছেন, "এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া। মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্যনৃত্য এমনি নানা চেষ্টার প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে, এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা। অন্তত এই প্রণালীতে সমস্ত প্রাচীন জাতিই ব্রত করছে দেখতে পাই।" অর্থাৎ নাচ-গান-ছড়ায়-ছবিতে-প্রকৃতিতে-মানুষে মিলেমিশে ও এক সম্পূর্ণ ও সুপ্রাচীন প্রকাশ বা সংস্কৃতি। আধুনিক প্রাকৃতিক সান্নিধ্যবিহীন materialistic industrialism আর নাগরিকতার সংস্পর্শে এসে এই সংস্কৃতিগুলি যে ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যাবে, এ স্বীকারোক্তিতে ক্ষোভ ও বিষাদ থাকতে পারে কিন্তু মিথ্যা ভাষণ নেই।

কেউ কেউ ব্রতের ছড়াগুলির মধ্যে উপন্যাসের বীজ খুঁজে পান। ব্রতের ছড়ার মাঝে আধিভৌতিক কামনা আর কিছু কিছু খণ্ড জীবনচিত্র মিলে থাকে বলে, তাকে উপন্যাসের বীজ বলা যায় না। পাশ্চাত্য দেশের মত আমাদের দেশে Ballad দেখা যায় না। R. G. Moulton দেখিয়েছেন Balladই হোল সাহিত্যের সমস্ত শাখার আদিরূপ বা মৌলিক বীজ। অবনীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ব্রতের

মাঝে ছড়া বা কবিতা, তার সাথে সুর মিলে গান, আলপনা থেকে ছবি, নৃত্য, নাট্য ইত্যাদির প্রাথমিক স্ফূর্তি ঘটেছে। এভাবে এর মাঝে কিছুটা বিচ্ছিন্ন জীবনচিত্র পাওয়া গেলেও তাকে উপন্যাসের বীজ বলা চলে কি ?

যা হোক, জগতের এই যে প্রাচীনতম সংস্কৃতি তা ক্রমেই লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে। পল্লী-অঞ্চলে এখনো তার শীর্ণ ধারা ও ক্ষীণ ধ্বনি শোনা যায়, আরও পরে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে, তখন এই ছড়াগুলি আবিষ্কার করা বা পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই গড়বেতা অঞ্চল থেকে একটি তুষুগীত সংগ্রহ করেছি। এক বর্ষীয়সী মহিলা ছেলেবেলায় আরও প্রাচীনা মহিলাদের কাছে যে গান শিখেছিলেন তা ব্রতপালনের মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করেছিলেন, সে মহিলা প্রায় নব্বুই বছর বয়সে কিছুদিন হোল গত হয়েছেন, তাঁর বয়স্ক-পুত্র বিপ্লবী পল্লীকবির স্মৃতি থেকে যতটুকু আহরণ করা গেছে তা তুলে দিলাম।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে এই ব্রত সম্পর্কে বেশ কিছুটা আলোচনা করেছেন (বাংলার ব্রত; বৈশাখ ১৩৫৪; ২৭—৩১ পৃঃ)। তিনি একে বলেছেন "তোষলা ব্রত"; আবার কোথাও বলে তুঁষতুষলি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ত্রই এর প্রচলন আছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন, মানভূমের টুসুগানের সঙ্গে এর যোগ আছে, এবং সেখান থেকে এর ধারা এসে পশ্চিমবঙ্গে এরূপ ধারণ করেছে। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিনে গড়বেতায় দেখেছি দূর-গ্রামের প্রাচীন-সমাজ-স্পৃষ্ট মেয়েরা দলবেঁধে গান করতে করতে শিলাবতী নদীর তীরে জড়ো হয়েছে, নদীর জলে কত গাঁদা ফুল, মাটির সরা কাগজের ঘেরাটোপ ভেসে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথ এই ব্রতকারিণীদের সম্পর্কে বলেছেন, শীতের সকালে, শীর্ণধারা নদীতীরে, তোষলা ব্রতের দিনে, সরষে শিম এমনি নানা ফুলে সাজানো সরা ভাসিয়ে, স্রোতের জলে নেমে, সূর্য্যের উদয়কে এবং শস্যের উদ্‌গমকে কামনা করছে···মেয়েগুলি·····বিশ্বচরাচরের সঙ্গে সূর্য্যের আলোতে হলুদ আর সাদা ফুলে-ফুলে-ভরা ক্ষেতের মতো জেগে ওঠবার জন্যে আনন্দে উদ্‌গ্রীব।

এবার সংগৃহীত তুষুগীতটি নিবেদন করছি।

তুষলা গো রাই, তোমার দৌলতে আমি ছ'বুড়ি পিঠা খাই
ছ-বুড়ি ন-বুড়ি, গাঙ-সিনানে যাই,
গাঙের জলে রাঁধি-বাড়ি, পুকুরের জল খাই।
বার মাস বরষা, পুকুর নাই বাড়ে,
পুকুরের ঢলাপাতা ঢলমল করে,
মায়ের কানে সাত তালা, ভেয়ের বর মাগে।
ভাই ভগ্নী পাটেশ্বরী
ধান কাপাসে ঘর করি,
এস পৌষ যেও না, জনম জনম ছেড় না,
যদিবা ছাড়িবে, পরাণে মরিবে,
এক কড়া কড়ি লয়া মা, দু' কড়া কড়ি,
তা দিয়ে মা পূজা করব সোনার পৌষরী
পৌষরী গোলে না, পতাকাতা খেলা
ঘোষকুলের মালা,
হব তোমার দাসী, তব জলে ভাসি।
ভবনী কলসী লহ-লহ করে
মালার বেটা বষ্ঠী মারে
মাঙ্কক ষষ্ঠী, শুকাক বিল সোনার কৌটা রূপার খিল।
এবড়া রে তোবড়া, যম দুয়ারে খড়া
যমের পূজা করে কে, সাতভেয়ের বুন সে,
লক্ষ্মী আসে লক্ষ্মী যায়, লক্ষ্মী নি পাতাড়ি পায়
সব সুদ্ধ মুজো, মোহরতলায় গুঁজো
মোহরতলায় ক্ষীরের লাড়ু
সেঁকা হাতে সোনার খাড়ু
সূর্য উঠে রঙ সরিষা ফুলের বর্ণ
আজ ঠাকুরকে আনবো আমি আনন্দ করিয়ে
কাল ঠাকুরকে পূজবো আমি টিবা গেঁদা দিয়ে,
টিবা গেঁদা তুলতে গেলাম সেই লতায় লতা
শিবের সঙ্গে দেখা হোল মাথাপরা কাঁটা।
ধান এল গো ছালা ছালা, তা মাপতে, তা গুণতে,
তা তুলতে এত বেলা, বাজ মাথায় দিয়ে ফুল
ধান উছুল উছুল।
যত কিছু এল ছালা ছালা, তা মাপতে, তা গুণতে,
তা তুলতে এত বেলা, বাজ মাথায় দিয়ে ফুল,
যত কিছু উছুল উছুল।

রাই উঠলো রাই উঠলো বামুনপাড়া দিয়ে।
উঠ গো বামুন ঝাঁজ ঘণ্টা বাজিয়ে।
রাই উঠলো রাই উঠলো যত পাড়া দিয়ে।
উঠ গো যন্ত-রা যত কিছু নিয়ে।
চাল গোটা দুই রাঁধ গো সুদন, ভাত গোটা দুই খাই।
কড়ির ঝোড়া মাথায় নিয়ে বামুনপাড়া যাই।
বামুন ভাই বামুন ভাই ঘরে আছ হে।
আমার সুদনের বিয়ে সোম মঙ্গলবারে ;
তোমরা যত কিছু জোগাবে ভারে ভারে।
নাইবো তোর সাগরে, চুল ঝাড়ব চামরে
দাঁত মাজবো ভমরে, আলো ধানের কালো চুল
ডা'র ডা'র এওয়ীর কুল ॥ ইত্যাদি...

বর্তমানে আধুনিক গায়িকারা ব্রতগীতের কিছু কিছু গাইছেন, তার মধ্যে ব্রতগীতের সেই লোকসুর থাকছে না, তাকে শৈল্পিক প্রয়াসে সজ্জিত ও মার্জিত করে তুলছেন।

আমার কথা (৬০)

শ্রীসলিল চৌধুরী

কয়েক বৎসর আগের কথা। হেমন্তকুমারের উদাত্ত কণ্ঠে সকলে শুনল গ্রাম্য বাঙ্গলার তিনটি রূপক সঙ্গীত—'পাল্কী চলে', 'একটি' ও 'গাঁয়ের বধু' মনে গেঁথে রইল সেগুলি—গুনগুনিয়ে উঠল, তবে কে কিন্তু খোঁজ করল সকলে কে এগুলির সুরকার? সেদিনের সেই অজানা সুরস্রষ্টা হলেন আজকের প্রখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীসলিল চৌধুরী।

সাদাসিধা, মাঝারী গঠন ও পরিহাসপ্রিয় এই ব্যক্তিটির সহিত আলাপে জানতে পারি :—

দক্ষিণ বারাসাত (বহড়ু) গ্রামের ডাক্তার ৺জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী ও কোদালিয়া ঘোষবংশের তনয়া শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর চার পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান আমার জন্ম হয় কলিকাতায় ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। যখন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর কোর্টের বিচারক, তখন আমার ঠাকুরদাদা ৺রামতারণ চৌধুরী তথাকার প্রবীণতম আইনজীবী ছিলেন। ১৯৩১ সালে হরিনাভি বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা, ১৯৪১ এ বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই-এস সি ও ১৯৪৪ সালে সেখান থেকে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স সহ গ্র্যাজুয়েট হই। বাবা আসামের চা-বাগানে ডাক্তার ছিলেন—শরীর খারাপ হওয়ায় তথায় পুরা এক বৎসর থাকি। বাবার ইচ্ছা ছিল চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করি কিন্তু তা আর হল না। ষষ্ঠবার্ষিক (এম-এ) ক্লাসের ছাত্র থাকার সময় সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। প্রথমে ছাত্র আন্দোলন পরে কিষাণ আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ায় প্রায় তিন বৎসর গ্রামে গ্রামে সংগঠক হিসাবে ঘুরি প্রায় গা-ঢাকা দিয়ে। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য চর্চ্চার দিকে ঝুঁকে পড়ি কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লেখা সুরু করি কিন্তু এগুলি পড়ে শোনাতাম মা ও ভাইবোনেদের। কলেজে পড়ার সময় কবিতা ও ছোট গল্প কিছু কিছু প্রকাশিত হত, নতুন সাহিত্য ও পরিচয়। আমার লেখা ড্রেসিং টেবিল গল্পটি ১৯৪৬ সালে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৯৫৮ সালে 'নতুন সাহিত্য'তে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়।

আমাদের বাড়ীতে গানের খুব চর্চ্চা হত। ঠাকুরদাদা ও বাবা প্রবাসে থাকায় জ্যাঠামহাশয়ের কালকাতাস্থ বাড়ীতে আমি ছিলাম। তাঁহার পুত্র ৺নিখিল চৌধুরী (ছোড়দা) মিলন পরিষদ-এর অর্কেষ্ট্রা পার্টির পরিচালক ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর কাছে আমি পিয়ানো ও অন্যান্য বাজনা বাজাতে শিখি। আমার গান লেখার প্রাথমিক ভিত্তি ছোড়দার নিকট হয়। ছোড়দার অসুস্থতার জন্য চার বৎসর পরে মামারবাড়ী হরিনাভিতে চলে আসি। সেখানে গানবাজনা নিষিদ্ধ ছিল, তার জন্য ছয় বৎসর সঙ্গীতহীন হই। মধ্যে মধ্যে বাঁশের বাঁশী বাজাতাম লুকিয়ে, ক্রমশঃ বাঁশী বাজিয়ে হিসাবে নাম হল। মামারা আর আপত্তি করেননি। বি, এ পড়ার সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীতিমিরবরণ ভটাচার্য্যের অর্কেষ্ট্রা দলে বংশীবাদক হিসাবে যোগ দিই।

১৩৫০ সালের বাঙ্গলা মন্বন্তরের সময় সর্ব্বজনমান্যা নেত্রী পরলোকগতা সরোজিনী নাইডুর উৎসাহে ছাত্রদের একটি দল আসাম ও বাঙ্গলা পরিভ্রমণে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। উহাতে আমি সঙ্গীত লেখক, শিল্পী ও বাদক হিসাবে স্থান পাই এবং নিজেকে সঙ্গীতানুরাগী হিসাবে আবিষ্কার করি—ইহার পূর্ব্বে কোনদিন আমি সঙ্গীত সাধনা বা সঙ্গীত ঘরাণার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করি নাই।

প্রথম আমি গান লিখিতে আরম্ভ করি গ্রাম-বাংলার উপযুক্ত সব রকম আন্দোলনের উপর। I P T A-এর মাধ্যমে লোকসঙ্গীত বিশেষভাবে চালু হইতে থাকে এবং আমি উহার সহিত জড়িত থাকায় ভারতীয় সঙ্গীত সাম্রাজ্যের গভীরে প্রবেশ করি। তখন থেকে লোকসঙ্গীত নিয়ে চলে আমার বিশ্লেষণ—জাগে আমার অনুসন্ধিৎসা—

শ্রীসলিল চৌধুরী

• ১৯৩১ মৃ... ইন্তিকাল করেন। লোকসভায় সভাপতিত্ব... প্রদান করেন।

উঠে আমার অনুপ্রেরণা—করি অনুশীলন—দেখি প্রদেশ ভেদে ভারতীয় সভ্যতার বিভিন্ন রূপ—খুঁজে পাই জাতীয় সংস্কৃতির বুনিয়াদী ঐক্য—কবিগুরুর ভাষায় 'বহুর মধ্যে এক।' ১৯৫৫ সালে প্রথম ভারতীয় ফিল্ম ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে রাশিয়া ও পূর্ব্ব-য়ুরোপের অন্যান্য দেশে ভ্রমণের সময় আমি প্রায় দুই হাজার লোকসঙ্গীতের রেকর্ড ও লেখা সংগ্রহ করি।

মেগাফোনে আমার প্রথম গানের রেকর্ড হয় 'নবারুণ রাগে রাঙা রে' ও পরে এচ, এম, ভিতে সুচিত্রা মিত্রের সহিত দ্বৈতসঙ্গীত 'আমাদের নানান মতে নানান দলে দলাদলি।' আই, এন, এ, ট্রায়াল ও নিখিল ভারত ধর্ম্মঘটের উপর আমার গাওয়া গান নিষিদ্ধ করা হয়। আমার লেখা 'সঙ্কেত' নাটকও নিষিদ্ধ হয়।

সঙ্গীত আমার profession হবে—এ ধারণা কোনদিনই আমার ছিল না। ১৯৪৯ সালে একদিন অক্টারলনী মনুমেন্টের তলায় অনুষ্ঠিত এক সভায় আমার পরিচালনায় একটি গান হয়। ফিল্ম-পরিচালক শ্রীসত্যেন বসু উহাতে উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে তিনি আমায় ডাকিয়া জানান যে তাঁহার পরিচালনাধীন 'পরিবর্ত্তন' ছবিতে আমাকে সঙ্গীতকার হিসাবে যোগ দিতে হবে। আমি ত অবাক! কিন্তু সত্যেনদা' অভয় দিলেন। দর্শকেরা ভালভাবে গ্রহণ করেছিলেন উক্ত ছবি ও উহার গানগুলিকে। তার পর বরযাত্রী, পাশের বাড়ী ইত্যাদি বাংলা ছবিগুলির সঙ্গীত-পরিচালক হই। তখন থেকে পাকাপোক্তভাবে সুরকার হিসাবে থেকে যাই।

আমার বোম্বাই গমনের কথা বলি। প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীবিমল রায় কলিকাতায় এলেন কাজে। আমার লেখা 'রিক্সাওয়ালা' গল্পটি তাঁহাকে পড়ে শোনাই। বিমলদা' কোনরূপ মতামত দিলেন না। মনে করি লেখা ভাল হয় নাই। পনের দিন বাদে বোম্বাই থেকে বিমলদা'র টেলিগ্রাম যে, গল্পটির হিন্দীসংস্করণ তোলা হবে—সেজন্য আমার বোম্বাই গমন। 'রিক্সাওয়ালা'র চিত্ররূপ হল 'দো বিঘা জমিন'—চিত্রনাট্যকার ও সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে আমাকে থাকতে হল। এর পর হল 'বিরাজ বউ'। তাতেও আমি রইলাম। সেই থেকে এপর্য্যন্ত বোম্বাইএ তোলা অনেক ছবিতে আমাকে সুরশিল্পী হিসাবে কাজ করতে হয়েছে। বোম্বাই আমার প্রধান কর্ম্মস্থল হওয়ায় সম্প্রতি সেখানে একটা নিজের বাড়ী করেছি।—পিতার স্মৃতিচিহ্নিত—নাম 'জ্ঞানকুটীর।'

১৯৫২ সালে শ্রীগিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা ও সরকারী আর্ট কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতি দেবীকে বিবাহ করি।

৩১শে জানুয়ারী' ৫৭ সালে সর্বশ্রী বিমল রায়, অনিল বিশ্বাস, কে, এ, আব্বাস,, লতামুঙ্গেশকর, মান্না দে প্রভৃতির সহায়তায় 'বোম্বে ইয়ুথ কয়ার' গঠন করি। কলিকাতায় সম্প্রতি রুমা দেবী ও দ্বিজেন্দ্র মুখার্জ্জি উহা গঠন করিয়াছেন।

আমার জিজ্ঞাসায় শ্রীচৌধুরী বলেন, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি শ্রোতাদের মনে গানের taste এনে দিচ্ছে।

মৌসুমী মন

উর্মিমালা চক্রবর্তী

ব্যথারা যতোই মিছিলে নামুক
জীবন জুড়ে,
না হয় ক্লান্তির ঢেউ উতোল করুক
এ সায়র-দেহ,—
লোকসান তিলমাত্রই—
শ্রাবণী-সুরের ঝিরঝিরে এই সন্ধ্যায়
কান্না নামুক থই থই।

কোন্ শুক্তি-চোখে কম্‌লার কোঁয়া
জম্‌ছে?—জমুক, জমবে।
স্বরোদে সেতারে আশারা কাঁদুক
করুণ বিপ্রলম্ভে।
কোন্ যুগে এ কান্নার মায়া থাম্‌বে?
আজ যোগ-বিয়োগের খতিয়ান-খাতা
না হয় রইল রুদ্ধ!
পেয়েছো গোলাপ—শতদল, শ্বেত, শুদ্ধ,
সতেজ, মত্ত? –
তবে হিসেবের খাতা তুলে রাখো তাকে
না হয় হোলই পণ্ড!

আষাঢ়ে-মেঘ আসবে জীবনে আসবে;
কবে বৈশাখী-বায়ু টুলুটুলু দেহে
শিউলী-শাখায় নাচবে?
তাই থাক্ না আজকে থাক্ না সময় কেনা!
নিশীথ-অস্তে নক্ত-সখী কি
হিলহিলে চুলে দোলাবে হাস্নুহেনা?

যদি বৈশাখী-মেঘ ঢেকে দেয়
এ মৌসুমী মন,
তবু অন্ধকারের বক্ষে আঁকব—আঁকবই
বিদ্যুৎ-কঙ্কণ।
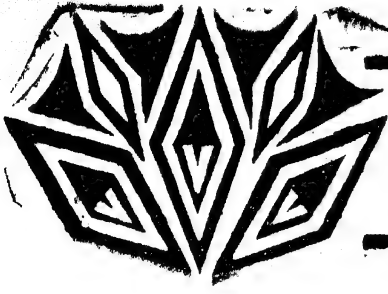
সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—গদ্য সংস্করণ—আদিলীলা

এ অতি স্পষ্ট সত্য যে চৈতন্যদেবের কৃপাতেই বলতে গেলে বাঙলা সাহিত্যের জন্ম। একে অস্বীকার করা কোন মতেই চলে না। পৌনে পাঁচ শ' বছর আগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বিধাতার অপার করুণার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। চৈতন্যের প্রভাব বাঙালীকে আত্মনির্ণয়ে উদ্বুদ্ধ করল। তাঁর প্রভাবে বাঙালীর প্রাণগঙ্গায় জোয়ার এল, বাঙালী জাগল, এল নব জাগরণ, এল নব চেতনা, এল নবযুগ—সেই যুগের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্য। তাঁর দিব্য জীবনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য চৈতন্যজীবনী গড়ে উঠতে লাগল এবং এই চৈতন্যজীবনী অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই মূলতঃ বাঙলাসাহিত্য জন্ম নিল। সাহিত্যের যে অভাব শূন্যতা, বিষয়বস্তুর অপ্রাচুর্য ছিল চৈতন্যজীবনীর দ্বারা তারা দূরীভূত হল, সাহিত্যের অবিব্যক্ত স্বর্ণ সম্ভাবনায় ভরে উঠল, তার ভোরের আকাশে মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল, তার সিংহদ্বারের হল শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন। সাহিত্যের তথা জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এদের প্রভাব অনতিক্রম্য। বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি করল যে চৈতন্যজীবনীগুলি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। এর শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত। এর গ্রন্থমূল্য অপরিমেয়। মহাপ্রভুর অনন্যসাধারণ লীলামাধুর্য পরম ভক্তি রসের সঙ্গে এতে বর্ণিত হয়েছে, বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থ চিরকাল পূজা পেয়ে এসেছে। চৈতন্যদেব বলতে পাঁচ শ' বছর আগেকার বাঙলা দেশের সামগ্রিক ইতিহাস—সেই ইতিহাসই স্থানলাভ করেছে এই পবিত্র গ্রন্থে। মহাপ্রভুর জীবনের পবিত্র কাহিনীগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। নবত্রাতা চৈতন্যের পাদদেশে অন্তরের শ্রেষ্ঠ ভক্তি নিবেদন করে যেন গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছে। ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে এই গ্রন্থে। এর সহজ, সরল, প্রাঞ্জল রূপদানে শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্যও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। ভক্তি, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে এই মহৎ প্রয়াসকে তিনি সার্থক করে তুলেছেন। তাঁর রচনা মূল গ্রন্থের পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এই গ্রন্থটি রসিক ও ভক্ত সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে আদৃত হবে এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। প্রকাশক—বৈষ্ণব প্রচারিণী সমিতি, ১০-এ, ডোভার রোড। পরিবেশক—ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

আমাদের শান্তিনিকেতন

ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি এবং বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাসের জীবনকাহিনী যাঁদের অজানা নয়—তাঁরা বিশেষ ভাবেই অবহিত যে সুধীরঞ্জনের বাল্যজীবন কেটেছে শান্তিনিকেতনে অর্থাৎ সুধীরঞ্জনের জীবনের এমন একটা সময় শান্তিনিকেতনে কেটেছে যে সময় শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-স্বপ্নের তিলে তিলে অঙ্কুরোদ্‌গম হচ্ছে। সুধীরঞ্জনের গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের পিছনে ফেলে আসা সেই প্রথম যুগটির অসংখ্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, রচনার উৎকর্ষে সেই সমগ্র যুগটিই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে গ্রন্থের পাতায়। গ্রন্থটি প্রমাণ করল যে সুধীরঞ্জন দাস কেবলমাত্র একজন ধুরন্ধর আইনজ্ঞই নন, তিনি একজন দক্ষ সাহিত্যশিল্পীও। শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য কাহিনী, অসংখ্য চরিত্র সুধীরঞ্জনের লেখনীর মাধ্যমে গ্রন্থে নতুন করে রূপ নিয়েছে। বহু প্রণম্য ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিভিন্ন উল্লেখ গ্রন্থটিকে শ্রীসম্পন্ন করে তুলেছে। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন আবহাওয়া, আবেষ্টনী ও পরিবেশকে প্রস্ফুটিত করার ক্ষেত্রে সুধীরঞ্জন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর বর্ণনভঙ্গী যেমনই সরস, তেমনই চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থটি সব দিক দিয়েই তাঁর রচনানৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। প্রকাশক—বিশ্বভারতী ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

আমেরিকায় শিশিরকুমার

বাঙলাদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ১৯৩০ একটি স্মরণীয় বছর। এই বছর নটগুরু শিশিরকুমার সসম্প্রদায়ে মার্কিণ মুলুকে বাঙলা নাটক অভিনয় করে আসেন। যদিচ নানাবিধ কারণে শিশিরকুমারের এই অভিযান সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি, তথাপি এর ইতিহাসমূল্য অনস্বীকার্য। আজকের দিনে দেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক দূতের দল প্রেরিত হলে আমরা স্বভাবতঃই গর্ব বোধ করে থাকি। কিন্তু বৃটিশের যুগে এই জাতীয় সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হলে গর্বের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিস্ময়বোধও করতুম যথেষ্ট পরিমাণে। সেদিক দিয়ে বিচার করলেও নটগুরুর এ অভিযানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুমেয়। শিশিরকুমারের এই অভিযান যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনই বাঙলা নাট্যালয়ের তথা সমগ্র দেশের গৌরববর্ধনে

প্রভূত সহায়তা করেন। এই অভিযান সম্প্রদায়টির সদস্যদের মধ্যে যশস্বী নাট্যকার প্রথিতযশা অভিনেতা স্বর্গতঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরীও অন্যতম। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করার প্রাকমুহূর্ত থেকে ভ্রমণ সমাপ্ত করে করাচী হ'য়ে ট্রেণযোগে দিল্লী পৌঁছান পর্যন্ত খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ যোগেশচন্দ্র একটি রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সেই রোজনামচাটি এবং "মার্কিনী মার" নামক তাঁর একটি অপ্রকাশিত নাটক একত্রে গ্রন্থরূপ নিয়েছে। বলা বাহুল্য মাত্র যে এই গ্রন্থটি শিশিরকুমারের আমেরিকা অভিযানের একটি পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য তুলে ধরেছে, প্রসঙ্গতই আমেরিকারও আভ্যন্তরীন বহুবিধ আলেখ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কেবলমাত্র শিশিরকুমারই নন, ভ্রমণরত সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্য যোগেশচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমে সমান মর্যাদার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছেন। গ্রন্থশেষে যোগেশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী যুক্ত হয়েছে। শিশিরকুমারের এবং অন্যান্য শিল্পীদের আমেরিকা ভ্রমণ উপলক্ষে যে একাধিক আলোকচিত্র আছে—সেগুলির অন্ততঃ একটিও যদি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হত তাহলে গ্রন্থটি আরও শোভন হয়ে উঠত। শিশিরকুমারের তথা বাঙলার নাট্যানুরাগীর দল এই গ্রন্থ পাঠে প্রচুর আনন্দ পাবেন। প্রকাশক—অরুণ চৌধুরী, ১এ নন্দলাল বসু লেন, পরিবেশক—বুক ম্যাণ্ড বুক, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

নজরুল-অনূদিত ওমরখৈয়াম

জগতের কাব্যসম্পদের সমৃদ্ধি ও পুষ্টির ইতিহাসে যাঁদের স্বাক্ষর চিরকালের জন্য অমলিন হয়ে আছে পারস্যের ওমর-খৈয়াম তাঁদের অন্যতম। তাঁর রুবাইয়াৎ তাঁকে অমর করে রেখেছে। এই বিশ্ব-বিখ্যাত কাব্যনিদর্শনটিকে বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতি (দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুবাদ ছাপার হরফে কখনো প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই তবে তারই কোন কোন অনবদ্য পংক্তি বিশেষ মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন অবনীন্দ্রনাথ) বাঙলা দেশের কাব্য-ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়ের স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতার জগতে নজরুল একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের একটি অনুবাদ নজরুলও করেছেন। স্মরণ থাকতে পারে, তিন-চার বছর পূর্বে এই অনুবাদটিরই কিয়দংশ ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। যে নিজস্বতা নজরুল প্রতিভাকে রূপ দিয়েছে তার সুস্পষ্ট ছাপ গ্রন্থে বিদ্যমান। নজরুলের এই অনুবাদকর্ম যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ, এর ছন্দ লীলায়িত, এর ভাষা-চিত্রবহুল। শব্দচয়নে, ভাববিন্যাসে, বর্ণনকুশলতায় এই গ্রন্থটিও নজরুলের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তিগুলির মধ্যে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখে। ওমরের জীবনদর্শনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নজরুলের অনুবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আপন বিশিষ্টতায় ওমরকে এক নতুনতর রূপ দিলেন নজরুল। ওমরের কবিচিত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ধারাগুলির সম্যক বিকাশ ঘটেছে নজরুলের লেখনীর মধ্যে দিয়ে। এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী। কাব্যরসিক মহলে গ্রন্থটি সমাদৃত হোক, এই কামনা। প্রকাশিকা—জোহরা খানম, ১ এন্টনিবাগান লেন। পরিবেশক—ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। দাম—দশ টাকা মাত্র।

লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়

লণ্ডন আমাদের বিদেশ হলেও আমাদের এত পরিচিত যে বলতে গেলে তার সম্বন্ধীয় কোন তথ্যই প্রায় আমাদের অজানা নয়। লণ্ডন সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তক ঐ অঞ্চল সম্বন্ধীয় আমাদের কৌতূহল বহুকাল ধরে দূর করে আসছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি লণ্ডন সম্পর্কীয় হলেও গতানুগতিক ধারায় লিখিত নয়, এক সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যর স্পর্শসমৃদ্ধ, যথোচিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অল্পকাল পূর্বে এই গ্রন্থটিই ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীর পাতায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর লেখক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকার শ্রীপরিমল গোস্বামী মহাশয়ের পুত্র শ্রীহিমানীশ গোস্বামী। হিমানীশ গোস্বামী এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে লণ্ডনকে দেখেছেন যা সব দিক দিয়েই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। লণ্ডনের ভিতরকার রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। গ্রন্থের নামকরণই প্রমাণ করে লেখকের দৃষ্টি কেবল গভীর থেকে গভীরেই ধাবিত হয়েছে। লণ্ডনের সাধারণ মানুষ, তাদের জীবন, তাদের ভাবধারা এ গ্রন্থে দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। তাদের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না এবং লেখকের দরদী মন ও বলিষ্ঠ লেখনীর সমন্বয় ঘটায় উপরোক্ত শিরোনামায় এক পরম সুখপাঠ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ গ্রন্থ কেবলমাত্র সাহিত্যরসেরই উৎস নয়, নানা তথ্যে পুষ্ট, লেখকের ভাষা তথা রচনাশৈলী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁর লেখকজীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা উজ্জ্বল আশা পোষণ করি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ ১৩ গান্ধী রোড। দাম—তিন টাকা মাত্র।

গ্র্যাণ্ড হোটেল

সুলেখিকা শ্রীমতী ভিকিবাউম সাহিত্যের দরবারে যথেষ্ট খ্যাতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা। তাঁর 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। গ্রন্থটি তাঁর অসামান্য সৃজনী-প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এই গ্রন্থে লেখিকার বহুদূরগামী ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচয় মেলে। গ্রন্থে চরিত্রসৃষ্টিতে ঘটনা সংস্থাপনে এবং সংলাপ রচনায় লেখিকা যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বক্তব্যও যেমনই জোরালো তেমনই যুগোপযোগী। গ্রন্থটি বক্তব্যের বলিষ্ঠতার কল্যাণে স্থায়িত্বের দাবী রাখতে পারে। এর আবেদন মানুষের মনে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পাবে। এই গ্রন্থটিতে বর্তমান সভ্যতার একটি জীবন্ত বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়। গ্রন্থটিকে আধুনিক সমাজের আগামী চিত্রের সতর্কবাণী বলে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকতে পারে না। গ্রন্থটি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন সুসাহিত্যিক শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁর অনুবাদগ্রন্থের সাহিত্যিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। রচনার মূল সুর কোথাও ব্যাহত হয়নি। ভাষা প্রাঞ্জল, রচনাশৈলী চিত্তাকর্ষক, সমগ্র অনুবাদকর্ম সর্বতোভাবে অনুবাদকের নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অনুবাদকের অনুবাদধারাও প্রশংসনীয়। প্রকাশক গ্রন্থভবন, ১৩ গান্ধী রোড। দাম দু' টাকা মাত্র।

বাঘের চোখ

শিশুদের উপযোগী সাহিত্য রচনার মাধ্যমে যাঁদের প্রতিভা বিকাশ লাভ করেছে শ্রীমতী লীলা মজুমদার তাঁদেরই একজন—এবং

তাঁদের মধ্যেই এক বিশেষ আসনের অধিকারিণী। ছোটদের উপযোগী অসংখ্য গ্রন্থ তাঁর সৃজনী-দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করছে। 'বাঘের চোখ' তাঁর একটি সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ। তাঁর পূর্বসুনাম এই গ্রন্থে অক্ষুণ্ণ আছে। অনেকগুলি ছোটগল্পের সংকলন এই গ্রন্থে। গল্পগুলি পাঠ করে ছোটরা যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দরস আস্বাদনে সমর্থ হবে। গল্পগুলির আবেদন শিশু-চিত্তে রেখাপাত করতে সমর্থ হবে। শিশুদের কোমল মনে গল্পগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করার দাবী রাখে। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পরিবেশক—পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড ১২-১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট। দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অন্য কোনখানে

বাঙলা দেশের সাহিত্য-জগতে সৌরীন সেন নবাগত শিল্পী। তবে তাঁর "অন্য কোনখানে" প্রমাণ করল নবাগত হলেও তাঁর আবির্ভাব যথেষ্ট সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করে। যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপকে কেন্দ্র করে এর গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। গল্পের মধ্যে ত্রিভুজ প্রেমের এক হৃদয়স্পর্শী আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের মাধ্যমে যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ ও পশ্চিম জার্মাণীর নরনারীকে বিশেষ ভাবে জানার সুযোগ মেলে। গ্রন্থের ভাষা লালিত্যপূর্ণ, লেখকের চরিত্রবিন্যাস কুশলতার স্পর্শযুক্ত বর্ণনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থের নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশক—রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

অস্তি ভাগীরথীতীরে

রহস্য কাহিনীর স্রষ্টারূপেই ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত হলেও এ কথাও কারো অজানা নয় যে, সামাজিক স্মৃতিধর্মী গল্প উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনী অক্ষম নয়। আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁদের থেকেও একটু ব্যতিক্রম। কলকাতার প্রাচীন ইতিহাস এর পটভূমিকা। কলকাতার জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে তার ক্রমবিকাশ তৎকালীন পরিবেশ-আবহাওয়া, জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে লেখক আলোকপাত করেছেন। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকে আশ্রয় করে একটি পরিবারের উত্থান-পতনের অতি বিচিত্র কাহিনী তুলে ধরেছেন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। উপন্যাসের দিক দিয়ে, সাহিত্যের দিক দিয়ে, রচনার দিক দিয়ে গ্রন্থটি সর্বতোভাবে লেখকের দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। উপন্যাসের গতি চিত্তাকর্ষক, ভাষা, বর্ণনা, বিন্যাস সকল দিক দিয়েই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে এই গ্রন্থে যেখানে ইতিহাস এসেছে, যেখানে সাল-তারিখের ব্যাপার এসেছে সেখানেই লেখক অনেক ক্ষেত্রেই গুরুতর ভ্রমের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানেই লেখক হিসেবের খেই হারিয়েছেন, এবং তার ফলেই ইতিহাস মূল্যের দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে গ্রন্থমর্যাদাও তার ফলে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে ভুলগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক—লেখক জানিয়েছেন আলীবর্দীর মৃত্যুকালে কন্দর্পের বয়েস তিন বছর এবং সুমন্তের মৃত্যুকালে কন্দর্পের বয়েস একুশ—আলীবর্দীর মৃত্যু ১৭৫৬ অতএব কন্দর্প জন্মালেন ১৭৫৩—পিতা সুমন্তের মৃত্যু তা হলে হবে ১৭৭৪ সালে, কন্দর্পের অল্প বয়সেই বিবাহ হয়—লেখক বলছেন (পৃঃ ১৯৫) যে সেই দিন উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু হল, ইতিহাস বলছে যে জোন্স মারা যান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি—তা হলে তা যদি হয় তা হলে কন্দর্প তো তখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন'(এসিয়াটিক সোসাইটিরই প্রতিষ্ঠা ১৭৮৪) গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে কর্ণওয়ালিশের যুগেও সুমন্তের জীবন বিকাশমান—তা হ'লে ১৭৭৪ সালে সুমন্তের মৃত্যু কি করে হয়? কন্দর্পের চেয়েও বয়েসে ছোট কন্যা, তার কন্যা নির্মলা, লেখকের মতে সুমন্তের মৃত্যুকালে পনেরো বছরের মেয়ে নির্মলা অথচ কন্দর্পই তখন একুশ বছরের ছেলে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কন্দর্পের চেয়ে নির্মলা যদি ছ' বছরের ছোট হয় তা হ'লে কন্দর্পের অনুজা—তার গর্ভধারিণীর চেয়ে সে ক' বছরের ছোট? লেখক বলেছেন কন্দর্পের রাজত্বকাল বারো বছর অর্থাৎ ১৭৮৬ সালে তার মৃত্যু—সেই সময়ে কালীরও মৃত্যু, তখন তার ছেলে কানাই গুনতি তেরো বছরের ছেলে (অতএব কানাইয়ের জন্ম ১৭৭৩) তার ছেলে—রামলাল বিভূতির সমসাময়িক কি করে হয় (যে বিভূতি কন্দর্প সহোদরা হৈমর নাতনীর নাতি)? চোদ্দ বছর বয়েসে রাধারাণীর বিবাহ হয়, কালীর বয়েস তখন আট তাহলে দেখা যাচ্ছে রাধার চেয়ে কালী ছ' বছরের ছোট, অন্য এক জায়গায় লেখক বলছেন—কালীর বয়েস সতেরো কন্দর্পের বয়েস তেরো, তা হ'লে কালীর চেয়ে কন্দর্প চার বছরের ছোট, কন্দর্প যদি কালীর চেয়ে চার বছরের ছোট হয় তা হলে তার মায়ের বিয়ের সময় কালীর বয়েস আট হয় কি করে? নির্মলা রাধারাণীর দৌহিত্রী, লেখক তাকে পৌত্রী বলে বর্ণনা করেছেন (পৃঃ ২৮৮) সুরথ সৌদামিনীর দৌহিত্র তাকেও লেখক পৌত্র বলে অভিহিত করেছেন। (পৃঃ ৩০২)।

লেখকের নিজেরই বর্ণনাগুলি যে কি রকম পরস্পর বিরোধী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণটি এইবার বিচার করে দেখা যাক—১২৮ পাতায় লেখক জানাচ্ছেন যে সুমন্তের মৃত্যুকালে কঙ্কা-রূপার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু হৈমর হয় নি আর ১১৪ পাতায় লেখকই জানাচ্ছেন যে কন্দর্পের বিয়ের খোঁজ চলছে, সুমন্ত জীবিত এবং তাঁর সব ক'টি কন্যাই বিবাহিতা—ছোট মেয়ে হৈমর বিয়েও দু'বছর আগে হয়ে গেছে এবং তার একটি কন্যাও হয়েছে আবার ২১২ পাতায় দেখছি, সমাচার-দর্পণের যুগে (সমাচারদর্পণের প্রতিষ্ঠা ১৮১৮ খৃঃ) হৈমর বয়েস ত্রিশ বছর ছুঁই ছুঁই করছে, ঘটনাটি ১৮১৮ সালেও অর্থাৎ সমাচার দর্পণের প্রতিষ্ঠাকালেও যদি ঘটে থাকে তা হ'লে দেখা যাচ্ছে ১৭৮৮ সালের পর হৈমর জন্ম। পাঠক-পাঠিকাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিই, লেখকের দেওয়া হিসাব অনুসারে সুমন্তের মৃত্যু ১৭৭৪। কন্দর্পের বিয়ের সময় দেখছি সৌদামিনী দু'বছরে মেয়ে, তা হ'লে দেখা যাচ্ছে কন্দর্পের একুশ যুক্ত বারো তেত্রিশ বছর বয়েসে যখন মৃত্যু হয় সৌদামিনীর বয়েস তখন আনুমানিক যোলো-সতেরো, আর এক জায়গায় সেই সময় তাকে আট ন' বছরের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা হলে সে জন্মাচ্ছে আনুমানিক ১৭৭৮ সালে, বিভূতি তার প্রদৌহিত্র—এখন যদি বিভূতির পঞ্চাশ বছর বয়েসও আমরা ধরে নিই তাহ'লে তার জন্ম ১৯১০ পিতামহী-জননীর সঙ্গে দৌহিত্রপুত্রের বয়েসের ব্যবধান এখানে দ্বিগুণ হয়ে যায় নি কি? এই সমস্ত ভুলত্রুটিগুলির দিকে যদি লেখক দৃষ্টি দিতেন তা হ'লে এ গ্রন্থ এক অনবদ্য সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থে পরিণত হোত, সে ধারণা আমরা নিঃসন্দেহে পোষণ করতে পারি। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—সাত টাকা মাত্র।

কেনাকাটা

এ যুগে চিকিৎসার ব্যয়

পারিবারিক বাজেটের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ চিকিৎসার ব্যয়। আগের দিনেও এ ছিল বটে কিন্তু আজকের দিনে এইটি তুলনায় অনেক বেশি। এ যুগে বিশেষ করে আমাদের দেশে এমনি দাঁড়িয়েছে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থার সঙ্গে চিকিৎসা-ব্যয়ও একটা ধরে না রাখলে নয়। অথচ সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা খুবই কঠিন—অনেক ক্ষেত্রেই তা প্রায় ঠিকভাবে হয় না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে সব দেশেই, আমাদের ভারতেও। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চিকিৎসার ব্যয়ও বর্দ্ধিত হয়েছে সেই থেকেই ধাপে ধাপে। এ যুগে চিকিৎসার অর্থ প্রচুর টাকা খরচ, ডাক্তার মানেই সাধ্যাতীত ফি। সীমাবদ্ধ আয় যেখানে, সেখানে বড় রকমের চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ঋণ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কতক্ষণ ঠিক এ ভাবে চলতে পারে, কয় জনের পক্ষে এমনটিও সম্ভবপর, সেই প্রশ্ন।

ভারত এখনও একটি দরিদ্র দেশ, অনগ্রসর জাতি। রোগের সাথে লড়াই দিতে দিতে এখানকার মানুষ আর পেরে উঠছে না। সহরগুলোতে জনসংখ্যার আধিক্যের দরুণ আধি-ব্যাধি আরও বেশি হয়ে চলেছে। অথচ কোন ঔষধই কম দামে মিলে না, ডাক্তার ডাকতে গেলেই চাই বেশ কিছু টাকা। বিশেষজ্ঞদের দেখাতে গেলে টাকার প্রয়োজন আরও বেশি হয়ে দাঁড়ায়—নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের নিকট যার সুযোগ গ্রহণ দুঃস্বপ্ন মাত্র। অস্ত্রোপচারের দরকার হলেও সেই একই বিপদ। হাসপাতালে সকলেই প্রয়োজন হওয়া মাত্র ভর্ত্তি হবার সুবিধা পায় না, বাইরে চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের সুযোগ নেবে, মুষ্টিমেয় লোকেরই সে সাধ্য রয়েছে।

বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই চিকিৎসার ব্যয় পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, এ অবশ্য ঠিক। এক মাত্র রুশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে এ প্রশ্ন হয় তো নেই, থাকলেও ততটা জটিল নয়। অপর দিকে বৃটেন ও আমেরিকায় চিকিৎসার খরচ বেড়ে যাওয়ার সমস্যাটি রয়েছে বিশেষ রকম। এ সকল দেশে স্বল্প আয়বিশিষ্ট পরিবারগুলোর মধ্যে সে জন্য অসন্তোষ রয়েছে—অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা আলোচ্য ব্যয়-ভার বহন করে উঠতে পারছেন না। ডাক্তার ও ঔষধপত্রের বিল পরিশোধ করতে গিয়ে তাঁরাও দিন দিন ঘাবড়ে যাচ্ছেন, এ ধরণের সংবাদও পাওয়া যায়।

চিকিৎসার ব্যয় কি হারে বেড়েছে এ যুগে বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলোতে, তা পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে হতবাক্ হতে হয়। মাস পনের আগেকার কথামাত্র—আটলাণ্টার এক আদালতে কোন মামলায় সাক্ষ্য দেন জনৈক মার্কিন ডাক্তার। তাঁর মুখ থেকে এই কথাই ব্যক্ত হয় পরিষ্কার—চিকিৎসা ব্যবসায়ে নামবার পাঁচ বছর মধ্যেই বার্ষিক আয় তাঁর দাঁড়ায় ৭০ হাজার পাউণ্ড।

নিউ ইয়র্কের ম্যামরভিলের জনৈক চিকিৎসকের একটি বিলে টাকার মোটা অঙ্ক ছিলো বলে বছর তিনেক আগে হৈ-চৈ পড়ে গেছলো। বেঞ্জামিন হোপার (ছোট) নামে ছয় বছরের একটি বালককে কূয়োর ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু এর পরই দেখা গেলো ছেলেটি জোর আক্রান্ত হয়েছে নিউমোনিয়া রোগে। চিকিৎসকদের হাতে তার ভার তুলে দেওয়া হল, বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর সেরে উঠে বেঞ্জামিন। বাপ-মায়ের নিকট বিল প্রেরিত হল—এই একটি চিকিৎসায় ডাক্তার চার্জ্জ করেছেন সোজাসুজি দেড় হাজার পাউণ্ড। মাত্রাতিরিক্ত চার্জ্জ করা হয়েছে, এই ধারণার ওপর সোরগোল ওঠে স্থানীয় এলাকার সর্বত্র। এমনি অবস্থার উদ্ভব হয়, যার দরুণ মেডিক্যাল সোসাইটি পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে তদন্ত আরম্ভ করেন। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেন—নিউমোনিয়ায় যখন বালকটি ভুগছে, সে সময় তাকে দেখতে যেতে হয় বহু বার। এর জন্যে এক শত ঘণ্টার ওপর সময় তিনি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ঘণ্টায় ৩০ পাউণ্ডের কম ফি হতে পারে না। সে দিক থেকে বিলটি তাঁর করতে হতো তিন হাজার পাউণ্ডের। কিন্তু বেঞ্জামিনের বাপ-মায়ের অবস্থা ভাল নয়, এই বিবেচনায় অর্দ্ধেক ফি দাবী করে তিনি বিল পাঠিয়েছেন।

সমসাময়িক কালের চিকাগো সহরতলীতে সংঘটিত একটি চিকিৎসা ব্যাপার। আলোচ্য ক্ষেত্রে পারিবারিক ডাক্তার 'কল' পিছু ১৪ পাউণ্ড বিল করে পাঠিয়ে দেন রোগীর বাবার কাছে। বাবা তো বিলে দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ দেখে আগুন হয়ে যান। বললেন স্পষ্ট—ইহা বিলকুল ডাকাতি ছাড়া কিছু নয়। এই উক্তির কারণ দেখিয়ে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ইচ্ছা করলেই ঘণ্টায় ১৮০ পাউণ্ড কিংবা সপ্তাহে ৭২০০ পাউণ্ড পেতে পারতেন। ডাক্তারের দিক থেকে এইরূপ আয় কিংবা পসার নেহাৎ খারাপ বলা যেতে পারে না, যদিও যে-পরিবারে বিলটি পাঠানো হয়, বিল পরিশোধ করা তাঁদের ছিল সাধ্যাতীত।

শুধু আমেরিকা কেন, আমাদের দেশেও অনেক বাপ-মা বা পরিবার-পরিচালককে এই ধরণের শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—তার কারণ, চিকিৎসার ব্যয় ও ডাক্তারী চার্জ্জ অতিমাত্র বৃদ্ধি পাওয়া। ১৬ টাকা, ৩২ টাকা কিংবা ততোধিক 'কল' চার্জ্জ

[illegible], এমন ডাক্তারের সংখ্যাও আজকাল কম নয়। শুধু এ্যালোপাথরাই নহেন, হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজরাও 'ভিজিট' দাবী করে থাকেন আগেকার তুলনায় যথেষ্ট বেশি। কিছুদিন আগে চিকাগোয় একটি জনসংস্থা চিকিৎসার ব্যয় ব্যাপারে গণমত বা গণবক্তব্য আহ্বান করেছিলেন। অধিকাংশ লোকই জবাবে এই বলতে চেয়েছেন—এ যুগে ডাক্তারের ফি বা ঔষধপত্রের খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অপরাপর জিনিসের তুলনায় আলোচ্য খাতে ব্যয়ের মাত্রা অত্যধিক।

হাসপাতাল বা নার্সিং হোমগুলোতে বেড পেতে হলেও আজকাল খরচের অন্ত নেই। 'ফ্রি বেড' চাইলেই সব সময় পাওয়া যায় না—পাওয়া গেলেও আশানুরূপ যত্ন বা চিকিৎসার জন্যে বেশ কিছু টাকা খরচ দরকার। যক্ষ্মা, ক্যান্সার, মানসিক ব্যাধি—এ সকলের চিকিৎসা-ব্যয় এতই অধিক যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা চালানো অসম্ভব বলা যায়। আমেরিকার মতো অগ্রসর দেশেও হাসপাতালে রোগীর খরচ কিছুমাত্র কম নহে। ইলিনয়েস হাসপাতাল সংগঠনের ডিরেক্টার ডেভিড এম্ ফিনজারের এক উক্তি অনুসারে এই হাসপাতালে গত দশ বছরে প্রত্যহ রোগী-পিছু গড়পড়তা ব্যয় বেড়ে গেছে শতকরা ১০৭ ভাগ। শুধু এইখানেই নয়, অপরাপর মার্কিণ হাসপাতালের হিসাব পর্য্যালোচনার মাধ্যমেও দেখা যায় যে, রোগী-পিছু খরচ শতকরা ১৩২ ভাগ থেকে ১৫০ ভাগ অবধি বর্দ্ধিত হয়েছে এর ভেতর।

কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা পরিকল্পনা মারফত নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মী ও শ্রমিকদের চিকিৎসা বাবদ সাহায্যদানের সরকারী ব্যবস্থা চালু আছে অনেক দেশেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও এই ব্যবস্থা অবশ্য ক্রমেই সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও এই ব্যবস্থা সম্পর্কে বীমাকারীদের মুখে বহু সঙ্গত প্রশ্ন ও অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। মোটের ওপর সাধারণ নাগরিকদের দিকে লক্ষ্য রেখে অল্প ব্যয়ে সুষ্ঠু চিকিৎসা যাতে সম্ভবপর হতে পারে, সেইটি সর্ব্বাগ্রে অত্যাবশ্যক। সরকার ও জননেতাগণ একযোগে মিলে এ বিষয়ে সম্যক চিন্তা-আলোচনা করলে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু করে দিলে তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়।

নতুন কাজ নিতে হলে

সংসারে বেঁচে থাকবার জন্য কাজ করতে হবে, এইটি সহজ কথা। কিন্তু যেটি ঠিক সহজ নয়, সে হচ্ছে কে কোন কাজ করবে এবং চাইলেই সেটি মিলছে কি না। অন্যত্র যেমনই হোক, অন্ততঃ এদেশে এখনও এই প্রশ্নটি উঠতে পারে বহু ক্ষেত্রে।

যে কাজ করতে হবে, মন যদি তাতে না বসে অর্থাৎ করণীয় কাজটি যদি পছন্দসই না হলো, তবেই মুস্কিল। চাকরিতে ঢুকবার আগেই সেজন্যে ভালরকম ভেবে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ বা চাকরি খুঁজে যেখানে পাওয়া গেলো, সেখানেই সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায় শান্তি।

একথা আবারও বলতে হয়, এদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় মনের মতো কাজ খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার। সবক্ষেত্রেই যোগ্যতার মাপকাঠিতে চাকরি নির্দ্ধারিত হয় না। কাজ বা চাকরি রদবদলের তাগিদ সেই কারণেই দেখা দেয়, প্রশ্ন সেই থেকেই উঠে। যোগ্যতা কিংবা কাজের দায়িত্ব অনুপাতে মাস মাইনা না পেলেও গোলমাল। এই থেকেও অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্মীর মনে চাকরি পরিবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুলতা আসতে পারে।

একটি কাজ ছেড়ে আর একটি কাজ নিতে হলে কতটা হুঁসিয়ার হতে হবে, এক্ষণে সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাক্। প্রথমেই দেখতে হবে, নতুন যে কাজ বা চাকরি করতে যাওয়া হবে, সেইটির নিশ্চয়তা বা স্থায়িত্ব আছে কি না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও দেখা প্রয়োজন যে, কাজটিতে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা কি পরিমাণ পাওয়ার আশা আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কাজ বা চাকরি যদি পাল্টাতেই হয় অর্থাৎ নতুন কোন কাজ নিতে হলে কর্ম্মজীবনের সূচনাতেই সেইটি খুঁজে পেতে পাওয়া চাই। ঝুঁকি যা লওয়ার প্রয়োজন হবে, দেহ-মনের শক্তি ও সামর্থ্য অটুট থাকতে থাকতেই সে লওয়া বাঞ্ছনীয়।

আগে থেকে মনোমত কাজ না পাওয়ায় কত লোককে আজীবন দুঃখ বা আফশোস করতে দেখা যায়। সেজন্যই বলতে হয়, যেইমাত্র মনে হবে, যে-কাজ বা চাকুরিতে যাওয়া হলো, সেটি ভাল লাগছে না (কারণ যাই হোক), যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটি ছেড়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। একবার বাঁধন শক্ত হয়ে পড়লে অমনি ছুটে যাওয়া সহজ হয় না—পছন্দসই নতুন উদ্যমের ঝুঁকি নেওয়ার প্রবৃত্তি ক্রমেই হ্রাস পাবার আশঙ্কা থাকে। কর্ম্মসংস্থানে অভাব যেখানে নেই, সেই সমাজে কাজ রদবদলের জন্য এতটা ব্যস্ত না হলেও চলে, এ ঠিক। কিন্তু ভারতীয় সমাজে যেখানে বেকারী এখনও বেশ বিকটরূপে বিদ্যমান, সেখানে নতুন লাইন ধরতে হলে তৎপরতা চাই বেশিরকম। হতাশা নিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকলে প্রত্যাশিত কাজ আপনি এসে জুটবে, এমনটি নিশ্চয়ই হওয়ার নয়।

স্বস্তিকার পুনরাবির্ভাব—

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা-যুদ্ধের তীব্রতা যখন হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, পশ্চিমী-শক্তি শিবিরের সহিত কম্যুনিষ্ট শক্তি-শিবিরের একটা বুঝাপড়া হওয়ার দেখা দিয়াছে বিপুল সম্ভাবনা, সেই সময় শুধু পশ্চিম জার্ম্মানীতেই নয়, নিউ ইয়র্ক হইতে মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন সহরে স্বস্তিকার পুনরাবির্ভাবের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য উপেক্ষার বিষয় নয়। পশ্চিমী শক্তি শিবিরের চারিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ১৯শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর (১৯৫৯) পর্য্যন্ত এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া রাশিয়ার সহিত শীর্ষসম্মেলনে সমবেত হওয়া সম্পর্কে একমত হওয়ার পরই স্বস্তিকার পুনরাবির্ভাব কি সূচনা করিতেছে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। উল্লিখিত চারিটি পশ্চিমী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন ২১শে ডিসেম্বর শেষ হয়। উহারই তিন দিন পরে বড়দিনের প্রাক্কালে ২৫শে ডিসেম্বরের প্রারম্ভে অর্থাৎ ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রি পার হওয়ার পর পশ্চিম জার্ম্মাণীর একটি ক্ষুদ্র সহর কোলনে ইহুদীদের উপাসনা মন্দির সিনাগগের দেওয়ালে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত এবং 'হেইল হিটলার' ও 'ইহুদীরা দূর হও', এই শ্লোগান লিখিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সহরেই ফ্যাসীবাদের অত্যাচারে নিহত সাতজনের একটি স্মৃতিস্তম্ভের ফলক কাল বার্নিশদ্বারা অবলিপ্ত করা হয়। ঐ স্মৃতিফলকে লিখিত আছে, "Here rest seven victims of the Gestapo." অর্থাৎ "এখানে গেষ্টাপো কর্ত্তৃক নিহত সাত ব্যক্তি অনন্ত শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছে।" গেষ্টাপো অর্থাৎ (Geheime staats Polizei) জার্ম্মাণীর গুপ্ত পুলিশের অত্যাচার কাহিনী এখনও লোকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। কাজেই সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। উল্লিখিত দুষ্কর্ম্মের জন্ম দায়ী দুইজন তরুণ দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেফ্তার করিতে পুলিশের পনর ঘণ্টার অধিক সময় লাগে নাই। তাহাদের বয়স ২৫ বৎসর এবং নয়া ফ্যাসিষ্ট ডুৎসে রাইস পার্টির (Deutsche Reichspartei) তাহারা সদস্য। ইহা হইতেই স্বস্তিকার পুনরাবির্ভাব এবং ইহুদী-বিরোধী ধ্বনির উৎস কোথায় তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

প্রাক্তন ষ্টরম ট্রুপস এর (Storm troops) জন কতক নায়ক দ্বারা ডুৎসে রাইসপার্টি (D R P) পরিচালিত হইতেছে। উহাদের ধ্বনি বা শ্লোগান হিটলারের পার্টির অনুরূপ। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে এই পার্টি গঠিত ও পরিচালিত হওয়াই শুধু সম্ভব হয় নাই, বিগত প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে এই নয়াফ্যাসিষ্ট পার্টির একজন সদস্য রাইনল্যাণ্ড Pfalzএর পার্লামেন্টেও একটি আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত নির্ব্বাচনের সময় প্রাক্তন এস এস নায়ক কর্ণেল রুডেল তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বেচ্ছায় পশ্চিম জার্ম্মাণী পরিত্যাগ করিয়া আর্জেণ্টিনায় বাস করিতেছেন। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে যে শুধু এই নয়া ফ্যাসিষ্ট পার্টি গঠিত ও পরিচালিত হইতেছে তাহা নয়, ডাঃ এডেনুয়েরের মন্ত্রিসভাতেও দুইজন প্রাক্তন নাৎসী আছেন। পশ্চিম জার্ম্মাণীর বিচার ও শাসন বিভাগে এখনও নাৎসীদলের বহু সদস্য কাজ করিতেছেন। পশ্চিম জার্ম্মাণীর বিচারালয়গুলিতে এখনও এক হাজার নাৎসী বিচারপতি এবং পাবলিক প্রসিকিউটর আছেন। বিগত দশকে পশ্চিম জার্ম্মাণীর

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

স্কুলগুলিতে যে ইতিহাস পড়ান হইয়াছে তাহার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই ইতিহাস ১৯৪৯ সালে হিটলারের শাসনকালের বিবরণ ছিল ৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী। এই ৪১ পৃষ্ঠার মধ্যে তিন পৃষ্ঠাব্যাপী ইহুদী নির্যাতনের এবং দুই পৃষ্ঠাব্যাপী ধর্ম্মমত দমনের বিবরণ ছিল। রাইসের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সাড়ে পনর পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ ছিল। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এবং হিটলার বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে একটি কথাও ছিল না। বর্ত্তমানে অবশ্য হিটলারের শাসনকালীন বিবরণ ১৮ হইতে ১৯ লাইনের মধ্যেই শেষ করা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকখানি যে পশ্চিম জার্ম্মাণীর তরুণদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

পশ্চিম জার্ম্মাণীর কোলন সহরে স্বস্তিকা চিহ্নের, নাৎসী 'হেইল হিটলার' ধ্বনি এবং ইহুদী বিরুধী ধ্বনির যে প্রথম আবির্ভাব হয় তাহা সূচনা মাত্র। অতঃপর পশ্চিম জার্ম্মাণীর বিভিন্ন অংশ তো বটেই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহরে উহার আবির্ভাব হয়। সিনাগগে, ইহুদীদের বাড়ীতে, দোকানে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কনের কাজই শুধু চলিতে আরম্ভ করে নাই, ঢিল ছোঁড়া প্রভৃতি উৎপাতও আরম্ভ হয়। এখানে সে সকল বিবরণ সংক্ষেপেও উল্লেখ করিবার স্থান আমরা পাইব না। শুধু এইটুকু উল্লেখ করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, পশ্চিম জার্মাণীর বিভিন্ন স্থান ছাড়াও ভিয়েনায়, মিলানে, মেলবোর্ণে, নিউইয়র্কে ও লণ্ডনে সিনাগগ, ইহুদীদের বাড়ীও প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে স্বস্তিকা চিহ্ন অঙ্কিত এবং ইহুদীবিরোধী ধ্বনি লিখিত হইয়াছে। এক সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নাৎসী চিহ্ন ও ধ্বনির পুনরাবির্ভাব হইতে ইহা অনুমান করা কঠিন নয় যে, নাৎসীবাদের পুনরভ্যুত্থানের জন্ম একটি আন্তর্জ্জাতিক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। উহার গঠনের ইতিহাস অবশ্য এখনও কিছু জানা যায় না। কিন্তু বৃটেনে বর্ণবিদ্বেষজনিত হাঙ্গামা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিগ্রোছাত্রকে শ্বেতকায়দের স্কুলে ভর্ত্তি করার ব্যাপারে হাঙ্গামা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্ণবিদ্বেষের নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই নাৎসীবাদের এই নবজীবন লাভের ঘটনা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। শুধু ইহুদীদের বিরুদ্ধেই নয়, অশ্বেতকায় লোকদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার মূল কোথায়, তাহা নির্ভুল ভাবে জানা

যাইবে কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু পশ্চিম জার্ম্মাণীর গবর্ণমেণ্ট মুখে নাৎসীবাদের যতই নিন্দা করুন না কেন, পশ্চিম জার্ম্মাণী হইতে নাৎসীবাদ নির্ম্মূল করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত কিছুই করেন নাই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এমন কথাও শোনা যায়, নাৎসীরা ব্যাপক ভাবে যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেছে। এই গঠনকার্য্য কত দিন ধরিয়া এবং কোন দেশে কি ভাবে চলিতেছে তাহা অনুমানের বিষয় নয়। প্রথম মহা যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিতে হিটলারের পনর বৎসর লাগিয়াছিল। হিটলারের পতনের পনর বৎসর পর আবার নাৎসীবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, গত ১৫ বৎসর ধরিয়াই নয়া নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের জন্য গঠনকার্য্য চলিয়া আসিতেছিল।

কোলনে স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত করা এবং ইহুদী-বিরোধী শ্লোগান লিখিবার অপরাধে যে দুই জন তরুণ ধরা পড়িয়াছে তাহারা যে রাইস পার্টির সদস্য সে কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত পার্টির চেয়ারম্যান হের মিনবের্গ (Herr Meinberg) বলিয়াছেন যে, বিশ্ববাসীর সম্মুখে পশ্চিম জার্ম্মানীকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব-জার্ম্মানী ও অন্যান্য দেশ হইতে কম্যুনিষ্টরা এজেণ্ট প্রোভোকেটর পাঠাইয়া এই দুষ্কর্ম করাইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে তাঁহার এই অভিযোগ শুধু হাস্যকরই নয়, গোড়া কম্যুনিষ্ট বিরোধীরাও উহা বিশ্বাস করিবেন না। উক্ত দুই জন তরুণকে রাইশ পার্টি হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। রাইশ পার্টির পক্ষে উহা ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না। শুধু পশ্চিম জার্ম্মানীই নয়, সমস্ত বিশ্ববাসীই স্বস্তিকার এবং নাৎসী ধ্বনি ও ইহুদী বিরোধী ধ্বনির পুনরাবির্ভাবে যদি বিচলিত হইয়া উঠে তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। নাৎসীবাদের অন্যতম একটি প্রধান ভিত্তি ইহুদী-বিদ্বেষ। নাৎসীরা জার্ম্মানীতে ক্ষমতা দখলের পর যে ইহুদী নিধন যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতেও বিশ্ববাসীর দেহ মন এখনও শিহরিয়া উঠে। গত দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের সময় ৬০ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হইয়াছে। সমগ্র জার্ম্মানীতে এখন মাত্র ২৮ হাজার ইহুদী বাস করিতেছে। ১৯৩৩ সালের পূর্ব্বে কোলনে ইহুদীর সংখ্যা ছিল ২০ হাজার। এখন সেখানে ইহুদীর সংখ্যা ১২ শত মাত্র। ১৯৪৫ সালে তৃতীয় রাইশের পতনের পর নাৎসীবাদ ধ্বংস হইয়াছিল বলিয়া যে ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহুদী-বিদ্বেষ এবং বর্ণ-বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। জাতি বিদ্বেষ নিরোধের জন্য জন্য একটি বিল ১৯৫৯ সালের মার্চ্চ মাস পশ্চিম জার্ম্মানীর পার্লামেণ্ট উত্থাপন করা হয়। গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৫৯) এই বিল সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং বিলটি প্রকৃতপক্ষে স্থগিত রাখা হয়। নাৎসীবাদের পুনরাবির্ভাবের পর পশ্চিম জার্ম্মানীর গভর্ণমেণ্ট বিলটি তাড়াতাড়ি পাশ করিবার জন্য পার্লামেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

নাৎসীবাদের পুনরাবির্ভাবে পশ্চিম জার্ম্মানীর সরকার বিশেষ করিয়া ডাঃ এডেনুয়র যে বিব্রত বোধ করিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিম জার্ম্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনুয়র প্রথমে পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর উপরেই দোষ চাপাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাৎসীবাদের পুনরায় অভ্যুত্থানের যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সেগুলি পশ্চিম জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে পূর্ব্বজার্ম্মাণীর প্রচার কার্য্য এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না, সে কথা তিনিও ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন। তাছাড়া পশ্চিম জার্ম্মানীর বন্ধুবর্গের মনে জার্ম্মাণ বিরোধী একটা ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা ডাঃ এডেনুয়রও যে বুঝিতে পারেন নাই তাহা নয়। নাৎসীবাদের পুনরাবির্ভাবে তাঁহাদের মনে যে গভীর আশঙ্কা সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমজার্ম্মানীর সমর্থক মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও উহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীরা যে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী ডাঃ এডেনুয়রকে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কম্যুনিষ্ট বিরোধিতাকে অবলম্বন করিয়াই হিটলার এবং নাৎসীবাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কম্যুনিজম নিরোধের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাৎসীবাদের পুনরাবির্ভাবকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। পরমাণু বোমা বিশ্ববাসীর সম্মুখে সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংসের আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু নাৎসীবাদকে পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা অপেক্ষাও লোকে বেশী ভয় করে।

ভারতে ভরোশিলভ—

গত ডিসেম্বর মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত দর্শনের পর বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসে (১৯৬০) সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল ভরোশিলভ ভারতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল আসিয়াছেন। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে তিনজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই তিন জনের মধ্যে মঃ এফ আর কোজলভ রুশ মন্ত্রিপরিষদের প্রথম ভাইস্ চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সোভিয়েটের ডেপুটি মাদাম ই এ ফুর্ৎসেভা, এবং মঃ কুজেনেটসভ রাশিয়ার প্রথম সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী। মঃ কোজলভ এবং মঃ কুজেনেটসভ রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই দুইজনের কে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী তাহা একটা গবেষণার বিষয় হইতে পারে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং রুশ প্রেসিডেণ্ট মঃ ভরোশিলভ উভয়েই পূর্ব্ব জীবনে সৈনিক ছিলেন। মঃ ভরোশিলভ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এক রেল শ্রমিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলে যোগ দেন এবং বলশেভিক সমর্থক হিসাবে উহার কাছে যোগ দেন। তাঁহার বিপ্লবী কার্য্যকলাপের জন্য জারের গবর্ণমেণ্ট কয়েকবার তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু তিনি বার বারই পলায়ন করিতে সমর্থ হন। ১৯১৫ সালে তিনি শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে কাজ করিতে থাকেন। তিনিই ইজমাইলোভস্কি সেনাবাহিনীকে বিপ্লবের পথে আনে। ১৯১৯ সালের জুন মাসে তিনি চতুর্দ্দশ স্থল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা সচিব ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের সময় তিনি সোভিয়েট সেনাবাহিনীর নেতৃস্থানীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের ভাইস

চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। কম্যুনিষ্ট পার্টির ১৯তম কংগ্রেসের পর মঃ ভরোশিলভ রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে রাশিয়ার সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের সভাপতি মণ্ডলীর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট এবং মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। মার্কিন-শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে প্রেসিডেণ্ট সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী যদিও এই ক্ষমতা মার্কিণ কংগ্রেসের ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাশিয়ার শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রুশপ্রেসিডেণ্টের পদ মর্য্যাদাসর্ব্বস্ব। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত দর্শনের যে রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল রুশপ্রেসিডেণ্ট ভরোশিলভের ভারত ভ্রমণের সেরূপ কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই। হয়ত ইহার অনুষ্ঠানিক গুরুত্বই বেশী। তথাপি তাঁহার এই ভ্রমণের রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছুই নাই তাহা বলা যায় না। তাঁহার সহিত আগত প্রতিনিধি দলের মধ্যে যে তিন জনের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের উপস্থিতি মঃ ভরোশিলভের ভারত-ভ্রমণকে রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। রুশ প্রেসিডেণ্ট মঃ ভরোশিলভ ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ভারতে আসিয়াছেন। মঃ কোজলভ এবং মাদাম ফুর্‌সেভা আসিয়াছেন ভারত সরকার কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া। রাশিয়ার সহিত ভারতের মৈত্রী সম্পর্কে যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে মঃ ভরোশিলভের ভারত ভ্রমণ তাহার অন্যতম প্রধান নিদর্শন।

রুশ প্রেসিডেণ্ট মঃ ভরোশিলভ গত ২০শে জানুয়ারী (১৯৬০) সদলবলে দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি ১৬ দিন ধরিয়া ভারত ভ্রমণ করিবেন। তাঁহার ভারত ভ্রমণ শেষ হওয়ার পরেই রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে ভারতে আসিবেন। মঃ ভরোশিলভের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইতে মঃ ক্রুশেভের ভারতের আগমনের উদ্দেশ্য যে স্বতন্ত্র, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। রাশিয়ার সাহায্যে যে সকল পরিকল্পনা ভারতে কার্য্যকরী করা হইতেছে রুশ প্রেসিডেণ্ট সেগুলি পরিদর্শন করিবেন এবং রাশিয়ার সাহায্যে আরও পরিকল্পনা ভারতে কার্য্যকরী করা যায় কি না তাহার সম্ভাবনা সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইবে। এই দিক দিয়াও তাঁহার ভ্রমণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য।

রুশ প্রধান মন্ত্রীর পুনরায় ভারত দর্শন—

রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভকে ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে ভারতে অবতরণ করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে যে আমন্ত্রণ লিপি প্রদান করা হইয়াছে তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। গত ৬ই জানুয়ারী মস্কোতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতে যাওয়ার জন্য তিনি যে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন, তাহা তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। তাঁহাকে এই আমন্ত্রণ জানাইবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই শোনা যাইতে ছিল যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলোচনার জন্য মঃ ক্রুশেভ ভারতে আসিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণের জন্য যদি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে না। ইতিপূর্ব্বে তিনি ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনের জন্য প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী মিঃ সোয়েকর্ণের নিকট হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন এবং এই আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে তিনি শুধু ভারতেই আসিবেন না, আফগানিস্থান ও ব্রহ্মদেশেও অবতরণ করিবেন। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি এই ভ্রমণে বাহির হইবেন। এক সংবাদে প্রকাশ ১১ই ফেব্রুয়ারী তিনি নয়া দিল্লীতে পৌঁছিবেন। অন্ততঃ চারিদিন তিনি দিল্লীতে অবস্থান করিবেন বলিয়া প্রকাশ। ফেব্রুয়ারী মাসের পরে তিনি ফ্রান্স ভ্রমণে যাইবেন।

রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশেভের এই ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ এবং ভারতে আগমনের যে বিশেষ তাৎপর্য্য রহিয়াছে একথা অস্বীকার করা যায় না। বর্ত্তমানের চীনের সহিত ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মৈত্রীসম্পর্ক যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সীমান্ত লইয়া চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যেও একটা মন কষাকষি চলিতেছে। চীন কর্ত্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন লইয়া যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। এখন সে সম্পর্কে নূতন করিয়া আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। ইন্দোনেশিয়ার সহিত চীনের মৈত্রী যে কারণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে সে সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইন্দোনেশিয়ায় যে সকল চীনা বাস করিতেছে তাহাদের লইয়াই চীন-ইন্দোনেশিয়া মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ২০ লক্ষ চীনা বাস করিতেছে। ইন্দোনেশিয়ার পাইকারী ও খুচরো ব্যবসা এবং আমদানী রপ্তানীর অধিকাংশই চীনাদের হাতে। ১৯৫৯ সালে প্রেসিডেণ্টের ১০নং নির্দ্দেশ দ্বারা বিদেশীদিগকে পল্লী অঞ্চলে খুচরা এবং ছোটখাটো ব্যবসা করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হইয়াছে গত ১লা জানুয়ারী (১৯৬০) হইতে। ইহার ফলে পল্লী অঞ্চলে যে সকল চীনা খুচরা ও ছোটখাটো ব্যবসা পরিচালন করে তাহারা জীবিকাহীন হওয়ার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রায় তিন লক্ষ চীনাকে তাহাদের জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইতে হইতেছে এবং কতকগুলি নির্দ্ধারিত সহরে আসিয়া তাহাদিগকে বাস করিতে হইবে। অন্য সময় হইলে এই নির্দ্দেশ যে সমস্ত এশিয়াবাসীরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার চীনারা জীবিকাহীন হইলে চীন সরকার যদি ক্ষুব্ধ হন তাহা হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। ভারতবাসী আমরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং সিংহলে ভারতীয় বংশোদ্ভবদের সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করা হইতেছে তাহার জন্য কম ক্ষুব্ধ হই নাই। চীন-ভারত এবং চীন-ইন্দোনেশিয়া বিরোধের দিক হইতে মঃ ক্রুশেভের ভারত ও ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, ইহা মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। তাঁহার এই ভ্রমণ হইতে তিনি চীনের নীতির বিরোধী কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি হয়ত এই বিরোধ মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতাও করিবেন না। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ আন্তর্জ্জাতিক সকল বিরোধ মীমাংসার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার এই সফরের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

১৯৫৫ সালের শেষ ভাগে মঃ ক্রুশেভ আর একবার ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তখন ছিলেন রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল। মঃ বুলগানিন ছিলেন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী।

মঃ ক্রুশেভ এবং মঃ বুলগানিন উভয়ে এক সঙ্গে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যে অভূতপূর্ব্ব সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন তাহার স্মৃতি ভারতবাসীর মন হইতে এখনও মুছিয়া যায় নাই। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ভারত ভ্রমণের পর তিনি ভারতে আসিতেছেন বলিয়া পশ্চিমী শান্তি বিরোধী নীতি লইয়া তিনি ভারতে আসিতেছেন, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। এশিয়ায় শান্তি পূর্ণ সহাবস্থান নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। বান্দুং সম্মেলনের পর এই নীতি ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়াই উঠিতেছিল এবং পাশ্চমী শাক্তবর্গের কাছে উহা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চীন-ভারত এবং চীন-ইন্দোনেশিয়া মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এশিয়ায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মঃ ক্রুশেভ ইউরোপে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলি যাহাতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে তাহার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এশিয়াতেও ঐ নীতিকে তিনি দৃঢ় করিতে চাহিবেন, ইহাও স্বাভাবিক। তাঁহার ভারত ও ইন্দোনেশিয়া সফর যদি এশিয়ায় সহাবস্থান নীতিকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে ইউরোপেও সহাবস্থান নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা—

গত ১৪ই জানুয়ারী (১৯৬০) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ সুপ্রীম সোভিয়েটে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট সশস্ত্র বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১২ লক্ষ সৈন্য হ্রাস করা হইবে। এই হ্রাসের পর রুশ বাহিনীতে থাকিবে ২৪ লক্ষ ২৩ হাজার সৈন্য। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৯) মার্কিন দেশরক্ষা দপ্তর হইতে যে ঘোষণা করা হয় তাহাতে প্রকাশ, গত অক্টোবর মাসে মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৩৪ জন। অবশ্য কোন্ রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীতে সশস্ত্র সৈন্যের সংখ্যা কত তাহা নির্ভুল ভাবে জানিবার উপায় নাই। সে কথা সকল রাষ্ট্রই সযত্নে গোপনই রাখিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে রাশিয়ার সৈন্য সংখ্যা কত তাহা মঃ ক্রুশেভের ঘোষণা হইতে জানা যাইতেছে এবং আরও বুঝা যাইতেছে যে, রুশ সশস্ত্র বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হইলে যে সৈন্য থাকিবে তাহা মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা হইতে সামান্য কম। ১৯৫৭ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয় দেশই সৈন্য সংখ্যা ২৫ লক্ষের মধ্যে রাখার নীতি মানিয়া লইয়াছিল। বৃটেনও সৈন্য সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষের মধ্যে রাখিতে সম্মত হইয়াছিল। বৃটেনের সৈন্য সংখ্যা ১৯৫৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ছিল ৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৩ শত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কোন চুক্তি না হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎরাষ্ট্রবর্গ স্বেচ্ছায় সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতেছেন। ইহাতে আশ্বস্ত হওয়ার কারণ আছে কি না তাহা বলা কঠিন। বরং মনে এইরূপ আশঙ্কা জাগিতে পারে যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ বর্ত্তমানে সশস্ত্র বাহিনী অপেক্ষা পরমাণু অস্ত্রের উপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতে চাহিতেছেন। সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের সঙ্গে পরমাণু অস্ত্র নিরোধের জন্য যদি কোন চুক্তি না হয় তাহা হইলে পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংসের আশঙ্কা দূর হইবে না।

পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে কোন চুক্তি হওয়া এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। রাশিয়া একক ভাবে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করে। কিন্তু তাহার কিছু পরেই তিনটি বৃহৎ শক্তিই পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য জেনেভায় আলোচনা সাপক্ষে ১৯৫৮ সালের ৩১শে অক্টোবর হইতে পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়। গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৫৯) পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা স্থগিত রাখার মেয়াদ শেষ হইয়াছে। উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কথাবার্ত্তা আর হয় নাই। সুপ্রীম সোভিয়েটে মঃ ক্রুশেভ বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় পরমাণু বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ এখনও চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, আণবিক যুদ্ধ বাধিলে সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা পশ্চিমী দেশসমূহই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মঃ ক্রুশেভ অবশ্য ইহাও জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ যদি পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করে তাহা হইলে রাশিয়াও আর পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করিবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ঘোষণা করিয়াছে যে, পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা করা হইলে পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে জানাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ফ্রান্স সাহারায় আণবিক পরীক্ষা করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অবশ্য উহা সমর্থন করে নাই। কিন্তু ফ্রান্স সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই অভিমত গ্রাহ্য করিবে কিনা সন্দেহ। গত ১৮ই জানুয়ারী (১৯৬০) মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিণ কংগ্রেসে ১৯৬১ সালের আর্থিক বৎসরের জন্য যে বাজেট প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে মোট ব্যয় ৭৯৮০ কোটি ডলার বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই বরাদ্দের শতকরা ৫৭ ভাগই নিরাপত্তা খাতে ব্যয় বরাদ্দ। বস্তুতঃ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ১৯৫৯-৬০ সালের ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী ধরা হইয়াছে। বাজেটে দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকারী তিনটি সাবমেরিণ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা আছে। সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা 'তাসে'র এক সংবাদে প্রকাশ যে, রাশিয়া গত ২০শে জানুয়ারী (১৯৬০) প্রশান্ত মহাসাগরের আকাশপথে পরীক্ষামূলকভাবে একটি রকেট উৎক্ষেপণ করিয়াছে।

পরমাণু অস্ত্র সম্পর্কে গত বৎসর জেনেভায় যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। এই আলোচনার ফল কি হইবে তাহা অবশ্য অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে একমাত্র আশার আলোক দেখা যাইতেছে এই যে, আগামী শীর্ষ সম্মেলনে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। এই সম্মেলনেই যে মীমাংসা সম্ভব হইবে সে সম্বন্ধেও আশা করা কঠিন। তবে শীর্ষ সম্মেলন শুধু একটাই হইবে না, একাধিক হইবে। উহা ঠাণ্ডাযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসে সহায় হইবে, ইহাই একমাত্র ভরসার কথা।

ফরাসী ক্যামেরুন্সের স্বাধীনতা লাভ—

আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসী ক্যামেরুন্স স্বাধীনতা লাভ করায় আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা আর একটি বৃদ্ধি পাইল। এই দেশটির স্বাধীনতা লাভে ভারত যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে চারিশক্তি কমিশন ফরাসী ক্যামেরুন্সের স্বাধীনতা লাভের তারিখটি ধার্য্য করে তাহাদের মধ্যে ভারত অন্যতম।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত ক্যামেরুন্স ছিল জার্মাণীর প্রটেকটরেট দেশ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ এবং ফ্রান্স এই দেশটি দখল করে এবং ভাগভাগি করিয়া লয়। ইহা ১৯১৬ সনের কথা। উহার বৃহৎ অংশই অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ভাগের চারি ভাগই পড়ে ফ্রান্সের ভাগে। ভার্সাই সন্ধিতে ফ্রান্স এই অংশটির ম্যাণ্ডেট লাভ করে। ১৯৪৬ সালে উহা ফ্রান্সের অধীনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ট্রাষ্টিশিপ কমিটির আওতায় আসে। ১৯৫৯ সালের প্রথম ভাগে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ক্যামেরুন্স সম্পর্কে একটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং তাহাতে দুইটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথমতঃ ইহা সিদ্ধান্ত করা হয় যে, ফরাশী ক্যামেরুন্স ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী স্বাধীনতা লাভ করিবে এবং দ্বিতীয়তঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আওতায় বৃটিশ ক্যামেরুন্সে গণভোট গ্রহণ করা হইবে। বৃটিশের অভিপ্রায় ছিল নাইজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলে বৃটিশ ক্যামেরুন্স উহার সহিত যুক্ত করা হইবে। ফরাসী ক্যামেরুন্স স্বাধীনতা লাভ করিলে উহা ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, ইহাই ছিল ফ্রান্সের মতলব। গত নবেম্বর মাসে (১৯৫৯) উত্তর ক্যামেরুন্সে যে গণভোট গ্রহণ করা হয় তাহাতে স্থির হয়, আগামী অক্টোবর মাসে উহা নাইজেরিয়ার সহিত যুক্ত হইবে না। উত্তর ক্যামেরুন্সের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের জন্য আবার গণভোট গ্রহণ করা হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আগামী অক্টোবর মাসে নাইজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

ফরাসী ক্যামেরুন্সের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে এই দেশে যে হাঙ্গামা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য। এই হাঙ্গামার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ফরাসী ক্যামেরুন্স স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু যে ইউনিয়ন অব পিপল্‌স অব আফ্রিকা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করিয়া ছিল ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে আসে নাই। ক্ষমতা আসিয়াছে রক্ষণশীল বুর্জ্জোয়াদের হাতে। ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘানার রাজধানী আক্রায় যে সর্ব্ব আফ্রিকা সম্মেলন হয় তাহাতে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ক্যামেরুন্স হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ করিয়া, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া এবং ইউনিয়ন অব দি পিপল্‌স অব আফ্রিকা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া স্বাভবিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং ক্যামেরুন্সকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রস্তাব অনুসারে যদি কাজ করা হইত তাহা হইলে ফরাসী ক্যামেরুন্সের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে হাঙ্গামা সৃষ্টি হইবার কোন কারণ থাকিত না।

সদ্যমুক্ত ফরাসী ক্যামেরুন্সে আগামী মার্চ্চ মাসে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্ব্বাচনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। কাজেই এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য জাতীয় নেতাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। এ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। ক্যামেরুন্সের দুইটি অংশকে পৃথক রাখার একটা চক্রান্ত চলিতেছে বলিয়া আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। জার্ম্মাণী, কোরিয়া এবং ভিয়েটনামকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে-সময়ে চেষ্টা চলিতেছে সেই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ক্যামেরুন্সকে ঐক্যবদ্ধ হইবার সুযোগ দেওয়া আবশ্যক।

আলজেরিয়া সমস্যা ঃ—

আলজেরিয়ার সমস্যা ক্রমশঃ যে আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে উহার পরিণতি কোথায় তাহা বলা কঠিন। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল দ্য গল আলজেরিয়া সম্পর্কে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে কি আলজেরিয়ার অধিবাসীরা কি আলজিরিয়াস্থিত ফরাসীরা কোন পক্ষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। তাঁহারা আলজেরিয়া সম্পর্কে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির সমালোচনা করায় দ্যগল জেনারেল জাক মাস্যুকে গত ২২শে জানুয়ারী পদচ্যুত করেন। জেনারেল মাস্যু ছিলেন আলজেরিয়াস্থিত সৈন্যবাহিনীর অস্থায়ী অধিনায়ক। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৮ সালের যে বিক্ষোভের ফলে জে: দ্যগল ক্ষমতা লাভ করেন জে: মাস্যু ছিলেন তাহার অন্যতম পরিচালক। জে: মাস্যুকে পদচ্যুত করার অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ায় আলজেরিয়া প্রবাসী ফরাসীরা ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং আলজিয়ার্সে অবরোধ অবস্থা ঘোষণা করা হয়। আলজিয়ার্সে যে হাঙ্গামা চলিতেছে তাহাতে দ্যগলের ভবিষ্যৎ কি তাহা বলা কঠিন। ফরাসী মন্ত্রিসভায়ও আলজেরিয়া সমস্যা লইয়া মতভেদ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

আলজেরিয়া সঙ্কট সমাধানের জন্য প্রেসিডেণ্ট দ্যগল চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মঃ মাইকেল দেব্রে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনে অনিচ্ছুক। প্রেঃ দ্যগলের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত তাঁহারা মনে করেন দ্যগলের পদচ্যুত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তিন বৎসরের জন্য তাঁহাকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দিবার জন্য তিনি হয়ত ফরাসী জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইবেন। আলজেরিয়ায় বর্ত্তমানে কি অবস্থা চলিতেছে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। আলজেরিয়াস্থিত ফরাসীরা যেমন বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে তেমনি একটা পাল্টা বিক্ষোভও প্রদর্শন করা হইতেছে। প্রায় ১২ হাজার মুসলমান এই পাল্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তরুণ ইয়োরোপীয় অধিবাসীরা সাধারণ ধর্ম্মঘটে সাড়া দিয়া মুসলমান দোকানগুলি বন্ধ রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান দোকানদাররা তাহা অমান্য করায় তাহাদের দোকানের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের আলজেরিয়া

যাওয়ার কথা আছে। এই অবস্থায় তিনি যাইবেন কিনা তাহা কিছুই জানা যায় না।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর আফ্রিকা সফর—

গত ৬ই জানুয়ারী (১৯৬০) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান এক মাসব্যাপী আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। এক মাসে তিনি আফ্রিকার বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত আফ্রিকার দেশগুলি পরিভ্রমণ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় আফ্রিকা ভ্রমণে বাহির হন নাই। ইহা হইতে এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, আফ্রিকায় বৃটিশের অধীন দেশগুলির সমস্যার উপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। লণ্ডন বিমানঘাঁটি ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে মিঃ ম্যাকমিলান বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই ভ্রমণ আফ্রিকার সমস্যাগুলির পটভূমিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। আফ্রিকায় বৃটিশের অধীন দেশগুলি সম্পর্কে বৃটিশ সরকার একটা নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মিঃ ম্যাকমিলানের এই ভ্রমণে এই নীতি সার্থকভাবে রূপায়িত করিতে কতখানি সাহায্য করিবে সে কথা বলা কঠিন। একথা সত্য যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ সুরু হওয়ার পর আফ্রিকার কয়েকটি পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বৃটিশের অধীনস্থ গোল্ডকোষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিয়া ঘানা নাম গ্রহণ করিয়াছে। নাইজেরিয়াও আগামী ১লা অক্টোবর স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু 'ডার্ক আফ্রিকা' বা কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার বিভিন্ন পরাধীন দেশের সমস্যা ঘানা বা নাইজেরিয়ার মত অত সহজ নয়। ইউরোপের যে সকল শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলিতে বাস করিতেছেন এবং সমস্ত রকম ক্ষমতা এবং সুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহারাই এই সকল দেশের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত বৃটিশের অধীন মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশন এবং কেনিয়া। ফ্রান্সের অধীন আলজেরিয়াও এইরূপ সমস্যারই সম্মুখীন হইয়াছে। প্রকৃত সমস্যা হইতেছে এই যে, শ্বেতাঙ্গরা তাঁহাদের রাজনৈতিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত রাখিতে চাহিতেছেন। যেখানে তাহা সম্ভব হইতেছে না সেখানে তাঁহাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেই সঙ্গে চলিতেছে আফ্রিকার অধিবাসীদের উপর কঠোর অত্যাচার। মিঃ ম্যাকমিলান কি ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিবেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশনের কথাই আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব।

উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং ন্যায়াশাল্যাণ্ডকে একত্র মিলিত করিয়া মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশন গঠন করা হইয়াছে। বৃটিশ ন্যায়াশাল্যাণ্ডকে এই ফেডারেশনে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছে। ন্যায়াশাল্যাণ্ডের অধিবাসীসংখ্যা ৩০ লক্ষ। তাহাদের শতকরা ৯৯.৬ জনই নিগ্রোজাতীয়। এই মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশন যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গরাই এই স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিতেছে, তাহারাই শাসন করিতেছে এই ফেডারেশনকে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রতি ১৪ জনে একজন শ্বেতাঙ্গ। উত্তর রোডেশিয়ায় প্রতি ৩৯ জনে একজন শ্বেতাঙ্গ এবং ন্যায়াশাল্যাণ্ডে শ্বেতাঙ্গর সংখ্যা প্রতি ২৫০ জনে একজন। দক্ষিণ রোডেশিয়ায় যে বর্ণবিভেদ প্রচলিত আছে তাহা দক্ষিণ আফ্রিকার অনুরূপ। আফ্রিকার সর্ব্বত্র কৃষ্ণকায়দের মধ্যে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে তাহা ন্যায়াশাল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকেও প্রভাবিত করিবে, তাহারা ফেডারেশনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। বেলজিয়ম কঙ্গোতে যেমন হাঙ্গামা হইয়াছে তেমনি ন্যায়াশাল্যাণ্ডেও হাঙ্গামা হইয়াছে। ন্যায়াশাল্যাণ্ডের হাঙ্গামায় বহু লোক নিহত হইয়াছে। এই হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য গঠিত হইয়াছিল ডেভ্‌লিন কমিশন (Devlin commission)। এই কমিশন তদন্ত করিয়া শ্বেতাঙ্গ হত্যার ষড়যন্ত্রের কোন সন্ধান পান নাই এবং ন্যায়াশাল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থাকে পুলিশ রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশনকে আরও স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়ার জন্য গঠিত হইয়াছে মঙ্কটন কমিশন। বৃটিশ শ্রমিকদল এই কমিশনে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এই ধরণের কমিশনে তাঁহাদের আপত্তি করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তাঁহারা পার্লামেণ্টারী কমিশন চাহিয়াছিলেন। মঙ্কটন কমিশনের ২৬জন সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র আফ্রিকান। এই পাঁচজনের মধ্যেও তিনজন তাঁহাদের আয়ের জন্য সরকারের উপর নির্ভরশীল। বৃটিশ সরকার ডাঃ বান্দা প্রভৃতি বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে সম্মত হন নাই। মধ্যআফ্রিকা ফেডারেশনের প্রধান মন্ত্রী স্যার রয় উইলেনস্কির সহিত পরামর্শ করিয়াই বৃটিশ সরকার এই ধরণের কমিশন গঠন করিয়াছেন, ইহা একরূপ সকলেরই জানা কথা। মিঃ ম্যাকমিলান আফ্রিকানদের স্বাধীনতার দাবী পূরণ করিতে পারিবেন কি ?

কেনিয়ায় "মাউ মাউ" আন্দোলন দমন করিবার জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কেনিয়ায় সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করা হয়, ইহা সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা। সাত বৎসর পরে সম্প্রতি কেনিয়া সরকার এই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিয়াছেন। কেনিয়ার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই উহার উদ্দেশ্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, গত সাত বৎসরে "মাউ মাউ"দের উপর যে আক্রমণ চলিয়াছে তাহার ফলে ১৩ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হইয়াছে। মাউ মাউদের আক্রমণে শ্বেতাঙ্গ নিহত হইয়াছে মাত্র ২২ জন। কিকিয়ু-নেতা মিঃ জিমো কেনিয়াটাকে মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। কেনিয়ায় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সংখ্যা মাত্র ১৩ হাজার এবং অবশিষ্ট ৫ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। কেনিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় ও এশিয়া প্রতিনিধিদের লইয়া গত ১৯শে জানুয়ারী (১৯৬০) লণ্ডনে যে আপোষ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। মিঃ ম্যাকমিলান কেনিয়ার সমস্যা কি ভাবে সমাধান করিবেন ?

মিঃ ম্যাকমিলান দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাইবেন। সেখানকার সমস্যা অন্যরকম। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে বর্ণবিদ্বেষের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে তিনি কোন কথা বলিতে পারিবেন কি ?

—২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬০

বন কেটে বসত
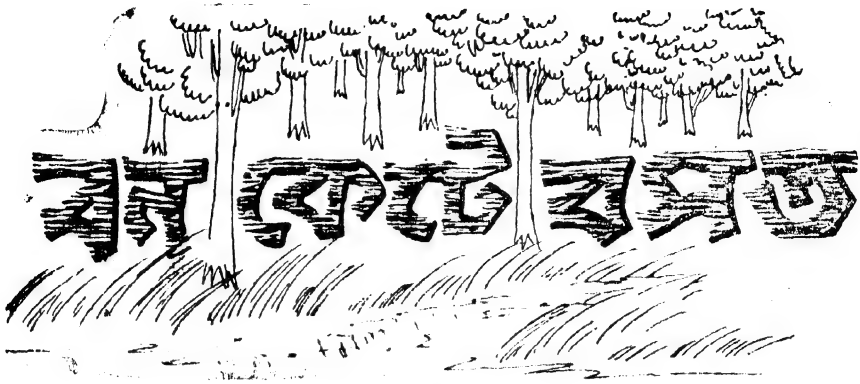
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

টৌর্নি মানুষ চক্রবর্তী—অতএব রীতিমত এক জেরার ব্যাপার। আর প্রমথ হালদারও কম ব্যক্তি নন—তিনি এক মর্মভেদী গল্প ফেঁদে বসেছেন। নাম হল তাঁর জনার্দন মুখুজ্জে। কাজকর্মের চেষ্টায় বেরিয়েছেন তিনি এবং সঙ্গের ওই লোকটি। আরও নাবালে কাঁটাতলা অঞ্চলে কারা নাকি লাট ইজারা নিয়ে বন কাটছে। এদিকে সুবিধা না হলে সেই কাঁটাতলা অবধি চলে যাবেন। লোকজন খাটানো হিসাবপত্র রাখা এই সমস্ত কাজ ভাল পারেন তিনি। মোটের উপর, ডাঙা-অঞ্চলে আর কিছু নেই। পোকার মতন মানুষ কিলবিল করে। পোকায়-জরো-জরো ঐ মানবেলায় পড়ে থেকে বাঁচা যাবে না। বাঁচতে হলে নতুন জায়গায় বসত গড়তে হবে। যেমন এই এঁরা সব করেছেন।

গগন তিক্তস্বরে বলে, সে-ও আর থাকছে কোথা ঠাকুর মশায়? মানুষের ক্ষিধের অন্ত নেই। দেদার খাবে, আবার ছেলেপুলের জন্য রাজ্যপাট বানাবে। ক্ষ্যাপা মহেশ বলে একজনে ঘোরাফেরা করছে ইদানীং। ঝানু বাউলে, কথাবার্তাও বলে বেশ খাসা। সে বলে, বড়লোকের নজর লেগেছে—পোকায় ধরেছে, এ ধেরির আর বাড়বাড়ন্ত হবে না। আরও নাবালে একেবারে সাগরের মুখে গিয়ে দেখ। কিন্তু গিয়ে কি হবে, সেখানেও যাবে ওরা। কত হাঙ্গামা করে ক'টা মানুষ বনের মধ্যে ক'-খানা ঘর বেঁধে নিয়েছি, এই এত দূরেও শনির দৃষ্টি।

জগন্নাথের চিঁড়ে খাওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কানাচে এসে একটুখানি ওদের কথাবার্তা শুনল। হাসে। চারুবালাকে চুপি চুপি বলে, আমি সামনে যাচ্ছিনে। থালের মধ্যে রেখে পালিয়ে এসেছিলাম। গেলে ধরে ফেলবে। পচা বলাই সবাই কালীতলায়—আমিও চললাম। বাড়িতে তোমাদের ভাল ভাল অতিথ—বিস্তর রান্নাবান্না হবে। আমিও অতিথ আজকে। রান্না হয়ে গেলে খেতে আসব।

সাতাশ

চারুবালা এসে প্রমথকে ডাকে: উঠুন ঠাকুর মশায়! উনুন ধরিয়ে চালডাল গুছিয়ে দিয়ে এলাম। চাপিয়ে দিন এবারে গিয়ে।

ছুটোছুটির কষ্টে ক্ষিধে খুব প্রবল। খেতে হবে তো বটেই। কিন্তু পরোপকারে প্রমথর ভারি বিতৃষ্ণা। উনুনের ধারে সেঁকা-পোড়া হয়ে তিনি রেঁধে দেবেন, অন্য সকলে মহানন্দে রাঁধা ভাত নিয়ে বসবে—ভাবতে গিয়ে দেহ যেন এলিয়ে আসে। আড়ামোড়া ভেঙে বললেন, আমার অত হাঙ্গামা পোষাবে না। প্রাকটিশও নেই। চিঁড়ে-মুড়ি যা ঘরে থাকে দাও। তাই চাট্টিখানি আর ঘটি দুয়েক জল খেয়ে পড়ে থাকি। রাত কেটে যাবে।

নিবারণ বলে, ভাত বিনে আমার চলবে না। স্পষ্ট বলছি। আমি হাঙ্গামা পোহাব। রাঁধিও ভাল। চল মা রান্নার জায়গা দেখিয়ে দেবে।

উদ্যোগী পুরুষ—বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। চারুবালার সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে প্রস্তুত। প্রমথ খিঁচিয়ে উঠলেন: তোমার এ সাউখুরি কেন বলতো? রেঁধে খাওয়াবার শখ তো ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলে না কেন? তোমার রান্না কে খেতে যাচ্ছে? একা তুমি খাবে, আমরা সবাই চেয়ে চেয়ে দেখব—তাই বা কি রকম হবে বিবেচনা কর।

নিবারণ বলে, কি করতে পারি বলুন মশায়? আপনাদের কারও তো গরজ দেখিনে।

চক্রবর্তীর দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রমথ বলেন, সদ্ ব্রাহ্মণ আরও তো রয়েছেন আমি ছাড়া।

চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমার কথা বলেন তো নাচার। দাস মশায় বিষম খাওয়ান খাইয়েছে—আমার গলায় গলায় এখন। ভাত বেড়ে আসনে সাজিয়ে দিলেও খেতে পারব না।

টৌর্নি মানুষ চক্রবর্তী কত রকমের মক্কেল ভাজিয়ে খান। ধৈর্য সকলের বড় গুণ, জেনে বুঝে বসে আছেন। ধৈর্য ধরে চুপচাপ চেপে বসে থাকুন, গরজ দেখাবেন না, নড়াচড়া করবে না—সিদ্ধি পায়ে হেঁটে আপনার কাছে হাজির হবে।

ঢেকুর তুলে চক্রবর্তী বলেন, দাস মশায় আর খড়ুই মশায় মিলে যা ব্রাহ্মণ-সেবাটা করল, তিন দিন আর জলগ্রহণ করতে হবে না। চারু একটা পাশবালিশ দিতে পার তো এই মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ি। চক্রবর্তী ঠাকুর খান বা না খান, শোন ভাল। শিয়রের বালিশ না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পাশবালিশ বিনে ঘুম হবে না।

নিবারণ রাগ করে বলে, বামনাই ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়ে আমি যে মশায় ক্ষিধেয় মারা পড়ি। পেটের নাড়িভুঁড়ি অবধি হজম হয়ে যাচ্ছে। আমার মতন আমি চাট্টি ফুটিয়ে নিইগে।

প্রমথ হালদার তড়াক করে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন: একটা মিনিট ক্ষিধে চাপতে পার না, তা বাইরে এত জোর কেমন করে? বসে থাক তুমি, আমি যাচ্ছি।

নিবারণ না-না করে ওঠে: আপনার যে প্রাকটিশ নেই। হাত-টাত পুড়িয়ে ফেলবেন। রান্নাও ভাল হবে না। মুড়ি খেয়ে থাকবেন, তাই থাকুন না মশায়।

প্রমথ ধৈর্য হারিয়ে বললেন, রান্না হয়ে যাক—খেয়ে দেখো প্রাকটিশ আছে কি নেই। বকর-বকর কর কেন, শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিলে তাই নাচাও আবার।

চারুকে বলেন, কোথায় কি জোগাড় করেছ, চল—

চারুবালার সঙ্গে প্রমথ রান্নাঘরে গেলেন। খিক-খিক করে চাপা হাসি হাসে নিবারণ। চক্রবর্তীর কাছে গুঁাক করে বলে, জাতে ছোট হওয়ার কত সুবিধা, বুঝে দেখুন চক্কোত্তি মশায়। আমাদের হাতে কেউ খাবে না, আমরা মজা করে সকলের হাতে খাব। ঝামেলা পোহাতে হল না তাই। কিন্তু আপনি যে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লেন, একেবারে নিরম্বু রাত কাটাবেন?

চক্রবর্তী তার কথার জবাব না দিয়ে উচ্চকণ্ঠে চারুকে ডাকলেন, শুনে যাও তো মা একবার এদিকে?

চারু এলে বললেন, মুখুজ্জে মশায় রাঁধতে গেলেন তো আমারও এক মুঠো চাল দিয়ে দিও।

চারুবালা হেসে বলে, সে জানি। চাল আমি বেশি করে দিয়েছি।

হর ঘড়ুই বলে, ব্রাহ্মণের প্রসাদ আমিও চাট্টি পাই যেন।

চারু বলে, তুমি একলা কেন, বাড়ি সুদ্ধ সবাই আমরা প্রসাদ পাব। হিসেব করে চাল মেপে দিয়েছি।

বেশ, বেশ! পরম উল্লাসে নিবারণ ঘাড় দোলায়: এক যজ্ঞির রান্না রাঁধিয়ে নিচ্ছ তবে তো? খাসা রাঁধেন, আমি খেয়েছি ওঁর রান্না। এক দোষ, পরের উপকারে আসবে শুনলে মন বিগড়ে যায়। আজকের রান্নাই বা কি রকমটা দাঁড়ায়, দেখ!

রান্নাঘরের ভিতরে প্রমথ ওদিকে তেরিয়া হয়ে উঠেছেন: আস্ত এক এক পশুরের গুঁড়ি—গোটা বাদাবন তুলে এনে রান্নাঘরে ঢুকিয়েছে। এই কাঠ ধরাতেই তো রাতটুকু কাবার হয়ে যাবে।

ম্যানেজারের অবস্থা বুঝে নিবারণের মায়া হল বোধ হয়। বলল, মাথা গরম করবেন না। রান্নায় তা হলে জুত হবে না। দা-কাটারি একখানা দাও দিকি ভালমানষের মেয়ে, আমি কাঠ কুচিয়ে দিচ্ছি।

জগার কাছে শুনে পচা বলাই রাধেশ্যাম এবং আরও দু-তিন মরদ কালীতলার দিক থেকে এসে পড়ল। গগন আর হর ঘড়ুই তাদের সঙ্গে। গোয়ালের গরু বের করে কোথায় নিয়ে গেল। কামরার তক্তাপোশটাও ধরাধরি করে নিয়ে চলল। প্রমথ রান্না করেন আর দেখেন। রাঁধেন তিনি সত্যিই ভাল। ভাত আর হাঁসের ডিমের তরকারি নেমে গিয়েছে, মুগের ডাল ফুটছে। আহা মরি কী সুগন্ধ! রান্নাঘরের সামনে গগন এসে তাগিদ দেয়: আর বেশি কাজ নেই, নামিয়ে ফেলুন দেবতা।

প্রমথ বলেন, খুব ক্ষিধে পেয়ে গেল?

গগন বলে, আজ্ঞে না, ক্ষিধের কারণে বলছিনে। গোলমালের ব্যাপার আছে আজ। আমাদের যখন হয় হবে, বিদেশি মানুষ আপনারা তাড়াতাড়ি সেবা শেষ করে নিন। তার পরে আপনাদের পার করে বরাপোতার দিকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ বলে, বেশ তো আছি ভাই, রাতদুপুরে আবার পারাপার কেন? একটা চট-মাদুর যা হোক কিছু দিও, তোমার ঐ আলাঘরে পড়ে থাকব। কিছু না দিতে পার, তাতেও ক্ষতি নেই। মেজেয় পড়ে ঘুমব।

গগন বলে, ঘুম হবে না এদিগরে থাকলে। তবে আর বলি কেন।

হর ঘড়ুই ঐ সঙ্গে যোগ দেয়: একটা রাতের তরে অতিথ এসেছেন, গণ্ডগোলে থাকার কি দরকার? তাড়াতাড়ি চাট্টি খেয়ে নিয়ে গাঙ পার হয়ে সরে পড়ুন।

কী একটা বড় বড় ব্যাপার আছে, মানুষগুলোর গতিক দেখে বোঝা যায়। এক দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, চরকির মতো ঘুরছে। এই রকম আধাআধি বলে গগনও ছুটে বেরুল আবার কোন দিকে।

প্রমথ জানবার জন্য আকুলিবিকুলি করছেন। চারুবালাকে ইসারায় কাছে ডেকে বলেন, ওরা কি বলে গেল, মানে তো বুঝলাম না মা!

নিম্ন কণ্ঠে চারু বলে, কালীতলায় পুজো হচ্ছে। নরবলি ওখানে।

সে কি গো?

বলবেন না কাউকে! খবরদার, খবরদার! আমার আবার মস্তবড় দোষ, পেটে কথা থাকে না। সমস্ত বলে-কয়ে অবসর হয়ে পড়ি। টের পেলে পাড়ার ওরা আমাকেই ধরে হাড়িকাঠে ফেলবে!

কিন্তু চারুর যা-ই হোক সেজন্য কার মাথাব্যথা? নিবারণ বলে, বলছ কি তুমি! জলজ্যান্ত মানুষ ধরে বলি দেবে—থানা-পুলিশের ভয় করে না?

চারু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলে, এমন কত হয়ে থাকে! থানা তো একদিনের পথ এখান থেকে। কুমিরমারিতে এক চৌকি আছে—শুনেছি, জন দুই-তিন সিপাহি সেখানে তিনবেলা ঠেসে মাছ-ভাত খেয়ে আরাম করে নাক ডেকে ঘুমোয়। ধরবে কি করে? বলির পরে পুজোআচ্চা হয়ে গেলেই তো ধড়-মুণ্ডু গাঙের জলে ছুড়ে দেয়। টানের মুখে সে সব দূর-দূরন্তর চলে যায়, কামটে খুবলে খুবলে খেয়ে দু-দশখানা হাড় শুধু অবশেষ থাকে।

প্রমথ সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, এ যে বাবা মগের মুলুক একেবারে!

চারু বলে, বাদা মুলুক। বাদায় মানুষ কাটতে হাঙ্গামা নেই। কাটে সব বাইরের মানুষ ধরে ধরে। বাদার বাসিন্দা তারা নয়। কোন রকম তাদের খোঁজখবর হয় না। এই যত শোনেন, সাপে কাটল বাঘ-কুমিরের পেটে গেল—সবই কি তাই? মায়ের ভোগেও যাচ্ছে কত জনা। পাঁচ-সাতখানা বাঁক অন্তর এক এক মায়ের থান—তাঁরা কি উপোসি পড়ে থাকেন? সমস্ত কিন্তু সাপ-বাঘের নামে চলে যায়।

শুনে প্রমথ হালদার থ হয়ে গেছেন। বাদা রাজ্যের এ হেন পুজা-প্রকরণ বাইরের লোকের অজানা। মুগের ডাল কড়াইয়ে টগবগ করছে, প্রমথ দেখেও দেখছেন না। নিবারণ বলে,

ডালে খানিকটা জল ঢেলে দাও ঠাকুর মশায়। ধরে যাবে, খাওয়া যাবে না।

প্রমথ বলেন, রাখ বাপু এখন ডাল খাওয়া। মানুষ কেটে মায়ের পুজো—কী সর্বনাশ! গা-মাথা আমার ঘুলিয়ে আসছে। খাওয়া মাথায় উঠে গেল।

চারু বলে, কিন্তু ভাল মানুষ বলি হবে না কখনো। বাদায় যারা মন্দ করতে আসে, কালী করালী তাদেরই রুধির খান। তাদেরও ভাল, মুক্তি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

সহসা গলা নামিয়ে নিরীহ কণ্ঠে বলে, জানেন মুখুজ্জে মশায়, ভারি এক শয়তান ফেরেব্বাজ আজ নাকি বাদায় আসছে। প্রমথ হালদার নাম—ফুলতলার কাঙালি চক্কোত্তির ছেলে অনুকূল চৌধুরি—তাদের ম্যানেজার। আমাদের উচ্ছেদ করে এই নতুন-ঘেরি গ্রাস করবার নানা রকম প্যাঁচ কষে বেড়াচ্ছে সেই লোক।

প্রমথ তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেন। কিন্তু চারুবালা ছাড়ে না। বলে, অমন কুটকচালে লোক শুনেছি চাঁদের নিচে নেই। আমি দেখিনি মানুষটাকে। আপনারা দেখেছেন?

নিবারণের দিকে তাকিয়ে প্রমথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, না না, আমরা দেখব কোথায়?

বলে, শুনুন মুখুজ্জে মশায়। দাদা বলে দিলেন পার হয়ে বরাপোতা চলে যেতে। আপনারা যাবেন না। কিম্বা গেলেও নরবলির সময়টা লুকিয়ে এসে চোখে দেখে যাবেন। সুবিধা হল তো ছাড়বেন কেন? আমাদের দেখতে দেবে না। কি করব—মেয়েমানুষের রাত্তিরে একা-দোকা বেরুতে সাহস হয় না। ঘরে বসে বসে বলির বাজনা শুনব।

প্রমথ বলেন, বলি দিচ্ছে কাকে? কোথায় রেখেছে—মানুষটাকে দেখেছ তুমি?

চারু একেবারে কাছে এসে বলে, আপনাদের বলছি। চাউর হয়ে না যায়, খবরদার! ওরা বলা-কওয়া করছিল, চুরি করে আমি শুনে নিয়েছি। ম্যানেজার প্রমথ হালদারের কথা হল না—বলি দেবে সেই মানুষটাকে। মিথ্যে মামলা সাজিয়ে আমাদের দায়িক করেছে, জিনিসপত্তোর ক্রোক করে নিতে আসছে আজকে তারা।

নিবারণ আর ধৈর্য রাখতে পারে না।

সবই তো পাচার করে দিলে। পাড়াসুদ্ধ মিলে করলে তাই এতক্ষণ ধরে। রান্নাঘরে আছি, কিন্তু চোখ দুটো মেলেই আছি মা-লক্ষ্মী। জিনিষের মধ্যে আছে ওই মেটে হাঁড়ি, ফুটো কড়াই আর ছেঁড়া মাদুর গোটাকয়েক। ক্রোক করতে এসে নৌকো-ভাড়াও তো পোষাবে না। কে এক বাজে খবর রটাল—তাই অমনি একদল মাল বওয়াবয়িতে লেগেছে, আর একদল হাড়িকাঠ পুঁতে বসে আছে কালীতলায়।

চারু বলে, খবর বাজে নয়। দাদা নিজে গিয়ে সদর থেকে জেনে এসেছে। আসছিল তারা। তা আচ্ছা এক কায়দা হল—খালের ভিতর গরুর গাড়িতে আটকে রেখে এসেছে। চার পাঁচ জন বেরিয়ে পড়েছে, হাত-পা বেঁধে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলবে এক্ষুণি।

প্রমথ সাহস করে বলে ফেললেন, এ-ও তো বিষম ব্যাপার দেখছি। সরকারি হুকুম মতে আইন মোতাবেক পরোয়ানা নিয়ে আসেই যদি সত্যি সত্যি, অমনি এরা বলি দিয়ে ফেলবে? লাটসাহেব যা, আদালতের চাপরাশিও তাই—সবাই ওঁরা ভারত সরকার। সরকারের বিপক্ষে যাবে—তার পরের হাঙ্গামাটা কেউ একবার ভেবে দেখবে না।

চারু সহজ কণ্ঠে বলে, হাঙ্গামা কিসের! বললাম তো সে কথা। মানষেলা নয়, এখানকার রীতব্যাভার আলাদা। ছাগল বলি দিতে দিতে তার মধ্যে এক সময় মানুষটাও টুক করে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দেবে। বালিতে ধার দিয়ে দিয়ে মেলতুকখানা এমন করে রেখেছে, সে মানুষ নিজেই ঠাহর পাবে না কখন ধড়মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে। খালি মুণ্ডু পিটপিট করে তাকাবে। ততক্ষণে ঝপ্‌পাস করে মাঝ-গাঙে ছুঁড়ে দিয়েছে। জলের টানে পাক খেয়ে পলকের মধ্যে কোথায় চলে গেল মুণ্ডু—কোথায় বা চলে গেল ধড়! এসে পড়েছেন তো স্বচক্ষে দেখে যাবেন কেমন সে ব্যাপার।

বলে কি মেয়েটা! কী রকম সহজ ভাবে বলে যাচ্ছে। হামেশাই যেন এই সব ঘটে থাকে, মাটি কাটা কিম্বা মাছ মারার মতোই অতি-সাধারণ এক ব্যাপার। হবেও বা! বাদাবন এক তাজ্জব জগৎ—প্রাণের দাম কাণাকড়িও নেই এখানে। মানবেলায় থেকে প্রাণ বাঁচাতে না পেরে মানুষ প্রাণ হাতে করে পড়ে এসে এখানে। প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা। টিকে থাকল তো মাছে-ভাতে সুখে বাঁচবে। এমন কি কাঙালি চক্কোত্তির কপাল হলে মেছো-চক্কোত্তি নাম ঘুচিয়ে চৌধুরি খেতাবও হতে পারে কোন এক দিন। কিন্তু প্রাণ হারাতেও হয় গাদা গাদা মানুষের—জন্তু-জানোয়ারের মুখে যায়, আবার এই দেখা যাচ্ছে—সোজাসুজি মানুষের কবলেও।

চারু বলে, ডাল সম্বরা দেবেন না ঠাকুর মশায়? দাঁড়ান, কাল-জিরে এনে দিই। আর বিলাতি কুমড়া আছে ঘরে, কুমড়ো-ছেঁচকি খেতে চান তো এক ফালি কেটে নিয়ে আসি।

চারু উঠে কামরার দিকে দ্রুত চলে গেল কালজিরা ও কুমড়া আনতে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার ফুরসৎ এতক্ষণে। প্রমথ বলেন, শুনলে তো? বিপদের উপায় কি বল।

নিবারণ হাই তুলে দু-বার তুড়ি দিয়ে বলে, আমি চুণোপুঁটি মানুষ—আমার বিপদ-টিপদ নেই। এত কথা হল, আমার নাম একবারও করেনি ম্যানেজার মশায়।

আঃ—বলে প্রমথ ঠোঁটে আঙুল ঠেকালেন। বললেন, আমি হলাম জনার্দন মুখুজ্জে মুখুজ্জে, মুখুজ্জে মশায়—ভুলে যাও কেন? ম্যানেজার এখানে কেউ নেই।

তা নেই বটে। তবে আবার ভাবনা কিসের? ডাল নামিয়ে ফেলুন, পাতা করে বসে পড়া যাক।

প্রমথ আগুন হয়ে বললেন, বুঝেছি চাপড়াশি। ভাবছ, তুমি ভাত-তরকারি সাপটাবে, বলি দেবে শুধু আমাকেই। সেটা হচ্ছে না। যেতে হয় তো তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে হাড়িকাঠে মাথা দেব। দু'জনে এক সঙ্গে এসেছি তো তোমায় একলা ছেড়ে যাব কোন আক্কেলে?

নিবারণ বলে, আমার কি! বিবাদ-বিসম্বাদ আপনাদের মধ্যে, সরকারি মানুষ আমার কোন দোষ হয়ে গেল?

সমন বয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। তোমার জোরেই তো আসা। নইলে একা আমার সাধ্য কি কারও অন্দরে হাত দিতে পারি।

যে ডিক্রিজারি করবে, তারই সমন বইব আমরা। এই গগন দাস কাল চৌধুরিগঞ্জের মাল ক্রোক করুক, গগনের আগে আগে আমি গিয়ে আপনাদের আলায় উঠব।

কথাবার্তা নিম্নকণ্ঠে হচ্ছিল। হাত তুলে প্রমথ থামিয়ে দিলেন। চুপ, চুপ! অনতিদূরে ওদের অনেকের আলোচনা। যারা গুলো খাল অবধি খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারাই বুঝি এইবার ফিরে এল। স্তব্ধ নিশিরাত্রে উত্তেজিত কণ্ঠের প্রতিটি কথা কানে আসছে।

গাড়ি ডাঙায় তুলে গরু দুটো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ সরে পড়েছে। ধরে বেঁধে নিয়ে আসব, সেটা বোধ হয় কেমন ভাবে টের পেয়ে গেছে।

যাবে কোথা? নতুন মানুষ—ওরা পথঘাট জানে না। আমাদের সব নখদর্পণে। পাখি হয়ে উড়ে পালাতে পারে না তো! আছে কোনখানে ঘাপটি মেরে। সবাইকে জিজ্ঞাসা কর, নতুন মানুষ এদিগরে দেখা গেছে কি না। বড়দা কোথায়?

হর ঘড়ুইকে নিয়ে কালীতলার দিকে গেল, দেখতে পেলাম।

চল বালিতলায়। বলি পালিয়েছে, খবর দিতে হবে। বেশি লোকে বেরিয়ে পড়ে খোঁজাখুঁজি করুক। মহাবলির সঙ্কল্প করে শেষটা চালকুমড়োয় পুতুল গড়ে রীত-রক্ষা করতে না হয়।

আর একজন বলে, কামার দেবীস্থানে তৈরি হয়ে থাকুক। ধরে আনা মাত্তোর কপালে সিঁদুর দিয়ে মালা পরিয়ে হাড়িকাঠে চাপান দেবে।

দুড়দাড় পায়ের শব্দ। ছুটল বোধ করি ওরা কালীতলায়। নিঃশব্দ। সবাই চলে গেছে তা হলে।

প্রমথ আর নিবারণ দম বন্ধ করে শুনছিল। আর নয়—নিবারণ তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে উঠানে। ভাগ্য ভাল, মানুষজন কেউ নেই রান্নাঘরের এদিকটা। একটা বার পিছন তাকিয়ে দেখল না মোটা মানুষ প্রমথর অবস্থাটা কি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। অন্ধকারে বাঁ করে কোন দিকে মিলিয়ে গেল। প্রমথ তখন পাথরের খোরায় ডালটা ঢেলেছেন সযত্নে অন্ন। রইল পড়ে ডাল আর ভাত—প্রাণের চেয়ে বড় কিছু নয়। বেঁচে থাকলে ঢের ঢের খাওয়া যাবে।

বাইরে এসে ভয় যেন হুমড়ি খেয়ে চেপে ধরল। যেদিকে তাকান, মনে হচ্ছে ওই বুঝি মানুষ। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাঁধ থেকে নিচে নেমে পড়লেন। ঝুপসি জঙ্গল আর মাঝে মাঝে জল ভেঙে চলেছেন। চৌধুরিগঞ্জের আলা কতখানি দূর—পশ্চিমে না উত্তরে, কোন রকম তার ধারণা নেই। যাচ্ছেন, যাচ্ছেন। আর নিবারণ যেন কর্পূর হয়ে উপে গেছে, কোন দিকে মানুষটার চিহ্ন দেখা যায় না। সন্ধানি মানুষগুলোর চোখ এড়িয়ে নিজের কোটে কোন গতিকে পড়তে পারলে যে হয়!

আঠাশ

সকলের আমোদস্ফূর্তি ছাপিয়ে গগন দাসের হাসি—সে হাসির তোড় ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়েছে। রান্নাঘরে সকলে এসে জুটেছে এখন। গগন বলে, আশামুখে ম্যানেজার মশায় রাঁধাবাড়া করলেন। তা অতি নিষ্ঠুর তোরা জগা। দুটো গ্রাস অন্তত মুখে তুলতে দিলে পারতিস। বলি-টলির কথা একটু পরে তুললেই হত।

জগা বলে, বড় লোকের ম্যানেজার—কত মানুষকে নিতিদিন ওরা বেগার খাটায়। আজকে একটা বেলা খোদ ম্যানেজারকে আমরা বেগার খাটিয়ে নিলাম। রান্না করে দিয়ে চলে গেল। ডাল রেঁধেছে হে, নাকে সুবাস লাগছে। জিনিষপত্তোর টানা-হেঁচড়া করতে খাটনি হয়েছে, বসে পড় সবাই। দু-গ্রাস চার গ্রাস যেমন হয় ভাগ করে খাওয়া যাবে।

চারুবালা জগার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, পেটুক মানুষটা খাই-খাই করছে আসা অবধি। বউদি কালীতলার পুজোআচ্চার জোগাড়ে আছে, আমার হাত ছেঁচে গিয়েছে—কী মুসকিলে যে পড়েছিলাম! পেট বাজিয়ে একটা মানুষ খেতে চাচ্ছে, স্পষ্টাস্পষ্টি না বলা যায় কেমন করে?

জগাও কথা পড়তে দেয় না: তার উপরে এই চক্কোত্তি মশায় এসে পড়লেন। বড়দা আহ্বান করে এনেছেন, ব্রাহ্মণ মানুষ ভিটের উপরে উপোসি রাখা যায় না। আবার যার তার হাতের রান্নাও চলবে না ওঁর। ম্যানেজার মশায় নৈকষ্য কুলীন। তিনি এসে পড়ে সুরাহা করে দিলেন। এইদিকে চলে আসুন চক্কোত্তি মশাই, পরিবেশনটা আপনি করুন। চারুবালার হাতের টাটানি—আমি সকলের পাতা করে দিচ্ছি। আমরা ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে যাব না।

পাশাপাশি পাতা পড়ল অনেকগুলি। কত চাল দিয়েছে রে চারু—এত জনের প্রায় ভরপেট হবে। কিসের পর কোনটা ঘটবে আগে ভাগে যেন ছকে ফেলে সাজানো। এরা দিব্যি খাওয়াদাওয়া চালাচ্ছে—আর পাকশাক সমাধা করে দিয়ে প্রমথ হালদার পশ্চিমের চৌধুরিগঞ্জের পথ না চিনে উত্তরমুখোই ছুটলেন কি না কে জানে? রংতামাসা হাসিমস্করা—তার মধ্যে খাওয়া বেশি এগোয় না।

এমনি সময় বিনি বউ আর নগেনশশী এসে পড়ল। ধামা কাঁধে দশাসই এক পুরুষ খানিকটা পিছনে। ক্ষ্যাপা মহেশ। মহেশের পরনে লাল চেলির কাপড়; গলায় কড় ও রুদ্রাক্ষের মালা, শুভ্র পুষ্ট উপবীত। বাদা অঞ্চলে এক ডাকে চেনে তাকে সকলে।

আজকের পুরুত সে-ই। নৈবেদ্য ও গামছা-কাপড় নিয়ে নিয়েছে, দক্ষিণার টাকা বাকি। নগেনশশীর পিছু পিছু তাই এসেছে। কর্তা ব্যক্তি নগেনশশী, শুধুমাত্র মচ্ছবের মানুষ নয়, দায়দায়িত্ব অনেক কাঁধের উপর। পুরুত ও বাজনদারের হিসাব মিটিয়ে তবে আসতে হল। আরও অনেক পড়ে আছে, সমাধা হতে এই মাস পুরো লেগে যাবে। তার উপরে একখানা পা ইয়ে মতন নগেনের—বিনি-বউ ভাইয়ের হাত ধরে এতখানি পথ ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই জন্য দেরি।

আসার ঢুকে কলরব শুনে নগেনশশী রান্নাঘরের ছাঁচতলায় এসে দাঁড়াল।

কি গো, ভোজে বসে গেছ যে তোমরা সকলে?

গগনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। স্ফূর্তিবাজ মানুষ। বাড়ি থেকে এই দল এসে পড়ার আগে ব্যাপারি আর মাছ-মারাদের কত দিন খাইয়েছে এটা-ওটা উপলক্ষ করে। এতগুলো তরকারি সহ এমন আয়োজন করে নয় অবশ্য, সে সাধ্য তখন ছিল না। কোনদিন হয়তো শুধুই নুন-ভাত। তবু খেয়েছে অনেক মানুষ একত্র বসে। নগেনশশী জেঁকে বসার পর আর তেমন হবার জো নেই। নিজের ঘরেই চোর যেন সে। কৈফিয়তের ভাবে তাড়াতাড়ি বলে, কী করা যাবে? ঠাকুর মশায় রান্নাবান্না করে দিয়ে গেলেন। ভাত নষ্ট হয়। তাই বললাম, তোরা বাপু এগুলো খেয়ে শেষ করে দিয়ে যা।

চারুবালা কিন্তু দৃকপাত করে না। ঠেশ দিয়ে বলল, পায়ের দোষে দেরি করে ফেললেন। নইলে আপনিও তো এই সঙ্গে বসে যেতে পারতেন।

জগন্নাথ জুড়ে দেয়: এখন বসে পড় না কেন একটা পাতা নিয়ে। নৈকষ্য বামুনে রেঁধেছে, জাত মরবে না।

চারু ও জগাকে একেবারে উপেক্ষা করে নগেনশশী গগনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কোন বামুন ঠাকুর এসে রান্নাবান্না করে দিয়ে গেল?

কিন্তু জবাব দিল জগা, চৌধুরি বাবুদের ম্যানেজার প্রমথ হালদার। মানুষ যেমনই হোক, লোকটার জাত্যাংশে খুঁত নেই।

ঘরের ভিতরে উঠে এল নগেনশশী, কিন্তু খেতে বসল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত খবরাখবর শুনে নেয়। শুনে হতবাক হয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

কী সর্বনাশ, কোন সাহসে এত বড় কাণ্ড করে বসলে জামাইবাবু? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া। চৌধুরিরা লোক সোজা নয়—হাত-পা ধুয়ে আবার গিয়ে জেলেঘরে উঠতে হবে, এই তোমার ভবিষ্যৎ। সে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

গগন ভালমন্দ কিছু জবাব দিল না। জগা বলে, কুমিরের যা স্বভাব তা সে করবেই। ঝগড়া না করে যাও না জলে কুমিরের সঙ্গে ভাব করতে। গিয়ে মজাটা বুঝে এস।

নগেনশশী আগুন হয়ে বলে, মতলবখানা কে পাকাল বুঝতে পারছি। বাউণ্ডুলেটা তো বিদেয় হয়েছিল। আবার কখন এসে ভর করল?

জগা বলে, তোমার বুক টনটন করে কেন? তুমি কে হে? তোমার বুকে চড়াও হয়েছি নাকি?

বলল গগনই যেন—তার উপরে নগেনশশী খিঁচিয়ে ওঠে: বলে দিয়েছি না জামাইবাবু, বাড়ির উপর কেউ না আসে। কাজকর্ম থাকলে বাইরে থেকে মিটিয়ে যাবে। তবে কি জন্য বাজে লোক ঢুকতে দাও?

এর পরের জবাব আর মুখের নয়, হাতের। তাতে জগা পিছপাও নয়। কিন্তু হঠাৎ কী হল তার—দুরন্ত অভিমানে সর্বদেহ অসাড় হয়ে গেল যেন। সকলে মিলে কত আশায় নতুন আলা বানাল—এই নগেনরা কোথায় তখন? আজকে সেই লোক হমকি দিচ্ছে জগন্নাথকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে কেন? এর জবাব গগনই যা দেবার দিক। গগনকে সে বলে, কি বড়দা, বলবে না কিছু? নতুন ঘেরি শালাকে দানপত্র করে দিয়েছ বুঝি—কিছু তোমার বলবার নেই?

তারপরে অন্য যারা খাচ্ছে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকায়। ঘাড় নিচু করে সবাই দ্রুত খেয়ে যাচ্ছে। জগা উঠে পড়ল।

বলাই বলে, ও কি, ভাত থুয়ে ওঠ কেন?

সুখের মাছ-ভাত খেয়ে খেয়ে মেনিবিড়াল হয়ে গেছিস তোরা সব। মানুষ নেই এখানে। নয়তো পা ভেঙে লোকটা খোঁড়া হয়ে আছে, হাত ভেঙে দিয়ে নুলো করে দিতিস এতক্ষণ।

আলার সীমানা ছেড়ে তীরবেগে বেরুল। ইচ্ছে হচ্ছিল, যাবার আগে একটা থাবড়া মেরে যায় নগেনশশীর গালে। কিন্তু কিন্তু ঘেরি পত্তনের সেই গোড়ার আমল আর নেই। সবাই তাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন আলায় পড়ে খোসামুদি করে। সাঁইতলা কম দুঃখে ছেড়েছে সে—সাঁইতলা ছেড়ে যাত্রাদলের চাকরি স্বীকার করে বয়ারখোলা গিয়ে উঠেছে। ফিরে যাবে বয়ারখোলা এই রাত্রেই। গরু ছুটো, শোনা গেল, গাড়ি পার করে এনেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে তেলিগাতির পুল হয়ে যাবে এবার।

বাঁধের উপর এসেছে। নীরন্ধ্র অন্ধকার। ভাবছে, পাড়ার ভিতর পুরনো চালাঘরে দু-দণ্ড বসে যাবে কিনা। মাছমারারা ঘোর থাকতে জাল নিয়ে ফিরবে, তাদের সঙ্গে দুটো কথা বলে যেতে ইচ্ছে করে। জগাকে দেখে খুশি হবে নিশ্চয় তাদের কেউ কেউ। তবে তো চালাঘরে পড়ে থেকে রাতটুকু কাটিয়ে যেতে হয়। মাছের সায়ের বসাল এই মুলুকে—ওরা সেই থেকে দুটো চারটে পয়সার মুখ দেখছে। নাক সিঁটকে ভাল লোকেরা বলেন, চোরাই কাজ-কারবার বাড়িয়ে দিল সায়ের বানিয়ে। তা সাধু পথ দিন না কিছু

ব্যবস্থা করে এই চোর মাছ-মারারা খেয়ে-পরে যাতে সাধুসজ্জন হয়ে যায়।

ফাঁকায় এসে শীতল জলের হাওয়ায় রাগ কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন জগা এই সমস্ত ভাবছে। জঙ্গল কেটে ঘেরি বানালাম, জঞ্জাল জমেছে—কার ভয়ে এক্ষুণি খাল পার হয়ে উল্টোমুখো বয়ারখোলা ছুটতে? অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ এক সময় চোখ তাকিয়ে দেখে, এদিকে-ওদিকে ছায়ার মতন মানুষ। বাদাবন—কত মানুষ মরেছে কত রকমে। অপঘাতে মরলে গতি হয় না, ভূত-প্রেত হয়ে বিচরণ করে। রোমহর্ষক কত কাহিনী! তাদেরই একটা দল এসে পড়ল নিশিরাত্রে?

একজন তার মধ্যে হাত জড়িয়ে ধরল জগার। বলাই। মগেনশশীর ধমকিতে ওরাও সব আধ-খাওয়া করে উঠে এসেছে। বলাই বলে, ঘরে চল জগা।

কোন্ ঘরের কথা বলছিস?

তোমার ঘর—আমাদের সকলের সেই চালা-ঘর। ঘরের কথা মনে করিয়ে দিতে হয়—বাপ রে বাপ, কী রাগ তোমার জগা ভাই।

ক্ষ্যাপা মহেশ এমনি সময় দ্রুত পা ফেলে তাদের মধ্যে এল। জগার আর এক হাত ধরে বলে, ঘরে কেন, বাদায় যাওয়া যাক চল। বাদার পথ একেবারে ছেড়ে দিলে—কত দিন যাও নি বল তো জগা ভাই। মানুষের কুদৃষ্টি লেগেছে, এখানে আর যুত হবে না। নতুন জায়গা খুঁজে নাও। ভগবানের এত বড় পিরথিমে জায়গার অভাব কি?

পচা এসে আবার এর মধ্যে যোগ দেয়: বাদায় যখন যাবে, তখন সে কথা। কিন্তু নিজের ঘর-দুয়োর ফেলে বয়ারখোলায় পড়ে থাকবে, সে কিছুতে হবে না জগা। তুমি না এলে আমরাই চলে যেতাম, গিয়ে জোরজার করে নিয়ে আসতাম।

জগা বলে, ঘরে থেকে তো রাতভোর একা একা মশা তাড়ানো? তার চেয়ে যাত্রাদলের মানুষ—দিব্যি জমিয়ে আছি সেখানে।

বলাই বলে, এবার আর একলা থাকতে হবে না। সন্ধ্যার পর চালাঘরেই এখন খেলাধুলো গান-বাজনা। নতুন আলায় আমরা কেউ যাইনে।

পচা একেবারে সোজা মানুষ, রেখে ঢেকে বলতে জানে না। বলে, যাইনে মানে কি? আলায় যাওয়া বারণ হয়ে গেছে। আলা নয়, ষোলআনা গৃহস্থবাড়ি এখন। গৃহস্থবাড়ি উটকো লোক কেন ঢুকতে দেবে? নগ্না খোঁড়া চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খালের ঠিক মুখটায় এক নতুন ঘর বেঁধে নিয়েছে, সেইখানে সায়েব। কেনা-বেচার সময়টা মানুষ জমে, তার পরে সে ঘর ফাঁকা খাঁ-খাঁ করে।

জগার হাত ধরে নিয়ে চলল পাড়ার দিকে। যেতে যেতে বলাই বলে, ঐ নগনাটা বিয়ে করবে বলছে চারুকে। এক বউ কোথায় পড়ে আছে, ঘর করতে চায় না। বউঠাকরুনের খুব মত। বড়দা ভাল-মন্দ কিছু বলে না। আপত্তি থাকলেও বলতে সাহস পায় না।

থমকে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ প্রশ্ন করে, চারু কি বলে?

মেয়েমানুষ তো! ধরে পেড়ে পিঁড়িতে তুলে দিলে সাতপাকের সময় সে কি আর লাফ দিয়ে পড়বে? অজঙ্গি বাদা জায়গা—লাফিয়ে যাবেই বা কোথায়?

পচা আবার বলে, যাওয়া কিন্তু হবে না জগা। কক্ষণো না। কি ভাবছ?

আচ্ছা, গরুর গাড়ি তো দিয়ে আসি আগে বয়ারখোলায়—

পচা বলে, তোমায় ছাড়ব না। গাড়ি-গরু আমিই কাল তৈলক্ষ মোড়লের বাড়ি দিয়ে আসব।

[ক্রমশঃ।

মাঝি

[জাপানী কবি 'নগুচির' "The Boatman" কবিতার ভাবানুবাদ]

পথিকের জন্য প্রতীক্ষমান রাতের ফেরী মাঝি হাঁকলে
: এবার নৌকা ভাসবে বিস্ময়ের দেশে।
: প্রদীপ জ্বালো রাতের জল আলোকিত হোক
ভয় হচ্ছে এ অন্ধকার বুঝি হাড়ে কামড় বসাবে।

: হে অতিথ, মিথ্যে আলো জ্বালা
নিঃসংগ অন্ধকারের চিন্তার সড়ক বেয়ে
বিস্ময়ের দেশে প্রথম বার পৌঁছোতে পারো।
হে অতিথ, রাত্রিকে ডরালে চলবে না
যতক্ষণ না নির্জনতায় একাত্ম হবে
বিস্ময়পুরীর ছাড়পত্রও মিলবে না।

অনুবাদক—চণ্ডী সেনগুপ্ত।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

আমরা সকলেই নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলাম যে, একমাত্র আসামী গোপী বাবু ও কেষ্ট বাবু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের সহিত এই হত্যাকারীদের দলের সর্ব্বময় নেতা খোকাবাবুর বর্ত্তমান সম্ভাব্য বাসস্থান এবং তাহার গতিবিধি ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ আমাদের সরবরাহ করতে সমর্থ। এই মামলার অন্যতম আসামী গোপী বাবু আমাদের তদন্ত সম্পর্কীয় ভুলের জন্য ইতিমধ্যেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে আমাদের একমাত্র সম্বল এই আসামী কেষ্ট বাবু। এও যদি গোপী বাবুর মত স্বীকারোক্তি না করে জেল-হাজতে চলে যায়, তাহলে তো এই মামলার তদন্তের ব্যাপারে আমরা অগাধ জলে পড়ে যাবো। এই জন্য যেরূপেই হোক এই আসামী কেষ্ট বাবুর নিকট হতে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করতে আমরা মনস্থ করলাম। এই সময় জনৈক নাগরিক আমাদের থানায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মধ্যযুগীয় কচুয়া-ধোলাই জাতীয় একটি দাওয়াই এই আসামীর জন্য ব্যবস্থা করবার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমরা সুসভ্য ভারতীয় পুলিশ বিধায় এই ব্যাপারে দৈহিক পীড়নের পক্ষপাতী ছিলাম না। আমি ঐ ভদ্রলোককে এই সময় বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, দৈহিক পীড়ন এই ধরণের উৎকট অপরাধীদের উপর কখনও কার্য্যকরী হয়নি। এই সকল অপরাধীদের মধ্যে শেষের দিকে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। এই জন্য এদের মধ্যে কষ্টবোধ, উদ্বোধ প্রভৃতি কয়েকটি বোধ কমে গিয়ে থাকে। এর ফলে দৈহিক পীড়ন এদের কষ্ট না দিয়ে আনন্দ দিয়ে থাকে। এইজন্য এই শ্রেণীর আসামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। এর পর ঐ বাহিরের ভদ্রলোকটিকে বিদায় দিয়ে আমি দরজার সিপাইকে বাজার হতে সের আড়াই রসগোল্লা এবং তার সঙ্গে কয়েকটি লুচি ও কিছু তরকারী কিনে আনতে বললাম। প্রয়োজনীয় রসগোল্লা ও লুচি তরকারী সেখানে আনা হলে আমি অপর একজন সিপাহীকে হুকুম করলাম, অভি লে'আও আসামী কেষ্ট বাবুকো। এর পর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় কেষ্ট বাবু আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে আমি আসামী কেষ্ট বাবুর হাতের হাতকড়ির দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গের সিপাহীকে পূর্ব্ব পরিকল্পনা মত মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললাম, আরে, এ ক্যা কিয়া হ্যায়? হাতকড়ি লাগায়া কাহে? ই মামুলী আসামী নেহি হ্যায়, ভাই, ই আসামী বড়ঘরকা লেড়কা হ্যায়। বহুৎ বড়ী খানদানী আদমী, সমঝা হ্যায়? এতটা মধুর ব্যবহার থানায় এসে পুলিশের নিকট পাবে, তা খুনী আসামী কেষ্ট বাবুর কল্পনার বাইরে ছিল। আমার এইরূপ সদব্যবহারে তার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠলো। আমি এইবার বুঝতে পারলাম যে, আমাদের আকাঙ্খিত দুর্ব্বল মুহূর্ত্তটি আসামীর মধ্যে এইবার আগতপ্রায়। আমি তাকে সরাসরি খুনের কথা জিজ্ঞাসা না করে অতি সহানুভূতির সহিত তার পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতে সুরু করলাম। এর পর তার সহিত বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে রসগোল্লা ও তরকারীসহ কয়েকখানি লুচি খাইয়ে দিলাম। এই ভাবে তাকে ভরপেট খাইয়ে দেওয়ার মধ্যে আমাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। আমরা জানি যে খুব বেশী আহার করলে মস্তিষ্কের রক্ত উদরকে সুপরিচালিত করবার জন্যে উদরে নেমে আসে। এর ফলে রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের শক্তি ক্ষীণ হয়ে উঠে এবং তজ্জনিত মানুষের মনের প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস ঘটে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মন বিশেষরূপে বাক প্রয়োগশীল হয়ে উঠে। এইরূপ অবস্থায় আসামী তার অন্তরের গোপনতম কথাটিও স্বেচ্ছায় বলে ফেলতে বাধ্য। আমদের এই উদ্দেশ্যটিকে সাবধানে গোপন করে আমি একজন নিকট আত্মীয়ের মতন কেষ্ট বাবুকে বললাম, 'তোমার যদি ইচ্ছা হয় তো পুলিশের নিকট সত্য কথা বলো, কিন্তু যদি তা না ইচ্ছা হয় তো কোনও কথা আমাদের বলো না। এর পর আমি নিজেই তাকে হাজতঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার শয়নের জন্য দুইখানা ভালো কম্বলও সেখানে আনিয়ে দিলাম। এর পর আমি সহকারীদের যথাযথ উপদেশ দিয়ে রাত্রিকালীন আহার সেরে ঘুমবার জন্য উপরে চলে গেলাম।

এই রাত্রে মাত্র একটুখানি ঘুমিয়ে আমি নিয়ে নীচে নেমে এসে দেখলাম যে, কেষ্টা বাবু হাজতঘরে তখনও পর্য্যন্ত ঘুমাতে পারেনি। আমি সহানুভূতির সহিত কেষ্ট বাবুকে হাজত হতে বার করে অফিস ঘরে এনে একটা ভাঙা ডেক চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে অকারণে ডাইরী লিখলাম। তার পর আমি একটির পর একটি কথা বলে কেষ্টর সঙ্গে আলাপও জুড়ে দিলাম। সাংসারিক কথাবার্ত্তার ফাঁকে-ফাঁকে আমি কেইস সংক্রান্ত দুই-একটা কথা যে না পাড়ছিলাম, তাও নয়। অনেকেই জানেন যে দিনে কেউ ভূত বিশ্বাস না করলেও রাত্রে তারা তা করে থাকে। এর কারণ এই যে রাত্রে স্নায়ু তথা মন দুর্ব্বল থাকে। রাত্রিকালে মানুষের মন অতীব বাক-প্রয়োগশীল বা সাজেসসিভ্ হয়। এই কারণে রাত্রে মানুষকে যা তা বিশ্বাস করানও সম্ভব। বলা বাহুল্য যে আমি এই বিশেষ দুর্ব্বলতারই সুযোগ নিতে চাইছিলাম। এ ছাড়া ডেক চেয়ারের উপর শোয়ানরও একটা কারণ ছিল। মানুষ আরাম কেদারায় শুলে তার স্নায়ুগুলি এমনিই শিথিল হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় মানুষ যুক্তি-তর্ক রহিত হয় এবং সাময়িক ভাবে বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে। আমি জানতাম যে

কখন, কবে এবং কোথায় আঘাত হানতে হবে। এ কথা ও কথার পর বাক-প্রয়োগের দ্বারা আমি অচিরেই কেষ্ট বাবুকে অভিভূত করে ফেললাম। ইতিমধ্যেই কেষ্ট বাবু আমাকে তার একজন নিকট আত্মীয়ের মতনই মনে করে আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা চারজন অফিসার পালা করে রাত্রে ঘুমিয়ে নোবো এবং তার পর প্রত্যেকে তিন ঘণ্টা করে সারা রাত তাকে ঘুমতে না দিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দ্বারা তাকে জর্জরিত করে তুলবো। পরিশেষে নাচার হয়ে সে যে একটা স্বীকারোক্তি করবে তাতে আমাদের আর কোনও সন্দেহ ছিল না। এইরূপ অবস্থায় পড়ে মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। এর ফ.ল প্রশ্নবাণ হতে শুধু অব্যাহতি পাবার জন্যও তারা স্বীকারোক্তি করে ফেলে। যুরোপে এইরূপ ব্যবস্থাকেই বলা হয় থার্ড ডিগ্রি মেথড়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এতো অন্যায় অন্যায়ের মারপ্যাঁচে পড়ার আমাদের আর কোনও প্রয়োজন হয় নেই। আমার সহিত কথোপকথনের মধ্যে কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে আসামী কেষ্টো বাবু তার অনেক গোপন কাহিনীই আমাকে জানিয়ে দিলে। এমন কি, তাদের নেতাজী খোকা বাবুর বর্ত্তমান আবাসস্থলেরও একটা হদিশ সে বিনা দ্বিধায় আমাকে বলে ফেললে। এর পর আমি একটুকুও কালক্ষেপ না করে নিবিষ্ট মনে আসামী কেষ্টো বাবুর এই খুন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতিটুকু দ্রুত গতিতে টুকে নিয়েছিলাম।

"হঠাৎ সেদিন আমাদের দলের নেতা খাঁদা ওরফে খোকা এসে জানালো 'জানিস. একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে'। ছোটখাটো কাণ্ড আমাদের গা'সওয়া। এতে আমাদের আশ্চর্য্য হবার কিছু ছিল না। তাই ওস্তাদের এরূপ ব্যবহারে কোনওরূপ হদিশ না পেয়ে আমি তাকে শুধালাম 'কিসের কাণ্ড? কেউ ধরা পড়লো না'কি'? উত্তরে খোকা বাবু ওরফে খেঁদা বাবু আমাকে জানালো 'না না তা নয়। শোন তবে বলি—কাল মলিনার ঘরে আমি বসেছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমি দেখলাম যে দরজার বাইরে পুলিশ। এর পর উদ্‌গ্রীব হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলিস কি রে, তারপর?' খাঁদা উত্তরে আমাকে জানালো 'তারপর! হাঁ, বলছি শোন। মলিনাকে দরজাটা বন্ধ করতে বলে এক লাফে জানালা গ'লে আমি খড়া বয়ে রাস্তায় নামি এবং তারপর পিছনের সরু গলিটার ভিতর দিয়ে সটকান দিই। আমি চলে আসবার পর মলিনা দরজা খুলে দিলে পুলিশ ভিতরে এসে কাউ:ক না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে চলে যায়। কিন্তু এ সবই হচ্ছে ঐ পাগলা বেটার কাণ্ড। সেই আমার সম্বন্ধে পুলিশকে খবর দিয়েছে। এই পাগলা ছিল, হুজুর, মলিনাসুন্দরীর শিক্ষক. মলিনাকে সে গান শিখিয়েছে! মধ্যে মধ্যে মলিনার ঘরে এসে সে তবলাও বাজাত। বেচারা পাগলা মলিনাকে খুউব ভালো বাসতো। যতদূর আমি জানি মলিনাও অনুরূপ ভাবে তাকে ভালোবাসতো। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন বে-টাইমে খাঁদা আর আমি মলিনার ঘরে আসি। আমরা পাগলাকে এই সময় মলিনার ঘরে বসে থাকতে দেখে অবাক হই। খাঁদা পাগলার ঘাড় ধরে রুখে হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, আমি শা—প্রতি মাসে ৩৫০৲ টাকা করে গুণবো, আর তুমি শা—তার ফল ভোগ করবে। বেরো, শা—এখান থেকে। পাগলা বেরিয়ে যেতে যেতে খোকাকে বলে গিয়েছিল 'বেটা, জেল খারিজ গুণ্ডা, কে'না জানে তোকে। দাঁড়া, সব কথা আমি থানায় জানিয়ে দিচ্ছি। হাঁ হুজুর, এ সত্যি কথা। পরে আমরাও শুনেছি যে পাগলা থানায় খবর দেয় নি। সে সাহসও তার ছিল না। পুলিশ আকস্মিক ভাবে সেদিন মলিনার ঘরে হানা দিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের হুজুর, ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই আপনাদের ঘরে খবর পাঠিয়েছে। আমরা সকলেই পাগলার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনস্থ করি। আমাদের নেতা খাঁদা ওরফে খোকাবাবুর মতে মলিনার এতে কোনও দোষ ছিল না। এর কারণ এই যে মলিনা সব সময়ই মলিনা! ও-ত জানা কথা। ও'ত বিশ্বাসঘাতকতা করবেই। কিন্তু পাগলা সব বিষয় জেনে শুনে পরের ভাগে ভাগ বসায় কেন? এ'ছাড়া খাঁদার মতে পুলিশে এইজন্য খবর দেওয়াটা ছিল তার পক্ষে এক অমার্জ্জনীয় অপরাধ। পুলিশের দল হন্তে কুকুরের মত এক পাড়া হতে আর এক পাড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে। আমরা না পারবো বাঁচতে, না পারবো জীবনটা ভোগ করতে. এ আমাদের কাছে অসহ্য। সব দিক বিবেচনা করে আমাদের জীবনের পথের কাঁটা এই পাগলাকে আমরা 'ট্যাপ' করাই মনস্থ করলাম।

চৌঠা সেপ্টেম্বার ১৯৩৭ সালের সন্ধ্যায় আমরা দশ জনে মিলে পাগলা ওরফে অতুলকে সোনাগাছির ভিতর পাকড়াও করি। এই সময় সে তার একজন বন্ধুর সঙ্গে পথ চলছিল। খাঁদা পাগলার গলা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে হুঙ্কার করে উঠলো, 'জানিস আমি কে? আমি আর কেউ নয়, আমি খোকা। আমি তোর নাক কেটে দেবো। উত্তরে পাগলা সভয়ে খোকা বাবুকে বললে, 'এবারের মত মাপ কর ভাই। আমি কক্ষনো আর তার ওখানে যাবো না। ইতিমধ্যে ঐ পাড়ার মাতব্বর মণীন্দ্রবাবু—সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা শুনে মণীন্দ্রবাবু মধ্যস্থ হয়ে খোকাবাবুকে অনুরোধ করলেন, 'যাক্, এবারকার মত ওকে যেতে দ ও।' এর পর পাগলাকে কিছুক্ষণের মত সেখান থেকে আ.মরা যেতে দিই। কিন্তু সে কিছু দূর চলে আসার পরই আমি খাঁদার আদেশে তাকে পুনরায় চেপে ধরি এবং গোপী বাবু দৌড়ে গিয়ে আমাদের জন্য সেখানে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে পাগলা একবার আমাদের হাত ফস্কে নাকি বীণা নামে একটি স্ত্রীলোকের বাটীতে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু আমরা তার পিছু পিছু ধাওয়া করে তাকে পুনরায় পাকড়াও করে নিয়ে এসেছিলাম। ব্যাপার দেখে পাগলার সঙ্গী বন্ধুটি সরে পড়ছিল। গোপী বাবু তাকে চেপে ধরে বলে উঠলো, তুই আবার যাচ্ছিস কোথায় রে শা—। কিন্তু খোকা এই দিনের মত তাকে রেহাই দিতে বলায় সে তাকে ছেড়ে দেয়। এর পর আমরা সকলে মিলে জোর করে পাগলাকে ট্যাক্সিতে তুলি। আমাদের ট্যাক্সিখানা গরাণহাটার একটি শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে চলছিল। এমন সময় হঠাৎ পাগলা পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওগো, তোমরা আমাকে বাঁচাও। এরা আমাকে মেরেই ফেলবে।' পাগলাকে চেঁচাতে শুনে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ঐ মন্দিরের সামনেই তার গাড়ীখানা রুখে দিলে। সত্য গোয়ালা নামে একজন ব্যক্তি ঐ সময় ঐ মন্দিরের পৈঠায় মাথা ঠুকে প্রণাম

জানাচ্ছিল, 'ঠাকুর। বাবা তারকনাথ'। হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সিখানা থেমে যাওয়ায় ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজ হয়। এই আওয়াজ শুনে সত্যবাবু আমাদের দিকে ফিরে দেখে এবং আমাদের সেখানে এই ট্যাক্সির উপর বসে থাকতে দেখে সে ট্যাক্সীর কাছে ছুটে আসে। ইতিমধ্যে হারু গোঁসাই নামে এক স্থানীয় ভদ্রলোকও অন্যান্য পথচারীদের সহিত সেখানে এসে ভীড় করে। এই দুই ব্যক্তির সহিত আমাদের পূর্ব্ব হতে পরিচয় ছিল। এদের মধ্যে গোঁসাইজী ট্যাক্সির পাদানীর উপর উঠে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'এঁ্যা, ব্যাপার কি? পাগলা বাবু চেঁচায় কেন?' এই পাগলাকে ওরা আমাদের তবলচি বলে জানতো। সেই জন্য এরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহ করে নি। পাগলা কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক এদের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু নালিশ জানায় নি। তবে তার দুই চোখ দিয়ে তখন ঠিক বরষার ধারার মত জল গড়িয়ে পড়ছিল। নিঃশব্দে সে ট্যাক্সির উপর বসে রইলো। এই সময় মুখ দিয়ে তার একটা রা'ও বেরোয় নি। এদের এই প্রশ্নের উত্তর দিল খাঁদা নিজে। একটু হেসে ফেলে তাদের সে জানালো, 'আপনারাও যেমন। মদটা খেয়েছি একটু নেশাও হয়েছে। এখন আবার যাচ্ছি আর এক জায়গায় খেতে। এই সকলে মিলে একটু ফুর্ত্তি করতে হে হে—। এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিখানা আমাদের নির্দ্দেশ মত গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সিটাকে এখানে বিদেয় দিয়ে আমরা একটু মদ খেলাম। পাগলাকেও এখানে আমরা একটু মদ খাওয়ালাম। শেষ পর্য্যন্ত পাগলার বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে আমরা তাকে দুই একটা চড় চাপড় দিয়েই ছেড়ে দেবো। এই জন্যই বোধ হয় সে আমাদের প্রতিটি কথাই শুনে চলছিল। এর পর আমরা তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার ধার দিয়ে অগ্রসর হই। রাত তখন আটটা বেজে গিয়েছে। তবে ঐ দিন জোছনার রাত্রি ছিল। ইতিমধ্যে সাঁতরে গঙ্গা পার হয়ে আমাদের এক পরিচিত পুরানো পাপী গৌরিয়া সেখানে এসে উপস্থিত হলো। গৌরিয়া ছিল একজন সাধারণ 'থাউ' অর্থাৎ চোরাই মালের গ্রাহক বা ক্রেতা। বড় গোছের চুরিচামারি বা খুনখারাপীর মধ্যে সে কখনও থাকেনি। এই সকল ব্যাপারকে সে ভয় করেই চলে। তাকে সেখানে দেখে খোকা তাকে বললো, 'একে আমরা এখানে এনেছি ট্যাপ করবো বলে। আসবি তুই আমাদের সঙ্গে?' ট্যাপ করার প্রকৃত অর্থ গৌরী জানতো। সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল চোরাই মালের আশায়। খুনখারাপীকে সে বিশেষরূপে ভয় করে। আমাদের মুখে এই ট্যাপের কথা শুনে সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়লো। বিনা অনুমতিতে সরে পড়ায় খাঁদাবাবু গৌরিয়ার উপর ভীষণ চটে গিয়েছিল। একটা খুনের নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে। ভীষণরূপে ক্ষেপে উঠে খাঁদা আমাদের জানালো, আচ্ছা শা— যাক তো এখোন। পরে ওকেও দেখে নেবো আমরা।

এর পর খাঁদা পাগলাকে আদেশ করলো, 'যা নেমে যা গঙ্গায়। শীঘ্রি স্নান করে আয়।' আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাগলা গঙ্গায় নেমে চান করে এলো। পাগলা গঙ্গার পাড়ের উপরকার রাস্তায় উঠে এলে খাঁদা তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি রে গঙ্গাজল পান করেছিস? খোকার এই প্রশ্নের উত্তরে পাগলা তাকে জানিয়েছিল, না ভাই পান করিনি। এইবার ধমকে উঠে খাঁদা তাকে আদেশ করলো, যা শীঘ্রি গঙ্গাজল পান করে আয়। খাঁদার আদেশে পাগলা পুনরায় গঙ্গার জলে নেমে অঞ্জলি ভরে গঙ্গোদক পান করে এলো। আমি শুনেছি যে পাগলা ভালোরূপ সাঁতার জানতো। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে একবারও পালাবার চেষ্টা করে নি। এর পর খাঁদার নির্দ্দেশে আমরা তাকে নিকটের এক 'কাল ভৈরব' শিবের মন্দিরে নিয়ে আসি। খাঁদা পূর্ব্বের মত আবার তাকে আদেশ জানালো, 'যা বেটা যা ঠাকুর নমস্কার করে আয়।' মন্দিরের ঠাকুরকে প্রণাম করে ফিরে এলে খাঁদা পাগলাকে আবার জিজ্ঞেস করলো, চরণামৃত একটু খেয়েছিস তো? তার এই কথার উত্তরে পাগলা তাকে জানালো, না ভাই খাইনি তো। খাঁদা আবার তাকে ধমকে উঠে বললে, এঁ্যা? খাস নি। যা শীঘ্রি খেয়ে আয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খেঁদা মন্দিরের পুরোহিতকে বা সেখানকার অপর কাউকে তার এই আশু বিপদের সম্বন্ধে কোনও নালিশ জানায়নি। এমন কি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষায় চেষ্টাও সে করেনি। ঠাকুরের চরণামৃত পান করে সুবোধ বালকের মতই সে আমাদের নিকট ফিরে এসেছিল। এর পর আমরা পাগলাকে কুমারটুলির একটা সুয়ার্ড ডিচ বা মেথর গলির মধ্যে টেনে আনি। গলিটা ছিল একটি অপরিসর গলির পথ। একমাত্র মেথররাই সেই পথে যাতায়াত করে। চারি দিক অন্ধকার—নিঃশব্দ অন্ধকার। হঠাৎ খাঁদা আস্তিনার তলা থেকে হাতীর দাঁতে বাঁধানো তার সখের ছুরিখানা বার করে সেটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে বাম হাতে পাগলার জামার কলারটা চেপে ধরে তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বল দিকিনি পাগলা এটা কি? আসল ব্যাপারটা এতোক্ষণে পাগলার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে উত্তর করলো, ওটা-ওটা ভাই ছুরি। তোরা তো আমাকে মেরেই ফেলবি। আমি কিন্তু ভাই একেবারে নির্দ্দোষ। উত্তরে খেঁদা ভাবগম্ভীর স্বরে তাকে বললো, ও সব কথা আর নয়। বিচার হয়ে গিয়েছে। এই বার শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তবে হাঁ, একটা কথা। তোর কোনও শেষ ইচ্ছে আছে?

হঠাৎ পাগলার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'আমি মলিনাকে একবার দেখবো।' পাগলার এই কথায় আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম,' এঁ্যা। পাগলা বলে কি? যে মলিনাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই মলিনাকেই সে দেখবে!' হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম খাঁদার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠলো। চারি দিকে শুধু অন্ধকার। দেখা যায় সেখানে শুধু খাঁদার দুটো চোখ ও তার হাতের ধারালো চকচকে ছুরীখানা। এইরূপ অবস্থায় খাঁদা প্রায়ই হয়ে যেতো একটা নির্দ্দয় পশুর মত। এমন কি, সেই সময় তার চেহারাও যেত বদলে। এই সময় আমরা পর্য্যন্ত তার ভয়ে শিউরে উঠতাম। হিংস্র পশুর মত এগিয়ে এসে খাঁদা আমাদের হুকুম করলো 'ধর বেটাকে ভাল করে। আমি আর গোপী বাবু দুই দিক থেকে এসে তার দুই হাত সজোরে চেপে ধরলাম। খাঁদা বাবুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও ছিল না। অন্ধকারের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি যে পাগলার চোখ দুটো ভয়ে বুজে গিয়েছে। দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে খাঁদা বাবুর কিছু জ্ঞান ছিল। তার ঘরে আমি কয়েকটি এ্যানাটমির চার্টও টাঙানো দেখেছি। হৃৎপিণ্ড

ফুসফুস প্রভৃতির অবস্থিতি তার অজানা ছিল না। হঠাৎ আওয়াজ হলো, ক্যাচ ক্যাচ ক্যাঁচ। হৃৎপিণ্ড লক্ষ করে খাঁদা তিন তিন বার তার ছুরীখানা পাগলার বুকের ভিতর বসিয়ে দিলে। বিনা প্রতিবাদে পাগলের দেহটা রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

ব্যাপারটা দেখে আমরা সকলেই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হাওড়ার চোক পাগলা বাবু আমাদের পরিচিত ছিল। আমাদের মনের এই দুর্ব্বলতা খাঁদার চোখ এড়ায়নি। সে এই বার আমাদের সাহস দিয়ে বলে উঠলো, কি রে ভয় পেয়েছিস? এই কি আমাদের প্রথম কাজ? এতো ভয়ের কি আছে? এর পর খাঁদা ধীর স্থির মস্তিষ্কে গোপী বাবুকে আদেশ জানালো, 'যা তোর ডলিকে নিয়ে এখোন তুই হাওড়ার দিকে সরে পড়। আমিও আজ মলিনাকে নিয়ে কলকাতা ছাড়বো। গোপী বাবু খাঁদার নির্দ্দেশ মত ঐ স্থান থেকে চলে গেল খাঁদা আমাকে নিয়ে তার কুমুরটুলির বাড়ীতে আসে। এই সময় সামনের রকটায় বসে পাড়ার দেবেন বাবু হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের জামা কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, 'কি রে! তোদের জামা-কাপড় অতো রাঙা কেন? খাঁদা তার জামার আস্তিনার ভিতর হতে তার ধারালো ছুরীখানা বার করে ইসারায় তাকে চুপ করতে বললে দেবেন বাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখানে চুপচাপ বসে পড়ল। সেই সুযোগে আমরা খোকার বাটীর ভিতর এসে আমাদের রক্তমাখা জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলি। এর পর খাঁদার আবার কি খেয়াল হলো, কে জানে! সে আমাকে নিয়ে পুনরায় অকুস্থলে ফিরে আসে। ওখানে যাবার সময় একটা ভোজালিও সে জোগাড় করে। ভোজালিটা দিয়ে সে পাগলার গোড়ালির শিরা দুটো কেটে দেয় এবং তারপর সে পাগলার মুণ্ডটাও এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে একটা চটের বোরা আনবার জন্যে আদেশ জানায়। আমি চটের একটা থলে সংগ্রহ করে সেখানে ফিরে এসে দেখি যে, সেখানে খোকা নেই। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি খবরের কাগজে মোড়া পাগলার কাটা মুণ্ডটা তার কোঁচার খুঁটে আড়াল করে খোকা সেখানে ফিরে আসছে। আমাকে সেখানে দেখে খাঁদা গর্ব্বভরে আমাকে জানালো, জানিস, ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পাগলার এই মুণ্ডটা মলিনাকে দেখিয়ে এলাম। আর সেই সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করে এলাম যে এর পর আর কাউকে সে ভালবাসবে কি না? তার প্রিয়তমের এই কাটা মুণ্ডটা দেখে বেটী একেবারে দাঁত ছিরকুটে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল! সেই অবস্থাতেই বেটীকে সেখানে ফেলে রেখে আমি চলে এসেছি।' এর পর খোকা আমার আনা সেই বোরাটার মধ্যে পাগলার ঐ মুণ্ডটা পু'রে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসে। ঘাটের উপরদিককার একটা পৈঠার উপর খাঁদার পিতার এক বন্ধু সন্ন্যাসীবাবু একটা পোষা কুকুর নিয়ে বসেছিল। খাঁদাকে মুণ্ড সমেত বোরাটা জলে ফেলতে দেখে ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি রে খাঁদা কি ফেললি রে জলে? কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে খাঁদা উত্তরে তাকে জানিয়েছিল, ও কিছু নয়। একটা মরা বেরাল।

এদিককার সব কাজ হতে করে আমরা একটা সরু গলির পথ ধরে ফিরে আসছিলাম। এমন সময় আমরা লক্ষ্য করলাম, খাঁদার জুতা দুটো রক্তে ভিজে গিয়েছে। এইজন্য খাঁদা তার জুতো দুটো একটা গর্ত্তের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শুধু পায়ে চলে আসে। হাঁ হুজুর! জুতা দুটো এখনও সেখানে আছে। ঐ জায়গাটা এখুনি আপনাদের আমি দেখিয়ে দিতে পারি। এর পর খাঁদার কৃপানাথ লেনের ঐ বাড়ীতে আমরা পুনরায় ফিরে এসে উভয়ে আর একবার আমাদের জামা-কাপড় ছাড়ি। এই জন্যেই আপনারা ঐখানে দুই প্রস্থ রক্তমাখা জামা-কাপড় দেখতে পেয়েছিলেন।

এর পর হতে খাঁদার মনের মধ্যে কি হয়েছিল কে জানে? সে আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও সেই হত্যার স্থলে বারে বারে ফিরে যেতো। সে যাকে তাকে নিজের এই বীরত্ব সম্বন্ধে ফলাও করে গল্প করতো। ব্যাপার সুবিধে নয় বুঝে আমি খাঁদাকে নিয়ে দেওঘরে চলে আসি। সেইখানে খাঁদা 'রাজা অফ কুমুরটুলি' এই নামে পরিচয় দেয় এবং এর ফলে আমাকেই সেখানে খাঁদার দেওয়ান সাজতে হয়। আমরা এইখানে দান ধ্যান সুরু করি, ভিখারীদেরও সেখানে খাওয়াতে থাকি। দুই একদিন সেখানকার সরকারি কর্ম্মচারীদের সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েও দিই। আমাদের রাজোচিত ব্যবহারে দেওঘরবাসীরা মুগ্ধ হয়ে ওঠে। এই সময় খাঁদার খেয়াল হয় তার রাণীকে—অর্থাৎ কি না মলিনাকে সে সেখানে নিয়ে আসবে। আমরা শুনেছিলাম যে আপনারা মলিনার বাটীতে পাহারা বসিয়েছেন। হাঁ হুজুর! আপনি ঠিকই জেনেছিলেন যে মলিনাকে না দেখে খাঁদা কিছুতেই থাকতে পারে না। মলিনাকে দেখবার জন্যে তার ওখানে তাকে আসতেই হবে। তবে আপনারা যেমন আমাদের উপর নজর রাখবার জন্যে গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকেন, আমরাও তেমনি আপনাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য বেতনভুক গুপ্তচর রেখে থাকি। আমাদের নিযুক্ত গুপ্তচরেরা কলিকাতা হতে খবর দিয়েছিল যে কয়েক দিন হলো মলিনার ওখানে আপনারা পাহারা দেবার জন্য সিপাহীদের আর পাঠাচ্ছেন না। আপনাদের এই ভাঁওতায় ভুলে গিয়ে মলিনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওঘরে নিয়ে যেতে এসেই না আমি আপনাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। হাঁ হুজুর, খাঁদার দেওঘরের আস্তানা আপনাকে আমি দেখিয়ে দেবো। সে এখনও সেখানে আছে এবং আমার জন্য সেখানে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু দেখবেন হুজুর, আমার এই স্বীকারোক্তির কথা যেন সে জানতে না পারে। একথা সে জানতে পারলে তার হাতে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। হাঁ, এই ব্যাপারে একটা জরুরী কথা আপনাদের আমি বলতে ভুলে গিয়েছি। পাগলাকে হত্যা করার পরদিনই খোকা আমাকে নিয়ে তার প্রতিশ্রুতি মত সেই পলাতক গৌরীর খোঁজে শেওড়াফুলি যায় এবং সেখানে গিয়ে তাকে এবং তার বন্ধুদের মারপিট করে আসে। আমি যে সত্য কথা বলছি তা সেখানে গিয়ে আপনি এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন। আসলে খাঁদা কাউকে কখনও ক্ষমা করে নি। আমাকেও এইজন্যে সে ক্ষমা করবে না। আপনারা দেখবেন হুজুর! সে আমাকেও তার প্রতি এই বেইমানির জন্য হত্যা করবে। আপনিও খুউব সাবধানে থাকবেন। দেওঘরের রাস্তায় যদি একবার সে আপনাকে দেখে তো তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে গুলী করে মারবে"।

আসামী কেষ্টোবাবুর এই দীর্ঘ বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করে আমি ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম যে ভোর পাঁচটা বাজতে চলেছে। ভোরের হাওয়া ও সেই সঙ্গে ভোরের আলো আসামী কেষ্টোবাবুর গাত্রস্পর্শ করা মাত্র কিন্তু কেষ্টোবাবু সচেতন হয়ে উঠলো। খুউব সম্ভবতঃ কেষ্টোবাবু এই সময় ভাবছিল যে সে একি করলে? আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে কেষ্টোবাবু অনুশোচনায় অস্থির হয়ে উঠছে! সে তার সম্বিত ফিরে পেয়ে হয়তো ভেবেছিল যে, সে নিজে তো মরলোই—সেই সঙ্গে সে তার গুরুজীর প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলো। এই সময় হঠাৎ শুনলাম যে কেষ্টো বাবু ক্ষেপে উঠে আমাকে বলছে 'আপনি আচ্ছা শয়তান তো মশাই? ফাঁকি দিয়ে সব কথা বার করে নিলেন। যা খুশী আপনি করতে পারেন। আমি আপনাকে আর কিছুই বলবো না'। কিন্তু কেষ্টোবাবুর বলবার আর বিশেষ কিছু বাকী ছিল না। প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ইতিমধ্যেই আমি তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। কেষ্টোবাবু দেওঘরের খোকার আস্তানার ঠিকানা ইতিপূর্ব্বেই আমাকে বলে দিয়েছিল। উপরন্তু সে নিজে হাতে তার সেইখানকার সেই বাড়িটার একটা নক্সা আশে-পাশের' পথঘাটের পরিপ্রেক্ষিতে এক টুকরো কাগজের উপর আমাকে এঁকেও দিয়েছিল। কেষ্টোবাবুকে আমার আর কোনও প্রয়োজন না থাকায় তাকে এইবার আমি হাজত ঘরে পুরবার জন্ত পাহারাদার সিপাহীদের আদেশ দিয়ে লিপিবদ্ধ বিবৃতিটি অনুধাবন করে তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলির সত্যতা যাচাই করবার জন্ত সেইগুলি পৃথক ভাবে একটি কাগজে টুকে নিলাম। আসামী কেষ্টোবাবুর এই বিবৃতির মধ্যে এই হত্যা সম্পর্কে কয়েকজন মূল্যবান সাক্ষীর নাম পাওয়া গিয়েছিল। এই সকল সাক্ষীদের মধ্যে সত্য গোয়ালা, হারু গোঁসাই এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিল অন্যতম। আমি এর পর দিনের আলো ফুটে উঠতেই বাইরে বেরিয়ে পড়ে এই তিন জনা অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের খুঁজে বার করে থানায় এনে হাজির করলাম। ইতিমধ্যে সুনীল বাবুও চা পান সমাপনান্তে তাঁর আফিসঘরে নেমে এসেছেন। পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসিত হলেও এই তিন জন সাক্ষী আসামী কেষ্টোবাবুর বিবৃতির অনুরূপই এক একটি বিবৃতি আমাদের নিকট প্রদান করেছিল। এই নিরপেক্ষ সাক্ষী তিনটির সাক্ষ্য হতে বুঝা গেলো যে আসামী কেষ্টো বাবু গত রাত্রে এই খুন সম্পর্কে আমার নিকট সত্য কথাই বলেছে। কিন্তু বহু সাধ্যসাধনা করা সত্ত্বেও কেষ্টোবাবু আমাদের সঙ্গে গিয়ে তার বিবৃতি অনুযায়ী সেই গলি হতে খোকা বাবুর পরিত্যক্ত রক্তমাখা জুতা জোড়াটি বার করে দিতে রাজী হলো না। আমি প্রস্তাব করলাম যে আমরাই ঐ গলিটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে ঐ রক্তমাখা জুতা দুটি উদ্ধার করে আনবো। কিন্তু ইনেস্পেকটার সুনীল রায় অভিমত প্রকাশ করলেন যে, আসামী নিজে পুলিশকে অকুস্থলে নিয়ে গিয়ে ঐ জুতা জোড়াটি তাদের দেখিয়ে না দিলে আদালতের নিকট প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে উহার কোনও মূল্য থাকবে না। এই জন্ত ইনেসপেকটার রায় আমাদের উপদেশ দিলেন যে, এই সম্পর্কে পুনরায় কেষ্টো বাবুর সুবুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করাই সমীচীন হবে। কিন্তু এর পর শত চেষ্টা করেও আমি তার মধ্যে তার পূর্ব্ব মনোভাব আর ফিরিয়ে আনতে পারি নি। অগত্যা এর পরের দিনেই তাকেও গোপী বাবুর মত জেলহাজতে পাঠিয়ে আমাদের দিতে হয়েছিল। এই সময় আসামী কেষ্টো বাবু ক্ষোভে অভিমানে অস্থির হয়ে বারে বারে হাজত-ঘরের লোহার গরাদের উপর মাথা ঠুকে রক্তারক্তি করছিল। এই জন্ত তাকে আর একদিনও পুলিশ হেপাজতিতে রাখতে আমাদের সাহস হয় নি।

এক্ষণে আসামীদের মধ্যে সকলকেই একে একে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। বাকি ছিল শুধু মূল হত্যাকারী ঐ দলের নেতা খোকা ওরফে খেঁদা। পরিশেষে এই রাবণ বধের ভারও আমাকেই স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে তুলে নিতে হয়েছিল। এই সময় একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা আমাকে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে বেপরোয়া করে তুলেছিল। এই জন্ত নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও আমিই উপযাচক হয়ে খোকার সন্ধানে দেওঘরে যাত্রা করার জন্তে প্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

[ক্রমশঃ।

আকাশের প্রতি

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

আমিও তোমার মত রিক্ত নিঃস্ব হয়েছি এখন।
মাটি নেই, ঘর নেই, নেই কোন মানুষের প্রীতিবন্ধন
শুধু নীল বেদনায়, তিল তিল শুধু হতাশ্বাস
শূন্য হয়ে গেছে সব জীবনের সোনালি আশ্বাস।

দিবসে দুঃখের জ্বালায় আমি জ্বলি তোমারি মতন
সারা রাত বক্ষে মোর শতকোটি কামনার করুণ ক্রন্দন
নির্বাক নিস্পন্দ তবু। নিষ্ফল বেদনায় থাকি চিরমূক
অশ্রুর শিশির দিয়ে সিক্ত শুধু করি এই বুক।
আমারও দিগন্ত জুড়ে মাঝে মাঝে নেমে আসে মেঘ
সঞ্চিত ব্যথার মত পুঞ্জ পুঞ্জ বিবর্ণ আবেগ
বিষণ্ণ শ্রাবণ আসে, ছেয়ে ফেলে আমার অন্তর
ক্লান্তিহীন বরষণে ঝরে পড়ে কান্নার করুণ নির্ঝর।

তুমিও আমারই মত হে আকাশ!
একদিন হয়েছিলে বহু কিছু চেয়ে ব্যর্থকাম
তাই আজ সমস্ত চাওয়ার উর্দ্ধে ধ্যানমৌন তুমি নিষ্কাম—
তৃপ্তির আসন পেতে বসে আছ নির্বিকার সিদ্ধ যোগাসনে
অন্তরের শূন্যতা যত লুকায়েছ পূর্ণতার ছদ্ম আবরণে।

বেদনায় নীলে নীলে তোমায় আমায় আজ মিলেছি দু'জন
আমিও তোমার মত রিক্ত শূন্য হয়েছি এখন।

দেশে-বিদেশে

পৌষ, ১৩৬৬ (ডিসেম্বর, '৫৯ জানুয়ারী '৬০)
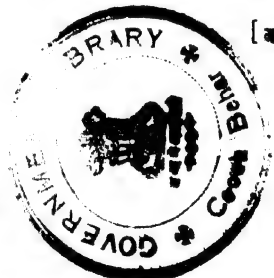
অন্তর্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর): লোকসভায় দ্বিতীয় পে-কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিতর্কের সূচনা—কমিশনের সুপারিশ নৈরাশ্যজনক বলিয়া বিরোধী পক্ষের অভিযোগ।

কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার (৮০) হায়দ্রাবাদে পরলোকগমন।

২রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর): ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের (৭৫ হাজার) মাগ্‌গীভাতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

৩রা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর): দ্বিভাষিক বোম্বাই রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া বোম্বাই ও গুজরাট দুইটি নূতন রাজ্য গঠন—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদন সূচক প্রস্তাব প্রকাশ।

৪ঠা পৌষ (২০শে ডিসেম্বর): দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকী-করণ অত্যাবশ্যক—নয়াদিল্লীর আলোচনা চক্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

৫ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর): ২৬শে ডিসেম্বর চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ-এর সহিত বৈঠকে অসম্মতি জ্ঞাপন—চৌ-এন-লাই-এর প্রস্তাবের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু।

৬ই (পৌষ ২২শে ডিসেম্বর): আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসাই ভারতের অভিপ্রেত—লোকসভায় বিতর্কের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

৭ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর): আকস্মিকভাবে পাঞ্জাব বিধান সভা অধিবেশন মুলতুবী রাখার সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যদের বিধানসভা-কক্ষ ত্যাগ।

৮ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর): কানপুরে টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভের গৌরব অর্জ্জন।

বিশ্ব ভারতীয় সমাবর্ত্তন উৎসবে আচার্য্য শ্রীনেহরুর (প্রধান মন্ত্রী) মন্তব্য—অচলায়তন সমাজ জাতির অগ্রগতির অন্তরায়।

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর): বাঙ্গালোরে তিন দিবসব্যাপী নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সুরু—মূল সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী।

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর): জাতীয় মর্য্যাদা বিকাইয়া দিয়া শান্তি সংস্থাপনে ভারত রাজী নয়—চীন-ভারত সম্পর্ক প্রশ্নে কানপুরে দেশরক্ষা সচিব শ্রী ভি. কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর): নাগা বিদ্রোহীদের আক্রমণে ডিমাপুর ও ফারকাটিং-এর মধ্যে ট্রেন চলাচল ব্যাহত।

'শিক্ষা সঙ্কোচ বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় নহে'—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তি।

১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর): গণতান্ত্রিক ও শিক্ষাভিত্তিক সমাজের উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—জব্বলপুরে নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনে অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্তের (সভাপতি) ভাষণ।

নয়াদিল্লীতে বিশ্ব নয়া শিক্ষা সমিতির দশম বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর দাবী—সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর): রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রথম ব্লাষ্ট ফার্ণেসের উদ্বোধন।

পরিবহন কর্ম্মিদের ধর্ম্মঘটের ফলে বোম্বাই নগরীতে বাস ও ট্রাম চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ।

১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর): দার্জ্জিলিং জেলার নানাস্থানে বহু তিব্বতীর সন্দেহজনক গতিবিধির সংবাদ।

১৫ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর): নাগা তৎপরতা বৃদ্ধির দরুণ পাকিস্তানের সন্নিহিত আসামের তিনটি মহকুমা রাজ্যপাল জেনারেল এস এম শ্রীনাগেশ কর্ত্তৃক উপদ্রুত অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত।

১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী '৬০); ভারত সরকারের নিকট চীনের নূতন নোট প্রেরণ—ভারত চীন সীমান্ত সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য সরবরাহ।

১৭ই পৌষ (২রা জানুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গে সভা-শোভাযাত্রা, সমাবেশ প্রভৃতি কার্য্যও নিষিদ্ধ করণের আয়োজন—বিধান সভায় পরবর্ত্তী অধিবেশনে সরকার কর্ত্তৃক নূতন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত।

১৮ই পৌষ (৩রা জানুয়ারী): বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে শুভ ও অশুভ সম্ভাবনা—বোম্বাই-এ ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী): পাক্-ভারত বিভিন্ন অমীমাংসিত আর্থিক প্রশ্ন সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে উভয় রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের চার দিবসব্যাপী আলোচনার সন্তোষজনক সমাপ্তি।

আরও দুই সহস্র শিবিরবাসী উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের ব্যবস্থা—কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত।

২০শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী): কেন্দ্রীয় শ্রমসচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ঘোষণা—তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইবে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

অন্তর্বর্ত্তী নির্ব্বাচনের জন্য কেরলে ১লা ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে ছুটির দিন ঘোষণা।

কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করার স্বপ্ন কখনই সফল হইবে না—চীন ও পাকিস্তানের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের সতর্কবাণী।

২১শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী): মধ্য প্রদেশের দামুরায় কয়লা খনিতে আকস্মিক প্লাবনের ফলে ১৬ জন শ্রমিকের সলিল সমাধি।

ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম 'বিধান-সরোবর' করার প্রস্তাব—কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রস্তাবের নোটিশ।

২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী): শ্রীএন্ সঞ্জীব রেড্ডী কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁহার স্থলে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রমমন্ত্রী শ্রীদামোদরম সঞ্জীবায়া রাজ্য পার্লামেণ্টারী দলের নেতা (রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী) নির্ব্বাচিত।

২৩শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী): ইণ্ডিয়ান পাইলটস গীল্ডের আহ্বানে এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশানাল কর্পোরেশনের বৈজ্ঞানিকদের আকস্মিক ধর্ম্মঘট—বিদেশগামী বিমান চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি।

পাক্ ভারত সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে নয়াদিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের দ্বিতীয় পর্যায় বৈঠক সুরু।

২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী): শনিবারের ছুটি ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ হাজার কর্ম্মচারীর (কলিকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গে কর্ম্মরত) অর্দ্ধ ঘণ্টা কর্ম্মবিরতি।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক শিলং-এর সন্নিহিত বড়পানিতে আসামের বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার উদ্বোধন।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী): মহাসমারোহে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্ত্তৃক পাণ্ডুতে (গৌহাটির সন্নিহিত) বৃহৎ ব্রহ্মপুত্র সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্ম্মাণে ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ—সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় রেলওয়ে সচিব শ্রীজগজীবন রামের ঘোষণা।

২৬শে পৌষ (১১ই জানুয়ারী): সদাশিবনগর (বাঙ্গালোর) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশন আরম্ভ—সভাপতি শ্রীএন্ সঞ্জীব রেড্ডী।

নেফা, মণিপুর, নাগা পর্ব্বত ও ত্রিপুরা আসামের সহিত যুক্ত হইবে না—গৌহাটিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় (দিল্লী) কলিকাতার লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দলের দ্বিতীয়বার ডুরাণ্ড কাপ লাভ।

ভারত-পশ্চিম পাকিস্তান (পাঞ্জাব) সীমান্ত সংক্রান্ত সকল বিরোধের নিষ্পত্তি—দিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২৭শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী): ভারত সীমান্তে চীনা আক্রমণের তীব্র নিন্দা—সদাশিবনগরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণ।

২৮শে পৌষ (১৩ই জানুয়ারী): কলিকাতায় ট্রাম ও বাসে ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ—পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃবৃন্দের যৌথ বিবৃতি।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): মণিপুরের গ্রামে সশস্ত্র নাগা বিদ্রোহীদের হানা—গ্রাম্য নাগা সর্দ্দার নিহত ও অপর দুইজন আহত হওয়ার সংবাদ।

বহির্দেশীয়—

১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর): টিউনিসে প্রেসিডেণ্ট হাবিব বরগুইবার সহিত মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

২রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর): ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাই-এর আর এক দফা পত্র—২৬শে ডিসেম্বর চীনে বা রেঙ্গুণে নেহরু-চৌ বৈঠকের প্রস্তাব।

৫ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর): ২৭শে এপ্রিল প্যারিসে প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব—পশ্চিমী শীর্ষ বৈঠকান্তে (প্যারিস) রুশিয়ার নিকট লিপি প্রেরণ।

৭ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর): এগারোটি দেশে 'শান্তি সফরান্তে' মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ওয়াশিংটন প্রত্যাবর্ত্তন।

ইরাক-ইরাণ সীমান্তে উভয় পক্ষের সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশ।

৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর): বসন্তকালে প্রাচ্য-প্রতীচ্য শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মতি।

১০ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর): সোভিয়েট অভিযাত্রী দল কুমেরু (দক্ষিণ মেরু) উপনীত ('টাস' প্রচারিত সংবাদ)।

সীমান্ত বরাবর ইরাকী সৈন্য সমাবেশের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ইরাণ কর্ত্তৃক সীমান্তে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বাহিনী মোতায়েন।

১২ই পৌষ (২৮শে ডিসেম্বর); ১৫ মার্চ্চ জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ কমিটির প্রথম বৈঠক—পশ্চিমী প্রস্তাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্মতি।

১৩ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর): ১৬ই মে পূর্ব্ব-পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানে রুশিয়ার নিকট পশ্চিমী ত্রিশক্তির নূতন প্রস্তাব পেশ।

১৪ই পৌষ (৩০শে ডিসেম্বর): পূর্ব্ব-পশ্চিম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের পশ্চিমী প্রস্তাব (১৬ই মে) সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক গ্রহণ।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সিরীয় অঞ্চলের ৪ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ।

১৬ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, '৬০): রুশিয়ার পক্ষে একতরফা-ভাবে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রতিরক্ষার জন্য রকেট ব্যবহার করাই সঙ্গত হইবে—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী): পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধ সমূহের মীমাংসার জন্য লাহোরে পাঁচ দিবসব্যাপী সম্মেলন আরম্ভ।

২১শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী): সিংহল মন্ত্রিসভার আরও পাঁচজন মন্ত্রী (শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টিভুক্ত) পদচ্যুত।

২২শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী): রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভ কর্ত্তৃক ইন্দোনেশিয়া যাইবার পথে ভারত সফরের সরকারী আমন্ত্রণ গ্রহণ।

পশ্চিম বার্লিন পার্লামেণ্টে নয়া নাৎসী সংস্থা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গৃহীত।

২৪শে পৌষ (৯ই জানুয়ারী): পাকিস্তানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ-পর্ব্ব—সরকার কর্ত্তৃক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ।

মঙ্গল গ্রহে রকেট অভিযানের জন্য সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের প্রস্তুতি—মস্কোর ষ্টার্নবার্গ জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগারের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মার্তিনোভের ঘোষণা।

২৫শে পৌষ (১০ই জানুয়ারী: চীন-ভারত সীমানা বিরোধ যুদ্ধে পরিণত হইবে না—তেজপুরে দেশরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

২৭শে পৌষ (১২ই জানুয়ারী): কেনিয়ায় সাত বৎসরব্যাপী আপৎকালীন অবস্থার অবসান।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সুয়েকার্ণো কর্ত্তৃক দেশের রাজনৈতিক দলগুলি নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ।

২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী): রুশিয়ার সৈন্যসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ (এক কোটি ২০ লক্ষ) কমাইয়া দেওয়া হইবে—সুপ্রীম সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

দক্ষিণ পেরুতে ভূমিকম্পে ৩৮ জন নিহত ও দুই শত জন আহত হওয়ার সংবাদ।

রঙ্গপট

"সেতু"—বিশ্বরূপা

বিশ্বরূপার নতুন নাটক সেতুর সম্যক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় যে, এমন উচ্চস্তরের নাটক মঞ্চজগতে বিরল। নাটকটি এক কথায় সুরুচিসম্পন্ন ও ত্রুটিহীন। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য্যকে অভিনন্দন জানিয়ে তাই আলোচনা সুরু করি। কিরণ মৈত্রের কাহিনীতে তিনি সার্থক নাট্যরূপ আরোপ করেছেন। নাটকটির আখ্যান ভাগ আমাদের মনটাকে নাড়া দেয়। অথচ সেই চিরপুরাতন প্রথায় মানুষের মনের দুর্ব্বল কোণে আঘাত করে দুর্ব্বল নাটককে জমিয়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নেই, আবার তেমনি বাস্তবধর্মী ও নতুনত্ব করবার অহেতুক মোহে নাটকটিকে আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক করে তোলা হয়নি। সর্ব্বত্র নাটকটিই প্রধান স্থান পেয়েছে এবং তাকে পরিণতি দেবার জন্যই চার পাশের যত কিছু আয়োজন।

নাটকটির প্রতিটি চরিত্র পরিপূর্ণ ও সার্থক। নায়িকা অসীমার দুরূহ চরিত্রটি শিল্পীর হাতে অনেক যত্নে আঁকা। নাটকের অনেকখানি অংশ জুড়ে তার চরিত্রটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ভাইতারকে ছুটি মঞ্জুর করার আকস্মিক অনিচ্ছায় তার অন্তরের গোপন চেতনার যে স্বপ্ন প্রকাশ ঘটেছে তা অনবদ্য, ফুল সাজাতে সাজাতে ক' লাইন আবৃত্তিতে তার অন্তরের উচ্ছ্বাসিত আনন্দের যে অভিব্যক্তি ঘটেছে, তা অবিস্মরণীয়। কি জটিল, গম্ভীর মুহূর্ত্তে, কি হাস্যোজ্জ্বল হাল্কা পরিবেশে—সর্ব্বত্রই কথোপকথনগুলো প্রথম শ্রেণীর হয়েছে। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলো তো কাহিনীকারের অনবদ্য সৃষ্টির স্বাক্ষর বটেই, কিন্তু কোন পার্শ্বচরিত্রও অসম্পূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে সব আগে মনে পড়ে মাসীমার চরিত্রটি, স্বপ্নের সাধ যাঁর বাস্তব 'স্বপত্রে' পূর্ণ হতে পেল না। আর ভাবী সন্তান বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক আর না করুক, সে যেন উদার হৃদয়, আত্মভোলা, মহান এক মানুষ হয়, অসীমার এই মনোভাবটি নাট্যকারের একটি রসোত্তীর্ণ তুলিকাস্পর্শ।

পার্কের দৃশ্যটি সুন্দর, আপাত-অবান্তর ছাড়া ছাড়া ঘটনাগুলো নিয়েই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ হয়েছে। উপরন্তু এই দৃশ্যে সুকান্তির বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে দেওয়ার মধ্যে সুপরিকল্পনার স্বাক্ষর আছে।

প্রতি দৃশ্যেই সেট-সেটিংগুলি ভাল। বিশেষতঃ রেল-যাওয়ার দৃশ্যটির পরিকল্পনা অভিনব ও সার্থক। এজন্য তাপস সেনের সুপরিকল্পিত আলোক-সম্পাত উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

তবু নাটকটিতে কয়েকটি সূক্ষ্ম ত্রুটি চোখে পড়ে, যেগুলি অন্য কোন সাধারণ নাটকে উপেক্ষা করা গেলেও এমন অনন্যসাধারণ নাটকে তাদের উপস্থিতি পীড়াদায়ক। যেমন বার বার বলা হয়েছে পুলকেশ ছ'মাস ছিল না, কোথায় এবং কেন ছিল বলাটা স্বাভাবিক ছিল। পিছনের লাল বাড়ীর জানলায় সুনন্দা সকল দর্শকের চোখে পড়েন না সামনের কৌচে ঢাকা পড়ে যান, অথচ সহজেই তাঁকে দোতলার জানলায় দেখানো যেত। শিশুদের চীৎকার স্বাভাবিক হয়নি। পর্দ্দা টেনে চীৎকার বন্ধ করা কি সম্ভব? আরও আছে। শেষ দৃশ্যের শুরুটা আনন্দে—পুলক-রীতার রেজিষ্ট্রী অফিস থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা আর বরণের প্রস্তুতিতে সেক্ষেত্রে অসীমার কালো শাড়ীটা একটু দৃষ্টিকটু নয় কি?

কিন্তু উচ্চশ্রেণীর অভিনয়ে এসব সামান্য ত্রুটি সহজেই উপেক্ষণীয় হয়েছে। কুশলী শিল্পীদের দক্ষতায় নাটকের অনেক না বলা বাণীও মুখর হয়ে উঠেছে দর্শকের অনুভূতিতে।

অসীমার চরিত্রটি একটি উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি। মাতৃত্বের আকুলতা তাঁকে নারীর শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা দিয়েছে। হৃদয়বান স্বামীর স্নেহ, দেওরের ভালবাসা আর্থিক প্রাচুর্য্য, সব কিছু পেয়েও তার অন্তরে যে রিক্ততা, যে ক্রন্দন প্রতিদিন তারই প্রকাশ ঘটে বার বার— অকারণে সে রেগে ওঠে, ব্যবহারটা ক্ষণিকের জন্য রুক্ষ হয়ে ওঠে। আবার যখন আসে কর্ত্তব্যের আহ্বান, তখন তাকে আপনার সকল ব্যথা ভুলে সাড়া দিতেই হয়, চোখের জল তার মুখের হাসিতে ধরা পড়ে না। এই সব কিছু মিলিয়েই সে একটি পরিপূর্ণ মানবী। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র (বহুরূপী)। যে অভিনয় ভাষায় বর্ণনা করা চলে না। ভবতারণকে ছুটি নামঞ্জুর করায় দৃশ্যে, অণিমার বাড়ী নিমন্ত্রণ যাওয়ায় আপত্তিতে, অণিমার বাড়ীর বেদনাদায়ক ঘটনায়, ভাবী মাতৃত্বের পূর্ণতায় তিনি অসাধারণ, আর শেষ দৃশ্যে শূন্যতার হাহাকারে তিনি অতুলনীয়া। প্রকৃতপক্ষে তাঁর অভিনয় একান্ত ভাবে তাঁরই, তার কোন সংজ্ঞা নেই। নামের পাশে "বহুরূপী"র উল্লেখে, কণ্ঠস্বর বাচনভঙ্গীতে প্রতি মুহূর্ত্তের অভিব্যক্তিতে তিনি বিশিষ্ট। প্রার্থনা করি এই বিশেষত্ব তাঁর চিরস্থায়ী হোক।

অসীমার স্বামী তাপস রায় একদিকে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী, সুকান্তি বেবিফুডের মালিক, আর অন্যদিকে স্নেহ-প্রেমে ভরপুর একটি মানুষ। চরিত্রটির সার্থক রূপ দিয়েছেন শ্রীঅসিতবরণ মুখোপাধ্যায়। পুলক-রীতার প্রতি হাস্যোজ্জ্বল ব্যবহারে তিনি স্বাভাবিক, অসীমার প্রতি স্নেহ ও মমতাবোধের প্রকাশে তিনি অপূর্ব্ব! প্রথম দৃশ্যে সীমা বলে ডাকার থেকে, নাটক সমাপ্তির মুহূর্তটিতে অসীমার বেদনা-ব্যাকুল প্রশ্নে নিরুত্তরে তার মাথায় হাতটি রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অবধি, সর্ব্বত্র শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের উজ্জ্বল অভিনয়ের পাশে তাঁর অভিনয় যে কোথাও এতটুকুও ম্লান হয়নি, এই-ই তাঁর কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

অভিনয়ের দিক থেকে এর পরই মাড়োয়ারী কংকরের ভূমিকায় শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম করতে হয়। হাব-ভাবে, বাচনভঙ্গীতে শঠ মাড়োয়ারীর রূপটি তিনি সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়েছেন। জোচ্চুরীর প্ল্যান, লক্ষ্মি পিয়ে আসা ঘুষ দিয়ে পুলিশকে হাত করা সম্বন্ধে আস্থা এবং সর্ব্বোপরি জালিয়াতির পয়সায় এক অংশ ব্যয়

করে তিনি ভগবানকে খুশী করে রাখার মনোভাব—সব কিছু মিলিয়ে সাহিত্যে কংকরজী একটি বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি।

অপরেশের ভূমিকায় মমতাজ আহমেদ সুঅভিনয় করছেন। পুলকেশের ভূমিকায় তরুণকুমারের পরিবর্তে সেদিন ছিলেন শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্বাভাবিক সুন্দর অভিনয় মনেই রাখতে দেয় না যে তিনি প্রতিদিন এই ভূমিকায় নামেন না। অন্যান্য ভূমিকায় শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীসন্তোষ সিংহ, জয়শ্রী সেন, শ্রীসুব্রতা সেন, শ্রীইরা চক্রবর্তী, শ্রীআরতি দাস প্রভৃতি সকলেই ভাল অভিনয় করেছেন। তবে প্রধান শিল্পীদের পাশে সুব্রতা সেনকে একটু আড়ষ্ট লাগে।

সেতুর সাফল্যের পিছনে আছে নাট্যকার পরিচালক, অন্যান্য কলাকুশলী ও শিল্পিবৃন্দ—সবার আন্তরিক সহযোগিতা। এই সহযোগিতার তালিকায় বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষের নামটিও যোগ করতে হয়। সেতু মঞ্চস্থ করে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ যে উচ্চশ্রেণীর রুচিজ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা একেবারে নির্ভেজাল—ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি তাতে মেলে নি মোটেই। সর্বশ্রেণীর দর্শকের মন ভোলাবার সস্তা বাসনার প্রকাশ এতে যে কোথাও ঘটেনি তাতে (ভেতরের কথা ভাবলে) নাট্যকারের চেয়ে প্রোপাইটারের অবদান একটুও কম নয়। চটুল নৃত্য তো নয়ই এমন কি রীতার কণ্ঠেও একখানি 'ড্রয়িংরুম' সঙ্গীত স্থান পায় নি—এটা মস্ত বড় কথা। শুনেছি শুধু রেডিও মারফৎ শ্রীহেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের "আমার মন মানে না' রেকর্ডটির দুটি লাইন আর শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের কণ্ঠে "নববর্ষা" কবিতাটির কয়েক লাইন। দু'ক্ষেত্রেই মনটা অতৃপ্তই রয়ে গেল বরং। তবু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রেকর্ডটা ঘরে বসেও শোনা যেতে পারে, দ্বিতীয়টি সুলভ নয় বললে অত্যুক্তি হবে না। অপ্রত্যাশিত ভাবে আবৃত্তির সূচনায় তাই পুতুলখেলার সেই অননুকরণীয় কণ্ঠস্বরের আভাস পাবার দুরাশা জেগেছিল মনে।

বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ ও কর্মিবৃন্দ শুধু ভঙ্গী চোখ না ভুলিয়ে সারবস্তু দিয়ে মন ভরাচ্ছেন আমাদের—তাঁরা তাই অশেষই ধন্যবাদার্হ।

রাজা সাজা

নিজেই লেখক নিজেই পরিচালক নিজেই অভিনেতা এক যোগে এই ত্রিবিধশক্তির পরিচয় দিলেন বিকাশ রায় তাঁর রাজা সাজা ছবিতে। গ্রাম্য শিক্ষক রজতশুভ্র হঠাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে এক বিরাট সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে, এ সম্পর্কে পূর্বে সে কিছুই জানত না জমিদারীর ম্যানেজার তাকে খুঁজে বের করে এ বিষয়ে অবহিত করে, তারপর তার জীবনে আসছে একটি মেয়ে। নাম তার মালিনী। ম্যানেজার চক্রান্ত করে এই সুযোগে অর্থ উপার্জন করার যা সে চিরকাল ধরে করে এসেছে। সহকারী ম্যানেজার ম্যানেজারের আসল রূপটি প্রকট করে তোলে রজতের সামনে—ম্যানেজারকে বরখাস্ত করে রজত সঙ্গে সঙ্গে মালিনীকেও ভুল বুঝতে আরম্ভ করে—ম্যানেজারের নিজের স্বার্থে ঘা পড়ার সেও মরিয়া হয়ে উঠল রজতের বিরুদ্ধে, মামলা জুড়ে রজতকে পাগল প্রমাণিত করার চেষ্টা করতে থাকে—মামলার দিন শুনানীর মধ্যবর্তী বিরতিকালে মালিনীর অনুনয়ে রজত তখন মুখ খুলল—পূর্বে সে চুপ করে শুধু বসেছিল, ছবি আঁকছিল শব্দ পর্যন্ত করে নি—শেষে তার বিবৃতি অনুধাবন করে বিচারক তারই স্বপক্ষে রায় দিলেন, পরে রাস্তার ধারে ট্যাক্সির সামনে রজত-মালিনীর শুভমিলন।

গল্পটি এলোমেলো ভাবে সাজানো হয়েছে। চিত্রনাট্য দোষমুক্ত নয়। শ্লথ গতিও ছবিকে বেশ পীড়িত করেছে। দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করার পর হঠাৎ প্রাচুর্যের মধ্যে এসে পড়ায় রজতের যে সব আচরণ দেখা গেল কোন শিক্ষিত ছেলের পক্ষে সেটি সম্ভবপর হয় কি? হয় বলতে হবে এ জাতীয় ঘটনা অবাস্তব, নয় বলতে হবে শিক্ষিত সমাজের উদ্দেশে এটি একটি ব্যঙ্গ, আদালতগৃহে নিজের ঐ জাতীয় আচরণের যে সব হেতু রজতকে দিয়ে বিশ্লেষণ করানো হয়েছে—সে বিশ্লেষণ মোটেই সন্তোষজনক নয়। যে বাড়ীতে কায়দা-কানুনের বজ্র আঁটুনী সেখানে জমিদারকে সহকারী ম্যানেজারের দাদা বলে ডাকাটাও অস্বাভাবিক নয় কি? বিশেষ করে যেখানে ম্যানেজার হুজুর বলে সম্বোধন করছে, মালিনীর মা মিসেস ঘোষ একটি বিশেষ শ্রেণীর মহিলা। ম্যানেজারের সঙ্গেও তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা, কিন্তু এই মহিলাটির বিষয় বলতে গেলে দর্শক সাধারণ আগাগোড়াই অন্ধকারে থেকে গেছেন, মিসেস ঘোষ বলে তিনি যখন পরিচিতা তখন মিঃ ঘোষটিই বা কে—বর্তমানে তিনি কোথায় এ বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়োজন ছিল।

রজতশুভ্রের ভূমিকায় উত্তমকুমার ও ম্যানেজারের ভূমিকায় বিকাশ রায় অনবদ্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। এঁদের পরেই উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন তরুণকুমার। স্বল্প আবির্ভাবে দর্শকচিত্তাধিকার করে গেলেন ছবি বিশ্বাস। মালিনী ও তার মায়ের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন যথাক্রমে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রাবতী দেবী। এঁরা ছাড়া ভূমিকালিপি সমৃদ্ধ করেছেন জীবেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতি।

মায়ামৃগ

নীহাররঞ্জন গুপ্তের মায়ামৃগ কাহিনীটি রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। বলা বাহুল্য মাত্র যে, মায়ামৃগ কোন রহস্যকাহিনী নয়—বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের বেদনা, আর্তি ও হাহাকার পরম দক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। বর্তমানে এর ছায়াচিত্ররূপ দিয়েছেন চিত্ত বসু। অনেককাল বাদে চিত্ত বসুকে আবার পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখা গেল। রঙ্গমঞ্চে মায়ামৃগের কাহিনী যে ভাবে পরিবেশিত হয়েছিল চলচ্চিত্রে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ছবিতে সুজাতা অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়েছে—ফলে মঞ্চে গল্পটি যেভাবে জমে উঠেছিল ছবিতে গল্প সেভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারল না। শুভ্রর সত্যিকারের চরিত্র সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গেলে সুজাতাকে বাদ দেওয়া চলে না, কেন না সুজাতা ও নিরু—দুটি পৃথক জাতের মেয়ের মধ্যিখানে শুভ্র চরিত্রের যথাযথ বিকাশ ঘটেছে। অবশ্য মঞ্চে নিরুকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল ছবিতে নিরু তার চেয়ে অনেক বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পরিচালক ছবিটিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন, এমন কথা বলতে কোন বাধা নেই।

সংঘাতই হচ্ছে এ ছবির আসল প্রাণ। ছবির শেষ দৃশ্যটির প্রতি পরিচালক চরম অবিচার করেছেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না—ও রকম হৃদয়স্পর্শী মুহূর্তে পারাবত উড়িয়ে দিয়ে ছবির সমস্ত গুরুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। ঐ রকম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশে যেখানে চিত্রনাট্য সব চেয়ে দানা বেঁধে উঠছে সেখানে ঐ রকম একটি দৃশ্য যোগ করে ছবিটিকে হালকা করে দেওয়া হয় নি কি? তবুও এটুকু অনায়াসে বলা যায় যে ছবিটির আবেদন মনে রেখাপাত করবে।

অভিনয়ে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন সুদর্শন তরুণ বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়, উভয়ের অভিনয়ই ভালো লাগবে, বিশ্বজিতের নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। মহেন্দ্র চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে উত্তমকুমার একটি নতুন ধরণের রূপসৃষ্টি করলেন, ঐ ভূমিকায় তাঁর অভিনয় অনবদ্য। ছবি বিশ্বাস ও সুনন্দা দেবীর অভিনয় যথেষ্ট গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং ব্যক্তিত্ববান। বিকাশ রায় ও সন্ধ্যারাণী দেবীর অভিনয় যথোচিত হৃদয়ধর্মী ও যথেষ্ট সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এঁরা ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন তরুণকুমার, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, শ্রীপতি চৌধুরী, শান্তি ভট্টাচার্য, রেবা দেবী, নিভাননী দেবী, আশা দেবী প্রভৃতি। সুরযোজনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কুহক

একই আধারে ভালো ও মন্দের পাশাপাশির অবস্থিতির ফলে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয় তাকেই অবলম্বন করে কুহকের গল্পাংশ গড়ে উঠেছে। সমরেশ বসুর লেখনী থেকে এই কাহিনী জন্ম নিয়েছে। মানুষের চরিত্রের ভিতরকার ভালো-মন্দ প্রবৃত্তিগুলির কোনটি কি পরিবেশে কি রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় সেই সম্পর্কেই লেখক আলোকপাত করেছেন। একই মানুষ—সে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ জগতে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বাসা বাঁধতে চায়—পরমুহূর্তেই রাজ্যের খলতা, নীচতা—ক্রূরতা তাকে গ্রাস করে ফেলে। মানবজীবনে দেবত্ব ও দানবত্বের সংমিশ্রণে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সেই বৈচিত্র্যকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

জেলখানা থেকে গল্পের শুরু আর নদীর ধারে গল্পের শেষ। সুনন্দ এই গল্পের নায়ক, খুনের চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত। সেখানে চুরির দায়ে অভিযুক্ত গণেশের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। মুক্তির পর যাত্রাদলের সঙ্গে মফঃস্বলে সুনন্দ আসে গণেশদের বাসায়, সেইখানেই রাত্রে চুরি করে গণেশ বাড়ীতে টাকা রাখে, তারপর বাইরে বেরোতে গিয়ে পুলিশের গুলীতে মারা যায়—সুনন্দ টাকার লোভে সেখানেই থেকে যায়, ইন্ধন জোগাল গোকুল—যাত্রাদলের সহচর। মরীয়া হয়ে সে টাকা খুঁজে বেড়ায়—তারপর সর্বশেষে গোকুলের ছুরিকাঘাতে নদীর ধারে তার পতন ও ছবির সমাপ্তি।

সুনন্দর ছুরিকাটিকে বাইরে থেকে মনে হয় একটি মাটির পুতুল, মাথাটা টানলে ছুরিটি বেরিয়ে আসে—সুনন্দ যতদিন জেলে ছিল ততদিন তার জিনিষপত্র হিসেবে পুতুলরূপী ছুরিটিও থানায় জমা ছিল, যখন সে মুক্তি পাচ্ছে তখন পুতুলটিকে দেখে অফিসাররা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কিন্তু যখন জিনিষটি জমা পড়ল তখন তা কি কোন অফিসারের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে নি, বিশেষতঃ সুনন্দর মত একটি খুনে আসামীর পক্ষে সর্বদা একটি পুতুল সঙ্গে রাখার কি তাৎপর্য থাকতে পারে, তাছাড়া পুতুল সঙ্গে রাখার বয়েসও তার নয়, সেক্ষেত্রে স্বভাবতঃই তো সন্দেহের উদ্রেক হয়, থানার লোকেরা চোখ বুজে সেটাকে রেখে দিলেন, পরীক্ষা করে দেখলেন না একবারও? গান শুনে মোহিত হয়ে দশ টাকা একবাক্যে দিতে যাওয়া বাস্তব-সম্মত কি? জেলের কয়েদীদের একটি বিশেষ পোষাক থাকে, ডোরাকাটা পরিধেয় তাদের পরতে হয়, এ তথ্য সকলেরই সুবিদিত—ছবিতে অবশ্য তা দেখা গেল না, ছবির মধ্যাংশ তো ভয়ানক একঘেয়ে হয়ে গেছে। একেবারে শেষাংশ অবশ্য যথেষ্ট বেগবান হয়ে উঠেছে এবং যথোচিত জমে উঠেছে।

একটি মানুষের দ্বৈত ভাবটি অনবদ্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন উত্তমকুমার, তাঁর অভিনয় এ ছবির এক সম্পদ বিশেষ। তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, তুলসী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুজাতা দেবীর অভিনয় চরিত্রানুযায়ী যথাযথ। প্রেমাংশু বসু ও শ্রীমান দীপক অভূতপূর্ব অভিনয়-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বারেকের আবির্ভাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন প্রীতি মজুমদার ও গোপাল মজুমদার। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী।

রজনীগন্ধা

আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী নিউ এম্পায়ারে তরুণ রায়ের পরিচালনায় ধনঞ্জয় বৈরাগীর শ্রেষ্ঠ নাটক রজনীগন্ধার উদ্বোধন হবে। ৭ই ফেব্রুয়ারী ছাড়াও ঐ অভিনয় উক্ত মঞ্চে নিয়মিত চলবে। নাটকে চরিত্র মোট চারটি। ঐ চারটি চরিত্রে রূপদান করবেন তরুণ রায় সহ কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পিকলু নিয়োগী ও শ্রীমতী দীপান্বিতা রায়। সুরযোজনা করেছেন বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী ওস্তাদ আলী আকবর খান। আলোকসম্পাত ও শিল্পসজ্জার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে তাপস সেন ও খালেদ চৌধুরী। এই অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টাটির আমরা সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

চুম্বনে তার এমনই বিষ। সেখানে অধরে অধরে সংযোগ মানেই জীবনের পরিসমাপ্তি। জীবনের পটভূমির উপর ধীরে ধীরে নেমে আসবে মৃত্যুর নীল যবনিকা। মিলনের সম্ভাবনা মানেই বিচ্ছেদের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

এখন বিষকন্যা ছবিটির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আগেই বলেছি যে একটি নারীকে কেন্দ্র করে দুটি পুরুষের সেই সনাতন দ্বৈতযুদ্ধ, যার উদাহরণ ইতিহাসের অনেকগুলো পাতাকে ভরিয়ে রেখেছে, যার নজীর মিলবে অসংখ্য কাহিনীতে, অনেকানেক ইতিবৃত্তে—যুগে যুগে, কালে কালে, সমাজে সমাজে এই দ্বৈতযুদ্ধের সংখ্যাতীত নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিষকন্যাকে কেন্দ্র করে দু'টি পুরুষ লোলুপ হয়ে উঠল। দুজনেই চায় বিষকন্যাকে আপন করে পেতে, তার সঙ্গে চিরকালের সম্পর্ক স্থাপন করতে, দেহের উপরে যে

আত্মার অবস্থান, বিষকন্যার সঙ্গে সেই আত্মার বন্ধন নিবিড় থেকে নিবিড়তর করতে। উভয়েরই প্রাণগঙ্গার ভাঁটা পড়া তীরভূমিতে জোয়ার আনল সে, উভয়েরই প্রাণের নীরব বীণায় সে ধ্বনিত করে ঝঙ্কার, উভয়েরই প্রাণের অনুর্বর ভূমিতে সে বপন করল বসন্তের বীজ। দু'জনেই তাকে ঘিরে স্বপ্ন সৃষ্টি করতে লাগল, আনন্দ, গান, কবিতা, হাসি, রোমাঞ্চ, অনুভূতি, ছন্দ ও লালিত্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি নিটোল স্বপ্ন, একটি মধুর স্বপ্ন, এক অভঙ্গুর স্বপ্ন। মেয়েটি বিষকন্যা। আর পুরুষ দু'টি? তাদের পরিচয়? তাদের বিবরণ? একজন রাজ্যের রাজা, আর একজন রাজ্যের পুরোহিত, একজন সমগ্র রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর, বহুজনের ভার বহনের যাঁর দায়িত্ব, রাজ্য পরিচালন চলে যাঁর অঙ্গুলি নির্দেশে অন্যজন রাজ্যের তথা প্রতিটি রাজ্যবাসীর কল্যাণ কামনায় দেবতার চরণকমলে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদনে নিমগ্ন, রাষ্ট্র শাসনের গুরুদায়িত্ব একজনের উপর ন্যস্ত অন্যজন রাষ্ট্রের 'ধর্মানুশীলনের কর্ণধার বিশেষ।

বিষকন্যার এই ভুবন ভোলানো রূপ আসলে যে এক পুঞ্জীভূত গরলরাশিরই আবরণমাত্র এ তথ্য অজ্ঞাতই ছিল পূজারীর (সুরেন্দ্র) কাছে। তবে তাঁরা দু'জনেই যে একটি মেয়েরই স্বপ্নে বিভোর এ বিষয়ে রাজা (পৃথ্বীরাজ) কিন্তু অনবহিত ছিলেন না। কিন্তু দু'জনের একজনও দেহগত অধিকার তাকে করতে সমর্থ হয় নি। রাজা ও পূজারীর মধ্যে তীব্র প্রেমযুদ্ধ, মাঝখানে বিষকন্যা—এক অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রগ্রহণের সময় একদিন কাশ্মীরের মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। চিত্রায়ণের জন্যে সেদিন যে দৃশ্যটি বাছা হল তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম এই—পূজারীর এবং বিষকন্যার গোপন সাক্ষাৎকার। বিষকন্যা তার পরিপূর্ণ নারীত্ব নিয়ে পূজারীর সামনে এসে দাঁড়ায়, তার রূপের ছটা পূজারীর চোখের সামনে থেকে নিজেকে ছাড়া সমস্ত জগতকে সরিয়ে দেয় পূজারী কি দেখে সেই রূপের মধ্যে। গরলের আভাসমাত্র সে পায় না—সেই রূপের মধ্যে সে দেখে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা, আত্মনিবেদনের আকুতি, আত্মঅঞ্জলির অটল সিদ্ধান্ত। রক্তমাংস দিয়ে গঠিত তার দেহ, পরিপূর্ণ মানবিকতার উপকরণ দিয়ে তৈরী তার মানুষী মন। বাস্তবজগতের সঙ্গে তার দেওয়া-নেওয়া। সে ক্ষেত্রে বিষকন্যার নারীত্বের পরিপূর্ণ আবেদনকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব, বিষকন্যার রূপের জালে সে গ্রহণ করল বন্দিত্ব, সেই রূপশিখা তার ভিতরকার সুপ্ত জাগতিক কামনা বাসনা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিল—তখন নিজেকে সংযমের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখা সত্যি সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ল পূজারীর পক্ষে।

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী শান্ত। মাথার উপর রোহিণী মনবল্লভ, স্নিগ্ধ, স্তব্ধ, মৌন। প্রাসাদের অন্তর্গত সুবিস্তৃত নির্জন কাননকুঞ্জ বিরাট নীরবতার মধ্যে দুটি প্রাণী মুখোমুখী দাঁড়িয়ে—পূজারী বিবাহের প্রস্তাব আনে তারপর—তারপর তার আকাঙ্খার, দাবীর, চাওয়ার মাত্রা আরও ছাড়িয়ে যায়—দীর্ঘকাল খাঁচার মধ্যে বন্দী বিহঙ্গকে হঠাৎ আকস্মিকভাবে মুক্ত আকাশে যথেষ্ট বিচরণের ছাড়পত্র দিলে যা হয়ে থাকে—শুধু বিবাহের প্রস্তাব জানিয়েই শীতল হয় না পূজারীর পিপাসু মন, সে আরো চায় 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও…'

ভাবী পত্নী হিসেবে বিষকন্যার কাছে একটি চুম্বন দাবী করতেও সে দ্বিধা বোধ করে না। কোন সঙ্কোচই সে করে না অনুভব, লোকলজ্জা, ভয়ভীতি তার কাছ থেকে আজ শতহাত দূরে। বিষকন্যারও অন্তর চায় পূজারীকে, পূজারীকে জীবনের দোসর রূপে পাওয়া তার কাছে বিধাতার অপরিসীম করুণারই নামান্তর মাত্র, পূজারীর হাতে চিরকালের জন্যে হাত রাখতে পাওয়া, পূজারীর বুকে চিরকালের মত মাথা নুইয়ে রাখার সৌভাগ্য অর্জন করা, পূজারীর জীবনে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেওয়া—আর ভাবতে পারছে না বিষকন্যা এ আনন্দ সে রাখবে কোথায়—তার উপযোগী আধার কই? আনন্দে সে দিশাহারা, তারপর একরাশ কালোচিন্তা কোথা থেকে উড়ে এসে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত নিমেষের মধ্যে তার সমস্ত আনন্দকে আচ্ছন্ন করে দিল, যে মন ক্ষণকাল পূর্বে আনন্দের উদাত্ত আহ্বানে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছিল সেই মনই বিষণ্ণতার বজ্রমুষ্টিতে সঙ্কুচিত হয়ে এল মনের উপর এখন কোথায় আনন্দের স্বাক্ষর? এ যে বিষাদের প্রলেপ। চোখের সামনে থেকে কোথায় সরে গেল আনন্দের সুপ্রশস্ত চলার পথ? এ যে দুঃখের বিসর্পিল চোরা গলি। বিষকন্যা তো স্পষ্টই জানে যে তার একটি চুম্বন মানেই তার প্রিয়তমের জীবনান্ত। জীবনের পরমতম প্রাপ্তির মুহূর্তেই চিরবিচ্ছেদের নিদারুণ বেদনা সহ্য করতে সে পারবে না, তার থেকে এই প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি অনাস্বাদিতই থেকে যাক তার জীবনে—না পাওয়ার ব্যথার থেকে পেয়ে হারানোর ব্যথা বহুগুণ বেশী। না-না—এ হতে পারে না, এ হতে পারে না, নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে, নিজেরই হাতে নিজেকে মুছে দিতে হবে পূজারীর মন থেকে, পূজারীর জীবন থেকে তাকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে, সরে আসতে হবে তার জীবন

প্রতীক্ষিত চিত্র 'উত্তরমেঘ'-এর একটি প্রণয়মধুর দৃশ্যে—
উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

থেকে। পূজারীকেই অন্তর দিয়ে ভালোবাসত বিষকন্যা রাজাকে সে ভালোবাসতে পারেনি।

একটা না-না চীৎকার করে বিষকন্যা পালিয়ে আসতে চেষ্টা করল পূজারীর কাছ থেকে। পূজারীর মধ্যে তখন পরিপূর্ণ কামপিপাসা, তার ভিতরকার জৈবিক প্রবৃত্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখন, তার দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তার নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে, তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে তখন কাম ঝরে পড়ছে, বিষকন্যাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না, তাকে সে ধরে রাখবেই, ধরে রাখবে তার বাহুবন্ধনে, তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে ভরিয়ে দিয়ে তার অবয়ব, তার অধরোষ্ঠে এঁকে দেবে চুম্বনের চিহ্ন। তার মনের বাঁধ আজ ভেঙে গেছে, সিংহদ্বার খুলে গেছে, দুর্গতোরণ হয়েছে অর্গলমুক্ত। প্রাণপণে সে আটকাতে চাইছে তখন বিষকন্যাকে তার মনের ক্ষুধা বিষকন্যাকে মেটাতেই হবে এই তার দৃঢ় দাবী। উপায়ান্তর না দেখে সাহায্যের জন্যে চেঁচিয়ে ওঠে বিষকন্যা। কি আশ্চর্য! স্বয়ং রাজার রহস্যজনক আবির্ভাব ঘটল প্রাসাদ অলিন্দে। রাজার এই অবিশ্বাস্য আবির্ভাব উভয়কেই হতবাক করে দিল বিস্ময়ে। রাজা আদেশ দিলেন পূজারীকে সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করে যেতে নতুবা পরিণতি আরও মর্মান্তিক রূপ ধারণ করবে।

চিত্রগ্রহণ শেষ হল। যেই না হওয়া আর যায় কোথায়, হাসির তুফান উঠল সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে। যুগ্ম প্রযোজক শ্রীচাতুলাল শাহ এবং শ্রীমতী গোহরবাইয়ের মধ্যে পরিচালক কেদার শর্মার মধ্যে, প্রতিটি কলাকুশলীর মধ্যে, আমাদের শিল্পীদের মধ্যে। এই হাস্য-তরঙ্গের অর্থ এই যে, এই অংশটির চিত্রায়ণ মাত্র একবারে সমাপ্ত হয় নি, ক্রমাগত রি-টেকএর অর্থাৎ পুনর্চিত্রগ্রহণের প্রয়োজন হয়েছে। দৃশ্যটিকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ও কৃত্রিমতামুক্ত করে তোলার জন্য পরিচালকের বারংবার রি-টেক নেওয়ার নির্দেশে সুরেন্দ্র এবং আমি আমরা দুজনেই রীতিমত বিব্রত ও ক্লান্ত বোধ করছিলুম দৃশ্যটির বিবরণ একটু আগেই লিপিবদ্ধ করেছি, সুতরাং পাঠক-পাঠিকাগণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে এই দৃশ্যের ক্রমাগত রি-টেক এ শিল্পী বা শিল্পীদল কি পরিমাণ বিব্রত বোধ করতে পারেন তেমনই একাধিকবার রিটেক নেওয়ার চাহিদায় আমাদেরও কম বিব্রত হতে হয় নি। খুব স্পষ্টভাবে মনে না পড়লেও যতদূর মনে পড়ে একটি সংলাপ ছিল (হিন্দীতে) যার বাঙলায় অনুবাদ হলে আমমর্ম দাঁড়াবে তোমার ঠোঁটে আমার ঠোঁট স্পর্শ করতে দাও নয় তো যা আমি চাইছি জোর করে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে তা আমি কেড়ে নেব।

ক্রমাগত এই অংশটির অভিনয় আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে বিব্রত ও ক্লান্ত করে তুলেছিল—শেষ অবধি চূড়ান্তভাবে দৃশ্যটির চিত্রায়ণ যখন পরিচালকের অনুমোদন লাভ করল তখন আমি সত্যিই মুক্তির আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর শুধু আনন্দনাদ করেই ক্ষান্ত হইনি একটি মন্তব্যও করেছিলুম। সমস্ত পরিশ্রম যখন সমাপ্ত, অভিনয়ে পরিচালক যখন পরিতৃপ্ত, করণীয় অংশের যখন আর আরক বলতে বাকী কিছু নেই—ঠিক এই সময়েই মন্তব্যটি আমি করেছিলুম, কথাটি বলেছিলুম পরিচালককে উদ্দেশ করে, বলেছিলুম "কেদার এতই যদি করলে—তাহ'লে চিত্রনাট্যটা বদলে কেন আমাকে করে তুললে না চুম্বনযোগ্য?"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটি অন্তর্গূঢ় সংস্কৃতির বন্ধন চিরকাল রয়েছে। এই সংস্কৃতি সংস্কৃতমূলক। সেজন্ত বিগত ডিসেম্বর মাসে দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ সহর বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে যে বাংলাদেশ থেকে সংস্কৃত অভিনেতার দল তাঁদের নাট্যাভিনয়ের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করে এসেছেন, তা সর্বদিক থেকেই অতি শুভজনক। এই সংস্কৃত নাট্যাভিনয় করেন ডাঃ যতীন্দ্রবিমল ও ডাঃ রমা চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবাণী গবেষণাগার প্রাচ্যবাণী মন্দিরের কৃতী অধ্যাপক অধ্যাপিকা অভিনেতৃবৃন্দ। বিগত পূজার বন্ধে এই দলটি মাদ্রাজে ও পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দাশ্রমে ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী বিরচিত ভাবগম্ভীর রসমধুর সঙ্গীতমুখর সংস্কৃত নাটক 'মহাপ্রভু-হরিদাসম্' 'শক্তি-সারদম্' ও 'ভারত-হৃদয়ারবিন্দম্' অতি সুন্দর ভাবে অভিনয় করে সকলকে বিশেষ মুগ্ধ করেন। এবারও তাঁরা শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর পুণ্য জীবনীর পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধনসঙ্গিনী মহাজননী বিষ্ণুপ্রিয়ার অমিয় চরিতাবলম্বনে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'শক্তি-সারদম্', 'মুক্তি-সারদম্' ও 'ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্' যথাক্রমে বাঙ্গালোর নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলন, বাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশন এবং পণ্ডিচেরীর শ্রীশ্রীঅরবিন্দাশ্রমের তত্ত্বাবধানে অতি মনোরমভাবে অভিনয় করে সকলেরই মনোহরণ করেন। এই সংস্কৃত অভিনয়গুলির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল সুবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবোচ্ছল প্রারম্ভিক সংস্কৃত সঙ্গীত। সেই সঙ্গে ছিলেন সংস্কৃত সঙ্গীত-নিপুণ শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী রত্না রায় ও নবাগত শ্রীপূর্ণেন্দু রায়। তাঁদের সংস্কৃত সঙ্গীতও শ্রোতৃবর্গের প্রশংসার্জন করে।

মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ রূপসজ্জাকার শ্রীযুক্ত হরিপদ চন্দ্র মহাশয় রূপসজ্জা দ্বারা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কর্ণাটক শাখাধিবেশনে ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর 'কর্ণাটক সাহিত্য ও মহীয়সী কর্ণাটক নারী কবি' এবং ডাঃ রমা চৌধুরীর 'বাংলার দর্শন ও বিভিন্ন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব' বিষয়ক বক্তৃতাদ্বয় সকলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ভারত সংস্কৃতির শাশ্বত ধারক ও বাহক সংস্কৃত সর্বতোভাবে পুনরুজ্জীবিত করার মহাব্রতে যাঁরা জীবনোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টাও সার্থক হোক।

—বিনয় চৌধুরী

খেলাধূলা

অষ্ট্রেলিয়ার "রাবার" লাভ

ঐতিহাসিক দর্শক-সমাকীর্ণ ইডেন উদ্যান। এখানেই ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট পর্য্যায়ের যবনিকা পড়ে। কলকাতায় যে ক্রিকেট-যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিলো তারও অবসান ঘটে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল ভারতের বিরুদ্ধে "রাবার" নিয়ে স্বদেশে ফিরেছে তারা পাকিস্তান ও অষ্ট্রেলিয়া সফরে মোট ১১টি খেলায় যোগদান করলেও ৮টি টেষ্ট ম্যাচ খেলে। পাকিস্তানে ৩টি টেষ্ট ম্যাচে তারা ২টিতে জয়লাভ করে ও ১টি অমীমাংসিত থাকায় তারা "রাবার" লাভ করে। ভারতে পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে ২টিতে জয়লাভ করে, ২টি অমীমাংসিত ও ১টিতে পরাজিত হয়েও "রাবার" তাদের অনুকূলে রাখতে সমর্থ হয়। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান নরম্যান ও'নীল ব্যাটিং-এ এবং ন্যাটা বোলার এলান ডেভিডসন বোলিং-এ শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। ও'নীল ১৫টি ইনিংস খেলে মোট ৯৪১ রাণ করেন ও ব্যাটিং-এর গড়পড়তা দাঁড়ায় ৮৫'৫৪ রাণ। ডেভিডসন ৪২২ ওভার বোলিং করে ১২২টি মেডেন সমেত ৪২টি উইকেট পেয়েছেন। তাঁর বোলিং-এর গড়পড়তা দাঁড়ায় ১৮'৫৯। কিন্তু দলের অধিনায়ক রিচি বেনড সর্ব্বাধিক ৩৯টি উইকেট পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। অষ্ট্রেলিয়ার ৩৮ বৎসর বয়স্ক ফাষ্ট বোলার রে লিণ্ডওয়াল ৪টি টেষ্ট খেলায় ১টি উইকেট পেয়েছেন। এতে তাঁর টেষ্ট খেলায় মোট ২২৮টি উইকেট লাভ হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত এলেন বেডসার ২৩৬টি উইকেট লাভের যে রেকর্ড করেছেন, লিণ্ডওয়াল তা এখনও ভাঙতে পারেননি। দেখা যাক এই সম্মান লিণ্ডওয়ালের ভাগ্যে আসে কি না।

মাদ্রাজের চতুর্থ টেষ্টে ভারত শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করলেও কলকাতার পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলার আকর্ষণ কোন মতেই যে ক্ষুণ্ণ হয়নি, তা এখানকার ক্রীড়ামোদীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি করা গেছে। কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা এবার জেনেছেন, যা একেবারে পাওয়া যায় না—সেটা হ'লো টেষ্ট খেলা দেখার একটা টিকিট। টিকিট টিকিট করে চারদিকে হাহাকার পড়ে যায়। তবে এবার টিকিট নিয়ে যে ধরণের কেলেঙ্কারী হোয়েছে, তার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। সত্যিকারের ক্রীড়ামোদীরা একখানা টিকিটের জন্যে যখন আকাশ-পাতাল চষে বেড়িয়েছেন, ঠিক সেই সময়েই দেখা গিয়েছে—কোথাও কোথাও খুব উঁচু দরে টিকিট বিক্রয় হোচ্ছে। উঁচু দর মানে উচিত মূল্যের চেয়েও কয়েক গুণ বেশী। ফলে দেখা গেল যে, খেলার মাঠে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নর-নারী আবির্ভূত হয়েছেন যথেষ্ট পরিমাণে—যাঁরা মূল্যের জন্যে পরোয়া করেন না। এই টিকিটগুলো কোথা থেকে যে এলো, তা কেউই বুঝতে পারেন না। লাল-নীল শাড়ীর প্রদর্শনীতে মাঠের শোভা বদলে গিয়েছিলো। খেলা দেখার চেয়ে তাঁদের উল বুননের মধ্যেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতে দেখা গেছে। সত্যিই তো ভারি শীত যে পড়েছে!

কর্তৃপক্ষদের হিসাব অনুযায়ী মাঠে ত্রিশ হাজার দর্শকের বসার জায়গা—আর খেলা দেখার উৎসাহী দর্শক হলো কয়েক লক্ষ, সেখানে খেলা আরম্ভ হবার বহু আগে থেকেই লাইনে দাঁড়ান ছাড়া উপায় কি? খেলা আরম্ভ হবার কথা শনিবার আর চার টাকার দৈনিক টিকিটের লাইন পড়ে বৃহস্পতিবার। এ কি সত্যিই ক্রিকেটপ্রীতি না হুজুগপ্রিয় কলকাতার ক্রীড়ামোদী?

খেলার আগে থেকে অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেলেও প্রথম ইনিংসে ভারতের ব্যাটিং দেখে সকলেই হতাশ হন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটিং-এ দৃঢ়তা দেখা যায়। চতুর্থ দিনে খেলার মোড় একেবারে ঘুরে যায়। এর জন্য তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় জয়সিমার অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। জয়সিমা এই টেষ্টে সম্পূর্ণ চতুর্থ দিন এবং বাকী চারদিনের কিছু না কিছু সময় ব্যাটিং করেছেন। টেষ্ট খেলার ইতিহাসে পাঁচ দিনই ব্যাটিং করার এই কৃতিত্ব সত্যিই এক স্মরণীয় ব্যাপার! কেনীর ব্যাটিং-এও দৃঢ়তা দেখা যায়। চান্দু বোড়ে, পঙ্কজ রায়, নরী কনট্রাক্টার ও বাসু নাদকার্ণির নিপুণ হাতের ব্যাটিংও প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁদের নৈপুণ্যের জন্য ভারতের পক্ষে শেষ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

আগন্তুক দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ দিয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার নূতন ব্র্যাডম্যান নর্ম্মাণ ও নীলের মন মাতানো ও চোখ জুড়ানো অনবদ্য ব্যাটিং। উইকেটের চারদিকে তাঁর চোস্ত মার দর্শক-মানসপটে বহুদিন অঙ্কিত থাকবে। অধিনায়ক রিচি বেনড ও ডেভিডসনের বোলিং সকলকে বেশ আনন্দ দেয়। যাহা হউক, এই টেষ্ট পর্য্যায়ে ভারতীয় ক্রিকেটের যে অভ্যুত্থান হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মোহনবাগানের পুনরায় ডুরাণ্ড কাপ লাভ

বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম দল মোহনবাগান তাহাদের গৌরবময় ফুটবল ইতিহাসে আর একটা নূতন অধ্যায় রচনা করেছে। তাহারা দ্বিতীয়বার ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। দর্শক-সমাকীর্ণ দি[illegible] গেট কর্পোরেশন ষ্টেডিয়াম। এখানেই ১৯৫৩ সালের বিজয়ী মোহনবাগান—ভারতের প্রাচীন ফুটবল প্রতিযোগিতা ডুরাণ্ড কাপ লাভের জন্য শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়—বাঙ্গালার শক্তিশালী দল মহমেডান স্পোর্টিং-এর সঙ্গে। কি হবে আর কি হবে না—এটা নিয়েই মাঠ বেশ জমে উঠে। মোহনবাগানের সমর্থকদের বাদ সাধলেন ওমর। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ওমর প্রথমেই গোল করে

ধলার মাঠ একেবারে নিস্তব্ধ। কিন্তু দীপু দাসও ছুটো ও তারালু একটা গোল করে পুনরায় মোহনবাগানের সমর্থকদের মনে আনন্দের বন্যা বহিয়ে দেন। অগণিত দর্শক বিজয়ী দলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মোহনবাগানের এবারকার সাফল্যের পুরোভাগে ছিলেন এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় জার্ণেল সিং। তাঁর খেলা খুবই উচ্চ পর্য্যায়ের হয়। তাঁর খেলা দেখে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তিনি বর্ত্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার হাফ। মোহনবাগানের সাফল্যের জন্য চুনী গোস্বামীর অবদান কম নয়। তাঁহার দর্শনীয় 'কর্ণার কিক' হইতে দীপু দাস ছু'টি ও তারালু একটি গোল করেন। দীপু দাসের খেলাতেও সুযোগ সন্ধানীর পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর শেষ গোলটি দিল্লীর দর্শকদের মানসপটে বহু দিন অঙ্কিত থাকবে। দীপু দাস লম্বা ডাইভ দিয়ে হেডের সাহায্যে দর্শনীয়ভাবে গোল করেন।

মহামেডান সেমি-ফাইন্যালে কলকাতার অন্যতম শক্তিশালী দল ইষ্টবেঙ্গলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করায় সকলেই এই দলের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ফাইন্যালে তারা মোটেই খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। স্বাভাবিক ভাবে খেলতে না পেয়ে মহমেডান দলকে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলার কৌশল গ্রহণ করতে হয়। মাঠে মোহনবাগানের গোলের পেছনে দর্শকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হল এবং শেষ পর্য্যন্ত খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হল। তবে পুলিশ অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে আনে। কলকাতার খেলার মাঠের উচ্ছৃঙ্খলার বীজ তখন ভারতের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আর এর বীজ যেন কলকাতার দলগুলোই বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—এটাই দুঃখের বিষয়।

মহমেডান তৃতীয় বার রোভার্স কাপ-বিজয়ী

ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য। তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা রোভার্স কাপ, ডুরাণ্ড কাপ ও আই, এফ এ শীল্ড সবগুলিতেই বাঙ্গালার বিশিষ্ট দলেরা ফাইন্যালে উন্নীত হয়। তার মধ্যে তিন প্রধান মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান দলই আছেন। রোভার্স কাপ থেকে মোহনবাগান প্রথমেই বিদায় গ্রহণ করে। ইষ্টবেঙ্গল ও মহমেডান দল ফাইন্যালে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।

সকলেরই দৃষ্টি পড়ে বোম্বাইয়ের দিকে, ইষ্টবেঙ্গল কি ডুরাণ্ডের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে—এটা নিয়ে মাঠ বেশ সোরগোল। মাঠে তিল ধারণের জায়গা নেই। উভয় দলের সমর্থকদের সে কি উৎসাহ ও উদ্দীপনা। গত বছর মহমেডান দল ফাইন্যালে পরাজয় বরণ করে। এবার তারা রোভার্স কাপ লাভের জন্য চেষ্টার কোন রকম ত্রুটি করেনি। অপর দিকে ১৯৪৯ সালের পর ইষ্টবেঙ্গল ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে। তাদের সমর্থকরাও দলের সাফল্য সম্পর্কে উদগ্রীব হয়ে আছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহমেডান দল তিন গোলে জয়লাভ করে। প্রথম দিন অবশ্য খেলাটি অমীমাংসিত থাকে। মহমেডান দল এবার নিয়ে তৃতীয়বার এই সাফল্য অর্জন করে। ১৯৪০ ও ১৯৫৬ সালে তারা রোভার্স কাপ লাভ করেছিলো। মহমেডান দলের এবারকার সাফল্য সুসার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে বলা চলে। তিনি একাই তিনটি গোল করে "হ্যাট্ ট্রিক" সম্পাদন করেন। ইষ্টবেঙ্গল ১৯৪৯ সালে প্রথম রোভার্স কাপ লাভ করে। এবার তাদের ব্যর্থতার জন্য দলের সমর্থকগণ বিশেষ হতাশ হয়েছেন। ইষ্টবেঙ্গল বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী দল বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। কিন্তু এবার তারা সাফল্য অর্জন না করার জন্য পুরোভাগের খেলোয়াড়দের দায়ী করা চলে। গোল করার যে সকল সুযোগ তারা নষ্ট করেছে—তা খুব কম দলের ভাগ্যে জোটে। গোলই যখন খেলার জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি—তখন যত উঁচু দরের খেলোয়াড়ই হোন না কেন এই বিষয়ে ব্যর্থতা প্রকাশ করলে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করতে পারেন না।

ক্রীড়াজগতে শ্রীএম, দত্ত-রায় (বেচু বাবু) একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। ফুটবল ও ক্রিকেট—উভয় আসরের তিনি নাটের গুরু। রাজনীতি করে তিনি ফুটবলকে এমন পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছেন যে গত এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমাঞ্চল লীগের খেলায় ভারত সর্ব্বনিম্নস্থান দখল করে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনী কমিটির তিনি একজন জাঁদরেল সভ্য। তাঁর রাজনীতিতে সকলেই ঘায়েল। ক্রিকেটকেও তিনি ডোবাতে বসেছেন। গত ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দলের ফলাফল আলোচনা না করাই ভাল। তবে তাঁর আমলেই ভারত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেওয়ায়—এখন বেশ খোস মেজাজে আছেন। লালা অমরনাথ ও দত্ত-রায় কোম্পানী এখন বেশ সুস্থ ভবিষ্যতে বেশ কিছুদিন চালিয়ে যাবেন বলে মনে হয়।

শ্রীএম দত্ত-রায় কলকাতার ক্রীড়া আসরের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তিনি মোটা মাহিনার আই, এফ, এ'র বেতনভুক সম্পাদক। গত দু'বছর ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই, এফ, এ শীল্ডের নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিসমাপ্তি হয়নি। গত বছর কোন রকমে ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হ'লেও এ বছর এখনও পর্য্যন্ত শেষ হয়নি। সত্যিই শ্রীদত্ত-রায়ের কর্ম্মকুশলতার তারিফ করতে হয়। তবে একটা সুখবর শোনা যাচ্ছে। তিনি বাঙ্গালা দেশের দুটো প্রধান দল—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে এবারকার আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইন্যাল নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছেন। কি ভাবে ফাইন্যাল খেলা করা যায়, সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য আই, এফ, এ'র টুর্ণামেণ্ট কমিটির একটা সভাও হয়ে গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলকেই ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ফাইন্যাল খেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। দু'টি দলের কয়েক জন নামকরা খেলোয়াড় বর্ত্তমানে কলকাতার বাইরে আছেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে সমস্ত খেলোয়াড়দের কলকাতায় হাজির করার পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তবে দেখা যাক, শ্রীদত্ত-রায়ের হাত-যশ। তাঁর চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না ঠিকই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দু'টো দল খেলতে রাজী হবে তো?

আরতি সাহা, প্যাটেল ও হাজারের পদ্মশ্রী লাভ

রাষ্ট্রপতি একাদশ প্রজাতন্ত্র দিবসে ৩১জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করেছেন। তার মধ্যে চ্যানেল সাঁতারু কুমারী আরতি সাহা, ক্রিকেট খেলোয়াড় জেসু প্যাটেল ও বিজয় হাজারে আছেন। ভারত সরকার যে ভাবে খেলোয়াড়দের সম্মানিত করেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশের অবস্থা

"গত শুক্রবার মধ্য রাত্রে হাওড়া সহর হইতে মাত্র আট মাইল দূরে হাওড়া-আমতা রোডের উপর অবস্থিত ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি অফিসে যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তাহা খুবই উদ্বেগজনক। সংবাদে প্রকাশ, প্রায় ২০ জন দুর্বৃত্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উক্ত ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি অফিসে হানা দেয় এবং অফিসের কর্মচারীদের আটক করিয়া রাখিয়া প্রায় আট হাজার টাকা মূল্যের বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম লরীতে তুলিয়া চম্পট দেয়। ব্যাটরা এলাকার পুলিস লরীটিকে আটক করিবার জন্য উহার টায়ার লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইয়াছিল। গুলী ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। দুর্বৃত্তদের মধ্যে কয়েকজন নাকি পুলিসের মত খাকী পোষাক-পরিহিত ছিল। এই ব্যাপারে প্রথমেই যাহা আমাদের মনে পড়িতেছে তাহা এই যে, ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি অফিসে কোন সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা ছিল কি না? সশস্ত্র পাহারার যে ব্যবস্থা ছিল সংবাদ হইতে তাহা বুঝা যায় না। থাকিলে অন্ততঃ দুর্বৃত্তদিগকে প্রতিরোধ করিবার একটা চেষ্টা অবশ্যই হইত। যেখানে মূল্যবান বহু বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম রাখা হয় সেখানে সশস্ত্র পাহারা নাই কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি অফিসে এই ডাকাতির ঘটনা হইতে সাধারণ গৃহস্থের অবস্থা যে কত নিরাপত্তাহীন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গে পুলিসের ব্যয়ই শুধু বাড়িতেছে, সেই অনুপাতে দেশবাসীর ধনপ্রাণ নিরাপদ হইতেছে না। ব্যাটরা পুলিসের গুলী লরীর টায়ারে লাগে নাই, এই ব্যাপারটি উপেক্ষার বিষয় নয়। জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার সময় পুলিস যখন গুলীবর্ষণ করে, তখন গুলীতে কেহই হতাহত হয় নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত বড় দেখা যায় না।"

—বসুমতী।

বাবাজীর যুগ

"এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সকল প্রকার দেশী-বিদেশী ইজম আসর জমাইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। কাজেই কটকে হউক অথবা কালীঘাটে হউক, সনাতন বাবাইজম নব নব কলেবরে আবির্ভূত হইলে তাহাতেও বিস্মিত হইব না। বিস্মিত হই তখন যখন দেখিতে পাই এই জাতীয় অজ্ঞাতপরিচয় ভুঁইফোঁড় কোনও বাবাকে বাজারে চালু করিবার পবিত্র কর্তব্যভার কাঁধে তুলিয়া লইয়াছেন মন্ত্রী, মেয়র প্রমুখ দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরা। উড়িষ্যার নেপাল বাবার কীর্তিকাহিনী জনসাধারণ এখনও ভোলে নাই। এখন আবার দেখিতেছি, কালীঘাটে নটবর বাবা নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং এই বাবাজীর যজ্ঞানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছেন মন্ত্রিপ্রবর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়, প্রধান অতিথির ভূমিকা লইয়াছেন, মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবাজীর কৃপায় রাজ্যের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা কলিকাতা পৌরসভার চরিত্রোন্নতি ঘটিবে অথবা ঘটিয়াছে কি না জানা যায় নাই। তবে দেখিতেছি, মন্ত্রী এবং মেয়রের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য নটবর বাবাজীর চালচলন মতি-গতি সম্পর্কেই মারাত্মক সন্দেহসূচক প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়া ভাষার অধ্যাপক শ্রীমহেশ্বর দাস মহাশয় আমাদের পত্রিকায় একখানি চিঠিতে উক্ত বাবাজীর সংসারাশ্রমের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্য হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—খাদ্যমন্ত্রী এবং মেয়র মহোদয় কী কারণে না জানিয়া শুনিয়া এই বাবাজীর জয়ঢাক নিজেদের কাঁধে তুলিয়া লইয়াছেন? নেপালবাবা জাতীয় প্রতারকদের পাল্লায় পড়িয়া সরল বিশ্বাসী জনসাধারণের যে দুর্গতি হইয়া থাকে তাহার কাহিনী মন্ত্রী, মেয়র প্রভৃতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের অজানা থাকিবার কথা নয়। তাঁহারাও যদি এই জাতীয় বাবাজীদের লইয়া নাচানাচি করেন তাহা হইলে জনসাধারণ প্রতারিত হইবে না কেন?"

—আনন্দবাজার।

নারীর কথা

"মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ২৬তম অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীমতী রুক্মিণী অরুণ বলেন, জাতি গঠন ও সমাজ উন্নয়ন কর্মে ভারতীয় নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বুদ্ধি ও কর্মশক্তির ব্যাপারে নারী পুরুষের চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নন। পুরুষের যা করণীয়, যোগ্য নারীহস্তে ন্যস্ত হইলে তাঁহারাও তা করিতে পারেন না, এমন কথা কেহই বলিবেন না। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা পঁচানব্বুই জন নারীর জীবনই রন্ধনশালা ও সূতিকাগৃহে, এই দুই মহলে আবদ্ধ। শিক্ষা অনেকের ভাগ্যে জোটে না, যাঁহাদের জোটে, তাঁহাদেরও ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশই মাত্র বাহিরের কর্মক্ষেত্রে আসার বা জীবিকার্জনের সুযোগ পান। এই অধঃপতনের অবস্থা হইতে ভারতনারীকে উদ্ধারের কাজ আগে করা দরকার। তারপর বাহিরের কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের দায়িত্ব কি ও কতটা, তা স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার। দুঃখের বিষয়, নারীসমাজে যাঁহারা নেত্রীপদবাচ্য, তাঁহারা দেশের সাধারণ নারীর জীবন কেমন ভাবে কাটে, তা সামান্যই জানেন। তাই তাঁহারা স্বগোষ্ঠীর শিক্ষিতা মহিলাদেরই একমাত্র নারী জ্ঞান করেন এবং যা বলেন কহেন, সে উহাদের উদ্দেশেই। এইজন্যই সম্মেলন ঠিকই জমে, কিন্তু কাজ হয় না!"

—যুগান্তর।

পাক-ভারত মৈত্রী

"মৌলানা ভাসানী ও আবদুল গফুর খানকে নিশ্চয়ই ভারতের জাতীয়তাবাদীরা এত সহজে ভুলিয়া যান নাই। আজ যদি সত্যই পাক-ভারত মৈত্রী স্থাপিত হয় তাহা হইলে কমিউনিষ্টদের অপেক্ষা বেশী সুখী আর কে হইবে? কিন্তু দেখিতেছি, এখন এক ধরণের পাক-ভারত মৈত্রীর কথা বলা হইতেছে যাহা পাকিস্তান ও ভারতের জনগণের স্বার্থের বিরোধী, যাহা পাকিস্তান ও ভারতকে তাহাদের অকৃত্রিম বন্ধু সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী রণাঙ্গনে পরিণত করিবার পরিকল্পনা। নতুবা, পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করিয়া চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার চেষ্টার পরিবর্তে উহাকে প্রতিবেশী চীনের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে ব্যবহারের কথা উঠিতেছে কেন? পাক-ভারত সীমান্ত-বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা

জানাইয়া পণ্ডিত নেহরু যখন চীন-ভারত সীমান্তবিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশা প্রকাশ করিলেন তখনই বা কেন আয়ুব খাঁদের দোস্তরূপী ভারতীয় পত্রিকাগুলি ও নেতাগণ ঠিক উল্টা সুরে ইহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন? অতএব, জেনারেল আয়ুবের মারফৎ ভারতের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বের শত্রুদের যে চোপ আসিতেছে সে সম্পর্কে আমরা যদি এখন হইতে সাবধান না হই, তার অদূর ভবিষ্যতে অনুতাপ করিবারও সুযোগ থাকিবে না।"

—স্বাধীনতা।

জেলায় সরকারী অফিসগৃহ কোথায় হইবে

"এতদিন পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বীরভূম জেলায় বিভিন্ন সরকারী অফিস সমূহের জন্য নিজস্ব গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। সিউড়ীতে জেলা সরকারী অফিস ভবন নির্মাণের জন্য নাকি সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে। কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা লাভ করার পর নূতন নূতন মন্ত্রীদপ্তর স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক মন্ত্রীদপ্তরের কার্য্যের জন্য জেলায় ও মহকুমায় বিভিন্ন অফিস খোলা হইয়াছে। প্রচার অফিস, চাষ অফিস, মাছ অফিস, বন অফিস, বাজার করা অফিস, ম্যালেরিয়া অফিস হইতে সুরু করিয়া আরও কত অফিস জেলায় হইয়াছে তাহার সবগুলির নাম করা কষ্টকর। জমিদারী গ্রহণ আইন পাশের পর এষ্টেট একুইজিসান অফিস, ক্ষতিপূরণ দান অফিস এবং সেটেলমেন্টের চার্জ্জ অফিস প্রভৃতি অফিসের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ময়ূরাক্ষী ক্যানেলের সংগৃহীত ভূমির ক্ষতিপূরণ দান এবং ভবিষ্যতে নব নব পরিকল্পনা জন্য যে সকল ভূমি গৃহীত হইবে তাহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার জন্য এক বিরাট স্থায়ী অফিসের প্রয়োজন হইয়াছে। পরিবহন বিভাগ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের জন্যও বিভিন্ন অফিসের প্রয়োজন কম দেখা দেয় নাই। এতদিন শুনিতাম, সাত বৎসর বয়সে ব্যবহৃত জামা সত্তর বৎসরে পরিধান করা যায় না এবং এরূপ সখ হাস্যকর কিন্তু জেলার সরকারী অফিস সম্পর্কে দেখা যাইতেছে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত জেলা কালেক্টরী অফিস ভবনের এখানে ওখানে তার, চট বা ইটের পর্দ্দা দিয়া ঘেরিয়া কংগ্রেস সরকারের আমলে বহু অফিসের বিভিন্ন দপ্তরের স্থান হইলেও সব অফিস কুলাইল না, এজন্য সহরের বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহ সরকারী রিকুইজিসান করিয়া সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু অফিস স্থাপন করা হইল। যদিও রিকুইজিসান করা গৃহগুলির ভাড়া কম করা হইল তথাপি দীর্ঘ বার বৎসরে শুধু বাড়ী ভাড়া বাবদ যত টাকা ব্যয় হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাতে বহু অফিসের জন্য সরকারী নিজস্ব ভবন নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত এবং সহরে বাড়ী ভাড়া পাওয়ার সমস্যাও অনেকটা হাল্কা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের হয়রাণি এবং কোন কোন অফিসের শৃঙ্খলাহীনতা অনেকখানি কম হইত।"

—বীরভূমবাণী।

পৌষমাসেই সর্ব্বনাশ

"পৌষ পার্ব্বণ শেষ করিয়া মাঘমাসের মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতেছে। গতকল্য ৭ই মাঘ বর্দ্ধমান বাজারে সরু ধান্যের দর ১৬ টাকা মণে উঠিয়াছে, মাঝারী ধান্য সুদূর মফঃস্বলেও ১৫।০ টাকায় উঠিয়াছে। চাউলের দর ইতিমধ্যেই ২১ টাকা মণ হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলা নাকি ধান্যে উদ্বৃত্ত জেলা, এখানেই যখন এই অবস্থা তখন পশ্চিম বাংলার ঘাটতি অঞ্চলের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সেদিনও হুগলী জেলার এক জনসভায় দাম্ভিকতাপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছেন, এ বৎসরের প্রবল বন্যা ও অস্বাভাবিক জলপ্লাবন সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলায় পর্য্যাপ্ত ফসল হইয়াছে। যদি তাহাই হয় এবং অতি উদ্বৃত্ত উড়িষ্যারাজ্যের সহিত এক খাদ্যাঞ্চল গঠন করিয়াও কেন ধান্য চাউল, ক্ষেত হইতে ফসল উঠিতে না উঠিতেই এমন অগ্নিমূল্য হইল, তাহার কৈফিয়ৎ খাদ্যমন্ত্রী কি ভাবে দিবেন তাহা আমরা জানিতে পারি কি? সরকারী মহলের সমর্থকগণ বলিতে সুরু করিয়াছেন চাষীর হাতে অর্থ জমিয়া গিয়াছে, সেজন্য তাহারা আরো অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য ধান্য ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহাই যদি সরকার তথা কংগ্রেস পক্ষ মনে করেন, তাহা হইলে কেন তাঁহারা মজুত-বিরোধী ব্যবস্থা করিতেছেন না? আমরা বর্দ্ধমান জেলাবাসী লক্ষ্য করিতেছি, এ বৎসরের প্রবল বর্ষণে যদিও কোন কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলে ডাঙ্গা ও অনুর্ব্বর জমিতে এবার কিছু ধান জন্মিয়াছে বটে কিন্তু অধিকাংশ জমি যাহা ক্যানেল ও ক্যানেল বহির্ভূত অঞ্চলের জোল ও সমতল জমির ধান জলের চাপে এবং ভাদ্রে রৌদ্র না পাওয়ায় ভালভাবে জন্মাইতে পারে নাই। উপরন্তু গাঁজ, জলাস ও নানাবিধ পোকায় ধান্যের ফসলকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে।"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

নিরপেক্ষতা

"মুর্শিদাবাদ জেলা উন্নয়ন পরিষদ এবং মহকুমা উন্নয়ন কমিটি গঠন সম্পর্কে আলোচনামূলক এক বিস্তারিত সংবাদ গত সংখ্যা জনমত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টাফ রিপোর্টারের প্রদত্ত সংবাদে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে পরিষদ ও কমিটি গঠন যিনি বা যাঁহারা করিয়াছেন তিনি বা তাঁহারা তাহা খুব একটা নিরপেক্ষ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। যে কোন কারণেই হউক না কেন, কমিটি যেভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কমিটি মনে করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। একটি বিষয় আজ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে যে, গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে মৌখিক যতই উপদেশ বর্ষিত হউক না কেন—কার্য্যক্ষেত্রে উপদেশ বর্ষণকারীরা প্রায়ই বিপরীত করিয়া থাকেন। রেডক্রশ হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন রিলিফ কমিটি পর্য্যন্ত সর্বত্র একই ধরণের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ চলিতেছে। ইতিপূর্বে গ্রাম্য রিলিফ কমিটি গঠন সম্পর্কে বহু অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা হইয়া রহিয়াছে। উন্নয়ন পরিষদ সম্পর্কিত সংবাদটি পক্ষপাতিত্বের ইতিহাসে কয়েকটি নূতন পৃষ্ঠারূপে সংযোজিত হইয়া রহিল মাত্র।"

—জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

শিশির-সান্নিধ্যে সম্পর্কে

[নটগুরু শিশিরকুমারের দেহান্তের পর থেকেই এই রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আলোড়ন এনেছে পাঠকমহলে। বিশেষতঃ এই রচনাটি শিশির অনুরাগীদের মন বিশেষভাবে যে স্পর্শ করেছে এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই এই রচনার মধ্যে দিয়ে প্রধানতঃ মানুষ শিশিরকুমারদের তুলে ধরা হচ্ছে। মানুষ শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে যে প্রতিভার, মনীষার

প্রজার অভাবনীয় সমন্বয় ঘটেছিল সেই সময়ের একটি পরিপূর্ণ আলেখ্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে। আমরা ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন সংলাপে বিভিন্ন জনের সম্পর্কে অনুকূল-প্রতিকূল বিভিন্ন ধরনের উক্তি করে থাকি, শিশিরকুমারের চরিত্রের মধ্যেও স্বভাবতঃই এই অভ্যাস বিদ্যমান, কারণ সাধারণ মানুষ মাত্রেরই চরিত্রে এই অভ্যাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে। সাধারণতঃ প্রতিকূল উক্তিগুলি বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই শ্রেয়ঃ। কারণ তা সত্যাই হোক আর মিথ্যাই হোক তা যে অপ্রিয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না এবং এও ঠিক যে, সেই সব উক্তিগুলি কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ হ'লে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তথা তাঁর আত্মপরিজন হিতাকাঙ্খীরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হবেন এবং সে ক্ষেত্রে এমনিভাবেই ধীরে ধীরে তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি। এই রচনাটি প্রকাশ করে বিরাট পাণ্ডিত্যের আধার শিশিরকুমারকে প্রকটিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য—কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষকে আঘাত করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। তা সত্বেও যদি ইতোমধ্যে এই রচনার মধ্যে এমন কোন উক্তি প্রকাশিত হয়ে গিয়ে থাকে যার ফলে কেউ ব্যথিত হ'তে পারেন—সে জন্যে আমরা বেদনাবোধ করছি এবং আশ্বাস দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে বিষয়ে আমরা দৃষ্টি দেব।—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী]।

শোক-সংবাদ

তৎকালীন বাঙলার জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রধান কর্ণধার স্বর্গতঃ রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম পৌত্র ও ভারতীয় মুক্তি-যজ্ঞের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র উত্তরপাড়ার প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় পরিবারের স্বনামধন্য, সুখোজ্জ্বলকারী সন্তান অমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৬ই পৌষ ৫৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। বিশিষ্ট লোকহিতব্রতী সমাজসেবক ও সাহিত্যসংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হিসেবে স্বর্গতঃ মুখোপাধ্যায় চিরকাল স্মরণীয় থাকবেন। ১১০২ সালে এঁর জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র অমরনাথ ছাত্রজীবন থেকেই পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশ ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জড়িত হন এবং ক্রমে ক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশনায়কের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। অমরনাথের সমগ্র জীবন দেশের ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণকর্মে উৎসর্গিত। অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যপ্রীতি সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন জনহিতকর কর্মে এঁর অদম্য উৎসাহও সুবিদিত। বাঙলার অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এঁর কল্যাণে রূপ পেয়েছে, পুষ্ট হয়েছে, গড়ে উঠেছে। শ্রীরামপুরের প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, উত্তরপাড়া পৌরসভার ও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, দীর্ঘ পঁচিশ বছরব্যাপী হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশানের সহ-সভাপতি, দেবানন্দপুর শরৎস্মৃতি সমিতির কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক আসনসমূহ অলঙ্কৃত করে যথেষ্ট যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। নিজে জমিদার-বংশোদ্ভব হওয়া সত্বেও জমিদারী বিলোপ আন্দোলনে তিনি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। অমরনাথের তিরোধানে বিনয়গুণ, শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তির অন্তর্ধান হ'ল, জনসেবা তথা সমাজসেবার ক্ষেত্র থেকে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন, বাঙলাদেশ একজন আদর্শ ও বদান্য জমিদার হারাল। তাঁর সহধর্মিণী, দুই পুত্র শ্রীরমেন্দ্রনাথ ও শ্রীশমীন্দ্রনাথ, দুই পুত্রবধূ এবং একটি পৌত্রী বর্তমান। তাঁর পরলোকগমনে মাসিক বসুমতী একজন প্রকৃত অনুরাগীর ও শুভাকাঙ্খীর অভাব বোধ করছে।

অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ভূতপূর্ব জেনারেল ম্যানেজার এবং রেলওয়ে বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্তচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০এ পৌষ ৫৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১১২৫ সালে পুরাতন পূর্বভারতীয় রেলপথে যোগদান করেন ও দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর কাল তার সঙ্গে যুক্ত থেকে নানাভাবে তার সেবা করেন। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস-এর প্রথম জেনারেল ম্যানেজাররূপে অপরিসীম কর্মনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ছাত্রজীবনেও ইনি যথেষ্ট প্রতিভা ও মেধার পরিচয় দেন। ইনি ভারতবরেণ্য দার্শনিক স্বর্গীয় ডাঃ পি, কে (প্রসন্নকুমার) রায়ের অন্যতম দৌহিত্র ছিলেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় যথাক্রমে এঁর সহোদর ও সহোদরা।

রঞ্জিত রায়

প্রখ্যাত কৌতুকাভিনেতা রঞ্জিত রায় ৩রা পৌষ মিহিজামে ৫৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ইনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, হাসির গানের গায়ক হিসেবে এঁর খ্যাতি সমধিক বিস্তৃত। গ্রামোফোন কোম্পানী ও হিন্দুস্থান রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের ইনি পরিচালক ছিলেন। অসংখ্য নাটকে ও ছায়াছবিতে কৌতুকাভিনেতা হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন,—

মাসিক বসুমতীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় আজকের নয়। আমি যখন নিতান্ত বালিকা মাত্র, তখন থেকেই নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী আমরা বাড়ীর সকলে মিলে পড়ে আসছি—সে আজ অন্ততঃপক্ষে সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা—এই দীর্ঘদিনের ইতিহাসে ভিতরে ভিতরে বসুমতীর সঙ্গে আমাদের যে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে উঠেছে তারই জোরে আপনাকে এই পত্র লিখতে সাহসী হয়েছি। মাসিক বসুমতীকে আজ আর তথাকথিত মামুলী সাধুবাদ দেওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না—কারণ সে সব থেকে আজ সে অনেক উর্ধে—আপনার আদর্শ সম্পাদনা তার চিরাচরিত আসন থেকে অনেক উচ্চে তাকে টেনে নিয়ে গেছে। এ সব জেনেও বসুমতী সম্বন্ধে দু'টি-একটি কথা বলতে যাচ্ছি—অপরাধ হয়তো ক্ষমা করবেন। মাসিক বসুমতী যে কাগজে ছাপা হয় তা যদি একটু উচ্চ শ্রেণীর হয় তো আমাদের পক্ষেই সুবিধে হয়, কারণ মাসিক বসুমতী পরম সমাদরে আমরা বাঁধিয়ে রাখি। ভবিষ্যতের পাঠক-পাঠিকা এ থেকে যে বিবিধ বিষয়ে প্রভূত ফল লাভ করবেন সে বিষয়ে আমরা যথেষ্ট নিশ্চয়তা পোষণ করতে পারি—কিন্তু এখন যে কাগজে মাসিক বসুমতী ছাপা হচ্ছে তার স্থায়িত্ব নেই, অল্পকালের মধ্যেই বিবর্ণ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সংরক্ষিত করা মুস্কিল হয়ে ওঠে। অতএব এদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি—আর একটি কথা, এক সংখ্যায় সমাপ্য রচনার সংখ্যা একটু বাড়িয়ে দিন—বলতে গেলে একসঙ্গে অতগুলি ধারাবাহিক উপন্যাস পাঠক সমাজে উপহার আপনি ছাড়া কেউ দেন না, এ দিকে আপনার কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ এবং এ আপনার অপূর্ব সম্পাদনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে গণনীয় কিন্তু সেই অনুপাতে ছোট গল্পের পরিমাণ আমাদের মন ভরাতে পারছে না, আমাদের আর্জি—প্রতি মাসে ছোট গল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন। নমস্কারান্তে—সুপূর্ণা দাশগুপ্ত, কাশী-১।

সবিনয় নিবেদন,—

কর্মব্যপদেশে দীর্ঘকাল আমি দেশের বাইরে। দেশের মাটি বহুদিনের ব্যবধানে অল্পকালের জন্যে স্পর্শ করে থাকি। আশ্চর্য এই—দেশে যে আমি নেই আমি যে দেশের বাইরে তা অনুভবই করতে পারি না, তার জন্যে দায়ী মাসিক বসুমতী—বলতে গেলে প্রবাসী বাঙালীর প্রবাসবাসের ব্যথা মাসিক বসুমতীই মোচন করেছে। মাসিক বসুমতীর মধ্যে আমি গোটা বাঙলা দেশটাকেই দেখতে পাই, বাঙলাদেশের নরনারী জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে বসুমতীর পাতায়। তা ছাড়া যুগের সমকালীন ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি স্থান পায়। বসুমতীর সাহিত্যমূল্য ও ইতিহাস-মূল্যও অপরিসীম। মাসিক বসুমতীর মধ্যে আমায় সবচেয়ে যা আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে তার বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন বিষয়ক বিভাগগুলির এমন সুচারু সম্পাদনা যেমনই বিস্ময়ের তেমনই আদরের। বিভিন্ন বিষয়কে পাশাপাশি তুলে ধরায় আপনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেন। চার জন, রঙ্গপট, সাহিত্য-পরিচয়, বিজ্ঞানবার্তা, কেনা-কাটা নাচ-গান-বাজনা প্রতিটি বিভাগই সম্পাদন-নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। পত্রিকার গোড়ার দিকে এক সংখ্যায় সমাপ্য যে প্রবন্ধগুলি দেওয়া হয় সেগুলি যথেষ্ট সারবান, বহুবিধ তথ্যে সমৃদ্ধ, প্রবন্ধকারদের কুশলতার ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সকল দিক দিয়েই সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। নমস্কার নেবেন। অতসী মুখোপাধ্যায়, মাদ্রাজ।

সবিনয় নিবেন,—

প্রথমেই বলে রাখি, আমার এই চিঠি প্রশংসা বা প্রশস্তিবাচক পত্র নয়—কারণ আমার মত একজন অতি সাধারণ পাঠকের প্রশংসা বা প্রশস্তির অপেক্ষা রাখে না আপনার ঈশ্বরদত্ত সম্পাদন প্রতিভার পরিচায়ক মাসিক বসুমতী—সে কল্পনা করাও দুঃসাহস বা স্পর্দ্ধারই নামান্তর মাত্র। এই পত্রটিকে তাই আপনার হাজার হাজার পাঠক-পাঠিকাদেরই একজনের মনের কথাটিরই ভাষাময় অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। মাসিক বসুমতী শুধুমাত্র সাহিত্যসৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না—তার পরিধি আজ অনেক বেড়ে গেছে—সাহিত্যের মাধ্যমে আজ সে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে একটি মাসিক পত্রিকা—এত অসংখ্য বিষয়বস্তুর ব্যাপক সমারোহ ইতঃপূর্বে অন্য কোন মাসিক পত্রে দেখা গেছে বলে আমার জানা নেই।

সাহিত্যের-বিভিন্ন বিভাগে যে, যে রসের রসিক তিনি সেই রসেরই সন্ধান মাসিক বসুমতীর মাধ্যমে পাবেন। আপনি তো শুধু সম্পাদক নন আপনি সাহিত্যিক ও শক্তিমান কথাশিল্পী। সেই জন্যেই যুগের গতিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে, কালের বিধানকে আপনি যতটা অনুধাবন করতে পারবেন, অন্যান্যদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সেই জন্যই আপনার সম্পাদনা এত তাৎপর্যপূর্ণ এত সাবলীল এবং এত অনবদ্য। বাঙলা দেশের সাময়িক পত্রিকার জগতে কিছুকাল আগে এক গতানুগতিকতা যে ভাবে বদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করছিল আপনি তার মুক্তিদাতা। এ কথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করব—আপনি নতুন যুগ এনেছেন বাঙলা দেশের সাময়িক পত্রজগতে। আপনি ছকে বাঁধা পথে চলেননি, আপনি নতুন পথ খুঁজে বার করেছেন এবং আপনার প্রদর্শিত পথ মাসিক

আমার অভাবনীয়
আলেখ্য উপহার নতুন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়েছে। বাঙলা দেশের বৈনন্দিনঅনাম লেখকের আবিষ্কর্তার গৌরবও আপনার। আপনার প্রাচুর্য পূর্ণ উদ্ভাবনী শক্তিই মাসিক বসুমতীকে এতখানি বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং তাকে আজ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাসিক পত্রিকায় পরিণত করেছে। ইতি—তাপস সেনগুপ্ত, পাটনা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please arrange to send your monthly Basumati for a period of one year.—Mrs. Pratima Nathan, Coimbatore, S. India.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Sheba Ganguly, Waltair.

Annual subscription for Masik Basumati for the year Kartick, 1366 B. S. to Aswin 1367 B. S. is sent herewith.—Berhampore Girl's College.

Herewith sending advance subscription for six months upto Chaitra 1366—Sm. Niharika Roy, Delhi-7.

এই সঙ্গে ১৩৬৬ সালের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা মাসিক বসুমতীর জন্ম ষাণ্মাসিক মূল্য ৭'৫০ পাঠাইলাম—Mrs. Purnima Sarkar, Jabalpur, M. P.

Herewith sending Rs. 7·50 towards the outstanding subscription which may kindly be acknowledged.—S. P. Sen, Sambalpur.

এই সঙ্গে ৭৷৹ টাকা পাঠাইলাম। কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পাঠাইবেন।—Mira Rani Das, Cachar.

আমার আশ্বিন হইতে গ্রাহকমূল্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি আবার ৬ মাসের জন্য ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম।—Sm. Juthika Mitra, B. A. Cuttack.

I am remitting herewith Rs. 7·50 towards the subscription of Masik Basumati for six months from Kartick 1366—D. K. Banerjee, Sagar (M.P)

আপনাদের মাসিক বসুমতীর জন্য আমাদের পাঠাগারের পক্ষ হইতে আমি ৬ মাসের চাঁদা বাবদ ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া কার্ত্তিক ৬৬ হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—সম্পাদক, নব চৈতন্য পাঠাগার, নবগ্রাম, বর্দ্ধমান।

I send herewith Rs. 15/- only being my annual subscription for "Masik Basumati."—Mr. A. G. Pal, Cachar.

Half yearly subscription for Masik Basumati Rs. 7·50,—Preeti Chakravorty, Pusa, (Bihar).

Herewith half yearly subscription for Basumati.—Usha Rani Dasi, Assam.

Please find subscription for six months.—Mrs. Shila Mookherjee, Kanpur.

কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ৬ মাসের পত্রিকার মূল্য বাবদ ৭'৫০ পাঠাইলাম।—Sri Chameli Devi, Jalpaiguri.

Herewith sending Rs. 7·50 as a subscription for 6 months.—Smriti Bhusan Mookherjee, Rourkela, Orissa.

We beg to remit herewith the sum of 24/- only being subscription for one year.—Vses Gosbiblioteka, Glavpochta, Moscow, U.S.S.R.

আমাদের মাসিক বসুমতী নেওয়ার মেয়াদ গত আশ্বিন মাসে শেষ হইয়া গিয়াছে। পুনরায় ৬ মাসের ৭'৫০ পাঠাইলাম। গত কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন—পল্লীশ্রী সঙ্ঘ, বোম্বাই।

বিশেষ কারণে অন্যত্র যাওয়াতে টাকা পাঠাতে দেরী হয়েছে। কার্ত্তিক মাস থেকে মাসিক বসুমতী পাঠাবেন—শ্রীমতী লতিকা বিশ্বাস, নৈহাটি, ২৪ পরগণা।

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম—শ্রীমতী স্মৃতিকণা ভট্টাচার্য্য, কাছাড় (আসাম)

The sum of Rs. 15/- is remitted herewith towards my yearly subscription for the membership of monthly magazine.—Ilarani Ghose, Cherapunji, Assam.

Herewith sending Rs. 15/- as the annual subscription of Monthly Basumati.—Chiria Recreation Club, Singhbhum.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম—শ্রীঅরুকুমার রায়, জলপাইগুড়ি।

৬ মাসের চাঁদা ৭৷৹ টাকা পাঠালাম। কার্ত্তিক হইতে পরবর্ত্তী সব ক'খানি পাঠাবেন।—Mrs. Sovana Sen, Jaipur.

I am remitting herewith Rs. 7·50 for the subscription for six months from Kartick to Chaitra—Mrs. Ava Biswas, B.A. Hazaribagh.

মাসিক বসুমতীর ১ বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম, অগ্রহায়ণ সংখ্যা ৬৬ হইতে কার্ত্তিক ১৩৬৭ সাল পর্য্যন্ত চাঁদা পাঠাইলাম।—Deulbera Colliery Institute, Orissa.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা

"সংস্কৃতভাষার 'শ্রদ্ধা' কথাটি বুঝাইবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নাই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বলিলে সংস্কৃত শ্রদ্ধা কথাটার অনেকটা কাছাকাছি অর্থ হয়। নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে যে-কোন তত্ত্ব হউক না, ভাবিতে থাকিলে দেখিতে পাইবে, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে যাইতেছে বা সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুভূতির দিকে যাইতেছে। ভক্তি বা জ্ঞানশাস্ত্র উভয়েই ঐরূপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আনিবার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছে।

কঠোপনিষদের সেই মহাবাক্যটি মনে পড়িতেছে—'শ্রদ্ধা' বা অদ্ভুত বিশ্বাস। নচিকেতার জীবনে শ্রদ্ধার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এই 'শ্রদ্ধা' বা যথার্থ বিশ্বাস-তত্ত্ব প্রচার করাই আমার জীবনব্রত। আমি তোমাদিগকে আবার বলিতেছি যে, এই বিশ্বাস সমস্ত মানবজাতির জীবনের এবং সকল ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমতঃ, নিজের প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও।...সকলেরই আশা আছে, সকলেরই জন্য মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত, সকলেই শীঘ্র বা বিলম্বে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যদি সেই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে আবির্ভূত হয়, তবে উহা আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাস ও অর্জুনের সময়—যে সময় আমাদের সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছিল—আনয়ন করিবে।

জগতের যত কিছু উন্নতি, সব মানুষের শক্তিতে হইয়াছে, উৎসাহের শক্তিতে হইয়াছে, বিশ্বাসের শক্তিতে হইয়াছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা সেই সকল উপনিষদের মধ্যে মনোরম কঠোপনিষদ্ পাঠ

করিয়াছ, তাঁহাদের সকলের অবশ্য স্মরণ আছে,—সেই রাজা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল ভাল জিনিস দক্ষিণা না দিয়া অতি বৃদ্ধ, কার্যের অনুপযুক্ত গো-দক্ষিণা দিতেছিলেন। ঐ উপনিষদে লিখিত আছে, সেই সময় তাঁহার পুত্র নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবেশ করিল। এই 'শ্রদ্ধা' শব্দ আমি তোমাদের নিকট ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া বলিব না; অনুবাদ করিলে ভুল হইবে। এই অপূর্ব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা কঠিন; এই শব্দের প্রভাব ও কার্যকারিতা অতিশয় প্রবল। নচিকেতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্র কি ফল হইল, দেখ। শ্রদ্ধার উদয় হইবামাত্রই নচিকেতার মনে উদয় হইল, অনেকের মধ্যে প্রথম, অনেকের মধ্যে মধ্যম, আমি অধম কখনই নহি, আমিও কিছু কার্য করিতে পারি। তাঁহার এইরূপ আত্মবিশ্বাস ও সাহস বাড়িতে লাগিল, তখন যে সমস্যার চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতেছিল, তিনি সেই মৃত্যুতত্ত্বের মীমাংসা করিতে উদ্যত হইলেন, যমগৃহে গমন ব্যতীত এই সমস্যার মীমাংসার আর উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি যমসদনে গমন করিলেন। সেই নির্ভীক বালক নচিকেতা যমগৃহে তিন দিন অপেক্ষা করিলেন। তোমরা সকলেই জান, কিরূপে তিনি যমের নিকট হইতে সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইলেন।

আমাদের চাই এই শ্রদ্ধা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত হইতে ইহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তজ্জন্যই আমাদের এই উপস্থিত দুর্দশা। মানুষে মানুষে প্রভেদ—এই শ্রদ্ধার তারতম্য লইয়া, আর কিছুতেই নহে। এই শ্রদ্ধার তারতম্যেই কেহ বড় হয়, কেহ ছোট হয়। মদীয় আচার্যদেব বলিতেন, যে আপনাকে দুর্বল ভাবে, সে দুর্বলই হইবে, আর ইহা অতি সত্য কথা। এই শ্রদ্ধা তোমাদের ভিতর প্রবেশ করুক। পাশ্চাত্ত্য জাতি জড়জগতে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা এই শ্রদ্ধার ফলে। তাহারা তাহাদের শারীরিক বলে বিশ্বাসী। আর তোমরা যদি তোমাদের আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও, তাহা হইলে তাহার ফল আরও অদ্ভুত হইবে। তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ যাহা একবাক্যে প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত আত্মায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও—সেই আত্মায়—যাঁহাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, অনন্ত শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।—বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, আর যাহা কিছু আসিবেই আসিবে।

অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে তোমরা সর্বদাই বৃথা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখনও পাও নাই; যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি নিজে যাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছ, তাহাই ফলরূপে পাইয়াছ; তথাপি কি আশ্চর্য, তুমি সর্বদাই অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ।—এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাটস্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ?

আমি ইহা করিতে পারি বা ইহা করিতে পারি না, ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম বলেন, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস-স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন।

মানুষে মানুষে প্রভেদ কেবল এই বিশ্বাসের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব লইয়া, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর যতই আমার বয়স হইতেছে, ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে; যে আপনাকে বিশ্বাস না করে, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস-স্থাপন না করে, সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে লইয়া নহে, কারণ বেদান্ত আবার একত্ববাদ শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ তোমরা সকলে শুদ্ধস্বরূপ।"

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে

সত্যের অন্বেষণ ও মানব কল্যাণ

নীলরতন ধর ও সুযুক্তা মিত্র

"হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং
তত্ত্বং পূষণ, অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।"

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। হে জ্যোতির্ময়! আমাদের সত্যদৃষ্টিলাভের জন্য সে আবরণ উন্মোচন কর।

ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন যুগে কোন্ সুদূর অতীতে আমাদের দেশের শান্ত তপোবনে সত্যসন্ধানী ঋষির কণ্ঠে যে আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছিল, মনে হয় সেই সত্যদৃষ্টি লাভের ব্যাকুলতা শুধু একটি দেশকালের গণ্ডীবদ্ধ নয়, সে প্রার্থনা যুগাতিশায়ী। প্রতি যুগে প্রতি দেশে সত্যসন্ধানী মানুষ এই ব্যাকুল প্রার্থনায় নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছে। তাই যুগে যুগে দেশে দেশে মহামনীষীর ইতিহাস সত্যসন্ধানের ইতিহাস। তাই প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও আগে সে এক অত্যাশ্চর্য ও অদ্ভুতপূর্ব কাহিনী আমরা দেখেছি। অতুল ঐশ্বর্য্য, অনুপম সুখসম্পদ, সুন্দরী স্ত্রী, শিশু পুত্রের কোমল বাহু-বন্ধন—যা কিছু মানুষের কাম্য ও আকাঙ্ক্ষার ধন—সব আকর্ষণই তুচ্ছ করে, হেলায় সে সবই পিছনে ফেলে রেখে ভিখারীর জীর্ণবসন ধারণ করে রাজার পুত্র সত্যসন্ধানের আকুল পিপাসায় ঘুরে ফিরছেন বনে বনে। চোখে তাঁর সত্যসন্ধানের তৃষ্ণা, একমাত্র উদ্দেশ্য সেই পরম বোধি লাভ করা, যার দ্বারা এই ক্ষণিক জীবনে মানুষ তার সকল পার্থিব হীনতা, দৈন্য, দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোকের পারে যেতে পারে। সাধারণ ধূলিমলিন যে অগণিত জীবন, তারই দরদী আত্মা ইনি। এঁরই নাম গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। সাধারণ মানুষের দুঃখশান্তির ব্রত যাঁর, তিনি সহজ সাধারণ ভাষাতেই সহজ মানুষের সহজসাধ্য পন্থা নির্দ্দেশ করে গেলেন তাঁর অষ্টমার্গ পন্থায়—সৎচিন্তা, সদালাপ, সদুপদেশ ইত্যাদি। যে বিরাট আত্মত্যাগের স্বাক্ষর তিনি ইতিহাসের পাতায় রেখে গেলেন, তারই প্রেরণায় পরবর্ত্তী যুগেও এ দেশে কত রাজা, মহারাজা পর্য্যন্ত মানবকল্যাণে সর্ব্বস্বত্যাগ করে আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ইনি-ই ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী; এই যুগই ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সুখসম্পন্ন।

এই সমসাময়িক কালেই নীতি ও সত্যধর্ম্মের প্রচারক হিসাবে আমরা চীনদেশে পেয়েছি কনফুসিয়াসকে।

কালের প্রবাহে আরও পাঁচশত বছর কেটে গেল। প্যালেষ্টাইনে সাধারণ দরিদ্র ইহুদীদের মধ্যে সহজ ভাষায় একটি নতুন নীতি ও ধর্ম্মের বাণী শোনাবার জন্য দরিদ্র সূত্রধরের ঘরে আবির্ভাব হল যীশু খৃষ্টের। আমাদের মতে এমন বুদ্ধিমান ও সৎলোক পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাবিহীন। অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত সরল দরিদ্রের মধ্যে সত্য, নীতি ও ধর্ম্মের বাণী গল্পচ্ছলে বোঝাবার যে সহজ ও অভিনব পন্থা তাঁর ছিল, সেও অদ্বিতীয়। কিন্তু সত্যের সহজ পথ জগতে কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাঁর একনিষ্ঠ সত্যানুসরণে আঘাত পেল ক্ষমতার আসনে আসীন ইহুদীদের মদমত্ত অহংকার। তাই রোমের সম্রাটের প্রতি বিরুদ্ধ ব্যবহারের অভিযোগে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে এদের হাতে তাঁর জীবন উৎসর্গ করতে হল। সত্যসেবকের চরম পুরস্কারের প্রথম ইতিহাস রচনা করলেন যীশু। তাঁর বিচারক ছিলেন রোমীয় শাসনকর্ত্তা Pontine Pilate, তাঁকে এই সহজ সরল প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি নিজেকে ইহুদীদের রাজা মনে করেন কিনা। একটিমাত্র উত্তরের প্রত্যাশা। বিনিময়ে হয় মৃত্যু নয় মুক্তি। কিন্তু সত্যসন্ধানী খৃষ্ট—সত্যধর্ম্মের সাধনাই যে তাঁর ব্রত। নির্ভীককণ্ঠে তাই সত্য উত্তরই তিনি দিয়েছিলেন—'আমার রাজত্ব ও আমার প্রভাব পৃথিবীর ঊর্দ্ধচারী।' এই সত্যের কণ্ঠ বজ্রকঠিন মুষ্টিতে চেপে ধরে পাইলেট ও ইহুদীরা সেদিন চরম পুরস্কারে এই কথার উত্তর দিয়েছিলেন। অশেষ যন্ত্রণায় ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল যীশুর। তাঁর বারজন সুযোগ্য শিষ্য দেশে দেশে, প্যালেষ্টাইন, এশিয়া-মাইনর, গ্রীস, রোমে গুরুর অগ্নিগর্ভ সত্যের বাণী নিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের ভাগ্যেও অনুরূপ পুরস্কার লাভ হল। কঠিন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। সত্যানুসরণে যে অসীম দুঃখভোগ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন যীশু ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা, সেই দৃষ্টান্তের বীজ হতেই অঙ্কুরিত হল খৃষ্টধর্ম্মের সত্য, মৈত্রী, করুণা ও সহিষ্ণুতার বাণী। ইহুদীরা যীশুর পার্থিব কণ্ঠই রোধ করতে পেরেছিলেন, এই বাণীর কণ্ঠ রোধ করা তাঁদের সুদূর পরাহত ছিল। অগণিত ভক্তের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে নবযুগের সূচনা হল। ধর্ম্মের জন্য হেলায় প্রাণবিসর্জ্জনের এই অপূর্ব্ব প্রেরণা আনল নতুন উদ্দীপনা। এরই প্রভাবে পরবর্ত্তী যুগেও খৃষ্টধর্ম্মরক্ষার জন্য অগণিত প্রাণ রোমে, প্যারিসে ও অন্যত্র আপনাকে উৎসর্গ করে ধন্য হল। আজো এই অসংখ্য নামগোত্রহীন ভক্তের মৃতদেহের সমাধি (catacomb) ঐ সব সহরে দেখা যায়। আজ পৃথিবীর ২৮৮৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

মানবপ্রেমিক বুদ্ধ ও খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত এই কল্যাণকর সত্যধর্ম্ম প্রচারের ফলে পৃথিবীর বহু স্থানে প্রচলিত ঘৃণিত দাসপ্রথা লোপ পেতে সহায় হয়েছে। কেবলমাত্র ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও মানুষে মানুষে অখণ্ড মৈত্রীবোধ ফিরে আসা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের কালচক্রে এই খৃষ্টধর্ম্মে বহু পরিবর্ত্তনের ধারা এসে মেশে। একদা যা ছিল সহজ মানবধর্ম্ম, তারই শেষ পরিণাম হয় পুঁজিবাদী স্বার্থের কেন্দ্ররূপে। পোপ মহাশক্তিশালী হয়ে ওঠেন। রাজদণ্ডের উপরও তাঁর অসীম প্রভাব বিস্তৃত হয়। শুধু খৃষ্টধর্ম্ম জগতের সর্ব্বাধিনায়কত্বে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন না। তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে চলে রাজ্য ভাঙাগড়ার ইতিহাস। রাজশক্তি তাঁর মুষ্টিগত। চার্চ্চের এই অধঃপতনের ফলে অনিবার্য্যরূপে দেখা দেয় বিদ্রোহ। যারা সমাজে বুদ্ধিজীবী বিচারশীল, তাঁদের ধৈর্য্য ভেঙে পড়ে। এই বিদ্রোহের পরিণাম Martin Luther কর্ত্তৃক Protestant ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠা। এই লুথারই ইয়োরোপের অন্ধকার যুগের অবসান করে Renaissanee বা পুনরুজ্জীবনকাল প্রতিষ্ঠা করেন।

এই কালের আর এক যুগান্তকারী ঘটনা ফরাসী-বিদ্রোহ। এর মূল ইন্ধন ছিল সাধারণ মধ্য ও নিম্নবিত্ত নাগরিকদের উপর প্রবল পরাক্রান্ত শাসকগোষ্ঠীর নির্ব্বিচার ও নির্মম অত্যাচার। ক্ষমতার হাতে দুর্ব্বলের পীড়ন। এরই

প্রতিক্রিয়ায় যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ যুগান্তকারী বিপ্লবের রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তারই নাম ফরাসী বিদ্রোহ। দীর্ঘদিনের নিষ্পেষিত বিদ্রোহী মানুষ সেদিন স্বাধীনতা, একতা ও ভ্রাতৃত্বের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহের পর নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠল প্রাচীনের ভস্মস্তূপের উপর। কেন্দ্রীয় শক্তিকে জনগণের হাতে এনে তাকে বিকেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এইখানেই প্রথম সূচিত হয়। তাই সমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে 'ফরাসী বিদ্রোহ' এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করে আছে।

প্রায় এগার শ' বছর আগে আরব দেশেও সাম্যনীতিমূলক ধর্মের প্রচার হয় এবং এর বাণী নানাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ। সাম্যমন্ত্রই এই ধর্মের মূল। তাই এই মুস্লিম ধর্মীয় লোকেরা পরস্পর সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে একতাবদ্ধ। দুঃখের বিষয়, মুস্লিম ও খৃষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের কাহিনী। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইতিহাস এইরূপ নয়। এইসব ধর্মপ্রভাবে মানবসমাজে সত্য, নীতি, ধর্ম ও শান্তির প্রভাব বহুল বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী যুগেও আবির্ভাব হয়েছে বহু যুগ-মানবের—যাঁরা এইসব ধর্মই কিছু পরিবর্তন করে প্রচার করে গেছেন।

গুহাচারী মানুষের আদিম জীবনযাত্রা হতে শুরু করে বিংশ-শতাব্দীর মধ্যযামের আজকের পৃথিবীর জীবনধারা পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করলে বিবর্তনশীল মানবজীবনের যে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় তার মূলকথা হয়ত এই যে, শ্রেয় হতে শ্রেয়তর পথে যাত্রা করে শ্রেয়োলাভ! সমাজের পক্ষে এই শ্রেয় শুধুই আধ্যাত্মিকতা নয়, শুধুই ঐহিক ভোগতৃষ্ণাও নয়। সংসারে ব্যবহারিক জীবনে ঐ দুইয়েরই প্রয়োজন। যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন Men can not live upon bread alone. কিন্তু এই Breadকে বাদ দিয়েও মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। বুভুক্ষার হাহাকার বুকে নিয়ে ঐহিক সুখ-বঞ্চিত মানুষের পক্ষে উচ্চাদর্শ পালন করা অসম্ভব! ভারতবর্ষে অন্নকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। এই অন্ন গ্রহণ করে মানুষ তার লুপ্ত জীবনীশক্তি ফিরে পায়। বুভুক্ষু বঞ্চিত মানুষের মুখে সর্বস্বত্যাগের কথা তার আত্মপ্রবঞ্চনার কথামাত্র। যে ভোগই করে নি, সে ত্যাগের মহিমা কতটুকু বোঝে? তাই আপামর সাধারণ মানুষের প্রথম প্রয়োজন একটি সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনের মান। এই যুগের কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ এইজন্য বলেছিলেন—"So long a single dog in my country remins without food, my whole religion will be to feed it." তাই সাধারণ মানুষের জীবনের আদর্শ ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয়। কিন্তু মহাপুরুষের বাণী পারমার্থিক সুখের সন্ধান দিলেও, ঐহিক শ্রী সম্পদ লাভের নির্দেশ তাঁরা তেমন দিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের চর্চ্চার পথেই মানুষ এই সমৃদ্ধির সন্ধান পেয়েছে।

এইখানে একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও চিন্তনীয়। মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করে ধর্মনেতাদের জীবনে যে একাগ্র সাধনা, সত্যনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁরা বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছেন, সেই সব বিজ্ঞান-সেবকের জীবনেও পরহিতার্থে দধীচির মত আত্মদান, কঠোর সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও সর্ব্বস্ব বিনিময়েও একান্তভাবে সত্যানুসরণের স্বাক্ষর আছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দী হতে ৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। গ্রীসে যখন এ্যারিষ্টটল্ ও ডিমোক্রিটাসের অভ্যুদয়, তখন আমরা ভারতে পেয়েছি কণাদকে ও কপিলকে। ২য় খৃষ্টাব্দে জীবক ও ৭৫০ অব্দে নাগার্জ্জুনের নামও বিশেষ স্মরণীয়। কিন্তু তারপর মুসলমান বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত ভারত তার স্বাধীন সত্ত্বা বিসর্জ্জন দেয়। তার স্বাধীন চিন্তাধারা লোপ পায়। ফলে বিজ্ঞানসেবা, দেশের কৃষ্টি, কর্মকুশলতা লোপ পায়। কিন্তু ইয়োরোপীয় দেশসমূহে এ্যারিষ্টটল্ প্রমুখ চিন্তানায়কগণ যে বিজ্ঞানসেবার সূত্রপাত করেন, তার ধারা বরাবর অব্যাহত ছিল। এ্যারিষ্টটলের গুরু প্লেটো সর্ব্বপ্রথম তাঁর গ্রীক এ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। কিন্তু প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে, প্রত্যক্ষ হতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তার প্রবর্ত্তক এ্যারিষ্টটল্ ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্যরা। দুর্ভাগ্যক্রমে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের পর এই কষ্টসাধ্য ও দুরূহ প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষণের গতি মন্থর ভাবে চলেছিল। চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে ইয়োরোপ এবং পশ্চিম-এশিয়াতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে এবং চিন্তার চর্চ্চা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। পশ্চিম এশিয়া এবং ইজিপ্টে আরব সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া এবং ইয়োরোপের অর্দ্ধাংশ মঙ্গোলীয় শাসনাধীন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারতের মত ইয়োরোপে বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। এবং এই প্রভাবের একটি সুফলও পরিলক্ষিত হয়। কারণ আরবী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসার পর হতে ইয়োরোপে সর্ব্বত্রই জ্ঞানতৃষ্ণা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইটালিতে সূচিত Renaissance বা পুনরুজ্জীবন-যুগ হতে সারা ইয়োরোপে জ্ঞানচর্চ্চা ছড়িয়ে পড়ে। এই যুগে যে সকল মহামনীষী যুগান্তকারী দৃষ্টি ও কাজের সূত্রপাত করেন, তারই ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছে। ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষতঃ প্যারিস, অক্সফোর্ড ও বোলোনা Bolognaএর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তার চর্চ্চা ও গবেষণা পুনঃ প্রচলিত হয়। এই প্রসঙ্গে Peter Abelaras (১০৭৯—১১৪২) ; Albertus Magnus (১১৯৩—১২৮০), Thomas Aquinas (১২২৫—১২৭৪), Dum Scotus (..—১৩০৮) ; Oceam (...—১৩৭৪), প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে Roger Baconএর নামই যুগপুরুষরূপে প্রধান। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতকের আগাগোড়াই পদার্থের গবেষণামূলক প্রত্যক্ষ ও নিরীক্ষণের উপর ভিত্তি করে নব নব জ্ঞান আহরণের চর্চ্চা অব্যাহত দেখতে পাই। যদিও বিশেষ কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার কোনো পরিচয় এই ক্ষেত্রে নাই। পরে আরো চিন্তাশীল যুক্তিবাদীর আবির্ভাব ঘটে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির সূত্রপাত হয়। ফ্লোরেন্সের Leonardo da Vinci (১৪৫২—১৫১৯), পোল্যাণ্ডের কোপার্নিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩), ডেনমার্কের Tycho

Brahe (১৫৪৬—১৬০১), জার্মাণীর Keplar (১৫৭১—১৬৩০), ইটালীর গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬৪২), ইংল্যাণ্ডের Gilbert (১৫৪০—১৬০৩), এবং Newton (১৬৪২—১৭২৭) প্রভৃতির নাম বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় অক্ষয় হয়ে আছে। এই সময় Francis Bacon (Lord Verulam (১৫৬১—১৬২৫), New Atlantics রচনা করে পথ-প্রদর্শক না হলেও বিজ্ঞানের বিশেষ ধ্রুবস্বরূপে পরিচিত হন। এই গ্রন্থে তিনি জ্ঞানের চর্চ্চার জন্য একটি বিজ্ঞানমন্দির পরিকল্পনা করেন। এখানে সর্ব্বোচ্চ মানের যোগ্যতায় জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইয়োরোপে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। Paracelsus, Bacon, Boyle প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার বিশেষ অগ্রসর হয়। প্রত্যক্ষ হতে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার অভ্যাস বা শিক্ষা ইয়োরোপীয়দের ছিল বলে তারা প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছেন। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও তাঁদের এই নিষ্ঠা ও সত্যদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এরই অভাবে ৮ম শতাব্দীর পর হতে ভারতে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী মন আর অধিক অগ্রসর হতে পারে নাই।

মানুষের দুঃখদারিদ্র্য মোচনের জন্য প্রকৃতির অবগুণ্ঠন খুলে ধরে তার প্রসন্ন কৃপালাভের যে পথে বিজ্ঞানী মানুষ চিরদিন সাধনা করতে চেয়েছে, সেই পথ আরামের কুসুমকোমল নয়। ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, কঠোর শ্রম ও সত্যদৃষ্টির সহায়েই সে পথে সিদ্ধিলাভের আশা করা যেতে পারে। লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে নিভৃতে বসে যাঁরা একান্তই স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে আত্মত্যাগের পথে সাধনা করে গেছেন, তাঁরাই দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষকে দিতে পেরেছেন রোগে সুখ, শোকে শান্তি, অভাবে, অনটনে তৃপ্তির আনন্দ। মানবকল্যাণের ইতিহাসে এইসব বিজ্ঞানসাধকের অবদান অসামান্য।

বিখ্যাত জার্মাণ রাসায়নিক Paracelsus বলেছিলেন—"Experimentors do not go idly about in gorgeous suits of satin, silk and phesh, with gold ring on their fingers, silver dagger at their sides, and white gloves on their hands, but, they tend patiently to their work at the fire day and night."

অমর ফরাসী রাসায়নিক A. L. Lavoisier যিনি ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনে প্রাণ দিয়েছিলেন, তিনি মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লিখেছিলেন—"We will close this memoir with a consoling reflection. It is not required in order to merit well of humanity and to pay tribute to one's country, that one should participate in brilliant public functions that relate to the organisation and regeneration of empires. The scientist in the seclusion of his laboratory and study, may also perform patriotic functions. He can hope, by his labours to diminish the mass of ills that afflict the humanity and to improve its enjoyments and happiness; and should he, by the new paths which he has opened has helped to prolong the average life of man by several years or even by several days, he can then aspire to the glorious title of benefactor of humanity."

আজ বিশ্বসভায় ইয়োরোপের যে স্থান, তার মূলে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদান অবশ্য স্বীকার্য্য। এঁদেরই সার্থক কৃতিত্বের জন্য পাশ্চাত্যবাদিগণ ব্যবহারিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই অগ্রাধিকারের যোগ্য। তাঁদের কাছে বিজ্ঞানের গবেষণাগার মন্দিরতুল্য এবং বিজ্ঞানের বেদীমূলে আত্মনিয়োগ সাধনা। এই সূত্রে Palissy, Black, Scheele, Priestly, Newton, Canendist, Daivy, Faraday, Pasteur, Ross, Koch, Lister প্রভৃতি বিশেষ স্মরণীয়। এদেরই অকান্ত একনিষ্ঠতা ও আত্মদানে ইয়োরোপে বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞানের চর্চ্চা এত অগ্রসর। এবং ইয়োরোপবাসী এত সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তবমুখীন চিন্তাধারাযুক্ত। প্রকৃতিকে জয় করে ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করে এঁরা আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের সন্ধান পেয়েছেন। যার ফলে মণিময় ভাণ্ডারের মত প্রকৃতির অতুল সম্পদ তাঁদের করায়ত্ত। ইয়োরোপকে সুখসমৃদ্ধি সম্পন্ন করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে তাঁরা বসাতে পেরেছেন।

যাঁদের সাধনায় বর্ত্তমান ইয়োরোপের বহুবাঞ্ছিত জীবনযাত্রাপালন সম্ভব হয়েছে, সেইসব যুগপুরুষকল্প বিজ্ঞানসেবকের কঠোর শ্রম ও সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা, এবং চরম আত্মদানের বিনিময়ে সত্যানুসরণের কাহিনী, গ্যালিলিও হতে ম্যাডাম কুরী পর্য্যন্ত তাঁদের জীবনকথা, গল্পের মতই মনোরম ও আশ্চর্যকর। ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বকাম্য সুখসম্ভোগ, অর্থতৃষ্ণা, সবকিছুই তুচ্ছ করে পরম সত্যনিষ্ঠার পথে অশেষ দুঃখবরণ করে এঁরা বিজ্ঞানসাধনা করে গেছেন। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সব কিছু ছেড়ে এঁরা মানুষকে দিতে চেয়েছেন সব কিছু পাবার প্রতিশ্রুতি। নীরবে নিভৃতে বসে একাগ্রসাধনায় এঁরা রচনা করতে চেয়েছেন সেই সোনার সিঁড়ি, যার ধাপে ধাপে সাধারণ মানুষ যদি এগিয়ে যায়, তবে সে দুহাত ভরে কুড়িয়ে পাবে ঐহিক শ্রী ও সম্পদলাভের অজস্র সম্ভাবনার পরশপাথর।

অসংখ্য সেবকের অসংখ্য জীবনকথায় এঁদের অসামান্য নিষ্ঠা, ত্যাগ, দুঃখবরণ ও কঠোর শ্রমস্বীকারের পরিচয় পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক Scheele এক ঔষধবিক্রেতার দোকানে সামান্য কাজ করে, কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে একাগ্রমনে অবসর সময়ে রসায়নের গবেষণা করতেন। নিজের জীবনের চরম দুঃখ দুর্দ্দশা হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়ে তিনি রেখে গেছেন তাঁর অমূল্য সাধনার ফলাফল।

ইংরাজ বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে যাঁর যুগান্তকারী প্রতিভার দানে বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক যুগের প্রবর্ত্তন, দারিদ্র্যের কশাঘাতে স্কুল-কলেজে পড়ায় সুযোগ পর্য্যন্ত পান নাই। পুরাণ বই

বাঁধানর দোকানে সামান্য বেতনে অতি সামান্য কাজে নিযুক্ত থেকে তিনি অবসর সময়ে অধ্যয়ন করতেন। তাঁর এই অপূর্ব্ব নিষ্ঠা লণ্ডনের Royal Institutionএর Sir Humphry Davyর দৃষ্টিগোচর যেদিন হয় সেদিন তাঁর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। কারণ, এঁরই সহায়তায় তিনি গবেষণাগারে চাকুরী পেয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অসামান্য গবেষণা করার সুযোগ পান। তাঁর প্রতিভার যোগ্য পুরস্কার তিনি লাভ করে'ছলেন যখন Davyর মৃত্যুর পর তাঁকে Royal Institutionএর কর্ত্তৃপক্ষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা ৪০০০৲ টাকা মাসিক বেতনের বিনিময়ে Faradayকে তাঁদের ব্যবসায়ে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। কিন্তু অর্থের প্রলোভনে সত্যসেবক সত্যানুসন্ধানের পথ পরিত্যাগ করেন নাই।

ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সর্ব্বজনস্বীকৃত ও সর্ব্ববরেণ্য ব্যক্তি হলেন Louis Pastaur লুই পাস্তুর। যিনি জলাতঙ্ক রোগের কারণের আবিষ্কর্ত্তা। রোগের নিদানরূপে জীবাণুর অস্তিত্বের যিনি প্রথম ঘোষণাকারী। রোগ নির্ণয়ের দ্বারা মানুষের ক্লেশহরণের পথের সঙ্কেতদান করে ইনি ফ্রান্সের এবং শুধু ফ্রান্সের নয়, সারা বিশ্বের সর্ব্বনমস্য হয়ে আছেন। ১৯১৪—১৯১৮ সালে যখন ফ্রান্সের চরম দুর্দশার কাল—একদিকে সীমান্ত অবরোধ করে জার্ম্মাণ জাতি বহুদূর অগ্রসর, প্যারিস সহর বোমাবিধ্বস্ত, সেই সময় Petit Parisien (ছোট প্যারিসবাসী) নামক এক সংবাদপত্রের সম্পাদক গ্রাহকদের কাছে একটি প্রশ্ন নিবেদন করে উত্তর প্রার্থনা করেন। প্রশ্নটি এই—ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন কে? এই ছোট সহজ প্রশ্নটি একটি অত্যাশ্চর্য্য উত্তর বহন করে এনেছিল—ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হলেন দরিদ্র বিজ্ঞানবীর লুই পাস্তুর। দ্বিতীয়—Le Miserables-এর লেখক Victor Hugo-কে প্রকৃত মানবকল্যাণকারী এবং অগণিত দেশবাসীর মনে কার জন্য অক্ষয় আসন পাতা—এই উত্তর তারই দিগ্‌দর্শন।

এই সূত্রে দুই মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশিষ্ট জৈব রাসায়নিকদ্বয় অধ্যাপক Emil Fischer যখন বার্লিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হন এবং অধ্যাপক W. H. Perkin (Junior)কে যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়, তখন তাঁরা এই সর্ত্তে রাজি হয়েছিলেন যে, তাঁদের গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করার অখণ্ড অবসর দিতে হবে। কোনরকম কমিটি মিটিং ইত্যাদিতে তাঁরা যোগ দিতে পারবেন না। সকলেই জানেন যে Emil Fischer Phenylhydrotineএর সাহায্যে তাঁর সুবিখ্যাত গবেষণা করেছিলেন এবং এরই ধীরগতি বিষক্রিয়ায় ১৯১৯ সালে তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

জগদ্‌বিখ্যাত মাদাম কুরীর সাধনা ও আত্মদানের কাহিনী অমর হয়ে আছে। শেষ জীবনে তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। যদিও প্যারিসের বিখ্যাত ডাক্তাররা সদাই তাঁর জন্য সতর্ক ও উদ্‌গ্রীব থাকতেন। পরে বোঝা যায় যে, যে Radium ও অন্যান্য শক্তি নিয়ে তাঁর গবেষণা ছিল, তারই বিষক্রিয়ায় তাঁর এই অসুস্থতা।

মাদাম কুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জামাতা Irene Curie এবং অধ্যাপক Joliot Curie ও আণবিক রশ্মির উপর গবেষণায় রত হয়ে যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্য বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁদের অকালমৃত্যু হয়।

১৯১৩ সালে লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে (University College) Sir William Ramsay অধ্যাপক পদ হতে অবসর গ্রহণ করলে এই পদে প্রথম Sir James Walkerকে আহ্বান জানান হয় কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করলে, অধ্যাপক F. G. Donnan এই পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু চাকুরী গ্রহণ করে Donnan লণ্ডনে এসে দেখলেন যে তাঁর উপর পরিচালনার নানারূপ কর্ত্তব্যভার দেওয়া আছে এবং বহু মিটিংএ তাঁকে যোগ দিতে হবে। তিনি নিজের গবেষণার ব্যাঘাত আশঙ্কা করে তাঁর নিজের পুরাণ পদে Liverpoolএ পালিয়ে আসেন। এরপর সমস্ত কর্ত্তব্য যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দিয়ে বিশেষ অনুরোধ ও উপরোধ করে তবেই তাঁকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতে ও প্রাচ্যে বিজ্ঞানের সেবায় এতটা নিষ্ঠা, সততা ও শ্রমস্বীকার দেখা যায় নাই। এইজন্য তারা বিজ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনেও প্রয়োগ করতে অক্ষম হয়েছেন। প্রকৃতির অফুরাণ সুধাগার নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষিলক্ষ্মী পাশ্চাত্যের মত কৃপাদৃষ্টি প্রসারিত করেন নাই! বিশেষতঃ দুর্ভাগা ভারতবর্ষ বার বার বিদেশী বহিঃশত্রুর আক্রমণে স্বাধীনতা হারাতে হারাতে মনে, প্রাণে, চিন্তায়, কর্ম্মেও যেন দাসত্ব বরণ করে নিয়েছিল।

ভারতবর্ষে আধুনিককালে বিজ্ঞানের সেবায় যাঁরা দেশমাতৃকার গৌরববৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের মধ্যে স্যার জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও স্যার সি, ভি, রমণ, রামানুজ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাদপীঠ এঁরাই রচনা করেছেন। বিখ্যাত শিল্পপতি জামসেদজী টাটার অকুণ্ঠ বদান্যতায় ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান (Indian Institute of Science) প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানের একান্ত আরাধনায় উৎসুক দেশের যুবকযুবতীদের একত্রিত করে বিজ্ঞানচর্চ্চার সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে Sheila Dhar Institute of Soil Science প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এই যে, গবেষণাগারে আবিষ্কৃত নব নব পদ্ধতির সহায়ে জমির উর্ব্বরতাবৃদ্ধি ও খাদ্যসমস্যা দূর করার প্রচেষ্টা করা। নিরন্ন বুভুক্ষু দেশে একমুষ্টি ক্ষুধার নিশ্চিত অন্ন সংস্থান করে অগণিত ক্লিষ্ট দরিদ্রনারায়ণের সেবা করা।

মানবজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অমর বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের একটি স্মরণীয় উক্তি উল্লেখ করে এ আলোচনার সমাপ্তি করতে চাই। তিনি মানুষের জীবনের তিনটি প্রধান স্তরে তিনটি আত্মজিজ্ঞাসা রেখে গেছেন। তিনি বলেছিলেন—ত্রিশ বছর বয়সে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা হওয়া উচিত এই যে, সে কতদূর মনকে প্রসারিত করে নিজেকে বিস্তৃত করতে পেরেছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে জীবনমধ্যাহ্নে তার প্রশ্ন হওয়া উচিত—দেশের কতখানি সেবা তিনি করতে সক্ষম হয়েছেন। সত্তরবছর বয়সে জীবনের আসন্ন সন্ধ্যায় তার এই আত্মচিন্তা আসা উচিত যে, মানবসেবায় তিনি কতখানি নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছেন।

গীতা পাঠের রীতি

(আলোচনা)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

গত শ্রাবণ সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত (পৃঃ ৫৬৬।৫৬৭) "গীতা পাঠের রীতি" বিষয়ক প্রবন্ধটি আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পাঠ করিতে গেলাম; কিন্তু আগ্রহ স্তিমিত এবং আনন্দ বিষাদে রূপান্তরিত হলো। 'বিষাদ' হলেও ক্ষতি ছিল না, যদি সেটা আগে হতো এবং পরে আনন্দ দেখা দিত; কিন্তু এ আগাগোড়াই বিষাদে ভরা এবং বলতে পারা যায় কেমন যেন একটু বিস্বাদও!...

গল্প-উপন্যাসের কথা না হয় বাদই দিলাম; কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ক কোন কিছু রচনা মাসিক বসুমতীর মত বহুল প্রচারিত একখানি পত্রিকায় প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লেখকের ভাবা উচিত ছিল যে, ইহা সর্ব্বজনপাঠ্য পত্রিকা এবং এমন কি, বললে অত্যুক্তি হয় না যে, ইহা সর্বসাধারণেরই পত্রিকা। গল্প-উপন্যাসাদির যা ধারা এখন বর্ত্তমান তা প্রকাশ করা একান্তই অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে, এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও; নতুবা পত্রিকা চালনাই এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। গল্প-উপন্যাসে অনেক কিছুই ভুল থাকতে পারে, অনেক কিছুই ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ করে শ্রীশ্রীগীতার মত একখানি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা কালে কোন কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলে তাহা যে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, জনসাধারণকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে—এ জ্ঞান লেখকের থাকা উচিত। তাঁর বক্তব্য যদি সম্যক পরিস্ফুট না হয়—তাঁর বক্তব্য যদি মধ্যপথ হতেই ভিন্নপথ অবলম্বন করে এবং তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তবে "সর্বসাধারণের জন্য" তা ব্যক্ত না করে অব্যক্তই রাখা উচিত ছিল।

লেখকের প্রধান বক্তব্য ছিল 'গীতা পাঠের রীতি' সম্বন্ধে এবং রীতি-অর্থে তিনি ধরেছেন অভ্যাস; এই হিসাবে তিনি শ্লোকের পর শ্লোক তুলে দেখিয়েছেন কেমন করে গীতা পাঠ অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু এর যে অন্য আরও একটা দিক্ আছে সে, সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরব। সে কথা পরে বলছি।

গীতাপাঠ কেমন করে অভ্যাস করতে হবে, তা দেখাতে গিয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পর পর শ্লোক তুলেছেন—২।৪৭, ৩।২৭, ৫।৮-৯, ১৩।২৯, ১৮।৫৯; পুনরায় ১৩।২১-২৩, পুনরায় আরও পশ্চাদপসরণ করেছেন—৬।২৯-৩০, ১।১৭, ১।১৫ ইত্যাদি অর্থাৎ নিজের সুবিধামত শ্লোকগুলি সাজিয়ে এইভাবে যে গীতাপাঠ করতে হয় বা বুঝতে হয়, ইহাই বোধ হয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি আবারও বলেছেন "গীতা সমগ্রভাবে পাঠ করা উচিত";—অর্থাৎ? গীতা যে পাঠ করে সে কি সমগ্রভাবে পাঠ করে না? অথবা তিনি কি এই বলতে চান যে, গীতা আগে সমগ্রভাবে পাঠ করে তারপর বুঝে বুঝে খাপছাড়া ঐ রকমভাবে পড়তে হবে!...

তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্য হলো—"জ্ঞান যেরূপ যেরূপ উন্নত হইবে, শিক্ষাও সেই মত হইবে।" কিন্তু ঠিক্ কি তাই?—জ্ঞানের চেয়ে শিক্ষা কি বড়?—সাঁতার সম্বন্ধে উন্নত ধরণের জ্ঞানলাভ করে, তারপর সাঁতারকাটা শিখতে হবে!—না, জলে নেমে সাঁতারকাটা শিক্ষা করতে করতে তবেই না সাঁতার সম্বন্ধে উত্তম জ্ঞানলাভ হবে? সন্তান যেদিন ভূমিষ্ঠ হয় সেইদিন থেকেই কি সে জ্ঞানলাভ করে যে 'অমুক' আমার মা, 'অমুক' আমার বাবা—না ক্রমশঃ শিক্ষালাভের পর সে বুঝতে পারে যে, 'অমুক' তার মা, 'অমুক' তার বাবা?—অবশ্য গর্ভাবস্থায় জ্ঞানলাভ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মাত্র একজন মহাপুরুষ এবং সেরূপ জ্ঞানলাভ হয়েছিল বলেই তিনি ভূমিষ্ঠ হবামাত্র সংসার থেকে ছুটে পালাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।

জ্ঞান থেকে শিক্ষা নয়—শিক্ষা থেকেই জ্ঞানলাভ হয়। জ্ঞানলাভ যার ঘটেছে তার আবার শিক্ষার কি প্রয়োজন? জ্ঞান কাকে বলে?—'সংশয়'ই হলো অজ্ঞানতা, আর সংশয় থেকে মুক্ত যিনি তিনিই হলেন জ্ঞানী। সুতরাং সংশয়মুক্ত ব্যক্তির জীবনে আবার শিক্ষালাভের কি প্রয়োজন?

অর্জ্জুনের মন নানা সংশয়ে সংশয়াপন্ন ছিল বলেই নানা প্রশ্নের উদ্ভব ঘটেছে এবং সে-সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানকালে স্বয়ং ভগবান যে সব হিতবাণী শোনালেন, তাতেই অর্জ্জুনের জ্ঞান-চক্ষুরুন্মিলিত হলো অর্থাৎ অর্জ্জুনের সকল সংশয় দূরীভূত হলো।

যদিও অর্জ্জুন আমাদের চির-নমস্য, তথাপি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের শিক্ষা-দীক্ষা এমন কিছু উন্নত ধরণের ছিল না—যাতে তাঁর চির-সঙ্গী হলেও সখা শ্রীকৃষ্ণকে সম্যকরূপে অবগত হতে পারতেন। তাই অর্জ্জুনের তথা লোক-শিক্ষার জন্যই শ্রীশ্রীগীতার হিতবাণীর প্রয়োজন হয়েছিল অত্যধিক। এবং সেই শিক্ষালাভের ফলেই অর্জ্জুনের অন্তরে অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল এবং পরে এক সময়ে তাঁর সেই অজ্ঞানতা-জনিত দোষ স্বীকার করে দুঃখিত এবং লজ্জিত অর্জ্জুন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে:

"হেন বিশ্বরূপ আর মহিমা অপার
প্রমাদ বা প্রীতিবশে না জানিয়া সার,
'হে কৃষ্ণ, যাদব সখে', বলি এই মত
সখা ভাবি তিরস্কার করিয়াছি কত।
আনন্দে অচ্যুত, যবে থাকিতে শয়নে
অথবা উপবেশনে বিহার ভোজনে
সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে পরিহাস করি
কত অপরাধ পদে করিয়াছি হ'র!
অচিন্ত্য যে তুমি! আজ ভিক্ষা তব পাশে
নিতান্ত অজ্ঞান আমি! ক্ষমা কর দাসে।"

(সুধাকরী গীতা, ১১-৪১।৪২)

যাক। লেখকের তৃতীয় বক্তব্য বা আসল উদ্দেশ্য রয়েছে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে! কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তা 'সর্ব্বসাধারণই' বিচার করবেন। তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখিত হয়েছে—"উপরোক্ত বাঙ্গালা ছন্দ লেখকের 'ছন্দে গীতা' হইতে উদ্ধৃত করা হইল—মূল সংস্কৃত দুই লাইনে, ছন্দে গীতায় লেখক যতদূর সম্ভব দুই লাইনে অতি সহজ ভাষায় ও শুদ্ধ বা সঠিক অর্থে সর্ব্বসাধারণের জন্য অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।—"

চেষ্টা না করলেই ভাল করতেন! কেননা, ট্রেণের বা ট্রামেরই শুনেছি দুই 'লাইন' আছে—মূল সংস্কৃতেরও! তাহলে দাঁড়াল কি?—ছেলেবেলায় পড়েছিলাম যদি $A = B = C$ হয়, তবে $C = A$ হবে; অর্থাৎ এই ফরমূলাটি যদি এখানে প্রয়োগ করি, তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এই যে: ট্রেনের দুই লাইন = ট্রামের দুই লাইন = মূল সংস্কৃতের দুই লাইন; সুতরাং মূল সংস্কৃত = ট্রেন!...

কিন্তু ঠিক কি তাই?—সর্ব্বসাধারণ কি এতই বোকা যে ট্রেন আর সংস্কৃতকে একাকার করে ফেলবে!...

পরের কথা হলো: "অতি সহজ ভাষায় ও শুদ্ধ বা সঠিক অর্থে—" ইত্যাদি।

তার নমুনা:—

"সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ি, এক যে আমি সেই আমাকে আশ্রয় ধরি,
চিন্তা কি আর, কর্ম্মবন্ধন হইতে আমিই যে মুক্ত করি।"—১৮।৬৬

এখন ঐ অনুবাদটা গদ্যে রূপান্তরিত করলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক:—"(হে অর্জ্জুন!) চিন্তা কি আর, কর্ম্মবন্ধন হইতে আমিই যে মুক্ত করি। (সুতরাং) সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া, এক যে আমি সেই আমাকে আশ্রয় ধরিয়া...???"

কি সুন্দর সরল সহজ ভাষা! কি সঠিক অর্থ! 'সর্ব্বসাধারণের' কাছে একেবারে জলবৎ তরলম্!...

সমাপিকা ও অসমাপিকা নামে দুইটি ক্রিয়াপদ আছে; যে ক্রিয়ায় বাক্যের সমাপ্তি ঘটে না, তাহাই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। এখানে 'ছাড়ি' এবং 'ধরি' দুইটিই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ; সুতরাং এর পরেও একটা করে প্রশ্ন থেকে যায়, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া (কি?), আমাকে আশ্রয় ধরিয়া (কি করতে হবে?)—এ সবের কোন জবাব নেই কিন্তু; সুতরাং অনুবাদ অসম্পূর্ণ।

ঐ অনুবাদটির মূল সংস্কৃত হলো:

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

এই শ্লোকের কোন্ কথাটির 'সঠিক' অর্থ হলো—'চিন্তা কি আর'? অথবা 'কর্ম্মবন্ধন'?

"চারি বা বেশী লাইনে অনুবাদ করিলে অনেক সময় অহেতুকর অতিরিক্ত শব্দ আসে"—তাই যদি হয়, তবে দুই 'লাইনে' অনুবাদ করায় অহেতুকর অতিরিক্ত শব্দ আসিল কেন? অথবা লেখক কি ধরে নিয়েছেন যে, দুই 'লাইনে' অনুবাদ করায় অহেতুকর অতিরিক্ত শব্দ আসিলে তাহা মার্জ্জনার যোগ্য হইবে?

স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা কথা আছে; সে কথা স্মরণে থাকলে অনুবাদ করবার সময় লেখককে অকারণ 'চিন্তা কি আর' বলে চিন্তিত হতে হতো না অথবা অকারণে তিনি 'কর্ম্মবন্ধনেও' জড়িয়ে পড়তেন না।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বেই অর্জ্জুন দেখলেন যে, তিনি যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা ত সকলেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-কুটুম্ব; শুধু তাই নয়, এর মধ্যে গুরুদেবও আছেন এবং যাঁদের সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই এমন ব্যক্তিও আছেন। এইসব দেখে শুনে তিনি শর ও শরাসন ত্যাগ করে সখেদে শ্রীভগবানকে বললেন—'আমি যুদ্ধ করব না; কেননা যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, যারা এই যুদ্ধে হত হবে, তারা ত সবাই আপনার লোক, তাদের বধ করে আমি রাজ্য চাই না। শুধু তাই নয়, এই সব আত্মীয়-স্বজন বধ হেতু পাপভার বৃদ্ধি হবে মাত্র; আর দু'-পক্ষের যুদ্ধে বহু পুরুষ হত হবে, ফলে কুলবধূগণ অকাল-বৈধব্যদশায় পতিত হবে; তাতে কুলক্ষয় হবে। কুলক্ষয় হেতু কুলধর্ম্ম নষ্ট হবে; ধর্ম্ম নষ্ট হলে নারীগণ সহজেই ধর্ম্মচ্যুতা হবে, তাতে সঙ্কর বর্ণের উদয় হবে—ফলে পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণা হবেন। হে কৃষ্ণ! রাজ্যলোভে অরাতিদল জ্ঞানশূন্য হয়েছে, তাই কুলনাশে দোষ দেখে না, স্বজন-বিদ্রোহ পাপ বলে মনে করে না;—আমরা সেই দোষ দেখে কেন এই পাপ-প্রলোভন ত্যাগ করব না। হায়! রাজ্যলোভে আমরা কি পাপই না করতে এসেছি!'—এইভাবে তিনি শোক প্রকাশ করতে লাগলেন।

শ্রীভগবান তখন নানা হিতোপদেশচ্ছলে, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা শুনিয়ে এবং সাহস ও অভয় দিয়ে অর্জ্জুনের শোকগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। এক্ষেত্রে তাই শ্রীভগবান অভয়বাণী উচ্চারণ করে বলছেন, "হে অর্জ্জুন! সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে তোমার সকল পাপ থেকে মুক্তি দেব; সুতরাং তুমি আর রোদন করো না।"

রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সশস্ত্র পাণ্ডব ও কৌরবগণ যখন পরস্পর ঘোরতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত,—মুহূর্ত্তে যেখানে বিশ্বের বিস্ময়কর এক মহাপ্রলয় ঘটে যাবে; সেখানে দাঁড়িয়ে অর্জ্জুন 'কর্ম্মবন্ধন' থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ততটা চিন্তিত হয়ে পড়েননি—যতটা ভীত এবং মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন সমূহ পাপের ভয়ে! তাই না শ্রীভগবান অভয়বাণী দিয়ে বলছেন—'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'সঠিক অর্থে অনুবাদ' হয়নি। লেখকের উচিত ছিল এইরূপ একটি ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ কালে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুবাদকগণ কি করেছেন তা একবার দেখে নেওয়া। লেখকের তথা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমি পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত 'গীতা-রত্নামৃত' থেকে ঐ অংশ তুলে দিচ্ছি। তিনি প্রাগুক্ত শ্লোকটির এইরূপ অনুবাদ করেছেন:

"সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করি' অনুক্ষণ
একমাত্র আমাকেই কর হে শরণ
সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত করিব নিশ্চয়
শোক নাহি কর তুমি ওহে ধনঞ্জয়।"

এ ক্ষেত্রে দুই 'লাইনের' পরিবর্ত্তে চারি 'লাইনে' অনুবাদ করলেও 'অহেতুকর অতিরিক্ত শব্দ' কিছুই আসেনি—যাতে মূল শ্লোকের অর্থের কিছু ব্যাঘাত ঘটতে পারে। 'অনুক্ষণ' শব্দটি অতিরিক্ত বলে মনে হলেও বাংলায় এর ভাবার্থ আরও পরিষ্কার হয়েছে।

চার 'লাইনে' ঐ শ্লোকটিরই আবার কি সুন্দর অনুবাদ করেছেন

কুমারনাথ সুধাকর। যেন সুধাংশু উৎস ঝরে পড়েছে তাঁর অমৃতময়ী লেখনী থেকে। তিনি লিখেছেন :

"সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি, কেবল আমাকে ধরি
একান্ত অন্তরে লও আমার শরণ,
সর্ব্ব পাপে পরিত্রাণ আমিই করিব দান,
আর দুঃখ করিও না, কুন্তীর নন্দন।"

এ ক্ষেত্রে 'একান্ত অন্তরে', 'আমিই করিব দান' এবং 'আর' কথাটি লেখকের কাছে হয়ত অতিরিক্ত বলেই মনে হবে ; কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই বুঝতে পারা যাবে যে, ঐ কথাগুলি প্রয়োগ করাতে শ্লোকটির একাধারে অর্থ, ভাষ্য এবং অনুবাদ অতি সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় স্থান পেয়েছে।

'মামেকং শরণং' অর্থে একমাত্র আমাকেই শরণ ; কিন্তু শুধু শরণেই কি হবে !—না, সেই শরণ হবে বা হওয়া উচিত আন্তরিকতায় পূর্ণ, তবেই না সেই শরণ লওয়া সার্থক হবে। তাই সাধক কবি সুধাকর ঐ মূল্যবান্ কথাটি যোগ করে দিয়েছেন—'একান্ত অন্তরে লও আমার শরণ'। 'আমিই করিব দান'—এ কথাটির এখানে একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। দান যে করে সে দাতা, আর তা গ্রহণ যে করে সে গ্রহীতা। এই দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই পরস্পর উপযুক্ত না হলে দান যেমন করাও যায় না, দান তেমনি লওয়াও যায় না। এক্ষেত্রে দাতা হলেন স্বয়ং ভগবান, আর গ্রহীতা হলেন অর্জ্জুন। কি দান করবেন—না, সর্ব্বপাপে পরিত্রাণরূপ দান। কিন্তু ভগবান অর্জ্জুনকে সে-দান গ্রহণ করবার উপযুক্ত পাত্র ভাবলেন কেন? তার কারণ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা এবং ভূভার-হরণের জন্ম তিনি অর্জ্জুনকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন ; কিন্তু এরূপ এক বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহু বাধা বিঘ্ন এবং সম্ভাব্য বিপদের কথা বাদ দিলেও সমূহ পাপের ভয় আছে। সেই পাপের ভয়ে কেহই ঐ কাজ করতে স্বীকৃত হবেন না ; এমনকি অর্জ্জুনও হন নি। তাই অর্জ্জুনকে অভয় দিয়ে কাজে প্রবৃত্ত করবার জন্মে ভগবান বললেন—সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, সকল পাপ থেকে মুক্তি দেব। কিন্তু পাপ করলে পাপীর শাস্তি বিধানই হলো বিধির বিধান—ভগবান সে বিধাতার নিয়ম লঙ্ঘন করবেন কেন? দ্বিতীয় কথা, পাপীর যদি শাস্তি ভোগ না হয়, তাহলে ত সকলেই পাপকার্য্যে রত থাকবে এবং সহজেই তারা নজীর দেখিয়ে বলবে যে, অর্জ্জুন যখন শাস্তি না পেয়ে পাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে, তখন তারাই বা পাবে না কেন?

কিন্তু আসলে তা নয় ; সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। অর্জ্জুনের পাপেরও মোচন হবে অথচ বিধির বিধানও লঙ্ঘন করা হবে না। এবং এরই গূঢ়ার্থ নিহিত রয়েছে ঐ শ্লোকেরই মধ্যে যা ভক্ত প্রকাশ করেছেন এইভাবে :

'সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ আমিই করিব দান'

অর্থাৎ ভূভারহরণ তথা ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্ম যে প্রশংসনীয় কাজ তুমি করবে, তার জন্ম উপযুক্ত দান তোমায় দেব—সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ। সুতরাং এতবড় একটা প্রতিশ্রুতির পর 'আর' শোক বা দুঃখ করার কোন প্রয়োজনই নেই।

মোট কথা ; চারি বা ছয় 'লাইনে' অনুবাদ করিতে গেলে দু' একটি কথা হয়ত বেশী আসিতেই পারে, কিন্তু মূল শ্লোকের কথা একেবারে বর্জ্জন করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। কি পণ্ডিত শ্যামাচরণ, কি সাধক কবি সুধাকর, কেহই 'চিন্তা কি আর' অথবা 'কর্ম্মবন্ধন' লেখেননি ; তাঁরা উভয়েই 'সর্ব্বপাপেভ্যো' এবং 'মা শুচঃ' এই মূল কথা দুইটিরই হুবহু অনুবাদ করেছেন—'সর্ব্বপাপ হতে', 'আর দুঃখ বা শোক করো না'।

যাক্। এইবার আসল কথায় আসা যাক্। "গীতাপাঠের রীতি" সত্যই কি রকম হওয়া উচিত? এর দুটো দিক্ আছে। প্রথম হলো, গীতার অধ্যায়গুলি যেমন আছে ঠিক্ তেমনিভাবেই পড়ে যাওয়া। অর্থাৎ প্রথম "অর্জ্জুন বিষাদ যোগে" আরম্ভ করে 'মোক্ষ যোগে' শেষ করা। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রথম বিষাদ প্রাপ্তি না হলে বৈরাগ্য আসে না ; বৈরাগ্য না এলে কেহই মোক্ষের কথা চিন্তা করে না। এই জন্যই প্রথমেই 'অর্জ্জুন বিষাদ যোগ'। মাঝের অধ্যায়গুলি লক্ষ্যস্থল সেই মোক্ষপথে এগিয়ে নিয়ে যাবার সোপানশ্রেণী বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কাজেই গীতা যেমন খাপছাড়া ভাবে পাঠ করা কোনক্রমেই উচিত নয়, তেমনি "গীতা সমগ্রভাবে পাঠ করা উচিত" এরূপ অবান্তর প্রশ্নের কথাও আদৌ ওঠে না! এর পর হলো গীতাপাঠের আর একটা দিক্ ;—যার সম্বন্ধে লেখক একটি কথাও বলেন নি!—সেটা হলো ছন্দ বজায় রেখে গীতাপাঠ করা। অনেকেই হয়ত সুর করে গীতা পাঠ করেন ; সেক্ষেত্রে যাঁদের কণ্ঠস্বর ভাল, তাঁদের গীতাপাঠ ভালই লাগে ; কিন্তু কণ্ঠস্বর ভাল না হলে হাজার সুর করে পড়লেও তা মিষ্ট লাগে না। পক্ষান্তরে, যদি ছন্দ বজায় রেখে গীতা পাঠ করা যায় তবে কণ্ঠস্বর ভালই হোক্ অথবা মন্দই হোক্ উভয় ক্ষেত্রেই তা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আপন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইবেই—শ্রুতিসুখকর ত বটেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—ছন্দ কি? সেকথা বলিতে গেলে অনেক কথাই আসে ; সংক্ষেপে দু' একটা কথা বলছি।

ব্যাপক অর্থে ছন্দ—গতি-সৌন্দর্য্য ; সঙ্কীর্ণ অর্থে—'ভাষার অন্তর্গত প্রবহণশীল ধ্বনি-সৌন্দর্য্য' (নূতন বাংলা অভিধান)। সুতরাং এক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ অর্থই প্রযোজ্য। ছন্দ উভয়বিধ—গদ্য এবং পদ্য। আমরা পদ্য ছন্দেরই কেবল আলোচনা করিব।

পদ্য শব্দের অর্থ পদ-যুক্ত ; নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ধ্বনি-প্রবাহই পদ বা চরণ—"লাইন" নহে। চরণের মধ্যস্থিত বিভাগগুলির নাম পর্ব্ব। পদ্য পড়িবার সময় মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নেবার জন্য একটু বিশ্রামের প্রয়োজন হয় ; এই বিরাম স্থলকে যতি বলে।

মৌলিক রচনাই হোক্ অথবা অনুবাদই হোক্, পদ্য বা কবিতা লিখতে গেলে ঐ নিয়মগুলি মানতেই হয়। যদিও ছন্দ প্রধানতঃ তিন প্রকার (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরমাত্রিক বা বলবৃত্ত) তথাপি ইহার শাখা-প্রশাখা বহু। সেইজন্য সংস্কৃত থেকে বাংলা পদ্যে অনুবাদ করতে গেলে বিশেষ একটি ছন্দ বেছে নেওয়াই ভাল। সাধারণতঃ দেখা যায় সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদকালে অনেকেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত পয়ার ছন্দই ব্যবহার করেছেন বেশী। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, সুধাকরী গীতা, শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ইত্যাদি। সুতরাং লেখকেরও এই পয়ার ছন্দই অবলম্বন করা উচিত ছিল,—যে ছন্দ শুধু সর্ব্বসাধারণ নয়, সুদূর পল্লীগ্রামের নিরক্ষর নরনারীগণের কাছেও সুপরিচিত।

কিন্তু লেখক যেভাবে অনুবাদ করেছেন (অন্ততঃ বসুমতীতে যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে) তাতে ছন্দের সাধারণ নিয়মগুলি তিনি স্বচ্ছন্দে পরিহার করে গেছেন। শুধু আক্ষরিক মিল আর অক্ষরসংখ্যার সমতা বজায় রাখতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মিল বজায় রাখতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার উভয় চরণেরই শেষে একই কথা দুইবার ব্যবহার করেছেন; এতে পুনরুক্তি দোষও ঘটে। (যেমন ৯'২৯ শ্লোক—আছি, আছি। ১৮।৬৫ শ্লোকে—আমারি, আমারি। ইত্যাদি)

এখন ছন্দ বজায় রেখে কি করে গীতা পাঠ করতে হয় তার দু' একটা উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

১ (ক)। মূলসংস্কৃত: সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

এখন, যেখানে দাঁড়ি আছে সেখানে 'যতি' বুঝতে হবে, যতির দুই পাশে দু'টি পর্ব্ব। এই যতি মেনে পড়লে গীতাপাঠ যেমন সহজ সুন্দর হবে, অন্যভাবে পড়লে তেমন কদাচিৎ হয়। যেমন:

(খ) সর্ব্বধর্ম্মান্। পরিত্যজ্য। মামেকং। শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং। সর্ব্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি। মা শুচঃ।

(গ) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। মামেকং। শরণং ব্রজ।
অহং। ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো। মোক্ষয়িষ্যামি। মা শুচঃ।

(ঘ) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য। মামেকং শরণং। ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি। মা শুচঃ।

উপরি উক্ত গীতাপাঠের চারিটি রীতির মধ্যে (ক)টিই যে সর্ব্বোত্তম এবং সহজগ্রাহ্য যাঁরা 'রীতি'মত গীতাপাঠ করেন তাঁরা তা' সহজেই বুঝতে পারবেন। আরও দুই একটি উদাহরণ দিচ্ছি:—

২। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র। সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি। স চ মে ন প্রণশ্যতি। (৬—৩০)

৩। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু। ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা। ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। (৯-২৯)

৪। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি। গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢাত্মা। কর্ত্তাহমিতি মন্যতে। (৩—২৭) ইত্যাদি।

এইবার লেখকের অনুবাদগুলি পাঠ করা যাক:—

১। সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ি। এক যে আমি। সেই আমাকে আশ্রয় ধরি;
চিন্তা কি আর। কর্ম্মবন্ধন হইতে। আমিই যে মুক্ত করি।

২। যে সবই আমাতে দেখে। সর্ব্বত্র দেখে আমারে,
ছাড়ে না তিনি আমারে। আমিও ছাড়ি না তাহারে।

৩। নাহি মোর কেহ। প্রিয় বা হেয়। সমভাবে সবেতে আছি,
যে মোরে ভক্তিতে ভজে। সে আমাতে। ও আমি তাহাতে আছি।

৪। প্রকৃতির তিন গুণেতেই। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করে,
অহঙ্কারে বিমূঢ় হয়ে। লোক নিজে কর্ত্তা মনে করে।

এইবার বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, প্রত্যেক শ্লোকের চরণগুলির অক্ষর সংখ্যার সমতা বজায় রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হলেও, পর্ব্বগুলির আক্ষরিক সংখ্যার সমতা নাই—যে জন্য যতির কাছে থামতে গেলেই খট্‌কা লাগবে, অর্থাৎ পাঠ করতে গেলেই বাধ বাধ ঠেকবে। সুতরাং ছন্দ বজায় রেখে ঐ অনুবাদগুলি পাঠ করাই যাবে না; যেহেতু ছন্দেরই পতন ঘটেছে। ভাষার কথা আর নাই বা বললাম।

কিন্তু কি ভাষার লালিত্যে, কি ছন্দের মাধুর্য্যে, কি অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারায় ঐ একই শ্লোকের পদ্যানুবাদ সুধাকরী গীতায় স্থান পেয়েছে, পাঠকবর্গ তার একটু আস্বাদন করে দেখুন:—

১। সর্ব্বধর্ম্ম পরিহরি। কেবল আমাকে ধরি
একান্ত অন্তরে লও। আমার শরণ
সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ। আমিই করিব দান
আর দুঃখ করিও না। কুন্তীর নন্দন।

২। সর্ব্বত্রই আছি আমি। আমাতে সকল
ভাগ্যবান্ যেই জন। দেখেন কেবল
তাঁহার অদৃশ্য আমি। নহি কদাচন
আমার অদৃশ্য তিনি। কভু নাহি হন।

৩। সর্ব্বভূতে সম আমি। আছি সর্ব্বদাই
বিদ্বেষভাজন কিংবা। প্রিয় কেহ নাই
আমাকেই ভক্তি ভরে। পূজা করে যারা
তাদের অন্তরে আমি। আমাতেই তারা।

৪। প্রকৃতির গুণ এই। ইন্দ্রিয় সকল
সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন। করিছে কেবল
অহঙ্কারে জ্ঞানহীন। মায়ামুগ্ধ নর
আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা। ভাবে নিরন্তর। ইত্যাদি।

* * *

"হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি—কমলাকান্তের আর সে রস নাই! আমার সে নসী বাবু নাই—অহিফেনের অনাটন—সে প্রসন্ন কোথায় জানি না, তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা, এখনও একা; কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র—এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একায় এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম, কবে মরিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম—কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মিসম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম—তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী—তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল—ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল—আগুন নিবে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল—এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? ঝড় থামিয়াছে—দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে—এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে—আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে—যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে, পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে, যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে, আবার স, ঋ, গ, ম, কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুর গিয়াছে ভাই, আর কান্না কেন? তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।"

অনুগত, স্বগত এবং বিগত—
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রবীন্দ্র-রচনার পাঠ-চর্চা

শ্রীঅবিনাশ রায়

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী-উৎসব সমাগত। নানাদিকে নানা আয়োজন চলছে। সকলেই চান, স্থায়ী কাজেরও কিছু সূচনা হোক। যিনি যেমন ভাবছেন, প্রস্তাব ও প্রয়াস করছেন। এমনি-একটি প্রস্তাব এখানে রক্ষা করা গেল। প্রস্তাবটি হচ্ছে,—বঙ্গ-সাহিত্যের আসরে "রবীন্দ্র-রচনার পাঠ-চর্চা"-র প্রবর্তন। ব্যাপক ও বিশদভাবে সকলের সহযোগে তা শুরু হোক। 'পাঠ' মানে এখানে 'পড়া' নয়, 'পাঠ-চর্চা' মানেও 'ষ্টাডি-সার্কল' নয়,—রচনাতে নানাশব্দপ্রয়োগাদির বিচারই বিশেষ উদ্দিষ্ট বিষয়। তবে 'ষ্টাডি-সার্কল'ও এ বিষয়ে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ অন্যত্র।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠন চলছে তা ঠিকই কিন্তু কি ভাবে চলছে তাই নিয়েই কথা। কবির লেখার কোন্ স্থলে মূলে কী ছিল, কখন্ কী কারণে কত রকমে বদল হল, তার মধ্যে কোন্ পাঠের কী তাৎপর্য,—সাধারণ-পাঠকমণ্ডলীতে এ নিয়ে খোঁজখবর নেই, প্রশ্নও ওঠে না, ওঠবার তেমন কথাও নয়, কারণ, তাদের একটা-কিছু পেলেই হয়, মোটামুটি পড়ে যেতে পারলেই হল; অনেকস্থলে হয়তো সেটুকুই হয়ে ওঠে না, রবীন্দ্রনাথের বই-একখানা হয়তো চোখেও দেখেনি অনেকে।—কিন্তু 'পাঠ-চর্চা', সে তো শ্রেণীবিশেষের ক্ষেত্রে বিলাস ব'লেই ঠেকবে। কেন না, এটি রীতিমতো গবেষণার বিষয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে সাধারণ-সমাজে যা-ই হোক, দেশের সুধীসমাজেও যদি এ বিষয়ে বেশি দিন অসাড়তা দেখা যায়, তা গৌরবেরও নয়, ক্ষতিকর তো বটেই। প্রস্তাবিত পাঠ-চর্চায় যতই বিলম্ব ঘটবে, ততই এতে অবহেলা ও জাতীয় বিদ্যাবত্তার শিথিলতা বিশেষ সূচিত হবে, অন্যদিকে নির্ভর-যোগ্য উপাদান ও পরিবেশসংশ্লিষ্ট তথ্যাভিজ্ঞ-মণ্ডলীর সাহায্য-সুলভতাও হয়তো ক্রমেই সুদূর-পরাহত হতে থাকবে।

শিক্ষিত এবং অর্থবান মহলেই রবীন্দ্রসাহিত্যের বিস্তার বেশি, তবে ক্রমে সাধারণের মধ্যেও তার প্রচার হচ্ছে এবং এই শতবার্ষিকী উৎসবে আরো হবে, সে কথাও সত্য। এ জন্যই আবার সাবধান হবার সময় এসেছে।

গ্রন্থ লাখে-লাখ বিক্রী হবে, শুভসংবাদ, কিন্তু এর পরে আসে ব্যবহারের পালা, আশঙ্কার কারণ ঘটে সেইখানে;—কেবল কেনার খবরই যদি বাড়ে,—পাঠচর্চার দিকটা থাকে স্তিমিত, তবে কবির "কণিকা"র সেই বহু পুরাতন ইঙ্গিতটাই বা শেষে লেগে যায়। অনেকস্থলেই না প্রকাশ পায়, পড়ার নামে গ্রন্থকে সে-ও 'মেহাগিনি'র তাকে রেখেই আমরা কাজ সেরেছি।

"কোন্ হাটে তুই বিকোতে চাস্ ওরে আমার গান,
কোন্ দিকে তোর টান্?
পাষাণ-গাঁথা প্রাসাদ-'পরে আছেন ভাগ্যবন্ত,
মেহাগিনির মঞ্চ জুড়ি' পঞ্চহাজার গ্রন্থ,
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা,
অস্বাদিত মধু যেমন যূথী অনাঘ্রাতা,
ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে, যত্ন পুরামাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী, সেথায় করবি যাত্রা?
গান তা শুনি কর্ণমূলে মর্মরিয়া কহে—
নহে নহে নহে।"—(যথাস্থান)

কবির অনুশীলনে আগ্রহ এবং সক্রিয়তা চাই দেশব্যাপী, তার সঙ্গে অনুরাগী অনেকে রয়েছেন সতর্কচিত্তে বিশেষ পাঠনিবিষ্ট, এরূপটি হলে হয় যথার্থ যা হওয়া সংগত।

বই-এর মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকবে না, এমন নয়; কিন্তু, শুধরে-নেবার বিচারযুক্ত অতন্দ্র ব্যবস্থাই প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচায়ক, একথাও সকলেই বলবেন। তৎসত্ত্বেও ভুলচুক কিছু থেকেই যদি যায়, সেক্ষেত্রে এই বহুদৃষ্টির পাঠচর্চায় তা ধরা পড়তে পারে; তা-ছাড়া, যেটি এর শ্রেষ্ঠলাভের দিক,—যেটি নিগেটিভ নয় পজিটিভ—সে হচ্ছে বিভিন্ন মনীষার সাধনা যোগে পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন সংস্করণ ও পুঁথিপত্র-ছাঁকা সংগৃহীত পাঠগুলির বিচিত্র ব্যবহার-তাৎপর্য ও অর্থসম্পদের ঘটবে অভাবিত উন্মেষ,—নানাদিক থেকে হীরকখণ্ডের মতো নানাভাবের আলোক তাতে বিচ্ছুরিত হবে।

এবিষয়ে এযাবৎ যতটা হয়েছে, তার থেকেই ধারণা আসে, যথোচিত সমবায়ে খোঁজখবর সব শুরু হলে, কত-কী আরো অপূর্ব্ব ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হতে পারে। এখন একস্থলে একটি পাঠই মন ভরিয়ে রাখে,—কিন্তু তখন দেখা যাবে, আরো কত রঙের মেলা:—এধারে-ওধারে ছড়িয়ে আছে।—উপেক্ষিত, কোনোটা বর্জিত, কোনোটা-বা অনবধানে নেপথ্যগত। কবি বর্তমান থাকতে নিজেই এক এক স্থলে কতবার ক'রে কত পাঠ বদলেছেন। পাঠান্তরগুলি কালানুক্রমিক ক'রে পাশাপাশি সব সাজিয়ে নিয়ে দেখলে, তখন আপনি সাধারণের সাহিত্য-রুচি ও অভিজ্ঞতা প্রসারিত হবার এক সহজ সুন্দর উপায়ের সৃষ্টি হবে, তা সুনিশ্চিত। তাঁর পরিবর্তনের সেই পর্যায়গুলি কত বিচার-বিবেচনা, কত গভীর শিল্পকৃতি, ও কত নিবিড় আনন্দ-বেদনার রোমাঞ্চকর সূক্ষ্ম-সুকুমার রেখানুসরণের সুযোগ দেবে। সে-সব পাঠোদ্ধারের সঙ্গে জড়িয়ে সামনে আসবে রচনার পটভূমিকাগত কত বিচিত্র ইতিহাস। তারপরে বেরতে পারে অপ্রকাশিত আরো কত রচনা বা রচনাংশ; বর্জিত যা, তারও জাগবে কত সম্ভাবনাময় মহৎ মূল্যবোধ; এবং আরো পরে হয়তো গোচরে আসবে, কপিকারক কম্পোজিটর প্রুফরীডার সম্প্রদায়ের কত আশ্চর্য অবদান।—এমন কি, কবির প্রয়োগ নয় জেনেও অনেকস্থলেই সে-পাঠেরও উপযোগিতা এমনই মনোরম লাগবে যে, তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে বাদ দিতেও আর মন উঠবে না। সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রচলিত পাঠগুলি এক-একস্থলে মূল-পাঠের আবির্ভাব দেখে নিজেদের ভুলের খোলসটা ছেড়ে ফেলে আমাদের এতদিনের গোঁজামিল-টানার বিড়ম্বনাকে হঠাৎ একনিমিষে মূর্ত করে দিয়ে, একটু-বা বক্রহাসি উপহার দিয়েই, মিলিয়ে যাবে, এবং, হয়তো কোথাও চিরদিনের অস্বস্তিকর সংশয়ের

ছাপাখানার বেতালের হাত থেকে পরিত্রাণ দিয়ে চারায়ণিটি এসে ধরা দেবে পরম সৌভাগ্যের মতো। এরই সঙ্গে এক সময়ে কোনো-খানে-বা হতবুদ্ধি করে দেবে বহুরূপী-পাঠকসমূহের বেপরোয়া অভিযান।

যেমন, মনে হবে, শব্দটা 'পুণ্যজীবী' না 'পণ্যজীবী'।— রবীন্দ্রনাথের আধুনিক গ্রন্থ 'কালান্তর'; তার "লড়াইয়ের মূল" রচনাটির আধুনিক সংস্করণ (১৩৫৫, পৃ ৪২) ও রচনাবলী সংস্করণ (১৩৬৫, পৃ ২০১) দুইস্থলেই দেখন,—ছাপা হ'য়েছে; প্রথম স্থলে 'পণ্য', রচনাবলী ১ম ও ২য় দুটি সংস্করণেই নিয়ে যায় দৃষ্টিকে 'পুণ্যে'র দিকে। অথচ, প্রথম সংস্করণ গ্রন্থেও জানায় কথাটা—'পণ্যজীবী'। প্রথমমুদ্রিত পাঠ মিলে 'সবুজপত্রে', পত্রিকাটিও সাক্ষ্য ধরে—'পণ্যজীবী'। তারপরে প্রুফ, প্রেসকপি, পাণ্ডুলিপি—কোথায় কী আছে, কে বলবে। জায়গাটা হচ্ছে এই,—"....এবারকার যে লড়াই, তাহা বৈশ্যিকে-বণিকে লড়াই, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে। পৃথিবীতে চিরকালই পণ্যজীবীর 'পরে অস্ত্রধারীর একটা স্বাভাবিক অবজ্ঞা আছে—বৈশ্যের কর্তৃত্ব ক্ষাত্রিয় সহিতে পারে না।"

বই আজকাল কেনাবেচা হয় অনেক, কিন্তু কর্মব্যস্ত সাধারণের পড়া হয় বা ক'খানা, খোঁজাখুঁজি ক'রে দেখেশুনে পড়া হয় আরো কম। তারও মাঝে-মাঝে ঠেকে যেতে হলে, বা, ভুল গেলা হলে, পড়ার স্বাদ হয় নষ্ট, আখের হয় ভ্রষ্ট। সংশয়ের খোঁচা অস্বস্তিকর হলে ধরে বিরক্তি, এবং তার পরে—। অন্তদের কথা বাদ দেওয়া যাক,—রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সংস্করণের বইগুলিতে সম্পাদনার ছাপ সুস্পষ্ট। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত লোকমতের ছায়ায় নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে রবীন্দ্রনাথ পড়ে যাওয়ার আশা করতে বাধে না। তবু এখনো এ সমস্যার আকস্মিক অভ্যুদয় এ হেন ক্ষেত্রেও যে বিচিত্র নয়, উদাহরণ শুধু এ জন্তই।

বিদেশী সাহিত্যে এই দিক দিয়ে টেকস্‌চুয়াল্‌ ক্রিটিসিজ্‌ম্‌-এর ব্যাপারে, একটা দৃঢ় মান গড়ে উঠেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। সেকস্‌পীয়রের প্রতি লোকের কী অনুরাগ, অজস্র পাঠ-সংবলিত গ্রন্থাবলী তার প্রমাণ। শোনা যায়, কবি হার্ডস্‌ম্যান্‌ তাঁর কাব্যগ্রন্থ নিজের জীবদ্দশাতে মুদ্রিত করে যেতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, শুধু এ জন্তই, যে,—একটি কমার ভুলও যাতে কোথাও না থেকে যেতে পারে। যদিও সেখানে ভুলভ্রান্তি যা থাকে, তা নিয়ে ধুরন্ধর সাহিত্যিকমণ্ডলী ও পাণ্ডিতসমাজ নিয়তই আছেন শোধননিরত। রবীন্দ্রনাথশ্রেণীয় মহান্‌ লেখকদের লেখা সম্বন্ধে এই সতর্কতা সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। এ উপলক্ষে সেই কথাটাই আরো স্মরণ হয়, দেশেও প্রাচীন-সাহিত্য নিয়ে এ ধরণের কাজ চালু না রয়েছে এমন নয়, আধুনিক বিশেষতঃ কালোত্তীর্ণ রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তাগিদ নেই কেন, এবং সর্বজনের সহযোগে এজন্তই একটি "রবীন্দ্রপাঠচর্চ্চা" নামক সাহিত্যিক আলোচনাধারার সূত্রপাত হওয়া সমীচীন কি না।

বিশ্বভারতীর চেষ্টায় কাজ এগোচ্ছে এও যেমন সত্য নিঃসন্দেহ, এ কাজ সকলের যোগে করবার মতো বিরাট কাজও বটে। কেননা, দু'একজন নয়, বা উপরে দু'চারজন থাকলেও, বহুজনের অনুসন্ধান, আলোচনা, ও বিচার-বিবেচনায় চারদিক থেকে একে পরিপুষ্ট ও পরিশুদ্ধ করে তুললে, তবে তার সুষ্ঠুতা আশা করা যেতে পারে। সে-কাজ যে কত ব্যাপক, কত গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্তই আরো কত-যে বাকি থাকা সম্ভব, তার জন্ত কোনদিক দিয়ে আরো কত আয়োজন করা দরকার, গ্রন্থন-বিভাগ নিশ্চয়ই তা জানেন,—জনসাধারণ এ বিষয়ে ঠিক কতখানি সচেতন, তা জানার সুযোগ মিলছে স্বল্পই। কেন না, রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্বব্যাখ্যা নিয়েই এখন লেখালেখি চলছে; কিন্তু কবি যে বলেছেন, কবিকে দেখতে হবে তাঁর রচনাতেই,—কবির-দেখানো সেই প্রাথমিক পথে তাঁর মূলবস্তু রচনাবলীর পাঠবিচার-সম্পর্কে সাধারণের তেমন কৌতূহল কোথায়? আলোচনা তো পরের কথা। অথচ, কবির কথায় মূল্য দিলে এদিকটায়ই খুঁটিয়ে খবর করা জরুরি হয়ে পড়ে।

আজকাল ঘাটে-পথেই বারোয়ারি পুজা হয়; সাজ-শোভাযাত্রা বাক্যজালের সরগরমের কাছে ধ্যান-মন্ত্রও'র দিকটা একটু দেখার বাইরে থেকে যায়। রবীন্দ্র-উৎসবের বেলায়ও বাণীর দিকটা যদি লাঘব হয়ে চলে, সেটা ঠিক হবে কিনা, সময় থাকতে বিচার্য। প্রতিকারস্বরূপ 'পাঠচর্চ্চার' কথাটা এসঙ্গে ভেবে দেখা যেতে পারে না কি?

সে কথা সত্য, অত্যন্ত পরিশ্রম, যত্ন ও মেধা সাপেক্ষ এই কাজ। ফল তার এক-একটি আবিষ্কারের মতো, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক ও মূল্যবান। যাঁরা যেটুকু এদিকে কাজ করেছেন, তাঁরাই এর রহস্য জানেন; আর, তাঁরা অশেষ ধন্যবাদার্হও বটেন। অদ্যাবধি এ সাধুবাদের প্রায় পুরোভাগটাই পাবেন বিশ্বভারতী। কেন না, সকলেই জানেন, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদন ও গ্রন্থনবিভাগ—যুক্তভাবে এ কর্মের কেন্দ্রস্থল।

অন্য সব কিছু উপাদান সংগ্রহের কর্তব্য অন্য-সব জায়গার পক্ষে প্রাধান্য পেতে পারে কিন্তু মূল রবীন্দ্ররচনার প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি ও যাবতীয় উপাদান সংগ্রহ, সংস্করণ ও সেই সঙ্গে রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজটি বিশ্বভারতীর পক্ষে একান্ত আবশ্যিক ও প্রাথমিক কর্তব্য। আর সব উপাদান অন্যত্র মিলতে পারে, তার জন্য গৌরবও অনেকের অনেক কিছু প্রাপ্য থাকতে পারে, কিন্তু যে-নিমিত্ত সমগ্র বিশ্বকে একমাত্র বিশ্বভারতী তথা রবীন্দ্রসদনে চিরকাল অর্থী হয়ে আসতে হবে, সে হচ্ছে রবীন্দ্র রচনার বহুবিধ আদি ও অকৃত্রিম নিদর্শন-সম্পদের সাক্ষাৎলাভ ও ব্যবহার। এর উপরেই নির্ভর করবে রবীন্দ্রসদনের প্রধানতম সার্থকতা। আর, সে জন্যই এখানে সকল কাজের আগে এ কাজটির সুব্যবস্থা হওয়া চাই বিধিমতে, তা বলাই বাহুল্য।

বস্তুত, রবীন্দ্রসদন ও গ্রন্থনবিভাগ এ বিষয়ে পারস্পরিক পরিপূরক ব্যবস্থায় একটি বিভাগের মতোই যে অঙ্গাঙ্গিভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয়, বিশ্বভারতী-পত্রিকা, বিশ্বভারতী-নিউজ, কোয়ার্টালি ও নানা প্রদর্শনী ইত্যাদির মধ্যে সে-পরিচয়ই সকলে পেয়ে থাকেন। তবু, বলতে হয়, পাঠচর্চার কাজটি সম্বন্ধে দু'য়েরই অনেক-কিছু করবার আছে। তার মধ্যে, ধারাবাহিক পাঠান্তর সংগ্রহ, বিচারপূর্বক তার সম্পাদনা, এবং ধারাবাহিকরূপে সাময়িক পত্রসমূহে ও পুস্তিকামালায় এই নব উদ্ঘাটিত পাঠ-তালিকা ও তার ব্যাখ্যা-সমন্বিত প্রবন্ধাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে

অন্যতম। এর মধ্যে সংগ্রহ, গবেষণা, পরীক্ষণ ও প্রকাশনায় সবদিকই আছে এবং সেইজন্যই বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সকলেরই সক্রিয় সহযোগ একান্ত প্রয়োজন। এর মধ্যে যেখানেই হোক, গবেষণা ও নিয়মিত উপাদান সংগ্রহ ও সরবরাহের উপযোগী একটি সুব্যবস্থিত কাজের ক্ষেত্র তৈরি করাই হবে প্রাথমিক কর্তব্য। জন সাধারণের মধ্যে, এই ব্যবস্থার ফলে, প্রামাণিক মূল উপাদানগুলি প্রচারিত হ'লে, তার সাহায্যে নানাদিক থেকে নানাজনের নানাভাবে কাছে-দূরে সর্বত্রই পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যাদির কাজ চালাবার সুযোগ ও সংযোগ স্থাপিত হবে; তখন নিশ্চয়ই এই পাঠচর্চার সাহিত্যিক আন্দোলনটিও প্রসারলাভ করবে, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্র-'গ্রন্থ-পরিচয়ে' সময় সময় এই পাঠচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নিশ্চয়ই সেই পরিসর সামান্য; তা-ছাড়া বহুদিন ব্যবধানে সে সবের প্রকাশ দীর্ঘবিলম্বিত-ও বটে। সাহিত্যচর্চায় একটি বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তনের পক্ষে তা যে যথেষ্ট নয়, তা হয়তো উদ্যোক্তারাও বলবেন; বরঞ্চ, এজন্য "বিশ্বভারতী পত্রিকায়" স্থায়িভাবে একটি বিভাগের প্রবর্তন শ্রেয় কিনা, বিশেষভাবেই তা বিবেচ্য। বলাবাহুল্য, দেশের পত্রিকামাত্রেই এ কাজে সক্রিয় হতে পারেন ও হবেন এইরূপই সম্ভব।

এরূপ যোগাযোগ-ব্যবস্থায় বিশ্বভারতী ও লোক-সাধারণের মধ্যে রবীন্দ্রানুশীলন ব্যাপকতর হলে নিখুঁত পাঠ সম্বন্ধে উদাসীনতা ও অসুবিধাবোধ দুইই যেমন দূর হবে, সাহিত্যিক উপভোগের সুযোগও বাড়বে।—তখন চারিদিক থেকেই কবি সম্বন্ধে বহুলোকের অনুসন্ধিৎসা, পাঠসম্বন্ধে প্রস্তাব ও ব্যাখ্যা উপহার-সমূহের স্বতঃস্ফূর্ত সহায্যের যোগে বিশুদ্ধ পাঠবিচার ক'রে একদিন সেক্সপীয়রের মতোই রবীন্দ্ররচনাবলীরও উন্নততর সংস্করণ প্রকাশের কাজ এগিয়ে থাকবে এবং প্রকাশের সময়ও নিকটতর হবে। এতে প্রকাশক এবং পাঠক, বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ সকলেই যে লাভবান হবেন, তা খুবই বলা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশে পঠন-পাঠনের মান, ক্রমোন্নত হয়ে রবীন্দ্র পরিবেশটি আরো সমৃদ্ধ হবারই কথা। নৈমিত্তিক সাময়িক উৎসব, এই 'পাঠচর্চা'ধারার প্রবর্তনক্রমে, সার্থকতর হয়ে চলবে নিত্যকার উৎসবে। ভারতবাসী তথা বাঙালীসমাজের কাছে এটি যে একটি মহান জাতীয় দায়িত্ব, বিশেষভাবেই তা এ উপলক্ষে স্মরণীয়। বাইরের অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে একাজ শুরু করার আগে বিশ্বভারতী যদি যথোচিত ব্যবস্থায় ও তৎপরতা সহকারে এর সংগঠনে অগ্রণী হন, তবে তা শোভন হয়; সকলেরই শ্রদ্ধা উদ্রেক ক'রে তা যে আনন্দজনক হবে, তা সহজেই অনুমেয়

অনেকদিন ধ'রে অপর অনেকের পক্ষ থেকে এ উদ্যোগের অপেক্ষা করা গেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে এই পাঠচর্চার ধারাটি যাতে সারাদেশে সংগঠিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে ও প্রতিষ্ঠা পায়, এইজন্য জনসমাজের দৃষ্টি ও সহযোগ আকর্ষণ করা এবং সে-মর্মেই প্রস্তাবটি অবশেষে সাময়িক-পত্রজাত করা আবশ্যক মনে করেছি। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবেই নিবেদনটি ভেবে দেখতে বলি।

এ প্রস্তাবের উপযোগিতা বিবেচিত হলে, বিশ্বভারতীর সহৃদয় কর্তৃপক্ষের সাধুপ্রয়াসের থেকেও যে সম্ভবপর আরো সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে, সে প্রত্যাশা একান্ত স্বাভাবিক।

একটি কবিতা

পদ্মা কুণ্ডু

ও'কে নায়ক করে' লিখবো একটা গল্প
অনেক দিনের সখ ও'র।
কিন্তু আমি, কিইবা জানি ও'র সম্বন্ধে,
শুধু জানি নাম-টা—
ও'র নাম 'লিরক'।
আমারই দেওয়া নাম—
আসল নাম জানিনা।
কিন্তু তবু লিখতে হবে।
গ্রীষ্মের তাপে তপ্ত তরুণ পিয়ন সে।
কেন জানিনা হঠাৎ সে বললে,
"লিখবে একটা গল্প আমাকে নিয়ে?"
স্বভাবের হাসি হেসেছিলাম আমি,
শোনালে ও,—"জানি লিখবে না—
আমি যে পিয়ন, তোমার নায়ক তো পিয়ন হবে না।
হবে কলেজ-ষ্টুডেন্ট নয়তো শিল্পী।"
স্বীকার করিনি আমি।
দিয়েছিলুম কথা—"লিখবো গল্প
তোমাকে নিয়ে।" কিন্তু যেটা
নিজে জানিনা, সেটা অপরকে জানাব
কেমন করে?
কিন্তু তবু লিখতে হবে।
যদিও কথা রাখা আমার কাছে
বড়ো কথা নয়—শুধু ভাল লাগা।
তাই হবে, ভালই লেগেছে ওকে
অবাক হয়েছি আমি, কেন ও অনুরোধ
এক অচেনা মেয়েকে?
তবে ও'রও কি লেগেছে ভালো?
তবে ত' লিখতেই হবে গল্প
ও'কে নায়ক করে—
না হয়, আমিই হবো ও'র 'নায়িকা'।

সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে ভারতমাতার যে দুই বীর সন্তানের অবদান অতুলনীয়, যাঁদের সুমহান চেষ্টা ও আত্মত্যাগ বৃটিশ সাম্রাজ্যের দৃঢ় বনিয়াদে ফাটল ধরিয়েছিল, যাঁরা নিজের চেষ্টায় ভারতের লোক নিয়ে মুক্তিফৌজ গঠন করে বিশাল বৃটিশ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ভারতের পূর্ব্বাংশে সাময়িকভাবে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, যাঁদের কাজ বৃটিশ জাতির মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে—এবং বৃটিশকে ভারত ত্যাগে অনুপ্রেরিত করে, সেই দুই মহান নেতার একজন সূর্য্য সেন, যারা বাংলায় 'মাষ্টারদা' নামে পরিচিত এবং অন্যজন বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিচিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস।

দেশকে ভালবাসা, দেশের মুক্তি আনয়নের চেষ্টা করার অপরাধে প্রথমোক্ত নেতার ফাঁসি হয় ১২ই জানুয়ারী ১১৩৪ সাল এবং শেষোক্ত নেতার জন্ম হয়—২৩শে জানুয়ারী ১৮১৭ সাল। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের উক্ত দুইটি দিবসে ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ—বাঙালীরা, এই দুই মহান্ নেতার স্মৃতি স্মরণ করে তাঁদের অমর আত্মার প্রতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

এই দুই মহান নেতার কাজে অনেক স্থলে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রথমতঃ দুইজন নেতাই বাঙালী, এবং দুইজনেরই জীবনের প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ছিল বৃটিশকে বিতাড়িত করে ভারতকে বিদেশী-শাসন-মুক্ত করা। দুজনেই কংগ্রেস-কর্মী ছিলেন এবং পরবর্ত্তী জীবনে কংগ্রেস ত্যাগ করে ভিন্নপথে ভারতের মুক্তি আনয়নের চেষ্টা করেন।

এই দুই নেতার জীবনের শেষের দিকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং তন্মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের চেষ্টা অন্যতম। এই দুই বাঙালী বীরের গঠিত দেশীয় ফৌজের সঙ্গে বৃটিশের সেনাবাহিনীর সংগ্রাম সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

সূর্য্য সেন ছিলেন একজন স্কুল-শিক্ষক, তাই তিনি মাষ্টারদা বলিয়া পরিচিত, ভারতের মুক্তির জন্য তিনি একটি বিপ্লবী-বাহিনী শাসনের অলক্ষ্যে গঠন করেন এবং ঐ বাহিনী গঠন হওয়ার পর তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন—কোন্ সময়ে কিভাবে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ চট্টগ্রামকে বিদেশী-শাসনমুক্ত করা যায়।

তখন আইন-অমান্য-আন্দোলন সুরু হয়েছে, দেশের অন্তঃস্থলে বৃটিশ-বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত, বিপ্লববহ্নি ধূমায়মান, ইংরেজকে আঘাত হানবার এইটিই উত্তম সুযোগ মনে করলেন সূর্য্য সেন।

বিপ্লবী দলের সকলের সম্মতি নিয়ে তিনি একটি কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত করলেন। বিপ্লবীদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য—এই ছয়জনের ওপর ভার দিলেন কর্ম্মতালিকা মতে কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে; এক কথায়, সর্বাধিনায়ক সূর্য্য সেনের অধীনে এই ছয়জন নির্বাচিত হলেন বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতি, সূর্য্য সেন তাঁর এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন—ভারতীয় গণতন্ত্র বাহিনী।

১৮ই এপ্রিল ১১৩০ সাল, সূর্য্য সেনের নির্দেশে নির্বাচিত নায়কগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় রইলেন। ব্যস্ততার মধ্যে দিন শেষ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে রাত্রি তার কালোবাস আচ্ছন্ন করে দিল চট্টলার বুকে।

এইবার আক্রমণের পালা, লোকনাথ বল আটজন সৈনিক বেশে সজ্জিত বিপ্লবী নিয়ে আক্রমণ করলেন চাটগাঁ শহর থেকে কিছুদূরে অবস্থিত পাহাড়তলী অস্ত্রাগার, পাহারাওয়ালারা বাধা দিতে চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর পক্ষ হতে গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের শব্দ—নিমেষের মধ্যে পাহারাওয়ালারা সরে পড়ে। তখন সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল গুলী করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সে সময়ে বিপ্লবীদের গুলি এসে তার বুকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হয়, রেলওয়ে অস্ত্রাগার লুট করলেন বিপ্লবীরা।

বীর অনন্তসিংহ ও গণেশ ঘোষ তাঁদের দল নিয়ে মোটর ভাড়া করে বেরিয়ে গেলেন এবং একই সময়ে আক্রমণ করলেন পুলিশ-অস্ত্রাগার, তখন রাত দশটা হয়নি। সামরিক পোষাক পরিহিত বিপ্লবীরা গাড়ী থেকে নেমেই গুলী চালাতে সুরু করেন, ঐখানে পাঁচশো পুলিশ থাকতো, অতর্কিত আক্রমণে যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো, পুলিশ-অস্ত্রাগার বিপ্লবীদের দখলে এলো।

একই সময়ে অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তাঁর দলবল নিয়ে আক্রমণ করলেন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, এখানেও অতর্কিত আক্রমণে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অপারেটর প্রভৃতি অন্ধকারে পালিয়ে যায়।

চাটগাঁতে যাতে বাইরের সেনা আনতে পারা না যায়, এই উদ্দেশ্যে ধুম ও লাংগলকোটের কাছে একদল বিপ্লবী গিয়ে রেল লাইন তুলে ফেলে।

নির্দ্দিষ্ট কাজ শেষ করে প্রত্যেকটি দল এসে সমবেত হল পুলিশ-অস্ত্রাগারে, ঘন ঘন "বন্দেমাতরম" ও "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যে সেখানেই সাময়িক স্বাধীন বিপ্লবী সরকার গঠিত হল এবং সূর্য্য সেন নির্বাচিত হলেন তার সর্বাধিনায়ক।

সকাল না হতেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয়ানদের সকলকে নিয়ে জাহাজে নদীর মাঝখানে গিয়ে নোঙর ফেলে রইলেন। তিন দিন সারা চট্টগ্রামে ইংরেজদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। চট্টগ্রামের আদালত, পুলিশ-অফিস ইত্যাদির ওপর ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উড়তে থাকে। ভারতে বৃটিশ আগমনের পর এই প্রথম এবং শেষবারের জন্য চাটগাঁয়ের ওপর জাতীয় ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা সাময়িক ভাবে দেখা যায়।

বিপ্লবীরা আশ্রয় নিলেন সহরের নিকটবর্ত্তী জালালবাদ পাহাড়ে।

২২শে এপ্রিল বিপুল গোরা সৈন্য এসে ঐ পাহাড় চারিদিক থেকে আক্রমণ করে। সূর্য্য সেনের আদেশে আবার যুদ্ধ সুরু হয়। উভয় পক্ষের গুলী-বিনিময় চলে সারাদিন। বিপ্লবী দলের বারো জন এই যুদ্ধে নিহত হলেন, কিন্তু তাদের তুলনায় গোরা সৈন্য নিহত ও

আহত হল অনেক বেশী। জালালাবাদ পাহাড়ে মুষ্টিমেয় বাঙালী যোদ্ধার যে কৌশল, যে বীরত্ব, যে দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল— অগণিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বৃটিশ সেনার বিরুদ্ধে, তাহার তুলনা মিলে না।

রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড় থেকে সরে পড়ে। একটানা তিন দিন তিন রাত তাদের পেটে পড়েনি খাদ্য, মুখে পড়েনি এক ফোঁটা জল, কী দুঃসহ কষ্টের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতিটি ক্ষণ কেটেছে, তা বর্ণনা করার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় তাঁরা অদৃশ্য হয়ে যান চারদিকে।

সূর্য্য সেন আত্মগোপন করেও দলের ছিন্ন-সূত্রের যোগসাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এইদিকে বিপ্লবীদের ধরবার জন্ম ইংরেজরা সর্ব্বত্র ফাঁদ পেতেছে।

ঐ যে ছয়জন পলাতক বিপ্লবী গ্রাম সহরের নিকটবর্ত্তী খেতাংগ মহল আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়, তাদের নাম রজতকুমার, মনোরঞ্জন সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, স্বদেশ রায় ও সুবোধ চৌধুরী, কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে প্রচুর সৈন্য মোতায়েন। আক্রমণ অসম্ভব দেখে তারা ফিরে আসে রজতের বাড়ীতে, তারা ভাত খেতে বসেছে, এমন সময় খবর পেলো পুলিশ এসেছে, বাড়া ভাত পড়ে রইল, তারা পালিয়ে গেল নদীর দিকে, কিন্তু বিরাট পুলিশ-বাহিনী তাদের আক্রমণ করে এবং কালোরপোলবাসী সমস্ত মুসলমান দল বেঁধে পুলিশের সাহায্যে এগিয়ে আসে। একদিকে বিরাট বাহিনী, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত ছয়জন বিপ্লবী— আরম্ভ হল দুইপক্ষের গুলী-বিনিময়, সুবোধ চৌধুরী ও মনীন্দ্র নন্দী সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে ধরা পড়ে। অবশিষ্ট চারজন যুদ্ধ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

এর পর আরম্ভ হল পুলিশ আর মিলিটারীর তাণ্ডবলীলা। জেলার সর্ব্বত্র অসংখ্য পুলিশ-ফাঁড়ি এবং মিলিটারী-ঘাঁটি বসল, সর্ব্বত্রই কিল, চড়, লাথি, লাঠি আর সংগীনের খোঁচা চলল অবিশ্রান্তভাবে, নরনারী নির্বিশেষে সকলের ওপর, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি ধরা না পড়া পর্য্যন্ত এইভাবে শাসকেরা অত্যাচার চালিয়ে যেতে মনস্থ করে।

অবস্থা চরমে উঠেছে দেখে অনন্ত নিজেই কলিকাতার পুলিশের নিকট ধরা দিলেন। লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিও ধরা পড়লেন। এঁদের পর শাসকেরা চেষ্টা করে সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করতে।

এই সময়ে চট্টগ্রামে গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা আসানুল্লার অত্যাচার সকলকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তাঁর নাম শুনতে জেলার সকলের, বিশেষতঃ হিন্দু নরনারীর, বুক কেঁপে উঠত, একদিন হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামক এক চৌদ্দ বৎসরের বালক তাকে গুলী করে হত্যা করে; হত্যার অপরাধে এই বালকের উপর ইংরেজরা বর্ব্বরোচিত অত্যাচার চালায়। আসানুল্লা হত্যার পর চট্টগ্রামে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। গ্রাম ও শহরের সর্ব্বত্র পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী মুসলমান গুণ্ডাদের নিয়ে সর্ব্বত্র লুণ্ঠন, অত্যাচার, নারীর অমর্য্যাদার অভিযান চালিয়েছে। বিপ্লবীরা এই সময়ে চুপ থাকে না, সুযোগ পেলে ইংরেজদের আক্রমণ করে, হত্যা করে এবং এইভাবে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিপুল বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে মুষ্টিমেয় বিপ্লবীর পেরে উঠা সম্ভব হল না। ইংরেজদের আক্রমণ করতে গিয়ে অনেক বিপ্লবী মারাও যায়। এইবার বিপ্লবী দলের নেতা সূর্য্য সেনকে ধরবার জন্ম বৃটিশ দশহাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

ধলঘাটের নিকটবর্ত্তী শৈয়লার গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্রে সূর্য্য সেন, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্ত্তী, সুশীল দাসগুপ্ত, মণি দত্ত, ব্রজেন সেন একসঙ্গে ভবিষ্যৎ বিপ্লবী পরিকল্পনায় মন দিয়েছেন, ব্রজেন সেনের বাড়ী থেকে তাঁদের খাবার আসে। দশহাজার টাকার লোভে নেত্র সেন নামে একজন বিশ্বাসঘাতক সূর্য্য সেনের আশ্রয়কেন্দ্রের খবর দেয় ইংরেজদের নিকট।

ক্যাপ্টেন ওয়ামসলী বহু পুলিশ নিয়ে নেত্র সেনের সাহায্যে বিপ্লবীদের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র ঘিরে ফেলে, নেতা সূর্য্য সেন আত্মহত্যার জন্ম নিজের রিভলবার খুঁজলেন, কিন্তু সেটাও তাঁর অলক্ষ্যে অপসারিত হয়েছিল। তিনি ধরা পড়লেন। কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন।

এবার সূর্য্য সেনের স্থানে দলের সর্বাধিনায়ক হন তারকেশ্বর দস্তিদার। একদিন তিনি গুপ্তকেন্দ্রে বসে কাজ করছিলেন, এমন সময় পুলিশ ও মিলিটারী এসে তাঁদের আশ্রয়স্থল ঘিরে ফেলে। এদের সঙ্গে গুলী-বিনিময়ে দু'জন বিপ্লবী বীর নিহত হন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত বন্দী হন।

পূর্ব্বে অনেক বিপ্লবীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়েছিল, এবার সূর্য্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারকের রায়ে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির হুকুম হল এবং কল্পনা দত্তের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির দৃশ্যটি বৃটিশ জাতির চরম বর্ব্বরতার নিদর্শন। গভীর রাতে ইংরেজপ্রহরা কারাকক্ষের দরজা খুলে ঘুমন্ত নেতাদের টেনে বের করে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে। ফাঁসির মঞ্চ পর্য্যন্ত প্রহরীরা কর্তৃপক্ষের আদেশে নির্মম প্রহার চালাতে থাকে দু'জনের ওপর। অত্যাচার এবং নির্মম প্রহার সহ্য করেও সূর্য্য সেন ধ্বনি দিতে দিতে চল্লেন, 'বন্দেমাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ,' একই সঙ্গে সূর্য্য সেন (মাষ্টারদা) ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসির মঞ্চে এনে দাঁড় করানো হল, কয়েক মিনিটের মধ্যে দুই নেতার ফাঁসি দেওয়া হল। জাগ্রত পাষাণপুরীর প্রতিটি কক্ষে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি উঠল,—"বন্দেমাতরম্" "মাষ্টার দা জিন্দাবাদ"। দু'শো বছর ইংরেজরা ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করে রেখেছে, তাই তাদের ধারণা হয়েছিল ভারতবাসী আর অস্ত্রচালনা করতে পারবে না। কিন্তু সূর্য্য সেন এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা প্রমাণ করলেন যে, স্বাধীনতার জন্যে এই দেশবাসী সশস্ত্র সংগ্রাম করতে পারে। চট্টগ্রামের ঘটনা শাসকদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং শাসকরা বুঝতে পারে যে, ভারতে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

চট্টগ্রামের ঘটনার পর বৃটিশের মনে যে আতঙ্ক হয়েছিল, পরবর্ত্তীযুগে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম সে আতঙ্ককে আরও বাড়িয়ে দেয় এবং সসম্মানে ভারত-ত্যাগের পথ শাসকেরা খুঁজতে থাকে। এই আজাদ-হিন্দ ফৌজের সহস্র সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর, জাপান অতর্কিতে পার্ল হারবার আক্রমণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। দেখিতে দেখিতে আমেরিকা ও বৃটিশের অনেক ঘাঁটি জাপানের হস্তগত হয়। তারপর সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জাপানের দখলে আসে। বহু ভারতীয় সেনা সেই সময়ে পূর্ব-এশিয়ার ইংরেজ-স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মোতায়েন ছিল, বৃটিশ সৈন্য মালয়, সিঙ্গাপুর এবং অবশেষে ব্রহ্মদেশ হইতে পশ্চাদপসরণ করায় সেখানকার ভারতীয়-সৈন্য—জাপানের হাতে বন্দী হয়। জাপানীরা ভারতীয় সৈন্যদের ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর হাতে সমর্পণ করে। মোহন সিং জাপানে রাসবিহারী বোসকে এই সংবাদ দেন। রাসবিহারী বোস এই সংবাদ পেয়ে জাপানে পূর্ব-এসিয়াস্থিত ভারতীয়দের লইয়া এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় স্থির হয় যে, জাপানীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে না। ভারতীয় সৈন্যরাই ইংরেজকে বিতাড়িত করে নিজেদের দেশ মুক্ত করবে। জাপান অবশ্য রাজী হল ভারতীয় বাহিনীকে আবশ্যকীয় অস্ত্রাদি সরবরাহ করতে, এই সভা থেকেই আজাদ-হিন্দ-সংঘ গঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্র বোস ইতিপূর্বে ভারত ত্যাগ করে আফগানিস্থান হয়ে জার্মাণীতে উপস্থিত হন এবং হিটলারের সঙ্গে দেখা করেন। রাসবিহারী বোস সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আনাইলেন (২।৭।১৯৪৩ সাল)। তাঁহার অনুরোধে সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ-ফৌজের সর্বময় কর্তা হলেন। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজকে নতুন মন্ত্র দিলেন—'জয়হিন্দ'। তাদের সামরিক ধ্বনি হল "দিল্লী চলো", তাদের পণ হল সর্বস্ব বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন—লালকেল্লার উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেন্ট নামে একটি অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র হলেন ইহার রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী এবং সমর ও পররাষ্ট্র সচিব, তাঁহার নির্দেশে আজাদ-হিন্দ ফৌজ পরিচালিত হবে স্থির হল। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সংঘটন ও ভারত-অভিযানের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করতে ১৯৪৩ সাল কেটে যায়। তখন এই বাহিনীতে ৬০ হাজার সৈন্য ও ৫ শত অফিসার। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে ভারতের মুক্তি পণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হন। ১৯৪৪ সালের প্রথমদিকে আজাদ-হিন্দ সরকারের দপ্তর সিঙ্গাপুর হতে রেঙ্গুণে স্থানান্তরিত হল। তারপর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতের দিকে অভিযান আরম্ভ হল। নেতাজী মাত্র ৬০ হাজার ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত বাহিনী নিয়ে ইংরেজ ও আমেরিকার মিলিত শক্তির সম্মুখীন হলেন।

এইদিকে ইংরেজরা মিথ্যা প্রচার সুরু করে দিয়েছে—আজাদ-হিন্দ সংঘ জাপানের তাঁবেদার। ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ নেতাজীর বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করে, অবশ্য ভারতীয়দের মধ্যে যারা এই অপপ্রচার করেছে, পরবর্তীযুগে তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ ফৌজ ব্রহ্ম-সীমান্ত পার হয়ে আসামে প্রবেশ করে। মেজর-জেনারেল শা নওয়াজ ইম্ফল অবরোধ করেন এবং স্বাধীন ভারত ভূমিতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ১৫ শত বর্গমাইলের বেশী ভারতভূমি আজাদ-হিন্দ ফৌজের দখলে আসে, কোহিমা এবং তৎপার্শ্ববর্তী আরও অনেক অঞ্চল ইংরেজদের কবল হতে মুক্ত করা হয়।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, এই সময় ভীষণ বর্ষা নামে। দুর্গম অরণ্য ও গিরিপথ পার হয়ে মুক্তি-ফৌজকে ভারতে আসতে হয়েছে। বর্ষার দরুণ তাঁদের যোগাযোগ রক্ষা ও রসদ সরবরাহের কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনেক সৈনিক আমাশয়ে আক্রান্ত হয়। বাধ্য হয়ে অগ্রগামী দলকে পেছিয়ে আসতে হয়।

বর্ষায় কোহিমা-ইম্ফলের পথে বহু আজাদী সৈন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। জাপানীরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজাদ-হিন্দ-বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করল না।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্য ব্রহ্মদেশ অভিযান করল। এই অবস্থায় আজাদ-হিন্দ সরকারের দপ্তর রেঙ্গুন হতে সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত করতে হল। সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুর যাত্রার প্রাক্কালে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর প্রশংসা করে একটি বাণী প্রদান করেন। প্রথম পর্যায়ে জয়ী হতে না পারায় তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই, তিনি জানালেন—"আমি চিরদিন আশাবাদী, কোন অবস্থাতে পরাজয় মেনে নিব না।"

ইতিমধ্যে জার্মাণরা হেরে গিয়েছে। এটম বোমা জাপানীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়, তারা আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে নেতাজী সিঙ্গাপুর হতে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আর একটি বাণী প্রেরণ করেন! পরদিন প্রত্যূষে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি বিমানযোগে টোকিও যাত্রা করেন। কিন্তু পথে বিমান-দুর্ঘটনায় তিনি ভয়ানকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে প্রেরিত হন। সেখান থেকে চারিদিকে প্রচার হল তিনি মারা গিয়েছেন। অবশ্য ভারতবাসীর মন এখনও এই কথা বিশ্বাস করতে চায় না, এখনও মধ্যে মধ্যে প্রচার হয় নেতাজী বেঁচে আছেন।

জাপানের পরাজয়ের পর বৃটিশ আজাদ-হিন্দ ফৌজের সেনা ও অফিসারদের বন্দী করে ভারতে আনে। দিল্লীর লালকেল্লায় তাদের বিচার সুরু হয়। ইহার প্রতিবাদে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়ন হয়; ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সেনারা বিদ্রোহ করে। ভারতবাসীর বিক্ষোভ দেখে ইংরেজরা আর অগ্রসর হতে সাহস করল না, আজাদ-হিন্দ ফৌজের অফিসারদের মুক্ত দেওয়া হল। আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতকে মুক্ত করতে পারে নাই, কিন্তু পরোক্ষভাবে ভারতের মুক্তি অর্জনে ইহার অবদান অতুলনীয়, সিপাহী-বিদ্রোহের পর ভারতে বৃটিশ শক্তির ভিত্তিমূলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং বিপ্লবী সূর্য সেন, এই দুই নির্ভীক বাঙালী বীর, প্রচণ্ড আঘাত হানে, যাহা পরবর্তী সময়ে বৃটিশকে ভারত ত্যাগে অনুপ্রেরিত করে।

ভারত বর্তমানে স্বাধীন, তবে ভারতবাসীর নিকট একটি প্রশ্ন—ভারত কি নেতাজী এবং মাষ্টারদার কাম্য স্বাধীনতা লাভ করেছে—এবং পশ্চিমবঙ্গে আগত পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল হিন্দু নরনারীর দিকে দেখে কেহ কি বলতে পারেন,—এই স্বাধীনতা ভারতের জনগণের মঙ্গল আনয়ন করেছে?

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু
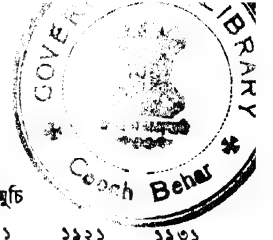
সেন্সাস রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গকে সামগ্রিকভাবে দেখলে এবং ১৯০১ থেকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার সেন্সাস-রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, রায়পুরের সিংহদের অথবা শান্তিপুর সহরের ইতিহাসে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তা সমগ্র প্রদেশেই বিস্তারলাভ করেছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, কালক্রমে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নীচের তালিকা থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে, চিরাচরিত বৃত্তি পরিবর্ত্তনের গতি অসমান তো বটেই, বরং যে সমস্ত জাতি সহরে চলে গিয়ে লাভজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েছে এবং যে সমস্ত জাতি পুরুষানুক্রমিক শিল্পকলা হারিয়ে শিল্প-শ্রমিক অথবা ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে, তাদের উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নগর ও সহরের নিকটবর্ত্তী যায়গায় এবং যানবাহনের যোগাযোগ-বিহীন অঞ্চলে কি করে এই অবস্থা ঘটেছে, তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা করে আবিষ্কার করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

সেন্সাস রিপোর্ট থেকে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা' লেখকের পূর্বেকার এক প্রবন্ধ থেকে নীচে দেওয়া হল :—

কুমোর

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	১৯৫,৫৫৩	২৭৮,২০৬	২৮৪,৫১৪	২৮৯,৬৫৪
রোজগারী লোকজন		৯২,৬৫৯	৭৫,৩২৬	৫৩,৫০৬
শিক্ষিতের শতকরা হার	৬·৫৪	৮·০৪	১০·১৮	৯·৬৬
শতকরা কতজন আছে :				
চিরাচরিত বৃত্তিতে	৭৫·১৬	৭৩·৮০	৬১·৬৯	৫৮·৮৭
কৃষিকার্যে	১৬·৬০	১৩·৪০	১১·৭৬	১১·৮৯
শিল্পে		৭৮·১৪	৬৪·৫০	৬৬·৬৬
উচ্চতর বৃত্তিতে		০·৮৫৭	১·২৮৮	৪·৩১৭

কামার

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	১৭৬,৮৭৩	২৩৮,৫১৫	২৫৯,৮৫৩	২৬৫,৫২৬
রোজগারী লোকজন		৮৬,১০২	৮৯,৬৩৩	৮১,৭১০
শিক্ষিতের শতকরা হার	১০·৩৪	১৪·১৮	১৭·৮৮	১৪·৯১
শতকরা কতজন আছে :				
চিরাচরিত বৃত্তিতে	৪৭·৩৫	৫৭·৪৮	৩৪·১১	৪৩·৭৬
কৃষিকার্যে		১১·৩০	২৬·০২	২১·৮১
শিল্পে		৬৭·৫৩	৫২·০৪	৫৬·১১
উচ্চতর বৃত্তিতে		১·৭৪৫	১·২৯০	৫·৩২১

চামার ও মুচি

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	৯৬,৩৯১	৫৩৩,১৩১	৫৬৪,৮৭৯	৫৬৪,৬৮২

(শুধু চামার)

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
রোজগারী লোকজন		২৩৮,০৫৮	২৪৪,১৪৫	২১৭,৩৬৬
শিক্ষিতের শতকরা হার	৩·১৯	২·৯৭	৩·১১	৪·৫২
শতকরা কতজন আছে :				
চিরাচরিত বৃত্তিতে	২৩·২৬	৩৩·৭৭	২৩·৯৪	২৪·৫৯
কৃষিকার্যে	৩৩·৪৭	৩২·৩৩	২৮·৬০	৩২·৮৮
শিল্পে		৩৭·০৬	৪২·৮৪	৪৩·৯৩
উচ্চতর বৃত্তিতে		০·২৫৪	০·৪৪৯	১·০৭১

বাগ্‌দী অথবা বগ্রাক্ষত্রিয়

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	৭০৩,১৪৭	৮৪৭,২৯৮	৮৮৬,৮২১	৯৮৭,৬১৫
রোজগারী লোকজন		৫৯২,৪৭২	৩৭১,৪৭৭	৩৬৬,৪৫৫
শিক্ষিতের শতকরা হার	১·৫৭	১·৯১	২·১৩	১·৯২
শতকরা কতজন আছে :				
চিরাচরিত বৃত্তিতে	৭০·১৩	৭১·২৮	৪২·২৮ (?)	৬৯·৭৯
কৃষিকার্যে		৭৩·৪১	৬৮·৬৬	৫·০৩
শিল্পে		১০·০৫	৯·২৩	৫·০৩
উচ্চতর বৃত্তিতে		০·২৪৭	০·৩৫৫	১·১৭১

গোয়ালা

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	৪১৪,৬৯৯	৫৮৩,৭১০	৫৮২,৫৯৭	৫৯৯,২৮১
রোজগারী লোকজন		২৫১,৮২৯	২৩৯ ৪২৯	২১৭,৪৩৮
শিক্ষিতের শতকরা হার	৬·৩৮	৭·৬৮	১০·৫৭	১০·১৭
শতকরা কতজন আছে :				
চিরাচরিত বৃত্তিতে	৪১·৪৫	৩১·৩৯	২১·৩০	২৪·৭৭
কৃষিকার্যে		৪১·০০	৪২·১১	৩৭·৪৯
শিল্পে		৬·৪৭	৭·৪৩	৭·২৮
উচ্চতর বৃত্তিতে		১·৬৫০	১·৮৭১	৫·৪২১

বৈদ্য

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	৩১,৩৫৭	৮৮,২৯৮	১০২,৮৭০	১১০,৭০৯
রোজগারী লোকজন		২১,১৩৩	২৪,১১৪	২৬,৫৯২
শিক্ষিতের শতকরা হার	৪৫·৬২	৫৩·২১	৫৭·৫২	৫১·৭৯
শতকরা কতজন আছে :				
চিরাচরিত বৃত্তিতে	৩৬·১০	২০·১১	১৫·০২	১৮·৮০
কৃষিকার্যে		৭·১৬৩	১২·৪১৮	৬·০৪

শিল্পে	২.১৩	১.৫২	১.৮৫
উচ্চতর বৃত্তিতে	৫৪.৬৯৩	৪৬.৮১১	৪১.৪০

ব্রাহ্মণ

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
জনসংখ্যা	১০,১৯,৩৪৮	১১,৯১,৮৬৭	১৩,৪১,৪৩০	১৪,৫৬,১৮০
রোজগারী লোকজন		৪০০,০৬৪	৪২৫,১৭৩	৪১৭,১৫৭
শিক্ষিতের শতকরা হার	৩৫.৮৪	৩৯.৮৫	৪৩.১৫	৩৭.২৮
শতকরা কতজন আছে :				
চিরাচরিত বৃত্তিতে	৩৩.৫৪	২১.৭৯	১৪.৫৭	১৬.৫৭
কৃষিকার্যে		১৯.৩৮৮	২২.৬৩১	১৫.৩৮
শিল্পে		২.৯২	৩.৫৭	৪.৫০
উচ্চতর বৃত্তিতে		৪৩.৭১২	৩৪.৯৬	৩০.৭৬

তালিকাটি তুলনা করলে দেখা যাবে মোটের ওপর বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে দুই দিকে। কুমোর, কামার অথবা চামার-মুচির মত কারিগর জাতিরা হয় ক্ষেতমজুর হয়ে গেছে, অথবা তাদের চিরাচরিত বৃত্তি ছেড়ে শিল্পে দক্ষ-শিল্পী হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব কম, বাংলার অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক কম। ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের (বাগদি) চিরাচরিত বৃত্তি হল মাঠে চাষ করা। তারা সেটা যথেষ্ট পরিমাণে বজায় রেখেছে। তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার যথেষ্ট কম, কারিগর শ্রেণীর জাতির মধ্যেও গড়ে যে শিক্ষিতের হার তার চেয়েও কম। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতিরা চিরাচরিত বৃত্তির পরিবর্তন করেছে। তারা শুধু কৃষি ও শিল্পে নিবদ্ধ থাকেনি। উচ্চতর বৃত্তি যথা, চিকিৎসা, আইন ব্যবসায়, অফিসের নানাধরণের কাজ, জমিদারী ও জমির তত্ত্বাবধান প্রভৃতিতে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে। এদের মধ্যে শিক্ষিতের হার দেশের অন্যান্য জাতির মধ্যে গড় শিক্ষিতের হার অপেক্ষা বেশী।

আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, ঐ অনুচ্ছেদের শেষ অংশে যে জাতির উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে চিরাচরিত বৃত্তি বিশেষ ভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিভাবে হ্রাস পেয়েছে তা নীচে দেখান হল :

চিরাচরিত বৃত্তিতে নিযুক্ত রোজগারী লোকের শতকরা হার	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
ব্রাহ্মণ	৩৩.৫৪	২১.৭৯	১৪.৫৭	১৬.৫৭
বৈদ্য	৩৬.১০	২০.১১	১৫.০২	১৮.৮০

উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এখনও এখানে একই জাতির মধ্যে বিবাহের রীতি আগের মতই চালু আছে। উচ্চতর বৃত্তিতে অথবা কৃষিকার্যে বিভিন্ন জাতির সমাবেশ ঘটলেও সেই পেশাগত ঐক্য তাদের প্রাচীন বিবাহ রীতিকে ভঙ্গ করতে পারেনি।

বাংলা দেশে কিভাবে পরিবর্তন ঘটেছে তার একটা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে অজয় নদ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দু'টি জেলার সীমারেখা চিহ্নিত করেছে। এক সময়ে সুপুর, রায়পুর ইলামবাজারের মত সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো অজয় নদের তীরেই অবস্থিত ছিল। নদীগুলো তখন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যপথ হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা দেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সোজা যাতায়াতের পথ খুলে গেল। এই রেল-পথগুলো বীরভূমের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রসারিত এবং অজয়, কোপাই, ময়ূরাক্ষী নদীগুলোকে সমকোণে অতিক্রম করেছে। এই রেলপথ অজয়নদকে রায়পুরের কাছাকাছি একটি জায়গা আড়াআড়ি-ভাবে অতিক্রম করেছে।

রায়পুরের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এই সংযোগস্থলে রয়েছে প্রাচীন গ্রাম বুদ্রো। এখন গ্রামের অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু। বর্তমানে অজয়ের উপরে যে রেলপুলটি আছে, তার তিন মাইল উত্তরে বোলপুর অবস্থিত।

দেশের সর্বত্র যেমন ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম রয়েছে, এক সময়ে এটিও সেইরকম একটি ছোট গ্রাম ছিল। এখানে একটি রেল ষ্টেশন হওয়ায় এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা আসতে থাকায় এর গুরুত্ব বেড়ে গেল। কিছুলোক এলো নদীতীরবর্তী সমৃদ্ধ গ্রামগুলো থেকে। ফলে ঐ গ্রামগুলো উপেক্ষিত হয়ে রইল ; আরও লোক এল বিহার থেকে অথবা রাজস্থানের মত দূরবর্তী প্রদেশ থেকে।

প্রথম যুদ্ধের সময় চালের দর বেড়ে গেল এবং বোলপুর স্থানীয় একটি ক্ষুদ্র বাজার থেকে ক্রমশ দেশের একটি বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হল। রাতারাতি বহু ধানকল গড়ে উঠল। চারিদিকে রাস্তাঘাট ছড়িয়ে পড়ল। গরুর গাড়ীর সংখ্যা বাড়লো এবং বোলপুর বাংলার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চাউল-ব্যবসায়-কেন্দ্র হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে গুস্‌করা-আমেদপুর-সাঁইথিয়া প্রভৃতি রেল-ষ্টেশনগুলোরও গুরুত্ব বেড়ে গেল। বোলপুরের গুরুত্ব কিন্তু সবার উপরেই রইল।

এই সহরের গত ৫০ বছরের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। জমির দর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। রাস্তাগুলো উন্নত হল, অপরদিকে বন্দগোড়া অথবা ত্রিশূলাপটির মত নিকটবর্তী গ্রামগুলোর রাস্তার পাশে গুদাম, কারখানা, দোকানপাট, বাসগৃহ ইত্যাদি গড়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ক্রমে এলোমেলো ভাবে সব জায়গায় মিউনিসিপ্যাল সহর গড়ে উঠলো। রাস্তাগুলোর সব দিকে ঘরবাড়ীর সংখ্যা বেড়ে গেল। সস্তা, স্বল্প ব্যয়ে মোটর পরিবহনের ব্যবস্থা হওয়ার পর থেকে রাস্তাগুলোর গুরুত্ব যেমন সব দিক থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তার পাশে পাশে ঘরবাড়ী তৈরীর ভিড়িকও বেড়ে গেল।

যে সমস্ত ব্যবসায়ী দোকানদার প্রথমে বোলপুরে এলো, তারা গোড়ায় পল্লীগ্রাম থেকে তাদের পরিবারবর্গ আনেনি। যত দিন যেতে লাগলো, গ্রামের প্রধান ও উৎসাহী নেতারা গ্রাম ত্যাগ করায় গ্রামগুলোর অবনতি ঘটলো। ফলে তারা ও তাদের পরিবারবর্গও গ্রামের ভিটে থেকে সহরে এসে ভিড় জমাতে লাগল। কারণ তারা দেখল, আর কিছু না হোক, অন্তত শিক্ষা আর চিকিৎসার সুবিধে গ্রামের তুলনায় এখানে সহজলভ্য। এইভাবে বাছা বাছা লোকগুলো সহরে চলে যেতে লাগলো এবং ধনী লোকেরা গ্রাম ত্যাগ করায় প্রাচীন শিল্পগুলো শ্রীহীন হতে আরম্ভ করলো। তাদের পক্ষে কলকারখানার তৈরী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হল না। ফলে কারিকর শ্রেণীর লোক ক্রমবর্ধিষ্ণু সহরগুলোতে কাজের সন্ধানে চলে গেল। বাকী সকলে চামার মুচি শ্রেণীর জাতের লোকের মত ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হল। খামারে মজুরীর মূল্য কমে যেতে লাগল। এত কমে গেল যে, যেক্ষেত্রে আগে আগে তারা ফসলের আধাআধি ভাগ পেত, সেক্ষেত্রে উৎপন্ন ৪০ বস্তা ধান পিছু ভাগচাষীদের পাওনা

২০ বস্তার বদলে ১৮ বস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। জমির মালিকের পাওনা হল ২২ বস্তা।

বোলপুর সহরে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের নিয়মিত আনাগোনা চলতে লাগল। ধানকলে প্রচুর শ্রমিক কাজ পেতে লাগল। শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য এবং অস্থায়ী লোকজনের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে দেহোপজীবিনীদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের অবস্থা যখন এই রকম, তখন অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের সমৃদ্ধ চাষী ও ব্যবসায়ীরা সহরের উন্নতির সঙ্গে তাদের নিজেদের স্বার্থ স্থায়িভাবে সংযুক্ত করে নিল। সহরের স্কুল এবং লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়ল, চিকিৎসা আরও সহজলভ্য হল, মিউনিসিপ্যাল কার্যকলাপ ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হল। ফলে সহর বৃহত্তর এবং নানাভাবে উন্নততর হয়ে উঠলো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, হাড়ি, ডোম, মুচি, সাঁওতাল শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লোক পরোক্ষভাবে সহর-উন্নয়নের কিছুটা ফল পেলেও উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই এ ব্যাপারে সব সময় অগ্রাধিকার পেতে লাগলো ; ফলে নীচের স্তরের লোকেরা আগের মতই দীন দরিদ্র এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে বাস করতে লাগলো।

লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, কারখানার মালিক ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং স্কুল-মাষ্টার প্রভৃতি নূতন অর্থনৈতিক শ্রেণীর লোকেরা প্রধানত এলো পুরোনো সমাজের সমৃদ্ধ জাতিগুলোর মধ্য থেকে। তথাকথিত নীচু জাতের লোকেরা এ সুযোগ পায়নি। কারণ, উঁচু জাতের লোকেরা আগেই শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেয়েছিল এবং সহর গড়ে ওঠার সময় গ্রাম থেকে সহরে চলে আসার আর্থিক সঙ্গতি একমাত্র তাদেরই ছিল। নূতন সহরে বৃত্তিগুলো গ্রামের সাবেকি বৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বংশগত বিধি-বিধান মোটামুটিভাবে এখানে অচল হয়ে গেল। ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়ে অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যপূর্ণ এক নতুন সমাজ ধারার প্রবর্তন হল। সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে অসাম্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আগে 'উচু জাতের' লোকদের মধ্যে চিরাচরিত প্রথার যে সমস্ত সাংস্কৃতিক দায়িত্ব ছিল, তা ক্ষীণ হতে সুরু করলো।

স্বার্থের ব্যবধান

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দৃঢ়তর হওয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে ইংরেজদের ব্যবসায় স্বার্থ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাশ্চমের দিকে মুখ ফেরালো। ফলে গ্রাম ও সহরের স্বার্থের ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে যে মুনাফা সংগৃহীত হয়েছিল তা সব সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের মূলধনে রূপান্তরিত হয়নি। তার একটা মোটা অংশ জমিদারী ক্রয়ে ব্যয়িত হয়েছিল। কারণ তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনিশ্চিত এবং দেশীয় স্বার্থের প্রতিকূল ছিল বলে লোকে জমিদারীতে টাকা লগ্নী করা নিরাপদ মনে করত।

ব্যবসায়ীরা এবং বৃটিশ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের এজেন্টরা এইভাবে যখন জমিদার হয়ে বসলো, তখন তারা তাদের সম্পদের একটা অংশ পল্লীভবনের উন্নয়ন, মন্দির নির্মাণ, নদীতীরে স্নানের ঘাট তৈরী, ধর্মীয় উৎসব ও বিবাহ-অনুষ্ঠানে ব্যয় করতে লাগলো। ধনী দরিদ্র—নির্বিশেষে গ্রামের প্রতিবেশীরা এই সমস্ত উৎসবে যোগ দিয়ে এক ঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনে কিছু পরিমাণে বৈচিত্র্য খুঁজে পেত। ফলে তারা এগুলোকে স্বাগত জানাতে লাগলো। সহরের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আগের পুরুষের লোকেরা গ্রামের বাল্যস্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে গ্রামেই রয়ে গেল এবং সেইখানেই তাদের জীবনলীলা শেষ হল। কিন্তু তাদের বংশধরদের সঙ্গে গ্রাম্যজীবনের যোগাযোগ ইতিমধ্যে ক্ষীণতর হয়ে আসায় গ্রাম ও সহরের ব্যবধান বৃদ্ধি পেল এবং এই ব্যবধান ক্রমশঃ পরিষ্কার ভাবে বেড়ে যেতে লাগ্‌লো।

সাংস্কৃতিক অনুকরণ

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এদেশে ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থের লেজুড় হিসাবে যে দেশীয় নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠ্‌লো, তাদের উপর ইংরেজ-সংস্কৃতির প্রভাবও এসে পড়তে আরম্ভ করলো।

শান্তিপুরে তিলি ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রথম যুগে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ব্যবসায়ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা এবং কলকাতার সুবর্ণ-বণিক, গন্ধবণিক, কায়স্থ জাতি ও অন্যান্য জাতির ব্যবসায়ীরা সে যুগে ইংরেজ মহল্লার বড় বড় দালালের অনুকরণে ইউরোপীয় ছাঁচে বড় বড় দালান তৈরী করেছিল।

কিন্তু বাংলা দেশে নরনারীর জীবনধারা আগে যেমন চলছিল, তেম্‌নিই চল্‌তে লাগলো। নারীরা পর্দার আড়ালে নিরালা জীবন যাপন করতে লাগলো, সুতরাং বাড়ীর ভিতরে উঠোন এবং তার পাশের খোলা বারান্দাগুলো আগেকার মতই বাঙালী সংসারের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে রইল। ছাদ ছিল মেয়েদের বিকালে মুক্ত বায়ু সেবন করবার অথবা পাড়াপড়শীদের সঙ্গে গল্প করবার যায়গা। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে সমৃদ্ধিশালী হিন্দু পরিবারের বিপুল সংখ্যক অতিথিকে এখানেই আদর অপ্যায়ন করা হত। বাড়ীর বাইরে বেঞ্চের আকারে একটি স্থান নির্মাণ করা হয়, বাংলায় তাকে 'রক' বলে। এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ছেলে বুড়ো সবাই সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব করত, ধূমপান করতো অথবা তাসপাশা খেলে সময় কাটাত।

এই দুটি জিনিষ যথা, বাড়ীর ভিতরের প্রাঙ্গণ ও খোলা বারান্দা এবং অন্দরমুখী অধিকাংশ ঘরগুলো ছিল বর্তমানের ইটের তৈরী বাড়ীর বিশেষত্ব। আগে মাটি, বাঁশ ও খড়ের তৈরী বাড়ীগুলোর বিশেষত্ব অন্নবিস্তর এই রকমই ছিল। ইটের তৈরী বাড়ীতেই ছাদ তৈরী সম্ভব ছিল, কারণ ইতিপূর্বে যে সমস্ত মালমসলা ব্যবহৃত হত, তা দিয়ে ছাদ তৈরী সম্ভব ছিল না। আরও উল্লেখযোগ্য যে, কাঠামো মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকলেও, এই সব নতুন বাড়ীতে ইউরোপীয় ছাঁচে কারুকার্য করা হত। কখনও কখনও এই কারুকার্য এত গুরুত্বপূর্ণ হত যে, তা বাড়ীর কাঠামোতেও পরিবর্তন আনতো। সামগ্রিকভাবে স্থাপত্যশিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব মোটামুটি একটা বহিরঙ্গের ব্যাপার ছিল, যদিও সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক ছিল না।

[ক্রমশঃ

পত্রগুচ্ছ
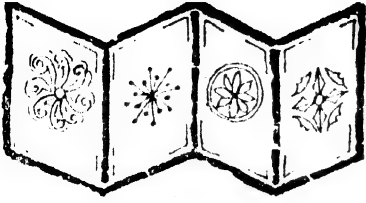
মহাকবি গ্যেটের পত্র

[গ্যেটের জীবনে যে প্রেমানুভূতি জেগেছিল তা নিয়ে একখানা বই লেখা চলে। ভৃঙ্গ-স্বভাব ছিলেন কবি। প্রতিবার প্রেমে পড়েছেন আর প্রতিবার জীবন-সংশয় উপস্থিত হয়েছে। মাত্র পনের বছর বয়সে প্রেম জাগে এবং জীবনের শেষ দিক অবধি সে প্রেমানুভূতি—নারীর প্রতি আকর্ষণ—প্রবল ছিল। ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী গ্যেটের এ হচ্ছে চতুর্থ প্রণয়। তবে শার্লোট বাফের সঙ্গে তার জীবনের প্রেম তার দিক হতে এক তরফাই ছিল। কারণ শার্লোট বাফ কেষ্টনার নামক এক উচ্চ রাজকর্মচারীর বাগদত্তা ছিলেন। সুতরাং এ বার্থতা ভুলে যাবার জন্য পালাবার মনস্থ করলেন। তবু তাঁর জীবনে এই ব্যর্থ প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পায় তাঁর লেখা 'হ্বের্থরের দুঃখ' নামক উপন্যাসে। এ-বই সারা ইউরোপে চাঞ্চল্য আনে। এ বইখানির প্রতি নেপোলিয়ানের প্রচুর অনুরাগ ছিল। গ্যেটের প্রেম দান্তে বা পেত্রার্কের মত একনিষ্ঠ ছিল না। শার্লোট বাফের বিয়ে হয় কেষ্টনারের সঙ্গে। কবির প্রেয়সী ও প্রেয়সীর ভবিষ্যৎ-স্বামীকে লিখিত কতগুলো চিঠির অনুবাদ দেওয়া হল। কবির প্রেয়সীর স্বামী না বলে কেষ্টনারকে কবির প্রতিদ্বন্দ্বী বললেই ঠিক হবে। কেষ্টনারকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার অনুবাদও দেওয়া হল।—অনুবাদক]

প্রিয় কেষ্টনার,

সে চলে যাবে, সে চলে যাবে, যখন এ পত্র তুমি পাবে। চিঠির সঙ্গে যা পাঠালাম, সেটা লটীকে দিও। আমি পূর্ণশান্তিতে আছি। তবে যা তুমি বলেছ তাতে আমি অবাক হয়েছি। বিদায় দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নাই। আমি এখানে অবস্থান করলে নিজেকে আর সামলাতে পারব না। এখন আমি একা। আগামীকাল চলে যাব। কী অসহ্য মাথার যন্ত্রণা।

শার্লোট বাফকে এই চিঠিখানা উপরের চিঠির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

আমি আশা করি ফিরে আসব একদিন। কিন্তু কবে তা ভগবান জানেন। লটী, চিন্তা কর—তোমার সঙ্গে কথা বলে কী আনন্দই না পেতাম যখন বুঝেছিলাম সেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎপর্ব। চিরদিনের জন্য না হলেও আগামীকাল আমি চলে যাব। সে চলে গেছে। কোন এক সত্তা তোমাকে আমার সঙ্গে গ্রথিত করল। যা আমি অনুভব করেছিলাম, তা বলবার সুযোগ আমার ছিল। বর্তমানে ইহজগতের কথা ভাবছি আর ভাবছি যে তোমার কর আমি চুম্বন করেছি, এখন আমি একা। এখন কাঁদতেও পারি। তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি, উদ্দেশ্য তুমি আর আমি যেন শান্তি পাই, আর নিজের হৃদয়ের মধ্যে আমরা যেন বসবাস করি। আগামীকাল বলতে চিরকালের না বোঝায় না। আমার ছোট ছোট বন্ধুদের বল সে চলে গেছে। এখন আর না—ইতি।

প্রিয় লটী,

আমাকে আর স্বপ্ন দেখ না—তা হলে আবার বুকে আমাকে ক্রশ আঁকতে হবে। লটীকে আজ আমি রাতে স্বপ্নে পাওয়ার ঈপ্সা করি। ভেবেছিলাম মনের এ-বাসনা তোমাদের দু'জনকে জানাব না। তোমার চিঠির একটা অংশ পড়ে আমি বিরক্তি বোধ করেছিলাম। লটী যে আমাকে একবারও স্বপ্নে দেখে নি, এক মুহূর্তের জন্যও না। লটীর দেহ ও মনের আত্মা হচ্ছি আমি। লটীকে সারা দিন-রাত আমি স্বপ্ন দেখি। ভগবান জানেন সবচেয়ে জ্ঞানী হয়েও আমি বোকা। এক অশুভ দেবতা কেন লটীকে আর আমাকে বিচ্ছিন্ন করল। দিনগুলো কী শুভই না ছিল। Wetzlar-এ আমার দিনগুলো সুখে কাটবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সেদিন ভগবানের কৃপায় আর ফিরে আসবে না। তারা জানে কী করে শাস্তি দিতে হয়। ট্যান্টালাস তোমাকে শুভরাত জানাচ্ছি। লটীর অঙ্গরাখা বিষয়ে বলছিলাম।

(এ চিঠি শুক্রবারে লিখে অসমাপ্ত রাখেন। আহারের পর শনিবারে আবার লেখেন)।

এই সময় তাকে আমি দেখতে আসতাম। এই সময়ে প্রিয়তমাকে বাড়ীতে দেখতাম। যাক চলে যাওয়ার পর আমার লেখার সময় হল। যদি তুমি দেখতে কত ব্যস্ত আমি। সব কিছু সহসা ছেড়ে দিয়ে অনুভব করছি যে, গত চারমাসে কোথায় আমার জীবনের শান্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

তুমি আমাকে ভুলে গেলেও আমি ভয় করি না। তবুও মনে মনে তোমাকে আবার দেখবার বাসনা করি। যা হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মনের জোরের সঙ্গে বলতে পারছি যে তোমাকে ভালবাসি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি না। তোমাকে না লিখলেই ভাল হত। শান্তিতে আমার কল্পনা থাক। তোমার অঙ্গরাখা সেখানে ঝুলছে। ওইটাই সবচেয়ে খারাপ। বিদায়—

প্রিয় কেষ্টনার,

বাইরে এখনও অন্ধকার। আজ ভোরে প্রদীপের আলোর মধ্যে বসে লিখছি তোমাকে। এ অতীতের প্রীতিপদ স্মৃতি বহন করে আনে। দিনকে স্বাগত অভিনন্দন জানাব বলে কফি তৈরী করেছি এবং যতক্ষণ আলো আসে ততক্ষণ লিখব। চৌকিদার বাঁশী বাজিয়ে সময় ঘোষণা করে গেছে। সে শব্দ শুনে আমি জেগে উঠি। সে শব্দ আমাকে জানিয়ে দেয়, তোমাকে সম্মান জানাই প্রিয় যীশু। আজ

খৃষ্টমাস। আমি এ ঋতু ভালবাসি। দূরে একজন গান গাইছে। বাইরে যে তীব্র শীত পড়েছে ত আমাকে আনন্দিত করেছে। গতকাল কী সুন্দর দিন গিয়েছে। আজকের জন্ম আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। দিনটা ভালভাবে শুরু হয়েছে। দিনের সমাপ্তি বিষয়ে আমি আর ভাবছি না। গতকাল রাতে দুটো অঙ্গরাখা দেখে মনের বাসনা হয় তোমাকে আমি লিখব। দু'টী প্রিয় মুখ আমার চোখের সামনে নাচে পরীর মত। ঘুম থেকে জেগে আমি লটীর অঙ্গরাখার আবরণ দেখি। আমি যখন অন্য এক জায়গায় ছিলাম তখন কয়েকজন লোক আমার বিছানার ওপর সেটা রেখেছিল। আমার ঠিক বিছানার ওপরে লটীর ছবি। কি আনন্দ। এ ছবির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি যেভাবে তার বিষয়ে লিখেছ তার চেয়ে বেশী আমি কল্পনা করি। তার বিষয়ে কল্পনা করা, চিন্তা করা বা অন্য কিছু বলা মানে বোকামি। চৌকিদার আবার ফিরে এসেছে। উত্তর বাতাসে সে-শব্দ আমার জানালার বাইরে থেকে সরাসরি ঢুকছে।

প্রিয় কেইনার,

গতকাল পল্লীর মধ্যে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দিন আমি কি সুন্দরভাবে কাটিয়েছি। পরের দিন অবশ্য এ-ভাবে সময় কাটাতে পারিনি। তবে স্বর্গের ভগবানগণ ইচ্ছা করলে মন্দকে ভাল করতে পারে। সুন্দর সন্ধ্যাকে তারা উপহাস করেছিল। মদ আমি খাইনি। উগ্র দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাইনি। যখন আমরা ফিরলাম তখন রাত নামলো। একটা সঙ্গীতের সুরজাল এ আমাকে স্পর্শ করায়, যখন নীচে সূর্য্য থাকে এবং অন্ধকার সারা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ক্ষীণ আলোকের দ্যুতি পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকে। সমতল দেশে এ দৃশ্য অপূর্ব। মনে পড়ে যৌবনে এর নীচে খেলা করতাম। সে কাজে উদ্দীপ্ত হতাম। আমি সূর্য্য অস্ত দেখতাম যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্ত যেত। সাঁকোর ওপরে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ প্রায়ান্ধকারে। স্বর্ণময় সূর্য্য আর নদীর জলে সূর্য্যের প্রতিফলন—এসব আমার অন্তরে এক বিগলনীয় সৌন্দর্য্য অনুভূতি এনে দিত। এগুলো উন্মুক্ত বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করতাম। তারপর খাতা আর পেন্সিল দিয়ে সমস্ত নিসর্গের ছবি আঁকতাম। কেউ কেউ এ আনন্দে আমার সঙ্গে যোগ দিত। আমি যা অনুভব করতাম সে আরও পূর্ণতর করে দিত আর আমার মধ্যে সে আত্মনির্ভরশীলতা এনে দিত। এসব ছবিতে গতিদান করে শিল্পী বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিতাম মতামত জানবার জন্ম। সে ছবিগুলো এখনও আমার ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে। আমি প্রীত এই ভেবে যে, গতকালের আমি আজ সেই রকমই আছি। আমরা সে সন্ধ্যা কী সুন্দরভাবে কাটাতাম। আর ভাবতাম, প্রকৃতি আমার ওপর অনেক কিছু দান করেছে। আর আমি নিদ্রালু হয়ে ভাবছি যে স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ আমাদের শিশুসুলভ উৎসব দিয়ে খৃষ্টমাস অনুষ্ঠান আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে। বাজারে শিশুদের খেলনা আর মোমবাতি দেখলাম। আর তোমার কথা ভাবলাম। গৃহ-অভ্যন্তরস্থ শিশুদের কথা ভেবে তোমার বাইবেল-হাতে আনন্দিত রূপ আমার চোখে ভেসে উঠল। যদি আমি তোমার সঙ্গে থাকতাম, তা হলে আনন্দিত হতাম এই দেখে যে, হয়ত আমরা অসংখ্য মোমবাতি জ্বালাতাম। সে স্বর্গের আলোতে দীপ্ত বিচ্ছুরিত হত। প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাবি বাজাতে বাজাতে চৌকিদার আসছে। বাদামী আলো আমার মাথা স্পর্শ করছে। খৃষ্টমাসের ঘণ্টা বাজছে।

ঘরের মধ্যে নিজেকে উদ্দীপ্ত হয়ে ভাবছি। এত সুন্দর দিন এর আগে কোনদিন আসে নি। সুখী ছবির চিত্রকল্প ভেসে উঠেছে। এ আমাকে শুভ সকাল জানাচ্ছে। ঈশ্বরের বাসনায় উদ্দীপ্ত হয়ে রাফেলের ছবির সাতটা ছোট ছোট মাথা নকল করা হয়েছে। আমি সেই ছোট ছোট মাথা নকল করেছি। আমি এ ছবি এঁকে সুখী না হলেও সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার প্রিয় মানসীর অঙ্গরাখা সেখানে আছে। লটীর অঙ্গরাখা গৃহে আছে। আমার মেয়ে যদি থাকত তা হলে তার অঙ্গরাখার মধ্যে প্রেমপত্র সঞ্চয় করে রাখতাম আর সেই প্রেমপত্রের ভিতরে আমার মেয়েকে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দিতাম। আমার বোনের হাসি আর থামে না। কারণ স্পর্শালু যৌবনে এ রকম চিঠি তার জীবনে আদান প্রদান হয়েছিল। হৃদয়বান যুবতীর প্রতি পচা ডিমকে রোগগ্রস্ত করবার এ বস্তু। আমি লটীর চিরুণীটা পালটিয়েছি। প্রথমবারের চিরুণীর মত এটা সুন্দরও নয় এবং ভালও নয়। আশা করি এটা তবুও কাজে লাগবে। হ্যাঁ, লটীর মাথাটা দেখতে খুব সুন্দর।

দিনের আলো দ্রুত আসছে। ভাগ্য যদি ভাল হয় বিয়ে হবে আমার। মোটে তোমাকে আর এক পাতা বেশী লিখব। দিনের আলো না দেখবার ছল করব আমি।

কুকুরের মতন দেখতে সেই বুড়ো অধ্যাপক মেয়েমানুষের মত ক্রুদ্ধ হয়েছে। এ যেন সেই পুরাণের মহিলা পেনী হারিয়ে কোঁস কোঁস করছে। গোয়েন্দার মত কোন একটা সূত্র অন্বেষণ করে গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছে। এ চিঠিতে তার নাম উল্লেখ করব না আমি। সেই বুড়ো অধ্যাপক এই চিঠিতে লটীর বা তোমার নাম দেখলেই জ্বলে উঠবে। সে বুড়ো আরও রেগে উঠবে কারণ তাকে আমি আমল দিই না। সে বুড়ো এ-রকম কাজ করে আমাদের লোভ দেখাতে চায়। আমার লেখার ওপর বুড়োর প্রবল বিতৃষ্ণা। বুড়োটা গাধার মতন। 'আমি আছি' এই বলে সে আমার বাগান রক্ষা করে আর সব কাঁটাঝোঁপ ও আগাছা পরিষ্কার করে।

বিদায়। দিবালোক চারিদিকে। ভগবান তোমার সহায় হোন। অনুষ্ঠানের মধ্যে আনন্দের বাণী নিয়ে দিনটা এসেছে। সুন্দর মুহূর্ত্তগুলো আমাকে নষ্ট করতে হবে। অনেক বই-এর সমালোচনা আমাকে করতে হবে। শেষ সংখ্যা বলে সমালোচনা আরও ভাল করতে হবে।

বিদায়, আমাকে ভুল না। সকলের প্রতি ভালবাসা রইল। আমি এক অদ্ভুত জীব। তোমাদের সংবাদ দিও—ইতি।

প্রিয় কেইনার,

তোমার পক্ষে এটা খুব হৃদয়হীনতার কাজ যখন প্রতিজ্ঞা করেও তুমি আংটিটা পাঠালে না। আমার জন্ম এ কাজটা করা তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ বলে হয়ত মনে হয়নি। তোমাকে আমি ঘৃণা

করি। কারণ শয়তান প্রলুব্ধ করেছিল আমার কাছ থেকে এ আংটি নিতে। আমার মনে হয়, রাজার মুকুটের চেয়েও এগুলো সুন্দর। বিদায়। তোমার পত্নীর কাছে আমার কোন বাণী নাই। ইতি।

প্রিয় কেষ্টনার,

এক সপ্তাহ পূর্বেও তুমি যে আংটি পাওনি তার জন্ম আমি দোষী নই। এই যে, আংটিগুলো এখন এখানে। আমি আশা করি এগুলো তোমার পছন্দ হবে। আমি অবশেষে প্রীত হয়েছি। এটা হচ্ছে দ্বিতীয়টি। এক সপ্তাহ আগে এগুলো পাঠান হয়েছিল আমার কাছে। খুব কষ্ট করে গড়তে হয়েছে। 'পুরোণোগুলোকে সরিয়ে নতুন গুলোকে গ্রহণ কর।' আমি আশা করি সব ঠিক আছে।

আশীর্বাদের এক শৃঙ্খলের সূচনা স্বর্গ ও মর্ত্তের সাধনা নিকটতর করুক। আমি তোমারই, কিন্তু তোমাকে বা তোমার বউকে দেখবার জন্ম আমি লালায়িত নই। ইষ্টারের ছুটিতে তার অঙ্গরাখা আমার ঘর থেকে সরিয়ে নেব। কারণ তোমাদের বিয়ের দিন দু এক দিন আগে বা পিছে ঠিক হবে। যতদিন না লটীর প্রথম সন্তান হয় ততদিন আর অঙ্গরাখা ঝুলাব না সেখানে। কারণ তা নতুন কিছুর সূচনা করবে। তারপর প্রেয়সীকে আর ভালবাসব না। ভালবাসব তার সন্তানকে। তার সুখ ও সুবিধার জন্ম একাজ করব কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আমাকে যদি তোমাদের নবজাতকের ধর্মপিতা করতে চাও তা হলে সে-শিশুর ওপর আমার আত্মা বর্ত্তাবে। তা হলে সে শিশু মেয়েদের বিষয়ে ঠিক আমার মত অজ্ঞ হবে, যে-মেয়েরা ঠিক তার মায়ের মতন। স্বামীর গৃহে গিয়ে সুখী হও। ফ্রাঙ্কফর্ট আর তোমার সইছে না। আর তুমি আসছ না, এর জন্ম আমি সুখী। আর যদি তুমি এখানে আস, তাহলে আমি চলে যাব। হ্যানোভারে তোমার যাত্রা শুভ হোক। বিদায়, লটীর আংটি আমি শীলমোহর করে রেখেছি। তোমার কথামত আমি কাজ করছি। বিদায়। —ইতি।

'প্রিয়তমা লটী' এতদিন শার্লোট বাফ বলে পরিচিত ছিলেন। তাকে লিখলেন :

তোমার সুখের সঙ্গে আমার আশা মিশে থাক আংটির মত। দীর্ঘদিন কেটে গেছে। তোমার সঙ্গে কবে আমরা মিলিত হব। তোমার হাতে আংটি রাখব। আর তোমার চিরকালের আমি তোমারই থাকব। আমার আর কোন পরিচয় নাই। তুমি জান আমার পরিচয়।

প্রিয় লটী,

তোমার একটা ঢোলা পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে কী না তা আমি ঠিকমত অনুমান করতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় যে, সে-জিনিষটির তোমার প্রয়োজন হতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ আমি চিন্তা করে নিজেকে বলছি। প্রিয়তমা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতে ভালবাসে। যথাযথভাবে সূচীশিল্পের কাজ না হলে আর সে পোষাক পরলে ঠাকুরমার মতন মনে হবে। এ-সময় ক্যানানের দেবতা এসে মগজে কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। তা হলেও এ-পোষাক বেশীদিন টেঁকসই হবে না। মসলিনের কাপড় পাঠালাম। এর অনেক গুণ আছে। এ দিয়ে শীতবস্ত্র তৈরী হবে। দরজীর কাছে সরাসরি পাঠিয়ে এক প্রস্থ কিছু সুন্দরভাবে তৈরী করে নাও। সাদা ছাড়া আর কোন লাইনিং যেন না হয়। নীল ও সাদা বিছানার চাদর পাঠালাম। নতুন সজীব স্বামীকে পেয়ে পুরোণো বন্ধুকে ভুল না, তোমার স্বামীকে ভালবাসা দিও। আমার মতন অতীতের কথা চিন্তা কর।—ইতি।

প্রিয় কেষ্টনার,

নবজাতককে আমার চুমু দিও, আর তার সঙ্গে আমার চুমু লটীকে দিও। তাকে বল, সন্তানের জননী হিসাবে তাকে আমি কল্পনা করতে পারি না। এ অসম্ভব ব্যাপার। প্রথম যখন আমি তার কাছ থেকে চলে আসি, সেই ঠিক রূপ এখনও আমি দেখতে পাচ্ছি। পুরোণো সম্পর্ক ছাড়া স্বামী হিসাবে তোমাকে আমি চিনি না। আর এই বলে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে, অপরের অনুভূতি দেখে বা অনুধাবন করে আমার অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করতে হবে না। আগে তোমাদের দুজনকে যেমন ভালবাসতাম, ঠিক সেই রকম আমাকে ভালবেসো। —ইতি।

প্রিয় লটী,

ঠিক এই মুহূর্ত্তে কে আমার ঘর থেকে চলে গেছে, এ তুমি অনুমান করতে পারবে না। অনেক চেনা ও অচেনা লোককে তুমি অনুমান হয়ত করতে পারবে। সেই মোজাওয়ালীর কথা তোমার মনে পড়ে, যে তোমাকে খুব ভালবাসত। সে আর এখানে বাস করতে পারছে না। আমাদের বিচ্ছেদ শুনে সে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। আমার মা তাকে কোন একটা কাজে বহাল করে দিতে বলেছে। তোমার অঙ্গরাখা দেখে বলল,—ও বাছা লটী! তার দাঁত নাই; তবু তার মুখে এক অদ্ভুত বিস্ময়। আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ম আমার হাত ও কোট সে চুম্বন করল আর বলল—আগে কত দুষ্ট আমি ছিলাম আর এখন কত শান্ত হয়ে গেছি! যে বৃদ্ধা আমার অনুভূতির সঙ্গে হৃদয় মেলাতে পারে তার কাছে আমার কতটা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সাধুদের অস্থি আর ছেঁড়া শীতবস্ত্র যদি রক্ষা করা হয়ে থাকে এবং তার মূল্য দেওয়া হয়, তবে এই বৃদ্ধাকে আমি কেন শ্রদ্ধা করব না? এই মহিলা তার বাহুর মধ্যে রেখে আদর করেছিল একদিন তোমাকে শিশুর মত। সেদিন তুমি এই মহিলার কাছে অনেক কিছু চেয়েছিলে। স্বর্গের পরী তুমি। তুমিও ভিক্ষা করেছিলে লটী। আমার কাছে কিছু না কিছু একদিন প্রকাশ করেছিলে। একটা কথা ভেবে আমার হাসি আসে। সে-বুড়ী বলেছে তুমি কি ভাবে তাকে রাগাতে ছোট ছোট হাত নেড়ে! মনে হয় তোমার সত্তা আমাদের খুঁজছে। লটী—লটী—লটী—আমার প্রিয় লটী, পৃথিবীতে লটী ছাড়া আর কিছু নাই। যেখানে লটী নাই, সেখানে দুঃখ মৃত্যু আর অভাব বিরাজ করছে।

গত ডিসেম্বরে আগষ্ট তোমাকে একখানা চিঠি লিখতে সুরু

করেছিলাম আমি। ছ বছর আগে আমি তোমার পাশে বসে কত সীম কুচি কুচি করেছিলাম মধ্যরাত পর্যন্ত। ২৮শে আগষ্ট আমার জন্মদিন চা-পর্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সুরু হয়েছিল। তুমি তোমার স্পর্শালু হৃদয় দিয়ে আমাকে ভালবাসার শপথ করেছিলে, আর আমিও তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তোমরা দুই স্বামী-স্ত্রী আমাকে ভালবেসেছিলে। সময়ের গতি যদি আমাদের গ্রাস করে, তা হলে আমাদের পক্ষে তা আদৌ শুভ হবে না। তোমাকে একখানা প্রার্থনার বই পাঠাচ্ছি তাড়াতাড়ি। এর মারফত আমাদের বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের অতীত প্রতিশ্রুতি আরও দৃঢ় হবে। সকাল ও সন্ধ্যায় এই বই পড়বে। আমার জন্ম নিশ্চয়ই আগামী কাল চিন্তা করবে। আগামী কাল আমি তোমার কাছে থাকব। এর পিছনে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী মহিলার আশীর্ব্বাদ আছে। চার সপ্তাহ পর দীর্ঘ প্রত্যাশিত বৃষ্টি ঝরছে। দেশে থাকলে যেমন চাঙা হওয়া যায় সে-রকম চাঙা আমি হয়েছি আর ভাবছি যে, শান্ত পল্লীর পরিবেশ আমি অনুভব করছি। আরও কয়েকজন আমার বন্ধু এসেছিল। তোমার অঙ্গরাখা দেখে তারা উল্লসিত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমার খুচরো আলাপ হলো। যাবার সময় বন্ধুরা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গেল।

গতকাল ছিল নীরস ৩১শে আগষ্ট। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা এসেছিল। গতকাল রাতে তোমাকে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, তুমি আমার কাছে এসে চুমু দিয়ে উদ্দীপ্ত করছ। তোমার কাছ থেকে বহু দূরে আমি রয়েছি। কোনকালে এতদূরে ছিলাম না। এর আগে স্বপ্নও দেখিনি। ঘুম থেকে জাগিনি। তোমার জন্য এখানে অঙ্গরাখা সাজিয়ে রেখেছি। আরও কয়েকজনকে আমি তা দেব। তোমার স্বামীকে বল, সে আমাকে যেন অবশ্যই লেখে। আমার লেখা ও ছাপার অক্ষর জানাচ্ছে ধন্যবাদ। তোমাকেও আমি ভালবাসি। তোমার ছেলেকে চুমু দিও। তোমার কাছে উপস্থিত হলে লিখে বা বকে তোমাকে বিরক্ত করব না। তোমার কাছে অশরীরীর মতন উপস্থিত হব, তা হ'লে আমার বিকৃত মুখ দেখতে পারব না। আশা করি, তোমার বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন অবস্থায় তোমাকে দেখতে পাব। ইতি।

প্রিয় কেষ্টনার,

বইটা যদি তোমার কাছে পৌছে, তা হলে বুঝবে এই প্রেরিত চিঠির অংশ। তাড়াতাড়িতে এ আমি ভুলে গিয়েছিলাম। একটা ঘূর্ণিঝড়ের আবর্ত্তে রয়েছি আমি। উৎসব শেষ হল আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে। অতীত ও বর্ত্তমান ছুটছে আমাদের পরস্পরের দিকে। আমার ভবিষ্যৎ কী হবে। লোকদের নিয়ে তুমি নিশ্চয়ই আসবে অবসর সময় অতিবাহিত করবার জন্য। এ বইটা কাউকে ধার দিও না। যে বেঁচে আছে, তাকে ভালবাস আর যে মৃত, তাকে সম্মান কর। আমার শেষ চিঠিতে অস্পষ্ট বিষয়ে তোমার ধারণা স্পষ্ট হবে। ইতি।

(ওই চিঠির সঙ্গে এটা জুড়ে দিয়েছিলেন, লটীকে উদ্দেশ্য করে নীচের চিঠি)।

প্রিয় লটী,

আমার বই পড়ে তুমি বুঝতে পারবে কত প্রিয় এই লেখা বই আমার। আমার কাছে এই বই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কারণ, তা তুমি পাঠ করবে বলে শতবার চুমু দিয়েছি আর তালাচাবি দিয়ে রেখেছিলাম যাতে এ বই অন্য কেউ স্পর্শ করতে না পারে। ও লটী, এই বই কাউকে দেখিও না। লাইপজিগে যখন পুস্তক-প্রদর্শনী হবে তখন এ-বই প্রকাশিত হবে। তোমরা স্বামী-স্ত্রী নির্জ্জনে বইখানি একা একা পড়বে, এ-ই আমি চাই। তুমি একা পড়বে, তোমার স্বামী একা পড়বে। আর তোমরা আমাকে দু'কলম লিখবে। ইতি।

প্রিয় কেষ্টনার,

আবার তোমাকে আমার বুকের ব্যথা দূর করবার জন্য চিঠি লিখব প্রিয় কেষ্টনার। যা হয়েছে তার জন্য আর যা প্রকাশ পেয়েছে তার জন্য। আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে প্রস্তুত নই। যদি ভাব তুমি নিজেকে দুঃখ দিচ্ছ এবং যদি ভাব যে এই লেখার মধ্যে সত্যের সরল রূপ রয়েছে, তবেই আমি লিখব।

তুমি একজন সুদর্শন ব্যবহারজীবী। আমি বলতে পারতাম যে, তুমি সব কিছু হরণ করেছ। আমি আর কিছু বলতে পারছি না, আর আমার বলবারও কিছু নাই, কারণ ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারছি না।

নীরব হয়ে আমার আশাতীত অনুভূতির কথা বলছি। আমি কল্পনা করছি—কল্পনা কেন—বিশ্বাস করছি যে, আমাদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করবার জন্য প্রকৃতি এই কাজ করেছে। হ্যাঁ, সত্যিই বন্ধু, ভালবাসা আমাদের সাযুজ্য নিকটতর করেছে। আমি তোমাকে ও তোমার সন্তানদের কাছে এক অশুভ মুহূর্ত্ত চিঠির মধ্যে ব্যক্ত করছি। যা বলবার তুমি বল। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। এর আগেকার চিঠিতে তোমাকে গভীরভাবে চিনতে পেরেছি। সেই রকম চেনা তুমি হয়ে থাক—লটীও সেই রকম হয়ে থাক। ঠিক সেই রকম হোক—যা ঘটে তার জন্যই ঘটুক। তারা বলে শুভ সব কাজ ভগবান আদেশ করে থাকেন। প্রিয় বন্ধু, এ চিঠি পড়ে যদি ক্ষুব্ধ হও, তা হলে স্মরণ করে ভেব যে, তোমার বন্ধু গোটে পরিবর্ত্তিত হলে এখন সে পূর্বের চেয়ে তোমার কাছে প্রিয়। ইতি।

কেষ্টনার,

তোমার চিঠি পেয়েছি। এ চিঠি আমার ডেস্কের ঘরে পড়িনি। একজন চিত্রশিল্পীর ঘরে সে চিঠি আমি পড়েছি। গতকাল আমি তৈলচিত্র আঁকতে সুরু করেছিলাম। তোমাকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তোমার অন্তর সজীব চিরকাল। আমি যদি তোমাকে আলিঙ্গন করতে পারতাম। লটীর পদতলে পড়ব এক নিমিষের জন্য। সামান্য পত্রে কি আর জানাব। সব কিছু কালি দূর হয়ে যাবে। তোমরা সন্দেহবাদী। আমি কাঁদব। তোমার বিশ্বাস কম। হেবর্থরের সহস্র অংশ পাঠ করে যদি তুমি বুঝতে পারতে। হেবর্থরের দুঃখের মূল্যায়ন তুমি বুঝতে পারবে না।

আমি একটা নোট পাঠালাম। পড়ে ফেরৎ পাঠিও ঠিক যেমন অবস্থায় তুমি এ পেয়েছ। তুমি এক বন্ধুর কথা লিখেছ। সে আমাকে অভিযোগ করেনি, ক্ষমা করেছে। ভাই, প্রিয় কেষ্টনার। অপেক্ষা কর, তাহলে সাহায্য পাবে। আমি হেবর্থরকে

বলব না ফিরে এসে সে আমার জীবন রক্ষা করুক। তা হলে অন্ধকারে তোমার দুঃখ আবছায়ার মতন বিলীন হবে। এক বছরের জন্য আমি সজীব উত্তর-বাতাসের মতন হব। সব কুয়াশা আর তুষার উড়িয়ে নিয়ে যাব। বিরোধ, হতাশা, সব কিছু দূর করে নিভিয়ে দিয়ে আনন্দের পথ খুঁজে পাব। হতাশা, সন্দেহ, ইতর লোকদের মধ্যে থাকে। হ্বের্থরের জীবনেও এই ঘটেছিল। তার কথা তুমি ভেব না। আমার কথা আর তোমার কথা ভেব যা তোমাকে জড়িয়ে ধরে গ্রন্থিজাল বুনে চলেছে। তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি—এখনও আমি জীবিত আছি।

আমার থেকে উষ্ণ তোমার হাত লটীকে দিও। আর তাকে জানিও ক্ষতিপূরণ হয়েছে, কারণ শ্রদ্ধা ও ঘৃণার সঙ্গে তার নাম অসংখ্য জনতার মুখে মুখে ঘুরছে। তারা কাউকে বেশীদিন বিপদে ফেলবে না। তুমি যদি ভাল হও আর আমাকে পীড়ন না কর, তা হলে তোমাকে আমি পত্র পাঠাব। তাতে দীর্ঘশ্বাস আর দুঃখ হ্বের্থরের থাকবে। তুমি যদি বিশ্বাস রাখ তাহলে ভাল হবে। আর যা কানাঘুঁসা হবে তার কিছুই থাকবে না। এই চিঠি তোমার হৃদয়ে ধর। আমি চুমু দিয়েছি।

কেষ্টনার, তুমি ভেব না যে, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি, সান্ত্বনা দিচ্ছি। আমার সান্ত্বনা তোমার ও লটীর শুভকামনায় রসান্বিত করছি। বিপদে বাস্তব কাহিনীর মত হয়ত তোমাকে ভয় পাওয়াবে। লটী বিদায়, কেষ্টনার বিদায়—আমাকে ভালবেসে পীড়ন কর না।

অন্য কোন লোকের কাছে এ চিঠির বাণী জানিও না। তোমাদের দুজনকে উদ্দেশ্য করে এ চিঠি আমার লেখা। আর কারও জন্য নয়। বিদায়—ভালবাসার ধনদের বিদায়। তোমার পত্নী ও ছেলের জন্য চুমু রইল।

সন্দেহের শূন্য দোলায় না দুললে সব কানাঘুঁসা থেমে যায়। যা বাকী ছিল তা আমি করতে পারতাম খুব তাড়াতাড়ি। তোমার বন্ধুদের প্রতি আমার ভালবাসা রইল।

গতকাল এক বালিকা বলল—লটী যে এত সুন্দর নাম, এর আগে আমরা জানতাম না। লেংহেন বা লোলো যে নামেই তুমি ভালবাস কিন্তু লটীর মত উপযোগী নাম আর হবে না।

প্রেমের ও বন্ধুত্বের মধ্যে যাদুকরের শক্তি আছে। খুব শীত, আমি স্কেটিং খেলতে বাইরে যাব। ইতি।

তাপসী-প্রতীক্ষিতা

শ্রীঅরুণা ঘোষ

হে রাম তপস্বিনি !
শ্রীরামের লাগি আঁখি-দীপ জ্বালি
বসে আছ একাকিনী।

পলে পলে দিন যায়।
স্মরণ-বেদিকা নিতুই ধুয়েছো
তব আঁখিজলে হায়।

এই বুঝি আসে রাম।
এই বুঝি আসে প্রাণের ঠাকুর
নব-দূর্ব্বাদল-শ্যাম।

কতদিন আসে যায়;
কোথায় তোমার চির-আরাধ্য
বুঝি বা এলো না হায়।

অন্তরতম তরে।
নয়নের জলে আল্পনা আঁকি
চাহিয়া রয়েছো দ্বারে।

শুনি মর্ম্মর ধ্বনি।
ভেবেছো, এসেছে পাতকী-তারণ
তোমার সে রঘুমণি ?

মঙ্গল-ঘট ভরি।
নিত্য রেখেছো দুয়ারের পাশে
রাতুল চরণ স্মরি।

ব্যথার প্রদীপ হয়ে।
শ্রীরামের লাগি জ্বলিয়াছ শুধু
দহনের ব্যথা সয়ে।

জীবন ঘনায়ে আসে।
জরা আর ব্যাধি ঘিরে ফেলে দেহে
তবু আছ রাম-আশে।

আয়ুঃশিখা হোল ম্লান।
প্রভুর আশায়, আশার শিখাটি
তবু জ্বলে অম্লান।

আঁখি পল্লব হতে।
বিদায় দিয়েছো নিদ্রা-দেবীরে
শ্রীরাম প্রতীক্ষাতে।

শবরী এসেছে রাম।
সীতা অন্বেষণে তোমার দুয়ারে
এল লীলা-অভিরাম।

এসেছো কি তুমি রাম ?
"এসেছি শবরী করিতে আশিস্
পূরাতে মনস্কাম।"

প্রতীক্ষাই তব ধ্যান।
তাইতো অতিথি পর্ণকুটিরে
পতিতপাবন রাম।

তাপসী প্রতীক্ষিতা।
তপস্যা তোমার চির প্রতীক্ষা
অয়ি অতিচিন্মিতা।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রাধিকাই জয়শ্রী। জয় মানে উৎকর্ষ আর শ্রী মানে শোভা। জয়হেতু যার শ্রী, অর্থাৎ উৎকর্ষহেতু যার শোভা, সেই জয়শ্রী। দ্যূতক্রীড়া, জলকেলি, নর্মবাক্য—সর্ব কিছুতেই তার বিশেষ উৎকর্ষ। আবার সৌন্দর্যে, সৌভাগ্যে, বৈদগ্ধ্যে, পাতিব্রত্যেও সে অপরাভূতা। সুতরাং সে জয়া। আর লক্ষ্মীরই আরেক নাম শ্রী। লক্ষ্মীশক্তির সারভূতা প্রতিমাই রাধিকা। তার মানে মূলশ্রীই রাধিকা। সুতরাং রাধিকা জয়াও, শ্রীও।

লীলাস্বয়ম্বররস উপভোগ করছে। লজ্জায় কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের পায়ের নখের অগ্রভাগের দিকে তাকিয়ে আছে অবনতমুখে। তাকিয়ে আছে পাদ-কল্পতরুপল্লবশেখরের দিকে। আর সেই পদনখশোভা দেখেই রাধিকা বিহ্বল। লজ্জা-শীল ধর্মকুল—সমস্ত আর্যপথ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণচরণে সম্যক তার আত্ম-সমর্পণ। সে সমর্পণে যে আনন্দ, তার তুলনা শুধু ঐ আনন্দই।

রাধিকাই প্রেমপরাকাষ্ঠারূপিণী। তার রতি সান্দ্রতমা। চমৎকারকরশ্রী। এই রতির চেষ্টা স্বীয়ানুকূল্যতাৎপর্যা নয়, প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্যা। ওর সকল উদ্যম কৃষ্ণসৌখ্যার্থ।

জ্যৈষ্ঠের মধ্যাহ্ন। গোচারণে গিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণকে দেখবার জন্যে রাধিকা আর তার সখীরা বেরিয়ে পড়েছে বাড়ী ছেড়ে। গোবর্ধন পাহাড়ের কাছে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল, কোথায় কৃষ্ণ? বুঝল, কৃষ্ণ পাহাড়ের অপর দিকে অবস্থান করছে। ডাকলে কি আর শুনবে, দাঁড়াবে চোখের সামনে? দরকার কী। গোবর্ধনের চূড়ায় গিয়ে আরোহণ করি। সেখানে উঠলেই কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হবে। কোন্ দিকে পালাবে তখন? চূড়ায় উঠলেই দেখা যাবে সর্বদিক।

সখীরা নিরস্ত করতে চাইল। কিন্তু কে শোনে কার কথা? মধ্যাহ্ন-সূর্যের উত্তাপে পাহাড়ের গা আগুন হয়ে উঠেছে, তোমার পায়ের পাতা পাতবে কী করে? তা ছাড়া উঁচু নিচু টুকরো-টুকরো পাথরের কোণগুলো অসিফলার মত তীক্ষ্ণ। তোমার পায়ের পাতা রাখবে কোথায়?

কিন্তু রৌদ্র বা অসি, তাপ বা তীক্ষ্ণতা, কোনো কিছুতে রাধিকার লক্ষ্য নেই। কৃষ্ণে অর্পিতচিত্ত, অনন্যচিত্ত হয়ে সে পাহাড়ে চড়ছে। চূড়াতে পৌঁছে দেখতে পেয়েছে কৃষ্ণকে। চরণতল দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, এ সবে রাধিকার অনুভূতি নেই, অনুসন্ধান নেই। কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়ার সুখেই সে নিস্পন্দ-নিমগ্ন। কোথায় বা পাথরের ধারালো কোণ, কোথায় বা সূর্যের প্রাখর্য! রাধিকার মনে হচ্ছে কমলদল-আস্তৃত সুকোমল শয্যায় সে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণকে দেখতে যাওয়ার দুঃখ কৃষ্ণকে দেখতে পাওয়ার সুখ হয়ে গিয়েছে। সূর্যকিরণ আমাকে কী করবে, আমার দেহ কোটিচন্দ্রের চেয়ে সুশীতল।

ভাদ্র মাসের চতুর্থ তিথির চাঁদ দেখলে মিথ্যে কলঙ্ক জন্মে—এইরূপ কিম্বদন্তী। এক গোপী বহু আরাধনা-উপাসনা করেও পাচ্ছে না কৃষ্ণকে। কৃষ্ণকে না পাই, কৃষ্ণ সঙ্গের মিথ্যা কলঙ্কের আনন্দটুকু অন্তত দাও। নিজের অযোগ্যতার দৈন্যে ভাদ্রের চতুর্থ তিথির চাঁদের কাছে প্রার্থনা করছে: হে চতুর্থ-নিশা-শশাঙ্ক, হে কামাম্বুরাশি-পরিবর্ধন, সেই যুবকের সঙ্গে

আমার অভিমান মিথ্যাপবাদ-বাক্যেও যেন সিদ্ধ হয়। কে সেই যুবক? আর কে! স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। আর কিসের অভিমান? তিনি আমার কান্ত, আমি তাঁর কান্তা—এই অভিমান। এই অভিমানে কৃষ্ণ-সঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়? নাই বা থাক কৃষ্ণ-সঙ্গের সম্ভাবনা, কৃষ্ণ-সঙ্গের আভাস তো আছে। কৃষ্ণ আমাকে না নিক, লোকে যে বলবে আমি কৃষ্ণকে নিয়েছি—এই অপবাদে, এই লজ্জায়, এই দুঃখেও আমার পরম সুখ।

দ্বারকায় কৃষ্ণের অসুখ করেছে। এ রোগের চিকিৎসা কী, জিজ্ঞেস করল নারদ। কৃষ্ণ বললে, কোনো ভক্ত যদি তার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দেয়, ভালো হতে পারি। যে নারদ এত বড় ভক্ত, সেও পিছু হটল। কৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী, প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত পাতল। সে কী কথা? স্বামীকে কী করে পায়ের ধুলো দেব? তাতে আমাদের পত্নীধর্ম নষ্ট হবে না? না, পারব না ধুলো দিতে। নারদ তখন ব্রজে গেল। ব্রজাঙ্গনারা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাদের কৃষ্ণের অসুখ? আমরা কি তার ভক্ত? আমাদের ধুলোতে কি কাজ হবে? তবু আমাদের কৃষ্ণ যদি ভালো হয়, দেব আমাদের পায়ের ধুলো! যদি পাপ হয়, অধর্ম হয়, তো আমাদের হবে। আমাদের পাপে, আমাদের অধর্মেও যদি কৃষ্ণ সুখী হয়, আমরা সে পাপ, সে অধর্ম করব হাসিমুখে। জীবনে আর আমাদের ব্রত কী? সেবা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করাই আমাদের ব্রত।

প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার কী দশা? নয়নে ঘুম নেই। কদাচিৎ যদি ঘুম আসে, মাটিতে শোয়। শরীর ক্ষীণ মলিন হয়ে গিয়েছে। তণ্ডুল গুনে গুনে হরিনামের সংখ্যা পূরণ করে। সে তণ্ডুল ফুটিয়ে আগে প্রভুকে নিবেদন করে, তারপর তার কিঞ্চিন্মাত্র খায়। জীবন যে কেন রাখছে, কে বলবে!

'প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুকে অর্পয়॥
তাহার কিঞ্চিৎমাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন॥'

জীবন কেন রাখছে? পতির সুখেই পত্নীর তৃপ্তি, পতির ইষ্টেই পত্নীর ইষ্ট, শুধু এই তত্ত্ব প্রকট করবে বলে, প্রতিষ্ঠিত করবে বলে। তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির কার্যে আমি আনুকূল্যবিধায়িনী—এই প্রমাণ করব বলে। যে প্রেমভক্তি বিতরণে তোমার স্পৃহা, আমি সেই প্রেমভক্তিরই প্রতিমূর্তি। তোমার বিতরণ বাইরে, আমার বিতরণ ঘরে। আমিই মূর্তিমতী ভক্তি, তোমার স্বরূপশক্তি। তোমার সুখচিন্তা, ভক্তি চিন্তা ছাড়া আর সমস্ত বাসনাই অশ্রুর গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছি।

বিয়ের পর প্রায় দু বছর কাটল নিশ্চিন্তে। অধ্যাপনা নিয়েই মেতে আছে নিমাই। এদিকে ভক্তিবিরোধী নানা মতবাদের প্রচার হচ্ছে নবদ্বীপে। বাড়ছে অভক্তের দল। 'চতুর্দিগে পাষণ্ড বাড়য়ে গুরুতর।' বৈষ্ণব দেখছে আর গাল দিচ্ছে। ভক্তের দল অনুযোগ করছে—এ সময় উনি কিনা বিদ্যাচর্চায় নিবিষ্ট!

নিমাই স্থির করল এবার আত্মপ্রকাশের সময় এসেছে। 'চিত্তে ইচ্ছা হইল আত্মপ্রকাশ করিতে।' কিন্তু তার আগে একবার গয়া থেকে আসি। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য শেষ করি।

প্রায় তেইশ বছর বয়েস, সঙ্গে মেসো চন্দ্রশেখর আর বহু ছাত্র-শিষ্য, নিমাই মার অনুমতি নিয়ে, সব দেশ গ্রাম তীর্থ করে গয়ায় চলল। আশ্বিন মাস, ১৪৩০ শকাব্দ। চলতে চলতে পৌঁছুল এসে 'চির' নদীর তীরে। সেখানে স্নানাহ্নিক সেরে ভাগলপুর জেলার মন্দারে এল। যেমন মথুরায় কেশব, নীলাচলে পুরুষোত্তম, প্রয়াগে বিন্দুমাধব, কেরলে বাসুদেব, দাক্ষিণাত্যে পদ্মনাভ, তেমনি মন্দারে মধুসূদন। মধুসূদনকে দর্শন করল নিমাই।

মন্দারে নিমাইয়ের জ্বর হল। বেশ কঠিন জ্বর, সঙ্গীরা সব ভাবনায় পড়ল। নিজের চিকিৎসা নিজে করল নিমাই। বললে, এক ব্রাহ্মণের পাদোদক নিয়ে এস। তা খেলেই আমি ভালো হব।

আনা হল বিপ্রপাদোদক। তা খেতেই জ্বর ছেড়ে গেল নিমাইয়ের।

ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখাবার জন্যেই এই রঙ্গ। না কি নিজের অসাধারণত্ব যাতে বুঝতে না পারে কেউ তারই জন্যে এই কৌশল!

তারপর দলবল নিয়ে নিমাই পুনপুনে এল। সেখানে স্নান করে পিতৃদেবের অর্চন করল। তারপর রাজগিরে আবার স্নান সেরে গয়ায় প্রবেশ করল।

গয়াতে ঢুকে দুই শ্রীকর জুড়ে নমস্কার করল

তীর্থরাজকে। ভঙ্গি গাঢ়, গম্ভীর ও প্রশান্ত। পিতৃকার্য করে স্নান করল ব্রহ্মকুণ্ডে। তারপর চক্রবেড়ে এসে দেখতে চলল পাদপদ্ম। দেখ দেখ ভগবানের পদচিহ্ন দেখ। যে চরণ কাশীনাথ হৃদয়ে ধরেছে, যে চরণ লক্ষ্মীর জীবন, বলির মাথায় যে চরণের আবির্ভাব, তাকে দেখ চোখ ভরে। যে চরণ তিলার্ধ ধ্যান করলে যম তার অধিকার হারায়, যে চরণে ভাগীরথীর প্রকাশ, ভক্ত নিরবধি যাকে বুকে করে রাখে, তুমি নিতান্ত ভাগ্যবান, তাই তাকে দেখতে পেয়েছ।

নারায়ণের নাভি থেকে উৎপন্ন পদ্মের নালে চৌদ্দ ভুবন প্রস্ফুটিত। তার মধ্যে এক ভুবন পৃথিবী। পৃথিবীতে সপ্তসমুদ্র—লবণসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র। দধিসমুদ্রের আরেক নাম ক্ষীরসমুদ্র বা ক্ষীরাব্ধি। ক্ষীরাব্ধির মধ্যে এক দ্বীপ আছে, যার নাম শ্বেতদ্বীপ। ঐ শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা বিষ্ণুর নিজধাম। দেবতারা তাঁর দর্শন পায় না। অসুরের উৎপীড়নে পৃথিবী যখন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, তখন দেবতারা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরে গিয়ে তাঁর স্তব করে পৃথিবীর দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে। তখন বিষ্ণু অবতীর্ণ হয়ে জগৎকে রক্ষা করেন, ত্রাণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; পূর্ণতম ভগবান। তিনি যখন অবতীর্ণ হন সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপই তাঁর বিগ্রহের মধ্যে মিলিত হন! সমস্ত ভগবৎস্বরূপই তাঁর অংশ, তিনিই সকলের আশ্রয়।

> কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয়।
> সর্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়॥
> যেই যেই-রূপ জানে সেই তাহা কহে।
> সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে॥

কৃষ্ণের ছেলে শাম্ব স্বয়ম্বর-সভা থেকে দুর্যোধনের মেয়ে লক্ষণাকে হরণ করল। কৌরবেরা তাকে বাধা দিল, পরাভূত করে হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখল। স্বয়ং বলরাম গেল আপোষ করতে। দুর্যোধনকে বললে—বৃষ্ণিবংশের সঙ্গে কুরুবংশের বিরোধ বাধিয়ে লাভ কি? শাম্বকে ছেড়ে দাও। বলদৃপ্ত দুর্যোধন বললে—আমার অনুগ্রহেই বৃষ্ণিবংশীয়েরা বেঁচে আছে। আমিই তাদের একটি ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজত্ব দিয়েছি, নইলে রাজাসন তারা কোথায় পেত? আমারই অনুগ্রহে প্রাণ ধারণ করে আবার আমাকেই নির্লজ্জের মত আদেশ করছেন?

বলরাম বললে—"কৃষ্ণকে রাজাসন দিয়েছ বলে গর্ব করছ? কিন্তু কৃষ্ণের রাজাসনে কী প্রয়োজন? একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসনে তার আর কী মহিমা বাড়বে? অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিরা যাঁর চরণরেণু মাথায় ধরে কৃতকৃতার্থ; ব্রহ্মা, শিব আর আমি, এমন কি সর্বৈশ্বর্যময়ী লক্ষ্মী, যার অংশের অংশ, কলার কলা, তার কি হবে নৃপাসনে?"

একদৃষ্টে নিমাই দেখতে লাগল পাদপদ্ম। দুই পদ্ম-নয়ন ভরে উঠল অশ্রুতে। প্রথম ধারা নামল অপাঙ্গ থেকে, দ্বিতীয় ধারা নামল নাকের কাছেকার কোণ থেকে। চোখের মাঝখান থেকে নামল তৃতীয় ধারা। তিনধারা মিশে গেল এক হয়ে। ত্রিবেণী হয়ে গেল গঙ্গা অবিচ্ছিন্না। নিমাইয়ের উপবীত ভিজল, উত্তরীয় ভিজল, বসন ভিজল।

নিমাই দেখছে কৃষ্ণকে, আর সকলে দেখছে নিমাইকে। কী সুন্দর মুখ। কী সুন্দর চোখ। কী সুন্দর অশ্রুধারা! মুখে কথা নেই, শুধু ঠোঁট দুখানি কাঁপছে। শরীর টলছে কিন্তু পড়ছে না। এ কী নতুন ভাবাবেশ! কারু সাহস নেই নিমাইকে ছোঁয়; তার বাহ্য সম্বিৎ ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে।

দৈবযোগে সেখানে ঈশ্বরপুরী উপস্থিত। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে নিমাইয়ের এ অভিনব ভাব দেখতে লাগলেন। এ কী অমানুষিক কাণ্ড! মেঘ দেখলে তাঁর গুরু মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণস্ফূর্তি হত, পড়তেন মূর্ছিত হয়ে। এ যে দেখি সেই দশা। সত্যি নিমাইও দেখি মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। আর সকলে বোঝেনি—ঈশ্বরপুরীর জানা, ঈশ্বরপুরী বুঝেছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ধরলেন নিমাইকে। নিমাই চিনতে পারল, প্রণাম করতে চাইল, ঈশ্বরপুরী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রেমানন্দে একসঙ্গে কাঁদতে লাগলেন দুজনে।

নিমাই বললে—'আমার গয়াযাত্রা সফল হল। দেখলাম আপনাকে। কোনো তীর্থই আপনার সমান নয়, আপনিই পরম তীর্থ। তীর্থে পিণ্ড দিলে, যার পিণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সে তরে যায়। কিন্তু আপনাকে দেখলে সমস্ত পিতৃপুরুষেরই বুঝি উদ্ধার হয়। সংসার-সমুদ্র থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আমার এই দেহ আপনাকে সমর্পণ করলাম। আমাকে কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান করান।'

'পণ্ডিত, শোনো, আমি বলছি,' ঈশ্বরপুরী বলতে লাগলেন গাঢ় স্বরে, 'সন্দেহ নেই, তুমি ঈশ্বর-অংশ।

যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি নবদ্বীপে, সেদিন থেকে তুমি আমার চিত্ত আলো করে আছ। কিন্তু আজ যা দেখলাম, তা অপরূপ। আজ আলোর চেয়েও বেশি, আজ আনন্দ। আজ তোমাকে দেখলাম না কৃষ্ণকে দেখলাম। তোমাকে দেখেই আজ আমার কৃষ্ণ দর্শনের সুখ হচ্ছে।'

'এ আপনার কৃপা, আমার ভাগ্য।' বিনয় বচনে নিমাই বললে।

ফল্গুতীর্থে গিয়ে নিমাই বালির পিণ্ড দিলে। তারপর গেল প্রেতগয়ায়। তারপর রামগয়ায়। সেখান থেকে যুধিষ্ঠিরগয়ায়। ক্রমে ক্রমে ষোড়শগয়ায়। সব গয়াতেই শ্রাদ্ধ করল ক্রমে ক্রমে। তারপরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে শেষ পিণ্ড গয়াশিরে।

'আমি আর আমার স্ববশে নেই।' বললেন ঈশ্বরপুরী, 'আমি এখন তোমারই অধীন। তুমি এখন যা বলবে আমি তাই করব, আমাকে তাই করতে হবে।'

সর্বস্থানে সর্বপ্রকার শ্রাদ্ধ সেরে নিমাই নিজের বাসায় ফিরে এল, আর স্বহস্তে রাঁধতে বসল। রান্না শেষ হয়েছে, এমন সময় প্রেমাবিষ্ট ঈশ্বরপুরী মুখে কৃষ্ণনাম বলতে-বলতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

'তোমাকে চোখের আড় করে থাকি, এমন আর আমার সাধ্য নেই।' বললেন ঈশ্বর-পুরী, 'আর এখন তো সমীচীন সময়েই এসেছি। তোমার রান্নাও শেষ আর আমিও ক্ষুধার্ত।'

'খুব আনন্দের কথা।' নিমাই তৃপ্ত মুখে বললে, 'দয়া করে তবে বসুন। আমি ভাত বাড়ি আপনার জন্যে।'

'আমি খেলে তুমি খাবে কি?'

'আমি পরে রান্না করে নেব।'

'তা কি হয়?' ঈশ্বর পুরী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'বরং যা রেঁধেছ, এস, দুজনে ভাগ করে খাই।'

'তা হয়না।' নিমাই সব ভাত এক থালায়ই বাড়তে লাগল। গম্ভীরস্বরে বললে, 'যদি সত্যিই আপনি আমাকে চান, সমস্ত ভাত আপনাকে খেতে হবে। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। তিলার্ধের মধ্যে আমি আবার রান্না করে নেব নিজের জন্যে।'

কৃষ্ণ-ছাড়া ঈশ্বরপুরীর অন্য মতি নেই। কৃষ্ণের প্রসাদ খেতে বসে গেল পাত পেড়ে। আপন হাতে পরিবেশন করল নিমাই। পরমানন্দে খেতে লাগল ঈশ্বর।

খাইয়েও ছুটি দিলনা। চন্দন নিয়ে এসে ঈশ্বর-অঙ্গ লেপতে বসল নিমাই। ঈশ্বরের গলায় দুলিয়ে দিল ফুলের মালা। দিব্যগন্ধে আমোদ হতে লাগল ঈশ্বরের।

ঈশ্বরের বাসায় এল নিমাই। নিভৃতে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'আমাকে মন্ত্র দীক্ষা দিন।'

ঈশ্বর বললেন, 'মন্ত্র বলছ কী। আমি তোমাকে আমার প্রাণ দিয়ে দিতে পারি।'

দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে নিমাই তখন প্রদক্ষিণ করল। বললে, 'আমার দেহ আপনাকে অর্পণ করলাম। আমাকে এমনি শুভদৃষ্টি করুন, যাতে আমি কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসতে পারি নিরন্তর।'

'হেন শুভদৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে॥'

মন্ত্র দিয়ে ঈশ্বরপুরী আলিঙ্গন করলেন নিমাইকে। দুজনেই কাঁদতে লাগলেন অঝোরে, উদ্বেল আনন্দে।

তারপরে ঈশ্বরপুরী কোথায় চলে গেলেন, কেউ জানেনা।

এ কে? কাকে সে মন্ত্র দিল? জীবনে কত বড় সিদ্ধি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, তিনিই মন্ত্র নিলেন তাঁর কাছে। দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করলেন। দীক্ষার পর নিমাই বারে বারে প্রণাম করে ঈশ্বরকে। যাকে ভগবান বলে জানি, তার প্রণাম নিই কী করে? নিমাইয়ের থেকে দূরে সরে যাই। দূরে সরব কোথায়? নিমাই আমার হৃদয়ের মধ্যে, আমার অণুতে অণুতে। মাধবেন্দ্র যে বীজ পুঁতেছিলেন, নিমাই তারই ফলন্ত বৃক্ষ।

পরে যখন প্রভু কুমারহট্টে এসেছেন, ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থানে, কাঁদতে লাগলেন অনর্গল। সেস্থানের মৃত্তিকা তুলে বহির্বাসে বাঁধলেন ঝুলি করে। বললেন, এ ধুলো নয়, এ সোনা। কোথায়—কোথায় আমার সেই আনন্দের আকর, সেই স্বর্ণ-খনি!

এই অধন্য দিনান্তর আমি কাটাই কী করে? হে অনাথ-বন্ধো, করুণৈক সিন্ধো, হা হন্ত, হা হন্ত, কথং নয়ামি? কী করে কাটবে আমার দিন-রাত্রি? বলো, কি করে? 'এই কাল না যায় কাটন।'

[ক্রমশঃ।

বর্ণ বিদ্বেষের বিভীষিকা

মিহির সেন

১৯৫১ সালে সন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে দৃপ্ত আদর্শবাদ নিয়ে আমি যখন ছাত্র হিসাবে প্রথম ইংলণ্ডে যাই, তখন বর্ণ-বৈষম্য বর্ণ-বিদ্বেষ (Colour Bar and Apartheid) সম্বন্ধে আমি অবহিত ছিলাম না। ভারতবর্ষে ইংরেজ বা আমেরিকানদের সাক্ষাৎ অবশ্যই আমার ঘটেছে, কিন্তু ওয়াটার্লু ষ্টেশনে পৌঁছে চারপাশের ফ্যাকাশে ও ঈষৎ লাল মুখগুলি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিলো। ইংলণ্ডে পুরুষরাও যে "ফর্সা" হয়, এই কথা উপলব্ধি করে আমার যথেষ্ট কৌতুক হয়।

কবি ও ভাবুকেরা চিরকাল সুন্দরী 'গৌরী তরুণীর' গুণগান করে এসেছেন কিন্তু "গৌরতনু পুরুষের" কথা কে কবে শুনেছে? পৌরুষ ও শক্তির আধার হিসাবে চিরকাল শ্যামবর্ণকেই কল্পনা করা হয়েছে। যাক, তখন গায়ের রং নিয়ে আমি এর চাইতে বেশী মাথা ঘামাতে রাজী ছিলাম না।

ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বর্ণ বৈষম্যের নগ্নস্বরূপ আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হলো ইংরেজদেরই সৌজন্যে।

ফ্ল্যাট কিম্বা থাকার জায়গা খুঁজতে গিয়ে এই বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ হয়। ভাড়ার বিজ্ঞপ্তি লাগানো সুন্দর বাসগৃহগুলিতে কিম্বা "অতিথির" জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এ রকম গৃহস্বামিনীদের কাছে গিয়ে প্রায় প্রতিবারেই আমি সময়োপযোগী মিষ্টি হাসির সাথে শুনেছি "বড়ই দুঃখিত, এইমাত্র ভর্ত্তি হয়ে গেছে"।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে—বহু অভিজ্ঞতার পর আমি ধীরে ধীরে বুঝেছি যে, বর্ণ-বিদ্বেষ—যদিও এর শুরু বোধ হয় ইংলণ্ডেই, এখন শুধুমাত্র ইংরেজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্ণের বিভিন্নতার জন্য হেয় জ্ঞান করা এবং বিভেদ করার নীতি বহুদেশেই আছে, এবং এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণকে অবদমিত করে রাখার জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এই বৈষম্যনীতি অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার হচ্ছে।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছে, সেখানেই তারা এই ঘৃণা ও হিংসার বিষ সুনিপুণ দক্ষতার সাথে ছড়িয়ে দিয়েছে। বর্ণ-বৈষম্য ইংরেজ নীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়ার কথা ধরা যাক। এই দ্বীপ—মহাদেশের লোকসংখ্যা খুবই কম। পরিসংখ্যানের তুলনা করলে দেখা যায় অষ্ট্রেলিয়া পশ্চিমবঙ্গের থেকে আয়তনে ১০০ গুণ বড়, অথচ লোকসংখ্যা মাত্র আমাদের (পঃ বঙ্গের) এক-তৃতীয়াংশ। দেশকে উন্নত করবার জন্য যথেষ্ট লোকের একান্ত অভাব সেখানে। আমাদের দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার কিছু অংশ সহজেই অষ্ট্রেলিয়ার জনহীন অঞ্চলে পুনর্বসতি স্থাপন করতে পারে। কিন্তু তা অসম্ভব। অষ্ট্রেলিয়া শুধুমাত্র শ্বেতকায়দের সংরক্ষিত স্বর্গ হয়ে থাকবে। গত দুটি বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ অষ্ট্রেলিয়ানদের সাথে জার্মানী ও ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি যুদ্ধ করেছে—অনেকে মৃত্যুও বরণ করেছে। কিন্তু আজ অষ্ট্রেলিয়া শ্বেতবর্ণ ইউরোপীয়ানদের, এমনকি ওই জার্মাণ ও ইটালিয়ানদেরও প্রায় নির্লজ্জের মত অনুরোধ জানাচ্ছে অষ্ট্রেলিয়ায় আসার জন্য, বিনা ভাড়ায় আসা, মনোরম বসবাসের ব্যবস্থা, মোটা বেতনের চাকুরী এবং আরও বহুবিধ স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস দিচ্ছে। ইউরোপের অষ্ট্রেলিয়ান দূতাবাসগুলির প্রলোভন-জনক বিজ্ঞাপনগুলির দিকে তাকালেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। অথচ আমাদের দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, আজ ভারতবর্ষে বাস করার জায়গা নেই, যার ফলে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক হয় অনুপযুক্ত বেতনে কাজ করে, নয় পুরোপুরি কর্ম্মহীন। আমাদের তরুণেরা সৎ জীবন যাপন করার জন্য পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে কাজ করতে প্রস্তুত। আমাদের সহস্র সহস্র ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং যন্ত্রবিদ্যা-বিশারদ (Technician) যুবক রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত মেধাবী তরুণেরা আছে, যারা সুযোগ পেলে মরুভূমিতেও ফুল ফোটাতে পারে। এ মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষে নিঃশ্বাস ফেলার স্থানের প্রয়োজন, আর প্রয়োজন কর্ম্মহীন যুবকদের জন্য কাজ।

অষ্ট্রেলিয়াই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে বলেই স্বভাবতঃ তার কথা মনে আসে। কিন্তু আমাদের কমনওয়েলথের প্রিয় বন্ধুগণ লজ্জাকর 'শ্বেতকায় নীতি' (White Australian Policy) পালন করে চলেছেন। এই গণতান্ত্রিক গালভরা বক্তৃতার আবাসভূমিতে জেলের আসামী, যুদ্ধের অপরাধী, এমনকি ইউরোপীয় সমাজের নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও অভিনন্দিত হয়, কিন্তু সৎ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ভারতবাসীর স্থান হয় না। অষ্ট্রেলিয়া কি অপরাধীদের আবাস-কেন্দ্রের (Convict Settlement) ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্যই এই নীতি অবলম্বন করেছে? এই সূত্রে এ প্রবাদটি অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অষ্ট্রেলিয়াতে কাউকে পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা না করে বরং সংখ্যা বা নম্বর জিজ্ঞাসা করলে ভুল করা হয় না। কারণ, অষ্ট্রেলিয়ায় বৃটিশ বহুদিন ধরে কেবল দাগী আসামীদের পাঠাতো—তারপর বসবাস আরম্ভ হয়। তথাকথিত গণতন্ত্রের বৃহত্তম কেন্দ্র আমেরিকা, জাতি-বৈষম্যের দুর্নামের দিক থেকে, দক্ষিণ-আফ্রিকার (যাকে এদেশের নরক বলে গণ্য করা যায়) পরেই। এই স্বয়ং-নিযুক্ত পৃথিবীর 'স্বাধীনতার রক্ষক ও মুক্তিমন্ত্রের উদগাতা' প্রতিবছর ৬০,০০০ ইংরেজকে প্রবেশ করতে অধিকার ও বসবাস করার সুযোগ দেয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যা ইংলণ্ড থেকে শতগুণ বেশী হলেও, ভারতের Quota বা প্রবেশাধিকার মাত্র ১৬০ জনের জন্য। আমরা আজও ভুলিনি আমাদের প্রতিনিধি দূত জি, এল, মেহেতাকে সেখানে যে অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। শুধুমাত্র গা'য়ের রংএর জন্য নিজের পরিচয় বিবৃত করার পরও তাঁর আমেরিকার এক হোটেলে স্থান হয়নি। এইসাথে বলে রাখা উচিত যে, শ্রী মেহেতার গায়ের রং 'উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।'

আমেরিকার অধিবাসীদের দর্পিত বিশাল জাতিকে, কলম্বাস-বর্ণিত রেড-ইণ্ডিয়ানদের শ্বেত উপনিবেশিকরা কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বা চাতুরীর সাহায্য নিয়ে নিরপেক্ষ করে ফেলেছে, তা সকলেই

জানে, যার ফলে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদিবাসী এখনো পশুর মত অবস্থায় জীবন ধারণ করছে।

এটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, অধিকাংশ আমেরিকানের শিরায় নিগ্রো-রক্ত প্রবাহিত, কিন্তু এ কথা আরও সত্য যে, প্রত্যেকটি শ্বেতকায় আমেরিকানের হাত ও বিবেক নিগ্রোরক্তে রঞ্জিত। সমস্ত পৃথিবী আহত বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে আমেরিকায় মানুষ মানুষের উপর কি নিষ্ঠুর বীভৎস অত্যাচার করেছে, কি নির্মম দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আমেরিকার দাস-প্রথার দিনগুলিকে এক ভীষণ দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। আজ আমেরিকার ঐশ্বর্য্য এবং প্রাচুর্য্যের মূলে রয়েছে কালো ক্রীতদাসের প্রাণপাত পরিশ্রম। সহস্র সহস্র কৃষ্ণকায় লোকদের আফ্রিকায় তাদের শান্তির নীড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশুর মত শৃঙ্খলিত অবস্থায় আটলাণ্টিক পার করে এনে কারখানায় ও শস্যক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। শেষে অপরিসীম পরিশ্রম ও অমানুষিক অত্যাচারে তারা মৃত্যুবরণ করেছে। "লংফেলোর" (Longfellow) ভাষায় তারা চিরদিন নামহীন কবর থেকে আর্তনাদ করবে "আমরা সে অত্যাচারের সাক্ষী"।

মিথ্যা স্তোক ও দম্ভোক্তির আবরণ ছিন্ন করে জাতিগত বৈষম্যের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই যে, আমেরিকাতে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণকায় নাগরিক বিগতযুগের ক্রীতদাসদের থেকে মাত্র সামান্য উন্নততর অবস্থায় বাস করছে আজ ১৯৫৯ সালে।

সম্প্রতি আলবামার জিমি উইলসনের ঘটনাটি, যা প্রায় আন্তর্জাতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, আমেরিকার নিগ্রো-জীবনের উপর কিছুটা আলোকপাত করে। আমেরিকা হচ্ছে একমাত্র দেশ—যেখানে কৃষ্ণবর্ণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে সামান্য চুরির অপরাধও প্রমাণিত হলে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। কোনও শ্বেতকায় নাগরিককে যদিও একই অপরাধের জন্য সামান্য অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

পঞ্চান্ন বৎসরের প্রৌঢ় নিগ্রো জিমি উইলসন এক শ্বেতকায়া মহিলার টাকা আড়েকের মতো চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়। জিমি বলে যে মিথ্যায় তাকে জড়িত করা হয়েছে। আমেরিকার শ্বেতকায় জুরীগণ বিচারের সময়—সত্যঘটনা যাই হোক না কেন—কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদের সর্ব্বদাই দোষী সাব্যস্ত করেন। আমেরিকাতে নিগ্রোদের বিচার করতে পারেন শুধুমাত্র শ্বেতকায় প্রভুর দল, যাঁরা "কালো ব্যাটাদের" (Niggers) শিক্ষা দেওয়ার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আইনের ধারা অনুসারে জিমি দোষী প্রমাণিত হলো এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো। ভাগ্যের খেলায় তার পক্ষ নিলেন কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক এবং ঘটনাটি ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সহস্র সহস্র প্রতিবাদ আসতে লাগল; পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হোল। অবশেষে কিছুটা লজ্জিত হয়ে আমেরিকার সরকার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। ১৯৫৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর Londonএর News Chronicleএ এই সংবাদ বার হয়।

১৯৫৮ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর London Daily Expressএ মুদ্রিত আমেরিকার আরেকটি খবর পাঠকদের ভীতি সঞ্চার করবে। কণ্ঠদেশে অস্ত্রোপচারের পর প্যারী বিশবো নামে তিন বছরের শ্বেতকায় শিশু অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে বাঁচাতে হলে প্রচুর রক্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ এক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারল না, কারণ "লুসিয়ানাতে" (Louisiana) গত জুনে পাশ হওয়া এক আইনের বলে রক্তকে "সাদা" ও "কালো" (Blood Plasma to be lebelled 'Black or White') তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। প্যারীর গরীব শ্রমিক পিতার পক্ষে শত শত টাকা খরচ করে 'সাদা' রক্ত কেনা ক্ষমতার বাইরে, কিন্তু একটি নিগ্রো যখন রক্তদান করতে চাইল, তার আবেদন সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হলো। এখানে বলা উচিত যে, শ্বেতকায়, নিগ্রো এবং আমাদের রক্তে কোনও প্রভেদ নাই। যখন Daily Expressএর আমেরিকাস্থিত সাংবাদিক মিসেস্ বিশবোকে ফোন করে এ বিষয়ে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস্ বিশবো দ্রুত প্রত্যুত্তর দিলেন—'আমার সন্তানের জন্য আমি কিছুতেই কালো আদমীর রক্ত নেবো না। বর্ণভেদ সব সময় মেনে চলা কর্ত্তব্য। নিগ্রোদের রক্ত যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মঙ্গলজনক হয়েছে।' তাঁর মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি এই উক্তি করেছেন।

আমেরিকার দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর যদি এত বিদ্বেষভাবাপন্ন অহমিকাপূর্ণ মনোভাব হয়, তবে সমাজের উন্নত শ্রেণীর অভিজাত লোকদের যে কৃষ্ণকায়দের প্রতি কি ধারণা, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শ্বেতকায়গণ বিশেষ করে এ্যাংলো-স্যাক্সনেরা (Anglo-Saxons) কৃষ্ণকায়দের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বৈষম্য-নীতির জন্য পৃথিবীব্যাপী কুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে। এদের প্রাধান্য যে দেশে বেশী, সেই দেশেই এরা আমাদের প্রতি বৈষম্যের নীতি প্রয়োগ করেন। এই এ্যাংলো-স্যাক্সনরা সাধারণতঃ ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন। অল্পবিস্তর পার্থক্য ছাড়া সব জায়গায় একই কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি ইংলণ্ডে, কানাডায়, আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়। কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে (Central African Federation) অথবা নিউজিল্যাণ্ডে অত্যাচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী সব জায়গায় এক।

একদা দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে আগত এক উচ্চপদস্থ এবং অভিজাত ভারতীয় আইনজীবী আমায় এই গল্পটি বলেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, দঃ আফ্রিকায় বহু ভারতীয় বাস করেন।

একদিন বিকালে কেপটাউনের অবস্থাপন্ন সহরতলীর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি অপরদিক থেকে দুইজন শ্বেতকায় শ্রমিককে আসতে দেখেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাস্তার অন্যদিকে চলে যান, কারণ, দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়েকটি জায়গায় কৃষ্ণকায়দের, ইউরোপীয়দের সাথে রাস্তায় একদিকে হাঁটার অধিকার নেই। সেই ইতর লোক দুটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করে, প্রচণ্ড প্রহার দিয়ে পথের পাশের নর্দ্দমায় ফেলে দেয়; তিনি এতটুকু প্রতিবাদ করার বা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেন নি। কারণ, তাহলে তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হোত।

যাই হোক্ আমার বন্ধু জীবিত থেকে পরে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করার সুযোগ পেয়েছেন—কিন্তু সেই সহরে আর একজন নিগ্রো ব্যারিষ্টার সাদা দস্তানা পরার অপরাধে নিহত হয়েছেন। প্রথম

শ্রেণীর বাস-ষ্ট্যাণ্ড শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত বলে তিনি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর বাস-ষ্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিলেন, কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ যুবক তাঁর নিগ্রো হয়ে সাদা দস্তানা পরার 'অপরিসীম ধৃষ্টতায়' ক্ষেপে যায় এবং সেখানেই তাঁকে প্রহার করতে করতে খুন করে ফেলে। তারপর এই নৃশংস হত্যাকারীরা শুধুমাত্র সামান্য অর্থদণ্ড দিয়ে মুক্তি পায়। এ ঘটনার বিবরণ আমরা বেভারেণ্ড ফাদার Huddlestone এর "Nought for Your Comfort" বইতে পাই।

বর্তমানে তথাকথিত গণতন্ত্রপ্রিয় ইংরেজ মধ্য-আফ্রিকার টিনভর্ত্তি (Tin-rich) অঞ্চল গুলিতে লুঠ করার অভিপ্রায়ে "কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র" (Central African Federation) গঠন করেছে। এবং হিটলার ও মালানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শান্তিপ্রিয় ও নির্বিরোধী আফ্রিকানদের সভ্য করার চেষ্টা করছে Concentration Camp ও অত্যাচারের মাধ্যমে!

রয়টারের এক খবরে আমরা জানতে পাই কিভাবে বিশাল-নির্যাতন-ঘাঁটি (Concentration Camps) তৈরী করা হয়েছে য'র চারপাশে রয়েছে সুউচ্চ টাওয়ার থেকে সতর্ক মেসিনগানের পাহারা আর ১২ ফুট উঁচু বিদ্যুৎ দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া।

এই কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় হাইকমিশনারের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে, তা সহজেই প্রমাণ করে—এখানে, এই কমনওয়েলথের দেশে—কৃষ্ণকায়দের প্রতি ঘৃণাবোধ কত তীব্র!

একদিন গ্রামের মধ্য দিয়ে মোটরে যেতে যেতে ভারতীয় হাইকমিশনার ও তাঁর স্ত্রী একটি সুন্দর হোটেলে জলপান করার জন্য আসেন। তাঁরা ভিতরে বসতে না বসতেই একটি লালমুখো গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক তাঁদের রূঢ়ভাবে জানায় যে, সে 'কালো আদমীদের' পরিবেশন করে না। ভারতীয় হাইকমিশনার তাঁর পরিচয় দেন—এবং 'আমার স্ত্রীর ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে' বলা সত্ত্বেও উক্ত লালমুখো পশু শুধু ঘৃণাসূচক ইঙ্গিত ক'রে তাঁদের বহিষ্কৃত করে দেয়।

যদি একজন উচ্চশ্রেণীর সরকারি দূত এই ব্যবহার পেয়ে থাকেন, তবে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত এই বন্ধুভাবাপন্ন দেশে সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের কি দুর্দ্দশা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। আমার ত মনে হয়, আন্তর্জাতিক নির্লজ্জ জুয়াচুরীর মধ্যে এই কমনওয়েলথের ব্যাপারটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং ইংরেজেরা সব চাইতে বেশী হীন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, যাদের ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা প্রায় ব্যাধির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশের অনেকের ইংলণ্ড সম্বন্ধে কাল্পনিক ও ভুল ধারণা আছে। ম্যাগনাকার্টার মানবিক অধিকার ঘোষণাকারী 'পবিত্র' ইংলণ্ড আমাদের কাছে স্বপ্নের দেশ।

আমরা ইংরেজের ক্রিকেট-প্রীতির কথা জানি; কিন্তু জানিনা সাধারণ ইংরেজ কালা-আদমীদের কতখানি ঘৃণা করে এবং ভারতীয়রা ইংরেজদের মতে 'কালা আদমীর' পর্য্যায়েই পড়ে।

আমাদের মধ্যেই হীন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন (Inferiority Complex) অনেক 'কালাসাহেব' আছেন, যাঁরা ইতিপূর্বে এবং এখনো মনে করেন ইংল্যাণ্ডে বর্ণবৈষম্য নেই বা থাকতে পারে না।

তাই গত পূজোর সময় যখন লণ্ডনে আফ্রিকান এবং ভারতীয়-বিদ্বেষী দাঙ্গা বেঁধেছিলো, আমা'র অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিলো এই ভেবে যে, এখন অন্ততঃ এই ইংরেজ-পাগল অভারতীয়-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন কালোসাহেবগুলি সত্যকে চিনতে পারবে।

ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক শ্রেণী এবং অন্যান্য সকল শ্রেণী পরস্পরের প্রচুর বিভেদ সত্ত্বেও একটা অনুভূতি সমানভাবে পোষণ করে। সে অনুভূতি হলো আফ্রিকান ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণার মনোভাব।

বৃটিশ লেবার দলের বড় পাণ্ডা মিষ্টার টম্ ড্রিবার্গ Scarborough সভায় গত বৎসর বৃটিশ রক্ষণশীল দলের প্রতি কটাক্ষ করে বলেন যে, রক্ষণশীলগণ মনে করেন তাঁরা কৃষ্ণকায় হীন-জাতিগুলির—যাদের খনিজ সম্পদ ও পরিশ্রম তাঁদের প্রভূত উপকার সাধন করেছে, তাদের প্রভু। (News Chronicle. 30. 9. 58) কিন্তু বাস্তবে এ্যাটলির লেবার দল চার্চ্চিলের টোরীদের থেকে কৃষ্ণকায়দের প্রতি ঘৃণা বা শোষণনীতি কিছু কম ভাবে পালন করেনি। সমাজবাদী এ্যাটলির প্রধান-মন্ত্রিত্বের সময় বৃটেন মালয় এবং পূঃ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উচ্ছেদার্থে বর্ণবিদ্বেষমূলক তীব্র যুদ্ধ শুরু করে।

১৯৫৮ সালের ২৫শে অক্টোবর 'জন বুল' (John Bull) নামক পত্রিকায় গিলবার্ট হার্ডিং (GILBERT HARDING) নামক এক বিখ্যাত সংবাদদাতা একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যা শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর ইংরেজদের ভারতীয়দের প্রতি তীব্র ঘৃণা পরিস্ফুট করে তোলে।

বহু বছর আগে তিনি যখন ভারতীয় ক্রীকেট খেলায় দিলীপ সিংজীর সঙ্গে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে খেতে যান, পাশের একটি টেবিল থেকে কয়েকজন সুসজ্জিত অভিজাত ইংরেজ চাপা গলায় দাবী করেন 'কালা আদমীকে বার করে দাও' (Chalk the Nigger out)। আজকাল লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে দেখা যায় 'ইংল্যাণ্ডকে শ্বেতকায়দের জন্যই রাখা হোক' (Keep Britain White অথবা K. B. W.)

অবস্থা এমন চরমে দাঁড়িয়েছে যে, আজকাল লণ্ডনে কোন সভাগৃহে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সভা ডাকা অসম্ভব। ইংলণ্ডে আজ শুধু বর্ণবিদ্বেষীদের এবং ফ্যাসিষ্টদের প্রাধান্য এবং তাদের বক্তৃতার স্বাধীনতা আছে। কেন্দ্রীয় আফ্রিকান যুক্তরাষ্ট্র থেকে পলাতক একজন আফ্রিকাবাসী লণ্ডনে বক্তৃতা দিতে গেলে দাঙ্গা বেধেছিলো। ইংরেজরা হাইডপার্কে (Hyde Park) বক্তার আসনটিকে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সাজিয়ে রেখেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নিপীড়িত এবং অত্যাচারিত লোকদের সেখানে মুখফুটে কথা বলার অধিকার নেই, বিশেষ করে তারা যদি আবার রংয়ে কালো হয়।

এ বছর ২১শে মার্চ্চ হের মুলার (Herr Mueller) পশ্চিম-জার্মাণীর এক নাৎসী বিরোধী যোদ্ধা বলেছেন যে, ইংল্যাণ্ডে কিছুদিন আগে ফ্যাসিষ্টদের একটি গোপন সমিতি গঠিত হয়েছে। এই সমিতির নাম 'ফ্যাসিষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল' (Fascist International)। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু ভারতীয় এবং আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাবকে তীব্রতর করে তোলা।

১৯৫৯ সালের ২৩শে মার্চ্চ কলিকাতার "ষ্টেটস্ম্যান" কাগজে এ খবরটি বের হয় যে, ব্রিষ্টল-এ একটা দুধের ডেয়ারী অধিকাংশ খদ্দেরকে হারায়, কারণ দুধের বোতলগুলি বিলি করার জন্য একজন

কালো লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। যে গৃহিণীরা দুধ নিতে অস্বীকার করেছেন, তাঁরা সবাই "সুসভ্য গণতন্ত্রপ্রিয়" ইংরেজ জাতি-ভুক্ত।

গতমাসে লণ্ডনের একটি প্রধান রাজপথে কক্রেণ (Cochrane) নামক "জামাইকার" এক নিগ্রোকে ছুরিকাঘাতে ইংরেজ গুণ্ডারা হত্যা করে। কক্রেণ লণ্ডনের এক হাসপাতালে কাজ করতো। তার একমাত্র দোষ—সে কালো এবং বর্ণবিদ্বেষ-উন্মত্ত ইংরেজরা কালো লোকদিগকে জানিয়ে দিতে চায় যে, ইংলণ্ডে তাদের জায়গা হবে না। অথচ বৃটিশ অধিকৃত "জামাইকার" লোভী ইংরেজদের অবাধ লুণ্ঠন-নীতির জন্য সেখানে আজ অভাব ও বেকার-সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বুভুক্ষু কক্রেণকে বিলেতে আসতে হয়েছিল চাকরীর সন্ধানে।

গত মে মাসের ১৬ তারিখে গৌতম নামক এক ভারতীয় যুবক মিডল্যাণ্ড রেলওয়ের লণ্ডনস্থিত কিলবার্ণ হাইরোড ষ্টেশনে যায় অন্য দিনের মত। সেখানে সে বুকিং ক্লার্কের (টিকিট বিক্রেতা) কাজ করতো। হঠাৎ একজন সুসজ্জিত দীর্ঘাকৃতি ইংরেজ তার জানালার সামনে দাঁড়ালো এবং টিকিট চাওয়ার পরিবর্তে জিগ্যেস করলো "তোমার দেশ কোথা?" "আমি ভারতীয়" গৌতম হেসেই উত্তর দেয়। বেশ, আর কথা নেই বার্ত্তা নেই, সেই ইংরেজ আরম্ভ করলো ভারতবর্ষকে ও ভারতীয়দের গালাগালি করতে অকথ্য ভাষায়। পণ্ডিত নেহরুও বাদ গেলেন না। ব্লাডি, সোয়াইন, নিগারস (ভারতীয়দের ওরা 'নিগার' বলে), বেরিয়ে যাও আমার দেশ থেকে, ইত্যাদি। গৌতম যখন প্রতিবাদ করে, তখন উক্ত লালমুখো ক্ষিপ্ত গুণ্ডার মত ঘরে ঢুকে আরম্ভ করে এলোপাথাড়ি প্রহার। দুর্বল গৌতম কেন পারবে তার সাথে গায়ের জোরে? গৌতমকে টেনে ঘরের বাইরে এনে "গণতান্ত্রিক ইংরেজ ভদ্রলোক" লাথি, কিল, ঘুষি মেরে যায় এবং তার সাথে "ব্লাডি ইণ্ডিয়ান" "ডার্টি নিগার" (Bloody Indian, Dirty Nigger) ইত্যাদি গালি দিতে থাকে। লোক জড় হয়—সবাই সাদা-চামড়া, কিন্তু এগিয়ে এসে গৌতমকে সাহায্য করা দূরে থাক, মুখ ফুটে একটি প্রতিবাদও করলো না কেউ। একটি বুড়ি এ অন্যায়কে সহ্য না করতে পেরে পুলিসকে ডাকে এবং পুলিস যখন এসে পৌছায়, তখন রক্তাক্ত গৌতম বেহুঁস। এ ঘটনা দু'মাসের ওপর হলো। লণ্ডন পুলিস কাউকে এ ব্যাপারে গ্রেপ্তার করেনি, কোনও তদন্ত পর্য্যন্ত করেনি। এখনও গৌতম হাসপাতালে শয্যাশায়ী এবং ওর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি প্রায় রহিত। শ্রীগৌতমের স্ত্রী লণ্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করা সত্ত্বেও ভারত সরকার এ ব্যাপারে কোনও অনুসন্ধান করেন নি। গৌতম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কবেক্ কলেজে সন্ধ্যার সময় অধ্যয়ন করতেন।

ভারত আজ বারো বছর হলো স্বাধীন। অথচ ভারতে দাম্ভিক ইংরেজদের বেয়াদবী এতটুকুও কমে নাই। এই সবে ক'দিন গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কের (Grindlay's Bank) জেনেরাল ম্যানেজার মিঃ ব্রাউন (Brown) তাঁর ভারতীয় কর্মচারীদের হুমকি দিয়ে বুট ঠুকে বলেন,—"আমি যুদ্ধে ছিলাম, আমি জানি ভারতীয় দিগকে কি ভাবে সায়েস্তা করতে হয়" (I was in the war, I know how to teach the Indians). এই দম্ভোক্তির জন্য, অন্য দেশ হলে কত বিকৃত মিষ্টার ব্রাউন হাসপাতালের ষ্ট্রেচারে পড়ে, তার পরের দিনই "হোম" অভিমুখী এরোপ্লেনে পলায়ন করতে পথ পেত না। এটা অবশ্য ঠিক কথা, এটা গান্ধীর দেশ, এখানে বিদেশীর অপমানের প্রতিবাদ করা—ছি ছি ঘোর অন্যায়। ত্যাগোচিত সহ্যশক্তি আমাদের পরম আদর্শ। কেউ যেন এ মহৎ গুণকে কাপুরুষতা বলে ভুল না করেন।

লণ্ডনে একটি ভারতীয় ডাক বিভাগীয় শ্রমিকের ইংরেজ স্ত্রী গ্লোরিয়ার স্বামীর করুণ অশ্রুসজল কাহিনী চিরদিন পাঠকহৃদয় ভারাক্রান্ত করবে। ১৯৫৭ সালের ২০শে আগষ্ট ইংরেজী কাগজ-গুলিতে এ খবরটির বহুল প্রচার হয়।

বাবা মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজ-দুহিতা গ্লোরিয়া এই ব্যক্তিকে বিবাহ করেন এবং তাদের মিলিত জীবন খুব সুখের ছিল। কিন্তু তাদের সন্তানের জন্মের পর থেকে প্রতিবেশীদের হিংসা ও ঘৃণা তীব্রতর হয়ে ওঠে। নানারকম বিদ্রূপোক্তি ও বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি তাদের জীবন অসহ্য করে তোলে। দিন দিন এ যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে এ কথা কল্পনা করা কঠিন, কিন্তু ইংলণ্ডে একটি শ্বেতকায়া মেয়ে যদি তথাকথিত "হীন জাতির" (Inferior Breed) পুরুষকে বিবাহ করে, তবে তাদের সন্তান নিদারুণ ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

২০শে আগষ্ট ১৯৫৭ এর "ডেইলী মেলের" (Daily Mail) খবর অনুযায়ী তার সন্তানের এই দুরবস্থা দেখে গ্লোরিয়ার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং সে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

তার গণতান্ত্রিক আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দিনের পর দিন লাঞ্ছিত হয়ে হতভাগিনী মা চরম পথ বেছে নেয়। ২০।৭।১৯৫৭এর নিউজ ক্রনিকেলে (News Cronicle) বলা হয়েছে—গ্লোরিয়া সহরের ভূগর্ভস্থ রেল-ষ্টেশনে গিয়ে তার শিশুকে প্ল্যাটফর্মের একটি আসনে শুইয়ে নিজে ট্রেনের তলায় আত্মহত্যা করে। নির্দোষ অসহায় শিশুটি যখন করুণভাবে কাঁদছিল, তখনি এক স্নেহময়ী মা'র দেহ ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়।

হয়তো আজ রাতেও সেই মাতৃহীনা মেয়েটি তার একলা শয্যায় চোখের জল ফেলছে, কিন্তু তার প্রতিটি অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে ন্যায় বিচার ও তার মা'র মৃত্যুর প্রতিশোধের আবেদন মেশানো রয়েছে। সে তো আমাদেরই একজন—তার শিরায় তো ভারতীয় রক্তই প্রবাহিত।

এ্যাংলো-স্যাক্সনদের এ্যাফ্রো-এশিয়ান লোকেদের প্রতি মর্মন্তুদ অত্যাচারের কাহিনী হিটলারের জঘন্য বর্বরতাকেও হার মানিয়ে দেয়।

হিটলার ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ পর্য্যন্ত ইহুদীদের উপরে অত্যাচার করেছিলেন, কিন্তু এ্যাংলো-স্যাক্সনেরা শত শত বছর ধরে আমাদের লুণ্ঠন করে অপমানিত করে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে রেখেছিলো ও এখনও রাখছে। একথা যখনই ভাবি যে, তারা আমাদের দেশে এসে বর্ণবিদ্বেষমূলক ক্লাব খুলে ফ্যাসিষ্টদের মত আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বর্ণবিদ্বেষ চালাচ্ছে, তখন আমি চোখে অন্ধকার দেখি।

আজ এ্যাংলো-স্যাক্সনরা (Anglo Saxons) পৃথিবীর জনমতের সামনে দাঁড়িয়েছে মানুষের প্রতি জঘন্যতম অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। আগামী দিনের ইতিহাসে তাদের দণ্ডের কথা লেখা থাকবে। কিন্তু আজও এই লোলুপ লুণ্ঠনকারী জাতির আপন অপরাধের প্রতিকারের সময় আছে।

প্রতিচ্ছবি

—পরিতোষ মিত্র

॥ আলোকচিত্র ॥

জলছবি

—শান্তিকুমার গুপ্ত

মনোযোগ

— আশুতোষ সিনহা
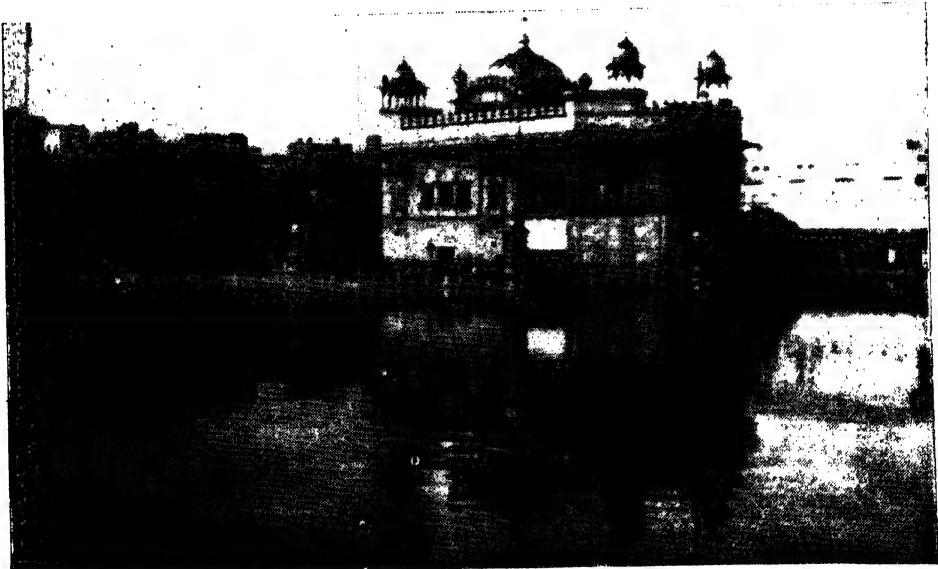
নিরাশ্রয় (ইংল্যাণ্ড)

— অজয়কুমার দে

কুসুম-কীট

—মোনা চৌধুরী

শ্রীমতী ঠাকুর

[লব্ধপ্রতিষ্ঠা নৃত্যশিল্পী ও যশস্বিনী চিত্রশিল্পী]

পশ্চিম-ভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুজরাট এক বিশিষ্ট স্থানাধিকারী, সামাজিক ও সংস্কৃতিমূলক কাজে তথাকার কয়েকটি ব্যবসায়ী পরিবারের দান অতুলনীয়। তন্মধ্যে হাতীসিং পরিবারের শিল্পসংগ্রহ, স্ত্রীশিক্ষাপ্রসার ও সমাজহিতকর কার্য্যধারা উল্লেখযোগ্য। এই বংশের ৺পুরুষোত্তম ভাই ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লীলা দেবীর ছয় সন্তানের তৃতীয়া শ্রীমতী দেবী ১৯০৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর আমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রীকস্তুরভাই লালভাই হলেন লীলাদেবীর ভ্রাতা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবীর স্বামী শ্রী রাজা হাতীসিং হলেন শ্রীমতী দেবীর অন্যতম ভ্রাতা। শ্রীমতী দেবী বঙ্গ-দুহিতা নন, কিন্তু বাঙলার বধূ।

শ্রীমতী দেবী আমেদাবাদ সরকারী বালিকা-বিদ্যালয় হইতে ১৯১৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্থানীয় সরকারী কলেজে পড়িতে থাকেন। সেই সময় গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত থাকায় তিনি সরকারী কলেজ ত্যাগ করিয়া গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষালয়ে যোগদান করেন। তথায় দুই বৎসর থাকার পর ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন এবং ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। প্রথমে তিনি সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন, পরে আচার্য্য নন্দলাল বসুর নিকট চিত্রাঙ্কন, ভীমরাও শাস্ত্রীর নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং নবকুমার সিংএর কাছে নৃত্যশিক্ষা করেন। ১৯২৭ সালের শেষার্দ্ধে তিনি জার্ম্মাণী যাইয়া Froebel Houseএ এক বৎসরে কিণ্ডারগার্ডেন কোর্স শেষ করেন এবং দুই বৎসর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে PEDAGOGY ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। অসুস্থতার জন্য উক্ত বৎসরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছুদিন পরে দিল্লীর মডার্ণ হাইস্কুলে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

বিদেশে থাকার সময় তিনি শান্তিনিকেতন ও ইহার শিক্ষাধারাকে ভোলেন নাই। তাই জার্ম্মাণীর বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যবিদদের প্রায়ই আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করিতেন। অনেকের ধারণা যে, তিনি তথায় নৃত্যশিক্ষা করেছিলেন ; কিন্তু শ্রীমতী দেবী জানান যে, ইহা সত্য নয়। ১৯৩১ সালে তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার নৃত্যছন্দে বিমুগ্ধ কবিবর উক্ত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় এক নৃত্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন। উহাতে কবিগুরু 'ঝুলন' ও অন্যান্য কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন আর শ্রীমতী দেবী নৃত্যের তালে তালে এগুলি রূপ দিতে থাকেন। সেই সময় কলিকাতার দর্শক প্রথম দেখেছিলেন নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাস্তবরূপ। 'দে দৌড় দে দৌড়' কবিতাটি শ্রীমতী দেবীর লীলায়িত ছন্দে কি অপূর্ব হয়েছিল—আজও দর্শকেরা তাহা ভুলিতে পারেন নি। ইহার পর তিনি কলম্বো, কাণ্ডী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নৃত্যপ্রদর্শন করেন। সেই সময় স্থানীয় পত্রিকাগুলি তাঁহার উচ্ছসিত প্রশংসা করে। ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় নৃত্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন—শ্রীমতী দেবী 'বিদায় অভিশাপ' ও আরও কয়েকটি কবিতা পাঠের সাথে নৃত্যছন্দে সেগুলি বিকশিত করেন। সেই সময় ছয় মাসের জন্য তিনি কবিগুরুর সেক্রেটারীর কাজও করেন।
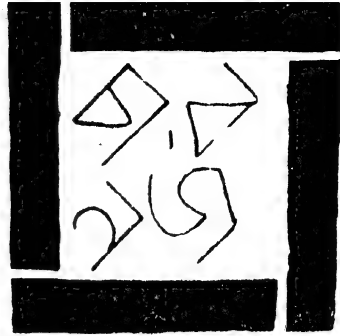
১৯৩৫ সালে শ্রীমতী দেবী কবি ভাল্লাথলের কেরালা কলামণ্ডলে 'কথাকলি' নাচ শেখেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি মণিপুরী ও ভারত-নাট্যম্ নৃত্যে পারদর্শিনী হন। ১৯৩৫-৩৬ সালে তিনি বোম্বাই, আমেদাবাদ ও কলিকাতায় নৃত্য-আসরে অবতীর্ণা হন। ১৯৫৩র দিল্লী সেমিনারে ও ১৯৫৯এর Dance-Seminarএ রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে তাঁহার লেখা তথ্যবহুল হয়।

১৯৩৭ সালে তিনি গুরুদেবের ভ্রাতুষ্পৌত্র স্বনামধন্য শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিণয়ে আবদ্ধা হন। উক্ত বৎসরে তিনি নৃত্যকলালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালের 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে লিপ্তা থাকায় তাঁহাকে লখ্‌নৌতে গ্রেপ্তার করা হয় ও ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যদিও তিনি চিত্রাঙ্কন শিখেছেন প্রথম জীবনে আচার্য্য নন্দলাল বসুর নিকট, নৃত্যের প্রতি বেশী অনুরক্তা হওয়ায় সেদিকে প্রথম ভাগে বেশী মনঃসংযোগ করিতে পারেন নাই। তাই স্বাধীনোত্তর ভারতে তিনি এদিকে বেশী আগ্রহী হলেন—১৯৪৭ সালে রচনা

শ্রীমতী ঠাকুর

ইুডিও খুললেন—অজন্তা, ইলোরা থেকে মুঘল চিত্রশিল্প পদ্ধতিতে মনোনিবেশ করলেন—সুন্দর চিত্র বেরোল তাঁর হাত দিয়ে—আমেদাবাদের শেঠ আনন্দজী কল্যাণজী ট্রাষ্টের পক্ষ থেকে তীর্থঙ্কর জৈনের জীবনের উপর ছয়টা ছবি আঁকলেন—ভূয়সী প্রশংসা পেল সেগুলি। শিল্পী শ্রীগোপেন রায় তাঁহার সহিত জৈন আর্টের কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করেছেন—সেকথা জানালেন শ্রীমতী ঠাকুর। 'রচনা' চিত্র-প্রদর্শনী কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও আমেদাবাদে উচ্চ প্রশংসিত হয়। শ্রীমতী ঠাকুর ১৯৫৭ সাল হইতে Indian Society of Oriental Artএর অবৈতনিক সম্পাদিকা এবং অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার প্রভৃতির অঙ্কিত চিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

শ্রীমতী দেবী নানারূপ সামাজিক কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বিশেষতঃ উদ্বাস্তু নারীদের উন্নতিকল্পে তাঁহার কার্য্যধারা প্রশংসনীয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

[বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রেস-ট্রাষ্ট-অফ-ইণ্ডিয়ার
কলিকাতা শাখার ম্যানেজার]

সততা, কর্ম্মনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা থাকলে একদিন সত্যিকারের সাফল্য আসবেই—এর প্রশস্ত উদাহরণ সর্ব্বভারতীয় সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রেস-ট্রাষ্ট-অফ-ইণ্ডিয়ার কলিকাতা শাখার ম্যানেজার নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ। সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশসেবা করবার তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল, তাই সরকারী চাকুরীর প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি সাংবাদিকের জীবনই বেছে নিলেন। এর জন্যে একদিন তাঁকে দারিদ্র্য ও নানা অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে ও জীবনে বহু দুঃখ কষ্টও স্বীকার করতে হয়েছে; কিন্তু সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবা করবার অটুট সঙ্কল্প ও আগ্রহ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি! যে সময়ে শ্রী ঘোষ সাংবাদিকের জীবন বেছে নেন, সে সময় সাংবাদিকতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; অপর পক্ষে বলা যেতে পারে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম ও ভীতি-সঙ্কুল ছিল। সামান্য ৩০৲ টাকা বেতনে তৎকালীন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক বসুমতীতে সাংবাদিক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। তারপর কর্ম্মনিষ্ঠা, সততা ও অধ্যবসায়ের বলে আজ তিনি বাংলা তথা ভারতের একজন প্রেস সাংবাদিক। আজ এত বড় হয়ে এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি সগর্ব্বে প্রকাশ করেন যে, বসুমতীতেই সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার হাতেখড়ি।

বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্তানের বরিশাল জিলার গাভার বিখ্যাত ঘোষ-দস্তিদার পরিবারে নৃপেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ শ্রী ঘোষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। শ্রী ঘোষের পিতা ৺ললিতমোহন ঘোষ তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। গাভা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল বি, এম, কলেজে আই, এ পড়েন। তারপর স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ থেকে ১৯২৬ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে রিপণ ল' কলেজে আইন পড়েন। রিপণ কলেজে (বর্ত্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ল' ইণ্টারমিডিয়েট পড়বার সময় একদিন তৎকালীন ইংরাজী 'নিউ সার্ভেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তার অনুরোধেই তিনি সাংবাদিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। নিউ সার্ভেণ্টে ৪ মাস কাজ করবার পর শ্যামসুন্দর বাবু ইংরাজী দৈনিক বসুমতীতে যোগদান করলেন ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি। "আমিও তাঁর সাথে চলে আসি বসুমতীতে। শ্যামসুন্দর বাবুর কাছেই আমার প্রুফরিডিং শিক্ষা।" বললেন নৃপেনবাবু। "এর কিছুদিন পরে শ্যামসুন্দর বাবু বসুমতী ত্যাগ করলেন, কিন্তু আমি বসুমতীতেই থেকে গেলুম। এখানেই সংবাদপত্রের প্রতিটি কাজ আমি হাতে কলমে শিক্ষালাভ করি। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। আমি সতীশবাবুর কাছে অশেষ ঋণী।" শ্রী ঘোষ বললেন, সাংবাদিক জীবন আমার প্রথম সুরু ১৯২৯ সালে। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষ দলের এবং মতিলাল নেহরুর দলের মধ্যে যে বিবাদ ও কলহ ছিল, তাহার আপোষ মীমাংসার সংবাদ আমিই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করি ইংরাজী দৈনিক বসুমতীতে, এবং এই সংবাদটি প্রকাশিত হ'বার পরই কলিকাতা শাখার এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টারের ম্যানেজার মেজর স্কোল্ড ফিল্ড আমাকে ডেকে পাঠান ও এসোসিয়েটেড প্রেসে কার্য গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু সে সময় আমি যোগদান করিনি। তারপর ১৯২৯ সালে সতীশ বাবুর আশীর্বাদ ও অনুমতি নিয়ে আমি এসোসিয়েটেড প্রেসে যোগ দিই। তারপর একে একে বহু ঘটনা ঘটে গেল। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল। ত্রিপুরী হরিপুরা কংগ্রেসের কাজ উল্লেখ প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বহু কথা বললেন।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যে কত নিবিড় ছিল এবং শ্রীঘোষের প্রতি সুভাষচন্দ্রের যে কতখানি গভীর ও অকৃত্রিম ভালবাসা ও আস্থা ছিল, তা শ্রীঘোষের সঙ্গে কথোপকথনকালে বিশেষভাবে জানা গেল। শ্রীঘোষ একটি অশ্রুতপূর্ব ও চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃত করলেন। তিনি জানালেন যে, সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের ঠিক পূর্বদিন তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে নেতাজী তাঁকে একটি সিলকরা খাম দিয়ে বলেন যে, তিনি যদি আর ফিরে না
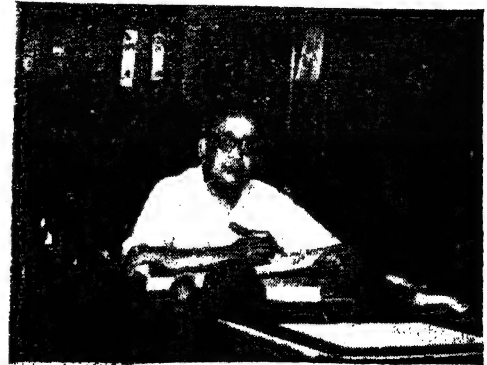
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ

আসেন বা মারা যান, তা হলে খামটি তাঁর মেজদাদার (স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু) হাতে দেওয়া হয়। যদি ইত্যবসরে শরৎচন্দ্রও লোকান্তরিত হন তাহলে খামটি খুলে শ্রীঘোষ যেন দেখেন তার মধ্যে কি আছে ; তার পূর্বে তিনি যেন খামটি না খোলেন এবং খামটি যেন অতি সঙ্গোপনে রাখা হয়, খামটি সোজাসুজি শরৎচন্দ্রের হাতে দিলে পুলিশ তাঁকে নিয়ে গোলমাল করতে পারে। নেতাজীর অন্তর্ধানের পর গোয়েন্দাবিভাগ এই নিয়ে শ্রীঘোষকে নানাভাবে বিব্রত করতে লাগলেন। শ্রীঘোষকে বাঁচাবার জন্তে য়্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কলকাতা শাখার তৎকালীন কর্মাধ্যক্ষ স্বর্গীয় কুমুদিনী মোহন নিয়োগী তখন তাঁর ড্রয়ার থেকে খামটি বার করে সোজা গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করেন, এ জন্তে পরবর্তীকালে শ্রীঘোষ দুঃখিত হয়ে স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসুর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

দেশ স্বাধীন হলে ১৯৪৯ সালে যখন প্রেস-ট্রাষ্ট-অফ-ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন আমি ও শ্রীভারতন এ'তে বিশেষ অংশ গ্রহণ করি—জানালেন শ্রীঘোষ। এজন্তে বিভিন্ন সংবাদপত্রের মালিকদের নিকট যে শেয়ার বিক্রয় হয়, তার একটি বড় অংশ আমারই চেষ্টায় সংগৃহীত হয়। কর্ম্মী হিসেবে প্রেস ট্রাষ্টের কর্ম্মকর্তারা একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

লেবং হত্যাকাণ্ড, সার চার্লস টেগার্টের উপর গুলী চালনা প্রভৃতি ঘটনায় তিনি নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে সত্য ঘটনা অনুসন্ধানের জন্তে অকুস্থলে গিয়েছেন। শ্রী ঘোষের সাংবাদিক জীবনে বহু চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে, তার কয়েকটি মাত্র আমার কাছে উল্লেখ করলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে নৃপেন বাবু দিবারাত্রি অফিসের কার্য্যেই ব্যয় করেন। তাঁর কোন সামাজিক কি অন্য কাজে হাত দিবার সময় নাই। অফিসের কাজকেই তাঁর ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জ্ঞান বলে মনে করেন এবং এজন্তে—আজও তিনি অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি অবৈতনিক ভাবে সাংবাদিকতা করবেন এবং সাংবাদিক হিসাবেই তিনি মৃত্যু বরণ করতে চান বললেন। "সাংবাদিকতাই আমার জীবনের আদর্শ। আমি মনে করি, সত্যিকারের দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা সাংবাদিকরাই করতে সক্ষম, এবং এই আদর্শ নিয়েই যতদিন আমি বাঁচবো, সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ, জাতি ও সমাজের সেবা করবো—।" বললেন তিনি।

শ্রীআশুতোষ মল্লিক

[পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার উপাধ্যক্ষ]

সহজ, সরল, নিরহঙ্কার, অমায়িক, বন্ধু-বৎসল এ মানুষটি। পৃথিবীতে একটি মাত্র কাজকে তিনি বেছে নিয়েছেন, সেটি হলো দেশ-সেবা। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার উপাধ্যক্ষ হিসেবে তিনি দল-নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বিধান সভার কার্যের মধ্য দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে বিধান সভার কার্যও পরিচালনা করেন কিছুদিন। এক কথায় বলা যেতে পারে, শ্রীআশুতোষ মল্লিক অজাতশত্রু। আজও তিনি দেশসেবা করে চলেছেন অক্লান্তভাবে। যত দিন বেঁচে থাকবেন, তত দিন

শ্রীআশুতোষ মল্লিক

তিনি জনগণের ও দেশের সেবা করে যাবেন, এই হচ্ছে তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা।

শ্রীমল্লিকের জীবন ও আদর্শ বাঙলার তপশীলী সম্প্রদায়ের অনুপ্রেরণার বস্তু। তপশীলী সম্প্রদায়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি উন্নয়নের জন্তে তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করে এসেছেন এবং আজও চেষ্টা করে চলেছেন।

আশুতোষ ১৯০৩ সালে বাঁকুড়া জিলার হলুদকানালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম স্বর্গত পিয়ারীলাল মল্লিক। বাঁকুড়া হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯২৪ সালে বি, এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে ১৯২৯ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৩০ সালে প্রবেশ করলেন কর্ম্মজীবনে। বাঁকুড়া জজ কোর্টে আইনজীবিরূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে দেশ-সেবা। কিন্তু দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি ছিলেন সদাই উন্মুখ। তাই ১৯৩৭ সালে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দেশের অগণিত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন মনে-প্রাণে। তিনি বাঁকুড়া পশ্চিম সাধারণ কেন্দ্র থেকে সর্ব্বাধিক ভোট পেয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হলেন। ১৯৪৬ সালে তিনি পুনরায় বাঁকুড়া থেকে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হলেন। তার পরেই তিনি ভারতের আইন প্রণয়ন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি কংগ্রেস দলের "হুইপ" ছিলেন ১৯৪০ সালে এবং ১৯৪২ সালে বিরোধীদলের চীফ হুইপ হন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার উপাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। সেদিন থেকে আজ অবধি তিনি নিরলস ভাবে কার্য্য করে চলেছেন উপাধ্যক্ষ হিসেবে। উপাধ্যক্ষ থাকা কালীন শ্রীমল্লিক কর্ত্তৃক নিরাপত্তা বিলের উপর ৪৫টি ডিভিশন প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বর্গত রায় যতদিন বেঁচে ছিলেন, এমন একদিনও যায় নি যে দিন তিনি স্বর্গীয় কিরণবাবুর সঙ্গে মিলিত হন নি। বস্তুতঃ রাজনৈতিক জীবনে শ্রীমল্লিক বহুক্ষেত্রে কিরণ বাবুর অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং এক সময়ে শরৎ বসু প্রবর্ত্তিত বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। কেবল সমর্থনই নহে, পূর্ব্ব-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গমন করে তিনি জনগণকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলনকে সমর্থন করতে উপদেশ দান করেন। যে ৭ জন এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন, তার মধ্যে শ্রীমল্লিক ছিলেন একজন। তিনি এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের ফলে যখন দলে দলে উদ্বাস্তু ভারত ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আসতে লাগলো তখন তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গে গিয়ে যাতে তারা তাদের পিতা-পিতামহের বাস্তু ত্যাগ না করে, সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

পশ্চিম বাংলা বিধান সভার উপাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি এ যাবৎ যতগুলি 'স্পীকার'-সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলিতেই যোগদান করেছেন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীমল্লিক বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগী। বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র পড়াতে তিনি উৎসাহ ও আনন্দ পান। এব্যাপারে তিনি বহু পণ্ডিত ও সুধী সমাজের সংস্পর্শে এসেছেন তন্মধ্যে প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন এবং দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, কাব্য ও দর্শন থেকে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

শ্রীমল্লিকের জীবনধারা হচ্ছে যাকে বলে "Plain living and high thinking"—সহজ সরল জীবনযাপন করাই হচ্ছে তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। দেশ ও জনগণের সেবার মধ্যে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করছেন তিনি এবং আজও নিরলস ভাবে কর্ম্ম করে চলেছেন এ উদ্দেশ্য সাধনে।

ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

[বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সেক্রেটারী]

শিক্ষার সাথে নিরহঙ্কার ভাব—অধ্যাপনার সাথে স্নেহের সংযোগ—পরিচয়ের সাথে প্রীতির বন্ধন—আলাপের সাথে বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন—জ্ঞানগরিমার সাথে জ্ঞানান্বেষণের আগ্রহ—কর্ম্মভারে পূর্ণ দায়িত্ব পালন—সহকর্ম্মীদের সাথে একাত্মবোধ—আর নিজ প্রদেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল—এইরূপ এক ব্যক্তিকে কয়দিন আগে জানিতে পারি নিবিড়ভাবে। তিনি হলেন মাধ্যমিক-শিক্ষা-সংসদের কর্ম্মাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।

বরিশাল জিলার কুলকাঠি হল তাঁহার স্বগ্রাম। সেখানে তাঁহার জন্ম ১৯০২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। পিতা পরলোকগত হরপ্রসাদবাবু বগুড়া টেকনিক্যাল স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। তাই পিতার কর্ম্মস্থলের জিলা-বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়েন। কিন্তু বয়স কম হওয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেন নি। শেষে বরিশাল জিলা-বিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ সালে বিভাগীয় বৃত্তিসহ উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে আই-এস-সি পাশ করিয়া ১৯২৩ সালে স্কটিশচার্চ্চ কলেজ হইতে ফিজিক্স অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান গ্রহণ করেন। অসুখের জন্য এক বৎসর পড়া বন্ধ থাকে—কিন্তু ১৯২৬ সালে Pure Physicsএ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম হিসাবে এম-এস-সি ডিগ্রীলাভ করেন। ফলাফলে সন্তুষ্ট না হইয়া ১৯২৮ সালে উক্ত বিষয়ের অন্য গ্রুপে পরীক্ষা দিয়া তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। মধ্য সময়ে কয়েক মাস তিনি বরিশাল বি-এম কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে ডক্টর ডি, এম, বসুর তত্ত্বাবধানে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৯৩৩ সালে ম্যাগনেটিজিমের উপর 'ডক্টরেট' পান। ইহার পর তিনি তথায় অস্থায়ী লেকচারার নিযুক্ত হইয়া প্রায় তিন বৎসর থাকার পর ১৯৩৬ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পর বৎসর ভারতে ফিরিয়া কলিকাতার স্কটিশচার্চ্চ কলেজে অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৯৫১ সালে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ গঠিত হইলে শ্রী রায়চৌধুরী সহঃ কর্ম্মাধ্যক্ষ হিসাবে তথায় নিযুক্ত হন। সেই সময় মাত্র তের জন সহকর্ম্মীসহ শ্রীরায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সংসদের কার্য্যপরিচালনা বিশেষতঃ পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে অমানুষিক পরিশ্রম অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫৫ সালে তিনি উক্ত পর্ষদে সেক্রেটারী হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। গত কয়েক বৎসরে উচ্চ মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয় পরিচালনা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ছয় মাস intensive ট্রেনিং এর ব্যবস্থা তাঁহারই প্রচেষ্টায় আরম্ভ হইয়াছে। উচ্চ-মাধ্যমিক ও বহুমুখী শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে মতামত প্রদানের সময় বর্ত্তমানে আসে নাই বলিয়া ডাঃ রায়চৌধুরী মনে করেন।

তিনি মনে করেন যে, বাংলার ছাত্র-সমাজে মেধা, প্রতিভা, ও বুদ্ধিমত্তার অভাব নাই—ঠিকমত তাদের পরিচালনা করলে—বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রী আবার আমাদের মুখোজ্জ্বল করবে। আর সেই সঙ্গে দিতে হবে শিক্ষক সম্প্রদায়কে যথাযোগ্য মর্য্যাদা। তিনি জানান, বাঙ্গালী জীবনের প্রতি স্তরে প্রয়োজন দায়িত্ববোধ—কর্ম্মবিমুখতা এনে দেবে অবসাদ, দুঃখ, কষ্ট ও মনের গ্লানি। কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমরা যেন পশ্চাৎপদ না হই।

শেষে তিনি বলেন যে, আমার বাবার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁর শিক্ষাধারা আমার পরবর্ত্তী জীবনে খুবই কাজ দিয়াছে। আমার মা স্বর্গগতা শৈলবালা দেবী ছিলেন সুগৃহিণী।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়ে গিয়েছে যে আমাকেই আসামী কৃষ্ণলাল প্রদত্ত 'খোকার' দেওঘরের বাসস্থাননির্দেশক' নক্সাসহ খোকাবাবুকে গ্রেপ্তার করার জন্য ঐ শহরটিতে যথাশীঘ্র রওনা হয়ে যেতে হবে। এই দেওঘর শহরটি পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে অবস্থিত। এই জন্য কলিকাতা শহর হতে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে আমাদের যাওয়া চলে না। এ ছাড়া পুলিশ পোষাকে প্রকাশ্যে দল বেঁধে সেখানে গেলে খোকাবাবুর মত একজন দুর্দান্ত খুনে গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব হবে। এর কারণ খোকাবাবুরও আমাদের মত লোকবল আছে। এই সব বেপরোয়া খুনে গুণ্ডাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানে না গেলে তারা যে কোনও মুহূর্তে পাততাড়ী গুটিয়ে ঐ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে। অন্যথায় আমাদের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ হওয়াও বিচিত্র নয়। পরিশেষে সকল দিক বিবেচনা করে আমি ছদ্মবেশে একজন মাত্র সঙ্গিসহ দেওঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার সঙ্গিরূপে আমার সঙ্গে কা'কে নিয়ে যাবো? আমি এমন একজনকে আমার সঙ্গিরূপে চাইছিলাম যে খোকাবাবুকে এক দৃষ্টিতে চিনে নিতে পারবে। এই সম্পর্কে খোকাবাবুর বাল্যবন্ধু দেবেন বাবু কিংবা হরিপদকেই আমাদের উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দেবেন বাবু আমাদের সঙ্গে কিছুতেই দেওঘরে যেতে রাজী হলেন না। আমি তাকে মানবতা, লোকহিতৈষণা, দেশপ্রেম নাগরিক কর্তব্যবোধ প্রভৃতি বহুবিধ সূক্ষ্ম বৃত্তি সম্ভূত বাক্যবলী দ্বারা তার হৃদয় উদ্বেলিত করতে সচেষ্ট হলাম। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়, তার সেই এক কথা, নূতন বিয়ে করেছি মশাই? আমি মারা গেলে আমার বৌকে আপনারা খেতে দিবেন?

অগত্যা তাকে পরিত্যাগ করে আমি খোকার অপর বাল্যবন্ধু হরিপদর শরণাপন্ন হলাম। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর হরিপদ বাবু ওরফে হরিপদ সরকার একটি বিশেষ সর্ত্তে দেওঘর পর্য্যন্ত আমার অনুগামী হতে স্বীকৃত হলো। প্রথমতঃ খোকা ধরা পড়ার পর তবে তাকে খোকাকে সনাক্ত করার জন্য ডাকা হবে। দ্বিতীয়তঃ খোকা গ্রেপ্তারের পর ছয় মাস পর্য্যন্ত তার বাটীতে পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। এই দুইটি সর্ত্ত আমরা আমাদের তৎকালীন উত্তর কলিকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের অনুমতিক্রমে মেনে নিয়েছিলাম। যাক, একজন সনাক্তকরণকারী সঙ্গী তো পাওয়া গেল, কিন্তু এখোন ছদ্মবেশ ধারণ আমার পক্ষে কিরূপ ভাবে করা যাবে? এই সময় পুলিশ বিভাগে দাড়ী-গোঁফ পরা বা রঙমাখা প্রভৃতি অসাধারণ ছদ্মবেশ ধারণের রীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু আমি সুরু হতেই এইরূপ ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এসেছি। আমি, ইনেসপেক্টার সুনীল বাবু এবং আমার জনৈক ফটোগ্রাফার বন্ধুর সাহায্যে এই বিষয়ে একটি নূতন মতবাদের সৃষ্টি করেছিলাম। আমার নির্দ্দেশে আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু নিতাই পাল এই শহরের বিবিধ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক বেশভূষা সহ অসংখ্য আলোকচিত্র ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছিল। এই সকল ফটোগ্রাফারের মধ্যে স্ব স্ব পেশায় নিরত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, উনি পেশোয়ারী, কর্ম্মরত মুচি ও নাপিত, ফেরিওয়ালা, ভ্রাম্যমান সাধু, তীর্থযাত্রী বাঙালী রিক্সাওয়ালা, ভাটিয়া বণিক, বাঙালী জোতদার ইত্যাদি বহু ব্যক্তির স্বাভাবিক বেশভূষা ও চেহারার ফটো ছিল। আমাদের পরামর্শসভায় সমবেত হয়ে প্রায় বারোটি ফটো-এ্যালবামের পাতা ঘেঁটে আমি একটা পেশোয়ারী হিন্দু ভদ্রলোকের ফটোচিত্র মনোনীত করলাম। আমার বর্ণ ও দীর্ঘ দেহের সহিত সামঞ্জস্য রেখে আমরা এই ফটো-চিত্রটি আমার ছদ্মবেশের জন্য বেছে নিয়েছিলাম। ঐ ফটো-চিত্রে প্রদর্শিত ভদ্রলোকটির বেশভূষা ও হাবভাব অনুকরণ করতে আমার একটুমাত্রও দেরী হয়নি। বস্তুতপক্ষে এইরূপ ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে আর্সির সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারছিলাম না। এর পর পর্য্যাপ্ত অর্থ ও একটি টোটাভরা পিস্তল কোমরে গুঁজে খোকার বাল্যবন্ধু হরিপদকে সঙ্গে করে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের উৎকণ্ঠা উপেক্ষা করে ও সেই সঙ্গে তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা শিরোধার্য্য করে আমি দেওঘর শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। খোকাবাবুর দলের লোকজনেরা এমন কি তাদের নিযুক্ত উকিলরাও যে আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে থানার আশে-পাশে কিংবা হাওড়া ষ্টেশনের কাছে নজর রাখে, তাতে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। এই জন্য আমরা একটি প্রাইভেট মোটরকার জোগাড় করে মালপত্রবিহীন অবস্থায় তাতে উঠে প্রথমে নৈহাটি পর্য্যন্ত চলে আসি এবং তার পর পুনরায় ফিরে এসে ওয়েলিংডন ব্রিজ পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে আসানসোল ষ্টেশনে এসে আমাদের বেশভূষা অনুযায়ী ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাশের একটি কামরায় উঠে বসি।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা ভোরের আলোয় দেওঘর সহরে এসে পৌছিলাম। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম প্রথমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু পরে এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আমরা সহরে একটি পৃথক গৃহ ভাড়া করে সেখানে আস্তানা গাড়লাম। এর পর আর একটু মাত্রও সময় নষ্ট না করে আমি হরিপদ বাবুকে বাসায় রেখে বাটি ভাড়া করার অছিলায় একেবারে খোকাবাবুর বিলাসী টাউনের ভাড়া করা বাটির নিকট এসে দাঁড়ালাম। খোকাবাবুর সম্ভব দেড় হাত দূরত্ব বজায় রেখে আমি ইতস্ততঃ ঘুরাফিরা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম একখানি নাতিবৃহৎ বাটীর দরজার পাশে একটা নেমপ্লেট সাঁটা রয়েছে। এই নেমপ্লেটটিতে লেখা ছিল—"রাজা অফ কুমারটুলি"। কুমারটুলি স্থানটি যে কলিকাতার একটা মহল্লা তা বোধ হয় দেওঘরবাসীদের জানা ছিল না। সম্ভবতঃ তারা উহা বাঙলার

কোনও এক জেলার অন্তর্ভুক্ত স্থান মনে করেছিল। এই জন্য উহা তারা রাজন্যবহুল বাঙলাদেশে কোনও জমীদারের আবাসভূমির নাম ব'লে বিশ্বাস করে থাকবে। আমি চতুরতার সহিত গোপন তদন্ত দ্বারা জানতে পারলাম যে সপরিবদ রাজাবাহাদুর, বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সেখানে বাস করেন। তাদের রাজোচিত ব্যবহার ও দানধ্যানের জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই মুগ্ধ। এ ছাড়া ইনি কয়েকবার সহরের রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ করে য়ুরোপীয় কায়দায় খাইয়েও দিয়েছেন। এর পর আমার আর বুঝতে বাকি থাকে নি যে আমাদের অন্যতম খুনে আসামী খোকাবাবুই এখানে এসে ভোল বদলিয়ে 'রাজা অফ কুমারটুলি' সেজে আসর জমিয়েছেন।

আমাদের নিজেদের ডেরায় ফিরে এসে আমি ভাবছিলাম এর পর কি করা যায়। একমাত্র সশস্ত্র সিপাহী দলের সাহায্যে খোকাবাবুকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব। বিনা গুলী বিনিময়ে জীবিত অবস্থায় খোকাবাবু যে ধরা দেবেন না, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমার একজন আত্মীয় শ্রীরবীন্দ্র ব্যানার্জ্জির কথা মনে পড়ে গেলো। ইনি এই সময় দেওঘরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বহাল ছিলেন। কোর্টের নিকট তাঁর সরকারী কোয়ার্টারে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন। আমি মনে মনে স্থির করলাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করা উচিত হবে। [ক্রমশঃ।

ক্রিকেট খেলার অতীত ও বর্তমান

শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু

ক্রিকেট খেলার সুদীর্ঘ ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়, কালাতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনবোধে তার সরঞ্জাম, খেলোয়াড়দের সাজ-পোষাক এবং খেলার আইন-কানুনে অনেক রদ-বদল হয়েছে। সব কথা বলার সুবিধা এই প্রবন্ধে নেই, তবু কিছু বলতে হয়।

সরঞ্জাম : ব্যাটের চেহারা অনেকটা হকিষ্টিকের মতন এবং ষ্টাম্প দুটো ক'রে ছিল আগে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ৩টা করে ষ্টাম্পের প্রবর্ত্তন হয়। ব্যাটের চেহারাও বদলায়।

খেলোয়াড়ের সাজ

এখন খেলোয়াড়দের যে-সাজ দেখা যায়, যথা :—সাদা ফ্লানেলের ঢিলা প্যাণ্টেলুন, সাদা ঢিলা শার্ট, সাদা বুট-জুতা এবং ক্যাপ টুপি (অনেকটা ঘোড়দৌড়ের জকীদের মতন), ১০০ বছর আগে তা ছিল না। তখন ছিল উঁচু টুপি—বালতির মতন দেখতে; ওটুপি প'রে দৌড়ঝাঁপ বেশী চলত বলে মনে হয় না। গলায় নেকটাই কিংবা 'বো' বাঁধা হ'ত। প্যাণ্টেলুনটা ঝুলে না পড়ে, তার জন্য বেল্ট বা কোমরবন্ধ ব্যবহার করা হত না, পরা হ'ত ব্রেসেস। সাদা জুতার চল ছিল না। গোড়ায় ছিল ব্রাউন ও সাদায় নক্সা করা জুতা। তারপর এল ব্রাউন বুট, সর্ব্ব শেষে এখন যা দেখতে পাওয়া যায়—সাদা বুট।

ক্যাপের ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছিল ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। এরপর আর বালতি-টুপির ব্যবহার হয়নি।

উইকেট-কিপিং গ্লভস্ বা দস্তানার চামড়া অত্যন্ত কড়া এবং প্রায় অনমনীয় হ'ত। ব্যাটিং গ্লভস্ এবং প্যাডের তেমন পরিবর্ত্তন হয় নি।

খেলার কায়দা

ক্রিকেট খেলার কায়দার অনেক উন্নতি হয়েছে গত একশো বছরের মধ্যে। যখন আণ্ডারহ্যাণ্ড বৌলিঙের যুগ চলেছে, তখন দেখা যেত যে, লেগব্রেক (legbreak) বল করার যত সুবিধা পাওয়া যেত (এবং সেই জন্যই রেয়াজ ছিল) অফ ব্রেকের (off break) তেমন ছিল না। তার কারণও সুস্পষ্ট ছিল। থ্রো (throw) না করে, বা না ছুঁড়ে—থো করা বরাবরই বে-আইনী ছিল এবং আছে—অফব্রেক বল করার তেমন সুবিধা আণ্ডারহ্যাণ্ড বৌলিঙে পাওয়া যেত না, এক খুব আস্তে লপ্পা বল করা ছাড়া। ব্যাটিঙের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৌলাররা তাদের বল করার বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন। হাত উঁচু করে বল করলে অফব্রেক বল করার সুবিধা আছে, তাঁরা দেখতে পেলেন। এমন কি, হাত উঁচু করে (ওভারহ্যাণ্ড) বেশ জোরেও অফব্রেক বল করা যায়, এটাও তাঁরা দেখলেন। দু-চার জন এই বল করা শুরুও করে দিলেন। প্রথম প্রথম আম্পায়াররা তা বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। পরে জনমতের চাপে প'ড়ে নতুন আইন হ'ল—ওভারহ্যাণ্ড বল করা চালু হ'ল (১৮৬০ খৃষ্টাব্দ)।

ওভারহ্যাণ্ড বল করা চালু হ'ল এবং মাঝারি গোছের জোরে অফব্রেক বৌলিংও চালু হ'ল। কিন্তু যাকে বলে জোরে (fast medium) অফব্রেক বল করা, তা তখনও কেউ দেখতে পাননি। ১৮৭৮ খৃঃ অঃ এই রকম বল ক'রে ক্রিকেট-জগৎকে চমকে দিলেন অষ্ট্রেলিয়ার এবং জগতের শ্রেষ্ঠ বৌলার, এফ, আর, স্পফোর্থ (F. R. Spofforth)। এখানে বলে রাখা দরকার যে, স্পফোর্থ শুধু জোরে অফব্রেক বলই দিতে পারতেন, এমন নয়। সব রকম বল করাই তাঁর আয়ত্তে ছিল—এক 'গুগলী' (Googly) বল ছাড়া। 'গুগলী' বলের আবিষ্কার তাঁর সময়ে হয়নি।

'গুগলী' বলের আবিষ্কারক বোসাঙ্কোয়েট (Bosanquet) দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়া এই পদ্ধতির বল করার কায়দা সেখানকার খেলোয়াড়দের দেখান ; ফলে সেখানে কয়েকজন বৌলার সেটা শিখে নেন এবং এত ভালো করেই শিখে নেন যে, তাঁদের বল করার উৎকর্ষ দেখে 'গুগলী' বলের মাতৃভূমি ইংলণ্ড অবাক হয়ে যায়। বলা বাহুল্য বোধ হয়, অফব্রেক বা লেগব্রেক বল করার সময়ে বৌলার বলটা ছাড়বার আগে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলটাকে একটা

মোচড় দেয়, আঙুল এবং কব্জীর সাহায্যে অফব্রেকের বেলায় একজন ডান-হাতে বল-করিয়ে মোচড় দেবে বাঁদিক থেকে ডান দিকে, আর লেগব্রেকের বেলায় ডান-দিক থেকে বাঁ-দিকে। এই মোচড় দেওয়াটা লক্ষ্য ক'রে ব্যাট্‌সম্যান টের পায় বলটা মাটিতে প'ড়ে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে। 'গুগলী'বল করা যে শিখেছে, সে কিন্তু লেগব্রেক বলের মোচড় দেখিয়ে অফব্রেক বল দিতে পারে। এখন, যদি কেউ লেগব্রেক বল দিতে দিতে হঠাৎ একটা এমন বল ফেলতে পারে যেটা লেকব্রেকের ভাবটি দেখিয়ে অফব্রেক ক'রে যায়, তা হ'লে ব্যাট্‌সম্যান যে বিশেষ অসুবিধায় পড়িবে, এতে আর সন্দেহ কি? এই জন্যই গুগলীবল ব্যাট্‌স্ম্যানের খেলার অপ্রতিহত উন্নতিতে—যার দরুণ ক্রিকেট খেলাটা প্রায় একঘেয়ে হ'য়ে এসেছিল— ্কটা নতুন সীমা টেনে দিলে। খেলায় একটা নতুন রস এল।

খেলার মাঠ

বিগত একশো বছরে খেলার মাঠের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। পিচের (Pitch) এত উন্নতি হয়েছে যে, বোলাররা প্রায় নিরুৎসাহ হ'য়ে প'ড়েছেন। •বৃষ্টিভেজা মাঠ ছাড়া ব্যাট্‌সম্যানদের কিছুতেই আর বাগে আনা যায় না—এক নতুন বলে খুব জোরে সুইও (Swing) বল করা ছাড়া। কিন্তু নতুন বল কতক্ষণ আর নতুন থাকে, আর খুব জোরে বল করতে পারে এমন বোলারই বা ক'জন হয়?

পিচ (Pitch) এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে (গত ৬০ বছর ধ'রে) যে, বল মাটিতে প'ড়ে তার গতি আস্তে হয়ে যায়; সজোরে মাটিতে ছুঁড়লেও সেটা লাফায় না, হড়কেও যায় না, যাকে বলে Shoot করা। এমন মাটিতে বলকে ব্রেক করানো দুঃসাধ্য। কাজেই, ব্যাট্‌সম্যানরা আর আউট হ'তে চায় না। তবে, মজা দেখা যায় যখন বৃষ্টিভেজা মাঠে খেলা হয়, কিংবা চার-পাঁচদিন ধ'রে রোদে শুকিয়ে পিচের ওপরটা ফাটতে থাকে বা গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। একটি ভালো স্পিনবোলার তখন ও-রকম মাঠে ভেলকি খেলা দেখাতে পারে। মহামহারথীরা তখন ব্যাট হাতে কাঁপতে কাঁপতে খেলতে যায়, আর, যাকে বলে, পত্রপাঠ বিদায়!

ব্যাটিং

ক্রিকেটখেলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সমালোচক যাঁরা, তাঁদের মতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পরে ব্যাট্‌সম্যানদের খেলার কৌশলে এমন কিছু উন্নতি দেখা যায়নি যাকে বলা যায় যুগান্তকারী কিংবা একেবারে নতুন। কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কায়দার দিক দিয়ে, ক্রিকেট খেলায় বিশেষ ক'রে ব্যাটিঙে, চেহারা অনেক বদলে গেছে। এই সময়ের প্রথম দিকে ক্রিকেট-গুরু ডাঃ ডব্‌লিউ, জি, গ্রেস ব্যাটিং করাটাকে একটা বিদ্যা ব'লে মেনে নিলেন, এবং এই বিদ্যার সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করলেন। ক্রিকেট-জগৎ অবাক বিস্ময়ে বছরের পর বছর তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখতে লাগল। এমন হ'ল যে, ক্রিকেটখেলা মানেই ডাঃ গ্রেস দাঁড়িয়ে গেল। যেসব মাঠে (পিচে) আর আর মহারথীরা ৫০ রান করতে পারেন না, সেখানে ডাঃ গ্রেস বছরের পর বছর একশো-দু'শো ক'রে রান ক'রে যেতে লাগলেন। বোলিঙের যাদুকর জে, সি, শ'কে একবার (আরও অনেকবার) ডাঃ গ্রেসের হাতে খুবই নাকাল হ'তে হয়েছিল। খেলার পর শ'কে জিজ্ঞাসা করা হয়—'কি হে! তুমি না যেখানে ইচ্ছা ঠিক সেখানেই বল ফেলতে পার, তবে তোমার এ-দুর্গতি?' শ' বললেন 'বল আমি যেখানে ইচ্ছা ঠিক সেখানেই ফেলেছি, আর গ্রেস তাঁর যেখানে ইচ্ছা ঠিক সেখানে সেটাকে পাঠিয়েছেন।'

সাফল্যের শীর্ষে উঠে ডাঃ গ্রেস তাঁর সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখান—ভারী ব্যাটসম্যানদের সাহায্য হবে ব'লে। প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হ'ল ব্যাট্‌সম্যানের পক্ষে ডান পা'টা ব্যাটিং ক্রিজের ঠিক ভিতরে অনড়ভাবে রেখে খেলা। যে মারই মারা হোকনা কেন, ডান পাটা জায়গা ছাড়বে না।

দ্বিতীয় হল প্রত্যেকটা সোজা বলকে সোজা বা Straight ব্যাটে খেলতে হবে। Straight বল (যে বল কপালে Stump এ লাগবে) কখনও বাঁকা বা Cross ব্যাটে খেলবে না, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ১৮৯৪-৯৫ পর্য্যন্ত প্রায় সব ভালো ব্যাটসম্যানরাই ডাঃ গ্রেসের পদ্ধতিতেই খেলতেন, এবং তার দরুণ প্রতিষ্ঠাও লাভ করলেন অনেকেই। এমন সময় ইংলণ্ডের ক্রিকেট-ময়দানে উদয় হ'ল ভারতভূর্ষ্য কুমার শ্রীরণজিৎসিংজীর।

রণজিৎসিংজী, ডান পা'টা মাটিতে অনড় রেখে ব্যাট করতে হবে, একথা মানলেন না। সোজা বল হ'লেই সেটাকে সোজা বা Straight ব্যাটে খেলতে হবে, একথাও তিনি মানলেন না। তিনি বললেন, ব্যাট্‌সম্যানের কাজ হ'ল রাণ করা। সোজা বলকে বাঁকা ব্যাটে (cross bat) মেরে যদি রাণ পাওয়া যায়, তবে তাকে সেটা করতে হবে। ডান পা'টাকে নড়িয়ে যদি বলটাকে মারবার সুবিধা হয় ব্যাট্‌সম্যানের, তবে তাকে তার পা'টাকে নড়াতে হবে। উদাহরণ দিলেন তিনি: ভালো বোলার, অফ্- এর (off) দিকে ফিল্ড (field) সাজিয়ে, অফ্-ষ্টাম্প তাগ ক'রে বা তার একটু বাইরে যদি ভালো লেংথ বজায় রেখে বল দিয়া যায়, তা হ'লে ব্যাট্‌সম্যান রাণ তুলবে কি করে? অথচ ভাল বোলার মাত্রেই এই পদ্ধতিতে বল দেন এবং দেবেন। কারণ, যদিই বা হঠাৎ লেংথের একটু তারতম্য ঘটে যায় এবং ব্যাট্‌সম্যান সেই খারাপ লেংথের বলটাকে পেটায়, তা হ'লেও, ওই বলটাকে ধরবার জন্য অনেকগুলো লোক অফ্-এর দিকে সাজানো আছে—তারা ওই বলটাকে ধরবার একটা সুবিধা পাবে। রাণ তাহ'লে উঠবে কি ক'রে? কখন একটা খারাপ লেংথের বল পড়বে, তারই আশায় থাকতে হবে? আর তাতেই বা কি হবে? সোজা বল যদি কেবল ষ্ট্রেট ব্যাট-এ খেলতে হয়, তা হ'লে ওই অপেক্ষমান ফিল্ডারগুলোর দিকেই তো বলটা যাবে। ক'টা বল তাদের এড়িয়ে বাউণ্ডারীতে গিয়ে পড়ছবে? অথচ, বল বুঝে, আমি যদি এগিয়ে বা পেছিয়ে খেলি, তা হ'লে ওই ভালো লেংথের বলগুলোকে আমি শর্ট-পিচ বা ওভার পিচ ক'রে নিতে পারি, অর্থাৎ পেটাবার যোগ্য বল করে দিতে পারি। তার পর, আমি যদি সোজা শর্ট পিচ বলকে (বা যেগুলোকে শর্টপীচ ক'রে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে) বাঁকা ব্যাটে (cross) হুক (Hook) করি বা লেগের (leg)

দিকে চালিয়ে দিই, তা হ'লে আমাকে ঠেকায় কে? সে-দিকে ফিল্ড্‌স্‌ম্যান নেই, চালালেই অব্যর্থ চার রাণ; কেন চালাব না?

মুখেই শুধু বলেন নি তিনি। কাজেও ক'রে দেখাতে লাগলেন তিনি, ম্যাচের পর ম্যাচে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বোলারদের বিরুদ্ধে খেলে। কখনও পিচ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে মারেন। কখনও ডান পা'টা পেছিয়ে প্রায় উইকেটের কাছাকাছি নিয়ে (বাঁ পা'টাও টেনে নিয়ে) বোলারের দিকে ঘুরে সোজা বলকে হুক করে বাউণ্ডারীতে পাঠান। বোলারের বল মাটিতে পড়বার আগেই তিনি আন্দাজ ক'রে ফেলতেন, বলটা কোথায় পড়বে; তার পর, বল বুঝে এগুনো বা পেছনো।

বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে ইংলণ্ডবাসী তাঁর খেলা দেখতে লাগলো। পুরাতন-পন্থীরা মাথা নেড়ে বললেন,—এ, অনাড়ীর কাঁচা খেলা। 'রণজি'—(রণজিৎসিংজীকে ইংলণ্ডবাসীরা 'রনজি' ব'লেই অভিহিত করতেন) পা দিয়ে উইকেট ঢেকে খেলছেন। বল ফস্কালেই এল-বি-ডবলিউ (L. B. W.)। জবাবে রণজিৎসিংজী বললেন, সোজা বল পা'এ এসে লাগ্‌লে এল-বি-ডবলিউ হব নিশ্চয়, কিন্তু বলটা ফস্কালে তবে না পা'এ এসে লাগবে? তা হ'লে পা'টা কি দোষ করলে, ফস্কানোতেই তো দোষ। পা দিয়ে যদি উইকেটটাকে ঢেকে না থাকতাম তা হ'লে তো বলটা সরাসরি উইকেটেই গিয়ে লাগত—সেটাও তো 'আউট' হওয়াই।

ইংলণ্ডের বোলাররা (এবং অধিনায়করাও) বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, এক রাজপুত ছোকরা একটা নতুন সমস্যা নিয়ে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ ফিল্ড সাজানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিই বা অফ্ থেকে কয়েকটা ফিল্ডসম্যান লেগের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তা'হলে ওই অফের ফাঁকা জায়গাগুলো (যেখান থেকে ফিল্ডস্‌ম্যান লেগের দিকে সরানো হ'য়েছে) দিয়ে রণজিৎসিংজী বল বাউণ্ডারীতে পাঠাতে থাকেন, কারণ, তাঁর নিজস্ব মারগুলো ছাড়া, তখনকার দিনে 'শাস্ত্রীয়' বলে অভিহিত সমস্ত মারই (strokes) তাঁর পুরোপুরি দখলে ছিল। বোলাররা যেমন একটা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হ'ল, ব্যাটিং-শৈলী তেমনই সমৃদ্ধ হ'ল অচিন্তনীয় ভাবে। তাই ব'লে এ-কথা বলা চলে না যে, রণজিৎসিংজী যা করে গেছেন, অন্য ক্রিকেটাররাও তার অনুকরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। অত্যন্ত দ্রুতগতি বলের বেলাতেও পেছিয়ে গিয়ে সেই বলটাকে হুক (hook) ক'রে লেগের দিকে পাঠাতে পারতেন তিনি। ইংল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ জোর্-বোলাররা তার প্রমাণ পেয়েছেন বারে বারেই। আজ পর্য্যন্ত কেউই আর এরকম দেখাতে পারেননি।

জায়গা ছেড়ে, এগিয়ে গিয়ে, বলটাকে ওভার-পিচ ক'রে নিয়ে ড্রাইভ বা হিট করার কায়দা (বিশেষভাবে ভেজা এবং খারাপ উইকেটে) যদিও রণজিৎসিংজী চমকপ্রদভাবে দেখিয়ে গেছেন, তবু, সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, এবিষয়ে আর একজন ব্যাট্‌সম্যান অধিকতর নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভ্রাম্যমান অষ্ট্রেলিয়ান টীমের সঙ্গে একজন তরুণ আসেন টীমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। এর আগে আরও একবার তিনি এসেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান টীমের সঙ্গে, কিন্তু সেবারে তেমন কিছু বিস্ময়কর খেলা দেখাতে পারেন নি, ভালো খেলেছিলেন—এই পর্য্যন্তই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আবহাওয়া এবং মাঠের অবস্থা একটু বেশী রকমই যেন খারাপ হোতে লাগল, যখন তখন বৃষ্টি; বোলারদের সস্তায় উইকেটপ্রাপ্তির একটা মরশুম পড়ে গেল। বল মাটিতে প'ড়ে হয় লাফায়, না হয় 'শুট' করে (shoot), নয়তো বা এক ইঞ্চি থেকে এক ফুট ব্রেক করে—বোলারের ইচ্ছামত। জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলা অসম্ভব। সেই অবস্থায় দিনের পর দিন বিস্ময়কর ভাবে খেলে গেলো উপরোক্ত তরুণটি। তাঁর নাম, ভিক্টর ট্রাম্পার। 'ক্রিজ ছেড়ে খেলা' বিষয়ে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখালেন তিনি। বোলারের বল মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে গিয়ে হাজির, তার পর ড্রাইভ ক'রে বা হিট ক'রে ফিলডস্‌ম্যানের মাথার ওপর দিয়ে বাউণ্ডারীতে পাঠানো তো এক পলকের কাজ!

রণজিৎসিংজী ব্যাটিং-সাফল্যের মূল সূত্র হিসাবে যা বলে গিয়েছেন, যথা—"বুঝে নাও বলটা কোথায় প'ড়ছে, সেখানে গিয়ে হাজির হও, তারপর পেটাও সেটাকে", ট্রাম্পার সেটাকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ময়দানে ভালো করেই দেখালেন।

ক্রিকেটখেলার যে চেহারা আজকাল দেখা যায়, সেটা, ব্যাটিঙের দিক দিয়ে, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যে চেহারা ছিল তার, তাই আছে—অবশ্য মোটামুটি শৈলী হিসাবে। বোলিঙ-শৈলী সম্বন্ধে বলা যায়, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের চেহারা এখনও বদলায় নি।

পথনির্দ্দেশক হিসাবে যেমন নাম করা যায় (ব্যাটিঙে): ডাঃ গ্রেস, রণজিৎসিংজী এবং সি বি ফ্রাই-এর, ট্রাম্পারের বেলায় তা বলা চলে না। ট্রাম্পার ছিলেন স্বভাব-খেলোয়াড়, তিনি রণজিৎসিংজী ক্রিজ ছেড়ে খেলা সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন (Find out where the ball is going to pitch, go there, hit it) তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ দেখিয়ে গেছেন। ব'লে রাখা ভাল যে, ট্রাম্পার শুধু এগিয়ে মারতেই ওস্তাদ ছিলেন, এমন নয়। সব রকম মারই তাঁর আয়ত্তে ছিল।

ফ্রাই-এর বিষয় বলতে হয়, তিনি কথায়, কাজে এবং চিত্র দিয়ে যে সব অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন ব্যাটিং সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে রণজিৎসিংজীর খেলার পদ্ধতি এবং উপদেশ সম্বন্ধে, তা সর্ব্বকালের জন্য ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের অমূল্য সম্পদ হ'য়ে থাকবে। তাঁর চিত্র সম্বলিত "Great cricketers, their methods at a glance" বইখানি জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের সাফল্যের কারণ (শৈলী) ব্যাখ্যা ক'রে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

বর্ত্তমানে ব্যাটিঙ-এর যে রূপ দেখা যায় (কায়দা এবং শৈলী), একশো বছর আগে তা ছিলনা। একশো বছর আগে থেকে আর আজ পর্য্যন্ত ব্যাটিঙের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে, তার মূল কথাগুলো অল্প কথায় বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বড় বড় ব্যাট্‌সম্যানদের সাফল্যের ইতিহাস এটা নয়। এই জন্যই জে বি হব্‌স, ডি ব্রাডম্যান, এল হাটন বা ডি কম্‌পটন ইত্যাদি ক্রিকেটারদের কোনও উল্লেখ এতে নাই।

জীবন-গীতা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীগৌতম সেন

প্রাণায়ামের কাজ

এই প্রাণায়াম দেহের অভ্যন্তরে কি-ভাবে কাজ করে, অর্জুন অতঃপর তাই জানতে চাইলেন।

ভগবান তার উত্তরে বললেন, প্রাণায়ামের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্বন্ধ খুব অল্প। অবশ্য প্রাণের প্রকাশ ফুসফুসের গতিতেই। এই ফুসফুসের গতি রুদ্ধ হলে দেহে সকল ক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ফুসফুসের গতি বন্ধ করেও মানুষ বেঁচে থাকে। তবে দেহে যত গতি আছে, তার মধ্যে ফুসফুসের গতি প্রধান বলতে পারো।

ভগবান বললেন, সূক্ষ্মতর শক্তির কাছে যেতে হলে স্থূলতর শক্তির সাহায্য নিতে হয়। মানুষ এমনি ক'রেই ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর শক্তিতে গমন করতে করতে চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোয়।

অর্জুন বললেন, আরো পরিষ্কার ক'রে বলো।

শরীরে যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তার মধ্যে ফুসফুসের ক্রিয়াই অতি সহজ প্রত্যক্ষ। ফুসফুস হলো সকল যন্ত্রের গতি নিয়ামক যন্ত্র। প্রাণায়াম এই গতিকে রোধ করে। এই গতির সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের অতি নিকট সম্বন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বাস যে এই গতি উৎপাদন করছে তা নয়, বরং সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সৃষ্টি করছে। এই বেগই উত্তোলন যন্ত্রের মতো বায়ুকে ভেতর দিকে আকর্ষণ করে।

অর্জুন বললেন, এই ফুসফুসকে চালায় কে?

চালায় প্রাণ। ফুসফুসের গতি বায়ুকে আকর্ষণ করে। যে পৈশিক শক্তি ফুসফুসকে সঞ্চালন করছে, তাকে বশে আনাই প্রাণায়াম। যে-শক্তি স্নায়ুমণ্ডলীর ভেতর দিয়ে মাংসপেশীগুলোর কাছে যাচ্ছে এবং যা ফুসফুসকে সঞ্চালন করছে, তাই প্রাণ। প্রাণায়াম সেই প্রাণকেই আয়ত্তে আনে। আর সেই প্রাণকে আয়ত্তে আনা মানে, দেহের মধ্যে প্রাণের অন্যান্য ক্রিয়াকেও আয়ত্তে আনা।

সত্যিই কি তা আয়ত্তে আনা যায়?

মানুষ যদি পেশীকে ইচ্ছামত সঞ্চালন করতে পারে, তবে স্নায়ুকে পারবে না কেন? দেহের সকল অংশকে প্রাণ অর্থাৎ জীবনী-শক্তি দিয়ে পূর্ণ করা যায়। অভ্যাস করলেই মানুষ তা পারে।

ভগবান বললেন, তা পারলেই তোমার শরীর বশে আসবে—শুধু তোমার শরীর নয়, তুমি অপরের শরীরেও ক্ষমতা বিস্তার করতে পারবে।

অর্জুন বিস্মিত হয়ে বললেন, তা-ও কি সম্ভব?

জগতের মধ্যে ভালো-মন্দ যা কিছু আছে সবই সংক্রামক। তাই ভগবান বললেন, মানুষের শরীরযন্ত্র যখন একসুরে বাঁধা, তখন তুমি তোমার প্রভাবের দ্বারা তোমার সুর অপরের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারো। তারের যন্ত্রগুলি যদি একসুরে বাঁধা থাকে তবে একটিতে ঝংকার দিলে সব যন্ত্রগুলিই বেজে ওঠে। কেন? সমভাবাপন্ন তারা। তা যদি হয় তবে তোমার দৈহিক কম্পনও সঞ্চারিত হতে পারে অপরের মধ্যে। এই ভাবে বল সঞ্চারের দ্বারা রুগ্নকেও সবল করা যায়। কারণ, এ-ও তো প্রভাব। এ-ক্রিয়া জ্ঞাতসারেও হয়, আবার অজ্ঞাতসারেও হয়।

ভগবান বললেন, এই সঞ্চারণ-ক্রিয়া দূরেও পাঠানো যায়।

অর্জুন বিস্মিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে চাইলেন।

ভগবান বললেন, দূর বলি কা'কে? দূরত্বের অর্থ যদি ক্রম-বিচ্ছেদ হয়, তবে দূরত্ব ব'লে কোনো পদার্থই নেই। কোথায় আছে এমন দূরত্ব, যেখানে পরস্পর কিছুমাত্র সম্বন্ধ বা কিছুমাত্র যোগ নেই? সূর্য ও তুমি—এর মধ্যে কি কোনো ক্রম-বিচ্ছেদ আছে? এক অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড বস্তু—তুমি তার এক অংশ, সূর্য অপর অংশ। নদীর এক দেশ ও অপর দেশে কি ক্রম-বিচ্ছেদ আছে? তা যদি না থাকে, তবে শক্তি এক স্থান থেকে অপর স্থানে যেতে পারবে না কেন?

ভগবান বললেন, সকল সাধনার লক্ষ্যই হলো একাগ্রতা। মানুষের জ্ঞান, অহং জ্ঞান। যখন তুমি আহার করছো—জ্ঞানপূর্বক করছো, কিন্তু যখন তুমি তার সারভাগ ভেতরে গ্রহণ করছো, তখন তা তোমার অজ্ঞাতসারেই হচ্ছে। অজ্ঞাতসারে হলেও তুমিই করছো। এই যে খাদ্য থেকে রক্ত হচ্ছে, সেই রক্ত থেকে দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হচ্ছে—সে-ও তোমার অজ্ঞাতসারেই হচ্ছে কিন্তু তুমিই করছো। শরীরের মধ্যে যা কিছু হচ্ছে, সে তুমিই করছো। তুমি যে করছো, এ জানা যায়। এই জানাই হলো সাধনা। তাকে জানা যায়, ইচ্ছামত চালানোও যায়। হৃদযন্ত্রের কাজ আপনি হচ্ছে—কেউ তাকে ইচ্ছামত চালাতে পারে না, কিন্তু যোগে ইচ্ছাধীন করা যায়।

জ্ঞানের অতীত লোকে

ভগবান বললেন, মানুষের মন দুই অবস্থায় থেকে কাজ করতে পারে। এক হলো জ্ঞানভূমি। যে-কাজে সব সময় জ্ঞান থাকে, আমি করছি, সেই জ্ঞানভূমি। আর যে-কাজে এই 'আমি' জ্ঞান থাকে না, তাকে অজ্ঞানভূমি বলে।

ভগবান বললেন, মন এই দুই ভূমি থেকে আরো উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করতে পারে। অর্থাৎ সে জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যেতে পারে। এই জ্ঞানাতীত ভূমি থেকে যে কাজ, সে কাজে 'অহং' থাকে না। মন তখন এই জ্ঞানভূমির অতীত প্রদেশে গমন করে—যার নাম সমাধি।

অর্জুন বললেন, এই সমাধি আর নিদ্রার প্রভেদ কি?

নিদ্রা এবং সমাধিতে মানুষ জ্ঞানের অতীত লোকে যায়। প্রভেদ এই—নিদ্রা-ভঙ্গে সেই মানুষই ফিরে আসে, কিন্তু সমাধি-ভঙ্গে ফিরে আসে আর এক নতুন মানুষ।

এই সমাধি ছাড়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তুমি যোগ-অভ্যাস করো। যোগের দ্বারা তোমাকে জানতে হবে, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবেই তো দেখতে

পাবে, জগৎ জুড়ে কি লীলা চলছে। শুধু মানুষেরই নয়, প্রত্যেক প্রাণীরই জ্যোতি আছে। এ জ্যোতি সর্বদাই বিকীর্ণ হচ্ছে। সকলে তা দেখতে পায় না। যোগীরা পায়। পুষ্প থেকে যেমন সূক্ষ্ম পরমাণু নির্গত হচ্ছে। গন্ধ পাই তো ঐ কারণে। তেমনি মানুষের শরীর থেকেও শুভ-অশুভ শক্তির নিষ্ক্রামণ হচ্ছে। তাই মানুষ যেখানেই থাক, সেখানেই এই আকাশ-তন্মাত্রায় পূর্ণ হচ্ছে। ঠিক এই একই নিয়মে মহাত্মগণের চতুর্দিকে যে সত্ত্বগুণ বিকীর্ণ হচ্ছে, সেই গুণ প্রভাবে মানুষ প্রভাবান্বিত হচ্ছে।

মুক্তি সত্য, না বন্ধন সত্য ?

অর্জুনের মনে আর এক নতুন প্রশ্ন দেখা দিলো। মুক্তি সত্য, না বন্ধন সত্য ? জগতের যা কিছু সবই তো বদ্ধ। এ বন্ধন থেকে মুক্তি নেই। তবে ?

এই 'তবে'র উত্তর দিলেন ভগবান। অতি ক্ষুদ্র পদার্থ থেকে বুদ্ধি পর্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত, কেবল পুরুষ প্রকৃতির বাইরে। এই পুরুষ বা আত্মার কোনো গুণ নেই। সকল পদার্থই প্রকৃতির অন্তর্গত। সুতরাং তা চিরকালের জন্য বদ্ধ।

তবে মুক্ত কে ? অর্জুন প্রশ্ন করলেন।

মুক্ত তিনিই, যিনি কার্য-কারণ সম্বন্ধের অতীত। যদি তুমি বলো মুক্তভাবটি ভ্রমাত্মক, তাহলে আমি বলবো, বন্ধনভাবটিও ভ্রমাত্মক। মানুষের জ্ঞানে এই দুই ভাবই আছে। তারা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় ক'রে আছে। একটি না থাকলে অপরটি থাকতে পারে না। ওদের মধ্যে একটির ভাব, আমি বদ্ধ। কিন্তু মানুষের রয়েছে ইচ্ছাশক্তি। মানুষ সেই ইচ্ছাশক্তিকে যেখানে ইচ্ছা পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু বিরোধী ভাব দুটো প্রতি পদে সামনে আসছে। যদি দুটোর ভেতরে একটি ভাব ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটিও ভ্রমাত্মক। আর যদি একটি সত্য হয়, তবে অপরটিও সত্য। কারণ, উভয়েই অনুভব রূপ একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

ভগবান বললেন, আসলে কিন্তু ঐ দুই ভাবের উভয়টিই সত্য। বুদ্ধি পর্যন্ত ধরলে মানুষ বদ্ধ, কিন্তু আত্মাকে ধরলে মুক্ত। মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা বা পুরুষ। যিনি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের বাইরে। তাই আত্মা মুক্ত। কিন্তু তুমি ভুল ক'রে সেই মুক্তস্বভাবকে প্রতি মুহূর্তেই বুদ্ধি ও মনের সঙ্গে ফেলছো। অবশ্য তোমার ভুল তুমিই দেখতে পাচ্ছো—দেখতে পাচ্ছো, মুক্তি দেহেরও ধর্ম নয়, মন বা বুদ্ধিরও ধর্ম নয়। একমাত্র আত্মাই মুক্ত-স্বভাব, জ্ঞানস্বরূপ।

ভগবান বললেন, সমুদয় ব্যক্ত-জগত প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। কিন্তু প্রকৃতির নিজের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই, কেবল পুরুষকে মুক্ত করাই তার কাজ।

আত্মা যে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র, এই জানানোই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য। আত্মা এ-খবর জানতে পারলে প্রকৃতি আর তাকে প্রলোভিত করতে পারে না। যিনি মুক্ত, তাঁর কাছে সমুদয় প্রকৃতিই লুপ্ত।

ভগবানের বিভূতি

অর্জুন বললেন, সবই বুঝলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না তুমি কে ? তোমার শক্তি কি ? হয়তো তুমি ভগবান কিন্তু মন মানতে চায় না।

ভগবান বললেন, দেবতা ও মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি জানে না, কারণ আমিই তাদের আদিকারণ। আমার বিভূতি ও শক্তিকে যে জানে, তার কোনো সংশয়ই থাকে না।

অর্জুন বললেন, দূর করো আমার সেই সংশয়। জানতে দাও আমাকে, যে-বিভূতি দ্বারা তুমি এই তিন-ভুবন ব্যাপ্ত ক'রে আছো—বলো তোমার সেই দিব্য-বিভূতির কথা। আমাকে বলো, তুমি কে ? জানতে দাও তোমার শক্তি, তোমার ঐশ্বর্য।

ভগবান বললেন, তুমিই একমাত্র, যে আমার বিভূতির কথা জানবে। আমি না জানালে কেউ তা জানতে পারে না। দেবেরও বাঞ্ছিত সেই পরম-ঐশ্বর্যের কথা একমাত্র তোমাকেই আমি বলবো।

আমি সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত আত্মা। আমি সকল বস্তুর আদি অন্ত মধ্য। আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু আমি, জ্যোতির মধ্যে ঝলসিত সূর্য, বায়ুর মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র। আমি বেদের মধ্যে সাম, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র—ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন আমি, প্রাণীদের মধ্যে চেতনা। রুদ্রের মাঝে শংকর, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমিই কুবের। আমিই কার্তিক সেনাপতির মধ্যে—জলরূপে সাগর আমি, পাথররূপে হিমালয়।

'গাছের মাঝে অশ্বত্থ হই
নদীর মাঝে জাহ্নবী,
ঋতুর মাঝে বসন্ত আর
শিল্পী মাঝে হই কবি।'

আমি অবিনাশী কাল, সর্বব্যাপী ধারণকর্তাও আমি। সর্ব-হরণকারী মৃত্যুও আমি, উৎপত্তির কারণও আমি। আমি জয়, আমি নিশ্চয়—আমি দণ্ড, আমি নীতি—জ্ঞানও আমি, মৌনও আমি।

'ধ্বংসমূলে মৃত্যু আমি
জন্মমূলে আমি কাম,
সৃষ্টি আমি স্থিতি আমি
আমিই সবার পরিণাম।'

হে অর্জুন, আমার বিভূতির অন্ত নেই। কি হবে অত কথা জেনে ? শুধু জানো, আমার একটিমাত্র অংশ দ্বারা আমি এই সমুদয় জগত ধারণ করে আছি।

অর্জুন অভিভূত হয়ে শুনলেন। তবু সংশয়—তবু তাঁর দ্বিধা। বললেন, ওতে হবে না—দেখাও তোমার বিশ্বরূপ, যে রূপে তুমি জগত ব্যাপ্ত করে আছো। তোমার মহিমা প্রকাশ করো, আলোকিত করো আমার মন। সকল দ্বন্দ্বের হোক অবসান।

তোমার দৃষ্টি-অগোচর ঈশ্বরীয় রূপ, যা সর্বভূতে আছে ব্যাপ্ত হয়ে।

ভগবান বললেন, সে তো চোখে দেখা যায় না বন্ধু, দেবতাদেরও নেই সে দৃষ্টি। আমি ইচ্ছা না করলে কে দেবে সেই দিব্যদৃষ্টি ?

অর্জুন প্রার্থনা করলেন, দাও আমাকে সেই দিব্যদৃষ্টি যা একান্ত আমারই। জগতে আর কেউ পায়নি সে দৃষ্টি, জানে না তোমার কি সে রূপ। সখা তুমি, গুরু তুমি, অর্জুনের চিরসাথী তুমি—দেখাও আমাকে তোমার সেই লোকাতীত রূপ।

বিশ্বরূপে ভগবান

ভগবান দিলেন সেই দৃষ্টি অর্জুনকে।

অর্জুনের মনে হলো, একসঙ্গে সহস্র সূর্য উদিত হলো। অর্জুন দেখলেন, সেই জ্যোতিসমুদ্রকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এক বিরাট অনন্ত পুরুষ।

অনাস্বাদিত এক দিব্য চেতনায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে অর্জুনের দেহ-মন—সব সংশয় সব তর্ক মিলিয়ে যায় নিমেষে। বুদ্ধির অতীত, বিচারের অতীত—বিস্ময়ের মহাসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে।

'পশ্যামি দেবাংস্তব দেব! দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষী চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।'

অর্জুনের সমস্ত দেহ মন মস্তিষ্ক প্রণাম হয়ে সেই অনন্তরূপের পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

কৃতাঞ্জলিপুটে বলে গাণ্ডীবী, কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় তুমি? এ কি তোমার রূপ! কোথায় তোমার আদি, কোথায় তোমার শেষ! তোমাতেই উঠছে সূর্য, তোমাতেই যাচ্ছে অস্ত—তোমাতেই আবর্তিত হয়ে চলেছে চরাচর জগত! তোমাকে দেখছি সৃষ্টির আদিম প্রভাতে—কমলাসনে ব'সে তুমিই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, তোমাতেই রয়েছে সকল দেবতা—তোমার অনন্ত দেহের অণুতে পরমাণুতে মিশে আছে জগতের যা কিছু সব।

তামার মুখগহ্বরে জ্বলছে প্রলয়ের শিখা, সেই প্রজ্বলিত মুখগহ্বরে পতঙ্গের মতো গিয়ে পড়ছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা—কুরু এবং পাণ্ডব। ভয়াল দংষ্ট্রা-করালের অন্তরালে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাদের দেহ।

কে তুমি ভয়ংকর, ব্যাপ্ত হয়ে আছো স্বর্গ মর্ত পাতাল—হে বিরাট, হে মহান, এ কি রূপ তোমার! যার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই—যার শক্তি অনন্ত, অনন্ত যার বাহু, হে বিকট-দর্শন, এই ভয়াবহ রূপ তুমি সংহরণ করো—সংহরণ ক'রে নাও তোমার এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা।

মৃত্যু নয়, অনিবার্য-গতিতে ছুটে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যু আকর্ষণে! এ কি আকর্ষণ তোমার, যে-আকর্ষণ ভয়ে আর্তনাদ করছে সমগ্র সৃষ্টি!

'কে গো বিরাট, কি তোমার নাম
লহ আমার লক্ষ প্রণাম;
আদি অন্ত মধ্য কোথায়?
কে গো সর্বভুক?
রক্ষা কর রক্ষা কর
কাঁপছে আমার বুক।'

রক্ষা করো কৃষ্ণ, ফিরে এসো তুমি আমার অন্তরে—ফিরে এসো সখারূপে, আত্মীয়রূপে। ওগো অর্জুনের চিরসাথী, কোথায় তুমি? দূর করো আমার ভয়!

ভগবান অর্জুনের বুকে হাত রাখলেন। বললেন, যে-সংগ্রামের মূর্তি দেখে তুমি ব্যথিত ও বিমূঢ় হয়েছিলে, সেই সংগ্রামের সমগ্র মূর্তি তোমাকে আমি দেখালাম।

আমিই মহাকাল, যুগসন্ধিক্ষণে আমিই পরিবেশন করি মৃত্যু। তুমি যাদের হত্যা করবে ব'লে ব্যথিত হয়েছিলে, স্বচক্ষে দেখলে, তারা আমার দ্বারা আগেই হত হয়ে আছে।

মৃত্যু-অগ্নি দিয়ে আমিই পরিশুদ্ধ করি পৃথিবীকে। মৃত্যুতে তোমার ব্যথিত হবার কিছু নেই—ওঠো, গাণ্ডীব ধরো।

অর্জুনের আর দ্বিধা নেই—সব সংশয় গেলো ঘুচে।

'ব্যাপ্ত হ'লে বিশ্ব ভরি'
কোথায় তোমা প্রণাম করি?
সম্মুখে পশ্চাতে পাশে
নমো নমো নমঃ।
হে অনাদি হে মহাকাল
বিশ্বব্যাপী ওগো ভয়াল
লক্ষ প্রণাম লও, এ দীনের
সব অপরাধ ক্ষম'।'

কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জুন বললেন, হে পুরুষোত্তম, তোমার করুণায় আজ চিনলাম তোমাকে। বন্ধু ব'লে, সখা ব'লে তোমাকে করেছি কত অমর্যাদা—আহারে, বিহারে, শয়নে, আলাপে, প্রণয়ের বশে যা করেছি ত্রুটি—হে অচ্যুত, হে দেবদেব, ক্ষমা করো আমার সেই মানবীয় প্রেমের উদ্ধত অপরাধ।

সংবরণ ক'রে নাও তোমার এই প্রজ্বলন্ত রূপ, তোমাকে এ ভয়ংকর মূর্তিতে আমি দেখতে চাই না—দেখা দাও তোমার প্রসন্ন দিব্যমূর্তিতে—সহস্রবাহু নয়, হও চতুর্ভুজ, হও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী—এসো আনন্দঘন নারায়ণরূপে এসো।

পিতার কাছে পুত্রের মতো, পতির কাছে পত্নীর মতো, সখার কাছে সখার মতো আমি সমর্পণ করলাম আমাকে তোমার কাছে।

ভগবান শান্ত হলেন, শান্ত হলেন অর্জুন।

অর্জুন বললেন, এ আমি কি দেখলাম?

ভগবান জানালেন, এ দেখার সৌভাগ্য পৃথিবীতে কারু কখনো হয়নি—দেবতারাও দেখেননি আমার এই তেজোময় বিশ্বব্যাপী আদিরূপ। তপস্যা ক'রেও পাবে না, যজ্ঞ ক'রেও নয়—অনন্যা ভক্তি দিয়ে শুধু দেখা যায়, জানা যায়।

সে কি এমন ভক্তি? যে-প্রেমে তুমি আছো বাঁধা?

সেই প্রেমই ভক্তি

ভগবান বললেন, তোমার মন আমাতে যুক্ত করো, তোমার বুদ্ধি আমাতে রাখো, তাহলেই আমাকে পাবে।

'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' এই বোধ চাই। তিনি পিতারূপে সংসারকে পালন করছেন, মাতারূপে সবলকে বক্ষে ধারণ ক'রে আছেন, প্রভুরূপে নিখিল জগতকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন—তিনি অগ্নিতে তেজ, সূর্যে দীপ্তি—তাঁর হতেই সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, আবার সমস্ত জগত তাঁতেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যা কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে, তাও তিনি। আবার যা কিছু এখনো হয়নি তাও তিনি। সূর্যে তিনি, তারায় তিনি, ফুলে তিনি—সব কিছুকে ব্যেপে আছেন তিনি, একমাত্র তিনি।

এমনি ক'রে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—সর্বত্র ভগবানকে যখন অনুভব করতে পারবে, তখন হৃদয় শুধু জেনেই তৃপ্তিলাভ করবে না, প্রেমের ও আনন্দের আলোকশিখায় তুমি জ্বলে উঠবে।

কেবল সুখের মধ্যে নয়, দুঃখের মধ্যেও বাসুদেব। সফলতায় বিফলতায় আলোকে আঁধারে—সর্বত্র তিনি। কেবল নির্মল চরিত্র সাধুর মুখে নয়, পতিতা এবং তস্করের মুখেও লুকিয়ে থেকে তিনি বলছেন, এই যে আমি, এখানে আমি।

এই অনুভূতি মনের মধ্যে জাগলে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ আনন্দ-গানে ভরে ওঠে। তখন ভয় থাকে না, উদ্বেগ থাকে না। একটি চেতনা তখন সমস্ত সত্তাকে সর্বক্ষণের জন্যে পূর্ণ ক'রে থাকে।

'বাসুদেবঃ সর্বমিদং' এই বোধ যখন জাগেনি, তখন অর্জুন গাণ্ডীব ধরতে কুণ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, জগতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে—যার সঙ্গে ভগবানের কোনো সম্পর্ক নেই। যুদ্ধ, রক্তপাত—এ-সব ভগবানের ইচ্ছায় কখনো হতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধকে ভগবান থেকে পৃথক ক'রে দেখবার ফলেই অর্জুনের মনে ভয় এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছিল। নূতন এক দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে অর্জুন তখন দেখলেন, মহাকালরূপে ধ্বংস করছেন যিনি—তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং ভগবান। কিন্তু ধ্বংসই তাঁর একমাত্র কাজ নয়—নব নব সৃষ্টির মধ্যেও তাঁর প্রকাশ। তিনি অসীম। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে তিনি অহরহ প্রকাশ করছেন। অনন্ত মৃত্যুর মধ্যেও তাঁরই ইচ্ছা কাজ করছে। যা আছে তাও তিনি, যা নেই বলে মনে হচ্ছে তাও তিনি। যা ঘটবে তাও তিনি। যা ঘটে বিলুপ্ত হয়ে যাবে তাও তিনি। মরণ-স্নানে ডুবিয়ে বিশ্বকে নিমেষে-নিমেষে তিনিই শুচি ও নতুন করে তুলছেন। জীবন-মৃত্যুর এই অবিরাম লীলাস্রোতের ওপরে যিনি সব কিছুকে মিলিয়ে দিচ্ছেন, তার মধ্যে কারো ক্ষয় নেই—যা কিছু মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে, সব কিছুই সেখানে অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজ করছে।

অর্জুন দেখলেন, মৃত্যুর মাঝে হাসছেন অমৃতের দেবতা, জীবনের দেবতা। কালীর মুখে রয়েছে জগজ্জননীর সুপ্রসন্ন হাসি। বজ্রের মধ্যে বাজে ভগবানের বাঁশী, দুঃখের কালো মেঘের বুক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্গের আলোকছটা।

ভগবানের কাছে অর্জুন যে মুহূর্তে নিঃশেষে আপনাকে নিবেদন করলেন, সেই মুহূর্তে জীবনের সমস্ত কর্ম অপরূপ রঙে রঙীন হয়ে উঠলো। কর্মের বিপুল ভার একেবারে হাল্কা হয়ে গেলো।

ক্ষুদ্র 'আমিটা'কে নিয়েই তো যত গোল ছিলো। 'আমি' যেই ভগবানের মধ্যে সরে গেলো, সব উদ্বেগও চলে গেলো, ভয়ও গেলো। তখন আর সফলতার জন্যে উৎকণ্ঠা নেই, বিফল হবে বলে দুশ্চিন্তাও নেই। তখন যে কর্ম এবং ফল তিনি ভগবানকে সমর্পণ করে বসে আছেন।

ভগবান বললেন, জ্ঞানের পথ ক্লেশের পথ। জ্ঞানী জগতকে অস্বীকার করে, আপনার ইন্দ্রিয়ের পথগুলিকে রুদ্ধ করে। প্রকৃতির দাবীকে ক্রমাগত অস্বীকার করতে করতে নিজের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাকে চলতে হয়।

তাই ভগবান বলছেন, জ্ঞানের পথে কঠোর তপস্যা, অবিরাম আত্মনিগ্রহ। তাকে সেখানে নিজের চেষ্টায়, নিজের জোরে নিজেরই ওপর একান্ত নির্ভর করে সাধনার পথে চলতে হয়। কেউ তাকে সাহায্য করে না।

কি হবে অত কথা জেনে। যেখানে সকল কথার শেষ হয়ে গিয়েছে?

অর্জুনের আর প্রশ্ন নেই। তাঁর সকল প্রশ্নের অবসান হয়েছে। তিনি এখন শ্রোতা। গুরুর পদতলে বসেছেন অনুগত শিষ্য।

ভগবান বললেন, প্রেমের পথই আসল পথ। এখানে ভগবান মানুষের একান্ত আপনার ধন। তিনি তাঁর সিংহাসনের আসন থেকে নেমে এসে মানুষের ঘরের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। একান্ত প্রিয়জনের মতো এসে দাঁড়িয়েছেন। যাঁকে ধরা যায় না, বোঝা যায় না—যিনি অন্তহীন দূরের, তিনি পিতা হয়ে, সখা হয়ে, জননী হয়ে, ছোটো হয়ে ভক্তের কাছে এসেছেন—জলে স্থলে কত আকার নিয়ে ধরা দিয়েছেন তিনি।

আবার ধরা দিলেও, মানুষ ধরতে পারে না। এইখানেই মানুষের বড় আক্ষেপ। এ অনুশোচনার অন্ত নেই। তখন মনে হয়, এত দিন ভগবানকে বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানব-প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র করে দেখেছি। দিন-রাত দুয়ার রুদ্ধ করে রেখেছি—যে আসতে চেয়েছে, তাকে সন্দেহ করে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছি। বিশ্ব তার সমস্ত আনন্দ নিয়ে বাইরে খেলা করেছে—আমার প্রাণের ওপর কোনো মাধুর্যই বিকিরণ করেনি। তোমাকেও সেই সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছি।

"আছি রাত্রি দিবস ধ'রে
দুয়ার আমার বন্ধ করে
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বারে।
তাইতো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।"

কিন্তু ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক প্রেম যখন জাগে তখন সেই প্রেমের দৃষ্টিতে সে দেখে, অরূপ অসংখ্য রূপের মধ্যে দিয়ে তিনি কেবলই নিজেকে প্রকাশ করছেন—যিনি অসীম, তিনি সীমার মাঝে আপনার সুর বাজাচ্ছেন।

তখন সে জানে, আমাকে দিয়েই তাঁর প্রকাশ। প্রতিটি বস্তু তিনি আস্বাদন করছেন আমাদের মাঝে নিজেকে দান করে। আমার চোখেই তাঁর প্রতি-প্রভাতের সূর্যোদয় সফল হচ্ছে।

তাইতো ভগবান বললেন, যতক্ষণ আমিত্বের জঞ্জাল থাকবে ততক্ষণ তুমি তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে প্রকাশ করতে পারবে না। সব না ছাড়লে তাঁকে পাওয়া যায় না। ভগবানের কাছে সব-কিছু নিঃশেষে নিবেদন করতে পারলে তবেই শান্তি পাওয়া যায়। 'বাসুদেবঃ সর্বমিদং' সব কিছুই বাসুদেব। যা দেখছি, যা দেখছি না—যা আছে, যা এখনো হয়নি সব কিছুই তিনি। জীবন আনন্দের, জগত আনন্দের। কারণ, জগত ও জীবনের যিনি স্বামী, জগত ও জীবনকে যিনি ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত ক'রে আছেন—তিনি এক, অদ্বিতীয়, অসীম—তিনি আনন্দ।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নয়, বিশ্বমানবের মধ্যে—বিশ্বমানবের অজস্র কর্মধারার মধ্যেও তিনি।

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

ভগবান বললেন, ভক্ত সেই—যার রাগ নেই, যে সকলের মিত্র—যার মমতা নেই, অহংকার নেই—সুখে-দুঃখে যে সমান, যে ক্ষমাবান, দয়াবান, সর্বদা যে সন্তুষ্ট—যে সংযমী, যে যোগযুক্ত, যার মন দৃঢ়, যে আমাতে মন-বুদ্ধি অর্পণ করেছে—যে হর্ষ-ক্রোধ-ঈর্ষা-ভয়-উদ্বেগ থেকে মুক্ত, যে ইচ্ছা-রহিত, উদাসীন যে—যার চিন্তা নেই, যে সংকল্প মাত্র ত্যাগ করেছে—যার আসক্তি নেই, যে নিন্দা-স্তুতিতে সমান, যে স্থির-চিত্ত, যে শ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করে, সেই আমার ভক্ত।

যে জ্ঞানের দ্বারা সকল সংশয় নষ্ট করেছে, যোগের দ্বারা কর্ম সমর্পণ করেছে—আত্মাকে যে পেয়েছে, সে ব্যক্তি কখনো কর্মে আবদ্ধ হয় না।

সর্বত্র সমদর্শী যোগী সর্বভূতে আত্মা এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করে। যে আমাকেই সর্বত্র দেখে এবং সকলকেই আমার মধ্যে দেখে, আমি তাকে কখনো হারাই না—সে-ও হারায় না আমাকে।

একত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, সর্বভূতে অবস্থিত—আমাকে যে ভজনা করে, সে যেখানেই থাকুক, আর যাই করুক, সে আমার মধ্যেই বাস করে, আমার মধ্যেই কর্ম করে।

ভগবান বললেন, জ্ঞান ছাড়া ভক্তি হয় না। জ্ঞান কি? জানা। তোমাকে জানবো তবে তো ভালবাসবো। না জানলে ভালবাসা হবে কি ক'রে? ভক্তি তো প্রেম। ভগবানে প্রেম। হৃদয়ের পরশ মানেই ভক্তি।

অত্যন্ত প্রিয়কেই তো মানুষ বরণ করে। যে আত্মাকে ভালবাসে, আত্মাও তাকে ভালবাসে। ভগবান তাকে সাহায্য করেন। ভগবান বললেন, যারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত, যারা ভালবেসে উপাসনা করে, আমি তাদেরই।

তাই হে অর্জুন, আমাতে আসক্ত থাকো, তারপর কাজ করো। এ আসক্তি পার্থিব বস্তুতে আসক্তির মতো নয়। এতে দোষ নেই। ভগবানে আসক্তিই তো পুজা—ভক্তি।

পুজা সগুণেও করা যায় আবার নির্গুণেও করা যায়। একে অন্যেতে গাঁথা। কেউ কাউকে ছিন্ন করতে পারে না। কর্ম নিজেই পুজা। তবে অন্তরে ভাবনা জাগ্রত থাকা চাই। যেমন ঠাকুরের মাথায় ফুল চড়ানো। ভাববিহীন ফুল চড়ানো—পাথরের ওপর ফুল চড়ানোর মতো। তাই সগুণ ও নির্গুণ, কর্ম ও প্রীতি, জ্ঞান ও ভক্তি সবই এক রূপ। প্রথমে সগুণ আসে আসুক, পরে কিন্তু নির্গুণ আসা চাই। নইলে পূর্ণতা লাভ হয় না। ভক্তির ধারাও তাই। প্রথমে সগুণ থেকে উৎসারিত হয়, মেশে নির্গুণে। কেমন জানো, বাড়ি তৈরির সময় ঠেকনা দেওয়ার মতো। পরে সরিয়ে নিলেই হলো।

সগুণ উপাসকের কাছে ইন্দ্রিয়গুলো হলো সাধন-স্বরূপ। ইন্দ্রিয়গুলো যেন ফুল—পরমাত্মাকে নিবেদন করার জন্যেই রয়েছে। চোখে হরির রূপ দেখে, কানে হরি-কথা শোনে, জিভে হরিনাম করে, পায়ে তীর্থযাত্রা করে, হাতে সেবার কাজ করে—এই ভাবে সকল ইন্দ্রিয় সে পরমেশ্বরকে অর্পণ করে।

অর্জুন বললেন, তবে ভক্তিই কি সব?

না। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—এরা তিনটি বৃত্তি। একটি অপরটির হাত ধরে জীবকে মোক্ষের পথে নিয়ে যাচ্ছে। একটি না থাকলে অপর দুটি অচল। কর্ম ছাড়া জ্ঞান হয় না, জ্ঞান ছাড়াও কর্ম নয়, ভক্তি নয়। আবার ভক্তি না থাকলে জ্ঞান-কর্মের পুরুষ-প্রচেষ্টা সবই মিথ্যে।

মনের ময়লা দূর করবে কে? স্থূল-ময়লা না হয় জ্ঞানে পুড়ে ছাই হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম-ময়লা? সে দূর করবার শক্তি জ্ঞানের নেই। সে দূর করতে পারে একমাত্র ভক্তি। ভক্তির জল ছাড়া সে-ময়লা ধোয়া যায় না।

আবার এই প্রেমই দেখো, বিষিয়ে উঠছে আর এক রূপে। যে-পশু প্রাণী বধ করছে, সেই আবার আপন শাবককে রক্ষা করতে প্রাণ দিচ্ছে। যে মানুষ অপরের ক্ষতি করছে, সেই আবার স্ত্রী-পুত্রের জন্যে সর্বস্ব দিচ্ছে। তবু সে প্রেম। কিন্তু বিকৃত প্রেম।

এরা কেউ পৃথক নয়। একই প্রেমের ভিন্ন অভিব্যক্তি। যে হত্যা করছে, সে একের প্রতি স্নেহবশেই করছে। তার প্রেম সংকীর্ণ। লক্ষ ব্যক্তিকে বঞ্চিত করে একের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রকৃতির মধ্যেও সেই একই প্রেমের বিকাশ। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহৎ, সবই প্রেম থেকে জন্মলাভ করেছে।

ভগবান বললেন, যেখানেই আনন্দ দেখতে পাবে, সেখানেই বুঝবে ভগবানের অংশ রয়েছে। তিনি সকলকেই আপনার দিকে টানছেন। তিনি যে প্রেমের একমাত্র আস্পদ।

জগতের সেবক ভগবান তোমার দ্বারে দাঁড়িয়েই আছেন। বন্ধ দরজা ঠেলে ভিতরে তিনি প্রবেশ করেন না। তিনি যে সেবক। সূর্যের আলো। ঘর বন্ধ থাকলে আলো ঢোকে না। দরজা খুলে দাও, সূর্যদেব তাঁর সমস্ত আলো নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবেন। ভগবানও তো তাই। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছো কি তিনি বাহু বিস্তার করে এগিয়ে আসবেন। তিনি কোল দেবার জন্যেই তো অপেক্ষা করে আছেন।

অর্জুনের সব তর্ক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। যিনি ভাবার অতীত, যিনি বুদ্ধির অতীত, তাঁকে আর তিনি কি দিয়ে বিচার করবেন?

ভগবান বললেন, বেদের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ দর্শন হয় না। একে দেখা যায়, জানা যায়—এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে সেই, যে ভক্তির দ্বারা সর্বভূতে আমাকেই দেখে, আমাকেই শ্রদ্ধা করে, ভজনা করে, ভালবাসে।

আমার কর্ম করো—আমাকেই জানো পরম পুরুষ ব'লে। আমাকে স্বীকার করো, আমার ভক্ত হও—আসক্তি বর্জন ক'রে সর্ব জীবের বন্ধু হও, তবেই আমাকে পাবে।

অর্জুন বললেন, তুমি বলো, আরো বলো—আমি শুনি।

ভগবান বললেন, যে পুরুষোত্তমের ভক্ত, তার হৃদয় ও মন বিশ্ব-প্রসারিত। সে অহং-এর সব প্রাচীর ভেঙে ফেলেছে। বিশ্বপ্রেম তার হৃদয়ে—সমুদ্রের মতো প্রবাহিত হচ্ছে সর্বভূতের প্রতি করুণা।

এই প্রেমই কি তবে ভক্তি?

প্রীতি যার আদি মধ্য অন্ত। ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি।

প্রেমের জন্যেই প্রেম—সেই প্রেমই নিঃস্বার্থ প্রেম। কিছু চেও না। এর আর বিনিময় নেই। ভয় ক'রো না—ভয় থাকতে প্রেম আসে না। প্রেম ভয়কে বিনাশ করে।

এ ভয় কি ? কেন এই ভয় হয় ? পাছে জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তাই এই ভয়। এ স্বার্থেরই কথা। স্বার্থ থেকেই ভয় আসে। নিজেকে যত ছোট ও স্বার্থপর করে তুলবে, ভয় সেই পরিমাণেই বাড়বে।

ভয় থাকতে প্রেম হয় না। প্রেম আর ভয় দু'টি বিপরীত-ভাবাপন্ন। ভগবানকে ভালবাসলে আর ভয় থাকে না।

ভগবান বললেন, যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে মানুষ পৌঁছোয়, তখন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানও থাকে না, মুক্তির প্রশ্নও চ'লে যায়।

ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না। বলে, মুক্তি নিয়ে আমি কি করবো ? আমি যে তোমাকে চাই। দেবে যদি, দাও ভক্তি।

ভগবান বললেন, সে যে ভালবাসায় উন্মাদ। সে কেন মুক্তি চাইবে ? সে কিছুই চায় না। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। এই তো আত্মসমর্পণ। এর চেয়ে আর বড় শান্তি কি ?

ভক্ত বলেন, তিনি আমি যে এক। পৃথক হলে পাবো কি করে ? প্রেমের জন্যে প্রেম, এতেই আছে সুখ। এই প্রেম ছাড়া সে আর কিছু চায় না। ভালবেসে ভালবাসাতে চায়। ভক্ত যে, তার আর কোনো কামনা নেই সে চায় শুদ্ধা ভক্তি।

ভগবান ভক্তি ছাড়া কিছুই নেন না—শুধু দিয়েই যান। মানুষ নেবার জন্যেই ব্যাকুল। নিতে নিতে নিজেদের সংকুচিত করে ফেলেছে। এর মূল্য কতটুকু ? নেওয়ার বদলে, নিজেদের নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে দেওয়াই যেদিন তাদের কাজ হবে, সেদিন কর্মের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

অর্জুন তন্ময় হয়ে শুনছেন।

ভগবান বললেন, চাই ব্যাকুলতা। বালক যেমন তার মাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়, তেমনি ব্যাকুলতা।

ভালবাসার যে উন্মাদ—তার কে মা, কে বাবা, কেই বা স্ত্রী। সে সকল ঋণ থেকে মুক্ত। মানুষ এই অবস্থায় জগত ভোলে।

অর্জুন বললেন, এ তো বৈরাগ্যেরই নামান্তর।

ভগবান বললেন, ত্যাগেই তো বৈরাগ্য আসে। ত্যাগই হলো শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তের এ সাধন সহজে আসে। কারণ তাকে তো কিছু ছাড়তে হয় না, ছিনিয়ে নিতেও হয় না—জোর করে কোনো কিছু থেকে নিজেকে তফাৎ করতেও হয় না। তাই ত্যাগ তার কাছে অত সহজ।

ভক্তিতে সবকিছু লয় হয়। যেমন ক্রম-বর্দ্ধমান আলোর কাছে অল্পোজ্জ্বল আলো ক্রমশঃ স্নিগ্ধ থেকে নিষ্প্রভতর হতে হতে অন্তর্হিত হয়। প্রেমের কাছে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরও হয় লয়। একেই বলে পরাভক্তি। তখন তার কাছে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না, শাস্ত্রেরও থাকে না প্রয়োজন। প্রতিমা, মন্দির, দেশ, জাতি সবই তার কাছে তখন নিরর্থক।

ভক্ত টানেন ভগবানকে, ভগবান টানেন ভক্তকে। নইলে ভক্তের ভগবান কেন ?

অর্জুন বললেন, শুধু কি ভক্তেরই তিনি ?

তিনি প্রত্যেকের। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি। বস্তু মানুষকে আকর্ষণ করে। প্রাণহীন জড় যে, সে কি কখনো চৈতন্যবান আত্মাকে টানতে পারে ? ঐ জড়পরমাণুর অন্তরালে রয়েছে তাঁরই শক্তি, তাঁরই প্রেমের খেলা। তিনি নিরত টানছেন। তিনিও টানছেন, জীবাত্মাও চেষ্টা করছে তাঁকে পাবার জন্যে। জীবনের লক্ষ্যই হলো তাঁর নিকটে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়া।

এই মহান আকর্ষণ ভক্তের সকল আসক্তিকে নাশ ক'রে দেয়। সে তখন আর কিছু দেখে না—দেখে, তার ভগবান ছাড়া আর কোনো বস্তু নেই।

ভগবান বললেন, এই অবস্থা যখন ভক্তের আসে তখন তার চোখে মানুষ আর মানুষ নয়—যা সে দেখে, সবকিছুর মধ্যেই সে দেখে, তার প্রিয়তমের ছবি। জলে ভগবান, বস্তুতে ভগবান, জীবে ভগবান, উদ্ভিদে ভগবান—বিশ্ব জুড়ে রয়েছেন তার ভগবান।

অর্জুন চতুর্দিকে চাইলেন, কিন্তু কি দেখবেন ? সে চোখ কোথায় ?

ভগবান বললেন, শ্রদ্ধার মূলই হলো ভালবাসা। শ্রদ্ধা না থাকলে ভক্তি হয় না।

কিন্তু ভালবাসবে কাকে ? সমষ্টিকে। আগে সমষ্টিকে ভালবাসো, তবে তো ব্যষ্টিকে ভালবাসতে পারবে। ঈশ্বরই সেই সমষ্টি। ঈশ্বর কে ? সমগ্র জগতে যদি এক অখণ্ডরূপে চিন্তা করা যায়, তবে সেই হবে তোমার ঈশ্বর। মানুষ যতই ভগবানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, ততই সে সমুদয় বস্তুকে তাঁর ভেতরে দেখতে পায়—সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন তো এই। তখন মানুষ আর মানুষ নয়, প্রাণী আর প্রাণী নয়—ভগবান। তখন দুঃখকে সে দুঃখ বলে না, বেদনাকেও সে হাসিমুখে ভগবানের দান ব'লে গ্রহণ করে।

ভগবান বললেন, মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নেই।

তিনি সর্বভূতময়। তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড়জগত ন'ন, জগত থেকে পৃথক। কিন্তু জগত তাঁতেই আছে। যেমন সূত্রে আছে মণিহার, যেমন আকাশে আছে বায়ু। কোনো মানুষ তাঁর ছাড়া নয়, সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। আমার মধ্যেও তিনি আছেন। আমাকে ভালবাসলে তাঁকেই ভালবাসলাম, তাঁকে না ভালবাসলে আমাকেও ভালবাসলাম না। তাঁকে ভালবাসলে সব মানুষকেই ভালবাসলাম। সব মানুষকে না ভালবাসলে তাঁকে ভালবাসা হলো না—আপনাকে ভালবাসা হ'লো না। অর্থাৎ সমস্ত জগত প্রীতির অন্তর্গত না হ'লে প্রীতির অস্তিত্বই থাকে না। যতক্ষণ না বুঝবো যে, সর্বলোক আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয়নি, ধর্ম হয়নি, ভক্তি হয়নি, প্রীতি হয়নি।

ভগবান বললেন, যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রয়েছে, প্রীতিতেও তেমনি জগৎ গাঁথা। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি।

অর্জুন বললেন, কিন্তু জ্ঞানেও তো ঈশ্বর উপলব্ধি হয় ?

জানা আর পাওয়া কি এক জিনিস ? যাকে দ্বেষ করো, তাকেও তো জানো ? কিন্তু তার সঙ্গে কি মিলিত হও ? দ্বেষ করলে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অনুরাগে।

কিন্তু মানুষ তো নিরন্তর উপাসনা করছে। ভগবানকে পাবার জন্যেই করছে।

কিন্তু উপাসনা তো ভক্তি নয়, প্রার্থনা। যে যা কামনা করে,

সে তাই পায় কিন্তু ভগবানকে পায় না। ভগবানকে পেতে হলে চাই ভক্তি।

প্রেমের দৃষ্টিতে সমগ্র ক্রিয়া যে দেখে সে আর্ত। জ্ঞানের দৃষ্টিতে যে দেখে সে জিজ্ঞাসু। আর সকলের কল্যাণ দৃষ্টিতে যে দেখে সে অর্থার্থী।

এই তিন ভক্তই নিষ্কাম এবং ঈশ্বরও লাভ করে। একজন করে কর্মের দ্বারা, আর-একজন হৃদয়ের দ্বারা, আর অপরজন করে বুদ্ধির দ্বারা। কিন্তু যিনি পূর্ণ ভক্ত, তিনি সব কিছুতেই ভগবানের রূপ দেখেন; ভালবেসেই তার আনন্দ। পতঙ্গ যেমন। সে আগুনকে ভালবাসে—আগুনেই আত্মসমর্পণ করে প্রাণ দেয়। প্রেমের জন্যে প্রেম—সেই তো নিঃস্বার্থ প্রেম।

ভক্ত তার ভগবানকে মন্দিরাদিতে আবদ্ধ করে না—সে সকল স্থানেই ভগবানকে দেখে। তিনি নিত্য দীপ্তিমান, নিত্য বর্তমান।

কিন্তু সকল ভালবাসা তো এক নয়?

ভগবান বললেন, সেইজন্যেই তো ভক্তের ভগবান। যে যেমন ভাবে ভালবাসে। কেউ সন্তানভাবে ভগবানকে ভালবাসছে, কেউ পতিরূপে দেখছে, কেউ সখারূপে, কেউ প্রভুরূপে।

ভগবান যখন সন্তান হন তখন তাঁর ঐশ্বর্য থাকে না। তিনি তখন পুত্র। তখন ভক্তি কোথায়? এই প্রেমই হলো বাৎসল্য প্রেম।

আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রভু। এ-ও প্রেম। প্রেমের আর এক রূপ আছে যা সকলের চেয়ে বড়। সে প্রেম, মধুর প্রেম। এ-প্রেম, স্ত্রী-পুরুষের প্রেম। আমি স্ত্রী, তুমি স্বামী। তুমিই একমাত্র পুরুষ। জগতে আর পুরুষ কোথায়?

প্রেমের উচ্চতম আদর্শে মানুষ যখন পৌঁছোয় তখন আর জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান চলে যায়। কে-ই বা তখন জ্ঞানের জন্য? মুক্তি, উদ্ধরণ, নির্বাণ—এসব কথা মনেও হয় না তখন। প্রেম সম্ভোগ করতে পেলে কে আর মুক্তি চায়?

চেষ্টা দ্বারা, প্রয়াসের দ্বারা এ-প্রেম লাভ হয় না। চিত্ত শুদ্ধ হলেই আপনি আসে। আপন মহিমায় আপনি প্রকট হয়। ভালবাসা কখনো কি শিখিয়ে পড়িয়ে হয়, না, বলে-কয়ে করানো যায়? যার হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর দেখা দেয়, সেই মরমীই বোঝে প্রেম কি বস্তু। সে এক সহজ স্বাভাবিক স্বতঃউদ্ভূত চিত্তের অবস্থা-বিশেষ। সেখানে আয়াস-প্রয়াস বা কষ্ট কল্পনার কোনো অবকাশই নেই। তাই এ প্রেমে কোনো হেতু বা কারণের অপেক্ষা নেই। 'কেন ভালবাসি' এ প্রশ্ন যেখানে অবান্তর সেখানে প্রেম অতলস্পর্শী। গঙ্গার তরঙ্গ যেমন অজানা সাগর পানে আপনি চলে আপন টানে, তেমনি মনে প্রেমের ছোঁয়া লাগলে সে ছুটে চলে তার অ-দেখা প্রেমিকের সন্ধানে। কোনো বাধাই সে মানে না। চোখে দেখেনি, শুনেছে গুণ-কীর্তন। শোনা মাত্রই প্রাণে উঠলো ঢেউ, ছুটলো গুণনিধির সন্ধানে। এই তো নির্গুণ প্রেম—যা কোনো হেতুকে অপেক্ষা করে না।

নির্গুণ প্রেম সর্বভূতের কল্যাণে রত। সারা বিশ্বের কল্যাণ করতে হবে—এ কথা বলা সহজ, করা কঠিন। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ চিন্তা যার চিত্তে, সে তা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

সগুণ পুজো সহজ। যার যেমন শক্তি সে সেই ভাবে পুজো করে। মা-বাবার সেবা কর। শুধু দেখতে হবে, সে সেবা যেন বিশ্ব-কল্যাণের বিরোধী না হয়। যত ছোটো আকারেই সেবা করো না কেন, অপরের অহিত না হলে তা ভক্তির দরজায় পৌঁছবেই। নইলে সে সেবা হবে আসক্তি।

নির্গুণ হলো জ্ঞানময়। সগুণ প্রেমময়, ভাবময়। সগুণে যেমন আর্দ্রতা আছে, ভক্তি আছে তার চাইতেও বেশী।

অর্জুনের সমাহিত অবস্থা। সকল কিছু নিবেদন করে, ভগবানকে সম্মুখে রেখে বসে আছেন। তাঁর আর কোনো কামনা নেই। মুখে প্রসন্ন হাসি, চিত্তে পূর্ণ আনন্দ।

আনন্দই তো সব। যার আনন্দ আছে, তার সব আছে।

আমরা যে তাঁকে ডাকছি, সেটা মিথ্যা। তিনিই ডাকছেন, আর আমরা সেই দিকে ছুটে যাচ্ছি। মন দিয়ে মন টেনে নিচ্ছেন তিনি। দেহ দিয়ে দেহ আকর্ষণ করছেন, আর প্রাণ দিয়ে প্রাণ আকুল করে তুলছেন।

ভগবান বললেন, এই তো প্রেম। প্রেমে অনন্তও সান্ত হয়, অসীমও সীমার মাঝে ধরা দেয়। চেষ্টার দ্বারা প্রেম হয় না। বিশ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা—এসব নিয়েই মানুষ জন্মায়।

মানুষ যাকে ভালবাসা বলে, সেটা ভালবাসা নয়—'ভাল লাগা।' যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণ মেলামেশি। তারপর মন বদলে গেলে, আর সে ভাব থাকে না। ভালবাসা একবার হলে আর যায় না। ভালবাসার প্রতিক্রিয়া আনন্দ। ভালবাসাই জগতকে ধরে রেখেছে। জীবনকেও ধরে রেখেছে এই ভালবাসা। যেমন ধরে রেখেছে মূল গাছকে।

ভগবান বললেন, এ প্রেম আমরা মৃত্যুর কাছ থেকে শিক্ষা করি। মৃত্যু ও প্রেম একই জিনিস। যে প্রেমিক, সে মৃত্যুকে প্রিয়তমের মতো মনে করে, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে সে-ই পারে।

প্রেমিক দুঃখকে আলিঙ্গন করবে, তবু প্রেম ছাড়বে না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে তবু প্রেমকে ত্যাগ করবে না। প্রেম কি সেই জানে। তাই তো সে দুঃখ-দৈন্যে কাতর হয় না, মৃত্যুকে বাঁধে বাহুপাশে।

এ সাহস সে পায় কোথায়? ভগবান বললেন, স্বার্থের ভিত্তি দেহ, আর ভালবাসার ভিত্তি আত্মা। স্বার্থ মানুষকে নীচে নামায়, আর ভালবাসা মানুষকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে।

প্রেমই ভগবান আর তিনিই প্রেমাস্পদ। যার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ যত অধিক সে তত বড় আর সেই প্রেমাস্পদের দিকে তত এগিয়ে যায়।

নিজের সর্বোত্তম আদর্শকেই প্রিয়তমের মধ্যে দেখে আত্মসমর্পণ করে। তাদের কাছে জগতের যা কিছু সবই সুন্দর, সবই পবিত্র। কুৎসিত অপবিত্র কিছু নেই। এই প্রেমের সাধনাই বেদ-বেদান্ত, যোগ-উপনিষদ যা-কিছু সবেতে। এই প্রেমেই মানুষ গৃহী ও সন্ন্যাসী। এই প্রেমের প্রেরণাতেই জগৎ চলছে। মহাপুরুষগণ এই প্রেমেরই ঘনীভূত মূর্তি।

শেষ

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১৪

এলাহাবাদে ফৌজ রুখেছিল। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে ফোর্ট দখল করেছিল। লিয়াকত আলী স্থাপনা করতে চেষ্টা করেছিলেন স্বাধীন রাজত্ব। আগে ও পিছনে শ্মশান রচনা করতে করতে নীল এলেন সেখানে। এবার শিখ সৈন্যদের কিছু পেলেন নিজের হাতে। গোরা ফৌজ ও শিখ সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রামে ঢুকে সুরু করলো নির্বিচারে লুণ্ঠন ও নরহত্যা। এলাহাবাদে চকের বুকে এক সুবৃহৎ বটগাছে ঝুলতে লাগলো মৃতদেহ। সেই একই বর্বরতার পুনরাবৃত্তি এখানেও। বিচারের শুধু প্রহসন মাত্র। অফিসার দুরন্ত গরমে তাঁবু ছেড়ে বেরোন না। ফৌজ চ্যাঁচাতে থাকে—ত্রিশ, পঞ্চাশ, পঁচিশ।

অর্থাৎ এক এক দলে এই সংখ্যার বন্দী আছে। আর অফিসার চ্যাচাতে থাকেন—লটকাও! লটকাও! লটকাও!

কোনো নির্বোধ মেয়ে মরতে চায়। তখন কামানে বারুদ ঠেসে, তার নলের মুখে পিছমোড়া করে বেঁধে দেওয়া হয় তাকে, অথবা আর যার মুখ দেখে এই শাস্তি বিধান করেন অফিসার—তাকেও একই সঙ্গে বাঁধা হয়—এক, দুই, তিন! এই পর্যন্ত বলে মজা দেখেন অফিসার। মুখখানা নীল হয়ে যায় বন্দীদের। ভয়ে মুখ দিয়ে লালা পড়ে। এই একবার, দুইবার, তিনবার—ক'রে তারপর হয়তো কামান দাগবার হুকুম দেন অফিসার। অমনই বিকট মর্মন্তুদ এক আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো মাংসপিণ্ড হয়ে ছিটকে ছিটকে পড়ে মানুষগুলো। এক একটা বিচ্ছিন্ন মাংসপিণ্ড—কিন্তু তার থেকেও তাজা গরম রক্ত ঝরতে থাকে—ছিন্ন মস্তক আছড়ে পড়ে হয়তো এমন একজনের গায়ে, যে হবে পরবর্তী বধ্য। শকুনির দল মহা উল্লাসে উড়তে থাকে উপরের আকাশে। এর পরেই সুরু হবে তাদের কাজ। শৃগালের দল দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। এই হত্যার ক্লান্তির পর সাহেবরা বিশ্রাম করতে গেলে তারা দিনমানেই বেরিয়ে আসে। প্রকাশ্য সূর্যালোকে কাড়াকাড়ি করে ঝোপে-ঝাড়ে—যদি খুঁজে পায় মাংসের টুকরা—সেই আশায়।

মানুষগুলি কি অমানুষ হয়ে গিয়েছে? তারা কি ফিরে গিয়েছে সেই আদিম যুগে? যখন শুধু বেঁচে থাকবার জন্য একে অপরের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলতো—মানবীয় বৃত্তি যখন একেবারেই অনুপস্থিত ছিলো তাদের মধ্যে।

তাও ত নয়। তারপর সন্ধ্যায় হোক বা দ্বিপ্রহরের অবসরেই হোক—চিঠি লিখতে বসে তারা। কারু মাতা-পিতা স্ত্রী ভাই আছে সুদূর ইংলণ্ডে, কেউ বা কলকাতায় নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে এসেছে তাদের। চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ের কত জিজ্ঞাসাই না ফুটে ওঠে! কত উদ্বেগ, কত ব্যাকুলতা! আর সেই সঙ্গে নিজেদের 'heroic exploits'এর কথা। কি অসীম আত্মবিশ্বাস! কেউ লেখেন 'আমাদের শিখগুলো ভারী কৃত্তিবাজ। এদিকে ওদিকে গ্রামে ঢুকে, হঠাৎ নিগারগুলোকে তাড়া করে তারা যে মজা করে। প্রত্যেকেই অফিসারের কাছে নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে চায়। গোরাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কে কতজনকে মারতে পারে তাই নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলে। সত্যি বলছি প্রাণ ভয়ে ভীত নেটিভ বদমাসগুলো যে কান্নাকাটি করে দেখলে এদের ওপর শুধু ঘেন্নাই হবে। গ্রামকে গ্রাম আগুনে জ্বলছে—বাঁশ ফাটছে—মেয়েরা কাঁদছে, এদিকে আমরা প্রত্যেক দিন নির্মূল করে চলেছি বদমাসদের। আমাদের এই বিজয়যাত্রা সম্পর্কে বার বার আমার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে, কি অমর ইতিহাসই না রচনা করছি আমরা। এই অসভ্য মহাউপনিবেশ আমাদের এই বিজয় গৌরব কি ইংরাজজাতির শ্রেষ্ঠত্বের জয়গাথাই ঘোষণা করছে না? নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমার। আমাদের মধ্যেও কি কিছু কিছু মানুষ নেই, যাদের ধমনীতে রক্ত এসেছে ঝিমিয়ে যারা এখানে দীর্ঘ দিন বাস করেছে আর যাদের ধাতও হয়ে এসেছে নরম। তাদের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সামান্য মতবিরোধ। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে তারা যেন কিছুটা বিরূপ। তবে সৌভাগ্য বশতঃ তেমন মানুষের সংখ্যা বেশী নয়।

নির্বিচার এই নিরীহ নাগরিকদের হত্যা মন প্রাণ থেকে সত্যিই মেনে নিতে পারছিলেন না পুরনো জঙ্গীরা কেউ কেউ।

বুঢ়া ম্যাকমোহন যে কত অকেজো হয়ে গিয়েছেন, এই এলাহাবাদে বসে তা অনুভব করলেন। হঠাৎ সত্তরের প্রান্তে এসে সব হিসেব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। একটা অদ্ভুত বিভ্রান্ত অবস্থা। সামায়ক শিক্ষাদীক্ষা রক্তে রক্তে—ভিক্টোরিয়ান যুগের পিউরিটান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ তিনি। এ হলো—

They are not to make a reply
They are not to ask the reason why
They are but to do and die—

সেই শিক্ষা। পালন করতেই জন্মায় মানুষ। কর্তব্যের মূল্য বিচার যুক্তি দিয়ে করবার কোন অধিকার নেই তার।

কর্তব্য পালন করতেই এসেছেন এখানে। তবু যেন পারছেন না। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে নিজের মধ্যে চলেছে এক সংগ্রাম। ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরাজিত হচ্ছেন বুঢ়া ম্যাকমোহন।

বুড়া ম্যাকমোহন—এ নাম কে দিয়েছিলো তাঁকে? দিয়েছিলো তাঁর-ই রেজিমেন্টের সিপাহী ও রিসালা। এ নাম তাদের অন্তরের প্রীতির পরিচায়ক। আজ ম্যাকমোহনের মনে হয়, কি ভাগ্য, যে তারা ছুটি পেয়ে গিয়েছে। অযোধ্যা জেলার সেই সব কৃষাণ, রাজপুর ভূঁইয়া—তারা পেনসন নিয়ে কবে চলে গিয়েছে দেশে। না হ'লে, যদি ফোর্টের সংলগ্ন ময়দানে তাদের সঙ্গে দেখা হতো? সেই মহাবৎ আহীর—যে ভাবারের জঙ্গলে তাঁকে সাপে কামড়ালে মুখ দিয়ে রক্ত চুষে প্রাণ বাঁচিয়েছিল তাঁর? সে রাতে ঘুমে ঝিমিয়ে পড়ছিলেন তিনি। অথচ ঘুমালে সে হতো মরণ-ঘুম। মহাবৎ আর তেজপাল তাঁর দুই বগলের নিচে হাত দিয়ে তাঁকে সমস্ত রাত পায়চারি করিয়েছিলো তাঁবুর সামনে। তবু ঢুলে পড়ছিলেন ম্যাকমোহন। মহাবৎ তখন তাঁকে ধাক্কা দিয়েছে, মেরেছে—মাথাটা ঝুলে পড়ছিলো—চুলের মুঠি ধরে ধরে তুলে দিয়েছে। পরদিন ভোর হতে গাছের ডাল কেটে ডুলি বানিয়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছে গাঁয়ে। সেখানে হাকিম চিকিৎসা করে তাঁকে বাঁচায়। পরে মহাবৎ এসে অপ্রতিভ হেসে মাপ চেয়েছিলো। বলেছিলো—হুজুরকে বাঁচাতে গিয়ে কতকগুলো চড়চাপড় মারলাম। গোস্তাকি হয়ে গেল। মাপ করবেন হুজুর।

ম্যাকমোহন হাসতে পারেননি। তখন তিনি তরুণ। সেই সময়ই সরল সেই মানুষটার মুখ-চোখে কি যেন দেখেছিলেন—মনের ভেতরে কি যেন স্পর্শ করেছিল। এমনি আরো কতজনের কথা মনে পড়ে। কত বছরের জঙ্গীজীবন—কত তার স্মৃতি। তাঁকে যে এদের সঙ্গে দিনের পর দিন—রাতের পর রাত কাটাতে হয়েছে—মনে মনে এদের সঙ্গে তাঁর এক নিগূঢ় মিতালীর বন্ধন।

আজ যদি তারা থাকতো? অমনি করে কামানের মুখে বাঁধা—অমনি পশুর মতো অসহায়? তাদের সঙ্গে চোখে চোখ পড়লে কি হতো? তারা কি জিজ্ঞাসা করত না? বলতো না? যে সাহেব—এত বছরের সম্পর্ক এমনি করেই কেটে দিলে? আজ মৃত্যুর সময়ে মানুষের মতো মরতে দেবে না? মারবে জন্তুর মতো? এতই কি অপরাধ করেছি? কেন? কেন সাহেব?

কি জবাব দিতেন তিনি? অথচ তবু কি বিবেক তাঁকে শান্তি দেয়? মনে হয় তারা না হোক, এরা যে তাদেরই উত্তর পুরুষ। এই নির্বিচার হত্যায় কা'কে ভয় দেখানো হচ্ছে? এই জিঘাংসা ও ঘৃণা—কেমন করে তিনি বোঝাবেন নীলকে বা নতুন আমদানী ঐ ছোকরা জঙ্গীদের? ঘৃণা আর অত্যাচার যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে ধরছে শাসক ও শাসিতের মাঝখানে? ভুল হচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তিনি, যে ভুল হচ্ছে। ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের কোনদিনও মনে মনে সমঝোতা হবে না—ভারতীয় কৃষাণের রক্তে-মাংসে মাটিকে উর্বর করলে, তাতে শুধু ভুলের ফসলই ফলবে, তাতে করে সাম্রাজ্য রক্ষার দিক থেকে ক্ষতিই হবে।

তিনি হিন্দুদের বই পড়েছেন। তাদের মৌলভী ও পণ্ডিতদের মুখে শুনেছেন ধর্মের ব্যাখ্যা। না—বিশ্বমানবতার বড় বড় আদর্শবাদ নেই তাঁর মনে। সহজ সরল একটা বিশ্বাস বা জীবনবোধ প্রসূত তাই তাঁর মনটাকে শিখিয়েছে, যে ভালবাসা ও বিশ্বাস দ্বারা মানুষকে যত সহজে জয় করা যায়, এমনটি আর কিছুতে নয়।

বুড়া ম্যাকমোহনকে পাপামৌ-য়ে তাঁর বাংলোর সংলগ্ন বসতির শিশুগুলো অবধি ভালোবেসেছে। নির্ভয়ে কাছে এসেছে। এখন এ কি হলো? পথে চলতে চলতে তাঁর চেহারা দেখলে সভয়ে কান্না বন্ধ করে মায়ের কোল থেকে শিশু চেয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে। সদ্যবিধবা যুবতী, পতিহারা বৃদ্ধা, পুত্রহারা মা—তাঁর চোখের দিকে চেয়ে কি যেন খোঁজে। এলাহাবাদে পুরনো শহরের পথের দুই পাশে তাদের ভিড়। তারা নিরাশ্রয়, অনাথ—তারা কি করবে? কোথায় যাবে?

মনে মনে যন্ত্রণাবোধ করেন ম্যাকমোহন নিরন্তর। কিন্তু কে শুনবে তাঁর কথা? কা'কে বোঝাবেন? তবু তাঁকে যেতে হয় প্রতিদিন। সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় এই শাস্তিবিধান।

ইচ্ছা ছিল, পাপামৌ-য়ে যে গাছগুলি লাগিয়েছেন—তাতে ফুল ফুটলে তাই দেখবেন। মৌসুম শীতের দেশ থেকে পাখিগুলি উড়ে এসে তাঁর বাংলোর পুবে বিলের ধারে বাসা বাঁধলে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবেন। সেই শান্তিপূর্ণ অবসর জীবনে বসে বসে 'Fifty years in India' বইখানা শেষ করবেন। সেটাই হবে তাঁর সবচেয়ে সার্থক কাজ।

সব হিসেবই যে উল্টে গেল। ভারতকে তিনি ভালবেসেছেন? যদি উত্তরকালে এই সব মানুষের উত্তর-পুরুষ জিজ্ঞাসা করে তাঁকে? যে বুড়া ম্যাকমোহন, তুমি ভালবেসেছিলে ভারতকে? তাই ভারতের মন্দাক্রান্ত জীবনের ইতিহাস উৎসব লোকাচার ও দেশাচারের কথা লিখেছ? তবে তোমার সে ভালবাসা এমন নিষ্ঠুর গোঁজামিলে ভরা কেন? কেন সেই তোমাকেই ১৮৫৭তে ভারতের মানুষ দেখলো এক নিষ্ঠুর এক অত্যাচারী জাতের সুযোগ্য সন্তান হিসেবে? সেই তুমিই কেন দাঁড়িয়ে দেখেছ ফাঁসীতে মানুষ কি যন্ত্রণায় ঝটপট করে মরে? কামানের মুখে দাঁড়িয়ে ভারতের জোয়ানের মুখ কেমন ধূসর দেখায়?

না। কোন জবাব নেই তাঁর। এরা বলছে তিনি কাপুরুষ? যা বলে বলুক তাঁর জাতিভাইরা কোনো উত্তর দেবেন না তিনি। সমস্ত হিসেব পাল্টে গিয়েছে তাঁর। তিনি হেরে গিয়েছেন। আজকের দিনে তিনি অযোগ্য। তাঁর চেয়ে অনেক যোগ্য তাঁরই ভাগিনেয় ব্রাইট। ব্রাইটদেরই চায় আজকের শাসকরা। তিনি আজকে বাতিল।

ব্রাইট নীলের প্রিয় হয়ে উঠেছে। তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়েই হয়তো ব্রাইট বেরিয়ে যায় তার দল নিয়ে। তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়েই হয়তো বলে—বুড়োজঙ্গীদের বাতিল না করলে হবে না। তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছে।

ব্রাইটকে এড়িয়ে চলেন তিনি।

ব্রাইটের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যেন এই রক্তাক্ত পটভূমিকারই প্রয়োজন ছিলো। বরাবরই সুন্দর চেহারা তার। বালক বয়সে ম্যাকমোহনের মনে হতো তরুণ খৃষ্টের মতোই নিষ্পাপ কান্তি ব্রাইটের। একমাত্র বোন, যার প্রতি সুবিচার করতে পারেননি—তার প্রতি সকল অপরাধ স্খালন করতে চাইতো তাঁর মন। তাই ব্রাইটের ওপর সকল সুন্দর বিশেষণ আরোপ করতে চাইতেন তিনি। কিন্তু সুন্দর ঐ মুখখানার আড়ালে যে মনটা আছে, তার পরিচয়

যতই পেলেন—ততই মনটা তাঁর গুটিয়ে গেল ঘা খেয়ে খেয়ে। তারও পরে—চম্মন যখন পে-হাবিলদার—তখন এক কুশ্রী অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে তাঁদের দুজনের বিচ্ছেদ ঘটলো।

ব্রাইটও সমস্ত জীবনটা নানারকম কলঙ্কের ছায়ায় কাটিয়েছে। সবচেয়ে বড় হলো জন্মগত সূত্রে, সে যে এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পিতার সন্তান, সে কথাটা তার সঙ্গী অফিসার ও উপরিস্তনরা কোনদিনও ভোলেননি। ব্রিজদুলারীকে সে যখন ঘরে আনলো তখনও যেন বিস্মিত হলেন না কেও। সে ব্রাইট—তার কাছে এর চেয়ে বেশী আর কে কি আশা করেছে? এই যেন ছিলো সকলের মনোভাব।

ব্রাইটদেরও ট্র্যাজেডি আছে। এ দুনিয়ায় ব্রাইটরাও বড় হতে চায়। ব্রাইটের মনে হতো, সে যেন ঠিক উপযুক্ত ক্ষেত্র পাচ্ছে না। পেলে একবার দেখিয়ে দিতো। তার মনে হতো অদৃশ্য কতকগুলো বাঁধন যেন তাকে সতত নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। সীমাবদ্ধ করে রেখেছে তার গতিবিধি।

১৮৫৭ তাকে এনে দিলো সুযোগ। ব্রিজদুলারীকে সোনায় রূপোয় সে ভরে দিয়েছে। মূর্খ মেয়েটা মনে করে, সে বুঝি ব্রাইটের ভালোবাসার দান। তা নয়। সঞ্চয় করে রাখবার সে একটা পন্থামাত্র। টাকার দাম ব্রাইটের কাছে সবচেয়ে বেশী।

আর সুযোগও মিলেছে বটে। লুণ্ঠিতদ্রব্যের সব কিছুই কি সে নিয়ে আসছে? রূপোর পিকদানী আর সোনার আতরপাস নয়—সে শুধু সংগ্রহ করছে সোনার মোহর। সোনার ভারী বাদশাহী মোহর—একখানার দাম অনেক। রূপোর টাকার চেয়ে সে মোহর নিতে সুবিধে।

তা ছাড়া নেটিভ এই কালোজাতটার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক টেনে তাকেই যেন ছোট করা হয়েছিলো। এখন সেই পরিচয় অস্বীকার করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার এক সুবর্ণ সুযোগ। ব্রাইট তাই তার নিজস্ব কিছু সওয়ার নিয়ে প্রত্যহই নতুন নতুন এ্যাডভেঞ্চার খুঁজছে। হত্যায় যে এত আনন্দ, তাতে যে অবরুদ্ধ বহু কামনা বাসনাকে এমন মুক্তি দেওয়া যায়, তা ব্রাইট জানতো না। বর্ত্তমানে সে সুরু করেছে 'Surprise attack.' রাত বিরেতে হোক, বা দিনমানে যে কোন সময়ে হোক, সে আর তার অশ্বারোহী দল, এগিয়ে এগিয়ে যায়। খুঁজতে থাকে যদি কোন সন্দেহের পাত্র নজরে পড়ে। মূর্খ গ্রামবাসীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আরো দূরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ধরা পড়লে অবশ্য বলে—তারা নির্দোষ। শুধু প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করে কোন মূর্খ? ব্রাইট তাদের সেখানেই শাস্তিবিধান করে। মেয়েগুলো শিশুদের বুকে নিয়ে চুল ছিঁড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়—শরীর করে ফেলে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ব্রাইট সেদিকে তাকায় না। মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা হলো ইংরেজ জাতির বৈশিষ্ট্য। সে সুনাম আর যেই হোক, ব্রাইট কখনো ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না। যখন ফিরে আসে তারা—মেয়েদের আর্ত ক্রন্দন আকাশ চিরে তাদের অনুসরণ করে। কয় জনকে ঝুলিয়ে দিয়ে, আর বাকি কয় জনকে গুলী করে ব্রাইট যখন ফেরে—পাশের চামড়ার থলিতে সোনার মোহরগুলির চাপা ঝুন ঝুন শব্দ হয়। ঘোড়ার লাগাম আলগোছে ধরে চোখ ছোট করে চেয়ে থাকে ব্রাইট। দেখে তাকে কোনো স্বপ্নদর্শী কবি বা শিল্পী মনে হয়। মুখে একটা আনন্দের নিমীলিত হাসি—স্বপ্নচারী দুই নীল চোখ এখন ধূসর দেখায় মমতায়—মনে হয় না যে এর সঙ্গে কয়েক মাইল পেছনে ফেলে আসা সে সর্বনাশের দৃশ্যের কোন যোগাযোগ আছে।

সেদিন ব্রাইট কি খবর পায় কে জানে! রাত তিনটে থাকতে রওনা হয়ে যায় কানপুর রোড ধরে। কানপুর রোডের ওপর লালোয়া গ্রাম! ছোট এ গ্রামটি এতদিন ডাকগাড়ীর 'ট্রানজিট হল্ট' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। লালোয়ার ভূস্বামী কোম্পানীর অনেক দিনের অনুগত প্রজা। তিনি কিছু লোক সংগ্রহ করে হল্ট বাংলো আর লালোয়াকে এই সাময়িক উন্মত্ততা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর নাম শাদা খাতায়। তবু লালোয়া গ্রাম অভিমুখে এ অভিযান কেন?

ম্যাকমোহনের মনে হয় চিন্তিত হবার কারণ আছে। তিনি বলেন—এর ফলে সেই বিশ্বস্ত মানুষগুলোর মনে অযথা অবিশ্বাসই সৃষ্টি করা হবে। সেখানকার তালুকদার ত' টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন আমাদের।

নীল এত ভাবতে চান না। তাঁর কথা তোলো—যদি সেখানে শঙ্কিত হবার কোন কারণ না থাকে তবে বেলা দশটার মধ্যেই ফিরে আসবেন ব্রাইট-রা। যে নির্দোষ তার আর শঙ্কা কি?

সেই রাতে চম্মন বহুদিন পর নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছিলো লালোয়ার হল্ট বাংলোতে। অনেক দিন পরের ঘুম। নিজের খাকী ব্যাগটি জাপটে ধরে তার ওপর মাথা রেখে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিলো চম্মন। বৃদ্ধ মানুষটির মুখখানা দেখাচ্ছিলো শিশুর মতো। তেমনই নিরুদ্বিগ্ন। ডেরাপুরে পৌঁছনো আর হয়নি চম্মনের। সোজাসুজি দক্ষিণে নেমে আসবে পিলভিত হয়ে নামবে আরো দক্ষিণে—ডাকগাড়ীর পথ ধরে পৌঁছুবে, কানপুরে—তার পর আরো দক্ষিণের পথে তার গ্রামে পৌঁছুবে এই ছিলো তার পরিকল্পনা। কিন্তু সাকাখানা ছেড়ে আসবার আগেই খবর এলো নৈনিতালের দিক থেকে। কোম্পানী সাহেবের সিপাহীরা রুখে গিয়েছে।

চম্মন সে কথা কানেও নেয়নি। কোম্পানীর সিপাহীরা অমন রুখে ওঠে মাঝে-মধ্যে সে কথা সে নিজেও জানে। আবার মূর্খ সেই সব মানুষকে কেমন করে জব্দ করতে হয়, তাও জানে কোম্পানী। চম্মনের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী কোম্পানীই হলো সর্বশক্তিমান দেবতা। তার মতো ক্ষমতা বুঝি ভগবানেরও নেই। কয়টা মানুষ যে কোথা থেকে উড়ে এসে একেবারে কায়েম করে ফেলেছে তাদের রাজ—এতেই ত তাদের প্রতিপত্তি বোঝা যায়। চম্মনের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সাহেবরা দেবতা। দয়া আর শাসন দুই-ই তাদের আছে। শাসন যে আছে, সে ত' দেবতারই এক হাতিয়ার। কঠোর না হ'লে মানুষকে সে দমন করবে কি করে? আর দয়া? এক বুড়াসাহেব, তার ম্যাকমোহন সাহেব তার কাছে সকল সাহেবদের সকল অক্ষমতা ঢেকে দিয়েছে। দয়া, করুণা, ভালবাসা, স্নেহমমতা, বুড়া ম্যাকমোহনের কথা মনে হলে চিরদিন চম্মনের অন্তর থেকে উঠবে এই ডাক—সাহেব, তুমি আমার মা-বাপ।

দীর্ঘ দিন এই সাকাখানার নির্জন পরিবেশে বাস করেছে চম্মন।

ইদানীং সে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বর্ত্তমানকাল থেকে। সিপাহীদের ক্ষেপে যাবার খবরটাকে সে কাজেই গুরুত্ব দিল না। বরঞ্চ ম্যাকমোহন সাহেবের চিঠির জবাব পেয়ে পত্রবাহককে দিয়ে সে চিঠি বার বার পড়িয়ে নিল। সাহেব লিখেছেন—'চম্পনের সাহেব একদিন লিখেছিল বটে—যাও, আপনা ঘর মেঁ ঘি কা দিয়া জালাও, তৈরী হোক চম্পন, আসছে সাহেব। কিন্তু নানা কারণে তা আর সম্ভব হচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে সেদিন আজও আসেনি। নাই বা হলো এবার—আবার ভবিষ্যতে হবে। চম্মন কি বলবে—তাঁর কি দুঃখ হচ্ছে না? সেই জঙ্গলে শিকার ত' শুধু নয়, ঝর্ণায় মাছ ধরবার প্রলোভনও ত' ছিলো। যাক, চম্মনের সাহেব বুড়ো হয়েছেন বটে—তবে এত বুড়ো হননি, যে চম্মনের নিমন্ত্রণ না রেখেই মরে যাবেন।'

সাহেব লেখেন উর্দু-ভাষায়, কিন্তু নাগরী হরফে। ছোটছেলেরা যেমন পণ্ডিতের কাছে লিখবার পরীক্ষা দেয়, তেমনই ধরে ধরে লেখা লাইনবাঁধা অক্ষরগুলি। চম্মন চিঠিখানা ওপর থেকে নিচে, নিচ থেকে ওপরে—নানা ভাবে শুনলো। কই, তার মধ্যে ত' কোন হাঙ্গামার কথা লেখেনি সাহেব? কেন লেখেনি? তবে নিশ্চয় গোলমাল বেশী নয়।

কিন্তু তার পরে তার আর সে নিশ্চিন্ত ভাব রইলো না। বেরিলী থেকে সাহেবরা পালিয়ে এলেন। চলে গেলেন নৈনিতালের নিরাপদ আশ্রয়ে। যাবার পথে তাকে বলে গেলেন—বুঢ়া, তুমিও পালাও—এখানে হাঙ্গামা নেই। হতে কতক্ষণ?

তার পর কয় দিন ধরে নিশ্চিন্ত সেই বনভূমিতে যেন ঝড় বয়ে গেল। আতঙ্কে গ্রামবাসীরা পালাবার চেষ্টা করলো বনপথ ধরে এদিকে ওদিকে গিয়ে। বাঙ্গালীবাবুরা পরিবার নিয়ে পালালেন নৈনীতালে। বলে গেলেন—তোমার কাছে যা আছে নিয়ে পালাও। খুব মুস্কিলে পড়েছ।

চম্মন ত' চিন্তিত হয়ে পড়লো। সাহেখানার আসবাবপত্র, বাসনকোসন, সামান্য ওষুধপত্র, সবই তার জিম্মায়। বুদ্ধি করে সে সব জিনিষ টেনে টেনে এনে একটা ঘরে বোঝাই করলো। কয়টা অর্কিডের টব ঝুলছে বারান্দায়। ম্যাকমোহন বলতেন—এগুলো বড় দামী।

একখানা জাহাজের ডেকে মরণোন্মুখ এক আহত বীরের ছবি—সকলে তাঁকে ঘিরে রয়েছে—সাহেব বলতো, এ ছবিও না কি বড় দামী। চম্মন অনেক ভেবে ভেবে বিশাল সে ভারী ছবিখানাকেও নামালো টেনে। নিয়ে রাখলো তালাবন্ধ ঘরে। আর অর্কিডগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পাতলা চুলগুলো টানতে লাগলো। দামী যদি হয় তো তাকে সুরক্ষিত করাই উচিত। অনেক ভেবে ভেবে চম্মন সে অর্কিডগুলো এ্যাকাসিয়া গাছের ডালে বেঁধে দিলো। জল ছিটিয়ে দেবার মানুষ না থাক। রাতভোর হিম পড়বে—তাতেই বেঁচে যাবে গাছগুলো।

আরো কত টুকিটাকি—বাগান করবার কোদাল, খুরপী, ঝুড়ি—ঘাসনিড়োবার যন্ত্র। সব টেনে টেনে নিলো সেই ঘরে।

তার পর ঘরটা তালাবন্ধ করলো চম্মন। তালা বন্ধ করে একটা চাবি নিজের কাছে রাখলো। আর একটা চাবি গুঁজে রাখলো কাঠের দেওয়ালের ফাঁকে।

নিজের জিনিষপত্র ভরে নিলো খাকী একটা ব্যাগে। আর তার সঙ্গের সাথী, ম্যাকমোহনের সেই পুরনো সার্টিফিকেট, তার ফৌজী-জীবনের কাগজপত্র, তার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন কলিন্‌সের চিঠি, এই জঙ্গলে শিকার করতে এসে তার সমাদরে পরিতুষ্ট অফিসারদের প্রশংসাপত্র, এই সব নিলো গুছিয়ে। টাকা জমিয়ে জমিয়ে দুইখানা মোহর কিনেছিলো—তা-ও নিলো পেটকাপড়ে বেঁধে। জল খাবার জন্য পেতলের ঘটি নিলো একটা, পেতলের ছোট একটা থালা আর একটা ছোট হাঁড়ি। সঙ্গে রইলো চকমকি। পথে এমনি ভাবে চলতে ফিরতে সে অভ্যস্ত। এমনি করে চলতে চলতে পথের পাশে বসে আর কিছু না হোক, চেয়ে নিলে দুটো চাল আর এক ছটাক ঘি সর্বত্র-ই মিলবে। তিনখানা পাথর পেতে কাঠকুটো জেলে দুটো ভাত সে রান্না করে নিতে পারবে। আর তা-ই বা কেন—আধসের আটা মিললে লেটি বানিয়ে সেঁকে নেবে—আর কোনটাই যদি সুবিধে না মনে হয় তাহ'লে যে কোন গৃহস্থ কৃষাণের বাড়ী গিয়ে দাঁড়াবে। অতিথি হয়ে সেবা নিতে নিতে পৌঁছিয়ে যাবে ডেরাপুর।

বাইরে টালমাটাল—বলওয়া সুরু হয়েছে—চম্মনের মনটা অনেক দিন বাদে গৃহীমানুষের মতো কথা কইছে। কেমন যেন ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে প্রতাপের কাছে। পুত্রবধূ দুর্গার মুখের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। সে যায় আর চলে আসে। দুর্গা সেই কয় দিন কতরকম জিনিষই যে রেঁধে তাকে খাওয়ায়। আসবার সময়ে সঙ্গে বাড়ীর ঘি, আচার, পাঁপড় দিয়ে দেয়। মিষ্টান্ন বানিয়ে বেঁধে দেয় নতুন কাপড়ের টুকরোয়। তারপর রাত্তিরে পায়ের কাছে বসে নতমুখে শ্বশুরের সব নির্দেশ শোনে—আর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে চম্মনের পায়ে।

চম্মনের অমন নাতিটা, সে-ও বেহাত হয়ে গেল। চম্মন এবার চন্দনকে ধরে নিয়ে যাবে ঘরে। সেই মেয়েটার সঙ্গেও একটা ফয়সালা করবে দরকার হলে। আসলে নিজের ঘর সংসারটা বেশ বেঁধে ফেলা দরকার। চম্মনের মনে হয়, সংসারটা বেশ মুঠোর মধ্যে ধরা থাকলে, তবে যেন এই সব দিনের ঝড়ঝাপটা বুক দিয়ে রোখা যাবে।

উৎরাই-এর পথ ধরে চম্পন। প্রথম দিন না হলে-ও দ্বিতীয় দিন থেকেই তার চোখে পড়ে বলওয়া কি কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। বড় বড় গ্রাম, প্রায় জনশূন্য। মানুষ ত্রস্তে চলে গিয়েছে, তাই ঘর বন্ধ করে রেখে যেতে পারেনি। গরু, ছাগল, ভেড়া যারা নিতে পারেনি তারা ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। আশে-পাশে ঘাসের অভাব নেই—তবু সেই মূক পশুগুলি বড় বড় চোখ তুলে শুধু মানুষ খুঁজছে—পরিচিত কেউ এলো কি না, তাই দেখছে। গ্রামের এমন অবস্থা হয়, জানে চম্মন। যখন সাক্ষাৎ কোন শয়তান এসে ঢোকে বাঘের শরীরে—মানুষের রক্ত ছাড়া যার তৃপ্তি নেই—তখন গ্রামের মানুষ কিছুতেই যুঝতে পারে না সেই দানবের সঙ্গে। তারা তখন গ্রাম ছেড়ে চলে যায় অন্য গ্রামে! আর গ্রামের প্রধানরা এসে দরবার করে চম্মনের-ই কাছে। চম্মন যেন তাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করে। আর্জিনামা লিখে আনে কখনো তারা। চম্মন নিজের দর বাড়ায়। নানাবিধ অসুবিধা আর বন্দুক যে কি রকম অকেজো হয়ে পড়ে আছে সেই কথা-ই বলে বার বার। শেষ অবধি

টোটার দাম দেয় তারা—চন্দনকে খাওয়ায়, খোসামোদ করে। চন্দন ঐ সম্মানটুকু চায়। শিকার করাও তার খুব-ই ভাল লাগে। সে তারপর 'মড়ি' ফেলে মাচা বেঁধে-ই হোক, বা যে করে-ই হোক—সে বাঘকে মারে। ভাগ্যক্রমে বাঘগুলো বুড়ো না হলে শয়তান আত্মাটার সুবিধে হয় না। তাই চন্দনকে খুব কষ্ট করতে হয় না। অবশ্য একেবারে তাজা জোয়ান বাঘ, সবে পাঁচ ছয় বছর বয়স—সে-ও যে মানুষখেকো হয় না তা নয়। তেমন বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা-ও চন্দনের আছে বই কি!

বলওয়া তাহ'লে তেমনিই কোন শয়তানের রুদ্রতাণ্ডব হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এখানে। সেইজন্য এই নির্জনতা? আরো নিচে নামতে অরণ্য কম, জনপদ বেশী। সেখানে হাটের চালাঘরগুলি ফাঁকা পড়ে আছে, খাঁ খাঁ করছে অঙ্গন। পরিশ্রান্ত চন্দন ইঁদারার ধারে যেতেই বিশ্রী একটা গন্ধ পেলো।

গন্ধটা আসছে তার পরিচিত এক ডাকরাণারের থেকে। এই ডাকরাণার জাতে গাড়োয়ালী, এবং এই পার্বত্য পথে-ঘাটে চলতে সুপটু। এ পথে ডাকরাণার তাই এদেরই নিযুক্ত করা হয়। চন্দন এর নাম জানে না, কিন্তু মুখ চেনে। প্রয়োজনে এ মানুষটি অনেকবার এসেছে সাকাখানায়।

এখন পড়ে আছে চিৎ হয়ে। রোগা ছোটখাটো শরীরটা ফুলে হয়েছে ঢোল। গলার এপাশ থেকে ওপাশ অবধি কাটা। সেখানে মাছি ভন্‌ভন্ করছে। কুকুর বেড়ালে বোধ হয় টেনে ছিঁড়ে খেয়েছে কিছুটা। ডাকব্যাগ আর চিঠিপত্র ছিটিয়ে পড়ে আছে।

রাম রাম! বলে সরে আসে চন্দন। ইঁদারার ধারে বসে সমস্ত গা গুলিয়ে ওঠে। বমি হয়ে যায় সব। অনেকক্ষণ ঝিম ধরে থাকে। তারপর জল তুলে ইঁদারার পাড়ে বসে স্নান করে। জল খায়। এবার এদিকে ওদিকে তাকায়। না। বিপদ যেন চতুর্দিকে। হাটের আঙিনা ঘোড়ার খুরে খুরে চষে ফেলেছে কারা। এদিকে ওদিকে মাটির দেয়ালে গুলীর ফুটো। শূন্য কার্তুজের খোলও পড়ে আছে। কি যেন হয়ে গিয়েছে। ঐ মানুষটাকে কে মারলো? কেন মারলো?

চন্দনের মনে পড়ে পলায়নপর গ্রামবাসীদের কথা। তারা বলেছে—সরকারী কাজের কোনো মানুষ দেখলেই ওরা মারবে। তুমিও পালাও বুড়া।

এই ডাকরাণারকে কি সেইজন্যেই মরতে হলো? সে সরকারের কাজ করতো বলে? এই কি তাহলে বলওয়া?

সহসা চন্দনের মনে হয়, সে খুবই বিপন্ন। কেন মনে হয়? অভিজ্ঞ শিকারীর সতর্কতায় কান পাতে সে। বিপরীত মুখে বাতাস আসছে। কোন সঙ্কেত আনছে সে বাতাস? মনে হয় পুবদিক থেকে যেন ক্ষীণ হলেও ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসছে। এদিক ওদিকে চেয়ে চন্দন তার থলিটা কাঁধে বেঁধে নেয়। পরে নেয় জুতো। তারপর ঢুকে যায় জঙ্গলে। সুনিবিড় বন। ঘন ঝোপঝাড়। মিহি একটা আতপচালের গন্ধ লেগে আছে বাতাসে। শঙ্খচূড়ের মিথুনের সময় এটা। মিথুনকামী কোন শঙ্খচূড়ের গায়ে যদি পা তুলে দেয় সে, মৃত্যু হবে অনিবার্য। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। একেবারে স্থির হয়ে যায় চন্দন। গাছের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যায়। ঘোড়ার পায়ের শব্দ আসে নিকটে।

দশ-বারোজন অশ্বারোহী। উন্নত চেহারা, গৌরবর্ণ, দেখে মনে হয় রোহিলা পাঠানই হবে। তারা নামে। ঘোড়াগুলোকে টেনে আনে। সামনে পড়ে আছে যে মৃতদেহ—সেদিকে চেয়ে নাকে কাপড় দেয়। জল তুলে নিজেরা খায়, ঘোড়াকে খাওয়ায়। তারপর নিজেরা হাটঘরের বারান্দায় বসে। ঘোড়াগুলিকে চরতে দেয়। ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘোড়া। সওয়াররা কি কথা নিয়ে তর্ক করে। সব কথা বোঝে না চন্দন, তবে বেরিলী—কাশীপুর—এমনি কতকগুলো নাম ছিটকে ছিটকে তার কানে আসে।

তারপর ঘোড়া নিয়ে চলে যায় তারা। যে পথ দিয়ে চন্দন এসেছে, সেই পথই ধরে।

চন্দন এবার জঙ্গলের নিরাপদ রাস্তাই ধরে। হাজার হলেও এ তার জানা পথ। এখানে কোন ভয় নেই তার। জঙ্গলটা তার সঙ্গে বেইমানী করবে না। দুজনে অনেক দিনের বন্ধু।

প্রবল প্রতিকূল অবস্থা চন্দনকে বার বার বাধা দেয়। কিছুতেই ডেরাপুরে পৌঁছুতে পারে না চন্দন। শেষ অবধি সে এলাহাবাদের পথ ধরে। এলাহাবাদে বুড়া ম্যাকমোহনকেও পাওয়া যাবে, এ একটা বিধিদত্ত বর ব'লে মনে হয় তার।

পথে বার বার কোম্পানী সাহেবের ফৌজও তাকে রুখছে। সেখানে সে ফৌজীস্থালুট দিয়ে সাহেবের সার্টিফিকেট আর চিঠি খুলে ধরে অন্য সাহেবের সামনে। সেই চিঠিই হয়েছে তার ছাড় চিঠি। চন্দন যখন প্রথম নেমেছিলো সমতলে, তার হাঁটা ছিলো অদ্ভুত—পাহাড়ের পথে চলে অভ্যস্ত পা—সমতলে পা ফেলতো সে বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে—অদ্ভুত ভাবে।

কিন্তু এই স্বল্প সময়েই সে যা যা দেখলো, তাতে চন্দনকে একেবারে বুড়িয়ে দিলো। মর্মন্তুদ ও বিভ্রান্তকর সে অভিজ্ঞতার ভারে ক্লান্ত চন্দন একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেল। অথচ ঈশ্বর জানেন, এই সেদিন অবধি মনে-প্রাণে তার কতখানি তারুণ্য ছিলো।

চারি পাশে শুধু মৃত্যু। এই মৃত্যু শিকারীর পরিচিত মৃত্যুর মতো পরিচ্ছন্ন ও সহজ নয়। এ মৃত্যুতে ঘৃণার গন্ধ। ভয়ের আভাস। মানুষ মানুষের রক্ত দেখতে এত ভালবাসে? তার জন্মকালের পরিচিত কোম্পানী সাহেব, যে সরকারকে সে দয়া ও ন্যায়ের অবতার বলেই জানে, এ তার কি ব্যবহার? এ যেন একটা শত মুণ্ডবিশিষ্ট দানব। শত মুখে রক্তপান করছে, এবং আরো রক্ত চেয়ে লকলক করছে জিভ। চন্দনের অন্তরাত্মা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। বধ্যভূমিতে আনবার পর, সাহেবদের সহযোগী শিখসৈন্যদের দিকে চেয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত সিপাহীরা কি ঘৃণার সঙ্গে টিটকারী দিচ্ছে। বলছে—পাঞ্জাবে তোমার মা-বোনকে পথে বসিয়ে, তোমার বাপ-ভাইকে শূয়োরের মত খুঁচিয়ে মেরেছে যে ইংরেজ, তারই সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতভাইকে মারছ? লজ্জা নেই?

পাঞ্জাবের শিখরাও সমান ঘৃণার জবাব দিচ্ছে। বলছে—যা, দিল্লীতে মোগলসাহী কায়েম করগে যা। আমাদের গুরুর ভবিষ্যদ্বাণী ঐ তৈমুরবংশ আর থাকবে না।

এ ওকে ঘৃণা করছে—এত ঘৃণা কোথায় ছিল? এ কি হচ্ছে

দিন দিন? মানুষগুলো এত অমানুষ? চন্দনের মনে হয়, এই নরকটাই বুঝি সত্য—তার সে জঙ্গল, সাফাখানা, আর পরিচ্ছন্ন জীবন সে বুঝি কোথাও নেই। মনে হয়, এই ঘৃণা ও আতঙ্ক ও রক্তের গন্ধ তাকে চিরতরে নোংরা করেছে। সে আর শুচিশুদ্ধ হতে পারবে না।

বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছে তার মাথায়। কিছু বুঝতে পারছে না চন্দন। তার শুধু মনে হচ্ছে, কোন মতে বুড়া সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরবে। বলবে—সাহেব, তুমি মা-বাপ, তোমার গোড় লাগি—তুমি আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও।

এলাহাবাদের উপকণ্ঠে লালোয়ার হল্টবাংলোতে পৌঁছিয়ে, এলাহাবাদ এখান থেকে মাত্র ছয় মাইল জেনে সেই রাতে তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোল চন্দন। অনেক দিন বাদে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্নে কোন নিহত তরুণের রক্তাক্ত দেহ, বা ফাঁসীতে ঝুলতে ঝুলতে বলিষ্ঠ দেহ কোনো কৃষাণের গলার বোবা আর্তনাদ তাকে ভয় দেখাল না। বরঞ্চ অনেক দিন বাদে চন্দন স্বপ্নে দেখলো, সে চলেছে সবুজ ঘাস দিয়ে—তার পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে একটা ঘুঘাল। সেটাকে, নিয়ে আসতে মনে হলো ঘুঘালটা বাচ্চা। তার মুখটা চেটে দিয়ে ঘুঘালটা ডেকে উঠলো। ছেড়ে দিলো তাকে চন্দন। মুখে তার হাসি ফুটে উঠল।

তখনই ভোরের আলো ফুটেছে, আর ব্রাইট পৌঁছিয়েছে সেই হল্ট-এ।

ঘুম ভাঙতে লাফিয়ে উঠে যখন গোরাফৌজ দেখলো চন্দন, বুক থেকে তার পাষাণ ভার নেমে গেল। বেরিয়ে এলো বারান্দায়। নেমে এলো সাহেবের হুকুমে। আর সে সাহেবকে ব্রাইট বলে যখন চিনতে পালো চন্দন, আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল ফেটে বেরুলো। ব্রাইট আগে তার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছে, সব ভুলে গেল সে। মনে হলো ব্রাইট ম্যাকমোহনের ভাগ্নে। নিশ্চয় তাকে বুড়া সাহেবই পাঠিয়েছেন। ব্রাইটের জন্ত বুকের মধ্যে একটা আশ্চর্য বাৎসল্য মিশ্রিত গর্ব অনুভব করলো সে। চোখ হাতের পিঠ দিয়ে মুছে সে এগিয়ে এল ছোট ছোট শিকারী পদক্ষেপে। সাহেব! সাহেব! আমার ছোট সাহেব! এই ছাড়া মুখে আর কোনও কথা বেরুচ্ছিল না তার।

মানুষটার মজার আচরণ দেখছিলো সবাই মিলে। এখন, যখন মানুষটাকে চন্দন বলে বুঝলো ব্রাইট, তখনই সে পিস্তল তুললো। ব্রাইট যে পিস্তল তুললো, চন্দন সেটা, দেখলো না। কারণ হলো দৃশ্যমান অনেক কিছুই তার চোখে পড়ছে না। সে যে এতদিন পরে ব্রাইটকে দেখতে পেয়েছে, যে ব্রাইট ম্যাকমোহনেরই ভাগ্নে—সেই ব্রাইট তাকে সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে, আর এই সব ঘৃণা ও ভয় দেখে দেখে তার ক্লিষ্ট মন প্রাণ নিয়ে সে সাহেবের পা ধরবে—ধরে বাড়ী ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করবে—এই চিন্তাগুলো ছাড়া আর নতুন কোন কিছু বোঝবার ক্ষমতা যেন তার মাথায় নেই। আর নতুন কোন কিছুই সে গ্রহণ করতে পারবে না মাথায়।

ব্রাইট পিস্তলটা যে তুললো, তার সে ভঙ্গীর মধ্যে কোন তাড়াহুড়ো ছিল না। চন্দনকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চিন্তাটা তার মাথায় পরিষ্কার একটা বোধে গিয়ে দাঁড়ালো। একখানা ছবি যেন মাথার মধ্যে ছাপ কেটে বসে গেল। এ সেই চন্দন, যার জন্ত তার সঙ্গে তার মামার বিরোধ—যে তার জীবনের একটা অবাঞ্ছিত অভিজ্ঞতা এনেছিলো—সে বুঝতে তার দেরী হলো না। এইখানেই ব্রাইটের বিশেষত্ব—যে প্রয়োজনের সময়ে সে অতি দ্রুত বুঝতে পারে সব।

ব্রাইটের পিস্তলে টিপ ভুল হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না বিশেষ করে গুলীর লক্ষ্যস্থল যখন একেবারে সামনে অত বড় একটা মানুষ। তবু ব্রাইট ঝামেলা এড়াবার জন্তেই বোধ হয় পর পর দুটো গুলী করলো।

চন্দনের চোখ থেকে সে অশ্রুর ধারা শুকোবার আগেই গুলীটা লাগলো গলায়। উপুড় হয়ে দুটো হাত এগিয়ে দিয়ে তবু সে এগিয়ে এলো দুই পা। ব্রাইটের দ্বিতীয় গুলীটা পিঠের দিকে পাঁজরে লাগতে সে পড়ে গেল বটে, কিন্তু সে গুলীটা বাজে খরচই হলো বলা চলে। কেন না, চন্দন প্রথম গুলীতেই মরতো আর অমনি করেই পড়তো।

বুকের ভেতরে কলজেটা কমজোরী হয়ে এসেছিলো, তাই দেরী হলো না চন্দনের। পা দুটো স্থির হয়ে গেল যখন, তখন লক্ষ্য করা গেল যে পায়ের ওপরে গোছার মাংসপেশীটা খুব সুপুষ্ট ও তাজা দেখতে। পাহাড়ে হেঁটে চলে ওরকম হয়েছিল।

চন্দন উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ আগেকার নিদ্রিত চেহারাটার সঙ্গে এখনকার চেহারারও খুব সাদৃশ্য আছে। তেমনই নিশ্চিন্ত ভঙ্গী। তেমনই শিশুর মতো নিরুদ্বেগ ভাবে মাথা হেলানো। তফাতের মধ্যে, তাজা রক্ত ডানদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটির ওপর ফেনা হয়ে জমে যাচ্ছিলো।

চন্দনের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে ব্রাইটরা যখন ঘোড়ার মুখ ফেরালো, তখন বেলা হয়েছে।

সেই পরিচিত থলিটা আর তার কাগজপত্রগুলো সামনে বিছিয়ে বিমূঢ় ম্যাকমোহন বসে রইলেন। যে লোকটার বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ পাওয়া যায়নি, এতগুলো শত্রুর ঘাঁটি পেরিয়ে, নিজেদের প্রহরীদের উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে খুসী করে যে এতদূর এসেছিলো, আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী যে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছিলো ব্রাইটের দিকে, তাকে হত্যা করার পেছনে কোন্ যুক্তি আছে?

তাঁর লেখা সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে গিয়েছে। তার পেছনে আঠা দিয়ে কাপড়ের গায়ে সেটা আবার সাঁটা হয়েছে। আরো কত সার্টিফিকেট—এই চাবিটা বুঝি সাফাখানার।

সেই কাগজপত্রের সামনেই মাথার টুপিটা খুলে বসে রইলেন আফঘান যুদ্ধের জঙ্গী, পিণ্ডারী দমন করা বুড়া ম্যাকমোহন। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে মাথা অল্প অল্প নাড়তে লাগলেন। আর হবে না। আর চলতে পারবেন না তিনি। ভেতরে কোথায় যেন কি ভেঙে গেল মট করে।

একেবারে হেরে গিয়েছেন তিনি। পরাজয়ের সে কলঙ্ক কালিমা আজ তাঁকে এমন করে গ্রাস করেছে যে আর মুক্তি পাবেন না তিনি।

তবে কি করবেন ম্যাকমোহন? কোথায় যাবেন? কি করবেন?

প্রশ্নটা অন্তর থেকে উঠে তাঁবুর দরজা দিয়ে অন্ধকারে ঘুরে আবার তাঁর কাছেই ফিরে এল। [ক্রমশঃ।
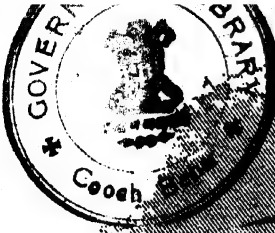
বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

সাত

'বিকোলীনা'য় ফিরে গিয়ে আবার সুরু হল আমাদের দৈনন্দিন জীবন। সেই সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে সার্জ্জারীতে যাই, দুপুরে ফিরে এসে লাঞ্চ খাই, একটু বিশ্রাম করে বিকেলে চা খেয়ে আবার যাই এবং ঘণ্টাখানেক থেকে ফিরে আসি। সন্ধ্যাবেলাটা মার্লিনের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিই কিংবা হয়ত কোনও কোনও দিন ডিনার খেয়ে দুজনে বেড়াতে বেরুই।

রবিনহুড গলফ ক্লাবেও আগেরই মতন যাওয়া সুরু করেছি—অর্থাৎ রবিবার দিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়েই চলে যাই, সমস্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি যদি অবশ্য দিনটা ভাল থাকে। এ ছাড়া বুধবারের বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে যাই যেমন আগেও যেতাম। কিন্তু এবার অতি সহজেই লক্ষ্য করলাম, মার্লিনের ক্লাবে যাওয়ার আগ্রহ আর একেবারেই নাই। নানান ছুতোয় ক্লাবে যাওয়াটা কাটিয়ে দিতে পারলেই সে যেন বাঁচে।

শুধু তাই নয়, এটাও লক্ষ্য করতে আমার দেরী হল না যে, জীবনযাত্রায় মার্লিনের মনের সেই আনন্দ ভরা উৎসাহ মার্লিন যেন এবার হারিয়ে ফেলেছে। সবই করে, কাকর্ম্ম সুনিপুণ ভাবে করে যায়, আমারও সেবা যত্নের ত্রুটি এতটুকু ধরার উপায় নাই—তবুও কেমন যেন উদাসীন অন্যমনস্ক ভাব আগের সে প্রাণের সাড়া যেন ঠিক পাইনা। এ নিয়ে কিছু যে ভাবিনি তা নয়। সেই লুর শেষের দিক থেকেই মার্লিনের মনের এই পরিবর্ত্তনটি সুরু হয়েছে, ভেবেছিলাম সেলে ফিরে গিয়ে দৈনন্দিন জীবন সুরু হলে সব যাবে কেটে কিন্তু কাটল না ত। মনে নানা প্রশ্ন জাগে। আমাকে কি আর তেমন ভাল লাগছে না? যে 'লু'তে প্রথম জীবনে মার্লিন আমাকে নিয়ে মশগুল হয়ে তন্ময় হয়ে ছিল সেই 'লু'তে এবার গিয়ে কি মার্লিন আবিষ্কার করল—আমার মধ্যে সে জিনিষ আর নাই? তাই কি মার্লিন মুষড়ে পড়েছিল? তারপর ভাটিমুরে রোলাণ্ডকে দেখে মার্লিন কি বুঝতে পেরেছিল যে সে জীবনে ভুল করেছে সহজ ও আনন্দময় পথটি সে হারিয়েছে তেলে জলে মিশ খায় না? এ সব কথা যদিও মনে ওঠে কিন্তু মন এ সব কথা মানতে রাজী নয়। তাই নানান দিক দিয়ে মনকে বোঝাই। কিন্তু মার্লিনের এই ভাবান্তরের সন্তোষজনক কারণ কিছু খুঁজে পাইনি।

ফিরে আসার পর মাসখানেক পর্য্যন্ত মার্লিনের যখন এই ভাবটি চলল—কাটল না—তখন একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মার্লিনকে সোজা প্রশ্ন করলাম। খেয়ে-দেয়ে কফি নিয়ে আমরা দুজনে লাউঞ্জে বসেছিলাম—মার্লিন বসেছিল আমারই কৌচের হাতলের উপরে, যে রকম বসতে মার্লিন ভালবাসত।

ডাকলাম, লীনা।

উত্তর দিল, উঁ।

বললাম, তোমাকে একটা প্রশ্ন করব?

বলল, কি?

শুধালাম, তোমার কি হয়েছে?

বলল, কৈ—কিছুই না ত।

বললাম, আমার কাছে লুকিও না লীনা! আমার কি চোখ নেই? আমি কি দেখতে পাই না যে তোমার সেই আগের আনন্দময় সহজ ভাবটা আর নাই। কেন হারাল?

চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না। পিঠের নীচে হাত দিয়ে একটু কাছে টেনে নিলাম। বললাম লীনা! আমাকে বল, আমার কাছে কোনও আড়াল রেখ না।

হাতলের উপর থেকে নেমে এসে মুখটি রাখল আমার বুকের উপরে। চুপ করেই রইল। শুধু পড়ল একটি প্রাণঢালা দীর্ঘশ্বাস।

সস্নেহে বললাম, লীনা! বলবে না?

হঠাৎ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে সুরু করল—সহজেই বুঝতে পারলাম।

আদর করে শুধালাম, লীনা! কি হয়েছে তোমার?

চাপাগলায় ধীরে ধীরে বলল, বিকো! বিকো! আমাকে ভুল বুঝ না। জীবনটা বড় নিষ্ঠুর।

* * * *

যাই হোক, যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় মাস দেড়েক পরে মার্লিনের ও-ভাবটি আস্তে আস্তে গেল কেটে। আবার যেন ফিরে

এল সেই প্রাণঢালা সহজ প্রফুল্লতা। আমারও মন ক্রমে খুশীতে উঠল ভরে। মনকে বোঝালাম—মেয়েদের মাঝে মাঝে ওরকম মানসিক ভাবান্তর একটু আধটু ঘটে, ওটা ওদের স্বভাবগত।

আরও প্রায় মাসখানেক কাটার পর মার্গিন একদিন আমাকে বলল, দেখ, লালকাকাদের খবর অনেক দিন পাই না—একটা খবর নিলে হয়।

বললাম, ঠিকই ত। ক্লাবেও আর তাদের দেখি না!

মার্গিন বলল, ক্লাবে যায় না—সেটা বোঝা যায়।

শুধালাম, কেন?

বলল, সবাই ত সব জানে—গ্রেসের লজ্জাটা বোধ হয় এখনও কাটেনি।

বললাম, কেন, গ্রেসের শরীর খারাপ হওয়ার দরুণ কর্ণওয়ালে সমুদ্র তীরে ছিল—এই রকমই ত রটনা হয়েছে শুনেছি।

মার্গিন মৃদু হেসে বলল, লোকে সেটা ভদ্রতার খাতিরে মুখে মেনে নিলেও অন্তরে মানে নি। লোক অত বোকা নয়।

সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট টেবিলে এই কথা হল এবং সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা ডিনারের পরে লালকাকাকে টেলিফোন করলাম। লালকাকাই টেলিফোন ধরলেন। শুভসম্ভাষণাদির পর শুধালাম, কেমন আছেন আপনারা সব? অনেক দিন আপনাদের খবর পাই না।

লালকাকা শুধালেন, আপনারা কবে ফিরে এলেন? কোন খবর পাইনি তো?

বললাম, অনেক দিন ফিরেছি। তা আপনাদের তো আর ক্লাবেও দেখতে পাই না!

লালকাকা বললেন, আমাদের খবর খুব ভাল নয়।

শুধালাম, কি হোল?

বললেন, গ্রেসের শরীর খুব খারাপ—একেবারে শয্যাশায়ী।

শুধালাম, কি রকম?

বললেন, রক্তশূন্যতা, সঙ্গে জ্বর চলেছে। কি জানি কি হবে।

শুধালাম, কোথায় সে—হাসপাতালে?

বললেন, না বাড়ীতেই আছেন। বাড়ীতেই সব ব্যবস্থা করেছি।

বললাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তা আমার স্ত্রী গিয়ে একদিন তাঁকে দেখে আসতে পারেন?

একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, আপনার স্ত্রীর বিশেষ করুণা। তবে আপাততঃ গ্রেসের সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। দেখি, ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করব।

বললাম, তবে থাক, কিছুদিন পরেই না হয় যাবেন।

বললেন, তা আপনি একদিন যদি দয়া করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো বড়ই সুখী হবো।

বললাম, নিশ্চয়ই যাব। দু-চার দিনের মধ্যেই যাব।

বললেন, বিশেষ ধন্যবাদ।

টেলিফোন শেষ হোল। মার্গিনকে সব বললাম। একটু চুপ করে থেকে মার্গিন বলল, বেচারী গ্রেস! মনের গ্লানিটা কাটিয়ে উঠতে পারল না।

শুধালাম, ও কথা বলছ কেন?

বলল, আমি তো বরাবরই বলেছি গ্রেস মেয়েমানুষ। ভাই জীবনে একবার যা করে ফেলেছে, তার গ্লানিতে নিজেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, সে সব তো মিটে গেছে।

মৃদু হেসে বলল, মেয়েদের মনে অত সহজে মিটে যায় না। বিশেষতঃ অত বড় গ্লানি।

* * * *

দু-তিন দিন বাদে একদিন সন্ধ্যার পরে লালকাকাদের বাড়ী গেলাম। লালকাকা বাড়ীতেই ছিলেন—দোতলায় বসবার ঘরে আমাকে নিয়ে বসালেন। লালকাকার চেহারা দেখে অবাক হলাম—কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তাঁর! মুখটা যেন গেছে ভেঙে। শুধু তাই নয়, মুখটা বড় মলিন ও ফ্যাকাশে মনে হোল।

শুধালাম, তা আপনি ভাল আছেন তো?

বললেন, আমি ভালই আছি।

শুধালাম, মিসেস লালকাকা এখন কেমন?

বললেন, জ্বরটা চলেছে, তবে একটু কমের দিকে।

শুধালাম, তা হাসপাতালে রাখলে ভাল হোত না কি?

হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, হাসপাতালে ছিলেন বেশ কিছুদিন। বিশেষ কিছু উপকার হচ্ছিল না। তারপর নিজেই অস্থির হয়ে উঠলেন বাড়ী ফেরার জন্য। এখানে আমি সব বন্দোবস্ত করেছি। দুবেলা ডাক্তার এসে দেখে যায় এবং তাছাড়া দিন-রাত নার্সের ব্যবস্থাও আছে।

বললাম, হ্যাঁ। মনে প্রফুল্লতাটা দরকার।

বললেন, বাড়ীতে এসে সেদিক দিয়ে উপকারই হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম, তা আপনার সঙ্গে দেখা হয়তো?

বললেন, হ্যাঁ। রোজই দু-তিনবার দেখে আসি। তবে বেশী কথা বলি না।

শুধালাম, কথাবার্তা বলা কি এখনও বারণ?

বললেন, বেশী কথা না বলাই ভাল। তবে কথা বলতে চান—একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বললেন, আমি গেলে বড্ড খুশী হয়ে ওঠেন।

বললাম, তা তো হবেনই। যাক, আশা করি শীঘ্রই সেরে উঠবেন।

বললেন, ডাক্তাররা তো বলেন—এবার ভালর দিকে যাচ্ছে।

শুধালাম রক্ত দিচ্ছে না ডাক্তাররা?

বললেন, হ্যাঁ—মাঝে মাঝে এখনও চলছে।

শুধালাম, রক্ত কোথা থেকে আনান?

বললেন, আমিই রক্ত দিচ্ছি।

একটু অবাক হয়ে শুধালাম, আপনি?

বললেন, হ্যাঁ।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, লালকাকার শরীর ওরকম হয়েছে কেন,—মুখের চেহারা কেন এত ফ্যাকাসে। বললাম, কিন্তু আপনার পক্ষে রীতিমত রক্ত দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।

বললেন, না আমার কিছু হবে না।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তা রক্ত কিনে এনে দিলেই তো হোত?

লালকাকা বললেন, বাইরের রক্তের প্রতি আমার তেমন আস্থা নাই, আর তাছাড়া—খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ছেলেমানুষের মত মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বললেন, আমি নিজে রক্ত দিচ্ছি, গ্রেসের মনটা তো খুসী হবে।

তারপর কথাবার্ত্তা অন্য দিকে গেল এবং নানা কথাবার্ত্তায় খানিকটা সময়ও কাটল।

বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন মিসেস লালকাকাকে দেবেন।

বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আমি টেলিফোনে খবর দেবো। মিসেস চৌধুরী দয়া করে এসে যেন একবার দেখে যান।

নিশ্চয়ই আসবেন, বলে বিদায় নিলাম।

*   *   *   *

বাড়ী ফিরে এসে মার্লিনকে সমস্ত কথা বিস্তারিত বললাম।

মার্লিন একটু চুপ করে থেকে বলল, গ্রেসের মনের গ্লানি যদি কাটে তো সে শুধু মিষ্টার লালকাকার জন্যই।

বললাম, যা বলেছ, মিষ্টার লালকাকা গ্রেসকে কি ভালই বাসেন!

বলল, শুধু ভালবাসাই নয়, গ্রেসের প্রতি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জন্যই গ্রেস নিজের মনে জোর পাবে। আবার সুস্থ হয়ে উঠবে গ্রেসের মন।

বললাম, সত্যিই, কেমন ছেলেমানুষের মত বললেন—আমাকে দেখলে বড্ড খুসী হয়ে ওঠে—তাতে নিজে কি খুসী।

মার্লিন বলল, এই বিশ্বাসটুকু যে মেয়েদের মনে কত বড় সম্বল—তোমরা পুরুষ, তোমরা তা ঠিক ধারণা করতে পার না।

বললাম, হয় তো তাই কিন্তু মেয়ে খাঁটি হলে পুরুষের মনে বিশ্বাস তো আপনা থেকেই গড়ে ওঠে।

বলল, তা হয় তো ওঠে—কিন্তু জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সেটাকে অটুট রাখা, সকলে সব সময় পারে না।

শুধালাম, তা কেন বলছ লীনা! জীবনে যাই ঘটুক, মেয়ে যদি খাঁটি থাকে তবে পুরুষের বিশ্বাস ভাঙ্গবে কেন?

মৃদু হেসে শুধাল, গ্রেসকে কি তুমি খাঁটি মেয়ে বলবে?

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, তা খাঁটিই বলতে হবে বৈ কি! তুমিই তো বল—গ্রেস মেয়ে ভাল, জীবনে একটা ভুল ক'রে বসেছে।

শুধালো, কিন্তু এত বড় ভুল করার পরে তার প্রতি বিশ্বাস রাখা কি সকলের পক্ষে সম্ভব হোত?

বললাম, তা অবশ্য—সেইখানে লালকাকার বিশেষত্ব মানতেই হবে।

বলল, তাই তো বলি—লালকাকার এই বিশেষত্বটুকু আছে বলেই গ্রেস হয়তো বেঁচে যাবে! নইলে বাঁচত না। কেন না সে সত্যই খাঁটি মেয়ে।

মাথায় একটু দুষ্ট বুদ্ধি এলো। বললাম, এই দিক দিয়ে গ্রেসের বরাতটা তোমার চেয়ে অনেক ভাল—এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মৃদু হেসে সংক্ষেপে উত্তর দিল, মানি না।

শুধালাম, কেন?

বলল, তোমার আমার প্রতি ভালবাসা কি লালকাকার গ্রেসের প্রতি ভালবাসার চেয়ে কোন অংশে কম?

বললাম, ভালবাসার কথা তো হচ্ছে না লীনা! বিশ্বাসের কথা।

বলল, ভালবাসা গভীর হলে বিশ্বাস সহজে হারায় না। খাঁটি ভালবাসার মূলেই যে বিশ্বাস।

শুধালাম, কিন্তু ঝড়-ঝঞ্ঝা এলে?

বলল, যে মাটির শিকড় মাটির গভীরে বাসা নিয়েছে—সে গাছ সহজে পড়ে না।

একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বললাম, তা বলতে পারি না। আমার মন লালকাকার মত অত উদার তো নয়।

একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, যদি কোনদিন তা হয় তো বুঝব মাটির দোষ, গাছের নয়—বুঝবো দৈন্য আমার মনে, তাই তোমার বিশ্বাস হারিয়েছি। তোমাকে দোষ দেব না।

বললাম, লালকাকার বিশ্বাস যদি আজ অটুট না থাকত—গ্রেস হয় তো সেই কথাই ভাবত।

বলল, হয় তো তাই, কিন্তু গ্রেস তাহলে বাঁচত না।

একটু চুপ ক'রে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, বিকো! যদি কোনদিন তোমার বিশ্বাস হারাই—আমিও বাঁচবো না।

কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললাম লীনা! লীনা! আমি যে তোমার উপর কতখানি নির্ভর করি তা তো জান। তোমার প্রতি বিশ্বাস হারালে আমিও যে তলিয়ে যাব।

*   *   *   *

আরও প্রায় মাস দুই পরের কথা। একদিন সন্ধ্যার পরে আমরা লাউঞ্জে বসে আছি—হঠাৎ লালকাকার টেলিফোন বাজল। শুভ সম্ভাষণাদির পর লালকাকা শুধালেন, আপনারা ভাল আছেন ত?

বললাম, হ্যাঁ। মিসেস লালকাকা?

বললেন, ভালই আছেন। অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এখন আর শয্যাশায়ী নন।

বললাম, আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বললেন, গ্রেসের একান্ত ইচ্ছা—মিসেস চৌধুরী যদি একদিন তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করেন। গ্রেসের এখনও ঠিক বাইরে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়নি।

বললাম, নিশ্চয়ই যাবেন। একদিন পাঠিয়ে দেব।

বললেন, আপনিও ত আসবেন?

বললাম, আচ্ছা—কবে যাব, টেলিফোন করে খবর দেব।

বললেন, বেশী দেরী করবেন না। গ্রেস প্রায় রোজই মিসেস চৌধুরীর কথা বলে।

পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে টেলিফোন শেষ হল। মার্লিনকে বললাম। মার্লিন যাবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাল। বলল, চল শীঘ্রই একদিন যাওয়া যাক।

দিনটা শুক্রবার ছিল। ঠিক হল—পরের বুধবার বিকালটা ত আমার ছুটী, বুধবার আর ক্লাবে যাব না, বিকেলে চা খেয়েই ওদের বাড়ী যাওয়া যাবে। সোমবার টেলিফোন করে লালকাকাকে সে কথা জানিয়ে দিলাম।

বুধবার বিকেলে যথাসময়ে লালকাকাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। লালকাকা অভ্যর্থনা করে আমাদের উপরে বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, গ্রেস সখানে একটি কৌচের উপর বসে আছে। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। গ্রেসের দিকে চেয়ে দেখলাম—চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। পূর্ণ স্বাস্থ্য ক্রমে যে ফিরে আসছে, মুখের চেহারা দেখে সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহই রইল না। মার্লিন ও গ্রেস-এদেশের রীতি অনুসারে পরস্পরকে জড়িয়ে চুমো খেল।

হেসে বললাম বাঃ! আপনাকে আবার সুস্থ দেখে কী আনন্দই না হচ্ছে!

গ্রেস বলল, বিশেষ ধন্যবাদ। আপনারা ত চিরকালই আমার শুভাকাখী।

মার্লিনকে নিয়ে গিয়ে গ্রেস নিজের পাশে বসাল। কথাবার্ত্তা চলল। পানীয় এল। লালকাকা হুইস্কি নিয়ে বসলেন। আমি হুইস্কি খাই না—আমাকে দিলেন একটি শেরী। গ্রেস ও মার্লিনের জন্ম চা এল।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলার পর মিঃ লালকাকা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন ত আমি একবার নীচে দোকানে যাই—একটু কাজ আছে।

গ্রেস বলল, হ্যাঁ যাও, আমি এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছি।

আমি বললাম, তা আমাদেরও ত এবার উঠলে হয়। বেশীক্ষণ আপনাকে—

গ্রেস তাড়াতাড়ি বলল না—না। কত দিন পরে আপনাদের পেয়েছি—আপনাদের সহজে ছাড়ছি না।

বললাম, তা আপনারা না হয় দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা বলুন—আমি একটু ঘুরে আসি।

আমার যে বিশেষ কিছু কাজ ছিল বা কোথাও যাওয়ার কথা ছিল—এমন নয়। কিন্তু মনে হল—গ্রেস হয় ত তার বর্ত্তমান মনোভাবের দিক দিয়ে মার্লিনের সঙ্গে সরল ভাবে আলোচনা করতে চায়, আমি থাকলে বাধাই হবে।

মৃদু হেসে গ্রেস বলল, আপনিও বসুন, আমাদের এমন কিছু গোপনীয় কথা নেই যা আপনার সামনে বলা চলে না।

বললাম, শুনে সুখী হলাম।

গ্রেস বলল, সত্যি, আপনাদের কাছে আমি যে কি ঋণী, ভাষায় বলে কোনও লাভ নেই। আপনাদের দু' জনকেই আমি আমার একান্ত আপনার বলে মনে করি।

বললাম, সেটা আপনারই মনের গুণ।

মার্লিনের কাঁধে হাত দিয়ে মার্লিনকে একটু যেন কাছে টেনে নিয়ে সোজা আমার দিকে চেয়ে গ্রেস বলল, ডাঃ চাউডুরী! আপনার স্ত্রী একটি রত্ন!

মার্লিন কথাটা হাল্কা করে দিয়ে হেসে বলল, তোমার কাছ থেকে এই প্রশংসাপত্র পাওয়ার জন্ম তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ গ্রেস!

সে কথায় কান না দিয়ে গম্ভীর ভাবে গ্রেস বলে যেতে লাগল, আমি ত এরকম মেয়ে দেখিনি এবং অন্য দেশের কথা বলতে পারি না, আমার বিশ্বাস, এরকম মেয়ে ইংল্যাণ্ডে—

কথা থামিয়ে দিয়ে মার্লিন বলল, চুপ চুপ। বেশী বলো না। (আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে) ওঁর অহঙ্কার বেশী বাড়ালে আমি হয়ত শেষটা সামলাতে পারব না।

গ্রেস যেন নিজের মনেই বলে যেত লাগল: সোজা কথা, মার্লিন আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। বাঁচিয়ে দিল আমাকে। এখন আমি ভাবি আর অবাক হই। মার্লিন আমার জীবনে না গিয়ে পড়লে আমি ত এ্যাসটন লজেই প্রাণ দিতাম। তৈরীও ত হয়েছিলাম তার জন্ম।

মার্লিন বলল, মানুষ জীবনে ভুল করেই ভাই! ভুলটা অনেক সময় বুঝতে পারে না। তাই বুঝিয়ে দিলে—যে খাঁটী মানুষ, সে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে।

গ্রেস বলল, শুধু কি ভুল? তুমি যে আমার চোখ খুলে দিয়েছ।

মার্লিন বলল, সেটা তোমারই গুণ। আমার আর কতটুকুই বা শক্তি।

গ্রেস আবার যেন নিজের মনেই বলে যেতে লাগল, কি অন্ধই ছিলাম। ওঁর এত বড় ভালবাসা একেবারে বুঝতে পারিনি। জান মার্লিন, আমার অসুখ যখন বাড়াবাড়ি উনি কিছু খেতেন না, খেতে পারতেন না, টেবিলে বসে অনেক সময় কিছু মুখে না দিয়েই উঠে পড়তেন, আমি সবই ত খবর পেয়েছি। মাঝে মাঝে এসে আমার পাশে দাঁড়াতেন—কি কাতর মর্ম্মভেদী চাহনি! এ চাহনি তো আগে চিনতে পারিনি?

মার্লিন বলল, সেইখানেই তো জীবনের নিষ্ঠুর লীলা। তুমি তো তবু শেষ পর্য্যন্ত চিনতে পেরেছ—বেঁচে গেলে। অনেক সময়ে এ জীবনে চেনা আর হয়ই না—সর্ব্বনাশ ঘটে।

মার্লিনের হাতখানা ধরে গ্রেস বলল, তা তুমিই তো চিনিয়েছ ভাই!

মার্লিন কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিল, মার্লিনের মুখের কথা থামিয়ে দিয়ে গ্রেসকে বললাম, আপনি ওকে আর অত বাড়াবেন না। ওর অহঙ্কার বেশী বাড়লে আমি আর হয়ত ওকে সামলাতে পারব না।

আমার কথা শুনে মার্লিন ও গ্রেস দুজনেই হেসে উঠল।

গ্রেস মার্লিনকে বলল, কেমন? তোমার কথার পাল্টা জবাব পেলে ত?

মার্লিন বলল, আমার অহঙ্কার যদি বাড়ে আমি নিজেই নিজেকে সামলাতে পারব—ওঁকে সামলাতে হবে না।

আমি বললাম, আমিও পারব।

মার্লিন মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বলল, একেবারেই না। (গ্রেসের প্রতি) জান ভাই, মনটা একেবারে ছেলেমানুষের মতন—এই কান্না, এই হাসি।

হেসে গ্রেস বলল, তার জন্ম ভাই তুমিই দায়ী। ওঁকে বাড়তে দিলে না, আঁচল দিয়ে আড়াল করেই চিরদিন রাখলে।

মার্লিন বলল, ঠিক তা নয়—ওঁর স্বভাবই যে ঐ। তাইত ওঁকে সব সময় বাঁচিয়ে চলতে হয়।

আমার দিকে চেয়ে গ্রেস বলল, আপনি সত্যিই ভাগ্যবান।

হেসে বললাম, আপনার কথার ত প্রতিবাদ করতে পারি না—মেনেই নিলাম।

মার্লিনের কথাটা নিয়ে মনটা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

বুলা। আমার জীবনের প্রথম পর্ব্বে তোমাকে লিখেছিলাম—আমার মনটা একটা হালকা বেলুনের মতন, সামান্য হাওয়াতেই আকাশে ওড়ে আবার একটু আঘাত পেতে না পেতে চুপসে মাটিতে পড়ে যায়। মার্লিনের কথায় সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। কথাটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম—সত্যিই ত, এই ত সেদিন ভাটিঘুরে রোলাণ্ডকে দেখে মনটা যেন কেমন চুপসে গিয়েছিল। কেন?

ইতিমধ্যে মার্লিন ও গ্রেসের কথাবার্ত্তা চলছিল। অন্যমনস্ক হওয়ার দরুণ হয়ত কিছুটা আমার কানে যায়নি। হঠাৎ গ্রেসের কথা কানে এল। গ্রেস বলছে আমি য করেছি ভাই, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এর জন্য আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মার্লিন বলল, ভয় পেও না। মিঃ লালকাকা নিজেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গত করে দেবেন।

গ্রেস বলল, হয়ত তাই। কিন্তু আমি কেমন করে ভুলব?

হঠাৎ গ্রেসের গলা যেন ভেঙে গেল। চুপ করে চোখে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

মার্লিন গ্রেসকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল, গ্রেস! ডার্লিং! ভুলে যেও না তুমি ভাগ্যবতী, মিঃ লালকাকার প্রেমে উত্তেজনা না থাকলেও গভীর বিশ্রাম আছে। সেই বিশ্রামের সন্ধান যখন একবার পেয়েছ, তুমি এক দিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে—এ কথা জোর করে বলতে পারি।

* * * *

বাড়ী ফিরে এসে সেই দিনই রাত্রে বিছানায় শুয়ে মার্লিনের সঙ্গে আমার যেটুকু কথাবার্ত্তা হোল—সেইটুকু বলে রাখি।

মার্লিনকে শুধালাম, আচ্ছা লীনা! সত্যিই কি আমার মনটা ছেলেমানুষের মতন?

হেসে মার্লিন বলল, কথাটা মনে লেগেছে বুঝি?

বললাম, না—না। তোমার কথাটা নিয়ে ভাবছি।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, বিকো! অল্পতেই তুমি অভিভূত হও এবং অল্পতেই খুশী হয়ে ওঠ—তাই ত তুমি এত মিষ্টি। আবার সেইখানেই তোমাকে নিয়ে আমার ভয়।

শুধালাম, ভয় কেন?

বললাম, কিছুই ত বলা যায় না—জীবনে যদি বড় কিছু ঘটে তুমি যে নিজেকে সামলাতে পারবে না।

হেসে বললাম, কেন? তুমি আছ।

বলল, আমি যত দিন আছি—তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেব না। কিন্তু—

বললাম, আবার কিন্তু কি?

বলল, আমি যদি না থাকি—

বললাম, না—না লীনা!—ও-কথা বলতে নেই, ও-কথা ভাবতে নেই।

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে বলল, জীবনকে যে মোটেই বিশ্বাস নাই বিকো!

* * * *

সত্যিই—ভেবে দেখলাম, আমি মার্লিনের উপর কি রকম নির্ভর করি। মন কোনও কারণে অভিভূত হলে মার্লিনের মধ্যেই পাই বিশ্রাম এবং মন কোনও কারণে উৎফুল্ল হয়ে উঠলে যতক্ষণ মার্লিনের
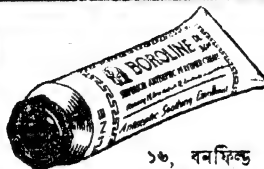
মধ্যে তার সাড়া না পাই, আমার মনের যেন তৃপ্তি হয় না। জীবনের প্রত্যেক কাজে এমন কি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মার্লিনের সঙ্গে আমার পরামর্শ করা চাই-ই এবং মার্লিনের সঙ্গে একমত হলেই আমার মনটা খুশী হয়। শুধু তাই নয়, ক্রমে এমন হল, জীবনের সব ব্যাপারেই শেষ সিদ্ধান্তের ভার মার্লিনের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি যেন রেহাই পাই।

একটা উদাহরণ দিই। সাণ্ডারীতে আমার এক সেক্রেটারী ছিলেন—মিস হলওয়েল, জানই ত। তাঁর শরীর ইদানীং অসুস্থ হওয়াতে তিনি কাজে ইস্তফা দিলেন। এক মাস সময় দিলেন আমাকে অন্য সেক্রেটারী খুঁজে নেওয়ার জন্য। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম এবং যথাসময়ে অনেকগুলি দরখাস্ত এল আমার কাছে—অবশ্য সবই মেয়ে—কেন না এ সব কাজ এদেশে বেশীর ভাগ মেয়েদেরই। দরখাস্তর সঙ্গে ফটোও অনেকে পাঠাল—কেন না, বিজ্ঞাপনে বলে দিয়েছিলাম ফটো পাঠাবার জন্য।

দেখে শুনে তার মধ্যে চারটিকে মনোনীত করলাম। কিন্তু এর মধ্যে কোনটিকে যে গ্রহণ করব ঠিক করতে না পেরে ভাবলাম, মার্লিনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করা যাবে।

যথাসময়ে মার্লিনের সঙ্গে কথা হল। মার্লিনকে ফটো সমেত দরখাস্ত চারটি দিয়ে শুধালাম লীনা! বল ত, এর মধ্যে কোনটিকে নিই ?

মার্লিন দরখাস্ত চারটি একটু দেখে নিয়ে একটি মেয়ের ফটো আমাকে দেখিয়ে বলল, বাঃ—এ মেয়েটির মুখখানি ত বড় সুন্দর !

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ওর কাজের অভিজ্ঞতা তেমন নাই।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, তা হোক, তোমার কাজ শিখে নিতে আর কতক্ষণ লাগবে। অমন সুন্দর মেয়ে—চোখে বুদ্ধির দীপ্তিও রয়েছে।

হেসে শুধালাম, অমন মেয়েকে সর্ব্বক্ষণ আমার পাশে রাখতে তোমার হিংসে হবে না ?

শুধাল, কেন ?

বললাম, যদি আমি হাতছাড়া হয়ে যাই ?

মৃদু হেসে বলল, আমার বাঁধন কি এতই আলগা ? আর তাছাড়া তোমাকে সন্দেহ করলেই যে তোমাকে ছোট করা হল—তাতে ত আমারই লোকসান। আমারই ত মনে লাগবে।

বললাম, লীনা ! প্রেম ঠিকই বলেছে—সত্যি তোমার তুলনা নেই !

মার্লিন দরখাস্ত চারখানি আর একবার ভাল করে দেখে আর একটা ফটো আমাকে দেখিয়ে বলল, এ মেয়েটিও মন্দ নয়, কাজে অভিজ্ঞতাও আছে দেখছি, তবে—

আমিও মনে মনে এই মেয়েটির কথাই ভেবেছিলাম। মেয়েটি দেখতেও ভাল, কাজও মোটামুটি জানে এবং বাড়ী ম্যানচেষ্টারের কাছাকাছি প্রেষ্টনে (Preston)

বললাম, আমি ত ঐ মেয়েটিকে রাখার কথাই ভাবছিলাম।

মেয়েটির ফটোর দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে মার্লিন বলল, তবে মেয়েটির চোখে একটা চাপা দুষ্টুমী আছে।

ফটোটি হাতে নিয়ে ফটোর দিকে তাকিয়ে বললাম, কৈ—বেশ ত শান্ত দুটো বড় বড় চোখ।

মার্লিন হেসে বলল, ওটা বাইরের। যাই হোক, কাজ জানে—ওকেই রাখ।

আমার মনও সায় দিল এবং তাই ঠিক হল।

মার্লিন বলল, তবে পাকা করার আগে একবার ডেকে পাঠিয়ে কথা বলে নিও।

বললাম তা ত বটেই। কালই আমার সঙ্গে এসে দেখা করার জন্য চিঠি পাঠাব।

একটু পরে মৃদু হেসে মার্লিন বলল, সুশ্রী চেহারা না হলে আমি তোমাকে রাখতে দিতাম না।

শুধালাম, কেন ?

বলল, সুশ্রী চহারা হলে তুমি কাজে অনুপ্রেরণা পাবে।

হেসে বললাম, ওটা যেন হিংসের কথা হল।

বলল, হিংসের কথা মোটেই নয়। কথাটা কি জান—তোমাকে সর্ব্বদিক দিয়ে সুস্থ ও নিপুণ রাখতে হলে, তোমার যা খোরাক তোমাকে সব সময়ই দিতে হবে ত ?

বললাম, আমার মনের খোরাকের জন্য সুন্দরী সেক্রেটারীর দরকার নাই। তোমাকে নিয়েই আমার মন ভরপুর।

বলল, তা ত জানি। তাই ত সুন্দরী সেক্রেটারীতে আমি ভয় পাই না। বরং—

চুপ করে গেল।

শুধালাম, বরং কি—খুলে বল লীনা !

মাথা ঈষৎ নীচু করে সলজ্জ দৃষ্টিতে মৃদু হেসে আমার দিকে চেয়ে বলল, বরং কাজের মধ্যে মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে চাইলে আমাকেই মনে পড়বে।

* * * *

আরও প্রায় বছর দুই কেটে গেল। যত দূর মনে পড়ে—এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটেনি। আমাদের জীবন-প্রবাহ তার সাবলীল গতিতে অনায়াসে চলছিল—কোনও দিকে কোনও বাধার সৃষ্টি হয়নি।

তারপর এল মেঘ। 'লু'তে মার্লিনের একটা কথা মনে পড়ে—ঠিকই বলেছিল—মানুষের ভাগ্যবিধাতা যে হিংসুক, জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি তিনি সইতে পারেন না। যাই হোক, সে-সব কথা পরে বলব। ইতিমধ্যে একটি ছোট ব্যাপার বলি।

মার্লিনের সঙ্গে সেক্রেটারী রাখার বিষয় আলোচনা হওয়ার প্রায় বছরখানেক পরের কথা। একদিন সাণ্ডারীতে সকালের কাজকর্ম্ম সেরে বেলা প্রায় ১টার সময় ফিরে এলাম বাড়ীতে—লাঞ্চ খাওয়ার জন্য। মার্লিন টেবিলে লাঞ্চ সাজিয়ে তৈরী হয়েছিল। গিয়ে হাতটা ধুয়ে খেতে বসলাম।

মার্লিন বলল, সার আর্থার এসেছিলেন।

শুধালাম, সার আর্থার ?

মৃদু স্বরে মার্লিন বলল, রোলাণ্ড।

মনটা যেন একটু চমকে উঠল। শুধালাম, রোলাণ্ড হঠাৎ ?

বলল, তিনি, কি কাজে ম্যানচেষ্টার এসেছেন। এক ফাঁকে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বললাম, তা আমার ওখানে সাণ্ডারীতে পাঠিয়ে দিলে না কেন ? কিংবা একটা ফোন করে আমাকে খবর দিলেই হত?

বলল, আজ তাঁর বেশী সময় ছিল না। তাই কালকে তাঁকে লাঞ্চে বলেছি। তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

বেশ, বলে চুপ করে গেলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে—মনটা বিশেষ খুশী হল না। রোলাণ্ড আবার কেন? আমাদের ভিড় বনে না এলেই যেন ভাল হত। পরের দিন সার্জ্জারীতে কাজকর্ম্ম যে একটু তাড়াতাড়ি সেরে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম—আজও মনে আছে। রোলাণ্ডের প্রতি ভদ্রতা দেখাবার জন্য আমার আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরে যাওয়ার দরকার—সেইজন্য কি? কিংবা মার্লিন ও রোলাণ্ড বাড়ীতে একলা আমি নাই—ভাবতে আমার কি ঠিক ভাল লাগছিল না? তাই কি তাড়াতাড়ি কাজকর্ম্ম সেরে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম? মার্লিনের মতন মেয়ের সঙ্গে এত দিন ঘর করার পরেও কি এ দৈন্য আমার মনের কাটেনি?

যাই হোক, ১টার অনেক আগেই বাড়ীতে ফিরে গেলাম। দেখলাম—রোলাণ্ড আসেনি, মার্লিন একলাই বাড়ীতে রয়েছে। মনটা কি হাল্কা হয়ে উঠল!

হেসে মার্লিনকে বললাম, কৈ, সার আর্থার আসেননি দেখছি!

বলল, না, তিনি লাঞ্চে থাকবেন না।

শুধালাম, টেলিফোন করেছিলেন বুঝি?

বলল, না, সকালবেলা তুমি চলে যাওয়ার পরেই এসেছিলেন—বিশেষ দুঃখ করে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছেন—লাঞ্চের আগেই তাঁকে ম্যানচেষ্টার ছেড়ে চলে যেতে হবে।

মনটা যে হাল্কা হয়েছিল—আজও মনে আছে—সে হাল্কা ভাবটা গেল কেটে।

বললাম, তা আসার কি দরকার ছিল—টেলিফোনে খবর দিলেই হত।

বলল, সেটা বোধ হয় ওঁর স্বাভাবিক ভদ্রতা।

হুঁ বলে চুপ করে গেলাম।

একটু পরে বললাম, একবার আমার সঙ্গে দেখা করাটা ত ভদ্রতার দিক দিয়ে প্রয়োজন বোধ করলেন না?

মার্লিন বলল, সেজন্য আমার কাছে বারে বারে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে গেছেন।

কি আর বলি। চুপ করেই গেলাম। কিন্তু সহজেই টের পেলাম—মনটা মেঘাচ্ছন্ন হয়েই আছে। এবং সমস্ত দিন রইল—একথাও অস্বীকার করব না। বারে বারে মনে হতে লাগল—আমাকে আড়ালে রেখে মার্লিনের সঙ্গে দেখা করারই গরজ তার। এবং মার্লিনও কি তাতে খুসী?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসতে একটু দেরী হল। মার্লিন সহজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাইরে বোধ হয় চাঁদের আলো ছিল। জানালার সার্সীর মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে মার্লিনের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে চেয়ে মার্লিনের প্রতি একটা গভীর দরদে মনটা উঠল দুলে—বেচারা! আশ্চর্য্য! এই দরদটুকু স্পর্শেই আমার মনের মেঘ হঠাৎ গেল কেটে—মনে হল—ছিঃ ছিঃ, মার্লিনের মতন মেয়ে, তবুও মনের এই দৈন্য! পিতামহ 'সুশান্তসা'র রক্ত ত রয়েছে আমার শরীরে—এ কি তারই দায়?

বুলা! তোমার পাঠান পূজনীয় 'সুশান্তসা'র আত্মজীবনী তখনও আমার হাতে আসেনি। [ক্রমশঃ।

কাল তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

চার

চিঠি এসেছে।

সুলতান কুঠিতে পিওনের পদার্পণ একেবারে নেই বলা ঠিক হবে না। মাস এক আধবার তাকে কুঠির আঙিনায় দেখা যায়। এলে সাধারণত তাকে রমণী পণ্ডিতের খোঁজ করতে দেখা যায়। দু'চারটে জানা ঘর আছে, বিয়ের ঠিকুজি মেলানো বা দৈব সমাধানের এক আধটা খোঁজ খবর আসে তাঁর কাছে। খামে নয়, তিন নয়া পয়সা বা পাঁচ নয়া পয়সার পোষ্টকার্ডই যথেষ্ট।

দু'চার মাস অন্তর একাদশী শিকদারের কাছেও আসে এক আধখানা পোষ্টকার্ডের চিঠি। ছেলে অন্যত্র কোথায় চাকরি করে। কোথায় থাকে বা কি চাকরি করে সেটা এক শিকদার মশাই ছাড়া আর কেউ জানে না বোধহয়। তবে তাঁর একখানা চিঠি পিওনের ভুলে একবার নাকি রমণী পণ্ডিতের হাতেই পড়েছিল। সে-চিঠিতে প্রেরকের ঠিকানা ছিল না, শুধু তারিখ ছিল। তবে পোষ্ট অফিসের ছাপটা নাকি চোখে পড়েছিল পণ্ডিতের। সেই চিঠি কলকাতা থেকেই এসেছিল। খেয়াল না করেই পণ্ডিত চিঠিখানা পড়ে ফেলেছিলেন, তিন চার লাইন মাত্র বয়ান—টানাটানির সময়, বেশি টাকা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু এবারের মত কিছু বেশি দিতে চেষ্টা করব।

মেয়ে কুমুকে পড়ানোর খাতিরের সময় সেই চিঠির সমাচার পণ্ডিত নিজেই সঙ্গোপনে ধীরাপদর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন একদিন। তাঁর ধারণা, ছেলে সপরিবারে কলকাতাতেই থাকে, বছরান্তে একটা দিনও বুড়ো বাপ-মাকে দেখতে আসে না সেই লজ্জাতেই গোপন সেটা। তাঁর আরও ধারণা, মাসের গোড়ার দিকে এক-আধদিন ঘরে-কাচা জামা-কাপড় পরে শিকদার মশাইকে বেরুতে দেখা যায়—সেটা পোষ্ট অফিসে গিয়ে টাকা আনার উদ্দেশ্য নয়, ছেলের বাড়ি থেকে টাকা আনার উদ্দেশ্যেই। যাই হোক, এখানে প্রায়-অথর্ব গৃহিণী আর প্রৌঢ়া বিধবা কন্যা নিয়ে শিকদার মশাইয়ের সংসার। দেশ খোয়ানো ভিটেমাটি বিক্রীর কিছু পুঁজি তাঁর হাতে আছে। সে-প্রসঙ্গ অবান্তর, কখনো-সখনো পোষ্টকার্ডে লেখা এক আধটা চিঠি তিনিও পান, এটা ঠিক।

শকুনি ভটচাযের কাছে চিঠি লেখার নেই কেউ। তিনি শিকদার মশাইয়েরও বয়ঃজ্যেষ্ঠ। তাঁর গোটা পরিবারটিই এখানে। বঙ্গচ্ছেদের আগে যজমানী করতেন কোথায়, ছেলেরাও চাকরি করতেন। গোলযোগের সূচনাতেই সব ছেড়েছুড়ে স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ নাতি-নাতনি সহ এই সুলতান কুঠিতে ঠাঁই নিয়েছেন। দুই ছেলেই প্রৌঢ় বয়সে শহরের উপকণ্ঠের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করেছেন। এ ছাড়া প্রাইভেট ছেলে পড়ানোর কাজও তাঁরা সেখানেই জুটিয়ে নিয়েছেন। অতএব তাঁরা ঊষায় যান আর নিশায় ফেরেন। ঘরে বৃদ্ধা গৃহিণী, পুত্রবধূ দুটি এমন কি নাতনিরাও প্রায় অসূর্যম্পশ্যা। এ পরিবারে চিঠি আসার বালাই নেই।

এ দিকের এলাকায় আর থাকল গণুদার সংসার। সেখানে শুধু সাইকেল পিওন আসে আর দুটি খবরের কাগজ আসে। আর কেউ না বা কিছু না।

কিন্তু যে চিঠি এসেছে সেটা রমণী পণ্ডিতের নয়, একাদশী শিকদারের নয় বা আর কারো নয়। সেই চিঠি ধীরাপদর। যার কাছে কেউ কোনদিন চিঠি আসতে দেখেনি।

পোষ্টকার্ডএ লেখা চিঠি নয়, হালকা-নীল শৌখিন খাম একটা।

ধীরাপদ বাড়ি ছিল না। নতুন-পুরনো বইএর দোকানের মালিক দে-বাবুর নতুন বইএর বিজ্ঞাপন লেখার তাগিদে সকালে উঠেই বেরিয়েছিল। একখানা নয়, এর পরে আবার দু'খানা নতুন বই প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছেন ভদ্রলোক, তাগিদটা তাই অবহেলা করতে পারেনি। ডাকপিওন চিঠি দিয়ে গেছে কদমতলায় শকুনি ভটচাযের হাতে। হুঁকো-পর্বের পরে প্রাক-গাত্রোত্থানের মুহূর্ত। সন্তর্পণে উল্টে পাল্টে দেখে সেটা তিনি শিকদার মশাইয়ের হাতে দিয়েছেন। এ-রকম একটা তকতকে খাম জীবনে তিনি হাতে করেছেন কি না সন্দেহ। খামটা বাড়িয়ে দেবার সময় রমণী পণ্ডিত সাগ্রহে ঘাড় বাড়িয়ে কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করেছেন। ওদিকে একাদশী শিকদারের নীরব বিস্ময়ও ভটচায মশাইয়ের মতই।

ধীরাপদর ঘর বন্ধ ছিল, জানালা দিয়ে খামটা ভিতরে ফেলে দেওয়া যেত। শিকদার মশাই সেটা পারলেন না। সোনাবউদিকে ডেকে চিঠিখানা তার হাতে দিলেন।—পাশের ঘরের বাবুর চিঠি, এলে দিয়ে দিও।

ধীরাপদর ফিরতে একটু বেলা হয়েছিল। তাড়াতাড়ি চান সেরে খেতে বেরুতে যাচ্ছিল সে। দিনের আহার সেই পুরনো হোটেলেই চলছিল। কুবারের টাকাটা ধীরাপদ পরদিনই সোনাবউদিকে ফেরত দিতে গিয়েছিল। সোনাবউদি টাকা রাখেনি বা হোটেলে খাওয়া

সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যও করেনি। তারপর এ ক'দিনের মধ্যে আর চোখের দেখাও হয়নি।

সোনাবউদি চিঠি দিয়ে গেল।

যেন প্রায়ই আসে এমনি চিঠি, আর প্রায়ই দিয়ে যায়—কোনো কৌতূহল নেই। বিস্মিত নেত্রে খামের ওপর চোখ বুলিয়ে ধীরাপদ মুখ তুলে দেখে সোনাবউদি ততক্ষণে চৌকাঠ পেরিয়ে গেছে।

হোটেলের খাওয়া সেরে ঘরেই ফিরল আবার। অবাক সেও হয়েছে বটে। সেই রাতের পরে সত্যিই আবার চারুদি এমন অন্তরঙ্গভাবে যেতে লিখবে একবারও আশা করেনি। তার ঠিকানা অবশ্য রেখেছিল আর ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি করে বাড়িও পৌঁছে দিয়েছিল। ধীরাপদ ভেবেছিল, সেই অন্তরঙ্গতা শুধু চক্ষু-লজ্জার খাতিরে। নইলে ব্যবধান সে ভালই রচনা করে এসেছে। সমানে অসমানে করুণার সম্পর্ক, মিতালীর নয়। চারুদির দুয়োতেই বাধবে।

কিন্তু এ চিঠিতে না যাওয়ার দরুন অনুযোগ এবং অবিলম্বে আসার জন্য অনুরোধ। সতের আঠারো বছর আগে হস্টেলের সেই ছাত্র-জীবনের সঙ্গে মেলে। অভিমানবশে দিনকতক দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করলে যেমন তাগিদ আসত। সেই তাগিদের প্রতীক্ষাও করত তখন, আজ যাবে কোন্ মুখে? ক্ষুধার যে চিত্র দেখিয়ে এসেছে তাতে শুধু অহঙ্কার নয়, আঘাত দেবার বাসনাও ছিল, সেটা চারুদির বুঝতে বাকি নেই। আগের ধীরাপদ বদলেছে, বুঝতে বাকি নেই তাও। তবু ডাকাডাকি কেন?

বিকেলের দিকে বারান্দায় সোনাবউদির সঙ্গে আর একবার দেখা হয়ে গেল। দুধওয়ালা টাকার জন্য বসে'ছিল, টাকা মেটাতে এসে ওকে দেখে একটু যেন স্বস্তিবোধ করল।—হিসেবটা ঠিক হল কিনা দেখুন তো—

হিসেবের ব্যাপারে সোনাবউদি কোনদিনও চট করে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এ পর্যন্ত হিসেবপত্র সব ধীরাপদই দেখে দিয়েছিল। এটা বোধহয় গণুদার কথা।

ঠিক আছে—

দুধওয়ালাকে বিদায় করে সোনাবউদি ঘরমুখো হয়েও ফিরে দাঁড়াল। একটু থেমে আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, আপনার দিদি কি লিখলেন?

নীল শৌখিন খাম দেখেই ধীরাপদ অনুমান করেছিল চিঠি কার এখন দেখছে, অনুমানটা শুধু তার একার নয়।

যেতে—

গেলেন না?

জবাব না দিয়ে ধীরাপদ হাসল একটু। তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোনাবউদি আবার বলল, জামা কাপড় কাচা নেই বুঝি?···জামা তো গায়ে হবে না, ধুতি দিতে পারি। দেব?

হাসি করুণা বিরাগ বিদ্রূপ কোন্‌টা কখন কার গায়ে এসে পড়ে ঠিক নেই। নিছক ঠাট্টা না সংগতির ওপর কটাক্ষ সঠিক বোঝা গেল না। ধীরাপদ হেসেই জবাব দিল, গেলে এতেই হবে

সোনাবউদি নিশ্চিন্ত যেন।—খামের বাহার দেখে আমি ভাবছিলাম হবে না বোধহয়।

হাসি চেপে ঘরে ঢুকে গেল।

পরের ক'টা দিন ধীরাপদ একরকম ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল। চারুদির চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে ছুটে যাবার মত কোনো তাগিদ যে অনুভব করেনি সেটা সত্যি। এবারে সেখানে গেলে অনুকম্পা জুটবে হয়ত। সেটা বরদাস্ত হবে না। অনুগ্রহ দেখাবার মত সংগতি চারুদির আছে, অমন বাড়ি গাড়িতেই প্রমাণ।···কিন্তু সে-সংগতি চারুদির এলো কোত্থেকে, কোন্ বিনিময়ে? ফুটপাথে বাস-স্টপের ধারে সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে যে-বিনিময়ের প্রত্যাশায় তার সঙ্গে তফাৎ কতটুকু? আঠার বছর আগে যে চারুদিকে হারিয়ে শূন্য হৃদয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরেছে একদিন, সেই চারুদি হারিয়েই গেছে। তাই চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে যাবার চিন্তাটা ধীরাপদ বাতিল করে দিতে পেরেছে।

কিন্তু একদিন চারুদির হারানোটা যেমন অঘটন, আঠার বছর বাদে গ্রামোফোন-রেডিওর দোকানের সামনে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগটা যে তেমনি এক নতুন সূচনার ইঙ্গিত, সেটা জানত না। জানলে চিঠি পেয়েই ছুটত। আর তাহলে বিব্রতও হত না এমন।

দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল তখন। শুয়ে শুয়ে ধীরাপদ একটা পুরনো বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিল। আর মনে মনে ভাবছিল, বইয়ের দোকানের দে-বাবু আর ওষুধের দোকানের অম্বিকা কবিরাজের সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে। আজও না গেলে দে বাবু অন্তত

মারমুখি হবেন। ক'দিন তার দেখা না পেয়ে সকালে কর্মচারী পাঠিয়েছিলেন।

সোনাবউদি এসে খবর দিল, আপনাকে বাইরে কে ডাকছেন দেখুন—

ধীরাপদ বই নামালো। খবরটা সাদাসিধে ভাবেই দিতে চেষ্টা করেছে সোনাবউদি, কিন্তু তার চোখে মুখে যেন চাপা আগ্রহ। বইয়ের দোকানের দে-বাবু আবারো লোক পাঠালেন কি না ভাবতে ভাবতে বাইরে এসেই ধীরাপদ একেবারে হতভম্ব।

কদমতলা ছাড়িয়ে অনতিদূরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে চারুদির ঝকঝকে মোটর গাড়িটা। পিছনের সীট-এ চারুদি বসে, পাশে আর একটি অপরিচিত মূর্তি—সিগারেট টানছে। এদিকে বিস্ময়ে বিমূঢ় গোটা সুলতান কুঠির প্রায় সমস্ত বাসিন্দারা। মোটরের গা ঘেঁষে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখছে গণুদার মেয়ে, বাচ্চা ছেলে দুটো আর রমণী পণ্ডিতের ছোট ছেলেমেয়ের দঙ্গল। কদমতলার বেঞ্চির কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন রমণী পণ্ডিত, তাঁর খানিকটা তফাতে শকুনি ভটচায। অন্য মেয়ে-বউরা জানালা দরজা দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। হুঁকো হাতে শিকদার মশাইও বেরিয়ে এসেছেন।

পরিস্থিতি দেখে ধীরাপদও হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

কি ব্যাপার!

এক লহমা তাকে দেখে নিয়ে চারুদি বললেন, ঠিকানাটা ঠিকই দিয়েছিলে তাহলে।

ধীরাপদ বিব্রত মুখে পিছনের দিকে ঘুরে তাকালো একবার। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের জোড়া জোড়া চোখ এদিকেই আটকে আছে। চারুদির পাশের সুদর্শন লোকটি কুশনে মাথা এলিয়ে সিগারেট টানছে আর পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে আড়ে আড়ে কিছু যেন মজা দেখছে একটা।

চারুদি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

হ্যাঁ—মানে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু তুমি হঠাৎ। বসবে?

না, জামা পরে এসো।

ধীরাপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নামলে কোথায়ই বা বসাতো? বলল, কি কাণ্ড, এই জন্যে তুমি নিজে কষ্ট করে এসেছ! তুমি যাও, আমি পরে যাব'খন—

আঃ, চারুদির মুখে সত্যিকারের বিরক্তি, সংয়ের মত বসে থাকতে পারছি না, তাড়াতাড়ি এসো।

অগত্যা জামা পরার জন্য তাড়াতাড়িই ঘরে আসতে হল তাকে। ভেবেছিল, দরজার আড়ালে সোনাবউদিকেও দেখবে। দেখল না। লোহার হুকে দুটো জামা ঝুলছে, দুটোই আধময়লা। তাই একটা গায়ে পরে চাদরটা জড়িয়ে নিল।

মোটর চলার রাস্তা নেই। এবড়োখেবড়ো উঠোন ভেঙে গাড়ি রাস্তায় পড়তে চারুদি সহজ ভাবেই বললেন, তোমার এই বাড়ির লোকেরা বুঝি মেয়েদের গাড়ি চড়তে দেখেনি কখনো?

ধীরাপদ সামনে বসেছিল। পিছনের আসনেই তাকে জায়গা দেবার জন্যে চারুদি পাশের দিকে ঘেঁষে বসতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সামনের দরজা খুলে ধীরাপদ সরাসরি ড্রাইভারের পাশের আসনে গিয়ে বসেছে। কথা শুনে ঘুরে তাকালো। হাসি মুখেই বলল, দেখেছে—গাড়ি চড়ে আমার কাছে আসতে দেখেনি কখনো।

চিঠি পেয়ে এলে না কেন? খুব জব্দ—

যেন ওকে জব্দ করার জন্যেই তাঁর এই অভিনব আবির্ভাব। ধীরাপদ সামনের দিকে চোখ ফেরাল। এক নজরে চারুদির পাশের লোকটিকেও আবার দেখে নিয়েছে। আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বছর বত্রিশ তেত্রিশ হবে বয়েস। পরনের স্যুটটা দামী হলেও ভাঁজভাঙা আর জায়গায় জায়গায় দাগ ধরা। মাথার একরাশ ঝাঁকড়া চুলে বহু দিন কাঁচি পড়েনি। মুখ নাক আর চওড়া কপালের তুলনায় চোখ দুটো একটু ছোট বোধহয়। পুরু লেন্স এর জন্যেও ছোট দেখাতে পারে।

ধীরাপদ মনে মনে প্রতীক্ষা করছে, ভব্যতা অনুযায়ী চারুদির এবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু চারুদি তা করলেন না। একটা লোককে জোরজার করে ধরে আনা হয়েছে তাই যেন ভুলে গেলেন। তাঁর পাশের সঙ্গীটির উদ্দেশেই এটা সেটা বলতে লাগলেন তিনি। বলা ঠিক নয়, সব কথাতেই অনুযোগের সুর। সে আবার অফিসে ফিরবে কি না, ফেরা উচিত, কাজে কর্মে একটুও মন নেই, সকলেই বলে। সকলের আর দোষ কি, খেয়াল খুশিমত চললে বলবেই। কতবড় দায়িত্ব তার, এ-ভাবে চললে নিচের পাঁচজনও ফাঁকি দেবেই। তাছাড়া নিজের ভবিষ্যতও ভাবা দরকার, এমন সুযোগ ক'জন পায়—

তুমি থামো তো এখন, বাজে বোকো না—

সামনে থেকে ধীরাপদও সচকিত হয়ে উঠল একটু। এমন কি একবার ঘাড় না ফিরিয়েও পারল না। সেই থেকে নিরাসক্তভাবে বসে বসে সিগারেট টানাটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। উপেক্ষার মত লাগছিল। তাছাড়া চারুদির এমন অল্প বয়স্ক সঙ্গীটি কে সেই বক্র কৌতূহলও ছিল। কিন্তু এই স্পষ্ট গম্ভীর বিরক্তির ফলে একটু যেন শ্রদ্ধা হল। ধীরাপদ ফিরে তাকাতে চারুদি হেসে ফেললেন, ওকে লক্ষ্য করেই নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করলেন, দেখেছ, ও সব সময় এমনি মেজাজ দেখায় আমাকে—

মেজাজ যে দেখায় তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি সেটা চারুদির খেয়াল নেই বোধহয়। কিন্তু তাঁর উপদেশের ফলেই হোক বা যে কারণেই হোক, মেজাজীর মেজাজ তখনো অপ্রসন্নই মনে হল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করতে করতে আবারও অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপন করল, কি বাজে বকছ সেই থেকে।

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে থাকা অশোভন। ড্রাইভারের সামনের ছোট আর্শিতে চারুদিকে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তীর একাংশও। চারুদি খপ করে তার হাত থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিলেন। —ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা গায়ে গন্ধ হয়ে গেল—আমি তো বাজেই বকি সব সময়, আমাকে দেখেই বাজে কথা শোনার জন্য সাত তাড়াতাড়ি উঠে পালিয়ে আসতে তোকে কে সেধেছিল?

লোকটা কে না জানলেও ধীরাপদর কৌতূহল এক দফা পাক-মুক্ত হয়ে গেল। উপদেশ বা অনুযোগের অধ্যায়ে চারুদি 'তুমি' করে বলছিলেন। এবারের বাৎসল্য-সিক্ত ব্যতিক্রমটা কানে আসতে সুস্থ নিঃশ্বাস ফেলল। প্যাকেটে আর সিগারেট ছিল না, কারণ শূন্য প্যাকেটটা বাইরে নিক্ষেপ করা হল টের পেল। আর্শিতে শুধু

চারুদিকেই দেখা যাচ্ছে এখন, পিছন ফিরে না তাকিয়েও ধীরাপদ অনুভব করল, বাৎসল্যের পাত্রটি তার দিকের জানালা ঘেঁষে ঘুরে বসেছে। অর্থাৎ চারুদির কথায় পিঠে কথা বলার অভিলাষ নেই।

সেদিন রাতের অভ্যর্থনায় চারুদি অতিশয়োক্তি করেননি। দিনের আলোয় তাঁর বাড়িটা ছবির মতই দেখতে। শ্বেত পাথরের মত ঝকঝকে শাদা ছোট্ট বাড়ি। দু' দিকের ফুলবাগানে বেশির ভাগই রাজতে ফুল। ফটক থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত লাল মাটির রাস্তা।

বসার ঘরে চারুদির প্রতীক্ষায় এক ভদ্রলোক বসে। অবাঙালী, বোধ হয় পার্শী। তাঁকে দেখেই চারুদি ভয়ানক খুশি। বলে উঠলেন, কি ডাক্তার, আপনি কতক্ষণ? আমার তো খেয়ালই ছিল না, অথচ ক'দিন ধরে শুধু আপনার কথাই ভেবেছি।

চারুদির মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে ধীরাপদ মনে মনে অবাক একটু। মনে পড়ে চারুদি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু শুধু সেটুকুর দ্বারা এমন অভ্যস্ত বাক্‌-বিনিময় সম্ভব নয়। সেটা আরো বোঝা গেল আর একটু পরেই।

বোসো ধীরু বোসো, অমিত বোসো। নিজেও একটা সোফায় আসন নিয়ে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গেই আলাপে মগ্ন হলেন চারুদি। ভদ্রলোক ফুলের সমজদার এবং ফুল-সমস্যা সমাধানে বিশেষজ্ঞ বোঝা গেল। কারণ, রোগী যেমন করে চিকিৎসকের কাছে স্বাস্থ্য সমাচার জ্ঞাপন করে, চারুদি তেমনি করেই তাঁর ফুল আর ফুল বাগানের সমাচার শোনাতে লাগলেন।—ডালিয়া তেমন বড় হচ্ছে না, আরো সর্বনেশে কাণ্ড পাতাগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। আর স্ন্যাপ ড্রাগন নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা, শুটগুলো গলা বাড়িয়ে লম্বা হচ্ছে বলে মোটেই ভর-ভরতি দেখাচ্ছে না। প্যানজি? চমৎকার হয়েছে, দেখাচ্ছি চলুন—মিকি মাউসের মত কান উঁচু উঁচু করে আছে সব!···ফ্লক্স হয়েছে তো ভালো কিন্তু সব রঙে মিলেমিশে একেবারে খিচুড়ি—আলাদা আলাদা রঙের চারা যোগাড় করা যায় না? পপির তো বেশ আলাদা আলাদা রঙের বেড হয়েছে।··· ক্রিসেনথিমাম খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু সারাক্ষণই পোকার ভয়ে অস্থির আমি!

সেই আশঙ্কায় চারুদির দেহেই সুচারু শিহরণ একটু। ধীরাপদ হাঁ করে শুনছিল আর তাঁকে দেখছিল। বলার ধরনে সমস্যাগুলো তার কাছেও সমস্যার মতই লাগছিল। কাঁটা বিনা কমল নেই আর কলঙ্ক বিনা চাঁদ নেই। কাঁটা আর কলঙ্ক না থাকলে চারুদির গতি কি হত!

মোটরের সিগারেটখোর কোট-প্যান্টপরা সঙ্গীটি সোফার শরীর এলিয়ে একটা রঙচঙা ইংরেজি সাপ্তাহিকে মুখ ঢেকেছে। একটু আগে চারুদির মুখে নাম শুনেছে অমিত। হাবভাবে মিতাচারের লক্ষণ কমই। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে এক-একবার চোখ থেকে সাপ্তাহিক নামাচ্ছে, দুই-এক কথা শুনছে, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—তারপর আবার মুখ ঢেকে সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে।

কিন্তু চারুদি তাঁর ফুল আর ফুলবাগান নিয়ে হাবুডুবু। তাদের বসতে বলে ফুল-বিশেষজ্ঞটিকে নিয়ে বাগান পর্যবেক্ষণে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতের সাপ্তাহিক চটাস করে সামনের সেন্টার টেবিলের ওপর পড়ল। ধীরাপদ সচকিত। লোকটা উঠে বইভরা কাচের আলমারির সামনে দাঁড়াল, ঝুঁকে ভিতরের বইগুলোর দিকে চেয়ে রইল খানিক। ঝুঁকতে হবে, কারণ তার মাথা আলমারির মাথা সমান। কিন্তু একটা বইয়ের নামও পড়ল না। পাশের ছোট টেবিলে সাজানো ঝকঝকে অতিকায় কড়ি আর শামুকের খোলটা উল্টেপাল্টে দেখল একবার। আবার এসে ধুপ করে সোফায় বসল। অসহিষ্ণুতাটুকু নয়নাভিরাম।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখছে এবার। নির্বিকার দর্শন।

আপনার নামটি কী?

আচমকা প্রশ্নটার জন্য ধীরাপদ প্রস্তুত ছিল না। নাম বলল।

চারু মাসি আপনার দিদি?

চারুদি বলেছে বোধ হয়, কিন্তু বললে আবার এ কেমনধারা জিজ্ঞাসা। ধীরাপদর মুশকিল কম নয়। বলল, অনেকটা সেই রকমই···

লোকটার দু' চোখ নিঃশব্দে তার মুখের ওপর থেমে রইল খানিক। তারপর বলল, আমার নাম অমিত। অমিতাভ ঘোষ। আপনার দিদি আমার মাসি, নিজের মাসি নয়, অনেকটা সেই রকমই···

সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাসিতে ঘরের আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত যেন সজাগ হয়ে উঠল। এমন কৌতুক-ঝরা হাড়-নড়ানো হাসি ধীরাপদ কমই শুনেছে। এই লোকই এমন হাসতে পারে একদণ্ড আগেও মনে হয়নি।

কিন্তু তখনো শেষ হয়নি। একটু সামলে আবার বলল, আপনি হলেন তাহলে মামা, মানে অনেকটা সেই রকমই···

সঙ্গে সঙ্গে আবার। এবারের হাসিটা আরো উচ্চগ্রামের অথচ শ্রুতিকটু নয়। ধীরাপদও হাসতে চেষ্টা করছে একটু একটু। লোকটা বুদ্ধিমান তো বটেই, বেপরোয়া রসিকও। অমিত নয়, অমিতাভ···তেজোময়···হাসির তেজটা অন্তত: বিষম। ধীরাপদর খারাপ না লাগলেও তলায় তলায় অস্বস্তিও একটু। সদ্য পরিচিতের সঙ্গে এ-রকম বেআবরু রসিকতা খুব স্বাভাবিক নয়।

হাসি থামতে সচিত্র সাপ্তাহিকটা হাতে তুলে নিল আবার। অন্য হাতে কোটের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগল। আপনার কাছে সিগারেট আছে?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, নেই। কেমন মনে হল, থাকলে ভালো হত।

একেবারে চুপ। একটু আগে অমন বিষম হেসেছে কে বলবে। ফলে ঘরটাই যেন গম্ভীর। ধীরাপদ আড় চোখে তাকালো, পড়ছেও না, ছবিও দেখছে না—শুধু চোখ দুটোকে আটকে রেখেছে। খানিক আগের সেই প্রচ্ছন্ন অসহিষ্ণুতার আভাস।

কাগজখানা নামিয়ে ভিতরের দরজার দিকে চেয়ে হঠাৎ হাঁক পাড়ল, পার্বতী—!

সঙ্গে সঙ্গে কাগজ হাতেই উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে গলার স্বর আরো চড়িয়ে দিল, পার্বতী!

সোফায় ফিরে এসে কাগজ খুলল।

আবার কোন প্রহসনের সূচনা কে জানে। যাকে ডাকা হল ধীরাপদ তার কথা যেন ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। সেদিনের পরিবেশন করে খাওয়ানোটা ভোলেনি। মেয়েটার সামনে সেদিনও সুস্থ বোধ করেনি খুব। নিস্পৃহতার আবরণে চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দু'হাতে একটা চায়ের ট্রে নিয়ে খানিক বাদে পার্বতীর প্রায় যান্ত্রিক আবির্ভাব। ট্রেতে দু'পেয়ালা চা। দিনের আলোতেও আজ অতটা কালো লাগছে না, পরনের শাড়িটা বেশ ফর্সা। আজও ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ধীরাপদর মনে হল, গৃহ পুরুষশূন্য হলেও চারুদি নিরাপদই বটেন। আঁটসাঁট বসনের শাসনে তনু-মাধুর্য ভারাবনত নয় একটুও, যৌবনের এ-বিদ্রোহে যেন পার্বত্য গাম্ভীর্য। প্রভাব আছে, ইশারা নেই।

ট্রে সুদ্ধ আগে অমিতাভ ঘোষের সামনে এসে দাঁড়াল। সে-ই কাছে ছিল। কিন্তু চায়ের বদলে সে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল—চেয়ে যে আছে তাও ঠিক খেয়াল নেই যেন।

মেয়েটা ভাবলেশশূন্য। দাঁড়িয়ে আছে পটের মূর্তির মত। ফিরে চেয়ে আছে সে-ও, কিন্তু সে চোখে কোনো ভাষা নেই। চায়ের ট্রেটা যন্ত্রচালিতের মতই আর একটু এগিয়ে ধরল শুধু। এইবার ঈষৎ ব্যস্ততায় অমিতাভ ঘোষ ট্রে থেকে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

দ্বিতীয় পেয়ালাটা ধীরাপদকে দিয়ে পার্বতী এক হাতে শূন্য ট্রেটা ঝুলিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দু'চার মুহূর্তের প্রতীক্ষা। কিন্তু গভীর মনোযোগে অমিতাভ ঘোষ চা পানে রত। যেন শুধু এই জন্যেই একটু আগে অমন হাঁক ডাক করে উঠেছিল। মন্থর পায়ে পার্বতী ভিতরে চলে গেল।

চুপচাপ চা পান চলল। ধীরাপদ ভাবছে, চারুদি কতক্ষণে ফিরবে কে জানে!

পার্বতী! পার্বতী!

ধীরাপদ চমকেই উঠেছিল এবারে। কি ব্যাপার আবার, চিনি চাই না দুধ চাই—কিন্তু চায়ের পেয়ালা তো খালি ওদিকে!

পার্বতী এলো। এবারে খালি হাতেই। তেমনি অভিব্যক্তিশূন্য নীরব প্রতীক্ষা।

ড্রাইভারকে বলো এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেবে। পেয়ালা রেখে আবার সাপ্তাহিক পত্র হাতে নিয়েছে।

ড্রাইভার নেই।

ও···। মুখ তুলে তাকালো, সমস্যাটার সমাধান যেন নিশ্চল রমণী-মূর্তির মুখেই লেখা।

পার্বতী চলে গেল, যাবার আগে পেয়ালা দুটো তুলে নিল। পাছে এবার আবার ওর সঙ্গেই ভদ্রলোকের আলাপের বাসনা জাগে সেই ভয়ে ধীরাপদ মুখ ফিরিয়ে দূর থেকেই কাচের আলমারির বইগুলো নিরীক্ষণ করতে লাগল।

পার্বতী!

ধীরাপদ তটস্থ। সেদিন চারুদির মুখে শোনা, একজনের সঙ্গে পার্বতীর ডাব কাটা দা হাতে দেখা করতে এগনোর কথাটাই কেন জানি মনে পড়ে গেল।

এবারে মেয়েটা কাছে এসে দাঁড়ানোর আগেই হুকুম হল, সেদিন ক্যামেরাটা ফেলে গেছলাম, এনে দাও।

আবার প্রত্যাবর্তন এবং একটু বাদেই ক্যামেরা হাতে আগমন। ক্যামেরাটা ছোট হলেও দামী বোঝা যায়। সামনের সেন্টার টেবিলে সেটা রেখে পার্বতীর পুনঃপ্রস্থান। ও-মুখে ভাব-বিকার নেই একটুও—বিরক্তিও না, তুষ্টিও না।

পার্বতী—!

ধীরাপদ কি উঠে পালাবে এবার? বাইরে চারুদির বাগান দেখবে গিয়ে? এ কার সঙ্গে বসিয়ে রেখে গেল চারুদি তাকে! আড়চোখে তাকালো একবার, ছবি তোলার জন্যে ডাকেনি বোধহয়, কেসের মধ্যে ক্যামেরাটা সেন্টার টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে।

পার্বতী!

তার আগেই পার্বতী এসেছে। না হাতে লাঠিসোঁটা বা ডাব-কাটা দা নয়, ছোট মোড়া একটা। অন্য হাতে বোনার সরঞ্জাম। মোড়াটা ঘরের মধ্যেই দরজার কাছাকাছি রেখে এগিয়ে এলো। হাতে শুধু বোনার সরঞ্জামই নয়, এক প্যাকট সিগারেট আর একটা দেশলাইও। সে-দুটো সোফার হাতলে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল একটু।

ধীরাপদ মনে মনে বিস্মিত, ড্রাইভার তো নেই, এরই মধ্যে সিগারেট এলো কোত্থেকে! তাছাড়া, ড্রাইভার এসে থাকলেও পার্বতীকে বাইরে যেতে দেখা যায়নি। আর, যে সিগারেটের শূন্য প্যাকেট মোটরের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দেখেছিল সেই সিগারেটই।

এবারের আহ্বানটা কেন সেটা আর বোঝা গেল না। লোকটার দুহাতের মোটা মোটা আঙুলগুলি সিগারেটের প্যাকেট খোলায় তৎপর। সিগারেট এলো কোথা থেকে বা কি করে চোখে মুখে সে-প্রশ্নের চিহ্নও নেই। আস্তে-ধীরে পার্বতী মোড়ায় গিয়ে বসল, একবার শুধু মুখ তুলে নির্বিকার চোখ দুটো ধীরাপদর মুখের ওপর রাখল। তারপর মাথা নিচু করে বোনায় মন দিল।

ধীরাপদ আশা করছিল, ওই রমণী মুখের পালিশ করা নির্লিপ্ততার তলায় কৌতুকের ছায়া একটু দেখা যাবেই। আর, একটু সংকোচের আভাসও। ঘরের মধ্যে মোড়া এনে বসার একটাই অর্থ, ডাকাডাকি বন্ধ হোক—।

কিন্তু কিছুই দেখল না ধীরাপদ, না কৌতুক না সঙ্কোচ। একেবারে স্থির, অচল—পার্বত্য। এমনটা সেই রাত্রিতেও দেখেনি। বোনার ওপর কাটা-ধরা আঙুল ক'টা নড়ছে, তাও যেন কলের মতই। অস্থির রোগীকে শান্ত করার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক যেমন কিছু একটা ব্যবস্থা করে, ঘরের মধ্যে মোড়া এনে বসাটা তেমনিই একটা ব্যবস্থা যেন।

ব্যবস্থাটায় কাজও হল। ডাকাডাকি বন্ধ হল।···শান্ত একাগ্রতায় সিগারেট টানছে, ধীরে সুস্থে সাপ্তাহিকের পাতা

ওলটাচ্ছে, অলস চোখে বোনা দেখছে খানিক, সোফায় মাথা রেখে ঘরের ছাদও দেখছে।

এই নীরব নাটক আরো কতক্ষণ চলত বলা যায় না। দু'হাত বোঝাই নানা রকমের ফুল নিয়ে ড্রাইভার ঘরে ঢুকতে ছেদ পড়ল। কর্ত্রী বাগান থেকে তুলে পাঠিয়েছেন বোধহয়। কিছু না বলে ফুলসহ সে পার্বতীর কাছে এসে দাঁড়াল। পার্বতী ইশারায় ভেতরে যেতে বলল তাকে। তারপর মোড়াটা তুলে নিয়ে সেও অনুসরণ করল। কর্ত্রী ফিরছেন অনুমান করেই চলে গেল হয়ত।

ফলাফল দেখার জন্য ধীরাপদকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অমিতাভ ঘোষ সিগারেটের শেষটুকু শেষ করে অ্যাশপটে গুঁজল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে দলাই আর প্যাকেট পকেটে ফেলল। তারপর ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর যে বসে আছে, তাকে কোনরকম সম্ভাষণ জানানো প্রয়োজন বোধ করল না।

ধীরাপদ এতক্ষণ যা দেখেছে সে-তুলনায় এ আর তেমন বিসদৃশ লাগল না। আরো আশ্চর্য, এতক্ষণের এই কাণ্ডটা নীতিগতভাবে একবারও অশোভন মনে হয় নি তার। অবাকই হয়েছে শুধু। লোকটার এমন অদ্ভুত আচরণ কতটা বাস্তিক তাও খুঁটিয়ে দেখতে ছাড়েনি। ওর চোখ ফাঁকি দেবে এমন নিপুণ অভিনেতা মনে হয় না। ধীরাপদ রোগ নির্ণয় করে ফেলল, হেড কেস্···বড়লোকের মজার হেড-কেস।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কৌতূহল একটু থেকেই গেল।

চারুদি একাই ঘরে ঢুকলেন, ফুল-এক্সপার্ট বাগান থেকেই বিদায় নিয়েছেন বোধহয়। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির ফলে চারুদি বেশ শ্রান্ত। ধীরাপদকে একলা বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, অমিত কোথায়, ভিতরে?

না, এই তো চলে গেলেন।

চলে গেল! সোফায় বসে পড়ে বললেন, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না, এখানে কি হাতের কাছে ট্যাক্সি পাবে না ট্রাম-বাস পাবে! যাকে বলছেন তার সঙ্গে যে চলে গেল তার কোনো যোগ বা পরিচয় নেই মনে হতেই বোধহয় প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন।—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম, চা দিয়েছে তো না তাও দেয়নি?

দিয়েছে।

চারুদিকে এতক্ষণ একা বসিয়ে রাখার কৈফিয়তটা শেষ করে নিলেন।—কি করি বলো, ভদ্রলোক এসে গেলেন, আমারও ওদিকে বাগান নিয়ে ঝামেলা, এটা হয় তো ওটা হয় না—ভদ্রলোক জানেন শোনেন খুব, পুণার পোচা নার্সারির লোক।

পোচা নার্সারির লোকের সম্বন্ধে ধীরাপদর কোনো আগ্রহ নেই, বরং অমিতাভ ঘোষ সম্বন্ধে আরো দু'চার কথা বললে শোনা যেত।

···চলো, ভিতরে গিয়ে বসি, আজও মাগৃগির ছাড়া পাচ্ছ না।

ধীরাপদ বলল, আজ একটু কাজ ছিল—

চারুদি উঠে দাঁড়িয়েছেন, ফিরে তাকালেন।—কাজও তাহলে কিছু করো তুমি?···কি কাজ?

এখানে এই ঘরে বসে কি কাজের কথাই বা বলতে পারে ধীরাপদ—নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবুর সঙ্গে করার কাজটা নিজের কাছেই আর জরুরী মনে হচ্ছে না তেমন। জবাব না দিয়ে হাসল একটু।

চারুদি ডাকলেন, এসো—

অন্দর মহলের প্রথম ছুটো ঘর ছাড়িয়ে চারুদির শয়ন ঘর। দামী খাটে পরিপাটি শয্যা আর স্বল্প আসবাব পত্র। বেশ বড় ঘর, এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট টেবিল আর চেয়ার। টেবিলে টেলিফোন, লেখার সরঞ্জাম। অন্য কোণে মস্ত ড্রেসিং টেবিল আর আলমারী একটা। মেঝেতে কুশন বসানো গোটা দুই মোড়া।

বোসো—

চারুদি দোরগোড়া থেকে চলে গেলেন এবং একটু বাদেই আঁচলে করে ভিজে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এলেন। ধীরাপদর মনে পড়ল, আগের দিন বলেছিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল না দিলে মাথা গরম হয়ে যায়।

দাঁড়িয়ে কেন, বোসো—

শয্যার ওপরেই নিজে পা গুটিয়ে বসলেন, ধীরাপদ কাছের মোড়াটা টেনে নিল।

তারপর, কি খবর বলো—দাঁড়াও, আগে তোমাকে খেতে দিতে বলি—

খাট থেকে নামতে যাচ্ছিলেন, ধীরাপদ বাধা দিল, বোসো, আজ খাবার তাড়া নেই কিছু।

কিছু না?

না, অবেলায় খেয়েছি।

সত্যি বলছ, না শেষে জব্দ করবে আবার?

ধীরাপদ হাসতে লাগল। সে-দিনের ও-ভাবে খেতে চাওয়ায় শুধু যদি জব্দ করার ইচ্ছেটাই দেখে থাকেন, বাঁচোয়া।

চারুদি আবার পা গুটিয়ে নিয়ে খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চিঠি পেয়েও এলে না কেন?

আসব ভাবছিলাম···।

হুঁ, আসলে তোমার এড়াবার মতলব ছিল। নইলে কতকাল বাদে দেখা, আমি তো ভেবেছিলাম পরদিনই আসবে।

ধীরাপদ হাসিমুখেই বলে বসল, কতকাল বাদের দেখাটা সত্যিই তুমি জিইয়ে রাখতে চাইবে জানব কি করে, এবারে জানলাম।

চারুদি থতমত খেয়ে গেলেন একটু। আত্মীয় পরিজন সকলকেই পরিত্যাগ করেছেন, করা দরকার হয়েছে—সেই কটাক্ষ কি না বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর সহজ ভাবেই বললেন, তোমার কথাবার্তাও বদলেছে দেখছি, এবারে জানলে যখন আর বোধহয় গাড়ি নিয়ে হাজির হতে হবে না?

ধীরাপদ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল। কিন্তু চারুদির তার আগেই কিছু যেন মনে পড়েছে। বললেন, আচ্ছা তোমার ঘরের সামনে ওই যে বউটিকে দেখলাম—সেই তো বোধহয় খবর দিলে তোমাকে—কে?

ধীরাপদর হাসি পেয়ে গেল। মেয়েদের এই এক বিচিত্র দিক। এতলোকের মধ্যে চারুদিরও শুধু সোনাবউদিকেই চোখে পড়েছে। নিজের অগোচরেই আঠারো বছরের ব্যবধান ঘুচতে চলেছে ধীরাপদর। মজা করার লোভে গম্ভীর মুখেই জবাব দিল, সোনাবউদি।

সোনাবউদি।

হ্যাঁ, গগুদার বউ।

চারুদি অবাক। তারা কারা?

চিনলে না?

আমি কি করে চিনব?

ধীরাপদ হেসে ফেলল, ও-বাড়ির কাকেই বা চেনো তুমি?

হাসলেন চারুদিও।···তাই তো, যাকগে তোমার খবর বলো, ওখানেই বরাবর আছ?

হ্যাঁ।

কিন্তু বাড়িটার যা অবস্থা দেখলাম ও তো যখন তখন মাথার ওপর ভেঙে পড়তে পারে।

ও-বাড়ির অনেকেই সেই শুদিনের অপেক্ষা করছে···কিন্তু বাড়িটা নির্লজ্জের মত শুধু আশাই দিচ্ছে।

শুনে চারুদি কেন জানি একটু খুশিই হলেন মনে হল। মুখে অবশ্য কোপ প্রকাশ করলেন, কি বিচ্ছিরি কথাবার্তা তোমার।

শয্যায় পা-টান করে বসে আবারও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ধীরাপদর এটা স্বাভাবিক লাগছে না খুব। গত আঠারো বছরের ওর ব্যক্তিগত সবকিছুই যেন জানার আগ্রহ তাঁর। কোন্ পর্যন্ত পড়েছে, এম, এ টা পড়ল না কেন, তার পর এ ক'বছর কি করেছে, এখন কি করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষের দিকে প্রায় জেরার মত লাগছিল। যেন চারুদির জানারই প্রয়োজন এই সবকিছুই। উঠে ঘরের আলোটা জেলে দিয়ে এসে বসলেন আবার।

দিনের আলো বিদায়মুখি, তবু ঘরের আলো আর একটু পরে জ্বাললেও হত। ধীরাপদর মনে হল উনি মুখেই জেরা করছেন না, তাঁর চোখও সজাগ। আর জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসত না দিয়ে বলল, এবারে পাত্রীর খবর বলো দেখি শুনি।

পাত্রীর খবর! চারুদি সঠিক বুঝলেন না।

যে-ভাবে জিজ্ঞাসা করছ ভাবলাম হাতে বুঝি জবর পাত্রী-টাত্রী কিছু আছে।

উৎফুল্লমুখে চারুদি তক্ষুনি জবাব দিলেন, তোমায় পাত্রী তো আমি—আর পছন্দ হয় না বুঝি? তাছাড়া, যে হতভাগা অবস্থা দেখছি তোমার, তোমাকে মেয়ে দেবে কে?

আজ উঠি তাহলে।

চারুদি হেসে ফেললেন, না অতটা হতাশ হতে বলিনে—। থেমে কি ভেবে নিলেন একটু, তারপর নিরপেক্ষ মন্তব্য করে বসলেন, কিন্তু এভাবে এতগুলো বছর কাটানো পুরুষ মানুষের পক্ষে লজ্জার কথা।

বলার মধ্যে দরদ কমই ছিল, ধীরাপদ উষ্ণ হয়ে উঠল। যেন এমন একটা কথা বলার যোগ্যতা উনি নিজেই অর্জন করেছেন। বিরক্তি চেপে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বলল, তা হবে। কিন্তু যে-ভাবে তুমি আমার খবর-বার্তা নিচ্ছ সেই থেকে, মনে হচ্ছিল লজ্জাটা ইচ্ছে করলে তুমিই দূর করে ফেলতে পারো।

চারুদি সোজাসুজি খানিক চেয়ে রইলেন তার দিকে, তারপর খুব স্পষ্ট করে জবাব দিলেন, পারি। তুমি রাজি আছ?

পারেন যে, সে সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র নেই যেন। সরাসরি এমন একটা প্রস্তাবের মুখে পড়তে হবে জানলে ধীরাপদ বিদ্রূপের চেষ্টা না করে খোঁচাটা হজম করেই যেত। কিন্তু যত না বিব্রত বোধ করল তার থেকে অবাকই হল বেশি। রমণী-মহিমায় রাজার রাজ্য টলে শুনেছে, এই বা কম কি। জবাবের প্রতীক্ষায় চারুদি তেমনি চেয়ে আছেন ওর দিকে।

হাসিমুখে ধীরাপদ পরাজয়টা স্বীকার করেই নিল এক রকম, যাক, তাহলে পারো বোঝা গেল—

তুমি রাজি আছ কি না তাই বলো।

এবারে ধীরাপদর দুচোখ তার মুখের ওপর ঘুরে এলো একবার পরিহাসের আভাসমাত্র নেই, বরং ওর জবাবেরই নীরব প্রতীক্ষা। বিস্ময়ের বদলে এবারে ধীরাপদ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কেমন, মনে হচ্ছে, ওর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চারুদির এতক্ষণের এত জেরা শুধু এই প্রশ্নটার মুখোমুখি এসে দাঁড়ানোর জন্যেই। রমণী-মন-পবনের এ আবার কোন ইশারা ঠিক ধরতে পারছে না। রাজি হোক না হোক, এই বয়সে চারুদির এমন জোরের উৎসটা কোথায় জানার কৌতূহল একটু ছিল। হেসে বিব্রতভাবটাই প্রকাশ করল, ঘাবড়ে দিলে যে দেখি, উপকার না করে ছাড়বে না?

একটু থেমে চারুদি বললেন, উপকারটা তোমার একার নাও হতে পারে।

আর আবার কার, তোমারও?

চারুদি বিরক্ত হয়েও হেসে ফেললেন, বড় বাজে কথা বলো, যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও না?

বেশ একটা বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়ে গেল ধীরাপদ। আর গলা না বাড়িয়ে কেন জানি প্রসঙ্গটা এবারে এড়াতেই চেষ্টা করল সে। হস্টেলে থাকতে যে-ভাবে কথাবার্তা কইত অনেকটা সেই সুরেই বলল, এই না হলে আর মেয়েছেলে বলে, আঠারো বছর বাদে সবে তো দু'দিনের দেখা—আঠারোটা দিন অন্তত দেখে নাও মানুষটা কোথা থেকে কোথায় এসে ঠেকলাম!

আমার দেখা হয়েছে, সে ভাবনা তোমার—তেমন যদি বদলেই থাকো আজকের ব্যবস্থাও কাল বদলাতে কতক্ষণ?

সাফ জবাব। অর্থাৎ, দেবো ধন, বুঝব মন—কেড়ে নিতে কতক্ষণ। কিন্তু এ নিয়ে ধীরাপদ আর বাক-বিনিময়ের অবকাশও পেল না। চারুদি খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

পার্বতী!

এই এক নামের আহ্বান-বৈচিত্র্য আজ অনেকবারই শুনেছে। পার্বতী দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল। রাতের আলোয় হোক বা যে জন্যেই হোক, মুখখানা অতটা ভাবলেশশূন্য পালিশ করা লাগছে না এখন।

মামাবাবু এখানে খেয়ে যাবেন।

নির্দেশ শ্রবণ এবং প্রস্থান। এর মধ্যে আর কারো কোনো বক্তব্য নেই যেন। পার্বতী চলে যাবার পরেও ধীরাপদ হয়ত আপত্তি করত বা বলত কিছু। কিন্তু সেই চেষ্টার আগেই চারুদি সোজা টেবিলে গিয়ে বসলেন। প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে দু'চার মুহূর্ত ভাবলেন কি, তারপর চিঠি লিখতে শুরু করে দিলেন

ধীরাপদ নির্বাক দ্রষ্টা।

রাত মন্দ হয়নি।

আজও চারুদির গাড়ি করেই ধীরাপদ বাড়ি ফিরছে। বুকপকেটের খামটা বার দুই উল্টে-পাল্টে দেখেছে। এ আলোয় দেখা সম্ভব নয়, দেখেও নি—অস্বস্তিকর কৌতূহলে হাতে নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছে শুধু।

তেমনি নীল খাম, যেমন ডাকে এসেছিল সেদিন। অপরিচিত নাম, অপরিচিত ঠিকানা, পরিচ্ছন্ন ভাবে আঁটা। চারুদি খাম আঁটেন বটে, এমাথা-ওমাথা নিশ্ছিদ্র। ধীরাপদর কৌতূহল অনেক বার ওই বন্ধ খামের ওপর থেকেই ব্যাহত হয়ে ফিরে এসেছে।

আকাশের পরীরা একবার নাকি বড় মুশকিলে পড়েছিল। বিধাতার বরে তাদেরও বর দেবার ক্ষমতা জন্মেছিল। কিন্তু ওদিকে যে বরের যুগের বিশ্বাসটা যেতে বসেছে বেচারীরা জানত না। বর দেবার জন্যে তারা মানুষের রাজ্যে যখন-তখন এসে ঘুর-ঘুর করত আর বর দেবার ফাঁক খুঁজত। চুপি চুপি অনুরোধ উপরোধও করত একটা বর প্রার্থনা করবার জন্যে। একেবারে করুণ দশা তাদের।

গল্পটা মনে পড়তে ধীরাপদর প্রথমে মজাই লাগছিল। এই আঠারো বছরে চারুদিরও হয়ত কিছু দেবার ক্ষমতা জন্মেছে, কিন্তু নেবার লোক জোটেনি নাকি!

চারুদি বর গছালেন?

পরীর গল্পের শেষটা মনে পড়তে ধীরাপদ একা একাই হেসে উঠেছিল। এক পরীর তাগিদে উত্যক্ত হয়ে একজন মানুষ বর চেয়েই বসেছিল। চাইবার আগে পরীর মিষ্টি মুখখানি ভালো করে দেখে নিয়েছিল। শেষে বলেছিল, বর দেবে তো ঠিক? পরী বলেছিল, বর দেবার জন্যেই তো হাঁসফাঁস করছি—সত্যাবদ্ধ হয়ে বর দেব না, বলো কি তুমি!

তাহলে ওই ডানা দুটি আগে খোলো!

কিছু না বুঝেই পরী ডানা খুলেছিল।

এবারে আমার রমণীটি হয়ে এখানেই থেকে যাও।

ভাবতে মন্দ মজা লাগছিল না ধীরাপদর, বর গছিয়ে ফেলে চারুদি যদি বিপদই ডেকে এনে থাকেন নিজের। চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল আবারও, আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁটা—বরের নমুনাটা জানা গেল না।

চিঠি হাতেই থাকল!...ভাবছে। প্রথম কৌতূহল আর কৌতুকানুভূতির পরে ভাবনাটা বাস্তবের দিক গড়াতে লাগল। চিঠি নিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করতে হবে কাল বা পরশুর মধ্যেই। চারুদির সেই রকমই নির্দেশ। পরশু রবিবার, কি হল না হল সোমবার চারুদিকে এসে খবর দিতে হবে। চিঠি হাতে নিয়েও ধীরাপদ একটু আপত্তি করেছিল, বলেছিল, একেবারে অপাত্রে করুণা করছ চারুদি, চাকরিতে অনেকবার মাথা গলিয়েছি, কোথাও মানিয়ে নেওয়া গেল না—

চারুদি খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে জবাব দিয়েছেন, সেটাই ভরসার কথা, খুব তাহলে বদলাওনি তুমি।

ধীরাপদর দুর্বোধ্য লেগেছিল। অভিনব ব্যাপারটার আগাগোড়াই দুর্বোধ্য লাগছে এখনও। কার সঙ্গে দেখা করতে হবে? চাকুরে না ব্যবসাদার? যাই হোন, বড় লোক নিশ্চয়ই। কিন্তু কে চেনে তো না। কলকাতার শহরে ধনদার ভাণ্ডারী তো একটি দুটি নয়—ছড়াছড়ি। এক একজনের বিত্তের অঙ্ক শুনলে হার্টফেল করার দাখিল। ক'জনকেই বা চেনে।

তবু কে ভদ্রলোক?

স্মৃতির পটে ধীরাপদ একটা মূর্তি হাতড়ে বেড়ালো কিছুক্ষণ। মুখ স্পষ্ট ধরা পড়ছে না। ধীর, গম্ভীর অথচ মুখখানা যাঁর হাসি হাসি, কানের দু'পাশের চুলে একটু একটু পাক ধরায় যাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে ধীরাপদর প্রায় ছেলেমানুষ মনে হত নিজেকে।

তিনিই কি?

...কিন্তু তাঁর তো নিজের গাড়িও ছিল না তখন। চারুদির গাড়িতেই ঘুরে বেড়াতেন।

চিঠি নিয়ে দেখা করতে যাবে কি যাবে না সেটা পরের কথা। বোধহয় যাবেই না, চিঠিতে চারুদি ওর হয়ে সংস্থান ভিক্ষা করেছে কিনা কে জানে। একবার দেখতে পারলে হত কি লিখেছে। কিন্তু ওর তাগিদ নেই জেনেও চারুদি চেষ্টা করতে যাবে কেন। চারুদির এই ব্যাপারটাই অদ্ভুত ঠেকছে তার কাছে। শুধু এই ব্যাপারটা নয়, আজকের গোড়া থেকে সবটাই। এর আগের দিন যে চারুদিকে দেখেছিল, এমন কি পোচা নার্সারির সেই ফুল-বিশেষজ্ঞটির সামনে সমস্যা-ভারাক্রান্ত যে চারুদিকে দেখেছিল, তার সঙ্গে এই চারুদির বেশ তফাত।

এই চারুদির ভিতরে ভিতরে যেন অনেক সমস্যা। এই চারুদি প্ল্যান করতে জানে।

ধীরাপদ ভাবছে, কিছু একটা জট ছাড়াবার মত করেই ভাবছে। চিঠিতে ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও ও যায়নি, গাড়ি হাঁকিয়ে চারুদি নিজেই এসে ওকে ধরে নিয়ে গেছে। অস্বাভাবিক আগ্রহে ওর এই অলস মরচে-ধরা জীবনের খবরাখবরও জানতে চেয়েছে। জেনে খুব যে দুঃখিত হয়েছে মনে হয় না। উল্টে মনে হয়েছে, ওর এই আলো-নেভানো জোড়াতাড়া অবস্থাটাই কিছু একটা উদ্দেশ্যেরই অনুকূল তার। চারুদি স্নেহ করত, ভালও বাসত হয়তো—কিন্তু সেই স্নেহ বা ভালবাসাও ছিল ভক্তের প্রতি করুণার মতই। তার বেশি কিছু নয়। ভক্তের প্রতি মায়া একটু আধটু কার না থাকে? কিন্তু এই দেড় যুগেও সেটা অটুট থাকার কথা নয়। উল্টো হওয়ার কথা এখন। চারুদির এই প্রাচুর্যের মধ্যে সে-তো মূর্তিমান ছন্দপতন। তার বিস্মৃতিকামী জীবনের এই অঙ্কের ও তো কোনো সুবাঞ্ছিত দর্শক নয়, বরং স্মৃতির কাঁটার মতই।

চারুদিরই এড়িয়ে চলার কথা সব দিক থেকে।

তার বদলে এই চিঠি। কি চিঠি কে জানে। উদ্দেশ্য যাই থাক, ওর দারিদ্র্যটাই ফলাও করে এঁকে দেয়নি তো! দিক, যাচ্ছে কে।

কিন্তু এই এক চিঠির তাড়নায় পরের দিনটাও প্রায় ভেবে ভেবেই কেটে গেল। এমন কি এই ভাবনায় ফাঁক দিয়ে তার প্রতি সুলতান কুঠির বাসিন্দাদের সদ্য জাগ্রত কৌতূহলও দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। গত রাতে ধীরাপদ দূর থেকে গাড়ি ছেড়ে দেয়নি, অন্যমনস্কতার ফলে গাড়িটা সুলতান কুঠির আঙিনার মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল। আজ সকালে বদমতলার বেঞ্চির হুঁকোর আসরে ওকে নিয়ে অনেক ফিসফিস জল্পনা-কল্পনা হয়ে গেছে। হুঁকো

শোধনের ফলে বাটির গঙ্গাজল আজ সবটাই ফুরিয়েছে। ওই দুই বুড়োর কাছে আজ রমণী পণ্ডিতের কদর হয়েছে একটু। আর যাই হোক, পেশাদার দূরদ্রষ্টা তিনি। তাঁর অমায়িক দূর-দর্শনে শকুনি ভটচায আর একাদশী শিকদার কখনো ভ্রূকুটি করেছেন কখনো বা রোমাঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু ধীরাপদ এসব কিছুই লক্ষ্য করেনি।

মধ্যাহ্নে হোটেল থেকে খেয়ে ফেরার সময়ে সোনাবউদির সঙ্গে একবার চোখোচোখি হয়েছিল। সোনাবউদি নিজের ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। ওকে দেখে মুচকি হেসে সরে গেছে। ওর ঘরে এসে সরাসরি জেরা করতে বসলে বরং ধীরাপদ খুশি হত। কথায় কথায় সবই বলা যেত সোনাবউদিকে। ঠাট্টা করুক আর যাই করুক, পরামর্শ ঠিক দিত।

কিন্তু আশার সময় আসাটা সোনাবউদির রীতি নয়।

চারুদির চিঠি নিয়ে নির্দেশমত কাল একবার দেখা করে আসার কথাই ধীরাপদ ভাবছে এখন। না গেলে চারুদি আবারও এসে উপস্থিত হবে কিনা ঠিক কি। আর একটা কথাও আজ ভাবছে। শুধু প্রাচুর্য নয়, চারুদির চলনে বলনে বেশ একটা আত্মপ্রত্যয়ী মর্যাদাবোধ ধীরাপদ লক্ষ্য করেছে। অকারণে একটা হাল্কা ব্যাপার করে বসে চারুদি নিজেকে খেলো করতে পারে সেটা আজ আর একবারও মনে হচ্ছে না।

তা'ছাড়া, না গেলে বিবেকের তাড়না। ওর নিষ্ক্রিয় পরিহার প্রবৃত্তিটাই তাহলে বড় হয়ে ওঠে। চোখে আঙুল দিয়ে চিঠিটা ওর এই নিশ্চেষ্ট আত্মবঞ্চনার প্রবৃত্তিটাই যেন দেখিয়ে দিচ্ছে বারবার। তুমি পেলে না? না পেতে চাইলে না? না পাও নাই পেলে কিন্তু পেতে না চাওয়াটা দোষের। আশার সদর রাস্তায় চলে অনেক হোঁচট খেয়েছ? অনেক হতাশা অনেক উদ্বেগ অনেক চিন্তা জ্বরে ভুগেছ?

তবু। আশার আলো নিভিয়ে নিষ্ক্রিয়তার বিবরে গিয়ে ঢুকতে চাইলে নিজের কাছেই নিজের ক্ষমা নেই।

ঠিকানা মিলিয়ে ধীরাপদ যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল, চারুদির বাড়ি দেখার পর এমন একটা বাড়িতে আসছে একবারও কল্পনা করেনি। বেঢপ গঠন, স্ফীতি আছে—ছাঁদ-ছিরি নেই। খুব পুরনো নাও হতে পারে, কিন্তু অনেকখানি অযত্ন আর উপেক্ষা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে বোঝা যায়। এক যুগের মধ্যেও ওর বাইরের অবয়বে অন্তত রং পালিশ পড়েনি।

রাস্তা ছাড়িয়ে একটা ব্লাইণ্ড লেনের মুখে বাড়িটা। সামনেই ছোট উঠোনের মত খানিকটা জায়গা। সেখানে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। একটা ছোট একটা বড়। ছোটটা ধপধপে শাদা, নতুন। বড়টা গাঢ় লাল রঙের, তার চালকটি মাঝের পার্টিশনে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। ছোট গাড়ির চালকের আসন শূন্য।

ধীরাপদ দরজার কাছে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। বাড়িতে জন-মানব আছে বলে মনে হয় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে জানালাগুলোও বেশিরভাগই বন্ধ। ভিতরে ঢুকেই ডাইনে বাঁয়ে ঘর, সামনের দরজার ওধারে দোতলার সিঁড়ি। আশার মধ্যে বাইরের চৌকাঠ পেরিয়ে দরজার কোণে কলিং বেল চোখে পড়ল একটা। আরো একটু অপেক্ষা করে অগত্যা ধীরাপদ সেটাই চড়াও করে দেখল একবার।

একটু বাদে বাঁ দিকের ঘর থেকে মাঝবয়সী একজন লোক এসে দাঁড়াল। ঠাকুর চাকর বা সেই গোছেরই কেউ হবে। শয্যার আরাম ছেড়ে উঠে আসতে হয়েছে বোধহয়, কারণ শীতে লোকটার গায়ে কাঁটা দিয়েছে। এক কথার জবাবে তিন কথা বলে সম্ভাব্য দায় সেরে ফেলতে চেষ্টা করল সে। ধীরাপদ জানল, হিমাংশু মিত্রর এই বাড়ি, কিন্তু সাহেব এখন ব্যস্ত—মিটিং করছেন, আগের থেকে 'এপোণ্টমেন' না থাকলে দেখা হওয়া শক্ত।

কিন্তু ধীরাপদর বরাত ভালো, বাইরের দিকে চোখ পড়তে লোকটা অন্য সমাচার শোনালো। গাড়ি তো দেখছি না, মিটিং তাহলে হয়ে গেছে, আপনি ওপরে চলে যান—

অর্থাৎ মিটিং যখন হচ্ছিল তখন আরো গাড়ি ছিল। ধীরাপদ মোলায়েম করে বলল, একবার খবর দিলে হত না।

লোকটা তার দরকার মনে করল না, কারণ, ওপরে বেয়ারা আছে, তাছাড়া ছোট সাহেবও আছেন, দেখা যদি হয় ওপরে গেলেই হবে। আর কাল-বিলম্ব না করে সে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

অতএব পায়ে পায়ে উর্ধ্ব পথে।

দোরগোড়ায় বেয়ারা না দেখে দ্বিধান্বিত চরণে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। আর দু'চার মুহূর্তের একটা নয়নাভিরাম দৃশ্যের সাক্ষি হয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। বড় হল্ ঘর একটা, বেশ সাজানো-গোছানো। তার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বড় সড় পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে একটি মেয়ে। সামনের দিকে মুখ করে আছে বলে মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। হলের ওধারে আর একটা ঘর, মাঝের হাফ-দরজার সামনে ফাইল হাতে একটি ফিটফাট তরুণ ওখান থেকেই হাতের ইশারায় মেয়েটিকে কিছু বলছে। হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে খুব সম্ভব আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার অনুরোধ। এদিকে মেয়েটির মুখে মৃদু হাসির আভাস। জবাবে ফোলিও ব্যাগ সুদ্ধ বাঁ-হাত তুলে ডান হাতের আঙুলে করে ঘড়ির কাঁটা ইশারা করছে সে।

সেইক্ষণে আবির্ভাব।

খুব শুভ আবির্ভাব নয় বোধহয়।

এদিক ফিরে ছিল বলে দূরের মানুষটিরই আগে দেখার কথা ওকে। সেই দেখল। ধীরাপদ ধরে নিল এই ছোট সাহেব। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়েটিও ঘুরে দাঁড়াল। স-প্রশ্ন নিরীক্ষণ করল। ধীরে সুস্থে এগিয়ে এলো। এই টুকুর মধ্যেই ধীরাপদর মনে হল, আসাটা রমণীয় ছন্দের নয় ঠিক, কিছুটা পুরুষ সুলভ নির্লিপ্ত ঢঙের।

কা'কে চান? ওকে নীরব দেখে নিজেই জিজ্ঞাসা করল।

হিমাংশু বাবু—

এক পলক দেখে নিয়ে বলল, মিঃ মিত্র এক্ষুনি উঠে পড়বেন, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ফ্যাসাদ কম নয়, বলবে চারুদির কাছ থেকে? বলল, একটা চিঠি ছিল, তাঁকে দিতে হবে—

হাত বাড়াল, দিন।—সামান্য কথাটা বলতেও ইতস্তত করছে দেখেই হয়ত [illegible] বিরক্তি একটু।

এই গণ্ডগোলে পড়তে হবে জানলে ধীরাপদ চিঠির কথা বলত কি না সন্দেহ। নিচের লোকটা বলেছিল ওপরে বেয়ারা আছে। সেই হাতে চিঠি সমর্পণ অনেক সহজ হত হত। কিন্তু বেয়ারা বোধহয় প্রভুর আগেই উঠেছে।

খামটা উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে মেয়েটি আর একবার তাকালো। ঠিকানায় নারী-অক্ষর-বিন্যাস দেখে সম্ভবত। তারপর চিঠি হাতে ফিরে চলল। হাফ-দরজা সংলগ্ন সুদর্শনটি তখনো দাঁড়িয়ে। খামসুদ্ধ রমণী-বাহুর ইশারায় তার প্রতি আর একটু অবস্থানের ইঙ্গিত। পত্র-বাহিনীর এই ফিরে যাওয়াটুকুও তেমনি সবল-মাধুর্য পুষ্ট বিলম্বিত লয়ের। দেখে পুরুষের চোখ একটু সজাগ হলেও আত্মবোধ কিছুটা দুর্বল হবার মত।

চিঠিখানা সেই তরুণের হাতে দিতে সেও সেখান থেকে ধীরাপদর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা, তারপর হাফ-দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। মেয়েটি ফিরে এসে একটা সোফায় বসল, হাতের অতবড় ব্যাগটা কোলের ওপর। সোফায় মাথা রেখে চোখ বুজল কি না বোঝা গেল না।

একটু বাদে সম্ভবপর-ছোট সাহেবটি হাফ-দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসে দূর থেকেই ধীরাপদকে ইংগিতে জানালো, সে ভিতরে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে পারে। তারপর এগিয়ে এসে মেয়েটির পাশে ধুপ করে বসে পড়ল। অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি, তাই দেখে মেয়েটির মুখে চাপা কৌতুক।

দু'জোড়া চোখের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে ধীরাপদ হাফ-দরজার দিকে এগোলো। এদের চোখে নিজেকে কেমন অবাঞ্ছিত লাগছে বলেই ভিতরে ভিতরে অপ্রতিভ। এমন একটা দুটো মূর্তি তারও চোখে পড়েছে, যাদের দেখে মনে অকারণ-বিরক্তির ছায়া পড়ে এক ধরনের। এর আগে নিজেকে সেই জাতের ভাবেনি কখনো।

ভিতরে ঢুকল। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারটা জবরাট করে বসে আছেন একজনই, ঘরে দ্বিতীয় কেউ নেই। ভারি মুখে মোটা পাইপ, আয়ত চোখে লাইব্রেরি-ফ্রেম চশমা। পরনে দামী স্যুট।

মনে মনে ধীরাপদ একেই দেখবে আশা করেছিল।

আঠার বছর বাদে দেখেও চিনতে একটুও দেরি হল না। বয়েস এখন বোধ হয় সাতান্ন আটান্ন। চারুদির শ্বশুর বাড়িতে এঁকেই দেখত মাঝে-সাজে। তেমনি গম্ভীর অথচ হাসি হাসি মুখ। কানের দু'পাশের চুলে তখনই পাক ধরেছিল, এখন যে-কটা চুল আছে সবই রেশমের মত শাদা। আঠের বছর আগের দেখা সেই পুরুষোচিত রূপে বয়েসের দাগ পড়েছে, ছাপ পড়েনি।

ধীরাপদ দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো।

রিভলভিং চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে আয়েস করে বসলেন তিনি, দাঁতে পাইপ চেপে মাথা নাড়লেন একটু। সেই ফাঁকে নীরব ঔৎসুক্যে দেখেও নিলেন তাকে। তারপর ইঙ্গিতে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

চারুদির চিঠিটা টেবিলের ওপর খোলা পড়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে একবার চোখ বোলালেন। পরে চিঠি পকেটে রেখে চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি হলেন।—চাকরি চাই?

চাই বলতে বাধল। আর, চাইনে বললে এলো কেন? নিরুত্তরে হাসল একটু।

চশমার ওধারে দুটো চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। দু'-চারটে মামুলী প্রশ্ন, কতদূর পড়াশুনা করেছে, চাকরির কি অভিজ্ঞতা, এখন কি করছে, ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ধীরাপদর কোনো জবাবই ত্বরিত নিয়োগের অনুকূল নয়। এরপরেই খুব সহজ ভাবেই ভারী একটা বেখাপ্পা প্রশ্ন করে বসলেন তিনি। বললেন, যিনি আপনাকে চিঠি দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন আপনি খুব বিশ্বাসী, আই মিন ভেরি ভেরি রিলায়েবল—রিয়েলি?

ভদ্রলোকের দু'চোখ শিথিল বিশ্লেষণ রত। ধীরাপদ জবাব কি দেবে!—সেটা উনিই জানেন···

উনি কত দিন জানেন?

ছেলেবেলা থেকে।

ভুরুর মাঝে ঈষৎ কুঞ্চন-রেখা পড়ল। ওর দিকে চেয়েই কিছু স্মরণ করার চেষ্টা।—ডোন্ট মাইণ্ড, তাঁর সঙ্গে আপনার কত দিন পরে দেখা?

ধীরাপদর অনুমান টেলিফোনে এঁর সঙ্গে চারুদির আগেই আলোচনা হয়েছে। তাই প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝলেও যথাযথ জবাব দিল, প্রায় আঠারো বছর···

দেখছেন নিরীক্ষণ করে, মুখ আরো একটু হাসি হাসি।—এ প্রিটি লং টাইম, এতগুলো বছরে যে কোনো লোক একেবারে বদলে যেতে পারে···কি বলেন?

বিদ্রূপের আভাস যেন। ধীরাপদর মুখে সংশয়ের চকিত ছায়া একটা। চুপ-চাপ চেয়ে রইল। তিনি আবার বললেন—বললেন না, পরামর্শ দিলেন যেন, গরম জলের কেটলির মুখে কিছুক্ষণ ধরে রাখলে খাম খোলা সহজ হয়, নেক্সট টাইম ইফ ইউ হ্যাভ টু ডু ইট, ট্রাই দ্যাট্ ওয়ে।

এমন এক অশোভন ব্যাপারে ধরা পড়েই যেন ধীরাপদর এই অনভ্যস্ত পরিবেশে এসে পড়ার জড়তা গেল। নিজের নির্বিকার সহজতায় আত্মস্থ হতে সময় লাগল না। সেই সঙ্গে বেশ একটু কৌতুক-বৈচিত্র্যের আমেজ। মনে মনে ভদ্রলোকের প্রশংসাই করতে হল, এমন হতে পারে ভাবেনি। তাঁর দিকে চেয়েই নিরাসক্ত জবাব দিল, চিঠিটা পড়ে ছিঁড়ে ফেলব বলে খুলেছিলাম।···আমার জন্য চাকরি ভিক্ষা করা হয়েছে ভেবেছিলাম। তাতে আপত্তি ছিল।

চোরের মুখ হল না দেখেই ভদ্রলোক বিস্মিত হচ্ছিলেন, কথা শুনে বেশ অবাক।—চাকরির দরকার নেই?

ধীরাপদ হালকা জবাব দিল, দরকার আছে কি নেই এতদিনে সেই বোধটাই গেছে। আচ্ছা, নমস্কার—

সীট-ডাউন প্লীজ—!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার মুখে অপ্রত্যাশিত একটা তাড়া খেয়েই ধীরাপদ বসে পড়ল আবার। রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে পাইপ ধরানোর ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বক্র দৃষ্টি আরো বার কতক ওর মুখের ওপর এসে পড়ল। আগের মতই হাসি হাসি দেখাচ্ছে, লাইটার পকেটে ফেলে বললেন, তুমি কাল থেকে এসো, শ্যাল বি গ্ল্যাড টু ক্লাভ-ইউ উইথ আস—

ইলেকট্রিক বেলএর বোতাম টিপলেন। প্যাঁ-ক্ করে শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের তরুণটির প্রবেশ। পাইপের মুখ হাতে নিয়ে হিমাংশু মিত্র উঠে দাঁড়ালেন। সৌজন্যের রীতি অনুযায়ী উঠে দাঁড়ানো উচিত ধীরাপদরও, কিন্তু সেটা খেয়াল থাকল না। সে দেখছে এখনো তেমনি উন্নত ঋজু স্বাস্থ্য ভদ্রলোকের।

ধীরাপদকে দেখিয়ে আগন্তুকের উদ্দেশে বললেন, ইনি কাল থেকে আমাদের অর্গানিজেশনে আসছেন—নাম ঠিকানা লিখে নাও আর কোন্ কাজ সুট করবে আলাপ করে দেখো, তার পর কাল আলোচনা করা যাবে। ধীরাপদকে বললেন, এ আমার ছেলে সিতাংশু মিত্র—অরগ্যানিজেশন চীফ।

ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল। নমস্কার বিনিময়।

হিমাংশু মিত্র ততক্ষণে দরজার কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে এসেছে?

ছেলে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

এলে বোলো তার জন্য আমি ঘড়ি ধরে দু ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। ফ্যাক্টরীতে টেলিফোন করেছিলে?

নেই সেখানে।

হাফ-দরজা ঠেলে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। অর্গানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্র এবারে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মুখভাবে একটুও তুষ্ট মনে হল না তাঁকে। বসতেও বলল না। হাবভাবে ব্যস্ততা। জিজ্ঞাসা করল, কি চাকরির জন্যে এসেছেন বলুন তো?

ধীরাপদ হাসিমুখে জবাব দিল, আপনাদের কোন চাকরির সম্বন্ধেই আমার একটুও ধারণা নেই।

ও···টেবিলের প্যাড টেনে নিল।—নাম ঠিকানা বলুন।

হাফ-দরজা ঠেলে এবারে ঘরে ঢুকল সেই মেয়েটি। শিথিল চরণে এবং নিরাসক্ত মুখে ভিতরে এসে দাঁড়াল। হাতে ব্যাগটা নেই।

ধীরাপদ নাম ঠিকানা বলল। এর পরের আলাপ আরো অস্বস্তিকর লাগবে ভাবছে। কিন্তু আলাপ আজকের মত ওখানেই শেষ দেখে হাঁপ ফেলে বাঁচল। সিতাংশু মিত্র বলল, আচ্ছা আপনি কাল তো আসছেন, কাল কথা হবে—আজ একটু ব্যস্ত আছি।

ওকে বিদায় করার ব্যস্ততায় কাল কখন আসবে তাও কিছু বলল না। নিস্পৃহ রমণী-দৃষ্টি টেবিল-জোড়া কাচ আবরণের নিচের চার্টটার ওপর।

রাস্তায় নেমে ধীরাপদ পায়ে পায়ে হেঁটে চলল। হাসিই পাচ্ছে এখন। কি চাকরি করতে হবে বা কত মাইনে পাবে সে সম্বন্ধে খুব কৌতূহল নেই। শুধু ভাবছে ব্যাপার মন্দ হল না।

পাশ দিয়ে সেই টকটকে লাল বড় গাড়িটা বেরিয়ে গেল। ধীরাপদ সচকিত একটু। না, ভদ্রলোক ওকে দেখেননি, পিছনের সীটে মাথা রেখে পাইপ টানছেন। গাড়ি আড়াল হয়ে গেল।

মনে মনে ধীরাপদ আবারও তারিফ করল ভদ্রলোকের। চোখ বটে। কি করে বুঝলেন চিঠি খোলা হয়েছে সেটা এখনো বিস্ময়। কথাবার্তা চাল-চলন সুষ্ঠু 'ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক'। অথচ মুখখানি হাসি হাসি। আঠার বছর আগেও প্রায় এই রকমই দেখেছিল মনে পড়ে।

ধীরাপদ থমকে দাঁড়াল।

আর একটা গাড়ি। সেই ধপধপে শাদা ছোট গাড়িটা। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। ড্রাইভ করছে অর্গানিজেশন চীফ সিতাংশু মিত্র। পাশে সেই মেয়েটি। আত্ম প্রতীতি-চেতন। পলকের দেখা বসার শিথিল ভঙ্গিটুকুও সেই রকমই মনে হল। ধীরাপদর আবির্ভাবে ছোট সাহেবটির বিরূপ অভিব্যক্তির হেতু বোঝা গেল এতক্ষণে। ও এসে বড় সাহেবকে আটকানোর ফলে এদের কিছু একটা আনন্দের ব্যবস্থা বরবাদ হতে বসেছিল বোধহয়! ওপরের হল-ঘরে ইঙ্গিতে একজনের সেই দু'-পাঁচ মিনিট প্রতীক্ষা করার অনুনয় এবং আর একজনের ঘড়ির কাঁটা দেখানোর দৃশ্যটা মনে পড়ল। ধীরাপদ হাসতে লাগল, বিসদৃশ অভ্যর্থনার দরুন আর কোনো অভিযোগ নেই। গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়নি এই ঢের। কত হবে বয়েস? মেয়েটির পঁচিশ ছাব্বিশ, ছেলেটিরও আটাশ উনত্রিশের বেশি নয়। কিন্তু মেয়েটার কাছে ছেলেটা একেবারে ছেলেমানুষ যেন।

কোন দিকে যাবে ভাবতে গিয়ে ধীরাপদর মনে হল আজই একবার চারুদির সঙ্গে দেখা করা দরকার। এখুনি। কাল যাবার কথা। চিঠি খোলার ব্যাপারটা চারুদি আর কারো মুখে শোনার আগে ও নিজেই বলবে। স্পষ্ট স্বীকৃতিরও মর্যাদা আছে, আপাতত ওটুকুই হাতের কড়ি। আজ যাওয়াই ভালো।

দূর কম নয় চারুদির বাড়ি। দুটো বাসে মিলিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ।

গেট পেরিয়ে অন্যমনস্কের মতই দালানের দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ ধীরাপদর দু'চোখ যেন এক স্তূপ লালের ধাক্কায় বিষম একটা হোঁচট খেল। পা দুটো স্থাণুর মত আটকে গেল।

হতভম্ব। চোখ দুটো কি গেছে!

গেট থেকে বাড়ি পর্যন্ত লালমাটির রাস্তা আর বাগান-ভরা লাল ফুলের সমারোহের মধ্যে সিঁড়ি-লগ্ন লাল নিশানাটা তেমন বিচ্ছিন্ন মনোযোগে লক্ষ্য করেনি।

সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে হিমাংশু মিত্রর টকটকে লাল গাড়িটা।

সম্বিত ফিরতে ধীরাপদ ঘুরে গেটের দিকে পা চালিয়ে দিল আবার।

[ক্রমশঃ।

ভলতেয়ার—জীবন ও দর্শন

উপমন্যু

১৮৪২ সালের প্যারিস Merope নাটকের মহড়া চলেছে। পরিচালক স্বয়ং নাট্যকার—ভলতেয়ার। নায়িকা কিছুতেই পরিপূর্ণ আবেগ দিয়ে তার ভূমিকা অভিনয় করতে পারছে না। পরিচালক নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই মনের মতো হচ্ছে না। বেচারি নায়িকা শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়লো। না, আমি পারবো না ভেতরে একটা জাগ্রত শয়তান থাকলে তবেই এই অভিব্যক্তি সম্ভব। আনন্দে লাফিয়ে উঠলো পরিচালক এই তো, ঠিক ধরেছো তুমি। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর রাখতে গেলে শয়তানের দাসত্ব করতেই হবে। পরবর্তীকালে সমালোচক, আর শত্রুরা অনেকেই ভলতেয়ারের জীবনে এই সংজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভলতেয়ারের দেহে শয়তান বাসা বেঁধেছিল বলে গেছেন Sainte-Beuve। De Maistre এতেও তৃপ্ত না হ'য়ে বলেছেন আর তাঁর হাতে ছিল নরকের সব কিছু শক্তি।

সাদামাটা কুৎসিত চেহারা, মুখে বড় বড় কথা, অতি-চটুল, অসভ্য এমন কি সময় সময় অসৎ—এই সব বাছা বাছা বিশেষণ দিয়ে ভলতেয়ারের ঠিক রূপটি আঁকা যাবে না। এক কথায় বলা যায় একটা বিশেষ স্থান এবং কালের যত দোষ সব কিছুর একত্র সমন্বয় এই ভলতেয়ার। সবকিছুর। তবুও অনেক কথা বলা বাকী থাকে, টানা হয় না অনেক রেখা। এই ভলতেয়ারের মাঝেই আবার দেখা গেছে অসীম দয়ার প্রকাশ। যে ভলতেয়ার প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন, উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর সঞ্চয় সেই ভলতেয়ারই বন্য পশুর হিংস্রতা দিয়ে আক্রমণ করেছেন শত্রুকে। কলম চালিয়ে মারতেও মায়া নেই, আবার কেঁদে পড়লে বুকে টেনে নিতেও নেই দ্বিধা। সাদা আর কালোর পরিমিত অথচ পরিপূর্ণ সমন্বয় একই আধারে বিপরীতের বিচিত্র বিকাশ এই ভলতেয়ার!

চরিত্রের নানা দিক নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুললেও আঁকা হয় না এই বিচিত্র প্রতিভার অন্তরের রূপটি। প্রতিভা, বিস্ময়কর প্রতিভা ভলতেয়ার। আর সেই প্রতিভার পরিচয় আছে তাঁর জীবনব্যাপী বিপুল সাহিত্যসৃষ্টিতে, এই সৃষ্টির মহীরুহে অসংখ্য শাখা, অনেক ফুল আর অগণিত ফল। সত্যিই ফুলে ফলে সমৃদ্ধ ভলতেয়ারের সাহিত্য সাধনা। ভলতেয়ার নিজেই বলেছেন, যা ভাবি তা বলাই হচ্ছে আমার কাজ। ভলতেয়ারের এক একটি ভাবনা যেন নিটোল এক একটি মুক্তা। ভলতেয়ারের বলা যেন সেই মুক্তাকে কথার হারে গেঁথে সাহিত্যলক্ষ্মীর গলায় দুলিয়ে দেবার সুচারু সুনিপুণ প্রচেষ্টা।

ভলতেয়ার-সাহিত্যের আকর্ষণ আজ আমাদের কাছে বেশী নেই। তার কারণ বোধ হয় আদর্শের, যে জীবনায়নের যুদ্ধে ভলতেয়ার মশালজ্বালনা ক'রেছিলেন, সেই যুদ্ধ ভলতেয়ারের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু শেষ হ'য়েই যায়নি, আজ তার বিন্দুমাত্র স্মৃতিও জেগে নেই, আমাদের জীবনের আশেপাশে।

নতুন শতাব্দী এনেছে জীবনের নতুন সমস্যা, আদর্শের নতুন সংঘাত। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেছে সেই আগুন, যে আগুনে একদিন দীপ্ত হয়েছিল ভলতেয়ারের ব্যক্তিত্ব, দীপ্যমান হয়েছিল তাঁর সাহিত্যের স্রোত। তাছাড়াও, এই বিরাট ব্যক্তিত্বের আকাশচুম্বী যশের অনেকখানি জুড়ে ছিলেন আলাপচারী ভলতেয়ার। মৃত্যু মুছে দিয়ে গেছে সেই আলাপের উৎস। আছে শুধু লেখা আর সেই লেখার ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় লেখকের অন্তরাগ্নির জ্যোতির্ময় পূতাগ্নির রেশ। এই আলোর রেখায় কালের পথ বেয়ে পিছিয়ে গেলে হঠাৎ এক বিস্ময়বিমূঢ় মুহূর্তে সামনে এসে পড়ে সেই ঝড়ের মত দুর্মদ, আগুনের মত লেলিহান এক মানুষ। মানুষ কিন্তু সব বিচারে অসাধারণ সব নিরিখেই অসামান্য মানুষের ইতিহাসে বিরাটতম মানসশক্তির আধার এক মানুষ।

ভলতেয়ারের লেখাতেই লুকিয়ে আছে এই মহাশক্তির মন্ত্র। অলস বসে থাকা মানেই আমাদের অস্তিত্বের শেষ। পৃথিবীতে এক অলস ছাড়া আর সকলেই ভালো, এই হচ্ছে অক্লান্ত, নিরলস কর্মযোগী ভলতেয়ারের কথা। আরও বলেছেন ভলতেয়ার, বলেছেন, যত বয়স বাড়ছে ততই বুঝছি প্রতি মুহূর্তে কাজ না পেলে বাঁচা যায় না··· কাজের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবনের প্রকৃত আনন্দ, কাজ দিয়েই ছিঁড়ে ফেলা যায় মোহের আবরণ!

যদি আত্মহত্যা করতে না চাও তাহলে সব সময়ে কাজ নিয়ে থাকো। হয়তো আত্মহত্যার প্রতি গোপন কোনো আকর্ষণ ছিল ভলতেয়ারের, তাই তাকে এড়াবার জন্যেই গড়েছিলেন কাজের প্রতি এই নিবিড় আসক্তি, ১৬৯৪ থেকে ১৭৭৮—প্রায় দীর্ঘ একটা শতাব্দী জুড়ে ছড়িয়ে আছে ইউরোপের সাহিত্যে, সমাজে সর্বত্র একটি মানুষের অগ্নিসম প্রভাব। ভিক্টর হুগোর কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ভলতেয়ারের কথা বললেই বলা হয় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মর্মকথা। সত্যিই তাই। ইতালীতে এল নবজাগরণের সাড়া, জার্মানীতে বয়ে গেল সংস্কারের স্রোত। কিন্তু ফ্রান্সে? ফ্রান্সে এলেন ভলতেয়ার একাধারে নব জাগরণের ঋষি আর সংস্কারের হোতা। ভলতেয়ারের নেতৃত্বে এখানেই থামল না ফ্রান্স। আরো একটু এগিয়ে গেল। পার হল গণজাগরণের ক্ষুরধার পথের অনেকখানি, প্রায় অর্দ্ধেক। অতীতকে নূতন রূপে উপস্থাপিত করলেন ভলতেয়ার। সংস্কার আর দুর্নীতির মাথায় মারলেন লুথার বা ইরাসমাসের চেয়ে জোরালো চাবুক। জীবনের সাধনা দিয়ে ভলতেয়ারই তৈরী করলেন সেই বারুদ, যে বারুদে আগুন দিয়ে পুরনো পৃথিবীকে উড়িয়ে দিয়েছিল মিরাবোঁ, মারাট্ড্যানেটন আর রোবসপেয়ার। কিন্তু সে অন্য কথা, সে অনেক পরের কথা। তবু ভুললে চলবে না যে ফরাসী বিপ্লবের মাটি তৈরী করে বীজ বুনেছিলেন ভলতেয়ার, তারপর ফসল যেই ফলাক। লামারতিনকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, সৃষ্টির সাফল্য দিয়ে বিচার করলে বলতে হয় ভলতেয়ারই আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ লেখক। বিধাতা তাঁকে তিরাশী বছরের দীর্ঘজীবন দিয়েছিলেন ক্ষয়িষ্ণু একটা যুগকে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে। সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তিনি পেয়েছিলেন এবং জয়ের মুকুট মাথায় পরে ফেলেছিলেন শেষ নিঃশ্বাস।

পারেননি, কোনো লেখকই পারেননি জীবনকালে ভলতেয়ারের মত প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে। নির্বাসিত হয়েছেন তিনি, বন্দী হয়েছেন কারাগারে। রাষ্ট্র এবং ধর্ম দুই বাধা দিয়েছে তাঁকে, তাঁর একের পর এক বই হয়েছে বাজেয়াপ্ত। কিন্তু সত্যকে চেপে রাখা যায় না, মারা যায় না তাকে গলা টিপে, রাতের আঁধার ছিন্ন করে সত্যের সূর্য্য উদয় হতে দেরি হয়নি। তখন সেই ভলতেয়ারের পায়েই লুটিয়ে পড়েছিল রাজা, মহারাজা, পোপ আর পুরোহিতের দল। তাঁর আঘাতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি উঠেছিল টলমল করে। তাঁর কথা শোনবার আশায় উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্দ্ধেক পৃথিবীর মানুষ। আরও অনেক পরে হাস্যমুখ সিংহের আবির্ভাব স্বপ্ন দেখেছিলেন নীটশে। ভলতেয়ারই ছিলেন এই স্বপ্নের পিছনে সত্যিকারের মানুষ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ভলতেয়ার যুগ যুগ সঞ্চিত যত জঞ্জাল, ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছিলেন পুরাতনের ভগ্নপ্রায় দেউল।

অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক চেতনার এক পরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ইউরোপের আত্মা। বিরাট ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, শাসনযন্ত্র সামন্ততন্ত্রের বজ্রমুষ্টি ছিন্ন করে, মধ্যবিত্ত মানুষের হাতে গিয়ে পড়বার প্রস্তুতির মুখে। সভ্যতার এই বিরাট অগ্রগতিতে হাল ধরলেন দুজন—ভলতেয়ার আর রুশো। ব্যক্তি-মানুষের মনে আদর্শের দ্বন্দ্ব রূপ পায় তার চিন্তায়। ইউরোপের মানুষও তখন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। আইন এবং আচার—দুয়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। সকলেই খুঁজছে মনের এই বিক্ষোভের আগুনকে মুক্তি দেবার ভাষা। সকলেই খুঁজছে আশ্রয়—আইনের শৃঙ্খল থেকে প্রকৃতির শান্ত শীতলতায়, আচারের আবর্জনা থেকে যুক্তির মুক্ত-আকাশে। এই মূক মানুষের এই সমষ্টির সমস্যা, ভাষা পেল ভলতেয়ার আর রুশোর লেখায়। মুক্ত আকাশের আশ্বাস নিয়ে এলেন ভলতেয়ার, প্রকৃতির শান্ত শীতল কোলে ফিরে যাবার পথ দেখালেন রুশো।

নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিতে উন্মুখ হল সকলে, সাড়া দিল অনেকে। বুর্জোয়া ধনীর দলও সাড়া দিল, কারণ মান রাখতে নতুন পরিবেশকে মেনে নেওয়াই ভালো। সম্মান বাঁচাতে নতুন তালে তাল মিলিয়ে চলবার চেষ্টায় দোষ নেই। চললো সকলে, এগিয়ে চললো বাস্তিলের লৌহকপাটের পানে। ফরাসীদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের অন্তরালে পুঞ্জীভূত হয়েছিল অনেক বিক্ষোভ অনেক বিষ। জ্বলছিল আগুন, ধিকিধিকি জ্বলছিল। এই আগুন প্রথম উৎক্ষিপ্ত হ'ল দুই উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গের রূপ ধরে—ভলতেয়ার আর রুশো। তারপর সুরু হল ফরাসী বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাত।

ষষ্ঠ লুই ভলতেয়ার আর রুশোর লেখা দেখে বলেছিলেন, এই দু'জন মানুষই ফরাসী দেশকে ধ্বংস করেছে। ফরাসী দেশ কথাটা বলে লুই বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর রাজবংশ। ঠিক এই ধরণের কথাই শোনা যায় নেপোলিয়নের মুখে—লেখার সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বুরবোঁদের আধিপত্যও নিরাপদ হতো। কামানের আবিষ্কারে সামন্ততন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কালি-কলমই এবার আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। এই কথার সূত্র ধরেই বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছিলেন ভলতেয়ার, পৃথিবীতে পুস্তকের প্রতাপই সর্বজয়ী হবে, অন্ততঃ পক্ষে সেই সব দেশে হবে, যেখানে লিখিত ভাষার প্রচলন আছে। যাদের নেই তারা তুচ্ছ, নগণ্য। এই প্রতাপের পুরোধা হয়ে এগিয়ে চললেন ভলতেয়ার। কানে তাঁর বাজছে মন্ত্র একটা জাত চিন্তা সুরু করলে আর তাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। ফরাসী জাতকে চিন্তার মন্ত্রে দীক্ষা দেবার ব্রত নিলেন ভলতেয়ার।

ভলতেয়ার—পুরো নাম ফ্রাসোঁয়া মারী আঁরুএদ ১৬৯৪ সালে প্যারিস সহরে জন্মান। তাঁর বাবা ছিলেন সহরের একজন নামজাদা এ্যাটর্নি। মায়ের পিতৃ পরিচয়েও সামান্য আভিজাত্যের ছাপ ছিল। বাবার চাতুর্য আর অস্থির মেজাজ তিনি পুরোমাত্রায় পেয়েছিলেন। মায়ের রসিক মন আর খেয়ালী স্বভাব থেকেও তিনি বিশেষ বঞ্চিত হননি।

প্রায় মৃত্যুর হাত ফসকে তিনি পৃথিবীর মাটিতে পড়েছিলেন বলা যায়। বলা যায়, কারণ তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মা চোখ বুজলেন এবং এই কঙ্কালসার, রুগ্ন, ছোট্ট শিশু যে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী টিঁকবে এমন আশা কারুর ছিল না। কিন্তু সকলকে সচকিত করে শিশু শুধু টিঁকেই গেল না, তারপর আরো প্রায় চুরাশী বছর বেঁচে রইল। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দেহের উন্নতি হয়নি। রুগ্ন দেহ সারাজীবন তাঁর অদম্য আশা আকাঙ্খার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

বড় ছেলেকে নিয়ে বাবা মা দুজনে ব্যস্ত হয়েই ছিলেন—অল্পবয়সেই সন্ন্যাস নেবার দিকে ঝুঁকেছিল ভলতেয়ারের দাদা। ভলতেয়ারের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু ভাইকে নিয়ে এই দম্পতি এবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বাবা বলতেন যে দুটি মার্কামারা বোকা এসেছে তাঁর ছেলে হয়ে। একজন গদ্য নিয়ে মাথা

ভলতেয়ার

ঘামাচ্ছে আর অন্যজন পদ্য নিয়ে। পদ্য নিয়ে মাথা ছোট ছেলেই ঘামাচ্ছিল। লিখতে লিখতেই সে মেতে গেল পদ্য বানানোর কাজে। বিষণ্ণ বাবা তাই ছোটটির সম্বন্ধেও সব আশা ছেড়ে দিলেন। বিরক্ত হ'য়ে সকলকে পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়ীতে।

গ্রামে আঁরুএদ সকলের প্রিয় হ'য়ে উঠল। বিশেষভাবে প্রিয় হ'ল এক ধনী বারবনিতার। বাবার চোখে যা ধরা পড়েনি, তাই আকৃষ্ট করল বারবনিতাকে। আর সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথকে সুগম করবার জন্যেই বোধ হয় মহিলা মৃত্যুর সময় উইল করে এই কিশোরকে বই কেনবার জন্য দিয়ে গেলেন ২০০০ ফ্রাঙ্ক। বই কেনা হ'ল এবং পড়াও এগিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলল এক পাদ্রীর কাছে তর্কশাস্ত্রের শিক্ষা। তর্কশাস্ত্র দিয়ে প্রথম হ্যাঁ কে না করতে সুরু করল ছাত্র। ক্রমশঃ শাশ্বত সত্য বলে আঁকড়ে থাকবার মত কিছুই আর রইল না তার হাতের কাছে। কিছু পরে দেখা গেল, কৈশোর আর তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে সন্দেহজর্জর, প্রশ্নাকুল, নাস্তিক মন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ।

বাবা বললেন, কিছু একটা কাজকর্ম আরম্ভ করে দাও এবার।

নির্বিকার ছেলের উত্তর শোনা গেল, আরম্ভ কেন? কাজ তো করছিই।

মানে? ধমকে উঠলেন বাবা।

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ছেলে উত্তর দিলে, কেন, সাহিত্যচর্চা?

সাহিত্যচর্চা! মুখ ভেঙচে চীৎকার করে উঠলেন বাবা, তা না হলে আর সমাজের জঞ্জাল, সংসারের বোঝা হয়ে ওঠবার সুবিধে হবে কেন? শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে মরতে হবে, এই আর কি!

আঁরুএদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহিত্যচর্চাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করল।

বাবা দেখলেন, ছেলে সাহিত্যচর্চার নামে দিনরাত আড্ডায় মেতে উঠেছে। যত অকর্মাকে নিয়ে গভীর রাত পর্য্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে হৈ-হল্লোড়, তর্ক আর আলাপ। রেগে মেগে তিনি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন কাঁয়ে সহরে এক আত্মীয়ের কাছে। বলে পাঠালেন যে ছেলেকে যেন সব সময় ঘরে বন্দী করে রাখা হয়। ভালো ছেলের মত নতুন জায়গায় গেল আঁরুএদ। দু'-চারদিনের মধ্যেই হাসিতে গল্পে আত্মীয়টিকে হাত করে সেখানেই পাতলে তার আড্ডার আসর। আটকে রাখা গেল না এই দুরন্ত তরুণকে। অতএব এল নির্বাসনের হুকুম। তরুণ বয়সেই বুঝি ভবিষ্যৎ ভাগ্যের আভাস পাওয়া গেল।

আভাস যে পাওয়া গেল তাতে সন্দেহ নেই। ফরাসী দূতের বাড়ীতে থাকবার জন্য হেগ সহরে গেল আঁরুএদ। চলছিল ভালই। হঠাৎ প্রেমে পড়ে গেল সে বিদেশী তরুণীর সঙ্গে। আলাপের সময় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগলো, বাড়তে লাগলো চিঠির সংখ্যা আর লেখার দৈর্ঘ্য। লম্বা লম্বা চিঠি শেষ হয় ছোট্ট ক'টি কথা দিয়ে: সারাজীবন আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসবো।—দিন কয়েক পরেই বাবার হুকুমে বাড়ী ফিরতে হ'ল তাকে! সারাজীবন না হোক সারাপথ এবং তারপরেও সপ্তাহকয়েক প্রথম প্রেমিকার কথা ভোলেনি তরুণ আঁরুএদ্।

১৭১৫ সালে একুশ বছরের সুঠাম তরুণ আঁরুএদকে দেখা গেল প্যারিসের পথে। চতুর্দশ লুই সবে দেহ রেখেছেন। নাবালক নতুন সম্রাটের হ'য়ে রাজ্য চালাচ্ছেন একজন রাজপ্রতিনিধি। প্যারিস ভ'রে তখন বইছে জীবনোল্লাসের উচ্ছল স্রোত। সেই স্রোতে সে স্বচ্ছন্দ গা ভাসালো। কিন্তু মিশে গেল না সকলের সঙ্গে। শীঘ্রই তার বুদ্ধির চমক এবং বেহিসাবি জীবনযাত্রা আকৃষ্ট করল সকলকে। এই সময়েই রাজপ্রতিনিধি খরচ বাঁচানোর জন্যে রাজকীয় আস্তাবলের অর্দ্ধেক ঘোড়া বেচে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই সারা সহরে সকলের মুখে শোনা গেল আঁরুএদের মন্তব্য—আহা! রাজসভার অর্দ্ধেক গাধা বেচে দিলে আরো কত ভালোই না হ'ত।

হাসি থেকে কান্না খুব দূরের পথ নয়। অন্ততঃ তাই দেখা গেল আঁরুএদের বেলায়। হাসির কথা হ'লেই তার নামে চালু হচ্ছিল। মিথ্যা হ'লেও মাথা ঘামায়নি সে। হঠাৎ রাজপ্রতিনিধিকে আক্রমণ করে লেখা দু'টো ব্যঙ্গ কবিতা তারই লেখা ব'লে প্রচারিত হ'ল। রাগে আগুন হ'লেন রাজপ্রতিনিধি। আর ঠিক এই সঙ্কটময় মুহূর্তেই একদিন রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে তার দেখা হ'ল এক পার্কে।

রাজপ্রতিনিধি তরুণ আঁরুএদকে লক্ষ্য ক'রে ধারালো হাসি হেসে বললেন, মঁসিয়ে আঁরুএদ, আপনি জীবনে কোনোদিন দেখেননি এমন জিনিষ আমি আপনাকে দেখাতে পারি।

কি বলুন তো? সরল হেসে প্রশ্ন করলে তরুণ।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রাজপ্রতিনিধি বললেন, বাস্তিল কারাগারের অন্ধকার কক্ষ।

পরের দিন ১৭১৭ সালের ১৬ই এপ্রিল বাস্তিল কারাগারের অন্ধকার কক্ষে আশ্রয় পেল তরুণ আঁরুএদ।

এই কক্ষেই আঁরুএদ মরে গেল আর জন্ম নিলেন ভলতেয়ার। আর জন্ম নিল এই নতুন ছদ্মনামের লেখা তাঁর প্রথম সাহিত্যসৃষ্টি—Henriade—দীর্ঘ এবং চলনসই এক মহাকাব্য।

এগারো মাস বাদে মুক্তি পেলেন ভলতেয়ার। ভুলের মাশুল হিসাবেই বোধ হয় রাজপ্রতিনিধির কাছ থেকে হ'ল মাসহারার বন্দোবস্ত। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লিখলেন ভলতেয়ার—আমার দৈনন্দিন উদরপূর্তির ব্যবস্থা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এই সঙ্গে সবিনয় নিবেদন যে ভবিষ্যতে আমার বসবাসের কোনো ব্যবস্থা আপনি না করলেই খুশী হব। ও ব্যবস্থাটা আমি নিজেই ক'রে নিতে পারবো।

অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে তিনি সোজা এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোয়। ১৭১৮ সালে oedipe নামে তাঁর লেখা ট্র্যাজেডি মঞ্চস্থ হ'ল। একাদিক্রমে পঁয়তাল্লিশ রাত্রি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় হ'য়ে ম্লান ক'রে দিল প্যারিসের পূর্বেকার সব রেকর্ড! বৃদ্ধ বাবা একদিন এলেন ছেলের এই কীর্তি দেখতে—ইচ্ছেটা যাবার সময় একটু ধমকে দিয়ে যাবেন। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হলেন বৃদ্ধ, মাঝে মাঝেই বিড়-বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, উঃ, র‍্যাস্কেলটা করেছে কি অ্যাঁ!

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'ল সারা সহর। বিখ্যাত সব কবি আর নাট্যকারেরা এলেন অভিনন্দন জানাতে, উপদেশ দিতে। তরুণ ভলতেয়ার কিন্তু কান দিলেন না অভিনন্দনে, গ্রাহ্য করলেন না কারুর উপদেশ। অদূরাগত দ্বন্দ্বের জন্যে তখন প্রস্তুত হচ্ছেন ভলতেয়ার। সেই দ্বন্দ্বের পূর্বাভাস তিনি দিয়েছেন নাটকের চরিত্র আরাস্পের মুখে: নিজের উপর যেন আমরা বিশ্বাস রাখি, সব কিছু যেন দেখি নিজেদের চোখ দিয়ে, এই মন্ত্রই হবে আমাদের পথের আলো, বুকের বল আর ঈশ্বর-আরাধনা।

অভিনয় থেকে ৪০০০ ফ্রাঁ আয় হ'ল ভলতেয়ারের। বাবার ধারণা মিথ্যা প্রমাণ ক'রে সব টাকাটা সুনিপুণ ভাবে খাটানোর ব্যবস্থা করেলন তিনি। ভবিষ্যতে আয় তাঁর যত বেড়েছে ততই বেড়েছে তাঁর টাকা খাটিয়ে লাভ করার নানা ফন্দী-ফিকির। সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে প্রচলিত নানা বেহিসাবিপনার মাপকাঠিতে বিচার করলে সত্যিই আশ্চর্য মনে হয় ভলতেয়ারের এই অভ্যাস। কিন্তু প্রচলিত কোন মাপকাঠিতেই বা কবে মাপা গেছে ভলতেয়ারের মত অলৌকিক প্রতিভাদের ?

১৭২৯ সালে এক সরকারি লটারীর সব টিকিট কিনে ফেললেন ভলতেয়ার। অনেক হিসেব ক'রে কিনেছিলেন, লাভও হ'ল বেশ মোটা টাকা। সরকার চটলো কিন্তু তাঁর চাটুকার আর অনুগ্রহভাজনরা খুশী হ'ল। ধনী হবার সাথে সাথে মুক্তহস্ত হয়েছিলেন ভলতেয়ার। মধুর চার পাশে মৌমাছির মত চাটুকার আর অনুগ্রহভাজন সমাগমের এই শুরু। জীবনের অপরাহ্নেও ভলতেয়ারের চার পাশে এদের গুঞ্জন শোনা গেছে।

কলমে শাণ দিতে দিতে টাকার অঙ্কের হিসেব রাখা সহজ নয়। কিন্তু ভলতেয়ারের কাছে এইটাই ছিল সাধারণ একটা অভ্যাসের মতো। ভালই ক'রেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর পরবর্তী নাটক Artemire সফল হ'ল না। অন্তরে খুব আঘাত পেলেন নাট্যকার। আগের নাটকের সাফল্যে মনের বীণা আত্মতৃপ্তির চড়া সুরে বাঁধা হ'য়ে গিয়েছিল। একটা তার ছিঁড়তে তাই জাগল মর্মান্তিক যন্ত্রণার কম্পন। জনমতের প্রতি ভয় এই যন্ত্রণা আরো বাড়িয়ে দিল। এক এক দিন পথ চলতে চলতে তাঁর মনে হ'ত ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াটাও তাঁর চেয়ে সুখী। কারণ মানুষের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তার কানে যায় না।

দুঃখ একা আসে না। প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ হ'ল ভলতেয়ারের জীবনে। মারাত্মক জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে কঙ্কালসার দেহ লেখক দেখলেন রাতের অন্ধকার অপসারিত হয়ে পূর্বদিগন্তে উঠছে সৌভাগ্যের সূর্য। Henriade তাঁকে শুধু বিখ্যাত করেনি, অভিজাত সমাজে তাঁর আসন নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেছে। সেই আসনে জেঁকে বসলেন তরুণ সাহিত্যিক অভিজাত সমাজের আওতায় আর আদরে সব খুঁত নিশ্চিহ্ন হয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সৌখীন, সচেতন, বাস্তববাদী, চমকপ্রদ আলাপচারী, সুন্দর, সুসংস্কৃত, ইউরোপীয় কালচারের পূর্ণ প্রতীক একটি মানুষ।

আভিজাত্যের উষ্ণ পরিবেশে, আদরের আসন দখল করে আট বছর বসেছিলেন ভলতেয়ার। তারপরই ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। বংশগৌরবের বর্ম নেই তাঁর, নেই গালভরা সম্মানের কবচ-কুণ্ডল। শুধু প্রতিভা সম্বল করে আর থাকা চলল না অভিজাত সমাজে। এক ভোজের আসরে একদিন বেসুর শোনা গেল। প্রাণ খুলে হাসছিলেন ভলতেয়ার, ওড়াচ্ছিলেন মজার মজার কথার তুবড়ি। হঠাৎ হোমরা-চোমরা অভিজাতকে মধ্যমণি একজন বেশ জোর গলায় প্রশ্ন করলেন, কে হে এই ছোকরা, এমন হাউ-হাউ করে চীৎকার করছে!

চকিতে ভেসে এল ভলতেয়ারের উত্তর, আজ্ঞে এমন একজন যে নামের বোঝা বয়ে বেড়ায় না, বরঞ্চ তার নাম আছে বলেই তাকে সম্মানের বোঝা বইতে হয়।

মহামান্য মধ্যমণির সামনে মুখ খোলাই অন্যায়। এমন প্রাণখোলা কথা বলা তো প্রচণ্ড অপরাধের সামিল। অতএব গোপনে এই দুর্বিনীত তরুণের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন মহামান্য ব্যক্তিটি। রাতের অন্ধকারে ভলতেয়ারকে উত্তম মধ্যম দেবার জন্য নিযুক্ত হল গুণ্ডার দল। গুণ্ডাদের বলে দেওয়া হল, লোকটার মাথায় আঘাত করো না, কারণ ওর মাথা থেকে ভালো কিছু বার হবার সম্ভাবনা আছে।

হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পরদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে থিয়েটারের সৌখীন আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ভলতেয়ার। একেবারে মধ্যমণির মুখোমুখি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানালেন মধ্যমণিকে। তারপর বাড়ী ফিরে এসে বসলেন তরবারিতে শাণ দিতে। মধ্যমণি কিন্তু দ্বন্দ্বের ধার দিয়েও গেলেন না। সোজা ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন তাঁর আত্মীয় পুলিশের প্রধানকে। ফলে ভলতেয়ারকে আবার এসে ঢুকতে হল কারাগারের রুদ্ধকক্ষে।

পরদিনই ছাড়া পেলেন ভলতেয়ার কিন্তু হুকুম হল ইংলণ্ডে নির্বাসন। ডোভার বন্দরে এই নির্যাতিত মানুষটিকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল ফরাসী প্রহরীরা। তাদের পিছু পিছু ভলতেয়ারও ফিরলেন, প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে জ্বলতে গোপনে এসে পা রাখলেন ফরাসী উপকূলে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। ধরা পড়লেন ভলতেয়ার। তৃতীয়বার কারাগারে আটক হবার আগেই জাহাজে চড়ে পালিয়ে গেলেন ইংলণ্ডে। সুরু হল ১৭২৬ থেকে ১৭২৯ তিন বছর ইংলণ্ডের জীবন।

[ক্রমশঃ।

একটি সনেট

শ্রীপিনাকীনন্দন চৌধুরী

পূর্বের নীড়ের যত আলোর পাখীরা
মনের আকাশ-নীলে ভিড় ক'রে আসে।
নিভৃত হৃদয়-কোণে মৌন যে বাণীরা
ধ্বনি পাবে তাহাদের পাখার বাতাসে।
মন্থর রজনী ক্লান্ত। আমি ক্ষণ গুণে
স্মৃতিরে প্রলুব্ধ করি চিন্তার যৌতুকে।

স্বপ্নের মেয়েরা বুঝি সারা রাত বুনে
সোনালী পশম ঢাকে হিম জমা বুকে।
মনের কথারা মৌন রাতের গভীরে :
তাইতো বঞ্চিত প্রেম—স্তব্ধ নিবেদনে।
তোমার চোখের কালো-সাগরের তীরে
হয়তো পূর্বের নীড় রেখেছ গোপনে।

ও'নয়নে আলোকের পাখীরা জাগুক :
যুগান্তের মৌন বাণী আজিও উৎসুক।

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

চৈত্র মাস যাই-যাই করছে। আসছে বৈশাখ নতুন বছরের স্বাক্ষর নিয়ে। কমলা সেবাসদনের উদ্বোধনের দিনও আসছে এগিয়ে। সেই বিষয় জানাতে সেদিন লালকুঠিতে এসেছিল সুদাম।

বাড়ী ছিলোনা অসীম। একটু ইতস্তত করে ওপরে উঠে এলো সুদাম সুমিতার ঘরে, তখন সুমিতা দোলনায় আলোকে শুইয়ে, মৃদু মৃদু দোল দিতে দিতে গুন গুন করে গাইছিলো একটা ঘুমপাড়ানি গান। হঠাৎ সুদামকে দেখে গান থামিয়ে একটু অবাক চোখে চাইলো ওর দিকে।

স্নিগ্ধ হাসির আলো আর তার সাথে একটু গোলাপি রং ছড়িয়ে পড়লো ওর দুটি গালে আর ঠোঁটে।

—বাঃ! দাঁড়িয়ে কেন? বোসো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো সুমিতা।

খোকনের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে ওকে একটু আদর করে বললো সুদাম——তোমার খোকন তো বেশ বড়-সড় হয়ে গেছে এই ক'টা দিনেই? আরো মিষ্টি হয়েছে দেখতে। বেশ ভালো আছে তো?

—হাঁ ভালোই আছে। জানো দামীদা, খোকনের সব কাজ আমি নিজে হাতে করি। কাকীমাকে বলো, আমি সব শিখে গেছি। কাকিকে রেখেছি শুধু আমার সঙ্গে গল্প করবার জন্য।

—তাই নাকি? তা তোমার কাকির বরাত ভালো বলতে হবে। নিজে হাতে সব করো এটা বড় আশার কথা মিতা? কারণ ভবিষ্যতে অনেক বাচ্চাদের ভার তো তোমায় নিতে হবে। হাঁ যে কথা বলতে এসেছিলাম—আগামী বিশে বৈশাখ কমলা সেবাসদনের উদ্বোধনের দিন স্থির হয়েছে। কাকাবাবু আসছেন গুরুদেবকে নিয়ে, তাই বলতে এসেছি তুমি আর কাকা যাবে—ছোট মামাকেও বোলবো—

—তোমার কাকাকে বোলোনা দামীদা। ব্যথা-ছলো-ছলো কণ্ঠে বললো সুমিতা, কি ভয়াবহ যে হয়েছেন তিনি আজকাল, তা আর তোমায় কি বলবো।

—সে কি? এই তো সেদিন তুমি বলছিলে তোমাকে অনাথ আশ্রম করতে বলছেন, উদ্বিগ্ন ভরা কণ্ঠে শুধোলো সুদাম।

—হাঁ বলেছিলেন যে উদ্দেশ্য নিয়ে, সেটাতো সিদ্ধ হলোনা তাই।

—উদ্দেশ্য? এর পেছনে আবার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে?

—উদ্দেশ্য ছাড়া যে উনি শুধু শুধুই এতটা মহত্ব দেখাবেন এটা ধারণা করাই তো আমার মহা ভুল হয়েছিলো দামীদা! ব্যাপারটা বলছি শোনো, আলোকে নিয়ে আসবার ক'দিন পরেই ভজনদা যে কি ভাবে মারা গেলো তুমি শুনেছো বোধ হয়?

—শুনেছি মিতা। ছোট মামা একদিন গিয়েছিলেন, সব শুনলাম তাঁরই কাছে। বড়ই মর্মান্তিক ঘটনাটা। যাক সেকথা, এখন তোমার কথা বলো।

—হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি দামীদা। জলভরা চোখ দুটো আঁচলে মুছে নিয়ে বললো সুমিতা, ভজনদার মৃত্যুর দিন তিনেক পরেই তোমার কাকা সেদিন খুব ব্যস্তভাবে ভেতরে এসে বললেন,—লালকুঠির খুব ভালো একজন খদ্দের পাওয়া গেছে, বাড়ীখানার দাম দিচ্ছে দশ লক্ষ টাকা, তার ওপর পুরোনো ফার্নিচার বা অন্যান্য জিনিষের জন্যেও ভালো দাম দেবে, কালই বায়না করতে চাইছে, এখনই আমাদের মতামত জানাতে হবে।

আমি তো প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম ওঁর কথা শুনে, বাড়ী বিক্রি? কেন?

উনি খেঁকিয়ে উঠলেন—এইতো সেদিন ঠিক করলে বাড়ী বিক্রি করে সেই টাকায় অনাথ আশ্রম করবে। এর মধ্যেই মত পাল্টে গেলো?

—না। আশ্রমের সঙ্কল্প আমার ঠিকই আছে, জবাব দিলাম আমি। তবে বাবা যত দিন আছেন, তত দিন বাড়ী বিক্রি করতে পারবো না। ব্যস, এই কথাতেই দপ করে জ্বলে উঠলেন উনি, বললেন—ধড়িবাজ মেয়ে তুমি। আমাকে কলা দেখিয়ে নিজের বেজন্মা ছেলেটাকে বাড়ীতে এনে পুরেছো। ভেবেছো বড্ড চালাকি খেলিয়েছো। বড্ড জিতে গেছো। কিন্তু এটা বোঝোনা যে চালাকি আর শয়তানিতে তুমি আমার কাছে ছমাসের শিশু মাত্র। ভালো চাও তো এখনও রাজি হও আমার কথায়, এতে তোমারও ভালো আর আমিও তোমার নোংরামি নিয়ে মাথা আর ঘামাবোনা কথা দিচ্ছি। ভাববার জন্যে তোমাকে সাত দিন সময় দিতেও রাজী আছি।

—নীরব হল সুমিতা।

—তারপর? তুমি ভেবে কিছু ঠিক করেছো? মৃদুস্বরে শুধালো সুদাম।

—ভাববার অবকাশ আমি নিইনি দামীদা! জবাব তখুনি দিয়ে দিয়েছি। বাড়ী আমি বিক্রি করবো না এই আমার শেষ কথা। কারণ এ তো জানা কথাই—আমাকে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে বাড়ীখানা বিক্রি করাতে পারলে টাকাগুলো ওঁর হাতেই যাবে। কিন্তু আমি আর কথার ছলনায় নিজের সর্বনাশ করবো না দামীদা! একবার করেছি, আর নয়, আর নয়। এর জন্যে যত লাঞ্ছনা সইতে হয় সইবো, খালি ভয় করে আমার আলোর জন্যে, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওর কোনো ক্ষতি না করেন, এই চিন্তায় যেন আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি দামীদা!

নতমুখে স্তব্ধ হয়ে মিতার কথাগুলো শুনছিলো সুদাম। কথার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলো—চিন্তা শুধু মনকে বিক্ষিপ্ত করে মিতা! তার চেয়ে স্থির চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করো, তিনিই সব ঠিক করে দেবেন। আজ চলি, অনেক কাজ এখনও বাকি আছে।

দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এলো সুদাম।

মুখ তুলে ওর দিকে চাইলো সুমিতা। দর দর করে দু'চোখের জল ঝরে পড়ছে রক্তিম দু'টি গাল বেয়ে।

—মিতা। কেঁদোনা লক্ষ্মীটি। জানি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছো তুমি। কিন্তু বিশ্বাস রাখো সেই সর্বনিয়ন্তার ওপর, তোমার এই মহাদুঃখের অন্ধকার অবশ্যই কেটে যাবে মিতু!

—তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি তাই ফিরে এলাম—অনিরুদ্ধদার ভারি অসুখ করেছিলো—ম্যালেনড়ন্‌ ম্যালেরিয়া। দিন সাতেক হয়ে গেলো—বড় বড় ডাক্তার দেখছিলেন তার সঙ্গে আমিও ছিলাম এ ক'দিন, আর করবী মাসী, কি সেবাই করেছেন এ ক'দিন। তোমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন আমায়—কিন্তু··· জানি তো তুমি যেতে পারবে না, মনও খারাপ হবে। তাই আমি খবর দিইনি। যাক্‌ এখন বিপদের আশঙ্কা কেটে গেছে, তবে দুর্ব্বল খুবই হয়ে গেছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে সময় লাগবে।

—আবার কোন মতলব নিয়ে এসেছো? কোন মন্তোর দিচ্ছো ওঁর কানে?

চমকে উঠে ফিরে দাঁড়ালো সুদাম সামনেই দাঁড়িয়ে অসীম দু'কোমরে হাত দিয়ে। চোখ দুটো ওর জ্বলছে ঠিক কেউটে সাপের চোখের মতো। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো সুদাম। ধীর গলায় জবাব দিলো। আপনার কাছেই এসেছিলাম। সামনের বৈশাখী পুর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় কাকাবাবুর "কমলা সেবাসদনের" উদ্বোধন হবে। কাকাবাবু আসছেন গুরুদেবকে নিয়ে, তিনিই উদ্বোধন করবেন। তাই আপনাকে জানাতে এসেছি, ঐদিন যাবার জন্যে। মিতাকেও নিয়ে যাবেন।

—কৃতার্থ হয়ে গেলাম আর কি খবর শুনে, ভেংচি কেটে দু'হাত নাচিয়ে জবাব দিলো অসীম। আমাকে কাঁচকলা ঠেকিয়ে নিজেরা চালাচ্ছেন রাজভোগ। সেবাসদন হচ্ছে। গুষ্টির পিণ্ডি হচ্ছে। তাই দেখতে যেতে হবে? অনেক দূর এগিয়েছো—তোমাকে এই শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি সুদাম। মোটা টাকাও বাগিয়েছো, তোমার তো একাদশে বৃহস্পতি। আমার ঘরে ঢলাঢলি তোমার না করলেও চলবে। আর তা আমি বরদাস্ত কখনই করবো না।

অপলক দৃষ্টি মেলে ওর রুদ্রমূর্ত্তির পানে চেয়েছিলো সুদাম। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে এবার জবাব দিলো—আপনি যে এতো নিম্নস্তরে নেমে গেছেন, দেখে আমি বড় দুঃখ পাচ্ছি কাকা। আমার দেবতুল্য বাপের সহোদর আপনি। কেমন করে সম্ভব হলো আপনার পক্ষে এমন জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়ার? যাক্‌! আপনাকে জানানো কর্ত্তব্য বলেই এসেছিলাম, এখন আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন। দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সুদাম।

নব বৈশাখের প্রথম সন্ধ্যায় নিঃশব্দ চরণে এলো সুমিতা অনিরুদ্ধর বাড়ীতে! সঙ্গে ছিলো ওর অনিল!

খাটের ওপর বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলো অনিরুদ্ধ, ওর পাশের চেয়ারে ছিলো সুদাম। ওরা দুজনেই চমকে উঠেছিলো সুমিতাকে দেখে।

—এ কি? তোমরা হঠাৎ ভূত দেখেছো নাকি? অমন মুখ করে কেন? একটু হেসে শুলো সুমিতা।

ভূত দেখলেও এত অবাক হবার কথা নয় মিতা, একখানি হাত ওর দিকে প্রসারিত করে বললো অনিরুদ্ধ! আমরা হঠাৎ দর্শন পেলাম সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যার। সেই সহস্র নাগিনীর বন্ধন খুলে, একচোখো দৈত্যের চোখ এড়িয়ে ডাইনীর মন্ত্রতন্ত্রের জাল ছিঁড়ে তার পর তো তোমার দর্শন পাবার কথা! এসো! এসো, কাছে এসো!

—বলেছো মিথ্যে নয় দাদা! তোমার অসুখ শুনে অবধি সুযোগ খুঁজছি আসবার। কিন্তু জানোই তো সব। আলোকে রেখে বেরুতেও ভয় করে, ওর ওপর যে কি আক্রোশ ওঁর! গলার স্বর ভারি হয়ে এলো মিতার,—ধীর পায়ে এসে বসলো অনিরুদ্ধর পাশে।

—তবে আজ কেন এলে মিতা! ওর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললো অনিরুদ্ধ। এলেই যদি আলোকেও নিয়ে এলে না কেন সঙ্গে?

তার শরীরটা আজ ভালো নেই দাদা, তাই কাকির কাছে রেখে এলাম! কাকিটা বড় ভালো মেয়ে, ওর প্রাণ থাকতে অলোর ক্ষতি করা সম্ভব নয় কারুর পক্ষে। তাই রেখে আসতে পারলাম দাদা! আর আজ ধনপতি ক্ষেত্রির বাগানবাড়ীতে গেছেন, সেখানে গেলে তো রাত্তে ফেরা সম্ভব নয়, তাই এলাম নিশ্চিন্ত মনে!

অনিল বসেছিলো সুদামের পাশের চেয়ারে। সুমিতার কথার জের টেনে বললো সে—অবশ্যই ফিরবে না সে আজ রাত্তে—যখন শুকতারা আছে তার সঙ্গে। ম্লান হাসি খেলে গেলো ওর বাঁকা ঠোঁটে।

—আপনার নেমন্তন্ন ছিলো না ছোট মামা! শুধালো সুদাম।

—ছিলো বৈ কি! তবে কি জানো? হঠাৎ ঐ সব নরকে কেমন যেন আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। একদিন যাদের সঙ্গ ছিলো পরম লোভনীয়, আজ তারাই যেন আমার জীবনের বিভীষিকা বলে মনে হয়। স্বর্গসুখ মনে হয়েছিলো যে প্রমত্ত লীলাকে আগে, এখন মনে হয় ঠিক ওটা যেন চেড়ি চামুণ্ডা আর দানবের নারকীয় উৎসব! অবশ্য আমিও একদিন ওদেরই একজন হতে চেয়েছিলাম বা হয়েওছিলাম কিন্তু আজ আমি আর ওদের কেউ নই সুদাম! আমার আজকের সত্য পরিচয় যে কি,—তা আমি নিজেই জানি না—আমি ওদেরও নই। আবার তোমাদেরও নই; সব হারিয়ে আজ আমি সম্পূর্ণ একা। একটা মহাশূন্যতা যেন আমার চারিদিকে।

—ছোট মামা! বেদনার্ত কণ্ঠে বললো সুমিতা। আমি তো আছি, ঠিক তোমার অবস্থায়। তবে তুমি একা কেন? দিদিমা, ছোট মাসী, আমি, আমরা সবাই যে আছি তোমার। কিন্তু আমার কথা একবার ভাবো তো? ইচ্ছা করলে এ নাগপাশ থেকে মুক্তি তুমি পেতে পারো, কিন্তু আমার মুক্তি? তবুও তোমার মত তো আমি ভেঙে পড়িনি ছোট মামা!

—ঠিক কথাই বলেছিস মিতু। একটা লম্বা নিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলো অনিল,—আমার দুঃখ কিসের, আমার তো সবাই আছে। তোর তুলনায় আমার এ দুঃখ কিছুই নয়! তবুও জ্বালা আছে যে! যত জ্বালায় পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে বুকটা, সে জ্বালা তোর নেই। বিবেকের দংশন, বড় জ্বালাবহ, গোখরো সাপের বিষের জ্বালা তার কাছে কিছু নয় রে মিতু! সে বিষ সাময়িক যন্ত্রণা দিয়ে তারপর সব জ্বালার নির্ব্বাণ ঘটায়—আর এ বিষের অনির্ব্বাণ জ্বালা ইহকাল পরকাল সব কালকে জ্বালিয়ে দেয়।

ঘরে জ্বলছে নীলাভ আলো। জানলার পাশের গাছে ফুটেছে রাশি রাশি স্বর্ণচাপা। উন্মুক্ত প্রশস্ত বাতায়নপথ বেয়ে আনাগোনা করছে হু-হু করা বাতাস। মুঠো মুঠো চাপার গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে সকলকার ব্যথাতুর মনগুলোকে আরো উদাস করে দিয়ে গেলো সে।

ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন মিসেস বাসু। অনিরুদ্ধর জন্যে এক গ্লাশ হরলিক্স্ নিয়ে ঘরে পা দিয়েই। বিস্ময়-আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললেন—ও মা! মিতা কখন এলি মা? এই যে অনিলও এসেছো? কতকাল পরে যে এসেছো তোমরা, ভারি ভালো লাগলো দেখে তোমাদের।

—সুমিতা আর অনিল উঠে গিয়ে একে একে মিসেস বাসুকে প্রণাম করলো।

—হরলিক্স্টা অনিরুদ্ধর হাতে দিয়ে, সুমিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে চুম্বন করলেন তিনি, তারপর ওর চিবুকটা ধরে মুখখানি দেখতে দেখতে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন—সেই বিয়ের সময় দেখেছিলাম, আর এই পাঁচ ছ' বছর পরে আবার দেখছি! কি রোগাই হয়ে গেছিস মা! -কি চেহারা—কি হয়ে গেছে। এতও ছিলো এই সোনার প্রতিমার বরাতে? আ-হা-হা! বোস মা বোস, প্রাণ ভরে চাঁদমুখখানা দেখি। সেই যে বলে, অশোকবনে রামের সীতা। তোর কপালে তাই হলো মা!

সুমিতাকে সোফায় বসিয়ে পাশে নিজে বসলেন মিসেস বাসু।

—দাদার অসুখ শুনে অবধি মনটা যে কি খারাপ লাগছিলো মাসীমা,—তাই আজ লুকিয়ে চলে এলাম ছোট মামার সঙ্গে। অজি, বিজি, ওরা কোথায় মাসীমা? শুধালো সুমিতা।

—ওদের কথা আর বোলো না মা! নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিলেন মিসেস বাসু। অজি তো থাকে এলাহাবাদে, অতটা দূরের পথ সহজে আসতে পারে না, আর বিজি তো দিন-রাত পড়ে আছে মিসেস বর্ম্মণের কাছে, কোনোদিন রাতে ফেরে আবার কোনদিন ফেরেও না। তখন তো বুঝিনি মা, যে কি কালনাগিনী তোমাদের ঐ অলকাপুরীর মাসীমাটি। নিজে মিশেছি, মেয়েদেরও দিয়েছি সেখানে। বাপ রে কি সাংঘাতিক চিজ মা, কত ছেলেমেয়ের মাথা যে খেয়েছে রাক্ষুসী,—বাদ কারুকে দেয়নি মা। বড্ড বেঁচে গেছে খালি তোমার ছোট মাসী। তার ছোঁয়া লাগেনি কি না তাই। আহা কি সেবাই করলো, সুদাম আর রুবি, ওরা না থাকলে আমার অনিকে ফিরে পেতাম না মা! আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি—কিছু মুখে না দিয়ে যেন চলে যাসনি মিতু! তোদের খাবার কথা বলে আসি বামুনকে। অনিল, সুদাম তোমরাও খেয়ে যাবে বাবা! ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মিসেস বাসু।

সুমিতা উঠে গিয়ে অনিরুদ্ধর পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—ছোটমাসীর অনেক ভাগ্যি যে তোমার সেবা করতে পেয়েছে দাদা, আমি তো কিছুই পারলাম না।

—তা এখন বেশ ভালো আছো তো ?

—হ্যাঁ, ভালোই আছি দিদি ! অনেক কিছুই তো মানুষে পারে না, তার জন্যে দুঃখ কি বোন ? যা তোমার আয়ত্তের বাইরে তার দিকে না চেয়ে এমন আরো বড় কাজ আছে তোমার জন্যে, তাই তোমাকে হয়তো করতে হবে ভাই ! সুমিতার পিঠে সস্নেহ করপরশ দিয়ে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—দামীদা' তুমি আমার ওপর বড্ড রেগে আছো না ? বললো সুমিতা সুদামের দিকে মুখ ফিরিয়ে !

—আমি ? তোমার ওপর রেগে আছি ? এ যে একেবারে অসম্ভব কথা শোনালে মিতু ! বরং যদি বলতে সাহারা মরুভূমিতে বন্যা হয়েছে, আর মরুবাসীরা আমেরিকায় গেছে বাস্তুহারা হয়ে—তাহলে সেটা বরং এর চেয়ে সহজ শোনাতো।

—মুখ নিচু করে হেসে বললো মিতা—তবে কথা বলছো না যে ?

আহা ! কতদিন পরে দাদার সঙ্গে দেখা হল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোক, আমি তো আছিই। তারপর ? সেদিন আমার জন্যে খুব বকুনি খেতে হলো তো ?

—তোমার জন্যে নয় দামীদা, ও জিনিষ আমার নিত্যকার বরাদ্দ ! যতদিন না বাড়ী বিক্রি করে সব টাকা ওঁর হাতে তুলে দিচ্ছি, ততদিনই অত্যাচারও চলবে আমার ওপর। কিন্তু বাড়ী আমি কোনমতেই ছাড়বো না, ও বাড়ী আমার প্রপিতামহের বড় সাধের বাড়ী। ওখানে কত দান ধ্যান, উৎসব, হোম যজ্ঞ হয়েছে, আবার কত অন্যায়, অত্যাচারও হয়েছে, সব মিশিয়ে ও বাড়ী আমার বড় প্রিয়, বড় আপনার। ওটা হবে সেই শিশুতীর্থ। একটু থেমে আবার বললো সুমিতা—দামীদা, একটা কথা বড় বেশী করে ক'দিন ধরে আমার মনে জাগছে, সেই কথাটা তোমাকে বলবার জন্যে ক'দিন মনটা আমার বড় ছটফট করছে।

—কি কথা মিতু ? বলো।

—সুদামের চোখের ওপর নিজের দুটি শান্ত উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি স্থির করলো সুমিতা। তারপর গভীর সুরে বললো—দামীদা ! যে সঙ্কল্প তুমি আর আমি করেছিলাম সেদিন, সেটা সম্পন্ন করতেই হবে।

কিন্তু তার আগে যদি—যদি আমি চলে যাই ; তাহলে সে কাজের ভার আমি তোমার আর দাদার ওপর দিলাম, তোমরা নাও সে কাজের ভার। আমার আলোর মত পরিত্যক্ত অনাথ শিশুরা যেন স্থান পায় ঐ বাড়ীতে। তাদের জন্য বাতিঘর তোমরা কোরো ঐ অভিশপ্ত লালকুঠিকে। তাহলে শান্তি পাবেন আমার পূর্ব্বপুরুষদের আত্মারা। বলো দামীদা, এ কাজের ভার নিলে তো ?

সুমিতার কথার কোনো জবাব দিলো না সুদাম। জবাব দিলো অনিরুদ্ধ—এ কথার উত্তর তো তোমার জানাই আছে মিতা ! তোমার দামীদা আর দাদা, তোমার শান্তির জন্য তোমার ছোট বড় সব ইচ্ছা প্রাণ দিয়ে পূরণ করবার জন্যে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ! নতুন করে এর জবাব নেবার তোমার এ ব্যাকুলতা কেন মিতা ? আর তুমি থাকবে না তো যাবে কোথায় ?

—কি জানি দাদা ! কিছুই তো জানতে পারি না সুস্পষ্ট ভাবে। তবে খালি মনে হয়, কে যেন ডাকছে আমায়। কার ডাকে আমি ঘুম ভেঙে রাত্রে বার বার উঠে বসি—

—ও কিছু না, তুমি ওসব কথা ভেবোনা মিতু। ওগুলো মনের এলোমেলো চিন্তা থেকে জন্ম নেয়। বললো অনিরুদ্ধ।

সুদামের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিলো সামনের দেওয়ালে টাঙানো একখানি ছবির ওপর।

অসীম নীল আকাশের তলায় ফুলে ভরা এক উপত্যকা। তারি মাঝে পড়ে আছে কোন শিকারীর গুলীখাওয়া একটি পাখি, তার বুকের রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে পাথরে মাটি। লম্বা ঠোঁটটা ফাঁক করে যেন কি কথা বলতে চাইছে, অক্ষম ডানা দুটি ছড়িয়ে পড়েছে দুধারে। আর ওর সঙ্গী পাখিটি একটু উঁচুতে ডানা মেলে বোধ হয় ওর চার ধারে ঘুরপাক খাচ্ছে। মুখটা নিচু করে ঘাড় বেঁকিয়ে করুণ চোখে চেয়ে দেখছে তার মুমূর্ষু সঙ্গিনীকে। দুচোখে ওর কি হৃদয়ভেদী করুণ চাউনি !

ছবিটার দিকে চোখ ফেরালো সুমিতা। কি দেখছে দামীদা অমন নির্ব্বাক হয়ে !

—উঃ ! কি নিদারুণ দুঃখময় ছবিটা—ব্যথাভরা গলায় বললো সুমিতা।

—না। এমন আর কি। ভারি গলায় জবাব দিলো সুদাম, ও তো পৃথিবীর নিত্যকারের ঘটনা। হ্যাঁ। তুমি যে কাজের ভার দিতে চাইছো মিতা, আমার সমস্ত মন, প্রাণ দিয়ে আমি তা গ্রহণ করলাম। জানি না তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে কি না, কারণ আমাদের ইচ্ছাতেই সব কিছু ঘটে না, তবে আমার দিক দিয়ে চেষ্টার ত্রুটি হবে না জেনো।

—বড় শান্তি পেলাম দামীদা ! এই কথাগুলো তোমাদের বলবার জন্যে একদিন আমার মনটা যে কি ছটফট করেছে। এখনও বাকি রইলো আরেকটি কাজ, সেটি হচ্ছে আমার দানপত্র। বাবা তো আসছেন সেবাসদন উদ্বোধনের দিন, তখন বাবাকে জিজ্ঞেস করে সেটাও সেরে রাখতে পারলে আমার মনে আর কোন উদ্বেগ থাকে না।

—আচ্ছা ! আচ্ছা ! সে সব হবে'খন। এখন তোমার পাকা বুলিগুলো একটু থামাও তো মিতা, উঃ ! তোমার বানপ্রস্থের কথাগুলো যে আমাকেও বানপ্রস্থে পাঠাচ্ছে। একটু হেসে সুমিতার হাতটা ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললো অনিরুদ্ধ—কথা থামিয়ে দাও না একটু মাথাটা টিপে মিতু—বড্ড যেন ধরেছে রগ দুটো !

—আচ্ছা গো দিচ্ছি ! লাজুক হাসির সঙ্গে হেঁট হয়ে ধীরে ধীরে অনিরুদ্ধর চুলগুলোর ভেতর আঙুল চালনা করতে করতে বললো সুমিতা—বারো মাস তোমার সেবা কে করবে বলতো ? এবারে একটা বৌ নিয়ে এসো দাদা ! মাসীমার তো বয়েস হয়েছে, তিনি কি আর পারেন ?

—এবারে তাই আনতে হবে রে মিতু ! ক্লান্ত হাসির সঙ্গে বললো অনিরুদ্ধ,—কিন্তু বৌ হবার মতো মেয়ে কই ? একজন তো বৌ হবার ভয়ে পালালো, আবার যদি তাই হয় ?

—বৌ হবার মত মেয়ে তো তোমরা খোঁজ না দাদা ! যার কথা বলছো, ও সব মেয়েরা প্রেমিকা হতে চায়, বৌ নয়। এখন তো

ভুল ভেঙেছে তোমার,—এবারে খুব লক্ষ্মী মেয়ে একটি আনো বৌ করে, দেখো সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে তোমায়। তোমার ঘরই হবে তার স্বর্গ। আর তোমার আপন জন হবে তারও পরমাত্মীয়! অবশ্য তোমাকেও হতে হবে তারই মত সত্যপরায়ণ, তারই মত একনিষ্ঠ, তবেই দেখো দাদা তোমাদের বাড়ীটি হবে একেবারে সেই Home, Home, Sweet home.

—হা, হা, হা,! উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অনিরুদ্ধ। তার পর উঠে এসে সুস্মিতার চিবুকটি নেড়ে দিয়ে বললো—উঃ গিন্নীপনার ঠাকুমা যে!

—বড্ড সত্যি! ভারি খাঁটি কথাগুলো বলেছে হে,—ব্যথাভরা গলায় বললো অনিল—ও কথার মর্ম্ম তুমি বুঝবে না, বুঝেছি আমি! আমরা সভ্য হয়েছি, আমাদের মঙ্গলময়ী মা, ঠাকুমাদের অবজ্ঞা করে নিজের ভালো মন্দ নিজেরাই বুঝতে চেয়েছি। তাই আজ আমাদের ঘরে ঘরে জ্বলছে অশান্তির আগুন।

—পুরুষরা তো চিরকালই লক্ষ্মীছাড়া, কিন্তু সেই ছন্নছাড়া হতভাগাদের নিয়ে ঘর বাঁধে নারী। সেই শান্তিপূর্ণ নীড় রচনার জন্যে প্রয়োজন একটি শান্তিময়ী লক্ষ্মীরূপা নারীর। পুরুষদের যত বীরত্বই থাক না কেন, এই নীড় রচনার ক্ষেত্রে তারা যেমন অপটু তেমনি অসহায়,—অথচ শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে তারা চায় ঐ রকম একটু আশ্রয়, একটু আন্তরিকতা তার বিশ্বস্ত সঙ্গিনীর কাছে। আগেকার দিনে এটা দুর্লভ ছিলো না ভাই, কিন্তু এই বিলাতি সভ্যতা-সর্ব্বস্ব যুগে এটা হয়েছে স্বপ্নবৎ!—কালের সমুদ্র মন্থন ক'রে এই নব্য আলোকপ্রাপ্ত যুগ, অমৃত পায়নি ভাই,—পেয়েছে বিষ, শুধু বিষ! আর সেই বিষ পান করছি আমরা অমৃত জ্ঞানে!

—আমি জানি অনিল! গভীর স্বরে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। আমরা, এই সব হাই সোসাইটির ছেলে-মেয়েরা সকলেই আমরা মেকি খোলস ব্যবহার করি। মেকি রূপ দেখিয়ে চমক লাগাই সকলের মনে, আবার ঐ মেকি খোলসটারই সমাদর করি, মূল্য দিই। তাই আসল রূপ যে কত উজ্জ্বল, কত নির্ভরযোগ্য শান্তিময় হতে পারে, তার সন্ধান আমরা কেউ করি না। হ্যাঁ করি তখনই,—যখন আকণ্ঠ বিষে জর্জরিত হয়ে ওঠে, তখনই খুঁজি আমরা শান্তির জল কোথাও আছে কি—না। সেদিক দিয়ে তোমরা আমাকে ভাগ্যবান বলতে পারো অনিল, মরীচিকাকে আমি, অত সহজেই মরীচিকা বলেই চিনতে পেরেছি। আর এই সংসার মরুভূমিতে ওয়েসিস কোথায়? তার দর্শনও লাভ হয়েছে আমার। এটা আমার জীবনের দিব্যদর্শন বলতে পারো।

—Yes, quite right. তোমার ভাগ্য তোমাকে সত্যদৃষ্টি দান করেছে অনিরুদ্ধ, তাই বেঁচে গেছো তুমি। পাঁকে থেকেও পাঁক লাগেনি গায়ে, এমন হংসনীতি জ্ঞান কচিৎ কেউ লাভ করতে পারে। শতকরা নিরেনব্বই জনেরই ভাগ্যে জোটে আমার আর মিতার মত দুদশা। ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিলো অনিল।

—ওসব কথা থাক ছোট মামা! যা ঘটে গেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। হ্যাঁ আপনি আসছেন তো উদ্বোধনের দিন? তবে আমার মতে—মিতু, তোমার বোধ হয় সেদিন না আসাটাই ভালো হবে। মৃদু স্বরে বললো সুদাম।

—কেন, কেন? অবশ্য যাবে ও। উত্তেজিত ভাবে জবাব দিলো অনিল,—জানো তো সুদাম, অন্যায় অত্যাচারকে যত নীরবে মেনে নেবে, তার জুলুমের মাত্রাটাও তত বেড়ে চলবে। এর একমাত্র ওষুধ হচ্ছে যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কিম্বা তাকে অবহেলায় উপেক্ষা করা। ঐ দুটো না হলে, বাঁচবার কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ আমার কিন্তু ভাই সেদিন যাওয়া হবে না,—অনেকদিন শিকারে যাইনি, তাই আমার শিকারী সঙ্গীরা ঠিক করেছে ঐ দিন একটু কোথাও যাওয়া হবে, সেখানে ছোটোখাটো শিকার করা হবে, যা মিলবে। আর পাপী তাপী মানুষ ভাই ও ধর্ম্মস্থান-টান আমাদের মানাবে কেন? তার জন্যে আছো তুমি, অনিরুদ্ধ, রুবি, মিতা তো আছেই,—হাসতে হাসতে বললো অনিল।

—তুমি ভয় পেও না দাদাদা—করুণ চোখ দুটি তুলে বললে সুস্মিতা, আমি এমন কিছুই করবো না যাতে আর তোমাকে অপমানিত হতে হয়। তোমার অপমান সে যে আমার বুকে শেল হয়ে বিঁধে আছে দাদাদা, আমাকে বলতে গিয়ে সেদিন—অবরুদ্ধ বেদনার স্তূপ এসে রুদ্ধ করে দিলো সুস্মিতার কণ্ঠস্বর।

—জানি আমি। মিতা! তবে আমার ওপর দিয়েই যদি সব হাঙ্গামাটা চলতো বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিলো না আমার, কিন্তু তা তো হয় না মিতু! তোমাকে যে সইতে হয় অনেক বেশী, আর সেইটাই হয় আমার পক্ষে গভীর বেদনাদায়ক। তাই বারণ করছিলাম তোমায় যেতে। তবে তুমি না গেলে মঙ্গল অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থাকবে, সেটাও ধ্রুবসত্য! কাকাবাবুও মনে ব্যথা পাবেন,—তোমাকে না দেখতে পেলে. এর জন্যে বলছি, ভেবে-চিন্তে এমন কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে, যাতে দু' দিকই রক্ষা হয়!

খুট-খুট হাইহিল জুতোর শব্দে চোখ ফেরালো সুস্মিতা দরোজার দিকে—একটু চমকে উঠলো বিজ্‌তা আসছে দেখে।

ঘরে ঢুকে সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়লো বিজি। ভারি ক্লান্ত লাগছিলো ওকে। চোখের কোলের কালি, উগ্র প্রসাধনেও ঢাকা পড়েনি! রুক্ষ এলোমেলো চূর্ণকুন্তল উড়ে পড়ছে মুখে,—বড্ড বেশী যেন গালদুটো বসে গেছে আর গলার কণ্ঠার হাড় দুটো বেরিয়ে পড়েছে! সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে বললো ও'—কেমন আছো দাদা? কি খাটুনিই যাচ্ছে, তোমার কাছে একটু বসবার সময়-ই পাচ্ছিনে। ভাগ্যিস্ রুবি ছিলো!

একটু হাসলো অনিরুদ্ধ! কিছু বললো না। দাদার জবাব না পেয়ে সোজা হয়ে বসলো বিজি! তারপর ভালো করে চোখ ফিরিয়ে দাদার খাটের দিকে চেয়ে চোখ বড় করে আহ্লাদভরা সুরে বললো—ও মা! রুবি তো নয়, ও যে মিতা! কখন এলে ভাই? অসীম বাবুর কারাগার থেকে বেরুতে পেরেছো দেখছি?

—হ্যাঁ! অতি কষ্টে। একটু ম্লান হাসির সঙ্গে জবাব দিলো সুস্মিতা! তোমাকে যে বড্ড রোগা দেখছি?—কেমন আছো?

—হ্যাঁ! তিনটে বইয়ের সঙ্গে কনট্রাক্ট রয়েছে কি না, ষ্টুডিওর খাটুনিতে একটু রোগাই হয়ে গেছি! তা এই ভালো, মোটা হলে ছবিতে মানায় না। অন্য দিকে ভালোই আছি! তোমার মতো, কারুর খোঁয়াড়ে বন্দী হতে রাজি নই বাবা! যতক্ষণ বনবে ততক্ষণ তুমি আমার, তা না হলে যে যার পথে চলো, এই ভালো,! আচ্ছা, একটা কথা এই যে, অসীম বাবু তো শুকতারাকে নিয়ে পঞ্চগণ যায়
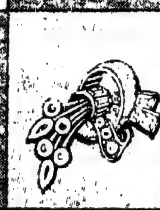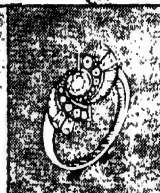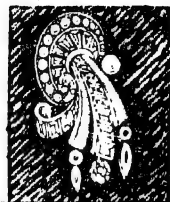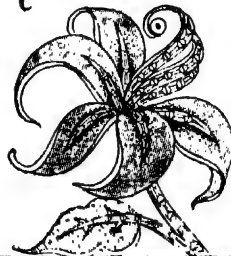
যাচ্ছেন ধনপতি ক্ষেত্রির বাগানে,—কত দিন বলেছি, তোমাকে আনবার জন্যে ; মাসীমাও বললেন বার বার—মিতাকে এক দিন আনো না কেন অসীম, বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

তা তিনি তো বললেন,—তুমি নাকি কোথাও বেরুতে চাও না ? সত্যি নাকি ?

—জবাব দিলো—দু'-এক কথায় অষ্টাদশ মহাভারত তো বলা যাবে না মিস বাসু ! যদি শুনতে চান তো একদিন আসুন না লালকুঠিতে। আমি শোনাবো সেই সীতাহরণের কাহিনী।

—আজ থাক্ ! আপনাদের খবর বলুন।

—আমাদের আর খবর কি ? হ্যাঁ, নতুন একটা খবর আছে বটে, মাসীমার কাছে। রতনলাল ক্ষেত্রি একা ফিরেছে বোম্বাই থেকে, পল্পিয়া ওকে ডাইভোর্স করে নাকি কোথাকার এক নবাবকে বিয়ে করেছে, তাই বেচারা একটু মনমরা হয়ে গেছে আর কি ! মাসীমা ওকে চাঙ্গা করে তোলবার ভার নিয়েছেন, বলেছেন তিনি, অমন পল্পিয়ার মত সাতটা বাঁদী তোমায় এনে দেব, পয়সা আছে যার, তার আবার ভাবনা কি ? ভাত ছড়ালে কাগের অভাব ? খিক খিক করে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিলো বিজি। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো যেন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ।

—তুমি এখন বড় ক্লান্ত, বিশ্রাম নাও বিজি। গম্ভীর গলায় বললো অনিরুদ্ধ।

—আজকাল তুমি যেন আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারো না দাদা, কাছে এলেই, তাড়াতে চাও কেন বলো তো ? কি করেছি আমি তোমার ? কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে ফেললো বিজিতা। একটা বিশ্রি, অবাঞ্ছিত আবহাওয়া যেন সবার মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো।

বালিশে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসলো অনিরুদ্ধ। শান্ত গলায় বললো বিজিতার দিকে চেয়ে—ভুল বুঝো না বিজি। আজকাল তোমাকে দেখছি অনেক বেশী করে, কারণ একটা উগ্র আধুনিকতা, সিনেমার বিকৃত চটক্ বড্ড বেশী প্রকট করে তুলেছে তোমাকে সবার চোখে, আর সেইটাই হয়েছে বড় বেদনাদায়ক আমার পক্ষে।

ওর কথা শেষ হল না,—পাশের ঘরে ঝন্ ঝন্ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। মিসেস বাসু আসছিলেন খাবার জন্যে সকলকে ডাকতে। তিনিই ফোন ধরলেন।

মিনিট দুই বাদে তিনি এলেন ঘরে, আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে। বিজিতা তার ভিজে ভিজে চোখ দুটি তুলে প্রশ্ন করলো—কে ফোন করছিলো মা ? কোনো দুঃসংবাদ না-কি ?

—হ্যাঁ। তবে আমাদের পক্ষে দুঃসংবাদ হলেও তাঁর দিক দিয়ে মঙ্গলই বলবো, আহা যা কষ্ট পাচ্ছিলেন। নাতনী নয়তো, কালসাপ, সেই যে ছোবল দিয়ে গেলো, সেই অবধিই তো শয্যে নিয়েছিলেন রাজাবাহাদুর। তাঁর সেক্রেটারী ফোন করছিলো, তাঁর অন্তিম অবস্থা, ডাক্তার জবাব দিয়েছেন, সেজন্য তিনি উইল করতে চান, তাই অনিরুদ্ধকে একবার যেতে বলছেন, তাঁর বাড়ীতে রেজিষ্টার আর আরো দু তিন জন অ্যাটর্নি ব্যারিষ্টার উপস্থিত আছেন। তা আমি বললাম, অনিরুদ্ধ তো এখনও বেশ দুর্ব্বল, তবে আমি এখনি যাচ্ছি। বিজি, তুমি এদের নিয়ে যাও, এক সাথে সবাই খাওয়া দাওয়া করো, আমি যাই একবার রাজাবাহাদুরকে দেখে আসি।

খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধ। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—আমিও যাবো মা ! শরীর আমার এখন ভালোই আছে। কর্ত্তব্যের ডাকে না যেতে পারলে, চিরদিন মনে গ্লানি থেকে যাবে যে—মিতা, সুদাম তোমরাও চলো,—

—হ্যাঁ। আমরাও যাবো মাসীমা, ব্যথিত স্বরে জবাব দিলো সুমিতা। দাদু বড্ড ভালোবাসতেন আমাকে, আহা তাঁর শেষ সময়ে যদি পল্পিয়া একবারও আসতো !

—ডাক্তার হিসেবে, তোমার সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে দাদা, কারণ তোমার শরীর এখনও বেশ দুর্ব্বল। মৃদুকণ্ঠে বললো সুদাম।

—না, শুধু ডাক্তার হিসেবে নয় সুদাম, একজন Honest man হিসেবেই দরকার তোমাকে। কোটটা গায়ে গলাতে গলাতে জবাব দিলো অনিরুদ্ধ।

—তোর যে খাওয়া হল না মিতু ! সুদাম, অনিল তোমাদের সকলকার খাবার প্রস্তুত, খেয়ে গেলে ভালো হয় না ? বললেন মিসেস বাসু।

—না, মা ! আর এক মিনিটও দেরী করা উচিত হবে না, ওদের খাওয়াবার সময় পরে আরো পাবে। ড্রাইভারকে গাড়ী বার করতে বলো। এসো ডাক্তার, তোমার স্কন্ধে ভর দিয়ে শম্বুক গতিতে চলতে সুরু করি। মিতা, তুমিও আমার আরেকটা হাত ধরো ভাই। আর অনিল তুমি বসে কেন ? এগিয়ে এসো না, সবাই মিলে আমাকে এগিয়ে দাও কর্ত্তব্যের পথে। সুদামের কাঁধে ভর দিয়ে মিতার একখানি হাত চেপে ধরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো অনিরুদ্ধ।

—ওঃ ! তোমার ভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে অনিরুদ্ধ। ওদের দিকে চেয়ে একটু হাসির সঙ্গে জবাব দিলো অনিল,—চলার পথে দু' ধারে যে সঙ্গী দুটিকে বাগিয়েছো, আমি বলতে পারি, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও স্বর্গে যাবার পথে এমন সঙ্গী পাননি। ওদেরই শেষ পর্য্যন্ত ধরে থেকো ব্রাদার, খাঁটি মাল ওরা। আর সব মেকি, ঝুটো।

—না ভাই, আমাকে আর টেনো না। একটু দরকার আছে, রমেন বোস-এর কাছে, মানে একটা রিভলবার নেব তার কাছ থেকে, আজ রাত দশটায় দেখা করতে বলেছে, সেজন্যে ভাই এখন আমার যাবার উপায় নেই ! তোমরা এগোও, আমি বরং প্রাণভরে তোমাদের সকলকার খাবারগুলো একাই খেতে সুরু করি, কি বলেন মাসীমা ?

—সে তো উত্তম কথা অনিল, খাবারগুলোরও সদ্গতি হয় তাহলে। বিজি, একটু দেখিস না অনিলের খাওয়াটা, আমরা চলি তাহলে।

—কারুকে দেখতে হবে না মাসীমা ! আপনার এ ছেলে স্বয়ং ভীম। হিড়িম্বা রাক্ষসীর পতিদেবতা। ফিরে এসে দেখবেন, শুধু খাবার দাবার কেন, হাঁড়ি কুঁড়ি সব খেয়ে ফেলেছি। উচ্চ হাস্যের সঙ্গে জবাব দিলো অনিল।

[ক্রমশঃ।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৭। হাসতে হাসতে শ্যামা তখন বললেন—আমার কতকগুলি সহচরী রয়েছেন। বেজায় তাঁদের বুদ্ধি।

এখন একদিন হয়েছে কি—ধেনু চরাতে বনে চলেছেন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন। এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন—পিছনে রয়েছেন সখার দল। বেণু, বিষাণ, গুঞ্জা, শিখণ্ড ইত্যাদি নানান অলঙ্কারে সকলেই সুসজ্জিত। ব্রজপুরের তোরণ ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণ, রুণ-রুণ করে বাজছে সোনার সাজ মণির সাজ। প্রাসাদের বলভীর নীচে এসেছেন, এমন সময় তাঁর এক জোড়া চোখ দেখতে পেল,··· আপনাদের এই সখীটি সেই বলভীতে দাঁড়িয়ে এদিকে-ওদিকে চাইছেন। বড় ভীরু চাহনি। আকস্মিক সরল চাহনি। কৃষ্ণকে দেখেই কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হল তাঁর দৃষ্টির। কিন্তু চোখ আর নড়ে না, অলস হয়ে গেল। চোখ ঘুরিয়ে নিতে নিতে আপনাদের সখীর মনে দোল দিয়ে গেল উল্লাসের দোয়েল। ফেরে গিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে যেই আবার দেখতে যাবেন, অমনি হঠাৎ ছুটে এল শ্রীকৃষ্ণের সরল চাহনি। মাঝ পথে কেটে গেল সখীর কটাক্ষ। চরমার্দ্ধটিকে সখী উপসংহার করলেন বটে, কিন্তু ততক্ষণে অপেক্ষা না করেই কটাক্ষের পূর্ব্বার্দ্ধটি অর্থাৎ সেই ভাঙা বাণ বিদ্ধ হয়ে গেল কৃষ্ণের হৃদয়ে। নিয়তির নিয়োগে দ্বিখণ্ডিত হয়েও যেন ভুজঙ্গ তার পূর্ব্বার্দ্ধ দিয়ে দংশন করল তাঁর হৃদয়। দৈবের প্রেরণা। আকস্মিক ব্যাধি তাঁকে পেড়ে ফেলল। এল উৎকণ্ঠা, এল বিস্ময়ের চমক। চোখের দেখারও যেন আর শেষ নেই, কেবল দেখতেই চায়।

তাঁর প্রিয় নর্মসহচরটিকে শ্রীকৃষ্ণ তখন যা বলেছিলেন সেগুলি আবার আমার সহচরীরা শুনেছেন শুকপক্ষিনীদের মুখ থেকে। খাঁচা খুলে তাঁরা পালিয়ে গিয়েছিলেন, আর আমার সখীরা গিয়েছিলেন তাঁদের খুঁজে ধরতে।

২৮। যা শুনেছিলেন তা এই :—

প্রিয় সখা, প্রাসাদের চন্দ্রশালা আলোয় আলো করে কে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলতে পার? নির্মেঘ যেন বিদ্যুৎ। নন্দনবন থেকে এই চন্দ্রশালার নিভৃতে কেমন করে খসে পড়ল এই ছোট্ট কল্পলতিকাটি? ত্রিলোক সম্মোহনের শক্তি রাখেন ইনি।

না জানি কোন মায়া দিয়ে এমন সোনার পুতুল গড়েছেন ঐন্দ্রজালিক কামদেব। গোকুলনগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী নন তো?

সখা, এ কী দেখলেম? পরমকলাবিৎ চিত্রকরের হাতে আঁকা আমি কি কোনো চিত্রলেখা দেখলেম, না, দেখলেম কোনো আকাশ-সায়রের টলমল হেমহংসীর স্বপ্ন? যেন সোনার কেয়াফুল দুলছে আকাশে। যেন পুষ্পধনুর হাতের ইনি কৃপাহীনা কৃপাণী।

অদ্বিতীয়া যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রলেখা, সম্মোহের মহিমার বল্লরী, লাবণ্যের দর্পনিকা, মাধুর্য্যের যেন সীমান্তরেখা!

ইনি যেন গুণমণীন্দ্রগুলির তেজের মঞ্জু মঞ্জরী। সোনার খাঁচায় সৌন্দর্য্যের পাখী। ক্ষণে হয় আবির্ভাব, ক্ষণে হয় তিরোভাব। সখা এ-কি আমার স্বপ্ন, না মনের ভুল, না কোনো দৈবী মায়া, বিভ্রান্ত করছে আমার মন?

২৯। উত্তর এল :—

সখা, অত খেদ করবেন না। ইনিই বৃষভানুনন্দিনী। বিধাতার এক নবীনা সৃষ্টি। এঁকেই সকলে ডাকে, সর্ব-সৌভাগ্য-সারাধিকা রাধিকা নামে।

শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে বেরল,—

ওঃ তাই বলো। এরই কথায় আমার দুই মা সহস্রমুখ হয়ে ওঠেন। বলেন ইনিই ঘুইয়ে দিয়েছেন প্রসিদ্ধাসুন্দরীদের রূপের দম্ভ। গুণবতীদের গণনায় এঁরই চরিত্রের ব্যাখ্যান করেন তাঁরা বেশী। কিন্তু সখা, আজই এই প্রথম ইনি আমার নয়নপথের পথিকা হয়েছেন। আঃ তাই বলো।

বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের মনোভাব গোপন করে অন্য কথায় চলে যান। হৃদয়ে বিকারের জন্ম হলেও বাইরে থাকেন প্রকৃতিস্থ। ধেনু নিয়ে চলে যান বনের দিকে। নাটুকে মেঘের মত নাচতে নাচতে চলে যান। কোমল নীল গাহনহারা এক জ্যোতিঃর যেন স্ফূর্তি। শ্যামলে শ্যামল হয়ে যায় বনতল।

ওলো সই, ওলো ললিতে, তাই বলছি, দুজনেরি একটি মনের একটি ইচ্ছেলতায় একটাই মহাঙ্কুর জেগেছে। কাল দুটি পাতাও বেরবে, ফল ধরার সম্ভাবনাও আছে।

৩০। সব শুনে শ্রীরাধা বললেন—শ্যামা, তুই বড় মিছে বকিস্। এবার থামো সই। চন্দ্রশালায় কবে, কখন, কোনদিন, আবার আমি একলা উঠতে গেলুম? এর পর আমাকে আর অতটা হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করিসনে সই। পায়ে পড়ি, থামো, নির্লজ্জতার সমুদ্রে আর ডুবিয়ে মেরো না আমাকে।

শ্যামা বললেন—খবরটি যদি এতই মিথ্যে হয়, তবে আবার নির্লজ্জতার সমুদ্রে ডোবার কথা ওঠে কেন? অতএব জেনে রেখো সই, যে ভাব আপনা থেকেই জন্মায় সে ভাব চেষ্টা করলেও নিজেকে গোপন রাখতে পারে না। যাক্ এখন চাপল্য ক্ষমা করুন সখি, আশা করি এরপর নিজের সৌভাগ্য-সম্পদে ফিরে আসবে আত্মবিশ্বাস।

৩১। এই ঘটনার রটনাটি ততঃপর ধীরে ধীরে বিতরিত হয়ে গেল ব্রজনগরের সর্বত্র। যূথেশ্বরীদের সঙ্গে মিলিতা হলেই তাঁদের সখীদের মুখে ফুটত ঐ এক কথা! সরস কোনো প্রসঙ্গ উঠলে ঐ একই কথারি হোতো আধিপত্য। কথার পিঠে কথায় অভিব্যক্ত হতে লাগল তাঁদের সকলেরি কৃষ্ণানুরাগ। এই ভাবে নিরন্তর শ্রীবৃদ্ধি পেতে লাগল পূর্ব্বরাগ-নাটকের পূর্ব্বরঙ্গ। ফলে দাঁড়াল এই :— পৃথিবীতে ধ্বজা ওড়ে, পদ্ম ফোটে, আর তাঁরা সকলেই দেখেন আর ভাবেন,—ও সব সত্যিই শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজকমলাঙ্কিত শ্রীচরণ।

জল দেখলেই ভাবেন, ও জল তো কৃষ্ণকান্তি কালিন্দীরি নীল জল।

জগতের সব আলো, তাঁদের মনে কৃষ্ণশ্যাম আলোকেরি প্রীতি-প্রীতীতি জাগালো। সব গন্ধই তাঁদের কাছে বয়ে নিয়ে এল শ্রীকৃষ্ণেরি অঙ্গ-সৌরভ। সারা আকাশ যেন বিধৌত হয়ে যায়—কালা চাঁদের আলোর ইশারায়!

৩২। অতএব সর্বভূতে তাঁদের সকলেরি জন্মাল শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা। এবং ধ্যানের এক তাল তার মধ্য দিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করলেন —নয়নে নয়নে তাঁরি শ্যামল রূপ, রসনায় রসনায় তাঁরি অধর-রস, শ্রবণে শ্রবণে তাঁরি গুণ-শব্দ, নাশায় নাশায় তাঁরি অঙ্গ-গন্ধ এবং চর্মে চর্মে তাঁরি আনন্দ-স্পর্শ।

কৃষ্ণদর্শনের নিমেষ গুণতে গুণতে তাঁরা জানলেন সংখ্যার নীতি; কৃষ্ণাধারে প্রেম পরীক্ষা করতে করতে তাঁরা বুঝলেন পরিমাণের মিতি; গুরুজনদের থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁরা চিনলেন পৃথকত্বের ইতি। তাঁরা সংযোগ শিখলেন কৃষ্ণমূর্তির ধ্যানের মাধ্যমে, বিভাগ শিখলেন স্বামীস্বজনদের বর্জনে; 'পরত্ব' চিনলেন গুরুজন পরিজনদের সান্নিধ্যে; এবং অপরত্ব বুঝলেন শ্রীকৃষ্ণেরি সম্বন্ধে। জীবনবিষয়ে তাঁদের এল ভাববোধ গুরুত্ব; চেতনায় এল দ্রবত্ব, প্রেমে স্নেহত্ব। কৃষ্ণমিলন চিন্তাতেই তাঁদের যুক্ত হল বুদ্ধি, কৃষ্ণসঙ্গ প্রত্যাশাতেই তাঁরা পেলেন সুখ, কৃষ্ণবিরহেই দুঃখ। তাঁদের ইচ্ছা চাইল কৃষ্ণসামীপ্য,

দ্বেষ	...	গুরুপরিহার,
প্রযত্ন	...	কৃষ্ণাভিসার,
ধর্ম	...	কৃষ্ণসেবা,
অধর্ম	...	কৃষ্ণ-ছাড়া ভাব,

আর তাঁদের সংস্কার চাইল কৃষ্ণপ্রেমায়ন। চতুর্বিংশতি গুণ এইভাবে তখন তাঁদের সকলেরি মধ্যে আসন পেতে বসলো।

৩৩। সহচরীদের মধ্যে ব্রজনন্দনকে নিয়ে যে ধরণের পারস্পরিক আলাপ চলতে লাগল সেগুলিও অতি সরস। যেমন—

ভারী তো তোর ভুরুর বড়াই! অমন পুরুষরতনটিকে যে মেয়ে হৃদয়ের গয়না করতে না পারলেন, সই লো ধিক তাঁর কুলশীলযৌবনে, ধিক তাঁর রূপগুণসম্পদে।

জীবনটাকেই বেচে দিয়েছি সখি, এখন আমার ভয়টা কিসের গুরুজনবন্ধুবান্ধবে? তাঁকে পেলে কাকে ভয়? না পেলে, কারই বা অভয়?

স্বামীদেবতা মারেন যদি মারুন,
বন্ধুরা ছাড়েন যদি ছাড়ুন,
সাধুরা হাসন যদি হাসুন,

আমি কিন্তু সই লো নিজের করে নিয়েছি মাধবকে। কিন্তু তিনি, যে লজ্জা ঘুলিয়ে দেন, ধৈর্য্য ভাঙেন, আর্য্য ভীতির ভিৎ টলান, চিত্তবৃত্তির ঘরে ডাকাতি করেন। কান দিয়ে যার নাম শোনাতেই এই, না জানি দর্শন দিয়ে তিনি কী না করতে পারেন অন্ততঃ আমার মত মানুষটার উপর।

৩৪। সত্যই অন্ত ছিল না গোকুলকুলবালাদের ঔৎসুক্যের।

সকালবেলায় ধেনু চরাতে বনের পথ ধরেন কলানিধি শ্রীকৃষ্ণ; চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নাঢালা মুখে বাজতে থাকে মুরলী; তখন তাঁর পানে দুচোখের পদ্ম ছোঁড়েন এই সব অনুরাগিনীদের দল। নয়নের চঞ্চল সৌন্দর্য্য বিলোতে বিলোতে আহা, যেন তাঁদের উপর কৃপাবারি ঢালতে ঢালতে এগিয়ে চলে যান শ্রীকৃষ্ণ। যেতে যেতে এদিকে চান, ওদিকে চান। দেখতে পান রাজপথের দুধারের অভ্রবীথিগুলিতে, অথবা সন্তোষবীথিগুলিতে, অথবা তাঁদের স্বকীয় প্রাসাদের গোপুরে বসে রয়েছেন গোকুলের কুলবৃদ্ধাদের দল। তাঁদের মন ভুলিয়ে নবীন নটের মত নাচতে নাচতে বনে চলে যান শ্রীকৃষ্ণ। সামনে চলে ধেনুর দল।

এই ভাবে ভবন থেকে বনে, আবার বন থেকে ভবনে যখন ফিরে আসতেন শ্রীকৃষ্ণ তখন এক উৎকণ্ঠার আগ্রহের আনন্দের ঢেউ খেলে যেত কুলবালাদের সম্বন্ধে।

কেউ কেউ হয়ত কেশ প্রসাধনে ব্যস্ত ছিলেন, খোঁপা না বেঁধেই তাঁরা ছুটতেন। কেউ কেউ হয়ত স্নানরতা ছিলেন, আশ্চর্য্য, গায়ের জল না মুছেই তাঁরা ছুটতেন। মদিরেক্ষণে, একটু দাঁড়া···বলেই কেউ কেউ হয়ত অর্দ্ধেক চোখে অঞ্জন মেখেই ছুটতেন। দাঁড়া, আসছি···বলে এক পায়ে আলতা পরেই কেউ কেউ সিঁড়ি বেয়ে ছুটতেন ছাতে, ধাপগুলির পাশে পাশে ফুটে উঠত শ্রীচরণের কমলচিহ্ন। কেউ কেউ হয়ত সবেমাত্র একপায়ে নূপুর বেঁধেছেন, হঠাৎ কী যেন কি শুনলেন, ব্যস্ আর খেয়াল নেই, এক পায়ের নূপুর নিয়েই ছুটলেন উপরে। বিশৃঙ্খলার এক শেষ। গুরুজনদের ভয়ে আবার থেমে থেমে চলতে হয়, আরো বেতালা বলতে থাকে নূপুর। আধগাঁথা মেখলা, পায়ের পাতায় লুটোচ্ছে আঁচলা, ঘসড়াচ্ছে ঘসড়াক, ছুটতেন···মৃণালের নালবাঁধা রাজহংসীদের মত নিতান্ত বিশৃঙ্খলা হয়ে তাঁরা ছুটতেন, গোকুলের এই কুলবালারা ভয়গুলোকে নীচে ফেলে হুড়মুড় করে আরোহণ করতেন চন্দ্রশালায়, আর সেথায় আঁকা হয়ে যেত ভোরের সূর্য্যি-ফোটা যেন কমলিনীদের ছবি।

৩৫। আবার যখন দুপুর হত, কুলবালাদের আঁখিগুলি তখন চুরি করে নিত ঘুমন্ত নীলপদ্মের মাধুরী, এবং ধ্যানের মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পেত মাধবকে—যিনি নিবাস করেন হৃদয়ে। চন্দ্রশালার জালরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা এই আঁখিগুলিই দেখতে পেত শ্রীকৃষ্ণকে; আর কবিদের মনে পড়ে যেত পিঞ্জরের ভিতর খঞ্জনের উপমা।

৩৬। আর মনের সাধ মনেই ঢেকে একটি একটি করে দিন কাটাতেন গোকুলের অনূঢ়া কুমারীরা। গোপজাতির সকলেই স্বভাবতঃ সরল পথের পথিক। তাই গোপ-পিতামাতারা সরল মনেই জানতেন, তাঁদের ঘরের মেয়েরাও শ্রীকৃষ্ণের বাড়ীও যায় আসে সরল মনে। আর যাবে নাই বা কেন, যখন ধুলোখেলা থেকে আরম্ভ করে শ্রীভগবানের ভবনে তাঁরা নিত্য এসেছেন নিত্য গেছেন! ওতে দোষের কিছুই দেখতেন না তাঁরা। কিন্তু কুমারীদের হৃদয়ে জন্মাবধি নিগূঢ় ভাবে লুকিয়ে থাকে একটি ভাবী পতিপ্রসঙ্গ। নিভৃতে নিঘাত মহানিধির মত সেটি গুপ্ত করে রাখে অন্তর, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ হয় তটস্থ উদাসীনতায়। অনূঢ়াদেরও সেই দশা হল। তাঁদের মানসরথে চড়ে চললেন একটিই মাত্র অভিলাষ···শ্রীকৃষ্ণই আমাদের ভাবী পতি, আর ঘুরতে রইল কালচক্র।

৩৭। তারপরে একদিন, সেদিন মণিপিঞ্জর থেকে বাহির করে, নিজের পদ্মহাতে বসিয়ে শ্রীমান কেলিশুকটিকে একটি একটি করে পাকা ডালিমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন বৃষভানুনন্দিনী। এমন সময় হঠাৎ তাঁর হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল কৃষ্ণানুরাগের নিভৃত আগ্রহে। তিনি তাঁর খেলার পাখীটির দিকে চেয়ে বারংবার বলতে লাগলেন—

ওরে পাখি, কৃষ্ণ কও।

বার বার কৃষ্ণ কও কৃষ্ণ কও, বলতে বলতে এক অনির্বচনীয় পরিতুষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর হৃদয়। উপস্থিত হল মহানুরাগ তার বিপুল নিবিড়তা নিয়ে। শুকটিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বৃষভানুনন্দিনী যেন পাঠ করলেন একটি হৃদ্য পদ্য,—

দুর্জনেরে ভালবাসা
কী বিপুল লজ্জিত দৃষ্টি
ঝরঝরি ভাঙে সব আশা
গুরুজন-বাণী বিষ-বৃষ্টি।
এ ঘর ছাড়িয়া দেহ হায়
আন ঘরে ক্ষণে চলে যায়
মরি মরি তনু হাসি-নাশা।
জীবনেতে হেরি মধুসৃষ্টি।

৩৮। শুকপাখীটি ছিলেন পরম পণ্ডিত ও রসিক। পূর্ব থেকেই তিনি সর্ববিদ্যায় পটীয়ান। শুনতে শুনতেই তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেললেন কবিতাটি। কিন্তু তাহলেও পক্ষিস্বভাব যাবে কোথায়? আদরের পাখী, স্বাতন্ত্র্য পেয়েছেন, অতএব কৃষ্ণ কও কৃষ্ণ কও পাঠ করতে করতে শ্রীরাধিকার কর-কমল থেকে ডানা মেলে তিনি উঠে পড়লেন গগনে। কিন্তু উড্ডয়ন বিষয়ে যেহেতু অপ্রবীণ, সেইহেতু তাঁকে এ বাড়ীর ছাদ থেকে ও বাড়ীর ছাদে উড়ে বেড়াতে হল। ক্রমে তিনি এসে নামলেন গোকুলরাজকুমারের প্রাসাদের অলিন্দে। আর তারপরেই নিজের কোমল স্বরটিতে একটু রঙ চড়িয়ে গান করতে লেগে গেলেন সেই কবিতাটি—

দুর্জনেরে ভালবাসা—

গান শুনে যেন কান জুড়িয়ে গেল, এবং তাই 'কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য' বলতে বলতে সবিস্ময়ে সকৌতুকে শুকের কাছে স্বয়ং ধেয়ে এলেন ব্রজরাজকুমার ধরি ধরি মন। তবু প্রথমেই প্রশ্ন করলেন—

কে তুমি, কার তুমি?

তারপরে সপ্রণয় বললেন—

পাখী, আবার তুমি গাও।

পদ্যটি পুনর্বার পাঠ করলেন শুক-মহাশয়।

৩৯। কৃষ্ণ বললেন, পাখী, অসীম আপনার মেধা, বিদ্বানদেরও আপনি বিদ্বান। আপনার কথায় ধন্যি ধন্যি করছে আমার কর্ণ। আশা করি অতীব ধন্য হয়ে গেছেন আপনিও।

শুক বললেন, ব্রজরাজনন্দন, আমি নিতান্তই কৃতঘ্ন। কেন আমাকে ধন্যি ধন্যি করে বৃথা স্তুতি করছেন?

গাঢ় অনুরাগে ভঙ্গুরা হয়ে পড়েছিলেন দেবী। মৃদু মৃদু মধুর মধুর কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম পাঠ দিচ্ছিলেন আমাকে। কিন্তু ধিক আমাকে, অধন্য আমি, অতি চঞ্চল জাত আমার, আমায় সহস্র ধিক দেবীর করকমল থেকে আমার কিনা ঘটল বিচ্যুতি?

৪০। নিশ্চয় তাহলে এই পক্ষীটি কোনো মহানুরাগবতীর করতললালিত হবে, এই ভেবে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

পাখী, যাঁকে চাও, তাঁকে যতক্ষণ আমি না পাই, ততক্ষণ এইখানে একটু থাকো। এই বলে বাড়িয়ে দিলেন নিজের করকমল। শুকপক্ষীটিও কৃষ্ণবাসনা-প্রতিপালন লালসায় নির্ভয়ে চড়ে বসলেন শ্রীকৃষ্ণের করকমলে। এবং ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন কৃষ্ণের হাস-প্রিয় সখা কুসুমাসব। বটু এসেই বললেন—

শুকটি তো মহা-বিদগ্ধ দেখছি। কেলি-কৌতুকের জন্যেই যেন তৈরী। সযতনে রক্ষণীয়।

এই বলে শ্রীকেলি শুককে তিনি তুষ্ট করতে বসে গেলেন দাড়িম-দানার ভোজ খাইয়ে।

৪১। এদিকে বৃষভানুনন্দিনী সেই সময়ে••কৃষ্ণানুরাগের পরাভবে একেই তাঁর কোমল তনুখানির ভজ্যমান অবস্থা, তার উপর হাত থেকে কোথায় যেন উড়ে চলে গেল পাখী••অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাঁর অনুচরীকে বললেন,—মধুরিকে, ধাত্রেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজে দেখ ত শুকের বাচ্ছাটি কোথায় গেল?

অতএব দুজনে খুঁজতে খুঁজতে শেষে দৈবাৎ দেখতে পেলেন, কৃষ্ণপুরের গোপুর-পরিসরে ঋতুরাজ বসন্তের মত শ্রীকৃষ্ণ বসে রয়েছেন চৈত্র-চিত্রের মত তাঁর সখা কুসুমাসব—কেলিশুকটিকে তাঁরা খাওয়াচ্ছেন। কেলিশুকটিও আনন্দে বিলীন তন্ময়।

কৃষ্ণনিকটে যখন মধুরিকা উপস্থিত হলেন কৃষ্ণ তখন ভাবছিলেন। ভাবনাটিও যেন আবার তাঁর মূর্তিটিকে আরো মনোরম করে তুলেছিল। আর করবেই বা না কেন? কেলিশুকের মুখ থেকে শোনা দুখণ্ড কাব্যের অর্থানুভব করে তাঁর হৃদয়ে জন্ম নিয়েছিল গভীর একটি বেদনা। কিন্তু সে বেদনাটি প্রকাশ্যে জানাবার মত ত্রিভুবনে লোক কোথায়? কেউ যে নেই। তাই নিজের হৃদয়ের সঙ্গেই চলেছিল তাঁর বেদনার বিচার, আর ধ্যানগৃহীতা একটি দেবী কেবল ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই বেদনায়-ঘেরা বিজন মনের পথে। অতএব তাঁকে দেখাবেই তো মনোরম।

৪২। দেখে এগিয়ে এসে মধুরিকা বললেন—জয় হোক্ ব্রজরাজকুমারের। হে পীতাংশুক, এই শুকটি আমার দেবীর। এখন অনুগ্রহ করে এই শুকটিকে আমায় দিন। বিস্তীর্ণ হবে আপনার যশঃ পরিমল।

৪৩। কুসুমাসব বললেন—এটি যে তোমার দেবীর তার প্রমাণ কি? তোমার কথা তো আর প্রমাণ হতে পারে না? যদি হয় তাহলে পাখীটিকে ডাকো, ডাক শুনে যদি তোমার হাতে চড়ে, তবেই বুঝব এটি তোমাদের।

৪৪। মধুরিকা বললেন—বটু, ব্রজকুমারের পদ্মহাতের একটু আদর পেতে কার না লোভ হয়? হাতের আস্বাদ পেলে যেখানে বাঁশের বাঁশী অচেতন হয়েও হাত ছাড়তে চায় না সেখানে সচেতন পাখী বলুন তা কেমন করে পারবে? কিন্তু কুমার, আমার দেবীটি বড্ড ভালবাসেন শুকসারিদের গান গুণ আর চালচলন। ওটিকে না হলে তিনি এক পলকও শান্তি পাবেন না। ওটিকে দিন।

৪৫। কুসুমাসব। তা ঠিক বটে। নবীন শুক, তায় এমন গুণ। এমন ধন কোন রমণীই না কামনা করেন?

মধুরিকা। এ শুকটি তো তাঁর। তিনি কেন এক্ষেত্রে কামনা করতে যাবেন ?

কৃ। তোমার দেবীটি বলি কে ?

মধু। আপনার এই বয়স্যটি যেমন কোনো একটি ব্রজরাজের নন্দন তেমনি আমার তিনিটি হবেন কোনো একটির নন্দিনী। আপনার মত মহাত্মার সাক্ষাতে তাঁর আর কী গুণ ব্যাখ্যান করব ?

৪৬। কৃ। বেশ তাই সই। তা আমরাই বা কেন এটিকে দান করতে যাব ? আমার বয়স্য তো আর চোর নয় যে চুরি করে বা গায়ে পড়ে এটিকে এনেছেন। আপনাদের ছলাকলার অন্ত নেই, লোভেরও সীমা নেই। মিথ্যে দোষ চাপিয়ে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দৈবাৎ শরণাগত হয়েছে শুক ; যিনি শরণাগতবৎসল তিনি তাকে রক্ষা করেছেন। রক্ষা করে তিনি আবার কেমন করে বিলিয়ে দিতে পারেন জানি না ! ইত্যবসরে তথায় উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজেশ্বরী মা যশোদা। শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন বড্ড দেরী করিস বাছা ! বেলা যে পুইয়ে এল, ভাত যে জুড়িয়ে গেল ! বড্ড অনিয়ম করিস। সখারা কখন চলে গেছে, এতক্ষণে মায়ের বাড়া ভাত খেয়ে দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। খাবি চল। ধেনুগুলোও চোখ বড় বড় করে, কান খাড়া করে ঘাড় বাঁকিয়ে ডাকছে, তোর পথ চেয়ে বসে আছে।

৪৭। দেরী করিসনে, আর। খেয়ে দেয়ে লক্ষ্মীটি আমার, সাথীদের নিয়ে গোঠে যা।

ব্রজেশ্বরীর কথা থামতে না থামতেই এগিয়ে এলেন কুসুমাসব বললেন, মা ভারী মজার ব্যাপার ঘটেছে একটা। এত বড় মজা আর হয়নি।

এই যে শুকপাখীটি দেখছেন, এটি সাক্ষাৎ শুকদেবের মত পরম বুদ্ধিমান। চন্দ্রপুত্র বুধের মত কথাশিল্পে বিদগ্ধ। গুপ্তধনের মত এটি মা, কারোর চোখে পড়েনি এতদিন। অগোচরে ছিলেন বটে, কিন্তু সত্যি মা, ইনি সকলকার মন-সন্ধানী গুপ্তচর। আবার এদিকে দয়ার বিগ্রহ, মন গলাতে একটি। পদের মত এঁতে বিভক্তিও লেগে আছে। ভক্তিযুক্তের মত মিঠে মিঠে বুলিও ছাড়ছেন। সিদ্ধান্ত-বাগীশের মত মেধার ভীষণ দৌড়, কেবল দৌড় নয় ; কণ্ঠেরও মহাতেজ। কণ্ঠটি আবার গর্ব-স্বরের আশ্রয়। দুষ্টু মন দেবতুল্য সাধু শান্ত। পাহাড়ের মত স্থির। নাদুসনুদুস দেখতে বটে কিন্তু মন চমকিয়ে চলেন। হঠাৎ উড়তে উড়তে এসে পড়েছেন বয়স্যের হাতের মধ্যে। এত কলা আর এত কৌশল এঁর আলোকে যে সখার আমার মন ভরে গেছে ; পক্ষীটিতে গেঁথে গেছে তাঁর ভালবাসা। তাই এই দেরী। দুঃখু করবেন না। আমার চেয়েও সখার অধিক প্রণয়ের পাত্র হয়ে উঠেছেন শুকটি। তার উপর এই যে গোপকুমারীটিকে দেখছেন, ইনি দন্তের একটি সিঁড়ি। আমাদের দুষছেন। বলছেন, শুকটি তাঁর দেবীর। শুধু বলা নয়, নিয়েও যেতে চাইছেন। অন্যান্য যত সব উত্তর দিয়ে ব্যথা দিচ্ছেন বয়স্যকে।

কুসুমাসবের কথা শুনে ব্রজরাণী পাশের দিকে চাইলেন। তারপরে সানুগ্রহে মধুরিকার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—মধুরিকা, তুমি এখানে কেন ?

৪৮। ভয়ে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় প্রণতা হলেন মধুরিকা। বললেন, রাণীমা, আমি তো এমন কিছুই বলিনি। এটি আমার দেবী শ্রীরাধিকার শুক। তাঁর খেলনা। মাত্র বলেছি এটিকে না পেলে তাঁর বড় কষ্ট হবে। [ক্রমশঃ।

এরা কারা ?

শ্রীমতী রত্না চৌধুরী

একখানি ভাঙ্গা ঘর,
মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তার ভিত,
দুপুরের সূর্য আর সন্ধ্যার চাঁদ
ঘরে শুয়েই দেখা যায়
বৃষ্টির ফোঁটা, তাও পাওয়া যায়।
এই ঘরেই বেড়ে ওঠে ওরা ক'টি ভাই-বোন।
এইখানেই সুরু হয় ওদের অভিশপ্ত জীবন।
বাপ মা আছে, নেই তাদের স্নেহ ভালবাসা,
ও দুটো জিনিষ ওদের কাছে অনাস্বাদিত।
সে জন্যে নেই কোন অভিযোগ।
ওদের আছে শুধু বুভুক্ষা যার নেই শেষ,
এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল, তারও জন্যে আছে ক্লেশ,
সারিবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় দাঁড়িয়ে
রাস্তার কলের সামনে।
এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে
শুনতে হয় মোংরা গালাগালি
ছাতামলা, চড়চাপড়, সেও বাদ যায় না।

তবু ওরা সুখী, অবচেতন মন ওদের
অল্পেই থাকে খুসী।
দিনান্তে কুপীর মিটমিটে আলোর সামনে,
কলাই-চটা ফুটো থালায় মোটা চালের ভাত
আর একটুখানি তরকারী পেয়ে,
ওদের মুখে ফুটে ওঠে এক তৃপ্তির ছবি।
যার তুলনা মেলে না,
দোতলায় বিজলী বাতি ও পাখার তলায়
ডাইনিং টেবিলে পোর্সিলিনের ডিশে সাজানো
চপ, কাটলেট পোলাও কালিয়ায়।
স্যাঁতসেঁতে ভিজে মেঝেয় ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে
ঘরের পাশের নর্দমা থেকে ভেসে আসা ব্যাঙের ডাক শুনে
একটা দিনকে এরা ঠেলে দেয় দূর অতীতের কোণে।
এই ভাবেই সুরু হয় ওদের অভিশপ্ত জীবন।
হয়তো বা শেষও এইখানে,
অথবা অন্য কোনখানে,
কিংবা আর কোথায় কে জানে ?

সেকেলে ধারণা নিয়ে

ভালভাবে জীবনযাপনের সুযোগ

নষ্ট করবেন না ?

সেকেলে ধারণা ও অন্ধসংস্কার মানুষের পক্ষে ভালভাবে জীবন উপভোগ করবার এবং আধুনিক জগতের সুযোগ সুবিধে সদ্ব্যবহারের পথে সত্যিই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো কোনো লোককে বলতে শুনা যায়, "আমি কখনো বনস্পতি ব্যবহার করি না। শুনেছি, স্বাস্থ্যের পক্ষে জিনিসটা ভাল নয়।" এ হল একেবারেই সেকেলে সংস্কার ··· কারণ স্নেহজাতীয় পদার্থ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। উপরন্তু, বনস্পতি যে সবচেয়ে পুষ্টিকর ও উপকারী স্নেহপদার্থের মধ্যে অন্যতম বিজ্ঞান তাও প্রমাণ করেছে।

অত্যাবশ্যক ভিটামিনে সমৃদ্ধ

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন অন্ততঃ পক্ষে দু' আউন্স ক'রে স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। স্নেহপদার্থ আমাদের অন্য খাদ্য হজম করতে ও তার উপকারিতা পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রোগ ও অবসাদের বিরুদ্ধে যুঝতে এবং আমাদের সুস্থ ও সবল থাকতেও সাহায্য করে!

বনস্পতি বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ স্নেহ—চিনাবাদামের ও তিলের তেল পরিশোধন ক'রে বিশেষ প্রণালীতে তৈরী। এর ভেতরে স্নেহপদার্থের সব গুণ ঘনীভূত হয়ে আছে ব'লে বনস্পতি শুধু যে দামে সুলভ ও অল্পেতেই অনেক কাজ দেয় তা নয় ··· আরো স্বাস্থ্যপ্রদ করবার জন্যে একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় ভিটামিনও এতে মেশানো হয়। বনস্পতির প্রতিটি আউন্স এ-ভিটামিনের ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিটে সমৃদ্ধ—যা চোখের ও ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষায়, শরীরের ক্ষয়পূরণে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে অত্যাবশ্যক!

ভাল খাদ্য আপনাকে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে ও ভালভাবে জীবন যাপন করতে সাহায্য করে ··· এবং বিশুদ্ধ, পুষ্টিকর ও দামের দিক থেকে সুলভ বনস্পতির কল্যাণে ভাল খাদ্য খাওয়া সহজ হয়েছে। আপনার কি বনস্পতি ব্যবহার করতে সুরু করা উচিত নয়?

বনস্পতি
— বাড়ীর গিন্নীর বন্ধু

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত

VMA 9203

নার্সিসাস

স্পেনসার সুব্রত দত্ত

পাঁচ বছর পরে দেখা—ওমরের সংগে। তাও ভিন্ন পরিবেশে। কলেজের সংগে সম্পর্ক কাটিয়ে আমি এসেছিলাম যাদবপুরে পড়তে, ওমর গেল য়ুনিভার্সিটিতে। তখন তবুও দেখা হোত। এবারে দেখা হোল হঠাৎ—ট্রেফালগার স্কোয়ারে। আর তা পাঁচ বছর পরে। বয়স ওর বেড়েছে বলে মনে হয় না। ছিপছিপে, সুন্দর চেহারা, কালো কুচকুচে দীঘল চোখ আর আশ্চর্য রকমের বড় পাতাগুলো। এই চোখই ছিল ওমরের বিশেষত্ব। আমি একা ছিলাম না, সংগে ছিল আমার বৌ, সুইস-মেয়ে লুলু। ট্রেফালগার স্কোয়ারের সামনে শাড়ী পরে ওর ছবি তোলার শখ, তাই ওকে শাড়ী পরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, ছবি তোলার শেষে ফেরার পথে ওমরের সংগে দেখা। আমার চেহারার কি পরিবর্তন হয়েছিল জানি না, লণ্ডনে হঠাৎ অন্য ভারতীয়ের সংগে গায়ে পড়ে আলাপ করা ত ভুলে গিয়েছিলাম—চার বছর তখন আমার থাকা হয়ে গেছে। ওমরের দিকে কেন যে তাকিয়েছিলাম জানি না, ও ন্যাশনাল গ্যালারীর সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে—দীপঙ্কর না ?

আমি বললাম, তুমি—তুই ওমর তো ?

লুলু এগিয়ে এলো। বললাম—এই আমার স্ত্রী লুলু—

বাংলা শিখিয়েছিস বুঝি, ওমর বললে তা অত ঘটা ক'রে এই আমার স্ত্রী বলার দরকার কি ? বলতে পারিস না, আমার বৌ। কি বলেন বৌঠান ?

লুলু হাঁদার মত তাকিয়ে রইলো। হাত যোড় ক'রে বোধ হয় নমস্কার বলার চেষ্টায় ছিল কিন্তু হতবাক হয়ে রইলো।

তুই একটুও বদলাসনে ওমর, আমি বললাম। আর বাংলা শিখোইনি, শুধু ঐ কথাটা ও জানে, তবে আরো দু-চারটে কথাও জানে। থাক আমার বৌ-এর কথা, তোর কথা বল্।

ওমর হঠাৎ দাঁড়াল। তার পর ওর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলো। বুঝলাম—ও একটা কিছু বলবে কি বলবে না ভাবছে। মুসলমানের ছেলে। যদিও আমরা ছেলেবেলায় একসংগে মানুষ হয়েছি, তবু আমাদের অন্দরমহলের সর্বত্র ওর গতি বাঞ্ছিত কি অবাঞ্ছিত—এই সংশয় যখনই ওর হোত, তখনই ও মাথার চুলে আঙুল চালাত—এ আমার অজানা নয়, তাই ওকে এই অবস্থায় দেখে বললাম—মা ভৈঃ।

দীপংকর, আমার সংগে ঐ সরাবখানায় একটু আসবি ? বড় তেষ্টা পেয়েছে, আর ঐ সরাবখানায় বসা যাবে।

আমার কোনও আপত্তি ছিল না, লুলুরও। তিনজনে এলাম পাবে। অনেক গল্পের পর যখন তিনজনে বেরোলাম তখন বেলা পড়ে এসেছে। ওমর আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার নিলো—আমি নিলাম ওর। আমরা বাসের জন্য চেয়ারিং ক্রশের দিকে হাঁটতে সুরু করলাম। ওমর চললো তার উল্টো দিকে।

ওমরের নাম আমীর খান। আমীর থেকে কি ক'রে ওমরে এসেছে—ঠিক মনে পড়ে না। হয়তো ইস্কুলে ছেলেদের দেওয়া নাম অথবা ওরই বাড়ীর। তবে নাম যেই দিয়ে থাকুক ঐ নাম ছাড়া আর অন্য কোন নামে ওকে মানাত বলে মনে হয় না।

ওমর বড় চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য ওর এখনও আছে, লুলুর কাছেও তা ধরা পড়েছিল। আর ধরা পড়েছিল ওমরের চোখ। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমার কি ওকে পছন্দ হয়েছে ? ও ছেলে হিসেবে ভালই, তবে স্বামী হিসেবে কি হবে জানা নেই। লুলু মুখ ভার করল অভিমানে ! বললাম, মানিনি, তোমার ভারতবর্ষেই জন্মান উচিত ছিলো।

ওমর লণ্ডনে এক বছর এসেছে। ব্যারিষ্টারী পড়ছে। দেশে ওর বৌ আছে কোলকাতায়—পার্ক সার্কাসে। বিয়ে ওর হয়েছে প্রায় দু বছর। ওর বৌ-এর কাছে যা গল্প শুনলাম, মনে হোল সুশিক্ষিতাই। কি পাশ, জিগ্যেস করিনি। সিভিল সাপ্লাই-এ বোধ হয় কাজ করে। তবে চাকরী জীবিকা হিসেবে নেয়নি, বহির্জগতের সংগে যোগাযোগ রাখার জন্য চাকরী নেওয়া। ওমরের বাবার অনেক পয়সা—শ্বশুরেরও। এদেরই ব্যারিষ্টারী পড়া মানায়, তবে ওমরের কথা বলা বড় কঠিন। মন ওর দাঁড়াতে চায় না—গতির অভাব ওকে বাধা দেয়, বিশ্রামও চায় না অন্ততঃ চাইতো না। পাঁচ বছর পরে দেখলাম, বি-এ ক্লাশের ওমর আর আজকের ওমরের পার্থক্য নেই মৌলিক। সেই আনমনা উন্মনা, বয়সের গাম্ভীর্য ওর চেহারাকে অবধি ছুঁতে পারেনি। আমার নিজের দিকে তাকালে মনে হচ্ছিলো আমি ওর চেয়ে দশ বছরের বড়। মেদ জমতে সুরু হয়েছে দেহে সাতাশেই। নির্ভরতার মেদ, আত্মপ্রীতির মেদ—সংসারীর স্থিতিশীলতার মেদ। ওমরও তো সংসারী ? ওর তো বৌ আছে ? তবু ওর চেহারায় বিবাহিত জীবনের ছাপ নেই। আহার নিদ্রা মৈথুনের গতানুগতিক ছন্দের ছাপ।

কারণও জেনেছিলাম কিছুদিন পরে, বেশ কিছুদিনই, অফিসের কাজে বড় ব্যস্ত তখন। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনী—তার ওপর লুলু নেই। শাড়ী পরা প্র্যাকটিস হচ্ছিলো তখনও। সিঁড়ির কার্পেটে পা বেধে পড়ে গিয়ে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে শুয়ে আছে। বারে বারে বলেছিলাম—শাড়ী পরো না, শাড়ী পরো না, একে তো

আমাকেই ওকে শাড়ী পরান শেখাতে হয়েছিল, কোমরে বড় গেরো বেঁধে, তার বর্ণনা না দেওয়াই ভাল, হয় ওর পা শাড়ীর ঝুলে বেধে যায়, নয়তো উঠে আসে হাঁটু অবধি। তবু কে যেন ওকে বলেছিল যে শাড়ী পরলে নাকি ওকে অপূর্ব সুন্দর লাগে, ভারতীয় মেয়ের লাবণ্যিমা আর স্বকীয়তা ফুটে ওঠে ওর মধ্যে। আমি বাজি ধরতে পারি যে, যে একথা বলেছিল সে নিশ্চয়ই ঠাট্টা করেছিল। তা ও কি বোঝে? মেয়েমানুষ সব দেশেই সমান—মিথ্যা স্তুতিতে ওদের ভোলান এত সোজা! যাই হোক, লুলু বোধ হয় এবারে হাসপাতাল থেকে এসে আর শাড়ী পরার নাম করবে না। ঠিক এমনি সময়ে একদিন ওমরের টেলিফোন এলো আমার অফিসে।

তোরা কেমন আছিস? আমার খোঁজও তো নিস না একটা টেলিফোন করে! ওমর বললে।

ভাল নেই, আমি বললাম। লুলু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে। রোজ অফিস ফেরৎ দৌড়তে হয়, তবে আজ ছুটি, আজ ওর পরিচিত কয়েকটি সুইস-মেয়ে ওকে দেখতে আসবে। আজ ওদের প্রাণভরে জার্মাণ বলার সুযোগ দিয়েছি—

বৌঠান সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে? আহা হা! কি করে পড়লো? কেমন আছে—সীরিয়াস কিছু নয়তো?

কে জানে? তবে খুব খারাপ নয়। জানিস আমার বোধ হয় কোন পরিচিত ভারতীয় বন্ধু বলেছে ওকে, শাড়ী পরলে খুব মানায়। সেই শোনা অবধি রোজ শাড়ী-পরে আয়নার সামনে নিজেকে ঘুরে ফিরে কতবার যে দেখা হোত, তার শেষ নেই। সম্প্রতি শাড়ী পরে ভারতীয় মেয়ের মত gracefully হাঁটা প্র্যাকটিস হচ্ছিলো—ব্যস, সিঁড়ির কার্পেটে পা বেধে পড়ল। এখন মর তুই দীপংকর ঝামেলা পুইয়ে।

হো হো করে ওমর হেসে উঠলো। বললাম, হাসছিস কেন? তোর খুব মজা লাগলো বুঝি? না—ধরেছি, তুই বলেছিস বুঝি শাড়ীর কথা।

হ্যাঁ আমিই বলেছিলাম, কিন্তু কে জানতো? রাগ করিসনি তো তুই? ওমর বললে। তারপর কিছুক্ষণ থেকে বললো দীপংকর, আজ সন্ধ্যায় তো তোর কাজ নেই, আমার সংগে Lancaster gate এ সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় দেখা কর, আমরা একসংগে খাব আর তোকে একটা জিনিষ দেখাব।

কি দেখাবি? আমার আর দেখার বাকি নেই।

সাকীকে কি দেখাবনে? আমি ওমর একলা থাকি কী ক'রে, সাকী ওমরের চাই-ই, আজ তুই সাকীকে দেখবি।

তোর সাকী তো দেশে আছে। সেলিমা এসেছে নাকি?

দূর বোকা, সেলিমা কি সাকী হ'তে পারে? ও তো আমার জরু। সাকী কি কখনো বাঁধনে ধরা পড়ে?

টেলিফোনে এর বেশী কথা বলার আমার ইচ্ছে ছিল না, বললাম আচ্ছা আমি আসছি, আমার কিন্তু এ-সব ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় এলাম ল্যাংকাষ্টার গেটে, আণ্ডার-গ্রাউণ্ড থেকে বার হ'য়ে যে সরু গলি-পথ আছে সেখানে দেখি ওমর দাঁড়িয়ে, ভারী সুন্দর বেশ-বাস, ওমরের চেহারার বৈশিষ্ট্য যেন ফুটে উঠছিল।

তুই ঠিক সময়েই এসেছিস, আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের ঐ সুবিধে—বাসে এলে পনের কুড়ি মিনিট দেরী হ'লেও আশ্চর্য হতাম না, আয়।

কই, তোর সাকী কোথায়? তাকে দেখতেই তো আসা—সে আসেনি?

ধীরে বন্ধু ধীরে, ঘড়ির কাঁটার সংগে কি সাকী চলে? তার যাওয়া-আসা সময় এড়িয়ে সময় পেরিয়ে।

সেই পাগলামী পাঁচ সাল আগে শুনেছি—তখন মানাতো, তখন আমরা দুজনেই ছাত্র ছিলাম। কিন্তু আজ আমরা দুজনেই সংসারী, এসব ছেলেমানুষী আমাদের মানায় না। চল কোথায় বসি, আমার আবার সকাল সকাল ডিনার খাওয়া অভ্যাস।

খাবি ডিনার, তোকে তো খাবার কথা বলেছি। এই Grill-room এ আমরা খাব বলে ওমর আঙুল দেখাল।

Grill-roomটা ষ্টিটের ষ্টেশনের লাগাও। দেখে মনে হোল—উঁচুদরেরই, লুলুর সংগে যখন কোর্টসিপ চলছিল তখন, কখন-সখন একটু উঁচুদরের রেস্তোরাঁয় গেছি—কিন্তু এমন জায়গায় এসেছি বলে মনে হয় না। যদিও আমার এঞ্জিনিয়ারের চাকরী আর টাকার অংকটা মোটাই, তারও পরে আমার সাদা-বৌ, তবু জীবন-মান ভারতীয় অনুপাতের সংগে সমতা রেখেছিল বেশী ইয়োরোপীয় মানের সংগে কম। ইয়োরোপীয় জীবন-মান আর ভারতীয় মানের সংগে পার্থক্য মৌলিক, ইয়োরোপীয় মানের পর্যায়ে যা প্রয়োজন—ভারতীয় মান অনুসারে তা বিলাস। আমার বিয়ে হবার পরে এ ব্যাপারটা আরো ভাল করে বোঝা হয়েছিল, তবু লুলু আর পাঁচজন সুইস মেয়ের মত খরচে নয়—সামলে চলতে জানতো। বিয়ের পরই তাই আর আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া রেস্তোরাঁয় আসা হো'ত না। আর এমন রেস্তোরাঁয় তো নয়ই। দরজা দিয়ে ঢুকেই প্রথমে নজরে পড়ে এর সৌন্দর্য, এত গভীর আর মোলায়েম। পা বুঝি ডুবে যায়! বেলোয়ারী কাঁচের ঝাড় ঝুলছে ইতি-উতি। খরিদ্দারদের তখনও আসার সময় হয়নি। সবেমাত্র সন্ধ্যে। আমি আর ওমর একটা কোণের টেবলে এলাম।

তোর সাকী কখন আসবে, আসবে তো না রহস্য করছিস? তার নাম কি, বয়স কত কোন দেশীয়?

অনেক প্রশ্ন করলি দীপংকর, অবিশ্বাসের প্রশ্নও—আর তুই চটে যাসনি তো?

চটবো কেন? তোর ঘরে বউ আছে, তোর অনেক কিছুই আজ পাওয়া হচ্ছে না, অনেক কিছু থেকে তুই বাকত, যদি এদেশী কোন মেয়ের সংগে মেলা-মেশা করে তার কিছুটা পাস তাহ'লে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে না, তবে খরচের দিকে নজর রাখতে বোলব, এত খরচ পোষায় কি ক'রে তোর, সস্তার রেস্তোরাঁয় যাস না কেন?

সস্তার রেস্তোরাঁয় সাকীকে মানায় না। সাকীর পারিবেশটা কি অনেকখানি নয়?

থাক তোর রহস্য, আমার ক্ষিধে পাচ্ছে। তোর সাকীর জন্য তো আর অপেক্ষা করা চলে না, এর মধ্যে একটা মেয়ে এগিয়ে এসেছিল আমাদের খাবার টেবলে—ফরমায়েস নিতে। ওমরকে দেখে সে হাসলো, বুঝলাম, ওমর পরিচিতই।

ডে-নীস কোথায়? ওমর মেয়েটাকে প্রশ্ন করলো, শুনলাম ডে-নীস শব্দের ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে উচ্চারণ করা।

আসার সময় তো ওর হয়ে গেছে, মেয়েটা বললে, হয়তো ডে-নীস ক্লোকরুমে পোষাক বদল করছে।

ডে-নীস যদি আসে তো তাকে পাঠিয়ে দেবে কি ! আমি তার সংগে একটু কথা বলতে চাই,, ফরমায়েস তাকেই কোরব—Please লিলি।

লিলি মিষ্টি হেসে চলে গেল। তোর মতিচ্ছন্ন হয়েছে বললাম। কোথায় লক্ষ্মী-শ্রী মাখান হাতের পরিবেশন, আর কোথায় ডে-নীসের সার্ভিস। সে বোধ হয় স-গুম্ফ মস্ত জোয়ান কোন পোল বা ইটালীয়ান।

না রে, ডে-নীস মেয়ের নাম ছেলের নয়, শুনছিস না নামের উচ্চারণ আলাদা—বানানও আলাদা, ঐ দেখ ডে-নীস আসছে।

কাউণ্টারের ধার দিয়ে দেখলাম একটা মেয়ে এগিয়ে আসছে—কালো পেনসিল লাইন পোষাকের ওপর এপ্রন, টিউলিপবৃন্তের মত তার গড়ন। আর কি আশ্চর্য মিল তার চেহারায় ওমরের সংগে, চুল যদি তার কালো হোত, হয়তো আমারই ভুল হোত ওমরের বোন ব'লে, শুধু মাথার চুলে পার্থক্য আর পার্থক্য চোখের রংএ, দীর্ঘপক্ষ্ম আয়ত চোখ, কিন্তু কি গভীর নীল—যেন মাঝ-দরিয়া। ওমরের চোখও দীর্ঘপক্ষ্ম, তবে সে কালো, এক ঝলকে দেখলাম, আবার চেয়ে দেখার ইচ্ছে হোল। কিন্তু অন্য দিকে তাকালাম। আমাদের টেবলের সামনে এসে ডে-নীস দাঁড়াল।

আজ তো তোমার আসার কথা ছিল না ওমর হঠাৎ ?—ডে-নীস প্রশ্ন করলে।

আমার এক বন্ধু এসেছে সাকী! ভাবলাম—চলেই আসি। তোমার হিসেবে—আমি তো বি-হিসেবীই, এই আমার বন্ধু দীপংকর—আর এই আমার সাকী ডে-নী'স। ওমর আমাদের আলাপ করিয়ে দিলো, আমি কিছু বললাম না। Grill-room এর ওয়েট্রেস। না হয় রূপই আছে। তার জন্য এত খ্যাপামো করা ওমরের সাজে না, কিন্তু ওকে কিছু বলাও চলেনা—এমন কাজ ওকেই সাজে, রেস্তোরাঁয় এসে ওয়েট্রেসের সংগে আলাপ করিয়ে দেওয়া। আদিখ্যেতার একটা সীমা আছে, লণ্ডন শহরে হাজার বিদেশী বান্ধবীকে নিয়ে সময় কাটায়—কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। মেয়েটা ওমরের কথা শুনে শুধু হাসলো, সেই হাসি—ওমরের মত। ঠোঁট-চাপা, অন্তর। শুধু চোখ দুটো হাসলো।

কি খাবি দীপংকর ? Mixed-Grill ? আর লাল সরাব সাকী, লাল-সরাব ওমর বাংলায় বললে। সাকী চলে গেল, একটু পরেই কুজোজি আনলো একটা ছোট্ট বেতের ঝুড়িতে রাখা, ছিপি খুলে একটু আমার পাত্রে ঢেলে দিয়ে ডে-নীস চলে গেল, খাবার আনতে। আমরা দু'জনে বসে রইলাম। কেমন দেখলি সাকীকে ? ওমর বললে। কি আর দেখলাম, আমি বললাম, এতো জামা-কাপড় আর এপ্রণ পরা। এতে মতামত দেওয়া চলে না। ও কি তোর বান্ধবী না'কি ?

না রে, সাকী আমার বান্ধবী নয়—But She gives me a good time. ওকে ধরা বড় কঠিন।

ওর কি বিশেষ বয়-ফ্রেণ্ড আছে ? বিবাহিত ব'লে তো আমার মনে হয় না—বললাম।

না বয়-ফ্রেণ্ড নেই, তবে আমার কমপিটিটর আছে, তার সংগে পাল্লা দেওয়া কঠিন, মনে হয় তার অনেক পয়সা, ডে-নীস তাকে গত আট বছর ধরে চেনে।

আট বছর ! আকাশ থেকে পড়লাম, তোর ডে-নীসের বয়স কত ? আর আট বছর একটা লোকের সংগে নিরামিষ সম্পর্ক রাখা অবিশ্বাস্য। তার ওপর তুই বলছিস যে লোকটার পয়সা আছে। কেন এসব ঝামেলায় আছিস ? আমার বাপু সব ভাল লাগছে না।

নিরামিষ সম্পর্কের কথা কেন তুলছিস দীপংকর ? ওর কি কোনও মানে আছে। আমি জানি শুধু, আমার আট পৌরে দিনের প্রহর ডে-নীস বদলে দেয়, ওর সাহচর্যে সেলিমার কাছে শোনা—আর প্রায় ভুলে যাওয়া মেঠো বাঁশীর সুর এক প্রহরে হয়ে যায় রওশান চৌকীর বাজনা, সন্ধ্যা তারার আভা ডুবে যায় পূর্ণিমার বন্যাস্রোতে। ওর ফ্ল্যাট-এ যখন রাত কাটাই তখন ভাবি আহা, কাল তুমি কেন এসে দাঁড়াও না এই মুহূর্তে। কিন্তু তারপর যেন শুনি ভোরের আজান, বাতাস আসছে অনেক দূর থেকে, আজান আসছে 'আল্লা হো আকবর আল্লা হো আকবর, আমাহো আব্‌লা ইল্লেলা ইল্লেলা'—সেই আজানের শব্দ শেষ হয়ে যায়, তারপর শুনি মেঠো বাঁশী আর সেই বাঁশীর শেষ, সেলিমার দীর্ঘনিঃশ্বাস—

তোর কি মদের মাত্রা বেশী হয়ে যায় ! আমিও তো লুলুর সংগে বিয়ের আগে রাত্রিবাস করেছি। কিন্তু এসব হেটো বাঁশী, মেঠো সুর। না মাইরী তুই রাশ টেনে ধর।

ডে-নীস এর মধ্যে খাবার নিয়ে দুজনকে দিয়ে গেল। আমি এবারে আর মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম না, শুধু দেখলাম সযত্নে রাখা প্রসাধন-সেবিতা দুটি শুভ্র হাত। রক্তনখী।

কাল তোমার ছুটি আর আমার পার্বণ, মনে আছে তো সাকী ! ওমর ডে-নীসকে বললে।

আছে, আর আমরা Lotus House এ যাব আমার ভাল করে মনে আছে, ডে-নীস বললে। ডে-নীস চলে গেল, আমি নীরবে খেয়ে গেলাম। ওমর হঠাৎ প্রশ্ন করলো তুই হঠাৎ চুপ করে গেলি কেন ? একটা কিছু বল ?

তুই বলার বাইরে গেছিস ওমর, Lotus House এ নিয়ে যাচ্ছিস ওকে, তোর পয়সায় কুলোয় কি করে ?

চাকরী করি জানিস না। তার ওপর সস্তার ঘরে চলে এসেছি নিজে রেঁধে খাই, শুধু সাকীর জন্য নয়তো খরচে কুলোয় না।

জ্ঞানপাপীর মত তো কথা বলছিস, অথচ এদেশে সাতাশ বছর বয়সে তুই রোম্যান্স করতে আসিসনি তোর ঘরে বৌ আছে। তুই মেয়েমানুষ কি তা জানিস। তুই ওর মধ্যে কি পেয়েছিস ?

জানি না দীপংকর ! কিন্তু তোকে সাকী দেখাতে আনলাম ওকে তোর ভাল লাগেনি না ? মেয়েটা কিন্তু বেশ !

এর পরে বেশী শোনার সময় ছিলোনা আমার। ডিনারের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দুজনে বেরিয়ে এলাম।

এর পর অনেক দিন কেটে গেছে। ওমরের কি হোল আর না হোল আমার ভাবার সময় ছিলোনা। লুলু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী চলে এসেছিল। আমার ওর গেরস্থালী আর উইক-এণ্ডে সাংসারিক কাজের চাপে আর কারুর খোঁজ নেওয়াও সম্ভব হয়নি, প্রত্যেকেরই নিজস্ব সমস্যা আছে। অন্যের জন্য আর কে মাথা ঘামায়। লুলুই একদিন ওমরের কথা তুলেছিল।

ছেলেটা বেশ, তবে বড় চঞ্চল, আমাদের এখানে তো অনেক দিন আসেনি, তোমায় অফিসে ফোন করে নাকি ?

হ্যাঁ ছেলেটা বেশ। অন্ততঃ তোমাকে শাড়ী পরলে খুব সুন্দর দেখায় একথা একজনও বলে, তা শাড়ী পরা প্র্যাকটিস বন্ধ হয়েছে কেন ?

তোমরা বড় হিংসুটে, অন্য কেউ আমাদের সুন্দর বললে তোমাদের সহ্য হয় না, তোমার বোধ হয় জেলাসী হয়েছে ওকে আমি সুন্দর বলি বলে।

না জেলাসীর আর কারণ নেই বলে লুলুকে আমি ডে-নীসের গল্প বললাম, ওমরের ঘরে বিবাহিতা স্ত্রী, অথচ ওমর এখানে ডে-নীসের জন্য পাগল। সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় আর যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। যদি এই সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ের ও ডে-নীসের ভালবাসা পেত তাহলে বুঝতাম এ ব্যয়ের সার্থকতা আছে, কিন্তু ডে-নীসের মত মেয়েকে জাল ফেলে ধরার মত জাল ওমরের নেই, ওমর কি ওকে ঘরণী হিসেবে চায়। এ প্রশ্নও ভেবেছি কোনও উত্তর পাইনি নিজের কাছে, সাকীর পরিবেশ কি সব চেয়ে বড় কথা নয়? একথা মনে পড়ে। ডে-নীসের গল্প শোনার পর লুলু বললে—আমাকে কি ডে-নীসকে দেখাতে পারো ?

সে বড় খরচ হবে লুলু, একটা ওয়েট্রেসকে দেখতে যাবার জন্য এত খরচ পোষায় না।

কেন আমরা Grill room এ খাব না, Saloon এ বসে drink কোরব ও নিশ্চয়ই drink নেবার জন্য আসবে, তাতে তো খরচ কম।

অগত্যা রাজি হলাম, এর কয়েক মাস পরেই আমরা সুইটসারল্যাণ্ডে, হলিডে করতে যাব বলে স্থির করেছিলাম। লুলুর বাপের বাড়ীর দেশে। আমার তাই এমন সময়ে বাইরে গিয়ে ড্রিংক করে পয়সা খরচ করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তার ওপরে তখন ওমরের আমি একটা ডিনার ধারি। ভেবেছিলাম বাড়ীতেই নেমন্তন্ন করে খাওয়াব কারণ তাতে খরচ অনেক কম। তবু এক শনিবার সন্ধ্যের দিকে আবার এলাম Lancaster gateএর সেলুন বারে লুলুকে নিয়ে, একটু দেরী করেই এসেছিলাম, এক রাউণ্ড ড্রিংকের পরে এদিক ওদিক চাইলাম, ডে-নীস নেই। লুলুকে বললাম—ডে-নীসকে দেখছিনা, হয়তো আসেনি। একটা শেরী খেয়েই লুলুর আবার ক্ষিধে পেল, স্যাণ্ডউইচ নিলাম এক রাউণ্ড। দ্বিতীয়বার ড্রিংক কেনার সময় বললাম, এবারে একটা বেবী স্যাম নি, শেরীর বদলে, সস্তা হবে। লুলু হাসলো, বললে বিয়ের আগে তুমি আমাকে শেরী খাওয়াবার জন্য জোর করতে এখন বেবী স্যাম। বেশ !

আমি লজ্জা পেলাম। যা নাগালের বাইরে তার জন্য সাধ্যাতিরিক্ত আয়াস স্বাভাবিক, কোর্টসিপের সময় লুলুকে তাই মনে হোত। আজ ও আমার বৌ—আমারই। অতএব আমার দৈন্য তুচ্ছতা, ওর কাছে আড়াল নেই, আড়াল করিও না, তবু লজ্জা পেলাম বড়। আবার শেরীই কিনলাম এবারে এ রাউণ্ড ও শেষ হোল ডে-নীসের দেখা পেলাম না—কিন্তু অবাক হলাম আবুলকে দেখে। আবুল নওয়াজ আমাদের ক্লাসএর সেরা ছেলে য়ুনিভারসিটির গোল্ড মেডাল পাওয়া নওয়াজ। আমরা সকলেই এক সংগে বর্ধমানে

পড়েছি। কলেজে এসে আমি খাট সায়েন্স আর আবুল আর্টস এ। আবুল এসেছিল লণ্ডনে P. H. D করতে Econnmics এ। আমাকে দেখে খুসীই হোল। লুলুর কথা ও দেশে থাকতেই শুনেছিল, কারণ আমি যখন বিয়ে করি তখন আর পাঁচজনের মত লুকিয়ে করিনি, বাড়ীতে জানিয়েই করেছিলাম। এমন কি আমার মা লোক মারফৎ লুলুর হাতের সোনার কংকণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর তা সোনা বলে লুলুর কি গর্ব! লুলুর সংগে আবুলের আলাপ করিয়ে দিলাম। ভণিতা না করে, আবুল আমাকে ডে-নীসের কথা জিজ্ঞেস করলো। নাম ওর জানা ছিল না তবে ওয়েট্রেস একজন তা বললে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম কেন?

সেলিমা আমার চাচার মেয়ে, ওমরের সংগে ওর বিয়ে হয় আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না বেদরদ। কিন্তু পাছে কেউ মনে করে যে এতে আমার স্বার্থ আছে তাই কিছু বলিনি। তুমি তো জান নন্দিতা রায় আর শিপ্রা ঘোষের ব্যাপার ওমরের সংগে, ওমর কিনা করেছে, ওদের সংগে? এখানে এক ওয়েট্রেসের জন্য নাকি ওমর পাগল, সেলিমা সে কথা শুনেছে। এদেশী মেয়েরা সাধারণতঃ বিবাহিত ছেলেদের সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী নয়, তাই সেলিমা আমাকে বলেছে আমি যদি মেয়েটিকে জানাতে পারি যে ওমর বিবাহিত, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকমে দাঁড়াবে।

তুমি কি এই ব্যাপার জানার জন্য এসেছ? কিন্তু এর কতখানিই বা তুমি করতে পারো? তোমার তো মেয়েটির নামও জানা নেই, কি করে তুমি তাকে চিনবে? কিছু করা তো দূরের কথা। আর এ রেস্তোরাঁর খবর দিলে কে?

খবর ওমরের এক বন্ধুর কাছে পেয়েছি। এখানে ওমরকে দেখার আশা করি সেই মেয়েটির সংগে তারপর হয়তো—

মেয়েটির নাম ডে-নীস তবে আজ তাকে দেখছিনা। তুমি যদি কিছু করার থাকে তো করতে পারো, তবে আমার মনে হয় তাকে বলার আগে ওমরকে বলা ভালো, ওমর হয়তো কিছু মনে করতে পারে, আমরা এখন চলি, আমাদের সময় নেই।

চলে এলাম দুজনে, লুলুকে সব ব্যাপার বলছিলাম পথে, ওমরের ব্যাপার দেশ অবধি গেছে, কি করে যে এসব খবর রটে আল্লা জানে, আবার শুধু সঠিক ঘটনা এত বেশী যে বলার নয়। দেশের লোকেদেরও ঠিক বুঝিনা। যদি ওমরের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের অনাস্থা থাকে, যা নন্দিতা আর শিপ্রার ব্যাপারের সংগে জড়িত—তাহলে তাদের সেলিমার সংগে ওমরের বিয়ে দেবার যুক্তি কি? ওরা কি ভেবেছিল, শয়নমন্দিরের গতানুগতিক প্রক্রিয়া ওমরের জীবনে স্থিরতা আনবে? যদি এই ওদের যুক্তি তাহলে একলা পাঠান কেন ওমরকে বিদেশে? রক্তের স্বাদ যে একবার পেয়েছে তার পক্ষে কি আবার চাওয়া অযৌক্তিক?

ডে-নীসকে না দেখে লুলু একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু আবার Lancaster gateএ খাবার কথা সে মুখে আনেনি। আমাদের হলিডে করার দিন এগিয়ে এসেছিল। লুলু যাবে বাপের বাড়ী ডুব্লিকে, আমিও সুইটসারল্যাণ্ডের কয়েকটা জায়গা ঘোড়ায়ে শেষ দু' সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ী থাকবো প্রোগ্রাম ছিল। আমরা এখন খরচ সংক্ষেপ নিয়ে ব্যস্ত। আমার প্রোগ্রাম তিন দিন জেনিভা, দুদিন বার্ণ, দু'দিন লাসন—বাকি ক'টা দিন শ্বশুরবাড়ী ডুব্লিকে। আর লুলু থাকবে এক মাস বাপের বাড়ী, আমরা দিন গুণতে লাগলাম।

জুনের তৃতীয় সপ্তাহ, জুলাই-এ আমাদের হলিডে যাবার কথা। হঠাৎ এক শনিবার জানান না দিয়ে ওমর আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। তখন বিকেল পাঁচটা বোধ হয় হবে, জানান না দিয়ে কারুর বাড়ী আসা, এ দেশী সভ্যতায় অভদ্রতা, আমারও খুব ভাল লাগেনি, বাড়ীটা গুছোন নেই, ফুল কেনা হয়নি উইক এণ্ডে। পরের সপ্তাহে চলে যাব বলে পয়সা বাঁচান হ'চ্ছিলো। অতিথি আসবে জানলে নিশ্চয়ই ফুল কেনা হোত। তবুও মুখে হাসি টেনে এনে বললাম আয় ওমর, কিন্তু হঠাৎ না জানিয়ে? টেলিফোনেও তো একটা খবর দিতে পারতিস?

বসার ঘরে দুজনে বসলাম, ঘর আমাদের দুটো, একটা শোবার আর একটা বসবার, ছোট্ট কিচেনও আছে। বসার ঘরেই খাবার টেবল পাতা, আসবাবপত্র নেহাৎ সাবেকী, ওমর কিছু বললে না, চুপচাপ বসে রইলো। লুলু এসে ওমরকে জিগ্যেস করলে, সে চা খাবে কি না, ওমর সম্মতি জানালো।

আমরা সামনের শনিবার হলিডে করতে যাচ্ছি সুইটসারল্যাণ্ডে। বললাম, তুই পরের শনিবার বিকেলে এলে পাত্তা পেতিস না।

তাই বুঝি? তোদের অনেক দিনই খবর নেওয়া হয়নি। বৌঠানকে তো ভালই দেখছি। কবে ছাড়া পেল হাসপাতাল থেকে?

লুলু এর মধ্যে চা নিয়ে এসেছিল, আমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই বললে, তুমি কি সেই ভারতীয় বন্ধুর কথা বলছ যার সংগে আমাদের দেখা হয়েছিল? কোথায় দেখা হয়েছে কবে, কার সংগে? ওমর প্রশ্ন করলে।

আমার আর ওর রোমান্টিক অধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতাম, কিন্তু লুলুর জন্য আর উপায় রইলো না। তাই বললাম—দেখা হয়েছিল নওয়াজের সংগে, Lancaster gateএ saloon এ—

আচ্ছা? কিন্তু নওয়াজ তো আমার কাছে ব্যাপারটা চেপে গেছে, তাজ্জব!

আমি কিছু বললাম না, তিন জনে চুপ করে রইলাম, একটা বিশ্রী নীরবতার মধ্যে। আমার উৎসুকতার অভাব লুলুকে বিব্রত করেছে বুঝলাম, লুলু আমাদের কাছে মাপ চেয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। তোরা কোথায় যাবি সুইটসারল্যাণ্ডে? ওমর বললে। আমি যাব জেনিভা, লসেন, বার্ণ হয়ে ডুব্লিকে। লুলু সটান যাবে ওর বাপের বাড়ী ডুব্লিকে। তিন সপ্তাহ আমার ছুটি।

বৌঠান কি তোর সংগে ফিরবে? ওমর বললে। না আগে ঠিক ছিল ও এক মাস থাকবে, এখন শুনছি সেটা দু'মাস। শেষ অবধি সেটা কত দিনে দাঁড়াবে জানি না বললাম। বৌঠানের বাপের বাড়ীর ঠিকানাটা দে তো, ওমর বললে, আমি অষ্ট্রিয়ায় যাব ভাবছি, যাবার পথে না হয় দেখা করবো, ঠিকানা দিলাম, ওমর ওর ডায়েরীতে তা তুলে নিল। আবুল আমার সম্বন্ধে কিছু জিগ্যেস করেছে তোকে দীপংকর, অথবা ডে-নীস সম্বন্ধে? ওমর বললে। যদি জিগ্যেস করেই থাকে তুই কি ভাবছিস আর পাঁচটা ভারতীয়ের

মত আমি তোকে নিয়ে পরচর্চা করবো ? বললো, দীপংকর, তুই বোধ হয় আমাকে দেখে মোটেই খুসী নস। কিন্তু কারণটা বলবি কি ? টেলিফোন না করে আসাটা, না ডে-নীসের ব্যাপারটা। খুলেই বল না। বিদেশে পুরোনো বন্ধুর সংগে সাক্ষাৎ হওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু এমন ব্যবহার পাওয়াও দুর্ভাগ্য! টেলিফোন না করে আসার জন্য মাপ চাইছি। আর ডে-নীস ? সে ব্যাপারও শেষ।

লজ্জায় অধোবদন হলাম, আমি সত্যই ওর সংগে ইতরের মত ব্যবহার করছিলাম। দু-হাত দিয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরে বললাম, ওমর রাগ করিসনে ভাই, আমার ভুল হয়েছে, মাপ কর।

ওমর ওর গল্প বলে গেল, ওর গল্প বলতেই ও এসেছিল—ডে-নীসের গল্প, এ গল্প ও কোথায়ও বলেনি সহানুভূতি পাবে না বলে, আমার সাদা-বৌ ভেবে বোধ হয় কিছুটা সহানুভূতি আশা করেছিল। ডে নীস ওকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, অনেক বার, ওমরের সাধ্যাতিরিক্ত সে এ কথা ওমরকে সোজাসুজি না বললেও প্রকারান্তরে জানিয়েছে। কিন্তু কি দুর্নিবার তার আকর্ষণ, ওমর বুঝতে পারে না। হাজিরা দেয় প্রতি সপ্তাহে Lancaster gate-এ Grill-room-এ, আর প্রতিটি সপ্তাহের একটি রাত সে যায় তার কাছে, একটি রাতের স্বপ্নের নেশায় ওর বাকি সাত দিন কেটে যায়, ওর প্রতিটি মুহূর্ত থাকে সেই স্মৃতির সৌরভে মন্থর হয়ে। আবার অনাগত সন্ধ্যার প্রতীক্ষা। ডে-নীস ওকে কোন দিন ভালবাসেনি, একথা ওমরের জানা আছে, ডে-নীসের ভালবাসা ও কোন দিনও পাবে বলে মনে হয় না, তবু ডে-নীস ওর কাছে যতটুকু থাকে, তার মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না। ওমরকে চার দিন আগে ডে-নীস একটা চিঠি পাঠায়, সেটার তর্জমা এই—

প্রিয় ওমর, আমি রোজানোর সংগে আজ ম্যাজরকায় যাচ্ছি, হয়তো আমাদের বিয়ে হবে। আশা করি তুমি তোমার পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে শীগগির দেশে ফিরবে এবং সুখী হবে, শুভেচ্ছা-সহ, ডে-নীস, এই চিঠি পাবার সংগে সংগেই ওমর ডে-নীসের কর্মস্থলে আর Flat-এ কোন করে কোনও খবর পায় না, দুদিন ও পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, কাজে যায় না, আজ শনিবার ওর ছুটি। আমার বাসায় আসা ওর হিসেবে ছিলো না, কিন্তু পথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এসে পড়ে আমার পাড়ায়, তাই জানান না দিয়েই ও চলে আসে আমার বাড়ীতে।

রোজানো কে ? বললাম, তোর কমপিটিটর বলে যাকে বলেছিলি সেই বুঝি ? নাম শুনে মনে হয় ইটালীয়ান।

হ্যা ইটালীয়নই। ঠিক ধরেছিস, ও বোধ হয় ডে-নীসকে ভালবাসে। তবে ও ক্যাথলিক আর বিবাহিত, ওর পক্ষে বিয়ে করা অত্যন্ত কঠিন। এ এক গোলকধাঁধা।

তোর পক্ষে তো ভালই হোল, এ হাতী পোষা তোর সামর্থ্যের নয়, এখন সুবোধ ছেলে হয়ে ঘরের বউকে নিয়ে ঘর কর।

কিন্তু আমার প্রেম ? তার কি হবে, জান আমার প্রেম কত গভীর। আমি ওর জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করলাম, কত কষ্ট করছি, কিন্তু ও তার দাম দিলো না, হয়তো ও একদিন বুঝবে।

এ তোর প্রেম—না এ তোর নিজেকে ভালবাসা? তুই ডে-নীসের জন্য যা ত্যাগ বলছিস তা কি ডে-নীসের জন্য, না তোর আত্মতৃপ্তির জন্য ? আর থাক ও কথা, যা গেছে তা মুছে যাক।

মুছবে না দীপংকর! আমি কখনও ভালবাসিনি জীবনে, ওকেই শুধু ভালবেসেছি বলে মনে হয়, এ মোহ্চার নয়।

হয়তো আমাদের আলোচনা অনেক দূর যেত। হয়তো আমি সেদিনই ওর নজরে আনতাম ওর চেহারা আর ডে-নীসের চেহারার সাদৃশ্য সম্বন্ধে—কিন্তু তা আর বলা হোল না। ওমর বাকি সময় ওর ভালবাসা—আর তার গভীরতা সম্বন্ধে আমাকে বলে গেল। আমি চুপ করে শুনে গেলাম, একটু পরে তিন জনে বাইরে বেরোলাম, লণ্ডনে—হলিডে যাবার আগে সেই শেষ দেখা।

ওমরের গল্প বোধ হয় এইখানেই শেষ হোত, আমি ভেবে দেখেছি ওর ব্যাপারটা, ওর ভালবাসা আত্মকেন্দ্রিক, এর আগে দেশে থাকতে ওর জীবনে শিপ্রা আর নন্দিতা যতটুকু আন্দোলন এনেছিল, তাও আমার অজানা নেই। সম্পূর্ণ বিদেহী আত্মকেন্দ্রিক প্রেম। ওমরের ভালবাসা অসম্ভব রকমের স্বার্থপর, তাই শিপ্রা আর নন্দিতা ওর কাছ থেকে অপবাদ ছাড়া আর কিছু পায়নি। আর পাঁচজনে জেনেছিল মুসলমানের ছেলে হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছ তা নিরামিষ কখনই নয়, আমি তখন শুনতাম ওমরের প্রেমের বাখানি। অশ্রুত-বাণীর-গুমরণ-ইন্দ্রনীল-বেদনা এই সব শব্দগুলো ও ব্যবহার করতো তখন আমার কাছে। ইন্দ্রনীল-বেদনা-টেদনা আমি মোটেই বুঝতাম না—বুঝতাম ছেলেটা অত্যধিক রোমাণ্টিক, ও নন্দিতার প্রেমে হয়তো পড়েওছিল। কিন্তু ওর প্রেম কত মহৎ, এই ভাব নিজের কাছে নিজেকে দেখাতে গিয়ে ও সেই প্রেমের অপমৃত্যু ঘটায়। এমন আত্ম-কেন্দ্রিক প্রেম সংসারে বিরল!

লুলু কদিন আগেই জুরিকে গিয়েছিল আকাশ পথে। ওর দেখার কিছু নেই পথে, আমার দেশ দেখার ইচ্ছে, তাই আমার প্রোগ্রাম ছিল প্যারিস হয়ে জেনিভায় যাওয়া, ওমর ও যাচ্ছিলো অষ্ট্রিয়ায়, তবে তারিখ আমার জানা ছিলো না। সুইটসারল্যাণ্ডে ওর সংগে থাকলে আমাদের দুজনের অন্ততঃ আর্থিক সুবিধে হোত, কিন্তু ওর সংগে পথে বেরোতে ভয় হয়, পথে দাঁড়ানও বিচিত্র নয়।

জেনিভায় লেকের ধারে একটা এক্সকারসন ট্রিপ দিয়ে ফেরার সময় হঠাৎ মনে হোল, একটা ভারতীয় ছেলেকে যেন দেখলাম। তীরে দাঁড়িয়ে সে অভিনিবেশ সহকারে খাঁচায় রাখা এক কুচকুচে দাঁড়কাককে কি যেন খাওয়াচ্ছে। একটু কাছে এসে শুনি ওমর বাংলায় দাঁড়কাকের সংগে কথা বলছে আর স্যাণ্ডউইচ ব্যাগ খুলে তাকে ফ্রাংকফুটার খাওয়াচ্ছে, আয় বাবা দীর্ঘ-চঞ্চু, ফ্রাংকফুটার খাবি আয়, দাঁড়কাকের পায়ে ঘুঙুর, সে পরম অনুমোদন সহকারে সর্ব-অংগ নাড়াচ্ছে।

তুই দাঁড়কাকের সংগে বাংলায় কথা বলছিল কেন ওমর ? ওকি বাংলা বোঝে ?—বললাম, Golly। দীপংকর তুই ? দীর্ঘ চঞ্চু তো Good Luck। তোর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। আর দীর্ঘ চঞ্চু তো ফ্রেঞ্চ ছাড়া কিছু বুঝবে না। তাই বাংলাই বললাম। থাক তোর দীর্ঘ চঞ্চু! চল ঐ বেঞ্চে বসি। তুই যে এখন চলে এলি ? তোর তো আরো পরে আসার কথা ?

ভাল লাগছিল না লণ্ডন দীপংকর। continent এ তো আসার

কথাই ছিল আগেই চলে এলাম। তুই কি করছিস? বৌঠান কি জুরিকেই?

হ্যাঁ জুরিকে লুলু—আমি আজ মস্কোতে যাচ্ছি। তারপর লুলুর সংগে একটু এদিক সেদিক বেড়াব, তোর প্রোগ্রাম।

ওমরের প্রোগ্রাম কিছু নেই তবে ওর ভিয়েনা অবধি টিকিট কাটা বার্ণে যাবে কয়েকদিন পরে, জুরিকে আবার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে জানাল। একটু পরেই আমি উঠলাম ট্রেনের সময় হ'য়ে এসেছিল।

সাত দিন পরে জুরিকে আমার শ্বশুর বাড়ীর দরজায় দেখি ওমর দাঁড়িয়ে। আয় ভেতরে উঠে বললাম। তুই যে চরকি ঘুরছিস।

ঠিক বলেছিস দীপংকর, চরকি ঘুরছি, তবে এবার আমার খান বসবে, ঘাটে নোঙর ফেলবে আর নোঙর ছিঁড়বে না।

এদেশে আর নোঙর ফেলে তোর কাজ নেই, এতো আ-ঘাটা, আমাকে দ্যাখ না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে আছি। তবে তুই আবার বিদেশে এসে নতুন কিছু করলি না কি বলে হাসতে লাগলাম। হাসিস না দীপংকর please বলে ওমর আবার ওর মাথার চুলে আঙুল চালাতে লাগলো, বুঝলাম ও ভাবছে বলবে কি বলবে না। বললাম মা ভৈ, একটা কথায় ওর চোখে হাসি ফুটে উঠলো, দীর্ঘ পক্ষ্ম আয়ত চোখের সেই সুন্দর আলো আর ঠোঁট চাপা একটু হাসি, এ হাসি দেখেছি ডে-নীসের ঠোঁটে, এ আলো দেখেছি তার চোখে। অদ্ভুত সামঞ্জস্য। কি ক'রে যে সম্ভব হ'য়েছে তা অবিশ্বাস্য, সাধারণ লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

দীপংকর, ঐ সরাবখানায় আসবি কি? সুইস-বীয়ারের তুলনা হয় না, দু ভাই এ একটু গলা ভেজাব। আর শোন, বৌঠানের সেই ইংলিশ-জার্মাণ ডিকসনারীটা যদি বাড়ীর থেকে নিয়ে আসিস, এনেছিস তো এদেশে ওটা?

এক এক জনের অদৃষ্ট এমন। শুনতে হবে। শ্রোতা আবার সব সময়ে পাওয়া যায় না—তার ওপর সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রোতা সুদুর্লভ, ওমরের পক্ষে সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রোতা পাওয়া কঠিন অথচ আত্মকেন্দ্রিক ওর মন শ্রোতা খোঁজে—দরদী শ্রোতা, আমাকে বোধ হয় ও দরদী মনে করে। তাই আসে আমার কাছে বারে বার। বাড়ীর ভেতর থেকে লুলুর ডিক্সনারী নিয়ে দুজন এলাম পাবে।

আবার জালে পড়েছিস বুঝি আমি বললাম, তোর জন্য কি পথে ঘাটে ফাঁদ পাতা আছে? না তুই ইচ্ছে করে জালে পড়িস?

দীপংকর, আমি কিছু বোলব না, তুই শুনে বিচার কর, হ্যাঁ আবার ফাঁদ। তবে এবারে জাল আমার, আর জালে পড়েছে মারিয়া।

সুইস-মেয়ে জুটিয়েছিস? বেশ করেছিস, হলিডে করতে এসে সকলেই করে, তুই আর নতুন কি করলি?

দীপংকর, সুইস বীয়ারের বৈশিষ্ট্য কি বলতো? ও আমাকে হঠাৎ বললে। বীয়ারে তখনও চুমুক দেওয়া হয়নি। কিন্তু ওর খাপছাড়া এই প্রশ্নে একটু আশ্চর্য হলাম। সুইস বীয়ার কেন? বললাম তোর মত তো আমি ড্রিংক করি না আমার পক্ষে বলা কঠিন।

খুব সোজা, ও বললে। ওতে ঝাঁজ নেই স্নিগ্ধতা আছে, এর তিক্ততা আর মাধুর্য দুটোই দুষ্প্রাপ্য (আমার হঠাৎ মনে পড়লো ইন্দ্রনীল-বেদনা ওর দুষ্প্রাপ্য শুনে) তুই সারা রাত খেয়ে যা—Hans বাক হবেনা। সুইস-মেয়েও এমনি।

না মাইরী, তুই ডুবোলি যথার্থ। লুলুও তো সুইস-মেয়ে, কিন্তু এসব সারা রাত—Hans বাক না হওয়া, আমি তো জানিনা, তোর ব্যাপার খুলেই বলনা, এই মারিয়া থাকে কোথায়—চালু মেয়ে নিশ্চয়ই যখন ইংরিজিতে আলাপ হোল।

চালু একেবারেই নয়, আলাপ হয়েছে বার্ণে আর ও একদম ইংরেজি জানেনা বলতে গেলে। আর আমার খান? থাক বেচারা!

আবার শুনতে হোল মারিয়ার গল্প। দেশে রাসবিহারী এ্যাভিনিউএ জলযোগের পয়োধি খেতে খেতে শুনেছি শিপ্রা-নন্দিতার গল্প, অশ্রুত গুঞ্জরণ, ইন্দ্রনীল-বেদনা, ট্রেফালগার স্কোয়ারের পাসে ব'সে শুনেছি, ডে-নীসের ভোরের-ভৈরবী, আজ আবার জুরিকের সেলুন-বারে বসে শুনতে হবে মারিয়ার গল্প। বেচারা দীপংকর। হঠাৎ আমার সেলিমার কথা মনে পড়লো, সে কি জানে? হায়রে ভারতীয় মেয়ে!

বার্ণে দেখা ওমরের মারিয়ার সংগে, প্রথম দেখায় আলাপ হয়নি—ও কি যেন এক মিউসিয়ামের দরজায় দাড়িয়েছিল। সেটা লাঞ্চ-আওয়ার বলে মিউসিয়াম বন্ধ ছিল। মারিয়াও ছিল সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। পরনে হালকা লিনেনের ফ্রক, চোখে কাল চশমা। ওমরের নজরে আসতো না যদি না দুজনেই থাকতো দাঁড়িয়ে। মারিয়া যে সুইস মেয়ে ওমর তা ভাবতেই পারেনি, ও ভেবেছিল হয় এ্যামেরিকার নয় ক্যানাডার। ওর অবশ্য ভাববার কোন যুক্তি ছিলোনা। মারিয়ার রূপ অবশ্য ওকে আকর্ষণ করে, ওমরের শুধু একবার ইচ্ছে হয় মারিয়া যদি একবার তার কালো চশমাটা খোলে। ওর'চোখ যদি আকাশ-নীল হয়, সাগর নীল। উপায় ছিলো না।

আবার দেখা হোল তারপরের দিনে পার্লামেণ্টের ধারের পার্কে। ওমর তখন ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। সাইজ খোঁজা হচ্ছিলো। হঠাৎ দেখা মারিয়ার সংগে—সে তখন পার্কের হাঁসগুলোকে কি খাওয়াচ্ছিল। আহা ওর চোখ দুটো যদি একবার দেখতে পাই ওমর ভাবে, তাই মরীয়া হয়ে সে আসে মারিয়ার কাছে, মারিয়াও যে ওকে বিশেষভাবে নজর করছিল তা ওর চোখ এড়ায়নি। Excuse me বলে ওমর কথা আরম্ভ করে—মেয়েটা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়। চোখের ভাষা দেখার উপায় ছিল না, কিন্তু মুখের ভাবে ওমর বোঝে যে সে ঠিক বোঝেনি। Do you speak English? ওমর বলে। NICHT জার্মাণে মেয়েটা উত্তর দেয়। Not a little? ওমর তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দেখায়। NICHT মেয়েটি আবার বলে। not a tiny little ওমরের তর্জনীর অংশ আরো ছোট হয়, 'লিতল' মারিয়া বলে। এই হোল ওদের আলাপের সুত্রপাত। ওমর ওর ছবি তোলে—তারপর ইংগিতে বলে তোমার একটা চশমা ছাড়া ছবি নিই। চশমা খোলে মারিয়া ওমর আকুল আগ্রহে তাকায় যদি এর চোখ নীল হয়—যদি নীল হয়। হায় আল্লা কুচকুচে কালো।

তবু ওরা দুজনে এক সংগে পথে পথে বেড়ায়, মারিয়ার হাতে Dictionary ইংরিজি জার্মাণ দুজনে'তা'খুলে কথা বলে, গল্প করে হাসে। পার্লামেণ্টের একটু দূরেই আর নদী—ভীমা। এর দুই তীরে অগণ্য গাছ গলাগলি করে উঠেছে, সেই সন্ধ্যায় ওমর মারিয়ার হাত ধরে বসে থাকে সেই নদীর তীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রাত

যখন প্রায় দশটা তখন ওদের খেয়াল হয় সময়ের, ওমরের কাঁধে মারিয়ার মাথা—হয়ত ও কেঁদেছে ওমরের মনে হয়। কিন্তু ও কারণ বোঝে না। অন্ধকার নেবে এসেছিল—ওদের ভিক্সনারী খুলে কথা বলার উপায় ছিলো না। মারিয়া ওকে বলে 'বীয়েরা-ক্যাসিনো'—অর্থাৎ Cassino-তে Bear খাবে চল। ওমর বলে চল। যখন ওরা আঁধার ছেড়ে আলোয় আসে তখন মারিয়া বলে 'ICH BEZAHLEN' অর্থাৎ আমি দাম দেব। ওমর রাজি হয় না, শেষ অবধি রফা হয়—Spin of coin. যে জিতবে, সে দাম দেবে, ওমরের হার হয়েছিল।

ক্যাসিনো তো ওমরের যাবার সাহস হোত না—হয়তো অনেক খরচ হবে এই ছিল ওর ধারণা, মারিয়া স্বচ্ছন্দে এর ভেতরে এলো। যেন কতবার সে এখানে এসেছে। ওমরের ধারণা হয়—মারিয়া নিশ্চয়ই অত্যন্ত ধনী। অর্কেষ্ট্রা বাজছিল—মারিয়া বললে এসো আমরা নাচি। ওমর নাচ জানে না—নাচা হয়নি।

খাবার এলো—তার দাম বোধ হয় অনেক। মারিয়া দাম দিলো, হঠাৎ ওমর দেখলো—মারিয়ার চোখে জল। উপায় নেই বোঝার। ভাষা জানে না। কি বলবে ওমর? কিছু ইংগিতে কিছু ভাষা জার্মাণ কিছু ইংরিজিতে ওমর বললে—মারিয়া তোমার ঠিকানা দাও কাল সকালে আমি জুরিক যাব, সেখান থেকে তোমার ছবিগুলো পাঠিয়ে দেব। মারিয়া ঠিকানা দেয়, ওমরের হঠাৎ খেয়াল হয় আর একদিন বার্ণে যাবার। সে মারিয়াকে আভাষে ইংগিতে বোঝাতে চায়, মারিয়া রাজি হয় না। আঙুল দিয়ে দেখায় দশ ফ্রাঙ্ক আর বলে হোটেল। অর্থাৎ একদিনে হোটেল খরচ দশ ফ্রাঙ্ক। ওমর অবাক হয়, যে মেয়ে ক্যাসিনোতে এত পয়সা খরচ করতে পারে সে দশ ফ্রাংক হোটেল খরচ চালাতে পারে না? শেষে রফা হয় ওরা দুপুর তিনটেয় ক্যাসিনোতে আবার দেখা করবে। তারপর রাত আটটার গাড়ীতে মারিয়া যাবে—অলটেনএ। ওই অবধি ওর গল্প বলে ওমর থামলো। বললো, দীপংকর, দুটো পাইট নিয়ে আয় তুই, আমি একটু জিরোই।

দুটো পাইট হাতে ফেরৎ এলাম, বললাম, যা বললি এতো মামুলী, তার পর দিন মেয়েটা কি কোরল? তুই কতদূর এগোলি? তার পর দিন মারিয়া আসেনি।

ওমর বললে, আসেনি। বিষম খেলাম, খাবারই কথা। আমি খেলাম এখন, ওমর খেয়েছিল সেদিন।

তার পরের দিন ক্যাসিনোর বাইরের বাগানে রামধনু-রঙা ছাতার তলায় বসে ওমর একটার পর একটা বীয়ার খেয়ে গেল, বেলা তিনটে থেকে চারটে অবধি, মারিয়ার চিহ্নও নেই। চারটে থেকে এগারোটা অবধি ওমর পথে পথে ঘোরে, মারিয়ার হোটেলও জানা নেই। মারিয়া তুমি কেন এলে না, কেন এলে না ও বারে বারে বলে। আমি শুধু তোমাকে বিদায় অভিনন্দন জানাতাম। শেষে সেই রাতেই ওর হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়ে জার্মাণ ভাষায় মারিয়ার ঠিকানায় চিঠি পাঠায়, যে সে আসছে অলটেনে, তার একদিন পরে, শুধু দেখা করার জন্য মারিয়ার সংগে—মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য।

অলটেনে আসে ওমর চিঠির কথা মত, অলটেন—নাম না জানা ছোট্ট সহর, সুইটসারল্যাণ্ডের কোনও টুরিষ্ট কোনদিন এর নাম জানতো না—ওমর তো নয়ই। অলটেন—অলটেন, সে বার বার আবৃত্তি করে, কেমন এই শহর, যে শহরে তার মারিয়া যাবে? মারিয়া কি? সে কী ধনীর দুলালী? বিবাহিতা? অবিবাহিতা? ওমরের কিছুই জানা নেই। কেন মারিয়া তাকে এড়িয়ে গেছে মধু যামিনীর স্মৃতি ফুরোতে না ফুরোতে? যার দাক্ষিণ্য তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল, কেন এত কার্পণ্য তার একদিন পরেই? তার মেলামেশার মধ্যে তো এমন কিছু হয়নি যে মারিয়া তাকে এড়িয়ে যাবে একদিন পরেই! চুম্বন! সে তো হাত ধরার চেয়ে কি এমন বেশী এদেশে? আর তার চুম্বন তো মারিয়া গ্রহণ করেছে—এতো উষ্ণতা সেই চুম্বনের স্বাদ। তা কি ভোলার।

ছোট ষ্টেশন অলটেন। সন্ধ্যে পাঁচটার সময় ওমর নামলো অলটেনে, 'বামেল' হয়ে তখন তার অষ্ট্রিয়া যাবার কথা। থাক অষ্ট্রিয়া কী হবে মাটি চিনে। মাটির চেয়ে মাটির মানুষই কি অনেক বড় নয়।

জনসমুদ্র নয়, ইতস্ততঃ কয়েকটা যাত্রী—তার মধ্যে ওমর খুঁজতে লাগলো প্রায় ভুলে যাওয়া সেই মুখকে, দেখলো দূরে মারিয়া দাঁড়িয়ে। সেই পোষাক পরা হালকা লিনেনের ফ্রক। চোখে চশমা নেই, দ্রুত পা চালিয়ে আমীর খান এলো, ভাঙা জার্মাণে বললে মারিয়া, দু লীভ, ক্যাসিনো মানে তুমি ক্যাসিনো না, মারিয়া হাসলো কিন্তু দু চোখে তার জল। দু হাত দিয়ে সে ভংগী করে দেখাল সে ঘুমিয়ে পড়েছিল বেলা তিনটের সময়। তার আগের রাতে অত্যধিক পান করার দরুণ Hans বাক এর ঘুম।

অলটেনে ওমর এসেছিল পাঁচ মিনিটের জন্য বিদায় নিতে। হোল না। ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই সামনের সরাইখানায় সে আস্তানা নিলো সেই রাতের মত, তার পর এলো মারিয়ার বাড়ী। চাষীর মেয়ে মারিয়া—ধনীর নয়। সংসারে সৎ বাপ, বুড়ো ঠাকুরদা আর ঠাকুরমা। মা মারা গেছে তিন মাস আগে। বার্ণে সে সৎ বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে গিয়েছিল। সামান্য কিছু পয়সা নিয়ে। ওমরের আন্তরিকতা আর আদর তার নিজের মার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল—তাই সে কেঁদেছে।

প্রথম দেখায় ভালবাসা বলে একটা শব্দ ওমর জানতো, ওর মনে হোল—মারিয়া ওকে ভালবেসেছে। অলটেনে যাবার তৃতীয় দিনে মারিয়া ওকে একথা বলেও। দ্বিতীয় দিনে ষ্টেশনের ব্যুফেতে বসে লাঞ্চ খাচ্ছিলো, সেদিনই ওমর চলে যাচ্ছিলো, ওমর হঠাৎ দেখলে মারিয়া কাঁদছে। টেবলের লিনেন দিয়ে ও চোখ মুছলো। খাঁ খাঁ করে উঠলো ওমরের বুক। কই কেউ তো কোনদিন তার জন্য চোখের জল ফেলেনি। শিপ্রা ভয় দেখিয়েছে—নন্দিতা অভিশাপ দিয়েছে, সেলিমা ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে চলে গেছে বিদায়-লগ্নে, সে কি উদ্গত-অশ্রু গোপন প্রচেষ্টা। ডে-নীস জানিয়েছে শুভেচ্ছা, কিন্তু চোখের জল? হোক না সে রাত্রি-কালো চোখের মুক্তা বিন্দু—নাই বা হোল অথৈ নীল দরিয়ার পানি—তবু সে তো কেউ দেয়নি ওকে অর্ঘ।

রয়েই গেল ওমর আরো দুদিন, দুদিন শুধু সে মারিয়াকে খুশী করে রাখলো শুধু মারিয়ার সুখ, মারিয়ার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিয়ে। ওমর তুমি আমার স্বর্গের দান—মারিয়া ওকে বলে। তুমি আমার—ওমর বলে, আর বলে, মারিয়া আমি London-এ তোমার কাজের ব্যবস্থা করবো, তুমি আসবে তো? আমাকে

মারিয়া ওকে জড়িয়ে ধরে, গল্প শেষ করে ওমর এবার আমার দিকে তাকাল।

তোর মারিয়া পর্ব তো শুনলাম, তো এখানে এলি যে, তোর তো অস্ট্রিয়া যাবার কথা এখন, আর গল্প শেষ হয়েছে তো!

শেষ কিরে—বললাম না নোঙর ফেলবো এবারেও বললে। অশ্রু মুক্তা মালা কুড়িয়ে পেলাম (ইয়া আল্লা, আবার বোধ হয় ও ইন্দ্রনীল বেদনা বলবে) আবার তাকি পথের ধুলোয় ফেলে দেওয়া সাজে।

তোর মতলব কি বলতো? ঘরে তোর বউ আছে এসব ফষ্টি-নষ্টি আর কতদিন করবি?

দীপংকর তিন পুরুষ আগে এক তুর্কী ছিল আমার পূর্বপুরুষ, তার কত বিবি ছিল জানিস? আমিও তো মুসলমানের বেটা।

কিন্তু তুই কি মারিয়াকে ভালবাসিস? আর ও কি তোকে ভালবাসে? এই প্রশ্নের জবাব দে আগে—রাখ তোর তুর্কী-নাচন।

আমি যদি মারিয়াকে ভাল না বাসবো তো ইনসব্রুকে রইলাম কেন? কেন ওর জন্য এত পয়সা খরচ করলাম, অস্ট্রিয়ার টিকিট নষ্ট করলাম। বলতে পারিস না ওর দেহের লোভে, নিছক চুমু খাওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি, আমার ইচ্ছেও কোরত না, ভাবতাম দেখুক এ দেশের মেয়ে পূব দেশের প্রেম কত গভীর। দেহসর্বস্ব পশ্চিমের প্রেম নয়।

থাক তুই তোর পূব দেশ নিয়ে। বললাম। এখন ওঠ। তোর plan কি এখন? এবারে তো London-ফিরতে হবে, তার আগে চল তোকে এখন লুলুর কাছে নিয়ে যাই। পাতা ঝরা শুরু হয়েছে, হলুদ রঙের পাতা, 'অটাম' এসেছে শরৎ নয়। কাশফুলের আলপনা নেই, এলোমেলো খুসীর মত হালকা মেঘ নেই আকাশে—পত্রঝরা। শুধু ঝরাপাতার গান শোন লণ্ডনে। আমার মন-মেজাজ ভাল নয়। লুলুর বাচ্চা হবে, বাচ্চা হবার সুবিধে এদেশে যত ঝামেলাও তত। এই সেদিন বিয়ে হল, দু বছরও নয়। এর মধ্যে ছেলের বাপ হবার সাধ মোটেই ছিল না। হয়ে গেল।

সুইটসারল্যাণ্ড থেকে হলিডে করে দু মাস লণ্ডনে আসা হয়ে গেছে, সামনের বছর অস্ট্রিয়ায় যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লুলু বাদ সাধলো। ছানা-পোনা নিয়ে তো আর হলিডে হয় না। ক দিন আগে ভাবছিলাম ওমরের কথা। ওর অস্ট্রিয়ার সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর জানা ছিল, কিন্তু এখন আর আমার প্রয়োজন নেই তাতে।

নওয়াজের সংগে আমার সম্প্রতি দুবার দেখা হয়েছে, কিন্তু আমরা কেউ ওমর প্রসংগে আলোচনা করিনি। নওয়াজ বোধ হয় লণ্ডনের আদব কায়দা একটু শিখেছিল। আমার তো মনে হোত ওমরের মারিয়া বোধ হয় এতদিনে লণ্ডনে এসে হাজির হয়েছে, ছেলেটি হয়ত একটা কিছু করে বসে আছে। তাও ভাল। ভে-নীস ঘাড় থেকে নামলেই হোল। আমি আর ফোন করে ওর খবরও নিইনি। আর ভালও লাগে না বুড়ো বয়সে বালখিল্য প্রেমগাথা শুনতে। তবু এক একবার মনে হোত কোথায় ওর ফাঁক, ও যদি তা জানতো কত ঘাটে ওর নৌকো ঘুরে মরবে? সেলিমাকেও চোখে দেখিনি. দেখলে বা জানলে হয়ত বুঝতাম, কেন ওমরের প্রেম পলাতকা? তার সাকী ভে-নীস নয়, মারিয়া নয়, শিপ্রা নন্দিতা সেলিমাও নয়। ওমরের প্রেম—ওমরের সাকী। এই সাকীর পিছে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজে

নিজের ছায়া ধরার প্রচেষ্টায়। কি করে তা ধরা যাবে? আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা প্রমাণ করার জন্যই বোধ হয় ওমরের আবার টেলিফোন এলো আমার বাড়ীতে।

দীপংকর, তোর বৌ এসেছে তো এখানে? টেলিফোনে ওর প্রথম প্রশ্ন শুনলাম। হঠাৎ লুলুর কেন খোঁজ করছে বুঝলাম না। দু'মাস লণ্ডনে এসেছি, এর মধ্যে ওমরের নিশ্চয় আমাকে দরকার ছিল না, তাই খোঁজ হয়নি, সে সম্বন্ধে কিছু বললাম না।

হ্যাঁ লুলু এসেছে, কিন্তু ওকে হঠাৎ তোর দরকার পড়লো কেন? তুই কিরলি কবে, একটা খোঁজও তো নিস না বিনা দরকারে। রাগ করিসনে দীপংকর, বড় তাড়া। কিন্তু একটুখানির জন্য কি আসতে পারি তোর কাছে? please না বলিস নি।

এর পরে না বলা চলে না। একটু পরেই ওমর এলো, বণ্ড ষ্ট্রীটের বাবুটি। কেতাদুরস্ত পোষাক। একেবারে নিখুঁত। এত সাজগোজ করে আমার বাড়ীতে তোকে কখনও আসতে দেখিনি। ব্যাপার কি। তার ওপর টেলিফোনে তুই আবার লুলুর খোঁজ করলি। এবার কি আমার বৌ-এর পালা? হাসতে হাসতে বললাম।

সাজগোজ? ডিনারে যাচ্ছি ডে-নীসের সংগে Lotus House-এ বৌঠানকে দরকার জরুরী একটা চিঠি লিখতে হবে জার্মাণে।

তোর ডে-নীস আবার কবে এলো? সে না ম্যাজরকায় গিয়েছিল ঐ বড়লোক ইটালীয়ানটার সংগে। কেন সেখানে বুঝি জুত হোলনা, তাই আবার তোর কাঁধে ভর দিয়েছে। আর চিঠি দিবি কাকে জার্মাণ ভাষায়?

মারিয়াকে। আমাকে ত বিরক্ত করে মারছে মেয়েটা লণ্ডনে আসা অবধি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি আসছে, আধা-জার্মাণ আধা-ইংরিজি। আমাকে ও কত ভালবাসে এই সব লেখা। আমি ভদ্রতা করে চিঠির উত্তর দিয়েছি ইংরিজিতে। কিন্তু এবারের চিঠি পেয়ে ঘাবড়ে গেছি। মারিয়া দু-তিন সপ্তাহ পরে লণ্ডনে আসবে। তাই ওকে জার্মাণে একটা চিঠি দেবার দরকার হয়েছে।

জার্মাণ ভাষায় কি লিখবি বলে দে, লুলু তর্জমা করে দেবে। ওমর চিঠির যা মর্মার্থ বললে তা এই—

প্রিয় মারিয়া—তোমার চিঠি পেয়েছি। অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছি সাংসারিক ব্যাপারের জন্য হঠাৎ আমি ভারতবর্ষ যাচ্ছি। ওমর তার চিঠির লাইনগুলো বলে গেল। আমার মনে পড়লো ডে-নীসের লেখা চিঠি ওমরকে। দুটো চিঠির সুর হুবহু এক। দীপংকর kindly মারিয়ার চিঠিটা আমার বাড়ীতে post করিস। আমি চলি বড় তাড়া। সাকী বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে।

তোর পাঁচ মিনিট সময় হবে কি ওমর, তোকে একটা কথা বলবো বললাম। ওমর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। তোর খেলা কবে শেষ হবে বলতে পারিস? জুরিকে নতুন গল্প বলে এলি মারিয়ার, হলিডে করতে গিয়ে যদি ফুর্তি করে আসতিস আমার কিছুই বলার ছিল না। তুই একটা মেয়েকে নাচিয়ে এলি অথচ নিজে ঘুরে মরছিস এই মরীচিকার পেছনে, ডে-নীসের পেছনে, তুই জানিস ও তোর নাগালের বাইরে, তুই জানিস তোর যা আয় তাতে ডে-নীসের সংগে তাল রেখে চলা চলে সপ্তাহে একদিন, বড় জোর দুদিন, তবু তুই ওর পিছে ঘুরে মরিস।

ওমরের মুখ ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল। এত রূঢ় কথা ওকে কোন দিন বলার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কেন জানি না আমার পক্ষে আর না বলে থাকাও চলছিল না। অবসন্ন বসন্তের মত ম্লানোজ্জ্বল ওমর বললে দীপংকর, তুই তো জানিস, সাকী আমার কী? আমি কি বুঝি না ও আমার নাগালের বাইরে? এই দেখ না আজ সন্ধ্যের জন্য নওয়াজের থেকে পাঁচ পাউণ্ড ধার করেছি।

তুই কেন ওকে ভালবাসিস আমি জানি। আমার বোধ হয় তোর তা জানা নেই। ওমর, তুই কি কখনো তোর আর ডে-নীসের মুখ দেখেছিস পাশাপাশি কোন আয়নায়? ওর চেহারার সংগে তোর চেহারার এত সাদৃশ্য যে, আমার প্রথম দিনে ভুল হয়েছিল ডে-নীস বুঝি তোর মার পেটের বোন। তুই ডে-নীসকে ভালবাসিস না ওমর, ডে-নীসের মধ্যে তোর নিজেকে ভালবাসিস।

ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওমরের মুখ, সে কোনও দিন ভাবতে পারেনি যে কথা, আজ যেন তা পরম সত্য হয়ে ফুটে উঠল তার সামনে। ডে-নীস—তার ডে-নীস তার সাকী নয়? সে নার্সিসাস। সে যাকে ভালবেসেছে সে তারই প্রতিবিম্ব। দিনের পর দিন ব্যথার বিষ জমেছে, ওর শরীর সেই বিষে নীল হয়ে গেছে, তবু সেই বিষ গ্রহণ করে ওর প্রেম অমর হয়ে গেছে, ব্যথার নীল সাগরে উৎফুল্ল কমল হয়ে আজ যেন প্রচণ্ড ঝড় হয়ে আমি তা ভেঙে দিলাম। টলতে টলতে ওমর বসে পড়ল ঘরের কোণে রাখা চেয়ারে। অসহ্য বেদনায় যেন ফুলে উঠল তার সারা দেহ। একটু পরেই ও তা সামলে নিল।

দীপংকর, জার্মাণ চিঠিটা তুই আমার ঠিকানায় post করিস। আমার আর একটা চিঠি লেখার আছে এখন যাই।

কোথায় যাচ্ছিস? Lotus House-এ? আমি প্রশ্ন করলাম।

দূর বোকা! সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও বললে। পদ্মের ডাঁটা ভেঙে গেছে, পাপড়ি গেছে ঝরে। ডে-নীস আজ আর Lotus House-এ যাবে না, যাবে সস্তার রেস্তোরাঁয়, আমাকে সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে, সেলিমাকে চিঠি লিখতে হবে, সাকী চলে এসো। তোমার ওমর দিন গুণছে।

বীরের এ রক্তস্রোত—মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
থামিবে না রক্তস্রোত বাজিবে না বীণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?

—রবীন্দ্রনাথ

হবিবুল্লার মেশিন

বিজ্ঞানভিক্ষু

Wherever [the Reader] finds that I have ventur'd at any small conjectures at the causes of things that I have observed, I beseech him to look upon them only as uncertain ghesses (=guesses), and not as unquestionable conclusions, or matters of unconfutable science.

—*Micrographia :* Robert Hooke

এক

গোপন আমন্ত্রণ

There was a young lady from kent,
Who said that she knew what it meant
When men took her to dine,
Gave her cocktails and wine;
She knew what it meant—but she went.

—*Anon.*

রাত্রি বুঝি শেষ হয়ে এল।

এক সেকেণ্ড সময় লেগে যায় আচম্কা তন্দ্রা-ভাংগা চোখে অজানা পরিবেশ চিনে নিতে। হাওয়াই জাহাজের 'জেট' এর মৃদু গর্জন কাণের পর্দা থেকে স্নায়ুমণ্ডলীর নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সাড়া তোলে আরও এক সেকেণ্ড পরে। বাইরে দেখা যায় পূর্বদিগন্তে ধূসর আলোর আভাষ। সতের হাজার ফুট নীচে বর্ণময় পৃথিবী সুপ্তির কালিমায় ঢাকা। দূরে দূরে আলোর ক্ষীণতম বিন্দু—সম্ভবতঃ উত্তর রেলওয়ের কোন ষ্টেশন হবে। আগ্রা, টুণ্ডলা না গাজিয়াবাদ?

সহযাত্রী সকলে এখনও ঘুমে অচেতন। 'পরশুরাম'—অধ্যাপক শিকদারকে দেখায় ঘুমন্ত শিশুর মতোই। পেছনে অমল বন্দ্যোর মুখ বিকৃত হয়ে গেছে—হয়তো বা দুঃস্বপ্নের ঘোরে। কিন্তু পাৎলুন এর 'ক্রীজ' এখনও অটুট!

শংকর মনে মনে হিসাব করে—রোজ কতটা সময় বয়ে যায় অমল বন্দ্যোর জামাকাপড়ের ভব্যতা রক্ষা করতে।

আসাম-প্রবাসী সিন্ধী ছেলেটির—নামটা ঠিক স্মরণে থাকে না শংকরের—আলিমচান্দানী (?) নাসিকা গর্জন করে চলেছে 'জেট' এর গর্জনের সংগে পাল্লা দিয়ে। অতৃপ্ত ঘুমের ক্লান্তি শংকরের সর্বদেহে—মেসের শয্যার সংগে বিচ্ছেদের ভারে শরীর-মন নত। নিজের শয্যার যে কতো মায়া—হোক না তা মেসের অর্ধমলিন শয্যা—বোঝা যায় কেবল তা থেকে বঞ্চিত হলেই।

শংকরের অভিযোগ—সরকারী উড়োজাহাজে হাল-ফ্যাশনের হেলান দেওয়া গদীর পরিবর্তে ঢালা ফরাসের ব্যবস্থা করা হয় না কেন?

পেছন থেকে আসে লম্বা কাশির শব্দ। মিনিট দুয়েকের মধ্যে তার বিরতি নেই। গোয়েন্দা ভদ্রলোক তাহলে অ্যাজমায় কষ্ট পান। পেটের দায়ে চাকরী—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। হঠাৎ সহানুভূতি জেগে ওঠে শংকরের মনে ভদ্রলোকের জন্য।

* * * *

কন্ট্রোল কেবিন-এর দরজা এবার খুলে যায়। সহকারী পাইলট এলেন কয়েকটি কাগজের পেয়ালা আর থার্মোফ্লাসক্ নিয়ে। থার্মোফ্লাসক্ থেকে চা ঢেলে শংকরের দিকে এগিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন, এই চা-টুকু খেয়ে চাংগা হয়ে নিন—পালাম এয়ারপোর্টে আমরা পৌঁছব আর বিশ মিনিটের মধ্যে।

ধন্যবাদ জানিয়ে শংকর জিজ্ঞাসা করে ভদ্রলোককে যে এটাও সরকারী ব্যবস্থা কি না।

মৃদু হেসে ভদ্রলোক বল্লেন, না। প্লেনে বেরোতে হলে সব সরঞ্জাম যোগাড় করে রাখতে হয়। কখনো বা চব্বিশ ঘণ্টাই কাটিয়ে দিতে হয় ডিউটিতে। আপনাদের মতো সম্মানিত অতিথি পেলে যৎসামান্য সেবার চেষ্টা করি।

* * * *

চা-এর উষ্ণতা শরীর অভ্যন্তরে সঞ্চারিত হয়ে আশা-আকাংখার দ্বন্দ্বটাকে আবার চাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে। এ রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদয় কখনো হয় নি শংকরের তেত্রিশ বছরের জীবনে। ল্যাবরেটরীর দৈনন্দিন কার্য্যক্রমটাই ছিল এতদিন একমাত্র, বাস্তব সমস্যা—

ঘড়িতে সময় জানাচ্ছে—চারটে বেজে বত্রিশ। দমদম থেকে পালাম আজ মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। অভাবনীয়। পনের বছর আগেও এতটা গতিবেগ ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে।

শুক্লপক্ষের চাঁদ অস্ত গেছে দমদম ছাড়াতেই। আশেপাশের অগণিত তারার জ্যোতি ম্লান হয়ে এল। মানুষের কৃতিত্ব কতো সামান্য! দূরের নীহারিকাপুঞ্জ মহাশূন্যের পথে ধাবমান প্রতি সেকেণ্ডে বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার মাইল করে। সাড়ে চারশো মাইল সে মহাযাত্রার তুলনায় কতটা অকিঞ্চিৎকর! শংকর হিসাব করে যায়। এক্সপ্রেস ট্রেন এর তুলনায় কূর্মের গতি? এই প্লেন এর তুলনায় একটা পিঁপড়ের গতি? না, তার চেয়ে অনেক-অনেক মন্থর—

সহযাত্রীরা সকলেই জেগে উঠেছেন। সহকারী পাইলট ও গোয়েন্দা ভদ্রলোকের কী নিয়ে আলোচনা চলেছে। অন্য সকলের ওপর দিয়ে শংকরের দৃষ্টি ঘুরে আসে। সকলেই নির্বাক—সকলের মুখেই একটা উদ্বেগের ছায়া। কী আশ্চর্য সাদৃশ্য বিভিন্ন মানুষের মনের গঠনে—অথচ কী পার্থক্য মানুষে-মানুষে! শংকর অবাক বিস্ময়ে ভাবে—

কন্ট্রোল ঘরে দরজার ওপরে জ্বলে উঠল লাল আলোর নিষেধাজ্ঞা—বেল্ট লাগাও সকলে—ধূমপান নিষেধ। সহকারী পাইলট অদৃশ্য হয়ে যান 'কন্ট্রোল' কেবিনের বন্ধ দরজার পেছনে।

কোমরবন্ধ আটকাতে গিয়ে শংকর ভাবে যদি এবার দুর্ঘটনা ঘটে। আইডলওয়াইল্ড (Idleuilde) বিমান ঘাঁটির দুর্ঘটনাটা আবার শংকরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ছোট 'জেট' প্লেন মাটি স্পর্শ করার সংগে সংগেই হোলো বিস্ফোরণ—আগুনের শিখা ছিটকে গেল প্রায় দুশো গজ। দুটি মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। হতভাগ্যেরা বোধ হয় টের পর্যন্ত পেল না। দৈনন্দিন দুঃখ ধান্দার হাত থেকে চমৎকার মুক্তি!

কানের পর্দায় লাগছে এবার অস্বস্তিকর চাপ। মাথাটাও যেন একটু ঘুরে উঠল শংকরের। চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্তের অস্বাচ্ছন্দ্য সামলাবার চেষ্টা করে সে···

* * * *

পালাম বিমানঘাটি।

আকাশের দানব সামান্য মোড় খেয়ে শান্তশিষ্ট গৃহপালিত জন্তুর মতো এসে দাঁড়িয়েছে উত্তর কোণ ঘেঁসে এবার নামবার পালা।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক ঘোষণা করছেন।

'রানওয়ে'র ওপর গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে আপনাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবার জন্য। প্রথমে আপনাদের নিয়ে যাওয়া হবে আপনাদের জন্য নির্দিষ্ট 'ব্যারাক'এ। সেখান থেকে প্রাতঃরাশের পর গাড়ী আপনাদের পৌঁছে দেবে 'কনফারেন্স'এ। সময় আপনাদের হাতে বেশী থাকবে না। তাই অনুরোধ যে কোনো কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত দেরী হতে দেবেন না। মালপত্রের জন্য আপনারা ব্যস্ত হবেন না—সে ভার আমাদের।

আর একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে। কনফারেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে কারো কাছে কোন প্রশ্ন করবেন না। করলেও প্রশ্নের উত্তর পাবার আশা করবেন না। আমাদের কাজ কেবল আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আপনাদের যাতে কোন অসুবিধা ভোগ না করতে হয়, আমরা সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। সুপ্রভাত।

প্রত্যুষের আবছায়ায় 'রানওয়ে'র ওপরে বিরাট কালো 'সীডান'টা ভূতে-পাওয়া বলে মনে হয়। অন্য যাত্রীদের অনুসরণে শংকর সবশেষে গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। অক্টোবরের রাত্রি শেষের মৃদু বাতাসে আগামী শীতের আমেজ। রাজধানী ঘুমন্ত। কখনো বা দু একটা 'বাস-লরী'র দেখা মেলে পথে—নির্জন সহরতলী শব্দে সচকিত করে তারা লাল চোখ দেখিয়ে ঘন আঁধারের মধ্যে যায় মিলিয়ে।

শংকর মগ্ন হয়ে যায় গতদিনের অভিজ্ঞতার হিসাব মেলাতে···

* * *

সে যেন কতো যুগের কথা। অথচ মাত্র বিশ ঘণ্টা আগে নিত্যকারের অভ্যাসের বশে পরম নিশ্চিন্ত মনে সে ল্যাবরেটরীর দীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করছিল। দূর থেকেই কখন ভেসে এল তার ঘরের টেলিফোনের অশান্ত আহ্বান। বন্ধ ঘরের তালা খুলে শংকর ফোন তুলে ধরে। এত সকালে তাকে প্রয়োজন কার?

হ্যালো, ডাঃ রায়ের সংগে একটু কথা বলতে পারি কি?

তীক্ষ্ণ জোরালো কণ্ঠস্বর। শংকরের কানের পর্দা যেন ফেটে যায়।

হ্যালো, আমি রায় কথা বলছি।

ডাঃ শংকরপ্রসাদ রায়?

আজ্ঞে হাঁ। আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

আমি ডিরেক্টর, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিস থেকে বলছি। দয়া করে একটু ফোনটা ধরে থাকুন। ডি-আই-বি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ডি-আই-বি? ডিরেক্টর, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো? তার আবার কী প্রয়োজন শংকরের সংগে। শংকরের মনে জেগে ওঠে শংকামিশ্রিত বিস্ময়।

সুপ্রভাত ডাঃ রায়।

মোলায়েম মার্জিত কণ্ঠস্বর। শংকর সাড়া দেয়।

ডাঃ রায়, আপনার সংগে গোপনে একটু আলোচনা করতে চাই। আপনার ঘরে আর কেউ আছেন?

বিস্ময়ের ওপরে বিস্ময়। গোপন আলোচনা। কেন?

শংকর ঘরের চার দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নেয়। তালুকদারের আজ আসতে দেরী হবে। আর দেবতোষ বা মীনাক্ষি দশটার আগে সাধারণতঃ আসে না ল্যাবরেটরীতে।

না, আর কেউ এখানে নেই।

তা হলে দরজাটা একটু বন্ধ করে দেবেন কয়েক মিনিটের জন্য।

শংকর দরজা বন্ধ করে আবার ফোন ধরে—

এবার বলুন।

ডাঃ রায় আপনার সংগে আমার আলোচ্য বিষয় টেলিফোনে বলা চলে না। দয়া করে একবার আমার অফিসে আসবেন কী?

এক্ষুণি?

আজ্ঞে হাঁ। বিষয়টা খুবই জরুরী।

শংকর একটু বিরক্ত হয়। আজ কাজের তাড়া অনেক। চ্যাটার্জীর ঘর থেকে বড় ম্যাগনেটটা ধার করে আনা হয়েছে দু দিনের

কড়ারে তাড়াতাড়ি কাজ সুরু না করলেই নয়। দেবতোষ আর মীনাক্ষি নূতন সার্কিটটা গড়ে তুলেছে কাল অতিরিক্ত সময়ের পরিশ্রমে। সেটার পরীক্ষার সময় শংকরের থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু ডি-আই-বি! গোয়েন্দা পুলিশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা!

অনর্থক পুলিশকে চটিয়ে বা লাভ কী? এ ছাড়া কৌতূহলও জেগে ওঠে একটু।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তার পরে শংকর বলে, আচ্ছা। তবে আজ আমার অনেক কাজ আছে, একটু তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিতে হবে কিন্তু।

ডি-আই-বি বলেন, অনেক ধন্যবাদ। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—পনেরো মিনিটের বেশী আপনার মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করব না। আর একটা কথা, আমাদের এখান থেকে আপনার জন্ম গাড়ি পাঠিয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না। আপনার ল্যাবরেটরী সামনে—নম্বরের একটা ছোটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তাকে হুকুম দেওয়া আছে আপনাকে আমার অফিসে পৌঁছে দেবার জন্ত।

* * * *

নিজের নামের যে এত মহিমা চোখে না দেখলে শংকরের বিশ্বাস হত না। গেটে নিজের পরিচয় দেবা মাত্র একজন সাধারণ পোষাক পরিহিত পুলিশ কর্মচারী—ইউনিফর্মধারী সেপাই শান্ত্রী—উচ্চ নিম্ন বিভিন্ন পদস্থ কর্মচারীদের ব্যূহ ভেদ করে শংকরকে সোজা বড় সাহেবের খাস কামরায় পৌঁছিয়ে দেয়।

শংকর ঘরে প্রবেশ করবামাত্রই ডি-আই-বি চেয়ার ছেড়ে শশব্যস্তে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বিস্ময়ে শংকরের বাকস্ফূর্তি হয় না। কী ব্যাপার? এমন ত হবার কথা নয়! একজন নগণ্য বিজ্ঞান-সাধকের এত সম্মান!

করমর্দন করে ডি-আই-বি বলেন, ডাঃ রায়, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম, এজন্ত মার্জনা করবেন। কিন্তু এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় ছিল না সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে আপনার সংগে আলাপ করার।

শংকরের মনে নানা রকমের সন্দেহ-দুশ্চিন্তার মেঘ। সহজ হবার চেষ্টা করে সে। সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করে কী ব্যাপার?

ডি-আই-বি বলেন, বলছি। কিন্তু তার আগে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আপনাকে। আজ আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হবে ঘুণাক্ষরেও সে কথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। শংকরের বিধা বেড়েই চলে। এ কী ফাঁদ পেতে রাখলেন ভদ্রলোক?

ডি-আই-বি শংকরের মনের অবস্থা কিছুটা বোধ হয় আন্দাজ করে ফেলেন, হেসে অভয় দেন—ভুল বুঝবেন না ডাঃ রায়, কোনো সাধারণ রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে আজকের আলোচনা নয়। যদি ভেবে থাকেন যে সাত বছর আগে ছাত্রনেতা হিসাবে আপনার বিগতযুগের আইনবিরোধী কোন কাজের জবাবদিহি করবার জন্ত আপনাকে ডাকা হয়েছে অথবা আপনার শ্রমিকনেতা বন্ধুদের সম্পর্কে কোনো তথ্য আলোচনা করবার জন্ত এই আমন্ত্রণ—তাহলে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। সরকার সে সব নিয়ে এখন মাথা ঘামান না।

শংকর সতর্কভাবে উত্তর দেয়, কিন্তু আলোচ্য বিষয়টা না জেনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায় কেমন করে বলুন?

ভদ্রলোক খোলা জানালাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন, তারপরে বলেন, যদি বলি আপনার প্রতিশ্রুতির ওপরে ভারতের নিরাপত্তা নির্ভর করছে?

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! ভারতের নিরাপত্তা? তার সংগে শংকর রায়ের প্রতিশ্রুতির কি সম্পর্ক?

শংকরের বিমূঢ় ভাবটা বেশ প্রকট হয়েই ফুটে ওঠে। ডি-আই-বি কিছুক্ষণ পরে আবার বলেন, জাতীয় সরকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে গোপনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনার নাম আছে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। আমার ওপরে ভার পড়েছে সে আমন্ত্রণলিপি আপনাকে পৌঁছিয়ে দেবার। কিন্তু তার আগে আপনার প্রতিশ্রুতি আমার প্রয়োজন যে এই আলোচনা বা নিমন্ত্রণলিপি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কারো সংগে আলোচনা করবেন না। এমন কি নিকটতম আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সংগেও নয়।

শংকরের সন্দেহ কিন্তু যায় না—দয়া করে একটু আভাষ দেবেন কী জন্ত এই আকস্মিক গোপন আমন্ত্রণ?

ডি-আই-বি বলেন, আমি দুঃখিত কিন্তু এর বেশী কোনো খবরই আমি জানি না। এটুকুর ওপরেই আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শংকর সিদ্ধান্ত নেয়, আচ্ছা প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ডি-আই-বি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে ভারত সরকারের কেবল একটা গোপন প্রজেক্ট-এ আপনাদের সাহায্য চাই। এ প্রজেক্টের একটা সাংকেতিক নাম আছে—'প্রজেক্ট-এ'। আমার ধারণা, সমগ্র ভারতে উপরওয়ালা দু-একজন ছাড়া এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য বা স্বরূপ সম্বন্ধে কেউই জানেন না।

শংকরের মনে আবার সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে। ভারত সরকারের গোপন প্রজেক্ট? 'প্রজেক্ট-এ'?

এর অর্থ কী? অ্যাটম নয় ত? না, তা কী করে হবে?

হতেও পারে, কিছুই বলা যায় না। তবে কি ভারত সরকারও—শংকর মন স্থির করে ফেলে।

দেখুন, একটা কথা আপনাকে এখন থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি। যদি যুদ্ধ বা মারণাস্ত্র এ প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হয় তবে আমি তাতে যোগদান করতে অক্ষম। আমার এ অক্ষমতার জন্য যদি শাস্তিভোগ করতে হয়, আমি তাও মাথা পেতে নেব।

ডি-আই-বি শশব্যস্তে বলেন, নাঃ, ডাঃ রায়, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমাদের এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে 'প্রজেক্ট-এ'র সংগে মারণাস্ত্রের কোনো সংযোগ নেই। আপনি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

শংকরের সংশয় কিন্তু দূর হয় না। জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, দেশে এত বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক থাকতে আমার মত নগণ্য বিজ্ঞান-সাধককে আপনাদের প্রয়োজন কেন?

ডি-আই-বি হেসে বলেন, দেখুন প্রয়োজনটা আমার নয়—সেটা উপরওয়ালাদের। আমরা জানাদ্ধ পুলিশ—বিজ্ঞানের রাজ্যে কে

বড়ো, কে ছোটো কী করে জানব? দিল্লী থেকে প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী একটা তালিকা আমার কাছে পাঠিয়েছেন—আপনার নাম আছে তাতে সর্বাগ্রে। আমি পত্রবাহক মাত্র।

শংকর একটু আশ্বস্ত হয়। যাক, অন্ততঃ কৃষ্ণস্বামী আছেন এর মধ্যে। সদাহাস্যময় কৃষ্ণস্বামীর মূর্তিটা শংকরের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গত বারের পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা সমিতিতে শংকরের তিনটে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে একমাত্র কৃষ্ণস্বামীরই চেষ্টায়।

ডি-আই-বি ততক্ষণে টেবলের টানা ড্রয়ারের মধ্য থেকে একখানা সীলমোহর করা খাম বের করে শংকরের হাতে তুলে দেন।

সীলমোহর ভেঙে খামটা খুলতেই আর একটা সীলমোহর করা খাম বেরিয়ে পড়ে। তার ভেতরে সরকারী কাগজে একটা ছোটো চিঠি।

চিঠিটা খোলার সময় শংকরের হাত ঈষৎ কেঁপে ওঠে।

চিঠির মর্মার্থ এই—

ভারত সরকারের কোনো জরুরী কাজে কিছুদিনের জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ ও সাহায্যের প্রয়োজন। শংকরকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে যদি সম্ভব হয় তবে ১৭ই অক্টোবর বেলা ৮টা ৩০ মিনিটে নয়া দিল্লীতে এক গোপন বৈঠকে যোগদান করতে। পত্রটা পাঠান হচ্ছে স্বরাষ্ট্র বিভাগের মারফৎ—কারণ এ বৈঠক সম্বন্ধে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন। পত্রবাহকের কাছে সম্মতি জ্ঞাপন করলে তিনিই সময়মত নয়া দিল্লীতে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

সরকার বিশ্বাস করেন যে শংকরের মত বৈজ্ঞানিক এ ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন এবং বৈঠকের কথাটা গোপনে রাখবেন।

পরিশেষে নির্দেশ দেওয়া আছে, পত্রপাঠ চিঠিখানাকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য।

শংকর চিঠিটা পড়ে নেয় আর একবার—সন্দেহের কোনো কারণ নেই—কৃষ্ণস্বামীর স্বাক্ষরও রয়েছে।

ডি-আই-বির টেবলের ওপরে ডেস্ক ক্যালেণ্ডারে শংকর তারিখটা দেখে নেয়। কী সর্বনাশ! আজ ১৬ই অক্টোবর। ১৭ই যে তাহলে কালই!

শংকর উত্তেজিত ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। কী করা যায় এখন? মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করতে থাকে। এত কম সময়ের মধ্যে মনস্থির করা ত সম্ভব নয়? কিছুক্ষণ বাদে প্রশ্ন করে—প্রশ্নের উত্তর কি আজ বিকালে দিলে চলবে? মনস্থির করতে তো কিছু সময় লাগে। এ ছাড়া অনেক জরুরী কাজও রয়ে গেছে। দিল্লী যেতে হলে সেগুলোর একটা বন্দোবস্ত করার দরকার।

ডি-আই-বি বলেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ডাঃ রায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি নিরুপায়। আজ বিকালের প্লেনে আপনাদের উত্তর নিয়ে আমাকে দিল্লী যেতে হবে।

শংকর তবুও জিজ্ঞাসা করে, কতটা সময় আমাকে দিতে পারবেন দয়া করে বলুন। শংকর ততক্ষণে দেশলাই জেলে আমন্ত্রণ লিপির সৎকার সুরু করে।

ডি-আই-বি বলেন, আজ বেলা বারটা পর্যন্ত সময় আপনাকে দিতে পারি। বেলা বারটার মধ্যে এই নম্বরে আমাকে ফোন করবেন।

একটা স্লিপের ওপরে ভদ্রলোক একটা ফোন-নম্বর লিখে শংকরের হাতে দেন

কানেকশন পাবার পর কেবলমাত্র বলবেন 'প্রজেক্ট'-এ তাহলেই অপারেটর সরাসরি আমার সংগে সংযোগ করে দেবে। আপনার সম্মতি পাবার পর আপনার দিল্লী যাবার সমস্ত ব্যবস্থার কথা আপনাকে জানিয়ে দেব। আমার একান্ত আশা যে জাতীয় সরকারকে আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আচ্ছা সুপ্রভাত!

* * * *

ল্যাবরেটরীতে ফিরে এল শংকর দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে। এখন কী করা উচিত? তাই তো? সহকর্মীরা সকলেই উপস্থিত হয়ে গেছে। তালুকদার একমনে রিপোর্টের খসড়া লিখে চলেছে আর পাশের ঘরে দেবতোষ আর মীনাক্ষি একটা রীলে-র সংযোগ করতে ব্যস্ত। শংকর নিজের চেয়ারে বসে পড়ে। নাঃ, একদিনের মধ্যে সব কাজ শেষ করা অসম্ভব। কিন্তু, ব্যাপারটা কী?

শংকর কৌতূহলকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করে। টেবলের ওপরে সকালের ডাকের চিঠিগুলোর ওপর মনোনিবেশ করে। একখানা নীল খাম। ওপরে পরিচিত হস্তাক্ষর। সুমিত্রা!

আগ্রহের আতিশয্যে খামটা খুলতে গিয়ে চিঠির একটা অংশ ছিঁড়েই যায়।

সুমিত্রা এখন দিল্লীতে আছে। শংকর যদি কোনো কাজে, অথবা পথ ভুলেই যদি ওদিকে যায় তবে যেন মনে করে একবার সুমিত্রার সংগে দেখা করে

কোনো প্রিয় সম্বোধন নেই—উচ্ছ্বাস নেই। নিতান্ত মামুলি, বৈষয়িক চিঠি। সুমিত্রা—

তন্বী, লঘুচ্ছন্দা সুমিত্রা। বুদ্ধির দীপ্তি তার মুখে, সর্বাংগ জড়িয়ে। সাড়ে তিন বছর আগের সেই সুমিত্রা!

মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে ফেলে শংকর। একবার ঘুরে দেখেই আসা যাক না ব্যাপারটা কী! ঘরের ফোন তুলে সংযোগ করে সে।

ওধার থেকে সাড়া পেতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। যেন কয়েক বছর বলে মনে হয়। এখনও সময় আছে শংকর—এখনও সংযোগ কেটে দেওয়া চলে। ভেবে দেখ আর একবার—এখনও—

ওপার থেকে সাড়া এসে গেছে।

শংকর একবার গলাটা পরিষ্কার করে নেয়, হ্যালো 'প্রজেক্ট'-এ

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে কখন যে দু'চোখের পাতা নিমীলিত হয়ে গেছে, শংকরের খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙলো অমল বন্দ্যোর ধাক্কায়, এই রায়, ওঠো ওঠো—এসে গেছি আমরা।

চোখ মেলে শংকর দেখে—ভোরের আলো ফুটে বেরিয়েছে। গাড়ীটা থেমেছে একটা লম্বা মিলিটারী ব্যারাকের সামনে। উর্দীপরা সৈন্য আর চাপরাশির দল পেছনে একটা মিলিটারী ট্রাক থেকে ওদের মালপত্র নামিয়ে নিচ্ছে। গেট থেকে দেখা যায় প্রকাণ্ড একটা হলঘর। তার দুপাশে লম্বা বারান্দা রাস্তার সমান্তরাল ভাবে সারি সারি দরজা জানালার পাশ দিয়ে চলে গেছে।

অভিযাত্রীর দল হলঘরে প্রবেশ করে।

এক বিশালকায় শিখ সামরিক অফিসার ওদের অভিনন্দন ও প্রাতঃসম্ভাষণ জানালেন। বললেন—

দিল্লীতে থাকাকালীন আপনাদের এটাই হবে হেড কোয়ার্টার্স ও বাসস্থান। আমার ওপরে ভার দেওয়া হয়েছে আপনাদের তত্ত্বাবধান করবার। কোনো অভিযোগ বা অসুবিধার কথা আমাদের জানাতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না।

এখানে থাকবার সময়ে কতকগুলি নিয়ম আপনাদের পালন করে চলতে অনুরোধ করছি। যদি এ সব নিয়ম রাখার কাজে আপনাদের সহযোগিতা পাই, তবে আপনাদের সহযোগিতা আমরাও সর্বতোভাবে করব।

এই নিয়মগুলির মধ্যে সবচেয়ে দরকারী নিয়ম হচ্ছে এই যে, এ ব্যারাক থেকে কখনও বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে আমাদের জানিয়ে দিতে ভুলে যাবেন না।

এই হলঘরেই আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের প্রাতরাশের আয়োজন করা হয়েছে। সুপ্রভাত!

ততক্ষণে আর একজন সহকারী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিতরণ করে চলেছেন কতকগুলো সাইক্লোষ্টাইল, করা ইস্তাহার। শংকর চোখ বুলিয়ে নেয় কাগজগুলোর ওপরে। বাসস্থান-ডাইনিংরুম সম্পর্কিত নিয়মাবলী, 'সিকিউরিটি' সম্বন্ধে কতকগুলি মামুলি উপদেশ, দিল্লীর বিভিন্ন জায়গায় গমনাগমনের জন্য মিলিটারী-ট্রাকএর ব্যবস্থা, কতকগুলো গেটপাশ ও প্রবেশপত্র, নানা রকমের ফর্ম ইত্যাদি।

শংকরের অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে ওঠে এই বিধি-নিষেধের সংখ্যা দেখে। এমনভাবে তাদের নজরবন্দী করে রাখার সার্থকতা কী?

স্বাধীনতা লাভ হয়েছে ভারতবাসীর কতো বছর আগে! এখনও কেন মনে হয় না পুলিশ ও সৈন্যদের আপনার লোক বলে? এখনও যেন তারা হুকুম তামিল করে চলেছে কোনো বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের। ভারতবাসীর নিরাপত্তা রক্ষা যাদের একমাত্র কর্তব্য, দেশের মানুষের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে তারা এতো উদাসীন রয়ে গেল কেন?

নিজের নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করে কিন্তু শংকর খুশী না হয়ে পারে না। প্রকাণ্ড একখানা ঘর—একটা 'পার্টিশন' দিয়ে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক পাশে রয়েছে একটা বড় 'সেক্রেটারিয়েট টেবল্, বই-এর আলমারী, চারখানা বেতের চেয়ার। আর এক পাশে দুখানা আরাম কেদারার পুরু 'স্পীং'এর গদীর আচ্ছাদন, মাঝে একটা নীচু টিপয়। পার্টিশনের পেছনে প্রশস্ত শয্যা, ড্রেসিং টেবল্ ও ওয়ার্ডরোব। ঘরের পেছনে সংযুক্ত হালফ্যাশনের বাথরুম-বাথটাব শাওয়ার 'ওয়াশ-বেসিন', গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। মেসের ব্যবস্থার তুলনায় রাজকীয় বললেও চলে।

বাসস্থানের এ-হেন পরিপাটি ব্যবস্থা আর প্রাতরাশে ভোজ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য অতিথিদের আড়ষ্ট ভাবটা শিথিল করে দেয়। একমাত্র প্রফেসর শিকদারেরই কেবল মনের কাঠিন্য বজায় থেকে যায়। প্রাতরাশে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেও অভিযোগের শেষ নেই। জাতীয় সরকার, জাতীয় কংগ্রেস, পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস, শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দপ্তর, জাতীয় পুলিশ-সৈন্যদের সংকার কার্য সমাধা করে, ভদ্রলোকের বক্তব্য আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় আলোচ্য বা সমালোচ্য বিষয়ে। বিষয়টা আর কিছুই নয়—একজন সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দ্বী বৈজ্ঞানিকের মুণ্ডপাত। পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ভণ্ডামি, ছাত্রদের নষ্টামি, আধুনিক যুব সমাজের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে মোক্ষম মন্তব্য করে শিকদার আবার নীরব হয়ে যান।

ততক্ষণে 'কনফারেন্স'এর জন্য তৈরী হবার তাগাদা এসে গেছে।

শিকদারের বাক্যস্রোত কতকটা আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের মতো। দিনের পর দিন শোনা যায় না ভদ্রলোকের কাছ থেকে হাঁ কি না ইত্যাদি অতি অপরিহার্য কথা ছাড়া আর কোনো শব্দ। কিন্তু কোনও একটা ব্যাপারে উত্তেজিত হলে আর রক্ষা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে অগ্ন্যুদগার! শংকরের মতো অকালপক্ব বিজ্ঞানসাধকদের সম্বন্ধে ভদ্রলোকের মতামত সর্বজনবিদিত, অল্পবয়সী ছেলের দল সেজন্য যথাসম্ভব তাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে।

জীবনযুদ্ধে প্রফেসর শিকদার জয়লাভ করতে পারেননি। অথচ তাঁর প্রতিভার কথা নূতন করে আপনাদের কিছু বলতে হবে না। ছাত্রজীবনে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের কথা কে না জানে? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কৃতিত্বের রেকর্ড কেউ ভাঙতে সক্ষম হননি গত চল্লিশ বছর ধরে। শুধু দেশে কেন, ইংল্যাণ্ড অথবা জার্মাণী—যেখানে ভদ্রলোক পদার্পণ করেছিলেন স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষার জন্য, সেখানেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর যশের সৌরভ। কিংবদন্তী আছে, জার্মাণী থেকে শিকদারের বিদায় নেবার প্রাক্কালে মহামানব আইনষ্টাইন নাকি বলেছিলেন—ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানকে এবার থেকে সমীহ করে চলতে হবে জগতের বৈজ্ঞানিকদের। রাদারফোর্ড নাকি বলেছিলেন যে শিকদারের মত বোধশক্তি একটা 'জেনারেশন'এ দু-একবারের বেশী দেখা যায় না।

সে যুগে এতো বৃত্তির ছড়াছড়ি ছিল না। বিজ্ঞান সাধনার উপকরণেরও না ছিল এতো প্রাচুর্য—দেশের দু-একটি গবেষণাগার ছাড়া। অতএব শেষ পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে পদার্থবিজ্ঞানের উদীয়মান জ্যোতিষ্ক জীবনের পরম লগ্ন খোয়ালেন এক আধাসরকারী কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের কাজে নেহাত পেটের দায়েই। নিখিল ভারত 'এডুকেশন সার্ভিস'এ শিকদারের স্থান নিঃসন্দেহেই হয়ে যেত, যদি না থাকত তাঁর নাম পুলিশের খাতায় রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের একটা চেয়ারও তাঁর পাবার কথা। কিন্তু সেটাও হঠাৎ ফস্‌কে গেল সিনেট সিণ্ডিকেটের দলাদলিতে।

এই বছরগুলো কাটলো শিকদারের নানা রকমের পারিবারিক ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে। তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয় বহুদিনের দুরারোগ্য ব্যাধিতে তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়ে। অগ্রজ ছিলেন এলাহাবাদের খ্যাতনামা অধ্যাপক। হঠাৎ তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে গেলেন। সমগ্র পরিবারের ভার পড়ল ছোট ভাইয়ের ওপরেই। বিবাহের দু বছরের মধ্যে তাঁর এক মেয়ে ঘরে ফিরে এল মাথার সিঁদুর আর হাতের লোহা খুইয়ে। একমাত্র ছেলেরও দীর্ঘদিনের জন্ত কারাবাসের হুকুম হয়ে গেল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলাতে। মাঝে রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্ত তাঁকে দুবার নোটিশ দেওয়া হল; আর একবার কিছুদিনের মতো 'সাসপেণ্ড' করা হল অবাধ্যতার অপরাধে।

উমাকান্ত শিকদারকে চিরবিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে তুললেন দাক্ষিণাত্যের এক নামজাদা ইন্‌ষ্টিটিউট-এর কর্তৃপক্ষ কিন্তু তখন আবিষ্কারের লগ্ন গেছে বয়ে—দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষক-মণ্ডলী, কর্তৃপক্ষ এমন কি জনসমাজের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ কঠিন হয়ে দানা বেঁধে গেছে। কারণে অকারণে ছাত্রদের গালমন্দ দিয়েই তাঁর দিন কাটে। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্রে দেখা যায় শিকদারের প্রতিভার স্ফুলিংগ। এই ভস্মাচ্ছাদিত অনলের কিছু প্রকাশ দেখা যায় কেবল তরুণ বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠীর নূতন 'থিওরি'গুলোর নির্মম ভাবে বিনাশ করতে। বৈজ্ঞানিক মহলে তাই উমাকান্ত শিকদারের নাম "পরশুরাম।" একুশবার তিনি নবজাত 'থিওরি'গুলোর বিনাশ করবেন। তবেই হয়তো হবে এ দাবানলের শান্তি।

[ক্রমশঃ।

ল্যাম্পপোষ্ট

দিলীপ নাথ

অন্ধকারের কালো সমুদ্র গাঢ় কালি ঢালা,
ঘূর্ণীঝড়ের ধাক্কায় তার পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার
হৃৎপিণ্ডটা তবুও তার ধুক্‌ধুক্‌ করে।
ল্যাম্প্‌পোষ্ট জ্বলে।
গহন আঁধার বুকে জড়িয়ে প্রহর জাগা প্রহরীর মতো
ভয় আর ষড়যন্ত্রের রণাঙ্গনে
এক ফোঁটা আলোকশিশু আধো আধো পিটপিট চোখে
ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
রক্তলোলুপ শকুনির দল ওৎ পেতে থাকে চার পাশে,
কণ্টক-আকীর্ণ পথ হানিবার তৃষ্ণায় ছটফট করে,
সরীসৃপ অন্ধকারের বিষাক্ত কালো জিহ্বাগ্রে ঝরে
আদিম গরল যন্ত্রণায় গলিত সমুদ্র
ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
এ পৃথিবীর গভীর রাত্রের অচেনায় অজানায়
সারাক্ষণ অমনি একটা ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
জানেনাকো কেউ তার ইতিহাস,
তার কাহিনীর বোবা সংগ্রাম,
তার ধূসর চোখের তারায় ঝলসে যাওয়া দুঃস্বপ্ন
হতাশার হৃদে একটা ফুল—ল্যাম্পপোষ্ট
ল্যাম্পপোষ্ট জ্বলে।
অন্ধকারের কালো সমুদ্র গাঢ় কালি ঢালে,
ঘূর্ণীঝড়ের আঘাত দীর্ণ জীর্ণ পাঁজর তলে
হৃৎপিণ্ডটা তবুও তার ধুক্‌ধুক্‌ করে।

পলাশ

শ্যামলী রায়

পলাশ, কী আশ্চর্য্য তুমি,
গত বছরেও দেখেছি শীতের মৌসুমী—
প্রাকৃত প্রেমের রং-এ তেমনি নিবিড়
এলে, উদার আকাশে ফেলে অজস্র শিবির,
শেষে তুমি পলাতক জেনেও জীবনের দাম
থাক্‌—সে কথা নাই বা তুললাম।

এবারেও তেমনি শীতের সকালে
ভোরের সূর্য্য যদি কুয়াশা সরালে
যে রোদে তীক্ষ্ণতাপ রয়,
সে রোদে তোমায় মনে পড়া বিচিত্র নয়—
আমি তাকেও দেখেছি যে পুনর্ণবা
এখনও দুচোখে রাখে তোমার বাহবা,

তখন অসুস্থ হলে, যখন সত্যি সত্যি
পারনি তাল রাখতে, বুঝেছ একরত্তি
সান্ত্বনা নাই বুদ্ধিতে অভিনয়ে
তখন অসুস্থ হলে—লুকাতে নির্ভয়ে।

আর অসুস্থতাই লাল কিংশুক
অন্ত দরজা মেলে ফিরায়েছে মুখ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

নোঙ্গর

মিতা সেন

নৌকা ভাসিয়ে দিল মাঝি। শীতলক্ষার বুকে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল কোষা নৌকাটা।

জলীল মিঞা নিজে এসে তুলে দিয়ে গেছে মালতীকে। বার বার আশ্বাস দিয়ে গেছে: ডরাইও না মা, এ আমার চেনা মাঝি, তোমাগো গেরামেরই মানুষ। ঠিক পৌঁছাইয়া দিব। আর গিয়াই আমারে একটা পত্র দিও কিন্তুক, বুড়া মানুষডারে নইলে চিন্তা করব।

ম্লান হেসে মাথা নেড়েছিল মালতী। তারপর নদীর জল ছুঁয়ে উঠে এসেছিল নৌকায়।

শ্বশুরবাড়িতেই আবার ফিরে যাচ্ছে মালতী। বাপের বাড়িতে এসেছিল বেড়াতে। ওরা কিছুতেই যেতে দেবেনা। অনেক কান্নাকাটি করে অনেক ঝগড়া করে এসেছিল মা-বাপকে দেখতে। তারপর? সে একটা দুঃস্বপ্নের মত। ভাবতে গেলে এখনও মালতীর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, গলার ভেতরটায় কান্নার পাথর আটকে থাকে। রাত তখন কতই হবে? খাওয়া দাওয়া সেরে সবেমাত্র বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে ওরা। ঘুম আসছে সবেমাত্র চোখের পাতায়, এমন সময় ভেসে এল আকাশফাটা চিৎকার। ভয়েই বুক দুরু দুরু করে উঠল ওদের, ভয়ে শরীর অবশ। সেই গর্জন ক্রমশঃ কাছে আসতে লাগল। মনে হল হাজারটা বাঘ আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে ছুটে আসছে আর প্রাণ ভয়ে চিৎকার করছে আহত প্রাণীরা। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশটা আগুনের শিখায় লাল টকটকে হয়ে উঠল আর ধোঁয়ার গন্ধে ভরে গেল বাতাস। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তার মধ্যেই ভেঙে পড়ল ওদের সদর দরজা, আগুন জ্বলতে লাগল ওদের রান্নাঘরের চালে। মালতীর চোখের সামনে ওরা ওর বাবার বুকে ছুরি বসালো, ভাইটা পড়ে গেল মাটিতে। আর যে মুহূর্তে একটা হিংস্র পশু মালতীর দিকে ছুটে এল, সেই মুহূর্তেই মালতী একটা আর্ত চিৎকার করে ছুটে পালাল। খিড়কি দরজা দিয়ে অন্ধকার সরু পথ আর পাইখানার তল দিয়ে ছুটতে লাগল মালতী, শেষে একসময়ে আর না পেরে লুটিয়ে পড়ল জলীল মিঞার পায়ে, চোখের জলে পা ভিজিয়ে বলল: আপনে আমার মা বাপ, আমারে রক্ষা করেন।

জলীল মিঞা তুলে বসালো ওকে। বলল: ওঠ মা, আমি মোছলমান হইতে পারি, কিন্তু পশু নই। তোমারে আমি মা ডাকছি, আমি বাইচ্যা থাকতে কেউ তোমার জাইত ধর্ম কাইড়া নিতে পারব না। সেই জলীল মিঞাই আজ নিজে এসে নৌকায় তুলে দিল মালতীকে।

নদী ছেড়ে খাল বেয়ে নৌকা চলেছে, বৈঠা ছেড়ে লগি ধরেছে মাঝি। দূরে মোগরাপাড়ার বাঁক। বাঁক ঘুরে আর একটু এগিয়ে গেলেই মালতীর শ্বশুরবাড়ির ঘাট, মালতী ঠিক হয়ে নিল। পুনর্জন্ম নিয়ে সে আবার স্বামীর কাছে ফিরে যাচ্ছে, রাত্রে সনাতনের বুকের একান্ত কাছে শুয়ে সে খুলে বলবে সব কথা, শুনে সনাতন নিশ্চয়ই ভয়ে শিউরে উঠবে, তার পর হঠাৎ মালতীকে টেনে নেবে বুকের কাছে। মালতী চোখ বুজল।

ঘাটে এসে নৌকা ভিড়লো। লগিটা কাদায় পুতে নৌকাটা অনেকটা উপরে তুলে দিল মাঝি। মালতী নৌকা ছেড়ে নামল মাটিতে। তার পর এগিয়ে গেল। সদর দরজা পেরিয়ে উঠোনে এসে পা দিল মালতী, পা দিয়েই যেন থমকে গেল। আশ্চর্য! একটা ঘরেরও দরজা খুলল না। এগিয়ে এল না কেউ ঘরের বউকে ডেকে নিতে! তবু সাহসে ভর করে দাওয়ায় এসে উঠল মালতী। তার পর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলো: মা, মা গো, আমি আইছি মা!

সাড়া এল না। তবে কি কেউ নেই? এখানেও কি সেই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে? তবু দরজায় দু' হাতে শব্দ করে মালতী আবার ডাকলো: মা, মা গো, দরজা খুলুন। আমি মালতী। তবু সাড়া এল না, দরজায় কান পেতে শুনল মালতী খড়মের খটখট আওয়াজ এগিয়ে আসছে। সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে মালতী এক পাশে সরে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো অশ্বিনী চক্রবর্তী, মালতীর শ্বশুর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল সে, দু' পা পিছু হটে গেলেন অশ্বিনী চক্রবর্তী। বললেন: থাউক থাউক, প্রণামের আর দরকার নাই, ব্যাপারডা স্পষ্টই জানাইয়া দিতাছি তোমারে!

চমকে উঠল মালতী। অশ্বিনী দু'বার গলাখাকারী দিলেন। তার পর বললেন: শোন, এই বাড়ীতে তোমার কোন স্থান নাই, তোমার সঙ্গে আমাগো আর কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার যেখানে খুশী যে ভাবে ইচ্ছা থাকতে পার।

মালতীর বুকে কে যেন একটা তীর মারল। ব্যথায় শরীরটা কেঁপে উঠল, তবু কাঁপা গলায় বলল: আমার অপরাধ?

গর্জন করে উঠলেন অশ্বিনী চক্রবর্তী। অপরাধ তোমার নয়, অপরাধ ঈশ্বরের, ফল ভোগ করছ তুমি। তোমার উপর দিয়া যে অত্যাচার হইয়া গেছে, তার জন্য তোমারে আমরা ত্যাগ করলাম।

মালতী কেঁদে ফেলল: না, না বিশ্বাস করেন বাবা, আমি নিষ্পাপ, কেউ আমারে ছুইতে পর্যন্ত পারে নাই।

আবার চিৎকার করে উঠলেন অশ্বিনী চক্রবর্তী: নিষ্পাপ? এতবড় একটা রায়ট হইয়া গেল। তোমার মত কত মাইয়ার উপরে হেরা অকথ্য অত্যাচার করল, আর তার মধ্যে তুমি অক্ষত আর নিষ্পাপ রইয়া গেলা, এই কথা তুমি আমারে বিশ্বাস করতে কও?

মালতী হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল: বিশ্বাস করেন বাবা, আপনে—

বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অশ্বিনী: আমি বিশ্বাস করলে কি হইব, সমাজ কি বিশ্বাস করব? আর তোমার মত একটা কলঙ্কিনীরে লইয়া ঘর করলে এই কুলীন ব্রাহ্মণের সমাজে আমারে একঘইরা কইরা রাখব না?

বোবা মালতী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল, তবু শেষ চেষ্টা করে একবার মুখ ফুটে ভাঙ্গা গলায় বলল: বাবা, আপনে দয়া করেন··· আপনে যদি চান তো আমি প্রমাণ পর্যন্ত দিতে পারি।

আবার গর্জে উঠলেন অশ্বিনী। প্রমাণ দিতে পারবা তুমি সীতার মত আগুনে ঝাঁপ দিয়া? পারবা তুমি? ও-সব কথা আমি শুনতে চাই না। যাও তুমি। এই আমার হুকুম।

উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল মালতী। দাওয়ার মাটি পিছল হয়ে গেল, রোদের ছায়া ক্রমশঃ হেলে পড়ল, তবু দরজা খুলে কেউ এল না। শেষ দেখা পর্যন্ত করল না সনাতন। পাড়ার লোক এসে ভীড় করতে লাগল। শেষে কাঁদতে কাঁদতে দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নামল মালতী। টলতে টলতে ফিরে এল নৌকায়। উপুড় হয়ে পড়ল ছইয়ের তলে।

আবার নৌকা চলল। আশ্বিনের নরম রোদে ধানক্ষেত ভরে আছে। খালের কালো জলে অজস্র ঢেউ তুলে নৌকা ছুটে চলেছে সোজা উত্তরে। তার পর এক সময় এসে নৌকা ভিড়ল সোনাকান্দির বাজারে। চোখের জল মুছে আবার মাটিতে পা দিল মালতী। পিছনে এল মাঝি। পথেই দেখা হ'ল মালতীর দাদা রমেন্দ্রের সঙ্গে। রমেন্দ্র মালতীকে দেখেই যেন চমকে উঠল, বলল: মালতী তুই? তবে যে শুনেছিলাম—

দু'হাত ধরে মালতী কেঁদে উঠল: কি, কি শুনছিলা কও, কও দাদা—

রমেন্দ্র আমতা আমতা করে। এই লোকে গুজব ছড়ায়—মোছলমানরা নাকি তোর উপরে—

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মালতী: না, না, সব মিথ্যা। সব মিথ্যা। তুমি বিশ্বাস কইর না দাদা। আমি নিষ্পাপ, কেউ আমারে ছুইতে পর্যন্ত পারে নাই। আর যদি আমি মিথ্যা কই, তবে আমার সর্বাঙ্গে যেন কুষ্ঠ—

রমেন্দ্র বলল: আঃ কান্দিস না। শোন, শ্বশুরবাড়ি গেছিলি?

ভেজা আঁচলটা দিয়ে চোখ মুছল মালতী। বলল: হ্যাঁ, ওরা কইল সীতার মত যদি পরীক্ষা দিতে পারি, তবেই ঘরে তুলব।

রমেন্দ্র চুপ করে রইল। যেন সে ভীষণ চিন্তিত।

মালতী বলল: আমারে একটু স্থান দেন দাদা। তোমার ঘরের কুত্তা বিড়ালের মত থাকমু। আইঠা কুটাইয়া খামু।

রমেন্দ্র ওকে নিয়ে এল বাড়িতে। দাওয়ায় দাঁড়াল মালতী। রমেন্দ্র গেল ঘরে সুরোকে মালতীর কথা বলতে। একটু পরেই মালতী শুনতে পেল রমেন্দ্রের স্ত্রী সুরোর কানফাটা চিৎকার।

কি কইলা তুমি? ওরে না মোছলমানরা টাইনা লইয়া গেছিল?

আঃ চুপ কর না। ওগুলি সব মিথ্যা কথা।

চুপ করুম কান? তা তোমার অত দরদ কেন? তাও যদি মায়ের পেটের বইন হইত।

শোন, ও কিন্তু কিছুদিন এইখানেই থাকব।

এবার সুরোর কণ্ঠ আরো জোরে গর্জে উঠল, কি কইলা? মরণের আর চুলা পাইল না, আঃ মর, সংসার ভারে জ্বালাইতে আইছে। ওরে ঘরে রাখলে তুমি আর দশজনের কথায় টিকতে পারবা?

আমার কথা মানতে হইব। ও এইখানেই থাকব।

বেশ থাক তুমি তোমার ঐ সতী সাধ্বী পাতান বইনেরে লইয়া, আমার বরাতে একটা দড়ি আর কলসী জুটবই।

আর শুনতে পারল না মালতী। এতক্ষণ শুনতে শুনতে সে তার আঙুলটাকে জোরে কামড়ে ধরে সামলেছিল। আঙুল কেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। চোখের জলে ঝাপসা দেখতে লাগল সব। উঠোন পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগল মালতী। মনে হল দুধারে সব বাড়ির দরজা জানালাগুলো খুলে গেছে, আর সেখান থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে সব সিঁদুর-কপালে বউগুলি। হেসে হেসে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলছে, বেশ্যা, পতিতা, কলঙ্কিনী।

মালতী ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে আবার এসে উঠল নৌকায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মাঝি বলল, এইবার কই যামু ঠাইরেন?

মালতী চেঁচিয়ে উঠল, জানি না, তোমার যেদিকে খুসী চালাও।

আবার নৌকা ছুটে চলল। বেলা শেষ হয়ে আসছে। খালে সূর্যের রক্ত আভা। দূরে গাছপালার ফাঁকে একটা মসজিদের চূড়ো। একঝাঁক পাখী পাণ্ডুর আকাশের তল দিয়ে উড়ে গেল। জলে তাদের ছায়া পড়ল, আর সে ছায়াকে চাপা দিয়ে নৌকা চলল এগিয়ে। শেষে অন্ধকার যখন ঘন হয়ে উঠল, শুধু জোনাকীরা জ্বলতে লাগল তখন মাঝি নৌকা ভেড়ালো মাটিতে। মালতীকে বলল, এইখান এক সাধুর আশ্রম আছে। অনেক লোক থাকে। আপনেও চেষ্টা কইরা দেখেন।

নৌকা ছেড়ে মাটিতে পা দিল মালতী। তারপর সরু অন্ধকার পথটা ধরে এগিয়ে চলল আশ্রমের দিকে। ওখান থেকে তখন গান ভেসে আসছে। 'দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হানো·····'

ক্লান্ত, অবসন্ন মালতী বসে পড়ল বারান্দার এক ধারে। গান শেষ হল, সন্ধ্যা প্রার্থনাও। স্বামীজি এগিয়ে এলেন মালতীর কাছে।

: কে তুমি? কি চাও?

অমনি বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত মালতী লুটিয়ে পড়ল স্বামীজির পায়ে। তার পর কান্না জড়ানো কণ্ঠে খুলে বলল সব কথা। একটুও গোপন করল না, একটুও অতিরঞ্জিত করল না। সব বলে মালতী কেঁদে উঠল: বাবা, আমারে আপনের চরণে ঠাঁই দেন, আমার আর যাওয়ার জায়গা নাই।

স্বামীজি ভাবলেন কি যেন। শিষ্যরা সব উদগ্রীব হয়ে রইল।

শেষে তিনি বললেন : আমায় ক্ষমা কর মা ! এখানে তোমায় থাকতে দেবার মত জায়গা নেই। এখানে আমি তোমায় রাখতে পারি না।

মালতী বলল : তবে আমি কই যাবু ?

: পথে নেমে পড়। ঈশ্বর আছেন, তিনিই তোমাকে পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে তুলবেন। ভয় কি মা!

মালতী আবার উঠে দাঁড়াল। পথ, হ্যাঁ সে পথেই নামবে, সামনে দীঘির কালো জল অন্ধকারেও চকচক্ করছে। গভীর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মালতী।

ভবেশ বললো : মহারাজ, এ কি করলেন! একটা আশ্রয়হীনা নারীরে আপনে তাড়াইয়া দিলেন ?

স্বামীজি মৃদু হাসলেন, বললেন : অনেকগুলো বিচার করে আমায় কাজ করতে হয়, তা জান ? ওকে এখানে রাখলে তোমাদের চিত্ত চঞ্চল হবে, চিত্তচাঞ্চল্য থেকে ঘটবে ব্রহ্মচর্য্যে ব্যাঘাত।

চিত্তচাঞ্চল্য ? ব্রহ্মচর্য্য ? ভবেশের মুখে একটা অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। তারপর হ্যারিকেনটা নামিয়ে রেখে স্বামীজিকে একটা প্রণাম করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল আশ্রম ছেড়ে। যে পথে মালতী মিলিয়ে গেছে সে পথ ধরে হাঁটতে লাগল ভবেশ।

অনেক রাতে লাপাড়ার মসজিদে অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালান হ'ল। সেই আলোতে সামনের অন্ধকার কেটে গেল। নতুন লুঙ্গি আর টুপী পরেছে রমজান। মেহেদি পাতায় হাত রাঙ্গিয়েছে। আর আবেদালীর ঘরেও বোরখায় মুখ ঢেকে বসে আছে একটি মেয়ে, সেও হাত রাঙ্গিয়েছে মেহেদি পাতায়। আর একটু পরেই রমজানের হাত ধরে সে এগিয়ে যাবে মসজিদের ভেতর। প্রার্থনা করবে জীবনের সুখ ও শান্তির জন্ত। মালতীর নৌকা এতক্ষণে নোঙ্গর করল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

খুবই আনন্দ ও আশার কথা যে ভারত সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালের শেষের দিকে ছয় থেকে এগার বছরের ছেলে-মেয়েদের বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করছেন।

শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের দুরবস্থার কথা নতুন ক'রে আর বলবার দরকার নেই। মূর্খতা প্রসূত অজ্ঞতা আমাদের অপরিসীম দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্ত অনেকাংশে দায়ী। এই সত্য উপলব্ধি ক'রে মূর্খতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করবার প্রয়াস সত্যই প্রশংসার্হ।

এই প্রচেষ্টা কার্য্যকরী করবার জন্ত যথারীতি খসড়া প্রস্তুত করা ও নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক তা অনুমোদিত করাও হ'য়ে গেছে।

খসড়ায় অবশ্য সমগ্র দেশের প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের জন্তই যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তা বলা হয়নি। বলা হ'য়েছে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় ছয় থেকে এগার বছরের ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক ভাবে অনুমোদিত বিদ্যালয়-সমূহে যোগদান করতেই হবে। এবং যে সমস্ত পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক উক্ত বয়সের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবেন না অথবা তাদের অন্ত কোন কাজে নিযুক্ত করবেন তাদের আইনানুসারে দণ্ড দেওয়া হবে।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না এই পরিকল্পনা অনুসারে তাদের মধ্যে দুই কোটি ছেলেমেয়ে অন্ততঃপর এই সুযোগ পাবে! আরও কোটি কোটি ছেলে-মেয়ে অবশ্য এখনকার মত এ সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিতই থাকবে—কিন্তু আশা করা যায় ক্রমশঃ পরবর্ত্তী পরিকল্পনা সমূহে এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হবে।

শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে সে সম্বন্ধেও খসড়ায় সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হ'য়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তন করে বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে এবং শিশুদিগকে প্রথম থেকে নাগরিক হবার উপযুক্ত ক'রে তোলার জন্ত উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। তা ছাড়া সামাজিক শিক্ষা, হাতের কাজ এবং সমাজ-সেবা করার শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হবে, যাতে ক'রে গোড়ায় থেকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে গৃহ এবং সমাজের একটা যোগ থাকে।

খসড়ায় আরও বলা হ'য়েছে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিশুদের এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের তৈরী হাতের কাজ বিক্রয় করে শিশুদের টিফিনের এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হবে।

উপজাতি শিশুদের শিক্ষার জন্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবারও ব্যবস্থা করা হবে এবং সর্ব্বোপরি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে এবং শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত গাফেলতি দেখা যায় সেই সমস্ত কারণগুলি অনুধাবন করবার জন্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গবেষণা করবার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও করা হয়েছে।

প্রস্তাবসমূহ কার্য্যকরী করার জন্ত অভূতপূর্ব্ব কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই শিক্ষা-দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ কে, জি, সইয়াদাইনের সঙ্গে একমত হবেন।

প্রাথমিক শিক্ষাটাকে এত দিন আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই যেন আনিনি। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে গিয়েছি মাত্র।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির গৃহ থেকে আরম্ভ ক'রে পারিপার্শ্বিক, আসবাবপত্র, পাঠ্যবিষয় ও পুস্তকাদি সর্ব্বোপরি শিক্ষক—সকলের অবস্থা ব্যবস্থাই শোচনীয়।

কোন কোন বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর পরিত্যক্ত একতলার দুটি একটি ঘর—কোথাও কোথাও আটচালা এমন কি খোলা জায়গা—গৃহস্থের বসতবাড়ীর একাংশ—এই রকম বিদ্যালয় ব'লে মনেই হয় না এমন সব জায়গায় বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরিকল্পনা ক'রে, উদ্যোগ আয়োজন ক'রে, কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয় আরম্ভই করেনি যেন—দুটি একটি, দুটি একটি ক'রে ছেলে পড়াতে পড়াতে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ছেলে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন এক একটা ধাপ ওঠা হয়েছে এবং তারপর কোন রকমে বিদ্যালয় আখ্যা নিয়ে কুঁকড়ে-মুঁকড়ে টিকে আছে। অর্থাভাব, সহানুভূতির অভাব, দায়িত্ব নেবার লোকের অভাবে অনেক প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। বিদ্যালয়গৃহ, পরিবেশ,

আসবাবপত্র এই সব কারণেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও অবান্তরের পর্য্যায়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

শিশুর দেহের ও মনের স্বাস্থ্য যে বিদ্যালয়ের গৃহ, পরিবেশ ও আসবাবপত্রের শোভনতা সৌন্দর্য্যের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে, একথা আমাদের মাথায়ই আসেনি কোনদিন। এবং শিশু বয়সের এই সব ঘাটতির ফল যে প্রাপ্তবয়সেও ভোগ করতে হয় সে কথাও আমরা জানি না অথবা ভাবতেও পারি না। আমাদের অধিকাংশের জ্ঞান নেই, মানুষের জীবনের একটি ধাপ আরেকটি ধাপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের বিশ্বাস এক ধাপ শেষ হলে বুঝি সেখানেই তার ছেদ পড়ে গেল—পরবর্ত্তী ধাপের ওপর আগের ধাপটির কোন প্রভাব প্রতিপত্তিই নেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা এবার বলা যাক্। স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সাধ ক'রে কেউই এ পথ বেছে নেননি। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সম্ভ্রম যে কাজে নেই কেউই তা নেয় না। জীবন যাঁদের বঞ্চনা করেছে, তাঁরাই গত্যন্তর না দেখে এ পথে নেমেছেন। তাই প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই হয় না প্রায়। যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন, তাঁদেরই শিক্ষা নেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মন নেই, যোগ্যতা নেই—এক কথায় আদর্শ বলে কিছু নেই, তাই দিনগত-পাপক্ষয় ছাড়া আর কি-ই বা হতে পেরেছে?

তা ছাড়া মানুষ, বিশেষ ক'রে শিশু সুন্দরের উপাসক—চেহারায়, সাজসজ্জায়, ব্যবহারে, শালীনতায় সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হয়—সুন্দর যা সে তাই ভালবাসে। কিন্তু জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশাগ্রস্ত দেহ-মনের সব মাধুর্য্য নিঃশেষিত শিক্ষকের মধ্যে সে কি পায়? তাই তাঁর কাছে শিক্ষা পাবে, যাঁকে ভালবাসবে, যাঁকে মেনে চলবে, যাঁকে মনে মনে পূজা করবে তাঁকে অশ্রদ্ধা ভয়ই করতে পারে শুধু—ক্রমাগত বিতৃষ্ণা জাগতে জাগতে একটা বিরুদ্ধভাবই আস্তে আস্তে শিকড় গেড়ে বসে—এবং অধিকাংশ লোকই যে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শিক্ষকমাত্রকেই কৃপা অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে তার মূল কারণই হচ্ছে ঐখানে। গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা মেনে চলা (ভয়ে নয় ভক্তিতে) ছোটবেলা থেকে এই ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলেই বয়স বাড়লে আর কাউকেই শ্রদ্ধা সম্মান করবার মত মন থাকে না।

পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পূর্ব্বে এই দিকে যেন বিশেষ করে নজর রাখা হয়, সেজন্য এত কথা লিখলাম। ইউরোপ আমেরিকা

প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্যই বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিযুক্ত করা হয়—আর আমাদের দেশে যাদের আর কোন গতি নেই তাদের হাতেই পড়ে এই গুরুতর কার্য্যের ভার। প্রাথমিক শিক্ষা বলতে আমরা বর্ণপরিচয়, একটু আধটু কাগের ঠ্যাং যাই হোক লিখতে শেখা আর সামান্য হিসেব করতে পারার মত একটু অঙ্ক শেখা এইটুকুই ধরে রেখেছি—শিক্ষার অর্থ যে কত ব্যাপক তা আমাদের ধারণা নেই বলেই আমাদের এই মারাত্মক ভুল।

তারপর আসে পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবিষয়, উপকরণ ইত্যাদির কথা। যাঁরাই আমাদের দেশের সাধারণ যে কোন একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেছেন তাঁরাই দেখেছেন উপকরণ বলতে সেখানে কেবল একটি ঢগঢগে নড়া, রংচটা কোনরকমে থাকতে হয় তাই থাকাগোছের ব্ল্যাক্‌বোর্ড ছাড়া আর কিছুই নেই। অন্য উপকরণের কথা স্বপ্ন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। পাঠ্যপুস্তকও একটি কি দুটি মলাটছেঁড়া পাতা-ছেঁড়া, তেলধরা সেই মান্ধাতা কাল থেকে যা হ'য়ে আসছে সেই পাঁজির পাতায় লেখা বই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে—আর একটি ভাঙা শ্লেট। এই ভাবে চলে এসেছে, আসছে-ও। পড়ানোর পদ্ধতি বলতে সেই মুখস্থ করানো ও বলানো গড়গড় করে—বোঝাবুঝির বালাই নেই। উদ্দেশ্য আদর্শের মধ্যে লিখতে পড়তে শেখা কোনরকমে।

নতুন পরিকল্পনায় এসব দিকেরই আমূল পরিবর্ত্তন হবে, এ খুবই আশার কথা। গৃহের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগও স্থাপিত হবে। যা আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন উচ্চতর বিদ্যালয়েও নেই। কিন্তু এর জন্য গৃহ এবং সমাজের সংস্কারেরও প্রয়োজন। আমাদের অধিকাংশ গৃহ অজ্ঞতায় অন্ধকূপ। বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় গৃহে সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের শিক্ষা একেবারে ভিন্নমুখী।

নতুন পরিকল্পনায় প্রায় ৫০ কোটি টাকা স্ত্রীশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষার দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অবশ্য বয়স্কদের অ আ ক খ থেকে আরম্ভ না করে সিনেমা, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, অভিনয়, ম্যাজিকলণ্ঠন, সহজ ভাষায় লেখা সুলভ পুস্তকের প্রচার, সমাজ-সেবক-সেবিকা নিয়োগ করে গৃহে গৃহে গিয়ে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় জানানোর নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্যও টাকা বরাদ্দ করা একান্ত দরকার।

শিশুদের হাতের কাজ বিক্রয় করে তাদের টিফিনের ব্যবস্থা করার কথাও হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে টিফিন দেওয়া যে একান্ত দরকার তা যাঁরা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরাই জানেন। টিফিন খেতে পায় না বলে টিফিনের পরের ক্লাসগুলো বৃথাই নেওয়া হয়—মন শরীর দুই-ই বেঁকে বসে তখন। ছাত্রদের শিক্ষকদেরও। তাই টিফিন ব্যবস্থা দুপক্ষের জন্যই দরকার। কিন্তু অর্থকরী বিদ্যা শেখার দিকটায় বেশী ঝোঁক দিলে বিপদের সম্ভাবনা শিশুদের সুকুমার মনে। কঠিন কারিগরী মনোবৃত্তি তাদের যাতে না গড়ে ওঠে সেদিকে কড়া নজর রাখা দরকার।

অভিভাবকগণ বিদ্যালয় যাবার বয়সের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে যেতে না দিলে অথবা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত করলে দণ্ড পাবেন, এ ব্যবস্থাও করা হবে। অর্থাভাবেই অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে দিতে পারেন না এবং সেই একই কারণে তাদের কাজ করবার বয়স না হলেও কাজ করতে দেন। তাছাড়া সাধারণ লোকে এ-ও জানে, অর্থাভাবে বেশী লেখাপড়া শেখানো যখন সম্ভব হবে না তখন ছোটবেলা থেকে কাজ শেখানেই যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র দেশে যে জ্ঞানটা থাকা একান্ত প্রয়োজন সেই পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞানের অভাবের জন্যও অনেক শিশুর সংখ্যাধিক্য পিতামাতাকে তাদের প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পক্ষে দুর্নিবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সবশেষে বলব তাঁদের কথা, যাঁরা বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। অর্থাৎ ম্যানেজিং কমিটি। অধিকাংশ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা এবং স্কুলের সেক্রেটারীও অনেকক্ষেত্রে শিক্ষাবিদই নন। তাঁদের হাতে শিক্ষানিয়ন্ত্রণের ভার থাকা কোন দিক দিয়েই যুক্তিযুক্ত নয়।

পরিকল্পনানুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করবার প্রয়াসের প্রথমেই সরকারকে এদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য অনুরোধ করা আবশ্যক।

স্বীকৃতি

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কিছুই যাবে না সঙ্গে
অশ্রু-হাসির রঙ্গে,
যে মালা গেঁথেছি
যে মালা পরেছি,
প্রতিদিন এই অঙ্গে।
কিছুই যাবে না জানি যে
আকাশের আসমানী যে,
গেঁথেছিল নীল,
খুশি অনাবিল,
সাতনরী হারখানি যে।

ঘিরে রাখা বুক
ছোট ছোট মুখ,
কান্নার ঝরা মুক্ত,
নিঃশেষ হয়ে
ধুলোর কণার,
হবে অন্তর্ভুক্ত।

তাইতো চাই না রাখতে,
বিবিধ কথার
দিয়ে উপচার,
যে ছবি চেয়েছি আঁকতে।

শুধু ভরা আছে হৃদয় আশায়
লিখে রেখে যাব গানের ভাষায়,
যে দিন ছাড়িয়ে এসেছি।

তারি ভীড় থেকে এইটুকু বেছে
বিগত ফাগুনে যে লগ্ন গেছে,
তাকে কোন দিন স্বার্থবিহীন
সত্যি ভালোবেসেছি।

রান্না ও কান্না

শোভারাণী হালদার

ভবিষ্যৎ-এর গর্ভে এমন এক বিস্ময়কর আজাদীন-যুগ'-এর অবস্থিতি অসম্ভব নয় যে-যুগ হয়ত বড়ি-যুগ (Tablet Age) নামেই বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। সকালে খান চা বা কফির বড়ি' সঙ্গে এক আউন্স জল। একটু বাদে স্নান সেরে এসে শিশি থেকে বার করে নিন ভাতের বড়ি—সঙ্গে মিন ডাল বা মাছ-মাংসের বড়ি। এক আউন্স জল। স্বাদ? হা ভগবান! তবু ভরসা দিয়ে রাখি, গোটাকয়েক উদ্গার খাদ্যের স্বাদ নিয়ে দ্রুত আপনার জিহ্বার নিম্ন বা উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ছুটে আসবে—ব্যস্! বৈকালীন ফল বা দুধ এবং রাত্রের লুচি পোলাও'-এর জন্য ঐ একই ধাঁচের সরকারী ব্যবস্থা। রান্নাঘর ও রাঁধুনীর নিশ্চয়ই প্রয়োজন ফুরোবে—হোটেল, রেস্তরাঁগুলো খুলবে বড়ির রেশন-শপ। বড়ি গেলা এবং গলাবাজী করার যুগ সেটা। তখনকার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হয়ত মনুষ্য-সভ্যতার ইতিহাস লিখতে বসে মন্তব্য করবেন—অগ্নি আবিষ্কারের কিছু পরে এই অর্দ্ধ-সভ্য মনুষ্যেরা নানাবিধ গাছ ও তার ফলগুলিকে মশলা দিয়ে সিদ্ধ এবং তেল দিয়ে ভাজা করে খেতে ভালবাসতো। খুব সম্ভব, রাক্ষস-যুগের প্রভাব এদের ওপর বেশ কিছুকাল সক্রিয় ছিল। এরা এক একজন এক সের পাঁচপো চাল সিদ্ধ করে ডাল তরকারী-সহ অনায়াসে আহার করতো—যেখানে আমাদের এক লক্ষাধিক খাদ্যবড়ি ওজনের সমতুল্য! মাছ-মাংসের সংস্পর্শে ঐ ভোজনের পরিমাণ অনেক স্থলে প্রায় দ্বিগুণ হওয়ার সংবাদও পাওয়া যায়! তাদের পেটগুলি বেশ বড় বড় হ'ত। তাদের পেটের পীড়া লেগেই ছিল। তখনকার চিকিৎসকেরা সপ্তাহে সাতদিনই তাদের জোলাপ-বড়ি ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিতেন। সে এক ভয়াবহ ওলট-পালটের যুগ!

কিন্তু আজও যখন সে-যুগ ভবিষ্যৎ-এর গর্ভে তখন বর্ত্তমানকে নিয়েই আমাদের চলতে হবে এবং বর্ত্তমান-যুগের যুগধর্ম্মও অবশ্য পালনীয়। রান্নাঘর, রন্ধন সামগ্রী এবং উত্তম রাঁধুনীরও প্রয়োজন আছে। মধ্যবিত্ত ঘরে ঠাকুর-বামুন রেখে রাঁধার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। সেখানে গৃহবধূরাই সে-কাজ করে থাকেন এবং সেটাই তাঁদের সর্ব্বপ্রধান কাজ এবং কর্ত্তব্যও। কিন্তু আজকাল তাঁরা এটাকে সর্ব্বপ্রধান কাজ বলে স্বীকার করতে নারাজ। রন্ধন কাজটার ওপর একটা মিথ্যা হীনতার আচ্ছাদন টেনে দিতে পারলেই তাঁরা যেন বেশ খুশী হন।

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মন্তব্য করেন যে, অত্যধিক পুরুষালী শিক্ষা পেয়েই মেয়েদের এই মতিগতি হয়েছে। নম্রতার সাথে কঠোরতার মিশ্রণে তাদের মনোভাব বিকৃত হতে চলেছে। তাঁরা আজকাল গৃহলক্ষ্মীরূপে গৃহে প্রবেশ করেন না—গৃহসরস্বতীরূপে শুধু সংসারে শোভাময় হয়ে থাকতে চান। এবং তার ফলেই নাকি রন্ধন-বিদ্যা বা রন্ধন-আর্ট সংসার থেকে বিদায় নিতে বসেছে। উক্ত মতবাদ কতদূর সত্য তা অবশ্য গবেষণা সাপেক্ষ। তবে এইটুকু বলা যায় যে মেয়েরা আজকাল রন্ধনকার্য্যে কম-উৎসাহী। এই সেদিনেও মেয়েদের মনোভাব ছিল যে স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদের নিজেদের হাতে মুখরোচক খাবার তৈরী করে খাওয়ান এবং পুরস্কারস্বরূপ তাঁদের প্রশংসামিশ্রিত ভালবাসা একা একা আত্মসাৎ করে তাঁরাও এক অপূর্ব্ব পুলক ও গর্ব্ব অনুভব করতেন মনে মনে। অতি সাধারণ উপাদান নিয়ে তেলমশলার কল-কৌশলের ভেতর দিয়ে কে কত সুন্দর ও মুখরোচক ভোজ্যদ্রব্য তৈরী করতে পারে, তার একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সমাজে। সুখাদ্য রন্ধনকারীর যথেষ্ট সম্মানও ছিল গৃহে গৃহে। তাঁদের সুন্দর আন্দাজ জ্ঞানও উল্লেখযোগ্য। কাজের বাড়ীতে কত লোকের জন্য কত কত জিনিষ লাগতে পারে তার জন্য তাঁদের সসম্মানে ডেকে আনা হোত্তো। ভাতে-ভাত থেকে কালিয়া—কোর্ম্মা—এমন কি, নানাবিধ মিষ্টান্ন তৈরীর ব্যাপারে তাঁদের অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। আর এখন?

অধিকাংশ আধুনিক নবাগতা গৃহবধূরা তরকারী কুটতেই জানেন না—মাছ কোটা তো দূরের কথা! ঝোল, ডালনা, ঘণ্ট, অম্বল প্রভৃতির জন্য যে বিভিন্ন-ধরণের কুটনো কোটার প্রয়োজন তা তাঁদের কাছে একটা অবাক ঘটনা! ফলে চচ্চড়ীর আলু ঝোলে দিয়ে বা ঝোলের আলু চচ্চড়ীতে ঢেলে এক অদ্ভুত তরকারী যুগান্তরকারী ইতিহাস সৃষ্টি করেন! সংসারে বৃদ্ধা কেউ থাকলে তবেই রক্ষে! তাঁর ওপর কুটনো কোটার কাজটা পড়ে। কই, ট্যাংরা, সিঙ্গি মাগুর প্রভৃতি আনলে তো রক্তারক্তি সহ কান্নাকাটি এবং শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তার ডাকাডাকি। ঘন ঘন ওদের আগমন হতে থাকলে বাপের বাড়ীর ডাক পড়াও চোখে পড়েছে! পুঁটি, মৌরলা আনলে কোটার অদক্ষতার জন্য কর্ত্তার নজর খারাপ বা নীচ নজর রটে রান্নাঘরে। তরকারীর দিক থেকেও বাছবিচার কম নয়। পেঁপে চলবে না, ডুমুর অখাদ্য, মোচা গো-খাদ্য, থোড় ছোটলোকে খায়, কচু গলা ধরে, ওলে চর্ম্মরোগ হয়, পুঁইশাক ঢেঁড়স লাল-জাল বিশ্রী! বড় বড় নৈনীতাল আলু, ফুলকপি, বেগুন, কাটা-পোনা, কাটা ইলিশ ইত্যাদি নিত্য যোগাতে পারলে এঁদের কাছে উঁচু নজরের সম্মান মেলে!

প্রায়ই দেখা যায়, আধুনিক মহিলারা তরকারী সুস্বাদু করবার জন্য এক অদ্ভুত প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হন—অর্থাৎ, প্রচুর পরিমাণে তেল ঘি মশলা পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার করেন। তাঁদের ধারণা, যত বেশী ঐগুলি প্রয়োগ করা যায়, তরকারী তত বেশী সুস্বাদু হয়। কিন্তু তাতে করে তাঁদের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়ই না উপরন্তু অম্বল ও পেটের নানাবিধ পীড়ায় শেষে শুধু সিদ্ধ খাওয়ার পরামর্শ আসে ডাক্তারদের কাছ থেকে।

কোন তরকারীতে কতটা ঝোল থাকবে না থাকবে সেই বুঝে জল ঢালা রান্নার আর একটি অন্যতম দিক। কত নুণ ঝাল দিলে ঐ জলের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে এবং তরকারীটা সুস্বাদু হয়ে উঠবে, সেইটাই বোধ হয় রান্নার প্রধান আর্ট। ঝোল কম হলে ডালনা, শুকিয়ে ফেললে চচ্চড়ী বা ঘণ্ট, গায়ে গায়ে থাকলে কালিয়া এই সব হচ্ছে আধুনিকাদের থিওরী! এখনও অনেক বৃদ্ধ মহিলারা সামান্য তেল মশলায় এমন সুন্দর রান্না করেন যে খেয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাঁরা বলেন, ঠিকমত নুণ-ঝাল-জল দেওয়ার কায়দাটাই আসল কায়দা। ওটা নাকি শুনে পড়ে হয় না। হাতে নাতে শিখতে হয়। এই প্রসঙ্গে হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল। কোন ঘরে শাশুড়ী কিছু ঝোলের বেগুন কুটে নববধূকে সেগুলি ঝোলে ফেলে দিয়ে আসতে বলেন। বধূটি বেগুনগুলি ঝোলে

দিয়ে দেখে যে তারা ভেসে রয়েছে—অন্ত তরকারীর মত ডুবে যাচ্ছে না। বধূ নিজেকে দোষী মনে করে বাটি-বাটি জল কড়ায় ঢালতে সুরু করে। জল কড়া ছাপিয়ে পড়া সত্ত্বেও যখন বেগুনগুলি কিছুতেই ডোবে না, তখন বধূটি ভয়ে কাঁদতে সুরু করে দেয়। এমন সময় শাশুড়ী সেস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেন—এক কড়া জল, বেগুন ভাসছে, উনুন জলে প্রায় নিবে এসেছে! শাশুড়ী বুঝতে পারলেন বধূর অজ্ঞতা। একটু বাপের বাড়ীর খোঁটা দিলেন বটে কিন্তু জিনিষটা বুঝিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের অনেক বধূই আমাদের মধ্যেই এ যুগেও নাইলনের শাড়ী পরে ফুরফুর করে ঘোরাফেরা করছেন আশেপাশে। রান্না করতে করতে তাঁরা অবশ্য কাঁদেন না আজকাল কিন্তু অপরকে কাঁদান হামেশাই। রান্না খেয়ে কান্না পেল—এ অভিযোগ প্রায় ঘরে ঘরে।

এখানে বক্তব্য, কেন এমন হবে? মেয়েদিগকে বিদ্যাচর্চায় এত বেশী মগ্ন থাকতে হয় না যার জন্তে তাঁরা এদিকে কিছুটা সময় না দিতে পারেন। ছেলেরা পড়াশুনাও করে এবং আরও অনেক কিছু করে। আজকাল নাচ গান বাজনা শেখার দিকে মেয়েদের আগ্রহ দেখা যায়। মধ্যবিত্ত সংসারে ওসবের খুব মূল্য আছে বলে অনেকে মনে করেন না। সুরুচি এবং মনোমুগ্ধকর পরিবেশ বজায় রাখতে হলে সুস্বাদু রান্না শেখা মেয়েদের পক্ষে একটা মস্ত বড় সুশিক্ষা এবং সংশিক্ষা। সেলাই কোঁড়াই তার পরে। মেয়েমহল এবিষয়ে আলোড়িত হওয়া উচিত।

হেমন্ত-শেষে

স্বাতি ঘোষাল

হেমন্তের ছিন্নপত্র কাঁপে থর থর
মুটা মুটা ধূলি ওড়ে তুচ্ছ আলোড়নে—
অকাজের বৈকালীতে কি করি কি করি
অলস কুয়াশা জমে কোঠরের মনে।

মন্থর মহিষ দু'টি ঘুম ঘুম চোখে
উদ্দেশ্যবিহীন যেন চলে কি না চলে;—
হিজলের ডালে দিয়ে হঠাৎ চমক
মাছরাঙা নেমে এল হিম্ ঝিম্ জলে।

ছায়া ছায়া ঢেকে আসে আকাশ পৃথিবী,
শীতের অলস ছোঁয়া এখনি পেল কি?

প্রমাণ

মাধবী সেনগুপ্ত

জীবনের প্রান্তে আজ দেখ পিছু চেয়ে
যার তরে সাংগ হল জীবনের গান,
বরণ করিলে যারে আবাহনী গেয়ে
সে কী আজ উপযুক্ত দিয়েছে সম্মান?

হৃদয়ের যত সুর ছিল যত কথা,
সাংগ হলে তবু থাকে স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
যে প্রেম তাহার দান তারই কিছু আলো,
অবশেষে হৃদয়ের শূন্যতা ভরালো।

তার প্রেম অমলিন অফুরন্ত দান,
ভরাট হৃদয় তার সুন্দর প্রমাণ।

প্রত্যয়

অম্বুজা দেবী

কখন যে বেলা গেল, রোদের কানাকানি
বন্ধ হল। একটি দু'টি তারা
সন্ধ্যারাতের বিজন অবসরে
অন্তমনে দূর আকাশের নটী
নূপুর বাজায়: শুনছি বারে বারে।

ঘরে ফেরার তাড়া অনেক, বিবশ আমার মন
ক্লান্ত চরণ ছায়া ফেলে, মেঘের পদধ্বনি
রাত্রি নামে আমায় ঘিরে
আমায় ঘিরে নামে,
হৃদয় বলে তুমি আছো: আমার মধ্যমণি।
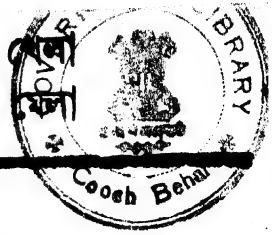
ধারাবাহিক রচনা

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

নিজের সম্বন্ধে বললেন—গিরিশ বাবুর চেয়ে আমি বেশি দিন অভিনয় করেছি। সেই ১৯৫৬ পর্যন্ত—৪৮ বছর। প্রথম ক'বছর ইনষ্টিটিউটে, তার পর পাবলিক ষ্টেজে।

এখনও করতে পারি। একটা পাদপীঠ দাও। বাইরে যেতে হলে একটা দল ত চাই। দু মাস অন্তর একটা নতুন বই ধরব, রিহার্স্যাল দেব, ভূতনাথকে ধমকাবো।

ভূতনাথ প্রথমে 'সিন' উইংস থেকে ফাঁক করে লাগাত তারপর আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে উইংসের সঙ্গে লাগিয়ে দিত। ওর ধারণা ছিল উইংসের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেই সব চেয়ে ভাল হয়। আবার ধমক দিলেই সরিয়ে নিত। হঠাৎ কথা বদলালেন, দেবুদাকে বললেন—দেবু, তুমি যদি ভাবো ওরা আমায় মস্কোয় যেতে ডাকবে ত ভুল করবে। সাদা চামড়ার কারোর সঙ্গে আমার ভাব নেই; ওরা কেউ আমার বন্ধু নয়।

পশ্চিমের দেশে ত আমাদের দেশের সভ্যতাকেই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা বলতে বোঝে পশ্চিমী সভ্যতা। তবে ওদের মধ্যে আমাদের সম্বন্ধে রাশিয়ানদের ধারণা একটু ভাল হতে পারে, কারণ—ওদের শরীরে মুসলমান রক্ত (? তাতার) একটু বেশী পরিমাণে আছে ত। কথায় কথায় একজন বললেন—ষ্টেজে গঙ্গাবতরণ দেখায় প্রথম ষ্টারে। বললেন—গঙ্গাবতরণ প্রথম ষ্টারে দেখাবে কেন, প্রথম দেখায় পার্শি থিয়েটারে। রবি বর্মার ছবির মত গাট্টাগোট্টা এক মহাদেব বিরাট জটা এলিয়ে এসে দাঁড়াত ষ্টেজের মধ্যে আর উপর থেকে মাথার ওপর ছর-ছর করে জল পড়ত। জল জটা বেয়ে ষ্টেজের ফুটো দিয়ে নিচে চলে যেত, আর ওপর থেকে আবার জল পড়ত।

থিয়েটারের একটা বাড়ি থাকলে অনেক ভাল ভাল লোককে ডেকে আনতে হয়। দু-চারজন ঐতিহাসিক (মানে যাদের মাথায় কিছু আছে), দু-চারজন অন্য ধরণের পণ্ডিত লোকে। তার জন্য তাঁদের এক কাপ চা দিতে হবে; কোনদিন দুটো সিঙ্গাড়া, কোনদিন বা দুটি মুড়ি—মানে কিছু খরচা করতে হবে। তাঁরা রিহার্স্যাল দেখবেন, নাটক দেখবেন; ভাল লাগলে দুচার কথা বলবেন।

আজে-বাজে বই হৈ চৈ করে চলে। কেন? না, দর্শকরা নেয়, তাইতো! কিন্তু ভাল কিছু করতে গেলে দর্শক তৈরী করা চাইত। সেই জন্যেই ত ঐসব পণ্ডিত আর জ্ঞানী লোকেদের সঙ্গে থিয়েটারের যোগ রাখা দরকার।

আমার নাটক দেখে দু-চারজন যে মন্তব্য করেননি তা নয়। অবন বাবু আমার সীতা দেখে বললেন—অযোধ্যার সব কিছু ধপধপে সাদা হওয়া উচিত বলে মনে হয় আমার।

একজন বললেন—উনি বোধ হয় রঙীন আলো ফেলার কথা ভেবে বলেছিলেন।

বললেন—বেশ ত তাই না হয় মানলুম, কিন্তু আলো ফেলত কে? সতু যে শিখে এসেছিল, কি কাজে লাগলো? আমাদের দেশে আলোর imaginative use ত কই দেখি না? ওদের দেশে দশ ডলার হপ্তায় মাইনে নিয়ে কাজে লেগে শিখে আসা উচিত, নইলে ওরা ত শেখাবে না। আমি নিউইয়র্কে এক জায়গায় দেখলুম, ধুলো ওড়ার দৃশ্য দেখাচ্ছে, সত্যিকারের ধুলো উড়ছে যেন। বললুম—কি করে করছ দেখিয়ে দাও ত।

বললে—I will tell you later on. কিন্তু আর বললে না।

অন্য প্রসঙ্গে ফিরলেন—অপরেশ বাবুর কর্ণার্জুনই পার্শী মহাভারতের ওপর নির্ভর করে লেখা। জায়গায় জায়গায় হুবহু অনুকরণ। ওদের যে কায়দায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখানো হত কর্ণার্জুনেও এও তাই। বৃষকেতুর মাথা কাটাটাও ঠিক ওদের মত করেই দেখানো হত। এমনি scene এর পর scene মিলে যায়।

কর্ণার্জুনেতে আমি দুবার নেবেছি। তখন আমার টাকার খুব দরকার তাই করি। প্রত্যেকদিন তেরো'শ করে টাকা দিয়েছিল, করব না কেন? অপরেশ বাবুর খুব ইচ্ছা ছিল, আমি ওঁর বইতে পাঠ করি।

একজন বললেন—ওতেও সংস্কৃতও আবৃত্তি করেছিলেন।

বললেন—হ্যাঁ, তা করেছিলুম, কিন্তু যখন যা মনে হয়েছে বলেছি। নতুন কি দিচ্ছে? আমার শঙ্খধ্বনি দেখেছ কেউ? ওতে যে বুদ্ধি পড়া ছিল, তার চেয়ে ভাল বুদ্ধি পড়া দেখিয়েছে কেউ?

একজন ভাল নাট্যকার চাই—বিদেশী নাটকের সঙ্গে যার পরিচয় থাকবে না। বিদেশী নাটকের সঙ্গে পরিচয় থাকলে অনুকরণ করে বসবে। গিরিশ বাবুর ত ভাল করেই জানা ছিল। ধর ক্ষীরোদ বাবুর মত। না, ভুল করলুম, ঠিক বলা হ'ল না। ওঁরও খান কতক সেক্সপীয়রের বই পড়া ছিল, আর বেশ ভাল করেই পড়া ছিল। তখন বোধ হয় বি কোর্সেও ইংরেজী পড়তে হত।

১ই অক্টোবর যখন এলেন তখন মনে হল অসুস্থ। প্রশ্ন করাতে বললেন—শরীর ত আমার ভালই ছিল, কিন্তু সেই যে তোমরা সন্দেশ খাওয়ালে না তারপর থেকে রোজই সন্দেশ আসতে লাগলো, আর লোভের বশে খেয়েও বসলুম। অমল পাঠিয়েছিল চকোলেট কেক, ওটা আবার আমি খেতে ভালবাসি বলে pretend করি, কাজেই চার পাঁচ টুকরো খেয়ে বসে আছি। তার ফলে লিভার ফুলে পেটে ব্যাথা হয়েছে।

বলা হল, বোধ হয় হেপাটাইটিস হয়েছে আপনার।

হেসে বললেন—হেপাটাইটিস'ত ছিলই। কথাটা'ত গ্রীক, লিভার যখন আছে আর তার ওপর যা অত্যাচার হয়েছে তাতে খারাপ হওয়াটা ত আশ্চর্য কথা নয়।

আমার যখন থিয়েটার ছিল তখন বড়দিনের সময় বরাদ্দ ছিল ৪টি করে কমলালেবু আর দুটো করে কেক। তবে ভগবানের দয়ায় আর পয়সা আমদানী থাকায় কখনো গুণে খেতে হয়নি,

যার য'টা ইচ্ছে খেত। নির্মলেন্দু লাহিড়ীর দাদা, অমল বললেন—তোমাদের যেন কি রকম! ভাল ভীমনাগের সন্দেশ কিনে এনে খেলেই ত পারো।

আমি তাতে বললুম—ক্রীসমাসের সময় কেকই ত খেতে হয়।

ক্ষীরোদ বাবু নাটক লিখতেনও ভাল, বুঝতেনও ভাল, কিন্তু জিনিয়াই পরিবৃত থাকাতেই গোলমাল হল। নর-নারায়ণে দুর্বল লেখা খুব কমই আছে। যেটুকু আছে তাও ঐ ছাপা বইয়েতেই।

নর-নারায়ণের ভূমিকায় লেখা আছে, ক্ষীরোদদা নিজেই বইটা লিখেছেন। কি বলব বল, নিজের কথা বলতে লজ্জা করে। কি ঝগড়া ক্ষীরোদদার সঙ্গে বই নিয়ে।

বললেন—আমি বই লিখে অন্য থিয়েটারে অভিনয় করতে দিতে পারি। নর-নারায়ণ লেখার সময়কার কথা বলতে পারি, কেউ যদি "রাধেয়" বইটা জোগাড় করতে পার। বাঁকুড়া না বীরভূম কোথাকার এক কাগজে ১১২৩-২৪ সালে বেরিয়েছিল।

একজন বললেন—নির্মলশিব বাবুর কাগজে বেরিয়েছিল।

বললেন—তা হতে পারে। নির্মলশিব বাবু ত বুদ্ধিমান লোক ছিল।

ডাঃ অধিকারী এই সময়ে এসে ঢুকলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন—এই যে রাম, এস এস। তোমার কিছু বৃদ্ধি হয়েছে দেখছি।

এবার একজন কথা তুললে—মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নিলে চলবে কি না।

বললেন—চলবে না কেন? তবে লিজতো পাবে না। মাড়োয়ারীর ব্যাপার ত।

বলা হল, ওখানে হিন্দী-থিয়েটার হচ্ছে।

বললেন—করাবে না কেন? এককালে ওরা খুব বাঙলা বই দেখত। আজকাল রাজনৈতিক কারণে হিন্দীর ওপর ঝোঁক দিয়েছে। বলা হল, হিন্দী-থিয়েটারে মাইনে বেশী দেয়। মুনলাইট থিয়েটারে সীতা দেবী দেড় হাজার টাকা মাইনে পান। বললেন—ও আর এমন কি বেশী পাচ্ছে। সীতা যখন আমার থিয়েটারে কাজ করতে এল হিন্দী-থিয়েটারে ও তখনই সতেরো শ টাকা মাইনে পায়। আর গহর—যার বস্ত্রহরণ দেখে পরে নীহারের বস্ত্রহরণ হল—পার্শী থিয়েটারে কাজ করার সময় সেকালেই সব মিলিয়ে দু হাজার টাকা পেতো।

এবার কটা শো দেবার কথা বললেন—ইনষ্টিটিউটে নাটক করলে কি বিক্রী হবে? ঠিক করেছি, মানে একটু বাধা আছে, সেটা কেটে গেলেই চারটে অভিনয় করবো। কিন্তু কি করবো বল তো চারটে পুরোনো বই করব না নতুন বই একটা ধরব। দর্শকরা বসে অভিনয় দেখলে দেখতে পাবে না কেন? এই ত রবীন্দ্র ভারতীর কুড়ি ফুট ষ্টেজে অভিনয় করে এলুম, সবাই ত দেখতে পেলে।

নাটক পড়তে সুরু করলেন। খানিকটা পড়ার পর বললেন—নাটকের এই অংশটা খুবই সুন্দর। তবে পড়ে সমস্ত সৌন্দর্য্যটা বোঝানো যায় না, উঠে নড়ে চড়ে বলতে হয়। কিন্তু এখন ত তা পারবো না, সব পার্ট করবার দম পাবো না।

দৃশ্যটা শেষ করে বললেন—কেমন timely শেষ হয়েছে দেখ দৃশ্যটা। শেষ কথাগুলো না বললেও চলতো। অবশ্য এরকম ইংরেজীতেও আছে। Pinero'র বই এতেও এই রকম tune ending আছে

ইনষ্টিটিউটের আবৃত্তির প্রাইজ না পাওয়ার জন্তে আমার দুঃখ আছে। প্রথমবার ইংরেজী, বাঙলা দুটোতেই ফার্ষ্ট হয়েছিলুম। পরের বার ইংরেজী, বাঙলা, সংস্কৃত তিনটিতেই ফার্ষ্ট হতুম। কিন্তু বিনয়বাবু যখন কারা কারা আবৃত্তি করবে সেই নাম পড়ছিলেন, তখন আমার নাম পড়ে বললেন—না শিশির, তুমি নয়। ইংরেজীতে কাদারও তাই বললেন।

আমাদের সময় ইনষ্টিটিউট খুব জমজমাট ছিল। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত ইনষ্টিটিউট সবচেয়ে ভাল চলেছিল। সে সময় আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অনেক ভাল ভাল লোক হতেন বিচারক। পোপ পঞ্চাননও হয়েছেন। শাস্ত্রী মশায় হলে খুব ঝগড়া করতেন। গলার আওয়াজ পেতুম দেখেছি কি আর সত্যেন্দ্রনাথ (ঠাকুর) খুব ভাল আবৃত্তি করতেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক ভাল। আর কি উৎসাহ, খবর পেলেই আবৃত্তি শুনতে আসতেন। একাশী বছর বয়সে মারা গেলেন, তার দুবছর আগেও আবৃত্তি করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন।

সত্যেন্দ্রনাথ অবশ্য নব্বই পেরোন নি। সেদিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী গেছেন, বোধহয় যাঁকে তোমরা মহর্ষি বল—অষ্টাশী বছর।

প্রতাপচন্দ্র আবৃত্তি ভালই করতেন, উনি জজ হয়েছেন আমাদের পরে। কেশব বাবুর আবৃত্তি শুনিনি, বিনয় সেনের কাছে গল্প শুনেছি।

বিনয়বাবু আমাদের সম্বন্ধে কতকগুলো খারাপ ধরণের ধারণা নিয়ে এসেছিলেন। বললেন,—হ্যাঁ মশায়, আপনাদের সম্বন্ধে অমুকে অমুক কথা বললে—কথাটা মিথ্যে কথা। তাহলে ত তাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

উনি বুঝলেন না যে, আমাদের মত ছেলেরা যেমন সত্যি কথা বলে, তেমনি দরকার হলে মিথ্যে কথা বলতেও তাদের আটকায় না। তাঁকে মিথ্যে কথা বলার জন্তে লজ্জিত আছি। পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথায় কথায় বললেন—গিরীনের খবর কি? মাঝে ত অসুখ করে হাসপাতালে ছিল। এণ্টালীতেই ত আছে। যাব একদিন দেখা করতে। সত্যি গিরীন সেন বড় ভাল লোক। নরেন সেন, এটর্নী অফিসের মালিকও। ওর অনেক টাকা বন্ধুরাই আটকে দিলে। কিন্তু কষ্টে পড়েছি বলে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কাউকে ও কোনদিন ফেরায়নি। হাতে যদি একটা টাকা থাকে ত কেউ গিয়ে কেঁদে পড়লেই দিয়ে দেবে। অভিনেতাদের অনেককে অনেক টাকা দিয়েছে। দশ হাজার টাকা হাণ্ডনোটে দিয়ে বন্ধু বলে নালিশ করলে না। তবে ভি-কে দেড় লাখ টাকা দিয়েছিল, তার জন্তে নালিশ করলে না কেন, বুঝি না। দেড় লাখ টাকা ছেড়ে দেবার মত অবস্থা ওর নয়। ওইটাই বোধ হয় ওর স্বভাব।

বিনয়দা বললেন—নরনারায়ণ আপনি অভিনয় না করলে জমবে না। বললেন—বিনয়, কথাটা তোমার ঠিক নয়। নাটক যদি বোঝে আর চেষ্টা যদি থাকে যে কেউ হোক পারবে। তাছাড়া আমিও ত আছি, শিখিয়ে দিলে পারবে না কেন? আমি থিয়েটারের মত ৬০'×৪০' ফুট জায়গাই দাও না দেখি।

আধুনিক ইংরেজী নাট্যকারদের কার লেখা খুব ভাল বল ত? অবশ্য সিঞ্জের কথা বাদ দাও। রবার্টসনের লেখায় নতুনত্ব কই? বেশীর ভাগই ত jejune। শ'র পরে যাঁরা লেখেন—ককটেল পার্টি, কনফিডেন্সিয়াল ক্লার্ক লিখেছেন টি-এস-ইলিয়ট; সেপারেট টেবলস লিখেছেন, টেরেন্স র‍্যাটিগান তাছাড়া ফ্রাই—এঁদের লেখার মধ্যে গুণটা কি আছে? দিগ্বিজয়ী ব শঙ্খধ্বনিও ত খুব ভাল বই, ওদের তুলনায় ত বটেই। অ্যাবি থিয়েটারের জন্যেই আইরিশ নাটক ভাল হয়েছিল। ওর জন্যে টাকা খরচ করেছিলেন মিস্ হর্নিম্যান। কিন্তু তার আগে অবশ্য লেডী গ্রেগরী খুব খেটেছিলেন। প্রথম প্রথম টাকা পয়সাও দিয়েছিলেন উনি।

নর-নারায়ণের লেখা বইটার অবস্থা খুবই খারাপ। বাড়িতে এত করে বলছি, একটা কপি করতে তা আর কিছুতেই করছে না। আরো একটা কথা ছিল, কোথায় যে গেছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আসল কথা কি জান, যে কাজ আমরা করি তার ওপর আমাদের কোন শ্রদ্ধা নেই, তাই এমনিই ঘটে।

৮

এতদিন পর্যন্ত যে সব নাট্যকারের নাটক তিনি পড়েছিলেন তাঁরা নাট্যকার হিসাবে তাঁর অগ্রবর্ত্তী অর্থাৎ নাটক লেখা এবং নাট্যকার হিসাবে নাম তাঁরা শিশিরকুমার অভিনয় করতে আরম্ভ করার আগেই করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি এমন একজন নাট্যকারের নাটক পড়লেন যাঁর নাটকার হিসাবে খ্যাতি তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িত।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সীতা নাটক লেখেন দায়ে পড়ে। কারণ পূর্ব্ব-বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা শিশিরকুমার অভিনয় করতে পারেন নি। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা কৌশলে সীতার অভিনয় স্বত্ব কিনে নেন। নাটকটির অভিনয় করবার কোনরকম সদিচ্ছাই ক্রেতাদের ছিল না, এ শুধু নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।

শিশিরকুমারেরও গোঁ ছিল ভয়ানক। তিনি ঠিক করলেন সীতা তিনি অভিনয় করবেনই। তাই যোগেশচন্দ্রকে দিয়ে নতুন করে সীতা লেখালেন। সে নাটকের অভিনয় দেশে আলোড়ন তুলল কিন্তু বিজ্ঞজনের মত হল, নাটকটির কোন গুণ নেই। তার ফলে নাটকের সুনাম হল কিন্তু নাট্যকারের সুনাম হ'ল না বিশেষ।

পরবর্ত্তী জীবনে অনেকগুলি সামাজিক নাটক লেখেন যোগেশচন্দ্র আর কতকগুলি সুপরিচিত উপন্যাসের নাট্যরূপও দেন তিনি। এছাড়া বহু নাটকের কঠিন চরিত্রে অভিনয়ও করতেন তিনি। এইটুকুই মাত্র জানতাম আমরা।

শিশিরকুমারের মুখেই যোগেশচন্দ্রের একটি ইতিহাসাশ্রিত নাটকের খবর পেলাম, নাটকটি নাকি খুবই ভাল। স্থির হ'ল ১৬ই অক্টোবর এসে দিগ্বিজয়ী পড়বেন।

সেদিন যখন এলেন মনে হ'ল অত্যন্ত ক্লান্ত, সেকথা বলতে বললেন—শরীর আমার ভালই ছিল আবার দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি, একটু ক্লান্তি অনুভব করছি। তারপর আমাদের একজনকে বললেন—ডাক্তার, বলতে পার ক্লান্তি দূর করবার মত কোন ওষুধ আছে কি না? অবশ্য মদ নয়; মদের নেশায় ক্লান্তি দূর হয় না, একটু সময়ের জন্যে উপকার হয় মাত্র, তারপরেই একই অবস্থা দাঁড়ায়। ঐ যে লেখক—আলডুস হাক্সলি—কি ওষুধের নাম করেছেন যেন?

বলা হ'ল—মেস্কালিন। উৎসাহভরে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেস্কালিন! ও ত সিদ্ধিপাতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সিদ্ধি খেলে বোধহয় একটু ক্লান্তি দূর হয়। আফিং খেলেও হয় বোধহয়।

আমি একবার খেয়েছিলুম। whole night performance শেষ হবার আগেই শরীর আর বইছে না; তা যোগেশদা বললেন—যদি রাগ না কর ত তোমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বললাম—দিন।

তা ওঁর আফিংএর বড় গুলিকে তিন ভাগ করে ছটো আমায় খেতে দিলেন। খেয়ে উপকার হয়েছিল, কিন্তু তারপরের দিন খুব ঘুমিয়েছি।

দিগ্বিজয়ী পড়তে সুরু করবার আগে বললেন—দিগ্বিজয়ীর কথা হল—একজন যদি ক্ষমতা পায় ত তার মনে একটা মত্ততা আসে তা সে যে অবস্থা থেকেই আসুক না কেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ফল ভাল হয়না মোটেই।

এবার নাটকটা সম্বন্ধে বললেন—নাটকটা অভিনয় হয় ১১২৮ সালে, কিন্তু লেখা সুরু হয় ১১২১ সালে। আমি তখন মদন কোম্পানীতে চাকরী করি, ওরা একটা blood and thunder নাটক চেয়েছিল; সেই জন্যেই লেখা নাটকটা। তিন সাড়ে তিন ঘণ্টার নাটক অথচ মোটে ৬টি দৃশ্য। এত কম দৃশ্যে নাটক এর আগে বোধহয় লেখা হয়নি। মন্মথর একটা একদৃশ্যের নাটক আছে, নাম বোধহয় মুক্তির ডাকই হবে। হরিদাস বাবু বলতেন—বেশীদিনের কথা নয়: (শেষের দিকে কবছর আগে) ঐটাই আগে।

বলা হ'ল নাটকটি ১১২৬ সালের চব্বিশে ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয়। বললেন—তাহলে হরিদাস বাবু ঠিকই বলতেন।

আবার দিগ্বিজয়ীর প্রসঙ্গে ফিরলেন—দিগ্বিজয়ীর গল্পটা মোটামুটি ইতিহাস সম্মত। কিন্তু সাদাৎ আলিখাঁ আর চিন কিলিচ খাঁ—এরা দুজনে একসঙ্গে লড়েন নি। সাদাৎ আলি প্রথম দুদিন যুদ্ধে জেতার পর তৃতীয়দিন সকালে বন্দী হয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সৈন্যদের হার হল। অবশ্য প্রথম দুদিন তিনি জিতেছিলেন বলা ভুল, চেক করে রেখে দিয়েছিলেন। Irvine এর বইয়েতে সব কথাই লেখা আছে, তবে নাটকটা মার্টিমার ডুরাণ্ডের বইয়ের ওপর নির্ভর করেই লেখা।

সালে বেগ একটি historical character, লোকটি ছিল Idealist, আলি আকবর হচ্ছে পারস্য সম্রাট তামাসের ভাগনে! তামাসকেই বন্দী করে নাদির সম্রাট হন। তামাসের যে মেয়েকে উনি বিয়ে করেন আলি হল তারই কাজিন। ঐ যে সর্দারদের ডাকা হত—খোরাসানী, সিস্তানী, আবদাল আর অমনি তারা স্টেজে আসত। সেই সময় অন্ততঃ আটাশ জন স্টেজে থাকত তার পর দুজন দুজন করে বেরিয়ে যেত। তাদের পোষাকগুলো বড় সুন্দর হয়েছিল খরচও হয়েছিল খুব বেশী।

দিগ্বিজয়ী করার জন্যে ডেপথ খুব বেশী লাগে। দিল্লী পোড়ানো দেখাবার জন্যে নয়, প্রথম দৃশ্যের জন্যে। দিল্লী পোড়ানো দেখাতে বেশী জায়গা লাগবে কেন? ছোট জায়গাতে মসজিদের মিনার দেখালেই চলবে।

আমরা প্রথম দৃশ্যে ষ্টেজের চার ফুট ডেপথ ছাড়াও তার পেছনে বিশ ফুট একটা ঘর, চার পাল্লা দরজা খুলে কানাত লাগিয়ে তাঁবুর দরজা করে তার পেছনের বারো ফুট প্যাসেজ ম্যার গাছপালা শুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছিলুম। মোট ডেপথ প্রায় একশ ফুটের মত হয়েছিল। সিন উঠলেই তাই দর্শকরা হাততালি দিত। আজকে করতে গেলে অবশ্য কোন ষ্টেজে করা যাবে না করতে হবে ময়দানে।

পরে ষ্টারে করেছি কিন্তু এখন আর ষ্টারের ষ্টেজের সে ডেপথ নেই, দেওয়াল টেওয়াল তুলে ছোট করে দিয়েছে।

একজন বললেন—নাট্য নিকেতনে প্রবোধবাবুর থিয়েটারেও করেছিলেন দিগ্বিজয়ী, পেছনের প্যাসেজ পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন।

বললেন—প্রবোধের থিয়েটারে করেছিলুম? পেছনের প্যাসেজ পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলাম নাকি? হবে।

ভোলাদা এসেছিলেন এদিন, তিনি 'বিরাজ বৌ' করার সময় প্রোসেনিয়াম খুলে আর বজরাটা কেমন সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল সেই কথা তুললেন। উনি বললেন—প্রোসেনিয়ামটা খুলে দিয়ে ভালই করেছিলে ভোলা। বজরার দৃশ্যটাও খুব ভাল হয়েছিল—মাটি আর জলের তফাৎটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল।

এবার বিদেশী ষ্টেজের প্রসঙ্গে এলেন—ওদের দেশের ষ্টেজের ডেপথ খুব বেশী দেখা যায় না। ওদের সব চেয়ে বড় ষ্টেজ ব্রডওয়েতে ডেপথ ষাট থেকে সত্তর ফুট। তবে সব ষ্টেজেরই ওপেনিংটা খুব চওড়া। আরে আমরা যেখানে অভিনয় করেছিলুম—অ্যাণ্ডারবিল্ট—ছোট্ট ষ্টেজ তারই ওপেনিং ছিল আটাশ ফুটের মত।

বলা হল—শ্রীরঙ্গমের ওপেনিংও ত বোধ হয় ঐ রকমই ছিল। হেসে বললেন—শ্রীরঙ্গমের ওপেনিং কোনদিনই আটাশ ফুট ছিল না, বড় জোর চব্বিশ ফুটের মত হবে।

ভোলাদার 'শাস্তি কি শান্তির' ওপর খুবই ঝোঁক; ও নাটকটার কথা তুলতে উনি বললেন—'শাস্তি কি শান্তি' গিরিশবাবুর শেষ দিকের লেখা, তখন ওঁর ক্ষমতা কমে গেছে, তাছাড়া সেকেলে 'কনজার্ভেটিভ' ভাব বড় বেশী। নাটকটা উনিশশো দশ সালে লেখা।

অমৃতলাল বোসের কথা উঠলো। বললেন—অমৃতলাল বোসের নাটক সবগুলোই ভাল নয়। তবে গ্রাম্য বিভ্রাট যা লিখেছেন, একেবারে হুবহু ইলেকশনে কি হবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

এতক্ষণ চা খাওয়া হচ্ছিল, এবার আবার বই ধরলেন, বললেন—দিগ্বিজয়ী হল মহম্মদশাহের রাজত্বের কথা নিয়ে লেখা; আর যে একটা করেছিলুম—তখৎ-এ-তাউস জাহান্দার শাহের রাজত্ব নিয়ে লেখা। মাঝখানে রইল ফররুখশিয়ার জাহান্দারকে যে মেরেছিল, আর পরে রইল আমেদশা আবদালী—এই দুটো নাটক লিখলেই সুন্দর একটা সিরিজ হয়।

কিন্তু লিখবে কে? পড়াশোনা আছে এমন যুবক নাট্যকার কই? আমি গল্প বলে দিতে পারি, চরিত্র বোঝাতে পারি কিন্তু লিখতে পারিনা। আজকালকার দিনে পড়াশোনা করবে, খাটতে পারবে এমন একজন নাট্যকার সত্যি দরকার।

নাটকের জন্য কে কি করছে? ওই তোমাদের আকাদমী

রয়েছে। কিন্তু তারা করল কি? সবচেয়ে আনসাকসেসফুল নাট্যকারকে পাঠালে ডেলিগেট করে—যেন তার চেয়ে ভাল নাট্যকার এদেশে নেই।

আর ঐ যে সুলাজিনী ভদ্রমহিলা তাঁকে দুচার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন নাটক ত আমি বিশেষ পড়িনি। তাঁর বাবাকে গুলি করে মেরেছিল সেইজন্যে এই চাকরী তাঁকে দেওয়া হয়েছে।

এবার নাটক পড়তে সুরু করলেন, বললেন—তৃতীয় অঙ্কের এই দিল্লী পোড়ানোর দৃশ্যটা করতে পারলে খুব ভাল হয়। নাদিরের কথা শেষ হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ আর কোন কথা নেই। এই সময়টায় বাইরে থেকে চীৎকার, আর্ত্তনাদ, মেরে ফেললে, মলাম, ইত্যাদি শোনা যাবে আর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ক্রমশ: বেড়েই চলবে। এই দুটোকে ঠিকমত দেখাতে পারলে কথা না বলার জন্য খুব অসুবিধে হয় না।

ভারত নারীর চরিত্রটা একটু মেলো ড্রামাটিক ত বটেই। এতক্ষণ পর্যন্ত নাটকটা ছিল এপিসডিক কিন্তু সাধারণ ভারতনারীকে এখানে এনে নাটকটাকে সিম্বলিক করার চেষ্টা হয়েছে। ভালভাবে অভিনয় করতে পারলে চরিত্রটি কিন্তু ভালই লাগত। প্রথমে করেছিল কৃষ্ণভামিনী।

অভিনয়ের গুণে চরিত্র ত ভালই ফোটে। এমনকি ঐ যে গিরিশবাবুরা বলতেন—এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল তাতেও কি খারাপ হত?

আমাদের দেশে থিয়েটার এল হঠাৎ। তার আগে পর্যন্ত যে যাত্রা হত তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে সাহেবদের পুরো অনুকরণে, আমরাও করতে পারি দেখাতে তাঁরা থিয়েটার সুরু করলেন।

যাত্রারও অবশ্য বিকৃতি সুরু হয়েছিল। মতি রায় আর মথুর শাই এই বিকৃতির কারণ।

আমাদের সময় সংস্কৃত ভাল করে শেখানো হত। আমি তখনো স্কুলে পড়তে ঢুকিনি—বয়স কত হবে আট নয়, তখন থেকেই মুগ্ধবোধ পড়তে শুরু করি। স্কুলে যে ভাল সংস্কৃত পড়ানো হত তার জন্যে পোপ পঞ্চাননকে ধন্যবাদ দিতে পারি। আমাদের পাড়ায় পণ্ডিতেরা তখন খুবই আসা যাওয়া করতেন। আমরা তখন রমানাথ কবিরাজ লেনে থাকতুম।

হরিনাথ দের কাছে গিয়ে বললুম—স্যার, ফ্রেঞ্চ শিখতে চাই, কি বইটই পড়ব বলে দিন ত। তাতে তিনি বললেন—well youngman, it is best to have a mistress speaking the tounge আমি তখন মোটে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, বয়স আর কত হবে—ওঁর কথা শুনে একেবারে ভেবড়ে গেলুম। অভিনয় শেখানোর কথায় বললেন—সে রকম ছেলে পেলে ত শেখাই। দাঁড়াও আমার থিয়েটার হোক। এই ত একরকম আরম্ভ হয়েছে। এইবার এটাকে বাড়ালেই চলবে।

আমাদের দেশে যার যা কাজ নয় সে তাই করে। এই রাধাকৃষ্ণণ আসছেন জগদীশ বোসের শতবার্ষিকীতে বক্তৃতা দিতে। জগদীশ বোসের উনি কি বোঝেন? অবশ্য জগদীশ বাবুও ঐরকমই ছিলেন। একবার ওঁর একটা লেকচারের টিকেট ওখানকার স্কুলের মেয়েদের মধ্যে বিলোচ্ছেন। পান্নালাল এক স্কুলের সায়েন্সের মাষ্টারের জন্য টিকিট চাইতে গেছে। তাকে উনি বললেন—সে আমার লেকচার কি বুঝবে?

পান্নালালও মুখফোঁড় ছেলে, বললে—উনি স্কুলের মাষ্টার উনি বুঝবেন না কিন্তু এই যে (মেয়েদের দেখিয়ে) যাদের দিচ্ছেন এরা কি বুঝবে? তখন একটু চুপ করে থেকে দুটো টিকিট দিয়ে বললেন—যাও। কিন্তু আর যেন আসেনা।

কে একজন বললেন—শিকার ছবির জন্যে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

শুনে বললেন—শিকারের দরুণ চারলাখ টাকা খরচ হয়েছে বলছ? আমরা ত টাকা পাইনা। টাকা ত দেওয়া উচিত সরকারের।

কে একজন বললেন—সরকারের কাছে মাথা নীচু করলেই টাকা পাওয়া যায়।

বললেন—মাথা নীচু করলেই টাকা পাওয়া যায়? তাও যদি যেত আমি একশ বার মাথা নীচু করতে রাজি ছিলুম। কিন্তু তা ত পাওয়া যায় না। সরকার ত সব কিছুই গোলমাল করে দেয়।

অভিনেতার চেহারা ভাল থাকা একটা সৌভাগ্যের পরিচায়ক। ঐ যে ভদ্রলোক—কি যেন নাম—হ্যাঁ, জন ব্যারিমুর। লোকে বলত একেবারে হ্যামলেটের উপযুক্ত চেহারা। সে তুলনায় আমার একেবারে বাজে—বেঁটে, মোটা, চোখ ছোট ছোট তার ওপর আবার ভেতরে ঢোকানো। কিন্তু তাতে দমে গেলে চলবে না। ওই চোকা চোখকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে।

২৩শে অক্টোবর পুজোর ঠিক পরে একাদশী না দ্বাদশী। উনি আসতে সবাই প্রণাম করলাম, উনিও কোলাকুলি করে আশীর্ব্বাদ করলেন, তারপর বসে বললেন—শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে, পেটে ব্যথাও রয়েছে। এরপর কি হবে তা জানি! বাইরে যেতে পারলে শরীর ভাল হত কিন্তু যাব কি করে?

পাশের বাড়ি থেকে কাল প্রণাম করতে এসেছিল, ভদ্রলোকের দশটি মেয়ে! ভাব দেখি কি ভয়াবহ অবস্থা। দশটি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে, যাতে তারা রোজগার করতে পারে, ভালভাবে বাঁচতে পারে।

ওদের মাকে দেখলুম। তেরটি সন্তানের জননী কিন্তু কি অপূর্ব্ব স্বাস্থ্য। দিগ্বিজয়ী পড়তে শুরু করলেন—দিগ্বিজয়ী হল শক্তিমত্ততার মিথ্যাময়ী পরিণামের ছবি। শক্তিমত্তার ফল কখনই ভাল হয়না। এই সোভিয়েতেই দেখনা। লোকেদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছেনা? তুমি বলতে পার আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু তাই কি সব। তিরিশ বছর একটা প্রচণ্ড পাজি লোক কিনা নিজের ক্ষমতা চালিয়ে গেল। দেড় কোটি লোককে মারলে (ক্রুশ্চেভই বলেছে)।

দেশের লোকে সরকারের নামে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেই কিন্তু ওরাত তা করেনা। আর যারা দেখতে যায় তারা ভাল বলবে বলেই তৈরী হয়ে যায়। আর সবটাই ত আর ভাল নয়। এইত আমার এক পরিচিত লোক মার্কারি ট্রাভেলসকে তিন হাজার টাকা দিয়ে পনেরো দিনের জন্য ঘুরে এল। দোকানে দোকানে জিনিষপত্র সাজানো আছে তা তারা দেখেছে কিন্তু সেইটাই সব নয়।

[ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর

সাত

বাঁধ ভেঙ্গে দাও

এমনি করেই হঠাৎ রাতারাতি যক্ষপুরীর অন্দর মহলের নিয়ম কানুন গেল বদলে। চোদ্দ বছরের পুরোন বাধা নিষেধের সুদৃঢ় পাঁচিলগুলো ভেঙে চুরমার করে এল জীবনের সাড়া। যে বাড়ীতে সূর্য্যের আলোরও ঢোকবার হুকুম ছিল না। সেখানে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল বিদ্যাপীঠের সব ছেলেমেয়েরা। যক্ষপুরী আর সেই আগের যক্ষপুরী নেই। এ যেন বিদ্যাপীঠেরই আরেকটা বাড়ী।

প্রথম প্রথম খেলা চলত বাড়ীর মধ্যেই পাছে বাইরে বেরুলে পুলুর শরীর খারাপ হয়। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই আর পাঁচটা ছেলের মত পুলুও সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। যক্ষপুরীর বাইরের বিরাট মাঠে ফুটবল খেলা সুরু হল। কিছুদিন আগেও যেখানে শুধু ঝরে পড়া শুকনো পাতার রাজত্ব ছিল সেখানে আজ শুধু সবুজের ইসারা। ছেলে মেয়েদের চঞ্চল প্রাণের স্পন্দন, আদিকালের পুরোন গাছগুলোও যেন অনুভব করেছে, নতুন করে গজাচ্ছে সেখানে সবুজ পাতা। যে গাছে ফুল ফুটতে দেখেনি লোকে বছরের পর বছর সে গাছেও আজ ফুলের কি সমারোহ, রঙের কি কোলাহল।

ভোর বেলা পাখীর ডাকে পুলুর ঘুম ভাঙ্গে। আনন্দে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে মাঠের মধ্যে। নাম না জানা পাখীগুলোর দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। আর ভাবে, কোথা থেকে এল এই পাখীর দল।

—দেখিস, ঠাণ্ডা না লাগে।

পুলু পেছন ফিরে দেখে দাদু এসে দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

পুলু সোচ্ছ্বাসে বলে, না দাদু, ঠাণ্ডা আর লাগবে না। কিন্তু এসব কি পাখী তুমি নাম জান ?

দাদু পাখীগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে, জানতাম, ভুলে গেছি। এরাও যে আসেনি কত বছর।

—কেন দাদু ?

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কি জানি।

এ ধরণের উত্তরে পুলুর মন খুসী হয় না। সেদিন রেণুকাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, এখানে এতদিন পাখীরা আসেনি কেন দিদি ?

রেণুকা সহজ গলায় উত্তর দিয়েছিল, কেন আসবে, তুই যে ছিলি জেলখানার মধ্যে। যেখানে আনন্দ নেই, সেখানে ওরা যায় না। দেখ না আজ তোদের বাড়ীর চেহারাই বদলে গেছে, আলোয়, হাওয়ায়, ফুলে, পাখীর গানে কি আনন্দ। তোর মুখখানা যখন আনন্দে ঝলমল করে ওঠে ঠিক মনে হয় যেন তারই প্রতিচ্ছবি।

পুলু রেণুকার হাতটা ধরে বলে, সত্যি দিদি জীবনে যে এত আনন্দ তা আগে কখনো বুঝতে পারিনি।

রেণুকা হাসে, এখনই বা কতটুকু বুঝেছ ? এবার থেকে তোমায় নিজে কাজ করতে হবে।

—তার মানে।

—প্রশান্তরা যখন মাঠে ফুটবল খেলে তুমি বসে বসে দেখো, আমরা গান করি তুমি শোন। এবার থেকে তুমি নিজে খেলো, গান করো, দেখবে কাজের মধ্যে দিয়ে আরও কত বেশী আনন্দ পাবে।

পুলু কিন্তু ভয়ে ভয়ে বলে, আমি কি পারবো ?

—নিশ্চয়ই পারবে।

সেইদিনই বিকেলবেলা প্রার্থনা গানের সময় রেণুকা পুলুকে কাছে নিয়ে বসল। সকলের সঙ্গে পুলুও গলা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু একটু পরেই যেন হাঁপিয়ে পড়ে। থেমে গিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। রেণুকারা আর ইচ্ছে করেই সেদিকে নজর দেয় না। নিজেদের মনে গান করে যায়।

কেউ আর তাকে লক্ষ্য করছে না দেখে ক্রমশঃ পুলু সাহস পায়। লজ্জা কাটিয়ে আস্তে আস্তে গলা মিলিয়ে গান করতে

দিন আগত ঐ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

থাকে। গান শেষ হয়ে গেলে রেণুকা দেখে পুলুর চোখে জলের ধারা। ঝাপসা চোখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

রেণুকা মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করে। গান করতে ভাল লাগলো পুলু?

—আজ আমার প্রাণ আনন্দে ভরে গেছে। সত্যি নিজে গান না করতে পারলে এ সুখ কোন দিনই বুঝতে পারতাম না।

সেই দিন থেকে রোজ গানের সময় পুলু সকলের আগে বসে যায়, গলা ছেড়ে গান করে। খুশিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দূর থেকে দাদু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, এক বছর গান না শোনা কান তন্ময় হয়ে গান শোনে। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানায় কমলেশের দলকে, পুলুকে তারা সুস্থ সবল করে তুলছে এ কি কম কথা?

তবে মুস্কিল হয় খেলার সময়। পুলু এখনও ফুটবলের মাঠে যোগ দিতে পারে না। তার ভয় করে। দু'বার বল মেরে পুলু মাঠের উপরেই বসে পড়ে। প্রশান্ত এসে হাত ধরে টানে, চল, পুলু বসে পড়লি কেন?

পুলু করুণ চোখে তাকায়, আমি দম পাচ্ছি না।

—আস্তে আস্তে পাবে। ভয় কিসের?

—না, না আমি পারবো না। দেখছো না একটু দৌড়লেই আমি কিরকম পড়ে যাই।

প্রশান্ত সাহস দিয়ে বলে, অনেকদিন দৌড়ওনি বলে তুমি পড়ে যাও, একটু মনের জোর, দেখবে ঠিক খেলতে পারবে।

হয়ত প্রশান্ত জোর করে পুলুকে খেলাতে পারতো, কিন্তু ওর দাদু এসে বাধা দেন, পুলুর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিও না ওতে ওর শরীর খারাপ হবে।

প্রশান্ত বলবার চেষ্টা করে, পুলুতো আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে তবে আর বাধা দিচ্ছেন কেন?

বুড়ো গম্ভীর গলায় বলে। আমি কারুর সঙ্গে তর্ক করতে ভালবাসি না, পুলু চলে আয়।

পুলুকে নিয়ে বুড়ো বাড়ীর ভেতরে চলে যায়?

এরকম কিন্তু প্রথম প্রথমই হয়েছিল তার পরে ক্রমে সে মনের জোর পেয়েছে, ছেলেরা আসবার আগেই বল নিয়ে মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, খেলার সময় যতদূর সম্ভব মনের জোর করে বলের পেছনে ছোটাছুটি করেছে। তার জন্তে দু'একদিন যে বেশী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েনি তা নয় তবে মনের মধ্যে পেয়েছে চরম আনন্দ। আর পাঁচটা ছেলের মতই সে সুস্থ সবল। এতদিনের অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যের গণ্ডী পেরিয়ে সে বেরিয়ে আসতে পেরেছে এই তার পরম লাভ।

মাত্র এই কয়েক দিনের মধ্যে যক্ষপুরীতে যে এতখানি পরিবর্তন হয়ে গেছে তা বাইরের লোকেরা কেউই বুঝতে পারেনি। দরজা জানালা বন্ধ, [illegible] নিঃঝুম প্রাসাদের কথা লোকেরা প্রায় এক রকম ভুলেই গিয়েছিল, কিন্তু আজ সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পথিক-জন থমকে দাঁড়ায়। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে এ প্রাসাদ যেন রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে। ছেলে মেয়েদের কোলাহলপূর্ণ এ বিরাট বাড়ীতে যেন উৎসবের সমারোহ চলেছে। সকলেই একবার করে গেটের মধ্যে দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারে বুঝতে পারে না কার সোনার কাঠির পরশে এই ঘুমন্ত পুরী জেগে উঠল, কোথা থেকে এল এই সব ছেলে মেয়ের দল।

এ বিস্ময় শুধু সাধারণ লোকের জন্তেই নয়, সদাশঙ্কর নিজে অবাক না হয় পারেনি। কমলেশদের বার বার জিজ্ঞেস করেছে, আমি তো বুঝতেই পারছি না বুড়ো কি করে তোদের সবাইকে নিয়ে গেল, যে লোকটা আমার সঙ্গে একদিন ভাল করে কথা পর্যন্ত বলল না তার কিনা এতখানি পরিবর্তন।

কমলেশ হেসে উত্তর দেয়, আমরা যে তাকে ভালবাসি।

—কাকে? পুলুকে?

—দুজনকেই। নাতি, ঠাকুরদা। তাদের ভালবাসার সম্পর্কটা যে আপনারা দেখতে পাননি। পুলুর জন্তেই তার দাদু বেঁচে আছে, যদি সে আপনাদের প্রতি রূঢ় হয়ে থাকে তাও ঐ নাতির কথা ভেবেই। আমাকেও উনি ভালবাসেন।

শঙ্করদা কি যেন ভাবছিলেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, তবে উনি চিনির কল বসাতে দিচ্ছেন কেন? দেখছি তো কোম্পানীর মালিকরা রোজই এসে সামনের মাঠে ঘোরাঘুরি করছে।

কমলেশ দৃঢ় কণ্ঠে বলে, মিলও এখানে বসবে না, সামনের রবিবার ওদের লোকেরা আসছে মিহিরদাকে নিয়ে বুড়োর সঙ্গে পাকাপাকি কথা বলতে। বুড়ো আমাকে বলেছে সে সময় থাকবার জন্তে। যদি ইচ্ছে করে আপনিও আমার সঙ্গে আসতে পারেন।

সদাশঙ্কর মাথা নাড়ে না। মিহিরের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে তর্ক করতে চাই না।

রবিবার।

ইচ্ছে করেই কমলেশ আজ ছেলের দলকে পুলুর কাছে আসতে বারণ করেছে। পাছে মিহিরদাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অসুবিধা হয়। সকাল থেকেই কমলেশ আর পুলু যুক্তি করেছে কী ভাবে তারা কথা বলবে। কি করে বুঝিয়ে দেবে যে চিনির কল তারা বসাতে দেবে না বিদ্যাপীঠের সামনে।

পুলু উৎসাহ দিয়ে বলে, তুমি মিথ্যেই এত ভাবছ, দাদু ও জমি বিক্রি করবেন না।

—উনি তোমাকে বলেছেন।

—বলেননি, তবে ওর কথার ধরণ থেকে বুঝতে পেরেছি। তোমাকে উনি ভালোবেসেছেন, যে রকম আমাকে ভালবাসেন। তাই মনে হচ্ছে তোমার কথা উনি রাখবেন। কমলেশ জোর দিয়ে বলে, আমি বড় মুখ করে শঙ্করদাকে বলেছি—তোমার দাদু কলওয়ালাদের জমি দেবেন না। তাইতো' ভয় পাচ্ছি যদি উনি মিহিরদার কথায় রাজী হয়ে যান।

কথা হয়তো আরও চলতো কিন্তু পুলুর দাদু এসে পড়ায় তা থেমে যায়। উনি একটু হেসেই জিজ্ঞেস করেন, কৈ আজকে বড় ছেলের দলকে দেখতে পাচ্ছি না। কমল তুমি একা কেন?

কমলেশের বদলে পুলুই কথা বলে, ওদের সব মন খারাপ।

—কেন?

—যদি তুমি চিনির কল বসতে দাও। তাহলে যে বিদ্যাপীঠের সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

বুড়ো চোখ দুটো ছোট করে পুলুর দিকে তাকায়, তোকে বুঝি ওকালতি করতে বলেছে।

—কেউ বলেনি কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ওদের মনের কথা।

—এখন তো আর কলওয়ালাদের বাধা দেবার উপায় নেই। আমি যে ওদের কথা দিয়েছি।

কমলেশ হতাশ হয়ে পড়ে, সে কি কথা।

—আমি মিহিরকে বলেছিলাম কলোনীর বেশীর ভাগ লোকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে যে এই চিনির কল বসালে তাদের কোন আপত্তি হবে না। আজ সেই কাগজ সই করিয়ে আনার কথা। তা যদি আনে আমাকে জমি ছেড়ে দিতেই হবে। কথা দিয়ে তা না রাখলে তো চলবে না।

পুলুর ইচ্ছে ছিল দাদুর সঙ্গে তর্ক করে আর একবার বোঝায় কিন্তু মিহির তার দলবল নিয়ে বাইরের ঘরে এসে পড়ায় উনি চলে গেলেন। কমলেশরাও কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না দরজায় কান পেতে শোনে।

অনেকক্ষণ ধরে মামুলি কথাবার্তা চলে, তারপর হঠাৎ বুড়ো জিগ্যেস করে মিহিরবাবু কলোনীর বাসিন্দাদের অনুমতি পেয়েছেন?

মিহির সগর্ব্বে হেসে বলে, না পেলে আপনার কাছে আসবো কেন?

—তাদের সই নিয়ে এসেছেন?

—নিশ্চয়ই, মিহির ব্যাগ থেকে অনেকের সই নেওয়া কাগজ বার করে দেখায়।

বুড়ো ভালো করে কাগজটা দেখে নিয়ে বলে, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই, যে কোন শুভদিন দেখে আপনারা জমি রেজিষ্ট্রী করে নিতে পারেন।

কমলেশের আর শোনবার ধৈর্য্য থাকে না। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়, চেঁচিয়ে বলে, মিল বসাতে আমরা দেব না। জমি আপনারা পাবেন না।

কমলেশকে হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হয়ে ঢুকতে দেখে মিহির ডাক্তার চমকে ওঠে। কমলেশ তুমি এখানে?

—আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন, না মিহিরদা? ও সব মিথ্যে সই, আমি জানি। এবার পুলুর দাদুর দিকে তাকিয়ে সজোরে বলে। যদি সত্যিই জানতে চান কলোনীর বাসিন্দাদের মনের কথা কি? তাহলে সবাইকে ডেকে একটা মিটিং করুন, তাদের মুখের কথা আমরা শুনতে চাই। শুধু সই দেখবো কেন?

বুড়ো কমলেশের কথায় উৎসাহিত হয়, একথা মন্দ নয় মিহিরবাবু আপনাদের মাঠে সবাইকে জড়ো হতে বলুন, সামনা সামনি শোনো যাবে তাদের কী বক্তব্য।

মিহির বাধা দিয়ে বলে, মিছিমিছি এতে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। তর্কাতর্কি আর বাজে ঝামেলা।

কমলেশ তীব্র কণ্ঠে বলে উঠে, তবু সেইটাই উচিত মিহিরদা, লুকিয়ে চুরিয়ে সকলের সর্বনাশ করার চেয়ে, সামনা সামনি ঝগড়া করা ঢের ভালো।

—থাম তুমি আর মাঝখান থেকে ক্যাচ ক্যাচ করো না।

—সাচ্চা কথা শুনলে বুঝি মনে এত কষ্ট লাগে।

মিহির ডাক্তার শাসিয়ে যায়, ঠিক আছে দেখা যাবে মিটিংএর সময়, কালই আমি সবাইকে জড়ো করবো ময়দানে।

মিহির যা বলে গিয়েছিল সেই মতই ব্যবস্থা করল। পরদিন বিকেলবেলা মাঠে জড় হ'ল কলোনীর বাসিন্দারা। আজ সকলের মনেই উত্তেজনা, এ মিটিংএ কোন পক্ষে বেশীর ভাগ লোক যোগ দেবে তাই জানবার জন্যে সকলেরই আগ্রহ। মাঝখানে একটা টেবিল পাতা হয়েছে। সেখানে বসানো হয়েছে পুলুর দাদুকে, ওঁকেই যে রায় দিতে হবে জমি তিনি বিক্রী করবেন কিনা চিনির কলের মালিকদের। সব চেয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মিহির ডাক্তার, দেখলে মনে হয় আজকের নাটকের সে-ই যেন নায়ক। সকলের কানেই ফিস ফিস করে কথা বলে আসছে।

সদাশঙ্কর কিন্তু চুপটি করে বসে আছে আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে। এ মিটিংএ সে যেন দর্শক মাত্র, মণিকাদিরা এসে বার বার তাকে অনুরোধ করে শঙ্করদা আজ কিন্তু নিশ্চয় আপনাকে বক্তৃতা করতে হবে।

সদাশঙ্কর মৃদু হেসে মাথা নাড়ে, না আমি কিছু বলব না।

—তাহলে মিহিরদার কথার জবাব দেবে কে?

—যেই দিক, আমি নই।

মিটিং সুরু হয়ে গেল, বুড়ো সহজ কথায় জানিয়ে দিল এই মিটিংএর প্রয়োজন কি, কেন সে জমি বিক্রি স্থগিত রেখেছে এতদিন। কলোনীর বাসিন্দাদের স্বাধীন মতামত সে জানতে চায়।

চিনির কল বসানোর স্বপক্ষে যাঁরা বললেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান বক্তা হল মিহির ডাক্তার। নানা রকম যুক্তির অবতারণা করে সে বোঝাল এখানে··শিল্প গড়ে না উঠলে এ কলোনী বাঁচতে পারে না। সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে বলে, আদর্শ নিয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারব না, আমাদের খেতে হবে কাজ করতে হবে, কিন্তু কাজ কোথায়, এখানে চিনির কল বসলে সকলে কাজ পাবে, রোজগার বাড়বে। মানুষের মত আমরা বেঁচে থাকব। এ কলোনীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই আপনাদের সকলের কথা ভেবে তবেই আমি এই কাজে এগিয়েছি। এখন আপনাদের মতামত দিন।

মিহির ডাক্তার বলার সঙ্গে সঙ্গে সবার মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে সুরু করে, বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর বুড়ো চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে কি, মুখ ফুটে বলুন। আপনারা এখানে কল বসাতে চান, না, না।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন চীৎকার করে বললে, চাই, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কণ্ঠে তার সমর্থন শোনা গেল।

সদাশঙ্কর আর কোনদিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে উঠে চলে গেল। তার একলা চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে কমলেশের বুকটা গুর গুর করে কেঁদে ওঠে, চাপা উত্তেজনায় তার চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, নিজের অজান্তে সে দাঁড়িয়ে ওঠে, বুঝতে পারে না কখন সে বলতে সুরু করে দিয়েছে।

—আপনারা অনেকেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার পক্ষে কিছু বলতে যাওয়া হয়ত বাতুলতা। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কি করে ভুলে গেলেন সেই মানুষটাকে, যে আপনাদেরই জন্যে সব কিছু ত্যাগ করেছে।

কমলেশের কথা শুনে সকলেই তার মুখের দিকে তাকায়।

কমলেশ সজল কণ্ঠে বলে যায়, আমি বলছি শঙ্করদার কথা, যিনি একলা উঠে চলে গেলেন। নিজের হাতের তৈরী এই কলোনীকে স্বার্থান্বেষী ব্যবসাদারদের হাতে চলে যেতে দেখেও একটা প্রতিবাদ

করলেন না। যিনি চিরকাল আপনাদের দিয়ে গেছেন প্রতিদানে কিছু চাননি। যাঁর আদর্শ মানুষের মত মানুষ তৈরী করা এত সহজে তাঁকে আপনারা ভুলে গেলেন—

নিপুণ বক্তার মত কমলেশ বক্তৃতা দিয়ে যায়। কোথা থেকে এত কথা তার মুখে যুগিয়ে যাচ্ছে, সে নিজেই বুঝতে পারে না, মন্ত্র মুগ্ধের মত শ্রোতারা শোনে। এমনকি বুড়োর চোখ দিয়েও জলের ধারা নেবে আসে।

কমলেশ এই বলে তার কথা শেষ করে, যাঁরা কল কারখানা চান, তাঁরা যান না সহরে, কেউ তো তাদের বাধা দেয় নি। শঙ্করদা চেয়েছেন তাঁর এই আদর্শ বিদ্যাপীঠ থেকে মানুষ তৈরী করতে। আপনারা কি চান না, এই মানুষ তৈরীর কারখানা বেঁচে থাকুক। আপনারা কি চাননা এখানকার ছেলেমেয়েরা বিজয় গর্বে দেশে বিদেশে এখানকার আদর্শ প্রচার করুক।

কমলেশ থেমে গেলে বুড়ো সোচ্ছ্বাসে বলে ধন্য ধন্য সদাশঙ্কর, তোমার আদর্শ আজ সার্থক হয়েছে, তার প্রমাণ এই কিশোর। এখন আপনারা বলুন এ জমি আমি মিল ওয়ালাদের দেব, কি না?

সমস্বরে সকলে চীৎকার করে ওঠে, না।

মিহির ডাক্তারের মুখ কালো হয়ে যায়, হিংস্র সাপের মত তার চোখ দুটো জলে ওঠে?

সেদিকে কিন্তু কারুর খেয়াল নেই। সবাই এসে কমলেশকে সাধুবাদ জানায়। মণিকাদি'রা কোন কথা বলতে পারে না। তাদের চোখে জল। পুলু কোন সময় তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কমলেশের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গদ গদ স্বরে বলে আমি যেন তোমার মত মানুষ হতে পারি।

(আগামী বারে সমাপ্য)

কাজল মেয়ে

শাসিতরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে—শতবার ধুলেও নাকি কয়লার কালো রং মোছা যায় না। কথাটা কি সত্যি?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, পণ্ডিতেরা মাথা ঝুঁকিয়ে বলবেন, তুমি বল কিহে ছোকরা শাস্ত্রের কথা কখনও মিথ্যে হতে পারে। কক্ষনো নয়—কক্ষনো নয়।

কিন্তু তোমরা কি বল ভাই। সত্যিই কি কয়লার কালোবরণ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা যায় না? বড়ই চিন্তার কথা। একদিকে গুরুজনের বাক্য। অন্যদিকে বিজ্ঞানের। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার যেন ভায়া। কোনদিকে যাই।

আমি কিন্তু তোমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। কি করে এই ত। বেশ ধর, গুরুজনের কথা মানলাম জল দিয়ে শত সহস্রবার ধুলেও কয়লা কয়লাই থাকে। কোন রকমফের হয় না। আবার বিজ্ঞানের কথাও ঠিক। সে বলে, ধুৎ, শুধু জল দিয়ে ধুতে যাব কেন? কয়লার কালো অঙ্গে আগুন লাগিয়ে দাও। কোথায় যাবে কালোমেয়ের কালো-বরণ-রূপ। ঝলমলে সোনার হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠবে মেয়ে। উজ্জল কৌতুকে বলবে, ছুয়ো, ছুয়ো ছুয়ো।

এ যেন রূপকথার রূপকুমারের ব্যাঙ-বউ। ব্যাঙের খোলসটা পুড়িয়ে দিতেই কেমন লাল টুকটুকে মেয়ে বেরিয়ে এল। বিজ্ঞানও কাজলকন্যার কালো আবরণটি খুলে ফেলে অপূর্ব্ব সুন্দর রূপটিকে ধরে ফেলল।

রূপকুমার ব্যাঙ বউয়ের খোলসটা পুড়িয়েছিল উনুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে। কিন্তু এই কাজলমেয়ের ছদ্মবেশ হাজার বছরের। তাকে অনেক সন্তর্পণে অনেক কৌশলে পোড়াতে হয়।

তোমরা হয়ত বলবে, উনুনে ফেলে দিলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়, অত ঝামেলায় দরকার কি?

ঠিক কথা উনুনে ফেলে দিলে সোনার রূপটিকে ধরতে পারি বটে। তবে ক্ষণিকের জন্য। ডাল ভাতের সঙ্গে সঙ্গে উপকারটুকুও পেটের মধ্যে চলে যায়। তাতে লাভ খুব কম। অন্যদিকে কোক চুল্লির মধ্যে বিটুমিনাস মেয়েকে (এই যা, তোমাদের বলতে ভুলে গেছি মেয়েগুলো অবার তিন জাতের লিগনাইট, বিটুমিনাস অ্যানথ্রেসাইট। লিগনাইট মেয়ে বাদামী রংএর। এর শক্তি সামর্থও কম। বিটুমিনাস মেয়ে কালো। শক্তি সামর্থও লিগনাইট মেয়ের চেয়ে অনেক বেশী। অ্যানথ্রেসাইট মেয়ে কালো খুব কালো। আর দেমাক কি! গর্ব্বে মাটিতে যেন পা-ই পড়তে চায় না। এই জন্য দেখ হিংসুটে মেয়ের সংখ্যা অন্যান্য মেয়ের চাইতে কত কম। তা যাই বল আর তাই বল ক্ষমতা আছে মেয়ের)। গুঁড়ো করে ভরে দাও। তারপর চুল্লির মুখ বন্ধ করে আগুন লাগিয়ে দাও। নলের মধ্যে দিয়ে যে গ্যাস বেরিয়ে আসবে তার থেকে পাওয়া যাবে অনেক উপজাত দ্রব্য। যেমন আলকাতরা, রাস্তার পিচ, বেনজিন, এমোনিয়া সালফেট, রং, গন্ধক আরও কত কি? যে অগ্নিময় কয়লাগুলো বের করে নিয়ে আসা হল তাকে বলব কোক মেয়ে। এই মেয়ের দাম আধুনিক রাজকুমারদের বাজারে ভয়ানক চড়া।

কাজল মেয়ের উপকার সম্বন্ধে তোমাদের আর কিছু বলব না। কারণ তোমরা অনেকেই অনেক কিছু জান। আমার চেয়ে ত বটেই।

মেয়ের জন্ম ত হাজার হাজার বছর আগে। কিন্তু আমাদের দেশে কাজল মেয়ে কে আবিষ্কার করল। যুগ-যুগান্তর ধরে মাটির নিচে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রামগ্ন ছিল কাজল মেয়ে। হঠাৎ কোন অচীনপুরের এক রাজপুত্র এসে সোনার কাঠির পরশ বুলিয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারীকে ডেকে তুলল, ওঠ রাজকুমারী আর কতকাল ঘুমুবে। তোমাকে দেখবার জন্য পৃথিবী আজ পাগল।

পৃথিবী। অবাক বিস্ময়ে রাজকুমারের দিকে কাজল টানা দীঘল চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, পৃথিবী। সে আবার কোথায়?

মধুর হাসিতে ছেয়ে গিয়েছিল রাজকুমারের মুখ। বলেছিল, রাজকুমারী, তোমার চোখে সহস্র বছরের ঘুম, অনেক কিছু জান না তুমি। চল আমার সঙ্গে চল, দেখাব কত অজস্র আলো, কত বিচিত্র রং-এর আশা আকাঙ্ক্ষার ফুলঝুরি। জীবনকে উপভোগ করবে চল।

উঠে এলো রাজকুমারী। উঠে এলো ১৭৭৪ সালে রাণীগঞ্জে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা নিয়ে। বড় বড় নৌকো দিয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে আসা হল কলিকাতায়।

কলিকাতা! রাজকুমারী ডাগর ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল, আশ্চর্য্য, বিস্ময় সুন্দর।

১৮৫০ সালে ভারতবর্ষে এলো যন্ত্রদানব রেলগাড়ী। রাজকুমারীকে রাক্ষস ইঞ্জিনের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। সেদিন দারুণ কষ্ট হয়েছিল রাজকুমারীর। সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত অভিমানও। কিন্তু যখন দেখল ঐ বিরাট দানবটা তারই স্পর্শে হুস্ হুস্ করে ছুটতে সুরু করেছে তখন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছিল রাজকুমারী। নিজের যন্ত্রণা ভুলে গিয়েছিল একমুহূর্ত্তে।

১৮৯৪ সালে রাণীগঞ্জের সঙ্গে ঝরিয়ার সংযুক্তি ঘটল রেলপথের রাখী বন্ধনে। ১৯০০ সালে গড়ে উঠল আধুনিক শিল্পের বনিয়াদ। রাজকুমারীর আদরও বেড়ে গেল অসম্ভব রকম।

যুদ্ধের হিড়িকে রাজকুমারী সম্মান পেল প্রচুর। ঐশ্বর্য্য পেল মুঠো ভরে ভরে। কিন্তু বুকটা টন টন করে উঠল অব্যক্ত ব্যথায়। মানুষের হিংস্র লোলুপ মূর্ত্তি দেখে দু'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার স্নেহ ঝলমল চোখ বেয়ে। কিন্তু উপায় নেই। তার যে হাত পা বাঁধা।

যুদ্ধের পর এসেছে মন্দা। মন্দার পর আবার এসেছে সুদিন। রাজকুমারীকে আমরা আপনজন করে নিয়েছি। সে এখন আর রাজকুমারী নয়, আমাদের কাজল মেয়ে।

আজ বড় ভয়ের কথা শুনি। আমাদের অতি আদরের কাজল মেয়ের আয়ু নাকি বেশী দিনের নয়। মাত্র আর ৮০।৯০ বৎসর। কিন্তু কেন—কেন এই অভিশাপ। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমাদের বোকামির কথা মনে পড়ে।

কাজল মেয়ের প্রতি আমরা নির্দ্দয় ব্যবহার করেছি, যথেচ্ছ ভাবে তার গায়ে আঘাত করেছি। তাকে টেনে হিঁচড়ে তুলে এনেছি। এত অত্যাচার সে সহ্য করতে পারেনি। ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে পড়েছে। যখন তুলে এনে লাভের অঙ্ক কষতে গেছি দেখি আমাদের আশা অর্দ্ধেকের বেশী গুঁড়ো হয়ে গেছে।

ইংরেজরা আমাদের দেশের কাজল মেয়ের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য দেয়নি। যথেচ্ছ ভাবে হেলাফেলা করেছে। আর সেই মাশুল দিতে হচ্ছে আমাদের।

আবার যতটুকু অক্ষত দেহ পেলাম তার থেকেও বেশী উপকার নিংড়ে নিতে পারিনি। উপজাত দ্রব্যগুলির (আলকাতরা রং ইত্যাদি) অপমৃত্যু ঘটেছে ব্যবহারের দৈন্যতায়।

আমাদের দেশে যে পথগুলি দিয়ে কাজল মেয়ে পাতাল থেকে উপরে উঠে এসেছে সেই পথগুলি এত ছোট যে যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করা যায় না। ফলে কাজল মেয়েকে তুলে আনতে অনেক দাম দিতে হয়।

তাই আজ জাতীয় সরকার কাজল মেয়েকে রক্ষা করতে উঠে পড়ে লেগে গেছেন। নিয়ম করেছেন প্রতি বছর ১৪ নিযুত টনের বেশী কোক মেয়ে তৈরী করা যাবে না। আর কাজল মেয়েকে অতি সন্তর্পণে কৌশলের সঙ্গে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে করে পূর্ণ উপকার পেতে পারি কাজল মেয়ের কাছ থেকে।

ওগো কাজল মেয়ে, পাতালপুরীর রাজকুমারী তোমার ঘুম ভাঙ্গান সোনার কাঁঠি ছুঁইয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে উজ্জ্বল করে তোল।

আঠা

মুদ্রার পিঠে কাগজ সাঁটা

ভৌতিক মুদ্রা

যাদুকর এ, সি, সরকার

ফরাসী দেশে পাঁচ ফ্রা (Cinq Franc) মুদ্রার সাহায্যে একটি মজার ম্যাজিক সেবার আমি দেখিয়েছিলাম ফরাসী দেশের রুয়া সহরে আমার এক ফরাসী সম্পাদক-বন্ধুর বাড়ীতে। সম্পাদক-বন্ধুটি আমার ম্যাজিকের বিশেষ ভক্ত ছিলেন তাই তিনি ছিলেন আমারও খুব অনুরক্ত। মাঝে মাঝেই তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন তাঁর সহরতলীর বাড়ীতে নৈশভোজের জন্য। প্রায় দিনই ভোজের টেবিলে পরিচয় হত নতুন নতুন খাবারের সঙ্গে আর সেই সঙ্গে পরিচিত হতাম সহরেরই কোনও না কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে। ভোজনান্তে প্রত্যেকবারই আমাকে দেখাতে হত দু'একটি যাদুকৌশল সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে। এমনি ধারা একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম একটি খুব মজাদার খেলা। 'পাঁচ ফ্রা মুদ্রা অদৃশ্য করা'র খেলা। একটি পাঁচ ফ্রা মুদ্রা তুলে নিলাম ডান হাতে। বাঁ হাতে তুলে ধরলাম একটি কাগজের তৈরী গ্লাস। গ্লাসটাকে কাৎ করে ও উপুড় করে ধরে দেখালাম যে তাতে কোনও কারসাজি নাই। এর পরে ডান হাতের মুদ্রাটি গ্লাসের ভেতরে রেখে মন্ত্র পড়লাম। ফুস মন্তরে মুদ্রাটি হল উধাও। গ্লাসটাকে কাৎ করলাম, উপুড় করলাম মুদ্রাটির পাত্তা পাওয়া গেল না। দেখে তো সবাই অবাক! সেদিন সম্পাদক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে প্রথমেই দেখা হয়েছিল সম্পাদকের ছেলের সঙ্গে। সে তখন কাগজ, বোর্ড, আঠা ইত্যাদি নিয়ে এক মডেল তৈরী করছিল। তার ঝোলায় মধ্যে পেয়েছিলাম ছুটো ছোট সাইজের কাগজের গ্লাস। পকেট থেকে একটি পাঁচ ফ্রা মুদ্রা নিয়ে গ্লাসে ফেলে দিয়ে দেখলাম যে মুদ্রাটা গ্লাসের তলায় একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ব্যস সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল আবিষ্কার। মুদ্রাটার এক পীঠে লাগালাম গঁদের আঠা আর অন্য পীঠের মাপে কেটে নিলাম একটি অংশ একটি গ্লাসের তলা থেকে। এইটি সেঁটে নিলাম মুদ্রাটির অন্য পীঠে। খেলা দেখানোর সময়ে মুদ্রাটিকে এমন ভাবে দর্শকদের দেখালাম যে এর কাগজ লাগানো দিকটা তারা দেখতে পেলেন না। আঠা মাখানো দিকই শুধু তারা দেখতে পেলেন। গ্লাসের ভেতরে মুদ্রাটা রেখে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চাপ দেওয়াতে মুদ্রার আঠা মাখানো দিকটা সেঁটে গেল গ্লাসের তলায়। কাগজ লাগানো দিকটা দর্শকের নজরে পড়াতে তারা ভাবলেন বুঝি গ্লাসের তলাই শুধু দেখছেন তারা। বড় সাইজের রূপোর টাকা দিয়ে তোমরা এ খেলা দেখাতে পারবে।

কৈ-ভোলা

সুরেশচন্দ্র সাহা

মৎস্যশিকারের ইতিহাসে সেদিন এক স্মরণীয় দিন। সমুদ্রের অতি গভীরে আশানুরূপ মাছ না পেয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া অপেক্ষাকৃত অল্পজলে; প্রায় বার মাইল দূরে দেখা যাচ্ছিল বালুকাময় বেলাভূমি।

প্রায় একঘণ্টা পর জাল তুলে মাছ মিলল প্রচুর, প্রায় একশ' কাছাকাছি। সকলের আনন্দ আর উৎসাহ গেল বেড়ে। জালের কড-এণ্ড (COD-END) বা থলের আকৃতিতে নির্মিত প্রান্ত জলে থাকতেই চোখে পড়ল অপরিমিত মৎস্যরাশিতে আলোড়ন-তোলা এক বিরাট জীব, যদিও পূর্ণদৃষ্টিতে কবুল না হওয়ায় তার ধরণটা তখনই ঠাহর করা গেল না। কেউ মন্তব্য করল গজ-কচ্ছপ, কারও মতে পাঁচমণী ভেটকী; কেউ বা আট মণের শঙ্করমাছ কল্পনা করে অন্যের ছোবল এড়িয়ে কি করে লেজটি হস্তগত করা যায় তারই কল্পনা করছিল মনে মনে। কিস্তিবন্দী হারে চারবারে সমস্ত মাছকে ডেকের 'পর তুলে আনা হোল। তৃতীয় কিস্তিতে উঠল সেই বহু উৎসুক দৃষ্টির বিস্ময়; ভেটকী নয়, শঙ্কর নয়, গজ-কচ্ছপও নয়—বিপুলায়তন এক মৎস্যরাজ! সাগরতলে ছোট থেকে বড় নানা শ্রেণীর মাছই আছে যাদের মানুষ নামকরণ করেছে এক থেকে অন্যকে সনাক্তকরণের জন্য। নিজের শ্রেণীর মধ্যে এই মৎস্যপুঙ্গব শুধু যে রাজা নয়—একছত্র সম্রাট, এবং তার যথেচ্ছা বিচরণ যে নিজের অন্তহীন এলেকাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। মৎস্যকুলপঞ্জীতে এর নাম কৈ-ভোলা। মীন-বৈজ্ঞানিকরা বলেন সমুদ্রের নীচে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এর বাস। জানি না অগভীর জলে, কাদা আর বালির ভাঁজে এই অতি সৌখীন ভোলাকুল সম্রাট কি করতেই বা এসেছিল যার মূল্য দিতে হল নিজের জীবন দিয়ে—ছাড়পত্র ছাড়া রাজ্যসীমা লঙ্ঘন করে অপর রাজ্যের বন্দীশিবিরে প্রাণহারানোর মত। সাত ফুট লম্বা ধূসর রঙের কৈ-ভোলাকে কাত ক'রে ফেলা হোল জাহাজের ডেকে। চওড়াতেও কম নয়, প্রায় দু'ফুট—দৈর্ঘ্যের অনুপাত মিশিয়ে বেশ বেখাপ। সম্রাটোচিত সৌষ্ঠবের পরিচয় ছিল না মৎস্যরাজের অঙ্গে। লেজের দিকে আবার অশোভন ভাবে সরু, অবিভক্তপুচ্ছ। একটি বড় রুইমাছের আঁশগুলি যত বড়, এর গায়ের আঁশ তার চাইতে বেশ ছোট; গায়ে এমনভাবে আঁটা, দেখে মনে হচ্ছিল ঘনবুনটের সরু মূলীবাঁশের চাটাই। পিঠের উপরের দিককার ডানা হাড়-বের করা; সূঁচোল। উদ্যত বর্শাফলকের মত।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে জাহাজ-কর্মীরা সকলে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল ভাগাভাগি নিয়ে। কারও লেজটা চাই, কারও পেটি, কারও চাই মুড়োটা। কালিয়ার জন্য নয়, মুড়িঘণ্টের লোভেও নয়। বাড়ীতে গিয়ে পাঁচ জনে মিলে দেখা আর দশজনকে দেখানো এবং সেই সূত্রে উৎসুক মহলে লোকপ্রিয়তা অর্জনের তাগিদেই এই খণ্ডিত মৎস্য দেহের কাড়াকাড়ি। কালনেমীর লঙ্কাভাগের মত মৎস্যরাজের লেজ মাথা পেটের বণ্টন পরিকল্পনাও হল। প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত মহলের সমর্থন। সকলকেই নিরাশ হতে হল মৎস্যরাজকে অক্ষত অবস্থায় রাজধানী কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থায়। তখন আর কি করা যায়, মুখে আপ্যায়িতের হাসির রেখা টেনে বণ্টন পরিকল্পনাকারীরাই সুর পালটিয়ে মন্তব্য করলেন—ছুৎ ছাই কেটে ফেললে এত বড় মাছটার সৌষ্ঠব থাকে! আর একদল কর্মী তখন কৈ-ভোলা নিয়ে মেতে উঠেছে। নির্গত জীবন মাছটার স্বাভাবিকভাবে হাঁ করা মুখে যে পরিমাণ চাঁদা-চিংড়ি-ফ্যাসা জড়ো হয়েছিল তার ওজন দশ থেকে পনের সের। মুখের উপরে ও নীচে দু' পাটী দাঁত কণ্ঠনালী মুখাগ্র পর্য্যন্ত অর্দ্ধগোলীয়ভাবে সাজানো। প্রত্যেক পাটীতে আবার চারটে করে সারি। আর দাঁতগুলি দেখতে অনেকটা আমাদের মাড়ির দাঁতের মত। জালে বাঁধার জন্য জাহাজে থাকে লোহার তৈরী ফাঁপা বল। হঠাৎ একজন কর্মী মোহনবাগানের মাঠে খেলার পাঁচ নম্বর ফুটবলের মত এক ফাঁপা লৌহ গোলক নিয়ে অক্লেশে পুরে দিল মরা মাছটার মুখে। শেষে কৌতুকের আতিশয্যে আট ইঞ্চি মোটা রবারের পাইপ গলনালীতে প্রবেশ করিয়ে জল চালিয়ে দিল পেটে। ফলে মাছটার গলাপথে বেরিয়ে এলো আস্ত-গিলে-খাওয়া পরিপাক-হতে-থাকা বড় বড় কাঁকড়া, হাঙর, শঙ্কর ইত্যাদি এক থেকে দেড় সের ওজনের মাছ এবং মৎস্যজাতীয় জীবকুল। আর একজন ত মাছটার পিঠে তবলা বাজাতে বাজাতে গম্ভীর আওয়াজ সৃষ্টি করে ফেলল। অদূরবর্তী এক নীরব দর্শক এগিয়ে এসে মাছটাকে গভীর শোকে আঁকড়ে ধরে 'হায়রে বাপ, কাল এমন সময় কোথায় ছিলিরে' বলে মরাকান্না সুরু করে দিলে।

গভীর জলে মাছ ধরার দ্বিতীয় বছরে পাওয়া গিয়েছিল এক কৈ-ভোলা। তার পরে সকলেই উৎসুক অপেক্ষায় ছিল আরও দু' একটি মেলে কিনা এই দুর্লভ মাছ। ভগবান দাসের জালে হাঙর ধরা পড়েছিল গঙ্গায়। কিছু দিনের মধ্যেই ভগবানের জালে আটক হয়ে গেল আরও একটি বড় হাঙর। হাঙরের জোরে আর পত্রিকার প্রচারে ভগবান মাঝি সেই দিন থেকে বিখ্যাত ব্যক্তি। সমুদ্রে আমাদের জালেও রোজ ধরা পড়ে নানা আয়তনের শত শত হাঙর। অথচ হাঙরের নাম শুনলেই লোকে এখন মুখ হাঁ করে ফস করে বলে বসে—ভগবানের জালে ধরা হাঙরের সমান কি তোমাদের হাঙর? সেদিন ডায়মণ্ড হারবারের নদীতে দেখা গেল এক হাঙর, জোয়ারের স্তিমিত প্রবাহের সংগে সাঁতার কেটে চলেছে। দেখে মনে হল সাগরজলের আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে মামার বাড়ী বেড়াতে এসেছে হাঙর শিশু। তবু ভগবানদের হাতে পড়লে এদেরই হবে কত নাম ডাক। প্রথম দিনের কৈ-ভোলা যেদিন কলকাতায় এসেছিল সেদিন ত রীতিমত একটা খবর। আর একটার পর একটা যতই কৈ-ভোলা আসছে লোকে ততই জিজ্ঞেস করছে—এটা কি খাবার? অর্থাৎ সাগরে বড় মাছ যে পাওয়া যায় বেশ ভাল কথা। লেকিন, খাওয়া যাবে ত। না, আঁশ-হওয়া অতিবৃদ্ধ ছাগমাংসের মত রসনা তৃপ্তিহীন। লোককে দোষ দেওয়া যায় না, উপেক্ষা করারও উপায় নেই তাদের সমুদ্রের মৎস্যাভিজ্ঞতা হীন মন্তব্যকে। তবু ভগবান দাসের মত বার বার বিখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও নিশ্চিত বলা যায় আমাদের সেদিনের কৈ-ভোলা আকার আয়তন ওজনে আগের রেকর্ডকে সগৌরবে অতিক্রম করেছিল।

এই বিপুলদেহী মৃত কৈ-ভোলা কলকাতার দর্শনীয় আকর্ষণ

সৃষ্টি করেছিল। মেয়ে-পুরুষ যুবকবৃদ্ধ সবাই নয়ন সার্থক করেছিল মৎস্যরাজ দর্শনে। ব্যবস্থা থাকলে প্রদর্শনীর মারফতে দর্শনী আদায় হত বেশ।

ভালবাসার জয়

(মিশরের রূপকথা)

পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

এক যে ছিলেন রাজা। তাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষ ভরা ধনরত্ন। রাজার সুবিচারে প্রসন্ন প্রজারা রাজাকে ভালবাসে। তবু রাজার মনে সুখ নেই, রাণীর মুখে নেই হাসি, প্রজাদের মনে নেই আনন্দ।

কেন? কেন না রাজার না ছিল ছেলে, না মেয়ে। তাঁর অবর্ত্তমানে এ রাজ্যের রাজা হবে কে?

মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন, মহারাজ, মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠান। কখন কোন দেবতার বরে কি হয় বলা তো যায় না।

সেই দিন থেকেই রাজা আর রাণী প্রতিদিন উপবাস করে নানা দেবমন্দিরে গিয়ে সন্তান কামনায় পূজা দিতে লাগলেন। দিন যায়। শেষে দেবতার বরে রাজার ঘর আর রাণীর কোল আলো করে জন্ম নিল একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। রাজামশায় নিজের হাতে মন্দিরে পূজা পাঠালেন, কোষাগার খুলে ধরলেন রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণে। তারপর দেশের বড় বড় গণৎকারদের আনিয়ে রাজকুমারের ভাগ্য গণনা করতে বললেন।

গণৎকারেরা এসে রাজপুত্রের হাত দেখলেন, পা দেখলেন, কপাল, ঘাড় সব দেখে ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে কত কি সব আঁকলেন, তারপর নানা পাঁজিপুঁথি পড়ে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন—ছেলেটি বড় দুর্ভাগ্য!

সে কি? কেন? রাজা-রাণী শশব্যস্ত হয়ে হাতজোড় করে প্রশ্ন করলেন।

কারণ তার ভাগ্যে রয়েছে অপঘাত মৃত্যু। সে হয় কুকুরের, নয় সাপের কামড়ে কিংবা কুমীরের মুখে মারা পড়বে।

রাজামশায় ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন—এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রাজকুমারকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই?

একটি মাত্র উপায় আছে। রাজকুমারকে যদি তাঁর প্রিয়জনেরা সর্বদা সতর্ক সেবা-যত্নে ও ভালবাসায় ঘিরে রাখেন, কোন কারণে তাঁর মনে দুঃখ না দেন, তাহলে হয় তো এই ফাঁড়া কেটেও যেতে পারে। এই দুর্ভাগ্যটি ছাড়া রাজকুমারের ভাগ্যলিপি আর সব দিক থেকেই ভাল।

এই আশ্বাস দিয়ে গণৎকারেরা চলে গেলে রাজারাণী মহা ভাবনায় পড়লেন।

মন্ত্রীদের পরামর্শ মতন নগরের বাইরে নদীর ওপারে একটি পরিষ্কার খোলা নির্জন স্থানে চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে একটি প্রাসাদ তৈরী করিয়ে সেইখানে রাজকুমারকে তার মা আর দাস-দাসীদের সঙ্গে রেখে দেওয়া হল। রাজকুমার যাতে কখনও প্রাসাদের বাইরে না আসে সে জন্ত প্রাসাদের ফটকে সব সময়ে প্রহরীদের পাহারার ব্যবস্থা রইল। রাজামশায় প্রতিদিন রাজকার্য্যের শেষে রাজকুমারের জন্তে নানা খেলনা, খাবার ইত্যাদি নিয়ে সেই প্রাসাদে গিয়ে ছেলের সঙ্গে খেলা করতেন।

যত দিন ছোট ছিল তত দিন রাজকুমার সেই প্রাসাদে বেশ আনন্দেই রইল। কিন্তু বয়স বাড়ার পর সে আর বাড়ীর মধ্যে কোন আনন্দ পায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাড়ীর ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে নদীর পরপারের নগরের দিকে চেয়ে থাকে। রাজপথ দিয়ে কত লোক, গাড়ী ঘোড়া যাওয়া-আসা করছে। দূরের মরুভূমি পার হয়ে মাঝে মাঝে ব্যবসায়ীদের উটের দল তাদের গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে সহরে প্রবেশ করছে। ছোট ছোট ছেলেরা দল বেঁধে কখন পাঠশালায় পড়তে যায়, কখন রাজপথে নানা রকম খেলা করে বেড়ায়, গান করে। এদের দেখলেই রাজকুমারের মনে হয় সে বড় একলা, তার কোন খেলার সাথী নেই। এই কারাগারের মত প্রাসাদ ছেড়ে নদীর ওপারের রাজপথে যে ছেলেরা খেলা করছে তাদের সঙ্গে খেলা করতে ইচ্ছা করে রাজকুমারের। একদিন সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, অন্ত সবাইয়ের মতন আমিও কেন এই বাড়ীর বাইরে যেখানে ইচ্ছা যেতে পাই না?

রাজামশায় গম্ভীর হয়ে বললেন—কারণ তুমি রাজকুমার। প্রাসাদের বাইরে গেলেই অল্পবয়সী রাজকুমারদের বিপদে পড়তে হয়।

আর একদিন রাজকুমার দেখল, নদীর ওপারে তারই বয়সী একটি ছোট ছেলে একটা কুকুরের সঙ্গে খেলা করছে। সে আগে কখনও কুকুর দেখেনি, তাই ফটকের সামনে যে প্রহরী ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করল—ঐ ছেলেটা কি নিয়ে খেলা করছে?

প্রহরী উত্তর দিল—ছেলেটা কুকুরের সঙ্গে খেলা করছে।

রাজকুমার ছুটে গিয়ে তার বাবাকে ডেকে এনে কুকুরটাকে দেখিয়ে বলল—বাবা, আমার তো কোন খেলার সাথী নেই। তুমি যদি আমাকে ঐ রকম একটা কুকুর এনে দাও তাহলে আমি আর বাড়ীর বাইরে গিয়ে খেলতে চাইব না। আমার আর একলা একলা খেলতে ভাল লাগে না।

জ্যোতিষীরা বলেছিলেন রাজকুমার যেন কোন দুঃখ না পায়। তাই রাজামশায় ভাবলেন, একটা ছোট কুকুর পেলেই যদি রাজকুমার সুখী হয় তো ভালই। ঐটুকু কুকুরছানা আর তার কি ক্ষতি করবে?

রাজামশায় তখনই একজন চাকরকে নদীর ওপারে পাঠালেন। সে অনেক টাকা দিয়ে ছেলেটার কাছ থেকে কুকুরটাকে কিনে আনল। সেই দিন থেকে কুকুরটি রাজকুমারের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। তারা দুজনে সব সময়ে একসঙ্গে থাকে আর নানা রকম খেলা করে।

কয়েক বছর রাজকুমারের বেশ আনন্দেই কাটল। কিন্তু যখন সে যুবক হল তখন রাজপ্রাসাদের আরামের বন্দিজীবন তার অসহ্য হয়ে উঠল। সে চায় এই বন্দিশালার বাইরে নানা জায়গা দেখতে, নানা নরনারীর সঙ্গে মেলামেশা করে অনেক বিদ্যা শিক্ষা করতে। সে তার বাবাকে বলল—আমি আর এই ভাবে বন্দী হয়ে থাকতে পারব না। এবার আমাকে বাড়ীর বাইরে যাবার অনুমতি দিন আপনি।

ছেলে বড় হয়েছে, তার বোঝবার মত বয়স হয়েছে, তাই

রাজামশায় তাকে জ্যোতিষীদের গণনার কথা জানিয়ে বললেন—ঐ সব দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই তোমাকে প্রাসাদে আগলে রেখেছি।

রাজকুমার উত্তর দিল, বাবা, এ ভাবে বন্দিজীবন কাটানর চেয়ে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে মরাও ভাল। আপনি আমাকে বাইরে যাবার অনুমতি দিন।

কিন্তু রাজামশায় তাকে প্রাসাদের বাইরে যেতে দিলেন না।

কিছুদিন পরে মনের দুঃখে রাজকুমার অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন আর কোন উপায় না দেখে রাজামশায় ছেলেকে বাইরে যাবার অনুমতি দিলেন। রাজকুমার দেশ ভ্রমণে যেতে চাইলে তার সঙ্গে অনেক লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাকে দেশ ভ্রমণেও পাঠালেন। রাজধানী থেকে কিছুদূর যাবার পর রাজকুমার সঙ্গের লোকজন অস্ত্রশস্ত্র সব ফিরিয়ে দিয়ে একলাই বিদেশে যাত্রা করল। সঙ্গে নিল একমাত্র তার প্রিয় কুকুরটিকে। পথে যেতে যেতে সে ধনী গরীব সব রকম পথিকদের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করে তাদের কাছ থেকে নানা দেশের নানা রকম সংবাদ আর কাহিনী শুনতে লাগল।

এই ভাবে যেতে যেতে রাজকুমার উত্তর দেশের রাজার রাজ্যে এসে পৌঁছাল। এই রাজার একমাত্র মেয়ে ছিল অপূর্ব সুন্দরী। কাজেই দেশ-বিদেশের রাজারা তাকে বিয়ে করতে চাইছিলেন। কয়েকজন রাজা তো রাজকুমারীকে চুরি করেও নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিলেন। এদের হাত থেকে মেয়েকে রক্ষা করবার জন্য উত্তর দেশের রাজামশায় খুব উঁচু সাততলা একটা কেল্লা তৈরী করিয়ে তারই সব চেয়ে উপরের তলার একটা ঘরে রাজকুমারীকে রেখে দিয়েছিলেন। তবু নানা দেশের রাজা আর রাজপুত্রেরা ক্রমাগত রাজকুমারীকে বিয়ে করবার অনুমতি চেয়ে পাঠাতে লাগলেন। এদের মধ্যে থেকে যোগ্য পাত্র বেছে নেওয়া কষ্টকর। তাই রাজকুমারী বললেন—বাবা, আমি সব চেয়ে সাহসী আর বলবান লোককেই বিয়ে করব। আপনি ঘোষণা করে দিন, যে লোক পাঁচিল বেয়ে সাততলার উপরে আমার এই ঘরের জানালায় উঠতে পারবে, আপনি তারই সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।

রাজামশায়ের এই ঘোষণা শুনে দলে দলে রাজপুত্র, রাজা আর অন্যান্য বীরপুরুষেরা সেই সাততলার জানলায় ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই খাড়া পাঁচিল বেয়ে ওপরে ওঠা তো সহজ নয়? কাজেই সেই চেষ্টায় কেউ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাল, কারুর বা হাত-পা ভাঙ্গল। কিন্তু কেউই সাততলার জানালায় পৌঁছাতে পারল না।

একদিন রাজকুমার এই পথে যেতে যেতে দেখল, একটি খুব উঁচু দুর্গের সবচেয়ে উপরতলায় একটা খোলা জানালার সামনে একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দলে দলে নানা বয়সের লোক দুর্গের পাঁচিল বেয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। রাজকুমার একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করে রাজকুমারীর পণের আর রাজামশায়ের ঘোষণার কথা শুনে বলল—আমি ঐ জানালায় উঠে রাজকুমারীকে জয় করব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তার লোকেরা অবাক হয়ে দেখল, একটি বিদেশী যুবক দুর্গ-প্রাচীরের জল নিকাশের নালি, সরু কার্নিস ইত্যাদি ধরে তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতেই সে সাততলার জানালার সামনে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা নিজের গলার হার খুলে যুবকটিকে পরিয়ে তার হাত ধরে জানালার ভিতর দিয়ে দুর্গের মধ্যে তুলে নিল। এই দেখে প্রহরীরা ছুটে গিয়ে রাজামশায়কে খবর দিল—একজন লোক দুর্গ-প্রাচীর বেয়ে রাজকুমারীর জানালা দিয়ে তার ঘরে গিয়েছে। রাজকুমারীও তাকে বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছেন।

রাজামশায় জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে?

প্রহরীরা বলল, আমরা তাকে চিনি না। সে নিজেকে মিশরবাসী বলে পরিচয় দিয়েছে।

রাজার আদেশে প্রহরীরা সেই সাহসী যুবককে রাজসভায় নিয়ে এলে দীর্ঘ পথ-ভ্রমণে ক্লান্ত রাজকুমারের ছেঁড়া আর ময়লা জামা-কাপড় দেখে রাজামশায় বললেন—যত সাহসী আর বীরই হোক না কেন, আমি এই ভিখারীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।

রাজামশায়ের কথা শুনে দুঃখিত হয়ে রাজকুমার যখন সভার বাইরে যাচ্ছিল সেই সময়ে খবর পেয়ে রাজকুমারী এসে বলল—বাবা, আপনি যদি আপনার পণ রক্ষা না করেন তাহলে আমি অনাহারে প্রাণ দেব।

রাজামশায় মেয়েকে বড় ভালবাসতেন কিন্তু একটা ভিখারীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলে লোকে তাঁর নিন্দা করবে ভেবে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। সেই সময়ে একজন মন্ত্রী তাঁর কানে কানে বললেন—মহারাজ, আমি ঐ ময়লা কাপড়পরা ছেলেটিকে চিনি। সে মিশররাজের ছেলে।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজার সব আপত্তি দূর হয়ে গেল। তিনি ঐ যুবকটির সঙ্গেই খুব ঘটা করে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিলেন। রাজকুমারী ছাড়া তার আর কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না, তাই তিনি রাজকুমারকে আর দেশে ফিরতে দিলেন না। তাঁর অর্দ্ধেক রাজত্ব তাকে দিয়ে ঐ সহরেরই এক প্রান্তে নদীর ধারে একটা বড় প্রাসাদে মেয়ে-জামাইকে রাখলেন।

বিয়ের পর রাজকুমারের কাছে জ্যোতিষীদের গণনার কথা শুনে রাজকুমারী ভয় পেয়ে বললেন—কুকুরের কামড়ে মৃত্যুভয় যখন রয়েছে তখন তোমার কুকুরটাকে আর কাছে রেখ না। ওটাকে হয় মেরে ফেল, না হয় অন্য কোথাও সরিয়ে দাও।

কিন্তু রাজকুমার সে কথা শুনলেন না। বললেন—ঐ কুকুরটি আমার আশৈশবের বন্ধু। যদি কামড়াবার হত তাহলে অনেক দিন আগেই কামড়াত আমাকে। আমি কিছুতেই আমার এই প্রিয় সাথীকে ত্যাগ করব না।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজকুমার যখন নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময়ে একটা কুমীর নদী থেকে উঠে চুপি চুপি রাজকুমারের পেছনে এসে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। রাজকুমার সে কথা জানতে না পারলেও একজন পথিক কুমীরটাকে দেখতে পেয়েছিল। সে ছিল শিকারী। জঙ্গল থেকে শিকার করে বাড়ী যাচ্ছিল, তাই তার হাতে ছিল তীর-ধনুক আর সড়কী। সে সড়কী দিয়ে এক ঘা মারতেই কুমীরটা ভয় পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিকারীও রাজকুমারকে সাবধান করে দিয়ে বাড়ী চলে গেল।

রাজকুমারী এই ঘটনার কথা শুনে এতই ভয় পেলেন যে, তিনি সব সময়ে রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে লাগলেন যাতে তিনি আর কোন অতর্কিত বিপদে না পড়েন। কিন্তু তবু দুর্ভাগ্যের হাত এড়ান গেল না। এক গরমের দুপুরে রাজকুমার ঘরের মেঝেতে শীতলপাটির উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন আর রাজকুমারী ঘরের জানালার কাছে বসে একটা চাদরে ফুল তুলছিলেন। হঠাৎ দরজার কাছে একটা সর সর শব্দ শুনে রাজকুমারী চেয়ে দেখেন একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ সেই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। রাজকুমার দরজার ঠিক সামনেই শুয়ে। রাজকুমারী যদি কোন শব্দ করেন কিংবা নড়া-চড়া করেন তাহলে হয়তো ভয় পেয়ে সাপটা রাজকুমারকে কামড়ে দেবে। রাজকুমারী কি করবেন ভাবছেন, এমন সময়ে দেখলেন একজন চাকর জানালার কাছ দিয়ে যাচ্ছে। তিনি ইসারায় তাকে ডেকে এক বাটি দুধ এনে সাপটার কাছে রাখতে বললেন। চাকর তাড়াতাড়ি দুধ এনে ঘরের মাঝখানে রেখে সরে যেতেই সাপটা দুধের গন্ধ পেয়ে সেই বাটির কাছে গিয়ে দুধ খেতে লাগল। রাজকুমারীও সেই সুযোগে ঘরের কোণ থেকে রাজকুমারের তলোয়ারটা এনে সাপকে দু টুকরা করে কেটে ফেললেন।

এর পর কিছুদিন বেশ নিরাপদেই কাটল দেখে সকলে ভাবল, বিপদ বুঝি কেটে গিয়েছে। তাই রাজকুমার একদিন তাঁর কুকুর সঙ্গে নিয়ে আবার নদীর ধারে বেড়াতে গেলেন। কুকুরটা কিছুক্ষণ মনিবের সঙ্গে বেড়াবার পর হঠাৎ একটা হাঁসকে তাড়া করে নদীর দিকে ছুটে গেল। নদীর ধারে কাদার মধ্যে একটা কুমীর শুয়ে ছিল। কুকুরকে দেখে সে তাকে ধরবার জন্ত গুটি গুটি ডাঙ্গায় উঠে এল। কুমীরকে দেখেই কুকুর তার মনিবের কাছে ছুটে পালাল। এইবার কুমীরের নজর পড়ল রাজকুমারের দিকে। ছোট কুকুর ছেড়ে সে রাজকুমারকেই ধরতে গেল। সৌভাগ্য ক্রমে সেদিনও ঐ পথে সেই শিকারী কোথাও যাচ্ছিল। সে সড়কী হাতে তেড়ে আসতেই কুমীর নদীর দিকে পালাল। কিন্তু যাবার আগে কুকুরটাকে মুখে তুলে নিয়ে গেল। এই ভাবে প্রিয় কুকুরের মৃত্যুতে রাজকুমারের শেষ দুর্ভাগ্যেরও অবসান হল।

রাজকুমার এবার রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরে গেল। রাজা রাণীও ছেলে বউকে নিয়ে সুখে বাস করতে লাগলেন।

ছোট চাঁদ

মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়

আয় আয় ছোট চাঁদ, টিপ দিয়ে যা,
ঘুমের অতল-তলে খোকার কাজল চোখে
এক ছুটে টুপ করে, টিপ দিয়ে যা।
ঘুম ঘুম, চুম চুম, চাঁদ আয় আয়,
খোকন সোনার খেলাঘরের মাটির আঙিনায়,
মাটির হাতী, কাঠের ঘোড়া ভাঙা টিনের বাঁশী,
পা ভাঙা এক মস্ত রাজা খেলনা রাশি রাশি।
ব্যাট আছে, বল, ডাণ্ডাগুলি মেলাই আছে ঘুঁড়ি,
এমনি তরো সবই আছে নেইকো খেলার জুড়ি।
আকাশ থেকে নেমে এসে খোকার সাথে খেলবে?
খেলাঘরের রকেট বাজী তোমার আবার ঠেলবে।

তিন চিমটি

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

চিমটিদিদির আসল নাম দীপালি, গীতালি, রূপালি, বিচালি বা ঐ রকমই কিছু একটা হবে কিন্তু অন্তত আমি সেটা ভুলে গেছি। আমার কাছে ও শুধুই চিমটিদিদি। যতক্ষণ আমি ওদের বাড়িতে থাকি ওর একমাত্র কাজ হল আমাকে চিমটি কেটে চলা। না, চিমটিদিদির সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। চিমটিকাটা হচ্ছে ওর ভালবাসার লক্ষণ। ও যাকে যত ভালবাসে তাকে তত বেশি চিমটি কাটে—অবশ্য বাবাকে আর মাকে বাদ দিয়ে।

ওর চিমটি কাটার জায়গা হচ্ছে হাত দুটো। তাই ওদের বাড়ি যাবার আগে আমি ছ'তুটো ফুলহাতা গেঞ্জি আর ফুলসার্ট পরে নিই আর তার ওপর চাপাই কোট। যদি কোনোদিন ভুল ক'রে কোট আর ফুলহাতা গেঞ্জি গায়ে না দিয়েই ওদের বাড়িতে যাই, ফিরে এসে দেখি সারা হাতে কালশিটে পড়ে গেছে।

অথচ উপায় কিছু নেই। যদি ওর প্রশংসা করি তাহলে ও আহ্লাদে আটখানা। আর ওর খুশী হওয়া মানেই বেশি ক'রে চিমটি কাটা। আবার কোনদিন একটু গম্ভীর হয়ে থাকলে চিমটিদিদির মুখও গম্ভীর হয়ে যাবে অর্থাৎ ও রেগে যাবে। আর ও রেগে গেলেই—নাঃ, সে কথা চিন্তা করা যায় না।

একদিন আমার ছোট বোনের কাছ থেকে একটা গল্প শিখলুম। সেটা টাটকা টাটকা মনে থাকতেই চিমটিদিদিকে গিয়ে বললুম, আজ তোমায় একটা গল্প শোনাব চিমটিদিদি!

চিমটিদিদি তখন ওর দিদিকে চিমটি কাটার কাজে ব্যস্ত ছিল। সেই জরুরী কাজটা ফেলেই ছুটে এল।

বললে, কী? কী গল্প?

আমার গল্প আরম্ভ হ'ল: অতি প্রাচীন কালে চিমটিরাজ্য বলে একটা দেশ ছিল। সেই দেশের তিনজন চিমটি একবার দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। চিমটি তিনজনের একজন হ'ল রাজপুত্র, নাম শ্রীরামচন্দ্র চিমটি। আরেক জন হল মন্ত্রিপুত্র—শ্রীশ্যামচাঁদ চিমটি। তিন নম্বর কোটালপুত্র। তার আগে শ্রী নেই। সে শুধুই কাটচিমটি। সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় তিন বন্ধু একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। রামচিমটি আর শ্যামচিমটি বাইরে গেল খাবার জোগাড় করতে। কাটচিমটি ভেতরে রইল। আচ্ছা কে যেন ভেতরে রইল?

চিমটিদিদি মনে করিয়ে দিলে, কাটচিমটি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলুম। এবার বাছাধন! ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি! নিজের মুখে আমাকে চিমটি কাটতে বলেছ—এস চিমটি কাটি।

চিমটিদিদি এতটুকু বিচলিত হল না। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো বিলুদা?

আমি ঘাবড়ে গেলুম। মাথা চুলকে বললুম, নাইন টেন হবে।

নাক কুঁচকে চিমটিদিদি বললে, ছি! নিজেই জান না কোন ক্লাসে পড়ো? তাই তো এইরকম বুদ্ধি তোমার। ব্যাকরণ একেবারে জানো না।

ব্যাকরণ? নামটা যেন শোনা-শোনা মনে হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই

মনে করতে পারলুম না কোথায় শুনেছি। ভয় পেয়ে বললুম, কী করে বুঝলি বল্ তো?

আমি তোমাকে তুমি বলে ডাকি তো? চিমটি কাটতে বললে আমি তো বলব কাটো চিমটি—'কাটচিমটি' বলব কেন?

আমার মুখে কথাটি নেই। এতক্ষণে যেন মনে পড়ল ব্যাকরণ জিনিসটা কী।

চিমটিদিদি বললে, গল্পটা তুমি ঠিকই আরম্ভ করেছিলে শুধু মাঝখানে এসে সব গুলিয়ে ফেলেছ। রাজপুত্র আর মন্ত্রিপুত্রের নাম রামচিমটি আর শ্যাম চিমটি কিন্তু কোটালপুত্রের নামটা ঠিক হলো নি। ভেবে দেখো তো তুমি কী শুনেছিলে?

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম। কী ছিল কোটালপুত্রের নাম? যায় চিমটি? খা চিমটি? কিন্তু এগুলোর তো কোনোই মানে হয় না।

চিমটিদিদি জিজ্ঞাসা করলে, কী মনে পড়ল?

উঁহু, আর একটু দাঁড়াও।

ওর নামটা এমনিই যে কোনোদিন না শুনলেও মনে এসে যায়।

বটে! এমন আশ্চর্য নাম! এই বলে আবার ভাবতে লাগলুম।

আরো খানিক পরে চিমটিদিদি বললে, কী? মনে এল?

হতাশ হয়ে বললুম, না।

এবার ঠিক মনে আসবে! আচ্ছা বলো কোটালপুত্রের নাম কী ছিল?

ওর কথা শেষ হবার আগেই আমি বাঁ হাতে একটা ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করলুম। কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে আমার মাংস চেপে রয়েছে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে উঠলুম, বাপ চিমটি!

চিমটিদিদি খিল-খিল করে হাসতে হাসতে বললে, এতক্ষণ লাগল?

ক্রীষ্ট্‌মাস্ ষ্টার

শ্রীছায়া চৌধুরী

তোমাদের মধ্যে যারা যীশুর জন্মোৎসব দেখেছ, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে 'খৃষ্টমাস্ ট্রী'র সবচেয়ে উপরে একটি রূপালী তারা থাকে। এর কারণও হয়তো তোমরা জানো। তবু শুনে রাখো—এই ঝকমকে তারাটি দেখেই মহামনীষীরা জানতে পেরেছিলেন—পৃথিবীতে এক মহাপুরুষের আগমন হল—তাই তাঁরা নক্ষত্র দেখে দিক ঠিক করে বেথেলহেম যাত্রা করেছিলেন। আর সত্যিই সেখানে পৌঁছে শিশু যীশুকে দেখতে পেয়েছিলেন।

দু হাজার বছর আগে যে তারাটি সেই সব মহান্ পুরুষদের খৃষ্টজন্মে নির্দেশ করেছিল—সেই তারাটি নিয়েই এখন এক আশ্চর্য্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে—সে তারাটি কি সত্যিই তারা অথবা অন্য কিছু খুব উজ্জ্বল কোন পদার্থ? প্রশ্ন উঠেছে—সেটা কি নূতন কোন তারা অথবা ঝকমকে কমেট, উল্কাপিণ্ড বা কোন উপগ্রহের শেষ সময়ের আলোক?

তোমাদের কি মনে হয়? তবে বিজ্ঞানীদের মতে, নূতন তারার পক্ষে অতখানি উজ্জ্বল হওয়া সম্ভব নয়। প্রায় তিন শ বছর আগে হঠাৎ একটি নূতন তারা, সাধারণ তারাদের থেকে এক শ' গুণ—হাজার গুণ বেশী আলো দিয়েছিল। কিন্তু এই রকম হঠাৎ আলোয় ঝলমলানো তারাদের সংখ্যা নেহাৎই কম। আর প্রাচীনেরা এদের সংখ্যা গুণেও রেখেছেন। কাজেই খৃষ্টমাস্ তারাটি নূতন তারা নয় বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এবার প্রশ্ন উঠবে—এটা কমেট কি না? ঝকমকে একটা লেজ নিয়ে একটা কমেটও তো এ সময়ে দেখা দিতে পারে। এ সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া যায়। চীনীয় পণ্ডিতগণ হাজার হাজার বছর ধরে এই সব স্বর্গীয় বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ রেখে দিয়েছেন। তাঁদের সেই সব নথিপত্র ঘেঁটে যে একটি সত্য পাওয়া গেছে—তা হলো এই সময়ে সত্যিই একটি কমেট দেখা গিয়েছিল।

তবে বেশীর ভাগ ধর্মপ্রবণ লোকেদের বিশ্বাস যে, বেথেলহেমের সেই তারাটি শুধু একটি মাত্র তারা নয়—সেই উজ্জ্বল পদার্থটি হল মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনির একত্র সমাবেশ। অনেকেরই বিশ্বাস যে, প্রতি আট শ' বছর পর পর এই তিনটি গ্রহ একস্থানে এসে ত্রিভুজাকৃতি রূপ ধরে। পিছনে-ফেলে-আসা-বছরের মধ্যে গ্রহের গতিপথ হিসাব করতে করতে জ্যোতিবিদগণ বের করেছেন যে, যীশুর জন্মের সময় এই তিন গ্রহ একত্র হয়েছিল।

অবশ্য যীশুর জন্মের সঠিক সময় এ পর্য্যন্তও কেউ বার করতে পারেন নি। তবুও বিশেষজ্ঞদের মতে যীশুর জন্মসময় খৃঃ-পূঃ ১১ থেকে ৪ অব্দের মধ্যেই। তালিকা থেকে প্রমাণ হয় যে, রাজা হেরডের রাজত্বকালেই যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন এই রাজা হেরড খৃঃ-পূঃ চার অব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কাজেই এই সময়টাই যীশুর জন্মের শেষ তারিখ হতে বাধ্য। আর যদি এরও আগে জন্মে থাকেন, তবে সেটা হবে খৃঃ-পূঃ এগার অব্দ। এর আগে যীশু জন্মান নি। কিন্তু জ্যোতিবিদগণ বলেন যে, যীশু খৃঃ-পূঃ সাত অথবা ছয় অব্দে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। কেন না, এই সময়েই পৃথিবীর উপর-জগতে আকাশের বুকে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেছে। হয়তো দেবতারা তাঁদের প্রিয় পুত্রকে মর্ত্যের কঠিন মাটিতে নেমে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছিলেন আলোকশিখা জ্বালিয়ে রেখে। তাই তো সেই সব আশ্চর্য্য উজ্জ্বল নক্ষত্রদের তখন দেখা গেছে। আজও তাই বিশ্বাসী মানুষ 'খৃষ্টমাস্ ট্রী'র উপরে রূপালী তারা জ্বালিয়ে রেখে সেই স্বর্গের দেবশিশুকে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে আকুল আহ্বান জানায়।

বিজ্ঞান বার্তা

মার্কিণ কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাস

মহাশূন্য সন্ধান ও মহাশূন্য বিজয়ের পথে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবদান কি এবং কতখানি, গত এক বৎসরের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলেই তার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাবে।

১৯৫৯ সালে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১৪টি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরণ করেছে। এদের মধ্যে কয়েকটি এখনও মহাশূন্যে অবস্থান করছে এবং গোলাকৃতি অথবা ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। গত বৎসর ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরিত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে সেইগুলিরই বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই ১৫টি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে সাফল্য অর্জন করা ব্যতীতও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বহু দূর মহাশূন্যের তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্য আরও তিনটি মহাশূন্যসন্ধানী রকেট ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে দু'টি রকেট দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর তাদের কক্ষ পরিক্রমা শেষ করেছে। তৃতীয়টি এখনও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, এর সূর্য পরিক্রমা চলবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যের রহস্যসন্ধানে এ পর্যন্ত যতগুলি মহাশূন্যযান শূন্যে নিক্ষেপ করেছে তার মধ্যে সর্বপ্রথমটি হল "১নং এক্সপ্লোরার"। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯.৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী। সর্বশেষ মার্কিণ উপগ্রহটি ছোড়া হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর। এটির নাম "৮নং ডিসকভারার"।

মহাশূন্য সম্পর্কে আরও জ্ঞানলাভের জন্য এবং মানুষের মহাশূন্য যাত্রাকে সম্ভব করে তোলার পথ প্রস্তুত করার জন্য মহাশূন্য যুগের অগ্রদূত এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির প্রত্যেকটির ওপর মার্কিণ বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। এরা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে বিশ্বের সর্বত্র বিজ্ঞানীদের তা সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে তাঁদের গবেষণার কাজে সহায়তা হয়।

১নং এক্সপ্লোরার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রত্যাশিত তথ্য আবিষ্কার করেছে। যে দুটি 'ভ্যান অ্যালেন তেজবিকিরণ বলয়' বিষুবরেখার নিকট পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, তার একটি আবিষ্কার করেছে ১নং এক্সপ্লোরার। দ্বিতীয়টি আবিষ্কার করেছিল ৩নং পাইওনীয়ার।

১নং এক্সপ্লোরার শূন্যে প্রেরিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী। এটির জীবৎকাল তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসরকালের মধ্যে হবে বলে আশা করা হয়। এর বেতারযন্ত্র বর্তমানে স্তব্ধ হয়ে গেছে, বিজ্ঞানীরা দূরবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রাদির সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ থেকেই এখনও বহু মূল্যবান তথ্য এই উপগ্রহটির কাছ থেকে সংগ্রহ করছেন।

বেতার প্রেরকযন্ত্রটি যতদিন সক্রিয় ছিল ততদিন পর্য্যন্ত ১নং এক্সপ্লোরার যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে তার মধ্যে রয়েছে মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণের ও অতি সূক্ষ্ম উল্কার পুনঃপুনঃ সংঘর্ষের বিপদ এবং এক্সপ্লোরারটি যখন উত্তপ্ত সূর্যকিরণ থেকে পৃথিবীর অতি ছায়াশীতল অংশের দিকে চলে যায় তখন 'এর মধ্যে তাপমাত্রার যে পার্থক্য ঘটে সেই সংক্রান্ত তথ্যাবলী। ১নং এক্সপ্লোরার থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ করেছে যে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা যে পর্যায়ে থাকলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলি বিনা বাধায় চালু থাকতে পারে, তাপমাত্রা সেই পর্যায়ে বজায় রাখা সম্ভব এবং আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, অতিসূক্ষ্ম উল্কার সংঘর্ষ অথবা মহাজাগতিক ধূলিকণা মহাশূন্য ভ্রমণের পক্ষে গুরুতর বিপজ্জনক নয়।
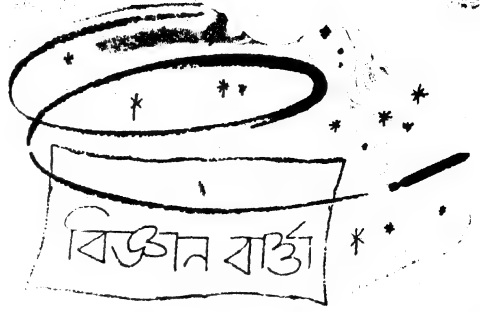
দূরবীক্ষণ ইত্যাদির সাহায্যে ১নং এক্সপ্লোরারের পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভূচৌম্বক ও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র, বিভিন্ন পর্যায়ে আবহমণ্ডলের ঘনত্ব এবং পৃথিবীর আকৃতি ও আয়তন সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য অবগত হচ্ছেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ১নং ভ্যানগার্ড মহাশূন্যে প্রেরিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি অন্ততঃ ২০০ বৎসর কক্ষপথে অবস্থান করবে। এর কারণ এর কক্ষপথ এটিকে নিয়ে গেছে বহু ঊর্ধ্বে—প্রায় ২৫০০ মাইল ঊর্ধ্বে—যেখানে আবহমণ্ডল অত্যন্ত পাতলা এবং তা অত্যন্ত অল্প ঘর্ষণ সৃষ্টি করে।

১নং ভ্যানগার্ডের উপাদানসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল এর ব্যাটারীগুলি। উপগ্রহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট অন্যতম বেতার প্রেরকযন্ত্র চালু রাখার জন্য এই ব্যাটারীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাটারীগুলি সিলিকন সেল দ্বারা প্রস্তুত এই সেলগুলি সূর্যের তেজকে বৈদ্যুতিক প্রবাহে পরিবর্তিত করে। অতি সূক্ষ্ম উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সেলগুলি বহু বৎসর পর্যন্ত কার্য্যকরী থাকবে।

১নং ভ্যানগার্ডের কক্ষপথে পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা মহাশূন্যের অবস্থা সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য লাভ করেছেন। ৪৭০ মাইল ঊর্ধ্বে বাতাসের ঘনত্ব সম্পর্কে তথ্যাদি লাভ করা গিয়েছে। ইতঃপূর্বে আর কোন কৃত্রিম উপগ্রহ ১১০ মাইলের ঊর্ধ্বে বায়ুস্তরের কোন তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করতে পারেনি।

পৃথিবী গোলাকার, তবে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে কিঞ্চিৎ চাপা বলে চিরাচরিত যে ধারণা রয়েছে ১নং ভ্যানগার্ডের সাহায্যে জানা গেছে যে তা ভুল, পৃথিবীর আকৃতি ন্যাসপাতি জাতীয় ফলের অনুরূপ।

তৃতীয় সফল উপগ্রহটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ২৬শে মার্চ। এর নাম ৩নং এক্সপ্লোরার, এটি প্রায় তিন মাসকাল কক্ষপথে অবস্থান করেছিল। ঐ সময়ের শেষে কক্ষপথের নিম্নাংশ অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ১০০ মাইল ঊর্ধ্বে আবহমণ্ডল দিয়ে যাওয়ার সময় বায়ু সংঘর্ষণজাত উত্তাপে এই উপগ্রহটি ধ্বংস হয়। এর কক্ষপথের সর্বাধিক উচ্চতা ছিল প্রায় ১,৭৪০ মাইল।

মহাজাগতিক বিকিরণ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করাই

আমেরিকা মহাশূন্যচারী পাইওনীয়ার-৪ উৎক্ষেপণ করছে

চারটি সৌরকক্ষ প্যাডল হুইলসহ এক্সপ্লোরার-৬কে দেখা যাচ্ছে

EXPLORER I EXPLORER III
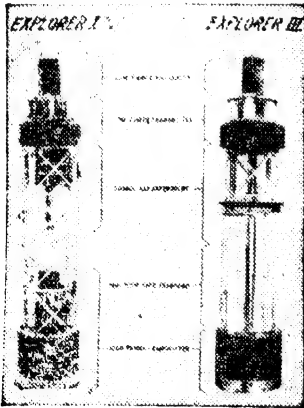
দুইখানি এক্সপ্লোরার—১নং ও ২নং এক্সপ্লোরার-এর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি

৩নং এক্সপ্লোরারের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল এবং এদিক থেকে এ সাফল্যলাভ করেছে। যে সকল তথ্য এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে তা থেকে 'ভ্যান অ্যালেন তেজ বিকিরণ বলয়' সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে।

পরবর্তী উপগ্রহ ৪নং এক্সপ্লোরার মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ২৬শে জুলাই। মহাজাগতিক বিকিরণ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য লাভ করাই এই কৃত্রিম উপগ্রহের লক্ষ্য ছিল। ১নং এক্সপ্লোরার ও ৩নং এক্সপ্লোরারের সাহায্যে তেজ বিকিরণ-সংক্রান্ত যে তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল তার আরও সূক্ষ্ম পরিমাপ সম্ভব হয়েছে ৪নং এক্সপ্লোরারে সন্নিবিষ্ট দুটি গাইগার কাউণ্টারের সাহায্যে। ১৫মাস যাবৎ কক্ষপথ পরিক্রমণের পর এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ১৯৫৯ সালের ২২শে অক্টোবর কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর দুটি মহাশূন্যসন্ধানী রকেট মহাকাশে প্রেরণ করে। এদের অন্যতম ১নং পাইওনীয়ার নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৬ই ডিসেম্বর।

১নং পাইওনীয়ার প্রায় ৭১,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে উঠেছিল, ৩নং পাইওনীয়ার উঠেছিল ৬৩,০০০ মাইল ঊর্ধ্বে। ১নং পাইওনীয়ার পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে, মহাশূন্যে সূক্ষ্ম উল্কাকণার ঘনত্ব সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেছে। ৩নং পাইওনীয়ার পৃথিবী বেষ্টনকারী দ্বিতীয় ভ্যান অ্যালেন তেজ বিকিরণ বলয় আবিষ্কার করেছে।

আইওয়া ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জেমস এ, ভ্যান অ্যালেনের নামানুসারে 'ভ্যান অ্যালেন তেজ বিকিরণ বলয়ে'র নামকরণ করা হয়েছে। ডাঃ ভ্যান অ্যালেন ৩নং পাইওনীয়ারের তথ্য সংগ্রহে সাফল্যের কথা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন :

১। পৃথিবী বেষ্টনকারী তেজ বিকিরণ অঞ্চল ভেদ করে বলয়ের গঠন ও বিস্তৃতি নির্ধারণ, ২। পৃথিবীকে কেন্দ্র করে দুটি সুস্পষ্ট বিকিরণ বলয় আবিষ্কার, ৩। পৃথিবী থেকে দূরে মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা পরিমাপ, এবং ৪। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র কতদূর পর্যন্ত কার্য্যকরী থাকে সে সম্পর্কে নতুন জ্ঞান লাভ।

মহাশূন্যে প্রেরিত পরবর্তী মার্কিণ কৃত্রিম উপগ্রহের নাম 'অ্যাটলাস সবাক উপগ্রহ'। ১৯৫৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর এটি মহাকাশে যাত্রা করে। প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার বড়দিন উপলক্ষ্যে বিশ্ববাসীকে যে শান্তি শুভেচ্ছার বাণী শুনিয়েছিলেন তা টেপ রেকর্ডিং করে এই উপগ্রহ মারফত পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েছিল। এই সর্বপ্রথম মহাশূন্য থেকে মানুষের কণ্ঠ শোনা গেল। উপগ্রহটি ১৯৫৯ সালের ২১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কক্ষপথে অবস্থান করেছিল।

মহাকাশবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, সবাক অ্যাটলাস সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ একটি নতুন দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এক পর্যায়ে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠ থেকে একই সঙ্গে ৭টি বিভিন্ন সংবাদ গ্রহণ করে ও তা' টেপ রেকর্ডিং যন্ত্রে লিপিবদ্ধ করে রাখে, এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্র পর্যায়ক্রমে তা পৃথিবীতে প্রেরণ করে।

এর পর এল '২নং ভ্যানগার্ড।' ১৯৫৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এটি মহাকাশে উঠল। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ১০০ বৎসর বা তার চেয়েও বেশি দিন কক্ষপথে বিরাজ করবে বলে আশা করা যায়, তবে এর বেতারপ্রেরক যন্ত্রগুলি বহু পূর্বেই অচল হয়ে গেছে। একটি বেতারপ্রেরক যন্ত্র ২৭দিন যাবৎ, অপরটি ২৩দিন যাবৎ বহু তথ্য প্রেরণ করার পর বন্ধ হয়েছে।

নতুন ধরণের কৃত্রিম উপগ্রহ '১নং ডিসকভারার' মহাশূন্যে প্রেরিত হল ১৯৫৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী। ১,৩০০ পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহটি চোঙ্গাকৃতি। এই উপগ্রহটিই সর্বপ্রথম উত্তর ও দক্ষিণমেরু অঞ্চল অতিক্রম করে যায়। এর কক্ষপথ ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত।

পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহযোগে মানুষকে মহাশূন্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ১নং ডিসকভারারের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। পাঁচ দিন কক্ষপথে অবস্থানের পর ১৯৫৯ সালের ৫ই মার্চ এটি সমুদ্রে পতিত হয়।

এর পর মহাশূন্যসন্ধানী রকেট ৪নং পাইওনীয়ার ১৯৫৯ সালের ৩রা মার্চ পৃথিবী থেকে মহাশূন্য অভিমুখে ধাবিত হয়। ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে এটি সূর্যপ্রদক্ষিণকারী কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছায়। বিজ্ঞানীদের মতে এ লক্ষ লক্ষ বৎসর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে।

ডিসকভারার শ্রেণীর দ্বিতীয় উপগ্রহটি হল ২নং ডিসকভারার, এই উপগ্রহটি ১৯৫৯ সালের ১৩ই এপ্রিল উত্তর-দক্ষিণ মেরু কক্ষপথে উপনীত হয়। ১৩ দিন পরে এটি কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়।

১৯৫৯ সালের ৭ই আগষ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্মরণীয় 'প্যাডস্ হুইল উপগ্রহ' ৬ষ্ঠ এক্সপ্লোরার মহাশূন্যে প্রেরণ করে। এই উপগ্রহের দেহসংলগ্ন চারটি প্যাডল্ বা পাখনা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সৌরকোষ দিয়ে গড়ে উঠেছে। উপগ্রহটিতে ১৫টি বড় রকমের বৈজ্ঞানিক তথ্য পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ভ্যান অ্যালেন তেজবিকিরণ বলয়, পৃথিবীর মেঘাবরণ, মহাশূন্যে উল্কাকণা, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য লাভের উপযোগী করেই এই যন্ত্রপাতিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬ষ্ঠ এক্সপ্লোরার উর্ধ্বে মহাকাশে যে স্তরে পৌঁছেছিল পূর্ববর্তী কোন কৃত্রিম উপগ্রহের পক্ষে সে পর্যন্ত পৌঁছান সম্ভব হয়নি। এই উপগ্রহটি সর্বপ্রথম যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে তন্মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর একটি টেলিভিশন চিত্র এবং মহাশূন্যে তেজবিকিরণ সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য। পৃথিবীর চিত্র গৃহীত হয়েছিল ১৭,০০০ মাইল উচ্চ থেকে এবং তাতে উত্তর মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের বৃহৎ অংশের ওপর মেঘাবরণ লক্ষ্য করা গেছে।

মহাশূন্যে তেজবিকিরণ সংক্রান্ত গবেষণায় ৬ষ্ঠ এক্সপ্লোরার বিজ্ঞানীদের যে তথ্য সরবরাহ করেছে তাতে এরূপ ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীর ভূচৌম্বক বিষুবরেখার উর্ধ্বে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটনের তেজস্ক্রিয় বলয় বা এযাবৎ
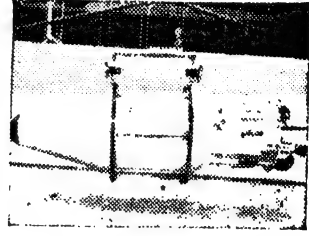
এখানে দেখা যাচ্ছে সর্ব্বাধুনিক মার্কিণ কৃত্রিম উপগ্রহ 'ডিস্কাভারার'। কালিফোর্ণিয়ার ভ্যাণ্ডেনবার্গ বিমানবাহিনী ঘাঁটি থেকে বিমানবাহিনীর লোকেরা একে উৎক্ষেপণ করে।
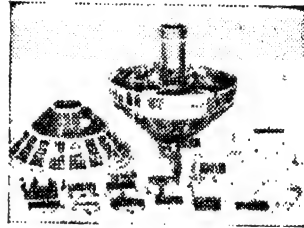
একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কতক বিচ্ছিন্ন অংশ দেখা যাচ্ছে। ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে জুনো-২ শূন্য যান কর্তৃক এগুলি উৎক্ষিপ্ত হয়।

অনাবিষ্কৃত ছিল। এই বলয়টি পৃথিবীর ১,২০০ মাইল উর্ধ্বে রয়েছে এবং বলয়টির ঘনত্ব ৩০০ মাইল। এই নতুন বলয়টি পূর্বাবিষ্কৃত ভ্যান অ্যালেন বলয়ের অংশ নয়।

১৯৫৯ সালে আগষ্ট মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ডিসকভারার শ্রেণীর আরও দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ শূন্যে উৎক্ষেপণ করে—'পঞ্চম ডিসকভারার' ১৩ই আগষ্ট ও ৬ষ্ঠ ডিসকভারার ১৯:শ আগষ্ট তারিখে। এই উপগ্রহগুলির মোচাকৃতি অগ্রভাগের মধ্যে ছিল দূরত্বপরিমাপক যন্ত্র। কারিগরিবিদ্যা বর্তমানে যে স্তরে উপনীত হয়েছে তাতে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে প্রেরণ করে বিস্ফোরণের সাহায্যে তার যন্ত্রসমন্বিত মোচাকৃতি অগ্রভাগটিকে বিচ্যুত করে দেওয়া এবং সমুদ্রে পতিত হওয়ার পর পরীক্ষার জন্য ঐ অগ্রভাগটিকে উদ্ধার করা সম্ভব কি না নির্ধারণ করাই এই উপগ্রহগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আগামী দিনে টেলিভিশন ক্যামেরা প্রভৃতি মহাশূন্যে প্রেরণ ও পুনরায় তা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পথ প্রস্তুত করার জন্যই এই পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এদের অগ্রভাগগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা করা হবে। পঞ্চম ডিসকভারার ১৯৫৯ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর

ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল ঘাঁটি থেকে থার-এবল-৩ রকেট আপন নাসিকাগ্রে এক্সপ্লোরার-৬কে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং ৬ষ্ঠ ডিসকভারার কক্ষচ্যুত হয় ২০শে অক্টোবর।

এর পর ১৮ই সেপ্টেম্বর মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয় '৩য় ভ্যানগার্ড'। এর জীবৎকাল ৩০ থেকে ৪০ বৎসরকাল হবে বলে আশা করা হয়। অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রপাতি এর মধ্যে রয়েছে। মহাশূন্যের অবস্থা সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য এ সরবরাহ করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। চৌম্বকঝঞ্ঝা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও অন্ধকারেই রয়েছেন। চৌম্বকঝঞ্ঝার কারণ কী? আবহাওয়ার মত চৌম্বক-ঝঞ্ঝা সম্পর্কেও কি পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব? এ নিবারণের উপায় কী? বিজ্ঞানীরা আশা করেছেন ৩য় ভ্যানগার্ড এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অতঃপর ১৯৫৯ সালের ১৩ই অক্টোবর ৭ম এক্সপ্লোরার মহাশূন্যে প্রেরণ করে। প্রায় ২০ বৎসরকাল এটি কক্ষপথে থাকবে বলে আশা করা যায়। মহাশূন্যে শক্তিশালী মহাজাগতিক রশ্মি ও সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত এক্স রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মি প্রভৃতি নানা ধরণের বিকিরণ পরিমাপ করার উপযোগী যন্ত্রপাতি এই কৃত্রিম উপগ্রহটির মধ্যে রয়েছে। এই যন্ত্রপাতিগুলি সর্বসমেত ৭টি পরীক্ষাকার্য চালাচ্ছে। এর মধ্যে চারটি পরীক্ষা হল মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ সংক্রান্ত, একটি পরীক্ষা উল্কাকণা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং অবশিষ্ট দুটি হল কৃত্রিম উপগ্রহের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের তাপের পরিমাপ এবং মহাশূন্যের পরিবেশে অরক্ষিত সৌরকোষের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা। পৃথিবী কতখানি প্রাণশক্তি সূর্য থেকে লাভ করছে এবং কতখানি শক্তি মহাশূন্যে ফিরিয়ে দিচ্ছে তা নিরূপণ করাই তেজস্ক্রবিকিরণ পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৫টি কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে শেষ দুটি উপগ্রহ ৭ম ডিসকভারার ও ৮ম ডিসকভারার মহাশূন্যে প্রেরিত হয় যথাক্রমে ৭ই ও ২০শে নভেম্বর।

আবার বসন্ত এল

জয়শ্রী সেন (বসু)

আবার বসন্ত এল নতুন আশার বাণী লয়ে
এল কি নতুন দিন, সূর্য্য তার প্রসন্ন নয়ন
মেলে দিল নীলাম্বরে, যতদূরে দেখি
সোনালী রশ্মিতে তার মেঘেদের অপূর্ব্ব বয়ন!

কল-কারখানা ধোঁয়া, হেথা ত্রস্ত-ব্যস্ত মানুষেরা
দশটা-পাঁচটা সার দলে দলে কেরাণীর ভীড়ে
শান্তি নেই, নেই যেন জীবনের বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা
শুধু ক্লান্তি, হৃদয়েরে কঠিন বন্ধনে রাখে ঘিরে।

তবুও বসন্ত আসে, ইট-কাঠে ভরা কলকাতা
তবুও কোকিল ডাকে, সবুজেরা তবু যেন হাসে
দীপ্তি হীন, তৃপ্তি হীন মরুতীর্থ এই তো পৃথিবী
তবুও জড়তা ভেঙ্গে বসন্ত আবার ফিরে আসে।

ভাল ছেলে

—সুব্রত ত্রিপাঠী

আলোক চিত্র

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না।]

চলমান দোকান

—দীপক ঘোষ
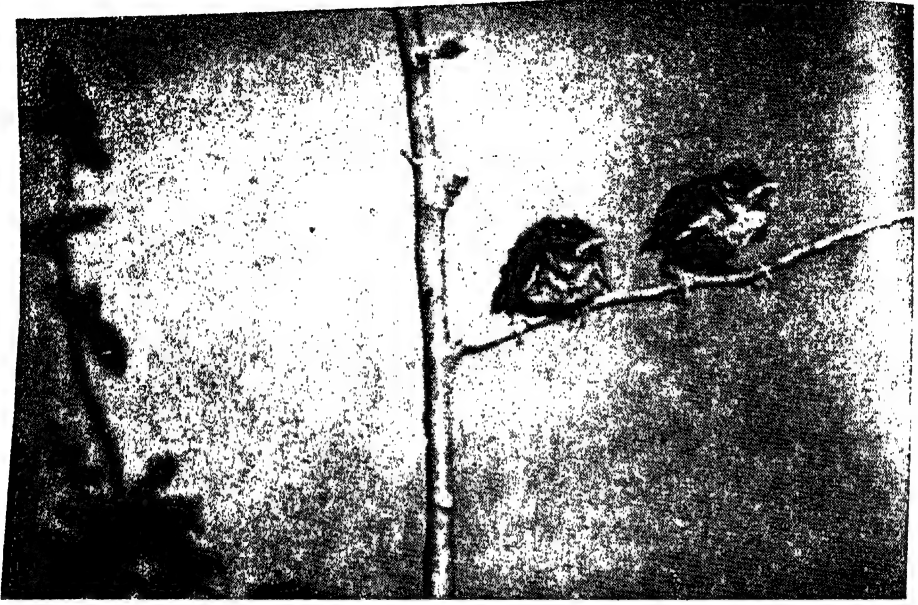
অবাক পৃথিবী।

—বিশ্বরূপ সিংহ

বিশ্রাম

—শেফালী চট্টোপাধ্যায়

ভাই-বোন

—টু ভিও বীণা

—প্রফুল্ল মিত্র

সাজসজ্জা

শ্রমজীবী

—কুমারকান্তি রাউত

বিপ্লবের সন্ধানে
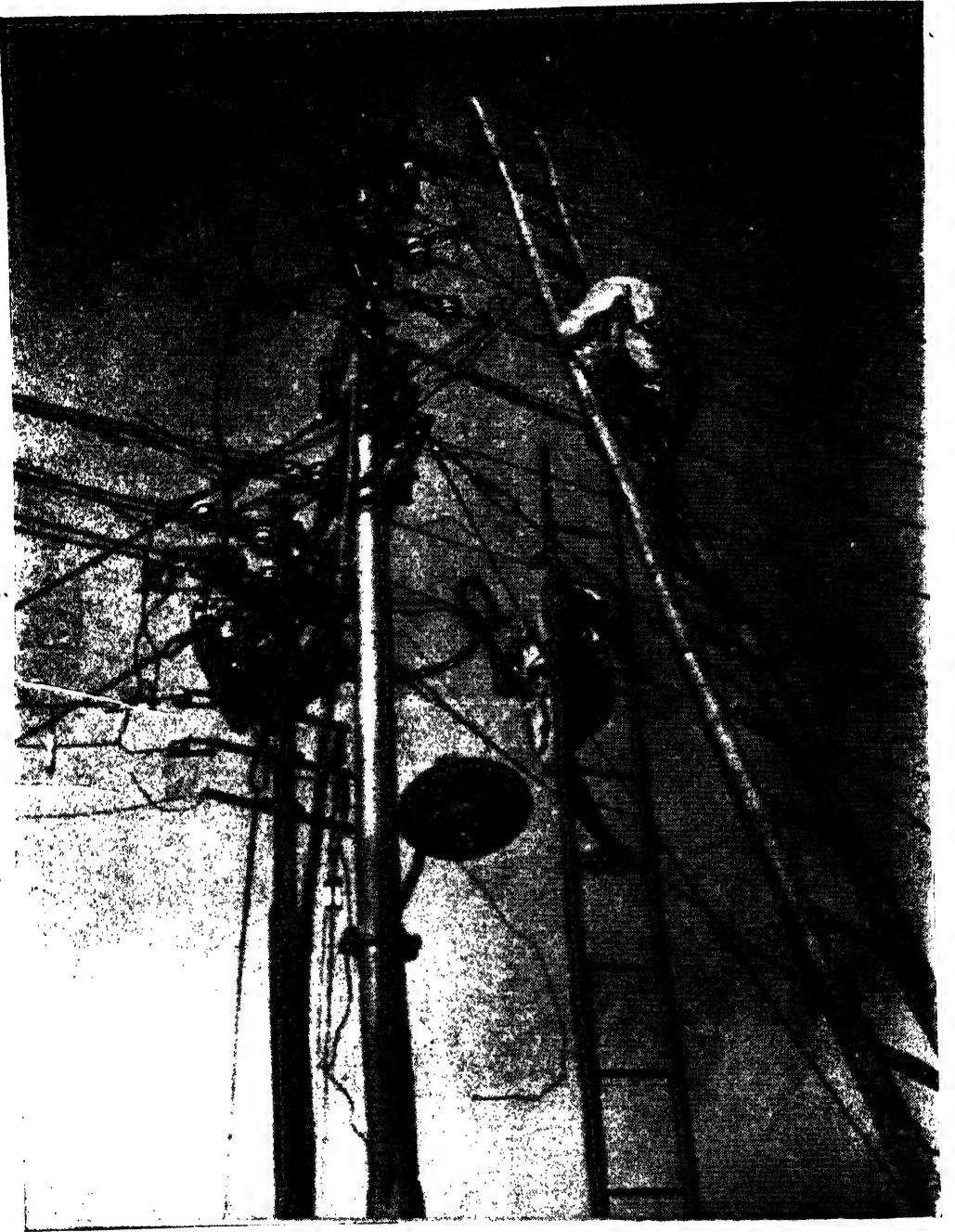
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাবনার অন্তর্বীণ যাত্রার কথা আপাতত স্থগিত রেখে আমাকে একটা গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে। গত সংখ্যায় আমি অম্বিকা খাঁ'র আত্মহত্যার যে বিবরণ লিখেছি,—সেটা আমার স্বচক্ষে দেখা বিবরণ। মাসিক বসুমতীর যে-পাঠকেরা আমার লিখিত বিবরণটা পড়বেন,—তাঁদের একথাটাও জানা থাকা প্রয়োজন যে,—বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত বিরাট পুস্তক "বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি"তে—অম্বিকার আত্মহত্যা সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে,—সেটা আমার বিবরণ থেকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের—একটা পৃথক গল্প। সুতরাং আমার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—কারণ আমি সামান্য লোক—নেতা নই।

কিন্তু যেহেতু আমি আমার বিবরণ বাতিল করতে প্রস্তুত নই, অতএব যত পাপই হোক—আমাকে যাদুদার বিবরণ বিশ্লেষণ করতেই হবে।—সব দ্বিধা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে' যুক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণের কষ্টিপাথরের সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে হবে। কারণ বিষয়টা তুচ্ছ নয়।

প্রথমে যাদুদার প্রশস্ত বিবরণটা উদ্ধৃত করা যাক। তিনি লিখেছেন (বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি—৫১৩-১৪ পৃষ্ঠা)—

"আমি ১৯২৬ সালে আলিপুরে বদলি হয়ে আসি······আলিপুরে রাজবন্দী মহলের একটা দুর্নাম দূর পর্যন্ত রটে গিয়েছিল। আমাদের নতুন করে পুনর্মিলন-গঠনের কাজ চলছিল—বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি সংগঠন,—'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর'—এক হয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং সন্দেহ-চরিত্র যারা, তাদের এড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা কওয়ার স্থান আলিপুর জেলেই করে নিতে হয় (১)। আমার চিরশ্রদ্ধেয় বন্ধু নরেন সেন : তার সঙ্গে পরামর্শ করলাম······স্থির হল রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মচারী একতলায় বাছা বাছা লোকদের নিয়ে বসবাস করবেন। আমি থাকবো দোতলায় বেণের দোকান খুলে পাঁচ রকম ভাল মন্দ মশলা নিয়ে (২)। একজন খাঁ (হিন্দু) আমাদের সঙ্গে দোতলায় থাকতো (৩)।····তার সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কিছুই আমি জানতাম না। জেনেছিলাম সে বিদ্রোহী সংসদের লোক। বিদ্রোহী সংসদে চাটগাঁয়ের কয়েকটি লোকও ছিল। এদের পরস্পরের মধ্যে তেমন মিল ছিল না—মন-ভার-ভার অবস্থা ছিল:···খাঁর সঙ্গে অন্য দলের কেউ বিশেষ সৌহার্দ্য রাখতো না। ওটা ছিল দলাদলির ব্যাপার। আমি তাকে আদর করে একটা নামে ডাকতাম। সে তাতে ভারি খুশি হত। হায়রে, স্নেহ-বুভুক্ষু!···আমার জেলখানার কর্তা বললেন—আমার জেলখানা সর্বদা সর্বত্র প্রহরী বেষ্টিত। আমি কোথায় কি হচ্ছে জানি না। অথচ গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমায় জানায় কবে কি ঘটছে। আপনি সতর্ক থাকবেন। (৪) আমি প্রশ্ন করলাম আমায় সতর্ক করার অর্থ কি? আমি তো জেলে রাজনীতি করি না। তিনি বললেন—বেশী প্রশ্ন করা নিরর্থক। তাঁর সন্দেহ, জেল থেকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর যায় (৫)।

"আমার শরীরে একটা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে জন্য আমাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় ভীষণ হিন্দু-মোস্লেম দাঙ্গা সুরু হয়। পুলিশ দাঙ্গা থামাতে ব্যস্ত ছিল। আমায় জেলখানায় ফিরিয়ে আনার পাহারা পাওয়া না যাওয়ায় আমাকে অনর্থক কিছু বেশিদিন হাসপাতালে থাকতে হয় (৬)।

"এরই মধ্যে খাঁ সাহেব একদিন হাসপাতালে এসে উপস্থিত। বলল, তার ভাই হাসপাতালে অন্যত্র রোগী ছিল। তাকে সে দেখতে আসে (৭)। সেই সুবিধায় আমার সঙ্গে দেখা করে গেল (৮)। খেদ করে বলে, তাকে কেউ ভালবাসে না (৯)। আমি কেন জেলে ফিরে যাচ্ছি না? কতদিনে যাব? কবে যাব? ইত্যাদি—(১০)। বেশ বুঝতে পারলাম, তার হৃদয় বড়ই, তাকে অনেক ভাল কথা বললাম। সে সময়মত বিদায় নিল। ক্ষুধাতুর (১১)। সেদিনের বিদায় বড় ব্যথাদায়ক (১২)। সে আমার পায়ের ধুলো নেবে—আমি দেব না। এটা আমি বহুকাল ধরে পালন করে আসছি। সে আমার সঙ্গে দস্তুরমত ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে দিল। পায়ের পাতায় হাত দিতে না পারলেও হাঁটুর নীচে ছুঁয়ে সেই হাত মাথায় লাগিয়ে চলে গেল (১৩)।

"তার পর গেছে একদিন। আমি সংবাদ পেলাম, খাঁ গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। যেদিন সে শম্ভুনাথ হাসপাতালে আসে, ঐদিন রাত্রে সে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে একটা চিঠি রেখে গিয়েছিল। তা সামলে রাখা হয়। পুলিশের তরফ থেকে ধুম করে অনুসন্ধান চলে (১৪)। সে আত্মহত্যা সত্যই কি করেছিল? অথবা অন্য কেউ বা কারা তাকে ঐ ভাবে হত্যা করেছিল? (১৫)···আমি হাসপাতাল থেকে জেলে প্রত্যাবর্তন করলে চিঠি আমায় দেওয়া হয় (১৬)। তাতে

সে বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি করে যায় (১৭)। জেল থেকে সে গোয়েন্দা বিভাগকে খবর সরবরাহ করতো। সময়মত এই চিঠি দৈনিক ফরোয়ার্ড কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হয়। চিঠিখানি জেলের শত সতর্কতা এড়িয়ে গোপন পথে শরৎ বোসের কাছে পাঠানো হয়।"

* * * *

দেখা যাচ্ছে, অজিত মৈত্র নামক একজন ডেটিনিউয়ের অস্তিত্বই যেন যাদুদার অজ্ঞাত ছিল, বা অম্বিকার আত্মহত্যার ব্যাপার সম্পর্কে অজিত মৈত্র নামক কোন ডেটিনিউয়ের কোন সম্পর্কের কথা যাদুদা জানতেন না। অথচ অম্বিকার যে চিঠি ফরোয়ার্ডে ছাপা হয়েছিল, সেটা যে অম্বিকার স্বহস্ত লিখিত, এটা দেখাবার জন্য চিঠিটার যে ফটোষ্টাট কপিই ছাপা হয়েছিল, তাতে "ভাই অজিত" বলে সম্বোধন করেই চিঠিটা সুরু হয়েছিল। সে চিঠিটা যে যাদুদাকেই দেওয়া হয়, এবং তাঁর ব্যবস্থাতেই ফরোয়ার্ডে পাঠানো হয়, তা তিনি নিজেই বলেছেন। সুতরাং অজিতের নামটা যাদুদা ভালো করেই জানতেন।

অজিত চিঠিটা চেয়েছিল,—কিন্তু তাকে সেটা দেওয়া হয়নি এই কথা বলে' যে, এখন নয়, পরে নিও, আমাদের কাছেই থাক It is your property, তুমি পাবে। তারপর সেটা ফরোয়ার্ডে পাঠানো হয়।

অজিতের কাছে আমার যাতায়াত আছে শুনে কিছুদিন আগে অমর ঘোষ আমাকে বলেছিলেন,—তাকে একদিন আমার এখানে নিয়ে আসতে পার না? অজিতের সময়াভাব বলে সেটা হয়নি। অর্থাৎ অমর বাবুর এখনও অজিতের ওপর একটু টান আছে, যার সূত্রপাত ঐ অম্বিকার প্রভাব থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টার মধ্যে। সেই তাঁর অজিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সেই অজিত যাদুদার গল্পে বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে! এ কি শুধুই বিস্মৃতি?

যাদুদার গল্পের ১৭টা জায়গায় আমি নম্বর দিয়েছি, কারণ ওর সবগুলিই ভুল। আর দেড় পৃষ্ঠার গল্পে যদি ১৭টি ভুলের একটি সুন্দর মালা গাঁথা হয়, তা হলে স্বভাবতই মনে হয়, ভুল নয়—সজ্ঞান গল্প রচনা।

কথাটা বড় দুঃসাহসের কথা। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাহসের কথাও আছে! এমন বেপরোয়া ভাবে এই গল্প রচিত হয়েছে যে, রচয়িতার হুঁস নেই যে, অনেক কথা শুধু পরস্পরবিরোধী নয় অনেক কথা অসম্ভব—কোন প্রকারেই সম্ভব হতে পারে না। এমন বেপরোয়া হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, বিপ্লবান্দোলন সম্পর্কে তাঁর মত একজন নেতার গল্পের কেউ যে কোনদিন প্রতিবাদ করবে, একথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি—বিশেষত ত্রিশ বছর আগের এক 'স্পাই" সংক্রান্ত গল্পের।

কিন্তু আমার গল্প শুধু অজিত মৈত্রই সমর্থন করেন, এমন নয়, স্বয়ং অমর ঘোষও সমর্থন করেন,—যিনি যাদুদার সঙ্গে পরামর্শ করেই অজিতকে অম্বিকার প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

এখন যাদুদার গল্পের বিশ্লেষণ করা যাক :—

(১) অনুশীলন-যুগান্তরের মিলনের জন্যে কথা কওয়ার স্থান নাকি "আলিপুর জেলেই করে নিতে হয়।" শুনলে হাসি পায়। আলিপুরে সে সময় অনুশীলনের একটিমাত্র নেতা ছিলেন নরেন সেন এবং যুগান্তরেরও একটি মাত্র নেতা ছিলেন যাদুদা। মিলনের কথাবার্তার সুযোগ হয়েছিল ২৫ সালে মেদিনীপুর জেলে, এবং কথাবার্তা অনেকখানিই এগিয়েছিল। কারণ সেখানে দুই দলের অনেকগুলি নেতা অনেকদিন একত্র ছিলেন—যুগান্তরের যাদুদা, মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত), ভুপতিদা, নরেনদা (চৌধুরী) যুগান্তরেরই জ্ঞাতি বিপিনদার দলের গিরীনদা (ব্যানার্জি) এবং অনুকুলদা (মুখার্জি)—আর অনুশীলনের প্রতুল গাঙ্গুলী, রবী সেন, অমৃত সরকার এবং সতীশ পাকড়াশী। যুগান্তরের নেতা উপেন ব্যানার্জি, অমর চ্যাটার্জি এবং অতুল ঘোষ, ২৬ সালের প্রথম ভাগেই মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং দুই 'দলে' কথাবার্তায় মতন কোন কাণ্ড ঘটানোর কোন Scope ই ছিলনা। মাঝে মাঝে নরেন বাবু ও যাদুদা একসঙ্গে বেড়াতেন এবং কথাবার্তা চলছে ভেবে আমরা ওঁদের সঙ্গে যেতুম না—এই পর্যন্ত।

মিলনের কথাবার্তার প্রথমভাগ মেদিনীপুর জেলে, এবং final amalgamationএর জন্যে সকল দলের নেতাদের তিন দিনব্যাপী গুপ্ত সম্মেলন ২৮ সালে আমারই ঘরে হয়—সে কথা যথাসময়ে আসবে আর মাঝখানে ২৬ সালে আলিপুর জেলে যাদুদা এবং নরেন সেনের আলাপন।

(২) "স্থির হল, রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী একতলায় বাছাবাছা লোক নিয়ে বসবাস করবেন। আমি থাকবো দোতলার বেণের দোকান খুলে পাঁচ রকম ভাল ও মন্দ মশলা নিয়ে।"

"বাছাবাছা লোক" মানে অনুশীলন ও যুগান্তরের বাছাবাছা নিশ্চয়—যেমন ধরুন নৃপেন মজুমদার, কিরণ দে, প্রভৃতি। আর "বেণে মশলা" যেমন ধরুন, অমর ঘোষ, মনোমোহন ভট্টাচার্য, অনুকূল মুখার্জি প্রভৃতি। হাসবো না কাঁদবো, ভেবে পাই না। ২৩ সালে রেগুলেশন থ্রির প্রথম ব্যাচে যুগান্তরের দাদারাই অন্তত ডজনখানেক, এবং তাঁরা যে প্রথমে দোতলাটাই দখল করেছিলেন,—ফিমেল ইয়ার্ড থেকে উপেনদা প্রভৃতি ফিরে এসে যে দোতলাতেই উঠেছিলেন, সেই থেকে ২৮ সাল পর্যন্ত দোতলাটা ছিল প্রধানত যুগান্তরদলেরই একচেটিয়া এবং নেতাদের একচেটিয়া। অন্যদল বা ঝড়তি পড়তি, এবং জুনিয়ার দলই বরাবর একতলায় থাকতো। এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম করা স্বয়ং হিটলার এলেও পারতো না।

(৩) "একজন খাঁ (হিন্দু) আমাদের সঙ্গে দোতলায় থাকতো।" হায় বেতুল! সে যে গায়ে আগুন লাগিয়েছিল নীচের ঘরে একতলায়! "পাঁচ মিশেলী" দেখাবার জন্যে তাকে দোতালায় আনা যে একটা দুপুরে ডাকাতি! আর অম্বিকা নামটা উচ্চারণে এমন সর্বাত্মক আপত্তিটা কি 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'র একটা উৎকট দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু? কিছু ঢাকা দেওয়ার গরজে অম্বিকা নামটা পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে!

(৪) "জেলখানার কর্তা বলেন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমায় জানায় (জেলে) কবে কোথায় কি ঘটছে—আপনি সতর্ক থাকবেন।" কোনো স্পাই যদি জেল থেকে গোয়েন্দা বিভাগকে গুপ্ত খবর দেয়, তখন সেটা জেল কর্তৃপক্ষকে জানাবে স্বয়ং গোয়েন্দা বিভাগ, কেন যাদুদা? আপনাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে? ভগবান!

অম্বিকার চিঠির মত চিঠি যখন বিপ্লবীরা ফরোয়ার্ডে যোগানে পাঠায়, তখনই গোয়েন্দা বিভাগের প্রয়োজন হয় জেল কর্তৃপক্ষকে

গাফিলতী করার দায়ে ধমক দেওয়ায়। আর জেলের মধ্যে 'কোথায় কি ঘটছে' সবই বিপ্লবীকাণ্ড এবং স্পাইয়ের এলাকা ?

(৫) "আমি তো রাজনীতি করি না। তাঁর সন্দেহ, জেল থেকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর যায়।" কথাটা কি "আমি তো কলা খাইনি" ধরণের হল না ? spy theory খাড়া করার জন্ত এতটা বাহুল্য কি নিস্প্রয়োজন নয় ?

(৬) "অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ দাঙ্গা থামাতে ব্যস্ত ছিল। আমায় জেলখানায় ফিরিয়ে আনার পাহারা পাওয়া না যাওয়ায় আমাকে অনর্থক কিছু বেশিদিন হাসপাতালে থাকতে হয়।" সমস্ত পুলিশ এতদিন ধরে এত ব্যস্ত ছিল দাঙ্গা থামাবার জন্ত যে, escortএর অভাবে বেশ কিছুদিন তাঁকে হাসপাতালে থাকতে হল, কারণ তাঁকে জেলে ফিরিয়ে আনতে একটা প্রকাণ্ডবাহিনী দরকার, ব্যাপারটা কি এই ?

(৭,৮) "এরই মধ্যে খাঁ সাহেব একদিন হাসপাতালে উপস্থিত। তার ভাই—রোগী ছিল। তাকে সে দেখতে আসে। সেই সুবিধায় আমার সঙ্গে দেখা করে নেয়।"—অর্থাৎ সে স্পাই ছিল বলেই তাকে অত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, এবং escort এরও অভাব হয়নি—তার জন্তে ২।১ জন পুলিশই যথেষ্ট কিনা !

(৯.১০) "খেদ করে বলে, তাকে কেউ ভালবাসে না। আমি কেন জেলে ফিরে যাচ্ছি না—ইত্যাদি।"—Spy এর মুখে এমন কথা ! আর দুজনের পাহারা-পুলিস নিশ্চয়ই সরে গিয়েছিল, কারণ তাদের সামনে ভালবাসাবাসিটা কি ভাল কথা ?

(১১,১২) "বেশ বুঝতে পারলাম, তার হৃদয় বড়ই ক্ষুধাতুর। তাকে অনেক ভাল কথা বললাম।—সেদিনের বিদায় বড় ব্যথাদায়ক।—অর্থাৎ Spyটা যাদুদার বিরহে কাতর, এবং যাদুদাও তাকে বড্ড ভালবাসতেন। যাদুদা যদি সেদিন জেলে ফিরে যেতেন, হয়ত অম্বিকা আত্মহত্যা করতো না। অর্থাৎ অম্বিকার স্নেহ-বুভুক্ষু বিরহ কাতর হৃদয় তাঁর প্রতি এতটা আসক্ত ছিল বলেই সম্ভবত তার আত্মগ্লানি এসেছিল, এবং তার আত্মহত্যার প্রাক্কালে যাদুদার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অনাবিল স্নেহের। অজিতের ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জানা দূরে থাক, অম্বিকার আত্মহত্যার সম্বন্ধে যাদুদার গৌণভাবেও বিন্দুমাত্র দায়িত্ব ছিল না। তিনি সে ঘটনার কিছুদিন আগে থেকে কিছু দিন পর পর্যন্ত জেলেই ছিলেন না।—কিন্তু অম্বিকার চিঠিটা যাদুদার নামে না হয়ে অজিতের নামে হওয়া কি উচিত হয়েছে ?

(১৩) "সে আমার পায়ের ধূলো নেবে,—আমি দোব না। এটা আমি বহুদিন ধরে পালন করে আসছি। সে আমার সঙ্গে দস্তুর মত ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে' দিল।"—পায়ের ধূলো দিতে চায় না অনেকেই—কিন্তু কেউ সেটা পালনও করে না, এবং তা নিয়ে 'ধস্তাধস্তি'ও করে না। কিন্তু ভাল মানুষ সাজার এতখানি প্রয়োজনেও হয়ত কারো কখনও হয় না।

(১৪) "পুলিশের তরফ থেকে ধুম করে অনুসন্ধান চলে।"—ধুম করে অনুসন্ধান চলে না। কেন চলবে ? রুটিন মাফিক সকলের Statement নেওয়ার জন্তে পরদিন সকালে Lowman ও ভূপেন চাটুয্যে এসেছিলেন—নীচের ঘরে বসে সকলের সামনেই সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন,—অজিতও সেখানে গিয়েছিল,—ভূপেন

চাটুয্যে তাকে কিছু বেতাল। প্রশ্ন করতে সে চীৎকার করে তাঁকে মারতে গিয়েছিল,—সকলে ধরে ফেলতে সে জুতো ছুঁড়েছিল, ব্যস! অনুসন্ধান ঐ পর্যন্ত। তার শেষ ফল, অজিতের যশোর জেলে বদলী। যশোর জেলটা ছিল শাস্তির জায়গা—নানা অসুবিধা এবং ম্যালেরিয়ার আড্ডা।
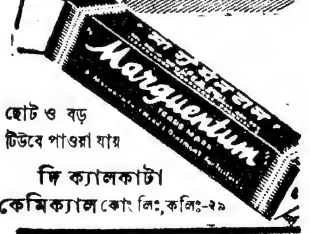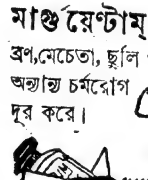
পাশেই দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডে হরিনারায়ণ চন্দ এবং বীরেন ব্যানার্জি ছিলেন,—তাঁরা আমার গল্প সমর্থন করেন এবং বলেন তাঁরা কোন "ঘুষ্ দিয়ে অনুসন্ধান" টের পাননি।

(১৫) "সে আত্মহত্যা সত্যই কি করেছিল? অথবা অন্য কেউ বা কারা তাকে ঐ ভাবে হত্যা করেছিল?"—সে যখন স্পাই, তখন আত্মহত্যার চেয়ে হত্যাই বেশী সম্ভব,—পুলিশের অনুসন্ধানের সূত্র এই সন্দেহেই। নীচের ঘরেই যদি কাণ্ডটা ঘটে থাকে, রাত্রে, তালা বন্ধ ঘরের মধ্যে, তাহলে নীচের ঘরের কেউই দায়ী। কিন্তু যে ঘরের ব্যানার্জি কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নিবিয়েছিলেন বলে' সকলের কাছেই বলেছিলেন, তাঁর ওপর পর্যন্ত পুলিশের কোন সন্দেহ ছিল বলে কখনও কেউ কিছু শোনেননি। জেরাও হয়নি। "ঘুষ" বটে!

(১৬, ১৭) "আমি হাসপাতাল থেকে জেলে প্রত্যাবর্তন করলে চিঠি আমাকে দেওয়া হয়। তাতে সে বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি করে যায়"।—বাঁকুড়া জেলে গণেশ ঘোষের পলায়ন চেষ্টার সময় অম্বিকা সেখানে ছিল—কোন অপকর্ম করেনি। আলিপুরে কয়েক মাসে এমন কিছু বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র হয়নি, যা নিয়ে অপকর্ম "বহু" হতে পারে। বাইরে কয়েক বছর ধরে বোমা-বন্দুক, খুনোখুনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল,—"বহু অপকর্মের স্বীকারোক্তি" হতে পারে সেই বাইরের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে। বাচ্চুদার গল্পের মধ্যে তার একটারও উল্লেখ নেই।

কিন্তু তার বাইরের সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কোন অপকর্মের কথা বলে না। অজিত মৈত্র বলে না। অতুল রায় বলেন, অম্বিকা যদি স্পাই হত, আমাদের রাজবন্দী হতে হ'ত না—ঘানি টানতে হত। নর্থবেঙ্গল যুগান্তর পার্টির একদল কর্মী নীলফামারীতে এক বৈঠক করে অম্বিকাকে স্পাই বলে প্রচার করা হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে' এবং অম্বিকার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে জুনিয়ার লীডার কালী বাকচিও (কালাদা') ছিলেন। তিনি দাদাদের বিশ্বস্ত অনুচর,—বচ্চুদারও বিশ্বস্ত,—এবং সম্প্রতি সে কথা সমর্থন করেছেন।

অনুকূলদাও তাকে স্পাই বলেননি। শুধু তা নয়, তিনি তা বলতে পারেন না। কারণ শান্তি চক্রবর্তীকে চরম দণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে সভায় স্থির হয়েছিল, সে সভা হয় নিমতলা শ্মশানঘাটে রাত্রে এবং সে সভায় অনুকূলদাও উপস্থিত ছিলেন, এবং অজিত এবং অম্বিকাও উপস্থিত ছিল।

মৃত্যুর আগে অম্বিকা যে অনুকূলদাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, অজিতকে ডাকেনি, তার ব্যাখ্যা, অজিতেরও ধারণা অনুকূলদার কাছ থেকে অজিতের মনোভাব সম্বন্ধে কিছু শুনে, তারপর হয়ত তাঁকে দিয়েই অজিতকে ডেকে পাঠাতো। কিন্তু তার শেষ ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ হল না।

অম্বিকা স্পাই হলে অজিত এবং অনুকূলদা শাস্তির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তেনই, আরো কয়েক জনও রেহাই পেতো না। এটা অনুকূলদার তো, অজানা ছিল না। অজিতের তো অজানা নয়ই। এই অজিত মৈত্র বাচ্চুদার গল্পে একেবারে out of picture।

সত্য মিথ্যা বিচারের ভার পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি এ প্রসঙ্গ এই বলে শেষ করতে চাই যে, সে সময়ে যে ব্যাপারটা আমার শুধু বিসদৃশ মাত্র লেগেছিল, আজ ৩০ বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে সে ব্যাপারটার কথা ভেবে, বিশেষত বাচ্চুদার বই পড়ে আমার শুধু এই কথাই মনে হচ্ছে বিপ্লবান্দোলনের এবং বিপ্লবীদের চিত্রের এই অজ্ঞাত দিকটা চিরকাল দেশের লোকের অজ্ঞাত থাকলে বিপ্লবান্দোলনের লিখিত ইতিহাস হবে একটা লুকোচুরীর নামান্তর।

* * * *

এখন অন্তরীণ যাত্রার কথায় ফিরে আসা যাক। প্রভাস শিয়ালদায় এসে আমার পাবনা যাত্রার কথা শুনেই গাড়ীর সময় জেনে নিয়ে, 'আসছি' বলে চলে গেল, আমার escort watcher দুজন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রভাস আবার ফিরে এল, গাড়ীতে ওঠার সময় হয়েছে বলে ওদের সঙ্গে মালপত্তর নিয়ে আমার গাড়ীতে তুলে দিতে চললো। আমি গাড়ীতে উঠে বসলে প্রভাস প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে কথা কইতে লাগলো। তারপর গাড়ী ছাড়তেই সে টুপ করে গাড়ীতে উঠে পড়লো। ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলো। প্রভাস বললে রাণাঘাট পর্যন্ত টিকিট কিনে এনেছি।

তারপর চললো গল্প। প্রভাস বি পি সি সি এবং কর্মীসংঘের কাণ্ডকারখানার কথা বললে। শাসমলের সঙ্গে আমাদের বি পি সি সি ক্যাপচারের লড়াই, দপ্তর নিয়ে সরে পড়া, জবর দখল, গুণ্ডার আমদানী, বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে কেমন করে শাসমলের গুণ্ডারা ওদের আটকে ফেলেছিল, কেমন করে ওরা জানালা টপকে পালিয়েছিল ইত্যাদি। তখন কংগ্রেস অফিস ছিল ১১৬ নং বৌবাজার স্ট্রীট নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁর বাড়ীতে। কর্মীসংঘের অফিস এবং মেস ছিল কলেজ স্কোয়ার ও মির্জাপুর স্ট্রীটের কোণায়।

আমি অম্বিকার আত্মহত্যা এবং অনন্তহরি প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসির গল্প বললুম। প্রমাণ হয়ে গেল, বিপ্লবটা বাইরের থেকে জেলের ভিতরেই চলছে অনেক বেশী জোরে। কংগ্রেস ও ক্যাপচার নিয়ে দলাদলিটা খাঁটি অহিংস না হলেও নিরামিষ তো বটে! সরকার শুধু মজাই দেখে।

রাণাঘাটে প্রভাস নেমে গেল। আমি পাবনায় পৌঁছালুম রাত্রে। পুলিশ সাহেবের অফিসে গিয়ে শুনলুম, তিনি শিকারে গেছেন। আই বি অফিসার আমাকে ডি এস পির অফিস ঘুরিয়ে পুলিশ ক্লাবে রেখে এলেন। তার পরদিন সেখানে খাওয়া দাওয়া করে চললুম সিরাজগঞ্জ সাবডিভিসনে জামতৈল রেলষ্টেশন হয়ে কামারখন্দ থানায়। সৌভাগ্যক্রমে কামারখন্দের দারোগা সেদিন কার্যোপলক্ষে সিরাজগঞ্জে এসেছিলেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া হল, সুতরাং ভাল escortই পেয়ে গেলুম।

অন্ধকার রাতে প্রায় ১০টার সময় ষ্টেশনে নামলুম। মাইল টাক পথ হেঁটে যেতে হবে। গরুর গাড়ীও নেই, একটা কুলিও নেই। একা হলে বিপদে পড়তুম। দারোগা সাহেব (মুসলমান, বয়স বেশী নয়) রেলের কুলি জোগাড় করলেন। এক চৌকিদার হ্যারিকেন নিয়ে পথ দেখিয়ে চললো।

রাত্রে খাবার কোন ব্যবস্থা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করাতে দারোগা সাহেব বললেন, নেই, এবং হওয়াও শক্ত, এখান থেকেই কিছু খাবার খেয়ে বা নিয়ে যেতে হবে। একটা খাবারের দোকানে তখনও টিমটিম করে আলো জ্বলছে এই ট্রেণটা আসার অপেক্ষাতেই। সেখান থেকে কিছু চিনিসন্দেশ কিনে নিলুম।

আধঘণ্টাটাক হেঁটে থানায় উঠলুম, এবং তারপর গেলুম "আমার ঘরে।" জেলাবোর্ডের রাস্তার একদিকে থানার টিনের ঘর তার তার বিপরীত দিকেই আমার জন্যে নতুন ঘর তৈরী হয়েছে। রাস্তা থেকে এক ফুটটাক উঁচু খানিকটা জমির ওপর একখানা বড় নতুন টিনের চালা ঘর কিন্তু সেটা আমার ঘর নয়, সেটা ম্যারেজ রেজেষ্ট্রী অফিস—কাজী সাহেবই ঐ জমিটার মালিক। অফিসের খানিকটা পিছনে এক পাশে আর একখানা ঘর টিনের দোচালা দরমার বেড়া একফুট দেড়ফুট জানালা নতুন তৈরী হয়েছে আমার জন্যে। ঘরের মেঝে আর বাইরের জমি এক level। সে মেঝেও পিটে চৌরস করা হয়নি। তার মধ্যে এক পাশে একটা মাচা, আর একপাশে এক তক্তপোষ বিরাজ করছেন। সমস্ত কাণ্ডটা দেখে, "এই ঘরে আমায় থাকতে হবে!" বলে আমি তক্তপোষে বসে পড়লুম।

দারোগা সাহেব একটু অপ্রতিভভাবে বললেন,—সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাববেন না—মৌলবী সাহেবের সঙ্গে আমার কথা আছে আপনার প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে। এখানে এমন একটা শিক্ষিত ভদ্রলোক নেই—যার সঙ্গে দুটো কথা কই। তাই ভেটিনিউ রাখার বন্দোবস্তের order যখন এল, তখন কাজী সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম। তিনিও মাসে ১০টা করে টাকা ভাড়া পাবেন, আর আপনিও থাকবেন আমার কাছেই!

কাজেই বিছানা পেতে শোয়ার জোগাড় করলুম! এক কলসী খাবার জল একটা বালতি ও মগ এবং একটা হ্যারিকেন থানা থেকে দিয়ে গেল। আর সব জিনিস সকালে দেওয়া হবে।

গোবরের সঙ্গে গুড় মেখে ঘুঁটে দিলে কেমন হয়, যদি কল্পনা করতে পারেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, কেমন সন্দেশ খেলুম। একটুখানি খাবার চেষ্টা করে জল খেয়ে শুয়ে পড়লুম। দারোগা সাহেব বললেন, সকালে সবজিনিসই পাবেন, কাছেই হাটখোলা আছে। শুনে রাগ হতে লাগলো, কিন্তু এই নতুন অবস্থার সঙ্গেই তো নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। দারোগা সাহেব চলে গেলে চিৎপাৎ হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠে একটু সার্ভে করতে বেরিয়ে দেখলুম, যেদিকে যত দূর দৃষ্টি যায়, লোকবসতির চিহ্ন নেই। আমার ঘরটা মৌলবী সাহেবের ভিটের এক পাশে। তার ঠিক পাশে পুরানো কবরখানা। এখন সেখানে কবর দেওয়া হয় না,—কিন্তু কবরই কতকগুলো সেখানে আছে,—এবং আমার জানালা দিয়ে থুতু ফেললে সেই কবরস্থানেই পড়ে। তারপর খানিকটা চাষের জমি, তারপর একটা ছোট শুকনো খাল,—তারপর একটু দূরে হাটখোলা। খালটা হচ্ছে বৈদ্য-জামতৈল এবং কামারথন্দ গ্রামের মাঝের সীমানা। মৌলবী সাহেবের ভিটের আর দু'চারখানা ছোট ছোট একচালা ভাঙা-পড়ো চালাঘর আছে। ভিটের অপর পাশেও খানিক চাষের জমি, তারপর নতুন কবরস্থান, তারপর আবার চাষের জমি, তারপর শ্মশান। মৌলবী সাহেব অন্য গ্রামের বাড়ী থেকে রোজ সাইকেলে আসা-যাওয়া করেন।

হাটখোলা থেকে খালপার হয়ে, থানা এবং মৌলবী সাহেবের ভিটের মাঝখান দিয়ে, কবরস্থান ও শ্মশানের পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের সড়ক চলে গেছে। তারই সমান্তরাল আমার বাসার পিছন দিয়ে চলে গেছে একটা ছোট শুকনো নদী, এবং তার ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। বর্ষাকালে সে জমি ডুবে সমুদ্র হয়ে যায়,—নদীর সঙ্গে একাকার হয়ে আমাদের ভিটের কানায় কানায় জল হয়, পাশের খালেও নৌকা আসে। আমার ঘরের সামনে নদীর ঢালুতে চারটে বাঁশ পুঁতে তার ওপর একটা বাঁশের ফ্রেম বেঁধে আমার উঠোন থেকে দুটো বাঁশ পেতে দিয়ে পায়খানা বানানো হয়েছে এবং তার বেড়া দেওয়া হয়েছে পাঁকাটি বা পাটখড়ির। দরজা করা হয়েছে একটা দরমা ঝুলিয়ে দিয়ে। রান্নাঘরও প্রায় তথৈব চ, তবে চালটা ঠিক আছে।

কামারথন্দ গ্রামটা খুব ছোট—থানা ছাড়া একপ্রান্তে কয়েক ঘর মুসলমান কৃষকের বাস আছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে গ্রামটা বৈদ্য জামতৈল গ্রামেরই একটা অংশ মাত্র—জামতৈল গ্রামে মুসলমানের বাস নেই, আর কামারথন্দ গ্রামে হিন্দুর বাস নেই। একজন বাঙালী জমাদার, একজন হিন্দুস্থানী কনষ্টেবল, এবং এক নতুন আমদানী ডেটিনিউ আমি, এই তিনটি প্রাণী মাত্র হিন্দু।

আমার সরকারী অন্তরীণ আদেশপত্রে শুধু বাসার চৌহদ্দী লেখা

আছে, এবং থানায় রোজ হাজিরা দেওয়া ছাড়া এই চৌহদ্দীর বাইরে যাওয়া নিষেধ। অর্থাৎ Orderটার মধ্যে একটা ভুল ছিল, যার ফলে আমি দিনরাত ঘরে আটক থাকতে বাধ্য।

সুতরাং আমি একটা দরখাস্ত করলুম। মেদিনীপুর জেলে একবছর থেকে আমি দরখাস্ত লেখা রপ্ত করেছিলুম। সকলের সকল রকমের দরখাস্ত draft করতেন বাচ্চুদা—একখানা মোটা exercise bookএ—এবং আমি সেগুলোর fair copy লিখে দিতুম। ফলে দরখাস্ত লেখা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি লিখলুম—আমার যতদূর জানা আছে, Internment Orderএ ছুটো চৌহদ্দী দেওয়া থাকে—একটা দিনের বেলার জন্ত—সাধারণত একটা গ্রামের চৌহদ্দী—যেখানে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি, —আর একটা চৌহদ্দী রাত্রের জন্ত বাসার চৌহদ্দী—যেটা আমি সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি না। সুতরাং আমার Internment Orderএ শুধু বাসার চৌহদ্দী দেওয়াটা তোমাদের ভুল হয়েছে—তার জন্তে কে দায়ী, সে কথা ছেড়ে দিয়ে পত্রপাঠ Orderটা সংশোধন করে' পাঠাও—না হলে আমার নির্জন কারাবাসে থাকতে হচ্ছে।

দারোগা সাহেব বললেন,—আমি কি এসব জানি মশাই? একটা চৌহদ্দী চেয়েছে, আমি বাসার চৌহদ্দী লিখে দিয়েছি। যাই হোক, দরখাস্তের ফলে দিনের চৌহদ্দীর বন্দোবস্ত হল জামতৈল গ্রামের আর্দ্ধেক নিয়ে কিন্তু Orderটা সংশোধন হয়ে আসতে প্রায় এক মাস কেটে গেল। আমি সুযোগ বুঝে দিন রাত ঘরে বসে Bertrand Russellএর Roads to freedom বইখানা বাংলায় অনুবাদ করে ফেললুম। পরে Brailsfordএর Russian Worders' Republic বইখানাও ঐখানেই বাংলা করেছিলুম।

দরখাস্তের লেখাটা ভাল,—attitude ভাল,—সরকারী Order মেনে দিনরাত ঘরেই থাকি এবং লেখাপড়া করি—বেশ একটা propaganda হয়ে গেল পুলিশ সাহেবের অফিসে, লোকটা ভাল লোক, এবং পণ্ডিত।

সিরাজগঞ্জের সিনিয়র মোক্তার প্রাণনাথ সেন non-official visitor, একদিন আমার ঘরে এসে বসে পরিচয় দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি দারোগা সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন কি? —তিনি বললেন, তাঁর কাছে যাওয়ার আমার কোন দরকার নেই—আমি আপনার সঙ্গে privately দেখা করতে পারি। আমি বললুম, আমার ওপর সরকারী আদেশ, আমি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না, ঘরেও receive করতে পারি না। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন তিনি আমাকে non-official visitor appoint করে বলছেন, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে' আপনার অভাব-অভিযোগ জেনে তাঁকে জানাবো। আমিও আমার Internment Order বার করে তাঁকে দেখিয়ে বললুম,—আমার অনেক অভাব-অভিযোগ আছে—কিন্তু এই দেখুন আমি বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। তারপর খানিক ধস্তাধস্তি করে' হার মেনে ফিরে গিয়ে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখলেন—detenue আমার সঙ্গে কোন কথা বলতে রাজি নয়, কারণ আমি বাইরের লোক।

ফল হল এই যে, সেখানে আবার একটা propaganda হল, detenue অক্ষরে অক্ষরে Govt. order মেনে চলে। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সাহেবকে লিখলেন, পুলিশ সাহেব আমাকে লিখলেন, অমুক অমুক non-official visitor—তাঁদের সঙ্গে আমি privately কথা বলতেও পারি, ঘরেও তাঁদের receive করতে পারি।

আমি পাবনায় যাওয়ার আগে সেখানে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেছে—তার ফলে মুসলমান পুলিশ সাহেব বদলী হয়ে গেছেন, এবং তাঁর স্থলে এসেছেন মোহনবাগান ক্লাবের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় 'কাছু'—(J. Roy)।

এদিকে ঘরের অবস্থা সম্বন্ধে আমি প্রভাসের কাছে একটা বিস্তারিত চিঠি লিখলুম—অভিযোগের সুরে নয়—একটা মজাদার প্রবাসের গল্পের মতন করে। সেটা পাশ হয়ে গেল এবং সেটা পেয়ে প্রভাস তার যোরালো ইংরাজী অনুবাদ করে' প্রকাশ করে দিলে ফরোয়ার্ড কাগজে, এমন ভাবে যে, আমার চিঠির খবর বলে বোঝা না যায়।

পরের দিন দারোগা সাহেবের কাছে খবর পেলুম, ফরোয়ার্ডে আমার ঘরের এক বিতিকিচ্ছি বর্ণনা বেরিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক মোটর বাইকে এক তরুণ সাহেব একটা মাপের ফিতে নিয়ে হুড়মুড় করে এক চোটে আমার ঘরে এসে উঠলেন। দারোগা সাহেব ছুটে এসে পড়লেন। সাহেব তখন গম্ভীরভাবে মাপজোপ করতে সুরু করে দিয়েছেন। দারোগা সাহেব নিঃশব্দে সাহায্য করতে লাগলেন। মাপজোপ বোধ হয় ফরোয়ার্ডের বিবরণের সঙ্গে মিললো। দারোগা সাহেব কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলেন,—বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কথা আছে, detenue-এর প্রয়োজন মতন সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে—আমি detenue বাবুকে সে কথা বলেছি।

সাহেব কিছু উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন—আমার সঙ্গে একটাও কথা না বলেই। শুনলুম উনি সিরাজগঞ্জের S. D. P. O.—অর্থাৎ সিরাজগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত অ্যাসিষ্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট—নাম বোধ হয় Minister.

মৌলবী সাহেব এলেন—সব শুনলেন—দারোগা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ হল। পরদিনই কাজ সুরু হয়ে গেল। ঘরের মেঝে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু করা হল, বাইরে রোয়াক হল—নিকিয়ে দেওয়া হল—রোয়াকের ওপর চাল হল—পায়খানা নতুন করে তৈরী হল—ঘরের জানালা বড় করার ব্যবস্থা হল।

একজন কম্বাইণ্ড্হাণ্ড—ঠাকুর-চাকর তো দরকার—প্রথমে ঠিক করা হল এক মালি-চৌকিদারকে, জামতৈল গ্রামে থাকে। থানার কাছে যে চৌকিদারের বাস, তাকে দারোগা-জমাদারের বেগার খাটতে হয় সর্বদাই—তার জন্তে রোজ সকালে তাকে থানায় আসতে হয়। চৌকিদারদের মাইনে তখন ৬ থেকে ৯ টাকা। অন্ত কাজ না করলে চলে না কিন্তু এ বেচারীর অন্ত কিছু করার উপায় নেই। সে যেন বর্তে গেল।

একদিন সে রাঁধছে, এমন সময় এক কনেষ্টবল এসে হাজির—জমাদার বাবুর ঘোড়া খুঁজে আনতে হবে—এখনি। আমি এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলুম। চৌকিদার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। বিকালে বললে, আমি আর কাজ করতে পারবো না। তখন দারোগা সাহেব

বদলী হয়েছেন—এক সেকেলে বৃদ্ধ মুসলমান দারোগা এসেছে—মূর্খ, পাজী, ভীতু।

চৌকিদারকে বললুম, জমাদারবাবু শাসিয়ে গিয়েছে—এই তো? সে কিছুতেই তা বলে না—বলে, আমার অসুবিধা হয়। সুতরাং একটা লড়াই লাগলো চাকর নিয়ে। জামতৈল গ্রামে এক বুড়ো কামার ছিল গরীব এবং বেকার। তাকে বলা হল—সে রাজী কিন্তু কামারগিন্নী রাজী নয়, বলে ওখানে খেতে হবে তো? কিন্তু উনি তো মালির হাতের ভাত খেয়েছেন কাজেই ওখানে খাওয়া চলবে না।

ঐ গ্রামের এক ছুতোর বড় জানালা বসাতে এসেছিল—তাকে চাকরের সমস্যার কথা বললুম। সে ভেবেচিন্তে কামার বুড়োর কথা বললে। আমি বললুম তার কাছে লোক গিয়েছিল, সে রাজী কিন্তু আমি মালির হাতে ভাত খেয়েছি বলে কামারগিন্নীর আপত্তি। শুনে ছুতোর মুখ টিপে হাসতে লাগলো। আমি বলি, হাস কেন? সে বলতে চায় না। শেষে হাসতে হাসতে বললে—গ্রামে কামারগিন্নীর মাল্লি বদনাম আছে!

চৌকিদারী হাজিরার দিন এক বুড়ো হিন্দুস্থানী চৌকিদারকে ডেকে দারোগা সাহেব বললেন, তোর ছেলে তো কিছু করে না, ভাত রাঁধতে পারে? সে বললে, পারবো না ক্যান্ হুজুর কিন্তু উনির কি পসন্দো হবে? দারোগা সাহেব আমাকে বললেন, ও কিন্তু জাতে মুচি—আপনার চলবে? আমি বললুম, খুব চলবে। তাই ঠিক হল।

পরের দিন এক ১৫।১৬ বছরের ছোকরা এসে কাজ কর্ম করলো, রাঁধলো, আমাকে খাওয়ালে, বাসন মেজে, উনুন নিকিয়ে, শেষে বলে কিনা আমি বাড়ী চললুম ভাত খেয়ে আসবো! আমি বললুম, তোর তো এখানে খাওয়ার কথা। সে বলে, না—মা বারণ করে দিয়েছে। আপনি তো কিরিস্তান!

অবাক কাণ্ড! আমি বললুম, কে বলেছে আমি কিরিস্তান? সে বলে আপনি যে সব-জাতের হাতে ভাত খান। বলে সে চলেই গেল!

দারোগা সাহেবকে বললুম তিনি অন্য লোকের সন্ধান করবেন বললেন কিন্তু লোক মেলে না। মালি-মুচির হাতে ভাত খেয়ে এক দফা গোল পাকিয়েছি। তার ওপর মুসলমান রেখে আরো গোল পাকাবার ভরসা হল না। জামতৈল গ্রামের হিন্দুরা একটু খাতির করে, তারাও শেষে বিগড়ে যাবে?

সুতরাং পাবনার S. Pর কাছে এক যোরালো দরখাস্ত লিখলুম আগাগোড়া ইতিহাস মায় জমাদার বাবুর ঘোড়ার গল্প পর্যন্ত। ফলে কয়েক দিন পরেই জমাদার বাবুর বদলীর হুকুম এসে হাজির! আমার কাছেও খবর এল S. P স্বয়ং কামারখন্দে আসছেন।

কয়েক দিন পরে একদিন সকালে থানার "হাতা"র প্রকাণ্ড বটগাছের তলার ছায়ায় আমার ঘরের প্রায় সামনে এক টেবিল ও দু'খানা চেয়ার পড়েছে একখানা নতুন টেবলক্লথও পড়েছে আর দারোগা সাহেব full uniformএর ধড়া-চূড়ো পরে অপেক্ষা করছেন। বুড়ো মানুষ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে, ঘুরে-ফিরে অপেক্ষা করার পর হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন—S. P. এসে হাজির সাইকেলে।

দারোগা সাহেব খটাস করে সেলাম দিলেন। S. P. চেয়ারে বসেই হুকুম করলেন—ডাকুন detenue বাবুকে। আমি গিয়ে বসতে বসতেই দারোগা সাহেবের বাসা থেকে একগাদা গরম লুচি, আলুর দম, হালুয়া আর একটা প্লেট-ভরা ল্যাংড়া আম ছাড়ানো, টুকরো করা। আমি একটু অপ্রতিভ হতে না হতেই S. P. বললেন—হাত লাগান, এক প্লেটেই চলুক! আমরা খাই আর কথাবার্তা চালাই—আর দারোগা বাবু ঠায় attention হয়ে খাড়া—এই show জেলা-বোর্ডের রাস্তার ধারে। সুতরাং রাস্তায় দুদিকে একটু একটু তফাতে দেখতে দেখতে দুটি ছোট ভিড় জমে গেল।

খাওয়া এবং কথাবার্তা শেষ হলে S. P. দারোগা বাবুকে কড়াভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—চাকর পাওয়া যায় না কেন? দারোগা বাবু সটান বললেন, একটা লোকের সন্ধান পেয়েছি স্যার—আজই তাকে ডাকিয়ে আনবো। S. P. বললেন, কাল থেকেই চাকর চাই, অন্য কোন কথা শুনবো না। আমাকে বললেন, যখন যা কিছু অসুবিধে হবে, আমার কাছে লিখবেন,—একটা খামে ভরে আঠা দিয়ে এঁটে "confidential" লিখে দারোগার কাছে দেবেন। আমি বললুম, তাহলে তো উনি নিশ্চয় চিঠি খুলে দেখবেন, এবং চিঠি চেপে দেবেন। S. P. বললেন, Let him do it—তারপর আমি তার ব্যবস্থা করবো।

S. P. চলে গেলেন। অনেক দূরের অনেক পথ-চলতি লোক কাণ্ডটা দেখে গেল। দারোগা সাহেব একটু চুপ্সে গেলেন। পরদিনই

একজন চাকর এল, কিন্তু সে ছ'বেলা এসে শুধু বেঁধে খাইয়ে যায় মাত্র। সব অসুবিধা ঘুচলো না। কিন্তু গাঁয়ে গাঁয়ে খবর পৌঁছে গেল, স্বদেশীবাবু দারোগার চেয়ে বড় অফিসার।

২।৪ দিন পরেই এক ঘোরালো লম্বা দরখাস্ত লিখলুম S. P.র কাছে। তারপর সেটাকে খামে ভরে আঠা দিয়ে এঁটে "confidential" লিখে থানায় মুন্সী সাহেবের (literate constable) কাছে দিয়ে এলুম। তিনি বাঙ্গালী মুসলমান, আধাবয়সী, আমি আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলুম। বলে এলুম, দারোগা সাহেব নিশ্চয় চিঠিটা খুলে দেখবেন এবং চেপে দেবেন। আপনি শুধু খবরটা আমাকে দেবেন,—আমি এ নিয়ে লেখালিখি কিছুই করবো না। আমি চাই, চিঠিটা চেপে দিয়ে দারোগা সাহেব একটু ভয়ে ভয়ে থাকবেন, এবং আমার পিছনে লাগবেন না। মুন্সী সাহেব কথাটা বুঝলেন এবং দিন দুই পরে বললেন, আপনার আন্দাজ ঠিকই হয়েছে। আমি নিশ্চিন্ত হলুম।

নওসের নামে এক জোয়ান ছিল গ্রামের pound keeper কিছু রোজগারও করতো, এবং সব সময়েই ফিটবাবু সেজে থাকতো, জবজবে করে তেল মেখে টেরি কেটে কোট চড়িয়ে থানায় আসতো এবং আমার কাছেও আসতো। সে এক হারমোনিয়াম কিনেছিল, যদিও না পারতো বাজাতে, না পারতো গান গাইতে। আমি গান গাইতে পারি শুনে এক দিন হারমোনিয়াম এনে হাজির—গান শুনবে। গান শুনিয়ে দিলুম, শুনে বললে, ওটা আপনার কাছেই থাক। তারপর রোজ বিকেলে ঘরের সামনে রাস্তার ধারে মাদুর পেতে বসে গান গাই, নওসের আসে, আরো ২।৪ জন এসে জোটে বুড়ো হাজি সাহেবরা পর্যন্ত। দারোগা সাহেব দেখেন, মনে মনে গজরান, কিছু বলতে পারেন না।

একদিন নওসের এসে একগাল হেসে বললে, বাবু, দারোগা সাহেব আপনাকে ভারি ভয় করে। আজ আমাকে বলে কি, তোর সাত বছর জেল হবে, তুই স্বদেশীবাবুকে হারমোনি দিয়েই তো গানের ঘটা করেছিস। জানিস? ওরা ডাকাত। তা আমি বলি কি,তাহলে যাই, এক্ষুনি হারমোনি নিয়ে আসি। দারোগাবাবু বলে কি, না না, এখন যাসনি, তাহলে বুঝতে পারবে, আমি বলেছি, কাল আনিস। বলে নওসের হাসলো। আমি বললুম বেশ, কাল তোর হারমোনি নিয়ে যাস, গানতো অনেক হল।

বুড়ো হাজি সাহেবদের সঙ্গেও আলাপ জমেছে, এবং কথায় কথায় তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি আল্লা হচ্ছে জমিদারের দালাল, আর মোল্লারা সাব দালাল। কথাটা সহনীয় এবং গ্রহণীয় করার জন্যে হরিকেও সঙ্গে রাখি—আমাদের হরিও তাই—জমিদারদের দালাল আর গুরু পুরুতরা সাব দালাল। হিন্দু মুসলমান চাষারা এককাট্টা হলে কি জমিদাররা তাদের ঠকাতে পারে? কিন্তু এককাট্টা হওয়ার লক্ষণ দেখলেই একদিক থেকে মোল্লা, আর একদিক থেকে গুরু-পুরুতরা ধর্মের দোহাই দিয়ে, আল্লা হরির দোহাই দিয়ে ভেদ ঘটায়, দাঙ্গা বাধায়, চাষারাই মরে, জমিদার মোল্লা পুরুতদের গায়ে হাত লাগে না। শুনে হাজি সাহেবদেরও বলতে হয়, তা, বাবু যা বলছেন, কথাগুলোতো ঠিকই। চাষাদের বুদ্ধি যে বলদের মতন, তাই মারও খায় বলদের মতন। ওরা যেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, সেইদিকেই যায়।

তখন সিরাজগঞ্জের এক প্রধান মুসলমান নেতা ছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। উমেদালী সরকার নামক এক দুঁদে জোতদার থানায় আসতেন। তিনি বলতেন,—ওঃ, বেটা সিরাজী! যেন পারস্য থেকে এসেছেন। ওর চোদ্দ পুরুষ সিরাজগঞ্জের—বেটা সিরাজগঞ্জী। কথাটা অবশ্য সহজবোধ্যই।

সিরাজীর একটা বিশেষ অপরাধ ছিল এই যে, তিনি বলতেন, সুদ নেওয়া যে হারাম, মুসলমানদের এই ধর্মীয় কুসংস্কার একটা সাংঘাতিক নির্বুদ্ধিতা। হিন্দুরা মহাজনী কারবার করে, সব মুসলমানই তাদের কাছে মোটা সুদে কর্জ করে। সুদ নেওয়া যদি হারাম হয়, তাহলে দেওয়াটাও হারাম। তবু তারা হিন্দু মহাজনদের পেট ভরায়। মুসলমানদেরও মহাজনী করা উচিত। এ কথাটাও অবশ্য সহজবোধ্যই।

যাই হোক, চাকর আমার টিকলো না। অগত্যা মুন্সী সাহেবের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম। তিনি আমাদের "ভিটের" একটা পড়ো ঘরে বেঁধে খেতেন। বন্দোবস্ত হল, আমি মাছ—কিছু কই-মাগুর মাছ এবং মাঝে মাঝে মুরগী, হাট থেকে কিনে দোব, তিনি রাঁধবেন তাঁর ঘরে, আর আমি আমার ঘরে ষ্টোভে দুজনকার ভাত রাঁধবো, তার পরে দুজনে এক সঙ্গে খেয়ে বাসন ধুয়ে ফেলবো। তিনি অবশ্য আমাকে বাসন ধুতে দিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ এক চাকর জুটে গেল নোয়াখালীর এক জোয়ান, নাম লক্ষ্মণ। বাড়ীতে "বাইয়েরা ক্যাবলই খ্যাচর খ্যাচর করে" বলে চাকরী করতে বেরিয়েছে, অনেক জায়গায় কাজ করে শেষে জামতৈল গ্রামে এসেছিল। জাতে কায়স্থ, বেশ পরিচ্ছন্ন স্বভাব।

তখন আমি গড়গড়ায় তামাক খাওয়া ধরেছি। লক্ষ্মণ সর্বদা কান খাড়া করে রাখে, গড়গড়ার আওয়াজ বন্ধ হলেই নতুন কল্কে চড়িয়ে দিয়ে যায়। অবশ্য কল্কে পাল্টানোর সময় প্রত্যেকবারই বেশ দু'চার টান মেরে ভাল করে ধরিয়ে তারপর নিয়ে আসে। মনে হল, এই ধোঁয়ার বাঁধনেই টিকে যাবে। কিছু দিন বেশ চললোও। তারপর হঠাৎ একদিন বেমালুম উধাও। মাইনের টাকার আন্দাজ মতন টাকা আগে নিয়েছিল, তাছাড়া যাবার সময় একটি কুটোও নিয়ে যায়নি, সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গেছে। বুঝলুম, এমনি করেই ও অনেক জায়গায় কাজ করে এসেছে! বলতো, "আমার হক্কল ত্থাণ ত্থাখোনের ইচ্ছা।" অদ্ভুত স্বভাব।

'২৭ সাল শেষ হয়ে আসছে। বোধ হয় সেপ্টেম্বরের শেষে, হঠাৎ একদিন release order এসে গেল। চাটিবাটি গুটিয়ে কলকাতায় রওনা হলুম। [ক্রমশঃ।

কবি গীতিকার রজনী সেন প্রসঙ্গে

পাবনা জেলার অন্তর্গত ভাঙাবাড়ী নামক স্থানে কবি রজনী সেন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি কবিতা ও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। সঙ্গীতপ্রতিভা তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা-নৈপুণ্যে এতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে, অতি অল্প আয়াসেই তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। বি, এল পরীক্ষা পাশ ক'রে তিনি রাজসাহী কোর্টে ওকালতি করতে থাকেন। এই সময় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর রচিত গান লোকের মনে বিশেষ প্রেরণা দান করতে সমর্থ হয়েছিল। স্বদেশী সঙ্গীত 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' কবি রজনী সেনেরই রচনা। ইনি বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, সদ্ভাবকুসুম, অমৃত, বিশ্রাম ও অভয় প্রভৃতি সাতখানি কবিতা ও সঙ্গীত পুস্তক রচনা করেছিলেন। বাংলা ১৩১৭ সালে ইনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ আট মাস কাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগভোগের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রচিত বাণী ও কল্যাণী নামক পুস্তক দু'খানি সেই সময় বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর 'অমৃত' নামক পুস্তকে মোট ৪৮টি ছোট ছোট কবিতা স্থান পেয়েছে। এগুলি বালক-বালিকাদের শিক্ষাপ্রদ ক'রে রচিত হয়েছে।

কবি নিজেই বলেছেন, এই কবিতাগুলির ভাব কিছু সুপরিচিত সংস্কৃত নীতি শ্লোক ও বাংলা ইংরাজী গল্প হ'তে গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি স্কুলপাঠ্যের উদ্দেশ্যে লেখা এবং এগুলির কিছু কিছু আজকাল পাঠ্যপুস্তকেও স্থান পেয়েছে। এগু শিক্ষামূলক উপদেশ শিশুমনে সহজেই দাগ কেটে বসে।

ক্ষুদ্রচেতা মানুষ সামান্ত বিদ্যা লাভ ক'রে গর্ব করে। কিন্তু বিদ্যার পরিমাণ অধিক হলে অহঙ্কার কমতে থাকে, সত্যই তখন 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'। মানুষ তখন বুঝতে পারে নিখিলের তুলনায় তার জ্ঞান কত অল্প। কিন্তু এই জ্ঞানের অল্পতার অনুভূতি অনন্ত জ্ঞানের বিশালতার উপলব্ধি না হ'লে জাগে না। কারণ নিউটনের ন্তায় বিজ্ঞ ব্যক্তিও দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, 'সম্মুখে জ্ঞানের সমুদ্র পড়িয়া রহিয়াছে, আমি তাহার তীরে দাঁড়াইয়া শুধু নুড়ি কুড়াইতেছি।' তাই তিনি তাঁর কবিতায় ইহা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন।

"বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান লাভ তরে;
সুন্দর গম্ভীর মূর্ত্তি শান্ত দরশন
হেরি সব ভক্তিভরে বন্দিল চরণ।
সবে কহে 'শুনি তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু'-একটি তত্ত্বকথা কহ মহাশয়।'
দার্শনিক বলে, 'কেন বল জ্ঞানী?
কিছু যে জানি না আমি এই মাত্র জানি।"

দর্প করা যে বৃথা সেই কথোপকথন দ্বারা সুন্দর ভাবে বাঝান হয়েছে তাঁর এই ক্ষুদ্র কবিতায়।—

"নর কহে, 'ধূলিকণা, তোর জন্ম মিছে;
চিরকাল প'ড়ে র'লি চরণের নীচে।'
ধূলিকণা কহে, 'ভাই কেন কর ঘৃণা?
তোমার দেহের আমি পরিণাম কি না"

তাঁর আর একটি কবিতায় শিক্ষাপ্রদ বিষয় সুনিপুণ ভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি মাত্র চারিটি ছত্রে।

"মেঘ বলে 'সিন্ধু তব জনম বিফল
পিপাসায় দিতে নার এক বিন্দু জল।'
সিন্ধু কহে 'পিতৃনিন্দা কর কোন্ মুখে?
তুমিও অপেয় হবে পাড়লে এ বুকে।"

এই কবিতায় দুটি পাখীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সুখ যে কি, তা বোঝান হয়েছে।

"বাবুই পাখীরে ডাকি বলিছে চড়াই,
'কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা' পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ বৃষ্টি ঝড়ে।'
বাবুই হাসিয়া কহে 'সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়;
পাকা হোক্ তবু ভাই, পরের ও বাসা;
নিজে হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।"

একে অপরকে হিংসা করে, একে অপরকে নীচ মনে করে; এই মনোভাব মানব সমাজের প্রকৃতি। এই সমস্ত অতৃপ্তির লক্ষণ। অতৃপ্ত মানুষের মনোবিকারই আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু

(হিংসার ফল)

"পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায়
পিপীলিকা বিধাতার কাছে পাখা চায়;
বিধাতা দিলেন পাখা দেখো তার ফল,
আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা দল।"

"মানবের গীতি শুনি হিংসা উপজিল,
মশক, বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল;
গীতশক্তি দিল বিধি; দেখো তার ফল,
নরকরাঘাতে মরে মশক সকল।"

যা সাধ্যায়ত্ত, লোকে তাই করতে পারে। অন্তের সাধ্যায়ত্ত নয় বলে পরিহাস করবার কিছুই নাই। এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন কবি তাঁর এই কবিতায়।—

(উচ্চ নীচ)

"উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি,
'কি কর চাতক ভায়া, ধূলি মাঝে থাকি?
কোথায় উঠেছি চেয়ে দেখো একবার,
এখানে আসিতে পার? সাধ্য কি তোমার?'
চাতক কহিছে, 'তবু নীচে দৃষ্টি তব;
সদা ভাব, কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব।
মেঘ-বারি ভিন্ন অন্য জল নাহি খাই,
তাই, আমি নীচে থেকে উর্দ্ধমুখে চাই।'"

সভ্যতার সংঘাতে যে জাতীয়তাবাদ এই সময় জন্মগ্রহণ করে সেই স্বাজাত্যবোধের পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজন জন্মভূমির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করার। দেশমাতৃকার পরাধীনতা দূরীকরণে একদিকে যেমন দেশের জনসাধারণকে উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছিল, বক্তৃতা দিয়ে তেমনই অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন হয়েছিল দেশের লোককে গণতান্ত্রিক রূপের মূল্য বোঝাবার জাতীয় সংগীত দিয়ে। এই সংগীতের মূল্য তখনকার দিনে বড় কম ছিল না। তাই তিনি দেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে দেশমাতৃকার মহিমময় গৌরবোজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপন করেছিলেন জন্মভূমির গান গেয়ে। তাঁর রচিত সংগীতের বর্ণবিন্যাস ও ছন্দোবদ্ধতা অনবদ্য।

"জয় জয় জন্মভূমি, জননি,
যাঁর স্তন্য সুধাময় শোণিত ধমনী;
কীর্ত্তি গীতিজিত, স্তম্ভিত অবনত
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী।"

* * * *

"সর্ব্ব শৈলজিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে
মধুর গীতি চির মুখরিত ভৃঙ্গে
সাহস-বিক্রম-বীর্য্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত পরিণত জ্ঞান-খনি।"

"জননী তুল্য তব কে মর জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ 'জয় মা বরদে!'
দীর্ণ বক্ষ হতে তপ্ত রক্ত তুলি
দেহ পদে। তব ধন্য গণি।"

নিম্নলিখিত গানে কবি বাংলা দেশের ভৌগোলিক সংস্থাকে কাব্যে রূপায়িত করে এবং ছন্দে গেঁথে একে রসসমৃদ্ধ করেছেন। রচনা-নৈপুণ্যে ও বর্ণনার কুশলতায় সংগীতটি কবির একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

(বঙ্গমাতা)

"নমো নমো নমো জননি, বঙ্গ!
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী
অতুল, বিপুল গিরি অলঙ্ঘ্য!
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণতল নিরবধি,
মধ্যে পূত জাহ্নবী জল
ধৌত শ্যামক্ষেত্র সঙ্ঘ।
বনে বনে ছুটে ফুল পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে কোটি
তটিনী মত্ত, খর তরঙ্গ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে
ফল-ভর-নত শাখিবৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ।"

ভারতবাসীর বিভ্রান্ত দৃষ্টি স্বদেশের প্রতি আকৃষ্ট করে কবি ভারতবর্ষের পুরাণ ও সাহিত্য হ'তে শ্রেষ্ঠত্ববোধক উপকরণ সংগ্রহ ক'রে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শের এক গৌরবোজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেছেন চোখের সামনে।

"সেথা আমি কি গাহিব গান।
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা স্বর সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্র কমলাসীনা
রোধি তটিনী জলপ্রবাহ
তুলিত মোহন তান।

* * *

যেথা—বৃন্দাবন কেলিকুঞ্জে
মুরলী রবে পুঞ্জে-পুঞ্জে
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?" (বাণী)

দেশাত্মবোধ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অঙ্গীভূত। যাযাবর মানুষের জীবনে এল স্থিতির সংকল্প, জন্মস্থান নিরূপিত হল, জেগে উঠল মানুষের মনে দেশাত্মবোধের স্পৃহা। তাই রচিত হল দেশাত্মবোধক সংগীত, জন-জাগরণের প্রেরণা নিয়ে। মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠল, বিদেশী শাসনে; তাই বিদেশী পণ্য বর্জনের সংকল্প দেশ গ্রহণ করল এবং স্বদেশজাত দ্রব্যের শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগিয়ে তুললেন কবি তাঁর কাব্যে, তাঁর সংগীতে।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই;

এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।" ইত্যাদি—
(বাণী)

মত্ত বাসনার মোহ মুক্তির সুর ধ্বনিত হয়েছে কবির এই গানে। সর্বত্র বিরাজমান পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিকট তাই তাঁর করুণ আকুতি, তাই তাঁর বিশ্ব-বিপদহন্তার নিকট করুণ আবেদন মঙ্গলের জন্য।—

"তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক্ মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল গরল-পাথারে।
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে,
ভূধর-সলিলে, গহনে,
বিটপি-লতায় জলদের গায়
শশি-তারকায় তপনে।"
ইত্যাদি—

জগতের দুঃখ ও বিপর্যয় দেখে তিনি সংশয়াকুল হ'লেও নির্ভরতায় তাঁর যে অবিচলিত বিশ্বাস তারই সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সংগীতে;—

"কেন বঞ্চিত হব চরণে
আমি কত আশা ক'রে বসে আছি, পাব
জীবনে না হয় মরণে!
আহা, তাই যদি না হবে গো;
পাতকী-তারণ তরিতে, তাপিত
আতুরে তুলে না লবে গো;
হয়ে পথের ধূলার অন্ধ,
আমি দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পারে ব'সে পার কর' বলে পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে?

আমি শুনেছি, হে তৃষাহারি,
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি।
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার;
এ কি, সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে প্রভু মরমে!"

গভীর ভাবব্যঞ্জক এই গানে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সব কাজই সুসম্পন্নের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু' নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হাহা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতল সৌরভ।" ইত্যাদি—

কবির এই সংগীতে ধ্বনিত হয়েছে শেষ মহাযাত্রার সুর। তিনি গেয়েছেন:—

"কবে এ তৃষিত মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে,
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা চন্দনে।
কবে তোমাতে হ'য়ে যাব, আমায় আমি হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে বহে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে।
কবে ভবের সুখ-দুঃখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।"

গিরিরাজকন্যা আনন্দময়ী গৌরীর পিতৃগৃহে আগমন, শ্বশুরবাড়ী প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয়ে কবির কতকগুলি কবিতা তাঁর আনন্দময়ী নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ইহার আদ্যংশ আগমনী ও ও শেষাংশ বিজয়ার নানা শ্রুতিসুখকর সংগীতে সমৃদ্ধ।

গৌরীর আগমন-সংবাদ

(প্রতিবাসিনীর উক্তি)

"গা তোল, গা তোল, গিরিরাণি !
এনেছি মা, শুভবাণী,
দেখে এলাম পথে, তোর ঈশানী।
রূপে কানন আলো করে
ছেলে দুটি কোলে ধরে
কিশোরী কেশরী 'পরে
কোটি চন্দ্র নিন্দি, পা দুখানি।" ইত্যাদি

(গৌরীর নগরে প্রবেশ)

"কে দেখবি ছুটে আয়,
আজ গিরিভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায়।
ঐ মা এল, মা এল' বলে
কেমন বাদ্য কোলাহলে
উঠি পড়ি করে সবাই আগে দেখতে চায়।" ইত্যাদি

তিন দিন গৌরীর মর্তে অবস্থানের পর নবমী নিশির সকরুণ বর্ণনা কবি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন,—

"নবমী-নিশায় নগর নীরব,
আনন্দ-সঙ্গীত থেমে গেছে সব।
একটি পতাকা উড়ে না আকাশে,
বাজে না মঙ্গল শঙ্খ।
কঠোর কর্ত্তব্য পালন নিরত
নবমী নিশীথ কি বিষাদ ব্রত,
ক্লিষ্ট মলিন, অবসন্ন কত।
সুগভীর কি কলঙ্ক।" ইত্যাদি—

রসসমৃদ্ধ রচনাতেও যে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর নিরুত্তর, তিনকড়ি শর্ম্মা ও জেনে রাখো প্রভৃতি কবিতায়। এই সকল কবিতায় মনুষ্য-চরিত্র সংশোধনের এবং সমাজ সংস্কারের অনেক ইঙ্গিত আছে।

(নিরুত্তর)

"ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে
দেখবো সে উপাধি নিকে,
কটা কেনর জবাব লিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা ছেঁড়া ফলটি কেন সে,
দেয় না যেতে অন্য দিকে ?
* * *
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;
চকোর চায় চন্দ্রমাকে,
কমল কেন চায় রবিকে ?" ইত্যাদি—

(তিনকড়ি শর্ম্মা)

"(আমি) যাহা বলি, সবি বক্তৃতা,
যাহা লিখি মহাকাব্য ;
(আর) সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুপ্রাণিত
দর্শন, যাহা ভাব্‌ব।
* * *
(আমি) যা খাই সেইটি খাদ্য ;
আর যা বাজাই সেটা বাদ্য ;
আমি যদি বলি এইটে উহ্য
সেইখানে সেটা যাপ্য।
* * *
আমি করি যার হিত ইচ্ছে,
তারে পৃথিবী শুদ্ধ দিচ্ছে
(দেখো) কক্ষণো তার বংশ রবে না
ঘরে বসে যারে শাপ্‌বো।" ইত্যাদি

তাঁর আর একটি ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা :—

(জেনে রাখো)

"মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা ;
সাধু সেই যে পরের টাকা নিয়ে, দেখায় রম্ভা।
ধার্ম্মিক বটে সেই, যে দিন-রাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাঁটে।
সেই মহাশয় সংগোপনে যে মদটা আসটা টানে ;
নিষ্ঠাবান যে কুক্কুট মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ ;
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ্য।"

বরপণ প্রথাকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। সমাজ সংস্কারের পক্ষে এগুলি অতি মূল্যবান অবদান।

(বরের দর)

"কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ ;
তাই বুঝি সংক্ষেপে কাজ্জ ফর্দ্দ সমাপন।
নগদে চাই তিনটি হাজার
তাতেই আবার গিন্নী বেজার,
বলেন এবার বরের বাজার কসা কি রকম !
(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে বিষম !
গিন্নি বলেন, 'বাউটি' সুটে রূপলাবণ্য ওঠে ফুটে,
একশ ভরি হলেই হবে একটি সেট উত্তম,
যেন অলঙ্কার দেখে, নিন্দে করে না লোকে,
দিও বেনারসী, বোম্বাই, ফর্দ্দ কিছু হল লম্বাই,
তা, তোমার মেয়ে তোমার জামাই
তোমার আকিঞ্চন।
আমার কি ভাই ? আজ বাদে কাল মুদব দু'নয়ন।"
ইত্যাদি—

যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আর এই সব ভাবসমৃদ্ধ সংগীত গাইবার রীতি নেই। লঘু ও চটুল সিনেমার গানে আজ আকাশ-বাতাস মুখরিত। সুতরাং প্রাচীন কবির কাব্য চর্চায় ও সংগীতে কাহারও স্পৃহা নেই। এই প্রতিভাবান কবিকে স্মরণীয় করার এবং তাঁর কাব্য আলোচনা

করার দায়িত্ব স্বাধীন দেশের নাগরিকের। তাই, কবির জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে কবিকে স্মরণীয় ক'রে রাখা প্রত্যেক বাঙালীর কর্তব্য।

—শ্রীকালীপদ লাহিড়ী

আমার কথা (৬১)

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকালীপদ পাঠক

গ্রামের ছেলে—বংশের ধারানুযায়ী নিজেই গান গায়—কিন্তু স্বাস্থ্যচর্চ্চায় উদ্যোগী বরাবর—কৈশোরে এল কলিকাতায়—গান শেখার সুযোগ হল না প্রথমে—তবে ব্যায়ামানুশীলন করার সুবিধা হল—হঠাৎ যোগাযোগ ঘটে সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করার—সেটা গ্রহণ করেন নিবিড় ভাবে—আর তার জন্ত বাঙলা দেশ পেল এক মার্গ সঙ্গীতসাধকরূপে আজকের বয়োবৃদ্ধ শিল্পী শ্রীকালীপদ পাঠক মহাশয়কে। ডাকনামেই পরিচিতি তাঁর কিন্তু অজানার অন্তলে রয়েছেন শ্রীমোহিনীমোহন পাঠক।

মজবুত দেহ, কোমল মন আর দিলখোলা হাসির ভিতর থেকে জানতে পারি সঙ্গীতাচার্য্যকে—

১৩০১ সালের ফাল্গুন মাসে আরামবাগ মহকুমার (জাহানাবাদ পরগণা) খানাকুল থানান্তর্গত রাজহাটি গ্রামের ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৺শীতলচন্দ্র পাঠক ও ৺গিরিবালা দেবীর সাত পুত্রের মধ্যে তৃতীয় আমি স্বগৃহে জন্মাই। পাঠশালা ও গ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখি। বড় চঞ্চল ছিলুম আর প্রথম থেকে খেলাধূলা ও ব্যায়ামের দিকে খুব মন দিই—সেই জন্য পড়াশুনায় বেশীদূর যাইনি।

আমার ঠাকুরদাদা ৺রামলাল পাঠক ভাল মৃদঙ্গ বাজাতেন। তাঁর অন্যান্য ভায়েরাও গান-বাজনা করতেন। ময়ূরভঞ্জ দেশীয় রাজ্যের সভাগায়ক ৺যদুনাথ রায় সম্পর্কে আমার ঠাকুরদাদা হতেন। তাঁর দুই ভাইপো ৺আশু রায় ও সুধীর রায় কলিকাতার সঙ্গীতমহলে পরিচিত ছিলেন।

গ্রামে যাত্রা শুনতাম—গান নকল করতাম—থিয়েটারে অংশগ্রহণকারী ছিলাম—পাঠশালায় গান করার জন্য গুরুমশায়ের কাছে মার খেয়েছি কিন্তু গান গাওয়া নিয়মিত চলত। দাদা যামিনীশেখর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর কলিকাতায় চাকুরী নেন। কিছুদিন বাদে সপরিবারে বাবা হাওড়া কদমতলায় চলে আসেন। আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর। আমি শিবপুর ব্যায়াম সমিতির সদস্য হয়ে পড়ি। নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চ্চা করতুম সেখানে—কাছেই প্রখ্যাত অন্ধগায়ক পরলোকগত নিকুঞ্জবিহারী দত্তর বাড়ী। প্রত্যহই গান শেখাতেন তিনি অনেক ছেলেকে—আমি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর গান শুনতুম আর নকল করে নিতাম। একদিন তিনি আমার গলায় তাঁর গান শুনে অসন্তুষ্ট হন ও নিষেধ করেন। আমার তখন খুব ঝোঁক গান শেখার—তাঁর কথা প্রায় অগ্রাহ্য করি—তজ্জন্য আমি অপমানিত হই। মনে বড় ক্ষোভ হল—একদিন বড়রাস্তায় দত্ত মহাশয়কে ধরে দাবী জানাই আমায় তাঁর সঙ্গীত-শিষ্য করার জন্য। বহু অসম্মতির পর তিনি রাজী হন। এক বৃহস্পতিবার সকালে শুচিসিক্ত মনে তাঁর গৃহে তাঁকে গুরু-বন্দনা জানাই। খেয়াল ও ধ্রুপদ গান তিনি আমায় শেখান আন্তরিকভাবে ও বিনা দর্শনীতে। ৺মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও রমজান খাঁর শিষ্য ৺শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট টপ্পা শিখি। সেই সময় আমি কলিকাতার কয়েকজন শিল্পীর সহিত পরিচিত হই। কাজী নজরুল, নলিনীকান্ত সরকার, অধ্যাপক ধূর্জটি মুখার্জ্জী, অমিয়নাথ সান্যাল ও আমি প্রতি রবিবার মিলিত হতুম গানের জলসায়—বুক কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীদের অখিল মিত্রী লেনের গৃহে।

ডাঃ রবীন্দ্র মিত্র ছিলেন আমাদের প্রধান উৎসাহদাতা এর পর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ও পরেশ ভট্টাচার্যের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২৭ সাল থেকে আমি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। হিজ মাষ্টার্স ভয়েস ও সেনোলা কোম্পানীতে আমার গাওয়া শ্যামাসঙ্গীত ও টপ্পা গানের রেকর্ড আছে। আমি নিধুবাবুর লেখা ৮৫টি গান জানি। ভদ্রকালী নিবাসী ৺রাম দত্তর লেখা গান আমি রেডিওতে গেয়ে থাকি। আমার দুটি ছাত্র শ্রীগোপালচন্দ্র চাটার্জ্জি ও শ্রীচণ্ডীদাস মালের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর বলে আমার ধারণা। ১৯৩১ সালে আমার স্ত্রী চণ্ডীবালা দেবী পরলোক গমন করেন। আমি নিঃসন্তান।

বহুদিন আগে মুরারি সঙ্গীত-সম্মেলনে আমি একবার দর্শক হিসাবে যাই। এক কর্ম্মকর্ত্তাকে হঠাৎ অনুরোধ করি আমায় গান গাইতে দেওয়ার জন্য। তিনি রাজী হলেন। ভারতবিখ্যাত কয়েকজন গায়কের গান গাওয়া শেষ হল পরদিন ভোরে। সেই ভদ্রলোককে আবার মনে করাইয়া দিতে আমি গাইবার সুযোগ পাই। একটি গান ধরি, ক'ল ভাঙা-আসর আবার ভর্ত্তি হল খানিকটা। কর্ম্মকর্ত্তারা সন্তুষ্ট হলেন। এর পর থেকে আমি তথাকার নিয়মিত শিল্পী হই।
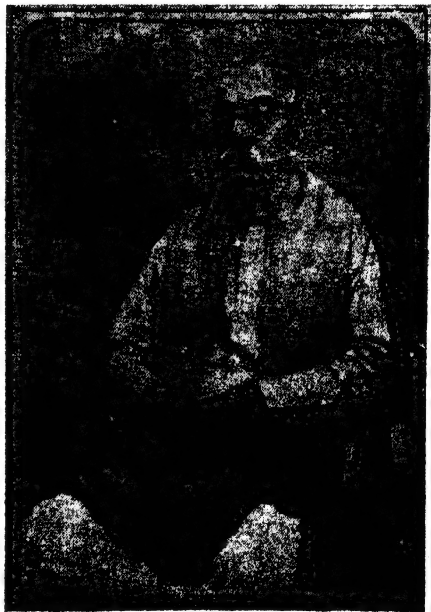
সঙ্গীতাচার্য শ্রীকালীপদ পাঠক

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

হাজার বছরের প্রেমের কবিতা

জীবনের পূর্ণতা প্রেমে। আর এই প্রেমের মধ্যেই মানুষ খুঁজে পেয়েছে জীবনের মানে, প্রেমকে কেন্দ্র করে মানুষ অনন্তকাল ধরে জীবনের গভীর থেকে গভীরে অবগাহন করে আসছে। কালের প্রভাবে প্রেমের হয়ে থাকে রূপান্তর। সময়ের ব্যবধানে প্রেমও তার রূপ বদলায়, তার প্রকাশভঙ্গিমার হয় পরিবর্তন—সমকালীন কাব্যে তারই ছায়া পড়ে। এ কথাও স্পষ্ট সত্য যে প্রেমের কাছে পৃথিবীর কাব্য সম্পদ যে কি পরিমাণ ঋণী তার তুলনা নেই, কেন না প্রেমকে ঘিরেই জগতের কাব্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। খৃষ্টপূর্ব ষোড়শশতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতের বিভিন্ন ভাষায় যে সকল প্রেমের কবিতা রচিত হয়েছে, তাদের বঙ্গানুবাদ সমূহের একটি সার্থক সঙ্কলন সম্পাদনা করেছেন কবি অবন্তী সান্যাল। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কালিদাস রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীলকুমার দে, কানাই সামন্ত, বিষ্ণু দে, হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের অনুবাদ রচনা গ্রন্থকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে অবন্তী সান্যাল যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিতা একত্রে সঙ্কলিত হয়ে গ্রন্থটির মাধ্যমে যেন এক আন্তর্জাতিক মহামিলনের পবিত্র মন্ত্রপাঠ করছে। কবিতার দৃষ্টিকোণ থেকে সারা পৃথিবী যেন এখানে এক হয়ে গেছে, একত্রে সারা জগতের বরেণ্য কবিদের কাব্যসৃষ্টির রসাস্বাদনে তার সমস্ত বাধা যেন অপসৃত হয়ে গেছে। গ্রন্থটি বাঙলার কাব্যভাণ্ডারে একটি মূল্যবান সংযোজন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রকাশক নতুন সাহিত্য ভবন, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট কলিকাতা-২০। দাম আট টাকা মাত্র।

মধুসূদন : কবি ও নাট্যকার

বাঙলা কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের নবজাগরণের ইতিহাসে শ্রীমধুসূদন একটি চিরউজ্জ্বল স্বাক্ষর। মধুসূদনের কল্যাণে বাঙলাদেশের কাব্য ও নাট্যসাহিত্য প্রথম মুক্তির রসাস্বাদে সমর্থ হল। তাঁর অবদানের গরিমা ইতিহাসকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দিয়েছে। কবিতায় ও নাটকের ক্ষেত্রে তিনি অনেক কিছুরই প্রবর্তন করলেন, বহু বিষয়ের নবজন্ম দিলেন। তাঁর কালজয়ী কাব্য ও নাট্যসৃষ্টিকে কেন্দ্র করে উপরোক্তআলোচনাগ্রন্থটি রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালায় প্রদত্ত প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ও খ্যাতনামা প্রবন্ধকার শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের বক্তৃতার গ্রন্থরূপ। কবি ও নাট্যকার হিসেবে মধুসূদন সম্বন্ধে সুবোধচন্দ্রের একটি বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটিকে রূপ দিয়েছে। সুবোধচন্দ্রের আলোচনা শুধু বিস্তৃতিতেই পূর্ণ নয়, সারবত্তার দিক দিয়েও বিশিষ্ট। তা ছাড়াও আলোচনা প্রাঞ্জল, তথ্যসমৃদ্ধ এবং অধ্যাপক সেনগুপ্তের প্রভূত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সুধী ও ছাত্র উভয় সমাজেই গ্রন্থটি যথেষ্ট সমাদর অর্জন করবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। প্রকাশক এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক

(প্রথম খণ্ড)

পরলোকগত সাহিত্যকার সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মাতুল। বয়েসে অবশ্য কিছু ছোট—বছর চারেকের, সুতরাং সমসাময়িক বলতে বাধা নেই—বাল্য ও কৈশোরকাল এঁরা একত্রেই অতিবাহিত করেছেন—শরৎচন্দ্রের জীবনের বাল্য ও কৈশোরপর্বে ঘটে যাওয়া এমন বহু ঘটনা আছে যার তাৎপর্য অসীম এবং পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে যাদের প্রভাব বিস্তার হয়েছে বহুল পরিমাণে—এই ঘটনাগুলি অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয়—কেবলমাত্র যাঁরা সেই সব ঘটনার সাক্ষী বা যাঁরা শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছেন প্রধানতঃ তাঁদেরই পক্ষেই তা সম্ভব। সুরেন্দ্রনাথ সেই সব ঘটনাগুলির প্রতিই আলোকপাত করেছেন। অসংখ্য কৌতূহলোদ্দীপক এবং চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আর সেই সব ঘটনার আলোয় শরৎচন্দ্র যেন এই নতুন মূর্তিতে এখানে ধরা দিয়েছেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের, তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির, শরৎচন্দ্র—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ ভট্ট—নিরুপমা দেবী প্রমুখ সাহিত্যরথীদের জীবনের প্রস্তুতি পর্বের একটি নিখুঁত আলেখ্য অঙ্কনে যথোচিত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে—সুরেন্দ্রনাথের লেখনী। গ্রন্থটি যথাযোগ্য সমাদর লাভ করুক এই কামনা করি। প্রকাশক—পূর্বাচল প্রকাশনী, ৩২-ই ল্যান্সডাউন রোড। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মুক্তধার

ভদ্রমহিলার বয়েস আশি। তাঁকে ঘিরে বিস্ময়ের যেন সীমা-পরিসীমা নেই। কোন দেশ-বিশেষের, জাতি-বিশেষের

বস্তু-বিশেষের তিনি বিস্ময় নন, বিস্ময় তিনি সমগ্র বিশ্বের। নাম তাঁর হেলেন কেলার। ডক্টর মিস্ কেলার। স্থূল দৃষ্টিশক্তি না থাকা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির দ্বারা জীবনের পূর্ণতার পথের যে সন্ধান তিনি হৃদয়ের গভীরতার দ্বারা পেয়েছেন, তারই ব্যাখ্যা তিনি করেছেন বিভিন্ন বাক্যের মাধ্যমে। সেই বাক্যাংশগুলি একত্রে সংকলিত হয়ে গ্রন্থরূপ নিয়েছে। মিস্ কেলারের সেই বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম "দি ওপেন ডোর"। পঞ্চেন্দ্রিয়ের কয়েকটি ইন্দ্রিয় তাঁর চেতনাহীন সত্যিই কিন্তু যেমনই তাঁর উপলব্ধির ও অনুভূতির গভীরতাও অবর্ণনীয় এবং তার সাহায্যেই তিনি অমৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছেন—সেই সত্যই তাঁর বাক্যাংশগুলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে হেলেন কেলার বিচার করেছেন। গ্রন্থটি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অচিন্ত্যকুমার অনুবাদকর্মে যথেষ্ট নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন, তাঁর অনবদ্য ভাষা-সম্পদ অনুবাদ প্রচেষ্টাকে সার্থকতার রূপ দিয়েছে। তাঁর অনুবাদ যথেষ্ট সাধুবাদের দাবী রাখে। প্রকাশক—পার্ল পাবলিকেশানস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ ওয়াটার্লু ম্যানসনস, ১৭০ গান্ধী রোড, বোম্বাই ১। পরিবেশক ইণ্ডিয়া বুক হাউস, ১ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট। দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মাঝির ছেলে

শুধু সাহিত্যশিল্পী হিসেবে নয়, সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে ইতিহাসে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, স্বর্গীয় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। জলচর মানুষদের তিনিই প্রতিষ্ঠা করলেন সাহিত্য-জগতে। তারাও তাঁরই কল্যাণে সাহিত্যের পাতায় স্থান পেল, সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে যে বৈশিষ্ট্যের তিনি অধিকারী ছিলেন আলোচ্য উপন্যাসে সে বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। লেখনীর বলিষ্ঠতা আর হৃদয়ের গভীরতা, দু'য়ের সমন্বয়ে এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। হাসি-কান্নায় ভরা কয়েকটি মানুষকে কেন্দ্র করে, তাদের সমাজ, চিন্তাধারা, ভালোবাসাকে নিয়ে একটি সুন্দর নিটোল গল্প পরিবেশিত হয়েছে। এতে কোনপ্রকার ছলনা, কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা বিন্দুমাত্র ছায়াপাত করে না, উপন্যাসটি আন্তরিকতার আলোয় উদ্দীপ্ত। লেখক আজ আমাদের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী থেকে অনেক দূরে, সুতরাং পার্থিব নিন্দাস্তুতি আজ আর তাঁকে স্পর্শ করতেও পারবে না। তাঁর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

স্মরণচিহ্ন

অতীত শব্দটির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে 'মৃত' বিশেষণটি যুক্ত হয়ে থাকে—কিন্তু তা যথার্থ নয়, অতীত মৃত্যুহীন। যৌবনের বুকের উপর দাঁড়িয়ে বাল্য ও কৈশোরের দিকে পিছন ফিরে তাকালে তখনকার ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি এক নতুন রূপ নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এই সব ঘটনাগুলি জীবনকে শুধু স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হয় না, জীবনে এনে দেয় মুঠো মুঠো বৈচিত্র্য, যার ফলে জীবন এত বিচিত্র। শিশুকালে এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন আমরা হই যাদের স্থায়িত্ব ক্ষণকালের কিন্তু প্রভাব চিরকালের। জীবন যেন একটি দীর্ঘ পথ, বয়েসরূপী এক একটি পথিক যেন তার বুকের উপর পা ফেলে চলেছে আমাদের চেতনা যেন তার নীরব দ্রষ্টা। এই পটভূমিকে ভিত্তি করেই আলোচ্য উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসটির রচয়িতা বাঙলার যশস্বী সাহিত্যকার সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। অতীত—স্মরণে যে এক অপার আনন্দ, এক পুলক রোমাঞ্চ, এক গভীর তৃপ্তি এই সত্যটিই উপন্যাসটির মধ্যে বারংবার ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসটি প্রাণস্পর্শী, হৃদয়ধর্মী এবং পরম সুখপাঠ্য। সুধীরঞ্জনের লেখনীর তীক্ষ্ণতা, বলিষ্ঠতা ও শক্তির ছাপ উপন্যাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। চরিত্রগুলি সুকল্পিত এবং সুরূপায়িত। সংলাপ যোজনাও সুনিপুণ। লেখকের অনুভূতিময় হৃদয়ের সমস্ত স্নিগ্ধতা যেন তিনি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন এই উপন্যাসটির মধ্যে। পটভূমির দিয়ে উপন্যাসটি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরযুক্ত। গ্রন্থটিকে শুধু বৈশিষ্ট্যবান বললেই সম্পূর্ণ-রূপে বলা হয় না, গ্রন্থটিতে নতুনত্বের স্পর্শও যথেষ্ট এবং এই নতুনত্বের পরীক্ষায় লেখক সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলা যায়। লেখককে আমরা অভিনন্দন জানাই। প্রকাশক—ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

রাজমহল

মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্ত অপরিচিতা নন। অল্পকালপূর্বে তাঁর ইন্দ্রাণীর প্রেম শীর্ষক উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজমহল' তাঁর আর একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসটি লেখিকার দক্ষতার, প্রতিভার ও শক্তির যথাযথ স্বাক্ষর নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি অভিজাত বর্ধিষ্ণু রাজপরিবারের বিপর্যয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের মাধ্যমে ফুটে ধরা হয়েছে। তিন পুরুষের কাহিনী এর মধ্যে স্থান লাভ করেছে। রচনার প্রসাদগুণে উপন্যাসটি পাঠকের প্রাণস্পর্শ করতে সক্ষম হবে। প্রতিটি চরিত্র যথাযথ বিকশিত, আবেষ্টনী বা পরিবেশও সুচিত্রিত, আনন্দকিশোর ও হরিপ্রিয়ার জীবনের পরিণতিও হৃদয়স্পর্শী। ললিতকিশোরের চরিত্রসৃষ্টিতে নীলিমা দাশগুপ্ত অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—এস, ব্যানার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

মানুষ কি করে গুণতে শিখল

গণনার সঙ্গে পরিচয় নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। গণিতের দুরূহ জটিল তত্ত্বাদির সঙ্গে দক্ষ গণিতজ্ঞ ছাড়া অন্যের পরিচয় নেই, একথা সত্য—তবে তার প্রাথমিক অধ্যায়গুলির অর্থাৎ গণনাদির সঙ্গে পরিচয় নেই, এ ধরণের মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সংখ্যাবিজ্ঞান আজ এক বিরাট রূপ নিয়েছে, তার জয়যাত্রা আজ ব্যাপক, তার আবেদনও আজ অপরিহার্য কিন্তু সুদূর অতীতে সুপ্রাচীনকালে প্রায় হাজার তিনেক বছর আগে পৃথিবীতে এই গণন বিদ্যার জন্ম হল কেমন করে, কার দ্বারা, কি ভাবে—সেও এক চমকপ্রদ ইতিহাস। সেই ইতিহাস রচনা করেছেন গ, ম, বেরমান মূল রুশ থেকে বাঙলায় তা অনুবাদ করেছেন বিনয় মজুমদার। বহু চিত্র সহযোগে ইতিহাসটি বোঝানো হয়েছে। আলোচনা যথে

সারণী, ইতিহাস বর্ণনায় প্রভূত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি পাঠ করলে সংখ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা যায়। সংখ্যাশাস্ত্রের বিরাট, চমকপ্রদ ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব সর্বতোভাবে বিদূরিত হবে। সংখ্যাশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থটি বহুবিধ জ্ঞাতব্য ও বিচিত্র তথ্যের আকর। প্রকাশক—ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম বোর্ড বাঁধাই—এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র এবং কাগজে বাঁধাই—পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে

বাঙলা দেশের গা ঘেঁসেই বলতে গেলে লেপচাদের বাসস্থান—সুতরাং তারা যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী, এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। অথচ এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ বললেই চলে, ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি ও উপজাতি। ভারতভূমির এই বৈশিষ্ট্যই তাকে অনেকখানি মহিমময়ী করে তুলেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ছেলেমেয়ে লেপচাদের একটি পরিপূর্ণ ইতিহাস। এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থে তাদের সাহিত্য—শিল্প—রাজনীতি—দর্শন—সমাজ—চিন্তাধারায় বিস্তৃত ইতিহাস পরিবেশন করা হয়েছে। অন্যান্য জাতির মত লেপচাদের সম্বন্ধেও আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই। নীহাররঞ্জন চক্রবর্তীর এই গ্রন্থটি সেই কৌতূহল বহুল পরিমাণে নিরসন করবে। শ্রীচক্রবর্তী নিঃসন্দেহে একটি অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। এই ইতিহাস রচনায় তাঁকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অনেকখানি শক্তি ও আন্তরিকতারও পরিচয় দিতে হয়েছে। এই গ্রন্থটি লেপচাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অভাব দূর করবে। গ্রন্থটি লেখক নিজেই প্রকাশ করেছেন। প্রাপ্তিস্থান (১) হোমশিখা প্রকাশনী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর (২) বুক হাউস, কৃষ্ণনগর এবং (৩) বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

ডোভার পেরিয়ে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও আলোচ্য গ্রন্থটি কবিতাগ্রন্থ নয়, এটি একটি ভ্রমণকাহিনী। ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করাকালীন যে অভিজ্ঞতা লেখক অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতাকেই লেখনীর মাধ্যমে এখানে তুলে ধরেছেন, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ যেভাবে লেখকের সামনে ধরা দিয়েছে তারই প্রতিচ্ছবি গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। লেখকের লেখনীর বলিষ্ঠতায় তাঁর রচনা প্রাণ পেয়েছে। ভ্রমণপর্বটি যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, ভাষার মধ্যেও প্রাঞ্জলতার স্পর্শ পাওয়া যায়। মনকে আকৃষ্ট করার শক্তি এই গ্রন্থটির আছে। কয়েকটি আলোকচিত্র গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। প্রকাশক এম সি, সরকার য্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম চা টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

সর্প সম্বন্ধীয়: (১) সাপের খবর ও (২) সাপের কথা

সাপ। দুটি মাত্র অক্ষর—কিন্তু তার দংশন মানেই জীবনান্ত, তার ফণা উদ্যত হওয়ার অর্থই জীবনের উপর যবনিকাপতনের সঙ্কেত। সর্প দংশিত মানুষের গাত্র হয়ে যাবে নীলাভ যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ না পেয়ে তাকে ঢলে পড়তে হবে মৃত্যুর কোলে। সর্পদেহ হচ্ছে বিষের আধার আর এই সর্প শব্দটির সঙ্গে বলতে গেলে মিশে আছে আবহমানকালব্যাপী মানুষের ভয়, আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা কিন্তু এরও ইতিহাস আছে, আছে পরিচিতি, আছে নানা তথ্যবহুল বিশদ বিবরণ। ১৩৬৪ সালের দৈনিক বসুমতীর শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্রের সাপের সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, বর্তমানে তাঁরই রচিত সর্প সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে (সাপের খবর)। দ্বিতীয়োক্ত গ্রন্থটি শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষের লেখনীজাত এবং ভারত সরকার গ্রন্থটিকে একটি পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। উভয় গ্রন্থই সর্প সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে ভরপুর, সুবর্ণিত এবং বিষয় বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। লেখকদ্বয় সর্প সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা করেছেন গ্রন্থ দুটির সারবত্তাই তার প্রমাণ। প্রথমটির প্রকাশক এ, মুখার্জী য্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র। দ্বিতীয়টির প্রকাশক ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম এক টাকা পঁচিশ নয়াপয়সা মাত্র।

আকাশের নেশা

অধীর সরকার

স্মৃতির হরফে দেখেছি কাহার মুখ
দুটি কালো চোখে আষাঢ়ের ঘনছায়া,
হৃদয়ে জড়ানো একান্ত উৎসুক
কাছে পেতে চাওয়া অতীতের কোনো মায়া—
হয়তো এ সব আমি নেই তার জন্যে।

পাখি হল মন, উধাও আকাশ পারে,
অশ্রুমজ্জিত মানসকুঞ্জে তার
ফুটেছে বকুল অজস্র সম্ভারে
পাগল করেছে গোপন সুরভিভার—
পাখি হল মন উধাও তাহার জন্যে।

অথচ সে পাখি ক্লান্ত করেছে ডানা;
আকাশ কোথাও আছে নাকি? বুঝি নেই;
গোপন গন্ধ দুয়ারে দিয়েছে হানা
সুরভি তাহার ঝরে গেছে গোপনেই।
ক্লান্ত পাখায় আর্তি কিসের জন্যে?

ওরে তুই পাখি, উড়ে যা উর্ধ্বে দূরে
অতি কাছে তার হৃদয়ে অন্ধকার;
লাগুক ডানায় গভীর রক্ত জুড়ে
আকাশের নেশা দুরন্ত দুর্বার—
অদ্ভুত ভুবন ঝরে গেছে তোর জন্যে।

কেনাকাটা

ভাগ্য গঠন—কয়েকটি সূত্র

বড় হবার স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষেরই থাকতে পারে। কিন্তু নিছক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গৃহকোণে বসে থাকলেই বড় হওয়া যায় না। জীবনে বড় হতে হলে সঙ্কল্প যেমন থাকবে, তেমনি থাকতেই হবে সাধনা। উদ্যোগী পুরুষের ওপরই কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয়। রত্ন পেতে হলে প্রয়োজনীয় যত্ন চাই-ই।

আসল কথা হচ্ছে—ভাগ্য গঠনের জন্য ব্যাকুলতা যদি জাগলো, তা হলে কয়েকটি মূল নিয়ম বা সূত্র মেনে চলতেই হবে। জীবনে যাঁরা সফলকাম হয়েছেন, প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থায়িভাবে, পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মূল নীতিগুলো অনুসরণ না করে এগোতে পারেন নি তাঁরা। সত্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাস—এ কয়টি অপরিহার্য্য মূলধন নিয়েই চলতে হয়েছে তাঁদের বরাবর।

যথাসম্ভব লেখাপড়া হয়ে গেলেই আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় চাকরি করা কি ব্যবসা-বাণিজ্য করা, সে যেদিকেই হোক্। ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবনে বড় হবার যতদূর সুযোগ হতে পারে, চাকরিতে সাধারণতঃ ততখানি হওয়া কঠিন। তবু চাকরির দিকেই গড়পড়তা মানুষের ঝোঁক থাকে বেশি আর এর কয়েকটি বিশেষ কারণও রয়েছে। যেমন, ব্যবসা করতে গেলেই কিছু না কিছু মূলধন চাই, চাকরির ক্ষেত্রে যেটির প্রায় প্রয়োজন হয় না। অপর দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের বেলায় যে ঝুঁকি লওয়ার প্রশ্ন থাকে, চাকরিতে নিশ্চয়ই ঠিক সেই পরিমাণে ঝুঁকি নেই।

জীবন-সংগঠন কি ভাবে হতে পারে, কেমন করে ভাগ্যবান্ হওয়া যায়, এই নিয়ে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ পর্য্যালোচনা করেছেন প্রচুর। বেশ ভেবে-চিন্তে তাঁরা কতকগুলো মৌল নিয়ম বা সূত্র নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নির্দ্দেশ সমূহের সূচনা। আলোচ্য সূত্র বা নির্দ্দেশগুলো হুবহু অনুসরণ করে চলা কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নেই।

অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, ভাগ্যোন্নতির পথ প্রশস্ত করতে চাইলে সকলের আগেই যে মৌল নীতিটি পালন করা আবশ্যক, সে হচ্ছে একটি সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা। বিনা পরিকল্পনায় কোন কিছু করতে গেলেই বিফল মনোরথ হওয়ার বেশিরকম আশঙ্কা থাকে। আবার কোন ব্যাপারে নামতে হলে, সে ব্যবসার খুঁটিনাটি সম্পর্কে আগে থেকে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। যে লাইনে যোগ্যতা প্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকবে না, তেমন কোন কোন লাইন বেছে নেওয়াও শ্রেয় নহে। মোটের ওপর আর্থিক পুঁজি যা-ই থাকুক, সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পর্কে চাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান বা হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা।

বিশেষজ্ঞ মহলের তাই দাবী—জীবনে সফলতা লাভের গোপন চাবিকাঠিটি হচ্ছে প্রস্তুতি। যথেষ্ট প্রস্তুত হয়ে ঠিক সময়টি বেছে নিয়ে কাজে নামলে উদ্যম সহসা ব্যর্থ হবার নয়। আরও একটি নীতি বা সূত্র রাখা হয়েছে সামনে, যাতে বলা হয়েছে—নতুন পথ ধরে এগোতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকবার জন্যেই বিশেষত্ব প্রদর্শনের এই দাবী। নতুন কিছু নিয়ে হাজির হতে পারলেই দেখা যাবে সরাসরি প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। প্রস্তুত প্রস্তাবে সরাসরি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন যাতে না হতে হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তবেই উদ্যমে নামতে যাওয়া সমীচীন। বাণিজ্য-পণ্যের স্বাতন্ত্র্য অথচ উপযোগিতা যদি ঠিক ঠিক থাকলো, তা হ'লে চালু করার জন্য এ প্রচার-কার্য্যেরও তেমন প্রয়োজন পড়ে না। সে পণ্য আপনার বাজার আপনি সৃষ্টি করে নিতে পারে, ভাগ্যলক্ষ্মীকেও টেনে আনতে পারে সাথে সাথে।

ব্যবসায়ে নামবার জন্যে টাকা কোথায় পাওয়া যাবে, এই প্রশ্নটি শুনতে পাওয়া যায় অনেক স্থলেই। অবশ্য এ ঠিক, শুধু সংগঠন হলেই হবে না, পরিকল্পনার রূপ দিতে হলে আবশ্যক পুঁজি বা মূলধনও চাই। অন্য উপায়ে মূলধনের ব্যবস্থা না হলে নিজেকেই কোন জীবিকা থেকে অর্থ সঞ্চয় করতে হবে কিছু কিছু করে। এতেও যদি অভীষ্ট পুঁজি সংগৃহীত হবে বলে বিশ্বাস না হলো, বিকল্প কোন কাজ বা পেশা দেখে নিতে হবে পাশাপাশি। ব্যাঙ্কে কিছু পরিমাণ অর্থ যখন জমা হয়ে যাবে, তখনই ধরে নেওয়া চলবে কিছু মূলধন হলো। এই অল্প পরিমিত অর্থই কি ভাবে বাড়ানো যায়, কোন্ পন্থায় ব্যবসা করে দ্বিগুণ তিনগুণ ঘরে আনা চলে, এইটি হবে পরবর্ত্তী ভাবনা। সামান্য আরম্ভ থেকে অসামান্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই এ দেশেও, বিলেতে তো নয়ই। তলিয়ে দেখলে সব ব্যাপারেই সাফল্যের একটি সাধারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। আবারও বলতে হয়, সেটি হচ্ছে প্রস্তুতি ও উদ্যম, সংগঠন ও কর্ম্মনিষ্ঠা। এই সূত্র মেনে কাজ করলে সত্যি দেখা যাবে, 'মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা'—এ প্রবাদটি তাৎপর্য্যবহুল।

নস্যির নেশা

আজকের দিনে এমন দেশ প্রায় বিরল, যেখানে নস্যির (নস্য) ব্যবহার চলতি নেই। বাংলা তথা ভারতে এ ব্যাপকতা লাভ করেছে

পূর্ব্বের চেয়ে বরং বেশি। এক টিপ নস্যি পেলেই খুশি হয়, অসংখ্য লোক এ যুগে চোখে পড়ে, যেমন এদেশে, অন্য দেশেও।

নস্যির ব্যবহার শুরু হয়েছে ঠিক কতকাল আগে, জোর করে হয়'তো বলা চলে না। ইতিহাস পর্য্যালোচনায় এইমাত্র দেখা যায়, আজকের দিনে আমরা যেভাবে নস্যি ব্যবহার করি, মধ্য আমেরিকার আজটেক্‌রাও ঠিক তেমনি নস্যি ব্যবহার করতো। শুকনো তামাক-পাতা গুঁড়ো করে নিজেদের নস্যি নিজেরাই তৈরী করে নিতো তারা—যেমন এখনও অনেক জায়গায় হয়। ১৪৯৪ সালে কলম্বাস যখন দ্বিতীয়বার ভারতের (আমেরিকা) উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসান, সে সময় একজন ইতালীয় মঠবাসী ছিলেন তাঁর সঙ্গী। এই ইতালীয় লোকটির লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিবাসীদের ভেতর তামাক পাতার গুঁড়ো নাসিকার ছিদ্রপথে টানবার অর্থাৎ নস্যি ব্যবহারের অভ্যাস ইনি লক্ষ্য করেছেন অভিযাত্রাকালে।

ইতিহাসপাঠে এ-ও জানা যায় যে, সর্ব্বপ্রথম নস্যি আমদানী হয় স্পেনে এবং তারপর পর্ত্তুগালে। ১৫৬০ সালে লিসবনস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত মাথা ধরার ওষুধ হিসাবে নস্যির ব্যবস্থা করে দেন ক্যাথারিনে দ্য মেডিসিকে। রাণী সুস্থবোধ করেছেন বলে প্রচার হতেই নস্যির ব্যবহার সে দেশে দেখতে দেখতে চালু হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে কিন্তু গোড়ার দিকে নস্যি ছিল ধনিকশ্রেণীর একটা বিলাস দ্রব্যবিশেষ। ঐ দেশে তামাকের ব্যবহার প্রবর্ত্তন হওয়ার পরও প্রায় দুই শতককাল অবধি নস্যি এমনি আটকে পড়ে থাকে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যেই। তারপর ১৬৬৫ সালে যখন দেশব্যাপী মহামড়ক দেখা দেয়, তখনই মাত্র নস্যির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। ১৭০২ সাল নাগাদ অর্থাৎ রাণী অ্যানের রাজত্বকালে সকল শ্রেণীর লোককেই নস্যি টানতে দেখা যায়।

নস্যি যারা নিয়ে অভ্যস্ত, তাদের একটি বিরাট অংশের দাবী—নস্যি ব্যবহার করলে চট্‌ করে ঠাণ্ডা লাগতে পারে না, ইনফ্লুয়েঞ্জা দূরে থাকে। শুধু তাই নয়, এক টিপ নস্যিই শরীরকে ঝিমিয়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম—মানসিক শক্তিও এতে বৃদ্ধি পায় (সাময়িক ভাবে হলেও) অনেক। শুধু তাই-ই নয়, এই শ্রেণীর নস্যি-সেবীরা এরূপও অভিমত প্রচার করে থাকেন, পাইপ, সিগার বা সিগারেট খাওয়ার চেয়ে নস্যি টানার অভ্যাস ভাল। কারণ এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে না কখনও, দৈনন্দিন খরচও পড়ে কম। এক কৌটা নস্যিতে বহু সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় মনের আনন্দে।

আর এক শ্রেণীর লোকও অবশ্য সমাজে দেখা যায়, যারা নস্যি ব্যবহারটা খুব ভালো'র চোখে দেখতে রাজী নয়। কিন্তু এইজন্যে যে নস্যি কম ব্যবহৃত হচ্ছে, এমনটি বলা চলে না আদৌ। বরং কি বক্তা, কি ডাক্তার, কি শিক্ষক, কি আইনজীবী, কি ব্যবসায়ী, কি কারণিক, কি শ্রমিক—সব পেশার লোকদের মধ্যেই নস্যিপ্রীতি বাড়ছে। বহু পরীক্ষার্থীকেও নস্যি সম্বল করে অবিরাম পড়াশুনো চালিয়ে যেতে দেখা যায়। শুধু পুরুষরাই নয়, নারীরাও নস্যি ব্যবহার করে থাকেন এবং সংখ্যা উভয়তই বেড়ে চলেছে।

নস্যিকে কেন্দ্র করে বড় রকম শিল্প গড়ে উঠেছে অনেক দেশেই। ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলেই নস্যি তৈরীর কারখানা তুলনায় বেশি—যেখান থেকে অপরাপর রাজ্যে প্রচুর নস্যি সরবরাহ হয়ে আসে। নস্যি কাট্‌তি বৃদ্ধির সাথে সাথে নস্যির কৌটাও রকমারী তৈরী হচ্ছে। বড় বড় মহলে হাতির দাঁতের এমন কি সোনারূপার কৌটাও ব্যবহৃত হয়। আজকাল কারখানায় বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে যে নস্যি তৈরী হয়, তাতে হাত ছোঁয়ানো হয় না। নস্যির একটি বিশেষ রঙ্‌ আছে—যা দেখলেই চিনতে পারা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নস্যিতে সুন্দর গন্ধ মিশ্রিত করা হয় যাতে করে জিনিসটি আরও লোভনীয় হয়ে ওঠে।

অনেক গণ-বক্তাকে শপথ করে বলতে শোনা গেছে—নস্যি খুবই ভালো জিনিস। এ নিয়মিত ব্যবহারের এই সুফল তাঁরা পেয়েছেন—তাঁদের গলার স্বরটি (যা তাঁদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মূলধন) পরিষ্কার থাকে এবং জোরদার হয়। ওয়াশিংটনের সেনেটে যাবার প্রবেশ মুখে দুটি প্রকাণ্ড সবুজে রঙের পাত্র বসানো আছে। এইগুলো সব সময় মনমাতানো নস্যিতে ভর্ত্তি রাখা হয়। মার্কিণ সেনেট সদস্যগণ সভাকক্ষে যেতে আসতে ওখান থেকে নস্যি নিয়ে থাকেন, এইজন্য অবশ্য কোন মূল্য দিতে হয় না তাঁদের।

সব লোকই যে নস্যি ব্যবহার করবে কিংবা সকলের কাছেই যে এইটি হবে একান্ত প্রিয়, এমন কথা নেই। তবে বিশ্বের সর্ব্বত্র সিগার, সিগারেট, বিড়ি—এ সকলের পাশে থেকেও এর সমাদর বাড়ছে দিন দিন, এ ঠিক। এমনটি হওয়ার প্রধান কারণই হলো, নস্যি ক্ষতিকারক নয়, উৎসাহ সঞ্চারক। অবসাদ দূর করে অল্প সময়ের মধ্যে হলেও কর্ম্মের প্রেরণা এনে দিতে পারে এ সক্ষম, দাবীটি একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের একখানি অপ্রকাশিত আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। চিত্রখানি নেতাজী রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

বন কেটে বসত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

উনত্রিশ

রাত তো অনেক। তা বলে কেউ শুয়ে পড়ছে না। এমন রাত্রি কতদিন আসে নি। এত জনে আজ এক সঙ্গে। চালাঘরে জমিয়ে বসা গেল অনেক দিন পরে। না, ঘরের জায়গা কতটুকু—উঠান জুড়ে বসা যাক। মায়ের পূজা উপলক্ষে সাঁইতলার মাছ-মারারা কেউ জালে বেরোয় নি। না হয় কাল উপোসই যাবে। কাজকর্ম তো বারোমাস আছে, মায়ের নামে একটা দিনের এই ছুটি।

জমেছে খুব। জগন্নাথ এসে পড়ল কোথা থেকে, নতুন-ঘেরি পত্তনের মূলে যে মানুষটা। ঘেরি বানিয়ে আলা বেঁধে সায়ের চালু করে জঙ্গলে জনালয় বানিয়ে দিয়ে একদিন সরে পড়ল। আর আছে মহেশ, কালী করালীর পুজোয় যে এসেছে। এই এক মজা। ক্ষ্যাপা বাওয়ালির কোথায় বসবাস, কেউ জানে না। অন্য সময় বুঝি সে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হয়ে থাকে, মায়ের নামে ঢাকে কাঠি পড়লে অমনি বুঝি সে মূর্তি ধরে উদয় হয়। রাদাবাজ্যে যেখানেই পুজো হোক, মহেশ হাজির। জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে। বাঘ-কুমীর পোষ-মানা গরু-ছাগলের মতো। অন্যে যা দেখতে পায় না, তার নজরে সে সব এড়ায় না। এই যেমন, কথাবার্তা হচ্ছে তো উঠানের উপর বসে—কথার মধ্যে চোখ পাকিয়ে হঠাৎ মহেশ আকাশ মুখো তাকিয়ে পড়ে: এইও—দাঁড়িয়ে কি দেখিস? পালা, পালা। গা শিরশির ক'রে ক্ষ্যাপা মহেশের কথা শুনে। তার কাণ্ডকারখানা দেখে।

ঠিক মাঝখানে মহেশ। তার পাশে জগা। মহেশ আজ জগাকে নিয়ে পড়েছে। বোঝা বোঝা শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে দিয়েছে। শীত কেটে গিয়ে ওম হচ্ছে আগুনে। আলো হচ্ছে। বাতাসের ঝাপটা আসে এক একবার। রাত্রিচর পাখী হুশহুশ করে উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। ক্ষ্যাপা মহেশ কথা বলে আর খলখল করে হাসে। সাঁইতলার মেয়েপুরুষ ঘিরে বসেছে।

কত সব আজব খবর। ক্ষ্যাপা মহেশ যখনই আসে, এই সব শুনতে পাওয়া যায়। শোনবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকে। জানাশোনার এই দেশভূঁই মানুষজন নয়। অগম্য অরণ্য। কালেভদ্রে কদাচিৎ যেখানে মানুষের পা পড়ে। পা ফেলে এই মহেশ আর তারই মতন দশ-বিশটা গুণীন বাওয়ালি। পা ফেলবার আগে পূজা দিয়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য মানসিক করে বনের ঠাকুরকে তুষ্ট করে যেতে হয়। হরেক রকমের শত্রু—নজর মেলে যাদের দেখা যায়, বাঘ-সাপ-কুমির। অস্ত্রের শুধু অস্ত্রের ভরসায় গেলে হবে না। চোখ রয়েছে সামনে, পিছনে দুটো চোখ নেই তোমার, পিছন দিয়ে এলে কি করবে? চোখ থেকেই বা কি! কোন হেঁতালঝোপে কিম্বা গিলেলতার চোখের মধ্যে গাছপালার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙ মিলিয়ে ঘাপটি মেরে আছে—চোখ থেকেও তুমি যে বনকানা বনে গিয়েছ। অস্ত্র থাকে থাকুক, কিন্তু আসল হল মন্ত্র। ভাল গুণীন আগে আগে পথ দেখাবে—মন্ত্র যাদের ডেকে কথা বলে।

আর শত্রু আছে—যারা বাতাস হয়ে থাকে, গুণীনের তীক্ষ্ণ চোখ শুধু ঠাহর পায় তাদের। ঝুটো-দানো জিন-পরী। জনালয়ের অত্যাচার এড়িয়ে নিঃশঙ্ক আরামে থাকে তারা। এককালে মানুষ হয়তো ছিল—মরে যাবার পর মানুষের সম্বন্ধে ঘৃণা আর অবিশ্বাসের অন্ত নেই। মানুষ কিছুতে ঢুকতে দিতে চায় না জঙ্গলে।

জগা এর মধ্যে সহসা মন্তব্য করে ওঠে: বেঁচে থেকে আমাদেরও ঠিক তাই। মানুষ বড় পাজি। তাড়িয়ে তাড়িয়ে কোথায় এই এনে তুলেছে। তাড়া করছে এখানেও।

চোখ তুলে ক্ষ্যাপা মহেশ তাকায় একবার তার দিকে। গল্প যথাপূর্ব চলেছে: নতুন যারা জঙ্গলে ঢোকে, সকল রকম শত্রুতা সাধে তাদের সঙ্গে। ঝড়-তুফান তুলে নৌকো বানচাল করে। বাঘ-সাপ-কুমির লেলিয়ে দেয়। নিজেরাই পশু-মূর্তি ধরে আসে কখনো বা। অথবা রূপসী মোহিনী হয়ে কোন জলাভূমিতে ভুলিয়ে নিয়ে ঘাড় মটকায়। অথবা সোজাসুজি উড়িয়ে নিয়ে দুর্গমতম অঞ্চলে একলা ছেড়ে দেয়। বড় দয়া হল তো মানবেলার ভিতর আবার উড়িয়ে রেখে আসে।

মহেশ বলে, আমায় সহায় ধর তোমরা। বড়লোকের বিষ-নজর লেগেছে, এ জায়গায় মজা নেই। কোনদিন আর সুখ পাবে না। দক্ষিণের নতুন নতুন বাদায় নিয়ে যাব তোমাদের। মা বনবিবি আর বাবা দক্ষিণরায়ের আজ্ঞায় জীবজন্তু আমার হুকুমের দাস। সে কথা না মানলে মাটি আগুন করে দেব—গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে দৌড়ে পালাতে দিশে পাবে না। কামরূপ-কামিখ্যের আজ্ঞায় দানো-পরী মান্য করে চলে, আকাশের বায়ু নয়তো আগুন করে দেয়। গুরু কাণ্ডারী ধরে

লোকে ভবসিন্ধু পার হয়, গহিন বনের কাণ্ডারী হলাম আমরা ফকির-বাউলে। চল আমার সঙ্গে। কানা গাঙ পার হয়ে গিয়ে কেশেডাঙা—দরিয়া সেখান থেকে পুরো বেলার পথও নয়।

সেই কেশেডাঙার তেপান্তর জুড়ে সাদা বালি চিকচিক করছে। আর কাশবন। মিঠাজল দূর-দূরন্তর থেকে বয়ে আনতে হবে না—গুপ্তস্থান আছে কাশবনের ভিতরে, সন্ধান জানে শুধুমাত্র মহেশ। বালি সরিয়ে গর্ত করে চুপচাপ বোসো গিয়ে—কাকের চোখের মতো নির্মল জল এসে জমবে। আঁজলা ভরে খেয়ে দেখ, কী মিষ্টি! জলে যেন বাতাসা ভেজানো।

শুনতে শুনতে সকলে দোমনা হয়ে ওঠে। সাঁইতলা সত্যি আর ভাল লাগে না। এক জায়গায় অনেক দিন হয়ে গেছে। তা ছাড়া প্রবল শত্রু চৌধুরিরা নানা রকম প্যাঁচ কষছে। এতদিন নিজেরা করছিল, এবারে সদরের আদালত অবধি ধাওয়া করেছে। আদালতের চাপরাশি এসে পড়েছিল, এর পিছনে আরও কত কি আসবে কে জানে। কিন্তু সকলের চেয়ে অসহ্য নগেনশশীর মাতব্বরি। নতুন-আলা এখন হয়ে গেছে গৃহস্থবাড়ি। জঙ্গল হাসিল করে গতরে খেটে যারা একদিন আলা বেঁধেছিল, বাইরের বাজে মানুষ তারা, গৃহস্থবাড়ি ঢোকবার তাদের এক্তিয়ার নেই। তাদের যাওয়া-আসা খাল-ধারের সায়ের অবধি—মাছ নামিয়ে দিয়ে টাকাপয়সা মিটিয়ে নিয়ে চলে এসো। ব্যস। কাজকর্ম ব্যাপার বাণিজ্য ছাড়া অন্য সম্পর্ক নেই। তামাকটা এখনো ফুকতে খেতে দেয় বটে, তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে একদিন। খোঁড়া নগনাটা এমনভাবে চোখ ঘোরায়, ইচ্ছাও করে না বিনি কাজে সেখানে দু-দণ্ড বসে থাকতে।

বলাই বলল, যেতে তো মন লয় গুণীন। কিন্তু এ জায়গায় বড়দা ছিল। হিসাবি মানুষ, লিখতে পড়তে জানে, হাতে-গাঁটে দু-চার পয়সা নিয়ে এসেছিল। তাইতে যোর পত্তন হল। আমাদের সম্বল ফুলো-ডুমুর—শুধু ক'টা মানুষ গিয়ে নতুন জায়গায় কি করব?

মহেশ বলে, অথই দরিয়ার তলা থেকে দেবতা ডাঙা বের করে দিয়েছেন, মবলগ পয়সা লাগছে কিসে সেখানে? ডিঙি জোগাড় করে নাও। চাল-নুন নাও। আর পুজোর বাবদ যা লাগে সেইগুলো নিয়ে নাও মিলমিশ করে। এইটে হল আসল, পুজো অঙ্গে খুঁত না থাকে। নৌকো কাছি কর গিয়ে চরের পাশে। গুণীন যাবে পথ দেখিয়ে, মরদ জোয়ানেরা তার পিছন ধরে। পা ফেলে ফেলে জায়গাজমির দখল নিচ্ছে। পায়ে হেঁটে যে যতদূর বেড় দিয়ে এল, জমি ততখানি তার। লেখাজোখা দলিলপত্তর নেই। এসব জমির মালিক মানুষ নয়, মালিক হলেন দেবতা। তাঁর সঙ্গে লেখাজোখা লাগে না, খরচ-খরচার ব্যাপার নেই।

জগা জেদ ধরল: হবে না ঠাকুর। আগে ওদের তাড়াব—তাড়িয়ে দিয়ে তার পরে যেখানে যেতে হয় যাব।

জ্যোৎস্নার আলোয় নিশুতি আলা দেখা যায় দূরে। সেদিকে সেদিকে জগা আঙুল দেখায়: বড্ড আয়েশ করে ঘুমুচ্ছে। কোন মুলুক থেকে বাঁশ জুটিয়ে এনে জঙ্গলের গোল-গরান কেটে ঘর বেঁধে দিয়েছি—মজা লুঠছে বাইরের উটকো মানুষ এসে এখন। ওদের তাড়াব।

মহেশ বলে, তাড়িয়ে কি লাভ হবে, একের জায়গায় অন্য দশজন এসে পড়বে। রাস্তা হয়ে গেল, কলের গাড়ি এসে যাচ্ছে, মানুষের গাদি লেগে যাবে এবার। আমার সুখ আর রইল না কোথাও।

এ সমস্ত পরের ভাবনা, এক্ষুণি তো আর হচ্ছে না। আপাতত বিস্তর আনন্দ। মস্তবড় রণজয় হয়েছে, ম্যানেজার প্রথম আর চাপরাশি নিবারণ রাঁধা-ভাত ফেলে ছুট পালাতে দিশা পায় না। ষড়যন্ত্রের ভিতরে যেমন জগন্নাথ তেমনি গগন দাস। এবং মেয়েলোক হয়ে চারুবালাও রয়েছে। আর সকলের বড় আনন্দ, খোঁড়া নগনার তাড়া খেয়ে বলাই পচা আবার এখন ষোলআনা পাড়ার মানুষ হয়েছে। বলাই ঢোল বের করে নিয়ে এল চালার ভিতর থেকে। জগা কোলের উপর টেনে নিয়ে দু-তিনটে ঘা দিয়ে বলে, বেশ তো আছে। দিব্যি আওয়াজ আছে।

বলাই বলে, বাজাই যে আমরা।

বাজাবি তো বটেই। নতুন-আলায় খোল বাজাতিস—বাজনায় বড় ওস্তাদ তুই যে এখন।

জগার মাথার ভিতর বুদ্ধি খেলে যায় একটা। বলে, আলায় ওরা বড্ড মজা করে ঘুমুচ্ছে। সে হচ্ছে না।

ক্ষ্যাপা মহেশ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জানে এদের—কিছুই অসম্ভব নয় বাদা অঞ্চলের হটকো ছোঁড়াদের পক্ষে।

কি করবি? হানা দিয়ে পড়বি নাকি আলায়?

জগা হাসতে হাসতে বলে, অন্যায় অধর্মে আমরা নেই। ষোল-আনা ধর্মকাজ। একটা জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে কি হবে—ঘুরে ঘুরে গানবাজনা। নগরকীর্তন।

পচা বলে, ঢোল বাজিয়ে কিসের আবার কীর্তন!

ঢোলে বুঝি খোলের বোল তোলা যায় না? খুব যায়। ঢোলে আরও জোরদার হয়। এতগুলো জোয়ান মরদের গলা—মিনমিনে খোল তার সঙ্গে মানায় না।

মহেশ চালাঘরে ঢুকে গেল। বাঁধের পথে বেরিয়ে পড়ল এরা সব—

নগরবাসী আয় তোরা
সংকীর্তনের সময় বয়ে যায়।
নেচে নেচে বাহু তুলে
হরি বলে ছুটে আয়।

আঠার-বিশ জন মানুষ—আঠার রকম সুর তাদের গলায়। তোলপাড় লেগে গেছে। কালীতলাটা আগে পরিক্রমা করে এলো। নতুন-আলার সামনে বাঁধের উপর এসে পড়ে। নড়তে চায় না আর এখান থেকে। বাঁধের উপর পাশাপাশি দুটো কেওড়াগাছের নিচে পুরো আসর বসিয়ে নিয়েছে।

গান গায় আর উঁকিঝুঁকি দেয় জগা।

বলাই বলে, পাড়াসুদ্ধ আমরা জেগে, ওদের তো নড়াচড়া নেই। দেখে আসব জগা ভিতরে গিয়ে?

জগা বলে, দেখবি আর কোন ছাই? এর পরেও ঘুমুতে পারে সে যারা মরে গেছে তারাই।

বলছে তবু ষোলআনা ভরসা করতে পারে না। গানে আরও জোর দিয়ে দিল। প্রত্যাশা, নগেনশশী মেজাজ হারিয়ে যদি উঠানে একবার বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু চিৎকারে গলায় নলি ছিঁড়ে যাবার দাখিল, বাজাতে বাজাতে আঙুল টনটন করছে—না রাম না গঙ্গা, তিলেক শব্দসাড়া নেই ওপক থেকে। হতাশ হয়ে বলাই বলে, ঘরে চল জগা ভাই। কানে ছিপি এঁটে ওরা পড়ে আছে। পারবি নে। আমরাই মিছে হয়রান হচ্ছি।

পচা বলে, নগনা-খোঁড়া বুঝতে পেরেছে, এত মানুষ আমরা পিছু হঠব না। এক কথা বলতে এলে উলটে বিশ কথা শুনিয়ে দেব। মরে গেলেও সে বেরুবে না।

জগা বলে, তার উপরে আজকে আর এক উপসর্গ টৌর্নি চক্কোত্তি। কিন্তু ওরা কিছু না বলুক, চারুবালার কি হল? গলার তোড়ে জঙ্গলের বড়-শিয়াল লেজ তুলে দৌড় দেয়, সে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে আছে কেমন করে?

বলাই হেসে বলে, আমি বলতে পারি চারুবালা কেন চুপচাপ।

কেন রে?

বলাই বলে, নগেনশশী জব্দ হচ্ছে, তাতে বড্ড সুখ চারুবালার। খোঁড়াটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। নিজের কষ্ট হলেও দু-কানে আঙুল ঢুকিয়ে দাঁত-মুখ চেপে পড়ে আছে কোনরকমে।

জগা উল্লাস ভরে বলে, সত্যি? লাগাও তবে, জোর লাগাও—

কিন্তু কতক্ষণ! পোহাতি তারা উঠে গেছে। একতরফা লড়াইয়ে মজাও পাওয়া যায় না। পাড়ায় ফিরে এল অবশেষে। দাওয়ায়, ঘরের মধ্যে, উঠানের উপর—যে যেখানে পারল গড়িয়ে পড়েছে।

চক্কোত্তি মশায় আর নগেনশশী দুই পাটোয়ারি ব্যক্তি। পরিচয় অল্প সময়ের বটে, কিন্তু একে অন্যের গুণ বুঝেছেন। ভাব হয়ে গেছে দু-জনার। আলাঘরে পাশাপাশি শুয়েছেন। একটুখানি ঘুমের আবল এসেছিল, গানের তোড়ে সে ঝোঁক অনেকক্ষণ কেটে গেছে।

নগেন বলে, এক ছিলিম হবে নাকি চক্কোত্তি মশায়? কলকে ধরাব?

চুপ! বলে চক্কোত্তি থামিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বলেন, কথা বলবে না, মোটে নড়াচড়া নয়, পেয়ে বসবে। বেড়ায় চোখ দিয়ে দেখছে হয়তো কেউ। যেমন আছ ঘুমিয়ে পড়ে থাক অমনি। আর ভাবো।

রাত কেটে গিয়ে অবশেষে গান-বাজনা থামল। আলো হয়ে গেছে চারিদিক। বাঁধের পথে কেউ নেই। চক্কোত্তি তখন উঠে বললেন: তামাকের কথা বলছিলে না? হোক এইবারে।

হালকা গেঁয়োকাঠের কয়লা করা থাকে। টেমর জেলে ধরানো যায়। নগেনশশী তামাক সেজে কয়েক টান টেনে ভাল করে ধরিয়ে দিল। ব্রাহ্মণের হুঁকো নেই, বাদা অঞ্চলে দরকার পড়ে না। নলচের মাথা থেকে কলকে নামিয়ে ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতটা চিতিয়ে নিচের দিকে ধরে চক্কোত্তির দিকে সম্ভ্রমভরে এগিয়ে দিয়ে বলে, ইচ্ছে করুন।

চক্কোত্তি চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ ধরে টানলেন। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সহসা চোখ তাকিয়ে বলেন, কেমন বুঝলে?

ঠিকমতো অর্থ না বুঝে নগেনশশী বলে, আজ্ঞে?

দাস মশায় আমায় বললেন, শত্তুর পিছনে লেগেছে। শত্তুর কিসে নিপাত হয় তার যুক্তি-পরামর্শের জন্য টেনেটুনে নিয়ে এলেন। তা ভালই হল, সব শত্তুর স্বচক্ষে দেখে গেলাম। রাত দুপুরে এক শত্তুর দেখেছি, ভোররাত্রে আবার এই ভিন্ন দল দেখলাম। বেশি প্রবল কারা দেখ এইবারে ভেবে।

নগেনশশী বিনয় দেখিয়ে বলে, আপনি বলুন, শুনি।

চক্কোত্তি বলেন, চৌধুরি বাবুরা ঘেরিদার, দাস মশায়ও তাই। বড় আর ছোট, এই হল তফাৎ। চিল বড় পাখি তা বলে চড়ুই কি আর পাখি হল না? সামনাসামনি বসে দু-পক্ষের কতকটা বুঝসমঝ হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যায়। কিন্তু হাঘরের দল পথে দাঁড়িয়ে গণ্ডগোল করে যায়, তাদের সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকি কিসের রে? আমি বাপু দাস মশায়ের ব্যাভারের মর্ম বুঝলাম না।

পুলকিত নগেনশশী ঘাড় নেড়ে বলে, দেখুন তাই। ইদিকপানে ওদের আসা বন্ধ করে দিয়েছি, তাই নিয়ে জামাই বাবু মন গুমরে বেড়ান। বুঝিয়ে বলুন আপনি তাঁকে। আর প্রতিকার কোন পথে, সেটাও বলে দিন।

চক্কোত্তি হেসে উঠে বলেন, নতুন আর কি, সনাতন পথ। সদরের-পথ। ঐ একটা পথ আজন্ম চিনে বসে আছি। পাঁচ-সাত নম্বর মামলা ঠুকে দাও। পয়লা নম্বরে ফৌজদারি—কাঁচা-খেগো দেবতা যাকে বলে। আইন মোতাবেক ওই চলল, আর
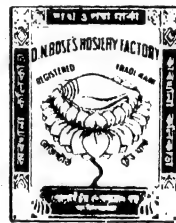
আইনের বাইরে যা করবার এদিক থেকে চলুক। থানায় ভাল করে তদ্বির করে এসো, কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে সবগুলোকে যাতে টেনে নিয়ে যায়।

নগেনশশী বলে, সবগুলোকে লাগবে না। পালের গোদা ঐ জগন্নাথকে নিলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেটা ছিল না এখানে, কাল এসে পড়েছে। খালের মধ্যে গরুর গাড়িতে ওঁদের আটকে রেখে চক্রান্ত করতে এলো এখানে। বাঁধে দাঁড়িয়ে অমন হট্টগোল করা জগা না থাকলে কেউ সাহস করত না।

চক্কোত্তি লুফে নিয়ে বলেন, খপ্পরে এসে গেছে তো, বেড়ে হয়েছে। ঘাঁটা দেওয়া হবে না, বুঝলে? খেয়েদেয়ে ফূর্তিফার্তি করে বেড়াক অমনি। কোন-কিছু টের না পায়। আর দেখ, তোমাদের উপর ঝুঁকি রেখে কাজ নেই। তোমাদের কি মুরোদ? চৌধুরি বাবুদের নামিয়ে দিতে হবে। ম্যানেজার টং হয়ে রয়েছে, নতুন কিছু করতে হবে না, খালি এখন বাতাস দিয়ে যাওয়া। দেখাতে হবে, তোমরাও চৌধুরিদের সঙ্গে। কালকের ব্যাপারের মধ্যে তোমরা ছিলে না। বাউণ্ডুলেগুলো করেছে।

বলতে বলতে চিন্তান্বিত হয়ে চক্কোত্তি একটু থামলেন। বলেন, তবে কিনা দাস মশায়ের বোনটাও জড়িয়ে পড়েছে। প্রমথ ম্যানেজারকে ভয়-ভীত দেখাল সে-ই।

নগেনশশী আগুন হয়ে বলে, তাকে টেনেছে ঐ জগাই। আচ্ছা রকম জব্দ করতে ওটাকে। রান্না-করা মুখের ভাত ফেলে ভদ্রলোক ছুটে বেরুলেন। সাপে কাটল না গাঙে-খালে ভেসে গেলেন কে জানে!

সহাস্যে চক্কোত্তি ঘাড় নাড়েন: কিছু না, কিছু না। ও মানুষ মরবে না—প্রহ্লাদ। নামটা শোনা ছিল, কাল পরিচয় হল। নাম ভাঁড়িয়ে কত খেল খেলতে লাগল। চৌধুরিগঞ্জে গেলে খবরবাদ পাওয়া যাবে যাবে তো চলো। আমি যেতে রাজি আছি।

টৌর্মি মানুষ, মামলা-মোকদ্দমা বাধাতে জুড়ি নেই। এই হল পেশা। গণ্ডগোল দু-পক্ষে যত জমে আসবে, তত মজা লুঠবেন।

বলেন, দাস মশায়কেও নিয়ে চলো। খোদ মালিক তো বটে—তোমার আমার চেয়ে তার কথার দাম বেশি। ভেবে দেখছি, কালকের কাজটা ভালই হয়েছে মোটের উপর। ঠিক মতো খেলাতে পারলে ম্যানেজার আর জগন্নাথে লেগে যাবে। সেই যে বলে, বাঘকে বাঘ মারতে শত্তুর পাঠানো। বাঘ মরে ভাল, শত্তুর মরে আরও ভাল।

উৎসাহে নড়েচড়ে চক্কোত্তি উঠে দাঁড়ালেন: কি হে, দাস মশায় ঘুম থেকে ওঠেনি এখনো? খোঁজ নাও।

কামরার ভিতরে গগন শোয়। অনেকক্ষণ সে উঠেছে, ডোবার ঘাটে গুঁড়ির উপর বসে বাবলার ডাল ভেঙে দাঁতন করছে। নগেনশশী বলে, ঐ যে জামাইবাবু। জিজ্ঞাসা করে আসি।

বেরুতে গিয়ে দেখে বেড়ার ওধারে মানুষ—চারুবালা। ঝাঁটা হাতে যে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কি?

চারুবালা কর কর করে ওঠে, তামাক-টামাক বাইরে গিয়ে খেলেই তো হয়। এতখানি বেলা হল, ঝাঁট-পাট হবে আর কখন?

না, রাজি নয় গগন। চৌধুরিগঞ্জে সে কিছুতে যাবে না। অস্থাবর ধরতে এসে কাল পেরে ওঠে নি, দৌড়ে পালাতে দিশা পায় না। কিন্তু ছাড়বে না ওরা, আবার আসবে। মামলামোকদ্দমায় নাস্তানাবুদ করে শোধ তুলবে। যতদূর সাধ্য লড়ে যাবে গগন। নিতান্ত না পেরে ওঠে তো বাস তুলবে এ জায়গা থেকে। পালা গেয়ে যাত্রার দলের মানুষ যেমন এক গ্রাম ছেড়ে বিদায় হয়। রং মেখে আবার ভিন্ন গাঁয়ের আলাদা আসরে গিয়ে নামে। দুনিয়ার মধ্যে ভাগ্য খুঁজে নিতে একদিন খালি হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, দুনিয়া একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে না এই সাঁইতলায় করালীর কূলে এসে। আবার বেরুবে। তা বলে কাল রাত্রে এত সব কাণ্ড হল, সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে শত্রুর পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়তে পারবে না।

নগেনশশী নানা রকমে বোঝবার চেষ্টা করে: ক্ষেপে গেলে কেন জামাইবাবু? ব্রাহ্মণমানুষ অতিথ হয়ে হাত পুড়িয়ে রাঁধাবাড়া করলেন। রাঁধা-ভাত তোমরা কেড়ে নিলে তাঁর মুখের সামনে থেকে। হাঁ, কেড়ে নেওয়া ছাড়া আবার কি! মামলা-মোকদ্দমা চুলোয় যাকগে। কিন্তু মনের কষ্টে ব্রাহ্মণ শাপশাপান্ত করে গেলেন, তার একটা প্রতিবিধান চাই তো! গিয়ে পড়ে দুটো মিষ্টিকথা বলে বুঝসমঝ করা।

গগনের এমনি স্বভাবটা নরম, কিন্তু গোঁ ধরল তো একেবারে ভিন্ন মানুষ। গাড়ালের গোঁ আর মরদের গোঁ—একবার যে পথ নিয়েছে, কারও ক্ষমতা নেই ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেবার। যার বলে ঘর ছেড়ে এসে এত দুঃখকষ্ট পেয়েছে কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার কথা মনে কখনো ওঠেনি। যাবেও না আর—সেই কথা গগন যখন তখন বলে থাকে।

নগেনশশী তখন ভিন্ন দিক দিয়ে তাতিয়ে তুলছে: শত্রু-শত্রু করছ—চৌধুরিগঞ্জের শত্রুর কাছে দণ্ডবৎ হবে না। চৌধুরিরা তবু যতই হোক টাকার মানুষ—ভদ্রলোক। যত সব ছ্যাচড়া শত্রু যে তোমার ঘরের দুয়োরে। সুবিধা পেলেই বুকে বসে দাড়ি উপড়াবে। তাদের ঠাণ্ডা করা হল বেশি জরুরি।

গগন বোকা নয়। বুঝে ফেলেছে নগেন কি বলছে। ন্যাকা সেজে তবু প্রশ্ন করে, ঘরের দুয়োরে কাদের কথা বলছ তুমি—হ্যাঁ?

ভোর অবধি কীর্তন গেয়ে যারা আমাদের গঙ্গাযাত্রা করে গেল। ঘরের সামনে বাঁধের উপর এসে হানা দিল—একা-দোকা নয়, পাড়াসুদ্ধ জুটেপুটে এস। কাল ঢোল পিটেছে, এর পরে লাঠি-পেটা করবে। টৌর্মি ঠাকুর বলে দিলেন, ভয় এদেরই কাছে, এদের কি করে সামলাবে তাই ভাবো।

গগন এক কথায় উড়িয়ে দেয়: আমার ভয়টয় নেই। তোমায় ওরা দেখতে পারে না। আর চারুকে বিয়ে করবার মতলব করেছ তো বিয়ে থাওয়া সেরে দু-জনে বিদেয় হও দিকি। তোমার বোন থাকতে চায় তো রেখে যাও তাকে। আগে আমরা যেমন ছিলাম, ঠিক আবার তেমনি হয়ে থাকব।

রাগ ও বিরক্তির ভাব গিয়ে নগেনশশীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল: বেশ, ভাই। জোগাড়যন্তর করে দিয়ে দাও বিয়ে। তুমি বোনাই আছ, আমিও তোমার বোনাই হয়ে ঘরের মানুষ দেশে ঘরে চলে যাই। পেটের পোড়ায় তোমার মতন জঙ্গলে আসি নি তো! বাপ-দাদার দৌলতে তিন পুরুষ এখনো উঠোনে পা না দিয়ে ঘরে বসে খেয়েপরে যেতে পারব।

গগন যাবে না তো, নগেনশশী ও চক্কোত্তি চললেন। দু'টো মানুষ রাত্রিবেলা অচেনা পথে ছুটে বেরুল, অন্য কিছু না হোক তাদের খবরাখবর নিয়ে আসা কর্তব্য। খবর ঐ চৌধুরিগঞ্জে না মেলে তো চলে যাবেন ফুলতলা অবধি। ও-তরফের সামনে গিয়ে দোষঅপরাধ ঝেড়ে ফেলতে হবে একেবারে: আমরা নেই ওসব বজ্জাতির মধ্যে, আমরা কিছু জানি নে।

ম্যানেজার ও চাপরাশি পৌঁছেছেন তাঁরা চৌধুরিগঞ্জের আলায়। অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক অপথ-বিপথ ঘুরে। নিবারণ ভোরবেলা মাছের ডিঙিতে রওনা হয়ে গেছে। আছেন প্রমথ ম্যানেজার। আয়েশি মানুষ, অত ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। রাত্রিবেলা নিরম্বু উপোস গেছে, মুড়িও ছিল না ঘরে। মেছো রাজ্যে, দরকার মতন ছাইটুকুও পাওয়া যায় না। সব কিছু আগে থাকতে যোগাড় করে রাখতে হয়। কালোসোনা গেছে চিঁড়ে-মুড়ির চেষ্টায়—গেছে তো গেছেই, দেখ কোথাও রস গিলতে বসে গেল কিনা। মেছোঘেরির এই ভূতগুলোকে বিশ্বাস নেই। প্রমথ ম্যানেজার শুয়ে ছিলেন। নগেনশশীকে আগে দেখেন নি, চক্কোত্তিকে দেখে চিনলেন। গর্জন করে উঠলেন উঠে বসে: সকালবেলা কোন মতলবে আবার? কালীতলায় বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল। আইন তো জানা আছে মশায়ের —ক'বছর জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে সেইটে ভাল করে ওদের বুঝিয়ে দিন গে।

টোর্নি চক্কোত্তি বলেন, শুধু আপনি হলেও তো ভাল ছিল ম্যানেজার মশায়। আদালতের চাপরাশিও সরকারি কাজে ব্যাঘাত-সৃষ্টি। সরকারি লোকের উপর জুলুম, খুনখারাবির চেষ্টা। শ্রাদ্ধ কদ্দুর অবধি গড়াতে পারে, উটকো লোকে কিছু কি তলিয়ে দেখে?

নগেনশশী স্তম্ভিত। কী মানুষ চক্কোত্তি। ঠাণ্ডা করাতে এসে আরও যে বেশি করে তাতিয়ে দিচ্ছে। প্রমথ ম্যানেজার ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, কে কাউকে ছাড়ব না, সবসুদ্ধ জড়িয়ে ফৌজদারি হচ্ছে। নামধাম জোগাড়ের জন্য থেকে গেলাম আজকের দিনটা।

উঁহু, উঁহু—সবেগে ঘাড় নেড়ে ওঠেন চক্কোত্তি: পাকা লোক হয়ে কাঁচা কাজ করে বসবেন না। তবে তো জুত পেয়ে যাবে। গগন দাস যতই হোক ঘেরিদার মানুষ। শাঁস আছে, ছ্যাঁচড়া কাজে সে যাবে না। এ সব করে বেড়ায় উড়ো মানুষ যারা। বলে দিল মুখে মুখে ফুক্কুড়ি কথা কতকগুলো, বাতাসে উড়ে চলে গেল। সে কথার দায়ঝক্কি নিতে যাবে না। এবারে কায়দায় পাওয়া গেল তো দলটা ধরে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিন। আপনাদের বৈষয়িক বিরোধের মীমাংসা হতে তারপরে দেখবেন দু-দণ্ডের বেশি লাগবে না।

আসল মারপ্যাঁচ নগেনশশী এতক্ষণে বুঝতে পারছে। চক্কোত্তিকে মনে মনে তারিফ করে। চক্কোত্তি আবার বলেন, পুরো দল নিয়ে পড়তে হবে না। পালের গোদা একটা আছে, তার নাম জগন্নাথ। ওটাকে ফাটকে পুরে দিন, দেখবেন সব ঠাণ্ডা।

কিন্তু প্রমথও গভীর জলের মাছ,—এক কথায় মেনে নেবেন, সে মানুষ নন। ঘাড় নেড়ে বললেন, ও বললে শুনি নে মশায়। খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। গগন দাস প্রকাশ্যে না হোক তলে তলে ছিল। ওই যে ছুঁড়িটা—গগন দাসের বোনই তো—হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল আমরা যখন বেরিয়ে আসি। স্বকর্ণে শুনে এসেছি।

চক্কোত্তি বলেন, ফচকে ছুঁড়ি—কোন একটা মজা পেলেই হাসে। ও হাসি ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? ইনি নগেনশশী, গগনের সম্বন্ধী— মেয়েটাকে দোজপক্ষে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছেন। ডাঙারাজ্যে নিয়ে তুলে হেঁসেলে জুড়ে দেবেন। আর কখনো এ মুখো হতে হবে না।

প্রমথ কঠিন হয়ে বলেন, ওসব বুঝিনে আমি। বাছাবাছির কী দরকার! সবসুদ্ধ জড়িয়ে দেব। নির্দোষী হলে আদালতে প্রমাণ দিয়ে ছাড়িয়ে আসবে।

কথা এমনি দাঁড়াবে, চক্কোত্তিরও আন্দাজে ছিল সেটা। নগেনের দিকে তিনি চোখ ইসারা করেন: ম্যানেজার বাবু বুঝতে পারছেন না। বুঝিয়ে দাও নগেন বাবু।

নগেনশশীর কোমরে গাঁজিয়া বাঁধা। চক্কোত্তির পরামর্শে নিয়ে এসেছে। গাঁজিয়া খুলে টাকাপয়সা বের করে। ইতিমধ্যে কালোসোনা ফিরেছে কোথা থেকে মুড়ি সংগ্রহ করে। লেনদেনের ব্যাপার দেখল একটুখানি দাঁড়িয়ে। তামাক আনল, পান সেজে

এনে দিল। কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ। যাওয়ার সময় প্রমথ এগিয়ে বাঁধ অবধি দিয়ে এলেন। নগেনকে বলেন, পাটোয়ারি মানুষ চক্কোত্তি মশায়। এঁর জন্যে তোমাদের রক্ষে হয়ে গেল। তোমার বোনাইকে বোলো সে কথা। আমরা ঘেরিদার, তোমরা ঘেরিদার—আমাদের উভয় তরফের শত্রু জগন্নাথ। ঐ শত্রু নিকেশ করি আগে। চোর-ছ্যাঁচোড় চেলাচামুণ্ডাগুলো ফুঁয়ে উড়ে যাবে তারপরে। বুঝিয়ে বোলো সমস্ত দাসমশায়কে।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে গগনকে মাঝে বসিয়ে ফলাও করে এই সব কথা হচ্ছে। বড় শত্রু এইবারে মিত্র হয়ে মাথায় মাথায় এক হয়ে লাগছে। নতুন-ঘেরির আর বিপদ নেই।

নজর পড়ল, চারুবালা যূণ হয়ে শুনছে। নগেনশশী বলে ওঠে, বোনের জন্যেই তুমি জাহান্নামে যাবে জামাইবাবু। মান-পশার নষ্ট হবে। ম্যানেজার আর চাপড়াশিকে কালীতলায় বলি দেবার কথা চারু বলেছিল, কোমরে দড়ি বেঁধে সকলের আগে ওকেই থানায় টানত। খরচপত্র করে বিস্তর কষ্টে আমরা ঠেকিয়ে এলাম। সামাল কর এখনো বোনকে, বাদা থেকে সরিয়ে দাও। আমরা সেই কথা দিয়ে এসেছি। ঝামেলার নয়তো পার থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো চক্কোত্তি মশায়ের কাছে শোন।

চারু চলে গেল। বেরিয়ে পড়ল পাড়ার দিকে। সারা রাত্রি হুল্লোড়ের পর নিশ্চয় সব মজা করে ঘুম দিচ্ছে। চৌধুরি-আলা আর নতুন-আলায় মিলে গলা কাটবার মেলতুকে শান দিচ্ছে, নির্বোধ গোঁয়ারগুলো কিছু জানে না।

ক্ষ্যাপা মহেশ শুধুমাত্র জেগে। লম্বা কলকের গাঁজা সেজে এক-মনে ফুড়ি ধরাচ্ছে। ঘাড় তুলে চারুবালাকে দেখে বলে, দুপুরের সেবা তোমাদের ওখানে দিদি। বাদাবনে আর শ্রীক্ষেত্রে জাত-বেজাত নেই। তোমাদের হেঁসেলের ভাত খাব। হাদাগুলোই হাত পুড়িয়ে রান্না করতে যায়।

চারুবালা এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে বলল, সে লোকটা কোথায় গেল ঠাকুর মশায়? সেই যে নাটের গুরু—দুশমন দুটোকে গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে আসছিল।

জগন্নাথ? গাড়ি ফেরত দিতে চলে গেল। যাত্রাদলে আবার পাছে জুটে যায়—বলাই আর পচা পাহারাদার হয়ে গেছে। ওরা টেনেটুনে নিয়ে আসবে।

কবে আসবে?

আমি তো রয়ে গেলাম ওদের জন্যে। বলে কয়ে ছাড়ান করে আসবে তো—আজকে পেরে উঠবে না। কাল নয় তো পরশু। যয়ার-খোলায় আর যাবে না, এইখানে থাকবে!

চারু দৃঢ় স্বরে বলে, এখানেও থাকবে না। সেই কথা বলতে এসেছিলাম। ওদের পেলাম না, তোমায় বলে যাচ্ছি। নতুন বাদার কথা বলছিলে, সেইখানে নিয়ে তোলগে। আমার দাদা এখন ঘেরিদার। আগের মতন আর হবে না। হাঙ্গামায় পড়ে যাবে, ধরে নিয়ে ফাটকে পুরবে। বলে দিও তাদের।

মহেশ বড় খুশি: আছি তো সেই জন্যে। নেহাৎ একবার দেখিয়ে আনব নতুন জায়গাটা। মানুষের নজর খাটো কেন জানিনে। পুবের দিকে দেখতে পায় না। পিরথিমে ঠাঁইয়ের অভাব নেই, হাঙ্গামাহুজ্জুতের তবে কী দরকার! ওরা না যায় তো ভিন্ন এলাকার মানুষ দেখতে হবে। সেবা কিন্তু এই ক'দিন তোমাদের ওখানে। জঙ্গলের মানুষের গৃহস্থ-বাড়ি খাওয়া—এমন খাওয়া খেয়ে নেব, মাসাবধি তার ঢেকুর উঠবে। [ক্রমশঃ।

দেহের কথা

শ্রীবিবেকানন্দ পাল

[শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ১৪শ অধ্যায় অবলম্বনে]

মায়ের মনের ক্ষণিক ভুলে আসেই বুঝি কুলাঙ্গার,
মায়ের বুকে কাঁটা হয়েই রয় যে চির আশঙ্কার।
ভাবেই নাকো পাগল করা দুর্বার সে দেহের ক্ষুধা,
পিয়ায় শুধু গরলধারা, নয় সে কভু পরম সুধা।
আবার জানি, ক্ষমা চেয়েই, পায় যে নারী পুরস্কার,
কুলের মাঝে আসেই নেমে বংশ তিলক অলঙ্কার।

কশ্যপ সে ঋষির জায়া, দক্ষকন্যা নামটি দিতি,
সন্ধ্যাকালে কামার্তা যে হলেন অতি, নয় যা রীতি।
ছিলেন ঋষি যজ্ঞশালায়, মগ্নচিত বিষ্ণু-ধ্যানে,
অনুচিত এই আবেদনেই, পেলেন ব্যথা বড়ই প্রাণে;
"ধিক তোমারে নিলাজ নারী, অবুঝ কেন পাগলপারা?
পুণ্যক্ষণে শান্ত হও, সামনে দেখ পূজ্য যাঁরা।"
কিন্তু স্বামীর ইষ্ট বাণী নারীর কানে বৃথাই বাজে;
নিয়তিরই অমোঘ বিধান চরম বুঝি সকল কাজে

ক্ষণের মাঝে বুঝলে নারী, কর্মফল নয় ক' সোজা,
বংশধারায় বইতে হবে হয়তো বুঝি পাপের বোঝা।
"আমায় ক্ষম, দেবতা সবে, এই মিনতি সবায় করি,
আমার দোষে দণ্ড দিতে পারবে নাক' পুত্রোপরি।"
"স্বামীর সাথে দেবতা হেলা, অনিয়ম যে করলে আর
তারই ফলে হবেই হবে, পুত্র দু'টি কুলাঙ্গার;
বিশ্বমাঝে করবে তারা অকথ্য যে অত্যাচার,
বধতে তাদের অবতীর্ণ হবেন হরি পুনর্বার।"

স্বামীর কথা শুনেই দিতি, বললে, "তোমার অপার কৃপা,
ব্রহ্মশাপ মুক্ত তাদের মারবে হরি; ভাগ্য কিবা।"
"অনুতাপের পুণ্যে তব, হবেই জেনো এক যে নাতি,
তিনটি ভুবন মাঝেই যার ব্যাপ্ত হবে যশের ভাতি।
পুণ্যে তাহার, মুছেই যাবে জগৎ হতে যতেক পাপ,
চন্দ্র যথা হরণ করে নিদাঘ দিনের যতেক তাপ।"

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সাহারায় বিস্ফোরণ—

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) ফ্রান্স সাহারা মরুভূমিতে তাহার প্রথম আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। সাহারা মরুভূমির যে স্থানে এই বিস্ফোরণ ঘটান হইয়াছে তাহা রেগাম আলজিয়ার্স হইতে ৭৫০ মাইল এবং কাসাব্লাঙ্কা হইতে ৬২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি তিন শত ফুট উচ্চ ইস্পাতের স্তম্ভের উপর হইতে জি, এম, টি সকাল ছয়টায় (ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড টাইম বেলা সাড়ে এগারটা) এই বিস্ফোরণ ঘটান হয়। গত নভেম্বর (১৯৫৯) মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ সাহারায় পরমাণু পরীক্ষা স্থগিত রাখিবার জন্য ফ্রান্সকে অনুরোধ করিয়াছিল। ফ্রান্স এই অনুরোধে কর্ণপাত করে নাই। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বৃটেন, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতেই ফ্রান্স এই অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাহস পাইয়াছে। তাছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনুরোধ নিজের পছন্দ মত না হইলে কোন রাষ্ট্রই সেই অনুরোধ রক্ষা করে না, ইহা নূতন কথা কিছুই নয়। পশ্চিম-আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্র পরমাণু বোমার পরীক্ষার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। ফ্রান্স এই প্রতিবাদ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিবে ইহা আশা করা দুরাশা। ফ্রান্স নিজের পরমাণুবোমা বিস্ফোরণ ঘটাইবার ফলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তির আসন লাভ করিয়াছে কি না, পরমাণুশক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকই মনে জাগিতে পারে। পরমাণুবোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ফ্রান্স যে উল্লসিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে তাহার এই উল্লাস যে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ইহা মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, it was only natural that first Britain and then France had developed a nuclear device in the circumstance of life existing today অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলিতেছে তাহাতে প্রথমে বৃটেন এবং তারপর ফ্রান্স পরমাণু বোমা উদ্ভাবন করিবে ইহা খুব স্বভাবিক। সেই সঙ্গে তিনি এই আশাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃহৎ শক্তিবর্গ এমন একটা চুক্তিতে পৌঁছিতে পারিবেন যাহাতে অন্যান্য রাষ্ট্র এই ধরণের অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় অর্থব্যয় করিতে না চায়। তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইলে সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহারার বিস্ফোরণ ইহাই প্রমাণিত করিয়াছে যে, পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে দুর্জ্ঞেয় রহস্য আজ আর কিছুই নাই।

আজ ফ্রান্স পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। লাল চীনও পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবে। জাপান এবং অন্যান্য রাষ্ট্রও যে পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে পারিবে না, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহাতে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসকারী তৃতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ না হইয়া একটা দীর্ঘস্থায়ী অচল অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, বায়ুমণ্ডলী ততই দূষিত হইতে থাকিবে এবং পৃথিবীর বর্ত্তমান অধিবাসীদিগকে না হইলেও তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে অতিভয়াবহ ফল ভোগ করিতে হইবে। বিশ্ববাসীকে এবং পরমাণু শক্তিবর্গকে একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা অবশ্যই প্রয়োজন। দেড় বৎসর হইতে চলিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং বৃটেন পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা চালাইতেছে। সাহারায় একটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ফ্রান্স হয়ত এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে চায়। বর্ত্তমানে যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে ফ্রান্সকেও যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে কি না সে-সম্বন্ধে কিছুই এখনও জানিতে পারা যায় নাই। হয়ত ফ্রান্সকে আমন্ত্রণ করা না-ও হইতে পারে। ফ্রান্স যদি আমন্ত্রিত না হয় এবং বৃহৎ পরমাণু শক্তিত্রয় পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সম্পর্কে একটা চুক্তিতে উপনীত হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ফ্রান্স সেই চুক্তি মানিবে কি? সাহারায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ফ্রান্সের প্রথম ও শেষ পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পরমাণু অস্ত্র নির্ম্মাণ সম্পর্কে ফ্রান্সের একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনা হয়ত ১৯৬৫ সালের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হইবে না। কিন্তু আগামী দুই মাসের মধ্যে ফ্রান্স সাহারায় আরও একটি ছোট পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবে এবং তাহার প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ হয়ত ১৯৬১ সালের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে ঘটান হইবে। ফ্রান্স আশা করে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে বৎসরে একশতটি হাইড্রোজেন বোমা সে তৈয়ার করিতে পারিবে। ইহার অর্থ প্রতি চারিদিনে একটি হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার হইবে। সেই সঙ্গে পরমাণু বোমা বহু দূর অঞ্চলে বহন করিয়া লইয়া যাইবার উপযোগী জেট বোম্বার এবং মিরেজ—৪ নির্ম্মাণকার্য্য ১৯৬৩ সালে পূর্ণ মাত্রা লাভ করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের নেতৃত্বে ফ্রান্স পৃথিবীর অন্যতম পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হইবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। সাহারায় বিস্ফোরণ তাহারই প্রথম ফল। সাহারার আশে-পাশে আফ্রিকায় যে সকল স্বাধীন রাষ্ট্র আছে তাহারা, ফ্রান্সের এই বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। ঘানায় ফরাসী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি আটক করা হইয়াছে, অবশ্য বিস্ফোরণের ফল কিরূপ হয় তাহা না জানা পর্য্যন্ত। মরক্কো সরকার প্যারী হইতে তাঁহাদের রাষ্ট্রদূত ফিরাইয়া আনিয়াছেন।

এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিও এই বিস্ফোরণের ফলে যে বিচলিত হইয়াছে সে কথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ড-ও স্বীকার করিয়াছেন। এই বিস্ফোরণের ফল ভারতে কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিতেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু লোকসভায় বলিয়াছেন, সাহারায় ফ্রান্সের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে যেটুকু তেজস্ক্রিয়তা বাড়িয়াছে তাহাতে ভারতের আশঙ্কার কারণ নাই। হয়ত নাই, কিন্তু পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যদি চলিতে থাকে তবে উহার পরিণাম পুরুষানুক্রমে বিশ্ববাসীর মধ্যে যে সর্বনাশ করা হইবে, ইহা-ই প্রধান উদ্বেগের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ফ্রান্স এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির ক্রোধ ও বিক্ষোভে মোটেই বিচলিত নয়। পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ শক্তির হাতে যতদিন পরমাণু অস্ত্র থাকিবে তত দিন ফ্রান্স পরমাণু অস্ত্র নির্মাণে বিরত হইবে না, ইহাই ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের সঙ্কল্প। ১৯৫৮ সালে শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পরই তিনি পরমাণু বোমা তৈয়ার করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেড় বৎসরের চেষ্টায় এই পরমাণু বোমা তৈয়ার করা হইয়াছে। পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের জন্য ফ্রান্স ব্যাপক পরিকল্পনা গঠন করিয়াও ১৯৬৫ সালের মধ্যে সে পরমাণু অস্ত্রে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার সমকক্ষ হইতে পারিবে ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পরমাণু বোমার প্রথম অধিকারী হইয়াছে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ না হওয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই ছিল পরমাণু বোমার একচেটিয়া অধিকারী। কম্যুনিজম নিরোধের জন্য মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতিকে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমার একচেটিয়া অধিকারের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্ববাসী সর্বপ্রথম জানিতে পারিল যে, রাশিয়াও পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। ইহার পর ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে আমরা জানিতে পারি, মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা অপেক্ষাও বহুগুণ শক্তিশালী 'সুপার' বোমা তৈয়ার করিতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাইড্রোজেন বোমা নির্ম্মাণের কাজ চলার সংবাদ যখন প্রকাশিত সেই সময় ইহাও প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রাশিয়াও হাইড্রোজেন বোমার বৈজ্ঞানিক থিওরী জানে। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র এনিওয়েটক অঞ্চলে (Eniwetok Atok) সর্বপ্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু উহার বিবরণ ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব্বে প্রকাশ করা হয় নাই। অতঃপর ১৯৫৪ সালের ১লা মার্চ প্রশান্ত মহাসাগরের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষামূলক ভাবে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৩ সালের ১০ই আগষ্ট তদানীন্তন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ম্যালেনকোভ সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের যুক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, হাইড্রোজেন বোমাও আর মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রে একচেটিয়া নয়। ইহার চারদিন পরেই রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবার পূর্ব্বে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমার কোন বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে কিনা এই প্রশ্ন অবান্তর। পরমাণু শক্তিতে রাশিয়া বড় না মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র বড় তাহা বলা সম্ভব নয়। পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার সংখ্যার দিক দিয়া মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র হয়ত রাশিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। কিন্তু দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্ম্মাণ এবং মহাকাশের গবেষণার ব্যাপারে রাশিয়া যে মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রগুলির অধিকতর ভার বহনের ক্ষমতা আছে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের ফটোগ্রাফ লইতে সমর্থ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, এই সকল ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যাপারে রাশিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। আজ মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রেও প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, রাশিয়া যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণের উপযোগী সামরিক শক্তি অর্জ্জনের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে কি না। অর্থাৎ রাশিয়া এমন সামরিকশক্তি অর্জ্জন করিতে চলিয়াছে কি না যে, প্রতি আক্রমণের ক্ষতি সহ্য না করিয়া সে আক্রমণ চালাইতে পারে।

মার্কিণ ষ্ট্রেটজিক বিমান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল পাওয়ার বলিয়াছেন যে, "সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্রিশ মিনিটের মধ্যে আমাদের সমগ্র পরমাণবিক আঘাতের সামর্থ্যকে অর্থাৎ প্রতি আক্রমণের (retaliatory) শক্তিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ।" রাশিয়া এবং মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরমাণবিক শক্তির এই যে ব্যবধান তাহা "missile gap" বলিয়া অভিহিত। উহাকে এখন বলা হয় "deterrent gap." এ সম্পর্কে এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। কিন্তু মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৩ সালের মধ্যে এই ব্যবধান বিলুপ্ত করিতে পারিবে কি না, এই প্রশ্নও উঠিয়াছে! ইহা বিবেচনা করিলে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ফ্রান্স মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়ার সমকক্ষ হইতে পারিবে ইহা আশা করা সম্ভব নয়। তবে সাহারার বিস্ফোরণ 'নাটো'তে যে ফ্রান্সের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত চুক্তি—

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ যে সময় তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে, সেই সময় চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে উভয় দেশের সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি চুক্তি এবং দশ বৎসরের জন্য একটি মৈত্রী ও অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার তাৎপর্য্য এবং চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের উপর উহার প্রতিক্রিয়া বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌএন লাইয়ের আমন্ত্রণে ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নে উইন গত ২৪শে জানুয়ারী (১৯৬০) পিকিংয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় উল্লিখিত চুক্তি দুইটি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২৮শে জানুয়ারী (১৯৬০) একটি যৌথ ইস্তাহারে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় কিন্তু ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী রেঙ্গুনে পৌঁছিবার পর উক্ত চুক্তির বিবরণ এক সঙ্গে পিকিং ও রেঙ্গুনে প্রকাশ করা হয়। চীন ব্রহ্মদেশ সীমান্ত বিরোধটাও অবশ্য নূতন নয়। ১৯৫৪ সাল হইতে এই বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই। এই বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যেই চীনের প্রধান মন্ত্রী ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রীকে পিকিংয়ে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রী পিকিংয়ে না রেঙ্গুনে

আলোচনার জন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রীর নিকটেও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ যেরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, চীন-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত বিরোধ যে সে-রকম গুরুতর নয়, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। চীন-ব্রহ্মদেশ সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্ত যে-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে কার্য্যক্ষেত্রে তাহার ফল কি হইবে, এখনই তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে দুইটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। একটি দশ বৎসরের জন্ত মৈত্রী ও অনাক্রমণ চুক্তি আর একটি সীমান্ত সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্ত। নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গত ৩১শে জানুয়ারী (১৯৬০) পিকিং হইতে প্রচারিত রিপোর্টে এই চুক্তি দুইটির বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সীমান্ত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া একটি যুক্ত কমিটি গঠন করা হইবে এবং এই কমিটি উহার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্ত একটি চুক্তির খসড়া তৈয়ার করিবেন, সীমান্ত অঞ্চল জরীপ করিবেন এবং সীমান্ত চিহ্নিত করার জন্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। কি ভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা হইবে তাহার নীতিও চুক্তিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। হিম গাওলুম এবং কাংফাং অঞ্চল ব্যতীত মৌচাকৃতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের পশ্চিমদিকস্থ শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র অচিহ্নিত সীমান্ত অঞ্চলকে প্রচলিত সীমারেখা অনুসারে চিহ্নিত করা হইবে। অর্থাৎ একদিকে উত্তর দিকের মৌচাকৃতি উচ্চ শৃঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া টাইপিং, শোয়েসি, মু এবং টুলং নদীর জলরেখা বরাবর এবং অপর দিকে মাইহা নদীর জলরেখা ধরিয়া চিদাম ও নকুমকাম্বের মধ্যে মাইহা ও তুলংয়ের সঙ্গমস্থল বরাবর এবং উহার পর একদিকে তুলুং ও তামুল নদীর মধ্যবর্ত্তী জলরেখা এবং অপরদিকে চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের পশ্চিমের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তুলং ব্যতীত ইরাবতী নদীর উজান অঞ্চলের সমস্ত উপনদী বরাবর সমগ্র সীমান্ত প্রচলিত সীমারেখা অনুযায়ী চিহ্নিত করা হইবে। ব্রহ্মদেশ হিম, গাওলুম ও কাংফাং অঞ্চল চীনকে ফিরাইয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত অঞ্চলের কতখানি ভূভাগ চীনকে দেওয়া হইবে তাহা যুক্ত কমিটি নির্দ্ধারণ করিবেন এবং তদনুযায়ী সীমারেখা চিহ্নিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন। চীন সরকারও ত্রিভুজাকৃতি মেংমাও অঞ্চলটি ব্রহ্মদেশকে দিয়া দিবেন এবং উহার বিনিময়ে ব্রহ্মদেশ পানহুং ও পানলাও উপজাতীয়দের কতকটা অঞ্চল চীনকে প্রদান করিবেন।

চুক্তিতে সীমান্ত চিহ্নিত করিবার যে নীতি স্বীকৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, চীন সরকার ম্যাকমোহন লাইনের ব্রহ্মদেশের সহিত সংযুক্ত শেষ অংশ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সীমান্তরেখা নির্দ্ধারণের জন্ত 'ওয়াটারশেড' নীতিও মানিয়া লইয়াছেন। দৃষ্টতঃ এই নীতি সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। ১৯৪১ সালে ইসেলিন কমিশন (Iselin Commission) যে সীমান্তরেখা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহাও অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের রূপার খনিতে কাজ করিবার পুরাতন অধিকারও চীন ছাড়িয়া দিয়াছে। ব্রহ্মদেশের সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার একটা তাৎপর্য্য যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কম্যুনিষ্টদের অনুকূল নেশন্যাল ইউনাইটেড ফ্রন্ট নির্ব্বাচনে যাহাতে কিছু সুবিধা করিতে পারে সেইজন্ত সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে এই চুক্তি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাচনে এ-এফ-পি-এফ-এলের উন্নুর অংশই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। নি উইন মিশন যে উদ্দেশ্য লইয়া ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য কতকটা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই আপাতত মনে হইতেছে।

ব্রহ্মদেশে সাধারণ নির্ব্বাচন—

ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল, তাহাতে উ নু দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে উ নুর জনপ্রিয়তা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। ফ্যাসী বিরোধী গণস্বাধীনতা লীগ ১৯৫৮ সালে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। উহার উ নুর সমর্থকগণ (clean faction of the A. F. P. F. L) পুনরায় চারি বৎসরের জন্ত পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন। ফ্যাসী বিরোধী গণস্বাধীনতা লীগের যে অংশ stable faction নামে অভিহিত উহার নেতা উ বা শোয়ে। উ বা শোয়ের সমর্থক দলটি নির্ব্বাচনে বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। উ নু দুইবার ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে আউঙ সান ও তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্যগণ নিহত হওয়ার পর তিনি প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার দলকে সুসংহত করিবার জন্ত তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব একবার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার প্রধান মন্ত্রিত্ব
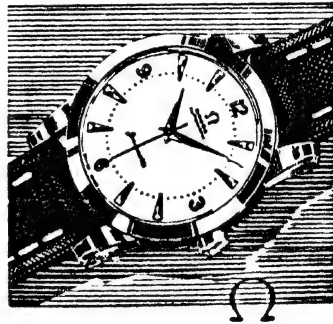
ত্যাগ করেন ১৯৫৮ সালে অক্টোবর মাসে। দেশের অবস্থা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে সাধারণ নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া জেনারেল নি উইনের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছিলেন। উ বা সোয়েও এক সময় ব্রহ্মদেশের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

উ নুর দল একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় কম্যুনিষ্ট অনুরাগীদের সমর্থন লাভের জন্য উ নুকে আর উদ্‌গ্রীব থাকিতে হইবে না। তিনি ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই নীতি তিনি কার্য্যকরী করিবেন কি না কিম্বা কি ভাবে করিবেন তাহা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবেন। তাঁহার অর্থনৈতিক নীতি কি হইবে বিদেশী ব্যবসায়িগণ আশঙ্কাপূর্ণ চিত্তে তাহা লক্ষ্য করিবেন।

কেনিয়ায় শাসন-সংস্কার—

কেনিয়ার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া লণ্ডনে যে সম্মেলন হইতেছিল গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। সম্মেলনে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে মোটের উপর একটা মতৈক্য হইয়াছে। কিন্তু ভূমিসংক্রান্ত রক্ষাকবচ সম্পর্কে কোন মতৈক্য সম্ভব হয় নাই। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ ম্যাকলয়েড প্রতিনিধিদের ঘরোয়া অধিবেশনে এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, ভূমিসংক্রান্ত রক্ষাকবচ সম্পর্কে কোন মতৈক্য সম্ভব না হওয়ায় মন্ত্রিসভার নিকট সুপারিশ করিবার সময় এ সম্পর্কে তিনি তাঁহার প্রস্তাব পেশ করিবেন। যদিও মোটামুটি ভাবে কেনিয়ার শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে মতৈক্য হইয়াছে তথাপি কেনিয়ার অশ্বেতকায় অধিবাসীরা এই মতৈক্যের ফলে কতটুকু রাজনৈতিক অধিকার পাইল তাহাই প্রধান বিবেচনার বিষয়। তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গ যে সকল অধিকার পাইবার আশায় এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন প্রথমে সেগুলির কথাই উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহাদের দাবী ছিল দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, এই বৎসরেই এক সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী গঠন, একজন আফ্রিকান প্রধান মন্ত্রী হইবেন এবং আইন-সভায় বিশেষ আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিলোপ। তাঁহাদের এই দাবীগুলির একটিও পূরণ করা হয় নাই। বৃটিশ সরকারের নিকট এইটুকু আশ্বাস মাত্র তাঁহারা পাইয়াছেন যে, কেনিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়াই বৃটিশসরকারের অভিপ্রায়। এইরূপ আশ্বাস বৃটিশসরকার ইতিপূর্ব্বে কেনিয়াকে আর কখনও দেন নাই ইহা অবশ্য সত্য। কিন্তু এই আশ্বাস যে কবে কার্য্যে পরিণত করা হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। কেনিয়ায় যে সকল এশিয়াবাসী এবং আরব আছেন তাঁহারা অবশ্য আফ্রিকানদের হাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য ন্যস্ত করিতে রাজী আছেন। কিন্তু কেনিয়াবাসীরা স্বাধীনতা লাভের 'প্রধান অন্তরায় যে শ্বেতকায়গণ এ কথা অনস্বীকার্য্য।

মিঃ ব্লাণ্ডেন এবং তাঁহার মাল্‌টিরেসিয়েল নিউকেনিয়া পার্টি (multi-racial New Kenya Party) এক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকা হওয়ার সম্ভাবনা মানিয়া লইয়াছেন। কেনিয়ার আইন-সভায় আফ্রিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এইরূপ প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়াই মনে করিতেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন ব্রিগ্‌স এবং তাঁহার দলের ইউরোপীয়গণ মনে করেন যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। একথা হয়ত সত্য যে, তাঁহারা ঠিক যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা পান নাই, কিন্তু কেনিয়ার আফ্রিকানগণ প্রকৃতপক্ষে কিছুই পান নাই, তাঁহাদের কোন দাবীই পূরণ করা হয় নাই। শাসন পরিচালনক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের প্রাধান্যই থাকিয়া গেল। তবে কেনিয়াকে আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত করিবার যে অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল তাহা পূরণ হওয়ার পথে কতকটা অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে।

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ ম্যাকলয়েড কেনিয়ায় শাসন সংস্কার সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণ আমরা জানিতে পারি নাই। যতটুকু জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, কেনিয়া আইনসভা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই নির্ব্বাচন হইবে আংশিকভাবে একটি সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা, আংশিকভাবে সীমাবদ্ধ নির্ব্বাচকমণ্ডলী এবং আংশিকভাবে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকার ভিত্তিতে। গবর্ণরের মন্ত্রিসভা বারজন মন্ত্রী লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে নয়জন মন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠদল হইতে গ্রহণ করা হইবে। আফ্রিকান মন্ত্রীর সংখ্যাই যে বেশী হইবে ইহা মনে করিবার নাই। প্রধান মন্ত্রীও আফ্রিকান হইতে পারিবেন না। বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে যে নির্ব্বাচক তালিকা রহিয়াছে তাহা বিলোপ করা হয় নাই। তবে নির্ব্বাচন অধিকারের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে একই নির্ব্বাচক তালিকা গঠিত হওয়ার একটা আশা সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে ভাবে আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত জটিল। এই জটিলতার অভিজ্ঞতা বৃটিশ শাসনের আমলে আমরাও সঞ্চয় করিয়াছি। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়াই কেনিয়ার আইনসভা গঠিত হইবে। প্রতিনিধির সংখ্যা হইবে ৬৫ জন। এই ৬৫ জনের মধ্যে ১২ জন হইবেন জাতীয় সদস্য বা national members. যাঁহারা বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদের এই নূতন নামকরণ করা হইয়াছে। আইনসভা তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে চারি জন আফ্রিকান, চারি জন এশীয় এবং চারি জন ইউরোপীয়। অবশিষ্ট ৫৩ জন সাধারণ নির্ব্বাচন তালিকার ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত হইবেন। যাঁহারা নিজেদের ভাষায় পড়িতে বা লিখিতে পারেন, বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছে, কোন চাকুরী করিয়াছেন বা বার্ষিক আয় ৭৫ পাউণ্ড তাঁহারাই ভোট দিতে পারিবেন। সংখ্যালঘুদের রক্ষা-কবচ হিসাবে ৫৩টি আসনের মধ্যে ২০টি আসন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংরক্ষিত থাকিবে। এই ২০টি আসনের ১০টি ইউরোপীয়দের জন্য, ৮টি এশীয়দের জন্য এবং দুইটি আরবদের জন্য। গবর্ণরের সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিবে। মন্ত্রিসভা ৪ জন সিভিল সার্ভেণ্ট, ৪ জন আফ্রিকান, ৩ জন ইউরোপীয় এবং একজন এশীয় লইয়া গঠিত হইবে। কিন্তু কোন আফ্রিকান প্রধান মন্ত্রী হইতে পারিবেন না। তবে একজন আরব উপদেষ্টা থাকিতে পারেন।

কেনিয়ার আফ্রিকানরা যে এই ধরণের শাসন সংস্কারে সন্তুষ্ট হইবেন না তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। আফ্রিকানদের প্রতিনিধি

মিঃ মবোয়াকে যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে তিনি একজন চরমপন্থী বলিয়া বিবেচিত হইলেও আফ্রিকানদের কাছে তিনি নরমপন্থী বলিয়া গণ্য। তিনি লোওস (Luas) উপজাতির লোক। বিদ্রোহের পর কিকিউদের বিপদ হইতে এই উপজাতি কিছু সুবিধা করিয়া লইয়াছে। মাউ মাউ আন্দোলনের প্রতি মিঃ মবোয়ার কোন সহানুভূতি কোন সময়েই ছিল না। মাউ মাউ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির জন্যই মিঃ কেনিয়াট্টা দণ্ডিত হন। কেনিয়ায় যে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আফ্রিকানরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না। কেনিয়ায় শ্বেতকায়দের হাইল্যাণ্ড (White Highland) গঠিত হওয়ার আশঙ্কা দূর হয় নাই।

মঃ ক্রুশেভের সফর—

রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্থান ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসেই (১৯৬০) তিনি প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের সঙ্গে আলোচনার জন্য ফ্রান্সে যাইবেন। চতুঃশক্তির শীর্ষ সম্মেলন হইবে আগামী মে মাসে। মঃ ক্রুশেভের এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভ্রমণের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রমণের কথা মোটামুটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি গত ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) ভারতের রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ গ্রোমিকো, সংস্কৃতি মন্ত্রী মঃ মিখাইলভ, বিদেশের সহিত সংস্কৃতি স্থাপন সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান মঃ ঝুলকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই তিনি ভারতীয় পার্লামেণ্টের উভয় সভায় সভার সদস্যদের নিকট বক্তৃতা দেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী মঃ ক্রুশেভ এবং পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে প্রথম দফা আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় রামলীলা ময়দানে মঃ ক্রুশেভকে পৌরসম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐ দিনই ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে দুইটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। একটি চুক্তি ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান সম্পর্কে এবং অপর চুক্তি সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কে। মঃ ক্রুশেভ বিশ্ব-কৃষিমেলা পরিদর্শন করেন। ভারত-সোভিয়েট যে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় তদনুসারে ভারত রাশিয়ার নিকট হইতে ১৮০ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য পাইবে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঃ ক্রুশেভ সুরাটগড়ের রাষ্ট্রীয় খামার পরিদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অকর্ষিত অঞ্চলে একটি রাষ্ট্রীয় খামার গড়িয়া তুলিবার জন্য ১৯৫৬ সালে রাশিয়া-ভারত সরকারকে বহু রকম কৃষিযন্ত্রপাতি উপহার দেয়। এই সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা রাজস্থানের সুরাটগড়ে ৪৮ বর্গ মাইল ব্যাপী অনুর্ব্বর ভূমিতে রাষ্ট্রীয় খামার স্থাপন করা হয়। সুরাটগড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঐদিন তিনি নেহরুজীর সহিত আর এক দফা আলোচনা করেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি ভিলাই ইস্পাৎ কারখানা পরিদর্শন করেন। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট সাহায্যে এই কারখানা স্থাপিত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতায় পৌছেন এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুণযাত্রা করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুণ হইতে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় গমন করেন।

ইন্দোনেশিয়া হইতে ফিরিবার পথে ১লা মার্চ্চ (১৯৬০) মঃ ক্রুশেভ পুনরায় কলিকাতা আগমন করেন। তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার জন্য পণ্ডিত নেহরুও কলিকাতায় আসেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ব্রহ্মদেশের নেতা উনুও কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় ঐদিন অপরাহ্নে তাঁহাকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় ক্রুশেভ ও নেহরুজী নিভৃতে আলোচনা করেন। যতটুকু জানা যায় উ নু এই আলোচনায় যোগদান করেন নাই। ২রা মার্চ্চ মঃ ক্রুশেভ কলিকাতা হইতে কাবুলে পৌছেন। কাবুল হইতে তিনি ৫ই মার্চ্চ মস্কো প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মস্কো পৌছিবার অব্যবহিত পরেই লেনিন ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত তাঁহার গুরুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হইয়াছে ইহার ফলে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়তর হইবে। তিনি আরও বললেন যে, প্রাচ্যের অধিবাসীরা এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিবার ব্যাপারে রাশিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদীরা যাহাই বলুন না কেন, অনগ্রসর ও পূর্ব্বের বিদেশী-পদানত দেশগুলিতে উন্নতির রথচক্র রোধ করা যাইবে না।

রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশেভ এশিয়ার চারিটি দেশ ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্থান সফরের তাৎপর্য্য এবং উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। ইহা নিছক শুভেচ্ছা মিশন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। গত ডিসেম্বর মাসে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ার এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের এগারটি দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি পরিভ্রমণ করিতেছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী আফ্রিকার বৃটিশ কমন ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি গত জানুয়ারী মাসে (১৯৬০) পরিভ্রমণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রনায়কদের এই সকল সফরকে নিছক শুভেচ্ছামিশন মনে করিলে ভুল করা হইবে। পশ্চিমীশিবির এবং সোভিয়েটশিবিরের মধ্যে আদর্শগত একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। পশ্চিমীশিবির চাহিতেছে সামরিক জোট গঠন করিয়া কম্যুনিজমকে নিরোধ করিবার জন্য। ফলে উভয় শিবিরের মধ্যে অস্ত্রসজ্জার তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে। ইহার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বৎসর দশ হাজার কোটি ডলার ব্যয় হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া কম্যুনিজমের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চায়, অস্ত্র বলে নয়, 'প্রতিযোগিতা মূলক সহাবস্থান' দ্বারা। ইহার জন্য বিশ্বশান্তি তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মঃ ক্রুশেভ এশিয়ার যে চারিটি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন, তাহারা কোন সামরিক জোটে যোগদান করে নাই। এই দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য বিশ্বশান্তি একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই মঃ ক্রুশেভ এই চারিটি দেশ ভ্রমণ করিয়া বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রী করণের বাণী প্রচার করিয়াছেন। কারণ বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই বলিয়াই তিনি মনে করেন। প্রতিযোগিতা-মূলক ধ্বংসের আয়োজন অপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক 'সহাবস্থানই রাশিয়ার কাম্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তাঁহার এই সফর, বিশেষ করিয়া আসন্ন শীর্ষ-সম্মেলনের প্রাক্কালে। ইন্দোনেশিয়ায় মঃ ক্রুশেভ স্বীকার করিয়াছেন, এশিয়ার প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের

শীর্ষ-সম্মেলনে স্থান পাওয়া উচিত। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ-ই এ প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপন করিয়াছিলেন। মঃ ক্রুশ্চেভ কম্যুনিজমের সেলসম্যান হিসাবে এই সফরে বাহির হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থান নীতি গৃহীত হইলে অনুন্নত দেশগুলি শুধু কম্যুনিষ্ট দেশের সাহায্যই পাইবে না, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিরও সাহায্য পাইবে। কম্যুনিজমের সহিত ধনতন্ত্রের চলিবে অবাধ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় যদি কম্যুনিজমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় তবে তাহার অগ্রগতি ঠেকাইতে পারা যাইবে না। আবার ধনতন্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইলে উহার আয়ুষ্কাল আরও বর্দ্ধিত হইবে। বিশ্ববাসীর পক্ষে এইরূপ প্রতিযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য দিয়া তাহাদের উন্নতি দ্রুততর করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। অবশ্য উহার মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যও নিহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ পশ্চিমী শক্তিশিবির বর্ত্তমানে প্রতিযোগিতামূলক ধ্বংসের নীতি অপেক্ষা প্রতিযোগিতা মূলক সহাবস্থানের নীতির দিকেই ঝুঁকিয়াছে মনে হয়।

ভারত, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার সহিত চীনের যে বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিবার অভিপ্রায় মঃ ক্রুশ্চেভের এই সফরের মধ্যে কতখানি নিহিত রহিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে না। চীন ও ব্রহ্ম দেশের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারত-চীন সীমান্তবিরোধের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। মঃ ক্রুশ্চেভের সহিত নেহরুজীর আলোচনায় চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মঃ ক্রুশ্চেভের সহিত আলোচনার কয়েক ঘণ্টা পরেই নেহরুজী রাজ্যসভায় ঘোষণা করেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় চীনের সঙ্গে কোনরূপ আলোচনা করিয়া লাভ হইবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পূর্ব্বেই গত ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) চীনের প্রধান মন্ত্রীর নিকট দিল্লীতে এক বৈঠকের প্রস্তাব করিয়া এক পত্র দেন। উক্ত পত্রের নকল গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। পালাম বিমানবন্দর হইতে যাত্রার প্রাক্কালে অনেক সাংবাদিক চীন-ভারত বিরোধ সম্পর্কে মঃ ক্রুশ্চেভের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি ১৯৫৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর টাস কর্ত্তৃক প্রচারিত একটি বিবৃতির কথা উল্লেখ করেন। উহাতে দুইটি মিত্র দেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় সোভিয়েট সরকার দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই বলেন নাই। কিন্তু রেঙ্গুণ যাত্রার প্রাক্কালে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দমদম বিমানঘাঁটিতে মঃ ক্রুশ্চেভ সাংবাদিকদিগকে বলেন যে, ভারত এবং চীন এই দুই সুহৃদ দেশ অতি শীঘ্রই তাহাদের মতবিরোধ মিটাইয়া ফেলিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের সৌহার্দ্য সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন। তাঁহার এই উক্তির কয়েক দিন পরেই চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন-লাই কর্ত্তৃক নেহরুজীর আমন্ত্রণ গ্রহণের কথা আমরা জানিতে পারি। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তিনি নেহরুজীর আমন্ত্রণ গ্রহণের কথা জানাইয়াছেন। তবে তিনি মার্চ্চ মাসে আসিবেন না, আসিবেন এপ্রিল মাসে। আমন্ত্রণ গ্রহণের পত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, "আমাদের দুই দেশের মাঝখানে যে কৃষ্ণমেঘ জমিয়াছে, তাহা আমাদের মিলিত চেষ্টায় দূর হইবে বলিয়া আমি বিশেষ ভাবে আশা করি।" তিনি কি ভাবে এই সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করিতে সম্মত হন তাহার উপরেই তাঁহার এই আশার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

মঃ ক্রুশ্চেভ তাঁহার এই ভ্রমণের সময় একাধিক বার বলিয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন যে নানাভাবেই অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে সে কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মঃ ক্রুশ্চেভ পশ্চিম ইরিয়ানের (নিউগিনি) কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহার উপর ইন্দোনেশিয়ার দাবী মানিয়া লইয়াছেন। সোভিয়েট রাশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা নিবিড়তর করার জন্য অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সহযোগিতার একটি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার একটি চুক্তি ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। রাশিয়া ইন্দোনেশিয়াকে ২৫ কোটি মার্কিণ ডলার ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছে। মঃ ক্রুশ্চেভ আফগানিস্থানে ছিলেন তিন দিন। তাঁহার সম্মানার্থে আফগান প্রধান মন্ত্রী ২রা মার্চ্চ যে ভোজ প্রদান করেন তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি পাক-আফগান বিরোধে আফগানিস্থানকে সমর্থন করেন এবং বলেন যে, যে সকল দেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে সেই সকল দেশের কোন কোন মহলের আচরণ ও প্রাক্তন শাসক গোষ্ঠির আচরণের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই। এই সকল মহল অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করেন না। তাঁহারা কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সমর্থন করিয়া থাকেন। মঃ ক্রুশ্চেভের এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বৃটিশরা যে পাক-আফগান সীমান্ত রেখা টানিয়াছে আফগানিস্থান তাহা স্বীকার করে না আবার পাকিস্তানী বেতারে আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন হওয়ার অভিযোগ করা হইয়া থাকে। ৪ঠা মার্চ্চ মঃ ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করিয়াছেন যে, আফগানিস্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে সোভিয়েট রাশিয়া সাহায্য করিবে।

—৫ই মার্চ্চ, ১৯৬০।

খেলাধূলা

দিল্লীতে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান

দিল্লীর ন্যাশনাল ষ্টেডিয়াম। এখানেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ১৯৬০ সালের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের উপর যবনিকা পড়ে। আগষ্ট মাসে রোমে বিশ্ব অলিম্পিকের যে আসর বসবে তার জন্য ভারতীয় দল গঠন করা হবে বলে এবারকার জাতীয় প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়। বার শত প্রতিযোগী নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসেন। দৌড়ঝাঁপ ছাড়াও কুস্তি, ভারোত্তোলন এবং ভলিবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। কর্পোরেশন ষ্টেডিয়াম, বিমান-বাহিনীর ষ্টেশন, সফদারগঞ্জ ও পাহাড়গঞ্জের রেলওয়ে ষ্টেডিয়ামে কতকগুলি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। ন্যাশনাল ষ্টেডিয়াম থেকে তিন মাইল দূরে তালকাটোরা গার্ডনসে "গেমস ভিলেজ" অর্থাৎ প্রতিযোগীদের থাকার ব্যবস্থা হয়। এখানে ব্যাঙ্ক, তার ও ডাকঘর, ক্যানটিন, রেডিও ও টেলিভিশান সেট, সিনেমা, চিকিৎসার ব্যবস্থা কোনটারই অভাব থাকে না। এখানে গড়ে ওঠে এক নতুন সহর। নানা রঙের ফুল আর বিজলী বাতির ঝলকানিতে বাগানের শোভাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

সার্ভিসেস স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নি। দিল্লীর ৩৪৫ মাইল দূরে জ্বালামুখীর যোগমায়া মন্দিরের চিরন্তন শিখা থেকে অলিম্পিকের মশাল পাঁচ শত লোকের হাতে হাতে দিল্লীতে আনা হয়। উদ্বোধনের সময় শেষ বাহক ঐ মশাল নিয়ে ন্যাশনাল ষ্টেডিয়ামে রক্ষিত আধারে পূতাগ্নি প্রজ্বালিত করেন। উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ১৯ বার তোপধ্বনি করার পর ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হয়। ক্রীড়ানুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু, শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে, এল, শ্রীমালী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভেচ্ছা বাণী পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি বাণীতে বলেছেন—"দেহ সুস্থ ও সবল রাখা ছাড়াও খেলার মাঠে খেলাধূলা কল্যাণমূলক কার্য্য হিসাবে খুবই বাঞ্ছনীয়। সেই কারণে আমি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনে সামরিক বাহিনীর আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আনন্দিত।" প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বাণীতে বলেছেন—"ভারতে খেলাধূলা কল্যাণমূলক কার্য্য হিসাবে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি ইহাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কারণ, দেহকে সুস্থ রাখা ছাড়াও ইহা তরুণ-তরুণীর মানসিক উৎকর্ষ সাধন করে। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী বাণীতে বলেছেন—"এ দেশে খেলাধূলার উন্নয়নে জনসাধারণকে আগ্রহশীল করিয়া তুলিবার জন্য এবং ইহাকে অধিক গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সাহায্য দিয়াছেন। জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

শুধু এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে এবার নতুন রেকর্ড হয়েছে ২৩টি। কিশোরদের দীর্ঘ লম্ফনে চার জন আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। হাজার মিটার দৌড় ও পোলভল্টে তিন জন করে এথলীট নতুন রেকর্ড করেছেন। এমনি ভাবে কোন বিষয়ে দু'জন, কোন বিষয়ে তিন জন অথবা চার জনও আগের রেকর্ড ভাঙতে কসুর করেন নি। এ থেকে কি মনে করতে হবে যে ভারতে এ্যাথলেটিক্সের মান উন্নত হয়েছে? কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা করলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। ভারত একটি বিরাট দেশ। বিশ্বের দরবারে ভারতের এত প্রতিপত্তি। কিন্তু এ-হেন দেশেও একমাত্র মিলখা সিং ছাড়া আর কোন এথলীট বের করা যায়নি—যাঁকে অলিম্পিকের পর্য্যায়ে ফেলা চলে। এ্যাথলেটিকসে উন্নতি করতে হলে—চাই সাধনা আর সঙ্গে চাই রীতিমতো অনুশীলন। এই দুটোরই ভারতে অভাব। তবে সামরিক বাহিনীর কিছুটা সাধনা আছে বলেই তারা এ বিষয়ে অগ্রণী। এবারও সামরিক বাহিনীর প্রতিযোগীরা সর্ব্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে ভারতের কীর্ত্তিমান এথলীট মিলখা সিং-এর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। তিনি এবার ভারতের এ্যাথলেটিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করার গৌরবে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে জাতীয় ও এশীয় রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন। কিন্তু মিলখা সিং ১০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড করলেও সেটা রেকর্ডরূপে অনুমোদিত হয় নি। কারণ, পবনদেব এ বিষয়ে বাদ সাধলেন। শত মিটার দৌড়ের সময় বাতাসের গতিবেগ সেকেণ্ডে পিছু দুই মিটারের বেশী ছিল। যাই হোক, এবিষয়ে স্বীকৃতি না পেলেও তিনি যে রেকর্ড করেন—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এর পূর্ব্বে কোন ভারতীয় এথলীট এভাবে স্বল্প পাল্লার তিনটা দৌড়ে সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেন নি।

বেশ তোড়জোড় করেই বাঙ্গালা থেকে এক বিরাট দল দিল্লীতে হাজির হয়েছিলো। এখানকার প্রতিযোগীদের সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভালো। তবু ভালো—সবে ধন নীলমণি—শঙ্কর নাগ। কিশোরদের বিভাগে উচ্চ লম্ফনে প্রথম স্থান লাভ করে বাঙ্গালার মুখ রেখেছেন। তিনি এ বিষয়ে রেকর্ড করারও কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন। সাবাস শঙ্কর নাগ!

পাঁচজন এথলীটের যোগ্যতা লাভ

অলিম্পিক ক্রীড়ার ষষ্ঠ স্থানাধিকারীর মান অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ক্রীড়ামানের সমপর্য্যায়ভুক্ত হওয়ায় ভারতীয় এথেচার এ্যাথলেটিক

ফেডারেশন কর্তৃক নিম্নলিখিত পাঁচজন এথলীট নির্বাচন যোগ্যতা অর্জন করেছেন :—

মিলখা সিং (১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়) লালচাদ (ম্যারাথন), জগমোহন সিং (১১০ মিটার হার্ডল), জোরা সিং (২০ কিলোমিটার ও ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ) ও অজিত সিং (৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ)।

এ ছাড়া সিলভেরা, রাজকুমার, হরদীন সিং ও লস্কর সিং শিক্ষণ শিবিরে যোগদানের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

নূতন রেকর্ডের খতিয়ান

পুরুষ বিভাগ

২০ কিলোমিটার ভ্রমণ—জোরা সিং। সময়—১ ঘণ্টা ৩৩ মি: ৩৩ সে:, ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ—জোরা সিং। সময়—৪ ঘণ্টা ৩৬ মি: ৪৬'৮সে:, ৫০০০ মিটার দৌড়—পান সিং। সময়—১৪ মি: ৪৩'২ সে:। ষ্টিপল চেজ—পান সিং। সময়—৯ মি: ৭'৮ সে:, পোল ভল্ট—রামচন্দ্রন। উচ্চতা—১৩ ফুট ১ ইঞ্চি, ৮০০ মিটার দৌড়—দলজিৎ সিং। সময়—১ মি: ৫২'২ সে:, বর্শা নিক্ষেপ—অবতার সিং। দূরত্ব—২০১ ফুট ৪ ইঞ্চি, ডেকাথলন—গুরুবচন সিং। পয়েণ্ট—৫১৭৩, ২০০ মিটার দৌড়—মিলখা সিং। সময়—২০'৮ সে:, ৪০০ মিটার দৌড়—মিলখা সিং। সময়—৪৬'১ সে:, ম্যারাথন দৌড়—লালচাদ। সময়—২ ঘণ্টা ২৪ মি: ২২'৪ সে:, ৪×১০০ মিটার রিলে—সার্ভিসেস। সময়—৪২'২ সে:, ৪×৪০০ মিটার রিলে সার্ভিসেস। সময়—৩ মি: ১২'৬ সে:।

মহিলা বিভাগ

ডিসকাস নিক্ষেপ—মনোমোহিনী ওবেরয়। দূরত্ব—১২০ ফুট ১½ ইঞ্চি, বর্শা নিক্ষেপ—ডেভেনপোর্ট। দূরত্ব—১৪৫ ফুট ৫ ইঞ্চি।

কিশোর বিভাগ

বর্শা নিক্ষেপ—প্রেম প্রতাপ। দূরত্ব ১৭৫ ফুট ½ ইঞ্চি, উচ্চ লম্ফন—শঙ্কর নাগ। উচ্চতা—৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, ২০০ মিটার দৌড়—মহম্মদ হামিদ। সময়—২২'১ সে:, দীর্ঘ লম্ফন—দলবীর সিং। দূরত্ব—২০ ফুট ২ ইঞ্চি।

কিশোরী বিভাগ

সট পাট—মেরি ডি'সুজা। দূরত্ব—২৭ ফুট ১¾ ইঞ্চি, ৮০ মিটার হার্ডল—জেনিস স্পিঙ্ক। সময়—১২'৬ সে:, ৪×১০০ মিটার রিলে—দিল্লী। সময়—৪৪ সে:।

সার্ভিসেস দলের চতুর্থবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ

ক্যালকাটা মাঠে এবার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসে। বাঙ্গালা হকি এসোসিয়েশন এর উদ্যোক্তা। তাদের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্য করেই এই আয়োজন। রজতজয়ন্তী উৎসবের বিশেষ কোন জাঁকজমক ছিলো না। তবে এই উপলক্ষ্যে একদিন "ককটেল" পার্টির ব্যবস্থা হয়েছিলো। সে যাই হোক, প্রতিযোগিতা সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্য বাঙ্গালা হকি এসোসিয়েশন কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। ২২টি দল এবার যোগদান করে। এবারকার প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকটা বেশী। কারণ ছয় ছয়টা অলিম্পিকের সাফল্যের অধিকারী ভারতীয় হকি দল গঠন করা হবে এই প্রতিযোগিতার পারদর্শিতার উপর। নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে বাবু ছাড়া সকলেই হাজির হন। ধ্যানচাদ ও কিষেনলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খেলোয়াড়দের চেষ্টার কোন ত্রুটী দেখা যায় নি। কিন্তু এবারকার খেলা দেখে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে—ভারতে হকি খেলার মান কি ছিল—আর আজ কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে! এতগুলো দল খেলে গেল—খুব কম খেলাতেই উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্যের অভাব পাওয়া গেছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন কোন পারদর্শিতা দেখা যায় নি যাকে অলিম্পিকের পর্য্যায়ে ফেলা চলে। অন্যান্য দেশ যখন বিশ্বের দরবারে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য ভাঙ্গবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে সেই সময় ভারতের খেলার মান ক্রমশঃ নীচের দিকে যাচ্ছে। এ নিয়ে ভারতের সাফল্য সম্পর্কে সকলেই আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সে কথা থাক, খেলা দেখে ভারতীয় অলিম্পিক দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শ্রীজয়পাল সিং আশা প্রকাশ করেছেন যে, এবারের অলিম্পিকেও ভারত তাহার বিজয়ীর আখ্যা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হবে। এটা সুখের কথা নিশ্চয়ই। তবে ফাইন্যাল খেলা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, কোন খেলোয়াড়ের খেলাই বিশ্ব-পর্য্যায়ে পড়ে না। কিন্তু সবচেয়ে তিনি যেটা বিশেষ করে বলেছেন, তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতের হকি পরিচালনার ভার অযোগ্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়েছে। খেলা-ধূলার উন্নতির জন্য ভারত সরকার নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিল গঠন করেছেন। আশা করা যায় যে, শ্রীজয়পাল সিং-এর মন্তব্যটা তাঁদের দৃষ্টিগোচর হবে।

সার্ভিসেস দল এবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। এ সম্মান তাদের এই প্রথম নয়। এর আগে ১৯৫৩, ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে তারা সাফল্য অর্জ্জন করে। তবে ১৯৫৫ সালে তাদের মাদ্রাজের সঙ্গে যুগ্মভাবে বিজয়ী হতে হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ দল ফাইন্যালের প্রথম দিন অল্পের জন্য সাফল্য অর্জ্জন করতে পারেনি। সেদিন তাদেরই খেলায় প্রাধান্য দেখা যায় এবং তারা ঐ দিন জয়লাভ করলেও কাহারও কিছু বলবার থাকতো না। তবে দ্বিতীয় দিন তারা বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। সার্ভিসেস যোগ্য দল হিসাবেই জয়লাভ করে।

রঞ্জী প্রতিযোগিতা হইতে বাঙ্গালার বিদায় গ্রহণ

ক্রীড়াজগতে বাঙ্গালার অবস্থা কোন পর্য্যায়ে এসে পড়েছে তা নিয়ে আলোচনা করতে সত্যই লজ্জা হয়। এবার বাঙ্গালাকে রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। তারা বিহারের নিকট ২ উইকেটে পরাজিত হয়। রঞ্জী প্রতিযোগিতার খেলায় বাঙ্গালার বিরুদ্ধে বিহারের এই প্রথম সাফল্য। দীর্ঘ ২২ বছরের মধ্যে বিহার দল ইতিপূর্ব্বে কোন বারই বাঙ্গালাকে পরাজিত করতে পারে নি। বাঙ্গালার এই পরাজয়ে দুটো কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একদিকে বাঙ্গালার ক্রিকেটের অবনতি আর একদিকে বিহারের অগ্রগতি। বিহার এই সাফল্যের জন্য সত্যই কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। বাঙ্গালার এই দুরবস্থা হলেও এখনকার ক্রিকেটের কর্ম্মকর্ত্তাদের ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না নিশ্চয়ই?

স্মৃতির টুকরো

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সাধনা বসু

মা এলেন বম্বেতে : আমাদের কাছেই উঠলেন, ওরলিতে। শঙ্কর-পার্বতী এবং বিষকন্যায় যে আশাতীত সাফল্য অর্জনের সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল তার জন্যে—এ কথা স্পষ্ট সত্য যে, এর পরোক্ষ ভাবে দায়ী যিনি তিনি আমার মা ছাড়া কেউই নন। নৃত্য-সম্প্রদায়ের ভ্রমণের এবং ছবির স্যুটিং-এর অকল্পনীয় পরিশ্রমের মধ্যে যখন আমার দিনগুলি কেটে যাচ্ছে সেই সময় মা যদি ব্যক্তিগত ভাবে আমার দেখাশুনোর ভার না নিতেন তা হ'লে আমার স্বাস্থ্য যে কি রূপ নিত, বোধ করি তা বিধাতা ছাড়া আর কারুর পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। আমি তখন একসঙ্গে তিনখানি ছবিতে অভিনয় করে চলেছি। একযোগে তার চিত্রায়ণ চলছে—দিনে এবং রাতে সকল সময়ই স্যুটিং চলেছে।

রেডিও শোনা, রেকর্ড বাজানো, খেলা দেখা, ছবি দেখা, বেড়ানো, গল্প করার মধ্যে দিয়ে নয়—সেই সময়গুলো আমার একভাবে কেটে যাচ্ছে ষ্টুডিওর আওতায়। রূপসজ্জার আর অজস্র আলোর উত্তাপে দেহ তখন তাপদগ্ধ—তখন শুধু মনিটার, টেক, কাট, ও-কে, সাউণ্ড, ক্যামেরা টিল্টিং, প্যানিং, প্যাক আপ।

কাজের চাপ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলো ঘণ্টা কেড়ে নিয়েছিল বটে কিন্তু সবগুলো পারে নি, কর্মের যজ্ঞে আমরা নিজেদের আহুতি দিয়ে থাকি আর সেই আহুতি দেওয়াটাই আমাদের ধর্ম কিন্তু বিধাতাও কর্মজগতকে গোলকধাঁধায় পরিণত করেন নি—সেই সঙ্গে অন্যবিষয়ক আনন্দের সন্ধানও তিনিই দিয়েছেন, কর্মের দুর্গম, কঙ্করময় পথই কেবলমাত্র মানুষের সামনে খোলা নেই—আনন্দের উন্মুক্ত সরণিও মানুষের সামনে পরিব্যাপ্তমান, কর্মই জীবন—তবে জীবনের সব কিছু নয়, কোন "একটি"র মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নিজেকে সমাহিত রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—তাহলে সে যন্ত্রে পরিণত হবে—সম্ভব সাধকের পক্ষে। বৈচিত্র্যের তাৎপর্যও তো মানুষের জীবনে উপেক্ষণীয় নয়, আমরা কাজও করেছি, পরিশ্রম করেছি চূড়ান্ত, অবহেলা করে ধর্ম থেকে বিচ্যুত নয়—আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে যখনই অবসরের বিন্দুমাত্র আভাস পেয়েছি তখনই তার মর্যাদা দিতে বারেকের তরেও করিনি কার্পণ্য প্রকাশ। কর্মের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি জীবনের আনন্দকে, অবসর যখনই এসেছে তখনই অন্য পথ থেকে তাকে আহরণের চেষ্টায় মেতে উঠেছি—তখন সেই আনন্দের অতল সাগরে অবগাহন করে শ্রান্তি দূর করেছি। স্নিগ্ধ চন্দ্রিমার কিরণোদ্ভাসিত সাগরাভিমুখী অলিন্দে তখনই বসেছে সুরের আসর, সামনে সীমাহীন সমুদ্র, কখনও শান্ত, মৌন, স্থির, কখনও উদ্দাম, তরঙ্গসঙ্কুল, বেগবান। কুন্দনলাল সায়গলের সেই ললিতকণ্ঠ, মোতিলালের সহজ পরিহাসপ্রিয়তা, সুরেন্দ্রের গান এবং নিজেকে ধরা দেওয়ার সেই কমনীয়তা, বুলবুলের শ্রবণ-ধৈর্য, তিমিরবরণের ভাইপো অমিয়কান্তির এবং ছোট ভাই শিশিরশোভনের যথাক্রমে সেতার ও তবলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই বরণ করে নিয়েছি সেই সুবাঞ্ছিত অবসরকে। সেই মাধুর্যে-মণ্ডিত আবার পরম উত্তেজনাপূর্ণ জীবনের অবিস্মরণীয় সেই বর্ণবিচিত্র দিনগুলি কি সত্যিই হারিয়ে গেল ?

রঞ্জিত মুভিটোনের সঙ্গে আমার চুক্তি বলতে গেলে তখন শেষ হয়ে আসছে এবং আমিও তখন মনে মনে কলকাতা ফেরবার সঙ্কল্প করছি—যদিও বোম্বাইতেও আমার বন্ধুবান্ধবের অপ্রাচুর্য ছিল না, বোম্বাইয়েও আমার বহুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধবী ছিলেন। আমার নিজস্ব জগত ছাড়াও সমাজের অন্যান্য শাখার বহু শীর্ষপুরুষের শুভাগমন ঘটেছে আমাদের বোম্বাইয়ের বাসগৃহে। ছবির ও নৃত্যজগতের বিশিষ্ট যাঁরা তাঁরা তো বটেই অন্যান্য জগতের সুধীরূপে যাঁরা স্বীকৃত তাঁদের সান্নিধ্যও আমরা পেয়েছি যথেষ্ট পরিমাণে। সুতরাং যদিও বোম্বাইতে আমাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাকেন্দ্রিক দৈন্য মোটেই ছিল না তবুও ঠিক অনুরাগী বলতে যা বোঝায়, আমার সেই বিশেষ অনুরাগীর দল স্বভাবতই কলকাতাতেই ছিলেন।

১৯৪২ থেকে শুরু করে ১৯৪৩-এর শেষ অবধি এইটুকু সময়ের মধ্যে আমি অজস্র অর্থ উপার্জন করতে পারতুম, কত টাকা যে আমার জমার ঘরে উঠতে পারত তার সীমা-সংখ্যা নেই—অন্যান্য অভিনয়শিল্পীদের সেই স্বাধীনতা ছিল—তাঁরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন—কোন কিছু চুক্তিতে তাঁরা বদ্ধ ছিলেন না কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই সময় রঞ্জিত মুভিটোনের সঙ্গে তাঁদের নির্ধারিত বা নিজস্ব শিল্পীহিসেবে চুক্তিবদ্ধা ছিলুম—অর্থাৎ অন্য প্রয়োজনায় কাজ করার স্বাধীনতা তখন আমার ছিল না—অন্ততঃ সেই চুক্তি যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে—এর ফলে অনেক সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফলতঃ অন্যান্য শিল্পীরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন আমার উপার্জন তার চার ভাগের এক ভাগও হতে পারল না।

১৯৪৩ সালে সেজপিসীমা সম্প্রতি পরলোকগতা ময়ূরভঞ্জের মহারাণী কবি-শিল্পী সুচারু দেবীর টেলিগ্রামে যে মুহূর্তে বাবার দেহান্তরের সংবাদ পেলুম—সেই সঙ্গেই আমার জীবনযাত্রায় নিয়মহীনতার আবির্ভাব ঘটল—টেলিগ্রামের কয়েকটি শব্দ সম্বলিত বাক্যাংশ আমার জীবনে সৃষ্টি করল বেদনার সুগভীর ক্ষত। বাবা যে অসুস্থ এ সংবাদই আমার কাছে সম্পূর্ণ অগোচর ছিল। তিনি স্বাভাবিক, সুস্থ সেই ধারণাই আমার যতক্ষণ ছিল তার পর-মুহূর্তেই একেবারে আচমকা তাঁর মৃত্যু সংবাদ—তার ধাক্কা সহজেই অনুমেয়, শুধু তাই নয়, বোম্বাইতে আমার কাছে এসে থাকায় কথাও

তাঁর ছিল—দিন পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয়েছিল। ৩রা ডিসেম্বার কথা ছিল তাঁর বোম্বাই আসার—তিনি এলেন না, এল তাঁর মৃত্যু-সংবাদ। ৮ই ডিসেম্বার পৃথিবীর কাছ থেকে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। বাবার আদুরে মেয়ে আমি। তাঁর জীবনের অন্তিমতম মুহূর্তটিতে তাঁর সঙ্গে শেষবারের মতন পার্থিব সাক্ষাৎ আমার হল না—এ দুঃখ কি ভোলবার? পিতৃবিয়োগের এই বেদনা সুদীর্ঘ কালব্যাপী আমার চিত্তে স্থায়িত্বলাভ করেছিল, অবশ্য সময়ের এই সুদীর্ঘতার কারণ আমার নিজেরও জানা নেই, আমার মনের গভীরে গভীরে এই শোকের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, শোকজ অস্বাভাবিকতা আমায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আমার মন থেকে জীবনের সৌন্দর্যের সকল আবেদন মুছে গেল একেবারে। মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, আগেকার সেই জীবন বেগ আংশিকভাবেও ফিরে পেতে, সৃষ্টিধর্মী করার মত মনকে কোন কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকার মত একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তি আবার আয়ত্তে আনতে আমাকে দীর্ঘ সময় হয়েছিল ব্যয় করতে।

আমার দাদা সুনীলচন্দ্র সেন এলেন বম্বেতে, উঠলেন আমাদের কাছেই। আমাদের নৃত্য-সম্প্রদায়ের পরিভ্রমণে দাদাও আমাদের সঙ্গ নিলেন।

দিন এগিয়ে চলে। কোথা দিয়ে যে এক-একটি দিন আসে এবং যায় তা ভাবাও যায় না—সময়ের এই নিরবচ্ছিন্ন গতির মধ্যেই জগতের বৈচিত্র্য।

ধীরে ধীরে আবার কাজের জালে জড়িয়ে পড়লুম। আবার সেই কর্মজীবন, আর কর্মের মধ্যে দিয়ে জীবনধর্মের সাধনা। আমি যোগ দিলুম জয়ন্ত পিকচার্স লিমিটেডে। উর্বশীর ভূমিকায় আমায় অবতীর্ণা হতে হল। ভূমিকালিপিও যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল। তখনকার দিনে "রামরাজ্য" খ্যাত জনপ্রিয় তারকাদ্বয় সম্প্রতি পরলোকগত প্রেম আদিব এবং শোভনা সমর্থও এর ভূমিকালিপিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ঠিক এই সময়ে আমি কিছুকালের জন্যে তাজমহল হোটেলে বাস করছি। তারপরই উঠে গেলুম গ্রীণস হোটেলে। তাজমহল এবং গ্রীণস এই দুটি হোটেলেরই পরিচালনভার ন্যস্ত ছিল একই কর্তৃপক্ষের উপরে।

ছবিতে অভিনয়ের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছি কিন্তু চিত্রগ্রহণ তখন হচ্ছে না। এ-হেন সময়ে প্রযোজকেরা একদিন আমায় জানালেন যে তাঁদের চিত্রগ্রহণ শুরু করতে তখনও কিছু বিলম্ব আছে অর্থাৎ সেই দিনটির এবং চিত্রগ্রহণ শুরু হওয়ার দিনটির মধ্যে এমন অনেকগুলো দিন পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি তাঁরা কাজে লাগাতে পারছেন না—অতএব আমি ইচ্ছে করলে সেই দিনগুলি যেভাবে ইচ্ছে সদ্ব্যবহার করতে পারি—এই মধ্যবর্তী সময়টুকু আমার নিজস্ব ইচ্ছামত সদ্ব্যবহার করতে তাঁদের তরফ থেকে কোন বাধা থাকছে না।

আবার সাক্ষাৎ মিলল আমাদের জনপ্রিয় হরেনদার—সপ্রস্তাব হরেনদাকে পুনরায় আমাদের মধ্যে পাওয়া গেল। হরেনদা এবার অভিপ্রায় জানালেন আমাদের নৃত্য-সম্প্রদায়সহ এবার মধ্যভারত পরিভ্রমণ করা হোক।

যে সময়ের ঘটনাটি বিবৃত করছি সেই সময়টি হচ্ছে—১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ পাতাল

সর্বতোভাবে ব্যর্থ এই বাঙলা ছবিটি গোড়া থেকেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এসেছে বাঙলার দর্শকসমাজে তার নামকরণকে কেন্দ্র করে। ছবিটির বিজ্ঞপ্তির প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকেই ভেবেছিলেন যে প্রখ্যাত কথাশিল্পী প্রাণতোষ ঘটকের অবিস্মরণীয় সাহিত্যসৃষ্টি "আকাশ পাতাল" চিত্রায়িত হচ্ছে। ছবির গল্পাংশও যখন প্রচারিত হল তখন অবশ্য এ ভুল ভাঙতে বিলম্ব হয় নি দর্শকসাধারণের। একটি বিখ্যাত এবং বহুলপ্রচারিত উপন্যাসের জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণ করা যে শিষ্টাচারসম্মত নয় বা নীতি-বিরুদ্ধ, আশা করি এ বিষয়ে কেউই দ্বিমত হবেন না।

শ্রমিক-মালিক সংঘর্ষই এর গল্পের প্রধান উপজীব্য। মালিকপুত্রের সঙ্গে শ্রমিককন্যার প্রণয়, পিতাপুত্রে সঙ্ঘর্ষ, পিতার পরাজয়, শ্রমিকদের জয়—অতি মামুলী বৈশিষ্ট্যবিহীন গল্প যেমনই দুর্বল তার চিত্রনাট্য, ততোধিক অসার তার পরিচালনা। ছবিটির মধ্যে চোখধাঁধানো যে কতরকম হতে পারে তারই একটা দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বস্তী সম্বন্ধে পরিচালকের সাধারণ জ্ঞানের যে নিতান্ত অভাব ছবিটি সে কথাও বিশেষভাবে প্রমাণ করে, বস্তীর মেয়েদের যেভাবে এখানে রূপায়িত করা হয়েছে (বস্তীর গৃহসজ্জা, প্রকোষ্ঠের আয়তন তার অঙ্গসজ্জা, মেয়েদের মার্জিত ও বুদ্ধিদৃপ্ত সংলাপ প্রভৃতি) আসলের সঙ্গে সেই রূপায়ন বিন্দুমাত্রও মেলে না! আসলের সঙ্গে তার ব্যবধানটাই আকাশ পাতাল। নেত্রীর মেয়েটিকে মারবার জন্যে ম্যানেজার যে লোকটিকে নিযুক্ত করলেন অর্থ দিয়ে সেই লোকটি শেষ পর্যন্ত যখন মেয়েটিকে তার মায়ের কোলেই ফিরিয়ে দিল, ম্যানেজারের দিক থেকে তখন কি কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, লোকটিকে কি তিনি তখন তার চুক্তিভঙ্গের জন্যে অভিনন্দন জানালেন? পতাকা হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা পৃথিবীতে নতুন নয়—আমাদের দেশেও বহুবার শোভাযাত্রা বেরিয়েছে পতাকা হাতে নিয়ে—জননায়করা বেরিয়েছেন, দেশসেবকেরা বেরিয়েছেন পরাধীনতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, বিদেশী অত্যাচারের প্রতিবাদে। মদের দোকান তোলার জন্যে তাঁরা পতাকা হাতে নিয়ে বেরিয়েছেন এ রকম কোন তথ্য আমাদের অবিদিত। মদের দোকান তুলতে গেলে কোন দেশসেবী শহীদের শেষ স্পর্শধন্য পতাকা হাতে নিয়ে শোভাযাত্রা করে বেরোতে হয়, এ বিষয়ও আমাদের ইতঃপূর্বে জানা ছিল না।

দু'হপ্তা চলা এই ছবিটির প্রযোজনার মূলে আছেন এ-ভি-এম। ভারতের বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠান এ-ভি-এম এবং শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় যুগ্মভাবে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের একটি বিশিষ্ট আসন আজ এ, ভি, এম-এর অধিকারভুক্ত, মাদ্রাজ এবং বাঙলার এই যৌথ প্রচেষ্টা দুর্ভাগ্যক্রমে সফল হতে পারল না, এই ছবিটি সম্পূর্ণ হতে এবং শেষে মুক্তিলাভ করলে দেখা গেল যে মাদ্রাজীমহলে প্রভাত মুখোপাধ্যায় দেশের মুখটি পুড়িয়ে দিলেন। বাঙালী চিত্রনির্মাতাদের চিত্রবোধ এবং বাঙালী পরিচালকদের চিত্রসৃষ্টির দক্ষতা সম্বন্ধে মাদ্রাজের চিত্রজগত এবার থেকে প্রতিকূল ও নৈরাশ্যজনক মনোভাব স্বভাবতঃই পোষণ করে থাকবেন এবং তাতে আশ্চর্য হবারও কিছু [illegible] কারণ তাঁদের

বিশ্বাস এবং আন্তরিকতাকে নিয়েও এই বাঙালী পরিচালকটি ছিনিমিনি খেললেন। এর ফলে ভবিষ্যতে সত্যিকারের শক্তিমান চিত্রস্রষ্টাদের মাদ্রাজ থেকে যেটুকু সহযোগিতা পাবার আশা ছিল তা থেকেও তাঁরা স্বভাবতঃই বঞ্চিত হবেন। প্রভাতবাবু এই ভাবে বাংলার সমগ্র চিত্রশিল্পের যে কত বড় সর্বনাশ করলেন তার তুলনা মেলা ভার!

তবে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, চারুপ্রকাশ ঘোষ ও দিলীপ রায়ের অভিনয় এবং জ্যোতির্ময় রায়ের সংলাপ এই অসার ছবিটিকে অনেকখানি পুষ্ট করেছে। পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, জহর রায়, রসরাজ চক্রবর্তী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, তপতী ঘোষ, মণিকা গাঙ্গুলী, রেণুকা রায়, পাপিয়া বসুঠাকুর, গীতা সিং, তাপসী রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, অচলা সহদেব প্রভৃতি শিল্পীরাও বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন। দুটো কথা বলবার জন্যে চন্দ্রাবতী দেবীর মত একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীকে নামানোর তাৎপর্য বোঝা গেল না, দুর্গা খোটের বাঙলা উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয়, তা সত্ত্বেও তাঁকে নামানোর অর্থও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, ঐ ভূমিকায় অভিনয় করার মত বাঙলাদেশে কি অভিনেত্রী ছিল না?

দেবী

ছায়াছবির বাজারে এবার সত্যজিত রায়ের দেখা পাওয়া গেল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে, প্রভাতকুমারের স্বীকৃতি থেকেই জানা যাচ্ছে যে প্রায় ষাট বছর পূর্বে লেখা এই গল্পটির বিষয়বস্তু নাকি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর মূল কাঠামোটি মাত্র বলেছিলেন, তার অন্যান্য সব কিছুই অর্থাৎ চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ প্রভাতকুমারের সৃষ্টি।

স্বর্গীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলা সাহিত্যের বিস্ময়। বাঙলা ছোট গল্পকে তিনি যেভাবে শ্রীসম্পন্ন করে গেছেন তা মুগ্ধ-বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সার্থকনামা স্রষ্টাকুলের একজন বৈশিষ্ট্যবান প্রতিনিধি। তিনি যে অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিভার এবং স্বাতন্ত্র্যের স্পর্শে তাঁর যে-সব ছোট গল্প অমর হয়ে আছে, "দেবী" গল্পটির মধ্যে তাদের কোন স্পর্শই পাওয়া যায় না। দেবীর মধ্যে প্রভাতকুমারের কুশলতা, নিপুণতা, দক্ষতার (যা তাঁর অন্যান্য রচনাগুলিকে অমরত্ব দিয়েছে) ছায়া পড়ে না বিন্দুমাত্র।

একটি কিশোরী বধূ এর নায়িকা, শ্বশুর স্বপ্নে জানলেন সেই সাক্ষাৎ 'দেবী'। দেবীজ্ঞানে চলল তার উপাসনা, পূজার্চনা এই দেবীত্ব শেষে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল, বধূর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল, স্বামীর সঙ্গে সে পালিয়ে বাঁচতে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে তার ভয়ও হল—সত্যি যদি সে দেবী হয় তা হ'লে তার স্বামীর অকল্যাণ হবে যে—ভয়েরই জয় হল শেষে পালাতে গিয়েও সে পালিয়ে এল, একদিকে আরোপিত দেবীত্বের বিড়ম্বনায় মুক্তিপিপাসু মন অন্যদিকে সকলের অন্ধ ধারণাকে অস্বীকার করার অক্ষমতা এবং প্রায় অজান্তেই আরোপিত দেবীকে মেনে নেওয়া—এই দোটানায় ধ্বংস হয়ে গেল সাজানো একটি সংসার, একটি শিশুর জীবন, একটি যুবকের ভবিষ্যৎ, একটি কিশোরীর সর্বস্ব।

গল্পটি যখন লেখা হয় তখনকার সমাজজীবনে নিশ্চয়ই এর আবেদন ছিল—বিশেষতঃ আজকের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তখনকার সমাজব্যবস্থার ছিল আকাশ পাতাল প্রভেদ, তখনকার তুলনায় আজ কুসংস্কার অনেক কমে গেছে—তখনকার কুসংস্কার দূরীকরণের জন্যে বা তার কুফল বোঝানোর জন্যে এজাতীয় গল্প রচনার প্রয়োজন ছিল (বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বলছি) আজ ষাট বছর বাদে চিত্রায়ণের জন্যে এই গল্প নির্বাচনে অন্ততঃ বুদ্ধির কোন পরিচয় মেলে না, তাও যদি প্রভাতকুমারের অন্যান্য গল্পগুলির সঙ্গে তুলনীয় হোত তাহলেও বুঝতুম গল্পমূল্যের দিক দিয়ে এর আবেদন উপেক্ষণীয় নয়। কয়েকটি দৃশ্য পরিকল্পনায় অবশ্য পরিচালক সাধুবাদের দাবী রাখেন। তা ছাড়া একটু অনুধাবন করলেই দেখা যাবে কুসংস্কার ও মোহের অন্ধতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে এক সঙ্ঘাতের ইঙ্গিত খুব প্রচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বৃদ্ধ গৃহস্বামী নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক পুরুষ, আজীবন ধর্মানুশীলনে তিনি করেছেন অতিবাহিত, ঠাকুর দালানের নাটমন্দিরে তিনি খড়ম পরে আসছেন, নাটমন্দিরের শেষ সীমায় এসে তিনি পাদুকা ত্যাগ করেছেন—তাঁর মত নিষ্ঠাবানের পক্ষে এ সম্ভব নয়—অতি সাধারণ লোকও দালানের প্রান্তদেশে পাদুকা ত্যাগ করে থাকেন বা থাকে, আমরা হিন্দুরা দেব-দেবীমূর্তি চরণপদ্ম থেকে কল্পনা করি, চরণ থেকে আমরা প্রতিমাকে চিন্তা করি, প্রতিমার চরণোৎপল থেকে আমাদের দৃষ্টি উপরে ওঠে, এখানে দেখলুম দেবীর মুখের উপর ক্লোজ আপ, পরে ক্যামেরা পিছিয়ে গেল এবং দেবীর প্রতিমার সম্পূর্ণচিত্রটি আমাদের

জনতা পিকচার্স পরিবেশিত গল্পায় একটি দৃশ্যে রমা গাঙ্গুলী ও সীতা দেবী

চোখের সামনে ভেসে উঠল অর্থাৎ দেবীপ্রতিমা পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখানো হয় নি, দেখানো হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত, যা বিধেয় নয়। বৃদ্ধ গৃহস্বামীর সংস্কৃতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কাকাতুয়ার উৎকট চীৎকার সমস্ত পারবেশটির গাম্ভীর্যের মূলে কুঠারাঘাত করল। গানগুলি সুগীত।

অভিনয়ে শিল্পীরা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় ছবিটিকে অনেকখানি প্রাণ দিয়েছে। ছবি বিশ্বাস, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর প্রভৃতি প্রধানাংশে দেখা দিয়েছেন। অল্প আবির্ভাবে যথেষ্ট দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন কালী সরকার ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

এক পেয়ালা কফি

"এক মুঠো আকাশ" এর মাধ্যমে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে তরুণ রায়ের প্রথম আত্মপ্রকাশ। এক মুঠো আকাশ এর পর নাট্যকার পরিচালক ও শিল্পিরূপে তাঁর দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ ঘটল রঙমহলেই এক পেয়ালা কফিকে কেন্দ্র করে। বাঙলার নাট্যজগতে তরুণ রায় যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং যে নতুনত্বের সন্ধান তিনি দিয়েছেন তার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি এক পেয়ালা কফির মধ্যেও ধরা পড়েছে।

এক চিত্র-সম্প্রদায়ের সভাবৃন্দ এর পাত্র-পাত্রী, পরিচালকের আকস্মিক এবং রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। এ ধরণের অপরাধমূলক কাহিনীর কৌতুকলই হচ্ছে মূল সম্পদ যে কাহিনীতে কৌতূহল যত তীব্র কাহিনী তত সার্থক, সেদিক দিয়ে এক পেয়ালা কফি সার্থকতার স্পর্শে ভরপুর। কাহিনী হিসেবে তো বটেই, নাটক হিসেবেও এক পেয়ালা কফি তরুণ রায়ের শক্তিমত্তার পরিচায়ক। ঘটনার সংস্থাপন কুশলতায় এবং বিন্যাসের প্রাঞ্জলতায় নাটকটি জমে উঠেছে। কাহিনীও কৌতূহলোদ্দীপক হওয়ায় নাটকের মধ্যে এক শ্বাসরুদ্ধকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নাটকের গতিবেগের কল্যাণে নাট্যরস যথেষ্ট ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

সচরাচর অপরাধীকে যে রীতিতে ধরা হয়—এখানে তরুণ রায় সে রীতি অনুসরণ করেন নি, নাটকের শেষ দৃশ্যে অপরাধী যখন প্রকট হয়ে পড়ল—সেই অংশেও নাট্যকার যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা ছিল যাতে অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করল, অপরাধী যে কে বুদ্ধিমান দর্শকের তা আগে থাকতে অনুমান করতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু যে পরিবেশে অপরাধী নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে বাধ্য হল—তার সূত্র নির্ণয় করা আগে থাকতে অনেক বুদ্ধিমান দর্শকের পক্ষেও সম্ভব নয়, নাটকের সেইখানেই আসল কৌতূহল এবং এ ক্ষেত্রে নাট্যস্রষ্টা সম্পূর্ণ সফলতাই অর্জন করেছেন। সেটির বিশদ বর্ণনা আমরা দেব না—তার কারণ আপনারা যাঁরা নাটকটি এখনও দেখেন নি, তাঁদের কাছে মূল কৌতূহলটি তা হ'লে আগে থাকতেই ভেঙে দেওয়া হবে।

তরুণ রায়ের এতে মাত্র প্রথম অঙ্কেই আবির্ভাব, অল্প আবির্ভাবে তরুণ রায় আপন দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন, এঁর পরেই উল্লেখ করব হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়ের নাম। করব সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন মজুমদারের নাম। এঁরা ছাড়া ভূমিকা-লিপিতে আছেন বিশ্বজিত চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, পিকল নিয়োগী কেতকী দত্ত, কবিতা রায় এবং শ্রীমতী দীপান্বিতা রায় প্রভৃতি।

অঙ্গার

মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্‌ল থিয়েটারের বিজয়বৈজয়ন্তী—অঙ্গার একটি যুগোপযোগী বলিষ্ঠ ও হৃদয়স্পর্শী নাটক। কয়লাখনির শ্রমিকদের নিয়ে এর গল্প। মালিকদের অতিরিক্ত অর্থগৃধ্নুতায় শ্রমিকদের মধ্যে কত জীবন যে অকালে নষ্ট হয়ে যায় তার তুলনা নেই, মালিকের লোভের বা লাভের আগুনে অনেক শ্রমিকের জীবন বলি দিতে হয় (মালিকদের কাছে সে সব প্রাণের কোন মূল্য নেই) অথচ তার কোন বিচার নেই, তার কোন প্রতিবিধান নেই, তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই—এই পটভূমিকায় নাটকের আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে। নাটকটির রচয়িতা ও পরিচালক উৎপল দত্ত। এ ছাড়া অভিনয়াংশেও তিনি দেখা দিয়েছেন। সুর দিয়েছেন রবিশঙ্কর। লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী।

বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী সারবান এবং বক্তব্য সমন্বিত নাটক। বাঙলা নাটকের আবার রূপান্তর শুরু হয়েছে, কালের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী বাঙলা নাটক আবার পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে, বাঙলা নাটকে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়ে পরিচালনরীতির দিক দিয়ে বাঙলা নাটক আজ কৃত্রিমতা কাটিয়ে উঠে ক্রমেই উন্নততর পথে পদার্পণ করছে। অঙ্গার প্রমুখ নাটকই আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে এবং আমরা আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে এই ব্যাপকতার ও নতুনত্বের অভিমুখে বাঙলা নাটকের অগ্রগমন আশার বারতাই বহন করে আনে। কলাকৌশলের দিক দিয়ে এবং মঞ্চ পরিকল্পনার দিক দিয়ে অঙ্গারের বৈশিষ্ট্য অবর্ণনীয়, সেদিক দিয়ে যে বৈশিষ্ট্যের এবং যে সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় এঁরা দিলেন বাঙলার রঙ্গমঞ্চে তার তুলনা মেলে না। রঙ্গমঞ্চে যেভাবে খনির দৃশ্য দেখানো হয়েছে তা যেমনই অপূর্ব তেমনই বিস্ময়কর, একটি মঞ্চের উপর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সহযোগে একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা যথেষ্ট শক্তিরই পরিচায়ক। শেষাংশে মাত্র আলোক-রেখার সাহায্যে তাপস সেন যেভাবে জলপ্লাবনের দৃশ্য দেখিয়েছেন তা অভাবনীয়, ইতঃপূর্বে আলোকনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ ধরণের দক্ষতার পরিচয় দর্শকরা বোধ হয় পান নি, আমরা মুক্তকণ্ঠে আলোকশিল্পীকে তাঁর এই বিস্ময়কর নৈপুণ্যের জন্য স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই অনবদ্য সৃষ্টি দর্শকসাধারণের মুখের কথা কেড়ে নেয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রাণপূর্ণ অভিনয় করেছেন ; প্রত্যেকেই প্রশংসার দাবী রাখেন তাঁদেরই মধ্যে উৎপল দত্ত, তরুণ মিত্র, রবি ঘোষ, শ্যামল সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, নাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য, শোভা সেন, সুমিতা দাশগুপ্ত, নীলিমা দাস, মায়া চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিক চিত্রসংবাদ

আকাশ পাতাল এবং দেবী ছাড়া শহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে আরও যে-সব ছায়াছবি প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে উত্তম সুপ্রিয়া অভিনীত উত্তরমেঘ, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর ভয় এবং দুই বেচারার নাম উল্লেখযোগ্য।

দেশে-বিদেশে

মাঘ, ১৩৬৬ (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী) : 'দেশরক্ষার জন্ম হইলেও ভারত কোন সামরিক জোটে যোগ দিবে না'—সদাশিবনগরে কংগ্রেস-বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারী) : 'আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ম সর্ব্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের আহ্বান'—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৫তম অধিবেশনে (সদাশিবনগর) সভাপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডীর ভাষণ।

এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনেল কর্পোরেশন ও ইণ্ডিয়ান পাইলট গীল্ডের মধ্যে মীমাংসা আলোচনায় এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনেলের পাইলটদের নয় দিবসব্যাপী ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) : স্বতন্ত্র পার্টি নেতা শ্রী সি রাজা গোপালাচারী কর্তৃক মন্ত্রী ও পদস্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্যে ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব সমর্থন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) : সারনাথে দালাই লামার (তিব্বত) সহিত সর্ব্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের চার ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) : ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও সহরতলীতে সরকারী ও বেসরকারী বাসের ভাড়াও বর্দ্ধিত।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) : ভারতে ১৬ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফর উদ্দেশ্যে রুশ রাষ্ট্রপতি মার্শাল ভরোশিলভ, রুশ সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভ ও সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি নেত্রী মাদাম ফুৎসেবার দিল্লী আগমন।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) : 'পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক ছাত্রের ব্যর্থতা শিক্ষার মানের অবনতির পরিচায়ক'—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের উক্তি।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) : তৃতীয় পরিকল্পনায় (পঞ্চবার্ষিক) ক্ষুদ্র শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নয়নকল্পে ২৩২ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ—দিল্লীতে ক্ষুদ্র শিল্পবোর্ডের দুই দিবসব্যাপী বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) : ভারতের সর্ব্বত্র এবং বিশেষভাবে কলিকাতা ও সহরতলীতে সাড়ম্বরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬৪তম জন্ম-জয়ন্তী পালন।

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) : স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ম রুশিয়া ও ভারত একযোগে সংগ্রাম করিবে—দিল্লীতে নাগরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রুশ রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভের ঘোষণা।

নেপাল ও ভারতের বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অমর—দিল্লীতে নেপালী প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালার উক্তি।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) : প্রজাতন্ত্র দিবসে ৩১ জন বিশিষ্ট ভারতীয়ের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা লাভ—কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ও ডাঃ আর, এন চৌধুরী 'পদ্মভূষণে' সম্মানিত এবং চ্যানেল সাঁতারু কুমারী আরতি সাহা, ক্রিকেট খেলোয়াড় জেসু প্যাটেল ও বিজয় হাজারের পদ্মশ্রী লাভ।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) : রাজধানী দিল্লী ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সমারোহ সহকারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত।

দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী কৈরালার মধ্যে উভয় দেশের স্বার্থ সম্পর্কে দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) : কোয়েম্বাটুরে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা-সচিব শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের ঘোষণা—আবশ্যক হইলে সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইবে।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) : ভারত ও নেপালের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—দীর্ঘ বৈঠকান্তে নেহরু-কৈরালা (সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের প্রধানমন্ত্রী) যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা।

অর্দ্ধকুম্ভ উপলক্ষে এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে ২০ লক্ষাধিক নর-নারীর পুণ্যস্নান।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) : কলিকাতার বাজার হইতে চিনি উধাও—১১০০টি ন্যায্য মূল্যের দোকানে চিনি দেওয়া সত্ত্বেও সর্ব্বত্র চিনির জন্ম হাহাকার।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শান্তি সম্মেলনে (কলিকাতা) সারা ভারত শান্তি সংসদের সভাপতি পণ্ডিত সুন্দরলালের উক্তি—সহ-বিলুপ্তিই সহ-অবস্থানের একমাত্র বিকল্প।

১৬ই মাঘ (৩০শে জানুয়ারী) : জাতিকে সম্মিলিতভাবে ভারতের অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি চ্যালেঞ্জ রুখিতে হইবে—শহীদ দিবস উপলক্ষে দিল্লীর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর দাবী।

বিখ্যাত গান্ধীবাদী অর্থনীতিবিদ ডাঃ জে, সি, কুমারাপ্পার মাদ্রাজের হাসপাতালে পরলোক গমন।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) : 'ভারত ও চীনের মধ্যে কোনক্রমেই যুদ্ধ হইবে না'—ভারত সফরান্তে চণ্ডীগড়ে সাংবাদিক-বৈঠকে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি, পি, কৈরালার উক্তি।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) : বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে কেরল রাজ্যের অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন—কংগ্রেস, পি, এস, পি, মসলেম লীগ জোট ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি মার্শাল ক্লিমেণ্ট ভরোশিলভের ভারত সফরের শেষ পর্য্যায়ে সদলবলে কলিকাতা মহানগরীতে শুভাগমন।

১৯শে মাঘ (২রা ফেব্রুয়ারী) : কেরলের অন্তর্ব্বর্তী নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী যুক্তফ্রন্টের (কংগ্রেস-পি, এস্, পি, ও মসলেম লীগ গঠিত) জয়লাভ।

রঞ্জী ষ্টেডিয়ামে (কলিকাতা) সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভ, রুশ সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ কোজলভ ও সোভিয়েট নেত্রী মাদাম ফুৎসেবার নাগরিক সম্বর্দ্ধনা।

২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী) : কেরলে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ম কংগ্রেস, লীগ ও পি-এস্-পি যুক্তফ্রন্টের তৎপরতা—পক্ষকাল মধ্যেই নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-আয়োজন।

২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ১০১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য সচিব শ্রীএস, কে, পাতিলের ঘোষণা।

কেরলের অন্তর্ব্বর্তীকালের নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত—১২৬টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রণ্ট ৯৪টি (কংগ্রেস—৬৩,

পি-এস-পি—২০, মসলেম লীগ—১১), কম্যুনিষ্ট পার্টি—২৬, কম্যুনিষ্ট-সমর্থিত স্বতন্ত্র—৩, 'আর-এস-পি—১, কর্ণাটক সমর্থিত—১ ও নির্দলীয় স্বতন্ত্র—১টি।

২২শে মাঘ (৫ই ফ্রেব্রুয়ারী): মণিপুরের খারসোম অঞ্চলে আসাম রাইফেল বাহিনীর উপর নাগা বিদ্রোহীদের আক্রমণ—সংঘর্ষে দুইজন সিপাহী ও তিনজন বিদ্রোহী নিহত।

২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী): অঞ্চল সমর্পণের সর্ত্তে আলোচনা চালাইতে ভারত কখনই প্রস্তুত নয়—চীনের প্রতি কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের সতর্কবাণী।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের স্পষ্ট দাবী—লাডাকের উপর চীনা আক্রমণ প্রত্যাহার করিতে হইবে।

২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী):—প্ল্যাটিনাম স্বর্ণে রূপান্তরিত—নয়াদিল্লীতে বিশ্বকৃষিমেলায় ভারতীয় পরমাণু-বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব প্রদর্শন।

২৫শে মাঘ (৮ই ফেব্রুয়ারী): 'চীন-ভারত সীমান্ত সম্পর্কে চীনের একতরফা সিদ্ধান্ত ভারত মানিবে না'—পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্বোধনী ভাষণ।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রদেশ কংগ্রেসনেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরূপ মন্তব্যে পৌরসভায় কংগ্রেসী ও বিরোধী সদস্যদের মধ্যে তুমুল বাক্-বিতণ্ডা।

জেলাবোর্ড ও পৌরসভাগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গঠনের প্রস্তাব—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আবশ্যক বিল প্রণয়নের সিদ্ধান্ত।

২৭শে মাঘ (১০ই ফেব্রুয়ারী): পশ্চিম বঙ্গ সভা ও শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরোধিতা—নবগঠিত গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির প্রতিরোধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী): ভারতে 'শান্তি ও শুভেচ্ছা সফর' উদ্দেশ্যে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের দিল্লী উপস্থিতি। নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও রুশ রাষ্ট্র-প্রধানের জরুরী আলোচনা সুরু

২৯শে মাঘ (১২ই ফেব্রুয়ারী): বর্তমান অবস্থায় চীনের সহিত আলোচনার কান ভিত্তি নাই—রাজ্যসভায় বিতর্কের জবাবে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর উপস্থিতিতে নয়াদিল্লীতে ভারত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক সাহায্য চুক্তি ও সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক-বিষয়ে দিল্লীতে শ্রীনেহরু ও মঃ ক্রুশ্চেভের মধ্যে তিন ঘণ্টাব্যাপী গোপন আলোচনা।

৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী): ছুটি হ্রাস ও শনিবারে পুরা কাজের আদেশের প্রতিবাদে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের কলম-বিরতি ধর্মঘট।

বহির্দেশীয়—

১লা মাঘ (১৫ই জানুয়ারী): রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার সরকারী প্রস্তাবটি সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক অনুমোদন।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী): হোয়াইট হাউসের প্রস্তাবিত সংবাদে প্রকাশ—মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ১০ই হইতে ১১শে জুন জাপান সফর করিবেন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী): মার্কিণ-বাজেটের অর্দ্ধেকের বেশী অর্থ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক কংগ্রেসে নূতন বাজেট উপস্থাপন।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী): পাক-ভারত যৌথ প্রতিরক্ষায় শ্রীনেহরুর (ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী) নিরপেক্ষ নীতি ব্যাহত হইবে না—ঢাকায় পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের ঘোষণা।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী): অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের (আফ্রিকা) কয়লাখানর ছাদ ধ্বসিয়া পড়ায় মর্ম্মন্তুদ পরিস্থিতি—খানগর্ভে প্রায় ৫ শত শ্রমিক আটক।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী): দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিণতিতে আলজিয়ার্সে জরুরী অবস্থা ঘোষিত—সমগ্র ফ্রান্সে জনসভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী): সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে—অসলোয় ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ঘোষণা।

চীন ও ভারতের জনগণের মধ্যে নিবিড় মৈত্রী কামনা—পিকিংএ ভারতীয় দূতাবাসের অনুষ্ঠানে (ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বার্ষিকী) চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর ঘোষণা।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী): শ্রীহট্টের জনসভায় পাক্ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সদম্ভ উক্তি—কাশ্মীর নিশ্চয়ই আমাদের হইবে—আমরা ইহার জন্য ভিক্ষা করিতে যাইব না।

১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী: চীন-ব্রহ্ম মৈত্রী ও অনাক্রমণ চুক্তি এবং সীমানা নির্দ্ধারণ চুক্তি সম্পাদিত—পিকিং-এ ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নে উইন ও চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন্ লাই কর্তৃক চুক্তিদ্বয়ে স্বাক্ষর দান।

১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী): সম্মিলিত আরব-প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আরব প্রজাতন্ত্র প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ—সীমান্তে ইস্রায়েলী ও সিরীয় সৈন্যদের সংঘর্ষের জের।

২০শে মাঘ (৩রা ফেব্রুয়ারী): সোভিয়েট ইউনিয়ন আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত—কাটমাণ্ডুতে সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রুশ রাষ্ট্রপতি ভরোশিলভের ঘোষণা।

আলজিরিয়ায় বিদ্রোহ দমনের জন্য ফরাসী সেনেটে গৃহীত বিল অনুসারে প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের বিশেষ ক্ষমতা লাভ।

২৩শে মাঘ (৬ই ফেব্রুয়ারী): ব্রহ্মে সাধারণ নির্ব্বাচনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

২৬শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী): ব্রহ্মের সাধারণ নির্ব্বাচনে উ নুর দলের (ফ্যাসিবিরোধী গণ-স্বাধীনতা লীগের) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ।

২৮শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী): সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কোন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সফল করিতে হইলে চীনকে ও তাহার মধ্যে আনিতে হইবে—ওয়াশিংটনে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের ঘোষণা।

ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি—কায়রো-এ আরব লীগ পরিষদের গোপন বৈঠকের সিদ্ধান্ত।

৩০শে মাঘ (১৩ই ফেব্রুয়ারী): সাহারায় ফ্রান্সের প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বন্যাত্রাণ সমিতির নাচ ও গান

"পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ সমিতি সরকারী প্রতিষ্ঠান নহে—আধা সরকারী; কারণ প্রধান সচিব তাহার সভাপতি এবং সরকারের দপ্তরখানায় তাহার অধিবেশন (রবিবারেও) হয়। গত রবিবারে দপ্তরখানায় "রোটাণ্ডা"য় তাহার যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত—সমিতি পশ্চিমবঙ্গের বন্যাবিক্ষত স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্ম্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিবে। কেন্দ্রী সরকার সভাপতি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে ঐ কাজের জন্য ৬ লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়াছেন। সমিতি কেন্দ্রী সরকারের সম্মান রাখিয়া সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা দিয়াই নিরস্ত হইল। নানা সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গে বন্যাবিক্ষত জিলাসমূহের আর্ত্তত্রাণে যে সব ত্রুটির বিষয় প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, লোকের খাদ্যের ও বাসের আবশ্যক ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। ঈশপের উপকথায় দেখা যায়, কয়জন অশ্বপাল অশ্বগুলিকে প্রভূত পরিমাণে মর্দ্দন ও মার্জ্জন করিত, কিন্তু খাদ্যশস্য দানে কার্পণ্য করিত। সেইজন্য অশ্বগণ অশ্বপালদিগকে বলিয়াছিল—এত মর্দ্দন ও মার্জ্জন না দিয়া আমাদিগকে অধিক খাইতে দিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থায় সেই উপকথার বিষয় মনে পড়া স্বাভাবিক। তবে কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে যদি ৬ লক্ষ টাকা আদায় হয় তবে—সে যথালাভ—লক্ষ্মী যদি গৃহে আসে, তবে যাহা আসে তাহাই ভাল। বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হইলেও প্রাথমিক শিক্ষা কি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে? তাহা যদি না হয়, তবে গৃহগুলি কি কাজে ব্যবহৃত হইবে? দেখা যাইতেছে, নেতাজীর পরিকল্পিত "মহাজাতি সদনে" দেশের জন্য ত্যাগস্বীকারকারীদিগের প্রতিকৃতি সম্মুখে রাখিয়া হইতেছে—নাচ ও গান।"

—দৈনিক বসুমতী।

চলচ্চিত্রের বিরোধিতা

"অশ্লীল চলচ্চিত্র-বিরোধী সমিতি নামে যে সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের যে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দু-একটি ধারা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। সমিতি 'ম্যাটিনী শো' অর্থাৎ বৈকালিক প্রদর্শনী একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। ইহাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে। তাহা ছাড়া সকলের দৈনন্দিন কর্মসূচী এক নয়, যার যখন অবসর সে তখনই ছবি দেখে। বৈকালিক প্রদর্শনীতে যে কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাত্ররাই ভিড় করে এমন নয়। বিশেষ করিয়া গৃহিণীরা ত রীতিমত দলে ভারী হইয়াই আসেন। সেন্সর প্রথায় আরও কড়াকড়ি প্রবর্তন করার যে পরামর্শ সমিতি দিয়াছেন তাহা বিবেচনা-যোগ্য। তবে সমস্যাটাকে কেবল চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়াইয়া দেখিলেই চলিবে না, শিল্পদৃষ্টির ব্যাপকতর পটভূমিতে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। যে প্রশ্ন আজ চলচ্চিত্রকে উপলক্ষ করিয়া উঠিয়াছে তাহা নানা সময়ে সঙ্গীত, চিত্র ভাস্কর্য এবং সাহিত্য-জগৎকেও আলোড়িত করিয়াছে। আবার ইহাও ঠিক সাহিত্য এবং চলচ্চিত্রের আবেদন এক জাতীয়ও নহে। ছাপার অক্ষরের বর্ণনায় যাহা আভাসে থাকে দৃশ্যপটে তাহাই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হইয়া মনকে দোলা দেয়। কিশোর চিত্তের উপর "হরর কমিকস"এর অকল্যাণকর প্রভাবের কথা আমরা জানি। বিলাতী "রক ন রোল" সঙ্গীত প্রতিক্রিয়া এখনও মিলায় নাই। চলচ্চিত্র সংস্কারের প্রশ্নও এই পর্যায়ে পড়ে। তবে সেই সঙ্গে দেশ ও কালভেদে রুচিও যে বদলায় এই কথাটাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বিদেশী এবং দেশী ছবিকে একই গজকাঠি দিয়া মাপিতে গেলে চলিবে না। বিদেশের আচার-আচরণ আমাদের দেশের চেয়ে একেবারে আলাদা। সুতরাং বিদেশী চিত্রে যে দৃশ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সঙ্গত ঠেকে, দেশী ছবিতে তাহাই দৃষ্টিকটু হইয়া দাঁড়ায়। চলচ্চিত্র-নির্মাতাদেরও অন্তত এই বাস্তব অবস্থাটা মনে রাখা কর্তব্য। শ্লীল কী অশ্লীলই বা কী, এই তত্ত্বগত আলোচনায় না গিয়াও এই কাজটুকু করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া মূল প্রশ্নটির কোন মীমাংসাও বুঝি নাই? বহুকাল ধরিয়াই রসিক মহলে ইহা লইয়া সওয়াল জবাব চলিতেছে, চূড়ান্ত রায় মেলে নাই। শেষ পর্যন্ত বুঝি এই কথাটাই থাকে যে, আর্টের ক্ষেত্রে বস্তুটা শুধু সুন্দর-অসুন্দরেরই নহে। ইহার সহিত সত্য ও শিবেরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অসুন্দরকে অকারণে আসরে নামাইলেই সে অশ্লীল হইয়া ওঠে; অশোভনের অবতারণা শিল্পী যদি করেনও তবে তাঁহার বিশিষ্ট একটি লক্ষ্য থাকা চাই। এই লক্ষ্য অবশ্যই শিব বা কল্যাণ, এবং শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি যে সত্য বস্তু হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ঘড়িহীন ভারত

"প্রতি মাসে পাঁচ হাজার ঘড়ি (ক্লক) নির্মিত হইতে পারে এইরূপ একটি জাপানী ঘড়ির কারখানার প্রথম চালান জুন মাসে ভারতে প্রেরিত হইবে, টোকিওতে এক প্রতিষ্ঠান ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। ছয় জন ভারতীয় শিক্ষার্থী এই মাসেই জাপান যাইতেছেন, ইহাও তাঁহাদের ঘোষণাতেই জানা গিয়াছে। জাপানী ঘড়ি, সাইকেল, কাচ, চীনামাটির বাসন ইত্যাদি ছাড়াও বহু মনোহারী দ্রব্যে জাপান এককালে ভারতের বাজার জাঁকিয়ে বসিয়াছিল। দাম কম, টেঁকসই ও দেখিতে সুন্দর বলিয়া উহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত। এখন শিল্প বাণিজ্যে সকলেই স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং বিদেশী দ্রব্যের আমদানীও বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। ভারত সরকারের সর্ত্তানুযায়ীই এই কারখানা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে। অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূল্যের জন্যই এদেশে জাপানী জিনিসের আদর ছিল। কিন্তু সেই কারখানাই এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এখানকার নির্মিত ঘড়ির দাম যাহাতে অত্যধিক হইয়া না পড়ে, সেদিকে নিশ্চয় লক্ষ্য রাখা হইবে ত? এ যুগের ঘণ্টা-মিনিট ধরা সব কাজেই ঘড়ির প্রয়োজন। কিন্তু ঘড়ি তৈরীর ব্যবস্থা না হইতেই যেভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে ঘড়ি কেনা দুঃসাধ্য। সুতরাং অল্প মূল্যে ঘড়ি পাওয়া গেলেই এই ব্যবস্থার সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।"

—যুগান্তর।

৮ই মার্চ স্মরণে

"বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে শিল্পী, সাহিত্যিক, মানবপ্রেমিক, রাষ্ট্রনেতা ও রাজনীতিবিদগণ এই কথা উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছেন যে, সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গ পঙ্গু হইয়া থাকিলে তাহার চলনশক্তি রহিত হইয়া যাইবেই—মাতৃজাতিকে হীনাবস্থায় রাখার অপরাধে সমগ্র সমাজই নিমজ্জিত হইতে থাকিবে। আজ যখন পৃথিবীর বৃহৎ অংশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারে নারী পুরুষের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তখন সেই মুক্তির আলোকে আমাদের চোখের সামনেও একথা ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে যে নারী পুরুষের সম্পত্তি নয়, দেবীও নয়, তাহাদের বরতনু পুত্রেষ্টিযজ্ঞের পোড়াকাঠও নয়—তাহারা মানুষ, তাহাদের নিজস্ব সত্তা আছে, সমাজ গঠনের মহাযজ্ঞে পুরুষের সমান অবদান আছে, নূতন সমাজসৃষ্টির কাজে সমান ভূমিকা আছে। কিন্তু কোন পথে ? কি ভাবেই বা মুক্ত জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে ? কাহারাই বা আলোকবর্ত্তিকা হাতে পথ দেখাইবে ? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নূতন প্রত্যয়ের পথ দেখাইয়াছিল বলিয়াই আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিশ্বের একটি স্মরণীয় দিন। শুধু আইনগত অধিকার, শুধু মৌলিক ও আদর্শগত অধিকার, শুধু চেতনার উদ্রেক ও বিবেকের দংশন যে—শুধু মুক্তিসংগ্রামের ভূমিকা মাত্র। নারীর সামাজিক মুক্তি সমগ্র সমাজের দাসত্বমোচনের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে সমস্ত শোষিত মানুষের মহান মুক্তির বাস্তব সংগ্রামের পথে বিশ্বনারী আন্দোলনে সূচনায় শ্রমজীবী মেয়েরা যেদিন সমবেত কণ্ঠে সমানাধিকারের ধ্বনি তুলিয়াছিলেন—সেই স্মরণীয় দিন ৮ই মার্চ। আজ সেই দিনটিরই স্বর্ণ জয়ন্তী।" —স্বাধীনতা।

আয়করের ভাগ

"বাঙ্গলা দেশে অর্জ্জিত আয়করের মোটা ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার কাড়িয়া নিতেছেন এবং উহা বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতিকে দাতব্য করিতেছেন, ইহার বিরুদ্ধে আমরা বহুদিন আন্দোলন করিতেছি। বঙ্গীয় বিধান পরিষদে শশাঙ্কশেখর সান্যাল এ বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের জন্য বাঙ্গলার নিকট হইতে আয়করের ভাগ নিতে পারেন কিন্তু অন্য প্রদেশকে দাতব্য করিবার জন্য উহা কাড়িয়া নিতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারকে টাকা দেওয়ার দায়িত্ব প্রদেশসমূহের আছে, কিন্তু এক প্রদেশের সম্পদ অপরকে খয়রাতি করিবার অধিকার কোন প্রদেশের নাই, এক প্রদেশের সম্পদ কাড়িয়া নেওয়ার ক্ষমতা সংবিধান কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয় নাই। সান্যাল মহাশয় বিষয়টি বিচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে পাঠাইতে বলিয়াছেন। ডাঃ রায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ভাল করিবেন।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

ঘর করিলেও জাত দিব কেন ?

"শরৎচন্দ্রের এক উপন্যাসের উপনায়িকা বারো বৎসর ধরিয়া ঘর করিলেও জাত দেয় নাই। যে সব রাজপুত রাজকন্যা মোগল বাদশাহের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, তাঁহারা হারেমে থাকিয়াও নিত্য যমুনায় স্নান ও শিবপূজা করিতেন। আমাদের কংগ্রেস নেতারা ঠিক এই রকমের সাধ্বী। মুসলীম লীগের সহিত কেরলে যুক্তফ্রণ্ট করিতে পারেন, মুসলমান ভোটগুলি পাইবার জন্য তাহাদের পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের সহিত কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন—নেভার, নেভার! জহরলালের সেকুলারিজম্ খানিক মুসলমানের মুর্গী পোষার মত। মুসলমানদের চাই, কারণ, তাহাদের নধর নধর ভোটগুলি একসাথে আসে। তজ্জন্য লীগের চরণসেবাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের মন্ত্রিসভায় নিলে নিজেদের ভাগে কম পড়িয়া যাইতে পারে।"

—হিন্দুবাণী (বাঁকুড়া)

খাদ্যসমস্যা

"এ বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বীরভূম জেলার প্রায় সর্বত্রই ধানের ফলন মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও কৃষি ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হইয়াছে। খাদ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত বীরভূম আজ প্রকৃতির কানাভা ড্যামের দানের ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত। ইহার উপর সরকার অবিবেচকের নির্মমতা লইয়া বাকী খাজনা, ঋণ ও অতিরিক্ত ক্যানেল কর আদায়ের হামলার দ্বারা ধান ওঠার প্রথম মরশুমেই আড়তদার ও মিল মালিকের নিকট চাষীকে ধান্য বিক্রয়ে বাধ্য করিয়াছেন। বন্যার্ত্ত মানুষের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি কোনটিই কার্য্যকরী করেন নাই। চাষীর ধানের মোটা অংশটা মুনাফা শিকারীদের কবলাগত হওয়ার পর হইতেই ধান চালের দরের অব্যাহত উর্দ্ধগতি সাধারণ মানুষের মনে এক ভয়াবহ সন্ত্রাস হতাশার করাল ছায়া ঘনাইয়া আনিতেছে। গ্রামাঞ্চলে খাটনির অভাব প্রতিনিয়ত তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। কৃষি মজুর ও নিম্নবিত্ত গৃহস্থের গৃহে গৃহে অর্দ্ধাহারের সর্বনাশা দুর্দ্দিন ক্রমশঃই ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে। খাদ্যদ্রব্যের বাজারের নিয়ন্ত্রণ কংগ্রেসী সরকার তাহাদের প্রভু মুনফাবাজ শ্রেণীর কবলে তুলিয়া দিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ দিশেহারা হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপর এ বৎসরের দুর্দ্দশার কথা বিস্মৃত হইয়া জেলার প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষ উদার ভাবে সিনেমা ও সার্কাসের অনুমতি পত্র বিতরণ করিয়া চাষীর ঘরের শেষ ধান্যকণাও মুনাফা শিকারীদের গুদামজাত করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে অবৈধ লেনদেনের একটা স্থায়ী কারবার চলিতেছে বলিয়া জনরব প্রায় প্রকাশ্যেই বিনা প্রতিবাদে আলোচিত হইতেছে।" —বীরভূম।

ছাত্রবিক্ষোভ

"গোটা ভারতেই ছাত্রবিক্ষোভ প্রচণ্ড ভাবে চলিতেছে। শুধু বিক্ষোভ হইলে আশঙ্কার কারণ ঘটিত না। ইহার সহিত লুঠ, গৃহদাহ, গুণ্ডামী প্রভৃতি জড়িত। প্রথমে আলিগড়, বারাণসী, তারপর এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, সর্ব্বশেষে লক্ষ্ণৌ, তারপরে কোথায় ঘটিবে বলা যায় না। শিক্ষাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূলেই যখন এই গলদ, তখন দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই অন্ধকারময় ও শঙ্কাজনক। আমাদের ভাগ্যে সত্যই কি একনায়কত্বের বিড়ম্বনা আছে ? এই সমস্ত সমাজ-বিরোধী ঘটনাগুলির মূল কারণ অসংখ্য। সারা দেশব্যাপী দুষ্ট ব্যাধির ইহা উপসর্গ মাত্র। এই মহাব্যাধির নিদান কি ? গভীর অনুসন্ধান করিলে অনেক কিছুকেই ইহার

নিদান বলিয়া ধরা যায়। শুধু মানুষ ইহার হেতু নয়, পরিবেশও ইহার উৎপত্তিস্থল বলিয়া বিবেচিত হইবে। ছাত্রেরাই এই সমস্ত হেয় কার্য্যের জন্য একমাত্র দায়ী নয়। সরকার, রাজনৈতিক দল, বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী অভিভাবকগণ ও শিক্ষকগণ কেহই দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন না। এই সমস্ত দুষ্কার্যের দণ্ড ছাত্রদের প্রাপ্য হইলেও তাহারাই যে এই সমস্ত কার্যের হেতু, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বীকার করিবেন না। যুবকেরা সাধারণতঃ অপরিণতবুদ্ধি। তাহাদিগকে লইয়া রাজনৈতিক দলগুলি যদি দাবাখেলার গুটির মত ব্যবহার করে, তবে সে দোষ কি তাহাদের নয়? নিম্নশ্রেণীর ছায়াচিত্রের প্রচলন যুবকগণের নৈতিক অধোগতির কারণ। ছাত্রদের নিকট আদর্শবাদের বালাই নাই। কোন রকমে পরীক্ষার বৈতরণী পার হওয়াই তাহাদের জীবনের কাম্য। ক্রমবর্ধমান বেকারী ও আশঙ্কাজনক অর্থনৈতিক অবস্থার বিভীষিকায় তাহারা জীবন সম্বন্ধে উদ্দেশ্যহীন। কাজেই ভবঘুরের মত তাহারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভাবনাশূন্য। দ্রুত শিল্পীকরণের ফলে চলতি মূল্যমানের লোপ অথচ তাহার স্থলে কোন নূতন মূল্যমানের প্রকাশ না হওয়ায় নীতিবোধ অবলুপ্ত। এই সমস্ত কারণ ও অন্যান্য প্রভাবের ফলে ছাত্রসমাজ যে বিক্ষুব্ধ হইবে, তাহা স্বাভাবিক নয় কি? তার পর আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থাও এক জটিল সঙ্কটের মধ্যে। এই সমস্ত অবস্থার চাপে আমাদের ছাত্রসমাজ দুর্নীতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। জাতির যাত্রাপথে ইহা একটি বড় দুর্লক্ষণ। ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?" —জনমত।

প্রদর্শনীর সার্থকতা ও ব্যর্থতা

"বারাসাত মহকুমা কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য ও পশুপক্ষী প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে বারাসাত সহরে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তিনটি দিনে যেরূপ উৎসাহ আলোড়ন পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। আমাদের গত সপ্তাহের সংখ্যায় প্রদর্শনীর একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে প্রচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হইতেছে প্রদর্শনী, যেখানে হাতে-কলমে কাজ করিয়া চিত্র, পুতুলের সাহায্যে অনেক নীরস প্রচার সরস হইয়া উঠে। যন্ত্র বা মডেল যাহা সাধারণতঃ পুস্তিকা, বক্তৃতার মারফৎ গ্রামবাসীকে বুঝাইয়া দেওয়া খুবই কঠিন, প্রদর্শনীতে তাহা অনায়াসে হাতের কাজে দেখাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়। বারাসাত মহকুমার কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে অনেকগুলি জিনিস ছিল যাহা গ্রামের কৃষক ও সহরের মধ্যবিত্ত দর্শকগণের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু আবার এমন কতকগুলি জিনিস ছিল না যাহার অভাবে প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া গ্রাম গঠনের সহায়ক প্রেরণা সহজে প্রচার করা যাইত। এই প্রদর্শনীতে আমরা সবচেয়ে বেশী যত্নের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, মহিলাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার অভাবে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি মহিলাদের বিশেষ লক্ষ্যের কারণ হইলেও তাহারা অত্যন্ত সংকোচ ও লজ্জার সহিত পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক, একেই গ্রামের মহিলাদের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল এবং পুরুষ পরিবেষ্টিত প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে তাহাদের স্বাভাবিক কৌতূহল লজ্জা ও লোকনিন্দার ভয়ে এক বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। যদি মহিলাদের জন্য বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত এবং পুরুষদের প্রবেশাধিকার না ঘটে, তবে গ্রাম্য মহিলাদের পক্ষে দীর্ঘ সময় ধরিয়া প্রদর্শনী প্রদক্ষিণ পরিদর্শনের সুযোগ হইয়া উঠে।"

—বারাসাত বার্তা।

দোকান আইন

"কিছু দিন আগেও দেখিয়াছি, কিছু সংখ্যক দোকানদার সপ্তাহে দেড় দিন দোকান বন্ধ রাখিত। দোকান কর্মচারী আইন তাহারা মানিয়া চলিত। কিন্তু একশ্রেণীর ব্যবসাদারের প্রচলিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার প্রবণতা সেই সঙ্গে অপরাপর দোকান বন্ধ থাকার সুযোগে অধিক মুনাফা লুঠিবার আকাঙ্খা এই আইনটির প্রয়োগকে প্রায় সম্পূর্ণ বানচাল করিয়া দিয়াছে। এখানে আমরা বর্দ্ধমান

মাসিক বসুমতীর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান---বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা---১২

২। প্রকাশের সময়---প্রতি মাসে।

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকরের নাম ও ঠিকানা----- শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় নাগরিক। গ্রাম-- মেড়িয়া। পোঃ---আকনা। জেলা—হুগলী।

৪। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা---প্রাণতোষ ঘটক। ভারতীয় নাগরিক। ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা---৯।

৫। মোট মূলধনের শতকরা এক ভাগের অধিকের অধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা---শ্রীমতী দীপ্তি দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা---১২। শ্রীমতী ভক্তি দেবী। ১৪১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা৩৭। শ্রীমতী আরতি দেবী। ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা---৯। কুমারী প্রণতি দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা---১২। কুমারী উৎপলা দেবী। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা---১২।

আমি শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসসম্মত।

স্বাক্ষর
শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

তারিখ
১-৩-১৯৫৯।

জেলার কথাই বলিতেছি। মালিকের লোভের সঙ্গে কর্মচারীর প্রাপ্য ছুটি অস্বীকারের এমন দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দেখা যাইবে না। কয়েক দিন পূর্বে কলিকাতায় দোকান কর্মচারীরা সভা-সমিতি এবং বিধান সভা অভিযান দ্বারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। দোকান কর্মচারী আইনের সংশোধন দাবী করিয়াছে। সরকারও সংশোধনী বিল আনিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আইনের কথা না বলাই ভাল। আইন উপেক্ষা করার হিড়িক আসিয়াছে। সুতরাং আইনের কড়াকড়িতে কোনো ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। জনগণ তথা ক্রেতাসাধারণ যদি আগাইয়া আসেন, তাহা হইলে কিছু সুরাহা হইতে পারে। যে সরকারী কর্মচারী এই আইন যথাযথ প্রয়োগ হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য আছেন (জেলায় একজন!) তাহার একার পক্ষে সম্ভব নয়। বন্ধের দিন সেই দোকান খোলা থাকিলে কোনো দ্রব্য সেই দোকান হইতে না ক্রয় করা এই মনোভাব যদি ক্রেতা সাধারণ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কিছু সুফল দেখা দিতে পারে। আর একটি বিষয় আছে—তাহা হইতেছে আইনগত। দোকান বন্ধ রাখার নিয়ম অঞ্চল হিসাবে করা উচিত। একটি সহরকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া দোকান বন্ধ রাখার দিন নিরূপিত করা। ইহাতে আইনভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করা সহজ হইবে। আশা করিতেছি, আমাদের সুপারিশ ক্রেতা ও সরকার বিবেচনা করিবেন।"

—বর্দ্ধমানবাণী।

সিনেমার হাতছানি

"দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইল। বেলা দ্বিপ্রহর, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাহির হইয়াছি—সুতরাং তাড়া ছিল না। চাহিয়া রহিলাম। এক বালক—বয়স বোধ করি ১৬।১৭ বৎসর হইবে। সম্মুখের এক প্রৌঢ়ের নিকটে আগুন চাহিয়া লইয়া আপন সিগারেটের মুখাগ্নি করিল। প্রৌঢ়কে সে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। বালক তখনও ঠোঁট পাকাইয়া উঠিতে পারে নাই, তাই 'দাদা' বলিলেন—'নূতন শিখেছ বুঝি?' বালক ঘাড় নাড়িল। লম্বা লাইন। সব রকমের মানুষ আছে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদভ্রান্ত-প্রেমে' লিখিয়াছিলেন—এখানে আসিলে সকলে সমান হয়।' এখানে অর্থাৎ শ্মশানে। তাঁহার মন তখন ভাল ছিল না। সদ্য স্ত্রী মরিয়াছেন—সুতরাং দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন ছিল। নহিলে দেখিতেন—শ্মশানে সকলে সমান হয় না, কাহাকেও চন্দনকাঠে পোড়ান হয়, কাহাকেও আমকাঠে, কাহাকেও বা গাদায়। কাহারও অঙ্গে সিল্কের কাপড়, কাহারও মিলের ধুতি—কেউবা দেহের কেন্দ্রস্থলে একটা না-থাকিলে-নয় গোছের টুকরা লইয়া চিতায় চাপে। শ্মশানে সাম্য নাই। সাম্য আছে এই লাইনে। সকলেরই মূল্য ছয় ছয় আনা, না হয় দশ আনা। ইহারা কতক্ষণ ধরিয়া লাইন লাগাইয়াছে? এক বার বছরের বালককে প্রশ্ন করিলাম। ছেলেটা বলিল—১২টা হইতে। ৩টার সময় ছবি আরম্ভ। দেখিয়া বুঝিলাম, আজকাল দেশের নেতারা ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলার অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া যে আওয়াজ তুলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা।"

—পুণ্যভূমি (তারকেশ্বর)।

শিশির সান্নিধ্যে প্রসঙ্গে

[মাসিক বসুমতীর বিগত আশ্বিন (১৩৮৬) সংখ্যায় প্রকাশিত শিশির সান্নিধ্যে রচনাটিতে স্বর্গত নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের কিছু অপ্রীতিকর ও অবাঞ্ছিত উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনানুভব করিতেছি। এইরূপ ভিত্তিহীন উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় অপরেশচন্দ্রের আত্মজনবর্গ ও অনুরাগিগণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। আমরা এই লজ্জাকর পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় ভবিষ্যতে তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিব।

—সম্পাদক, মাসিক বসুমতী]

শোক-সংবাদ

বাঙলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ কথাশিল্পী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৬ই মাঘ ৭৯ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। অমায়িকতার নিরহঙ্কারিতার ও সৌজন্যবোধের মূর্ত প্রতীক উপেন্দ্রনাথ ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবারের সন্তান এবং অপরাজেয় সাহিত্যশিল্পী শরৎচন্দ্রের তিনি সম্পর্কে মাতুল। প্রথম জীবনে ইনি আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন, পরবর্তীকালে সর্বতোভাবে সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। উপেন্দ্রনাথ সম্পাদিত বিচিত্রা বাঙ্গলাদেশের সাময়িক পত্রকুলের গৌরব। অভিনেতা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে তিনি অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। (বিশেষতঃ গায়ক হিসেবে), সাধারণতঃ গল্পলেখক হিসেবে সাধারণ্যে পরিচিত হ'লেও কবি হিসেবেও তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতির আসন উপেন্দ্রনাথ অলঙ্কৃত করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দ্বারা এঁকে সম্মান নিবেদন করেছেন। উপেন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শশীনাথ, রাজপথ, অভিজ্ঞান, অমলতরু, দিকশূল, একই বৃন্তে, বিগত দিন, শেষ বৈঠক, স্মৃতিকথা, শ্রেষ্ঠ গল্প ইত্যাদির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙলার সমাজজীবন থেকে একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় পুরুষের স্থান শূন্য হ'ল।

বিখ্যাত চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ধনপতি পাঁজা ১২ই মাঘ ৬৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। গত সেপ্টেম্বরে পরলোকগত প্রখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা এঁর অগ্রজ ছিলেন। ইনি ১৯৫২ সাল পর্যন্ত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চর্মরোগ বিভাগের প্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইনি দেশব্যাপী প্রভূত সুনাম এবং খ্যাতি অর্জন করেন।

বিশ্ববিখ্যাত সন্তরণবিদ রবীন চট্টোপাধ্যায় ১ই মাঘ এলাহাবাদে ৬০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৩২ সালে ইনি দীর্ঘস্থায়ী সাঁতারের আন্তর্জাতিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। সন্তরণবিদ হিসেবে জগতের দরবারে ইনি বাঙলার ও বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিসেবেও জগতের সাঁতারুমহলে ইনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হতে সমর্থ হন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাঠক পাঠিকার চিঠি

মহাশয়।

মাসিক বসুমতীর বর্তমান সংখ্যায় 'চারজন' এর মধ্যে আমাকে স্থান দিয়েছেন। সেজন্ত ধন্যবাদ। কয়েকটি মুদ্রাকর প্রমাদ এবং কিছু তথ্যগত ভুল লক্ষ্য করা গেল। (১) প্রথম 'প্যারাগ্রাফ'এ লাইনগুলো উল্টো-পাল্টা হয়ে যাওয়ায় কোনো অর্থবোধ হয় না। (২) বি, সি, এস্ ফেল করলাম কবে বুঝতে পারছি না। কথাটা বোধ হয় ছিল—'দিলেন' কিংবা 'দেন'। কম্পোজিটর মশাই করেছিলেন 'ফেল'। বোধ হয় ভাবলেন, জেলখানার লোক যখন, নিশ্চয়ই পাশ করতে পারেনি। (৩) Last but one প্যারাগ্রাফে বর্তমানে কথাটা যদি রাখতে চান, তাহলে তিন বছর আগেকার তথ্যগুলো বদলানো দরকার। অর্থাৎ বর্তমানে আমি বহরমপুর নয় আলিপুর সেণ্ট াল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তামসী ও লৌহকপাট (৩য়) যথাক্রমে মাসিক বসুমতী ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হচ্ছে না, অনেকদিন আগেই বই-আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে, এবং 'তামসীর ষষ্ঠ মুদ্রণ ও লৌহকপাট তৃতীয় পর্বের চতুর্থ মুদ্রণ শেষ হতে চলেছে। আমার এ চিঠিখানা প্রকাশ করতে বলছি না। যে ভুলগুলোর উল্লেখ করলাম, আগামী সংখ্যায় তার সংশোধনের ব্যবস্থা করলে বাধিত হবো।—শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জরাসন্ধ) ২ বেকার রোড, কলিকাতা—২৭

ঋগ্বেদের রচনাকাল ও বৈদিক আর্য্যের আদিনিবাস

মাসিক বসুমতীর বেশ কয়েকটি সংখ্যা থেকেই শ্রীহেম সমাজদার ও শ্রীশিলানন্দ ব্রহ্মচারীর "বৌদ্ধ ও পঞ্চশীল" প্রবন্ধের বিষয় থেকে অন্যান্য আনুসংগিক কয়েকটি বিষয়ের উপর বিতর্ক চলে। তার ভিতর ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব এবং বৈদিক আর্য্যের আদি-নিবাস সম্বন্ধে প্রসংগ উঠে এবং তা নিয়ে বাদানুবাদ চলে। বলা বাহুল্য, শ্রীশিলানন্দ বাবুর মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খৃঃ-পূঃ ২৫০০—১৫০০ মধ্যে এবং বৈদিক আর্য্যের আদিনিবাস ভারতবর্ষের বাহিরে। অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকের মতের সংগে এ মতের পার্থক্য নেই। অধিক সংখ্যক জনসাধারণের কাছে বা ইতিহাসের ছাত্রের কাছে এ মতই গ্রাহ্য হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক এবং চিন্তাশীল লোকের সংগে এবিষয় নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। তাই প্রচলিত মতবাদও পাল্টে যেতে পারে—যদি তার বিপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকে। আর স্বপক্ষের যুক্তি যদি নিতান্ত দুর্বল থাকে তবে তা চিরদিন অভ্রান্ত বলে পরিগণিত হয় না। কাজেই সে ক্ষেত্রে উদারভাবে মতের কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন বলেই মনে করি। এ ক্ষেত্রে শ্রীহেমবাবুর স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিশেষভাবে গত আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল প্রবন্ধে। সেখানে তিনি সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন শিলালিপি, ভগ্নস্তূপ এবং লিপিমালার দ্বারা ঐতিহাসিক সঠিককাল নির্ণীত হয় না। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর 'উপনিষদ' নামক আলোচনা গ্রন্থেও এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনিও প্রত্নতাত্ত্বিক মতকে পরিত্যাগ করেছেন। আর তাছাড়া প্রত্নতত্ত্বের সংগে অনুরূপ অন্যান্য প্রমাণের আবশ্যক। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ও সেক্ষেত্রে সম্ভব নয়—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে। কেননা এখানে গ্রন্থ প্রকাশ হোত অনেক পরে। পূর্বে মুখস্থাকারে থাকিত। যেই জন্য বেদ-উপনিষদকে শ্রুতি বলা হয়ে থাকে। তাতে লিখবার সময়ে তৎকালীন ভাষার ছাপ অবশ্যই থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনা বা সৃষ্টির কাল অনেক পূর্বেই। তাই ভাষাতত্ত্ব দ্বারা অন্ততঃ আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের কাল নির্ণয় সহজ নয়। তারপর 'বেদের রচনাকাল' এবং 'বৈদিক আর্য্যের আদিনিবাস বাহিরে' ছিল—এ ধরণের ঐতিহাসিক তথ্য প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রচার করেন। তাঁদের প্রভাব আমাদের অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও এসেছে। তাঁরা যে নিরপেক্ষ ভাবে লিখেছেন, তা সর্বাংশে মানা যায় না। কারণ তাঁদের অনেক সদম্ভ মতোক্তি পরবর্তীকালে প্রমাণের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা চিরদিনই হিন্দুসভ্যতাকে সংক্ষিপ্ত এবং খাটো করে দেখানোর যথেষ্ট অপপ্রয়াস করে

মধ্যে তাঁদের ভাবশিষ্য নেহাৎ কম নয়। তাই দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এক একজন এক এক কথা বলেছেন। কেউ বলেন, আর্যদের আদিনিবাস মোসেপোটেমিয়া অঞ্চল, আবার কেহ বলেন রাশিয়ার ভল্গার অববাহিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চল, আবার কাহারও মতে হাঙ্গেরীয় অঞ্চল। তার পিছনে ঐতিহাসিক যুক্তি খুবই কম। এর পিছনে এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভিন্ন দ্বিতীয় নেই। কাজেই এই দুইটি বিষয়ের উপর বর্তমান বিজ্ঞানের সাহায্যে কিছুটা আলোচনা করব। কেননা আনুমানিক সিদ্ধান্তের চেয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রথমতঃ ধরা যাক ঋগ্বেদের রচনাকাল। পূর্বেই এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ভাষাতত্ত্ব এবং প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা এর কাল সঠিক নির্ণয় সম্ভব নহে। এ ক্ষেত্রে জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রয়োগ অধিকতর যুক্তি-সংগত। যেমন ভাবে হেমবাবু শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। লোকমান্য তিলক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Orion এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সে সম্বন্ধে এখানে সামান্য একটু আলোকপাত করা সংগত বলে মনে করি। আকাশমার্গে ১২টি রাশি এবং তাকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ভাগের নাম নক্ষত্র।

অয়নচলন (Precenion of the equinoxes) দ্বারা জানা যায় বিষুবণ (vernal equinox) একস্থলে স্থির থাকে না। উহা বৎসরে ৫০ বিকলা সরে যায় এবং ২৫৮৬ বৎসরে ৩৬০ ঘুরে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসে। বিষুবণ এখন মীনরাশিস্থ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে আছে। ২০০০ বৎসর পূর্বে মেষে ছিল, ৪০০০ বৎসর পূর্বে উহা বৃষে ছিল। বিষুবণ যে নক্ষত্রে থাকে, সেই নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত (vernal equinox ধরা হয়। এই অয়নচলন দ্বারা বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা যায়। তিলক মহারাজ তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের কয়েকটি ঋকের রচনাকালে পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত সংঘটিত হত। যে হেতু বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হয় উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে এবং উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র থেকে পুনর্বসুর দূরত্ব ৮ নক্ষত্রেরও অধিক। এখন এক এক নক্ষত্র ৩২/৩ × ৬০ × ৬০ = ৮৪০০ বিকলা। অতএব ৮ নক্ষত্রের দূরত্ব ৬৮৪০০০ বিকলা। বৎসরে বিষুবণ যখন ৫০ বিকলা অতিক্রম করে তখন ৬৮৪০০০ বিকলা অতিক্রম করিতে ১৬৮০০ বৎসর প্রয়োজন। অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ প্রায় ৫০০০ বৎসর। কাজেই এক্ষেত্রে ঋগ্বেদের সময় খৃঃ পূঃ ২৫০০-১৫০০ ধরা মোটেই সংগত নয়।

তারপর বৈদিক আর্য্যের আদিনিবাস সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক। এ ক্ষেত্রেও লোকমান্য তিলক গবেষণার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন যে বৈদিক আর্যদের বাসস্থান উত্তর কুরুতে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Arctic Home in the Vedic Arya গ্রন্থে এমত প্রকাশ করেছেন। বর্ত্তমান Paleontologist-গণ বলেন, উত্তর কুরু (North pole) স্থির নহে। তিলক মহারাজ দেবের যে সময় নির্ণয় করেছেন, সে সময় এবং তার পিছনে বৈদিক সভ্যতা গড়ে উঠতে যে সময় লেগেছিল সে সময়ের সমষ্টিকালের সময় উত্তরকুরু বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ সমগ্র হিমালয় অঞ্চল (Tras Himalayan), তিব্বত ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে ছিল। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামায়ণের সভ্যতার কাল মহাভারতের সভ্যতার কাল অপেক্ষা প্রাচীন অনুমান করা অসংগত নয়। (প্রসংগত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে মহাভারতের সভ্যতা প্রাচীন, কেন না, আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করে এবং যেখানে যেখানে বসতি স্থাপন করে সেখানে সেখানে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। ক্রমশঃ তারা পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয় এবং রামায়ণের সভ্যতা অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। এই ভাবে তাঁরা প্রমাণ করেন—মহাভারতের সভ্যতা রামায়ণের সভ্যতা থেকে প্রাচীনতর। বলা বাহুল্য, তাঁদের এ মতের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে ঐরূপ গণনা অনুযায়ী প্রমাণিত হয় বৈদিক আর্য্যদের আদিনিবাস প্রাচীন ভারতবর্ষ। বাহির থেকে যে সমস্ত আর্য্য এসেছে তারা বৈদিক আর্য নয়। ভারতীয় আর্য্যদের সঙ্গে বহির্ভারতীয় আর্য্যদের যোগাযোগ অনেক পরে হয়। তার প্রমাণ তৎকালীন সাহিত্যে মিলবে। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা এত প্রাচীন যে তখন বহির্ভারতে কোন সভ্যতা ছিল বলে মনে হয় না। থাকলেও যোগাযোগ ছিল না, তার প্রমাণ বৈদিক সাহিত্য। কাজেই বৈদিক আর্য্যদের আদি নিবাস বহির্ভারতে এ তথ্য জোর করে বলা উচিত নয় বলেই মনে করি।—শ্রীসুনীলকুমার আচার্য্য, ৬।৫২, বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Sending Rs. 10·50 as subscription for Monthly Basumati—R. P. Saksena, Gomia. Dt. Hazaribagh.

মাঘ থেকে আষাঢ় পর্য্যন্ত টাকা পাঠালাম—Sovona Rahut, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৬ সালের মাঘ হইতে ১৩৬৭ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত ৬ মাসের চাঁদা বাবদ ৭।০ টাকা পাঠাইলাম।—বেণু বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণা।

Subscription for one year from Agrahayan 1366. Kindly arrange to send the magazines from that month.—Dr. D. N. Chakravorty, Silchar, Assam.

The sum of Rs. 15/- is remitted towards the annual subscription of monthly Basumati from Poush Sankhya—Promode Library, Darjeeling.

আমাদের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে বসুমতী পাঠাইবেন—Durgabati Boys Library, Sahabad.

আমার চাঁদা বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইলে বাধিত হইব।—শ্রীমতী প্রভারাণী পাহাড়ী, Midnapur.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক মূল্য ৭।০ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া কার্ত্তিক হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী সেবা দেবী চক্রবর্ত্তী—Deona (U. P.)

আমার বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিতভাবে পত্রিকা পাঠাইলে বাধিত হইব।—গীতা ভৌমিক, জলপাইগুড়ি।

Hereby I am sending Rs 15/- as the yearly subscription of Masik Basumati for the new year—Sm. Debi Banerjee, Jodhpur.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭·৫০ নঃ পঃ পাঠাইলাম। দয়া করিয়া মাঘ মাসের পত্রিকা হইতে পাঠাইয়া দিবেন।—Gouri Ghoshal, Jamshedpur.

I am remitting herewith my subscription towards monthly Basumati for the period from Poush to Jyaistha—Leela Ghosh, Jabbalpur.

১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ১৩৬৭ সালের কার্ত্তিক পর্য্যন্ত নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীমতী কমলা মিত্র, বোম্বাই।

Remitting herewith Rs. 7·50 on account of half yearly subscription to Monthly Basumati for Kartik to Chaitra 1366 B. S. in advance—Berhampur Girls Mahakali Pathsala, Dt. Murshidabad.

Sending herewith Rs. 7·50 for Masik Basmati as half-yearly subscription—Sulekha Roy, Bombay.

Sending herewith yearly subscription Rs. 15/- —Shanta Ganguly, Hazaribagh.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
৩২। সমাধি	(কবিতা)	বন্দনা ভট্টাচার্য্য	৮৪০
৩৩। শিশু	(কবিতা)	জয়া সরকার	ঐ
৩৪। অবেলার গান	(কবিতা)	অন্নপূর্ণা মৈত্র	ঐ
৩৫। নতুন দ্বীপ	(কবিতা)	শ্রীমতী প্রভা দত্ত	৮৪১
৩৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব	(কবিতা)	পুষ্প দেবী	ঐ
৩৭। জানালা	(কবিতা)	রমা ভট্টাচার্য্য	ঐ
৩৮। বন-মহোৎসব	(কবিতা)	শ্রীমতী সুপ্রীতা মিত্র	৮৪২
৩৯। আজকের এই সূর্য্য স্বপ্ন	(কবিতা)	শ্রীঊর্মিলা মুখোপাধ্যায়	ঐ
৪০। প্রশ্ন	(কবিতা)	মায়া মুখোপাধ্যায়	ঐ
৪১। তৃষ্ণা	(কবিতা)	কদম্বা পিল্লাই	ঐ
৪২। বিলম্বিত লয়	(কবিতা)	দীপ্তি সেনগুপ্তা	৮৪৪
৪৩। বিজ্ঞানবার্ত্তা			৮৪৫
৪৪। আধুনিক বঙ্গদেশ	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু	৮৫০
৪৫। ঋতুরঙ্গে: জিজ্ঞাসা	(কবিতা)	কৃত্তী সোম	৮৫৩
৪৬। ছোটদের আসর—			
(ক) দিন আগত ঐ	(উপন্যাস)	ধনঞ্জয় বৈরাগী	৮৫৪
(খ) কি করে স্পষ্ট ছবি তুলতে হয়	(প্রবন্ধ)	রথীন রায়	৮৫৭
(গ) ম্যাজিক ম্যাচ	(যাদুতথ্য)	যাদুকর—এ, সি সরকার	৮৫৮

সূচীপত্র

সূচীপত্র

১। সাময়িক প্রসঙ্গ—

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

জাতি-বিভাগ

আমি সব জাতিকে একাকার করিতে বলি না। জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতি-বিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করিতে চাই। জাতি-বিভাগ যথার্থ কি, তাহা লক্ষে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই, যেখানে জাতি নাই। ভারতে আমরা জাতি-বিভাগের মধ্য দিয়া উহার অতীত অবস্থায় গিয়া থাকি। জাতি-বিভাগ ঐ মূল সূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতের এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হইতেছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা—ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়িয়া দেখ, তবে দেখিবে এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হইয়াছেও। আরও অনেক হইবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হইবে। —কাহাকেও নামাইতে হইবে না—সকলকে উঠাইতে হইবে।—ইউরোপ ও আমেরিকার জাতি-বিভাগের চেয়ে ভারতের জাতি-বিভাগ অনেক ভাল।—ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখিয়াছ? ইহা সর্বদাই গতিশীল।

আধুনিক জাতিভেদ ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক; উহাতে সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ আনয়ন করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডী কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা ছিল—বর্তমান জাতিভেদের মধ্যে যেটুকু ভাল দেখিতে পাইতেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইতেই আসিয়াছে। বুদ্ধ জাতি-বিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারত বার বার যখনই জাগিয়াছে, তখনই জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রবল চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য চিরকাল আমাদিগকেই করিতে হইবে—আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাশ-কল্পে নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে। যে কোন বৈদেশিকভাব ঐ কার্যে সাহায্য করে তাহা যেখানেই পাওয়া যাউক না কেন, লইয়া আপনার করিয়া লইতে হইবে। অপরে কখন আমাদের হইয়া ঐ কার্য্য

করিতে পারিবে না। সকল উন্নতিই ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের প্রাচীন স্মৃতিকারেরাও জাতিভেদ-লোপকারী ছিলেন, তবে আধুনিকদিগের ন্যায় নহে। তাঁহারা জাতিভেদরাহিত্য অর্থে এই বুঝিতেন না যে, শহরের সব লোক মিলিয়া একত্র মদ্য-মাংস খাউক; অথবা যত আহাম্মক ও পাগল মিলিয়া যখন যেখানে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুক, আর দেশটাকে একটা পাগলাগারদে পরিণত করুক, অথবা তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন না যে, বিধবাগণের পতির সংখ্যানুসারে কোন জাতির উন্নতির পরিমাণ করিতে হইবে। এরূপ করিয়াই অভ্যুদয়শালী হইয়াছে, এমন জাতি ত আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই।

জাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্মের বিরোধী। জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, আর আমাদের বড় বড় আচার্য্যেরা উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই এইরূপ প্রচার করিয়াছেন, ততই জাতিভেদের নিগড় আরো দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade guild)। কোনরূপ উপদেশ অপেক্ষা ইউরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জাতিভেদ বেশী ভাঙ্গিয়াছে।

বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যাহাই বলুন, জাতি একটি সামাজিক বিধানমাত্র, এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নির্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা নিজের কার্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের নিজের সামাজিক স্বত্ববুদ্ধি জাগরিত করা যায়।

উপনিষদের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্যেরাই জাতিভেদের বেড়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছেন; অবশ্য মূল জাতিবিভাগকে নহে। তাঁহারা উহার বিকৃত ও অবনত ভাবটাকেই ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন

উচ্চবর্ণকে নিম্ন করিয়া, আহার-বিহারে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়া, কিঞ্চিৎ ভোগসুখের জন্য স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে না; পরন্তু আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি বৈদান্তিক ধর্মের নির্দেশ পালন করে, প্রত্যেকেই যদি ধার্মিক হইবার চেষ্টা করে, প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়—তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা হইবে।

জাতিভেদ-সমস্যার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে—সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণরূপে পরিণত হইবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছে—উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না—ব্রাহ্মণজাতির লোপসাধন করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ।...এই ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, এই আদর্শ ও সিদ্ধপুরুষের প্রয়োজন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লোপ হইলে চলিবে না...উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া এ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্যপ্রণালী। একদিকে ব্রাহ্মণ, অপরদিকে চণ্ডাল, আর চণ্ডালকে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়ন।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে যবদ্বীপের একটি প্রস্তরমূর্তি উমার তপস্যার চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র পুলিনবিহারী চক্রবর্তী গৃহীত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি এসে বুঝতে পারলেন যে, বাঙালীর স্বজাতিপ্রিয়তা, স্বদেশানুরাগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কাজেই বাঙলা দেশকে যদি দুর্ব্বল করে রাখা না যায়, তবে বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনে যে এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দিয়েছে, তা অদূর ভবিষ্যতে সারা ভারতের আকাশ ছেয়ে ফেলবে এবং ভারত শোষণের লালসা ত্যাগ করে ইংরেজদের দেশে ফিরে যেতে হবে, তাই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকারের বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গালাকে দুইভাগে ভাগ করবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ হয় দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথ ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর মধ্যে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল, তেমন আর কোনদিন হয়নি, বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ সহর হতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালার প্রতিটি পল্লীতে বিস্তার লাভ করে "Divide and rule" নীতির ধ্বজাধারী সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে আগত অবাঞ্ছিত ইংরেজ ১৯০৫ সালে এই প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ নিয়ে হল পশ্চিম বাঙ্গালা এবং ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে হল পূর্ব্ব বাঙ্গালা।

শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অগ্রগামী বাঙালী জাতি এই কৃত্রিম বিভাগকে মানতে রাজী হল না। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সুরু হল দেশব্যাপী বিদেশী বর্জ্জন, বিদেশ হতে প্রেরিত অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বর্জ্জন করে বাঙ্গালীরা চেষ্টা করে স্বাবলম্বী হতে এবং বিদেশী বণিকের শোষণ বন্ধ করতে।

ইংরেজরা বাঙ্গালীদের আন্দোলন দমন করার জন্য আরম্ভ করে নির্ম্মম উৎপীড়ন এবং বর্ব্বর জাতির ন্যায় অত্যাচার। অত্যাচার যতই বাড়তে থাকে, আন্দোলনের জোরও সেভাবে বাড়তে থাকে, বাঙ্গালার তরুণ মুক্তি-দূতেরা গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে।

তদানীন্তন কবি ও লেখকগণ বৃটিশ জাতির অবিচারের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, এই পূর্ব্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্ত স্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে, জননীর বাম ও দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙ্গালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।

জাতির উদ্দেশ্যে অমৃতলাল বসু লিখলেন :—

ওরা জোর করে দেয় দিক না,
বঙ্গ বলিদান।
আমরা যব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গ
মনের সঙ্গে মিলিয়ে প্রাণ
আমরা জাত বাঙ্গালী, প্রেম বাঙ্গালী,
ভাবছিস তোরা মন ভাঙ্গালী,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন করলি দ্বিগুণ,
বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ গাইলেন :—

বঙ্গ আমার, জননী আমার
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।
কেন গো মা তোর শুষ্ক বদন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ।
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন "আমার দেশ"।
একদা যাহার বিজয় সেনানী, হেলায় করিল লঙ্কা জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন বেশ?
যদিও মা তোর দিব্য আলোকে,
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা,
ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

লেখকের উদ্দীপনীয় প্রবন্ধে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনলবর্ষী বক্তৃতায়, কয়েকখানি জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় প্রচারের ফলে বিপ্লবের আগুন অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র।

বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদের দিনটিকে বাঙ্গালীরা শোকের দিন বলে গ্রহণ করে, উভয়বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ "রাখী" বন্ধনের প্রস্তাব করেন এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রস্তাব করেন অরন্ধনের, শোকের চিহ্নস্বরূপ বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার অঙ্গচ্ছেদের দিনে অন্নজল গ্রহণ করত না, থাকত সকলে খালি পায়ে, বন্ধ থাকত দোকানপাট, হাটবাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য গাড়ীঘোড়া সব। সকাল হতে সকলে "বন্দে মাতরম্" গাইতে গাইতে রাস্তায় ঘুরে, রবীন্দ্রনাথের রাখী বন্ধনের গানটি সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে একে অন্যের হাতে রাখী বেঁধে দিত—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।

বাঙলার ঘর বাঙলার হাট
বাঙলার বন বাঙলার মাঠ,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

বাঙ্গালার এইরূপ দুর্দিনে বাঙ্গালীরা জাতীয় কংগ্রেসের সহায়তা আশা করে বিমুখ হল। ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের কথা তখনও কংগ্রেসের নেতাগণ ভাবতে পারেন নি। বাঙ্গালীজাতি ইহাতে ক্ষুব্ধ হল, কিন্তু হতাশ হল না। বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠল।

সারা দেশে বিলাতী জিনিষ বিক্রী প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। স্থানে স্থানে জনতা মদের দোকান পোড়াল, লবণের নৌকা ডুবিয়ে দিল, বিলাতী কাপড়ে আগুন লাগিয়ে দিল।

ইংরেজ ব্যবসাদার জাত, ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম দেখে তারা আইন দিয়ে বাঙ্গালা দেশ বাঁধতে চেষ্টা করে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হওয়ার ব্যবস্থা হয় বরিশালে, যেখানে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা সব চেয়ে বেশী দেখা দিয়েছিল, আয়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর কর্তাদের হুকুম জারী হল, পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রকাশ্য রাস্তায় "বন্দে মাতরম্" বলা বেআইনী, এই আইন জারী করার পর "বন্দে মাতরম্" বলার অপরাধে পূর্ব্ব বাঙ্গালার হাজার হাজার যুবকের মাথা ফাটল পুলিশের লাঠির ঘায়ে।

বাঙ্গালার সকল জেলা হতে প্রতিনিধি আসে বরিশালে, বাঙালার সকল নেতা সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যাত্রামোহন সেন প্রভৃতি আসলেন বরিশালে। স্থির হল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করবার পর শোভাযাত্রা বের হবে। কিন্তু এখানেও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ করে দেয়, নেতারা অপমানজনক সর্ত্তে সম্মেলনের কাজ না করাই স্থির করলেন। তাই বন্ধ হল সম্মেলনের কাজ।

এর পর বাঙ্গালার যুবকেরা বোম্বাই থেকে চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলককে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। কোলকাতার ত্রিশ হাজার ছেলে তিলককে নিয়ে এক শোভাযাত্রা বের করল, তিলক ঘোষণা করলেন—"স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার।"

এবার সরকার জাতীয়তাবাদী পত্রিকার মুখ বন্ধ করতে উঠে পড়ে লাগলেন, প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে প্রথমেই নালিশ হল "যুগান্তরের" সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নামে। ভূপেন্দ্রনাথ কিংসফোর্ডকে বললেন—আমি দুঃখিনী জন্মভূমির জন্য যা কর্ত্তব্য বুঝেছি, তাই করেছি। এখন তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হল।

রাজা সুবোধ মল্লিকের অর্থে "বন্দেমাতরম" পত্রিকা স্থাপিত হয়েছিল, এর সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং অরবিন্দ। বিপিন পাল ছিলেন সহকারী সম্পাদক। রাজদ্রোহের মামলায় অরবিন্দ অভিযুক্ত হন। সে সময়ের উদীয়মান ব্যারিষ্টার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন অরবিন্দের পক্ষে মামলা চালাইলেন। অরবিন্দ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানালেন—"স্বাধীনতার কথা বলা যদি অপরাধ হয়, তবে আমি প্রথম অপরাধী।" যে প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করে মামলার উদ্ভব হয়, তা যে অরবিন্দের লেখা প্রমাণ করা গেল না। তাই অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, তার পর সহকারী সম্পাদক বিপিন পালের সাক্ষ্য ডাকা হল। তিনি জানালেন যে ইংরেজের আদালতে তিনি সাক্ষী দিবেন না, আদালত অবমাননার জন্য তাঁর ছয় মাস জেল হল।

ধীরে ধীরে ইংরেজের অত্যাচার চরমে উঠল, সমস্ত ক্লাব ও সমিতি বন্ধ করে দেওয়া হল। সব জায়গায় পিটুনি পুলিশ বসে জরিমানা আদায় করতে আরম্ভ করে। মুকুন্দ দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধ মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ, সতীশ চ্যাটার্জ্জী, পুলিনবিহারী দাস প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের জেলে পাঠানো হল।

ইংরেজদের অত্যাচারের ফলে বাঙলার বিপ্লবীরা আরো সক্রিয় হয়ে উঠল। সে সময়ে বাঙলার একটি বিশিষ্ট তরুণ সম্প্রদায় দেশের মুক্তি সাধনের জন্য গুপ্ত সমিতি গঠন করে। গুপ্ত সমিতি গোপনে গোপনে চারিদিকে নির্ভীক যুবকদের মধ্যে বিপ্লবের ভাবধারা প্রচার সুরু করে। বাঙ্গালার জেলায় জেলায় বিপ্লববাদীদের শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হল, গুপ্ত সমিতির সভ্যরা এবার প্রচার আরম্ভ করে যে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কখনও কোন দেশের মুক্তি আসে না, জনগণের মঙ্গল হয় না, আর দেশও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয় না। তারা স্বদেশী গান গেয়ে গেয়ে শোভাযাত্রা করে গিয়ে সভা জমাত, দলে দলে বিলাতী জিনিষের দোকানে পিকেটিং করত। তাদের দমন করবার জন্য সরকার আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কিন্তু সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের দমন করা গেল না।

বিপ্লবীরা সুযোগ পেলে ইংরেজদের হত্যা করত, আবার ইংরেজদের হত্যা করতে গিয়ে অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ে এবং ধৃত বিপ্লবীদের অনেককে ইংরেজ ফাঁসি দেয়, পুলিশের সন্দেহেও অনেকের দ্বীপান্তর, এবং অন্যান্য প্রকারের সাজা হয়, এত করেও বাঙালীদের আয়ত্তে আনা গেল না।

বাঙালার স্বদেশী ভাবধারা, এমন কি সন্ত্রাসবাদও বাঙালার সীমানা পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের বিভিন্ন দিকে, ভয়ের সঞ্চার হয় অত্যাচারী শাসকদের মনে, ইংরেজরা বুঝতে পারল যে, দমননীতি মানুষের মন দমন করতে পারে না, বাঙলার এই বিপ্লবের বহ্নি নির্ব্বাপিত না হলে যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে তারা এসেছে, সেখানে আবার ফিরে যেতে হবে পরাজয়ের কালিমা লিপ্ত দেহে। অবস্থা বুঝে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও পশ্চিম বাঙ্গালা আবার মিলে গঠিত হল বাঙ্গালা প্রদেশ এবং ইংরেজদের নতি স্বীকারের ফলে বিপ্লবীদের কাজ স্থগিত হল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বিপ্লবী বীর সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলন, ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন, বাঙালার গৌরব নেতাজী সুভাষ বোসের নেতৃত্বে ভারতের মুক্তির

জন্ম আজাদ হিন্দ বাহিনীর আসাম সীমানায় সংগ্রাম, বৃটিশজাতির মনে ভয়ের সঞ্চার করে এবং তারা বুঝতে পারে যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের ভারত ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু যদি ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করা না যায়, তবে ভবিষ্যতে কোন দিন তাদের ভারতে আসার সুযোগ হবে না, তাই ইংরেজজাতি বাঙ্গালা ভাগ করার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯০০ সালের প্রথমভাগে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্ম যে অভিনয় করেছিল, সে অভিনয় আবার আরম্ভ করে, তাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে আবার বিদ্বেষের অনল জ্বলে ওঠে এবং উহা সর্বাধিক সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে, সুযোগ বুঝে ইংরেজরা ভারতকে খণ্ডিত করে এবং ভারতের মধ্যবর্ত্তী বাঙ্গালা প্রদেশকেও দুই ভাগে বিভক্ত করে। এক ভাগ ভারতের সঙ্গে এবং অন্য ভাগ (পূর্ব্ববঙ্গ) নবগঠিত পাকিস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়, ভারত বিভাগের ফলে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হল বাঙ্গালী জাতীর এবং বাঙ্গালা প্রদেশের।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ভারতের বুকের ভিতর এবং পশ্চিম পাকিস্থানের মত কোন মুসলমান রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, তাই ভারতের নিরাপত্তার জন্ম, বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলের জন্ম, ভারতের অধীনে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তাই বর্ত্তমানে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যুগের নেতা সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত দেশপ্রেমিক মহাপুরুষের প্রয়োজন, যাঁহারা বর্ত্তমান অন্যায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করবেন, যাঁহারা হিন্দু মুসলমানদের বুঝিয়ে দিবেন যে ধর্ম্মমত বিভিন্ন হলেও বাঙালী হিন্দু মুসলমান একজাত, বাঙালার বাহিরে তাদের পরিচয় দিতে হয় বাঙালী বলে, বৃটিশের চক্রান্তে এবং কয়েকজন ধর্মান্ধ নেতার উস্কানিতে দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে বাঙলার শতকরা ৯৯ জন লোক তাদের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। দেশ বিভাগের পর বাঙালীদের সামাজিক জীবনে যেরূপ অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে, দেশ বিভাগের পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। দেশ বিভাগের পরিণতি স্বরূপ একই দেশে দুই সরকার গঠিত হওয়ায় শাসনতান্ত্রিক ব্যয় বেড়েছে দ্বিগুণ, তার উপর কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে বাস্তহারা সমস্যার সমাধানকল্পে, দুই দেশের দুই সীমানায় বিরাট সীমান্ত বাহিনী রাখার জন্ম এবং সেরূপ আরও অন্যান্ত কারণে, সে বিরাট ব্যয় প্রয়োজন হবে না। দুই বঙ্গ পুনরায় মিলিত হয়ে এক প্রদেশ গঠিত হ'ল এবং যে অর্থ দুই বঙ্গ মিলনের ফলে রক্ষা পাবে, তা জাতীয় কল্যাণের জন্ম ব্যয়িত হলে বাঙ্গালীজাতির নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য দূর হবে, বাঙ্গালা-প্রদেশ শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হবে, বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক জীবনে সুখ-শান্তি ফিরে আসবে, বাস্তহারাদের অভিশপ্ত-জীবনের অবসান ঘটবে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাঙ্গালা আবার সোনার বাঙ্গালায় পরিণত হবে।

উপসংহারে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের নিকট একান্ত অনুরোধ যে তারা একবার চিন্তা করে দেখুন, বঙ্গ-বিভাগের ফলে তাদের কত রকম দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাদের সামাজিক জীবনে কত বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এই সমস্ত বিবেচনা করে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে যে ভাবে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানরা মিলিত হয়ে দুই বঙ্গ মিলনের জন্ম চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টায় সফল হয়েছিলেন, সে ভাবে সকল সমস্যার সমাধানের জন্ম আবার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানদের দুই বঙ্গ মিলনের জন্ম চেষ্টা করা প্রয়োজন কিনা?

রাইনের মারিয়া রিল্কের দুটি কাবতা

আগমন

গোলাপের অন্তরে, প্রিয়তম, তোমার শয্যা বেছানো। তুমি, যদিও,
আমি (বেচারি সাঁতার সুগন্ধের বিপক্ষ স্রোতে)
মনে হয় হারিয়ে গেছি। এখন, জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথে
যারা (বহিঃস্থিত পরিমাপের অতীত) তিনবার তিন মাসের জীবন্ত,
আমিও তলাই ভেতরে, প্রকৃত সত্তা হবো। এক মুহূর্ত্তে,
দুই সহস্র বৎসর পূর্বে সে নতুন সৃজনে আমরা উভয়ে
কী উল্লসিত, যেমন দ্রুত মিলন ঘটেছে,
সহসা : মুখোমুখি তোমার সঙ্গে,
আম জন্ম নেবো তোমার উর্দ্ধ দৃষ্টিতে।

আকিলেজা গির্জায় পিয়েতা

……এবং তুমি দীর্ঘ হয়েছিলে,
কেবল, অতিদীর্ঘ বেদনার মতো,
সীমা ছাড়িয়ে মিনার উচ্চ
আমার হৃদয় ক্ষমতার। এবং এখন তুমি শায়িত
তাড়াতাড়ি আমার গর্ভে, আজ আমি অক্ষম
তোমায় জন্ম দিতে।

অনুবাদক—কমলেশ চক্রবর্ত্তী

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য

শ্রীনারায়ণ ভঞ্জ

অপ্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপ অবধারণে সহায় অনুমান, কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজন তদ্রূপ লক্ষণান্বিত অপর একটি বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান, যদ্দারা উহার কল্পনা করা যাইতে পারে; নতুবা উহা অবিজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থাও তদ্রূপ অব্যক্ত এবং অবিজ্ঞেয় যেহেতু উহার লক্ষণ প্রতিপাদনের যোগ্য কিছুই নাই। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে:—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।" ১।৫

বস্তুতঃ "তমোভূত" বা "শূন্যময়" বলিলে যে অবস্থা অভিব্যক্ত হয় না; কেন না, উহাতেও অন্ধকার বা আকাশের অস্তিত্ব সূচিত হয়; কিন্তু তদবস্থায় উহাও ছিল না; কিছুই ছিল না,—সে ভাব অব্যক্ত।

"ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ।" ১।৬

ইহাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথা। উপনিষদে কথিত হইয়াছে—"এক, বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতেই এই বিশ্বসংসার অকস্মাৎ প্রকটিত হইল।" অব্যক্ত হঠাৎ ব্যক্ত হইলেন কেন, অথবা ইচ্ছামাত্র এই বিরাট, বৈচিত্র্যময় বিশ্বচরাচর প্রকটিত হইল কিরূপে—বিজ্ঞানের যুগে এরূপ প্রশ্ন অবশ্য উঠিবে, কিন্তু ইহার সন্তোষজনক উত্তর মনুতে নাই, বেদে-পুরাণে নাই; পক্ষান্তরে বিজ্ঞানই কি এ বিষয়ে নিঃসংশয়িত সত্য প্রতিপাদনে সমর্থ? সুতরাং সে রহস্য-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা বৃথা—ইহা অবিজ্ঞেয় এবং অপ্রতর্ক্য।

যাহা হউক, সেই আদি সৃষ্টি পর্ব্বটা যেরূপেই হউক, সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষায় মূলতঃ মনুকথিত রীতিই বিদ্যমান:—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।" ১।৩২

অর্থাৎ স্রষ্টা প্রথমেই স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া মৈথুনিক বা sexual পদ্ধতিতে ইহার যে সূচনা করিলেন, অদ্যাপি সৃজন-ব্যাপারে সেই নিয়মই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এই প্রক্রিয়ার এক অংশে বীজ, অপর অংশে ক্ষেত্র, আর মধ্যে নিয়োজিত এক দুর্নিবার শক্তি উভয়ের সংযোগ-সাধনে। তাহা হইতেই নব নব প্রভব এবং বংশপরম্পরায় সৃষ্টিপ্রবাহের অগ্রসৃতি। জীবজগতে কি জরায়ুজ, কি অণ্ডজ উভয়বিধ প্রাণীই যে মিলনোদ্ভূত অর্থাৎ শুক্র-শোণিতসৃষ্ট ইহা তো প্রত্যক্ষদৃষ্ট, কিন্তু জড়জগতে তরবাদিও যে এই নিয়মাধীন উহাই সমধিক বিস্ময়কর। যে পরমাদ্ভুত কৌশলে বিশ্বনিয়ন্তা সৃষ্টিরক্ষার সুদুঃসাধ্য কার্য্যকে সহজ ও সাবলীল করিয়াছেন, তাহার তত্ত্বনিরূপণে মানব-বুদ্ধি একেই অসমর্থ, তদুপরি আবার এতৎসম্পর্কে কথা বলিবার অধিকারও এরূপ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ডাক্তারী গ্রন্থের sexology ব্যতীত) একান্তই সীমাবদ্ধ! সুতরাং অনেক স্থলে বিশদ বর্ণনার অভাব ঘটিবে; সুধী পাঠকবর্গ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

মনীষী জন্ ষ্টুয়ার্ট মীল্ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিতে রাজি ছিলেন না? যেহেতু, সর্ব্বশক্তিমানের আর কৌশলের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সর্ব্বত্র কৌশলজাল বিস্তৃত। বস্তুতঃ তাঁহার কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নিত্যদৃষ্ট ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধিতে আমরা অভ্যস্ত নহি, নতুবা একটি ক্ষুদ্রতম কীটেরও জন্ম যে কত বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের আহিত-কিমীয়, যন্ত্রাঢ্য বিরাট Laboratory সমূহে বহু প্রয়াসে যাহা সম্ভাবিত করিতে পারেন নাই, জীবোৎপাদনরূপ সেই সুদুষ্কর কার্য্য যিনি হস্তি-অশ্বাদি বৃহৎ প্রাণী দূরে থাক, চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র জীবাণু-দেহের ততোধিক ক্ষুদ্র রসায়নাগারে অবলীলাক্রমে সম্পাদিত করিতেছেন, তাঁহার মত কৌশলী কে আছে? কি বিচিত্র বিধানে এই রসায়নাগারে রস-রক্তাদি ধাতু নিচয় পাক প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নব জীবোৎপত্তিরই কারণ ভূত হইতেছে, আবার কিরূপে উহা দুই বিপরীত ধর্ম্ম পদার্থে পরিণত হইয়া পুরুষে শুক্র ও নারীতে আর্ত্তবরূপে উপচিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে সত্যই প্রতীত হয় যে, বিশ্ব-নিয়ন্তা শক্তি সহায়ে নয় পরন্তু কৌশলেই কার্য্যোদ্ধার করিতেছেন। নতুবা প্রজনন-ক্রিয়াকে তিনি অনন্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের মিলনাধীন না করিয়া স্বতঃসিদ্ধই করিতেন। কিন্তু কার্য্য কারণ নির্ণয় নিপুণ জ্ঞানস্পর্দ্ধী মানবের চিন্তাশক্তি ও বিচার বুদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া দিবার মত সে অসাধারণত্বও তাঁহার কার্য্যে যদি না থাকিত, তবে এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গের অবতারণাও অর্থহীন হইত। তথাপি সেই অসাধারণটাই কেন সৃষ্টির মুখ্য অর্থাৎ মূলনীতি হইল না, তৎসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে সংসার নাট্যলীলা একেবারে রসলেশশূন্য হইয়া দাঁড়াইত, সৃজনানন্দই জীবের চরম কাম্য, উহাতে তাহারা বঞ্চিত হইত। সিসৃক্ষার সক্রিয়ত্ব হেতু দ্বিধা-বিভাজিত স্ত্রী ও পুরুষের একার্দ্ধ অপরার্দ্ধের জন্য স্বতঃই আকুল। উহাদের অনির্ব্বচনীয় মিলনানন্দোপলব্ধেই তাই সৃষ্টির সম্ভাব্যতা।

"সম্ভাব্যতা" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, জীবোৎপত্তির কারণভূত হইলেও মৈথুনিক ক্রিয়া মাত্রই ফলোপধায়ক নহে; বিশেষতঃ জরায়ুজ প্রাণী-সমূহের ক্ষেত্রে। কারণ, জরায়ুতে শুক্র-শোণিত-সম্প্রাপ্তি আবার ঘটনাধীন। আদৌ জীবের প্রজনন-শক্তি কাল-নিয়ন্ত্রিত। সাধারণতঃ যৌবনই তাহার পক্ষে উপযুক্ত হইলেও বৈচিত্র্যময় নারী-জীবনে উহা আবার ঋতুপ্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন জীবে ঋতুপ্রবৃত্তির নিয়মও আবার বিভিন্ন রূপ—কাহারও ত্বরান্বিত, কাহারও বা বিলম্বিত। মানবী পক্ষে উহার প্রথমারম্ভ সম্ভাবনা একাদশ বর্ষে ("দশমে কন্যকাকালঃ তদূর্দ্ধে তু রজঃস্বলা"—মনু)। তদনন্তর প্রতি ২৮ দিন পরে উহার পুনরাবৃত্তি এবং সাধারণতঃ ৪০ বৎসরাবধি উহার প্রভাব। প্রত্যেক পর্য্যায়ে ঋতুপ্রবৃত্তির প্রথম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত গর্ভ গ্রহণের অধিকার কাল, তদন্তে নিষ্ফল। পশুদিগের পক্ষে আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে ঋতুপ্রবৃত্তির নিয়ম প্রত্যেক শ্রেণীর ভিন্নরূপ। তবে প্রায়শঃ বৃহৎ জীবে উহা বিলম্বিত এবং ক্ষুদ্র জীবে ত্বরান্বিত, দৃষ্ট হয়। গর্ভধারণ কাল সম্পর্কেও অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম।

অণ্ডজ প্রাণীদিগের ঋতুপ্রবৃত্তির নিয়ম শ্রেণীগত ভাবে কেবল বিভিন্ন নহে—বিচিত্র। পক্ষিকুলে হংস, পারাবত ও কুক্কুট ব্যতীত অন্যান্য পক্ষীদিগের বৎসরে নির্দিষ্ট সময় একবার মাত্র ঋতু হইয়া থাকে। মৎস্য, ভেক প্রভৃতি জলচর প্রাণীদিগেরও প্রায়শঃ এই

নিয়ম এবং ইহা শ্রেণীগত অর্থাৎ একই সময়ে তজ্জাতীয় সবাকার ক্ষেত্রেই সমানভাবে ঘটিয়া থাকে। তৎকালে পুং-সংসর্গ ঘটিলেই উহাদের গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু ঐ একবারের মত। পক্ষান্তরে একটি মক্ষিরাণী বারেকমাত্র পুংসংসর্গে সারাজীবনের জন্য প্রজননশক্তি সংগ্রহ করিতে পারে।

মৎস্য ভেকাদি এককালে যে অপরিসংখ্যেয় ডিম্ব প্রসব করে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হই। পরন্তু বর্ষায় নানাজাতি কীট-পতঙ্গ, শরতে নদীজলে কাঁকড়ার বাচ্চা এবং হেমন্তে দেওয়ালী পোকা প্রভৃতির বংশ বিস্তৃতি কি বিস্ময়কর! আবার উহাদের আবির্ভাবও কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৎসরের অন্য সময়ে ইহাদের কোনও অস্তিত্বই দৃষ্ট হয় না। স্বল্প পরিসর জীবনের কতিপয় দিবস মাত্র আনন্দক্রীড়া করিয়া চরম সময়ে ইহারা কি অপরিজ্ঞাত উপায়ে ভাবী কালের জন্য ভবিষ্য সন্তানগণের জন্মলাভের ব্যবস্থা করিয়া যায়, তাহা পরম রহস্যাবৃত। তথাপি বিশ্বের দরবারে ইহারাও সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়—জীবাণু-গোষ্ঠীর তুলনায়।

অণ্ডজ প্রাণীদিগের অপর অভিধা—'দ্বিজ'। অর্থাৎ একবার মাতৃজঠর হইতে এবং আরও একবার ডিম্বভেদপূর্ব্বক জন্ম হয় বলিয়া দ্বি-জন্ম আখ্যা দেওয়া হয়। এই ডিম্ব হইতে বাচ্চা জন্মাইবার প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। পক্ষিমাতা সযত্নে তা-দিয়া (তাপ) ডিম ফুটাইয়া থাকে, কিন্তু মৎস্য-ভেকাদি জলমধ্যে ডিম্ব প্রসব করিয়াই নিশ্চিন্ত; জলে ভাসিতে ভাসিতে এমন কি, মাতৃসান্নিধ্য হইতে শত শত মাইল দূরে গিয়া নিরাপদ হইয়াই যেন ডিম্ব হইতে সন্তানের নিষ্ক্রমণ! কারণ, মৎস্যমাতা স্বীয় ডিম্বের পালন অপেক্ষা গেলনেই সমধিক যত্নবতী। তবে এ বিষয়ে নাগমাতাই আদর্শস্থানীয়া। পক্ষান্তরে কর্কটমাতার অপত্যস্নেহের পরাকাষ্ঠা দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়,—কাঙ্গারুর থলির অনুরূপ ইহাদের তলপেটে, পৃষ্ঠদেশের আবরণ (খোলা) হইতে কিঞ্চিৎ কোমলতর যে নাতিক্ষুদ্র সম্পুট আছে, তাহারই মধ্যে প্রসূত ডিম্ব ধারণ করিয়া, বাচ্চা হইবার পর, ঐ অসংখ্য বাচ্চাকে স্বীয় জীবনরসে পুষ্ট করিয়া, সন্তানকল্যাণে নিঃশেষে আত্মদান করিয়াই জীবন-লীলা শেষ করে। এরূপ মাতৃত্ব-মহিমার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

জলচর কুম্ভীরাদি জলাশয়ের তটভাগে গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে এবং উহার প্রতি লক্ষ্য রাখে, ডিম্ব ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইলেই জলে লইয়া যায়। কৃকলাসেরাও শুষ্ক মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ডিম পাড়িয়া উহাতে মাটি চাপা দেয়। শাবকেরা যথাকালে স্বয়ং মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বাহির হয়। ষটপদ অর্থাৎ মধুমক্ষিকা, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি স্বীয় লালা-নির্ম্মিত কোষমধ্যে ডিম্ব প্রসব করে। উহাদের ডিম্ব ফুটিয়া প্রথমে কীড়াকারে, তদনন্তর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সন্তান বাহির হইয়া আসে। মধুমক্ষিকার চক্রনির্ম্মাণ কেবল মধুসংগ্রহের জন্য নহে, সন্তান উৎপাদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। উর্ণনাভ ভিত্তিগাত্রে অথবা বৃক্ষ ত্বকে ডিম পাড়িয়া তদুপরি ঐরূপ লালা-তন্তুর পুরু আস্তরণ রচনা করে এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া তাপ দিয়া ডিম ফুটাইয়া থাকে। কুমারিয়া পোকা ও কাচপোকা মাটির ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে এবং ডিম ফুটিবার পর কীড়াদশায় শাবকের খাদ্যের যোগান স্বরূপ ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ধরিয়া আনিয়া উহার ভিতর স্থাপিত করিয়া মৃৎপ্রলেপ দ্বারা সেই ঘরের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। অতঃপর বিনা তদ্বিরে শাবক সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হয়।

ডিম্ব জীবলক্ষণশূন্য উহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থে জীবের আভাষ থাকিলেও জীবনের আভাষ কিছুমাত্র থাকে না। কতিপয় ক্ষেত্রে মাতৃদত্ত প্রাণের তাপে উহাতে 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' হয়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহারও অভাব কেবল স্বভাববলেই অর্থাৎ কালানুক্রমেই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া উহা জীবরূপে প্রকটিত হয়। একটি হাঁসের ডিম ও একটি মুরগীর ডিম যুগপৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে পদার্থতঃ সম্পূর্ণ অভিন্ন প্রতিপন্ন হইয়াও সেই একই রূপ উপাদান হইতে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির দ্বিবিধ জীব কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার মীমাংসা কে করিবে? সকল সম্ভাবনার হেতু নিরসনেও ক্লেদপঙ্কে কৃমিকুলের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়, কে বলিবে?

জীবোৎপত্তির ন্যায় উদ্ভিদের উৎপত্তিকারণও যে মৈথুনিক অর্থাৎ দ্বিধা-বিভাজিত স্ত্রী ও পুরুষের মিলন-সাপেক্ষ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; বস্তুতঃ উহা বীজ ও ক্ষেত্রের যোগ-সম্পাদনরূপ কৃষিসাধ্য স্থূল ব্যাপার নহে, প্রকৃত স্ত্রী-পুরুষের মিলন-ঘটিত শুক্রশোণিত সম্প্রাপ্তির অনুরূপ নিগূঢ় তাৎপর্য্যপূর্ণ তথ্য। যেহেতু, বীজই উদ্ভিদ-জন্মের সূচনা, ক্ষেত্রে উহা অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত হয় মাত্র;—অণ্ডজ প্রাণীদিগের অণ্ডের সহিত ইহা তুলনীয়। ডিম্বের মধ্যে যেমন প্রজনন ব্যাপার সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, কাল উহাকে কলিত করে মাত্র, বীজের মধ্যেও তেমনই সম্পূর্ণতা থাকে উদ্ভিদের—অনুকূল পরিবেশ উহাকে প্রকটিত করে মাত্র। নারিকেল ও তালের বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমে এমন কি, ক্ষেত্রেরও মুখাপেক্ষিতা নাই, শূন্যমার্গে ঝুলাইয়া রাখিলেও নির্ব্বিবাদে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, অবশ্য বৃক্ষে পরিণতি লাভের কথা স্বতন্ত্র। কুষ্মাণ্ড (চালকুমড়া) ও কাঁঠালের ভিতর বীজ স্বচ্ছন্দে মূলপত্র বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উদ্ভিদের প্রজনন কার্য্য বীজ মধ্যেই সুসম্পন্ন এবং বীজ বৃক্ষোৎপত্তির নিদানভূত স্বয়ংসম্পূর্ণ পদার্থ ইহাও সংশয়াতীত। তাহা হইলে বীজের সহিত ক্ষেত্রের সংযোজন গৌণ ব্যাপার, সৃষ্টির মুখ্য সাধন বীজের উৎপত্তিতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কখন, কোথায় কি প্রকারে তাহা ঘটিল?

প্রজনন ব্যাপারে কি জীব, কি উদ্ভিদ উভয় এ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ উপায়ন পুষ্প, ইহারই পথে তাঁহার সৃজন লীলার জয়যাত্রা। স্ত্রীজাতির ঋতুপ্রবৃত্তির ক্ষেত্রে যেমন ইহার গোপন উন্মিষণ, উদ্ভিদেও ঋতু সমাগমে তেমনই ইহার প্রকাশ্য উদ্গমন। তথাপি জীব হইতে উদ্ভিদে ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, নারীর জরায়ুমূলে বিকশিত সেই পুষ্পের মধ্যে কেবলমাত্র আর্ত্তবগুণ, কিন্তু উদ্ভিদের শাখায় উদ্গত এই পুষ্পে একাধারে শুক্র শোণিত উভয় গুণই বিদ্যমান। প্রত্যেক পুষ্পের অভ্যন্তরে গর্ভকেশর ও পরাগকেশর পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট এবং পরাগরেণু গর্ভকেশরে প্রবিশনই পুষ্পের গর্ভাধান; তাহাতেই ফলোৎপত্তি আর ফলের ভিতরই উদ্ভিদের নিদানভূত বীজের জন্ম। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, ঐরূপ দ্বিবিধ কেশর একান্তে সন্নিহিত থাকিয়াও, উহারা মানুষের ভ্রাতা ভগিনীরই ন্যায় অবস্থিত—একই পুষ্পের

পরাগরেণু কদাপি ঐ ফুলের গর্ভকেশরে অন্তঃক্ষিপ্ত হয় না। তজ্জন্য প্রতীক্ষা অন্য ফুলেরই অনুরূপ অপর ফুলের। কিন্তু গতিশক্তিহীন পাত্র পাত্রীর সেই আকুল প্রতীক্ষার ফল কি, ঈপ্সিত মিলনের সম্ভাবনা কোথায়?

বস্তুতঃ ইহাও সম্ভাবিত হয় কৌশলী স্রষ্টার চাতুর্য্যপ্রভাবে। কাব্যশাস্ত্রে ফুলবালা রসবতী নায়িকা এবং ভৃঙ্গরাজ সুরসিক নাগররূপে পরিকল্পিত। ইহাদের বিরহ ও মিলনের অপূর্ব্ব কাহিনী প্রণয়াকুল মানব সমাজের উপজীব্য স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। কাব্যের কবি কল্পনা মাত্র হইলেও কথাটা আদৌ ভিত্তিহীন নহে,—সৃষ্টির মূলনীতি উহার অন্তর্নিহিত। নায়িকার রূপ যৌবন ফুলের সৌন্দর্য্য, সুরভি, পরিমল—আকর্ষণ প্রবল; কিন্তু যেহেতু নায়ক ভৃঙ্গরাজ, সেই হেতু রাজাদিগের ন্যায় তিনি 'সকৃৎপ্রণয়ী'। এক ফুলে তাঁর মন ভরে না, বারেকমাত্র মধুপান করিয়াই উড়িয়া গিয়া বসেন অন্য ফুলে,—উহা হইতেই হয় বিশ্বপিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধি। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন,—ফুলের অভ্যন্তরস্থ গর্ভকেশরই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত এবং স্থূলতর; উহা উপরের দিকে প্রসারিত, আর পুং-কেশরগুলি ক্ষুদ্র ও মধুচ্ছদে অবলিপ্তপ্রায়। এই জন্য একই ফুলের পরাগরেণু উহার গর্ভকেশরে পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু ভ্রমর যখন পুষ্পপুটে প্রবিষ্ট হইয়া হুলদ্বারা মধুচ্ছদ বিদ্ধ করতঃ মধুপানে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার লোমশপদগুলিতে ঐ সকল পরাগরেণু সংলিপ্ত হইয়া যায়। তদনন্তর অন্য ফুলে বসিবামাত্র গর্ভকেশরই ঊর্দ্ধে প্রসারিত থাকা প্রযুক্ত উহারই উপর তাহার পদসংলগ্ন পরাগরেণু পতিত ও রন্ধ্রপথে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে মধুলিহ জীবের সাহায্যে মৈথুনিক প্রক্রিয়ায় জড়-উদ্ভিদের বংশরক্ষা হইতেছে।

তবে উহাই যদি উদ্ভিদের বংশরক্ষার একমাত্র উপায় হইত, তাহা হইলে অনেক বৃক্ষ-লতার বংশলোপ বহুপূর্ব্বেই ঘটিত; কারণ অনেক প্রকার উদ্ভিদের আদৌ ফল প্রবৃত্তি নাই, আবার কতকগুলি এমনও আছে, যাহাদের ফল হয়, কিন্তু উহা বীজশূন্য এরূপ ক্ষেত্রে স্রষ্টা মূল, কন্দ, শাখা, পল্লব, এমন কি পত্র মধ্যেও উহাদের বংশ রক্ষার উপায়ভূত সৃজনীশক্তি নিহিত রাখিয়াছেন। কোথায়ও আবার দ্বিবিধ, বা ততোধিক ব্যবস্থাও বিদ্যমান। টগর, জবা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষে ফল হয় না; কিন্তু শাখা হইতে উহাদের নব নববৃক্ষের উৎপত্তি হয়। গাঁদা ও কৃষ্ণকলির বীজ ও শাখা দুইই কার্য্যকরী। পটোল ও বিম্ব বা তেলাকুচার মূল, বল্লী ও বীজ তিনই বংশবিস্তারে সমর্থ। বাঁশ, হিন্তাল, কদলী প্রভৃতির বংশধারা মূলগত,—মূল হইতে ইহাদের নূতন নূতন চারা বাহির হয়। তথাপি কদাচিৎ বাঁশের ফলোৎপত্তি হইতে দেখা যায় এবং ধান্য সদৃশ সেই বীজ হইতেও বংশের বংশরক্ষা হইয়া থাকে। বাঁশ একপ্রকার বৃহৎ তৃণ ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং ফল পাকিলেই মরিয়া যায়। তখন ঐ সকল বীজ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা বাহির হয়—উহা কঞ্চি হইতেও ক্ষুদ্রতর। কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তন নীতি অনুসারে উহাদের মূলানুসৃত, কয়েকটি বংশ পর্য্যায়ে উহা আবার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। বাঁশ নানা জাতীয় আছে, তন্মধ্যে বেউড় বা "কাটা বাঁশে"ই এই অভিনবলীলা প্রত্যক্ষভূত হইয়া থাকে। ইহাদের এইরূপ এক একটি পর্য্যায় আরম্ভ ও সমাপ্ত হইতে প্রায় ৩৬ বৎসর লাগে। বীজ গর্ভ কদলীরও বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়; কিন্তু ঐরূপ অতি ক্ষুদ্রত্বে সূচনা হেতু বহু বৎসরে ফল প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় কে থাকিবে তাহাও আবার বীচি-কলা।

ওল, কচু, আলু প্রভৃতির বংশবিস্তৃতি কন্দ হইতে। ইক্ষুর প্রতি গ্রন্থিতেই প্রজননশক্তি বিদ্যমান। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অমৃত বা গুলঞ্চ লতার যে কোনও ক্ষুদ্রতম অংশ স্বীয় বংশরক্ষায় সক্ষম। অমৃত নাম ইহার সার্থক,—শতচ্ছিন্না হইলেও ইহার জীবনান্ত হয় না। এমন কি, তদবস্থায় ভূমি সম্পর্ক বিযুক্ত করিয়া উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে স্থাপিত করিলেও উহা বাঁচিয়া থাকিবে এবং তথা হইতেই মূল বিস্তার দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ পূর্ব্বক বংশ বিস্তার করিবে। আবার হিমসাগর বা পাথরকুচির কার্য্য ততোধিক বিস্ময়কর। এই গাছের পাতা মাটিতে পড়িলেই উহার ঝালর তুল্য চক্রায়িত প্রান্ত ভাগের অসংখ্য গ্রন্থি হইতে রক্তবীজের উৎপত্তির ন্যায় অগণিত বৃক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করে।

বীজোৎপন্ন হইলেও উদ্ভিদগণের ভিতর বট, অশ্বত্থ ও উডুম্বরাদির চরিত্র অতীব বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফুল না হইয়াই ফল হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের পুংসত্ববাচক আখ্যা—বনস্পতি। ফলোৎপত্তির সহিত পুষ্পের শাশ্বত-বিধানের ইহা ব্যতিক্রম ইহাকে স্রষ্টার অন্যনিরপেক্ষ সৃষ্টিলীলার অন্যতম নিদর্শন বলা যাইতে পারিত, কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদগণ ঐ সকল বৃক্ষের ফলেরই মধ্যে পুষ্পত্ব আরোপ করিতেছেন। অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় উহারা পুষ্প; তখন সুকোমল দলরাজির পরিবর্ত্তে স্থূল আবরণ মধ্যে উহার যে কিঞ্জল্ক থাকে, তাহাই ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া ফলের আকারে পাকিয়া স্বাদিষ্ট হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্ত যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে তাল ও খর্জ্জুরাদির ফলোৎপত্তির তাঁহারা কি ব্যাখ্যা করিবেন? কিন্তু সে কথা রাখিয়া বনস্পতিগণের অত্যদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্তই অগ্রে কথনীয়। সাধারণতঃ বীজের ধর্ম্ম—সরস ভূমিতে পড়িলে অচিরেই অঙ্কুরিত হইবে; কিন্তু এই বনস্পতিগণের বীজ সে প্রকৃতির নহে,—স্বাভাবিক প্রজননশক্তি ইহাদের নাই; নতুবা সুপক্ব ফলের রাশি রাশি বীজ বৃক্ষতলে কর্দ্দমে মিশিয়া মাটি হইয়া যায়, কদাপি অঙ্কুরোদ্গম হয় না কেন? আর পক্ষিপুরীষে উচ্চ সৌধশিখরে উহাদের উৎপাদিকা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিতহয় কিরূপে? বলিতে কি, সৃষ্টি বৈচিত্র্যেরই ইহা অন্যতম নিদর্শন। যেহেতু, জীবভুক্তহইলে (ফলের সহিত) বীজের উৎপাদিকাশক্তি জঠরাগ্নিতে নষ্ট হইবারই কথা, কিন্তু বনস্পতির বীজ জীবের পাকাশয়ে পাকপ্রাপ্ত হইয়াই উৎপাদিকা শক্তি লাভ করে।

লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, তরমুজ প্রভৃতি লতা ফসলে বৈচিত্র্য ফলসনাথ পুষ্পোদগম; কিন্তু প্রথমতঃ উহাদের কতকগুলি নিঃসঙ্গ পুষ্প না হইয়া একেবারেই ঐরূপ ফলসহ পুষ্প হইতে দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ সকল পুষ্পে পরাগ রেণু লতাদেহে সঞ্চারিত হইবার ফলেই লতার ঐরূপ ফলসনাথ পুষ্প প্রসবের সামর্থ্য জন্মে। লতা ব্যতীত অন্য কোন উদ্ভিদে ইহা দৃষ্ট হয় না; কেবল দাড়িম্ববৃক্ষের প্রকৃতিতে ইহার সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান।

নারিকেলের বৈচিত্র্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ। অত্যন্ত সন্নিহিত বস্তুকে নাকি আমরা ভাল করিয়া দেখি না; তাই নারিকেলের মর্য্যাদা বোধে আমরা এত উদাসীন কিন্তু দূরাগত গুণগ্রাহী। বাবর শাহ ইহাকে সম্যকরূপে চিনিয়াছিলেন। এ হেন নারিকেলের

ফুল ও ফল একই কাঁদিতে হয়; কিন্তু ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি নহে—স্বতন্ত্রভাবে।

অতঃপর তালের কথা। ফলোৎপত্তির সাধারণ নিয়ম প্রমাণিত করিতে কেহ যদি তালের মুচিতে পুষ্পত্বের আরোপ করেন, তবে অসংকোচে বলা যাইতে পারে—তাঁহার তালজ্ঞান নাই। বস্তুতঃ উডুম্বরাদির ন্যায় ইহার ফল প্রথমাবস্থায়ও শূন্যগর্ভ নহে এবং তন্মধ্যে গর্ভপরাগ রেণুর অস্তিত্ব কল্পনারও কোন সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান নাই। তথাপি স্রষ্টার বিচিত্র বিধানে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের তিন আঁটি সমেত তালের বিরাট প্রকাশ, একান্তই অনস্বীকার্য্য।

খর্জ্জুরেও তালের মত স্বতোদ্ভব গুণই বিদ্যমান। তথাপি এই দুয়েরই পুষ্প প্রকারান্তরে হইয়া থাকে। কিন্তু পুষ্পের সহিত ফলের কোনও রূপ সাক্ষাৎসম্বন্ধ একেবারেই নাই। যে বৃক্ষে ফুল হয়, সে বৃক্ষে কোনওকালেই ফল হয় না এবং যে বৃক্ষে ফলোৎপত্তি হয়, তাহাতে কোনদিন ফুল হয় না। তবে একের পুষ্প প্রবৃত্তিই যদি অপরের ফলপ্রসবের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালার সেই প্রবাদবাক্য সত্যই এক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে;—

মা না বিয়ালো, বিয়ালো মাসী,
ঝাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী।

উদ্ভিদের কার্য্যপর্য্যালোচনা করিলে ইহাদেরও ইচ্ছাশক্তির কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। মনুষ্য, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির ন্যায় ইহারাও যে নিরন্তর বংশবিস্তারের জন্য ব্যস্ত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও ইহাদের আচরণে পাওয়া যায়। আওতার বাহিরে, দূরে—আরও সুদূরে গোষ্ঠিবৃদ্ধির চেষ্টা ইহাদের কতই না প্রবল! তজ্জন্য বীজের দূরপ্রাপণে ইহাদের কতই না কৌশল! ফলের স্বাদিষ্টতা, ফুলের সৌরভ, পত্রের সৌন্দর্য্য যেন সকলই সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়রূপে আকর্ষণ সৃষ্টি,—দূরে নীত হইবার প্রয়োজনে। যাহাদের তাদৃশ কোনও আকর্ষণ নাই, তাহাদের চাতুর্য্যই সম্বল। কাহারও ফলে কাঁটা, কাহারও চটচটে আঠা, উদ্দেশ্য—জীব-শরীরে বা চলমান পদার্থে সংলগ্ন হইয়া দূরে গিয়া বংশ-বিস্তার। অপামার্গ, চোরপাণ্টা তো চলেন একেবারে নরবাহনে। কাহারও ফলে তুলা ভরা,—বায়ুভরে তৎসংলগ্ন বীজ 'প্যারাসুটে' চড়িয়া সুদূরে যাত্রা করিবে। আবার "বাঁদরা" (পরগাছা) ও "আলোকলতা"র কৃতিত্ব আরও চমৎকার। ইঁহারা স্বয়ং লাফাইয়া পড়েন গিয়া দূরবর্ত্তী শিকারের ঘাড়ে। তবে তজ্জন্য সুযোগ প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়,—যখন প্রবল ঝটিকায় পাদপকুল বিধ্বস্ত হইতে থাকে, তখনই ইঁহাদের দূর-দূরান্তে গিয়া "কলোনী" স্থাপনের মরশুম—ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে চলে ইঁহাদের বিজয়-অভিযান। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা—যেখানেই পতিত হইবে, সেইখানেই পরস্বাপহারী দস্যুর ন্যায় উহার ত্বক হইতে রস শোষণ করতঃ আত্মপুষ্টি ও বংশবিস্তার করিবে। আলোকলতার এই শক্তি এমনই প্রচণ্ড যে, বিতস্তি পরিমিত স্বর্ণতন্তু সদৃশ উহার কোনও ছিন্নাংশ গাছের উপর গিয়া পতিত হইলেই অচিরাৎ স্বীয় প্রান্তভাগ দ্বারা বৃক্ষের শাখা বা পল্লবের কণ্ঠবেষ্টনপূর্ব্বক রস-শোষণকরতঃ দ্রুত সংবর্দ্ধিত হইবে এবং ক্রমে ক্রমে সেই বৃক্ষের উপরিভাগ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া উহাকে সূর্য্য-কিরণ সংস্পর্শে বঞ্চিত ও মৃতপ্রায় করিয়া ফেলিবে। কিন্তু ইহা হইতেও হিংস্র—জীবভুক্ শিকারী উদ্ভিদ আছে—"কলসী-গাছ"। লজ্জাবতী লতার ন্যায় তাহাদের স্পর্শশক্তি এমনই প্রখর যে, কোনও ক্ষুদ্র জীব তাহার পত্রপুটে আসিবামাত্র তাহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহার পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ আর সেই কলসীতুল্যপুট বাবৃত করিবে না।

আনারসেও বৈচিত্র্য অল্প নহে। উদ্ভিদের ফলপ্রসবের সাধারণ রীতি ইহাতে কিছুমাত্র নাই। গণ্ডগণ্ডের ন্যায় বৃক্ষকাণ্ডে ইহার উৎপত্তি এবং তাহাতে বীজ সমেত সুরসাল ফলের সমস্ত সম্পদ সংযুক্ত করিয়া বৃক্ষের পুনরায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি, আর শিরশ্ছেদের পরও সেই ছিন্ন শির হইতেই নবজীবনের সূচনা—আর কোথায়ও দেখা যায় না।

উদ্ভিদ যে কেবল স্থলেই হয়, তাহা নহে; জলমধ্যেও বহুবিধ আছে এবং তাহাদের বংশধারাও বহুবিধ বিচিত্র প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমতঃ শৈবাল,—ইহারা স্বজননশীল। আর্দ্র মৃত্তিকায়, এমন কি সুউচ্চ সৌধশিখরে যে শেওলা জন্মে, বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে, নিঃসন্দেহে প্রতীত হইবে যে উহা অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, কিন্তু উহাদের উৎপত্তি সৃষ্টির স্বভাবধর্ম্মেই হইয়াছে। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার না করিলে গলিত পঙ্ক হইতে পানাও ঐরূপে জন্মিতে দেখা যায়। শিউলী, ময়রা গাঁজ ও দাম জাতীয় জলজ উদ্ভিদের সামান্যমাত্র অংশও কোনওরূপে আসিয়া পড়িলে পরিষ্কৃত পুষ্করিণীও অচিরাৎ উহারা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সরোবরের শোভা নয়নানন্দকর ইন্দীবরের বংশবিস্তার পদ্ধতি এমনই চমকপ্রদ যে, জলাশয়ের মালিকের চক্ষে উহা সর্ষপপুষ্প রূপে প্রতিভাত হইতে অতি অল্প সময়ই লাগে। মূল, বল্লী ও বীজ ত্রিবিধ উপায়েই কুবলয়ের কুলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুমুদিনী এ বিষয়ে বিশেষ সংযত। ইহার লতা-বিস্তারের বালাই নাই, মূলদেশের 'গণ্ড' হইতে পর্য্যায়ক্রমে পত্র ও পুষ্প উদগত হইয়া, গভীর বা অগভীর যাহাই হউক, জলের উপরে ভাসিবার মত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। লজ্জাশীলা কুলবালার ন্যায় ফুলগুলি নিশাকালেই বিকসিত হইয়া শোভা বিস্তার করে আর দিবালোক প্রকাশিত হইতে দেখিলেই মুখাবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়। পুষ্প হইতে যে ফল জন্মে, তাহার বীজে প্রজনন-শক্তি থাকে, কিন্তু খাদ্যান্বেষী মানবের দৌরাত্ম্যেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। জলজ উদ্ভিদ সমূহের মধ্যে বংশ বিস্তারে কচুরিপানার খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত।

বলা বাহুল্য যে, উদ্ভিদজগৎ সর্ব্বতোভাবে ঋতুচক্রে নিয়ন্ত্রিত। ওষধিজাতীয় উদ্ভিদ সমূহ ঋতু-অনুসারেই জন্মে, ফুল-ফল প্রসব করে এবং যথাসময়ে মরিয়া যায়। তরু-লতা সকলও ঋতু-অনুসারেই পত্র-পরিহার, নব কিশলয় ও পুষ্পপ্রসব এবং ফলধারণ করে। কতকগুলি বৃক্ষের ফল প্রবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন চলিতে দেখা যায়, আবার অনেকের এমনও আছে, যাহাদের ফল বৎসরে একবার মাত্র ফলে, কিন্তু সম্বৎসরব্যাপী স্থায়িত্ব হেতু কোন সময়েই উহাদের অভাব বোধ করিতে হয় না। বেল ও আম্রাতক প্রভৃতি সেই জাতীয়। আম্রাতক বা আমড়ার পুরাতন ফল নূতনের সহিত একই সঙ্গে মায়ের কোলে শোভা বর্দ্ধন করে; তাই মৃতবৎসা জননী সযত্নে ইহার আঁটি নিজ সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দেন।

সৃষ্টির আনুকূল্যে সকল ঋতুরই কিছু-না-কিছু দান আছে; কিন্তু এ বিষয়ে বর্ষার সহিত কাহারও তুলনা হয় না। এই বর্ষা ঋতুতে স্থল-জল-অন্তরীক্ষে এককালে সৃষ্টির সমারোহ লাগিয়া যায়। কত অভিনব উদ্ভিদ, কত বিচিত্র কীট-পতঙ্গ-প্রজাপতি যে এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ষার আর এক অনন্যসুলভ দান—ছত্রক। গলিত তৃণ-কাষ্ঠাদিতে অথবা ভূমিভেদ পূর্ব্বক ছত্রের আকৃতি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা ধরণের এই পদার্থগুলি এ সময়ে যত্রতত্র আত্মপ্রকাশ করে। চলিত কথায় ইহাকে 'ব্যাঙের ছাতা' বলে। কথাটা সত্য হইলে প্রকৃতি মাতার ইহা ঘোরতর পক্ষপাত বলিতে হয়। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সর্দ্দি হইবার কোন আশঙ্কাই যাহাদের নাই, তাহাদের জন্য তাঁহার এই ছাতা বিতরণের দরাজ বন্দোবস্ত; আর আমরা মানুষেরা চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও ছাতা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া সর্দ্দি-কাসিতে ভুগিয়া মরি!

সৃষ্টি প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যাহা পরিবক্ত হইয়াছে, বৈচিত্র্য কিছু থাকিলেও তৎসমূহে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু এইবার যাহা বলিতে উদ্যত হইতেছি, তাহা একেবারেই কার্য্য-কারণের বহির্ভূত। আকাশের সর্ব্বানুস্যূত সত্তায় যাঁহারা আস্থাবান এবং সূর্য্যমণ্ডল হইতে আগত পার্থিব বায়ুস্তরে বিচরণশীল জীবাণুগণের প্রাকৃতিক আনুকূল্যলাভের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় স্বজনন-ধর্ম্মী জীবরূপে আত্মপ্রকটনে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহাদেরও নিকট উপহাসাস্পদ হইবার ভয়ে বলিতে সাহস হয় না যে, দেড় ফুট দীর্ঘায়ত দেহধারী কোনও জীবের সৃষ্টি নিরালম্ব শূন্যমার্গে সম্ভব হইতে পারে। তথাপি যদি খোষ-মেজাজে ও বহাল-তবিয়তে, প্রকাশ্য দিবালোকে, নিষ্পাদপ মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া, অকস্মাৎ শূন্য হইতে তালফলবৎ বস্তুপিণ্ডের পতন ও তাহা হইতে শতাধিক সর্পের ইতস্ততঃ পলায়ন-ব্যাপার দীন লেখকের একাধিক বার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য না হইত, তবে কদাপি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের অবতারণা হইত না। তবে ভরসা আছে—হয় ত কোনও বর্ষীয়ান্ পাঠক "হেলে-সাপের" এই অত্যদ্ভুত জন্মকথা সমর্থন করিবেন।

তুলসী কেন বরণীয়া?

শ্রীযুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায়

আজ হতে হাজার হাজার বছর আগে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী জন্ম নিলেন এক রাজার ঘরে। তারপর কত যুগ কত বর্ষ চলে গেছে, তবু নারায়ণপ্রিয়া তুলসী আজও ভারতভূমিতে বরণীয়া ও চির আদরিণী হয়ে মানুষের মনের মাঝে স্নেহের ও শ্রদ্ধার আঁচল পেতে প্রতি ঘরে বৃক্ষরূপে বিরাজিতা আছেন। এখনও প্রতি সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে কুলবধূগণ আর ফুলের মত ছোট ছোট শিশুরা শ্রদ্ধা ও প্রীতির মাঝে জ্বেলে দেয় সন্ধ্যার প্রদীপ তাঁর চরণকমলে। নত মস্তকে ভক্তি ভরে অর্ঘ দেয় তুলসীর স্মরণে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সুমধুর সংগীতের মাঝে করতালি দিয়ে করে চরণ-বন্দনা।

ভগবদ্‌ভক্তগণ আজও শ্রদ্ধাভরে বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীকে আদরে নিজ নিজ বক্ষে ধারণ করেন। কেমন করে সেই পরমারূপবতী তুলসী অখিল বিশ্বের নাথ শ্রীহরির বক্ষে মালা ও বিষ্ণুপ্রিয়া হলেন সে এক অতীত কালের পুণ্য কাহিনী।

রাজার দুলালী গুণময়ী তুলসী বাল্যে সকল খেলা ফেলে ছুটে যেতেন শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে, আর কচি কচি হাত ভরা ফুল এনে অঞ্জলি দিতেন শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে। নানা ফুলের মালা গেঁথে পরিয়ে দিতেন বিশ্বনাথের কণ্ঠে। ঘুমের মাঝে দেখতে পেতেন কমলাপতির চির-প্রসন্ন প্রেমময় মূর্ত্তি। আনন্দে ভরে উঠতো তাঁর শিশুমন। স্বপ্নের দেবতা হাসি ভরা মুখ নিয়ে মিলিয়ে যেতেন আকাশের বুকে।

সুখকর স্বপ্ন যেত ভেঙ্গে। জলভরা নয়নে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতেন আবার বিষ্ণুমন্দিরে। এমনি করেই তুলসী শ্রদ্ধায় অর্ঘ দেয় ভগবানের রাঙ্গা চরণে। যৌবনে তুলসী সবার অলক্ষ্যে হৃদয়ের অনন্ত প্রেম নিয়ে যান দেবতার মন্দিরে, আর রেখে আসে শ্রদ্ধা ও প্রীতি কমলাপতির শ্রীচরণে। তবু পাষাণ দেবতা বলে না কথা তাঁর সাথে, তাই ব্যথাভরা অন্তরে অশ্রু মাঝে ফিরে আসেন আপন ঘরে। রাতের অন্ধকারে আবার যান এগিয়ে হৃদয়ের একান্ত আশা নিয়ে, আবার আসেন ফিরে ব্যর্থ হয়ে নীরব অশ্রুর মাঝে।

পিতা তাঁর মনের কথা জেনে বিবাহের করেন আয়োজন। নানা দেশ হতে আসে বহু রাজকুমার বিচিত্র রথে, আর সুন্দর সাজে। তুলসী আসেন মালা নিয়ে কিন্তু দেখতে পান না তাঁর অন্তরের স্বামী ভগবান বিষ্ণুকে। পদ্মনয়ন জলে যায় ভরে, বেদনার মাঝে শূন্য হৃদয়ে যান ফিরে।

সহসা বিচিত্র সজ্জায় আসে অপরূপ সাজে ছদ্মবেশী শঙ্খচূড়। শঙ্খচূড়ের তেজোদীপ্ত ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি দেখে রাজগণ হন বিস্মিত। তুলসীর পিতা ভয়ের মাঝে করেন সাদর সম্ভাষণ। পিতার আদেশে তুলসী এগিয়ে যান মালা নিয়ে করকম্পন মাঝে। বেদনার অশ্রু যায় ভরে পদ্মনয়নে। দৈবের বশে তুলসী শঙ্খচূড়ের গলায় পরিয়ে দিলেন মালা। রাজগণ ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসেন যুদ্ধ করতে। প্রবল পরাক্রান্ত শঙ্খচূড় সকলকে করে পরাজিত। তুলসীর ললাটে যশের খ্যাতি আছে লেখা, তাই সবার অন্তরের ঠাকুর মহামুনি নারদ এলেন এগিয়ে, আর হাস্যিভরা মুখে বিদায়ের কালে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, কল্যাণময়ী তুলসী, বিধাতার ইচ্ছায় এই মিলন ঘটেছে, ওঁকে হাসিভরা মুখে বরণ করে নিও। ভুলে যেও না দৈবের দুর্ব্বার গতির কথা। তুমি যাঁকে চাও সেই অখিলবিশ্বের নাথ শ্রীহরি

ছড়িয়ে আছেন সবার অন্তরে এক আত্মরূপে। শ্রদ্ধা করো মানুষের অন্তরের স্বামীকে, তার মাঝেই খুঁজে পাবে একদিন তোমার চিন্তামণিকে।

বিধির নিয়মে যে এসেছে তোমার জীবন-পথের পরে, আদর করে নিও তারে আপন হৃদয়-মাঝে। স্বামীকে অন্তরে প্রেমের ও শ্রদ্ধার প্রদীপ জেলে গ্রহণ না করলে, তোমার পতিব্রতাধর্মের মর্যাদা হবে হানি, আর তার সাথে তোমার অন্তরের নির্মল জ্যোতি হবে ম্লান। কোন দিন হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে প্রকাশ হবে না কমলাপতির চিরপ্রসন্ন প্রেমময় মুখকমল। প্রেমরূপে আছেন বসে সবার হৃদয়ে জগতের স্বামী, তাই সোহাগের বাতি জেলে এগিয়ে যেও স্বামীর পাশে, তার মাঝে খুঁজে পাবে তোমার অন্তরের স্বামী।

মহামুনি নারদের কথায় তুলসীর হৃদয়ে জ্ঞানের ও প্রেমের প্রদীপ-শিখা ওঠে জলে। দেখতে পান সবার হৃদয়ে আপন প্রেমের ঠাকুরকে। হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে যায় স্বামীর ঘরে। গুণবতী তুলসীর গুণে আর পবিত্র জ্যোতিতে শঙ্খচূড় করে তাকে আদরের রাণী। নির্মাণ করে সুন্দরী তুলসীর প্রাসাদ যেখানে, তুলসী গোপনে প্রতিদিন স্বামীর মঙ্গলের জন্য করেন শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা, আর পবিত্র হোম।

বিষ্ণুবিদ্বেষী শঙ্খচূড় দেখতে পায় তুলসীর একান্ত আরাধনা, ক্রোধে নিক্ষেপ করে শ্রীমূর্ত্তি। তুলসীর নয়নে আসে জল, তুলে আনেন শ্রীমূর্ত্তি, চোখের জলে আঁচল দিয়ে প্রেমের মাঝে মুছিয়ে দেন শ্রীঅঙ্গ। তবু স্বামী যুদ্ধে গেলে তুলসী প্রাণের ঠাকুরকে সাজায় নানা ফুলে, আর তাঁর মঙ্গলের জন্য উপবাসী থেকে লক্ষ লক্ষ মহামন্ত্র করেন জপ। সতীর পুণ্যে ও ভক্তিতে বিষ্ণুতেজ হয় সঞ্চারিত স্বামীর অঙ্গে। শঙ্খচূড় হয় আরও দুরন্ত, দুর্বার গতিতে এগিয়ে যায় দেবলোকে। সর্ব্বত্র জয়ের মালা পরে শঙ্খচূড় ফিরে আসে আপন প্রাসাদে। হাসিভরা মুখে তুলসী এগিয়ে এসে পরিয়ে দেন হোমের জয়টিকা স্বামীর ললাটে। সতী তুলসীর বিষ্ণুতেজে শঙ্খচূড় হয় চিরজয়ী। তবু সে জানে না, তার আসল শক্তির উৎস কোথায়, তাই অহঙ্কারে এগিয়ে যায় সর্ব্বত্র ভীষণ করালমূর্ত্তিতে।

দেবতারা হন ভীত, স্মরণ করেন বিপদভঞ্জন মধুসূদন শ্রীহরিকে। সেই সময় গোলোকবিহারী শ্রীহরি এই পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়ে ব্রজে ব্রজদুলালরূপে অপূর্ব্ব ঐশ্বর্যময় লীলা করছেন। ব্রজের দুলাল শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র গুরু সান্দীপনির আশ্রমে শিক্ষা সমাপন করে ভক্তি ভরে দিতে চাইলেন গুরুদক্ষিণা। মুনি সান্দীপনি অশ্রুজলে বললেন নিজ পুত্রের করুণ কাহিনী। দুরন্ত শঙ্খচূড় করেছে বন্দী মুনির পুত্রকে। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগোবিন্দের চোখের সামনে ভেসে এলো দেবতার অন্তরের ডাক, আর আপন গুরুর বেদনাময় জীবনের কথা। চঞ্চল হলো তাঁর হৃদয়। একদিকে ভক্তের ব্যাকুল আহ্বান, অন্য-দিকে প্রিয়া তুলসীর প্রেমময় ভালবাসা তাঁকে নিয়ে এলো শঙ্খচূড়ের কাছে। মুনিপুত্র উদ্ধার ও প্রিয়া তুলসীকে হৃদয় বরণের মানসে শেষে এগিয়ে এলেন শঙ্খনিনাদ করে শঙ্খচূড়ের দ্বারে। শ্রীকৃষ্ণের তূর্য্যনিনাদ শুনে বলদর্পী অসুর ধনুকে টঙ্কার দিয়ে এগিয়ে এলো মহাসংগ্রামে। মহাসতী তুলসী স্বামীর অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে পরিয়ে দিলেন পবিত্র হোমের জয়টিকা। দুরন্ত মহামায়াবী শঙ্খচূড় প্রবলবেগে নানা অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেন কৃষ্ণবলরামকে।

শ্রীকৃষ্ণ দিব্য অস্ত্র হেনে ব্যর্থ করে অসুরের আক্রমণ। নানা দিব্য অস্ত্রের ঝনঝনার শব্দে দেবতারা হন শঙ্কিত। মেঘের কোলে ভেসে আসেন ভগবান শঙ্কর আর মুনি-ঋষিগণ, স্তব্ধ হয়ে দেখেন প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ। পুণ্যবতী সতী তুলসী উপবাসী থেকে লক্ষ লক্ষ মহামন্ত্র করেন জপ স্বামীর মঙ্গলের জন্য। সতীর বিষ্ণুতেজ সঞ্চারিত হয় অসুরের সারা অঙ্গে, তাই সে হয় আরো দুর্জ্জয়। শ্রীমাধব হলেন চিন্তিত অস্ত্র সব ব্যর্থ দেখে। ধ্যানের মাঝে জ্ঞাত হলেন শঙ্খচূড়ের দুর্জ্জয় শক্তির কারণ। তাঁর হৃদয়কমলে ভেসে এলো স্নেহময়ী তুলসীর স্মৃতি। কমলা-পতির পদ্মনয়ন ভরে গেল প্রেমাশ্রুতে। ব্যথিত হন প্রিয়া তুলসীর কথা ভেবে। বলরাম স্মরণ করে দেন মাধবকে দুষ্টের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণের জন্যই তাঁর ধরায় নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণের কথা।

ভগবান শ্রীগোবিন্দ ভক্তিমতী তুলসীকে দর্শন ও তাঁকে আপনার হতে আপনার করবার জন্য পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করলেন। বলভদ্র বলে দিলেন কৌশলে নিধনের কথা। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি শুনে শঙ্খচূড় আবার এগিয়ে এলো বিচিত্র রথে ও নানা দিব্য অস্ত্র নিয়ে। ভগবান কৃষ্ণ যুদ্ধের মাঝে নিজ দৈবী মায়ায় প্রকাশ হলেন দুই মূর্ত্তিতে। এক রূপে দুর্জ্জয় অসুরের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করেন, আর শঙ্খচূড়ের মূর্ত্তিমাঝে দেখা দিলেন প্রিয়া তুলসীকে। তুলসী আনন্দে এগিয়ে এলেন জয়মাল্য নিয়ে ছদ্মবেশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তুলসী যেই মাত্র মহামন্ত্র জপ ত্যাগ করেন, বিষ্ণুতেজ হয় অন্তর্হিত স্বামীর অঙ্গ থেকে। সেই অবসরে কৃষ্ণ করেন নিধন দুরন্ত মায়াবী শঙ্খচূড়কে।

তুলসীর অন্তরের জ্যোতি যায় নিবে, দিকে দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন দর্শন করে চিত্ত হয় ব্যাকুল। ধ্যানের মাঝে ভেসে এলো স্বামীর জীবনের বেদনাময় করুণ ছবি। ক্রোধে দূরে নিক্ষেপ করেন জয়মাল্য, আর নানা আভরণ। মহাসতী তুলসীর জ্বলন্ত পাবকসম মূর্ত্তি দেখে নারায়ণ হন ভীত। নয়নের বহ্নির মাঝে ত্রিলোক হয় কম্পিত। শ্রীগোবিন্দ প্রসন্নময় নারায়ণমূর্ত্তিতে প্রকাশ হলেন তুলসীর কাছে। হরমনোমোহিনী দেবী দুর্গা শান্তি রূপে প্রকাশ হলেন তুলসীর হৃদয়-মাঝে। তুলসী হন শান্ত। জলভরা নয়নে নারায়ণকে বলেন—প্রভু জন্মকাল হতে তোমার শ্রীচরণ ছাড়া এ দাসী আর কিছু জানে না। তার ফল কি এই নিষ্ঠুর বৈধব্য?

রাধাকান্ত শ্রীমাধব আপন রূপে প্রকাশ হয়ে মৃদু হেসে বলেন—বাল্য হতে তুমি আমার অন্তরের প্রিয়া। দৈবের প্রভাবে হয় তোমার মিলন শঙ্খচূড়ের সঙ্গে। তোমারই পুণ্যে আমার হস্তে নিধন হয়ে সে যাবে অমরলোকে বৈকুণ্ঠধামে। পাবে চিরমুক্তি। আর আজ হতে তুমি হবে আমার অন্তরের প্রিয়া। জগত মাঝে চিরপূজিতা হবে বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসী নামে।

প্রেম ভরে ভক্তগণ দেবে তোমায় সন্ধ্যার প্রদীপ। আর মালা করে কণ্ঠে তোমায় করবে ধারণ। ধরাতলে বৃক্ষরূপে থেকে সকলের পাপ হরণ করবে।

তাই আজও মানুষ প্রতি পুণ্য কাজে শ্রদ্ধা ও প্রীতির মাঝে প্রদীপ জেলে করে বরণ, আর নানা ফুলের মাঝে সাজিয়ে বৃক্ষরূপী তুলসীকে বন্দনা করে বলে—

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িন্যৈ সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

শীতের কথা

কাননবিহারী দে

ভারতবর্ষের আবহাওয়া নিয়ে আলোচনা করার সময় এসে গেল। মাত্র আর কয়েক সপ্তাহ পরেই কাগজে দেখা যাবে, গত ৬ ৭ বৎসরে এত গরম পড়ে নাই,—ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য আবহাওয়ার আর একটা দিক নিয়ে খবরের কাগজ ও রেডিও যে অবিরাম আলোচনা চালিয়েছেন, সেটা খবর হিসাবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কি না সন্দেহ। তবে শীতের শ্বেত-শুভ্র স্নেহকণা তুষারপাত এখনও পুরোদমে চলেছে—এর জন্যে যা কিছু অসুবিধা ও দুর্গতি সেটিই সাধারণের কাছে সব চাইতে বড় কথা। গত ১৭ বছরের মধ্যে নাকি মার্চ্চ মাসের অর্দ্ধেক দিন পেরুলেও এত ঠাণ্ডা আর তুষারপাত হয়নি।

গত বুধবার, ৯ই মার্চ্চ-এর পর এই এক সপ্তাহের ভিতরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩০ জনের প্রাণহানি হয়েছে তুষারের ঝড়ে। নর্থ ক্যারোলাইনা রাষ্ট্রের বহু জনপদ বরফে ঢাকা পড়ে যায়, রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবশেষে পৌর প্রতিষ্ঠান, সেনাবিভাগ ও বিমান বহরের প্রচেষ্টায় জনপদের বাসিন্দাদের খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

১৫ই মার্চ্চ মধ্যরাত্রি হইতে আইওয়া, ইলিনয়, উইসকনসিন, ইণ্ডিয়ানা ও মিশিগান প্রভৃতি রাষ্ট্রে পুনরায় তুষারপাত সুরু হয়েছে। ১৬ই মার্চ্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই তুষারপাত চলবে, এইরূপ পূর্ব্বাভাষ। ইতিমধ্যে চিকাগোতে প্রায় ৬।৮ ইঞ্চি তুষারপাত হ'য়ে গেছে। মিশিগান লেকের ধারে মিলওকি সহরে প্রায় ১৪ ইঞ্চি তুষারপাতের সম্ভাবনা। ১৬ই মার্চ্চ সকালে চিকাগোর রাস্তাঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তবে বিকেলের দিকে তাপমাত্রা কয়েক ঘণ্টা ২৩-৩৩° ফা থাকায় রাস্তাঘাটগুলি সন্ধ্যার দিকে কিছুটা পরিষ্কার করা সম্ভব হয়। আজ চিকাগোর দুইটি বিরাট বিমানঘাঁটি মিডওয়ে আর ও'হ্যার একেবারে চুপচাপ, কোনও বিমান উঠা বা নামা বন্ধ।

দপ্তরের হিসাব মত, আগামী চারদিনের মধ্যে বসন্ত ঋতু সুরু হয়ে যাওয়ার কথা। এখনও পর্য্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাসের জমা বরফ—না গলে রাস্তার ধারে স্তূপাকার হ'য়ে থাকায় সবাই আকাশের দিকে তাকাচ্ছে আর সাজসজ্জাহীন শীর্ণ গাছগুলোর দিকেও মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। একটু গরম পড়বে, রোদ উঠবে। রাস্তার ধারে জমা বরফগুলো গলে নালার ভেতরে যাবে—তার একটা কলকল শব্দ হবে। ন্যাড়া গাছগুলোর ডালে ডালে পাতা ও কুঁড়ি দেখা যাবে। মাঝে মাঝে দু'টো-একটা রঙিন পাখী ডেকে উঠবে। এই হ'ল বসন্ত ঋতুর আগমন সংবাদ। যেখানে একটু মাটি বেরিয়ে আছে সেখানে ঘাসের সবুজ রেখা দেখা পেতে এখনও দেরী আছে। ঘাসেরা নাকি উদ্ভিদ জগতের মধ্যে সব চাইতে সৌখিন। ঠিক যোগ্যমত আবহাওয়ার প্রতিশ্রুতি না পেলে ওরা মাথা তোলে না। ছোট্ট মাথা তুলতে না তুলতে মুড়িয়ে দিলে হয়ত আর ওঠাই হ'বে না। তার চাইতে রয়ে সয়ে ওঠাই ভাল। আমাদের মত সাধারণ মানুষের, ঘাসের দৃষ্টান্ত মেনে চলাই ভাল নয় কি?

এই শীত আর বসন্তের মাঝামাঝি সময়টার ভেতরে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করার মত। প্রথম সর্দ্দি-কাশির ধুম। জামা-জুতো আলগা করেছ দু'পুরের একটু গরমে, ব্যস। তার পর চলল চেন রিয়াক্‌সন। বাড়ীর একজন হ্যাঁচ করলে আর রক্ষে নেই। বাড়ী শুদ্ধ, তার পর ট্রামে, বাসে, হাটে বাজারে, ইস্কুল, কলেজে, অফিসে আর আর সর্ব্বত্র একচোট সবার ওপর দিয়ে হ'য়ে যাবে। মাত্র দু-একজন রেহাই পাবে—যারা জানে সর্দ্দিকাশির আক্রমণ থেকে দূরে থাকার কয়েকটা বাঁধাধরা নিয়ম।

শীতের দিনে সাধারণ পুরুষেরা ভেতরে গরম লম্বা আণ্ডার ওয়ার, গরম স্যুট আর তার ওপরে ওভারকোট পরে। সার্টের গলাটা তো টাই দিয়ে একেবারে এঁটে বাঁধা থাকে। স্যুটের আর ওভার কোটের মাঝখান দিয়ে স্কার্ফখানা (আমরা যাকে মাফলার বা কমফর্টার বলি) কাঁধ থেকে ঝোলে, গলাটা আরও একদফা ঢাকা দেবার ব্যবস্থা। গরম মোজা তো চাই-ই। অনেকে আবার দু'জোড়া মোজা পরেন। বুদ্ধিমানের জয় সর্ব্বত্র। তুষারপাত শুরু হ'লে চাই ওভারশু বা গাম্ বুট। প্যাণ্টের তলাটা মুড়ে, তার ভেতরে ঢুকিয়ে দাও। নতুবা বরফ ঢুকে মোজা ভিজিয়ে দিলে হাসপাতালে যেতে হবে। মানেই প্রাণান্ত। খরচে—সেবায় নয়। যত একটু একটু গরম পড়বে তত ভারী ওভার কোটের বদলে হাল্কা টপ কোট তার পর শুধু পশমের স্যুট—এই ভাবে কমতে কমতে দেখা যাবে জুলাই মাসে এ্যাসিটেটের (সিল্কের মত জিনিষ) হাল্কা পোষাক পরে জলের ধারে।

মহিলাদের ছবিটা শীতবস্ত্রের দিক দিয়ে ঠিক অনুরূপ নয়। কারণ আমাদের খুকীরা—দেশের সর্ব্বত্র মহিলা মহল-এর ঠিক স্বজাতীয় বলা যায় না। পাশ্চাত্যে মা, ঠাকুমা সবাই খুকী-শ্রেণীভুক্ত, অন্তত পোষাকে, কেবল বয়সে তফাৎ। অতএব সামাজিক সজ্জ-পোষাকে শীতের দিনে মেয়েদের কষ্টের সীমা নেই। সৌখিন জুতোর ওপর বুট পরা চলে না ও পরা যায় না। হাঁটু পর্য্যন্ত পা খালি। ঝড়ের দিনে কন্‌কনে হাওয়ায়, বাসের জন্যে ৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হ'লেই মা'য়ের জাত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গালি দিতে কুণ্ঠিত হন না। তবে সামাজিক সভা, সমিতি বা দপ্তরের কাজ ছাড়া মেয়েদের প্যাণ্টের মত পোষাকও চল আছে। তা ছাড়া আজ-কাল হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত মোজা পরার নতুন ফ্যাসন হওয়ায় কিছুটা রেহাই। এখানে বলা ভাল, পুরুষদের কেবল মাথায় টুপি ছাড়া কান ঢাকা দেওয়ার প্রথা নেই—যদিও ইয়ার মাপ বা কানের পুঁটলি ব্যবহার মাঝে মাঝে দেখা যায়। মেয়েদের কিন্তু কান মাথা স্কাফ দিয়ে ঢেকে চলার প্রথাই বেশী। শীত কমার সঙ্গে সঙ্গে মা'য়েরাও ভারী পোষাক ছেড়ে ক্রমে হাল্কা পরতে সুরু করেন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি পোষাকের পরিমাণ এত কমে যায় যে বস্ত্রাভাব, দারিদ্র্য না ফ্যাসন এই তিনটের মধ্যে কোনটা ঠিক গুলিয়ে যায়। তবে জলের কিনারায় 'পোষাকে' সব চাইতে বেশ স্বাধীনতা। উপসংহারে আরও দু'-একটা কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভাল।

যাঁদের অপেক্ষাকৃত অবস্থা ভাল, তাঁরা শীতের একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে একবার দক্ষিণের দিকে ফ্লোরিডা রাষ্ট্রের মায়ামি বা টেক্সাস রাষ্ট্রে কোথাও ঘুরে আসেন। বিমানের ভাড়া এদেশে সস্তাই বলা চলে। এই সব জায়গাগুলিতে শীতকালেও তাপমাত্রা ৫০—৭০° ফা থাকে। ভ্রমণকারীদের জন্যেই এই সব জায়গাগুলিতে হোটেলের ব্যবসাই প্রধান। আমাদের অবশ্য ছবিটা উল্টো, আমরা গ্রীষ্মে যাই দার্জ্জিলিং বা উটি (অনেক বন্ধুর মতে দার্জ্জিলিং নাকি বদ্দি, সেকেলে!)।

বাড়ীর ছাদে ছাদে জমা বরফ আস্তে আস্তে গলে পড়তে শুরু করবে। দিনে তাপমাত্রা ৩০।৩৫° ফা থেকে রাত্রে নামবে ২০° ফার কাছাকাছি। সেই গলা বরফের ধারাগুলি ইতিমধ্যে জমে যাবে। সকালে দেখা যাবে ছাদ থেকে ঝুলছে জমে যাওয়া জলের ধারা দেখতে সাদা মোমের মত, ওপরটা চওড়া, ঝলছে শিলিং থেকে—নাম আইসিকলস।

বরফ গলে রাস্তাঘাট পিছল ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে, প্রায়ই রাস্তার ধারে মোটর গাড়ীগুলি আটকে গিয়ে বিব্রত হয়। কান পাতলেই শুনতে পাবে চাকা ঘোরার সাঁই সাঁই শব্দ, গাড়ী কিন্তু নড়ছে না। যদি একমাত্র চালক গাড়ীতে থাকে তবে দুর্দশার একশেষ। ভাগ্যক্রমে পথচারী দয়া করে ঠেলে ঠুলে তুলে দিলে রাস্তায়—নতুবা উদ্ধার করার জন্যে ট্রাক ডাক তার বকশিস ২-৪ ডলার। সন্ধ্যায় বরফ গলে জল হয়ে জমে থাকে রাস্তার ধারে। গাড়ী দাঁড় করিয়ে গিয়ে দিব্যি সারারাত বিশ্রাম করলে, সকালে এসে দেখবে সেই জল আর তরল নেই, জমে পাথর হয়ে আছে, আর তোমার গাড়ীর টায়ারগুলোকে আঁকড়ে আছে শক্ত করে। ভাগ্য ভাল হলে একটু শাবল দিয়ে কুপিয়ে বেরিয়ে যেতে পার নতুবা পথচারী বা অন্য গাড়ীর চালক একটু ঠেলে দিলে। প্রায়ই দুর্গতির একশেষ। ট্রাককে ডাক—পয়সা দণ্ড দাও। বরফের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে স্নো টায়ার আছে, কিন্তু এই সব অবস্থায় তার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ।

ছোটবেলায় গরুর গাড়ীর চাকা আটকে গেলে কাঁধ দিয়ে ঠেলে তুলতে দেখেছি, অবশ্য কাহিনীও আছে 'পুট ইওর সোল্ডার টু দি হুইল'। বিজ্ঞানের যুগে হয়ত গল্পের শিরোনামা পাল্টাতে হবে—'পোর ইওর ডলার আণ্ডার দি হুইল' (Pour your dollar under the wheel) বললে খুব খারাপ শোনাবে না।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের একটি দিক

শ্রীগৌর দাস ও শ্রীবিশ্বনাথ নাথ

সমস্ত বৈষ্ণব কাব্য, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি জুড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ত্তমান অর্থাৎ যেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই ঐ সমস্ত গ্রন্থাবলী রচিত। তাই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের সম্পূর্ণ অংশ লইয়া আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে। যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদের বস্ত্রহরণ করিয়া সমাজবিগর্হিত কাজ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আবার হস্তিনাপুরের রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কালে তাঁহার লজ্জা নিবারণার্থে বস্ত্রদান করিয়াছিলেন—এইরূপ একই ব্যক্তির পক্ষে কিরূপে পরস্পর-বিরোধী কাজ সম্ভব হইল তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বৈষ্ণব কাব্য পড়িয়া যতদূর জানা যায় বৃন্দাবনের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ছিলেন। তিনি তাঁহাদের যে বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন একথাও শাস্ত্রানুযায়ী সত্য। কিন্তু নারীদের বস্ত্রহরণ যে কত অপরাধমূলক কাজ তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ যুগে যদি শ্রীকৃষ্ণ কোন নারীর বস্ত্রহরণ করিতেন কিংবা ঐরূপ করিবার চেষ্টাও করিতেন তাহা হইলে উত্তমরূপে উত্তম-মধ্যম প্রহৃত হইতেন এবং পুলিশ কর্ত্তৃক যে পাকড়াও হইতেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি সেকালের সমাজে ঐরূপ অপরাধমূলক কার্য্যের সমর্থন ছিল? কিন্তু মোটেই তাহা নহে। কেননা, যখনই কাল্পনিক দৃষ্টিতে 'বস্ত্রহরণ' বলিতে নারীদের যে অসম্মানসূচক 'বস্ত্রহরণ' বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় তখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নিন্দাবাদ করিতে অগ্রসর হই। আমাদের সকল শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকেই সেই 'একম্ অদ্বিতীয়ম্ পুরুষোত্তম ভগবান্' বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব স্বয়ং ভগবানের দ্বারা ঐ কাজ সমাধা হইতে পারে না।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের যথেষ্ট ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা সাধারণ মানবীয় ভালবাসা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নহে। ইহা ভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম। এই প্রেম মানুষের মধ্যে তখনই সম্পূর্ণরূপে উজ্জীবিত হয় যখন মানুষ বাহ্যিক সকল প্রকার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করিয়া একান্তই একাত্মভাবে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ভুলিয়া তদ্‌গতপ্রাণ হয় অর্থাৎ যখন মানুষ ব্রহ্মলাভ করেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত ভালবাসা সত্ত্বেও হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে লজ্জা-ভয় ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। ফলে দেখা গিয়াছিল, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সমীপে নিরাভরণা অবস্থায় লজ্জা বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, গোপীগণ তখনও সম্পূর্ণরূপে লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে প্রেম নিবেদন করিতে পারেন নাই অর্থাৎ গোপীগণের একাত্মবোধ জন্মায় নাই। তথাপি এই প্রসঙ্গে একজন নারীর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে, যিনি আপনার লজ্জা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আত্মনিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন।

একদা বিদুর-গৃহে বিদুরের অনুপস্থিতি কালে শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিদুরকে আহ্বান করেন। সে সময় বিদুরপত্নী গৃহে বিবসনা অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন। গৃহাভ্যন্তর হইতে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সেই সরলা রমণী প্রেমময় গভীরতা বশতঃ বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেইরূপই বিবসনা অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিরূপে অভ্যর্থনা জানাইয়া তুষ্ট করিবেন তাহা ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই রমণীর

এইরূপ গভীর উৎকণ্ঠা দেখিয়া নিজ অঙ্গ হইতে একখণ্ড বস্ত্র তাঁহার পরিধানের নিমিত্ত তাঁহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ইত্যবসরে বিদুর স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইলে স্বীয় পত্নীর এইরূপ অশোভন আচরণে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বিদুরকে তাহার পত্নীর ঐশ্বরিক প্রেমের গভীরতার মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিয়া তাহার পত্নীকে নির্দোষ বলিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং ইহাতে বিদুর তাহার পত্নীর পরম সৌভাগ্য দর্শনে অতীব বিমুগ্ধ হইলেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে—ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করিতে হয়, মহাভারতে বর্ণিত তথকথিত 'বস্ত্রহরণ' এই শিক্ষাই দিতেছে। সুতরাং সকল শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের আভ্যন্তরীণ সত্যতা যে রূপকচ্ছলে বর্ণনা করা হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ব্যক্ত করিতে কেন রূপকের সাহায্য গ্রহণ করিলেন সে কথা এই প্রবন্ধের উপসংহারে কিছু আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে আসা যাক।

অর্জ্জুন ছিলেন অদ্বিতীয় বীর। তিনি দ্রুপদ-গৃহের স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ পত্নীলাভ অর্জ্জুনের এক অধ্যাত্ম শক্তিলাভের প্রচ্ছন্ন পরিচয়। শাস্ত্রে কথিত আছে, নারীই পুরুষের শক্তি। যখন কোন ব্যক্তি অধ্যাত্ম শক্তিতে পারদর্শী গুরু দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আত্মার উন্নতি-মূলক কার্য্যে লক্ষ্যভেদ করিতে পারেন তখন তিনি এক অভিনব অধ্যাত্ম শক্তি লাভ করেন। এই শক্তিলাভ করার পরেও মানুষের কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের দ্বারা নির্য্যাতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই হেতু অর্জ্জুনপত্নী দ্রৌপদীকেও দুঃশাসন নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে দুঃশাসনের পরিচয় সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, দুঃশাসন অর্থে যাহাকে শাসন করা যায় না অর্থাৎ সেই রিপু শ্রেষ্ঠ কাম। মানুষ চরম অধ্যাত্মশক্তি লাভ করিতে না পারিলে এই প্রবলতম কামরিপুকে শাসন করিতে পারে না। সুতরাং অর্জ্জুনপত্নী দ্রৌপদী যে দুঃশাসন কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই যে, অর্জ্জুন নামক ব্যক্তির অধ্যাত্মশক্তি কামরিপু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাঁহারই অন্তর্নিহিত পরমাত্মা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই শক্তি রক্ষা পাইয়াছিল। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, দুঃশাসন প্রত্যেকেই এক একটি রূপক চরিত্র। আমাদের শাস্ত্রকারগণ রূপকের আশ্রয় লইয়া অধ্যাত্মবিদ্যার নিগূঢ় মর্ম্মার্থ সকল শাস্ত্রের মধ্যে পরিবেশন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই সকল চরিত্রে ঐতিহাসিক সত্যতা অনুসন্ধান করিতে গেলে আমরা বিশেষ কিছুই পাইব না এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে হারাইয়া ভুল পথে অন্ধের মত অনুগমন করিব।

এতাবৎ আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, পূর্ব্ব-কথিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও দ্রৌপদীকে লজ্জা নিবারণার্থে বস্ত্রদান আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী কার্য্য মনে হইলে উভয়ই এক উদ্দেশ্যমূলক। এই কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া রসময় শ্রীকৃষ্ণ মানবের মুক্তিদানের সন্ধান দিয়াছেন।

উপসংহারে শাস্ত্রে কেন রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাউক। আমাদের সকল শাস্ত্রই অধ্যাত্মবাদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই কঠিন বিষয়বস্তু সকলের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ রূপকের সাহায্যে উহাকে সহজ গ্রহণীয় করিয়াছেন। এইরূপ হাল্কা রসের মধ্য দিয়া পরিবেশনে উহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। জোর করিয়া বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না যে, পৃথিবীর সকল দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা একমাত্র ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রই অধ্যাত্মবাদের এইরূপ নিগূঢ় তত্ত্বের পরিচ্ছন্ন প্রকাশে সফলকাম হইয়াছে।

বিদায় প্রার্থনা

মফেজ আলী মিয়া

হয়েছে সময় এত দিনে
এইবার যেতে হবে চলি।
ডাকে মোরে অরণ্য পর্ব্বত
ছায়া-ঘন শ্যামল প্রান্তর,
সুবিশাল বটতরু মেলি শতবাহু
বারবার করিছে ইশারা—
যাবো হোথা চলি।
নাই সেথা জনতার ক্ষুব্ধ কোলাহল
হানাহানি স্বার্থ-শকুনির।
হেথায় প্রখর রৌদ্র—জীবন-সংগ্রাম
বিক্ষত তনু-মন
শ্রান্ত বিবশ—
পারি নাকো আর।
জননী বসুন্ধরা, ক্ষমা করো মোরে
আজ আমি যাচি আশ্রয়।

এত দিনে হয়েছে সময়।
পাণ্ডুর হয়েছে নভ—প্রদোষ এখন
এইবার যেতে হবে
শ্যামল বনানী ঢাকা
তরুছায়া-তলে।
বানপ্রস্থ দিন মোর এসেছে জীবনে,
ফণিনীর বিষজ্বালা দহিছে নিয়ত—
দিনে দিনে কৃশ হলো মন।
ক্লান্ত আমি পরাজিত—
এইবার মুক্তি চাহি
তোমাদের সবাকার কাছে।
চলে যাবো অরণ্য-গহনে
বাঁধিব একটি নীড়—রহিব সেথায়
ফিরিব না আর।
সময় হয়েছে এত দিনে, চলিনু এবার।
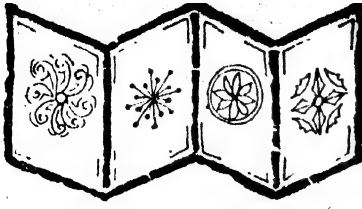
মহাকবি গ্যেটের প্রেমপত্র

[গত মাঘ সংখ্যায় এই লেখকের অনূদিত গ্যেটের পত্রাবলী আপনারা পড়েছেন। সে পত্রগুলি কবির প্রেমিকা ও প্রেমিকার স্বামীর কাছে লিখিত। আলোচ্য পত্রাবলীতে যে-সংকলন প্রকাশিত হল, সেগুলো প্রেমপত্র। তবে শার্লোট বাফের মত এ প্রেম একতরফা ছিল না। কেষ্টনারের মত এ প্রেমিকার স্বামী কৃষ্টি ও সংস্কৃতিবান ছিলেন না। গ্যেটের নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, শ্রীমতী ফ্রাউ ভন্ স্তায়েন কবির পূর্ব প্রমদাদের মাতার এবং ভগিনীদের স্থান অধিকার করেছিলেন। শ্রীমতী স্তায়েন ছিলেন সাত সন্তানের জননী। ভাইমার রাজসভায় শ্রীযুক্ত স্তায়েন অশ্বারোহী বাহিনীর কর্মচারী ছিলেন। গ্যেটে অপেক্ষা শ্রীমতী স্তায়েন আট বছরের বড় ছিলেন। শ্রীমতী স্তায়েন লিখিত কোন পত্রই পাওয়া যায় না। শ্রীমতীর সঙ্গে গ্যেটের চুক্তি ছিল, শ্রীমতী কর্তৃক গ্যেটেকে লিখিত পত্র নষ্ট করে দিতে হবে। প্রেমিক কবি তাঁর সর্ত্ত সম্পাদন নিষ্ঠা সহকারে করেছিলেন। শ্রীমতী স্তায়েনকে গ্যেটে সামান্ত তুচ্ছতম ঘটনাগুলো লিখে পাঠাতেন হয়ত একটুকরো কাগজের মধ্যে। প্রায় দশ বছরব্যাপী এক উষ্ণ অনুরাগ শ্রীমতীর সঙ্গে গ্যেটের বর্ত্তমান ছিল। স্তায়েন অজ্ঞান সিদ্ধহস্তা ছিলেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী গ্যেটের এটি পঞ্চম প্রণয়। চতুর্থ প্রণয়ের পাত্রী শার্লোট বাফের কাছ থেকে প্রবঞ্চিত হয়ে গ্যেটে লিলির প্রেমে পড়েন। লিলিও কবিকে ভালবেসেছিল। প্রতিবন্ধক দাঁড়াল আত্মীয়স্বজন। ভাইমার রাজসভায় শেষে গ্যেটে চলে যান। শ্রীমতী স্তায়েন ছাড়া আরও দুই রমণী কবিকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। একত্রে তিন রমণী কবির জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রথম জন শ্রীমতী স্তায়েন, দ্বিতীয় জন অভিনেত্রী করোণা শ্রোয়টার—ইনি অভিনয়ে ও কয়েকটি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন। তৃতীয় জন হলেন মার্চেসা ব্রানকণি। অভিনেত্রী করোণা শ্রোয়টারের সঙ্গে কবি স্বরচিত নাটক ইফিজিনীতে এক আবেগময় ভূমিকায় সাফল্যের সহিত অভিনয় করেন। শ্রীমতী স্তায়েন এই মেলামেশা দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। মার্চেসা ব্রানকণিকে কবি উপেক্ষা আর অনীহা দিয়ে এড়িয়েছিলেন; তবে সে-প্রেমে কবির নাভিশ্বাস উঠেছিল। শ্রীমতী স্তায়েন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যখন তাঁর অজানতে গ্যেটে ইটালীতে চলে যান, এই অবৈধ প্রণয় ছিন্ন করবার জন্ত ইটালী ভ্রমণান্তে ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াসের সহিত গ্যেটের অবৈধ সম্পর্ক দেখে শ্রীমতী স্তায়েন আরও মরীয়া হয়ে ওঠেন। শেষে সম্পর্কে ছেদ পড়ে। ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াস অতি নগণ্য ঘরের রমণী ছিলেন। গ্যেটে প্রথমে এই মহিলাকে পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত এবং অবশেষে বিবাহ করেন।—সম্পাদক]

কোন নিয়তির যন্ত্রণায় জড়িয়ে পড়েছি এত কাছাকাছি। আমাকে জেনেছ তুমি একটি দৃষ্টিতে। যা তুমি জেনেছ তা কেউ জানে নি বা কেউ জানতে পারে নি। তুমিই আমাকে পরিচালিত করতে পার। অসুস্থ রক্তপ্রবাহে তুমিই সান্ত্বনা আমার। তোমার বাহুমাঝে আমার শান্তি।

শ্রীমতী স্তায়েনকে লিখিত গ্যেটের পত্রাংশ।

আমরা কোন জন্মে বোধ হয় স্বামী স্ত্রী ছিলাম। তা না হলে আমার জীবনে এ রমণীর কী গূঢ় সার্থকতা থাকতে পারে।

ওয়েল্যাণ্ডকে লিখিত শ্রীমতী স্তায়েন বিষয়ে গ্যেটের পত্রাংশ।

এ মহিলা আমার জীবন থেকে জালের আবরণ দূর করে দেয়।

ল্যাভেটরকে লিখিত শ্রীমতী স্তায়েন বিষয়ে গ্যেটের পত্রাংশ।

গ্যেটে কর্ত্তৃক শ্রীমতী স্তায়েনকে লিখিত

মার্চ্চ ১৭৭৬

কুয়াশায় আর তুষারে তোমার জন্ত ফুল তুলি। আমার প্রেম যে জীবনের ঝড়ে আর শৈত্যে পরিব্যাপ্ত। আজ আমি আসতে পারি। আমার মনে শান্তি আছে। আমি বেশ ভাল আছি। আমার মনে হয় আগেকার চেয়ে আমি তোমাকে ভালবাসি। আর এর তাৎপর্য্য আমি নতুনভাবে অনুধাবন করি। ইতি

২৪ মার্চ্চ ১৭৭৭

হে আমার মানসী, আবার বিদায় জানাই। আমি বুঝতে পারছি যে প্রেম হল মাটিতে শস্য ছড়ানোর মত অলক্ষ্যে জেগে ওঠে মুকলিত হয় তারপর বিকশিত হয়। এ সব বস্তুকে যেন ভগবান আরও আশীর্ব্বাদ জানান। ইতি

২২শে জুলাই

পাহাড়ের অন্যদিকে আমি ছবি আঁকছিলাম। আর ভাল লাগছে না। আমার ঘর থেকে লেখাই ভাল। এখানে বিশ্রামের জন্ত কিছুদিন থাকতে চাই। প্রিয়তম, কত ছবি আমি এখান থেকে এঁকেছি। তবু স্পষ্ট বুঝতে পারছি, জীবনে শিল্পী হতে পারব না। প্রেম আমাকে সব কিছু দেয়। যেখানে প্রেম নাই সে স্থানটি আমার কাছে আগাছার স্থান বলে মনে হয়। আর এ সব আগাছা শস্য নয়। বর্ণাঢ্য ছবি আমি আঁকতে পারি না। তবে নিখুঁত নিরাবরণ ছবি আমি সহজে আঁকতে পারি বেশ মনোরমভাবে। গভীর মনে বর্ষা নামছে। তুমি যদি এখানে

তাহলে ছবি ত ছায়। সব কিছু চলে যেত বর্ণনার বাইরে। এখানে আসবার পর অনেক ছবি এঁকেছি। ছবিগুলো নগণ্য। চোখ দিয়ে, হাত দিয়ে পরখ করলেও তা অন্তরে সাড়া দেয় না। তাই আর দেখবার কিছু নাই। যে কেউ কবি হোক, শিল্পী হোক বা মানুষ হোক নিজেকে সম্বৃত করা এক চিরন্তন সত্য। প্রয়োজন, ভালবাসা, কতগুলো বস্তুকে অবলম্বন করে কোন কিছু ধরে থাকা, কোন জিনিষকে সব দিক থেকে দেখা এবং তাদের সঙ্গে ঐক্য। অনুভব করা এক চিরন্তন সত্য বিদায়। খাড়া পর্বত আর পাইনের বনের দিকে আমি তাকাব। এখনও বাদল ঝরছে।

ইতি

3rd May 1777

শুভ সকাল! গতকাল কেমন ছিলে। ভৃত্য আমার জন্য একটা ওমলেট বানাল। তারপর নীল রঙ-এর পোষাক পড়ে বাইরে বার হলাম।প্রথমে বেশ শুকনো আবহাওয়া ছিল, তারপর ঝড় বাদলের মধ্যে বেশ স্বচ্ছন্দগতিতে চললাম। দেরীতে ঘুম আমি পছন্দ করি না। তোমার স্বামী যদি গৃহে থাকেন তা হলে বল নতুন ঘোড়াকে বাগ মানাতে আমি চেষ্টা করব অবশ্য তিনি যদি বল্গা লাগিয়ে আমার কাছে ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। সম্ভবতঃ তিনি তার রূপ আমার মধ্যে দেখবেন। প্রিয়তম, মধ্যাহ্ন ভোজে হয় ত তোমার কাছে আমি যেতে পারি। তোমাকে আগামী কাল ফুলের স্তবক দেব বলে এক সপ্তাহব্যাপী আমি ফুল বাছাই করেছি। ইতি—

12 June 1777

ঘরের বাইরে বাগানে তুমি যখন আমাকে ছেড়ে গেলে তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কিছু ঐশ্বর্য্য আছে। কর্ত্তব্য পালনের কিছু আছে। আমার অন্য সব তুচ্ছ বাসনা, বিক্ষিপ্ত ভাব প্রেমজাত চাপল্য বিক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পেয়ে তোমার জীবন বৃন্তেই আমার প্রেম ফিরে যায়। যার ফলে আমার স্বরূপকে আমি চালিয়ে নিয়ে যাই, কিন্তু যখনই তুমি দূরে থাক তখন সব কিছুই আমার ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে। বেলভিডিয়ারে আজ সকালে গিয়ে মাছ ধরে সেখানেই খেয়েছিলাম। সেখানে আমার এক পরিচিতের তনয়া উপস্থিত ছিল। রান্না খাসা হয়েছিল লিখে চলছি। হাতে আঠা লেগেছে। গাছ-গাছালির পরিচর্য্যা আমি করছি। ঝড়তি-পড়তি সব ঠিক করে দেব। চিকিৎসার জন্য গাছগুলি বহুদিন থেকে যেন কাঁদছে। গাছগুলির মুক্তি আমি দেব। কবি আর প্রেমিক মালী গড়তে পারে না। কারণ হল, কবিরা প্রেমিক আর না হয় প্রেমিকেরা কবি। বিদায় প্রিয়তম! তুমি সর্বদা আমার হও কারণ আমি যে তোমার। আমার জীবনের ঐশ্বর্য্য, বিদায়। ইতি—

13 Sept. 1777

প্রিয়তম, ওয়াটবুর্গে এসেই ঈশ্বরের স্তোত্র করেছি—যিনি নানা দুঃখ ও কষ্টের মধ্যে থেকে আমাকে তুলে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উচ্চাসনে। ডিউকের প্রস্তাবে আমি এখানে চলে এসেছি। স্থানীয় লোকের সঙ্গে আমার করণীয় কিছু নাই। এই সব লোক হয় সত্য ভাল। তবু তারা আমার কাছে নাই। তাদের মধ্যে অনেকে ভাবে যে তারা আমাকে ভালবাসে। এটা অবশ্য সত্য নয়।

প্রিয়তম, এই রাতে গৃহে তুমি আসীন হয়ে আছ এই কথাটা ভাবছি। তুমি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে আগুনের ধারে শীতে বসে আছ এই কথাটাই আমি কল্পনা করছি। এখানকার শীত ও স্যাঁৎস্যেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে বাগান ছেড়ে আমাকে থাকতে হবে। দূরে। সেই বাইরের দৃশ্য যদি তোমাকে আজ দেখাতে পারতাম। এই নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার জন্য কোন কিছু খরচ নাই। শুধু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলেই হল। কত প্রশস্ত উপত্যকা, প্রান্তরের স্তর, বন, অরণ্যানী, বালিয়াড়ী প্রভৃতি চন্দ্রিমার কোমল কিরণে উদ্ভাসিত। পর্বতের দুর্গপ্রাকার ছাড়া আর সব আঁধারে ছেয়ে গেছে। এমন কি পর্বতের সানুদেশে অন্ধকার। শুধু পাহাড়ের চূড়াগুলি চন্দ্রিমার আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে। নিম্নে জল বিভাজিকা আর উপত্যকা। প্রকৃতির এর পরই থরজিয়া বনভূমি, প্রিয়তম কী মধুর এ আনন্দ। যদিও এ আনন্দ থেকে আমি কিছু পাইনি। মনে হচ্ছে কতকাল বাঁধা পড়েছিলাম। আজ আমি হাত মেলে মুক্ত হচ্ছি। ধন্যবাদের স্পগা এসেছে। তৃষ্ণার্ত্ত আমি জলপান করে মনোরম প্রভৃতি আকর্ষণ ও বসন্তের প্রতি আমি তাকাচ্ছি। একটা ছোট কোণ খুব একটা ছোট কোণ আমি বেছে নেব। দার্শনিক প্রকৃতি এখানে উৎসারিত। তারপর সেই ছোট কোণ! আঃ। এসব কিছুর বর্ণনা দিতে নাই, লিখতে নাই। এই অবসরে তোমাকে আবার জানাই যে আমি বেঁচে আছি। সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। তা হলে আমি যে কত সুখী হব। আমার এই নিঃসঙ্গতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিশ্চয়ই অন্য একটি পত্রে মন দিয়ে তুমি আনন্দ পাচ্ছ বা আমাকে তুমি নিশ্চয়ই লিখছ।

ইতি—

14 Sept 1777

একটা চিন্তা জেগেছে আমার মনে। আঁকা হচ্ছে আমার কাছে খেলনার মত—যে খেলনা একটা শিশুর মুখে গুঁজে দেওয়া হয়েছে শান্ত করবার জন্য। এই স্থানটি খুব মনোরম। এত মনোরম স্থান এর পূর্বে আমার জানা ছিল না। দৃশ্যের শিখরের একটা শান্ত ঔদার্য্য আছে। যে সব অতিথি এখানে আসে তারা মোহিত হয়ে পড়ে। তোমাকে চিঠি লেখার জন্য কত পত্রই না নষ্ট করলাম। কী বৃথা প্রচেষ্টা প্রাচীন শিল্পীদের কথা ভাবলাম, যারা ধ্বংসাবশেষের ওপর মহাকালের মত বসে সব কিছু সীমারেখাকে রেখাঙ্কিত করেছে, মানুষের নগ্ন আবরণকে প্রকৃতির মধ্যে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করেছে। মহাকালের গোপন পথযাত্রা আর তার প্রয়োজনীয়তা মানুষ ও শিল্পীর কাছে কি তা বোধ হয় ঈশ্বর জানেন। আমাদের মধ্যেই যে ঈশ্বর, একথা আমি বেশ ভালভাবে জানি। তবে কী ভাবে তা আমি প্রকাশ করব। রাত সাড়ে এগারটা। শহর থেকে আমি এখানে হেঁটে এসেছি। মনোরম রাত। চন্দ্রালোকিত রাতে দুর্গে উঠতে কী শিহরণ যে লাগে। যখন ডিউক এখানে এসেছিলেন তাঁকে এ কথা বলেছিলাম, আমাদের জীবনে কী এক অদ্ভুত পরিবেশ এসেছে। এক মাস আগে এখানে থাকবার কথা বলে অবাক হতাম। এখন সব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এটা গৃহের মত মনে হচ্ছে; পাখীর কাছে যেমন নীড় মনে হয়।

আমার কাছে কতগুলো সুন্দর সজীব গাছ এসে পৌঁছেচে। সেগুলো চেরী এবং নানান ধরণের গাছ। কখন যে এগুলো তোমায়

পল্লীগৃহে পৌঁছাবে। সযত্নে চারাগাছগুলো পুঁতবে এবং বেশ সযত্নে রাখবে। চারধারে বেশ শক্ত কাঁটাগাছের ঘের দিও, তা না হলে খরগোস সব নষ্ট করে দেবে।

গতকাল তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে আমার মধ্যে একটা চিন্তা পেয়ে বসেছে। সে চিন্তার প্রথম কথা হল আমি কী তোমাকে গভীরভাবে ভালবাসি বা তোমার যে সাজুয্য চাই যা লোকে চেয়ে থাকে দর্পণের কাছ থেকে। আমি বুঝতে পারছি সত্যই তোমাকে আমি দর্পণের মত ভালবাসি; তার প্রতিফলন থেকে আমার সমস্ত সত্তাকে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি।

তারপর ভাবছিলাম, আমার ভাগ্যজালকে কী ভাবে মাটীর সঙ্গে রোপণ করা হল। গাছের সজীবতাই বা কী ভাবে এল। তবু এই সজীবতা না থাকলে গাছ যে মরে যায়। তবু কয়েক বছরের জন্য স্তম্ভের মত সে গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকে, কয়েক বছরের জন্য। বিদায়! হঠাৎ গত বছরের ৭ই নবেম্বরের একটা দেওয়ালপঞ্জী দেখলাম। পড়লাম, হে ঈশ্বর, মানুষ কে, যার প্রতি তুমি এত করুণাময়। ইতি

12th May 1779.

সত্যি কথা বলছি, তোমার কাছ ছেড়ে দূরে আমি থাকতে পারি না। আমি একটা ছোট কাঠের টুকরো। একই স্থানে আছি, আর বার বার ঢেউ আমাকে ধুয়ে দিচ্ছে। প্রবাহিত হওয়ার জন্য জলের আর প্রয়োজন নাই। তোমার জন্য কতগুলি ফল ও ফুল পাঠাচ্ছি। আমার কথা চিন্তা কর। ইতি

7. 9. 80

হার্জ পর্বত থেকে লিখছি। দিনটা উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। রাতে অল্প বাতাস বইছিলো। আজকের আবহাওয়া ভাল যাবে। যাত্রার পূর্বে তোমাকে শুভ সকাল জানাই—ইতি।

আমার কাছে তোমার প্রেম প্রভাতীতারার মতন, সন্ধ্যাতারার মতন। একতারা সূর্য্য অস্তাচলে যাবার আগে ওঠে অন্যটি সূর্য্য অরুণ অচলে জাগবার আগে ওঠে। সত্য কথা বলতে কী এ হল ধ্রুবতারা—যে তারা কখনও ওঠে না। এ শুধু আমাদের মাথার ওপরে নিরাবরণ মালা গেঁথে চলছে। প্রার্থনা করি, জীবনের পথে ঈশ্বর যেন এ তারাটিকে মসীলিপ্ত না করেন। বসন্তের প্রথম বর্ষা আমাদের কর্মসূচী হয়ত নষ্ট করে দিতে পারে। তবে তা গাছগুলোকে সজীব করবে এবং অল্পদিনের মধ্যে শ্যাম সমারোহ আমরা দেখতে পাব। একসঙ্গে এত মনোরম বসন্ত এর পূর্বে উপভোগ করি নি। এ ঋতু শরতে যেন রূপান্তরিত না হয়। বিদায় আমার প্রিয়তম! ইতি

28. 4. 1781

আজকের এই আবহাওয়া তোমাকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে যে তোমার অন্তর আমার কাছে এসে আনন্দে পূর্ণ দলে বিকশিত হতে চাইছে। আবার বল প্রিয়, কেমন ঘুম হয়েছে তোমার? আজ বিকেলে আসবে ত? তোমার সঙ্গে কে আসবে? বিদায়। তুমি আমার অনন্ত সুখের উৎস। ইতি—

19-12-81

তোমাকে একখানা ভ্রমণকাহিনী পাঠালাম। কাহিনীর মৃত্যুর অংশ পর্য্যন্ত পড়েছি। জীবনের গর্ভসন্ধিতে এসে এ-ভাবে মৃত্যু বরণই মহৎদের কাজ। যে মানুষ ঈশ্বর সে নিজের জন্য বা অপরের জন্য বাঁচতে পারে না। বিদায়! তোমার কাছেই আমি আছি। তোমার মহত্ত্ব আর প্রেম হল সেই বায়ু যা আমি শ্বাসপ্রশ্বাসে গ্রহণ করি। ইতি—

14-2-82

আমাকে একটা কথা শোনাও লটী। তোমার প্রেমে আমি বুঝছি যে আমি পথে প্রান্তরে বা তাঁবুতেও যদি বনবাস করি তবে মনে হবে যে আমি সুদৃঢ় ভিত্তিক গৃহে বসবাস করছি এবং সেইখানে নিরাপদে মরতে পারব এবং সেখানে জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য রেখে যেতে পারব। বেলা দশটার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তোমার কাছে গিয়ে বিদায় নেব, তোমাকে দেখতে যাব। তোমার কাছে এখন বিদায় বলতে পারি না, কারণ তোমার কাছ থেকে সরে আমি এখনও অন্য কোথাও যাই নি। ইতি—

কতগুলো টুকরো পত্রাংশ:—

রজনী আর প্রত্যূষ যেখানে একাকার হয়ে আছে সেই তোমার কাছে আমি অনতিবিলম্বে পৌঁছাব। তোমার জীবনের নিশ্চয়তা আমার জীবনে স্বপ্ন জাগিয়েছে—নতুন ও পুরোনো জিনিষের কত নানা সংমিশ্রণ, কিন্তু তুমি আমার চিরকালের নতুন রতন। ইতি—

আজকের সকাল থেকে তুমি আমার কাছ ছাড়া। জীবন, মৃত্যু, সাহিত্য পঠন, সরকারী কাজ প্রভৃতি তোমার কাছ থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তুষার ঝরুক এই আমি চাই। তা হলে শীতের স্মৃতি আর তোমার করুণার কাহিনী ভেসে ওঠে। বিদায়! আমি তোমার জীবনের স্বপ্ন। আমার দুঃখে একটু ব্যথা দূর কর। আগামীকালে চা-পর্ব আহ্বান করে মজলিস জমাব। ইতি—

অভিনেত্রী করোণা সুমধুর স্বরে গান গাইছিলো। সে সুর অতীব সুশ্রাব্য। কিন্তু আমার চিন্তা তখন তোমাকে কেন্দ্র করে ঘুরছিল। গানে মানুষের কণ্ঠস্বর না থাকা যেমন অস্বাভাবিক সেই রকম আমার জীবনে তোমার অস্তিত্ব না থাকা অস্বাভাবিক। আগামী কাল আমরা দুজনে আর একটা দিন বাড়িয়ে নেব। তুমি যদি অন্য কোথাও যাও তা হলে আমি বাড়াতে থাকব। সহস্রবার বিদায় বান্ধবী! ইতি—

17-6-84

আমার চিঠি পড়ে বুঝবে আমি কত একা। আহার আর কোর্টে আমি করি না। দু'-একটা লোক আসছে আর যাচ্ছে—এই আমি দেখছি। পৃথিবীর সুন্দর স্থানে তোমাকে আমি উদ্ভাসিত দেখতে চাই। তোমাকে ভাল না বেসে থাকতে পারি না। এতে আমার ভাল হয়। তোমাকে চোখে দেখলে আরও খুশী হব। তোমার সাযুজ্য বিষয়ে আমি সচেতন। তুমি যেখানে থাক সেখানে আমি উপস্থিত থাকি। তোমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত নারীকে আমি পরিমাপ করি। তোমার মধ্যে সবকে আমি দেখতে পাই। তোমার প্রেমে আমি নির্দ্ধারণ করি আগামী দিনের পরিমাপকে। তবে তা এই ভেবে নয় যে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ তোমার মধ্যে আমার কোন কিছু অপরিচিত হয়ে থাকবে। বলতে গেলে তোমার প্রেমে সব কিছু পরিচালিত হয়। মানুষকে সহজে বুঝি। তাদের

পরিকল্পনা, কাজ, আনন্দকে অনুধাবন করি। তাদের যা আছে সে বিষয়ে অসন্তোষ জানাই না। তবে তুলনা করে একটা আনন্দ পাই। আমি যে তেলায় বহু ঐশ্বর্য্য পেয়েছ।

বাড়ীর কাজেও যেমন তোমাকে অনুভব করি সেই অনুভব তুমিও কর, বস্তু-বিষয়ে আমরা অজ্ঞ থাকি। কারণ বস্তুর স্বরূপ আমরা জানি না, আর বস্তুর দিকে নজরও দিই না। বস্তুর রহস্য আমরা বুঝতে পারি যদি বস্তুর স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারি। আমরা সমবেত হতে চাই। বিজ্ঞব্যক্তি সব কিছু সু-সম্বদ্ধ করে সব কিছু শৃঙ্খলায় এনে এবং সেগুলি যথার্থস্থানে নিয়ে আসে সরলীকরণ মারফত। ইতি

1.9.86.

কার্লস বাড় হতে বিদায়, এক ভদ্রমহিলা তোমাকে হয়ত এই চিঠিটা দেবে। সে ভদ্রমহিলা তোমাকে যা বলবে সে বিষয়ে তোমাকে আমি আর কিছু বলত না। সহজভাবে তোমাকে বলছি আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি যখন অন্যত্র চলে গিয়েছিলে তখন আমি ব্যথা পেয়েছিলাম। তোমার আনন্দের প্রতিশ্রুতি আমাকে আবার উজ্জীবিত করেছিল। নীরবে আমাকে অনেক কিছু সইতে হয়েছে। আমার সব চেয়ে সেরা বাসনা ছিল যে আমাদের সম্পর্ক পুনরায় স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং অন্য কোন শক্তি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যে কোন সর্ত্তে আমি আর তোমার কাছে থাকব না। যে দেশে অর্থাৎ যে বিদেশে আমি যাচ্ছি সেখানে নীরবে জীবন কাটাব। আমাকে ভালবেস। আমার সব কিছুই তোমার। আশা করি অনতিবিলম্বে আমি তোমাকে লিখব। আবার। ইতি—

আজকের সকালে সব কিছু আলাদা বলে মনে হচ্ছে। বাইরে উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি এক তুষারের আস্তরণ। এটা হ্রদের মত মনে হল। খাড়াই পাহাড় হ্রদের পাড় থেকে উঠেছে মনে হল। এ দৃশ্য সম্বলিত ছবি আমি এঁকেছি। ছবিটা যদি নষ্ট না করি তা হলে তুমি দেখতে পাবে। গতকাল আমি চমকিয়ে উঠেছিলাম। দিনপঞ্জীতে আঁকার কথা ছিল। তোমাকে যে ক'খানা ছবি পাঠিয়েছি তাছাড়া আর কিছু আঁকি নি। বিদায়! তুমি আমার কথা ভাবছ—এ আমি জানি, তা না হলে তোমার কথা আমি অহরহ ভাবতাম না। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। এ আমি অনুভব করি, কারণ তুমি যে আমাকে ভালবাস। ইতি—

তোমার চিঠির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে সে চিঠি বহু দিক থেকে আঘাত দিয়েছে। উত্তর দিতে আমি ইতস্তত করছিলাম, কারণ এ সব ক্ষেত্রে প্রকৃতিস্থ হওয়া শক্ত এবং আঘাত না দিয়েও থাকা যায় না।

ইটালী থেকে ফিরে এসে বুঝেছি, প্রমাণ পেয়েছি যে, তোমাকে আমি কত ভালবাসি এবং আরও বুঝেছি তোমার প্রতি, তোমার সন্তানের প্রতি আমার দায়িত্ব কতখানি। ডিউক যদি এখানে থাকেন তা হলে আমাকে এখানে থাকতে হবে,·····তোমার সন্তান ও তুমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোন বস্তু আমার কাছে ছিল না। ইটালীতে আমি যা ফেলে এসেছি তা পুনরায় বলবার আদৌ ইচ্ছা আমার নাই। এ বিষয়ে আমার আত্মা যে কতখানি তা তুমি বন্ধুসুলভ মনোভাব দিয়ে দেখনি। আমি যখন পৌঁছাই তোমার মনের অবস্থা সে-সময় ছিল অদ্ভুত ধরণের। আমাকে স্বীকার করতে হবে যে আমি খুব ব্যথা পেয়েছিলাম—যে ভাবে তুমি এবং আরও বহুজন অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। একটা শূন্য আসন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য বন্ধুদের খাতিরে আমি সেখানে ছিলাম, কারণ এ সব বন্ধুদের জন্যও ত আমি ফিরে এসেছি। তবু সে সময় বার বার কড়া কথা শুনেছিলাম। বুঝলাম সকলকার সহযোগিতা হারিয়েছি; সে স্থান হয়ত পরিত্যাগ করতাম সেখানে, হয়ত এর পূর্বের এক সম্পর্কের সূত্র[১] তোমাকে আঘাত দিয়েছি।

এ সম্পর্কটা কী? এতে কার ক্ষতি হয়? সেই হতভাগিনী নারীর প্রতি আমার যে মনোভাব তার দাবী করেই বা কে? কতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছি?

ফ্রিটজকে[২] প্রশ্ন কর, শ্রীমতী হার্ডারকে প্রশ্ন কর, যে আমাকে জানে এমন যে কোন লোককে প্রশ্ন কর তা হলে বুঝতে পারবে তা হলে বুঝতে পারবে বন্ধুদের প্রতি কী আমার কম সহানুভূতি, কম ভাবসঞ্চরণ, কম তৎপরতা প্রদর্শন করি? আর যদি তা না হয়, আমি জানি না তাদের সঙ্গে, আমার সমাজের সঙ্গে কী ভাবে আমি জড়িয়ে আছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের যদি ছেদ পড়ে তা হলে সেটা রহস্য হয়ে দাঁড়াবে। তুমি যে আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বস্তু এবং অন্তরতম ছিলে। সর্বদা উদ্দীপ্ত হয়ে ভাবি জীবনের প্রত্যেক স্তরে সে ভাব বর্তমান। আর ভাবি জীবনের প্রতি স্তরে তুমি যে আমার সঙ্গে কথা বলতে।

তবু আজ আমি বলতে বাধ্য, যে ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে করেছ তা সইতে আমি আর রাজী নই। আমি যখন কথা বেশী বলতাম তখন তুমি আমার মুখ চেপে রাখতে। যখন সব কিছুর ব্যাখ্যা করতাম তখন তুমি উন্নাসিক বলে আমার বিপক্ষে অভিযোগ এনেছ। বন্ধুদের হয়ে কোন কাজ করতে গেলে আয়াসহীনতা ও অবহেলার অভিযোগ তুমি আমার এনেছ। আমার প্রত্যেক বইটার তুমি তীব্র সমালোচনা মারফৎ এবং আমার হাবভাবের সমালোচনা করে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলে। যখন আমাকে এমন ঘৃণ্য পরিণত করেছ তখন আর আত্মা আর সজীবতা থাকে কী?

আমি আরও লিখতে পারতাম কিন্তু বর্তমানে তোমার মানসিক অবস্থা যা, তা ভেবে ভয়ে এর বেশী লিখতে সাহস করলাম না এইজন্য যে, এই পত্র তোমাকে শান্ত করার পরিবর্তে উত্তেজিত করবে আর তাতে তুমি অপমানিত হবে। বলতে দুঃখ হয়, তোমার কফি পান বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেছিলাম তা তুমি জান না উপরন্তু এমন বস্তু আহার করছ যা তোমার শরীরকে বিষিয়ে তুলছে। এ থেকে মনে হয় যে এগুলি এমন কিছু না তোমার কাছে যা থেকে মানসিক অবসাদ হতে তুমি মুক্তি পাও। তুমি দেহগত দিক

১। ক্রিশ্চিয়ান ভুলপিয়াস।

২। স্টায়েনের সন্তান, গ্যেটে এর শিক্ষার ভার নিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন, একবার গ্যেটে শ্রীমতীকে লিখেছিলেন, ফ্রিটজকে যখন চুমু খাই তখন তার মধ্যে তোমার অন্তরাত্মা দেখি।

থেকে এমন একটা জিনিষ নিয়েছ যা তোমার জৈব ক্লান্তিকর প্রবৃত্তিকে ব্যথার খোরাক জোগাবে।

কিছুদিন আগেও ক্ষতিগুলো তুমি বুঝেছিলে। আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ছিল বলে এগুলোকে তুমি এড়িয়ে গিয়েছিলে। ফলে তোমার উপকারও হয়েছিল। তোমার যাত্রাপথ ও স্বাস্থ্য শুভ হোক। এখন আমি আশা ছাড়িনি এই ভেবে যে সত্যিই তুমি আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে, আমি যেমন আছি সেই ভাবে তুমি আমাকে দেখবে। বিদায়। ফ্রিটজ ভাল আছে। সে প্রায়ই আসে। ছোট যুবরাজ বেশ স্ফূর্তিতে বেঁচে আছে। ইতি—

তোমাকে লিখিত আগেকার পত্রে প্রত্যেকটি ছত্রে ছত্রে কী বেদনা জেগেছে জান? সেটা সবচেয়ে অসম্মানজনক, কারণ সে চিঠি তোমাকে পড়তে হয়েছে আর আমাকে লিখতে হয়েছে। তবুও আবার আমি কথা বলছি আর আমি আশা করি যে আমরা দুজনে আর কথা না বলে থাকব না। অন্য কোন কিছুর মধ্যে নিজেকে না রেখে তোমার মাঝে আত্মসমর্পণ যে কত আনন্দের তা এর আগে আমি বুঝতে পারি নি। এ আমি খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করেছি আর তাতে তুমি বাধা দিয়েছ। এখন আমি অন্য মানুষ। আগেকার চেয়ে আমার পরিবর্ত্তনও দরকার।

বর্ত্তমানের অবস্থার জন্য কোন দোষারোপ আমি করি না। তার সঙ্গে আমি খাপ খাইয়ে নিয়েছি। তা আমি সঞ্চয় করে রাখব যদিও বর্ত্তমান আবহাওয়া আমার শরীরকে বিষাক্ত করে তুলেছে। আশঙ্কা করছি অসুস্থ হয়ে পড়ব—তা হলে সেটা আমার পক্ষে ভাল হয়। শীত গ্রীষ্ম আমাদের সম্ভাবনাকে, নিষ্ঠাকে যে শূন্য করে দেয়। অসম্ভবের কাছে এসে যদি অন্যকে কেউ নামাঙ্কিত করে তখন কেউ কেউ সেই অবস্থায় হয়ত সুখে থাকে, তবে এর জন্য শক্তির প্রয়োজন—তলিয়ে গেলে হবে না। কারণ এর জন্য আনন্দ ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন। শুধু পরিকল্পনা খাড়া করে নিজেকে মুক্ত ভাবা উচিত নয়। তবে পূর্ব্বেই যদি এই অপ্রীতিকর সম্পর্ক অত্যন্ত নিকটজনের সঙ্গে ঘটে তবে কোথায় যে ঘুরতে হবে তা কেউ বলতে পারবে না। তোমার এবং আমার ভালোর জন্য এ কথা আমি বলছি। তোমাকে আর জানাই যে এ অবস্থায় তোমাকে ব্যথা দিতে আমার নিজের লাগে। নিজেকে ক্ষমার জন্য আমি কিছুই বলব না। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, তুমি আমাকে সাহায্য কর এই জন্য যে, তোমার এবং আমার সম্পর্ক যেন ঘৃণ্য না হয়ে ওঠে; উপরন্তু যেমন আছে ঠিক তেমনটাই যেন থাকে।

তোমার আস্থা আমার মধ্যে সঞ্চারিত কর। সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে বিচার কর। তোমাকে সহজ সরলভাবে আমাকে বোঝাতে দাও। তা হলে আশা করতে পারব যে তোমার কাছে সব কিছু স্বচ্ছ ও সত্য হয়ে উঠবে। তুমি আমার মাকে দেখেছ, তাকে পূর্ণ তৃপ্তিও দিয়েছ। প্রতিদানে আমাকে উদ্দীপ্ত হতে দাও।

বিঃ দ্রঃ—শেষ দুখানা পত্রের অন্তঃসঙ্গাত থেকে এ কথা বোঝা যায়—শ্রীমতী স্তায়েনের সঙ্গে গ্যেটের সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসছে। গ্যেটের Pagan প্রেম শ্রীমতী স্তায়েনের অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইটালী প্রবাস-জীবনে আর তিন নারীর সঙ্গে কবি ভৃঙ্গের মত ব্যবহার করেছিলেন।

অনুবাদ: শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

এলেই হল

বাসুদেব গুপ্ত

এলেই হ'ল। ঘর সাজানো আছে শীতের মত
সাড়াশব্দহীন। ঝোটন পায়রাগুলি এখনো নাচে;
ঢেউ তোলে। কথা হয়ে উড়ে যায় নীচু/বিনত
মেঘের দিকে।

ওদিকে ঢালুতা। নদীর কাছে
ছিপছিপে হাওয়ার নৌকো কাশফুলকে স্মৃতি
করে রাখে। আর মিহি বালুরেণু চিক চিক
করে হাসে, কেবল হাসে! তাকিয়ে থাকে অলীক
আকাশে।

এলেই হ'ল। দেখা অদেখার প্রীতি
দুরন্ত বৃষ্টিতে জল চুমু দেয়। ভীরু হয়ে ভাবে
এই যে দিন, আহা এই যে রাত দুর্গের মত
মাথা উঁচিয়ে নগর সাজায়, সাজায় গ্রাম। শত
ইচ্ছাকে মেলে ধ'রে আলোর আগুনে তার:
চলতে চলতে চোখের চাহনি কুড়িয়ে বহুবার,
কোথায় যাবে—এরা একদিন কোথায় যাবে?

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'দীক্ষা-অনন্তরে কৈল প্রেম-পরকাশ।' যে পরম গম্ভীর ছিল সে এখন পরম বিহ্বল হয়ে পড়ল। ছাড়ল কথাস্ফূর্তি, ছাড়ল দেহচেষ্টা। কখনো উর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকে, কখনো বা ধ্যাননিশ্চল চোখে, শূন্য পানে। কখনো বা বিরলে বসে কাঁদে। কার সঙ্গে বা কথা বলে স্বগত। কী হল আমাদের নিমাইয়ের? সঙ্গীরা দিশেহারার মত পরস্পরের মুখচাওয়াচাওয়ি করে। নিজেরাও কিছু বোঝে না, নিমাইকে জিগগেস করলেও কিছু বলে না।

আমি কি জানি আমার কী হয়েছে! রাধিকাই বা কী জানত!

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী, চুলের গাঁথনী, দেখয়ে খসায়া চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে, কি কহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠি করি ময়ুর-ময়ূরী-কণ্ঠ করে নিরখনে।
চণ্ডীদাস কয়—নব পরিচয় কালিয়া বন্ধুর সনে॥

কৃষ্ণের সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে। 'কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধ রাধা।' কৃষ্ণের অঙ্গে আটটি পদ্ম। অঙ্গ নলিনাষ্টক। কি কি? নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি আর মুখ। কি দিয়ে চর্চিত করেছেন? মৃগমদ আর কর্পূর, বরচন্দন আর অগুরু দিয়ে। পদ্মগন্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছে অঙ্গানুলেপের গন্ধ। বায়ুর তরঙ্গ নয়, শুধু অঙ্গগন্ধের তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ শুধু আমার ঘ্রাণস্পৃহাকেই বিস্তার করছে। স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্।

গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করছে, হঠাৎ নিমাই ডুকরে কেঁদে উঠল: 'কৃষ্ণ রে, বাপ রে, তুমি কোথায়? তুমি কোন দিকে পালালে?' বলতে বলতে মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। শিষ্যদের শুশ্রূষায় মূর্ছা যদি বা ভাঙল, ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে আবার কাঁদতে লাগল: 'কৃষ্ণ, বাপ, আমার জীবন-শ্রীহরি, তুমি আমার প্রাণ চুরি করে কোথায় অন্তর্হিত হলে?'

কে সান্ত্বনা দেবে নিমাইকে? যে স্তোকবাক্য বলতে আসে সে নিজেই কেঁদে আকুল। নিমাইয়ের কান্নায় তাদেরও কান্না।

কৃষ্ণ যদি ব্রজে না আসে এ নিশ্চিত যে আমি তাকে পাব না, সেও পাবে না আমাকে। তবে এত কষ্ট স্বীকার করে এ দেহ রেখে লাভ কী? ললিতাকে বলছে রাধিকা: এ দেহ আমি ছেড়ে দেব। আমার মৃত্যুর পর এ দেহ ধরে রাখতে তোমরা কোনো চেষ্টা কোরো না। এ দেহ পচে যাক, গলে যাক, পুড়ে যাক, মিশিয়ে যাক মাটির সঙ্গে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে লয় হয়ে যাক। এই পঞ্চভূতই তো আমার প্রাণবল্লভের ব্যবহারের বস্তু। তার ব্যবহারের বস্তুর সঙ্গে এ দেহ মিশে গেলেই তো আমি কৃতার্থ। সখি, এ দেহ দিয়ে তো তার সেবার সৌভাগ্য হল না। দেহাবশেষ দিয়েও যদি তার একটু সেবা করতে পারি। তার সেবা ছাড়া এ জীবনের সার্থকতা কী!

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি! কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥

কে বলে তুমি পাগল? তোমার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়েছে। কৃষ্ণনামের মজাই এই যে, এই নাম

জপবে তার প্রাণই কৃষ্ণপ্রেমের পাথার হয়ে উঠবে। প্রেমের তরঙ্গে সে তখন হাসবে কাঁদবে নাচবে ধুলোয় গড়াগড়ি দেবে।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই তো স্বভাব।
যেই জপে—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

আমাদের নয়নপথে আবির্ভূত হও। গোপীরা কৃষ্ণের জন্যে কাঁদছে। হে সম্ভোগমতি, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনাবেতনের কিঙ্করী, তাই বলে কি সুস্ফুট কমলনয়নের আঘাতে তুমি আমাদের বধ করবে? তুমি আমাদের বিষ, সর্প, রাক্ষস, বাত্যা, দাবানল—সকল প্রকার ভয় থেকে রক্ষা করেছ, তবে এখন কেন তুমি উদাসীন? ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্ব পালনের জন্যে তোমার জন্ম। তুমি গোপিকাসুত নও, তুমি অখিল-দেহীর অন্তরের সাথী। অতএব আমরা যখন তোমার ভক্ত, আমাদের প্রার্থনা পূরণ করো। আমাদের ভজনা করো, আমাদের দেখাও তোমার শ্রীমুখ। তোমার যে পাদপদ্ম প্রণতদেহীর পাপনাশন, লক্ষ্মীর সাধনের তীর্থ, যা দিয়ে তুমি গোচারণে যেতে, যা কালীয়ের ফণার উপর ন্যস্ত করেছিলে, তা এখন আমাদের কুচতটের উপর অর্পণ করে আমাদের অনঙ্গবেদনা অপহরণ করো। তোমার কথামৃত আমাদের বিহ্বল করেছে। তুমি এস, তোমার অধরসুধায় আমাদের পুনর্জীবিত করো। তোমার কথাই তো তপ্তজনের জীবনপ্রদ, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলসাধক, সমস্ত কামকর্মনিবারক। যারাই তোমার কীর্তক তারাই বহুদাতা।

নিমাই সঙ্গের লোকদের বললে, 'তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।'

'আর তুমি?'

'আমি আর ফিরব না। আমি মথুরায় চললাম।'

'মথুরায়?'

'হ্যাঁ, মাকে বোলো আমি কৃষ্ণ পেতে মথুরায় চলেছি। আর প্রবেশ করব না সংসারে।'

সকলে মিলে ঠেকাল নিমাইকে। বোঝাতে বসল।

রাত্রে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, প্রেমের আবেশে বেরিয়ে পড়ল নিমাই। কৃষ্ণ রে, বাপ রে, কোথায় গেলে পাব তোমাকে, কোন পথে, কোন অরণ্যে? তোমাকে ছাড়া আমার রাত অন্ধকার, দিনও অন্ধকার।

কিছু দূর যেতে দৈববাণী শুনল নিমাই। এখন বাড়ি ফিরে যাও, কাল পূর্ণ হলে যাবে মথুরায়।

কথোদূর যাইতে শুনেন দিব্যবাণী।
এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে॥

আকাশবাণী শুনে গৌরহরি ফিরে চলল নবদ্বীপ। পৌষমাসের শেষে বাড়ি পৌঁছুল।

নিমাই ফিরেছে। শচী ছুটে এল বাইরে, বিষ্ণুপ্রিয়া দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। মার পাদুখানি ধরে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করল নিমাই, আর চক্ষুর স্নিগ্ধ প্রসাদটি রাখল প্রিয়ার নয়ন দুটিতে।

কিন্তু এ নিমাই কী হয়ে গিয়েছে! এ যেন আরেক মানুষ। বিদ্যার সেই ঔদ্ধত্য নেই, নেই বা প্রাধান্যবোধ। মূঢ় জগৎ সংসারকে উপেক্ষা করবার জন্যে মুখে যে একটি বিদ্রূপের রেখা ছিল সেটিও অন্তর্হিত হয়েছে। নিমাই এখন নম্রতা-বশ্যতার প্রতিমূর্তি। মুখখানি বুঝি বা একটু ম্লান, দুটি চোখ করুণায় স্নান করা। সকলের চেয়ে তুচ্ছ, সকলের চেয়ে দীন এমনি এক আর্তি তার শরীরে। অন্যমনস্ক, না, দূরমনস্ক। যে অনর্গল কথা কইত, কথা কইতে ভালোবাসত, সে এখন স্তব্ধতার সঙ্গেই কথা কইতে উন্মুখ। কেন যে চোখে জল আসছে কে জানে! এ কি তার দুঃখের অশ্রু না আনন্দের অশ্রু, তাই বা কে বলবে?

কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥

কৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশ্যেই যে সেবাবাসনা তার নামই অনুরাগ বা প্রেম। যদি সেবা না থাকে তা হলে সম্বন্ধও থাকে না। আর সম্বন্ধ না থাকলে প্রেম কোথায়? আলোকহীন সূর্য যেমন নিরর্থক তেমনি সেবাবাসনাহীন সম্বন্ধজ্ঞানও নিরর্থক। প্রেম যদি জাগে সঙ্গে-সঙ্গে সেবা করবার সাধও জাগবে। আর কৃষ্ণপ্রেম যদি জাগে তাহলে কৃষ্ণসেবার সাধ ছাড়া আর কিছুতেই মন আসক্ত হবে না, আকৃষ্ট হবে না।

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্যদাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥

সাদা কাপড়ে কালির ছোট দাগটিও ধরা পড়ে। তেমনি সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেমে যদি সুখবাসনার লেশ থাকে তা হলে তাও ধরা পড়বে। তা পড়ুক। আশার

কথা এই, কৃষ্ণপ্রেম গঙ্গাজল। গঙ্গাজলে তো কত কর্দম কত আবর্জনা, তবু তা সংসারমোচক। তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে সুখবাসনা থাকলেও তা অনুরূপ সংসারতারক। কিন্তু গঙ্গাজল যদি আবিল হয় তবে তা সুস্বাদু হয় না, তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্গে যদি বিষয়মালিন্য মেশে তবে তাও বিস্বাদ লাগে। সুস্বাদু লাগুক আর না লাগুক, কৃষ্ণপ্রেমই পুরুষার্থ। পরমপ্রয়োজন।

'গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ।' নিমাইকে গুরুজনেরা আশীর্বাদ করছে। তবু নিমাইয়ের কান্নার বিরাম হচ্ছে না কেন?

শ্রীমান পণ্ডিত, সদাশিব কবিরাজ আর মুরারি গুপ্ত —তিন বন্ধুর কাছে তীর্থকথা বলছে নিমাই।

'বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখলাম। গয়ায় এসে ঐখানে কৃষ্ণ পা রেখেছিল, ঐখানেই ধুয়েছিল পা। ঐ পা-ধোয়া জলই তো গঙ্গা। সেই গঙ্গাই শিব মাথায় ধরেছে।' বলতে-বলতে থেমে পড়ল নিমাই। চক্ষু নির্নিমেষ হয়ে গেল। মহাশ্বাস ছেড়ে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে কাঁদতে লাগল। টলে পড়ে গেল মাটিতে।

এ কী অবস্থা! তিন বন্ধু স্তম্ভিত হয়ে রইল। পরে শুশ্রূষায় মন দিল। কী বলে কাকে বোঝাব! কী দুঃখ যে সান্ত্বনা দিই। কৃষ্ণকে কি দেখছে, না, দেখতে পাচ্ছে না বলে কাঁদছে? যারই জন্যে কাঁদুক, মানুষের চোখে এত অশ্রু থাকতে পারে এ কবে কে দেখেছে? এরই নাম বুঝি প্রেমগঙ্গা?

সুবিশাল তনু কত বলবান হয়ে উঠেছে, কী সুঠাম সুন্দর! সর্বকলেবর এখন পুলকপরিপূর। থরথর করে কাঁপছে কখনো। কখনো বা স্বেদ ঝরছে। কখনো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কখনো কথা বলছে গদগদ ভাষে। কখনো বা ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব মিলে আনন্দচমৎকার।

কৃষ্ণভাবে চিত্ত আক্রান্ত হলেই চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব থেকে যে ভাব জাগে তাই সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব আট রকম। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু আর মূর্চ্ছা। এই সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ এখন নিমাইয়ে।

> প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কাঁদে গায়।
> উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায়॥
> স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।
> উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য গর্ব হর্ষ দৈন্য॥
> এই ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
> কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥

'সেই নিমাই কী হয়ে গেল দেখছ?' বললে সদাশিব।

'কে জানত সেই বিদ্বান 'এমন ভক্তিমান হবে?' মুরারি বললে।

'কিন্তু আসল ব্যাপার কী?' শ্রীমান পণ্ডিত তট বা তল কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। নিমাই কি কৃষ্ণকে দেখছে, না, দেখছে না? দেখছে না বলে যদি কাঁদছে তবে আনন্দে এমন মাতোয়ারা কেন? আর দেখছে বলে যদি তার পুলকরোমাঞ্চ, তবে এমন কাঁদছে কেন অঝোরে!'

বন্ধুদের সেবায় কিছুটা শান্ত হল নিমাই। বললে, 'কাল তোমরা তিন জন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়ি যাবে। সেখানে নিভৃতে বসে তোমাদের কাছে আমার দুঃখের কথা নিবেদন করব। 'মোর দুঃখ নিবেদিব নিভৃতে বসিয়া।'

'মা, ওঠ, ওঠ—' শচীর রুদ্ধ ঘরের দরজায় করাঘাত করছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

'কি, কী হয়েছে?' ধড়মড় করে উঠে বসল শচী।

'দেখ এসে উনি কেমন করছেন।'

তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে শচী দেখল, শয্যায় বসে নিমাই কাঁদছে, অবুঝের মত কাঁদছে। বউয়ের দিকে তাকাল শচী। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া কী এর ব্যাখ্যা দেবে? ঝড়ে পড়া পাখীর মত চেয়ে রইল অবোলা চোখে।

ছেলের মাথায় হাত রাখল শচী। বললে, 'নিমাই, কাঁদছিস কেন?'

প্রশ্ন নিমাইয়ের কানেও ঢুকল না।

'কেন কাঁদছিস বাপ, কী হয়েছে?'

কে কার কথা শোনে।

'তোর কিসের দুঃখ? আর যদি দুঃখ থেকেই থাকে, আমি তোর মা, সেই কথা তুই আমাকে বলবি না তো কাকে বলবি?'

নিমাইয়ের কান্না আরো বেড়ে চলল।

'নিমাই, বাপ', গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে লাগল শচী। বললে, 'অন্যে উতলা হলে তুই তাকে শান্ত করিস, এখন তুই-ই যদি উতলা হোস তোকে কে শান্ত করবে? আমার এত গম্ভীর নিমাই পণ্ডিত সে কেন পাগল হল, বিহ্বল হল?' শচীও কাঁদতে লাগল।

মায়ের কান্না বুঝি শুনতে পেল নিমাই। বললে, 'মা, আমি কাঁদছি দেখে তুমি কেঁদো না। আমি স্বপ্নে বনমালী কৃষ্ণকে দেখলাম। সেই কালিন্দী-পুলিনপ্রাঙ্গণ প্রণয়ী কৃষ্ণ। যার বাঁশির স্বরে শুষ্ক স্থাবর সজীব হয়ে ওঠে সেই বিপুল বিলোচন কমনীয় কিশোর, অখিললক্ষ্মীচিত্তহারী মুগ্ধমূর্তি। মা এমন রূপ আর দেখিনি, এমন বাঁশি আর শুনিনি! কিন্তু জানো, দেখা দিয়েই যে কোটি মদন-বিমোহন পালিয়ে গেছে। কৃষ্ণকে সকলে কল্পতরুর চেয়েও উদার বলে। কল্পতরু বিনা প্রার্থনায় কাউকে কিছু দেয় না। বাঞ্ছাতিরিক্ত দান কল্পতরুর নিয়ম নয়। কিন্তু কৃষ্ণ, মা, না চাইলেও দান করে। না চাইতেই স্বপ্নে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মিলিয়ে গেল। আবার কৃষ্ণ দেখা দেবে সেই আশায় তৃষ্ণাতুর চোখে তাকিয়ে আছি। যমুনা বা জাহ্নবীর স্রোতের বিরাম আছে, আমার এই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকার বিরাম নেই।'

সারা রাত বসে মা আর স্ত্রী শুনতে লাগল কৃষ্ণকথা।

ভোরবেলা শ্রীবাসের বাড়ি ফুল তুলতে এসেছে শ্রীমান। শুধু শ্রীমান নয়, গদাধর, গোপীনাথ, আরো অনেকে। শ্রীমানের মুখখানি হাসি-হাসি।

'বড় যে হাসি দেখছি। কী ব্যাপার?' জিগগেস করল শ্রীবাস।

'তা, কারণ ছাড়া কি কার্য হয়?'

'সত্যি? বলো না কী কারণ?' আগ্রহে এগিয়ে এল শ্রীবাস।

'সে এক অদ্ভুত কথা। নিমাই পণ্ডিত পরম বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছে।'

'বলো কী?'

'গয়া থেকে ফিরেছে জেনে বিকেলে গিয়েছিলাম কুশল সম্ভাষ করতে।' বলতে লাগল শ্রীমান। 'গিয়ে দেখি উদ্ধত নিমাই আর নেই, এ এক বিনম্র নিমাই। বৈরাগ্যে—ঔদাস্তে অপরূপ। আমাদের কাছে তীর্থের কথা বলতে লাগল। পাদপদ্মতীর্থের নাম নেওয়ামাত্র বিরাট বিপ্লব এল নিমাইয়ে। সর্ব-অঙ্গে মহাকম্প-পুলক উপস্থিত হল। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলে কাঁদতে-কাঁদতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল মাটিতে। ভাই, এত কান্না মানুষে কাঁদতে পারে তা আমার জানা ছিল না। দেখিনি কখনো শুনিনি কখনো।'

যে-অশ্রু দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্যবুদ্ধি নাহি তার মনে॥

'এর মত শুভসংবাদ আর কী আছে?' বললে শ্রীবাস, 'নিমাই যদি বৈষ্ণব হয় তা হলে আর পায় কে আমাদের? বিদ্বেষীদের তবে দেখে নেব এবার।'

'শোনো। নিমাই আমাকে আর সদাশিবকে আর মুরারিকে শুক্লাম্বরের বাড়ি যেতে বলেছে। সেখানে নাকি আমাদের বলবে সে আরো দুঃখের কথা।' শ্রীমান ত্বরান্বিত হল। 'ফুল তুলেই সেখানে যাচ্ছি।'

শ্রীবাসের উঠোনে কুন্দফুলের ঝাড়। গদাধরও ফুল তুলছিল। যতই ফুল তোলে ততই শাখায় আবার ফুল আসে। ফুল তুলে গাছকে কেউ রিক্ত-শূন্য করতে পারে না। 'যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে। অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে।' কিন্তু গদাধর যে নিজেই নিষ্পুষ্প, নির্গন্ধ। কই তাকে তো নিমাই নিমন্ত্রণ করল না, শুক্লাম্বরের বাড়িতে উপস্থিত থাকতে বলল না। সে কি নিমাইয়ের অন্তরঙ্গ হবার অধিকারী নয়? নিমাইয়ের দুঃখের কথা সেও কি একটু শুনতে পায় না? তবে নিশ্চয়ই তার হৃদয়ে ভক্তি নেই, নেই নামগন্ধ। সে তাই প্রত্যাখ্যানের যোগ্য।

তবে ভক্তি কী?

গর্গাচার্য বললে, কথাদিষ্বনুরাগঃ। অর্থ, ভগবানের কথা-ইত্যাদিতে অনুরাগ। অঙ্গিরা বললে, সানুরাগরূপা।

অনুরাগ কী?

আসক্তির নাম অনুরাগ। যেমন শিশুর মাতৃস্তন্যে, কামুকের কামিনীতে, গৃধ্নুর অর্থে, তৃষ্ণার্তের জলে, ক্ষুধিতের অন্নে অজ্ঞানীর দেহে, কুলটার উপপতিতে আকর্ষণ তেমনি ভগবানের প্রতি একান্ত আকর্ষণের নাম অনুরাগ। আর সেই অনুরাগই ভক্তি।

ইন্দ্রিয় নির্মল করে প্রিয়তমের যে সেবা তার নামই ভক্তি। ইন্দ্রিয়কে নির্মল করব কী করে? সর্বত্র ভগবানকে দেখে, সকল শব্দে ভগবানকে শুনে, সকলরূপে ভগবানের আস্বাদনে, নিখিলগন্ধে তাঁর ঘ্রাণ নিয়ে, সমস্ত স্পর্শে তাঁর স্পর্শ অনুভব করে। সেই অনুভবেই নির্মল হওয়া।

এ তো খুব কঠিন শোনাচ্ছে। এমন লোক আছে নাকি পৃথিবীতে?

দুর্লভ হলেও আছে। চন্দন দুষ্প্রাপ্য কিন্তু পাওয়া যায়। ভক্তিদেবীর কাছে কেউ বঞ্চিত হয় না।

আর কিছু না পারো তুমি শুধু শ্রবণ-কীর্তন করো। শ্রবণের চেয়ে অবশ্য কীর্তন শ্রেষ্ঠ। শ্রবণে শুধু কান পরিতৃপ্ত হয়, কীর্তনে রসনাও পরিতৃপ্ত হবে।

প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাফলের পরম সাধন॥
শ্রবণকীর্তন হতে হয় কৃষ্ণপ্রেমা।
সেই পরমপুরুষার্থ, পুরুষার্থে সীমা॥

কিন্তু নাম করতে হলেও তো শ্রদ্ধা চাই। না, নাম শ্রদ্ধারও অপেক্ষা করে না। সংশয় সত্ত্বেও নাম করো শুষ্কতাতেও ভয় কোরো না। ডাকতে ডাকতেই ভক্তি আসবে। প্রবল নামশক্তির দুয়ারেই ভক্তি শৃঙ্খলিতা।

তা হলে আর ভয় নেই গদাধরের। সেও তবে যাবে শুক্লাম্বরের বাড়িতে। না হয় লুকিয়ে থাকবে।

শ্রীবাস হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'কৃষ্ণ আমাদের বৈষ্ণব পরিবার বৃদ্ধি করুন।' 'গোত্র বাড়াউক কৃষ্ণ আমা সভাকার।'

শুক্লাম্বরের ঘরে সমবেত হয়েছে তিন বন্ধু।

ঐ আসছে নিমাই।

দীর্ঘকায় পরাক্রান্ত পুরুষ কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে স্খলিত হয়ে পড়ছে। বাহ্যদৃষ্টির প্রকাশ মাত্র নেই। অজস্র ধারায় অশ্রু পড়ছে গড়িয়ে।

এ কী, সর্বক্ষণই আবেশ। সর্বক্ষণই অশ্রুস্নান।

'আমার কৃষ্ণ কোন দিকে গেল? তাকে পেয়েছিলাম, দেখেছিলাম, কিন্তু সে পালিয়ে গেল। কেন পালিয়ে গেল? কোন দেশে গেল?'

টলতে টলতে একটা স্তম্ভ ধরল নিমাই। ভেঙে পড়ল স্তম্ভ।

জলসিঞ্চনে অর্ধ বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের। সে এবার আরেকজনের কান্না শুনছে। জিগগেস করল, 'ঘরের মধ্যে কে কাঁদে?'

শুক্লাম্বর বললে, 'তোমার গদাধর।'

'গদাধরকে ডাকো।'

গদাধর বেরিয়ে এল।

নিমাই বললে, গদাধর, তুমিই ধন্য। শিশুকাল থেকে তুমি আমার সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াচ্ছ, কিন্তু ছায়াই সার্থক, দেহী নয়। শিশুকাল থেকেই তুমি কৃষ্ণে দৃঢ়মতি, কিন্তু আমার জীবন বৃথা-রসে কেটে গেল। অমূল্য নিধি পেয়েও আবার হারালাম। তোমরা সব বল, আমার কৃষ্ণ কোথায়।'

ক্ষণে পড়ছে ক্ষণে উঠছে। দুই চোখ প্রেমজলের প্লাবনে মেলতে পারছে না। নিমাইকে দেখে আর সকলেও কাঁদছে। হরি-হরি ধ্বনি তুলছে। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ থেকেই এই কৃষ্ণপ্রকাশ। বলছে কেউ-কেউ। 'গয়াধামে ঈশ্বরপুরী কিবা মন্ত্র দিল। সেই হতে নিমাই আমার পাগল হইল।' কৃষ্ণরহস্যের উদ্ভেদ হল এতদিনে, বলছে আবার কেউ-কেউ। নিমাই একটু সুস্থ হোক, পাষণ্ডীদের মুণ্ড ছিঁড়ে নেব এবার, কেউ কেউ আবার আস্ফালন করলে।

'আমার দুঃখের খণ্ডন করো সকলে। নন্দগোপের নন্দনকে এনে দাও।' মাটিতে চুল লুটিয়ে দিয়ে কাঁদছে নিমাই।

সারা দিন চলে গেল, স্নানাহার নেই নিমাইয়ের। সন্ধ্যায় টলতে-টলতে ফিরে চলল বাড়ি। শচী তার ভার নিলে।

স্নানাহারের পর আবার বেরিয়ে পড়েছে নিমাই। এবার তার ছাত্রেরা তাকে ঘিরে ধরল। মনে পড়ল, হ্যাঁ, সে তো টোলে পড়াত এ সব ছাত্রদের। আর কি তবে সে পড়াবে না এদের? আর কি কিছু পড়াবার নেই?

গুরু গঙ্গাদাসের কথা মনে পড়ে গেল। সটান চলে গেল পণ্ডিতের বাড়ি। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল গুরুকে।

'তোমার জীবন সার্থক, পিতৃকুল মাতৃকুল দুই কুলই মোচন করলে। এবার তবে আবার অধ্যাপনা শুরু করো।' বললে গঙ্গাদাস।

'আর কেউ পড়ালে হয় না?'

'তোমার পড়ুয়ারা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। তোমার যাবার পর থেকে ওরা পুঁথিতে ডোর দিয়ে বসে আছে। পড়তে হলে তোমার কাছেই পড়বে, আর কারু কাছে নয়।'

'আমি আর কী পড়াব?'

সেখান থেকে মুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ি গেল। মেয়েরা উলু দিয়ে উঠল, শঙ্খধ্বনি করল। চণ্ডীমণ্ডপে টোল ছিল নিমাইয়ের, সেখানে গিয়ে বসল। মুকুন্দ এসে প্রণাম করল, নিমাই তাকে বাহুবন্ধনে বেঁধে কাঁদতে লাগল।

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥

[ক্রমশঃ।

বন কেটে বসত
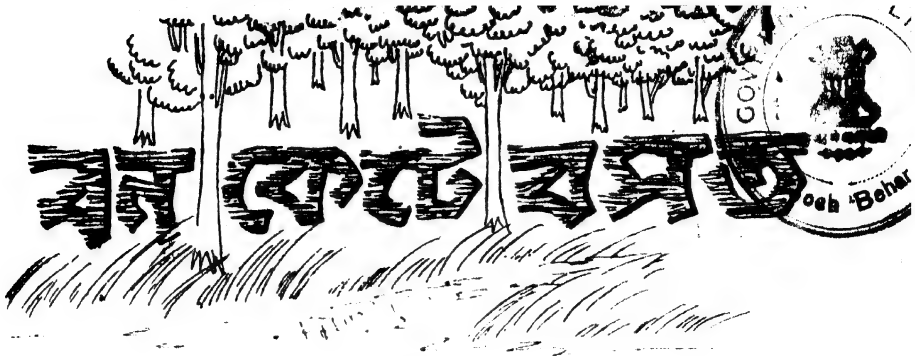
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

ত্রিশ

জগাররা গেছে তো গেছে। দুটো দিন দুটো রাত্রি কাটল, ফিরবার নাম নেই। মহেশ ঠাকুরকে রেখে গেছে তাদের চালাঘরে। ঘরবাড়ি পাহারায় আছে ঠাকুর। পাহারার মানুষই বটে! গাঁজা টানে, আর মানুষ পেলে বনের গল্প জুড়ে দেয়। মানুষ না থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

রাধেশ্যাম জুটেছে ক্ষ্যাপা ঠাকুরের সঙ্গে। গাঁজার গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে তুলেছে। কিন্তু এমন মানুষটার সঙ্গে মউজ করে ভালমন্দ দুটো কথা বলবে তার ফুরসত কই? সুমুখ-আঁধারি রাত বলে সকাল সকাল এখন জালে বেরুতে হচ্ছে। কড়া ব্যবস্থা অন্নদাসীর। সন্ধ্যা হতে না হতে যা-হোক দুটো খাইয়ে জালগাছ কাঁধে দিয়ে বাঁধের উপর তুলে দেবে। ঠিক ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে, কিম্বা পাড়ামুখো ফিরল—পরখ করবার জন্য নিজেও পিছু পিছু সঙ্গে যায়। বউ বটে একখানা! ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে এক সময় ফিরে আসে একলা মেয়েমানুষ—ডর লাগে না। সত্যিই বউ ফিরে গেছে অনেকক্ষণ—রাধেশ্যাম তবু কিন্তু ভরসা করতে পারে না। কোন হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? পতি-দেবতার একটু বেচাল দেখলে ক্যাঁক করে অমনি টুটি চেপে ধরবে: তবে রে হাড়-ফুটো, এই তোমার জালে যাওয়া!

মহেশের মতো গুণিজন পাড়ার মধ্যে বর্তমান, তা সত্ত্বেও রাধেশ্যাম বউয়ের ভয়ে সারা রাত ভেড়িতে ভেড়িতে জাল বেয়ে বেড়াল। ব্যাপার-বাণিজ্যও নিজের হয়নি—টাকা পুরে তার উপরে আরও তিন আনা। অন্নদাসী শেষ রাত্রে উঠে যথারীতি সায়েরে চেপে বসেছে। ডাক শেষ হয়ে গিয়ে ব্যাপারির ঝোড়ায় মাছ পড়তে না পড়তে দামের টাকা-পয়সাগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে আঁচলে বেঁধে সে ফরফরিয়ে চলল। রাধেশ্যাম হাঁ করে দেখছে। বিড়ি খাওয়ার জন্যেও দুটো পয়সা হাতে দিয়ে গেল না।

একটা রাত গেল তো এই রকমে। আলা থেকে সোজা সে মহেশের কাছে চলে গেল। কিন্তু গিয়ে হবে কি! সারা রাত ভূতের খাটনি খেটে চোখ ভেঙে আসছে, ভাল করে দুটো কথা বলার তাগত নেই এখন মানুষটার সঙ্গে। ঢুলতে ঢুলতে শুয়ে পড়ে শেষটা। মড়ার মতো ঘুমোয়। পরের রাতে বেরুতে আর মন চায় না। মহেশ ঠাকুর ভাগ্যবশে আজকের দিনও রয়ে গেছে। তবু হায় রে, বউয়ের তাড়ায় জাল ঘাড়ে রওনা হতে হয়। এখানে ওখানে ঝপ-ঝুপ করে জালও ফেলে পাঁচ-দশ ক্ষেপ। শীত ধরে আসে, দেহে কাঁপুনি লাগে। এই কাঁপুনির প্রতিষেধক আছে মহেশের কাছে। তার বন্ধ-কলকেয়। মরীয়া হয়ে এক সময় রাধেশ্যাম বাঁধ ধরে আবার ফিরে চলল। ভারি তো বউ—বউ-টউ সে গ্রাহ্য করে না।

আলো নেই, অন্ধকার চালাঘরের ভিতর কলকের মাথা জ্বলে জ্বলে উঠছে। ছায়ামূর্তির মতো ক্ষ্যাপা মহেশ ও দু-তিনটি লোক গোল হয়ে বসে। রাধেশ্যামও গিয়ে একপাশে ঠাঁই নিল।

শীতে মারা যাই ঠাকুরমশায়, প্রসাদ দাও।

ভেবেছিল দুটো তিনটে টান টেনেই আবার বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু গা এলিয়ে দিচ্ছে। এ নেশায় একবার বসে পড়লে হঠাৎ আর ওঠা যায় না। চলছে। মহেশ আগে বেশ কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু কলকে ঘুরে ঘুরে যতবার হাতে আসে, দম দিয়ে ততই সে ঝিম হয়ে যাচ্ছে। রাধেশ্যাম ভাবছে, ক-খানা ঘরের পরেই তার ঘর। অন্নদাসী ঘুমিয়ে গেছে এতক্ষণে। রাধেশ্যাম জল ঝাঁপিয়ে মাছ মেরে বেড়াচ্ছে, অবলা নারী শুকনো-খটখটে ঘরে ঘুম দিচ্ছে মজা করে। ভোর থাকতে উঠে আলায় গিয়ে চেপে বসবে মাছের পয়সাকড়ি আঁচলে বাঁধবার জন্য। আঁচল কেন রে বউ দু-মুখো থলি সেলাই করে নিয়ে যাস কাল। সেরেসুরে যা পয়সাকড়ি রেখেছিস, তাই কাল বের করতে হবে। নয়তো পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা সকলের। বাচ্চাটা অবধি।

এমনি নানা রকম ভাবতে ভাবতে, বিশেষ ঐ বাচ্চার কথা মনে ভেবেই, রাধেশ্যাম আবার জাল কাঁধে বেরিয়ে পড়ল। চাঁদ উঠে গেছে, জুত হবে না আর। বাঁধে উঠলেই ভেড়ির যত পাহারাদার দূর থেকে দেখে ফেলবে। ঘিরে ধরবার চেষ্টা করবে নানান দিক থেকে। তার ভিতরে এক-আধ ক্ষেপ দেওয়া যায় যদি বড় জোর। মাছ-মারার দেবতা বুড়ো হালদার—তিনি ইচ্ছা করলে কী না হতে পারে! উঠানের উপর কানকো হেঁটে মাছ আসছে, কত এমন দেখা যায়। সবই বুড়ো হালদারের মরজি।

কিন্তু হল না আজ কিছুই। বউ ক্যার-ক্যার করে, কাক ঘরের চালে কাক পড়তে দেবে না। পাড়ার লোকের অশান্তি। বাচ্চাটা ট্যা-ট্যা করে চেঁচাবে।

অন্নদাসী বলে, বাওনি মোটে জালে। গেলে নিদেনপক্ষে দুটো কুচোচিংড়ি জালে বেধে আসত না?

যাইনি, তবে জাল ভিজল কি করে?

খানাখন্দের জলে জাল ভিজিয়ে আনা যায়। গাঁজায় দম মেরে পড়েছিলে পাগলা ঠাকুরের ওখানে।

এমনি কথা উঠবে অনুমান করে রাধেশ্যাম সতর্ক হয়ে এসেছে। কুলকুচা করে এক মুঠো তুলসী পাতা চিবিয়েছে। বউয়ের নাকের কাছে মুখ নিয়ে যায় একেবারে। বলে, দেখরে—গন্ধ শুঁকে দেখ মাগি।

ঠেলা দিয়ে অন্নদাসী মুখ ফিরিয়ে দিল। জোরটা বেশি হয়ে গেল রাগের বশে। রাধেশ্যাম চেঁচিয়ে ওঠে, অ্যাঁ, মারলি তুই আমার? পতির গায়ে হাত তুললি? পতি হল দেবতা, কাঁচাখেগো দেবতা—হাত তোর কুড়িকুষ্ঠ হয়ে খসে পড়বে।

এবং দেবতাটি শুধুমাত্র মুখে শাপশাপান্ত করেই নিরস্ত হয়ে যাবার পাত্র নয়। হাতও চলে। অন্নদাসী যথাসম্ভব প্রতিরোধ করে কুক ছেড়ে শেষটা কাঁদে। জেগে উঠে বাচ্চাটাও চেঁচাচ্ছে। এদিককার রণে ভঙ্গ দিয়ে রাধেশ্যাম দু-হাতে বাচ্চা তুলে নেয়। নাচিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্ত করে। কিন্তু পেটের ক্ষিধে ভুলে অবোধ শিশু নাচানোয় কতক্ষণ শান্ত হয়ে থাকবে? একটা উপায় এখন—আধুলিটা সিকিটা হাওলাত চাইতে হবে গগন দাসের কাছে। সায়েরে মাছের দাম থেকে পরে কেটে নেবে।

গণ্ডগোলে দেরি করে ফেলল, সায়ের ভেঙে গেছে। গগন এখন আলায় ফিরেছে। রাধেশ্যাম আলার সীমানার মধ্যে ঢোকে না। খোশামুদি করতে এসেছে, ঝগড়াঝাটি নয়। ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, একটা কথা বলব, ইদিক পানে এসো বড়দা।

চুপ করে যায় হঠাৎ। নির্বাক ভালমানুষ হয়ে দাঁড়ায়। ধবধবে ফর্সা জামা-কাপড় পরে নগেনশশী বেরিয়ে আসছে। নগেনের আগে আগে সেই মানুষটি—চক্কোত্তি মশায়।

নগেনশশী রাধেশ্যামের দিকে ভ্রূকুটি করে: মতলব কি হে? বড়দার কাছে কোন দরকার?

রাধেশ্যাম কাতর হয়ে বলে, জালে কিছু হয়নি। চার-পাঁচ আনার পয়সা না হলে তো বাচ্চাটা সুদ্ধ উপোষ করে মরে।

নগেন বলে, সেটা ভাল। কাজ করবে, বেজুত হলে এসে হাত পাতবে। নয়তো আমরা সব আছি কি করতে? কিন্তু বলে দিচ্ছি। জগার ঐ শয়তানি-রাহাজানির মধ্যে কক্ষণো যাবে না। গেলে মরবে। পথে দাঁড়িয়ে সারারাত্তির হল্লা করল তুমি তার মধ্যে ছিলে নাকি রাধে?

না ছোট বাবু। আমি কেন থাকতে যাব! ছ্যাঁচড়া কাজে আমি নেই। তিনটে মুখের ভাত জোগাতে আমার বলে রক্ত জল হয়ে যাবার জোগাড়—

সেদিনের গানের দলে রাধেশ্যাম ছিল তো বটেই, কিন্তু সজোরে সে ঘাড় নাড়ে। নগেনশশীও এক কথায় মেনে নিল। শত্রুর সংখ্যা যত কম হয় ভাল। বলে, এই যাচ্ছি পিণ্ডি চটকাতে ওদের। চক্কোত্তি মশায় সহায়। সদরে যাচ্ছি, ফুলতলা আগে হয়ে যাব। চৌধুরির আলা আর সাঁইতলার নতুন আলা এক হয়ে গেছে। ফিরে এসেই লঙ্কাকাণ্ড।

কয়েক পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার বলে, সমঝে দিও পাড়ার সকলকে। নগেনশশী বাবু খোদ বেরিয়ে পড়ল। এস্পার-ওস্পার করে তবে ফিরব। সায়েরে আজ বলে দিয়েছি সকলকে। তুমি এই দেখে যাচ্ছ—তোমার মুখে আর একবার সবাই শুনে নিক।

খালের ধারে ছয় দাঁড়ের পানসি বাঁধা। এ হেন শৌখিন বস্তু বাদাবনে হামেশা আসে না, উত্তর অঞ্চল থেকে জুটিয়ে আনতে হয়। দু-জনে সেই নৌকোয় উঠছে। আরও লোক আছে ছইয়ের খোপে। রাধেশ্যাম উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে—কে মানুষটা? মানুষটা এদের আহ্বান করে: এসো গো। লাঠি ধরে খুব সামাল হয়ে ওঠ, খোঁড়া মানুষ পা পিছলে না পড়। উঠে আসুন চক্কোত্তি মশায়।

রাধেশ্যামের মোটেই ভাল ঠেকে না। যা বলেছে—কাণ্ড ঘটাবে একখানা সত্যিই। পানসি কি ফুলতলার চৌধুরি বাবুদের—প্রমথ ম্যানেজার যাচ্ছে পানসিতে, ক'দিন আগে সকলে মিলে যাকে নাস্তানাবুদ করল? ঐ কাজটা জগা বড় অন্যায় করেছে—কেউটেসাপ খোঁচা দিয়ে রাখা।

পানসি চলে যাবার পরে গগন আলা থেকে বেরুল। বেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। রাধেশ্যামকে এইমাত্র যেন চোখে দেখতে পেল। কোমল সুরে বলে, কে, রাধে? পর-অপরের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এসো।

অপসৃয়মান নৌকার দিকে চেয়ে রাধেশ্যাম করুণ সুরে বলে, আগে তো যখন তখন চলে যেতাম ভিতরে। বলতে হত না। এখন যাওয়া যায় না।

গগন ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, কুকুর পুষেছি। পুষি নি, এমনি এসে জুটেছে। মানুষ দেখলে ঘেউ-ঘেউ করে। কিছু বলতে গেলে আমায় অবধি তেড়ে আসে।

রাধেশ্যাম বলে, এই মাত্তর চলে গেল—সেই জন্যে বলতে পারলে দাদা। কিন্তু আর একটি আছে—

আলাঘরের দিকে সভয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, নিজের বোন বলে বাদ দিচ্ছ, ওটিও কম যায় না।

গগন ভারি ভরসার কথা বলে, তাড়াব। কোনটাকে থাকতে দেব না। চেষ্টা করছি এক সঙ্গে তাড়াব দুটোকে—বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দেব। এখন বুঝি নগনাটা ওই লোভে ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করে এলো। বড় ভাই আমি মত না দিলে বিয়েথাওয়া হবে না, চেপে বসে থেকে তাই যত অঘটন ঘটাচ্ছে।

শালা বড্ড ভয় দেখিয়ে গেল। শুনে তো গা কাঁপে। বলতে বলতে রাধেশ্যাম ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, তোমার শালা সেই সুবাদে পাড়াসুদ্ধ আমাদের সকলের শালা।

গগন বলে, মিথ্যে ভয় দেখানো নয়। আমে-দুধে মিশে যাচ্ছি, আঁঠি তোরা এখন তল। চৌধুরি ঘেরিদার আর গগন ঘেরিদার দুই এখন এক হয়ে গেছে—পাড়ার মধ্যে তোমরা কারা হে বাপু? রাতবিরেতে ঘেরিতে জাল বাওয়া চলবে না, সায়েরে চুরির মাছ বেচাকেনা হবে না। যত পুরানো নিয়মকানুন বাতিল। ঘেরির আইন আর সরকারি আইন এক রকম—চুরি করে জাল বাইলে কাটকে নিয়ে পুরবে।

রাধেশ্যাম সভয়ে বলে, বিয়ের পিণ্ডিগিরি মত দিয়ে দাও বড়দা। ঝুলিয়ে রেখো না। বিয়েথাওয়া চুকিয়ে আপদ-বালাই বিদেয় হয়ে যাক।

বয়ারখোলায় পুরো ছুটো দিন কাটিয়ে জগারা ফিরল। চুকিয়ে-বুকিয়ে আসা সহজ নয়। ছাড়তে কি চায়। যাত্রার দলটা এখন অসময়ে ঝিমিয়ে আছে বটে, কিন্তু কটা মাস গিয়ে আবার তো পৌষমাস। উঠোন-ভরা ধানের পালা, দলও চাঙ্গা হবে সেই সঙ্গে। বিবেক তখন কোথায় খুঁজে বেড়াবে?

সুদন কপাল চাপড়ায়। খানিকটা মস্করা, খানিকটা সত্যি সত্যি। বলে, ইস রে! জ্বর হোক বিকার হোক, ধুঁকতে ধুঁকতে কেন আমি গাড়ি নিয়ে গেলাম না! হাটে গিয়েই জগা-দার মন বিগড়ে গেল

জগা বলে, কোট আমার কোনটা দেখলি তোরা? ছুনিয়ার উপর জন্মে পা ছুখানা শক্ত হতে যে ক'টা বছর লেগেছিল। তারপর থেকে খালি কোট বদলে চলেছি। নামতে নামতে নাবালে নেমে যাচ্ছি। দেখি কদ্দূরে ছুনিয়ার মুড়ো। যেখানে গিয়ে বিনি গণ্ডগোলে আয়েস করে থাকা যায়।

চলে যাচ্ছ যখন একদিন চাট্টি শাক-ভাত খেয়ে যাও জগা। এ-বাড়ি খায়, ও-বাড়ি খায়। শীতকালে আসছে তো ঠিক? কথা দিয়ে যাও। হ্যাঁ, জগার কথার কানাকড়িও দাম আছে নাকি?

বলাই বলে, সবাই তোকে ভালবাসে জগা। যেখানে যাস, মানুষজন ছু-দিনের ভিতর মাতিয়ে তুলিস।

জগা বলে, ভালবাসা সয় না আমার মোটে। মন ছটফট করে, লোহার শিকলির মতন লাগে।

অবশেষে রওনা হয়ে পড়ল তিনজনে। বলাই পচা আর জগা। সকলের হাত ছাড়িয়ে বেরুতে দেরি হল অনেক। পথ কতটুকুই বা! গাঙ-খালে আগে শতেক বাঁক ঘুরতে হত, তখন দূর-দূরন্তর মনে হত। সড়ক বানিয়ে বাঁকচুর সিধে করে দিয়েছে। রাস্তাঘাট বানিয়ে ছুনিয়া কত ছোট করে ফেলেছে মানুষ! সাঁইতলা সকাল সকাল পৌঁছানোর দরকার—পাড়ার মানুষ ডেকেডুকে আসর বসাতে হবে। সেদিনের মতো তুমুল গান-বাজনা। আর কিছুতে না পারা যায় গান গেয়েই জব্দ করবে খোঁড়া নগনাকে। পা চালিয়ে চলো। দেরি হলে সবাই জালে বেরিয়ে যাবে, মানুষ পাওয়া যাবে না।

সাঁইতলা এসে পড়ল, প্রহর রাতও হয়নি তখন। পাড়া নিশুতি। মানুষ অকারণে কেরোসিন পোড়ায় না। কিন্তু মুখের উপরে তো খাজনা-ট্যাক্স বসায় নি, কথা বলতে এক পয়সা খরচা নেই—তবে কেন চুপচাপ এমন ধারা? পাখপাখালি জীব-জানোয়ার সকলের ডাক আছে। কিন্তু সাঁইতলার পাড়া ভরতি এক গাদা মানুষ যেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। ছুটো রাত্রি ছিল না। সবসুদ্ধ তার মধ্যে মরে-হেজে গেল নাকি?

বলাই বলে, বেষ্ট পক্ষ পেয়ে সকাল সকাল জালে বেরিয়ে গেছে।

জগা বলে, বেরুবে মরদ মানুষ। মাগিগুলো কি করে? কাজকর্ম সেরে নিয়ে নিজেদেরপক্ষে একটু ঝগড়াঝাটি তো করবে। কী হল! বন না বসত, কিছু বোঝা যায় না।

উঠানে এসে গাঁজার গন্ধ নাকে পায়। তাতে খানিক সোয়াস্তি। পাড়ায় মানুষ থাকুক না থাকুক, তাদের চালাঘরে আছে। অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছে ক্ষ্যাপা মহেশ। দাওয়ার খুঁটি ঠেশ দিয়ে ঝিম হয়ে একলাটি বসে। অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে, বুঝে দেখ তবে। গাঁজা একা একা খাবার বস্তু নয়। অথচ এমন পাড়ার ভিতর থেকে একজন কেউ বেরিয়ে এলো না। গন্ধ পাচ্ছে—মানুষের মন ঠিক আনচান, তবু কি জন্যে কোন লোক এসে পড়ছে না।

মহেশও ঠিক এই কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বোমার মতো ফেটে পড়ে: বেরিয়ে পড় ওরে শালারা, মাথা কুটছি। এ জায়গায় শনির নজর লেগেছে। বাবুভেয়েরা ধাওয়া করেছে—আর সুখ হবে না। পালা, নয়তো মারা পড়বি একেবারে।

বৃত্তান্ত এর পরে সবিস্তারে শোনা গেল। রাধেশ্যামকে ওই শাসানি দিল, পাড়ার প্রতিজনকে ধরে ধরে অমনি বলে দিয়েছে। চৌকি বসে যাচ্ছে নাকি চৌধুরিগঞ্জে, পুলিশ মোতায়েন হবে। রাত্রিবেলা ঘেরির খোলে জাল ফেলে মাছ মারা বা, সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে মাল পাচার করাও ঠিক সেই বস্তু। চুরি। চুরির আইনে বিচার হবে এবার থেকে, শুধুমাত্র জাল কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে না। হাতে হাতকড়ি পরিয়ে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাবে।

পচা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে, চলবে কি করে তবে মানুষের? খাবে কি?

মহেশ বলে, সে কথাও হয়েছিল। নগেন বাবু বলল, রাস্তাঘাট হচ্ছে, মাটি কাটবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে খেতে হবে। অসংবৃত্তি চলবে না। শোন কথা! ওরাই যেন খাটনি খেটে রোজগার করে খায়।

পচা বলে, মাটি কাটুক, ভাল কথা। কিন্তু একদিন তো রাস্তা বাঁধা শেষ হয়ে যাবে। তখন?

মহেশ বলে, তখন মরবে। সময় থাকতে তাই তো পালাতে বলি। কানে নিচ্ছিস নে শালারা।

চালাঘরে ঢুকে বলাই টেমি জ্বালে। বয়ারখোলা থেকে চাল নিয়ে এসেছে—তাই কিছু তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে নেওয়া। পচাকে ডাকছে, উনুন ধরা পচা। ক্ষিধেয় পেটের মধ্যে বাপান্ত করছে—

জগা বলে, খাওয়া হোক শোওয়া কিন্তু হবে না। তাই বুঝে চাল নিবি। কুঁচকি-কণ্ঠা গিলে হাঁসফাঁস করবি, ঘুষি মেরে ভুঁড়ি ফাঁসাব তাহলে। সারা রাত জেগে গানবাজনা। ঢোল বাজাব আমি, আর গাইব তিনজনে মিলে। দল ভেঙে দিল তো বয়ে গেছে—আমাদের তিনটে মানুষের প্রতাপ দেখিয়ে দেব আজ ওদের।

বলাই চাল ধুতে গেছে বাঁধের নয়ানজুলিতে। পচা উনুন ধরাচ্ছে। ক্ষ্যাপা মহেশ উঠে এসে উনুনের আগুনে কলকের ছুড়ি ধরিয়ে নিয়ে গেল। আর জগাই বা সময়ের অপব্যয় করবে কেন—ততক্ষণ ঢোলক নামিয়ে নিয়ে বসলে তো হয়।

বেড়ায় ঢোলক টাঙানো থাকে—কী আশ্চর্য, ঢোলক তো নেই। গেল কোথায়? টেমি নিয়ে এলো উনুনের ধার থেকে, বেড়ার চতুর্দিকে টেমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে: নেই তো। ঢোলক বলে নয়—দড়ির উপর কাঁথা টাঙানো থাকে, তাও গেছে। ছুটো দিন ছিল না, মহেশকে পাহারাদার রেখে গিয়েছিল। ক্ষ্যাপা ঠাকুর

গাঁজা খেয়ে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে পড়েছিল, সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে সেই সময়।

জগন্নাথ গরম হয়ে মহেশকে বলে, তোমার জিম্মায় সব ছিল। ঠাকুর-ঘরের মধ্যে কে এসেছিল ?

বড়-কলকের প্রবল এক টান দিয়ে চোখ পিটপিট করে মহেশ বলে, কে আসবে ? চারুবালা এসেছিল বুঝি ক'বার। মেয়েটা বড্ড ভাল। আমার সেবা হত কিনা আলায়—ডাকতে আসত।

ডাকবে তো বাইরে দাঁড়িয়ে। কোন সাহসে ঘরে ঢোকে ? মুগুর তো ঠ্যাঙে লাঠি মেরে খোঁড়া করে দিলে না কেন ?

মহেশ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, এসে মন্দটা কি করল শুনি ? ময়লা দেখতে পারে না মেয়েটা। ঝাঁটা নিয়ে কোমরে আঁচল বেঁধে লেগে যেত। গোবর-মাটি গুলে ঘরের মেঝে লেপত। বেড়ার নিচে ফুটো। বলে, মাটিতে পড়ে থাকে মানুষগুলো। ফুটো দিয়ে কবে সাপখোপ ঢুকে পড়বে। মাটি লেপে ফুটো বুজিয়েছে। ঘর কেমন ঝকঝক তকতক করছে, সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বড্ড দোষ হল মেয়েটার—কেমন ?

কিছু নরম হয়ে জগা বলে, আমাদের কাঁথা কোথায় রেখে গেল ?

আর বোলো না। যা দশা হয়েছিল কাঁথার ! ক'টা আঙুলে মেড়েচেড়ে মেয়েটা তো হেসে খুন। বলে বাদায় যাবে গুণীন ঠাকুর, তা তোমাদের বন্দুক লাগবে না। জন্তু-জানোয়ার দেখলে কাঁথা ছুঁড়ে দিও, কাঁথার গন্ধে পালাতে দিশে পাবে না। দানো-ভূতের জন্যেও তোমার ধুনোবাণ সর্বেবাণের দরকার নেই। নিয়ে গেল কাঁথা বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে। ক্ষারে কেচে দেবে কাচতে গিয়ে সুতো সুতো হয়ে যায় তো গোবর-মাটি দেবার ন্যাতা করবে। নয়তো ফেরত দিয়ে যাবে বলেছে।

আর ঢোলক ?

মহেশ হি-হি করে হাসতে লাগল : মেয়েটা আবার স্ফূর্তিবাজ খুব। ঘর লেপে হাত ধুয়ে এসে ঢোলকটা গলায় ঝুলিয়ে ডুম-ডুম করে বাজাতে লাগল। আর ঠিক তোমার মতন গলা করে ভেঙচে ভেঙচে গান গায়। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জোগাড়।

গেল কোথায় ঢোলক ? সে-ও ক্ষার কাচতে নিয়ে গেল নাকি ?

মহেশ বলে, ভুল করে বোধ হয় গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

জগা আগুন হয়ে বলে, চলে গেছে তার মানে ? ঢোলক কি সরু চেনহার যে গলায় পরে তারপরে আর খুলতে মনে নেই ? চালাকি পেয়েছে ?

বলাইকে জগা হাঁক দিয়ে ডাকল।

বড় তো ব্যাখ্যা করিস চারুবালার। ওটা হল চর। গানে সেদিন খুব অসুবিধা লেগেছে। আমরা ছিলাম না—খোঁড়া নগনা সেই কাঁকে ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে দল ভাঙিয়েছে। আর মেয়েমানুষ চর পাঠিয়ে ঢোলক হরে নিয়ে গেছে। তিনটে মানুষ খালি গলায় চেঁচিয়ে কায়দা করা যাবে না।

পচা আর বলাইর হাত ধরে জগন্নাথ হিড়হিড় করে টানে : চল্—

বলাই বলে, কোথায় রে ?

আলায়। ঘরের জিনিষপত্তর টেনে নিয়ে গেল, ভেবেছে কি ওরা ?

মনে মনে রাগ যতই থাক, বলাই ঠিক সামনাসামনি পড়তে চায় না। বলে, ভাত চাপিয়েছি, ধরে যাবে।

পোড়া ভাত খাব আজকে। চল্—

বলাইর দিকে জগা কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে : মেয়েটাকে ভয় করিস, স্পষ্টাস্পষ্টি তাই বল না কেন। কাছা দিবিনে আর, তুই বুঝলি ? মাথায় ঘোমটা টেনে বেড়াবি এবার থেকে।

মহেশ এর মধ্যে কথা বলে ওঠে : যেতে হবে না। তোমরা এসে গেছ, কাঁথা এবারে নিজে থেকে এসে দিয়ে যাবে। মেয়েটা বড্ড ভাল গো, সাধ্য পথে কারও কষ্ট হতে দেবে না।

আর ঢোলক ?

তা জানি নে। ঢোলক অবিশ্যি না দিতেও পারে। ঢোলক হাতে পেলে তো কান ঝালাপালা করবে তোমরা। সেটা বোঝে।

জগা আগুন হয়ে বলে, দেবে না, ইয়ার্কি পেয়েছে ? নতুন করে ছেয়ে আনলাম ফুলতলা বাজার থেকে। করকরে টাকা বাজিয়ে দিয়ে। দেখে আসি, কেমন দেবে না—ঘাড়ে ক'টা মাথা নিয়ে আছে !

টেনে নিয়ে চলল দু-জনকে। রোখের মাথায় আজকে আর সীমানার বাইরে নয়—একেবারে আলা-ঘরের ছাঁচতলায় গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে : বড়দা—

ঘরের ভিতর কথাবার্তা হচ্ছিল, ডাক শুনে চুপচাপ হয়ে গেল।

জগা বলে, কানে তুলো ভরে রেখেছ বড়দা, শুনতে পাচ্ছ না ? বেরিয়ে এসো বলছি। নয় তো ঘরে ঢুকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব।

এইবার দাওয়ার প্রান্তে গগন দাসকে দেখা গেল : চেঁচাস কি জন্যে ? হল কি তোদের ?

অন্ধকারে গগন দাসের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলার স্বরে বোঝা যায়, ভয় পেয়ে গেছে খুব। বলে, কি বলবি বল। রাগিস কেন ?

তোমার বোনটাকে শাসন কর বড়দা।

গগন অসহায়ের ভাবে বলে, কি করল আবার ? নাঃ, পারার জো নেই ওদের নিয়ে। দিব্যি শান্তিতে ছিলাম। জুটেপুটে এসে এই নানান ঝঞ্ঝাট।

জগা বলে, আমরা ছিলাম না। সেই কাঁকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মালপত্তোর পাচার করেছে।

চারুবালা বুঝি পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : মাল আর পত্তোর—কচু আর ঘেঁচু।

জগা বলে, ভালর তরে বলছি, আপসে দিয়ে দিক সমস্ত। নয়তো কুরুক্ষেত্তোর হবে।

চারুবালা দ্রুত ভিতরে চলে গেল। পরক্ষণে কাঁথা এনে দু-হাতে মেলে ধরে। কেচে ফর্সা করতে গিয়ে পুরানো কাঁথা ফেঁসে গিয়েছে। ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়ে হেসে ফেটে পড়ে।

দেখ দাদা, চেয়ে দেখ। ঘর থেকে কত দামি শাল-দোশালা নিয়ে এসেছি, সেই জন্যে মারমুখি এসে পড়ল। মানুষ নয় ওরা, মানুষে এর উপরে শুতে পারে না।

জগা আগুন হয়ে বলে, আমাদের ঘরের ভিতর আমরা যেমন খুশি শোব, অন্য লোকে কি জন্য মোড়লি করতে যায় বড়দা? দিয়ে দিক এক্ষুণি।

চারুবালা বলে, সেলাই করে তারপরে দিয়ে আসব। এ কাঁথায় শাওয়ার চেয়ে মাটিতে শোওয়া অনেক ভাল।

মাদুর গুটানো ছিল দোরের পাশে, চারুবালা ছুঁড়ে দিল। বলে, মাদুরে শুয়ে আজকের রাতটা কাটুক। কাঁথা দেব কাল।

জগা জেদ ধরে: না এক্ষুণি। পরের মাদুরে পা মুছি আমরা।

সত্যি সত্যি পা মুছে পায়ের ঘায়ে মাদুরটা চারুর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

আর গগন ওদিকে কাতর হয়ে বলছে, ওরে চারু, দিয়ে দে ওদের জিনিষ। মিছে ঝগড়া করিসনে।

চারু কানেও নেয় না। জগার রাগ দেখে হাসে আরও মিটিমিটি। জগা বলে, ঢোলক কি জন্যে আনা হয়েছে, জিজ্ঞাসা কর তো বড়দা। ঢোলক ময়লা নয়, ছেঁড়াও নয়।

চারু বলে, ছিঁড়ে দেব সেই জন্যে নিয়ে এসেছি। ঢ্যাব-ঢ্যাব করে বেমক্কা পিটিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দেয়। তবু যদি বাজাতে জানত।

জগা চেঁচিয়ে ওঠে: ছিঁড়ে দেবে, জুলুম। তাই যেন দিয়ে দেখে। হাত মুচড়ে ভেঙে দেব না?

চারু বলে, মুচড়ে ভাঙতে আসবে, তার আগেই যে হাতকড়া পড়ে যাচ্ছে। তার কি উপায়—সেই ভাবনা ভাব গিয়ে এখন।

বলাই হাত ধরে টানে: চল্ রে জগা। ভাত ধরে ওদিকে।

জগা বলে, ভয় পেয়ে গেলি?

বলাই ঢোক গিলে বলে, না, ভয় কিসের? কিন্তু এরা লোক খারাপ, বলা যায় না কিছু।

পচা এগিয়ে এসে আর এক হাত চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলে, গোঁয়ার্তুমি করিসনে জগা, চলে আয়। ছিল নগনা-খোঁড়া, তার উপরে আবার টৌর্নি চক্কোত্তি ভর করেছে। গতিক সুবিধের নয় মোটেই।

দু'জনে দু' হাত ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল জগাকে।

মহেশ শোনে সমস্ত কথা, আর হা-হা করে হাসে: চল্ রে, বেরিয়ে পড়ি। বদর বদর হুকার দিয়ে কাছি খুলে দে নায়ের। তরতর করে নেমে চলুক। হিংলি বিংলি আর মোংলা—ঘোর জঙ্গলের তিন দেবতা। রামরূপী দেবতা ওঁরা। হক্কে মানুষ তোদের তাড়া করেছে, মানুষের রাজত্বে ঠাঁই হবে না। রামের রাজত্বে চল যাই। তাদের দয়া হবে, সেখানে ঠাঁই মিলবে।

সে রাত্রে গান-বাজনা হল না। ভালই হল। ক্ষ্যাপা মহেশ ঘুমোয় না। ঘোর বাদার গল্প করে, আর গাঁজা খায় ক্ষণে ক্ষণে। এরা তিন জনে প্রসাদ পায়।

শোন, জল হল জীবন। জলে জলময় বাদাবনের চতুর্দিক—সে জল ডাকে, রোদের আলোয় ঝিকমিক করে দাঁত মেলে যে জল খেতে আসে। ঝিলিক দেয় সে জলে রাত্রিবেলা। অন্তহীন আকাশের নিচে কূলহীন সেই জলের উপরে ভীতু মানুষ আর্তনাদ করে: ঠাকুর, দুনিয়া-জোড়া তোমার দরিয়া। কত ছোট আমাদের নৌকো। ডাঙা এনে দাও কাছাকাছি—ডাঙায় জীব, শক্ত মাটির উপর পা রেখে রক্ষে পাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, তবু এত জলের একটি ফোঁটা মুখে তোলবার উপায় নেই। উৎকট নোনতা। সেই সময় কেউ যদি বলে এক ঘটি সোনার মোহর নিবি না এক ফেরো জল—জল চাইবে মানুষ। মিঠা জল—যার বিহনে কণ্ঠাগত হয় জীবন।

সেই জীবন অফুরন্ত রয়েছে কেশেডাঙার চরে। মাটির নিচে লুকানো। আমি সন্ধান পেয়েছি। বালি খুঁড়ে খেয়েও এসেছি অঞ্জলি ভরে। নিজে গিয়ে দেখে এসে তবে বলছি।

আমি প্রথম নই। সকলের আগে গিয়েছিল শশী গোয়ালা। তার মুখে শুনে সমস্ত হদিস নিয়ে তবে আমি যাই। সরকার থেকে লাট বন্দোবস্ত নিয়েছিল শশী। সিকি পয়সা সেলামি লাগেনি, খাজনাও নয় প্রথম আট বছর। আট বছর অন্তে দু-আনা নিরিখে নামেমাত্র খাজনা। এমনি চলবে। ষোলআনা হাসিল হয়ে গেলে পুরো খাজনার কথা তখন বিবেচনা। কী দিনকাল ছিল—জমি-জিরেত ডেকে ডেকে দিয়েছে, নেবার লোক পাওয়া যায় না। সাহস করত না লোকে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান ছিল, ইচ্ছেও হত না লোকের। ভাত-কাপড় পুড়ে-জ্বলে যায়নি তো এখনকার মতো!

গাঙে-খালে ডাকাতি করে শশী পয়সা করেছিল। বয়স হয়ে গিয়ে এবং টাকাপয়সা জমিয়ে পাপবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে, পুলিশ তবু ত্যক্ত-বিরক্ত করে। মোটা তঙ্কা গুণে যেতে হয়, নয়তো দশ ধারায় মামলায় জুড়ে দেবে, নাজেহাল করবে নানা রকমে। ডাকাতির আমলে কাঁচা পয়সা হাতে আসত, দিতে আটকাত না। এখন পুঁজি ভেঙে ভেঙে দিতে গায়ে বড্ড লাগে। শশী তাই ছেলেদের নিয়ে বাদায় চলে গেল। নিরিবিলি সেখানে সংসার পাতবে। চেষ্টাও করল অনেক রকমে। পেরে উঠল না। তিন তিনটে জোয়ান ছেলে বাঘের মুখে দিয়ে টাকাকড়ি সমস্ত খুইয়ে শশী আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। উপযুক্ত গুণীন সঙ্গে না নিয়ে তার এই দশা। ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী হলেন গুরু-মুর্শিদ, বনের কাণ্ডারী ফকির-গুণীন। আমার পিছন ধরে শশী যেতে চাচ্ছে আর একবার। বনের টান কাটেনি—ও নেশা কারও কোন দিন কাটে না।

যাওয়ার মতি হয়েছে অবশেষে ওদের। টিকতে না পারে তো ফিরে আসবে। কিম্বা আর যেখানে হয় চলে যাবে। দুনিয়া থেকে এত দিনে সম্বল যা জুটিয়েছে, সেটা ভার-বোঝা কিছু নয়। এদের এই মস্ত সুবিধা, নড়তে-চড়তে হাঙ্গামা নেই। বাদাবনে যায়নি কত কাল! অরণ্যের অন্ধিসন্ধিতে সাপের মতো বুকে হাঁটা, বানরের মতো ডালের ডগায় চড়ে বসা আবার কখনো বাঘের মতো চক্কোর দিয়ে ঘোরা। মনে পড়ে গিয়ে বুকের মধ্যে আনচান করে।

পচা বলে, নৌকোর কি হবে?

পচার বেকুবি কথা শুনে বলাই হি-হি করে হাসে: ছুতোর ডেকে নৌকোর বায়না দে। নয়তো আর কোথায় পাবি? বলি, হাটবারে কুমিরমারি গিয়ে ঘাটে তাকাসনি কখনো? নৌকোয় নৌকোয় এখন জল দেখা যায় না। বনে যাবে, তাই নৌকোর ভাবনা করছে।

মহেশ ঘাড় নেড়ে আপত্তি করে ওঠে: দুর্মতি কোরো না খবরদার! অনিষ্ট হবে। আশাসুখে যাচ্ছ, কেউ শাপমন্যি না দেয়। দুঃখ পেয়ে নিশ্বাসটাও জোরে না ফেলে যেন কেউ।

শশী গোয়ালার কথা উঠল আবার। শশীর পাপার্জিত পয়সা। ভোগান্তি সেই কারণে। গাঙ-খাল আর গহিন জঙ্গল এক সঙ্গে যেন আড়েহাতে লাগল ডাকাত শশীর সঙ্গে। সন্ধ্যা অবধি লোক খাটিয়ে মাটি ফেলে বাঁধ বাঁধল—সকালবেলা দেখা যায় মাটি ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে, বাঁধের নিশানা পাওয়া যায় না। কুড়াল মেরে যে গাছটা কাটে, সাতটা না যেতে গোড়া দিয়ে পাঁচ-সাতখানা ওজ বেরোয়। কেটে কেটে শেষ হয় না। ক্ষেপে গিয়ে শশী আরও টাকা ঢালে, জনমজুর দুনো তেদুনো নিয়ে আসে। হল না, সর্বস্ব গেল। মজুরি না পেয়ে মাটি-কাটার দল শেষটা একদিন বিষম মার মারল শশীকে। মার খেয়ে শশী পালাল। নির্বংশ নিরন্ন হয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে এখন ঘুরে বেড়ায়।

জগা বলে, সস্তায় নৌকো ভাড়া করব আমরা। জগন্নাথকে সবাই চেনে। ভাড়ার টাকা আগাম দিয়ে দেব।

চিহ্নিত সেই কেওড়াগাছতলায় ভাণ্ডারের কিছু অবশিষ্ট আছে। জোর সেইখানে জগার।

মহেশ ঠাকুর বলে, কুমিরমারি চল তবে একদিন। নৌকো ঠিক করা যাবে। বাদায় নেমেই তো পুজোআচ্চা, তার কেনাকাটা আছে। খোরাকিও সঙ্গে নিতে হবে।

বলাই পরমোৎসাহে বলে, ফর্দ করে ফেল ঠাকুর।

মহেশ বলে, লেখাজোখার ধার ধারি নে। ফর্দ মুখে মুখে। ফর্দ আমার মনে গাঁথা। কত বার কত লোক নিয়ে গেলাম।

জগা বলে, পরশু হাটবার আছে। পরশুদিন চল তবে। সাঁইতলা আর ফিরব না। ঐ পথে অমনি না ভাসাব।

গোপন ছিল ব্যাপারটা। জঙ্গল কেটে খেটেখুটে বসতি গড়ে তুলে এক কথায় এমনি ছেড়ে চলে যাওয়া লজ্জার ব্যাপারও বটে। নগেনশশী নেই, শয়তানি প্যাঁচ কষছে কোনখানে গিয়ে। কিন্তু চারুবালা আছে। টের পেলে মেয়েটা হাসাহাসি করবে: নেড়ি কুকুরের মতন লেজ তুলে পালায় কেমন দেখ। সেইজন্য রা কাড়ে নি ওরা মুখে।

তবু কি ভাবে জেনে ফেলেছে রাধেশ্যামটা। বেড়ায় আড়ি পেতে শুনে গেছে নাকি?

শেষরাত্রি। তারা ঝিকমিক করছে ওপারে বনের মাথায়। খালে ভাঁটার টান। জল নামছে কোনদিকে অবিশ্রান্ত কলকল আওয়াজে। এদিক ওদিক তাকিয়ে চারজনে বাঁধের উপর এসে উঠল।

বাঁধের নিচে গর্জন গাছের পাশ থেকে রাধেশ্যাম কথা বলে ওঠে, আমি যাব—

তুমি যাবে কোথা?

তোমরা যেখানে যাচ্ছ। ক্ষ্যাপা ঠাকুর যেখানে নিয়ে যায়।

তোমার বউ-বাচ্ছা?

বউয়ের ভয়েই তো যাচ্ছি—

বাঁধের উপর সকলের মাঝখানে চলে এল। হাতে খেপলাজাল। বলে, মাছ আজও হল না। গালি দিয়ে ভূত ভাগাবে বউ। মরে গিয়ে জ্বালা জুড়াব, সেই মতলব হয়েছিল। বউ বলে আমি মরলে সে-ও সঙ্গে সঙ্গে মরবে। মরে গিয়ে পেত্নী হয়ে পিছু নেবে। তা ভেবে দেখলাম, এই ভাল। রাতে রাতে সরে পড়ি রে বাবা, বউ টের পাবে না। রোসো, জালগাছ দাওয়ায় রেখে আসি। মাগি ঘুমুচ্ছে এখন।

[ক্রমশঃ।

মা-মণি বিদায়

[সালভাতোর কোয়াসিমাদোর চিঠি: 'আমার মাকে' এর মূল-ভাব গ্রহণ করিয়া নিজস্ব-ভঙ্গীতে রচিত]

গণেশ বসু

শীতের কুয়াশা জাগে, মনে পড়ে যায় সেই ভোরের নীলিমা,
তোমারো চোখের পাতা ভিজেছিল মানবিক চোখের জলে
দেখেছিলাম অশ্রুসিক্ত সে আঁখি তোমার মা গো পৃথিবীর তলে;
আজ আর কেঁদো নাকো কবির জননী তুমি, স্নেহের প্রতিমা।

মনে পড়ে অদূরের বনানীর পাশ দিয়ে ট্রেণের গতি
একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে হুইসেল দিতে দিতে অজানার পথে
ধূসর ইয়ার্ড থেকে বাদাম-আপেল হ'তো ভরা এই রথে;
ক্ষণিকের জন্যে আমি ভুলে যাই পৃথিবীর সব লাভ-ক্ষতি।

কমলার ঝুড়ি নিয়ে ট্রেণ যেতো ইমেরাই নদী-মোহানায়
অসংখ্য ম্যাগপাই, সহস্র নুন আর ইউক্যালিপটাস;
তোমারই দান এই ওষ্ঠের শাণিত হাসি একরাশ
দুঃখ আর কান্নার প্রশস্ত হাত থেকে যে হাসি বাঁচায়।

মনেতে বাসনা জাগে ধন্যবাদ দিই আমি তোমারে গো আজ
তবুও চোখের কোণ আজো দেখি জল শুধু করে টলমল
তাদেরও চোখের কোল কিসের প্রতীক্ষায় করে ছলছল,
জানি আমি কে সে বীর, কোন্ সে অতিথি জানি, মৃত্যুর সাজ।

মৃত্যু দুয়ারে বুঝি, তাই আজ বলে যাই মা-মণি বিদায়
চলে যাই পাখনার ভর করি আমি সেই দূর নীলিমায়!

শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

[প্রবীণ দেশকর্ম্মী ও বিপ্লবী]

মনে-প্রাণে একজন বিপ্লববাদী ও নিঃস্বার্থ দেশসেবী এই মানুষটি। বলতে কি, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র জীবনটাই জাতির কল্যাণব্রতে উৎসর্গীকৃত। ভারতে বৈপ্লবিক ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে যাঁদের প্রয়াসের অন্ত নেই, তিনি তাঁদেরই অন্যতম প্রধান। মুক্তি-সংগ্রামের অংশীদার হতে যেয়ে কী অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে—অথচ মেরুদণ্ড তাঁর এখন অবধি বেশ সোজা, বিপ্লবের পথ-রেখা ধরে চলার আজও তিনি একজন দুঃসাহসী সেনানী।

ঢাকার বিক্রমপুরের পঞ্চসার গ্রামে জীবনলাল জন্মগ্রহণ করেন বিগত শতাব্দীর শেষ শতকের গোড়ায়। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের আর দশ জন ছেলের ক্ষেত্রে যেমন হয়, বা হতো তেমনি সাধারণ ভাবে গড়ে উঠতে থাকে তাঁর জীবন। কিন্তু সামনে ছিল একটি প্রোজ্জ্বল আদর্শ—দেশমাতৃকার নিঃস্বার্থ সেবার আদর্শ।

ছাত্রজীবন তখনও অতিক্রান্ত হয় নি জীবনলালের—দেশ জুড়ে চলেছে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন। ইত্যবসরে পুলিন দাস ঢাকায় অনুশীলন সমিতি সংগঠন করে ফেলেছেন—পূর্ব্ববঙ্গে এসে গেছে একটা প্রাণের জোয়ার। জীবনলাল এই মুহূর্ত্তে গৃহকোণে বসে থাকতে চাইলেন না। অপরিণত বয়সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যান তিনি—উদ্দেশ্য, ঢাকায় যেয়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেবেন। এরই ভেতর বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন তিনি সক্রিয় ভাবে। তাঁর বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্ম্মজীবনের সূচনা বলতে পারা যায় এইখানেই।

লক্ষ্যপথে ক্রমেই এগিয়ে যাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে জীবনলালের বিপ্লবী মন। ইতোমধ্যে কলকাতায় এসে যান তিনি এবং আসার পরই তখনকার বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর'-এর সাথে সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে যায় তাঁর। ওদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের অবকাশে জার্ম্মাণ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে এদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে গোপন আয়োজন হয়, এর সাথে ঘটে জীবনলালের নিবিড় সংযোগ। এই সময় যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), এম্ এন্ রায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসভাজন ও নির্ভরযোগ্য কর্ম্মী ছিলেন তিনি। কোন কারণে ষড়যন্ত্রটি ফাঁস হয়ে পড়লে পুলিশী অত্যাচারের তাণ্ডব চলতে থাকে দেশের সর্ব্বত্র। অনেক নেতা ও কর্ম্মী কারাবরণ করেন তখন—কতক সংখ্যক বিপ্লবী কাজ করে চলেন গা ঢাকা দিয়ে। সংগঠনকে ('যুগান্তর') বাঁচিয়ে রাখাই ছিল সে মুহূর্ত্তের বড় সমস্যা। এই দুরূহ দায়িত্ব পালন করেন ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কুন্তল চক্রবর্ত্তী—এঁদের সাথে নির্ভীক প্রাণ জীবনলাল আর সেটি আত্মগোপন অবস্থায় থেকে। ইংরেজ সরকারের পুলিশী লাঞ্ছনা থেকে বিপ্লবী কর্ম্মীদের বাঁচাবার চেষ্টায় সেদিনে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন, জীবনলাল তাঁদেরও অন্যতম। এর জন্যে অবশ্য অবর্ণনীয় নির্য্যাতন ও নিপীড়ন বুক পেতে সইতে হয়েছে অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও।

রাজনৈতিক মহলে 'জীবনদা' বলে পরিচিত এই নিরহঙ্কার ও চিন্তাশীল মানুষটি কতবার যে জেলের খাঁচায় আটক পড়েছেন, বলবার নয়। সূচনা থেকেই তিনি আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন—বিপ্লবের আদর্শে তাঁর প্রবল অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। এমন কি, ইংরেজের গারদখানায় যেয়েও আপন নীতি ও আদর্শের জন্যে সংগ্রাম দিতে তিনি পিছপা হন নি। অনশন ও অন্যান্য ব্যবস্থা মারফত জুলুম ও নির্য্যাতনের জোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি আটক জীবনেও। এরই নিমিত্ত দেখা গেছে—লোম্যানের মতো ঝানু গোয়েন্দা অফিসারও কাজের গণ্ডী পেরিয়ে এসে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাঁকে।
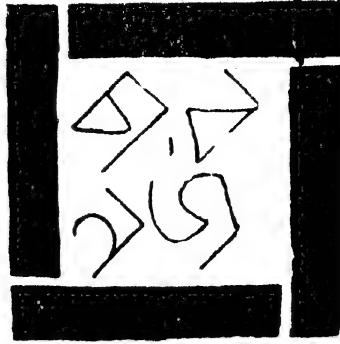
ইত্যবসরে ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতা এ পথে না এলেও বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় গণ-জাগরণের পক্ষে এ পরম সহায়ক হবে, এই প্রত্যয় নিয়ে 'যুগান্তর' দলের নেতারা কংগ্রেসের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সংগ্রামী জীবনলালও স্বভাবতঃই থাকলেন আন্দোলনের অগ্রভাগে। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে থেকেও ভবিষ্যতের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ প্রচার ও গুপ্ত সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা পাশাপাশি। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই সময় জীবনলালকে ('জীবনদা') ঘিরে একটা তরুণ বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে থাকে, শুধু বাংলায় নয়—বাংলার বাইরেও। 'যুগান্তর' দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র 'সত্যাশ্রমে'র (দৌলতপুর) সাথে তিনি নিবিড়ভাবে

শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

যুক্ত ছিলেন। অপরদিকে মুন্সীগঞ্জ ন্যাশনাল স্কুলেরও (ঢোকা) তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতি দেখে দেশবন্ধু যখন স্বরাজ্য পার্টির আদর্শ নিয়ে কংগ্রেসকে নতুন করে গঠন করতে ব্রতী হন, সে সময় যুগান্তর দল ও এর বিপ্লবী কর্মীরা এসে হাত মিলান তাঁর সাথে। এই ব্যাপারেও একটি প্রধান সক্রিয় নেতৃত্ব ছিল গঠনপটু জীবনলালের। সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) সাথে এ সময়ই তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। পার্টির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বহু আলোচনা ও পরামর্শ হয়েছে উভয়ের ভেতর। সেদিনে। জীবনলালের ওপর সুভাষচন্দ্রের কী অসীম শ্রদ্ধা ছিল, নানাসূত্রে দেখতে পাওয়া গেছে সেটি।

এম্‌ এন্‌ রায় মারফত কম্যুনিষ্ট ভাবধারা ও আন্দোলন ভারতের বিপ্লবী মহলে তখন আলোড়ন আনতে সুরু করেছে। জীবনলালও প্রথম দফাতেই কম্যুনিজমের আদর্শ ও কর্মনীতির সাথে নিজকে ভালরকম পরিচিত করে তোলেন। দেখতে দেখতে এদেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা হয়ে পড়েন তিনি। সে যুগে অন্যান্যদের মধ্যে বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট নেতা মুজফফর আহমেদ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও সুহৃদ।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৮ সাল—পাঁচটি বছরই কারাজীবন যাপন করেন জীবনলাল আর এবার সুদূর ব্রহ্মদেশে। অগ্নিযুগের এই বিশ্বস্ত সেনানী কিন্তু এইখানেই দমে গেলেন না। বরং মনে এই দাবীটি রাখলেন তিনি—আগে চলতেই হবে, ঠিক পথ মিলবেই এক সময়। কেন না, সর্বোপরি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—'পথই পথ দেখায়'।

ব্রহ্মের জেল থেকে মুক্তি পাবার পরই কলকাতার ঐতিহাসিক কংগ্রেসে (১৯২৮) যোগদান করেন জীবনলাল। তারপর ১৯৩০ সাল—কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশময় চলেছে আইন অমান্য আন্দোলন। এতটুকু দ্বিধা না করে জীবনলালও ঝাঁপিয়ে পড়েন এই গণ-আন্দোলনে। এই সময়ই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব ভার পড়ে তাঁর ওপর। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে ১৯৩৮ সাল অবধি আটক জীবন যাপন করতে হয় তাঁকে? এই আটটি বছর কাটে তাঁর কখনও বক্সার জেলে, কখনও হিজলী জেলে, আর বেশির ভাগ সময় মাদ্রাজের কয়েকটি জেলে। তাঁর সময়োচিত সমর্থন ও নির্দ্দেশ পেয়ে মাদ্রাজে সেদিনে একটি বেশ বড় রকম বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

এবারে জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর জীবনলাল আরও অনেকের সাথে কংগ্রেসের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। রামগড় কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের আপোষ-রফা মারফত ক্ষমতা আদায়ের প্রস্তাব গৃহীত হলে এই সংগ্রামী মানুষটির মন স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারপর তিনি একাই নন, এম্‌, এন্‌, রায় প্রমুখ বহু নেতা ও দেশকর্মী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। দেশে কি ভাবে শক্ত ভিত্তিতে বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তোলা যায়, তখন তাঁদের সামনে এই জরুরী প্রশ্নটি দেখা দেয়। নীতি ও কর্মসূচীর অমিল হওয়ায় জীবনলাল কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিতে পারলেন না। এম্‌, এন্‌ রায়ের সংগঠিত র‍্যাডিকাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতেও যুক্ত থাকা তাঁর পক্ষে কঠিন হলো। পরিশেষে কতক সংখ্যক বিশ্বস্ত কর্মী নিয়ে ১৯৪৩ সালে গড়ে তোলেন নিজে একটি নতুন সংগঠন—যার নামকরণ করা হয় ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড। আদর্শ অনুযায়ী এই মার্ক্সবাদী সংগঠনটিকে জোরদার করে তুলতে সেই থেকেই চলেছে জীবনলালের ব্রত ও প্রয়াস।

এ দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেও এই মুক্তিযোদ্ধার অবদান সামান্য নয়। খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন, ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলন, শান্তি আন্দোলন—প্রতিটি গণ-আন্দোলনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ডের মুখপত্র 'গণ-বিপ্লবে'র পরিচালনার দায়িত্ব আজও তাঁরই ওপর ন্যস্ত আছে। মত ও পথের বিভিন্নতা থাকলেও জীবনলাল দল নির্বিশেষে সকল বিপ্লবী ও দেশকর্মীর শ্রদ্ধাভাজন। এর প্রধান কারণই বোধ হয়—আজ জীবনলাল একজন ব্যক্তি-বিশেষ মাত্র নয়, নিজেই একটি আদর্শ।

আচার্য শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথের কর্মময় জীবনের হীরক জয়ন্তীবর্ষ হল ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং এ সময় থেকে তিনি সমাজসেবা শিক্ষা প্রচার দেশের আর্থিক উন্নয়ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমগ্র নোয়াখালী জেলা শিক্ষায় কতদূর পশ্চাৎপদ ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা নেই। কারণ শ্রীরাধাগোবিন্দের পূর্ববর্তী এম এ পাশ ব্যক্তি মাত্র দুজন ছিলেন।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র হলেও সেকালে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করতেই তাঁর বয়স হয়েছিল ২১ বৎসর। এর প্রধান কারণ—কঠোর দারিদ্র আর শিক্ষার সুযোগের অভাব। নোয়াখালী দালাল বাজারের বিদ্যোৎসাহী রায় পরিবারের সাহায্য সহযোগিতা না পেলে কিশোর রাধাগোবিন্দের বিদ্যার্জ্জন হয়তো গ্রাম্য পাঠশালায়ই সীমাবদ্ধ হ'ত। তমসাবৃত বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলোকে স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর লাভ নেই। তাঁর জন্মভিটা এখন পাকিস্তানে অবহেলিত; কিন্তু তাঁর জন্মতারিখ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিবস।

বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যাবিতরণকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে শিক্ষায় অনগ্রসর নোয়াখালী ত্রিপুরাবাসীদের সেবার সুযোগের জন্য কলিকাতার সেন্ট পল্‌স কলেজে এবং চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপকের পদ প্রত্যাখ্যান করে কুমিল্লাকেই কর্মকেন্দ্র নির্বাচন করেন। সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ পদের গুরুভার সুখ্যাতির সহিত বহনের পর ১৯৪৩ সনে অবসর গ্রহণের পর নোয়াখালী-চৌমুহানীতে কলেজ স্থাপনা এবং পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক রক্তমোক্ষণের পর থেকে তিনি স্থায়িভাবে কলকাতায় অবস্থান করে স্বীয় মহৎকাজে লিপ্ত আছেন।

সুদীর্ঘ বাট বৎসর নিরলস একান্ত সাধনা দ্বারা তিনি সমগ্র বৈষ্ণব শাস্ত্র ও সাহিত্যসিন্ধু মন্থন করে পরমার্থ বিদ্যা আহরণ করেছেন।

কর্মকুশল জীবনের প্রারম্ভ থেকে তিনি প্রবাসী, ভারতবর্ষ, আনন্দবাজার পত্রিকাকে বহু জ্ঞানগর্ভ ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ দ্বারা
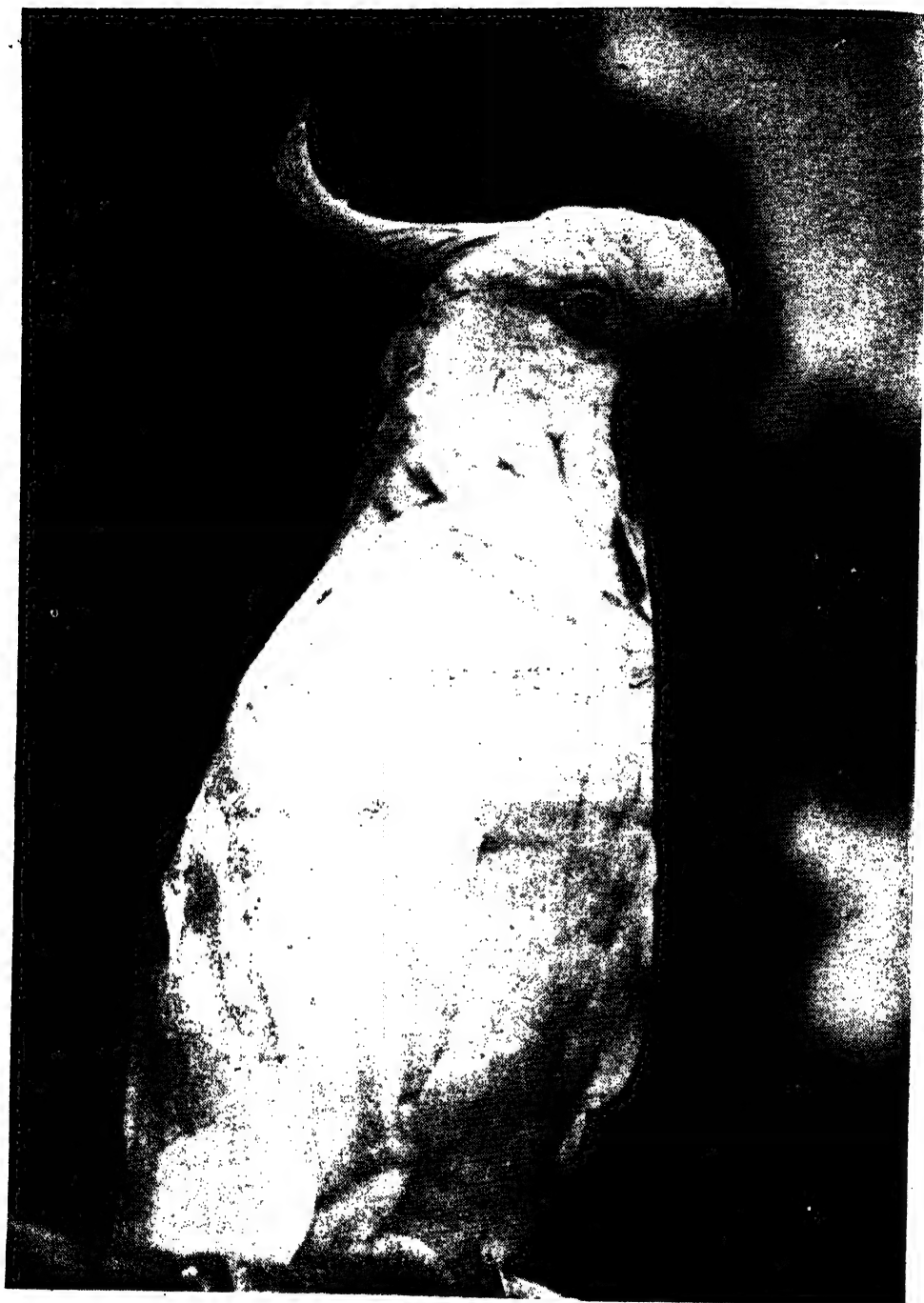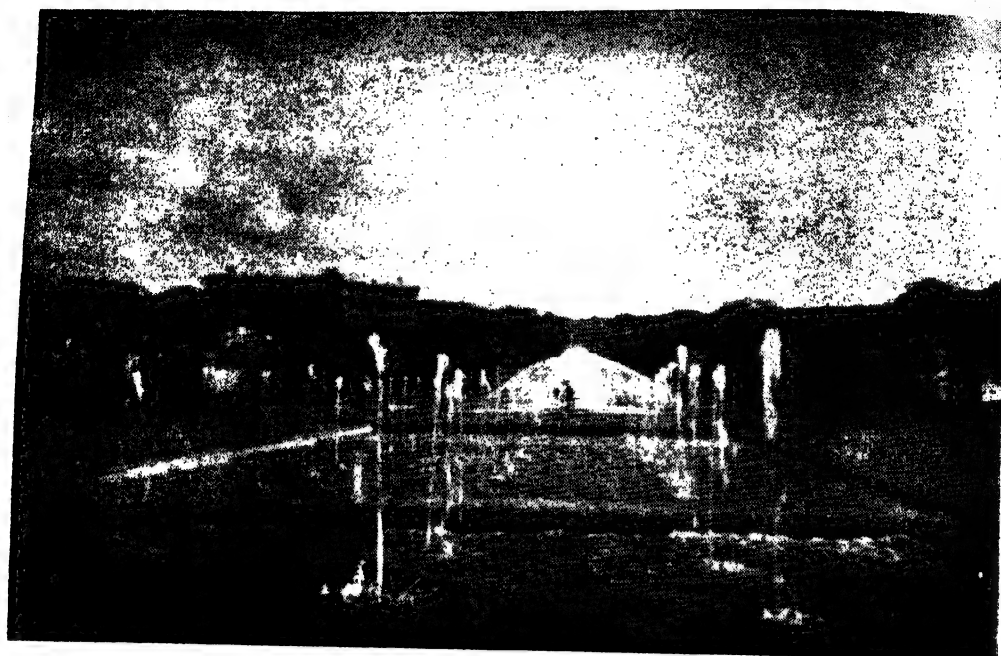
মুক্তি

।। আলোক চিত্র ।।

বন্দী

পোষাপাখী

—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

নাচের পোষাক

—বিশু চক্রবর্তী

ফোয়ারা

—সুব্রত বাগচী

ফসলের প্রস্তুতি

—নিমাইরতন গুপ্ত

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

সমৃদ্ধ করেন। বিদ্যালয়ের তরুণ বিদ্যার্থীদের জন্য তিনি পাটীগণিত প্রণয়ন করেন এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য তৎকৃত বীজগণিত জ্যামিতি সলিড জিওমেট্রী কণিক্ সেক্‌সন প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।

কুমিল্লা নোয়াখালীর ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতিগঠন মূলক প্রতিষ্ঠান সংস্থা সর্বত্রই তাঁর সৃজনী প্রতিভার নিদর্শন। কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতির গঠন কাজে তাঁর প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে স্মরণীয় দান।

শ্রীরাধাগোবিন্দের কর্মধারা উত্তর কালে তদীয় জীবন সাধনায় অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বজনের জন্য ভক্তিরস ভাগীরথী ধারার সৃষ্টি করল। ভাগবত-প্রেমতত্ত্ব রসমাধুর্য নিজে আস্বাদন করে নিবৃত্ত হন নি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ, সমাজ, সাধনা, প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বজনের জন্য সে অমৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌর কৃপাতরঙ্গিণী টীকা তদীয় ভাগবত নিষ্ঠার অপূর্ব আলেখ্য। সত্ত্বগুণের পরম মহত্ত্বে শ্রী রাধাগোবিন্দ-জীবন আত্মসমাহিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রানুশীলনে প্রজ্ঞার নবতম বিকাশ হচ্ছে। অশীতিবর্ষে এ জ্ঞানতাপসের শ্রী হস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মহাগ্রন্থ লিখনে নিয়োজিত। তিন হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী এ বিশাল গ্রন্থখানি শুধুমাত্র লিখন কার্য্যে যে শ্রমসহিষ্ণুতা আর গভীর শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক তার জন্য সর্বস্তরের সুধীমণ্ডলী শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে।

বঙ্গভারতীর আজীবন আন্তরিক আরাধনার প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন, প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথকে "সরোজিনী বসু সুবর্ণ পদক" দ্বারা। এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার দ্বারা এ বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানতাপসকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন" তাঁর জীবন-সন্ধ্যার সাহিত্য সাধনার নবতম অর্ঘ্য।

গুণমুগ্ধ জনগণের শ্রদ্ধা নিবেদনের অভিব্যক্তি ডি লিট, পরবিদ্যাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর, ভাগবতভূষণ প্রভৃতি অগণিত উপাধিতে।

আমরা এ জ্ঞানবৃদ্ধ সহজ সরল অমায়িক বিনয়ী আদর্শ বাঙালী বরেণ্য ব্যক্তিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

[প্রবীণ সাংবাদিক]

দেশ ও দশকে পরিচালনা করেন রাজনৈতিক নেতারা, কিন্তু দেশ ও দশ-এর অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধা এবং দুঃখ-কষ্ট জনসমক্ষে তুলে ধরেন নীরব সাংবাদিকেরা। শুধু তাই নয়—এই সবের প্রতীকারপন্থা উপস্থিত করেন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁদের সুলেখনীর মাধ্যমে। দৈনিক "যুগান্তর"-এর যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত আলোচনার সময় সংবাদ-পত্রসেবীদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা আমার বার বার মনে আসে।

১৯০০ সালের ৩১শে আগষ্ট শ্রী দাশগুপ্ত বরিশাল জিলার মাহিলাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান হল যশোহর জিলার মাগুরা সহর। বাবা ৺কৃষ্ণবন্ধু দাশগুপ্ত বরিশালে জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে বসতি স্থাপন করেন। একমাত্র পুত্র বিজয়ভূষণ বাবাকে হারান মাত্র তিন বৎসর বয়সে—আর মা ৺ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী সন্তানকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নেন স্বহস্তে। গ্রামের বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি ১৯১৬ সালে গোলক-বাটাজোড় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ পাশ করেন। ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ পড়ার সময় অর্থাৎ ১৯২১ সালের শেষভাগে জিলা কংগ্রেস সম্পাদকের কার্য্যভার লইয়া তাঁহাকে বরিশালে ফিরিতে হয়। বাল্যকাল হইতে রাজনীতিতে জড়িত থাকায় তিনি বিশিষ্ট নেতাদের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। তিনি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং দুই বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি ১৯২৪ সালে বরিশাল সহরে "অভ্যুদয়" নামে একটি মুদ্রণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৯২৬ সালে তথা হইতে "বরিশাল" সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরলোকগত জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে উহাতে যোগদান করিয়া চারি বৎসর শিক্ষকতা করেন। অন্য দিকে সাংবাদিক শ্রীসদানন্দ প্রতিষ্ঠিত ফ্রী-প্রেস-এর বরিশাল জিলার সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। সেই সময় তৎপ্রেরিত ঝুলকাঠি—পোনাবালিয়া গুলীচালনা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার পর এসোসিয়েটেড প্রেস তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানায়।
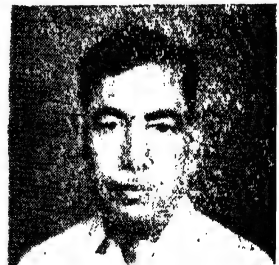
শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত

কিন্তু জাতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া অধিক মাহিনায় বিদেশী প্রতিষ্ঠানে যোগদান জাতীয়তাবাদী বিজয়ভূষণকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। তজ্জন্য এ. পি-র কলিকাতা শাখার তৎকালীন কর্মকর্তা শ্রীদাশগুপ্তর দৃঢ় মনোভাবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পত্র দেন।

একবার বরিশাল পরিভ্রমণে আসিয়া সুভাষচন্দ্র (নেতাজী) শ্রীদাশগুপ্তর সহিত কলিকাতায় সাংবাদিকতা করার কথা আলোচনা করেন। ইহার পর ১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের কলিকাতা হইতে তারবার্ত্তায় শ্রীদাশগুপ্ত 'দৈনিক বঙ্গবাণী'তে সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। তিন বৎসর পরে ১৯৩২ সালে তিনি 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় আসিয়া দেড় বৎসর তথায় থাকেন। ইহার পর সাপ্তাহিক 'নবশক্তি'তে দেড় বৎসর সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়া ৺হরিদাস মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক কেশরী'তে চলিয়া আসেন।

১৯৩৮ সালের ১১শে সেপ্টেম্বর শ্রীদাশগুপ্ত 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগদান করিয়া বর্ত্তমানে উহার যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে কার্য্য করিতেছেন।

নদীয়া জেলার দামুড়ুহুদা গ্রামের ৺হেমনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী প্রমীলা দেবীকে শ্রীদাশগুপ্ত বিবাহ করিয়াছেন।

১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে বৃটিশ সরকারের কমনওয়েলথ রিলেসান্স ডিপার্টমেণ্টের আমন্ত্রণে শ্রীদাশগুপ্ত ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন এবং যাতায়াতের পথে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী পরিদর্শন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ ও নবীন সাংবাদিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার প্রয়োজনের কথা শ্রীদাশগুপ্ত উল্লেখ করেন।

নবলব্ধ স্বাধীনতাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে আর ভারতবর্ষকে প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে জগৎ-মাঝে থাকিতে হইলে—আমাদের সমাজ, সংসার ও দেশ পরিচালনার শৃংখলতাবোধের পরিচয় দিতে হইবে—আর প্রয়োজন একাগ্রতা, কর্ম্মনিষ্ঠা, সহানুভূতি ও মানবত্তাবোধ। আসার সময় শ্রীদাশগুপ্তর এই কথাগুলি আমার অন্তরের গভীরে স্পর্শ করে।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

[বিখ্যাত চা শিল্পপতি]

উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বস্তু। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে দেশী চা-শিল্পের (বাঙ্গালী পরিচালিত) পত্তন হয়। ইহার পূর্ব্বে চা-শিল্পে ইউরোপীয়ানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙ্গালী অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে এবং নানা প্রকার সরকারী বেসরকারী প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল অস্বাস্থ্যকর তরাইয়ের জঙ্গলে চা-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন জলপাইগুড়ি শহরের তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। জলপাইগুড়ি শহরে অবস্থিত ভারতীয় চা-কর সমিতির প্রধান কর্মপরিষদ ভবন যোগেশ মেমোরিয়াল হল তাঁহার নামাঙ্কিত হইয়া আছে।

এই বিখ্যাত চা-শিল্পপতিরই অন্যতম সন্তান শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়াই চা-শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এবং পিতার সহযোগিতায় ১৯২৭ হইতে ১৯৩০ এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারা মালহাটি, সৌদামিনী, কাদম্বিনী, বিজয়নগর, এবং লক্ষ্মীকান্ত এই পাঁচটি নূতন চা-বাগানের পত্তন করেন। তিনি তখন বয়সে তরুণ মাত্র। এই পাঁচটি বাগান এখন সম্মিলিত ভাবে প্রায় বার লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন করিতেছে। ১৯৩৬ সাল হইতেই তিনি ভারতীয় চা-কর সমিতির (Indian Tea planters Association) সঙ্গে যুক্ত হন। এবং ইহার সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং সভাপতিরূপে কার্য করিয়া নানা ভাবে চা-শিল্পের সম্প্রসারণে সহায়তা করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি কেন্দ্রীয় চা সংস্থা Central Tea Board) কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া লণ্ডনস্থ আন্তর্জাতিক চা-শিল্প সম্প্রসারণ সভায় (International Tea Market Expansion Board) যোগদান করেন। কিন্তু ভারতীয় চা-শিল্পের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষিত না হওয়ার দরুণ ভারত সরকার এই আন্তর্জাতিক চা সমিতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং স্বাধীন ভাবে ভারতীয় চা-সমিতি (Tea Board of India) বলিয়া একটি নূতন সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ ১৯৫৪ সনে ভারত সরকার কর্ত্তৃক এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যরূপে মনোনীত হন। এই সনের মধ্য ভাগেই তিনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক আমেরিকা পরিদর্শনকারী ভারতীয় চা প্রতিনিধি মণ্ডলীর সভ্য নিযুক্ত হইয়া সমগ্র আমেরিকা এবং কানাডা পরিভ্রমণ করেন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Tea council-র অন্যতম পরিচালক বলিয়া মনোনীত হন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় চা সমিতির সভাপতিরূপে বৃত হন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ইহার সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পরিচালিত দুইটি বিরাট চা-বাগান অতি অল্প সময়ের মধ্যে অংশীদারদের নিকট হইতে ২১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া ক্রয় করেন। এই দুইটি সদ্যক্রীত চা-বাগান শ্রীঘোষের সুষ্ঠু পরিচালনার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই উৎকৃষ্ট চা-বাগান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি তিনি আরও দুইটি চাবাগান ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের স্বপ্ন—ইউরোপীয়ানদের দ্বারা পরিত্যক্ত চা-বাগানগুলি ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাঙ্গালী পরিচালিত চা বাগানে পরিণত করা এবং উত্তরবঙ্গে সমস্ত চা-শিল্পে বাঙ্গালীর মূলধন নিয়োগ ও বাঙ্গালীর প্রাধান্য বিস্তার করা। এখনও পর্যন্ত মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রে, এমন
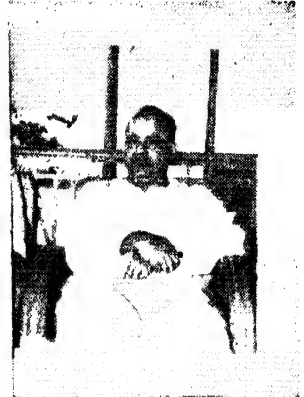
কি সংখ্যার দিক হইতেও জলপাইগুড়ি দার্জিলিং অঞ্চলে চা শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর একক প্রাধান্য লাভ দূরে থাকুক, সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভও হয় নাই। তাঁহার জীবনের স্বপ্ন সফল হউক।

শ্রীযুক্ত ঘোষ কেবলমাত্র বিশিষ্ট চা-শিল্পপতি এবং চা বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়াই সর্বভারতে খ্যাতি ও বিশিষ্ট পদ লাভ করেন নাই; তাঁহার অফুরন্ত কর্মশক্তি নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি সম্প্রতি Reserve Bank-এর director নিযুক্ত হইয়াছেন। জলপাইগুড়ি শহরের তিনি কেবল বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত নহেন, তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতাও বটে। বলিতে গেলে তিনি জলপাইগুড়ির Polytechnic Institute-র গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত এই শিশু প্রতিষ্ঠানটি শ্রীযুক্ত ঘোষের পরিচালনায় বহুমুখী সম্প্রসারণের পথে। শ্রীযুক্ত ঘোষ চেষ্টা করিতেছেন—যাহাতে এই বিদ্যালয়টি বিভিন্ন শাখা সম্বলিত ইঞ্জিনিয়ারিং মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়! তিনি এই শহরের আনন্দচন্দ্র কলেজ, প্রসন্নদেব বালিকা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং এই প্রতিষ্ঠান দুইটির সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি আরেকটি বিরাট কার্যে হাত দিয়াছেন। তাহা প্রায় সফলতার পথে। যদি তাঁহার এই নবতম উদ্যমটি তাহার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিপূর্ণতা লাভ করে, তাহা হইলে ইহা কেবলমাত্র তাঁহার কর্মপ্রতিভার একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া যাইবে না, ইহা জাতির ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিবে এবং জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত সহস্র সহস্র ছিন্নমূল পরিবারের উদ্যমশীল যুবকদের একটি বিরাট কর্মসংস্থান ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহার পরিকল্পিত North 'Bengal Sugar Mill' বাংলার প্রধান মন্ত্রীর আশীষপূত হইয়া এবং বঙ্গীয় সরকারের অর্থসাহায্যপুষ্ট হইয়া প্রায় প্রস্তুতির পথে। বঙ্গীয় সরকার প্রায় এক কোটি টাকার মূলধন এই শিল্পে নিয়োগ করিবেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষ কেবলমাত্র দুরূহ কর্মভারেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন নাই, শহরের খেলাধূলা ক্ষেত্রেরও তিনি একজন বিশিষ্ট উৎসাহদাতা। তাঁহার পিতার নামের সঙ্গে জড়িত Jogesh Chandra Memorial Sports Association প্রতি বৎসর জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়াবিদগণকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকেন এবং ইহার বাৎসরিক অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গে একটি বিশিষ্ট চিত্তাকর্ষক বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ সাংসারিক জীবনে সমস্ত প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার কর্মক্ষমতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা শহরবাসী মাত্রেরই গৌরবের বস্তু। তিনি সম্প্রতি ৫৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা এই স্পষ্টভাষী, সরলচিত্ত, ভগবদ্ভক্ত কর্মীপুরুষের দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও বাণিজ্য ক্ষেত্র দিকে দিকে সম্প্রসারিত হইয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক।

ভালবাসার গান

[জাপানী কবি 'নগুচী'র Love song কবিতার অনুবাদ]

হাতে হাত।
কাঁধে কাঁধ মিশেছে।
গ্রীবাশ্লেষ আর অধরে অধর।
আঃ দুটি বক্ষের উদ্দাম স্ফুলিংগ মাতাল,—
হায় পৃথিবী রাতের সামিল আর জীবন ফুরোয়
প্রেমের কি মধুর অবসাদ—
প্রেম সরিৎ কখনো স্বপ্নিল কখনো তন্দ্রিত,
মরু ক্লান্তি কুমুদ কখনো ব্রীড়ায় উজ্জ্বল কখনো বা ম্লান,
প্রণয় মীনেরা ভাসুক না কিংবা অতলে ডুবুক,
দেবতা অথবা 'মার'কে দেহ সমর্পণ কর,
দৈব দুটি সত্তা নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলুক।
কাঁধে কাঁধ মিশেছে,
কপোলে কপোল আর অধরে অধর,
দুটি হৃদস্পন্দন আনন্দে উচ্ছল,—
ভালোবাসার কি নিবিড় অবসাদ।
পৃথিবী হারাক জীবন ফুরোক
শুধু অন্ধকারের বন্দনা গাইবো॥

অনুবাদক—চণ্ডী সেনগুপ্ত

ধারাবাহিক রচনা

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

দিগ্বিজয়ী প্রথম লেখা হয় উনিশ শো একুশে। আমি তখন মদন কোম্পানীতে চাকরী করি। লেখাটা পড়ে ওদের পছন্দ হল না, ওরা আমায় আলমগীর করতে দিলে। সেই first draft এরই সংস্কৃত রূপ দিগ্বিজয়ী। যোগেশদার আগে মন্মথ এক দৃশ্যে মুক্তির ডাক লিখেছে বটে, কিন্তু ওটা ঠিক নাটক নয়—আর ওখানে দৃশ্য বদলাবার দরকারই হয় না। এখানে কিন্তু ডেলিবারেটলি সিন কমানো হয়েছে।

দিগ্বিজয়ীর প্রকৃত সমালোচনাই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সেই যে বলেছিলেন—সীতা নাটকই নয়, সেই থেকে যোগেশদার নাটক কেউ গ্রাহ্যই করলে না। শুধু যোগেশদার লেখা বলে দিগ্বিজয়ীর কেউ সমালোচনাই করলে না। এক বুঝি হেমেন্দ্র সমালোচনা করেছিল, বলেছিল—শিশিরকুমার ভাল অভিনয় করেছেন। দৃশ্য ভাল হয়েছিল কিন্তু নাটকটি তেমন সুবিধার নয়।

আমরা আগের দিন তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত পড়েছিলুম—যেখানে ভারতনারী বুকের রক্ত দিয়ে নাদিরকে অভিশাপ দিয়ে গেল। তার পরেই নাদির ভারতবর্ষ ছেড়ে ইরাণে ফিরল।

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যাচ্ছে নাদির তার ছেলে রেজাকুলিকে সন্দেহ করছে। সিরাজী সিতারাকে বোঝাচ্ছে যে, ক্রিশ্চান সাধুর কাছে গেলে তিনি হয়ত নাদিরের মতিগতি বদলাতে পারেন। এর পর নাদির এলে সে কথাটা তাকে বলে দেবে।

রহমনের চরিত্রটা অনেকটা মহাভারত গান্ধীর মত। অহিংসা বলেই চীৎকার। তিনি সত্যি সাত্য বিশ্বাস করতেন কিনা জানি না; কিন্তু প্রায়ই বলতে হয়েছে আমি ভুল করেছি, মস্ত ভুল করেছি—হিমালয়ান ব্লাণ্ডার।

ইংরেজরা কি ভেবেছিল, কোনদিন এদেশ তাদের ছেড়ে যেতে হবে? অবশ্য আঠারো শ' পঁচাশী সাল নাগাদ একটু একটু ভাবনা আসতে আরম্ভ করেছে, তাই রাওইয়ার্ড কিপলিং বলছে—Lest we forget.

বিনয়দাই বোধ হয় এবার জিগ্যেস করলেন—মার্লো ত কবি, তাকে নাট্যকার বলে কেন?

বললেন—বলবে না! ওই ত প্রথম নাটকের আজকালকার রূপ দিল। Tamburlane, Dr. Faustes, Jew of Malta—সব ক'খানাই ত ভাল নাটক। ওর Edward II ত ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রপাত করল। সেক্সপীয়ারের Richard II ত ওর থেকেই চুরি।

আবার প্রশ্ন হল—সেক্সপীয়ারকে কবি বলে কেন?

বললেন—কবি ত বলবেই, তবে কবি নাট্যকারই বলে। থেকে থেকে নাটকের কাব্যাংশ কবিতার চরমে উঠে যায়।

সেক্সপীয়ার পড়াতেন পার্সিভ্যাল সাহেব। কর্কশ গলা কিন্তু পড়ানোর ভঙ্গী ছিল অপূর্ব! আমি ত ভাল ছেলে ছিলুম না, তবু পড়ে আসতুম। যারা ক্লাস পালায়, কোন দিন পড়ে-টড়ে আসে না, তারা পর্যন্ত কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করত।

পার্সিভ্যাল সাহেবের মতো ঘোষ সাহেবও (M. Ghosh) পড়ানোতে একটা আকর্ষণ এনে দিতে পারতেন। কিন্তু নোট নিয়ে পড়াতেন না বলে এ বছরের পড়ানো, আগের বছরের পড়ানোর থেকে অনেক তফাৎ হ'ত। নোট না নিয়ে পড়ালে অমন অবশ্য হয়।

বিনয়দা বললেন—নোট না নিয়ে পড়ালে ও-রকম হয়। পড়ানোর সময় যেমন মুড থাকে interpretationও তেমনি হয়।

বললেন—কথাটা ঠিকই বলেছ বিনয়। মুড যেমন থাকে interpretationও সেই রকম হয়। এই নোট নিয়ে না পড়ানোর কথা আমাকেও বলেছে। ছাত্ররা এসে বলত—আপনি কোনও নোট কলো করেন না, আপনার পড়া ধরতে পারি না। আমাদের ত পাশ করতে হবে। তারা কিন্তু ঠিক বলতো না। আসল কথা হ'ল, একটু ঘুরিয়ে বললে তারা আর বুঝতে পারত না।

পার্সিভ্যাল সাহেব শুধু যে ভাল পড়াতেন তাই নয়, পড়াশোনা করাবার কায়দাও ভাল জানতেন। তবে ক্লাসে কথা বললে চটে যেতেন। চটে যেতেন বলাটা বোধ হয় ঠিক বলা হল না; মুখ-চোখ লাল হয়ে যেত, বলতেন—Talking in the class is not only an insult to the professor, it is an insult to the class. বলেই আবার পড়াতে শুরু করতেন।

প্রফুল্ল বাবু ওঁর সব বই পেয়েছিলেন। বইতে সাদা কাগজ লাগিয়ে, এপাশে ওপাশে চারপাশে ছোট ছোট করে যখন যা মনে হয়েছে, লিখে রাখতেন।

অনেকে বলে পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক লেখা সহজ। আমার ত মনে হয় নাটক লেখাই শক্ত। অবশ্য পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকের একটা তৈরী কাঠামো পাওয়া যায়, কিন্তু interpretation দেবার বা চরিত্র গড়বার স্বাধীনতা ত থাকেই। ভাল সামাজিক নাটক লেখা ত খুবই শক্ত।

এর পর কি বই পড়বেন জানতে চাওয়াতে, অনেকেই বললে—রক্তকরবী পড়ুন। বললেন—না ওটা এখন থাক। তখন আবার বলা হল—যোড়শী। বললেন—হ্যাঁ ওটা পড়া যেতে পারে। নাটকটা নষ্ট করে দিলে নৃপেন চাটুজ্জে। অবশ্য ওওই বা দোষ কি!

একজন নাটকটা শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা কি না জানতে চাওয়ায় বললেন—না ও নাটক শিবরামের লেখা নয়। আসল ব্যাপার হল, দেনাপাওনার নাট্যরূপ দেবার অধিকার শরৎদা শিবরামকে লিখে দিয়েছিলেন। সে চারটে দিনে বইটা লিখে আনল। কিন্তু চারটে দিনে কি নাটক দাঁড়ায়? পরে শরৎদাকে ওর জন্যে একশ টাকা দিতে হয়েছিল। আমি আসল কথা বলিনি, তাহলে হয়তো শরৎদাকে বিপন্ন হতে হত।

বিনয়দা বললেন—উপন্যাসে আছে, জীবানন্দ একজন অত্যাচারী জমিদার ছিল।

বললেন—জীবানন্দকে অত্যাচারী জমিদার বলছ, কিন্তু সে ত অত্যাচার for অত্যাচার's sake করত না। তার দরকার টাকার আর টাকা পেলেই সে খুশী। কিন্তু টাকা চাইলেও তার ওপর তার মায়া হয় না। দেখা যায় একটা সোনার ঘড়ির ওপর সে ছাই ফেলছে, বিছানায় একটা দামী শাল পেতে রেখেছে, একটা ভাল চাদরে হাত মুছছে।

ওর একমাত্র আকর্ষণ ছিল অলকার ওপর। জেল থেকে বেরিয়ে অনেক করে খুঁজেও ছিল তাকে। তাই ষোড়শীকে দেখে চমকে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মায়াও তার চলে গেল। আর তারপরে ত বাঁচার আর কোন মোহ রইল না তার।

বিনয়দা আবার বললেন—জীবানন্দের ত্যাগী রূপটা আপনার কল্পনা।

বললেন—না, না, জীবানন্দের এই ত্যাগী রূপটা আমার কল্পনা নয়, উপন্যাসে এর আভাস ছিল, নয়ত আমি পেলাম কোথা থেকে? এবার সাধারণ আলোচনা সুরু হ'ল। যাঁরা হাজির ছিলেন তাঁদের প্রায় কেউই দিগ্বিজয়ী অভিনয় দেখেন নি। ওঁকে অনুরোধ করা হ'ল দিগ্বিজয়ী একবার অভিনয় করতে,—বললেন, আজকাল আমার আর এই সব কম বয়সী চরিত্র করতে ভাল লাগে না। তাছাড়া নাদির করতে বোধ হয় দমও পাবো না।

কে একজন বললেন—নতুন বই করতে গেলে একটা নতুন দলও দরকার।

বললেন—হ্যাঁ, নতুন একটা দল ত করা দরকার। দেখ চেষ্টা করে যদি কিছু করতে পার।

চাঁদা করে টাকা তোলার কথা উঠল, তাতে উনি বললেন—টাকা পয়সা তুললে আমাদের দেশে হিসেব দেয় না। এই ধারণা আমার অনেক দিনের। আমরা ফেডারেশন হলে মিটিং করে নন্দ বোসের বাড়ি গেলুম। তা সে সময়ে কত টাকা উঠেছিল কেউ জানে না।

নন্দ বাবু আমার চেয়ে অনেক বড়। ওঁর বয়স প্রায় ৮০ হল। অবন বাবু ছিলেন রবি বাবুর চেয়ে বছর দশেকের ছোট।

যামিনী রায়কে যোগেশদা অনেক সাহায্য করেছেন। আমাদের থিয়েটারএ কত কাল Decor করেছে। নবনাট্যমন্দিরে ত করেছেই—এমন কি শ্রীরঙ্গমে পর্যন্ত "সরমার" সমুদ্রের দৃশ্য করেছিল। অবশ্য খুব ভাল করে নি। যামিনী হয়ত আজকাল পুরোনো দিনের কথা ভোলবার চেষ্টা করছে।

বাড়ি ফিরতে গাড়ীতে উঠলেন। সেখানে আজকালকার থিয়েটার সম্বন্ধে কথা হল। বললেন—উল্টা দেখতে এসেছিলুম একবার, দেখি সব এমনিতেই হাততালি দিচ্ছে। বড় রাস্তার ওপর থিয়েটার হলে বড় অসুবিধা হয়। কর্ণওয়ালিসে সীতা করার সময়, ভাল একটা জায়গায় ঘড় ঘড় করে ট্রাম চলে গেল। শ্রীরঙ্গমের মত জায়গায় ত খুবই ভাল হয়। পনেরো বছর ছিলুম ওখানে।

দিগ্বিজয়ী কবে শেষ হয়েছিল জানতে চাওয়ায় বললেন—উনিশশো তেত্রিশে দুরান্তের জন্তে শেষ অভিনয় হয় দিগ্বিজয়ী। ওতে সিতারা করেছিল রাধা।

বলা হল—যিনি কীর্তন গান করেন।

বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে কীর্তন গায়। আমার ওখানে চাণক্যে ছায়া করতো। শিখেও ছিল আমারই ওখানে।

ওঁকে আবার অনুরোধ করা হল—একবার অন্ততঃ দিগ্বিজয়ী করুন।

বললেন—দিগ্বিজয়ী করতে বোধ হয় দম পাবো না। অন্তগুলো চরিত্রকে তৈরী করানো, বড্ড খাটনী পড়বে। তাছাড়া excitementও আছে ত।

হঠাৎ এমনি এমনিই বললেন—তারাশঙ্করের রাইকমল পড়ে রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন—বইটা আমার বেশ ভাল লাগল, ওটা তুমি থিয়েটারে করতে পার। কথাটা তারাশঙ্করকে আমিই বলি। ও বেশ ভাল লোক।

৯

আজকের দিনে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ তথা চিত্রজগতের অধমতারণ, অগতির গতি শরৎচন্দ্রকে, শিশিরকুমারের চেষ্টাতেই জনসাধারণ নাট্যকার হিসাবে চিনতে পারে। শরৎচন্দ্রের ষোড়শী নাটক জীবানন্দরূপী শিশিরকুমারের অভিনয় নৈপুণ্যেই ভাস্বর হয়ে থাকবে চিরকাল।

তিরিশে অক্টোবর সেই ষোড়শী পড়বার জন্ত এলেন। আগের সপ্তাহের চেয়ে শরীরটাও ভাল মনে হল, নিজেও বললেন—শরীরটা কদিন পরে একটু ভলো। তবে ফুলোটা এখনও কমেনি। ডাক্তার এসেছিল, কারণটা বলতে পারলে না।

রাজনীতির কথা তুললেন—গান্ধিজী বাঙ্গালীদের একেবারে দেখতে পারতেন না। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বাঙলা দেশে কোয়ালিশন হতে না দেওয়া। বললেন—কোয়ালিশন করা পাপ। অথচ সেদিন শরৎ বোসের সঙ্গে ফজলুল হকের কোয়ালিশন হতে দিলে বাঙলা দেশে মুসলিম লীগের নাম-গন্ধ পর্যন্ত থাকত না। বাঙলা দেশে মুসলিম লীগের সৃষ্টি হল একটি আলিঙ্গনে—পশ্চিম আর পূর্ব্বের মিলনের জন্তে জিন্না আর ফজলু চাচার আলিঙ্গন ঘটানোর ফলেই মুসলিম লীগের জন্ম হল। ফজলু চাচাকে তখন লেখাপড়া জানা লোকরা খুবই খাতির করত; তাদেরই বিশেষ অনুরোধে ফজলু চাচা শেষ পর্যন্ত জিন্নার সঙ্গে দেখা করলেন।

পাকিস্তান ইসলামের গৌরবের জন্তে ততটা হয়নি যতটা হয়েছে হিন্দুবিদ্বেষের জন্তে। মুসলমানদের দিয়ে কিছু হবে তা আমি আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছু হলেও হতে পারে। ঐ যে ইজিপ্টের নাসের—ওকে দেখেই মনে হচ্ছে কিছু হতে পারে। ওর দেশে ত কিছুই পাওয়া যায় না তুলো ছাড়া —Longstaple Cotton না? সেই তুলো যখন কিনবে না বললে, তখন তার উত্তর দিলে আরব ফেডারেশন করে। প্যান আরবের কল্পনা বোধ হয় প্যান ইসলামেরও আগেকার! প্রথম মহাযুদ্ধের আগেরই হবে হয়তো।

এই সময় বরিস-পাষ্টার নাকের ডাঃ ঝিভাগো নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। তাই জানতে চাইলেন—ডাঃ ঝিভাগো কেমন বই হয়েছে? কোলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে? শুনছি নাকি টলষ্টয়ের মত ভাল লেখা হয়েছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

একজন বললেন—বইটাতে কিছু উল্টোপাল্টা কথা আছে বলে ওঁর দেশে কেউ পছন্দ করেনি;

বললেন—ওই ত ওদের দোষ, একটু এদিক ওদিক হতে দেবে না। তাছাড়া বড্ড মিছে কথা বলে। (এখানে আবার কমু নেই ত কেউ, তাহলে তারা আবার চটে যাবে।) রাশিয়ানদের মধ্যে একটা blood thirsty ভাব আছে। ঐ দেখ না বলগা—

কোথায় গেল সে? উলান বাটোরে তিন মাস তার খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

বলা হল—সে মলোটোক। বুলগানিন ষ্টেট ব্যাঙ্কের গভর্ণর হয়েছেন?

এবার ষোড়শী নাটক ধরলেন—ষোড়শী নাটকটা incomplete রয়ে গেল, complete করবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু একটা দুর্ঘটনার জন্তে হল না। এখন যা আছে তাতে অভিনেতাদের চেষ্টাতেই দাঁড়ায়।

বইয়ের সুরুতেই এই যে detailed directions এটা সব কিছু বেঁধে দেয়। এতে অভিনেতাদের করবার কিছু থাকে না। আগে কিন্তু এমন ছিল না। ঐ যে second Mrs. Tanered লিখেছে পিনেরো নাটকে—মানে যে ইংরেজী নাটকেবেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল তার সময়েও এত বেশী থাকত না। এটা ইবসেনের সময় থেকেই সুরু বলা যায়, আর সবচেয়ে বেশী বলেছেন শ'।

জীবানন্দের যে কোনও কিছুর ওপরই লোভ নেই তা বেশ বোঝা যায়। বিছানায় একটা দামী শাল পাতা, সোনার ঘড়ি, ছাইদানি, হাত মুছছে ঢাকাই চাদরে।

এই যে বিষ দেওয়ার কথা এইটাই বার বার বলেছেন উপন্যাসে। আমরা অবশ্য ওটা বাদ দিই। চোখ বুজে ওষুধ খাওয়ার কথাটাও ঠিক রাখিনি। ষোড়শী এসে মুখে ঢেলে দিত, জীবানন্দের মুখের ওপর আলো পড়ত, আর তাতেই তার মুখের আঁচিল দেখতে পেয়ে ষোড়শী চিনতে পারত।

জায়গায় জায়গায় এমন ভুল ডাইরেকসন দেওয়া আছে যে হাস্যকর। অবশ্য সবটাই শরৎদার দোষ নয়।

আজকাল নাটকের উপাদান আমাদেরই আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। সেইগুলো গুছিয়ে লিখলেই হবে, তবে কোন নারায়ণ টায়ায়ণ দিয়ে কিছু হবে না।

তারকদা বললেন—নাটুকে রামনারায়ণও কি ঐ দলে পড়েন?

ব্যস্তভাবে বললেন—না, না, সে রামনারায়ণের কথা বলছিনা। তিনি নমস্য লোক ছিলেন। তাঁর নাটক সত্যিকারের ভাল নাটক। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকটা কাটাকাটি করছিলুম কিন্তু ও আর এখন প্রকাশ করব না, তাহলে আবার অন্য কেউ ব্যবহার করে ফেলবে।

ষোড়শীর কথাতেই এলেন আবার—ষোড়শীর সময় থেকেই শরৎদার সঙ্গে বিরোধ বাধলো। নৃপেন না জেনে আমার কতটা ক্ষতি করেছে? না, ও বোধ হয় জানেও কিছুটা।

আমি ওঁর কথাগুলো একটু ডায়ালগের মত করে বলেছি বলে, উনি বললেন (আমাকে অবশ্য সরাসরি বলেননি)—আমার কথা কুকুরের মুখে দিলেও জমে যায় আর শিশির সেগুলো বলায়।

তাতে আমি বললুম—কই দাদা জমেনি ত। পল্লীসমাজ ঝগড়া করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে ষ্টার থিয়েটারকে দিলেন কিন্তু চলল না। তখন আবার আমার কাছে এসে দিয়ে বললেন—যা ভাল বোঝ কর।

আমি বললাম—এখন একটা ছাঁচ করে ফেলেছেন, আর কি করব বলুন।

পানিত্রাসে যেতে হলে কোন ষ্টেশনে নামতে হয় জেন—কুলগাছিয়া, একবার কুলগাছিয়ায় যাবেন, হাওড়া ষ্টেশনে নাবিয়ে দিতে গেছি। তা আমায় বললেন—তুমি চল।

গাড়ী ছেড়ে দিয়ে সঙ্গে চললুম। যেতে যেতে দেখি খালি একটা থার্ডক্লাস কমপার্টমেণ্টে আমরা দুই বন্ধু বসে, বললুম—শরৎদা বেশ ভাল সঙ্গী পাওয়া গেছে, চলুন এটাতেই ওঠা যাক, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

উঠলেন, কিন্তু তারপরেই গাড়ী ছাড়ার মুখে মুখে বললেন—না ভায়া, আমি ওদিকেই যাই। বলে সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়ে উঠলেন।

আমি বললুম—আচ্ছা, ষ্টেশনে পৌঁছে আপনার সঙ্গে দেখা করব, এখন এখানেই থাকি।

শরৎদার মনোগত ধারণা ছিল সব মেয়েই সতী সাবিত্রী। তাই তাঁর সব নারীচরিত্রই সতী এমনকি সাবিত্রী পর্য্যন্ত। শরৎদার সঙ্গে আমার বিরোধের আর একটি কারণ—বঙ্কিমচন্দ্র। আমি তখন কৃষ্ণকান্তের উইল রিহার্স্যাল দিচ্ছি, হঠাৎ একদিন শরৎদা এসে হাজির। দেখে টেখে বললেন—এই সব 15th rates বইগুলো যে কেন কর বুঝতে পারি না।

তাতে আমি বললুম—দাদা, আপনি আর এর চেয়ে ভাল লিখলেন কোথায়? আজও ত আপনি সেই রোহিণী আর হীরার চরিত্রেরই অনুকরণ করছেন। ওদের চেয়ে ভাল একটা চরিত্রও কি আঁকতে পেরেছেন? শুনে রাগ করে চলে গেলেন, আর সেই থেকেই বিরোধের শুরু।

রবীন্দ্রনাথও চল্লিশ সালের আগে চোখের বালির ভূমিকায় লিখেছিলেন—আজকের দিনের অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী যা করত তাই বিনোদিনী আর কৃষ্ণকান্তের উইল চোখের বালি। চল্লিশ সালের পর সেটা উড়িয়ে দিয়ে উপদেশ পূর্ণ ভূমিকা জুড়ে দেন।

রবি বাবু উপন্যাস এমন কিছু ভাল লেখেননি এক গোরা ছাড়া। গোরাকেও বিশ্বমানবতা ইত্যাদি ঢুকিয়ে দিলেন। ললিতা চরিত্রটি বেশ ভাল কিন্তু সুচরিতার প্রেমের অপূর্ব বেগ। চতুরঙ্গও ভাল উপন্যাস।

বিনয়দা বললেন—কিন্তু ওতে দামিনী যে ভাবে বেড়ে গেল তাতে উপন্যাসের structure ধ্বসে পড়ে।

বললেন—জীবনে অমন হয়।

নাটকও উনি খুব ভাল লেখেননি, তবে লিখতে পারতেন। কিন্তু মঞ্চের সঙ্গে ত মেশেননি। না সেটাও ঠিক নয়, মেশবার চেষ্টা করেছিলেন। অমর দত্তর সময় ষ্টার থিয়েটারে প্রায়ই আসতেন। তা ছাড়া ওঁদের বাড়িতেই তাঁরা অভিনয় করেছেন। কিন্তু উনি ছিলেন স্পর্শকাতর, তাই মিলতে পারেননি।

আমাদের বিদেশীরা কি বলছে না বলছে তার ওপর খুব শ্রদ্ধা আছে। সেদিন শ্রীমনি এসেছিল, আমায় বললে—রাশিয়ানরা আমাদের অভিনয় দেখে কি সব যেন বলে গিয়েছিল, আপনার কাছে কি লেখা আছে নাকি?

রবীন্দ্রনাথেরও এক সময় এই রকম ধারণা ছিল। তারপর কেম্‌ব্রিজের History of literature-এ ওঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য বেরোল—তখন উনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তারপর থেকেই বিদেশীদের মন্তব্যের উনি কোন আর মূল্য দেননি।

রবিবাবুর সম্বন্ধে ওদেশে অন্তরকম ধারণা ছিল। আমেরিকায়

যখন গেছেন—ক্ষিতীশ সেন বলেছেন—ওর লম্বা দাড়ি আর flowery robes দেখে লোকের ধারণা হয়েছে উনি বোধ হয় prophet. উনি নিজেও ভাবতেন, উনি একজন proPhet.

রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা বলছিনা। ওঁর কবিতার Lyrical quality তুলনা হয় না, বিশেষ করে শেষ সাতটি বই—রোগশয্যায় ইত্যাদি। তবে মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এই Lyrical qualityর সূত্রপাত হয়। অবশ্য তখন তাঁর লেখায় বৈচিত্র্য খুব বেশী ছিল না।

বলা হ'ল, অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শৌভনিকের অভিনয়ে বলেছেন যে, থিয়েটারে লেখাপড়া জানা কেউ অভিনয় করতে আসেনি।

শুনে হাসলেন—অহীন্দ্র বলেছে বুঝি? তা না হয় বললে।

তারপর রসিকতা করে বললেন—অহীন্দ্র বলবে না কেন? তোমরা ওর নাম দিয়েছ নটসূর্য। এখন নটসূর্য বলছেন—আমি কর প্রসারণ করছি, তোমরা ধারণ কর।

মাইকেলের নাটক অপূর্ব রচনা। কৃষ্ণকুমারীর মত নাটক ত দেখি না। 'একেই কি বলে সভ্যতা'ও খুব ভাল প্রহসন। দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী" একেই কি বলে সভ্যতার উল্টো দিক। দীনবন্ধু বলতে চেয়েছিলেন, সভ্যতা তোমরা পাওনি, তাই 'সধবার একাদশী।'

দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে নিমচাঁদের চরিত্র কেউ কেউ বলে মাইকেল, কিন্তু মোটেই তা নয়। তাছাড়া নিমচাঁদের চরিত্রে ত খারাপ কিছু নেই, বরং বেশ ভাল ভাল কথাই বলেছে। নিমচাঁদ মদ খেতো আর খেতো বলেই কিছু করতে পারত না। মৈনাকের মত—দুই পক্ষ ছিন্ন তার পারে না উড়িতে।

তখনকার দিনে কাগজে লেখা বেরোলে আর কেউ অবিশ্বাস করত না। মুদির দোকানে বলত—বঙ্গবাসীতে বেরিয়েছে! তখন মুদির দোকানে খুব বঙ্গবাসী পড়ত। মাইনর পড়া একজন পড়ত আর বাকীরা বসে শুনত। তখন মুদির ছেলেরা মাইনর পড়ত, আমি চার বছরের মত মাইনর স্কুলে পড়েছি, আমাদের সঙ্গে অনেক সেকরার ছেলে, মুদির ছেলে পড়ত। তখন মাইনর পাশ করলেই থার্ড ক্লাসে ওঠা যেত। তবে ঐ সব ছেলেরা বড় একটা পাশ দিত না। দু তিন বছর পড়ে মোটামুটি শিখে নিয়ে ছেড়ে দিত।

একজন বললেন—খাতা লিখতে শিখেই ছেড়ে দিত আর কি।

বললেন—হ্যাঁ, খাতা লিখতে ত শিখতই। মাইনর স্কুলে দু বছর পড়লে শুভঙ্করী একেবারে তৈরী হয়ে যেত। তখনকার দিনে স্কুলে লেখাপড়া খুব ভাল করেই শেখান হত। আমি ত কোন ভাল স্কুলে পড়িনি, বঙ্গবাসীতে পড়েছি। সেখানে আমাদের এক মাষ্টার ছিলেন, নাম বরদাবাবু—এম, এ নয় শুধু বি, এ পাশ কিন্তু ইংরেজী যা পড়াতেন না তার তুলনা হয় না। সেকেণ্ড ক্লাশে আমাদের কম্পোজিশন পড়াতেন, এক একটা কম্পোজিশনে বেশ খানিকটা সেক্সপীয়র পড়িয়ে দিতেন। দৃষ্টান্ত বোঝাতে একটার পর একটা পড়ে শোনাতেন!

অবশ্য তখন একটা সুবিধে ছিল। ক্লাশে আমরা ছেলে ছিলুম মোটে আটত্রিশ জন। কলেজে অবশ্য আমাদের সময়েও ছেলে বেশী হত—থর্ড ইয়ারে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমরা ছিলুম একশ উনিশ জন।

ওদের দেশে যাওয়া উচিত ঘুরে টুরে দেখবার জন্যে। তাছাড়া দলবল নিয়ে ঘুরে আসা উচিত।

গাড়ীতে ফেরার সময় কথা হল, গিরিশবাবু সম্বন্ধে বললেন—গিরিশবাবুর উপযুক্ত দাম দেওয়া হয়নি। ওঁর কতকগুলো বই সত্যি ভাল যেমন প্রফুল্ল, বিল্বমঙ্গল—পড়লে মনে হয় আজকের কথা লিখেছেন। তবে দোষও কতকগুলো ছিল। কিছু কিছু বই একেবারে খারাপ লিখেছেন। অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। থিয়েটারে অভিনয় করাতে হবে অথচ বই নেই। তাছাড়া সাধারণ দর্শকের রুচির ওপর বড্ড বেশী জোর দিয়েছেন। অথচ উনি ইচ্ছা করলে দর্শকদের রুচি উন্নত করতে পারতেন। থিয়েটারের জন্যে হাজার হাজার টাকা দিয়েছেন অথচ থিয়েটারের ওপর কখনো মায়া পড়েনি। ছেলেকে বলেছিলেন—কখনো থিয়েটারের মালিক হোসনে।

রাশিয়ায় যা ঘটেছে তা চিরকাল থাকবে না। কুশ্চেভ কি ভাবে যে সবাইকে দাবিয়ে রাখবে? ওদের একটা blood thirsty ভাব চিরকালের। কিছুটা তাতার রক্তের যোগ আছে বলেই মনে হয়।

৬ই নভেম্বর যখন এলেন শরীরটা আবার খারাপ হল, বললেনও—শরীরটা কয়দিন থেকেই খারাপ যাচ্ছে। নিজেই আবার বললেন—সেদিন দেখেছিলুম কাগজে, মিসেস সামথিং অ্যালেন ত মিলিয়ন ডলার দিয়েছে আমেরিকান র‍্যাপেটার থিয়েটারকে (তিন মিলিয়ন ডলার মানে আমাদের দেশের দেড় কোটি টাকা)। থিয়েটারকে কি পরিমাণ ভালবাসে বোঝ; আর টাকাও কি পরিমাণ আছে ভেবে দেখ।

একজন বললেন—ওদের সব চেয়ে নামকরা মিলিওনেয়ার বোধ হয় রকফেলার।

বললেন—রকফেলার তো মিলিওনেয়ার নন, বিলিওনেয়ার। ওঁর কত টাকা নিজেই জানেন না। রকফেলারের কাছে যেই যেত তাকেই একডাইম করে দিতেন। না নিলে আবার তাঁকে অপমান করা হত। আমরা যখন নিউইয়র্কে যাই ১৯২৯-৩০ সালে, তখন slump, কাগজে খবর বেরোল যে তিনি এখন slump বলে একডাইমের জায়গায় ৫ সেণ্ট করে দিচ্ছেন। (এখানে বোধ হয় উনি একটু ভুল করেছেন, কারণ ১ ডাইম=৫ সেণ্ট। হয়ত নিকেল বলতে ডাইম বলেছেন।

এই সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, বললেন—ও, আপনি? আপনার ত বেশ কম বয়স বলে মনে হচ্ছে? চল্লিশ হবে?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে জানালেন, না। বললেন—হবে না। তাহলে ত বেশ বয়েস।

ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে ১৯৪৩ সালে স্কটিশচার্চ কলেজে নিয়ে গিয়েছিলাম।

বললেন—তা হবে।

ভদ্রলোক আবার বললেন—আপনি বলেছিলেন, নাটক লেখার অপরাধে একদিন এই কলেজের কেমিষ্ট্রীর প্রফেসার তাড়ানো হয়েছিল।

বললেন—বলেছিলুম? তাও হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলছিলেন তাতে খুব অন্তরের যোগ ছিল না। এবার আপনা থেকেই পুরোনো কলেজ-জীবনের স্মৃতিকথা বলতে সুরু করলেন। কামরাঙা মানে ক্যামেরণ আর মাকু

মানে ম্যাকলীন ! এরা আমাদের সময়েই আসে। এই এডিনবরা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটরা কোলকাতা ইউনিভার্সিটির মানে আশুবাবুর সময়কার বি, এর চেয়ে কোন অংশে ভাল নয় বরং নিরেশ।

মাকু যখন প্রথম আসে আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারে—আমাদের ১০.১২ জনের Tutorial নিতে এল। আমাদের সঙ্গে শ্রীকুমার, সুকুমার, শহীদ সুরাবর্দি পড়ে। তাছাড়া আমিও ছিলুম। তা প্রথম দিন ক্লাসে এসে বললে—তোমরা কি পড়তে চাও ?

তা বলা হল, আমরা অনার্সে মোটে তিনখানা সেক্সপীয়ারের নাটক পড়ি, সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য কোন একটা সেক্সপীয়রের বই পড়াও। কি একটা খুব পরিচিত বইয়ের নাম করা হল—তাতে বললে, দেখ ও বইটা আমি পড়িনি।

তখন বলা হল—'এসে-টেসে' করাও। তাতে বললে—My English composition is not very good.

এদিকে খুব সরল ছিল। তা ক'দিন পরেই ওকে Ist yearএ পড়াতে দেওয়া হল—আর অন্য প্রফেসারেরা বলে দিলে ও রকম করে সব কথা খুলে বোলো না। তা কিছুদিন পরে দেখলে সুবিধা হচ্ছে না, তখন কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

কামরাভা ওর চেয়েও খারাপ পড়াত। একজন একবার ওর পড়ানো লিখে নিয়ে গিয়ে ল্যাম্ব সাহেবকে বলেছিল—দেখ কি ভুল পড়ায়। ওর কাছে আবার পড়ব কি ? আর সেই শেষ পর্যন্ত হল প্রিন্সিপ্যাল। কাউকে বলতে শুনেছি—ও নাকি খুব ভাল পড়াত। কি পড়াত ? Economics।

মাকু মানুষটি খুব সরল ছিল আর থিয়েটারের ওপর ওর ঝোঁকও ছিল। সেক্সপীয়রের যে কটি নাটক ও অভিনয় করেছিল সে কটি খুব ভাল জানত। নরেশের সঙ্গে অভিনয় করেছিল—নরেশ সাইলক আর ও অ্যান্টোনিয়ো।

এডিনবরা বা এবারডীন ইউনির্ভাসিটির গ্র্যাজুয়েটরা যে কিছু শিখত না একথা ওয়ান সাহেব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন, বলতেন তোমরা কি ভাব তোমাদের শেখাতে এসেছি আমরা ? ইংরেজী তোমাদের যেমন আমাদেরও তেমনি বিদেশী ভাবা।

এই সময় আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, জিগ্যেস করলেন কার ভাই বললেন ? পঞ্চানন দাস ?

ভদ্রলোক বললেন, পঞ্চানন দাস মুখাজ্জির ভাই।

বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, পঞ্চানন দাস মুখাজ্জির কথাই বলছি। ইকনমিকসে অনার্স ছিল।

ভদ্রলোক বললেন—চেনেন তাঁকে ?

উত্তর দিলেন—চিনি বৈ কি। ওর ভাই পান্নালাল ত ছিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পঞ্চাননের মত ওরকম ভাল ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি। পান্নালাল আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ছিল। ও শুধু আমার বন্ধুই ছিল না ছিল ভায়ের মত। ১১১২ থেকে ১১৩৮ পর্যন্ত এমন রাত খুব কমই আছে যেদিন আমরা একসঙ্গে থাকিনি। বাড়িতে লোকজন কেউ না থাকলে আমি ওদের বাড়িতে যেতুম আর বেশীর ভাগ দিন রাত্তিরে ও আমার বাড়িতে খেত। রাত্তিরে দুজন বেরিয়ে ফিরতুম রাত বারটার আগে কোনদিন নয়—তখন বি, এ পাশ করেছিল, তারপর বাড়িতে এসেছি জানান দিয়ে আমরা আবার বেরোতুম।

আমি তখন বাদুড়বাগান সেকেণ্ড লেনে থাকি। ওখান থেকে বেরিয়ে সার্কুলার রোডে পড়ে গ্রীয়ার পার্কে—সেখান থেকে তখন পুলিশের তাড়া খেতে হত না—তারপর এধার ওধার ঘুরে চারটে নাগাদ এসে শুতুম। এই সময় নানা রকম আলোচনা করতুম আমরা মানে পলিটিক্স থেকে সুরু করে, নাটক মায় সাহিত্য পর্যন্ত। নাটকের কি ভাবে উন্নতি করা যায় এ নিয়ে অনেক কথা বলত সে। বিজ্ঞানের ওপরও ঝোঁক ছিল তার। বোধ হয় অনেকদিন আগে আমাকে বলেছিল, হাউইএর মত কোন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা চাঁদে পৌঁছতে পারবো।

বুদ্ধি ওর খুবই বেশী ছিল ; কিন্তু কেমন একটা বৈরাগ্যের জন্যে কিছু হল না ওর। মাইনর পরীক্ষায়ও হল ফার্ষ্ট আর আমি ওর ন'জনের নীচে টেনথ। এণ্ট্রান্সে ও হল থার্ড না ফোর্থ আর আমি শুধু পাশ করলুম। ফার্ষ্ট আর্টসে ও বোধ হয় আরো উঁচুতে, না বোধ হয় সিক্সথ, তারপর বি, এস, সিতে ফার্ষ্টক্লাশ অনার্স কিন্তু এম, এসসিতে কোনরকমে পাশ করলে। তাও ওর মাষ্টার মশায় চন্দ্রভূষণ বাবু বললেন, ও ফেল করলে only chemist in the batch ফেল করবে। শুনে ওকে পাশ করায়।

ওর ছিল কেমিষ্ট্রী অনার্স। একটা কোশ্চেন either/or ছিল, তার একটা অংশ ছিল এতই শক্ত যে কেউ চেষ্টাই করেনি। সেটা বোধ হয় প্র্যাকটিকাল। এক্সপেরিমেণ্ট ও আরম্ভ করেছিল ভালই, প্রফেসার, ডিমনষ্ট্রেটর সবাই সাহস দিচ্ছে। হঠাৎ মাঝপথে কি হল সিগারেট ঝাড়তে গিয়ে যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে চুরে সব তছনছ।

ও পরীক্ষার আগে বড্ড নার্ভাস হয়ে যেত। একবার ছুটোর সময় পেপার আরম্ভ ও গোলদীঘিতে সিগারেট খাচ্ছে আর ছড়ি হাতে পায়চারী করছে। পনর মিনিট হয়ে গেছে এমন সময় কে একজন দেখতে পেয়ে বলছে—পান্না আজ পরীক্ষা না ?

তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজত পরীক্ষা। ভেবে পাচ্ছিলুম না কি কাজ আছে। চল যাই।

ওর এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে কোন বিষয়ে তর্ক করতে পারত।

এবার ষোড়শী পড়তে শুরু করলেন। প্রথমে বললেন—ষোড়শীর দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটা বেশ বড় আর খুব ভাল লেখা কিন্তু কেমন যেন দরকচা মেরে গেছে।

ষোড়শী-জীবানন্দের কথোপকথনের অংশটা পড়ে বললেন—জীবানন্দ এখানে বলতে চাইছে তুমি আমায় স্বামী বলে স্বীকার কর কি না ?

এর পরের দৃশ্য নির্ম্মল জীবানন্দ আমার পর যে সব কথা বলছে সে সম্বন্ধে বললেন—নির্ম্মলের কথাগুলো অস্বাভাবিক নয়। এখানে সে একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে—cought with the Jampot in hand. ষোড়শীর এটা deliberate, নির্ম্মলকে ধরে এনেছে জীবানন্দকেও ডেকে পাঠিয়েছে। অবশ্য জীবানন্দ এসে পড়ায় নির্ম্মলের অস্বস্তিকর অবস্থা হয়ই আর অভিনয়ে সেই অস্বস্তিকর অবস্থাটাই ত ফুটিয়ে তুলতে হবে। এখানটা একটু খাপছাড়া লাগে, কিন্তু কি করব বল ! এই দুটো সিনের আগে ছোট্ট একটা সিন যদি লিখে দিতেন তাহলেই হৈমর কি দেখে ষোড়শীর লোভ হয়েছিল সেটা বোঝা যেত। [ক্রমশঃ।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১৫

ব্রাইটের গুলীগুলো শরীরে নিয়ে চম্মন সেখানেই পড়ে রইলো দিনভোর। সন্ধ্যের দিকে তাকে পা ধ'রে টেনে নিয়ে পাশের খানায় শুকনো পাতার ওপর ফেলে দিলো ডোমরা। এ সময় পয়সা যা, তারাই কামাচ্ছে। পয়সা দিয়েও প্রয়োজন মতো ডোম বা ভাঙ্গী মিলছে না। এমনি করে চম্মনের জীবনটা ফুরিয়ে গেল। জীবনটা চম্মন এমনিই কাটায়নি। দীর্ঘ দিন ধরে সে সাহেবদের সর্বশক্তিতে বিশ্বাস করেছিলো। কুমায়ুনের কোন একটি বনাঞ্চলকে নিজের শরীরের মতো ক'রে খুঁটিনাটি জেনেছিলো। তার শরীরে ক'টা কাটাছেঁড়ার দাগ আছে, কোথায় তিল আছে, কোথায় শিরাগুলো দড়ির মতো উঠে আছে, এ-ও যেমন সে জানতো; তার সেই বনটার কোথায় সুঁড়িপথ, কোথায় নতুন চারা উঠছে, কোথায় নদীর বাঁকে আত্তিকেলে বুড়োময়ালটা পাথরের কোলে জলে গা ভেজাতে আসে, সে বছরকার বাঘিনীর আসঙ্গঋতুর ফলে জন্মিয়েছিলো যে ব্যাঘ্রশাবক —এ বছর বালকের মতো কৌতূহলী অসন্ধ্যে চোখ নিয়ে মা-র কাছ ছাড়া হয়ে সে কোথায় দাঁড়িয়ে খরগোস ও সজারুর ত্রস্ত গতিবিধি দেখে—এ সবই ছিলো তার জানা। তার সাফাখানার গাছগুলোকে সে ভালবাসতো, আর নতুন পাতার সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়ি এলে পরে তার বালকের মতো আনন্দ হতো। সে প্রকৃতির সঙ্গে দীর্ঘ দিন একসঙ্গে বাস করে, প্রকৃতির সে জীবনলীলা থেকে তার মধ্যেও অনেকটা প্রশান্তি, ধৈর্য এবং বাঁচবার আনন্দ সে গ্রহণ করেছিলো।

দেখা গেল সে সব জ্ঞান প্রক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সে সব তার এ সময়ে কোন কাজেই আসলো না। এমন কি, সারা জীবন সে আত্মসম্মানকে যে এত বড় ঠাঁই দিয়ে এসেছে, কোন সময়েই অশোভন বা অসম্মানজনক কোনো আচরণ সে করেনি—মৃত্যুটা ঠিক তেমন ভাবে এলো না। মৃত্যু, সে ত' জীবনের চক্রের এক অবশ্যম্ভাবী পরিসমাপ্তি। মৃত্যুকেও শ্রদ্ধেয় করে তোলা হয় নানা রকম জাগতিক রীতিনীতি দিয়ে। রামনাম, লাল কাপড়, পুত্রের হাতের আগুন এবং পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ এই সব নিয়ে তবে মৃতদেহ বিলীন হয় চিতাভস্মে।' চম্মনের মৃত্যুটা সেদিক থেকেও সম্পূর্ণ পরিণতি পেল না।' মৃত্যুটা এলো বিশ্রীভাবে, সুর কেটে, যে মানুষটার মধ্যে জীবনতৃষ্ণা বৃদ্ধ বয়সেও ছিলো প্রবল—তার ওপরে অতর্কিত এক বেইমানের ছুরির মতো।

পাতাগুলো তার পরেও ঝরলো, সারারাত, সারাদিন ধরে এই খা। চম্মনের দেহটা বিশ্রীভাবে চিৎ হয়ে পড়েছিলো—পাতাগুলো বন্ধুর মতো শেয়াল ও শকুনের চোখ থেকে কিছুদিনের মতো ঢেকে রাখলো তাকে।

চম্মনের মৃত্যুর কথা চন্দন জানে নি। সে ফিরছিলো কানপুরের দিকে। কানপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে হ্যাভলকের বিজয়ী সেনানী, এবং নীল·চলেছেন এলাহাবাদ ছেড়ে কানপুরে। এ সময়ে কানপুরে যাওয়া মানে মৃত্যুবরণ করা। ফাঁসী, গুলী অথবা কামানের গোলা ডেকে আনা।

তবু চন্দন ফিরছিলো। বাইরের সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে তার মনের ভেতর তখন একটা অদ্ভুত তাগিদ। ফিরতে তাকে হবে-ই। যেমন ক'রে হোক যেতে হবে কানপুরে। চম্পাকে সে খবর পাঠিয়েছে—চম্পা তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

মনের ভেতরের এই দুর্মদ তাগিদ—চম্পার জন্য তার এই আকুতি এখন চন্দনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সত্তার চেয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। চম্পা, যে ছিলো চন্দনের হৃদয়ের মধ্যে, মুঠোর ধরা —সে যে তার হৃদয়, মন, তার পৃথিবী সব ছাড়িয়ে এমন ক'রে বড় হয়ে উঠবে, তা বুঝি জানতো না চন্দন।

বেনারস ছেড়ে এলাহাবাদের পথ ধরে উজিয়ে আসতে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে বার বার। যাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলো চন্দন, তারা কে কোথায় চলে গেল! এই যে লড়াই করলো, এই বনে একশো সাল বাদে, ইংরেজদের হারিয়ে তাদের রাজ কায়েম হবে—এই বিশ্বাসেই সে-ও ধরেছিলো হাতিয়ার। মানুষ মানুষকে মেরে এত আনন্দ পাবে, এত রক্তপাতের প্রয়োজন হবে—আর এমন করে পরাজয় আসবে—তা সে আগে জানে নি।

মৃত্যুর এমন সর্বগ্রাসী রূপ সে আগে দেখেনি। গত ছয় মাসে মৃত্যু তার নিত্যসঙ্গী ছিলো। মৃত্যু যে এমন ভয়ঙ্কর অথচ ভয়হর, এমন নিষ্ঠুর, অথচ এমন নির্মল—যে মৃত্যুতে এত ভয়, সেই মৃত্যুকে সে নিত্য দেখলো—বুকের কাছে, দুই চোখ জুড়ে, প্রাণমন ভরে

এই মৃত্যু-ই তার চোখ খুলে দিয়েছে। যারা নিজেরা মরতে ভয় পায়, তারাই বুঝি অপরকে মেরে এক অদ্ভুত আনন্দ পায়। শুধু কি ইংরেজদের কথাই মনে পড়ে তার? তার স্বদেশীয়দের, সে দেখেনি? দেখেনি যে তারই দেশের মানুষ, বেতনভুক্ কিছু পদলেহী মানুষ—ইংরেজদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে সমান আনন্দে ক্ষেত থেকে গাঁ থেকে মানুষ তাড়িয়ে এনে ফাঁসী দিয়েছে? ফাঁসী দিয়েছে—আর কিষাণের প্রাণ হাজার শিকড়ে বাঁধা, সে প্রাণ যেতে চায়নি সহজে। কতক্ষণ ধরে গাছের ডালে অসহায়ভাবে ছুমড়ে মুচড়ে, চোখ কান

থেকে রক্ত ফেটে বেরিয়ে তবে মরেছে এক একটা মানুষ। সে দৃশ্য দেখে নিচে দাঁড়িয়ে ভাঙ ও আফিম খেয়ে আনন্দ করছে অন্তরা।

কিষাণ এমন অতর্কিত ও নিষ্ঠুর মৃত্যু বোঝে না। কিষাণ প্রাণ সৃজন করে। মাটির সঙ্গে কিষাণের সম্পর্ক নারী ও পুরুষের মতো। যে আনন্দে কিষাণ তার সঙ্গিনীর জঠরে জীবনের বীজ সঞ্চার করে—সেই আনন্দে-ই সে মাটির অন্ধকার জঠরে রোপিত করে প্রাণের বীজ। মাটিকে সে ফলবতী করে আর তার ও মাটির যে ভালোবাসাবাসি চলে এক একটি ফসলের মৌসুম ধরে। ক্ষেত থেকে শস্য কেটে নিয়ে চলে যায় কিষাণ, রিক্ত ও হৃতশ্রী ভূমি পড়ে থাকে। কিন্তু মাটি তখন তার ঐ অর্ধনগ্ন কালাদেহ, দরিদ্র প্রেমিকের ওপর রুষ্ট হয় না। অভিমান করে না। সে জানে, এর পরে বর্ষণের ঋতুতে তারও ঋতু সঞ্চার হবে আর ঐ কিষাণ-ই ফিরে এসে গভীর প্রেমে আবার তাকে ফলবতী করবে। রিক্ততার অভিমান নিয়ে কিষাণের দিকে চেয়ে থাকে শুধু পতিত অনাবাদী জমি। কিষাণকে জন্মস্বত্ব না হোক, শুধু কর্ষণের মালিকানাটুকুও কেউ দেয়নি বলে যে জমিকে বন্ধ্যা থাকতে হয়। কিষাণ আদর্শ প্রেমিকও বটে। কেন না জমির শেষ মালিক সে নয় মালিক কোনো ভূম্যধিকারী—যে শুধু শস্যলাভের লোভে জমি চায়; শুধু পুত্রকামনায় পত্নী চাইবার মতোই অবিবেচক তার সে মালিকানার অধিকার।

কিষাণ অনেক প্রাণ সৃজন করে এবং অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে, সেই ফসলের অকাল মৃত্যুতে সে বিয়োগব্যথা অনুভব করে। গাছের জন্ম ও মৃত্যু যেমন স্বাভাবিক, নিঃশব্দ এবং তার মধ্যে যেমন জীবনের অন্ত সূচিত হয় না নতুন প্রাণের আগামী সম্ভাবনাই বোঝা যায়—কিষাণের নিজের জীবনেও সে সেই স্বাভাবিক মৃত্যুই কামনা করে। যে মৃত্যু স্বাভাবিক ভাবে আসে। যে মৃত্যু দ্বারা সে অবলুপ্ত হয়ে যায় না—বরঞ্চ চিতাভস্মে গ্রামের পরিচিত নদীর জলের সঙ্গে মিসে, নিজের পুত্র ও পৌত্রের স্মৃতিতে মিশে সে জীবনের সীমিত বাধা অতিক্রম করে চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকে।

সে মৃত্যু শান্ত, বন্ধুর মতো, দেবতার মতো আশ্রয়দাতা, এবং জননীর মতো ক্ষমাশীল।

সে মৃত্যু পেল না কিষাণ। চন্দনও সেই মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত, এবং সেই মৃত্যুই সেও কামনা করেছিলো।

এখানে সে যে মৃত্যু দেখলো, তা জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নয়। কিষাণ জীবনশিল্পী, তাই সে অমন সযত্নে পরম আদরে নিখুঁত ও নিটোল ভাবে প্রাণ সৃজন ও মৃত্যুকে গ্রহণ, দুই-ই করতে পারে।

এই সব মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত। তারা আপাতলোভের আশায় অস্থির। তারা পৃথিবীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ভালোবেসে নয়, ক্ষমা দিয়ে নয় জোর করে বলপ্রয়োগে।

ইংরেজ অফিসার-ও সেনানীকে চন্দন দেখেছে—হাত-পা বাঁধা বন্দী কিষাণ, যে সদ্যোজাত কোনো শিশুর মতোই অসহায় তখন, সেও যদি ফাঁসীর দড়িতে গলা ঢোকাতে দেরী করেছে—অফিসার ও সেনারা কি রকম ছটফট করে, গালাগালি দিয়ে শূন্যে চাবুক আস্ফালন করেছে।

ফাঁসী দিচ্ছে অসহায় বালক ও কিশোর ও বৃদ্ধদের—সেখানে মদগর্বিত হবার কোন মানেই হয় না। তবু, তারা যে এত সহজে প্রাণহরণ করতে পারে, তা জেনে, ইংরেজ অফিসারকে সে চোখ মুখ লাল করে উল্লসিত হতে দেখেছে—যা মদ-মত্ততারই নামান্তর মাত্র।

প্রাণহরণে এই আনন্দ কেন? না, ঐ যে অসহায় শরীরগুলো ওগুলো ব্রিটিশের শ্রেষ্ঠত্বেরই জয়ধ্বজা। ব্রিটিশ যে কত বড়, পরাধীন দেশের মানুষের প্রাণহননে কি যে ভগবৎদত্ত অধিকার তাদের, এ যেন তারই প্রমাণ।

চন্দনের মনে হয়েছে, এই শ্বেতাঙ্গরা জোর করে, এই ভাবে তাদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। আর এই থেকেই মনে হয় কোথাও তারা দুর্বল। কোথাও তাদের ভিত্তি একান্ত দুর্বল। কেন না, যে প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ এবং সত্যিই যে শক্তিশালী তার কি এমনি এক রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করে তবে নিজেকে জাহির করতে হয়? চন্দনের মনে হয় ব্রিজদুলারীর কথা। ব্রাইট তাকে শরীরে মনে নিত্য ধর্ষণ করে নিজের প্রতি আসক্ত ও আবদ্ধ করতে চেয়েছে। পেরেছে কি? ব্রিজদুলারীর শরীরটা নিত্য লাঞ্ছিত হয়েছে কিন্তু তার বাইরেও যে মনটা?

চন্দন জানে ব্রাইট কোনদিনও সে মনের নাগাল পায়নি। সে মনটা ব্রিজদুলারী দিয়েছে ডাক্তারসাহেবকে। ভবানীশঙ্কর ভীরু, তাই সে প্রেমের মর্য্যাদা দিতে পারেননি। তাই বলে ব্রিজদুলারী ছোট বা মিথ্যা হয়ে গেল না।

আজকে ইংরেজরা চন্দনের দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বলদর্পী কোনো লুণ্ঠক বিদেশীর মতোই ধর্ষণে কলঙ্কিত করে নিজেদের অধিকার জাহির করতে চাইছে।

পারবে না। পারবে না। সে কথা এক বছর আগেকার মন নিয়ে চন্দন বুঝতে পারতো না।

কিন্তু মৃত্যুর নিত্য সাহচর্য তাকে অনেক শিখিয়েছে। চন্দন জেনেছে যে মৃত্যুটা কোন সত্যই নয়। তার চেয়ে সে অনেক সত্য। চম্পার প্রেম অনেক সত্য।

আজ, কানপুরে মৃত্যু নিত্য অপেক্ষমান জেনেও যে সে চলেছে, তার কারণ ঐ চম্পা। চম্পা তাকে টানছে।

চম্পা টানছে, চম্পা আর শুধু চম্পা নেই আর চন্দনের কাছে। ডেরাপুরের মাটি, গ্রাম, সে বটগাছ, তার সে সাদামাটা শান্তিকামী বাবা প্রতাপ, মূর্খ ও মদগর্বিতা মা দুর্গা—এদের সে দীর্ঘদিন ভুলে ছিলো। কিন্তু এরাই তার জীবনের জল, মাটি, আকাশ, উত্তাপ ও বায়ু। এদের উপাদানেই তার দেহ মন তৈরী। দীর্ঘদিন চন্দন তাদের ভুলে ছিলো। কিন্তু এখন, এই মহান অভ্যুত্থান যখন অক্ষম কোনো প্রাচীন যূথপতি হাতীর মতো মুখ থুবড়ে পড়েছে—এখন তারা তাকে টানছে। তারা সবাই এক হয়ে গিয়েছে চম্পার মধ্যে।

চম্পা তাকে টানছে তাদের সকলের হয়ে। চন্দন জানে সামনে বিপদ, পিছনে শত্রু-সৈন্য, এবা নিরাপদে যদি বাঁচতে চায়, তবে যমুনা পেরিয়ে কাল্পীতে গিয়ে নানাসাহেবের যে নতুন ঘাঁটি হচ্ছে সেখানে যোগদেওয়া-ই সমীচীন। যারা বুদ্ধিমান, যারা লড়তে চায়, তারা তাই করছে। কেননা, দাবানলের গতি এখন মধ্যভারতের মুখে ধাবমান। সেখানে, বলতে গেলে ইংরেজ শাসনের কোন অস্তিত্বই নেই।

চন্দন সে সব কথা ভাবতে পারছে না তার দেহটার রক্ত,

মাংস, শিরা, উপশিরা, চোখের দেখবার ক্ষমতা, ত্বকের অনুভবের শক্তি, শ্রবণের শোনবার ক্ষমতা—এই সব কিছু ভরে ছড়িয়ে গিয়েছে চম্পা।

চম্পা তাকে নিরন্তর টানছে। চম্পার মধ্যে দিয়ে ডেরাপুরের মাটি, গাছ, বর্ষার ভিজে বাতাস, সেই বটগাছের নিচে জল ছল ছল ধানী জমিটুকু—সব কিছু তাকে সমানে ডাকছে আর টানছে। চম্পার মধ্যে দিয়ে তার বাবার রেখাঙ্কিত মুখখানা, আর মা-র দুই প্রসারিত হাত তাকে ডাকছে।

কেন চন্দন নিজেকে না বুঝে এমন ক'রে ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেয়ে বেড়িয়েছে? সে কি চায়, তা বুঝতে এত দেরী হলো কেন? কেন সে নিজের পরিচয় এমন করে ভুলে ছিলো? কি চায়, আর কি সে পাবে, জীবন তার জন্য কি পাওনা মেপে রেখেছে তাই বুঝতে এমন করে এতগুলো দিন কেটে গেল?

এমনি করেই হয়তো জীবন থেকে শিক্ষা মেলে। এমনি করে, সেরশাহী সড়কের ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে, লড়াই করে শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে, হাজারটা মৃত্যুর স্বাদ নিজের ক্লান্ত রক্তে নিয়ত অনুভব না করলে চন্দন কোনদিনও জানতো না, যে সে কি চেয়েছিলো।

আজ চন্দন জানছে, যে সে শুধু এইটুকুই চেয়েছিল—চম্পার হাত ধরে ডেরাপুরে ফিরে যাবে—সেইখানে, তার গ্রামের মাটির তার গ্রামের বাতাস ও জলের ও আকাশের সস্নেহ পরিবেশে সে চম্পাকে ভালোবাসবে। চম্পা এবং তার সে প্রেমের ফলের উত্তরপুরুষ সৃষ্ট হবে। তার চম্পা জননী হবে। তার সন্তানকে ধারণ করে চম্পার শরীরটা যখন স্ফীত হয়ে যাবে—তখনও চম্পাকে তার অসুন্দর লাগবে না। বরঞ্চ তখনই বোধ হয় চম্পাকে সুন্দরতম লাগবে। তার জন্য ক্ষেতে খাবার বয়ে নিয়ে—গাছের ছায়ায় বসে চম্পা তার সন্তানকে দুধ দেবে। আর তা-ই দেখতে দেখতে চন্দন, জীবনের সঙ্গে তার নতুন নতুন গ্রন্থির বন্ধন অনুভব করবে।

এই সে চেয়েছে। এই সে চায়। আর কিছু চায় না। আজ চন্দন চম্পার জন্যে সেই প্রেম অনুভব করে, যা সে কোন দিন-ও করেনি।

তার গ্রামকে সে কোনদিন এত ভালবাসেনি। তার পিতা-মাতাকে সে কোনদিন এত ভালবাসেনি! চম্পাকে সে কোন দিন এত ভালবাসেনি।

তার আর চম্পার ভাগ্য সেই কবে, সুদূর কোন্ শৈশবে লাল-চেলীতে গ্রন্থি বেঁধেছিল। চন্দন বুঝতে পারেনি।

এগিয়ে আসে কানপুর। পথে এবার ছোট ছোট ইংরেজ পক্ষের প্রহরা দলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। চন্দন প্রায় বিনা অনুভূতিতে যুদ্ধ করে ও হত্যা করে। তার সঙ্গীদল মরতে মরতে কমে এসেছে। এখন আছে তারা সাত জন। হিন্দু ও মুসলিম। তার সঙ্গীরা তার এই মরিয়া সাহসের প্রশংসা করে। চন্দন ধূমায়িত রাইফেল বাতাসে ঠাণ্ডা করে, আর রক্তমাখা তরবারি ঘাসে মুছে নেয়। কোন কথা বলে না। বলে না যে, এটা সাহস নয়। ভয়ের বোধ নেই, সাহসের কথা ওঠে না।

কানপুরের উপকণ্ঠে ভগবানপুরের কাছাকাছি এসে চন্দন ও তার সঙ্গীরা কোন শেঠের এক আমবাগানে বিশ্রাম করে। বিশ্রাম ক্ষণিকের। এখন সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন। ভগবান ও অর্জুন, গুলমুহাম্মদ, সিরাজ ও বিষুণ—তারা এখন-ও সক্ষম আছে, তাদের ঘোড়া-ও তাজা আছে। তাদের হয়ে সিরাজ বলে—আমরা যমুনা পেরিয়ে কাল্পীর পথ ধরব। চিরখারী যাই, বা বান্দা যাই—কানপুরের পথে যাব না।

দয়ারাম এদের চেয়ে বয়সে তরুণ। তাকে প্রায় কিশোর বলা চলে। পথে, গত পরশু-র লড়াই-এর পর তার বাঁ পাখানা গিয়েছে। পা-টা রক্তমাংসের একটা জড়পুঁটুলীর মতো একপাশে ঝুলছিলো। কাল থেকে তাতে পচ ধরেছে। ওপরের ঊরুটা কালো হয়ে ফুলে উঠেছে। দয়ারামের জ্বর-ও হয়েছে। সে আর চন্দন থেকে যায়।

দয়ারামকে মাটিতে শুয়ে পড়তে সাহায্য করে চন্দন।

সঙ্গীরা এবার পাঁচ মাস বাদে ছাড়াছাড়ি হয়। তারা চন্দন ও দয়ারামকে আলিঙ্গন করে বিদায় নেয়।

দয়ারাম চন্দনকে শুকনো গলায় বলে—একটা ডাল ভেঙে দাও।

গাছের একটা ডাল ভেঙে দেয় চন্দন। দয়ারাম সেটা কামড়ে ধরে থাকে। কাছে-পিঠে জল নেই। ডালটা কামড়ে সে যন্ত্রণার আর্তনাদগুলো চেপে চেপে দেয়। বেশী যন্ত্রণা হ'লে পরে মুখ গুঁজে দেয় মাটিতে। চন্দনকে বলে—যদি দেখ ফিরিঙ্গীরা আসছে, তবে চন্দন ভাই তুমি গুলী করে আমাকে খতম করে দেবে। কথা দাও।

চন্দন বলে, দেব।

রাত বাড়তে থাকে। মশা ভন্ ভন্ করে। দয়ারামের যন্ত্রণা বাড়ে। একবার সে মুখ ফিরিয়ে বলে—মাটিতে কান পেতে আছি। মনে হয় ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাচ্ছি অনেক দূরে। তুমি বরাবর চলে যাও। এখন গেলে বাঁচতে পারবে।

চন্দন বলে—আমি যাব না। আমি কানপুরে যাব।

দয়ারাম বলে—না, ভুল শুনেছি। সব চুপচাপ।

চন্দন গড়িয়ে পড়ে পাশে। বলে—রাত তিন প্রহরে উঠে আমরা বেরিয়ে যাব। তুমি যদি কিছু শোন—তবে আমাকে ডেকো।

দয়ারাম ঘাড় নাড়ে। চন্দনের তন্দ্রা আসে।

রাত তিন প্রহর পেরিয়ে যাবার আগেই এসে পড়ে ব্রিগেডিয়ার ইভান্সের প্রহরাদল। রাতটা যখন ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বাড়ছিলো—তখনই মাটিতে মুখ গুঁজে মরতে থাকে দয়ারাম। শেষ চেষ্টায় বারুদের গুঁড়ো মাখা পটিটা থেকে ফেলে দিয়ে সে ছোরা দিয়ে বাঁধন কাটাতে চেয়েছিল। হাতে বশ ছিলো না। ছোরার খোঁচা লেগে ঊরুতে একটা বিশ্রী গর্ত হয়। সে গর্ত থেকে 'প্রথমে কালো রক্ত ও পুঁজ, তার পরে লাল রক্ত ছিটকে ছিটকে বেরোয়। অদ্ভুত আরাম বোধ করে দয়ারাম। রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও বেরোতে থাকে। মরতে যে তার কত ভালো লাগছে, এই কথা পাছে বলে উঠে চেঁচিয়ে আর শত্রু সৈন্যদলকে জানান দিয়ে দেয়, এই ভয়ে দয়ারাম মুখের গহ্বরে যতটা আঁটে—ততটা ধুলো আর ঘাস কামড়ে নেয়। চন্দনের ঘুম ভাঙে না।

ভগবানপুরের ক্যাম্পে ইভান্স সকালবেলা কোর্টমার্শালে বসে।

যুদ্ধের কয়টা মাসে, ইভান্স-এরও আত্মোপলব্ধি হয়েছে। সেই স্বপ্নদর্শী, ভাবপ্রবণ ইভান্স—যাকে যুবক বয়সেও বয়ঃসন্ধির এক তরুণ

ব'লে বোধ হতো। কিশোর বেতস গাছ যেমন রোদ ও জল ও বাতাস সবটুকুই পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করবার জন্য কচি কচি পাতাগুলি মেলে থাকে—ইভাজও একদিন এই মহাদেশের সবটুকু জানবার জন্য, বুঝবার জন্য—তার অনুভূতিগুলিকে মেলে রাখতো। ভারতের সব কিছুই তার মনে হতো রহস্যময়, সুন্দর। চম্পাকে তার মনে হয়েছিলো এই প্রাচ্যের উত্তপ্ত বসন্তের মতোই কোনো মদিরযৌবনা প্রেমিকা। এমন কি চম্পার সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, তাকেও সে কত রোমান্স দিয়ে রাঙিয়েছিলো। তার মনে হয়েছিল অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ অফিসাররা, ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনা করে, তাতে প্রেম থাকে অনুপস্থিত। চম্পা ও তার সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক সুন্দর। চম্পা তাকে সত্যিই ভালোবাসে। বিদেশী পরিব্রাজক এবং Indian nautchgirl এর যে আরব্য উপন্যাসধর্মী প্রণয়ের কথা পড়া যায় তারও চম্পার প্রেম সেই গোত্রেরই কিছু। এমন কি, সে এ কথাও ভেবেছিলো—'O, Lotus eyed maiden' ধরণের কোনো প্রেম সিঞ্চিত উদাত্তস্বরের কবিতা লিখবে।

এখন ইভান্সের সে কথা মনে পড়লে হাসি পায়। মনে হয়, তখন অবধি তার নিজের পরিচয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিলো না। তাই তার ধ্যানধারণাগুলো ছিলো ঐ রকম স্বপ্নদর্শী এবং দুর্বল চিত্ত। হ্যাঁ—সে ত' দুর্বলচিত্তেরই পরিচয়।

এই কয় মাসের লড়াইয়ে সে ভালো করেই জেনেছে সে-ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক বলশালী প্রতিভূ। এই উপলব্ধি তার এসেছে, ব্রিটিশের সর্বশক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে। কত সহজে তারা দমন করছে এই অর্ধনগ্ন মানুষগুলোর স্বাধীন হবার অভ্যুত্থান। কি ক্ষমতা তাদের—যে অনায়াসে হাজার হাজার মানুষকে তারা হত্যা করে চলেছে।

মানুষকে এমন সহজে, আইনের নামে, ধর্মের নামে, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিকার বজায় রাখবার নামে যে হত্যা করা চলে—এই থেকে ইভান্সের মনে স্বাজাত্যবোধ এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাগ্রত হয়েছে।

চম্পার কথা এখনও মনে হয় তার। তবে সেই স্বরভিত ভীরু প্রেমের চোখে নয়। মনে পড়তে, চম্পার উন্নত স্তন এবং দেহটার কথাই মনে হয়।

নিয়ত রক্তপাত দেখতে দেখতে তার রক্তেও ক্ষুধা জেগেছে। সে চম্পাকে এখন পেলে তাকে যে পরিপূর্ণ ভাবে আস্বাদন করবে—সেই কথাটাই মনে হয়। মনে হয় সে মূর্খ, তাই দিনের পর দিন চম্পার সঙ্গে কথা বলে আর হাত ধরে, আর বড়জোর তার আতরগন্ধী চুলের গন্ধ শুঁকে কাটিয়েছে।

কাল্পী রোডের ধারে ভগবানপুর গ্রাম বর্তমানে ইংরেজ ঘাঁটি। সেখানে নিয়ত কোর্টমার্শাল ও ফাঁসী চলেছে। তবে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বড় তাড়াতাড়ি। কেন না, ফাঁসী দেবার মতো মানুষ আর বড় বেশী মিলছে না।

চন্দনকে পেয়ে তাই উল্লসিত হয়ে ওঠে সবাই।

চন্দনের ঘুম ভাঙলো যখন, তখন দেরী হয়ে গিয়েছে সত্যিই—তবু চন্দন একেবারে আত্মসমর্পণ করেনি। সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার খুরের শব্দ এবং চীৎকারে ঘুম ভাঙলো তার। প্রথমেই মনে হলো দয়ারামের কথা। দেখলো অনেকখানি কালো ও লাল রক্ত মাটিতে ফেলে দয়ারাম শরীরের এমন একটা কোণ সৃষ্টি করে কুঁকড়ে পড়ে আছে, যে সে কেন সৈনিকের কর্তব্য স্মরেনি—সে প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞাসা করা অবান্তর। দয়ারামের হাত ও পিঠের ওপর দিয়ে তখনই পিঁপড়ে উঠছে। আর মৃত্যুর আঘ্রাণ না পেলে পিঁপড়ে হাঁটে না কারুর শরীরে।

চন্দনের রাইফেলে গুলী ছিলো। বহু ক্ষত-বিক্ষত হাতখানায় জোর ছিলো। আর, ইংরেজরা এ কথা ভাবেনি, যে একটা লোক উঠে ছয়টা সওয়ারের বিরুদ্ধে রাইফেল তুলবে। হঠাৎ এসে ধরলে পরে ভারতীয়রা খানিকটা অসহায় হয়ে পড়ে এই তারা জানে।

চন্দন তখনই বোধ করলো, জীবনের সঙ্গে তার যে গ্রন্থি বাঁধা ছিলো, সে গ্রন্থি যেন কেটে দিলো কেউ। তখনই সে বুঝতে পারলো।

তার নিশানাও কম স্থির নয় আর পাল্লা নেবার এমন কিছু ছিলো না—সামনের ঘোড়সওয়ারটি বেশ ডাগড়া তাজা—গলায় উল্কি দেখা যায়—বোঝা যায় কোনো মানোয়ারী গোরা হবে। চন্দনের গুলীতে বিজাতীয় উক্তি ক'রে সে মুণ্ডুকাটা খড়ের পুতুলের মতো টুপ করে পড়ে গেল পাশে।

দিব্যি লাগলো চন্দনের। পাশের জনকেও সে গুলী ছুঁড়লো, কিন্তু প্রথম সৈন্যটির ঘোড়াটা এগিয়ে এসে তাকে ফেলে দিলো। ভড়কে গিয়েছিলো আর কি! আর চন্দনের হাত থেকে তখনই রাইফেলটা ছিটকে পড়লো।

চন্দনকে ইভান্স আগেও দেখেছে। চেনা মুখ দেখে আনন্দে ও সাফল্যে সে হাসতে লাগলো। কতকগুলো প্রশ্ন এবং অশ্লীল রসিকতা করলো। জবাব দিলো না চন্দন।

দু'জন ডোম তাড়াতাড়ি করে দড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাছের ডালে লটকাচ্ছিলো। চন্দন দেখলো দড়িটা চক চক করছে। সম্ভবত ওরা মোম ঘষে পালিশ করে ফাঁসির দড়ি।

তারপর, একটা মিনিটকে খণ্ড খণ্ড ক'রে প্রতি পল অনুপলকে এক একটা অনন্ত সময় ক'রে নিয়ে চন্দন তীক্ষ্ণ ও একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে নিলো পৃথিবীটাকে। কপালের চামড়া ঘোড়ার খুরে ঝুলে নেমেছে। হাত পিছমোড়া ক'রে বাঁধা।

চন্দন দেখলো সকালের আলোতে সামনে কানপুরের পথে আমগাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। তার ওপরে শিবমন্দিরের পিতলের ত্রিশূল চক্‌চক্‌ করছে। দেখলো পশ্চিম-দক্ষিণে যমুনার জল বালির কোলে নীল দেখাচ্ছে। তার ওপারে আর কিছু দেখা যায় না। ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখলো আমগাছটার ডালের ওপরে একটা কাঠবিড়ালী মুখে কি নিয়ে উঠে যাচ্ছে। চন্দন জানলো, ও খাদ্য সঞ্চয় করছে। তারপর দেখলো তার পায়ের নিচে ঘাসগুলো সবুজ। দুই পা ঠুকে নাগরা দুটো খুলে ফেললো সে। খালি পা ঘাসে রেখে মাটি ও পৃথিবীর স্পর্শ নিলো সে, এই হলো তার এবং পৃথিবীর মধ্যে অন্তিম আদান-প্রদান। মনটা বিহ্বল হলো না। কেন না, ঐ খণ্ডিত মুহূর্তের মধ্যে যে অনন্তর আস্বাদ পেলো চন্দন তার মধ্যেই চম্পা ছিলো। বস্তুত চম্পা এবং তার গ্রাম, তার মাটি, ঘাস, সেই বটগাছ, সেই আকাশ ভরে টিয়াপাখির ঝাঁক নেমে আসা মরকত সন্ধ্যা, সেই কালো মেঘের তলায় চম্পার হাত ধরে ছুটে চলা শৈশব, তার মার সান্নিধ্যে এলে পরে ঘি ও দই এর পরিচিত গন্ধ, তার বাবার চোখের নিচের পরিচিত জন্ম দাগ, তার দাদা চন্দনের হাসিভরা চোখ, আর

আবার চম্পা, আরো অনেক ক'রে চম্পা, শুধু চম্পা—শৈশবের বেণী খোলানো চম্পা, প্রথম যৌবনের বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা একাকিনী চম্পা, বিদায়ের দিনের রক্তলগ্ন চম্পা। চম্পা, চম্পা এবং চম্পা এবং আরো অনেক চম্পা তার মধ্যে সেই সময় মিলে গেল।

* * * *

ভগবানপুরের ঠিক বাইরে, ছাউনীতে তখন চম্পা বসেছিলো।

তখনো ইভান্স বা ম্যাক্সওয়েল, বা ষ্টিফেন্সন জানেনি, যে তাদের বিশ্বস্ত হাবিলদার লক্ষ্মণ সিং প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শিবিরের লোক। বস্তুত, লক্ষ্মণ দীর্ঘদিন নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। তারও পরে—গ্রামে গ্রামে সন্দেহজনক লোকদের নামের লিষ্ট নিয়ে সে ঘুরেছে—এবং বহুজনকে পূর্বাহ্ণে খবর দিয়ে পালাতে সাহায্য করেছে। এ কাজে নিত্য মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করছে সে, তা জেনেও লক্ষ্মণ থেমে যায়নি। ১৮৫৭-তে এ ধরণের নির্বোধ সাহস দেখাবার মানুষ কিছু ছিলো। আগষ্ট মাসে তার সহকারী যখন তাকে ধরিয়ে দিলো, তখন তার ফাঁসী হলো, আর তখন জানা গেল, লক্ষ্মণের তৎপরতায় অন্তত: দুই হাজার মানুষের প্রাণ বেঁচেছে। গ্রামকে গ্রাম তাড়িয়ে এনে ফাঁসী দেওয়া যেখানে নিত্য চলেছে—সেখানে লক্ষ্মণের চেষ্টায় অন্তত: পনেরোটা গ্রামে পূর্বাহ্ণে খবর গিয়েছে আর পুরুষরা পালিয়ে বেঁচেছে।

লক্ষ্মণই চম্পাকে খবর দেয়। চন্দনের সে ঘনিষ্ঠ পরিচিত মানুষ—আর ইভান্সের রক্ষিতা নামে পরিচিতা চম্পার প্রকৃত পরিচয় তখন কানপুরের মানুষ ভাসো করেই জানে।

চন্দন আসছে খবর পেয়ে চম্পা অগ্রসর হয়। কিন্তু পদে পদে বাধা—এবং ইংরেজদের বেষ্টনী। ইভান্সের কথা বলে, চেষ্টা ক'রে ক'রে এগোতে এগোতে সে পদে পদে বাধা পেয়েছে। ভগবানপুরে যদি বা পৌঁছলো—গ্রামে ঢুকতে পেল না। ছাউনীতে তাকে আটকে ফেললো সবাই। সাহেব কোর্টমার্শালে আছে—এবং এখনই ফিরবে—একটা মানুষকে লটকাতে আর কি লাগবে—অন্য সাহেব হ'লে পরে তাঁবু থেকে বন্দীর সংখ্যা শুনে—লটকাও। লটকাও! এই বলে কাজ সেরে দিতো। বাকিটুকু ডোম ও ইংরেজ সিপাহীরা করতো। ইভান্স সে দরের মানুষ নয়। সে বিচার করবে—অর্ডার দেবে—তবে ফাঁসী দেবে। মানুষটা না মরা পর্যন্ত পকেট ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

চম্পা বসে থাকে। আসবার সময়ে কিছুটা এসেছে বয়েল গাড়ীতে—কিছুটা এসেছে হেঁটে। নাগরা দুটো ধুলোয় ভরা। চুলে-ও ধুলো।

দুটো হাত কোলে ক'রে সে বসেছিলো—। মনে তার অনেক চিন্তা। আজ রাত্তের মধ্যেই এখান থেকে ক্যাম্প তুলে ইভান্সের ব্রিগেড চলে যাবে বিঠুর। বিঠুরে পেশোয়ার প্রাসাদ ধ্বংস করতে। এই ব্রিগেড-ও প্রয়োজন হবে মেজর ষ্টিফেন্সনের।

ইভান্স এলো দুপুর নাগাদ। এসে চম্পাকে দেখে তার মনে হলো এটা-ই খুব স্বাভাবিক—এবং এ-ই সে চেয়েছিলো। চম্পা কি বললো না বললো ভালো ক'রে শুনলো না সে—নোংরা হাতে-ই প্লেট তুলে মাংস খেলো—ব্রাণ্ডি খেলো নির্জলা—আর তাকিয়ে তাকিয়ে চম্পার বুক, চম্পার শরীর ভালো করে দেখতে লাগলো। ইভান্সের সেই চোখ দেখেই চম্পা বুঝতে পারলো এখন কি হবে না হবে—আর এ-ও বুঝলো, সে এতদিন ধরে প্রেমের যে অভিনয় করেছে—তার দামটুকু কড়ায় গণ্ডায় না নিয়ে ছাড়বে না ইভান্স।

ইভান্স তারপর শিখ সিপাইকে হুকুম দিলো, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। এঁটো প্লেট ও বোতল চৌকির নিচে ঠেলে দিয়ে সে উঠে এলো। পর্দাটা ফেলে দিলো। তারপর হাত বাড়িয়ে টেনে আনলো চম্পাকে।

চম্পা শুধু এই বুঝলো না। যে তার ওপরে অমন পশুর এবং পশু হয়ে, তার জামা ছিঁড়ে তাকে আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করবার কি প্রয়োজন ছিলো ইভান্সের। কেননা, চাইলে-ও সে প্রতিরোধ করতে পারতো না।

তার পরে এক সময় বিকেল হলো। ক্যাম্প তোলবার সময় হলে-ও ইভান্স-কে ডেকে বিরক্ত করতে সাহস ছিলো না কারু। ইভান্স নিজে-ই উঠে এলো। চম্পার জামাকাপড়গুলো তার গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

তারপর ভেতরে এসে ব'সে লালচোখে দেখলো চম্পা কি রকম কষ্ট করে টেনে টেনে জামাটা পরছে—চাদরটা দিয়ে গা ঢাকবার চেষ্টা করছে—রুমাল ভিজিয়ে রক্তাক্ত ঠোঁট, গাল সব মুছতে চেষ্টা করছে।

ইভান্স দুটো-চারটে অসংলগ্ন কথা বললো। একবার বললো—এবার তোমার একটা বাচ্চা আশা করতে পার।

চম্পা জবাব দিল না। তার দিকে চাইলো না। ইভান্স তারপর বললো—সেই ছোঁড়াটাকে আজকে লটকালাম—সেই যে তোমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করতো।

চম্পা এবার তাকালো। বললো—কখন?

—আজ-ই সকালে। বেশ মরলো। বিশেষ ঝামেলা করলো না।

চম্পা ধুলো ঝেড়ে নাগরা পরলো। ইভান্স বললো—এবার আমার সঙ্গে যাবে?

—যাব। তোমার খোঁজে-ই ত এসেছিলাম।

—কখন?

—তুমি যাও। আমি সিপাহীদের সঙ্গে যাব।

—আচ্ছা!

ক্যাম্প উঠিয়ে নিঃশেষে সকলে চলে না যাওয়া অবধি চম্পা সেখানেই বসে রইলো। ক্যাম্পে রইলো বারো জন শিখ পাহারাদার। তাদের সম্পর্কে চম্পা নিঃশঙ্ক ছিলো। কেন না, সে জানে, সন্ধ্যা ঘনালে ঝড়তি-পড়তি কুড়ি জন ভারতীয় আসবে ভগবানপুরে। যমুনা পেরিয়ে কাল্পী যাবে। সে-ও যাবে— এ-ই ঠিক আছে। আর সে বিশ জন এই বারো জনের মহড়া ঠিক-ই নিতে পারবে!

ভারতীয় বিশ জন এসে সে-ই মদের নেশায় মাতাল বারো জনকে ঘায়েল করতে বেশী সময় নিলো না। তারপর তারা চম্পার খোঁজে গেল।

তারা-ই চন্দনকে দড়ি কেটে নামালো। চম্পা বললো—একটা গোর খুঁড়ে দাও।

তখন গোর খোঁড়বার সময় নেই। তবু চম্পার কথা তারা ফেলতে পারে না আর অগভীর একটা কবর তারা খুঁড়লো।

চন্দনকে সেখানে শোয়াবার পরেও চম্পা উঠলো না। বসে রইলো। তারা বললো—এবার চলো। রাতারাতি নৌকো পেরিয়ে চলে যাবার কথা না ?

চম্পা বললো—তোমরা যাও। আমি যাব না।

—তার মানে ?

চম্পা অধৈর্য না হয়ে বুঝিয়ে বললো—চন্দন একলা আছে। আমি যাব না। আজ আমি বিঠুরে যাব।

তারা কিছু বুঝলো, কিছু বুঝলো না। মনে হলো চম্পা বোধ হয় প্রকৃতিস্থ নেই—কেন না ছেঁড়া জামার ফাঁকে বুক ঢাকবার চেষ্টা করছে না। একদিক খোলা। আবার চোখ দেখে বা কথা শুনে অপ্রকৃতিস্থ মনে হলো না। তবে তাদেরও সময় ছিলো না। তারা চলে গেল। আঁধারে গা মিশিয়ে, ছায়া ছায়া হয়ে।

চম্পা চন্দনের গলা থেকে ফাঁসটা কাটলো। ওড়নী দিয়ে মুখটা, চোখের কোলটা মুছলো। হাতে দড়ির দাগটা ঘসে ঘসে মেলাবার চেষ্টা করলো। পা থেকে ধুলো মুছলো। তার পর বসে রইলো পাশে।

সে রাতে দুটো শেয়াল এসেছিলো, তাদের তাড়ালো। একবার বিরক্ত হয়ে-ই বললো—আমি ঐ ছাউনীতে বসেছিলাম, ডাকতে পারোনি ?

কিন্তু চন্দনের উপস্থিত বুদ্ধির ওপর কোনকালেই তার ভরসা ছিল না। তাই আর কিছু শুধোল না।

পরদিন সকাল হতে মনে হলো, এত রোদ পড়ে চন্দনের কষ্ট হচ্ছে। চম্পার বুকের মধ্যে রুমালে বাঁধা ডেরাপুরের মাটি ছিলো একমুঠো। সেই মাটিটা সে সযত্নে প্রথমে ছড়ালো চন্দনের ওপর। তার ওপর কবর খোঁড়া মাটি চাপা দিলো। তার ওপর আরো কিছু ডালপালা এনে ফেললো। তার পর আবার সে সেইখানে বসলো। ওপর দিয়ে চম্পাকে ধুয়ে বৃষ্টি নামলো। চম্পা বসে রইলো।

রাতে তীব্র বাতাসে শীত করতে লাগলো। মেঘমুক্ত আকাশ চেয়ে রইলো নিচের দিকে। চম্পা বসে রইলো।

তার পরদিন সকাল থেকে রোদ উঠে পুড়িয়ে দিলো চম্পাকে। চম্পা বসে রইলো।

সেই দিনটা যখন শেষ হলো, তখন চম্পা উঠলো।

ইভান্‌স যাবে বিঠুরে। বিঠুরের পথ ধরলো চম্পা।

[ক্রমশঃ।

হার

শ্রীমহুয়া মুখোপাধ্যায়

এবার তুমি হার মেনেছ কবি,
জীবনভরা মানস-পটে
হারিয়ে যাওয়া বালুর তটে
মিলিয়ে গেছে তোমার আঁকা ছবি
এবার তুমি হার মেনেছ কবি !

আজকে কোমল তুলির টানে
ধরছে না রং যতেক প্রাণে
জোয়ার যেথা বইতো সেদিন
বারেক পরশ পেলে,
মনের পটে আজকে শুধু
তপ্ত বালু করছে ধূ ধূ
চাইলে কেবল দু' হাত ভ'রে
ব্যথার দহন মেলে।

হাসিমুখে গ্রহণ কোরো সকল প্রতিদানে
হৃদয় যদি হয় গো ক্ষত
ওষ্ঠাধরে সাধ্যমত
রুদ্ধ কোরো তোমার রুধির-বানে ;
নতুন পটে আবার তুমি
সোহাগভরে লও গো চুমি
শ্যামল বেশে সাজিয়ে তোল তোমার প্রিয় ছবি
পরাজয়ের সকল কালো
মুছিয়ে দেবে বিজয়-আলো
ললাট-'পরে পূবকুমারী আঁকবে তিলক-রবি।

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

আট

আমার নতুন সেক্রেটারীর একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার দরকার। মেয়েটির বয়স বছর সাতাশ আটাশ—নাম মিস ভায়লেট মিলবার্ণ। দেখতে সুন্দরী—সে কথা অস্বীকার করা চলে না। ফটো দেখে যা মনে হয়েছিল, আসলে তার চেয়ে দেখতে ভাল। একহারা লম্বা গড়নের সামঞ্জস্যে যৌবনের সহজ প্রকাশ সুস্পষ্ট। একটু লম্বা ধরণের মুখে দুটো সোনালী বড় বড় চোখ—বাইরের অভিব্যক্তিতে শান্ত ও গম্ভীর কিন্তু তার মধ্য দিয়ে চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। একমাথা সোনালী চুল, খুব পরিপাটি করে যে আঁচড়ান তা নয়, একটু যেন এলোমেলো থোকা-থোকা গুচ্ছে ঘাড় পর্য্যন্ত নেমে এসেছে—মুখের সঙ্গে যেন সহজে মানায়। কথাবার্ত্তা খুব কম বলে কিন্তু যতক্ষণ আমি সার্জ্জারীতে থাকি কর্ম্মের তৎপরতায় সদাই চঞ্চল—এক মুহূর্ত্ত যেন বিশ্রাম নিতে রাজী নয়।

সত্যিই মেয়েটির কর্ম্মের নিপুণতায় মুগ্ধ না হয়ে উপায় নাই। মিস্ হলওয়েল ও কাজে ভাল ছিলেন, তার কাজে বিশেষ কোন ত্রুটি কোনও দিনই আমার চোখে পড়েনি। কিন্তু এ মেয়েটির কাজের ধরণই আলাদা। কাজকে শুধু সুসম্পন্ন করা নয়, কাজটিকে আপনা থেকে সহজ করে তোলার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল এই মেয়েটির। আমি ত বেলা ১০টা আন্দাজ সার্জ্জারীতে যাই—মেয়েটি সার্জ্জারীতে যোগ দেওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিয়ম করে দিল রোগীদের সাড়ে নটার মধ্যে সার্জ্জারীতে এসে হাজির হতে হবে। তার পর আমি সার্জ্জারীতে যাওয়ার আগেই কিংবা আমার রোগী দেখার ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেক রোগীর সঙ্গে কথা বলে তাদের রোগের বৃত্তান্ত আলাদা আলাদা কাগজে লিখে নিতে লাগল এবং প্রত্যেক রোগীকে আমার ঘরে পাঠাবার আগে তার রোগের বৃত্তান্তের কাগজখানি গম্ভীরভাবে এসে আমার টেবিলে আমার সামনে যেত রেখে—যা পড়ে রোগীটিকে দেখার কাজ আমার অনেক সহজ হয়ে গেল এবং সময়ও লাগতে লাগল অনেক কম। শুধু তাই নয়, অল্পের মধ্যে প্রত্যেক জরুরী খবরটা দিয়ে এমন গুছিয়ে লিখত যে আমি অবাক হয়ে অনেক সময় ভেবেছি—মেয়েটি কি ডাক্তারী জানে! ফলে, সার্জ্জারীতে আমার কাজের সময় অনেক কমে গেল। মিস হলওয়েলের সময় সকাল বেলা আমি প্রায় তিন ঘণ্টার কমে রোগী দেখা শেষ করতে পারতাম না কিন্তু এখন দু'ঘণ্টা যেতে না যেতেই আমার রোগী দেখা শেষ হয়ে যায়।

একদিন মেয়েটিকে বললাম, ভায়লেট! তুমি কি ডাক্তারী জান নাকি?

যে সময়ের কথা বলছি—মেয়েটি কাজ ছাড়া আমার ঘরে ঢুকত না এবং কাজ সেরেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেত—বৃথা সময় একটুও যেন আমার ঘরে থাকতে নারাজ।

চলে যাচ্ছিল—আমার প্রশ্ন শুনে চমকে দাঁড়িয়ে গেল। সেই গম্ভীর চোখ তুলে চাইল আমার দিকে। কিন্তু ঠোঁটের কোণে মুহূর্ত্তের জন্য যে একটু মৃদু হাসি খেলে গিয়েছিল—সেটুকু লক্ষ্য করেছিলাম।

শুধাল, কেন?

বললাম, তুমি এমন সুন্দর নোট লেখ কি করে? ডাক্তারীর দিক দিয়ে যেটুকু জানা দরকার কিছুই ত বাদ যায় না?

বলল, আমি ত অন্য ডাক্তারদের কাছে কাজ করেছি। এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি কাজে যোগ দেওয়ার দু'-তিন মাসের মধ্যে ক্রমে লক্ষ্য করলাম আমার রোগীর সংখ্যা যেন বেড়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু নতুন রোগী এসে আমার তালিকায় যোগ দিতে লাগল এবং তার প্রধান কারণ যে এই মেয়েটি, সেটা বুঝতে আমার দেরী হল না। বুঝলাম, মেয়েটির রোগীদের সঙ্গে ব্যবহারে শুধু যে মাধুর্য্যই প্রকাশ পায় তা নয়, একটা দরদে তাদের আস্থা জয় করারও ক্ষমতা ছিল মেয়েটির। ফলে আমার মন মেয়েটির উপর ক্রমেই খুসীতে ভরে উঠতে লাগল।

* * *

দু-তিন মাসের মধ্যেই ক্রমে আমার মনে হল—মেয়েটি যেন আমাকে একটু এড়িয়ে চলে। কাজের কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা আমার সঙ্গে বলে না এবং কাজের প্রয়োজন ছাড়া আমার সামনে আসেও না। জিনিষটা একটু যেন অস্বাভাবিক বলে মনে

হল এবং ক্রমে মেয়েটিকে আরও একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে জানার ইচ্ছা হল মনে। এতদিন কাজ করছে—ব্যবহার সহজ হচ্ছে না কেন?

একদিন সকালের কাজ সেরে বেরিয়ে যাচ্ছি,—তখন বেলা ১২।০টা হবে। মেয়েটি সদর-দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল, যেমন রোজই থাকে। আমাকে মাথা নীচু করে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য। মেয়েটির সামনে এসে আমি দাঁড়ালাম।

শুধালাম, ভায়লেট! তোমার এখানে থাকতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ত?

মেয়েটি মিস হলওয়েলের মতন সার্জ্জারী সংলগ্ন ফ্ল্যাটেই থাকত।

বলল, না সার! ধন্যবাদ!

বললাম, তুমি ত কিছু আমাকে বল না। যদি কোনও দিক দিয়ে কোনও অসুবিধা হয় ত আমাকে জানাতে দ্বিধা কর না।

বলল, অনেক ধন্যবাদ।

বললাম, সুবিধা মত মেড পেয়েছ। না নিজেই সব কর?

বলল, একজন মেড রেখেছি—এক বেলা আসে।

বললাম, শুনে খুসী হলাম।

তারপর একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে আর কি বলা যায় ভাবছি এমন সময় মেয়েটি বলল, আশা করি আমার দ্বারা আপনার কাজের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

বললাম না-না। সুন্দর কাজ কর তুমি।

তারপর একটু হেসে বললাম, শুধু তোমার স্বাভাবিক লজ্জাটা একটু বেশী—ব্যবহারে সহজ হতে পারছ না।

এইবার ঠোঁটের হাসি পরিষ্কার ফুটে উঠল। বলল, আমি চেষ্টা করব!

* * * *

এই কথাবার্ত্তার দু-একদিনের মধ্যেই সকালে রোগী দেখবে, মাঝামাঝি এক ফাঁকে এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে ঢুকল আমার ঘরে।

বলল, আপনার জন্য এক পেয়ালা চা এনেছি—খাবেন কি?

চা দেখেই মনটা খুশী হয়ে উঠল। হেসে বললাম, নিশ্চয়। অনেক ধন্যবাদ।

চায়ের পেয়ালা আমার টেবিলে বসিয়ে শুধালে, চিনি দুধ ঠিক হয়েছে? আমি ত আন্দাজে করে আনলাম।

এক চুমুক দিয়ে বললাম, ঠিক হয়েছে। আচ্ছা ভায়লেট! আমি এ সময় এক পেয়ালা চা পেলে খুশীই হব—তুমি জানলে কি করে?

এবার ঠোঁটে নয়, চোখের মধ্যে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

বলল, সেটুকু বুঝতে পারি।

শুধালাম, কি করে?

একটু চুপ করে থেকে বলল, কাজের মধ্যে এক ফাঁকে এক

পেয়ালা চা খেয়ে নিলে কাজে আরও মন লাগে আর তাছাড়া—চুপ করে গেল।

শুধালাম, কি?

বলল, আপনি চা খেতে ভালবাসেন—আমি জানি।

শুধালাম, কি করে?

মৃদু হেসে বলল, আমার কাছে যে মেড কাজ করে তার নাম মিস স্কট। সে এককালে আপনাদের বাড়ী কাজ করত। সে গল্প করে।

একটু অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটি খবর রাখে ত!

* * * *

এই হল সূচনা, এর পর থেকে রোজই কাজের মাঝামাঝি এক পেয়ালা চা নিয়ে আসত আমার ঘরে এবং আমিও চা পেয়ে রোজই খুশী হয়ে উঠতাম। এবং দু'-চার দিনের মধ্যেই শুধু একবারই নয়, আমার কাজ শেষ হলে আর একবার ট্রেতে চা সাজিয়ে ঘরে নিয়ে আসতে সুরু করল এবং প্রথমে মুখে একটু আধটু আপত্তি জানালেও আসলে যে আমি খুশীই হতাম—সেটুকু বুঝতে মেয়েটির দেরী হয়নি। এবং ক্রমে আমারই আমন্ত্রণে একটি পেয়ালার পরিবর্ত্তে দুটি পেয়ালা সাজান ট্রে কাজের শেষে আমার ঘরে নিয়ে আসত এবং মিনিট পনের কুড়ি এমন কি এক একদিন আধ ঘণ্টাও চা খেতে খেতে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হত এবং যদিও মেয়েটি কথা কম বলত তবুও তার সঙ্গে কথা বলে বেশ একটা আনন্দ পাওয়া যেত সে সময়। তার প্রধান কারণ মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে যে বিষয়েই কথাবার্ত্তা হোক না কেন সবই কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

সে সময় বেশীর ভাগ কথাবার্ত্তাই হত রোগীদের নিয়ে। এবং ক্রমে লক্ষ্য করলাম, যদিও মেয়েটি ডাক্তারী জানত না তবুও কার রোগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এমন কি কার রোগে আর নিষ্কৃতি নাই ঠিক বুঝতে পারত এবং সে বিষয় নিজের মতকে সুস্পষ্ট আমাকে জানিয়ে দিতে কোনও দ্বিধা ছিল না। শুধু তাই নয়, রোগীদের নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গেই এটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায়নি যে মেয়েটি মনুষ্য চরিত্র খুব ভাল বোঝে এবং সেদিক দিয়ে তার মতামতের উপর ক্রমে আমার একটা আস্থা গড়ে উঠল।

একটা ছোট্ট উদাহরণ দি। একদিন একটি রোগিনী এল তার স্বামীকে নিয়ে, শারীরিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তিতে বড়ই কাতর, কাজের শেষে 'চা' খেতে খেতে আলোচনায় ভায়লেট বলল, সার, আমার ত মনে হয় ওর রোগ কিছুই নয়। ও স্বামীর কাছে নিজের দর বাড়াচ্ছে।

রোগ যে কিছু নয়, সেটা মেয়েটিকে পরীক্ষা করে আগেই আমার মনে হয়েছিল। তবে স্বামীর কাছে দর বাড়াবার দিকটা আমি ভাবিনি।

শুধালাম, মেয়েদের ত হিষ্টিরিয়া বলে একটা জিনিষ আছে। স্বামীর কাছে দর বাড়াচ্ছে একথা মনে করছ কেন?

সংক্ষেপে বলল, স্বামীর ব্যবহারে।

শুধালাম, কি রকম?

মৃদু হেসে বলল, আমি লক্ষ্য করছি স্বামীর কাছে ওর আর তেমন মূল্য নেই—ওকে এড়িয়ে চলতেই চায়। তাই মেয়েটি রোগের আশ্রয় নিয়েছে, নিজের মূল্য যদি একটু বাড়ে।

ভায়লেটের এই ধরণের কথাবার্ত্তায় ভায়লেটের মনুষ্য চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রশংসা না করে পারিনি।

* * * *

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একদিন ভায়লেট কথায় কথায় আমাকে বলল, একটা দিক দিয়ে আমি নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করি।

শুধালাম, কেন?

বলল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, শ্রদ্ধা নিবেদন আজ পর্য্যন্ত করিনি।

হেসে বললাম, বেশ ত যেও।

বলল, তিনি পছন্দ করবেন কি না এই ভেবে এতদিন চুপ করে ছিলাম।

বললাম, না না। তিনি খুশীই হবেন।

বলল, মিস স্কটের কাছে তাঁর এত প্রশংসা শুনেছি—তাঁকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

বললাম, আচ্ছা, তাঁর সঙ্গে কথা বলে কবে যাবে আমি কালই তোমাকে জানাব।

বাড়ীতে এসে মার্লিনের সঙ্গে কথা বললাম।

মার্লিন বলল, বেশ ত। পরশু দিন ত বুধবার—পরশু বিকেলে চা খেতে আসতে বল।

বললাম, বুধবার বিকেলে ক্লাবে যাওয়াটা মাটি করবে? দিনগুলি এমন সুন্দর চলেছে।

তখন গ্রীষ্মকাল। সূর্য্যের আলোতে ঝকঝকে দিনগুলি প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছিল—যেটা এদেশে খুব কমই পাওয়া যায়। ক্লাবে গিয়ে গল্ফ খেলায় ত আমার দারুণ নেশা। তাই বুধবার বিকেলটা খেলা বন্ধ করতে আমার মন একেবারেই সায় দেয়নি।

মার্লিন বলল, বেশ ত। তুমি ক্লাবে যেও—আমি বাড়ীতে থাকব। বুধবার ছাড়া আর বলবেই বা কবে—অন্যদিনে ত তোমার সার্জ্জারীতে কাজ। আর রবিবারও ত সমস্ত দিনই ক্লাবে কাটাতে চাও।

বললাম, তা বটে।

শেষ পর্য্যন্ত বুধবারই ঠিক হল। ইতিমধ্যে অবশ্য ভায়লেটের বিষয় মার্লিনকে অনেক কথা বলেছিলাম—কোনও কথাই বোধহয় বাদ দি নাই। সার্জ্জারীতে চা খাওয়ার গল্প শুনে মার্লিন মৃদু হেসে বলেছিল, যাক—মেয়েটি আসাতে তোমার সার্জ্জারীও আনন্দময় হয়ে উঠল।

* * * *

বুধবার ক্লাব থেকে ফিরে আসতে রাত প্রায় ১১টা বাজল। বুঝা। রাত ১১টা শুনে চমকে উঠল না। মনে আছে ত—এদেশে গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা হতে হতে ১০টা বাজে। তাই ১১টা মানে সন্ধ্যার একটু পরেই, ডিনার যথাসময়ে অবশ্য ক্লাবেই খেয়ে নিয়েছিলাম, ক্লাবে সব বন্দোবস্তই আছে জানই ত।

মার্লিন আমার জন্য কিছু সাপার অর্থাৎ জ্যাম স্যাণ্ডউইচ চা ইত্যাদি রেখে দিয়েছিল। এসে সাপার খেতে খেতে মার্লিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভায়লেট এসেছিল?

মার্লিন বলল, হাঁ।

শুধালাম, কেমন লাগল ভায়লেটকে ?

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, মেয়েটিকে ঠিক বোঝা গেল না।

শুধালাম, কেন ?

বলল, সহজে নিজেকে ধরা দেওয়ার মেয়ে ও নয়—অসম্ভব চালাক !

বললাম, তা ত বটেই, এবং চারিদিকে লক্ষ্যও খুব।

মার্লিন বলল, প্রথমে এসেই তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আলাপ সুরু করল। বোধ হয় ভাবল—আমি সহজেই খুসী হয়ে উঠব।

শুধালাম, আমার প্রশংসা কোন দিক দিয়ে ?

মৃদু হেসে মার্লিন বলল, রূপের দিক দিয়ে নয়—অত সোজা নয় মেয়েটি। ডাক্তার হিসেবে।

বললাম, ওঃ।

মার্লিন বলল, সে ত অল্প অল্প ডাক্তারদের কাছে কাজ করেছে—এমন বিচক্ষণ ডাক্তার সে না কি আজ পর্য্যন্ত দেখেনি।

হেসে বললাম, রোগীদের কাছেও বোধ হয় ঐ ধরণের কথা বলে—তাই রোগীর সংখ্যা একটু একটু বাড়ছে।

মার্লিন বলল, বোধ হয়। মেয়েটি জানে—কাকে কি ভাবে হাত করতে হয়।

শুধালাম, তোমাকে হাত করে ফেলেছে না কি ?

চোখে হাসি মাখিয়ে মার্লিন বলল, আমাকে হাত করা ত ওর উদ্দেশ্য নয়—তোমাকে।

শুধালাম, তাই কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ?

বলল, হুঁ। এতদিন লক্ষ্য করে মেয়েটি এটুকু বুঝেছে—আমাকে খুশী করতে পারলে তুমি খুশী হবে।

হেসে শুধালাম, তা আমাকে হাত করে ওর লাভটা কি ? আমি ত অবিবাহিত নই ?

বলল, প্রথমতঃ ওটা ওর স্বভাব। দ্বিতীয়তঃ মনিবকে হাতে রাখলে ত সুবিধাই হয়।

বললাম, তোমার দেখছি মেয়েটি সম্বন্ধে ধারণা ভাল হয়নি।

একটু ভেবে বলল, তা ঠিক নয়। অন্ততঃ কাজের, সে বিষয় কোনও সন্দেহ নাই। তা হলেই তোমার হল।

বললাম, নিঃসন্দেহ। এরকম পরিপাটী কাজ এর আগে কোনও সেক্রেটারীর কাছ থেকে পাইনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু বেশী দিন টিঁকবে বলে মনে হয় না।

শুধালাম, কেন ?

বলল, কেমন যেন মনে হয়—ওর জীবনে সবই লীলা। অন্য লীলার সুযোগ ত তোমার কাছে নাই। শুধু কাজের লীলা নিয়ে টিঁকে থাকবে বলে মনে হয় না।

* * * *

পরের দিন সকালবেলা কাজ শেষ করে চা খেতে খেতে ভায়লেট বলল, আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।

শুধালাম, কেন ?

বলল, কি সুন্দরী মোহিনী স্ত্রী আপনি পেয়েছেন—এরকম খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে।

ভায়লেটের কথা শুনে মনটা শুধু খুসী নয়, একটা গর্ব্বে ভরে উঠল। সত্যিই ত—এত ত চারিদিকে দেখি, মার্লিনের মতন এমন স্ত্রী ত কারও দেখি না।

বললাম, তা বটে—মার্লিনকে পেয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, শুধু তাই নয়, এরকম বুদ্ধিমতীও আমি খুব কম দেখেছি।

হেসে বললাম, তা সত্যি। আমি ত জীবনে সব ব্যাপারেই মার্লিনের উপর নির্ভর করে চলি।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, তা নির্ভরতা বহন করার শক্তিও আছে তাঁর।

হেসে শুধালাম, ভায়লেট ! তুমি একদিন মার্লিনকে দেখেই এতটা চিনলে কি করে ?

ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলে গেল।

বলল, আমিও ত এদেশের মেয়ে—তাই এদেশের মেয়ে দেখলে সহজেই চিনতে পারি। [ক্রমশঃ।

প্রত্যয়

মাধবী সেনগুপ্ত

তবু সেই ফুল আজ ফুটবেই,
কান্নার জলে যদি হয় হোক সিক্ত ;
ধূ-ধূ বিকেলের মলাটের সাদা ছবি
হবেই রঙিন, হোক না নিঃস্ব-রিক্ত।

যদি মুছে যায় স্মরণীয় সরণি
ঝড় যদি ভাঙে টলোমলো এই ঘর,
যদি ফেলে আসি করুণ পথের রেখা—
আঁধার ফেরে সমুখের প্রান্তর।

স্মৃতি যদি হয় শুধুই তমসাময়,
উপহার যদি বিশীর্ণ পারিজাত,
পৃথ্বী যদি বা হৃদয়ে বেদনা আনে
তবু জানি হাতে আছে যে তোমার হাত।

নিবে যদি যায় জীবনের উত্তাপ
যদি থেকে যায় অস্ফুট কথা যতো,
সলজ্জ বধূর মত নম্র সেই ফুল
হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে ফোটাতে হবে তো।

হবিবুল্লার মেশিন

বিজ্ঞানভিক্ষু

দুই

"...Emergencies produce astonishing progress and concentrations of effort, as has often been demonstrated, can move mountains."

C. H. Greenwalt
The Fickle Fashions of Science."

শংকর রায় স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে 'রিসেপশন্ হল'-এর ছাদের দিকে। দশ মিনিটের মধ্যেই সে সিদ্ধান্ত করে ফেলল—কোন দিক থেকে চুণকামের কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল, কোন দিকে গিয়ে তার শেষ হয়েছে—আর কত টাকা লাভ করেছে 'কনট্রাক্টর' এই কাজে।

বাড়ীটা নূতন। চুণকামও করা হয়েছে হালেই। বুরুশের দাগ ও বুরুশের অংশবিশেষও জায়গায় জায়গায় রয়ে গেছে। সবটা মিলিয়ে যুগের নৈতিক অবনতির স্বাক্ষর। পায়ের নীচে মোলায়েম কার্পেটটা বহুমূল্য—কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু তার এখানে ওখানে বুননী হয়ে গেছে অসমান। কনট্রাক্টর, কার্পেটনির্মাতা আর 'কারনিচার' নির্মাতার ব্যবসায় ভিন্ন হলেও সকলেরই মূলনীতি এক। মাল বন্দি হলে ফেলে দিও না—জাতীয় সরকারকে তা চড়া দামেই গছিয়ে দেওয়া যাবে।

দেওয়াল-ঘড়িতে সময় জানাচ্ছে—আটটা বেজে বত্রিশ মিনিট। এখনও সরকারের ডাক পড়ল না কনফারেন্সের ঘরে। কী একটা অজুহাতে গোয়েন্দা পুলিশ তাকে ছাড়পত্র দিচ্ছে না ওপরে যাবার। সহযাত্রীদের সমবেত চেষ্টাতেও কোনও ফল পাওয়া যায় নি। পাঞ্জাবী শাস্ত্রীর দল বলছে, অর্ডার নেহি হায়।

শংকর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—বাঁচা গেল। এই অজুহাতে যদি মুক্তি মেলে। এখান থেকে সোজা সুমিত্রার ওখানে হাজিরা দেওয়া যাবে। ওর চিঠি পাবার বাইশ ঘণ্টার মধ্যেই শংকর ওকে চমকে দেবে। শংকর উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এ কী শংকর? এখনও ভেতরে যাও নি কেন? তোমার জন্য যে সকলে অপেক্ষা করছেন!

যাকে চমকে দেবার মতলবে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল শংকর, তারই অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে শংকর হতবাক হয়। সুমিত্রা এখানে জুটল কেমন করে?

এই যে সুমিত্রা! তুমি এখানে? কী করে এলে? কী ব্যাপার বলো তো? বলতে পার, আমাকে এরা কেন ওপরে যেতে দিচ্ছে না? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে শংকর।

সে কি কথা? আচ্ছা বোসো তুমি, আমি দেখছি।

সুমিত্রা রক্ষীর দলের সংগে হাত-মুখ নেড়ে তর্ক জুড়ে দেয়। তাদের মুখপাত্র ভদ্রলোক কিন্তু ঘাড় নেড়েই চলেছেন। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে হতাশার ভংগী দেখিয়ে সুমিত্রা সিঁড়ির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেই সুমিত্রা! সাড়ে তিন বছরেও এতোটুকু পরিবর্তন হয় নি তার! হাত নাড়ার ভংগীতে কেমনি রয়ে গেছে তারুণ্যের উচ্ছলতা। কেমন করে শংকরের মনে তা জাগিয়ে তোলে হারানো হসন্তদিনের জন্য একটা অহেতুক ব্যর্থতাবোধ···

সিঁড়ির বাঁকে এবার দেখা গেল সুমিত্রার পাশে প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীকে। রক্ষীদের সংগে তর্কের অংশ মাঝে মাঝে শংকরের কানে ভেসে আসে। ছাত্রনেতা···বামপন্থী···কৃষ্ণস্বামীর কথা··· এঁকে না হলে প্রজেক্ট চলবে না রক্ষীদের ওজর আপত্তি—আপনারাই সিকিউরিটির ছাড়পত্র চেয়েছেন এখন আপনারাই সে ব্যবস্থার লংঘন করতে চান?

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণস্বামী সমস্ত দায়িত্ব নিজের ওপরে তুলে নিলেন। রক্ষীর দল ইসারায় শংকরকে জানায় যে তার পথ খোলা হয়ে গেছে।

শংকর স্তম্ভিত না হয়ে পারে না। আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানে তার চাকরী—ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে তার দিল্লীতে আসা—অথচ তারই প্রবেশাধিকার নিয়ে এতো হাংগামা?

কৃষ্ণস্বামী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন, ডাঃ রায়, আমি খুবই লজ্জিত যে আপনাকে এই অসুবিধাটুকু সহ্য করতে হয়েছে। দোষ এদের খুব বেশী নেই—আদেশ দিয়েছি খুব কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবার জন্য। কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে এই অজুহাতে এরা মন্ত্রণাসভায় আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদেরও আটকে রাখবে। দয়া করে মনে কিছু করবেন না।

শংকর সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করে।

শ্রীমতী ওয়াহেদা রেহমান
গুরুদত্তের "চাদওদভি কা চাদ" ছবিতে

রূপ যেন তার রূপ কথারই রাজকন্যার মতো...

রূপে রূপে অপরূপ ! যেন রূপকথার, রূপবতী রাজকন্যা ! .... এত রূপ, এত লাবণ্য সে-ওতো ওর নিজেরই চেষ্টায়। রূপসী চিত্রতারকা ওয়াহেদা রেহমান জানেন, সৌন্দর্য্যের গোপন কথা হলো ত্বকের কুসুমসম কোমলতা। 'তাইতো আমি রোজই লাক্স ব্যবহার করি। এর সরের মতো ফেনায় সত্যিই ত্বক মোলায়েম আর লাবণ্যময়ী হয়' ওয়াহেদা বলেন। আপনার সুন্দরতাও বাড়িয়ে তুলুন — নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করে।

LUX
TOILET SOAP

চিত্রতারকার সৌন্দর্য্য-সাবান
বিশুদ্ধ, শুভ্র, লাক্স

LTS.42-X52 BG

হিন্দুস্তান লিভারের তৈরী।

সুমিত্রা বল্লে, এবার চল, তোমার জন্য সকলে অপেক্ষা করে রয়েছেন।

লম্বা করিডর অতিক্রম করে ওরা প্রবেশ করে কন্‌ফারেন্স রুম-এর মধ্যে।

অর্ধ চন্দ্রাকারে চার সারিতে চেয়ার সাজানো। পেছনে একটু উঁচু ডেস্ক-এর ওপরে একটা মুভী প্রজেক্টর। সামনের আসনগুলো থেকে পনেরো-বিশ হাত দূরে খাড়া করা রয়েছে চলচ্চিত্রের পর্দা। সে পর্দার পাশেই একটা ছোটো টেবল-এর ওপর সাদা কাপড়ে ঢাকা কোনো বস্তু।

ঘরের চার পাশে শংকরের দৃষ্টি ঘুরে আসে।

সহযাত্রীদের বাদ দিয়ে জনা দু-তিন চেনা-জানা বৈজ্ঞানিকদের সে আবিষ্কার করে। এ ছাড়া লক্ষ্য করল যে, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিকদের নিয়েই সভা ডাকা হয়নি। ভারতসরকারের ক্যাবিনেটের দু-চার জন মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীও উপস্থিত রয়েছেন সভায়। তা ছাড়া সেনা বিভাগ নৌ-বিভাগ ও বিমান বিভাগের ইউনিফর্মধারী 'জেনারেল', 'ব্রিগেডিয়ার', 'অ্যাড্‌মিরাল', 'এয়ারমার্শাল', 'চীফ-অফ্‌-ষ্টাফ' ও অনেক কেষ্ট বিষ্টু ব্যক্তিদের সমবেত সমাগমে সভাস্থল গম গম করছে। কৃষ্ণস্বামী সুমিত্রাকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সভার মাঝখানে। অসহায় ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষ সারিতে একটা আসন খুঁজে নেয়, শংকর।

সভার কাজ ততক্ষণে সুরু হয়ে গেছে।

মাননীয় অতিথিবর্গ ও বৈজ্ঞানিকদের যথারীতি সম্বোধনের পালা শেষ করে কৃষ্ণস্বামী বললেন, এ সভার সম্পর্কে 'সিকিউরিটি'র কড়া ব্যবস্থায় আপনারা নিশ্চয়ই সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। অনেকে হয়ত মনে মনে বিরক্তিও পোষণ করছেন। সে জন্য সত্যই আপনাদের দোষ দেওয়া চলে না।

আমরা কারো সংগে যুদ্ধে লিপ্ত নই। উপরন্তু জাতীয় সরকারের প্রধান বৈদেশিক নীতি জগতের সর্বত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া। এমন কি প্রতিবেশী দু-একটি রাষ্ট্রের সংগে নানা ব্যাপারে সম্পূর্ণ সখ্যতার অভাব থাকলেও সমরায়োজনের কোনও তাগিদ এখনও আসেনি। তবে নিরাপত্তারক্ষার এই জটিল ব্যবস্থা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আপনাদের সকলের কাছে চাই এই প্রতিশ্রুতি যে; যে প্রয়োজনে আপনাদের আহ্বান করা হয়েছে সেটা এ সভার বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করবেন না, এমন কি নিকটতম আত্মীয়স্বজনের কাছেও নয়।

সরকারের তরফ থেকে অবশ্য এ আশ্বাস অবশ্যই আপনাদের দেওয়া যায় যে যদি আপনাদের মধ্যে কেউ কোনো কারণে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে সক্ষম না হন, সরকার সে জন্য কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না। আপনাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আর একটা ব্যাপারে, যুদ্ধ বা মারণাস্ত্রের সংগে আজকের সভার কোনও সংযোগ নেই।

এ ছাড়া-যদি কারো মনে সন্দেহ জেগে ওঠে যে এই সম্মেলনের অছিলায় একটা 'সায়েণ্টিফিক ইণ্টেলিজেন্স কোর-এর পত্তন করবার চেষ্টা চলেছে—আমরা সে সন্দেহেরও নিরসন করে দিতে চাই।

কিন্তু সকলকেই এই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে আজকের আলোচ্য বিষয়ের গোপনতা দরকার হলে জীবনপণ করেও আমরা রক্ষা করব। কেউ যদি এ প্রতিজ্ঞা নিতে মনস্থির করতে না পারেন, তিনি দয়া করে এখনই সেটা আমাকে জ্ঞাপন করুন।

কৃষ্ণস্বামী কিছুক্ষণের জন্য নীরবে অপেক্ষা করলেন।

বৈজ্ঞানিক মহলে সামান্য একটু চাঞ্চল্য। তার পর ঘরে নিথর নীরবতা।

কৃষ্ণস্বামী আবার আরম্ভ করেন।

আপনাদের নীরবতা আমি সম্মতি বলে গ্রহণ করলাম। আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমার যে কতটা গর্বের, তা বলে বোঝাতে পারব না। এ বারে তাহলে কাজের কথায় আসা যাক।

আজ থেকে ঠিক দু মাস আগে দিল্লীতে আমাদের পদার্থ-বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে ধূমকেতুর মতো উদয় হল এক তরুণের। নিজের পরিচয় সে দেয় "অ্যামেচার ফিজিসিষ্ট" সৌখীন পদার্থ-বিজ্ঞানী বলে। 'রিসেপসনিষ্ট'এর কাছে তার দাবী ছিল 'ডিরেক্টর' এর সংগে তার দেখা করার একটা বন্দোবস্ত করে দিতেই হবে। দেখা করার কারণ—সে নাকি এক অত্যাশ্চর্য এবং অভূতপূর্ব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।

তরুণের নাম হবিবুল্লা খান। খুব সম্ভবতঃ আপনাদের মধ্যে কেউই এর নাম শোনেন নি। শোনবার কথাও নয়। ন্যাশনাল রেজিষ্টারে আমরাও হবিবুল্লা খান নামধেয় কোনো পদার্থবিজ্ঞানীকে আবিষ্কার করতে পারিনি। কিন্তু এই ধরণের ছেলেদের দেখা নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে অনেকেই পেয়েছেন। নিজেদের সম্বন্ধে এদের ধারণা আকাশস্পর্শী এবং এরা আশাও করে যে জগতের সকলেই এদের প্রতিভা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করে নেবে।

এই ধরণের আত্মম্ভরিতায় ও লম্বা-চওড়া কথায় ছেলেটি উপস্থিত দু একজন কর্মচারীর বিরাগভাজন হয়ে দাঁড়াল। 'ডিরেক্টার' ছাড়া আর কারো সংগেই সে কথা বলতে নারাজ। শেষে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে হয় তাকে পুলিশে দেওয়া, না হয় 'ডিরেক্টর' এর সংগে তার দেখা করার ব্যবস্থা করানো ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

—আমি সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম 'ডিরেক্টর'-এর ঘরে একটা কাজের জন্য। কতকটা আমারই অনুরোধে ডিরেক্টর ছেলেটিকে ডাকালেন আমাদের সামনে। হবিবুল্লার বক্তব্যটা ছিল বেশ চমকপ্রদ! সে নাকি একটা 'অ্যাণ্টিগ্রাভিটি মেশিন'—মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি সৃষ্টি করবার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে!

শংকরের অন্তস্তল থেকে একটা বিপুল হাসির ধাক্কা ঠেলে উঠলো। এমন কি রাশভারী প্রফেসর শিকদারের ঠোঁট দুটিও বেঁকে গেলো ক্ষীণ হাস্যরেখায়। আস্তে আস্তে হাসির শব্দে ঘরটা ভরে উঠলো। পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেলো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে। শংকর চেয়ে দেখলো যে সভাস্থলে একমাত্র সুমিত্রাই অবিচলিতা। তার মুখেই কেবল একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছায়া।

শংকর ভাবে, মনস্তাত্ত্বিকদের মনের নাগাল পাওয়াই ভার! কৃষ্ণস্বামী একটু থেমে আবার সুরু করেছেন—দেখতে পাচ্ছি আপনারা সকলেই কৌতুক উপভোগ করছেন। আমিও সেদিন হাস্য-সম্বরণ করতে পারিনি। ভাবতে সুরু করলাম—এখন এ আপদটাকে বিদায় করা যায় কী করে?

আমি চেষ্টা করলাম, কোন বৈজ্ঞানিক সূত্র তার এই মৌলিক আবিষ্কারের ভিত্তি সে সম্বন্ধে আলোচনাটা টেনে নিয়ে আসবে। কিন্তু হবিবুল্লা পরম ঔদ্ধত্যের সংগে অস্বীকার করে বসল 'থিয়োরি' সম্বন্ধে আমাদের সংগে আলাপ করতে। শুধু তাই নয়, সে দাবী করে বসল যে তাকে ওই ল্যাবরেটরীতে গোপনে কাজ করবার অনুমতি ও সুবিধা দেওয়া হোক। তার মেশিনের ক্ষমতা ও গুণাগুণ সম্বন্ধে সে কতকগুলো পরীক্ষা করতে চায়। একখানা আলাদা ঘরই তাকে ছেড়ে দিতে হবে, সমস্ত দরকারী যন্ত্রপাতি তাকে জোগাড় করে দিতে হবে—সে পরীক্ষার জন্য। সমস্ত পরীক্ষা সন্তোষজনক ভাবে সমাপ্ত হলে তবেই সে আমাদের সংগে 'অ্যান্টিগ্রাভিটি থিয়োরি' নিয়ে আলোচনা করতে রাজী আছে।

দেশে বা বিদেশে এমন কোনও গবেষণাগার আছে বলে আমার জানা নেই, যার কর্তৃপক্ষ ওই রকমের অসংগত ও অদ্ভুত প্রস্তাবে রাজী হতেন। বলা বাহুল্য, আমরাও তার দাবী মেনে নিতে পারলাম না। তাই নিয়ে এমন বচসার সৃষ্টি করল হবিবুল্লা, যে তাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলাম আমরা।

হবিবুল্লা আমাদের শাসিয়ে গেল যে একদিন আমাদেরই যেতে হবে, পায়ে ধরে তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য।

তার সে আস্ফালন যে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে, সেদিন তা কল্পনাও করতে পারি নি।

কৃষ্ণস্বামীর শেষ মন্তব্যের তাৎপর্য গ্রহণ করতে চেষ্টা করে শংকর। মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক অজানা অস্বস্তি। লক্ষ্য করল যে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই নড়ে চড়ে বসলেন।

হবিবুল্লার কথা ভুলে যেতে আমার কয়েক মিনিটের বেশী সময় লাগে নি। সৌভাগ্যক্রমে ডিরেক্টরের রিসেপশনিষ্ট-এর ফাইল-এ তার নাম, ধাম, ঠিকানা, পেশা, ইত্যাদি জমা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী অনুসন্ধান পর্বে এটাই আমাদের হয়েছিল প্রধান সহায়।

এ কাহিনীর পরবর্তী ও শেষ অধ্যায়ের সুরু ও শেষ মাত্র আটারো দিন আগে। খবরের কাগজে বিশেষ করে যারা দিল্লীর সংবাদপত্রগুলো পড়েন—আপনারা হয়তো দেখে থাকতে পারেন ঐদিন টিমারপুরে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়। অগ্নিকাণ্ডের পরের দিনই টেলিফোনে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের সম্পাদকের কাছ থেকে এক জরুরী তলব আসে। তিনি আমাকে বললেন যে টিমারপুরের অগ্নিকাণ্ডের ছবি উঠেছে নিউজ রীল-এর জন্য। সে ছবিতে একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ধরা পড়েছে। সে ঘটনার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব কিনা?

কৌতূহলের বশে তাঁর অফিসে গিয়ে জুটলাম সেদিন বিকালেই। সেখানে কী অভিজ্ঞতা হল সেটা আপনাদের জানাবার জন্য ফিল্মটাই সংগে নিয়ে এসেছি। বলা বাহুল্য, এ ছবি প্রকাশিত হয় নি। নেগেটিভ ও একমাত্র কপি এখন রয়েছে দেশরক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে।

জানালার পর্দা টেনে ঘর অন্ধকার করা হল। পিছন থেকে পাওয়া গেল প্রজেক্টরের শব্দ।

পর্দায় প্রথম চিত্রে প্রকাশ হল—একটা তিনতলা বাড়ীতে আগুন লেগেছে। প্রকাণ্ড দিবালোক। একতলায় কয়েকটি দোকান প্রায় পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে। একটা বড়ো সাইনবোর্ড ঝলসে, দুমড়ে পড়ে গেছে পথ জুড়ে। দোতালার জানালার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা আর তিন তলার সমস্ত ফোকর দিয়ে ধোঁয়ার কালো কুণ্ডলী উঠে যাচ্ছে মহাকাশে।

দমকল এখনো এসে পৌঁছায় নি। বিপরীত দিকের ফুটপাথে আশ্রয় নিয়েছে হতভাগ্য বাসিন্দার দল। বিছানা-মাদুর, চৌকি-চেয়ার-টেবল, বাক্স-তোরংগ, রান্নাঘরের বাসন, স্তূপীকৃত কাপড়-জামা চতুর্দিকে ছত্রাকার হয়ে রয়েছে। সকলে হতাশাসে অগ্নিকাণ্ড দেখছে। কয়েকজন কেবল ভগ্নোদ্যমে এখানে-সেখানে দু-এক বালতি জল ফেলে আগুন নেবাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে।

এর পরের দৃশ্য তোলা হয়েছে বাড়ীটার পাশ থেকে। আগুনের শিখা এদিকে দেখা দেয়নি—কিন্তু ধোঁয়ার জালে সমস্ত দৃশ্যপট অস্পষ্ট করে তুলেছে।

এর পরে একটা "ক্লোজ আপ"—তিন তালার একটা খোলা জানালার। হঠাৎ ধোঁয়ার কুয়াশার মধ্যে দেখা গেল এক অল্প- মহিলাকে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি পাগলিনীর মত চীৎকার করে চলেছেন—কোলে তাঁর এক শিশু। শিশু প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে নারীকে।

সহসা দেখা গেল—একজন যুবক চক্ষের নিমেষে এক লাফে ওই তিন তালার জানালার ওপরে লাফিয়ে উঠল অবলীলাক্রমে। তার পর ধোঁয়ার অন্তরালে দৃশ্যপট আবার ঢেকে গেল। হঠাৎ বিস্ফোরণের মত আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল সমস্ত পটভূমিকা। প্রায় সংগে সংগেই ধ্বসে পড়ল এই দিকের সমগ্র দেওয়ালটা।

পরের দৃশ্যে দেখানো হোলো তিনটা দমকল থেকে জলের ধারা অবিরাম পড়ছে ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর বাষ্প মিলে আকাশ আচ্ছন্ন করে তুলেছে। আগুনের শিখা হয়ে এসেছে আয়ত্তাধীন।

সর্বশেষে দেখা গেল একটা অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের অংশ—ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে। পিঠের ওপরে রয়েছে একটা সাদা চ্যাপ্টা বাক্সের মত কোনো বস্তু।

ফিল্ম প্রদর্শনীর শেষ হল।

কৃষ্ণস্বামী ঘোষণা করলেন—যে শেষ অংশটুকু আবার দেখানো হবে স্লো-মোশানে।

পর্দায় ছবির পুনঃপ্রকাশ হলে দেখা যায় বলিষ্ঠকায় এক যুবাকে। পিঠের ওপরে একটা চ্যাপ্টা বাক্স চামড়ার 'ষ্ট্রাপ' দিয়ে বাঁধা। পরনে তার ট্রাউজার ও রঙীন স্পোর্টস সার্ট। মাথার চুল খুব খাটো করে ছাঁটা। চোখে একটা অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কোমরবন্ধে অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, কতকগুলো রেডিওর knob এর মত বোতাম। এক হাত দিয়ে যুবা তার একটিকে ঘোরাচ্ছে আর এক হাত রয়েছে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে। মাটি থেকে দশ ফুট ওপরে দাঁড়িয়ে আছে যুবক—শূন্যে! ধীরে ধীরে সে ওপরে উঠে গেল—তারপর মাটির সংগে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে গেলো জানলার দিকে। হঠাৎ ধোঁয়ার মেঘে দৃশ্যপট হয়ে গেল আচ্ছন্ন।

হবিবুল্লাকে দেখে শংকরের স্মৃতিপটে জেগে ওঠে এক রকম মনোবিকারের কথা—'প্যারানয়েড'! সুমিত্রা একদিন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল 'প্যারা নইয়া'র লক্ষণগুলো। হাঁ, অনেকগুলোই মিলে

যাচ্ছে তো। লংকেৰ স্থির করে সভার শেষে সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করবে এ সম্বন্ধে।

কৃষ্ণস্বামী আবার আরম্ভ করেছেন—হবিবুল্লার মৃতদেহ উদ্ধার করা গেলেও ওই নারী ও শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা যায়নি। অবশ্য সমগ্র ভগ্নস্তূপ এখনও সরানো সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু সকলেরই ধারণা যে, তারাও জীবিত নেই।

আপনারা সকলেই দেখলেন যে হবিবুল্লা, অ্যান্টিগ্রাভিটির সন্ধান পেয়েছিল। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর কাহিনী হলে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের কথা হচ্ছে যে, সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছে সকলের চর্মচক্ষুর অন্তরালে। একমাত্র ক্যামেরার চোখেই সেটা পড়েছে ধরা। এখন ক্যামেরার সাক্ষ্য অবিশ্বাস করবেন কী করে?

সামনের টেবল্ থেকে শ্বেতবস্ত্রের আচ্ছাদন করিয়ে কৃষ্ণস্বামী বললেন, এই হচ্ছে মানুষের তৈরী প্রথম অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিনের ধ্বংসাবশেষ। আপনারা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে, একটা ভাঙা, দুমড়ানো, ঝলসানো, অ্যালুমিনিয়মের বহিরাবরণ ছাড়া সে-যন্ত্রের কিছুই অবশিষ্ট নেই। আপনাদের প্রত্যেককে এই যন্ত্রটিকে পরীক্ষা করবার সুযোগ দেওয়া হবে। আপনাদের পরীক্ষা শেষ হলে আমরা রসায়নাগারে যন্ত্রটিকে পাঠাব তার মূল উপাদান নির্ণয় করবার জন্য।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মীদের অসাধারণ কর্মতৎপরতার মনে এই কয়দিনেই হবিবুল্লার অতীত জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেছে। শ্রীমতী সুমিত্রা দেশপাণ্ডে সেগুলো একসংগে গ্রথিত করে হবিবুল্লার জীবন কাহিনী গড়ে তুলেছেন। অনুসন্ধান এখনও চলেছে—নূতন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত হলে অবিলম্বেই আপনাদের তা জানানো হবে।

কিন্তু হবিবুল্লার সম্বন্ধে অনেক কথা জানলেও আমরা বহু চেষ্টারও এই আবিষ্কারে মূল উৎসের সন্ধান পাইনি। আমার আশা—আপনাদের তীক্ষ্ণতর বিশ্লেষণ ক্ষমতা সে সম্বন্ধে কিছু আলোকসম্পাত করবে।

হবিবুল্লা সংক্রান্ত তদন্তে আর একটা দুঃসংবাদ আমরা পেয়েছি। হবিবুল্লার একমাত্র সংগী ছিল তার এক আত্মীয়—সলিমুদ্দিন। হবিবুল্লার মৃত্যুর পর সলিমুদ্দিনকে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তার সংগে নিখোঁজ হয়েছে হবিবুল্লার সমস্ত নোটবই আর ডায়েরী তার ল্যাবরেটরী থেকে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি যে হবিবুল্লা ডায়েরী রাখত—আর অনুমান করে নিয়েছি যে সে পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে কোনো না কোন জায়গায় লিপিবদ্ধ করে রাখত। সমস্ত ল্যাবরেটরীখানা তল্লাসী করে পাওয়া গেছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলো কাগজের টুকরো। এগুলোতে পাওয়া যায় হয় কোনো ইকোয়েশনের অংশ, না হয় কোনো অজ্ঞাত পরীক্ষার ফলাফল অথবা data। অ্যান্টিগ্র্যাভিটি'র পরিপ্রেক্ষিতে সে সমস্ত কাগজের টুকরোর কোনো অর্থ হয় না অন্ততঃ আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো অর্থ করে নিতে পারিনি।

স্বরাষ্ট্র বিভাগের গোয়েন্দাদের ধারণা সলিমুদ্দিন আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁদের ধারণার ভিত্তি হচ্ছে এই যে সলিমুদ্দিনের মতো কোনো একজনকে হবিবুল্লা মৃত্যুর চারদিন পরে পালাম এয়ারপোর্ট-এ দেখা যায়। যুবকের 'পাসপোর্ট'-এ নাম ছিল সামাদ খান এবং সেই নামেই করাচী পর্যন্ত টিকিটও কেনা ছিল। যুবক করাচী হয়ে লণ্ডনগামী এক উড়োজাহাজে যাত্রা করে। 'বুকিং ক্লার্ক'-এর ঘটনাটা স্মরণে ছিল, কারণ সামাদ খানের সংগে ছিল প্রচুর মালপত্র—বাড়তি মাশুল নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটিও হয় তার সঙ্গে।

শুধু তাই নয়, বৈদেশিক 'ইন্টেলিজেন্স' শাখার কর্মীদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে সামরিক নেতাদের সংগে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকদের এক গোপন বৈঠক হয়ে গেছে—এক সপ্তাহ আগে। অবশ্য এ রকম বৈঠক আজকাল ওদেশে মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। কিন্তু হবিবুল্লার আবিষ্কারের পটভূমিকায় এরকম বৈঠকের সংবাদে আমরা আশংকিত না হয়ে পারি না। গোয়েন্দাবিভাগের ধারণা যদি সত্য হয় তবে, ভারতের ইতিহাসে মহা দুর্দিন আগতপ্রায়।

বলা বাহুল্য, কোনো যুযুৎসু দেশের পক্ষে হবিবুল্লার আবিষ্কার ভয়াবহ মারণাস্ত্রে পরিণত করতে কিছুই দেরী হবে না।

এ আপনারা এখন সকলে অবহিত হলেন, কেন এই আকস্মিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে—আর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই চরম পদ্ধতির প্রয়োজন কেন। উপস্থিত বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীকে সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য যে তাঁদের জীবন সংশয় হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সামান্য অসুবিধা হলেও এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাঁদের সর্বতোভাবে মেনে চলাটাই বাঞ্ছনীয়।

আজকের এই সভাস্থলে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা ছাড়া হবিবুল্লার আবিষ্কারের স্বরূপ বাইরের আর কেউ জেনেছে কিনা—আমাদের পক্ষে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি। হবিবুল্লার সংগে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল টিমারপুরের ওই ভস্মীভূত বাড়ীর কয়েকজন বাসিন্দার সংগে। কিন্তু তাঁরা কেউই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন নি। লক্ষ্য করে থাকলেও তাঁরা মিথ্যা কথা বলেছেন কিনা আমাদের তাও জানা নেই। তারা ছাড়া হবিবুল্লা তার যন্ত্রের স্বরূপ আর কারো কাছে উদ্ঘাটিত করেছিল কি না—আজ আমাদের সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার মতো কোনো সূত্র নেই।

সমবেত বৈজ্ঞানিকদের কাছে আমরা আশা করি, যে তাঁদের সহায়তা আমরা পাব ওই ভাঙা যন্ত্রটার পুনর্গঠনের কাজে। এ কাজে সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগ ও দেশরক্ষা বিভাগ সম্পূর্ণ সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। এই প্রজেক্টের ব্যয় নির্বাহ করে সরকার ব্ল্যাংক চেক দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রজেক্ট এ বা প্রজেক্ট অ্যান্টিগ্রাভিটির সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের দেওয়া হবে সর্বোচ্চ হারে বেতন। বাসস্থান, আহারাদি যানবাহন ও প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিকদের চিকিৎসার ব্যয় সরকারই বহন করবেন।

এ ছাড়া বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি, উপকরণ আমদানী করার প্রয়োজন হলে দেশরক্ষা বিভাগ বিশেষ মালবাহী উড়ো জাহাজের ব্যবস্থা করবেন। শুল্ক ও বাণিজ্য বিভাগের ছাড়পত্র 'এক্সচেঞ্জ পারমিট', 'লাইসেন্স' ইত্যাদির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করা যাবে। দেশরক্ষা বিভাগের যে কোনও 'অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী' বা জাতীয় সরকার পরিচালিত যে কোনো কারখানা বা গবেষণাগার সর্বদা প্রস্তুত থাকবে আমাদের যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করবার জন্য। রেলওয়ে আমাদের মাল সরবরাহ করবে অন্য কাজ স্থগিত রেখে। সমস্ত ব্যাপারেই সর্বোচ্চ 'প্রায়রিটি' দেওয়া হবে 'প্রজেক্ট'-এর জন্য।

আমার নিজের তরফ থেকে বলতে পারি যে এই পরিকল্পনার সাংগঠনিক সহায়তা করা আজ থেকে আমার প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করলাম। দিবারাত্র যে কোনও সময়ে আমার দ্বার খোলা থাকবে আপনাদের জন্য।

সর্বান্তঃকরণে আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

কৃষ্ণস্বামীর অভিভাষণ শেষ হল এখানেই। সভাস্থলে সুরু হল মৃদু গুঞ্জন। কৃষ্ণস্বামী সুমিত্রার সংগে মৃদু স্বরে কী নিয়ে আলোচনা সুরু করেছেন। শংকর লক্ষ্য করে, সুমিত্রার প্রবল আপত্তি কৃষ্ণস্বামীর কোনও এক প্রস্তাবে। কিন্তু কৃষ্ণস্বামী নাছোড়বান্দা—সুমিত্রার হাত ধরে সভাস্থলে তাকে টেনে নিয়ে আসেন তিনি। তার পরে আবার ঘোষণা করেন—

যে কোনো 'প্রজেক্ট' চালাতে গেলে একটা সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন। আমাদের সৌভাগ্য যে একজন যোগ্যা সম্পাদিকার সাহায্য আমরা এত দিন পেয়ে এসেছি। ডাঃ সুমিত্রা দেশপাণ্ডে এখনও পর্যন্ত 'প্রজেক্ট-অ্যান্টিগ্রাভিটি'র অস্থায়ী সম্পাদিকার কাজ করে এসেছেন। বস্তুতঃ একদিনেই যে আমরা সভার অধিবেশন করতে সক্ষম হয়েছি, তার জন্য সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে শ্রীমতী দেশপাণ্ডের। আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, এঁকেই আপনারা স্থায়ী সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করুন।

সুমিত্রা প্রবল আপত্তি জানায়—বলে, এত বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিকদের সমাবেশে আমার মতো নগণ্যাকে সম্পাদিকার পদে বহাল করলে 'প্রজেক্ট-এর' ক্ষতি ছাড়া উপকার কিছু হবে না। কিন্তু তার ওজর-আপত্তি ডুবে যায় অভ্যাগতদের সমবেত করতালিতে।

শংকর ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। লক্ষ্য করে যে এই ঘটনায় ঘরের গুমোট আবহাওয়াটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। অভ্যাগতদের স্মিতমুখের স্তুতিবাদে সুমিত্রার মুখ হয়ে উঠেছে আরক্ত। শংকর ভাবে—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!

কলগুঞ্জন থামবার পর কৃষ্ণস্বামী ঘোষণা করলেন—এবার আমাদের সম্পাদিকা আলোচনা করবেন 'প্রজেক্ট-এ'র সংগঠন সম্পর্কে।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সভার মাঝখানে। তার মুখের অরুণাভা তখনও মিলিয়ে যায়নি। শংকরের দিকে মিনতি ও হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে। তারপর আরম্ভ করে—

এ জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশে সম্পাদিকা হিসাবে আপনারা আমাকেই মনোনীত করেছেন। এ মনোনয়নে যোগ্যতার কোনও বিচার আপনারা করেন নি। তাই আমার প্রগল্‌ভতা মার্জনা করবেন।

কণ্ঠস্বর মৃদু। কিন্তু তা শোনা যায় বিরাট 'কনফারেন্স'-এর সুদূরতম কোণ থেকে। পরিষ্কার বাক্যবিন্যাস অনায়াসে বয়ে চলেছে নির্ঝরিণীর মতো। শংকর মুগ্ধবিস্ময়ে ভাবে, সাড়ে তিন বছর আগের সেই ভীরু মেয়েটির মধ্যে এ ক্ষমতা লুকিয়ে ছিল কোথায়!

আমার যদি কোনও দাম থাকে তবে সেটা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

মনোবিজ্ঞানের সংগে হবিবুল্লার এই আবিষ্কারের কোনো আপাত সুযোগ বের করতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তবুও কর্তৃপক্ষের আশা—হবিবুল্লার চিন্তাধারাটা কোন দুর্গম প্রণালী বেয়ে এত বড়ো আবিষ্কারের পথে উত্তীর্ণ হয়েছিল, মনোবিজ্ঞান হয়তো সে সম্বন্ধে কিছু আলোকসম্পাত করবে।

আপনাদের কাজ যেমন ওই ভাঙা যন্ত্রটাকে গড়ে তোলা, আমার কাজ তেমন অধুনা পঞ্চভূতে বিলীন হবিবুল্লার মূর্তিটাকে আপনাদের মানসপটে ফুটিয়ে তোলা। কতটা সক্ষম হব সে কাজে জানি না, কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদে ও সহায়তায় হয়তো বা ইতস্ততঃ ছড়ানো হবিবুল্লার জীবনের কতকগুলো ছোটো-বড়ো ঘটনার একটা অর্থপূর্ণ সমাবেশ করা সম্ভব হতে পারে।

আপনাদের আশাভংগ হবে, এই আশংকায় আগে থাকতেই আপনাদের জানানো দরকার যে এই সন্নিবেশে পাবেন না নিপুণ শিল্পীর দক্ষতা। অপটু হাতে গড়া মাটির তালকে যদি সম্পূর্ণ প্রতিমা বলে আপনাদের সামনে তুলে ধরি, তবে দয়া করে শিল্পীর অক্ষমতাটুকু মার্জনা করবেন। কিন্তু চেষ্টা আমাদের সকলকে করতে হবে যথাসাধ্য।

এক কথায়, আমরা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, এ কাজে সাফল্যলাভ করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আশাবাদীরা হয়তো বলবেন যে আমাদের এতটা আশংকার বা নিরাপত্তা রক্ষার এতটা কঠোর ব্যবস্থার কোনও সত্যিকারের ভিত্তি নেই। সলিমুদ্দিন হয়তো বা এ দেশের কোথাও রয়ে গেছে। তার অন্তর্ধান আর

হরিবুল্লার ল্যাবরেটরীর কাগজপত্রের অদৃশ্য হবার হয়তো বা একটা সরল ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিজ্ঞান সাধনার ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার কথাটা। অ্যাটম বোমা আর নিউক্লীয়ার মারণাস্ত্র প্রায় একই সময়ে একাধিক দেশে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কাজেই, যে আবিষ্কার একজন ভারতীয় তরুণ সম্ভব করেছিলেন, সে আবিষ্কার আর একজন মার্কিণ, রুশীয় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে—এমন কি একজন চৈনিক, বর্মীয় বা পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভবপর হবে না কেন?

আজ যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্ত প্রয়োজন বিরাট সমবেত চেষ্টা, বিশাল পরিকল্পনা—আর সম্ভব হলে বিপুল অর্থব্যয়। উদাহরণস্বরূপ আবার ওই অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা অথবা স্পুটনিক, লুনিক, পাইওনীয়ার বা এক্সপ্লোরার রকেট-এর কথা মনে আসে। পশ্চিমদেশে আজ বিরাট প্রজেক্টগুলোতে সমবেত চেষ্টার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সাধারণ দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানের জন্ত বিভিন্ন পেশার লোকেরা আজ সমবেত চেষ্টা বা "সাইবারনেটিক্" (cybernatic) পদ্ধতি কাজে লাগাচ্ছেন।

পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানের জন্ত যেমন বিভিন্নধর্মী 'সার্কিট'-এর একত্র সমাবেশ করে সাইবারনেটিক্স্ গড়ে তোলা হয়েছে বৃহত্তর জগতেও তেমনি বিভিন্ন ধরণের চিন্তাপ্রণালীর একত্র সন্নিবেশে অনেক দুরূহ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ইলেক্‌ট্রনিকস্-এর পরিবর্তে সমাবেশ করা হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে জটিলতম সার্কিট—মানুষের মস্তিষ্ক। এমন কি আমাদের দেশেও সাইবারনেটিক্ পদ্ধতি কিছু পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদাহরণ—আমাদের পরিকল্পনা কমিশন।

কোনো সমস্যার ওপরে বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞদের সমবেত চিন্তায় অদ্ভুত ফল পাওয়া গেছে। দেখা যায় পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন প্রাণিতত্ত্ববিদ্, রসায়নের নূতন আবিষ্কার সম্ভব করছেন ভূতত্ত্ববিদ: ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে বিপ্লব এনে দিচ্ছে নগণ্যা স্কুলশিক্ষয়িত্রীর প্রেরণা। এটা 'স্পেশালাইজেশন'-এর যুগ—আজকের বিশেষজ্ঞের চিন্তাধারা গড়ে ওঠে একটা নির্দিষ্ট সংকীর্ণ প্রণালী বেয়ে। তাই পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র পদার্থবিদ্যার প্রচলিত ধারাতেই সমস্ত যুক্তি রাখেন সীমাবদ্ধ। অর্থনীতির ছাত্রও সমগ্র জগতটার পরিমাপ করে চলেন অর্থনীতির চেনা মানদণ্ডটা দিয়ে। সহসা দেখা গেল, পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে অর্থশাস্ত্রের মাপকাঠিটা কাজে লেগে গেল—তার ফলে সম্ভব হয়ে গেল এক কল্পনাতীত আবিষ্কার।

তাই আজ এ সভায় আহ্বান করা হয়েছে কয়েকজন বিভিন্ন বিষয়ের সেরা ছাত্রদের। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে অনেক স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক এখানে অনুপস্থিত। বড়ো বড়ো গবেষণাগার পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যাঁদের ওপরে ন্যস্ত, অনির্দিষ্টকালের জন্ত তাঁদের 'এ প্রজেক্ট' আটকে রাখলে দেশের বিজ্ঞান-সাধনার শৃংখলা বজায় রাখা কঠিন হবে। তাই আমন্ত্রণলিপি তাঁদের কাছে পাঠানো হয়নি। যাঁদের স্বকীয় উদ্ভাবনীশক্তির কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি, তেমন বিজ্ঞানসাধকদের বাদ দিতে হয়েছে—তাঁরা প্রতিষ্ঠার চরম শিখরে থাকলেও। ভিন্নমতাবলম্বী অন্ত বৈজ্ঞানিকদের সম্পর্কে চরম অসহিষ্ণুতার অখ্যাতি শোনা যায় আরো কয়েকজন প্রবীণ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের। এঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হলে 'প্রজেক্ট-এ' বৈজ্ঞানিক তর্কযুদ্ধের রংগভূমি হয়ে দাঁড়াত।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আজ দেশের সত্যকারের প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আর কারো সন্ধান মেলে না। তাই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে মোটামুটি উদীয়মান দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্য থেকে। বস্তুতঃ এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সীমারেখা কোথাও দেখা যায় না। এঁদের কৃতিত্বের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়েছে জাতীয় রেজিষ্টার থেকে। দেশে বা বিদেশে গবেষণার কাজে যাঁরা স্বকীয় উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—একাধিক বিষয়ে যাঁদের দেখা গেছে মনের প্রসার, তাঁদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে বারো জনকে।

এই বারো সংখ্যার ওপরেও সীমারেখা টানা হয় নি। আপনারা যদি প্রয়োজন অনুভব করেন কোনো প্রতিষ্ঠানের অন্ত কোনো বৈজ্ঞানিকের সহায়তার, তবে সে বৈজ্ঞানিককে আমন্ত্রণ করে যে কোনো সময়ে দলবৃদ্ধি করার অসুবিধা হবে না।

এবার পরস্পরের সংগে পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেবার পালা।

প্রফেসর শিকদারের কথা নূতন করে আপনাদের না বললেও চলবে। মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্র, চুম্বকের বিভিন্ন রূপ আর পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে প্রফেসর শিকদারের দান জগত অনেক দিনই স্বীকার করে নিয়েছে।

প্রফেসর গোপালাচারী—রসায়নের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। ছাত্রজীবনে আর স্নাতকোত্তর জীবনে ইলেক্‌ট্রোকেমিষ্ট্রি সম্বন্ধে আমাদের প্রফেসর গোপালাচারী নূতন গবেষণার ধারা সৃষ্টি করেছিলেন। অক্সিডেশন-রিডাকশন' সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী থিয়োরির কথা নূতন করে প্রচার না করলেও চলবে। পরবর্তী জীবন এই প্রবীণ অধ্যাপক নিয়োগ করেছেন অধ্যাপনায়—আজ তাঁর ছাত্রেরাই যশস্বী হয়ে উঠছেন সাম্প্রতিক বিজ্ঞানসাধনায়।

ডাঃ শঙ্করপ্রসাদ রায়। আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের উদীয়মান জ্যোতিষ্ক। ইলেক্‌ট্রন্ ফিজিক্স নিয়ে ডাঃ রায়ের গবেষণা সুরু হয় আমেরিকার প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে—অনেকটা মহামানব আইনষ্টাইনের ছত্রচ্ছায়ায়। পরে ম্যাসাচুটেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নলজি-তে সাইবারনেটিক্স সংক্রান্ত এক দুরূহ সমস্যার সমাধান করে বিখ্যাত হন। বিলাতে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে ফ্লুইড ডাইনামিক্স সংক্রান্ত একটা নূতন থিয়োরি আবিষ্কার করেন। দেশে ফিরে এঁর গবেষণা চলছে—আইনষ্টাইনের ইউনিফায়েড ফীল্ড থিয়োরির একটা প্রমাণ বার করার উদ্দেশ্যে।

শংকরের কর্ণমূল আরক্ত হয়ে ওঠে সুমিত্রার এই বিশদ প্রশংসায়। প্রথামত দাঁড়িয়ে উঠে কোনোরকমে সভাসদদের অভিভাবণ জানিয়ে আনাড়ির মতো ধপ করে বসে পড়ে।

ডাঃ কালেশ্বর রাও। গণিতশাস্ত্রের সব্যসাচী বললেও চলে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ রাও গবেষণা করেন 'রিলেটিভিষ্টিক কোয়ান্টাম্ ডাইনামিক্স্' সম্বন্ধে। আলোক-তরংগের অভিনব রূপ ধরা পড়ে গেছে ডাঃ রাও-এর এক ইকোয়েশনে। শুধু তাই নয়,

কিছু দিন আগে 'থিয়োরি অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেরিয়েবলস্' শীর্ষক এক প্রবন্ধ ইনি গণিতজ্ঞদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তোলেন।

ডাঃ আলিমচান্দানী ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের পি-এইচ-ডি। 'অপারেশনস্ রিসার্চ' সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে। মানুষের সংগে জটিল যন্ত্রপাতির যে কী সম্পর্ক অটোমেশন ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদনযন্ত্র আজ কারখানা পরিচালনায় বা মানুষের সমাজবিধানেও যে কী পরিবর্তন এনে দিচ্ছে ডাঃ আলিমচান্দানী করেছেন এ সম্বন্ধে এক অসাধারণ বিশ্লেষণ-সাংখ্য ও পদার্থবিজ্ঞানের সহায়তায়। ফলিত পদার্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞানের এক অপরূপ মিলনক্ষেত্রের উন্মোচন হয়েছে এঁদেরই গবেষণার ফলে।

ডাঃ দত্তগুপ্ত—ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। নূতন ধরণের এক ট্রান্সিসটর আবিষ্কার করে এসেছেন জাপানে। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে বিপ্লব সুরু হয়েছে কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, রেডিও ইলেকট্রনিক্স্'এর রাজ্যে। রেডিও টেলিস্কোপ—এমন-কি মেসার ফিজিক্স-এ ও ডাঃ দত্তগুপ্তের ট্রান্সিসটর ব্যবহার করা হচ্ছে।

ডাঃ অমল ব্যানার্জি—আসলে ডাঃ ব্যানার্জি হচ্ছেন চিকিৎসক। গ্লাসগোতে ইতি বহুদিন কাটিয়েছেন ব্রেন ফিজিওলজি নিয়ে গবেষণায়। কতকগুলো মডেল ইলেকট্রনিকস এর সার্কিট উনি উদ্ভাবন করেছিলেন। এগুলোর সাহায্যে মানুষের মস্তিষ্কের অনেক ক্রিয়ার স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। ব্যানার্জি সার্কিটের আজ সমাদর জগতে সর্বত্র—মস্তিষ্কবিশারদদের মধ্যে। কেবলমাত্র ফিজিওলজি নয়, পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স ওপরেও ডাঃ ব্যানার্জির দখল অসাধারণ।

ডাঃ সুব্রাহ্মনিয়ন। জার্মাণীর ম্যাক্স প্লাংক ইনষ্টিটিউটে ইনি গবেষণা সুরু করেন প্রথমে উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে। সূর্যালোকের সহায়তায় উদ্ভিদ কী করে বাতাস থেকে অংগার সঞ্চয় করে বেড়ে ওঠে—এই ফোটোসিন্থেসিস সম্বন্ধে ইনি কৌতূহলী হয়ে পড়লেন। আলোক-তরণিকার শক্তি আর রাসায়নিক জৈব শক্তি কী ভাবে একটা থেকে আর একটায় রূপান্তরিত হচ্ছে এ সম্বন্ধে কয়েক বছর আগে কয়েকটি অসাধারণ প্রবন্ধ লেখেন ডাঃ সুব্রাহমনিয়ন। এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যে ইনি প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন উদ্ভিদ-বীজাণু, আর জীবজন্তুর মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্যের কথা। এই আবিষ্কারের জন্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ছাড়াও ডাঃ সুব্রাহ্মনিয়নকে নূতন করে শিখতে হয়েছিল থারমোডাইনামিস ও 'ওয়েভ মেকানিক্স'। তা ছাড়া অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে।

মিঃ জন হচ্ছেন মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার। সুইজারল্যাণ্ডে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন কোনো প্রসিদ্ধ মেসিনটুল তৈরী করবার কারখানায়। এরই ফাঁকে ফাঁকে 'ষ্টেবিলিটি অফ মেটাল ষ্ট্রাকচারস্'—ধাতুনির্মিত মূল কাঠামোর স্থায়িত্ব—শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের মধ্যে অনেক নূতন 'আইডিয়া' দিয়েছেন দেশ বিদেশের ইঞ্জিনীয়ারদের। মিঃ জনের গবেষণার ফল আজ কাজে লাগছে রকেট ও মিসাইল নির্মাণে। এ সমস্ত প্রবন্ধে পাওয়া যায় ফলিত-বিজ্ঞান তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয়।

ডাঃ কৌল আসছেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কৃষি বিভাগের অধ্যাপক ইনি। উত্তর বিহারের বন্যা নিবারণের জন্য এক নূতন পরিকল্পনা ইনি জাতীয় সরকারকে দিয়েছেন। একটা ছোটো জায়গা নিয়ে ডাঃ কৌলের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষা করে অসাধারণ সাফল্য লাভ করা গেছে। শুধু তাই নয়, 'লাইব্রেরী সায়েন্স' বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নিয়ে ইনি বহু গবেষণা করেছেন। ঘরে বাইরে তাই ডাঃ কৌলের প্রসিদ্ধি শুধু কৃষি বিজ্ঞানেই নয়—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও ভারতের একজন দিক্‌পাল বলে তাঁর খ্যাতি প্রসার লাভ করেছে।

আর এসেছেন স্বামী সচ্চিদানন্দ—আহমেদাবাদ যোগাশ্রম থেকে। এই বৈজ্ঞানিকদের আসরে স্বামী সচ্চিদানন্দের নাম শুনে আপনারা হয়তো বিস্মিত হবেন। আসলে স্বামীজি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে 'বায়োকেমিষ্ট্রি'তে এম, এস, সি আর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োফিজিক্স-এ পি, এইচ, ডি। যোগের ফিজিওলজি সম্বন্ধে গবেষণা করে ইনি মানুষের শরীর সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর তথ্য সুধী সমাজে প্রচার করেছেন। সামান্য উপকরণে অতি সূক্ষ্ম বিস্ময়কর যন্ত্র গড়ে তোলার কাজে, স্বামিজীর প্রতিভা অদ্বিতীয়।

সবশেষে বলতে হয় নিজের কথা। আমি সুমিত্রা দেশপাণ্ডে, মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। শিশু-মনস্তত্ত্ব আর মনোবিজ্ঞানে 'সাইবারনেটিক্' পদ্ধতির প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু কিছু অসংলগ্ন অসমাপ্ত কাজ আমার আছে। কিন্তু সে কাজ এতই নগণ্য যে এই মহাজ্ঞানীদের সভায় তার কথা উত্থাপন করলে ছন্দপতন ঘটবে। গুণ, অভিজ্ঞতা ও বয়সের দিক থেকে এই প্রজেক্টের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র অযোগ্যা হচ্ছি আমি।

বয়সের প্রশ্নটা যখন উত্থাপন করছি—তখন আর একটা কথাও বলতে হয়। আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, যে প্রফেসর শিকদার, প্রফেসর গোপালাচারী ও স্বামীজিকে বাদ দিলে আমাদের সকলের বয়স সাতাশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। সাংখ্যের বিশ্লেষণে যদি বিশ্বাস করা যায়, বেশীর ভাগ বিজ্ঞান সাধকের জীবনে এই চতুর্দশ বৎসরই হচ্ছে সবচেয়ে ফলবান সময়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা যায় অনেক।

আমরা ছাড়া প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীকেও এ 'প্রজেক্টের' একজন কর্মী বলেও আমরা ধরে নিতে পারি। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেছেন তিনি আমাদের এ সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য।

বস্তুতঃ আজকের এই সম্মেলন যে সম্ভব হয়েছে তার জন্য প্রধান কৃতিত্ব তাঁরই আর কারো নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণাদপ্তরে পুঞ্জীভূত অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ আর কমপক্ষে ত্রিশটি সরকারী ও বেসরকারী কমিটি যাঁর ওপরে নির্ভর করে বসে আছে। তিনিই যে কী করে মাত্র বারোদিনের মধ্যেই এ সভার আয়োজন করে তুললেন ভাবতেই বিস্ময় লাগে! সমবেত সভ্যবৃন্দের তরফ থেকে প্রঃ কৃষ্ণস্বামীকে তাই অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। [ক্রমশঃ।

ভলতেয়ার—জীবন ও দর্শন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

উপমন্যু

লণ্ডন—ইংরাজদের সম্পর্কে চিঠি

লণ্ডনে গুছিয়ে ব'সে ভলতেয়ারের প্রথম কাজ হল ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা। নতুন ভাষার ব্যাকরণ অবশ্য তাঁর বিশেষ বিরক্তির কারণ হল। কিন্তু তাতে শেখা আটকাল না। এক বছরের মধ্যে তিনি শুধু ইংরেজী ভাষাই শিখলেন না, ইংরেজী সাহিত্যের সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ প'ড়ে ফেললেন। এরই সঙ্গে ইংলণ্ডের সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হবারও একটা সুযোগ জুটে গেল। লর্ড বলিংব্রোক ভলতেয়ারকে একে একে সেই সময়ের সেরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডিন সুইফট থেকে আরম্ভ করে কনগ্রীভ, পোপ, অ্যাডিশন সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল ভলতেয়ারের।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপে চমৎকৃত হলেন ফরাসী লেখক। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন এই সাহিত্যিকদের কলমের স্বাধীনতা দেখে। শুধু সাহিত্যিক কেন, আশ্চর্য হলেন ইংরাজ জাতের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনের ধারা দেখে। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে সামান্য একটা সরু চ্যানেলের ব্যবধান কিন্তু কি বিরাট ব্যবধান দুই জাতির জীবনাদর্শে, জীবনোপলব্ধিতে। ইংলণ্ডে এরা ধর্মকে নূতন রূপ দিয়েছে, এক রাজাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছে অন্য এক রাজাকে, গড়ে তুলেছে নিজেদের পার্লামেণ্ট। যে পার্লামেণ্ট ইউরোপের যে কোনো শাসনকর্তার চেয়ে শক্তিশালী। সারা ইংলণ্ড ঘুরেও একটা বাস্তিলের কারাগার দেখতে পেলেন না ভলতেয়ার। অনেক খুঁজলেন কিন্তু পেলেন না সেই সব অকর্মণ্য খেতাবধারী আর রাজকীয় করুণাপুষ্ট অত্যাচারী রাজপুরুষের দল যাদের গোপন চিঠির জোরে একজন নির্দোষ সাধারণ মানুষকে জেলে আটকে থেকে আরম্ভ করে বিদেশে নির্বাসন পর্যন্ত দেওয়া যায়। ইংলণ্ড দেখে, সেই দেশের মানুষ দেখে, শাসন ব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হলেন ভলতেয়ার। আর যে পরিমাণে মুগ্ধ হলেন সেই পরিমাণে সারা অন্তর জুড়ে অনুভব করলেন তিক্ততা—নিজের দেশ আর তার আভিজাত্যের অত্যাচার সম্বন্ধে তিক্ততা।

কি শাসন ব্যবস্থা! কি বিরাট মানসিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রস্তুতি চলেছে সারা ইংলণ্ড জুড়ে! বেকনের নাম তখনো ভাসছে দেশের আকাশে বাতাসে। বেকন নির্দেশিত জীবন-জিজ্ঞাসার নূতন পথে এগিয়ে চলেছে দেশ এই চলার পথে পাথেয় 'হবসের' বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ, 'লকের' মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, 'কলিনস,' 'টিণ্ডাল' ইত্যাদির গির্জায় প্রচলিত গোঁড়ামি অগ্রাহ্য করে নূতন ঈশ্বর জিজ্ঞাসা।

নিউটনের মৃত্যু হল। সমাধিপ্রাঙ্গণে উপস্থিত ভলতেয়ার বিস্মিত হয়ে দেখলেন, লোকান্তরিত মহামানবের আত্মার প্রতি সমগ্র জাতির নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন। ফিরে এসে লিখলেন এই লোকের এক পণ্ডিতসভায় শুনলাম সেই পিঞ্জরস্থ প্রশ্ন নিয়ে তর্ক হচ্ছে—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে—সিজার, আলেকজাণ্ডার, তৈমুরলঙ না ক্রোমওয়েল। একজন বললেন—এঁদের কেউ নয়, নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন আইজাক নিউটন। আমার ওই একই মত। যিনি সত্যের শক্তিতে আমাদের অন্তর জয় করেছেন তাঁরই পায়ে তুলে দেব আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য; তাঁদের পায়ে নয় যাঁরা পাশবিক শক্তি দিয়ে আমাদের বেঁধেছেন দাসত্বের শৃঙ্খলে। এর পর নিউটনের লেখার মাঝে ডুবে গেলেন ভলতেয়ার, ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে এই মনীষীর মত সেখানে প্রচার করবেন বলে।

ইংলণ্ডের সোনার ফসল, তার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান অবিশ্রান্ত দ্রুততার সঙ্গে দুহাতে কুড়োলেন ভলতেয়ার। তারপর তাকে ফরাসী সংস্কৃতির আগুনে পুড়িয়ে, নিজের প্রতিভার রসে সিক্ত ক'রে নূতন রসায়ন প্রস্তুত করলেন ফরাসী পাঠকদের জন্যে। Letters on the English এর পাণ্ডুলিপি গোপনে পাঠিয়ে দিলেন ফ্রান্সে বন্ধুদের কাছে। গোপনে পাঠালেন কারণ কারাগারের স্মৃতি তখনো মন থেকে মুছে যায়নি। প্রত্যেক চিঠিতে অনেক প্রশংসা আছে ইংরাজদের আর তুলনায় আছে ফরাসী সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ, শাসনের বিরুদ্ধে কশাঘাত! তাই রাজপুরুষদের রোষচক্ষু এড়িয়ে চলাই ঠিক করলেন ভলতেয়ার। প্রত্যেক চিঠিতে আরো কিছু ছিল, ছিল মধ্যবিত্তদের প্রতি আহ্বান; যাতে ইংলণ্ডের মত ফরাসী মধ্যবিত্তরাও ফিরে পেতে পারে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে তাদের প্রকৃত স্থান। ভলতেয়ার হয়তো অতো ভেবে লেখেননি, কিন্তু ইতিহাস বলছে যে এই চিঠিগুলোর মধ্যেই লুকিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম বীজ।

রোমান্সের রঙীন আসর

ফরাসী রাজপ্রতিনিধি অবশ্য অত শত জানতেন না। তাই ১৭২৯ সালে তিনি ভলতেয়ারকে স্বদেশে ফিরে আসবার অনুমতি দিলেন। প্যারিসে পা দিয়েই ভলতেয়ার ভাসলেন বিলাসের স্রোতে আর সঙ্গে সঙ্গে অবারিত ধারায় তাঁর কলম থেকে ঝ'রে প'ড়তে লাগল জীবনানন্দের রঙে রঙীন নানা সুরের হাসি। উড়ে চলে গেল দীর্ঘ পাঁচ বছর আর তারপরই আবার তাঁর জীবনে আর একটি প্রবাদের সত্যতা প্রমাণিত হ'ল। হাসির পায়ে পায়ে এল কান্নার দিন।

হঠাৎ এক দুষ্ট প্রকাশক লেখকের অনুমতি না নিয়েই Letters on the English ছাপিয়ে ছেড়ে দিলে বাজারে। ভলতেয়ারের জীবনে আবার ঘনিয়ে এল মেঘ। প্যারিসের পার্লামেণ্ট এই নোংরা ধর্মদ্বেষী, নীতিবিগর্হিত, এবং রাষ্ট্রবিরোধী বই বাজেয়াপ্ত ক'রে খোলা রাজপথে সকলের সমনে পুড়িয়ে দেবার হুকুম দিলে। কিন্তু এখানেই থামল না রাজরোষের রথ। ভলতেয়ার শুনলেন সে রথ এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে, তাঁকে তুলে আবার বাস্তিলের কারাগারে নিয়ে যাবে ব'লে। কালের গতিতে জীবনদর্শন তখন অনেক গভীর হ'য়েছে ভলতেয়ারের। তাই এবার তিনি ৩৬ পলায়নই প্রবাদ

বাক্যের অনুসরণ করলেন। পালালেন, তবে আর একা নয়। প্রকৃত রসিকের মতো পালালেন অন্যের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।

সঙ্গিনী Marquise du chatelet'র বয়স তখন আটাশ; আর ভলতেয়ার চল্লিশ পার হয়েছেন। প্রতিভার প্রতিপ্রতিভার আকর্ষণের কাছে কিন্তু তুচ্ছ হ'ল বয়সের ব্যবধান। অনন্যা এক নারী ভলতেয়ারের এই প্রিয়বান্ধবী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তির সংবাদ তখনই ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সুধীসমাজে শুধু তাই নয়, নিউটনের Principia'র সঠিক অনুবাদ করেছেন তিনি এবং স্বয়ং ভলতেয়ারকে হারিয়ে পদার্থবিদ্যার ওপর রচনা লিখে লাভ করেছেন ফরাসী আকাদেমীর পুরস্কার। এমন সর্বগুণান্বিতা নারীর স্বামী ছেড়ে অন্যের জীবনে জড়িয়ে যাওয়ার কথা ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কিন্তু ভলতেয়ার যেখানে নায়ক সেখানে বুঝি বিস্মিত হবার কিছুই নেই। প্রিয়বান্ধবীই বলেছেন—সর্ববিষয়ে এমন সুন্দর পুরুষ; সারা ফ্রান্সের সবচেয়ে মূল্যবান অলঙ্কার। বোকা স্বামী ছেড়ে তাই হয়তো তিনি গলায় দোলালেন এই মূল্যবান মালা। অথবা প্রতিভার বিকাশে কিছুই বুঝি বাধা নয়, প্রেমের পথে সব সংস্কারই বুঝি তুচ্ছ।

প্রিয়বান্ধবীকে প্রেমে শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দিলেন ভলতেয়ার। মুগ্ধ হয়ে বললেন সত্যিই মহৎ একটি অন্তর, যার একমাত্র অপরাধ মনে হয় নারী হয়ে জন্মানো। শুধু মুগ্ধই হলেন না, এই প্রিয়বান্ধবীকে আর অসংখ্য পরিচিতাকে কেন্দ্র করে পাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে তিল তিল করে গড়লেন নারীর এক নিজস্ব রূপ, পেলেন পুরুষ আর নারীর মানসিক সমগোত্রতার ধারণা। লিখলেন ভলতেয়ার, পুরুষকে বশে রাখবার জন্যই ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন। সমাজ-বিজ্ঞানের পাতায় পাতায় এই উক্তির সত্যতা ছড়িয়ে আছে।

Cireyতে প্রিয়বান্ধবীর ভিলায় আশ্রয় নিলেন ভলতেয়ার। প্যারিসের রাজনৈতিক কোলাহল থেকে দূরে এক শান্ত নির্জন আশ্রয়। মাদামের স্বামী তখন অন্য কোথায় যুদ্ধে ব্যস্ত। ফলে দুজনের মিলনে কোনো বাধা রইল না। সমাজ? তৎকালীন ফরাসী সমাজে ধনী বৃদ্ধের তরুণী স্ত্রীরা দু একজন প্রেমিক নিয়ে মাথামাথি করতেনই। সুবিধাবাদী সমাজ চোখ বুজে থাকতো, কারণ ধনসম্পদ দিয়ে যে তরুণী নারীর মন ভরেনা এ সত্য অস্বীকার করবার সাহস কারুরই ছিল না। অভিজাত মহিলাদের খাঁচায় এমন দু-একটা বাড়তি পুরুষ সব সময়েই বশ করার জন্যে থাকতো। খুব কিছু বাড়াবাড়ি না হলে সমাজে বারণ করতো না। আর সেই পুরুষ পরিচিত এক প্রতিভা হলে তো কথাই নেই। সমাজ তখন সমস্বরে বাহবা দিত।

কিন্তু সমাজের বাহবায় কান দেবার সময় ছিল না ভলতেয়ার বা তাঁর বান্ধবীর। এমন কি বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়ন বা পরিচর্যার সময় ছিল না দুজনের। সারাদিন গভীর গবেষণায় মত্ত থাকতেন এই প্রতিভাবান পুরুষ আর অসামান্যা নারী। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নানা পরীক্ষার জন্য মূল্যবান এক গবেষণাগার তৈরী করিয়েছিলেন ভলতেয়ার। বছরের পর বছর নতুন নতুন আবিষ্কার আর আলোচনা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলল এই দুই নর-নারীর মধ্যে। ইতিমধ্যে অভিজাত ও সুধী সমাজের আসর স্থানান্তরিত হল প্যারিস থেকে Cireyতে। প্রত্যহ নৈশ আহারের পর ভলতেয়ার আর তাঁর বান্ধবী এসে যোগ দিতেন অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে। কোনোদিন সামান্য একটু অভিনয় হত, কোনোদিন বা ভলতেয়ার পড়ে শোনাতেন তাঁর লেখা গল্প। কখনো কখনো নাটকের কোনো চরিত্র অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন নাট্যকার স্বয়ং। আসরের মধ্যমণি হয়ে নিজে হেসে, অপরকে হাসিয়ে সময় কাটিয়ে দিতেন ভলতেয়ার।

১৭৩৭ সালের জুলাই মাসে ফ্রেডরিক দি গ্রেটকে চিঠি লিখেছিলেন এই ভলতেয়ার, কখনো কখনো বোকা সাজার মধ্যেও মাধুর্য আছে। যে সব দার্শনিক হেসে মনের ভার হাল্কা করতে পারে না, তারা সত্যই করুণার পাত্র। আমার মনে হয় যে গাম্ভীর্য একটা সাংঘাতিক রোগ। এই ভলতেয়ারকে লক্ষ্য করেই রাশিয়ার ক্যাথরিণ বলেছেন, আনন্দের পূর্ণ পবিত্র প্রতীক।

Cirey-র এই নিভৃত নিকেতনে আনন্দোচ্ছল ভলতেয়ারের কলস থেকে উৎসারিত হল রোমান্সের ধারা। স্বচ্ছ সাবলীল ঝর্ণার মত একে একে ঝ'রে পড়ল Zadig, Candide, Micromegas, L' Ingenn, Le Monde Conme il va। এই রসধারার মধ্যে প্রতিভাত হ'ল সাহিত্যিক ভলতেয়ার, রসিক ভলতেয়ার, ভাবুক ভলতেয়ারের পূর্ণ রূপ। দার্শনিক ভলতেয়ারও যে কোথাও উঁকি দেননি এমন নয়। এই বইগুলোকে উপন্যাস, বললে ভুল হবে, আবার ঠিক ছোট গল্পও নয়। ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রূপায়িত হয়েছে লেখকের চিন্তাধারা, নায়ক একটি বিশেষ ভাবের, আদর্শের প্রতীক, আর ভিলেন চরিত্রে ছায়া পড়েছে প্রচলিত সংস্কারের। সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি লেখা যেন এক একটি নিটোল নির্মল, দ্যুতিময় মুক্তা।

এই রকম মুক্তা, ছোট্ট একটি মুক্তা L' Ingenn। এক বিদেশী ঘুরতে ঘুরতে ফরাসী দেশে এসে পড়েছে। প্রথম গোলমাল বাধলো তাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা নিয়ে। সেটা কোনোক্রমে মিটল বটে কিন্তু বিদেশী তাতেই থামবে না। শাস্ত্রসম্মত স্বীকারোক্তি শেষ ক'রে সে দাবী জানালে সে যাজককেও তার কাছে স্বীকারোক্তি করতে হবে। শাস্ত্রেই লেখা আছে, পরস্পরের মধ্যে স্বীকারোক্তি করিবে। নাছোড়বান্দা এই বিদেশীর পাল্লায় যাজক বেচারির প্রাণ যায় আর কি! বিদেশী শেষে প্রেমে পড়ল এক তরুণীর। কিন্তু শাস্ত্রের নানা বাধায়, পুরোহিত, সাক্ষী, আইন ব্যবসায়ী ইত্যাদি একাধিক বিয়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যক্তির নানা প্ররোচনায়, বেচারির বিয়েই ফেঁসে যাবার যোগাড়। সে তখন শাস্ত্রের বাধা না সরিয়ে নিলে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করার ভয় দেখাল। শেষ পর্যন্ত বিয়েটাও হ'ল। এইভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে গড়ে উঠেছে ভলতেয়ারের গল্প। সারা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে সূক্ষ্ম একটি স্রোতের মত বয়ে গেছে খৃষ্টধর্মের মূল মন্ত্রের সঙ্গে তথাকথিত আচার-আড়ম্বর জর্জরিত যাজক-প্রচারিত ধর্মের বৈষম্য। এই বৈষম্যের বিবকে, সংস্কারের জঞ্জালকে দূর করাই ছিল ভলতেয়ারের লক্ষ্য। ছোট সরল একটি কাহিনীর মারফৎ সেই লক্ষ্যের পথে হ'ল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

Micromegas-এর কাহিনীতে ডিন্ সুইফটের প্রভাব আছে ঠিকই; কিন্তু কল্পনার বিস্তারে ভলতেয়ার তাঁর আদর্শকে বহুস্থানে অতিক্রম করেছেন। নায়ক লুব্ধক নক্ষত্রের অধিবাসী। ৫০০,০০০ হাজার ফুট লম্বা এই মানুষটি এসেছে পৃথিবীতে নেমে। পথে সঙ্গী জুটল শনিগ্রহের এক বাসিন্দা। সঙ্গী

বেচারি সারা রাস্তা অভিযোগ করতে করতে এসেছে তার উচ্চতা মাত্র কয়েক হাজার ফিট বলে, তার মাত্র ৭২ টা ইন্দ্রিয় আছে আর তাদের পরমায়ু মাত্র ১৫,০০০ বৎসর বলে। ১৫০০০ বৎসর পরমায়ু মানে জন্মাবার পরক্ষণেই মৃত্যু; ফলে কিছুই তারা শিখতে পারে না আর কোনো কাজেই লাগাতে পারে না তাদের ক্ষণস্থায়ী অভিজ্ঞতা। অনন্ত কালসমুদ্রে এমন মটরের মত ছোট, এক গ্রহের অধিবাসী হয়ে, ১৫,০০০ বৎসরের সামান্য পরমায়ু পেয়ে বেচারির দুঃখের শেষ নেই! ৫০,০০০ হাজার ফুট লম্বা সঙ্গীকে দেখে সে দুঃখ আবার উথলে উঠেছে যেন। এমন সময় ভূমধ্য-সাগরের ওপর দিয়ে চলতে চলতে চোখে পড়ল একটা জাহাজ। নায়ক টুক্ করে জাহাজটা তুলে বসালে তার বুড়ো আঙুলের ডগায়। ছোট্ট একটা ছারপোকার মত দুলতে লাগল জাহাজটা। তারপর সুরু হ'ল জাহাজের ভয়ার্ত যাত্রীদের সঙ্গে অন্য গ্রহের এই আগন্তুকদ্বয়ের কথাবার্তা। নাবিক, যাজক, দার্শনিক সকলেই কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করেছে আর এই মধুবর্ষী সংলাপের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে ভলতেয়ারের তীক্ষ্ণ শ্লেষ আর তীব্র ব্যঙ্গ।

তারপরই Zadig। Candide আরো পরের রচনা। শ্রেষ্ঠতায় Candide এর পরই Zadig। নায়কের নামেই কাহিনীর নাম। দার্শনিক তরুণ Zadig এর বর্ণনায় ভলতেয়ার বলেছেন মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব Zadig ঠিক ততখানি বিজ্ঞ··· দর্শনশাস্ত্রে তার জ্ঞান অসাধারণ বলা যায় অর্থাৎ সে খুব সামান্য জানে অথবা কিছুই জানে না! এই Zadig পড়ল Semiraর প্রেমে। ডাকাতদের হাত থেকে সেমিরাকে বাঁচাতে গিয়ে সে বাম চক্ষুতে আঘাত পেল। ইজিপ্ট থেকে এলেন এক বিখ্যাত চিকিৎসক। দেখে শুনে বললেন চোখ আর সারবে না। চিকিৎসক সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি, অন্ধ হবার দিনক্ষণ পর্যন্ত ব'লে দিলেন। ধন্বন্তরির কথা কিন্তু মিথ্যা হ'ল। দুদিন বাদেই ঘা সেরে গিয়ে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেল Zadig। চিকিৎসক রেগে এ ক্ষেত্রে ঘা সেরে যাওয়া যে অন্যায় হয়েছে তাই প্রমাণ করবার জন্যে একখানা বই লিখে ফেললেন। Zadig সে বই পাতা উল্টেও দেখলে না।

ইতিমধ্যে Zadig এর অন্ধ হবার সম্ভাবনা শুনেই সেমিরা অন্য একজনকে বিয়ে ক'রে ফেলেছে। বিরক্ত হয়ে Zadig তখন এক গ্রাম্য চাষার মেয়েকে বিয়ে করে বসল। বিয়ে তো হল কিন্তু স্ত্রী যে তাকে ভালবাসে তার প্রমাণ কি? এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল, সে মরার ভাণ করে পড়ে থাকবে আর সেই অবসরে বন্ধু গিয়ে স্ত্রীকে জানাবে বিবাহের প্রস্তাব। পরিকল্পনা ঠিক ঠিক রূপায়িত হ'ল। ফলও যা হবার ঠিক তাই হ'ল। অর্থাৎ স্ত্রী প্রথমে বন্ধুকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবার ভাণ দেখিয়ে তারপর সুড়সুড় ক'রে একটু সলজ্জ হেসে প্রস্তাবে রাজী হ'লেন। এ-হেন ব্যাপারে মরা মানুষ জেগে উঠত। সুতরাং জীবন্ত Zadig শুধু কফিন থেকে লাফিয়ে বাইরেই এল না, সোজা চ'লে গেল গভীর অরণ্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য আর সরলতার আশ্রয়ে।

কিছুদিন পর বন থেকে বিজ্ঞ হয়ে ফিরে এল Zadig। রাজা তাকে অমাত্যের আসন দিলেন। তার সুশাসন আর ন্যায় বিচারের ফলে রাজ্যে সুখ-সমৃদ্ধির বান ডাকলো। কিন্তু এধারে আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে এল Zadigএর জীবনে। রাণী ভালোবেসে ফেললেন তাকে। ফলে রাজা প্রথম বিরক্ত হলেন, তারপর তাকে এবং রাণীকে বিষ খাইয়ে মারবার এক ষড়যন্ত্র ফাঁদলেন। রাণী জানতে পেরে পালাবার পরামর্শ দিলেন তাঁর প্রিয়তমকে। প্রেমের চেয়ে প্রাণ বড় প্রমাণ ক'রে Zadig আবার আশ্রয় নিলে অরণ্যের নির্জন অন্ধকারে।

বনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল Zadig। তার এই সময়কার জীবনদর্শন বর্ণনা করেছেন ভলতেয়ার। পৃথিবীটা তার মনে হ'ল একটুকরো মাটির ঢেলার মত আর মানুষগুলো যেন একদল পোকার মত। সেই ঢেলা ব্যেপে পরস্পারের সঙ্গে মারামারি কামড়াকামড়ি করছে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে অন্যকে গ্রাস করবার। জীবন ও জগতের এই রূপ দেখার পর, নিজের দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবার আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা রইল না। কি-ই বা তার মত একটা কীটাণুকীটের অস্তিত্ব আর কতটুকুই বা এই পৃথিবী! ভাবতে ভাবতে অনন্তে লীন হ'ল তার অন্তর, গভীর ধ্যানাবস্থায় তার প্রত্যক্ষ হ'ল এই বিরাট বিশ্বের সুশৃঙ্খল সৃষ্টিরহস্য। কিন্তু ধ্যান ভাঙ্গার পর······হঠাৎ মনে হ'ল তার জন্যে কেঁদে কেঁদে রাণী না প্রাণত্যাগ করেন! অমনি বিরাট বিশ্ব মিলিয়ে গেল। মাটির পৃথিবীতে এসে দাঁড়াল সামান্য এক মানুষ।

আবার বন ছেড়ে লোকালয়ের পথ ধরল সে। পথে দেখে এক নারীর ওপর অত্যাচার করছে একজন পুরুষ। এগিয়ে গিয়ে সে অত্যাচারীকে আঘাত করল। আঘাতের প্রচণ্ডতায় প্রাণ হারালো পুরুষটি। বীরের মত বুক ফুলিয়ে সে চাইল নারীর পানে। প্রত্যুত্তরে কিন্তু নারী ক্রোধে জ্বলে উঠে তাকে অজস্র অভিশাপ দিলে। তার অপরাধ, আঘাত দিয়ে সে যাকে হত্যা করেছে সেই পুরুষটিই ছিল নারীর মনের মানুষ। নারীচরিত্রের বিচিত্র রহস্যে বিস্মিত হ'য়ে আবার পথ ধরল সে।

পথে বন্দী হ'ল Zadig। বাধ্য হ'য়ে ক্রীতদাসের কাজ নিতে হ'ল তাকে। প্রভুকে একদিন সামনে পেয়ে কিছু তত্ত্বকথা শুনিয়ে দিল, প্রভু খুসী হ'য়ে তাকে নিজের উপদেষ্টা ক'রে নিলেন। এই সময় স্থানীয় এক রাজা একজন সৎ মন্ত্রী খুঁজছিলেন। Zadig-এর ওপর ভার পড়ল একজন সৎ উপযুক্ত লোক বাছাই ক'রে দেবার। বাছাই করার জন্য একটা মজার পরীক্ষার ব্যবস্থা করল সে। নাচঘরে যাবার পথে টেবিলে নানা হীরা-জহরৎ সাজিয়ে রাখা হ'ল। প্রত্যেক প্রার্থীকে একা সেই পথ দিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হ'ল। একে একে প্রত্যেক প্রার্থী নাচঘরে জমায়েত হবার পর ঘোষণা করা হ'ল —সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ যার নাচ হবে, তাকেই দেওয়া হবে মন্ত্রীর পদ। দর্শক রাজা স্বয়ং এবং তার পাশে Zadig। সেই নাচের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভলতেয়ার লিখেছেন, প্রত্যেকটি ব্যক্তি নাচল সম্পূর্ণ অনিচ্ছার সঙ্গে, আশ্চর্য রকম জড়সড় হয়ে। কারুর মাথা ঝুলে পড়েছে, কারুর পিঠ কুঁজো, কেউ হাত দিয়ে পাশের পকেট সামলাতে ব্যস্ত।

এই ভাবে একটির পর একটি হাস্যদীপ্ত কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে তিক্ত ঘটনা সাজিয়ে এগিয়ে গেছে ভলতেয়ারের গল্প। কল্পনা করা যায় যে ভলতেয়ারের মুখে এই গল্প শুনতে শুনতে হেসে লুটিয়ে পড়েছিল শ্রোতার দল। প্রচুর চিনি মাখিয়ে ছোট

ছোট কুইনাইনের বড়ি পরিবেশন করেছিলেন ভলতেয়ার। সেদিন সেই সামান্য তিক্ততার স্বাদও কি পেয়েছিল উল্লসিত শ্রোতার দল ?

ফ্রেডরিক্ ও ভলতেয়ার

দেশে বিদেশে তখন অসংখ্য ভক্ত ভলতেয়ারের। সকলের Cireyতে এসে লেখকের সঙ্গলাভের সুযোগ বা সুবিধা ছিল না ? যারা আসতে পারত না তারা চিঠি লিখত। ১৭৩৬ সালে যুবরাজ ফ্রেডরিক্ প্রথম চিঠি লেখেন ভলতেয়ারকে। চিঠির ছত্রে ছত্রে ছড়ানো ছিল তরুণ একটি অন্তরের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়। ভলতেয়ার তখনো তাঁর অবিস্মরণীয় একখানি বইও লেখেননি। তবুও ফ্রেডরিক্ ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে তাঁকে সম্বোধন করে বোঝাতে চাইল যে স্বদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে তখনই ছড়িয়ে পড়েছে এই ফরাসী লেখকের প্রতিভার দীপ্তি। ফ্রেডরিকের চিঠির মধ্যে একটি মার্জিত প্রগতিশীল মনের পরিচয় পেয়ে খুশী হয়েছিলেন ভলতেয়ার। মানুষের জীবনে দারিদ্র্যের, সংস্কারের অন্ধকার দূর হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক নূতন স্বচ্ছল, সরল জীবনের আলো—এই ছিল ভলতেয়ারের স্বপ্ন। ফ্রেডরিক সিংহাসনে বসলে এই স্বপ্ন রূপায়িত হবার সম্ভাবনায় আনন্দে নেচে উঠেছিল তাঁর অন্তর। ফ্রেডরিকের কাছ থেকে এক খণ্ড Anti-Machiavel উপহার পেলেন ভলতেয়ার। বই পড়তে পড়তে তরুণ যুবরাজের যুদ্ধের প্রতি ঘৃণা, শান্তির কামনা দেখে বার বার চোখ জলে ভ'রে গেল এই প্রৌঢ় মানবহিতৈষীর। কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। কয়েক মাস পরে সিংহাসনে ব'সে এই ফ্রেডরিকই যুদ্ধ ঘোষণা করল সাইলেশিয়ার বিরুদ্ধে। ইউরোপে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের আগুন আবার উঠল জ্বলে।

১৭১৫ সালে বান্ধবীকে নিয়ে ভলতেয়ার ফিরে গেলেন প্যারিসে, ইচ্ছা, ফরাসী আকাদেমীর সভ্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। বান্ধবীর প্রেরণা ছিল এই ইচ্ছার আড়ালে। একটা কিছু নিয়ে মেতে ওঠা ভলতেয়ারের স্বভাব। আর মাতলে জ্ঞান থাকতো না ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে। এবারও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। অনেক ভেবেচিন্তে এক ধর্মধ্বজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লেন ভলতেয়ার, দু'-চারজন নামজাদা যাজকের অজস্র প্রশংসা সুরু করলেন এবং প্রাণখুলে মিথ্যে কথা বললেন ও লিখলেন। অর্থাৎ নির্বাচন-যুদ্ধে যা করা উচিত তাই করলেন ভলতেয়ার। কিন্তু তবুও প্রথম বছর হার হ'ল। পরের বছর অবশ্য নির্বাচিত হ'লেন এবং সম্বর্ধনা সভায় যে ভাষণ দিলেন তা আজও ফরাসী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে।

সৃষ্টির ধারা যেন কোন এক বালুচরে হারিয়ে গিয়েছিল। বান্ধবীও লক্ষ্য করেছিলেন এই পরিবর্তন। নূতন পরিবেশ, নবীন প্রেরণার আশায় ভলতেয়ারকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্যারিসে। ব্যর্থ হ'ল না তাঁর সেই আশা। প্যারিসে সেই হারানো ধারা আবার খুঁজে পেল পথ। একটার পর একটা নাটক বার হ'য়ে এল ভলতেয়ারের কলম থেকে। জীবনভোর অসংখ্য নাটক লিখেছেন ভলতেয়ার—আঠারো বছরে সুরু ক'রে তিরাশী বছরে শেষ হয়েছে এই রসধারা। সব নাটকই সফল হ'য়েছে এমন নয়। ১৭৩০ সালে Brutus আর ১৭৩২ সালে Eriphyle নিরাশ করলো সকলকে। বন্ধুরা নাটক লেখা বন্ধ করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কারুর পরামর্শ শোনবার লোক নয় ভলতেয়ার। সেই বছরেই তাঁর সবচেয়ে সফল নাটক Zaire দিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন সকলকে। এর পর ১৭৪১ সালে বার হ'ল Mahomet, ১৭৪৩ সালে Merope, ১৭৪৮ সালে Semiramis এবং ১৭৬০ সালে Tanoride। ফরাসী নাট্যসাহিত্যের ডালি ট্র্যাজেডি আর কমেডি দিয়ে পূর্ণ ক'রে দিলেন ভলতেয়ার।

এধারে জীবনেও তাঁর ঘনিয়ে এল ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। দীর্ঘ পনেরো বছর পর বান্ধবীকে আর ভাল লাগছিল না ভলতেয়ারের। ক্রমশঃ দু'জনের মাঝে সামান্যতম কলহও বন্ধ হ'য়ে গেল। এর ফল ফলতেও দেরী হ'ল না। ১৭৪৮ সালে মাদাম তরুণ এক মার্কুইসের প্রেমে পড়লেন। খবরটা কানে যেতেই দুর্জয় ক্রোধে গর্জন ক'রে উঠলেন বয়স্ক সিংহ। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বয়সের দোষগুলোই বা যাবে কোথায়! মার্কুইস এসে ক্ষমা চাইতেই স্নেহে গ'লে গেলেন তিনি। উদাস চোখ মেলে একবার চেয়ে দেখলেন সুদূর দিগন্তে। বেলাশেষের ম্লান আলোর রেশ তখনো জড়িয়ে আছে মেঘের গায়ে গায়ে। তাঁরও অস্ত যাবার সময় হ'য়ে এল অনেক আলো ছড়িয়েছে তাঁর ভাস্বর প্রতিভা ; এবার নবারুণের প্রতীক্ষাই শ্রেষ্ঠ পথ। চ'লে গেল মার্কুইস। কাগজ টেনে নিয়ে লিখলেন ভলতেয়ার, এই নারীর স্বরূপ বটে ! আমি একজনকে সরিয়ে বান্ধবীর অন্তরের সিংহাসন দখল করেছিলাম। আজ মার্কুইস আমাকে সরিয়ে অধিকার করেছে সেই সিংহাসন। প্রকৃতির এই নিয়ম—প্রত্যেককেই অন্যের জন্যে স্থান ছেড়ে দিয়ে যেতে হয়। এই নিয়মেই চলেছে আমাদের পৃথিবী। ভাবের আতিশয্যে অথবা নিজে পুরুষ ব'লেই শুধু নারীকে উদ্দেশ্য করেই রচিত হল এই দার্শনিক হা-হুতাশ।

১৭৪৯ সালে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যু হল বান্ধবীর। স্বামী এবং মার্কুইস দু'জনের সঙ্গেই মৃতদেহের পাশে দেখা হ'ল ভলতেয়ারের। এক ঈশ্বর ছাড়া কেউই জানলো না সব চেয়ে বেশি ক্ষতি কার হ'ল, কে হারালো সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ।

বান্ধবীর মৃত্যুতে সব কেমন শূন্য মনে হ'ল ভলতেয়ারের। Siecle de Louis xiv রচনায় মন দিলেন। কিন্তু কিছুতেই যায় না মনের ভার। এমন সময় Potsdam থেকে এল ফ্রেডরিকের আমন্ত্রণ, সঙ্গে রাহাখরচ ৩০০০ ফ্রাঁ। ১৭৫০ সালে বার্লিনের পথে যাত্রা করলেন ভলতেয়ার।

বার্লিনে যাবার অনেক আগে চিঠি লিখেছিলেন ভলতেয়ার আমি চাই তিন বা চারজন প্রতিভাবান পণ্ডিতের সঙ্গে থাকতে। আমাদের মধ্যে ঈর্ষার লেশমাত্র থাকবে না, শুধু থাকবে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা। একান্তে আমরা ক'জন থাকবো, নিজের নিজের বিষয় চর্চা করবো, পরস্পরের মধ্যে আলোচনা চালাবো আরো উন্নত কিছু সৃষ্টির আশায়। কবে যে আমার জীবনে এই ছোট স্বর্গীয় জীবনের আবির্ভাব হবে। বার্লিনে বাস্তবে রূপায়িত হল ভলতেয়ারের স্বপ্ন। স্বর্গীয় জীবনের আস্বাদ পেলেন তিনি।

বার্লিনে রাজকীয় জাঁকজমকের গণ্ডী এড়িয়ে চললেন ভলতেয়ার। ফ্রেডরিকের সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন রাত্রের ভোজন টেবিলে। কবি ও দার্শনিক হবার বাসনায় তখন উদ্বেল তরুণ

ফ্রেডরিকের মন। তাই এই ভোজসভায় ডাকতেন ভলতেয়ার এবং সামান্য ক'জন বাছা বাছা সাহিত্যিককে। ভোজন শেষে দীর্ঘকাল বয়ে চলতো আলোচনার স্রোত। কি স্বচ্ছ নির্মল সেই স্রোত, কি তীব্র তার গতিবেগ। আলোচনা চলতো ফরাসী ভাষায়। কারণ ভলতেয়ার অনেক চেষ্টা করেও জার্মাণ ভাষা আয়ত্ত করতে পারেননি। এই আলোচনা কেউ লিখে রাখার সুযোগ পায়নি, এ বিশ্ব সাহিত্যের দুর্ভাগ্য! লিখে রাখলে একাধিক বিষয়ে সমৃদ্ধ হত বিশ্বসাহিত্য। এই আলোচনাকে কেন্দ্র করে ভলতেয়ার লিখেছেন ফ্রেডরিক এক হাতে আঘাত আর অন্য হাত দিয়ে আদর করে—আমি অবশ্য কিছুতেই বিরক্ত হইনা পঞ্চাশ বছর তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে জাহাজ চালিয়ে, আমি এবার খুঁজে পেয়েছি নিরাপদ বন্দর। এখানে সব একটি কিছু তারই কাছে আমার মিলেছে এক রাজার স্নেহচ্ছায়া, দার্শনিকের আলাপ-আলোচনা, আর অনুরাগী বন্ধুর সাহচর্য···।

কবি ও দার্শনিক ভলতেয়ারের এত সুখ বুঝি সইলো না, হিসেবী, বাস্তববাদী ভলতেয়ারের। হঠাৎ সেই বছরের নভেম্বর মাস ভলতেয়ার স্যাক্সন বণ্ডে টাকা খাটাবার এক পরিকল্পনা ছকে ফেললেন। এই ধরণের টাকা খাটানোয় ফ্রেডরিকের যে কড়া নিষেধাজ্ঞা আছে তা তাঁর মনেই রইলো না। কালক্রমে বণ্ডের দাম চড়লো, বেশ দু'পয়সা লাভ হ'ল ভলতেয়ারের। কিন্তু বিপদ বাধালো তাঁর শত্রুরা। কথাটা পৌঁছে গেল ফ্রেডরিকের কানে। রাগে ফেটে প'ড়ে জানিয়ে দিলেন ফ্রেডরিক আর হয়তো এক বছর আমার প্রয়োজন হবে ভলতেয়ারকে। লেবুর রসটুকু পান ক'রে, ছিবড়েটা ফেলে দেওয়াই উচিত। রাজরোষের সংবাদ যথানিয়মে পৌঁছে গেল ভলতেয়ারের কানে। রাতের ভোজ তারপর ঠিকই চললো কিন্তু ছিবড়ের ভূত ঘাড়ে চেপে মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল ভলতেয়ারের। এই সময় লিখলেন ভলতেয়ার রাতে ঘুমিয়েও ছিবড়ের স্বপ্ন দেখি···পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়তে পড়তে বাতাসের নরম ছোঁয়ায় মুগ্ধ হয়ে যে ব্যক্তি বলেছিলেন সত্যিই আরামের, অবশ্য যদি এই পতন অনন্তকাল স্থায়ী হয়—তার তুল্য মহাপুরুষ আমি নই।

ইতিমধ্যে দেশের মাটিতে ফিরে যাবার জন্য মাসে মাসে ব্যাকুল হচ্ছিলেন ভলতেয়ার। দেশ ছেড়ে বেশি দিন থাকতে পারে না ফ্রান্সের লোক, ভলতেয়ারও পারছিলেন না। মনে মনে তাই তিনি ফ্রেডরিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। চায়ের পেয়ালায় তুফানের মতো সামান্য এক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বিচ্ছেদ ঘনিয়ে এলো। নানা দেশ থেকে পণ্ডিত-মনীষী এনে নবরত্ন সভা সাজিয়েছিলেন ফ্রেডরিক; উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণ জনগণকে নব-জাগরণের আহ্বান দেওয়া। ফরাসী দেশ থেকে এসেছিলেন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ Manpertuis। এই গণিতজ্ঞকে কেন্দ্র ক'রেই ভলতেয়ার আর ফ্রেডরিকের মধ্যে সুরু হ'ল দ্বন্দ্ব। জার্মাণীর একজন প্রায় অখ্যাত গণিতজ্ঞ Koenigএর সঙ্গে Manpertuisএর চলছিল তর্ক, বিষয় ছিল নিউটনের একটা সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা। ফ্রেডরিক নিয়েছিলেন Manpertuisএর পক্ষ। অদম্য ভলতেয়ার হিতাহিত বিবেচনা না করে নিলেন Koenigএর পক্ষ। এই সময় এক বান্ধবী শ্রীমতী ডেনিসের কাছে চিঠিতে লিখলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে আমি একজন লেখক এবং আমাকে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। আমার হাতে রাজদণ্ড নেই, আছে শুধু একটি কলম। ফ্রেডরিকও ঠিক একই সময় তাঁর বোনের কাছে চিঠি লিখলেন ভলতেয়ারকে অজস্র গালাগাল দিয়ে। কিন্তু শুধু চিঠি লিখে থেমে থাকবার মানুষ ভলতেয়ার নন। Manpertuisকে লক্ষ্য ক'রে লিখলেন তাঁর Diatribe of Dr. Akakin বিখ্যাত গণিতজ্ঞের বিরুদ্ধে ছাড়লেন মর্মভেদী বিদ্রূপ-বাণ। লেখা ফ্রেডরিককেও প'ড়ে শোনানো হ'ল। সারারাত হাসলেন ফ্রেডারিক এবং সকালে উঠে ভলতেয়ারকে লেখাটা প্রকাশ না করার জন্য জানালেন অনুরোধ। ভলতেয়ার কিছু না ব'লে চুপ করে রইলেন। তাছাড়া গত্যন্তরও ছিল না কারণ অন্যদিকে তখন ছাপার কাজ সুরু হ'য়ে গেছে। বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজরোষের আঁচ পেলেন ভলতেয়ার। অপেক্ষা না ক'রে যঃ পলায়তি নীতি অনুসরণ করলেন।

ফ্র্যাঙ্কফার্টে ধরা পড়লেন ভলতেয়ার। ফ্রেডারিকের রাজ্য-সীমানার বাইরে হ'লেও বেশ কিছুদিন আটকে থাকতে হল সেখানে। রাজকর্মচারীরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেনি। এসেছিল ফ্রেডারিকের লেখা কবিতা Palladiam-এর পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করতে। ভদ্রসমাজের জন্যে লেখা নয় এমন এক অশ্লীল কবিতার পাণ্ডুলিপি ভলতেয়ারের সঙ্গে চ'লে যাওয়ায় বিপদ বুঝেছিলেন রাজা ফ্রেডরিক। ভলতেয়ারও পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিয়ে অসহ্য বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন।

দীর্ঘপথ বেয়ে ফরাসীদেশের সীমান্তে এসে দাঁড়ালেন ভলতেয়ার। স্বদেশের মাটিতে পা দেবেন এবার। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। অভ্যর্থনার বদলে এল অচিরে স্বদেশ থেকে নির্বাসনের আদেশ। উদ্‌ভ্রান্ত ভলতেয়ার প্রথমটা কি করবেন ভেবে পেলেন না। একবার ভাবলেন সোজা চ'লে যাবেন আমেরিকায়। তারপর ক্রমশঃ শান্ত হ'য়ে জেনিভার প্রান্তে একটি কুটির কিনে রচনা করলেন শান্তির নীড়। অস্তাচলে যাবার আগে আর একবার রাঙিয়ে দিয়ে গেলেন মানুষের মনের আকাশ। সুরু হল তাঁর শ্রেষ্ঠতম এবং মহত্তম সৃষ্টির যুগ।

[ক্রমশঃ।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

—মিতা দিদি, একটু কাছে সরে এসো ভাই। ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন রাজাবাহাদুর। তাঁর কঙ্কালসার হাতখানি কেঁপে কেঁপে উঠছিলো বাহুবন্ধনে প্রিয়জনকে পাবার জন্য। দু' চোখে জ্বলছে তাঁর নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের অস্বাভাবিক দীপ্তশিখা।

—দাদু। এই যে আমি আপনার পাশেই বসে আছি। কান্নাভরা গলায় বললো সুমিতা। কিছু বলবেন আমায় ?

ওর দিকে ফিরে সতৃষ্ণদৃষ্টি মেলে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাও—না, আর কিছু নয়। কাজ আমার শেষ হয়েছে দিদি। তার পর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে থেমে থেমে বলতে লাগলেন— সব কথা আমি শুনেছি দিদি ডাঃ রুদ্রর কাছে। তোমাকে যাবার আগে একবার দেখবার জন্যে প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়েছিলো, আর এই সম্পত্তিগুলো কার হাতে দিয়ে যাবো, কে নেবে, সে ভার ? বড় ভাবনা ছি—লো। শুধু চেয়েছিলাম রুদ্রকে আর অনিরুদ্ধকে—উঃ! গলাটা বড় শুকিয়ে উঠছে—দাও তো, দিদি একটু···একটু ঠাণ্ডা জল···না, মা, আর কিছু নয়, সিষ্টার, তুমি নয় প্লিজ এক্সকিউজ মি—

সুমিতা ফিডিং কাপে একটু ঠাণ্ডা জল কম্পিত হাতে একটু একটু করে ঢেলে দিলো রাজা রাও-এর মুখে। দু' চোখ ছাপিয়ে ওর নেমেছে অশ্রুবন্যা।

—আপনি আর কথা বলবেন না রাজাবাহাদুর, একটু বিশ্রাম নিন এবার। অনুরোধ করলেন ডাঃ রুদ্র।

—না, না। অস্থির ভাবে মাথা নাড়লেন তিনি—বলতে দাও, বলতে দাও। হ্যাঁ, জানো দিদিভাই, ঐ দুটো সংলোককে চেয়েছিলাম, কিন্তু পেয়েছিলাম তার ডবল। তোমাকে আর ঐ দেবতার মতো—ঐ একরাশ আলোর মতো ছেলে—সুদামকে আজ যে ভগবান···আমার মৃত্যুশয্যার পাশে এনে দেবেন, ভাবতে পারিনি ভাই! তোমরা আমাকে মহা মু-ক্-তি দিয়েছো। আমার এই অভিশপ্ত সম্পদ মানুষের সেবায় খরচ করে দিও। আজ বুঝলাম দিদি, ঈশ্বর যা করেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য। পম্পাদিদি, যদি না যেতো, এ সম্পত্তি জনকল্যাণের জন্য উৎসর্গ করতে আমি পারতাম না। উঃ, বড় তেষ্টা! আ—রে—ক—টু জ—ল। হাঁ করলেন তিনি। সুমিতা ফিডিং কাপ নিতেই ইসারায় সুদামকে বললেন রাজা রাও—তাঁর মুখে জল দিতে।

রাজা রাওকে এবারে জল পান করালো সুদাম।

—আঃ! সৎসঙ্গ যে এত মধুর, এত শান্তিদায়ক তা এর আগে এমন করে বুঝিনি ভাই। তোমাদের হাতে, মানে, এই এক্জিকিউটিভ বোর্ডের হাতে রইলো আমার সব কিছু। হাসপাতাল, সেবাসদন, যা হয় কোরো ভাই।

—আপনি যে ভার দিলেন আমাদের ওপর রাজাবাহাদুর, আমাদের সমস্ত শক্তি, ও ইচ্ছা দ্বারা আপনার আদেশ আমরা পালন করবো, আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন—বললো সুদাম। অবনত হয়ে দু' হাত যোড় করে।

—আশীর্বাদ ? হ্যাঁ, প্রাণভরে আমার সকল শুভইচ্ছা, সব আশীর্বাদ, আমি নিজেকে উজাড় করে তোমাদের দিলাম ভাই। অস্থি-চর্মসার কাগজের মত শাদা রংএর হাতখানি তাঁর কেঁপে কেঁপে শূন্যে উঠে ধপ্ করে পড়ে গেলো বিছানার ওপর। অস্বাভাবিক জলজলে চোখ দুটি তাঁর হঠাৎ জলে ভরে এলো।

—জানো, মিতা দিদি। জানো ভাই ? ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন তিনি।

—দাদু, এই যে আমি, আপনার পাশেই—বলুন, কি বলবেন ?

—বলছি ভাই। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন তিনি—তোমার পিতামহ ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলো আমার সকল ব্যাপারেই কম্‌পিটিশন। মানে, তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে সুখ পেতাম। ঘোড়া, গাড়ী, বাঈজী, আর—সুন্দরী নারী, পোষাক, আষাক, সব কিছুতেই সে আমার কাছে হারবে না, আমিও তাকে হারাবোই, এই নিয়ে, আমরা দু'পক্ষ বহুৎ টাকা, উড়িয়েছি। তার মাথার ওপর, গার্জেন ছিলেন, আর আমি ছিলাম স্বাধীন। সেজন্যে, আমারই জিত হতো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু সব কেনা-বেচার শেষে, আজ হিসেব মেলাবার সময় দেখি, আমি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছি তার কাছে। সোমনাথের মত সাধু পুত্র, সুমিতার মত পৌত্রী তার বংশ উজ্জ্বল করে আছে। আর আমার ? একমাত্র ছেলে, ক্যান্সারে মরেছে। তার তিলে তিলে মৃত্যুযন্ত্রণা দেখেছি আমি। তারই মেয়েকে বুকে করে মানুষ করলাম, ওর মা কি করেছিলো জানো ? স্বামীর ক্যান্সার দেখে, ছোঁয়াচ লাগবার ভয়ে পালিয়েছিলো আমারই ভায়ের সঙ্গে। তারপর এতকাল পরে, তারই মেয়ে আবার পালালো। আমার বুকটা ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে, সেও পালালো ? হ্যাঁ। ওরা পালাবেই They are birds of passage।

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নীরব হলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাও। দু'চোখের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য যেন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো। চোখের দুটি কোণ বেয়ে নেমে এলো ক্ষীণ দুটি জলধারা।

—হ্যাঁ, মা। মহা-অরণ্যের এ একটি ক্ষুদ্র বীজ মাত্র। এর যে প্রয়োজন ছিলো তোমার কাছে আসবার। বলছিলেন গোপীদাস মহারাজ, আলোককে কোলে নিয়ে।

—কি বলছেন ? বুঝতে যে পারছি না। আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ? ব্যাকুল স্বরে শুধালো সুমিতা।

—সময় হলেই বুঝতে আপনিই পারবে মা। বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন সন্ন্যাসী—তোমার অন্তরে রয়েছে যে অনন্ত সুধা, একদিন এই ক্ষুদ্র ঘট ছাপিয়ে তা ছড়িয়ে পড়বে অনন্তেরই উদ্দেশে, শত সহস্র তৃষিত আত্মা শান্তি পাবে তাতে। সেই বিরাট উৎস এ ক্ষুদ্র ঘটে বদ্ধ থাকবে না মা।

চমকে উঠলো সুমিতা। সমস্ত অঙ্গে তার যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। বুকটা কেঁপে উঠলো থর থর করে। ব্যাকুল বাহু প্রসারিত

করে গুরুদেবের কোল থেকে আলোকাকে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলো নিজের বুকে।

—বাবা! আর্ত্তকণ্ঠে ডাকলো সুমিতা। গুরুদেবের পাশে কম্বলাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সোমনাথ। ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন তিনি।

—বল মা!

—আমার আলোকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন বাবা!

—আশীর্ব্বাদ করেছি মা। তোমার ঐ ক্ষুদ্র জলকণা, মহাসাগরে মিলিত হোক, ওর জীবন সার্থক হোক।

—বাবা, বাবা,—কান্নায় ভেঙে পড়লো সুমিতা সোমনাথের পায়ের ওপর।

গভীর স্নেহে দু'হাতে ওকে কোলে টেনে নিলেন সোমনাথ। আলোকাকে ওর কোল থেকে তুলে নিলো সুদাম।

—প্রাক্তন কর্ম্মের কণ্টকবন প্রায় পেরিয়ে এসেছো তুমি। দেহ-মন তোমার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে জানি, তবুও ধৈর্য্য ধরো মা। ক্ষুদ্র খেলাঘর, নিকৃষ্ট আনন্দ যে তোমার জন্য নয় মা। তোমার মাঝে চাপা রয়েছে বিরাট শক্তি। তাই বিরাট আঘাতের প্রয়োজনও। যা কিছু মালিন্য যা কিছু মিথ্যা সত্যকারের চালুনীতে তারই ঝাড়াই-বাছাই চলছে। তোমার খাঁটি সত্য সত্ত্বাটুকুকে, আলাদা করে নেবার জন্য। সেই বিরাটের লীলাসঙ্গিনী তুমি যে মা। মধুর স্বরে প্রশান্ত বললেন গোপীনাথ সুমিতার মাথায় হাত রেখে।

ডাক্তার দত্ত এসে বিনীত কণ্ঠে জানালেন,—আসুন আপনারা, উদ্বোধনের সময় উপস্থিত।

কমলা সেবাসদনের আজ শুভ উদ্বোধন। আমপাতা ফুলের মালা, আর পূর্ণ কলসের ওপর সশীষ ডাবে, হাসপাতালের গেটটি অনাড়ম্বর ভাবে সাজানো হয়েছে। গুরুদেব, সোমনাথ আর সুমিতার হাত ধরে গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

সামনেই ফুলেভরা ছোট একটি লন। লন পেরিয়ে হলে প্রবেশ করলেন সকলে। হলের দেওয়ালে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, খৃষ্ট, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, প্রভৃতি মহামানবগণের তৈলচিত্রের সঙ্গে টাঙানো ছিলো সোমনাথ-জননী [কমলার একখানি বৃহৎ আকারের তৈলচিত্র।

সব ছবিগুলোতে পরানো হয়েছে টাটকা বেলফুলের গোড়ের মালা। ঘরের কোণে কোণে জ্বলছে সুগন্ধি চন্দনধূপ। অন্যান্য ঘরগুলোতে সারি সারি বেড সাজানো রয়েছে। হাসপাতালের ল্যাবরেটারীখানি রকমারি ওষুধ আর যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ। যেখানে যেটির প্রয়োজন সব আছে। নিখুঁত সাজ-সরঞ্জামে প্রস্তুত কমলা সেবাসদন। অনেক গণ্যমান্য অতিথি এসেছেন। আর এসেছেন মহান হৃদয় বৈজ্ঞানিক, আর ডাক্তাররা, যাঁরা জড়িত আছেন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

হাসপাতালটি ঘুরে দেখবার পর সকলে এসে বসলেন হলে।

করবী শাঁখে ফুঁ দিয়ে মাঙ্গলিক ধ্বনি স্ফুরিত করলো। সুমিতা একছড়া বেলফুলের গোড়ে পরিয়ে দিলো গুরুদেবের গলায়।

গুরুদেব উঠে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত হাস্যের সঙ্গে বললেন—আমার পরম স্নেহভাজন, সাধু চরিত্র সোমনাথের এই মহান কর্ম্মক্ষেত্রটি সার্থক হোক। যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় আজ এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। পরমেশ্বর তাঁদের কল্যাণ করুন। তিনি আপনাদের শুভ শক্তি দান করুন মানব সেবার যোগ্যতা, ও নিঃস্বার্থ প্রেম আপনাদের দান করুন। একটু থেমে স্মিত হাসির সঙ্গে বললেন, আমি জানি, যশোলাভ বা সম্মানসূচক বাক্যের প্রয়াসী আপনারা নন, তবুও এইটুকু না বলে আমি নিরস্ত হতে পারছি না যে—সোমনাথের এই দায়িত্বপূর্ণ মহান কার্য্যের ভার যার ওপর দেওয়া হয়েছিলো, তিনি যে কতদূর সুযোগ্য ব্যক্তি তার প্রমাণ পেয়েছি তাঁর কাজের ভেতর দিয়ে। এই সাধু চরিত্র তরুণ ডাক্তারটির নাম সুদাম হালদার।

এঁর বাবাও ছিলেন পরম ধার্ম্মিক ও জ্ঞানবান। আজ তাঁর সুযোগ্য সন্তানের, আত্মত্যাগ, সাধুতা, ও কর্ম্মনিষ্ঠা, দেখে এই বুড়োর অন্তরটা যে কি গভীর আনন্দ অনুভব করছে, সে অনুভব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আপনারা সকলে ওকে আশীর্ব্বাদ করুন। সকলে ওর সহায়তা করুন, আর্ত্তের সেবার ভেতর দিয়ে সকলেই সেই পরমার্থের পূজা করুন।

তুমুল করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করলেন সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ও মহিলাবৃন্দ। লজ্জায় আনতবদনে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো সুদাম। নিজের গলা থেকে মালাটি খুলে সুমিতার হাতে আশীর্ব্বাদী মালাটি দিয়ে আদেশ করলেন গুরুদেব, যাও মা, আমার সুদামকে পরিয়ে দিয়ে এস।

গুরুবাক্য অবশ্যই পালনীয়। ভীরু পায়ে ধীরে ধীরে সুদামের সামনে এগিয়ে গেলো সুমিতা। তারপর জলভরা চোখ দুটি তুলে চাইলো, সেই দেবমূর্ত্তির দিকে।

হ্যাঁ। এই তো তার জীবনের পরম সত্য। সূর্য্যের মত মহাসত্যকে অস্বীকার করতে পারে কে? অন্তর্যামী গুরুদেব, তার অন্তরের সত্যলোকের দ্বার আজ খুলে দিয়েছেন। সকল লজ্জা, ভয়, সব সংশয়, সংস্কারের বন্ধনগুলো আজ ছিন্ন হয়ে গেছে তাঁর পুণ্যস্পর্শে। তবু কেন প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে? মালা পরাবার অর্থ যে আরেক রকম ছিলো। আর, আজ? অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস।

দাও মা। মালাছড়াটি পরিয়ে—

গুরুদেবের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে লজ্জা ও কুণ্ঠার ভারে অবনত সুমিতা, কম্পিত হাতে সুদামের গলায় মালা পরিয়ে দিলো। বিপুল হর্ষধ্বনি, ও করতালিতে ঘরখানি মুখরিত হয়ে উঠলো।

একটি ব্যথা-ছলো-ছলো কাতর চাউনি সুমিতার প্রতি নিক্ষেপ করে মালাটি গলা থেকে খুলে, পাশের টেবিলে রেখে দিলো সুদাম। অন্তর মথিত একটি দীর্ঘশ্বাসকে দমন করা বুঝি কিছুতেই আজ সম্ভব হলো না ওর পক্ষে।

ধীর পায়ে ও গিয়ে গুরুদেব আর সোমনাথের পদধূলি গ্রহণ করে, নিজের মায়ের, আর মিতার দিদিমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো।

আহা, বেঁচে থাকো দাদা বেঁচে থাকো। যেমন কৌশল্যা জননী, তেমনি তার রামচন্দ্র সন্তান, আ-হা-হা, দেখলে বুক জুড়িয়ে যায়। আর কি বরাতই করেছিলাম আমি মা!

আনন্দ উছলে পড়া কণ্ঠ থেকে শেষে জোড় ঝরে পড়লো দিদিমার।

ডাক্তার রুদ্র, অমিরুদ্ধ, ও অন্যান্য বক্তারা, সকলেই সংক্ষেপে কিছু কিছু বললেন। সবার শেষে সুদাম সকলকার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিনীত কণ্ঠে জানালো, স্বর্গীয় রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাও-এর বিরাট দানের কথা। এবং তাঁর মহান পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দেবার জন্যে চাইলো সকলকার সহায়তা ও শুভেচ্ছা।

ও কাজ এখন স্থগিত থাকবে সুদাম, গম্ভীর স্বরে বললেন গুরুদেব। এখনও সময় হয়নি, সামান্য বিলম্ব আছে ওর। তবে মহেন্দ্রপ্রতাপের আত্মা পরম শান্তি লাভ করেছে, তোমাদের মত কর্ম্মযোগীদের হাতে তাঁর অভিশপ্ত ধনভাণ্ডারটির ভার অর্পণ করে। তাঁর শেষ ইচ্ছা ও সংবাসনা অবশ্যই সিদ্ধ হবে।

এবারে সুমিতার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন গুরুদেব—তুমি খুব ভালো ভজন গাইতে পারো শুনেছি। দেখি একটা শোনাও তো মা।

—অনেক দিন যে গান গাইনি, গুরুদেব। মুখ নিচু করলো সুমিতা।

—নামকীর্ত্তন করার জন্যে অভ্যাসের প্রয়োজন নেই জননি। স্মিত হাস্যের সঙ্গে জবাব দিলেন গুরুদেব।

—আমার একটি ছোট্ট বক্তব্য আছে। গানের আগে সেটুকু আমায় বলতে দিন গুরুজি। উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে বললো অনিরুদ্ধ।

—বেশ, বলে যাও। আদেশ করলেন গুরুদেব।

বললো অনিরুদ্ধ—বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ বালুচরের নাম আপনারা অনেকেই জানেন ?

ভুরুচোখে বক্তার দিকে চাইলো সুমিতা। ওর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললো অনিরুদ্ধ—সেই কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী, 'ইছামতী' তাঁর বইয়ের লভ্যাংশ গ্রহণ করেন নি। বইখানির পঞ্চম সংস্করণ এখন চলছে এবং তার মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা আমার কাছে জমা আছে। 'ইছামতী' আমাকে আদেশ করেছিলেন, টাকাটা কোনো সৎকাজে ব্যয় করতে···সেজন্য আজ আপনাদের অনুমতি পেলে টাকাটা আমি 'কমলাসেবাসদন'কে উৎসর্গ করতে চাই।

আবার তুমুল করতালি দ্বারা প্রস্তাবটি গৃহীত হল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেলো।

—'ইছামতী'টি কে ? ওঁর আসল নাম কি ? মিটি মিটি হাসি ঠোঁটের ভাঁজে চেপে অনিরুদ্ধ এসে বসলো সুমিতার পাশে। ওর থরথর করে কাঁপা একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো,—একা গাইতে পারছো না বুঝি ? বেশ তো আমি আর রুবি আছি তো। কি গাইবে বলো, জানা থাকলে যোগ দেবো।

ওরা তিন জনে মিলে গাইলো—

ওহে ভক্তবল্লভ, ওহে সাধন দুর্লভ,
আমি কিছুই নাহিকো কব,
নীরব হৃদয়ে আঁকিয়া লইব
প্রেমমূরতি তব।

অপূর্ব ভাব আর সুরের ধ্বনিতে গম্ গম্ করতে লাগলো প্রশস্ত কক্ষটি। ভগবৎপ্রেমিকের আত্মনিবেদনের ব্যাকুল আকুতি, সুর-মূর্চ্ছনার মাঝে কেঁদে কেঁদে ফিরছিলো।

ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁর মুদিত নেত্র থেকে ঝরে পড়ছে প্রেমাশ্রুধারা।

সোমনাথের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো তাঁর জননী কমলার ছবিখানির ওপর। তাঁর চিরদুঃখিনী মায়ের মুখখানি যেন আজ শান্ত জ্যোতিতে ঝলমল করছে। ছবির তলায় পাথরের ফলকে খোদাই করা রয়েছে তাঁর জন্ম, ও মৃত্যু-তারিখ, ও তার তলায় রয়েছে কমলা সেবাসদনের প্রতিষ্ঠার দিনটি লেখা, উনিশ শো পঞ্চাশ সাল, বিশে বৈশাখ।

মায়ের কোল থেকে আলোককুমারকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সুদাম গিয়ে বসেছিলো সুমিতার পাশে।

আজ খোকনবাবুকে মনের মত করে সাজিয়েছে সুমিতা। দুধ-সাদা কিংখাপ সাটিনের ফ্রক্-এর সঙ্গে মানিয়ে পরিয়েছে নিজের ছোটবেলার গহনা। ধপধপে সাদা দুটি নধর হাতে মোটা মোটা হীরের বালা ঝলমল করছে। গলায় দামী মুক্তার দেলি, আর কপালের ওপর সোনালী চুলগুলো জড়ো করে, তাতে বেঁধে দিয়েছে একটি ছোট্ট হীরের তারা।

বিভোর হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে সুদাম। আর ওর দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসছে আলোক, ক্ষুদে হাতখানি নেড়ে, অবুঝ ভাষায় কত কি বলে যাচ্ছে।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো অনিল। নিচু গলায় বললো সুদামকে,—সাতটা বাজলো, এবারে আমি চ'লি সুদাম। রাত দশটায় ট্রেণ যদিও, তবুও গোছগাছ এখনও কিছু বাকি আছে।

আসতে পারবো না বলেও আজ আসতে হয়েছে ওকে, কারণ অসীম হিংস্র পশুর মত আক্রমণ করতে এসেছিলো সুমিতাকে। যখন সে চিৎকার করে বলছিলো—কখনই নয়। শা-লা, সুদামটার কুকীর্ত্তি আর সন্ন্যাসী ব্যাটার দানছত্র দেখতে যাবার জন্যে প্রাণটা যে একেবারে খাবি খাচ্ছে দেখছি। হবে না,—তা হবে না। আমাকে অবহেলা করে পা বাড়িয়েছো কি—গর্জ্জনের বাশটা হঠাৎ টেনে ধরলো অসীম। দু দরজায় দুহাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনিল।

—কি, খুন করবে না কি ? বলে যাও, থামলে কেন ? দুচোখে আগুন জ্বালিয়ে বললো অনিল।

—খুন ? ছোঃ। গোলাগুলী আমাদের মুখেই চলে, তার জন্যে দরকার পড়ে না কামান-বন্দুকের। ও সব পেশা তোমাদের জন্যে।

পায়চারী করতে করতে ঘাড় বেঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জবাব দিলো অসীম।

—You are right, মিষ্টার হালদার। তবে এটা ঠিক যে, বীরপুরুষের হাতের বন্দুক কামানের গোলাগুলীর চেয়ে, ঐ কাপুরুষের দাঁতের গুলী, আরো মারাত্মক আরো বিষাক্ত। বীরপুরুষের গুলীতে মানুষ একবার মরে, কিন্তু কাপুরুষের গুলীতে আছে, নিত্যকার মরণজ্বালা।

—তাই নাকি ? হা। হা। হা। হা। প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লো অসীম।

—মিতু! তুই একটু চট করে তৈরী হয়ে নে। ট্রেন তো আমার সেই রাত দশটায়, যাই একবার ঘুরে আসি তোর খোকনকে কোলে নিয়ে। তারপর একটু হেসে বললো অনিল—পুণ্যস্থানে যাওয়া নেহাৎ কপালে আছে যখন, তখন ঠেকায় কে?

চোখে কৌতূহল জাগিয়ে চাপা গলায় শুধোলো অসীম, কোথায় যাচ্ছো, রাত দশটায়?

—এই গোলা-গুলী নিয়ে একটু খেলা করতে। মানে শিকারে, জলপাইগুড়ি পাহাড়ে, সমতলে। সেই গিয়েছিলাম বছর আটেক আগে, তারপর যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, তাই আমার মেজাজের ধারটাকে একটু শানিয়ে নেবার বাসনা আর কি।

—হাঁ। হাঁ। মাঝে মাঝে এসব ভালো। তা না হলে জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগে। আর তুমি তো যাচ্ছো, চাসপাতাল দেখাতে, মিতাকেও নিয়ে যাও হয়ে,—আমায় একটু বিশেষ দরকারে সেখানে যেতে হবে কি না।

আশ্চর্য কোমল গলার স্বরটা অসীমের, মিতার কানে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকলো। যেন বাঘের কণ্ঠে হরিণের রব।

গাড়ীতে আসতে আসতে একটা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছিলো অনিল—মেজাজটা আমার দিনে দিনে ভারি কর্কশ হয়ে উঠছে। অযথা অসীমকে আক্রমণ করা যেন আমার একটা bad habitএ দাঁড়িয়েছে। না, না, এ বড় অন্যায়, নিজেকে সংশোধন করতেই হবে।

—ওর দিকে চোখ তুলে চাইলো একবার সুমিতা। কোনো জবাব দিলো না।

সেবাসদনে গিয়ে, এই প্রথম সে পরম ভক্তি ভরে, প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়েছিলো, গুরুদেব আর সোমনাথের।

—কি? হঠাৎ যেন একটা বড় পরিবর্তন জেগেছে তোমার ভেতর, মনে হচ্ছে? স্নেহ-করুণা ভরা দৃষ্টি তাঁর, ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে বলেছিলেন সোমনাথ।

—পরিবর্তন? তা হতেও পারে। তবে কি যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না জামাই বাবু! বাধা-ছলো-ছলো কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলো সে—একদিন যা বড় ভালো লেগেছিলো, আজ সে-সব যেন বিষ বলে মনে হচ্ছে। তাই মনে হয়, মাকে আর রুবিকে নিয়ে দিনকতক আপনার সঙ্গে ঘুরবো।

জবাব দেননি সোমনাথ। উদাস দৃষ্টি তাঁর তখন সুদূর গগনে, কি যেন অন্বেষণ করছে। সন্ন্যাসী গোপীনাথ তাঁর অন্তর্ভেদী, সাধনোজ্জ্বল দৃষ্টি প্রদীপের আলোতে কি যেন পাঠ করলেন অনিলের ললাটলিপিতে।

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ছাড়া শান্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নেই বৎস! ওঁর জ্যোতি বিচ্ছুরিত মুখের দিকে চাইলো অনিল। যেন অনন্ত শান্তি ও করুণা ঝরে পড়ছে ওঁর দুটি চোখ থেকে! বুকের দপদপানি জ্বালাটার ওপর যেন স্নিগ্ধ-শীতল প্রলেপ কে লাগিয়ে দিলো।

হেঁট হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা ছোঁয়ালো অনিল। ওর মাথায় পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে মৃদু কণ্ঠে উচ্চারণ করতে লাগলেন গুরুদেব ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

আলোকে সুধায়ের কোল থেকে তুলে নিয়ে আদর করে চুমো খেলো অনিল। তারপর ওকে নামিয়ে দিয়ে গেলো মায়ের কাছে।

নিচু গলায় বললো মাকে—এবারে আমি যাচ্ছি মা। ফিরে এসে,—তোমাকে নিয়ে যাবো গুরু মহারাজের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ করতে, কি বলো?

—যাবি বাবা? সেই ভালো। মনটা যেন আগুনে ঝলসে গেছে,—মায়ে-ব্যাটায় বেরিয়ে পড়বো ওঁর সঙ্গে এবার।

উঠে পড়লেন মায়া দেবী। অনিলের হাত ধরে গেট পর্যন্ত গেলেন ওর সঙ্গে। চোখ মুছতে মুছতে ভারি গলায় বললেন—দেরী করিসনে বাবা। অত দূরপথে যাবি,—সঙ্গে খাবার-দাবার নিয়েছিস তো? সব গোছ-গাছ ঠিকমত হয়েছে তো? আচ্ছা বাছা যে—আগে যখন গেছিস কোথাও, সাত দিন আগে থেকে যে আমি তোর জিনিষ গোছাতে সুরু করেছি।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁপাতে লাগলেন তিনি।

—মা। মা গো। অনিল জড়িয়ে ধরলো মাকে। ওকে বুকে টেনে নিলেন তিনি।

মার বুকে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদলো অনিল। এমন করে জীবনে আর কখনও কাঁদেনি সে। কি এক অসহ্য যন্ত্রণা যেন বুকের কলজেটা মুচড়ে দিচ্ছিলো, আজ সারা দিনটা ধরে। এতক্ষণে বুকটা অনেকটা হাল্কা বোধ হচ্ছে।

—ইস্। অনেক দেরী হয়ে গেলো মা! তুমি ভেবো না। লালকুঠিতে আর ফিরবো না, কুচবিহার থেকে সোজা তোমার কাছে ফিরে যাবো। দিন সাতেক থাকবো সেখানে। মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিয়ে গেট দিয়ে চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেলো অনিল। যতক্ষণ ওকে দেখা গেলো সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চেয়ে রইলেন মায়া দেবী। দর দর করে চোখের জলের ধারায় গাল দুটো ওঁর ভেসে যাচ্ছিলো।

বাড়ীতে পৌঁছে দেখলো অনিল, রাত্রি আটটা বেজে গেছে। ভেবেছিলো, তার যাবার সময় অন্ততঃ শুকতারা বাড়ী ফিরে আসবে। কিন্তু কৈ? উঃ কি হৃদয়হীনা! অন্যমনা হয়ে কোনোরকমে চাকরের সাহায্যে অসমাপ্ত গোছগাছ শেষ করলো সে। বারে বারে মনে কাঁটার মত বিঁধছে আজ সকালের ব্যাপারটা।

—একটু গুছিয়ে দাও না গো! ওসব আমার অভ্যেস নেই তো। আগে যখন বাইরে গেছি মা-ই সব ঠিক করে দিতেন কি-না। আর দেখো। কিছু খাবার দাবারও সঙ্গে দিও। আমার আবার ট্রেনে উঠলে বড় ক্ষিদে পায়। হাসতে হাসতে শুকতারার হাতটা চেপে ধরে বলেছিলো অনিল, তোমাকে এত করে সাধলাম, কিছুতেই তো গেলে না আমার সঙ্গে। সত্যি বলছি, যদি যেতে তুমি, খু-উব, ভালো লাগতো তোমার। আর আমারও।

—ও মা! আজই তোমার যাবার দিন? তা কাল মনে করিয়ে দিতে কি হয়েছিলো? হাতখানা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলো শুকতারা। জানোই তো আমার যাবার সময় নেই। তোমার না হয় দিন ফুরিয়েছে ছবির বাজারে, আমার তো আর তা নয়। ডেট দিতে না পেরে নিত্যি তো অফার ফিরিয়ে দিচ্ছি। তবে আজ অবশ্য স্যুটিং নেই, আ

বলে ওসব গোছগাছ করবার মতো সময়ও তো নেই। রতনলাল যে একটা জমকালো পার্টি দিচ্ছে আজ বাগানে। এই ন'টায় ব্রেকফাষ্ট, একটায় লাঞ্চ। সারাদিনই চলবে। দেরী করি কি করে বলো? ডিসি'প্লনটা মানতে হবে তো। দুদিন আগে মনে করিয়ে দিলেও কিছুটা করতে পারতাম। যাক্‌গে ছোট্টলালকে নিয়ে ওটুকু সেরে নিও।

নিখুঁত প্রসাধনে নিজেকে মনোমোহিনী রূপে সজ্জিতা করে রতনলালের পাঠানো বুইক্ কারে বেরিয়ে গিয়েছিলো শুকতারা।

একটা বোবা চিৎকার ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো পাক্ খেয়ে উঠে এসেছিলো ওর গলার কাছে। শুকতারার ব্যঙ্গপূর্ণ কথা আর প্রচ্ছন্ন অবহেলার বিষাক্ত তীরের তীক্ষ্ণ ফলাগুলো অন্তরটাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে ওর। ঘাড়ের দুপাশের মোটা মোটা শিরায় রক্তের শিরশিরাণি। মাথায় দপ দপ করে জ্বলছে যেন একথাবরা আগুন। হাত দুটো যেন নিস্‌পিস্ করে উঠেছিলো, শিকারী বাঘের থাবার মতো।

সেই জ্বালার খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলো, বিকেলে সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে ওপরে গিয়ে অসীমের ওপর।

এখন মন ওর প্রায় শান্ত হয়ে গেছে। তাই একটা কোমল বাসনা মনে ওর উঁকি ঝুঁকি মারছিলো, হয়তো সে সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসবে। যাবার মুহূর্ত্তটি তার একটু অনুরাগ রঞ্জিত করে দেবে।

—ইস। পৌনে ন'টা যে! হাতঘড়ির দিকে চেয়ে সচকিত হয়ে উঠলো অনিল। ছোট্টলালকে পাঠালো ট্যাক্সি ডাকতে। খাবার ব্যবস্থা হয়নি কিছু! ক্ষিদে পাচ্ছে খুব! যাক, ষ্টেশনে কিছু খেয়ে নিলেই হবে। একগ্লাশ জল ঢক্ ঢক করে খেয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লো অনিল।

ষ্টেশনে গিয়ে মালপত্র নামিয়ে কুলির মাথায় চাপিয়ে, ট্যাক্সির ভাড়া দেবার সময় মানিব্যাগটি খুলে অবাক হলো অনিল। খুচরো পয়সা টাকা মিলিয়ে সাত আট টাকার বেশী হবে না। তবে? নোটের তাড়াটা কোথায় গেলো? এ কি? ট্রেনের টিকিট? তারওতো পাত্তা নেই! মানিব্যাগে?···

অস্থিরভাবে হাতের মুঠোয় চুল টেনে ধরে ভাবতে চেষ্টা করলো অনিল।

ওঃ! তাইতো। ঠিক ঠিক। ছোট্টুলালকে বলেছিলো, সুটকেশ আর বেডিংটা ট্যাক্সিতে তুলে দিতে। সে তাই দিয়েছিলো। আর ছোট্ট হাতব্যাগটাতে টাকা, ট্রেনের টিকিট আরও দু চারটে দরকারী জিনিষ ভরে, সেটা রেখেছিলো ড্রেসিং টেবিলের ওপর, নিজের হাতে নেবে বলে।···কিন্তু মনটা যে কি হয়েছে, উঃ আর পারা যায় না। কুলিদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ষ্টেশনের ভেতরে যেতেই ছুটে এলো রমেন বোস, আরো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে।

—আরে? আচ্ছা কুঁড়ে লোক তো। এতক্ষণে যদি বা এসেছো অমন হাঁটি হাঁটি পা পা, করছো কেন? ট্রেন যে ছাড়বার সময় হয়ে এলো। ভীষণ ব্যস্তভাবে ওর হাতখানা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো রমেন বোস।

—আর কেন? হাসলো অনিল। আসল মাল ফেলে এসেছি। টাকা, ট্রেনের টিকিট সব। এখন সময় তো আর নেই যে ট্যাক্সি করে গিয়ে নিয়ে আসবো। যাক গে—তোমরা একটা উপকার করো আমার ভাই;—আমার মালগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এগোও তোমরা; আমি পরের ট্রেনে যাচ্ছি। এগুলো সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই আগে ওরাই যাক, আমি শুধু সেই ব্যাগটিকে প্রেয়সীর মতো বুকে জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

—আশ্চর্য্য! মন তোমার থাকে কোথায় হে? একসঙ্গে হৈ চৈ করে কতকাল পরে যদি বা যাবার সময় মিললো,—তা এমন করে নষ্ট করে দিলে? ঠিক আছে, তোমার ঝামেলাগুলোকে আমরাই নিচ্ছি। ঠিক পরের ট্রেনটা ক'টায় ছাড়বে, জেনে যাও। এবারে যেন আবার ব্যাগটাকে ভুলে দিয়ে, নিজে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। কিছু অসম্ভব নয় তোমার পক্ষে দেখছি।

সকলের মিলিত কণ্ঠের হাসিতে ট্রেনের কামরা যেন কেঁপে উঠলো।

—আরো কিছুক্ষণ রইলো ওদের সঙ্গে অনিল। তার পর নেমে এলো। ট্রেন ছেড়ে দিলো—রুমাল উড়িয়ে ওদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে হঠাৎ হাত ফস্কে রুমালটা ফরফরিয়ে উড়ে গিয়ে চলন্ত গাড়ির তলায় পড়ে গেলো।

একবার করুণ চোখে চাইলো, তার পলাতকা রুমালটির উদ্দেশে, তার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে চললো সে।

রুমালটা দিয়েছিলো ওকে শুকতারা,—একটি মনোরম সন্ধ্যায়। তাই ওটাকে হারিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওর।

প্রচণ্ড ক্ষিদের আগুন যেন জ্বলছে পেটের ভেতর। ষ্টেশনে কিছু খেয়ে নেবে কি না একটু দাঁড়িয়ে ভাবলো অনিল। মোগলাই গন্ধ ভেসে আসছে রেস্তোঁরাটা থেকে। নাঃ। থাক্—তাড়াতাড়ি বাড়ি যাওয়া দরকার, অতগুলো টাকা বাইরে পড়ে আছে। ব্যাগটা নিয়ে এসে কোথাও খেয়ে নিলেই হবে।

—রাত দশটা বেজে গেছে। বালিগঞ্জের বনেদি পথটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে।

ট্যাক্সিটা বাইরে ছেড়ে দিয়ে গেট দিয়ে পায়ে হেঁটে ঢুকলো অনিল। হয়তো মিতা এখনও ফেরেনি, তাই গেট এখনও খোলাই আছে। পাশের বেঞ্চিতে বসে দরোয়ান নাক ডাকাচ্ছে।

দূর থেকেই নজরে পড়লো ওর, শোবার ঘরে জ্বলছে মৃদু নীল আলোটা। মনটা যেন আনন্দে ছলছলিয়ে উঠলো—তারা তাহলে ফিরেছে ভালোই হয়েছে, ব্যাগটা ফেলে গিয়ে। ওকে একটু আদর করে, মনটাকে সুস্থ করে নিয়ে যাবে এবার।

চিঁ, চিঁ শব্দ করে পাশের গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে কেঁদে উঠলো কোন ঘুমভাঙা পাখী। আর ঝটপট করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো একটা কালপেঁচা, কর্কশ রব তার তীরের ফলার মতো বিঁধলো ঘন রাতের অখণ্ড নীরবতার বুকে।

পূর্ণিমার চাঁদের ওপর জমেছে খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ। চাঁদের আলোর উছলে পড়া হাসিটুকু এখন আর নেই। ম্লান বিষণ্ণ আলোর লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে থমথমে গাছগুলো দাঁড়িয়ে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে। কেমন যেন অদ্ভুত লাগলো ওর। এমন মৃত্যুর মত নীরবতা কৈ আগে তো কখনও নজরে আসেনি ওর? পশ্চিম দিগন্তে সর্পিল রেখায় বিদ্যুৎ খেলে গেলো, কার বাঁকা হাসির মতো। থমথমে স্তব্ধতা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ। হু হু করে যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে কালো কালো মেঘগুলো। আকাশের দিকে চাইতে চাইতে, চঞ্চল পায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে চললো অনিল।

কমলা সেবাসদন থেকে সোমনাথের সঙ্গে সুদামের বাড়ীতে গিয়েছিলো সুমিতা। সুদামের মা কিছুতেই ছাড়েননি ওকে।

—এত রাতে না খেয়ে যাবি? তাই কি হয়? তোর কিচ্ছু ভয় নেই, দাদা গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে তোকে। বলেছিলেন তিনি।

সোমনাথ, আর গুরুদেব রইলেন সুদামের বাড়ী। দু-একদিন থেকে ওঁরা চলে যাবেন। মায়া দেবী চোখের জলে ভেসে সোমনাথের দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—এবারে আমার একটা গতি করে দাও বাবা। প্রাণটা যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে; গুরুদেবের পায়ে আমায় একটু স্থান করে দাও।

গুরুদেব শান্ত হাসির সঙ্গে বলেছিলেন—দুঃখ যন্ত্রণা ভোগই যে শান্তিপথের প্রথম প্রবেশদ্বার মা! আত্মশুদ্ধি হবে ওর দ্বারাই; তারপরে আনন্দমার্গে যাবার অধিকার পাওয়া যায়।

গুরুদেবের দুটি পা জড়িয়ে ধরে মাথা রেখে বলেছিলেন তিনি, এ চরণ আর ছাড়ছি না বাবা। অনিল ফিরে এলে, দুজনেই সঙ্গ নেব আপনার, দয়া করে আশ্রয় দিতেই হবে।

—আমাদের ইচ্ছায় কিছু হয় না, তাঁর ইচ্ছা থাকলে সবই হতে পারে। গম্ভীর স্বরে জবাব দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী।

—যাবার সময় সোমনাথকে বললো সুমিতা—আপনাকে আমার কিছু বলবার আছে বাবা, আজ তো হলো না বলা, কাল আবার আসবো।

—আচ্ছা মা। তাই এসো। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন সোমনাথ। আলোক ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সুমিতার কোল থেকে ওকে নিজের কোলে নিলেন গুরুদেব। তারপর অনুচ্চস্বরে কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করে ওর মাথায়, গায়ে, সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিয়ে—ওকে সুমিতার কোলে ফিরিয়ে দিলেন।

সুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনকে কোলে করে সুদাম ট্যাক্সিতে উঠলো।

গাড়ীতে যেতে যেতে বললো সুমিতা—বাড়ীর ভেতরে গাড়ী নিয়ে যেও না দাদাদা। রাত দশটা বেজে গেছে, জানতো সবই। ব্যথা চুলচুলিয়ে উঠলো ওর কণ্ঠস্বরে।

—জানি মিতু। তোমাকে গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে, এই ট্যাক্সিতেই আমি ফিরে আসবো। জবাব দিলো সুদাম।

ওর একখানি হাত নিজের দুটি হাতের মুঠোয় নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো সুমিতা,—জলে ডুবে যাওয়া মানুষ যেমন করে জড়িয়ে ধরে, বাঁচবার একটি অবলম্বন হাতের কাছে পেলে।

—জানো দাদাদা'। কোমল করুণ কণ্ঠে বললো সে,—আজ বুঝতে পারলাম, জগতে শুধু দুঃখই নেই, আনন্দও আছে। কতকগুলো ছকবাঁটা পথেই শুধু সে আসে না, সে আসে নব নব রূপের ভেতর দিয়ে। যখন দুঃখের ঝড়-ঝাপ্টা আসে জীবনে, চারিদিকে দেখি শুধু কি ভীষণ অন্ধকার। তখন মনে হয় না এর পরেও আলো আছে; তাই মনে হয়েছিলো, আমি ফুরিয়ে গেছি। যে জীবনে শুধু ভুল, শুধু হতাশা তীব্র গ্লানি, আর মৃত্যু যন্ত্রণা, ছাড়া আর কিছু ছিলো না, সেই জীবনেই যেন আসছে আবার আলো, আশা, আনন্দ। আমি যেন কোন নতুন জীবনের স্পর্শ অনুভব করছি, মনে-প্রাণে। তাই মনে হয় দাদাদা' জীবনের এই ভুল, বিপর্য্যয়, বেদনা, কোনটাই বোধ হয় অর্থহীন নয় আমাদের পক্ষে।

—তোমার সত্য দর্শন, অভ্রান্ত মিতা। জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা আমাদের শ্রেণিবদ্ধ ভাবেই সাজানো আছে; আমরা শুধু চলেছি তার ভিতর দিয়ে। পূর্ব্ব পরিকল্পিত বন্ধনে যদি আবদ্ধ হতাম আমি, তাহলে, হয়তো নিজের উন্নতি, যশ অর্থ আর ভোগের দিকেই আমার মনটা নিবিষ্ট থাকতো মিতু! ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডিটাকেই পরমার্থ বলে মেনে নিতাম, শুধু সেইটুকুই আমার বলে জানতাম,—কিন্তু আজ তো আমার কাছে, আমার পরিচয় ঠিক তো তা নয়। আজ মনে হয় বিশ্বের সকলেই যেন আমার পরম আত্মীয়। মহাপ্রাণের যজ্ঞে এই ক্ষুদ্র জীবনের কণাটিকে উৎসর্গ করার নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুলতা অনুভব করি আমার সারা মনে প্রাণে। তোমার দিক্ থেকেও ঠিক ঐ একই কথা বলা যায় মিতা! যে মহাপ্রাণের পরশ পেয়েছ জীবনে তুমি, তা শুধু তোমার জীবনের ঐ দুঃসময় বিপর্য্যয়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আবেগ ভরা কণ্ঠে জবাব দিলো সুদাম।

—আমায় ক্ষমা করো দাদাদা'! একটু পায়ের ধুলো দাও আমায়, তোমার আশীর্ব্বাদে, যদি আমার মহাপাপের কিছু মাত্র ক্ষয় হয়! আমি যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি গো! ব্যাকুল হয়ে সুমিতা গেলো সুদামের পায়ে হাত দিতে—

—একি? একি? ওকে গভীর মমতায় নিবিড় অনুরাগে সুদাম কোলে বসিয়ে দিলো।

কোন পাপ, কোন ভুল কোনো অন্যায় তো তুমি করনি মিতু। বারংবার ও কথা বলে আমার মনে ব্যথা দিও না লক্ষ্মীটি। ওর মাথায় ওর পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো সুদাম—আমার মত তোমাকে আর কে জেনেছে মিতু? সাধ্য কি আমার তোমাকে ভুল বোঝবার? তুমি তো সেই মিতাই আছো আজও,—আর তোমার দামোদা' অনন্ত কাল থাকবে তোমার পাশেই। আমাদের এ বন্ধন কোনো মানুষের নয়তো মিতু। সে জন্য এ বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তিও কোনো মানুষের নেই। কোন এক অপার্থিব অব্যক্ত ভাবতরঙ্গে যেন নিমগ্ন হয়ে গেলো দুটি নির্মল আত্মা। সুদামের কোলে ঘুমন্ত ফোটা ফুলের মত এক দেবশিশু।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। চারিদিক স্থির নিস্পন্দ। যেন মহাপ্রকৃতি ধ্যাননিমগ্না পরমপুরুষের পাশে। সুখ, দুঃখ, লাভ ক্ষতি ভয় ভাবনা, পুলক, আনন্দ সব তরঙ্গগুলো এখন যেন শান্ত হয়ে দমিয়ে পড়েছে মহাসাগরের বুকে।

না কিছু হারায়নি ওদের জীবনে। সব আছে, সব আছে। মহাপ্রলয়ের পরও সব আছে, অনন্তকাল ধরে সব থাকবে।

অর্কিড হাউসের পাশ দিয়ে বাঁক ফিরে সরে গেছে রাস্তাটা গাড়ী বারান্দার দিকে। সেই পথেই ফিরে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো অনিল। ফিস ফিস করে ভেতরে যেন কারা কথা কইছে। এত রাত্রে ওখানে কারা? দরোয়ানটা তো গেট খুলে বসে নাক ডাকাচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে অর্কিড হাউসের দরজা খুলে ভেতরে দু-এক পা এগিয়ে গেল অনিল। না, কৈ, কেউ তো নেই, কতকগুলো ঝিঁঝিপোকা বোধ হয় শুকনো পাতার রাশ-এর ভেতর গুঞ্জন করছিলো, ওর পায়ের শব্দে থেমে গেছে। ফোয়ারার তলে জমে-থাকা পচা জল থেকে একটা ভাপসা গন্ধ উঠছে—সর সর করে পায়ের পাশ দিয়ে কি একটা চলে গেলো। সাপ নয় তো? ভয়ার্ত ভাবে তাড়াতাড়ি দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ যেন পায়ে কাঁটা দিলো অনিলের—থর থর করে যেন কাঁপছে মাটির তলাটা।

নেপালী মেয়ে। বিদ্যুৎ চমকের মতো উঁকি দিলো ওর মনের আকাশে। তাড়াতাড়ি বাইরে পালিয়ে এসে, খোলা জায়গায় বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিলো অনিল। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম, রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে অহেতুক ভয় পাওয়ার জন্যে, নিজের মনে একটু হেসে এগিয়ে চললো। বুকটা এখনও যেন কাঁপছে, ঐ অর্কিড হাউসের মাটিটার মতো।

ঘরের কাছাকাছি এগিয়ে আসতেই ওর কানে বাজলো, শুকতারার উছলে-পড়া হাসির শব্দ। চমকে উঠলো অনিল, এত রাত্রে ওর ঘরে কে? জুতো খুলে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে পর্দার ফাঁকে চোখ রাখলো সে।

ওর খাটের বিছানায় বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে অসীম আর তার বুকে এলিয়ে পড়ে খিলখিলিয়ে হাসছে শুকতারা। খাট সংলগ্ন টিপয়ে রয়েছে দুটি বোতল ও দুটি কাচের গ্লাসে কিছুটা পড়ে থাকা রক্তবর্ণ টলটলে তরল পদার্থ।

উঃ! দু' চোখ বন্ধ করে সরে এলো অনিল। হাসি নয়, ওর দু কানের পাশে শত শত কামান যেন গর্জ্জন করছে। সর সর করে ঘাড়ের দু পাশের শিরা বেয়ে গরম রক্তের স্রোত তীব্র উল্লাসে ছুটে উঠে আসছে মাথার ভেতর। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, দু' হাতে শক্ত হয়ে জেগে উঠেছে বজ্রমুষ্টি।

এক মুহূর্তের আত্মবিলুপ্তি। তার পর গলার কাছে পাক খেয়ে ওঠা এক আহত পশুর মুমূর্ষু গর্জ্জন,—সব কিছুকে রোধ করলো আর এক প্রতিহিংসাপরায়ণ অমানুষিক শক্তি।

এখনকার করণীয় কর্ত্তব্য সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করে, অরণ্য শ্বাপদের মত পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে নীচু হয়ে ঘরের পাশে বাগানের দিকের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো অনিল। খাটের পাশেই জানলাটা। উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখে নিলো, দরজায় খিল নেই—ঘরের ভেতরই যাওয়া যায়, তবে সেই মুহূর্ত্তে এই কাটা জানলা দিয়ে পালাতে পারে ওরা। না থাক, এখান থেকেই হবে।

পকেট থেকে বার করলো গুলীভরা পিস্তলটা। তার পর সজোরে পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে, পিস্তলের নিশানাটা ঠিক করে নিলো।

পর্দা সরানোর আওয়াজে অসীমের বুক থেকে মাথাটা একটু তুলে, ঢুলঢুলে রঙিন চোখ দুটি মেলে শুকতারা অনিলকে দেখে ভয়াবহ একটা চিৎকার করে মেঝেতে লাফিয়ে পড়লো। Help.. help.

চিৎকার শুনে অসীম যেই উঠে বসতে গেলো, গুড়ুম্ গুড়ুম্ করে গর্জ্জে উঠলো অনিলের হাতে ধরা পিস্তল। দুটো আগুনের হল্কার সঙ্গে গুলী ছিটকে এসে শুইয়ে দিলো অসীমকে আবার বিছানায়।

নিঃশব্দতার বুক বিদীর্ণ করে একটা মুমূর্ষ চিৎকার শেষ বারের মতো ছিটকে পড়লো অসীমের কণ্ঠনালী থেকে।

মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলো শুকতারা। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে কেঁদে উঠলো—Oh dearest, please, please, have mercy on me.

হাঃ। হাঃ! হাঃ। হাঃ। উন্মাদের মতো হেসে উঠলো অনিল, তার পর পিস্তলটা বেঁকিয়ে ধরে গুলী করলো ওকে লক্ষ্য করে।

মিস করলো গুলীটা বোধ হয়! বুকফাটা আর্ত্তনাদ করে শুকতারা ছুটলো দরোজার দিকে। আর মরিয়া হয়ে দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম করে পর পর গুলী ছুঁড়লো অনিল।

—কিন্তু ও কি হলো? ও কার কণ্ঠস্বর! দামোদা'-আ-আ... কে কেঁদে উঠলো অমন করুণ আর্ত্তনাদ করে? ঘর ভর্ত্তি ধোঁয়ার মাঝে দেখা যাচ্ছে ও কার অস্পষ্ট মূর্ত্তিখানি? কে? ওকে।

ছুটে রাস্তা ঘুরে ঘরের খোলা দরোজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো অনিল। এ কি? শুকতারা-নয়। আলোককে বুকে জড়িয়ে ধরে থর থর করে কাঁপছে দাঁড়িয়ে সুমিতা। [ক্রমশঃ।

কাল তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৫

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্যানি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ —

রমণী পণ্ডিতের উক্তি। সিংহও ঘুমিয়ে থাকলে তার মুখে হরিণ গিয়ে ঢোকে না। নিশ্চেষ্ট ভাবনায় কোন্ সমস্যারই বা সুরাহা হয়—চেষ্টা থাকা চাই। চেষ্টাই আসল। উদ্যমই আসল।

ধীরাপদর প্রচ্ছন্ন একটু ব্যস্ততা অনুভব করে অন্তরঙ্গ শুভানুধ্যায়ীর মত রমণী পণ্ডিত বলেছিলেন কথাগুলো। মজা-পুকুরের ধার দিয়ে ধীরাপদ একটু পা চালিয়েই শর্টকাট করছিল। তাড়া ছিল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর আগে হোটেলে খেয়ে নিতে হবে। এখানে এ-মূর্তি বিরাজ করছেন জানলে সোজা পথ ধরত। প্রাজ্ঞ-বচন শিরোধার্য করেই পাশ কাটিয়েছে। কিন্তু মনে মনে অবাক একটু, চেষ্টার কি দেখলেন এরা। বিগত ক'টা দিন ধরে ওকে ঘিরে সুলতান কুঠিতে একটা রহস্যের বুননি চলছে, আজ এই একজনের সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ধীরাপদ তার আভাস পেল। চিঠি আসা, চারুদির গাড়ি আসা, চারুদির আসা—এতগুলো আসার ধাক্কায় আলোড়ন একটু হবারই কথা। কিন্তু তা' বলে সিংহ যে জাগতে চলেছে ভদ্রলোক সেটা টের পেলেন কি করে? ওর এ-ক'টা দিনের চাল-চলনে চেষ্টার লক্ষণই বা কি ছিল।

চেষ্টার প্রথম ফল, হোটেল থেকে অভুক্ত ফিরতে হল। অফিস-টাইমের ভিড়ের সঙ্গে এতকাল পরিচয় ছিল না। নিয়মিত বেলা-শেষের আগন্তুক সে। এ-দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির। তাড়া না থাকলে বসে দেখার মত। ভোজন-পর্বে এমন তাড়া আর দেখেনি। টেবিলে থালা ফেলার ঠাঁই নেই। প্রত্যেকের পিছনে পিছনে পরের ব্যাচে যাঁরা বসবেন তাঁরা অসহিষ্ণু প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। এক একজনের পিছনে দু'জন করেও। তাড়াহুড়ো চেঁচামেচিতে পরিবেশন-রত কর্মচারীরা হিমসিম।

প্রত্যাবর্তন। ভাতের আশায় থাকলে কম করে আরো এক ঘণ্টা।

চেষ্টার দ্বিতীয় ফল, নির্দিষ্ট বাড়ির নির্দিষ্ট হল-ঘরে এসে দেখে 'জনমানব-শূন্য। আবছা অন্ধকার, জানালাগুলো পর্যন্ত তখনো খোলা হয়নি। হাফ-দরজার ও-ধারে উঁকি দিয়ে দেখে সেখানেও কেউ নেই। সিঁড়ির ওপাশে নিচের তলার মতই এক সারি ঘর। ধীরাপদর অনুমান এ বাড়ির ওটাই অন্দরমহল। কাজেই সেদিকেও বেশি উঁকিঝুঁকি দেওয়া সমীচীন বোধ হল না। হল-ঘরেই ফিরে এলো আবার। নিজেই দুটো জানালা খুলে দিয়ে আর একটা আলো জেলে বসল। একটা থমকানো শূন্যতা কিছুটা হাল্কা হল যেন।

ধীরাপদ বসে আছে। বসেই আছে।

ভুতুড়ে নেমন্তন্নের রসিকতার মত লাগছে। সেজেগুজে এসে দেখে হানাবাড়ি। এর মধ্যে নিচের তলায় ঘুরে এসেছে একবার, সাহসে ভর করে অন্দরমহলের কড়া নেড়েছে বারকতক, তার পর আবার এসে বসেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। যাঁর প্রবেশ তিনিও অপরিচিত। ছেঁড়া জুতো, মলিন ধুতি, কালচে কোট চড়ানো একজন প্রৌঢ়। ধীরাপদর প্রতীক্ষার কারণ শুনে একটু বিস্মিত।—এখানে দেখা করতে বলেছেন?

কোথায় দেখা করতে হবে নির্দেশ না থাকায় ধীরাপদর ধারণা এখানেই। মাথা নাড়ল বটে কিন্তু প্রশ্ন শুনে নিজেরই খটকা লাগছে একটু।

বসুন তাহলে। ভদ্রলোকের নির্লিপ্ত মুখে একটুখানি বিমর্ষ ছায়া পড়ল কিনা ঠিক ঠাওর হল না। হাফ দরজার কাছাকাছি হল্-এর এক কোণে টাইপ রাইটারের দিকে এগোলেন। চেয়ারের কাঁধে কোট ঝুলিয়ে টাইপ রাইটারের ঢাকনা খুলে বসলেন তিনি।

বসে বসে ধীরাপদর ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। বড় দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা আরো দু'পাক ঘুরেছে। টাইপের অতি-মন্থর খট-খটও এবার বোধহয় থেমেই গেল। দু'ঘণ্টায় পুরো এক পাতাও টাইপ করা হয়েছে কি না সন্দেহ! চেয়ার ছেড়ে ভদ্রলোক কাছে এলেন, পরে তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কই কেউ এলেন না তো?

ধীরাপদর মনে হল তাঁর নির্লিপ্ত মুখের সেই ছায়াটা সরে গেছে। 'নজীব প্রতীক্ষা দেখে পান-খাওয়া ঠোঁটের কোণে উল্টে হাসির আভাসের মত। অর্থাৎ, কেউ এলে সেটাই বিস্ময়ের কারণ হত।

কেউ খোঁজ করলে বলে দেবেন টিফিনে গেছি।

খোঁজ কেউ করবেন না সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ত, আর টিফিন থেকে ফিরবেন না উনি তাও নিশ্চিত বোধহয়। কারণ, কোটটা আবার গায়ে উঠেছে আর টাইপরাইটারের ওপরেও ঢাকনা পড়েছে।

হল্-ঘরে একা আবার। এতক্ষণ ভাবছিল, দুপুরের খাবার

সময় হলে সাহেবদের আবির্ভাব ঘটবে। এখন সে সম্ভাবনাও দেখছে না। ধীরাপদ উঠে পড়বে কি না ঠিক করার আগেই আর এক মূর্তির আবির্ভাব। কালকের সেই পরিচায়ক গোছের লোকটি, ঘুমের তাড়ায় যে তাকে ওপরে ঠেলে পাঠিয়েছিল। এসেই কৈফিয়তের সুরে বলল, টাইপবাবু বলে গেলেন আপনি সেই সকাল থেকে বসে আছেন, কলিং-বেল টেপেননি, আমি কি করে জানব বলুন—

যেন তার জন্যেই ধীরাপদ এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে আর সে সেটা জানে না বলে অনুতপ্ত। কথাবার্তায় আজ আর লোকটাকে তেমন বাকবিমুখ মনে হল না ধীরাপদর, মাঝে মধ্যে একটা আধটা প্রশ্ন করে সংলগ্ন এবং অসংলগ্ন অনেকখানি তথ্য আহরণ করা গেল। যেমন, 'সকালোয়' বাড়িতে তো কাউকে দেখা করতে বলা হয় না, ধীরাপদকে বড় সাহেব ফ্যাক্টরীতেই যেতে বলেছেন বোধহয়—না, সাহেবদের বাড়িতে খাবার পাট নেই, দু'বেলাই সকলে বাইরে খান—মাঝে সাজে ডাল-চচ্চড়ি-সুক্তোর ঝোল খেতে ইচ্ছে গেলে ভাগ্নেবাবু আগে থাকতে ওকে খবর দেন, ওই তখন সব ব্যবস্থা করে রাখে, কিন্তু ভাগ্নেবাবুর কাছে সবকিছু করার বাহাদুরী নিতে চেষ্টা করে কেয়ার-টেক বাবু—দু'টাকা বাজার করে দশ টাকা লিখে রাখে, বড়সাহেবের তো আর কেয়ার-টেক বাবুর লেখা উল্টে দেখার সময় নেই, মাসকাবারে টাকা ফেলে দিয়েই খালাস! কিন্তু এই মানকে মুখ্যু হলেও বোঝে সব, বুঝেও মুখ বুজে থাকে, জলে নিবাস করে তো আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না!

খেই হারিয়ে মানকের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মুখটাই আলগা হয়ে গেল। কে ভাগ্নেবাবু বা কে কেয়ার-টেক বাবু ধীরাপদর বোধগম্য হল না।

—সাহেবরা ফেরেন কখন? একেবারে সেই রাত্তিরে। কেউ এখন কেউ ত্যাখন। শুধু ভাগ্নেবাবু মাঝে সাজে ই'দিক-সিদিক চলে যান। সাহেবরা দু'জন রোজই ফেরেন, কখন কর্তা নড়ে উঠবে বা গাড়ির শব্দ শোনা যাবে সেই পিত্যেশে কান খাড়া করে এই মানুককেই ঠায় জেগে বসে থাকতে হয়—কেয়ার-টেক বাবুর তখন 'কুম্ভকর্ণের' নিদ্রা, আর সকালোয় উঠেই সাহেবদের কাছে এমন 'মুখ' দেখাবেন যেন মাঝ রাত অবধি তিনিই জেগে বসেছিলেন।

—ফ্যাক্টরীতে গেলে কার সঙ্গে দেখা হতে পারে? সকলের সঙ্গেই—বড়সাহেব ছোটসাহেব ভাগ্নেবাবু মেম ডাক্তার—মেম-ডাক্তারকে অবিশ্যি 'বিকেলোয়' ওষুধের দোকানেও পাওয়া যাবে, তেনার সঙ্গে দেখা হলে তিনিও সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন—ব্যবস্থাপত্রের ভার তো সব মেম-ডাক্তারেরই হাতে! সঙ্গে সঙ্গে কি মনে হতে রোগাটে মুখের কোটরাগত চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠেছে একটু। গলার স্বর নামিয়ে বলেছে, টাইপ বাবু বললেন আপনার চাকুরি হয়েছে এখানে, আপনি তো এখন ঘরের লোক, বলতে দোষ কি—সুযোগ সুবিধে হলে মেম ডাক্তারকে একটু বলে কয়ে দেবেন কারখানায় যদি চাপরাশির কাজটা জান, বাড়ির কাজ করেই 'কত্তে' পারব—আমি নিজেই একবার সাহসে 'নির্ভর' করে মেম ডাক্তারকে বলেছিলাম, তা তিনি ভুলেই গেছেন বোধহয়—এতকাল কাজ কচ্ছি এটুকু না হলে আর
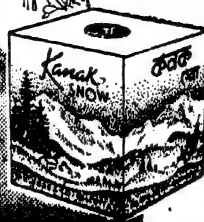
আশা কি বলুন—এখানে কেয়ারটেক বাবুটিতো সর্বক্ষণ বুকে পা দিয়েই আছেন, যেন তেনারই খাস-তালুকের প্রজা আমি !

নদীর গতি সমুদ্রে, মানকের সব কথার বিরাম কেয়ার-টেক বাবুতে এসে। মুরুব্বি ধরা দেখে ধীরাপদর হাসি চাপা শক্ত হচ্ছিল। সকল ব্যবস্থা-পত্রের কর্ত্রী মেম ডাক্তারটি কে অনুমান করা যাচ্ছে। সেই মেয়েটিই হবে। আর কেয়ার-টেক বাবু কেয়ার-টেকার বাবু হবেন। তবু এবারে জিজ্ঞাসা করল, কেয়ার-টেক বাবুটি কে ?

—কেয়ার-টেক বাবু বুঝলেন না ? ইঞ্জিরীতে বলে—নিজেই নিজের নাম দিয়েছে, আসলে ও হল বাজার সরকার, বুঝলেন ? গিন্নিমায়ের বাপের দেশের লোক কি না তাই পো বারো—গিন্নিমা চোখ বুঝতে এখন তো সর্বেসর্বা ভাবেন নিজেকে, দু-হাতে সব ফাঁক করে দিলে, ইদিকে আমি সোরা থেকে জল গড়াতে গেলেও সন্দোয় সন্দোয় ইঁদুর ধরা বেড়ালের চোখ করে তাকাবে—যেন বাসুক ভেঙে টাকা সরাচ্ছে ! কাউকে তো বলা যাবে না কিছু, কথাটি কওয়াই দায়, এক ভাগ্নেবাবুকে বলা যায়—তিনি লোক ভালো। কিন্তু তেনাকেও আগের ভাগেই হাত করে বসে আছে, বাপের পিসীর মত দরদ দেখায়। তবু তেনাকে বললে শুনবেন, ডেকে ধমক ধামকও করবেন—কিন্তু তারপর ? ভাগ্নেবাবু তো সর্বোক্ষণ নিজের তালে থাকেন, নিজের তালে ঘোরেন—কেয়ার-টেক বাবু তখন আমার কলজে ছিঁড়ে কালিয়া বানিয়ে খাবে !

ধীরাপদর হাসিও পাচ্ছে, দুঃখও হচ্ছে। যেন সে-ই ওকে ভাগ্নেবাবুর কাছে কেয়ার-টেক বাবুর বিরুদ্ধে নালিশের পরামর্শটা দিয়েছিল। ভাগ্নেবাবুটি কে ধীরাপদ এখনো জানে না। কিন্তু আঁচ করতে পারছে। সেই লোকটাই হবে—সেই অমিতাভ ঘোষ মানকের মুখে ভাগ্নেবাবুর স্বভাব আর আচরণের আভাসে সেই রকমই মনে হয়। শুধু তাই নয়, গতকাল হিমাংশু মিত্র ছেলেকে যার সঙ্গে দেখা হলে ঘড়ি ধরে তাঁর ছুলন্ট অপেক্ষা করার কথা জানাতে বলে দিয়েছিলেন, ধীরাপদর এখন ধারণা সেও ওই একই লোকের প্রসঙ্গে।

মানকের হাবভাব হঠাৎ বদলাতে দেখে ধীরাপদ ফিরে তাকালো। আধময়লা ধুতির ওপর ফটফটে শাদা গেঞ্জি গায়ে যে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল, তাকেদেখা মাত্র ধীরাপদ বুঝল, ইনিই কেয়ার-টেক বাবু। মানুকের মতই লম্বা, রোগা—ফর্সা মুখে তামাটে ছোপ। অনাবৃত বাহু দুটিতে যেন আগাগোড়া তামাটে ছিটের কাজ করা। মাথা-জোড়া তেল-চকচকে টাকের ওপর গোটাকতক মাত্র কাঁচা-পাকা চুল মাথার মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনো। এক-নজর তাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর প্রশ্ন করল, টাইপ বাবু বলে গেলেন আপনি নাকি সাহেবদের জন্য তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছেন ?

সম্ভাব্য অপরাধীকে যেভাবে জেরা করা হয়, অনেকটা সেই সুর। তার আপাদ-মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে ধীরাপদ জবাব দিল, তার ঘোষই হবে—

মানুকে !

দ্বিতীয় ব্যক্তিটির দিকে ঘুরে হাতে-নাতে এবারে আসামীই গ্রেপ্তার করা হল যেন। কিন্তু ধীরাপদ লক্ষ্য করল, ওই এক ডাক শুনেই মানকের এতক্ষণের নিরীহ মুখে রুক্ষ ছাপ পড়ে গেছে একটা। অভিযোগ সম্বন্ধে ঠিক সচেতন নয় বলেই মুখে ঈষৎ উদ্ধত প্রতীক্ষা এবং জবাবের প্রস্তুতি।

কেয়ার-টেক্ বাবুর ঝাঁঝালো অনুশাসনে মানকের অপরাধ বোঝা গেল।—নতুন কাজে লাগতে এসে ভদ্রলোক তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছেন আর তুই কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে বলে দিসনি, আমাকেও ডাকিসনি ! কোম্পানীর এই তিন ঘণ্টার লোকসান কে দেবে ? আর উনি যদি সাহেবদের সে-কথা বলেন, আমার মুখ থাকবে কোথায় ?

ধীরাপদ তাজ্জব। এদিকে মানকেরও সমান ওজনের জবাব, বাবু তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছেন আমি কি গুনে জানব ? উনি কি বেল্ টিপেছিলেন—জিগেস করুন তো !

ও···কেউ এলে ঘণ্টা বাজিয়ে শাঁখ বাজিয়ে তোমাকে জানাতে হবে আর তা না হলে পালঙ্কে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে সারাক্ষণ তুমি চুরির মতলব ভাঁজবে, কেমন ? আসুক আজ সাহেবরা, দুর দুর করে না তাড়াই তো কি বললাম—

সাহেবদের নামে মানকের সুর বদলালো একটু কিন্তু গলা নামলো না। ধীরাপদকেই একটা জাজ্বল্যমান অত্যাচারের সাক্ষি মানল সে।—দেখলেন ? যা নয় তাই বললে, দেখলেন ? আচ্ছা আমার কি দোষ বলুন তো, এতবড় বাড়ি, হাতী গললে টের পাওয়া যায় না, আপনি তো মানুষ—তাও বেল্ টেপেননি—

ফের টকটকিয়ে কথা ?

একটা থাপ্পড়ের মতই ঠাস করে কানে লাগল। মানুকের মুখ বন্ধ। রাগে গজগজ করলেও আর মুখ খুলতে ভরসা পেল না। কেয়ার-টেক বাবু এবারে দুই চোখে ধীরাপদকে ওজন করে নিল একটু।—আপনি কোথায় কাজে লেগেছেন, ওষুধের দোকানে না ফ্যাক্টরীতে ?

ধীরাপদ ভাবছে, কাজে লাগার কথাটা টাইপ-বাবুকে না বলাই ভালো ছিল। জবাব দিল, দেখা যাক—

লোকটি চিন্তান্বিত।—আপনি না-হয় ওষুধের দোকানেই চলে যান এখন, বিকেলে মিস সরকার সেখানে এলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেবেন।

ধীরাপদ উঠে দাঁড়াল, হাসল একটু।—আজ আর কোথাও না, সাহেবরা এলে বলে দেবেন।

কেয়ার-টেক বাবু বিলক্ষণ বিস্মিত, আজ কোথাও না মানে আজ কাজে জয়েন করবেন না ? কাজ পেয়ে কাজে লাগায় আগ্রহ নেই এ আর দেখেনি বোধহয়। একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি থাকেন কোথায় ?

রসিকতার লোভ এবারে কিছুতে আর সংবরণ করা গেল না। মানুকের সঙ্গে আগে আলাপের দরুনই হোক বা তার প্রতি কেয়ার-টেক বাবুর অবিচারের ফিরিস্তি শুনেই হোক, ধীরাপদর সহানুভূতি আপাতত আগের জনের প্রতি। তার পর ওর সামনেই যে-ভাবে দাবড়ানী দিয়ে থামালো লোকটাকে তাতেও টানটা দুর্বলের দিকেই হওয়াটা স্বাভাবিক। কেয়ার-টেক বাবুর দিকে চেয়ে হেসেই জবাব দিল, এখন পর্যন্ত থাকার ঠিক নেই কিছু, খুব সম্ভব এখানেই থাকব···

সঙ্গে সঙ্গে মুখের চকিত রূপান্তর। শুধু কেয়ার-টেক বাবু নয়, রমেনকেও ক্ষোভ ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তার পর নিজেদের মধ্যেই দৃষ্টি বিনিময়। শাদা অর্থ, এ আবার কি ঝামেলার কথা!

হাসি চেপে ধীরাপদ দরজার দিকে এগোলো। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রমণী পণ্ডিতের কথাটাই মনে পড়ে গেল। সিংহও ঘুমিয়ে থাকলে নিজে থেকে হরিণ গিয়ে তার মুখে ঢোকে না—চেষ্টা থাকা চাই। জবাব দিলে হত, শনির দৃষ্টি সামনে পড়লে চেষ্টাতেও কিছু হয় না, পোড়া শোলমাছও পালায়—

কিন্তু ধীরাপদর কিছু যেন লোকসান হয়নি, এতক্ষণের প্রতীক্ষার ক্লান্তিও তেমন টের পাচ্ছে না আর। ওই লোক দুটিই অনেকটা পুষিয়ে দিয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের এই আল-বাঁধা ক্ষেতে কত রকম জীবনের চাষ তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে।

বাবু! বাবু!

ধীরাপদ ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, ব্যস্ত-সমস্ত ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল।

তাকেই ডাকা হচ্ছে। ডাকছে মানুকে।

হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বড়সড় একটা দম নিয়ে উদ্ভাসিত মুখে জানালো, এক্ষুনি ফিরতে হবে, ফ্যাক্টরী থেকে ছোট সাহেবের টেলিফোন এসেছে।

ইচ্ছে খুব ছিল না, তবু ফিরতেই হল। কিন্তু বাড়ি পর্যন্ত যেতে হল না। গায় জামা চড়িয়ে আর ক্যাম্বিসের জুতোয় পা গলিয়ে কেয়ার-টেক বাবু নিচে নেমে এসেছে। গম্ভীর মুখে সংবাদ দিল, ভায়েবাবুর খোঁজে ফ্যাক্টরী থেকে ছোট-সাহেবের টেলিফোন এসেছিল। কেয়ার-টেক বাবু ধীরাপদর কথা জানাতে তার ওপর হুকুম হয়েছে ওকে সঙ্গে করে ওষুধের দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসতে। অতএব—

ধীরাপদ আপত্তি করল না।

মধ্য কলকাতার সাহেব পাড়ায় মস্ত ওষুধের দোকান। রাস্তায় দশ-বিশ গজ দূরে দূরে যেমন দেখে তেমন নয়। চোখে পড়ার মতই। গোটা একটা দালানের সমস্ত নিচের তলাটা দোকানের দখলে। এমাথা-ওমাথা কাউণ্টারে কম করে পনের বিশজন কর্মচারী দাঁড়াতে পারে। মাঝে মাঝে গ্লাসকেস্-এ ওষুধ সাজানো। কাউণ্টারের এধারে আগাগোড়া শোয়ানোএল্ সেপ কাচ দরজার আলমারি। চার আঙুলও ফাঁক নেই ভিতরে, ওষুধে ঠাসা। ভিতরের একদিকে 'ডিসপেনসিং' রুম—মিকশ্চার পাউডার ইত্যাদি তৈরি হয় সেখানে। অন্যদিকে ডাক্তারের চেম্বার। চেম্বারের সামনে গোটাকতক শৌখিন বেঞ্চ পাতা কয়েকটা মোম-পালিশ চেয়ারও।

দুপুরে এতবড় দোকানটার ঝিমন্ত অবস্থা। এদিক-ওদিকে দু'-চার জন খদ্দের মাত্র। কর্মচারীও এ-সময়ে পাঁচ সাতজনের বেশি দেখল না। ডাক্তারের চেম্বার শূন্য। দূরে আর এক কোণে তকে তকে আবা-কাঠ আর আধা কাচ-ঘেরা ক্যাশ-চেম্বার।

হালফ্যাশানের বিলিতি কায়দার দোকান।

ধীরাপদকে সঙ্গে করে এনে প্রথমেই ম্যানেজার বাবুর খোঁজ করল কেয়ার-টেক বাবু। চারটের আগে ম্যানেজার বাবু ডিউটিতে আসেন না শুনে নিজের পছন্দ-মত বাইশ-চব্বিশ বছরের একটি চটপটে ছোকরাকে ডেকে তার হাতে যেন সঁপেই দিয়ে গেল ধীরাপদকে। বলে গেল, সাহেবদের নিজের লোক তাই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে—ম্যানেজার এলে যেন তাকে বলা হয়, আর ভালো করে কাজকর্ম শেখানো হয়।

ছেলেটি সকৌতুকে সাহেবদের নিজের লোকের আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল।

কর্তব্য শেষ। কেয়ার-টেক বাবুর প্রস্থান। ধীরাপদর ধারণা, সে-ও মিত্র-বাড়িতে আস্তানা নিতে পারে সেই আশঙ্কাতেই তার এই অন্তরঙ্গ সতর্কতা।

সদ্যপরিচিত ছেলেটি রসিক আর তার রসনাও একটু মুখর। অন্তত সংযত নয় খুব। ধীরাপদকে নিয়ে কোণের বেঞ্চিতে বসল। নাম জেনে নিল, নিজের নাম বলল। রমেন, রমেন হালদার। ছ'বছর ধরে এই দোকানে কাজ করছে। ধীরাপদ আগে কোন্ দোকানে কাজ করত, ডিসপেনসিং শিখবে না কাউণ্টারে দাঁড়াবে? কোনো কিছুরই অভিজ্ঞতা নেই জেনে অবাক একটু। এত লোক থাকতে আর একজন লোক ঢোকানো দরকার হল কেন! ও, সাহেবদের নিজের লোক তাই। মনে মনে হাসছে, কেমন নিজের লোক তা এই সামান্য কাজে ঢোকা দেখেই বুঝে নিয়েছে।

চমৎকার দোকান? এ তল্লাটে বাঙালীর এতবড় দোকান আর কই। এখন তো দোকান ফাঁকা, দেখবেন বিকেলে আর সন্ধ্যার পর। সকালেও ভিড় থাকে কিছু, বিকেলের মত অত নয়। সন্ধ্যার পর তো এক-কুড়ি লোক কাউণ্টারে দাঁড়িয়েও হিমসিম খায়। আর ঠেলে রোগীও আসে তখন, সে-সময় আবার ডক্টর মিস্ সরকারের চেম্বার-আওয়ার্স তো—।

পলকের কৌতুকাভাস ধীরাপদর চোখ এড়ালো না। দোকানে সবসুদ্ধ চারজন ডাক্তার বসেন। সকাল আটটা থেকে দশটা একজন, দশটা থেকে বারোটা আর একজন। তারপর বিকেলে চারটা থেকে ছ'টা একজন, শেষে ছ'টা থেকে আটটা মিস সরকার। প্রথম তিন ডাক্তারই বিলেত ফেরত, তবু মিস সরকারেরই রোগী বা রোগিনী বেশী। মন্তব্য, হবেই তো, রাতের দিকেই সব রোগের জোর বাড়ে, বুঝলেন না?

ধীরাপদ বুঝল। মাত্র বাইশ তেইশ হবে বয়েস। পেকেছে ভালো।

মিস সরকার···কোম্পানীর কেউ, না শুধু ডাক্তার?

ব্যস্, এইটুকু থেকেই রমেন হালদার আরো ভালো করে বুঝে নিয়েছে কেমন আপনজন সাহেবদের। নিশ্চিন্তে মুখ আলগা করা যেতে পারে আরো একটু। বলল, আপনি কি রকম আপনার লোক দাদা সাহেবদের—মিস সরকারকে চেনেন না! উনিই তো দণ্ডমুণ্ডের মালিক আমাদের। কোম্পানীর মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার, দোকানের ডাক্তার আর সুপারভাইজার, নার্সিং হোমের অর্ধেক মালিক! সকলে ঠিক পছন্দ করেন না, আমার কিন্তু বেশ লাগে দাদা—

ওদিকটা একবার দেখে নিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

ছেলেটা ফাজিল হলেও ধীরাপদর মন্দ লাগছে না। হাসি-খুশিটা প্রাণবন্ত। নার্সিং হোম প্রসঙ্গে জানা গেল কোম্পানীর মস্ত

ওটার কোনো সম্পর্ক নেই। ওর মালিক মিস সরকার আর ছোট সাহেব। ইকোয়াল পার্টনারস। মস্ত মস্ত ঘরের ফ্ল্যাট, একটা মিস সরকারের বেড-রুম, দু-ঘরে চারটে বেড, আর একটা ঘরে বাদবাকি যা কিছু। মাস গেলে তিন শ' পঁচাত্তর টাকা ভাড়া—মেডিকাল অ্যাডভাইসারের ফ্রী-কোয়ার্টার প্রাপ্য বলে ভাড়াটা কোম্পানী থেকেই দেওয়া হয়। আর, সেখানে আলমারি বোঝাই যেসব দরকারী পেটেন্ট ওষুধ-টষুধ থাকে তাও কোম্পানী থেকেই নার্সিং-হোমএর তেড-এ অমনি যায়, দাম দিতে হয় না। খুব লাভের ব্যবসা দাদা, বুঝলেন ?

আবার হি-হি হাসি।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক চারটেয় ম্যানেজার হাজির। বেঁটে-খাটো, মোটাসোটা—মাথায় কাঁচাপাকা একরাশ ঝাঁকড়া চুল। বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। তাঁকে দেখেই রমেন হালদার চট করে উঠে এক দিকে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল কি। ধীরাপদর কথাই হবে। কথার ফাঁকে ছেলেটাকে হাসতেও দেখা গেল। সাহেবদের আপন জন জানানোর ফুর্তি হয়ত।

ম্যানেজার ঘুরে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই ওকে দেখলেন একবার। নিস্পৃহ দৃষ্টি। প্রায় তাচ্ছিল্যের মতই। বিজ্ঞাপন লেখার প্রত্যাশায় এলে অম্বিকা কবিরাজ বা নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবু যে চোখে তাকান অনেকটা সেই রকম। তাঁদের থেকেও নির্যাসক্ত।

উঠে দাঁড়িয়ে ধীরাপদ দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানালো। জবাবে তিনি ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা একটু নাড়লেন শুধু। ডাকলেনও না বা কিছু জিজ্ঞাসাও করলেন না। ওর কাজের গুণাবলী বা কেরামতি রমেন হালদারই জানিয়ে দিয়েছে সম্ভবত। প্রথম নির্বাক দর্শনেই লোকটিকে রাশভারী কড়া মেজাজের মনে হল ধীরাপদর।

খানিক বাদে এক ফাঁকে রমেনই কাছে এলো আবার—ম্যানেজারকে বললাম আপনার কথা, ওঁর মেজাজ অমনি একটু ইয়ে তো—বলছিলেন,কাজ জানে না কম্ম জানে না হুট করে আবার এক জনকে ঘাড়ে চাপানো কেন! আপনি কিছু ভাববেন না, আমি আপনাকে দুদিনেই শিখিয়ে দেব, কোন্ আলমারির কোন্ তাকে কোন্ রকমের ওষুধ থাকে এই তো—

বিকেল থেকে দোকানের চেহারা অন্যরকম। কর্মচারীরা একে একে এসে গেল। খদ্দেরের ভিড়ও বাড়তে লাগল। পাইকিরি আর খুচরো দু-রকমের বিক্রী, ভিড় হবারই কথা। রমেন হালদার বাড়িয়ে বলেনি, সন্ধ্যের দিকে দিশেহারা অবস্থাই বটে। কর্মচারীদের যান্ত্রিক তৎপরতা সত্ত্বেও খদ্দেরের তাড়ায় তাদেরও তাড়া বাড়ছে। ওটা আনো সেটা আনো, ওটা বার করো সেটা বার করো, ওটা দেখাও সেটা দেখাও—। কে কোন্টা আনছে, বার করছে, দেখাচ্ছে, ধীরাপদ হদিস পেয়ে উঠছে না। এরই মধ্যে একটু ফাঁকা হলে কাউন্টারের কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে সে, আবার ভিড় বাড়লে বাইরের দিকে সরে আসছে, বা জায়গা থাকলে বেঞ্চিতে বসছে।

ছ'টা নাগাদ ফুটপাথের ওধারে গাড়ি দাঁড়াল একটা। কোম্পানীর গাড়ি, স্টেশান-ওয়াগন গোছের। ড্রাইভার শশব্যস্তে নেমে পিছনের দরজা খুলে দিল।

যে নামল, মনে মনে ধীরাপদ তাকেই আশা করছিল হয়ত।... ডক্টর মিস লাবণ্য সরকার।

গোটা নামটা কেউ বলেনি তাকে। ডাক্তারের চেম্বারের গায়ে অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ানদের নামের বোর্ড থেকে দেখেছে। চারটে থেকে ছটার ডাক্তার একটু আগে বিদায় নিয়ে গেছেন।

আগের দিনের দেখা তেমনিই শিথিল চরণে দোকানে ঢুকল। পিছনে সেই মস্ত-ব্যাগ হাতে ড্রাইভার। প্রতীক্ষারত রোগীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খদ্দেরদের পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। ও-দিক দিয়ে অর্থাৎ দোকানের অন্দর মহল দিয়ে চেম্বারে ঢোকার আর একটা দরজা আছে। রোগীদের দেখার সময় ধীরাপদর সঙ্গেও একবার চোখাচোখি হয়েছে, কারণ সে ওদিকটাতেই দাঁড়িয়েছিল। আলাদা করে কিছু খেয়াল করেছে বলে মনে হল না।

ভিতরে যেতে যেতে যে-কজন কর্মচারীর মুখোমুখি হয়েছে, সকলকেই জোড়-হাত কপালে ঠেকাতে দেখা গেছে। রমেন হালদার ওদিক থেকে এগিয়ে এসে সামনাসামনি হয়েছে এবং তৎপর অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে। এমন কি এতক্ষণের হাক-ডাক আদেশ নির্দেশে ব্যস্ত ম্যানেজার এই প্রথম মুখে একটু হাসি টেনে একটা হাত কপালে তুললো, তাঁর অন্য হাতে ওষুধের প্যাকেট।

একটু বাদে এদিকের দরজা ঠেলে রোগীদের সম্মুখীন হতে দেখা গেল তাকে। গায়ে ঢোলা শাদা এপ্রন, হাত কনুইয়ের ওপর গোটানো, গলায় হারের মত ষ্টেথোসকোপ ঝুলছে। দেখে ধীরাপদরও রোগী হবার বাসনা। বেঞ্চিক'টায় ঠাসাঠাসি লোক। একটা বেঞ্চে শুধু মেয়েছেলে। চেয়ারক'টাও খালি নয়। এসেই বেয়ারার হাতে স্লিপ দিতে হয়, সেই স্লিপ অনুযায়ী পর পর ডাক পড়ে। যারা আগের পরিচিত রোগী অথবা যারা শুধু রিপোর্ট করতে এসেছে—একে একে তাদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়েই কথা বলল। অসুখের খবর নিল, প্রেসক্রপশান দেখল তারপর নির্দেশ দিয়ে বিদায় করল। ওষুধ বদলানো দরকার বলে কাউকে বা বসতে বলল। তারপর স্লিপ অনুযায়ী একজন একজন করে নিজেই ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। আগের ডাক্তারের সঙ্গে রোগী দেখার তারতম্য লক্ষ্য করল ধীরাপদ। আগের ডাক্তারটিকে একবারও চেয়ার ছেড়ে উঠে আসতে দেখেনি। লাবণ্য সরকার পর্যবেক্ষণ শেষ করে প্রত্যেকটি রোগীর সঙ্গে বেরিয়ে আসছে আর পরের জনকে ডেকে নিচ্ছে।

ধীরাপদর আর কেনা-বেচার দিকে ফিরে যাওয়া হয়ে উঠল না। সেই এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। বেঞ্চির খালি জায়গা নতুন রোগী বা রোগিনীর আবির্ভাবে ভরে উঠতে সময় লাগছে না। সকলে স্লিপ পাঠাচ্ছে তাও নয়। মনে মনে ধীরাপদ হিমাংশু মিত্রর বুদ্ধির তারিফ করেছে এরই মধ্যে। এমন সবল আকর্ষণ রচনার দরুণ বাহাদুরী প্রাপ্য বটে। মহিলার গলার স্বরটি পর্যন্ত চেহারার সঙ্গে মানায়। মেয়েদের তুলনায় মিটোল ভরাট কণ্ঠস্বর। চোখ বুজে শুনলে মনে হবে অল্পবয়সী ছেলের মিষ্টি গলা। যতবার বেরুচ্ছে, ধীরাপদ নিরীক্ষণ করে দেখছে। নামটাও মানায়। লাবণ্য। নারী-সুলভ ঢলঢলে লাবণ্যের চিহ্নমাত্র নেই বলেই ওই নাম বেশি মানায়। যা আছে সেটুকু উপলব্ধি করার মত, দেখার

মত নয়। মত খুব ফর্সা নয়, ফর্সা করার চেষ্টাও নেই। চুল টেনে বাঁধা, ফলে ও-দিক থেকেও কিছুটা লাবণ্য চুরি। চোখের দৃষ্টি গভীর অথচ নিঃসঙ্কোচ, কিছুটা বা নির্লিপ্ত। ঠোঁটের ফাঁকে একটু আধটু হাসির আভাস কমনীয় বটে, কিন্তু তেমন অন্তরঙ্গ নয় বলেই অনমনীয় মনে হয় আরো বেশি। এক ধরনের জোরালো স্পষ্টতার আড়ালে নারী-মাধুর্য প্রচ্ছন্ন রাখার মধ্যেই লাবণ্য নাম সার্থক মনে হল ধীরাপদর।

পুরুষের চোখ অলক্ষ্যে যতই উঁকিঝুঁকি দিক, অমন মেয়ে সামনা-সামনি হলে নিজেকে দোসর ভাবা শক্ত।

লাবণ্য সরকার সেটুকুও জানে যেন।

বেঞ্চি আর চেয়ার প্রায় ফাঁকা। এদিক-ওদিকে দুই-একজন বসে তখনো। শেষের যে লোকটিকে ডেকে নিয়ে গেছে তাকে দেখতে সময় লাগল একটু। ইতিমধ্যে আরো জনাকতক নতুন আগন্তুক বেঞ্চি দখল করেছে। এরই মধ্যে দু' জোড়া বোধ হয় স্বামি স্ত্রী। আগেও দু'-চার জনকে সস্ত্রীক আসতে দেখেছে। স্বামীটি রোগী কি স্ত্রীটি রোগিনী ধীরাপদ অনেক ক্ষেত্রেই ঠাওর করে উঠতে পারেনি। এই নতুন দম্পতীদের দিকে চেয়েও মনে মনে বোধহয় সেই গবেষণাতেই মগ্ন ছিল।

দরজা ঠেলে লাবণ্য সরকার বেঞ্চিতে আবার নতুন আগন্তুক দেখে ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার পরে ধীরাপদর দিকেই চোখ গেল তার। কে তেমন খেয়াল করেনি, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, শুধু সেটুকুই লক্ষ্য করেছিল। যে ক'জন প্রতীক্ষারত তাদের সকলের আগে এসেছে ভেবেই ডাকল, এখানে আপনি আসুন।

সমস্ত দিনের উপোসী মুখে অসুস্থতার ছাপ পড়াও বিচিত্র নয়। ধীরাপদ যতটা সম্ভব কোণের দিকে আর বাইরের দিকে মুখ করে দেয়াল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। থতমত খেয়ে নিজের অগোচরেই দুই-এক পা এগিয়ে এলো। আহ্বানকারিণী চেম্বারের দিকে এগোতে গিয়েও মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। দুই ভুরুর মাঝে কুঞ্চন রেখা। কিছু স্মরণের চেষ্টা। আপনি···আচ্ছা, আসুন।

ভিতরে ঢুকে গেল। অগত্যা বেঞ্চি ক'টার পাশ কাটিয়ে ধীরাপদও।

একটা ছোট টেবিলের এদিকে দুটো চেয়ার, উল্টো দিকে ডাক্তারের নিজের। টেবিলের ওপর প্রেসকৃপশানপ্যাড আর সেই বড় ফোলিও ব্যাগটা। দেয়ালের গায়ে হাত দেড়েক চওড়া রোগী পরীক্ষার ধপধপে বেড।

নিজের চেয়ারটা টেনে বসল লাবণ্য সরকার। ওকে বসতে বলল না। কাছে এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সরাসরি চেয়ে রইল। ভুল হচ্ছে কি না সেই সংশয়।—আপনাকে···আপনিই কাল মিষ্টার মিত্রর বাড়ি গেছলেন না?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল, গিয়েছিল।

আপনাকে এখানে কে পাঠিয়েছে?

সিতাংশুবাবু এখানে আসতে বলেছেন শুনলাম···।

গতকাল হিমাংশুবাবু বলে খোঁজ করতে লাবণ্য সরকার দুই

এক পলক চেয়ে থেকে বাবুকে মিঃ মিত্র করে নিয়ে জবাব দিয়েছিল ধীরাপদর মনে আছে। আজও মুখের ওপর ঠাণ্ডা দুই চোখ একবার বুলিয়ে নিয়ে খুব সাদাসিধে ভাবে বলল, তিনি সমস্ত বিজনেসের অর্গ্যানিজেশন চীফ—সকলে ছোট সাহেব বলে। তা আপনি সেই থেকে ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন, কাজ-কর্ম দেখেশুনে নিন—ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ার আগেই টেবিলের বোতাম টিপল। বেয়ারা হাজির।

ম্যানেজারবাবু—।

পরক্ষণে ভিতরের দরজা ঠেলে ম্যানেজারের আবির্ভাব। যোগী ডাক্তার জন্ম লাবণ্য সরকার চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ইনি ওদিকে দাঁড়িয়ে কেন, কি কাজ দেখিয়ে-টেখিয়ে দিন—যান এঁর সঙ্গে।

শেষের নির্দেশ ধীরাপদর উদ্দেশে। গুরুগম্ভীর ম্যানেজারের সঙ্গে বিব্রত দৃষ্টি বিনিময়। তাঁকে অনুসরণ করে ভিতরের দরজার এধারে আসতেই বিরক্তি চাপতে পারলেন না ভদ্রলোক।—ওদিকে হাঁ করে দেখার কি ছিল, এদিকে যান—চুপচাপ দেখুন কি হচ্ছে না হচ্ছে। এই তাড়াহুড়োর সময় কাজ দেখান বললেই দেখানো যায় না, কাজ শিখতে হলে দুপুরের নিরিবিলিতে এসে দেখতে হবে—

গজগজ করতে করতে আর একদিক চলে গেলেন তিনি।

ব্যাপার-গতিক দেখে ধীরাপদর হাসিই পাচ্ছে। ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার দরুন কাউন্টারের কর্মচারীদের সঙ্গে মিশে গেছে সেও। কেনা-বেচায় ভিড়ের কমেনি তখনো। যান্ত্রিক তৎপরতায় কর্মচারীরা ওইটুকু পরিসরের মধ্যেই একে অন্যের পাশ কাটিয়ে আলমারির কাচ-দরজা ঠেলে ঠেলে ওষুধ বার করছে—শিশি, বোতল, প্যাকেট, ট্যাবলেট। এ-মাথা ও-মাথা তাক-ঠাসা আলমারির মধ্যে কোথায় কোন্ খুঁটিনাটি বস্তুটি রয়েছে তাও যেন সকলের নখদর্পণে। ধীরাপদ ওষুধ অনেক কিনেছে, এভাবে ওষুধ বার করতেও দেখেছে—কিন্তু কাজটা যে এমন দুর্বোধ্য রকমের দুরূহ একবারও ভাবেনি। হালদার আশ্বাস দিয়েছিল দু'দিনেই শিখিয়ে দেবে,...দু' বছরেও রপ্ত হবে কি না সন্দেহ।

আঃ, আপনি ও-দিকে সরে দাঁড়ান না, কাজের সময়—

সচকিত হয়ে ধীরাপদ তিন চার হাত সরে দাঁড়াল, প্যাসেজ জুড়ে আড়া-আড়ি দাঁড়িয়েছিল বলে বিরক্তিটা তারই উদ্দেশে। খানিক বাদে আলমারি খুলতে বাধা পেয়ে আর একজন বলল, সরে দাঁড়ান। ধীরাপদ আবার দু'-চার পা সরেছে। একজন খদ্দের ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেসক্রিপশান এগিয়ে দিতে বিব্রত মুখে হাত বাড়িয়েছে, সেই সঙ্গে কর্মচঞ্চল ব্যস্ততায় হাত বাড়িয়েছে পাশের কর্মচারীটিও। হাতে হাতে কলিশান। অস্ফুট বিরক্তি, আপনি এটা নিয়ে কিছু বুঝবেন এখন ? সরুন ওদিকে—

ধীরাপদ আবারও সরেছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে এমনি বার কতক তাড়া খেয়ে সরতে সরতে ধীরাপদ একেবারে দরজার কাছটিতে এসে গেছে। তার পাশেই তখন যে-লোকটি দাঁড়িয়ে সে যদি সরতে বলে, তাহলে দরজা ঠেলে ধীরাপদকে এর পর দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াতে হয়।

বলার অপেক্ষা না রেখে ধীরাপদ বাইরেই চলে এলো।

ফাঁকা রাস্তায় পা চালিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিছুই করতে হয়নি তবু বেশ একটা ধকল গেল যেন। চাকরি পর্বের এখানেই ইতি, আর এ-মুখো হচ্ছে না। শান্তি। বিবেকের তাড়নায় ভুগতে হবে না আর।

কিন্তু পরদিন এ-নিশ্চিন্ততা দুপুরের ও-ধার পর্যন্ত গড়ালো না। ওষুধের দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওষুধ বিক্রী করার চাকরি দেবার জন্যে চারুদির এমন আগ্রহ—সেরকম কিছুতে মনে হচ্ছে না। হিমাংশু মিত্রকে লেখা চিঠির সুর, চিঠির ভাষা মনে আছে। লিখেছিলেন, নির্দ্বিধায় দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। সেটা এই দায়িত্ব ? তাছাড়া চিঠি খোলা হয়েছে ধরে ফেলেও হিমাংশু মিত্র যে-ব্যবহার করেছেন আর যে-কথা বলেছেন তাতে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওষুধ বিক্রির কাজটা ঠিক প্রত্যাশিত নয়।

নতুন-পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক দে-বাবুর সঙ্গে দেখা করবে বলে বেরিয়েও রাস্তা বদলে ধীরাপদ মধ্য কলকাতায় সেই ওষুধের দোকানে এসেই ঢুকল।

আগের দিনের মতই দুপুরের নিরিবিলি পরিবেশ। আজও সেই ছোকরা অর্থাৎ রমেন হালদারই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো।—দাদা কাল পালালেন কখন ? ম্যানেজারকে না বলে কয়ে ও-ভাবে যায় ! ম্যানেজার চটে লাল, কড়া মানুষ তো—আজ শোনাবে'খন। তা-ছাড়া সকালেও তো এলেন না, ডিউটির টাইমও ঠিক হল না।

তা সত্ত্বেও মুখে কোনোরকম উৎকণ্ঠার আভাস না দেখে একটু বোধহয় বিস্মিত হল সে। পরামর্শ দিল, যা-ই বলুক, মুখ বুজে বলবেন, নতুন মানুষ ভুল হয়ে গেছে—

একটু বেশি তড়বড় করলেও ছেলেটাকে গতকালই ভালো লেগেছিল ধীরাপদর। এই নীরস কর্মচঞ্চলতার মধ্যেও প্রাণবন্ত। অন্যের কান বাঁচিয়ে কোণের বেঞ্চিতে বসে ধীরাপদ বলল, ম্যানেজারের জন্যে ভাবনা নেই, ফ্যাক্টরীটা কোথায় বলো দেখি ভাই ?

প্রশ্নটা শুনে হালদারকে আসন পরিগ্রহ করতে হল। সেখানে যাবেন ?

মাথা নাড়ল।

সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন ?

দু'চোখ গোল হতে দেখে ধীরাপদ হেসেই ফেলল।

ছেলেটাও হাসল।—আমাদের কাছে ওঁরা আবার ভগবানের মতই কি না...আপনি এখানে কাজ করবেন না ?

দেখা যাক্—

ফ্যাক্টরীর হদিস দিয়ে রমেন আবারও সংশয় প্রকাশ করল, কিন্তু আপনি ভিতরে ঢুকবেন কি করে, দরজায় তো বন্দুকওয়ালা পাহারা—এনকোয়ারি ক্লার্কের সঙ্গে দেখা করতে হবে, সে সন্তুষ্ট হলে সাহেবদের টেলিফোন করবে, হুকুম হলে তবে যেতে দেবে।

এত গণ্ডগোল জানত না, ধীরাপদ দমে গেল একটু।

পরক্ষণে রমেনই আর একটা সহজ পথ বাতলে দিল। জানালো, তিনটের সময় গাড়ি যাবে ফ্যাক্টরী থেকে মাল আনতে, ড্রাইভারকে বলে দিলে দোকানের কর্মচারী হিসেবে সেই গাড়িতেই ধীরাপদ বিনা বাধায় ভিতরে ঢুকে যেতে পারে। সহজ পন্থা দেখিয়ে দেবার ফলে ভয়ও পেল একটু, কিন্তু সাহেবরা রেগে যাবেন না তো ? আমি বলেছি বলবেন না যেন...

ধীরাপদ হেসে অভয় দিল তাকে, তার কোনো ভয় নেই।

তিনটে বাজতে ঘণ্টাখানেক দেরি তখনো। ম্যানেজার আসার আগেই সরে পড়তে পারবে সেটা মন্দ নয়।

রমেন হালদার গম্ভীর মুখেই বলে যেতে লাগল, দেখুন, যদি অন্য কিছু পেয়ে যান, এখানে আমাদের যা মাইনে—ছ'বছর ধরে আছি, পাচ্ছি মাত্র একশ পঁচিশ—চলে আজকালকার দিনে? ম্যানেজারই পায় মাত্র সাড়ে তিনশ' সেই গোড়া থেকে আছে, আমাদের আর কত হবে। অল্প কিছু টাকা হাতে পেলে নিজেই একটা দোকান খুলতাম, আঁট-ঘাট সব জেনে গেছি, টাকাই নেই কি হবে—।

সমস্যার কথা ভুলে কি মনে পড়তে চপল কৌতূহলে দুচোখ উৎসুক হয়ে উঠল তার। ডক্টর মিস সরকার কাল আপনাকে ঘরে ডেকে কি বললেন?

বিশেষ কিছু না।

সংক্ষিপ্ত জবাব মনঃপূত হল না বোধহয়। একটু অপেক্ষা করে বলল, কিন্তু তাঁকে ডিঙিয়ে আপনি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করবেন···সাহেবরা তো আবার তাঁর কথাতেই ওঠেন বসেন, বিশেষ করে ছোট সাহেব—এখানকার যা কিছু সবই মিস সরকারের হাতে।

ধীরাপদ নিরুত্তর। এটুকু দুর্ভাবনার কথা মনে মনে নিজেও উপলব্ধি করছে হয়ত। কিন্তু সত্যিই চিন্তিত নয় তা বলে, যে-টুকু নাড়াচাড়া করে দেখছে, খেলার ছলেই দেখছে। এতকালের নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে ফিরে যেতে মনের একটা দিক সব-সময়েই প্রস্তুত।

—কিন্তু যাই বলুন দাদা—অন্তরঙ্গ জনের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করার জন্যেই যেন আরো কাছে ঝুঁকে রমেন হালদার গলা খাটো করে বলল, মিস সরকারকে আপনার ভালো লাগেনি? যতক্ষণ থাকেন উনি আমার কিন্তু বেশ লাগে, অমন জোরালো মেয়েছেলে কম দেখেছি, আর তেমনি চালাক—মাইনে বাড়িয়ে নেবার জন্য একটু ইয়ে করতে গিয়ে আমার যা অবস্থা শুনলে আপনি হেসে মরবেন—

হেসে মরার বাসনা না থাকলেও ধীরাপদর শোনার প্রচ্ছন্ন আগ্রহটুকু অকৃত্রিম! মিস সরকারকে তারও ভালো লেগেছে কি না জিজ্ঞাসা করতে নিজের অন্তস্তলে হঠাৎই যেন এক ঝলক আলোকপাত হয়েছিল। ধীরাপদর যা স্বভাব, মিত্র বাড়িতে গতকাল ওই রকম প্রতীক্ষার পর 'কেয়ার-টেক' বাবুর সঙ্গে তার ওষুধের দোকান পর্যন্তই আসার কথা নয়। আসার পিছনে নিজের অগোচরের একটুখানি আকর্ষণ ছিল, মানুকের মুখে মেম-ডাক্তারের কথা শুনে রমণীটিকে আর একবার দেখার বাসনা হয়েছিল বইকি। সেই বাড়িতে অল্প একটু দেখার ফাঁকে তার নির্লিপ্ত বলিষ্ঠতাটুকু এক ধরনের কৌতূহল যুগিয়েছে। তাই মনে হয়েছে, ভালো করে দেখা হয়নি, ভালো করে দেখতে পারলে কিছু যেন আবিষ্কারের সম্ভাবনা। ধপধপে শাদা মোটরে তার পাশে সিতাংশু মিত্রকে

একখানি নিষ্কম্প শিখার পাশে চঞ্চল পতঙ্গের মত মনে হয়েছিল ধীরাপদর। যখন খুশি গ্রাস করতে পারে, শুধু তেমন তাড়া নেই যেন—।

দোকানের অমন কাজের ঝড়ের মধ্যে মহিলার আবির্ভাব বায়ুগতি কর্ম-রথের বলগা-ধরা সারথিনীর মত। ভ্রুকুটি নেই অথচ এক ভ্রুকুটিতে সব ওলট-পালট হতে পারে সেই গোছের অনুভূতি। ধীরাপদ তন্ময় হয়েই দেখছিল, সমস্ত দিনের অনাহারের ক্লেশও ভুলে গিয়েছিল। পলকে সময় কাটছিল। তন্ময়তায় ছেদ পড়েছিল ওকেই ডেকে বসতে, শুধু তাই নয়, হকচকিয়েও গিয়েছিল একটু। কাউণ্টারের সেই স্বল্পক্ষণের অভিজ্ঞতার ফলেও আর দোকানমুখো হবার কথা নয় ধীরাপদর। নানান সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করে তবেই এসেছে বটে। কিন্তু কোথায় অলক্ষ্য একটু তাগিদও ছিল। রমেনের কথায় ধরা পড়ল। ভালো লাগার আকর্ষণে না-হোক, এক ধরনের লোভনীয় মনসিজ রেখাবিধির আকর্ষণ যেন ছিল। ওই ধরনের মেয়ের প্রতিকূলতা করতে পারার মতই পুরুষোচিত লোভের হাতছানি একটু। তুলনায় কাল নিজেকে বড় বেশি তুচ্ছ মনে হয়েছিল বলেই পুরুষ-চিত্তের সহজাত উসখুসুনি আজও তাকে দোকানের দিকে ঠেলেছে বোধহয়। দেখাই যাক না কি হয়, ওষুধ বিক্রি করতে তো আর যাচ্ছে না।

মাইনে বাড়িয়ে নেবার উদ্দেশে লাবণ্য সরকারের সঙ্গে একটু ইয়ে করতে গিয়ে কি হাল হয়েছিল, মনের আনন্দে রমেন সেই কাণ্ডর শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে বসেছে। অনেক দিন পায়তাড়া কষে সামনে সামনে ঘুর ঘুর করেছে, মিস সরকার এলেই ভিতরের দরজার কাছটিতে কাজ নিয়েছে সে, বেয়ারা ইনজেকশানের স্লিপ নিয়ে এলেই প্রত্যেক বার নিজে গিয়ে ইনজেকশানের ওষুধ সাপ্লাই করেছে, বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠায়নি। মিকশ্চারের প্রেসক্রপশানও নিজে নিয়ে এসেছে। মিস সরকার ইনজেকশানও দেন সব থেকে বেশি, মিকশ্চারের প্রেসক্রপশানও করেন সব থেকে বেশি। ইনজেকশান দেবার জন্ত দু' টাকা করে পান—কম্পাউণ্ডার ইনজেকশান করলে এক টাকাতেই হয়, কিন্তু রোগীর সামনেই যখন ইনজেকশান চেয়ে পাঠান রোগী তো আর বলতে পারে না এক টাকা বাঁচানোর জন্তে কম্পাউণ্ডারের হাতে ইনজেকশান নেবে। ওদিকে মিকশ্চারের প্রেসক্রপশানেও টাকায় চার আনা লাভ। কম চল নাকি। ছ'শ' টাকা মাইনে পান আরো কোন্ না চার পাঁচশ' এই করে হয়? রোগীদের কাছে ওনারই তো কদর বেশি, এই রোজগারের ওপর নার্সিং হোমের রোজগার—ভাবুন একবার। তা যাই হোক, মাইনে যদি কিছু বাড়ে আর নার্সিং হোমেও যদি একটু কিছু পার্ট টাইম কাজ-টাজ জোটে সেই আশায় রমেন হালদার অনেক দিন বলতে গেলে ওনার পায়ের জুতোর সঙ্গে মিশে থাকতে চেষ্টা করেছিল। তার পর সুযোগ-সুবিধে বুঝে একদিন—আর যখন একটিও রোগী নেই বাইরে, দুর্গা-গণেশ স্মরণ করে ভিতরে এসে দিদি বলেই ডেকে বসেছিল ঝপ করে। যতখানি সম্ভব করুণ করেই দিদি ডেকেছিল, নিজের দিদি হলে ওটুকুতেই স্নেহে চক্ষু ছলছল করে ওঠার কথা—

তার পর? তার পর সে যা হল—রমেনের মুখ আমসি। দিদি ডাক শুনেই এমন ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন যে মনে হচ্ছিল তার সমস্ত মুখে যেন দু টুকরো বরফ বোলানো হচ্ছে। সে একেবারে বোবার মতই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু বাদে মিস সরকার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি বলবে?

রমেনের মনে হয়েছিল চোখের থেকেও গলার স্বর আরো ঠাণ্ডা, একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগার মত। যা বলবে বলে এসেছিল ততক্ষণে সব ভুল হয়ে গেছে। যা মুখে এসেছে তাই বলে বসেছে। বলেছে, আজ একটু আগে বাড়ি যাওয়া দরকার ছিল।

রমেনের ধারণা, এতখানির পর এর থেকে অনেক বড় কিছু নিবেদন আশা করেছিলেন মিস সরকারও। আর দিদি ডাকে না ভুলে জবাব দেবার জন্তেও তৈরি ছিলেন। ওর আরজি শুনে ঠাণ্ডা ভাবটা কমলো একটু। রাত প্রায় ন'টা বাজে তখন, তা ছাড়া ছুটি কেউ কখনো ওঁর কাছে চাইতে আসেন না, একদিন-দু'দিন পর্যন্ত ছুটি ম্যানেজারই মঞ্জুর করে থাকেন। কিন্তু রমেন তো আর অতসব ভেবে বলেনি, যা হোক কিছু বলে ঘর থেকে পালাবার জন্তেই বলেছে। কিন্তু কি বিভ্রাটেই না পড়তে হল ওকে ওইটুকু থেকে—প্যাঁক করে টেবিলের বোতাম টিপে বসলেন মিস সরকার, ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এর বোধ হয় একটু আগে ছুটি দরকার, দেখুন।

ব্যস, বাইরে এসে ম্যানেজার হাঁ করে খানিক চেয়ে রইলেন ওর দিকে, কারণ, তিনি তো জানেনই যে ওর ডিউটি শেষ হয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে—ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারত!

তারপর এই মারেন তো সেই মারেন।

ফন্দিটা রমেন হালদার মন্দ বাতলে দেয়নি। বিনা বাধায় সরাসরি একেবারে ফ্যাক্টরীর এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। কোম্পানীর গাড়ি দেখে গেট-ম্যান গোটা ফটক খুলে দিল। বন্দুক হাতে যেখানে পাহারাওয়ালা বসে, সেখান দিয়ে পাশাপাশি দু'জনও ঢুকতে বা বেরুতে পারে না।

কিন্তু এভাবে ভিতরে ঢুকেই ধীরাপদ যেন আরো বেশি ফাঁপরে পড়ে গেল। কোথায় কোন্দিকে যাবে কিছুই হদিস পেল না। বিস্তৃত ঘেরানো এলাকার মধ্যে তিন চারটে ছোট-বড় দালান। দালান বলতে বিশাল এক-একটা গুদোম-ঘরের মত। শুধু মাঝখানের বড় দালানটা তিন-তলা। অনুমানে ধীরাপদ সেদিকেই এগোলো।

তালকানার মত নিচের বড় বড় ঘরগুলোতে এক চক্কর ঘুরে নিল। কোনো ঘরে সারি সারি মেসিনের মধ্য দিয়ে টুপটুপ করে অবিরাম ট্যাবলেট বৃষ্টি হচ্ছে। কোনো ঘরে মেসিনে করে গোটা দশেক বিশাল বিশাল ডেকচি ঘোরানো হচ্ছে—সব ক'টার মধ্যেই নানা আকারের ট্যাবলেট। একজন লোক ডেকচির মধ্যে এক-এক রকম রঙের মত কি ঢেলে দিচ্ছে। ট্যাবলেট রঙ-করার ব্যাপার বোধহয়। আর একটা ঘরে ইলেকট্রিক ফিট-করা গোটাকতক মস্ত মস্ত আলমারি। এক একবার খোলা হচ্ছে, বন্ধ করা হচ্ছে। প্রত্যেক তাকে হাতল-অলা বড় বড় ট্রেতে গুঁড়ো ওষুধ শুকোনো হচ্ছে।

কর্মরত এ-পরিবেশটা ধীরাপদর ওষুধের দোকানের থেকে অনেক ভালো লাগল। নিচে না ঘুরে ওপরে উঠে এলো। সেখানেও ঘরে ঘরে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম—যতদূর ধারণা, ওষুধ-

বিশ্লেষণের কাজ চলছে এখানে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল হিমাংশু মিত্র আজ আসেন নি, আর সিতাংশু মিত্র কণ্ট্রোল রুমে।

কণ্ট্রোল-রুমের খোঁজে এদিক-ওদিক বিচরণের ফলে একটা প্যাসেজের মুখে যার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা, সে মেডিক্যাল অ্যাডভাইসার লাবণ্য সরকার। একটা প্যামফ্লেট পড়তে পড়তে এদিকেই আসছিল। ধীরাপদ পাশ কাটিয়ে গেলে লক্ষ্যও করত না হয়ত। কিন্তু ধীরাপদ দাঁড়িয়ে পড়ল আর চেয়ে রইল।

কাছাকাছি এসে প্যামফ্লেট সরিয়ে মুখ তুলল লাবণ্য সরকার। নিজের অগোচরেই ধীরাপদর যুক্ত-কর কপালে স্পর্শ করল। ওদিকে প্যামফ্লেট-ধরা হাতখানা সামান্যই নড়ল। আপনি এখানে যে?

ধীরাপদ একবার ভাবল বলে, এমনি ফ্যাক্টরী দেখতে এসেছে। বলে ফেললে পরে নিজের ওপরেই রেগে যেত। জবাব দিল, সিতাংশু বাবু—ছোট সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করব বলে এসেছিলাম।

নামের ভুলটা হয়ত ইচ্ছে করেই করল আর শুধরে নিল। লাবণ্য সরকার বলল, তিনি ব্যস্ত আছেন, আপনার কি দরকার?

...আমার দরকার ঠিক নয়, থামল একটু, আমাকে তাঁর দরকার আছে কি না জেনে নিতে এসেছিলাম।

জবাবে যা স্বাভাবিক তাই হল। দুই চক্ষু ওর মুখের ওপর প্রসারিত হল। কিন্তু ধীরাপদরই বরাতক্রমে সম্ভবত আর বাকবিনিময়ের অবকাশ থাকল না। ফিটফাট সাহেবী পোষাক-পরা দুটি লোক হন্ত-দন্ত হয়ে লাবণ্য সরকারকে চড়াও করে ফেলল। এক জনের হাতে খোলা মেডিক্যাল জার্নাল একটা, আর একজনের হাতে বই। মুখে কিছু একটা আবিষ্কারের ব্যগ্র আনন্দ। বই আর জার্নাল খুলে কোনো সমস্যা-সংক্রান্ত তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার।

লাবণ্য সরকার নিরুৎসুক দৃষ্টিতে চোখ বোলাল একবার, তার পর বলল, চলুন দেখছি—

এক পা এগিয়েও ধীরাপদর দিকে ফিরে তাকালো।—মিঃ মিত্র ওপরে।

দু' পাশের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে সামনের দিকে এগোলো। ধীরাপদ চেয়ে আছে। ভক্তসমাবেশে অচপল-চরণে দেবীর প্রস্থান।

সিতাংশু মিত্রের সঙ্গে দেখা করার আর তেমন তাগিদ নেই। দেখাটা হিমাংশু মিত্রের সঙ্গে হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। পায় পায় উপরে উঠল তবু। সামনের এ-মাথা ও-মাথা বিশাল হল-ঘরের দরজায় সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। এখানকার কর্মরত দৃশ্যটা নয়নাভিরাম। হল্ ভরতি তিন সারিতে নানা বয়সের প্রায় একশ লোক ডিসটিলড ওয়াটারে অ্যামপুল ধুচ্ছে। প্রত্যেকের সামনে কল-ফিট করা একটা করে বেসিন। কলের মুখ দিয়ে রেখার মত তীরের নালে জল পড়ছে। এক-একটা অ্যামপুল ধোয়া হতে তিন সেকেণ্ডও লাগছে না। তার পর জালের মত গর্ত-করা কাঠের র‍্যাকে উপুড় করে রাখা হচ্ছে সেগুলো। গোটা হলঘরটাই সেই উপুড় করা অ্যামপুলএ ঝকঝক করছে। প্রয়োজন ভুলে ধীরাপদ তাই দেখতে লাগল।

হলের ও মাথার দরজায় সপার্ষদ সিতাংশু মিত্রর আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে অ্যামপুল-ধোয়া কর্মীদের বাড়তি নিবিষ্টতাটুকু উপলব্ধি করা গেল। সিতাংশু মিত্রর দু' পাশে জনা-পাঁচেক অনুগত মূর্তি, হাত নেড়ে তাদের উদ্দেশে কি বলতে বলতে এদিকে এগিয়ে আসছে। এ দরজার দরোয়ান শশব্যস্তে টুল ছেড়ে বুকটান করে দাঁড়ালো।

এক নজরে মালিক চেনা যায়।

এদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুই এক কথার পর অনুসরণরত পার্ষদদের মধ্যে দু'জনের ত্বরিত প্রত্যাবর্তন। তার পর ধীরাপদর সঙ্গে চোখাচোখি।

চৌকাঠ পেরিয়ে সিতাংশু মিত্র এগিয়ে এলো। অন্য তিন জন ভব্যতার দায়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে।

আপনি···ও আপনি। ছোট সাহেবের মনে পড়েছে, আপনাকে তো কাল ওষুধের দোকানে যেতে বলেছিলাম—যাননি?

ধীরাপদ ঘাড় নাড়ল, গিয়েছিল।

কথাবার্তা হয়নি বুঝি কিছু, আমারও মনে ছিল না। আচ্ছা আপনি সেখানেই যান, আমি বলে দেবখন।

ধীরাপদর মুখে বিব্রত হাসির আভাস একটু। সেখানে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে ওষুধ বিক্রি করব?

কাজটা নগণ্য অথবা ওর যোগ্য নয়, সেই অর্থে বলতে চায়নি, ওর দ্বারা ও-কাজ সম্ভব নয় সেইটুকুই ব্যক্ত করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আগের অর্থটাই দাঁড়াল। আর তাতে সুফলই হল বোধহয়। ছোট সাহেবের মনে পড়ল, কারো কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসার

শুনে বাবা ব্যস্ততা সত্ত্বেও লোকটির সঙ্গে দেখা করেছেন, তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, কোন কাজে সুট করবে ভাবতে বলেছেন, আর পরদিন এই প্রসঙ্গে তার আলোচনা করার ইচ্ছেও ছিল।

আচ্ছা, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

বেয়ারার প্রতি ওকে ঘরে নিয়ে বসাবার ইঙ্গিত। সপার্ষদ আর একদিকে চলে গেল সিতাংশু মিত্র। ব্যস্ত, কোনো কারণে একটু চিন্তিতও যেন।

তিন তলার বেয়ারা দোতলার কন্ট্রোল রুমের দরজায় মোতায়েন বেয়ারার জেপাজতে ওকে ছেড়ে দিয়ে গেল।

আগাগোড়া কার্পেট বিছানো মস্ত ঘর। দু'দিকের দেয়ালের কাছে কাচ-বসানো বড় বড় দুটো সেক্রেটেরিয়েট টেবিল। সামনে দু'খানা করে শৌখিন ভিজিটারস চেয়ার। মাঝামাঝি জানালার দিক ঘেঁষে ষ্টেনোগ্রাফারের ছোট টেবিল। একজন মাঝবয়সী মেম সাহেব টাইপে মগ্ন। দামী মেসিন সম্ভবত, টাইপের শব্দটা খট খট করে কানে লাগছে না, টুক টুক মৃদু শব্দ। বড় টেবিলের একটাতে লাবণ্য সরকার সামনের কতগুলো ছড়ানো কাগজপত্র থেকে লিখছে কি।

ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকে এক প্রস্থ দামী সোফা-সেট। বেয়ারা ধীরাপদকে সেখানে এনে বসালো। লাবণ্য সরকার মুখ তুলল একবার। ষ্টেনোগ্রাফারও।

দ্বিতীয় শূন্য টেবিলটা নিঃসন্দেহে ছোট সাহেবের। পাশের দেয়ালে মস্ত চার্ট একটা, তাতে খুবসম্ভব কারখানার সমস্ত বিভাগেরই নক্সা আঁকা। ও-পাশের দেয়ালে একটা বোর্ডের গায়ে কোন্ বিভাগে কত কর্মচারী উপস্থিত সেদিন, তার তালিকা। বিভাগের নামগুলো স্থায়ী হরপের, উপস্থিতির সংখ্যা খড়ি দিয়ে লেখা।

ধীরাপদ আড়চোখে দেখছে এক-একবার। সোজাসুজি চেয়ে থাকলেও কারো কোনো বিরক্তির কারণ হত না—মহিলার নিরুদ্বেগ কাজের গতিতে একটুও ছেদ পড়ত না। সেটুকু উপলব্ধি করেও ধীরাপদ চুরি করে দেখতে লাগল। খুব যে একাগ্র মনোযোগে কাজ করছে তা নয়, ধীরে সুস্থে হাতের কাজ সেরে রাখছে যেন।

বাইরে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ। প্রথমে ছোট সাহেবের প্রবেশ, পরে অনুবর্তীদের। লাবণ্য সরকার এবারে মুখ তুলে তাকালো।

আজ তো হলই না, কালও হবার কোনো লক্ষণ দেখছি না।—প্রচ্ছন্ন ক্ষোভে তার উদ্দেশে খবরটা বলতে বলতে সিতাংশু মিত্র নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

হাতের কলমের মুখটা আটকাতে আটকাতে লাবণ্য সরকার উঠে এসে তার সামনের চেয়ারটাতে বসল। অন্য আগন্তুকরা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে। ধীরাপদর দিকে চোখ নেই কারো। তাদের বাকবিনিময় থেকে সমস্যা কিছু কিছু আঁচ করা যাচ্ছে। নতুন বয়লার চালানো যাচ্ছে না, কারণ চীফ কেমিষ্টের হুকুম নেই। অথচ পুরনো বয়লারের ওপর সরকারী নোটিসের দিন এগিয়ে আসছে। আগন্তুকরা সম্ভবত ওই কাজেরই কর্মচারী, ছোট সাহেবের মন রেখে তারা বয়লার চালানোর সুবিধের কথাও বলছে, আবার চীফ কেমিষ্টের বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনাতেই হয়ত অসুবিধের কথাও বলছে।

লাবণ্য সরকার সামনের বোর্ডটার দিকে ইঙ্গিত করল, লোকজন তো সবই উপস্থিত, তাহলে এমন কি অসুবিধে হবে। আপনি তাঁর সঙ্গেই একবার পরিষ্কার আলোচনা করে নিন না, খেয়াল-খুশিমত হবে না বললে চলবে কেন?

প্রস্তাবের জবাবে খট করে টেলিফোন তুলে কানে লাগালো সিতাংশু মিত্র।—ইস, সি! সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর মৃদু শোনালো।—একবার আসবে? কথা ছিল...

টেলিফোন নামালো। মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ আসছে। ইঙ্গিতে অন্য সকলকে বিদায় দিল। ধীরাপদর ধারণা, এ কয়েকজনার মধ্যে তারা থাকতেও চায় না। সিতাংশু মিত্র ঘাড় ফিরিয়ে কর্মচারীদের উপস্থিতি-তালিকার বোর্ডটা দেখছে। আর সেই সঙ্গে নিজেকে একটু প্রস্তুত করে নিচ্ছে হয়ত। সমস্যার ভারে ধীরাপদর কথা মনেও নেই বোধহয়। অন্য-প্রান্তের সোফার কোণে নির্বাক মূর্তির মত গা-ডুবিয়ে বসে আছে সে।

লাবণ্য সরকার নড়ে চড়ে বসলো। পদমর্যাদার ঠাণ্ডা অভিব্যক্তির এই প্রথম ব্যতিক্রম একটু।...ধীরাপদর চোখের ভুল না দেখার ভুল? অভ্যস্ত উদাসীনতার বদলে রমণী-মুখে চকিত কমনীয়তার আভাস... দেখার ভুল না চোখের ভুল?

এবারে যে-মানুষের চঞ্চল আবির্ভাব তাকে দেখে ধীরাপদ ভিতরে ভিতরে চাঙ্গা হয়ে উঠল। অমিতাভ ঘোষই বটে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, পাটভাঙা দাগ-ধরা দামী সুট, ঠোঁটে সিগারেট।...

কি রে, কি খবর...

ছোট সাহেবের মুখে সহজতা বজায় রাখার আয়াস।—বোসো, ব্যস্ত ছিলে নাকি?

না। অমিতাভ ঘোষ দু'জনকেই দেখল একবার। শূন্য চেয়ারটায় একখানা পা তুলে দিয়ে চেয়ারের কাঁধ ধরে ঝুঁকে দাঁড়াল।—কি ব্যাপার—বয়লার?

হ্যাঁ, আজ তো চললই না, কালও চলবে না?

না। সাদামাপটা জবাব।

লাবণ্য সরকার অন্যদিকে মুখ ফেরালো। ছোট সাহেবের কণ্ঠস্বর ঈষৎ অসহিষ্ণু।—কিন্তু না চললে এদিকে সামলাবে কি করে, তাছাড়া বাবা বার বার বলে দিয়েছেন—

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়া। বচন শুনে নিজের উপস্থিতির দরুন ধীরাপদ নিজেরই অস্বস্তি একটু।—মামাকে গিয়ে বল মিটিং করে আর বক্তৃতা করে বেড়ালেই সব কাজ হয়ে যাবে, আর কিছু দরকার নেই—

দুই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিতাংশু মিত্র খোঁচাটা হজম করে নিল, তার পর উষ্ণ জবাব দিল সে-ও।—তোমার তো দু'দিন ধরে পাত্তা নেই, সেদিনও বাড়িতে বাবা বহুক্ষণ অপেক্ষা করলেন—মিটিং করা ছেড়ে তাহলে তোমার পিছনেই ঘুরতে বলি।

পায়ে করে চেয়ারটা একটু ঠেলে দিয়ে অমিতাভ ঘোষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখের সিগারেটটা অ্যাশপটে গুঁজল।—আমার যা বলার আমি পনের দিন আগেই লিখে জানিয়েছি। বয়লার চালাবে কে, তুই না আমি না ইনি?

ছোট সাহেব দৃঢ় অথচ মৃদু জবাব দিল, যারা চালাবার তারাই চালাবে, তুমি আপত্তি করছ কেন?

চেয়ারটা টেনে নিয়ে এবারে অমিতাভ ঘোষ বসল ধুপ করে।

বেশ, কারা চালাবে ডাকো তাদের, বুঝে নিই কি করে চালাবে'। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ছোট সাহেবের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল।

কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যে সিতাংশু মিত্রর কাউকে ডাকার অভিপ্রায় দেখা গেল না। তার বক্তব্য, পুরনো বয়লারের লোক দিয়ে নতুন বয়লার আপাতত চালু করা হোক, পুরনোটা তো বন্ধই হয়ে যাচ্ছে, পরে একসঙ্গে দুটোই যখন চলবে, তখন দেখে শুনে জনাকতক পটু কারিগর নিয়ে আসা যাবে। সমর্থনের আশাতেই বোধ করি নির্বাক রমণীমূর্তির দিকে তাকালো সে। কিছু বুঝুক না বুঝুক মেম-টাইপিষ্টেরও হাত চলছে না।

সামনের বোর্ডের ওপর চোখ রেখে লাবণ্য সরকার এই প্রথম মন্তব্য করল, ফুল ষ্ট্রেংথ তো আপাতত আমাদের আছেই, ওখানকার রিজার্ভ হ্যাণ্ড ক'জনও পাচ্ছি, তাদের পুরনো বয়লারে লাগিয়ে সেখানকার স্কিল্‌ড হ্যাণ্ড···

ব্যস ব্যস ব্যস। অমিতাভ ঘোষ যেন ফাপরে পড়ে থামিয়ে দিল তাকে। হাল্কা বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল, এতক্ষণ অমন গম্ভীর হয়ে বসেছিলে খুব ভালো লাগছিল, দ্যাট ওয়াজ ওয়াণ্ডারফুল!

তরল অভিব্যক্তির ধাক্কায় ধীরাপদসুদ্ধ সোফার মধ্যে সন্তর্পণে নড়েচড়ে বসল একটু। মেম টাইপিষ্টের মুখেও কৌতুকের আভাস। ছোট সাহেব গম্ভীর।

আর লাবণ্য সরকারের গোটা মুখখানাই আরক্ত।—কেন, হবে না কেন?

ঈষদুষ্ণ চ্যালেঞ্জ সোজাসুজি চীফ কেমিষ্টের উদ্দেশে। জবাব না দিয়ে হাসিমুখে সে ফিরে দুই এক পলক চেয়ে রইল শুধু। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আবার। সিতাংশু মিত্রকে বলল, তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো, আমি কোনো দায়িত্ব নেব না। লাবণ্য সরকারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, মুখখানি তেমনি লঘু কৌতুকে ভরা। —তুমি বললে এখানে সব হবে, এভরিথিং ইজ পসিবল—

দরজার দিকে দু'পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল। ধীরাপদর সঙ্কট আসন্ন এবার, তাকে দেখেই থেমেছে। চিনেছেও।

মামা—মানে অনেকটা সেই রকম যে! আপনি এখানে বসে, কি ব্যাপার? উৎফুল্ল মুখে কাছে এগিয়ে এলো।

এই পরিবেশে এভাবে আক্রান্ত হবার ফলে নাজেহাল অবস্থা। উঠে যদিও বা দাঁড়ানো গেল, সহজ আলাপের চেষ্টা ব্যর্থ। জবাবে, যার জন্যে বসে ধীরাপদ, তার দিকেই শুধু তাকালো একবার। ওদিকে এমন এক অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে লাবণ্য সরকার আর সিতাংশু মিত্রও বিস্মিত। ওর অবাঞ্ছিত উপস্থিতি এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি বলে বিরক্তও। ছোট সাহেবের মুখে মালিক-সুলভ গাম্ভীর্য। —আপনি সন্ধ্যার পর দোকানে এসে এঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেবেন।

নির্দেশ জানিয়ে গটগট করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

এঁর সঙ্গে অর্থাৎ লাবণ্য সরকারের সঙ্গে। ক্ষণপূর্বের বিড়ম্বনার সাক্ষি হিসেবে ধীরাপদর অবস্থান মহিলাটির চোখে আরো বেশি মর্যাদাহানিকর বোধহয়। চীফ কেমিষ্টের বিদ্রূপের জেরই তখন পর্যন্ত সামলে উঠতে পারেনি। ধীরাপদরই কপাল মন্দ। যে-ভাবে ঘুরে তাকালো ওর দিকে, মনে হল, ছোট সাহেবের হয়ে কথা বলার পরোয়ানা পেয়ে ঠাণ্ডা চোখে কিছু একটা কৈফিয়তই তলব করে বসবে এবার।

কিন্তু কিছুই বলল না। যে-টুকু বুঝিয়ে দেবার পরেই ভালো করে বুঝিয়ে দেবে, তাড়া নেই যেন। উঠে নিজের জায়গায় গিয়ে হাতের কলমটা টেবিলের ওপর রাখল। খানিক আগের লেখা কাগজটা তুলে নিয়ে সেটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে সেও দরজার দিকে এগোলো।

অমিতাভ ঘোষ আধাআধি ঘুরে দাঁড়িয়ে উৎসুক নেত্রে একে একে দু'জনের দুটি প্রস্থান-পর্ব নিরীক্ষণ করল। তারপর ধীরাপদর ওপরেই চড়াও হল আবার।—কি ব্যাপার বলুন তো, এঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন?

ধীরাপদ এতক্ষণে হালকা বোধ করছে একটু। মাথা নাড়ল, অর্থাৎ, সেই রকমই বাসনা ছিল বটে।

কেন?

প্রশ্নটা কানে নীরস শোনালো। জবাব শোনার আগেই দরজার দিকে পা-ও বাড়িয়েছে।

আর বলেন কেন, চারুদির পাল্লায় পড়ে দু'দিন ধরেই তো ঘুরছি। তাকে অনুসরণ করে ধীরাপদও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একদিনের স্বল্প আলাপের এই একজনকেই কিছুটা কাছের লোক মনে হয়েছে।

চারুদির নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতই কাজ হল বুঝি। আবারও বিস্ময় আর আগ্রহ। চারুমাসি পাঠিয়েছে আপনাকে? কেন? চাকরি?

কি জানি কেন, ধরে বেঁধে পাঠিয়েছেন এই পর্যন্ত।

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল দুজনেই। অমিতাভ ঘোষ ফিরে এবারে ভালো করে নিরীক্ষণ করল তাকে। সপ্রশ্ন খুশির আভাস।—চলুন নিচে চলুন। হাত বাড়িয়ে ধীরাপদর কাঁধ বেষ্টন করে নিচে নামতে লাগল।—আপনি তাহলে চারুদির সেই রিপ্রেজেনটেটিভ! তাই বলুন···কি আশ্চর্য!

ধীরাপদর মনে হল আশ্চর্য বলেই এত খুশি, আর, হঠাৎ এই অন্তরঙ্গতাও চারুদির কারণে। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি কিছুই বুঝল না। ওকে সঙ্গে করে ফুলবাগান পেরিয়ে সামনের মস্ত একতলা দালানের দিকে পা চালিয়ে অমিতাভ ঘোষ উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, কিন্তু আপনি এদের কাছে ঘুরছেন কেন, মামার সঙ্গে দেখা করুন।

ধীরাপদ বুঝে নিল মামাটি কে। মানুকের মুখে শোনা ভাগ্নে বাবুর সমাচারও মনে আছে।—দেখা করেছিলাম···চারুদি তাঁর কাছেই চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি পরে কথা বলবেন বলেছিলেন, কিন্তু দুদিনের মধ্যে তাঁর তো দেখাই পাওয়া গেল না।

দেখা পাওয়া শক্ত। হাসতে লাগল, নামের টান বড় সাঙ্ঘাতিক টান যে। পকেট হাতড়াতে লাগল, সিগারেট আছে? থাক··· আমার টেবিলেই আছে বোধহয়। তাহলে আপনার আর ভাবনাটা কিসের এখন?

ভাবনা নয়, এঁদের মেজাজ গতিক ঠিক সুবিধের লাগছে না···।

অমিতাভ ঘোষ হা-হা শব্দে হেসে উঠল একপ্রস্থ। এ-মাথা ও-মাথা শেড দেওয়া এক মস্ত ফ্যাক্টরী-ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তারা। তপ্ত গুমোট বাতাস। লোকজন গলদঘর্ম হয়ে কাজ করছে। ইলেকট্রিক প্লেট বসানো সারি সারি চৌবাচ্চার মধ্যে কি সব ফুটছে, লোহার ফ্রেমে ঝুলছে মিটার-বসানো মস্ত মস্ত ড্রাম— বোধ হয় শুকোনো হচ্ছে কিছু, অদূরে কাচ-ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তিতে বিশাল বিশাল জাঁতার মত ঘুরছে কি আর তাল তাল কি একটা কঠিন শাদা পদার্থ পিষে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—সেই তকতকে গুঁড়ো সারি সারি ভ্যাটের মধ্যে ময়দার স্তূপের মত দেখাচ্ছে। চারদিকে গোঁ-গোঁ শোঁ-শোঁ একটানা যান্ত্রিক শব্দ। ভিতরে ঢুকেই বাঁ-দিকে অল্প একটু ঘেরানো জায়গায় চীফ কেমিষ্টের টেবিল-চেয়ার।

—বসুন। নিজেও বসল, তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চুপ-চাপ বসে থাকুন, যাঁর কাছ থেকে আসছেন, এঁদের মেজাজের ধার ধারতে হবে না আপনাকে—মামার সঙ্গে দেখা হলে আমি কথা বলব'খন।

হৃষ্টচিত্তে সিগারেট ধরালো একটা।

ধীরাপদর আবারও মনে হল, সে চারুদির লোক, চারুদির কাছ থেকে আসছে—আপন জনের মত লোকটির এই প্রসন্ন অন্তরঙ্গতা শুধু সেই জন্যেই, আর কোনো হেতু নেই। ধীরাপদর ভালো লাগছে বটে, সেই সঙ্গে বুদ্ধির অগম্য কিছু হাতড়েও বেড়াচ্ছে।···চারুদি কাউকে পাঠাতে পারে এ কি জানত নাকি। বোধহয় জানত, নইলে, চারুদির রিপ্রেজেনটেটিভ বলবে কেন ওকে? চারুদির লোক বলেই ওর জোরটা যেন ঠুনকো নয় একটুও। অথচ যে বলছে, নিজে সে চারুদিকে পরোয়া কতখানি করে তা ধীরাপদ নিজের চোখেই দেখেছে সেদিন, নিজের কানেই শুনেছে। অবশ্য, পরোয়া কাউকেই করে বলে মনে হয় না। ছোট সাহেবের ঘরে স্বয়ং বড় সাহেবের উদ্দেশেই তার নিঃশঙ্ক ব্যঙ্গোক্তি শুনে এলো খানিক আগে। তবু ধীরাপদর খাপছাড়া লাগছে কেমন। যতটা জেনেছে যতটা দেখেছে আর যতটা শুনেছে—সব যেন ঠিক ঠিক জুড়ে উঠতে পারছে না।

চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে অমিতাভ ঘোষ পরম আয়েসে সিগারেট টানছে। গোটাকতক লম্বা টানে সিগারেট অর্ধেক।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই বিপরীত রোষে খুশির আমেজ খান খান। অদূরের মিটার বসানো ড্রামগুলোর ওদিক থেকে একজন অল্পবয়সী কর্মচারী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আধ-ঘণ্টা মিটার দেখা হয়েছে আর হীট দেওয়া দরকার আছে কিনা।

চেয়ারের কাঁধে তেমনি মাথা রেখেই চীফ কেমিষ্ট আগন্তুকের মুখের ওপর অলস দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একটা।—তুমি নতুন এলে এখানে?

জবাবে কর্মচারীটির নিবেদন, গত দুদিন চীফ কেমিষ্টের অনুপস্থিতিতে মিস সরকার কাজ দেখেছেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বদলে তিনি আধ ঘণ্টা মিটার দেখতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

যান্ত্রিক পরিবেশের সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ যেন বাজ পড়ল একটা।

গেট আউট।

চীফ কেমিষ্টের গোটা মুখ রক্তবর্ণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মারমুখি চিৎকার, সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড চাপড়।

লোকটা সত্রাসে পালিয়ে বাঁচল। কাছে, দূরে সকলেই ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে।

ধীরাপদ হতভম্ব। [ক্রমশঃ।

রাতের আছে হাজার আঁখি

[F. W. Bourdillon এর The night has a thousand eyes এর বাংলায় অনুবাদ]

রাতের আছে হাজার আঁখি
দিবসের শুধু এক,
তবুও বসুধা আঁধারে সে যে
রবি যবে রবে নাক'।

মনের আছে হাজার আঁখি
হৃদয়ের শুধু এক,
তবুও জীবন, জীবন-হারা সে
প্রেম যবে রবে নাক'।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী অঞ্জলি ভট্টাচার্য্য

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৪৯। ব্রজেশ্বরী তাঁকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন, মধুরিকা, তুমি এখন বাড়ী যাও। আমার বাছা ধেনু নিয়ে গোঠে গেলে, আমিই তোমার দেবীর কাছে শুকটিকে পাঠিয়ে দেব।

যথাদেশ।

প্রণামান্তে প্রস্থান করলেন মধুরিকা।

ব্রজরাণী তখন পুত্রের পদ্মহাতখানি নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বললেন—

চল রে বাছা চল।

তারপর ছেলেকে উঠিয়ে কুসুমাসবকে বললেন—

আর দেখ কুসুমাসব, নিজে তুমি শুকটিকে সাবধানে রাখবে। আর সোনার বাটিতে করে ঘি-ভাত খাওয়াবে। কেমন?

কিন্তু তর সইল না শ্রীকৃষ্ণর। তিনি বলে উঠলেন—

না মা আমিই নিজে ওকে খাওয়াব। এই বলে পীতাংশুক নিজের করকমলে আটকিয়ে রেখে দিলেন শুকটিকে।

কিন্তু বার বার তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগল শুকের মুখে শোনা সেই কবিতাটি। কবিতায় একটি উত্তর রচনা করেও ফেললেন। শুককে শুনিয়ে কুসুমাসবকে কাছে টেনে নেপথ্যে বললেন—

সখে, আর আমার মন উঠছে না, বয়স্যদের নিয়ে বনে যেতে, ধেনু চরাতে। সুখ নেই ছোট মুরলীটিকে বাজিয়ে। শুকোশুকের মুখে যে কবিতাটি শুনলুম সেটি বোধ হয় হবে বা কোনো দয়িতালাপ। একটি গাঢ় অনুরাগ থিতিয়ে রয়েছে কবিতায়।

৫০। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ জননীর চরণচিহ্নের উপর নিজের চরণ-কমল দুটিকে আধান করতে করতে পৌঁছে গেলেন ভবনে, যেখানে তাঁকে ধুতে হল পা, বসতে হল ভোজনের আসনে, খেতে হল, তার পর নিজের সামনে রাখা সোনার বাটি থেকে অতি সুগন্ধী ঘৃতাক্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে একটু একটু করে নিজের হাতে খাওয়াতে হল শ্রীকেলিশুকটিকে।

৫১। তারপর আচমনান্তে পূর্ব পূর্ব দিনের মতই যখন আবার ধেনু নিয়ে গোঠে যেতে প্রস্তুত হলেন তিনি, কখন আদর করে মাকে বললেন—মা, আর কারোর উপর ভার দিও না যেন, নিজেই তুমি শুকটিকে দেখো।

ধেনু পালন করতে বিপিন মধ্যে চলে গেলেন লীলাকিশোর। আর, এক মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না শ্রীকৃষ্ণ জননী; ধাত্রী-দুহিতাকে ডাকলেন এবং তাঁর হাত দিয়ে রাধার শুকটিকে পাঠিয়ে দিলেন রাধার গৃহে।

শুকপাখীটিকে হাতে বসিয়ে সহসা ধাত্রী-দুহিতাকে আসতে দেখে, শ্যামলা ও সখীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন বৃষভানুকিশোরী। আসুন আসুন বলে সবহুমান আহ্বান জানিয়ে নিজের অর্দ্ধাসনে তাকে বসিয়ে স-প্রণয় ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন পরে বললেন—

কুশলে আছেন তো মহীয়সী ব্রজেশ্বরী?

আপনিও তো ভাল আছেন? ধাত্রীকন্যা বললেন—

আপনাদের চরণাশ্রয়ে ভালই আছি। কিন্তু আপনার এই শুকটি যে এত তাড়াতাড়ি এত আনন্দ বিতরণ করতে পারবেন তা জানা ছিল না। কুমার তো আনন্দে দিশেহারা। ওঁর ঐ সুন্দর ডাক শুনে কুমারের কর্ণ দুটি যাকে বলে উৎপুলকিত। কী তাঁর আনন্দের ঘনঘটা। চক্ষুধারীদের যেন ত্রিতাপ খণ্ডালেন। তারপর যেই তিনি ধেনুচারণে চলে গেলেন বিপিনে, ব্রজেশ্বরীও বুঝলেন এটিকে না পেলে আপনারও অন্ত থাকবে না দুঃখের। তিলেক দেরীও হবে অসহ্য। তাই আপনার উপর ভেঙে পড়ল তাঁর দয়া আর তারপরেই অয়ি কুশলে, কুশলেশ মাত্র বিলম্ব না ক'রে সমর্য্যাদা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই পক্ষীরত্নটিকে।

৫২। শ্যামা বলে উঠলেন—সুবদনে অমন কথা বলবেন না। এই গোকুলে গোপকুলে গোপনীয় বা অগোপনীয় যা কিছু রত্ন রয়েছে, যা কিছু ভুবনের ভূষণ হয়ে রয়েছে সবই তো আমাদের ব্রজরাজনন্দনের। নন্দনকাননের বিহঙ্গশ্রেষ্ঠের চেয়েও সৌভাগ্যবান এই শুক, যেহেতু শ্রীভগবান তাকে হাতে তুলে নিয়েছেন। অতএব তাঁরই খেলার উপকরণ হওয়া উচিত এই শুকটির। তাবলে, এখনি এটিকে ফেরৎ পাঠানো অনুচিত হবে। আপনি এখন আসুন। ধেনুপালন করে যখন বন থেকে ঘরে ফিরবেন কুমার তখন ব্রজেশ্বরীর সামনে ললিতা গিয়ে এটিকে তাঁর হাতে দিলেই, মানাবে ভালো।

৫৩। শ্রীরাধা বললেন—

সুন্দর ঠোঁটে যা কিছু আমার শ্যামা বললেন, তার সবই সুন্দর। তা আপান এখন আসুন। আর্যা কার ব্রজেশ্বরীর চরণে পৌঁছয়ে দেবেন আমাদের প্রণাম।

৫৪। ধাত্রীকন্যা বিদায় নিলেন। তারপর নবীন কৃষ্ণানুরাগের ঐশ্বর্য সুখ অনুভব করতে করতে বৃষভানু-নন্দিনী সম্মুখবর্ত্তী বিহঙ্গোত্তমকে যেই বলেছেন—

ধন্য তুমি ধন্য; দুর্লভের স্পর্শ সুখ লাভ করে তুমি আজ সৌভাগ্যবান হয়েছ। তাই বলে আমার হাতে আসতে ভয় কোরো না কিন্তু। তোমাকে ছুঁলে আমারও যে কল্যাণ হবে, খুব। কি হল এখন বল। এবং এই পর্য্যন্ত বলে শ্রীরাধা যেমনি শুকটিকে তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে অমনি শ্রীকেলিশুক বলে উঠলেন—

আমার কবিতাও তাঁর কর্ণপথে প্রবেশ করল আর অলক্ষ্যে আতর হয়ে গেল তাঁর হৃদয়। পরিজনদের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে

লাগলেন বটে কিন্তু মনে হল কিশোর কবিবরকে যেন নিরন্তর শীর্ণ করে দিচ্ছে গোপন গভীর একটি ক্ষত।

৫৫। এবং সখাকে লক্ষ্য করে জনান্তিকে তিনি বললেন··· কুসুমাসব, আর মন উঠছে না বনে যেতে ধেনু চরাতে। সুখ নেই ছোট্ট মুরলীটিকে বাজিয়ে। শুকোত্তমের মুখে যে কবিতাটি শুনলুম সেটি বোধ হয় হবে বা কোনো দয়িতালাপ। একটি গাঢ় অনুরাগ থিতিয়ে রয়েছে কবিতায়।

৫৬। শ্যামা বললেন—যাক্ আর আমাকে হাস্যাস্পদ হতে হবে না। এখন বুঝলেন তো আমার কথাটিই ঠিক। আমাকে দয়া করে আপনাদের অভিনন্দন করা উচিত। দয়িতালাপ ঐ পদটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তোমাকেই সই প্রেমময়ী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

৫৭। শ্রীরাধা বললেন—বোধিদ্রুমের পাতার মত তোমার উদরটি হলে হবে কি সই, শ্যামের কথার বাঁধুনি বোঝবার বোধশক্তি তোমার নেই। তাঁর পরিহাস-কর্মটি এখনও তুমি ধরতে পারনি। এটি কর্মধারয়, ষষ্ঠীতৎপুরুষ নয়। তৎপুরুষটি সত্যিই দুর্লভ। সম্ভাবনার বা বাইরে তাই বা ভেবে আমাকে কেন হাল্কা করার তোমার এই চেষ্টা? সে মানুষটি তো বললে—পরম অদ্ভুত। তাঁর দশা আমার মত একটি মন্দভাগ্য লোকের স্কন্ধে কেমন করেই বা তুমি চাপাচ্ছ যদি বল, অনুমান করছ তাই বা কেমন ক'রে হয়। তার হেতু কই? হায় কপাল, আমার সমান হয়েও অসমাপ্ত উপরোধটাকে তুমিই তাহলে সমাপ্ত করছ! ঠাটাচ্ছলে নিজেরি মেটাচ্ছ কৌতুক?

৫৮। শ্যামা বললেন—চারদিক না ভেবেই যা নয় তা বলছ সই। গোকুলে কে না জানে মধুরিকা তোমার অনুচরী। সেইই যখন বলেছে, আমার দেবীর এই শুক তখন দেবীটি যে তুমিই সে কি আর বুঝতে বাকি থাকে শ্যামের। অসম তোমার ভাবনার সই। এইখানেই তো শেষ। এর পরে কি আর কথা কাটাকাটি চলতে পারে? বিশ্রাম নিল বিবাদ।

৫৯। তার পরে একদিন ব্রজধামে অতিথি হয়ে এল ভগবানের জন্মতিথি। মহোৎসবের প্রারম্ভে রাজপুরীতে ঢং ঢং করে বেজে উঠল ভেরী। পটদের সে কী পুষ্ট লাম্পট্য! মর্দনের সে কী স্পষ্ট পটুতা। দুন্দুভিতের দমৎ দমৎ হুঙ্কারের মধ্যে মধ্যে চমৎকার-কারী সুরে বেজে উঠল বাঁশরী। নানান ধ্বনিতে ঘোষিত হল উৎসব।

আনন্দের পথে এসে মিললেন ঘোষেরা, মিললেন ঘোষজায়ারা। এবং সেই সঙ্গে আনন্দমন্ত্রে পরমানন্দ ঘনিয়ে সহস্রচরণে রুণুঝুণু বেজে উঠল নূপুরের রোল, সহস্র হস্তে গুরু গুরু করে বেজে উঠল মৃদঙ্গের রোল।

মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে দ্বিজশ্রেষ্ঠরা এলেন। মন্ত্রপূত সলিলে পূর্ণ হয়ে উঠল সহস্র শিল্প বিঘটিত স্ফটিকের ঘটগুলি। সহস্রধারায় আরম্ভ হয়ে গেল অজিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গলাবণ্য-লক্ষ্মীবিধান অভিষেক মঙ্গল।

তারপরে শ্রীকৃষ্ণকে সযতনে পরানো হল নব্য দিব্য ও পীতবরণ কৌশেয়বস্ত্র ও উত্তরীয়। মণি-মণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবেশে যেন সহসা জলে উঠল মহোৎসবের মহোজ্জ্বল্য। মঙ্গল মণিবন্ধে পরানো হল মণি-বলয়, তার উপরে শোভা পেল পরিচিত হলুদডোরে বাঁধা নবদূর্বাঙ্কুর। গোরোচনা দিয়ে যখন তাঁর ললাটে আঁকা হল উজ্জ্বলায়ত একটি তিলক তখন তার বিশেষ কমনীয়তায় আকৃষ্ট হয়ে আনন্দিত আবেগের একটি বিহ্বল বেগ সৃষ্টি করে সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলেন শ্রীযশোদা। দয়ায় ও আমোদে বিচলিত হয়ে কুসুমধান্য দিয়ে পুত্রকে করলেন আশীর্বাদ। যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর আমন্ত্রিতা ব্রজপুরীর পুরন্ধ্রীরা তার পরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণের করলেন গীতোজ্জ্বলা আরতি। কৌতুকভরে যৌতুক করতে লেগে গেলেন সকলে। অনন্তরস পায়স পিষ্টক ও মোদকাদির নৈবেদ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের ঘটালেন সৌহিত্য।

ব্রজেশ্বরীর সখীদের ও ব্রজধামের স্নিগ্ধ জনদের যিনি প্রেমধাম তিনি যখন তাম্বুল সেবা করলেন তখন পুনর্বার অনুষ্ঠিত হল আরত্রিক। ততঃপর যখন তিনি দিব্যাসনে আরোহণ করলেন তখন মনে হল আরও যেন রূঢ়তেজে জ্বলে উঠল উৎসব-জ্যোতিঃ।

স্নেহের তারল্যে ও উৎসবের সিদ্ধি-কামনায় বন্ধুদের নিমন্ত্রিত করেছিলেন ব্রজরাজ মহিষী। নিমন্ত্রিতা হয়ে এসেছিলেন ব্রজধামের পুরস্ত্রীরা, তাঁদের বধূরা, তাঁদের কুমারী কন্যারা। ব্রজরাজেরও নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠেরা, সনন্দ, উপনন্দ আদি আভীরেরা। তাঁদের বধূদের নিয়ে রন্ধনে ব্যাপৃতা হয়ে পড়েছিলেন নিখিল গুণারোহিনী শ্রীমোহিনী দেবী। কত প্রকারের যে রন্ধন হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। নানাবিধ উপকরণ। ভোজের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হতেই পুনর্বার দৌড় করানো হল স্ত্রী-পুরুষদের প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতে যে যেখানে আছে তাকে ডেকে আনতে। সকলেই এলেন। গোপেরা ও গোপাঙ্গনারা তারপর যথাক্রমে আশীর্বাদ করলেন পরমসুকুমার লীলাকুমারকে। আনন্দিত উৎকণ্ঠায় তাঁরা নিজেদের কণ্ঠ থেকে খুলে নিয়ে কুমারকণ্ঠে পরিয়ে দিতে লাগলেন মণিহার। প্রত্যেকেই করলেন শ্রীকৃষ্ণের পূজা।

৬০। তারপরে একের পর এক এলেন শ্বশ্রূমন্তারা। এবং তারপর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এলেন নবানুরাগিনীদের দল। পাদাগ্র পর্যন্ত বহু মূল্য অন্তরীয় বস্ত্রে তাঁদের অঙ্গ আবৃত। পূর্ব্ব-রাগের বিরহগ্লানিমা লেগে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নতুন ওড়নার অতিসূক্ষ্ম রন্ধ্রজাল ভেদ করে যেন ঝলকে ঝলকে ফুটে বেরিয়ে আসছিল দেহবিভা। শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই, যদিও তাঁদের নীলপদ্মের মত সুন্দর নয়নগুলি চীনাবগুণ্ঠনের ফিনফিনে অঞ্চলের মত চঞ্চল হয়ে উঠতে চাইল, এবং যদিও সেগুলি নিষ্ঠুর হতে চাইল ক্ষিপ্র উদীয়মান হৃদয়ের চাপল্যাখ্য সঞ্চারী ভাবের মহিমায়, তবুও সেই ক্ষণে তারা ভাবগোপন করতে বাধ্য হল নির্বিকার অকুটিল দেখাল তাঁদের নয়ন-সজ্জ। এবং কৌতুক দেবার সময়টিতে, খর অনুরাগ সত্ত্বেও অমুখর হয়েই রৈল তাঁদের হাতের বলয়গুলি। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ধরেও ধরতে পারলেন না নবানুরাগিনীদের এই ভাবগোপনতা। কারণ শুভাদৃষ্ট-বশতঃ তাঁরাও ভাবছিলেন—পরম মহানিধির মত পাওয়া গেছে এই বল্লভটিকে, তাঁরাও ভাবছিলেন—আমিও আধার ঐ সৌভাগ্য ফুলমঞ্জরীর।

৬১। তারপরে জননীদের পায়ে পায়ে এলেন কুমারী কন্যাদের দল। তাঁদের মনের ফুলগুলির যদিও পতিভাবনায় নিত্য সুবাসিত থাকাই স্বাভাবিক এবং সেই হেন মনের মহোৎসব সমান শ্রীকৃষ্ণকে যদিও তাঁরা দিনের পর দিন প্রতিদিন দেখেছেন, তবুও আজ তাঁদের

মনে হল তাঁদের নয়ন যেন এই সৌন্দর্য্য গহ্বরে প্রবেশ করে, দেখবার মত এই প্রথম দেখল দৃশ্য। তাঁরা ধন্যা হয়ে গেলেন ধন্যাধিকা হয়ে গেলেন।

৬২। নবীনা গোকুল-কুললনাদের যখন এই হেন অবস্থা সমান সমবধানতা, সমান আকার বিকারের সবিশেষ সঙ্গোপনতা, লজ্জায় সিক্ত হয় এক সমান অবস্থা, তখন হঠাৎ শ্রীকেলিশুকের বিস্তীর্ণ হয়ে উঠল হৃদয়। এতদিন যাঁর কাছে তিনি ছিলেন হঠাৎ তাকে দেখে তাঁর প্রীতি ভালবাসায় তিমতিমে হয়ে উঠল তাঁর মন। অধীর হয়ে তিনি ব্রজরাজকুমারের পাশ ছেড়ে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন শ্রীরাধার চরণ কমলে।

তুই ওঁর, তুই যাঃ এই কথাটি জানিয়ে এবং আদরের বাহুল্য ফলিয়ে যখন তাঁকে সরিয়ে দিতে লাগল শ্রীরাধার কঙ্কনবতী একখানি হস্তভঙ্গি, তখন শ্রীকৃষ্ণেরও নয়ন ভোমরা অকস্মাৎ দেখতে পেল, একগাছি নতুন ফোটা পদ্মফুলের মালার মত বৃষভানুনন্দিনীকে। হাঁ, তিনিই তো। দৃষ্টি হল অদৃষ্টি মধুর। মন আলগা করে দিল চোখের রাশকে।

৬৩। পদ্মমুখীদের মধ্যে নিজের পুত্রটিকে দেখতে দেখতে মুচকি হাসির মধুরসে যেন আপ্লুত হয়ে গেল ব্রজরাণীর মুখ। অবশেষে তিনি পুত্রের নিকট থেকে নিজে ডেকে তুলে নিয়ে এলেন কমলমুখীদের, যথাযথ বসিয়ে দিলেন ভোজন স্থানে।

৬৪। ইত্যবসরে ব্রজরাজ শ্রীনন্দ তাঁর মণিমণ্ডিত অলিন্দে নিরুপম গন্ধমাল্যাদি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন নৈচিকী গাভীদের এবং তদুপরি গম্ভার কাঠের সর্বতোভদ্র আসনে উপবেশন করিয়ে চরণ ধুইয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠদের। এবং যেহেতু স্বর্ণপাত্র পাত্রসাৎ করতে হলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠরাই উপযুক্ত পাত্র, সেইহেতু ব্রজরাজ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন পান ভোজন আচমনাদির কনকপাত্রগুলির অর্ঘ্যদান করে। সমাগতা হয়ে আনন্দে এলেন সনন্দ উপনন্দের জ্যোৎস্নময়ী ভার্য্যাদ্বয় এবং শ্রীরোহিনী। তাঁদের পরিবেশন-তৎপরতায় ব্রাহ্মণ ভোজন সমাপ্ত হয়ে গেলে ব্রজরাজ তাঁদের সকলকে উপহার দিলেন মাল্যচন্দন তাম্বুল ও বস্ত্রালঙ্কার। তারপরে স্বয়ং বসে পড়লেন আসনে। সঙ্গে বসলেন লোকনয়ন তাপ সঙ্কর্ষণ শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরাম, শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধেরা, ব্রজতরুণেরা এবং শিশুগোপেরা।

এদিকে শ্রীরোহিনী পরিবেশন করছেন ও ব্রজরাজ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ভোজন করছেন, আর ওদিকে মসৃণ মরকতভবনে তৎক্ষণে শ্রীযশোদা কাপড় ঢাকা পিঁড়ি পাতিয়েছেন, পিঁড়িতে বসিয়েছেন সর্বপ্রধানা শ্রীরাধাকে, আর তাঁর দুপাশে বসিয়ে দিয়েছেন অসামান্যা মান্যাদের বধূদের কুমারীদের।

প্রত্যেকের পাতে পরিবেশনাদি করতে করতে নিজেই তিনি যেন ভাসতে লাগলেন সুখসমুদ্রে। মুচকি হাসির অমৃত ছড়িয়ে 'না গো মেয়েরা এখানে লজ্জা করতে নেই' বলতে বলতে তিনি প্রত্যেককেই খাইয়ে দিলেন তৃপ্তিভরে। তার পরে প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন একখানি করে অমল বসন, মণিময় অলঙ্কার, মাল্যানুলেপন সিন্দুর তাম্বুল। ভোজনপর্ব সমাধা হয়ে গেলে ব্রজবালারা সকলে প্রণাম করলেন সৌভাগ্যবতী শিরোমণি ভগবতী শ্রীকৃষ্ণজননীকে। লৌকিক রীতি অনুসারে ব্রজরাণীও তখন সকলকে আলিঙ্গন দান করে ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন প্রত্যেকের।

৬৫। মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন আপামর জনসাধারণ। অতিমোদন অবশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্যগুলিকে তাঁদের মধ্যে নিরলস হাস্যমুখে বিভাগ করে দিলেন ব্রজরাজ। নট নটী বাজকর চারণ মগেধাদির মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে তিনি বণ্টন করে দিলেন পারিতোষিক। তা সত্ত্বেও ব্রজরাণীকে পুনর্বার মেটাতে হল তাঁদের চাহিদা।

শান্ত হল মহোৎসব। কিন্তু শান্তি কোথায় মা যশোদার মনে? তাঁর মন কেবল বলতে লাগল—নিত্য যদি এমন হয় তবেই তো সুখ। ভাবতে ভাবতে ক্ষণকাল দয়াময়ীরও হৃদয়খানি অনুভব করল উৎসব শেষের পরম দুঃখ।

৬৬। তার পরের দিন। ধেনুপালনে বনে গেছেন নন্দকুমার। সহচরদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হঠাৎ তিনি প্রকাশ করে বসলেন ফুলের গেন্ডুয়া নিয়ে তাঁর বিচিত্র খেলা।

ফুল তুলেছেন সাথীরা। বিলাসরসের উপযোগী রাশি রাশি ফুল। ফুল তো নয়, যেন চন্দ্রদেবের মাংসপিণ্ড। অতি সুন্দর কুন্দকুসুম। অমনি শ্রীকৃষ্ণ নির্মাণ করে বসলেন হাজারে হাজারে কুন্দ-কন্দুক। তারপরেই লোফালুফি আর ছোঁড়াছুড়ির সে কী আমোদ আনন্দ। ফুলের গেন্ডুয়াগুলো আকাশে উঠে যায়, আর মনে হয় ঐ বুঝি ওরা ফুটিয়ে দিয়েছে দ্যুলোকসুন্দরীদের রমণীয় মনের লাবণ্য। ফুলের গেন্ডুয়াগুলো বেঁকে ছুটে চলে যায় আকাশ-পথে, আর মনে হয় দিগ্বধূদের কানে কানে বুঝি ঐ ওরা পরিয়ে দিচ্ছে কর্ণপুর। কুন্দকুন্দুক নিয়ে খেলতে খেলতে অবিশ্রাম ছুটতে থাকেন নন্দকুমার খেলার গর্ব্বে ফুলে ফুলে ওঠে বুক।

৬৭। আবার কখনও ছুটতে ছুটতে রাঙা চোখের কোণ কুঁচকিয়ে সূর্য্যালোকে তিনি ঘেমে যান। চৌদিকে বালকের চমূ ভাঙা ভাঙা ফুলগুলি তাদের নড়তে থাকে, উড়তে থাকে। আর তাদের মধ্যে কৌতুকী কুমার কিন্তু হঠাৎ যেন বিজয় গর্ব্বেই থেমে যান। আর সেই ক্ষণটিতে তাঁকে দেখায় যেন ছবিটি। উপর থেকে নীচে নামছে ফুলের গোলা ; মুখ তুলে সেটিকে ধরতে যাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বাঁ হাতে আধখসা মোহন পাগ ডান হাতে ঢাকছেন সূর্য্য।

৬৮। কেন যে এই খেলার প্রকাশ কে জানে? দুরবগাহ যাঁর চরিত্র তিনি আবার তারপর তখন খেলতে থাকেন ফুল দিয়ে বিলাসী খেলা। শরতের ভরা চাঁদের মত অমিয়ায় ভরে যায় তাঁর মুখ, মুক্তার ঝালর দোলায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। তরুণ তরুর মূল ঘেঁসে হঠাৎ তিনি বসে পড়েন। লম্বমান লতাপল্লব দিয়ে তাঁকে বাতাস করতে থাকে কোন সখা, নিজের বস্ত্রাঞ্চল বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে শুইয়ে দেন, কেউ কেউ বা ধীরে ধীরে পা টিপে দেন তাঁর।

৬৯। এই ভাবে দিন কেটে যায় কুন্দকন্দুক নিয়ে খেলায়। এই রকম করেই তো পরম দয়িতেরা অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলেন, সকল রসের আস্বাদ পান, আর পালন করতে থাকেন তাঁর নৈচিকী গাভীদের দল।

৭০। তার পরের দিন। সেদিনও কুতূহলী নয়ন মেলে দ্যুলোকচারী দেবতারা চেয়েছিলেন মর্ত্ত্যের পানে, জুড়োচ্ছিলেন নয়নের জ্বালা ; কৃষ্ণ বলরামকে মাঝখানে নিয়ে খেলছিলেন

সহচরেরা ; আনন্দে চরছিল ধেনুর পাল ; স্বনিষ্ঠ হলেও বৃন্দাবনের যত তরুলতা, যত মৃগ, যত পাখী, যত ভ্রমর সকলের সৌভাগ্যই দাদা বলরামের দয়ার···এই কথাটি ছল করে সকলকে বোঝাচ্ছিলেন কৃষ্ণ ভগবান ; সহচরেরা শুনছিলেন, হাসছিলেন, খেলছিলেন ; সেদিনও দুপুরের কড়া রোদে ঘেমে উঠে বনে বনে বিহার ছেড়ে ছায়াঘন তরুমূলে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়েছিলেন দু' ভাই ; হাসাহাসির ফুল ছড়িয়ে সখারা অভিনয় করছিলেন প্রণয় ডাম্বর্য্য।

৭১। এমন সময় সহসা তাঁর ক্ষণিক বিশ্রাম ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণ। এবং আশ্চর্য্য, সসম্ভ্রমে ও সপ্রণয়ে টিপে দিতে লাগলেন অগ্রজের চরণ-কমল। কৃষ্ণের করস্পর্শে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল বলরামের ক্লান্তি। তার পরে মধ্যাহ্নের তপনতাপ অগ্রাহ্য করে শ্রীকৃষ্ণ দৌড়লেন কাননে। সঙ্গে ছুটলেন সহচরেরা। শ্রীকৃষ্ণের হেলাখেলার হুল্লোড়ে নিমেষে যেন নিপাত হয়ে গেল তাঁদেরও চরম শ্রম। ধেনুদের পিছনে পিছনে কুতূহলী হয়ে ছুটলেন বলরাম।

৭২। সহজপ্রণয়মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দে আত্মহারা হয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে সকল খেলা খেলে চলেছেন তখন সখাদের মনে হতে লাগল তিনিই যেন ক্রীড়াশিল্পনৈপুণ্যের মধুরিমা, সম্মানধারীদের গণনায় তিনি যেন মূর্দ্ধন্য। কণ্ঠে মধুস্রোত বইয়ে তাই তাঁরা বলে উঠলেন—

বলি ও রাম, বলি ও কৃষ্ণ, প্রতাপের তো দেখছি অন্ত নেই। অঙ্গের প্রভা উড়িয়ে খুব তো দূর করলেন অন্ধকার। কিন্তু এদিকে যে আপনাদের সখাদের উদরে বরুণ উপস্থিত হয়েছে অক্ষয় বুভুক্ষার। সীমা টপকেছে। ঐ দেখুন ভ্রাতৃদ্বয়, দূর থেকে নয় নিকট থেকেই পরিপক্ক ফলের গন্ধনিমন্ত্রণ অস্মদীয় নাসিকার নিকটে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তালবন। ছিঁড়তে হবে না, নাড়ালেই ঝরিয়ে দেবেন তাল। সেগুলিকে সংগ্রহ করে আমাদের আপ্যায়ন করা কি আপনাদের কর্তব্য নয় উভয়ের ?

৭৩। সখাদের লোভ দেখে তাঁদের ঔৎসুক্য মেটাতে তালবনের দিকে তখনি ছুটে চলল চারখানি শ্রীচরণ। কে জানত···এই তালবনে পাহারায় বসে আছেন 'ধেনুক'-দৈত্য।

দু ভাই যখন তালবনের নিকটে এলেন তখন তাঁদের চোখে নাচছে আনন্দ। শোভায় লোভ বাড়ে, লোভে লোল হয় চোখ, আর চোখ তখন চেঁচিয়ে উঠে বলে ফল চাই।

৭৪। আগুনে-রঙের পাকা পাকা ফল। তখনও খসেনি। কাঁদি-কাঁদি ফলে স্থূল হয়ে গেছে তাল গাছের কাঁধ। ঠাস কাঁদি। দেখলে আনন্দ, খেলে কল্যাণ।

ভুরু বাঁকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখতে লাগলেন সেই তালীকুঞ্জ···মেঘের মত মেদুর, ফলেছে, কিন্তু নাগালের বাইরে। মনমাতানো সৌরভ। কিন্তু মানুষে কেমন করে উপভোগ করবে সেই সৌরভ যদি চরাচর গুরু পবনদেব নিজেই দয়া করে অমন সটসট ধ্বনিতে তালপল্লব চকিত করে হরণ করে নেন ফলগন্ধ ? দেখতে দেখতে সখাদের চীৎকার ভেসে এল—

ফেলো ফেলো, পাড়ো পাড়ো। বড় বড় ঢিল উড়ল। ধপধাপ করে মাটিতে পড়তে লাগল তাল।

তালপড়ার আওয়াজ শুনে তালকুঞ্জ থেকে পথের মাঝখানে বেরিয়ে এলেন ধেনুক-দৈত্য। প্রকাণ্ড গর্দ্দভের মত আকৃতি। মহাবলবান। খুরপার মত তাঁর চারপায়ের খুর। খুরের আঘাতে ফেটে যেতে লাগল মাটি সৃষ্টি হয়ে গেল ধুলোর আঁধি। পিছনের দুপা ছুঁড়ে কাঁপিয়ে তুললেন পৃথিবীর প্রাণ। কী তাঁর নাসার উর্জ্জং ক্ষূর্জং গর্জন। যেন তর্জ্জিত হয়ে গেলেন দ্যুলোকের নির্জরেরা, যেন জর্জরীভূত হয়ে গেল পর্জন্য-ঘোষ।

ঘোষবালকদের অবজ্ঞা করে ধেনুকদৈত্য সোজা ছুটে এলেন বলরাম ও কৃষ্ণের অভিমুখে। হত্যার বাসনা জ্বলছে চোখে।

৭৫। অগ্নিমুখী পতঙ্গের মত পিছনের পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝাঁপিয়ে এলেন অসুর। নড়লেন না বলরাম। অবহেলায়··· বামকরের অগ্রভাগ দিয়ে তিনি ধরে ফেললেন তাঁর দুপায়ের ছুটি গোছ। আকাশে ঘুরপাক খাইয়ে গাধার দেহটাকে ছুঁড়ে মারলেন সমুত্তাল তালবৃক্ষের কাণ্ডে। দেহটা দিয়েই এক পলকে সরিয়ে দিলেন তালগাছের সমস্ত ফল। পিষে নিষ্প্রাণ হয়ে গেল ধেনুক।

৭৬। ছুটে এলেন দৈত্যের অনুচরের দল। তাদেরও অনায়াসেই শেষ করে দিলেন দুভাই।

৭৭। বিদীর্ণ তালফলের নিবিড় নিপাতে পঙ্কিল হয়ে গেল কুঞ্জপ্রাঙ্গণ। অপক্ক ফলগুলিকে বেছে নিয়ে সকলে তখন কন্দুক ক্রীড়ায় মেতে উঠলেন। রক্তেভেজা প্রাঙ্গণ কেউ ভক্ষণ করলেন না ফল।

৭৮। যদিও তালফলের অস্বাদ না পেয়ে অতৃপ্ত রইল কৃষ্ণবান্ধবদের রসনা, তবুও ফলের গন্ধ বাহুল্যে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তাঁদের বন্ধুর নাসাপুট। তারপরে শ্রীকৃষ্ণ একত্রিত করলেন ধেনুমণ্ডলী এবং তাঁর অতলস্পর্শ মধুরিমা ছড়াতে ছড়াতে শ্রীবলরামের সঙ্গে বেলা পড়ে আসছে দেখে পা বাড়ালেন ব্রজের পথে। সৌন্দর্য্যে ছেয়ে গেল ভুবনতল। সেই সৌন্দর্য্যের পদতলে যেন নত হয়ে গেল পৃথিবীর দুঃখশোক। বৃন্দাবনের জ্যোতির্ময় প্রত্যেকটি তরুলতাকে অভিনন্দন করতে করতে মহানুভাব মহানুত্তম নন্দকুমার সসখা চললেন ব্রজের অভিমুখে। যিনি আদি তাঁতেও ফুটে উঠল প্রকৃতভাব। অনুপম অধরে মধুরে বেজে উঠল মুরলী। মানস গঙ্গার বাতাসে উড়তে লাগল গোখুরের ক্ষুদ্র রেণু ; আর সেই রেণুর আনন্দ বারবার চুম্বন করতে লাগল তাঁর অলকাবলী, চুম্বন করতে লাগল তাঁর সুচারু উষ্ণীষ।

প্রিয়জনদের নয়নে শ্রীমুখের প্রতিবিম্বটিকে প্রতিফলিত করতে করতে মুরলীর কলধ্বনিতে ব্রজনগরের নাগরীদের গরবভরা মনের মাণিকখানি ভুলিয়ে হরণ করতে করতে, শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন নিজের ভবনে। বলভীতলে আরোহণ করে তাঁকে অনিমেষ নয়নে দেখতে লাগলেন রসিকারা আর নয়নপদ্মের পত্রপুটে পান করতে লাগলেন সৌন্দর্য্যমাধুরীর মধু।

৭৯। পুত্রদুটিকে ফিরতে দেখে ছুটে এলেন শ্রীযশোদা, ছুটে এলেন শ্রীরোহিণী। তারপর প্রথামত অঙ্গমার্জন স্নান পান ভোজনের পর সুখে পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন শ্রীরাম এবং দামোদর।

ইতি পূর্ব্বরাগপরভাগো নাম অষ্টমঃ স্তবকঃ।

[ক্রমশঃ।

একটি বেদনাদায়ক কাহিনী

(আইরিশ গল্প)

জেমস জয়েস্

মিঃ জেমস ডাফি চ্যাপেলিজডে বাস করতেন। তার কারণ তিনি যে শহরের অধিবাসী ছিলেন তার থেকে যত দূরে সম্ভব তিনি বাস করতে চাইতেন এবং ডাবলিনের অন্যান্য উপকণ্ঠকে তাঁর মনে হত সাধারণ, আধুনিক এবং কৃত্রিম বলে। তিনি একটা পুরনো বিষণ্ণ বাড়িতে বাস করতেন এবং বাড়ির জানালা থেকে তিনি দেখতে পেতেন অব্যবহৃত মদ চোলাইর কারখানাটি কিংবা আরও দূরে দেখতে পেতেন সেই অগভীর নদীটি যার উপরে ডাবলিন শহর অবস্থিত। কার্পেটে অনাবৃত তাঁর ঘরের উঁচু দেয়ালগুলিতে কোন ছবি টাঙানো ছিল না। সে ঘরের প্রতিটি আসবাব কিনেছিলেন তিনি নিজে: কালো রঙের একটা লোহার খাট, লোহার একটা ওয়াসিং-ষ্ট্যাণ্ড, চারটা বেতের চেয়ার, একটা আলনা, একটা কয়লা রাখার পাত্র, ইস্ত্রি করবার যন্ত্রপাতি এবং ডবল-ডেস্ক যুক্ত একটি চতুর্ভুজ টেবিল। দেয়ালের গায়ে সাদা কাঠ দিয়ে তৈরি করা একটা বুককেসও ছিল। বিছানাটা ঢাকা ছিল সাদা চাদরে এবং চাদরের দিকে ছিল লাল ও কালো রঙের একটা কম্বল। ওয়াসিং-ষ্ট্যাণ্ডের উপরে একটা ছোট হাত-আয়না ঝুলানো ছিল এবং দিনের বেলা সাদা আবরণে ঢাকা একটা বাতি মাত্র ঘরের শোভা বৃদ্ধি করত। সাদা কাঠের তাকে বইগুলি নীচু থেকে উপরে আকার অনুসারে সাজানো ছিল। সব চেয়ে নীচু তাকটার একপ্রান্তে ছিল ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের গ্রন্থাবলী এবং সব চেয়ে উঁচু তাকের একপ্রান্তে নোটবুকের কাপড়ের কভারে সেলাই করা এক খণ্ড 'মেনুথ, ক্যাটেকিজম্' ছিল। ডেস্কের উপরে সব সময় লেখার উপকরণ থাকত। ডেস্কের মধ্যে ছিল হপ্টম্যানের 'মাইকেল ক্র্যামারে'র অনুবাদের পাণ্ডুলিপি; তার মঞ্চবিষয়ক নির্দেশাবলী লেখা ছিল লাল কালিতে। এ ছাড়া পিতলের পিন দিয়ে আটকানো এক গোছা কাগজও ছিল ডেস্কের মধ্যে। এই সব কাগজে মাঝে মাঝে বিশেষ করে ব্যঙ্গাত্মক মুহূর্তে এক একটি বাক্য লেখা হত। কাগজ গোছার প্রথমটিতে 'বাইল বিনসে'র বিজ্ঞাপনের একটা শিরোনামা আঠা দিয়ে এঁটে রাখা হয়েছিল। ডেস্কের আবরণ খুললেই একটা মৃদু গন্ধ এসে নাকে লাগত—নতুন দেবদারু কাঠের পেন্সিল কিংবা আঠার বোতলের গন্ধ। মাঝে মাঝে ভুলে ফেলে-রাখা খুব বেশি পাকা আপেলের গন্ধও পাওয়া যেত!

দৈহিক কিংবা মানসিক বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক যে কোন জিনিসই মিঃ ডাফ ঘৃণার চোখে দেখতেন। মধ্য যুগের ডাক্তাররা তাঁকে নিশ্চয়ই শনির মানুষ বলতেন। তাঁর মুখে ছিল তাঁর গোটা জীবনের কাহিনীর ছাপ এবং সে মুখের রঙ ছিল ডাবলিনের পথের মত বাদামী। তাঁর লম্বা এবং কিছু পরিমাণে বড় মাথায় ছিল শুকনো কালো চুল এবং তাঁর মুখে যে গোঁফ ছিল তাতে তাঁর অবিনয়ী মুখটা ঢাকা পড়ত না। তাঁর গালের হাড়ের দরুণও মুখটাকে কঠিন বলে মনে হত; কিন্তু তাঁর চোখে কোন কাঠিন্যের পরিচয় ছিল না। বাদামী রঙের চোখের পাতার নীচ থেকে তিনি চোখ দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাতেন এবং মনে হত যে তিনি অন্যের মধ্যে গুণ আবিষ্কার করার জন্যে আগ্রহান্বিত এবং তা না পেয়ে তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই হতাশ। তিনি যেন তাঁর নিজের দেহটা থেকেও কিছু দূরে বাস করতেন এবং নিজের কার্যকলাপকেও দেখতেন সন্দিগ্ধ চোখে। একটা অদ্ভুত আত্মজীবনীমূলক অভ্যাসও তাঁর ছিল। এই অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে তিনি কখনও কখনও মনে মনে নিজের সম্বন্ধে বাক্য গঠন করতেন—সে বাক্যের কর্তা হত তৃতীয় পুরুষের এবং ক্রিয়া হত অতীত কালের। তিনি কখনও ভিখারীদের ভিক্ষা দিতেন না এবং মোটা হ্যাজেলের লাঠি নিয়ে দৃঢ়পদে হেঁটে বেড়াতেন।

তিনি বহু বৎসর ধরে ব্যাগট ষ্ট্রীটের একটি বেসরকারী ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারের কাজ করছিলেন। প্রতিদিন সকালে তিনি চ্যাপেলিজড থেকে ট্রামে করে অফিসে যেতেন। দুপুর বেলা তিনি ড্যান বার্কের হোটেলে লাঞ্চ, এক বোতল বিয়ার ও বেশ কয়েকটি অ্যারারুট বিস্কুট খেতেন। বিকেল চারটায় তাঁর ছুটি হত। তিনি জর্জেস ষ্ট্রীটে একটা হোটেলে নৈশ ভোজন শেষ করতেন। এই হোটেলে তিনি ডাবলিনের গিল্‌ট করা যুব সমাজের হাত থেকে নিরাপদ বোধ করতেন এবং এদের খাবারের উপরও তাঁর আস্থা ছিল। তাঁর সন্ধ্যাগুলি কাটত হয় গৃহকর্ত্রীর পিয়ানোর সম্মুখে নয়তো শহরের উপকণ্ঠে বেড়িয়ে। মোজার্টের সঙ্গীত তিনি ভালবাসেন বলে মাঝে মাঝে তাঁকে অপেরা বা কনসার্টেও দেখা যেত। তাঁর জীবনে এগুলিই ছিল একমাত্র আনন্দ।

তাঁর সঙ্গী ছিল না, বন্ধু ছিল না, গির্জাও ছিল না, ধর্মবিশ্বাসও ছিল না। অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ না রেখেই তিনি তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন যাপন করতেন, বড়দিনে যেতেন কুটুম্বদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এবং তারা কেউ মারা গেলে তাদের মৃতদেহের পিছু পিছু তিনি সমাধি স্থানে যেতেন। তিনি প্রাচীন মর্য্যাদার খাতিরে এই দুটি সামাজিক কর্তব্য করলেও আমাদের সামাজিক জীবনের নিয়ামক অন্য কোন রীতি নীতি মানতেন না। তিনি একথা ভাবতেও নিজেকে অনুমতি দিতেন যে সেরকম অবস্থায় পড়লে তিনি ব্যাঙ্ক লুট করবেন কিন্তু সে অবস্থার সৃষ্টি কখনও হয়নি বলে তাঁর জীবন সমান ভাবেই গড়িয়ে চলেছিল—তার মধ্যে কোন উত্তেজনা ছিল না।

এক সন্ধ্যায় রোটাণ্ডায় তিনি নিজেকে দুটি মহিলার পাশে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। সেই হলে অল্প সংখ্যক দর্শক ও নীরবতার ফলে মনে হচ্ছিল যে আসর তেমন জমবে না। তাঁর পাশে উপবিষ্টা মহিলাটি প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহটি দুই একবার দেখে বললেন: এটা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে আজ রাত্তে দর্শকের সংখ্যা এত কম। শূন্য প্রেক্ষাগৃহে গান গাওয়া এক কষ্টদায়ক ব্যাপার।

তিনি মহিলার এই মন্তব্যকে কথা বলার আমন্ত্রণ বলে গ্রহণ করলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে মহিলাটি আদৌ বিব্রত বোধ করেন না। কথা বলতে বলতে তিনি মহিলাটিকে স্থায়ীভাবে নিজের স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। যখন তিনি শুনলেন যে মহিলাটির পাশে উপবিষ্টা তরুণীটি তাঁর কন্যা তখন তিনি বিচার করে দেখলেন যে মহিলাটির বয়ে তাঁর চেয়ে দুই এক বছরের কম হবে। তাঁর মুখ এক সময় সুন্দর ছিল এবং এখনও সে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে। ডিম্বাকৃতির মুখটিতে অবয়বের বৈশিষ্ট্য প্রকট। চোখদুটি ছিল

গভীর নীল ও স্থির। সে চোখের দৃষ্টির সূত্রপাত হত উদ্ধত ভঙ্গিতে কিন্তু পরে কণীনিকায় তারারন্ধ্রের ইচ্ছাকৃত মূর্চ্ছায় এক মুহূর্তের জন্যে বোঝা যেত যে চোখের অধিকারিনী খুব বেশ সংবেদনশীলা। তারারন্ধ্র আবার দ্রুত আত্মপ্রকাশ করত, আবার বুদ্ধিমত্তার অধীনে হারিয়ে যেত এই অর্দ্ধ নিমীলিত প্রকৃতি এবং মহিলার পরিপূর্ণ আকৃতির বক্ষদেশ আবরণকারী অ্যাষ্ট্রাখান জ্যাকেটে এই ঔদ্ধত্য আরও বেশি করে ফুটে উঠত।

আবার কয়েক সপ্তাহ পরে আর্লসফোর্ট টেরেসে একটা কনসার্টে দুজনের দেখা হল। মহিলাটির কন্যার মনোযোগ যখন অন্যত্র নিবদ্ধ তখন তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেন মহিলাটির সঙ্গে। তিনি দু একবার স্বামীর কথা উল্লেখ করলেন বটে, কিন্তু সে উল্লেখের মধ্যে সাবধানতার কোন ইঙ্গিত ছিল না। তাঁর নাম শ্রীমতী সিনিকো। তাঁর স্বামীর প্রপিতামহের পিতা এসেছিলেন লেগহর্ণ থেকে। তাঁর স্বামী হলেন ডাবলিন ও হল্যাণ্ডের মধ্যে চলাচলকারী একটি বাণিজ্য জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং তাঁদের সন্তান মাত্র একটি।

ঘটনাচক্রে তৃতীয়বার মহিলাটির সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি সাহস করে উভয়ের নিভৃতে একত্রিত হবার একটা প্রস্তাব করলেন। সেই নিভৃত মিলনে মহিলা এসেছিলেন। এইভাবে বহু নিভৃত মিলনের সূত্রপাত হল। তাঁরা প্রায়ই সন্ধ্যায় একত্রিত হতেন এবং সর্বাপেক্ষা নির্জন এলাকা বেছে নিয়ে উভয়ে একত্রে বেড়াতেন। এই ধরনের লুকোচুরিতে মিঃ ডাফির কিন্তু আপত্তি ছিল এবং মহিলাটি যাতে তাঁকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেন, সে বিষয়ে তিনি তাঁকে বাধ্য করলেন। ক্যাপ্টেন সিনিকো ভাবলেন যে মিঃ ডাফি বোধ হয় তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী তাই তিনিও তাঁর আসা সমর্থন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিজের আনন্দের মঞ্চ থেকে এমনভাবে নির্বাসিত করেছিলেন যে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে অন্য কারও কোন আগ্রহ থাকতে পারে একথা তিনি ভাবতে পারতেন না। স্বামী প্রায়ই বাড়ি থাকতেন না এবং মেয়েও সঙ্গীতশিক্ষা দিতে বেরিয়ে যেত বলে মিঃ ডাফি মহিলার সঙ্গসুখ ভোগের অনেক সুযোগ পেতেন। তাঁদের উভয়ের মধ্যে কেউ পূর্বে এ ধরণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন নি এবং তাঁরা এর মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করেন নি। ধীরে ধীরে মিঃ ডাফির সমস্ত চিন্তা জড়িয়ে গেল মহিলাটির সঙ্গে। তিনি মহিলাকে বই ধার দিতেন, তাঁর সঙ্গে ভাব বিনিময় করতেন এবং নিজের বুদ্ধিবাদের অংশও তাঁকে দেবার চেষ্টা করতেন। মহিলাটি সব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

কখনও কখনও মিঃ ডাফির মতবাদ বর্ণনার বিনিময়ে মহিলাটি নিজের জীবনের কোন কোন ঘটনা বলতেন। প্রায় মায়ের মতই উদ্বেগ নিয়ে মহিলাটি তাঁকে তাঁর প্রকৃতি পুরোপুরি খুলে ধরার উপদেশ দিতেন। মিঃ ডাফি তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি কিছুকাল আইরিশ সমাজতন্ত্রী দলকে সাহায্য করেছিলেন; তৈলদীপে স্বল্পালোকিত ছাদের একটি কুঠরীতে জন কুড়ি শ্রমিকের মধ্যে তাঁর নিজেকে খুবই বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে মনে হত। যখন সে দল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক উপদলই তার স্বতন্ত্র নেতার অধীনে আলাদা-আলাদা ছাদের কুঠুরীতে মিলিত হতে লাগল তখন তিনি দল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন যে শ্রমিকরা খুবই ভয়ে ভয়ে আলোচনা করত এবং নিজেদের বেতনের প্রশ্নে তারা যে আগ্রহ দেখাত তাও ছিল অস্বাভাবিক। তাঁর ধারণা তারা ছিল কড়া রকমের বাস্তববাদী এবং তাদের সাধ্যায়ত্ত নয় এরূপ অবকাশের ফলস্বরূপ কার্যকলাপে যে যাথার্থ্য আসে তা তারা ঘৃণা করত। তিনি মহিলাকে বললেন যে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ডাবলিনে কোন সামাজিক বিপ্লব হবার সম্ভাবনা নেই।

তিনি তাঁর চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করেন না কেন একথা মহিলা জানতে চাইলেন। তিনি সপ্রগল্‌ভ ঘৃণার সঙ্গে জানতে চাইলেন লিখে কি হবে। যারা ষাট সেকেণ্ড পারম্পর্য রক্ষা করে চিন্তা করতে পারে না সেই কথাজ্ঞাবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে? যে স্থূলবুদ্ধি মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের নীতিবোধ পুলিশের হাতে ও নিজেদের শিল্পকলা শিল্পোদ্যোক্তাদের হাতে সমর্পণ করে থাকে তাদের সমালোচনার সম্মুখীন হবে?

তিনি প্রায়ই ডাবলিনের বাইরে মহিলার ক্ষুদ্র গৃহটিতে যেতেন এবং তাঁরা দুজনে নিভৃতে বহু সন্ধ্যা কাটাতেন। ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তা যখন পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল তখন তাঁরা কাছেয় বিষয় নিয়েও আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন। সে মহিলার সান্নিধ্য ছিল বিদেশী চারার চার ধারে উষ্ণ মৃত্তিকার মত। অনেক দিন তিনি বাতি না জ্বালিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে দিতেন উভয়ের চার ধারে। তাঁদের দুটি সত্তা একত্রিত হত অন্ধকার কক্ষ, নিজেদের বিচ্ছিন্নতা ও উভয়ের কানে বাজা সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই মিলন মিঃ ডাফিকে উদ্বুদ্ধ করত, তাঁর চরিত্রের কর্কশ দিকটা নষ্ট করে দিত এবং তাঁর মনোজগতে আসত আবেগের শিহরণ। সময় সময় তিনি নিজের গলার স্বর নিজেই শুনতেন। তিনি ভাবতেন যে মহিলার চোখে তিনি দেবদূত পর্যায়ে উঠে দাঁড়াবেন এবং তিনি যত বেশি করে তাঁর সঙ্গিনীর আবেগোষ্ণ চরিত্রকে নিজের দিকে টানতে লাগলেন ততই তিনি শুনতে লাগলেন নিজের অদ্ভুত নৈর্ব্যক্তিক গলার স্বর—যে স্বরে তিনি বোঝাতে চাইতেন আত্মার দুশ্চিকিৎস নির্জনতার কথা। সে স্বর বলত, আমরা নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারি না—আমরা আমাদের নিজেদেরই। এই সব আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল যে রাতে সে রাতে শ্রীমতী সিনিকো অস্বাভাবিক উত্তেজনার সকল লক্ষণই প্রকাশ করেছিলেন এবং সাবেগে তাঁর হাত ধরে নিজের গালে ঘষেছিলেন।

মিঃ ডাফি খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর আলোচনাদির যে অর্থ মহিলা করেছিলেন তাতে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। তিনি সপ্তাহকাল আর মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চান নি। পরে তিনি তাঁকে দেখা করার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের শেষ দেখা নিজেদের বিধ্বস্ত স্বীকারোক্তির প্রভাবে ভারাক্রান্ত হোক—এ তিনি চান নি বলে তাঁদের দেখার ব্যবস্থা হয়েছিল পার্কগেটের কাছে ছোট একটি কেকের দোকানে। সময়টা ছিল শরৎকাল—রীতিমত ঠাণ্ডা কিন্তু তবু তাঁরা পার্কে তিন ঘণ্টা কাল এদিক ওদিক এক সঙ্গে বেড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত উভয়ে স্থির করলেন যে আর তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। মিঃ ডাফি বললেন যে প্রতি মিলনেরই পরিসমাপ্তি ঘটে বেদনায়। পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা নীরবে এগিয়ে

গেলেন ট্রামের দিকে কিন্তু এখানে শ্রীমতী সিনিকো এমন দুর্দান্তরকম কাঁপতে সুরু করলেন যে, তিনি আবার মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়বেন এই ভয়ে মিঃ ডাফি তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এর কয়েকদিন পরে মিঃ ডাফি পার্শেল যোগে নিজের বইগুলি ফেরৎ পেলেন।

তার পর চার বৎসর চলে গেল। মিঃ ডাফি তাঁর পূর্ববর্ত্তী সমতাপূর্ণ জীবন ধারায় ফিরে এসেছিলেন। তাঁর শয়নকক্ষে তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ মনের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। নীচের ঘরে তাঁর গানের জায়গায় কয়েকটি নতুন স্বরলিপির আবির্ভাব হয়েছিল আর তাঁর বই-এর তাকে দেখা দিয়েছিল নীটসের দু'খণ্ড বই—'দাস্ স্পেল্ জারাথুষ্ট্রা' ও 'দি গে সায়েন্স'। তাঁর ডেস্কের মধ্যে যে কাগজগুচ্ছ ছিল তাতে আর তিনি লিখতেন না। শ্রীমতী সিনিকোর সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাতের মাস দুই পরে লেখা তাঁর একটি বাক্যের বয়ান ছিল এই রকম: পুরুষের সঙ্গে পুরুষের প্রেম অসম্ভব কেননা তাদের মধ্যে রতিক্রীড়া সম্ভব নয়, আর পুরুষ ও নারীর মধ্যে বন্ধুত্ব সম্ভব নয় কারণ তাদের মধ্যে রতিক্রীড়া হবেই। মহিলার সঙ্গে দেখা হবে ভয়ে তিনি কনসার্টে যেতেন না। ইত্যবসরে তাঁর বাবা মারা গিয়েছিলেন এবং ব্যাঙ্কের ছোট অংশীদার অবসর নিয়েছিলেন। তিনি কিন্তু রোজই সকালে ট্রামে করে শহরে যেতেন এবং প্রতিদিন জর্জেস্ ষ্ট্রীটে সস্তায় নৈশাহার শেষ করে, সান্ধ্য পত্রিকা পড়ে সন্ধ্যায় শহর থেকে হেঁটে গৃহে ফিরতেন।

একদিন সন্ধ্যায় মুখে একটুকরো মাংস ও কপি পুরতে পুরতে তিনি থেমে গেলেন। তিনি যে সান্ধ্য পত্রিকাটি পড়ছিলেন তার এক সংবাদে এসে তাঁর চোখ স্থিরনিবদ্ধ হয়ে গেল! তিনি খাবার গ্রাস প্লেটে রেখে মনোযোগের সঙ্গে সংবাদটি পড়তে লাগলেন। তার পর এক গ্লাস জল খেয়ে, খাবারের প্লেটটা একদিকে সরিয়ে রেখে দুই কনুই-এর মধ্যে কাগজখানা দুই ভাঁজ করে নিজের সামনে রেখে সেই সংবাদটি বার বার মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলেন। কপির তরকারি থেকে একটা সাদা চর্বির মত জিনিস বেরিয়ে তাঁর খাবারের প্লেটে জমা হল। তাঁর খাবার ঠিক মত রান্না করা হয়েছিল কিনা জানার জন্যে হোটেলের পরিবেশিকা মেয়েটি এগিয়ে এল। তাঁর খাবারে যে কোন দোষ ছিল না একথা জানিয়ে তিনি অতিকষ্টে কয়েক গ্রাস গিললেন। তার পর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নবেম্বরের সন্ধ্যায় মাটিতে নিয়মিত হ্যাজেলের মোটা লাঠিটা ঠুকে তিনি দ্রুত গতিতে হেঁটে চললেন। তাঁর ওভার কোটের পাশের পকেট থেকে উঁকি মারছিল ধূসর রঙের 'মেইল' কাগজটি। পার্কগেট থেকে চ্যাপেলিজড পর্যন্ত রাস্তাটি নির্জন—সেখানে তিনি চলার গতি কমিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের লাঠিটি কম জোরে মাটিতে পড়তে লাগল এবং তাঁর নাক থেকে দীর্ঘশ্বাসের মত যে অনিয়মিত নিঃশ্বাস বেরুচ্ছিল তা শীতের হাওয়ায় উঠছিল জমে। বাড়ি পৌছে তিনি তৎক্ষণাৎ উপরে বসবার ঘরে চলে গেলেন এবং পকেট থেকে কাগজটা বের করে জানালার কাছে পড়ন্ত আলোতে আবার সেই সংবাদটা পড়লেন। তিনি সেটা জোরে পড়লেন না—তবে
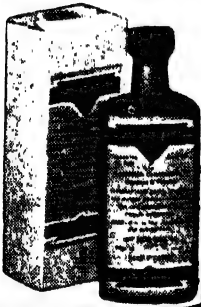
রাজকেরা প্রার্থনা পড়ার সময় যেমন করেন তেমনি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে তিনি সেটি পড়লেন। সংবাদটি ছিল নিম্নোক্তরূপ :

সিডনি প্যারেডে মহিলার মৃত্যু—

একটি বেদনাদায়ক কাহিনী—

আজ সিটি অব ডাবলিন হাসপাতালে ডেপুটি করোনার (মিঃ লেভারেটের অনুপস্থিতিতে) গত কাল সন্ধ্যায় সিডনি প্যারেড ষ্টেশনে নিহত ৪৪ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী এ'মলি সিনিকোর মৃতদেহের ময়না তদন্ত করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে মহিলা রেললাইন পার হবার সময় রাত দশটায় কিংসটাউন থেকে আসা ধীরগতির ট্রেণের এঞ্জিনের ধাক্কায় পড়ে যান এবং তার ফলে মাথায় ও দেহের দক্ষিণ ভাগে আঘাত পান। এই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

এঞ্জিনের ড্রাইভার জেমস লেনন তার সাক্ষ্যে বলে যে সে পনের বৎসর যাবত রেল কোম্পানীতে চাকুরী করছে। গার্ডের হুইসিল শুনে সে ট্রেণ চালু করেছিল ও তার দু-এক সেকেণ্ড পরে উচ্চ চীৎকার শুনে ট্রেণ থামিয়ে দিয়েছিল। ট্রেণটা চলেছিল ধীরগতিতে।

রেলের কুলি পি ডান বলে, যে ট্রেণটা যখন ছাড়ছিল তখন সে একটি নারীকে ট্রেণ লাইন পার হবার চেষ্টা করতে দেখেছিল। সে চীৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে গিয়েছিল কিন্তু সে তার কাছে পৌছানোর আগেই সে নারী এঞ্জিনের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

জনৈক জুরি : তুমি মহিলাকে পড়ে যেতে দেখেছিলে?

সাক্ষী, আজ্ঞে হাঁ।

পুলিশ সার্জেণ্ট ক্রসি তার সাক্ষ্যে বলে যে সে ষ্টেশনে পৌছে মৃতাকে প্ল্যাটফর্মে প্রায় মরার মত শোয়ানো অবস্থায় দেখেছিল অ্যাম্বুল্যান্স না আসা পর্য্যন্ত দেহটি রক্ষার জন্যে সে মৃতাকে ওয়েটিং রুমে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল।

৫৭ নম্বর কনেষ্টবল এই সাক্ষ্য সমর্থন করে। সিটি অব ডাবলিন হাসপাতালের সহকারী হাউস সার্জেন ডাঃ হ্যালপিন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে মৃতার নীচের দুটি পাঁজর ভেঙে গিয়েছিল এবং তাঁর দক্ষিণ কাঁধেও গুরুতর আঘাত লেগেছিল। পড়ে যাবার ফলে মাথার দক্ষিণাংশেও আঘাত লেগেছিল। স্বাভাবিক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে আঘাত যথেষ্ট ছিল না। তবে তাঁর মতে এক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটেছিল আকস্মিক ভাবে ও হার্টের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়।

রেল কোম্পানীর তরফে মিঃ এইচ. বি. চ্যাটারসন্ ফিনলে দুর্ঘটনার জন্যে গভীর অনুতাপ প্রকাশ করেন। সেতুর উপর দিয়ে ছাড়া লোকদের রেল লাইন পার হওয়া বন্ধ করার জন্যে কোম্পানী সতর্কতামূলক সব ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছে। প্রতি ষ্টেশানে নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং লেভেল ক্রসিংগুলিতে গেট বসিয়েও দেওয়া হয়েছে। মৃতার গভীর রাতে রেল লাইন পার হয়ে প্লাটফরম থেকে প্লাটফরমে যাবার অভ্যাস ছিল এবং আলোচ্য দুর্ঘটনার বিবরণ দেখে বোঝা যায় যে তাঁর রেল কোম্পানীর কর্মচারীদের এ ব্যাপারে কোন দোষ ছিল না।

মৃতার স্বামী সিডনি প্যারেডের লিওভিলের ক্যাপ্টেন সিনিকোও সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন যে মৃতা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। দুর্ঘটনার সময় তিনি ডাবলিনে ছিলেন—তিনি সেইদিন সকালেই রটারডাম থেকে ফিরেছিলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল বাইশ বৎসরের এবং বৎসর দুই আগে পর্যন্ত তাঁদের বিবাহিত জীবন ছিল সুখের। বৎসর দুই আগে থেকে তাঁর স্ত্রী কিছুটা অমিতাচারিণী হয়ে উঠেছিলেন।

কুমারী মেরি সিনিকো বলেন যে সম্প্রতি তাঁর মা মদ কেনার জন্যে প্রায়ই রাত্রে বাইরে যেতেন। সে এ নিয়ে মার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করত ও তাঁকে একটা সঙ্ঘের সদস্যা হতেও সে রাজী করিয়েছিল। দুর্ঘটনার ঘণ্টা খানেক পর পর্যন্ত সে বাড়িতে ছিল না।

জুরি ডাক্তারী সাক্ষ্যানুসারেই রায় দেন এবং লেননকে দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করেন। ডেপুটি করোনার ঘটনাটিকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে বর্ণনা করেন ও ক্যাপ্টেন সিনিকো ও তাঁর মেয়ের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নিবারণের জন্যে তিনি রেল কোম্পানীকে আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে অনুরোধ জানান এ দুর্ঘটনার কারও কোন দোষ ছিল না বলে প্রতিপন্ন হয়।

মিঃ ডাফি কাগজ থেকে চোখ উঠিয়ে জানালার মধ্য দিয়ে তাকালেন বাইরের সন্ধ্যাকালীন নিরানন্দ দৃশ্যপটের দিকে। শুধু মদ চোলাইর কারখানার পাশে নদীটি শান্ত হয়ে পড়েছিল এবং লুকান রোডে কোন কোন বাড়িতে কখনও-কখনও আলো দেখা যাচ্ছিল। কি দুঃখের পরিণতি। তাঁর মৃত্যুর সব কাহিনী তাঁর কাছে লজ্জাজনক মনে হল এবং তিনি এই নারীর কাছে তাঁর পবিত্র গোপন কথা বলেছিলেন বলে তাঁর নিজের উপরও ঘৃণা হতে লাগল। চুল চেরা বিশ্লেষণ, সহানুভূতির ফাঁকা কথাগুলি, অতি সাধারণ মৃত্যুর একটি বিবরণকে অসাধারণ প্রতিপন্ন করার জন্যে রিপোর্টার কর্তৃক প্রযুক্ত সযত্ন নির্বাচিত কথাগুলি তাঁর পাকস্থলীকে আক্রমণ করল। সে তো নিজেকে ছোট করে দিলই, সে যেন তাঁকেও ছোট করে দিল। তিনি দেখতে পেলেন তার পাপের জঞ্জালপূর্ণ পথ—কষ্টদায়ক ও দুর্গন্ধ পরিপূর্ণ। তাঁর আত্মার সঙ্গিনী। যে সব খুঁড়িয়ে চলা হতভাগাদের তিনি দেখেছেন মদের দোকানীর কাছে পাত্র ও বোতল পূর্ণ করতে নিয়ে যেতে তাদের কথা তাঁর মনে পড়ল। ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, কি দুঃখের পরিণতি! স্পষ্টতই সে বেঁচে থাকার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে উঠেছিল। তার জীবনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলেই সে অভ্যাসের দাস হয়ে উঠেছিল, এদের মত মানুষের ধ্বংসাবশেষের উপরই সভ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু সে এত নীচে নেমে গেল তাই বলে! তবে কি তিনি এতদিন তার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই চলেছিলেন! সেদিন রাত্রে তার ভাবাবেগ সঞ্জাত আচরণের কথা তাঁর মনে পড়ল এবং তিনি এর আগে যা করেন নি তেমনই কঠিন ব্যাখ্যা করলেন তার সেদিনের আচরণের। তিনি যে পথ নিয়েছিলেন সে পথের সমর্থন পেতে তাঁর আর কোন অসুবিধা হল না।

আলো কমে যাওয়ায় তাঁর স্মৃতি বিচরণ করে ফিরতে লাগল; তাঁর মনে হল তাঁর হাতে যেন সেই মহিলার স্পর্শ। প্রথম পাকস্থলীতে যে আঘাত লেগেছিল সে আঘাত এখন লাগল তাঁর স্নায়ুতে। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর টুপি ও ওভারকোট পরে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। দরজার গোড়াতেই সাক্ষাৎ হল ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে, সে ঠাণ্ডা বাতাস যেন কোটের হাতার ভিতর দিয়ে

দেহে প্রবেশ করল। তিনি চ্যাপেলিজ ও ব্রিজে একটা মদের দোকানে এসে একটা গরম পাঞ্চ আনার হুকুম দিলেন।

মালিক বিনীত ভাবে তাঁর হুকুম তামিল করলো কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস পেল না। দোকানে পাঁচ ছয়জন শ্রমিক বসে জটলা করছিল; তারা কাউন্টি কিলডেয়ারের কোন ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। তারা মাঝে মাঝে তাদের বড় বড় মদের পাত্রে চুমুক দিচ্ছিল, ধূমপান করছিল, মেঝেতে থুথু ফেলছিল এবং তাদের ভারি বুটের ধুলোবালিও ছড়াচ্ছিল। মিঃ ডাফি নিজের টুলে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিন্তু তিনি তাদের দেখতেও পাচ্ছিলেন না, তাদের কথাও শুনছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তারা উঠে গেল এবং মিঃ ডাফি আবার একটা পাঞ্চ চাইলেন। তিনি বহুক্ষণ ধরে সেটি পান করলেন। দোকানটা নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছিল। মালিক কাউন্টারে বসে হাই তুলতে তুলতে 'হেরাল্ড' পড়ছিল মাঝে মাঝে বাইরের নির্জন রাস্তায় এক আধটা ট্রাম দ্রুতগতিতে চলে যাবার শব্দ আসছিল ভেসে।

তিনি সেখানে বসে ভাবতে লাগলেন মহিলার সঙ্গে তাঁর সংযোগের কথা আর তাঁর মনে ভেসে উঠতে লাগল তাঁর দুটি মূর্তি; সেই সঙ্গে তাঁর এ অনুভূতিও হল যে সে মহিলা মৃতা, তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে সে আজ স্মৃতি মাত্রে পর্যবসিত। তাঁর যেন কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল। এরূপ অবস্থায় তিনি তার সঙ্গে প্রবঞ্চনামূলক মিলনাত্মক নাটকের অভিনয়ও করতে পারতেন না কিংবা তাকে নিয়ে খোলাখুলি বসবাসও করতে পারতেন না। তাঁর কাছে যা সবচেয়ে ভাল মনে হয়েছিল তিনি তাই করেছিলেন। এতে তাঁর দোষ কোথায়? এখন সে চলে যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে রাতের পর রাত একা ওই ঘরে কাটিয়ে তার জীবন নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তিনি মরে না যাওয়া পর্যন্ত, তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে স্মৃতি মাত্রে না দাঁড়ানো পর্যন্ত তাঁর জীবনও নিঃসঙ্গ।

রাত ন'টার পর তিনি মদের দোকান থেকে উঠে গেলেন। সে রাতটা ছিল ঠাণ্ডা ও বিষণ্ণ। তিনি প্রথম গেট দিয়ে পার্কে ঢুকলেন ও বড় বড় গাছগুলির নীচে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। চার বৎসর পূর্বে যে ঠাণ্ডা গলিপথগুলিতে তাঁরা দুজন একসঙ্গে হেঁটে বেড়িয়েছিল, সেই পথে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধকারে মনে হতে লাগল সে যেন তাঁর খুব কাছে। কোন কোন মুহূর্তে মনে হতে লাগল তার গলার স্বর যেন তাঁর কানে এসে বাজছে, তার হাতের স্পর্শ তিনি পাচ্ছেন নিজের হাতে। তিনি কান খাড়া করে শোনার জন্যে দাঁড়ালেন। তিনি কেন তাকে জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন? কেন তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন? তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর নৈতিক প্রকৃতি যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

ম্যাগাজিন হিলের চূড়ায় পৌঁছে তিনি থামলেন এবং নদীপথে তাকালেন ডাবলিনের দিকে; শীতের রাতে শহরের বাতিগুলি লাল হয়ে জ্বলছিল আর আতিথ্যের আহ্বান জানাচ্ছিল। তিনি ঢালু সমভূমির পথে তাকিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পার্কের দেয়ালের ছায়ায় শুয়ে থাকা নরনারীর মূর্তি দেখতে পেলেন। এই ধরণের কামুক ও লুকোচুরিকরা ভালবাসার দৃশ্যে তাঁর হৃদয় হতাশায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তাঁর জীবনের নীতিবোধ তাঁকে দংশন করতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন যে জীবনের ভোজে তিনি অপাঙক্তেয় হয়ে গেছেন। একটি মানবী তাঁকে ভালবাসতো বলে মনে হলেও তিনি তাঁকে জীবন ও সুখ থেকে বঞ্চিত করেছেন—তাকে তিনি দিয়েছেন লজ্জা ও কলঙ্কের মৃত্যুদণ্ড। তিনি বুঝলেন যে নীচে যে জীবগুলি দেয়ালের কাছে শুয়েছিল তারা চাইছিল যে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কেউ তাঁকে চায় না—জীবনের ভোজ থেকে তিনি নির্বাসিত। তিনি দৃষ্টি ফেরালেন ডাবলিনের দিক প্রবহমানা ধূসর চকচকে নদীটির দিকে। নদীর ওদিকে তিনি দেখতে পেলেন যে কিংসব্রিজ ষ্টেশন থেকে একটা মালগাড়ি অগ্নিবর্ষী মাথাওয়ালা একটা পোকার মত অন্ধকারে একগুঁয়েভাবে কষ্টে সৃষ্টে এঁকে বেঁকে চলেছে। সেটি ধীরে ধীরে দৃষ্টি পথের বাইরে চলে গেল কিন্তু তিনি তবু তাঁর মাথার মধ্যে শুনতে পেলেন এঞ্জিনের কণ্ঠস্বর, ধসধসানি যেন সেই মহিলার নামটিই বারবার উচ্চারণ করে চলেছে।

তিনি যে পথে এসেছিলেন সেইপথেই ফিরে চললেন—তাঁর কানে বাজতে লাগল এঞ্জিনের শব্দের ছন্দ। স্মৃতির বক্তব্য সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় জাগল। তিনি একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সেই ছন্দের ধ্বনিকে লুপ্ত হয়ে যাবার সুযোগ দিলেন। তিনি সেই অন্ধকারে সেই মহিলার অস্তিত্বও অনুভব করতে পারলেন না, তার গলার স্বরও তাঁর কানে বাজল না। তিনি শোনার জন্যে কয়েক মিনিট প্রতীক্ষা করলেন। তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না—রাতটা ছিল পরিপূর্ণরকমে নিস্তব্ধ। তিনি আবার শুনতে চেষ্টা করলেন—আবার সেই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। তিনি বুঝলেন যে তিনি সম্পূর্ণ একা।

অনুবাদক—গোপাল ভৌমিক

ছোঁওয়া

অঞ্জনা হালদার

ছুঁয়েই করবে জয়? স্পর্শেও কাতর
হয়, যদি সেই ছোঁয়া ওষ্ঠের রেশমে
বরফের মত থাকে কিছুক্ষণ জ'মে।
কিন্তু এ যে স্পর্শ নয়—স্পৃহা ভয়ংকর।
ছুঁয়েই করতে জয়, স্পর্শটুকু যদি
আরো ঘন হত—ওই আঁধারের মত,
অমাবস্যা তিথি আজ। অন্ধ এক ব্রত
নিয়েছে এ প্রবাহিত—বেগবতী নদী।

ছুঁয়েই করবে জয়, তমিস্রা যখন
আলোকের স্পর্শ পেয়ে স্বচ্ছ হয়ে যাবে,
চুম্বন ছুঁইয়ে হবে প্রাপ্তির আবেগ।

কেটে গেলে আকাংখার গাঢ়তম মেঘ
হিমালয় বাধা দিয়ে অনেক ঝরাবে
যে বারি সত্যই ছোঁয় পৃথিবীর মন।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

হামিদাবানু বেগম

শিবানী ঘোষ

একদল যাত্রী সিন্ধুনদ পার হয়ে এগিয়ে চলেছে সোজা পশ্চিমে। পঞ্চ নদীর পলিপড়া সমতল ভূমি পিছনে ফেলে রেখে দলটি ক্রমশঃ পার হয়ে চলেছে দুর্গম পার্বত্য পথ। কখনও পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করার পর তাদের যাত্রাপথের সমুখে এসে পড়েছে সুবিস্তৃত মরুভূমি। তাও পিছনে ফেলে রেখে যাত্রীদলটি এগিয়ে চলেছে শুধু পশ্চিম হতে আরও পশ্চিমে।

এই যাত্রীদলের মধ্যে রয়েছে কিছু পদাতিক সেনা আর কয়েকটি উট। মোগল সম্রাট হুমায়ুন শের খাঁর নিকট পরাজিত হয়ে রাতের নিস্তব্ধতায় পাঞ্জাব প্রদেশ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন আফগানিস্তানের পথে। তাঁর অভিপ্রায় সীমান্ত প্রদেশের কোথাও অবস্থান করে তিনি শক্তি সঞ্চয় করে নেবেন গুপ্ত ভাবে। পরে সুবিধে বুঝে আক্রমণ চালিয়ে পাঠান-রাজকে পরাজিত করে তিনি অধিকার করে নেবেন সিন্ধু প্রদেশ।

এই উটগুলির ওপর বসে রয়েছেন হুমায়ুন বাদশার জননী, জায়া ও ভগিনীগণ। তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই পড়েছে আতঙ্কের ছায়া। আপাতত কোথাও আশ্রয় না পেলে তাঁদের পক্ষে এই ভাবে উটের পিঠে বসে থাকাটা হয়ে উঠছে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই যাত্রীদলটি পরিচালিত হচ্ছে হুমায়ুনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা হিন্দোলের নির্দেশে। সে এর কি, ব্যবস্থা করছে কে জানে। শেষ পর্যন্ত কি কান্দাহারে যাবারই ঠিক করলো!

হুমায়ুন ডেকে পাঠালেন তাঁর ভ্রাতাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন অন্যজনের মুখে শুনছি তুমি নাকি এখন এই যাত্রীদলকে কান্দাহারে নিয়ে চলেছো? কিন্তু অত দূর এভাবে অগ্রসর হলে মেয়েদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো?

—দেখেছি দাদা। উত্তর দিল হিন্দোল—কান্দাহারে যাবার মতলব আমার থাকলেও আপাততঃ আমি স্থির করেছি শিবির স্থাপন করবো পট-নগরে। সেখানে থাকেন আমার গুরু মীর বাবা দোস্ত। তাঁর কৃপায় আমাদের কোন অসুবিধেই হবে না।

সিন্ধুনদের কুড়ি মাইল পশ্চাতে পট-নগর অবস্থিত। হিন্দোল সেখানেই স্থাপন করলেন শিবির।

হুমায়ুন বাদশা অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিচক্ষণতা দেখে। অন্তঃপুরিকাগণের দীর্ঘ পথ চলার কষ্ট তবু কিছুটা উপশম হবে এখানে। তিনি এগিয়ে গেলেন মেয়েদের শিবিরের দিকে।

হুমায়ুন-বাদশা সেখানে যেতেই একদল অজানা অচেনা মেয়েছেলে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো সম্রাটকে।

অবাক হয়ে গেলেন হুমায়ুন। এরা কারা?

এগিয়ে এলেন হুমায়ুনের মাতা দিলদর বেগম। তিনি বললেন ওরা এসেছে হিন্দুস্থানের সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে।

বিস্মিত হয়ে হুমায়ুন বললেন সম্রাট? কে হিন্দুস্থানের সম্রাট?

দিলদর বেগম হেসে বললেন—তুই বাছা তুই। তোকেই ওরা জানাতে এসেছে অভিনন্দন।

হুমায়ুন বললেন—মোটেই আমি এখন হিন্দুস্থানের সম্রাট নই। এখন আমি পথের ভিখিরী। কিসের জন্যে আমি নিতে যাব ওদের অভিনন্দন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে বলে উঠলো—অভিনন্দন নেবেন এই কারণে যে কিছুদিনের মধ্যেই আপনি হিন্দুস্থান জয় করে পুনরায় যখন তার সিংহাসনে বসবেন তখন আমাদের মত অভাগিনীরা আপনাকে পাবে কোথায়? তা ছাড়া কাবুল এখনও যাঁর অধীন তাঁকে তো পথের ভিখিরী বলা চলে না।

হুমায়ুন চেয়ে দেখলেন মেয়েটির মুখের পানে ভারী মিষ্টি তো ওর কণ্ঠস্বর।

তখনও হাসছে ঐ কিশোরীর চোখ মুখ। হুমায়ুন-বাদশা আর সামলাতে পারলেন না কৌতূহল। তিনি দিলদর বেগমকে জিজ্ঞেস করেন—ঐ মেয়েটি কে মা?

দিলদর বেগম মৃদু হেসে বললেন—ওটি মীর বাবা দোস্তের মেয়ে হামিদাবানু। বড় চমৎকার মেয়েটি। এর আগে হিন্দোলের মুখে ওর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি মেয়েটি তার চেয়েও সুন্দর।

মেয়েটিকে দেখে সত্যিই বড় মুগ্ধ হয়ে গেলেন হুমায়ুন। যদিও তাঁর বয়ঃক্রম তেত্রিশ পার হয়ে গেছে এবং তাঁর সহধর্মিণীও রয়েছে পাঁচ জন, তবু নিজের রাশ টেনে ধরে রাখতে পারেন না হুমায়ুন। ঐ চোদ্দ বছরের কিশোরীটিকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর।

দিন দুয়েক যেতেই মনে হল ঐ হামিদাবানুকে না পেলে মরুভূমি হয়ে উঠবে তাঁর জীবন।

সেদিন তিনি গেলেন তাঁর মাতার কক্ষে। তখন সেখানে রয়েছে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দোল। হুমায়ুন একটু ইতস্ততঃ করে সরাসরি মাকে কথাটা বলে দিলেন—দেখো মা আমি দোস্তের মেয়ে হামিদাবানুর রূপে বড় মুগ্ধ হয়ে গেছি, তা আমার অভিপ্রায় তোমরা আমার সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা কর।

তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে হিন্দোল বলে—সে কি, এখানে এখন আমাদের শক্তি সঞ্চয় করে হৃতবাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। এখন হঠাৎ নারীর প্রেমে পড়লে চলবে কেন?

হুমায়ুন বললেন—দেশ জয়ের কথা দু'দিন পরে চিন্তা করলেও কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু হামিদাকে না পেলে এখন আমার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে হিন্দোল বলে—না তা হতেই পারে না। কারণ মীর বাবা দোস্ত আমার গুরু। আর তাঁর মেয়েকে আমি দেখি নিজের বোনের মত। কাজেই এ অবস্থায় তার সাথে আপনার বিয়ে হতেই পারে না।

হুমায়ুন তাঁর ভাই-এর কথায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বললেন—মা তোমারও কি এ মত?

দিলদর বেগম এর কি উত্তর দেবেন ভেবে পান না। আর তাঁকে নিরুত্তর থাকতে দেখে হুমায়ুন সেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যান আপন শিবিরে।

পুত্রকে ঐভাবে চলে যেতে দেখে কিছুটা অনুকম্পা জেগে ওঠে দিলদর বেগমের অন্তরে। তিনি তাকে এই মর্মে একটা পত্র লিখলেন—বাছা, তুমি হামিদাবানুকে যে বিবাহ করতে চাও তাতে আমাদের কারও কোন অমত নেই। কিন্তু মেয়ের মা যে এখন হামিদার বিয়ে দিতে রাজী নন, কাজেই আমরা কি করতে পারি বল?

সেই পত্রের উত্তরে হুমায়ুন জানালেন—মেয়ের মায়ের মতামত কি তা পরে শোনালেই ভাল হয়, উপস্থিত মেয়েটির সাথে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হলেই তিনি বাধিত হন।

অগত্যা হামিদাবানু স্থির করেন আগামীকাল একটি সভা আহ্বান করে হামিদাকে এনে তাকে এতে রাজী করালেই ঠিক হবে। কাজেই লোকজন ডেকে জানিয়ে দিলেন সভার কথা এবং একটি দাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, সে যেন হামিদাবানুকে খবর দিয়ে আসে এখানে আসার জন্ম।

ঘরের মধ্যে একাকিনী বসে আনচান্ করছে হামিদাবানু। কই হিন্দোল তো এখনও এল না! ও এলে বড় মজা হয়। এই সময় বাড়ীতে কেউ নেই। সে এলে হামিদা তার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে—এবার আর তোমাকে ছাড়বো না, দেখি কেমন করে পালাও!

কিন্তু এখনও তো এল না! আসবে না না কি! না না, ঐ যে আসছে পা টিপে টিপে।

তাকে দেখে হামিদা বলে—ওগো এসো এসো আর উঁকি মেরে দেখতে হবে না, এখন বাড়ীতে এই কিশোরীটি ছাড়া আর কেউই নেই।

হিন্দোল বলে—তবে তো এই কিশোরীটিকে এবার অনায়াসেই নিয়ে পালাতে পারি।

• হামিদা বলে—তা পারলে যথেষ্ট খুসী হতাম।

হিন্দোল বলে—থাক অত খুসী হয়ে আর কাজ নেই। একটা কথা তোমাকে বলে যাই। আমার দাদা তোমাকে বিয়ে করবার জন্তে পাগল হয়ে উঠেছেন। এ থেকে পরিত্রাণ হয়ত তুমি পাবে না। কাজেই প্রস্তুত থেকো।

হিন্দোলের কথা শুনে তখনি মেঘাবৃত হয়ে যায় হামিদাবানুর মুখমণ্ডল। সে বিস্মিতা হয়ে বলে—কি! কি বললে! তোমার দাদা হুমায়ুন আমাকে বিয়ে করতে চান? তাঁর মত একজন আধবুড়ো লোকের সাথে আমার বিয়ে বাড়ীর লোকেরা দেবেন কেন! আর আমিই বা রাজী হব কেন!

হিন্দোল বলে—তোমার বাড়ীর লোকেরা এতে নিশ্চয়ই রাজী হবেন এবং তোমাকেও এই বিয়ে করতে বাধ্য হতে হবে।

—কখ্খন না। আমি তোমাকে ছাড়া—

তার কথার মাঝখানেই হিন্দোল ইসারা করে বলে—চুপ তোমার ঘরে কে যেন আসছে। আচ্ছা আমি পালাই পেছনের দরজা দিয়ে।

হিন্দোল চলে যাওয়ার পরই সেই ঘরে প্রবেশ করে দিলদর বেগমের দাসী। সে বললে—কাল সম্রাটের শিবিরে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে, তা সেখানে যাবার জন্তে বেগম সাহেবা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হামিদাবানু বলে—তোমার বেগম সাহেবাকে বলো আমি যেতে পারবো না। কারণ সম্রাটকে যা সম্মান দেখাবার তা আমি সেইদিনই দেখিয়েছি কাজেই সেখানে আমার যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

দাসী এই কথা শুনে ফিরে যায় তার বেগম সাহেবার কাছে। দিলদর তা শুনে পড়লেন মহাদুর্ভাবনায়। তিনি ডেকে পাঠালেন সুভান কুলিকে। তাকে বললেন—যাও হিন্দোলকে বলগে সে যেন ঐ কথা হামিদাকে বলে আসে। কারণ তার কথা মেয়েটি কখনই অবহেলা করবে না।

এতে হিন্দোল রাজী হল না একেবারেই। কাজেই দিলদর বেগম সুভান কুলিকে বলেন—যাও তুমি নিজে গিয়ে তাকে একথা বলে এসো।

সুভান কুলি একথা গিয়ে হামিদা বানুকে বললে সে জবাব দিল—রাজ দর্শন একবারই আইন সঙ্গত দ্বিতীয়বার নিষেধ। কাজেই সে কখনই যেতে পারবে না আগামী দিনের সভায়।

অগত্যা দিলদর বেগম নিজে হামিদার কাছে এসে বলেন—দেখো মা, আমার ইচ্ছে তুমি হুমায়ুনের স্ত্রী হও। সেই কারণেই তোমাকে কাল যেতে বলছিলাম।

হামিদাবানু বলে—এখন আমার পক্ষে বিবাহ করা সম্ভব নয়।

দিলদর বেগম বলেন—দেখো মা, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছো তখন বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। তা একজন বাদশাহের বেগম হতে পারাটা কি ভাগ্যের কথা নয়?

তাঁর কথা শুনে ফুঁপিয়ে ওঠে হামিদাবানু বলে—সব বুঝলাম। কিন্তু আমি এমন একজনকে বিয়ে করবো যার অন্ততঃ কাঁধ পর্যন্ত আমার মাথা যায়, কোমর পর্যন্ত নিশ্চয় নয়।

দিলদর বেগম বলেন—বুঝি মা তোমার আর হুমায়ুনের বয়সের পার্থক্য অনেক বেশী কিন্তু তোমাকে না পেলে যে সে স্থির থাকতে পারছে না। সেইজন্তেই আমার এত করে বলা। যা হোক, তুমি তোমার মন স্থির করে এ কথাটা ভেবে দ্যাখো। পরে আমি আর একবার আসবো 'খন। বলে চলে গেলেন দিলদর বেগম।

সেদিন হামিদাবানু তার পিতা মীর বাবা দোস্তকে গিয়ে বলে—

পিতা. হুমায়ুন বাদশা আমার পাণিগ্রহণ করতে চান, কিন্তু তাতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। কাজেই এ জিনিষ যাতে না হয় সেই মত আপনি নিষেধ করে দিন।

মীর বাবা দোস্ত, মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে বলেন—আমরা নিষেধ করবার কে মা। এ বিবাহ যে স্বয়ং বিধাতার অভিপ্রায়। শীঘ্রই দেশে আবির্ভাব হবেন এক মহাপুরুষ। সেই কারণেই তোকে হতে হবে হুমায়ুনের পত্নী।

পিতার কথা ঠিক বুঝতে পারে না হামিদাবানু। তার কেমন যেন ভয় হয়। সে নিঃশব্দে চলে যায় আপন ঘরে। নানা রকম দুশ্চিন্তা ঘুরতে থাকে তার মাথায়। হুমায়ুন বাদশাকে আপন স্বামীরূপে কল্পনা করতে তার বিশ্রী বোধ হয়। এদিকে হিন্দোলের কথা মনে পড়লে তার চোখ ফেটে নেমে আসে অশ্রু।

এই ভাবে নানান চিন্তার মধ্যে দিয়ে এক সময় ঘুম আসে তার চোখে। হঠাৎ স্বপ্নের ঘোরে মনে হল একটি ছোট শিশু এগিয়ে আসছে তার সামনে। তার মাথায় জ্বলছে উজ্জ্বল জ্যোতি। তামাম হিন্দুস্থানের লোক কুর্ণিশ জানাচ্ছে ছেলেটিকে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় হামিদাবানুর। কে, কে ঐ শিশুটি! ঐ কি তবে সেই মহাপুরুষ! তিনি কি জন্মগ্রহণ করবেন তাঁর পুত্ররূপে? ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে হামিদাবানু। সে ছুটে গিয়ে সব কথা বলে তার পিতাকে।

মীর দোস্ত কথা শুনে বলেন—এর পর আর হুমায়ুনকে বিবাহ না করবার আর কোন উপায় নেই মা। কারণ তুমি তাঁর সহধর্ম্মিণী হলে তবেই সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন তোমার গর্ভে। কাজেই এতে তুমি মত করে ফেলো।

হামিদাবানুর তখন কাঁপছে সারা অঙ্গ। সে কম্পিত ওষ্ঠে বলে—আমি এই বিবাহে মত দিলাম।

এমন সময় দিলদর বেগম পুনরায় এলেন তার মতামত জানতে। হামিদাবানু তখন তাঁর পায়ে মাথা রেখে বলে—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিবাহ করতে আর আমার অমত নেই মা।

দিলদর বেগম তখন তাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। তিনি বুঝতে পারেন এই মেয়েটির পুণ্যেই পুত্রহীন হুমায়ুনের অন্তরের আশা পূর্ণ হবে।*

দেনা-পাওনা

শিপ্রা দত্ত

অসীম ক্লান্তি নিয়ে সীমা কলেজ হতে ফিরে দরজার তালা খুলে রুদ্ধকক্ষের বাতায়নগুলি খুলে দিচ্ছিল। বাতায়ন পথে ভেসে আসছিল পাশের বিয়েবাড়ীর শানাই-এর সুর। অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনের কোণে ছড়োছড়ি করে চলেছিল অতীতের স্মৃতির মালা। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহকে সে এলিয়ে দিল জানালার পাশের ইজিচেয়ারের ওপরে।

সীমাদের ছোট্ট পরিবার ছিল,—মা বাবা ও তিন বোন সীমা, শিখা ও স্নিগ্ধা। বাবা সরকারী অফিসার। তাই স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। বাড়ীর প্রথম সন্তান সীমা—অতি আদরে মানুষ হচ্ছিল। পড়ার জন্য ছিল তার গৃহশিক্ষক তাছাড়া গান সেলাই ও অঙ্কনের জন্যও আরও তিনজন শিক্ষিকা, আজকের মত দেশের আর্থিক সমস্যা তখন দেশে ছিল না—তাই গৃহশিক্ষক নিযুক্তির জন্য দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিত না অভিভাবকদের অবয়বে। একটির পর একটি পরীক্ষার গণ্ডী সীমা উত্তীর্ণ হয়েছিল যেমন করে ঝরে পড়ে দিনপঞ্জী হতে একটির পর একটি দিনের পাতা। সুখের রথে চড়ে সৌভাগ্যের রাশ টেনে সীমার আনন্দমুখরিত দিনগুলি ছুটে চলেছিল। সীমার মার কোল পূর্ণ করে এলো আরও দুটি বোন ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ একটি ভাই।

কলেজে ঢুকেই সহপাঠী তপনের সঙ্গে হল সীমার বন্ধুত্ব। ধনীর একমাত্র পুত্র। তপন সীমার ঘনিষ্ঠতা যেয়ে দাঁড়াল নিবিড় বন্ধুত্বে। ঘরে বাইরে সবাই জেনে নিল একই সূত্রে বাঁধা পড়বে একদিন এই দুই তরুণ তরুণী। মহাবিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ঢুকলো তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কত রঙ্গীন আশার জাল বুনতো দুজনায়। শিখাও দিদির মত ওপরে উঠছিল এক এক করে পাঠ্যজীবনের সব সিঁড়ির। কিন্তু স্নিগ্ধা কেবল হোঁচট খেয়েই এগিয়ে চলেছে।

বর্ষার ধারা বর্ষণের মত যখন সীমা তপনের জীবনে বয়ে চলেছিল আনন্দের উদ্দামতা তখন হঠাৎ খবর এল সীমার পিতা অংশুবাবু মারা গেছেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সীমার সব কল্পনার গতি পথ যেন প্রতিহত হল বিশাল পাথরে বাধা পেয়ে। স্নেহপ্রবণ দিদির মন কেঁদে উঠল ছোট ছোট ভাই বোনদের জন্য। তপনকে ডেকে বললো—তপন হিসাবে ভুল হয়ে গেল। তুমি আরও এগিয়ে যাও। আমি কর্ত্তব্য শেষ করেই তোমাকে ধরে ফেলবো। তপন সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিল সীমার ক্ষত বিক্ষত মনে। আশার দেউটি জ্বেলে একটু আলোকিত করতে চেষ্টা করেছিল তার রুদ্ধ অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতের। হয়ত বিধাতা পুরুষ অলক্ষ্যে হেসেছিলেন বালকের ধৃষ্টতা দেখে।

পাঠ্যজীবন শেষ করে সীমা ঢুকলো কর্ম্মজীবনে। কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ পরীক্ষাটা পাশ করেছিল বলে—চাকরীর বাজারে আর তাকে কিছু দিতে হয়নি। যে উৎসাহ উদ্দামতা নিয়ে সে চাকরীতে ঢুকেছিল—পারিবারিক ক্ষুধা মিটাতে যেয়ে তার সবই নিভে গেল। অংশুবাবুর সঞ্চয়ের স্থান একেবারেই শূন্য ছিল। জীবনবীমাও মাত্র কয়েক হাজার ছিল আর ছিল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা। বিরাট সংসারের অভাব মিটাতে যেয়ে তাতেও পড়েছিল হাত। স্নিগ্ধার মত শীলা, শিবানীও কেমন যেন ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছিল জীবন পরীক্ষার গণ্ডিগুলোর দিকে। ফুটো পাত্রে জল ঢালার মত—অতি দ্রুত অংশুবাবুর সঞ্চিত শেষ সম্বল শেষ হয়ে গেল। তখন সুরু হল সীমার ধৈর্য্য পরীক্ষা। কলেজে অধ্যাপনার পর সে নিল কয়েকটি টিউশনি। সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ করার জন্য গৃহস্থালীর অনেক খরচ কমিয়ে দিল। সীমার আশা ছিল তার মত পড়াশুনা শেষ করে শিখাও সংসারের হাল ধরে তাকে সাহায্য করবে কিন্তু ঘটলো উল্টো।

---

*(1) The Humayun-Nama of Gulbadan Begam—Mrs. Beveridge.

(2) Journal of the Royal Asiatic Society, Oct. 1898, art. Bayazid biyat, H. Beveridge. 16.

(3) Ain-i-akbari—Blochmann.

শিখা এম, এ পাশ করে সীমাকে এসে জানালো সহপাঠি রজতের জীবন সঙ্গিনী সে হতে চায় না। যদিও তপনের মত ছাপিয়ে যায়নি রজতের ধন—তবু নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে অভাবের অশান্তি দেখা দেবার মত অবস্থা রজতদের নয়। পরীক্ষা দিয়েই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে একটা স্থান জুটিয়ে নিয়েছিল রজত। তাই সীমার বা তার মার আর আপত্তি করার কিছু থাকে না। তবু সীমার মা বলেছিলেন—শিখুর বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি নাই বা হলো। তুই আর কতকাল সংসারের হাল বইবি। তুই বরং এবার শিখুর উপর দায়িত্ব দিয়ে তোর সংসার গড়ে নে।

ম্লান হাস্যে সীমা উত্তর দিয়েছিল—সবার পক্ষে সব সম্ভব নয় মা। শিখা এতবড় সংসারের দায়িত্ব নিতে পারবে না। সবাইকে আর বদ্ধ কারাগারে বদ্ধ করে রেখো না। তা ছাড়া অনেক আশা নিয়ে রজত পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই চাকরী নিয়েছে—ওদের নীড় বাঁধতে দাও।

শিখা স্বার্থপরের মতই দিদির উপর গাধার বোঝা চাপিয়ে চলে গেল। মাধ্যাকর্ষণের মত সীমার রূপ, স্বাস্থ্য সবই নিম্নগামী হচ্ছিল। ওদিকে ধন'র দুলাল তপনের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছিল। সীমার সংসারের অপূর্ণতাকে সে পরিপূর্ণ করে দিতে চেয়েছিল তার প্রাচুর্য্যের ভগ্নাংশ দিয়ে। সীমার অতীত আভিজাত্যের অহমিকা মাথা নোয়াতে চায়নি এই দানের সামনে। সীমার মা-ও ব্যথিত হয়েছিলেন তপনের প্রস্তাবে। কিন্তু সীমার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেনি তার মা। সীমাকে যে তাড়াতাড়ি তার সংসার হতে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন—তা তখন নিজের অন্ধ স্বার্থের জন্য এ কথা ভুলে গেলেন। শিখা গেল—আরও চারটি ভাই বোনের দায়িত্ব বইতে হবে সীমাকে। কোন ব্যাপারেই স্নিগ্ধা, শীলা বা শিবানী সীমার মনে আশার আলো জ্বালাতে পারে নি। বিদ্যা, ধন—দুইএর অভাবে বোনদের পাত্রস্থ করার দুশ্চিন্তায় সীমা পাগলের মত কর্মসাগরে ডুব দিল। নিজের অস্তিত্বের কথা সে যেন ভুলে গেল, টাকার সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাই অহোরাত্রি নানাভাবে অর্থোপার্জ্জনের জন্য সে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। লতার মত যে কয়জন প্রাণী তাকে জড়িয়েছিল—তারা হতবাক্ হয়ে দেখছিল তার কর্ম্মক্ষমতা, অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য। বহু কষ্টে এক এক করে যখন স্নিগ্ধা, শীলার গতি সে করল। তখন আবার এসে দাঁড়াল তপন।

কিন্তু আজকের তপনের চোখে কয় বছর আগের দেখা—সীমার জন্য সেই মোহজাল বিস্তার করে নেই। সীমার রূপ লাবণ্য হারিয়ে গেছে—নিষ্ঠুর সংসারের কর্ত্তব্যের যাঁতায়। আদরে প্রতিপালিত

সীমার অবয়বে আজ ফুটে উঠেছে শ্রান্তি, ক্লান্তির রেখা, চোখের কোলে কে যেন কালির রেখা বুলিয়ে দিয়েছে। সীমার উজ্জ্বল যৌবনের সৌন্দর্য্য তপনের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল—আজ আর তা নেই। এ যেন ঝড়ে ভেঙ্গে শুকনো এক খণ্ড বৃক্ষশাখা। তপন ভালবেসেছিল সীমাকে নয়—সীমার সৌন্দর্যকে তাই সীমার ঘুণে ধরা হতশ্রীর প্রতি আর তার কোন আকর্ষণ ছিল না।

সীমা জেনেছিল তপনের মোহমুগ্ধ মন হতে তার আসন খসে পড়ছে। সেখানে আসন পেতেছে ধনী দুলালী সঙ্ঘমিত্রা। সব দিক দিয়ে দুর্ভাগ্য যখন ব্যূহ রচনা করে সীমাকে ঘিরে রেখেছিল—সেই দুর্য্যোগ মুহূর্ত্তে এসে তপন জানালো একমাসের মধ্যে সীমা যদি তাকে বিয়ে করে—এ সংসারের সব দায়িত্ব ত্যাগ করে চলে আসে—তবে তপনের গৃহে তার স্থান সঙ্কুলান হবে। সংগে সঙ্গে মড়ার উপর খাঁড়ার বাড়ি দিয়ে এটাও সে জানিয়ে দিল—সীমা বিয়ের পর চাকরী করতে পারবে না এবং জামাই এর সাহায্য নিতে সীমার মা যখন অপমান বোধ করেন—তখন সেও আর অপমানিত করবে না ভাবী শাশুড়ীকে।

তার পরের অধ্যায়ের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। তপন তার প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। সীমার সাধের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। বহু বছরের ঈপ্সিত বাসনা আর পূর্ণ হল না। মা ও ছোট ভাই বোন এর দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে—অপরিপূর্ণ থেকে গেল তার জীবন। জীবন সায়াহ্নে সব কর্ত্তব্য শেষ করে যখন সে নিজের দিকে ফিরে চাইবার সময় পেল—দেখলো সবার জন্য ছিল সে। কিন্তু তার জন্য নেই কেউ। ভাই বোনেরা সব আপন আপন ঘরে গেছে। ভাইও পড়াশুনা শেষ করে বিদেশে চাকরী নিয়ে গেছে। ভাইএর খাবার অসুবিধা হবে—তাই যে মা এতদিন সীমাকে মুক্তি দেন্ নি—তিনি গেলেন ভাইয়ের সংসারে। পড়ে রইল সীমা একা। একা অনন্ত অবসর। ঠিকা ঝি এসে কাজ করে দিয়ে যায়। সীমা নিজেই ভাতে ভাত কোনরকমে ফুটিয়ে নেয়, অথবা বাইরের রেষ্টুরেণ্ট হ'তে খেয়ে আসে।

একদিন যে সীমা ছিল ছাত্রমহলের সবার প্রিয়। সবার মধ্যে যে ছিল চাঞ্চল্যের কারণ, যাকে পাওয়ার জন্য—সবার মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়েছিল। যে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তপন আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। সেই সীমা আজ জীবনের পড়ন্ত বেলায় নৈরাশ্যের ডালি নিয়েই কেবল অতীতের স্মৃতি মন্থন করে চলেছে। কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কিছুই জুটলো না—তার অদৃষ্টে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা—সব কিছু হ'তেই সে আজ রিক্ত—সর্ব্বহারা। তাই শানাইএর যে সুর একদিন তার কাছে মধুর শোনাত—আজ যেন আর্ত্তনাদের মত তার জরাগ্রস্ত মনে তা পীড়া দিচ্ছে।

অসমাপ্ত

শ্রীলীলা বসু

দার্জিলিং-এর আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে চলেছি আমি আর মর্ম্মর। নীচের পথ বেয়ে যখন উঠছি আমরা ওপরের পথে চোখে পড়ছে আগের পথিকদের। ঐ ওপরে আমাদেরও পৌঁছুতে হবে ভাবতেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি আমরা, কলকাতার ছেলেরা। বিসর্পিত এই পথ ধরে, মাটি রংএর সাপ যেন উঠে যাচ্ছে ওপরে এঁকে বেঁকে। পাইনের সারি, নীলাকাশের মাঝে নিজেদের যেন বিলিয়ে দিয়েছে। মেঘেরা করছে খেলা, পাহাড় চূড়োর সাথে! টিপ টিপ করে বৃষ্টিও হয়ে গেল। ধোঁয়ার মতো জলে ভরা কুয়াশাগুলো ঝাপসা করে দিচ্ছে আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে। আমাদের চুলগুলোর ওপরে যেন তাদের লোভ। কুয়াশার জলে চুলের ওপর মালার মতো ঝরে পড়ছে।

একঝলক কুয়াশা ভেদ করে উঠছি, আমি আর মর্ম্মর। সাহিত্যিক আর শিল্পী। মনটা আমাদের বাঁধা রয়েছে সৌন্দর্য্যের মুদারায়। সৌন্দর্য্যপিপাসু আমরা সুন্দরের উপাসক আমরা। দূরে দেখা যাচ্ছে তিব্বতীয় মন্দির 'গুম্ফা'। লাল, হলদে কাপড়ের টুকরোগুলো মৃদু হাওয়ায় দুলছে বিভোর হয়ে গেছি, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি, প্রকৃতির এই নিখুঁত সৌন্দর্য্যে দূরে দেখা যাচ্ছে সাদা বরফের পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘা। শুভ্র। শুভ্র! শুভ্র! সাদা রং শুচিতার, পবিত্রতার নিদর্শন। সূর্য্যের শুভ্র আলোক যেন আরও শুভ্র, আরও সুন্দর করে তুলেছে, শুভ্রা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যখন আকণ্ঠ পান করছিলাম, মর্ম্মরের কথায় চমক ভাঙ্গল। বলল, মর্ম্মর দেখো দেখো পল্লব ঐ ওপরে ছুটোছুটি করছে একটি পাহাড়ী মেয়ে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি সত্যিই তো খুব দূরে নয়···কাছেই একটা প্রজাপতি ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করছে সুন্দরী এক যুবতী। পরনে তার তিব্বতীয় পোষাক পেছন দিক থেকে দেখলাম, লম্বা দুটো বাদামী বেণী ঝুলছে, সুন্দরীর পিঠ বেয়ে। তার খোঁপাকে লাগানো রয়েছে, নাম না জানা এক গুচ্ছ হলদে পাহাড়ী ফুল আমাদের পায়ের শব্দে মেয়েটি ফিরে তাকাল। হাসল সুন্দর প্রাণমাতানো অপ্রতিভ হাসি। এত সুন্দর মানুষ হতে পারে। গোলাপী রং, লাল টুকটুক করছে পাতলা ঠোঁট দুটো। গাল দুটো যেন আপেল ফল। বুদ্ধির দীপ্তি রয়েছে ছোট চোখ দুটিতে। চঞ্চল হরিণীর মতো ছুটে প্রজাপতি ধরবার তার কি প্রচেষ্টা। বয়স পনের-ষোল হবে। মর্ম্মর আর আমাকে দেখে লজ্জায় জড়সড় হল না—সুন্দরী পাহাড়ী যুবতী। হাসল মিষ্টি হাসি। কতদিনের পরিচয় মাখানো সরল চঞ্চল দৃষ্টি।

দূর থেকে ভেসে এলো ছোট ছেলের গলার ডাক, ইডেন, ইডেন। তার পর দুর্ব্বোধ্য এক ভাষায় কি যেন বলল ছেলেটি। মেয়েটি তখনই প্রজাপতিটাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে চলল সামনের ভুটিয়া মন্দিরটার দিকে।

আমাদের মুখে কথা ছিল না। দু'জনে হতবাক হয়ে এগিয়ে চলছিলাম। কথা বললে পাছে সময়টা নষ্ট হয়ে যায় স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে দু'জনেই নির্ব্বাক হয়ে এগিয়ে চলেছিলাম, পাহাড়ী পথ ধরে।

ছেলেটির গলার স্বর অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি—দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সারি মাটির ঘর। সেগুলোর টিনের চাল। এই চাল বেয়ে উঠে গেছে, সেই নাম না জানা জংলী ফুলের গুচ্ছ। থরে থরে আলোর মতো সাজান রয়েছে, সেগুলো। ঘরের ভেতরে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঝকঝকে বাসনগুলো। তিব্বতীয়দের বিলাসিতার নমুনা।

মর্ম্মর তখনও স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিল হরিণীর ছুটে যাওয়া পথ

পানে। ছোটাবার সময় পড়ে গিয়েছিল তার চুল থেকে, সেই ফুলগুচ্ছ। তিব্বতী তন্বীর বাদামী চুলের মিষ্টি গন্ধে ফুলগুলোও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। পাহাড়ী মেয়েদের সাথী যে সে। তাদেরই মতো অজ্ঞাত রয়ে গেছে এই জংলী ফুলদল। বিলাসিনী আধুনিকাদের সুগন্ধি কেশপাশে ক্যামেলিয়া ব্ল্যাকপ্রিন্সের মাঝে তাদের স্থান নেই যে।

আমরা ছেলেটি কাছে এগিয়ে স্পষ্ট বাংলা ভাষায় সে বলে উঠল, তোমরা বাঙালী বাবু, না? আমি বাঙালী বাবুদের খুব পছন্দ করি আমি অনেকদিন কলকাতায় ছিলাম কি না? পাহাড়ের এক বাচ্ছা তিব্বতী ছেলের মুখে বাংলা ভাষা শুনে আমরা দু'জনেই খুশি হয়ে উঠলাম। এগিয়ে গিয়ে বললাম এটাই কি তোমাদের বাড়ী? উত্তরে মাথা নাড়ল সে। সুন্দর রং ছেলেটির। মাথা ভরা কোঁকড়ানো বাদামী চুল। মেয়েটির মতোই চোখ দুটো ছোট ছোট। কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল আর বুদ্ধিদীপ্ত। মর্ম্মর জিজ্ঞেস করল ঐ মেয়েটি কে হয় তোমার? সে কি বলতে গিয়ে হঠাৎ হাততালি দিয়ে তার নিজের ভাষায় কি যেন বলে উঠল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখি, বিরাট আলখাল্লার মতো লাল রং-এর পোষাক পরা মুণ্ডিত মস্তক, বিরাট চেহারার এক তিব্বতী লামার হাত ধরে টানতে টানতে আনছে—সুন্দরী ষোড়শী। লজ্জারাঙা বাঙালী ঘরের ষোড়শী নয়। খোলা পাহাড়ের বুকে মানুষ, পাহাড় কন্যা ইডেন।

ছেলেটি এবার বাংলা ভাষায় বলল, ঐ দেখো আমার বাবা আর দিদি আসছে।

কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল কাপালিকের কথা।

তারপর সে আরও বলে গেল—তোমরা আমাদের মন্দির দেখতে এসেছ তো? আমি বাঙালীদের বড্ড ভালোবাসি। ইডেন ও বাঙালীদের গান শুনতে খুব ভালবাসে। এত changer আসে দার্জিলিং-এ, কিন্তু খুব কম লোকই আসে আমাদের মন্দির দেখতে। তুংসুং বস্তী সহর থেকে অনেকটা দূরে কি না তাই। যে দু' একজন এসেছে—তাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেছে।

আমরা অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিলাম ছেলেটির কথা। আমাদের চোখ পড়েছিল—ঐ আঁকাবাঁকা পথে, যেখান থেকে আসছিল ইডেন তার বাবার হাত ধরে।

লামাজী এসে আধা হিন্দী আধা বাংলায় বললেন, তোমরা আমার মন্দির দেখতে এসেছ? চল দেখিয়ে আনি। আমরা হেসে তাকে অনুসরণ করলাম। ইডেন কিন্তু লাফাতে লাফাতে লাফাতে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। আমাদের উৎসাহও যেন

নিমেষে নিমেষে হয়ে গেল শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী

লামাজী এবার বলে চলেন, সেই মন্দিরের ইতিহাস। সারি সারি প্রদীপ জলছে। বিরাট বুদ্ধমূর্তি লামাজী বললেন, মূর্তিটা নাকি হাজার বছরের পুরানো। কাশিলাবস্তুতেই নাকি পাওয়া গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তিব্বতীয় শিল্প, বুঝলাম না বিশেষ কিছু। লামাজীর সে কি উৎসাহ। অনর্গল বকে চললেন। সব দেখা হলে, আমি বললাম, চল মর্ম্মর এবার ফিরি। অনেক পথ নামতে হবে।

লামাজী চট করে হাত চেপে ধরলেন আমার। বললেন তা হয় নাকি। এতটা বেলা হয়ে গেছে। অভুক্ত অতিথি ফিরে যাবে। নিংপা তা হ'লে আমার ওপর খুব রেগে যাবে। তোমরা অতিথিরা, যদি না যাও আমার ঘরে, তবে রসম, ইডেনও খুব দুঃখ পাবে।

আমরা যেন আবার প্রেরণা পেলাম। আমরা ফিরলাম মেঠো ঘরের দিকে। যার চাল বেয়ে থোকা থোকা জংলী ফুলগুলো রয়েছে, আর ভেতরে রয়েছে, জংলী লামাজী-কন্যা ইডেন।

আমরা যখন সেখানে ফিরলাম, তখনও রসম সেখানে বসে। হাতে তার ইংরেজীতে লেখা ক্রিকেট সম্পর্কে একখানা বই। নানা ছবি দিয়ে খেলাটাকে শেখানার ব্যবস্থা রয়েছে এতে।

আমাদের দালানে বসতে দিয়ে লামাজী ঘরের ভেতর চলে গেলেন। সম্ভবতঃ নিংপাকে খবর দিতে। আমার চোখ কিন্তু খুঁজে ফিরছিল, আপেলের মতো লাল গালের অধিকারিণী সুন্দরী ইডেন কে।

'রসমের' হাত থেকে বইটা নিয়ে মর্ম্মর জিজ্ঞেস করল, কি তুমি বুঝি ক্রিকেট খেলা খুব ভালবাস? রসম বলল বারে, ভালো লাগবে না? এর মতো খেলা আছে? ক্রিকেট খেলাকে যে খেলার মধ্যে 'রাজার খেলা' বলা হয়েছে, এ শুধু costly বলেই নয়, এই খেলা 'সত্যিই' রাজা। আচ্ছা, গত Test match এ তোমরা কলকাতায় ছিলে? গুপ্তে, মানকড়! উঃ কি খেলা! গুপ্তের বোলিং কি অদ্ভুত না? আচ্ছা পি রায় তো তোমাদেরই মতো বাঙালী। কি ভালো খেলেন তিনি তোমরা খেল? আমরা অবাক বিস্ময়ে দশ এগারো বছরের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। দার্জিলিং-এর একটা বস্তীর ছেলের মুখ থেকে এ সব কথা যেন পাকামি মনে হ'ল। মর্ম্মর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, মুখে বিরক্তি ভরা। শিল্পী মন—খেলা-ধুলো পছন্দ ও করে না তেমন।

ইতিমধ্যে লামাজী ফিরে এলেন, সঙ্গে এক তিব্বতীয় মহিলা। ইডেন, রসমের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে অনেকখানি। লম্বা সুন্দর চেহারা। পরনে তিব্বতীয় পোষাক। লামাজী আলাপ করিয়ে দিলেন। নিংপা নমস্কার জানাল, তাদের দেশীয় ভঙ্গীমায়। তার পেছনে ইডেন। হাতে তার দুটো পাত্র। সে পাত্র দুটো নামিয়ে রেখে, মায়ের মতো করে নমস্কার জানিয়ে রসমের পাশে এসে বসল। চোখে-মুখে তার হাসির ঝকমকানি। অবাক বিস্ময়ে আমাদের দেখছে সে।

আমরা নিষ্পলক ভাবে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। অপ্রতিভ চাহনীতে ভয় ছিল না আমাদের। তার রূপ পান করছি দেখে—সে চিৎকার করে বলে উঠবে না, অসভ্য কোথাকার, ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় জানেন না। এ তো কলকাতার পথ নয়। এ যে দার্জিলিং-এর পাহাড়ের বাঁকে একটুকরো জংলী বস্তীর গল্প।

পাত্র দুটো হাতে নিয়ে দু'জনেই চমকে উঠলাম। মদ দিয়ে তারা অতিথির সম্মান করে, এ কথা গল্পেতেই পড়েছিলাম। বিশ্রী গন্ধ, অথচ এ গ্রহণ না করলে তাদের অপমান। মুখ বিকৃত করে খেলাম, এক ঢোক করে। এরপর নিংপা এনে দিল চিঁড়ে গুড়

আমরা কোন মতে সেগুলো গলাধঃকরণ করলাম। তারপর এল এক ধরণের সুপুরি, খাসি গাইয়ের দুধ জমিয়ে তা তৈরী। নাম বললে ছুরপি। বেশ লাগল সেটা।

এরপর এ দেশীয় নাচ গানের কথা উঠল। নিংপা খুব ভালো গান জানে। সে আর একদিন শোনাবে, কথা দিল।

খাওয়া শেষে বিদায় নিলাম তাদের কাছ থেকে। রসমের কাছে আসতেই আবার সে খেলার কথা পাড়ল। আমি বললাম তুমি নিজেও খেল তো ? একদিন এখানে এসে তোমার সঙ্গে ক্রিকেট খেলব— আর তোমার দিদির ঐ ইডেনের গান শুনব।

এই কথাতে হঠাৎ যেন কি হল। হাসি খুশি ভরা লামাজী, নিংপা, ইডেন, রসমের মুখ যেন কেমন হয়ে গেল ? সারাদিনের ঝলমলানি সূর্য্যালোকের পর, সন্ধ্যা নামলে পৃথিবীর চেহারা যেমন হয়—এ যেন তারই নিদর্শন। থমথমে এক বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হল।

রসম স্তব্ধতা ভেঙ্গে ম্লান মুখে বলল, আমি খেলব কেমন করে ? আমি যে হাঁটতেই পারি না। ডাক্তার বাবু ওষুধ দিচ্ছেন। বলেছেন শীগগিরি সেরে যাব। জন্ম থেকেই আমার পায়ের দোষ কি না তাই সারতে দেরী হচ্ছে। এত খেলতে ইচ্ছে করে—কিন্তু খেলতে পারি না। আমার পা যদি ঠিক থাকত, তবে দেখতে মানকড়, গুপ্তেকেও হারিয়ে দিতাম বোলিং এ। জান, দিদির ডাক্তারের ওষুধও খুব ভালো। দিদি হাসলে আগে কোন শব্দই বার হত না আজকাল একটু একটু আওয়াজ আসে। আর ক'দিন পরেই দেখবে দিদি কথা বলতে পারছে। দিদি এত গান ভালবাসে কিন্তু বেচারী করতে পারে না। কবে যে আমরা ভালো হব !

চমকে উঠেছিলাম আমরা দু'জনে। একসঙ্গেই নজরে পড়েছিল দেওয়ালে হেলান দেওয়া ক্রাচ দুটো। আর মনে পড়ে গিয়েছিল— সুন্দরী ইডেন তো একটাও কথা বলে নি ! সে শক্তি থেকে ভগবান ওকে বঞ্চিত করলেন কেন একে ? এত রূপ দিলে যদি তবে ভাষা দিলে না কেন, নিষ্ঠুর দেবতা ? চোখে পড়েছিল, সুন্দরী ইডেনের মিষ্টি লাল ঠোঁট দুখানা। সে দুটো নড়ে নড়ে উঠছে, নতুন কিছু বলবার জন্যে নতুন গান গাইবার জন্যে।

নিংপা অন্যদিকে চেয়ে রয়েছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল লামাজীর বুক থেকে।

চোখের জল মুছে, মন ভার করে ফিরে এসেছিলাম সেদিন আমরা সাহিত্যিক আর শিল্পী দু'জনে। অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল আমাদের পথের গান। আমাদের আনন্দ অভিযান।

সমাধি

বন্দনা ভট্টাচার্য্য

নীরব হয়েছে পৃথিবী এখানে
শেষ হয়ে গেছে চলা
থেমে গেছে সব কল কলতান
ফুরায়েছে কথা বলা।
কত বেদনার ভরা আঁখিজল
জমে আছে হেথা হায়
কত স্মৃতি আছে বিজড়িত এই
সাথী হারা আঙিনায়।
কত গান এসে থেমে গেল হেথা
কত হাসি হল ম্লান
কত বিরহের জলন্ত শিখা
হোল হেথা অবসান।

শিশু

জয়া সরকার

আমার নয়ন মণি আঁধার ঘরের আলো।
সবাই জানে পরান দিয়ে বেসেছি তোমায় ভালো।
অতীত ব্যথা সব ভুলেছি প্রথম দেখার ক্ষণে।
হারিয়ে গেছি যখন তুমি এসেছো আমার মনে।
তোমার গালে গাল্ বুলিয়ে ব'লবো মনের কথা।
সুখ সাগরে বেড়াই ভেসে জুড়োয় সকল ব্যথা।
বিকেল বেলা দু'জন মিলে বকুল তলায় বসে।
চুপটি ক'রে খেলব খেলা দেখুক্ না কেউ এসে।
ডুবলে রবি অতল জলে মেল্‌লে আঁধার পাখা।
ভয় পেয়ো না কুমুদ মামা দেবেন তখন দেখা।
তুমি কেবল লুকিয়ে থেকো মায়ার বাঁধন দিয়ে।
হৃদয় মাঝে পরাণ হ'য়ে প্রীতির পরশ নিয়ে।

অবেলার গান

অন্নপূর্ণা মৈত্র

তোমার অবাক মন স্বপ্ন বোনে রাতের কার্পেটে
দূরায়ত চোখে তাই কল্পনার ছায়াছবি দোলে !
গল্পের নায়িকা নও, শুধু এক শিল্পীর মডেল,
রূপ আর রঙ দিয়ে ভরেছিলে মনের ইজেল ?
জীবনের পটভূমি আজ তবু করুণ জিজ্ঞাসা।
অতীত প্রেমের লিপি খুঁজে করি দুরন্ত অন্বেষা ॥
প্রাগৈতিহাসিক প্রেম আজ শুধু কংকালের স্তূপ
মুছে যাক সে অধ্যায়। জীবনের ব্যর্থতায় রূপ
ওখানে নিশ্চিহ্ন হোক ; শেষ হোক হারানোর গান।
নিজেকে আশ্বাস দিই বা পেলাম সে তোমার দান ॥

নতুন দ্বীপ

শ্রীমতী প্রভা দত্ত

আমার জাহাজ ভাসে বিক্ষুব্ধ এ সাগরের বুকে :
এগিয়ে চলেছে বুঝি কোন এক নিরুদ্দেশ পথে,
যেখানে জীবন আছে মিছিলের নেই অবকাশ
ঝড় যেথা থেমে গেছে অজানা সে সাগর-সৈকতে।
আমি শুধু ভেসে যাই মনে হয় অবাক জীবন,
অবাক্ অবাক্ লাগে ছায়া ছায়া মেঘের পাহাড় :
নীল চোখ হরিণীর স্বপ্নভরা উদাস আকাশ—
মনে হয় কোন দ্বীপ আমি বুঝি করি আবিষ্কার।
হয়ত সে দ্বীপে আছে জীবনের অজস্র সম্পদ,
হয়ত সেখানে আছে অফুরন্ত বসন্ত-বাতাস
হয়ত সেখানে শুধু পরীদের ঘুম-ভাঙ্গা গান
নীল জলে স্নান সারে ডানা মেলে উদাস আকাশ।
আমার জাহাজ চলে পার হয় অনেক সাগর ;
সে সাগরে ঢেউ নেই সেখানেই হাঙ্গরের ভীড়,
মহাশূন্যকার দেশ তার বুঝি হয়নি কিনারা
হয়ত সেথায় শুধু ভীড় করে নক্ষত্রের নীড়।
আমার জাহাজ চলে কোন এক নিরুদ্দেশ পথে :
যেখানে জেগেছে দ্বীপ যেথা আছে আখেরে মিছিল—
যেখানে অনেক শস্য আছে জানি প্রাচুর্য্যের স্বাদ
শকুনীর ভীড় নেই আছে শুধু গাঙ-পাখী-চিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

পুষ্প দেবী

সহজ সরল পূত পবিত্র তুমি মমতার ছবি
তোমার উদয়ে নিমেষে মিলাল দ্বিধা সংশয় সবি
তন্ত্র মন্ত্র সবি নিলে মেনে
বুকে নিলে জীবে শিব বুঝে জেনে
ভাঙ্গনিত কিছু গড়ে গেলে শুধু মিলনের মহারূপ
হেরি সে বিরাট মিলন ক্ষেত্র হৃদি স্তম্ভিত চুপ।

দুর্ব্বল দেহে সবল উদার শক্তিতে ভরা প্রাণ।
শক্তি মায়ের শক্তি লভিয়া গেয়ে গেলে তাঁর গান,
ভালোবাসা দিয়ে করে নিলে জয়,
নিরমল মন চির নির্ভয়—
অহঙ্কারেরে করি পদানত উন্নত করি শির।
লোভ কাম পাপ তেয়াগী আপনি তুমি অবিচল স্থির।

কাম ও কামিনী তোমার মন্ত্রে মেনে নিল পরাজয়
কাম হল শুধু মায়ের কামনা কামিনী মাতৃময়
সংসার বলি জগতেরে নিলে
গার্হস্থ্য ছবি নিজে এঁকে দিলে
জীবের পালনে জনক রূপেতে জগত পিতার সম
উদিলে আপনি দীপ্ত সূর্য্য উজলিয়া মনোরম

উদার বিশাল পিতার রূপেতে জননীর মায়া মাখা
দয়াল ঠাকুর হে করুণা ঘন তব মুখখানি আঁকা
সবাকার তরে চির আশ্রয়
পেল পাপী তাপী সান্ত্বনাময়
মমতা কোমল হৃদয় কমল তুমি আনন্দময়
অযুত কণ্ঠে উঠে তাই ধ্বনি শ্রীরামকৃষ্ণ জয়।

অবতার কিনা আমি ত বুঝি না তুমি পূর্ণতাময়
পূর্ণরূপেতে জগতে আসিয়া গাহিলে প্রেমের জয়
লালসা বিলাস সরমে লুকায়
সহজ ভকতি পরাণ রাঙ্গায়
আপনার মাঝে দেবের প্রকাশ দেখিল বিশ্বময়
স্বদেশে বিদেশে সবাই প্রণমি গাহিল তোমার জয়।

সবারে মানিয়া সহজ পথেতে চলেছিলে লীলা তরে
শুধু ভেদাভেদ দূরেতে তেয়াগী সবারে আপন করে
শুদ্ধ মনের নিষ্কাম চাওয়া
আপনার মাঝে দেবতারে পাওয়া
দেবতারে পাওয়া সবাকার মাঝে আপনার ধন করে
তাঁহার দরশে তাঁহার পরশে উঠেছে পুলকে ভরে।

সে যে কী পুলক সে কী আনন্দ দেখিল বিশ্ব জন
জীবে ভাব শিব সহজ মন্ত্রে মোহিত সবার মন
শত্রু মিত্র সবে পদানত
বিস্ময় ভরে হল স্তম্ভিত
শিশুর মতন সহজ ভাষায় জটিল তত্ত্ব যত
মীমাংসা তার নিমেষে করিলে সহজ জলের মত

সবাকার দুখ রোগ পাপ তাপ নিলে আপনার দেহে
জগতের পিতা হইয়াছ তাই অপার করুণা স্নেহে
কঠিন রোগের যন্ত্রণা সহি
সে কী তপস্যা তুষানলে দহি
পাপী তাপী তরে নিলে অবহেলে শুধু অতুলন স্নেহে
সংসার তব ওগো সন্ন্যাসী সারাটি বিশ্ব গেহে

জানালা

রমা ভট্টাচার্য্য

স্যাঁতসেঁতে জমিতে ঘুটঘুটে অন্ধকার বাড়ী,
কুয়াশাগভীর মাঠ, পাতাছাড়া গাছের সারি,
বেদনার বিষাক্ত নিশ্বাস, সন্দিগ্ধ মন আর,
বিশ্বে ছড়িয়ে-পরা শান্তিহীন ভ্রান্তির বিকার
—আর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

রাত ভোর হো'ল। সূর্য্যের রেখা বসন্তের সাথে
এগিয়ে এলো। দিন-পাখী-মন নাচে গায় ডাকে
—কোন রৌদ্রময় জানালার পথে।

বন মহোৎসব

শ্রীমতী সুপ্রীতা মিত্র

নিত্য নিত্য কতই মালী, গাছ পুঁতে
ফলায় ফসল রৌদ্রে জলে ভিজে, তেতে।
ফোটায় কত রং-এর গোলাপ, যুঁই, বেলা,
সাজায় কত সুগন্ধিময় ফুলের ডালা
কতই রক্ত করবীর ওই ঝাড় দোলে।
দখিণ মারুত পরশ বুলায় লাল ফুলে।
রাজা উজীর গাছ পুঁতে হয় মহোৎসব
চারি দিকে উঠবে তখন কতই কলরব।
মাটীর কলস, রং দিয়ে হয় তায় আঁকা
মহিলারা নানান্ সাজে যায় দেখা।
মহোৎসবে উঠছে তো সব মেতে
ক্ষুধার জ্বালা মিটবে কাহার এতে?
সযতনে ফোটায় যারা ফুল
সুগন্ধিটি অন্য জনের, তাদের ভাগে হুল।
সকল মুখে অন্ন যারা ধরে
তাদের তনুই কৃশ অনাহারে।
যাদের দানে পুষ্ট করে কায়
তাদের পানে ফিরেও নাহি চায়।
দেশের ক্ষুধার ফসল ফলায় যারা,
তাদের গৃহই রইলো অন্নহারা।

আজকের এই সূর্য্য স্বপ্ন

শ্রীউর্মিলা মুখোপাধ্যায়

আজকের এই সূর্য্য স্বপ্ন
হবে কি সার্থক কোন কালের স্বাক্ষরে।
নরম নদীর দেহে
ছোট ছোট জাহাজের আনাগোনা
নতুন কালের বন্দরে!
গাংচিল ডানা মেলে ছোটে,
আবার মুক্তোর মেলা নদীর নতুন বন্দরে।
এও কি স্বপ্ন আমার—
জীবনের সোনালী স্বপন।
শালের প্রান্তর থেকে
জীবনের বলিষ্ঠ চেতনার আনাগোনা
খেতজোড়া ধানের বুকেতে।
সোনালী ফসল জোড়া—
দিগন্ত চুম্বিত জীবন,
এ তো আজকের নয়,
আগামী কালের কোন এক সূর্য্য-স্বপন।
হবে কি সার্থক……
গ্রহের কাঁপন লাগা……
কোন এক সৌরপ্রশ্ন জাগা
নতুন দিনের বন্দরে!

প্রশ্ন

মায়া মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণপক্ষের কালো চুলে ছাওয়া আকাশ
তোমার চুলেতে ছায়া ফেলে;
বোবা মুহূর্ত্তের অশরীরী পদক্ষেপে
মনে হয় তোমার আনাচে কানাচে কারা ঘোরে।
সুন্দর সজীব এক মনকে পাই কোথা বল?
এ রাত্রি তমসা কি আনবে না সকালের আলো?
দুশ্চিন্তার মৃত্যু নেই, আকাঙ্খার শেষও কি আছে?
চেয়ে না পাওয়ার অর্থ জীবনের অভিধানে খুঁজি বসে বসে।
পার্থিব কামনা ভেজা শিশিরে সুস্নাত নয় মন,
জীবনের রুক্ষ মাঠে ক্ষুণ্ণ হয় ফসল ফলার আবেদন।
পৃথিবী কি মূর্ত্তিমান বিষণ্ণতা?
হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে এ প্রশ্নের সাড়া মেলে কই?
তোমাকে রাত্রির মত মনে হয় নিঃসঙ্গ সুদূর,
মৌনতার হিমে জমা কঠিন জিজ্ঞাসা!!
নিশ্চিন্ত পাওয়ায় তাই ছেদ টানে হারাবার ভয়,
মৃত্যুহীন, প্রেমহীন তোমার সত্তার কি নেই কোনো পরিচয়?

তৃষ্ণা

কদম্বা পিল্লাই

সাগরের সীমা আছে।
সীমা আছে আকাশেরও—সুদূর দিগন্তে।
শুধু যার সীমা নাই—
সীমাহীন অসীম সে তৃষা।
নদীর উদ্দাম স্রোত শ্রান্ত সাগরেতে।
ঝর্ণার ঝুমুর-গান শান্ত সমতলে।
শুধু পিপাসার শান্তি
আর কামনার ক্লান্তি নাই।

বিলম্বিত লয়

দীপ্তি সেনগুপ্তা

শোনো আজ বাতাসেরা কোন কথা বলে যায়
নীল নক্ষত্রের ঐ হাজারো বুটির মত উজ্জ্বল আকাশ।
বাতাসের প্রাণে আজ শিশিরের শব্দ গান গায়
বাসন্তী রাঙালে মনে লাল সবুজের এক রঙিন আভাষ।
মনে পড়ে এমনি ফাগুন দিনে কুমারী ছিলেম আমি
টিপ-টিপ পা ফেলে মনের আকাশে ঢেউ তুলে
কাঁঠাল-চাঁপার ঐ সুরভি মাতানো এই তুমি
আসনিকো। জিওলের বেগুনী রঙের ফুলে
অনেক খুশীর ভাষা। মাঠে, ঘাসে, কলমীর দামে
ফাল্গুনের কত আয়োজন। মরালের গভির আবেগে
মনের জানলায় শুধু স্বপ্নের আবেগ নামে।
রাজকুমারের স্বপ্ন চিহ্ন রাখে সেদিনের মেঘে মেঘে।
সেই তুমি এলে আজ বসন্তের শেষে।
বৈশাখীর কান্না যবে আকাশেতে মেশে।

পৃথিবী থেকে মহাকাশে

মহাশূন্য—গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াবে, মহাশূন্য জয় করবে—মানুষের কতকালের স্বপ্ন। আজ সে স্বপ্ন দ্রুত সফল হতে চলেছে। কত উপকার হতে পারে এর ফলে মানুষের। যেমন, আবহাওয়া আয়ত্তে এসে গেলেই বাণিজ্য ও কৃষির পক্ষে সুবিধা হবে। বিশ্বজোড়া বেতার ও টেলিভিশন যোগাযোগও হবে তখন একটি সহজসাধ্য ব্যাপার।

ইতিকথা—মহাশূন্য সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন রয়েছে বরাবর। গ্রীক পণ্ডিত টোলেমি দ্বিতীয় শতকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে গবেষণা চালান। এই ব্রতে তাঁকে সহায়তা করেন চীন, আরব প্রভৃতি দেশীয় কয়েকজন গবেষক। এদিকে ১৬১০ সালে টেলিস্কোপ বা দূরবীণ আবিষ্কার করলেন গ্যালিলিও। গ্রহ নক্ষত্রাদি বিষয়ে প্রশ্নের প্রথম দফা জবাব মিললো এইখানেই।

স্বর্ণযুগ—দ্বিতীয় শতকের কথা-মহাশূন্যে অভিযানের স্বপ্ন দেখছেন গ্রীক দার্শনিক লুকিয়ান। এর পর ১৮ শত বছর কেটে যেয়ে হাজির হয় বিংশ শতকের স্বর্ণযুগ। লুকিয়ানের সেদিনকার স্বপ্ন আর ঠিক স্বপ্ন হয়েই নেই। আজ রকেট উঠেছে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে—গ্রহান্তরে পাড়ি জমাতে মানুষের চলেছে প্রস্তুতি। কত বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে পারা যাচ্ছে এর সহায়তায়।
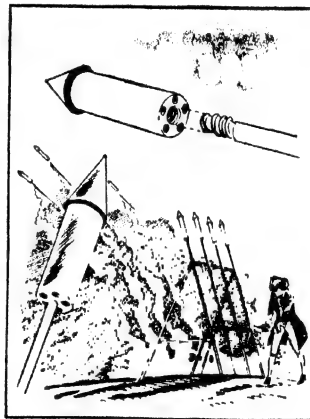
রকেট—মহাশূন্যের চাবিকাঠি আজকের এই রকেট, কিন্তু মানুষের কাছে এ ঠিক একটি নতুন আবিষ্কার নয়। ইতিহাসের পাতায়ই দেখা যায়—চীনারা ১২৩২ সালের উৎসব-অনুষ্ঠানে রকেট ব্যবহার করছে। তবে প্রথম যুগের রকেটগুলোর গতিবেগ ছিল নিতান্ত সামান্য—গতিপথও ছিল অনিশ্চিত। দিশেহারা অবস্থায় কয়েক শত ফুটের বেশি যেতে পারতো না সেদিনের রকেট।

অগ্রগতি—রকেট এশিয়ায় আবিষ্কৃত হলেও ব্যাপকতা লাভ করে এ ইউরোপে। অষ্টাদশ শতকে স্যার উইলিয়াম কংগ্রিভ (ইংরেজ) এর এমনি উন্নতিসাধন করলেন, যাতে করে এক মাইলেরও বেশি দূর রকেট প্রেরণ সম্ভব হলো। সে যুগের রকেটগুলোতে ব্যবহৃত হতো নিরেট জালানী (সাধারণতঃ বারুদ)। কিন্তু এ ব্যবস্থাধীনে অসুবিধা ঘটে অনেক, পরীক্ষায় দেখতে পাওয়া গেছে।

গডার্ড—উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ডাঃ রবার্ট এইচ গডার্ড (মার্কিণ) তরল জালানী দিয়ে রকেট চালানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন। রকেট চালনা ও মহাশূন্য অভিযাত্রা ব্যাপারে চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন করে দিলেন তিনি। রবার্ট গডার্ড ছিলেন একজন কলেজের অধ্যাপক। প্রচুর সময় ও অর্থ তিনি ব্যয় করেছেন এই অমূল্য গবেষণায়।
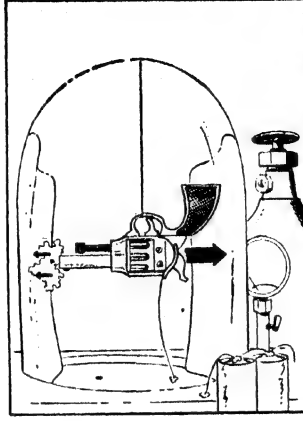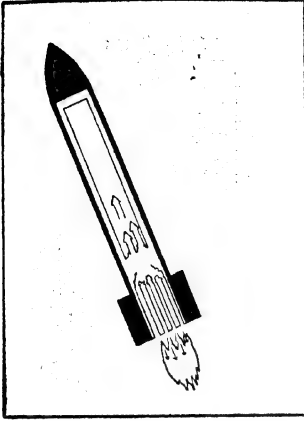
চালনা—ডাঃ গডার্ড যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালিয়ে যান, এর মাধ্যমে একটি নতুন জিনিস প্রমাণিত হয়। সেদিন অবধি ধারণা ছিল রকেট থেকেই বেরিয়ে আসা গ্যাস বায়ুকে ধাক্কা দেয় আর এরই ফলে রকেটের গতিবেগ আসে। কিন্তু বিজ্ঞানী গডার্ড দেখিয়ে দেন যে, রকেটের ভেতরকার জ্বলন্ত গ্যাসের চাপেই ঐটি চালিত হয়। এই দাবীর স্বীকৃতি কিন্তু মিলেনি বহু বছর।

বায়ুমণ্ডল—গডার্ড এও অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, স্বাভাবিক বায়ুসমন্বিত স্থানে রকেটের যতটা গতিবেগ হবে, তুলনায় তা অনেক বেশি হবে মহাকাশে—যেখানে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব নেই কিংবা বায়ুমণ্ডল ক্ষীণ। তিনি বায়ুশূন্য কাঁচের জারে রক্ষিত একটি পিস্তল থেকে ফাঁকা কার্তুজ ছুঁড়ে তাঁর মতবাদটি যে সত্য, সেইটির প্রমাণ তুলে ধরেন সকলের সমক্ষে।

তরল জ্বালানী—১৯২৬ সালে গডার্ড তরল জ্বালানীর সাহায্যে রকেট চালনার প্রথম পরীক্ষা চালান। তাঁর উৎক্ষিপ্ত রকেট তখন শূন্যপথে মাত্র ১৮৪ ফুট পর্য্যন্ত যেতে পারলো। কিন্তু গডার্ড বুঝে নেন যে, তরল অক্সিজেন ও গ্যাসোলিন মিশিয়ে তিনি যে জ্বালানী তৈরী করেছেন, তা পরীক্ষায় টিকেছে। আধুনিক রকেট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটিও গডার্ডেরই একটি আবিষ্কার।
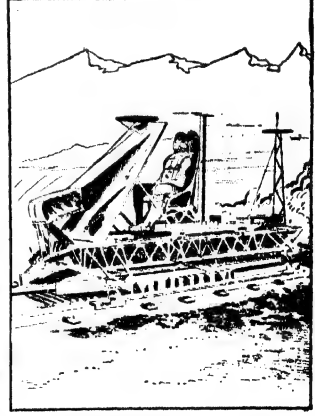
প্রাণরক্ষক—মহাশূন্য বিজয় অভিযানে সাম্প্রতিক অভাবনীয় সাফল্যে রকেটের অগ্রগতির গোড়াকার ধাপগুলোর কথা তেমন বলা হয় না কিংবা উপেক্ষা করা হয়। অথচ দূর দরিয়ার বিপন্ন জাহাজের উদ্ধারসাধনে—দুর্গত মানুষের প্রাণ-রক্ষায় রকেট কাজে লেগে এসেছে বহু যুগ ধরেই। রকেটচালিত তোপধ্বনি মারফত জল ও স্থলে সঙ্কেতদানের কাজও চলে দীর্ঘদিন।

জেটো—রকেট-শক্তির আর একটি কার্য্যকরী অবদান 'জেটো' (জেট সাহায্যে 'টেক অফ' বা উড্ডয়ন)। এই ব্যবস্থায় বেশিরকম বোঝাই করা বিমানগুলোতে ছোটখাটো রকেট জুড়ে দেওয়া হয়। এর লক্ষ্য—অনেকটা সহজে উক্ত বিমানসমূহকে শূন্যপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। অবতরণের সুবিধে নেই, এমন সব স্থানে জরুরী অবস্থায় সাহায্য প্রেরণেও এ বিশেষ সহায়ক।

এক্সিলারেশন স্লেড—রকেটের অপরএকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে 'এক্সিলারেশন স্লেড'-এ—যা দ্রুতগতিসম্পন্ন এরোনাটিক ও প্রত্যাশিত মহাকাশ অভিযানে বড় রকম পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়। খুব অল্প সময়ে পর্ব্বতাদির ওপর দিয়ে ডাক চলাচলেও রকেট কম কাজে লাগতে পারে না। বিশ্বের নানা দেশে নানা উৎসবে স্কাই-রকেটের ব্যবহার চলতি আছে এখনও।
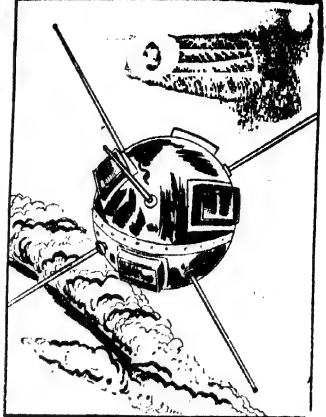
মার্কিণ কর্মসূচী—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্মসূচী অনুযায়ী রকেট সম্পর্কে গবেষণা চালায়। মানুষের কল্যাণের লক্ষ্য থেকে তারা যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করে, সারা বিশ্বকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। এই বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম-সাধনায় নিমগ্ন নামকরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন ডাঃ জেমস এ ভ্যান এলেন, ডাঃ উইলিয়ম এইচ পিকারিং ও ডাঃ ওয়ার্ণার ভন ব্রাউন।

বহুপর্য্যায় রকেট—১৯৪৬ সাল নাগাদ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই তথ্যটি আবিষ্কার করে যে, মহাশূন্যে অভিযান চালনার জন্য একাধিক পর্য্যায়বিশিষ্ট রকেট চাই। ১৯৪৯ সালে প্রথম বহু পর্য্যায়ের রকেট ছোঁড়া হলে সে-টি ২৫০ মাইলেরও বেশি পথ ছাড়িয়ে যায়। আজকের দিনে মহাকাশে উপগ্রহাদি উৎক্ষেপণের জন্য যে রকেটসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো চার বা ততোধিক পর্য্যায়বিশিষ্ট।

ভূ-পদার্থ বৎসর—বহু পর্য্যায়ের রকেটের সাহায্যেই ১৯৫৮ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি ('শিশু চাঁদ') পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ কক্ষে স্থাপন করে। আন্তর্জ্জাতিক ভূপদার্থ বছরের গবেষণায় জাতিসমূহের সাথে সহযোগিতার অঙ্গ হিসাবেই এই কাজটি করা হয়। এই বছর বিশ্বের ৬৬টি দেশ ১৮ মাস ধরে পৃথিবী, সাগর, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি সম্পর্কে পর্য্যালোচনা চালায়।

এ্যাটলাস—প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আরও কয়েকটি 'চাঁদ'কে কক্ষে পৌছে দেয়। এই ধরণের একটি 'চাঁদ' বা কৃত্রিম উপগ্রহই এ্যাটলাস। ওজন ছিল এইটির সাড়ে চার টন। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বড়দিনের শুভেচ্ছার বাণী ছড়িয়ে দেয় এ বিশ্বে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এতে করে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

ভ্যানগার্ড-২—এর পরই উৎক্ষেপণ করা হয় ভ্যানগার্ড-২। বিশেষজ্ঞরা দাবী করেন যে, আবহ-বিদ্যার ক্ষেত্রে এইটি নিয়ে আসতে পেরেছে একটি নতুন যুগ। এর মারফত ভূমণ্ডলের আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস বিজ্ঞাপিত করা সহজতর হবে—এও তাঁদের বিশ্বাস। এই উপায়েই মেঘমণ্ডলে আর পৃথিবীর উপরিভাগে সূর্য্যের প্রতিফলন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারা যাবে।

আবহাওয়া—বিজ্ঞানীদের একটি দাবী—আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস ঘোষণা ব্যবস্থা কিছুটা উন্নততর করা (শতকরা ১০ ভাগ) সম্ভব হলেও বিশ্বের বাণিজ্য ও কৃষির উপকার হবে অনেকখানি। কেউ কেউ এ-ও বলছেন যে, এরূপ অবস্থায় মানুষের পক্ষে আরও অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। এখন যেখানে ফলন হচ্ছে না, সেখানেও শস্য জন্মাবে, এ নিশ্চয়তা তখন দেওয়া চলবে।
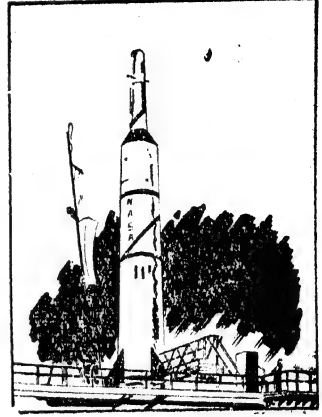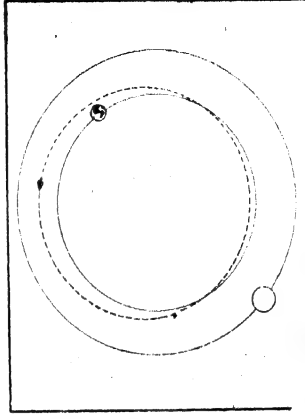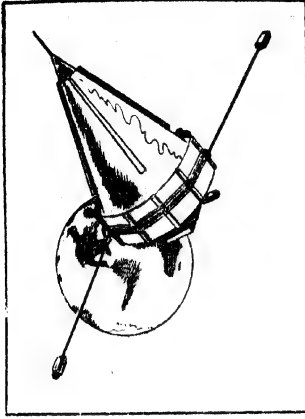
সৌর উপগ্রহ—মহাশূন্যচারী দুটি রকেট ৬৫ হাজার মাইলেরও অধিক উর্দ্ধে প্রেরণের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সাফল্যের সঙ্গে পাইওনীয়ার-৪ (কৃত্রিম সৌর উপগ্রহ) উৎক্ষেপণ করে। আপন কক্ষে পৌঁছবার পূর্ব্বে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পথ অতিক্রম করে যায় তিন লক্ষ মাইল। ৪০৬,৬২০ মাইল উর্দ্ধাকাশ থেকেও মানুষের তৈরী এই উপগ্রহের বেতার সঙ্কেত শ্রুত হয়।

কক্ষপথ—মহাশূন্য অভিযানে পাইওনীয়ার-৪ বিজয়ী হয়েছে। এক্ষণে ৯১,৭৪৪,০০০ মাইল হতে ১০৫,৮২৯,০০০ মাইল দূরে থেকে প্রতি ৩৯২ দিনে সূর্য্যকে এ প্রদক্ষিণ করে চলবে আবহমানকাল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য এই উপগ্রহটিকে গতিবেগ নিতে হয় ঘণ্টায় ২৪,৮৯১ মাইল, প্রসঙ্গতঃ এ-ও উল্লেখ করা যেতে পারে।

মহাকাশ দপ্তর—রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত কর্ম্মসূচীটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় বিমান ও মহাশূন্য বিভাগের (একটি অসামরিক সংস্থা) হাতে অর্পণ করেছে। শান্তিপূর্ণ পন্থায় রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের উন্নয়ন ব্যবস্থা তদারক করছেন এই প্রতিষ্ঠানটি। মানুষের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে গমনাগমনের দিনটিকে ত্বরান্বিত করার জন্যেই আজ মার্কিণ বিজ্ঞানীদের দুরন্ত প্রয়াস।

সমস্যাবলী—মানুষ যখন মহাকাশে ঘুরে বেড়াবে, তখন তার সামনে হাজির হবে রকমারী সমস্যা। মার্কিণ ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীরা এখনই তাই সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করছেন। বাতাস, খাদ্য, জল, এসব বাঁচবার উপাদান কিভাবে সঙ্গে দেওয়া যায়, আর অতিমাত্র তাপ, ঠাণ্ডা ও বিকীরণের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি, এ বিষয়ে পরীক্ষা চলেছে অনেক।

আকর্ষণ—মাধ্যাকর্ষণ না থাকার দরুণও মহাশূন্যে মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। সেই স্তরে তার ওজন থাকবে না, তখন সে ভাসতে থাকবে, তার খাবার জিনিসও সে সময় দেখা যাবে শূন্যে ভাসমান। নলের মারফত সেটি তখন মুখে টেনে নেবার ব্যবস্থা থাকা চাই। সেখানে যেহেতু চাপ থাকবে না, বিশেষ ধরণের পোষাক না থাকলে শরীর খান খান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

চন্দ্রলোক—চন্দ্রলোকে পৌঁছলে মানুষ দেখবে সেখানকার আকর্ষণশক্তি খুবই কম—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। ঐ অবস্থাধীনে ৩০ ফুট উঁচু অবধি লাফানো সম্ভবপর হবে। সেখানে বাতাস বা জল মানুষ পাবে না—বায়ুস্তরের অভাবে শব্দও শ্রুত হবে না। তাপমাত্রা রাত্রিতে শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২৫০ ডিগ্রী বা ততোধিক আর দিনে শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২০০ ডিগ্রী বা ততোধিক হবে।
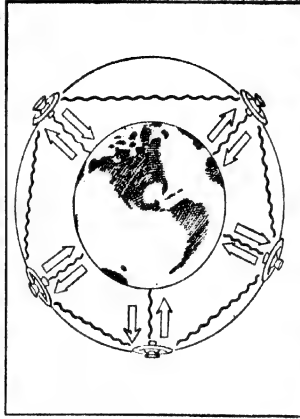
শূন্য ঘাঁটি—বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, গ্রহান্তরে পাড়ি দিতে হলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে ঘাঁটি (প্ল্যাটফর্ম) স্থাপন করাই নিতান্ত যুক্তিসম্মত ব্যবস্থা। ভূপৃষ্ঠ থেকে রকেটযোগে প্রেরিত হয়ে শূন্যচারী যান ও ঘাঁটির অংশগুলো এক জায়গায় মিলবে। বায়ুমণ্ডল কিংবা মাধ্যাকর্ষণ মুক্ত অবস্থায় এই ধরণের ঘাঁটি থেকে শূন্যযান-সমূহ উড্ডয়নের শক্তি খুঁজে পাবে প্রচুর।

অন্যান্য সুবিধা—শূন্যচারী যানগুলোয় উড্ডয়নের সুযোগ করে দেওয়া ছাড়াও শূন্য-ঘাঁটিসমূহ আরও অনেক কাজে লাগতে পারে। এই মঞ্চগুলো থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে উন্নত ধরনের পর্য্যালোচনা চালানো যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দরুণ গবেষণা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা, সেখানে থাকছে না। আবহাওয়া, বেতার ও টেলিভিশন ঘাঁটি হিসাবেও ঐগুলোর ব্যবহার চলতে পারে।

শূন্যচারী যান—মহাকাশে যেহেতু আকর্ষণ ও বায়ুমণ্ডল নেই, কোন প্রতিরোধও নেই। আর সে-সব নেই বলেই মহাশূন্যচারী কোন যানের জন্য ষ্ট্রীমলাইনিং-এর প্রয়োজন হবে না। বায়ুমণ্ডল সমন্বিত গ্রহে (যেমন পৃথিবী) অবতরণের জন্য ছোটখাট 'ষ্ট্রীম-লাইনিং' করা যান সঙ্গে থাকতে পারে। তবে এইরূপ অবস্থাধীনে গতিবেগ সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা না থাকলে চলবে না।
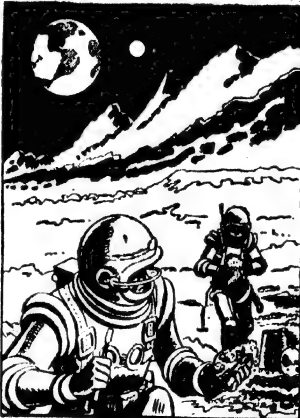
গতিবেগ—গ্রহ থেকে গ্রহান্তরগামী যানের গতিবেগ হতে হবে ঘণ্টায় অন্ততঃ ২৪,৭৮৮ মাইল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ও বায়ুমণ্ডলের এক্তিয়ার অতিক্রম করার জন্যই এইটি চাই। এর পরই দেখা যাবে ঐ শূন্যযানের গতিবেগ দাঁড়িয়েছে যেয়ে ঘণ্টায় চার থেকে পাঁচ হাজার মাইল। এই হারে চাঁদে যেতে ৫০ ঘণ্টা, মঙ্গলে যেতে ২৯০ দিন আর শুক্রগ্রহে যেতে ২১৫ দিন সময় লাগবে।

ফলাফল—বহু বিজ্ঞানীর ধারণা যে, মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহে আদিম জীবনের পরিচয় মিলতে পারে। কারো কারো বিশ্বাস, বুদ্ধি আছে, এমন প্রাণীর সন্ধানও সেখানে পাওয়া অসম্ভব নয়। তবে ইলেকট্রনিক রবটের সহায়তায় অন্য গ্রহ আবিষ্কারের প্রথম প্রয়াস চলতে পারে। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার সুবিধা—তাপ, আবহাওয়া, বিকীরণ ইত্যাদিতে এর কোন ক্ষতি হবে না।

গ্রহ-পরিবার—সূর্য্যকে কেন্দ্র করে যে গ্রহ-পরিবারটি রয়েছে, তাতে আছে—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। বিজ্ঞানীমহলের ধারণা—শুক্র খুব সম্ভব একটি 'মিত্র' গ্রহ আর মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীব বসবাস করতে পারে। একমাত্র শান্তির পথেই শূন্যযানের এই নতুন বিস্ময়কর যুগে মানবজাতির কল্যাণ সম্ভবপর।

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু

বিলিতি স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে করিন্থিয়ান স্তম্ভ নির্মিত হত। জানালা, ভেনিসিয়ান খড়খড়ি, খিলান, মিশ্র স্তম্ভ গথিক ধরণের গীর্জা থেকে নকল করে বারান্দা, ঘর, ঠাকুরদালান নামে অভিহিত পূজাঙ্গন প্রভৃতি নির্মাণ করা হত। সেগুলোর ব্যবহারে যথেষ্ট বুদ্ধি অথবা উপযুক্ত শিল্পচেতনা দেখা যায়নি। ইউরোপীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল কেবল তাদের ঘর-বাড়ীর কারুকার্যে এই বাহ্যিক পাশ্চাত্য শিল্পের প্রয়োগ দেখা যেত।

কলকাতার পুরোনো মহল্লায় যেখানে আগে ধনীরা বাস করতো সেইখানেই সাধারণতঃ এই ধরণের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। এই ভাবে চীৎপুর রোড, দর্মাহাটা, নিমতলা, পাথুরিয়াঘাটা অথবা তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ হুগলী নদীর কাছে অথবা এর পূর্বদিকস্থ অঞ্চলে পাশ্চাত্য স্থাপত্যশিল্পের এবং কারুকার্যের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। সহরের এই অংশটি উত্তরোত্তর ঘিঞ্জি হওয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ায় এখানকার আদি বাসিন্দারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন এবং পাশ্চাত্য শিল্পের যুগের অনুকরণে নির্মিত এই স্মৃতিসৌধগুলো এখন বাজার, গুদাম, বস্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলেই এক সময়ে ধনীরা তাদের নবলব্ধ নাগরিক গৌরব নিয়ে বসবাস করতেন।

হিন্দুসমাজের অবস্থা

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে বাংলার হিন্দুসমাজের দিকে পেছন ফিরে তাকালে এক বেদনাদায়ক চিত্র দেখতে পাই। নানারকম সামাজিক পাপে জীবন তালগোল পাকিয়ে গেছে। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত; প্রকৃত ধর্মীয় উৎসবের পরিবর্তে তখন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য এবং জাঁকালো পূজাপদ্ধতি দেখা দিয়েছে। নারীজাতি পরাধীন। উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ। পুরুষদের মধ্যে নৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি উপেক্ষিত। পবিত্রতা তখন জীবনের আদর্শরূপে সাধনার বস্তু ছিল না, বাহ্যত পবিত্রতা রক্ষার দিকেই অধিকতর ঝোঁক দেখা দিয়েছিল।

তখন সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, মাঝে মাঝে সতী হবার জন্য বলপ্রয়োগ করা হত বটে, তবে এইভাবে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদানের দৃষ্টান্তও কিছু কম ছিল না। জাপানের হারিকিরি প্রথার মত এ রকম আত্মবলিদানের প্রভূত সম্মান ছিল। মনে হয় যেন হিন্দু-সমাজ তার এই মহান অথচ সম্পূর্ণ বিপথচালিত বীরাঙ্গনাদের ওপর হিন্দুসমাজের পবিত্রতার জয়ধ্বজা ঊর্দ্ধে তুলে ধরার দায়িত্ব অর্পণ করে সেই পতাকা উড্ডীন রাখার চেষ্টা করেছিল। একদিকে নারীরা আগুনে পুড়ে মরছে, অপর দিকে অবশিষ্ট সমাজ কুপ্রথা ও অবনতির পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে প্রতিটি মানুষের জীবন সবদিক থেকে শ্বাসরোধ করে তুলছে, জীবনের বোঝা ও প্রলোভন থেকে ধর্মের পথে যাওয়াই একমাত্র মুক্তির উপায় ছিল।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নৈতিক দৈন্য এবং সাংস্কৃতিক অধঃপতন সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে তেমন কোন বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়নি। মাঝে মাঝে দুর্বল প্রতিবাদধ্বনি উঠেছে, কিন্তু সমগ্র ভাবে মানুষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোষ করেছে। এবং অসন্তুষ্টভাবে প্রতিক্রিয়াকেই মেনে নিয়েছে। অপর দিকে আর এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা দিয়েছে সংশয়বাদ ও ব্যর্থতাবোধ। সমাজ সংস্কারের সুস্থ প্রচেষ্টা কোন সঙ্ঘবদ্ধ আত্মনিয়োগে ঝোঁক দেখা দেয়নি। কয়েক শতাব্দী যাবৎ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যেমন উদ্যম উদ্যোগের অভাব বিরাজ করছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সেই উদ্যম উদ্যোগের অভাব দেখা গিয়েছিল। খৃষ্টান মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপ বাংলাকে যে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করলো তাতেই তার নিদ্রাভঙ্গের সূচনা করলো।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশন স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মিশন সমাচারদর্পণ নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাতে হিন্দুসমাজ ও ধর্মের উপর তীব্র আক্রমণ করা হয়। রাজা রামমোহন রায় এর উপযুক্ত জবাব পাঠান; কিন্তু তা ছাপা না হওয়ায় তিনি ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন নামে দ্বিভাষাভাষী নিজস্ব একটি সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। সেটি অবশ্য তিন সংখ্যার বেশী ছাপা হয়নি!

ইতিমধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ বেঙ্গল গেজেট (? জুন ১৮১৮) নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ছাপলেন। গঙ্গাকিশোর বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র বই প্রকাশ করলেন, সেটি হল, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র লিখিত ভক্তিমূলক কাব্য অন্নদামঙ্গল। তিনি গোঁড়া হিন্দুধর্মের বই, যেমন গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও লক্ষ্মীচরিত প্রকাশ করলেন।

কিছুকাল পরে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে হিন্দুসমাজের আরও শক্তিশালী একজন নেতা সম্বাদকৌমুদী (ডিসেম্বর, ১৮২১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) নামে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সমাচারচন্দ্রিকা নামে নিজস্ব একটি ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। ভবানীচরণ যেমন হিন্দুত্ব রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন, তেমনি নিজের সমাজ সংস্কারেও উৎসাহী ছিলেন। তিনি নববাবুবিলাস (১৮২৩) ও অপর ২টি বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থের লেখক, এই বইগুলিতে তৎকালীন কলকাতার ধনীদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে এই বইগুলো এবং শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম কেরী সম্পাদিত একটি বাংলা কথোপকথনের বই, সম্ভবত তা তাঁর শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কর্তৃক লিখিত, বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম বই। এতে সহজ ও চলতি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

খৃষ্টানী আক্রমণ

মিশনারী সংবাদপত্রগুলো এখন গোঁড়া সমাজ ও ধর্মের উপর আক্রমণ সুরু করলো, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সংবাদপত্র ও সভামঞ্চ থেকে এই আক্রমণ সুরু হল। কিন্তু একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করবার যে, বাংলার মুসলমান সমাজকে কোনরকমে স্পর্শ করা হল না। খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে ইস্‌লামের অনেক বিষয়ে মিল আছে বলে বোধ হয় এরকম হয়েছিল। কিন্তু এই মৌনভাবের আংশিক কারণ বোধ হয় এই যে, ভারতে নামমাত্র শাসক শক্তি তখনও ছিল মুসলিম এবং কয়েকজন মুসলমান নবাব বাংলা দেশ থেকে পর্তুগীজ শক্তি বিদূরিত করে মিশনারী কার্যকলাপে তাদের তীব্র আপত্তি জানালেন, কেন না পর্তুগীজ শক্তির সঙ্গে মিশনারীদের কার্যকলাপের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ ছিল।

ব্যাপারটি মিশনারীদের চোখে ইসলাম হিন্দুধর্ম অপেক্ষা কম ঘৃণ্য ছিল না; তবুও হিন্দুদের কুসংস্কার, তাদের পুতুলপূজা, জাতিভেদ ও অন্যান্য সামাজিক অন্যায়ের তীব্র সমালোচনা করা হত। এই অধঃপতনের যুগে মিশনারীদের পক্ষে দরিদ্র ও সমাজে উপেক্ষিত জাতিদের এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের মিথ্যা ও আনুষ্ঠানিক কঠোরতায় নিগৃহীতা নারীজাতিকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল। মিশনারীদের সমালোচনার মধ্যে অনেক সত্য ছিল; এবং বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিরা এই অধঃপতন চ্যালেঞ্জ করলে হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে উদ্ভূত সমাজ সংস্কারকরা সহজেই তা স্বীকার করতেন। একজন খৃষ্টানের পক্ষে বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে বাস্তব বস্তুবাদী বর্ণনা করা সহজ ছিল, কারণ নিজের দোষ খোঁজা অপেক্ষা অপরের দোষ খুঁজে বের করা সব সময় সহজ।

যাই হোক, এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে মিশনারীদের দৃষ্টিভঙ্গী যতখানি বাস্তব বলে তাঁরা দাবী করতেন তা থেকে কম বাস্তব ছিল। ঘৃণ্য জাতির লোকদের আত্মার মুক্তির আকাঙ্খায় দ্বারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়েছিল, এর ফলে তারা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত এবং খৃষ্টান ধর্ম ও ইউরোপীয় সভ্যতাকে আদর্শ বলে মনে করত। এর দ্বারা এই সমস্ত মিশনারী হিন্দু সভ্যতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করতে না পারলেও তারা অন্তত স্বদেশ অপেক্ষা এখানে আরও উন্নত ও খাঁটি খৃষ্টানী জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগ চলছিল। লোভ ও মুনাফার সামাজিক অনুমোদনের মধ্য দিয়ে এবং এক ধরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে অধিক মূল্য নির্ধারণের দ্বারা মানুষের জীবনে যে নিষ্ঠুরতা ও নোংরামি জমা হয়েছিল তা রাজনৈতিক পরাধীনতার পর শুদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ হিন্দুধর্ম অপেক্ষা কার্যত কম খৃষ্টান আদর্শবিরোধী ছিল না। যে চিন্তাধারা উপনিষদ, অর্থ ও কামশাস্ত্র রচনা করেছিল, তা এই শুষ্ক আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক ছিল এবং এমন কি পরবর্তীকালে শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য ও কবীরের নামে যে ধর্ম সংস্কার হয়েছিল তারও স্পষ্ট বিরোধী ছিল।

যাই হোক, খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধ প্রচারের ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে

ইংরেজ শাসন বাংলা দেশে এসেছিল শান্তি সংস্থাপকরূপে এবং খৃষ্টধর্ম ছিল সেই নতুন শাসকদের ধর্ম। সমাজের উপান্তবর্তী শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে সমাজের উপান্তে রাখা ছিল তারা ক্রমনিমজ্জমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে, এই ধারণা থেকে এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে খৃষ্টধর্ম উন্নয়নের বাহন এবং ইউরোপীয় জীবনযাত্রা পদ্ধতি গ্রহণ অগ্রগতির চাবিকাঠি। ধর্মান্তরকরণের ভার মিশনারীদের উপর ছিল, এবং শাসকগণ অনেকটা দূরে ছিল অথবা স্বেচ্ছাকৃত ভাবে নিরপেক্ষ ছিল।

কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে ইহা পূর্বতন মুসলিম শাসকদের মনোভাবের তীব্র বিরোধী ছিল। কেন না, সে সময় বলপূর্বক অথবা ধর্মনিরপেক্ষ নানারকম প্রলোভন দিয়ে ধর্মান্তর করা হত, এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও মিশনারীরা পরস্পর এক হয়ে গেছলো।

এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র "অবনত" শ্রেণীগুলোর মধ্যে এই খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল, অপরপক্ষে অধিকতর উচ্চশ্রেণীগুলো মিশনারীদের কার্যকলাপে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি। তবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) অথবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) খৃষ্টধর্ম গ্রহণ একটা ব্যতিক্রম মাত্র এবং এরূপ ঘটনা আর বেশী না ঘটায় বাংলার শিক্ষিত নেতৃসমাজের ওপর ধর্ম হিসাবে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব খুব অল্পই ছিল, ইহা প্রমাণিত হয়।

পূর্বের মতই খৃষ্টধর্মে নবদীক্ষিতরা হিন্দুধর্মের ত্রুটিগুলোর অত্যন্ত প্রবলভাবে নিন্দা করেন। কিন্তু তথাপি সমাজের একটা বৃহত্তম অংশ ছিল, যারা মনে করতেন যে হিন্দুধর্ম একটা অধঃপতিত ও কুসংস্কারের পঙ্কিল আবর্তে পরিণত হয়নি। ভবানীচরণ ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা প্রাচীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলো সম্পর্কে পুনরায় আগ্রহ সৃষ্টি করে হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা জনসাধারণকে প্রবল জড়তা থেকে উদ্ধার করার জন্য শ্লেষাত্মক রচনা দ্বারা জনমত গঠন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টাগুলো অনেকটা ব্যক্তিগত অথবা বেসরকারী পর্যায়ের ব্যাপার ছিল, যদিও ইহা আভ্যন্তরীণ সংস্কার এবং ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় সভ্যতার কতকগুলো বিষয় গ্রহণ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

লক্ষণীয় বিষয় যে, এই ব্যাপারে প্রথম যৌন প্রচেষ্টার নেতৃত্ব করেছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর শৈশবের শিক্ষাজীবনে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ গুণগুলির দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় একাধারে সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় একজন শ্রেষ্ঠপণ্ডিত ছিলেন। বস্তুত গোঁড়া হিন্দুসমাজে তাঁকে একজন বড় মৌলবী বলে অভিহিত করা হত। মেময়ার্স অফ মাই লাইফ এণ্ড টাইমস, বিপিনচন্দ্র পাল ১৯৩২, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭। তিনি ইংরাজী সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। একক জীবনে এরূপ সমন্বয় তখন দুর্লভ ছিল, তাকে সর্ববিষয়ে 'আধুনিক' বলে গণ্য করা যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় আসেন এবং খৃষ্টান মিশনারীদের রচনার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের সমাজের দোষগুলোর বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছিলেন, যদিও এর ফলে তাঁকে বহু তিক্ত

আগেই বলেছি যে, রাজা রামমোহন ইসলাম ও ইউরোপীয় চিন্তাধারায় প্রবল ভাবে প্রভাবিত ছিলেন, তিনি হিন্দুধর্মের এক নতুন ভাষ্য রচনা করলেন যা যে ধর্মের আক্রমণ থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন তা থেকে আদৌ নিকৃষ্ট ছিল না। হিন্দুধর্মকে বর্জন করে নয়, একমাত্র হিন্দুধর্মের মাধ্যমেই হিন্দুদিগকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল। এই বিষয়ে রামমোহনই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজের ভিতর থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নতুন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠায় যে মূল্যবোধ প্রয়োগ করেছিলেন এবং যার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তা হচ্ছে ইসলামের আপোষহীন একেশ্বরবাদ এবং আধুনিক ইউরোপের গর্বিত যুক্তিবাদ। রামমোহন এই ভাবে বীজ বপন ও সেটিকে একটি ক্ষুদ্র সংস্থারূপে লালন করলেও তাঁর উত্তরাধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৮-১৯০৫) যতদিন সে আন্দোলনকে ভারতীয় কৃষ্টির পুনর্জাগরণের জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে না পেরেছিলেন ততদিন সেই অঙ্কুর মহীরুহে পরিণত হতে পারেনি। রামমোহনের মত দেবেন্দ্রনাথও ইসলামীয় কৃষ্টির দ্বারা প্রবল ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। (আত্মজীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০১: পৃঃ ১২৭-১৪৬) কিন্তু রামমোহন আরবীয় সূত্র থেকে একেশ্বরবাদের আদর্শ পেয়েছিলেন, আর দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন সুফীসন্ত ও মরমী কবিগণের কাছ থেকে। এতে তাঁর উপনিষদের ধর্মতত্ত্ব রুক্ষতার সঙ্গে প্রেম ও ভক্তি সিঞ্চিত হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, কেমন করে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টা তার মর্যাদাকে আঘাত করেছিল এবং কেমন করে তিনি সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। (আত্মজীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৮-৯) এখানে বলা দরকার যে, বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ গোঁড়া হিন্দু সমাজের কয়েকজন নেতা ১৮৩০ সালে ধর্মসভা নামে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৫৯) স্থাপন করলেন, পত্রিকা প্রগতিশীল মতবাদের মুখপত্র হয়ে উঠলো। উপরোক্ত ঘটনার পর আমরা জানতে পারি, উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে তিরোহিত হয় তজ্জন্য ধর্মসভার সদস্যরা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন।

বাংলার নৈতিক ও চিন্তাজগতের পুনর্গঠনে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই পত্রিকাটি বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করতো, খৃষ্টান মিশনারীদের অভিযোগ সমূহের জবাব দিত, এবং আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করলেও তা (পত্রিকা) জনগণকে তাদের সভ্যতা সম্পর্কে গর্ববোধ করতে শিখিয়েছিল এবং একটা সুতৃপ্ত গর্ববোধের দ্বারা পশ্চিমের যা কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান তা গ্রহণে উন্মুখ করে তুলেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষ প্রভাব

লক্ষণীয় বিষয় যে, ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম সংস্কারের ফলে খৃষ্টান

কতকগুলো আন্দোলন দেখা গেল যার লক্ষ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহ প্রকাশ, (এগনষ্টিসিজম, এথিজম) অর্থাৎ সংস্কারমূলক কাজগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ করার ঝোঁক দেখা গেল। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

ডেভিড হেয়ার নামে একজন ইংরেজ ঘড়িওয়ালা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপন করতে সক্ষম হন। এই ব্যাপারে বৈদ্যনাথ মুখার্জির মত হিন্দু সমাজের কয়েক জন নেতার সাহায্য পেয়েছিলেন। এই স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হেনরী এল ভি ডিরোজিও (১৮০৯—১৮৩১) নামে এক জন তরুণ শিক্ষক কিছুকালের জন্য বাঙালী ছাত্রদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ডিরোজিওর কার্যকাল অল্পকালস্থায়ী ছিল, নাস্তিক মনোভাবের জন্য তিনি কলেজ থেকে বিতাড়িত হন, তথাপি তিনি স্বাধীনচিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রতি ইয়ংবেঙ্গলের মনকে আকৃষ্ট করাতে সক্ষম হন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা দেশের বহু ভবিষ্যৎ নেতা, যথা প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—১৮৮৩) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩), রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—১৮৮৫) ডিরোজিও সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থেকে অথবা কলেজ স্কোয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলের ধর্মনিরপেক্ষ আবহাওয়া থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন, এই কলেজ স্কোয়ারেই কলকাতা সহরের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত।

এক দিকে যেমন ব্রাহ্মসমাজের ধর্মসংস্কারের সমান্তরাল রেখায় ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি ও মানবতার আন্দোলন চলছিল অন্যদিকে তেমনি গোঁড়া হিন্দুরা তাদের প্রাচীন ভাবাদর্শ পুনরুজ্জীবিত করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী আন্দোলনের ফলে বাংলার জীবন ও সংস্কৃতিতে এক আগ্রহ উদ্দীপক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তরুণ বিপ্লবীরা ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক সময় তার আস্বাদ গ্রহণের জন্য নিষিদ্ধ সরাবের মত অনেক মজার মজার বীরত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলত। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখে গেছেন যে, যুবকেরা হিন্দু গোঁড়ামির মূলে আঘাত দেবার জন্যে দল বেঁধে নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করত। সাধারণতঃ মুসলমানের তৈরী রুটি বিস্কুট খেয়ে এই বিপ্লব সাধন করা হত, এর অর্থ মুসলমানের হাতে জল খাওয়া হল, কারণ রুটি বিস্কুট বানাতে জলের প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও মুসলমান অথবা ইউরোপীয় হোটেলে গিয়ে হিন্দু যুবকেরা গরুর মাংস খেয়ে আসত। (রামতনু লাহিড়ী সার মোপার লেথব্রিজ ১৯১৩, পৃঃ ৮৩) রাজনারায়ণ বসুও মাংস ভোজন এবং সুরা সেবনে তার সময়ের যুবকদের অতি উৎসাহের কথা লিখে গেছেন। আরও জানা যায়, হিন্দু যুবকেরা যখন কুলদেবতার মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে বাধ্য হত আর তারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের পরিবর্তে হোমারের ইলিয়াডের ইংরাজী অনুবাদ আবৃত্তি করত।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে সংবাদ প্রভাকরে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়, তা থেকে একটি দুর্লভ সংবাদ পাওয়া যাবে।

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সংবাদপ্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু।—কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাট আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনান্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সান্নিধানে উপনীত হইয়া ভাবভের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের পুত্রটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্য। যিনি তাঁহাকে ঐ বালক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মর্ণিং ম্যাডম ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিলায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন আহা এমন স্থানে রাগ প্রকাশ করা প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ বালকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কুকর্ম্ম করে তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি একঘরে হইয়াছি ধর্ম্মসভায় যাইতে পারি না এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে কেন ছেলেদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন ছাবলোকের পরকাল টেনে করিতেছেন—অতএব আমাদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য। (সংবাদপ্রভাকর, ১৪ই মে ১৮৩১।২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, পৃষ্ঠা ১৭১-৭২)

[ক্রমশঃ।

ঋতুরঙ্গে ঃ জিজ্ঞাসা

কৃতী সোম

এখনো হিমানী ঝরে, খুশিমত, আর
তুলতুলে বাদামী রোদ্দুর,
ভরন্ত মাঠের বুকে অনর্গল কাঁপে
ফসলের মায়াময় সুর।

ঋতুরঙ্গে আলো দিন, বৃন্তরেখা মন
আকাঙ্ক্ষারা স্বর্ণশস্যকণা,
হৈমন্তী দিনের মত ঝরবে কি আজ
[illegible] তোমার [illegible] ?

ছোটদের আসর

আট

লাল আগুন

বিদ্যাশ্রমের আকাশে যে দুর্যোগের কালো মেঘ জমা হয়েছিল তা কেটে গেল। সেই দিন মিটিং-এর পর মিহির ডাক্তার তার ডেরা তুলল এই কলোনী থেকে। সেই সঙ্গে দু'-চারজন তার অন্ধ ভক্তও। তবে কোথায় চলে গেল তারা বলল না কাউকে। অনেকে ভাবল কলকাতায় ফিরে গেছে। যেখানেই থাক তাদের কথা আর ভাবতে চায় না কেউ।

কমলেশ এখন এ কলোনীর ক্ষুদে নায়ক। বাইরে থেকে লোক এলে তাকে দেখতে চায়। বিদ্যাশ্রমের ছেলেরা সব সময় তার সঙ্গে পরামর্শ করে। কমলেশ নিজে কিন্তু এসবে লজ্জা পায়। ছেলেদের বলে, তোরা আমার কাছে মত চাইছিস কেন? শঙ্করদার কাছে যা।

ওরা বলে, শঙ্করদার কাছে তো যাবই, তবে তার আগে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া ভালো। কি ভাবে শঙ্করদাকে বলা উচিত তুমিই ঠিক বলে দিতে পারবে।

কমলেশের খাতির বেড়ে যাওয়ায়, সবচেয়ে বেশী খুসি হয়েছে প্রশান্ত আর রেণুকা। তাদের আনন্দের আর সীমা নেই। রেণুকা বলে, আমি বাড়িয়ে বলছি না কমল, ইদানিং শঙ্করদার ব্যথাভরা মুখ দেখলে সত্যিই বড় কষ্ট হত, মনে হত নিজের হাতে তৈরী এই কলোনী যে ছেড়ে চলে যেতে হবে, তা তিনি মনে মনে স্থিরই করে ফেলেছিলেন। আমি তো দেখেছি, মণিকাদিরা তাকে কত সান্ত্বনা দিত, উনি শুধু হাসতেন, বড় করুণ হাসি, বলতেন, তোমরা আমাকে কি মনে কর, একেবারে ছেলেমানুষ কিছু বুঝতে পারি নি। মিহির যে এ রকম একটা কাণ্ড করে বসবে তা বুঝতে পারি নি। তবু কাজ করতে হবে, এখানে না হয় অন্য কোথাও গিয়ে লাগতে হবে। তোমাদের সঙ্গে গেলে ভালো, না পাই একাই কাজ করবো।

রেণুকার কথা শুনে প্রশান্তর চোখে জল এসে পড়েছিল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলে, এখন শঙ্করদাকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। ঠিক আগের মত সেই সদাহাস্যময় মানুষ। কী মন দিয়ে কাজ করছেন। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে, ওঁর সঙ্গে তোর কি কথা হয় রে কমল?

কমলেশ দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই যেন বলে যায়। আশ্চর্য্য লোক শঙ্করদা, অনেকেই শুধু তার বাইরেটা দেখেছে, ভেতরটা দেখবার সুযোগ পায়নি। সেদিন মিটিং-এর পর সবাই যখন আমাকে নিয়ে হৈ-হৈ করছে, একসময় সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে আমি পালিয়ে যাই, শঙ্করদার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে কোথাও তাকে পাই না। শেষে দেখি, লাইব্রেরীতে একলা বসে খুব মন দিয়ে বই পড়ছেন। গীতা। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, প্রণাম করলাম। শঙ্করদা সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

কমলেশ চোখের জল সামলাবার জন্যে কিছুক্ষণ থেমে যায়। নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলে, কী আন্তরিক আশীর্ব্বাদ! আমার মন-প্রাণ ভরে গেল। বললেন, চেয়ারে বস। বসলাম।

একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে বললেন, আজকের মিটিং-এ বক্তৃতা করে তুমি এখানকার ছাত্রদের মান রক্ষা করেছো, শিক্ষকদের মর্য্যাদা বাড়িয়েছো। তবে কয়েকটি কথা সব সময় স্মরণ রেখো। সত্যের পথে চলবে। যে কাজই কর, মন-প্রাণ দিয়ে করবে। লোকের কাছ থেকে বাহবা পেলেও ভেবো না, কাজ তুমি করছো। মনে রেখ তুমি উপলক্ষ্য মাত্র। ঠাকুর নিজেই কাজ করেন, তোমাকে সামনে রেখে। এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁর কৃপা পাওয়ায়। যখন যেখানে যে অবস্থায় থাক। স্বামীজির কথা মনে গেঁথে রাখবে—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

কমলেশ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে বলে, আমি সত্যিই তোমাদের বোঝাতে পারবো না, শঙ্করদার এই ক'টি কথা আমাকে

দিন আগত ঐ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

কতখানি বদলে দিয়েছে। আজকাল ঠাকুরের কাছে শুধু এই প্রার্থনাই করি, শঙ্করদার উপদেশমত যেন চলতে পারি, যেন মানুষের মত মানুষ হই। দেশ আর দশের কাজে যেন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিই।

শুধু কমলেশ নয়, বিদ্যাশ্রমের সকলেই আজ ঐ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে। হাসিমুখে তারা কত বেশী কাজ করছে। যারা এতদিন বাধা দিয়েছে তারা যে আর কেউ নেই। সে-সব কাজ এতদিন শঙ্করদা চালু করতে পারেন নি। এখন তাই সুরু হয়েছে। কাছাকাছি গ্রামগুলোর উন্নতি কি ভাবে করা সম্ভব তা নিয়ে প্রায়ই আলোচনা-সভা বসে। গাঁয়ের মাতব্বররা আসে, তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানায়, সেই মত কার্য্যপ্রণালী তৈরী হয়।

ছুটির দিনে সদাশঙ্কর ছেলেদের দল নিয়ে বেরিয়ে যায়। পরাণপুরের কোন পুকুরে বুঝি পানা পড়েছে, সাফ করা হয়নি। আশ্রম থেকে তিনটে গাঁ পরে পরাণপুর—প্রায় সাত মাইলের দূরত্ব। ছেলের দল এগিয়ে চলেছে সেখানকার সংস্কার করতে।

পাশের গাঁয়ে এক সাবেকী জমিদারবাড়ী। সেখানে আজ ব্রাহ্মণ ভোজন। জমিদারের মা মারা গেছেন, তারই জন্য ধুমধাম করে স্বর্গে যাবার ব্যবস্থা। জমিদারবাড়ীর সকলেই থাকেন কলকাতায়, সেখানে ব্যবসা আছে।

শঙ্করদা যেতে যেতে বলেন, উঃ, কি বিশ্রী পয়সা নষ্ট।

কমলেশ সায় দিয়ে বলে, সত্যিই তাই, কি দরকার ব্রাহ্মণ ভোজনের, তার চাইতে, গরীব দুঃখীদের খাওয়ালে ভালো হয়।

—সেটাও পয়সা নষ্ট। একদিন ভালো-মন্দ খাইয়ে কি লাভ। তার চেয়ে যে টাকা এই ভোজনপর্ব্বের মধ্যে দিয়ে অপচয় হচ্ছে তা দিয়ে যদি গাঁয়ে একটা টিউবওয়েল বসানো হয় তাতে সাধারণের কত সুবিধা, তিন পুরুষ ধরে সেখানকার জল খেতে পারে। এরা টাকা খরচ করে সাধারণের ভালোর দিকটা ভেবেও দেখে না।

ছেলের দল এসে পড়ে পরাণপুর। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সহজেই চোখে পড়ে এখানকার সরল গতিময় জীবন।

গাঁয়ের মাতব্বররা এসে হাজির হয় শঙ্করদার কাছে, সবাই তাকে ভালোবাসে।

শঙ্করদা হেসে জিজ্ঞেস করে, কি দীনু খুড়ো, তোমাদের উত্তর দিকের পুকুরে পানা পড়েছে অথচ সেটা সাফ করনি, এই থেকেই যে রোগ জন্মায়।

বৃদ্ধ দীননাথ লজ্জিত হয়ে উত্তর দেয়, কি করব বল, রোজই তো ছোঁড়াগুলোকে বলি ওটাকে সাফ করে ফেলতে, করি করি করেও ওরা করে না।

সবাই পুকুরের দিকে এগিয়ে চলে, মাঝখানে পথ ভীষণ খারাপ। কাঁচা রাস্তা, জলে আর গরুর গাড়ীর চাকায় ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে রয়েছে, অথচ এইটাই গাঁয়ের প্রধান রাস্তা।

—এ পথটা সারান হয় না কেন? গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ সকলেরই তো অসুবিধে হয়।

—সে তো জানিই, অথচ ছোঁড়াগুলো—

দীননাথ চুপ করে যায়।

শঙ্করদা' ছেলেদের বলেন, আয় এক দল এ রাস্তার কাজে হাত দে আর এক দল পুকুরের পানাটা সাফ কর।

কথা শেষ করে, জামা খুলে কাজে লেগে যান শঙ্করদা, সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দলও হাত লাগায়। বেশীক্ষণ কাজ করতে হয় না, গাঁয়ের লোকেরা ছুটে আসে, সবাই কাজ করে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ভাঙ্গা রাস্তা হয় কঠিন, সুন্দর পানাপুকুর হয় পবিত্র নির্মল।

কাজ সেরে তারা ফেরে, কমলেশ প্রশ্ন না করে পারে না।

—শঙ্করদা, এত অল্প সময়ে যদি কাজগুলো করা যায় তবে না করে এত অসুবিধার মধ্যে থাকে কেন?

—সেইখানেই ওদের কুঁড়েমী। চলছে চলুক ভাব নিয়ে ওরা বেঁচে থাকতে চায়। দেশের কাজ করতে হলে আগে এইগুলো দূর করা দরকার। বেশী নয় শুধু একটু প্রেরণা দেওয়া। বক্তৃতা দিয়ে কাগজে নাম ছাপিয়ে দেশের সেবা হয় না। এদের মাঝখানে থেকে একসঙ্গে কাজ করে শিক্ষা দিতে হবে।

কথা বলতে বলতে তারা আশ্রমের দিকে এগিয়ে চলে। ছেলেদের চোখ-মুখ আনন্দে ভরে ওঠে। সত্যিই তারা করছে দেশের সেবা, মায়ের সেবা।

পুলু এখন এই বিদ্যাশ্রমের ছাত্র। আর পাঁচটা ছেলের মত ক্লাশে বসে পড়াশুনো করে, আশ্রমের জন্যে কাজ করে। কমলেশের সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের কাজে ও এগিয়ে যায়।

পুলুকে এ স্কুলে এনে ভর্ত্তি করেন তাঁর দাদু স্বয়ং। এ-ও সেই মিটিং-এর পরের দিনের ঘটনা। এত দিন সদাশঙ্করের সঙ্গে তার মোটেই প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। সেদিন কিন্তু নিজেই নাতির হাত ধরে এসে দাঁড়ালেন, সদাশঙ্করের টেবিলের সামনে।

তাঁকে দেখে সদাশঙ্কর বিস্মিত না হয়ে পারেনি। সম্মান দেখিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, আপনি?

বিনা ভূমিকায় মৃদু হেসে বৃদ্ধ বলেন, আমার নাতিটিকে তোমার হাতে দিতে এলাম।

—এ ত বড় আনন্দের কথা।

বুড়ো পুলুর কাঁধে হাত রেখে স্নেহভরা গলায় বলেন, এ আমার অন্ধের যষ্টি, একমাত্র বংশধর। এতদিন ভেবেছিলাম চারদিকে বেড়া দিয়ে চারাগাছকে বাঁচিয়ে রাখব কিন্তু দেখলাম ও শুকিয়ে যাচ্ছে, তাই দিয়ে গেলাম তোমার এই ফুল বাগানে। জানি তুমি যত্ন নেবে।

সদাশঙ্কর পুলুকে নিজের কাছে টেনে নেয়, আমার যথাসাধ্য আমি করব।

—দেখ ও যেন কমলেশের মত হতে পারে।

আর কোন কথা না বলে পুলুকে সদাশঙ্করের জিম্মায় রেখে বুড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে।

—যে জমি নিয়ে তোমার সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল মানে যেখানে চিনির কল বসবার কথা—যদি তোমার দরকার থাকে স্কুলের জন্যে নিতে পার।

সদাশঙ্কর সাগ্রহে বলে, তাহলে আমাদের বড় উপকার হয়। বয়স্ক গ্রামবাসীদের জন্যে আমরা শিক্ষাকেন্দ্র সুরু করতে চাই। ঐ জায়গাটার কথা আমি মনে মনে ভেবেও রেখেছিলাম, মাঝখানে সব গোলমাল হয়ে গেল, তাই আর করা হয়নি।

—বেশ তো, ঐ জমিতেই কর।

সদাশঙ্কর কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করে, দাম কত দিতে হবে?

যুক্ত প্ল্যান হাসে, সে পরে বলব। কাজ তো এখন কর।

সেই বিরাট জমিতে বড় বড় ছুটো টিনের চালা উঠেছে, কাছাকাছি পাঁচটা গ্রামের থেকে লোক আসে এখানে পড়বার জন্যে। এমন কি ষাট বছরের বুড়োরাও পেছিয়ে নেই, তারাও আসে, শিক্ষার মধ্যে দিয়ে নতুন জীবনের আস্বাদ পেতে চায়। এঁদের পড়াবার জন্যে নতুন শিক্ষকও এসেছে যারা বয়স্কদের শিক্ষা দিতে পারে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ।

এখানে ক্লাশ বসে বেশীর ভাগই রাত্রে, সারাদিনের কাজ-কর্ম সেরে বাড়ীর কর্তারা আসে লেখাপড়া করতে। কি তাদের উৎসাহ!

কমলেশ লক্ষ্য করে দেখেছে শিক্ষাকেন্দ্রের ছুটির পর রাত্রিবেলা যখন বয়স্ক ছাত্ররা এখান থেকে বেরিয়ে যায় সদাশঙ্কর দূর থেকে তাদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্বপ্নভরা সে চোখের দৃষ্টি। কমলেশ কাছে গিয়ে দাঁড়ালে শঙ্করদা তার কাঁধের ওপরে নিঃশব্দে হাত রেখে তেমনি দূরের দিকে তাকিয়ে গাঢ় স্বরে আবৃত্তি করে—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা,
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

যেদিন এ দেশে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই পাবে জ্ঞানের আলো, দেখবে, সব দুঃখ কষ্ট কেটে যাবে। আমরা মাতৃভূমিকে বুঝতে পারব, প্রকৃত সন্তানমন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হব।

কমলেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, সারাজীবন সে শঙ্করদার আদর্শকে অনুসরণ করে যাবে।

১লা বৈশাখ। পাঁচ বছর আগে এই দিনে এই কলোনীর পত্তন করেছিল সদাশঙ্কর। সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে এই ক'বছর কেটে গেছে। উন্নতিও হয়েছে অনেক; বিশেষ করে মিহির ডাক্তারের দলেরা হেরে গিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় আবার শান্তি ফিরে এসেছে সকলের মনে, কাজের উদ্যম আরো বেশী, তাই ঘটা করে এ বছর পালন করা হচ্ছে ১লা বৈশাখের পুণ্যতিথি!

ছাত্রদের অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে এ উৎসবে যোগ দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে আসছে কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তি। সকলকে দেখানো হবে, এই পাঁচ বছরে কি কাজ করেছে। সদাশঙ্করের বিদ্যাশ্রম। ফাঁকা মাঠের ওপর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে সাজানো থাকবে ছেলেমেয়েদের হাতে-আঁকা ছবি। সেলাই করা এমব্রয়ডারি, আবার কলকারখানার মডেল। ছাত্ররা অভিনয় করবে ঐতিহাসিক ছোট একটি নাটক। তারও রিহার্সাল চলছে রীতিমত। কমলেশ ও প্রশান্ত দুজনেই অভিনয় করছে এ নাটকে। এমন কি, পুলুও বাদ যায়নি। সে-ও বুঝি একবার মঞ্চে এসে দাঁড়াবে দুটো কথা বলার জন্যে।

আজ উৎসব। সারাদিন সকলেই ব্যস্ত—আশ্রমকে সাজানো হয়েছে খুব সুন্দর করে। সকাল থেকেই সুরু হয়েছে বস্ত্র বিতরণের পালা। দূর গাঁ থেকে সকলে এসেছে, তারা আজ উৎসবে যোগ দিয়ে, অভিনয় দেখে কাল বাড়ী ফিরবে।

কমলেশের বাবা-মাও এসেছেন, নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে। ঘুরে ঘুরে সমস্ত আশ্রমটা দেখে খুশি হয়ে বলেন, এ তোরা কি কাণ্ড করেছিস রে কমল? সেই ছোট আশ্রম আজ কত বড় হয়েছে। সত্যিই তোর শঙ্করদার বাহাদুরী আছে।

কমলেশরা সগর্বে বলে, শঙ্করদার আরও কত রকম প্ল্যান আছে, এখনও সে সব হয়ে ওঠেনি।—

এখনও বুঝি মেয়েদের হোষ্টেল হয়নি?

রেণুকা উত্তর দেয়, না। তাহ'লে বাইরে থেকে মেয়ে এখানে নেওয়া হয় না।

কমলেশের মা হাসতে হাসতে বলেন, কমলের যে দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে, শুনছি বক্তৃতা করছে, কাজ করছে, বাড়ীতে তো কাটি ভেঙে কুটো করলে না।

রেণুকা তাড়াতাড়ি বলে শুধু তাই, আমাদের কি দিদি বলে মানে, কত গম্ভীর গম্ভীর উপদেশ দেয়। আজ দেখবেন কি রকম থিয়েটার করবে।

—সে কি রে, তুই থিয়েটারও ক'চ্ছিস?

কমলেশ হেসে বলে, তুমি সব মাটি করে দিলে রেণুকাদি, কোথায় ভাব'ছলাম বাবা-মাকে একটা সারপ্রাইজ দেবো!

সত্যিই কিন্তু সারপ্রাইজ দেওয়া গেল না। বিকেল থেকে লোক জমতে সুরু করে, থিয়েটারমঞ্চের সামনে। নিমন্ত্রিতদের দল আর চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা। অভিনয়ের আগে বক্তৃতা করল সদাশঙ্কর, গত পাঁচ বছরের বিদ্যাশ্রমের অগ্রগতির বিবরণী পেশ করল অভ্যাগতদের সামনে। তারপর কলোনীর বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে এক বৃদ্ধের ভাষণ দেবার কথা ছিল কিন্তু তার বলা হল না। সবে মাত্র মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় চিৎকার উঠল, আগুন, আগুন! কয়েকজন ছুটে এসে বলে, সর্বনাশ হয়েছে, দুলালের ঘরে আগুন লেগেছে। উত্তেজনায় তাদের গলা কাঁপছে।

সকলে চমকে ওঠে, সে কি?

শীগ্‌গির চলুন। এখুনি আগুন থামাতে না পারলে সারা কলোনী পুড়ে যাবে।

অনুষ্ঠানের সেইখানেই শেষ। সদাশঙ্করের সঙ্গে সকলে ছুটে যায় আগুন নেবাবার জন্যে।

কি বিচিত্র দৃশ্য! আগুনের লেলিহান শিখা, লালের অদ্ভুত খেলা! শুধু দুলালদের ঘর নয়, আরো দু-চারটে বাড়ীতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। চোখের সামনে এ দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা অনেকেরই নেই। প্রথমটা কমলেশের মত অনেকেই নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে আগুনের প্রচণ্ডতার দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই যেন কমলেশ তার সম্বিত ফিরে পায়। অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিলে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে আগুন নেবাবার। সেই বিশাল অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে থেকে তারা আস্তে আস্তে বার করে আনছে জিনিষপত্রগুলো। নির্ভয়ে, নিঃশঙ্কায় বালতির পর বালতি জল এনে ছুঁড়ছে—বিরামহীন কাজ।

আগুন ক্রমশঃ নিবে আসে, সব জিনিষই প্রায় বার করে আনা হয়েছে কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না, উত্তর দিকের আধপোড়া ঘর থেকে টলতে টলতে ছায়ামূর্ত্তির মত কে যেন বেরিয়ে আসে, তার কোলে একটি শিশুপুত্র। এই হৈ-হৈ হাঙ্গামার মধ্যে সেই শিশুর কান্না প্রথমে কারুর কানে যায়নি, সদাশঙ্কররা ছুটে গিয়ে দেখে, ভয় নেই সে বেঁচে আছে। কিন্তু যে লোকটি বাচ্চাটিকে বার করে এনেছিল, সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বসে পড়ে মাটির ওপরে। সকলে এখন তার দিকে তাকিয়ে দেখে, চেনাই যায় না,

আগুনে হাত-মুখ বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে, তার শুশ্রূষার জন্য তাড়াতাড়ি কোলে করে নিয়ে আসা হ'ল, ডিসপেন্সারীর মধ্যে।

আলোয় সবাই তার চেহারা দেখে চমকে উঠল, এ আর কেউ নয়, পুলুর দাদু। সেই বক্ বুড়ো। সদাশঙ্কর বিহ্বল হয়ে পড়ে। আপনি এর মধ্যে গেলেন কেন? বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে ওঠে, অন্ততঃ একজনকেও তো বাঁচাতে পেরেছি। আমার জীবনের আর কি দাম, আজ না হয় কাল একদিন তো যেতেই হ'ত, যাকে রক্ষা করেছি সে হয়ত তোমাদের অনেক কাজে লাগবে।

সকলের চোখে জল ভরে আসে। কিন্তু বৃদ্ধের চোখে কোন জল নেই। উজ্জ্বল আনন্দময় হাসিতে ভরা মুখ। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার বাড়ীর তিন তলার বন্ধ ঘরটা খুলো। আমার উইল সেখানে রেখে গেছি।

পুলুর দাদু মারা গেলেন। যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল তা শেষ হ'ল বিষাদের মধ্যে। সৎকার সেরে পুলুকে নিয়ে সদাশঙ্কর গেল সেই যক্ষপুরীর মধ্যে, খুলল সেই তিন তলার নিষিদ্ধ ঘর। ঘর বড় নয় কিন্তু সুন্দর করে সাজানো। চারদিকের দেওয়ালে নেতাদের বড় বড় ছবি। মাঝখানের টেবিলে, দেরাজের মধ্যে রয়েছে বুড়োর শেষ উইল। আর তারই সঙ্গে লেখা একখানা চিঠি।

"স্নেহের পুলু,

তুমি যখন এ চিঠি পড়বে, তখন আমি থাকব না। আমার ঘরে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ এ তোমার বাবার ঘর। যে তার দেশ ও দশের জন্যে নিজের জীবনটা উৎসর্গ করেছে। পাছে তুমি ঐ পথেই চলে যাও, সেই ভয়েই এত দিন তোমাকে আগলে রেখেছিলাম, এখন বুঝতে পেরেছি আমার ভুল। এত দিন ধরে যক্ষের মত যে সম্পত্তি আমি জমিয়ে রেখেছিলাম তোমার ভোগের জন্যে তা উইল করে বিলিয়ে দিলাম দেশের লোকের জন্যে। তুলে দিলাম তোমাদের শঙ্করদার হাতে। তোমার বাবার ত্যাগ ও আদর্শের ছাব তুমি তারই মধ্যে দেখতে পাবে। আশীর্ব্বাদ করি মানুষের মত মানুষ হও।

ইতি তোমার দাদু।"

শেষ

কি করে স্পষ্ট ছবি তুলতে হয়

রথীন রায়

ভাল আলোকচিত্র মাত্রই সাধারণতঃ স্পষ্ট হওয়া দরকার কিন্তু কতকগুলি সাধারণ ভুলের ফলে অনেক সুন্দর সুন্দর আলোকচিত্রও অস্পষ্ট হইয়া যায় এবং আলোকচিত্র হিসাবে তখন তাহার আর কোন মূল্য থাকে না। কিন্তু একটু সতর্ক হইলেই এইসব ভুল এড়ানো সম্ভব। আসুন তবে দেখা যাক এইসব ভুলের প্রকৃতি কি এবং এইগুলি কি ভাবে এড়ানো সম্ভব।

(১) ভুল ফোকাস করা—ক্যামেরার লেন্স হইতে বিষয়বস্তুর দূরত্বের উপর লেন্স হইতে ফিল্মের দূরত্ব নির্ভরশীল। একের পরিবর্ত্তনে অপরের পরিবর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহাকেই ফোকাস করা বলা হইয়া থাকে। এই ফোকাস করার পদ্ধতি বিভিন্ন ক্যামেরায় বিভিন্ন প্রকারের। এই ফোকাস করা ঠিক না হইলে ছবি অস্পষ্ট হইতে বাধ্য। সুতরাং প্রথমেই ঠিকমত ফোকাস করা সম্বন্ধে সতর্ক হইতে হইবে। বক্স ক্যামেরাগুলির ফোকাস

রণতঃ অসীম দূরত্বে বাঁধা থাকে। এই ক্যামেরাগুলি সাধারণতঃ ফিটের (৬′) বাইরের যে কোন বিষয়বস্তুর আলোকচিত্র ভাবে তুলতে সক্ষম। অবশ্য খুব নিকট হইতে আলোকচিত্র তে হইলে অতিরিক্ত ক্লোজ-আপ লেন্সের সাহায্য লইতে হইবে।

(২) মন্থর 'শাটার স্পীড' (slow shutter speed) ছবি বার সময় ক্যামেরা নড়া—অল্প আলোয় ছবি তুলতে হইলে 'শাটার স্পীডে' যথা—১/২৫ সেঃ ½ সেঃ ½ সেঃ ১ সেঃ বা আরো সময়ব্যাপী এক্সপোজারে ছবি তুলতে হয়। তখন ক্যামেরা লে ছবি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং এইসব ক্ষেত্রে মেরাটি কোন শক্ত কিছু যথা—টেবিল, চেয়ার বা ক্যামেরার

ছবির তারতম্য

তিন পায়া ষ্ট্যাণ্ড ইত্যাদির উপর দৃঢ়ভাবে বসাইয়া লওয়া দরকার। মোটকথা ক্যামেরা যাহাতে না নড়ে সেই বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।

(৩) শ্লথ 'শাটার স্পীডে' গতিশীল বিষয়বস্তুর ছবি তোলা—গতিশীল বিষয়বস্তুর ছবি সাধারণতঃ দ্রুত 'শাটার স্পীডে' যথা—১/১০০ সেঃ ১/২০০ সেঃ ১/৫০০ সেঃ ইত্যাদিতে তুলিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে শ্লথ 'শাটার স্পীড' ব্যবহার করিলে ছবি অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এই 'শাটার স্পীড, নির্ভর করে (ক) ক্যামেরা হইতে বিষয়বস্তুর দূরত্ব (খ) বিষয়বস্তুর গতিবেগ ও (গ) ক্যামেরা হইতে বিষয়বস্তুর গতির দিক প্রভৃতির উপর। গতিশীল বিষয়বস্তু ক্যামেরার যত নিকটে হইবে 'শাটার স্পীড' তত দ্রুত প্রয়োজন হইবে। গতিবেগ কম বেশীর জন্য 'শাটার স্পীডও' কমবেশী করিতে হইবে। বিষয়বস্তুর গতির দিক যদি ক্যামেরার আড়াআড়ি (Parallel) হয় তবে অপেক্ষাকৃত দ্রুত 'শাটার স্পীড' প্রয়োজন হয়। গতির দিক যদি ক্যামেরাভিমুখী বা ক্যামেরার বিপরীতমুখী হয় বা ক্যামেরা হইতে ৪৫° কোণ করিয়া হয় তবে অপেক্ষাকৃত শ্লথ 'শাটার স্পীডে'ও ছবি তোলা সম্ভব হইবে।

(৪) অপরিষ্কার লেন্স—লেন্সই ফিল্মের গায়ে বিষয়বস্তুর প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। অপরিষ্কার কাচের মধ্য দিয়া যেমন স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না, তেমনি অপরিষ্কার লেন্সের সাহায্যেও স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব নয়। সুতরাং স্পষ্ট ছবি তুলিতে হইলে সর্বদা ক্যামেরার লেন্সটি পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখিলে ছবি অস্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে। এবং ভাল আলোকচিত্র আরো ভাল দেখাইবে।

খালি ম্যাচ

ম্যাজিক ম্যাচ

লুকানো ভর্তি ম্যাচ

যাদুকর এ, সি, সরকার

'ম্যাজিক ম্যাচ' খেলাটা যে কত মজাদার তা বলে বোঝানো যাবে না। যে কোনও জায়গায় এ খেলা দেখিয়ে সুনাম অর্জন করা যায়। এমন কি জাহাজ—বিমানে বসেও বহুবার এই খেলাটা দেখিয়েছি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে।

যাদুকরের হাতে আছে একটি ম্যাচ বক্স। ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি দেখালেন যে বাক্সটা কাঠিতে সম্পূর্ণ ভর্তি। আওয়াজ শুনে দর্শকেরাও নিশ্চিত হলেন।

এইবার যাদুকর তার মন্ত্র পড়লেন—

···ম্যাচ বক্সের ভূতকে ডাক
করতে কাঠি চিচিং ফাঁক
লাগ লাগ লাগ ভেল্কী লাগ
ভানুমতী করবে রাগ···

মন্ত্র পড়ে যাদুকর তাঁর হাতের ম্যাচ তুলে দিলেন দর্শকদের হাতে। তাঁরা খুলে দেখলেন বাক্স ফাঁকা একটি কাঠিও নেই তার মধ্যে!

এর পরে ম্যাচ বক্স আবার তুলে দেয়া হল যাদুকরের হাতে। তিনি মন্ত্র পড়লেন—

···লাগ লাগ লাগ ভেল্কী লাগ
কাঠিতে ম্যাচ ভরে যাক
দেখে সবার লাগুক তাক···

মন্ত্র পড়ে যাদুকর ঝাঁকুনী দিলেন। ম্যাচ বক্সটিতে আওয়াজ হল। সবাই বুঝলেন ম্যাচ বক্সে কাঠি ফিরে এসেছে!

কেমন করে এ খেলা সম্ভব তাই শোন। এ খেলা দেখাতে হলে আগে থেকেই একটি কাঠিভর্তি দেশলাই সেফটি পিন দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হয় কোটের বাঁ দিক্‌কার আস্তিনের ভেতরে সকলের অলক্ষ্যে। এখন বাঁ হাতে খালি ম্যাচ নিয়ে ঝাঁকুনি দিলে লুকনো ম্যাচ বক্সে ঝাঁকুনি লাগবে আর তা বেজে উঠবে। দর্শকেরা ভাববেন বুঝি খালি ম্যাচ বক্সের ভেতরেই কাঠি এসে গেছে যাদুমন্ত্রে।

ক্রীতদাস প্রথা

শ্রীভাগবতদাস বরাট

অতীতের কথা। কিন্তু তা' বলে গত কাল-পরশুর কথা নয়। সুদূর অতীতের অর্থাৎ বৈদিক যুগের তথ্য। মনুষ্য সমাজে দাসত্বপ্রথা সেই সুপ্রাচীন যুগ থেকে চালু হয়ে আসছে।

অধুনা আমাদের মধ্যে অনেকেরই ঘরে চাকর আছে। আবার চাকরাণীও আছে। তারা মাসমাইনার গোলাম। বেতনভোগী কর্মচারীর শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে এই শ্রেণীর গৃহভৃত্য নিযুক্ত হত কি না জানি না। হয়ত বা হত। তবে সেই সময়ে আর এক শ্রেণীর দাসেরও আমরা পরিচয় পাই। তারা ক্রীতদাস।

প্রাচীন যুগের কথা। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি জন্তু জানোয়ারের মত মানুষেরও বেচা-কেনা চলত সে যুগে। মানুষ মানুষকে কিনত আর বেচত! যারা কিনত তারা ঐ কেনা মানুষকে ঘরে নিয়ে গিয়ে কাজ করাত। দাসরূপে তারা গণ্য হত। সেজন্যে এদের নাম ছিল ক্রীতদাস।

পুরাতন পুঁথি, গ্রন্থ, হস্তলিপি, প্রস্তরফলক ইত্যাদি দর্শন ও অধ্যয়নাদির পর ঐতিহাসিকগণ আমাদের কাছে পুরাকালের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও বিচার-ব্যবস্থার একটা সঠিক তথ্য জাহির করেছেন। তাঁদের মতে সে যুগে মনুষ্য সমাজে অন্যান্য প্রথার মত দাসত্ব প্রথারও প্রচলন ছিল। নারদস্মৃতিতেও আমরা পনের প্রকার দাসের রূপ দেখতে পাই। যথা:—

"গৃহজাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ।
অন্নকাল ভৃতস্তদ্বৎ আহিতঃ স্বামিনা চযঃ॥
মক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ যুদ্ধে প্রাপ্তঃ পণে জিতঃ।
তবাহমিত্যুপাগতঃ প্রব্রজ্যাবাসিতঃ কৃতঃ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশা স্মৃতাঃ॥"

দাসত্বপ্রথা অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে যে প্রবর্তিত ছিল সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে।

শ্বেতকায় আর্য্যগণ কৃষ্ণকায় অনার্য্যদের যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী করতেন। তারপর তাদেরকে বন্দী অবস্থায় ঘরে এনে অনেক সময় দাসে পরিণত করতেন।

শূদ্র শব্দের অভিধানিক অর্থ দাস। পুরাকালে শূদ্রদের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে তারা সেবক। সুতরাং স্ব-ইচ্ছায় তারা Florance Nightangle এর মত সেবাধর্মে দীক্ষিত হয়ে অন্যান্য শ্রেষ্ঠবর্ণের ব্যক্তিবর্গের সেবা করত। ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের ব্যক্তিদের কাছে শূদ্ররা আপনা আপনি ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছিল। আর ঐ সমস্ত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গ প্রভু ভৃত্যের নজরে তাদের দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

রামায়ণের পাতায় আমরা দেখতে পাই যে সূর্য্যবংশের রাজা হরিশ্চন্দ্র আপন কর্ম্মবৈগুণ্যে স্বয়ং বিক্রীত হয়ে এক চণ্ডালের দাস হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী শৈব্যা দেবীকেও তিনি এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রয় করেছিলেন। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সুদূর অতীতে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগেও ক্রীতদাসত্বপ্রথা চালু ছিল। নিয়ে যে দলিলখানি প্রকাশ করছি, তা ১১১৫ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে লেখা। দাসত্বপ্রথার বিদ্যমানতার এটি একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। দলিলখানি এইরূপ:—

"ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং
শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত,
সাং চান্দশী, পরগণে বাজরোড়া সুচরিতেষু:—
নিশান সহি
শ্রীকুঞ্জমালা দাসী

শ্রীমতী কুঞ্জমালা ওমর ২৭ সাতাইশ বরিষ, রঙ্গশ্যাম জওজে রামরুদ্র দৈত, সাকিন—পিঙ্গলাকাঠি, পরগণে আজীমপুর। অস্য লিখনং আগে আজী মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোবাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর, সাত বরিষ, রঙ্গ শ্যাম, এহারও অন্নবস্ত্র দিয়া পরিশোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্নবস্ত্র দিয়া পরাবিষ করে এমত না য়াছে। অতএব আপন রাজির কবতে সচ্ছেন্দে আক্কেবহাল তবিয়তে সেইচ্ছাপুর্ব্বক আমি ও আমার কন্যা বহায় আপনার স্থানে মবলগ তিন রূপাইয়া পুরো ওজন দহমাসী চলন সহী দস্তবদস্ত পাইয়া আত্মবিক্রয় লইলাম। আপনে জিমা লওয়া খোরাক পোবাক দিয়া মুদত ৭০ সত্রী বরিষ দাসী অর্থ, কর্ম্ম, দান, বিক্রৌবধিকারী হইয়া করাইতে রহ। জদি এই মুদ্দত মৈর্দ্ধে আচাদ হইতে চাহি তবে ১।০ সোয়া মণ হলদি সিধা দিয়া আচাদ হইব। এই করায়ে আত্মবিক্রয় হইলাম। ইতি। সন ১১১৫ এগার শত পচানবৈ সাল, তারিখ ১৪ চৈদ্দহী মাহে অগ্রহায়ণ।"

এই দলিলপাঠে আমরা তৎকালীন দেশের অবস্থা, রীতিনীতি, ভাষা ও লিখনপ্রণালী ইত্যাদি বিষয়ের সঠিক পরিচয় পেয়ে থাকি। তা' ছাড়া সেকালের মানুষের আর্থিক অবস্থা ও নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধেও আমাদের মনে পরিপুষ্ট জ্ঞান জন্মে।

এই সঙ্গে আর একটি দলিল প্রকাশ করছি। এই দলিলপাঠে জানা যায় যে, কুঞ্জমালার এক ভাসুর ছিল। তার নাম ছিল রামরাম দৈত। কুঞ্জমালার আত্মবিক্রয়ের সময় ওর ভাসুরও জীবিত ছিল এবং তারও এই আত্মবিক্রয়ে সম্মতি ছিল। সেই দলিলখানি নীচে প্রকাশ করলাম।

"শ্রীশ্রীদুর্গা।
শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়ভূষণ, সাকিম চান্দসি, সুচরিতেষু—
শ্রীরামদাস দাস, সাকিম বট্যোঘোড়, পরগণে বাজরোড়া

অস্য লিখনং আগে—
নিশান সহি—
শ্রীরামদাস দাস।

শ্রীমতী কুঞ্জমালা জওজে রামরুদ্র দৈত সাকিম পিঙ্গলাকাটি, পরগণে আজীমপুর এবং ওহার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া,—এই দুইজন সেইচ্ছাপুর্ব্বক আপনার স্থানে আও বিক্রী হইল। এহার দুব দুইজনকে আমী আনিয়া দিলাম। এহার ভাসুর শ্রীরামরাম দৈত ইসাদী করেন। দুই তঙ্কা আমি দিলাম। এহার নাম কওলায় লিখাইয়া দিব। যদি না লিখাইয়া দিতে পারি তবে এইজন্যে কিছু খেসারত আপনার হয়ে তাহার নিসা আমি করিব। ইতি। সন ১১১৫ তেরিখ ১৪ চৈদ্দ অগ্রহায়ণ।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের দণ্ডবিধির পূর্ব্বে দাসত্ব প্রথার প্রচলন আমাদের দেশে ছিল। ইংরাজ রাজত্বের আমলে দণ্ডবিধি আইনের ৩৭০ ধারা অনুসারে এই প্রথা লুপ্ত হয়।

"Whoever imports, exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a slave or excepts, receives or detains against his will, any person as a slave, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine."

এই আইনের কঠোরতায় দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তা' হলেও পৃথিবীর অপরাপর দেশ থেকে ক্রীতদাস প্রথা এখনও বিলুপ্ত হয় নি।

দু'এক বছর পূর্ব্বে ক্রীতদাস নিবারণী সমিতির কাইরো অধিবেশনে মধ্যপ্রাচ্যের ক্রীতদাস প্রথার বিচিত্র তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সমিতির কর্তৃপক্ষগণ জানিয়েছেন যে এখনও আরবের সৈয়দ রাজবংশের আয়ত্তাধীনে ৭৫০,০০০ সহস্রাধিক ক্রীতদাস প্রতিপালিত হচ্ছে। সমিতির বিবরণীতে এ সংবাদও জানা গেছে যে বর্ত্তমানে ক্রীতদাস প্রথাটি বিশেষ ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ। ধনবান মক্কা তীর্থযাত্রীরা যাত্রার পূর্ব্বে গৃহে প্রতিপালিত ভৃত্যদের আরবের ক্রীতদাস বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রী করে চলে যান। ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের সর্ব্ব বৃহৎ কেন্দ্র মক্কার অন্তর্গত সুয়েইগুই।

রাজা সৈয়দের পুরস্কার প্রদানের বৈশিষ্ট্য ছিল। আমরা যেমন আমাদের কোন বন্ধু-বান্ধব, স্নেহাস্পদ কোন ব্যক্তি বা কোন উদ্যোগী পুরুষকে পুরস্কৃত করতে ধন-সম্পদ বা টাকা কড়ি প্রদান করি, রাজা সৈয়দ তা করতেন না। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে ক্রীতদাস উপঢৌকন পাঠাতেন। ক্রীতদাস সমিতির সদস্যদের মতে অত্যধিক দারিদ্র্যতা হেতু মধ্যপ্রাচ্যে ক্রীতদাস প্রথা বলবৎ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে

জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অনিশ্চয়তা হতে রেহাই পাবার জন্যেও স্বেচ্ছায় ক্রীতদাসত্ব গ্রহণ করে। ভারত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে ক্রীতদাস প্রথা এখনও বিদ্যমান।

ক্রীতদাসের ক্রয়-মূল্য সময় বিশেষে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। তবে সাধারণতঃ একটি শিশু কন্যার দাম একটি বলিষ্ঠ ঘোড়া বা কপুষ্ঠ উট অপেক্ষা অনেক কম। অধুনা বিংশ শতাব্দীতে জন্তু অপেক্ষা মানুষ অল্প মূল্যে বিক্রীত হচ্ছে এ সংবাদ শুধু বিস্ময়করই নয়,—পরিতাপের বিষয়।

মা ও মৃত্যু

হান্স ক্রিশ্চিয়ান আণ্ডারসন

মা বসে আছেন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে। ছেলের অসুখ করেছে, এখন অবস্থা বড়ো খারাপ, মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, যেন রক্তহীন, ধীরে-ধীরে নিশ্বেস পড়ছে। মা ছেলের মুখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে চুপ করে বসে আছেন সাদা, পুরু, নরম বিছানার পাশে। শীতের দিন, বাইরে শোঁ-শোঁ ব'য়ে চলেছে উত্তুরে হাওয়া, বরফ পড়ছে সেই কখন থেকে, সাদা সব বরফ, নিরেট শ্বেতবর্ণ ঠাণ্ডা কেবল।

কে একজন বাইরে দুয়ারের কড়া ধরে নাড়লো। মা আস্তে-আস্তে দরজা খুলে দিলেন, এক বুড়ো লোক ধীরে ঘরে এসে ঢুকলো মোটা কালো কাপড়ে তার সমস্ত শরীর ঢাকা, উষ্ণ কালো কাপড়, শরীরকে বেশ গরম রাখে। বাইরে সব তুষারে ঢাকা, পাঁজরায়-ছুরি-চালানো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে বাইরে।

বুড়ো লোকটা ঠাণ্ডায় ঠকঠকিয়ে কাঁপলো একটু; চুল্লি-জ্বালানো ঘরে এসেও সে যেন বাইরের শীতলতাকে এখন মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। অল্প একটুক্ষণের জন্য শান্ত হ'লো শিশুটির যন্ত্রণা-বাঁকানো শরীর, আর মা উনুনে একটা বাটিতে খানিকটে বিয়ার গরম করতে দিলেন বুড়ো লোকটার জন্য। আস্তে-আস্তে বসলো বুড়োটি, মন্থরভাবে দোলা দিতে লাগলো শিশুর দোলনা ধরে। মা বসলেন বুড়োর একপাশে এক পুরোনো চেয়ারে, পীড়িত শিশুর নরম হাত ধরে বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমার ছেলে বাঁচবে তো? কী মনে হয় তোমার? একটু পরে আস্তে, ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন মা, আমার সোনাকে ঈশ্বর কখনো আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না।

কিন্তু বুড়ো লোকটা রহস্যময় ভাবে ঘাড় নাড়লে, সে ঘাড় নাড়ার মানে 'হ্যাঁ'-ও হতে পারে, না-ও হতে পারে: বুড়ো আসলে হচ্ছে মৃত্যু। তার দিকে চেয়ে থাকতে পারলেন না মা, আপনা থেকেই নত হয়ে এলো তাঁর চোখ, তাঁর দু-চাখ দিয়ে গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো। মাথার ভেতরটা ভারি হ'য়ে উঠলো ক্রমশ, তিন দিন তিন রাত অবিশ্রাম তিনি শিশুর পাশে জেগে ব'সে, একবারো চোখ বোজেন নি, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন একটু, কয়েক মুহূর্তের জন্ম বুজে এলো তাঁর দু-চাখ। তারপর হঠাৎ তিনি চমকে জেগে উঠলেন ঠাণ্ডায় কেঁপে।

একি! একি হলো? মৃতের মতো অবরুদ্ধ গলায় জিগ্যেস করলেন মা, চারদিকে তাকালেন হতাশ ভাবে। সেই বুড়ো লোকটা চলে গেছে, আর তাঁর ছোটো শিশুও নেই, বুড়ো তাকে নিয়ে গেছে তার সঙ্গে। ঘরের কোণে এক পুরোনো ঘড়ি টিকটিকিয়ে বাজছিলো এতক্ষণ, হঠাৎ এবার সমস্ত ঘর জুড়ে কি ভার নেমে এলো, ঘড়িটা থেমে গেলো।

মা আর একমুহূর্তেও ঘরে থাকলেন না, কাঁদতে-কাঁদতে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এলেন পথে।

বাইরে পথ-ঘাট কঠিন বরফে ঢাকা; তুষারের উপর এক নারী ব'সে, কালো লম্বা তার কেশ; সে বললে, মৃত্যু তোমার ঘরে এসেছিলো আমি দেখলুম, সে তোমার ছেলেকে নিয়ে ছুটে চলে গেলো; বড়ো দ্রুত তার গতি, বাতাসের চেয়েও তাড়াতাড়ি যায় সে, আর সে যা নিয়ে যায় তা আর কখনো ফিরিয়ে আনে না।

মা বললেন, আমাকে কেবল বলে দাও কোন দিকে সে গেলো। কোন পথে সে গেলো—বলো আমাকে, আমি তাকে খুঁজে বের করবো।

কালো কাপড়পরা সেই নারী বললে, আমি জানি তার পথ; কিন্তু সেই পথের ঠিকানা তোমাকে দিতে পারি কেবল এক শর্তে, তা বলবার আগে আমাকে তোমার গান গেয়ে শোনাতে হবে, তুমি তোমার শিশুকে যে-সব গান গেয়ে শুনিয়েছো। আমি গান ভালোবাসি, সেই গানগুলি আমাকে শোনাও; তোমার-গাওয়া গান এর আগে আমি শুনেছি, কেননা আমি হচ্ছি রাত্রি; আমি দেখেছি তোমার দু'চোখে জল ঝরোঝরো করছে, যখন তুমি তোমার ছেলেকে গান গেয়ে শোনাচ্ছিলে।

শোনাবো তোমাকে আমি গান শোনাবো, সব গান তোমায় গেয়ে শোনাবো—অধীর গলায় মা বললেন, কিন্তু এখন আমার দেরি ক'রে দিয়ো না, মৃত্যুকে যে এগিয়ে গিয়ে ছুটে ধরতে হবে, আমার শিশুকে চাই।

রাত্রি কিন্তু স্তব্ধ, কোনো কথা বললো না, বোবার মতো বসে রইলো। মা তখন হাত মুচড়ে কাঁদলেন আর গাইলেন আর কাঁদলেন—অনেক গান, তার চেয়ে বেশি চোখের জল। তখন রাত্রি বললে, ডান দিক ধরে যেয়ো, ঐ অন্ধকার পাইন বনে, মৃত্যু ঐ পথে তোমার শিশুকে নিয়ে চলে গেলো, দেখলুম।

গভীর বনের ভিতর এক চৌমাথা; মা বুঝতে পারলেন না, কোন পথে তিনি যাবেন। পথের পাশে এক কালো কাঁটার ঝোপ, শীতে তার সব পাতা ঝরে পড়েছে, শুকনো ডালে তুষার জমে ঝুলছে।

মা তাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কি দেখেছো, মৃত্যু কোনদিকে আমার শিশুকে নিয়ে গেলো?

হ্যাঁ, আমি দেখেছি, ঝোপটি উত্তর দিলে, কিন্তু যতক্ষণ না তুমি আমায় তোমার বুকের তাপ দিয়ে আমাকে উষ্ণ করছো, ততক্ষণ কিছুতেই তোমাকে বলবো না সেই পথের ঠিকানা; আমি ঠাণ্ডায় জমে মরে গেলুম, বুঝি বরফ হয়ে জমে যাবো একেবারে।

মা সেই কালোকাঁটার ঝোপকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন, নিবিড় ভাবে জড়ালেন, যেন সে ঝোপ বেশ গরম হয়ে ওঠে, তাঁর দেহের মাংসে কাঁটা সব ফুটে গেলো, বড়ো বড়ো ফোঁটায় রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। কিন্তু মায়ের উষ্ণ, তপ্ত, কোমল বুকের স্পর্শে কালোকাঁটা গাছের শাখায় শাখায় নতুন পাতা সবুজ পাতা গজিয়ে উঠলো। ঠাণ্ডা, কনকনে, অন্ধকার শীতের রাতে কাঁটা গাছ ফুলে-ফুলে

ভরে উঠলো : সন্তান হারিয়ে মায়ের বুক এমনি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কালোকাঁটার ঝোপ তখন বলে দিলে কোন পথে মাকে যেতে হবে মৃত্যুর সন্ধানে।

যেতে যেতে মা এক বিশাল বড়ো হ্রদের সামনে এসে পৌঁছুলেন ; হ্রদে কোনো জাহাজ নেই, নৌকো নেই, পেরোবার কিছু নেই। ঠাণ্ডায় কঠিন হয়ে জমেও যায়নি হ্রদটা, যে তিনি পায়ে হেঁটে পার হয়ে যেতে পারবেন। আবার সাঁতরে পেরোবার উপায়ও নেই। তখন তিনি তীরে শুয়ে বসে হ্রদের জল খেতে শুরু করলেন ; অবশ্য একটা হ্রদের জল লক্ষ চুমুকেও শেষ করা একজনের পক্ষে অসম্ভব, এবং সে কথা ভাবাও পাগলামো ; কিন্তু শোকে আকুল হয়ে মা ভাবছিলেন, হয়তো দেবতার অনুকম্পায় কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাবে।

ভাখো, তুমি আমার জল খেয়ে শেষ করতে পারবে না কক্ষনো, বললে তাঁকে হ্রদ, তার চেয়ে শোনো। মুক্তো জোগাড় করে জমিয়ে রাখতে বড়ো ভালোবাসি আমি, আর তোমার চোখের মতো এমন স্বচ্ছ চোখ আমি আর দেখিনি। তুমি যদি কেঁদে কেঁদে তোমার চোখদুটিকে খসিয়ে আমাকে দিয়ে যাও, তাহলে আমি তোমাকে এই হ্রদ পার করে মৃত্যুর সবুজ দেশে নিয়ে যাবো, সেখানে বিপুল বড়ো এক বাগানে মৃত্যু বাস করে, সেখানে সে গাছ লাগায়, ফুলের চাষ করে. প্রতিটি ফুল, প্রতিটি গাছ হচ্ছে এক একটি মানুষের জীবন।

ফিসফিসিয়ে মা বললেন, আমার ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য আমি সব দিতে পারি। হ্রদের তীরে একলা বসে মা কাঁদতে লাগলেন ; কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ দুটি হ্রদের গভীর জলে খসে পড়ে গেলো. পড়েই তারা দুটি সুন্দর মুক্তোর আকার নিয়ে নিলে। তখন হ্রদ তাঁকে এপার থেকে তুলে নিয়ে অন্যপারে পৌঁছে দিলে, সে-পারে বিশাল বড়ো এক অপরূপ বাড়ি, মাইলের পর মাইল লম্বা, সেটা কি গহ্বর, না অরণ্যময় পাহাড়, না তৈরি বাড়ি তা বোঝবার জো নেই। আর সন্তান হারানোর শোকে অন্ধ মা তো কিছুই দেখতে পেলেন না, কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ খসে পড়ে গেছে।

খনখনে গলায় তিনি কেবল শুধোলেন, যে মৃত্যু আমার ছেলেকে নিয়ে চলে গেলো, তাকে আমি কোথায় পাবো ?

থরথরে এক বুড়ি বললে, মৃত্যু তো এখনো এখানে এসে পৌঁছোয়নি, তুমি কী করে এলে ? কে তোমায় সাহায্য করলো ?

এই বুড়ি মৃত্যুর বাগানে পাহারা দেয়, তার সব চুল পেকে শাদা হ'য়ে গেছে।

দেবতা আমাকে সাহায্য করেছেন, ক্লান্ত, কোমল গলায় মা উত্তর দিলেন, দেবতার করুণার তো শেষ নেই। তুমিও আবার করুণা করবে আমাকে ; কোনখানে—কোনখানে আমি আমার শিশুকে পাবো ?

বুড়ি উত্তর দিলে, আমি তো তা জানিনে। আমি তো বলতে পারবো না, কোনখানে তুমি তোমার ছেলেকে পাবে। আর তুমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছোনা। আজ রাতে অনেক গাছ অনেক ফুল শুকিয়ে ঝ'রে পড়েছে ; মৃত্যু এসে শীগগির তাদের আবার নতুন জায়গায় পুঁতবে। তুমি তো জানো, প্রত্যেক মানুষের একটি ক'রে জীবনের গাছ বা জীবনের ফুল আছে, সেই গাছ বা সেই ফুল হ'লো তাদের প্রাণ। অন্য সব গাছপালার মতোই তারা দেখতে, কেবল তফাতের মধ্যে এই যে, মানুষের জীবনের গাছগুলির হৃৎপিণ্ড আছে, তা স্পন্দিত হয়। হ্যাঁ, ছোটো ছেলেমেয়েদের গাছগুলির বুকও ধুকধুক ক'রে বাজে। হয় তো তুমি তোমার ছেলের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি আওয়াজ শুনে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, তার আগে বলো আমাকে তুমি কী দেবে। তবে তো তোমাকে খুলে বলবো সব কথা।

আমার তো আর কিছু দেবার নেই। ছিলো সাতরাজার ধন এক মণি, তাকেও তো মৃত্যু নিয়ে এসেছে। তোমার জন্য আমি যেখানে বলো যেতে পারি।

বুড়ি বললে, মা তোমাকে কোথোথাও যেতে হবে না. কিন্তু তুমি তো তোমার ঐ লম্বা কালো চুল আমাকে দিতে পারো। তোমার চুল কী সুন্দর। আমার ভারি ভালো লাগছে দেখতে। তুমি আমার শাদা চুল নিয়ে তোমার ঐ লম্বা কালো চুল আমাকে দাও।

এই তুমি চাচ্ছো ? আমার চুল গুলি তোমায় দিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে মা তাঁর সুন্দর কালো চুল বুড়িকে দিয়ে দিলেন, তার বদলে পেলেন তার শাদা চুল, বরফের মতো শাদা।

তখন বুড়ি তাঁকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলো মৃত্যুর বিশাল-বড়ো বাগানে। সেখানে কতো রকমের গাছ, কতো রকমের ফুল—বটগাছ, নারকেল গাছ, দেবদারু, সরল গাছ, য়ুকালিপ্টাসের রুপোলি শরীর, চন্দ্রমল্লিকা, হাসনুহানা, সূর্যমুখী—কতো সব আশ্চর্য গাছপালা। প্রতি গাছের, প্রতিটি ফুলের নাম আছে : পৃথিবীতে যতো মানুষ রয়েছে তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে গাছ, কেউ রয়েছে চীনদেশে, কেউ-বা গ্রীনল্যাণ্ডে, কেউ দিনেমার দেশে রয়েছে, কেউ ইংলণ্ডে—প্রত্যেকের প্রাণ তার নিজের-নিজের গাছে।

সন্তান হারাবার শোকে অধীর হ'য়ে মা হাজার-হাজার গাছের মধ্যে নিজের গাছটি খুঁজতে লাগলেন ; প্রত্যেকটি গাছের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি শুনে সেই অগুনতি গাছের মধ্য থেকে নিজের ছেলের গাছটি চিনে বের করলেন। একটি ছোটো কুঙ্কুম ফুলের উপর নুয়ে প'ড়ে তিনি বললেন, এই-যে এই-যে আমার ছেলের বুকের ধুকধুকানি। রোগজীর্ণ বিবর্ণ ফুলটির উপর ঝুঁকে প'ড়ে তিনি তাকে ধরতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে বুড়ি তাঁকে বাধা দিলে।

ছুঁয়ো না, স্পর্শ ক'রো না ঐ-ফুল। বাধা দিয়ে বললে বুড়ি, তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর মৃত্যু যখন আসবে—সে এই এলো ব'লে, আসবার সময় হয়েছে তার—মৃত্যু এসে ঐ ফুলের গাছ ছিঁড়ে উপড়ে ফেলতে চাইবে, তুমি তখন তাকে বাধা দিয়ো। তুমি বোলো, মৃত্যু যদি তোমার ছেলের ফুলের গাছ উপড়ে ফেলে তাহ'লে তুমিও আর সব গাছ টেনে তুলে লণ্ডভণ্ড করবে, তাহ'লে সে ভয় পেয়ে যাবে। তাকে যে প্রত্যেকটি গাছের হিসেব দিতে হয় ; দেবতার আদেশ না পেলে সে একটি গাছও উপড়ে ফেলতে পারে না।

আচমকা এক দমকা তুহিন হাওয়া এলো ; অন্ধ মা অনুভব করলেন, মৃত্যু আসছে।

মৃত্যু শুধোলে, তুমি এখানে কী ক'রে এলে ? আমার চেয়েও তাড়াতাড়ি কী ক'রে এখানে আসতে পারলে ?

নেতিয়ে যাওয়া গলায় মা উত্তর দিলেন, আমি-যে মা।

তারপর মৃত্যু সেই ছোটো সুন্দর ফুলটির দিকে তার লম্বা হাত

বাড়াতেই মা তার হাত জোরে চেপে ধরলেন প্রাণপণ শক্তিতে; তাঁর বুক ভয়ে দুলছে, এই বুঝি মৃত্যুর স্পর্শ কোনো পাতায় গিয়ে লাগে, এই বুঝে মৃত্যুর নিশ্বেস গিয়ে পড়ে ফুলের লাবণ্যে। মৃত্যু তাঁর হাতের নিশ্বেস ফেললে, সে নিশ্বেসের স্পর্শ তুহিন হাওয়ার চেয়েও ঠাণ্ডা; মায়ের হাত অবশ, শক্তিহীন হয়ে গেলো।

মৃত্যু বললে, তুমি আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।

কিন্তু দেবতা? দেবতার দয়া তো পারবে।

হাঁ, দেবতা যা বলেন, আমি তাই করি, আমি তাঁর হুকুম তামিল করি কেবল। আমি তাঁর বাগানের মালি; আমার কাজ হচ্ছে তাঁর হুকুম অনুযায়ী তাঁর এই সব গাছ ফুল এখান থেকে তুলে নিয়ে স্বর্গের বিরাট বড়ো বাগানে নতুন করে রোপণ করা। সে অজানা দেশ। সেখানে সব গাছ ফুল কেমন বাড়বে, তা আমি জানিনে, সে কথা কিছু বলতেও পারিনে।

মা বললেন, আমার ছেলেকে তুমি ফিরিয়ে দাও। কান্নার আবেগে তাঁর সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলো। তারপর হঠাৎ তিনি দুটি সুন্দর ফুল তাঁর হাতে ধরে মৃত্যুকে বললেন, তোমার সব ফুল আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবো, ভাখো, আমার শিশুর শোকে হৃদয় ভেঙে গেলো।

মৃত্যু বলে উঠলো, স্পর্শ কোরো না, ওদের স্পর্শ কোরো না। তুমি বলছো, তুমি ভয়ানক অসুখী, আর তবু তুমি পৃথিবীর অন্য আরেক মাকে অসুখী করতে চাও?

আরেকজন মাকে? মা অবাক হয়ে ফুলগুলি থেকে হাত সরিয়ে নিলেন।

এই নাও তোমার চোখ,—মায়ের হাতে তাঁর চোখ দুটি তুলে দিলে মৃত্যু, হ্রদের জল থেকে আমি চোখ দুটি তুলে আনলুম; কী ঝকঝক করছিলো। এ যে তোমার চোখ তা ভাবিনি। তোমার চোখ নিয়ে পারো—আগের চেয়ে চোখ দুটি আরো নির্মল, আরো উজ্জ্বল হয়েছে, তারপর ঐ গভীর কুয়োর মধ্যে ভালো করে তাকিয়ে ভাখো। তুমি যে ফুল দুটি তুলতে চাইছিলে তাদের নাম তোমায় বলছি। তুমি দেখতে পাবে তুমি ফুল ছিঁড়ে কী দুঃখ সৃষ্টি করতে যাচ্ছিলে।

গভীর কুয়োর ভিতর মা তাকিয়ে দেখলেন। তিনি দেখতে পেলেন একটি মানুষের জীবনের দৃশ্য। তার প্রাণ আনন্দে ভরা, সে পৃথিবীর কল্যাণ করছে, যেদিকে সে যাচ্ছে সেদিকেই সে ছড়াচ্ছে আনন্দ আর সুখ। দেখে মায়ের মন সুখে ভরে গেলো। তারপর আরেকজনকে দেখলেন, তার জীবন দুঃখে ভরা। দারিদ্র্য, ব্যর্থতা, বেদনা।

মৃত্যু বললে, দুটই দেবতার ইচ্ছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোন ফুলটি দুঃখী জীবনের আর কোন ফুলটি আনন্দের রঙে ছোপানো?

তা আমি তোমাকে বলতে পারবো না, বললে মৃত্যু তাঁকে, তবে তোমায় এইটুকু বলছি, ওর মধ্যে একটি ফুল তোমার শিশুর—একটি ছবি হচ্ছে, তোমার শিশু যদি না মরে পৃথিবীতে বাঁচে, তার ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যফলের ছবি—

শিউরে মা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। কোন জীবন আমার ছেলের, বলো, আমায় বলো। না, ঐ নিষ্পাপ শিশুকে তুমি মুক্তি দাও, সব দুঃখ যন্ত্রণা ব্যর্থতা থেকে তাকে রেহাই দাও। তাকে নিয়ে যাও তুমি দেবতার বাগানে। আমার সব অশ্রু তুলে নাও, আমার সব প্রার্থনা; তুমি তাকে নিয়ে যাও।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, মৃত্যু বললে, তুমি কি তোমার শিশুকে ফিরিয়ে চাও না? নিয়ে যাবো তাকে অজানা রাজ্যে।

বেদনায় একবার কেঁপে মা তাঁর দুহাত মুড়ে নতজানু হয়ে বসলেন, তারপর তিনি প্রার্থনা করলেন দেবতার দয়া। ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যা চাই আমি যা প্রার্থনা করি সে প্রার্থনা তুমি শুনোনা; তোমারই ইচ্ছে হচ্ছে সকল কল্যাণের উৎস। আমার ইচ্ছে আমার বাসনার প্রার্থনা তুমি শুনো না, কখনো শুনো না।

তাঁর মাথা বুকে নত হয়ে পড়লো। তাঁর শিশুকে নিয়ে মৃত্যু চলে গেলো অজানা দেশে।

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিপ্লবের সন্ধানে

। পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭ সালের শেষের কয়েকটা মাস অনেকগুলো বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল, বিশেষত আমার পক্ষে বড়। জেলখানা বা গ্রামের কতকটা নিরালা পরিবেশের মধ্যে থেকে বাইরেকার বিচিত্র হড়-হাঙ্গামার মধ্যে এসে পড়লে যা স্বাভাবিক,—খুঁটিনাটি সব কথাও মনে নেই, আর ঘটনাগুলোর সময়ের পারম্পর্যও সব সময়ে মনে থাকে না। তাই কয়েকটা বড় ঘটনার কথাই কতকটা বিচ্ছিন্ন ভাবে বলবো।

আমি যেদিন কলকাতায় আসি, সেই দিনই মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্বরাজ পার্টির ভূতপূর্ব সেক্রেটারী সদ্য মুক্ত রাজবন্দী সত্যেন মিত্রকে কর্পোরেশনে At Home দিচ্ছেন। আমি ৭১ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটের কংগ্রেসকর্মী সংঘের বাড়ীতে প্রথমে উঠে লট-বহর রেখেই চললুম "Forward" অফিসে উপেনদার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি ২৬ সালে মুক্ত হয়ে "ফরোয়ার্ডে" যোগ দিয়েছিলেন—তখন ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বসু।

সেখানে মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও দেখা হল। তিনিও কিছু দিন আগে মুক্ত হয়েছিলেন। আমাকে দেখে দুজনে কিছু আপ্যায়িত করেই কানে কানে পরামর্শ করে ফোনে মেয়রের সঙ্গে কথা কয়ে আমাকে নিয়ে চললেন কর্পোরেশনের At Home সভায়। সেখানে যাওয়ার পর যথাশাস্ত্র বক্তৃতাদি হল, এবং সত্যেনদার সঙ্গে আমাকেও সভার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে মেয়র দুজনার গলায় দুছড়া বড় বড় মোটা বেলফুলের "গোড়ে" মালা পরিয়ে দিয়ে সম্বর্ধনা করলেন। আমি সত্যেনদার প্রকাণ্ড ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে অভিনন্দন করলুম—তিনি সলজ্জ হাস মুখে আমার বাহু দুটোতে একটু অস্তুটিপুনী দিলেন।

কিন্তু সারা কলকাতার বড় বড় লোক, কাউন্সিলার প্রভৃতির সভায় হঠাৎ প্রোমোশন পেয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ব্যারিষ্টার সুরেন হালদার (বাসন্তী দেবীর ভ্রাতা) সেটা কাটিয়ে দিলেন, "হালো" বলে মোক্ষম রকমের হাত-ঝাঁকানি (সেকহ্যাণ্ড) দিয়ে। তাঁর সঙ্গে আলাপ বিশেষ ছিল না,—তিনি নেতা, আমি কর্মী—বি, পি, সি, সির মিটিংয়ে দেখা সাক্ষাৎ হ'ত। মনে হল, তিনি তাঁর বন্ধু বান্ধবদের বুঝিয়ে দিলেন,—এই দেখ একজন বিপ্লবী নেতা—তোমরা হয়ত চেননা, কিন্তু আমার সঙ্গে খাতির আছে। তিনি বললেন, আমাদের বাড়ী একদিন যেও। আমি বিনীত ভাবে হাসিমুখে বললুম, যাবো। পরে আরো অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, এবং তিনি বলেছেন, কৈ আমাদের বাড়ী এলে না? আমি বরাবরই বলেছি যাবো, কিন্তু যাওয়া কোনদিন ঘটে ওঠেনি।

প্রোফেসর বিনয় সরকারের স্ত্রী, জার্মান মহিলা, এসে আলাপ করলেন, এবং চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে অবশ্য না গিয়ে পারিনি।

প্রভাস তখন কর্মীসংঘের mess managé করতে করতে mismanage করে উধাও হয়েছে, তার কোন পাত্তা নেই। উপরন্তু তার আর একটা বদনামও রটে গেছে, সে নাকি আই বির কাছে খবর দিত। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বদনাম বিশ্বাস করতে পারলুম না। অথচ হঠাৎ অদৃশ্য হওয়া তো ভাল কথা নয়!

বরানগরের বাড়ীতে তখনই গেলুম না, কারণ ভাগ্নীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ায় জামাই তাকে নিয়ে পুরী চলে গিয়েছিল জানতুম, কিন্তু তারপর তাদের খবর বা চিঠিপত্র পাইনি।

দেনার মামলার তদ্বির করতো প্রভাস, উকীলের নামটা শুনেছিলুম—বোধহয় সুধীন্দ্র মুখার্জি, পদ্মপুকুরে থাকেন, ঠিকানা জানি না। খুঁজে যেতে ২।৪ দিন দেরী হল। তিনি দুঃখ করতে লাগলেন, ২।১ দিন আগেই তারিখ ছিল, প্রভাসও কিছুদিন যায়নি, আমার মুক্তির খবরটা সম্বর্দ্ধনার পরের দিন ফরোয়ার্ডে ঘটা করে ছাপা হয়েছিল, আমার পরিচয় ছিল প্রায় এক কলম জুড়ে। মহাজনের উকীল রাগ মানেনি, জজ এক্স পার্টি ডিগ্রী দিয়ে দিয়েছেন। ল্যাঠা চুকে গেল ভেবে স্বস্তিবোধ করলুম।

পরে অমরদার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি ডিগ্রীর কথা শুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মহাজনের বাড়ী গেলেন (কাশীপুরের বামন দাস মুখোপাধ্যায়ের কুলপুত্র)। তিনি কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পর অমরদা আমার কথা তুলে প্রস্তাব করলেন, ওভাবে বাড়ীটা নিয়ে নেওয়াটা তো ভাল দেখায় না, ওকে আর কিছু টাকা দিন, যাতে ও কিছু রোজগার করে খেতে পারে, ও বাড়ী বিক্রীর দলিল লিখে দিক। মহাজন বললেন, এসব বিষয়ে আমি কিছুই করি না, ম্যানেজারই যা ভাল বোঝে, করে। ম্যানেজার অবশ্য ব্রেক হাঁকিয়েই দিলেন।

সারদা দিল্লীতে বড়দাদার কাছে চলে গিয়েছিল, আমার মুক্তির খবর পেয়েই চলে এল। দোসর পেয়ে ভরসা হল, কারণ সে আমার সঙ্গে জাহান্নম পর্যন্ত যেতেও রাজি। চিন্তামণি দাসের লেনে একখানা ছোট ঘর ভাড়া করলুম ১২টাকা ভাড়ায়। কলেজ ষ্ট্রীটে ঘর এণ্ড

সজের ঢৌক্ত মেরামতের দোকান অনেক কালের—তাঁদেরই বাড়ীর বাইরের একখানা ছোট্ট ঘর।

কিছু অর্থের সংস্থান হয়েছিল ঘটনা চক্রে, এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে। কামারখন্দে থাকার সময় চাকরের অসুবিধাটা হয়েছিল শাপে-বর। প্রতি মাসেই কয়েকটা করে টাকা বাঁচতো। জামতৈল গ্রামের এক বড় জোতদার রাধাগোবিন্দ সাহার ভ্রাতুষ্পুত্র অখিল সাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, টাকা ক'টা তাঁর কাছে জমা রাখতুম। মুক্তির পর তাঁদের শোভাবাজারের পাটের আড়তে এসে তিনি আমাকে জমানো টাকাটা দিয়ে যান। সেই আমার প্রাথমিক সংস্থান। ভদ্রলোক শিক্ষিত, সৎ, চমৎকার লোক।

কিছুদিন চিন্তামণি দাসের লেনে থেকে অসুবিধা হ'তে কলেজ রো'তে এক "ব্রাহ্মণ মেস" নামক বোর্ডিংয়ে এক ঘর নিলুম,—এবং গুলিসুতো কিনে দুজনে পৈতে বানিয়ে পরলুম! পৈতে না দেখালে সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

কিন্তু এখনই কিছু রোজগারের ব্যবস্থা না করলে চলে না। ক'টা মাত্র টাকা, কয়েক দিনেই ফুরিয়ে গেল। নিলামে যাতায়াত সুরু করে দিয়েছিলুম, এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছে ঘুরে তাদের কাছ থেকে এক আধটা জিনিসের অর্ডার সংগ্রহ করে, কিনে দিয়ে ২-৫ টাকা পেতুম। তাতেই খরচ চলতো কায়ক্লেশে।

ঘর সংসারের ২।৪টে অপরিহার্য জিনিষের সন্ধানে বরানগরের বাড়ীতে গেলুম। বাড়ীর সামনে এক স্বর্ণকারের কাছে জামাই বাড়ীর চাবি দিয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে খবর পেলুম ভাগ্নী মারা গেছে। আর এক ল্যাঠাও চুকলো।

'২১ সালে যখন ডেকোরেশনের ব্যবসা তুলে দিয়েছিলুম, তখন প্রোসেশানের লাইট তৈরী চলছিল। লড়াইয়ের পরের চড়া দামে বহু লোহার পাইপ কিনেছিলুম, এবং সেগুলো বাণ্ডিল বাঁধা অবস্থায় বাড়ীতে পড়েছিল। দেখলুম, মরচে ধরে এক একটা খাম্বা হয়ে গেছে। সেগুলো নিয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়ানোর চেয়ে ভুলে যাওয়াই ভাল মনে করলুম।

বাড়ী থেকে সংগ্রহ করলুম একখানা বড় তক্তপোষ, একটা বেঞ্চ, একটা আলনা, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা অ্যাসিটিলিন গ্যাসের দেওয়ালগিরি আলো,—আর ছাদে ওঠার একটা কাঠের সিঁড়ি আর ১২ ফুট লম্বা একখানা সাইনবোর্ড (দোকানের)। জামাই যা নিয়ে যেতে পারেনি তাই পড়েছিল। আমি ঐ জিনিসগুলো নেওয়ার পর আর যা কিছু পড়ে থাকলো, সেগুলো স্বর্ণকার মশাইকে দিলুম। বললুম, যদি পারেন, আমাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে দেবেন। তিনি সঙ্গ সঙ্গ পনেরোটা টাকা দিয়ে বললেন, পরে আর যা পারি দোব। আমি তার পরে আর যাইনি। অর্থাৎ আমার বাকি অস্থাবর সম্পত্তি থেকে পেলুম পনেরো টাকা।

পূর্ণ দাশের এক লেফটন্যান্ট কালীপ্রসাদ ব্যানার্জিকে সাইনবোর্ডখানা বেচে কিছু পেলুম। তিনিও তখন অন্তরীণ থেকে মুক্ত হয়ে এসে কালীঘাট ট্রাম ডিপোর পাশে এক motor engineering works খুলেছেন—মেরামতী কাজের দোকান। সিঁড়িটা বেচেও কিছু পেলুম।

আমার বি, পি, সি, সি-র আগেকার মেম্বারশিপ তখনো আছে। ২৪-পরগণা কংগ্রেস কমিটির অফিসের কর্মীরা আমার সম্বর্ধনার এক আয়োজন করলেন। যথাশাস্ত্র বক্তৃতা ও মাল্যদান হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার অমূল্যধন মুখার্জিও সে সভায় ছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের দলের লোক।

তখন বি, পি, সি, সি-র Acting-President ছিলেন অখিল দত্ত। কেন, তা মনে নেই। সম্ভবত সেনগুপ্ত বম্বেতে মমতাজ বেগমের মামলায় বেগমের সমর্থনে মামলা করতে গিয়েছিলেন।

মমতাজ এক বিখ্যাত সুন্দরী—ইন্দোরের মহারাজার রক্ষিতারূপে প্রাসাদে প্রায় বন্দিনীর অবস্থায় ছিলেন, এবং একজন লোকের সহায়তায় তার সঙ্গে বম্বেতে পালিয়ে এসেছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সে লোকটা এক গুপ্ত আততায়ীর হাতে খুন হয়, এবং মমতাজকে আবার অপহরণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মমতাজের পক্ষে এবং খুনের ষড়যন্ত্র মহারাজাকে জড়িত করে যে মামলা হয়, বোধ হয় ২৫ সালের গোড়ায়—সে মামলা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হাতে দেওয়ার জন্য কলকাতায় লোক আসে, এবং তিনি নিজে না নিয়ে সে মামলায় সেনগুপ্তকে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেন।

তখন সুভাষ বাবু ভাওয়ালী বা রাণীক্ষেতে স্বাস্থ্য-নিবাসে আছেন। রোজ বিকালে টেম্পারেচার বাড়ে, রোগা হয়ে গেছেন—suspected T. B.—তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টা চলছে। এক বেসরকারী মেডিক্যাল বোর্ড তাঁকে পরীক্ষা করে টি বি সন্দেহই প্রকাশ করলেন। বোধ হয় তার মধ্যে ডক্টর বিধান রায়ও ছিলেন। সরকার এত দিন মানছিল না, এবার এক সরকারী মেডিক্যাল বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে suspected T. B. বলেই মুক্তি দিলেন।

তাঁর মুক্তির কয়েক দিন আগে বি, পি, সি, সি-র সভায় শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষের এক প্রস্তাব গৃহীত হল,—যাতে সুভাষ বাবুকে বি, পি, সি, সি-র প্রেসিডেণ্ট করা হল। সুভাষ বাবু এলেন। সর্বত্র তাঁর সম্বর্ধনা হল। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যও ভাল হয়ে উঠলো।

'২৭ সালের শেষেই বোধ হয়, বিলাত থেকে পার্লী এম, পি, বিলাতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সাপুরজী সাকলাতওয়ালা ভারতে এবং কলকাতায় এসে অ্যালবার্ট হলে এক বক্তৃতায় যুবকদের পরামর্শ দিলেন, তোমরা সর্বত্র Young Communist League সংগঠন কর। তখনও কমিউনিষ্ট পার্টি নামের কোন প্রকাশ্য সংগঠন ছিল না—কমিউনিষ্ট কর্মীরা workers party, peasants party প্রভৃতি ধরণের নামের আড়ালে থেকে কাজ করে। বস্তুত কমিউনিজম কথাটাই তখনও চালু হয়নি, তার বদলে চলতো বলশেভিজম কথাটা, কারণ আমাদের দেশের রয়টারের একচেটিয়া সংবাদজগতে রুশিয়ার কমিউনিষ্টদের বা পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার বলশেভিক নামেই চালানো হত।

কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠিত হয়ে ওঠার লক্ষণ দেখামাত্রই সে প্রচেষ্টার অঙ্কুরে বিনাশের জন্যই সরকার বাহাদুর '২৪ সালে কানপুর "বলশেভিক" ষড়যন্ত্র মামলা করেছিলেন,—যার এক নম্বর আসামী ছিলেন এম, এন, রায়। তিনি তখন রুশিয়ায়—মস্কোর তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সভাপতিমণ্ডলীর ১১জন সদস্যের অন্যতম'—সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে কমিউনিজম প্রচারের এবং পার্টি সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য।

যাই হোক, '২৭ সালে শাকলাতওয়ালার পরামর্শ অনুসারে ২।১

স্থানে স্থানীয় তরুণ কৃষক কর্মীরা Young Communist League গড়ার চেষ্টা করেছিল। ময়মনসিং জেলার কিশোরগঞ্জে এমনি এক সংগঠন হয়েছিল। তাদেরই প্রচারের ফলে '২১ সালে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করে, এবং ঢাকা থেকে মোল্লা-মৌলবীরা সেখানে গিয়ে সেটাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করে। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ যথাসময়ে দেওয়া যাবে।

এদিকে সুভাষবাবুকে বি, পি, সি, সি-র গদীতে বসানোর পর তাঁকে কর্পোরেশনের গদীতেও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা সুরু হল। জেলে যাওয়ার আগে তিনি ছিলেন কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং তাঁর অবর্তমানে ফার্ষ্ট ডেপুটী এক্সিকিউটিভ অফিসার জে, সি, মুখার্জী "চীফ" হয়েছিলেন। তাঁকে কংগ্রেস-নেতারা অনুরোধ করলেন, সুভাষবাবুকে জায়গা ছেড়ে দিতে। তিনি বললেন, অন্য কারো কথায় ছাড়বো না,—সুভাষ বাবু অনুরোধ করলে ছাড়বো। সুভাষ বাবুর সে অনুরোধ করতে সরমে বাধলো। সুতরাং মুখার্জিই চীফ থেকে গেলেন,—এবং সুভাষ বাবুকে মেম্বরের গদীতে বসাবার তোড়জোড় সুরু হল, সামনের কর্পোরেশন-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে।

ওদিকে আমার ভাগ্নে বেচারা তখনও বাহেরকে জিতেন কুশারীর সত্যাশ্রমে পড়ে আছে। তাকে নিয়ে এলুম। কিন্তু খরচ চালানোও দুরূহ,—আর পড়াশুনোর ব্যবস্থাও প্রায় অসম্ভব। আমার কাছে থাকলে পড়াশুনো হবে না ভেবে তাকে নিয়ে গেলুম তার জ্যাঠামশায়ের কাছে। তিনি retired Govt. Pensioner—বালিগঞ্জে ষ্টেশন রোডে সপরিবারে বাস করতেন। বাড়ীতে লেখাপড়ার আবহাওয়া চমৎকার। তাঁর ছেলেরা সকলেই শিক্ষিত, কেউ এম এ, কেউ এম এস সি, কেউ কলেজে বা স্কুলে পড়ে। আমি তাঁকে বললুম, আমার কাছে থেকে ওর পড়াশুনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, আর ক্ষতি করা উচিত নয় বলে আপনার কাছে এনেছি। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাকে গ্রহণ করলেন। ভাগ্নের একটা হিল্লে হল বলে আর একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। তার লেখাপড়া সেখানেই আবার শুরু হল।

আমার বাড়ীর মামলা revive করার জন্য কোন কোন বন্ধু পরামর্শ দিচ্ছিলেন—বাড়ীটা বিক্রী করার সুযোগ পেলে দেনা শোধ করেও কিছু টাকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খাবারই সংস্থান নেই—মামলার টাকা কোথায় পাব? ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে ভালই হয়েছে। হাত দুটো আর পেট একসঙ্গেই আছে। টায়ে টায়ে দিন গুজরাণ করতে পারলেই হল। দাদারা মুক্ত হয়ে আসছেন। দুই দলে জোট বাঁধতে পারলে একটা বিরাট শক্তির সৃষ্টি হবে। পারস্পরিক খেয়োখেয়িতে শক্তি ক্ষয় হবে না,—অবিপ্লবী নেতাদের বিপ্লববিরোধী কর্মসূচীর লড়াইয়ে দুই বিপ্লবীদল দুপক্ষে থেকে পরস্পরের বিরোধিতাকেই তাদের কর্মসূচীর প্রধান ধান্দা করে বরবাদ হয়ে যাবেনা। নতুন নিজস্ব কর্মসূচী আসবে,—তার জন্য তৈরী থাকাই দরকার।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল এবং ব্রেল্সফোর্ডের কাছে চিঠি লিখে অনুমতি চাইলুম, তাঁদের বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের জন্যে। রাসেল উত্তরে লিখলেন, তোমার চিঠি আমার প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিলুম, তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর। প্রকাশক আমাকে জানালেন, যদি অবিলম্বে পাঁচ পাউণ্ড পাঠাতে পার, অনুমতি পাবে; দেরী করলে পাঁচ পাউণ্ডে চলবে না।

তখন দিন-কাল এমনি ছিল। কিন্তু আমার দিন-কালও এমন ছিল যে, পাঁচ পাউণ্ডের মতন টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। ওটার আশা ছেড়েই দিলুম।

ব্রেল্সফোর্ড লিখলেন, আমিতো তোমার পরিচয় জানিনা, যদি একটা আমার চেনা লোকের সুপারিশ পাঠাতে পার,—ধর যদি জে, সি, বোসের সুপারিশ সংগ্রহ করে পাঠাতে পার,—তাহলে আমি অনুমতি দিতে পারি।

বুঝলুম, আমার প্রথম চিঠিতে একটু ঘোরালো করে পরিচয়টা দিলে হয়তো কাজ হয়ে যেত। কিন্তু একে আনাড়ী, তাতে নিজের সম্বন্ধে ভাল কথা বলার অভ্যাস কোন কালেই নেই, কাজেই সেটা হয়নি। যাই হোক, জগদীশ বসুর সুপারিশ সংগ্রহের জন্য বোস ইনষ্টিটিউটে গিয়ে গোপাল বাবুর (ভট্টাচার্য) সঙ্গে দেখা করলুম, এবং শুনলুম, কয়েকদিন আগেই তিনি "ফরেন টুরে" বেরিয়ে গেছেন। সুতরাং সে বইটা সম্বন্ধেও আশা ছেড়ে দিলুম।

গোপাল বাবু তখন টালার ননী গোঁসাইয়ের বাড়ী থেকে গৌরীবেড়ের খালধারের কাছে এক গলিতে বাড়ী ভাড়া করেছেন। তাঁর সঙ্গে সেখানেও গেলুম, এবং অবশ্য খেয়ে এলুম। তাঁর বাড়ীতে গেলেই খেয়ে আসা শেষ পর্যন্ত রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যারা "স্বদেশী" করে বেড়ায় তাদের যে খাওয়াদাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, এটা মায়েরা এবং বউয়েরা ধরেই নিয়েছিলেন, এবং তদনুসারে, গেলেই প্রথমেই বলতেন, ভাত খেয়ে যাবে।

বোস ইনষ্টিটিউটে গোপাল বাবুরা টিফিনের সময় মাংস-ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন,—আমাকে বলেছিলেন, যেদিন আসবেন, টিফিনের সময় আসবেন। সুতরাং মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে তাঁদের টিফিনের ভাগ খেয়ে আসতুম। এমনি করে ওখানকার কয়েকজন রিসার্চ স্কলারের সঙ্গে আলাপ জমেছিল, এবং পরে তার ফল ফলেছিল সুদূরপ্রসারী। সে কথাও পরে আসবে।

একদিন গিয়ে দেখি, নড়িয়া হাই স্কুলের হেডমাষ্টার নিবারণ দাশগুপ্ত এসেছেন। গোপালবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, এবং দুজনকে এক চেয়ারে বসিয়ে ফটো তুললেন।

তখন সস্তাগণ্ডার দিন, নতুন কায়দার হোটেল হয়েছে পাইস হোটেল—ছ'পয়সায় মাছের ঝোল ভাত খাওয়া হয়ে যায়। তাই কোন মতে চলে যেত। কিন্তু আর কিছু, কয়েকটা টাকা, রোজগার না করতে পারলে যুত হচ্ছে না। সুরেশ মজুমদারকে একদিন বললুম, আপনার "আনন্দবাজারে" আমাকে এমন একটা চাকরী দিতে পারেন, যাতে রোজ ঘণ্টা দুই খেটে মাসে ১৫।২০ টাকা পাওয়া যায়? তিনি বললেন, না—খাটনি ৩।৪ ঘণ্টা আর মাইনে গোটা ত্রিশ টাকা, যদি চান, হতে পারে। তখন মাদ্রাজে ডিসেম্বরে কংগ্রেস আসন্ন।

সুতরাং রাজী হলুম এবং ৩০ টাকা মাইনের সাব এডিটারী চাকরী নিলুম। যতীন ভট্টাচার্যও তখন (সিনিয়র) সাব এডিটার ছিলেন। সে ঠিক কংগ্রেসের আগেই। হরদম টেলিগ্রামে খবর

আসছে এবং আমরাও হরদম অনুবাদ করে চলেছি, এইভাবে কংগ্রেসের কয়েক দিন একটু বেশী রাত পর্যন্তই খাটুনী হল এবং তার পর হল জ্বর।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে তরুণ স্বাধীনতাবাদী ও বিপ্লবীদের চেষ্টায় এক প্রস্তাব পাশ হয়ে গিয়েছিল—কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। এটা হল এক প্রস্তাবের আকারে—creed পরিবর্তন হল না। মহাত্মাজী তখন অল ইণ্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে খদ্দর উৎপাদন চালাচ্ছেন, কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্বরাজ পার্টির হাতে ছেড়ে দিয়ে। মাদ্রাজের কাণ্ড দেখে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, ফিরে এসে আবার কংগ্রেসের কর্ণধারণ করলেন।

আমার প্রবল জ্বর, ওঠে-নামে, কিন্তু ছাড়ে না। পাশের ঘরে এক তরুণ ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের সিক্সথ ইয়ার ষ্টুডেণ্ট। তিনি ক'দিন দেখে, জ্বর নামার মুখে কুইনাইন খাওয়ালেন। আবার জ্বর ওঠা-নামা এবং আবার কুইনাইন—এমনি করে অনেক কুইনাইনও খাওয়া হল, জ্বরও চললো।

তখন আমাদের "ব্রাহ্মণ মেসে" ইলেকট্রিক ছিল না,—ঘরে ঘরে জ্বলতো হ্যারিকেন। জ্বর অবস্থায় একদিন আমি "গোখেলস স্পীচ" বইখানা পড়ছি। ক্ষুদে টাইপে ছাপা প্রকাণ্ড বই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তখনও পড়ছি। চোখের ওপর একটু অত্যাচার হচ্ছে। সারদা বারণ করলে, পড়া বন্ধ করলুম।

সেই দিন শেষ রাত্রে মাথার যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙ্গে গেল, মাথার পিছন দিকটাকে যেন কেউ ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে। আমার আর্তনাদে আর সকলের ঘুম ভাঙলো। পাশের ঘরের ডাক্তারও এল। হ্যারিকেন জেলে আমার মুখের কাছে ধরলো। আমি শুধু আলোর একটা আভাস বুঝতে পারছি, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সম্পূর্ণ অন্ধ।

কাণ্ড দেখে সারদার সঙ্গে ডাক্তারও ঘাবড়ে গেল এবং তখনই মেডিক্যাল কলেজে ছুটলো। বেশ কিছুক্ষণ পরে ফিরলো এক মোটর নিয়ে। তখন সকাল হয়েছে। আমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ওরা দুজনে চললো হাসপাতালে। তখন দেশী ওয়ার্ডে সিট খালি ছিল না,—ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে একটা মাত্র সিট খালি ছিল। "ডাক্তারের" তদ্বিরে আমাকে সেখানেই ভর্তি করে নেওয়া হল। খানিক পরেই এলেন কর্ণেল কোপিঞ্জার (আই স্পেসিয়্যালিষ্ট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) এবং কয়েক জন ডাক্তার ও ষ্টুডেণ্ট। কোপিঞ্জার চোখ পরীক্ষা করে বললেন, অ্যাকিউট গ্লকোমা, সাডন্ অ্যাট্যাক, ভেরি রেয়ার—ওঃ, আমার এক্ষুণি কাটতে ইচ্ছে করছে।

তার পর চললো লেকচার আর চোখ দুটোকে টিপে, পাতা টেনে তুলে দেখানো। সকলেই এক একবার চোখ দুটোকে টেপাটিপি করলেন। আমি তখন দেখছি শুধু কতকগুলো মানুষের অবয়ব মাত্র নড়াচড়া করছে—সবই ঘোলা। প্রাণটার মধ্যে চলছে একটা হাহাকার—এ কি হল!

পরীক্ষার জন্তে সেদিন রক্ত নেওয়া হল, পরদিন প্রস্রাবও নেওয়া হল, তৃতীয় দিনে হল অপারেশন। সেদিন "টেনশন" কমেছে, কাছের মানুষ চিনতে পারছি, একটু ভরসা হয়েছে। কিন্তু সজ্ঞানে চোখ কাটবে—ভয়ও হচ্ছে।

মুক্তির পরেও আমার ওপর একটা Restriction order ছিল, যেখানেই থাকি, I. B-র D. I. G. বা জেলার S. P-র অফিসে ঠিকানা জানাতে হবে, কলকাতায় বাস করতে করতে বাইরে যেতে হলে D. I. G-র কাছে খবর দিতে যেতে হবে, ইত্যাদি। যেদিন হাসপাতালে গেছি, তার পরের দিনই সে অর্ডারটা Cancel করার notice serve করার জন্তে একজন S, B. Inspector বাসায় গিয়েছিলেন, সেখান থেকে হাসপাতালে এসেছেন notice serve করতে। সুতরাং জানাজানি হয়ে গেল যে, আমি আটক ছিলুম। মেম নার্সেরা হাঁ করে আমার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে does he make bombs? অফিসার মৃদু হেসে চুপ করে থাকেন।

অপারেশন টেবিলে যখন চোখের সামনে ছুরি ধরে কোপিঞ্জার বলছেন look straight, তখন উঠে পালাতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু বোমাওয়ালা হয়ে কেমন করে পালাই? কাজেই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকলুম। দুটো eyeballই ইঞ্জেকশন দিয়ে রেডি করেছিল কাটার জন্তে, কিন্তু বাঁ চোখটা কাটতে যন্ত্রণা টের পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ডান চোখটা কাটতে দিলুম না।

কোপিঞ্জার বললেন, তুমি রাজী না হলে আমি কাটতে পারি না, কিন্তু না কাটলে আবার আক্রমণের ভয় থেকে যাবে, এবং আক্রমণ হলে আবার দুটো চোখই কাটতে হবে। আমি বললুম, তা হয় হোক।

বেশী কথার সময় নেই—তাঁর দুঘণ্টা ডিউটির মধ্যে তিনি ৪০টা রোগীর চোখ কাটলেন, গ্লকোমা, ছানি প্রভৃতি, কারো একটা, কারো বা দুটো চোখ, যেন আলু-পটল কাটছে—এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

প্রথম দিনই সারদা অনুকূলদাকে খবর দিয়েছিল—তিনিও কিছুদিন আগে অন্তরীণ থেকে ফিরে এসেছেন—তিনি দেখতে এসে, খাওয়া দাওয়ার অবস্থা ভাল নয় দেখে বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন, এবং রোজ দুপুর বেলা বাড়ী থেকে লুচি, তরকারী, মাছ প্রভৃতি থালা সাজিয়ে নিয়ে নিজে হাসপাতালে এসে খাইয়ে যেতেন। তাঁর ভালবাসা আমি ভুলতে পারি না।

যাই হোক, তৃতীয় দিনে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখে all right হলে, আবার বেঁধে ছেঁদে দিলে এবং আট দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলে ছেড়ে দিলে। লেখাপড়া আপাতত একেবারে নিষিদ্ধ হল। সুতরাং ব্যবসা ছাড়া আর কোন পথ রইলো না। নিলেমের উপরই চেপে পড়লুম।

'২৬ সালে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পর অতীন বসুর প্রতিষ্ঠিত সিমলা ব্যায়াম সমিতি জাঁকিয়ে উঠলো—হিন্দু ছেলেদের শরীরচর্চ্চা, লাঠিখেলা প্রভৃতি জোর চললো। মাড়োয়ারী বড় লোকেরা পৃষ্ঠপোষক হলেন, অমর বসুর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হল।

'২৭ সালের শেষে কলকাতায় কংগ্রেস অফিসে (বৌবাজার ষ্ট্রীট) ইউনিটি কনফারেন্স হল,—অন্যান্য স্থানেও ইউনিটি কনফারেন্স চলতে লাগলো। তখন মহম্মদ আলী, সৌকত আলী প্রভৃতি কংগ্রেস নেতারা বিগড়ে গেছেন এবং মুসলমানদের দাবী নিয়েই ইউনিটি কনফারেন্সে লড়ছেন। কলকাতার মোহাম্মদী প্রভৃতি কাগজে মুসলমানদের দাবীর মধ্যে নতুন চাকরীর শতকরা ৮০টা তাদের জন্ত রিজার্ভ রাখার দাবী উঠেছে। উপেনদা ঠাট্টা করে বলেন, মন্দির-মসজিদ ভাঙাও ঐ অনুপাতে করা চাই—শতকরা ৮০টা মসজিদ এবং ২০টা মন্দির। তিনি কংগ্রেস কর্মী সংঘে যোগ দিয়াছিলেন

এবং ঐ সময়েই তাঁর হিন্দু মহাসভার সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। অমরদাও (চ্যাটার্জি) সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি হয়েছিলেন কর্মী সংঘের প্রেসিডেণ্ট।

'২৭ সালের শেষে বা '২৮ সালের প্রথমে, ঠিক মনে নেই,— দেশবন্ধু পার্কে হিন্দু মহাসভার অল-ইণ্ডিয়া সম্মেলন হল,—মূল লক্ষ্য, ইউনিটি কনফারেন্সের বিরুদ্ধে হিন্দুদের একজোট্টা করা। সেই কনফারেন্সে বীর সাভারকরের নেতৃত্বে প্রস্তাব হল, এটা হিন্দুর দেশ, মুসলমানরা যদি এদেশে থাকতে চায়, তাহলে তাদের হিন্দুদের কাছে মাথা হেঁট করেই থাকতে হবে! এইভাবে সেই কনফারেন্সেই "টু নেশন থিওরী" বা দ্বিজাতি তত্ত্বের জন্মকথার সূত্রপাত। দাঙ্গার পর হিন্দুদের মন এতখানি বিষিয়ে উঠেছিল যে "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পর্যন্ত হিন্দু মহাসভার সুর ধরেছিল।

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়—সাম্প্রদায়িকতার আকারে বিপ্লব-বিরোধী শক্তি সর্বত্রই প্রবল হয়ে উঠছে। দাদারা ফিরলে final amalgamation হলে আবার একটা শক্তিশালী বিপ্লবীদল আসরে নামবে, এই আশায় দিন গুনছি।

ম্যাকেঞ্জি লায়ালের নিলামের সকলের সঙ্গেই আলাপ-খাতির ছিল বলে মাল কেনার সময় টাকা ডিপজিট দিতে হতনা— তাতে একটা হপ্তা সময় পেতুম, এবং কেনা-মাল বিক্রী করে ডেলিভারী আনতুম। তখন highest bidderএ অনেক ভাল মাল বিক্রী হত—কিনলে যথেষ্ট কেনা যায়, এবং বিক্রী করে দু'দশ টাকা লাভও পাওয়া যায়। কিন্তু সব কেনা মাল ডেলিভারী নেওয়ার আগে বিক্রি করতে না পারলে, বাকি মালগুলো এনে রাখার জায়গা দরকার। তা নেই বলে সস্তায় পেলেও যথেষ্ট মাল কিনতে পারি না। সুতরাং যেমন করেই হোক, একটা দোকান না করতে পারলে আর চলছে না,—এটা বেশ বুঝলুম, এবং অল্প ভাড়ার ঘর খুঁজে বেড়াতে শুরু করলুম।

শান্তিপুরের শশী খাঁর (মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, যিনি দেবেন দের সঙ্গে কয়েক বছর আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান) ছোট ভাই নীরোদ খাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল, তিনি ছিলেন সন্তোষ মিত্রের দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একদিন তাঁর সঙ্গে অ্যালবার্ট-বিল্ডিংয়ের পিছন দিয়ে যেতে যেতে দোকান ঘরের কথা হচ্ছিল। হঠাৎ শ্যামা চরণ দে ষ্ট্রীটের কোনায় অ্যালবার্ট বিল্ডিংয়ের দুটো দরজায় তালা বন্ধ দেখে নীরোদ ঠাট্টা করে বললে, এই ঘরটা নিয়ে ফেলুন। আমি বললুম, ঠাট্টা করছেন?—বেশ, এই ঘরই নোব।

দু দরজা ওয়ালা বড় ঘর,—কিছুদিন আগে সে ঘরে খদ্দর প্রদর্শনী হয়েছিল। ভাড়া মাসিক ১০০ টাকা। তখন আমার পকেটের সম্বল মাত্র গোটা পঞ্চাশেক টাকা। সেক্রেটারী সত্যানন্দ বসু বিক্রমপুরের লোক,—পঞ্চসারের যতীন দত্তের সঙ্গে (মুন্সীগঞ্জ ভাগ্যকুল স্কুলের ভূতপূর্ব হেড মাষ্টার) আলাপ আছে। সুরেশ মজুমদারের কাছ থেকে ৫০টা টাকা ধার করলুম এবং যতীন দত্তকে সঙ্গে নিয়ে সত্যানন্দ বাবুর বাড়ী গিয়ে আগাম একমাসের ভাড়া ১০০ টাকা জমা দিয়ে পকেট খালি করে ঘরের চাবি নিয়ে এলুম।

সাবুদা অবাক হয়ে আমার কাণ্ড দেখছিল। আমার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস,—সেই বিশ্বাসের জোরেই সে আমার পিছন পিছন বিপ্লবের পথে চলার জন্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল। তাকে আমার প্ল্যান বললুম,—একটু দেখে শুনে মাল কিনবো, মিস্ত্রীর খরচ এক পয়সাও করবো না; আমি ছুতোর মিস্ত্রী, তুমি পালিস মিস্ত্রী, দুজনেই দুজনের কাজে সাহায্য করবো, আমি বাইরে ঘুরবো, তুমি থাকবে দোকানে, এখানেই রেঁধে খাবো, যত সংক্ষেপে পারা যায়। সে বুঝলো, সায় দিলো, "ব্রাহ্মণ মেস" ছেড়ে ঘরের জিনিস ক'টা নিয়ে দোকানে উঠলুম।

ভাতে-ভাত একদিন রেঁধে দুদিন খাই, দ্বিতীয় দিনে ফুলুরী কিনে গুঁড়িয়ে তেলনুন মেখে নিই। ক্রমে এক এক দিন তৃতীয় দিনেও জল দেওয়া ভাত থাকে, ভাতগুলো আধ-পচা ভাঙাভাঙা, জলটা নাল-হড়হড়ে। সেগুলোকে টাটকা জলে দু-তিনবার ধুয়ে নিয়ে তেল-নুন দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে ফুলুরী দিয়ে খাই।

হাড়ে হাড়ে দুজনে মিস্ত্রীর কাজ করি। নিজেমে মালকেনা বাড়লো, বিক্রীও বড়লো, ২।১টা করে মাল দোকানেও জমতে শুরু করলো। ৭।৮ মাসের মধ্যেই দোকানও ভরে উঠলো, বিক্রী হাজার টাকায় পৌছলো, দোকান দাঁড়িয়ে গেল রীতিমত Self supporting হয়ে। দুজনার আনন্দ হল, নিজেদের ওপর ভরসা ও বিশ্বাস বাড়লো। এতদিনে '২৮ সালের মাঝামাঝি এসে পড়েছি।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে একটা নতুন কাণ্ডের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ১৯২০ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড এক পাঁপ স্বরাজ দেওয়ার সময় ঘোষণা করেছিল, ১০ বছর অন্তর অন্তর নতুন নতুন এক এক পাঁপ স্বরাজ দেওয়া হবে। সুতরাং ৩০ সালে পরবর্তী শাসন সংস্কারের কথা। তারই ব্যবস্থা করার জন্তে বৃটিশ সরকার '২৭ সালে এক রয়েল কমিশন তৈরী করলেন—Simon Commission. তাঁরা ভারতে এলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি, সম্প্রদায়, নেতা প্রভৃতির মতামত এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা ও বিবেচনা করে, '৩০ সালের শাসন সংস্কারের মূলনীতি নির্ধারণ করে কাঠামো বেঁধে দেবেন। কংগ্রেস সে কমিশন বয়কট করলো কারণ তার মধ্যে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না।

এই রকম এক কমিশন '২২ সালে ইজিপ্টের শাসন সংস্কারের জন্ত তৈরী হয়েছিল, বোধহয় Milner Commission মিশর-বাসীরা তাকে এমন সর্বাত্মক ভাবে বয়কট করেছিল যে, তারা ইজিপ্টে গিয়ে কারো তরফের কোন কথা শুনতে পায়নি। তারা যেখানেই যায়, যার কাছেই যায়, সকলেই তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলে, Go to Zoglul. তখন জগলুল পাশা মিশরীদের নেতা।

ভারতে '২০ সালে মণ্টেগুর কাছে সকল দল এবং লোকই দরখাস্ত করেছিল, সাক্ষ্য দিয়েছিল—কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগও যুক্ত মেমোরিয়াল দিয়েছিল। '২৭ সালে সাইমন কমিশনের কাছেও কংগ্রেস ও লীগ ছাড়া আর সকলেই দরখাস্ত ও সাক্ষ্য দিয়েছিল। আর কংগ্রেস তাদের বয়কট করেও, এক কমিটি তৈরী করেছিল, Nehru Committee, আগামী শাসন-সংস্কারে কি রকম ব্যবস্থা হলে কংগ্রেস ও ভারত সন্তুষ্ট হবে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে রিপোর্ট দেওয়ার জন্ত। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সে কমিটির সভাপতি—আর সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়স্ক ছিলেন সোয়ায়েব কোরেশি আর সুভাষ বসু।

'২৮ সালের গোড়ায় সে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল, অবশ্য প্রধানত সাইমন কমিশনকেই দাবী জানানোর জন্ত, যে দাবীর মূল

কথা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস। স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম সুভাষ বসু। বোঝা গেল, কংগ্রেসের creed যে স্বরাজ, তার প্রকৃত অর্থ ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এবং সেটা বিপ্লবীদাদাদেরও অনুমোদিত। তা না হলে হয়ত সুভাষ বাবু একটা note of dissent দিয়ে বসতেন।

এদিকে জহরলাল নেহেরু '২৭ সালের শেষেই ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন এবং বিলাতের বামপন্থী শ্রমিকনেতা ফেনার ব্রকওয়ে কর্তৃক সংগঠিত League against Imperialism এর সদস্য হয়ে, এবং সোভিয়েত রুশিয়া সফর করে ফিরে এসে একটু বেসুরো কথা বলতে সুরু করেছেন,—Independence এবং Socialism.

বোধহয় '২৮ সালের গোড়ার দিকেই মনোরঞ্জনদা (গুপ্ত) মুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ওপর একটা নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়েছিল যে, তিনি কলকাতা হাওড়া এবং ২৪ পরগণা জেলার সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। সেজন্য তিনি হুগলী বিদ্যামন্দিরে এসে বাস করছিলেন। গান্ধীবাদী নগেন মুখোপাধ্যায় এবং গৌরহরি সোম তখন হুগলী বিদ্যামন্দিরের নেতা, এবং তাঁদের সঙ্গে মনোরঞ্জন দার খুব খাতির জমেছিল কংগ্রেসের কাজের মধ্য দিয়েই। আমি এবং আরো অনেকে কলকাতা থেকে তাঁর কাছে যেতুম।

এমনি একদিন সন্ধ্যার পর হুগলী বিদ্যামন্দিরের দরজা থেকে ইমামবারার পাশের রাস্তা দিয়ে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত দুঘণ্টা পাইচারী করতে করতে তাঁর সঙ্গে নানা কথা হল। আমি সুভাষ বাবুর মতিগতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করলুম। তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, সব ঠিক আছে। আমি শেষ পর্যন্ত বললুম, বোঝাতে এলে তর্ক করবো—তার চেয়ে হুকুম জারি করুন, সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে পারবো না, আমি নিরস্ত হব। তিনি বললেন, বেশ, তাইই হোক।

দোকান দাঁড়িয়ে গেছে বলে আমার দুঃসাহসও বেড়ে গেছে। অ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর তেতলায় ফোটো আর্টিষ্ট সি গুহের ঘরের পাশে একটা অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর অফিস ছিল, সেটা উঠে গেল দেখে ৩৫৲ টাকা ভাড়ায় সে ঘরও নিলুম। অজুহাত গুদাম করবো, কিন্তু বাস্তবে সেটা হল গোপন কথা-বার্তার জায়গা, এবং তার সঙ্গে অবশ্য কিছু মালও থাকে, এবং রান্না খাওয়ারও সেখানেই ব্যবস্থা হল।

ক্রমে দাদারা সকলে ফিরে এলেন। যাদুদাকে রাঁচিতে extern করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেখানে যাওয়ার আগে কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় থাকার অনুমতি পেয়েছিলেন। সেই সুযোগে সকল বিপ্লবী দলের amalgamation এর জন্যে নেতৃ সম্মেলনের ব্যবস্থা হল গোপনে, এবং আমার ঐ ঘরে। অ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর পাশের গলিতে একটা দরজা এবং সিঁড়ি ছিল। আমি গলির মুখে দাঁড়ালুম, এবং নেতারা একে একে আসতে লাগলেন এবং আমি তাঁদের ঐ দিক দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতে লাগলুম।

পর পর তিন দিন ধরে ঐ ভাবে সম্মেলন চললো এবং মিলন হয়ে গেল। অনুশীলনের তরফে প্রতুল গাঙ্গুলী, রবী সেন প্রভৃতি, যুগান্তরের যাদু'দা, মনোরঞ্জন'দা ভূপতি'দা প্রভৃতি, যুগান্তর দলের সহযোগী বিপিনদার দলের বিপিন'দা, গিরীন'দা প্রভৃতি, পূর্ণ দাশের দলের পূর্ণ দাশ এবং আরো ২।১ জন, এমনি করে প্রায় জন কুড়ি নেতা সকল বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করে সকল অবিশ্বাস সন্দেহের নিরসন করে' সর্ববাদী সম্মত মিলন হয়ে গেল। আমি অবশ্য বরাবরই বাইরের গার্ড, escort এবং হুকুম বরদার থাকলুম। ভরসা হল, আনন্দ হল, একটা নতুন যুগের সূচনা হল।

এই অ্যামেলগ্যামেশনের মধ্যে উপেন'দা এবং অমরদাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, কারণ প্রথমত, তাঁরা সেনগুপ্তের সমর্থকদের চাঁই, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা ছিলেন হিন্দু মহাসভা-ঘেঁষা। তা ছাড়া উপেনদাকে তো যুগান্তরের দাদারা আগে থেকেই খরচের খাতায় লিখেছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে অমরদাকেও। অ্যামেলগ্যামেশনের মধ্যে অনুশীলনের দাবী ছিল, কমিউনিষ্টদের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখা চলবে না, কারণ অবনী মুখার্জি ও নলিনীগুপ্তকে দলে নিয়ে তাদের মারফৎ রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁদের কিছু আক্কেল হয়ে গিয়েছিল। অহেতুকী, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বতঃস্ফূর্ত আদিম কমিউনিজম-বিরোধিতা ঐ দুই political adventurer এর পাল্লায় পড়ে আরো উৎকট হয়ে উঠেছিল। যুগান্তর ও সংশ্লিষ্ট দাদারাও অনায়াসে এবং মনে প্রাণে সে দাবী মেনে নিতে পেরেছিলেন তাঁদের কমিউনিজম-বিরোধী বৈপ্লবিক আদর্শের কল্যাণেই। সুরেশ দাস এই সময় কর্মীসংঘ ছেড়ে দাদাদের মধ্যেই ফিরে এসেছিলেন।

জীবন তখনও টি বির আক্রমণের সন্দেহে সরকারী ব্যবস্থায় আলমোড়ায় রয়েছে। হঠাৎ একদিন কাগজে খবর দেখা গেল, তার কাশের সঙ্গে রক্ত পড়ছে, জ্বর চলেছে, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ। দাদাদের তরফ থেকে একজন লোক পাঠানোর ব্যবস্থা হল, এবং মনোমোহন ভট্টাচার্য আমাকে যাতায়াতের খরচের টাকা এনে দিলেন, আমি গেলুম আলমোড়ায়। গিয়ে দেখলুম, অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ বটে, কিন্তু আমরা যতটা আশঙ্কা করেছিলুম ততটা নয়। মা এবং বাদল (ছোট ভাই প্রফুল্ল চ্যাটার্জি) সঙ্গে আছে। ভয়ের কিছু নেই।

সেই প্রথম শুনলুম, পাহাড়ী ডাক্তার জ্বর হলে ভাত খেতে নিষেধ করে, বলে, খিচড়ী খাইয়ে! আর সেখানে দেখলুম প্রভাসকে—সে বার্মায় ছিল, কাগজে জীবনের খবর পড়ে' সেখান থেকে দেখতে এসেছে।

তার কাছে শুনলুম, আমাদের মুন্সীগঞ্জের এক সহকর্মী তার মাতব্বরীর position দেখে ঈর্ষা ও বিদ্বেষবশত তার নামে নানা অকথা-কুকথা প্রচার করে' তার এমন অবস্থা করেছিল যে, কর্মী-সংঘের সংশ্রব ছেড়ে তাকে পালাতে হয়েছিল, এবং দেশত্যাগের জন্যই সে বার্মায় গিয়েছিল।

আমি বললুম, আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে চল, দোকান নিয়ে থাকবে, কারো সঙ্গে মিশবে না, আমার কাছে কিছুদিন চুপ করে থাকলে ও সব কথা আপনি die out করবে। তাই ঠিক হল, আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরলুম।

তারপর একদিন মুন্সীগঞ্জের সেই বন্ধুটির সঙ্গে একান্তে বসে' প্রভাসের কথা পাড়লুম। যে সব ঘটনা নিয়ে তিনি বিগড়েছিলেন, সেগুলো শুনে আমি তার ব্যাখ্যা করলুম, এবং বললুম, এ ব্যাখ্যা কি অসম্ভব? তিনি একটু ভেবে বললেন, এরকমও হতে পারে, আমি এভাবে ভাবিনি। যাই হোক, প্রভাস দোকানেই থাকলো, এবং আস্তে আস্তে তার ওপর লোকের আস্থা ফিরে এল।

ওদিকে জহরলাল ইউরোপ থেকে আসার পর এলাহাবাদে এক নতুন সংগঠন আরম্ভ করলেন—Independence League,

তখন ডক্টর কানাই গাঙ্গুলী সেখানে ছিলেন, জহরলাল তাঁর ওপর ভার দিলেন, বাঙলায় Independence League-এর শাখা সংগঠনের, এবং তিনি কলকাতায় এসে দাদাদের কাছে তদনুযায়ী প্রস্তাব করলেন। তিনিও সোসিয়্যালিজমের কথাই বলতেন।

দাদারা সুভাষ বাবুকে 'অল-ইণ্ডিয়া' ক্ষেত্রে বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে খাড়া করার প্ল্যান নিয়ে কাজ করছিলেন। সুতরাং জহরলালের নেতৃত্বে সুভাষ বাবু কাজ করবেন এ তো হতে পারে না। ফলে দেখা গেল, কলকাতায় এক নতুন স্বাধীন সংগঠন হল Independence for India League, Bengal. কিরণশঙ্কর রায়কে করা হল সেক্রেটারী। কানাই বাবু সরে পড়লেন।

'২৭ সালে চীনে কমিউনিষ্টরা এক বিদ্রোহী সরকার গঠন করে ফেলেছিল, এবং কুয়োমিনটাং সেনাপতি চিয়াং কাইশেক সে বিদ্রোহ দমন উপলক্ষে সাংহাই সহরে হাজার হাজার বিপ্লবী অবিপ্লবী শ্রমিককে হত্যা করেছিল। এম এন রায় তখন চীনে উপস্থিত ছিলেন, এবং অসময়ে বিপ্লব ও তার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী করে কেমিণ্টার্ণ থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তিনি বলেন, এ সবের জন্য দায়ী বোরোডিন, যিনি কোমিণ্টার্ণের পক্ষ থেকে বহুকাল ধরে সেখানে কাজ করছিলেন।

এ Controversy-র কথা এখানে অবান্তর। শুধু এই কথাটুকু বলা দরকার যে, ভারতের কমিউনিষ্টরাও অতঃপর তাঁকে বর্জন করলেন, কিছু বদনাম রটাতে লাগলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসেও তার নামটা সম্পূর্ণ Black out করলেন।

'২৮ সালে ভগৎ সিং প্রমুখ কয়েকজন তরুণ এক 'নওজোয়ান ভারত সভা' সংগঠন করেন—বৈপ্লবিক সংগঠন, যার মধ্যে বোমা বন্দুক এবং সোসিয়্যালিজমের আদর্শ দুইই ছিল। জেলে যতীন দাশের ইতিহাস বিশ্রুত অনশন এবং ৬৩ দিন ধরে তিলে তিলে সজ্ঞান মৃত্যুবরণও এই সময়েই। [ক্রমশঃ।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো

১৯৫৭ সালের ২১শে অক্টোবর এলগিন রোডের 'নেতাজী-ভবন'-এ আজাদ-হিন্দ এমব্যুলেন্স সার্ভিসের সমাজ-শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে রিসার্চ ব্যুরোর কার্য্যারম্ভ হয়। ব্যুরোর উদ্দেশ্য হল :—(১) নেতাজীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়বস্তু সংগ্রহ, (২) সংগৃহীত বিষয়বস্তুর উপর সুসংবদ্ধভাবে ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় গবেষণা, (৩) নেতাজী-ভবনে নেতাজী archiles গড়িয়া উপযুক্তভাবে এইগুলি সংরক্ষণ, (৪) নেতাজীর বিভিন্ন লেখা ও আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ প্রকাশের ব্যবস্থা, (৫) নেতাজীর সম্পূর্ণ ও উপযুক্ত জীবনী প্রকাশের প্রয়োজনীয় পটভূমিকা।

কার্য্যকরী ভাবে ব্যুরোর সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা ও ইহাকে সুপরিচালনার জন্য বিশিষ্ট জননেতা, শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক ও নেতাজীর সহযোগী সহকর্মীদের প্রায়শ: আমন্ত্রণ জানান হয়। ব্যুরোর উপদেষ্টা বোর্ডের মধ্যে আছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, অতীন্দ্রনাথ বসু, জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার, হরিবিষ্ণু কামাথ, লীলা রায় ও শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল। ইহাতে যোগদানের জন্য আরও অনেকের সহিত পত্রালাপ চলিতেছে।

রিসার্চ ব্যুরোর বিভাগ কয়টি এইরূপ :—(ক) অভ্যর্থনা, (খ) বাছাই ও সম্পাদনা, (গ) ফটোল্যাবরেটরী (প্রধানত: মাইক্রোফিল্ম কাজের জন্য), (ঘ) আর্কাইভস, (ঙ) নেতাজী গ্রন্থাগার, (চ) প্রকাশনা, ইনফরমেশন, লেকচার ফোরাম ও প্রদর্শনী বিভাগ। অনেক চিঠিপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল ইত্যাদি রিসার্চ ব্যুরো মাইক্রোফিল্ম করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। নেতাজী ভারতে ও বিদেশে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করেছেন, সেগুলি সংগ্রহ করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। সংগৃহীত জিনিষগুলি নেতাজী-ভবনে চিরস্থায়ী করে রাখার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

নেতাজীর জীবনী সংক্রান্ত বিষয়বস্তু সংগ্রহে নিম্নলিখিত ধারা গ্রহণ করা হইয়াছে :—(১) ১৮৯৭ সালের (অর্থাৎ নেতাজীর জন্মগ্রহণের বৎসর) পূর্ব্বের ২৫ বৎসরে ভারতের সমাজ ব্যবস্থা, (২) তাঁহার পারিবারিক ইতিহাস, জন্ম ও শৈশবকাল, (৩) বাল্য ও যৌবনকাল (১৯০২-২০), (৪) জাতীয়কর্ম্মে উদ্যোগী (১৯২০-২৬), (৫) যুবসমাজের নেতৃত্ব (১৯২৬-৩০), (৬) জাতীয় রাজনীতিতে প্রথমকাল (১৯৩০-৩৩), (৭) বিদেশে প্রথম রাজনৈতিক দৌত্য (১৯৩৩-৩৬), (৮) জাতীয় নেতৃত্ব গ্রহণ (১৯৩৭-৪০), (৯) ভারতবর্ষ হইতে মহান নির্গমন (১৯৪১) ও (১০) ইউরোপ ও এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ আন্দোলনের প্রসার (১৯৪২-৪৫)।

চিঠিপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে রিসার্চ ব্যুরো যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তাহা খুবই সুন্দর হয়েছে এবং দেশে ও বিদেশে জনসাধারণের কাছে সাড়াও পাওয়া গিয়াছে। এর ফলে ব্যুরোর হাতে এসে পড়েছে বহু ছবি ও দলিল। মাইক্রোফিল্ম করে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নেতাজীসম্পর্কে দেশী ও বিদেশী লেখকদের প্রায় শতাধিক বই এঁদের গ্রন্থাগারে আছে। এ ছাড়া ব্যুরোর পুরাতন ও সাম্প্রতিক খবরের কাগজের কাটিং-এর সংগ্রহটিও বেশ ভাল। যে গাড়ী করে অন্তর্ধানের সময় নেতাজী কলিকাতা থেকে গোমো পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, সে গাড়ীটি নেতাজী-ভবনে কাচের আবরণে দ্রষ্টব্য হিসাবে রাখা আছে। তাঁর নিজের লেখা ও বক্তৃতার সংগ্রহটি খুবই ভাল হয়েছে—রিসার্চ ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে। ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালে নেতাজীর নিজের হাতে সই করা একখানা 'হুকুমনামা' ব্যুরোর হাতে এসেছে। অনেকে এই সমস্ত সংগ্রহ নিজেদের পড়া ও গবেষণার জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

একটি চিরস্থায়ী মিউজিয়াম প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে খুলিয়া ক্রমশঃ উহার পরিসর বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করছেন রিসার্চ ব্যুরো।

রিসার্চ ব্যুরোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্মীদের উদ্যম, অধ্যবসায় ও সততার সহিত দেশবাসীর আন্তরিক তৎপরতা মিলিত হলে ইহা এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে বেশী বিলম্ব হবে না। ব্যুরোর আর্থিক সঙ্গতি উল্লেখযোগ্য নয়—কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেশবাসী নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সহিত অনেক বেশী সহযোগিতা করুন—ইহাই কাম্য।

পরিবর্ত্তন

পটল বাবুর মেস। অনেকেই সেখানে থাকে। আমি থাকি, বিজয় থাকে, ভোলাও থাকে। আমরা এক ঘরেই থাকি। বিজয় ভোলা চাকুরী করে। আমি বেকার। বেকার আমি তিন বছর। টিউশনিতে পেট চলে। সন্ধ্যে সকাল চক্রবর্ত্তী বাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াই। গোটা চল্লিশেক টাকা মাসে হাতে আসে। ওরই ভেতর থাকা, খাওয়া, কাপড় চোপড়, পান, চা সবকিছু। কষ্ট করেই চলতে হয়। সকালে চায়ের নেশা। শুধু এক কাপ চা। দোকানটা একটু দূরে। ভুবনেশ্বর মটর ষ্ট্যাণ্ডটার কাছে। মেস থেকে, কিছুটা পথ হাঁটতে হয়।

সোজাই হাঁটতে হয়। একটা মোড়। চৌরাস্তার মিতালি। কোনের বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে সরকারি পুলিশ ট্রাফিক কন্‌ট্রোল করে। তারপর বাঁ দিকে ঘুরতে হয়। ঘুরতেই দোকানটা, তেমন বড় নয়, আবার একেবারে ছোটও নয়। চালু চায়ের দোকান। তবে সাইনবোর্ড নেই। ভাজাভুজি, মিষ্টি, জলখাবার সবই পাওয়া যায়। বরাবরই এখানে আমি এক কাপ চায়ের খদ্দের। এর ওপরে এগুবার সাধ্যি আমার নেই। আর ভাগ্যি জোরে এগুলে বড় জোর একটা চালু সিঙ্গাড়া নয়ত জিলিপি পর্য্যন্ত। তবে রোজই যাই।

পয়সা জুটলে কোন কোন দিন বিকেলের দিকেও এক একবার ঢুমারি। দোকানের মালিক রঘুনাথ সরকার। বাঙালী। মহাজন টাইপের লোক। রোজ সকালে তাঁর সাদর অভ্যর্থনা। আরে আসুন, আসুন, আপনাদেরই দোকান। ওরে টেপা, বাবুর জন্য এক কাপ চা নিয়ে আয়…টেপাও হাঁক ছাড়ে, 'এক্ চালু…'

ঐ চালু চায়ের খদ্দের সেজে মিনিট পাঁচেক ইলেকট্রিক পাখার ঠাণ্ডা হাওয়া খায়। সেই সাথে রোজকার ইংরিজি কাগজটাতেও চোখ বুলোয়। কাগজের অন্য খবরে আমার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। শুধু সিচুয়েশন 'ভ্যাকেন্টে'র কলমটাই দেখি। রোজই দেখি। এ কলমের প্রতিটি লাইন মন দিয়ে পড়ি। খালি চাকুরীর খবর ঝটপট টুকে রাখি। তারপর মেসে ফিরে পিটিশন ঠুকি, ঐ পর্য্যন্তই। বিজ্ঞাপনদাতারা দয়া করেও কোনদিন খবর দেন না। তবু পত্রিকা দেখি, চাকুরী খালির খবর পড়ি। রোজই পিটিশন ঠুকি, দিনগুলো কোনমতে কেটে চলে।…

বছর খানেক হয়ে গেছে, একটা চাকুরী পেয়েছি। তা-ও কিন্তু ঐ দোকানটায় পত্রিকারই সৌজন্যে, কেরানীর চাকুরী। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট আপিসে দশটা পাঁচটা কলম পেশার কাজ। মন্দ নয়। মাইনে একশো পাঁচ টাকা। এখনও পটল বাবুর মেসেই থাকি, তবে চায়ের দোকানটাতে আর যাওয়া হয়না, চালু চা সিঙ্গাড়ার স্বাদও প্রায় ভুলতে বসেছি।…বেকার জীবনের রোজনামচাটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। রোজকার সেই এক কাপ চা, সরকার মশাইয়ের চায়ের দোকানটা, টেপার হাঁক-ডাক্ সবই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

পুরোনো দিনের স্মৃতিসব, ভুলবার নয়, ভুলতে আমি চাইও না। রোববার সকালে গেলাম দোকানটায়। বটতলা পেরিয়ে মোড় ঘুরতেই দোকানটা দেখা যাচ্ছে। সরকার মশাই ক্যাশে বসে আছেন। আমার দেখতে পেয়েই একেবারে ছুটে এলেন, আদর করে ভেতরে নিয়ে বসালেন। মনে হলো পুরোনো গ্রাহকটিকে পেয়ে তিনি খুশীই হয়েছেন। কাপড়-চোপড়ের চেহারা দেখেই অবশ্য আন্দাজ করেছিলেন আজকাল কিছু একটা করছি।…আগের মতো আজও হুকুম হলো, 'ওরে টেপা, বাবুর জন্য এক কাপ চা, দুটো সিঙ্গাড়া, চালু নয়, স্পেশাল। গরম জলদি।'

স্পেশাল? বোধগম্য হলো না, হঠাৎ যেন একটা পরিবর্ত্তন মনে হচ্ছে, জীবনভোর চালু চা সিঙ্গাড়া খেয়েছি। আজকে হঠাৎ স্পেশাল কথাটা শুনে একটু অবাক হলাম।…স্পেশাল চা সিঙ্গাড়া এলো, সত্যিই স্পেশাল! অপূর্ব চা! সিঙ্গাড়া দুটোও বেশ বড় সাইজের। খেতে চমৎকার লাগছে, চালু জীবনে প্রথম স্পেশালের আস্বাদ। আগেও কয়েকবার সিঙ্গাড়া এ দোকানে খেয়েছি, তবে স্পেশাল নয়। জিজ্ঞেস্ করে জানলাম স্পেশাল সিঙ্গাড়া 'ডাল্‌ডা'য় ভাজা! 'সরকার মশাই তা'হলে 'ডাল্‌ডা'র ভক্ত'। কথাটা মুখ থেকে লুফে নিয়ে সরকার মশাই শুরু করলেন—'ভক্ত কি মশাই, সাধক বলুন। নিজেইতো দেখেছেন 'ডাল্‌ডা'র ভাজাতে সিঙ্গাড়ার স্বাদ কি চমৎকার হয়েছে।'

কথা পেলে আর যাবে কোথায়, সরকার মশাইয়ের চিরাচরিত স্বভাব। 'আমার বাড়ীর সব রান্নাই ডাল্‌ডা'তে হয়। আর গুণের তুলনায় দামেও খুব সস্তা কিনা'—এক নজর বপুটার দিকে তাকিয়ে নেন রঘুনাথ সরকার। 'এমন জিনিষ আর হয় না।' সরকার মশাই বোধ হয় থামবেন না। বাধা দিলাম না। ছুটির দিন। তেমন তাড়া নেই। তবু এবার ফেরা দরকার। নইলে হয়ত চানের আবার জল পাবো না। 'সব সময় সিলকরা টিনে। ধুলো ময়লা ভেজালের ভয় নেই। তারপর এর প্রতি আউন্সে কোম্পানীর লোকেরা ৭০০ ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'এ' এবং ৫৬ ইণ্টার ন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন 'ডি' জুড়ে দেয়।' এবার কিন্তু কথার মাঝে কথা বলতে হলো। 'ডাল্‌ডা'তো আমি খারাপ বলিনি সরকার মশাই।'

সরকার মশাই মুহূর্ত্তের জন্য থমকে গেলেন। 'ওহো, তা'হলে আপনিও 'ডাল্‌ডা'র ভক্ত বলুন, একা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন কেন!' হোঃ হোঃ হাঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন রঘুনাথ সরকার। ভাবখানা একেবারে যেন যুদ্ধ জিতে এলেন। আমাকেও হাসতে হলো, সরকার মশাই এখনও তবে আমার অবস্থা বুঝতে পারেননি। মেসের হাল হকীকৎ তাঁর জানা নেই। পাঁচুর রাঁধা ডালের কথা মনে হলে, চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। শুধু এক বাটি জল, ডালও নয়। গামছা দিয়ে ছেঁকলেও হয়ত ডালের দানা পর্য্যন্ত পাওয়া যাবে না।…

যাক্‌গে সে কথা। পাঁচুর ও দোষ নয়। দোষ আমাদের ভাগ্যের। চোখের ওপর কত পরিবর্ত্তন দেখছি। পথ-ঘাট, ঘর-দোর, লোকজন সবই পাল্টাচ্ছে। সরকার মশাইয়ের দোকানটারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমাদের এই এক ঘেঁয়ে জীবনটাতে কি পরিবর্ত্তন আসবে না? এ প্রশ্নের জবাব মেলা ভার।…

স্পেশাল চা সিঙ্গাড়ার দাম চুকিয়ে মেসের পথ ধরলাম। ধীরে ধীরে দোকানটা বটগাছের আড়ালে চলে যাচ্ছে। মোড় ঘুরলাম, এবার সোজা পথ। একটু পরেই পৌঁছে যাবো, মাথায় আজ নানা চিন্তা উঁকি মারছে…আশায় আছি। একদিন এ মেস জীবনেও পরিবর্ত্তন আসবে, হয়ত আমাদের মেসের খাবারও 'ডাল্‌ডা'তেই রান্না হবে।…

অসমাপ্ত ডাইরী। আজ এখানেই শেষ করি…

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

বর্ণালী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

[লেখিকার অসুস্থতা বশতঃ গত কয়েক মাস 'বর্ণালী' প্রকাশিত হয় নাই।—স]

উপন্যাসটি কিছুদিন বন্ধ ছিল, তাই ফের শুরু করবার আগে পূর্ব সূত্রটা একটু ধরিয়ে দিয়ে নিচ্ছি—

রজতের দেওয়া টাকা জয়ার মার হাতে তুলে দিয়ে মঞ্জু নিরুদ্বেগ মনে বইপত্র গুছিয়ে পড়ায় মন দিয়েছিল। যে মেয়ে জানে তাকে কাজ করতে হবে—অনেক কাজ, যে মেয়ে জানে তাকে বড় হতে হবে—অনেক বড়, যে মেয়ে মুখের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসকে কানে কানে বলে যেতে শোনে 'ওগো মেয়ে এগিয়ে চলো' সে মেয়ে আর যে কাজেই ফাঁক রাখুক আর ফাঁকি দিক, পড়ার ব্যাপারে ফাঁক রাখে না ফাঁকি দেয় না। জয়াদের দিকে একটু নিশ্চিন্ত হতে পেরেই বিক্ষিপ্ত মনটাকে মঞ্জু গুটিয়ে নিয়ে এসে নিবিড় করেছিল বই-এর পাতায়। কিন্তু ওর গ্রহযোগটাই বোধ হয় এমন চলছিল যে তারা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। জয়ার আত্মহত্যা করতে যাবার খবর পেয়ে ফের দৌড়োতে হলো ওকে বইপত্র ফেলে। কিন্তু কেবল দৌড়োদৌড়ি ছোটাছুটি, দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠার উপর দিয়েই ব্যাপারটা যদি মিটত তবুও ভালো ছিল। জয়ার প্রাণটুকুকে শুধু বিপদ সীমা পার করে আনতে যখন ওর অমন নিশ্চিন্ততার টাকা কটা এক সন্ধ্যায় হাসপাতালের হাওয়ায় হাওয়া হয়ে উড়ে গেল তখন এতদিনে সত্যি চোখে অন্ধকার দেখল মঞ্জু। এখন কি করে কি করবে সে? কোথা থেকে সে একদিকে জয়ার হাসপাতালের ওষুধ পথ্যের যোগান দেবে, অন্যদিকে জয়াদের বাড়ীর প্রতিদিনের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে চলবে। না, বাঁচবার উপায় নেই—আগে যাদের বাঁচবার উপায় ছিল না আজও তাদের বাঁচবার উপায় হয়নি। ছুটু বাঁচেনি—নীল, তাকে বাঁচাতে পারেনি। জয়া, জয়, জয়ার মাও বাঁচবে না—সেও তাদের বাঁচাতে পারবে না। সে পাগল—সে পাগল—সে উন্মাদ, তাই এ দুঃসাহস তার হয়েছিল।

ও পালাতো। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে মৌরীর চিলে কোঠার দরজা সেঁটে দিত। কারু সাধ্য ছিল সেখান থেকে ওকে টেনেও কেউ বের করে আনতে পারে। ও জানতো না জয়ার চিকিৎসা হচ্ছে কিনা—অনাহারী ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসে জয়ার মা ওর পায়ের শব্দের জন্য পল-দণ্ড গুণছেন কিনা। ও জানতো না ওর বাকী রেখে আসা ওষুধের বিল নিয়ে মমতা কি করল আর ওকে। কি ভাবলো ও জানতো না জয়া হাসপাতাল থেকে রক্তশূন্য রোগা দুর্বল পায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ওকে খুঁজত কিনা। ওকে না দেখে ওর ফ্যাকাসে মুখের সাদা ঠোঁট দুটো থরথর করে কেঁপে উঠত কিনা। যদি ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে সে গ্রাস ওর গলা দিয়ে নামতে না চাইতো, যদি তা উগরে ফেলে দিতে হতো তবু না—তবু সে ঘরের দরজা খুলত না, কিছু জানত না। কিংবা হয়ত ওর কানে এগিয়ে চলার বাণী বয়ে আনা বাতাসকে ওর রুদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিত। তারপর আঁচল দিয়ে কপালের স্বেদবিন্দু মুছত। কি যে সে করত আর কি যে সে করত না কে জানে, যদি না 'রজত আছে' এই একটা কথা ওর ভেতর মনে অন্তঃসলিলা নদীর মতো বইতে না থাকত।

অবশ্যি শুধু যে ঐ সেদিনের টাকা দেওয়ার জন্যই রজতের উপর এতটা ভরসা ও মনে মনে পোষণ করছিল তা নয়। রজতের বহু বিদেশিনী বান্ধবী আছে। তারা যদি কেউ বাংলা শিখতে চায় এবং রজত তাকে তেমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেয় তবে তার অশেষ উপকার হয় শুনে রজত বলেছিল, সে নিশ্চয়ই দেখবে। তার বই খোঁজ নিতে মঞ্জু এর মধ্যে আরো কয়েক দিন আসা যাওয়া করেছে রজতের কাছে। আর এই যাওয়া আসার ভেতর দিয়ে মানুষটি সম্বন্ধে ওর মনে যে ধারণটা গড়ে উঠেছে সেটা সুন্দরও বটে, প্রীতিপূর্ণও বটে। লোকটি বুদ্ধিতে ব্যবহারে আন্তরিকতায় উজ্জ্বল। এঁর কাছে এসে বসে সময় ভালো কাটানো যায়। এঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। বিনা দ্বিধায় এসে হাজির হওয়া যায় প্রয়োজনে—একটি মানুষকে বন্ধু বলে গ্রহণ করার জন্য আর কী চাই? বিশ্বাস?

হাঁ, বিশ্বাস বলে একটা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু আছে বৈ কী। প্রেমে প্রীতিতে ভালোবাসায়, কাজে কথায় আন্তরিকতায় যা মনুষ্যত্বের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল—একজনকে যে চেহারায় দেখছি, যে ভাবে চলছি তার যে ব্যবহারটুকু আমাকে তার কাছে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে হাজির করে দিচ্ছে সেটুকুর ওপরও নির্ভর থাকা চাই বৈ কী। কিন্তু বিশ্বাসের প্রতি কোন অবিশ্বাসই এখন পর্যান্ত ওর মনে গড়ে ওঠেনি। এ বয়সটাই হলো মঞ্জুদের বিশ্বময় বিশ্বাসের বাতাস বইতে দেখার। মৌরী ওকে রজত সম্বন্ধে যতই অবহিত করুক, মঞ্জু রজতকে সুজন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

আর রজতের মঞ্জুকে ভাল লাগার বোধ হয় কোন সীমা ছিল না। মঞ্জু যেন তার কাছে এক অপরিচিত বিস্ময়। মঞ্জু এলে জোর করে ধরে রাখত সে তাকে। আর কথার পর কথা তুলে শুনত কেবল মঞ্জুর কথা। কোন কথা আজ আর বাকী নেই মঞ্জুর যা রজতের শোনা না হয়ে গেছে। ছোড়দা বড়দা বৌদি থেকে মৌরী সুদর্শন নীল কেউ আজ অপরিচিত নয় রজতের কাছে—অপরিচিত নয় জয়া, জয়, জয়ার মা। ছোড়দার বিয়ে ভাঙ্গার কাহিনী শুনে গেছে সে চুপচাপ সিগারেট খেতে খেতে। মমতার রূপের কথা শুনে চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে একটু মুখটেপা হাসি হেসে বলেছে, আচ্ছা! মৌরী সুদর্শনের গল্প শুনতে শুনতে সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার আর আসবে না? তোমার তাই মনে হয়। দিদির মৃত্যু সংবাদ যে

নিঃ· তা সে বুঝবে কি করে, ভাববে কি করে? কতটুকু বোঝ তুমি ন? আমি বলছি, দেখো ডাক্তার ঠিক একদিন এসে উপস্থিত হবে। আচ্ছা, আমার কথা তোমার দিদিকে বলেছ?

—বলেছি। কি বলেন তিনি আমার বিষয়ে?

হেসে উঠেছিল মঞ্জু।

—এমন করে হেসে উঠলে যে?

—এমনি।

—ওঃ, লোকটি আদবেই পছন্দ করেন নি বুঝি? তা গল্প যা শুনলাম তাতে আমাকে তার পছন্দ হবার কথাও নয়। তুমি যে আমার এখানে আস এ কথা তিনি জানেন?

—না, জানেন না।

—জানলে আসতে দিতেন না?

—বাধা দিতেন।

—তোমার দিদি তো তোমার ভীষণ প্রিয়?

—ভী-ষ-ণ।

—তবে—তবে তার কথা শোন না কেন?

—যতই প্রিয় হোক আর যতই ভালবাসা থাক একজনের সব কথা আর একজন কিছুতেই সব শুনে চলতে পারে না বলে।

—তবে তুমি তোমার দিদির অবাধ্য হয়েই এখানে আস?

—কিছুটা—

—আই অ্যাম লাকি!

নীলের কথা শুনতে শুনতে কৌতুকে কৌতূহলে আর ঔৎসুক্যে ঝকঝক করে ওঠে রজতের চোখ—নীল ধনীর লেখা লিখে দেয়। কাজটা সে এত খুশী মনে করছে যে দেখে দুঃখ হয় মঞ্জুর। নিজের লেখা অপরের নামে দেওয়া—ক্ষোভের কথা নয়? কিন্তু নীল বলে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মূল্যবান সিগারেট টানতে টানতে, মূল্যবান কাপে চা খেতে খেতে নিজেকে তার মনে হয় সম্রাট। অপরের চিন্তা নিয়ে চিন্তা করতে লিখতে পীড়াদায়ক মনে হয় না তার? মঞ্জু জানতে চাইলে জবাব দেয়, তার চাইতেও অনেক বেশী পীড়াদায়ক চিন্তা মনে হয় তার বসে বসে পেটের চিন্তা করা। নীল বলে, নির্বোধ ঘ্যানঘেনে প্রিয়জনের অবুঝ দাবীর মতো নাকি তার একঘেয়ে ঘ্যানঘেনানি। তাকে ঠাণ্ডা না করে উপায় কি অন্য কোন কাজে মন দেয়—

চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে মঞ্জুর কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে ওঠে রজত—ভেরী ষ্ট্রং রাইভেল!

নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক অবতারিত কথা ধরে উঠতে পারল না মঞ্জু। রজতের করুণ করে তোলা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—রাইভেল—মানে?

—রাইভেল মানে প্রতিদ্বন্দ্বী।

—এখানে কথাটা কোথা থেকে এলো?

—শুধু কথা কেন আসবে। ব্যক্তিও আছেন। তোমার কথার ভেতর দিয়ে যাকে দেখতে পাচ্ছি আমি তারই কথা বলছি—কোয়াইট এ পারসোনালিটি।

—তাই বলুন, পারসোনালিটি। রাইভেল বলছেন কেন।

—তা আমি কি করবো বল। তিনি আমার কাছে যে রূপে দেখা দিলেন।

ছট্টুর কথা, তার চার পয়সার বাজেট মিলানোর গল্প শুনে রজত নীরবে। জয়ার কাহিনী শুনেছে মঞ্জুর সামনের প· কুর তিন চার হাতের ভেতর পায়চারি করতে করতে। মঞ্জুর এ খোঁজের ব্যাপারটা এতদিন রজতের বোধগম্যতার বাহিরে ছিল। ওদের বাড়ীর অবস্থা সে জানে। যতীনবাবু মঞ্জুর উপার্জনে নির্ভর নন। এতদিনে মঞ্জুর টাকার প্রয়োজনের রহস্য উদ্ঘাটিত হলো রজতের কাছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলো সে—যে আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?

যত মন দিয়েই শুনে যাক, শ্রোতা কোন গল্পের ভেতর প্রবেশ করছে আর কোন গল্পের বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে, গল্পকারের পক্ষে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ছট্টুর কথা যত হৃদয় বেদনা নিয়েই মঞ্জু বলুক, রজত গভীরভাবে শুনছে শুধু সে বলছে বলে—জয়ার কাহিনী তার অন্তর স্পর্শ করছে ঠিক যেমন একটা সার্থক উপন্যাস আমাদের অন্তরানুভূতিকে নাড়া দিয়ে যায় ঠিক তেমনি—এ বুঝছিল মঞ্জু। কিন্তু সেজন্য রজতের প্রতি ধারণার মান তার নেমে এলো না। কারণ রজতকে সে যা চিনেছিল সে চেনার কোন আঘাত এতে পড়ল না। রজতের 'আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?' জিজ্ঞাসার জবাবে বলল সে—আপনার বিদেশী বান্ধবীদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন।

—আর কি করতে পারি বল?

—আর কি করতে পারেন! সব কথা তো আপনাদের দিকে তাকিয়েই থেমে রয়েছে। না করতে পারেন কি আপনারা।

—আমার করার কথা বলছিনে। আমি ভাই একেবারেই অন্য জগতের মানুষ। তোমার করায় আমি কি কাজে আসতে পারি তাই বল।

—বন্দুক চালাতে জানেন?

একটুও বিস্মিত হলো না রজত মঞ্জুর প্রশ্নে। জবাব দিল—না।

—লড়াই করতে পারেন?

—উঁহু।

—তাও না! একটু যেন ভাবল মঞ্জু। তার পর, আচ্ছা আসুন পাঞ্জা কষে দেখা যাক গায়ের জোরটা আপনার কেমন। সামনের টেবিলটার ওপর কনুই রেখে পাঞ্জা লড়ার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল সে রজতের দিকে। রজত হাত মিলালে এক চাপে তার হাতটা টেবিলে নামিয়ে ফেলে বলল—ভাবছেন বুঝি ইচ্ছে করে হারলেন?

—নয়?

—কখনো নয়। হার—হার ইচ্ছে করে মানুষ তখনই হারে যখন ঠিক জানে হার অনিবার্য।

হেসে উঠল রজত। বললো, আর কোন কারণে হার স্বীকার করে না?

উঁহু। কিন্তু আপনি কি করে আমার কাজে আসবেন বলুন। মানুষের কাজে আসে হয় গায়ের জোর নয় টাকার জোর তো?

—অপর জোরটা পরীক্ষা করে দেখো।

—টাকার?

—হাঁ।

—সেটার পরীক্ষা নেওয়াও আমার হয়ে গেছে।

—বলো কি! সেটার পরীক্ষা নেওয়াও তোমার হয়ে গেছে। কবে হলো? পরীক্ষার রেজাল্ট কি?

—ভালো নয়।

—ভালো নয়! এবার কার কাছে হারলাম গো?

হেসে ফেলল মঞ্জু। বললো—হেরেছেন আমার কাছেই। হার কি এক চেহারার হয়। কোথাও হয় শারীরিক শক্তির কোথাও হয় মানসিক শক্তির। ভাবছেন তো, মেয়েটা বলে কি। এই সেদিন সত্ত সত্ত সাদা চেক সই করে দিলাম, একগোছা টাকা দিলাম আরও দেওয়ার প্রস্তাব বাড়িয়ে ধরে বসে আছি—তা ছাড়াও কত দেওয়া দিতে আপন চোখে মেয়েটা দেখছে—সেই মেয়ে আমাকে এমন কথা বলে! কিন্তু আপনিই বলুন, এগুলো কি কোন শক্ত দেওয়া না শক্তির দেওয়া? টাকার পরিমাণের তুলনায় এমন কিছু অঙ্কের দয়া দান সবাই করতে পারে। আমি পাঁচ পারি—কেউ পারে দশ, আপনি না হয় পারেন হাজার। কিন্তু পারেন দিতে সব?

রজত মুখ খুলতে যাবার আগেই মাথা দোলাতে দোলাতে বলল উঁহু, পারেন না। হাঁ নেও, হুঁ নেও করতে করতে সরে পড়েন।

—সরে পড়ি—

সরে পড়েন না তো কি। মনে নেই সেই সাদা চেক দেওয়ার দিনের কথা? বললাম, যা খুসী অঙ্ক বসাবো? বললেন, বসাও। বললাম, তারপর যে আর আমাকে দেখে দিন ভালো যাওয়ার কথা আপনার মুখে আসবে না। বললেন, আসবে। তুমি রোজ এসো। বললাম, এমনি একটা করে চেক রোজ দেবেন? বললেন, দেবো। তারপর যে দিন পারবো না, তুমি খাওয়াবে আমায়। কিন্তু যেই বললাম, তবে অনর্থক নিত্যদিন চেক কাটার হাঙ্গামাটা রেখে লাভ কি? একবারেই দিয়ে দিন না সব। আজ থেকে আপনার কিছু নয়—সব আমার। শুনে এমন ঘাবড়ানোই ঘাবড়ে গেলেন—ঐ যে বললাম, হাঁ নেও, হুঁ নেও করতে করতে তাড়াতাড়ি দেরাজ থেকে কিছু নোট এনে ব্যাগে ভরে দিয়ে বিদায় করলেন আমাকে—

হাঃ, হাঃ করে সমস্ত ঘর ভরে তুলে হেসে উঠেছিল রজত—ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বুঝি।

কথায় বার্তায় কৌতুকে পরিহাসে এমন একটা মধুর এবং পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক মঞ্জুর সঙ্গে রজতের গড়ে উঠেছিল যে, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এই রাতেও বিনা দ্বিধায় চলে এসেছিল মঞ্জু রজতের এখানে—যদিও এর আগে কখন সে এখানে রাতে আসেনি, এসেছে কলেজে যাবার মুখে। যে সময়টায় রজতের কাছে অভ্যাগতের ভিড় থাকেনা এবং তার দরজায় লটকানো থাকে 'ডোণ্ট ডিসটার্ব' কার্ড। তবু তখন যে কেউ কেউ না এসেছে বা দু'একজন মহিলাকে আসতে বসতে মঞ্জু না দেখেছে তা নয়। কিন্তু সেই আসা যাওয়া বসায় কখনো এমন কিছু দেখেনি যাতে মন বিরূপ করে তোলে; রুচি কুণ্ঠিত হয়। তাই কোন জানান না দিয়ে রজতের ঘরে এসে প্রবেশ করতে তার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি—না, এমন একটা অবস্থার সামনা সামনি হবার জন্ত কিছুমাত্রও প্রস্তুত ছিলনা সে।

তো সংসারে মানুষ কটা ব্যাপার সামলাবার জন্ত প্রস্তুত হবার সময় পায় বা প্রস্তুত হয়ে ঘটনার মুখোমুখি হয়। কটা ঘটনা আগে থাকতে সঙ্কেত দিতে দিতে আসে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের মতো ঘটনার গায় তো কোন ঘণ্টা বাধা থাকেনা। সে জন্ত কিছু নয়। জীবনে আকস্মিকতার যেমন শেষ নেই তেমনি তা সামলাতে মানুষ শিখে ফেলেছে। এই অবস্থায় একমাত্র করণীয় যা ছিল মঞ্জুর পক্ষে সেটাই করছিল সে অর্থাৎ যেমন অজ্ঞাতে প্রবেশ করেছিল তেমনি অজ্ঞাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর ছেড়ে। কিন্তু মঞ্জু যখন দেখল—যে রজত যেমন ছিল তেমনি থেকে শুধু মুখটাকে একটু ঘুরিয়েছিল আগন্তুককে দেখবার জন্ত, ওকে দেখামাত্র সেই রজতের নিবিড় বাহুবন্ধন মুহূর্তে বিকল হয়ে খসে পড়ল মেয়েটির শরীর থেকে তখন চলে যাওয়ায় উদ্যত মঞ্জু হঠাৎ যেন রজতের এই দুর্বলতার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল শক্ত হয়ে।

পরম স্নেহের পাত্রীকে নিজের বেচাল দেখে ফেলতে দেখলে গুরুব্যক্তি দুঃসহ লজ্জায় মরে যেতে যেতে যে ভাবে উল্টো তিরস্কারে তিরস্কৃত করে ওঠে, ঠিক তেমনি ভাবে ওকে তখন বলে উঠল রজত—আঃ মঞ্জু, তুমি এখন এসেছ কেন এখানে! তুমি যাও! তখন মেরুদণ্ড টান করে জবাব দিল মঞ্জু—না।

লাল টকটকে মুখটা আরো লাল হয়ে উঠল রজতের—তুমি যাবে না বলছ?

মঞ্জু তাই বলছে। হাঁ, মনুষ্যচরিত্রের সব চাইতে বড় দুর্বল দিকই বোধ হয় এটা, সে যদি একবার অপরের দুর্বলতার দিকটা টের পেয়ে যায় তবে পুরো মূল্য পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারে না—অনেক বেশী নিয়ে ফেলে।

হুইস্কির বোতল, সোডার বোতল পড়ে রয়েছে। টেবিলে টেবিলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে খালি খালি ওয়াইন গ্লাস। প্লেটে প্লেটে পড়ে রয়েছে ভাজাভুজির ভুক্তাবশিষ্ট। ছাই দান উপচে পড়ে ছাই আর পোড়া সিগারেট নোংরা করে তুলেছে কার্পেট। কোণের দিকে কেসের ভেতর আনকোরা বোতলগুলোর সোনালী রাংতা মোড়া মাথা আছে সারি সারি উঁচু হয়ে। কৌচের ওপর পড়ে আছে গোটা কয় নেটের স্কার্ফ। উচ্ছৃঙ্খল ঘরটার উপর চোখ বুলিয়ে আনতে আনতে মঞ্জুর মুখে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল সে—বসবো।

এক সঙ্গে পা ফেলে চলার মতো মঞ্জুর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রজতের রক্তাভ চোখ দুটোও অস্থিরভাবে ঘুরে এলো ঘরটার ভেতর—খালি বোতল, ভরা বোতল, গ্লাস, প্লেট, মেয়েদের ফেলে যাওয়া স্কার্ফ ওর বিছানার ওপর আধশোয়া মেয়ে—সাদা জরির নাইলনের শাড়ীটা তার দেহের উপর নিয়ন আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে যেন একটুকরো রূপালী রোদের মতো। আর দেখা যাচ্ছে ঠিক যেন নগ্ন দেহের উপর রোদের চাদর টাকা একটা পড়ে থাকা নিরাবরণ দেহ—ছটফট করে উঠল রজত—প্লিজ মঞ্জু, প্লিজ—আমি অনুনয় করছি, ওঠ লক্ষীটি।

শরীরটাকে আরো ছেড়ে দিয়ে বসতে বসতে শান্ত গলায় জবাব দিল মঞ্জু—আমার কিছু কথা আছে।

—না, এখন আমার কাছে তোমার কোন দরকার থাকতে পারে না—কিছু দরকার থাকতে পারে না মঞ্জু। গাড়ী বলে দিচ্ছি, পৌঁছে দিয়ে আসবে তোমায়—ওঠ। হঠাৎ যেন মাথায় নেশাটাকে ঝেঁকে ফেলে দৃঢ় কণ্ঠে আদেশ করল রজত।

কিন্তু আশ্চর্য্য মৃদু একটু হাসির উত্তরে অগ্রাহ্য করলো মঞ্জু তাও।

অসহায় ভাবে ফের তাকালো মঞ্জু মেয়েটির দিকে। ঠিক তেমনি আধ শোয়াভাবে শুয়ে আছে সে। তার এক হাতে সিগারেট। পাশে নিচু সাইড টেবিলের ওপর ওয়াইন-গ্লাস। তখনো সে নিমীলিত চোখে সিগারেটে টান দিয়ে ওপর দিকে ধোঁয়া ছাড়ছে, কখনো মাথাটা ঈষৎ উঁচু করে গ্লাস তুলে নিয়ে তাতে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে। কোন ভাবান্তর ঘটেনি তার। ঘরে সে ছাড়া যে কেউ আছে তাও জানে না সে। একা শুয়ে অলস সময় কাটাচ্ছে সে।

কিন্তু সেটা যে সত্য নয় বোঝা গেল এবার। রজতের অসহায় দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিছানার ওপর উঠে বসল সে। প্রথমে টেবিলের ওপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে হুইস্কিটুকু এক সঙ্গে চক করে ঢেলে দিল গলায়। তারপর গ্লাসটা টেবিলের ওপর ঠক করে রেখে দিয়ে নেমে দাঁড়ালো খাট থেকে। একটু সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে টলমলে শরীরটাকে নিল ধাতস্থ করে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে পড়ে যেমন কার্পেটের ওপর লুটোচ্ছিল তেমনি ভাবে সেটাকে লুটোতে লুটোতেই আসছিল সে রজতের কাছে কিন্তু নিতান্তই স্খলিত আঁচল পায় পায় বিরক্ত করছিল বলেই হয়ত তারপর সেটাকে কাঁধের ওপর তুলে দিল। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল—নাচের টিকিটটার একটু সদ্ব্যবহার করে আসতে যাচ্ছি রজত—কিন্তু কথাটা শুনে এমন সন্ত্রস্তভাবে এগিয়ে এসে তার বাহু চেপে ধরে ওর যাওয়ায় বাধা দিল রজত যে অবাক হয়ে গেল মেয়েটি। রজতের আজকের ব্যবহার প্রথম অবধিই দুর্বোধ্য ঠেকছিল তার কাছে। সেটা আরো একমাত্রা বাড়ল। সে ভেবেছিল, উঠে গিয়ে রজতকে কিছু সাহায্য করতে পারে এবং রজতের অসহায় দৃষ্টি তার কাছে এ কথাটাই বলতে চাচ্ছে—আর উচিত তো সেটাই। রজতের এই আতঙ্কিত বাধার কোন অর্থ বুঝে উঠতে পারল না সে। বলল—বড্ড বেশী খেয়েছ তুমি রজত। কিন্তু আতঙ্কিত হবার কারণ ছিল রজতের।

মাথার জ্ঞান বুদ্ধি বোধ তার তলিয়ে গেছে মদের তলায়। সর্বদেহে বইছে তার ঘনিষ্ঠ নারী সঙ্গের উত্তেজনা; এ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই দুর্দান্ত মাতাল মন নিয়ে সাহস নেই রজতের মঞ্জুর সাহচর্যে বসে থাকে। কারণ রজত জানে, শিশু যেমন আগুন নিয়ে খেলতে ভয় পায় না আগুনকে সে চেনে না বলেই মঞ্জুর অনেক খেলা, অনেক সাহস সেই জাতীয়। মেয়েটিকে হাত ধরে কৌচে বসিয়ে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম চটচটে মুখটা মুছতে মুছতে রজত বললো—তুমি বোস।

কিন্তু রজত হাত ছেড়ে দিতেই ফের উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। বললো—ডোণ্ট বি সিল্লি। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছিনে। শুনলে না ওরা যে বলে গেল—নাইট ইজ স্টিল ইয়াং—বলে ঝরঝর করে হেসে উঠল সে। তারপর দেহের প্রতিটি ভঙ্গির সচেতন আহ্বানে যেন রজতের শরীরময় সাগর তাণ্ডব তোলার ঢেউ খেলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।
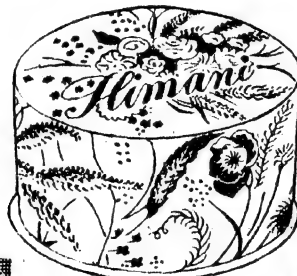
দুই হাতে চুলগুলো মুঠো করে ধরে কিছুক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল রজত। তারপর কৌচে বসে মাথাটা কৌচের পেছন দিকে ফেলে চোখ বন্ধ করল।

মঞ্জু টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখা ওর ব্যাগটা ফের কোলের ওপর টেনে নিয়ে তার ওপর থুতনী চেপে বসে বলল—আচ্ছা। ইরাং না হলে আপনাদের কিছু ভালো লাগে না না? কেন মধ্যরাতটা কম সুন্দর নাকি—আর শেষ রাতটা তো রমণীয়। শেষ রাত যখন বধূবরণের মতো লাল টুকটুকে ভোরের টুকরোটুকুকে বরণ করে তুলে রাজ্যপাট ছেড়ে নিজেকে নিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে থাকে, দেখেননি তো তার সেই উদার বিদায়।

রজত যেমন ছিল তেমনি থেকে ক্লান্ত গলায় বলল—তুমি কি বলবে বল।

কিন্তু কি বলবে মঞ্জু। সে কি কথা বলার জন্য এসেছিল। সে এসেছিল বিশ্রামের জন্য। এসেছিল আর্থিক প্রয়োজনের নিশ্চিন্ততার জন্য। আর এটার জন্য না এলেও পেটের ভেতর এমন একটা দুর্দান্ত ক্ষুধা জ্বলছিল যে, আসা মাত্র রজত যে খাবার ডিসটা এগিয়ে দেয় সেটারও দরকার ছিল। কি সব কথা সে ভুলেই গেছে এখন।

সত্যি এই এক আশ্চর্য বস্তু মানুষের মন। সে যে কখন কি করে, কেন করে তার কিছুই প্রায় সে নিজেই বোঝে না। মঞ্জুও কিছু বুঝে নয়, ভেবে নয়, কি করছে—কেন করছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র চৈতন্য থেকে নয়, শুধু করে যেতে লাগল—কারণ অন্য কিছু সে করতে পারল না। নেশার ঝোঁকে চলার চাইতে কম জোরালো নয়—ঝোঁকের নেশায় চলা।

রজতের তুমি কি বলবে বল সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবে বাকৃপে বলে মঞ্জু ওর পূর্বকথাটা ঝেড়ে ফেলল যে, যেন এসে পর্যন্ত ও তুবার নবীনা রাত্রির স্তুতি শুনেছে বলেই কাসতু কথাটা বলে ফেলেছে। কিন্তু এবারও ওর যে জন্য আসা সেই জরুরি কথা উত্থাপন করছে। কোলের ব্যাগটা ফের টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে মঞ্জু বললো—আচ্ছা, আজকাল নাকি ফোনে ফোনে সব কিছু হয়—হয়?

জবাবে রজত শুধু বলল—বল।

—হয় কিনা তাই বলুন না।

—সব না হোক অনেক কিছু হয়। তুমি কি করতে চাও বল।

মাথা ঝেঁকে উঠল মঞ্জু—আপনি মাথাটা অমনি করে পেছনে ফেলে রাখলে, আমি কি দেয়ালের সঙ্গে কথা বলব।

মাথা তুলে বসল রজত। বলল—বল, ফোনে ফোনে তুমি কি করতে চাও।

—একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে চাই—আজই—এক্ষুনি।

মঞ্জুর কথা শুনে এবার যেন রজতের মনের নেশা ছুটে গেল। বলল—কার বিয়ের?

—আমার।

—তোমার! নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রজত বললো—পাত্র আমি তো?

—অবশ্যই—কিন্তু ঘাবড়াবেন না। আপনাকে আমি হোটেল ছেড়ে গৃহবাসী হতে বলব না। পানীয় ছেড়ে জলপান করতে বলব না। বৈচিত্র্যের জীবন ছেড়ে নীরস একঘেয়ে জীবনে টেনে নিয়ে যাবো না। প্রতিদিন দিনে রাতে সন্ধ্যায় একই মুখ দেখে কাটাতে হবে এমন পীড়াদায়ক শাস্তি কখনোই আপনাকে ভোগ করাবো না—এমন কি আপনার সময়কে আনন্দময় করতে যে বান্ধবীরা আসেন তাদের মর্যাদা মূল্যের ব্যবস্থা পর্যন্ত আমি ঠিক রাখব। জীবন আপনার যেমন ছিল ঠিক তেমনই থাকবে।

—তোমার পার্টটা তবে হবে কি?

—আমার পার্ট? জীবনে একটা যেন রোল অবশ্যি আমি করবো—তবে সেটা এটা নয়। এ ক্ষেত্রে আমার রোলটা হবে একটা সাইড রোল—

—যেমন?

—যেমন—একটু থেমে মঞ্জু বলল, যেমন আপনার অর্থ সম্পদের কিছুটাও যাতে সদব্যয়ে যায় তার তদারক করব আমি। আপনার টাকাগুলোর প্রতি আমার বড় লোভ—ঘরের চারদিকে আবার একবার চোখ বুলিয়ে আনতে আনতে বলল—দেখুন না, সমস্ত ঘর ময় কেবল টাকা উড়ছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছে বুক আগলে পড়ে থাকি।

বহুক্ষণ ধরেই রজতের জিভ গলা শুকিয়ে আসছিল। কিন্তু তবু ওয়েটারকে ডেকে ড্রিঙ্ক চাইল না সে। একটা গ্লাসে কিছুটা জল পড়েছিল, কয়েক টুকরো বরফ চামচে দিয়ে তুলে তার ভেতরই ফেলে দিয়ে গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর কার্পেটের উপর তার অভ্যস্ত হাটাহাটি করতে করতে গ্লাসের ঠাণ্ডা জলে জিভ গলা ভেজাতে লাগল।

মঞ্জু কতটুকু সময় রজতের পায়চারি করা আর জল খাওয়া দেখল চুপ করে। তার পর বলল—আমার প্রস্তাবটা কিছু বিবেচনা করে দেখবেন না?

রজত কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছিল। হেসে ফেলল সে। বলল—তবে বিয়ের আয়োজন করি কি বল?

হাঁপ ছাড়ার মতো একটা নিশ্বাস ফেলল মঞ্জু—যাক বাঁচালেন। আজ আপনি কেবলি আমায় অপমান করে চলেছিলেন। ঐ মেয়েটির কাছে অপমান করেছেন কেবল—চলে যাও, চলে যাও, বলে। এখন করছিলেন বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে। অবিশ্যি এখন ঘরে কেউ ছিল না কিন্তু অপমানটা তো ছিলই। কিন্তু এই প্রস্তাবটা কিন্তু আপনিই আগে করেছিলেন—রজতকে কথাটা শুনে ওর সামনে জিজ্ঞাসু চোখ দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বলল—কেন আপনার মনে নেই, দিদির বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সংবাদ সে রাত্রে দিতে এলে, আপনি আমার বিয়ে ভেঙে গেছে ভেবে কি বলেছিলেন? বলেছিলেন—ধরো লগ্ন বয়ে গেল, বর এলো না। সবার অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলো কন্যা বেনারসির ওড়নায় মুখ ঢেকে। তারপর তরিংপায় পথ পার হয়ে তার চন্দনে কুমকুমে সাজানো মুখ আর কাজলটানা চোখ দুটি তুলে দাঁড়ালো এসে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে, মনে নেই?

মনের মধ্যে মোহ ধরে আসছিল রজতের। কিন্তু মোহ সৃষ্টি করবার জন্য মঞ্জু কোন কথাই বলছে না। মোহ টিকতে দিবে কেন মঞ্জু? তার কথার রেশ টেনে বলে যেতে লাগল—ধরুন আজকের রাতটাই সে রাত। কিন্তু চোখে কাজল টানার আর চন্দন কুমকুমের আয়োজন করার আজ কন্যার অবকাশ

মেলেনি। তবে কিছু আগে জানলে সে একটি তাজা লাল টিপ পরে আসতে পারতো—জয়া তার দুই অঞ্জলি ভরে সে আয়োজন করে রেখেছিল। এমন কি, শাড়িটা রাঙিয়ে আনাও অসম্ভব হতো না। বুঝতে পারছেন না তো? না আপনাকে বলা হয়নি, বলার অবসরই বা পেলাম কোথায়? জয়া আজ আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।

জয়াকে ধরে উঠতে পারল রজত কিন্তু এক টুকরো বরফের উপর হাতুড়ির ঘা মারলে যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তা চারদিকে ছিটকে পড়ে রজতের মোহটুকুও তেমনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ল আত্মহত্যা শব্দটার আঘাতে! দু চোখ বড় করে তুলে জিজ্ঞাসা করল সে, জয়া কে?

দু ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ হলো মঞ্জুর। মঞ্জুর ঠোঁটের এই দৃঢ় ভাঁজের সঙ্গে জয়ার গল্প বলে চলার সময়কার ঠোঁটের ভাঁজের কোথায় হয়ত মিল ছিল—জয়ার সব কথা মনে পড়ে গেল রজতের।

হাতের গ্লাসটা একটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কোচে বসে মঞ্জুর দিকে ঝুঁকে পড়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—তারপর?

—তারপর একটু হাসল মঞ্জু। গায়ের শাড়ি গুছোতে গুছোতে বলল—তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, রক্ত দেওয়া হল। সেলাইন দেওয়া হল, আরো কত কি করা হলো। তারপর? তারপর হাসপাতালে তাকে কিছু ভালো দেখে শ্রান্ত মঞ্জু সোজা আপনার কাছে চলে এলো। আপনি তাকে কিছুতেই বসতে দিতে না চাইলেও জোর করে সে বসল আর এখন সে যাবার জন্য উঠছে। টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলে তার ফিতেটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললো—আর তারপর? হয়তো জয়া বাঁচবে—হয়তো বাঁচবে না। সেদিন আপনি বলেছিলেন আপনারা হলেন নাকি একেবারে অন্য জগতের মানুষ। সত্যিই তাই। আর আপনাদের মতো অন্য জগতের মানুষদের হাতেই আজ সব অর্থ সব শক্তি। তাই এ জগতের মানুষদের দুঃখের ও শেষ নেই—মরণেরও শেষ নেই। আচ্ছা নমস্কার—আপনার সঙ্গিনীকে উঠিয়ে দিয়েছি—আপনি বসে বসে হুইস্কির বদলে জল খাচ্ছেন, আপনাদের রাত আর পণ্ড করবো না আমি। আশা করি যে সময়টা জোর করে বসে পণ্ড করে গেলাম সে সময়টুকুর জন্য বিশেষ ক্ষতি হবে না। আবারও আপনার এই স্বর্গীয় আসর একুণি গুলজার হয়ে উঠতে পারবে।

রজত জয়ার আত্মহত্যার কাহিনী শোনবার জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে যে ভাবে ঝুঁকে বসেছিল ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল অনড় হয়ে।

মঞ্জু দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—আপনার সঙ্গিনীর নাচ ভালো লেগে গেলে ফিরতে হয়তো তার কিছু দেরী হয়ে যেতে পারে। যদি বলেন, আর কাউকে আমি পাঠিয়ে দিয়ে যেতে পারি। সেদিন জয়াকে না চিনলেও আজ আমি একটু চেষ্টা করলেই ওদের চিনতে পারব।

কতক্ষণ যে রজত কৌচের পিঠে মাথা রেখে চোখ বুজে বসেছিল কে জানে! দল-বল ফিরে আসতে উঠে বসল সে। ওয়েটার এসে পটাপট পাকা আঙুলে বোতল টেনে টেনে খুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ঢেলে সবার হাতে ধরে দিতে লাগল। মেয়েটি এসে গ্লাস হাতে রজতের কৌচের হাতায় বসে তার গলায় হাত রেখে আব্দারের ভঙ্গিতে ঠোঁট ফুলিয়ে তুলে বলল—দেখো রজত, বলে বোস না যেন আমি আর মদ খাবো না—চা খাবো। বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল সে।

এক বন্ধু ঘরে ঢুকে বসতে বসতে বলল, বুঝলে রজত, আসার সময় নীচে একটা ভিড় দেখে ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য একটু উঁকি দিয়েছিলাম। দেখলাম, তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসে যে মেয়েটি সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আর এক পাঞ্জাবী ড্রাইভার সবাইকে উদ্দেশ করে উগ্র কটু কণ্ঠে বলছে, মেয়েটি নাকি তাকে আজ সমস্ত দিন হাসপাতালে আটকে রেখেছে। তারপর বলেছে, গ্র্যাণ্ডে এসে টাকা দেবে। আর এতক্ষণ এখানে বসিয়ে রেখে এখন বলছে, বাড়ী চলো। সেখানে টাকা দেবো। তার ভাড়া উঠে গেছে ত্রিশ টাকার উপর। সে যাবে না। তাকে এখুনি টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বুঝলে রজত, আশ্চর্য্য মেয়ে! এতগুলো চোখের উপর ধীর শান্ত পায় এগিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো এক পুলিশ। তাকে দিয়ে নম্বর টোকাল। তারপর গাড়ীতে উঠে বসে বলল—চলো। তার সেই চলা আর তার সেই দৃপ্ত কণ্ঠে 'চলো' বলা সে যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রশংসনীয়। যেতে হলো ড্রাইভারকে, তবে তার যাওয়াটা হয়তো মেয়েটির জন্য নয় পুলিশের ভয়ে কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি তার সাহস দেখে!

রজত উঠে কতকগুলো র হুইস্কি গলায় ঢেলে বিকৃত মুখটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে কের গিয়ে নীরবে কৌচে বসল। [ক্রমশঃ।
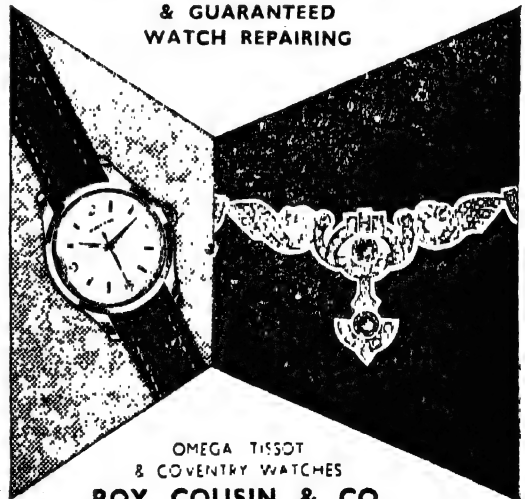
নাচ গান বাজনা

সুর ও যন্ত্র

সুরের জন্ম হোল কবে, কোথায় তার প্রথম বিকাশ? এ নিয়ে তর্কাতর্কির আজ শেষ নেই। নানা জ্ঞানীর নানা মত, কারো কারো অনুমান, যন্ত্রই সুর তথা সঙ্গীতের স্রষ্টা, যন্ত্রই তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জাগিয়ে তুলেছিলো যে সুর তার ধ্বনি প্রকম্পিত করেছে মানুষের হৃদয়তন্ত্রী। আর তারই প্রতিধ্বনি ফুটে উঠেছে মানব, কণ্ঠে। কণ্ঠসঙ্গীতের জন্মবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাই পাশ্চাত্য মনীষী বোনেথম্ সিদ্ধান্ত করলেন যন্ত্র-সঙ্গীতের জন্মের পরই কণ্ঠসঙ্গীত পেয়েছে তার রূপ। ক্রাউয়েষ্ট আবার উল্টো মতের পোষক। তিনি বলেন—যন্ত্র-সঙ্গীত শুধু কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরানুগামীই নয়, তার বয়সও নিতান্ত অল্প—বড়জোর ২০০ বছরের কিছু বেশী হবে। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ধারাকে অনুসরণ করলে দেখা যাবে, দুটি মতবাদের কোনটিকেই মেনে নেওয়া যায় না। 'যন্ত্র' মানুষের এক সুপরিকল্পিত সৃষ্টি, শিল্পের একটি উৎকর্ষ। স্বভাবজাত এমন কোন যন্ত্র সন্ধান আমরা আজও পাইনি যাতে ভিন্ন ভিন্ন স্বরগ্রন্থির সমাবেশ আছে বা যা থেকে অনায়াসে বিভিন্ন স্বরের উৎপত্তি হতে পারে। যন্ত্র সুর ও স্বর অনুযায়ী গড়ে তুলতে হয়, যাতে তা থেকে স্বর ও সুরের সৃষ্টি হতে পারে। এই গড়ে তোলাই শিল্প। শিল্প মানুষের কল্পনার বহির্বিকাশ মাত্র। প্রতিটি শিল্পের গোড়ার কথা প্রয়োজনীয়তাবোধ, তা থেকেই মানুষ নিজের সুবিধানুযায়ী করেছে কল্পনা আর আপ্রাণ চেষ্টায় তারই রূপ দিয়েছে কোন উপাদানকে অবলম্বন করে। হয়তো কোন সৌসাদৃশ্য—কোন সূত্র উপাদানটির যোগ্যতার আভাস দেয়। মানুষ তার আদিম প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতির দানে তাই থেকে সুবিধা মত গড়তে শেখে, যার ফলে জন্ম নেয় শিল্প। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আবার ঐ গড়ে তোলার জন্ম প্রয়োজন 'কান' এর সুর বা স্বর না শুনলে স্বরের সংজ্ঞা আসা সম্ভবপর নয়, যাতে সে স্বরানুযায়ী মিলিয়ে গড়তে পারবে যন্ত্র। তাই মনে হয়, মানুষ সঙ্গীতকে চিনেছে প্রকৃতির মাঝে, তাকে পেয়েছে আপন স্বরে আর তাকেই আবার চেয়েছে নিজের কৃষ্টির মধ্যে যা থেকে হয়েছে যন্ত্রের উদ্ভব।

সভ্যতার আলোক বর্জিত স্থানে আজও অনেক জাতির সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মাঝে গান আছে, কিন্তু বাজনার কোন অস্তিত্ব নেই। অথচ এমন কোন জাতির কথা শোনা যায় না যারা গান গায় না কিন্তু বাজনা বাজায়। কাজেই যন্ত্র-সঙ্গীত কণ্ঠ-সঙ্গীতের পরবর্ত্তীকালীন সৃষ্টি, এ মতবাদটিকে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। কিন্তু তাই বলে তার বয়স যে মোটে ২০০ বছর এ কথা মোটেই স্বীকার করা চলে না। তার প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেই বোধ হয় মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা তাদের জীর্ণ বক্ষে ধারণ ক'রে আছে আজও নানাপ্রকার যন্ত্রের নিদর্শন, যাদের বয়সের সীমা ৫০০০ বছরেরও মধ্যে নির্দ্ধারণকরা যায় না কিছুতেই। বৈদিকযুগের যজ্ঞানুষ্ঠানে নাচ ও গান একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করতো আর তাদের সঙ্গে সাহচর্য্য কোরতো বাজনা। বেদের বয়স নিয়ে তর্কাতর্কির শেষ না হলেও তা ৩৫০০ বছরের কম নয় একথা সবাই মানেন। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেও যে আমাদের দেশে যন্ত্র বা বাজনার প্রচলন ছিলো তা প্রমাণ করার জন্য খুব বেশী কষ্ট করতে হয় না। সংস্কৃতে বাজনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—"বদতি ইতি অনুগচ্ছতি বা," অর্থাৎ যাহা প্রতিধ্বনি করে।

সেই ধারানুযায়ী আজও তাই বাজনাকে বলা হয় 'সঙ্গত' (সম + গত), যা একই সাথে ও সমভাবে গমন করে।

যথা "সম গচ্ছতি বা সহ গচ্ছতি ইতি সঙ্গত।"

দেখা যায়, বৈদিক ভারত বাজনার শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়েছে 'সঙ্গত'-এর ক্ষেত্রেই। নাচ, গান ও বাজনা তিনের সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ ছিলো তখনকার সঙ্গীত। "ঋক্ সূত্রকে অবলম্বন করে তিন স্বরের প্রয়োগে গঠিত হোত সামিকযুগের প্রাথমিক সঙ্গীত। পরে সেই সঙ্গীতই পরিপুষ্টি লাভ করে সাত স্বরের বিচিত্র সমাবেশে। সামগানের আসল উপাদান ছিলো ঋক্ বা বাক্য—তাদের অবলম্বন করেই পরে সুর-সংযোগ করা হোত এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ কোরত ঐ বাক্যগুলিই, সুর নয়। তাই বলতে হয়, প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ছিলো বাক্য বা কথায়, সুরের সৃষ্টি হয় পরে। আর যন্ত্রসঙ্গীতের অবলম্বন কেবল মাত্র সুর, সুতরাং তার সৃষ্টি পরবর্ত্তীকালে হওয়াই স্বাভাবিক। আবার সামিক যুগের তিন স্বরের ব্যবহার থেকে এমন অনুমান করাও বিচিত্র নয় যে, তখন মাত্র তিন স্বরেরই প্রচলন ছিলো। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ হতে যে যন্ত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিতে নাকি সাত স্বরের সংস্থাপন আছে। ষ্টুয়ার্ট পিগগোট (Stuart Piggot)-এর অভিমতে আধুনিক স্বরগ্রাম অনুযায়ী গঠিত তারা।[১] এদিক থেকে দেখলে মহেঞ্জোদড়োর সংস্কৃতিকে বৈদিকোত্তর সভ্যতা বললে ভুল হয় না।

যন্ত্র ও বৈদিকযুগ:—বৈদিক কালের নির্দ্ধারণ নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মত বিরোধের সমাপ্তি আজও ঘটেনি। কেহ কেহ মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা হতে প্রাপ্ত কতকগুলি শীলমোহরের সাথে

১। Stuart Piggot mentioned as having seven toues or notes were constructed according to the heptatonic seat.—Prehistoric India, p270.

বৈদিক শীলমোহরের এবং কতকগুলি মূর্ত্তির সাথে বৈদিক দেবদেবী—যথা, দুর্গা, নটরাজ, শিব প্রভৃতির মূর্ত্তির সাথে সাদৃশ্যগুলি লক্ষ্য করে বলেছেন—মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা প্রাগ্বৈদিক তো নয়, বরং তা ঋকবৈদিক সভ্যতার আলোকে সমুজ্জ্বল ছিলো। অতএব বৈদিক যুগের সীমা নির্দ্ধারণ করতে হলে তা অন্ততঃ পক্ষে ৬০০০ বছর আগে করতে হয়। সাধারণ চলতি মতবাদকে অনুসরণ করলেও একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য যে, ঐ মতবাদের ভিত্তি অতি যুক্তিসঙ্গত।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনও এই ধরণের কয়েকজনের মতবাদের আলোচনা করে বলেছেন যে, বেদের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ শতক স্থির করলে তাকে অন্যান্য প্রাচীনত্ব দানের দোষারোপ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে নিশ্চয়। ঋকবেদ বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে প্রাচীনত্বের দাবী রাখে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই ঋকবেদ্-সংহিতায় আমরা কতকগুলি নাম পাই যাদের আচার্য্য সায়ণ তাঁর ভাষ্যে বাজনা বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। কাজেই আমাদের বাজনার প্রাচীন সংস্করণের বয়স খুব কম ক'রে ধরলেও ৩৫০০ বছরের কম হতে পারে না কিছুতেই।

ঋগ্বেদ-সংহিতায় উড়ন্ত শকুনের পাখার শব্দের সঙ্গে কর্করির শব্দের সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে। কর্করিকে সায়ণ 'বাদ্যবিশেষ' বলে ব্যাখ্যা করছেন।২ আবার 'ক্ষোণী' শব্দটিকেও পাই যাকে সায়ণ বলেছেন 'বীণা-বিশেষ'।৩ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য আরও কতকগুলি বৈদিক যন্ত্রের খবর দেয়। ডাঃ ক্যালাণ্ড তার 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এ ৪—'কর্করি, অলাবু, বক্র, কপিশির্ণনি, ঐসিকি অপঘাতলিকা, বীণা, কাণ্ডপি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন অথর্ব বৈদিক যন্ত্র বলে।৫ তিনি বৌধায়নসূত্র হতে প্রাপ্ত 'অবাতি', 'পিচ্ছোল এবং 'কর্করিবার'ও উল্লেখ তিনি করেছেন। ঐ নামগুলি আবার সাংখ্যায়ণ সূত্রেও পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবি ঐ যন্ত্রগুলির অস্তিত্ব ইতিহাসসিদ্ধ বলেই মেনেছেন। তাঁর মতে, 'পিচ্ছোলা' আর 'পেচ্ছোরা' একই যন্ত্র এবং উডুম্বা কাঠে তৈরি বলে তাকেই আবার 'ঔডুম্বরী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।৬ বিবাহানুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক কিথও বলেছেন যে বিবাহের পর সধবারা নৃত্য করিতেন এবং সে নাচের সঙ্গে থাকতো বেণু ও বীণা সংযোগে যন্ত্র সঙ্গীত। (সাংখ্যায়ন, ১।১১।৫।৬ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিবরণে আছে—বেদীর পশ্চাতে যজমানদের নারীরা বসতেন, তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকতো একটি ক'রে 'কাণ্ডবীণা' ও একটি ক'রে পিচ্ছোরা"। তারা প্রথমে কাণ্ডবীণা ও পরে পিচ্ছোরা বাজাতেন। ডাঃ ক্যালাণ্ড এই কাণ্ডবীণাকে বাঁশের বাঁশী ও পিচ্ছোরাকে 'গিটার'—বিশেষ বলেছেন। পিচ্ছোরা 'কোন'এর (জওয়ার) সাহায্যে বাজানো হোত। এই যন্ত্রগুলির উল্লেখ দ্রাহ্যায়ণ (১১।২।৬—৮) ও লাট্যায়ন জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে 'শততন্ত্রী'—বীণার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে—সেটি কাঠের তৈরী এবং লাল ষাঁড়ের চামড়ায় আবৃত হোত। চামড়ার লোমশ দিকটাই বাইরের দিকে থাকতো। বীণাটার পিছনের দিকে দশটি ছিদ্র থাকতো এবং প্রতিটি ছিদ্রে ২০টি ক'রে তার আটকান হোতা। তারগুলি তৈরী করা হোতে মুঞ্জা বা দূর্ব্বাঘাস হ'তে। এক উদগাত্রীর (বাঁশের টুকরো বিশেষ) সাহায্যে তারগুলিতে আঘাত করে শততন্ত্রী বীণা (৪।২'৫—৫) প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়। এ ছাড়াও পঞ্চবিংশ ও বাজানো হোত। এই 'শততন্ত্রী'বীণার বর্ণনাও বিশেষতঃ এবং বাজানোর পদ্ধতি থেকে হার্পের কথা মনে আসে। ডাঃ সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও আরো অনেকের, অভিমত যে, এই শততন্ত্রী-বীণাই পরে কাত্যায়নী-বীণা' বলে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু কবে বা কোন্ সময় এবং কে যে এই নূতন নামকরণ করেছেন তার কোন ব্যাখ্যা আমরা পাইনি। পরবর্ত্তীকালের সঙ্গীতগ্রন্থে আমরা এই সব বৈদিক যন্ত্রের মধ্যে 'অলাবু' করকরিকা, 'অঘাতী' 'অপঘাতলিকা' প্রভৃতির নাম বা ঐ সদৃশ নাম পেলেও 'পিচ্ছোরা' বা 'কাণ্ডবীণা'র কোন উল্লেখ পাইনি। অথচ পিচ্ছোরার বর্ণনা থেকে তাকে একটি প্রসিদ্ধ যন্ত্রের মর্য্যাদা যে দেওয়া হোত তা বেশ বোঝা যায়।

শিক্ষা-যুগের সুরযন্ত্র

নারদীশিক্ষায় (২য়-শতাব্দী) বীণা ও বেণুর কথা থাকলেও 'দ্বারবী' ও 'গাত্রবীণা' ছাড়া আর কোন বীণার নামোল্লেখ এতে

২। ঋগ্বেদ সংহিতা—২।৪৩.৩

৩। ঐ—২।৩৪.১৩

৪। ডাঃ ক্যালাণ্ড : 'পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ' (ইংরেজী সং), পৃঃ ৮৬

৫। 'দি কোয়াটার্লি জার্ণাল অব অন্ধ-হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটী, জুলাই ১৯২৫, পৃঃ ২০

৬। অধ্যাপক কিথ : 'সাংস্কৃট ড্রামা' (১৯২৪), পৃঃ ২৬ (খ) অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল : 'সাংস্কৃট লিটারেচার', পৃঃ ৩৪৭

পাওয়া যায় না। এমন কি এদের নাম করা ছাড়া আর কোন বর্ণনা নারদ দেননি। যথা "ধারবী গাত্রবীণা বীণে গান জাতিষু"। এছাড়া বীণা বা অন্য কোন যন্ত্রেরও আর স্পষ্টতর বর্ণনা নারদী-শিক্ষায় নেই এবং অপরাপর শিক্ষায়ও সামান্য কয়েকটি যন্ত্রেরই নাম পাওয়া যায় মাত্র। এ থেকে মনে হয়, শিক্ষাযুগে যন্ত্রকে যথেষ্ট মর্য্যাদা হয়তো দেওয়া হোত কিন্তু তখন তার প্রচলন কিছুটা কমে গিয়েছিল।

মহাকাব্যের যুগে সুরযন্ত্র

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যথা রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে আমরা নানা যন্ত্রের নাম পাই। প্রভাতে জাগরণী সঙ্গীতে প্রধান অংশ ছিলো যন্ত্রসঙ্গীতের। তা ছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাজ্যাভিষেক, বিবাহে, রাজসভায় ও শবানুগমনে থাকতো যন্ত্র ও সঙ্গীতের আয়োজন। কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্রের সাহচর্য্য তখন একরকম অপরিহার্য্য ছিলো। রাজাঙ্গনে অপ্সরাদের নৃত্যের সঙ্গে ঝঙ্কৃত হোত বীণা। রামায়ণে বাজনাকে বলা হয়েছে "আতোদ্য" এবং বিচিত্র প্রকৃতির বাজনা তখন প্রচলিত ছিলো বলেই জানা যায় (সুন্দরকাণ্ড ১০।৪২)। বীণার সঙ্গে লবকুশ গান করতো বলেও বর্ণিত হয়েছে। নয়টি তারযুক্ত "বিপঞ্চী"—বীণার উদাহরণ রামায়ণে পাওয়া যায় (সুন্দরকাণ্ড ১০।৪০—৪১)। তন্ত্রী ও লয় বলে বীণার উল্লেখও আছে (অযোধ্যাকাণ্ড ১৮।১২)। এ ছাড়া বহুস্থানেই মৃদঙ্গ (যুদ্ধকাণ্ড ৫০.২৬), মুরজ (অযোধ্যাকাণ্ড ৩১।৪১), ভেরী (অ: কা: ৫০।৬০), পণব (যু: কা: ৫১৮), ঘণ্টা (যু: কা: ২২৪।২২২৫), শঙ্খ, তূর্য্য, বেণু, বংশ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশেও তত, ঘন, শুষির, আনদ্ধ, ভেদে এ-ধরণের নাম যথা, বীণা, বেণু, তন্ত্রী, মুরজ, দুন্দুভি, মেঘদুন্দুভি, নন্দি, পটহ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

কালিদাসও তাঁর গ্রন্থে যন্ত্রসঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মেঘদূতে বীণা ও মুরজের প্রাঞ্জল বর্ণনা পাই।

নৃত্য, গীত বাদ্য কথাগুলি বৌদ্ধজাতকে প্রায়ই পাওয়া যায়। শোভাযাত্রার বর্ণনায় বাজনার উল্লেখ আছে। ভেরী বাজিয়ে উৎসবের কাল ঘোষণা করা হোত। গুত্তিল জাতকে 'সপ্ততন্ত্রী' বীণার বর্ণনা আছে ও তাতে যে ভাবে বীণা বাজানোর কথা বলা হয়েছে তা থেকে সে যুগের বেশ উন্নত পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। গুত্তিল জাতকটি পড়লেই, গান বা নাচের সহযোগী হিসাবে নয়, স্বতন্ত্র ভাবে বীণার মাধ্যমে যে কত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সাধনার রীতি প্রচলিত ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বীণা, তূর্য্য প্রভৃতির নাম অনাদৃশ-জাতক, ভেরী বাদক-জাতক বীণা স্থূল-জাতক, চুল্ল প্রলোভন-জাতক, শৌনিক-জাতক, বিদুর পণ্ডিত জাতক, কুশজাতক, প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

—শ্রীমীরা মিত্র

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

রেকর্ড-পরিচয়

সম্প্রতি যে সকল নতুন রেকর্ড সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাদেরই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও বিবরণী আমাদের পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্যে এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

যে রেকর্ডগুলি হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, তাদে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

এন ৮২৮৫৩—প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের মাধুর্য্য মণ্ডিত কণ্ঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুটি অনবদ্য গান।

এন ৮২৮৫৪—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে দু'টি আকর্ষণীয় আধুনিক গান।

এন ৮২৮৫৫—এতে দু'খানি হাল্কা ধরণের মার্গসঙ্গীত শোনা যাবে। গান দু'টি গেয়েছেন শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এন ৮২৮৫৬—সাবলীলতা, লালিত্য ও মাধুর্যের দিক দিয়ে বিচার করলে অতুলপ্রসাদের গানগুলির তুলনা হয় না। অতুলপ্রসাদের অসাধারণ গানগুলির মধ্যে থেকে দু'খানি গান এই রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে। সম্ভাবনায় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নবীন শিল্পী জ্যোতি সেন গান দু'খানি গেয়েছেন।

এন ৭৭০০২।৭৭০০৩—"মৃত্যের মর্ত্তে আগমন" নামক কথাচিত্রের গানগুলি এই রেকর্ডগুলির মাধ্যমে শুনতে পাবেন। গানগুলি গেয়েছেন এ, কানন, নির্মলা মিশ্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং আলপনা মুখোপাধ্যায়।

এন ৭৭০০৪—"মায়ামৃগ" ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঐ ছবিতে তাঁর নিজের গাওয়া দু'খানি 'হিট' গান এই রেকর্ডে শুনতে পাবেন।

এন ৭৭০০৫—"প্রবেশ নিষেধ" ছায়াছবির দু'খানি গানও এই রেকর্ডে ধরে রাখা হয়েছে। গান দু'খানি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া।

যে রেকর্ডগুলি কলম্বিয়ার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

জি-ই ২৪১৭৮—বাঙালীমাত্রকেই আকুল করে তোলে অবিস্মরণীয় কবি রজনীকান্ত সেনের অতুলনীয় গানগুলি। বাঙালী-হৃদয়ে এদের আবেদন চিরকালীন। এই রেকর্ডে তাঁর দু'খানি গান গৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে একটির নাম "কবে তৃষিত এ মরু"—প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় তাঁর দরদ, লালিত্য ও গম্ভীরতা সমন্বিত মধুগম্ভীর কণ্ঠে গান দু'খানি গেয়েছেন।

জি-ই ২৪১৭৯—দুটি মনোমুগ্ধকর আধুনিক গান এই রেকর্ডে শুনতে পাবেন জনপ্রিয় শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে।

জি-ই ২৪১৮০—এই রেকর্ডে দু'খানি অপূর্ব সুরসমন্বিত গান শুনতে পাবেন। গেয়েছেন শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী প্রতিমা যে একজন শক্তিময়ী কণ্ঠশিল্পী এবং বাংলার একজন সার্থকনাম্নী সুরসাধিকা—এই রেকর্ডে ধরে রাখা তাঁর গাওয়া গান দু'খানি সেই কথাটাই প্রমাণ করে।

জি-ই ৩০৪৩৪—"অবাক পৃথিবী" ছায়াচিত্রে গাওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের দু'খানি গান এই রেকর্ডের মাধ্যমে শুনতে পাবেন। গান দু'খানি সত্যিই যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক।

জি-ই ৩০৪৩১।৩০৪৪০—"হাসপাতাল" ছবিতে গাওয়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানগুলি এই রেকর্ডগুলির মাধ্যমে শুনতে পাওয়া যাবে।

মহানিষ্ক্রমণ

(দেওয়াল-চিত্র, সারনাথ)

—মহাদেব চট্টোপাধ্যায় গৃহীত

আলোকচিত্র

বাঁকা-চোখে —বিমল ঘোষ

—রাজেনকুমার মুখোপাধ্যায়
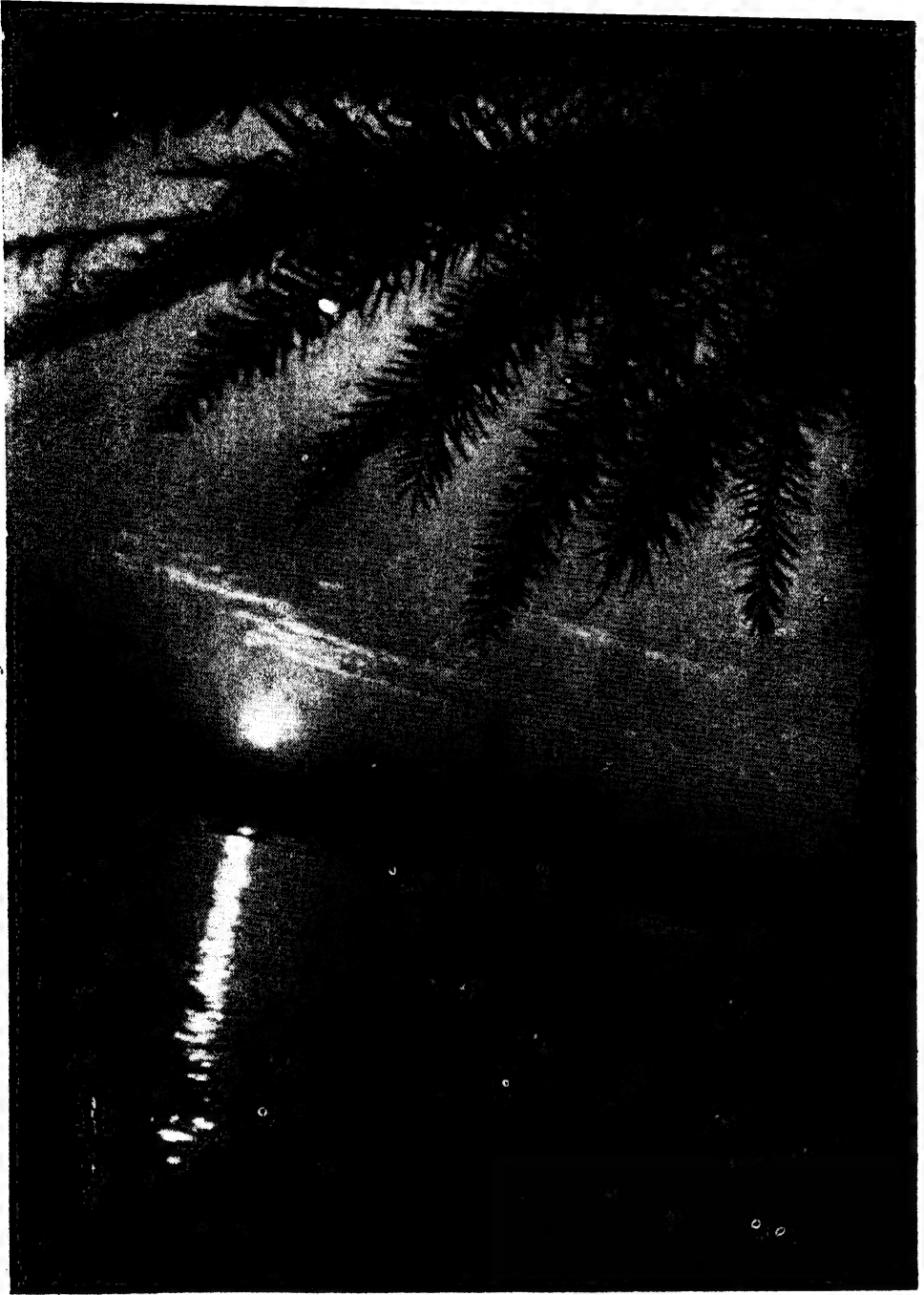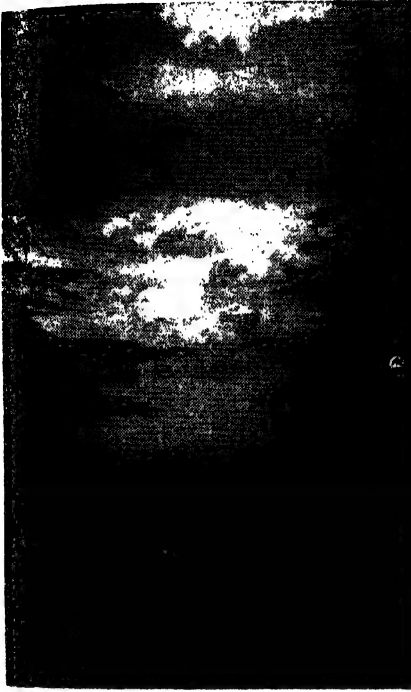
বিশ্রাম —দীপক ঘোষ
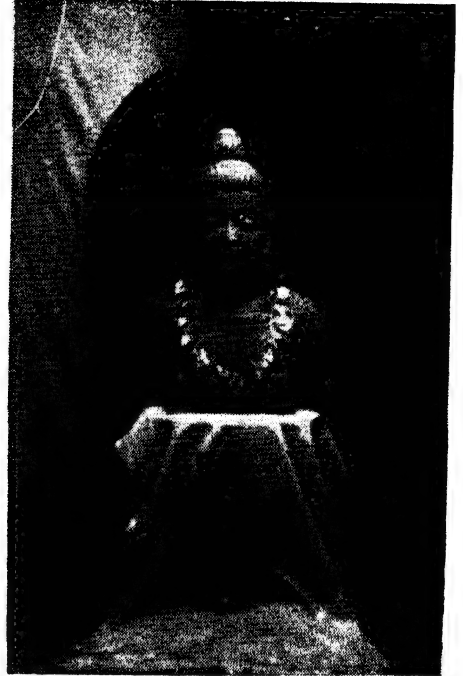
বুদ্ধমূর্তি

—বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্মিত ও গৃহীত

নিংকনে —হীরেন আচার্য্য

আমার কথা (৬২)

শ্রীমতী কমলা বসু

যে অল্পসংখ্যক শিল্পী গুরুদেব রচিত সঙ্গীতসম্ভারকে অন্তরের সহিত এখনও সাধনা করে চলেছেন—রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ব্যবসায়কেন্দ্রিক না করে তাহার প্রকৃত প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বয়ং প্রচারবিমুখ হয়ে আপ্রাণ চেষ্টিত আছেন—তাঁদের মধ্যে স্বল্পভাষী ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্তা শ্রীমতী কমলা বসু অন্যতমা।

স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত শ্রীমতী বসু বলেন—১৯২৪ সালের ১৪ই জুলাই আমি নারায়ণগঞ্জে জন্মাই। পারিবারিক স্থান হল ফরিদপুর কিন্তু কুচবিহারে বহুপূর্ব্ব হতে সকলে থাকিতেন। আমার বাবা শ্রীপ্রমথনাথ সেন উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গায় সিভিল সার্জ্জেন হিসাবে কাজ করে জৌনপুর থেকে অবসর নেন। আমার মাতুলালয় ঢাকা বিক্রমপুর—দাদামহাশয় ছিলেন ভারতের ডাক-তার বিভাগের ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ব্রজেন্দ্রকুমার সেন। মা হলেন শ্রীমতী প্রভারাণী দেবী। বাবার বদলী-চাকুরী হওয়ায় আমি উত্তরপ্রদেশের নানা স্থানে ঘুরেছি। ছেলেবয়সে স্থানীয় স্কুলে পড়ার সময় হিন্দী ভাষা শিখি। মধ্যে বারাণসী থিয়োজফিক্যাল (Theosophical) স্কুলে ভর্ত্তি হই ও উহার হোষ্টেলে থাকি। পরে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসি ও তথা হইতে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। এর পর তথাকার সঙ্গীত-ভবনে তিন বৎসর ছাত্রী হিসাবে থাকিয়া ১৯৪৬ সালে বিশ্বভারতী ডিপ্লোমা পাই। এছাড়া উক্ত বৎসরের Tagore's Hymn পুরস্কার আমাকে দেওয়া হয়।

উত্তরপ্রদেশে থাকার সময় আমি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখেছিলাম। ছয় বৎসর বয়স থেকে গান আরম্ভ করি। আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চ্চা ছিল। আমার দাদা প্রশান্তকুমার সেন আমার গান শেখার প্রথম থেকে খুব উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কথা আমি কখনও ভুলিব না। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে দাদা মারা যান। তিনি ডাক্তার কে, এস, রায়ের অন্যতম জামাতা ছিলেন। একমাত্র পুত্রকে চিরকালের জন্য হারিয়ে বাবা মা নিদারুণ আঘাত পান আর আমরা তিন ভগিনী শুধু বড় ভাইকে হারাইনি—সেইসঙ্গে বরাবরের জন্য হারিয়েছি দাদার অপরিসীম প্রভাব। বিশিষ্ট অঙ্কনশিল্পী
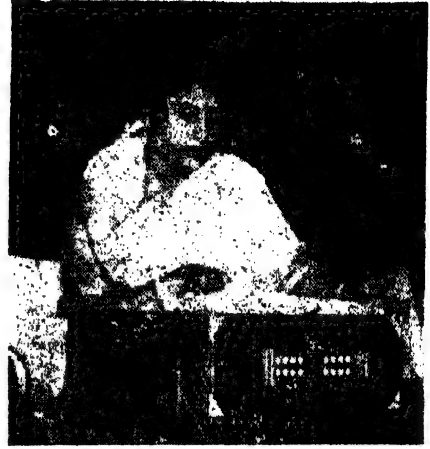
শ্রীমতী কমলা বসু

শ্রীসুধীর খাস্তগীর আমার ছোট বয়সে আমায় ২।৩টি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখান। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল যে আমরা শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করি ও গানবাজনা শিখি। উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে আমার কালকাতা ভাল লাগে নাই। তাই শান্তিনিকেতনে চলে যাই বাপ মার ব্যবস্থামত। সঙ্গীতভবনে শ্রদ্ধেয় শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের নিকট আমার রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখা হয়। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষালয় "দক্ষিণী"তে এক বৎসর শিক্ষিকা হিসাবে থাকি। শরীর খারাপের জন্য আমি "দক্ষিণী" ছাড়ি। পরে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কয়েকজন ছাত্রীকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখাই। বর্ত্তমানে আমি 'গীত-বিতান'এর সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। ভারত কোম্পানী হইতে আমার প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড 'পূর্ণচাঁদের মায়া' ও 'আমার এ পথ' বাহির হয়। ১৯৪৪ সালে কালকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম গান করি। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৪৮ সাল হইতে আমি তথাকার নিয়মিত শিল্পী রহিয়াছি।

১৯৪৭ সালে ময়মনসিংহের (সন্তোষ পাঁচ আনী) শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ বসুর সহিত আমার বিবাহ হয়। সঙ্গীতভবনের হোষ্টেলে শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, নৃত্যশিল্পী সেবা মিত্র ও আমি একত্রে থাকায় পরস্পরের প্রতি নিবিড় ভাবে আমরা পরিচিত হই।

চৈতালি দুপুর

অবিনাশ সাহা

তাপদগ্ধ দুরন্ত দুপুর
দিকে দিকে মৃত্যু-পরোয়ানা
পৃথিবীর নাভিশ্বাস সে কি
দানবেরা বোমাবাজী করে।

শাখায় শাখায় দাপাদাপি—
অজানল জ্বলে

বৃন্ত হতে খসে খসে পড়ে ফুল—ফোটা ফুল
ব্যাধের শায়কে।

তবুও তো যেতে হবে পথ
অনন্ত বিস্তৃত পথ—দিগন্ত নিলয়
দূর নভে শ্বেত কপোত
ভর করে শান্তির পাখায়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন—

দুই বৎসর পরে পুনরায় জেনেভায় গত ১৫ই মার্চ (১৯৬০) হইতে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের গ্রীষ্মকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রিসম্মেলনে এই সম্মেলন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরে এই সিদ্ধান্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এই দশটি রাষ্ট্রের পাঁচটি রাষ্ট্র পশ্চিমী শক্তি-শিবিরের এবং পাঁচটি রাষ্ট্র সোভিয়েট শক্তি-শিবিরের। পশ্চিমী শক্তি-শিবিরের এই পাঁচটি রাষ্ট্র কানাডা, ফ্রান্স, ইটালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন। সোভিয়েট শক্তি শিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্র বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন। দশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জেনেভায় যে আরও একটি সম্মেলন চলিতেছে সে সম্পর্কে একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং সোভিয়েট রাশিয়া এই তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে উক্ত সম্মেলন চলিতেছে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে অক্টোবর এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই সম্মেলনের অগ্রগতি বিশেষ কিছুই হয় নাই। অধিবেশন দুই মাস বন্ধ থাকার পর গত ২৭শে অক্টোবর (১৯৫৯) পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৯শে ডিসেম্বর হইতে অধিবেশন স্থগিত থাকিয়া গত ১২ই জানুয়ারী হইতে পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত সম্মেলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব।

গত ১৫ই মার্চ্চ যে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল পাশ্চমী শক্তিগোষ্ঠী এবং কম্যুনিষ্ট শক্তিগোষ্ঠী এই উভয়পক্ষের সমসংখ্যক রাষ্ট্রের যোগদান। ১৯৫৭ সালে লণ্ডনে যে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন হয় তাহাতে যোগ দেন বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং সোভিয়েট রাশিয়া। এই সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া যায়। অতঃপর এই সম্মেলনে পশ্চিম ও পূর্ব্ব শিবিরের প্রতিনিধিদের যোগদানের ঘটনা এই প্রথম। যে সম্পূর্ণ নূতন পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা এই সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রথম বক্তা বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ওরমসবী গোর এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতের কথায় বলিয়াছেন যে, It is beginning in an atmosphere more favourable to success than at any time since the end of war. অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্ত্তীকালের যে কোন সময় অপেক্ষা সাফল্যের পক্ষে অধিকতর অনুকূল পরিবেশের মধ্যে এই সম্মেলন আরম্ভ হইয়েছে। তাঁহার এই উক্তি যে খুবই ঠিক এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ কি দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পূর্ব্বে এবং কি উহার পরে সাফল্য সম্পর্কে অধিকতর আশা লইয়া নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আর হয় নাই। উভয় শক্তিশিবিরই আজ নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে যেরূপ আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে এইরূপ আগ্রহ আর দেখা যায় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গও আজ আলাপ আলোচনার পথে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীতে আজ যে শান্তি দেখা যাইতেছে তাহা আসলে ঝড়ের পূর্ব্ববর্ত্তী শান্ত অবস্থার মতই, সকলের মনেই এই আশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছে। অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বর্ত্তমান শান্ত অবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববাসী আজ ব্যাপক ধ্বংস এবং স্থায়ী শান্তির সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উভয় শক্তিশিবিরই আজ ব্যাপক ধ্বংস এড়াইতে চায়। উভয় শক্তিশিবিরই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের কোন ব্যবস্থা যদি করিতে পারা না যায় তাহা হইলে অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা আরও ব্যাপকভাবে চলিতে থাকিবে, বিশ্ব-সংগ্রামের রথের অগ্রগতি চলিতে থাকিবে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায়।

আলোচ্য নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব। ১৯৫৭ সালের লণ্ডন-সম্মেলনে তাঁহারা যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহার সহিত এই প্রস্তাবের পার্থক্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। পশ্চিমী শক্তিশিবিরের পাঁচটি রাষ্ট্র যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছেন তাহা তাহাদের রচিত সম্মিলিত পরিকল্পনা বা প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রস্তাব হইতে মনে হয়, তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিতে হইলে নিজেদের জেদ ষোল-আনা বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। কি রূপে অস্ত্রহ্রাসের সমস্যাটির সমাধান করিতে পারা যায় তাহার জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহিত একটা মতৈক্য হওয়া প্রয়োজন। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উভয় শিবিরই একমত। কিন্তু এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ সালের পরিকল্পনা বা প্রস্তাবটি ছিল কূটনীতিবিদ্‌দের ভাষায় প্যাকেজ বা অখণ্ড পরিকল্পনা অর্থাৎ ঐ পরিকল্পনা ষোল-আনাই গ্রহণ করিতে হইবে না হয় ষোল-আনাই বর্জ্জন করিতে হইবে। আলোচ্য সম্মেলনে পশ্চিমী পাঁচটি রাষ্ট্র যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন তাহা পুরাপুরিই গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এই পরিকল্পনার যে কোন দিক বা অংশ লইয়া আলোচনা চলিতে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিবে। যে-সকল বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে না সে-সকল বিষয় লইয়া পরে আলোচনা হইতে পারিবে।

সাধারণ ভাবে ইহাই পশ্চিমী পাঁচটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৯) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই ভিত্তিতে পশ্চিমী শক্তিশিবিরের প্রস্তাব রচিত হইয়াছে। অবশ্য পাঁচ পশ্চিমী রাষ্ট্রই যাহাতে একমত হইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে সেইজন্য উহাকে পরিবর্ত্তিত এবং সংশোধিত করিতে হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য প্রথমে ওয়াশিংটনে এবং পরে প্যারীতে আলোচনা হয়। কিরূপ পরিকল্পনা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে পেশ করা হইবে সে সম্পর্কে ফ্রান্সের সহিত একটা মতানৈক্য ঘটিয়াছিল। 'ফিশনেবল' বা বিভাজনযোগ্য পদার্থের উৎপাদন নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে ফ্রান্স আপত্তি করে। তাহার যুক্তি এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার হাতে যথেষ্ট পরিমাণে ফিশনেবল্ পদার্থ আছে। এইগুলি দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস করা যাইতে পারে এবং এই রাষ্ট্র কয়টি ছাড়া আর কেহই পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হইতে পারিবে না। ফলে ফ্রান্স উক্ত তিনটি রাষ্ট্রের সমমর্যাদা পাইবে না এবং আণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রত্যাশায় ফ্রান্সকে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্স আণবিক বোমারু বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ চায়, কিন্তু মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহা চাহেন না। কারণ এ ব্যাপারে রাশিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সমকক্ষ হইতে চায়। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা হইয়াছে এবং পাঁচটি পশ্চিমী রাষ্ট্র একটি যৌথ পরিকল্পনা রচনা এবং উহা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে পেশ করিতে পারিয়াছেন। এই পরিকল্পনা তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। ১৯৫৭ সালের পরিকল্পনার সহিত উহার আর একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, উহার সহিত রাজনৈতিক বিরোধ নিষ্পত্তির সর্ত্ত জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই। ১৯৫৭ সালের পরিকল্পনায় ঐরূপ সর্ত্ত ছিল।

তিনটি স্তরবিশিষ্ট পশ্চিমী পঞ্চ রাষ্ট্রের প্রস্তাবের প্রথম স্তর প্রস্তুতিমূলক। একটি আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থা গঠন করিয়া হইবে উহার প্রারম্ভ। উহার প্রকৃত কাজ কি হইবে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সহিত উহার সম্পর্ক কি হইবে তাহা আলোচনা দ্বারা নির্দ্ধারণ করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথমেই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান হইবে না এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র উহার শাখা প্রশাখাও স্থাপিত হইবে না। গঠিত হইবে একটি সদর কার্য্যালয় যাহাতে অতি দ্রুত উহা কাজ আরম্ভ করিতে পারে। সম্মেলনে যোগদানকারী দশটি রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী ২৫ লক্ষের বেশী হইবে না। অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা অনুযায়ী সৈন্যসংখ্যা নির্দ্ধারিত হইবে। প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র কি পরিমাণ আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার হাতে অর্পণ করা হইবে সে-সম্বন্ধেও একটা চুক্তি হইবে। দ্বিতীয় স্তরে সামরিক দিক হইতে উল্লেখযোগ্য সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। তৃতীয় বা শেষ স্তরে নিরাপদ, স্বাধীন এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। পশ্চিমী পঞ্চ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল মহাশূন্য সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ এবং ক্ষেপণাস্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ। প্রস্তাবিত সকল প্রকার মহাশূন্য যান ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সংস্থাকে খবরাখবর দিতে হইবে। মহাশূন্যে ঘাঁটি নির্ম্মাণও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কারণ এই সকল ঘাঁটি মহাশূন্য যানের অবতরণ ক্ষেত্র হিসাবে অথবা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই পরিকল্পনায় ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণের খবরাখবর দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মহাশূন্যের অবতরণক্ষেত্র পর্য্যন্ত মহাশূন্য সংক্রান্ত সকল বিষয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ব্যাপক ধ্বংসকারী আণবিক রাসায়নিক এবং জীবাণু সংক্রান্ত সকল প্রকার অস্ত্র সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ হ্রাসের উদ্দেশ্যে মজুত অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের প্রথম দিনে মার্কিণ প্রতিনিধিদলের প্রধান মিঃ ফ্রেডোরিক এম এটন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বর্ত্তমানে যে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র আছে তাহা ক্রমশঃ হ্রাস করিতে হইবে এবং কোন রাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার ক্ষমতা যে পর্য্যন্ত না বিলুপ্ত হয় সে পর্য্যন্ত যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থাধীনে এই হ্রাসের কার্য্য চলিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, While we are engaged here and until, hopefully the agreements which we shall set down are implemented, my country will continue to maintain the strength necessary to assure its security and to meet its commetments to the world. তাঁহার এই উক্তির সারমর্ম্ম এই যে, যতদিন তাঁহারা আলোচনা চালাইতে থাকিবেন এবং যতদিন না আশানুরূপ চুক্তি কার্য্যকরী করা হয় তাঁহার দেশ অর্থাৎ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহার নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বজায় রাখিবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহা পালন করিবে। বৈঠকের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জোরিণ পশ্চিমী পঞ্চশক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন যে, তাঁহারা যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান তাহাতে সাধারণ বা পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলি নাই। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সমাধানের জন্য যে মনোভাব উহাতে আছে তাহা কার্য্যকরী সমাধানের পক্ষে সন্দেহাতীত নহে। মঃ ক্রুশ্চেভ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণের যে সোভিয়েট পরিকল্পনা উত্থাপন করিয়াছিলেন মঃ জোরিণ উহা আলোচনার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। সাধারণ পরিষদ যে পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ অনুমোদন করেন সে কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বিস্তারিত ভাবে বিবেচনার জন্য উক্ত প্রস্তাবই সাধারণ পরিষদ কমিটির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

মোটের উপর অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। জেনেভায় যে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য ত্রিশক্তির একটি সম্মেলন চলিতেছে সে কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্মেলন ১৯৫৮ সালের ৩১শে অক্টোবর হইতে চলিলেও আজ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

কিছু হয় নাই। সম্প্রতি গত ১১শে মার্চের (১৯৬০) সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ-মার্কিণ-রুশ যুক্ত আণবিক গবেষণার জন্ত যে প্রস্তাব করিয়াছে একটি সর্ত্তাধীনে রাশিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে। রাশিয়ার সর্ত্তটি হইল এই যে, গবেষণা কার্য্য চলিতে থাকা অবস্থায় কোন পক্ষই নিম্নমানের কোন প্রকার পরীক্ষা চালাইবে না বলিয়া সম্মত হইতে হইবে। সহজে ধরা পড়ে এমন পরীক্ষা বন্ধ রাখার একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্ত রাশিয়া একটি প্রস্তাব করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি নির্দ্দিষ্ট রকমের ভূগর্ভস্থ পরীক্ষা বন্ধ রাখার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহা সহ ভূগর্ভস্থ সমস্ত পরীক্ষা বন্ধ রাখার জন্ত একটি চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব রাশিয়া করিয়াছে। কম গুরুত্বপূর্ণই হউক আর অধিক গুরুত্বপূর্ণই হউক, প্রায় সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা বন্ধ রাখাই রাশিয়ার অভিপ্রায়। পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখা সংক্রান্ত বৈঠক যেখানে ষোল মাস ধরিয়া চলিতেছে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক সেখানে এক বৎসরে শেষ হওয়ার আশা করা কঠিন। নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান খুব দ্রুত এবং চাঞ্চল্যকর রূপে হইবে এই প্রত্যাশা কেহই করেন না। উভয় পক্ষেরই গভীর আগ্রহ থাকিলেও ধৈর্য্যের সহিত দীর্ঘ দিন আলোচনা চালাইতে হইবে। আগামী মে মাসে প্যারীতে শীর্ষ সম্মেলন হইবে। উহাতে নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইবে। আন্তর্জাতিক পটভূমিকা এখন পর্য্যন্ত সব দিকেই অনুকূল বলিয়াই মনে হয়।

সিংহলে সাধারণ নির্ব্বাচন—

গত ১৯শে মার্চ্চ (১৯৬০) সিংহলে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল তাহাতে শ্রীডাডলী সেনানায়কের ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি ৫০টি আসন দখল করিয়া বৃহত্তম দলে পরিণত হইয়াছে এবং শ্রীসেনানায়ক প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। সিংহলের প্রতিনিধি পরিষদ ১৫৭টি আসন লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে ১৫১টি আসন নির্ব্বাচনমূলক। অবশিষ্ট ছয়টি আসনের জন্ত সদস্য মনোনয়ন করেন সরকার। নির্ব্বাচনমূলক ১৫১টির মধ্যে ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টি ৫০টি আসন দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। পরলোকগত প্রধান মন্ত্রীর শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি দখল করিয়াছে ৪৬টি আসন। ইউনাইটেড্ নেশন্যাল পার্টি বৃহত্তম দল হইয়াও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে না পারায় কি ভাবে প্রতিনিধিপরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষা করিবে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নূতন সরকার যে ছয়জন সদস্য মনোনয়ন করিয়াছেন তাহাদিগকে লইয়া সরকারী দলের সংখ্যা দাঁড়াইবে মাত্র ৫৬ জন। সুতরাং আরও ২৩ জন সদস্যের সমর্থন না পাইলে মন্ত্রিসভার পক্ষে কাজ চালাইবার মত সংখ্যাগরিষ্ঠতার থাকিবে না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সিংহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়ক এবং তাহার মন্ত্রিসভার চারি জন সদস্য নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এবং পরাজিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি তাঁহার ও তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। শ্রীদহনায়ক যে লঙ্কা প্রজাতন্ত্রবাদী পক্ষ দল গঠন করিয়াছিলেন সেই দলের মাত্র ৪জন প্রার্থী নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। এই চারি জন সদস্য ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টিকে সমর্থন করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তাহা হইলেও স্থায়ী সরকার গঠন করিতে হইলে শ্রীসেনানায়কের দলের আরও অন্ততঃ ১১ জন সদস্যের সমর্থন দরকার। ইউনাইটেড নেশন্যাল ফ্রণ্ট আশা করেন যে, ছোটখাটো দক্ষিণপন্থীদলের এবং কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থন তাঁহারা পাইবেন।

সিংহলের এই নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে প্রচার কার্য্য চলিয়াছিল তাহাতে নাগরিক অধিকার বিহীন লক্ষাধিক ভারতীয়দের সম্পর্কে কোন বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস দেখা যায় নাই। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর শ্রীসেনানায়ক সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন, "I propose to,as early as possible, try and implement the Nehru-Kotelawala agreement which was arrived at some time back." অর্থাৎ সিংহলস্থ ভারতীয় বংশোদ্ভবদের সম্পর্কে যে নেহরু-কোটেলাওয়ালা চুক্তি হইয়াছে তাহা তিনি যথাসম্ভব সত্বর কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিবেন। আগামী মে মাসে তিনি যখন কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করিতে লণ্ডনে যাইবেন সেই সময় অথবা প্রয়োজন হইলে তাহারও পূর্ব্বে এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি নেহরুজীর সহিত আলোচনা করিবেন। তাঁহার এই আশ্বাস বাণী সত্ত্বেও আমরা ভরসা করিবার মত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সিংহলের স্বাধীনতা লাভের পর এ পর্য্যন্ত তিনটি সরকার গঠিত হইয়াছে এবং পাঁচ জন প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীডাড্‌লী সেনানায়কও একজন ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি পিতার মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন সরকার বা প্রধান মন্ত্রী-ই ভারতীয় বংশোদ্ভবদের সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই। এবার চতুর্থ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইল এবং শ্রীডাড্‌লী সেনানায়ক হইলেন ৬ষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী। তিনি যে সহজে এবং শীঘ্র এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। তবে তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে না, এইটুকু আশা করাও বর্ত্তমানে কঠিন।

সিংহলের এই নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, সিংহলবাসীরা দক্ষিণপন্থার দিকেই ঝুঁকিয়াছেন। ১৯৫৬ সালের নির্ব্বাচনে ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টি মাত্র ৮টি আসন পাইয়াছিল। মার্কসবাদী পরিচালিত মহাজন এক সাথ পেরামুন্নাদলটি পাইয়াছিল ৫১টি আসন। এবার এই দলটি মাত্র ১০টি আসন পাইয়াছে। লঙ্কা সমাজপার্টি চা, রবর প্রভৃতির বাগান, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং আমদানী রপ্তানী ব্যবসায় সমস্তই রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পক্ষপাতী। কিন্তু শ্রীডাড্‌লী সেনানায়ক স্থিতাবস্থা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী। শ্রীডাড্‌লী সেনানায়ক বলিয়াছেন যে, তিনি চা, রবর প্রভৃতির বাগান রাষ্ট্রায়ত্ত করার বিরোধিতা করিবেন। বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী এখনও এই সকলের মালিক। কলম্বো বন্দর এবং পরিবহন ব্যবস্থা বন্দরনায়কের সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন। এইগুলির কোন পরিবর্ত্তন তিনি করিবেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে জনসাধারণ তাহাকে সমর্থন করায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে তাহারা মার্কসিষ্ট দলগুলির বিরোধী। তাঁহার এই অনুমানের মধ্যে অনেক গলদ আছে বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। তবেও রাজনীতি সচেতন, তরুণ

লঙ্কা প্রজাতন্ত্রবাদী পক্ষের সদস্য এবং ৫জন স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থন পাইলেও তাঁহার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না। সিংহলবাসী তামিল ভাষাভাষীদের প্রতিষ্ঠান ফেডারেল পার্টিগত ২২শে মার্চ্চ এক ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে, পার্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে কোন চুক্তি না হইলে তাঁহারা ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টির গবর্ণমেন্টকে সমর্থন করিবেন না। এই পার্টির ১৫জন সদস্যের সমর্থন ব্যতীত ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে শ্রীসেনানায়ক নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিবেন। আগামী ৩০শে মার্চ্চ স্পীকার নির্ব্বাচনের প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন হইবে এবং তখনই আনুষ্ঠানিক ভাবে কাজ আরম্ভ হইবে। ইউনাইটেড নেশন্যাল পার্টি যদি ভোটে জয়লাভ করিতে না পারেন তাহা হইলে কি হইবে? দ্বিতীয় মেজরিটি পার্টি হিসাবে পরলোকগত বন্দরনায়কের শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহূত হইতে পারে। উহার একমাত্র বিকল্প পুনরায় সাধারণ নির্ব্বাচন। শ্রীলঙ্কা ফ্রিডম পার্টি যদি স্থায়ী সরকার গঠন করিতে না পারে, তাহা হইলে আবার সাধারণ নির্ব্বাচন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

আগাদীরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা—

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৬০) গভীর রাত্রে মরক্কোর আগাদীর সহরে যে-প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা যেমন ভয়াবহ তেমনি মর্ম্মান্তিক। এই ভূমিকম্প কোয়েটার ভূমিকম্পের কথাই সর্ব্ব-প্রথম স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯৩৫ সালে কোয়েটায় ভূমিকম্প গভীররাত্রে ঘটিয়াছিল। আগাদীরে ভূমিকম্প হয় স্থানীয় সময় ২৩-৩১ মিনিটের সময়। ভূমিকম্পের ফলে আগাদীর সহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ক্রাউনপ্রিন্স মৌলা হাসান সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন, ভূমিকম্পের ফলে নিহতের সংখ্যা দশ হাজার হইতে বার হাজার হইবে। আহতের সংখ্যা দুই হাজারের বেশী হইবে না। চল্লিশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মরক্কোতে এইরূপ ভূমিকম্প আর হয় নাই। আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী সূর্য্যকরোজ্জ্বল এই সহরটি বিদেশী পর্য্যটকদের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু। বহু বিদেশী পর্য্যটক এই সময় আগাদীরে ছিলেন। তন্মধ্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সুইডিশ ঔপন্যাসিক মিঃ আর্থার লুণ্ডভিষ্ট অন্যতম। আগাদীরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। সমুদ্রতীর হইতে মাত্র কয়েক গজ দূরে অবস্থিত বিলাসবহুল আসাদা হোটেলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বণিক সভাভবন, ডাকঘর, পুলিশ হেড কোয়াটার, বিখ্যাত অনাথ আশ্রম প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের সময় এই সহরের বিলাসবহুল হোটেলগুলি বিদেশী পর্য্যটকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

বিধ্বস্ত, মৃতের সহর আগাদীরকে বুলডজার দ্বারা সমভূমি করিয়া ফেলা হইতেছে। আবার নূতন করিয়া এখানে সহর গড়িয়া উঠিবে, আবার নূতন রূপে আগাদীর সহর জনকোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের মর্ম্মান্তিক স্মৃতি চিরকাল অম্লান হইয়া থাকিবে। লিসবনের ভূমিকম্পের সময় মরক্কোর ফেজে আরও একবার প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, টর্নেডো প্রভৃতি এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত হানে যে মানুষ আত্মরক্ষা করিবার আর সময় পায় না। উহাদের আঘাত অনেক সময় এত প্রচণ্ড হয় উহা হইতে আত্মরক্ষা করাও অসম্ভব। ভূতাত্ত্বিক যুগে এই ধরণের বহু বিপর্য্যয় হইয়াছে যাহার ফলে পৃথিবী বর্ত্তমান রূপ পাইয়াছে। মানুষের স্মরণ কালের মধ্যে এইরূপ ধ্বংসলীলা বড় কম হয় নাই। ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পাম্পেয়াই ও হারকিউলানিয়াম সহর দুইটি বিধ্বস্ত হওয়ার কাহিনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ১৭৫৫ সালে ১লা নভেম্বরের ভূমিকম্পে লিসবন্ সহরটি সমভূমি হইয়া যায়। নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১০ হাজার হইতে ২০ হাজারের মধ্যে। ভূমিকম্পের ফলে সর্ব্বাধিক লোক নিহত হয় ১৫৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে চীনের সেন্‌সি অঞ্চলে। নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৮ লক্ষ ৩০ হাজার। আর কোন ভূমিকম্পে এত লোক নিহত হওয়ার কথা জানা যায় না। নিহতের সংখ্যাধিক্যের দিক হইতে উহার পরেই ১৭৩৭ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার ভূমিকম্পের কথা উল্লেখযোগ্য। এই ভূমিকম্পে তিন লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের কান্‌সুতে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৮০ হাজার। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর জাপানের টোকিওতে ভূমিকম্পের ফলে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার লোক নিহত হয়। ভারতে যে সকল প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছে তন্মধ্যে ১৭৩৭ সালের কলিকাতার ভূমিকম্প এবং ১৯৩৫ সালের কোয়েটার (বর্ত্তমানে পাকিস্তান) ভূমিকম্পের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কোয়েটার ভূমিকম্পে ৫০ হাজার লোক নিহত হইয়াছে। আসামে ১৯৫৩ সালে যে ভূমিকম্প হয় তাহার কথা বোধ হয় সকলেরই মনে আছে। এই ভূমিকম্পে দেড় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, নিহতের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। আসামে আরও একবার প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল ১৮৯৭ সালে। এই ভূমিকম্পেও দেড় হাজারের অধিক লোক নিহত হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলার ভূমিকম্প এবং ১৯৩৪ সালের বিহারের ভূমিকম্পের কথাও আমাদের মনে না থাকিয়া পারে না। সমস্ত ভূমিকম্পের কথা এখানে উল্লেখ করার স্থান আমরা পাইব না। গত দশ বৎসরের মধ্যে যে সকল প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছে তন্মধ্যে ১৯৫৩ সালে মার্চ মাসের তুরস্কের ভূমিকম্প, ১৯৫৬ সালের জুন মাসে আফগানিস্থানের ভূমিকম্প এবং ১৯৫৭ সালের জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে ইরাণের ভূমিকম্প এবং ১৯৫৭ সালের বহির্ম্মঙ্গোলিয়ার ভূমিকম্পের কথা উল্লেখযোগ্য। তুরস্কের উক্ত ভূমিকম্পে বার শত লোক নিহত হয়। ইরাণের দুই ভূমিকম্পে প্রায় তিন হাজার লোক নিহত হইয়াছে। বহির্ম্মঙ্গোলীয় ভূমিকম্পে নিহত হইয়াছে বার শত। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে পেরুতে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে ১২৮ জন নিহত হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও ভূমিকম্প কবে কোথায় হইবে পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারার উপায় আজও উদ্ভাবিত হয় নাই। ভবিষ্যতে হইবে কি না তাহা বলাও সম্ভব নয়। ভূমিকম্প নিবারণ করার কথা বিজ্ঞানে বোধ হয় এখনও কল্পনাও করিতে পারে না। ভূমিকম্পে ধ্বংস হইবে না এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা আজও সম্ভব হয় নাই। ভূমিকম্প কেন হয়, বিজ্ঞান তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে

ঘটে; কিন্তু এই তত্ত্ব পূর্ণাঙ্গ কি না তাহা বিজ্ঞানীরা বলিতে পারেন। কিন্তু আগাদীরের ভূমিকম্প সম্পর্কে অধ্যাপক জি, ডি বার্ণল এফ-আর-এস বলিয়াছেন, সাহারায় ফরাসী পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সহিত উহার কিছুটা সম্পর্ক থাকিতে পারে, এই সম্ভাবনা তিনি উড়াইয়া দিতে পারেন না।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় নরমেধ যজ্ঞ—

দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউন ও জোহেন্সবার্গের কৃষ্ণাঙ্গ অঞ্চলগুলির আফ্রিকানরা পরিচয়পত্র বা পাস আইনের বিরুদ্ধে গত ২১শে মার্চ্চ (১৯৬০) বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের শ্বেতাঙ্গ বাহিনী বেপরোয়া গুলীবর্ষণ করিয়া যে হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে তাহা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা যেন এক যুদ্ধের আয়োজন। শোভাযাত্রীদের মাথার উপরে বিমানের মহড়া দেওয়া হইয়াছিল। তার পর চলে রাইফেল ও ষ্টেনগানের গুলীবর্ষণ। শুধু তাই নয়, সাঁজোয়া গাড়ীও ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং উহা হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বর্ষণ করা হইয়াছে। নিরস্ত্র জনতাকে হত্যা করিবার জন্য যেমন যুদ্ধের আয়োজন করা হইয়াছিল তেমনি ঘটনাস্থলের অবস্থাও হইয়াছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতই। হতাহত নরনারী শিশুর দেহে ঘটনাস্থল সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কত লোক হতাহত হইয়াছিল? সরকার পক্ষ হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করা হইয়াছে যে, ৭২ জন আফ্রিকান নিহত হইয়াছে এবং আহত হইয়াছে ১৭৮ জন আফ্রিকান। কিন্তু এ সংখ্যা যদি আরও বেশী হয় তাহা হইলেও আমরা বিস্মিত হইব না। জনৈক পুলিশ কমাণ্ডাণ্ট বলিয়াছে—"কতগুলি মারিয়াছি জানি না।" আরও বেশী মারা হয় নাই বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সভার জনৈক সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলান আফ্রিকা ভ্রমণের সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেণ্টকে খুব মোলায়েম ভাষায় জানাইয়াছিলেন যে, সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ড যেন উহারই প্রত্যুত্তর।

দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের বর্ণবিদ্বেষের নীতির কথা আমরা ভাল রকমেই জানি। মহাত্মা গান্ধী যে উহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। আফ্রিকানদের বসবাসের জন্য স্বতন্ত্র অঞ্চল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শিক্ষার পবিত্র পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়েও প্রবেশ করিয়াছে বর্ণবিদ্বেষ। এইখানেই সব শেষ হয় নাই। আফ্রিকানদিগকে নিজের দেশেই সব সময়ই পরিচয়পত্র বহন করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। পুলিশ দেখিতে চাহিলেই উহা দেখাইতে হইবে। প্রতি মাসে উহাতে পুলিশের একটা সই লইতে হইবে। পরিচয়পত্র সঙ্গে না থাকিলে জেল ও জরিমানা হইবে। এই আইনের প্রতিবাদে প্যান আফ্রিকান-কংগ্রেসের নেতৃত্বে এক আন্দোলন পরিচালিত হইতেছে। এই আন্দোলনের মূলধারা হইল পরিচয়পত্র সঙ্গে না লইয়া থানায় হাজির হওয়া এবং গ্রেফতার বরণ করা। বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছিল এই আন্দোলনকে উপলক্ষ করিয়া। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ২৩শে মার্চ্চ (১৯৬০) লোকসভায় বলিয়াছেন, "দক্ষিণ-আফ্রিকায় আফ্রিকানদের ব্যাপক হত্যা এমন একটি ঘটনা যাহা ইতিহাসের গতি পরিবর্ত্তন করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই ঘটনার শেষ এইখানেই নয়; ইহা ভবিষ্যতে আরও সংঘর্ষের সূচনা করিতেছে। আফ্রিকার জনসাধারণ এই ধরণের ব্যাপার সহ্য করিবে না এবং তাহাদের পিছনে থাকিবে এশিয়ার প্রতি মানুষের সহানুভূতি।" তিনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আসন্ন কমনওয়েলথ সম্মেলনে এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রীর সহিত করমর্দ্দন করিতে এবং এক সঙ্গে বসিতে অস্বীকার করিয়া তিনি কি এই সহানুভূতিকে বাস্তব রূপ দিবেন? ঘানার প্রধান মন্ত্রীও কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করিবেন। তিনি কি দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর সহিত করমর্দ্দন করিতে এবং এক সঙ্গে বসিতে অস্বীকৃত হইবেন।

কেনিয়ায় এশীয়রা আক্রান্ত—

গত ১৩ই মার্চ্চের এক সংবাদে প্রকাশ, কেনিয়ায় পাঙ্গা ছুরিকা লইয়া একদল আফ্রিকান তিন বার এশীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছে। কেনিয়ার এশীয়দের উপর আফ্রিকানদের আক্রমণ এই নূতন নয়। কিন্তু সম্প্রতি বিশেষ করিয়া লণ্ডনে কেনিয়ার শাসন সংস্কার সম্পর্কে সম্মেলন শেষ হওয়ার পর এই আক্রমণ বাড়িয়াছে বলিয়াই মনে হইতেছে। মাউ মাউ আন্দোলন দমনের জন্য কেনিয়ায় যে সাত বৎসরব্যাপী সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত ছিল সেই সাত বৎসরে মোট ২৬ জন এশীয় আফ্রিকানদের হাতে নিহত হইয়াছে। কিন্তু গত পাঁচ মাসে আফ্রিকানদের হাতে নিহত হইয়াছে ৫ জন এশীয়। গত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৬০) নৈরবি সহরের এক হাজার এশীয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত কেনিয়ার গবর্ণর স্যার প্যাট্রিক রেনিসনের নিকট পেশ করা হইয়াছে। এই দরখাস্তে এশীয়দিগকে রক্ষার জন্য অধিকতর পুলিশী সাহায্য দেওয়ার আবেদন জানাইয়া বলা হইয়াছে যে, একদল দায়িত্বহীন লোক এশীয়দিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেছে এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে চাহিতেছে। লণ্ডন সম্মেলনে কেনিয়ার এশীয়গণ তাহাদের ভাগ্য আফ্রিকানদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছে। ভূমি সম্পর্কেও কোন রক্ষাকবচ তাহারা দাবী করে নাই। তবু এই আক্রমণের হেতু কি, সে-সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের কোন ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেনিয়ার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং দেশরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ এণ্টনী স্বোয়ান এবং পুলিশ কমিশনারের যে উক্তি 'ইষ্ট আফ্রিকান্ ষ্টেণ্ডার্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, এশীয়দের উপর যে আক্রমণ চলিতেছে তাহার কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য্য আছে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কেনিয়ার এশীয়দের অবস্থা একদিকে ইউরোপীয় এবং আর একদিকে আফ্রিকানদের চাপে পড়িয়া স্যেণ্ডুইচের মত হইয়াছে মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

কেনিয়াস্থিত ইউরোপীয়রা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, এশীয়রা প্রকাশ্যে কেনিয়াবাসীদের জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করেন এবং গোপনে সমর্থন করেন ইউরোপীয়দিগকে এবং উপনিবেশিক

সরকারকে। এই ধরণের উক্তি যে এশীয়দের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এশীয়দের উপর আফ্রিকানরা যদি ক্রুদ্ধ হয়, তাহাদিগকে যাহাতে অবিশ্বাস করে সেই উদ্দেশ্যেই এইরূপ প্রচার করা হইতেছে, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। এই ধরণের উক্তিই এশীয়দের উপর আক্রমণ চালাইতে আফ্রিকানদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করার পর জোমো কেনিয়াটা স্বগৃহে বন্দী আছেন। তাঁহাকে যদি এই বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টায় এশীয়দের উপর এই আক্রমণ বন্ধ হইতে পারে এবং এশীয়দের সম্পর্কে মিথ্যা ধারণাও দূর হইতে পারে।

চৌ এন লাইয়ের ভারতে আগমন—

সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য গত জানুয়ারী (১৯৬০) মাসের শেষভাগে চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর গত ২৮শে মার্চ্চ (১৯৬০) চীন-নেপাল সীমান্ত সম্পর্কে মিঃ চৌ এন লাই এবং নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরলার মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। তাছাড়া নেপালকে চীনের অর্থনৈতিক সাহায্য দান সম্পর্কেও একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চীনের প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নেপালের প্রধান মন্ত্রী গত ১১ই মার্চ্চ দুই সপ্তাহের জন্য চীনে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ ও নেপাল এই দুইটি দেশের সহিত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ১৯শে এপ্রিল নয়া দিল্লীতে আসিতেছেন। তিনি ভারতে এক সপ্তাহ অবস্থান করিবেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধের, মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা করিতে তিনি দিল্লীতে আসিতেছেন। চীন-ব্রহ্মদেশ বা চীন-নেপাল সীমান্ত বিরোধের মত চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা সহজ ব্যাপার নয়। চীন কর্ত্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘনের ফলে ভারতের জনমত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে, চীন-ভারত মৈত্রী সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নেহরু-চৌ আলোচনায় আগে সীমান্ত বিরোধের যদি সুমীমাংসা হয় তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

চীনের প্রধান মন্ত্রীর ভারতে আগমন উপলক্ষে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের ভারত ভ্রমণের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভারত সফর আরম্ভ হইবে। তিনি ২৯শে মার্চ্চ ভারতে আসিয়া পৌঁছিবেন। ৩১শে মার্চ্চ তিনি ভারতীয় পার্লামেণ্টে বক্তৃতা দিবেন। ভারতের রাজধানীতে তিনি তিন দিন থাকিয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত আলাপ আলোচনা করিবেন। দিল্লী পৌরসভা হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে। প্রেসিডেণ্ট নাসের ১০ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করিবেন এবং সম্মেলনের পর বিমানযোগে করাচী যাত্রা করিবেন।

২৫শে মার্চ্চ, ১৯৬০

অনেক সন্ধ্যার কথা

রণেশ মুখোপাধ্যায়

সাঁঝের আকাশে শিশু-তারকার ঘুম টলে,
বাদুড়ের ডানা ঢেকে দিয়ে যায় শেষ আলো :
খবরদারীতে হুতোম থুমোর চোখ জ্বলে ;
গাছেরা পরেছে জোনাকির জামা জমকালো।

মাঝখানে চাঁদ বসেছে আসর জাঁকিয়ে,
ঝাউ-ঝির-ঝির বাতাসে কতো না গানের সুর :
এমনই আবেশ মাখানো আকাশে তাকিয়ে ;
মনে হলো আজ, তুমি চলে গেছো কতো দূর।

সেদিনও এমনই তারাভরা সেই সন্ধ্যাতে,
ভেবেছি, তুমি না থাকলে সবই তো অন্ধকার :
খোঁপায় জড়ানো কিশোরী রজনীগন্ধাতে
দেখেছি তোমার প্রাণ-প্রত্যয় কণ্ঠহার।

আজও তো সে চাঁদ হামাগুড়ি দেয় আকাশে,
ভুঁইচাপা-মন গন্ধে আকুল আজও কয় :
চুড়ি-ঠুন্ ঠুন্ বেলোয়ারী সুর বাতাসে ;
আজও সেদিনের অনেক গোপন কথা কয়।

তোমার দু'চোখে এতো ভালবাসা দেখেছি :
আজ সেই প্রেম নিজের দু'চোখে মেখেছি।

খেলাধূলা

বোম্বাই দলের একাদশ বার "রঞ্জী ট্রফি" লাভ

বোম্বাই দলের গৌরবময় ক্রিকেট ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচনা হয়েছে। তাহারা একাদশ বার ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা "রঞ্জী ট্রফি" লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে। এই প্রতিযোগিতার ২৬ বছরের ইতিহাসে আর কোন দলের পক্ষে এই সম্মান লাভ সম্ভবপর হয় নি।

বোম্বাইয়ের ব্র্যাবোর্ণ ষ্টেডিয়াম। এখানেই বোম্বাই দল এবারকার ফাইন্যালে মহীশূর দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। খেলার আকর্ষণ কম ছিল না। মাঠে দর্শক-সমাগমও বেশ হয়। বোম্বাই দলের শক্তির সঙ্গে সকলেই সুপরিচিত। তাদের সাফল্য একরূপ নিশ্চিত। এই মনে করে বোধ হয় দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা কিছুটা দেখা যায়। বোম্বাই দল এই খেলায় এক ইনিংস ও ২২ রাণে মহীশূর দলকে পরাজিত করে। তাদের এবারকার সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবার কোন দলই তাদের বেগ দিতে পারেনি। মহীশূর দল ফাইন্যালে পরাজিত হলেও এই দলের তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়রা—শক্তিশালী বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে প্রশংসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উভয় ইনিংসেই মহীশূর দল দৃঢ়তার সঙ্গে রাণ তোলার চেষ্টা করে। তবে বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসে নিজেদের ফিল্ডিং বিপর্য্যয়ের ফলে তাদের যে ক্ষতি হয়—তা তাদের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মহীশূর "ফলো-অনের" পর ইনিংসে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবল প্রচেষ্টা সত্বেও মাত্র ২২ রাণের জন্য তারা সফল হতে পারে নি।

বোম্বাই দলের এবারকার সাফল্যের জন্য হার্ডিকার ও রামচাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশী। তাঁরা যথাক্রমে ১৪৫ রাণ ও ১০৬ রাণ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। বোলিং-এ গোলাম গার্ড উভয় ইনিংসে ১৩৫ রাণের বিনিময়ে ৯টি উইকেট পান। মহীশূর দলের সুব্রাহ্মনিয়াম দ্বিতীয় ইনিংস ১০৩ রাণ করার গৌরব অর্জন করেন। তাঁর ব্যাটিং বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। তাঁদের বোলিংএ দীপক দাশগুপ্ত সাফল্য অর্জন করেন। তিনি ৭৭ রাণে ৪টি উইকেট পান।

রাণ সংখ্যা

বোম্বাই—১ম ইনিংস ৫০৪ (হার্ডিকার ১৪৫, রামচাঁদ ১০৬, উম্রীগড় ৬৮; দীপক দাশগুপ্ত ৭৭ রাণে ৪ উইকেট)।

মহীশূর—১ম ইনিংস ২২১ (বিশ্বনাথ ৫১, কৃষ্ণমূর্ত্তি ৪৮, নাজারেথ ৪১; গোলাম গার্ড ৬৬ রাণে ৫ উইকেট)।

মহীশূর—২য় ইনিংস ২৬১ (সুব্রাহ্মনিয়াম ১০৩, রাজ্জক ৪১; গোলাম গার্ড ৬৯ রাণে ৪ উইকেট)।

আই এফ এ'র সম্পাদক শ্রীএম দত্তরায়ের আত্মপ্রসাদ

এবারকার আই, এফ, এ'র সম্পাদক শ্রীএম, দত্তরায়ের বার্ষিক বিবরণী আলোচনা কালে কয়েকজন সদস্য কয়েকটি যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক বলেছেন যে, আই, এফ এ'র অধীনে সকল ডিভিসন ফুটবল খেলাতেই বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। কোন দল পয়েন্টের জন্য কোন দলের কাছে কৃপা ভিক্ষা করেনি। লীগে উঠা-নামা স্থগিত রাখার জন্যই লীগের খেলা সুষ্ঠ ও সুশৃঙ্খল ভাবে শেষ করা সম্ভবপর হয়েছে। সম্পাদকের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে কয়েকজন সদস্য জোরালো ভাষায় সমালোচনা করেন। একজন সদস্য বলেছেন যে, লীগে উঠা-নামার ব্যবস্থা বন্ধ রাখার ফলেই খেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আকর্ষণ একেবারে কমে গেছে। শুধু তাই নয়, লীগে উঠা-নামা বন্ধ থাকার জন্য খেলার মানেরও অবনতি হয়েছে। সুতরাং নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সম্পাদক শ্রী দত্তরায়ের আত্মপ্রসাদের কোন কারণ নেই। তিনি আরও সমালোচনা করেছেন যে, আই, এফ, এ'র নিষ্ক্রিয়তার ফলে পরস্পর-বিরোধী নিয়মাবলী আজও পর্য্যন্ত সংশোধন করা হয় নি। কলকাতার ষ্টেডিয়াম গঠনের পথেও আই, এফ, এ অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় ঘটিয়েছে। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার সাফল্য সম্পর্কে যে ফলাও করে বিবরণী তৈরী হয়েছে—তার সমালোচনা করে অপর একজন সদস্য বলেছেন যে, এ বিষয়ে বাঙ্গালার গৌরব কোনমতেই বাড়েনি। ১৯৫৮ সালে পাঁচ জন এবং ১৯৫৯ সালে ছয় জন স্থানীয় খেলোয়াড় বাঙ্গালা দলে স্থান পান। এ থেকে ভালভাবেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে আই, এফ, এ'র ফুটবলের উন্নতির বিষয়ে কোন স্থায়ী পরিকল্পনা নেই। তাঁরা আজও পর্যন্ত তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়দের শিক্ষার কোন চেষ্টা করেন নি।

আই, এফ, এ-র আয়-ব্যয়ের হিসেব পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মোট ব্যয়ের প্রায় তিন ভাগই ব্যয় হয় কর্ম্মচারীদের বেতন, দুর্ম্মূল্য ভাতা ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ। এই বাবদ যে ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে তার আবার অর্দ্ধেকই খরচ হয়েছে, আই, এফ, এ-র বেতনভুক সম্পাদক শ্রীদত্তরায়কে পুষতে। সম্পাদকের মূল বেতন মাসিক বারো শত টাকা। তাছাড়া অন্যান্য ভাতা তো আছেই। আই, এফ, এ-র আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসছে চ্যারিটি ম্যাচ থেকে। চ্যারিটির টাকা থেকে মোটা মাইনের সম্পাদক পোষা উচিত কি না তা আই, এফ, এ-র পরিচালকমণ্ডলীই বলতে পারেন। মোটা মাইনের সম্পাদক শ্রীদত্তরায়ের কার্য্যক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটা উদাহরণ দিলেই ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে। (ক) ১৯৫২ সালে আই, এফ, এ শীল্ড ফাইন্যাল বানচাল। (খ) ১৯৫৩ সালে লীগ ও শীল্ড দুই-ই বানচাল। (গ) ১৯৫৭

সালে ডিসেম্বর মাসে শীল্ড ফাইন্যাল। (ঘ) ১৯৫৮ সালে জানুয়ারী মাসে শীল্ড ফাইন্যাল। (ঙ) ১৯৫৯ সালে শীল্ড ফাইন্যাল বানচাল। **সাবাস শ্রীদত্তরায়।**

ইংলণ্ড দলের "রাবার" লাভ

পোর্ট অফ স্পেনে (ত্রিনিদাদ) অনুষ্ঠিত পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় ইংলণ্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে সর্ব্বপ্রথম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে "রাবার" লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করে। ১৯২৯-৩০ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে স্থানীয় দল ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেষ্ট খেলা সুরু হয়। কিন্তু এর আগে ইংলণ্ড দলকে জয়লাভ করতে দেখা যায়নি। এবারে দুই দলের মধ্যে পাঁচটি টেষ্টের মধ্যে চারটি অমীমাংসিত থাকে। ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভ করে।

রাণ সংখ্যা

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ৩৯৩ (কাউড্রে ১১৯, ডেক্সটার ৭৬, ব্যারিংটন ৬৯, জিম পার্কস ৪০; রামাধীন ৭৩ রাণে ৪ উইকেট ও সোবার্স ৭৫ রাণে ৩ উইকেট)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস (৮ উইঃ ডিঃ) ৩৩৮ (সোবার্স ৯২, হাণ্ট নট আউট ৭২ ও ওয়ালকট ৫৩)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস (৭ উইঃ ডিঃ) ৩৫০ (জিম পার্কস নট আউট ১০১, স্মিথ ৯৬, পুলার ৫৪, ডেক্সটার ৪৭; সোবার্স ৮৪ রাণে ২ উইকেট)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস (৫ উইঃ) ২০৯ (ফ্রাঙ্ক ওয়েল ৬১, সোবার্স নট আউট ৪৯, হাণ্ট ৩৬, কানহাই ৩৪; ইলিংওয়ার্থ ৫৩ রাণে ২ উইকেট)।

আকর্ষণীয় ক্রিকেট খেলার জন্য আহ্বান

সম্প্রতি রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হয়। খেলায় বোম্বাই ও অবশিষ্ট দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। তবে প্রথম ইনিংসে অগ্রগমনের ফলে বোম্বাই দল ইরাণী কাপ লাভ করে। এই খেলা উপলক্ষে আয়োজিত এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা ভারতে ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে আকর্ষণীয় ক্রিকেটখেলার জন্ম আহ্বা'ন জানিয়েছেন। পাতিয়ালার মহারাজা বলেছেন যে, ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য সংগঠকদের চেষ্টার উপর ততটা নির্ভর করে না—যতটা খেলোয়াড়দের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। তিনি আরও বলেছেন যে, ক্রিকেট খেলোয়াড়রা আক্রমণাত্মক ভঙ্গীর খেলার দিকে মনোনিবেশ না করলে ক্রিকেট খেলায় দর্শকদের আগ্রহ লোপ পাবে। তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর পিতা পরলোকগত পাতিয়ালার মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং ভারতে ক্রিকেট খেলার বিষয়ে জনসাধারণের আগ্রহ বাড়াবার জন্ত "রঞ্জী ট্রফি" দান করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য কোন মতেই সফল হয় নি। পাতিয়ালার মহারাজার মন্তব্যটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্ম বর্ত্তমানে "রঞ্জী ট্রফি" খেলার আকর্ষণ একেবারেই বিলুপ্ত হতে চলেছে। "রঞ্জী ট্রফির" খেলায় আকর্ষণ একদিন টেষ্ট খেলার সমতুল্য ছিল বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। বর্ত্তমানে এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সকলেই আশঙ্কা বোধ করছেন।

প্রেমজিৎলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

সম্প্রতি বেঙ্গল লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলসের সেমি-ফাইন্যালে জয়দীপ মুখার্জীর জুটিতে খেলার সময় "খেলার প্রাঙ্গণে" অশোভন আচরণ, আম্পায়ারের নির্দেশ অমান্ত এবং খেলা চলার সময় আম্পায়ারকে লাঞ্ছিত করার জন্ম বেঙ্গল লন টেনিস এসোসিয়েশনের কার্য্যকরী সমিতি ভারতের তিন নম্বর ও ডেভিস কাপ খেলোয়াড় প্রেমজিৎ লালের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে, নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনকে অবহিত করার এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ প্রেমজিৎলাল ডেভিস কাপের খেলায় ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিলেন। তবে শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে মাঝে মাঝে সরে দাঁড়িয়েছেন। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশন কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ইহা দেখিবার বিষয়। তবে ভারতের লন টেনিস খেলার ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম একজন আম্পায়ার খেলোয়াড় দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। খেলার প্রাঙ্গণে এইরূপ অ-খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।

"বাম্পার বল" বন্ধ হওয়া দরকার

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ও ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ পি, সুব্বারায়ন সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, "বাম্পার বল" দেওয়ার প্রথা বন্ধ না হলে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি আশা করেন যে এ বছর ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সঙ্গে পরামর্শ করে এম, সি, সি এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

তিনি বলেন যে, একপক্ষ "বাম্পার" দিলে অপরপক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ম "বাম্পার" দিতে থাকেন। সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের খেলায় অনেকে ইহার ফলে আহত হয়েছেন। এই ধরণের বোলিং-এর ফলে ব্যাটসম্যানরা মারিয়া খেলতে-পারেন না। এতে ভাল না হয়ে ক্রিকেটের ক্ষতি হয়। ডাঃ সুব্রাহ্মনিয়ার বিবৃতি সত্যই বিবেচনার বিষয়। আশা করা যায় এবারকার ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

"আমাদের সঙ্গীতও রাজসভা সম্রাটসভায় পোষ্যপুত্রের মত আদরে বাড়িতেছিল। সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সঙ্গীতের সেই যত্ন আদর, সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য সঙ্গীত, বাউলের গান, এ সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড় শিল্পও টিকিতে পারে না।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেনাকাটা

কাজ—কে কোন্‌টি করবে ?

আজকের ছুনিয়ায় বিচিত্র ধরণের কাজ আছে, কিন্তু সবাই সব কাজ করতে সক্ষম হতে পারে না। কে কোন্ কাজের ঠিক উপযোগী, সে-টি খুঁজে পাওয়া চাই। ঠিক মানুষটি ঠিক যায়গায় পড়ে গেলে কাজ ভাল হবে, সহজে হবে। এমনটি যেখানে হলো না, সেখানেই কাজের গলদ দাঁড়িয়ে যায়, হাজির হয় অসন্তোষ বা বিশৃঙ্খলা।

এ-ও দেখা যায় অবশ্যি—যোগ্য লোক ঠিক যায়গায় পড়েও টিকে থাকতে চাইছে না। এর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে, তবে সাধারণ কারণ যেটি জানা যায়—চাকরি ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্য্যাদা বা মাইনে না পাওয়া। ক্রমাগত কয়েক বছর কাজ করা হয়তো হয়ে গেলো এর পরও বিকল্প কাজ চাইলে এ কারণটির কথাই মনে আসে প্রথম।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অসন্তোষ দেখা দেয়, প্রধানতঃ এই কারণে—যে কাজটি যার পক্ষে শ্রেয়ঃ, সে-টি না পাওয়া। উন্নতির নিশ্চিত তাগিদে যেখানে চাকরি রদবদল করা হয়, সেখানে অবশ্য থাকা চলে না। চাকরি পাল্টিয়ে নিয়েও যদি অবস্থান্তর না ঘটে, প্রত্যাশিত কাজটি যদি না মিললো, তা হলেই দুঃখের হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভালরকম বুঝতে পারা চাই আগেভাগে, কার পক্ষে কোন্ লাইনে যাওয়া ঠিক—কে কোন্ কাজটির সত্যি হবে উপযোগী।

শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ-তরুণীদের সামনে এ প্রশ্নটি হাজির হয়। প্রশ্নের সমাধান তাদের দ্বারা সব সময় হয়ে ওঠে না। এ জায়গায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা অনেক নিরাপদ। বিভিন্ন কাজের ভেতর কে কোন্‌টি করবে অর্থাৎ কোন্ কাজ কার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর, নিরূপণের ব্যবস্থা চাই-ই আর সে-টি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি।

পশ্চিমী দেশগুলোতে বিশেষভাবে আমেরিকায় এ জিনিস নিয়ে আলোচনা গবেষণা হয়ে চলেছে অনেক। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় কাজের যোগ্যতা বিচার ও পরামর্শদানের জন্য একটি কেন্দ্রই রয়েছে। এর ভেতর প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন, এমন অর্দ্ধ-লক্ষাধিক নর-নারীর সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে এখান থেকেই। নির্দ্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেয়ে কর্ম্ম-জীবনে বহু ব্যক্তি মনের প্রশান্তি পেয়েছেন, প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে।

আলোচ্য পরীক্ষা-কেন্দ্রে লিপিবদ্ধ একটি বিবরণ—খুব বেশি দিনের ব্যাপার নয়, ২৫ বছর বয়সের একটি যুবক আসে এখানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাবে বলে। যুবকটি সেলসম্যান হিসেবে কাজ করে চলেছে কয়েক বছর—কিন্তু তাতে তার কিছুই হচ্ছে না। পেশাগত পরীক্ষা, ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা কয়েক দফা চালানো হয় এর বেলায়। তারপর কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরামর্শদাতাগণ এই সুপারিশ করলেন যে, যুবকটির পড়া উচিত একাউণ্টিং।

যেমনি বুদ্ধি পাওয়া, অমনি যুবকের উদ্যম সুরু হয়ে যায় নতুন খাতে। একটি নৈশ বিদ্যালয়ে যেয়ে সে ঠিক ভর্ত্তি হলো। অল্প দিন বাদেই আগের কাজটি সে ছেড়ে দেয়—ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করে একদম একটি নতুন লাইন। উক্ত পরীক্ষা-কেন্দ্রকে সে লিখে জানায়—সুখের বিষয়, একাউণ্টিং পড়তে বলায় আমার চোখ খুলে গেছে। এক্ষণে আমি একটি বীমা কোম্পানীর কন্‌ট্রোলার বিভাগে কাজ করছি। তিন বছরেরও কম সময় মধ্যে মাইনে বেড়েছে এখানে আমার চার দফা।

উক্ত মার্কিণ কেন্দ্রটির বিবরণ থেকে সংগৃহীত আর একটি ঘটনা—বছর কয়েক হলো একটি অত্যন্ত লাজুক ও ভীরু ছেলের মা-বাবা এসে হাজির হন এখানে। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় দেখতে পাওয়া যায়, এর সামর্থ্য রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু অনেক লোকের সাথে মিশে কাজ করতে তাকে রাজী করানো কঠিন। বাপ-মা তো ভেবেই পান না—সত্যি কি করা যাবে ছেলেকে নিয়ে এর পর? আরও পরীক্ষা চালানো হলো, দেওয়া হল ব্যবস্থাপত্র—সমাজসেবামূলক কাজের দিকেই টেনে নিতে হবে তাকে ধীরে ধীরে। আশ্চর্য্য, সুফল বেশ ফললো এক্ষেত্রেও শেষ অবধি।

আমেরিকার মতো রাষ্ট্রসমূহে যোগ্যতার পরিমাণে কাজ বেছে নেওয়া কঠিন বলা যেতে পারে। কেন না, সেখানে প্রায় ৪০ হাজার রকমের কাজ রয়েছে—মার্কিণ শ্রম বিভাগের প্রকাশিত পেশাগত অভিধানেই এই তালিকাটি পাওয়া যায়। 'এ অবস্থায় অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণীর পক্ষে ভাল-মন্দ যথাযথ বাছাই করে নিয়ে কাজে ঢোকা একরূপ অসম্ভব। যন্ত্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এমন সব ধরণের কাজ সৃষ্টি হচ্ছে—যার সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় নেই কারও। এ সকল সমস্যার দরুণই দরকার পড়ছে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও সুচিন্তিত নির্দ্দেশ।

নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্যতা নির্দ্ধারণ কেন্দ্রটির অন্যতম পরিচালক ডক্টর ওয়ালেস গবেটজের মন্তব্য অনুসারে মানুষের চাকরি-জীবনটাও একটা বড় ব্যবসায়ের মতো। আপন দক্ষতা ও পছন্দ অনুযায়ী কাজ যে পেয়ে গেলো, এমন একজনের কথাই ধরা যাক। বছরে গড়পড়তা ৫,৫০০ পাউণ্ড রোজগার

করলে এবং ৪৫ বছর (২০ থেকে ৬৫) কাজ করা হয়েছে, ধরে নিলে ঐ লোকের মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ২,৪৭,৫০০ পাউণ্ড। আবার একই লোক ঠিক জায়গাটিতে পড়লো না ধরে নিলে অবস্থা কি দাঁড়ায়, পাশাপাশি পর্য্যালোচনা করা যেতে পারে। লোকটিকে স্বভাবতঃই অপছন্দসই নিম্নতম কোন কাজে বছরের পর বছর কাটাতে হয়, এ অমনি অনুমেয়—বছরে গড়পড়তা রোজগার তার ৪,৫০০ পাউণ্ড এই ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে লোকটির নীট ক্ষতি যেয়ে দাঁড়াবে ৪৫,০০০ পাউণ্ড সারা জীবনে।

এক্ষণে অন্ততঃ এ দেশে যা হয়—কে কোন্ কাজ করবে, কোথায় কার চাকরি হবে শেষ অবধি, সে-টি অনেকটা ঘটনাচক্র মাত্র। বেশির ভাগ কর্ম্মপ্রার্থীর বেলাতে আগে থেকে কিছু বলা চলে না—ঠিক কোন্ জায়গাটিতে কে যেয়ে বসবে। ফলে অনেক স্থলেই সম্বল করতে হয় নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা, দেখা দেয় ক্রমে অতৃপ্তি ও অসন্তোষ। সতর্ক হওয়ার বেশি রকম প্রয়োজন রয়েছে সেজন্যেই—আগে থেকে ভেবেচিন্তে কাজের লাইনটি তাই বেছে না করে নিলে নয়।

মাত্রা রেখে খাওয়া

সুস্থভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবার জন্যেই খাওয়া—এটি সহজ কথা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যদৃচ্ছা খেতে হবে। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির তাগিদ মেটাতে ঠিক সময় খাওয়াটি চাই, আর চাই মাত্রা রেখে খাওয়া অর্থাৎ পরিমিত আহার। অতিভোজনে মেদবৃদ্ধি হতে পারে, ভুঁড়িটি ফেঁপে উঠতে পারে; কিন্তু এটি যথার্থ স্বাস্থ্যের লক্ষণ কিনা, সে সন্দেহ থেকে যায়।

শরীর-বিজ্ঞানী বা স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা তাই দাবী রেখেছেন—মাত্রাতিরিক্ত খাওয়ার চেয়ে একটু কম খাওয়াই বরং ভালো। অতিভোজনে পাকযন্ত্রের ওপর স্বভাবতঃই বেশি চাপ পড়ে। ফলে ভুক্তদ্রব্য সহজে হজম হতে চায় না আর এ হজম না হওয়ার অর্থই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। শরীর-বিজ্ঞানীদের মতে যতটুকু খাদ্য অনায়াসে হজম হয়, তা-ই পরিমিত খাদ্য। পরিমিত ও সুষম খাদ্যগ্রহণের নিয়মটি উপেক্ষা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ভোজনবিলাসীদের প্রায় সব সময়ের একটি চিন্তা—কি করে ঠেসে উদরটি ভর্ত্তি করা যায়। এরূপ করতে যেয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেদ বা চর্ব্বি তাদের শরীরে দেখা দেয় কিন্তু শরীর চালনার ক্ষমতাটি ক্রমেই হ্রাস পেয়ে আসে। সমস্যাটি শুধু এদেশেই নয়, অন্যদেশেও রয়েছে এবং মাত্রা কোথাও প্রায় কম নহে। বহুলোক (সাধারণতঃ ওপরতলাকার) এই প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত—অপ্রয়োজনীয় মেদ কি ভাবে কমানো যায়, কোন্ পথ ধরে শরীরের অতিরিক্ত ওজন হ্রাস চলতে পারে। অনেক ওষুধপত্র বের হয়েছে এই প্রশ্নের দিকে নজর রেখে সেগুলোর ব্যবহারও চলছে অবশ্যি হরদম। কিন্তু স্বাস্থ্যবিদ্‌দেরই অভিমত—এ ব্যাপারে স্থায়ী ফল পেতে হলে সকলের আগে মাত্রা রেখে খাওয়ার নীতি অনুসরণ না করলে চলতে পারে না।

মার্কিণ মুলুকে স্ফীতকায় লোকের সংখ্যা নাকি আজকাল বেশ বেড়েছে (২৫ লক্ষের ওপর)। ফলে আলোচ্য প্রশ্নটি নিয়ে সেখানকার বিভিন্ন মহল অনেক মাথা ঘামাচ্ছেন বলেও জানা যায়। ভারতের মতো অনগ্রসর দেশগুলোতে অবশ্যি প্রশ্নটি ততটা ব্যাপক নয় কিংবা প্রশ্ন মূলতঃ উল্টো ধরণের। এ সকল স্থানে সাধারণ মানুষের মাত্রানুপাতে খাওয়ার সংস্থানই নেই, চর্ব্বি বা ওজন কমানর প্রশ্নটি তাদের কাছে অবান্তর বলা যায়। তবু অতিরিক্ত মেদবহুল ও দৈহিক ওজনবিশিষ্ট নরনারীদের ব্যাপার নিয়ে কিছুটা ভাববার নিশ্চয়ই প্রয়োজন রয়েছে এখানেও।

মাত্রাতিরিক্ত খেলেই যে শরীর স্ফীত হবে, সব সময় বা সবক্ষেত্রে অবশ্যি একথা খাটে না। এ-ও দেখা যায়, তেমন কিছু না খেয়েও শরীরে মাংস হচ্ছে—পেটে চর্ব্বি বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। এ ধরণের অবস্থা যেখানে, সেখানেই কোন ব্যাধি হয়েছে ধরে নেওয়া যায় সহজেই আর তখন চিকিৎসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দেখা যাবে, খাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ সে অবস্থাতেও রাখবার দাবী থাকছে। বাড়তি মেদ বা ওজন হবার পথরোধের আর একটি উপায় নিয়মিত কায়িক শ্রম করা। অপর দিকে চর্ব্বিপ্রধান খাদ্য যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করাই হবে এক্ষেত্রে যুক্তিসম্মত।

প্রয়োজনের চেয়ে সবসময়ই বেশি খেলে, দামী দামী জিনিসে পেট বোঝাই করলে, মেদ বা চর্ব্বি বাড়তে পারে এ বুঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—এত লোক মাত্রা ছাড়িয়ে খায় বা খেতে চায় কেন? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—পেটের ক্ষিদে ছাড়া চোখের ক্ষিদেও আছে, খেয়েও যেন খাওয়া হলো না. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, এই ভাবটারই আধিক্য। জিভের ওপর নিয়ন্ত্রণ যেখানে থাকে না, সেখানেই প্রায় মাত্রা-অতিরিক্ত খাওয়া হয়ে পড়বার কারণ ঘটে। গোড়াতেই বলতে চাওয়া হ'ল—অত্যধিক খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, তেমনি প্রয়োজনের চেয়ে কম মাত্রায় আহারও হানিকর। অমনি কম খেয়ে খেয়ে রোগাটে হয়ে যেতে হবে—দাবী যথার্থ অযৌক্তিক। আবার পরিমাপহীন খাওয়ার পরিণতিতে শরীরে অযথা মেদ ও চর্ব্বি বাড়ানোটাও অসঙ্গত। মনে রাখা চাই—এই দুই ধরণের অবস্থাটি ব্যাধির সমতুল্য, উভয়ই স্বাভাবিকতাবর্জ্জিত।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

শহর দেখবার অছিলায় আপন মনে পথ চলছিলাম। একবার মনে হলো আমাদের ভাড়া করা বাড়ীটাতে ফিরে যাই। বহুক্ষণ ঘুরা-ফিরা করবার জন্ম একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। খোকা বাবুর বাল্যবন্ধু হয়তো অধীর হয়ে আমার জন্য আমাদের ভাড়া করা বাড়ীটাতে বসে অপেক্ষা করছে। তবু আমার মনে হলো যে আমার পক্ষে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফসারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত হবে। আমি ধীর পদবিক্ষেপে থানার পথ ধরে থানায় এসে উপস্থিত হলাম। থানার অফসার ইনচার্জ্জ সুরেশ বাবু ছিলেন একজন বাঙ্গালী অফসার। আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে তিনি বললেন আরে মশাই! আপনে এসে গেছেন? কাল থেকে শুনছি যে কোলকাতা থেকে একজন পুলিশ অফসার এখানে তদন্তে এসেছেন। কিন্তু কোথায় যে তিনি এসে উঠেছেন তা এতো চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারলাম না। দেওঘর থানার ভারপ্রাপ্ত অফসারের এই খোঁজা-খুঁজির বহরে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমাদের খুঁজতে তিনি কুমারটুলির রাজার কাছে জান নি তো? তা'ছাড়া এই শহরে আমাদের আগমনের বার্ত্তা তিনি এতো শীঘ্র জানলেনই বা কি করে?

হঠাৎ আমার চিন্তার ধারা বিচ্ছিন্ন করে সুরেশ বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা খাওয়া দাওয়া করছেন কোথায়? কাল রাত্রি থেকে আপনি আছেনই বা কোথায়? আজ থেকে আমার কোয়ার্টারে থেকে এইখানেই খাওয়া দাওয়া করবেন। আপনাকে খুঁজে বার করবার আগেই আমাদের বাইরেকার ঘরটায় আপনার জন্যে একটা খাটিয়ায় বিছানা-পত্র ঠিক করে রেখেছি।

দেওঘর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এই অতিথিবাৎসল্য ও আগ্রহাতিশয্যে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম। আমরা কোলকাতা পুলিশের লোক। বাহির হতে কোন অফিসার এলে নিজেদের মধ্যে তাকে মেঠো পুলিশ বলে নিজেদের মধ্যে বহু ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছি। এমন কি, আমাদের কেউ তাদের অপেক্ষমান দেখেও পাশ কাটিয়ে আফিসঘরে চলে এসেছে! কিন্তু আমরা কোনও কার্য্যব্যপদেশে শহরের বাহিরের কোনও থানায় এসে উপস্থিত হলে তারা সাধ্যমত তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত যান-বাহন যোগে পুলিশি তদন্তকার্য্যে আমাদের সাহায্য তো তাঁরা করেছেনই; অধিকন্ত আমাদের জন্ম তাঁরা ধবধবে পরিস্কার মশারি সহ দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও মাংস দধি মিষ্টান্ন দুগ্ধ সমভিব্যাহারে পঞ্চব্যঞ্জন সহ অতি চিকণ অন্নেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বস্তুতঃপক্ষে একজন সাময়িক স্ত্রী ব্যতীত জামাই আদরের প্রতিটি উপকরণই তাঁরা আমাদের জন্ম সরবরাহ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আমরা তৎকালে মাত্র নিজেদেরই একজন সুসভ্য পুলিশ মনে করতাম। তা যেন আজ আমার ধারণার বাইরে! অথচ তাদের কাছে সমস্ত পুলিশেরই ছিল সমান আদর। একজন পুলিশ সাহেব ও একজন নিম্নতম পদের কনেষ্টবল অতিথি হিসেবে তাঁদের কাছে সমান ভাবেই আদর পেয়ে এসেছেন। একবার তাঁদের কাছে গিয়ে বললেই হলো যে আমি পুলিশ বিভাগের একজন লোক হিসাবে আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। কি মাদ্রাজ, কি বোম্বাই, কি মহারাষ্ট্র, কি বিহার—ভারতের প্রতিটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের পুলিশের মধ্যে আমি দেখেছি অতিথিসেবা ও ভ্রাতৃবাৎসল্যরূপ সেই একই ভারতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য। অন্তদিকে মাদ্রাজ বোম্বাই ও কলিকাতার মেট্রোপলিটন পুলিশদের মধ্যে আমি দেখেছি—য়ুরোপীয় সভ্যতার শুধু নির্ম্মম একটা যান্ত্রিক অভিব্যক্তি। কলিকাতা পুলিশের একজন অফিসার বিধায় লজ্জিত হয়ে উঠে আমি ভাবলাম, কাল ইনি কোলকাতায় এসে শ্যামপুকুর থানায় এলে হয়তো আমি জিজ্ঞাসাও করবো না যে ইনি কোথায় থাকবেন ও আহারাদি করবেন। বরং নির্ব্বিকার চিত্তে আমি দেখবো ও উপভোগ করবো যে তিনি থানা হতে বার হয়ে গিয়ে ট্রামের রাস্তার ওপারে জনতার ভীড়ের মধ্যে বেমালুম মিলিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা তাঁদের থানায় গেলে তাঁদের গৃহিণীরা পর্য্যন্ত অতিথি-সেবার জন্ম ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অনেকেই স্বহস্তে পরিবেশন করে আমাদের খাইয়েও দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের ওপরে নিয়ে যাওয়া বা তাঁদের জন্ম এতো বেলাতে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে—গৃহিণীদের নিকট তা কল্পনারও বাইরে ছিল।

এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এইরূপ অমায়িক ব্যবহার সত্ত্বেও আমি কিন্তু তাঁকে পুরাপুরি বিশ্বাস করে সকল বার্ত্তা তাকে এখুনি জানিয়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলাম না। এই সময় শুধু তাঁকে এইটুকু আমি বললাম যে কুমারটুলির একজন খুনে গুণ্ডার খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। তাঁর কাছে এ-ও শুনলাম যে, ষ্টেশনে সাদা পোষাকে পাহারারত একজন সিপাহী প্লাটফর্মে আমার ও হরিপদর মধ্যে কয়েকটা কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান দূর হতে শুনে বুঝে নিয়েছিল যে আমরা কোলকাতা পুলিশ থেকে এখানে একটি মামলার তদন্তের জন্ম এসেছি। আমাদের পুলিশ বলে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারার জন্যে সে আর আমাদের অলক্ষ্যে অনুসরণ করেনি। ঊর্দ্ধতন অফসারদের কাছে প্রায়ই কয়েকটি উপদেশবাণী শুনতাম, যথা—'বাজার হতে ক্রয় করো কিন্তু সেখানে নিজের জিনিস বিক্রয় করো না। লোকের কথা শুনে যেও কিন্তু নিজে বেশী কথা কও না। পথ চলো নিঃশব্দে ও আশে পাশের লোকেদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখো,' ইত্যাদি।

আজ সম্যক ভাবে উপলব্ধি করলাম, এ মূল্যবান উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হতে পারে। ভগবান আমাদের প্রতি সদয় যে ঐ

দিন আমাদের ঐ সব কথাবার্ত্তা খোকা বাবুর কোনও গুপ্তচর শুনে নি। পুলিশেরই জনৈক কনেষ্টবলের মাত্র তা কর্ণগোচর হয়েছিল। সকল কথা শুনে ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুরেশ বাবু বললেন, আচ্ছা, এখানে তো কুমারটুলির রাজাবাহাদুর এসে কিছুদিন আছেন। তাঁর লোকজনদের নিকটে গোপনে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ নিলে হয় না? তবে রাজাবাহাদুরটা অতি পাজী ও অহঙ্কারী। দারোগাদের একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। ওর মেলামেশা শুধু বড়োদের সঙ্গে। আমরা যেন মানুষই নই। এমন কি তাঁর গেটে দুই দিন পাহারার ব্যবস্থাও আমাকে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে করতে হয়েছিল। আইনে একবার পেলে দেখে নিতাম তাঁকে। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শুধু এইটুকু জানালাম যে কোলকাতায় তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটা মামলা আছে। শীঘ্রই তিনি চারটে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট পাবেন। সেই সময় দেওঘরবাসীর কাছে বেইজ্জত হয়ে তাঁর এই সব দুর্ব্ব্যবহারের জন্য উচিত শাস্তি তো এমনিই পাবেন। কাল থেকে তাঁর ওখানে এসে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তবে তিনি আমাকে বিদায় দিতে রাজী হলেন। এ ছাড়া তিনি এক ব্যক্তিকে আমাদের খবরদারী করবার জন্য আমাদের সঙ্গে পাঠাবার জন্য জিদও করেছিলেন। এর পর তিনি একটা টাঙ্গা গাড়ী ডেকে আমাদের তাতে তুলে দিয়ে গাড়োয়ানকে তার প্রাপ্য (?) ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিলেন।

আমার নির্দ্দেশমত টাঙ্গা গাড়ীখানা আমাদের ভাড়া করা বাসাবাড়ীর দিকে ছুটে চলছিল। ঠিক এই সময় আমার মনে পড়লো আমাদের জনৈক আত্মীয় ভদ্রলোক শ্রীরবীন্দ্র ব্যানার্জ্জির কথা। তিনি এই সময় দেওঘর কোর্টের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-এর পদে বহাল ছিলেন। তিনি দেওঘর সাবডিভিসনের সেকেণ্ড অফিসার বিধায় পদমর্য্যাদায় ঠিক এস-ডি-ও সাহেবের নীচে। তাঁর কথা মনে পড়ামাত্র আমি টাঙ্গাচালককে 'হাকিম লোককো বাঙ্গলো'র দিকে তার গাড়ীখানি চালাবার জন্য নির্দ্দেশ দিলাম। আমাদের ইনফরমার হরিপদ সরকার এদিকে আমাদের বাসাবাড়ীতে আমার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের আশু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাদের এই ক্ষমতায় আসীন আত্মীয় বন্ধুটির সহিত পরামর্শ করবার আমি বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলাম।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির বাটীতে এসে যখন আমি পৌছিলাম তখন সকাল দশটা বেজে গিয়েছে। আমাকে দেখে আমাদের রবিদা ওরফে রবীন্দ্র ব্যানার্জ্জি বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, আরে তুমি হঠাৎ এখানে? এই সময় তিনি আদালতে যাবার জন্য পোষাক পরে বার হয়ে যাচ্ছিলেন। আমার নিকট হতে সকল সমাচার অবগত হয়ে তিনি বললেন বাপ রে বাপ! এ তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! বেটা আমাকেও একবার নিমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু আমি তার ওখানে যাই নি। আচ্ছা। তুমি এখোন আমার এখানে স্নানাহার করে নাও। আমি আদালতে গিয়ে ঘণ্টা দুই 'দাঁড়ে' বসে ফিরে আসবো আধুন। এখানকার হেডকোয়ার্টারস হচ্ছে দুমকা সহর। দুমকা থেকে আর্ম্মাড ফোর্স নিয়ে আসা উচিত হবে। বিনা যুদ্ধে খোকা বাবু যখন ধরা দেবে না তখন এইরূপ ব্যবস্থা করাই ভালো হবে। আমি ফিরে এসে এস-ডি-ও সাহেবকে বলে দুমকায় লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমারও ইচ্ছা ছিল যে, রাত্রি তিনটার সময় খোকা বাবুর বাটীটা অতর্কিতে সশস্ত্র শান্ত্রী দ্বারা ঘেরাও করে ফেলে সজোরে বুটসহ পদাঘাতে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করা। এইরূপ অবস্থায় গুলী-বিনিময় হলেও আমাদের মধ্যে দুই তিনজনের বেশী হতাহত হবার সম্ভাবনা কম ছিল।

আমি রবীন্দ্র বাবুর উপদেশই শিরোধার্য্য করে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার গুলীভরা পিস্তলটি কোমরের পেটী হতে খুলে ফেলে শ্রীমতী ব্যানার্জ্জির নিকট জমা দিয়ে স্নান করে নিয়েছি। রবীন্দ্রবাবুর একজন আর্দ্দালীর মারফৎ আমাদের ইনফরমার হরিপদ বাবুর নিকট আমার এখানে অবস্থান ও কারণ সম্বন্ধে লিখে একটি গোপন পত্রও পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার স্নানের কার্য্য শেষ হলেও রবীন্দ্র বাবু ওরফে রবিদার সঙ্গে আমার একত্রে আহার করার কথা। এদিকে তাঁর ফিরে আসতে আরও দেড় ঘণ্টাকাল বাকি। তাই কিছু জলযোগ করে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আদালতের আশে-পাশের রম্য স্থানটি ঘুরে ফিরে একবার দেখে আসবার জন্যে আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমি এর পর মৃদু পদসঞ্চারে ইতস্ততঃ ঘুরা ফিরা করতে বড়রাস্তায় উঠে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছি। এই সময় হঠাৎ আমার নজর পড়লো সম্মুখের একটা ডাইনিঙ ক্লিনিঙ দোকানের দিকে। সম্মুখে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীরটা যেন সজোরে দুলে উঠলো। আমার দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায় যেন ইলেকট্রিকের শক

প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি পিছনে উঠে চেয়ে দেখলাম এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে খোদ খোকা বাবু গুরুফে খেঁদা গুণ্ডা আমার সম্মুখে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতখানি তার ডান পকেটের মধ্যে কখোন সে সেঁদিয়েও দিয়েছে। অভ্যাসবশত আমিও আমার ডান হাতখানি তখুনি আমার পাঞ্জাবীর ডান পকেটটাতে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার সেই ডান হাতখানি পকেট হতে টোটাভরা পিস্তলসহ বার করে নেওয়া আর সম্ভব হলো না। হায়, আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় গুলীভরা পিস্তলটি এখোন কোথায়? সেটি যে আমি বুদ্ধির দোষে সোফাগ করে আমার ভ্রাতৃজায়ার নিকট গচ্ছিত রেখে এসেছি। দেশীয় ব্যক্তিদের অধ্যুষিত বিলাসী টাউন ছেড়ে খোকাবাবু যে এই অফিস কোয়ার্টারসের কোনও রাস্তায় অতর্কিতে এসে পড়বে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। এইরূপ এক নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমার ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কয়েকটি উপদেশবাণী থেকে থেকে আমার মনে পড়ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র কখনো হাতছাড়া করো না।। একবার যদি তা হাতে ধরো তো তা যেন হাতেই থাকে। অন্যথায় কখন আগ্নেয়াস্ত্র আদপেই গ্রহণ করো না। ইহার অসতর্ক হেপাজতী শুধু পরের বিপদ ডেকে আনে না। সময় বিশেষে ইহা নিজেরও বিপদের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু খোকাবাবু কি আমার মত এই একই ভুল করেছে? নিশ্চয়ই সে তা করে নি। না হলে সে তার পকেটে অমন করে হাত পুরলে কেন? আমি আসামী কেষ্টোর মুখে শুনেছিলাম যে খোকা কাউকে ক্ষমা করে না। কাউকে শত্রু বলে সন্দেহ করলেও তাকে তৎক্ষণাৎ গুলী করে মেরে ফেলে। তা ছাড়া গুলী ভরা পিস্তল ও তৎসহ একখানি ধারালো ছুরি ছাড়া কখনও পথ চলে না। সে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে খোকা আমাকে দেওঘরের কোনও পথে দেখতে পেলে তখনি সে আমাকে গুলী করে মেরে ফেলবে। এর আগে কয়েক বার আমি মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এর পূর্ব্বে এমন অসহায় ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আমাকে কখনও দাঁড়াতে হয় নি।

এই সময় হঠাৎ দুই পা পিছিয়ে গিয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, আশা করি পঞ্চানন বাবু, যে আপনার কাছে একটা ভালো হাতিয়ার আছে। কিন্তু আপনার কাছে যেমন একটা আছে তেমনি আমার কাছেও একটা আছে। এমনি ভাবে দুজনেই এক সঙ্গে না মরে একটা কায করা যাক। আপনিও সরে পড়ুন এবং আমিও সরে পড়ি। দুজনেই ব্যাপারটা চেপে ফেলবো আসুন। কেউ আমাদের এখানে দুজনকে একত্রে এখনও দেখে নি। এতে দুজনার কারুরিই কোনও বদনামের সম্ভাবনা নেই।

খোকা বাবুর মুখে এইরূপ এক নতিবাচক বাক্য শুনে আমার মনে হলো যে তার কাছে বোধ হয় কোনও পিস্তল বা ছুরিকা নেই। তা তার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সে এতোক্ষণে আমাকে গুলী করে মেরে ফেলতো। এইবার আমি একটু সাহস সঞ্চয় করে খোকাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলাম, ওসব বাজে কথা থাক। এখোন তুমি একটু মাত্র নড়েছো, তো আমি তোমাকে গুলী করে মেরে ফেলবো। আমার নিকট হতে এইরূপ একটা উত্তর পেতে পারে তা বোধ হয় খোকা বাবুর কল্পনার বাইরে ছিল। সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আমার দিকে একবার হিংস্র পশুর মত তাকিয়ে দেখলো। তার পর ডান হাত তেমনি করেই পকেটে রেখে বাম হাতটা মুঠি করে উপরে উঁচিয়ে বললো, তা হলে আমাকে আর দোষ দেবেন না। আপনি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হন। তবে তার আগে আর একবার ভেবে দেখতে পারেন।

খোকার এই শেষ কথায় আমি ভীত-ত্রস্ত মনে দুই পাশে একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আশ-পাশে একটি মাত্রও পথচারী আমার দৃষ্টিগোচর হলো না। সাহায্যের জন্য চিৎকার করে ডাকবো, এমন একটি লোককেও নিকটে আমি দেখতে পেলাম না—যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারা যায়।

আরও মিনিট দুই এমনি ভাবে আমরা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরও খোকা কিন্তু আমাকে আক্রমণ করলো না। আমার সন্দেহ হলো যে আমার মত তার কাছেও কোনও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নেই। এর পর আমি আর একটু মাত্রও দেরী না করে ছুটে গিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সে আমাকে একরকম ছুড়েই ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিলে। কিন্তু আমি এই সময় মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমি সজোরে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে সেখানে ফেলে দিলাম। হঠাৎ এই সময় সেখানে একজন সিপাহীসহ পুলিশের জমাদারকে দেখা গেল। এদের একজন অপর জনকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, আরে এ কা ভৈল। রাজাবাবুকে পিটল হো। সৌভাগ্যক্রমে এদের অপর ব্যক্তি আমাকে থানার বড়বাবুর সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিল। অন্যথায় তারা হয়তো রাজাবাবুকে রাস্তার মধ্যে প্রহার করার জন্য আমাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতো। গোলমাল বুঝে সে এক দৌড়ে কোর্টে গিয়ে কোর্ট ইনেসপেক্টারকে খবর দিতে গেলো। ইতিমধ্যে সেখানে খোদ বড়বাবু সুরেশ বাবু একজন জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন। এস-ডি-ও সাহেবের কাছ হতে খবর পেয়ে তিনি রবীন্দ্রবাবুর কোয়ার্টারে আমাকে খোঁজ করতে আসছিলেন। এই সময় আমি ধস্তাধস্তির মধ্যে প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলাম। তবু রক্ষে যে খোকা বাবু ছুরি ও গুলী চালাতে অভ্যস্ত থাকলেও আমাদের মত রিক্তহস্ত মানুষের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে অভ্যস্ত ছিল না। থানার বড়বাবু সুরেশ বাবুর প্রকৃত বিষয়টি বুঝে নিতে একটুমাত্রও দেরী হয় নি। সুরেশ বাবুর নির্দ্দেশে জমাদার দিলোয়ার খানও পূর্ব্ব হতে সেখানে উপস্থিত কনেষ্টবলটি একত্রে খোকা বাবুকে ঘিরে ফেলে তাকে জড়িয়ে ধরলো। ইতিমধ্যে অদূরের আদালত গৃহ হতেও বহু ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এর পর যা আশা করেছিলাম তাই দেখা গেল। দেহ তল্লাসী করে খোকা বাবুর নিকট আমরা একটা পেনসিলকাটা ছুরিও পেলাম না।

খোকা বাবু সিংহ-বিক্রমে গর্জ্জে উঠে একবার বলে উঠলো, জয়বাবা বৈদ্যনাথ। যাক, একটি নরহত্যার পাপ থেকে তা হলে আমি রেহাই পেলাম। খোকা বাবু আমাকে কনগ্রাচুলেট করে খুশীমনেই জানালো যে তার অপরাধী জীবনে সে এই প্রথম নিরস্ত্র হয়ে রাজপথে বার হয়েছে। সে আমার দিকে এগিয়ে এসে জানালো, আরে পঞ্চানন বাবু! সকালে বাড়ী ফিরে সবেমাত্র ছুরিটা ও গুলীভরা পিস্তলটা পেটীর কাপড় হতে খুলে নিয়ে সেগুলো ট্রাঙ্কে বন্ধ করে চান করতে যাবো ভাবছি, এমন সময় কালাপাহাড়

এসে বললো যে ধোপা আমার কাপড় তখনও দিয়ে যায় নি। বেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি রাখে নি। তাই খামকা আমার রাগ হয়ে গেলো। রেগে মেগে ট্যাক্সী করে এই ডাইনিঙ ক্লিনিঙ দোকানটাতে এসে দেখি সেটা বন্ধ। একবার কোর্টে গিয়ে একজন বন্ধু উকিলের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে ছিল। এই জন্ম দুর্ভাগ্য ক্রমে ওই ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে সেটাকেও ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা'না হলে আমাদের মাইনে করা ট্যাক্সি ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করার জন্ম ছুটে আসতো। এতোগুলি ঘটনার যোগাযোগ আপনার পক্ষে গিয়েছে বলে আপনি এবারের মত বেঁচে গেলেন! আপনার ওপর বাবা বৈদ্যনাথের বোধ হয় দয়া আছে। অবশ্য ভগবান বলে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি যদি থাকেন তবে—

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে খোকার কাছ হতে এতো তথ্য কথা শুনতে আমরা স্বভাবতঃই রাজী ছিলাম না। কিন্তু সুরেশ বাবু আমার উপদেশ মত থানা থেকে একটা হাতকড়া ও একটা মোটা রশি আনতে পাঠিয়েছিলেন। এর কারণ এই যে, ঝটকান মেরে এতোগুলো ব্যক্তির হাত এড়িয়ে পালাবার মত ক্ষমতা খোকা বাবুর ছিল। দ্রব্যকয়টি থানা থেকে এসে পড়া মাত্র আমরা খোকার হাতে হাতকড়া পরিয়ে ও কোমরে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি জড়িয়ে তার মত বীরের মর্য্যাদা রাখতে কুণ্ঠা বোধ করিনি। এর পর ধীরে ধীরে আমরা তাকে নিয়ে থানায় এসে দেখি যে সশস্ত্র শাস্ত্রীদল সহ S. D. O. সাহেব, রবীন্দ্র বাবু, ডি, এস, পি, বসিরুদ্দিন খান সাহেব প্রভৃতি থানায় এসে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মধুপুর থানার অফসার ইনচার্জ্জ এস ব্যানার্জ্জিকেও দেখলাম। স্বাধীনতার পর ইনি এ আই জি হয়েছিলেন।

খোকা বাবু চারি দিকে একবার চেয়ে দেখে আমাকে বললো, পঞ্চানন বাবু, ভুল করছেন আপনি। আমি হচ্ছি ডুপ্লিকেট ধাঁধা। আমারই নাম হচ্ছে সুধীর। আসল ধাঁধাকে ধরেও কোলকাতায় তাকে আপনারা ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। খোকা বাবুর কথায় চমকে উঠে আমি তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। তারপর তার ক্রুর দৃষ্টির প্রতি চোখ রেখে আমি উত্তর করলাম, আচ্ছা, এখুনিই তা প্রমাণ হবে। তোমার বন্ধু হরিপদও আমার সঙ্গে এসেছে। হরিপদকে আনবার জন্ম আমি থানায় এসেই একজন জমাদারকে পাঠিয়েছিলাম। আমার কথা শেষ হতে না হতে হরিপদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে উঠলো, আরে, এই তো ধাঁধা—ধাঁধা— তাহলে ধাঁধা ধরা পড়লো, এঁ্যা! ধাঁধা বজ্রমুষ্টি তুলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলো।, কিন্তু তাতে অপারগ হয়ে চোখ দুটো ছোট করে বলে উঠলো, পঞ্চানন বাবু তার কর্ত্তব্য করেছে। কিন্তু তোকে আমি ঘৃণা করি। তোকে আমি আগে সরাবো, সকলে মিলে হরিপদ বন্ধুকে তার চোখের আড়ালে সরিয়ে দিয়ে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় খোকাকে নিয়ে একটা লরীযোগে D. S. P. সাহেবের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশের একটা দল সহ আমরা খোকার বিলাসী টাউনের বাটীতে এসে তখুনি কয়েকজন স্থানীয় সাক্ষীর সমক্ষে বাটীর খানাতল্লাসী সুরু করে দিলাম। ধাঁধার বাক্স খুলে তার মধ্যে আমরা প্রথমেই পেলাম তাজা কার্ত্তুজ ভর্ত্তি একটি পিস্তল। এই পিস্তলটি দুই বৎসর পূর্ব্বে কুমুরটুলির একটি জমীদার বাড়ী হতে সেখানকার তালা ভেঙ্গে চুরি করা হয়েছিল। এর পর ঐ বাক্সের ভিতর হতে হাতীর দাঁত দিয়ে বাঁট বাঁধানো খোকা বাবুর সৌখিন ক্ষুরধার ছুরিখানা বেরিয়ে পড়লো। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তখনও পর্য্যন্ত ছুরির ব্লেডে শুকনা রক্তের ছাপ লাগা ছিল। এছাড়া ঐ বাক্স হতে সতেরো হাজার টাকা ও এগারোটি হীরার অলঙ্কার পাওয়া গেল। খোকার এইখানকার বাটী হতে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রদর্শনী দ্রব্য (Exhibit) পাওয়া গিয়েছিল। এইগুলি ছিল খোকার পরিধেয় বস্ত্রাদি। এদের প্রত্যেকটির কোণে কোণে লাল সুতীর দ্বারা S অক্ষরটি উৎকীর্ণ করা ছিল। এইরূপ ভাবে S অক্ষর যুক্ত বহু রক্তমাখা বস্ত্রাদি ইতিপূর্ব্বে আমরা খোকার কৃপানাথ লেনের বাড়ীতেও পেয়েছিলাম। এই থেকে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে S অক্ষরযুক্ত রক্তমাখা কাপড়গুলির অধিকারী খোকাবাবুই ছিলেন।

এতে মহা উৎফুল্ল হয়ে আমরা খোকা বাবুকে নিয়ে দেওঘর থানায় ফিরলাম, কিন্তু খোকা বাবুর অনুগত ভৃত্য কালাপাহাড়কে কোথায়ও আর পাওয়া গেলো না। তবে স্থানীয় এক পানবিক্রেতা আমাদের জানালো যে এইদিনই সে খোকার আদেশে মধুপুরে একটা কাজে গিয়েছে। সেখানে সে দিন চার পাঁচ থাকবে। এর পর খোকাকে নিয়ে আমাদের অপর এক সমস্যা হলো। আমরা তাকে থানার হাজতে রাখা একটুমাত্রও নিরাপদ মনে করি নি। এইজন্ম S. D. O. সাহেবের বিশেষ আদেশে তাকে আমরা স্থানীয় জেলখানায় পাঠিয়ে দিলাম। এই সময় ঠিক হলো যে তার বিবৃতি নেবার জন্ম আমি পরদিন প্রত্যূষে খোকার সঙ্গে এই জেলখানায় এসে দেখা করবো। S. D. O. সাহেব এইজন্ম একটি বিশেষ হুকুমনামাও আমার সুবিধের জন্ম লিখে রাখলেন।

এইদিন কোনও রকমে একটু আহার করে হরিপদকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আমি থানার বড়বাবুর কোয়ার্টারের একটি ঘরে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ঘুমের আস্বাদ আমি বহুদিন পাই নি। কিন্তু কে জানতো যে বিপদ তখনও আমাদের শেষ হয়নি! [ক্রমশঃ।

একটি সম্ভাব্য হাসি

সন্তোষ চক্রবর্ত্তী

ঐ বুঝি হাসলো সে, জলচুড়ি বেজে ওঠে হাতে,
বিকেল সমুদ্র হল ঝিরঝির শাখার হাওয়ায়।
আমি তার দেবতাও হতে পারি। সময়ের সাথে
পথ চলা কী মধুর; কী বঞ্চনা নিবিড় পাওয়ায়!

যেতে যেতে চমকানো। ফিরে দেখি। ঝলকে ঝলকে
ঐ বুঝি হাসিতেছে, আকাশ যে আরও নীল হলো।
আমি তার দেবতাই। না হলে সে ধীর অপলকে
এমন আপন মনে তাকাতো না লাজে ছলোছলো।

আমাকে চঞ্চল করা তার ব্রত। শোনো, ঐ হাসে,
তখন গোধূলি কিবা ভোর হয়, পাখীরা বাতাসে।

শরৎচন্দ্রের এক সন্ধ্যার স্মৃতি

শ্রীঅজিতকুমার সেন

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দ্ব্যশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি বহু সুধী মনীষী ও সুবিজ্ঞ সমালোচকই সবিস্তারে তাঁর রচনার ও জীবন-কথার আলোচনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তাঁর সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য পরিবেশনের দাবী অথবা স্পর্ধাও আমি রাখি না। তবে, বহু বৎসর পূর্বে অনাড়ম্বর এক ঘরোয়া সান্ধ্য-বৈঠকে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে তাঁর লেখা সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক এক ভাষণ শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই কথাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বলিব।

১৯২৩ কি ১৯২৪—বোধ হয় ১৯২৪ই হইবে। কলেজে পড়ি ও মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের (বর্ত্তমানে কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট) ওয়াই-এম-সি-এ ষ্টুডেণ্ট্‌স্‌ হোষ্টেলে থাকি। তারই কর্তৃস্থানীয়দের আমন্ত্রণে সেই সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র আমাদের ছাত্রাবাসে আসেন। অনুষ্ঠানে আমার নিজের মামুলী একটি ভূমিকা ছিল,—উদ্বোধন-সংগীতের। আমাকে বর্ত্তমানে যাঁরা চেনেন—তাঁরা এ সংবাদে হকচকিয়া উঠিবেন নিঃসন্দেহ। শরৎচন্দ্র নিজে যে সংগীতজ্ঞ ও সুররসিক, তাহা আমরা জানিতাম। সুতরাং গাহিয়াছিলামও ভয়ে ভয়ে এবং সসংকোচে। গানের শেষে তাঁর মুখাবয়বের রেখা-চিহ্নে কোন বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি যে,—আনাড়ীর অক্ষম সে সংগীত-প্রচেষ্টা তিনি তাঁর সহজাত খেলোয়াড়-সুলভ মনেই গ্রহণ করিয়াছেন।

এরপর তিনি তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। দুঃখের বিষয়, তার কোন অনুলেখনই রাখা হয় নাই। স্মরণ হয় মূল বক্তব্য ছিল—তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসের ধারা। প্রসঙ্গক্রমে কিছুটা ক্ষুব্ধ ভাবেই যেন এই সূত্রে তিনি শরৎ-সাহিত্যের তথাকথিত দুর্নীতিমূলক বিতর্কের উল্লেখ করেন বাংলা সাহিত্যের আসরে সেদিন এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় খেউর উতোরের পালা উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব হইতেই রবীন্দ্র-পন্থী ও দ্বিজেন্দ্র-পন্থীর বিরোধ স্তিমিত হইয়া আসিলেও, সাহিত্যে দুর্নীতির ধূয়া তখন অব্যাহত, বিশেষতঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ‘সবুজপত্র’-যুগীয় গল্প উপন্যাস অবলম্বনে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী-চরিত্রসমূহ তাতে শুধু যে নূতন করিয়া ইন্ধন জোগাইয়াছিল এমন নয়, তাঁর বইগুলি এই সময়ে সনাতন-পন্থী বিশিষ্ট এক সমালোচকগোষ্ঠীর ভীমরুলের চাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াই যেন তাঁদেরে চকিত, ক্ষুব্ধ, প্রতিক্রিয়া-পরায়ণ ও দংষ্ট্রা-নখর-সংকুল করিয়া তোলে। লেখায় ব্যক্তিগত আক্রমণেও সেদিন কার্পণ্য হয় নাই। অন্যদিকে ইবসেন, বার্ণার্ড শ’-এর বইও তখন তরুণ সমাজের হাতে হাতে ফিরিতেছে, এবং প্রথম য়ুরোপীয় মহাসমরোত্তর কালের ভাব-বৈকল্যের বিপ্লাবন ধারা এদেশেও ক্রম-প্রসার্যমান। সেই ডামাডোলের বাজারে আমাদের সান্ধ্য আসরে যে সত্যটির প্রতি শরৎচন্দ্র পাঠক-সম্প্রদায়কে অবহিত হইতে বলেন—আমার মনে তা অনপনেয় এক রেখাপাত করে। তাকে শরৎচন্দ্রের—সাহিত্য-জীবনের উপর অভিনব এক আলোক সম্পাতও বলা যায়, বিশেষ করিয়া আজিকার এদিনে যখন এমনও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, শরৎ সাহিত্যের উপর সহজিয়া ধর্ম্মী সাহিত্যের ছাপ আঁটিয়া কোন কোন সমালোচক তাকে "Ism" (ইজম্) বা মতবাদ মূলক সাহিত্যের কোঠায় ফেলিতে চাহিতেছেন। স্বয়ং শরৎচন্দ্রের সেদিনকার নিজের কথা,—কথাশিল্পী চরিত্র সৃষ্টি করেন অন্তর্নিহিত সৃজনের প্রেরণায় এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ও প্রত্যয়ের আলোকে। মানুষের প্রকৃতি,—তার ভালো ও মন্দ,—তথাকথিত সু ও কু, অর্থাৎ নীতিবোধ এবং তার চিত্তের প্রবণতা বা ঝোঁক,—এক কথায় তার গোটা ব্যক্তিত্ব, এ সবই গড়িয়া ওঠে তারআপ্ত ও লব্ধ সংস্কার সমসাময়িক ঘটনা সংঘাত, এবং অনুকূল অথবা প্রতিকূল পারিবারিক, সমাজগত ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ প্রমুখ বাহিক ও আভ্যন্তরীণ নানা অপরিহার্য কারণের সমবায়ে। বিভিন্ন ছাঁচে গঠিত এ সব নরনারীর চরিত্র-বৈচিত্র্যই শিল্পের ও সাহিত্যের উপজীব্য। তাদের নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে চিত্তে যে গভীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা অন্তর্বেগের সঞ্চার হয়—সংবেদনশীল মনে তাহাই বহিয়া আনে প্রকাশবেদনা, প্রেরণা-সম্পাদন ও সিসৃক্ষা। শক্তিমান কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী ভাষায়, চিত্রে ও ভাস্কর্যে সেই অনুভূতিসমূহই অন্তরের দরদ ও সহানুভূতি দিয়া মূর্ত ও বাঙ্‌ময় করিতে প্রয়াস পান। এঁদের ভূমিকা দ্রষ্টার ও স্রষ্টার, ভোক্তার ঠিক নয় ;—এবং এই কারণেই এবম্বিধ ধারণা ভ্রান্ত ও অশ্রদ্ধেয় যে, সৃষ্ট কোন চরিত্র-বিশেষের প্রতি এঁদের কোন পক্ষপাতিত্ব অথবা তার সম্পর্কে এঁদের কোন অঙ্গাঙ্গী বা একাত্ম বোধ রহিয়া গিয়াছে। ভাবান্তরে সকল রঙে রঙীন হইয়াও এঁরা দলীয় মনোবৃত্তির অতীত এক ভূমিতে সংরূঢ়। সুতরাং রসতত্ত্ব বিচারে নীতির আলোচনা একান্তরূপে অপ্রাসঙ্গিক না হইলেও, এরূপ মনে করিবার কোন হেতুই নাই যে—মরমী সাহিত্য-স্রষ্টা তাঁর রূপায়িত কোন-না-কোন নরনারীর চরিত্র নৈতিক অথবা সামাজিক আদর্শরূপে খাড়া করিবার অপচেষ্টায় উন্মুখ ও উৎকণ্ঠ। বরং এমন বলা চলে যে, এসব চরিত্র দিনানুদিনের জীবনের এক একটি Type বা প্রতীক এবং এই কারণেই এদের আবেদন সার্থক ও শাশ্বত। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যে প্রচলিত অর্থে প্রচারমূলক ঠিক নয়, রস পরিবেশনই যে তার মূল উদ্দেশ্য, সুধী সমাজে অবিসংবাদিত রূপে একথাই বা আজও কোথায় স্বীকৃতি পাইল ?
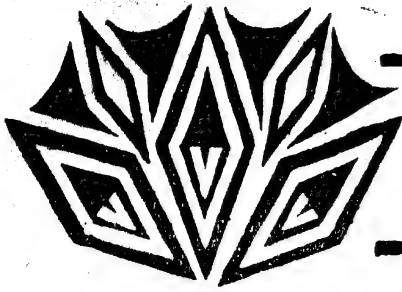
সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বাঙলা গ্রন্থ বর্গীকরণ

প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সাহিত্যজগতে বিশেষ শ্রদ্ধার অধিকারী। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পরিচালন পদ্ধতির উন্নতিকল্পে উপরোক্ত গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছেন। শিরোনামা থেকেই অনুমান করা যায় যে গ্রন্থটি গ্রন্থের বর্গীকরণ সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গ্রন্থের বর্গীকরণের বিষয়ে সকলেই আশা করি সুবিদিত। একই বিষয়ক গ্রন্থাদি একত্রে সজ্জিত না থাকলে গ্রন্থ লেনদেনের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের কর্মীকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এই অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই এই পদ্ধতির জন্ম, কিন্তু তাতে ভারতীয় বিষয়াদি যথোচিত সন্নিবেশিত না থাকায় ঐ পদ্ধতিটিকে এ দেশীয় গ্রন্থাগারগুলির প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রভাতকুমার এই দীর্ঘায়তন গ্রন্থটির জন্ম দিলেন, প্রভাতকুমারের এই অসাধারণ কীর্তি গ্রন্থাগার জগতের বিরাট অভাব দূর করল ও এক বিরাট সমস্যার সমাধানও করল সেই সঙ্গেই। গ্রন্থাগারিকের দল এই গ্রন্থটি থেকে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হবেন এবং স্বভাবতই আমরা আশা করি এ দেশের গ্রন্থাগারগুলিও এর ফলে ভবিষ্যতে ক্রমশঃই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। সে দিক বিচার করলে বলা যায় যে প্রভাতকুমারই সেই উন্নতির, পথের সন্ধান দিলেন। এই গ্রন্থটি প্রণয়নে এই পরিণত বয়সে তাঁকে যে পরিমাণ শ্রম বরণ করতে হয়েছে এবং যে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে হয়েছে তার তুলনা নেই। এই গ্রন্থটির জন্যে, এ কথা বলাই বাহুল্য যে দেশের গ্রন্থাগার জগত প্রভাতকুমারের কাছে ঋণী হয়ে রইল। প্রকাশক —ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট দাম—দশ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব

সুদূর অতীতের অভিমুখে পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় যে বাঙলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব অনতিক্রম্য। বাঙলা সাহিত্যের আজ যে বিশ্বব্যাপী জয়যাত্রা তার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল চৈতন্যজীবনীকে কেন্দ্র করে, সেই থেকে আজ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে অসংখ্য জীবনীকারের দ্বারা, আলোচ্য গ্রন্থটি মহাপ্রভুর জীবনী সম্পর্কিত একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি রচয়িতা স্বামী সারদেশানন্দের অশেষ দক্ষতার একটি উৎকৃষ্ট স্বাক্ষর। মহাপ্রভুর পূত পবিত্র জীবনী আলোচনায় ও বিশ্লেষণে স্বামী সারদেশানন্দ একাধারে যেমনই যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং অন্যদিকে তেমনই প্রভূত গবেষণা ও শ্রমের পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন গ্রন্থটির মাধ্যমে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর দেহান্তরে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়েছে। চৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে লেখক সে যুগের ঐতিহাসিক ও সামাজিক একটি নিখুঁত আলেখ্য পরিবেশন করেছেন। এই সব দিকগুলিকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি অসীম তাৎপর্যে পুষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখকের রচনা যথেষ্ট প্রাণস্পর্শী, সরস ও মনোমুগ্ধকর। গ্রন্থের অঙ্গসজ্জাও মনোরম। প্রকাশক—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, শিলং, পরিবেশক—মডেল পাবলিশিং হাউস। ২-এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম আট টাকা মাত্র।

অতীতের স্মৃতি

যুগত্রাতা রামকৃষ্ণের পুণ্যনামযুক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্রকীর্তি রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে যাঁরা দেশের ও জাতির সর্বৈব কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করে অমরত্ব অর্জন করেছেন স্বামী বিরজানন্দ তাঁদেরই একজন এবং এক বিশেষ জনও। বহুর দলে ক পূর্বেও তিনিও আমাদের মধ্যেই প্রকট ছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাধ্যক্ষরূপে তাঁর পুণ্যকীর্তি এবং ঠাকুর ও স্বামীজীর পবিত্র ভাবাদর্শ অনুসরণ করে মানব কল্যাণকর্মে তাঁর আত্মনিয়োগ তাঁকে অমরত্বের আসনে সমাসীন করেছে। গ্রন্থটি তাঁরই জীবনী গ্রন্থ, গ্রন্থটিতে বিরজানন্দের বংশ পরিচয়, গার্হস্থ্য জীবন, জীবনের ভাবান্তর, রামকৃষ্ণ আশ্রমে যোগদান এবং পরবর্তী সাধক জীবন সম্পর্কে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ তথ্যবহুল বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটির সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে, এই গ্রন্থে বিরজানন্দের জীবনকে কেন্দ্র করেই রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, এমন কি মিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন বহু ঘটনা কাহিনী বা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। ঠাকুরের, মায়ের, স্বামীজীর, নিবেদিতার এবং ঠাকুরের অন্যান্য মানসপুত্রগণের এবং আশ্রমের অন্যান্য স্বামীজীদের বিষয়ে বহু তথ্য ইতিহাস ঘটনা এখানে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এই সব দিক দিয়ে বিচার করলে গ্রন্থটিকে অনায়াসে এক প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া যায়। গ্রন্থটি রচনায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যথেষ্ট শক্তির ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া, পরিবেশক মডেল পাবলিশিং হাউস, ২-এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

জর্জ বার্ণার্ড শ'

'মাসিক বসুমতী'র পাঠক-পাঠিকার কাছে ভবানী মুখোপাধ্যায় অপরিচিত নন। বিদেশী সাহিত্যের বহু মূল্যবান রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তাঁর সুললিত অনুবাদের মাধ্যমে। আলোচ্য গ্রন্থটিও 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বার্ণার্ড শ' এর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কীয় এযাবৎ বহু রচনা প্রকাশিত হলেও বাংলায় ঠিক এধরণের একখানি প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ বইয়ের অভাব ছিল; বর্তমান বইটি সে অভাব অনেকাংশে দূর করবে।—বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এটি যে একটি মূল্যবান সংযোজন একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।—বইটির ভূমিকায় লেখক বলেছেন যে 'শ' এর সাহিত্য সম্বন্ধে পাঠককে আগ্রহী করে তুললেই এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। লেখকের এই আশার সঙ্গে একমত হয়ে আমরা গ্রন্থটির সাফল্য কামনা করি।—প্রচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।—প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, দাম—আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র

গল্প ও উপন্যাস রচনায় বর্তমান লেখকেরা যত উৎসাহী সাহিত্যের অন্যান্য দিক তাঁদের ঠিক ততখানি আকৃষ্ট করে না, এবং সেজন্যই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য এখনও খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। বিখ্যাত সাংবাদিক সুকুমার মিত্র রচিত "উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র" প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের জাতীয় বিদ্রোহ কাহিনীগুলিকে পরিবেশন করেছেন।—প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত, কালানুক্রমে এগুলি সাজান হওয়াতে পাঠকের পক্ষে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সহজ।—অনুসন্ধিৎসু পাঠক বইটি পড়ে আনন্দ লাভ করবেন।—প্রকাশক—এভারেষ্ট বুক হাউস, এ—১২এ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, দাম—তিন টাকা মাত্র।

সোনার আলপনা

বাঙলা দেশের পাঠক মহলে সুদক্ষ প্রবন্ধকার রূপে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আজ যথেষ্ট প্রসিদ্ধির অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থটি পৃথিবীর যুগস্রষ্টা সাহিত্যরথীদের জীবন ও তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধীয় তাঁর (লেখকের) কয়েকটি রচনার সমষ্টি। এই রচনাগুলিকে বসুমতীর পাঠক পাঠিকাগণ বসুমতীর পাতায় ইতঃপূর্বে দেখেছেন। পৃথিবীর দিকপাল সাহিত্যস্রষ্টাদের জীবনী এবং তাঁদের বিখ্যাত সাহিত্য সৃষ্টিগুলির সংক্ষিপ্ত সারসহ বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটিকে রূপ দিয়েছে। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন সাহিত্যিকের দ্বারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পদ কেমনতর রূপ নিয়েছে এবং সেই নব নব রূপান্তরণের মধ্যে দিয়ে কেমন করে সেই সাহিত্য পূর্ণতার অভিমুখে এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে এক অনুপম আলেখ্য চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক পাঠিকা জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি সমূহের আখ্যান ভাগগুলির সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হতে পারবেন। গ্রন্থটিকে সব চেয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছে লেখকের কাব্যময় ভাষা। গ্রন্থের নামকরণটি যথেষ্ট প্রাণস্পর্শী কেবল মাত্র সাহিত্যকারদের জীবনী ও গ্রন্থাদির আলোচনাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে লেখক একটি নিত্য সত্যের দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে শত সহস্র সংঘাত, বাধা, বিঘ্ন স্রষ্টাকে তার সৃষ্টির সাধনা থেকে কখনো বিচ্যুত করতে পারে না। মহৎ সৃষ্টিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তার প্রকাশ ঘটবেই। গ্রন্থখানি বাঙলার সাহিত্য ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করল এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রকাশক—এভারেষ্ট বুক হাউস, এ-১২-এ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। দাম—আট টাকা মাত্র।

বাস্তু-বিজ্ঞান

শ্রীনারায়ণ সান্যাল বাস্তু-বিদ্যা বিষয়ে বাংলা ভাষায় "বাস্তু-বিজ্ঞান" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে বিশেষজ্ঞ ও জনসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়েছেন এবং বাংলা ভাষায় এরূপ একটি প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা করবার গৌরব অর্জন করেছেন। অবশ্য আলোচ্য পুস্তকে শুধু নির্মাণ পদ্ধতি বা নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধেই আলোচনা সীমিত হয়েছে। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু (২)—বাস্তু বিদ্যার নক্সা, বনিয়াদ, ইটের গাঁথনি, রি-ইনফোর্সড কংক্রিট, বাড়ীর প্ল্যান প্রভৃতি। লেখকের শ্রম ও উদ্যম প্রশংসনীয়। প্রকাশক—ভারতী বুক ষ্টল, ৬ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, দাম দশ টাকা মাত্র।

ড্রাগনের নিঃশ্বাস

বাঙলা কবিতা এবং ছোট গল্পের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবদান পরিমাপ অন্ত নেই। শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি যাদুকর। বাঙলা শিশু সাহিত্য তাঁর দ্বারা বহুল পরিমাণে পুষ্ট হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর দু'টি ছোটদের উপযোগী বড় গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে (ড্রাগনের নিঃশ্বাস ও পিঁপড়ে পুরাণ) গ্রন্থটি স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য ভরপুর, লেখনীর দক্ষতার কল্যাণে প্রাণবন্ত, পটভূমির বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দ্বিতীয় গল্পটির পটভূমির বৈশিষ্ট্য পাঠককে হতবাক করে দেয়। ছোট বড় নির্বিশেষে আমরা দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করতে পারি গল্পটি অবশ্য পঠিতব্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে অফুরন্ত কল্পনাশক্তির অধীশ্বর তারই প্রমাণ মিলবে পিঁপড়ে পুরাণে—পিঁপড়েরা মাটির তলা থেকে পৃথিবীকে দুর্বল করেছে, হাজার হাজার বছরের সাধনায় তারা সফল হল, সমস্ত পৃথিবীকে তারা তখন ধ্বংস করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করল। এরকম একটি অভিনব চমকপ্রদ গল্প শিশুসাহিত্যের ঐতিহ্য বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। প্রেমেন্দ্র মিত্র সন্ধানী, দ্রষ্টা, চিন্তাশীল—তাঁর চরিত্রের এই তিনটি দিক গল্প দু'টির মধ্যে বিশেষ ভাবে ছায়াপাত করেছে। গ্রন্থটি আপন চমৎকারিত্বের জন্যে ছোটদের হৃদয় অনায়াসে জয় করতে পারবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, পরিবেশক পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড। ১২।১, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

মিতে-মিতিন

সাহিত্যে বলিষ্ঠ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তক হিসাবে শৈলজানন্দের নাম সামান্য নয়, একদা সমগ্র সুধীসমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল তাঁর কয়লাকুঠিকে কেন্দ্র করা অনবদ্য রচনা সমূহ খনি-মজুরদের জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের কাহিনীই তাঁর কয়লাকুঠি সংক্রান্ত গল্পগুলির বিষয়বস্তু; বর্তমান সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে তারই কয়েকটি। "মিতে-মিতিন" বারোটি ছোট গল্পের এক সংকলন, একমাত্র 'কে তুমি' ব্যতীত প্রত্যেকটিই সাঁওতাল খনি-শ্রমিকদের বিচিত্র জীবনযাত্রার সার্থক রূপায়ণ। শৈলজানন্দের অনিন্দ্য কথকতা, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, কাহিনীগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে; প্রতিটি গল্পই উপভোগ্য এবং পাঠকমনকে রসাবিষ্ট করে তোলার ক্ষমতা রাখে। 'কে তুমি' গল্পটির উপাদান একটু অন্য ধরণের, অশরীরী রহস্যের ছায়া আছে এই গল্পটিতে, কুশলী লেখকের লেখনীর স্পর্শে তা হয়ে উঠেছে রসমধুর। ইন্দ্র দুগার অঙ্কিত প্রচ্ছদটি অতি মনোরম। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, দাম তিন টাকা মাত্র।

স্বাদু স্বাদু, পদে পদে

অচিন্ত্যকুমারের নূতনতম গল্প-সংগ্রহ। 'অচিন্ত্যকুমার' এই নামটিই আজ পাঠকমনকে কৌতূহলী করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট, অপরূপ লিখনশৈলীর মাধ্যমে যুগোপযোগী বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করেছেন তিনি এই গল্পগুলিতে, ফলে প্রত্যেকটি গল্পই হয়ে উঠেছে নিটোল, রসোত্তীর্ণ, মোট সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটিই সুখপাঠ্য। বইটির নামের মধ্যেই তার সার্থক পরিচয়, রসপিপাসু পাঠক পড়ে তৃপ্ত হবেন এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। এরূপ একটি মনোরম গল্প সংগ্রহ উপহার দেওয়ার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

মানুষ গড়ার কারিগর

বর্তমানকালে বাঙলা কথাশিল্পীদের মধ্যে একটি বিশেষ ও সম্মানজনক আসন মনোজ বসুর অধিকারভুক্ত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা নাটক, ভ্রমণকাহিনী রচনায় সকল ক্ষেত্রেই ইনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষকতার চেয়ে মহত্তর পেশা আর নেই, অসংখ্য মানুষকে 'মানুষ' এর পর্যায়ে উপনীত করেন এই শিক্ষককুল, মানুষের সুপ্ত ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, চেতনাকে এঁরাই জাগরণের দেশে নিয়ে আসেন। মানুষকে তার জীবনের বোধনলগ্নে এঁরাই জীবন সম্পর্কে পাঠ দেন শিক্ষককুল সারা জাতির নমস্য তাঁদের অবদানের তুলনা নেই, তাঁদের কাছে ঋণের শেষ নেই। এই শিক্ষককে কেন্দ্র করেই আলোচ্য উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে, একদিকে সুন্দর প্রাণস্পর্শী পটভূমিকা অন্যদিকে মনোজ বসুর শক্তিমান লেখনী দুয়ের সংমিশ্রণে মানুষ গড়ার কারিগর নামে এক অসাধারণ সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। উপন্যাসটি হৃদয়ধর্মী, গতিমুখর, বলিষ্ঠ আবেদন সম্পন্ন। বর্ণনায়, ব্যঞ্জনায়, বিন্যাসে দক্ষ সাহিত্যশিল্পী সর্বজনস্বীকৃত আপন প্রতিভার যথোপযুক্ত পরিচয়ই দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসটি যেন লেখকের আন্তরিকতায়, দরদের, সহানুভূতির একটি স্নিগ্ধ প্রতিচ্ছবি বহন করছে। এই উপন্যাসটি পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হবে এ বিশ্বাস আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে পোষণ করি। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

আলেখ্যদর্শন

সুলেখক হিসেবে সুশীল রায় যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। কবি হিসেবেও তাঁর দক্ষতার অপ্রাচুর্য নেই। আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু তাঁর কোন গল্প উপন্যাস বা কাব্যগ্রন্থ নয় গ্রন্থটি তাঁর এক অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টার স্বাক্ষর, তাঁর লেখক জীবনের এক বিস্ময়কর কীর্তি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্যিক সুশীল রায়ের এক নতুন পরিচয় পাওয়া গেল মেঘদূতের অভিনব ভাষ্যকাররূপে। মেঘদূত সম্পর্কে আজ পর্যন্ত অসংখ্য আলোচনা হয়েছে তার অনুবাদ, তার টীকা, তার ব্যাখ্যা প্রভৃতির অন্ত নেই, সুশীল রায়ের ভাষ্য ভিন্নতর ধারা অবলম্বন করেছে। মেঘদূতের মর্মমূল তিনি এখানে উদ্ঘাটিত করেছেন। কালিদাসের মেঘদূতকে সুশীল রায় যে অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়েছেন, তার গোপন রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন সেই সব বিবরণীই অতীব দক্ষতা সহকারে লেখক তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। মেঘদূতও সুশীল রায়ের মর্মচক্ষুর সামনে নতুন রূপে যে ধরা দিয়েছে—লেখকের ভাষ্যই তার যাথার্থ্য প্রমাণ করে। মেঘদূতের মর্মকথা সম্পর্কে সুশীল রায় এক নতুন চিন্তাধারার উদ্বোধন করলেন। লেখকের ভাষা, বর্ণনা ও ব্যাখ্যা যেমনই ছন্দোময় তেমনই সরস তেমনই প্রাঞ্জল। গ্রন্থের ভূমিকা ও কথামুখ রচনা করেছেন যথাক্রমে ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন। গ্রন্থটি প্রমাণ করল সুশীল রায় কেবলমাত্র নিপুণ সাহিত্যিক এবং দক্ষ কবিই নন—ভারতের বিশ্ববন্দিত মহাকাব্যের একজন সার্থক ভাষ্যকারও। প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

সান্নিধ্যে

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি স্মৃতিচিত্র। লেখক চিন্তামণি কর। খ্যাতনামা শিল্পী এবং কলকাতার সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ চিন্তামণি করের নাম শিল্পরসিক সমাজে সুপরিচিত। সাহিত্যের আসরে তাঁর এই প্রথম প্রবেশকে সানন্দে স্বাগত জানাই। বিদেশে ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতার ফল এই স্মৃতিচারণ। স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষায় লেখক ছোট ছোট স্মৃতির টুকরোগুলিকে পরিবেশন করেছেন। শিল্পজীবন সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্যের সন্ধান এতে আছে। বিদেশী কথার আধিক্য

মাঝে মাঝে পীড়াদায়ক ঠেকে। তা ছাড়া বইটি নিঃসন্দেহ সুখপাঠ্য। শিল্পরসিক বিদগ্ধ পাঠককে এই স্মৃতিচারণ আনন্দ দেবে বলেই আমরা আশা করি। শিল্পীলেখকের স্বহস্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদটি সুশোভন। ছাপা বাঁধাই ভাল। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম চার টাকা মাত্র।

সাত পাকে বাঁধা

বাঙলার সাহিত্য জগতের শক্তিমান শিল্পীদের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অন্যতম এবং ইনি এমন একজন শিল্পী যিনি নিঃসন্দেহে বিশেষ উল্লেখের অধিকারী। বসুমতীর পাঠক পাঠিকারা কিছুকাল পূর্বে তাঁর "সেলিমচিস্তির কবর" নামে ছোট গল্পটি পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, বর্ত্তমানে সেই গল্পটিই "সাত পাকে বাঁধা" নামে উপন্যাসে পরিণত হয়ে প্রকাশলাভ করেছে। জীবনের হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনা-মিলন-বিচ্ছেদ প্রত্যেকটির স্বরূপ যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখক এখানে চিত্রিত করেছেন। ঘাত প্রতিঘাতময় জীবনের এক মর্মস্পর্শী আলেখ্য তিনি অপরিসীম কৃতিত্বের সঙ্গে পরিবেশিত করেছেন। জীবনকে তিনি নানা কেন্দ্র থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন—তার চিহ্ন তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যেই বিদ্যমান। এক বিচিত্র গতির মধ্যে দিয়ে লেখক কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। লেখকের হৃদয় আন্তরিকতায়, মমতায় ও স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ। তাঁর এই সদগুণগুলিই উপন্যাসটিকে একটি "সার্থক উপন্যাসে" পরিণত হতে সহায়তা করেছে। গ্রন্থটিকে এক যুগোপযোগী আবেদনের বাহক বলা যায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—সাড়ে চার টাকা মাত্র।

একটি নীড়ের আশা

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস "একটি নীড়ের আশা"। আজকের সমাজ যে কোন এক সঠিক নীতিতে কেন্দ্রীভূত হতে পারছে না, তারই নিখুঁত বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশ দেখা যায় এ উপন্যাসে। ব্যবহারিক দিক থেকে আজ প্রেমও যেন বাস্তব সংঘাতে কঠোর ভাবসম্পন্ন হয়ে পড়েছে। অলকা মিত্রর চরিত্রে এ প্রশ্নটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চরিত্র চিত্রণের ও স্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশের মাধ্যমে গভীর ভাব প্রকাশ করতে লেখকের দক্ষতা সাহিত্যে স্বীকৃত। সমাজ সংঘাতে যে প্রেমের বাহ্যিক রূপ বদলায়, এ উপন্যাসে তা দেখা যায়। প্রকাশক: ক্লাসিক প্রেস। ৩।১-এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম-তিন টাকা মাত্র।

পাখির পৃথিবী

পাখি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল কতখানি, এ সম্বন্ধে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ ঠিক ততখানি কম। ইতঃপূর্বে মুষ্টিমেয় কতিপয় লেখক এ সম্বন্ধে যতটুকু আলোকপাত করেছেন, তা অপর্যাপ্ত বললেও চলে। আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা সাংবাদিক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সুদূর লণ্ডনে বসে এ সম্বন্ধে যতটুকু গবেষণা করতে পেরেছেন, তার কয়েকটি তথ্যপূর্ণ অনুচ্ছেদে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক হয়েও ভাষা কাব্যময়। ছাপা ঝরঝরে ও পরিষ্কার। প্রচ্ছদপট সুন্দর। প্রকাশক: বলাকা প্রকাশনী। ২৭-সি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ দাম—দুটাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

চেনা-অচেনা

শ্রীমতী মায়া বসু সাহিত্যের জগতে নবাগতা হলেও অপরিচিতা নন, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পের মাধ্যমে ইতঃপূর্বেই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি গল্পেরই সমষ্টি। মোট ষোলটি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বইটি সুখপাঠ্য, স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল, গল্পগুলির মধ্যে কোথাও জড়তা বা ছলনা বা কৃত্রিমতার আভাস নেই। গল্পগুলি বলিষ্ঠ বক্তব্যে ভরপুর, লেখিকার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক এবং কুশলতার স্পষ্ট স্বাক্ষর। কাহিনী বিন্যাসে পরিবেশ ও চরিত্র সৃষ্টিতে, সংলাপ সংযোজনায়, লেখিকা যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার এই গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করে গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন। প্রকাশক—সাহিত্য সদন, এ-১২৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

রঙ্গপট

স্মৃতির টুকরো

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাধনা বসু

ভয়ঙ্করের বিষাণ তখন বেজে উঠেছে। আকাশে বাতাসে ছেয়ে গেছে হিংসার বিষবাষ্প। চতুর্দিকে তখন মৃত্যুর ইশারা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর দুর্যোগের কালো মেঘ ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। বিশ্ব জুড়ে তখন মরণের মহোৎসব লেগে গেছে। সারা দেশের তখন ছন্নছাড়া অবস্থা, মানুষ সব দিক দিয়ে তখন বিপন্ন, অক্টোপাশের মত রাজ্যের উদ্বেগ তার অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে। এক সর্বৈব ধ্বংসের অভিমুখে 'মানবসমাজ যেন শনৈঃ শনৈঃ পতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ তখন হাসতে ভুলে গেছে, গানের সুর মেলাতে পারছে না, কবিতার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না ছন্দ। তার জীবনে তখন স্থিতি নেই, নেই সুস্থিরতা, নেই প্রশান্তি। প্রাণের ভয়ে সমস্ত মায়ামোহ কাটিয়ে মানুষ তখন বন্য পশুর মত ব্যাকুল হয়ে দিক থেকে দিগন্তরে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটুখানি নিরাপদ আশ্রয়। যার তলায় অন্ততঃ প্রাণটা বাঁচানো যাবে।

কোথায় সেই ঘননীল, মেঘমেদুর, তারা ভরা আকাশ সে আকাশ আজ হানাহানির কৃষ্ণবর্ণের উত্তরীয়ে আবৃত। যে আকাশ কেবল আলো দিত, বৃষ্টি দিত, যার নীলাভায়, যার মৌন মেঘের মিছিলের আকর্ষণে মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলত, যেখানে পাখীরা আপন মনে নিরুদ্বিগ্ন গতিতে উড়ে বেড়ানোর মধ্যে কোন বাধার সম্মুখীন হোত না, সে আকাশের এ কি মর্মন্তুদ অবস্থা। আকাশ, বাতাস মাটি আজ থমথমে, ত্রস্তার্ত, শঙ্কাসঙ্কুল।

সারা জগতের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে ধ্বংসদেবতা তাঁর অমোঘ অস্ত্রগুলি পরম নিপুণতার সঙ্গেই একে একে প্রয়োগ করে চলেছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করালীলা তখন চরমে উঠেছে।

যুদ্ধ হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল দুর্ভিক্ষকে ধ্বংসকর্মে সে একলাই অংশগ্রহণ করে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ধ্বংসদেবতার হাত থেকে সে একলাই পুরস্কার গ্রহণ করবে? না না এতটা আত্মকেন্দ্রিক সে নয়, একটা সুচিন্তিত বিবেচনাবোধ তার অন্ততঃ আছে, তা ছাড়া এ খেলা একলা খেলতে তো ভালোও লাগে না, এই সব ভেবেই সে ডাক দিল দুর্ভিক্ষকে সেও যোগ দিক তার সঙ্গে সেও তার সঙ্গে এ খেলায় অংশ গ্রহণ করুক, সেও হতভাগ্য মানুষদের প্রতি উদ্দেশ করে এক একটি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করুক, অর্জিত গৌরব দুভাগে ভাগ হোক, একসঙ্গে দুজনে পারিতোষিক গ্রহণ করুক। দুর্ভিক্ষও সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল যুদ্ধের ডাকে, সুশীল সুবোধ বালকের মত সে এগিয়ে এল, ক্রমে সেও দেখা দিল রঙ্গমঞ্চে। তারপর শুরু হল সে খেলা, সে আরও অভিনব খেলা। যুদ্ধের তাড়নায় মানুষ আশ্রয় খুঁজে বেরিয়েছে এইবার একমুঠো চালের জন্যে সে প্রতিটি দুয়ারে করাঘাত করেছে, যাদের তদ্রূপই অবস্থা, তারা পরস্পরের ব্যথায় পরস্পরে চোখের জল ফেলেছে যাদের অবস্থা তদ্রূপ নয় তারা জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় স্বরূপ ক্ষুধার্তদের কুকুরের মত দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ডাষ্টবিনে তখন সে কি সাংঘাতিক ভীড়, কুকুরও তার খাদ্য খুঁজছে, মানুষও তার খাদ্য খুঁজছে, সামান্য ভাতের ফ্যানের উপর অসহায় জননীদের কি লোলুপতা এক চুমুক ফ্যান খেলেও তো দুঃখিনীর অঞ্চলনিধি, তার শিবরাত্রির সলতে তার বাছার যৎসামান্য ক্ষুন্নিবৃত্তিও তো হবে, এক মুঠো ফ্যান পর্যন্ত জোটাতে না পারার ফলস্বরূপ জননীকে দেখতে হয়েছে ভিখারীর অবস্থায় তার একমাত্র আশা-ভরসা-সান্ত্বনা —তার সন্তান পৃথিবীর বুকে তার শেষ নিঃশ্বাসটি উপহার দিয়ে গেল, পৃথিবী তাকে কিছু দিল না—দিল না তাকে একমুঠো অন্ন, পরিধানের জন্যে একখণ্ড বস্ত্র, প্রাণের আনন্দের প্রলেপ কিন্তু সে তার উদারতা যথারীতিই প্রদর্শন করল—তার যা দেবার পৃথিবীকে সেটুকু দিতেও কার্পণ্যবোধ করল না, পৃথিবীকে সে দিয়ে গেল তার পার্থিব জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাসটি। যে বাড়ীতে এই ঘটনা ঘটে গেল পাশের বাড়ীতেই কোন ধনীর দুলাল শ্রীওষ্ঠে স্পর্শ করলেন না—তাঁর সেদিনকার দৈনিক খাদ্য পোয়াটাক দুধ, রুটি, মাখন, দামী কল, ডিম, রাস্তায় মাটিতে ফেলে দেওয়া হল—কুকুরে চেটে খেল সেই খাদ্য, তবু মানুষ তা পেল না। দারবান, লন, পোর্টিকো পেরিয়ে সর্বহারা জননীর বেদনার্ত কান্নার শব্দ সেখানে পৌঁছতে পারে না।

সোনার বাঙলার এই অবস্থা। কত দূর-দূরান্তের পথিক দূর থেকে সোনালী ধানের রেখা দেখতে পেয়েই আপনমনে বলাবলি করত এ নিশ্চয়ই বাঙলাদেশ, হতেই হবে নয়তো এত ধান পৃথিবীর আর কোন্ দেশে আছে? এই সব ধান যখন চাষীরা মড়াইতে তুলত তাদের গৃহে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত—সে দিন সত্যি সত্যিই স্বপ্ন হয়ে গেল—দেশে অপচয় করেও ধান নষ্ট করা যেত না, সারা বিদেশ ভরে যেত বাঙলা দেশের পাঠানো ধান্য সম্পদে, ধান্যলক্ষ্মীর মুঠো মুঠো আশীর্বাদে সেদিন শ্যামল বাঙলা দেশ পূর্ণ ছিল কাণায় কাণায়—বাঙালীর তখন মনের কথা—"চিরকল্যাণময়ী; তুমি ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

দুর্ভিক্ষের দানবীয় লীলায় বাঙলা দেশ তখন দ্বিধাবিভক্ত।

ক্ষণকাল পূর্বেই ব্যক্ত করেছি এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে হরেনদার কাছ থেকে মধ্যভারত ভ্রমণের একটি প্রস্তাব এসেছে। "ক্ষুধা"কে কেন্দ্র করে নৃত্যসমূহ রচনা করা গেল। ক্ষুধার চেয়ে সে সময়ে সময়োপযোগী পটভূমি আর কি থাকতে পারে, মানুষের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী বা পরিস্থিতিরই সম্যক প্রতিফলন ঘটে তার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। তখন যা দেশের অবস্থা, মানুষের কান্নায় যা সুর,

সর্বহারার আর্তনাদের যা রূপ, সমস্যার যা চেহারা—সে ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পটভূমি বলতে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ল না, আর কিছু মনে করার ছিলও না। "Divine Source" নাম দিয়েও আর একটি নৃত্যসমষ্টি পরিকল্পিত ও রূপায়িত হল, নামকরণ অনুধাবন করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এর আবেদন ধর্মমূলক।

ভূখ (ক্ষুধা) এবং ডিভাইন সোর্স স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাদরে ভরে উঠল, দর্শকচিত্ত (বিশেষ করে বিষয়বস্তুর জন্যে) গভীর ভাবে স্পর্শ করতে এরা সমর্থ হল, জনতার-দল, বিপুলভাবে সাড়া দিল এর আবেদনে সমস্ত শহর এর জয়গানে ভরে উঠল। মুগ্ধ বিস্মিত জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া গেল আশাতিরিক্ত।

দিল্লীতে এই নৃত্য-সমষ্টি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে শেষে আমাদের পরিকল্পিত গোয়ালিয়ার ভ্রমণের তারিখ তার যোগে পিছিয়ে দিয়ে দিল্লীতে অনুষ্ঠান আরও কিছুকাল চালাতে হল। গোয়ালিয়ারে যাওয়ার সমস্ত কিছুই তো আমাদের আগে থাকতেই ঠিক ছিল তারিখ প্রভৃতি সব কিছু, সেই অনুযায়ী আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থাদিও যথারীতিই হয়েছিল কিন্তু শেষে দিল্লীর জনগণের দাবীতে সব কিছু পরিবর্তন করতে হল।

গোয়ালিয়ারে আমরা বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত হলুম। মহারাজা ও মহারাণী পরম সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের সদাশয়তা বিনয়নম্রতা ও অতিথিবাৎসল্য ভোলবার নয়। মহারাণীর পরিচিতি আর একটু বিশদ করি। সাওগারের রাণা কৃষ্ণ শমসের জঙ্গের ইনি নিকট আত্মীয়া। কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের গণেশ ম্যানসনে মহারাণী এক সময়ে থাকতেন। এই গণেশ ম্যানসনে মাও থাকতেন। স্বভাবতঃই একই গৃহের বাসিন্দা হওয়াতে এঁরা পরস্পর পরস্পরের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েন। দু'জনেই দু'জনের ব্যবহারে মুগ্ধ হন এবং পরস্পর পরস্পরের গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন। আমার প্রথম ছায়াছবি আলিবাবা যখন শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে সাধারণের প্রদর্শনের জন্যে প্রথম মুক্তিলাভ করল মহারাণী তখন মাকে তাঁদের সঙ্গে ঐ ছবি দেখতে যাওয়ার জন্যে তো রীতিমত পেড়াপেড়ি শুরু করলেন, সে এক সুন্দর আবদার সে আবদার সাড়া না দিয়ে থাকা যায় না শেষে মহারাজকুমারী তো রীতিমত আমার অনুরাগী হয়ে উঠলেন—পরবর্তীকালে গোয়ালিয়ারের মহারাণী হিসেবে যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন তাঁর মুখ থেকেই শুনলুম—যে আমার প্রত্যেকটি ছবি তিনি দেখেছেন একটিও বাদ দেন নি এমন কি এ কথাও জানাতে তিনি ভোলেন নি যে আমার কোন কোন ছবি তিনি দুবার এমন কি তিন বারও দেখেছেন। তাঁদের বাড়ীতে—যে বাড়ীর নাম 'সমুদ্র মহল'—এক পার্টিতে এমনি কথা প্রসঙ্গে গল্পের ছলে আমি বলেছিলুম যে আমি আবার নৃত্য পরিভ্রমণে বেড়ুচ্ছি সসম্প্রদায়ে এবং দিল্লী এবং অন্যান্য অঞ্চল হবে আমরা এবারের গন্তব্যস্থল। আর যায় কোথায়, যেই না বলা, একেবারে স্পষ্ট অনুরোধ দিল্লী ও অন্যান্য জায়গার সঙ্গে আপনার গন্তব্য স্থলের তালিকায় গোয়ালিয়ারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সে কি আগ্রহ, সে কি আন্তরিকতা, সে কি স্মিতহাসি।

দু বছর এর মধ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে অর্থাৎ একটি একটি করে সাতশো তিরিশটি দিন। আবার বাঙলা দেশ। আমার মাতৃভূমি, আমার জন্মভূমি আমার পুণ্যশ্লোক পিতামহের লীলাভূমি। ফিরে আসার পরই শুরু হল আবার নৃত্য প্রদর্শন বেশ কিছুকাল পরে বাঙলার বুকে আবার আমার নৃত্য প্রদর্শন। অব্যক্ত আনন্দে মনটা ভরে উঠল।

ছায়া প্রেক্ষাগৃহে আমার নৃত্য শুরু হল, দীর্ঘকাল পরে আমার দেশবাসী আমাকে সস্নেহে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেনি আমার অনুষ্ঠান সম্পর্কে ঠিক আগের মতই তাদের মনোভাব অনুকূল। আমাদের বাঙালী ভাই বোনদের তাঁদের মূল্যবান সহযোগিতা দ্বারা আগের মতই আমায় ধন্য করলেন। এরা আমার সব চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী সব চেয়ে আপনজন সব চেয়ে প্রিয় প্রিয়তর।

স্বীকার করছি নিজের মুখে ব্যক্ত করাটা সমীচীন হবে না তবুও এই ঘটনা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলেই বলবার প্রলোভনটাকেও পাশে সরিয়ে রাখতে পারছি না। তা ছাড়া এর মধ্যে আপনাদের যোগও যে রয়েছে অনেকখানি। ছায়াতে যখন অনুষ্ঠান করছি কর্তৃপক্ষরা একদিন জানালেন যে আমার অনুষ্ঠান না কি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে,—কি রকম—না—এর পূর্বের তাঁদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে বা প্রদর্শনীর যা শ্রেষ্ঠ রেকর্ড আমার অনুষ্ঠান তাকেও অতিক্রম করে গেছে।

এইবার আপনাদের বিস্মিত করে দেব। হাঁ বিস্মিতই করে দেব। এমন একটি তথ্য পরিবেশন করব যাতে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন—অবশ্য এ কথা আপনারা কতদূর বিশ্বাস করবেন তা আমার জানা নেই—এতাবৎ তো দেখা গেছে যে ঈশ্বরের কৃপায় আমার অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তার ভরে উঠেছে, দর্শক সাধারণ পরম সমাদরে বরণ করে নিয়েছে এই অনুষ্ঠানগুলিকে দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেছে এই অনুষ্ঠানের, শুধু বাঙলা দেশে নয়—ভারতের বিভিন্ন স্থানেও একই প্রতিক্রিয়া বাঙলায় ও বাঙলায় বাইরে সাংবাদিকের দল আমাকে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। গোয়ালিয়ারে যাওয়ার দিন পিছোতে হয়েছে দিল্লীর জনপ্রিয়তার দাবীতে। 'ছায়া'র কর্তৃপক্ষও জানিয়েছেন যে আমার অনুষ্ঠান তাঁদের আগেকার প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর ও অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ রেকর্ডকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে, জনগণের এই বিপুল সমর্থন বিধাতার অশেষ আশীর্বাদের নামান্তর ছাড়া তো কিছুই নয়, এঁদের প্রীতি, সহযোগিতা শুভ কামনার মধ্যে দিয়েই পরম কারুণিকের আশীষ ধারায় স্নাত হওয়ার সৌভাগ্য জীবনে মিলেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও হ্যাঁ-তা সত্ত্বেও আমাকে আমার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে শুনতে হয়েছে যে প্রদর্শনীর এই ব্যাপক জয়যাত্রা সত্ত্বেও লাভের ঘর ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে—লাভ কিছু হচ্ছে না—অবাক হলেন তো? কিন্তু এরও কারণ আছে—হেতু আছে বৈ কি এই লাভ না হওয়ার পিছনে, এই লাভের শূন্যতা অহেতুক নয়। আমার অনুষ্ঠানের খরচও যে ছিল বিরাট, মাত্রাতিরিক্ত, অভাবনীয়। আমার সম্প্রদায় পরিচালনা ছিল উচ্চতর মানের, সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যাও ছিল বিপুল, তার উপর প্রত্যেকের পারিশ্রমিক ছিল যথেষ্ট উচ্চ অঙ্কের—এই দিকগুলি ভেবে দেখলেই দেখা যাবে যে লাভ না হওয়াটা অহেতুক নয়, আয়ের অঙ্ক ব্যয়ে চলে যেত, জমার ঘরে আর জমত না কিছুই। এই ব্যয়বাহুল্য সত্ত্বেও জমার ঘর পূর্ণ করা সম্ভবপর ছিল না। জলস্রোতের মত টাকা এসেছে, চলেও গেছে জলস্রোতের মতই—একদিক দিয়ে

এসেছে, আর এক দিক দিয়ে গেছে, আমার অনুষ্ঠান টাকা পেয়েওছে যেমনই। দিয়েওছে তেমনই।

অতএব,* অগত্যাই, বেদনাহত চিত্তে ছবির জগতেই আমাকে ফিরে যেতে হল, তাও বাঙলাদেশে থেকে নয়, পা বাড়াতে হ'ল বোম্বাইয়ের অভিমুখে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বরূপা

গত মঙ্গলবার ২৪৪ ফাল্গুন সন্ধ্যায় বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের শততম রজনীর স্মারক উৎসব ও ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ১২৫তম আবির্ভাব দিবস ও নটগুরু গিরিশচন্দ্রের জন্মোৎসব স্বামী যুক্তানন্দের সভাপতিত্বে উৎযাপিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরস্কার প্রদান করেন শ্রীমতী বি, কে, দত্ত। এতদুপলক্ষে বিশ্বরূপা গোষ্ঠীভুক্ত শিল্পী ও কর্মীদের স্বর্ণ অলঙ্কার, মেডেল, আংটি, ফাউনটেন পেন, টি-সেট প্রভৃতি উপহার বিতরণ করা হয়। বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার অভ্যাগত ও দর্শকবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন ও বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে আজিকের উন্নততর আলোক শব্দ প্রভৃতি ব্যাপক ব্যাবহার বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যতের পক্ষে শুভফলদায়ক হ'বে কি না সে প্রশ্ন বাংলার নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে বিবেচনা ক'রে দেখতে অনুরোধ করেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী যুক্তানন্দ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মচারী নীরোদবরণ রামকৃষ্ণ স্তোত্র পাঠ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে যে জিলাপী ভোগ দেওয়া হয় সেই প্রসাদ দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

দুই বেচারা

ছুটুই ভাতির উদ্দেশ্যে একটি বাগানে জড়ো হয়েছে সবান্ধবী মিলি—ধনী কিশোরী চাটুজ্যের একমাত্র মেয়ে। বাগানের কাছেই দরিদ্র শিল্পী অলোক ও তার বন্ধু চঞ্চলের বাস। মিলির ও তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দৈবক্রমে পরিচয় হয়ে যায় অলোক ও চঞ্চলের। অলোক মিলিকে না জানিয়ে তার একখানি ছবি এঁকে ফেলে বাজারে বিক্রী করতে দেয়, জানতে পেরে মিলি রেগে গিয়ে অলোকের কাছে আসে তার আচরণ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দাবী করতে কিন্তু এই আসা থেকেই মিলির মনের পরিবর্তন সুরু নিজের অজান্তেই অলোককে হৃদয় দিয়ে ফেলে মিলি, কিশোরীমোহন ধনী অনিমেষের সঙ্গে চান মেয়ের বিয়ে দিতে। অবশেষে নানাবিধ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রেমেরই জয় হল। অলোকের হাতেই হাত রাখল মিলি।

দীপক বসু পরিচালিত "ইন্দ্রধনু"র একটি দৃশ্যে অসিতবরণ ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

মূলতঃ যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে গল্পের বিস্তার এবং যাকে কেন্দ্র করে ছবিতে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে মূল কাহিনী রূপ পেয়েছে সেটি হচ্ছে কিশোরীমোহন এক কথাতেই অলোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান নি—তিনি একটি সর্ত সৃষ্টি করলেন তাঁর সর্ত মত অলোককে তিনি এক লক্ষ টাকা দিলেন ও বললেন যে এই টাকা কোন প্রকার দাতব্য না করে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে খরচ করতে হবে—এবং তা করতেই হবে নচেৎ মিলিকে বিয়ে করার সঙ্কল্প অলোককে ত্যাগ করতে হবে। অলোক আর চঞ্চল দুজনে মরিয়া হয়ে খরচ করতে লাগল। কেনাকাটার পর ব্যবসায় ঢালতে লাগল লোকসান কামনায় একটি সচিব নিযুক্ত হল টাকাগুলি লোকসান করিয়ে দেওয়ার জন্যে সর্ত হল commission on loss কিছুতেই শেষ পর্যন্ত লোকসান আর হয় না কেবলই লাভ হয় যতদিন যায় এরাও মরিয়া হয়ে ওঠে কিন্তু পারে না—শেষে শেষ দিনটিতে কিশোরীমোহনও নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করলেন you have passed in every subject আসলে কাহিনীর এই অংশ অবাস্তব নয় কি? হাসির গল্পে অবাস্তবতা যত বর্জন করা যাবে রসসৃষ্টি ততই সার্থক হবে, হাসির গল্প মানেই অবাস্তবতার দৃষ্টান্ত নয় হাসির গল্পের পটভূমি যিনি যত বাস্তব করে তুলবেন তাঁর রচনা তত সার্থক হয়ে উঠবে। যদি কেউ স্যাটায়ারের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করেন তার উত্তরে আমরা বলব যে স্যাটায়ার আর হিউমার কখনোই এক জিনিষ নয়। একটি লোক হঠাৎ দু'হাতে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করছে, আয়কর বিভাগের কানে কি সে সংবাদ পৌছচ্ছে না বিশেষ করে যেখানে ব্যবসায়ে ক্রমশঃই লাভ হচ্ছে, লোকসানও নয়। এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না, এক লাখ টাকাকে কেন্দ্র করে ঐ রকম অদ্ভূত ধরণের একটা সর্ত করতে পারেন। দেবীমূর্তির পরেই বানরমূর্তি দেখানো কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়, বাঁদরকে দিয়ে টাইটেল দেখানোর মধ্যে চিত্রনির্মাতার কল্পনাশক্তির অপ্রখরতারই চিহ্ন মেলে। ছবির প্রথমাংশে হুলাহুলি এত বেশী দেখানো হয়েছে যার ফলে প্রথম থেকেই দর্শকচিত্তে রীতিমত বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

অভিনয়ে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অনুপকুমার। তিনি বাঙলার একজন সত্যিকারের সার্থকশিল্পী, এ ছবিতে তাঁর অভিনয়ের তুলনা নেই। কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি নিজেদের চরিত্রগুলি অতীব দক্ষতার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রধান দুটি নারী চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন বাসবী নন্দী ও সন্ধ্যা রায়। রাজলক্ষ্মী দেবীর শেষের দিকের অভিনয় প্রাণকে গভীরভাবে

স্পর্শ করে। এঁরা ছাড়া ছবিতে তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, পশুপতি কুণ্ডু, শৈলেন মুখোপাধ্যায় রসরাজ চক্রবর্তী প্রভৃতি বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন। সুরারোপ করেছেন ভূপেন হাজারিকা। কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন দিলীপকুমার বসু।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

শ্রীচৈতন্যের পুণ্যজীবন অবলম্বন করে এতাবৎ অনেক ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে শ্রীবিমল রায় যে ছবিটির নির্মাণকর্ম নিয়ে ব্যস্ত, সেই ছবিটিও চৈতন্যদেবের জীবনীকে কেন্দ্র করে। ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে নদের নিমাই। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, শোভা সেন, সবিতা বসু প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ।···সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "ক্ষুধা"র ব্যাপক জয়যাত্রা সমগ্র রঙ্গজগতের গৌরব। "ক্ষুধা" পেশাদারী রঙ্গালয়ে সর্বাধিক অভিনীত নাটক—এই তার বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে বিখ্যাত চিত্রপ্রযোজক শ্রীহরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই মঞ্চসফল নাটকটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন। সুরযোজনার ভার নিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন বসন্ত চৌধুরী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বিধায়ক ভট্টাচার্য (কাহিনীকার ও সংলাপস্রষ্টা), সুনন্দা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনয়শিল্পীর দল। "ক্ষুধা"র সর্বপ্রধান আকর্ষণ কিংবা গুরুত্ব যে—এই ছবিতে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন শিশিরোত্তর বাঙলার তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র।···সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরুর "চেনামুখ" কাহিনীটির চিত্রায়ণ পরিচালিত হচ্ছে ঋত্বিক ঘটকের দ্বারা। রূপায়ণে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, নিরঞ্জন রায়, বিজু ভাওয়াল, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, গীতা দে, আরতি দাস প্রভৃতি।···গৌরী সী রচিত "এমনও দিন আসতে পারে" কাহিনীটির চিত্ররূপ গৃহীত হচ্ছে সুন্দরমের পরিচালনায়। এতে অভিনয় করছেন বলে যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, বিপিন গুপ্ত, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, মাণিক দত্ত এবং রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।···শ্রীমতী শ্যামলী দেবীর লেখা "পটে আঁকা ছবি"টিকে চিত্ররূপ দিচ্ছেন কলাকুশলী গোষ্ঠী। কমল মিত্র, অসিতবরণ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, চন্দ্রা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সন্ধ্যা রায়, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, দীপিকা দাস, সাধনা রায়চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পীদের অভিনয় এই প্রসঙ্গে রূপালী-পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে।

নাজিম হিক্‌মেৎ

ইয়ারোস্লাভ স্মেলিয়াকোভ ১৯১৩তে—উক্রেইন-এ জন্ম]

এক বছর নয়, কিন্তু,
দশ বছর ধরে তাদের ব্যর্থ উড়ানে
আমার বাঞ্ছা ছিল তোমাকে দেখব, হিক্‌মেৎ!

তোমার জীবনে আমি বেঁচেছিলেম সেই সব মুহূর্তে
যখন তোমার কবিতা তর্জমা করেছি
এবং তোমারি চোখে আমি দেখেছিলেম, হিক্‌মেৎ,
তোমার যৌবনের প্রতিকৃতি দেখে।

ওঃ, সেই ব্যক্তিই, আমি,
সমস্ত বিশ্ববাসী, আমরা,
তোমার সংগীত এবং প্রেমের আপন সাহসে
দূরের অর্থ পেটিকার মত জেলখানায় দেওয়াল ভেদ করে
তাকিয়েছিলাম তোমার প্রতি মুগ্ধতা নিয়ে।

আর এখানে মস্কোতে
মস্কো সরাইখানায়
শুনেছিলেম তোমার মৌনী স্বর :
আমার সম্মুখে, দৃঢ় এবং চওড়া কাঁধ
অবশেষে ছিনিয়ে নিল জেলের দেওয়াল
সেখানে দাঁড়িয়েছিল আমাদের এই গ্রহের একজন কমিউনিষ্ট,
আমাদের কর্মীদের, একজন আমাদের গায়কদের :

গর্বী ভ্রূ
আর সহজ দীপ্তি
লাল খোঁচা-খোঁচা গোঁফ যা কর্মীদের মত :

তোমার চোখে
যেমন নীল গগনে
এক প্রদীপ্ত বিশ্ব এবং ঘুমন্ত বজ্র :

ওহে, কে পারে এই মুহূর্তকে ছুঁতে স্থির নিশ্চিন্তে?
যুদ্ধে তোমার স্বাধিকার এক মহৎ বিজয়।
তুমি আমাদের স্বপ্ন এবং এখনো আমাদেরই মধ্যে আছো
তুমি সংস্কার সংগীত গেয়েছিলে—
মস্কো তোমার সংগীতে আজ মত্ত।

অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী

◎ দেশে-বিদেশে ◎

ফাল্গুন, ১৩৬৬ (ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী): চীন-ভারত প্রশ্ন সমেত বিভিন্ন প্রসঙ্গে দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত রুশ প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের নিবিড় আলোচনা।

২রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী): কলিকাতা মহানগরীতে শান্তির দূত মঃ ক্রুশ্চেভ বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত।

চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন্-লাই-কে দিল্লী আগমনের জন্ত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণ জ্ঞাপন।

৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী): নয়াদিল্লী হইতে নেহরু-ক্রুশ্চেভ যুক্ত ইস্তাহার প্রচার—স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহ-অবস্থানের নীতিতে নেতৃদ্বয়ের পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান।

৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী): ভারতীয় রেল সচিব শ্রীজগজীবন রাম কর্ত্তৃক পার্লামেণ্টে ১৯৬০—৬১ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ—বাজেটে ১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত।

রেঙ্গুণে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নেউইনের সহিত সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ নিকিতা ক্রুশ্চেভের বৈঠক।

৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী): ভিলাই-এ ধর্ম্মঘটী ইস্পাত শ্রমিকদলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, বেত্রচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ।

৬ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী): খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাইতেছে বলিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রী এস. কে. পাতিলের দাবী —দিল্লীতে পার্লামেণ্ট খাদ্যশস্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ভাষণ।

৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী): চীনের চ্যালেঞ্জের সমুচিত জবাব দিবার জন্ত ভারত সরকারের প্রতি হুঁসিয়ারী—মহাজাতি সদনে (কলিকাতা) চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ সম্মেলনে আচার্য্য জে, বি কৃপালনী (প্রজা-সমাজতন্ত্রী) প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা।

রাণী এলিজাবেথের (ইংল্যাণ্ড) পুত্র সন্তান হওয়ায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ।

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী): কেরলে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে ত্রিবান্দ্রামের বৈঠকে কংগ্রেস, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ও মসলেম লীগের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা।

৯ই ফাল্গুন (২২শে ফেব্রুয়ারী): কেরলে শ্রীপট্টম থানু পিল্লাই'র (প্রজা সমাজতন্ত্রী নেতা) নেতৃত্বে কংগ্রেস পি-এস-পি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ—সাত মাস ব্যাপী রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান।

কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবঙ্কিম কর পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার নির্ব্বাচিত।

১০ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী): দালাই লামার হীরা, জহরৎ বোঝাই বহু বাক্স সিকিম হইতে কলিকাতায় আনয়ন—লোকসভায় (নয়াদিল্লী) প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

১১ই ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারী): বোম্বাই রাজ্য বিভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সন্তোষজনক মীমাংসা—নয়াদিল্লীতে বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের সহিত বৈঠকান্তে স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত পন্থের ঘোষণা।

১২ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে এক কোটি টাকা ঘাটতি—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অর্থমন্ত্রীরূপে রাজ্য বিধান সভায় বাজেট পেশ।

১৩ই ফাল্গুন (২৬শে ফেব্রুয়ারী): কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল আলোচনা কালে তীব্র সমালোচনা।

১৪ই ফাল্গুন (২৭শে ফেব্রুয়ারী): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসৃত কর্ম্মনীতিই রাজ্যের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার জন্ত দায়ী—রাজ্য বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক সুরু।

১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী): চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ-এন লাই কর্ত্তৃক চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে দিল্লীতে আলোচনা-বৈঠকের জন্ত শ্রীনেহরুর সর্ব্বশেষ আমন্ত্রণ গ্রহণ।

১৬ই ফাল্গুন (২৯শে ফেব্রুয়ারী): ভারতের ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে ৮৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি—কেন্দ্রীয় অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই কর্ত্তৃক লোকসভায় বাজেট পেশ।

এপ্রিল মাসে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এর সহিত বৈঠকে ভারত সরকার সম্মত—পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর বিবৃতি।

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ্চ) সামরিক পরাক্রমে সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র—কলিকাতার ব্রিগেড ষ্টেডিয়ামে প্রদত্ত নাগরিক সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ঘোষণা।

রাজভবনে (কলিকাতা) শ্রীনেহরু ও মঃ ক্রুশ্চেভের নিভৃত বৈঠক—ব্রহ্মের জনপ্রিয় নেতা উ নুর সহিতও পরে উভয় রাষ্ট্র-নায়কের আলোচনা।

১৮ই ফাল্গুন (২রা মার্চ্চ): শ্রীনেহরুর কংগ্রেসী সরকারকে সতর্ক করার জন্তই এখানে বিরোধী দলের একান্তভাবে প্রয়োজন—ওয়ালটেয়ারের জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী সি রাজাগোপালাচারীর (স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতা) ঘোষণা।

সফরান্তে ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে কলিকাতার সাংবাদিকদের নিকট ক্রুশ্চেভের মন্তব্য—ভারত ও রুশিয়া দুই দেশই শান্তির পথে অগ্রসর হইতেছে।

১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ্চ): ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির জন্ত দায়ী ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দাবী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাজেট বিতর্ককালে কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্য কর্ত্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা।

২০শে ফাল্গুন (৪ঠা মার্চ্চ): জীবন বীমা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ—রাজ্যসভায় সরকার পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিরোধী সদস্যদের আক্রমণ।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ্চ); বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে অনির্দ্দিষ্ট-কালের জন্ত ষ্টেট্ব্যাঙ্ক কর্ম্মীদের সারা ভারতব্যাপী ধর্ম্মঘট।

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ্চ): ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-এর নেতৃত্বাধীনে জয়নগর (ভারত-নেপাল) সীমান্ত হইতে প্রথম ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রী দলের যাত্রা।

তিব্বতে জনগণ চীনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ চালাইতেছে—মুসৌরীতে দালাই লামার বিবৃতি।

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ) : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দুর্গাপুরে দ্বিতীয় কোকচুল্লী স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) : 'চীনের সহিত আলোচনা করিব—দর কষাকষি নহে'—হায়দ্রাবাদে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী ভি, কে. কৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ) : দণ্ডকারণ্য ব্যাপারে পশ্চিম সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন দপ্তরের চরম উপেক্ষা—রাজ্য বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অসন্তোষ প্রকাশ।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) : বোম্বাই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রেম ভগবান দাস আহুজাকে হত্যার অপরাধে কমাণ্ডার কে, এম নানাবতী (৩৭) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

চীন-ভারত বিরোধ প্রসঙ্গে ২০শে এপ্রিল নাগাদ চৌ এন্ লাই-এর (চীনা প্রধান মন্ত্রী) সহিত বৈঠকের প্রস্তাব—চৌ-এর নিকট শ্রীনেহরুর নিকট লিপি প্রেরণ।

২৭শে ফাল্গুন (১১ মার্চ) : ষ্টেট ব্যাঙ্ক সহ সকল ব্যাঙ্কের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন-লোক সভায় কেন্দ্রীয় শ্রমসচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দের ঘোষণা।

বোম্বাই রাজ্য বিভাগক্রমে ১লা মে নূতন মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠা—লোক সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত পন্থের ইঙ্গিত।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) : বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর (৮০) জীবনদীপ নির্ব্বাণ।

২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ) : রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত বঙ্গ ভাষাভাষী মহা সম্মেলনের দাবী—পশ্চিম বঙ্গের সন্নিহিত বঙ্গ ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) : শাসনতন্ত্র সংশোধন ছাড়া বেরুবাড়ী হস্তান্তর সম্ভব নহে—নেহরু-নুন চুক্তি প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের রায়।

বহির্দেশীয়—

১লা ফাল্গুন (১৪ই ফেব্রুয়ারী) : নূতন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা (মৌলিক গণতন্ত্র) অনুযায়ী ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত।

৩রা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) : ১৯৬০-৬১ সালে বৃটেনের দেশরক্ষা বাজেট ১১ কোটি ৫৭ লক্ষ ষ্টার্লিং-বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া সরকারী ঘোষণা।

৪ঠা ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী) : রাওয়ালপিণ্ডিতে (নূতন পাক্‌রাজধানী) পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্টরূপে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শপথ গ্রহণ।

৫ই ফাল্গুন (১৮ই ফেব্রুয়ারী) : 'সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন মুছিয়া ফেলুন'—ইন্দোনেশিয়ায় ১২ দিন সফরকালে রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের আহ্বান।

৭ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী) : বাগদাদ চুক্তির স্থলবর্ত্তী 'সেন্টোর' (মধ্য চুক্তি সংস্থা) শক্তি বৃদ্ধিকল্পে করাচীতে ইরাণ, তুরস্ক ও পাক্ রাষ্ট্র নেতাদের জরুরী বৈঠক।

৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী) : বৃটিশ উত্তর বোর্ণিও'র রাজধানী জেসেলটনে ভারতের ভূতপূর্ব ভাইসরয় পত্নী লেডী মাউন্ট ব্যাটেনের ঘুমন্ত অবস্থায় জীবনাবসান।

১০ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী) : জেনেভায় ত্রিশক্তি আণবিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অজ্ঞাত আণবিক বিস্ফোরণের ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ সংক্রান্ত সোভিয়েট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

১২ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী) : বেসামরিকীকৃত অঞ্চল হইতে অবিলম্বে ইস্রায়েলী সৈন্য হটাইবার দাবী—সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রসংঘ মারফত চরমপত্র প্রেরণ।

১৫ই ফাল্গুন (২৮শে ফেব্রুয়ারী) : রুশিয়া কর্তৃক ইন্দোনেশিয়াকে ২৫ কোটি ডলার ঋণদানের প্রস্তাব—রুশ প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সফরকালে যবদ্বীপের বোগরে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর।

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ) : মরক্কোর আগাদির বন্দরে ভূমিকম্পের ফলে বহু সহস্র নর-নারী ও শিশু হতাহত—সমস্ত সহর ধ্বংসস্তূপ পরিণতি।

বৃটেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরোধিগণ কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকান-পণ্য বর্জ্জন আন্দোলন শুরু।

১৯শে ফাল্গুন (৩রা মার্চ) : পাক্-আফগান বিরোধে আফগানিস্থানের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন জ্ঞাপন—কাবুলে আফগান প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স দাউদের আয়োজিত ভোজসভায় মঃ ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা।

২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ) : হাভানা বন্দরে গোলা-বারুদ বোঝাই ফরাসী জাহাজে ('লাকরী') বিস্ফোরণ—প্রায় ৭৫ জন নিহত ও শতাধিক আহত।

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ) : চীন সরকারের আমন্ত্রণক্রমে চীন সফরের উদ্দেশ্যে নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবি, পি, কৈরালার সদলবলে পিকিং যাত্রা।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ) : কায়রো হইতে সরকারী ভাবে ঘোষণা—২৮শে মার্চ সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদেল নাসের ভারত সফরে আসিবেন।

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ) : যৌথ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গের মতৈক্য—প্যারিসে 'নাটো' জঙ্গী সংস্থার মুখপাত্রের উক্তি।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ) : পাইওনীয়ার-৫ নামক প্রথম মার্কিণ কৃত্রিম গ্রহ (সূর্য্য পরিক্রমাকারী) সাফল্যের সহিত কক্ষপথে স্থাপিত—কেপ ক্যানাভেরাল হইতে সরকারী ভাবে ঘোষণা।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ) : পশ্চিম পাকিস্তানের ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী মিঃ মুজাফর আলি কাজিলবাশ ও তৎকালীন মন্ত্রী মিঃ হাসান মাহ্মুদকে পশ্চিম পাকিস্তান ট্রাইবুনাল কর্তৃক বিচারার্থ তলব।

৩০শে ফাল্গুন (১৪ই মার্চ) : স্বাস্থ্যের কারণে পূর্ব্ব তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভ কর্তৃক ২৩শে মার্চ্চ ফ্রান্স সফরে যাত্রার নূতন তারিখ স্থিরীকরণ।

সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতার দরুণ আর্জেন্টিনায় প্রেসিডেন্ট আর্টুরো ফ্রণ্ডিজি কর্তৃক 'আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা' ঘোষণা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

আমদানী নীতি

"এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর (১৯৬০) পর্যান্ত যে আমদানী নীতি গত ৩১শে মার্চ্চ ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে আমদানী নীতির কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। কতকগুলি পণ্য আমদানীর পরিমাণ বৰ্দ্ধিত করা হইলেও কঠোরভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণের মূলনীতি অব্যাহতই রাখা হইয়াছে। অত্যাবশ্যক শিল্পের কাঁচা মাল ও যন্ত্রাংশের জন্ম অধিকতর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা যেমন বরাদ্দ করা হইয়াছে তেমনি এই বৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া বহু সংখ্যক শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর কোটার পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। অবশ্য যে সকল শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন সম্প্রতি ভারতে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানীর কোটাই হ্রাস করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষের দিক হইতে এই আমদানী নীতিতে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তাহাদের ব্যবহার্য্য কয়েকটি পণ্যের আমদানীর কোটা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই ঘড়ির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দুই বৎসর পূর্ব্বে ঘড়ির আমদানী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। গত ছয় মাসে আড়াই লক্ষ টাকা মূল্যের ঘড়ি আমদানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আগামী ছয় মাসে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের ঘড়ি আমদানী করার বরাদ্দ করা হইয়াছে। তবে সোনার ঘড়ি বা ১৫০৲ টাকার বেশী দামের ঘড়ি আমদানী করা যাইবে না। সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য্য আর যে সকল দ্রব্যের আমদানী বৃদ্ধির বরাদ্দ করা হইয়াছে তন্মধ্যে শিশুদের জন্ম দুগ্ধজাত খাদ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যা যাহাতে হ্রাস পায় তাহাই যে উহার উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধির ফলে নৈতিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নহে।" —দৈনিক বসুমতী।

ভারতীয় বিমানবাহিনী

"ভারতীয় বিমানবাহিনীর বার্ষিক দিবসের উদ্‌যাপন নিশ্চয়ই শুধু একটি সমরবিভাগীয় কর্মজীবনের বার্ষিক উৎসব নহে। ইহা বিমানবাহিনীর কর্ম কৃতিত্ব উন্নতি এবং বহু গৌরবের কীর্ত্তির সহিত জনসমাজের ধারণার ও আগ্রহের সংযোগ আরও অন্তরঙ্গ করিবার উৎসব। বাহিনীর সৈনিক দেশ ও জাতির প্রতি তাহার কর্ত্তব্যের পবিত্র অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া সৈনিকতার ব্রতে আরও নিষ্ঠাশীল হইবে, এবং জনসমাজ উপলব্ধি করিবে যে, এই বাহিনীকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী দক্ষ এবং যোগ্য করিবার জন্ম তাহারও দায়িত্ব আছে। বর্তমান বৎসরে বিমানবাহিনীর বার্ষিক দিবসের অনুষ্ঠান ঘটনা হিসাবেও একটি নূতন গুরুত্ব লইয়া দেখা দিয়াছে। স্মরণ করিতে হইতেছে, ভারতের উত্তর সীমান্তের মর্যাদা আজ বাহিরের আঘাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন, বিপদ কাটে নাই। বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ বলিয়াছেন আমাদিগকে এখন বিশেষ সতর্কতার সহিত মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষা করিতে হইবে। ভারতীয় বিমানবাহিনী তাহার সাতাশ বৎসরের জীবনে সামরিক যোগ্যতার বহু কীর্তি প্রদর্শন করিয়াছে। উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তার মর্যাদা রক্ষায় ভারতীয় বৈমানিক সৈনিক পুনরায় তাহার শৌর্য ও কৃতিত্বের এক দুরূহ পরীক্ষা স্বীকার করিতে অগ্রসর হইয়াছে। দেশবাসীর শুভেচ্ছা সৈনিকের জীবনের প্রেরণা; সে প্রেরণার মূল্য এবং মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াও বলিতে হইতেছে, অধ্যক্ষ এয়ার-মার্শাল মুখার্জি তাঁহার প্রচারিত বাণীতে যাহা বলিয়াছেন, আত্মতুষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। বিমান পরিচালনার কাজে আমাদের এখনও অনেক কিছু শিখিতে হইবে। দেশের সরকার, জনসমাজ এবং বিমানবাহিনীর সম্মিলিত আগ্রহে উৎসাহে ও সহযোগিতায় বিমানবাহিনীকে আধুনিকতম যন্ত্রোপকরণে সজ্জিত করিবার সংকল্পটিই বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রিয় সংকল্পে পরিণত হউক। যুবসমাজের পক্ষেও বৈমানিক শিক্ষায় বিশেষভাবে উৎসাহিত হইবার প্রয়োজন আছে। এই বৎসর বিমানবাহিনী-দিবস বোম্বাইয়ে পালিত হইতেছে। প্রত্যেক বৎসর দিল্লিতে দিবস উদ্‌যাপন করিবার রীতি পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও দাবি করিব, আগামী বৎসর যেন কলিকাতাতে বিমানবাহিনী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বাহিনীর জনসমাজের অন্তরঙ্গতার সংযোগ প্রসারিত করিতে হইলে বার্ষিক অনুষ্ঠানকে শুধু দিল্লিতে কেন্দ্রীভূত না করাই উচিত।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

শিল্পের প্রসার

"এই রাজ্যে শিল্পের প্রসার করিতে হইলে এসব বাধাবিঘ্ন এড়াইয়া যাইতে হইবে। অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে দ্রুত শিল্প প্রসারের জন্ম বিশেষ সুযোগ দেওয়াই সরকারের নীতি। নিত্যব্যবহার্য নানারকম ভোগ্য ও টেঁকসই জিনিষ তৈয়ারীর ছোট-মাঝারি শিল্প অল্প সময়ে গড়িয়া উঠে অল্প মূলধন লাগে ও বেশী লোক নিয়োগ হয়। এই কারণে এ ধরণের শিল্পই বিভিন্ন রাজ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। অতএব নিত্যব্যবহার্য নানারকম জিনিষ তৈয়ারীর জন্ম পশ্চিম বাঙ্গালায় নূতন কারখানা স্থাপনের সুযোগ নিতান্তই নগণ্য। তবে কতগুলি ব্যাপারে পশ্চিম বাঙলার বিশেষ সুযোগ আছে। এখানে পর্যাপ্তসংখ্যক সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত কারিগর পাওয়া যায়। ইহাদের কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করিয়া ব্যক্তিগত দক্ষতা-সাপেক্ষ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি তৈয়ারীর শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রভূত সম্ভাবনা রহিয়াছে। নদীবহুল ও সমুদ্রতীরবর্তী এই রাজ্যে নৌযান নির্মাণ ও মেরামতী কারখানার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল। খনি অঞ্চলে কয়লা হইতে নানারকম উপজাত উৎপাদনের অজস্র সুযোগ বিদ্যমান। এই সব নূতন নূতন পথে শিল্পের পুনর্বিন্যাস করিলে পশ্চিম বাঙলায় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু অন্ধের মত পূর্ব হইতে ছক-বাঁধা পথে শিল্প-প্রসারের চেষ্টা করিলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।"

—যুগান্তর।

ইহারা কাহারা?

"মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার আনন্দপুর গ্রামে হিজাবুল্লা পার্টি নামে একটি মুসলমানগোষ্ঠী আছে। কমিউনিষ্ট এম, এল, এ

শ্রীসরোজ রায় এই পার্টির অস্তিত্ব সম্পর্কে চারি বৎসর পূর্ব্বেও একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গত বুধবার বিধান সভায় শ্রীরায় জানান যে, এই হিজাবুল্লা দলের কিছু লোক অসাম্প্রদায়িক মুসলমানদের ১২টি ঘর লুঠ করে এবং মজলিস ঘর পুড়াইয়া দেয়। কয়েকজনকে নাকি মারপিটও করা হয়। কেশপুর থানার দারোগা কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। ইহাও জানা যায়, উক্ত দারোগাকে হঠাৎ বদলী করায় স্থানীয় অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ। এই অতি সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীটি স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজেদের ভিতরে ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এই অঞ্চলের আবহাওয়া বিষাইয়া তুলিতেছে ইহাদের আসল স্বার্থ কি তাহা জানা দরকার। কাহাদের নির্দ্দেশে ইহারা এই আত্মঘাতী পথ ধরিয়াছে তাহাও খোঁজ করা দরকার। শ্রীসরোজ রায় পুলিসমন্ত্রীর নিকট সমগ্র ঘটনাটি জানাইয়াছেন। আমরা আশা করি, পুলিসমন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জনসাধারণকে আসল ঘটনা কি তাহা জানাইয়া দিবেন।"

—স্বাধীনতা।

বিক্রয় কর

"ডাঃ রায় আশ্বাস দিয়াছেন দশটি জিনিষের উপর হইতে বিক্রয়কর প্রত্যাহৃত হইবে। তাঁর মনে কোন দশটি জিনিষ আছে জানি না। তার মধ্যে গাছ-বীজ-ফুল, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এবং মিষ্টান্ন আছে ইহা আশা করা কি অন্যায় হইবে? ফসলবৃদ্ধি আন্দোলনের সঙ্গে প্রথমটির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, গাছ ও বীজের উপর কর বহু আগেই প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত ছিল। দ্বিতীয়টি দরিদ্রের চিকিৎসার প্রধান উপকরণ। উহার উপর বিক্রয়কর ঘোরতর অন্যায়। তৃতীয়টির উপরও কর প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত এই কারণে যে, বর্ত্তমানে উহাই দেশে খাঁটি প্রোটিন খাদ্যের প্রধান উপকরণ। সেদিন এক সভায় ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছিলেন—আমাদের ছেলেরা এখন খাঁটি দুধ জানে না। অষ্ট্রেলিয়ার একপ্রকার শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ গুঁড়া হইয়া আমাদের দেশে আসে, উহা জলে গুলিয়া লইলে দুধ হয়—ইহাই তাহারা জানে। আমাদের এখানে যানবাহনের অসুবিধায় দুধ বেশীদূর চালান দেওয়া যায় না বলিয়া উহা ছানায় রূপান্তরিত হয় এবং মিষ্টান্নরূপে বিক্রয় হয়। একদিকে প্রোটিন খাদ্যবৃদ্ধির কথা বলিব, আবার সেইসঙ্গে কর চাপাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দিব—ইহা ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রের কর্ম্মপদ্ধতি নয়।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

টেলিফোন চার্জ

"টেলিফোন চার্জ্জ সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সরকারী সিদ্ধান্তটি অদ্ভুত। নতুন ব্যবস্থায় মধ্যবিত্তের উপর চাপ পড়িবে সবচেয়ে বেশি। গোটা বছরে যে কয়টা কলই হউক না কেন, মাসে ২০ টাকা হারে আগাম ২৪০ টাকা এপ্রিল মাসেই জমা দিতে হইবে। সাধারণতঃ অনেক মধ্যবিত্তই মোটামুটি 'বিসিজিং পারপাসে' ফোন রাখেন; মাসে বিসিভার রেণ্টসহ ১৫।১৬ টাকা চার্জ্জ ওঠে। এখন প্রয়োজন থাকুক আর নাই থাকুক, সকলকেই প্রতি বছর আগাম ২৪০ টাকা ফোন চার্জ্জ দিতে হইবে। ইহাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির খুব বেশী ক্ষতি হইবে না। নিম্নতম সংখ্যায় ফোন যখন তাহাদের প্রয়োজন হইবেই এবং বাড়তি কলের রেট যখন ১৫ নয়া পয়সাই বলবৎ থাকিবে তখন তেমন কোন অসুবিধা নাই। বরং তিন মাস অন্তর বিল মিটাইবার ব্যবস্থা হওয়ায় তাহাদের কিছুটা সুবিধাই হইবে। টেলিফোনের মাধ্যমে আয় বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকিলে সংসার এই মধ্যবিত্ত-মারা ব্যবস্থা না করিয়াও অতি সহজেই তাহা করিতে পারিতেন। একটা নিম্নতম সংখ্যা বাঁধিয়া দিয়া বাড়তি কলের রেট বাড়ানো যাইত। তাহাতে কালতু টেলিফোন কল কিছুটা কমার সম্ভাবনা থাকিত, আর পয়সাটাও বোরা তাহা করিয়া ভাবি পকেট হইতেই চলিয়া আসিত। একসঙ্গে আগাম ২৪০ টাকা জমা দিতে হওয়ায় অনেক মধ্যবিত্ত ডাক্তার উকিলের পক্ষেই আর ফোন রাখা সম্ভব হইবে না। অথচ বড় বড় শহরে টেলিফোন ইঁহাদের একান্ত প্রয়োজন।"

—বর্ত্তমান (কলিকাতা)।

রাস্তার দুরবস্থা

"কাঁথি তমলুক রাস্তার কাঁথি সহরের মুখে এক মাইল অংশ আজ প্রায় মাসাধিককাল পূর্ব্বে সংস্কার করা হইয়াছে। কিন্তু রাস্তার পার্শ্বস্থিত ইট খোলা ও কাঁকর রাশি আদি স্তূপীকৃত হইয়া থাকায় সাধারণের যাতায়াতে বিষম কষ্ট হইতেছে। সহরের মুখে এই পথটি সংস্কৃত হইলেও উহার পার্শ্বস্থিত অবস্থা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার বিষয়ই মনে পড়ে। মুখোমুখী যখন যাত্রীবাহী মোটর বাসগুলি কিম্বা রিক্সগুলি অতিক্রম করে তখন এক সঙ্কট অবস্থার উদ্ভব হয়, যে কোন মুহূর্ত্তে ঐ পথে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অবিলম্বেই উহার সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িবে কি? দ্বিতীয়তঃ রাস্তার এই অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা সংকীর্ণ। রাস্তাটির উভয় পার্শ্ব মাটি দিয়া বাঁধান প্রয়োজন। বর্ত্তমান নয়ানজুলীতে জলশূন্য হইয়াছে, এ অবস্থায় মাটির কাজ করার এখন প্রকৃত সময়। এ বিষয়েও কর্ত্তৃপক্ষ অবহিত হইবেন আশা করি।" —নীহার (কাঁথি)

চিনির হাহাকার

"যদি বর্ত্তমান হারে চিনির উৎপাদন ও ব্যবহার চলিতে থাকে তবে ১৩৬০ সালের নভেম্বর মাসে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন চিনি সঞ্চিত হইবে। গত বৎসর এই একই চিনি সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে চিনির দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে কোনই ভীতির কারণ থাকিতে পারে না। সমিতির পক্ষ হইতে এই মর্ম্মে এক তারবার্ত্তা প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পঃ বঙ্গে চিনি সরবরাহ ও বিতরণ সম্পর্কে রাজ্যসরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিয়াছেন ও এই কমিটিতে সভাপতিরূপে আমাদের এই জেলার অধিবাসী পঃ বঙ্গ সরকারের খাদ্য উপমন্ত্রী শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি মহাশয় ও আরো কয়েকজন সভ্য রহিয়াছেন। যাহাতে প্রতি ইউনিয়নে সুচারুরূপে চিনি পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অত্রস্থ চিনি ব্যবসায়ী সমিতির আবেদন অনুযায়ী চিনির উপর সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিবার সুপারিশ করিবার জন্য ইঁহাদিগকে অনুরোধ জানাই।"

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্ম্মতৎপরতা

"তুনীগ্রামে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রর জন্য গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নগদ টাকা ও জমি রেজিষ্ট্রী করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্ম্মিত হইতেছে না এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ জানান যে তাঁহাদের দপ্তরে জমি রেজিষ্ট্রীর কোনও দলিল নাই। ব্লক এলেকাভুক্ত হওয়া মাত্র যাহাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্ম্মিত হইতে পারে তাহার জন্য উক্ত রেজিষ্ট্রী দলিলের টাকা জমার চালানের নকলসহ মৌজা ম্যাপে উক্ত জমির অবস্থানের অনুলিপি স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রেরিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মতৎপরতার যে প্রমাণ মিলিল তাহা মোটেই গৌরবজনক নহে।" —বীরভূম (রামপুরহাট)।

আমের দুর্ভিক্ষ

"মালদহে প্রচুর পরিমাণ আম্রের মুকুল দেখিয়া "পূর্ব্বাভাষে" যাঁহারা আশান্বিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা সহ সকলে হতাশ হইয়াছেন। গম্ভীরার ভাষায় গাছে গাছে "ডাণ্টো খাড়ো" ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছে না? পর পর কয়েক বৎসর আম্রের উৎপাদক ব্যবসায়ীরা শোচনীয়ভাবে মার খাইতেছেন এবং সহস্র সহস্র কৃষি ও মধ্যবিত্ত পরিবার এবং মজুরদের কর্ম সংস্থান দুরূহ হইয়া উঠিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সঙ্কটকেও বাড়াইতেছে। আম্র মালদহের বিরাট এক অংশের অন্ততঃ দুই মাসের খাদ্য। আম্র না হইলে মালদহবাসী সে খাদ্য হইতেও বঞ্চিত হইবে। কলাই ও চৈতালীর ব্যর্থতা, আম্রের শোচনীয় অবস্থা, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের মালদহের গ্রামবাসীর আর্থিক অবস্থা করুণ হইবে। এই শোচনীয় অবস্থায় যেভাবে উৎপাদকরা বারংবার মার খাইতেছে—তাহাতে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য এবং আম্র বৃক্ষগুলি ফলপ্রসূ করিতে এতদসম্পর্কে সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সমবেতভাবে গভীর পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। এতদসম্পর্কে জেলা সমাহর্ত্তা, মালদহ ম্যাঙ্গো মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —উদয়ন (মালদহ)।

আর কত দিন আছে বাকী?

আসানসোল শিল্পাঞ্চলগুলির আশে পাশে যে সব কলোনী বা গ্রাম আছে, সে গুলিতে চুরি ডাকাতি ও নানাবিধ অসামাজিক অপরাধের ঘটনা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেমন বাড়িয়াছে জি, টি রোডের যানবাহন দুর্ঘটনার সংখ্যা। জি, টি, রোডের এই অঞ্চলটির উপর নানাবিধ মোটরযানের যাতায়াত ক্রমগত বৃদ্ধির ফলে দুর্ঘটনাও বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সাধারণ যুক্তি, কিন্তু তদন্ত করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে বেপরোয়া গতিতে অতিরিক্ত বোঝাই গাড়ী, এবং মত্ত অবস্থায় গাড়ী চালাইবার জন্যই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রতিবিধান করার উপযুক্ত কোনও ব্যবস্থা স্থানীয় পুলিশের নাই। গাড়ীর গতি নির্দ্দিষ্ট রাখিতে বাধ্য করা পুলিশের সাধ্যায়ত্ত নয়। অতএব বহুবৎসর যাবৎ যে অব্যবস্থার ফলে বহু ব্যক্তি নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা অব্যাহত আছে। ইহার পর চুরি ডাকাতি ও গুণ্ডামী প্রভৃতি—দুর্গাপুর ও এইদিকের বার্ণপুর ও কলিয়ারী সংলগ্ন অঞ্চলে এইসব ঘটনা প্রায়ই ঘটিতেছে।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকার প্রতি নিবেদন

বাঙলা ও বাঙালীর প্রিয়তমা মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে ৩৯শ বর্ষে পদার্পণে আমাদের দেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক বিস্ময় ও আনন্দের অধ্যায় রচনা হবে। মাসিক বসুমতীর অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকা সমগ্র বাঙলা তথা ভারতবর্ষ তথা সর্ব্ববিশ্বে ছড়িয়ে আছেন—যাঁদের কারও কারও আত্মপরিচয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন মাসিক বসুমতীর শেষ পৃষ্ঠায়—আমাদের নূতন ও পুরাতন গ্রাহক তালিকায়। হয়তো আপনাদের লক্ষ্যে ধরা পড়েছে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যেও মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা আছেন।

বাঙলা দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর মূল্য এবং মূল্যমান পত্রিকার পাঠক পাঠিকা ও গ্রাহকগ্রাহিকাই বিচার করেন। মাসিক বসুমতীর আগামী বর্ষের সূচীতে যা যা থাকবে তা আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, আমরা নিশ্চিত বলতে পারি। আগামী বৈশাখে মাসিক বসুমতীর বর্ষারম্ভ। আমাদের অনেক কালের পুরাণো গ্রাহক গ্রাহিকাগণ তাঁদের দেয় চাঁদা পাঠিয়ে বাধিত করুন। চিঠিতে গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

নমস্কারান্তে ইতি— কর্ম্মাধ্যক্ষ
কলিকাতা-১২ মাসিক বসুমতী

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে .... ২৪৲
ষাণ্মাসিক " " .... ১২৲
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে
(ভারতীয় মুদ্রায়) .... ২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক ১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক .... ৭॥৹
প্রতি সংখ্যা ১।৹
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ১৸৹

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ .... ২১৲
ষাণ্মাসিক " " " .... ১০॥৹
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " ১৸৹

দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা এমনভাবেই ঘটিতেছে যে পুলিশের সম্বন্ধে অপরাধীদের কোনও শঙ্কা আছে এরূপ বোধ হয় না। সুতরাং সাধারণ লোক নিরাপত্তার আশা না রাখিয়া কেবলমাত্র ভাগ্যের উপরই নির্ভর করিয়া আছে।" —আসানসোল হিতৈষী।

ডাকঘরে ডাকটিকেট নাই !

"মোহনপুর, ২৩শে মার্চ্চ—স্থানীয় ডাকঘরে প্রায়ই ডাকটিকেট, পোষ্টকার্ড, এনভেলাপ, রেভিন্যু ষ্ট্যাম্প পাওয়া যায় না বলিয়া জনসাধারণকে বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। রেভিন্যু ষ্ট্যাম্পের অভাবে অনেক সময় স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণকে বিলম্বে বেতন গ্রহণ করিতে হয়। সংবাদ লইয়া জানা যায় যে, ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসে ৫০৲ টাকার বেশী ডাকটিকেট রাখার বিধান নাই। ইহার ফলে প্রায়শঃই কোন না কোন প্রকারের টিকেট, রেভিনিউ টিকেট অথবা পোষ্টকার্ড ডাকঘরে মজুত থাকে না।" —সেবক (আগরতলা)।

ইঁদুরের অত্যাচার

"আমাদের সরকার খাদ্যাভাব সমস্যার জন্ত পরিবার পরিকল্পনা, এক কথায় যাকে বলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্ত উঠে পড়ে লেগেছেন ! আর ইঁদুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণে ভারত সরকার এখনও মন দিতে পারেননি। একজোড়া মানুষ খুব বেশী হলে বড় জোর সারা জীবনে এক ডজন মানুষের জন্ম দিতে পারে আর সেক্ষেত্রে একজোড়া ইঁদুর বছরে কমসে কম ২৫০টি ইঁদুরের জন্ম দিয়ে থাকে। মানুষের খাদ্যে ration ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ তারা ফেলিয়ে ছড়িয়ে খাওয়া দূরে থাক প্রয়োজনের চেয়ে কম খেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইঁদুর যত না খায় তার চেয়ে নষ্ট করে বেশী। ভারতে এইরূপে ইঁদুরে ফেলে ছড়িয়ে বছরে কত শস্য উদরস্থ বা নষ্ট করে জানেন ? মাত্র ৬০ কোটী ২০ লক্ষ মণ।" জি, টি, রোড (আসানসোল)।

অনাহারীর পারণ

"যাক অনাহারী সমাজের "হিল্লে" হলো। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যাপার নয়,—কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারের ভাতা ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু করদাতার করে কেবল কাউন্সিলারদের কর্পোরেশনই একমাত্র কাম্য নয়, ভরসা করি অনতিবিলম্বে মিউনিসিপ্যালিটি ও অধুনাতন পঞ্চায়েতগুলিও কলকাতা কর্পোরেশনের এই উজ্জ্বল ও রসাল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিদেশী শাসনকালের অবশিষ্ট কুপ্রথাটির বিলোপ সাধন করবেন। গৌরী সেন ত' স্কেল থেকে চড়ুই-এ পরিণত হয়েছে,—এর পর আরশুলা। তা' হোক, স্বায়ত্ত শাসন বিভাগে রসপিপাসুদের একমাত্র রস ছিল 'উপরি'। উপরিভাগের একটা কিছু থাকার দরকার বৈ কি ! তবে কেবল এখানে নয় সর্বত্রই আসল 'উপরিভাগটা' কিন্তু তলদেশে। অবশ্য আমাদের শোনা কথা।" —আমরা মানুষ (কান্দী)।

চিনি রহস্য

"মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের জন্ত নিয়ন্ত্রিত দরে চিনি পাইবার যে পারমিটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শুনা যাইতেছে তাহাদের অনেকেই স্ব স্ব চিনির কোটা তুলিতে শঙ্কাবোধ করিতেছে। শঙ্কার কারণ আর কিছুই না—ইনকাম ট্যাক্স ! অর্থাৎ যে দোকানের চিনির মাসিক খরচ হয়ত ১।০ থেকে ২ মণ সে ব্যক্তি হয়ত মাসিক চার পাঁচ' মণের পারমিট করাইয়াছে, কিন্তু কোটা তুলিবার সময় পারমিটে প্রাপ্ত সমস্ত পরিমাণ না তুলিয়া স্বাভাবিক প্রয়োজনমতই মাল উঠাইতেছে, (অবশ্য তাহাকে সত্তি করিতে হইতেছে নিশ্চয়ই সমগ্র পারমিটের জন্তই) অনেকের আবার প্রাপ্ত কোটার সমগ্র মাল তুলিবার মত অর্থসঙ্গতিও নাই, যাহার ফলে একটা বিপুল পরিমাণ চিনি কালোবাজারে পাচার হইতেছে। খোলা বাজার হইতে মোটা দানার চিনি যাহা সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে ১।০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছিল তাহা আজ গা ঢাকা দিয়াছে, এবং মিহিদানার চিনি ১৸০ আনা সের দরে বিক্রয় হইতেছে। নিয়ন্ত্রণের ফলে চিনির দর ত কমিল না উল্টা বাড়িয়াই চলিয়াছে।" —মালঞ্চ (নিয়ামতপুর)।

চাউলের বাজার

"গত বৎসর রাজ্য সরকার যখন চাউলের দাম নির্দ্ধারণ করেন তখন দেখা গিয়াছিল যে রাজ্যের বড় বড় ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে মোটা মোটা বিজ্ঞাপন দিয়া সরকারের নীতির ব্যর্থতায় ইঙ্গিত প্রকাশ্যে দিয়াছিলেন এবং কিছুদিন পরে সরকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহা হইতে পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় খাদ্যশস্যের উপর সরকার হইতে ব্যবসায়ীদের দখল বেশী। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ইংরাজ সরকারকে নত করিতে যেরূপ আলোড়ন দীর্ঘদিন চলিয়াছিল—১৯৫৯ সালে খাদ্যদ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিনান্স বাতিল করিতে রাজ্যের চাউল ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত স্বপ্নের মত সফল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯০৫ সালে ছিল ইংরাজ—১৯৫৯ সালে স্বদেশীয় কর্তৃত্ব সরকারী দপ্তরে উঠিয়াছে, প্রভেদ এখানেই এবং জনসাধারণের ভয় এখানেই। ইহা বোধ হয়, রাজ্যের একটি শিশু পর্য্যন্ত জানে যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলিলে তাহাকে জেলখানায় যাইতে হয়—খাদ্যের দাবী করিয়া আন্দোলন করিলে জেলে যাইতে হয় কিন্তু এই দেশের ক্ষুধার্ত্ত মানুষের মুখের অন্ন লইয়া চক্রান্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিলে স্বয়ং মাতঙ্গীর আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া পাওয়া যায়। আমরা সময় থাকিতে রাজ্যের নেতা ও বিধান সভার সদস্যগণকে জানাইয়া দিতেছি যে কালবিলম্ব না করিয়া চাউল ব্যবসায়ী মহাজনদের প্রতি সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে চাউলের বাজার ভবিষ্যতে যে পথ ধরিতে চলিয়াছে তাহাতে কোটি কোটি ক্ষুধার্ত্ত মানুষের চিৎকার দেশ গঠনের সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিবে। অতএব হুঁসিয়ার।" —বারাসত বার্ত্তা (বারাসত)।

খান্না খান না

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক করেন যে—ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে সত্য সত্যই—কে কে সরকারী ডোল পাইবার অধিকারী। দেখা গিয়াছে এমন লোকেরও ডোল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে যিনি মৃত্যুশয্যায়। খান্না সাহেবের ক্ষমতা রহিয়াছে। আজও তিনি ক্ষমতায় আসীন রহিয়াছেন। খান্না সাহেব যদি সত্য সত্যই বাঙালী দরদী হইতেন তবে—বাঙালী দণ্ডকারণ্যে যাইতে ভয় পাইত না এতদিনে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের কিছুটা পুনর্বাসন সম্ভব হইত'। খান্না সাহেব কখনও বলেন আমি মনে প্রাণে—বাঙালী, আবার কখনও বলেন আমি বাঙালী নই বলিয়াই বাঙালীরা আমার পিছনে লাগিয়াছে।" —জনমত (জলপাইগুড়ি)

পরীক্ষা বিভ্রাট

"কিছুদিন পূর্ব্বে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের রেক্টার এবং কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মন্তব্য করেন যে, ছাত্রগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার জন্য আসলে দায়ী শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ। তাঁহাদের নীতির জন্যই সর্ব্বগ্রাসী দাবানলের ন্যায় ছাত্রগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং করিতেছে। এইরূপ সত্যভাষণ যাহারা করেন তাঁহারা সরকারের চক্ষুশূল। কিন্তু একথা আমরা জানাইয়া দিতেছি—ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, পণ্ডিত মূর্খেরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে আগুন জ্বালায়, নিজেরাই একদিন সেই আগুনে পুড়িয়া মরে। ভারতবর্ষের প্রচুর ক্ষতি এই সকল নেতা করিয়াছেন যুবশক্তিকে তাঁহারা কলঙ্কিত দুর্ব্বল এবং দেশগঠনের অনুপযুক্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে আগামী কালের মহা-ভারতের ভিত্তি রচিত হইতেছে না, বিলুপ্তি বা পরাধীনতার পথ প্রশস্ত হইতেছে? পরীক্ষা বিভ্রাট বার বার ঘটিতে থাকিলে জাতীয় শৃঙ্খলা জাতীয় তাণ্ডবে একদিন পরিণত হইবে।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

নৈতিক মান

"কর জর্জ্জরিত দেশে পরিকল্পনার নামে দ্রব্যের মূল্য দিনের পর দিন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। করের বরাদ্দ যাহারা করেন তাহারা দ্রব্যের এই অগ্নিমূল্য স্বীকার করেন না। মূল্য বৃদ্ধি তাহাদের আঘাত করে না। ইহা আঘাত হানে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণের সাধারণ জীবন যাত্রার উপর। এ আমলে দ্রব্যের মূল্য কমিতে পারে না। দিনের পর দিন ইহা বাড়িয়াই চলিবে। ইহার উপর আছে ভেজাল। এমন কোন খাদ্যবস্তু নাই যাহাতে ভেজালের কারবার চলে না অর্থাৎ যাহা ভেজাল মুক্ত। দেশের দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন এবং চরিত্র ও নৈতিক মানের উল্লেখ করেন। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এই দেশের সাধারণ মানুষের চরিত্র ও নৈতিক মান নিকৃষ্ট নয়। যে সব স্তরে আজ চরিত্র ও নৈতিক মানের উন্নয়ন দেশ ও মানুষ আশা করে সেদিকে তাকাইলে হতাশ হইতে হয়। ইহাও আজ দেশবাসীর চরম দুঃখ কষ্টের অন্যতম কারণ? আজ দেশের উচ্চ স্তরে দুর্নীতি যেভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এই দেশে দুর্নীতির এই পঙ্কিল স্রোত কে রোধ করিবে এবং কিভাবে রোধ করিবে?"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

শিক্ষা ও শিক্ষক

"বর্তমান দুর্মূল্যতার বাজারে মাসিক ৫২৷৷০ ও ৬৭৷৷০ বেতনের শিক্ষকদের পক্ষে এমনিতেই ভদ্রভাবে বাঁচিয়া থাকা কঠিন। এই বেতন ও নিয়মিত মেলে না। সর্ব্বোপরি আছে যখন তখন দূরবর্তী স্থানে বদলী কিংবা কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইলে ছাঁটাইএর ব্যবস্থা। এই ভাবে শিক্ষার সর্বনিম্ন ভিত্তি গাঁথিয়া যাঁহারা জাতিকে গড়িয়া তুলিবেন তাঁহাদের নিজেদের জীবনেরই কোন ভিত্তি নাই। অবহেলিত শিক্ষক সমাজ, অবৈজ্ঞানিক ও দুর্বিবহ পাঠ্যক্রম, পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি ও সরকারী ঔদাসীন্য সব মিলিয়া দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে মন্থর ও জটিল করিয়া তুলিয়াছে; ফলে সংবিধানে নির্দেশিত দশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করিবার ব্যবস্থা ফলবতী হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা জগতে বরাদ্দ হ্রাসের যে সংবাদ বাহির হইয়াছে তাহাতে এই নীতি অনুসরণের সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী অবিচল রহিয়াছে বোঝা যায়।"

—মুর্শিদাবাদ বার্ত্তা।

পরের ধনে পোদ্দারী

"শাসনতন্ত্র সংশোধন না করিয়া ভারতের কোন অংশ অন্য রাষ্ট্রকে দান-খয়রাত করিবার অধিকার প্রধান মন্ত্রী বা লোকসভার যে নাই, বেরুবাড়ী সম্পর্কে সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাহাই ধ্বনিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল কুচবিহারের ছিটমহল, মুর্শিদাবাদ ও আসামের যে সকল অংশ পাকিস্থানকে বে-আইনীভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্ধারের কি কোন ব্যবস্থা হইবে? শাসনতন্ত্র সংশোধনের সাহায্যে বেরুবাড়ী যাহাতে পাকিস্থানকে দেওয়া না হয়, তাহার জন্য পশ্চিম-বাংলার পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তোলার প্রয়োজন।" —সমাধান (হুগলী)।

শোক-সংবাদ

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

বাঙলার তথা ভারতের প্রবীণ মনীষী, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য্য দেশবিশ্রুত সুধীবর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় ২৮এ ফাল্গুন বর্ধমান শহরে ৮০ বছর বয়েসে লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৮৮০ সালের ২রা ডিসেম্বর ভারতের পুণ্যভূমি, শিক্ষা দীক্ষার সংস্কৃতির মহাপীঠ বারাণসীতে ক্ষিতিমোহনের জন্ম। পনেরো বছর বয়েসে ইনি সন্তপন্থী সাধকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও তারই ফলস্বরূপ উত্তর জীবনে সন্তবাদ সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহনের নির্ভরযোগ্য অতুলনীয় পাণ্ডিত্য সারা ভারতের সুধী সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। আজকের দিনে আমাদের মধ্যে বাউল সমাজ সম্বন্ধে যে সচেতনতা এসেছে তারও মূলে আছেন ক্ষিতিমোহন। বারাণসীতে সে সব সময় সংখ্যাতীত দিকপাল পণ্ডিত-বৃন্দের সমাবেশ ছিল তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ক্ষিতিমোহন আপন জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। ১৯০৮ সালে ইনি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং আশ্রমের গঠন কর্মে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মী রূপে পরিগণিত হন। ১৯২৪ সালে ইনি কবিগুরুর সঙ্গে চীন, বর্মা, পেনাং, মালয় ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে "দেশিকোত্তম" (ডি লিট) উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে কিছুকালের জন্যে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে ইনি সমাসীন ছিলেন। ক্ষিতিমোহন একজন সুলেখকও ছিলেন, অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তাঁর লেখনীজাত। তাঁর তিরোধানে ভারতের সংস্কৃতির জগত থেকে একজন দিকপালের অভাব ঘটল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১৫—২৩

পাঠক পাঠিকার চিঠি

ক্রীষ্টমাস ট্রী

হিন্দুদের দেয়ালীর মত খৃষ্টমাস ইউরোপের একটা জাঁকজমক পূর্ণ উৎসব। যীশুর জন্মের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রতিবছর এই উৎসবে প্রত্যেকটি খৃশ্চিয়ান পরস্পরের মধ্যে সুখ ও শুভইচ্ছার আদান প্রদান করে থাকে। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বৎসর আগে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পুত্র মহান যীশু জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের পুত্রের মত প্রত্যেকটি মানুষই বিরাট শক্তির অধিকারী যদি তাহার মধ্যে থাকে একটি মহৎ অন্তঃকরণ।

প্রচলিত ক্রীষ্টমাস ট্রী, অর্থাৎ উৎসবের বৃক্ষটি আপার রাইনের এক অংশ হইতে উৎপত্তি লাভ করে এবং ১৭০৮ সালে প্রথম বর্ণিত হয়। একটি প্রচলিত তথ্য বৃক্ষটির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রূপকে উল্লেখিত আছে যে, শীতের এক সন্ধ্যায় বালক যীশু একটি কাঠুরিয়ার জীর্ণ কুটীরের দরজায় আঘাত করিতে থাকে। কাঠুরে দম্পতি দোর খুলে দেখে এক অপূর্ব বালক শৈত্যপীড়িত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে—ক্ষুধার্ত্ত ও মলিন বসনে। তারা আশ্চর্য্য বালকটিকে সর্বপ্রকার যত্ন খাওয়া ও উষ্ণ বিছানা দিয়া নিজের করিয়া লইল। প্রত্যুষে বালকটি শয্যাত্যাগ করিয়া কাঞ্চন শোভার ন্যায় শোভিত হইয়া নিজের পরিচয় দিল—আর একটা 'ফার' বৃক্ষ হইতে একটা শাখা ভাঙ্গিয়া কাঠুরে দম্পতিকে উপহার দিল—রাত্রের আশ্রয়টুকুর ধন্যবাদ হিসাবে। বালকটি মহান ইচ্ছা প্রকাশ করিল যে—এই বৃক্ষশাখাটি নূতন নূতন প্রাচুর্য্যের পল্লব বিস্তার করিয়া তাহাদের প্রতিবছর ফলপ্রসূ সুখ ও সমৃদ্ধি বিতরণ করিবে। তাহারা বালক যীশুর কথা শুনিল—বৃক্ষশাখাটি গৃহের কানাচেই রোপণ করিল। বৃক্ষটি যথাসময়ে বহু পল্লবিত-শাখা বিস্তার করিয়া ফলপ্রসূ হইল, তাহা হইতে তাহারা কালে প্রচুর শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভ করিল।

ইউরোপে নানা জাতীয় 'ফার' বৃক্ষ আছে। তাহাদের মধ্যে উপকারী প্রধান হইল—

সিলভার ফার—Abies alba· Mill
বাল সাম ফার—Abies balsamea (L) Mill
হোয়াইট ফার—Abies concolor Lindl. & Gord
এলপাইন ফার—Abies lasiocarpa (Hook) Nutt.
রেড ফার—Abies magnifica A. Murr..
নোব্‌ল ফার—Abies procera Rehd. ইত্যাদি।

এবিস্ (ফার). চিরহরিৎ বৃক্ষ, লম্বা পিরামিডের মত চেহারা। ইহারা নানাপ্রকার উপকারে আসে। মিল ও শিল্পপ্রধান স্থানে ইহাদের চাহিদা অনেক। ইহার কাঠ খুব হাল্কা নরম ও মসৃণ। বাক্স প্যাটরা নির্ম্মাণে ইহার উপকারিতা অত্যন্ত বেশী। বালসাম ফার হইতে এক প্রকার আঠা কাঁচ শিল্পের প্রয়োজনে বহুল ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে এবিসের একটি বৃক্ষ পাওয়া যায়। ইহার নাম হিমলয়ান্ ফার (Abies spectabilis—A. webbiana)—হিমালয় পর্ব্বতমালার মধ্যে ও দাক্ষিণ ভাগ ছাড়া প্রায় সকল অংশেই পাওয়া যায়।

সুইজারল্যাণ্ডে আর একটি চির হরিৎ বৃক্ষ 'ইউ' (Taxus) পরবর্ত্তী কালে পবিত্র হইয়া ওঠে। সত্য যে একটি সবুজ বৃক্ষকে বেছে নেওয়া হয় শুধু উৎসবটির সবুজ সফলতা ও প্রাণবন্তের প্রতীক হিসাবে। এই উনবিংশ শতকে আরম্ভ থেকে 'ফার' অথবা 'স্প্রুস্' (picea) বৃক্ষকে যথাযথ বেছে নেওয়া হয়েছে ক্রীষ্ট মাস ট্রী হিসাবে। ধার্মিক খৃশ্চানেরা অদ্যাবধি বহু পরিশ্রমে সুবর্ণরূপ কথার গাছটিকে পরিপূর্ণভাবে আলোক ও নানাপ্রকার বেশভূষায় সজ্জিত করে। বড়দিনের সময় বহু সমারোহে তাহারা নিজেদের মধ্যে শান্তি ও ঘনিষ্ঠতার আদান প্রদান করে—সমৃদ্ধির রূপক এই পবিত্র বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে। ইহাই প্রচলিত ইউরোপীয় সভ্যতার "ক্রীষ্ট মাস ট্রী"।—শ্রী চিন্ময়রঞ্জন দাস, ৩ নং, জ্যোতিষ রায় রোড, কলিকাতা—৩৩।

পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়, আপনার মাসিক বসুমতী ৩৮শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মাঘ ১৩৬৬ সনের একটি প্রবন্ধে শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত সূর্য্য সেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ২০ নং প্যারাগ্রাফে ৫ই মের জায়গায় ৬ই মে হইবে, "রজতকুমার" জায়গায় রজতকুমার সেন হইবে। কালোরপোল এর জায়গায় "কালারপোল" হইবে সূর্য্য সেনকে ধরার জন্য "দশ হাজার" নয় "১৫ হাজার" টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে "শৈরলা নয়" "গৈরলা" সূর্য্য সেনের রিভলবার অপসারিত হয় না, পিছন হইতে একটি গুর্খা সৈন্য তাঁকে ধরে ফেলে, হৃদয় বাবু যদি এ সম্বন্ধে আপনাদের কাছে কিছু জানতে চান তবে তাঁকে জানাবেন, মনোরঞ্জন সেনের ছোট ভায়ের কাছে লিখতে। ও নিম্ন ঠিকানায় পত্রালাপ করবার জন্য। ইতি—চিত্তরঞ্জন সেন ৭নং মধুসূদন বানার্জ্জী রোড, বেলঘরিয়া ২৪-পরগণা।

মহাশয়, আপনার পত্রিকায় (মাঘ সংখ্যায়) আমার প্রবন্ধ "ঋগ্বেদের রচনাকাল ও বৈদিক আর্যের আদিনিবাস" পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

জানাচ্ছি। এই চিঠিটি লেখার প্রয়াস শুধু কতকগুলি মুদ্রণ ঘটিত প্রমাদ উল্লেখ করা। কেননা আমার প্রবন্ধের মূল বিষয়ের সংগে উহার কিছু গরমিল রয়েছে। যেমন 'খ' পৃষ্ঠার প্রথম দিকের লাইনটি 'উহা বৎসরে ৫০ বিকলা সরে যায় এবং ২৫৮৬ বৎসরে ৩৬০° ঘুরে আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসে। ঐ লাইনটির ২৫৮৬র স্থলে ২৫৮৬৮ হবে (যদিও গণিতীয় হিসাবে আরও কিছু বেশী হয় ২৫৯২০)। আবার এখন এক এক নক্ষত্র $\frac{২৮}{১২}$×৬০×৬০=৮৪০০ ঐ ৮৪০০র স্থলে ৪৮০০০ হবে। হিসাবের ভুল—ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই জন্যই এই প্রচেষ্টা। আর অন্যান্য আক্ষরিক ভুলগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি ভুল আমার নিজের, সেটি লোকমান্য তিলকের গ্রন্থের নাম লিখেছিলাম Arctic home in the vedic Arya সেটি হবে Arctic home in the vedas। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। শুভেচ্ছান্তে—সুনীলকুমার আচার্য্য, ৬।৫২ বিজয়গড়, কলিকাতা-৩২।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please accept subscription for the 1st. six months for your monthly in 1367 B.S.—Ava Rani Devi, Kanpur.

মাসিক বসুমতীর অগ্রিম ছয় মাসের চাঁদা (ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত) পাঠাইলাম।—শ্রীমতী কণক দে, কটক।

Please send me your monthly magazine Basumati from Agrahayan to Baisakh. Sending my subscription herewith.—Krishna Dutta, West Dinajpur.

ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। মাঘ সংখ্যা হইতে গ্রাহক-শ্রেণিভুক্ত করিলে অশেষ খুসী হইব।—শ্রীনমিতা দত্তরায়, আসাম।

আমার ছয় মাসের চাঁদা ৭'৫০ নয়া পয়সা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Anjali Basak, New Delhi.

ছয় মাসের চাঁদা ৭॥০ টাকা পাঠাইলাম। ১৩৬৬ সালের মাঘ হইতে ১৩৬৭ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—লাবণ্যপ্রভা দে, দিল্লী।

Herewith sending Rs. 7·50 for the copies of 'Masik Basumati' for coming six months.—R. N. Talukdar, Jalpaiguri.

আগামী বৈশাখ মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর জন্য ৭॥০ পাঠাইলাম।—Mrs. Amita Sanyal, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। পত্রিকার আরও উন্নতি কামনা করি।—Mrs. Rama Dutt, New Delhi.

আগামী ছয় মাসের চাঁদা (মাঘ হইতে শ্রাবণ) পাঠালাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন।—ইন্দিরা মুখার্জ্জী, Shahdol (M. P.)

Herewith please find Rs. 7·50 being the subscription towards Monthly Basumati for a further period of six months.—Mrs. Purnima Chakravorty, Mokokchung, N.H.T.A.

আগামী ছয় মাসের (মাঘ হইতে আষাঢ়) জন্য আমার গ্রাহিকা চাঁদা ৭ টাকা ৫০ নয়া পয়সা পাঠালাম।—শ্রীসুরমা চন্দ, Dhenkanol.

Remitting Rs. 7·50 for enrolling me a member. Please continue to send me the copies of your Magazine from Kartick to Chaitra 1366 B.S.—Kalpana Das, Barkakana, Hazaribagh.

Sending herewith the subscription for another six months from the month of Chaitra.—Mrs. Namita Choudhury, Bangkok, Thailand.

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

মাসিক বসুমতী

৩৮শ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৬] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

হিন্দুর বৈশিষ্ট্য

হিন্দুদিগের একটি বিশেষত্ব এই যে, উহারা যে কোন তত্ত্বের আলোচনা করুক না কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে যতদূর সম্ভব একটি সাধারণ ভাবের অনুসন্ধান করে, উহার মধ্যে যাহা কিছু বিশেষ আছে তাহা পরে মীমাংসার জন্য রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—"কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?" (মুঃ উঃ, ১৷৩) —এমন কি বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমুদয় জানা যায়? এইরূপ, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, যত দর্শন আছে, সমুদয় কেবল যে বস্তুকে জানিলে সমুদয়ই জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত।

ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যষ্টি লইয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা ব্যষ্টির দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তৎপরেই ব্যষ্টি বা বিশেষ ভাবগুলি যে সকল সামান্য ভাবের অন্তর্গত, তাহাদের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই সামান্য ভাবের অন্বেষণই ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য। যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই সমষ্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত সামান্যভাবস্বরূপ পুরুষকে জানাই জ্ঞানীর লক্ষ্য; যাঁহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, ভক্ত সেই সর্বগত পুরুষপ্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে চাহেন; যোগী আবার সেই সকলের মূলীভূত শক্তিকে জয় করিতে চাহেন—যাহাকে জয় করিলে সমুদয় জগৎকে জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের গতির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে জানা যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, কি ভক্তিতত্ত্ব, কি দর্শন—সর্ব বিভাগেই উহা চিরকালই এই বহুর মধ্যে এক সর্বগত এই অপূর্ব অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতিই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হইতে পারিবে না।

প্রাচীন হিন্দুরা অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন—যেন জীবন্ত বিশ্বকোষ। তাঁহারা বলিতেন—

"পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্ ॥"
(চাণক্যনীতি)

অর্থাৎ বিদ্যা যদি পুথিগত হয়, আর ধন যদি পরের হাতে থাকে, কার্যকাল উপস্থিত হইলে সে বিদ্যাও বিদ্যা নয়, সে ধনও ধন নয়।

আধ্যাত্মিক-সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ।...আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব তাহাই যাহাতে সাংসারিকতা একেবারেই নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। হিন্দুজাতির ইহাই আদর্শ। ...আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—সত্যযুগে এই একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই—প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগ অভ্যুদয়ের সূচনা হইতেছে।

আমাদের দেশেও যে দুই-একটা বলবান জাতি আছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, কত বয়সে বিবাহ করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর শাস্ত্র পড়িয়া দেখ, ৩০, ২৫, ২০—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বিবাহের বয়স।

তোমরা সকলে জান, সন্ন্যাস-আশ্রমই হিন্দুজীবনের চরম লক্ষ্য। আমাদের শাস্ত্র সকলকে সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। যে না করে সে হিন্দু নহে, তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই। সে শাস্ত্রের অমান্যকারী। সংসারের সুখ সমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষভাগে সংসারত্যাগ করিতে হইবে। যখন ভোগের দ্বারা প্রাণে প্রাণে বুঝিবে যে সংসার অসার, তখন তোমাকে সংসারত্যাগ করিতে হইবে। আমরা জানি—ইহাই হিন্দুর আদর্শ।

তোমরা এই আদর্শ কখনও বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য এই সংসারের বাইরে যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে—মন্দকে ত্যাগ করিতে হইবে শুধু তাহা নয়, ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে—এই সকলের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে।

তোমরা হিন্দু আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। সময়ে সময়ে যুবকগণ আসিয়া আমার নিকট নাস্তিকতার কথা কহিয়া থাকে। আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখন নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, আমি জড়বাদী হইলাম, কিন্তু সে দুই দিনের জন্য, উহা তোমাদের মজ্জাগত নহে, তোমাদের ধাতে যাহা নাই তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, উহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা। এইরূপ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি বাল্যাবস্থায় একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহাতে কৃতকার্য হই নাই—উহা যে হইবার নয়।

হিন্দু যে কোন দেশের যে কোন সাধু-মহাত্মার পূজা করিতে পারে। আমরা কার্যতঃও দেখিতে পাই, আমরা অনেক সময় খৃষ্টানদের চার্চে ও মুসলমানদের মসজিদে গিয়া উপাসনা করিয়া থাকি। ইহা ভালই বলিতে হইবে। কেন আমরা এরূপ উপাসনা না করিব? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ধর্ম সার্বভৌম। উহা এত উদার, এত প্রশস্ত যে, উহা সর্বপ্রকার আদর্শকেই সাদরে গ্রহণ করিতে পারে।

জগতে যত জাতি আছে, তন্মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা অধিক পরধর্মসহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপন্ন বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তাহার উপর সে অত্যাচার করিবে। কিন্তু দেখুন, জৈনেরা ত ঈশ্বর-বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।

এখানে, কেবল এখানেই লোকে তাহাদের ধর্মে ঘোরতর বিদ্বেষসম্পন্ন অপর ধর্মাবলম্বীর জন্যও মন্দির গির্জাদি নির্মাণ করিয়া দেয়। জগৎকে আমাদের নিকট এই পরধর্মে দ্বেষরাহিত্যরূপ মহাশিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

হিন্দুসন্তান কখন মাকে টাকা ধার দেয় না, মার সন্তানের উপর সর্ববিধ অধিকার আছে, সন্তানেরও মার উপর তাই।

আমাদের জাতির পক্ষে এখন আবশ্যক কর্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক (তত্ত্বাবিষ্কারোপযোগী) প্রতিভা।

—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী হইতে।

লেনিন ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী

ম্যাক্সিম গোর্কি

১৯১৮ সালে যখন লেনিনকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়, তার আগে পর্যন্ত লেনিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়নি; এমন কি, দূর থেকেও আমি তাঁকে দেখিনি। আহত অবস্থায় তাঁকে যখন আমি দেখতে গেলাম, তখন তিনি হাতখানা বিশেষ নাড়াচাড়া করতে পারছেন না, ঘাড়টাও ফেরাতে পারছেন না। গুলীটা তাঁর ঘাড়েই লেগেছিল। এই ঘটনাটা সম্বন্ধে আমি ক্রোধ আর ঘৃণা প্রকাশ করলাম। লেনিন কিন্তু এমনভাবে ব্যাপারটাকে চুকিয়ে দিলেন যেন এর সম্পর্কে বহুবার নিজের মত দেওয়ার পরে ক্লান্ত বোধ করছেন। তিনি শুধু বললেন, "এটা তো লড়াই। কিছু করবার নেই। সকলেই তার নিজের উপলব্ধি অনুসারে লড়াই করে থাকে।"

খুব সৌহার্দ্য-সদিচ্ছার মনোভাব নিয়েই আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, আলাপ-আলোচনা করলাম। কিন্তু আমার দিকে যখন তিনি তাকাচ্ছিলেন, তখন ইলিচের তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টির মধ্যে স্পষ্টতই একটা করুণার ভাব অনুভব করছিলাম। আমি যে বিপথ-চালিত হয়েছিলাম, সেইজন্যেই যেন এই করুণা।

কয়েক মিনিট বাদে তিনি বেশ একটু আবেগের সঙ্গেই বললেন, "যারা আমাদের পক্ষে নয় তারাই আমাদের বিরুদ্ধে। জীবনকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটছে, সেই সব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে উদাসীন বা নিরপেক্ষ লোকও আছে—এটা নেহাৎই অলীক কল্পনা মাত্র। যদি বা স্বীকার করি যে, একদা এই ধরণের লোকের অস্তিত্ব ছিল হয়তো, তাহলেও এ ধরণের লোকের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই, থাকতেও পারে না। এরা কারুর পক্ষেই কোন কাজের নয়। এদের শেষ লোকটিকে পর্যন্ত বাস্তবতার ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়তে হবে—যে-বাস্তবতা দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। আপনার কি মনে হচ্ছে যে, আমি জীবনকে বড়ো বেশি সরল করে দিচ্ছি? এই সরলীকরণের ফলে সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়াছে? অ্যাঁ?" আর প্রশ্ন করার পরেই তাঁর সেই একটু ব্যঙ্গের সুর মেশানো নিজস্ব ভঙ্গীতে হঁ, হঁ...বলা।

বলতে বলতে তাঁর দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। আরেকটু নিচু গলায় তিনি বলে চললেন,..."রাশিয়ার সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষদের সামনে আমাদের সহজ কিছু-একটা তুলে ধরতে হবে, এমন একটা কিছু রাখতে হবে যেটাকে তারা ধরতে ছুঁতে পারবে। সাম্যবাদ আর আমাদের এই সোভিয়েতগুলো * সহজ ব্যাপার। শ্রমিকদের আর বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত একটা ইউনিয়নের কথা বলছেন? বেশ তো, সে তো ভালোই। বুদ্ধিজীবীদের সে কথা বলুন। তারা আসুক আমাদের কাছে। আপনার মতে, তারা যথার্থ ন্যায়ের পক্ষে। তাহলে আর এতো ভাবনা কিসের? অবশ্যই তাদের আমাদের কাছে আসতে বলুন। আমরাই হচ্ছি সেই সব লোক যারা জনসাধারণকে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবার মতো বিরাট কাজের ভার নিয়েছি, জীবন সম্পর্কে বিশ্বের সামনে সত্য কথাটি ঘোষণা করার দায়িত্ব নিয়েছি—আমরাই জনসাধারণের সামনে মানবজীবনের সোজা পথটি নির্দেশ করছি—যে-পথ দাসত্ব ভিক্ষাবৃত্তি অপমান থেকে মুক্তির লক্ষ্যে নিয়ে যায়।" তারপরে হেসে বললেন," সেই জন্যেই আমি বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে একটি বুলেট পেয়েছি।" তাঁর কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ বা বিরক্তি ছিল না।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে যেটুকু উত্তাপ ছিল, সেটা যখন মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন ভ্লাদিমির ইলিচ একটু বিষণ্ণ বিরক্তির সুরে বললেন, "বুদ্ধিজীবীদের যে আমাদের দরকার—এ সম্পর্কে আমার কোন ঝগড়া আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

লেনিন

* সোভিয়েত—অর্থাৎ সভা; জনসাধারণের মধ্যে থেকে তাদের নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কার্যনির্বাহক সংস্থা।

কিন্তু দেখুন, ওদের মনোভাবটাই কি রকম শত্রুতাপূর্ণ, ঠিক কোন মুহূর্তে যে কোন্‌টা প্রয়োজন সেটা তারা কতো কম বোঝে ! এবং ওরা এটাও দেখতে পায় না যে, আমাদের ছাড়া ওরা কতোটা শক্তিহীন, জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ওরা কতো অপারগ ! আমরা যদি একটু বেশি মাত্রায় কালা পাহাড় হয়ে পড়ি, তাহলে সেজন্যে ওরাই দোষী !"

লেনিনের সঙ্গে আমার যখনই দেখা হত, প্রায় প্রত্যেকবারই আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতাম। তাঁর মুখের কথা শুনে অবশ্য মনে হত যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাঁর মনোভাবটা মোটের ওপর অবিশ্বাসে ভরা, আর শত্রুতাপূর্ণ ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভ্লাদিমির ইলিচ বিপ্লবের কালে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা আর গুরুত্বের সঠিক মূল্যায়নই করতেন। এ বিষয়ে তিনি একমত হতেন যে, সামাজিক বিকাশের স্বাভাবিক গতি যখন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন বুদ্ধিজীবীদের প্রাগ্রসর চেতনা আর মানসিক শক্তির আকস্মিক আত্মবিকাশই হল বিপ্লবের মূল কথা।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে বিজ্ঞান-পরিষদের তিন সদস্যের কথাবার্তা হচ্ছিল। আমিও সেখানে ছিলাম। কথা হচ্ছিল পিটার্সবুর্গের উচ্চতম একটি বিজ্ঞান-সংস্থাকে নতুন করে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এঁরা তিনজন চলে যাবার পর লেনিন সন্তোষের সঙ্গে বললেন—"এই তো বেশ হল। এঁরা বুদ্ধিমান লোক। এঁদের কাছে সবই সহজ, সবই একটা নিয়মের ছকে বাঁধা। এঁদের সঙ্গে কথা বলে আপনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারবেন এঁরা কি চান। এঁদের সঙ্গে কাজে নেমে সুখ আছে। বিশেষভাবে আমার ভালো লাগল—কে।" লেনিন রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজনের নাম করলেন। এমন কি একদিন পরে আমাকে টেলিফোনে বললেন, "স—কে জিজ্ঞেস করবেন তো তিনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজে নামতে রাজি আছেন কি-না।" স—যখন এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আন্তরিক খুশি হলেন। হাতে হাত ঘষে হাসিমুখে কৌতুক করে বললেন, "একে একে আমরা সমস্ত রাশিয়ান আর ইওরোপীয় আর্কিমিডিসদের আমাদের পক্ষে টেনে আনব। তারপরে পৃথিবী চাক আর না চাক, তাকে বদলে যেতেই হবে !"

বিপ্লবের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আর বিপ্লবী জীবনের মধ্যে যেসব নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা আছে, আমি লেনিনকে প্রায়ই সে সম্পর্কে বলতাম। বিস্ময়মিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে তিনি আমাকে পাল্‌টা জিজ্ঞেস করতেন, "কি চান আপনারা ? এমন ভয়ঙ্কর আর অভূতপূর্ব রকমের হিংস্র এক সংগ্রামে কি দয়ামায়া বজায় রাখা সম্ভব ? কোমল হৃদয়ে উদারতা দেখানোর মতো অবকাশ কোথাও আছে কি ? গোটা ইওরোপ আমাদের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টি করেছে, ইওরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য যাতে আমরা না পাই তার জন্যে সব রকমের বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে, উন্মত্ত ভল্লুকের মতো প্রতিবিপ্লব আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে এগিয়ে আসছে চারিদিক থেকে। এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি ? আমরা যা করছি তা কি ন্যায়সংগত নয় ? আমাদের কি সংগ্রাম চালিয়ে শত্রুকে প্রতিহত করাই সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য নয় ? না, মাপ করবেন, আমরা একদল নির্বোধ লোক নই। আমরা জানি, আমরা যা চাই তা শুধু আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই পেতে পারি। এ সম্বন্ধে যদি সন্দেহাতীত প্রত্যয় আমার না থাকত তাহলে আমি কী এই জায়গায় বসতাম বলে মনে করেন ?

একবার খুব উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের মুখে ইলিচ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—লড়াইয়ের সময়ে কোন্‌ ঘুষিটা মারা উচিত আর কোন্‌টা বাড়তি হয়ে পড়ল—সেটা বিচার করবেন আপনি কোন মানদণ্ডে ? এই সহজ প্রশ্নটার জবাবে আমাকে শুধু কবিত্ব করতে হল। তাছাড়া আর কিছু জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

খুব ঘন ঘন আমি লেনিনের কাছে গিয়ে হাজির হতাম নানা ধরণের অনুরোধ জানাবার জন্যে। এবং এও অনুভব করতাম যে, বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে আমি যে এতো মাথা ঘামাচ্ছি, এর জন্যে লেনিন যেন আমাকে বেশ একটু করুণার চোখেই দেখছেন। মাঝে মাঝে বলতেন, "যতো সব বাজে লোকের জন্যে আপনি অযথা শক্তিক্ষয় করেছেন বলে আপনার মনে হয় না ?" কিন্তু আমি যা করা উচিত বলে মনে করতাম তাই করে যেতাম। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু কারা সেটা যিনি খুব ভালো জানতেন, তিনি যখন ক্রোধের সঙ্গে আমার দিকে আড়চোখে তাকাতেন তখন আমি দমে যেতাম না। একটা খুব প্রবল ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে তিনি বলতেন, আমাদের কমরেডদের চোখে, শ্রমিকদের চোখে, আপনি কিন্তু নিজেকে অসম্মানিত করছেন। আমিও বলতাম যে, শ্রমিকরা, কমরেডরা, যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা এমন সব লোকের জীবনকে তার স্বাধীনতাকে যৎসামান্যই মূল্য দিয়ে থাকে, যাদের জীবন মনীষা আর কর্মের স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে মূল্যবান। এবং, আমার মতো, এই ধরণের অতিরিক্ত রকমের—এমন কি মাঝে মাঝে কাণ্ডজ্ঞানহীন—নিষ্ঠুরতায় ফলে বিপ্লব যে তার সুকঠিন আর উচ্চ আদর্শটি থেকেই মাঝে মাঝে বিচ্যুত হয়, শুধু তাই নয় ; এরই জন্যে বহু সৎ আর সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোক বিপ্লবে যোগদান করতে পিছ্‌-পা হন।

একথা শুনে ভ্লাদিমির ইলিচ সন্দেহের সঙ্গে "হুঁ" "হুঁ" বলে মাথা নাড়তেন আর এমন সব উদাহরণ উল্লেখ করতেন যেক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। একবার বলেছিলেন—"বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুপক্ষে গিয়ে যোগ দেয় শুধু ভীরুতা আর কাপুরুষতা থেকেই নয় ; নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার বশেও তারা এরকম করে থাকে। পাছে তারা একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে, পাছে বাস্তবের মুখোমুখি তাদের প্রিয় থিওরিগুলি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, সেই ভয়েও তারা শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু এ জন্যে আমরা ভয় পাই না। আমাদের কাছে কোন থিওরি বা প্রকল্প একেবারে পূত পবিত্র অলঙ্ঘনীয় ধর্মসূত্রের মতো নয়। থিওরিকে আমরা কাজে লাগাই হাতিয়ার হিসেবে।"

কিন্তু ইলিচ কোনদিন আমার কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। সব সময়ে যে এই সব

অনুরোধ রক্ষিত হয়নি তার কারণ তাঁর দিক থেকে প্রত্যাখ্যান নয়, সেটা হয়েছে এমন কোন একটা ব্যবস্থার দোষে—যেসব দোষ তখনকার সদ্যোগঠিত শ্রমিক-রাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণেই ছিল। কিংবা হয়তো এ জন্যেও হতে পারে যে কোথাও কেউ একজন বিদ্বেষের মনোভাব থেকে একটি মূল্যবান্ জীবন বাঁচানোর ব্যাপারে কিংবা কারুর অন্যায় শাস্তির বোঝা হালকা করার ব্যাপারে অনিচ্ছা দেখিয়েছে। ইচ্ছাকৃত ক্ষতি করার দু-চারটি উদাহরণও যে না ছিল তা নয়। শত্রুপক্ষও তো যেমন ধূর্ত তেমনি নির্মম। প্রতিশোধস্পৃহা আর বিদ্বেষের মনোভাবটাও তেমনি প্রায়ই নিষ্ক্রিয়তার শক্তির মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে থাকে। আর, এরকম ক্ষুদ্রমনা লোক তো আছেই যাদের অসুস্থ মনে প্রতিবেশীর যন্ত্রণা-লাঞ্ছনা দেখে সুখভোগ করার এক বিকৃত কামনা গোপন রয়েছে।

লেনিন কিন্তু যাদের তাঁর শত্রুপক্ষের লোক বলে মনে করতেন, তাদের সাহায্য করার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। এটা লক্ষ্য করে আমি বহুবার বিস্মিত হয়েছি। তিনি শুধু যে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন, তা নয়; তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল।

উদাহরণ হিসেবে, সমর-বিভাগের একজন জেনারেলের কথা বলতে পারি। তিনি ছিলেন সেই সঙ্গে একজন প্রতিভাবান রসায়ন-বিজ্ঞানী। তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আমার বিবরণ খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর লেনিন বললেন, "হুঁ। হুঁ। তাহলে আপনি মনে করছেন যে ওর অজান্তেই ওর ছেলেরা ল্যাবরেটরিতে বন্দুক পিস্তল লুকিয়ে রেখেছিল? বেশ একটু রোম্যাণ্টিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। তা, আমাদের কিন্তু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে হবে দজেরজিন্স্কি-র* হাতে।" সত্য ঘটনাটা আবিষ্কার করার দিকে তাঁর একটা তীক্ষ্ণ স্বভাব-অনুভূতি আছে। দিনকতক বাদেই তিনি আমাকে পেত্রোগ্রাদে টেলিফোনে ডাকলেন। বললেন, "আপনার এই জেনারেল মশাইকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি—বোধহয় এর মধ্যেই তিনি ছাড়া পেয়ে গেছেন। এখন তিনি কি করতে চান?···তাঁর যদি কিছু দরকার পড়ে তো আমাকে বললেন।"

একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে পেরে ভ্লাদিমির ইলিচ যে আনন্দ বোধ করছেন, সেটা তাঁর গলার স্বরে আমি খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করলাম। কিন্তু সেই মনোভাবটা তিনি গোপন করতে চান বলে হাল্কা বিদ্রূপের ঢঙে কথা বললেন। আরও দিন কতক বাদে তিনি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা, আপনার সেই জেনারেলের খবর কি? সব ঠিক হয়ে গেছে তো?"

বিপ্লবের সময়ে মনের জানা আবেগকে চাপা দিতে হয়। মনের ভেতরে নানা আবেগের তরঙ্গকে কি ভাবে চাপা দিতে হয় সেটা লেনিন খুব ভালো ভাবেই জানতেন। তাছাড়া, নিজের দিকে তাঁর যেমন বিশেষ মনোযোগ ছিল না, তেমনি নিজের কথাও তিনি অন্যকে খুব কমই বলতেন।

কিন্তু একবার তাঁকে দেখেছিলাম—নিঝ্নি-নোভ্গোরোদ সহরে* একদল শিশুর মধ্যে। এই শিশুদের আদর করতে করতে তিনি বললেন, "আমাদের চেয়ে ঢের বেশী সুখী হবে এদের জীবন। আমাদের যে নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, এদের আর সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে না। এদের [illegible] নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা থাকবে না।" তারপরে দূরে পা[illegible] যেখানে গ্রামের কয়েকটা কুঁড়ে ঘর রোদ্দুরে উজ্জল [illegible] সেই দিকে তাকিয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ বললেন, "তা [illegible] আমি হিংসে করিনে। আমরা যা করেছি তা ইতিহাসে[illegible] দিয়ে বিস্ময়কর রকমের তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের জীবনের তাগিদেই এই নিষ্ঠুরতার প্রয়োজন ছিল। এ নিষ্ঠুরতা যে অবশ্যম্ভাবী ছিল, তা ভবিষ্যতে লোকে বুঝবে, একে তারা ক্ষমা করবে। এ সবই তারা উপলব্ধি করবে—সব কিছু।"

গভীর স্নেহের সঙ্গে তিনি এই শিশুদের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন এই কথাগুলি।

(—ম্যাক্সিম গোর্কির "লেনিনের স্মৃতিকথা" থেকে।)

তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা।

* বর্তমান নাম "গোর্কি।"

অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে

শান্তিকুমার ঘোষ

অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে মহানগরীর আভা
প্রস্তুত উজ্জ্বল মঞ্চ:
হবে কি সময় আর এক পাত্র মদ
বসে আলস্যে খাওয়ার।

এখনি অপেরা শুরু:
রঙ্গভূমি হয়ে যাবে নক্ষত্র-সংসার।
সোনালি আলোর বৃত্তে রূপসীর
খর কণ্ঠে অবাধ সঙ্গীত।

শব্দের অধিক বেগ—দৃশ্যের ভিতরে যাত্রা:
সবল রোমশ হাতে
অ টার বান্ধবী ক্ষীণ স্নায়ুর স্পন্দন।

ক্রমিক নিটোল শূন্যে
লব্ধ কামনায় তার—অনির্দেশ্য বিস্মৃতা
মাথায় খুলিতে আঁটা অন্ধকার স্নেহহীন সমুদ্র জাগা

জ্ঞানান্বেষণে

(চার্লস ডিকেন্সের মিঃ পিকউইক ট্রাভেলশ)

(বিদ্যাচর্চা এবং জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকার উদ্দেশ্যে লণ্ডনের পিকউইক সমিতির স্থাপনা। মিষ্টার পিকউইক এবং তাঁর বন্ধু মিষ্টার স্নডগ্রাস, মিষ্টার টুপম্যান এবং মিষ্টার উইংকল এরা চারজন পিকউইক সমিতির সভ্য। জ্ঞানান্বেষণে এঁরা দক্ষিণ ইংলণ্ডে ভ্রমণ কোরতে বেরিয়ে ছিলেন।)

আঠার শ সাতাশ খৃষ্টাব্দের তেরই মে'র সকালে সবে মাত্র ওঠা সূর্য্য আলোকপাত সুরু কোরেছে, এমন সময় মিষ্টার স্যামুয়েল পিকউইক দ্বিতীয় সূর্য্যের মতো নিদ্রাভঙ্গে গাত্রোত্থান কোরে তাঁর শয়নকক্ষের জানালা খুলে নীচের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত কোরলেন। নীচে গসওয়েল ষ্ট্রীট, ডাইনে বামে যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু গসওয়েল ষ্ট্রীটই তিনি দেখতে পেলেন, আর গসওয়েল ষ্ট্রীটের বিপরীত দিকটা তিনি দেখতে পেলেন রাস্তার অপর পারে।

"যে সকল দার্শনিকেরা তাঁদের সম্মুখে যা দেখতে পান, তাই দেখেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বড় সংকীর্ণ। তাঁরা অপর দিকে লুক্কায়িত সত্যের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হোতে পারেন না।" মিষ্টার পিকউইক ভাবতে লাগলেন। "আমিও যেমন গসওয়েল ষ্ট্রীটের চতুষ্পার্শে যে সকল স্থান আছে তাদের অনুসন্ধানে বহির্গত না হো'য়ে চিরকাল ধরে গসওয়েল ষ্ট্রীট দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম।" এবং এই কথা মনে উদয় হওয়া মাত্রই মিষ্টার পিকউইক নিজেকে এক প্রস্থ পোষাকের মধ্যে এবং অপর পোষাকগুলিকে বাক্সের মধ্যে বন্দী কোরতে সুরু কোরলেন।

মহাপুরুষদের সাজসজ্জার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতে বড় একটা দেখা যায় না। সেই জন্যই মিষ্টার পিকউইকের ক্ষৌর কর্ম্ম সমাধা, পোষাক পরিধান এবং কফি পান খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হো'ল আর এক ঘণ্টার মধ্যেই মিষ্টার পিকউইক হাতে পোর্টম্যাণ্টো, গ্রেটকোটের পকেটে টেলিস্কোপ আর উল্লেখযোগ্য যা কিছু দেখবেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য ওয়েষ্ট কোটের পকেটে নোট বই নিয়ে সেণ্ট মার্টিন্স-লে গ্র্যাণ্ডের ঠিকা গাড়ী আড্ডায় উপস্থিত হোলেন।

গাড়ী চাই—মিষ্টার পিকউইক নির্বিকার ভাবে গাড়ী তলব কোরলেন।৮

এই যে তাঁর গাড়ী প্রস্তুত,—উত্তর এল মানব জাতির এক অভিনব সংস্করণের কাছ থেকে। লোকটির পরিধানে থলের কাপড় দিয়ে তৈরী কোট এবং এপ্রন। তার গলায় ঝোলান সংখ্যালেখা একটা পিতলের চাকৃতি দেখে মনে হয় যেন কোন দুষ্প্রাপ্য জিনিষের সংগ্রহশালায় তাকে চিহ্নিত কো'রে রাখা হোয়েছে। লোকটি পানীয় জল সরবরাহ কারক। এইটেই প্রথম গাড়ী স্যার। প্রথম গাড়ীর মালিক নিকটবর্ত্তী সরাইখানায় বোসে তার পাইপে প্রথম অগ্নি সংযোগ কোরেছিল। মিষ্টার পিকউইকের প্রয়োজনে গাড়ী আনীত হোলে তাঁকে এবং তাঁর পোর্টম্যাণ্টোটাকে গাড়ীর মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হো'ল।

"গোল্ডেন ক্রশে চল"—মিষ্টার পিকউইক আদেশ দিলেন।

গাড়ী চলতে সুরু কোরলে চালক তার বন্ধু জলসরবরাহকারীকে উদ্দেশ কোরে বিরক্তিভরে বোলল—"ছোট ছেলের ভাড়া টমি"—(অর্থ—মাত্র একশিলিং পাওয়া যাবে এতে।)

মিষ্টার পিকউইক ভাড়ার জন্য আলাদা কোরে রাখা শিলিংটি দিয়ে তাঁর নাক চুলকাতে চুলকাতে চালককে জিজ্ঞাসা কোরলেন—"তোমার ঘোড়ার বয়স কত বন্ধু?"

"বিয়াল্লিশ",—পাশে উপবিষ্ট মিষ্টার পিকউইকের প্রতি একনজর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উত্তর দিল চালক।

"কি বোলছ!"—বিস্ময়সূচক উক্তি কোরলেন মিষ্টার পিকউইক, তাঁর নোট বইটির ওপর হাত রেখে। চালক তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। মিষ্টার পিকউইক কঠোর দৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে তাকান, কিন্তু তাঁর মুখাবয়বে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। সুতরাং তিনি কালক্ষেপ না কোরে কথাটি তাঁর নোট বই-এ লিপিবদ্ধ করেন। তারপর আরও নূতন তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোয়ে মিষ্টার পিকউইক তাকে জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা তুমি কতক্ষণ একে একটানা গাড়ীতে জুতে রাখ?"

"দু'তিন সপ্তাহ ধরে"।—উত্তর দেয় লোকটি।

"সপ্তাহ!"—অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা করেন মিষ্টার পিকউইক। তাঁর নোট বইটা আবার খুলে যায়।

"পেণ্টনউইলে ওর আস্তাবল। কিন্তু ও দুর্ব্বল বোলে আমরা ওকে আস্তাবলে খুব কমই নিয়ে যাই"—নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দেয় চালক।

মিষ্টার পিকউইক বুঝতে না পেরে ওর কথারই পুনরাবৃত্তি করেন—"দুর্ব্বল বোলে!"

"ওকে গাড়ী থেকে বার কোরে নিলেই ও পড়ে যায়, কিন্তু যখন গাড়ীতে জোতা থাকে তখন আমরা ওকে খুব টেনে ধরে রাখি, তাতে ওর আর পড়ে যাবার ভয় থাকে না। তাছাড়া গাড়ীতে একজোড়া বেশ বড় মূল্যবান চাকা লাগান আছে, সেইজন্য ও যখনই চোলতে থাকে চাকাগুলোও ওর পিছনে গড়াতে সুরু করে, ফলে ওরও না ছুটে গত্যন্তর থাকে না।"

মিষ্টার পিকউইক প্রতিটি কথাই তাঁর নোটবুকে লিখে নিচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য—কষ্টকর অবস্থার সঙ্গে ঘোড়া নিজেকে কিভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, তার একটা বিশেষ উদাহরণ হিসাবে এ ঘটনার কথা তাঁর সমিতির সভ্যদের কাছে পেশ করা। লেখা প্রায় শেষ হোয়েছে, এমন সময় তাঁরা গোল্ডেনক্রশে এসে উপস্থিত হোলেন। চালক গাড়ী থেকে নামার পর মিষ্টার

পিকউইক অবরোহণ কোরলেন। সেখানে মিষ্টার টুপম্যান, মিষ্টার স্নডগ্রাস এবং মিষ্টার উইঙ্কল অধীর আগ্রহে তাঁদের খ্যাতনামা নেতাকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য তাঁর আগমন প্রতীক্ষা কোরছিলেন।

(মিষ্টার পিকউইক এবং তাঁর সঙ্গীরা অতঃপর শকটারোহণে রচেষ্টার সহরের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং সেখানে পৌছে 'বুল' সরাইএ অবস্থান করেন।)

রণাঙ্গনে

পরদিন প্রাতে রচেষ্টার এবং তার নিকটবর্ত্তী সহরগুলির অধিবাসীরা যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শয্যাত্যাগ কোরল। সেদিন ঐ স্থানে এক চমকপ্রদ দৃশ্য অভিনয়ের আয়োজন হোয়েছিল। শ্যেন-চক্ষু প্রধান সেনাপতি আধ ডজন সেনাবাহিনীর যুদ্ধাভিনয় পরিদর্শন কোরবেন। সেইজন্য অস্থায়ী দুর্গ নির্ম্মিত হোয়েছিল, যেগুলি সেনাবাহিনী অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন কোরে আক্রমণ এবং অধিকার কোরবে। একটা মাইন ফাটাবার ব্যবস্থাও ছিল সেখানে।

মিষ্টার পিকউইক সেনাবাহিনীর একজন উৎসাহী প্রশংসক। তাঁর কাছে এর থেকে আনন্দদায়ক বিষয় আর কিছু নেই এবং তাঁর প্রতিটি সঙ্গীরই অদ্ভুত মানসিক অবস্থায় এ দৃশ্য অপেক্ষা ভালো লাগার বিষয়ও আর কিছু হোতে পারে না। সুতরাং তাঁরা যথাশীঘ্র প্রস্তুত হোয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে পদব্রজে যাত্রা কোরলেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক সেখানে সমবেত হোতে আরম্ভ কোরেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এবং আয়োজন দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যথেষ্ট জাঁকজমক সহকারেই যুদ্ধের অভিনয় হবে। দর্শকেরা যাতে রণাঙ্গনে প্রবেশ কোরতে না পারে তার জন্য শান্ত্রী মোতায়েন করা হোয়েছে। ভদ্রমহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান পাহারা দিচ্ছে ভৃত্যেরা। সার্জ্জেন্টরা বগলে বাঁধান বই নিয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি কোরছে। সামরিক পোষাক পরিহিত কর্ণেল বুলডার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কোরে একস্থান থেকে আর একস্থানে ভীড়ের মধ্য দিয়েই তাঁর অশ্বচালনা কোরছেন এবং মাঝে মাঝে বিনা কারণেই এমন কর্কশ শব্দে চিৎকার কোরে উঠছেন যে, উপস্থিত দর্শকেরাও তাতে ভয় পেয়ে চমকে উঠছেন। অফিসাররাও এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি কোরে কখনও কর্ণেল বুলডারের সঙ্গে পরামর্শ কোরছেন, কখনও সার্জ্জেন্টদের আদেশ দিচ্ছেন আবার কখনও অন্তরালে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ এবং অঙ্গভঙ্গী দেখে সেনাবাহিনীর লোকের চোখেও এমন একটা বিস্ময়ের দৃষ্টি ফুটে উঠছে যা থেকে এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

মিষ্টার পিকউইক তাঁর তিন সঙ্গীসহ ভীড়ের সম্মুখ সারিতেই অবস্থান কোরে অনুষ্ঠান সুরুর জন্য ধৈর্য্যসহকারে প্রতীক্ষা কোরছেন। ভীড় ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং যাতে তাঁরা স্থানচ্যুত না হন তার জন্য পরবর্ত্তী দু'ঘণ্টা ধরে তাঁদের যথেষ্ট পরিশ্রম কোরতে হোয়েছিল। অনেকখানি মনই এর জন্য ফেলে রাখতে হোয়েছিল ওঁদের। এক সময় মিষ্টার পিকউইক পিছনের ভীড়ের ধাক্কায় সামনে কয়েক গজ দূরে ছিটকে পড়লেন। যে গতিতে তিনি পড়লেন তা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বিশেষ মাত্রায় অসঙ্গতি সূচক। আর এক সময় তিনি পিছনে সরে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হোলেন এবং অনুরোধ যাতে তিনি যথাযথভাবে পালন করেন তার জন্য পায়ে এবং বুকে বন্দুকের কুঁদোর স্পর্শানুভূতিও লাভ কোরলেন তিনি। অতঃপর কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁদের এমন ভাবে পাশের দিকে ঠেলতে আরম্ভ কোরলেন যে, মিষ্টার স্নডগ্রাস কোথায় তাঁদের ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা কোরতে বাধ্য হোলেন। মিষ্টার উইঙ্কল 'যুদ্ধের অভিনয়' দেখাটা ঘৃণ্য কাজ বিবেচনা কোরে তাঁর মত প্রকাশ করায় কয়েকজন দর্শক ক্ষুব্ধ হোয়ে তাঁর টুপিটা চোখের উপর নামিয়ে দিলেন এবং তার মাথাটা পকেটস্থ করার দাবী জানালেন। এই সব বাস্তব কারণ এবং এছাড়াও মিষ্টার টুপম্যানের অনুপস্থিতি (তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হোয়েছেন।) অবস্থাকে অত্যন্ত অস্বস্তিকর কোরে তুলল। অন্ততঃ আনন্দদায়ক বা উপভোগ্য করেনি।

অবশেষে ভীড়ের মধ্যে বহুকণ্ঠের গুঞ্জন উঠলে বোঝা গেল যে তাঁদের প্রতীক্ষা সার্থক হতে চলেছে। সকল চক্ষুই নিবদ্ধ হো'ল দুর্গের নিষ্ক্রমণ-দ্বারের দিকে। কয়েক মূহুর্ত্ত সাগ্রহ প্রতীক্ষার পর হাওয়ায় পত্‌পত্‌ কোরে ওড়া রঙীন পতাকা এবং সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল অস্ত্রবাহী অগ্রগামী সেনাদল স্পষ্ট হো'য়ে উঠল। দলে দলে যোদ্ধারা সমবেত হোল প্রাঙ্গণে। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ সুরু হোল। প্রধান সেনাপতি, কর্ণেল বুলডার এবং আর কয়েকজন অফিসার সমভিব্যাহারে সারিবদ্ধ ফৌজের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। রণদামামা বাজতে লাগল। ঘোটকগুলি পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্রেষারব কোরল এবং কখনও সম্মুখে এগিয়ে এসে কখনও পিছিয়ে গিয়ে লেজ আন্দোলিত কোরতে সুরু কোরল। কুকুরের ঘেউঘেউ, ভীড়ের মধ্য থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার এবং সৈন্যদলের পদক্ষেপ জায়গাটাকে বেশ কোলাহলমুখর কোরে তুলল। বহুদূর দৃষ্টি চলে—শুধু লাল কোর্ত্তা আর সাদা পাজামার সমাবেশ দেখা যাচ্ছিল।

মিষ্টার পিকউইক নিজেকে পতনের হাত থেকে এবং ঘোড়ার পায়ের আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্য এমন ভাবে ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি পূর্ব্ববর্ণিত দৃশ্য ছাড়া অন্য কিছু দেখার অবসর পাননি যখন তিনি দৃঢ়ভাবে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে সমর্থ হো'লেন তখন তাঁর আনন্দ আর উৎসাহের অবধি রইল না।

মিষ্টার উইঙ্কলকে তিনি জিজ্ঞাসা কোরলেন—"এর থেকে সুন্দর আনন্দদায়ক আর কি হো'তে পারে ?"

মিষ্টার উইঙ্কল প্রায় পনের মিনিট যাবৎ একটি খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির ভার নিজের পায়ের উপর সহ্য কোরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিষ্টার পিকউইকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বোললেন—"কিছু না।"

এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে মিষ্টার স্নডগ্রাসের হৃদয়ে কবিত্বের উদয় হো'য়ে শুধু প্রকাশের পথ খুঁজছিল। তিনি বোললেন—"কি অপূর্ব্ব মহান দৃশ্য! শান্তিকামী নাগরিকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বীর রক্ষীবাহিনী ওদের মুখে যুদ্ধকালীন নৃশংসতা নেই, চোখে প্রতিহিংসা পরায়ণতার দৃষ্টি নেই···কেমন শান্ত সংযত মুখভাব আর মুক্তি দীপ্ত চোখে মানবতার আবেদন।"

মিষ্টার স্নডগ্রাসের কবিত্ব ভাল লাগল মিষ্টার পিকউইকের কিন্তু তাঁর কথার প্রতিধ্বনি তিনি কো'রতে পারলেন না। কারণ, যোদ্ধাদের চোখের দৃষ্টি তাঁর কাছে বুদ্ধি-দীপ্ত বোলে মনে হো'ল না। উপরন্তু "সম্মুখে দৃষ্টি" আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকল যোদ্ধারই ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ হো'ল এবং উপস্থিত দর্শকেরা হাজার জোড়া স্থির নিবদ্ধ চোখে মানবতার আবেদন অথবা বুদ্ধির দীপ্তি কিছুই দেখতে পেলেন না।

মিষ্টার পিকউইক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কো'রে বোললেন, "আমরা এখন বেশ সুন্দর জায়গায় দাঁড়িয়েছি।" তাঁদের কাছাকাছি ভীড় বেশ পাতলা হো'য়ে গিয়েছে এবং ঠেলাঠেলিও আর নেই।

"চমৎকার!"—মিষ্টার স্নডগ্রাস এবং মিষ্টার উইঙ্কল দু'জনেই জবাব দিলেন।

মিষ্টার পিকউইক তাঁর চশমা ঠিকমতো সন্নিবেশ কোরতে কোরতে জিজ্ঞাসা কোরলেন—"ওরা কি করছে এখন?"

মিষ্টার উইঙ্কল-এর রং পরিবর্ত্তিত হো'ল, মানে ফ্যাকাসে হো'য়ে গেলেন তিনি। "আ···আমার মনে হয় ওরা এবার ফায়ার কোরবে।"

মিষ্টার পিকউইক তাড়াতাড়ি বোললেন—"নন্‌সেন্স।"

"আ··আ··আমার মনে হয় ওরা সত্যিই ফায়ার কোরছে"—বেশ ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বোললেন মিষ্টার স্নডগ্রাস।

"অসম্ভব"—মিষ্টার পিকউইকের কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্মুখে দু'টি সেনাবাহিনীর রাইফেলের মুখ তাঁদের দিকে ফিরল। সব কটি রাইফেলের লক্ষ্য একই এবং তা হ'চ্ছে পিকউইক সম্প্রদায়। সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেলগুলি হো'তে ফাঁকা আওয়াজ করা হোল। সে আওয়াজে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। এই রকম এক অবস্তিকর অবস্থার মধ্যে তাঁরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হোয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় তাঁদের পিছন দিকেও আর একটি নূতন সেনাবাহিনী যুদ্ধোদ্যত ভঙ্গীতে আবির্ভূত হোল। মিষ্টার পিকউইক কিন্তু এতেও তাঁর মহৎ ব্যক্তিসুলভ ধৈর্য্য ও সংযম হারান নি। তিনি মিষ্টার উইঙ্কলএর হাত ধরে নিজেকে মাঝখানে এবং আর একদিকে মিষ্টার স্নডগ্রাসকে রেখে তাঁদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ কোরলেন যে, একমাত্র কানে তালা লেগে যাওয়া ছাড়া ফায়ারিং থেকে আর কোন বিপদ আশঙ্কা করার কোন হেতু নেই।

মিষ্টার উইঙ্কল বোললেন—"কিন্তু ধরুন যদি কেউ ভুল কোরে সত্যি গুলী ভরে থাকে ত!" ভয়ে বিবর্ণ তাঁর মুখ। "আমি এইমাত্র কানের পাশ দিয়ে সাঁ কোরে কি একটা চলে যাবার মতো শুনলাম।"

মিষ্টার স্নডগ্রাস বোললেন, "আমাদের পক্ষে এখন উপুড় হোয়ে শুয়ে পড়াই সব চেয়ে নিরাপদ।"

"না, না তার আর দরকার নেই, শেষ হোয়ে গিয়েছে সব"—মিষ্টার পিকউইক বোললেন, হয় ত তাঁর ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল আর গালের রক্তাভা ছিল না কিন্তু তাঁর বাচনভঙ্গীতে ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না।

মিষ্টার পিকউইকের কথাই ঠিক, ফায়ারিং বন্ধ হোয়েছিল। তাঁর কথা সত্য প্রমাণিত হওয়ার জন্য তিনি নিজেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কোরতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সময় পেলেন না তার। কারণ ইতিমধ্যে নতুন আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দু'টি বাহিনীর বেয়নেট উদ্যত কোরে যেখানে মিষ্টার পিকউইক এবং তাঁর বন্ধুরা অবস্থান কোরছিলেন সেই দিকে ধাবিত হোল।

মানুষ মরণশীল। তাছাড়া মানুষের সাহসেরও একটা সীমা আছে। ধাবমান সৈন্যদলের প্রতি মিষ্টার পিকউইক চশমার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরলেন এবং পরক্ষণেই—না, পালালেন এ কথা আমরা বোলব না কারণ প্রথমত, কথাটা অপমানজনক, দ্বিতীয়ত মিষ্টার পিকউইকের আকৃতিও ঐরূপ ক্রিয়ার উপযুক্ত নয়। তিনি যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সরে গেলেন।

পিছন দিকের সৈন্যেরা সারিবদ্ধ ভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হোয়ে অপেক্ষা কোরছিল এবং সম্মুখের সেনাদল আক্রমণ করার জন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল, ফলে মিষ্টার পিকউইক এবং তাঁর সঙ্গিগণ দুটি যুদ্ধোদ্যত সেনাবাহিনীর মধ্যে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হোয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

আক্রমণোদ্যত সৈন্যদলের অফিসার চিৎকার কোরে উঠলেন—"হোই।"

অপেক্ষমান বাহিনীর অফিসার ধমক দিলেন—"হঠ্ যাও।" উত্তেজিত পিকউইকেরা বোললেন—"যাব কোথায়?"

হোই-হোই—হোই, ছাড়া আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। থাবড়ে গিয়ে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা কোরতে পারেন তাঁরা? মুহূর্ত্তের মধ্যেই কি হোয়ে যায়। একটা ধাক্কা—উচ্ছৃঙ্খল হাসির শব্দ—পরক্ষণেই প্রায় পাঁচশ গজ দূরে সেনাবাহিনীর অবস্থান।

মিষ্টার স্নডগ্রাস এবং মিষ্টার উইঙ্কল দু'জনেই যথেষ্ট ক্ষিপ্রতা সহকারে লাফাতে বাধ্য হো'য়েছিলেন। অতঃপর মাটিতে বোসে প'ড়ে তাঁর হলদে রঙের রুমালে নাকের লাল রক্ত মুছে ফেলতে ফেলতে মিষ্টার উইঙ্কল প্রথম যে জিনিস দেখলেন তা হ'চ্ছে তাঁদের শ্রদ্ধেয় নেতার মাথার টুপিটি বিচিত্র গতিতে গড়িয়ে যাচ্ছে আর তিনি তাই ধরবার জন্য তাঁর ভারী দেহ নিয়ে ছুটছেন।

মানুষের জীবনে এরূপ মুহূর্ত্ত খুব কমই আসে যখন তাকে নিজের টুপির পিছনে দৌড়বার মতো লাঞ্ছনা সহ্য কো'রে সকলের কৃপার পাত্র হো'তে হয়। হাওয়ায় উড়ে যাওয়া টুপি ধরার জন্য যথেষ্ট ঠাণ্ডা-মস্তিষ্ক এবং বিচারবুদ্ধি থাকার প্রয়োজন। অতি দ্রুতগতিতে দৌড়লে হুমড়ি খেয়ে টুপির উপর পড়ার সম্ভাবনা, ফলে টুপি পদতলে পিষ্ট হবার ভয় থাকে। আবার ওর সঙ্গে তাল রেখে না ছুটলে নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হো'য়ে ঠিক মুহূর্ত্তে ওকে পাকড়াও কো'রে মাথায় চাপিয়ে দেওয়াই সমীচীন।

ধীরে ধীরে বাতাস বইছিল। মিষ্টার পিকউইকের টুপিটিও হাওয়ায় গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। এই রকম আরও এগিয়ে যেত, অন্ততঃ তাই ভেবে মিষ্টার পিকউইক প্রায় হাল ছেড়ে দেবার উপক্রম কোর'লেন।

অনুবাদক—মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

২১

উষাকালে গঙ্গাস্নান করে নিমাই টোলে গিয়ে বসল। পড়ুয়ারা আসতে লাগল একে-একে। হাতে পুঁথি আছে সকলের কিন্তু ডোর দিয়ে বাঁধা। যার-যার আসনে বসল স্থির হয়ে।

ডোর খোলো এইবার।

কোনোদিন এমন হয়নি, পড়ুয়ারা ডোর খোলবার আগে হরি-হরি বলে উঠল। হরিধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে গেল ডোর। হরিধ্বনিই কি সমস্ত বন্ধন মোচনের ভূমিকা?

হরিধ্বনি শুনে নিমাই আনন্দে আবেগে বিভোর হয়ে গেল। বললে, 'সর্বকালে হরিনামই সত্য। সূত্র বৃত্তি টীকা সমস্তই হরিনাম। হরি ছাড়া শাস্ত্র নেই শব্দ নেই অর্থ নেই ব্যাখ্যা নেই। আবার বলো। আবার শুনি।'

হরি শব্দের নানা অর্থ, দুটি মুখ্যতম। এক, 'সর্ব অমঙ্গল হরে'; আর 'প্রেমে হরে মন।' যিনি হরণ করেন তিনিই হরি। কী হরণ করেন? সমস্ত অমঙ্গলের যা কারণ সেই মায়াবন্ধন হরণ করেন। আর হরণ করেন আসক্তি যা মনের সঙ্গে ওতপ্রোত। শুধু নিয়েই যান না, দিয়েও যান। আসক্তি নিয়ে দিয়ে যান কৃষ্ণপ্রেম।

কৃষ্ণ তাই চৌরাগ্রগণ্য। ব্রজের নবনীতচোর, গোপীদের দুকূলচোর, রাধিকার হৃদয়চোর, নবাম্বুদের শ্যামলকান্তিচোর। আর আমাদের বহুজন্মার্জিত পাপচোর, যমবন্ধপাশচোর।

মাধুর্য চাতুর্যের সম্পদ কৃষ্ণের মুখপঙ্কজ সততই আমার হৃৎ-সরোবরে বিরাজ করুক। এ পদ্মের মকরন্দ কোথায়? মুরলীধ্বনিই এ পদ্মের মকরন্দ। কৃষ্ণের কপোল দুটি মুকুরায়মান ইন্দ্রনীলমণি। চোখ দুটি ভাবোদগারে ও স্মরমদে ঈষৎ মুকুলিত। তার সেই মধুরিমার কণিকাও কি আমার বাক্যে প্রকাশ পাবে? তবু আমার সেই বাঙ্ময়জীবিত মদনমন্থরমুগ্ধ শ্যাম-সুন্দরের জয় হোক।

'কৃষ্ণে যার রতি-মতি নেই, সর্বশাস্ত্র পড়েও তার দারিদ্র্য যাবেনা।' আপন মনে বলতে লাগল নিমাই, 'কিন্তু দুর্গত অধমও যদি কৃষ্ণনাম নেয় তার কৃষ্ণধামে গতি হয়। কৃষ্ণের ভজন নেই অথচ শাস্ত্রব্যাখ্যা করে, সে ভারবাহী গর্দভ ছাড়া আর কী! কৃষ্ণপদে ভক্তি—এই শাস্ত্রমর্ম যে পড়াবে, তার নিজের জীবনে তা বিশদ করতে হবে। সুতরাং, আর কিছু নয়, কৃষ্ণপাদপদ্মধন ভজন করো।'

'পুতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্যধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাহার কীর্তন॥'

ঘোরা খেচরী কামচারিণী পুতনা নন্দগৃহে যদৃচ্ছা ঘুরতে ঘুরতে শয্যার উপরে বালককে দেখতে পেল। সে বালক যে অসাধুদের অন্তকারক, ভস্মাচ্ছাদিত পাবকের মত স্বীয় অসীম তেজ প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে, জানত না পুতনা। সুতরাং তার ভয়ও হলনা। চরাচরাত্মা ভগবান হরি বুঝল এ ভামিনী-কামিনী নয় এ রাক্ষসী, বালঘাতিনী। চোখ বুজে রইল। নির্বোধ যেমন রজ্জুবোধে নিদ্রিত কালসর্পকে তুলে নেয়, তেমনি পুতনা নিজ কালস্বরূপ কৃষ্ণকে অসহায় শিশুজ্ঞানে কোলে তুলে নিল। কোষনিহিত অসির মত পুতনার

অস্তর তীক্ষ্ণ বটে কিন্তু তার বাহুভঙ্গি ঠিক মায়ের মত। যশোদা আর রোহিণী তাই বারণ করতে পারল না। শিশুকে কোলে নিয়ে পুতনা তার দুর্জয় বিষপূরিত স্তন তার মুখে দিল। শিশু দুই হাতে সেই স্তন ধরে সবলে পীড়ন করতে লাগল, ক্রুদ্ধ রসনায় স্তনদুগ্ধের সঙ্গে পান করতে লাগল রাক্ষসীর প্রাণশক্তি। মুঞ্চ, মুঞ্চ, অলং —ছাড়ো ছাড়ো আর নয়, আর্তনাদ করতে লাগল পুতনা। মর্মভেদী যন্ত্রণায় নয়ন বিবৃত করে হস্তপদ বিক্ষেপ করতে করতে নিজরূপ ধারণ করলে। আকাশপথে উড়ে যেতে চাইল কিন্তু সাধ্য কি অযুত মত্তহস্তী সেই শিশুর ভার সে সহ্য করে। কেশ, চরণ ও বাহু বিস্তৃত করে কংসের গোষ্ঠে গিয়ে পড়ল, ছয় ক্রোশ ব্যাপী সমস্ত গাছ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কোথায়? ছয় দিনের শিশু, কৃষ্ণ নির্ভয়ে সেই রাক্ষসীর বুকের উপর খেলা করছে।

ক্রীড়ারত শিশুকে উদ্ধার করে আনল গোপীরা। প্রচলিত বিধি অনুসারে শিশুর রক্ষাবিধান করল। চক্রধারী মুরারি তোমার সামনে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চাতে, ধনুর্ধারী মধুসূদন আর অসিধারী অজ তোমার দুই ভুজপার্শ্বে অবস্থিত হোক। হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়, নারায়ণ প্রাণ, শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত, যোগেশ্বর মন, পৃশ্নিনন্দন বুদ্ধি আর পরম ভগবান তোমার আত্মা রক্ষা করুন। তুমি যখন খেলবে তখন গোবিন্দ, যখন শুয়ে থাকবে তখন মাধব, যখন চলবে তখন বিষ্ণু, যখন বসবে তখন শ্রীপতি আর যখন খাবে তখন সমুদায় গ্রহের ভয়োৎপাদক যজ্ঞভুক তোমাকে রক্ষা করুন। যক্ষ-রক্ষ-পিশাচ-বিনায়ক, কোটরা-রেবতী-জ্যেষ্ঠা ডাকিনী সকলে নষ্ট হোক, নষ্ট হোক সকল ব্যাধি আর উৎপাত, উন্মাদ আর অপস্মার।

যশোদা কৃষ্ণকে কোলে করে স্তন্যপান করাতে লাগল।

গোপগণ কুঠার দিয়ে পুতনার বিশাল কলেবর খণ্ড খণ্ড করে কাষ্ঠে বেষ্টন করে দাহ করল। চিতাধূম থেকে উঠল অগুরুসৌরভ। কৃষ্ণকে স্তন্যদান করেছিল বলে ও তার লোকবন্দিত পদস্পর্শ লাভ করেছিল বলে পুতনার সমস্ত পাপ দূরীভূত হল আর সে লাভ করল জননীর গতি, বৈকুণ্ঠগতি।

আর অঘাসুর?

গোপাল-বয়স্যদের সঙ্গে খেলা করছে কৃষ্ণ। যে ভগবান হরি বিজ্ঞজনের পক্ষে স্বপ্রকাশ পরম সুখ, ভক্তজনের পক্ষে নিগূঢ় আত্মপ্রসাদ আর মায়ামূঢ়ের পক্ষে সামান্য নরবালক, সে পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যসঞ্চয়ী গোপবালকদের সঙ্গে বিহার করছে। প্রতিবিম্বকে উপহাস করছে আর আক্রোশ করছে প্রতিধ্বনিকে। কেউ গুঞ্জন করছে ভৃঙ্গের সঙ্গে, কূজন করছে কোকিলের সঙ্গে, কেউ বা উড়ন্ত পাখীর ছায়ার সঙ্গে ছুটছে। কেউ নাচছে ময়ূরের সঙ্গে, কেউ বা গাছে উঠে বানরের সঙ্গে শাখা থেকে শাখান্তরে লাফ দিচ্ছে।

তাদের সুখক্রীড়ায় অসহিষ্ণু হয়ে সেখানে অঘাসুর এসে উপস্থিত হল। পুতনা আর বকের ছোট ভাই এই অঘ, কংস তাকে পাঠিয়েছে কৃষ্ণ নিধনে। দাঁড়াও, এই শিশু আমার ভ্রাতা-ভগ্নীকে বধ করেছে। সন্দেহ কি এ শিশুই তাদের তিলোদক, একে বিনষ্ট করব সদলে। দুর্মতি অঘ অজগর দেহ ধারণ করল, আর গুহার মত মুখব্যাদান করে শুয়ে পড়ল পথের উপর। তার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবী ও উত্তর ওষ্ঠ মেঘ ছুঁয়ে রইল। দুই সৃক্কনী দুই দরীর মত বিস্তীর্ণ, একেকটি দাঁত একেকটি গিরিশৃঙ্গ, মুখবিবর ঘোর অন্ধকার, জিহ্বা যেন অন্তহীন সরণি, নিশ্বাস সাক্ষাৎ ঝঞ্ঝা, চক্ষু দাবাগ্নির মত খরস্পর্শ। হাসতে হাসতে করতালি দিয়ে গোপবালকেরা অঘাসুরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করল। অসুর তক্ষুনি ওদের গলাধঃকরণ করল না, কৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করতে লাগল। নিখিল লোকের অভয়দাতা অশেষদর্শী কৃষ্ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ করল, ঢুকল তার মুখগহ্বরে। মৃত্যুর জঠরাগ্নির মধ্যে বয়স্যদের সে তৃণীভূত হতে দেবে না আর খল অসুরকেও নষ্ট করবে। সর্পের গলদেশে কৃষ্ণ নিজেকে অতিবেগে বর্ধিত বিস্ফারিত করল। অসুরের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হল, ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করে প্রাণ বেরিয়ে গেল মুহূর্তে। বয়স্যেরা ত্রাণ পেয়ে বেরিয়ে এল। মহৎ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হল দশ দিক।

অসাধু ব্যক্তি কিছুতেই ভগবানের সমানরূপতা লাভ করতে পারে না, কিন্তু অঘাসুর শুধু তাঁর অঙ্গস্পর্শহেতু পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সমানরূপতা প্রাপ্ত হল। যার শুধু প্রতিকৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্ত ভাগবতী গতি পায়, সেই ভগবান স্বয়ং যদি অসুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে সে অসুর মুক্ত হবে না কেন?

নিমাই শুধু কৃষ্ণকথাই বলে চলেছে, আর পড়ুয়ারা শুনে চলেছে একমনে।

হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল নিমাইয়ের, লজ্জায় অধোমুখ হয়ে রইল। এ সে কী বলছিল ? তার না পড়ানোর কথা ? এ সে কী পড়াল ?

'এ আমি তোমাদের কাছে কোন্ সূত্র ব্যাখ্যা করলাম ?' নিজেই জিগগেস করল অপ্রস্তুতের মত।

'কিছুই বুঝলাম না।' বললে পড়ুয়ারা। 'শুধু বললেন যা কিছু শব্দ সবই কৃষ্ণনাম।'

'তা হলে এখন পুঁথি বাঁধো। চলো গঙ্গা স্নানে যাই।' নিমাই উঠে পড়ল। 'আজ মঙ্গলাচরণ হল, কাল পাঠারম্ভ হবে।'

বাড়ি ফিরে এলে মা জিগগেস করল, 'আজ টোলে কী পড়ালে ?'

নিমাই বললে, 'শুধু এক কথা। এক বিদ্যা। তার নাম কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণবিদ্যা।'

'মায়ে বোলে, আজি বাপ। কি পুঁথি পড়িলা ?
কাহার সহিত কিবা কন্দল করিলা ?
প্রভু বোলে, আজি পড়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ চরণ-কমল-গুণধাম ॥'

মায়ের সঙ্গেও কৃষ্ণকথা বলতে লাগল নিমাই। কপিল যেমন বলেছিল তার মা দেবহূতিকে।

বিন্দু সরোবরের তীরে দেবহূতি পুত্ররূপে অবতীর্ণ ভগবান কপিলের কাছে গিয়ে বললে,—হে ভূমন, আমি ইন্দ্রিয়াভিলাষে মোহান্ধ। আমার সম্মোহ দূর করে দাও। তুমি অজ্ঞানের চক্ষু, আমাকে পথ দেখাও।

কপিল বললে—হে অপাপে, চিত্তই জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হলে বন্ধের আর পরমাত্মাতে আসক্ত হলে মুক্তির কারণ হয়। মা, যোগীদের ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির একমাত্র পথ ভক্তি। ভক্তি ছাড়া মঙ্গলময় পথ আর দ্বিতীয় নেই। কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে সাধুসঙ্গ একান্ত দরকার। যে আসক্তি আত্মার অক্ষয়পাশস্বরূপ তা সাধু পুরুষে বিহিত হলে নিরাবরণ মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হয়ে যায়।

কিন্তু সাধু কে ? জিগগেস করল দেবহূতি।

যে তিতিক্ষু, দয়ালু, সর্বদেহীর সুহৃদ, শান্ত ও অজাতশত্রু, সেই সাধু। সে সর্বদা সদাচারভূষিত সর্ব-সঙ্গ বিবর্জিত। সে অপ্রগল্ভ হয়ে আমার পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্তন করে। 'দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ।' দেবতারা স্বার্থান্বেষী কিন্তু সাধুর ঈশ্বর ছাড়া অন্বিষ্ট নেই। তাই ভগবৎ কৃপাও 'সাধুবাহনা'—সাধুর কৃপাকে বাহন করেই মানুষের কাছে এসে থাকে। সাধু সমাগমে আবার বীর্যপ্রকাশক হৃৎকর্ণ রসায়ন কথা ওঠে আর সে কথাতেই শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হতে রুচি আসে আর রুচি থেকে ভক্তি। আর ভক্তি জাগলেই ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধে বিরতি ঘটে।

দেবহূতি বললে, আমি অল্পবুদ্ধি নারী, আমাকে সরলভাবে বুঝিয়ে দাও।

মা, ভগবান হরির প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাই অনিমিত্তা ভক্তি আর তা মুক্তির চেয়েও গরীয়সী। যদি ভক্তি জাগে তা হলে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতাও কাম্য নয়। ভক্ত কী করে ? আমার প্রসন্ন বরদরূপ দর্শন করে, আমার সঙ্গে ইচ্ছামত কথা বলে। মা, ভক্তিই জীবের নিঃশ্রেয়সের উপায়। আমার প্রতি ভক্তের মনোগতি সাগরাভিমুখিনী গঙ্গাধারার মত অচ্ছিন্নপ্রবাহা। সে সালোক্য সাযুজ্য সারূপ্য সামীপ্য কিছু চায় না, পেলেও নেয় না কোনোদিন। সে চায় শুধু আমাকে সেবা করতে—অখণ্ড অনন্তকাল ধরে সেবা করতে। যেহেতু আমি সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ, ভক্ত বহু সম্মানসহ সকল প্রাণীকেই প্রণাম করে মনে মনে। 'মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎ বহু মানয়ন্।' সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই অহেতুকী অব্যবহিতা ভক্তির চরম পরিণাম।

জননী দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হল। ভগবানের স্তব করে বললে—তোমার নাম যার জিহ্বাগ্রে থাকে, সে চণ্ডাল হলেও শ্রেষ্ঠ ; যারা তোমার নাম উচ্চারণ করে, তারাই যথার্থ তপস্যা হোম আর তীর্থস্নান করেছে, তারাই যথার্থ সদাচারী ও সার্থক বেদাধ্যায়ী !

পরদিন সকালে আবার টোলে চলল নিমাই। মনে মনে স্থির করল আজ ঠিক-ঠিক পড়াব, মন বিচ্যুত হতে দেব না, বিভ্রান্ত হতে দেব না। পণ্ডিত, থাকব পণ্ডিতের মত।

কিন্তু পড়াতে বসেই আবার লুপ্ত হল বাহ্যজ্ঞান। বৈষ্ণব আবেশে কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলতে লাগল। 'যে প্রভু আছিল ভোলা মহা বিদ্যারসে। এবে কৃষ্ণ বিনু আর কিছু নাহি বাসে।'

'তারপর ?' প্রশ্ন করল পড়ুয়া।

'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। তার পরেও কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।' নিমাইয়ের দুচোখে ধারা নামল। 'পঢ়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায়। কৃষ্ণ বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায় ।'

'বর্ণ সিদ্ধ কোন্ সংজ্ঞায়?' জিগগেস করল আরেক ছাত্র।

'সর্ব বর্ণে একমাত্র নারায়ণই সিদ্ধ।' নিমাই বললে।

'কিন্তু বর্ণ সিদ্ধ হল কী করে?'

'শুধু কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের কৃপায়।'

একজন ছাত্র বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'সমুচিত ব্যাখ্যা করুন।'

'সর্বক্ষণ কৃষ্ণ স্মরণই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

ছাত্র বললে, 'এ সব বায়ু ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়।'

'এ কৃষ্ণ ব্যাধি।' হাসল নিমাই। 'এখন তবে এ পর্যন্ত থাক। বিকেলে আবার একত্র হব। ইতিমধ্যে বিরলে বসে পুঁথি পড়ে তৈরি হই গে।'

ছাত্রের মধ্যে কেউ কেউ গঙ্গাদাসের বাড়ি গেল নালিশ করতে, নিজেদের দুর্দশার কথা বলতে। এখন কী করা যায়! গয়া থেকে এসে অবধি পড়ানোতে অ'র মন নেই অধ্যাপকের, সর্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেন। কৃষ্ণ ছাড়া শব্দও নেই, ব্যাখ্যাও নেই। যা কিছু সূত্র তার সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ। যা কিছু সিদ্ধান্ত তার সূত্র কৃষ্ণ। এরকম ভাবে চললে আমাদের পড়া হবে কী করে! আপনি যদি ওঁকে একটু বলে দেন।

'আমরা বাড়ি ঘর ছেড়ে কত দূর দেশে বিদ্যার্জন করতে এসেছি, কৃষ্ণকথা শুনতে আসিনি।' ছাত্রেরা কেউ কেউ বিদ্রোহী হয়ে উঠল—'আমাদের অধ্যাপকের এ কী হল? একে আপনি সংযত করুন। আদেশ করুন যেন ঠিকমত পড়ায় আমাদের।'

গঙ্গাদাস বিদ্রূপ করে উঠল, 'পণ্ডিত হয়ে শাস্ত্র ছেড়ে কৃষ্ণ ধরেছে? যাও, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। আমি নিমাইকে বলে দেব, ভালো করে পড়ায় যেন ঠিক ঠিক।'

বিকেলে ছাত্ররা এসে খবর দিল, গঙ্গাদাস ডেকেছে পণ্ডিতকে। তখুনি নিমাই ছাত্রদের নিয়ে গুরুগৃহে এসে উপস্থিত হল।

'বিদ্যালাভ হোক।' আশীর্বাদ করল গঙ্গাদাস।

বিনম্র ভঙ্গিতে বসল নিমাই।

গঙ্গাদাস বললে, 'কত বড় ভাগ্য তুমি অধ্যাপক হয়েছ। তুমি জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। তোমার বাপ আর মাতামহ দুইই প্রকাণ্ড পণ্ডিত। তুমি তাদের নাম ডোবাবে? সমস্ত গৌড়ে তোমার যশ পরিব্যাপ্ত, তোমার ব্যাকরণের টিপ্পনীর কত আদর আজ সমাজে, তুমি ডোবাবে তোমার নিজের নাম?'

আমি কী করেছি! শিশুর মত সারল্যে নীরবে তাকিয়ে রইল নিমাই।

'তুমি নাকি হরিভক্ত হয়ে যাচ্ছ? সর্বকথাই নাকি তোমার কৃষ্ণ-উত্তর।' গঙ্গাদাস প্রায় তিরস্কার করে উঠল: 'এ সব পাগলামি ছাড়ো। সমীচীন পাঠ দাও, ব্যতিরিক্ত অর্থ করো কোন সাহসে? তুমি না পণ্ডিত, অতএব তাৎপর্যে তুমি পর্যাপ্ত থাকবে। সীমা লঙ্ঘন করার তোমার অধিকার কোথায়? তোমার ছাত্ররা তোমাকে ছাড়া আর কারুর কাছে পড়বে না, অথচ তুমি রীতিমত পড়াচ্ছ না ওদের। তুমি আমার মাথা খাও, ওদের ক্ষোভ নিরসন করো।'

নিমাই লজ্জিত হয়ে করজোড়ে মার্জনা চাইল। বললে, 'আপনার ভয় নেই, আপনার চরণ প্রসাদে আমি যথার্থ পাঠ দেব। আমার সূত্র-ব্যাখ্যা খণ্ডন করতে পারে এমন কাউকে দেখিনা নবদ্বীপে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার পাঠে বিন্দুমাত্র ভুল হবেনা। কারু সাধ্য নেই দোষ ধরে।'

গঙ্গাদাস খুশি হয়ে আশীর্বাদ করল। গুরুকে প্রণাম করে সশিষ্য নিষ্ক্রান্ত হল নিমাই। এগিয়ে গিয়ে দেখল রত্নগর্ভ আচার্যের দুয়ারে শাস্ত্রালাপের সভা বসেছে। যোগপট্ট ছাঁদে কাপড় বেঁধে একপাশে বসল নিমাই, শিষ্যরাও বসল। চার দণ্ড রাত হয়েছে, তবু বাড়ির কথা কারু মনে এল না।

কৃষ্ণ দর্শনের বর্ণনা করছে আচার্য:

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ
ধাতু প্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধূনানমব্জং
কর্ণোৎপলালকপোলমুখাব্জহাসম॥

তার বর্ণ শ্যাম, পরিধানে পীতবাস, অঙ্গে বনমালা ও ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালে তার বেশ রচিত বলে নটের মত শোভমান। অনুচরের কাঁধে এক হাত রেখে আরেক হাতে একটি লীলাকমল ঘোরাচ্ছে। তার কর্ণযুগলে উৎপল, কপোলযুগলে কুন্তল আর মুখপঙ্কজে সুমধুর হাসি বিলসিত।

কৃষ্ণ-রূপবর্ণনার এই শ্লোক শুনেই নিমাই মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ছাত্রেরা বিস্ময়বিগাঢ় চোখে তাকিয়ে রইল।

এমন ভাব তো কোনোদিন দেখেনি। শুধু কথাই শুনেছে, এ কী তার উচ্চারণ!

ছাত্রেরা নিমাইয়ের সেবা করতে লাগল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়েও নিমাই শান্ত হলনা, কাঁদতে লাগল আকুল হয়ে। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ধুলো কাদা করে ফেলল চোখের জলে।

সভায় যারা ছিল তারা সবাই হতবাক। রাস্তায় চলতি পথিক দাঁড়িয়ে পড়ে, কেউ কেউ বা প্রণাম করে সেই ভাববিগ্রহকে।

'শ্লোক বলো। আবার বলো।' লুটিয়ে লুটিয়ে বলতে লাগল নিমাই।

রত্নগর্ভ আবার সেই শ্লোক পড়ল। 'শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ।' উঠে বসবার চেষ্টা করছিল নিমাই কিন্তু পড়ে গেল মাটিতে।

'শ্লোক বলো।'

এ কী শ্রবণক্ষুধা!

রত্নগর্ভ আবার পড়ল।

'বলো, বলো—' শ্লোক কথাটা আর বলতে পারছেনা, বিহ্বলকণ্ঠে নিমাই শুধু বলো-বলো করতে লাগল।

রত্নগর্ভ তৃতীয়বার পড়ল।

নিমাই টলতে-টলতে উঠে আলিঙ্গন করল রত্নগর্ভকে।

মুহূর্তে এ কী হল রত্নগর্ভের? নিমাইয়ের পা ধরে কাঁদতে লাগল অঝোরে। কাঁদে আর শ্লোক আওড়ায়। আর নিমাই ততই হুঙ্কার ছাড়ে: বোলো, বোলো। আর যত শোনে ততই ধুলোয় লুণ্ঠিত হয়।

যেখানে নিমাই সেখানে গদাধর। গদাধর আর সইতে পারছে না নিমাইয়ের আর্তি, বাণবিদ্ধ বিহঙ্গের কাতরতা। রত্নগর্ভকে বললে,—তুমি থামো। তুমি না থামলে নিমাইকে পারব না সুস্থ করতে।'

রত্নগর্ভ থামল।

'বলো, বলো—' অনুনয় করল নিমাই।

রত্নগর্ভ আর পড়ল না।

আস্তে আস্তে বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেল নিমাই। আস্তে আস্তে উঠে বসল। সোনার অঙ্গ ধূলিধূসর, প্রথম লক্ষ্য করল নিজেকে, তারপর বিস্ময়নিশ্চল জনতাকে। লজ্জিত মুখে বললে, 'এ আমি কী চাঞ্চল্য করলাম!'

'চলো গঙ্গাস্নানে যাই।' গদাধর নিমাইয়ের হাত ধরল।

'চলো।' উঠে পড়ল নিমাই।

পরদিন আবার টোলে এসে বসেছে। ছাত্রদের বলছে, 'একটি গোপন কথা তোমাদের বলি। এ কথা অন্যত্র অকথ্য। তোমরা আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়, তাই এ কথা শোনবার যোগ্য শুধু তোমরাই। শোনো। তোমাদের কী পড়াব, সব সময় দেখি এক কৃষ্ণবর্ণ শিশু আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে। তাকে দেখব, না শুনব, আমি উদভ্রান্ত হয়ে পড়ি। রূপমাধুর্য না বেণুমাধুর্য—আমি কোন্ লীলা-কল্লোল-বারিধিতে স্নান করি বলো।'

'কৃষ্ণবর্ণ শিশু?' সকলে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল উৎসুক হয়ে।

> শ্রাবং শ্রাবং সুনামশ্রুতি-
> সমিত-পরব্রহ্মবংশী-প্রসূতং।
> দর্শং দর্শং ত্রিলোক-বর
> তরুণ কলা-কেলি-লাবণ্য সারম্॥
>
> 'সবে দেখোঁ তাই, সেই বোলোঁ। সর্বথায়।
> কৃষ্ণবর্ণ শিশু এক মুরলী বাজায়॥
> যত শুনি শ্রবণে—সকল কৃষ্ণনাম।
> সকল ভুবন দেখোঁ—গোবিন্দের ধাম॥
> কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
> সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥'

'তাই আমার কাছে তোমাদের পড়া বিড়ম্বনা মাত্র।' বললে নিমাই, 'তোমরা অন্য গুরু দেখ। আমি অনুমতি দিচ্ছি, যার কাছে তোমাদের ইচ্ছে তার কাছে গিয়ে পড়ো, আমাকে নিষ্কৃতি দাও।' অশ্রু-উদ্বেল চোখে নিমাই নিজের পুঁথিতেই ডোর দিল।

'আমরা আর কার কাছে পড়ব? তোমাকে ছেড়ে আর কার কাছে যাব—আমাদের আর কে আছে?' সমস্বরে কাঁদতে লাগল পড়ুয়ারা। 'কী হবে আর আমাদের পড়ে? তোমার কাছে যা পড়লাম যা পেলাম তাই আমাদের বিস্তর।' কান্নার রোল উঠল চারদিকে।

নিমাই প্রত্যেককে ডেকে আলিঙ্গন করতে লাগল। বললে, 'আমি আশীর্বাদ করি, যদি আমি একদিনও কৃষ্ণ ভজন করে থাকি তবে তোমাদের জীবনের

অভিলাষ সিদ্ধ হোক। কৃষ্ণ-কৃপায় বিদ্যার স্ফূর্তি হোক তোমাদের হৃদয়ে। আর বিদ্যা কী? কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-বিলাসই তো বিদ্যা। তোমরা নিরবধি কৃষ্ণ-নাম শোন, তোমাদের বদন কৃষ্ণ নামে মুখর হোক। এস, সবাই মিলে কৃষ্ণ কীর্তন করি।'

শিষ্যরা কাঁদতে লাগল, বললে, 'কৃষ্ণ কীর্তন কেমন আমাদের শিখিয়ে দিন।'

নিমাই হাতে তালি দিয়ে গাইতে লাগল: 'হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ। আরো বলো, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।'

ছাত্ররাও তালি দিতে লাগল, গাইতে লাগল মুক্তকণ্ঠে।

কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ উঠল চারদিকে। কৌতুক দেখতে লোকে ভিড় করে এল কিন্তু সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। কৌতুক কোথায়, এ যে ভক্তি আর ভাবের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। কেউ নাচছে, কেউ ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, নিজ নাম রসে আবিষ্ট হয়ে কীর্তননাথ বারে বারে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

নয়ন সফল করছে সকলে। বলছে, 'জগতে এমন ভক্তি আছে তা কে জানত। হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়, না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা ওবা কিবা নয়।'

এই মহাপ্রভুর প্রকাশের সূচনা। নবদ্বীপে এই প্রথম নামকীর্তনের উদয়।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণচূড়া

শ্রীদিলীপকুমার বসু

বৈশাখের দুপুরে হু-হু করে ছুটে যাওয়া
উত্তপ্ত দুরন্ত বাতাসের ঠোঁঠে,
মনে হয় বুঝি চুম্বনের স্বাদ জেগে আছে।
ঝলসানো রোদের নিষ্ঠুর, নিবিড় আলিঙ্গনে,
প্রেমোন্মত্ত আতুর মনের
কামনার বহ্নিজ্বালা বুঝি তৃপ্তির সকল নিবৃত্তি যাচে।
তাই দেখি, রুক্ষ প্রান্তরের বুকে, মেঠোপথের ধারে,
পার্কে অথবা ময়দানের কোল ঘেঁসে,
পৃথ্বীর লজ্জারুণ আভা জাগে কৃষ্ণচূড়া শাখে।

রাগ-অনুরাগে ভরা ফাগের পরাগ নিয়ে,
নবোঢ়া বধূর মত সে যেন কম্প্র বক্ষে
চম্পকাঙ্গুলি দিয়ে তার সারা অঙ্গে মাখে।
জীর্ণ-শীর্ণ, শোকাচ্ছন্ন করে পরা শবাকীর্ণ প্রকৃতির,
কোকিলের থির-থির মন কাঁপানো সুর,
প্রাণের উচ্ছাস ঢেউ, মনের তটেতে এসে বাজে।

কচি ঘাস, কচি পাতা ফুল আর ফলের সম্ভার,
যৌবনের ইসারা নিয়ে মরা নদী কাঁখে,
পলাশ-কিংশুক আঁখি মেলে, প্রমত্ত বসন্তরাজ সাজে।
পুরনো জঞ্জাল যত কিছু, অতীতেরে সঁপে দিয়ে
হে বৈশাখ নতুনের জয়গানে ভরে তোল,
পূর্ণ কর নীলাকাশ, অকরাণ বাতাস বারবার।

তারই দূত হয়ে সলাজ রক্তিম তুলিকা নিয়ে
নানা বর্ণে, নানা রঙে আকাশকে তুমি রাঙিয়েছ।
ওগো কৃষ্ণচূড়া!—তাই, তোমায় নমস্কার।

সে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

রাতের সিঁড়ি বেয়ে সেই যে চলে গেল
আর সে ফিরল না। তবু সে জ্যোছনার
মদির মোমে গাঁথা অবাক কলকাতা
এখনো মনে পড়ে: ব্যথার বালু ঝড়ে—
সোনালী মুখখানি কাচের জানালায়
অগাধ ফ্রেমে আঁকা।—বাসের বাতিঘর
কখন ডুবে গেল রাতের প্রলয়ের প্রস্তন পারাবারে।
হারিয়ে গেল সব— যখন মুছে গেল হাওয়ার হাহাকারে।

যাত্রীভরা সেই বাসের আলোটিরে
রক্তে মাখা যেন দীর্ণ হৃদয়ের।
এখনো দেখি তারে—এখনো নাড়িচাড়ি
বোবা এ সন্ধ্যার সিন্ধু-তীরে তীরে।

আমার দিন-রাত—মযূর বরসাত—শিউলি-আশ্বিন
আহা কি রিমঝিম—আমার মধুমাস,
দুরূহ মেঘে ঢাকা। অবোধ এ আকাশ
গুমরে মরে আহা! কেবল মাথা কোটে:

স্মৃতির জানালায় তবু সে মুখখানি
সোনালী অবয়ব নিখুঁত হয়ে ওঠে
এখনো কেন জানি নিবিড় হয়ে ফোটে!
"এবার চলি তবে।"—ঠোঁটের পল্লবে
সেই যে গান-গান কথার কবিতাটি আমার মনে পড়ে।
বাঁচার বিবে নীল অতল আলোছায়া মনের সরোবরে
একটি টলোমলো করুণ পদ্মের হাসিটি ফুটে ওঠে।

ধারাবাহিক রচনা

শিশির-সান্নিধ্যে

রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু

বাঙলা দেশে দুজন সত্যিকারের নাট্যকার হতে পারতেন—রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ মিশতে পারলেন না বলে হলেন না, আর শরৎদা হলেন না চেষ্টা করলেন না বলে। ওঁকে কতবার বলেছি—লেখায় ভাষায় অভিনয় করা যায় না বলেই কথা বদলাই, আপনাকে অশ্রদ্ধা করে নয়।

তা কথাটা উনি বুঝলেন না। ওঁর লেখার মধ্যে ঐটাই দোষ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ওঁর লেখায় ছিল রিয়েলিজম্‌। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে কেবলই তত্ত্ব আর উপমা—অবশ্য সাধারণ ভাবে কথাও তিনি অমনি করেই বলতেন।

এই সময় বিনয়দা বললেন—শরৎচন্দ্রের নাটকে নায়ক-নায়িকারা একই ধরণের, তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের বড় অভাব।

বললেন—শরৎদার নাটকের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব আছে, এ কথাটা কিছুটা সত্যি। রবীন্দ্রনাথের নাটকে হাটুরে লোকের কথা, মেয়েরা যাচ্ছে তাদের কথা, এমন কি ভাণ্ডারীর কথা পর্য্যন্ত উনি সুন্দর তুলেছেন; কিন্তু ভদ্রলোকের কথায় এলেই উনি বৈচিত্র্যই সে যদি বল, একটি মাত্র লোকের লেখাতেই বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশবাবুর লেখাতেই নায়িকা বা নায়কের চরিত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এবার চা এল, বই বন্ধ করে চা খেতে খেতে অন্য গল্প জুড়লেন—আমাদের থিয়েটার ঠিক মত বাড়তে পেলো না। প্রথম দিকে নাটক ছিল যাত্রা-ঘেঁষা, অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু হঠাৎই সেটা একেবারে পশ্চিমীদের নকল হয়ে গেল। ওরকম থিয়েটারও ত আমাদের প্রাচীনকালে ছিল, থিয়েটারের উন্নতি করতে হলে যাত্রার সঙ্গে মিল ঘটিয়ে অভিনয় করানো দরকার; তবে তার জন্যেই ত পরীক্ষা করা চাই। যাত্রার লোকা বেরোনোটা আমার ঠিক ভাল লাগে না—হয় দূর থেকে ঢুকে আসা, নয়ত আসরের এক পাশে বসে থেকে টুপ করে উঠে পড়া। জাপানে এর জন্যে টানেলের ভেতর দিয়ে আসার ব্যবস্থা আছে। জাপানে অবশ্য হয় খুব বড় এরিয়া নিয়ে; চীনের কিন্তু আমাদের মত ছোট।

পুরোনো ড্যালহাউসি ইনষ্টিটিউট যেটা এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে—এতে বেশ সুন্দর একটা এপ্রণ ষ্টেজ ছিল। ওখানে আমি প্রথম অভিনয় করি ১৯১৩ সালের শেষ দিকে। একটা বই ঠিক করে অভিনয় করার ব্যবস্থা হ'ল। ও হলের ভাড়া ছিল ১০৲ টাকা প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব ঐ টাকাটা দিয়েছিল। প্রফুল্লর অভিনয়ের দিকে একটু ঝোঁক ছিল। ওয়ার ফণ্ড না কি ফণ্ডের জন্যে চ্যারিটি হিসেবে অভিনয় করা হ'ল—১৭০০৲ উঠেছিল। প্রফুল্ল বললে ১৭০০৲ দেওয়া যায় না; সে আরো ৮০০৲ দিয়ে ২৫০০৲ করে ফণ্ডে জমা দিলে।

সেই আমার বাইরের লোকের সামনে প্রথম অভিনয়। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল winter visitor, তারা আমার অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল; কিন্তু ও প্রশংসার খুব বেশী মূল্য দেওয়া যায় না।

থিয়েটার আর্টস কাগজটা আমাকে পাঠায়। ওদের কাগজের চব্বিশ বছর ধরে এডিটার ছিলেন—কি যেন নাম ভদ্র মহিলার—এখানে আসেন। আমি তখন তারাকুমারের বইটা (জীবন রঙ্গ) করছি। অভিনয় দেখে এসে আমায় গ্রীণ রুমে বললেন—Mr. Bhaduri, you are one of the greatest actors of the world. আমার চৌষট্টি বছর বয়েস, এর মধ্যে এমন অভিনয় খুব কমই দেখেছি। আমায় এখন হংকং, চীন যেতে হবে; ফিরে এসে তোমার সব নাটকের অভিনয় দেখব।" তিনিই পাঠান।

কে একজন বললে—ডেম সিবিল থর্ণডাইক বোধ হয়।

বললেন—না, ডেম সিবিল থর্ণডাইক নয়। সিবিল থর্ণডাইক ত বৃটিশ। উনি আমাকে সামনা সামনি খুব প্রশংসা করলেন। নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন; কিন্তু দেশে গিয়ে লিখলেন "Calcutta is a place where the most modern theatre flourishes side by side with the mediaeval type."

ওরা আমাদের প্রশংসা কোনদিনই করতে পারেনি; আজকাল ত আরো পারবে না, কেন না এখন ওদের থিয়েটার খুব নীচু স্তরের।

একজন প্রশ্ন করলেন—কন্টিনেন্টাল থিয়েটার দেখেছেন কিছু?

বললেন—না, কন্টিনেন্টাল থিয়েটার দেখিনি। তাছাড়া ফরাসী ভাষাও ত জানিনা, তবে শুনেছি ওদের নাটক খুব ভাল জাতের হয়। ভাষা না জানলে রস গ্রহণে অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু এমনও কেউ কেউ থাকেন, যিনি ভাষা না জানলেও রস ঠিক ঠিক ধরতে পারেন। আমেরিকার এক বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক আমাদের অভিনয় দেখে নিউইয়র্ক টাইমসে লিখলেন—The love of Rama and Sita will continue for ever and ever অর্থাৎ বিরহ যাদের প্রেমকে ম্লান করতে পারবেনা।

হুবহু বই-এতে যে কথাগুলি আছে তারই অনুবাদ।

আমেরিকানরা থিয়েটার বিশেষ বোঝে না। দেখনা, ওরা একটাও ভাল নাটক লিখতে পারলে না। কিন্তু ওদের চেষ্টা আছে খুব, একটা চরিত্র তিনজন অভিনয় করলে তিন রকম interpretation দেবে, মানে তার যেরকম মনে হয়েছে। কতটা ভাবে বুঝে দেখ।

তাছাড়া, তারা অভিনয়ের ইতিহাস খুব যত্ন করে লিখে রাখতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশে ইতিহাসই নেই। গিরিশবাবুদের নাম হারিয়ে রইল খালি রবিবাবুর নাম। কাগজে সত্যিকারের সমালোচনা ত আর বেরোয় না! সমালোচকরা অন্য দেশে দর্শক তৈরী করে, নাটকের উন্নতির পথ দেখায়। আমাদের দেশে সে সব কোথায়?

আমরাও পাব্লিসিটি বুঝতুম না, আজকালকার ছেলেরা ওসব খুব বোঝে। আমি প্রথমে ওকথা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু এখন দেখছি পাব্লিসিটিরও দরকার আছে।

চাএর পালা শেষ হয়ে গেল। আবার 'ষোড়শী' পড়তে শুরু করলেন, বললেন—শিরোমণি বা জনার্দ্দন কমিক রিলিফ দেবার

জন্যে সৃষ্টি হয়নি। ওগুলো সত্যি চরিত্র—ওরকম অনেক দেখা যায়। তাছাড়া ভিলেন হলেই যে হাসাবে না এমন কোন কথা নেই। তবে ওরা কোন সময়েই দর্শকদের সিমপ্যাথি পায়না, বরং শেষ দৃশ্যে শিরোমণি যখন বলে—সর্বনাশ, ও আমাদের সর্বনাশ করবে। দর্শকরা তখন হাসে, বলতে চায়—কেমন মজাটা টের পাও!

শিরোমণি যোগেশদা খুবই ভাল করেছিলেন, কতকগুলো চরিত্র ত ওঁর মত আর কেউই করতে পারে না।

ষোড়শীতে শেষ পর্যন্ত বলা হচ্ছে—জমিদার থাকবেনা, শোষক থাকবেনা, থাকবে শুধু ঐ চাষীর দল।

হঠাৎ পড়া থামিয়ে বললেন—আজ এই পর্যন্ত থাক। এবার গল্প করা যাক।

রাজনীতিকদের সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলেন—রাজনীতিকদের মধ্যে বিপিন পালের মত অমন বাগ্মী দেখিনি। আজও যেন শুনতে পাচ্ছি—'রক্তাক্ত রণক্ষেত্রের মধ্য দিয়া স্বরাজের রথ ঘর ঘর শব্দে চলিয়া যাইবে।'

বিপিন বাবু মোটেই সাহসী লোক ছিলেন না, আর সে কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। ফেডারেশন হলের মাঠে মিটিংএ ওঁকে যখন টাকার তোড়া দেওয়া হয়, উনি তখন নিজেই বলেছিলেন, ঘরের ভেতর থেকে যখন দেখেছি বাইরে ব্রীজের ওপর দিয়ে চলেছে ট্রামগাড়ী আর তার মধ্যে বসে আমারই দেশের ভাইবোন—তাদের রয়েছে খোলা আকাশ আর প্রচুর আলো হাওয়া; আর আমার ছোট্ট ঘর, আকাশ পর্যন্ত ছোট হয়ে গেছে, তখন ভেবেছি, দিই লিখে, যা ওরা চায় লিখে দিই।

রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী Consistent ছিলেন উনি। আর কি ওঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা। আমি পান্তীর মাঠ, ফেডারেশন হলের মাঠ ইত্যাদি জায়গায় ওঁর বক্তৃতা শুনেছি।

রবীন্দ্রনাথ করতে পারতেন অনেক কিছু, কিন্তু করলেন কই? কবিতায়, গানে, গল্পে উনি অনেক কিছু দিয়েছেন মানি, কিন্তু নাটক বা উপন্যাসে কি দিলেন? নাটকও লিখেছেন মোটে দুটি।

একজন বললেন—উপন্যাসের ধারাকে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বললেন—উপন্যাসের ধারা বঙ্কিমচন্দ্র নতুন পথে নিয়ে গেলেন বলছ, কিন্তু তার আগে কি উপন্যাস ছিল? ছিল ত গল্প। নভেল বলতে যা বোঝায় তা কোথায় ছিল? অবশ্য দশকুমার চরিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। একজনকে ত বলেছিলুম যে, সিনেমা করতে চাও ত দশকুমার চরিত কর।

রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের প্রতিভার সমাদর করেননি। উনি আর জ্যোতিবাবু দুই ভাই মিলে খুঁত ধরতে বসলেন। প্রথম দিকের লেখায় ত যথেচ্ছা নিন্দে আছেই। সেগুলো নষ্ট করা উচিত বললেও পরে আবার ওঁর কবিতায় ছন্দের কি দোষ, তাকে কি ভাবে লেখা চলত তাও লিখেছেন।

একমাত্র কিছুটা সমালোচনা লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের, তাও যেভাবে লেখা উচিত ছিল, সেভাবে মোটেই লেখেননি। অথচ লিখতে উনি পারতেন।

একজন বললেন—বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে ভাল লিখেছেন উনি।

বললেন—বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কি লিখেছেন জানি না, তবে হ্যাঁ, ঐ একটা চরিত্র, ওঁকে নিয়ে বিরাট একটা নাটক লেখা যায়। বারটি বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য—ওঁর সার্টিফিকেটে বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে রসময় লাহার সই আছে ওতেই সব কিছুর বিশদ বর্ণনা আছে। উনি বেদান্ত, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন, ন্যায়, সব কিছু জানতেন। অথচ দেখ ঐ রকম পণ্ডিতকে গর্ডন ইয়ংএর মত বাচ্ছা সিভিলিয়ান অপমান করতে পারে। উনি যখন চাকরী ছাড়লেন, তখন ওঁকে রাখার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু উনি থাকলেন না। তবে তিন মাস সময় চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—অনেকগুলো স্কুল খুলেছি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে, তার সমস্ত দায়ভার আমার ঘাড়েই পড়ে যাবে।

তার পরের দিন ফ্রেডারিক হ্যালিডে সাহেব formal জবাব পাঠালেন—When you have resigned, it is no longer necessary for you to continue.

মানুষটার কেমন সাহস ছিল দেখ। যাঁর বাপ আট টাকা ষোলো টাকা, বা চব্বিশ টাকার বেশী কখনো মাইনে পাননি, তাঁরই ছেলে অকুতোভয়ে ঋণ করে চলেছেন। বিশ্বাস আছে, বই লিখে সব টাকা শোধ করে দেবেন। আর দিয়েও ত ছিলেন। বই যা লিখলেন তাও সব বিদ্যালয়-পাঠ্য অর্থাৎ যাতে শিক্ষা বিস্তার হয় তার জন্যে। উনি যা উপক্রমণিকা লিখেছিলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখার তার চেয়ে ভাল বই আর হয় না। অথচ আজ সেকেণ্ডারি বোর্ড সে বই পছন্দ করেন না, ভাল নয় বলে। বিধবা বিবাহ দেবার আন্দোলন চালালেন একলা, তাও ইমোসানের ওপর নয়, স্মৃতির সাহায্যে।

বাড়িতে যে কেন ওঁর সঙ্গে গোলযোগ হ'ল তা কিন্তু জানা যায় না। বাপ মা ছাড়া ভায়েদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, কিন্তু কেন? নারান বিদ্যারত্ন বলছেন—কলহ হইল। কিন্তু কেন?

একজন সুপরিচিত থিয়েটার-মালিকের নাম করে বললেন—সে আজ এসেছিল। বলছিল অন্য দুটো হলের তুলনায় বিক্রী কম হচ্ছে, তবে লোকসান হবে না। কোন রকমে খরচ চলেও কিছু লাভ থাকবে। একশ রাত পার হলে আবার একটা ধাক্কা খেয়ে ভাল করে চলতে পারে।

তাকে আমি বললুম—বাবা, পয়সার ত তোমার অভাব নেই, আর পয়সাও তোমাদের থিয়েটারের দৌলতে। তা থিয়েটারের যাতে উন্নতি হয় সে কাজ ত তোমার করা উচিত।

তাতে বললে—বলুন, কি করতে হবে?

বললুম—কিছু লেখা-পড়া জানা লোক নাওনা কেন? মাইনে ত খুব খারাপ দাওনা, ষাট টাকায় ত আজকাল বি-এ পাশ পাওয়া যায়।

তাতে বললে—সে হবে না।

রবীন্দ্রনাথ নাকি শারদোৎসব আর কি একটা বই করেছিলেন শান্তিনিকেতনে—রথী বাবু লিখেছেন, যা নাকি খুব ভাল হয়েছিল। রবিবাবুর প্রোডাকসনের মধ্যেও ভাল হয়েছিল ডাকঘর সিম্বলিক সেটিংএর জন্যে, আর তাসের দেশ—অপেরা। এমনি নাটকে উনি স্বীকার করেছেন আমাদের প্রোডাকসনই ভাল হয়েছে। উনি আমার ওপরেই ভার দিয়েছিলেন, অথচ ওঁর অফিসিয়াল বায়োগ্রাফিতে লেখা হচ্ছে, উনি নাকি অহীন্দ্রর জন্যে বই

লিখেছিলেন। কোন্ বইটা লিখেছিলেন? উনি মণিলালকে চিঠি লিখেছেন—আমি বাইরে যাচ্ছি, যাতে গোলমাল না হয় তাই শিশিরের ওপর প্রয়োগের ভার দিয়ে যাচ্ছি।

সে চিঠি নাচঘরে ছাপা হয়েছিল। অথচ বলছে অহীন্দ্রের জন্মে লেখা হয়েছে। ও ত এক চিরকুমার-সভাতেই নেমেছিল। ঐ বইটাও কিন্তু উনি আমাকেই লিখে দিয়েছিলেন। তার প্রথম এডিশনের কাটা বইএ কাগজ মেরে রবিবাবুর হাতে লেখা কারেকশন, এতকাল আমার কাছেই ছিল, এখন এই নতুন বাড়ি বদলাতে গিয়ে হারিয়ে গেল। তপতীর কাটা কাগজ মেরে কারেকশন করা বইটা এখনও আছে।

একজন বললেন—এসব কথার উত্তর দেন না কেন?

ম্লান হাসলেন—উত্তর দিতে হবে বলে ত কোন দিন ভাবিনি!

চিরকুমার সভা ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হবারও একটা কাহিনী আছে। বইটা পাবার পর আমি অন্য বই অভিনয় করছি, সেই সময় প্রবোধচন্দ্র গিয়ে ওঁকে বললে—এই ত শিশিরবাবু এতদিন রেখে দিয়েছেন, এখন আবার অন্য বই করছেন। উনি করবেন না। কান পাতলা লোক ছিলেন ত, তখনি ওকে দিয়ে দিলেন।

সাজাহান নাটকের কথা উঠল, বললেন—সাজাহানে ঐ যে দৃশ্যে পাগল হয়ে বলছে, তুমি ঝঞ্জা, আমি তড়িৎশিখা, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিই। তারপরেই আছে—দিই লাফ, দেব লাফ। আগের দৃশ্যটা কেউ করে না, অথচ ঐ দৃশ্যটা না করলে সাজাহানের পাগল হওয়ার কারণটা বোঝা যায় না।

বিনয়দা বললেন—আপনার মত সবাই ত বুঝে অভিনয় করেন না, আর করতেনও না।

মাথা নাড়লেন—না না, ওকি বলছ। আমার আগে কেউ বুঝে অভিনয় করবে না কেন! ও কথাটা ত ঠিক নয়। তোমরা ত আর কেউ গিরিশবাবুর অভিনয় দেখনি। ওঁরা ত চরিত্র বুঝেই অভিনয় করতেন।

গাড়ীতে যেতে যেতে বললেন—টি· বির ফল ত চোখের সামনেই দেখলুম, যাদের টাকা পয়সা আছে, তারা যে কেন চিকিৎসা করে না, চাপা দিতে চায়, বুঝি না। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক কোটিপতি। ছেলের অসুখের কথা চেপে রাখলেন, তারপর শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে গিয়ে চিকিৎসা করে সারল। হয়ত আগে গেলে বেশী ভাল হ'ত।

১৩ই নভেম্বর এলেন, সেদিনকার প্রথম কথা হ'ল—আজকাল ভিক্টোরিয়া ষ্টাইল কেউ পড়ে। কত তাড়াতাড়ি ডেটেড হয়ে গেল দেখ। অথচ আমাদের সময় খুব পড়ত।

নানা জনের মদ খাওয়ার কথা হলে বললেন—মদ অন্যদেশের লোকেরাও খায় কিন্তু এতটা মাতাল হয়না। আর মদে জ্ঞানলোপ হতে গেলে অন্ততঃ বছর দশেক খেতে হয়।

এবার নিউইয়র্কের একটু স্মৃতি বললেন—নিউইয়র্কে দেখেছি একটু চেনা হলেই ফ্লার্ট করে।

ডিসেম্বরে নাট্যোৎসবের কথা পাকা করতে বিনয়দা' আগের দিন ওঁর বাসায় গিয়েছিলেন, সেই কথাই বললেন—বিনয় কাল আমার ওখানে গিয়েছিল।

বলা হ'ল—আমরা জানি, যাবার আগে আমাদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছিল।

আমাদের একজনকে বললেন—বিকেল পাঁচটার সময় তুমি এখানে ছিলে? ডাক্তার মানুষ বিকেল পাঁচটার সময় এখানে বসে কি করছিলে? রুগী বুঝি ডাকেনা এখনো?

বলা হ'ল—না, তবে আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে ডাকবে নিশ্চয়। তাছাড়া হাসপাতালে কাজ করি, প্রাইভেট প্রাক্‌টিশ করা চলেনা।

হাসলেন—ঘন ঘন ডাকে এইত আশা করি। হাসপাতালে কাজ করা অবশ্য ভাল, কোন্ হাসপাতালে কাজ কর?

হাসপাতালের নাম শুনে বললেন—বাঃ, বেশ ভাল জায়গা ত!

জানানো হ'ল—কিন্তু ভি-আই-পিদের বড় উৎপাত, বড্ড জ্বালাতন করে।

হাসলেন—ও উৎপাত এখন সর্বত্র। আগে এটা ছিল না। যখন থেকে রাশ আলগা হতে আরম্ভ করেছে, তখন থেকেই এরকম চলেছে। আমি যখন হাসপাতালে—in the thirties তখনই দেখেছি—আমার কাছে অনেকে আসত, খাবার ফলটল দিয়ে যেত, তাতেই curious হয়ে সিষ্টার আমাকে জিগ্যেস করেছিল—তুমি কে? কি কাজ কর?

বললুম—তুমি যা ভাবছ তা নয়। I am an actor by profession, তাই অত লোক আসে।

—ভি· আই· পি কথাটার পুরো হ'ল Very Important Person.

একজন বললে—কথাটা আমেরিকানরা চালু করেছে।

বললেন—আমেরিকানরা চালু করবে কেন? তবে ওদের কথার প্রথম অক্ষর নিয়ে abbreviation করার ওপর একটা ঝোঁক আছে। ওদের সোলজারকে বলে G. I., G. I. মানে General Issue। আর্মিতে সব কিছুই জেনারেল ইস্যু, তাই সোলজারও জেনারেল ইস্যু! বৃটিশ আর্মিতেও সোলজারকে বলা হয় টমি অ্যাটকিনস! ওদের রেডকোটও বলা হয়। জি·আই বলার আগে আমেরিকানদেরও কি একটা বলা হ'ত মনে পড়ছে না।

এবার পড়ব, কিন্তু বিনয় কি রাম এখনো আসেনি ত। মাতব্বর গোছের কেউ না থাকলে কার কাছে পড়ব?

বলতে বলতেই বিনয়দা ঢুকলেন, তখন আবার বললেন—রাম এখনো এলোনা, আবার এসেই এক গাদা বাজে বকতে সুরু করবে।

বই পড়তে সুরু করবার ঠিক আগেই বললেন—আগের দিন আমরা ৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য সুরু করেছিলুম, কিন্তু শেষ করিনি; কাজেই প্রথম থেকেই আরম্ভ করা যাক।

পড়তে সুরু করলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে জীবানন্দের সঙ্গে পথিকের কথা বলার অংশটা পড়ে বললেন—এই যে পথিকের সঙ্গে কথা বলতেই সে 'বাবু' বললে জীবানন্দ ভাবছে, বললে জমিদার বাবু! 'কাল আসব' বলার মানে কিছু টাকা দেব।

যখন তাকে বললে—চল, ওদিকে গিয়ে একটু নামগান শুনিগে। তখন সে তার গায়ের ছেঁড়া চাদর টানতে যায়, এদিক

দিয়ে ছেঁড়া, ওদিক দিয়ে ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ে! জীবানন্দ তখন নিজের গায়ের শাল খুলে তাকে পরিয়ে দেয়!

যে লোকটা দামী চাদরে হাত মোছে, শাল পেতে শোয়, তার কাছে একাজ করা মোটেই আশ্চর্য কথা নয়।

পথিক শেতল খুব ভাল করেছিল, গানটাও ওরই জোগাড় করা।

এক জায়গায় নির্দেশ আছে 'সভয়ে', সেখানটা পড়ে বললেন—এই দেখেছ, এখানটা সভয়ে নয়, ঠাট্টা করছে। এটা শরৎদার দোষ নয়, এরকম লিখে রাখা মানে অ্যামেচার পার্টির সর্বনাশ করা। তারাত 'বদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' করবে!

—মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে জীবানন্দ, অন্তরা সে কথা এখনও জানেনা। এবার জীবানন্দের সংলাপ পড়ে বললেন,—বাস হেরে গেল ষোড়শী, একেবারে complete defeat!

—জীবানন্দ সারারাত না ঘুমিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। সকালবেলা পেট চেপে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আগের দিন রাতে বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যায়, ওকে কোনরকমে ধরে এনে, শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এইসব গোলমালে ঘুম হয়নি।

পড়া শেষ করে বললেন—বইটা আরো ভাল করে করা যেত কিন্তু মায়ের তৃতীয় পক্ষের জন্যে আর হ'লনা। শেষের দিকটা অনেক বদলেছেন। মানে যেখানে যেখানে আমার সাজেশান মত লিখেছিলেন, সেখানে সেখানে নির্মমভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছেন। এ একধরণের ছেলেমানুষী। অথচ উনি লিখলে লিখতে পারতেন, কিন্তু ঐ যে লোকেরা বোঝাল, তুমি এমন লিখিয়ে আর কে এক ভেড়ের ভেড়ে শিশির ভাদুড়ির কথায় লিখবে। তা সে কথাত শুধু শরৎদাকেই বলেনি, ক্ষীরোদদাকেও ঐ একই কথা বলেছে।

ষোড়শী আমি পছন্দ করে নিয়েছিলুম। উনি আমায় দিয়েছিলেন 'পল্লীসমাজ'। ওটা আগে ষ্টার থিয়েটারকে দিয়েছিলেন। তা প্রথম দিনেই (বই) মার খেল, দু'তিন দিন পরে গোলমাল হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তখন একহাতে খাতা আর একহাতে ছাতা নিয়ে এসে হাজির হলেন। (কথাটা আমার নয় সুধার)। এসে বললেন—শিশির, এটা তুমি নাও। আমি টাকা পয়সা চাইনা, কেটেকুটে যা খুসী কর, শুধু দেখিয়ে দাও বইটা জমে।

সুধা বলেছিল—বনমালী পাড়ুই বলে যে স্কুল মাষ্টারের চরিত্রটি আছে, ওকে হোরেশিয়ো করে দিন। Ramesh is an inexplicable character! ওকে বোঝাবার জন্যে বনমালী পাড়ুইকে ব্যবহার করুন। আপনার ভাষার গুণ খুব বেশী আর শিশির বলতেও পারে ভাল, বেশ চলে যাবে।

তাইতেই ত চটে গিয়েছিলেন।

শেতল পাল যখন যে চরিত্রই করেছে, তাই ভাল করেছে। ওর ভেতর একটা কিছু ছিল যে! যোগেশদাও ত খুব ভাল অভিনয় করেছেন। উনি ছিলেন সত্যিকারের character Actor—a character of unusual brilliance.

বিজয়া খুব সুইট বই, চার্লস গার্ভিশের লেখা বইএর মত—বিশেষ কিছু পদার্থ নেই, তবে হিউম্যান এলিমেন্ট আছে, আর হিউম্যান এলিমেন্ট থাকলেই জমে যাবে।

প্রভা বিজয়া বড় ভাল করেছিল। অবশ্য কোন্ বইটাতেই বা ও ভাল পার্ট করেনি? সিরিয়াস পার্টই হোক আর হাসির পার্টই হোক, বড় পার্টই হোক আর খুব ছোট পার্টই হোক, সবতাতেই সে ভাল অভিনয় করেছে। তার সব চেয়ে বড় অপরাধ সে বাঙলা দেশে জন্মেছিল।

বাঙলা নাটকের আর মঞ্চের একটা সত্যিকারের ইতিহাস লেখা হ'ল না। সবাই জানল নাটক যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। গিরিশ বাবুরা'ত বাদ গেলেনই, রবীন্দ্রনাথের তপতীও নাটক নয়, নাটক হয়েছিল পোষ্ট অফিস (ডাক ঘর)। আমার নিজের জন্যে কিছু মনে হয় না, দুঃখ হয় গিরিশবাবুদের জন্যে।

বাঙলা নাটক সম্বন্ধে আগের কথাটা লিখেছে মুলুক রাজ আনন্দ। মুলুক রাজ একখানাও বাঙলা নাটক কখনো দেখেনি, অথচ কেমন মতামত লিখে বসল। আর আশ্চর্যের কথা, তার একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত কেউ করলে না।

একজন প্রশ্ন করলে, আপনি যে এতগুলো নাটক করেছেন, তার মধ্যে কোনটি আপনার পছন্দ বেশী?

বললেন—সব কটাই পছন্দ, নয় ত করব কেন? কোন বিশেষ চরিত্র সব চেয়ে ভাল লাগে বলতে পারব না, যখন যেটা করি তখন সেটাকেই সব চেয়ে ভাল লাগে।

রবীন্দ্রনাথ বড় স্পর্শ-কাতর ছিলেন। টমসনের ব্যাপারটা নিয়ে কি কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটালেন। নিজেই উত্তর লিখলেন।

বিনয়দা' বললেন,—না, ওটা নীহার রায়ের লেখা।

বললেন,—নীহার রায় লিখেছিল? কি জানি! আমি কিন্তু লেখার সময়েও দেখেছিলুম, যখন পড়েন তখনও শুনি। আমায় জিগ্যেস করতে গেলেন, আমি পালিয়ে বেড়াতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত ধরে নিয়ে গেল। আমি শুনে বললুম—ওটা আমার মতে না ছাপালেই ভাল।

ওঁর ভাল লাগল না, আমার ওপর রাগ হয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে, এবার উঠলেন। গাড়ীতে যেতে যেতে বললেন—আচ্ছা, আজকাল আর জগদ্ধাত্রী পুজো হয় না? ওপুজো করাতো শক্ত, গৃহস্থের পক্ষেও, পুরোহিতদের পক্ষে ত বটেই। সব কিছু দুর্গাপুজোর মত অথচ করতে হবে একদিনে। আজকাল সংস্কৃত মন্ত্রকে বাঙলা করা দরকার, আর কিছু হোক আর নাই হোক, তাতে লোকে অন্ততঃ বুঝতে পারবে।

১০

ইতিমধ্যে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, ডিসেম্বর মাসের ১১ই থেকে ১৪ই পর্যন্ত ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে নাট্যোৎসব হবে। এও ঠিক হয়েছে নব্য বাঙলা নাট্য পরিষদের নিজস্ব প্রচেষ্টা হিসেবে পরে 'মালিনী' মঞ্চস্থ করা হবে আর সেই জন্যে আপাততঃ সোমবার সোমবার তার মহলা চলবে। পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন এবার থেকে হবে শুক্রবার; আর সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে দরকারমত নাট্যোৎসবের নাটকগুলোর মহলা চলবে।

১৪ই নভেম্বর এ নিয়ে আলোচনা করতে এলেন। প্রথমেই বললেন—আলমগীর ত করা দরকার। আলমগীর প্রথম করি

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর। তারপর ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৫তম বার্ষিকী পর্যন্ত করি আমার বাড়িতে। ১৯৫৬ সালেও কেমন একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল যাতে ১০ না ১১ তারিখে করেছিলুম। খালি বাদ যায় ১৯৫৭ সালে। সেবারও হয়েছিল ২৩শে ডিসেম্বর—সেটা অনেক পরে। ১০।১১ তারিখ হলেই সবচেয়ে ভাল হয়। প্রথম দিন দুচার কথা বলব আর কি!

আলমগীরের পোষাক-টোষাক সব সময়েই ভাল ছিল। রাখালদাকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলুম—সে অবশ্য ১৯২৪ সালে। কিন্তু মদন কোম্পানীর সময়েও বেশ ভাল ছিল পোষাক। রাজেন সেন সেই সময় কতকগুলো ছবি তুলেছিল।

একজন বললে—বিশ্বরূপায় ত ছবি আছে আপনার!

বললেন—সেটা হাফবাষ্ট ত! ওটা ত কাগজ থেকে তৈরী করা। মণিলালের নাচঘরে ছাপানো হয়েছিল; সেখান থেকেই নেওয়া হয়েছে। ছবিটা অ্যালফ্রেড থিয়েটারের পেছনে বসিয়ে তোলা।

রাজেন বাবুর কাছেই ছবির কাচটাচগুলো ছিল। উনি ১৯৪২ সাল নাগাদ আমায় দিতে চেয়েছিলেন। তাতে আমি বলি—কোথায় রাখব ওসব।

তিনি ত মারা গেছেন, সে সব কাচটাচ আছে কিনা কে জানে?

আলমগীর করতে কি আমায় কম কষ্ট পেতে হয়েছে? যে যা আবদার করেছে সব শুনতে হয়েছে। ঐ ঘোষ বলে একজন তয়বর খাঁ করেছিল, সে বললে—ঘর ফাটিয়ে ডাকলাম। ইত্যাদি কথা না থাকলে পার্টই করব না।

কুসুমকে নিয়েও কি কম হাঙ্গামা? সে আমায় এসে বললে—ম্যানেজার বাবু (তখন সবাই আমায় ম্যানেজার বাবু বলত), দেখুন, আমি দুপুর বেলায় আসব।

আমি বললুম—সে কি, কেন?

বললে—না, মানে, ছোট ছোট মেয়েরা দেখবে আপনি আমায় শেখাচ্ছেন, সে আমার লজ্জা করবে। অবশ্য শেখা আমার দরকার, কেননা এরকম ত আমরা শিখিনি। তাই বলছিলুম কি, দুপুরে যখন কেউ থাকবেনা, তখন এসে শিখে নেব।

আমি বললুম—তা না হয় নেবে, কিন্তু কথাটা কি চাপা থাকবে?

তাতে বললে—আপনি রাজী থাকলেই হ'ল, বাকীটা আমি ব্যবস্থা করে নেব।

কি আর করি, তাতেই রাজী হতে হ'ল।

ডাঃ অধিকারী বললেন—কুসুমের শেষ দিকের অভিনয় আমার ভাল লাগেনি।

বললেন—কুসুমের শেষদিকের অভিনয় তোমার ভাল লাগেনি বলছ, কিন্তু ও ত চিরকাল একই রকম অভিনয় করেছে। তবে তখন সকলেই ওই রকম অভিনয় করত তাই বোঝা যায়নি। ওর চেয়ে তারাসুন্দরীর ব্যক্তিত্ব ছিল বেশী আর অভিনয় বুঝতও বেশী। কুসুম কিন্তু নাচত খুব ভাল। শেষের দিকে দেখেছি ঐ অতবড় শরীরটা নাড়ছে কিন্তু পা'ফেলায় আওয়াজ হচ্ছে না মোটে। চারুকে বললুম—দেখ, তোমরা দেখে শেখো।

তা সে বললে—কুসুমদি' আমাদের চেয়ে ভাল নাচে।

আমি বললুম—নাচো তোমরাও ভাল কিন্তু কুসুমের ক্ষমতা আছে, ওই অতবড় শরীরটা ফেলছে অথচ পায়ের কোন আওয়াজ নেই।

আলমগীর করার সময় প্রথম দিকে একদিন খুব গোলমাল হয়েছিল। এদিকে ত খুব বিক্রী হচ্ছে, তার ওপর লেডিজ সিটের কোন নম্বর নেই, যত পেরেছে বিক্রী করেছে। বসবার যা জায়গা ছিল সব ভর্তি হয়ে গিয়ে, বক্স পর্যন্ত ভর্তি করে বসে আছে তারা। কালীবাবু, জ্যোতিষবাবু খুব ছুটোছুটি করছে, এদিকে বক্স কিনেছে যে সব বড়লোকেরা তারাও এসে হাজির—মহাবিপদ! মেয়েদের বলতে যেতেই তারা ধমকে উঠল। একজন বলল—জায়গা যখন নেই টিকিট বেচেছ কেন? যেখানে জায়গা পেয়েছি সেখানেই বসেছি। ওঠাবে কেমন করে দেখি? বেশী কথা বললে এক চড় মারব।

বীরাঙ্গনা তখনও ছিল এদেশে! সেদিন থিয়েটার আরম্ভ করতে এক ঘণ্টা দেরী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কি করে মিটমাট হয়েছিল জানি না।

রাজসিংহ করতেন ললিতবাবু। প্রথমে অবশ্য করেছিলেন প্রবোধ ঘোষ। পার্ট খুব মন্দ করেননি, তবে সুরটা ত ছিলই।

একটি বিশেষ চরিত্রের নাম করে বললেম—এটা করত 'অমুক'। চেহারাটা খুবই সুন্দর ছিল আর পার্টও ভাল করেছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু নেশাখোর হয়ে গেল। অবশ্য দোষ খুব নেই। নজরধরা চেহারা দেখে একটি মেয়ের ভাল লাগল। ও তার খপ্পরে পড়ে গেল। বাপ-মাকে ছেড়ে তার কাছেই এসে রইল। তারপর তাকে ছেড়ে একজন, তারপর আর একজন, এমনি করে সব মেয়ের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত মরফিয়া ধরল।

আমি একবার ওর নেশার ফল দেখেছিলুম। তখন আমরা লক্ষ্ণৌ গেছি! অভিনয়ের আগে দেখি একেবারে ছটফট করছে, চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলা-ঘোলা; ঘাড় লটকে পড়েছে! ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হ'ল। এদিকেও খবর দেওয়া হ'ল একজন অভিনেতা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; উনি একটু সুস্থ হলে, না হয় বদলী একজনকে তৈরী করেই নাটক আরম্ভ করা হবে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার এসে গেছে, ওকে দেখে-টেখে বললে—কোন ভয় নেই, এখনই ঠিক হয়ে উঠবে। ফুঁড়েও দিলে। ব্যস, পনেরো মিনিটের ভেতর অন্য মানুষ।

ফেরবার সময় লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে ওকে নিজে ইনজেকশন নিতে দেখলুম। কিছুক্ষণ ছটফট করে ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে সিরিঞ্জ বার করে পায়ে বসিয়ে দিলে। দেখলুম, ওষুধটা ভরবার সময় থেকেই চেহারা বদলে গেল।

শেষদিকে ও বড় লোককে ঠকাত।

ডাঃ অধিকারী বললেন—আমাকেও একবার ঠকিয়েছিল।

বললেন—তোমার মোটে একবার ঠকিয়েছিল। রাম, তাহলে ত তুমি ভাগ্যবান।

আলমগীর প্রসঙ্গে এলেন আবার—যখন মহলে আমি আলমগীর করছি, তখন আমার কনট্রাক্ট শেষ হতে আর মাসচারেক বাকী। অন্তরা তখন বুড়োকে বুঝিয়েছে আমার নাম হলে অসুবিধে হবে, তাই ঝপাক করে আলমগীর বন্ধ করে দিলে। আলমগীরের পরে হ'ল আলিবাবা।

প্রশ্ন করা হ'ল আলিবাবায় আপনি কি পার্ট করেছিলেন ?

বললেন—আলিবাবায় আমার কোন পার্ট ছিল না। তারপর হ'ল রঘুবীর।

আমি ছাড়বার পর নির্মলেন্দুকে নিয়ে ওরা প্রতাপাদিত্য খুলল: বললে—আর কাউকে দরকার নেই, একলাই চালিয়ে নেবে। খুলেই ভীষণ মার খেল, তিন দিনের দিন বন্ধ হয়ে গেল। নির্মলেন্দু মোটে তিরিশ টাকা মাইনে পেত।

তখন ত অমনিই ছিল। একসময়ে দানীবাবুও পেতেন তিরিশ টাকা করে। তবে দানীবাবুর কোনদিনই খুব পপুলারিটি ছিল না।

দেবুদা পুজোর সময় রাজস্থান বেড়িয়ে এসেছে, তাকে দেখে বললেন—এই যে বড় দেবু, কবে এলে? কতদূর ঘুরে এলে ?

দেবুদা ফিরিস্তি দাখিল করলে—জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, অম্বর, আজমীর ইত্যাদি।

শুনে বললেন—আজমীর ঘুরে এলে, তিলাকুঠি, পাগলকুঠি দেখেছ—শেঠ নেমিচাঁদের ?

আমিও একবার ওখানে গিয়েছিলুম—এক আত্মীয়ের সুবাদে। খুব খাতির যত্ন করেছিল। সে অনেক কাল আগেকার কথা, আমি তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে।

জয়পুরে ত অনেক বাঙালী ছিল। লোকে বলত—সংসার বাবুর বাসা, মুখুয্যেদের বাসা আর রেসিডেন্সীর কোঠি।

কে একজন বললে—জয়পুরের মহারাণীও ত বাঙালী।

একটু যেন আশ্চর্য হলেন, প্রশ্ন করলেন—জয়পুরের মহারাণী বাঙালী ?

সে উত্তর দিলে—হ্যাঁ, কোচবিহারের মেয়ে।

বললেন—ও, কোচবিহারের মেয়ে। কোচরা ত বাঙালীই নয় তবে তিনশো বছর আগে জোর করে ওরা বাঙালী হয়েছিল। আজকে কি আর চাইলেই তিনশো বছরের ইতিহাস ভুলে যাবে? আচ্ছা বল ত, বাঙলাদেশের আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন আড়ারাও স্বীকার করবে আমরাও বাঙালী হচ্ছি।

সেদিন আসবেই, তার বেশী দেরীও নেই।

একটু সময় চুপ করে বসে রইলেন, তারপর একেবারে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন—দানীবাবুর অভিনয়ের মধ্যে ছিল অপূর্ব গলা, অমন গলা দেখা যায়না। তবে গিরিশবাবুর অভিনয়ের কাছে কিছুই নয়। গিরিশবাবুর অভিনয় প্রথম দেখি দক্ষযজ্ঞে—উনি সেজেছিলেন দক্ষ। এখনও মনে আছে—সবুজ রঙের সিল্কের লম্বাহাতা জামা পরনে। দানীবাবু হয়েছিলেন শিব। ওঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ গলায়—কোথা যাই, কোথায় পালাই: ছিলাম সন্ন্যাসী, হয়েছি সংসারী ইত্যাদি বললেন।

গিরিশবাবুর কিন্তু তুলনা হয়না। পরে একবার কমবাইণ্ড নাইটে ভ্রান্তি দেখেছিলুম—পুরঞ্জন: দানীবাবু, নিরঞ্জন—অমর দত্ত আর রঙ্গলাল—গিরিশবাবু। সে অভিনয় দেখে মনে হয়েছিল—Girish Babu first and every body else nowhere।

দানীবাবু কিন্তু খুব বেশী পপুলার ছিলেন না, ওঁর নামে কোনদিনই খুব একটা লোক আসত না। সেদিক দিয়ে অমর দত্ত ছিলেন হাজার গুণ পপুলার। দানীবাবু প্রথম নাম করতে শুরু করেন ১৯০৭ সালে অর্দ্ধেন্দুবাবু মারা যাবার পর। গিরিশবাবু তখন আর বড় একটা নাবেনই না; নাবলে ও প্রফুল্লতে যোগেশ আর বলিদানে করুণাময়। চন্দ্রশেখরে প্রথম দু-তিন দিন চন্দ্রশেখর করেছিলেন, তাও খুব ফাঁকি দিতেন। শেষপর্যন্ত করতেন সুন্দরীর স্বামী—ঘরজামাই। পার্টে ত কিচ্ছু নেই—নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারার মানুষটি কোঁচানো কাপড়টি পরে এসে ঢুকতেন তারপর ঘাড় নেড়ে বলতেন—আস্তে, আস্তে কে শুনতে পাবে।

সুন্দরী যখন হাঁটু গেড়ে বসে গান ধরত, বলতেন—চুপ চুপ কে দেখতে পাবে।

ভূমিকায় কিছু নেই কিন্তু কি অপূর্ব অভিনয়! চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠত।

তবে বড্ড ফাঁকি দিতেন। শেখানোর ব্যাপারেও তাই। দুবার বললেন ত, ভাগ্য ভাল। তারপরেই বলতেন—বেশ বলেছিস বাবা। বেশ বলেছিস। তোর বয়েসে আমি ওরকম পারতুম না। এখন এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল।

আমিও বলি ওঁর নকলে।

দানীবাবুর যতদিন গলা ছিল ততদিনই নাম, তারপর আর কেউ মনে রাখল না। অভিনেতার গলা গেলে আর কিছুই থাকে না। যখন বুঝবে ওপরে দু অক্টেভ (উঠছে না) আর নীচে এক অক্টেভ নাবছে না (গলা) তখন তার অভিনয় ছেড়ে দেওয়া উচিত।

সিনেমা হবার পরেই অভিনেতারা পয়সা পেলো। কুসুমই বলেছিল—একদিন কাজ করবার জন্যে পঞ্চাশ টাকা, তা বাপু করব না কেন বল?

এবার বললেন রবীন্দ্রনাথের কথা—রবীন্দ্রনাথের নাটক বলতে ত দুখানা—তপতী আর মালিনী। গোড়ায় গলদ শুধু কথা দিয়ে সাজানো, তবে কথা যা আছে খুবই সুন্দর। অথচ লোকে জানে রবিবাবুর ভাল বই হ'ল ডাকঘর, তাসের দেশ; কিন্তু ওগুলো কি ঠিক নাটক হ'ল। ওঁর কোন বই-ই দাঁড়ায়নি, এমনকি তপতীও নয়।

[ক্রমশঃ।

বঙ্গসংস্কৃতি ও চিত্রকলা

অশোক ভট্টাচার্য

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন তার বিপুলতায়, উদ্দেশ্যে এবং নিয়মানুবর্তিতায় কলকাতায় বিভিন্ন বাৎসরিক অনুষ্ঠানগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাধ্যানুযায়ী বাঙালী সংস্কৃতির সকল ধারাকে এক পক্ষকালাধিক সময়-ব্যাপী এই সম্মেলনে তুলে ধরেন এবং নাগরিক বাঙালীকে প্রায় ভুলে যাওয়া গ্রামীণ সঙ্গীতাদির সংস্পর্শ দান করেন। উদ্যোক্তাদের এই প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। এবারে একটি চিত্রপ্রদর্শনীকে সম্মেলনের নতুন সংযোজন হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার আলোচনার পাশাপাশি একদিন চিত্রকলা সম্পর্কিত আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আলোচনায় বর্তমান চিত্রকলা সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী আপন আপন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। আলোচনার ধারা মূলত: দুই ভাগে ছিল বিভক্ত। এক ভাগ শিল্পী আধুনিক চিত্রকলার নামে যে অহেতুক জাতীয় শিল্প ঐতিহ্য-বিরোধী শিল্পচর্চা চলেছে, তার বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করেন। অপর ভাগ শিল্পী বর্তমান বিশ্বচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ধারা থেকে মুক্তি চেয়েছেন এবং আধুনিক চিত্রকলার হিসাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। শিল্পীদের আলোচনা সর্বদাই নৈর্ব্যক্তিক ছিল না এবং তর্ক কোনো কোনো সময়ে প্রায় বিতণ্ডার স্তরে পৌঁছেছিল। তবু এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারা যায় না যে, আলোচনায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক শিল্পীই কিছুমাত্র তৈরী হয়ে এসেছিলেন। অথচ তাঁদের মুখনি:সৃত বাণী শোনার জন্যে মণ্ডপে এবং বাইরে বহুজনই হয়েছিলেন সমবেত। আধুনিক চিত্রকলার প্রচার ও প্রসারের জন্য বক্তাদের অনেকেই অনেক উপায় উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের সামনে উপস্থিত জনতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে উৎসাহ সঞ্চার করতে ভুলে গেলেন।

আলোচনায় দেখা গেল প্রত্যেক শিল্পীই আঙ্গিক সম্পর্কে অত্যন্ত ভাবিত, জাতীয় না বিজাতীয় কোন্ ধারায় এদেশের চিত্রকলার হবে অগ্রগতি—সে বিষয়ে সকলেই চিন্তান্বিত। কিন্তু সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক, মানবজাতির সাংস্কৃতিক উন্নতিতে তার বিশেষ কোন্ ভূমিকা কিংবা বস্তুজীবনের প্রতি শিল্পীর মনোভাব, এ জাতীয় কোনো আলোচনার সূত্রপাত তাঁরা করেননি। এমন কি, বিষয় ও আঙ্গিকের পারস্পরিক যে সম্পর্ক—সে বিষয়েও কোনো আলোকপাত বিশেষ কেউ করেননি। অথচ হয় তো এ সব আলোচনাতেই দর্শক বা শ্রোতারা চিন্তিত হবার সুযোগ পেতেন।

বঙ্গ সংস্কৃতির উদ্যোক্তারা স্থির করেছেন প্রতি বছর তাঁদের সম্মেলনের অংশ হিসাবে একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করবেন। এই সংবাদ অনেক তরুণ শিল্পীর মনেই উৎসাহ সঞ্চার করবে। কেননা, একাডেমির বাইরে কোনো জনপ্রিয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থার অভাব প্রতিদিনই অনুভূত হয়েছে। এ বছর প্রথম বছর। তাই আয়োজনে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তবু যাতে আগামী বছরেও একই ত্রুটির সম্মুখীন হতে না হয়, তাই উদ্যোক্তাদের অনুরোধ—তাঁরা যেন একটি প্রশস্ত মণ্ডপে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। নচেৎ বড় ছবি দেখার ব্যবধান পাওয়া যায় না। তা ছাড়া রচনার মাধ্যমের বিচারে ছবিগুলি আলাদা করে সাজালে দর্শকের প্রতি এবং ছবির প্রতিও সুবিচার করা হবে। তা না হলে চড়া তেল রঙের পাশে শান্ত জল রং প্রায়ই অসহায় বোধ করে।

প্রদর্শনীতে প্রাধান্য তৈলচিত্রের। সাধারণত: এ বিভাগে বাঙালী শিল্পীরা অপটু হলেও একাধিক শিল্পী তাঁদের রচনায় মোটামুটি দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিষয় নির্বাচনে এবং বস্তু সংস্থাপনে (Composition) তাঁদের অনেকেই চিরাচরিত ধারাকে পরিহার করেছেন। কিন্তু রঙের ব্যবহারে তাঁদের নৈপুণ্য অনেকাংশেই খণ্ডিত। কারো রচনায় রঙের আধিক্য লক্ষিত হয়েছে, আবার কারো ছবি দেখে মনে হয়েছে যেন ইংলণ্ডে আঁকা ছবি, সবই ধোঁয়াটে অথবা অনুজ্জ্বল।

আলোছায়ার বিন্যাসে সব থেকে ভালো লেগেছে অরুণ বসুর তৈলচিত্র জানালা (১৩)। আলোর ঔজ্জ্বল্যের বিভিন্ন মাত্রাভেদে সৃষ্ট এই ছবির শান্ত পরিবেশ মনোরম। এতে শিল্পীর সংযম পরিস্ফুট, তবে বিদেশী ছবি স্মরণে আনে। শিল্পীর অন্যান্য ছবিও উল্লেখযোগ্য। সোমনাথ হোড়ের কয়েকটি ছবির মধ্যে সব থেকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিত্র বিন্যাস (১২৫) ছবিটি। কয়েকটি নি:স্ব মানুষের সমাবেশে এর বস্তু সংস্থাপন। নীল রঙের প্রাধান্য তাদের পাণ্ডুরতা ও প্রাণহীনতাকে কানাডার শীতলতায় পৌঁছে দেয়। গ্রীষ্ম প্রধান এই দেশের মানুষ বলে চিনতে তাদের বুঝি তাই ভুল হয়। ঠিক অপর প্রান্তে শিল্পী অরুন্ধতী রায় চৌধুরী। তার 'চুম্বন' (৮) ছবিটি চোখে পড়ে বলিষ্ঠ বস্তু সংস্থাপন ও চড়া রঙের জন্যে। তিনি যদি রঙ ব্যবহারে একটু সংযত হন তবে ছবির রস গ্রহণে সুবিধা হয়, ছবিতে চোখ রাখা যায়। এ ছাড়া মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' (৮২), শ্যামলী ঘোষের 'প্রতিকৃতি' (৭৩), অমিতা ঘোষালের 'ওপারের নগর' (৪) ও কল্যাণ বসুর বর্ষা (৩৪) ভালো লেগেছে।

জলরঙে রচিত মদন সরকারের 'কলতলা' (৭৭) ও 'নদীর ধারে' (৭৮) ছবি দুটি উৎকৃষ্ট। রঙের স্বমিত ব্যবহারে ও রেখার সঙ্গে তার সঙ্গতি সাধনে তিনি সার্থক হয়েছেন। বিশিষ্ট শিল্পী গণেশ হালোই-এর ছবি কটির মধ্যে দু-একটি একাডেমিতে এবছরই প্রদর্শিত হয়েছে। না দেখা ছবি 'ধানভাঙা' (৪৩) দেখে মন স্বভাবতই শিল্পীর প্রতি অনুগত হয়, খুশী হয় শিল্পীর ঐতিহ্যবাহী ধারায় রচিত শান্ত পরিবেশ দেখে। গৌরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু-একটি ছবি এবং সুভাষ দে-র আঁকা 'বিশ্রাম' (১৩১) অন্যান্য জলরঙের ছবির মধ্যে বিশিষ্ট।

প্রখ্যাত শিল্পী স্বর্গীয় আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাতটি ছবি ছিল প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ।

লেঃ জেনারেল ডি, এন, চক্রবর্তী

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ও কর্মাধ্যক্ষ]

বাঙ্গালী এ সকল ক্ষেত্রেই একদিন প্রাধান্য লাভ করেছিল। কি রাজনীতিতে, কি সামাজিকক্ষেত্রে, কি সাহিত্যে, কি কাব্যে, কি বিজ্ঞানে, কি সাহসিকতায়—সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী জাতি ছিল সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু সাময়িক ভাবে ও ঘটনা-পরম্পরায় আজ বাঙ্গালী জাতির সে সুদিন অস্তমিত হলেও বাঙ্গালী জাতির সে সুনাম বিলুপ্ত হয় নি। আজও বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক দেখতে পাওয়া যায় যাঁর তুলনা হয় না। এমনি একজন মানুষ হচ্ছেন লেঃ জেনারেল ডি, এন, চক্রবর্তী। যাঁর কর্মনিষ্ঠা, সততা এবং অধ্যবসায় বাঙ্গালী জাতির অনুপ্রেরণার স্থল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নিজের কর্মদক্ষতায় আজ তিনি সমগ্র জগতে সুপরিচিত। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেলের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে লেঃ জেনারেল চক্রবর্তী পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ভার গ্রহণ করেছেন এবং এ গুরুভার আজও তিনি বহন করে চলেছেন অক্লান্ত ভাবে। জেনারেল চক্রবর্তী ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রভূত উন্নতি বিধান করেছেন। সাধু, কর্মনিষ্ঠ এবং অক্লান্ত কর্মী হিসেবে তিনি জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মত একজন নিরলস কর্মী পেয়ে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসী তথা সরকার ধন্য হয়েছেন, একথা অনস্বীকার্য।

লেঃ ডি, এন, চক্রবর্তী (স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর)

জেনারেল চক্রবর্তীর পৈত্রিক বাসভূমি পূর্ববঙ্গের ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রামে। তাঁর পিতা বিপিনবিহারী চক্রবর্তী ডিগ্রি লাভের পর উত্তর প্রদেশে রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে যান এবং সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তর প্রদেশেই ইঞ্জিনিয়ার'এর কর্ম গ্রহণ করেন এবং সে থেকেই এ বাঙ্গালী পরিবারটি উত্তর প্রদেশের অধিবাসী হন। বিপিনবিহারীর ছয় পুত্র ও এক কন্যা। তন্মধ্যে জেঃ চক্রবর্তী তৃতীয়। তাঁর সমস্ত ভ্রাতাই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত।

১৮৯৮ সালে উত্তর প্রদেশের রায় বেরিলীতে লেঃ জেঃ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেনারস, এলাহাবাদ এবং লাক্ষ্ণৌ'তে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯২২ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করে ১৯২৪ সালে ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে পদ গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সশস্ত্র বাহিনীতে দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন প্রথম-জীবনে তাঁকে রাজকীয় বিমান বহরের কার্য্যে ধার নেওয়া হয় এবং এ কার্য্যেই তাঁকে মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, ইরাণ ও অন্যান্য স্থানে অতিবাহিত করতে হয়। তাঁকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিলাতে প্রেরণ করা হয়। তিনি বিলাতে চিকিৎসা বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করে জেনারেল চক্রবর্তী সর্দ্দিগর্ম্মী ও তাহার কারণ এবং চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। সে সময় উহাতে বহু সংখ্যক সৈন্য বিশেষতঃ বৃটিশ সেনাগণ মৃত্যুবরণ করতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জেঃ চক্রবর্তীর গবেষণার ফলে বহু সেনার জীবনরক্ষা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষিত হয় এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর জেনারেল চক্রবর্তী ভারত থেকে প্রথম সেনাবাহিনীতে মধ্য-প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করেন। তিনি মিশর, সিরিয়ার মরুভূমি, সুদান, ঐরিটি রা আবেসেনিয়ায় গমন করেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি ঐ সকল দেশের ভাষা শিক্ষা করে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং ঐ সকল দেশের অধিবাসীদের বহু উপকার সাধন করেন। অবশ্য সেনাবাহিনীর লোকেরাও তাঁর কাছে যথেষ্ট সাহায্য পায়। তিনি সেনাবাহিনীরও উন্নতি বিধান করেন। এরিট্রিয়ায় কেরেণের যুদ্ধে অগ্রগামী দলের নেতৃত্ব করেন জেঃ চক্রবর্তী। এ কার্য্যের কৃতিত্বের নিদর্শন হিসেবে তাঁকে "অর্ডার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার" এ ভূষিত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনিই সর্ব প্রথম এই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি মিশরে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সৈন্যদের রেডক্রস কিংবা অন্য কোন সুখ সুবিধার ব্যবস্থা নাই। তিনিই মধ্য প্রাচ্যে সর্ব্ব প্রথম 'রেডক্রস' সংস্থা গড়ে তোলেন। কায়রোতে তিনি এ সময়ে নিয়মিত বেতারে ভাষণ দিতেন এবং এ'তে সৈন্যদের মধ্যে সাহস, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। কারণ এ সময়ে মিত্র

াহিনীর সৈন্যদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছিল। এজন্যই তিনি নিয়মিত বেতার ভাষণের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪২ সালে মধ্য প্রাচ্যের অবস্থার উন্নতি হয়, এবং জেঃ চক্রবর্ত্তী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সীমান্তে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্র সংগঠন করেন। তিনি সেকেন্দ্রাবাদে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৪৩ সালে লক্ষ্ণৌতে ১৫ সহস্র সৈন্যের শিক্ষার অধিকর্তা নিযুক্ত হন। এ কার্য্যের জন্যে তাঁকে 'কর্ণেল' পদে উন্নীত করা হয়। তারপর মেডিকেল অফিসারদের শিক্ষা-কেন্দ্র সংগঠনের জন্যে তাঁকে পুনরায় বদলি করা হলো, এখানেই সশস্ত্র বাহিনীর কলেজ স্থাপিত হয় এবং সেনাবাহিনীর মেডিকেল অফিসারদের স্নাতকোত্তর শিক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে এখনও উহা বর্তমান আছে।

১৯৪৬ সালে যুদ্ধের অবসান হলে সেনাবাহিনীর কর্ম্মীদিগকে অবসর গ্রহণের সমস্যা প্রবল ভাবে দেখা দেয়। এজন্যে পুনায় একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হলো এবং জেঃ চক্রবর্তীকে ভার দেওয়া হলো কি প্রকারে অতিরিক্ত সৈন্য ও অফিসারদের অবসর প্রদান করা সম্ভব। কেন না, শান্তির সময় যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লোকের প্রয়োজন হয় না। তিনি এই গুরু দায়িত্ব পূর্ণ কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করেন, এবং এরপর কিছুকাল বোম্বাইতে মেডিকেল সার্ভিসের সহকারী ডিরেক্টার হিসেবে কাজ করেন। প্রথম জীবনে রাজকীয় বিমান বহরের গুরুত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সাফল্য মণ্ডিত কাজ করার জন্য বিমান বহরের মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টার করা হলো তাঁকে। নয়াদিল্লীতে তাঁর সদর কার্য্যালয় স্থাপিত হলো এবং তাঁকে বিমান বহরের গ্রুপ ক্যাপটেন পদ দেওয়া হ'লো। ১৯৫০ সালে জেঃ চক্রবর্তীকে প্রেয়ার কামোডোর করা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর মেডিকেল সার্ভিসের ডেপুটি ডিরেক্টার জেনারেল পদে নিযুক্ত করা হয়। এর পরেই পর পর কয়েকটি গুরুত্ব পূর্ণ পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত হতে হয়। ১৯৫১ সালে ওয়েষ্টার্ণ কমাণ্ডের ডেপুটি ডিরেক্টার, ১৯৫২ সালে মেডিকেল সার্ভিস (সেনাবাহিনী) এর ডিরেক্টার এবং ১৯৫৩ সালে সেনাবাহিনীর মেডিকেল সার্ভিসের ডিরেক্টার জেনারেলের গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন পশ্চিম বঙ্গ সরকার ভারত সরকারের নিকট তাঁকে তাঁদের কাজের জন্যে প্রদানের অনুরোধ করেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার তাঁকে ডিরেক্টার জেনারেলের গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

লেঃ জেনারেল চক্রবর্তীর মত কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারী অতি বিরল। তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও গুণী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী, অমায়িক, বন্ধু-বৎসল, ন্যায়পরায়ণ। তাঁর অপূর্ব্ব কর্ম্ম-নিষ্ঠা ও দক্ষতা, সাহস, ভারতীয় জনগণের অনুপ্রেরণার বস্তু। এ বয়সেও তিনি যেভাবে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করেন, তা অফিসারদের অনুকরণীয়। তিনি একটি মিনিটও অপব্যবহার করেন না। তাঁর কর্ম্মদক্ষতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তরের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এরই মধ্যে। এই অক্লান্তকর্ম্মী মানুষটি দীর্ঘজীবন লাভ করে দেশের ও জাতির সেবা করুন, এ প্রার্থনাই আমরা শ্রীভগবানের নিকট জানাই।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

[কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পালিত (রসায়ন) অধ্যাপক]

"ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু আমাকে খুবই আঘাত করেছে —শুধু আমার সেজ দাদা বলে নয়—তিনি ছিলেন আমার বরাবরের শুভাকাঙ্ক্ষী, সুহৃৎ ও পথ প্রদর্শক। আমার ছাত্র-জীবনের ভিত্তি তাঁহারই হাতে গড়া—উহা সুদৃঢ় হয়েছিল তাঁহারই পরিচালনায়"—ছোটখাট, সরলমনা ও মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ আমায় জানালেন তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ে।

হুগলী জেলায় ৺তারকেশ্বরের কাছে স্বগ্রাম স্বরগোহালে ১৯০০ সালের এপ্রিল মাসে ভূপেন্দ্রনাথ জন্মান। এগার বৎসর বয়সে বাপ ৺রামচন্দ্র ঘোষকে হারান। মা ৺মনোরমা দেবী ছিলেন প্রতাপ নগরের দুহিতা। চার ভায়ের মধ্যে তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ—তাই অন্য তিন দাদার আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলেন। কিন্তু সেজ দাদা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, বৈজ্ঞানিক ও ভারতমাতার অন্যতম সুসন্তান পরলোকগত ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের প্রচুর প্রভাব পড়েছে ভূপেন্দ্রনাথের জীবনাদর্শে।

ছেলে বয়স থেকে তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা করেছেন আর বাবার সঙ্গে ঘুরতে হয়েছে বিহারের স্থানে স্থানে। একবার তাঁহার আত্মীয়-ভ্রাতাদের পাটনা সহরের গৃহে বেড়াইতে যান এবং তাঁহারা ভূপেন্দ্রনাথকে স্থানীয় রাজা রামমোহন রায় সেমিনারী স্কুলের ম্যাট্রিক ক্লাসে ভর্ত্তি করান। সেই সময় তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১৯১৭ সালে তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি পান—কিন্তু সেই বৎসরই পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা স্কটিশচার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হওয়ায় উহা হইতে বঞ্চিত হন। আই, এস, সি পাশ করিয়া অসুস্থতার জন্য এক বৎসর পড়া বন্ধ থাকে। কিন্তু ১৯২২ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কেমিষ্ট্রী অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম হন রাজ্য পরিবহন বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল সিভিলিয়ান শ্রীযতীন্দ্রনাথ তালুকদার। ১৯২৪ সালে তিনি এম, এস, সি-তে

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডক্টর পি, সি, মিত্র, ডক্টর জে, এন, মুখার্জ্জি প্রভৃতিকে। ইহার পর এক বৎসর বসু ইনষ্টিটিউটে স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। ১৯২৬ সালে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি পাইয়া তিনি নভেম্বরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজে যোগ দিয়া অধ্যাপক এফ, জি, ডোনানের অধীনে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯২৯এর মে মাসে তিনি "Roll of Electrokinetic behaviour of Colloids" নামে প্রবন্ধ দাখিল করিয়া 'ডক্টরেট' লাভ করেন। ইহার পর ছয় মাস গবেষণায় মগ্ন থাকেন। পরে য়ুরোপ ঘুরিয়া ১৯৩০ সালে ডক্টর ঘোষ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁহাকে এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট্রী পড়ার জন্য ডিপার্টমেন্ট-এ যোগদান করিতে নির্দেশ দেন—কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি নিবৃত্ত হন।

১৯৩২ সালে তিনি কসৌলী ম্যালেরিয়া সার্ভেতে রিসার্চ কেমিষ্ট হিসাবে যোগ দিয়া দুই বৎসর থাকেন। ১৯৩৪ সালে তিনি স্যার পি, সি, রায় রিসার্চ ফেলো রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। পর বৎসর তিনি Physical কেমিষ্ট্রীর লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি "রীডার" হন ও ১৯৫৩ সালে স্যার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু হল :—

"Separation of Toxin & Enzyme from Snake Venom", "Chemistry of Antigen & Antybody Reaction", "Collides".

ডক্টর ঘোষ ভারতীয় কেমিক্যাল সোসাইটীর কোষাধ্যক্ষ, সম্পাদক ও সহঃ সভাপতি হইয়াছেন ও ১৯৪৪ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ইনঃ-এর ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩১ সালে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সদ্য-লোকান্তরিত ডক্টর নগেন্দ্রমোহন গুপ্তের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইঁহার সহধর্ম্মিণী হলেন লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের বাংলা ভাষার প্রধানা অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রীমতী সতী ঘোষ। শ্রীমতী ঘোষের কনিষ্ঠা ভগ্নী হলেন ডক্টর নবগোপাল দাসের সহধর্ম্মিণী অঙ্কণশিল্পী শ্রীমতী উমা দাস।

কথায় কথায় ডক্টর ঘোষ বল্লেন—রাজনীতিতে কোন সময় যোগ দিই নাই, কিন্তু ৯৯, কলেজ ষ্ট্রীটস্থ মেসবাড়ীতে বিপ্লবী নেতাদের খুবই আনাগোনা ছিল এবং আমি তাঁদের বেশ ভাল করেই জেনেছিলাম। উক্ত মেসের পরিচালক ছিলেন ডাঃ নীলরতন ধর। আর সেখানে থাকতেন ডক্টর জ্ঞান মুখার্জ্জি, ডক্টর জ্ঞান ঘোষ, ডক্টর নীলরতন ধর। খুবই আসতেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু—আর প্রায়ই দেখা যেত "বাঘা যতীন" প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের। পরবর্ত্তী কালের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দিক্‌পালদের সঙ্গে থাকার সুযোগ হয়ত আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তোলার সাহায্য করেছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর

[পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভার অধ্যক্ষ]

সততা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকলে মানুষ বড় না হ'য়ে যায় না। এরই জলন্ত দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ-বিধানসভার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং নিজের অধ্যবসায়ের বলে তিনি আজ পশ্চিমবঙ্গ-বিধান-

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর (পঃ বঃ বিধানসভার অধ্যক্ষ)
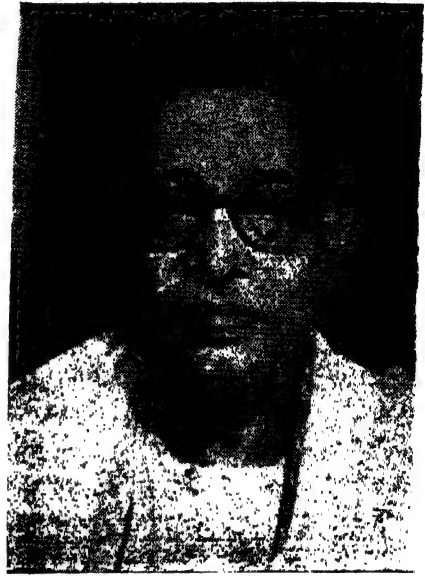
সভার অধ্যক্ষ। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে তিনি এম-এ ও ল' পরীক্ষা না দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি বিপ্লবী নেতা পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারের সংস্পর্শে আসেন এবং হুগলী বিদ্যামন্দিরে যোগদান করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রী কর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে এসে আরামবাগের বড় ডোঙ্গল খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী হিসাবে যোগদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি কংগ্রেসের সমর্থক এবং একজন সক্রিয় সদস্য। চিরদিনই তিনি দেশের কাজ করতে ভালবাসেন এবং এখন পর্য্যন্ত নানা ভাবে দেশের সামাজিক, শিল্পনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে সক্রিয় ভাবে যোগদান করে দেশ ও জাতির অগ্রগতির সাহায্য করছেন। জাতি ও দেশসেবাই এঁর জীবনের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এখনও অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন।

১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়ার লক্ষ্মণ দাস লেনে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রী কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় অমৃতলাল কর ছিলেন হাওড়া ষ্টেশনের চীফ বুকিং ক্লার্ক। ১৯১২ সালে প্রথম রেল ধর্ম্মঘটের সময় তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন।

শ্রী করের প্রথম শিক্ষালাভ হাওড়া এম, ই, (বর্ত্তমান হাওড়া টাউন) স্কুলে। কিছুকাল ঐ স্থানে শিক্ষালাভের পর তাঁহার পিতা কাসিম বাজারে বদলি হইয়া যান। শ্রী করও চলে যান তাঁর পিতার সঙ্গে এবং খাগড়া এস, এম, এস, ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হন। কিছুকাল ঐ স্থানে শিক্ষালাভের পর শ্রী কর হাওড়ায় চলে আসেন এবং আই, আর, বেলিলিয়স ইনষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হন। ১৯১৫ সালে উক্ত বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায়
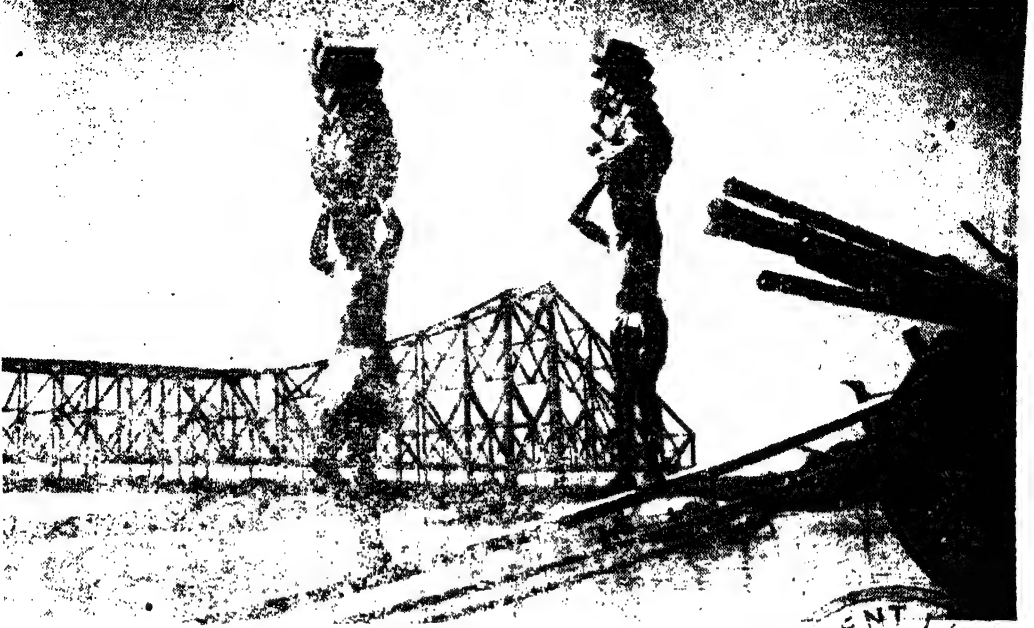
ইষ্টকনগরী কলকাতা

—নীতু পাল

॥ আ লো ক চি ত্র ॥

কিমাশ্চর্য্যম্‌।

—অরুণ বসু

নায়িকা সুপ্রিয়া (স্বরলিপি চিত্রে)

—হেমেন মিত্র

—সুকুমার পাল

সীমান্তের পথে

পুরুষানুক্রমে

—তারাপদ দাশ

উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯১৭ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯১৯ সালে বি-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভের পর ভর্ত্তি হলেন এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও ল' ক্লাসে। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় আরম্ভ হলো অসহযোগ আন্দোলন। ছাত্রেরা সারি সারি প্রবেশদ্বারে শয়ন করে থাকে। পরীক্ষার্থীদের এই সকল অসহযোগী ছাত্রদের পদদলিত করে পরীক্ষা দিতে হয়। শ্রী কর এ অমানুষিক ভাবে পরীক্ষা দেওয়া অপেক্ষা পরীক্ষা না দেওয়াই স্থির করলেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। তারপর প্রায় দুই বৎসর তিনি নানা ভাবে দেশের সেবা করেন। মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি হাওড়ায় ফিরে আসেন এবং ১৯২৩ সালে নন কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে এম-এ ও ল' পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

এর পরেই শ্রী করের কর্ম্মজীবন শুরু হলো। ১৯২৪ সালে তিনি প্রথম আলিপুর জজকোর্টে যোগদান করেন এবং পরে হাওড়া কোর্টে আসেন।

সে সময় থেকে তিনি হাওড়া কোর্টেই আইন ব্যবসা করেছেন। ফৌজদারী মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করেন।

শ্রী কর হলওয়েল আন্দোলনের সময় থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে তিনি হাওড়া পৌরসভায় কমিশনার নির্বাচিত হন এবং ২০ বৎসর (১৯৫৩) পর্য্যন্ত তিনি পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি হাওড়ার পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে হাওড়া পশ্চিম কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসেবে বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৫৭ সালে শ্রী কর ঐ একই কেন্দ্র থেকে পুনরায় বিধানসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়ে হাওড়ায় জনসাধারণের সেবা করে আসছেন।

শ্রীকর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে হাওড়া গার্লস্ স্কুল, হাওড়া গার্লস্ কলেজ, হাওড়া টাউন স্কুল, হাওড়া জিলা কংগ্রেস, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, হাওড়া জিলা হকার্স কংগ্রেস, হাওড়া সমাজসেবা সমিতি, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রী কর ১৯২২ সালে প্রখ্যাত সর্ব্বাধিকারী পরিবারের নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর কন্যা মঞ্জরী লতিকা দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। নগেনবাবু ছিলেন স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর পঞ্চম ভ্রাতা। শ্রী করের তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা।

শ্রী কর গত ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দত্ত

[বিশিষ্ট হোটেল-পরিচালক]

বহির্বঙ্গে বহু বাঙ্গালী শিক্ষাবিদ্, চিকিৎসক, আইনজীবী অথবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু আগ্রা নিবাসী শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দত্ত হলেন এক ব্যতিক্রম। আগ্রা, মথুরা ও দিল্লীর 'আগ্রা হোটেল'-এর স্বত্বাধিকারী ও সদ্ব্যবসায়ী হিসাবে শ্রী দত্ত সারা ভারতে বহুজনবিদিত।

স্বর্গীয় নন্দগোপাল দত্ত তদীয় সহধর্ম্মিণী ৺থাকমণি দেবীকে লইয়া স্বগ্রাম বড়িশা (২৪ পরগণা) হইতে একশত বর্ষ পূর্ব্বে উত্তর প্রদেশের জেলবিভাগে কর্ম্ম লইয়া আসেন ও পরে তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। ইঁহার তৃতীয় পুত্র অমূল্যচন্দ্র ১৮৮৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর মাতুলালয় সাহজাহানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুল কালীঘাটের স্বর্গত নন্দলাল মিত্র সেই সময় সেখানকার জেলা-শাসকের দপ্তরে হেড ক্লার্ক ছিলেন। মিত্র মহাশয়ের সম্বন্ধী ছিলেন মীরাটের প্রথম বাঙ্গালী আইনজীবী ৺কালীপদ বসু আর জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন ছোট জাগুলিয়া নিবাসী ও সাহিত্যিক ৺কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম সুহৃৎ পরলোকগত নারায়ণচন্দ্র বসু (বোলজা)। শ্রী দত্তর বাল্য ও কৈশোর মাতুলের নিকট অতিবাহিত হয়।

আট বৎসর বয়সে তিনি মোরাদাবাদ চার্চ্চ মিশন স্কুলে ভর্ত্তি হন ও এগার বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌর Queen's Anglo-Bengali School এ প্রবেশ করিয়া আঠার বৎসরে তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পিতৃহারা হন। লক্ষ্ণৌর ক্যানিং কলেজে পড়িবার সময় অর্থাভাবে তিনি চাকুরীর চেষ্টা করেন। খেলা-ধূলা ও কুস্তিতে পারদর্শী হওয়ায় ১৯০৩ সালে তিনি ইউ, পির পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন। এক বৎসর পরে তিনি সাধারণ বিভাগ হইতে রেলওয়ে পুলিশে বদলী হন। তখন তিনি প্রদেশের বহু জায়গায় যাতায়াত করিতেন। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি খাজাঞ্চীর পদে উন্নীত হন। কিন্তু এক হাজার টাকার জামানত সংগ্রহে খুব অসুবিধা দেখা দেয়। সেই সময় লক্ষ্ণৌর সুরেন্দ্রনাথ বসু বিনা দ্বিধায় উক্ত অর্থ দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করেন। সরকারী কর্ম্মচারী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীদত্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িত করেন। উত্তর প্রদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী, লক্ষ্ণৌর প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান ও পরে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীগোকর্ণনাথ মিশ্রের সহকর্ম্মীরূপে শ্রী দত্ত দুই বৎসর নানারূপ সামাজিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকেন। তখন প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কাশী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থে অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হন। গোকর্ণনাথের নিকট অমূল্যচন্দ্রের কথা শুনিয়া মালব্যজী শেষোক্তকে আহ্বান জানান। শ্রী দত্ত সঙ্গে সঙ্গে বিনা বেতনে দুই বৎসরের ছুটী লইয়া পণ্ডিত মদন মোহনের সহকারী হইয়া এই মহান্ প্রচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেন। এই সময় তিনি স্বর্ণলতা, সরোজিনী নাইডু ও ভারতবরেণ্য অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। দেশের কাজে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহিত অমূল্যচন্দ্রের এত নিকট-সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিদেশী সরকার তাঁহার সততা ও কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা দেন নাই।

১৯২১ সালে তিনি আগ্রায় বদলী হইয়া আসেন এবং ১৯৩০ সালে স্বেচ্ছায় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পশ্চাতে একটি ঘটনা আছে। ১৯২১ সালে দেশজোড়া আন্দোলন সুরু হয়েছে। আগ্রা শহরে দুইটি বাঙ্গালী তরুণী ধৃত হন।

অমূল্যচন্দ্র সরকারী কর্ম্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তরুণীদ্বয়ের পক্ষে জামীন হইয়া তাঁহাদের স্বগৃহে লইয়া আসেন। কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করেন। ইহার উত্তরে শ্রী দত্ত পদত্যাগ পত্র পেশ করিয়া লিখেন, "আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় যদি আপনাদের কিছুমাত্র অবিশ্বাস আসিয়া থাকে, তবে আমার আর এই কাজে থাকা উচিত নয়।" তরুণীদ্বয় হলেন কুমারী শান্তি দাস (বর্ত্তমানে শ্রীমতী শান্তি কবীর) ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র।

ইহার পর আরম্ভ হয় এক নূতন কর্ম্মধারা। এর সূচনা হয়েছিল কয়েক বৎসর পুর্ব্বেই। চাকুরী ছাড়ার পর ইহার পূর্ণ রূপদানে তৎপর হলেন অমূল্যচন্দ্র। ১৯২৬ সালে বৃন্দাবন ধামে কুম্ভমেলা বসেছে। বাংলা দেশের বহু যাত্রী তথায় সমবেত হয়েছেন। সেখান থেকে ফেরার পথে সকলেই আগ্রায় হাজির হন পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য দর্শনীয় মর্ম্মর-প্রাসাদ 'তাজমহল' ও অন্যান্য ঐতিহাসিক-স্থাপত্য কীর্ত্তিগুলি দেখিতে। স্থানীয় কালীবাড়ীর ক্ষুদ্র পরিসরে বাঙ্গালীর স্থান সংকুলান হয়নি—বিশেষতঃ মহিলাদের। কত অসুবিধা ও কত বিপদ যে হইতে পারে, পুলিশ কর্ম্মচারী অমূল্যচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করেন। এনে দিল তাঁর মনে এক প্রেরণা—স্থির করলেন স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের—পত্তন করলেন ১৯২৬ সালে 'আগ্রা হোটেল'-এর। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালীর নির্বিঘ্নতা, স্বল্প খরচে অবস্থান আর সুমধুর ব্যবহার।

১৯৩০ সালে অবসর গ্রহণের পর অমূল্যচন্দ্র একান্তভাবে নিজেকে সমর্পণ করলেন ইহার পিছনে—ক্রমশঃ গড়ে তুললেন মথুরা ও দিল্লীতে ইহার শাখা—বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী তাঁহার কর্ম্মনিপুণতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আজও তাঁহার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানত্রয়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দেশ ও বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এখানে অবস্থান করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। "আগ্রা হোটেল" আজ বৃহৎ কর্ম্মশালায় রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও অমূল্যচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রদের অনাড়ম্বর, অমায়িক ও সরল ব্যবহার মনে রেখাপাত করে। শ্রী দত্তর প্রেরণাতেই উত্তর-ভারতে বাঙ্গালী পরিচালিত কয়েকটি বিশিষ্ট হোটেল গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধর্ম্মপ্রাণ অমূল্যচন্দ্র ভারতবর্ষের অধিকাংশ তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এতকাল বহির্বঙ্গে বাস করিয়াও তিনি বাংলার ও বাঙ্গালীর কথা গভীর ভাবে চিন্তা করেন। উত্তর প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে তিনি তথাকার সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবহিত আছেন।

১৯০৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর আগ্রার বিশিষ্ট বাসিন্দা ও সরকারী কর্ম্মচারী ৺ভুবনেশ্বর ঘোষের তনয়া শ্রীমতী মৃণালিনীর সহিত শ্রী দত্ত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী দত্ত পরলোকগমন করেন।

বাঙ্গালী উত্তরোত্তর ব্যবসায়ে লিপ্ত হোক—ইহাই শ্রী দত্তর ঐকান্তিক ইচ্ছা।

দেশলাই কাঠি

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস

এক টুকরো দেশলাই কাঠি
পথিকজনের কেউ ফেলে গেল
পথের মাঝখানেই।
ঝিরঝিরে হাওয়ায় তার নিভু নিভু ফুলকিটা
নতুন জীবন পেলো আর একবার।

কত জনে দেখেও দেখলোনা যেন—
চলে গেল পাশ দিয়ে,
কেউ আবার মনে করলো :
নিভিয়ে কি দেব এটা ?
দরকার কি মিছে জ্বলবার ?
থাকৃগে, জ্বলুক, পুড়ুক···
আমারই বা কি এত মাথাব্যথা ?

কেউ বা ভাবলো :
এই বেলা চুপিচুপি এটা দিয়ে
আগুন লাগিয়ে দি আবদুলের ঘরে

ঐ যাঃ, কে যেন আসছে—
তবে সরে দাঁড়াই।
সরে গেল।

আর একজনে কাঠিটাকে দেখে
ভাবলো অনেক···
বললো সে সবাইকে ডেকে :
এক কাজ করি এসো ভাই সব
চলো কিছু কাঠকুটো দেখে শুনে নিয়ে আসি আগে
তারপরে এই কাঠির ফুলকি দিয়ে ধরিয়ে সেগুলো
হাড়কাঁপা শীতের সন্ধ্যায়
সকলেই এসে বসে আগুন পোহাই।

সব শেষে সেই নিল তুলে কাঠিটাকে। আনন্দে।
জ্বলন্ত স্ফুলিংগটা মুচকি হেসে হেসে বুঝি
দেখতে লাগলো মজা।
আর দেখলো মানুষকে!
সমস্ত···পৃথিবী জুড়ে

মুক্তিযুদ্ধে বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায়

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

১৭৬০ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ জাতি বাংলার এক সম্প্রদায়ের লোকের সশস্ত্র বিপ্লবের ফলে বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। উক্ত বিপ্লবীরা কি ধরণের লোক, একটানা ৪০ বৎসরের ওপর—তাঁরা কিভাবে সংগ্রাম করেছিলেন সামরিক শিক্ষায় উন্নত শক্তিশালী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে এবং কিবা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা শুনলে বিস্মিত হতে হয়।

উক্ত বিপ্লবী সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল হিন্দুদের সন্ন্যাসী এবং মুসলমানদের ফকিরদের নিয়ে। সন্ন্যাসী ও ফকিররা সর্ব্বত্যাগী এবং লোকালয়ের কোন ব্যাপারের সংগে তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকে না—তা সামাজিক ব্যাপারই হোক বা রাজনৈতিক ব্যাপারই হোক, তাঁদের কাজ ঈশ্বরের সাধনা, ফলমূল আহার এবং লোকালয়ের বাহিরে বসবাস, যেখানে থাকলে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, লোভ, মায়া, মোহ মানুষের মনকে দখল করতে পারে না।

কিন্তু ইংরেজ শাসনের ফলে বাঙ্গালী জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে ঐ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ফকিররা স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা মনে করলেন যে, দেশ ও দশের কল্যাণে উদাসীন থাকলে ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা হয় না, কারণ মানুষ ভগবানের অংশ এবং দুঃখ-দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অত্যাচারে অবিচারে জর্জ্জরিত জনসাধারণের সেবা করলে ঈশ্বর সুখী হন। আর তাঁরা দেখলেন যে, ইংরেজরা বিধর্মী এবং দেশের মঙ্গলের জন্য তাদের তাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। তাই সন্ন্যাসীরা সংঘবদ্ধ হলেন ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে এবং মুসলমান ফকিররা সংঘবদ্ধ হলেন মজনুশার নেতৃত্বে। সন্ন্যাসী ও ফকিররা একযোগে একই আদর্শ নিয়ে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে হিন্দু সন্ন্যাসীরা নানা জায়গা হতে এসে মিলিত হতেন একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এক একটা বিশেষ ধর্ম-অনুষ্ঠান উপলক্ষে। পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ঢাকা জেলার লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা সমবেত হতেন এবং কিভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, কিভাবে জনগণের মঙ্গল আনয়ন করা যায়, এইরূপ বিষয় নিয়ে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করতেন। বিশেষ তিথিতে এবং বিশেষ দিনে প্রতি বছর গঙ্গাস্নান বা সমুদ্রস্নান করতে গিয়ে অথবা রথযাত্রার সময়ে হিন্দুদের পবিত্র-তীর্থ পুরীতে গিয়ে তাঁরা মিলিত হতেন এবং ভাবী কার্য্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতেন, দেশের লোকেরাও তাদের ভালবাসতো এবং তাদের কাজের সমর্থন করতো।

মুসলমান ফকিরেরাও পাণ্ডুয়ার দরগায়, মালদহের আদিনা দরগায়, গারো পাহাড়ের শাহ কামালের দরগায় নির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত হতেন এবং পরামর্শ করতেন কিভাবে দেশকে ইংরেজদের কবল হতে মুক্ত করা যায়।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা বুঝতে পারলেন যে, সংগ্রাম ছাড়া অবাঞ্ছিত ইংরেজদের হাত হতে দেশের মুক্তি আনয়ন সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ধীরে ধীরে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা অস্ত্র-সংগ্রহ ও অস্ত্রশিক্ষায় মন দিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁরা হয়ে উঠলেন ভাল লাঠি খেলোয়াড়, তাঁদের বর্শা, তীর-ধনুক সন্ধান হয়ে উঠল অব্যর্থ। ইংরেজ সৈনিকদের বন্দুক তাঁরা কেড়ে নিতেন শুধু—লাঠি চালিয়ে। কি কৌশলে লাঠি চালিয়ে—বন্দুককেও ব্যর্থ করে দেওয়া যায়, তা এযুগে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। বন্দুক ছুড়তে ও তরোয়াল চালাতে তাঁরা হয়ে উঠলেন খুবই পারদর্শী; ঘোড়-সওয়ারদের মত ঘোড়ার পিঠে চড়ে অল্পসময়ের মধ্যে তাঁরা অনেকদূরে চলে যেতেন এবং সব জায়গায় যোগাযোগ রক্ষা করতেন।

দেশ ও দশের হিতকামী এই সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিল দেশের অগণিত লাঞ্ছিত, শোষিত, বঞ্চিত কৃষক, মজুর প্রভৃতি। এই বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের লোকজনদের ইংরেজরা বলতো ডাকাত, ইংরেজদের অত্যাচারে, অবিচারে, শোষণে যারা বাধা দিত, তাদের ডাকাত বলা শাসকদের খুবই স্বাভাবিক, আসলে তারাই ছিল তখনকার স্বদেশপ্রেমিক।

দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ফকির মিলিত হয়ে একটা বিশাল ও সুদৃঢ় রাজশক্তির বিরুদ্ধে বৎসরের পর বৎসর যুদ্ধ চালিয়ে গেছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন জেলায় কেল্লা স্থাপন করেন এবং ঐ সমস্ত কেল্লা হতে চালাতে থাকেন খণ্ড খণ্ড অভিযান। ঐভাবে ইংরেজকে বিব্রত করে—অনেক জায়গায় তাঁরা অনেক অত্যাচারের, অবিচারের প্রতিরোধ করেছেন। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বরিশাল এবং তখনকার পশ্চিমবঙ্গের যশোহরে ছিল তাঁদের কার্যকলাপের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র।

সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের বেশী যুদ্ধ হয়েছে উত্তরবঙ্গে। কুচবিহারের মহারাজের পক্ষে সন্ন্যাসীরা যে সংগ্রাম করেছিলেন, তাতে ইংরেজদের পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ সেনাপতি মরিসনকে সসৈন্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। ঐ ঘটনার দু'বছর পরেই জলপাইগুড়ি জেলায় এক যুদ্ধে মার্টল সাহেব সন্ন্যাসীদের হাতে মারা যান। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কিথ সাহেব বিশাল ইংরেজবাহিনী নিয়ে রংপুরে সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করতে যান। কিন্তু তিনিও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও সসৈন্যে নিহত হন। কিথ্ সাহেবের মৃত্যুর পর ক্যাপটেন টমাস সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে দলবলসহ নিহত হন। এবার ইংরেজ সেনাবাহিনী মেজর ডগলাস ও ক্যাপটেন এডোয়ার্ডের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হন। দুই পক্ষে প্রবল যুদ্ধ হল, সন্ন্যাসীদের যুদ্ধে জয় হয় এবং উক্ত সেনাপতিদ্বয় সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ইংরেজের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকে—এবং অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনারা প্রতিটি যুদ্ধে সন্ন্যাসীদের হাতে পরাজয় বরণ করে।

মুসলমান ফকিররাও বৃটিশের বিরুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বাখরগঞ্জ আক্রমণ করেন এবং কোম্পানীর ঢাকার ফ্যাক্টরী দখল করেন, বেগতিক দেখে ইংরেজরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। এর কয়েক বছর পর ফেলম্যান সাহেবের নেতৃত্বে ইংরেজরা ফকিরদের আক্রমণ করে, ফকিররা ঐ যুদ্ধে অদম্য সাহসের পরিচয় দেয়।

ঐ সময়ে সন্ন্যাসীরা রামপুর-বোয়ালিয়ার ফ্যাক্টরী দখল করেন। মেটন সাহেব দলবলসহ সন্ন্যাসীদের হাতে বন্দী ও নিহত হন।

সন্ন্যাসী ও ফকিররা মিলিতভাবে চেষ্টা করেছেন কোম্পানীর অত্যাচার ও অবিচার বন্ধ করতে এবং প্রাণপণ শক্তিতে তাঁরা আঘাত হেনেছেন বৃটিশ শক্তির ভিত্তিমূলে। শেষ সাফল্য লাভ হোক বা না হোক, আন্তরিক প্রয়াসের যে দাম, তাহা সাফল্যের দামের চেয়ে কম নয়।

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন বাঙালীই প্রথম করে। মুক্তি কামনার মন্থরতার মধ্যে সে এনেছে বিপ্লবী চিন্তার দুর্বার গতি, সে গতি যৌবন-জলতরঙ্গের মত ভয়ঙ্কর। সে কোন বিপদকে ভয় করে না, বিঘ্নকে গ্রাহ্য করে না, মৃত্যুকেও পরোয়া করে না, আপনার স্বাভাবিক প্রাণের আবেগে সে পাষাণ ভেদ করে সৃষ্টি করে উচ্ছল স্রোতপথ। এই বলিষ্ঠ স্বাধীনতার প্রাণময় প্রয়াস বাঙালী সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ইহাই ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ফকিররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিটি খণ্ড-যুদ্ধে জয়ী হওয়া সত্বেও বৃটিশকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি, কারণ তাঁদের বিপ্লব বাংলার বাইরে বিস্তার লাভ করেনি, ইংরেজ সেনাবাহিনী ছিল সংখ্যায় বিপুল, সুশিক্ষিত এবং অস্ত্রবলে বলীয়ান্, তাদের তুলনায় বিপ্লবী সন্ন্যাসী ও ফকিরদের সংখ্যা খুবই কম এবং তাদের (সন্ন্যাসী ও ফকিরদের) অস্ত্রশস্ত্রও ইংরেজদের অস্ত্রের মত উন্নত ধরণের ছিল না এবং সামর্থ্যের অভাবে তাঁরা ইংরেজদের যুগপৎ সব জায়গা হতে আক্রমণ করতে পারেন নি। তবে তাঁরা মিলিতভাবে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে একটানা ৪০ বৎসরের উপর সংগ্রাম চালিয়ে দেশবাসীদের শিখিয়ে গিয়েছেন যে, অত্যাচারী বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে চাই মনোবল, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টা এবং সশস্ত্র আন্দোলন।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে

মারাত্মক-ব্লাক-ম্যাজিক

ডি, আর, সরকার

আজ আপনাদের নিকট যে অলৌকিক কাহিনী এই প্রবন্ধে বর্ণনা করিব, তাহা আমার এক পশ্চিম-ইউরোপীয় বন্ধুর নিকট হইতে শোনা। তিনি ও তাঁহার পত্নী, তাঁহাদের আফ্রিকার জঙ্গলে ভ্রমণ কালে আইভরি কোষ্টের নিকট ইফাউব নামক এক পল্লীতে এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কাহিনীটি যদিও ভয়াবহ কিন্তু সত্য। যে সময় সেখানকার বাসিন্দারা তাহাদের বাৎসরিক ফসল সংগ্রহ করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করে, সেই সময় প্রতি বৎসরই একদল ম্যাজিক ক্রীড়া-প্রদর্শক সেই সুযোগে গ্রামের লোকেদের কাছ হইতে কিছু উপার্জনের আশায় এই লোমহর্ষক ক্রীড়া দেখাইতে আসে।

গ্রামের লোকেরা যেখানে সকলে সমবেত হয়, ঠিক সেই স্থানে সুযোগ বুঝিয়া খেলুয়াড় খেলা সুরু করে। তাহাদের দলে থাকে কতকগুলি স্বাস্থ্যবতী বালিকা, ডুমডুমী প্রভৃতি বাদ্য, বাদ্যকর ও নানা রকম খেলার উপকরণ। মেয়েগুলির পোষাক সামান্য কৌপীন, তাছাড়া খেলা দেখাইবার জন্য তাহারা কিছু টুকরা-করা কাপড়ের ফালী ঘাঘরার ন্যায় কোমরে পরে। ইহা খেলার জন্য তৈয়ারী হয়।

খেলার আরম্ভে শুরু হয় কয়েক মিনিট ধরিয়া একটানা বাজনা। দুই জন বলিষ্ঠ লোক চারটি বালিকা সমেত খেলার প্রাঙ্গণে প্রথমে আসে। এই বালিকাদের বয়স চার হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে। বলিষ্ঠ গঠন পুরুষ দুটি লাল ভেলভেট দেওয়া টুপী পরে, টুপীর ধারে ধারে কড়ির ঝালর গাঁথা এবং তাহাদের কৌপীন হলুদ রংয়ের কাপড়ের—ঝরা-ঝিনুক ও ছোট ছোট পিতলের ঘণ্টার দ্বারা আকর্ষণীয়। তাহাদের ঘন কৃষ্ণবর্ণ গাত্রের চতুর্দ্দিকে সাদা রংএর চিত্র আঁকা ও পায়ের হাঁটু থেকে নিচু অবধি থাকে মোজার মত বিচিত্র অঙ্কণ। সব সমন্বয়ে যাহা এক ভয়াবহ ও কৌতুহলপ্রদ দৃশ্য।

এইবার খেলা হয় শুরু। প্রথমেই বালিকাদের সমুদয় গাত্রে এক প্রকার মালিশ লেপন করা হয়, যাহাতে ছুরির আঘাতে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়।

সর্দ্দার খেলুড়েটি একটি গরুর শিংএর ভিতর হইতে একপ্রকার গাঢ় তরল পদার্থ নিজের হাতের তালুতে ঢেলে মেয়েগুলির গাত্রে আর একবার মালিশ করে—বিশেষ করে তাদের কপালে, বুকে ও পেটের উপর, সঙ্গে সঙ্গে একপ্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করে। আমার বন্ধুর পাশে দণ্ডায়মান একটি ফরাসী জানা বালক তাহাকে বলে যে, ইহাতে মেয়েটির গাত্রে ছুরীর আঘাতে কোনরকম যন্ত্রণা হবে না।

এই সব অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণায় আমার বন্ধু-পত্নী ভয় পাইয়া তাঁহার স্বামীর নিকট বলে—চল, এখান থেকে সরে পড়ি কিন্তু প্রবল বাজনার শব্দে সবার কথাবার্ত্তা চাপা পড়ে। ডুমডুমীর বাজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তারপর হঠাৎ একেবারে

থেমে যায়। পুরুষ ছুটি মেয়ে চারটিকে বেশ শক্ত করে ধরে এবং লোফালুফী শুরু করে। মনে হয় যেন চারটি মনুষ্য-আকৃতি বল লইয়া খেলা হইতেছে এবং দর্শকদের—বেষ্টনীকে বড় করবার জন্য তাহাদের লোফালুফীর আয়তন বৃদ্ধি করে। মেয়েগুলির মুখে ভয় বা বেদনার এমন কোন চিহ্ন দেখা যায় না, যাহাতে অনুমান করা যায় তাহারা মৃত কি জীবিত। এক এক সময় মনে হয় যেন চারটি আবলুস কাঠের বড় বল লইয়া খেলা হইতেছে, এত দ্রুত তাহাদের গতি। কিছু কিছু দর্শক জানায় যে তাহাদের Hypnotise করা হয়েছে। কোন জীবন্ত মানুষের দ্বারা ইহা সম্ভবপর, কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন।

হঠাৎ বাজনা থামে এবং মেয়েগুলিকে, কাছে খড়ের তৈরী মাদুরে ছুড়ে দেওয়া হয়। কিছু সময়ের মধ্যে তারা হাত-পা ছড়ায় মনে হয় যেন একটা সাপের বাণ্ডিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা উঠে এবং এমন সুন্দর সর্প নৃত্য করিতে থাকে যাহা সত্যই অপূর্ব্ব এবং যে কোন পেশাদার শিক্ষিত নৃত্য-শিল্পীকেও লজ্জা এনে দেয়। তাহাদের নৃত্য যখন শেষ হয় মনে হয় যেন একটি বৃহৎ রজ্জুগুচ্ছ পাক খুলিয়া মেয়েগুলির হাত, পা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ একটি একটি করিয়া পৃথক হইয়া গেল।

কিন্তু এই সব খেলাগুলি হচ্ছে প্রকৃত খেলা—যা এখন দেখান হবে তার সূচনা মাত্র। পুরুষ খেলুড়েরা—এইবার রিং এ আবার প্রবর্ত্তন হলেন, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে বৃহৎ এবং লম্বা আকৃতির শাণিত ছুরিকা ঠিক কসাই খানার মাংস কাটার ভোজালীর মত। এইবার একটি বালিকা সাধারণত আর্চ্চ হবার ভঙ্গীতে মাটীতে পা রাখিয়া পেছনে শরীর নুইয়ে হাত ছুটি মাটীতে ঠেকাল। আবার শুরু হল টমটম বাদ্য এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনে হয় যেন বাদ্যকারেরা পাগল হয়ে গেছে। দলপতি পুরুষ খেলুড়ে একটি বৃহৎ কাঠের হাতুড়ী তাদের ঝুড়ির ভিতর থেকে টেনে বার করে, সজোরে মেয়েটির পেটে ছুরীটি বিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার যে, মেয়েটা কিছুমাত্র আভাষ দিলেনা যে তার পেটের ভিতর একটি বৃহৎ ছুরিকা বিদ্ধ করা হল। সূর্য্যের আলোকে স্পষ্ট দেখা গেল—আঘাত এত জোরে হল যে আঘাতকারীর হাতের পেশী ফুলে উঠলো ও ছুরীর বাঁটের ওপর হাতুড়ীর আওয়াজ বাজনা বাজা সত্ত্বেও শোনা গেল। এই নিদারুণ আঘাত পর পর চারটি বালিকার উপর সমানে করা হল এবং দর্শকগণকে আহ্বান করে দেখান হল যে সত্যই ছুরীগুলি কোন রকম নকল নয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল তাদের পেটের উপর এক বিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই। এবং মেয়েগুলির কোন রকম পরিবর্ত্তন হল না। এইবার নতুন উদ্যমে বাজনা ও খেলুড়েদের উৎসাহ দেখা গেল।

বাদ্যকারেরা আবার বাজনা বন্ধ করল এবং খেলুয়াড়েরা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিল, তাদের নতুন দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য। কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট বালিকা দৌড়ে একটি বলবান পুরুষ খেলোয়াড়ের কাছে গেল। দর্শকগণ গজ পাঁচ ছয় আরও তফাতে দাঁড়াল এবং নূতন খেলার জন্য সাগ্রহ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করতে লাগলো। চকিতের মধ্যে মেয়েটিকে একটি পুরুষ খেলোয়াড় কাঁধে তুলে নিল এক ধারে এবং অন্যদিকে আর একজন দুইটি বৃহৎ ছুরিকা সোজা ধরে, ফলার সূচ্যগ্র উপর দিকে করে। যে সব দর্শক এই খেলাটি আগে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল তারা একপ্রকার এমন শব্দ উচ্চারণ করল যাহাতে বোঝা যায় আর সব দর্শকদের মধ্যে যেন ভীতি সূচনা দেখা গেল, কারণ তারা জানতো এবার যা দেখান হবে তা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমার বন্ধুটি বলল যে অনেকে দাঁত দিয়ে নিচুকার ঠোঁট কামড়ে ধরে রইল কিন্তু তাহাদের চক্ষু রইল খেলোয়াড়দের মধ্যে নিবদ্ধ। ডুরু ডুরু শব্দে আবার বাজে ডুমডুমি। এই দৃশ্য তুলনা করা যায় কোন সারকাস্ মঞ্চে, যখন ড্রামার একটি বিশেষ অবতারণায়, প্রথমে একপ্রকার দ্রুত বাদ্য ধ্বনি করে ও হঠাৎ থেমে যায় এবং সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে একটি দ্রষ্টব্য খেলার মধ্যে।

তারপর বিদ্যুৎ গতিতে ঐ পুরুষ খেলোয়াড়টি—মেয়েটিকে জোরে ছুড়ে দিল সেই দণ্ডায়মান ছুরির উপর। গেল গেল শব্দে দর্শকদের

খুব জোরে সে মেয়েটির পেটে শাণিত ছুরী বিদ্ধ করিল
এক বৃহৎ হাতুড়ীর দ্বারা।

মধ্যে অনেকে তাদের চোখ বুজিয়ে ফেলল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আর একটি পুরুষ দৌড়ে ছুরির ঠিক এক ইঞ্চি উপর থেকে মেয়েটীকে লুফে নিল। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে তখনও অনেকে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি যে মেয়েটি মৃতা না জীবিতা। এই দৃশ্য বার বার দেখান হল, পর পর অনেক বার। যারা দুর্ব্বল-চিত্ত তারা সেখান থেকে পালিয়ে গেল। একটি আদিবাসী যে বহুদিন আবাদিনে বাস করে—সে আমার বন্ধুকে বললে যে, মহাশয় প্রতিবৎসর এই রকম খেলুয়াড়েরা এই স্থানে মারাত্মক ব্লাক ম্যাজিক দেখাতে আসে এবং একটি দুটি বালিকা এই খেলার মধ্যে নিজেদের জীবন বিসর্জন দেয়। ছুরির দ্বারা বিদ্ধ হয়ে।

(প্রত্যক্ষদর্শীর কাহিনী অবলম্বনে)

বর্গালী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

সেই যে মঞ্জু রজতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেমে এলো তো একেবারেই এলো।

কিন্তু মঞ্জুর এতোটা আহত হবার কি ছিল—সে তো জানতো রজত মদ খায়? সে তো জানতো রজতের সে খাওয়ায় কোন পরিমাণ বোধ নেই? সে জানতো শুধু দেশী বান্ধবী নয়। বিদেশিনী বান্ধবীরও অভাব নেই রজতের?

হাঁ, সবই জানতো সে। কিন্তু মানুষের কোন জানাই তার আপন-জানার বাহিরে এক পাও বাড়াতে পারে না। তাই মঞ্জুর ধারণায় রজতের সব বন্ধুত্বের চেহারাই এসে থেমেছিল ওর সঙ্গেই রজতের বন্ধুত্বের চেহারায়। আর তা ছাড়াও জানা এবং শোনার সঙ্গে চোখে দেখার তফাৎ অনেক। কান যে কথা অনায়াসে অগ্রাহ্য করে—চোখ তা দেখে থমকে দাঁড়ায়।

জানার আর চোখে দেখার ভেতর আসমান-জমিন তফাৎ যদি না হতো তবে আজকের মানুষ এমন সুস্থমনে ঘরে বসে খেতে-ঘুমোতে পারতো না—কখনই পারতো না—পাগল হয়ে উঠতো তারা। মানুষ জানে না কোন কথাটা? বাস্তুহীন মানুষগুলোর মাথা গুঁজবার আশ্রয়টুকু থেকে শুরু করে খাওয়া, পরা, শিক্ষা স্বাস্থ্য—যাবতীয় ব্যাপার নিয়ে এক 'সেবা' শব্দের দুর্গে বসে, এক 'সেবা' শব্দের নামাবলী গায় জড়িয়ে যে, আমেরী আর অর্থলোভী খেলা যথেচ্ছাচারে বর্তমান রাজনৈতিক পুরুষরা খেলে চলেছেন,—চোখের আড়ালটাই তো তাদের একমাত্র বাঁচোয়া। নইলে চোখের ওপর একটা সামান্য চোরকেও চুরি করতে দেখলে তাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে না তারা? অপকর্মকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না তারা?

—জানায় যা সয়ে যাওয়া যায়, দেখায় তার আদ্ধেকও সয় না—মঞ্জুর তারুণ্যের শুচিতাও যে দেখায় রজতের এ জিনিষ গ্রহণ করতে পারবে না। আর আশ্চর্য্য কি।

নেমে এসে শেষ শক্তিটুকু দিয়ে মঞ্জু পুলিশ ডাকল, গাড়ীর নম্বর নিল এবং ড্রাইভারকে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিতে বাধ্য করল। তার পর গাড়ী চললে গদিতে মাথা রেখে একরকম শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। ক্রুদ্ধ পাঞ্জাবী ড্রাইভার এমন গতিতে গাড়ীটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চললো যে, যদি না পুলিশের কাছে গাড়ীর নম্বর থাকতো আর দুর্ঘটনা ঘটলে ওর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী এবং ড্রাইভারের বিনাশ এক সঙ্গেই ঘটবে···এই না হতো, তবে মঞ্জুর পক্ষে এভাবে চোখ বুজে থাকা সম্ভব হতো না। মাঝে মাঝে যা হুঁ' একবার চোখ খুলল সে তা শুধু পথ বলে দিতে।

বাড়ী গিয়ে দিদি আর বৌদিকে আজ জয়ার সব কথা বলবে প্রথম ধাক্কায় মঞ্জু মনে মনে তাই স্থির করে ফেলল কিন্তু পর মুহূর্তেই মত পরিবর্তন করলো সে। কি লাভ হবে বলে? কিছু কিছু না। যদিও বৌদির হাতে টাকা আছে। বাবা মার কাছ থেকে সে নিয়মিত মাসোহারা পায়। প্রথম হৃদয়াবেগে সে হাত করবেও কিছু কিন্তু তার সেই আগ্রহ মন্দীভূত হয়ে আসতে সময় লাগবে না। তাই তার কাছে দান হিসাবে নেওয়ার চাইতে ধার হিসাবে নেওয়ারই সুবিধা বেশী। আর মৌরী? তার সামর্থ্য তো ওরই মতো। সে হয় ত স্তম্ভিত হয়ে যাবে—বিরক্ত হয়ে উঠবে মঞ্জুর একটা গোটা সংসার টেনে চলার দুঃসাহস দেখে। না, দরকার নেই। আজকের ট্যাক্সি ভাড়াটা সে এক বন্ধু ধার চাইছে বলেই বৌদির কাছ থেকে নেবে।

দিদি বৌদি বাড়ী নেই! অন্যদিন হলে সমস্তদিন বাদে রাতে ফিরে এতে আরাম বোধ করতো সে। কিন্তু আজ শরীর ছেড়ে এলো মঞ্জুর। টাকা—টাকা কোথায় পাবে সে। নির্জন বাড়ী। ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে। তার মাসী পিসিমাও বাড়ী নেই? থাকলে কি তিনি এমন বৃথা ঘরে ঘরে বাতি জ্বলতে দিতেন। শুধু রান্না ঘর থেকে জোর খুন্তি নাড়ার শব্দের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে রামুর গান—মঞ্জুরই শেখানো সেই গান, 'হরদম্ লাগাতা ঝাড়ু, তবি এচ্ছা হাল—হিঃ হিঃ, এত্তা জঞ্জাল—'

গিয়ে রান্না ঘরের দরজায় উঁকি দিল মঞ্জু—রামু, কেউ বাড়ী নেই রে? গলা দিয়ে যেন স্বর বেরুতে চায় না মঞ্জুর।

হাতের খুন্তি উপর দিকে তুলে ছাদটা দেখিয়ে রামু বলল—আছে ছাদে।

—কে দিদি বৌদি?

—না পিসিমা। আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল রামু—হয়ত মঞ্জুর দেরী করে ফেরা বা খাওয়ার কথা, কিন্তু ততক্ষণে মঞ্জু ছাদের দিকে ছুটেছে। যে পিসিমার কাছ থেকে টাকা নেবার কথা এতক্ষণ তার একবারও মনে হয়নি—ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায় বলেই মনে হয়নি, এখন সেই পিসিমা আছেন শুনেই যেন সে হাতে স্বর্গ পেলো। ড্রাইভারের রুক্ষ হাতের হর্ণের শব্দ কানে নিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে উপস্থিত হলো ছাদে। ব্যস্তসমস্ত ভাবে পিসিমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—শিগ্গির পিসিমা—শিগ্গির—গোটা চল্লিশেক টাকা ধার দেও তো আমায়। আমার এক বন্ধুর ভীষণ দরকার। কালই ফিরিয়ে দেবে সে তোমার টাকা।

মঞ্জুর মুখের রেখায় রেখায় এমন কিছু ছিল পিসিমার মুখ দিয়েও টাকা না দেওয়ার কথাটা বেরুতে পারল না। যদিও কালই ফিরিয়ে দেবার কথাটা তিনি আদপেই বিশ্বাস করলেন না—তবু জপের মালা থলিতে ভরে উঠে দাঁড়ালেন। নীচে এসে টাকা বের করে দিতে দিতে একটা সৎপরামর্শ দেওয়ার মতো চোখের ইঙ্গিত করে চাপা কণ্ঠে বললেন—গোটা কুড়ি দে। চল্লিশ চাইলেই চল্লিশ দিবি কেন—বল মাসের শেষ হাতে নেই—

অধৈর্য্য মঞ্জু বলে উঠল—দাওনা। বলছি তো কাল দিয়ে দেবে। তেমন দরকার না হলে তোমার কাছে চাইতাম নাকি—

'তোমার কাছে চাইতাম নাকি' কথাটায় ক্ষুব্ধ হলেন পিসিমা। মুখ গোমরা করে টাকা বের করে দিলেন তিনি। টাকা হাতে নিয়ে

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছুটল মঞ্জু নীচে। জয়ার চিন্তার চাইতেও যেন বেশী বিপদে ফেলেছিল এই ট্যাক্সি ভাড়ার চিন্তাটা! এবার টাকা না পেলে সে যে কি করতো! শিউরে উঠল মঞ্জু। না, ড্রাইভারের দোষ কিছু নেই। আজ তার উপর জুলুমই চালিয়েছে মঞ্জু! বিগড়ে তো যাবেই সে। বকসিশ শুদ্ধ টাকা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিয়ে সত্যি সত্যি দুঃখ প্রকাশ করলো মঞ্জু। বললো, তার কাছে কিছুই ছিল না বলে বাধ্য হয়েই তাকে জোর করে বাড়ী পৌঁছে দিতে বাধ্য করেছে সে—সর্দারজী যেন কিছু মনে না করে। তার কাছে টাকা থাকলে সে নিশ্চয়ই সর্দারজীর সমস্ত দিনের ক্ষতি পূরণ করে দিত। তারপর যাওয়ার সময় গেল সে সর্দারজীকে নমস্কার জানিয়ে।

যদিও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে রূঢ় হাতেই মঞ্জুর হাত থেকে একরকম টাকা ক'টা টেনে নিয়ে গুণতে শুরু করেছিল সর্দারজী—কিন্তু মঞ্জুর কথা শুনে থেমে গেল তার হাত। আর তারপর সমস্ত ফিরতি পথটা মঞ্জুর শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্লিষ্ট—ছোট্ট মুখটা বারবার তার চোখের ওপর ভেসে উঠতে লাগল আর বারবারই সে সশ্মশ্রু মাথাটা নাড়তে নাড়তে মনে মনে নিজের ব্যবহারে নিন্দা করতে লাগল এই বলে যে, এই ছয়-সাত ঘণ্টার এদের পরস্পরের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে আর কিছু না বুঝুক এটা তো সে নিশ্চয়ই বুঝেছিল যে, আত্মহত্যা করতে যাওয়া মেয়েটি এর বন্ধু ছাড়া আর কিছুই নয়। একে রাস্তার উপর অপমান করাটা তার ঠিক কাজ হয় নাই—না হয়, কাল এসে ভাড়া নিয়ে যেত সে।

কিন্তু মঞ্জু কি তারপর এবার সত্যি গিয়ে মৌরীর চিলে কোঠায় দরজা বন্ধ করলো?

না। সময় যেমন কারু জন্য বসে থাকে না, কোন কাজও তেমনি কারু জন্য ঠেকে থাকে না। হয়তো একজনের সাহায্যে যে কাজ যত সহজে, যত অনায়াসে হতো তা হয় না—দেরী হয়, বিলম্ব ঘটে কিন্তু ঠেকে থাকে না—কারুর জন্য কেউ থেমে যায় না। মঞ্জুও থেমে গেল না রজতের জন্য। পরের দিন মমতাকে সে যে সময় দিয়ে এসেছিল হাসপাতালে উপস্থিত হবার, ঠিক সেই দশটায় সময় গিয়ে হাজির হলো সে হাসপাতালের দরজায়। আর সেখানেই দেখা হলো নীলের সঙ্গে। সে ভাবলো হঠাৎ কিন্তু হঠাৎ নয়, নীল ওরই জন্য অপেক্ষা করছিল। আপন চিন্তায় চলছিল মঞ্জু—নেমে পড়ল নীলের ডাকে—আরে থামুন, থামুন। একেবারে সোজা ঢুকে যাবেন না! আমি আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি যে। ঠিক তেমনি একটা ফাইল হাতে এগিয়ে এলো নীল ওর কাছে।

—আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন এখানে। আপনি জানলেন কি করে আমি এখানে আসবো?

—কেন, আপনি কি ভুলে গেলেন নাকি মমতা আমার বোন—

না, মমতা যে নীলের বোন একথা মঞ্জু ভুলে যায়নি ঠিকই, কিন্তু আশ্চর্য্য একবারও মনে পড়েনি তার সে কথা! হয়তো আর্থিক প্রয়োজনের ব্যাপারে নীলকে মনে পড়ার কথা নয় বলেই তার কথা ওর মনে হয়নি। কিন্তু মনে না পড়লেও ভারি খুশী হয়ে উঠল মঞ্জু নীলকে দেখে। একেবারে হাসপাতালের গেটের মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মঞ্জু—চুপ সরে রেলিং ধারে গিয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'তাই তো! তা কালকে যে অবস্থার মধ্যে ছিলাম—মনে পড়বার কথাও নয় কিছু।' তা মমতার সঙ্গে দেখা করতে এসে তুমি শুনলে কালকের ঘটনা।

নীলের হাতে তেমনি এক মস্ত ফাইল বই। ডান হাত থেকে সেটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে রেলিং ধরে দাঁড়ালো সে। বললো, হাঁ। মমতা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল মেয়েটি আপনার কেউ হয় কি না। কিন্তু আমিও তো সে কথা জানিনে। কে মেয়েটি? আমার যেন মনে হচ্ছে এদের কথার একটা আভাস আমায় একদিন আপনি দিয়েছিলেন—তাই কি?

হাঁ, নীল তার সেই ধনী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির গাড়ীতে ওকে জয়াদের বাড়ীর দরজায় যেদিন নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেদিন নীলকে মঞ্জু বলেছিল, এদের কথা আর একদিন সে নীলকে বলবে। এখন পর্যন্ত সে নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। নীলের জিজ্ঞাসার জবাবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো মঞ্জু—হাঁ, বলেছিলাম।

—চলুন তবে কোথাও বসে ব্যাপারটা শুনি। মেয়েটি ভালো আছে। তাকে মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে—ওদিকে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু মমতার সঙ্গে একবার দেখা করতে ওর ভেতরে যেতেই হবে। পিসিমার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সংবাদ বাড়ীর কারু জানতে বাকী নেই। সকালে উঠেই আবার ফের বৌদির কাছে ধার চাওয়া তাই মঞ্জুর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্লাড ব্যাঙ্কের টাকাও নিয়ে আসতে পারেনি—মমতাকে সেটা একটু জানিয়ে আসতে হবেই। নইলে সে ভাববে কি ওকে। বলল—দাঁড়ান, আমি আসছি একটু মমতার সঙ্গে দেখা করে। বলেই গলায় ষ্টেথিস কোপ ঝোলান একদল ক্লাস ফেরৎ ছাত্রের ভেতর দিয়ে, হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা লাল ক্রশচিহ্নিত মস্ত মস্ত গোটা দু'তিন এম্বুলেন্সের পাশ দিয়ে মঞ্জু হন্ হন্ করে ঢুকে গেল ভেতরে।

নীলের নয়া ধরানো সিগারেটের পুরোটা শেষ হতে হতেই ফিরে এলো মঞ্জু। বলল—চলুন।

দুজনে নেমে এলো রাস্তায়। কলকাতার ভিড়ের আজকাল আর ভারী পাতলা নেই। লেগেই আছে ভিড়! নইলে এখনও অফিস কাছারীর সময় হয়নি, এখনই রাস্তা ফুটপাত ভর্ত্তি গিজগিজ করছে। লোকজনের পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে মঞ্জু বললো, আপনার বোনকে না পেলে জয়াকে—মানে মেয়েটিকে বাঁচাতেই পারতাম না। কি ব্যবস্থা হাসপাতালের দেখুন, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কেস, এক ঘণ্টার ওপর পড়ে রয়েছে ইমার্জেন্সি ঘরের টেবিলের ওপর—কোথায় বা ডাক্তার, কোথায় বা নার্স—কোথায় বা কি। কি যে করবো বুঝেই উঠতে পারছিলাম না—কিছু করতেও পারতাম না যদি মমতাকে না পেতাম। বেচারী, মাত্র তার ডিউটি শেষ করে কোয়ার্টারে গিয়েছিল। কিন্তু আমার ফোন পাওয়া মাত্র ছুটে এসেছে।

একটা চায়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে নীল জিজ্ঞাসা করল—এটায় ঢুকবেন?

—চলুন।

বসে চায়ের অর্ডার দিয়ে নীল জানতে চাইল ঘটনা। বললো, এবার বলুন, ঐ মেয়েটি কে—কেন সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল?

ঠিক রজতের কাছে একদিন যেভাবে জয়ার কথা সে বলেছিল ঠিক তেমনি ভাবে তার কথা আজ মঞ্জু নীলের কাছে বলল। শুধু এর ভেতর থেকে যেটা কেটে বাদ দিল তা হলো রজতের প্রসঙ্গ। বাদ দিত না, নীলের কথা যেমন রজতের কাছে বলেছিল, তেমনি করেই বলত মঞ্জু নীলের কাছেও রজতের কথা। যদি আর একদিন আগেও এই গল্প সে নীলের কাছে করতে বসতো তবে তার ভেতর রজত বড় আসন পেতো।

নিবিষ্ট মনে শুধু শুনে গেল নীল। তারপর মঞ্জু থামলে একটু সময় চুপ করে থেকে বলল—কলেজ আছে তো?

—আছে। তবে যাবো না।

—কেন, টাকার খোঁজে বেরুবেন?

—উপায় কি।

—কোথাও গেলে টাকা পাবেনই এমন নিশ্চয় জায়গা আছে?

—না।

—তবে চলুন আমার সঙ্গে। ব'লে বেল বাজিয়ে বয়কে ডাকল নীল।

—কোথায় যাবো আপনার সঙ্গে? টাকার খোঁজে?

নীল হেসে বললো, না, খুঁজে বেরোবার মতো টাকা অনুসন্ধানের অত ঠিকানা আমার জানা নেই। চলুন ন্যাশনেলে যাওয়া যাক। পুজোর মরসুম চলছে—কালও কয়েকজন এসেছিল লেখা চাইতে। লেখা পেলে টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে তারা লেখা নিয়ে যাবে। চলুন লাইব্রেরী'তে—বই পত্তর ঘেটে কিছু বিষয় বস্তু বের করা যাক। অন্তত এর ধড়, ওর মাথা, তার হাত পা জোড়া দিয়ে কিছু প্রথম শ্রেণীর নিবন্ধ তো নিশ্চয়ই তৈরী করে ফেলা যাবে। আর যদি জব চার্ণক ঘেঁটে, পুরোনো কবর খুঁড়ে কিছু গল্প বের করে ফেলতে পারি তো কথাই নেই। বড়দের জন্য বিলিতি ভূতের গল্প লিখে ফেলব দেখবেন ডজনখানেক।

ডজন না হলেও দিন দশেকের ভেতর গোটা সাতেক লেখা তৈরী করে ফেলল—নীল। মঞ্জুকে প্রশংসায় উচ্ছসিত হয়ে উঠতে দেখে বলল—জনতা প্রডাকশন গাড়ী মেশিন, ষ্টোভ ইত্যাদির মতো এ হলো জনতা প্রডাকশন লেখা।

—না, না বেশ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে, চমৎকার হয়েছে লেখাগুলো।

—ভালো না হলে সম্পাদক নেবেন কেন, পাঠকই বা পড়বে কেন।

—তবে বলছেন যে, জনতা প্রডাকশন।

এ কথার জবাব দিল না নীল। বললো, কথাটা হচ্ছে কি জানেন, অর্থাভাব একেবারে ব্রহ্মতালুতে এসে না ঠেকলে এসব লিখতে ইচ্ছে করে না। বড্ড সময় নষ্ট হয়—আমার আসল কাজ একেবারে বন্ধ থাকে।

মঞ্জু জানে না নীলের আসল কাজটা কি। সে বলে না। জিজ্ঞাসা করলে হাসে। তবে মঞ্জু এটুকু জানে তার ধ্যান, জ্ঞান, সাধনার বিষয় একটা কিছু আছে। যার ভেতর মগ্ন হয়ে থাকে সে সব চাইতে বেশী সময়। অন্য লেখা লেখে সে অনুপায় হয়ে। কখনো নিজের জন্য, কখনো অপরের জন্য। এখন যেমন মঞ্জুকে কিছু সাহায্য করা যায় কিনা—তার জন্য লিখছে। নীলকে—সাহায্য করতে গিয়ে এই ন্যাশানেল লাইব্রেরী যেন মঞ্জুর মনে নেশা ধরিয়ে দিল। কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। নীলের প্রয়োজন থাক আর নাই থাক ও নীলের সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে বসে। তারপর নীলের কাজ হয়ে গেলে এক সঙ্গে ফেরে। চারটার সময় জয়াকে দেখতে যায়। ছটার সময় ভিজিটিং আওয়ার শেষ হয়ে গেলে বেরিয়ে এসে কখনো কিছুক্ষণ কোন পার্কে বসে নীলের সঙ্গে—কখনো বা বাড়ী চলে আসে। এই হলো ওর বর্ত্তমানের রোজ নামচা।

মৌরী দিন কয় অত্যন্ত রাগের সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে রইল মঞ্জুর দিক থেকে। না বলল কথা, না জিজ্ঞাসা করল কিছু। তারপর আর পারলো না। রোজকার মতো সেই বেলা নয়টায় প্রস্তুত হয়ে মঞ্জুকে বেরুতে দেখে কঠিন গলায় ডাক দিল মৌরী—মঞ্জু।

থেমে পড়ল মঞ্জু। একটু মুখ টিপে হেসে মৌরীর দিকে ফিরে জবাব দিল মঞ্জু—আজ্ঞে।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুচকালো মৌরী। মঞ্জুর ইয়ার্কি যেন অসত্য ঠেকল তার কাছে। একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, তুই ঠিক করেছিস এবার পরীক্ষা দিবিনে, এই তো?

—কেবল মনগড়া কথা নিয়ে মনগড়া ভাবনা ভাববি আর মন খারাপ করে গুম্ হয়ে থাকবি। কেন পরীক্ষা দেবো না? আমার প্রতিদিন—প্রতি ঘণ্টায় পড়া এগুচ্ছে—জানিস!

—এই বিশ দিনের ভেতর ত্রিশ মিনিট একত্রে তুই বই নিয়ে বসিসনি—আর যাকে বলে ঊষায় বেরুচ্ছিস, নিশায় ফিরছিস—তোর পড়া এগুচ্ছে কি করে?

—এই সেদিন তো পরীক্ষা দিলি। লাইব্রেরীর কাজ বলে একটা বস্তু আছে তো? তোর ধারণাই নেই সে কাজ আমার কতটা এগিয়ে গেছে—দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে খাতাগুলো এনে।

এমনি সময় মঞ্জু দেখতে পেলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে রামু প্রাণপণে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। কি ব্যাপার? মৌরীকে 'দাঁড়া আসছি' বলে বাইরে বেরিয়ে এলো মঞ্জু। রামু মৌরীর ঘরের কাছ থেকে আরো কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে বসবার ঘরটা হাত দিয়ে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল—দিদিমণি, জামাইবাবু।

—জামাইবাবু! জামাইবাবু আবার কে এলো তোর?

তাড়াতাড়ি নিজের মুখে আঙুল চাপা দিয়ে মঞ্জুকে আস্তে কথা বলতে ইসারা করল রামু। তারপর তেমনি চাপা কণ্ঠে বললো—দেখেই যান না।

রামুর কারুর আসার সংবাদ নিয়ে এমন চাপাচাপির অর্থ ধরে উঠতে না পেরে গিয়ে বসবার ঘরের পর্দা সরিয়ে ডাক দিল মঞ্জু।

ঘরের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল, তাঁকে দেখে মঞ্জু হেন ব্যক্তিও প্রথম ধাক্কায় পর্দা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসতে যাচ্ছিল। কিন্তু লোকটি দেখে ফেলল তাকে। বাধ্য হয়েই একমুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকতে হলো মঞ্জুকে। কিন্তু কি করবে, কি বলবে যেন বুঝে উঠতে না পেরে বোকা বোকা মুখে বলে উঠল—আরে, কি ভাগ্য আমাদের! বসুন—বসুন।

[ক্রমশঃ।

বিপ্লবের সন্ধানে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ সালে রাজবন্দীদের মুক্তির পর সম্বর্দ্ধনার একটা হিড়িক লেগে গিয়েছিল, পাইকারীভাবে। ব্যাপারটা হয়ে উঠেছিল একটা অ্যান্টি-গভর্ণমেন্ট ডিমনষ্ট্রেশনের মতন—সরকার যাদের বিনা বিচারে বন্দী করে, দেশের লোক তাদের শ্রদ্ধা করে, সভা থেকে এটাই ঘোষণা করা হত। সব রাজবন্দীই ছিল কংগ্রেস-কর্মী, এবং খাঁটী-খদ্দর-শোভিত,—সুতরাং প্রদর্শনীটা হত ভালই,—এবং বিভিন্ন স্থানের কংগ্রেস কমিটীই ছিল উদ্যোক্তা।

এমনি এক সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর তরফ থেকে। তখন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট। তাঁকে ব্যবহারিক রাজনীতিতে নামাবার চেষ্টা সুরু হয়েছিল এই হাওড়া জেলা কংগ্রেস থেকেই। অবশ্য কংগ্রেসের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে,—আর যারাই স্বরাজ চাক্, হাওড়ার লোক যে স্বরাজ চায়না, এটা তিনি বুঝেছেন!

যাইহোক, দুই বড় বিপ্লবী দলের মিলনের পর পরামর্শ হয়েছিল সন্তোষ মিত্রকে কোণঠাসা করতে হবে,—যাতে সে আবার ২২ সালের মতন "ফুট্‌ফাট্" সুরু করে পুলিসকে আবার ধর-পাকড়ের সুযোগ না দিতে পারে। দাদারা বলতেন, বিপিনদা এবং প্রোঃ জ্যোতিষ ঘোষ গোপনে তাকে সমর্থন করেন,—বস্তুতঃ তাঁদের প্রভাব তার ওপরে ছিল,—কিন্তু তাঁরা দাদাদের কাছে সেকথা স্বীকার করতেন না,—বিশেষত বিপিনদা বলতেন, সে আমাকেও মানে না। প্রকৃত কথা মনে হয় এই যে, সে ২২ সালে তাঁদের যেমন মানতো, জেল থেকে বেরোবার পর অবস্থাটা ঠিক তেমন ছিল না। তখন তার একটা নিজস্ব দল গড়ে উঠেছিল, এবং সে বিপিনদাকেও চ্যালেঞ্জ করতো—নিজেকে একটা পৃথক বিপ্লবী দলের নেতা মনে করতো।

তাছাড়া সে সোসিয়্যালিজমের কথাও বলতে সুরু করেছিল, এবং সে বিষয়ে "মাষ্টার মশাই" (প্রোঃ জ্যোতিষ ঘোষ) নাকি ছিলেন তার গুরু। এ ব্যাপারটা দাদাদের এবং বিপিনদার ভারি অপছন্দ। সুতরাং তাকে কোণঠাসা করা চাইই।

দার্জিলিং জেলে ২৪ সালে লর্ড লিটন সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন,—এবং কথাবার্তার মধ্যে সন্তোষ নাকি বড়াই করে বলেছিল,—হ্যাঁ খুন-ডাকাতি তো করেছিই। এই ব্যাপারটা থেকে দাদারা বলতে সুরু করেছিলেন যে, সন্তোষ লিটনের কাছে সব-কিছু বলে দিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে দেশের লোকের কাছে এই কথাটা প্রচারের প্রয়োজন, অথচ তার কোন সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। সে সুযোগ এল, হাওড়ার রাজবন্দী সম্বর্দ্ধনার উপলক্ষে।

হাওড়ার আয়োজনটা হয়েছিল বৃহদাকারে—প্রকাণ্ড প্যাণ্ডাল—প্রকাণ্ড সভা, এবং শেষে রাজবন্দীদের ভূরি-ভোজের ব্যবস্থা। দাদারা পিছনে থেকে শরৎ চট্টোপাধ্যায় এবং সুভাষ বাবুর হাতে তামুক খাওয়ার প্ল্যান আঁটলেন।—প্রথমে নিমন্ত্রণ পত্র বিলির ব্যবস্থার মধ্যে সন্তোষ মিত্রের দলকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হল, বিপিনদার দল,—গিরীন ব্যানার্জি, অনুকূল মুখার্জি প্রভৃতি বিগড়ে গেলেন। ওদিকে হাওড়ায় বিপিনদা এবং সন্তোষ মিত্রের দলের ছেলেরা গোপনে একগাদা নিমন্ত্রণ পত্র—শরৎ বাবুর সই করা পত্র—সন্তোষ মিত্রের হাতে পৌঁছে দিলে। দেখা গেল, প্যাণ্ডালের সভায় সদলবলে সন্তোষ মিত্র উপস্থিত।

তখন সুভাষ বাবুকে দিয়ে শরৎ বাবুকে চাপ দেওয়া হল, সভায় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে সন্তোষ মিত্রের বিরুদ্ধে বলতে হবে। শরৎ বাবু পড়লেন মহা ফাঁপরে,—এবং শেষ পর্যন্ত বক্তৃতার মধ্যে বললেন,—দুঃখের বিষয়, উপস্থিত রাজবন্দীদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যাদের সরকারের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ আছে, যারা পুলিসের কাছে গোপন রিপোর্ট দেয়—ইত্যাদি

একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থা। সন্তোষের নাম করে কিছু বলা হয়নি বলে সে চুপ করেই থাকলো। কিন্তু সভার পরে ভূরিভোজনের ব্যবস্থাটা মাঠে মারা যাওয়ার জোগাড়।—পাছে সন্তোষের সঙ্গে বসে খেতে হয়, সে জন্যে দাদারা ভোজ বয়কট করে চলে এলেন—যাতে কাণ্ডটা এবং প্রচারটা আরো ঘোরালো হয়। বিপিনদার দল থেকে গেল, যাতে ব্যাপারটা অত উৎকট না হয়। আমি গোপনে ভূপতিদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম,—ব্যাপারটা কি?—আপনারা সন্তোষ মিত্রকে সত্যিই স্পাই মনে করেন,—না, এটা তাকে কোণঠাসা করার প্ল্যান? তিনিও গোপনেই বলেছিলেন, কোণঠাসা করার প্ল্যান।

এরপর বিপিনদার দল সন্তোষ মিত্রের জন্যে এক বিশেষ সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেছিলেন মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর তরফ থেকে।

আমি সারদাকে সেখানে পাঠিয়েছিলুম। সন্তোষ মিত্র এই সুযোগে নিজেকে আরো স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিলে, এবং বিপিনদার বিরুদ্ধেও বা তা... শুরু করলে। ফলে বিপিনদা এবং গিরীনদা আবার আমাদের দাদাদের দলে ভিড়ে গেলেন। অনুকূলদা কিন্তু সন্তোষ মিত্রকে ... করলেন না। সুভাষ-সেনগুপ্ত লড়াইয়ে সন্তোষ মিত্র এবং অনুকূলদা সেনগুপ্তের সমর্থনে দাঁড়ালেন।

পরবর্তীকালে—৩১ সালে—হিজলী বন্দী নিবাসে সন্তোষ মিত্র পুলিসের গুলীতে নিহত হলে সুভাষবাবু স্বয়ং সন্তোষ মিত্রের বাড়ীতে গিয়ে তার বাবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এবং হাওড়ার ব্যাপারে ভুল করেছিলেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। দাদারা অবশ্য এরকম কাণ্ড করেননি।

ঢাকায় তখন শ্রীসংঘ তরুণদের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠন করছিল,—এবং তাদের সঙ্গে অনুশীলন পার্টির সংগ্রামও চলছিল,—অনুশীলন পার্টি বাণীসংঘ নাম দিয়ে শ্রীসংঘের পাল্টা এক তরুণসংঘ গঠন করেছিল। ফলে শ্রীসংঘের সঙ্গে যুগান্তর পার্টির সহযোগিতাও চলছিল। শ্রীসংঘের চারজন নেতা—অনিল রায়, সত্য গুপ্ত ("মেজর"), ভূপেন রক্ষিত এবং মণীন্দ্র নারায়ণ রায়—আর মহিলা বিভাগের নেত্রী লীলা নাগ (রায়)। যুগান্তর পার্টির তরফ থেকে জীবন (চ্যাটার্জি) তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো,—এবং সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল মণীন্দ্র বাবুর সঙ্গে। ঢাকায় জীবনের আড্ডায় তাঁর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল।

এই সময় ঢাকায় এক যুব সম্মেলন হয়,—শ্রীসংঘ ছিল তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে। বাণীসংঘের তরফ থেকে যথাশাস্ত্র এক মারামারি বাধাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কিন্তু সেটা বেশী দূর গড়াতে পারেনি। কাণপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত ও সন্ত জেল-প্রত্যাগত মোজাফ্‌ফর আহম্মদ বোধ হয় প্রধান অতিথি ছিলেন। অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল, গলার আওয়াজ ততোধিক ক্ষীণ। আমিও নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলুম। কমিউনিষ্ট পার্টি বা তার মার্কা তখনও চালু হয়নি। মোজাফ্‌ফর প্রভৃতি তখনও বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের নেতা বলেই পরিচিত। আর কংগ্রেসী ও বে-সরকারী কাগজে পত্রে তখনও সরকার বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এই নীতির দোহাই দিয়ে "কমিউনিষ্টদের" সমর্থনে লেখা হত যে, শুদ্ধ মতবাদের জন্যে কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া অন্যায়। কার্যত কোন বে-আইনী কাজতো তারা করেনি। ঢাকায় যুব সম্মেলনে মোজাফ্‌ফর আহম্মদের নিমন্ত্রণের কারণ এই।

তখন একটা অল-ইণ্ডিয়া কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠনের সাহায্য করার জন্যে বিলাতী কমিউনিষ্ট ফিলিপ স্প্রাট এবং হাচিন্সন, আর অষ্ট্রেলিয়ার কমিউনিষ্ট নেতা ব্রাডলে ভারতে আসেন এবং মোজাফ্‌ফর ডাঙ্গে প্রভৃতির সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসের পর থেকেই শ্রমিক আন্দোলন আবার জোরদার হতে থাকে। ২৮ সালে বড় বড় ধর্মঘটের হিড়িক লেগে যায়। বম্বের গিরণি কামগর (লালবাণ্ডা) ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা (বস্ত্রশিল্প শ্রমিক) ৭০ হাজারে ওঠে। বম্বের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের এক বিরাট ধর্মঘট ছয় মাস স্থায়ী হয়। সারা দেশে ধর্মঘটে সর্বসাকুল্যে ৩ কোটি ২০ লক্ষের ওপর "রোজ" ধর্মঘটে কাজ বন্ধ থাকে। সোসিয়্যালিজম কথাটাও ক্রমে জনপ্রিয় হতে থাকে। তরুণদের মনে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী নির্বিশেষে কমিউনিষ্টদের কথাগুলোই সবচেয়ে বেশী সাড়া দেয়। কারণ তার মূলে আছে বিপ্লবের কথা, এবং সাইমন কমিশন বয়কটের আন্দোলনেও তারা সামিল আছে।

এই সাইমন কমিশন লাহোরে গেলে যে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে কৃষ্ণপতাকা প্রদর্শিত হয়,—পুলিস তার ওপর প্রচণ্ড লাঠি চার্জ করে মিছিল ভেঙ্গে দেয়। সে মিছিলের নেতৃত্ব করছিলেন লালা লাজপত রায়—সামনের সারিতে থেকে। তাঁর পাঁজরে এক লাঠির গুতো মেরে পুলিস তাঁকে জখম করে, এবং সেই আঘাতেই তিনি হাসপাতালে মারা যান। এরই কিছুদিন পরে সণ্ডার্স নামক একজন পুলিস সাহেব বিপ্লবী নওজোয়ানদের গুলীতে নিহত হয়।

এদিকে বাংলার দুই বিপ্লবীদলের মিলনের পর মনোরঞ্জন দা' (গুপ্ত) ঢাকায় গেলেন এবং অনুশীলনের নেতা প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে যুগান্তর দলের লোকদের আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রতুলবাবুরও তাঁর দলের লোকদের মনোরঞ্জনদা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু পরে গোপনে শোনা গেল, প্রতুলবাবু সে বিষয়ে কিছু কারচুপি করেছেন। শুনে মনে হল, ওদের সঙ্গে মিলন বড় কঠিন ব্যাপার, কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা কেউ বললে না।

যাদুদার অবর্তমানে কলকাতার বাজারে যুগান্তরের নেতৃত্ব করছেন সুরেনদা' (ঘোষ), হরিদা (চক্রবর্তী), মনোরঞ্জনদা, ভূপতি দা' প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে সুরেনদার প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। একদিকে তিনিই সুভাষবাবুর সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ,—আর একদিকে নলিনী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে টাকাকড়ি সম্বন্ধেও তাঁর অবস্থা সচ্ছল, আর "বিগ ফাইভের" (শরৎ বসু, বিধান রায়, তুলসী গোঁসাই, নির্মলচন্দ্র, নলিনী সরকার) সঙ্গেও তিনিই যুগান্তর দলের পক্ষ থেকে সলাপরামর্শ করেন। এই রাজনৈতিক কূট-কৌশলের ক্ষেত্রে ক্রমে তাঁর প্রাধান্য সকলেই মেনে নিয়েছিল। যাদুদার সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখতেন। এই অবস্থায় ২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস সামনে এসে পড়লো। তার সংগঠনের সর্ববিধ ক্ষেত্রেই সম্মিলিত বিপ্লবীদলই প্রধান কর্মী। তার তোড়জোড় সুরু হল।

পার্ক সার্কাসের নতুন ময়দানে কংগ্রেস হবে। তার কাছেই প্রধান সড়কের ওপর কালী খাজাঞ্চিদের (মল্লী) বাড়ী—সে বাড়ীতে নতুন পোষ্ট অফিস হয়েছে। বড় বড় বাড়ী ওখানে অনেক তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। আমার মনে হল, যদি ঐ পাড়ায় ফার্নিচারের দোকান এখন করা যায়, পরে খুব ভাল চলবে। ঘুরে দেখে এলুম, ঐ বাড়ীটার মাঝখানের ফটকের একদিকটা জুড়ে পোষ্ট অফিস, আর একটা দিক জুড়ে এক প্রকাণ্ড ঘর খালি রয়েছে। ঘরটার সামনে ছ'টা দরজা ১০×৫ ফুট করে'—আর ভেতরের মেঝের আয়তন প্রায় দেড় কাঠার মতন। পরবর্তীকালে ঘরটাতে মোটর গাড়ীর শো-রুম হয়েছিল।

কালীবাবুর দাদা ছিলেন বিপিনদা'র চেলা এবং অনুকূলদা'র বন্ধু। অনুকূলদাকে সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বন্দোবস্ত

করে এলুম—ভাড়া সস্তা, ৬০ টাকা মাত্র। ঐ ঘরে ভালো করে দোকান সাজাতে পারলে বিনা খরচে খুব ভাল অ্যাডভারটাইজমেন্ট হয়ে যাবে—কারণ কয়েকটা দিন ধরে সারা সহর ও বাইরেকার কংগ্রেস যাত্রীদের ঐ ঘরের সুমুখ দিয়েই কংগ্রেসে যাতায়াত করতে হবে।

নিজের একটা পার্শোন্যাল লাইব্রেরী গড়ে তোলার সখ ছিল। নীলামে বইএর লটও কিনতুম, এবং ২৪ খানা করে বাছা বই রেখে বাকি বই বিক্রীর চেষ্টা করতুম। এমনি করে দোকানে প্রচুর বই জমে গিয়েছিল। ষ্টাফ্‌ড পশুপক্ষীও কিনতে সুরু করেছিলুম। একবার প্রকাণ্ড একটা বইএর লট নীলামে বিক্রী হয়েছিল—সব মিলিটারী বই—ইসুফ ও নাজিমুদ্দিনের দল সেটা কিনেছিল (কলেজ স্কোয়ারের পুরোনো বইএর বড় দোকানদার)—আমি তা থেকে বেছে বেছে মিলিটারী শিক্ষার অনেক বই কিনেছিলুম। এমনি করে' ছুটো বড় বড় ওসেনট্রাঙ্ক বোঝাই হয়ে গিয়েছিল—তেতলার ঘরে সেগুলো রাখতুম। কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার সংগঠনে যখন দাদারা নামলেন,—অনুশীলনের রবী সেন একদিন এসে সেগুলো নিয়ে গেলেন। বললুম,—কিছু টাকা দেবেন, একেবারে ফাঁকি দেবেন না। তিনি ২৫টা টাকা দিয়েছিলেন। চোরের "রাত্রিবাস" লাভের-মতন। কিছু কাজ হল ভেবে খুসীই হলুম।

একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ, একটা বেশ বড় কুমীর, একটা হনুমান, একটা প্রকাণ্ড বীভার, একটা হরিণের মাথাসমেত ডাল-পালাওয়ালা সিং—মাটিতে খাড়া করলে সিংয়ের ডগায় হাত পৌঁছাতো না—একটা বাঘের মাথা প্রকাণ্ড ধামার মত,—এইসব ষ্টাফ্‌ড জন্তু জানোয়ার, একটা বার্ড অফ প্যারাডাইজ প্রভৃতি সংগ্রহ করেছিলুম। কংগ্রেসের আগেই দোকান সাজিয়ে ফেলেছিলুম। অ্যালবার্ট বিল্ডিংএর ঘরে প্রথমে ফার্ণিচার তুলে দিয়ে এক প্রকাণ্ড পুরোনো বইএর দোকান সাজিয়েছিলুম। পরে ছুটো চালানো সম্ভব নয় দেখে সেটাও পার্কসার্কাসে তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম এবং কংগ্রেসের সময় বেশ কিছু বই বিক্রীও হয়ে গিয়েছিল।

এইবার আসল কংগ্রেসের কথা। কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি মতিলাল নেহেরু। সেনগুপ্ত ছিলেন স্বরাজ্যদলের নেতা এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, সুতরাং তিনি হলেন অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান—অল ইণ্ডিয়া লীডারদের কাছে বাংলা-কংগ্রেসের দলাদলির প্রদর্শনী তো ভালো কথা নয়! অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ডাঃ বিধান রায়। একজিবিশনের সেক্রেটারী নলিনীরঞ্জন সরকার। ভলান্টিয়ার বাহিনী সংগঠনের ভার দাদাদের হাতে। তার সংগঠন আগে থেকেই সুরু হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার ময়দানে ময়দানে মিলিটারী প্যারেড শিক্ষা সুরু হয়ে গিয়েছিল।—হাজার হাজার ছেলে—বিপ্লবীদের রিক্রুটিংয়ের টার্গেট। মেয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনীও সংগঠিত হয়েছিল—বোধ হয় লতিকা বসু হয়েছিলেন চীফ।

ভলান্টিয়ার বাহিনীর চীফ—G. C. O. (General Officer Commanding) কাকে করা হবে, তা নিয়ে এক ঝগড়া বাধলো। সুভাষ বাবুই নেতাদের মধ্যে বেকার ছিলেন—চীফ হলে সব দিক দিয়েই মানায়। দাদারাও তাঁকে চীফ করার কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু পূর্ণ দাশের দল থেকে প্রস্তাব করা হল, G. O. C. করা হোক পূর্ণ দাশকে। সুতরাং যথাশাস্ত্র অনুশীলনের তরফ থেকে পাল্টা প্রস্তাব হল প্রতুল গাঙ্গুলীর নাম। সঙ্গে সঙ্গে ময়মনসিংএর দল বললে,—সুরেন ঘোষ নয় কেন? হঠাৎ প্রায় অচল অবস্থা। শেষ পর্যন্ত,—"স্বোয়ামী যমকে দেওয়া যায়, তো সতীনকে দেওয়া যায় না"—এই নীতি অনুসারে সুভাষ বাবুকেই করা হল G. O. C.

পূর্ণ দাশ, হরি চক্রবর্তী প্রভৃতি হলেন লেফ্‌টন্যান্ট,—রবী সেন হলেন G. O. Cর অর্ডার্লি অফিসার। বিপিনদার দল কোথাও নেই,—তাঁরা ক্ষুব্ধ। অ্যামেলগ্যামেশনের এই অবস্থা আমরাও যেমন লক্ষ্য করছিলুম,—সুভাষবাবুও অবশ্যই লক্ষ্য করছিলেন। তারপর কংগ্রেসের বিভিন্ন বিভাগে কর্মী বণ্টনের ব্যবস্থা। প্রতুল গাঙ্গুলীকে করা হয়েছিল "হিন্দুস্থানী সেবাদলে" বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিধি। বিরাট একজিবিশনে সুরেনদার দলবলই কর্মী। কিচেন কমিটিতে সুরেশ দাস এবং টাঙ্গাইলের অমর ঘোষ (মোক্তার)। পার্কসার্কাস ময়দানের পিছনে "নেষ্ট" নামক একটা বাড়ী ছিল,—সেখানে হয়েছিল কিচেন ষ্টোর। সেখানে বসানো হল ময়মনসিংহের আনন্দ মজুমদারকে, সুরেনদার লোক। পূর্ণদাশের দল সেটা জোর করে দখল করতে গিয়েছিল, এবং লড়াই থামাবার জন্তে আপোষে তাদেরও সেখানে জায়গা দেওয়া হয়েছিল।

অনুশীলনের নেতারা ক্ষেপে গেল:—বটে! এই তোমাদের অ্যামেলগ্যামেশন?—যেখানে টু-পাইস আছে, সেখানেই যুগান্তর,—আর যত সব শুকনো আঘাটায় অনুশীলন! অ্যামেলগ্যামেশন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

টু-পাইস ছিল অবশ্যই। এতবড় একটা কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবী কর্মীদল দিনরাত ভূতের মতন খাটবে, আর পার্টির কিছু অর্থের সংস্থান হবে না,—এই বা কেমন কথা! একদিন রাত্রে একজিবিশনের টিকিট বিক্রীর পর হঠাৎ সমস্ত আলো নিভে গেল, বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে হুড়োহুড়ির পর আলো জ্বললো—এবং দেখা গেল, একটা ক্যাশ ভর্তি বাক্স উধাও হয়ে গেছে। মনোমোহন ভট্টাচার্য একজিবিশন কমিটীতে ছিলেন—পরে তাঁর কাছে কথাটা শুনেছিলুম। "নেষ্ট" বাড়ীটার পিছনের দরজা দিয়ে মাল বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে আবার সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতো, এবং এই ভাবে একই মাল দুবার জমা হত,—এ গল্পও শুনেছি। এক মালের দুবার বিল হয়েছে, এবং অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে সেটা ধরা পড়েছে,—দুজন জুনিয়ার দাদা সেজন্ত তাড়া খেয়েছেন, এ গল্পও শুনেছি। শুনেছি অনুশীলনের লোকের কাছে নয়, আমাদেরই পার্টির লোকের কাছে।

অ্যামেলগ্যামেশন ভেঙ্গে গেল দেখে মনটা খিচড়ে গেল। আমি বলতে সুরু করেছিলুম—এক কুড়ি শিয়াল যদি তিন দিন ধরে যুক্তি করে কিছু স্থির করতো,—তাহলে সেই "শিয়ালের যুক্তিও" এই অ্যামেলগ্যামেশনের চেয়ে বেশী দিন টিকতো। কলত ২১।৩০ সালের সুভাষ-সেনগুপ্ত লড়াইয়ের অনুশীলন গিয়ে জুড়েছিল সেনগুপ্তের শিবিরে। নো-চেঞ্জারদের ঘাঁটী নর্থ-ক্যালকাটা কংগ্রেসে সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অমর বসু যুগান্তর দলের লোক হয়েও সেনগুপ্তের শিবিরে ছিলেন। আর ছিলেন অমরদা (চ্যাটার্জি) কংগ্রেস কর্মী সংঘের প্রেসিডেন্ট।

ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতারা—শৈলেন রায়, শচীন মিত্র, প্রমোদ ঘোষাল, হাওড়ার কৃষ্ণ চ্যাটার্জি প্রভৃতি গান্ধীবাদী নো-চেঞ্জাররাও ছিলেন সেনগুপ্তের শিবিরে। মোটের ওপর, সে লড়াইয়ে সুভাষ বাবুর দিকে বিগফাইভের সঙ্গে যুগান্তর দল,—এবং সেনগুপ্তের দিক বাকি সব খেঁখাপ্পা পাঁচমিশেলী দল ও ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল।

যাই হোক,—আবার কংগ্রেসের কথায় ফিরে আসা যাক। ভলাণ্টিয়ারদের ক্যাম্প হয়েছিল প্রকাণ্ড। শ্রীসংঘের অন্যতম নেতা সত্য গুপ্ত হয়েছিলেন একজন মেজর। তিনি কঠোর সামরিক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বাছা বাছা ছেলেদের বিপ্লবের মন্ত্র দিয়ে নিজস্ব এক বিপ্লবী দল খাড়া করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দলই পরবর্তী কালের বি, ভি, দল, যারা মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে খুন করেছিল বলে শোনা গিয়েছিল। ভলাণ্টিয়ার ক্যাম্পের মধ্যেই অপর কোন ভলাণ্টিয়ার গ্রুপের সঙ্গে কি এক বিবাদ উপলক্ষে মেজর সত্য গুপ্ত তাঁর বাহিনীকে মিলিটারী কায়দায় পরিচালিত করে ঐ প্রতিপক্ষ ভলাণ্টিয়ার গ্রুপকে মার দিয়ে এসেছিলেন। তারজন্য সুভাষবাবু কোর্ট-মার্শালে বিচার করে তাঁকে একদিনের জন্য কয়েদ করেন। খাঁটী মিলিটারী সো। সুভাষবাবু রীতিমত গম্ভীরভাবে সেনাপতির ভূমিকায় তালিম দিচ্ছিলেন।

আমার দোকানে হয়েছিল জীবনের দলের আড্ডা। বম্বে থেকে গিরণি কামগর ইউনিয়নের নেতা মিরাজকর (পরে বম্বের মেয়র হয়েছিলেন) জীবনের (চ্যাটার্জি) অতিথিরূপে আমার দোকানেই উঠেছিলেন এবং বাস করেছিলেন। জীবনের সম্পর্কে আমিও হয়েছিলুম তাঁর নারানদা। এই সব কারণেই গোয়েন্দা বিভাগ বলতো, আমার ব্যবসাটা হচ্ছে ক্যামোফ্লেজ।

২৮ সালেই সুভাষবাবু এবং জহরলালকে করা হয়েছিল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী। কংগ্রেসের সাবজেক্টস্ কমিটিতে সুভাষবাবু এক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্রস্তাব দাখিল করেছিলেন। মহাত্মা তাঁকে বোঝালেন,—তুমি নেহেরু-রিপোর্টে সই করে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের দাবীর পক্ষে মত দিয়েছ,—এখন বৃটিশ সরকারকে একটু সময় না দিয়েই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দাবী কি শোভা পায়? অন্তত ২৯ সালটা তাদের বিবেচনার জন্য সময় দাও,—তারপর যদি তারা ডোমিনিয়ন-ষ্ট্যাটাস দিতে রাজী না হয়, তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালা হয়ে যাবো। সুভাষবাবু নিরস্ত হলেন।

বিপিনদা বলেছিলেন, তিনি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের প্রস্তাব তুলবেন। দাদারা তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় হঠাৎ একটা হুড়োহুড়ি লেগে গেল,—হাজার বিশেক (কারো কারো মতে ৫০ হাজার) শ্রমিক মিছিল করে শ্লোগান দিতে দিতে কংগ্রেসে আসছে। কর্তারা G.O.C.কে নির্দেশ দিলেন, ওদের রুখতে হবে। তিনি ভলাণ্টিয়ার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, শ্রমিকদের রুখতে হবে। কিছু কিছু ভলাণ্টিয়ার সে আদেশ না মেনে সরে পড়লো। এমনি একটা গ্রুপের মধ্যে তরুণ কবি বিমল ঘোষ ছিলেন।

দেখতে দেখতে বন্যার প্রবাহের মত শ্রমিক জনতা কংগ্রেস ক্যাম্প ছাপিয়ে এসে প্যাণ্ডালে ঢুকে পড়লো—তাদের বাধা দেওয়া সম্ভব হলনা—বাধা দিতে গেলে দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেত। তারা প্যাণ্ডাল দখল করে' ঘণ্টা দুই ধরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর কংগ্রেসের—কর্তারা তাদের দাবী-পত্র গ্রহণ করলেন এবং সেগুলো বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারা জয়ডঙ্কা বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। ভদ্রলোকদের একচেটিয়া কংগ্রেসে আবার ছোটলোকের ছেঁায়াচ লাগলো।

যাই হোক, কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব—গান্ধী-মতিলাল রচিত প্রস্তাব হল, ২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যদি বৃটিশ সরকার ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না দেয়, তাহলে আবার অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করা হবে এবং আইন অমান্য সুরু করা হবে খাজনা বন্ধ করে'।

স্বাধীনতাপন্থীদের (সুভাষ-জহর) তরফ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব হল,—২৯ সালের শেষে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস না পেলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কার্য্যক্রম গ্রহণ করবে। ভোটাভুটিতে সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে হল ৯৭৩ ভোট, আর মূল প্রস্তাবের পক্ষে ১৩৫০ ভোট। মূল প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

একদিকে বিপ্লবী নওজোয়ানদল, আর একদিকে জঙ্গী শ্রমিক—এই দুর্যোগ দেখে টি প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের গৌরাঙ্গ সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভার বক্তৃতায় বলেছিলেন,—একমাত্র ভরসা "গ্যাণ্ডি"।

বস্তুত "গ্যাণ্ডি" মহারাজও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন এবং কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন "দুর্যোগ" ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। ২৯ সালের বোধহয় এপ্রিল মাসে,—বড়লাট আরউইনের সঙ্গে দেখা করে স্বাধীনতাবাদীদের ও জঙ্গীশ্রমিকদের প্ল্যান বানচাল করার ব্যবস্থা করার জন্যে মহাত্মা গান্ধী "Dear friend" বলে এক প্রকাণ্ড চিঠি লেখেন, এবং তাঁর তখনকার এক নতুন ভক্ত রেজিন্যাল্ড রেনল্ডস নামক তরুণ ইংরেজের হাত দিয়ে সে চিঠি আরউইনের কাছে পৌঁছে দেন।

পরবর্তীকালে মহাত্মার কাণ্ডকারখানা দেখে ভক্তি চটে যাওয়ার ফলে ছোকরা দেশে ফিরে যায় এবং রেনল্ডস নিউজ নামক এক সাময়িকপত্র প্রকাশ করে মহাত্মার সমালোচনা লিখতে থাকে। বর্তমানে রেনল্ডস নিউজ বিলাতের এক সুপ্রতিষ্ঠিত বামপন্থী পত্রিকা।

সরকার বাহাদুরও দুর্যোগ লক্ষ্য করে কোমর বাঁধছিলেন। এখন তাঁরাও আঘাত হানার জন্যে এক Public safety bill তৈরী করে "Communist activities" দমন করার ব্যবস্থা করলেন। তখন স্বরাজ পার্টির নেতা বিঠলভাই ঝাবেরভাই প্যাটেল (সর্দার প্যাটেলের দাদা) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন, এবং স্বয়ং বড়লাটের স্বাক্ষরিত ঐ Bill ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করার জন্য প্রেরিত হলে তিনি তাঁর আইনানুগ ক্ষমতার বলে সে বিল উপস্থাপিত করার অনুমতি দেননি। এই অঘটন নিয়ে সারাদেশে একটা উল্লাস-উত্তেজনার ঝড় বয়ে যায়। অবশ্য বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা বলে আইনটা চালু করা হয়, এবং ঐ আইনে বাছা বাছা শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হতে থাকে, এবং তাঁদের নিয়ে মীরাটে এক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হয়। আসামীদের মধ্যে বিলাতী কমিউনিষ্ট হাচিনসন প্রভৃতিও ছিলেন, এবং অ-কমিউনিষ্ট কিশোরী ঘোষও ছিলেন। মামলায় কিশোরী ঘোষ খালাস পেয়েছিলেন,

কিন্তু তার আগেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আর ফিলিপ প্র্যাট মুক্ত হয়ে সরে পড়ে ছিলেন, বোধ হয় মামলা শেষ হওয়ার আগেই। তাঁর নামে spy বদনামও রটেছিল।

যাই হোক, কংগ্রেসের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস-ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের লড়াই বাইরে, বাংলাদেশে,—সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিরাট আকার ধারণ করলো। সরস্বতী প্রেস থেকে তখন "স্বাধীনতা" নামক সাপ্তাহিক কাগজ বেরিয়েছে। তাতে একবার লেখা হল,—আসলে সেনগুপ্ত-সুভাষ লড়াইটা হচ্ছে বৃটিশ ইম্পিরিয়্যালিজমের সঙ্গে স্বাধীনতাবাদী কংগ্রেসের লড়াই—সেনগুপ্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির লোক, সুতরাং হাইকম্যাণ্ডের ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের পক্ষপাতী,—আর তার মানেই বৃটিশ ইম্পিরিয়্যালিজমের বন্ধু; আর সুভাষ বাবু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের প্রতীক, সুতরাং ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের এবং ফলত বৃটিশ ইম্পিরিয়্যালিজমের শত্রু!

সে সময়ে বাংলাদেশের লোক কয়েকটা বছর ধরে বলেছে এবং শুনেছে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস এবং ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক নয়—ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস মানে ব্রাউন বুরোক্রেশী, অর্থাৎ কালা লাট সাহেব মাত্র,—আমরা তা চাই না, খাঁটী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চাই—বৃটিশ সম্পর্ক বর্জিত স্বাধীনতা।

এই ধুয়োর ওপর আমাদের দাদারা সুভাষ বাবুকে বুঝিয়ে রাজী করে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে লড়াইটা সম্প্রসারিত করে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়্যাল ষ্টুডেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং বেঙ্গল প্রভিন্সিয়্যাল ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনে নামলেন। ফলে আগেকার এ বি এস এ এবং এ বি ওয়াই এর মধ্যে ভাঙন ধরলো,—এ বি এবং বি পি-র লড়াইয়ে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে লড়াই চললো। এ বি হল সেনগুপ্তের সমর্থক, এবং বি পি-সুভাষ বাবুর। এই লড়াইয়ে চাটগাঁর একটা ছেলে খুনও হল—নাম বোধ হয় সুখেন্দু—বি পি। আহত হয়ে কলকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে মারা যায়, এবং আমরা প্রোসেশন করে সংকার করি।

ব্যাপারটা যখন ছেলে নিয়ে টানাটানি, এবং সুরেনদা যখন নেতা, তখন যুগান্তর পার্টির ছেলে বাগাবার মওকা বলে অনুশীলনের সেনগুপ্তের ক্যাম্পে ভিড়ে গিয়ে ছেলে বাগানোর চেষ্টা করতে হল। পরবর্তী কালে এ বির নেতা শৈলেন রায় যে ডেটিনিউ হয়েছিলেন, তার মূল কারণ এইখানে। আর শরৎ বসু বিপি সংগঠনে টাকা দিতেন, এবং সেই কারণেই তিনিও পরে রাজবন্দী হয়েছিলেন।

এই সময়ে বালীর কাছে ভানকুনী ষ্টেশনে এক রাত্রে এক বিরাট ট্রেণ-দুর্ঘটনা হয়। ফরোয়ার্ড কাগজে তার বিবরণে বলা হয়,—যত লোক মারা গেছে বলে রেল কর্তৃপক্ষ বলেছে, আসলে লোক মারা গেছে,—প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে,—তার চেয়ে অনেক বেশী; রেল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহগুলো গোপনে সরিয়ে ফেলেছে।

ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে ই, আই, আর লাখ টাকার দাবী করে' এক মানহানির মামলা করে। মামলার সময়ে যথাশাস্ত্র প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষী পাওয়া গেল না। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী সংগ্রহের চেষ্টা হল দাদাদের মারফতে। সতীশদা' (চক্রবর্তী-খুলনা) আমাকে বললেন, কোলিয়ারী এলাকা পর্যন্ত ষ্টেশনে ষ্টেশনে ঘুরে দেখতে হবে, সাক্ষী পাওয়া যায় কি না। আমি সারদাকে ভিড়িয়ে দিলুম। সারদা কয়েক দিন ধরে ঘুরে ফিরে এল—মামলায় সাক্ষী দিতে কেউ চায় না।

সুতরাং মামলায় ই, আই, আর লাখ টাকার ডিক্রী পেয়ে গেল, এবং প্রেস ক্রোক করার জন্তে কোর্টের লোক নিয়ে ফরিয়াদীর লোক গেল। ফরোয়ার্ড অফিসের গেটে তখন পাহারায় বসে গেছে নলিনী রঞ্জন সরকার ও তুলসী গোস্বাইয়ের লোক। তারা বললে, প্রেস আমাদের সম্পত্তি, ফরোয়ার্ড কাগজের সঙ্গে ছাপার কন্ট্রাক্ট ছাড়া প্রেসের আর কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই প্রেস ক্রোক করা গেল না। পরদিন দেখা গেল, সেই প্রেস থেকে "লিবার্টি" নামে কাগজ বেরিয়েছে—ফরোয়ার্ড উঠে গেছে। উপেনদার "আত্মশক্তি" সাপ্তাহিকখানাও ফরোয়ার্ড কোম্পানি নিয়েছিল। সেটা হল "নবশক্তি"।

সুভাষবাবুর রাজনৈতিক বিকাশের পথে সে সময়টা ছিল একটা সন্ধিস্থল। সুভাষবাবুর ভক্তেরা যেমন মনে করেন, তিনি যেন একটা ready made পাকা নেতাজী হয়েই জন্মেছিলেন,—সেটা ভক্তিমার্গের অপসিদ্ধান্ত মাত্র। তিনিও যে মানুষ, এবং মানুষের জীবনের সকল স্বাভাবিক নিয়মই যে তাঁর পক্ষে প্রযোজ্য, এটা ভুলে গেলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হয়। দেশের কি জটিল অবস্থার মধ্যে, রাজনীতির কি জটিল আবর্তের মধ্যে বিভিন্নমুখী বিচিত্র আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘাত-প্রতিঘাতে তিলে তিলে তাঁর বিপ্লবী চেতনার কার্যকরী রূপ গড়ে উঠেছে, সে ইতিহাস একটা সমস্যা-কণ্টকিত রহস্যোপন্যাসের মতন। একদিকে নির্ভেজাল গান্ধীভক্তি ও কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বস্ততা,—আর একদিকে তীব্র সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষ এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক আদর্শ তাঁর চরিত্রকে তখন একটা স্ব-বিরোধী কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার উদাহরণে পরিণত করেছিল। ন্যাশালিজম, ফ্যাসিজম, সোসিয়্যালিজম ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে গিয়ে "ফ্যাসিজম কাম সোসিয়্যালিজম" হয়ে উঠেছিল তাঁর বক্তৃতার ধুয়ো। কংগ্রেসের সভায় ন্যাশালিজম, শ্রমিকদের সভায় সোসিয়্যালিজম এবং ছাত্র-যুব সভায় ফ্যাসিজম তিনি একসঙ্গে বলতে সুরু করেছিলেন।

একবার ফরোয়ার্ডের প্রেসকর্মচারীরা ষ্ট্রাইক করে' বসেছিল। সুভাষবাবু তখন জেমসেদপুরে শ্রমিকদের সভায় সোসিয়্যালিষ্টিক বক্তৃতা করছিলেন,—এদিকে তাঁর ডেপুটী মেজদা শরৎ বসু ফরোয়ার্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ধর্মঘটীদের সঙ্গে ফয়সালা না করে নতুন কর্মী রিক্রুট করেছিলেন এবং এইভাবে ধর্মঘট ভেঙ্গে গিয়েছিল। সুভাষবাবু সরাসরি দায়ী নন, অথচ এই ছিল তাঁর "ঘরের অবস্থা"।

বিপ্লবী দলগুলোর অ্যামেলগ্যামেশনের আগে অনুশীলন ও যুগান্তরের নেতাদের সঙ্গে তাঁর জেলে খাতির জমেছিল,—এবং কলকাতা কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত দুইদলের দুই দাদা,—সুরেন ঘোষ এবং রবী সেন রোজ সকালে তার বাড়ী গিয়ে বসতেন। কংগ্রেসের পর সেটা "দুদিক থেকে তোয়াজের" রূপ নিয়েছিল। তিনি সবই বুঝতেন, এবং G.O.C-র মতন গম্ভীর চালে কথা কইতেন Yes, no, very well ধরণে। স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতিটা তাঁর এই সময়ে চূড়ান্ত গম্ভীর হয়েছিল—বোধহয় এই যুগটাতে কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি।

[ক্রমশঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন উপাচার্য্য)

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) যাতে সুষ্ঠুরূপে ও সংহতভাবে হতে পারে, এ নিশ্চয় ব্যবস্থার জন্য রেজিষ্ট্রার বিভাগ, পরীক্ষা কন্‌ট্রোলার বিভাগ ও কলেজসমূহের ইনস্পেক্টার বিভাগ—এ সকল একত্র করে দেওয়া হয়েছে। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া, টাকা-পয়সা ফিরাও দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে বিলম্ব সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা যাতে ক্রমে কমে যায়, এই ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য এ-ও। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসি, বলতে গেলে এই ধরণের অভিযোগ আর ছিলই না।

২। পরীক্ষার ফল ফাঁস হয়ে পড়া—কার্য্যতঃ এইটি তিরোহিত হয়েছে। ফলাফল প্রকাশের আগে নম্বর জানবার সুযোগ নেই এখন।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ার বিভাগটি পুনর্গঠন করা হয়। একজন আংশিক সময়ের ইঞ্জিনীয়ারের স্থলে সর্ব্ব সময়ের ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হয়েছেন। আগেকার ইঞ্জিনীয়ার মাসে চার শত টাকা করে পেতেন, এ ছাড়া পেতেন নিজের পরীক্ষিত বিল ও এষ্টিমেটের ওপর শতকরা হারে কতক টাকা। ইঞ্জিনীয়ারের কাজ যেখানে এষ্টিমেট কিংবা বিল কমানো, সে অবস্থায় এ ব্যাপারে তাঁকে শতকরা হারে কিছু দেওয়াটাই হাস্যকর বলে আমার মনে হয়। যে পরিবর্ত্তন ঘটানো হয়েছে, তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-ভাণ্ডারে কিছু অর্থ বেঁচে গেছে।

৪। গুণগত দিক বিবেচনাক্রমে পিওন ছাড়া আর সব কর্ম্মী নিয়োগ চলতে থাকে। নিয়োগ ব্যাপারে বাইরের লোক দ্বারা টেষ্ট পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়।

৫। বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসটি ঢেলে সাজানো হয়। এমন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এই প্রেসে বাইরের কাজ চলতে পারে এবং এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা রাজস্ব আসে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে প্রেসের ক্রিয়াকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। এই কমিটিতে অন্যান্যদের ভেতর থাকেন সরকারী প্রেসের একজন বিশেষজ্ঞ ও ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেসের একজন বিশেষজ্ঞ।

৬। লেক্‌চারার ও প্রফেসারদের (সর্বসময়ের ও আংশিক সময়ের) বেতনের গ্রেড স্থির করে দেওয়া হয় এবং লেকচারারদের একইদৃষ্টিতে দেখা হতে থাকে।

৭। ইন্‌ক্রিমেণ্ট (বেতন-বৃদ্ধি) পাওয়ার সময় হলেই ইন্‌ক্রিমেণ্ট দেওয়া হয় এবং এ কারো অনুগ্রহের ওপর নির্ভর হয়ে থাকে না।

৮। সহকারী লেক্‌চারারের পদ বিলোপ হয়ে যায় এবং আগে এই পদগুলিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের লেক্‌চারারের গ্রেড দেওয়া হয়। এর ফলে খরচ কিছুটা বেড়ে যায় ; কিন্তু এতে লেক্‌চারারদের অধিকতর সন্তুষ্টির কারণ ঘটে। শিক্ষাদান যেন আরও ভাল করে হতে পারে, সেইজন্যই এ ধরণের পরিবর্ত্তন মেনে নেওয়া হয়।

৯। পরীক্ষক নিয়োগ ব্যাপারটি খুব নিবিড় ভাবে পর্য্যালোচনা করা হয় এবং অপরের দাবী এড়িয়ে কোন নিয়োগ প্রায় হয় নি।

১০। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের মেরামতী অনেক আগেই হওয়া প্রয়োজন ছিল। কয়েকজন কর্ম্মচারী যক্ষ্মারোগে ভুগছেন, আমি দেখতে পেলাম। বিষয়টি নিয়ে আমি তখন পর্য্যালোচনা করে চলি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যেন চিকিৎসক হিসাবে এসে নিজে সব ব্যাপারটা দেখেন, সেভাবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীরা যে যে ঘরে কাজ করেন, সেগুলিতে আলো হাওয়া খেলবার একটা নতুন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। আমার আমলে যেমনটি ছিল, সেই থেকে এই ঘরগুলি কত ভাল হয়েছে, যে কেহ আজ দেখতে পারেন। বিজ্ঞান কলেজের মেরামতী এবং আলো হাওয়ার নতুন ব্যবস্থাটি প্রবর্ত্তনের জন্য সরকার আমাদের একটি ঋণ দেন—অল্প কিস্তিতে সে টাকা পরিশোধের কথা থাকে। সরকার প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর এ ৩০ বছরে পরিশোধ্য। সম্পূর্ণ আমার প্রচেষ্টায় এইটি হয়। বিজ্ঞান কলেজের রূপকার ডাঃ মেঘনাদ সাহা আমার সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতেন এবং বলতেন যে, গত ২০ বছর ধরে এই কলেজের কোন মেরামত হয় নি। নিকট ভবিষ্যতেও মেরামতী যদি না করা হলো, তা হলে কলেজটি যাবে। যক্ষ্মাক্রান্ত কর্মীদের স্ত্রী ও মায়েরা স্বামী কিংবা পুত্রের রোগ চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে সিণ্ডিকেটের নিকট দুইটি তিনটি আবেদন প্রেরণ করেন। এটি একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার বলে মনে হয়। আমি নিজে নীচুতলায় অফিসে গেলাম এবং দেখতে পেলাম যে, কর্মচারীরা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় কাজ করছেন। একটি ঘরে বড় বড় কাগজের বাণ্ডিল রাখা ছিল—যা থেকে খুবই খারাপ গন্ধ বের হতে থাকে। এই ঘরে কোন আলো হাওয়া খেলার ব্যবস্থা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমি বিষয়টি রাখলাম। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৭০ হাজার টাকা (সহজ কিস্তিতে পরিশোধ্য) ঋণ দেন এবং ঐ ঘরগুলিতে আলো হাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কারো কৌতূহল থাকলে যেয়ে দেখে আসতে পারেন।

১১। মার্কসীট দেওয়ার নতুন ব্যবস্থা পত্তন করা হয়। এর ফলে এই দাঁড়ায় যে, পূর্বে যেখানে ফলাফল প্রকাশিত হলে পর তিন চার সপ্তাহ অ-পেক্ষা করতে হতো, সেখানে আমার আমলে ফল প্রকাশের এক সপ্তাহের ভেতরই মার্কশীট পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১২। পূর্বের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ছাত্রদের অভিযোগগুলি যেমন, বেতন দেওয়া, কোন পত্রে উত্তর পাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে দূর দেওয়া হয়।

১৩। সেনেট কিংবা কিংবা সিণ্ডিকেটের কোন বিশেষ সদস্যকেই বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উহার কার্য্যপরিচালনা ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেওয়া হয় না।

১৪। গ্রেস মার্ক দেওয়া বন্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাগুলিতে অত্যধিক ফেলের হার হবার কারণ তদন্তের জন্য ১৯৫২ সালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। অধ্যক্ষগণের মতামত সংগ্রহ করা হয়। এবং কারণগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ফেলের শতকরা হার কমাবার দাবীতে কলেজ সমূহে টিউটরিয়াল ক্লাশ প্রবর্ত্তনের একটি প্রস্তাব করা হয়। আমার আমলেই বিশ্ববিদ্যালয় টিউটরিয়াল ক্লাশের ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দেন। (এ ব্যাপারে কোন মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল)।

১৫। সুরেন্দ্রনাথ, সিটি, বিদ্যাসাগর ও বঙ্গবাসী—এই কলেজগুলি ভালভাবে যাতে চালিত হতে পারে, তার জন্য ১৯৫২ সালে আমি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট থেকে প্রায় দেড় লক্ষ

টাকা ঋণ আদায় করি। সংগৃহীত এই অর্থ সিন্ডিকেটের নির্দেশ অনুসারে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে চ্যান্সেলারের (আচার্য্য) সাথে আমি আলোচনা করি। শিক্ষাদানের মান উন্নত করা হবে এবং কলেজগুলিতে সীমাবদ্ধ সংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করা হবে—এই সর্ত্তে সরকারের নিকট আরও সাহায্য আদায় করে দেবার প্রতিশ্রুতি আমি দিই।

১৬। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের হোষ্টেল (ছাত্রাবাস) ছিল দুইটি—একটি হোষ্টেল ছিল প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে (এমন নামকরা যায়গা নয়) এবং অপরটি মুরলীধর সেন লেনে। দুইটি নতুন হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হয়। এর জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তৃপ্তি ছিল যে, ছাত্ররা থাকবার ভালো যায়গা পেয়েছে আগের তুলনায়।

১৭। ভারত সরকার আমার আমলের পূর্ব্বেই পোষ্ট গ্রাজুয়েট হোষ্টেল নির্ম্মাণের জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে ২,৪০,০০০ টাকা সাহায্য প্রদান করেন। কিন্তু কাজ কিছুই করা হয়নি। আমার সময়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে পালিত ট্রাষ্ট ল্যাণ্ডে একখণ্ড জমি সংগ্রহ করা হয় এবং ৮০ থেকে ১০০ জন ছাত্রের থাকবার সংস্থান হতে পারে, সে ভাবে একটি হোষ্টেল তৈরী হয়।

১৮। ছাত্রদের সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম্মচারীদের হাজিরা ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হয় এবং অপরাহ্ণ ৫টার আগে তাঁদের অফিস ছেড়ে যেতে দেওয়া হত না। কারণ, ছাত্রদের অভিভাবকরা অপরাহ্ণ ৫টার পর আমার সাথে দেখা করতে আসতেন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অভাবে কোন নির্দেশ দেওয়া যেতো না। সেজন্তেই কর্ম্মচারীদের অপরাহ্ণ ৫টা অবধি অফিসে থাকতে অনুরোধ জানানো হয়। কর্ম্মচারীরা সেভাবেই কাজ করে চলেন।

১৯। ছাত্রদের পরীক্ষার ফি যাতে বেড়ে না যায়, সে লক্ষ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ত আরও অর্থ আদায় করে আনতে ছাত্রদের সহিত আমি শিক্ষাসচিবের কাছে যাই। ছাত্ররা যখন আমার সাথে দেখা করে বললে, রেজিষ্ট্রেশন ফি বাড়িয়ে ২ টাকা থেকে ৫ টাকা এবং আর একটি ফি ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা করা হলে তাদের পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার অসুবিধা হবে, তখনই ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবটি বন্ধ রাখা হয়।

২০। শ্রীসি, সি, বিশ্বাসের আমলে শিল্প ট্রাইব্যুনাল যে রোয়েদাদ দেন, পূর্ব্বে তা পুরোপুরি কার্য্যকরী করা হয়নি। সিণ্ডিকেটের সামনে নতুন দাবীপত্র পেশ হলেও আমার সময়েই রোয়েদাদটি সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করা হয়।

২১। আমার প্রচেষ্টায় অন্ততঃ দুইজন হাঙ্গামাকারী ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

২২। ১৯৫০ সালে আমি যখন উপাচার্য্য (ভাইস-চ্যান্সেলার) হলাম, সে সময় স্যার বি, এল মিত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের আংশিক মাত্র মুদ্রিত হয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী উপাচার্য্য শ্রী সি, সি, বিশ্বাসের আমলে এই তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইন সচিব নিযুক্ত হয়ে এই পদ ছেড়ে যাওয়ার সময় শ্রীবিশ্বাস আমার হাতে উক্ত রিপোর্টের অসমাপ্ত মুদ্রিত প্রথম খণ্ড এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি দিয়ে যান। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হচ্ছেনা বলে চারিদিক থেকে অভিযোগ উঠতে থাকে। আমি তখন চ্যান্সেলার (আচার্য) ডাঃ কে, এন, কাটজুর সাথে দেখা করি এবং বিষয়টি তাঁর কাছে বলে এই অনুরোধ জানাই যে, তাঁর নিজের প্রেসে উক্ত রিপোর্টের কিছুটা মুদ্রণে তিনি যেন আমায় সাহায্য করেন। তিনটি অংশের মুদ্রণ ৬-১৯-১৯৫০ তারিখ মধ্যে শেষ করা হয়। অর্থাৎ আমার উপাচার্য্য হবার তিন মাসের ভেতরই এই কাজটি হয়ে যায়। অনেকের কাছ থেকেই এরূপ হুমকী আসে যে, রিপোর্টটি প্রকাশ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হবে। চ্যান্সেলার ডাঃ কাটজু এই এই কমিটি নিয়োগ করেছিলেন এবং নিজেও তিনি একজন মস্ত আইনবিদ্। তিনি আমায় পরামর্শ দেন যে, রিপোর্টটি 'গোপনীয়' এই চিহ্ন দিয়ে সেনেটের সদস্যদের ভেতর বিলিয়ে দেওয়া হোক্। সে মতে ১৯৫১ সালে রিপোর্টটি সেনেট সদস্যদের বিলিয়ে দেওয়া হয়। সেনেট সদস্যগণ এই নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারতেন। সেরূপ সমীচীন মনে হলে রিপোর্ট প্রকাশ করতেও তাঁদের বাধা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টটি প্রকাশ বন্ধ করে রেখেছেন, এই অভিযোগের মধ্যে এতটুকু সত্য ছিল না।

২৩। এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষাগুলিতে বাঙ্গালী ছেলেদের অধিক সংখ্যায় ফেল হচ্ছে দেখেই আমি তৎকালীন জন শিক্ষা ডিরেক্টার ও অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে খ্যাতনামা আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের সাথে পরামর্শ করি এবং একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিই। আর্থিক খরচ বহন করার জন্ত আমি বাংলা সরকারকে অনুরোধ করি এবং তাতে তাঁরা রাজীও হন। আই-সি এস্ ছাত্রদের যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেভাবে বাঙ্গালী ছেলেদের ট্রেনিং দেবার জন্ত সাময়িকভাবে ইংল্যাণ্ড থেকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌কে আনা আমার ইচ্ছা ছিল। আমি চেয়েছিলাম যে, কতককাল পর আমাদের নিজেদের লোকেরাই এই কাজ করতে পারবেন এবং ছাত্রদের আই-সি এস্ পরীক্ষার লাইন ধরে ট্রেনিং দিতে সমর্থ হবেন।

২৪। হোষ্টেলের (ছাত্রাবাস) ছাত্রদের যেন আরও ভালো চাল দেওয়া হয়, খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সাথে আমি সেভাবে ব্যবস্থা করি।

২৫। প্রথম বিরোধিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন কলেজের পরিচালনা সংস্থাবলির (গভর্ণিং বডি) জন্ত একই ধরণের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা করি এবং একটু আধটু ব্যতিক্রম সহ ঐটি তৈরী করতে কিছু পরিমাণে সফলকামও হই। স্বজন-পোষণ ও দুর্নীতির অবসান ঘটাবার লক্ষ্য নিয়েই এই কাজটি করা হয়।

২৬। যখনই কোন ছাত্র এইভাবে অভিযোগ করে যে, সে ঠিক নম্বর পায় নি কিংবা তার উত্তরপত্র ঠিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে সে সন্দিহান, তখনই আমি একটি কমিটি নিয়োগ করি এবং নিজে উপস্থিত থেকে খাতা ভালরকম দেখা হয়েছে কিনা, নতুন করে পরীক্ষা করিয়ে নিই।

২৭। পরীক্ষাসমূহের ব্যাপারে আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাব কয়টি রাখি: (ক) কলেজের অধ্যক্ষদের সুপারিশক্রমে ছেলেদের ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। কলেজগুলিতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ও ষাণ্মাষিক পরীক্ষা হওয়া চাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। তবে

(খ) যদি কোন পরীক্ষা হতেই হয় আর আমাদের ছাত্রেরা নিয়ম-কানুনে নির্দ্ধারিত পাশ মার্ক না পায়, সেক্ষেত্রে আমি প্রস্তাব করি: (১) পাশ মার্ক কমিয়ে দেওয়া চলতে পারে; (২) পাঠ্য-তালিকা (সিলেবাস) কমানো যেতে পারে; (৩) পঠিতব্য বিষয় কম করা চলতে পারে এবং (৪) প্রশ্নগুলি এমনভাবে করতে হবে যাতে ছাত্রেরা ভাববার, লিখবার এবং লিখে পড়ে দেখবার সময় পায়। এ ছাড়া প্রশ্ন সহজ ও সোজাসুজি ধরণের হতে হবে এবং পরীক্ষাসমূহ ও একদম নির্দিষ্ট মান অনুপাতিক হওয়া চাই। আমি এও বলি যে, একটি মস্ত পাঠ-সূচী (সিলেবাস) করে দেওয়া, পাঠ্য বিষয়ের প্রকাণ্ড তালিকা করা ও পাশ নম্বরের শত করা হার বেশি করে রাখা এবং তার-পর গ্রেস নম্বর (কখন কখন ১৫।২০ নম্বর পর্য্যন্ত) দিয়ে ছাত্রকে পাশ করানো হলো বলে ঘোষণা করা জনসাধারণের সাথে প্রতারণা মাত্র।

২৮। উত্তরপত্রগুলি যেন সুষ্ঠুভাবে দেখা হয়, সেজন্ত আমি পরীক্ষকদের অনুরোধ জানাই। এ ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখাতে আমি নিষেধ করি। কোন ছাত্র এক দুই নম্বর আরও বেশি পেতে পারে কি না সন্দেহ হলে পরীক্ষক যেন সম্পূর্ণ খাতাটি আবার দেখেন, সেই দাবীই রাখা হয়। পরীক্ষককে দেখতে হবে, এই বিশেষ পত্রটিতে ছেলে পাশ হবার যোগ্য কি না এবং যদি যোগ্য বিবেচিত হয়, তা হলে তাকে পাশ করাতে হবে। পরীক্ষকরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁরা শিক্ষক—ছাত্রদের সম্পর্ক এবং তাদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে সিণ্ডিকেটের যে কোন সদস্যের চেয়ে তাঁরাই অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। এই পরীক্ষকদের আমরা বিশ্বাস না করে পারি না।

২৯। কলেজগুলির অধ্যাপকদের প্রতি আমি নির্দ্দেশ রাখি যে, যতই তাঁরা সুদক্ষ হোন, ছাত্রগণের সাহায্যের জন্তে নির্দিষ্ট সময় তাঁদের কাজ করতে হবে। কোন ক্রমেই কোন অধ্যাপকের (তিনি যতই দক্ষ হোন) পক্ষে বিলম্বে আসা এবং ক্লাশ থেকে আগে বেরিয়ে যাওয়া চলবে না।

৩০। যে মুহূর্ত্তে ছাত্ররা অভিযোগ করে যে, পাঠ-সূচী (সিলেবাস) শেষ হতে পারে, এমন ভাবে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক লেকচার দেওয়া হয়নি। তখনই আমি সেই ছাত্রদের জন্য বিশেষ লেকচার দেবার বিশেষ রকম ব্যবস্থা করি।

৩১। আমার আমলের আগে একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পদিন কাজ করার পরই কার্য্যতঃ পুরো বেতনে (পড়ার জন্য ছুটি) ইংল্যাণ্ড যাবার সুযোগ পান বলে আমি জানতে পারি। আমি এই ব্যবস্থা বিলোপ করে দিই এবং এই নির্দ্দেশ জারী করি যে, কোন অধ্যাপককেই নির্দিষ্ট কয়েক বছর কাজ না হলে এই রূপ ছুটি (পড়ার জন্তে) মঞ্জুর করা হবে না। শুধু তাই নয়, এইরূপ ছুটি মঞ্জুরীর পূর্বে বিভাগীয় প্রধানের নিকট থেকে এই জাতীয় সুপারিশ চাই যে, সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের অনুপস্থিত কালে লেকচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে অতিরিক্ত আর্থিক দায় মিটাবার প্রয়োজন হবে না।

৩২। বিজ্ঞান কলেজে কোন কাউণ্টার ছিল না—ফলে এই দাঁড়ায় যে, বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের এসে মাইনে দিতে হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারা অভিযোগ করে এবং বিষয়টি ক্রমাগত কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে অমীমাংসিত অবস্থায় পড়ে থাকে। যেইমাত্র ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম, তিন দিনের ভেতরই বিজ্ঞান কলেজে একটি কাউণ্টার খোলার ব্যবস্থা করে ফেলি।

৩৩। ছাত্র এবং কর্ম্মচারীদের ভেতর আমি নিয়মানুবর্ত্তিতা এনে দিই। ছাত্রদের ব্যাপারে কর্ম্মচারীরা যাতে সঙ্গে সঙ্গে কাজটা শেষ করেন, সেজন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

৩৪। পরীক্ষার ফল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করা হয়। স্বজন-পোষণ বা আত্মীয়-তোষণ যাতে না চলতে পারে, সেজন্য উত্তরপত্রগুলি একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩৫। যখনই আমি কোন কার্য্য ব্যবস্থা অবলম্বন করি, সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ—যাঁরা অভিজ্ঞ ও আমার চেয়েও অনেক বেশি জানেন, কলেজের অধ্যক্ষগণ ও শিক্ষাবিদ্ হিসাবে যাদের প্রভূত খ্যাতি আছে, তাঁদের সকলেরই আমি পরামর্শ নিই। যথোচিত চিন্তা—আলোচনা করা হলে পর তবেই সেই কার্য-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। কায়েমী স্বার্থের ওপর আমি হয় তো আঘাত দিয়ে থাকব, কিন্তু সেটা কখনই একনায়কত্বধর্ম্মী হয় নি।

৩৬। ছাত্রীরা তাদের হোষ্টেল সম্পর্কে, বাথ-রুম সম্পর্কে আমার নিকট অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগগুলি সম্পর্কে দেখাশোনা করার জন্তে আমি ব্যবস্থা করি। প্রকৃত প্রস্তাবে আমি দিন তিনেক মধ্যে একটি বাথরুম করে দিই এবং এতে ছাত্রীদের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

৩৭। আমি বলব যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন যাই, খুব অসুবিধার মুখে পড়ি। ১৯৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেবার সময় আমাকে যে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়, সে সময় একজন পূর্বতম উপাচার্য্য তাঁর ভাষণে বলেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন জ্বলিতেছিল' এবং আমি সে অবস্থা আয়ত্তে আনি।

৩৮। কতককাল পদক ও পুরস্কার বিতরণ বন্ধ ছিল। অনতি-বিলম্বে সেগুলি বিতরণের জন্য কার্য্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

৩৯। সুসমঞ্জস কার্য্য-সম্পাদন পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারে আমি তৎপর হই এবং প্রত্যেকটি ব্যাপার ঠিকভাবে দেখা শোনা হোক, এই চাই। এ করতে যেয়ে আমাকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য সংস্কার যিনিই করতে যাবেন, তাঁকেই কিছুটা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে আমি কি করেছি না করেছি, সে বিষয়ে আমার বিবেক পরিষ্কার।

৪০। কনট্রোলার বিভাগটি সারা বিল্ডিং-এ ছড়িয়ে ছিল এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে কোন সংহতি ছিল না। তদারকীতে তখন অনেক সময় নষ্ট হয়ে যেতো এবং ছাত্ররা যারা কনট্রোলার বিভাগের কাছে পরামর্শ নিতে আসতো, তাদের এঘর ওঘর করতে প্রচুর দুর্ভোগ ভোগ করতে হতো। আমি নিজেও অনেক সময় বিভাগীয় কাজ কর্ম্ম দেখতে যেয়ে দেখেছি কর্ম্মচারীরা অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর কাজ করছেন। কনট্রোলার বিভাগকে একটি যায়গায় নেবার জন্তে বিল্ডিং এ স্থান ছিল না। সেনেটের সভাগুলি যে হলে হয়, তার উচ্চতা বেশ বেশি ছিল। আমি প্রস্তাব করলাম যে, সেখানে নতুন তলা তৈরী করে কনট্রোলার বিভাগটিকে স্থান দেওয়া হোক। ফলে এই দাঁড়ায় যে, সমগ্র কনট্রোলার বিভাগটি এক যায়গায় এসে যায় আর এতে তদারকীর সুবিধা হয়, ছাত্রদের সুবিধা হয় এবং আরও অন্যান্য ধরনের সুবিধা হয়। অথচ সেনেট সভা যেখানে হয়, সেখানে যে আর একটি তলা সৃষ্টি হয়েছে, কারো চোখেই পড়ে না।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস

চম্পা তার নাম
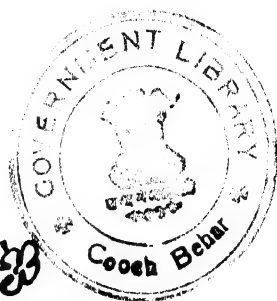
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

১৬

এক সর্বনাশা আতঙ্কের প্রেতছায়া তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিলো বুড়া ম্যাকমোহনকে।

নীলের সঙ্গে কানপুর অভিমুখে চলেছেন ম্যাকমোহন। এ হলো বাইরের ঘটনা। তিনি চলেছেন। পথে রাত হলে ক্যাম্প পড়ছে। সকালে ক্যাম্প উঠছে এবং চলেছে বিজয়ী সৈন্যের অগ্রগতি। এই অগ্রগতির চিহ্ন কোনো পাথরের ওপর কালো অক্ষরে খোদিত থাকছে না। চিহ্ন থাকছে দুই পাশের ভস্মীভূত গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রে। চিহ্ন থাকছে দুই পাশে গাছের ডালের মৃতদেহগুলিতে।

সৈন্যদের পায়ে পায়ে কদম। ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো। রাতে ক্যাম্পে ধুনী জ্বলে। সৈন্য এবং অফিসাররা শুধু হত্যা এবং প্রতিশোধের কথাই বলে। পাঞ্জাবে কুপারের কৃতিত্বের কথা বলে। কানপুরে যে তার কি করবে—কি নতুন রক্তাক্ত অধ্যায় সৃষ্টি করে অন্য সব জায়গার কীর্তিকাহিনী ডুবিয়ে দেবে—সেই কথা বলে। নিরন্তর হত্যা ও জিঘাংসা, আরো হত্যা এবং আরো জিঘাংসা—এই ছাড়া কথা নেই তাদের। মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য—যার স্তম্ভ আধখানা পৃথিবীতে ভারতের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন সব উপনিবেশে উপনিবেশে সুদৃঢ় ভাবে প্রোথিত—তার ভিত্তিতে ঘা দিয়েছে এই সব মানুষ। তারা স্বাধীনতা চেয়েছে। তারা চরম অপরাধে অপরাধী। অতএব তাদের শাস্তি দিতে হবে।

হত্যা ছাড়া তারা আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। তারা কথা বলে—আর ম্যাকমোহন উঠে যান সেখান থেকে।

ছোকরারা হাসে। ম্যাকমোহন উঠে গেলেই তারা ম্যাকমোহনকে নিয়ে ঠাট্টা জোড়ে। দেখা যাচ্ছে আফগান যুদ্ধের সময়কার এই সব বুড়োজঙ্গী এ সময়ে একেবারে বরবাদ হয়ে গিয়েছে। তাদের মনে হয়, তারা ভারতে এসে টাটকা টাটকা এদের কত কৃতিত্বের কথাই না শুনেছে। মনে হয় সে সব আধাসত্যি, আধাগল্প। সে সময় যুদ্ধে যদি এরা কৃতিত্বের সঙ্গে লড়ে থাকে, তবে এই যুদ্ধের সময়ে এমন মেয়েমানুষের প্রাণ আর পায়রার কলজের প্রমাণ দিচ্ছে কেন? বন্দীদের শাস্তিবিধান দেখতে চোখ বুঁজে আসে। যুদ্ধের কথা শুনলে উঠে যায় সামনে থেকে। সর্বদা নিজের মনে আছে—একলা ঘুরছে—নয় তো কপালে হাত দিয়ে ফুরফুরে শাদা চুলগুলো মুঠো করে ধরে দিনরাত কি যেন ভাবছে, কি ভাবছে? কোনো রসিক অফিসার হাসতে হাসতে বলে—বিবেক ওঁকে দংশাচ্ছে। নইলে দেখলে না? সেদিন বিন্দকীতে চারটে ছেলেকে ফাঁসী দেওয়া নিয়ে কি বললো? বললো এ সব আচরণ unchristian হচ্ছে?

হাস্যকর সে ঘটনার কথা মনে পড়তে সবাই হাসলো। মজার ব্যাপারই হয়েছিলো। এলাহাবাদে থাকতেই নীল শিখসিপাহীদের একটু লাইসেন্স দিয়েছিলেন। শুধু গ্রাম জ্বালাবে আর দিন থেকে রাত নেটিভদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে আনবে? শিখ সিপাহীরা মদ খেয়ে তারই মধ্যে একটু ফূর্তি করতো। ওরা স্বভাবতই ভারী ফূর্তিবাজ।

বিন্দকীতে সে চারটে ছেলে—ফাঁসী হবে জেনে-ই তাদের হয়ে গিয়েছিলো। মাথা ঘোরাচ্ছিল এদিক থেকে ওদিক—বিড়বিড় করে কি বলছিল আর যে সামনে আসছে তাকে-ই গোড়লাগি, বাবা গোড়লাগি—বলে পা ধরতে যাচ্ছিল। শিখ সিপাহীরা তাদের নিয়েই মজা করতে লাগলো। বেয়নেট বাগিয়ে তাড়া করলো তাদের। আর তারা ছুটতে সুরু করলো। এদিক থেকে ওদিক ছুটে আবার কাঁদতে কাঁদতে ওদিক থেকে এদিকে ছুটে আসে। ছুটতে ছুটতে মুখে ফেনা উঠে—কেঁদে কেটে সে অস্থির কাণ্ড! ফাঁসী হবার সময় যখন হলো, তখন ত' একজন ঘাড় নেতিয়ে পড়লো। অজ্ঞান অবস্থাতে-ই চড়াতে হলো তাকে।

সেই কথা গল্প করতে করতে ছোকরা জঙ্গীরা হাসতে লাগলো।

* * *

কথা এবং চিন্তা কি কোনো অদৃশ্য সুড়ঙ্গ দিয়ে চলাফেরা করে মন হতে মনে? নিজের তাঁবুতে, দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে বুড়া ম্যাকমোহনও, কি আশ্চর্য, সেই চারটে ছেলের কথাই ভাবছিলেন। তাদের মুখ-ই মনে পড়ছিল তাঁর। মনে পড়ছিলো শিখ সিপাহীদের সে বর্বরকৌতুকে তাদের মুখগুলো ভাবলেশহীন নির্বোধ ভয়ের মুখোস আঁটা—কাঁদছে, চোখ দিয়ে জল আর মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে—সে চৈতন্য তাদের নেই।

মনে পড়েছিলো কয় জন ছোকরা জঙ্গী তাদের দেখে কি ঠাট্টা জুড়েছিলো। আর শিখগুলো যখন বুঝল যে সাহেবদের তারা আনন্দ দিতে পেরেছে—তখন তারাও উল্লাসে আরো বর্বর হচ্ছিলো। ম্যাকমোহন এই আচরণের নিন্দা করতে গিয়ে নিজেই অপদস্থ হলেন। কম্যাণ্ডিং অফিসার সে বর্বর আচরণের মধ্যে কোনো কিছুই নিন্দনীয় খুঁজে পেলেন না।

এখন সেই চারটে ছেলের মুখ তাঁর মনের ভেতর যেন তাঁর দিকে ফিরে চাইলো। মুখ থেকে কান্না বা ভয়ের অভিব্যক্তি মুছে গিয়েছে।

তারা কি বলছে। তারা তাঁকেই অভিযোগ করছে—তুমি এই অপমান দেখলে কি করে?

ম্যাকমোহন বিড়বিড় করে বলেন—আমাকে ক্ষমা কর।

বলেই চমকে ওঠেন। কাকে বললেন? কেউ কোথাও নেই তো?

সত্যিই কি কেউ নেই? এখন রাত হয়েছে—সবাই বিশ্রামে গিয়েছে। ম্যাকমোহন তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ান। ধুনীর আগুনের বাইরে—ঐ যে দেখতে ভুল হয় না—কালো কালো ছায়া-শরীর গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছে।

ছায়া নয়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকারটা চোখে তরল হলে ঠিকই ঠাহর করা যায়, যে সামনে যারা বসে আছে, তারাও মানুষ। চুল ঝুলে পড়েছে মুখের দুই পাশে, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাপড়ের ওপর কেউ-বা শিশুকে চেপে [illegible] আছে—কেউ বৃদ্ধা, কেউ যুবতী, কেউ বা বালিকা। তবে এ তারতম্য শুধু চোখে দেখে বোঝবার। অন্যথায় নারীত্বের কোন অস্তিত্বই তাদের মধ্যে নেই। সকলেরই রুক্ষকেশ, জীর্ণ বসন—চোখে তাদের অপেক্ষমান জন্তুর মতো একাগ্র দৃষ্টি।

ম্যাকমোহন ওদের জানেন। ওরা অর্থাৎ ওদের মতো মেয়েরা, যেদিন মানুষ ছিলো, সেদিন ওদের স্বামী ছিলো, পুত্র ছিলো, পিতা ছিল, ভাই ছিল—ঘর ও গৃহস্থী ছিল।

বর্তমানে কিছু নেই। গ্রামের পর গ্রামে একজন পুরুষ মানুষও নেই। গ্রামের অস্তিত্ব নেই—ঘরদোর সব জ্বলে গিয়েছে।

এই মহাশ্মশানে তাই এই সব মেয়েদের শ্মশানচারী শৃগাল ও নেকড়ের মতো ক্যাম্প অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই।

যে কোন দেশে যে কোন যুদ্ধের পরে এমনি করেই শত সহস্র ধুমাবতী সৃষ্ট হয়। তারা তখন বিজয়ী সেনাদলকে অনুসরণ করে চলে—আর কিছু দরকার থাকে না।

উত্তরভারতের অযোধ্যা জেলার এই সব মেয়েরা তাই ক্যাম্প অনুসরণ ক'রে চলেছে। এদের কণ্ঠে কোন শব্দ নেই—এদের শিশুরা কাঁদে না—দিনমানে কোন্ ঝোপেঝাড়ে দগ্ধ-বসতিতে লুকিয়ে থাকে! কখনো ঘরপোড়া ছাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছাই উড়িয়ে খাদ্যবস্তুর সন্ধান করে। কখনো সেই ছাই-এর পাশে মাথায় হাত দিয়ে পাথর হয়ে বসে থাকে।

আর ক্যাম্পকে অনুসরণ করে। রাত্তিরে আঁধার নামলে একমাত্র সেই আঁধারে তারা স্বস্তি অনুভব করে—আর এগোতে থাকে আঁধারে আঁধারে। ক্যাম্পের আশে-পাশে গুঁড়ি মেরে বসে চেয়ে থাকে। বাচ্চা ও বালিকাদের দেখে কখনো সখনো কেউ খাবার ছুঁড়ে দেয়, কেউ দেয় না। খাবার ছুঁড়ে দিলেই যে তারা তুলে নেয়, তা নয়। তারা শুধু চেয়ে থাকে। চেয়ে দেখে এরা তাঁবু খাটাচ্ছে, রসুই বানাচ্ছে, হাসিঠাট্টা করছে—আরো কি করছে না করছে—দুই চোখ মেলে, পলক না ফেলে নির্নিমেষে দেখে তারা। দেশী সিপাহীরা ইতিমধ্যেই তাদের ভয় পেতে সুরু করেছে। ভয় পাচ্ছে—তাদের মনে হচ্ছে ওরা ডাইনী—মনে হচ্ছে ওদের চোখে ও নিঃশ্বাসে অভিসম্পাত আছে। দেশী সিপাহীরা তাই রাত ঘনালে তাঁবুর পেছন দিকে বেরোয় না।

শ্বেতাঙ্গরা ভয় পায় না। ইতিহাসের সে শৈশবে, যখন তারা এদেশে আসেনি, ভূমধ্যসাগরের অস্তিত্ববিহীন ভূখণ্ডে তারা ভ্রাম্যমানের জীবন যাপন করতো, তখন—তার পরে ঠাঁই না পেয়ে দল বেঁধে ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুকুশের পথে—সার্থবাহ দস্যু ধরে এই তাম্রসভ্যতার মহাদেশে যখন এসেছিলো, তখন—কৃষ্ণা দ্রৌপদীর মতো বহু মালিক দ্বারা ধর্ষিতা আফ্রিকাতেও যখন মিশনারীদের সামনে এগিয়ে পেছনে বন্দুক ও কামান নিয়ে গিয়েছিলো, তখন—মুখে ধর্মের বাণী ও [illegible]তে আফিমের বীজ ও কামানের গোলা নিয়ে চীনদেশে যখন গিয়েছিলো, তখন—যুগে যুগে বারে বারে তারা এমনি করে-ই অপরের দেশকে শ্মশান করেছে—শ্মশান রচনা করতে করতে এগিয়ে গিয়েছে—এবং সেই শ্মশানের ভস্ম ও অস্থি অনুসরণ করে এমনি ক'রে সব শ্মশানচারিণীরা অনুসরণ করেছে।

এ তাদের পরিচিত। তাদের রক্তকণিকা এসব কথা জানে। তারা না হয়, আজকের ১৮৫৭-তে জঙ্গী গোরা—তাদের রক্তকণিকা ত' কয় সহস্র বছরের বর্বরতার উত্তরাধিকার বহন করে। তারা তাই জানে যে এমন হবে। এখন তারা বার বার করবে—আর বারবার-ই বর্ণের গরিমা এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের শ্রেষ্ঠাধিকারের নজীর দেখিয়ে নিজেদের-ই নিজেরা 'জয় জয়' বলে ভেট দেবে।

নীল, বা ব্রাইট, বা পাঞ্জাবের কুপার, বা দিল্লীর নিকলসন্, বা লক্ষ্মৌ-এর হডসনের ঘুম বা আহারে অভিরুচি বা কোনো আরামের ব্যাঘাত ঘটে না।

ম্যাকমোহন শুধু বুঝতে পারেন, যে তিনি পারছেন না। তিনি হেরে গেছেন। এই যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, যে তিনি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য রক্ষার্থে এই হত্যা ও হননলীলায় অপারগ।

ম্যাকমোহন চোখ তাকিয়ে, বুড়ো নজরকে তীক্ষ্ণ করে ঐ নেকড়ের মতো অপেক্ষমান শ্মশানচারিণীদের দেখেন। তিনি জানেন, ওরা একটা কথা কইবে না—ওদের শিশুরা কাঁদবে না, ওদের কণ্ঠ থেকে একটা শব্দ-ও উচ্চারিত হবেনা—ওরা শুধু চেয়ে থাকবে। ওদের সমস্ত দেহমনের অস্তিত্ব এখন কেন্দ্রীভূত দুই চোখের মণিতে—ঝোলা, সিঁটিয়ে পড়া, জটপাকানো চুলের নিচ থেকে দুই চোখ দিয়ে তারা শুধু দেখবে—দেখবে এই নতুন মানবদের যাদের জুড়ি তারা কখনো দেখেনি—না মহাভারতের যুগে মহাশ্মশানের সময়ে—না নাদির বা তৈমুর, বা অন্য বিদেশীদের আক্রমণের কালে। ইংরাজ সকলকে টেক্কা দিয়েছে। এরা তাই দেখবে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণগরিমায় গরিয়ান বিজেতাদের।

ম্যাকমোহনের বুক যন্ত্রণায় মোচড় খায়। তিনি এগিয়ে যান। বলেন—ক্ষমা করো। ক্ষমা করো আমাকে—আমাকে শাস্তি দাও—আমাকে ক্ষমা করো, আমার জাতকে ক্ষমা করো—

সঙ্গে সঙ্গে প্রেতছায়ার মতোই সেই চোখগুলো পিছিয়ে যায়। পিছিয়ে পিছিয়ে গাঢ় আঁধারে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসে।

ম্যাকমোহন জানেন, যে তারা আবার আসবে—এগিয়ে আসবে—এগিয়ে এসে আবার চেয়ে থাকবে।

কত শত-সহস্র মুখ। সবগুলো মুখ এমন করে মনে গাঁথা থাকে কেন? নিজের মনটা তাই এমন ভারী হয়েছে, ভরে গিয়েছে, টানটান হয়ে গিয়েছে, যে ম্যাকমোহনের মনে হয় বুকটা কখন বুঝি দুইখানা হয়ে ভেঙে যাবে। তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না।

তাঁর কাজের প্রথম গোড়াপত্তন থেকে কত ভারতীয় সিপাহী,

সওয়ার, গ্রামের মানুষ, শহরের হিন্দু মুসলিম সম্ভ্রান্ত—কতজনের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল? সকলের মুখ মনে পড়ে। এক একটা রাত হয়, আর ম্যাকমোহনের বুক ছেড়ে মানুষগুলো বেরিয়ে এসে মিছিল বেঁধে তাঁর চারি পাশে দাঁড়ায়। তারা কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন শুধোয় না। শুধু চেয়ে থাকে। ঐ সব মেয়েদের মতোই চেয়ে থাকে, যারা আর মেয়ে নেই—কন্যা, পত্নী, জননী নারীত্বের সব সংজ্ঞা পেরিয়ে যারা মানুষ ও অমানুষের একটা অদ্ভুত সীমারেখায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে।

এরা তাদের মতো চেয়ে থাকে। কেন? কেন এরা একটা কথা-ও তাঁকে জিজ্ঞাসা করে না? কেন তারা বলে না, যে সাহেব, বুঢ়া সাহেব, এ তুমি কি করলে? তুমি সামনে দাঁড়িয়ে এ কি দেখলে? আর তুমি যে আমাদের সঙ্গে সকল দুঃখকষ্ট ভাগ করে নিয়েছ, ভালবেসেছ, আমাদের ভাবায় কথা বলেছ, ফৌজীকানুনে আমাদের শাস্তি হলে আর্জি লিখে লিখে লড়েছ, আমাদের সঙ্গে রামলীলা দেখে সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছ, আমাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে মোহর আশীর্বাদ দিয়ে খানা খেয়ে এসেছ—তুমি শেষ অবধি ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছ? সাহেব, তুমি এ কি করলে?

তারা সে প্রশ্ন করে না। বুঢ়া ম্যাকমোহন মাঝে মাঝে এই নীরবতায় অতিষ্ঠ হয়ে যখনই বলে ওঠেন—কি বলতে চাও, বলো!

তখনই তারা সরে যায়। আর তাদের দেখেন না। জানেন, যে ওরা তাঁর নিরন্তর চিন্তার ফলে সৃষ্ট কতকগুলো ছায়াশরীর।

তখনই এ-ও জানেন, যে ধুনীর আগুন কমেছে—আর বাইরের সেই মূর্তিগুলো গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে এসেছে—তারা ছায়া নয়। তারা সত্যি।

এতজনকে দেখেন তিনি, শুধু চন্দনকে দেখেন না। চন্দন—যে তাঁর অন্তরের সঙ্গী—যাকে তিনি বলেছিলেন—যাব একদিন তোমার বাড়ী। সময় হলে যাব। যাও, আপনা ঘর মে' ঘি কা দিয়া জ্বালাও

সেই চন্দন একদিনও আসে না।

এমনি করে চলতে চলতে ক'দিন বাদে একদিন এমন রাত-ও আসে যে রাত ভোর হলে-ই কানপুর। মানে নীল তার সকল কীর্তি ম্লান করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে সেখানে। কানপুরে বিবিঘরে ইংরেজ নারী ও শিশুদের হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষক সব কাহিনী সে রাতে মদের সঙ্গে চাটের মতোই পরিবেশন করা হয়। নিজেদের খেপিয়ে খেপিয়ে চড়া তারে বেঁধে রাখে সাহেব-রা। আজকের রাতটা এমন যে আজ রাতি অনুগত ও বিশ্বস্ত দেশী সিপাহীদেরও তারা কথায় কথায় গালি পাড়ে। জন্ম তুলে, জাত তুলে। অর্থাৎ আজকের রাত পোহালে যে ভোর হবে তার জন্ত এই সব গোলাম সেনাদের ও অপমান করবার প্রয়োজন আছে।

আজকের রাতটা ম্যাকমোহনকে কলিজায় কামড়ে ধরে। কলিজা, যেখান দিয়ে রক্ত চলাচল হচ্ছে, এবং যার থেকে সমস্ত শরীর প্রাণ পাচ্ছে, ঠিক সেইখানটায় ঢুকে বসে কামড়ে ধরে আজকের রাতটা। ম্যাকমোহন সে দাঁত ছাড়াতে পারেন না।

আজ রাতে চন্দন এসে দাঁড়ায়। সঙ্গ কুমায়ুনের সাকখানা থেকে এলো, কাঁধে শিকারের থলি, হাতে মাছ ধরা জাল। ম্যাকমোহন তাকে দেখে আশ্বস্ত হন। চন্দন তাঁকে ইসারা করে। বলে—বাইরে চল। এখানে কথা বলে সুখ নেই।

ম্যাকমোহন ওঠেন। তিনি-ও কম সতর্ক নন। নিজের রিভলভার নিতে ভোলেন না। রিভলভার নিয়ে উঠে খুব নিঃশব্দে বেরিয়ে যান। চন্দন তাড়াতাড়ি হাঁটে। ম্যাকমোহন দেখেন, যে পাহাড়ে চড়াই উৎরাই করে করে তার পদক্ষেপগুলি কেমন বাঁকাবাঁকা, অদ্ভুত অদ্ভুত হয়েছে। ম্যাকমোহনের এবড়ো খেবড়ো চষা জমির ওপর দিয়ে চলতে অসুবিধে হয়—কিন্তু চন্দন চলে তাড়াতাড়ি। খানিকদূর এসে যখন ম্যাকমোহন দেখেন, সে ক্যাম্প অনেক দূরে ফেলে এসেছেন, এখন আর কথা বলতে আপত্তি হওয়া উচিত নয় চন্দনের। এই কথা মনে করে যেমন ফিরে তাকান অমনিই দেখেন চন্দন নেই। চন্দন নেই? সামনে হাত বাড়ান। হাতটা হাওয়া কেটে ঘুরে আসে।

দুই পা ফাঁক করে দাঁড়ান ম্যাকমোহন। তাঁকে নিশি ডেকেছে। নিশিই এসেছিলো চন্দন হয়ে। চন্দনের রূপ ধরে তাঁকে পথের নিশানা দেখিয়ে গেল। বন্ধু চন্দন, তাকে বিশ্বাস করে করে সে এলাহাবাদ আসছিল পথে অতর্কিতে ব্রাইটের গুলীতে মরে যাওয়া চন্দন—সেই চন্দন দেখা গেল মৃত্যুর পরেও তাঁকে ভোলেনি।

আকাশের দিকে তাকান ম্যাকমোহন। ঐ তো সেই সব তারা ঠিক রয়েছে। প্রথম যেদিন কার্গো জাহাজ চড়ে ভারতে এসেছিলেন, বোম্বাইএর বন্দরের আকাশ থেকে প্রথম রজনীতে যে সব তারারা তাঁকে অভিনন্দন করেছিল তারা ঠিক তেমনিই জ্বলছে। বাতাসও ত' তেমনই বন্ধুর মতো জুড়িয়ে দিচ্ছে কপাল, চোখ-মুখ। আর ঐ মাটি। ভারতবর্ষের মাটি। যে সব মানুষকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়েছেন তাঁরা, তাদের হাতে চষা ঐ ধূমল পাটকিলে রঙের ঢেলা ও গুঁড়োমাটি—ম্যাকমোহন জানেন, মুখ গুঁজলে ঐ মাটি থেকে সেই পরিচিত প্রিয় গন্ধই পাবেন।

তবে আর এই রাতটাকে টেনে নিয়ে একটা রক্তমাংসের আর্তনাদে বর্বর সকালে পৌঁছে দেবার দরকার কি?

চিবুকের নিচে রিভলভারের ঠাণ্ডা নলটা চেপে ধরে গুলী করেন ম্যাকমোহন। তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে যান মাটিতে।

এমনি করে শেষ হয়ে যান ম্যাকমোহন। ১৮৫৭র দিন-কাল তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি এবং জীবনবোধের পক্ষে বড় বেশী সমস্যাসঙ্কুল হয়ে উঠেছিল। নির্বিচার নরহত্যা, এবং রাষ্ট্র ও রাজধর্মের নামে এই হননলীলা তিনি কিছুতেই মনে-প্রাণে মেলাতে পারছিলেন না। ম্যাকমোহনের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন জড়িয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। তার উত্তরের কিনারা তিনি করতে পারেননি। তিনি প্রথমতঃ এবং সর্বপ্রথম একজন খাঁটি ইংরেজ। একজন খাঁটি ক্রিশ্চিয়ান। কিন্তু তারও আগে, সর্বপ্রথমে ধরণীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথমে কি তিনি মানুষ নন? তিনি প্রথমে মানুষ, দ্বিতীয়ত ইংরেজ? না প্রথমে এবং চিরতরে ইংরেজ?

এই নির্বোধ প্রশ্ন তাঁর মনে হয়েছিলো। উত্তর পাননি।

বুঢ়া ম্যাকমোহন, তাঁর ফৌজের দেওয়া ভালবাসার নাম। সেই বুঢ়া ম্যাকমোহন, নিজের জীবনের সকল কর্তব্যকে বিশ্বাস করেছেন। তিনি অনেক কিছু করতে চেয়েছেন। তিনি পাপামোরের বাংলোতে

থাকবেন—তিনি অনেক কাজ করবেন, যার বড় প্রয়োজন এদেশে। তাঁর আদর্শ ছিলেন কর্নেল শ্লীম্যান প্রমুখ ভারতপ্রেমী বুড়ো ইংরেজরা। তিনি তাঁদের আদর্শে, খাঁটি ক্রিশ্চিয়ানের মতো ভারতকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনবোধ তাঁকে এই শিখিয়েছিল যে, এই দেশকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে, ভালোবাসা দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, সেবা দিয়ে তবে এদেশে বৃটিশ শাসনকে সার্থক করা যাবে। কেন না নিজের দেশকে ম্যাকমোহন সত্যিই ভালোবেসেছিলেন। ন্যায়পরায়ণ ইংরেজ জাতি কোন ভুল বা অন্যায় করতে পারে না—এই ছিলো তাঁর বিশ্বাস!

দেখা গেল, ১৮৫৭তে তাঁর মতো ধ্যানধারণাসম্পন্ন ইংরেজের কোন প্রয়োজনই নেই। তিনি একেবারে বরবাদ। আজকের দিন থেকে ভারতে যে ইংরেজ প্রয়োজন হবে, সে ঐ নীল, ব্রাইট, হডসন, নিকলসন ও কুপার। তাঁর মতো ভারতীয় ভাষা শেখা, আচার-ব্যবহার শেখা, এদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ভালবাসা ও স্নেহভরা হৃদয়, রোদে পোড়া, জলে ভেজা তামাটে মুখ ইংরেজের আর কোন প্রয়োজন হবে না।

এরা যা বোঝে, তিনি তা বোঝেন না। যদি সময় পেতেন, তবে ম্যাকমোহন অনেক কাজ করতেন, যার কোন জাগতিক প্রয়োজন নেই। টানা টানা অক্ষরে, হাঁসের পালকের কলমে—'Fifty Years in India' বইখানা তিনি লিখে শেষ করতেন। তাতে এদেশের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসার কথা লিপিবদ্ধ থাকতো। সময় পেলে কুমায়ুনের বনাঞ্চলে সে সাফাখানায় গিয়ে তিনি গাছের প্রথম কুসুমসঞ্চার দেখতেন। মৌসুম পাখীরা এসে কেমন করে বাসা বাঁধে, কেমন করে সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রণয় করে—কেমন করে বাচ্চাকে উড়তে শেখায় তাই দেখতেন। সময় পেলে চন্দনের সঙ্গে তার গাঁয়ে যেতেন। চন্দন তার ডেরাপুর গ্রামের নদীর ধারে একটি বটগাছের কথা প্রায়ই বলতেন—তিনি সেই বটগাছটা দেখতেন। গাছ, ফুল, পাখী, এ সব তাঁকে চিরদিনই আকৃষ্ট করেছে। সময় পেলে গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের চিবুক তুলে ধরে, তাদের কালো চোখের অতল সরোবর দেখতেন। ভারতের শিশুদের চোখের চাহনি তাঁর চিরদিন আশ্চর্য্য লেগেছে।

সে সব কিছু হলো না। ম্যাকমোহনের ফুরফুরে সাদা চুলগুলো রাতের বাতাসে উড়তে লাগলো। তাঁর মুখটা মাটিতে গোঁজা। তাই আকাশ দেখতে পেলো না তবে রক্তে ভেজা সে মাটি, কোঁচার মত অন্ধ চোখে অনুভব করেও ছুঁয়ে ঠিকই জানলো, যে তার বুকে গোঁজা ম্যাকমোহনের সে মুখটা ধীরে ধীরে প্রশান্ত হয়ে আসছে। শরীরটার স্নায়ু ঢিলে হয়ে আস্তে আস্তে আরাম পাচ্ছেন ম্যাকমোহন।

ডেরাপুরের সে বটগাছও ডালে ডালে মৃতদেহ ঝুলবার যন্ত্রণা জানলো।

ম্যাক্সওয়েলের বাহিনী আসবার খবর পেয়ে গ্রামের মানুষ পালিয়ে গিয়েছিলো। তবে সকলেই কিছুই আর বুদ্ধিমান নয়। কিছু কিছু মানুষ থাকে গোঁয়ার এবং নির্বোধ, তারা কোনমতেই কোন যুক্তিই শুনতে চায় না। চন্দনের ছেলে, চন্দনের বাপ প্রতাপকে যেমন বোঝাতে পারল না কেউ। সে গ্রাম ছেড়ে গেল না। বললো, আমার গম সব গোলায় ভরতে হবে মানুষ না পাই। আমি আর বৌ মিলে তুলবো।

গ্রামের বয়স্ক মানুষরা বললো—প্রতাপ, তোমার এত বুদ্ধি আর এই কথাটা বোঝ না, যে তোমাকে যদি জানে মেরে রাখে তা হলে গম দিয়ে কি হবে?

—জানে মারবে কেন?

প্রতাপ সবজান্তার মতো হাসতে লাগল। বললো—

আমার বাড়ীতে পেটি খুলে দেখিয়ে দেব সাহেবকে—বাবার কাছে সাহেবদের সার্টিফিকেট আমার ছেলে চন্দনের নামে সাহেবের সার্টিফিকেট সব আছে। সাহেবরা ত মা বাপ, তারা ঠিকই বুঝবে।

অন্য কারও ঘরে তেমন প্রাণ বাঁচাবার কোন সাক্ষী প্রমাণ ছিল না। তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। গরু-বাছুরের দড়ি কেটে দিয়ে গেল। তারা স্বচ্ছন্দভাবে চরে খাবে। ঘরদোরের জন্যে ভাবলো না। প্রতাপের মতো বিশ্বাস নিয়ে আরো যে কয়জন বসেছিলো গ্রামে তারা সবাই গ্রামের মানুষের এ আচরণ দেখে দুঃখে মাথা নাড়ে।

প্রতাপ কোনদিনও বাপের মতো একগুঁয়ে বা ছেলের মতো বেপরোয়া নয়। সে কলকৌশলে কাজ আদায় করাতে বিশ্বাসী। বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী আসছে জেনে সে ঘি, দুধ, মধু, ফল ও শাক-সবজীর ডালা সাজিয়ে সাক্ষাৎ করতে যায় মাথায় পোষাকী পাগড়ী বেঁধে।

তাই দেখেই সন্দেহ হয় ব্রাইটের। প্রতাপের কাছে তারই মামা ম্যাকমোহনের চন্দনের সম্পর্কে চিঠি দেখে সে সন্দেহ এবার ঘনীভূত হয়। তার আর বুঝতে বাকি থাকে না, যে এ একটা পুরোদস্তুর Rebel village, সেই চন্দনেরই ছেলে প্রতাপ—এবং এরই সহযোগিতার ফলে গ্রামের অন্য মানুষগুলি পালিয়েছে। এই সব কথা তার মনে দ্রুত বাসা বাঁধতে থাকে। তার পর প্রতাপকে বলে—তোমার মতো এই রকম বিশ্বস্ত আর কতজন আছে, ডেকে নিয়ে এস।

বেশী কেউ ছিলো না। গ্রামের বুড়ো মৌলভী আর বুড়ী কৌশল্যার নাতি। এই গ্রামে এবং এই অঞ্চলে এক সময় জরী-কাজের খ্যাতি ছিল। এ গ্রামের শেষ কারিগর শামাদের কাছে ছেলেটা জরী-কাজ শিখছিলো। পনেরো ষোল বছরের ছেলে—সূক্ষ্ম কাজ আর ছোটখাটো জিনিষ তৈরীতে তার নিপুণতার কথা সবাই জানে। শামাদ তাই ছেলেটাকে জরীকাজে তালিম দিয়েছিল। এমনও বলেছিল—আগ্রাতে গিয়ে যদি তার চাচেরা ভাইয়ের কাছে আমাদের পরিচয়পত্র নিয়ে হাজির হয় ছেলেটা তার চাচেরাভাই তবে তাকে নিজের কারবারে শিক্ষানবীশ করে নিতে পারে। সেই ছেলেটা যায়নি। দুর্গার কাছে খাওয়া দাওয়া করছিল—আর নিজের ছেলেটাকে ঘরছাড়া করে থেকে অল্প বয়সের এই ছেলেটার ওপর দুর্গার কেন যেন মায়া পড়েছিল। এ কয় দিন ছেলেটা এইখানেই প্রতাপের সঙ্গে কাজে সাহায্য করেছে। দুর্গার কাছে কাছে থেকেছে। আর দুর্গা তাকে অনেকবার বলেছে যে চন্দন ফিরে আসবে—চম্পাকে নিয়ে আসবে—আর তখন এই ভাল ঘরখানা ছেলে-বৌকে ছেড়ে দিয়ে দুর্গা ওদিকের ঘরে যাবে। ছেলেটাকে তখনও নিরাশ্রয় হতে হবে না। আগ্রা যাবার জন্যে যে টাকা দরকার, তা সেই দেবে।

রাজ সন্দর্শনে ডাক পড়েছে। মৌলভী পরিষ্কার সাদা পোষাক পরে আসে। ছেলেটা আসে প্রতাপের সঙ্গে। আর কেউ নেই জেনে এবার ব্রাইট উঠে আসে। একজন বৃদ্ধ, বালক ও একজন প্রৌঢ়কে ধরতে ছয় জন গোরাই যথেষ্ট হয়।

সেই বটগাছটাই বেশ উপযোগী বলে মনে হয়। সঙ্গে দড়ি ছিল না। একজন গিয়ে প্রতাপেরই বাড়ী থেকে দড়ি নিয়ে আসে। প্রতাপ চিরদিন ভীরু ও গা-পোষা ছিলো। তার বাপ তার মধ্যে পৌরুষের অভাব দেখে কত লজ্জিত হয়েছে। ছেলেও লজ্জা পেয়েছে বাপের জন্যে। আর সে যে মরদের মতো মরদ নয়—তা নিয়ে দুর্গাই কি কম কথা শুনিয়েছে তাকে?

মৃত্যুর সামনে এসে প্রতাপের সে ভয় এবং দুর্বলতা কোথায় চলে যায়। যেই জানে, যে কি হবে এখন—প্রতাপ মাথা থেকে পাগড়ী খুলে ফেলে পা থেকে জুতো খুলে ফেলে—গলায় শৈবীনাথের প্রসাদী কবচ ছিল, সেটা আর ফিরিঙ্গীদের ছোঁয়ায় কলঙ্কিত করে না—ছুঁড়ে ফেলে দেয় নদীর জলে। পায়ের কাছে অবধি জল উঠে এসেছে। আঁজলা ভরে জল তুলে খেয়ে নেয়, মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দেয়। মৌলভীকে বলে—এমন জানলে চন্দনের মার হাতের চুড়ি নিজে ভেঙে দিয়ে আসতাম।

তার শুধু চিন্তা হয়, দুর্গা দেখতে পাচ্ছে কি না, বাড়ী থেকে।

তারপর সে বোঝে, এখন এ চিন্তা করেও তার লাভ নেই। বুঝে মনটাকে বেঁধে ফেলে।

প্রতাপ এমন নির্ভীক ভাবে, এমন অবহেলে মরে—তা দেখতে কেউ থাকে না এই যা—নইলে, সে ভয়হীন ভাবে মৃত্যুবরণ দেখলে পরে তার পিতা চন্দন গৌরব অনুভব করতো—তার ছেলে চন্দন দেখলে অভিভূত হতো—আর তার কর্ত্রী দুর্গা তা দেখলে পরে স্বীকার করতো, যে হ্যাঁ, সারাজীবন তোমার মধ্যে যে পৌরুষ খুঁজেছি আমি তবু পাইনি সেই পৌরুষ চূড়ান্তভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেলে তুমি। আমি দেখে ধন্য হলাম।

গ্রাম লুঠে, রয়াল গাড়ীতে অজস্র খাদ্যসম্ভার তুলে নিয়ে চলে যায় ব্রাইটের ব্রিগেড। সকালের আলো পড়ে বড় সুন্দর দেখায় ব্রাইটকে। গ্রীক-ভাস্করের হাতে ক্ষোদিত সূর্যদেবতা এ্যাপোলো যেন খেলাচ্ছলে এই যোদ্ধার সাজ নিয়ে চলেছেন। ব্রাইটের সোনালী চুল, ও অল্প কুঞ্চিত দাড়ি গোঁফের ওপর আলো চকচক করে। দুটি চোখ যেন স্বপ্নদর্শী, সে চোখ অনেক সোনার স্বপ্ন দেখে।

প্রতাপ, মৌলভী ও কৌশল্যার নাতি—তিনজন তিনটে ডালে নিশ্চুপ হয়ে ঝোলে। তারাও একদিন জীবিত ছিলো—যে যার মতো ভাবে জীবন থেকে জীবনের পাঠ গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু এই সভাবনে সে সব শিক্ষা কোন কাজেই লাগলো না। প্রতাপ ভালো গৃহস্থ ছিলো। চাষবাস আর জমিতে তার প্রাণ ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, গ্রামের বুড়ো মাতব্বররা-ও জল, ঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ফসলের ভালোমন্দ, এ সব বিষয়ে প্রতাপ যে তাদের থেকে অনেক বেশী বোঝে, অনেক বেশী জানে—সে কথা স্বীকার করতো। মাটি দেখে মুঠো বেঁধে প্রতাপ বলতো,—এবার মাটি কি রকম রসাল হয়েছে। এবার অড়হর আর ছোলা তুলে শেষ করতে পারবে না। দেখেছ মাটির চেহারা?

নিজের ক্ষেতীকিষাণদের সঙ্গে ক্ষেতে কাজ করতে করতে বাতাস শুঁকে সে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনুভব করতো। বলতো —বৃষ্টি এসে পড়বে কালকে নাগাদ। হাত চালিয়ে কাজ করো তোমরা।

মাটিতে পা রেখে, হাতের মুঠোয় বীজের গড়নটি অনুভব করে, সেই বীজ মাটিতে পুঁতে নালা কেটে জল সেঁচে সেঁচে, সেই বীজকে গাছে পরিণত করে—প্রতাপ ডেরাপুরের ক্ষেত ও ফসল ও জল-বাতাসকে মনে-প্রাণে পুঁথির মতো পড়ে নিয়েছিলো।

মৌলভীর শুধু কোরাণ-ই মুখস্থ ছিলো না, সে সযত্নে গ্রামের ছেলেদের ফারসী পড়াতে শিখিয়েছে—সে নানা রকম ধর্মীয় উপাখ্যান জানতো। অনেক পীর, ফকির ও দরবেশের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা—হাজিপুরের সে মুরশেদ পীরের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা—বহু বাদশা বেগমের কাহিনী "লয়লামজনু" এবং সোরাবরুস্তমের কিস্‌সা এ সব সে জানতো। তাছাড়া সে জানতো কিছু হাকিমী দাওয়াই—নতুন প্রসূতিদের শরীর তাড়াতাড়ি ভালো করতে হলে কি খেতে হয়—গরমের কালে ছোটদের চোখে গরম বাতাস লেগে জ্বালা করলে এবং জল কাটলে কি মলম দিতে হয়—তা-ও সে জানতো। গল্প কাহিনী বলবার মতো একটা কণ্ঠ লাবণ্য তার ছিলো। তার গলায় গল্প কাহিনী শুনতে লোকের খুব ভালো লাগত। কেননা তার উচ্চারণ ছিলো বিশুদ্ধ এবং গল্প বলতো সে প্রাণ দিয়ে। মানুষটা শান্তিপ্রিয় এবং গ্রামের সকলে যেমন তাকে ভালোবাসতো, সে-ও গ্রামের সকলকে ভালোবাসতো। তার বংশে দুই চারজন শতবর্ষজীবী পিতৃপুরুষ ছিলেন। সে ও শতবর্ষ বাঁচবার আশা রাখতো, এবং বয়স সত্তর পেরুতেই সে মাংস ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধাচারীর জীবন অবলম্বন করেছিলো।

কৌশল্যার নাতির বয়স ছিলো কম। তার আঙুলে ছিলো প্রথম প্রণয়াসক্ত কিশোরীর মতোই ভীরু কোমলতা। সেই আঙুল দিয়ে রূপোর ছুঁচে জরী পরিয়ে কালো ভেলভেটের ওপর—সে অতি সুন্দর, অতি নিখুঁত ভাবে গোলাপগুচ্ছ ফোটাতে পারতো। আরো সুন্দর সুন্দর নক্সা জাহির করবার ইচ্ছা তার মনে ছিল এবং সে আশা রাখতো, যদি সুযোগ পায় এবং টাকা-পয়সা হয় তার, তবে গরীব কারিগর হয়ে শুধু খদ্দেরের টাকায় ফরমায়েসী জিনিষ না বানিয়ে সে নিজের জন্যে একটা তাজমহল বানাবে। সকল জরীর কারিগরই শেষ অবধি একটা জরীর তাজমহল বানাতে চায়। সেও বানাবে। তবে জরীর কাজে যে টাকা দরকার, তার তা নেই। সে আশা রাখতো, একদিন তার সে টাকা হবে।

এরা এই সব জানতো। কিন্তু এই সব জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা এ সময় কোন কাজেই লাগলো না। এই সব অনেক পরিচয়, এ সময় কোন কাজেই লাগলো না। হাজারটা খুচরো পরিচয়ের ভেতর থেকে একটা পরিচয়ই ছেঁকে তুলে নিলো ইংরেজরা—যে তারা ভারতীয়। অন্য কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

প্রথমে তাগড়া-তাজা, তার পর আস্তে আস্তে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে গলে-পচে—তারা সেই বটগাছের ডালে অনেক দিন ধরে ঝুলে রইলো।

দুর্গার মাথার দোষ হয়েছিলো। দেশ-ঘর ছেড়ে, ফৌজের পেছন পেছন এসে সে কানপুরের বাজারের রাস্তায় ঘর বানালো। দিন-রাত বিড়বিড় করে বকতো আর আঁচলে ধুলো নিয়ে স্বামি-পুত্রের জন্যে

খাবার নিয়ে ক্ষেতে যেতো—বাতাসের গায়ে হাত বুলিয়ে শ্বশুরের পা টিপে তাকে দেশে থাকবার অনুরোধ করে চোখের জল ফেলতো—আর চন্দন আর চম্পা, ছেলে-বৌয়ের বিয়ের বাজনা নিজে মুখে বাজিয়ে ধুলো দিয়ে ফুলের জলের ছড়া দিয়ে দিয়ে ছেলে-বৌ ঘরে তুলতো।

এ রকম অনেক হয়েছিলো। বেনারস, এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মীরাট—এই সব শহর, শহর ঘিরে যে বর্ধিষ্ণু গ্রাম—সে সব জায়গায় এই রকম উন্মাদ স্ত্রীলোকদের অভাব ছিল না। তারা সংখ্যায় অনেক। অনেক হাজার হবে। তারা সকলেই পাগল, তবে নজর করলে দেখা যেত একই 'method in madness তাদের মধ্যে। তারা সকলেই হাত বুলিয়ে গান গেয়ে কচি ছেলে ঘুম পাড়ায়, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করে সন্ধ্যাবেলা ছাগল গরু তাড়িয়ে গাঁয়ে আনে—ধুলো ও জঞ্জাল দিয়ে স্বামিপুত্রকে খাবার পৌছাতে যায় ক্ষেতে—আর রাস্তার চৌমাথায় বসে রান্নাবান্না, ঘর সংসারের কাজ করে— নেড়ী ও খেঁকি কুকুরকে দেখলে ঘোমটা টেনে —এ কি, তুমি কখন এলে ? বলে সলজ্জে মাথা ঘুরিয়ে নেয়।

এই এক ধরণের পাগলামি তাদের সকলের মধ্যেই ছিলো। তাদের মধ্যেই দুর্গাও হারিয়ে যায়।

• • • •

যে সুতোতে ব্রাইটের জীবনটা দুনিয়ার সঙ্গে বাঁধা ছিল, সে সুতোটা-ও চট্‌ করে কেটে গেল।

কানপুরে এসে ব্রাইট মুখে মুখে খবর পায়, যে ব্রিজদুলারী তাকে খুঁজছে। আর সেটা তার কাছে খুবই স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। কেন না ব্রিজদুলারী তাকেই খুঁজবে—এখন নয়, চিরদিন-ই—এটা-ই স্বাভাবিক। লড়াই-এর সুরু থেকে ব্রাইট কম টাকা হস্তগত করেনি। এবং সে সবের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য—নানাকারণে-ই তার ব্রিজদুলারীকে প্রয়োজন। আরো কি, এই কয় মাসে ব্রাইট ভালো করে-ই বুঝেছে, যে ব্রিজদুলারী ব্যতীত অন্য নারীতে তার রুচি হবে না। এমন কি, ব্রাইটের এমন সন্দেহ-ও হচ্ছে, সে বুঝি বা ব্রিজদুলারীকে ভালবাসে। এ-ও যদি ভালবাসা না হয়, তো অন্য কাকে ভালবাসা বলে ব্রাইট জানে না।

শেঠ মগনলালের এক বাগানবাড়ী কানপুরের উপকণ্ঠে—সে বাড়ীতেও মগনলালের গুপ্ত তোষাখানা আছে—এরকম শুনে ঢুকেছিলো ব্রাইট। সে বাড়ীতে আসবাবপত্র এবং অন্যান্য তৈজস যা ছিলো, তা মহামূল্য। ঘর থেকে ঘরে ঘুরছিলো গোরারা।

চূড়ান্ত সে গোলমালের মধ্যে-ই। একটা পালঙ্ক ঠেলে ফেলে মেঝেতে কোটর করে রাখা এক লোহার পেটি ঠিকই আবিষ্কার করলো ব্রাইট। টাকা নেই—কিছু সোনার আতরদান ও গোলাপ পাশ আছে। তাই বা মন্দ কি। ব্রাইটের মুখ এক আশ্চর্য আত্মপরিতৃপ্তির হাসিতে ভরে গেল। এ বিষয়ে, অর্থাৎ একটা বড় বাড়ীর ঠিক কোথায় লোহার পেটি থাকবে—সে বিষয়ে তার একটা আশ্চর্য বোধ জন্মেছে।

— নিচু হয়ে ব্রাইট পেটির ওপর উপুড় হয়ে পড়লো, আর উপুড় হতে হতেই সামনে দেখলো ব্রিজদুলারীকে। ওদিকে বুঝি গোরাগুলো আস্তাবলে আগুন দিয়েছে। দরজা দিয়ে শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঢোকে। নাক-মুখ জ্বালা করে—দেখতে কষ্ট হয়, তবু ব্রিজদুলারীকে সে ঠিকই চেনে।

ব্রাইট মুখ তোলে—কি বলতে ও চায় আর তাতেই সুবিধা হয় ব্রিজদুলারীর। এই মানুষটাকে খুঁজে খুঁজে সে অনেক দিন পরে ফিরেছে। এখন তাকে পেয়েছে। সুবিধেজনক ভাবেই পেয়েছে। গুঁড়ি মেরে উপুড় হয়ে আছে ব্রাইট—আর মুখটা উঁচু করেছে বলে, গলাটা বেশ দেখা যাচ্ছে। ব্রিজদুলারী তাক করে গুলী ছোঁড়ে গলায়। রিভলভারে ক'টা গুলী ছিল কে জানে ! আধাগর্জন আধা চীৎকার করে ব্রাইট গড়িয়ে পড়তে না পড়তেই সে বাকি গুলীগুলোও ছুঁড়তে থাকে।

সৈন্যরা ততক্ষণ পাশের কুঠি চড়াও করেছে। ব্রিজদুলারী রিভলভারটা ফেলে দিয়ে ব্রাইটের দেহটা টপকে দরজার কাছে এসে ভবানীশঙ্করের ওপরে আছড়ে পড়ে।

দীর্ঘ ছয় মাস বাদে দেখা। তবু আশ্চর্য হন না ভবানীশঙ্কর। তাকে জড়িয়ে ধরেন।

ব্রিজদুলারী নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। বলে—ব্রাইটকে আমি মেরেছি।

ভবানীশঙ্কর তাকে টেনে আনেন। তাঁর বুকের কাছে মুখ রেখে ফিস ফিস করে ব্রিজদুলারী বলে—এখন আমার কেউ নেই। কিছু নেই। এখন তুমি আমাকে নিতে পারবে না ?

—পারব।

—আর কখনো দূরে ঠেলে দেবে না ?

—না।

সে কুঠি জ্বলতে থাকে—সে কুঠির ছাই ও আগুন উড়তে থাকে। এই শ্মশান মাড়িয়ে ভবানীশঙ্কর ও ব্রিজদুলারী গঙ্গায় গিয়ে নৌকায় ওঠেন। এলাহাবাদ বা বেনারস, বা অন্য কোথাও, যেখানে হয় ঘর বাঁধবেন তাঁরা।

এই শ্মশানকে উপেক্ষা করে, নিজেদের প্রেম দিয়ে, জীবনতৃষা দিয়ে আবার নতুন এক ইতিহাসের গোড়াপত্তন করবার দুঃসাহসী সঙ্কল্প নেন ভবানীশঙ্কর ও ব্রিজদুলারী। তাঁদের এ প্রেম ইতিহাসের কোথাও লেখা থাকবে না—এবং তাঁরা যে নতুন এক ইতিহাস রচনা করছেন তা-ও তাঁরা জানেন না। তবে অনেক মৃত্যু, এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে এইটেকে মনে হয় পরম লাভ।

নৌকোটা তাঁদের নিয়ে ভেসে চলে। আজ প্রায় নির্লজ্জ হয়েই ব্রিজদুলারী ভবানীশঙ্করের বুকে জড়িয়ে থাকে। এতটুকু বিচ্ছেদ-ও সহ্য হয় না আজ।

মাঝি কিছু মনে করে না। মনে করবার দিনকাল ·এ সতাবন নয়। এখন চারিপাশে শুধু মৃত্যু, 'তাই এতটুকু জীবনের আশ্বাস যেখানে, সেখানে এমনি করেই দুজনে দুজনকে ধরতে হবে—তা যেন মাঝি বোঝে।

সতাবন সকলকেই জ্ঞানী করেছে। [ক্রমশঃ।

বিদেশিনী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

দেখতে দেখতে আরও বোধ হয় বছরখানেক কাটল এবং ক্রমে ভায়লেটের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব সহজ হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ কাজের শেষে রোজই সকালবেলা 'চা' খেতে খেতে দু'জনার কথাবার্ত্তা চলত অনেকক্ষণ—এবং ভায়লেটের সঙ্গে কথা বলার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। প্রত্যেক কথায় এমন সাড়া পাওয়া যেত তার মধ্যে যে অনেক সময় অবাক হয়ে ভেবেছি—মেয়েটির কি বুদ্ধির সীমা-পরিসীমা নাই! তাই অনেক বিষয় তার সঙ্গে আলোচনা করেছি সে সময়, অবশ্য বেশীর ভাগই আমার ডাক্তারীর ব্যবসার দিক দিয়ে।

এক দিন কথায় কথায় ভায়লেট বলল, আপনার ডাক্তারীতে যে রকম বুদ্ধি, আমার ত মনে হয় আপনার ম্যানচেষ্টারের মতন কোনও বড় সহরে একটা প্র্যাকটিস্ কিনে সেখানে যাওয়া উচিত। সেখানে সহজেই আপনার ব্যবসা খুব বড় হয়ে উঠবে এবং ক্রমে আপনি ইংল্যাণ্ড-বিখ্যাত লোক হয়ে উঠতে পারবেন। হাজার হলেও সেল ত ছোট সহর, কতটুকুই বা এর চাহিদা।

শুধালাম, তা এখানকার কি হবে?

বলল, হয় এটা বেচে দিন, না হয় একজন এসিস্ট্যাণ্ট বসিয়ে দিন।

বললাম, এখানে বাড়ীঘর করে গুছিয়ে বসেছি—

বলল, তা ম্যানচেষ্টার যদি যান—এখানে না হয় প্রত্যেক শনি রবিবার আসবেন। চাই কি, সপ্তাহে আরও একদিন এসে এখানকার প্র্যাকটিস্টা তদারক করে যেতে পারেন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, দেখি ভেবে,—মার্লিনকেও বলি।

বলল, তিনি নিশ্চয়ই কথাটার সমর্থন করবেন। স্বামীর উন্নতিতে সত্যিকারের স্ত্রী কি কখনও বাধা দেয়?

* * * *

মার্লিনকে সেই দিনই কথাটা বললাম। মার্লিন কথাটা শুনে একটু চুপ করে থেকে কেমন যেন একটু উদাসীন ভাবে বলল, আবার—ম্যানচেষ্টারে গিয়ে কি হবে। কি হবে আর বেশী টাকা রোজগার করে।

বললাম, শুধু টাকা ত নয় লীনা! ভায়লেট বলে—ম্যানচেষ্টার গেলে আমি একদিন ইংল্যাণ্ড-বিখ্যাত লোক হতে পারব।

একটু চুপ করে থেকে মার্লিন বলল, মনের শান্তিটাই ত সব চেয়ে বড় কথা।

সত্য কথা বলতে গেলে, মার্লিনের এই উদাসীন ধরণটা আমার কেমন ভাল লাগল না। জীবনে আমার উন্নতির দিক দিয়ে কি উৎসাহ আগ্রহই না ভায়লেটের মধ্যে পাই,—আর মার্লিনের মধ্যে!

শুধু এ ব্যাপারেই নয়। ইদানিং এই মাস দু-তিন থেকে মার্লিনের মধ্যে আবার একটা ভাবান্তর সুরু হয়েছে—সেটা লু থেকে ফিরে আসবার পরে কিছুদিন লক্ষ্য করেছিলাম। জীবনের কর্ত্তব্য সবই করে যাচ্ছে কিন্তু কোন কাজেই যেন কোনও উৎসাহ নাই, আনন্দ নাই। এবং ঠোঁটের সেই মধুর হাসিটি ঠোঁট থেকে যেন মিলিয়ে গেছে। মার্লিনের গভীর চোখ দুটি স্বভাবতই একটু বিষণ্ণ, জানই ত—

—তা যেন বিষণ্ণতায় আরও গভীর হয়েছে। একমাত্র বলতে লজ্জা করব না—প্রাণ ঢেলে যখন আমার বুকে আশ্রয় নেয় তখনই প্রাণের ক্লান্তি ও বিষাদ আমার বুকে ঢেলে দিয়ে যেন একটু বাঁচে।

কেন এমন হল,—নানা দিক দিয়ে মার্লিনকে অনেক প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোনও সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাই নি। কখনও বা রাগ করেছি একটু আধটু কখনও বা অভিমান করেছি। আবার কখনও বা মধুর আদরে মার্লিনকে প্রফুল্ল করে তোলার চেষ্টা করেছি—কিন্তু তাতে করে ক্ষণিকের জন্য একটু ফল পেলেও আসলে মার্লিনের মনের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারিনি।

অনেক ভেবে শেষ পর্য্যন্ত মনকে বুঝিয়েছি—কারণ কিছুই নাই, এটা একরকম মানসিক ব্যাধিই বলতে হবে। সেবায়ের মতন কিছুদিন গেলে আপনা থেকে যাবে কেটে। এ সময়টা মার্লিনের উপর আমার রাগ বা অভিমান করা উচিত নয়।

যাই হোক, ফলে মার্লিনের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সেই সহজ আনন্দ ক্রমে যেন হারিয়ে গেল। তাই কি, সার্জ্জারীতে ভায়লেটের সঙ্গে কথাবার্ত্তার দিকটা ক্রমে উঠতে লাগল জমে। আজ জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে এ কথাটা ভাবতেও যে আমার লজ্জা হয়।

এই সময় একদিন কথায় কথায় ভায়লেটকে শুধালাম, ভায়লেট!

কিছু ভাল লাগে না, জীবনে কোনও উৎসাহ নেই—মনের এ রকম একটা অবস্থা মাঝে মাঝে কেন হয় জান ?

ভায়লেট বলল, জানি বৈ কি। দু-তিন জনার দেখেছি। ক্রমে ঐ থেকে melancholia হতে পারে।

ভায়লেটের কথাটা ভাল লাগল না। বললাম, না না, সেটা ত একটা সাংঘাতিক মানসিক ব্যাধি। এ মনের একটা সাময়িক ভাবান্তর—ক্রমে কেটে যায়।

ভায়লেট শুধাল, সে রকম রোগী কি আমাদের কাছে কেউ এসেছে ?

বললাম, না—এমনি কথাটা মনে হল।

ভায়লেট একবার চোখ তুলে সোজা চাইল আমার দিকে। ভায়লেটের এ চাহনি এর পূর্ব্বে দেখিনি। চোখের গভীরে একটা চাপা হাসির তীক্ষ্ণ আলো আমার চোখের মধ্য দিয়ে আমার অন্তরতম অন্তর বিদ্ধ করে সমস্ত যেন নিল দেখে, আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

একটু চুপ করে থেকে মাথা নীচু করে ভায়লেট বলল, যে কারণে হয়, সেই কারণটা কেটে গেলে মনের এ ভাবটাও যায় কেটে।

বললাম, কোনও কারণ না-ও থাকতে পারে—বিনা কারণেও হয়।

ভায়লেট বলল, আপনি অবশ্য আমার চেয়ে বেশী জানেন। কিন্তু আমি যা জানি বা দেখেছি—কারণ একটা থাকেই।

বললাম, না। অনেক সময় কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভায়লেট বলল, আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। সেখানে বাইরের কোনও কারণ থাকে না কিন্তু অন্তরে খুঁজলে কারণ পাওয়া যায়ই।

বললাম, তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বলল, যে জীবনধারা চলে তার মধ্যে আনন্দ হারালেই ঐ রকম হয়। কিন্তু সে আনন্দ হারাবার কারণটি অনেক সময় অন্তরেই ঘটে।

শুধালাম, কি রকম ?

একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলতে লাগলো—এই রকম—কোন মেয়ে প্রাণ ঢেলে ভালবাসে স্বামীকে বিয়ে করেছে। কিছু দিন পরে হঠাৎ বুঝতে পারলে সে স্বামীকে আর ভালবেসে না, স্বামীর মধ্যে আর কোনও আনন্দ নেই। ছেলে মেয়েও হয়নি যে তাদের অবলম্বন করে আনন্দ পাবে। তখন তার ঐ অবস্থা হতে পারে।

মনটা চমকে উঠল। ভায়লেট কি মার্লিনকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলল ? ভায়লেট কি বুঝতে পেরেছে মার্লিনকে নিয়েই আমার কথা। মাথা নীচু করে কথাগুলি বলতে বলতে দু একবার মাথাটি হেলিয়ে ঈষৎ উঁচু করে আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছিল—আমার ভাল লাগেনি।

তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, থাকগে ও সব বৃথা আলোচনা করে লাভ কি। যদি কখনও কোনও কেস আসে তখন দেখা যাবে। কিন্তু—

শুধাল, কি ?

বললাম, তুমি এত জানলে কি করে?

মৃদু হেসে বলল, আমি যে ভুক্তভোগী।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, আজ থাক্ আর একদিন বলব।

* * * *

বাড়ী ফিরে যেতে যেতে সহজেই বুঝতে পারলাম—মনটা খারাপ হয়ে আছে। ভায়লেটের কথার মধ্যে কি বিষ ছিল? সূক্ষ্ম ইনজেকসানে কি সেই বিষ ঢেলে দিয়েছিল আমার মনে? মার্লিনের আমার প্রতি ভালবাসা আর নাই—এ কথার ইঙ্গিতও যে আমি সইতে পারি না। যাই হোক, বিষের ক্রিয়ায় মনটা প্রায় আট-দশ ঘণ্টা ভারি হয়েছিল আজও মনে আছে।

মন কিছুতেই মানতে রাজী হয়নি—মার্লিন আমার প্রতি ভালবাসা হারিয়েছে—কথাটা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ভায়লেটের একটা কথা মনে লেগেছিল মানসিক পরিবর্ত্তনের একটা কারণ থাকেই। সেই দিক দিয়ে ভেবে ভেবে কোনও সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে মনটা ক্লান্ত হয়ে উঠল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মার্লিনকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে শুধালাম, লীনা! তোমার কি হয়েছে আমাকে বলতেই হবে।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, কিছু না।

বললাম, কথাটা চাপা দিও না লীনা! কেন তোমার মন দিন রাত এত খারাপ যেন কোনও আনন্দ নাই? আমার কি চোখ নেই, আমি কি লক্ষ্য করি না?

একটু চুপ করে থেকে বলল, জীবনে ত ঘাত প্রতিঘাত আছেই কেটে যাবে। তুমি ভেব না।

শুধালাম, কিসের আঘাতে তোমার এমন হল—সেইটেই ত জানতে চাই।

চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না।

আবার বললাম, লীনা! লীনা! বল আমাকে। তোমার এই মানসিক ভাবান্তরে আমি যে কি রকম অশান্তি পাচ্ছি তুমি জান না।

বেচারা বিকো আমার। এই ক'টি কথা বলে আমাকে অন্তরের মধ্যে টেনে নিয়ে আকুল ভাবে উঠল কেঁদে। কান্নার রেশ একটু রোধ হলে ভাঙা গলায় বলল, বিকো! বিকো! তুমিই যে আমার একান্ত আশ্রয় তাই আমাকে ভুল বুঝ না আমার প্রতি বিশ্বাস হারিও না এই অনুরোধটি তোমার কাছে রইল।

এই বলে যেন নিশ্চিন্ত বিশ্রামে আমার বুকে সমস্ত প্রাণখানা ঢেলে দিয়ে এলিয়ে পড়ল। মার্লিনের প্রাণের স্পর্শে কি যাদু ছিল জানি না, সহজেই মনের ভার গেল কেটে—আর যেন কোনও প্রশ্ন নাই কোনও মীমাংসার প্রয়োজন নাই।

সস্নেহে বললাম, লীনা! তোমারও মনটা ক্লান্ত, তুমি এখন ঘুমাও।

* * * *

দেখে সুখী হলাম—পরের দিন থেকে মার্লিনের ভাবের যেন একটু পরিবর্ত্তন সুরু হল। সেই ঠোঁটের মধুর হাসিটি মাঝে মাঝে আবার এল ফিরে। শুধু চোখের সেই গভীর বিষন্নতাটি কাটল না। মনকে বোঝালাম ক্রমে যাবে কেটে।

শুধু তাই নয়, নিজেই একদিন বলল, এই রবিবার তোমার সঙ্গে ক্লাবে যাব বিকো। ইদানিং মার্লিন ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করেছিল।

অনুরোধ করলে বলত, আমার ভাল লাগছে না—তুমি যাও লক্ষীটি।

যাই হোক, এই ভাবে দিনগুলো কাটতে লাগল এবং ভায়লেটের সঙ্গে ও প্রসঙ্গে আর কোনও আলোচনা করিনি। একদিন ভায়লেট আমাকে বলল, কাল দু জন নতুন রোগী আপনার কাছে আসবে—আমাদের তালিকায় যোগ দিয়েছে।

বললাম, বেশ ত।

বলল, স্বামি-স্ত্রী। স্ত্রীটি আমার বিশেষ বন্ধু।

শুধালাম, থাকে কোথায়?

বলল, ব্রুকলীনে।

শুধালাম, তা তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল কি করে?

বলল, স্ত্রীটি আমার বাপের বাড়ীর দেশের মেয়ে। বরাবরই আমার সঙ্গে যোগ আছে।

শুধালাম, রোগী কে? স্বামী না স্ত্রী?

বলল, স্বামী। একটি পায়ে থেকে থেকে অসহ্য যন্ত্রণা হয় ক্রমে যেন অবশ হয়ে আসছে।

শুধালাম, বয়স কত?

বলল, বয়স বেশী নয়—এখনও চল্লিশের নীচে।

পরের দিন যথাসময়ে ভায়লেটের বন্ধুরা এল। ভায়লেট যখন তাদের আমার ঘরে নিয়ে এল দেখে অবাক হলাম, স্বামীটি চাইনীজ যদিও মেয়েটি ইংরেজ। মেয়েটিকে দেখেই ভাল লাগল—কি সুন্দর শান্ত কমনীয় চেহারা। কথাবার্ত্তা শুনেও মুগ্ধ হলাম—কি মিষ্টি কথাবার্ত্তা, কি মধুর ধরণ। ছোট খাট মানুষটি কিন্তু সর্ব্ব অঙ্গে একটি সামঞ্জস্যের ছন্দে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। বয়স এই ভায়লেটদেরই বয়সী হবে কিংবা কিছু ছোটও হতে পারে।

আরও লক্ষ্য করলাম—মেয়েটি যেন সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে স্বামীকেই জড়িয়ে আছে। স্বামীকে ধরে আমার ঘরে নিয়ে এল—তার মধ্যে শুধু যত্নই নয় একটা প্রাণ ঢালা দরদ সহজেই চোখে পড়ে। স্বামীটি যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করলে মেয়েটির চোখে যেন জল আসে, সামলাতে পারে না। নাম শুনলাম—মিঃ ও মিসেস প্যান।

বিশেষ যত্ন করে স্বামীটিকে দেখলাম এবং তারপর ওষুধ পত্রের ব্যবস্থা হলে তারা চলে গেল। যাওয়ার সময়ে মেয়েটি একবার আকুল ভাবে আমার দিকে চেয়ে শুধাল সারবে ত?

বললাম, আমি ত খুবই আশা করি। বেশী দিন লাগবে না। গোটা তিন-চার ইনজেকসান দিতে হবে।

রোগীরা সব বিদায় নিলে, যথাসময়ে চা খেতে খেতে ভায়লেটের সঙ্গে আলোচনা সুরু হল।

বললাম, ভায়লেট! তোমার বন্ধুটি ত ভারি চমৎকার মেয়ে—আমার খুব ভাল লেগেছে।

বললাম, হ্যাঁ—সকলেরই ওকে ভাল লাগে।

বললাম, স্বামীকে কি ভালই বাসে।

ঠোঁটের কোণে যেন একটা হাসি খেলে গেল।

তারপর বলল, হ্যাঁ। তা বাসে।

বললাম, তুমি যেন প্রাণ দিয়ে আমার কথাটার সমর্থন করতে পারছ না ভায়লেট!

বলল, স্বামীকেও ভালবাসে, অন্ত লোককেও ভালবাসে।

অবাক হয়ে শুধালাম, তোমার কথার মানে ?

বলল, ওর একটি প্রেমিক আছে।

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, দেখতে ত ভাল তাই কুমারী অবস্থায় ওর অনেক প্রেমিক জুটেছিল। হঠাৎ এই চীনেটিকে বিয়ে করে বসল। প্রেমিকরা সবাই অবশ্য বিদায় নিলে—একটি ওকে ছাড়ল না। সে-ই এখনও আছে।

হেসে বললাম, ও—তাকে কিছুতেই বিদায় করতে পারছে না বুঝি ?

মৃদু হেসে বলল, পারছে না—না। এখন তাকে বিদায় করতে চায়ও না।

বললাম, কিন্তু—

মৃদু হেসে বলল, স্বামীকে যে ভাবে যত্ন করে, তাই মনে করছেন ওটা সম্ভব নয়। আপনি আমাদের দেশের মেয়েচরিত্র কিছুই বোঝেন না।

শুধালাম, তুমি বলছ—স্বামীর প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও অন্ত প্রেমিক থাকা সম্ভব ?

বলল, ভালবাসার'ত সব সময় একরূপ নয়। সেবা যত্নের মধ্য দিয়ে তার একটা দরদের রূপ প্রকাশ পায় বটে—কিন্তু অন্তরূপও ত আছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভায়লেটের মুখের দিকে চেয়ে বললাম, ভায়লেট। তুমি মেয়েদের এত হীন মনে কর—

বলল, যা ঘটে, যা স্বাভাবিক—তাই বলছি।

একটু তিক্ত স্বরে বললাম, তোমার দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত হয়েছে—তোমাদের দেশে বিবাহিত মেয়েদের অন্ত প্রেমিক থাকা স্বাভাবিক বলতে চাও ?

একটু যেন জোরের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ—অবশ্য স্ত্রী যদি সুন্দরী হয়। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—সুন্দরী স্ত্রী অশান্তির বাহন।

ভায়লেটের সঙ্গে কথার ফলে সমস্ত দিন মনটা তিক্ত হয়ে রইল। মনে মনে ঠিক করে নিলাম না, ভায়লেটের সঙ্গে এ সব আলোচনা আর করব না। ওর জীবনে কি ঘটেছে জানিনা কিন্তু জীবনের প্রতি ওর দৃষ্টিভঙ্গী সহজ ও সুস্থ নয় তাই সে সংস্পর্শে না যাওয়াই ভাল। মন অযথা বিকৃত হয়।

বাড়ী ফিরে মার্লিনকে কথাগুলি বলার জন্ত মন ব্যগ্র হল—মার্লিনের সঙ্গে এ নিয়ে একটা আলোচনা করা দরকার। কিন্তু দুপুর বেলা কথাটা হলনা—কেন ঠিক মনে নাই। হয়ত মার্লিন দুপুর বেলাটা সাংসারিক কোন কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিল। বিকেলে চা খেতে খেতে সময় বেশী পাওয়া যায় না। তাই হয়ত ভেবেছিলাম রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু তাও হলনা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিশেষ কোনও রোগী ছিলনা—মাত্র দুজন। তাই সার্জ্জারীতে যাওয়ার মিনিট কুড়ি-পঁচিশ-এর মধ্যেই রোগী দেখা শেষ হল। অন্তদিন হলে ভায়লেটের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে বাড়ী ফিরতাম কিন্তু সেদিন আর ভায়লেটের সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে হলনা কেননা মনটা তখনও একটু তিক্ত ছিল এবং ঠিকই ত করেছি যে ভায়লেটের সঙ্গে আর ও সব আলোচনা করবনা। তাই সার্জ্জারীতে যাওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাড়ী ফিরে এলাম।

যতদূর মনে পড়ে তখন অক্টোবর মাস, সন্ধ্যা হতে দেরী হয়না। সার্জ্জারী থেকে যখন ফিরে আসছি সন্ধ্যা ঘনিয়ে প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ফিরে আসতে আসতে আকাশে একখানি চাঁদও দেখতে পেলাম। দিনটা পরিষ্কার ছিল—ফিরে আসতে আসতে কনকনে ঠাণ্ডায় ওভারকোটের গলা তুলে দিয়ে যেন একটু বাঁচলাম। এইখানেই বলে রাখি সাধারণতঃ সার্জ্জারী যাওয়া আসা আমি হেঁটেই করি—গাড়ীতে নয়।

ক্রমে ওল্ড হল লেনে ঢুকে বাড়ীর ফটকের কাছে এগিয়ে এলাম। ফটকে ঢুকতে যাচ্ছি একি! একটি ভদ্রলোক ওভারকোট গলা পর্য্যন্ত ঢাকা, মাথায় টুপী, আমার বাড়ীর সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল এবং আমার ফটকের দিকে দু'পা এগিয়েই, আমাকে দেখতে পেয়ে আবার ফিরে দ্রুতপদে অন্ত ফটক দিয়ে গেল বেরিয়ে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে মুখখানা একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্ত দেখতে পেয়েছিলাম—রোলাণ্ডই ত বটে! পিছন থেকে চলে যাওয়ার ভঙ্গীতেও রোলাণ্ড বলেই মনে হল।

আমি জানি—এ সময় বাড়ীতে মার্লিন ছাড়া অন্ত কেউ নাই। মেড সকালবেলা এসে কাজকর্ম্ম সেরে দিয়ে দুপুরে চলে যায়—সন্ধ্যাবেলা থাকে না। রোলাণ্ড, আমি চলে গেলে এই রকম চুপি চুপি মার্লিনের সঙ্গে এসে দেখা করে। বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প সুরু হল।

সদর-দরজা খুলে বাড়ীতে ঢুকলাম। মার্লিন একটু দূরে সিঁড়ির দিকেই দাঁড়িয়েছিল। শুধাল, আজ এত শীঘ্র কাজ হয়ে গেল ?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধালাম সার আর্থার রোলাণ্ড এসেছিলেন ?

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, কই না।

গম্ভীরভাবে বললাম আমি তাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম।

মাথা নীচু করে একটু যেন চুপ করে রইল। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, ভুল দেখেছ।

আর কথা বলার প্রবৃত্তি হল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ভায়লেটের কথা—সুন্দরী স্ত্রী অশান্তির বাহন। [ক্রমশঃ।

"তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষালাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহার আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে, গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিকভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্ত যে কোন শিক্ষায় এইরূপ সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যায়, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক।" —স্বামী বিবেকানন্দ।

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

গেটের সামনে সুমিতাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলো সুদাম। ঘুমন্ত খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে গাড়ি বারান্দার কাছাকাছি যখন এসেছে সুমিতা, তখন তার কানে এলো শুকতারার আকাশ ফাটানো চিৎকার—বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছ ?

ছুটে ওদের ঘরের ভেজানো দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়লো সুমিতা, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অনিলের পিস্তলের গুলী ছিটকে এসে বিদ্ধ হলো খোকনের পিঠে।

একটু কোমল কাতরাণ, আর হাত পায়ের খিচুনির পর স্থির হয়ে গেলো তুলতুলে নরম মাংসপিণ্ডটা সুমিতার বুকের ওপর। খোকনের তাজা রক্তের ধারা, ফিনকি দিয়ে নেমে এসে ভাসিয়ে দিলো সুমিতার দুটি হাত। টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ে রাঙিয়ে দিলো শাদা মার্বেল পাথরের মেঝেটাকে। চিৎকার করে উঠলো মিতা—দামীদা! আমার আলো যে নিবে গেলো দামীদা—

বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে অসীম হালদার। রক্তের ঢেউ খেলছে বিছানায়। শুকতারা? না মা সে মরেনি, সে পালিয়েছে। তার বদলে জীবন দিয়েছে সুমিতার আলোককুমার।

উন্মাদের মত ছুটে এলো সুমিতার কাছে অনিল—মিতা, মিতু? কোথা থেকে এলি তুই এখানে? কেন এলি? কেন এলি? ওরে—একি সর্ব্বনাশ হলো রে মিতু? সেই সর্ব্বনাশী একি সর্ব্বনাশ করে গেলো আমার। তাকে মারতে গিয়ে এ কাকে মারলাম। পাগোলের মত রিভলবার তুলে নিজের বুকের ওপর কায়ার করলো অনিল। কিন্তু হায় গুলী ফুরিয়েছে। সজোরে নিজের মাথায় ঘা মেরে রিভালবারটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, আলোর রক্তাক্ত দেহটা সুমিতার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে গেলো অনিল।

কিন্তু পারলোনা। এক অমানুষিক শক্তিবলে, বাহুডোরে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে থর থর করে কাঁপছে সুমিতা। রক্তের ঢেউ খেলছে ওর সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে।

—ছোট মামা? ছোট মামা? হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অস্ফুট স্বরে ডাকলো সুমিতা—ছোট মামা? ছোট মামা?

—না। না। আমি তোর মামা নই রে, দুহাতে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে কেঁদে উঠলো অনিল,—আমি রাক্ষস তোর ছেলেকে খেয়ে ফেলেছি, আমি খুনে, আমি শয়তান, আমি ডাকাত। ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি মেলে ঘরের চারিদিকে চাইছে সুমিতা! ঝপ ঝপ করে পড়ছে ওর দীর্ঘ ঘন আঁখি পল্লবগুলো। থর থর করে কাঁপছে সর্ব্বাঙ্গ। টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে অস্ফুট স্বরে আবার ডাকলো সুমিতা—ছোট মামা। ছোট মামা। ঐ ঐ দেখো, কারা সব হাসছে—ঐ দেখো, কারা—কারা সব কাঁদছে—ঐ দেখো কত র-ক্-তো! ছোট মামা! ছোট মামা! আমার আলোও কত রক্ত দিয়েছে আর নয়, আর নয়,—এবারে থা-মা-ও থা-মা-ও ছোট মামা—ওকে? ভীষণ জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে উঠলো সুমিতার সর্ব্বাঙ্গ! অতি কষ্টে টেনে টেনে চাইলো একটু শ্বাস নিতে। মৃত্যুপথযাত্রী যেমন করে অন্তিম শ্বাস টানতে থাকে। বাইরে গেটে তখন চলেছে ভীষণ গোলমাল। চারিদিকের বাড়ীগুলোর জানলা খুলে গেছে, লোকের ভীড় সেখানে। বহুলোকের পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে।

অনিল দুহাতে জড়িয়ে ধরলো সুমিতাকে। তখন খুলে গেছে ওর সুদৃঢ় বাহুবন্ধন। ওর কোল থেকে কেড়ে নিলো অনিল আলোককে।

বড় বড় চোখ দুটোতে সুমিতার আর পলক পড়ছে না। স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি ওর আটকে গেছে কোন্ অলক্ষ্য দৃশ্যের মাঝে।

—কে? ও কে? বাবা? না বাবার মত ও কে? মুখে ঠোঁটে কত রক্ত ওর? চোখে কত জল? কাঁদছে? ও কেন কাঁদছে? কত রক্ত! কত কান্না! উঃ! কৈ—কৈ তুমি—দা-মী-দ-অ-আ। মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের সঙ্গে-সঙ্গে, বুজে গেলো ওর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিজাগা চোখ দু'টো। হাত দুটো অসহায় ভাবে কি যেন আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করলো—তারপর সশব্দে দেহটা ওর লুটিয়ে পড়লো রক্তাক্ত মেঝের ওপর। আলোককে বুকে ধরে হো হো করে উন্মাদের মতো হেসে উঠে বললো অনিল—তুইও যাচ্ছিস মিতু? যা! যা! তোর খোকনের কাছে যা। আমিও যাচ্ছি—তোর পেছনে। ওরে, পরের পিস্তল কি—না, তাই ও বিশ্বাসঘাতকতা করলো আমার সঙ্গে—কিন্তু—ফাঁসির দড়িটা আমাকে ফাঁকি দেবে না রে—ওটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় কে দেখি এবার?

পরিশিষ্ট

পরদিন সকালে সংবাদপত্রের হকারদের চিৎকারে থমকে দাঁড়ালো মহানগরীর চলমান জনতা।

কলিকালের কংসমামা, অভিনেতার অভিনব কীর্ত্তি, সম্পত্তির লোভে জোড়া খুন। হু হু করে কাটতে লাগলো কাগজগুলো। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুখরোচক খবরটি আগুনের হল্কার মতো ছড়িয়ে পড়লো চারিধারে। পথে ঘাটে, রেস্তোরাঁ, রক্-আড্ডায়, স্কুল কলেজ, অফিস আদালত সর্ব্বত্রই লোকের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হতে লাগলো লালকুঠির হত্যাকাহিনীটি। আমরাও পড়েছিলাম ঐ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, গতকাল রাত্রি প্রায় পৌনে এগারোটার সময় প্রখ্যাত চিত্রতারকা শুকতারা সেন (চ্যাটার্জি) ভয়ার্ত্তভাবে ছুটে এসে ওস্ত বালিগঞ্জ ব্যারিষ্টার নীলমাধব দত্তের বাড়ীতে আশ্রয় নেন এবং কাতরভাবে বলেন যে, শীঘ্র থানায় খবর দেওয়া হোক, অদূরেই তাঁর বাড়ীতে ভীষণ খুন হয়েছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের ফোন পেয়ে তৎক্ষণাৎ স্থানীয় পুলিশ বাহিনী এসে ওস্ত বালিগঞ্জের লালকুঠি নামক প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং তাঁরা দেখেন যে, বাড়ীর একটি কক্ষে খাটে রক্তাক্ত শয্যার ওপর ঐ বাড়ীর মালিক অসীম হালদারের মৃতদেহ পড়ে আছে এবং তাঁর স্ত্রী সুস্মিতা দেবী

অচৈতন্য অবস্থায় ঐ কক্ষের রক্তাপ্লুত মেঝেতে পড়েছিলেন আর সেইখানে দাঁড়িয়ে একটি রক্তমাখা মৃতশিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে উন্মাদের মত হা হা করে হাসছেন একজন যুবক।

যুবকটি পুলিশের কাছে নিজেকে হত্যাকারী বলে আত্মসমর্পণ করে। জানা যায়, ঐ হত্যাকারী একজন অভিনেতা, নাম অনিল চ্যাটার্জ্জি। তিনি শুকতারা সেন-এর স্বামী ও সুমিতা দেবীর মামা হন। খবর পেয়ে সুমিতা দেবীর পিতা সোমনাথ ত্রিবেদী ও মৃত অসীম হালদারের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ সুদাম হালদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং সুমিতা দেবীকে হসপিটালে নিয়ে যান। মৃতদেহ দুটি মর্গে চালান দেওয়া হয়েছে।

অভিনেত্রী শুকতারা সেন পুলিশের কাছে বলেন যে সম্পত্তির জন্যই অসীম হালদার এবং তাঁর পালিতপুত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁকেও অনিল চ্যাটার্জ্জি গুলী করেছিলেন, কিন্তু সে গুলীটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে উনি প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছেন। এখন তিনি অসুস্থ, সমস্ত হত্যারহস্য তিনি সুস্থ হবার পর জানাবেন।

এ ঘটনার পর প্রায় দেড় মাস গত হয়েছে। লালকুঠি হত্যাকাণ্ডের সরকারী তদন্তের কাজ শেষ হবার পর বিচারের দিন ধার্য্য হয়েছে। বিচারের দিন অসংখ্য কৌতূহলী মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে আলিপুর দায়রাকোর্টের সামনে, আর পথের দুধারে। এই পথে আসবে মামলার প্রধান সাক্ষী জনচিত্তহারিণী শুকতারা সেন (চ্যাটার্জ্জি)।

যথাসময়ে জজসাহেব আসন গ্রহণ করলেন। ন'জন জুরি গঠন করে বিচারকার্য্য সুরু করা হল। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামী অনিল চ্যাটার্জ্জি। ছ'ফিট উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। টকটকে ফর্সা গায়ের রং, তেমনি নিখুঁত মুখশ্রী। একমুখ গোঁফদাড়ি, এই দেড় মাসের মধ্যেই রগের দু'পাশের চুলে শাদা ছোপ ধরেছে, চোখের কোণে জমেছে গভীর মনস্তাপের কালিমা।

বড় বড় উদাস করা দুটি চোখে বিষাদভরা গাম্ভীর্যের ম্লানছায়া ছাড়া ঐ চোখে-মুখে কুণ্ঠা বা ভয়ের লেশমাত্রও নেই।

সাক্ষীর আসনে উপবিষ্ট সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী অভিনেত্রী শুকতারা সেন। পরনে তাঁর লালপাড় দুধগরদে শাড়ী। কোঁকড়ানো কৃষ্ণচুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়ানো, কতকগুলো স্প্রিং-এর মতো ফণা তুলে আছে কপাল ঘিরে। সীঁথির অগ্রভাগে আর কপালে জ্বলছে এয়োতী চিহ্ন।

মাথায় অল্প ঘোমটা, যেন মূর্ত্তিমতী বিষাদপ্রতিমা!

সরকার পক্ষের ঝানু ব্যারিষ্টার নীলমাধব দত্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লালকুঠি হত্যারহস্যের কপাট জনগণের সামনে উদ্‌ঘাটিত করলেন। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—মহারাজা স্বর্গীয় রামনাথ ত্রিবেদীর একমাত্র পৌত্র সোমনাথ ত্রিবেদী লালকুঠি নামে প্রাসাদের মালিক ছিলেন। সোমনাথের অকালে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি তাঁর একমাত্র দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা সুমিতা ত্রিবেদীকে তার দিদিমা মহামায়া চ্যাটার্জ্জির তত্ত্বাবধানে রেখে, গুরুর সঙ্গে তীর্থ পর্য্যটনে চলে যান। তখন থেকে সুমিতার দিদিমা, তাঁর একমাত্র পুত্র অনিল চ্যাটার্জ্জি ও কন্যা করবীকে নিয়ে লালকুঠিতে বসবাস করতে থাকেন এবং সম্পত্তির আয় ভোগ দখল করতে থাকেন। বছর আটেক পর বিখ্যাত ক্রিকেটার অসীম হালদারের সঙ্গে সুমিতার বিবাহ হয়। বিবাহের পর অসীম হালদার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে লালকুঠিতে বাস করবার অভিপ্রায় জানালে সুমিতার দিদিমা তাঁর কন্যাকে নিয়ে রাগতচিত্তে লালকুঠি পরিত্যাগ করে চলে যান। এই সময় অনিল চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে অভিনেত্রী শুকতারা সেনের বিবাহ হয়। লালকুঠির একতলার এক অংশে শুকতারাকে নিয়ে অনিল চ্যাটার্জ্জি বসবাস করতে থাকেন। নিজেদের সুখভোগে বাধা পড়ার জন্য অনিল চ্যাটার্জ্জি আর তাঁর মায়ের মনে অসীমের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ সঞ্চারিত হতে থাকে, এবং তখন থেকেই এঁদের প্রধান চিন্তা হল কেমন করে ঐ পথের কাঁটাকে সরানো যায়।

শুকতারার কিন্তু এই জঘন্য ব্যাপারে মোটেই সমর্থন ছিলো না, বরং সে অনিলকে তিরস্কার করতো। তার এই হীনতার জন্য সুযোগ খুঁজছিলো, ওদের সব ব্যাপারটা জানিয়ে সাবধান করে দেবার জন্য, কিন্তু সম্প্রতি বোধ হয় অনিলের মনে শুকতারার প্রতি সন্দেহ দেখা দিয়েছিলো, তাই সে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি পাহারা দিতো তাঁর দিকে। অসীমের সঙ্গে দেখা করা একেবারে নিষেধ ছিলো অনিলের। বিয়ের বছর পাঁচেক পর অসীম ও সুমিতা একটি শিশুকে পালিতপুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, কারণ ওঁদের কোনো সন্তানাদি হয় নি। এই ব্যাপারে অনিল আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, সে প্রায়ই বলতো, একটা কাঁটা ছিলো আবার দুটো হলো। ঐ দুটোকে সরাতে না পারলে ওদের হারানো সুখের দিন ফিরে আসবে না। ঘটনার দিন সুমিতার বাবা সোমনাথ ত্রিবেদীর প্রতিষ্ঠিত হসপিটাল কমলা সেবাসদনের উদ্‌বোধন ছিলো। সুমিতা সেখানে গিয়েছিলো তার খোকাকে নিয়ে। অসীমের শরীর অসুস্থতার জন্য সে যায়নি। অনিল জানালো শুকতারাকে যে, সে তার বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রি ন'টার ট্রেণে যাচ্ছে শিকার করতে। যথাসময়ে অনিল চলে গেলো,—আর শুকতারা স্থির করলো, এই সুযোগে অসীমকে সাবধান করে দেবে। সে অসীমকে নিজের ঘরে ডেকে এনে যখন সব কথা তাকে বলছিলো, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে অনিল বাড়িতে এসে ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সব শোনে, এবং রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে জানালা দিয়ে প্রথম অসীমকে গুলী করে হত্যা করে। তার পর গুলী করে শুকতারাকে, সে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে চিৎকার করে শুকতারা দরজা দিয়ে যখন পালাতে চেষ্টা করে ঠিক সেই সময় ওর চিৎকার শুনে খোকাকে নিয়ে সুমিতা ঘরে প্রবেশ করে। সুমিতা তখনই ফিরেছিলো কমলা সেবাসদন থেকে। সুমিতাকে দেখেই অনিল তার কোলের ঘুমন্ত শিশুকে গুলী করে। এই ভয়াবহ কাণ্ড দেখে সুমিতা জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যায়। শুকতারা ভয়ার্ত্তভাবে রাস্তা দিয়ে ছুটে গিয়ে ব্যারিষ্টার নীলমাধব দত্তের কাছে আশ্রয়-ভিক্ষা করেন। ব্যারিষ্টার সাহেবের ফোন পেয়ে স্থানীয় পুলিশ বাহিনী লালকুঠিতে হানা দিয়ে হত্যাকারী অনিল চ্যাটার্জ্জিকে গ্রেপ্তার করেন।

সরকার পক্ষের ব্যারিষ্টার সমস্ত ঘটনা পেশ করবার পর জজ সাহেব আসামীকে প্রশ্ন করলেন—আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ

আনা হয়েছে তা আপনি শুনলেন, এখন আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনি অপরাধী না নিরপরাধ ?

"—ইয়োর ওনার"—আমি অপরাধী বা নিরপরাধ কোনটাই নই ; তবে আমি স্বহস্তে ঐ দুজনকেই হত্যা করেছি। উন্নত মস্তকে জবাব দিলো অনিল।

এবারে সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী শুকতারার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। সে সজল চোখে ঐ ব্যারিষ্টারের কথারই পুনরুক্তি করে গেলো।

আসামী পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তরুণ ব্যারিষ্টার অনিরুদ্ধ বাসু। তিনি বললেন—

'—ইয়োর ওনার' যদিও আসামী স্বীকার করছেন যে তিনি হত্যাকারী ; তথাপি এই হত্যাকাণ্ড যে একটা সাময়িক উত্তেজনা বশত সংঘটিত হয়েছে সেটা আমি প্রমাণ করবো।

তিনি জজসাহেবের অনুমতি নিয়ে প্রধান সাক্ষীকে জেরা সুরু করলেন।

—আচ্ছা, আপনি কি আসামী অনিল চ্যাটার্জ্জির সত্যিকারের স্ত্রী ?

—সে-কথা কারুর অজানা নয়। মৃদুমধুর কণ্ঠে জবাব দিলো শুকতারা।

—মানে আমি বলতে চাইছি যে, মৃত অসীম হালদারের সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্কটা তো বহুকালের পুরোনো ব্যাপার এবং তা সর্ব্বজনবিদিত। তাই জিজ্ঞাসা করছি যে, সেই মোহ কাটিয়ে, আপনি কি অনিল চ্যাটার্জ্জির সত্যই স্ত্রী হতে পেরেছিলেন ?

—আপনার উক্তি যেমন জঘন্য, তেমনি মিথ্যা। আমাদের স্বামি-স্ত্রী সম্পর্ক মধুর ছিলো, সতেজে জবাব দিলো শুকতারা।

—আচ্ছা আপনার স্বামী অনিল চ্যাটার্জ্জি কি সন্দেহ করতেন যে অসীম হালদারের সঙ্গে আপনার প্রণয়ঘটিত সম্পর্কটা বরাবর অটুটই আছে ? এবং সেই কারণেই তিনি আপনাদের দুজনের ওপরই বিরূপ ছিলেন ?

—কখনই না। তা যদি হতো, তাহলে এই পাঁচ বছর তিনি আমার সঙ্গে একত্রে জীবন যাপন করতেন না।

—হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে জীবন যাপন করাটা তার একটা মস্ত বড় মোহ ছিলো বটে। কারণ তিনি আপনাকে সত্যই ভালোবাসতেন ? সেজন্য আকণ্ঠ বিষ পান করেও তিনি আপনার সঙ্গ ত্যাগ করেননি। আচ্ছা শুকতারা দেবি, ঐ ঘটনার দিন আপনি যখন অসীম হালদারকে ঘরে ডেকে এনেছিলেন, তখন কি শুধু সাবধান করবার অভিপ্রায়েই ডেকেছিলেন ? না তা নয়। আপনার খাটের পাশের টেবিলে দুটি মদের গেলাস ও বোতল ছিলো, মানে এই যে আপনারা এক সাথে মদ্যপান করে বিছানায় বসে আপত্তিকর অবস্থায় স্ফূর্ত্তি করছিলেন, ঠিক সেই সময় অনিল চ্যাটার্জ্জি বাড়ী ফিরে আসেন, কারণ ষ্টেশানে গিয়ে যখন তিনি জানতে পারলেন যে মনের ভুলে ছোট হাণ্ডব্যাগটি ঘরের টেবিলে ফেলে গেছেন এবং তার মধ্যে তাঁর ট্রেণের টিকিট আর সব টাকা আছে। তখন তিনি তাঁর মালপত্র বন্ধুদের সঙ্গে রওনা করে দিয়ে, পরের ট্রেণেই নিজে যাচ্ছেন তাঁদের জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। এ ঘটনা জানা গেছে যাঁরা ওঁর সঙ্গে যাচ্ছিলেন তাঁদের কাছ থেকে। তাঁরা সকলেই এখানে উপস্থিত আছেন। বাড়ী এসে অনিল চ্যাটার্জ্জি আপনাদের ঐ অবস্থায় জানালা দিয়ে দেখতে পান, এবং ক্রোধে আত্মহারা হয়ে আপনাদের দুজনকেই পর পর গুলী করেন। আপনি চিৎকার করে যখন দরজা দিয়ে পালালেন, সেই মুহূর্ত্তে সুমিতা ঘরে ঢুকতেই, আপনার উদ্দেশে ছোড়া গুলীটি এসে সুমিতার খোকার পিঠে বিদ্ধ হলো। এই হচ্ছে আসল এবং খাঁটি সত্য ঘটনা। এখন বলুন, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলুন—হত্যাকাণ্ডের মূলসত্য তথ্য এই কি না ?

আদালতশুদ্ধ লোক নির্ব্বাক হয়ে চেয়েছিলো শুকতারার দিকে। জুরিরাও রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন ওর জবাব শোনবার জন্য।

ঘাড় বেঁকিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়ালো শুকতারা সেন, যেন ষ্টেজে দাঁড়িয়েছে জাত-অভিনেত্রী কোনো সিরিয়স ভূমিকায়, অভিনয়-চাতুর্য্য দেখাবার জন্য।

"—ইয়োর ওনার" এই কল্পিত কাহিনীটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, যা সত্য তা আমি আগেই বলেছি।

আমার স্বামী মাঝে মাঝে ঘরে বসে ড্রিঙ্ক করতেন এবং তাঁর প্রিয় চাকর ছোট্টুলালকে প্রসাদ দিতেন। ঘটনার দিন বেরুবার আগে, ঐ চাকরের সঙ্গে বসে ড্রিঙ্ক করেছিলেন, সেজন্য টেবিলে ঐ দুটি গ্লাশ ও বোতল ছিলো। ছোট্টুলাল হাজির আছে, সত্য মিথ্যা তার কাছেই জানা যাবে।

ছোট্টুলালের তলব হলো এবং তার জবানে শুকতারার কথাই সত্য প্রমাণিত হলো।

নিস্পৃহ ভাবে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওদের বাদানুবাদ শুনছিলো অনিল। যেন তার সামনে এক রহস্যময় নাটকের অভিনয় হচ্ছে ; আর সে তার একজন দর্শক মাত্র।

একটু দূরে জমাট পাথরের মতো বসেছিলো করবী। প্রাণটা তার হাহাকার করে কেঁদে বলছিলো—তুমি কি নিষ্ঠুর ছোড়দা ? একবার তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যে কি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিছুতেই কেন তোমার সম্মতি পেলাম না গো ? কাতর মিনতি ভরা ওর চোখ দুটির ওপর দৃষ্টি পড়লো অনিলের—আহা কি হয়ে গেছে রুবিটা ? কিন্তু মিতা কৈ—সে তো আসেনি ? সে কি তবে নেই ? তার খোকন ? আলোককুমার ? কৈ সেই ফুলের মতো মুখখানা ?—ওহো··· বড় যন্ত্রণায় দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলো অনিল।

আরো কিছুক্ষণ সাক্ষীদের তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করলেন ব্যারিষ্টার বাসু।

সেদিনকার মত আদালতের কাজ শেষ হল।

বিচারের দ্বিতীয় দিন,—আজকের জনস্রোত আরো দ্বিগুণ। রাস্তার দুধারে অসংখ্য মানুষের চাপাচাপি—ভিড়ের জন্য স্পেশাল পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথাসময়ে আদালতের কাজ সুরু হল।

জজসাহেব আসামী অনিল চ্যাটার্জিকে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, অসীম হালদারের, পালিতপুত্র আলোককুমারকে কি আপনি স্বইচ্ছায় গুলী করে হত্যা করেছিলেন ? না অকস্মাৎ গুলীটা লেগে গিয়েছিলো ?

মহামান্য বিচারপতি! ক্ষমা করবেন, মৃদুহাসির সঙ্গে বললো অনিল—আপনার প্রশ্নটিতে একটু ভুল থেকে যাচ্ছে। আলোককুমার অসীম হালদারের পালিতপুত্র নয়—তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ ও পালন করেছিলেন সুমিত্রা দেবী।

—ও! একই কথা। জবাব দিলেন বিচারপতি।

"—ইয়োর ওনার"! বিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে বললেন ব্যারিষ্টার বাসু, না একই কথা হতে পারে না। কারণ রাস্তার ডাষ্টবিন্ থেকে ছেলেটিকে কুড়িয়ে এনে যখন সুমিত্রা দেবী ওকে পুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, তখন ঐ অসীম হালদারের কাছ থেকে তাঁকে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিলো, কিন্তু সেই ছেলেটি আর তার মা সুমিত্রা এই আসামী অনিল চ্যাটার্জির প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আজ দুর্ভাগ্য বশতঃ সুমিত্রা দেবী অত্যন্ত অসুস্থ ও স্বাভাবিক জ্ঞানহারা, সেজন্য তাঁর জবানীতে যে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যেতো, যাতে এই হত্যারহস্যের মূল সত্যতথ্যটি প্রকাশিত হতো, সেই মূল্যবান জবান থেকে আজ আসামী বঞ্চিত হলেও, স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারাই বিচার করা যায় যে, তাঁর পুত্রকে তাঁর স্নেহময় মামার পক্ষে স্বইচ্ছায় হত্যা করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এটা একটা অ্যাক্সিডেণ্ট মাত্র। আশা করি শুকতারা দেবি, এই সত্যটুকু স্বীকার করবেন।

শুকতারা পূর্বস্থানেই ছিলো। পরনে তার আজ কালো মলমলের থান। চুল আজ আরো রুক্ষ! চোখের কোলে বিষাদের কালি। নিদারুণ দুঃখভারে যেন ভারাক্রান্ত এক বিষাদ-প্রতিমা।

জুরিরাও সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মত সেই বিষাদিনীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে ছিলেন। সমবেদনায় বোধ হয় তাঁদের চিত্তগায়রও টলমল করছিলো।

শুকতারার কাছেই দর্শকদের মাঝে বসেছিলেন মামীমা। পরনে তাঁর গরদের থান, শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কপালে, হাতে জপের মালা।

ব্যারিষ্টার বাসুর বাক্যবাণে ক্লান্তভাবে উঠে দাঁড়ালো শুকতারা। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বিষাদ ঢেলে বললো—ইয়োর ওনার! আমি জানি একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব কিছুটা হাল্কা হতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি, আসামী বিষয়ের লোভেই অসীম হালদার ও আলোককুমারকে হত্যা করেছে। তবে সেদিন রাগের মাথায় ওদের গুলী করেছিলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তা ছিলো না,— উদ্দেশ্য ছিলো গোপনে বিষ দিয়ে হত্যা করার এবং তার জন্য আমার সাহায্য চেয়েছিলেন, সেদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে আলোকের আয়াকে টাকার লোভ দেখিয়ে যে বিষ তার হাতে দিয়েছিলেন, ওদের খাদ্যে মেশাবার জন্য, সেটি এখনও তার কাছেই আছে। তার আয়াটি অত্যন্ত ভালো, তাই সে এসে আমাকে সব কথা বলে দেয়। সে এখানে উপস্থিত আছে, তাকে ডাকলেই সব জানতে পারবেন। আজ শুধু সত্যের খাতিরেই আমাকে সে সব কথা বলতে হচ্ছে,-এর জন্যে———। কান্নার আবেগে শুকতারার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলো। সে চঞ্চল পদে মামীমার কাছে গিয়ে তাঁর বুকে মুখ লুকোলো। মামীমা দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে বসালেন।

নিপুণা অভিনেত্রীর এই ব্যথানম্র মূর্ত্তি আর তার চোখের জলে ভেজা মধুর কণ্ঠের প্রাণস্পর্শী অভিনয় সিনেমার পর্দার মতোই সকলকার মন জয় করতে সক্ষম হলো। তার অভিনয়-চাতুর্য্যের সম্মোহন বাণে জুরিরাও সম্মোহিত হয়ে পড়লেন।

নেপালী আয়াকে হাজির করানো হলো এবং তার সাক্ষ্যও নেওয়া হলো। সে কম্পিতহাতে তার ওড়নার আড়াল থেকে একটি ছোট্ট নীল কাচের শিশি বার করে দিয়ে জানালো—এই বিষ মামাবাবু (আসামী) তাকে দিয়ে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে বলেছিলো, ছোট খোকাবাবু আর তার বাবার খাবারে দিতে কিন্তু সে তা পারেনি, তাই মামীমার কাছে এটা ফেরৎ দিয়ে কেঁদে বলেছিলো সে আর এ বাড়ীতে কাম করবে না। সে চলেই যেতো, খালি খোকাবাবুর মায়ায় যেতে পারেনি। খোকাবাবুর মাকে একথা বলতে পারেনি, কারণ তাঁর মাথার ব্যায়রাম ছিলো, ঐ ভয়ানক কথা শুনলে যদি কিছু খারাপ হয় তাই।

সাক্ষীকে কঠোর ভাষায় ব্যারিষ্টার বাসু জেরা সুরু করতেই বাধা পড়লো আসামীর কণ্ঠস্বরে।

মহামান্য বিচারপতি, এবারে আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললো আসামী অনিল চ্যাটার্জি।

—বলুন, আমি শুনতে প্রস্তুত। বললেন জজসাহেব।

—হ্যাঁ, বলছি শুনুন। এই বৃথা বাক্যুদ্ধ দয়া করে এবার বন্ধ করুন। আমি স্বীকার করছি, সাক্ষী শুকতারা দেবীর কথার প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য। অকস্মাৎ কিছুই ঘটেনি, আমি সম্পত্তির জন্যই অসীম হালদার ও আলোককুমারকে স্বইচ্ছায়, স্বহস্তে হত্যা করেছি।

বিচারকক্ষে যেন সহসা বজ্রপতন হলো। চমকে উঠলো দর্শকবৃন্দ। স্তম্ভিত, হতবাক্ হয়ে সকলে চাইলো আসামীর দিকে। থর-থর করে কেঁপে উঠলো শুকতারার সর্বাঙ্গ। সে ভয়ার্ত্তচোখে চাইলো অনিলের মুখের দিকে।

বিজয়ী বীরের মতো উন্নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলো আসামী অনিল চ্যাটার্জি। অপূর্ব হাসিতে দৃপ্ত ওর দুটি চোখ রাখলো শুকতারার চোখের ওপর। সে হাসির দীপ্তি বুঝি সইতে পারলো না শুকতারা। সভয়ে চোখ বুজে মামীমার কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিলো।

আপনার এই স্বীকারোক্তির ফল কি হতে পারে, সে ধারণা আছে আপনার? সুগম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বিচারপতি।

—অবশ্যই। সতেজ কণ্ঠে জবাব দিল আসামী। খুনী আসামীর উপযুক্ত দণ্ডই আশা করবো।

কপালের ঘাম মুছে বসে পড়লেন ব্যারিষ্টার বাসু। কয়েক মিনিট নতমস্তকে চিন্তা করবার পর জজসাহেব চার্জ সুরু করলেন। সরকার ও আসামী পক্ষের সকল তথ্য তিনি জুরিদের কাছে দীর্ঘ সময় ধরে নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করলেন।

তার পর জুরিরা উঠে গেলেন নিজেদের অভিমত স্থির করবার জন্য।

কিছুক্ষণ পরে জুরিরা ফিরে এসে নিজেদের আসন গ্রহণ করলেন-এবং তাঁদের মুখপাত্র জানালেন তাঁদের সম্মিলিত অভিমত।

সকলকার সঙ্গে একমত হয়ে বিচারপতি আসামী অনিল চ্যাটার্জির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ঘোষণা করলেন। আসামীকে প্রশ্ন করা হলো,—

তিনি কি হাইকোর্টে আপীল করবেন ? বা গভর্ণরের কাছে প্রাণ-ভিক্ষা করবেন ?

—ধন্যবাদ জানিয়ে আসামী জবাব দিলো না। কিছুই তিনি করবেন না।

আজ থেকে এক মাস আসামীর জীবনের মেয়াদ ধার্য্য হলো।

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো করবী অনিলের কোলে মুখ গুঁজে, ওর মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে বললো অনিল—এত ভেঙে পড়লে চলবে কেন দিদি ? সব তো বুঝিস তুই ? মিতার জীবনের আলোকে নিবিয়ে দিয়ে নিজের জীবনের আলো জ্বালিয়ে রাখার বাসনা আমার ছিলো না রে, এ আমার মৃত্যুদণ্ড নয়, এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মহামুক্তির ছাড়পত্র। একটা কথা শুধু জানতে বাসনা, মিতু কি বেঁচে আছে ?

—আছে। তবে সে না থাকার মধ্যে, বললো অনিরুদ্ধ। আগে থেকেই তো স্নায়বিক দুর্বলতা ছিলো, তার ওপর সেদিন মাথায় ভীষণ চোট লেগেছিলো। প্রথমে কমলা সেবাসদনে রেখেই চিকিৎসা চলছিলো, জ্বর আর অন্যান্য উপসর্গগুলো কিছুটা কমলো, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান আর ফিরে এলো না। কারুকে চিনতে পারেনা, বা কথা বলে না। ডাক্তারদের নির্দ্দেশ মতো ওকে এখন পুরীতে সমুদ্রের ধারে রাখা হয়েছে।

সুদাম তার মা আর কাকাবাবু সঙ্গে আছেন, আচ্ছা ও সব কথা এখন থাক—আমি বলতে এসেছি যে এমন করে আত্মহত্যা করার সার্থকতা কি ? হাইকোর্টে আমরা আপীল করতে চাই তুমি মাঝপথে অমন বাগড়া না দিলে, সব দিক্ রক্ষা হতো, মৃত্যুদণ্ড তো দূরের কথা, তোমার কোনো দণ্ডই হতো না, মিথ্যে সাজানো মামলাটাকে উড়িয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই শক্ত কাজ ছিলো না ; যাক্, এখনও পথ আছে,—

—আমি জানি,—আমি সব জানি অনিরুদ্ধ, কিন্তু বাঁচতে যে আমি চাই না,—অসীমকে খুন করে বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই আমি, আক্ষেপ রইলো ঐ শয়তানীটাকে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলাম না আরো বহু জীবন বিষময় করবার জন্যে ও বেঁচে রইলো, আর ওর বদলে জীবন দিলো মিতার খোকা ? বুঝবে না, তোমরা বুঝবে না ভাই, কি আগুন দিন-রাত আমার বুকে জ্বলছে, কি তার জ্বালা। মিতার যদি কোনো দিন জ্ঞান ফেরে, বোলো তাকে তার হতভাগা মামাকে যেন সে ক্ষমা করে। বোলো তাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছি, তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশী যাতনা তার মামা ভোগ করে গেছে। শুধু তার খোকা মরলো আমারই হাতে, এই ছিলো আমার অদৃষ্টলিপি। আর সব জেনেশুনেও তোমরা আমাকে আবার বাঁচতে বলছো ?

দুহাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো অনিল।

—ছোড়দা ! শুধু নিজের কথাই ভাবছো ? মা যে তোমার জন্যে পাগলের মতো বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। দিনরাত মাথা খুঁড়ে ঠাকুরের কাছে জীবন-ভিক্ষে চাইছেন তোমায়।

তাঁর কথা একবার ভাবো ছোড়দা। কাঁদতে কাঁদতে বললো করবী।

—আমি তো তাঁর চিরকালের হতভাগা সন্তান ভাই। কখনও তো সুখশান্তি দিইনি তাঁকে। তুই তাঁকে দেখিস দিদি। তবে আজ বড় দুঃখ হয় সেদিনের কথা ভেবে, যখন মা তোকে একজন ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আমি তখন তাঁকে বিদ্রূপই করেছি, কোনদিন তাঁর সহায়তা করিনি রে। আজ মনে হচ্ছে তখন যদি চেষ্টা করে তোর একটা ভালো বিয়ে দিতে পারতাম; তাহলে আজ তোদের পাশে কেউ একজন থাকতো।

মৃত্যুপথযাত্রীর কাতর মুখের দিকে একবার স্থির দৃষ্টি মেলে চাইলো অনিরুদ্ধ—তারপর চোখ ফেরালো, করবীর চোখের জলে ভেসে যাওয়া মুখের দিকে। একটু ইতস্ততঃ করে মৃদুস্বরে বললো সে ভার কি আমার ওপর দিতে পারোনা অনিল? আমি প্রার্থনা করছি করবীকে—চিরদিন ওদের পাশে আমি থাকবো।

থরথর করে কেঁপে উঠলো করবীর সর্বাঙ্গ। এই মর্ম্মঘাতী যন্ত্রণার ওপর আবার দুর্লভ আনন্দের এ কি অত্যাচার?

বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে একবার চেয়ে দেখলো করবী তার অসীম সৌভাগ্যদাতার দিকে, তারপর মুখ নিচু করলো।

চমক লেগেছিলো অনিলেরও মনে, তাই সে নির্ব্বাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবলো, পরিহাস নয়তো? না, না, ঐ পবিত্রমুখ কোনো ছলনাকারীর হতে পারে না।

—ভগবান আছেন। এই জীবনে আমি প্রথমে উপলব্ধি করলাম অনিরুদ্ধ, যে তিনি পরম করুণাময়। ব্যাকুলস্বরে বলতে বলতে, দুহাত যোড় করে অনিল প্রণাম জানালো সেই মঙ্গলময়ের উদ্দেশে। তারপর করবীর হাতখানা তুলে ওর হাতে দিয়ে বললো,—তুমি সত্যই দেবতা অনিরুদ্ধ, তোমরা আছো বলে আজো সত্য ধর্ম্ম, এগুলোর অস্তিত্ব জগতে রয়েছে ভাই। কি যে শান্তি তুমি আমায় দিলে, আর আমার কোনো দুঃখ নেই। যাবার সময় যে এমন শান্তি নিয়ে যেতে পারে, জেনো এক দিক দিয়ে সে মহাভাগ্যবান।

করবীর হাতখানা চেপে ধরে বললো অনিল—জামাই বাবুর মন্ত্রের ফল, আজ তোর ফললো রে দিদি। সাধুবাক্য, সাধুসঙ্গ যে এত মধুর, বড়—দেরীতে বুঝলাম।

—মাথা নিচু করে অনিলকে প্রণাম করতে গিয়ে—আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো ওর পায়ের ওপর করবী।

—জেল-অফিসার এসে দাঁড়ালেন,—সময় শেষ হয়েছে জানাবার জন্ত।

—মিতু। লক্ষীটি মাণিক আমার, সেই কখন থেকে বসে আছি যে, একবার হাঁ করো, একটু খাও। কিডিং কাপটি টেবিলে নামিয়ে রেখে যমুনা দেবী সুমিতার মাথাটি অল্প ঝাঁকিয়ে ওকে বারংবার খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ওঁর কোনো কথাই যে শুনতে পাচ্ছে সুমিতা, এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না।

চোখ দুটো ওর খোলাই ছিলো, তবে সে চোখে কোনো দৃষ্টি ছিলো না। আপন মনে বিড়বিড় করে কি সব বকছিলো। ক্ষীণ তনুলতাটি আরো ক্ষীণ হয়ে যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

একটু দূরে চেয়ারে বসেছিলো সুদাম, হাতে রয়েছে একখানি সংবাদপত্র। হার মেনে যমুনা দেবী তাঁকে বললেন—তুই একবার দেখ দাদা। সকাল থেকে এক চামচ যে পেটে কিছু গেলোনা। কাগজখানা নামিয়ে রেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে এলো সুদাম। সুমিতার পাশে বসে চামচে করে, কৌশলে তার মুখে একটু একটু করে সুপ ঢেলে দিয়ে ওকে খাওয়াতে লাগলো।

খবরের কাগজটি হাতে নিয়ে লালকুঠির হত্যার রায়টি পড়ে চমকে উঠলেন যমুনা দেবী। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে বেড়িয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বারান্দায় কম্বলের আসনে বসেছিলেন সোমনাথ। দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ সামনে দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রের প্রতি। যমুনা দেবী কাগজখানি তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

আমি দেখেছি মা। গম্ভীর স্বরে বললেন সোমনাথ—নিয়তির বিধান লঙ্ঘন করবার শক্তি কারুর নেই। তবে ভাবছি একবার কলকাতায় যাবো, ওর মাকে আর করবীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো।

—আমিও আপনার সঙ্গে যাবো ঠাকুরপো। একবার জন্মের শোধ বাছাকে দেখবো। উঃ, কি করে এই নিদারুণ দুঃখ সইবেন ওর মা। বললেন যমুনা দেবী।

যাবেন বৈকি। সুদাম থাকবে মিতুর কাছে, আর নার্সও তো রয়েছে, অসুবিধে হবে না। জবাব দিলেন সোমনাথ।

হঠাৎ গুরুদেবকে নিঃশব্দে সামনে দণ্ডায়মান দেখে একটু চমকে, উঠে দাঁড়ালেন সোমনাথ। তাঁকে প্রণাম করে আসন এগিয়ে দিলেন যমুনা দেবী।

কিছু দূরেই আশ্রম। গোপীদাস মহারাজ কয়েক দিন ওখানে বাস করছেন। সোমনাথ আছেন এ বাড়ীতে সুমিতার কাছে।

ওঁদের দুজনকে নীরব দেখে যমুনা দেবী উঠে গেলেন সেখান থেকে।

—আমাকে হঠাৎ দেখে বিস্ময় বোধ করছো বৎস। প্রশান্ত হাস্তের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন গুরুদেব সোমনাথকে।

—না গুরুজী। আমি জানতাম আপনি আসবেন। হ্যাঁ। তোমার মনের চাঞ্চল্য আমাকে আকর্ষণ করেছে। এখন বলো হঠাৎ কোন সংশয় তোমার সাধনপথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে?

—নতবদনে নীরব রইলেন সোমনাথ।

ওর দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করে, মৃদু হেসে বললেন গুরুদেব,—আচ্ছা এখন থাক ওকথা। এখন যে প্রয়োজনে এসেছি তাই বলি। আগামী পরশু আশ্রমে নরনারায়ণ সেবার মনস্থ করেছি। আশ্রমে কিন্তু সাধুদের একটিমাত্র মাটির কলসী আছে। সেজন্ত পানীয় জলের জন্ত বড় কয়েকটি পাত্রের দরকার।

—চোখ তুলে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন সোমনাথ—আজই আমি সে ব্যবস্থা করে রাখবো। কয়েকটি মাটির বড় জালা আনলেই হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ। হবে। তবে ঐ চার-পাঁচশো লোকের জলের প্রয়োজন মিটে গেলে পর পাত্রগুলো, কি হবে? ওগুলোতে কি

আশ্রমের জন্য রাখা হবে? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোমনাথের দিকে চেয়ে শুধালেন গুরুদেব।

—না গুরুদেব। কারণ, ওতে যে অনেক জল ধরে। অত জল ব্যবহার ও হবে না. আর কয়েক দিন রেখে দিলে ওতে পোকা হয়ে যেতে পারে। ওগুলো শূন্যই থাকবে।

—ও। তা হলে বুঝতে পারছো যে, হয় পাত্রগুলোকে বহু লোকের পিপাসা মেটাতে হবে, নয় শূন্য থাকতে হবে। দু-চার জনের জন্য ওরা সৃষ্ট হয়নি, যেমন ছোট পাত্রগুলো হয়েছে।

চমকে উঠলেন সোমনাথ। গুরুদেবের জ্যোতি-বিচ্ছুরিত চোখ দুটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকবার পর গভীর শ্রদ্ধায় মাথাটি নত হয়ে এলো তাঁর চরণে। ব্যাকুলকণ্ঠে বললেন তিনি—ক্ষমা করুন। আমার ঘোর অজ্ঞানভাব ত্রুটিকে ক্ষমা করুন গুরুদেব।

ওকে গভীর স্নেহে তুলে ধরে বললেন সন্ন্যাসী—ত্রুটি তোমার কোথায় বাবা? মহামায়ার খেলা বিদ্যা-অবিদ্যার খেলায় আমরা যে ক্ষুদ্র ঘুঁটি মাত্র। অবিদ্যার আকর্ষণে সাধকের মন যখন, সোঽহংতত্ত্ব বা সচ্চিদানন্দ ভূমিচ্যুত হয়ে সাময়িক ভাবে নেমে আসে নিম্নভূমিতে, তখন সে অহংসাগরের সুখ, দুঃখ, রূপ, উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধনার রজ্জু যার কোমরে বাঁধা, সে ওতে তলিয়ে যাবে না, কিছুক্ষণ পরেই আবার বিদ্যার আকর্ষণে ঐ সাধন-রজ্জুর সাহায্যে সে ফিরে যাবেই স্বস্থানে।

সুমিতার জীবনের এই শোচনীয় পরিণাম-দর্শনে তোমার মনে যে সাময়িক বিভ্রান্তির তরঙ্গ দেখা দিয়েছিলো, সেটা এই অহংতত্ত্বের খেলা আর কি। নিজেকেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তাজ্ঞান করলেই কর্ম্মের সুখ-দুঃখময় তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে হবে।

এখন বুঝেছো যে তোমার মনে যে সংশয় জেগেছিলো যে—তুমি সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন না করলে সুমিতার জীবনে এই বিপর্য্যয় ঘটতো না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সুমিতা ও সুদামরূপী এই দুটি পাত্র ক্ষুদ্র মাটির কলস নয়। ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য ওরা সৃষ্ট হয়নি বা ক্ষুদ্র গণ্ডিতেও ওরা আবদ্ধ থাকতে পারে না। ওরা সৃষ্টি হয়েছে বহু আর্ত্ততৃষিত আত্মার জন্য। ওদের জীবন উৎসর্গীত বিশ্বের জনকল্যাণে। সেজন্য সাধারণ সঙ্কীর্ণ পরিবেশে ওরা বেমানান। যেখানকার প্রয়োজন একটি সাধারণ ক্ষুদ্র পাত্রের সেই পরিবেশে, ওরা হবে অর্থহীন, সেজন্য শূন্যই থাকবে।

পর্য্যবেক্ষণ করলেই এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাবে, যেসব মহাজীবন দ্বারা বিশ্বকল্যাণ সাধিত হয়েছে, তারা সাধারণ নিয়মে সংসার-জীবন যাপন করেনি। নিজের আত্মীয়-পরিজনবেষ্টিত যে ক্ষুদ্র সংসার সেখানে ছিলো তারা বেমানান অনুপযুক্ত। তারপর সমষ্টি ছেড়ে যখন ব্যষ্টিতে প্রসারিত হল তাদের পরিবেশ তখনই স্বরূপে, স্বস্থানে, হল তাদের প্রতিষ্ঠা; হলো মহাজীবনের উদ্বোধন। আজ সুদাম ও মিতার জীবনে যা দেখছো এটা হচ্ছে ওদের মহাজীবনের প্রস্তুতি মাত্র। জন্মকাল থেকে যে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিলো ওদের মনে, লোকচক্ষে সাধারণ নিয়মে তা ব্যর্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু সত্যই তা ব্যর্থ নয়। ওদের ক্ষুদ্র প্রেম একদিন রূপায়িত হবে অখণ্ড মহাপ্রেমে। ওরা সেই বিশুদ্ধ অনন্ত চিদানন্দ-সাগরের তরঙ্গরূপে দিব্যলীলার আনন্দ উপলব্ধি করবে।

মিতার জীবনে অসীমের অনধিকার প্রবেশ, তারপর নিদারুণ মনস্তাপ, সেই দেবশিশুর সাথে অল্প কালের স্নেহলীলা, তারপর তার তিরোভাব, এর কোনটাই অর্থহীন নয়। এগুলো ওদের ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ, অসৎ হতে সৎ, অন্ধকার হতে আলোক অনিত্য হতে নিত্য জীবনের বিবর্ত্তন মাত্র। ঐ ক্ষুদ্র শিশুটি এসে, ওর নারীহৃদয়ের যে সুপ্ত বৃত্তিগুলোকে জাগরিত করে গেছে, সে থাকলে মাতৃত্বের ঐ অমৃত নির্ঝরিণী শুধু তাকেই ঘিরে থাকতো, কিন্তু তা যে হবার নয়, একদিন ঐ ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী মহানদীতে রূপান্তরিত হয়ে বহু পরিত্যক্ত, অনাথ শিশুর জীবনে অমৃত দান করবে। বিশ্বপিতা, বিশ্বমাতা, বিশ্ববন্ধু হতে যারা আসে তারা কি কারুর লৌকিক মাতা-পিতা, বন্ধু হতে পারে? বিশ্বের সমগ্র প্রাণীর সঙ্গেই যে তারা একাত্ম হয়ে যায়।

এখন বুঝেছো, তোমার উন্নত মার্গে গমন, মিতা সুদামের জীবনের বিপর্যয়, সব কিছুর মাঝেই রয়েছে সেই মঙ্গলময়ের মহান উদ্দেশ্য।

ঝর-ঝর করে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছিলো, সোমনাথের দুটি গণ্ড বেয়ে। আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বললেন—গুরুদেব সত্যই এই সংশয়টি কাঁটার মতো জেগেছিলো আমার সাধন-পথে। তাকে উপেক্ষা করে চলেছি এতদিন, কিন্তু মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব আমাকে যন্ত্রণাও দিয়েছে। আজ আপনার অপার করুণায় আমি কণ্টকমুক্ত হলাম।

গুরুচরণে প্রণাম করে আবার বললেন তিনি, অনিল আর তার মাকে আশীর্ব্বাদ করুন গুরুজী, তাদের জীবনে বড় সঙ্কট উপস্থিত।

গভীর স্নেহভরে সোমনাথের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বললেন তিনি। সাধনপথকে শাণিত ক্ষুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন যোগী-ঋষিরা। এপথে গমন সহজসাধ্য নয় বাবা! বারে বারেই আসবে নানা সংশয়, কঠোর রূপ ধারণ করে, ভয় পেও না, অমৃতপথযাত্রী তোমরা অবিদ্যার ছলনা অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারবে।

আর অনিল, আর তার মায়ের এই সঙ্কটকালকে ওদের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তই বলা যায়। আত্মা তো অবিনাশী সে কথা জানো, তবে তার সদসৎ কর্ম্মের ফল তো তাকে ভোগ করতেই হবে। ওদের অসৎ কর্ম্মের স্তূপীকৃত জঞ্জাল অনুতাপ ও দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে যাবে। এর পর ওরা শুদ্ধ জীবনের অধিকারী হয়ে উন্নত মার্গে অগ্রসর হতে পারবে। কর্ত্তব্যের দায়িত্বে ওদের জীবনের এই মহাসন্ধিক্ষণে সেখানে তোমার উপস্থিতির প্রয়োজন বাবা!

—হ্যাঁ গুরুজী। আমিও সেই কথাই ভেবেছি।

—আচ্ছা এবারে এসো, মিতুমার কাছে একবার যাই।

সুমিতার শয্যাপাশে বসেছিলো সুদাম, ওঁদের আসতে দেখে উঠে গিয়ে প্রণাম করলো।

ওর মাথায় হাত রেখে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন গুরুদেব—রুগীকে কেমন দেখছো ডাক্তার! সারিয়ে তোলার আশা রাখো?

—আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমার ভরসা। মৃদুস্বরে জবাব দিলো সুদাম—স্বাভাবিক জ্ঞান তো এখনও ফিরলো না, খাদ্যগ্রহণ

করানোও আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই মনে হয়, কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনালে বোধ হয় ভালো হয়।

—তোমার যখন তাই মনে হয়েছে, সোমনাথ তো কলকাতায় যাবেই—সেই রকম ব্যবস্থা না হয় করা যাবে। একটু হাসির সঙ্গে বললেন গুরুদেব।

—তার প্রয়োজন হবে না সুদাম, গাঢ় স্বরে বললেন সোমনাথ, গুরুজীর পদধূলি ওর সর্ব্বাঙ্গে দাও, এই একমাত্র মহৌষধি ওর।

গুরুদেব বসলেন সুমিতার শয্যাপাশে।

সুদাম তাঁর পদধূলি নিতে অগ্রসর হলে ইসারায় তিনি বারণ করলেন। তারপর সুমিতার মাথায় আর সর্ব্বাঙ্গে হস্তচালনা করতে লাগলেন। সবিস্ময়ে দেখ্‌লো সুদাম, দুটি নীলাভ জ্যোতিশিখা গুরুদেবের দুচোখ থেকে নির্গত হয়ে যেন সুমিতার সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হচ্ছে। মিতার আধখোলা নিষ্প্রভ দুটি চোখে আর শুষ্ক ফ্যাকাসে ঠোঁটে যেন' প্রাণের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। হাতখানি শূন্যে তুলে সে যেন কা'কে অন্বেষণ করছে। থর-থর করে কাঁপছে হাতখানা, কিন্তু পড়ে যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়ালেন গুরুদেব। স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বললেন ওর হাতখানা ধরো সুদাম।

গভীর মমতার সঙ্গে সুদাম হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই ধপ করে হাতখানা ওর হাতের ওপর পড়ে গেলো, আর অস্ফুট কাতরোক্তি করে চোখ বুজলো সুমিতা। মাথাটা একপাশে ঢলে পড়লো। মহাব্যস্ত হয়ে ওর হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করতে গেলো সুদাম।

স্থির হয়ে ওর পাশে থাকো ডাক্তার, আর কিছু করতে হবেনা। গুরুদেবের অলৌকিক কণ্ঠের বাণী শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুমিতার পাশে নিশ্চল হয়ে বসে রইলো সুদাম।

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির। সামনের নাটমন্দিরের চাতালে সর্ব্বাঙ্গে একখানা শাদা চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মত পড়েছিলেন মায়া দেবী। সারা চাদরটা মাছিতে যেন ঢেকে গেছে।

অনড় অচল হয়ে তিনি কেঁদে কেঁদে ডাকছেন মহা বিপদতারিণীকে পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাইছেন।

—মা, মা, মা গো। একবার উঠে বসো মা!

করবীর আকুল ডাকে মুখের চাদর সরালেন তিনি। চারিপাশে অত লোক দাঁড়িয়ে কারা? আস্তে আস্তে মেঝের ভর দিয়ে উঠে বসলেন মায়া দেবী।

করবীর পাশে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলো অনিরুদ্ধ আর মিসেস বাসু। যমুনা দেবী আর সোমনাথ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন।

বাবা সোমনাথ! ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি,'তোমরা এসেছো কেন বাবা! আমার অনিল আমার খোকা, সে কৈ বাবা? তাকে কোথায় রেখে এসেছো বাবা?

এগিয়ে এসে সোমনাথ বসলেন ওঁর পাশে। তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন—তার শেষ সময় উপস্থিত, আর কয়েক দিন থাকবে সে পৃথিবীতে। আপনি চলুন তাকে আশীর্ব্বাদ করবেন।

বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠলেন তিনি—এ কি খবর শোনালে গো! ওরে আমার সোনার বাছা, শেষে ডাইনীতে খেলো তোকে রে! আমার কোলে ফিরে আয় বাবা, আমি বুক চিরে লুকিয়ে রাখবো তোকে।

বিস্মিত হয়ে ওঁর দিকে চেয়ে দেখছিলেন মিসেস বাসু—মিতার সেই দিদিমা? কোথার সেই বিলিতি ফ্যাসান-দুরস্ত, গর্ব্বিতা দাম্ভিকা নারী? লম্বাচওড়া অত বড় দেহটা যেন শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ছোট করে কাটা চুলগুলো যেন ক' মাসের মধ্যে শণের মতো শাদা হয়ে গেছে। দিনরাত কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো স্ফীত রক্তবর্ণ। পাথরের মেঝেতে অবিরাম মাথা খোঁড়ায় অত কপাল ফুলে, চাপ চাপ রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। পরনে একখানি আধময়লা মোটা থানকাপড়। ওঁর পাশে বসলেন মিসেস বাসু—তারপর ওঁর হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন,—আপনার কাছে একটি প্রার্থনা জানাতে এসেছি দিদি।

—আমার কাছে? হা, হা, হা, করে হেসে উঠলেন মায়া দেবী—সর্ব্বহারা ভিখারিণীকে কি পরিহাস করছো দিদি!

—না, না, এটা কি পরিহাসের সময় ভাই? আমি এসেছি রুবিকে চাইতে আপনার কাছে। বললেন মিসেস বাসু।

—রুবি? কে রুবি? আমার করবীর কথা বলছো?

এবারে ওঁর পায়ের কাছে এসে বসলো অনিরুদ্ধ—বিনীতভাবে বললো—হ্যাঁ, মা! আপনার করবীকেই চাইছি, আমি আমার জীবনসঙ্গিনীরূপে, এসো রুবি, মাকে প্রণাম করো। ওরা দু'জনে এক সঙ্গে মায়া দেবীকে প্রণাম করলো।

—এ কি, এ কি? এ কি সত্যি, না স্বপ্ন? আমার এই রূপহীনা মেয়েকে তুমি গ্রহণ করলে বাবা? আমার বহুকালের

আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হলো ? বাবা বাবা অনিল, একবার আয় রে, দেখে যা বাবা তোর হতভাগী মায়ের বড় সাধ আজ পূর্ণ হলো রে। ও কে বুকটা তো আমার ফেটে যাচ্ছে না ? এত বড় দুঃখ আর আর এতখানি আনন্দের ভারে বুকটা আমার ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেলো না তো ? ওগো তোমরা কেউ একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এই পাষাণীর বুকটা ভেঙে দাও না গো ! করবী আর অনিরুদ্ধকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

—নিজেকে সংবরণ করুন। বজ্রগম্ভীর স্বরে বললেন সোমনাথ, প্রাণ দিলেও তার কর্মফলকে আপনি খণ্ডন করতে পারবেন না। ওতে তার মঙ্গলও কিছু হবে না। এর চেয়ে নিজের অশান্ত চিত্তকে ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করুন, আর তাঁর কাছে পুত্রের আত্মার সদ্গতি কামনা করুন। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

বড় বড় চোখ মেলে সোমনাথের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মায়া দেবী—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—নিয়ে চলো বাবা, আমায় কোথায় নিয়ে যাবে। কি করলে, কি বললে আমার খোকার ভালো হবে আমায় বলে দাও।

—আসুন। ওঁর হাতখানি ধরে, ধীর পদক্ষেপে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন সোমনাথ। মহামায়ার সামনে গিয়ে নিজে বসলেন, মায়া দেবীকেও পাশে বসালেন। তারপর অনুচ্চকণ্ঠে ওঁর কানে যেন কি বললেন।

দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে চোখ বুজলেন বৃদ্ধা। ধ্যানস্থ হয়ে ওঁরা দু'জনে বসে রইলেন মা ভবতারিণীর সামনে।

পাশেই দাঁড়িয়েছিলো করবী। দর-দর করে চোখের জলে গাল দু'টো ভেসে যাচ্ছিলো তার। একটু দূরে মিসেস বাসু ও যমুনা দেবী বসে জগন্মাতার কাছে বৃদ্ধার জন্যে শান্তি প্রার্থনা করতে লাগলেন। আর অনিরুদ্ধ অস্থির ভাবে মন্দিরের চাতালে পাইচারী করতে লাগলো। মনটা তার নিদারুণ আক্ষেপে হায় হায় করছিলো। প্রতি মুহূর্তে যে অনিলের জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। এমন নির্বোধ মানুষ কি এই পৃথিবীতে আর আছে ? যে স্বেচ্ছায় ফাঁসির দড়িতে গলা বাড়িয়ে দেয় ?

হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট করবার যে কত কি ছিলো। হায়, ঐ নির্বোধটার জন্যে যে কিছুই হলো না। অশান্তচিত্তে নিজের চুল দু'হাতে টানতে লাগলো ব্যারিষ্টার অনিরুদ্ধ বাসু !

আজ সকাল থেকেই সুরু হয়েছে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা। প্রমত্ত ঝড়ের হা, হা, করা অট্টহাসির সঙ্গে মিশেছে সাগরের অশান্ত কলরোদন। ক্ষিপ্ত পবন যেন আজ সিন্ধুকন্যার বুকে জাগিয়েছে প্রমত্ত আলোড়ন, তাই সে লক্ষ লক্ষ বাহু তুলে, আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করতে চাইছে মহাকাশকে আর তার নাগাল না পেয়ে নিষ্ফল বেদনার ভারে আছড়ে ভেঙে পড়ছে বেলাভূমির ওপর। জনহীন সাগরতট। বদ্ধঘরের ভেতরে ভেসে আসছে ঝড়ের হুঙ্কার আর সাগরের আকুল ক্রন্দনধ্বনি।

ঝড়ের দাপটে সন্ধ্যের আগেই পুরীধামের বিজলীপ্রবাহ কাজে জবাব দিয়েছে।

সুমিতার ঘরে মোমবাতি জ্বালাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় বিব্রত হয়ে পড়েছে সুদাম। যতবার সে বাতি জ্বালে, জানালার কোন ফাঁক দিয়ে দমকাবাতাস এসে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় বাতিটা।

প্রকৃতি আজ যত অশান্ত ঠিক তার বিপরীত শান্ত হয়ে গেছে সুমিতা। বহুদিনের অশান্ত ভাবটা যেন আজ তাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেছে, তাই সেই সকাল দশটা থেকে সে শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। বহুকাল কোনো সঙ্কটাপন্ন অসুস্থ প্রিয়জনের পাশে নিদারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে দিন-রাত সংগ্রাম করবার পর, শুশ্রূষাকারিণীর চোখে যেমন নামে নিদ্রার অতলসমুদ্র, তেমনি ঘুমের জোয়ার বুঝি এসেছে, ওর স্নায়ু-তন্ত্রীতে, নিদহারা দু'টি চোখে। কি এক অস্থিরতা ওকে কি নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে এই ক'মাস রোগশয্যায়। ঘুম যেন ওর চোখ ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলো, আজ বুঝি সে ফিরেছে। তার স্নেহ কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে ওর বিভ্রান্ত মনে।

বার বার শঙ্কিত হয়ে ওকে পরীক্ষা করেছে সুদাম কিন্তু না, ভয়ের কোনো কারণ নেই, তবুও সকাল দশটা থেকে এই রাত ন'টা পর্য্যন্ত কিছুই তো খাওয়ানো হয়নি ওকে, কিন্তু ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়াতেও ওর মন রাজি হলনা, তাই একটু দূরে চেয়ারে সে বসে বসে ওর ঘুম ভাঙার জন্য প্রতীক্ষা করছে সারাটা দিন। নার্সটি আজ সকাল থেকে প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়েছে। তাকে যমুনা দেবীর ঘরে শুইয়ে তার ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করে, নিজেই সারাক্ষণ আছে সুমিতার কাছে। রাত ন'টা বাজলো। ঝড়ের গতি মন্থর হয়ে আসছে, আকাশ ভেঙে এখন নেমেছে প্রবল বর্ষণ। আশ্রম থেকে ওর খাবার দিয়ে গিয়েছিলো, পাশের ঘরে ঢাকা আছে। অতিকষ্টে একটি বাতি জ্বেলে আড়াল দিয়ে সুমিতার ঘরে রেখে, আরেকটি বাতি জ্বালিয়ে, নিজের খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিলো সুদাম। ফিরে এসে দেখলো মিতার ঘরের বাতি নিভে গেছে।

—হঠাৎ মনে পড়লো ওর নিচের ঘরের আলমারীতে আছে তো সেই আলোটা, যে বাতিদানটা মিতা ওর জন্মদিনে একবার উপহার দিয়েছিলো। একটি সোনা রূপোর কারুকার্য্য করা ড্রাগন মূর্ত্তি, তার মাথার ওপর সবুজ রং এর বেলোয়ারী কাঁচের একটি চিনালণ্ঠন ফিট করা ছিলো। মূর্ত্তিটির গায়ে মাছের আঁশের মত খাঁজ কাটা, আর প্রত্যেক খাঁজে খাঁজে, হীরে, মুক্তো, চুণি, পান্না, প্রবাল, নীলা আর পদ্মরাগ মণি, মানিয়ে এমন করে বসানো যে, মাথার ওপর আলোটা জ্বাললেই, ড্রাগনের মূর্ত্তিটা থেকে রামধনু রংএর আলো ঠিকরে পড়ে। ওর চোখ দুটোতে রক্তবর্ণ দুটি মহামূল্য চুণি বসানো। এটি একজন চিনাসওদাগর বিক্রি করেছিলো কুমার ইন্দ্রনাথ ত্রিবেদিকে। তখনকার দিনে, সৌখিন এবং শিল্পের সমঝদার হিসেবে, কুমার ইন্দ্রনাথের খুব নামডাক ছিলো, তাই দেশ-বিদেশ থেকে আগত বণিকরা বাংলার মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধান নিয়ে জানতে পারতো এদেশে প্রকৃত ক্রেতা কে আছে ? এই অপূর্ব্ব সুন্দর বাতিদানটি একবার সোমনাথের আদেশে, সুমিতা ওর জন্মদিনে ওকে দিয়েছিলো। পুরীতে আসবার সময় এই প্রিয় দ্রব্যটি কাজে লাগতে পারে ভেবে সুদাম এটিকে সঙ্গে এনেছিলো। তারপর সেটা আলমারীতে তোলাই ছিলো।

হ্যাঁ বাতিদানটা যে আজ বড় দরকার। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে, মোমবাতিটা জ্বালিয়ে, আলমারী খুললো সে।

সেই ঘুট ঘুটে কালো সমুদ্র। ওঃ কি ভীষণ কালো কালো পাহাড়ের মত ঢেউগুলো। ওরা যেন বিরাটকায় দৈত্যের দল, চারি দিক থেকে হা, হা, করে ছুটে আসছে সুমিত্রাকে গ্রাস করবার জন্য। কাজল মাখা আকাশের কাটা বুকে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে যেন, প্রলয়ের আগুন?

ওর দেহটা নিয়ে দৈত্যগুলো লোফালুফি খেলছে, উঃ, কি যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্ত্তে যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে, ওর।

—আর যে পারি না। কে আছ? বাঁচাও বাঁচাও আমাকে, আমাকে বাঁচাও গো।

—ঘুমের ঘোরে গুমরে গুমরে কেঁদে উঠলো সুমিত্রা। ঐ, ঐতো সেই বাতিঘরটা। সেখানকার সেই উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুমিত্রা। হঠাৎ একটা বিশাল ঢেউ ওকে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাতিঘরটার ওপর।

—আঃ এসেছি। এতদিন পরে এসেছি বাতিঘরে, মহা বিস্ময় ভরে দেখলো সুমিত্রা, সেই উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভটি তো স্তম্ভ নয়, ও যে একজন মানুষ। আর তার হাতেই জ্বলছে সেই মস্ত উজ্জ্বল আলোটা।

—ও কে? দামীদা? তুমি? তুমি আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো এখানে? আমায় দেখতে পাচ্ছো দামীদা?

সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে, দামী'দা, দামী'দা আ-আ।

চীনা লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে নিয়ে সুদাম ঘরের বাইরে পা দিয়েই, চমকে উঠলো।

কে? কে ডাকছে তাকে? এদিক ওদিক আলোটি ঘুরিয়ে দেখলে না কেউ নেই মনের ভুল। বাতাসের শব্দ।

আবার ভেসে এলো সেই ডাক—দামী'দা। দামী'দা, আ—

—কে? কে ডাকে ওকে, অমন করে? মিতা। মিতা ডাকছে। একি সম্ভব? প্রায় আড়াই মাস হতে চললো, তার কণ্ঠ থেকে শুধু অস্ফুট, অর্থহীন যন্ত্রণাময় প্রলাপোক্তি ছাড়া স্বাভাবিক কথা একটিও শোনা যায়নি তো। ও কণ্ঠ বুঝি চিরতরে নীরব হয়ে গেছে।

আবার আবার ভেসে এলো সেই ডাক।

—দামী'দা, দামী'দা আ-আ।

—না। না ভুল নয়, ভ্রান্তি নয়। মিতাই ডাকছে। তবে কি জ্বলছে তার স্বাভাবিক জ্ঞানের আলো মনে? কেটে গেছে ওর মনের বিস্মৃতির তিমির অন্ধকার? প্রমত্ত ঝড়ের গর্জ্জন, সাগরের কলরোল, বৃষ্টির জলতরঙ্গ, সকল শব্দকে ছাপিয়ে ঐ যে ভেসে আসছে তার চির-পরিচিত কণ্ঠের ডাক—দামী'দা দামী'দা আ,—আ।

—এই যে, এই যে আমি মিতা। ভয় নেই। যাচ্ছি। যা-ই, যা-ই, মিতা, মিতা-আ।

উচ্চকণ্ঠে সারা দিতে দিতে, সেই মহা উজ্জ্বল পান্না রং এর আলোক বিচ্ছুরিত, রত্ন খচিত দীপাধারটি হাতে ধরে, দ্রুত পদক্ষেপে ব্যাকুল চিত্তে, সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উর্দ্ধে গমন করতে লাগলো, ডাক্তার সুদাম হালদার।

সমাপ্ত

শিশু

তারা ধর

নিশার অকূল ঘন আঁধার বিদারি
মেলিল তরুণ আঁখি উষার আলোকে,
ছিন্ন কন্থা পরে হস্ত পদ নাড়ি
চৌদিকে চাইছে কেবল বিস্ময় পুলকে।

অন্ধকার মাতৃগর্ভ, সীমিত বন্ধন,
আলোক প্রবেশিতে সেথা পায় না'ক পথ—
মুক্তি লাগি বক্ষ মাঝে সুতীব্র ক্রন্দন
ডাকি আনে অবশেষে বাহিরের রথ।

পূর্বাচলে দেয় দেখা অরুণের রেখা,
তিমির পলাইয়া যায় গোপনে গোপনে,
বিশ্বমাঝে নূতনের নাম হয় লেখা,
শিরোপরে আশীর্ব্বাণী করে যে তপনে।

বিশাল উত্তাল নদী এ বিশ্ব ভুবনে
পাড়ি দেবে এই শিশু বার্দ্ধক্যে যৌবনে।

এতটুকুন

জসীম উদ্দীন

আছে আদর আকাশ-ভরা কে তাহারে যাচে?
এতটুকুন চাই যে আদর ছোট মুখের মাঝে।

আছে সাগর জগৎ জোড়া কূল কে তাহার পায়,
এতটুকুন সাগর চাহি ঝিনুক্ মতির ছায়।

মেঘ ভরিয়া বৃষ্টি ঝরে কেবা সে খোঁজ করে,
আমার চাতক পাখী কাঁদে একটি ফোঁটার তরে।

আছে কথার সরিৎ সাগর কথামৃতের নদী
একটি কথার লাগি পরাণ কাঁদে নিরবধি।

রাত্র ভরি লক্ষ তারা হাসছে লয়ে চাঁদে
একটি মাটির প্রদীপ লাগি পরাণ আমার কাঁদে।

নদী ভরা তৃষার বারি তৃষ্ণা নাহি যায়,
গৃহকোণের মাটির কলস প্রাণ জুড়াবি আয়!

আকাশ ভরা সিঁদুরে মেঘ আকাশে না ধরে,
একটি ফোটা সিঁথার সিঁদুর পরাণ জুড়ায় ওরে।

কাল তুমি আলেয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৬

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং, স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য···

মানুষ কোন ছার, দেবতাদেরও বোধের অগম্য নাকি।

বচনটি জানা ছিল। তা'বলে ভাগ্যের সিঁড়ি রাতারাতি ঊর্ধ্বমুখি হতে পারে কোনোদিন এমন আশা ধীরাপদর ছিল না। আর, রমণী চরিত্র প্রসঙ্গে উক্তিটা একমাত্র সোনাবউদির বেলাতেই প্রযোজ্য বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু চারুদির বাড়ি এসে প্রাজ্ঞ বচনের নিগূঢ় ইঙ্গিত অনেকটাই প্রসারিত মনে হল। নিজের ভাগ্যের ওপরকার পুরু পরদাটা একদফা নড়ে চড়ে উঠল। চারুদির মধ্যেও জটিল নারী রীতির বৈচিত্র্য দেখল একটু। শুধু চারুদি নয়, ধীরাপদর মনে হল, ওই পাহাড়ী মেয়ে পার্বতীরও ভিতরে ভিতরে অনাবৃত রহস্যের বুনুনি চলেছে কিছু।

বাইরের ঘরে উকিঝুঁকি দিয়ে ধীরাপদ কাউকে দেখতে পায়নি। মালী ওকে দেখে খবর দিয়েছে তারপর ফিরে এসে ভিতরে যেতে বলেছে।

—এসো, তোমার আবার বাইরে থেকে খবর পাঠানোর দরকার কি, সোজা চলে এলেই পারো।

দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ানোর আগেই চারুদির আহ্বান। ধীরাপদ বুঝল না, সে-ই এসেছে চারুদি জানল কি করে। মালীর নাম বলতে পারার কথা নয়। বাইরে স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে তাঁর ঘরে ঢুকতেই বেশ একটু সঙ্কোচে পড়ে গেল। তকতকে মেঝেয় বসে চারুদি একটা মোটা চিরুনি হাতে পার্বতীর কেশ বিন্যাসে মগ্ন। তাঁর কোলের ওপর কালো ফিতে। ধপধপে ফরসা এক হাতে পার্বতীর চুলের গোছা টেনে ধরা, অন্য হাতে বেশ জোরেই চিরুনি চালিয়ে চুলের জট ছাড়াচ্ছেন। ধীরাপদর মনে হল পার্বত্য রমণীটি শক্ত হাতে বন্দিনী।

বোসো—। যেন ও আসবে জানাই ছিল। চারুদি পার্বতীর চুলের গোছা আরো একটু টেনে ধরলেন। তোর আবার লজ্জার কি হল, বোস ঠিক হয়ে, মাথা নয়তো আস্ত একখানা জঙ্গল!

ধীরাপদ আগের দিনের মতই অদূরে একটা মোড়ায় বসেছে। জঙ্গল-কেশিনীর মুখে লজ্জার আভাস কিছু চোখে পড়ল না। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে হয়ত, অথবা ঝুঁকতে চাইছে, চারুদির কেশাকর্ষণে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এটুকু ছাড়া মুখভাবে আর কোনো তারতম্য নেই। ওর লজ্জার লক্ষণ চারুদিই ভালো জানেন। তাঁর অগোচরে ধীরাপদ মেয়েটার দিকে দুই একবার চোখ না চালিয়ে পারল না। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল বসে আছে···সামান্য ব্যতিক্রমে আঁট বসনের বাধা ভেঙে হৃদু তরঙ্গ উপচে ওঠার সম্ভাবনা। পরিচারিকার প্রতি কর্ত্রীর এই বাৎসল্যটুকুও মিষ্টি।

এরই মধ্যে ছাড়া পেলে, কোথা থেকে আসছ? দ্রুত হাত চলেছে চারুদির।

ফ্যাক্টরী থেকে।

চারুদি উৎসুক নেত্রে তাকালেন, অমিতের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ধীরাপদ মাথা নেড়ে জানালো, হয়েছে।

এলো না কেন, আজ আসবে ভেবেছিলাম, টেলিফোনে বলেওছিল আসবে, তোমার সঙ্গে আলাপ সালাপ হয়েছে ভালোমত?

আজই হল। ধীরাপদর দুচোখ পার্বতীর মুখের ওপর আটকালো কেন নিজেও জানে না। অন্তস্তলের রসিক মনটির অনুভূতির কারিগরি আরো বিচিত্র। একজনের আসার সম্ভাবনার সঙ্গে চারুদির এই বাৎসল্যের একটা যোগ উকিঝুঁকি দেয় কেন, তাই বা কে জানে।

চটপট চুল বাঁধা শেষ করে চারুদি যেন মুক্তি দিলেন মেয়েটাকে। কি আছে মামাবাবুকে তাড়াতাড়ি এনে দে, খেটেখুটে এসেছে—

খেটে আসুক আর না আসুক ধীরাপদর খিদে পেয়েছে। পার্বতীর প্রস্থান। চারুদি উঠে ভিজে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে তাকালেন ওর দিকে। ধীরাপদর চোখ তখনো দোরগোড়া থেকে ফেরেনি, আপন মনে হাসছিল একটু একটু। চারুদির চোখে চোখ পড়তে কৈফিয়তের সুরে বলল, মনিব ভালো পেয়েছে—

তোয়ালে রেখে চারুদি খাটে বসলেন। তুমি কেমন মনিব পেলে শুনি—সেদিন এসেও ওভাবে চলে গেলে কেন, পার্বতী বলছিল—

ধীরাপদ অপ্রস্তুত। তার সেদিনের আসাটা কেউ টের পেয়েছে একবারও ভাবেনি। কিন্তু তাহলেও এ প্রসঙ্গ চারুদির অন্তত উত্থাপন করার কথা নয়। এসেও ওভাবে ফিরে গেল কেন সেটা তাঁর থেকে ভালো আর কে জানে।

ওকে স্থূল বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে কৌতুক উপভোগ করাটাই চারুদির উদ্দেশ্য বলে মনে হল না। চারুদি যেন বলতে চান, লাল গাড়ি দেখে তুমি পালিয়েছ, কিন্তু পালাবার কোনো দরকার ছিল না। সঙ্কোচের ব্যাপারটা গোড়া থেকেই কাটিয়ে দিতে চান হয়ত।

জবাব এড়িয়ে বলল, তোমার পার্বতী পাহারাদারও কড়া দেখি।

খুব। এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলেন না চারুদি। ওর চিঠি খোলার খবরটা হিমাংশু মিত্র বলে গেছেন কি না তাও বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল বলো, কাজ করছ?

কি কাজ?

ও-মা, সে আমি কি জানি! কাজে লাগোনি?

ধীরাপদ মাথা নাড়ল। তারপর হেসে বলল, শুধু তুমি কেন, কেউ জানে না—

চারুদি অবাক। এই যে বললে ফ্যাক্টরী থেকে আসছ?

গেছলাম একবার। হালকা করেই বলল, তুমি এভাবে আমার মত একটা লোককে ওঁদের মধ্যে ঠেলেঠুলে ঢোকাতে চাইছ কেন, ও থাকগে—

ভালো লাগছে না? চারুদি হঠাৎ বিমর্ষ একটু। বিরক্তও। তাঁর কিছু একটা প্ল্যান যেন বরবাদ হতে চলেছে।—এখনও তো কাজই শুরু করোনি, এরই মধ্যে এ-কথা কেন?

কাজের জন্যে নয়, ওঁরা ঠিক—

ওঁরা কারা?

ধীরাপদ আর কিছু বলে উঠতে পারল না। অভিযোগ করতে চায়নি, অভিযোগ করার নেইও কিছু। ও যাওয়ামাত্র সকলে সাদরে অভ্যর্থনায় গ্রহণ করবে এমন প্রত্যাশাও ছিল না। এই দুদিন ঘোরা-ঘুরি করে নিজেকে একেবারে বাইরের লোক আর বাড়তি লোক মনে হয়েছে বলেই কথাটা তুলেছিল।

কিন্তু চারুদি আমল দিলেন না। খুঁটিয়ে খুটিয়ে এই দুটো দিনের খবর শুনলেন। তারপর একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, কাজে না ঢুকেই পালাতে চাইছ! এক নম্বরের কুঁড়ে তুমি···দুটো দিন সবুর করো সব ঠিক হয়ে যাবে, ওঁরা সত্যিই এখন ব্যস্ত খুব।

একটু থেমে আবার বললেন, আর একটা কথা, ওখানে কাজ করতে গেছ বলে নিজেকে কারো অনুগ্রহের পাত্র ভাবার দরকার নেই, তুমি তো যেতে চাওনি, আমিই তোমাকে জোর করে পাঠিয়েছি।

তাঁর জোর করে পাঠানোর জোরটা কোথায় সঠিক না জানলেও ধীরাপদর আবারও মনে হল, জোরালো রকমের জোর কোথাও আছেই। সেটা শুধুই কোনো এক পুরুষের ওপর কোনো এক রমণীর জোর নয়। ব্যক্তিগত প্রভাব নয় কারো ওপর, ওই গোটা ব্যবসার-প্রতিষ্ঠানটির ওপরই কিছু একটা স্বার্থগত প্রভাব আছে তাঁর। ওর চাকরির ব্যাপার নিয়ে তা না হলে এমন অ-রমণীসুলভ মাথা ঘামাতেন না তিনি, অত আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। চারুদির লোক বলেই ওর জোরটা যে ঠুনকো নয় সে-রকম একটা স্পষ্ট আভাস বিকেলে অমিতাভ ঘোষও দিয়েছিল। বলেছিল, যাঁর কাছ থেকে এসেছে—কারো মেজাজের ধার ধারতে হবে না।

ধীরাপদর আরো কাছে এসে আরো ভালো করে, আরো নিরীক্ষণ করে দেখতে ইচ্ছে করছিল চারুদিকে। দেখছিল কি না কে জানে। হেসে বলল, অর্থাৎ, পার্বতীর মত আমারও আসল মনিবটি এখানে তুমিই?

চারুদিও হাসলেন। প্রায় স্বীকারই করে নিলেন যেন। হাসির সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক গাম্ভীর্যটুকু গেল। বললেন, আগে তো এই মনিবের টানে টানেই পাশ ছেড়ে নড়তে না, এখন বয়েস হয়ে গেছে, আর তেমন পছন্দ হবে না বোধহয়।

আঠের বছর বাদে দেখা হওয়া সত্ত্বেও সেদিন চারুদির বয়েসটা ধীরাপদর চোখে পড়েনি। আজও পড়ল না।···কারো কি পড়েছে? সেদিনও হিসেব করে বলেছিলেন চুয়াল্লিশ। যাই বলুন, ধীরাপদর এখনো মনে হয়, চারুদির সব বয়েস ওই লালচে চুল আর লাল রক্তের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ফিরে ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল, পছন্দ এখনো কম নয়, কিন্তু মনিবের কাছে সেটা অপ্রকাশ্য।

বলা হল না। খাবার হাতে পার্বতী ঘরে ঢুকেছে।

ধীরাপদ আড়চোখে খাবারের থালাটা দেখল। এত খাবার কেউ আসবে বলে তৈরি করা হয়েছিল বোধহয়। কে করেছে পার্বতী না চারুদি? কি দেওয়া হয়েছে চারুদি লক্ষ্য করলেন না, অন্য কিছু ভাবছিলেন তিনি। পার্বতী চলে যেতে সকৌতুকে তাকালেন তার দিকে।—তার পর, ওখানে মেম ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল?

মেম ডাক্তার! কার মুখে শুনেছিল? মনে পড়ল, হিমাংশু মিত্রর বাড়ির মানুকেকে বলতে শুনেছিল।···মানুকের সঙ্গে চারুদির যোগাযোগ আছে তাহলে। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ আশা করেনি ধীরাপদ। আরো কিছু শোনার আশায় নিরুত্তর।

হাঁ করে চেয়ে আছ কি, লাবণ্য সরকারকে দেখোইনি এ পর্যন্ত? তুমি সত্যিই ওখানে চাকরি করবে কি করে তাহলে!

ও। ধীরাপদও হাসল এবারে, আমি নগণ্য ব্যক্তি তাঁর কাছে।

চারুদি উৎফুল্ল মুখে সায় দিলেন, তা সত্যি—দেখো চেষ্টাচরিত্র করে একটু-আধটু গণ্য হতে পারো কি না, সেই তো বলতে গেলে কর্ত্রী ওখানকার।

আমারও? ধীরাপদ ঘাবড়েই গেছে যেন।

চারুদির খুশির মাত্রা বাড়ল আরো। তুমি না চাইলে তোমার নাও হতে পারে। কেন, পছন্দ নয়?

তেমনি নিরীহমুখে ধীরাপদ পাল্টা প্রশ্ন করল, পছন্দ হলেও চাকরিটা থাকবে বলছ?

চারুদি চোখ পাকালেন, বেড়ালের মত মুখ করে থাকো, কথায় তো কম নয় দেখি! পরমুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হাসি।—তাও থাকবে, চেষ্টা করে দেখতে পারো।

প্রথম দিন এ-বাড়ি এসে পার্বতীর বডি-গার্ড প্রসঙ্গে চারুদিকে এমনি হাসতে দেখে ধীরাপদর মনে হয়েছিল, অত হাসলে চারুদিকে ভালো দেখায় না। আজও তেমনি মনে হল। চারুদির অত হাসি খুব সহজ মনে হয় না। এত হাসি অন্তস্তলের কিছু গোপন প্রতিক্রিয়ার দোসর যেন।

এই দিনও ধীরাপদ ছাড়া পেয়েছে অনেক রাতে। কথায় কথায় এত রাত হয়েছে সেও খেয়াল করেনি। সন্ধ্যার ওই জলযোগের পর রাতের আহারের তাগিদ ছিল না। তবু না খাইয়ে ছাড়েননি চারুদি। বলেছেন, এত রাতে কে আর তোমার জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে আছে? ছদ্ম-সংশয়ও প্রকাশ করেছেন, না কি আছে কেউ?

ফেরার সময় অন্যান্য বারের মতই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন।

চারুদি অনেক গল্প করেছেন আজ। এই দিনের গল্প বেশ
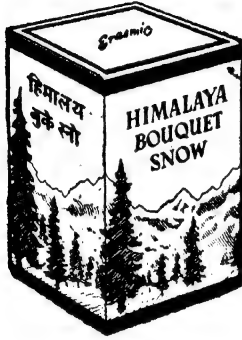
নিবিষ্ট আগ্রহে শুনেছে ধীরাপদ। যাদের সঙ্গে ওর নতুন যোগাযোগ, কথা বেশির ভাগ তাদের নিয়েই। বলার উদ্দেশ্য নিয়ে বলা নয় চারুদির, এক একটা হালকা সূচনা থেকে গভীরতর বিস্তার।

—ওই ছোঁড়াই তো ছুট করে এনে বসিয়েছিল মেয়েটাকে, কারো কথা তো শোনে না কোনোদিন, কারো কাছে জিজ্ঞাসাও করে না কিছু—নিজে যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

ছোঁড়া বলতে অমিতাভ ঘোষ, আর মেয়েটা লাবণ্য সরকার।

শুধু নিয়ে এসেছে। এনে ভেবেছে, ভারী দামী একটা আবিষ্কারই করে ফেলেছে।···আমি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলাম, সব ঝিনুকে মুক্তো নেই জানিস তো? শুনে সে কি রাগ ছেলের। যা নয় তাই বলে বসল আমায়, সবাই না কি তা' বলে আমার মতও নয়। খুব হেসেছিলেন চারুদি, সেই হাসি আবারও প্রাঞ্জল মনে হয়নি ধীরাপদর, খুব ভালো লাগেনি। হাসি থামতে বলেছেন, আসলে ওই বয়েস আর ওই শাদা নরম মন—চটক দেখে মাথা ঘুরে গেছল, বুঝলে না?

চারুদির কথা সত্যি হলে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লাবণ্য সরকারের যোগাযোগ বেশ রোমাণ্টিকই বটে।···যোগসূত্র 'সপ্তাহের খবর'। পরীক্ষার খাতার সাইজের ছোট আট পাতার কাগজ একটা। সপ্তাহে সপ্তাহে বেরোয়, ফেলে দিলে ঠোঙার কাজেও লাগে না, এমনি চেহারা-পত্র তার। কিন্তু নিয়মিত পড়ুক না পড়ুক, সেই কাগজের নাম জানে আধা-শিক্ষিতজনেরাও। চারুদির মুখে নাম শোনার আগেও ধীরাপদও জানত। এখনো জানে। সপ্তাহের খবরে খবরের মত খবর থাকে এক-একটা। চমকপ্রদ চটকদার খবর সব। কাগজখানা অনেক সময়েই ওপরের মহলের ভীতি, অস্বস্তি বা চক্ষুলজ্জার কারণ। আর সব সময়েই নিচের মহলের রোমাঞ্চ আর বিস্ময়ের খোরাক। সাধারণ লোক প্রয়োজনীয় একটা ঝাঁটার মতই মনে করে কাগজটাকে। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি আর হোমরাচোমরা অনেক ব্যক্তিনীতির অনেক অনুর্দ্ধসম্পৃক্ত জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে এনে ফলাও করে স্তূপীকৃত করা হয় ওখানে। 'সপ্তাহের খবর'এর খবরের ভিত্তিতে প্রাদেশিক এমন কি কেন্দ্রীয় আইন সভারও প্রতিপক্ষদলের হুল-ফোটানো জেরায় অনেক সময় নাজেহাল সরকারী পক্ষ। এই ধরনের খবর যদিও উপেক্ষার গহ্বরেই বিলীন হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তবু এতেই সাময়িক প্রভাব বড় কম নয়। শিকার যাঁরা তাঁরা অন্তত এই সাময়িক আলোড়নটুকুতে বেশ পর্যুদস্ত বোধ করেন। অন্ধকারের জীব হঠাৎ আলোর ঘা খেলে যেমন গোলমেলে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে যায়, অনেকটা তেমনি।

বহুরূপীর ভোল বদলানোর মত এ পর্যন্ত অনেকবারেই নাম বদলাতে হয়েছে কাগজখানার। শুধু নামই বদলেছে, ভোল বদলায়নি। অনেকবার কোর্ট-কাচারী করতে হয়েছে, ছোটখাট খেসারতও দিতে হয়েছে একাধিকবার, গুরুদণ্ড বা গুরু খেসারতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু নাম? নামে কি আসে যায়? গোলাপ ফুল নাম-চাপা পড়ে কখনো! ভিন্ন নামে আর ভিন্ন নামের সম্পাদনায় রাতারাতি সেই গোলাপই ফুটেছে আবার। অজ্ঞজনের কৌতূহল, এ-বাজারে কাগজ চালানোর খরচ পোষায় কোথেকে? পাঁচ নয়া পয়সায় ছাপার খরচও তো ওঠার কথা নয়। বিজ্ঞজনের অভিমত, খরচের ঘানি ভয় যাদের তারাই টানে—আটপাতার কাগজে এক-একবার চারপাতা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে না? আর দায়ে ঠেকলে সব সময়ে যে চোখে পড়ার বিজ্ঞাপনই দেবে সকলে, তারই বা কি মানে?

বছর কতক হল 'সপ্তাহের খবর' নাম-ভূষণে চলছে কাগজখানা। যে-নামে বা যে-নামের সম্পাদনায়ই চলুক, এর আসল মালিক আর সম্পাদকের নামটিও বলতে গেলে সর্বসাধারণের পরিচিত। তিনি বিভূতি সরকার। কীর্তিমান পুরুষ।

এই বিভূতি সরকার লাবণ্য সরকারের দাদা। অনেক বড় দাদা, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস।

এখান থেকে লাবণ্য-প্রসঙ্গ শুরু চারুদির।—গেল বন্যায় বিনে পয়সার কোম্পানীর বাক্স বাক্স ওষুধ পাঠানো হয়েছিলো অসুস্থ বন্যার্তদের জন্যে। অনেক জায়গায় মহামারী লেগেছিল। ওষুধ সাহায্য করে প্রতিষ্ঠান নাম কিনেছিল বেশ। কাগজে কাগজে সাহায্যের খবর বেরিয়েছিল, প্রশংসা বেরিয়েছিল।

কিন্তু 'সপ্তাহের খবর'এর এক ফলাও খবরে সব প্রশংসা কালি। দুর্গত অঞ্চলের ডাক্তারদের বিবেচনায় সাহায্য প্রাপ্ত ওষুধের নাকি মান খারাপ বলে প্রকাশ। যে-ওষুধে অবধারিত কাজ হওয়ার কথা, সেই ওষুধেও আশাপ্রদ ফল দেখা যাচ্ছে না। সপ্তাহের খবরে বড় বড় হরপে ছাপা হয়েছে, "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ!" তার নিচে আসল সংবাদ আর সম্পাদকীয় সংশয় টীকা-টিপ্পনী মন্তব্য।

অমিতাভ ঘোষ তার দিন কতক আগে বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে চীফ কেমিষ্ট হয়ে বসেছে। সব ক'টা কাগজের সঙ্গে প্রচারের যোগাযোগ তখন সেই রাখত, বিজ্ঞাপনও সেই পাঠাতো। দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কোন্ লটএর কি ওষুধ পাঠানো হয়েছে, ভালো করে জানেও না। এদিকে ফ্যাক্টরী তছনছ ওলট-পালট করল, অসহিষ্ণু সন্দেহে কত চলনসই ওষুধও নষ্ট করল ঠিক নেই—অন্যদিকে কাগজের মুখ-চাপা দেবার দায়ও তারই।

বিভূতি সরকার সবিনয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু পরের সপ্তাহেই ফলাও আক্রমণ আবার। প্রচারের লোভে অপচিত ওষুধ দান করার নৃশংসতা, নরম-গরম কটু-কাটব্য, উঁচু মহলের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান-প্রধানের, অর্থাৎ হিমাংশু মিত্রর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, ইত্যাদি।

অমিতাভ ঘোষ আর যেত কি না সন্দেহ, কিন্তু হিমাংশু মিত্রই আবার তাকে পাঠিয়েছেন। দরকার হলে একসঙ্গে ছ-মাসের বিজ্ঞাপনও 'বুক' করে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবারেও বিভূতি সরকার অমায়িক ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জনসাধারণ যে তদন্ত দাবী করে সম্পাদকীয় লেখার জন্য চাপ দিচ্ছে তাঁকে, সে-কথাও বলেছেন। মামার কথা ভেবেই অমিতাভ ঘোষ ঠাণ্ডা মেজাজে বসেছিল। যাই হোক, বাঙালী প্রতিষ্ঠানের প্রতি এবারে সহযোগিতার আশা এবং আশ্বাস দিয়ে শাদামাটা একটা ব্যক্তিগত সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন বিভূতি সরকার। তাঁর বোনটি সেবারে ডাক্তারী পাশ করেছে, ভালো যোগাযোগ কিছু হয়ে উঠছে না—সেই বোন এখন দাদাকে ধরেছে ওদের কোম্পানীতে কিছু সুবিধে হয় কিনা। বোনকে ডেকে তখুনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

ব্যস, চারুদি হেসে উঠেছিলেন, ছেলে ওইখানেই কাত। বি-এসসি পাস ডাক্তার শুনে আরো খুশি—শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে কেমিষ্টের কাজেও সাহায্য করতে পারবে ওকে। সটান গাড়িতে তুলে একেবারে মামার কাছে এনে হাজির!

চারুদি আরো মজার কথা বলেছেন। বলেছেন, তার পর ক'টা মাস সেকি আনন্দ আর উৎসাহ! ওকে পেয়ে লাভটা যেন শেষ পর্যন্ত ওদেরই হল! বিভূতি সরকার বোনের হিল্লে করে দিয়েই চুপ হয়ে গেছল নাকি? অমন পাত্রই নয়, নিজের স্বার্থের কাছে বোনটোন কিছু নয়—অতটা খোলাখুলি না হলেও মাঝে-মধ্যে খোঁচা দিতে ছাড়ত না—তাই নিয়ে এক একদিন অমিতের সামনেই বোনের সঙ্গে ভাইয়ের ঝগড়া।

এদিকে মাসির কাছে অর্থাৎ চারুদির কাছে লাবণ্য সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অমিতাভ ঘোষ। সঙ্গে করে নিয়েও এসেছে অনেক দিন। আই, এসসি পাস করেই লাবণ্যর নাকি ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছে ছিল, পয়সার অভাবে পারেনি—সকাল-বিকেল মেয়ে পড়িয়ে তো নিজের পড়া চালাতো। বি, এসসি পাস করার পর অবস্থাপন্ন ভগ্নিপতি ডাক্তারী পড়বার খরচ চালাতে রাজি হন। ভগ্নিপতির মস্ত মুদীর দোকান, মোটা রোজগার মাসে। তাঁর এত উদারতার পিছনে আসল লক্ষ্যটিও অমিতাভ ঘোষ বার করে নিতে পেরেছিল লাবণ্যর কাছ থেকে। ভগ্নিপতিটি বিপত্নীক, পাঁচ ছ'টি ছেলেপুলে। ভগ্নিপতির আশা বুঝেও লাবণ্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ না করে পারেনি। ঋণ পরিশোধের জন্যে তাঁকে যদি বিয়ে করতে হয় তাও করবে, তবু নিজের পায়ে দাঁড়াবে সে—ডাক্তার হবে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর আপস নেই তার।

চারুদি ঠাট্টা করেছিলেন, খুব প্রতিষ্ঠা হোক, কিন্তু মেয়েটার এতসব ঘরোয়া খবরে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

তাতেও রাগ, মেয়েরা নাকি মেয়েদের ভালো শুনতে পারে না, একটা মেয়ের অমন মনের জোর দেখে ছেলে তখন মুগ্ধ। সব মেয়ে এমন হলে এই দেশটাই নাকি অন্যরকম হত। চারুদির হাসি।

গল্পের মাঝে এইখানে ধীরাপদ ছন্দপতন ঘটিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, উনি ভগ্নিপতিকেই বিয়ে করবেন তাহলে?

চারুদির হাসিভরা দুই চোখ ওর মুখের ওপর আটকে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর মন্তব্য করেছেন, তুমি একটি নীরেট!

চারুদির মতে অমিতাভ ঠিকই বলেছিল, প্রতিষ্ঠালাভের ব্যাপারে লাবণ্য সরকারের আর কোনো কিছুর সঙ্গেই আপস নেই। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে কাকে ধরতে হবে, কাকে ছাড়তে হবে, কোন পথে চলতে হবে, কি ভাবে চলতে হবে সেটা ভালো করে বুঝে নিতে তার নাকি ছ'মাসও লাগেনি। প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি ধরে এখনো তাই চড়চড়িয়ে উঠেই চলেছে।

ফাঁকা রাস্তায় ঘুম চোখে ড্রাইভার খুশিমত স্পীড চড়িয়েছে। ধীরাপদর খেয়াল নেই। ভাবছে। চারুদির অমন নিটোল হাসি কৌতুক উদ্দীপনার ফাঁকে ফাঁকে ও তখন কোন্ ফাটল খুঁজছিল? প্রতিষ্ঠার সিঁড়ির খোঁজে কাকে ছেড়ে কাকে ধরতে হবে লাবণ্য সরকার ছ'মাস না যেতে বুঝে নিয়েছে—সেটাই খবর? না খবর আর কিছু? তার ছাড়াটা খবর না অন্য কাউকে ধরাটা? এভাবে ঠেলেঠুলে চারুদি ওকে এর মধ্যে ঢোকাতে চান কেন?

ব্যবসায়ের নাড়ি নক্ষত্র খবরই বা রাখেন কেন এত?—ধীরাপদ ভাবছে, কথা উঠলেই চারুদি নিজের বয়সের কথা বলেন কেন? বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, নিশ্চিন্ত দিন যাপনের টাকাও বোধহয় আছে—তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় চোখে মুখে জল দিতে হয় কেন চারুদির?

চারুদি ওকে পাহারায় বসালেন? নড়েচড়ে ধীরাপদ সোজা হয়ে বসল। লাবণ্য সরকার সিঁড়ি ধরে উঠছে, না সিঁড়ি দখল করেছে?

স্বভাব অনুযায়ী এবারে এই প্রগলভ বিশ্লেষণে গা ভাসানোর কথা ধীরাপদর। কিন্তু কোনো কৌতুক প্রহসন দেখে আসার পর শিথিল অবকাশে অলক্ষ্যে গভীরতর আবেদনটুকু যেমন ভিতর থেকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ায়, তেমনি সকলকে ঠেলেঠুলে ওর মনের মুখোমুখি যে এসে দাঁড়াল সে অমিতাভ ঘোষ। পরিহাস-তরল অনর্গল কথা-বার্তার মধ্যে নিজের অগোচরে চারুদি এই একজনকে কেমন করে তারা কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

—আমার কোনো কথা শোনে নাকি! আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করে না ছেলে, যা মুখে আসে তাই বলে।

অমিতাভ ঘোষ প্রসঙ্গে নিরুপায় অভিযোগ চারুদির। কিন্তু চারুদির মুখে খেদ দেখেনি ধীরাপদ, তৃপ্তি দেখেছে। মা যেমন দুরন্ত অবুঝ ছেলে নিয়ে নাচার, তেমনি। নিভৃত প্রশ্রয়ের তুষ্টি। ধীরাপদর ভালো লেগেছিল, মিষ্টি লেগেছিল।

ভয়ানক রাগ সকলের ওপর? এরই মধ্যে কি করে বুঝলে তুমি? চারুদির আলাপের বিস্তারও আর লঘু শোনায় নি — ওই রকমই মেজাজ হয়েছে আজকাল। রাগ সব থেকে ওর মামার ওপরেই বেশি, অথচ দু'বছর বয়েস থেকেই তাঁর কাছে মানুষ, কি ভালই না বাসত মামাকে—এখনো বাসে, অথচ ধারণা, মামা ভিতরে ভিতরে ওকে আর একটুও চায় না।

সত্যি নাকি? ধীরাপদ সাগ্রহে বিবৃতিটুকু জিইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিল।

সত্যি নয় শুনেছে। এম, এসসি অমন ভালো পাস করতে হিমাংশু মিত্রই আগ্রহ করে তাকে বিলেত থেকে ট্রেনিং দিয়ে এনেছেন, ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরীতে অতবড় কাজে বসিয়ে দিয়েছেন, আর গোটা ব্যবসায়ের দু'আনার অংশও অমিতাভ ঘোষের নামেই লেখা-পড়া করা আছে।

শেষের খবরটা অবাক হবার মতই। সেই সুউন্নত পুরুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জাগার মত। এতখানি ভাগনে বাৎসল্য দুর্লভ। তাহলে এমন হয় কেমন করে? ধীরাপদ কোন্ এক মনস্তত্ত্বগত গল্পে পড়েছিল, খুব অল্প বয়সে মা-বাপ হারানো স্নেহবঞ্চিত ছেলে মেয়ের অনেক রকমের জটিল অনভূতি-বিপর্যয় দেখা দেয় নাকি। চিকিৎসকরা যাকে বলেন ইমোশনাল ক্রাইসিস। চারুদির কথা থেকে সেই গোছেরই কিছু মনে হল।

মামাতো ভাইটি চার-পাঁচ বছরের ছোট, সে আসার পর থেকে নিজের সঙ্গে তার অনেক তফাত দেখেছে অমিতাভ ঘোষ। যে তফাত দেখলে এক শিশুর প্রতি আর এক শিশুর মনে শুধু বিদ্বেষই পুষ্ট হতে থাকে, সেই তফাত। তফাতটা দেখিয়েছেন অমিতের মামী,

সিতাংশুর মা। বাইরে থেকে সেই তফাতেই সে অভ্যস্ত হয়েছিল, বড় হয়েছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার প্রতিক্রিয়া ছিলই। চারুদির সেই রকমই বিশ্বাস। নইলে একজন আর একজনকে এখনো বরদাস্ত করতে পারে না কেন। সেই দশ-এগারো বছর বয়সে ছেলেটা প্রথম আসে চারুদির কাছে, তার পর থেকে একবার আসতে পেলে আর সহজে যেতে চাইত না—টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হত।

হিমাংশু মিত্র নিজের ছেলেকে কোনো দিন নিয়ে এসেছেন কি না চারুদি উল্লেখও করেননি। চারুদির কথা শুনতে শুনতে মনে মনে ধীরাপদ ছোট একটা হিসেবে মগ্ন হয়েছিল। অমিতাভ ঘোষের বয়স এখন বড় জোর তেত্রিশ, আর চারুদির চুয়াল্লিশ। এগারো বছরের ছোট। ছেলেটার দশ-এগারোর সময় চারুদির একুশ-বাইশ। অমিত ঘোষের মাসি-প্রাপ্তিটা তাহলে চারুদির শ্বশুরবাড়িতে, তাঁর স্বামী বেঁচে থাকতে।

অমিত ঘোষ মা না পাক, জ্ঞানাবধি মামাকে পেয়ে বাবা পেয়েছিল। সেই পাওয়ায় অনেককাল পর্যন্ত কোনো সংশয় ছিল না। যখন এম, এসসি পড়ে তখনো না। কিন্তু সেই সংশয় দেখা দিতেই যত সংকট। সেই সময় মামী চোখ বুজেছেন। হিমাংশু মিত্র তখন প্রকাশ্যেই মা-হারা ছেলের দিকে বেশি ঝুঁকেছিলেন। অস্বাভাবিক নয়, ছেলে তখনো ইস্কুলের গণ্ডী পেরোয়নি। মামাত ভাইয়ের প্রতি এম-এসসি পড়া ভাগ্নের প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষের আভাস পেয়ে অনেক সময় ভাগ্নেকে রুক্ষ শাসনও করেছেন তিনি।

—সেই থেকেই ছেলে একেবারে অন্যরকম···আর কি যে এক অসুখ বাঁধিয়ে বসল তার পর, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।

চারুদি সত্যি শিউরে উঠেছিলেন।—সেই ধকলই আজ পর্যন্ত গেল না ওর।

নিজের অগোচরে সেই রোগ-সঙ্কটের দৃশ্যটা ধীরাপদ কল্পনা করছিল। মনের উপাদান দিয়ে ভাবতে গেলে মর্মান্তিকই বটে। রোগ-যন্ত্রণার থেকেও মানসিক যাতনার ছটফটানি বেশি ছেলেটার। অসুখে হাসপাতালে এনে ফেলা হয়েছে সেটাই এক মর্মচ্ছেদী বিস্ময়। হাসপাতাল নয়, অনেক ব্যয়সাপেক্ষ নামকরা নার্সিং হোম। আরামের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা, বড় বড় ডাক্তারের আনাগোনা। কিন্তু বিশ-বাইশ বছরের ছেলেটার চোখে সেটাও হাসপাতাল। আর কখনো কোনো হাসপাতালের অভ্যন্তরে পা দেয়নি। যে ব্যবস্থা রোগীমাত্রেরই প্রায় ঈর্ষার বস্তু, ওর চোখে তাই তখন নির্বান্ধব নিরাশ্রয় রোগশয্যামাত্র। মামা পাঠিয়েছে তাকে এখানে, মামা পাঠালো! যতক্ষণ জ্ঞান ততক্ষণ আচ্ছন্ন প্রতীক্ষা। মামা আসে না কেন? মামা কই?

হিমাংশু মিত্রর বিদেশ যাত্রার দিন আসন্ন। অনেক আগেই সকল ব্যবস্থা সুসম্পন্ন। শেষ সময়ে যাওয়া বন্ধ করলে সব দিকের সব আয়োজন পণ্ড। চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে তার দরকারও বোধ করেন নি। এতবড় নার্সিং হোমে রেখেই অনেকটা নিশ্চিন্ত তিনি।

কিন্তু ছেলেটার মনের দিকটা চারুদি উপলব্ধি করেছিলেন। নিস্প্রভ চোখেরও চকিত দৃষ্টি কার জন্য প্রতীক্ষাতুর বুঝেছিলেন।—আসবেন'খন···কাজ বাদে পরশু বেরুবেন, ব্যস্ত তো খুব, ফাঁক পেলেই আসবেন।

আশ্বাস দিয়ে চারুদি নিজেই শঙ্কিত। মামা বেরোচ্ছেন কোথাও তা যে ওর মনেও ছিল না, দুই চোখের বেদনা ভরা বিস্ময়ে সেটুকু স্পষ্ট। অবুঝকে বোঝানোর চেষ্টা আবারও।—কতদিন আগে থাকতেই তো বেরুনোর সব ঠিক ঠিক, তুই ভুলে গেলি? এখন কি না গেলে চলে! তাছাড়া তোর কি এমন হয়েছে, আমি তো আছি—

কিন্তু হঠাৎ সেই উদ্‌ভ্রান্ত উত্তেজনা দেখে চারুদির ত্রাস একেবারে।—সত্যর হলে মামা যেতে পারত? তাকে হাসপাতালে দেওয়া হত?

হিমাংশু মিত্র পরদিন ভাগনেকে দেখতে এসেছিলেন, আর যাবার দিনও। কিন্তু তিনি একাই দেখেছেন, ও ফিরেও তাকায়নি। সকলেরই ধারণা রোগে বেহুঁস। কিন্তু তিনি ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে রোগী রক্তবর্ণ দু চোখ মেলে চারুদির দিকে তাকিয়েছে। বিশ্বাস আর কাউকেও করা চলে কি না তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে। তার পর ছোট শিশুর মত দুই হাতে চারুদিকে আঁকড়ে ধরেছে। তারপর সত্যিই বেহুঁস।

যমে-মানুষে টানাটানি গোটা একটা মাস। পালা করে হয় চারুদি নয় পার্বতী বসে সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত। চোখ মেলে দুজনের একজনকে না দেখলে বিষম বিপদ···জ্বর আর জ্বর, খই-ফোটা জ্বর—তাই থেকে মেনিনজাইটিস না কি বলেছে ডাক্তাররা। তারা হিমসিম, চারুদি দুর্ভাবনায় অস্থির, পার্বতী পাথর। শেষে জ্বর নামল, মাথার সেই মারাত্মক ব্যামোও ছাড়ল, অথচ ছেলেটা আর সেই ছেলেই নয় যেন। সব সময় অসহিষ্ণু সন্দেহ একটা। অবাঞ্ছিত কিনা কুরে কুরে শুধু সেই ভাবনা আর সেই সন্দেহ। ভালো হবার পর তিন মাস চারুদির কাছেই ছিল—ফিরে এসে হিমাংশু মিত্র চেষ্টা করেও ওকে নিতে পারেননি। দিন রাতের বেশির ভাগ তখনো হয় চারুদিকে নয়তো পার্বতীকে কাছে বসে থাকতে হত। এক ডাকে সামনে এসে না দাঁড়ালে তার জের সামলাতে তিন ঘণ্টা। চারুদি জানেন, ভিতরে ভিতরে সেই রোগই পুষছে এখনো—মামার প্রতি অবিশ্বাস। যুক্তি দিয়ে বোঝালেও ভিতরে ভিতরে প্রতিকূল আবেগ একটা। কখন কোন কারণে যে ওতে নাড়া পড়ে বোঝা ভার। ওই থেকেই যত গণ্ডগোল, ওই থেকেই অমন মেজাজ।

অমিতাভ ঘোষের জন্য চারুদির স্নেহার্দ্র দুশ্চিন্তাটুকু ধীরাপদ উপলব্ধি করেছে। ওকে বলেছেন, ভালো করে আলাপসালাপ করতে, ভালো করে মিশতে। অন্তরঙ্গ হবার রাস্তাও বাতলে দিয়েছেন।—একবার যদি ওর ধারণা হয় তুমি ভালবাসো ওকে, তুমি আপনজন—দেখবে তোমার জন্যে ও না করতে পারে এমন কাজ নেই। ব্যবহারে টের পাবে না, বরং উল্টো দেখবে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেনা হয়ে থাকবে।

ধীরাপদর মনে হল চারুদি সেই কেনাই কিনেছেন। আপনজন হয়ে উঠতে খুব বেগ পেতে হবে না সেটা লোকটির আজ বিকেলের আচরণ থেকে আশা করা যেতে পারে। সেটুকু চারুদির কল্যাণেই। সেটুকু হবার তাও চারুদির কল্যাণেই হবে। নৈশ নিরিবিলিতে আর একটা দৃশ্যও মনে পড়ছে ধীরাপদর। চারুদির দুইংরুমে সেদিন পার্বতীর উদ্দেশে অমিত ঘোষের সেই পাঁচ দফা হাঁক ডাক···শেষে চোখের নাগালে রমণীটির অবস্থানে রমণীর নিবৃত্তি।

চারুদির কাহিনী বিস্তার থেকে অমিত ঘোষের জীবনে পার্বতীর আবির্ভাবের একটুখানি হদিস মিলেছে।

অমিতাভ ঘোষকে চারুদি একাই কিনেছেন?

গাড়ীতে ঝাঁকানি লাগতে ধীরাপদ ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকালো। আর একটু এগোলেই সুলতান কুঠির একড়োখেবড়ো এলাকায় ঢুকে পড়বে। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামিয়ে সেখানেই নেমে পড়ল। আগের বারের অন্যমনস্কতায় গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ার ফলটা সেদিন রমণীপণ্ডিতের চোখেমুখে উছলে উঠতে দেখেছে।

সুলতান কুঠিতে অনেকক্ষণ ঘুম নেমেছে। পায়ে পায়ে শুকনো পাতার সামান্য শব্দও মড়মড়িয়ে ওঠে। বাতাসে এরই মধ্যে ঘন ঝিঁঝিঁর ডাক। আলো বলতে দুই একটা জোনাকীর দপদপানি। পা দুটো অভ্যস্ত বলেই হোঁচট খেতে হয় না। ধীরাপদ নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বারান্দাটা অন্ধকার। কতদিন ভেবেছে ছোট টর্চ কিনবে একটা। কেনা হয়নি। পকেটে একটা দিয়াশলাই রাখলেও হয়। দিনের বেলায় তাও মনে থাকে না। চাবির খোঁজে পকেটে হাত ঢুকিয়ে লক্ষ্য করল, দূরে রমণী পণ্ডিতের কোণা-ঘর দুটোর একটা ঘরে আলো জ্বলছে তখনো। কারো ভবিষ্যতের ছক তৈরি করছেন, নয়তো বিয়ের কুষ্ঠি মেলাচ্ছেন। কিন্তু রাত জেগে ঘরে আলো জ্বেলে কাজ করতে হয়, পণ্ডিতের এত কাজের চাপ কবে থেকে হল!

শুধু হাতটাই পকেটে বিচরণ করছে, চাবি উঠল না। এ পকেট···না এ পকেটেও নেই। বুক পকেটেও নেই। আচ্ছা ফ্যাসাদ···চাবি? বন্ধ-দরজার আঙটায় তালা তো দিব্বি ঝুলছে। দরজাটা ঠেলে দেখল একবার। না, তালাও বন্ধ। চাবিটা আবার কোথায় ফেলল তাহলে?

বাস্তব বিড়ম্বনা। অসহায় মূর্তিতে ধীরাপদ দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। তালাটা ভাঙবে? ভাঙবেই বা কি দিয়ে। এই রাতে আর এই অন্ধকারে ঠকঠকিয়ে তালা ভাঙতে গেলে লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে আসবে সব। এ-তল্লাটে চোরের উপদ্রবে ঘুমের মধ্যেও গৃহস্থ সচেতন। আবার তালা না ভাঙলে ঘরে ঢুকবেই বা কি করে! সারা রাত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটাতে হয় তাহলে, নয়তো কদমতলার বেঞ্চি ভরসা। শীতের রাতে সে-ভরসাও মারাত্মক।

সচকিত হয়ে ধীরাপদ ফিরে তাকালো।

পাশের ঘরের দরজা খোলার শব্দ। কুপি হাতে সোনাবউদি। সামনে এসে চাবিটা এগিয়ে দিল। ও-চাবি যেন তার কাছেই থাকে।

অবাক হলেও ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।—এটা আপনি পেলেন কি করে?

তালার সঙ্গে লাগানো ছিল।

ধীরাপদ অপ্রস্তুত। এতটাই অন্যমনস্ক ছিল নাকি! এ-রকম সংক্ষিপ্ত জবাব বা নীরবতা থেকে সোনাবউদির মেজাজ কিছুটা আঁচ করা যায়। তালা খুলে সেটা একটা আঙটায় আটকে ফিরে তাকালো।

সোনাবউদির চোখে মুখে ঘুমের চিহ্ন নেই। জেগেই ছিল বোঝা যায়। হাসতে চেষ্টা করলেও ধীরাপদর মুখে অপরাধীর ভাব একটু। বাঁচা গেল, এমন মুশকিলেই পড়েছিলাম, ভাবছিলাম কি করি—

সোনাবউদি চুপচাপ চেয়ে আছে।

আপনি ঘুমোননি এখনো ?

ঘরে ঢুকে আগুনটা জ্বালবেন না সারা রাত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব ?

ধীরাপদ শশব্যস্তে ঘরে ঢুকে গেল। কোণ থেকে হারিকেনটা মাঝখানে নিয়ে এলো। বালিশের নিচ থেকে দিয়াশলাই। সোনাবউদি দরজার বাইরে থেকেই কুপিটা একটু এদিকে বাড়িয়ে ধরেছে। ধীরাপদ বলতে পারত আলোর আর দরকার নেই। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করল না। ভরসাও পেল না বোধহয়। চাবি-ভুলের এই বিড়ম্বনাটাও খারাপ লাগছে না খব। এমন কি, হারিকেনটাও ইচ্ছে করলে হয়ত আর একটু তাড়াতাড়ি ধরাতে পারত।

অগ্নি সংযোগ করে চিমনিটা ঠিক করে বসাতে বসাতে কিছু একটা কথা বলার জন্যেই জিজ্ঞাসা করল, গণুদার নাইট ডিউটি বুঝি ?

জবাব না পেয়ে ফিরে তাকালো। তারপর জবাব পেল।

হলে সুবিধে হয় ? নিরুত্তাপ পাল্টা প্রশ্ন সোনাবউদির।

নিজেরই হাতের ঠেলা লেগে হারিকেনটা নড়ে উঠল। ফলে সোনাবউদির মুখভাব বদলালো একটু। মনের মত টিপ্পনী কেটে বা খোঁচা দিয়ে কাউকে জব্দ করতে পারলে এর থেকে অনেক রূঢ় নিস্পৃহতাও তরল হতে দেখা গেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিঠের কাছের দরজার আড়ালটা একবার দেখে নিয়ে সোনাবউদি হাতের কুপি নিবিয়ে দিল। তারপর ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে নিজে থেকেই বলল, মনের অবস্থা তো চাবির ভুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চোখেরও হয়ে এসেছে নাকি, বিটলে গণৎকারের ঘরে আলো দেখেননি ?

ধীরাপদ অবাক, গণুদা ওর ওখানে নাকি ?

খোলা দরজার গায়ে সোনাবউদি ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।—ভয় করছে ?

আমার আর ভয়টা কি, কিন্তু এত রাতে গণুদার ওখানে কী ?

সবই। নিস্পৃহ জবাব।—মাইনে বাড়লে কি হবে, প্রুফ রিডার প্রুফ রিডারই—এবারে সাব-এডিটার হবেন। বরাতের যেমন জোর শুনছি, কালে এডিটার হয়ে বসাও বিচিত্র নয়। —ওখানে বরাতের জট ছাড়ানো হচ্ছে, বরাতে থাকলে কি না হয় ?

যাবার জন্য দরজা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সোনাবউদি। নিরীক্ষণ করে দেখল একটু।—আপনারাও তো দেখি একই ব্যাপার, সাত মণ তেল পুড়ছে, রাধা নাচবে তো শেষ পর্যন্ত ? দাদার গলা ধরে ওই গণৎকারের কাছেই না হয় যান একবার—

সোনাবউদি চলে যাবার পরেও ধীরাপদ অনেকক্ষণ বসে কাটালো। শেষের এই ঠেসটুকু প্রাপ্য বটে। কিন্তু রাধা যে তার বেলায় সত্যি সত্যি নাচতে চলেছে সেটা আর বলা হল না। বললে বেশ হত। সমস্ত দিনটাই ভালো কাটল আজ, সেই গোছের তৃপ্তি একটু। পুরুষের ওপর সোনাবউদির শেষের এই বীতশ্রদ্ধ ভাবটুকু সত্যি হলে এত ভালো লাগত না। চারুদি ঠাট্টা করেছিলেন, এত রাতে কে আর ওর জন্যে খাবার সাজিয়ে বসে আছে। খাবার না হোক, এত রাতে এই চাবি নিয়ে বসে থাকাটাও কম নয়। অন্তত কম লাগছে না ধীরাপদর।

কি এক বিপরীত ইশারায় ভাবনার লাগাম টেনে ধরতে চাইল। একটা চকিত অস্বস্তি মনের তলায় ঠেলে দিয়ে ধীরাপদ উঠে দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে বিছানায় এসে বসল। অনভিলষিত ইঙ্গিতটা অর্গলবদ্ধ হল না তবু, অন্ধকারে ডুবল না।

—চারুদি বলেছিলেন একটুখানি স্নেহ দিয়ে অমিতাভ ঘোষকে কিনে রাখা যায়। চারুদির এই উপলব্ধির কথা অমিতাভ ঘোষ জানলে কেমন লাগত ? প্রার্থীর পক্ষে এটুকু জানা নিজের দেউলে মূর্তিটা চেয়ে চেয়ে দেখার মতই।

—অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে কোথায় যেন ওর বড় রকমের মিল একটা।

মনে মনে ধীরাপদর সেটাই অস্বীকারের চেষ্টা।···চাবিটা যে পেত সে-ই রেখে দিত, সেই দিয়ে যেত।

[ক্রমশঃ।

কবি কর্ণপুর-বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

॥ [পূর্বপ্রকাশিতের পর]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

নবম স্তবক

১। একদা শ্রীবলরাম নেই সঙ্গে, নৈচিকী গাভীগুলিকে সম্মুখে নিয়ে গোচারণে বনে বেরিয়েছেন বনমালী, ঘুরে বেড়াচ্ছেন কাননে, এমন সময়ে ঘটে গেল এক আশ্চর্য্য ব্যাপার অকস্মাৎ।

কদ্রুতনয় মহাসর্প "কালিয়" নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় আবিষ্কার করলেন যমুনার অন্তর্হ্রদে। তিনি এলেন···শ্রীমতী যমুনা দেবীর অচিকিৎস্য হৃদ্রোগের মত; কালাগ্নিরুদ্রের ত্রিলোক সংহারিণী শক্তির নিক্ষেপ-পীঠের মত; ভয়ানক রসের উৎপত্তি ভূমির মত, অনিয়োজিত সাহায্যকারী সুহৃদের মত মৃত্যুর।

২। জলের মধ্যে ডুবে রইলেন বটে কালিয় কিন্তু তাঁর বিষের বৈশাখে তপ্ত হয়ে গেল আকাশ। হ্রদের কূল ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল পাখীর ঝাঁক। ভস্ম হয়ে যাবার ভয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল জলের উপরকার বাতাস। এবং আশ্চর্য্য, যমের ভগিনী হয়েও যমুনা দেবী এই অতুলনীয়টিকে উদরমধ্যে বহন করতে লাগলেন···মহাদাহ পিত্তগুল্মের মত।

কালিয়ের নিঃশ্বাসের প্রচণ্ড শ্বসনে উত্তাল হয়ে উঠল যমুনার জল, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভেসে বেড়াতে লাগল ফুটন্ত সোনালি রঙের অতি তীব্র বিষ। কী তার জ্বালা! চক্চক্ করতে লাগল বিষ, সমুদ্রতরঙ্গে যেমন রাত্রে চক্চক্ করে লবণকান্তি ধাতুরাগ। রক্তিম পিত্তের মত যমুনায় ভাসতে লাগল বিষ।

৩। জলরাশিকে আচ্ছাদিত ক'রে ধূম্রশ্রেণীর মত কেঁপে কেঁপে জলের উপরে এত ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই বিষ-নিঃশ্বাস যে মনে হল 'জলহ্রদো বহ্নিমান ধূমাৎ' এই অসৎ-অনুমানটিকেও বুঝি সৎ অনুমানরূপে প্রমাণিত করতে চাইছে বিষনিঃশ্বাস। জলতলের বিষের জ্বালায় একমাত্র কালিয়-পরিবার ভিন্ন অন্য সমস্ত জলজন্তুদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়াল তত্র বাস। তারা আর্ত্ত হয়ে উঠল প্রবল জ্বরে।

৪। মহানলকুণ্ডের মত মহাহ্রদ। সেখানে বাস করা কি সহজ কথা! এ যেন প্রাণিদ্রোহের এক সত্র, প্রলয়দিনের কালপুরুষের যেন নাভি-হ্রদ।

মহাহ্রদের তটপ্রান্তে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে গাভীরা এল, গোপেরা এলেন। তাঁরা কেমন করেই বা জানবেন হ্রদের জলে কালিয়ের প্রবেশ-বার্ত্তা? তাঁরা পান করলেন জল।

গাভী এবং গোপেদের দেহ অপ্রাকৃত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁদের উদরের শান্তনের অসম্ভাব্যতা সত্ত্বেও অবিনাশী হয়েও তাঁরা সকলেই নিমেষে চলে পড়লেন বিপদগ্রস্তের মত। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-শক্তিই এর কারণ।

৫। কাণ্ড দেখে ব্যথায় ভরে উঠল দনুজদমনের মন। তাই তিনি অবিলম্বে তাঁর অমৃতরসসনিস্যন্দী কমলনয়নের একটি কটাক্ষপাতের বদান্যতায় সঞ্জীবিত করে তুললেন সকলকে। জীবিত হয়েই সকলে এ ওঁর দিকে চাইতে লাগলেন। সকলেরি চোখে বিস্ময়ের চাহনি। তারপরে তাঁদের হাসিতে ঝরল অমিয়া, তাঁরা কোলাকুলি করলেন প্রচণ্ড, পেলেন পর্বত প্রমাণ সুখ। বলাবলি করলেন—

৬। যমুনার জল পান করে আমরা তো মরেই গিয়েছিলুম। ইনিই-তো আমাদের বাঁচিয়েছেন অচিরে। আগেও একদিন এমনিই ঘটেছিল যেদিন পাপ অঘাসুরের পেট থেকে নিষ্পাপ আমাদের উদ্ধার করেছিলেন ইনিই। আমাদের সখাটি দেখছি মৃতসঞ্জীবনী একটি পদার্থবিশেষ।

বলতে বলতে সস্পৃহ-নয়নে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইলেন।

৭। শ্রীকৃষ্ণের নিজের নামের সঙ্গে যমুনার কৃষ্ণা নামের মিল রয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্থির করলেন···কদ্রুতনয় কালিয়নাগকে দূর করে দিয়ে তিনি হৃদয় শোধন করবেন মিতার।

তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল একটি বিপুল কদম্বতরু। এত উন্নত যে মনে হয় বুঝি আকাশের মুখ চুম্বনের লালসায় তুঙ্গী হয়ে উঠেছে কদম্। আর আশ্চর্য্য, চতুর্দ্দিকে এত বিষের জ্বালা সত্ত্বেও একটিও পাতায় তার কোথাও রঙ বদলায়নি। অপূর্ব কদম্বতরুটিতে সত্বর আরোহণ করলেন অগম্য-মহিমা শ্রীকৃষ্ণ। অহির মানভঙ্গ তাঁর উদ্দেশ্য।

আরোহণ করেই তিনি গুছিয়ে ফেললেন নিজের কুঞ্চিত অলকাবলী। মাথার উষ্ণীষপট্টটি যাতে না খুলে যায় বারংবার তাই করতল দিয়ে সেটিকে উল্লসিত করে বাঁধলেন। যেন সৌন্দর্য্য বাঁধল মাধুর্য্যকে।

তারপরে মহাপরাক্রমধুরন্ধরধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের দেহে যেন পর্বতের সমস্ত স্থৈর্য্য ভার বহন করতে করতে ঘুরিয়ে কাপড় বাঁধলেন কোমরে। বয়সে কিশোর হলে হবে কি, বপুতে মৃদু ভাবের পোষণতা থাকলেই বা হবে কি, তাঁর সেই বিপুল পরিচ্ছিন্ন মাধুর্য্য মহিমার আঘাতে যেন ছিন্ন হয়ে গেল জাগতিক অন্য সমস্ত কিছুর গরিমা।

তারপরে তিনি কালিয়ের মানমর্দ্দনের অভিলাষে, হর্ষের উৎকর্ষে এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে নিজের অনুচরদের দিকে বারেক নিক্ষেপ করলেন দৃষ্টি।

ভয় কোরোনা। মা ভৈঃ। ধেনুদের নিয়ে এইখানেই তোমরা থাকো। এখানে থাকলে প্রত্যবায় হবে না তোমাদের—এই বলতে বলতে হাস্যে শুভ্রায়িত হয়ে গেল তাঁর অধর, ভাবে নিষ্কম্প হয়ে গেল তাঁর বুদ্ধি।

সেই বিশাল হ্রদ বিষম বিষের তীব্রাতিতীব্র মহানলে টগবগ করে ফুটছে যার জল, যার বিপুল জ্বালায় আকাশ থেকে জলে পড়ছে পাখীদের দেহগুলো, তীর থেকে জলে পড়ছে মৃগদের দেহগুলো, সেই মহাহ্রদটিকে কদম্বতরুর শিখর দেশ থেকে দেখে, শ্রীকৃষ্ণের মনে হল সামান্য একখণ্ড শৈবাল শ্যামল পল্বল। তারপরেই সহসা তিনি ঝাঁপ দিলেন জলে; দূরে উড়তে উড়তে মাছরাঙা পাখী যেমন করে ছোঁ মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে মাছ ধরতে নির্ভয়ে। কী অসীম পরাক্রম, কী অপূর্ব আক্রমণের কৌশল, কী প্রচণ্ড সেই গতিবেগ!

নিপতনের আবেগে বিহ্বল হয়ে দ্বিগুণ লাফিয়ে

যমুনার ঢেউ, ছড়িয়ে পড়ল বর্দ্ধমান বহু ভঙ্গিমায়; ফেনস্ফুরিত হয়ে উঠল গরল-স্ফীত জলরাশি; এবং দুর্দ্দান্ত ঢেউগুলির কূলভাঙা আঘাতে ত্রস্ত হয়ে তীর ছেড়ে দূরে পালাতে লাগল গাভীর দল, রাখাল বালকদের দল। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সুগভীর মহাহ্রদ।

পাতালের উদর দারণের বাসনা নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ যেন ডুব মারলেন হ্রদে। সেই নিমজ্জনে যেন স্পষ্ট কেঁপে উঠল সর্প-পরিবারের মজ্জা। ডুব দিয়েই মণ্ডলাকারে দুই বাহুর আঘাতে শ্রীকৃষ্ণ আলোড়িত করলেন সেই জল। হ্রদের মাথায় ভেসে উঠল গরলের শিখা।

"কে এল, কোন্ অজানা,···কে দোলায় হ্রদের জল, এত ভীষণ ঢেউ ভাঙছে কে?"

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন কালিয় নাগ। তারপরেই ফণীন্দ্র দেখতে পেলেন,···যেন এক তেজোহরণ মণীন্দ্রকে।

৮। তমালবরণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, সেই নিরাতঙ্ক দর্পহরণ পরম-মনোহরণকে দেখে, তাচ্ছিল্যে ভরে উঠল কালিয়নাগের তার্কিক মন। ছোঃ ছোঃ, মাধুর্য্যের প্রতাপে ইনি যে দেখছি হার মানাতে চাইছেন কন্দর্পকেও। শোভার সার পদার্থটিকে দেখতে দেখতে প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল তাঁর পিত্ত-প্রকোপ। রোষে পরুষ হয়ে উঠল হৃদয়। ফেঁপে ফুলে উঠল ফণা। তারপরে, কালীয়ক-সুরভি-শরীর শ্রীকৃষ্ণকে সহসা বেষ্টন করে ফেললেন কালিয় নাগ।

আবৃত-ঐশ্বর্য্য শ্রীভগবান কিন্তু প্রকাশ করলেন না প্রাগল্ভ্য।

৯। এই অঘ-মথনকে, কৈশোরোৎসব পুষ্ট এই জ্যোতির্ম্ময় স্ফুরটিকে, হঠাৎ কালিয়ের মনে হল যেন তিনি বৃহৎ হয়েছেন, মহা-বিস্তার লাভ করছেন। অতএব গর্বোদ্ধত নাগ তখন আর বিলম্ব না করেই নিবিড় ভাবে তাঁকে পূর্ণ বেষ্টন করে ফেললেন, নিজের প্রকাণ্ড ভোগ-কাণ্ডের আবর্তনের মধ্যে। করেও, কিন্তু কেমন যেন অনুভব করলেন অপর্য্যাপ্তি।

১০। নির্ম্মল ইচ্ছাশক্তির আনুকূল্যেই শ্রীভগবান লীলাভরে বরণ করে নিলেন সর্পের বন্ধন চন্দনতরুর মত। হৃদয়ে লেশমাত্রও তাঁর উদ্রিক্ত হল না ক্ষোভ।

এবার আমার আসার এই বক্ষের আভার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে নব্য কৌস্তভ; মনে মনে এই আলোচনা করতে করতে শ্রীভগবান কালিন্দী-সলিলে মগ্ন হয়ে বিলম্ব করতে লাগলেন ততক্ষণ, যতক্ষণে না অনন্তকাম অনন্তদৈবত হয়ে নিখিল ব্রজবাসী ধেয়ে আসেন, তাঁদের প্রেম বাড়ে ধৈর্য্য বাড়ে, অনায়ত্ত হয় অনুরাগ, আতঙ্কে পিচ্ছল হয়ে যায় চোখ, আশু অরিষ্ট কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয় হৃদয়, এবং সর্ব শেষে নয়ন সার্থক করে তাঁরা অবলোকন করেন ফণীন্দ্রের ফণামণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর তাণ্ডব।

১১। হ্রদের তটপ্রান্তে যে সব ধেনুর দল ছিল, গোপবালকেরা ছিলেন, প্রাণেশ শ্রীকৃষ্ণের এই উত্থান বিলম্বে তাঁরা যেন ভয়ে কষ্টে তটস্থ হয়ে শিথিল জীবন হয়ে পড়লেন। আকাশের গীর্বাণগণ বিস্মৃত হলেন কেশবন্ধন বস্ত্র সংযম। বাণাহতের মত ব্যথায় আতুর হয়ে হাহাকার ধ্বনি তুলে নয়নজলে ভাসাতে লাগলেন মুখপদ্ম। দৌড়ে যে আসবেন তাও তাঁরা পারলেন না। কি যেন ভয়ে, কিসের যেন শোকে, মাথায় হাত দিয়ে তাঁরা এবং রাখাল বালকেরা যুক্তকণ্ঠে চীৎকার দিয়ে উঠলেন—

হা কষ্ট, হা কষ্ট, হায় হায়, আমরা মরলাম, আমরা মরলাম। নিরালোক হয়ে গেল তাঁদের লোক। যতক্ষণে মূর্চ্ছা গেলেন ততক্ষণে ব্রজনগরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রালয়িক বিকার বইয়ে দিয়েছে বিষসমুদ্রের বাতাস।

১২। সূর্য্যের দিকে মুখ তুলে অশুভ চীৎকার করে উঠেছে শৃগালের দল। ধূলির কম্পন লাগে না যাদের অঙ্গে সেই হেন দিগঙ্গনারাও মহিষ-শৃঙ্গের মত ম্লান হয়ে গেছেন বিষের ধোঁয়ায়। অহোমণির মধ্যে এসেছে নির্মহোমণির বিড়ম্বনা। পবনের সে কি খরতর স্পর্শন। ভূকম্পের সে কি প্রচণ্ড হুহুঙ্কার। বামনয়নাদের স্পন্দিত—হয়েছে—অবাম নয়নাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পুরুষদের ঘটেছে বৈপরীত্য। অনির্বচনীয় উদ্বেগের ব্যথায় ভেঙে পড়েছে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই প্রাণ।

১৩। সর্বত্র এই বিরুদ্ধভাবের অবতারণা দেখে ঘোষেদেরও হৃদয় পঙ্কিল হয়ে উঠল মহাতঙ্ক-পঙ্কে। একি ঘোর ছায়া নামল পৃথিবীতে! ঘোষাধিরাজ শ্রীনন্দেরও মন বললে···প্রলয় ঘটছে। যে কৃষ্ণের প্রভাব অনুভাব ও ভাব এতদিন তাঁরা গুণাতীতভাবে অনুভব করেছেন আজ আর তাঁর ভাব কিছুই যেন অনুভব করতে পারলেন না। কৃষ্ণের জন্যে আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠল তাঁদের মন।

১৪। নীতিমন্তেরা বলে উঠলেন—

দেখেছো' কাণ্ড, বলরামের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে একলা এই বনে যাওয়া কেন বাপু আমাদের দুলালের? চতুর্দ্দিকে ঘোর শত্রু, নানান উপদ্রব। কত আর সামলাই বলুন। আনাড়ী কতকগুলি শিশু আর পশুদের নিয়ে একলাই আছেন। শিব শিব, আমাদের মরণ আর কি। কী কষ্টটাই না পাচ্ছে? আমাদের নিষ্পাপ দুলাল।

১৫। যেমন ছিলেন তেমনি, কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে সকলেই দৌড়লেন। এক বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে সকলেই দৌড়লেন। বিকল হলেই বেড়ে যায় লোকের আগুন। যে পথে কৃষ্ণ গেছেন সেই পথ ধরে কুলবধূদের ও পুরস্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ব্রজেশ্বরী ছুটলেন। বালবৃদ্ধ তরুণ আভীরদের এবং সঙ্কর্ষণ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ব্রজেশ্বরও ছুটলেন। ত্রিভুবন-বিলক্ষণ লক্ষণ শ্রীভগবানের চরণকমলচিহ্নানুসরণ করে কাতরচিত্তে, মনের চেয়েও যেন অগ্রে সকলে উপস্থিত হয়ে গেলেন মহাহ্রদের তটদেশে। নিতান্ত অশান্তির মতই ব্রজধামের শূন্য ঘরগুলি, স্থাবর ও অবর বলেই, দাঁড়িয়ে রইল শোকাচ্ছন্ন হয়ে।

১৬। তাঁরা এসে দেখলেন, রাখালবালকেরা কাঁদছে, প্রচণ্ড শোকের ভারে তারা আতুর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, তাদের প্রাণের বন্ধু নেই। প্রশ্ন না করেই তাঁরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করলেন কী হতে পারে তাদের অকথিত উত্তর। বুঝতে পারলেন তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ ডুব দিয়েছেন বিষহ্রদে। এবং এই বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে হল তাঁরাও যেন ডুবেছেন—বিষের হ্রদে।

পাদাগ্র থেকে শিরোভাগ পর্য্যন্ত তাঁদের দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল বিষানলের রূঢ় প্রতাপে। জ্বালার বিভীষিকায় যেন ছাই হয়ে গেল হৃদয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন সকলে। হ্রদের প্রান্তদেশ আকীর্ণ করে লুটিয়ে পড়লেন নারীর দল—ঝড়ের ঘূর্ণীতে উপড়ে যাওয়া

লতাদের মত। পুরুষেরা কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ছিন্নমূল যেন তরুর দল।

পিতৃবৎসল পুত্রকে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ব্রজাধীশ কেঁদে উঠলেন—

ওরে তুই এ কী দুঃসাহসের কাজ করে বসলি? কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন, ধরণীতে।

হে ব্রজজনপ্রিয়, হে বৎস, চেয়ে দেখ, তুমি এত কাছে থাকতেও ব্রজবাসীরা আজ মরছে—

বলতে বলতে অনুলাপী আভীরেরা ব্রজাধীশের চতুর্দ্দিকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।

ব্রজগোপীরা যারা ব্রজরাণীর দুঃখে দুঃখিনী সুখে সুখিনী, তাঁরা চীৎকার দিয়ে উঠলেন। মা, কাঁদতে লাগলেন, কুররী পাখীর মত তাঁর কান্না। লোককর্শিতাঙ্গী যশোদাকে ঘিরে গোপীরা বিলাপ করে উঠলেন সকরুণ।

ছোট ছোট কুমারীরা এবং তাঁরা···যাঁদের চোখে এই সবে অঞ্জন পরিয়েছেন নবযৌবনের মোহ যাঁদের মনোমালঞ্চে এই সবে সৌরভ ছুটেছে প্রথম অনুরাগের,···তাঁরাও বিনোদিনী মূর্চ্ছার সান্ত্বনায় শিথিল-তনু হয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। বিলাপ করবার অবসর তাঁরা আর পেলেন না।

১৭। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আকারে আকারিত যাঁদের মন তাঁদের কি কখনও অন্ত হয়? প্রাণের হয় না। সে জীবন যে অপ্রাকৃত, বিপুল যে তার স্থৈর্য্যের বিস্তার। তাই মানবদেহের নিঃসহায় অবলুণ্ঠনে ছিন্নলতাক্রমময়ী হয়ে গেলেন ধরণী; করুণবিলাপের শব্দগুণে শব্দময় হয়ে উঠলেন গগন; অশ্রুর প্রবাহে নির্ঝরময় হয়ে গেল হ্রদতট, এবং বিহ্বলভরে শোকময় হয়ে গেল সময়।

এমন সময়, কৃষ্ণানুভাব-ভাবনায় কুতুহলী হয়ে তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠলেন হলধারী বলরাম—

১৮। তাত, মনটাকে অতিমাত্রায় তাতিয়ে দেওয়াই শোকের ধর্ম। অতিশোকের উত্তাপে নিজের দেহটিকে অঙ্গারবরণ করা,··· কাজের কথা নয়। আমার ধারণা কৃষ্ণই কিঞ্চিৎ অনুকরণ করছেন কালিয়কে।

১৯। আর মা, এর পর এখন আপনার বিলাপের প্রয়োজন নেই। আমার কথা শুনুন, ধৈর্য্য ধরুন।

এবং হে পৌরজনগণ, নূতন বিপদের আবিষ্কার মূলে মহাসন্তাপ কুড়িয়ে নেওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

২০। আমার এই অনুজটির শৌর্য্য মহিমা নিঃসন্দেহে আপনারা জানেন না। হ্যাঁ, আমিই কেবল জানি। এ মহিমা আনন্দ বাড়ায়। এই শৌর্য্যের জন্ম হয়েছে অহঙ্কারের শ্রেষ্ঠতা থেকে। এর খবর আমিই কেবল রাখি। দেবশ্রেষ্ঠদেরও এক কণিকা জ্ঞান নেই এই মহিমার।

২১। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকুঞ্জর। তাঁর পায়ে নাগরাজ কালিয়ের পরাভব,—একটা ঈষৎকার-বিশেষ।

গিরিরাজকে কি টলাতে পারে বাতাস? সূর্য্যকে কি ম্লান করতে পারে অন্ধকার? মহানলকে কি নেবাতে পারে নলবন? যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব আমার ঐ মকরকুণ্ডলধারী ভাইয়ার পক্ষে একটা কুণ্ডলীপাকানো ভুজঙ্গমেই ভয়ে ভীত হওয়া। সন্তাপ দূর করে দিন হৃদয় থেকে। দেখবেন, নিজের শৌর্য্যে জলাঞ্জলি না দিয়ে এবং নাগাধমটিকে মুক্তপ্রাণ ক'রে এখনি সমুত্থান করছেন আমার অখণ্ড প্রতাপ ভাইয়া। এই আমার অভিমত, নিঃসন্দেহে।

২২। চন্দ্রধবল ভগবান শ্রীবলরামের ভাষণ শেষ হতে না হতেই যেন কার অতি মহান লোকোত্তর অনুভাবে মায়াবিমোহিত হয়ে গেল সুরলোক এবং অসুরলোক। এবং সেইক্ষণে জনক-জননী ও ও পরিজনদের নীরন্ধ্র শোকের কাতরতা অনুমান করেই যেন ক্রমবর্দ্ধমান বিপুলবিক্রমে, অধরে মৃদুহাসির পেলবতা, সমুত্থান করলেন ভক্তজনসুধাকর শ্রীকৃষ্ণ। তখনও তাঁকে তাঁর কুণ্ডলিত বিরাট আবেষ্টনীর মধ্যে নির্দ্দয় ভাবে বিদ্ধ করে রেখেছেন, বিরাট কালিয়নাগ। হ্রদের উদর বিদীর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে আসতে লাগলেন, যেন এক তিমিরতরু-কাণ্ড গত চন্দ্রমার চিত্র।

২৩। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভং ভং ভং···ঘোষণায় দৈবতসভায় বেজে উঠল শঙ্খ; দুং দুং দুং···প্রনাদে বেজে উঠল দুন্দুভি; ভোঁ ভোঁ ভোঁ···গভীর ভাঙ্কারে গর্জ্জে উঠল ভেরী। নাদ গরিমায় গীর্বাণদের কান বুঝি ফেটে যায়।

২৪। সেই নাদ নিয়ে এল দিগন্তবিস্তার প্রমোদনা। আর সঙ্গে সঙ্গে কী সৌভাগ্য, মহাসৌভাগ্যশালী ব্রজরাজাদি সকলেই, বিপন্নদের জীবন পাওয়ার মত, হঠাৎ ফিরে পেলেন তাঁদের প্রাণ। প্রমোদ যেন হঠাৎ হাত ধরে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিল মাটি থেকে উঠিয়ে। বলতেই হবে এ সৌভাগ্য ব্রহ্মাদিরও অভিনন্দনযোগ্য।

তাঁরা দেখতে পেলেন কালিয় নাগকে। সুশাণিত 'তীক্ষ্ণ' লৌহের মত তাঁর প্রত্যেকটি কৃষ্ণকরাল ফণা থেকে কন্‌কন্ করে ছুটে বেরিয়ে আসছে গরলের ফেনা। যেন একটা প্রচণ্ড মহাভয়ের মুখের বিবর থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ। একশ মাথায় তাঁর একশ মণি। মণির রশ্মিগ্রাস যেন টেনে নামিয়ে আনতে চায় আকাশখানাকে। ফণার মুখগুলো যেন গণগণে লোহার কড়া, চোখগুলো যেন অগ্নিকণা, লক লক করছে দু'শো জিহ্বা।

কালিয়নাগকে দেখেই ভয়ে শুকিয়ে কালো হয়ে গেল তাঁদের আনন্দের নবাঙ্কুর। বিরাট অসন্তোষে ভরে উঠল হৃদয়। জীবনের আশ্বাস দিয়েছিলেন শ্রীবলরাম কিন্তু কেমন যেন বিশ্বাস হল না তাঁর কথায়। তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নিজেরাই যেন হরণ করতে লাগলেন নিজেদের ধৈর্য্য। প্রমোহাবস্থায় উপস্থিত হয়ে যে মুহূর্ত্তে তাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন, অনবস্থাটিকে অবলম্বন করতে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁরা হঠাৎ শোক-সর্ষণ শ্রীসঙ্কর্ষণের মুখে 'কী' যেন এক শুনতে পেলেন সরস বাণী, এবং তৎপরেই তাঁদের বাণীহীন করে দিয়ে তাঁদের নয়নসম্মুখে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলেন পরম প্রীতি-প্রতীক শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

কালিন্দীর রসতরঙ্গ থেকে ভুজঙ্গমের উৎসঙ্গের পেলব পেষণতা থেকে, রঙ্গভরে তিনি শিথিল করে নিয়েছেন নিজেকে।

ফণার মত কন্‌কন্ করে ফুলে উঠেছে তাঁর মন।

পাখীর মত আনন্দে লাফ দিয়ে তিনি চড়ে বসেছেন ফণীর ফণামণ্ডলে।

একশ ফণায় একশ মণি, কিরণের মঞ্জরীতে আলোয় আলো হয়ে গেছে মহাভক্তদের আঁখিকানন। [ক্রমশঃ।

হবিবুল্লার মেশিন

বিজ্ঞানভিক্ষু

তিন

আকাশ-কুসুম

"Alice laughed. 'There's no use trying', she said, one 'can't believe impossible things.

I dare say 'you haven't had much practice, said the White Queen. 'When I was your age, I always did it for half-an-hour a day. Why, sometimes, I've believed as many as six impossible things before breakfast'."

—Alice Through the Looking Glass
Lewis Carroll.

অস্ত্রোপচারের পর 'ক্লোরোফর্ম'এর ঘোর কাটিয়ে রোগীর চেতনা ফিরে পাওয়া একটা কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা। বাইরে বেরিয়ে এসে শংকরের মনে হল—তার মস্তিষ্কের মধ্যেও এমনই কোনো প্রক্রিয়া চলেছে। খররৌদ্রে নয়াদিল্লীর বড়ো বড়ো সৌধের সারি যেন পটে আঁকা—অবাস্তব। চোখ বন্ধ করলেই দেখা যায়, এক তরুণের মূর্তি—ধোঁয়ার কুয়াশায় ঝাপ্‌সা। পিঠে একটা চ্যাপটা বাক্স নিয়ে হবিবুল্লা ক্রমাগতই শূন্যে উঠে ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

খেয়াল হল হঠাৎ—আসল যন্ত্রটাই যে তার দেখা হয়ে ওঠেনি! যন্ত্রচালিতের মতো কখন যে সে রাজপথে নেমে পড়েছে, শংকর ভেবেই পায় না। তাই তো! আবার ফিরে যাবে কিনা—শংকর পথে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

এই যে শংকর—তোমারই খোঁজ করছিলাম। পালাচ্ছিলে কোথায়?

সংবিত ফিরে আসতে শংকর দেখে সুমিত্রাকে। চট করে কোনো জবাব মনে আসে না, তাই স্মিতমুখে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুমিত্রাকেই আবার কথা শুরু করতে হয়, ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মূর্তিটা দেখলে সত্যিই ভয় করে আমার। যদি চট করে শাপমন্ত্রি দিয়ে বস।

শংকর এবারে একটু লজ্জা পায়। না সুমিত্রা, রাত্রিটা কেটেছে না ঘুমিয়ে, মাথাটাও হঠাৎ ধরে উঠলো ওই সভাঘরের বদ্ধ গুমোট আবহাওয়ায়। তাই একটু বাইরে আসতে হলো।

আর তা ছাড়া তোমাকে তো দেখলাম প্রজেক্ট-এ'র মহিমময়ী কর্ত্রীরূপে। হঠাৎ ঘনিষ্ঠতা করাটা সাহসে কুলোল না।

সুমিত্রা এর জবাব দিতে ছাড়ে না।

ও, তোমার পৌরুষে আঘাত পড়ল বুঝি? হায় হায়, হায়, শেষে শংকর রায়েরও এই দশা!

শংকর বলে ফেলে—পৌরুষের অহংকার নয়—ভয়। প্রথম ভয় হচ্ছে সুমিত্রা দেশপাণ্ডে-সম্পাদিকাকে। তারপর মনোবিজ্ঞানী সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে আর সর্বোপরি সুন্দরী মনোবিজ্ঞানী সুমিত্রা দেশপাণ্ডেকে মাথা ধরেছে বলেও নিস্তার নেই—এবার হয়তো তার বিশ্লেষণটাও শুনতে হবে।

সুমিত্রার অন্তস্তলে কোথায় যেন আঘাত লাগে কিন্তু স্মিতমুখেই সে বলে, সাড়ে তিন বছর বাদে দেখা-আর প্রথম থেকেই তুমি ঝগড়া করতে শুরু করলে। থাক্ এখন তর্ক শুরু করলে রাস্তায় লোক জমে যাবে। কটা বাজলো খেয়াল আছে? ব্যারাকে ফিরবে না?

শংকরও লজ্জিত হয়, কী কথা বলতে গিয়ে কী কথা এসে পড়ল। ছি ছি কথাগুলো অমন করে বলার তো কোনো প্রয়োজনই ছিল না। প্রসঙ্গের পরিবর্তনে সেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

তাইতো সে কথা মনেই ছিল না। তা বাহনের ব্যবস্থা কি হবে।

সুমিত্রা বলে, বা রে, এরি মধ্যে ভুলে গেছ! তুমি এখন সরকারের সম্মানিত অতিথি; সব সময়েই মিলিটারি গাড়ী প্রস্তুত রয়েছে তোমার হুকুম তামিল করবার জন্ত, এখন কেবল হুকুম দেবার অভ্যাসটাই রপ্ত করতে হবে।

অবশ্য এখনকার মত মাতুলের গাড়ীটা আমার সঙ্গেই আছে-আপত্তি না থাকলে চলো না সেটারই সদ্ব্যবহার করা যাক।

* * * *

ছোটো গাড়ীটা মন্থর গতিতে চলেছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শংকর জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা সুমিত্রা, তোমাকে এরা পাকড়াও করলে কী করে?

সুমিত্রা বলে, সে অনেক কথা। পরে একদিন বিশদ করে বলা যাবে। এখন খালিপেটের মর্য্যাদা রাখবার জন্ত সংক্ষেপে উত্তরটাই দিতে হয়। নতুন ধরণের শিক্ষাপ্রণালীর আমার একটা 'স্কীম' (Scheme) কোনো কর্তাব্যক্তির নজরে পড়ে যায়।

দিল্লীতে একটা ছোটোখাটো শিক্ষালয়ে তার পরীক্ষা চলেছে। সেই উপলক্ষেই দিল্লীতে আজ বাস। এতদিন মাতুলের অন্নই ধ্বংস করছিলাম। কিন্তু আজ থেকে তোমাদের ব্যারাকে গিয়ে ডেরা বাঁধতে হবে।

আমার স্কীমটা কিছুটা কার্য্যকরী হয়েছে—সেই সূত্রেই প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীর সংগে আলাপ। এখন তাঁর অগাধ বিশ্বাস আমার ওপরে। আর তা ছাড়া—সুমিত্রা মৃদু হেসে যোগ করে, মেয়ে হয়ে জমাবার কিছুটা সুবিধা আছে সে খবর রাখো তো? শংকর দংশন করবার সুযোগ পেলে ছাড়ে না— তা তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। সুমিত্রা বলে, কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। কৃষ্ণস্বামী চান হবিবুল্লার অতীতকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে এই আবিষ্কারের পটভূমিকায়। তাঁর ধারণা আমি হয়তো অক্ষম হবো সে কাজে।

শংকর গম্ভীর হয়ে যায়, বলে—জানো সুমিত্রা, তোমাদের এ প্রজেক্ট সফল হবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের জানা বিজ্ঞানে এমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না যা দিয়ে হবিবুল্লার যন্ত্রটাকে বোঝানো যেতে পারে, পুনর্গঠন তো দূরের কথা।

সামনের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, নূতন জল নিষ্কাশনের নালী বসানো হবে রাস্তার এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত। সুমিত্রা গাড়ীটা পেছিয়ে নেয়, তারপর বাঁ দিকের অন্য এক রাস্তা ধরে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, তোমার এ কথার মানে কী?

শংকর বলে, এর মানে? মানে হচ্ছে এই যে হবিবুল্লার যন্ত্র যদি সত্য হয়, তবে তোমার গাড়ীটার মতো আমাদেরও পেছনের 'গীয়ার' লাগিয়ে অতীতে ফিরে যেতে হবে। কে জানে কতো দূর। পঁচিশ বছর? পঞ্চাশ বছর? না পাঁচশো বছর? অনুসন্ধান করতে হবে কোথায় বিজ্ঞানের জয়রথ রাজপথ ছেড়ে দিয়ে মেঠো পথে নেমে পড়ল।

আমি শুধু ভাবছি কী জানো? দুনিয়াতে এতো বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক থাকতে হবিবুল্লার মতো একটা চ্যাংড়া 'প্যারানয়েড' ই বা সেটা উপলব্ধি করেছিল কেমন করে?

সুমিত্রাও গম্ভীর হয়ে বলে, শংকর, হবিবুল্লাকে এতটা তুচ্ছজ্ঞান কোরো না। আমার অনুরোধ তার সম্বন্ধে কোনো রকম রায় দেবার আগে তার জীবনকাহিনীটা পড়ে নিও, আর তার ল্যাবরেটরী ও লাইব্রেরী ভালো করে ঘুরে দেখো। দেখবে, অদ্ভূত পরস্পর-বিরোধী উপাদানের সমন্বয়ে হবিবুল্লার মগজটা গড়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন পদার্থবিজ্ঞান, গণিত আর ইলেক্ট্রনিকসে ছিল তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অন্যদিকে আবার পাতঞ্জলদর্শন, হঠযোগ, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, লেভিটেশন, ডাকিনীতন্ত্র সব কিছুই জট পাকিয়েছিল তার মনের মধ্যে।

শংকর হেসে ফেলে, সম্ভবতঃ ইউরোপের ডাইনিবুড়ীদের মতো হবিবুল্লারও প্রথম আকাশযাত্রা সুরু হয়েছিল ঝাঁটায় চড়ে।

সুমিত্রা কিন্তু এ পরিহাসে সায় দেয় না। বলে—হাসির কথা নয় শংকর। ইউরোপের সব দেশেই ডাইনিদের সম্বন্ধে এতো অজস্র গল্প চলতি আছে কেন বলতে পারো? এ সব গল্পের সুরুই বা হোলো কেমন করে? ইউরোপ কেন, আমাদের দেশের প্রতি গ্রামে গ্রামেই হয়তো শুনতে পাবে মানুষের শূন্যে বিচরণ করার কাহিনী। মহারাষ্ট্রে কোনো কোনো বৃদ্ধা ঠাকুরমা বলবেন এ সমস্ত ব্যাপার তাঁদের চাক্ষুষ দেখা আছে। বাংলা উপকথার মারাঠি অনুবাদেও ছেলেবেলায় পড়েছি ওই একই ধরণের কাহিনী।

রেল বসবার আগে বাংলার সংগে মহারাষ্ট্রের প্রায় সংযোগই ছিল না বলতে পার। তা হলে একই রকমের কাহিনী সামান্য রং বদলিয়ে ভারতের কোণে কোণে ছড়িয়ে গেল কী করে?

শংকর বলে, এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়। এ সমস্ত গল্পের মূলে আছে মানুষের উর্বর কল্পনা। নিজের সম্বন্ধে মানুষ যেদিন থেকে সচেতন হল, সে দিন থেকে অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান জানোয়ারদের সে করুণাই করেছে। কিন্তু হার মেনে গেছে পাখীর কাছে। মগজের শক্তি থাকলেই তো আর রাতারাতি ডানা গজানো যায় না—অন্ততঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে তা সম্ভব হয়নি। পাখীর মতো আকাশে উড়বার ব্যর্থ কল্পনাই ছিল তার সম্বল। যেমন ধর, যখন ছোটো ছিলাম তখন পক্ষিরাজের গল্পটাই ছিল সবচেয়ে প্রিয়। ঠাকুরমা অন্য গল্প বললেও এঁকে রোজই একবার করে বলতে হত পক্ষিরাজের গল্পটা।

কিন্তু এখন হঠাৎ মনে হচ্ছে তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো অতো সহজ নয়।

* * *

মাথা ধরার উপশম হলেও শংকরের মাথার বোঝাটা নামতে চায় না। দুপুরে বিশ্রাম নেবার বৃথা চেষ্টা করে সে। ফিকে তন্দ্রার ঘোর বারে বারে কেটে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রতি বারেই ঘোর কৃষ্ণ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে হবিবুল্লা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে।

ঘুমের বৃথা চেষ্টা ত্যাগ কোরে শংকর উঠে পড়ে। মাথাটা পেতে দেয় বাথরুমে ঠাণ্ডা জলের ধারার নীচে। তারপর বসে যায় চিঠিপত্র লিখতে। কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটির দরখাস্ত, সহকারীদের কাছে উপদেশ কোলকাতার অসমাপ্ত কাজ সম্বন্ধে, দু-একজন বন্ধুর কাছে চিঠি।

অপরাহ্ণ বেলার তেরছা আলো ঘরে পড়ল পশ্চিমের জানালা বেয়ে।

* * *

সন্ধ্যাবেলা 'হল' ঘরে প্রথম জটলা বসে গেছে—টেবলের ওপরে হবিবুল্লার ভাঙা যন্ত্রটাকে কেন্দ্র করে। যন্ত্রটা এমনই দুমড়ে, ঝলসে গিয়েছে যে তার থেকে কোনো সমাধানের আশা করাই বৃথা। জিনিষটা অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বহিরাবরণটুকু ছাড়া ভেতরের যন্ত্রপাতির চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রিক তারের ধ্বংসাবশেষ। ভালো করে নাড়া দিলে বেরিয়ে পড়ে অংগারের কণিকা, আর ছোটো ছোটো কাঁচের টুকরো। অংগারীভূত রবার প্লাষ্টিক আর জৈব পদার্থের চড়া গন্ধ এখনও মিলিয়ে যায়নি যন্ত্রটার থেকে। সবটা মিলিয়ে যন্ত্রটার বহিরাবরণটা দেখতে একটা রেডিওর চাসিস্ (chasis)-এর মতো—কিন্তু সাধারণ কোনো বেতার যন্ত্রের সংগে পার্থক্যও তার অনেক।

শংকর ভাবে, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে যদি কোনো রকম যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা যেতো।

চোখ বন্ধ করে যন্ত্রটির ওপরে হাত বুলোয় সে।

এক মুহূর্তের বিভ্রম—তারপর সহসা শংকরের সংবিত ফিরে আসে! ছি ছি, এ কী উন্মাদের মতো কাজ করছে সে! 'আড়চোখে সকলের দিকে চেয়ে দেখে—তার এ ছেলেমানুষী কারো নজরে পড়ে গেছে কি না। না, তর্কের নেশায় সকলেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য! প্রফেসর শিকদার আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে একটা মোটা চুরুট ভস্মীভূত করছেন—শূন্য দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ 'সীলিং'এর দিকে। সুমিত্রার চোখেই শুধু একটু কৌতুকের আভাষ। শংকর জানল, যে একমাত্র সুমিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে গেছে তার এই আত্মবিভ্রম।

শংকর ভাবে—তার এই ক্ষণিক ছেলেমানুষীর মধ্যে সত্য কি কিছুই নেই? বৈজ্ঞানিকের দল বিশ্বাস করেন না 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'র অস্তিত্বে—তাই তাঁদের মধ্যে কারোরই 'অ্যান্টিগ্রাভিটি' সম্ভব করবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই। হবিবুল্লা বিশ্বাস করেছেন—সে অসম্ভবও সম্ভব। তার ফলেই এই বাক্সটার সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে কি—বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর?

প্রবল তর্ক চলেছে তখন সহকর্মীদের মধ্যে এই যন্ত্রটা সম্বন্ধে। একদলের মত হচ্ছে—যন্ত্রটা ইলেকট্রনিক্‌স সংক্রান্ত। এই দলটাই ভারী। আর একদলের কোনো নির্দিষ্ট মতামত নেই—আছে প্রতিপক্ষের সব যুক্তি খণ্ডন করবার চেষ্টা। কেবল দুটি প্রাণীই নীরব—আরাম কেদারায় শয়ান প্রফেসর শিকদার—আর কিছু দূরে বসে সুমিত্রা।

শংকর ভালো করেই জানে সুমিত্রার এই চুপ করে থাকার অর্থ। এই নীরবতার অন্তরালে চলেছে বিশ্লেষণ—কে কতটা 'অ্যাগ্রেসিভ,' ছেলেবেলার কোন 'ফিক্সেশন'এর ফলে কার মধ্যে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কার ব্যক্তিত্ব বহির্মুখী—কার বা অন্তর্মুখী। সুমিত্রার চিন্তার ধারাটা ধরে পড়ে ওর কপালের কুঞ্চনে। হবিবুল্লার বাক্সটা সম্ভব কি অসম্ভব—এ নিয়ে নিশ্চয় কোনো দ্বন্দ্ব নেই ওর মনে!

এ ঘরের মধ্যে সুমিত্রাই বোধ হয় একমাত্র প্রাণী যার কোনো সন্দেহ নেই 'অ্যান্টিগ্রাভিটি'র অস্তিত্বে।

সুমিত্রার এ প্রশান্ত নির্লিপ্ততা শংকরের সহ্য হয় না। নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে সে সুমিত্রার পাশে গিয়ে বসে মন্তব্য করে—পদার্থবিজ্ঞান চর্চা না করার একটা মস্তো সুবিধা আছে, সুমিত্রা। মানুষকে বন্দী করে রেখেছেন মা ধরিত্রী মহাকর্ষের শক্ত গরাদের মধ্যে। পদার্থবিজ্ঞানীর মাথা কয়েকবার ঠুকে গেছে সেই গরাদের লোহায় তাই সে বেড়ার স্বরূপটা ভালো করেই জানে। যাদের সে গরাদের সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, তারাই কেবল ভাবতে পারে এ গণ্ডী ভেদ করে বেরিয়ে পড়াটা এমন কিছু অসাধ্য সাধন নয়। মনোবিজ্ঞানীদের কাছে বোধ হয় সবই সম্ভব সেই জন্য।

সুমিত্রা প্রস্তুতই ছিল, মৃদু হেসে বলে, বৃথাই আমাদের ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়াচ্ছ, শংকর। আমাদের অবোধ, অজ্ঞান বলে যদি ক্ষণিক আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাও তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই টেবলের ওপরে ওই যন্ত্রটার কথা। ওটা কবি কল্পনা নয়, অবচেতন মনের দুঃস্বপ্নও নয়। ওটা ইট কাঠ পাথরের মতোই বাস্তব। এখন তোমার পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে ওটার স্বরূপটা আমায় বুঝিয়ে দাও তো।

কৃষ্ণস্বামী বৈজ্ঞানিকদের সংগে যোগ দিলেন নৈশ ভোজনের সময়। আহারাদির পর তিনি জানতে চাইলেন সকলের মতামত হবিবুল্লার মেশিন সম্পর্কে। দেখা গেল, প্রথমে কোনও মতামত প্রকাশ করতে সকলেরই দ্বিধা আপত্তি।

কৃষ্ণস্বামী অভয় দেবার জন্ত বললেন, এটা আদালত নয় বা বিজ্ঞান সম্মেলনও নয় যে কোনও মতামত প্রকাশ করতে আমাদের ভয় করতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের নিতান্ত ঘরোয়া আড্ডা, মনের লাগাম একবার ছেড়েই দিন না কেন? আপনাদের আন্দাজ বা থিয়োরির নির্ভুলতা প্রমাণ করবার জন্ত কোনও বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাড়বারও প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ ওই যন্ত্রটাকে ঘিরে আমাদের মনে চলেছে যে সব বুনো জল্পনা কল্পনা যতই অবিশ্বাস্ত অসম্ভব মনে হোক না কেন পরস্পরকে সেগুলো জানালে হয়তো বা তার মধ্যে কোনো সূত্র মিলে যেতে পারে।

—কী বলেন আপনারা?

দেখা গেল জল্পনা কল্পনার ব্যাপারে দত্তগুপ্তের সাহসই সবচেয়ে বেশী। তিনি প্রথমেই মুখ খুললেন, বললেন যে তাঁর ধারণায় যন্ত্রটি একটা নূতন ধরণের অ্যামপ্লিফায়ার ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎকণাকে কাজে লাগাত মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি তৈরী করতে কতকগুলো ট্রান্সিষ্টরের সহায়তায়। তবে এই ট্রান্সিষ্টরগুলো চালু করবার শক্তি যে কোথা থেকে আসতো সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই নেই।

দত্তগুপ্তর পরে সুব্রাহমনিয়ণ বললেন, যে তাঁর মতে যন্ত্রটা ছিল একটা অভিনব সোলার ব্যাটরী (Solar battery)। রবিরশ্মির তেজ কোনো অজ্ঞাত উপায় যন্ত্রটা কাজে লাগত মাধ্যাকর্ষণের বিপক্ষতা করতে।

দত্তগুপ্ত আর সুব্রাহমনিয়ণ স্রোতের বন্ধ লকগেটটা খুলে দিলেন। তারপর সুরু হয়ে গেল নানা রকমের উদ্ভট জল্পনা কল্পনা। দেখা গেল কল্পনাশক্তি কারোই কম নয়। কেউ বললেন যন্ত্রটা একটা ক্ষুদে সাইক্লোট্রন-চুম্বকশক্তির সাহায্যে পরমাণুর বা বিদ্যুৎকণার শক্তি ও গতি বহুগুণ বাড়িয়ে তোলার একটা উপায়। কেউ বা বললেন কস্‌মিক্ পার্টিক্‌ল্‌এর অতিক্তশক্তি আহরণ করা যেত হবিবুল্লার মেশিনে।

অমল বন্দ্যোর মতে একটা নূতন তরংগ সৃষ্টি করাটাই যন্ত্রটার মূল কাজ ছিল, সে তরংগ মাধ্যাকর্ষণ—তরংগের বিপক্ষতা করত। পজিট্রন রশ্মি বিপরীত পদার্থ বা অ্যা্ন্টিম্যাটার সৃষ্টি হত বাক্সটার থেকে, স্ফটিকের মধ্যে সে শক্তি পরমাণুগুলোর পরস্পরের দূরত্ব বজায় রাখে, তেমনি ধারা কোন অজ্ঞাত শক্তিকে পোষ মানিয়েছিল হবিবুল্লা —এই ধরণের কতো রকম কথাই উঠল।

শংকরের সবচেয়ে মনে ধরল রাও-এর মন্তব্য, আইনষ্টাইনের মতে গ্রাভিটেশনের মূলে আছে কোন পদার্থের কাছাকাছি Space—warp এর সৃষ্টি মহাশূন্যটা দুমড়ে বেঁকে যাওয়ার ফলেই মহাকর্ষ। হবিবুল্লার যন্ত্রে ছিল একটা কোন সরল ব্যবস্থা—মহাশূন্যকে আবার সোজা করে ফেলবার।

প্রফেসর শিকদার আহারাদির পর আবার আরাম কেদারার আশ্রয় নিয়েছেন। পরম নির্লিপ্ততার সংগেই চুরুট থেকে ধোঁয়া নিষ্কাশন করে চলেছেন—ঘরের মধ্যে যে তুফান বয়ে চলেছে সেদিকে কর্ণপাত না করেই। কোন মন্তব্যই শোনা যায় নি এখনও পর্য্যন্ত তাঁর কাছ থেকে।

কৃষ্ণস্বামী এবার শিকদারকে নিয়ে পড়লেন। আপনার মতামত তো জানা গেল না, প্রফেসর শিকদার?

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে শিকদার বলেন, দেশের বৈজ্ঞানিকদের একটা গুণের তুলনা পাওয়া ভার। সেটা হচ্ছে আকাশকুসুমের চাষ। এঁদের সকলের বৈজ্ঞানিক না হয়ে রূপকথার লেখক হওয়া উচিত ছিল। তা হলে বোধ হয় ভারতীয় শিশুসাহিত্য সমৃদ্ধ হত।

এবার যন্ত্রটার কথা।

আমার মতে, ওটা একটা ভাঙা অ্যালুমিনিয়মের বাক্স ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ততঃ আমার চালসে ধরা চোখ ওর মধ্যে আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারে নি। আপনাদের রংদার কবিকল্পনায় যোগ দিতে পারলাম না বলে মার্জনা করবেন।

হবিবুল্লার সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটু বিরাট ফাঁকী রয়ে গেছে। মানে, কতকটা ভেল্কীর খেলার মতো। মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে যাদুকর থলির ভেতর থেকে বের করে চলেছেন কবুতর না হয় খরগোস একটার পর একটা করে। যাদুকরের কারিকুরি অনেক সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাণসৃষ্টি ক্ষমতা তো আর তাঁর নেই। আসল ব্যাপারটা ঘটছে দর্শকদের চক্ষুর অন্তরালেই। প্রত্যেক রোমহর্ষক, অসম্ভব যাদুর খেলার পেছনে রয়েছে কৌশল। প্রত্যেক ম্যাজিকের মূলে আছে সহজ আর সরল ব্যাখ্যা।

কিন্তু অ্যা্ন্টিগ্রাভিটি? অসম্ভব।

শিকদারের কথার অবজ্ঞার সুরটা শংকরের মর্মে গিয়ে কোথায় আঘাত করে। তর্কযুদ্ধ করবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে যায় সে।

প্রফেসর শিকদার, কাল পর্যন্তও আমি আপনার মতেই সায় দিতাম। কেউ যদি আমায় বলতো, ও হে, আজ একজন মানুষকে উড়তে দেখলাম আকাশে, তাহলে তার কথা আমিও উড়িয়েই দিতাম। বলতাম আমাদের প্রত্যক্ষদর্শীর মতিভ্রংশ হয়েছে, না হয় যাদুর কৌশলে সে হয়েছে নাস্তানাবুদ। কিন্তু প্রশ্ন এক্ষেত্রে ওঠে এই যে, ক্যামেরার নির্ভুল চোখকে হবিবুল্লা ফাঁকী দিল কেমন করে?

শিকদার শংকরের যুক্তি মেনে নিয়ে বলেন, সেই সমস্যারই তো সমাধানের চেষ্টা করছি এতক্ষণ ধরে। হবিবুল্লার বাক্সটা বিশ্লেষণের আশায় বৃথাই সময় নষ্ট করছেন আপনারা। তবে সে আপনাদের অভিরুচি। দেখুন, কতকগুলো পায়রা বেরিয়ে আসে বাক্সটার থেকে।

নিজের রসিকতায় অট্টহাস্ত করে ওঠেন শিকদার।

স্বামীজিও কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এবার বললেন—

একদিক থেকে দেখতে গেলে হয়তো প্রফেসর শিকদার সত্য কথাই বলেছেন। আপনারা বোধ হয় ভেবে দেখেননি এ কথাটা। যে বাক্সটা হয়তো 'অ্যা্ন্টিগ্রাভিটি'র ক্ষেত্রে একেবারেই গৌণ। আসল ব্যাপারটা সম্ভব করেছিল হবিবুল্লা যোগশক্তির সাহায্যে। আমাদের দেশে অনেক নজীর আছে এ রকম 'লেভিটেশন'-এর অনেক বিশ্বাসযোগ্য লোকের লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে। আমার অবশ্য নিজের সৌভাগ্য হয়নি এরকম ঘটনা প্রত্যক্ষ করার। তবে যোগশক্তিতে অনেক দুঃসাধ্য শারীরিক পরিবর্তন যে অনায়াসে সম্ভব করা

বার এ আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি। যেমন ধরুন—ইচ্ছামত হৃৎস্পন্দন বাড়ানো বা কমানো, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আর ধমনীতে রক্ত চলাচলের যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণ, শরীরের তাপ কমিয়ে ফেলা। আমাদের আশ্রমে অনেক যোগীকে পরীক্ষা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। হয়তো মাধ্যাকর্ষণকে জয় করবার শক্তি মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়ে গেছে। হবিবুল্লা সন্ধান পেয়েছিল সে গুপ্তশক্তির উৎসের।

শংকর প্রশ্ন তোলে, তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করে নেওয়া গেল আপনার কথাটা, কিন্তু ও বাক্সটার তাহলে প্রয়োজন কী ছিল?

স্বামীজি বলেন, আমি সে কথাতেই আসছিলাম। শিশু যখন প্রথম দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে তার দরকার একটা অবলম্বনের। যন্ত্রটার প্রয়োজন হয়েছিল একটা অবলম্বন হিসাবেই। ধরুন, মোটার গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্ত চাই 'ষ্টীয়ারিং হুইল', 'গীয়ার', 'ব্রেক', 'অ্যাক্সিলারেটর'। কিন্তু গাড়ীটাকে চালু রাখবার আসল ব্যবস্থার সংগে এগুলোর সম্পর্ক নেই—সেটা আসছে ইঞ্জিন থেকে।

—মনে করুন, যন্ত্রটা হচ্ছে একটা ছোটোখাটো 'রেডার'। খুবই অসম্ভব মনে হচ্ছে কি?

শংকর চিন্তা করে দেখে—স্বামীজির যুক্তি চট করে এড়িয়ে যাওয়াও চলে না।

প্রফেসার শিকদার বলে ওঠেন, তাই যদি হয়, তবে এ প্রজেক্টে বৈজ্ঞানিকদের ডেকে আনবার সার্থকতা কী? আপনার যোগাশ্রম থেকে সকলকে এখানে নিয়ে আসুন, দরকার হলে ভোলাগিরির আশ্রম থেকে সাধুদের পাকড়াও করে দলবৃদ্ধি করুন। এর ওপরে 'সাইবারনেটিক' পদ্ধতির মান রাখবার জন্ত না হয় রাস্তা থেকে ভেল্কীওয়ালা আর গাঁ থেকে ভূতের ওঝাদের ধরে নিয়ে আসুন। তাহলেই তো কার্যসিদ্ধি হবে।

স্বামীজির সৌম্য মুখ ম্লান হয়ে যায় এই অপ্রত্যাশিত শ্লেষে।

কৃষ্ণস্বামী এবার স্বামীজির পক্ষ নেবার চেষ্টা করেন—

প্রফেসর শিকদার, বৈজ্ঞানিকের কাজ হচ্ছে সমস্ত থিয়োরি—যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা। যদি তথাকথিত যোগশক্তিই হবিবুল্লার আবিষ্কারে মূলে থেকে থাকে, তবে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতে হবে তো। হেসে উড়িয়ে দিলেই ত চলবে না।

ভেবে দেখুন, আদিমকালের গুহাবাসী মানুষের কী নিদারুণ ভয়ই না ছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগে অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝা-বাত্যা, বিদ্যুৎ বা বজ্রনির্ঘোষ সব কিছুই ছিল তার বুদ্ধির বাইরে। তার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এ সবের কোনোটারই সুষ্ঠু ব্যাখ্যা মিলত না। তাই এগুলোকে সে ধরে নিত দেবতা বা অপদেবতার প্রকোপ বলে।

নৈসর্গিক ব্যাপারের কারণ নির্ণয় করতে মানুষের লেগেছে হাজার হাজার বছর। এখন দেবতা বা অপদেবতাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে দর্শন বা ধর্মশাস্ত্রের মেঘের আড়ালে। তাঁরা এখন আর রণক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হয়ে গদা বা তরোয়াল ঘুরিয়ে নিজ হাতে সংহার করেন না, বড়ো বড়ো কোম্পানীর 'এক্জিকিউটিভ'দের মত 'সুইচ' অথবা 'কলিং বেল' টিপেই বিশ্বকারখানা চালান। আস্তিকদের সংগে ঝগড়া বাঁচাবার জন্ত আমাকে বলতে হয় যে দেবতাদের আজ পদোন্নতি হয়েছে।

আজকের মানুষ যদি নিঃসন্দেহে মেনে নিত যে তড়িৎ ভগবানের দুর্বোধ্য লীলা সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোনও কর্তব্য নেই তাহলে মাথার ওপরে ওই বিজলীবাতিগুলোর অস্তিত্ব থাকতো না।

আজকে আপনি অ্যান্টিগ্রাভিটির বা যোগশক্তির অস্তিত্ব উড়িয়ে দিতে চাইছেন। মনে করুন নিউটনের যুগে কোনো বৈজ্ঞানিককে যদি বলা হত যে রেডিও টেলিভিসন সম্ভব তাহলে সে বৈজ্ঞানিকের প্রতিক্রিয়া কেমন হত কল্পনা করেছেন কোনোদিন?

শংকর এতক্ষণ চুপ করে এঁদের মন্তব্য শুনে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ তার মনে উদয় হল এক ভয়াবহ সন্দেহের। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল—

আপাততঃ স্থগিত রাখা যাক যোগশক্তি প্রাণশক্তি, আত্মাশক্তির কথা। তা নিয়ে তর্ক সুরু করলে রাত কাবার হয়ে যাবে। শুধু সে জন্ত নয় আর একটা কারণে আপনার বক্তব্যে বাধা দিলাম সেজন্ত দয়া করে ক্ষমা করবেন, প্রফেসর কৃষ্ণস্বামী। একটা বিপদের কথা আমার স্মরণে এসেছে। সেটা আপনাদের সর্বাগ্রে জানানোর দরকার।

ধরে নেওয়া যাক যে মাধ্যাকর্ষণের সংগে লড়াই করবার সমস্ত উপকরণটাই মজুত ছিল ওই বাক্সটার মধ্যে। এ কথাটা আপনারা ভেবে দেখেছেন কি না জানি না যে মহাকর্ষ মানুষ একদিক দিয়ে বিজয় করেছে পাল্টা শক্তি লাগিয়ে, যেমন স্পুটনিক অথবা লুনিক। কিন্তু অতটুকু বাক্সের মধ্যে ধরানো যায় এমন কোনো শক্তি আমাদের জানা আছে কি?

এ প্রশ্নের একটা ভয়াবহ উত্তর এইমাত্র আমার মনে এসেছে। আমি পরমাণুশক্তির কথাটা ভাবছি।

ভেবে দেখুন, হবিবুল্লা জানালা দিয়ে টিপারপুরের বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করার সংগে সংগেই একটা বিস্ফোরণ হল। আকাশের ছবিগুলোয় লক্ষ্য করে থাকবেন—বাড়ীর ওদিকটাতে কিন্তু আগুনের কোনও চিহ্ন ছিল না। হবিবুল্লা প্রবেশ করল আর তার পরের মুহুর্তেই ছড়িয়ে পড়লো অগ্নিশিখা। হঠাৎ ধ্বসে পড়ল সমগ্র দেওয়ালটা।

আমার অনুমান যদি সত্য হয় তবে যন্ত্রটাতে ছিল একটা উগ্র ধরণের রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ। সম্ভবতঃ এখনো পর্যন্ত পরমাণু রশ্মি বিকীর্ণ হচ্ছে যন্ত্রটা থেকে। কে জানে, আমরা এর মধ্যে কতটা পরমাণুরশ্মি সেবন করছি। হয়তো বা আমাদের সকলের মৃত্যুও হতে পারে এ অনবধানতার জন্ত।

ঘরের মধ্যে বিস্ফোরণ হলেও এর চেয়েও স্তম্ভিত হত না কেউ। সমস্বরে বেজে উঠল অস্ফুট আর্তনাদ বৈজ্ঞানিকদের কণ্ঠ থেকে।

কৃষ্ণস্বামী ক্ষিপ্রহস্তে যন্ত্রটিকে তুলে নিয়ে বারান্দায় বের করে দিলেন। ফিরে এসে বললেন—তাই তো। এ কথাটা আমাদের একেবারেই স্মরণে ছিল না। এ অনবধানতার জন্ত একমাত্র দায়িত্ব আমারই। যন্ত্রটা এখনই পাঠাচ্ছি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্ত।

কৃষ্ণস্বামী আবার দ্রুতপদে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

নীরবতা ভংগ করে সুমিত্রা—শংকর, তাই যদি হয়, তবে হবিবুল্লা ওটাকে পিঠে নিয়ে বেড়াতো কী করে?

শংকর বলে, আমরা এমন কোন প্রমাণ পাই নি যে হবিবুল্লা ওটাকে সর্বক্ষণ পিঠে বেঁধে ঘুরে বেড়াতো। দুর্ঘটনার সময় ওই যন্ত্রটা ব্যবহার করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না।

আর একটা কথা, হবিবুল্লা সরকারী পদার্থবিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীতে চেয়েছিল যন্ত্রটির পরীক্ষা করতে। সেটা কিসের জন্ত? আমার মনে হয়, তার সন্দেহ ছিল যে তার যন্ত্রটার মধ্যে কোথাও ভয়ের কারণ রয়ে গেছে।

কৃষ্ণস্বামীর আদেশে ইতিমধ্যে যন্ত্রটাকে ভরা হয়েছে একটা লোহার তোরংগের মধ্যে। সন্তর্পণে সেই ট্রাংক তুলে দেওয়া হচ্ছে একটি বিরাট মিলিটারি ট্রাক-এর পেছনের দিকে। ঘরের টেলিফোন তুলে দেশরক্ষা বিভাগের ল্যাবরেটরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন কৃষ্ণস্বামী—তারপর ঘোষণা করেন যে আধঘন্টার মধ্যেই জানা যাবে ডাঃ রায়ের সন্দেহ সত্য কিনা।

সকলের কথার সব রকমের তর্কের উৎস হঠাৎ শুকিয়ে গেছে। অমল বন্দ্যোর অস্থির পায়চারি সুরু হয়েছে। প্রফেসর শিকদার আরাম কেদারায় উঠে বসেছেন—তাঁর হাতের চুরুটটা গেছে নিভে।

শংকর চেয়ে দেখে বিভিন্ন মানুষের মুখে মৃত্যু ভয়ের বিচিত্র বিকাশ! কারো মুখে ফুটে উঠেছে চরম হতাশা। কারো উত্তেজনা কারো বা রাগ। সুমিত্রাই কেবল এর মধ্যে অবিচলিতা। নীরবে শংকরের পাশে এসে সে দাঁড়ায়। শংকর মনে মনে সুমিত্রার প্রশংসা না করে পারে না।

অমল বন্দ্যো নানা রকমের প্রতিষেধক ঔষধের কথা বলে চলেছে—বি, এ, এল; ই, ডি, টি, এ; অরিন ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড, আয়ন্ একসচেঞ্জ রেজিন্।

নিজের মনে কোনো প্রতিক্রিয়ার অভাব লক্ষ্য করে শংকর বিস্মিত হয়। হয়তো বা মৃত্যু ভয়ে তার স্নায়ুমণ্ডলী অসাড় হয়ে গেছে তাই এই চরম বিপদ সাড়া তুলতে পারছে না তার চেতনায়। এত বড় জীবন-মৃত্যুর চমকপ্রদ নাটকের সেই যেন একমাত্র দর্শক।

কৃষ্ণস্বামী সামান্ত বিচলিত হলেও ধৈর্য হারান নি, সকলকে আশ্বাস দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সভাস্থলে শৃংখলা ফিরিয়ে আনবার জন্ত বলেন—আপনারা বিচলিত হবেন না, ভেবে দেখুন এমন কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ ওই বাক্সটার মধ্যে, থাকলে এতদিনে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল। আপনাদের সংগে ওই বাক্সটার সংস্পর্শ তো কেবল মাত্র দু ঘন্টার। আপনারা দিল্লীতে আসবার দু সপ্তাহ আগে থাকতে ঐ যন্ত্রটাকে নিয়ে আমরা সর্বক্ষণ নাড়াচাড়া করছি।

আর তা ছাড়া তেমন জোরালো পরমাণুরশ্মি যদি থেকেই থাকে ওই বাক্সটার মধ্যে তবে হয়তো মৃত্যুকে এড়াবার কোনও পথই নেই আমাদের। সেজন্ত বৃথা চিন্তা করেই বা কী লাভ? মরতে তো একদিন হবেই।

কৃষ্ণস্বামীর কথায় শংকার বিহ্বলতা কেটে গেলেও পরিপূর্ণ

আশ্বাসও কেউ পায় না। উদ্বেগের ছায়াটা রয়েই যায় প্রায় সকলের মুখে।

কৃষ্ণস্বামী বলে যায় আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্ম রেডিও অ্যাক্টিভিটির কথাটা ভুলতে চেষ্টা করুন এটাই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। যখন এখনও বেঁচে আছি তখন সব চেয়ে জরুরী কথাটা হচ্ছে যে ভবিষ্যতের কার্যক্রমের একটা পরিকল্পনা করতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হলে চাই নির্দিষ্ট কোনো 'আইডিয়া'।

আপনারা আমাদের সংগে যোগদান করার আগে নিজেদের মধ্যে আমরা প্রচুর আলোচনা করেছি হবিবুল্লার যন্ত্র সম্বন্ধে। আমাদের মনেও যে দু-একটা কল্পনার উদ্ভব হয়নি—এমন কথা বলছি না। কিন্তু কার্যক্রমের কোনও সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারিনি। কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টার সমবেত চেষ্টায় আমরা পেলাম নানা রকমের মত—কতো রকমের 'আইডিয়া'। কে বলতে পারে ভালো করে অনুসন্ধান করলে আজকের এই নিতান্ত ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা জল্পনা-কল্পনার মধ্যে—প্রফেসর শিকদার যাকে বলেন "আকাশ-কুসুমের চাষ"—অ্যান্টিগ্রাভিটির মূল স্বরূপ আবিষ্কার করা যাবে কি না?

এক ঘণ্টা আগে একটা কার্যক্রমের কথা চিন্তা করাই অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সামনে রয়েছে বহু সম্ভাবনা—তার মধ্যে কোন কোনটার হয়তো বৈজ্ঞানিক অনুশীলনও সম্ভব। কার্যক্ষেত্র আরো সীমাবদ্ধ করে ফেলাটাও কিছুই অসম্ভব নয়। হবিবুল্লার জীবনী এক কপি করে আপনাদের বিতরণ করা হয়েছে। কাল বিকালে আপনাদের হবিবুল্লার বাড়ী ও ল্যাবরেটরী পরিদর্শন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন একটা বিষয়ে—আজকের 'আইডিয়া'গুলোর মধ্যে কোনগুলো দিয়ে অগ্রসর হওয়া হবিবুল্লার পক্ষে সম্ভবপর হোতো।

কাজ আরম্ভ করতে হলে আপনাদের প্রথমেই প্রয়োজন একটা ল্যাবরেটরী। হবিবুল্লার বিরাট গবেষণাগার সৌভাগ্যক্রমে আমাদেরই তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সরকার ছেড়ে দিচ্ছেন সে ল্যাবরেটরীর সম্পূর্ণ ভার আপনাদেরই ওপরে—'প্রজেক্ট-এ'র কাজের জন্ম। যে গবেষণাগার থেকে প্রথম অ্যান্টিগ্রাভিটি মেশিনে আবিষ্কৃত হয়েছিল, দ্বিতীয়বার সে আবিষ্কার সম্ভব করবার সাধনায় সে গবেষণাগারের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত স্থান আর কোথাও পাওয়া যাবে কি? এ ছাড়া দরকার হলে দিল্লীর যে কোনো গবেষণাগার আমরা ব্যবহার করতে পারব।

ভেবে দেখুন, অদৃষ্টের কী পরিহাস! হবিবুল্লার চেয়েছিল মাত্র একখানা ঘর আর কতকগুলো সাধারণ উপকরণ। আজ তারই কাজের পুনরাবৃত্তি করবার জন্ম হয়তো বা নিষ্ফল আয়োজনেই—সুরু হয়েছে বিরাট পরিকল্পনা। সেদিন যদি তার কথায় কর্ণপাত করতাম!

যাই হোক, বৃথা আফশোস করেও লাভ নেই। এবারে সমিতি গঠন করতে হয়-দৈনন্দিন কার্যক্রম সজ্ঘবদ্ধ ভাবে পরিচালনা করবার জন্ম। কমিটির নামে যাঁরা ভয় পান, তাঁদের আশ্বাস দেবার জন্ম বলা যায় যে, এটা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি স্বতন্ত্রভাবে কোনো একটা সূত্র ধরে কাজ করতে চান—তাঁর কাজে কোনো রকম ভাবেই বাধা দেওয়া হবে না। কিন্তু সে-কাজের ফলাফলটাও সকলকে জানাতে হবে নিয়ম মতো।

দেখা গেল, সকলেই একবাক্যে সম্মতি প্রকাশ করলেন কৃষ্ণস্বামীর প্রস্তাবে। স্থির হোলো যে, সমিতির মেয়াদ আপাততঃ রাখা হবে চার মাস—তার পরে পুনরায় নির্বাচন হবে। সর্বসম্মতিক্রমে প্রফেসর গোপালাচারীকে করা হল সভাপতি আর মিঃ জন হলেন সহ-সভাপতি। সুমিত্রা এই সুযোগে নিজের ওপর থেকে সম্পাদনার ভার নামাতে চেষ্টা করল কিন্তু সহকর্মীদের প্রবল আপত্তিতে সে চেষ্টা সফল হল না। শংকরের ওপরেও ভার পড়ল একটা—সান্ধ্য বৈঠক পরিচালনা করবার।

নির্বাচন শেষ না হতেই টেলিফোনে পাওয়া গেল হবিবুল্লার যন্ত্র সম্বন্ধে রিপোর্ট। শংকরের ভয় অমূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'রেডিয়েশন মনিটর' দিয়ে পরমাণুরশ্মির কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। 'গাইগার কাউণ্টার' আর 'সিণ্টিলেশন কাউণ্টার' দিয়ে পরীক্ষা করতে আরো কিছু সময় লাগবে যদি সামান্য পরমাণুর তেজ থেকে থাকে যন্ত্রটার মধ্যে।

এ খবরে সবচেয়ে উল্লসিত হল কিন্তু শংকর সে মন্তব্য করলে—যাক্, এতগুলো থিয়োরির জঞ্জালের মধ্যে অন্ততঃ একটাকে তো বাদ দেওয়া গেল! সেটাও বড় কম কথা নয়!

দেখা গেল, ঘরের মধ্যের গুমোট হাওয়াটা হঠাৎ কোন্ মন্ত্রবলে হাল্কা হয়ে গিয়েছে। শীতার্ত বনের মধ্যে যেন ঢুকলো এক ঝলক বসন্তের হাওয়া ফুলের সৌরভ আর পাখীর গানের সংবাদ নিয়ে। শংকরকে সহ্য করতে হল অনেক পরিহাসের বাণ। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্যভেদের খেলায় সুমিত্রাই এলো অগ্রণী হয়ে।

এ কাহিনীর সংগে সে-সব ঘটনার কোনও সংস্রব নেই বলে সেগুলো না হয় বাদই দেওয়া গেল। [ক্রমশঃ।

অপরিচিতাকে

এডগার এলেন পো

দুঃখ আমি করছি না তো : এই যে পৃথিবীতে
আমার ভাগ্যে পার্থিব সুখ-শান্তির নেই লেশ—
এই যে আমার অনেক কালের প্রেমকে চাপা দিতে
ক্ষণকালের পরিহাসই ব্যাপ্তিতে অশেষ!

দুঃখ আমি করছি না তো : হতভাগ্যেরাও
আমার চেয়ে সুখী এবং মিষ্টি হাসে বলে;
দুঃখ শুধু : ভাগ্যে আমার তুমি যে তুলে দাও
সহানুভূতি, যখন আমি পাশ দিয়ে যাই চলে!

অনুবাদক : প্রফুল্লকুমার দত্ত

ভলতেয়ার—জীবন ও দর্শন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

উপমন্যু

ইতিহাসের আলো

ভলতেয়ারের এই নির্বাসনের মূলে ছিল বার্লিনে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সুবৃহৎ অবদান। বইয়ের নাম —**An essay on the morals and the spirit of the Nations from Charlemagne to Louis XIII**; বইয়ের নামেই ফুটে আছে লেখকের বক্তব্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা। Cireyতে বান্ধবীকে মুগ্ধ করার প্রেরণায় এই বইয়ের পরিকল্পনা, বার্লিনে এই বইয়ের প্রকাশ।

ইতিহাসের প্রতি ছিল বান্ধবীর বিষম বিরাগ। ইতিহাসকে তিনি বলতেন, পুরাতন পঞ্জিকা···যা অন্তরকে উদ্বেল হয়তো করে কিন্তু উদ্দীপ্ত করে না। ভলতেয়ারও তাঁর এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলেছেন এই একই কথা, বলেছেন, ইতিহাস হচ্ছে শুধু অসংখ্য দুঃখ আর দুষ্কর্মের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ভলতেয়ারের মনের কথা আলাদা। এমন ইতিহাস লিখবেন তিনি যা প'ড়ে শুধু বান্ধবীর অন্তর নয়, প্রতিটি মানুষের অন্তর উদ্দীপ্ত হবে। মানুষের কথা লিখবেন তিনি। লিখবেন ছোটখাটো ঘটনার কথা, যা একটু অন্যরকম হ'লে বদলে যেতে পারতো পৃথিবীর ইতিহাস। দার্শনিকের দৃষ্টির আলো ফেলতে হবে ইতিহাসের পুরাতন পাতায়, রাজনৈতিক ঘটনার আড়াল থেকে আলোয় আনতে হবে মানুষের মনের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্নার কাহিনী। তাঁর বইয়ের মুখবন্ধে লিখলেন ভলতেয়ার, প্রত্যেক জাতির ইতিহাস কালক্রমে অসংখ্য গালগল্পে ভরে ওঠে। তারপর একদিন জ্বলে ওঠে দর্শনের আলো, সুপ্ত মানুষকে উজ্জীবিত করবে বলে। ইতিহাসের গাঢ় অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় সেই আলোর রশ্মি। কিন্তু পথ আর পরিষ্কার হয় না, উদ্দীপ্ত হয় না মানুষের মন। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত স্তূপীকৃত কাহিনী, সংস্কার আর বিশ্বাসের বেড়াজাল, মিথ্যার মোহ আর ছিন্ন করা যায় না। মড়ার হাড় নিয়ে এই ভোজবাজির মহড়া শেষ করার কাজে হাত দিলেন ভলতেয়ার।

যেমনি বিরাট তাঁর পরিকল্পনা তেমনি ব্যাপক তাঁর প্রস্তুতির ইতিহাস। অসংখ্য পত্র আর পুঁথি পড়লেন ভলতেয়ার। প্রয়োজনীয় যা কিছু সামনে পেলেন সব রাখলেন সংগ্রহ করে। অসংখ্য চিঠি লিখলেন ঘটনার যাথার্থ্য যাচাইয়ের জন্য। দিনের পর দিন একাগ্র সাধনায়, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি গড়ে তুললেন মানবেতিহাসের এই বিরাট সৌধ।

মালমসলা সংগ্রহ হ'ল, তারপর সুরু হ'ল বাছাই আর সাজানোর কাজ। শুধু ঘটনার প্রতি কোনো মোহ ছিল না ভলতেয়ারের। তাঁর মতে যে ঘটনা দিয়ে নূতন পথের যোজনা সম্ভব নয়, সে ঘটনা সৈন্যের পিঠে বোঝার মতোই শুধু বাধা, আর কিছু নয়। বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক ঘটনা বিচার করে নিতে হবে, দিতে হবে বৃহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত। তা না হ'লে মানুষের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অসংখ্য বিবরণের ভারে ক্লান্ত হবে মাত্র। সব ঘটনাই ইতিহাসের উপকরণ হবার যোগ্য নয়। ঘটনা জানার প্রয়োজন আজ মানুষের থাকতেই পারে। কথার অর্থ জানার প্রয়োজন অবশ্য মানুষের আছে আর তার জন্যে আছে অভিধান। তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনার অভিধান সঙ্কলিত হ'লে আপত্তি নেই। আপনিও শুধু ইতিহাসকে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় ঘটনা দিয়ে ভারাক্রান্ত করায়। তা'হলে কোন পরিকল্পনায় রূপায়িত হবে ভলতেয়ারের এই ইতিহাস ?

ঠিক এই প্রশ্ন ভলতেয়ারকে কম ভাবায়নি। একটা ঐক্যের সূত্র খুঁজছিলেন তিনি, সে সূত্রে প্রয়োজনীয় ঘটনার ফুল সাজিয়ে ইউরোপীয় ইতিহাসের মনোহর এক মালা গাঁথা যায়। অবশেষে স্থির করলেন যে সংস্কৃতির ইতিহাসই সেই সূত্র। স্থির করলেন যে, তাঁর ইতিহাসে রাজার কাহিনী থাকবে না, থাকবে শুধু বিভিন্ন আন্দোলন, বিভিন্ন ভাবধারা আর তার মাঝে জনগণের বিকাশ ও বিলুপ্তির বিবরণ। কোনো বিশেষ জাতি নয়, তাঁর ইতিহাসের উপজীব্য হবে সারা মানবজাতি। যুদ্ধ স্থান পাবে না তাঁর ইতিহাসে। সেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় থাকবে নিত্য নব দিগন্তের পানে মানব-মনের অভিযান। এই স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করে চিঠি লিখলেন তিনি, যুদ্ধ বা বিগ্রহ আমার পরিকল্পনার এক অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র; হাজার হাজার সৈন্য জয়লাভ করলো কি পরাজিত হ'ল, কোন্ সহর কতবার হাত বদল হ'ল—ও সব তো প্রত্যেক ইতিহাসেই লেখা আছে···কিন্তু মানুষের সৃষ্টি, তার মানস-বিবর্তনের কাহিনীটুকু না থাকলে মানবেতিহাসের মধ্যে শাশ্বত সত্য, শিব আর সুন্দর ব'লে কিছুই থাকবে না।

আমি সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে চাই না, লিখতে চাই সমাজের ইতিহাস; জানতে চাই কেমন ক'রে মানুষ যুগ যুগ ধ'রে তার সামাজিক জীবন, সাংসারিক জীবন যাপন করে এসেছে। কোন্ কোন্ কৃষ্টির ধারক ও বাহক ছিল সে···নগণ্য সব ঘটনার বিবরণে আমার বিশ্বাস নেই, রাজারাজড়ার কাহিনীর প্রতি মোহ নেই। আমার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মানস-বিবর্তনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, মানুষ সন্তর্পণে পা ফেলে যুগ-যুগান্তের প্রচেষ্টায় অরণ্যের অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলোকে এসেছে। আমি আঁকতে চাই মানুষের সেই প্রতিটি পদক্ষেপের চিত্র। এই ইতিহাস থেকে রাজার নির্বাসনের মাঝেই ভলতেয়ার লিখে রাখলেন আগামী দিনে দেশে দেশে সিংহাসন থেকে অপসারণের ইঙ্গিত। ভলতেয়ার শুধু নূতন ইতিহাসই লিখলেন না, সঙ্গে সঙ্গে গাইলেন বুরবোঁ বংশের বিদায়-সঙ্গীত।

এই একান্ত সাধনার ফলে বিশ্বমানবের হাতে এল প্রথম ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা—ইতিহাসের দর্শন। যুগ-যুগান্তব্যাপী জীবনধারায় ইউরোপীয় মানস-বিবর্তনের বিশেষ ধারাটিকে নির্দিষ্ট

পরিচয়

জীবনের আর এক অধ্যায়। শুরু শেষ জানি না। তবে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না। শুধু জানি বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, টিকে আমাকে সংসারে থাকতেই হবে। অনেকদিন হলো ভুবনেশ্বর ছেড়ে কোলকাতা এসেছি। ভাল একটা চাকরীও পেয়েছি। রঘুনাথ সরকারের চায়ের দোকানে আনাগোনার দিনগুলোতে জানতাম জীবনে চাকরী পাওয়াটাই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু চাকরী পাবার পর সে ধারণা আমার পাল্টে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে, সুযোগ সুবিধে মতো চাকরী একটা পাওয়া যায়। বেকার জীবনে টিউশনিও জোটে। দুষ্কর হলো মহানগরী কোলকাতার বুকে আমাদের মতো সাধারণ চাকুরীয়েদের পক্ষে একটা ভাড়ার বাড়ী পাওয়া। এমন নয় যে কোলকাতা সহরে বাড়ী নেই কিম্বা মালিকরা তা ভাড়ায় দেন না। বাড়ীও আছে, ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে দুশো পঁচিশ টাকার ক্ষুদে অফিসারের জন্য নয়।···

দাদার সংসার বেড়ে গেছে। বুড়ো মা। এখনতো একেবারে বেকার নই। আগের তুলনায় ভালই আছি। সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনের আমারও দিন এসেছে। মা এখন আমার সঙ্গে চন্দননগরেই থাকেন। কোলকাতা থেকে ৪০ মাইলের দূরত্ব। কি আর করা যাবে, সহরে যখন জায়গা নেই তখন সহরতলীতেই থাকতে হয়। লোকাল ট্রেনে ডেলী প্যাসেঞ্জারী করি। সকালে আটটার গাড়ী ধরতে হয়। নিত্যির তাড়া। নাকে মুখে দুটো ভাত গুঁজে ষ্টেশন পানে ছুটি। গাড়ীর দু'চার মিনিট আগেই পৌছুই। ভাত একদিন না খেলেও চলতে পারে, কিন্তু আপিসের দেরী হলে আর রক্ষে নেই। ঘচাং করে 'লেট মার্ক' হয়ে যাবে। আমার আবার সেইটেই সবচেয়ে বড় ভয় কিনা!·····

ডেলী প্যাসেঞ্জারের দুর্গতির কথা ভাষায় বলা সম্ভব নয়। বসতে জায়গা পাওয়াতো বাপের ভাগ্যি। 'ফুট-বোর্ডে দাঁড়ানো আর 'হ্যাণ্ডেল' ধরার অধিকার নিয়েই তুমুল কাণ্ড হয়ে যায়। ঝুলতে ঝুলতে কোন মতে এসে হয়ত হাওড়া পর্য্যন্ত পৌছানো যায়। তবে গেট থেকে সবার আগে বেরুবার তাড়াহুড়োতে অনেককেই হাতের ছাতি লাঠি হারাতে হয়। ভিড়ের ঠেলায় পায়ের চটি হারিয়ে আমাকে একদিন খালি পায়ে আপিস যেতে হয়েছিল। একা হলে হয়ত হোটেল মেসেই থাকতাম। মুস্কিল হয়েছে মা-কে নিয়ে। বুড়ো মানুষ! কষ্ট তাঁর সইতেও পারি না, আবার কিছু করতেও পারছি না। একটা দুটো মাস নয়, আজ আড়াই বছর ধরে চেষ্টা করেও একটা ঘর ভাড়া পাইনি। লোকাল ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, রোজই আমি ভীড় ঠেলে আপিসটাতে আসি যাই।···

দৈবের ঘটনা। আপিস ফেরৎ বাড়ি ফিরছি। এস্‌প্লানেডে দাঁড়িয়ে আছি হাওড়ার ট্র্যাম ধরবো বলে। হঠাৎ একখানা হাত পেছন থেকে কাঁধে এসে ঠেকলো। 'কি ভায়া চিনতে পারেন?' আমি তো অবাক! এভাবে এতদিন পরে আবার যে সরকার মশাইয়ের দেখা পাবো ভাবতেও পারিনি। মিনিট দুই মুখ থেকে কথাই সরলোনা। বিস্ময়ে আর আনন্দে হতবাক হয়ে গেছি। 'আমি রঘুনাথ সরকার। সেই যে ভুবনেশ্বরের চায়ের দোকান মনে পড়ে?' 'সবই মনে পড়ে সরকার মশাই, সে কি আর ভোলার কথা। সত্যিই আপনাকে এখানে এভাবে দেখবো ভাবতেই পারছি না। কতখানি যে খুসী হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না।' 'সরকার মশাই মুচ্‌কি হাসলেন। 'আমিতো ভাবলাম বুঝি চিনতেই পারেননি। যাক্ ভাল কথা, কোথায় চলছেন?' 'ট্রামের অপেক্ষা করছি। হাওড়া যাবো। চন্দননগরে থাকি। লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করি।' 'চন্দননগর? এত দূরে!' 'কি আর করি বলুন। চাকরী একটা ভালই হয়েছে। তবে কোলকাতা সহরে আমার ভাগ্যে বোধ হয় বাড়ী লেখা নেই। মা-কে নিয়েতো আর হোটেলে থাকতে পারি না। তাই···' 'থাক ও সব কথা পরে শুনবো এখন চলুন আমার সাথে।' 'কোথায়?' 'শ্যামবাজার। আমার শ্বশুরবাড়ী। পূজোর ছুটিতে আমরা সবাই এখানে বেড়াতে এসেছি। স্ত্রীর বাপের বাড়ী থাকতে আবার উঠবো কোথায়?' 'কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাবে না? মা বাড়ীতে একা চিন্তা করবেন। তাই বলছি আর একদিন যাবোখন।' 'না না তা হতেই পারে না। একদিনে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। মা ঠিকই বুঝবেন জোয়ান ছেলে বন্ধু বান্ধবের সাথে ছবিটবিতে গেছে। চলুন, চলুন।' 'কিন্তু···' 'কোন' কিন্তু নয়। চলুন এক সাথে আপনার দু' কাজ হবে। গিন্নীর সাথে পরিচয়টাও হয়ে যাবে। আর শ্বশুর মশাইকে বলে তাঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আপনার জন্য একটা ফ্ল্যাটেরও ব্যবস্থা করে দেবো।' এবার কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বাড়ীর ব্যবস্থা হতে পারে এর পরেও কি আমি না বলতে পারি।···

চমৎকার লোক ঘনশ্যাম রায়। তবে হ্যাঁ, সরকার মশাইয়ের যোগ্য শ্বশুরই বটে! সরকার মশাইকে তবু থামানো যায়। রায়মশাই একবার মুখ খুললে রাত কাবার করে দিতে পারেন। যাকৃগে। ভালই হলো। রায়মশাই জামাইয়ের কথা মতো তাঁর বেলেঘাটার বাড়ীতে আমায় রাখতে রাজী হলেন। নিতান্ত সৌভাগ্য বলতে হবে। সরকার মশাইকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই। রাত হয়ে যাচ্ছিল। ভেতর থেকে ডাক আসায় রায়মশাই উঠে গেলেন। বাবাঃ বাঁচা গেল। এবার মনে হয় সরকার মশাইয়ের পালা। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। এখনও সরকার গিন্নীর সাথে পরিচয়টা হলো না। যাবার আগে আর একবার বলে দেখা যাক। 'সরকার মশাই সবইতো হলো তবে গিন্নীর যে দর্শন দেবার নামটি নেই। কি ব্যাপার? ফাঁকিতে পড়লাম নাতো?' 'ফাঁকীতে পড়বেন কেন, ঐ দেখুন···' শ্রীমতী থালাভর্ত্তি খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাঙালী গিন্নী। ঠিক যা ভেবেছি। 'আচ্ছা সরকার মশাই এত কষ্টের কি দরকার ছিল? ওনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো।' 'বিরক্তের কিছুই নেই। আপনার কথা ভুবনেশ্বর থাকতে কত শুনতাম। খাবার জিনিষ মুখটি বুজে খেয়ে যান।' এক নিমিষে কথাগুলো শেষ করে ঘোমটা টেনে সরকার গিন্নী এক রকম দৌড়েই পালিয়ে গেলেন। বাঙালী ঘরের লক্ষ্মী। 'ভালই হলো, কি বলেন সরকার মশাই! পেটটি পুরে খাওয়া যাক।' 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'···অনেক দিন এমন রান্না খাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, বাঙালী মেয়ের রান্নার হয়ত জগতে তুলনা মেলা ভার। 'কেমন লাগছে?' 'চমৎকার। গিন্নীর আপনার তুলনা নেই সরকার মশাই। দাদার ওখানে গেলে বৌদি বেঁধে খাওয়ায়। আমি আর একটি বৌদি পেলাম।' 'উঃ কৃতিত্বটা পুরোপুরি আপনার বৌদির একার নয়। একটু দাঁড়ান'— হঠাৎ সরকার মশাই অন্দরে ঢুকলেন। এক মিনিটও হয়নি। একটা টিন হাতে আবার ফিরে এলেন। টিনের গায়ের খেজুর গাছের ছাপ দেখেই চিনেছিলাম 'ডালডা' বই আর কিছু নয়। খাবারের স্বাদে গন্ধে সেইটেই মনে হচ্ছিল। আমায় অবাক করার টোনে টিনটি দেখিয়ে বললেন, 'এটির সাথে পরিচয় আছে?' 'এর পরিচয় তো আপনার চায়ের দোকানেই পেয়েছি সরকার মশাই।' 'ওহো' মনে আছে তা হলে? আমিই তো গিন্নীকে ডালডায় রাঁধতে শেখালাম। নইলে এমন রান্না পেতেন কোথায়।' 'তা' হলে আপনাকেও ধন্যবাদ দিতে হয়, কি বলুন?' সরকার মশাই হাসলেন। 'ঘরের ব্যবস্থাতো হয়ে গেলো। এবার গিন্নী করুন। আমরাও মাঝে মাঝে আসবো টাসবো।' চুপি চুপি কখন বৌদিও এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। বৌদির কথাগুলো সত্যিই যে আপন। বাংলার দরদী বৌদি। 'সব হবে বৌদি। কোলকাতায় আসি। তারপর সব ব্যবস্থাই হবে।' 'বৌঠানের হাতের রান্না খাওয়াবেনতো?' টিপ্পনী কাটলেন সরকার মশাই। 'নিশ্চয়ই তাতে সন্দেহের কি আছে?'···রাত হয়ে গেছে আর দেরী নয় সত্যিই আজ খুশীর দিন। বাড়ী পেয়েছি, খুশীর খবরটা মাকে দেওয়া দরকার। 'নমস্কার বৌদি। নমস্কার সরকার মশাই। আবার দেখা হবে।'··· 'আসুন ঠাকুর পো।'·····

করার প্রথম প্রচেষ্টা করলেন ভলতেয়ার। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত যা কিছু তা সযত্নে পরিহার করতে হল। অর্থাৎ থিয়োলজিকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তাঁর ইতিহাস রচনা করলেন ভলতেয়ার। Buckle বলেছেন ভলতেয়ারের হাতেই স্থাপিত হয়েছে আধুনিক ইতিহাসের—বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভিত্তি। এ উক্তির সত্যতার প্রমাণ রয়েছে Gibbon, Niebuhr, Buckle এবং Grote-এর পরবর্তীকালে রচিত বিরাট সব ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে। ভলতেয়ার এক নূতন পথের পথিকৃৎই শুধু নন; রচনার বৈশিষ্ট্যে এবং গভীরতায় আজো বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয় তাঁর এই অবদান।

আর এই অতুলনীয় অবদানই হ'ল তাঁর নির্বাসনের কারণ। ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা পড়ে রাগে জ্বলে উঠল তাঁর স্বদেশের লোক। বিশেষ ক্রুদ্ধ হলেন যাজকেরা। তাঁরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। ভলতেয়ারের মত, যে খৃষ্টধর্ম কর্তৃক রোমের নিজস্ব 'পেগান' জীবনধারা অতি দ্রুত কবলিত হওয়াই রোম সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। অবশ্য পরবর্তী Gibbon-এর বিরাট ইতিহাসেও এই মতেরই পরিশীলন ও প্রতিষ্ঠার পরিচয় আছে। কিন্তু সংস্কারে যারা অন্ধ তারা সত্যের আলো চোখে পড়লেও চোখ বুজে থাকবে। শুধু তাই নয়, জুডিয়া এবং খৃষ্টধর্মকে বলাও ক'রে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেননি ভলতেয়ার। তার বদলে তিনি তাঁর ইতিহাসে স্থান দিয়েছিলেন চীন, ভারত ও পারস্যকে—ইউরোপের জনগণকে জানিয়েছিলেন এই তিন প্রাচীন দেশের সাধনা ও সিদ্ধির ইতিবৃত্ত। ইউরোপীয় দর্শনের তাসের ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, নূতন আলোর বন্যায় লুপ্ত হ'ল অসংখ্য কুসংস্কারের অন্ধকার। সকলে জানলো প্রাচ্যে যে সংস্কৃতি, যে দর্শন ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ, তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবে শুরু হয়েছে পাশ্চাত্যের মাটিতে। পাশ্চাত্য মানস-বিবর্তনের মানচিত্রে আঁকা হয়ে গেল প্রাচ্যের স্থায়ী আসন। ভলতেয়ারের এই আন্তর্জাতিক মনোভাব বিষচক্ষে দেখলেন ইউরোপের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র ফরাসী দেশের রাজা। হুকুম জারী হল যে ফরাসী হওয়ার চেয়ে বিশ্ববাসী হওয়ার প্রতি যার লোভ, তার স্থান আর যেখানেই হোক, স্বদেশে, ফরাসী দেশের মাটিতে হবে না। নির্বাসিত হলেন ভলতেয়ার।

রোমান্সের রস—কাঁদিদ

নির্বাসিত ভলতেয়ার কিন্তু স্বদেশের মায়া কাটাতে পারলেন না। জেনিভার প্রান্তে কুটিরের আশ্রয় তাই ভাল লাগলো না তাঁর। ১৭৫৪ সালে ফার্ণিতে রচনা করলেন তাঁর নতুন নীড়। সুইজারল্যাণ্ডের মাটিতে কিন্তু ফরাসী সীমান্তের গা ঘেঁসে দাঁড়ানো ফার্ণি তিনি পছন্দ করলেন অনেক ভেবেচিন্তে। আজীবন স্থান থেকে স্থানান্তরে বাস করতে হয়েছে তাঁকে, পালিয়ে বেড়িয়েছেন বলা যায়। তাই বেছে নিলেন এমন জায়গা যেখানে ফরাসীরাজের অত্যাচার নেই, অথচ সুইশ সরকার বিরূপ হলে যেখান থেকে সহজেই সরে যেতে পারবেন স্বদেশের মাটিতে। চৌষট্টি বছর বয়সে ভলতেয়ার খুঁজে পেলেন শুধু আশ্রয় নয়, তাঁর নিজস্ব আবাসস্থল। এইটুকুই তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর "The Travels of Searmentads" কাহিনীর শেষে নিজের মনের কথাই বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বিরল—সব দেখার পর আমি স্থির করলাম যে এর পর শুধু নিজের নীড়টুকু ছাড়া আর কিছুই দেখবো না। বিয়ে করে ঘরে স্ত্রী আনলাম। অচিরেই স্ত্রীর বিশ্বস্ততায় সন্দিহান হবার কারণ ঘটলো। তবু এ সব সত্ত্বেও আমার ঘরের মাধুর্য আমার কাছে একটুও ম্লান হল না। ভলতেয়ারের অবশ্য স্ত্রী ছিলেন না। পরিচর্যার জন্য ছিলেন এক ভাগ্নী। তাতে সুখী ছিলেন ভলতেয়ার। প্যারিসে ফিরে যাবার জন্যে আর একদিনও উৎসুক হননি। অনেকের মতে এই নির্বাসন শাপে বর হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে শান্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম পেয়ে মনীষী ভলতেয়ার পরমায়ু বৃদ্ধির সুযোগ পেয়েছিলেন।

সুখে শান্তিতে দিন কেটে যেতে লাগলো ভলতেয়ারের। বাড়ীর চার পাশে এক সুরম্য বাগান গড়লেন নিজের হাতে। মানুষের প্রতি আর সামান্য বিরূপতাও ছিল না এই বৃদ্ধ দার্শনিকের মনে। সকলকেই সস্নেহে কাছে ডাকতেন, সমাদরে করতেন অতিথি-পরিচর্য্যা। অবশ্য মাঝে মাঝে বুদ্ধির উজ্জ্বল রেখা, বিদ্রূপের শাণিত আভাস যে চমকে উঠতো না তা নয়। একদিন এক অতিথি এসে জানালেন যে তিনি আসছেন মিঃ হলার্স-এর কাছ থেকে। অমনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন ভলতেয়ার। ওঃ মিঃ হলার্স-এর কাছ থেকে। বিখ্যাত কবি, দার্শনিক, বিশ্ববিখ্যাত প্রতিভা মিঃ হলার্সকে না চেনে কে? বিনয়ে গ'লে গিয়ে অতিথি বললেন, আপনি যা বললেন তা সবই হয়তো ঠিক। কিন্তু মিঃ হলার্স-এর মুখে আপনার সম্বন্ধে একটা প্রশংসার কথাও কখনো শুনিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে বাঁকা হাসির রেখা ফুটিয়ে এল ভলতেয়ারের উত্তর, ওঃ তাই না কি! তা'হলে আমরা দু'জনেই নিশ্চয় ভুল করছি।

ভলতেয়ারকে কেন্দ্র ক'রে ফার্ণিতে গড়ে উঠলো ইউরোপের নব পীঠস্থান। ইউরোপের সাহিত্যিক, রাজা-মহারাজা, রাজনৈতিক নেতা—সকলের লক্ষ্য হ'ল ফার্ণি। কেউ বা সশরীরে এলেন গুণমুগ্ধ ভক্তের মত, কেউ বা পত্রের মারফৎ জানালেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। এলেন প্রশ্রয়কামী পুরোহিত, উদারমনা অভিজাত-নন্দন, এলেন আলোকপ্রাপ্তা আধুনিকা মহিলার দল। ইংলণ্ড থেকে এলেন Gibbon আর Boswell, এলেন d'Alember Helvetius ইত্যাদি ফরাসী নব-জাগরণের বিদ্রোহী নেতা। নিত্য অসংখ্য অতিথির অত্যাচারে জর্জরিত ভলতেয়ার ক্ষোভে বলে উঠলেন, আমি শেষকালে সারা ইউরোপের জন্যে সরাইখানা খুলে বসলাম দেখছি! দু'সপ্তাহের জন্যে থাকতে এলেন এক অতিথি। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভালোমানুষের মত বললেন ভলতেয়ার, আপনার সঙ্গে ডন কুইক্সোটের বিশেষ তফাত দেখছি না। ডন কুইক্সোট পান্থশালাকে প্রাসাদ ব'লে ভুল করেছিল আর আপনি প্রাসাদকে পান্থশালা ব'লে ভুল করছেন। অতিথি উচ্চাঙ্গের একটা রসিকতা শোনার আনন্দে হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন তাঁর নির্দিষ্ট ঘরে, হতাশ ভলতেয়ার মনে মনে গর্জে উঠলেন, হে ঈশ্বর, তুমি শুধু আমায় বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষা কর, শত্রুদের বিরুদ্ধে আমি একাই লড়াই করতে পারবো।

কিন্তু কত লড়াই করবেন তিনি? শুধু অতিথির অত্যাচার

হ'লেও না হয় কথা ছিল। এ ছাড়াও ছিল চিঠির বোঝা। প্রত্যহ রাশি রাশি চিঠি আসতো তাঁর নামে। আজকের দিনে হ'লে সংখ্যার মাপকাঠিতে অনেক চিত্রতারকার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন ভলতেয়ার এবং প্রেরকদের ব্যক্তিত্বের বিচারে প্রায় সকলকে ম্লান করে দিতেন। রাজা থেকে দিনমজুর প্রত্যেকের মনের কথা, অন্তরের শ্রদ্ধা বয়ে নিয়ে আসতো এইসব চিঠি। জার্মানী থেকে এক সাধারণ নাগরিক অনুরোধ করলেন—গোপনীয় অনুরোধ, ঈশ্বর আছে কি নেই? পত্রপাঠ জানালে বাধিত হব। এরই সঙ্গে এল সুইডেন আর ডেনমার্কের রাজার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং রাশিয়া থেকে দ্বিতীয়া ক্যাথারিণ পাঠালেন ছোট্ট একটি পত্রের সঙ্গে সুন্দর এক উপহার। শেষ পর্যন্ত বছর খানেক বিভ্রান্তির পর ফ্রেডরিক আবার লিখলেন চিঠি। ভক্ত আবার মন্দিরের দরজায় ফিরে এল শ্রদ্ধা ও প্রীতির অঞ্জলি নিয়ে।

বাইরের এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার অসংখ্য অঞ্জলি কিন্তু শান্ত করতে পারেনি ভলতেয়ারের মন, শান্তি ফিরে আসেনি তাঁর ক্লিষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত অন্তরে। জীবনে অনেক রঙীন আশার জাল বুনেছেন তিনি, অনেক স্বপ্নই তাঁর সফল হয়েছে। তবুও মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত কোনোদিনই হ'তে পারেননি এই মানবদরদী দার্শনিক। মনের গোপন গভীরে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল হতাশার বিষাদ-মলিন মেঘ। মানুষের মানস-বিবর্তনের ইতিহাস লিখতে শুরু করে ঘনীভূত হল সেই মেঘের আস্তরণ। ইতিহাসের প্রথম প্রভাত থেকে মানুষের অগ্রগতির পিছনে যে অমানুষিক দুঃখ, দুর্দশা, নিপীড়ন, নির্যাতন—সব জানার পর ব্যথায় বিষিয়ে উঠলো তাঁর অন্তর। অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা ম্লান করে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল সেই কালো মেঘের কুণ্ডলী। মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো ১৭৫৫ সালের নভেম্বর মাসে।

১৭৫৫ সালের নভেম্বর মাসে লিসবনে হয়ে গেল এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প। All Saints Day ধর্মোৎসবের দিন, কাতারে কাতারে মানুষ প্রার্থনার আশায় জড়ো হয়েছিল সহরের বিভিন্ন গির্জায়। হঠাৎ কেঁপে উঠলো মাটি, প্রস্তুত উপচার সামনে পেয়ে হিংস্রদন্ত মেলে যেন এগিয়ে এল মৃত্যু। ত্রিশ হাজার মানুষের হল জীবন্ত সমাধি। সংবাদ পেয়ে ভলতেয়ারের অন্তরে পুঞ্জীভূত মেঘ ঝরে পড়ল করুণ কান্নায়। হয়তো নিজের মনে কেঁদে আবার শান্ত হ'তেন তিনি। কিন্তু তা আর হ'লনা। কানে এলো ফরাসী যাজকের উক্তি—লিসবনের অধিবাসীরা তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছে। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন ভলতেয়ার; এই ভূমিকম্পকে কেন্দ্র করে লিখলেন এক কবিতা। আগুনের অক্ষর সাজিয়ে তুলে ধরলেন তাঁর পুরাতন প্রশ্ন—হয় ঈশ্বর এই ধ্বংসরূপী মন্দ নিবারণ করতে পারতেন কিন্তু স্বেচ্ছায় করেন নি অথবা তাঁর নিবারণ করার ইচ্ছা থাকলেও শক্তি নেই। স্পিনোজা বলেছিলেন যে ভালো এবং মন্দ মানুষের মনগড়া দুটো কথা, বিশ্বযন্ত্রের বিচারে ও দুটো কথার কোনো মূল্য নেই, আমরা যাকে ধ্বংস বলি অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে তা অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। কিন্তু এ তত্ত্বের মধ্যে শান্তি পেলেন না ভলতেয়ার। তাই তাঁর কবিতার শেষ দু' লাইনে মেলে ধরলেন তাঁর রক্তাক্ত অন্তর:

রঙীন হালকা হাসির দিন শেষ হয়েছে আমার,
শেষ হয়েছে সোনালী আলোর ঝলমল আনন্দের পথ;
শুনছি নূতন যুগের পদধ্বনি, আর অভিজ্ঞতার ভারের সঙ্গে
মানুষের ঠুনকো জীবনের বোঝা বইতে বইতে,
খুঁজছি এই ঘনায়মান তমিস্রার মধ্যে একটু আলোর রেখা,
বুঝছি বুক পেতে ব্যথা নিতে হবে আমায় কিন্তু
বিক্ষুব্ধ হলে চলবে না।

কয়েক মাস পরেই শুরু হল ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধ। কানাডার কিছু তুষারাবৃত অঞ্চল নিয়ে দুই দেশের এই উন্মাদ অভিযানে ব্যথিত হলেন ভলতেয়ার। তারপর হঠাৎ একদিন এই বৃদ্ধ মানবদরদীর বুকে চরম আঘাত হানলেন স্বয়ং রুশো। ভলতেয়ারের কবিতার প্রতিবাদে রুশো লিখলেন: এই ধ্বংসের জন্য মানুষই দায়ী। সহরে বাস না করে যদি আমরা মাঠে বাস করতাম তাহলে ভূমিকম্পে এত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হত না। যদি আমরা বাড়ীতে বাস না করে উন্মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির বুকে আস্তানা নিতাম, তাহলে মাথায় বাড়ী ভেঙে পড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা এড়াতে পারতাম। বিপর্যস্ত ভলতেয়ার বিস্মিত হলেন, এই উন্মাদ উক্তি নিয়ে, নূতন এই ডন্ কুইকসোট কেন্দ্র করে, মানুষের মাতামাতি দেখে। স্থবির সিংহ আর একবার প্রস্তুত হলেন আক্রমণের জন্য। ১৭৫১ সালে তিন দিনের মধ্যে রচিত হল Candide—রুশোর প্রতি নিক্ষিপ্ত হল মানুষের বুদ্ধির তূণ থেকে নিক্ষিপ্ত ইতিহাসের সব চেয়ে সেরা ইন্‌টেলেকচুয়াল অস্ত্র ভলতেয়ারের মর্মঘাতী ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ।

হতাশ মানুষের মর্মবেদনাকে হাসির রসে জারিয়ে পরিবেশন করলেন ভলতেয়ার। পড়তে পড়তে হেসে যেমন আকুল হ'ল মানুষ, তেমনি জানলো যে কি বিরাট বেদনা ও ব্যর্থতায় ভরা এই পৃথিবী। ভলতেয়ার দেখালেন তাঁর উপলব্ধ সত্যকে এক সরল কাহিনীর রূপে, সহজ সংলাপের মাধ্যমে। সারা কাহিনীতে একটিও তত্ত্বকথা নেই, নেই গুরু-গম্ভীর আলোচনা। আনাতোল ফ্রাঁস তাই বলেছেন, ভলতেয়ারের হাতে কলম তটিনীর উচ্ছলতায় হাসতে হাসতে ছুটে এগিয়ে গেছে; সৃষ্ট হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের সেরা ছোট গল্প।

নামেই বোঝা যায় যে Candide এক অতি সরল সৎ কিশোর। Baron of Thunder—Ten-Trockh of Westphaliaর আশ্রয়ে মানুষ। সে আর মহা পণ্ডিত Metaphysicotheo-logicocosmonigologyর অধ্যাপক Panglossএর ছাত্র। দুর্গের কক্ষে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছিলেন অধ্যাপক, সব কিছুই যে প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রয়োজন, এটা প্রমাণ করা কিছু শক্ত নয়। দেখ, মানুষের নাক আছে চশমা ধারণের জন্য···পা দেখলেই বোঝা যায় যে মোজা ধারণের জন্য তার সৃষ্টি···পাথর সৃষ্টি হয়েছে কেল্লা বানাবার উদ্দেশ্যে···ভেড়ারা সৃষ্ট হয়েছে আমাদের প্রাত্যহিক মাংসের প্রয়োজন মেটাতে। সুতরাং যারা ব'লে যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই সুন্দর তারা ভুল বলে; তাদের বলা উচিত—পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই প্রকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এ হেন Candide ব্যারণ-কন্যার প্রেমে পড়ে বিতাড়িত হ'ল দুর্গ হ'তে। তার পর বুলগেরিয়ান সৈন্যদের হাতে বন্দী হ'ল সে; দু'বার ছত্রিশ

ঘা করে বেত খেয়ে সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হ'ল—মানুষের ইচ্ছায় স্বাধীনতা ইত্যাদি অজুহাত কোনো কাজেই লাগলো না।

পথে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে আবার তার দেখা হ'ল অধ্যাপক Pangloss-এর সঙ্গে। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অধ্যাপককে বাঁচাল সে, দেখা পেল তার হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়তমার। সেখানেই অধ্যাপকের মুখে শুনল যে শত্রুর আক্রমণে ব্যারণ এবং তাঁর স্ত্রী নিহত হয়েছেন এবং তাঁদের দুর্গ লুণ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপক ছাত্রকে সান্ত্বনা দিলেন, এ রকম না ঘটে উপায় ছিল না, কারণ ব্যষ্টির দুঃখের ফলেই সমষ্টির সুখের সূত্রপাত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য যত ঘটবে, ততই বেড়ে উঠবে সমষ্টির সম্পদ। ছ'ত্র কি বুঝলো কে জানে! অধ্যাপকের সঙ্গে যাত্রী হ'ল এক লিসবনগামী জাহাজে। এবং লিসবনে এসেই বুঝলো যে তার দুর্ভাগ্যের তখনো শেষ হয়নি। ভূমিকম্পে মরতে মরতে বেঁচে গেল সে এবং অধ্যাপক দু'জনেই। অধ্যাপক ও ছাত্র পরস্পরের মধ্যে এ দুর্ভোগের কথা আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় এলেন এক বৃদ্ধা। তিনি ওদের হা-হুতাশ শুনে হেসে বললেন, আমার দুর্ভোগের কাছে তোমরা যা কিছু বললে সব অতি তুচ্ছ। এই নিয়ে শ'খানেক বার আমি জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিতে চেয়েছি, তবুও জীবনকে আমি ভালোবাসি। এই ভালোবাসা বোধ হয় মানুষের এক অতি বিস্ময়কর বিশেষত্ব; তা না হলে দেখ যে বোঝা আমরা সহজেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, তাই কিনা হাসিমুখে দিনের পর দিন বয়ে বেড়াচ্ছি।

এর পর Candide চললো দেশ থেকে দেশান্তরে। প্যারাগুয়েতে দেখল ধর্মযাজকরা সব সম্পদ হস্তগত করে বসে আছে, সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। বিচার ও বিবেচনার এই চরম দৃষ্টান্ত দেখে খুশী হ'ল সে। এক ডাচ উপনিবেশে নিগ্রো ক্রীতদাস তাকে বললে আখ মাড়াইয়ের কলে কাজ করতাম আমি। কলে হাতের আঙুল আটকে গেল, মালিক সারা হাতটা কেটে মুক্ত করলেন আমায়। পালাতে গেলাম, মালিক একটা পা কেটে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন মুক্তির পথ। ফলে আজ এক হাত, এক পা হারিয়ে ভিক্ষে করছি। আমার মত অসংখ্য ক্রীতদাস এই মূল্য দিচ্ছে বলেই তোমরা ইউরোপে বসে পাচ্ছ সস্তায় চিনি খাবার মজা। ঘুরতে ঘুরতে Candide এক গুপ্তধন পেয়ে গেল। এই মহামূল্য মণি-রত্ন নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাবার উদ্দেশে এক জাহাজ ভাড়া করলো সে। জাহাজের চতুর কাপ্তেন মণিরত্ন নিয়ে উধাও হল, বন্দরে একাকী বসে রইল বিপন্ন Candide। শেষে অন্য এক জাহাজে একটু স্থান পেয়ে ফ্রান্সের পথে যাত্রা করলো সে। জাহাজে এক সাধু সন্তের সঙ্গে আলোচনার একাংশ:

Candide বললেন, আপনার কি মনে হয় যে মানুষ চিরকালই আজকের মত পরস্পরকে হত্যা করতো, চিরকালই সে ছিল আজকের মত মিথ্যাবাদী? ইত্যাদি (মানুষের স্বরূপ বোঝাতে কুড়িটা বাছা বাছা বিশেষণ ব্যবহার করেছেন ভলতেয়ার)।

সাধু বললেন, তোমার কি মনে হয় যে বাজপাখী চিরকালই কপোত দেখলে আজকের মতোই মেরে ফেলেছে।

নিশ্চয়ই, উৎসাহিত হয়ে বললে Candide।

হেসে বললেন সাধু, বাজপাখীর চরিত্রের যদি কিছু বদল আজো না হয়ে থাকে, তবে মানুষের হয়েছে এমন ভাববার কারণ কি?

এই ভাবে অনেক দেশ ঘুরলো candide, সঞ্চয় করলো প্রভূত অভিজ্ঞতা। তারপর গল্পের শেষে দেখা যায় সে এসে জুটেছে বাসা বেঁধেছে, জমী চাষ ক'রে করছে জীবিকা নির্বাহ। অধ্যাপক pangloss ও রয়েছেন ছাত্রের পাশে। গল্পের শেষ হচ্ছে অধ্যাপক ও ছাত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে:

অধ্যাপক বলেছেন ছাত্রকে, দেখ, এই অতি মনোরম পৃথিবীতে প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে রয়েছে একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলাময় গতি। কারণ যদি তুমি দুর্গ হতে বিতাড়িত না হ'তে——যদি তুমি পাদ্রীদের বিচারের সম্মুখীন হয়ে জীবন্ত দগ্ধ হতে হতে বেঁচে না যেতে, সারা আমেরিকা ঘুরে না বেড়াতে—তোমার সব ধন-রত্ন অপহৃত না হ'লে—তুমি এই এখানে বাদাম আর শাক খেয়ে জীবনধারণ করতে না। ছাত্র উত্তর দিলে, খুব ভালো কথা বলেছেন, এখন আসুন আমরা বাগান কোপাতে শুরু করি।

দর্শনের দিব্যজ্যোতি

ফ্রান্সের লোক candide এর মতো এক অদ্ভুত রস-সাহিত্য লুফে নিল বলা যায়। যেন এমনি কিছুর জন্যেই উৎসুক হয়েছিল তাদের পিপাসু অন্তর। রিফরমেশন ফ্রান্সের মাটিতে কোনো দাগ ফেলতে পারেনি। ধর্মীয় বিবর্তনের স্রোতে অলস গা ভাসিয়ে চলেছিল ইংলণ্ড ও জার্মেনীর বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু ফ্রান্সে? বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিল ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি। বিশ্বাসের আগুনে, বংশানুক্রমিক সংস্কারের ভিত্তিতে জল ঢালছিলেন, আঘাত হানছিলেন Le Mettrie, Helvetius, Hobbuch আর Diderot র নাস্তিক্য মতবাদ। তাই বোধ হয় প্রাণ খুলে হাসতে পেয়ে আর হাসির মধ্যে কান্নায় শিউরে উঠে Candide কে আন্তরিক আগ্রহে গ্রহণ করলো ফরাসী জনগণ। শুধু তাই নয়, ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবিরাও নূতন প্রেরণায় তাকালো ভলতেয়ারের পানে। ভলতেয়ার প্রথমটা সাড়া দিলেন না। বিচার করতে চাইলেন, যাঁরা ডাকছেন তাঁদের আর তাঁদের প্রচারিত মতবাদকে।

ডাকছিলেন Le Mettrie (১৭০৯—৫১) সৈন্যদলের ডাক্তার Le Mettrie চাকুরী হারালেন Natural History of the Soul লিখে—নির্বাসন বরণ করলেন Man a Machine প্রকাশিত ক'রে। ফ্রেডরিকের নবযন্ত্র-সভায় আশ্রয় মিলল ওই নব-প্রচারকের। Descartes ভয়ে যে পথ ছেড়ে পালিয়েছিলেন সেই ক্ষুরধার পথ ধরলেন তিনি। বললেন, বিশ্বের সব কিছু এমন কি মানুষ পর্যন্ত যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আরো বললেন—The soul is material and matter is soulful। তারপর ব্যাখ্যা করলেন যে সব কিছু সংজ্ঞা বাদ দিয়েও দেখা যাচ্ছে আত্মা এবং দেহের পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া, একের বৃদ্ধিতে অপরের বৃদ্ধি, একের বিলুপ্তিতে অপরের বিলুপ্তি। এর পর আত্মা ও দেহের সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহই থাকে না। যারা বলে যে আত্মা অক্ষয় ও অব্যয়, দেহ হ'তে তা ভিন্ন, তারা ভুলে যায় যে অন্তরের উল্লাস দেহকে উত্তপ্ত করে এবং দেহ উত্তপ্ত হ'লে মন চঞ্চল হয়। একই বীজ থেকে বস্তু ও পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট হয়েছে এই বিশাল বস্তুজগত। প্রাণীদের বুদ্ধি আছে বৃক্ষের নাই।

তার কারণ খাদ্যের জন্য প্রাণীরা ইতস্ততঃ বিচরণ করে কিন্তু বৃক্ষেরা স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে যা পায় তাই দিয়েই জীবন ধারণ করে। প্রাণীদের মধ্যে মানুষ সব চেয়ে বুদ্ধিমান, তার কারণ মানুষের অভাব অসংখ্য এবং তা মেটাবার জন্য তার গতি সর্বত্র। যে বস্তুর অভাব নেই তার মনও নেই।

La Mettrie নির্বাসিত হ'লেন কিন্তু তাঁরই প্রচারিত তত্ত্বের ভিত্তিতে On Man লিখে Helvetius পেলেন প্রচুর অর্থ এবং অজস্র সুনাম। Helvetius বললেন, মানুষের সব কাজের উৎস হচ্ছে আত্মপ্রেম এবং যাকে আমরা সদ্‌গুণ বলি সেও ওই আত্মপ্রেমের আয়নায় মুখ দেখে আনন্দিত হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। বিবেকের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্বন্ধ নেই; যা আছে তা হচ্ছে পুলিশের ভয়। বাড়ীতে, স্কুলে, খবরের কাগজে দিনের পর দিন বাধা-নিষেধের বিষ পান করতে হয় মানুষকে। বয়সে বাড়লেও মনের কোণে সেই বিষের তলানিটুকু থেকেই যায় আর তার বাষ্প মাঝে মাঝে উৎসারিত হয় বিবেকের রূপ ধ'রে অমাড়ম্বর ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে, সৎ যা কিছু তার সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়। বিচার করতে হবে সামাজিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তবেই লাভ করা যাবে প্রকৃত সত্যকে।

Denis Diderot (১৭১৩-৮৪) কে এই গোষ্ঠীর নেতা বলা যায়। Diderot নিজে খুব বেশী লেখেননি। তাঁর মতামত আছে নিজের টুকরো টুকরো লেখায় আর তাঁরই পৃষ্ঠপোষক Baron d' Holbach (১৭২৩-৮৯) এর System of Nature। Holbach বললেন—আদিম ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অজ্ঞানতা আর ভয় থেকেই ঈশ্বরের জন্ম। খামখেয়ালীপনা, আত্মোৎসাহ আর চাতুর্য কখনো মানুষকে ঈশ্বরের কৃপায় আবার কখনো বা তাঁর মুখে কালি মাখানোয় তৎপর করেছে। যুগে যুগে মানুষের দুর্বলতা ঈশ্বরের পূজার খোরাক জুগিয়েছে, অন্ধ বিশ্বাস তাঁর আসন স্থায়ী করেছে, সংস্কার এনেছে প্রণামীর নৈবেদ্য আর অত্যাচারীর স্বার্থ তাঁকে দিয়েছে মর্যাদার আসন। এই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়ে Diderot বললেন—একনায়কত্বের অত্যাচারে আত্মসমর্পণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস, এবং মানুষ ততক্ষণ প্রকৃত মুক্তির স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না পৃথিবীর শেষ যাজকের অন্ত্র দিয়ে তৈরী রজ্জুতে ফাঁসি হবে পৃথিবীর শেষ রাজার। স্বর্গকে না ধ্বংস করলে উপভোগ করা যাবে না পৃথিবীর মাটির মাধুর্য। বিশ্ব-রহস্যের অনেক কিছুই বস্তুতান্ত্রিকতা দিয়ে বিচার বা বিশ্লেষণ করা যায় না ঠিকই। কিন্তু এর চেয়ে ভাল হাতিয়ার যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ একেই চার্চকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইতিমধ্যে অবশ্য করতে হবে জ্ঞান আর শিল্পের প্রসার। শিল্পের মাধ্যমে আসবে শান্তি আর জ্ঞান মানুষকে দেবে নূতন জীবনের সন্ধান।

উপরোক্ত ভাবধারাকে সঞ্চারিত করার কাজে লাগলেন Diderot আর d' Alambert। ১৭৫২ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল বিরাট কোষ-গ্রন্থ Encyclopedie। প্রথম খণ্ড বার হ'তেই পাওয়া গেল চার্চের বিরুদ্ধতা। বাজেয়াপ্ত হ'ল প্রথম খণ্ড। বাধা আরো তীব্র হ'তে স'রে দাঁড়ালেন তাঁর বন্ধু আর পৃষ্ঠপোষকের দল। Diderot কিন্তু দমবার পাত্র নন। ক্রোধে, ক্ষোভে গর্জন করে উঠলেন তিনি, যুক্তির বিরুদ্ধে এই ধর্মীয় অনুশাসনের জেহাদ-এর চেয়ে অসভ্যতা আর কি হ'তে পারে? এই বিরুদ্ধবাদীদের কথা শুনতে শুনতে মনে হয় যে পশুর দল যেমন আস্তাবলে ঢোকে তেমনি নীরবে নতশিরে যেতে হবে ঈশ্বরের কোলে, এ ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনো পথ নেই। দিনের পর দিন প্রতিবাদ জানিয়ে চললেন Diderot। শোনালেন যে মানুষের বিচার-বিশ্লেষণের নিক্তিতেই হবে যা কিছু সৎ আর সুন্দর। বুদ্ধির বেলুনে চ'ড়ে ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন Diderot। কিন্তু তিনি জানতেন না যে সেই বেলুন ফেঁসে সব স্বপ্ন শীঘ্র মিলিয়ে যাবে। Diderotই রুশোকে (১৭১২—৭৮) প্যারিসের সমাজে পরিচিত করিয়েছিলেন। সেদিন কিন্তু তিনি ভাবতেই পারেননি যে সেই রুশোই একদিন এক নিশ্বাসে নস্যাৎ ক'রে দেবেন বুদ্ধির, যুক্তির জয়যাত্রা। দর্শনের রাজ্যে নূতন বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পাননি Diderot, চিনতে পারেননি রুশোকে, ভাবতে পারেননি প্যাশের প্রাশিয়ার ইম্যানুয়েল কাণ্টের অভ্যুদয়।

শেষ পর্যন্ত এই নবীন সম্প্রদায়ের এই Encyclopedistদের ডাকে সাড়া দিলেন বৃদ্ধ ভলতেয়ার। সহজেই এবং সানন্দে নেতার আসন গ্রহণ করলেন ভলতেয়ার। নবীনদের সব মতের সঙ্গে মিল না থাক, তবু নব-জীবনের এই যজ্ঞে সাধ্যমত আহুতি দিতে বাধা কি? বেশ কিছুদিন অশ্রান্ত বেগে বয়ে চললো ভলতেয়ারের দুর্দান্ত কলম, সমৃদ্ধ হ'ল কোষ-গ্রন্থের একাধিক খণ্ড।

কোষ-গ্রন্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে ভলতেয়ারের মনে জাগলো নূতন
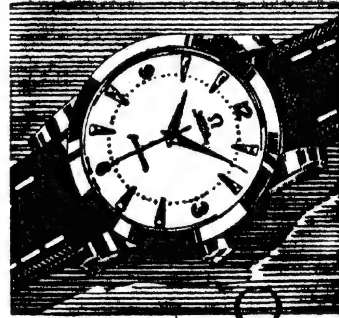
ফলের বীজ। কোষ-গ্রন্থের লেখা শেষ ক'রে তিনি চাইলেন এই ফলকে রূপায়িত করার কাজে, বীজকে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ বৃক্ষের পূর্ণতায় পৌঁছে দেবার সাধনায়। সৃষ্টি হ'ল Philosophic Dictionary। অভিধানে বর্ণানুক্রমিক বিষয়ের পর বিষয় সাজিয়ে লিখলেন ভলতেয়ার, উজাড় করে ঢেলে দিলেন তাঁর জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অফুরন্ত ভাণ্ডার। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে বিভিন্ন বিষয়ের লেখক মাত্র একজন এবং যা তিনি লিখেছেন তার প্রত্যেকটি ক্লাসিক পর্যায়ের ; সব মিলিয়ে সারবস্তুর সঙ্গে সৌন্দর্যের এক আশ্চর্য রসঘন সমন্বয়। Philosophic Dictionaryর স্রষ্টা ভলতেয়ার এইবার আভাসিত হলেন প্রকৃত দার্শনিকের মহিমায়।

বেকন, দেকার্ত এবং লকের মত দার্শনিক ভলতেয়ারেরও যাত্রা শুরু, সন্দেহের চশমা পরে, পরিষ্কার স্লেট হাতে নিয়ে। পুরাতন যা কিছু সব বাতিল করে দিয়ে নূতনের অনুসন্ধানই হল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর অভিধানে অজ্ঞানতা শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন কি করে আমি তৈরী হলাম, কেমন করে আমি জন্মালাম, তা কিছুই জানি না। জীবনের এক-চতুর্থাংশ কাল আমি জানতাম না আমার দৃষ্টি, শ্রবণ ও অনুভব শক্তির উৎস কোথায়—লোকে যাকে বস্তু বলে তা আমি দেখেছি, দেখেছি বিরাট লুব্ধক নক্ষত্রের গঠনে, দেখেছি অনুবীক্ষণের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম অ্যাটমের অস্তিত্বে ; কিন্তু জানি না, সত্যি এই বস্তু কি।

এর পর আছে তাঁর সৎ ব্রাহ্মণের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। ব্রাহ্মণ বললে আমার মনে হয় জন্ম না নেওয়াই ভালো ছিল।

কেন ? আমি শুধোলাম।

কারণ, ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, চল্লিশ বছর জ্ঞানার্জনের পর দেখছি যে এই দীর্ঘ সময় বৃথা চলে গেছে। পঞ্চভূতের সমষ্টি আমার দেহ কিন্তু আমার চিন্তার উৎস যে কোথায়, আজো তা ঠিক মতো বুঝতে পারলাম না। হাঁটা বা হজমের মতো আমার বোধশক্তির কি একটা সাধারণ জৈব প্রক্রিয়া ? হাত দিয়ে যেমন আমি জিনিষ ধরি ঠিক তেমনি কি মস্তিষ্ক দিয়ে আমি চিন্তা করি ? কত কথাই না বলি কিন্তু কথা শেষ হলেই যা বলেছি তার জন্যে বিস্মিত ও লজ্জিত হই।

সেই দিনই আমার সেই ব্রাহ্মণের প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হল। আমি তাঁকে শুধোলাম, আপনার আত্মা কি দিয়ে গঠিত জানেন না বলে কি আপনি কখনও অসুখী হয়েছেন ? বিস্মিত চোখ মেলে চেয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা ; তিনি আমার প্রশ্নের অর্থই বুঝতে পারেন নি। বোঝা গেল যে, যে প্রশ্ন নিয়ে ব্রাহ্মণ সারা জীবন মাথা খুঁড়ছে, সেই প্রশ্ন এই বৃদ্ধার মনে এক মুহূর্তের জন্য কোনোদিন উদয় হয়নি। ভগবান বিষ্ণুর প্রতি অচলা ভক্তি নিয়ে বেঁচে আছেন তিনি, পবিত্র গঙ্গাজলে ঠাকুরপূজাতেই তাঁর পরম আনন্দ। এই অতি সামান্য এক বৃদ্ধার এমন আনন্দমধুর জীবন দেখে আশ্চর্য হলাম আমি। তখুনি ব্রাহ্মণের কাছে ফিরে গিয়ে বললাম। এই নৈরাশ্যের জন্য আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত, কারণ আপনারই বাড়ীর পঞ্চাশ গজ দূরে এক বৃদ্ধা রয়েছেন যিনি চিন্তার ধার দিয়েও যাননা অথচ কেমন সুখে জীবন যাপন করছেন।

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, আপনার কথাই ঠিক। আমি জানি যে, ওই বৃদ্ধার মতো অজ্ঞ হলে আমিও সুখী হতে পারতাম। কিন্তু ঠিক ওই ধরণের সুখ আমার কাম্য নয়।

ব্রাহ্মণের এই মন্তব্য আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

ভলতেয়ার এই সূত্র ধরে এগিয়ে বার বার বলেছেন যে দর্শন যদি Montaigneএর আমি কতটুকু জানি ? এই প্রশ্নেই শেষ হয় তাতেও ক্ষতি নেই, তাই হবে জ্ঞানের রাজ্যে মানুষের বৃহত্তম এবং মহত্তম অভিযান। আরও বললেন তিনি—বিজ্ঞান কোন পথে যাবে মনীষী বেকন তা নির্দেশ করেছেন—তারপর এলেন দেকার্ত এবং যা তাঁর করা উচিত তা না করে করলেন ঠিক উল্টোটা অর্থাৎ প্রকৃতিকে অনুশীলন না করে করলেন তার আরাধনা, এই সব মহা মহা পণ্ডিতজ্ঞরা দর্শনকে রোমান্সে পরিণত করলেন। আমাদের কাজ হচ্ছে বিচার বিশ্লেষণ করা, সব কিছুকে নিক্তির ওজনে মেপে নেওয়া, সব কিছুকে দেখা এবং হৃদয়ঙ্গম করা, এই হচ্ছে প্রাকৃতিক দর্শনের ভিত্তি ; এ ছাড়া আর যা কিছু সব শুধুই মরীচিকা।

[ক্রমশঃ।

জন্মকাল

শ্রীআশীষকুমার দাস

কবে যে জন্মেছিলাম :
কিছু আলো আর অন্ধকার মিশে-থাকা
গাঢ় রজনীতে, সে দিনের কথা—
মন থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে গেছে।

কোন এক ফাল্গুনের রূপসী বিকেলে
আকাশে রামধনু রঙ!
পাখী হয়ে উড়ে উড়ে
মুঠো মুঠো আবীর রাঙায় ;
অথবা,
পৌষের কোন শীতের সন্ধ্যায়
স্নিগ্ধ হেসে ম্লানমুখে
বিদায়ের সুর তোলে গানে,

কিংবা—
কোন বিকেল—সকাল আর গোধূলি-বেলায়
নিজেকে প্রথম দেখে
হাসি-হাসি মুখ তুলে তাকিয়েছিলাম ?
আমার বিশ্বাস বরং
অগ্নিঝরা বৈশাখের তপ্ত কোন
দুপুরের কঠিন ছায়ায়
আমার জীবনলেখা হয়েছিল শুরু।

তাই আমি আগুনের শিশুর মতন
যত সব জরাগ্রস্ত জীবনধারাকে
পুড়িয়ে পুড়িয়ে নতুন সৃষ্টির নেশায়
উত্তাপিত হয়ে গেছি।

পত্রগুচ্ছ
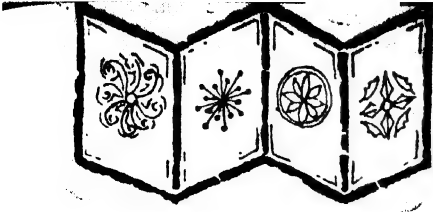
রাজা রামনারায়ণের ঐতিহাসিক পত্রাবলী

[মর্মান্তিক পলাশীর যুদ্ধের ঠিক সমসাময়িক কাল—বাংলা ও ভারতে নবাবী ও বাদশাহী আমলের চলেছে তখন পতনের যুগ। জাতীয় দুর্বলতার ছিদ্র ধরে ইংরেজ ক্ষমতা বিস্তারের জোর আয়োজন ও ষড়যন্ত্র চালিয়েছে সে সময়টিতে। এই মহাসন্ধিক্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক চরিত্র রাজা রামনারায়ণ। ইনি ছিলেন বিহারের বিচক্ষণ সহ-সুবাদার ১৭৫২ সাল থেকে ১৭৬১ সাল পর্য্যন্ত। বাংলার নবাব-বাহাদুরের অধীনে তাঁর এই গুরুদায়িত্ব পালনকালে দিল্লীর শাহজাদা (শাহ আলম) তিন তিনবার বিহারে আক্রমণ চালান। প্রকাণ্ড সংগ্রামে দলবল নিয়ে শাহজাদাকে বাধা দিতে পিছপাও হননি বীর রামনারায়ণ সেদিনে। দুই শতক আগেকার এই ঘটনাবলীর প্রামাণ্য বিবরণ আজও সম্যক্ উদ্ধার হয়েছে, দাবী করা চলে না। রাজা রামনারায়ণ প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র হ'তে শাহজাদার আক্রমণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে নবাব-বাহাদুর ও অপরাপর পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে যে পত্রালাপ করেছিলেন, প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধানে এই চিঠিগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ। সব কয়টি পত্র (মূল ফার্সিতে লিখিত) পূর্ণাঙ্গ উদ্ধার না হলেও এবং বিবরণ স্থানবিশেষে অসংলগ্ন ঠেকলেও এ সকলের মূল্যমান ও গুরুত্ব কিছুমাত্র অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ রাজা রামনারায়ণের আলোচ্য ঐতিহাসিক পত্রগুচ্ছেরই কয়েকখানি (বাংলা অনুবাদ) নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গ-বিহার তথা ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই দুষ্প্রাপ্য দলিল বা পত্রাবলী এক উজ্জ্বল আলোকপাত করবে। এই অমূল্য তথ্যরাজি 'বেঙ্গল : পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট'-এর সকলনবিশেষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।—সম্পাদক]

জগৎ শেঠ ও মহারাজা দুর্লভরামকে লিখিত পত্র

"শাহজাদা (১) সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য পূর্ব্বেই জ্ঞাপন করা হইয়াছে, বিস্তৃত বিবরণ ব্যাঙ্কিং কার্য্যের এজেন্ট সরবরাহ করিবেন। গত কিছুকাল হইতেই আমি মাননীয় নবাব বাহাদুরের (মীরজাফর) নিকট শাহজাদা সম্পর্কে সংবাদ পাঠাইতেছি। নবাব বাহাদুর যথারীতি এই একটি মাত্র জবাব লিখিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন যে, সংবাদটি পাওয়া গিয়াছে। শাহজাদা ইতোমধ্যে বারাণসীর সন্নিকটে (২) পৌঁছিয়াছেন এবং তিনি বিহার ও বাংলা দখল করিতে বদ্ধপরিকর। এলাহাবাদে নবাব মহম্মদ কুলী খাঁ তাঁহার উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং তিনি অগ্রগামী সেনাদলের নেতৃত্ব দিতেছেন। আজিমাবাদের (পাটনা) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিকট পত্রাদি প্রেরণ করা হইয়াছে। এখন সময় খুবই কম, এই অবস্থায় উক্ত পরিস্থিতির হাত হইতে কি ভাবে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে সামান্য লোক হিসাবে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। আমার বিভিন্ন প্রশ্ন—অর্থাভাব, সৈন্যবাহিনীর বকেয়া পাওনা এবং ক্রমবর্দ্ধমান রাজস্ব অনাদায় সঙ্কট, এই সকল সম্পর্কে আমি কি লিখিব ? পুরুষানুক্রমিক ধারায় আমি নবাব বাহাদুরের নফর (৩) আপনারা ছাড়া আমাকে দেখিবার শুনিবার আর কেহ নাই। অনুরোধ, এই মুহূর্ত্তে যাহা কিছু করা স্থিরীকৃত হইবে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় লিখিয়া জানাইবেন।"

মহম্মদ আমিন বেগ খানের (৪) নিকট লিখিত পত্র

"এক মাস হইল শাহজাদার অগ্রগমন সম্পর্কে আমি নবাব বাহাদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইতেছি। এখন পর্য্যন্ত কোন সাহায্য আসিয়া পৌঁছায় নাই। এই স্থানের অবস্থা আপনার কাছে অজ্ঞাত নাই কিছুই। আজ আমি এই গোপন বার্ত্তাটি পাইয়াছি যে, এই স্থানের সন্নিকটে শাহজাদা আসিয়া গিয়াছেন। এবং তিনি দাউদ নগরের (৫) দিক হইতে আগাইয়া আসিতেছেন। পালোয়ান সিংহ তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন। এই অবস্থাধীনে কি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। নবাব বাহাদুর, নবাব নাসিরুল মুলক বাহাদুর (মীরণ) এবং সবিত জং কর্ণেল ক্লাইভের নিকট হইতে পত্র পাইয়াছি। আমি যেন শাহজাদাকে বাধা দেই, ইহাই তাঁহাদের পত্রের মর্ম। কারণ, নবাবরা এই দিকে নিশ্চয়ই দ্রুত আগাইয়া আসিবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহারা ইতোমধ্যে মুর্শিদাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। সামান্য লোক আমি, আমার হেফাজতে যে অল্প সংখ্যক সৈন্য আছে, এই লইয়া তাঁহার প্রায় ১০।১৫ হাজার লোকের বিরুদ্ধে কি ভাবে আমি সংগ্রাম দিব, জানিনা। শাহজাদার কাছে কোন

(১) শাহ আলম।

(২) শাহজাদা বারাণসীর নিকট মোগলসরাই পৌঁছেন ১লা রজব তারিখে (মার্চ্চ, ১৭৫৯)। রাজা বলবন্ত সিংহের এজেন্ট তাঁকে ১০১টি সোনার মোহর উপহার দেন।

(৩) আলিবর্দী ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাইবাত জং (সিরাজউদ্দৌলার বাবা)—এঁরাই রামনারায়ণ ও তাঁর পরিবারের উন্নতির জন্য দায়ী।

(৪) মীরণের মাতুল ও মীরজাফরের শ্যালক। ১৭৫৭ সালে ইনি ছিলেন রামনারায়ণের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। শাহ আলমের সাথে মীরণের সংগ্রামকালে (২৩-১-১৭৬০) ইনি নিহত হন।

(৫) ১২ই রজব তারিখে শাহজাদা দাউদনগরে পৌঁছেন।

কোন নাই। অথচ লোকেরা প্রত্যহ অধিক সংখ্যায় তাঁহার চারিপাশে জমা হইতেছে—মনসব, জায়গীর, টঙ্কা (ভাতা) পাইবে, এই আশায় বর্তমান সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট নাগরিকগণ সুবিচার ও সাম্য নীতি উপেক্ষা করিয়া গোপনে অপর পক্ষের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। মরণ খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, একণে আর সময় নাই। যাহাই ঘটুক, সেই ঝুঁকি আমাকে নিতেই হইবে। আপনি (মান্যবর) আমার শুভাকাঙ্খী ও দরদী। নবাব বাহাদুরের নিকট গোপনে কিংবা খোলাখুলি ভাবে, এই মুহূর্তে যাহা করা আপনি ভাল মনে করেন, সেইমতে অনুগ্রহপূর্ব্বক লিপি পাঠাইবেন। নবাব বাহাদুরকে এই অধমের পক্ষ হইতে এই লিখিতে অনুরোধ করিব যে, বাংলার সুবাদার হিসাবে তাঁহার নিরাপত্তা ও ভাবিষ্য বিহার প্রদেশ দখল রাখার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ঈশ্বর না করুন, আমি অনেক অশুভ লক্ষণ দেখিতেছি। ভয়ানক চঞ্চল মন লইয়া আমি এই কয়েকটি ছত্র লিখিলাম। কেননা, আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন আশা নাই। আপনার বাড়ীতে (৬) সকলেই বেশ ভাল আছে—তাহাদের সুখ-সুবিধার ব্যাপারে আমি সর্ব্বদাই বিশেষ নজর রাখিতেছি। আপনি শীঘ্রই এইদিকে আসিতে পারেন, এই আশায় সরকারের নায়েবের নিকট হইতে কিস্তির পাওনা দাবী করিতে বিরত রহিয়াছি।"

বলবন্ত সিংহের (৭) নিকট লিখিত পত্র

"আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছি। পত্রের বিবরণ অনুসারে আপনি এখনও আপনার পূর্ব্বলিখিত পত্রসমূহের উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। আবশ্যক বিষয়ে আপনি রাজা বেণী বাহাদুরকে লিখিয়াছেন এবং তিনি নবাবের (সুজাউদ্দৌলা) নিকট সৌহার্দ্দপূর্ণ ভাবায় নিজের একখানি পত্র সহ আর্জি (আবেদন) পাঠাইয়াছেন। অবগতি জন্য আমার কাছে এই সকলের প্রতিলিপি প্রেরিত হইয়াছে। আমি যেন উপযুক্ত জবাব দেই, সেজন্যও লিখিয়াছেন। এও জানাইয়াছেন যে, মহম্মদ কুলী খাঁকে ধরা হইয়াছে এবং রাজা তাঁহাদের সুজাউদ্দৌলার (৮) নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সশস্ত্র বাহিনী ও মালপত্র আটক করা হইয়াছে এবং তিনি বলিতে গেলে শেষ হইয়া গিয়াছেন। আমি যাহা প্রয়োজন মনে করিব, কার্য্য-ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অবিলম্বে যেন সে সম্পর্কে আপনাকে লিখিয়া জানাই, ইহাও আপনার বক্তব্য। সহৃদয় বন্ধু! রাজা বেণী বাহাদুরের পত্র এবং সেই সঙ্গে আপনারটিও আমার প্রভুর (মীরণ) নিকট পেশ করিয়াছি। সম স্বার্থের কথা পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইয়াছে। সেই পত্র ও জবাবের নকল আপনার নিকট পাঠানো হইতেছে এবং এই সঙ্গে আপনার নামীয় একখানি পরোয়ানাও আপনি পাইবেন। ইহার পূর্ব্বে আমার প্রভুর পত্র এবং আমার একখানি পত্র আপনার নিকট হরকরা মারফত প্রেরিত হইয়াছে এবং ইত্যবসরে সেগুলি আপনার নিকট অবশ্য পৌঁছিয়া থাকিবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁহারই বিধান অনুসারে এই পক্ষের ও আপনার পক্ষের আগ্রহ—দুই-এর বিনিময় সম্ভব হইয়াছে। একণে আপনার বন্ধু হিসাবে আমি পলাতকদের সন্ধানে এবং পালোয়ান সিংহকে দমনের জন্য আমার প্রভুর দলবল লইয়া সীমান্তে পৌঁছিয়াছি। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যাইবে। শাহজাদার সন্ধানে সরকারের সৈন্য সামন্ত পাঠানো হইতেছে—শাহজাদা জমানিয়ার পথ ধরিয়াছেন। পথে বাধা সৃষ্টি করায় খুব সম্ভব তিনি গাজীপুরে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হন নাই। আপনি আমার বন্ধু, ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই যুগের আপনি একজন শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ ব্যক্তি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, দুই প্রদেশের সীমান্ত এলাকায় এইরূপ একদল লোকের অবস্থান খুবই অবাঞ্ছিত। সুতরাং অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন, সেইভাবে ঐক্য ও বন্ধুত্বের ভিত্তি যাহাতে দৃঢ় হইতে পারে এবং অবিশ্বাস ও সন্দেহের এতটুকু অবকাশ থাকিবার সুযোগ যাহাতে না হয়, সেইজন্য সর্ব্বাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় রাজাকে (বেণী বাহাদুর) অবহিত করিবেন। আপনার অপূর্ব্ব গুণাবলীতে ও আন্তরিকতায় আপনি আমাকে ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। বন্ধুত্বের জন্য যাহা প্রয়োজন, আপনার দিক হইতে তাহা করা হইয়াছে। আপনার সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করিতে আমি বিশেষ ব্যাকুল। রাজা সাহেবের (বেণী বাহাদুর) নিকট লিখিত পত্রে ও আমি একই মানোভাব প্রকাশ করিয়াছি।"

রাজা বেণী বাহাদুরের নিকট লিখিত পত্র

"প্রণাম নিবেদনান্তে এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎকারের আন্তরিক আগ্রহ জ্ঞাপনপূর্ব্বক আপনাকে এই পত্রখানি লিখিতেছি। আপনি কিছুকাল আগে অনুগ্রহ করিয়া আপনার বারাণসীতে আগমন সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন। আপনার ও লালা গোলাব রায়ের (৯) মধ্যে যে অন্তরের নিবিড়তা ও বন্ধুত্ব রহিয়াছে, তাহার দরুণ এবং আমার প্রাণাধিক প্রিয় রায় বসন্ত রায়ের সহিত আমার সম্পর্কের আপনি যে মূল্য দিয়া থাকেন, সেই হেতু এমনটি হইয়া থাকিবে। আমার উপর আপনার বিশেষ ভালবাসা আছে, ইহা আমি সব সময়ই বিশ্বাস করি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই (এবং আশা রাখি) নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত নিবিড়তা ও বন্ধুত্বের ভিত্তি যেন দৃঢ়তর হয়। আপনি আমায় কথা দিয়াছিলেন যে, ফিরিয়া যাইয়া আপনি এই কাজটি করিবেন। এখন আপনি ফিরিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস করির যে, বন্ধু হিসাবে আপনি নবাব সাহেবের (সুজাউদ্দৌলা) নিকট যেভাবে ভাল মনে করেন আমার নিবেদনটি জ্ঞাপন করিবেন। আমার প্রভু ও মনিব (মীরণ) ফিরিয়া যাইতেছেন। তিনি হাজার হাজার অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য দিয়া রহম খানের (১০) সহিত আমাকে এই জেলায় রাখিয়া গিয়াছেন। পালোয়ান সিংহের ব্যাপারটি

---

(৬) এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মহম্মদ আমিন খাঁর আদি নিবাস ছিল পাটনায়।

(৭) বারাণসীর রাজা।

(৮) অযোধ্যার নবাব।

(৯) ইনি লক্ষ্ণৌ-এর অধিবাসী ছিলেন। রাজা রামনারায়ণের একমাত্র কন্যা ময়না বিবির স্বামী বসন্ত রায় এঁরই পুত্র।

(১০) মানসুরপুরের যুদ্ধে দল থেকে বার হয়ে শাহ আলমের পক্ষে ইনি যোগ দিয়েছিলেন।

যাহাতে চুকাইয়া ফেলি, ইহাই তাঁহার ব্যবস্থার লক্ষ্য। নবাব সবিৎ জং বাহাদুরও (ক্লাইভ) চলিয়া গিয়াছেন এবং প্রতিনিধি হিসাবে উল্লিখিত নবাবের একজন ভাই মীরওয়াজিরকে (?) এখানে রাখা হইয়াছে। এই মীরওয়াজির হেফাজতে আছে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইলে পালোয়ান সিংহের ব্যাপারটা আমি শেষ করিয়া ফেলিব। নবাব সাহেব (সুজাউদ্দৌলা) আমাকে আশা দিয়েছেন এবং তাঁহার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাসও আছে। আপনার সহযোগিতার উপরও আমি নির্ভর করি।"

মীরণের নিকট লিখিত পত্র

(ক) "ইতিপূর্বে হুজুর রাজা বলবন্ত সিংহ মারফত রাজা বেণী বাহাদুরের পত্রের উত্তর দিয়াছেন, বেণী বাহাদুর তাহা হুজুরের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবশতঃ নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট পেশ করিয়াছেন। নবাব পারস্পরিক স্বার্থ ও অন্তরের মিলিত্তা হেতু বেণী বাহাদুর মারফত দুইখানি খরিতা (প্যাকেট) পাঠাইয়াছেন—একটি মহামান্য নবাব বাহাদুরকে লিখিত—এবং অপরটি হুজুরকে লিখিত। রাজা বেণী বাহাদুরের উৎচালক উত্তর পাইবার আশায় রাজা বলবন্ত সিংহের নিকট অবস্থান করিতেছে। হুজুর অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে খরিতাটির উত্তর পাঠাইবেন। তাহাতে এই কথাটি যেন জানাইবেন যে, মাক্তবর নবাব বাহাদুরের নিকট লিখিত পত্রখানি মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইতেছে। এবং সেখান হইতে যে উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা যথাসময়ে প্রেরিত হইবে। নবাব সুজাউদ্দৌলা বাহাদুর চিঠিপত্র আদান-প্রদান ব্যাপারে তৎপরতা দেখাইয়াছেন এবং হুজুরের পক্ষেও উপযুক্ত উত্তর দেওয়া সমীচীন হইবে। রাজা বেণী বাহাদুরের নিকট দয়া করিয়া বিস্তারিত লিখিবেন।"

(খ) "রাজা বেণী বাহাদুরের নিকট হুজুরের নফর হিসাবে আমি কি লিখিয়াছি, তাহা সবই অবহিত আছেন। নবাব সুজাউদ্দৌলাকে পত্রের বিবরণ তিনি পড়াইয়া শুনাইয়াছেন। উক্ত নবাব আপনার নফর আমাকে যে রুক্কা পাঠাইয়াছেন, সেইটি রাজা বেণী বাহাদুরের খামে হুজুরের নিকট পাঠানো হইতেছে। আপনার নফর এই রুক্কার উত্তরের মুসাবিদা কি ভাবে করিবে, হুজুর অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। হুজুরের পক্ষে কমনীয় ভাষায় একটি পরোয়ানা লিখা প্রয়োজন। প্যাকেটের প্রাপ্তি স্বীকারের সহিত আপনি রাজা রামনারায়ণের নিকট হইতে সব জানিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সেই কথাটি যেন থাকে।"

ধীরাজনারায়ণকে (১১) লিখিত পত্র

(ক) "এর আগে আমি তোমাকে এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, জানাইয়াছি। তোমার পত্রের উত্তরও আমি পাঠাইয়াছি এবং সে সব নিশ্চয়ই তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে। শোণ নদী পার হইয়া আসিয়া আমি রাজপুরে অপেক্ষা করি। কুখ্যাত পালোয়ানের বাসভূমি এই রাজপুরেই। পরদিন ভোরবেলা নোখায়(১২) তাহার কদর্য হাভেলি (বাসস্থল) অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যাই। এইখানে লুঠতরাজ চালান হয়। পরের দিন সকালে অর্থাৎ আজ রমজানের ৭ই তারিখ, শনিবার, আমি সাসারামে পৌঁছিয়াছি এবং সেলিম সাহ দীঘির সন্নিকটে তাঁবু পাতিয়া অবস্থান করিতেছি। নবাব নাসিরুল মুলক বাহাদুর এখনও নোখায় আছেন। তবে খুব শীঘ্র তিনি এখানে আসিবেন, আশা করা যায়। আমরা যখন একত্র হইবে, তখন যাহা কিছু স্থিরীকৃত হইবে, তাহাই কার্য্যকরী করা হইবে। শত্রুপক্ষের অবস্থা সম্পর্কে এই বলা যায় যে, শাহজাদা যখন সব দিক হইতে হতাশ হন, সেই সময় তিনি পালোয়ান সিংহের গৃহে যান এবং চার সহস্র টাকা প্রাপ্ত হন। এখন তিনি জমানিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন এবং গাজীপুরে যাওয়ার বিষয় ভাবিতেছেন। পালোয়ান সিংহ মাকৃরিকো-এ রাজা অমর সিংহের (১৩) আশ্রয় নিয়াছেন কিন্তু মনে হইতেছে অমর সিংহ ও রাজরূপ তাঁহাকে আর রাখিতে নারাজ। আমি তাঁহাদের নিকট পরোয়ানা পাঠাইয়াছি এবং আশা করিতেছি যে, দুই এক দিনের মধ্যে তাঁহারা এখানে পৌঁছিবেন। বাবু গিরিজা সিংহের সহিত সংশ্লিষ্ট মাধল সিংহ চৌবে পালোয়ান সিংহের যে পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার (পালোয়ান) শয়তানী মৎলব স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই প্রতিলিপিটি তেলিনথাসের পুলিস ঘাঁটিতে খুলিয়া দেখা হইয়াছে। মূল পত্রটি তাহার নিজের বিশ্রী হাতে লেখা—পার্সীতে লিখিয়া উহার একটি নকল তোমার নিকট পাঠানো হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে লোকটি কত নির্লজ্জ এবং তাঁহার মৎলব কি। দুই তিন দিন আমি এখানে থাকিবার প্রস্তাব করিতেছি। এর পর আমি কোথায় যাইব, সেই সম্পর্কে পরবর্তী ডাকে তোমার সব বিজ্ঞাপিত করা হইবে। আমার জীবনের চেয়ে তোমার মূল্য বেশী—সব সময় তুমি নিজের উপর নজর রাখিয়া চলিও। মানের ও নহবত অভিমুখে অশ্বারোহী দুইজন চৌকিতে পাঠাইয়া দিবে। পথিক ও পর্য্যটকদের চলাচল প্রশ্নে উক্ত দুইটি স্থানের উপর অবশ্য কড়া নজর রাখিতে হইবে। প্রত্যহ অভিযান চলিতেছে বলিয়া আমার মেজাজ ঠিক নাই—মেজাজ ঠিক না থাকার আর একটি কারণ অত্যধিক সূর্য্যতাপ।"

(খ) "রমজানের ১৫ই তারিখ, বুধবার সকালবেলা এখন। সাসারাম হইতে আমি যাইতেছি জাহানাবাদে। অভিশপ্ত পালোয়ান এখন পর্য্যন্ত মাকরিতেই আছেন এবং তিনি ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতেছেন। রাজা বলবন্ত সিংহ ও রাজা বেণী বাহাদুর বর্ত্তমানে রামনগরে (বারাণসী) আছেন—তাঁহারা এই অধমের নিকট এবং আমার প্রভু ও মনিব নসিরুল মূলক বাহাদুরের নিকট আন্তরিকতাপূর্ণ লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। রায় বসন্ত রায়ের(১৪) উপর ভালবাসা হেতু বেণী বাহাদুর কার্য্যক্ষেত্রে খুব উদারতা দেখাইতেছেন। রায় বসন্ত রায়

(১১) রাজা রামনারায়ণের ভাই, পাটনায় রামনারায়ণের সহকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(১২) এটি আরার (সাহাবাদ) ভাবুয়া মহকুমার অন্তর্গত। ১১৭৩ সালের রমজান মাসে (১৭৬১ সালের এপ্রিল) এই অভিযান চলে।

(১৩) মীরণ, কর্ণেল ক্লাইভ ও রামনারায়ণের অভিযানে ভোজপুর জমিদারদের অনেকেই ভীতত্রস্ত হয়ে পড়েন, এমনটি মনে হয়। সুবেদারের সাথে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয় রাজা ছত্রধারী গজরাজ সিংহ প্রমুখদের।

(১৪) রামনারায়ণের জামাতা।

আমার চক্ষুর মণি, আমার দেহের আত্মা। ওমরাওদের(১৫) ও রাজা প্রতাপনারায়ণের নিকট হইতেও আমি পত্র পাইয়াছি। এই অধমের বিজয়বার্তায় নবাব সুজাউদ্দৌলা(১৬) শাহই খুব আনন্দিত এবং তাহারা সমাবেশে আমার কথা তিনি অহরহ বলিয়া থাকেন। মহম্মদ কুলী খাঁ অপমান বরণ করিয়াছেন এবং ৫০ জন অশ্বারোহীর হেফাজতে নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। রাজা বলবন্ত সিংহ এই লোকটিকে আটক করিয়া রাখিয়াছেন। শাহজাদা আমার ও কর্ণেল বাহাদুরের (ক্লাইভ) নিকট হইতে কড়া জবাব পাইয়া হতবাক হইয়া পড়িয়াছেন এবং জমানিয়ায় সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সন্ধানে জাহানাবাদে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হইতেছে। কুখ্যাত পালোয়ানের আচরণের জন্য কিছুটা মার্জনা করিতে মহানুভব(১৭) লিখিয়াছেন। ইহা আমার ক্ষমতা বহির্ভূত। পরবর্তী পত্রে আমি বিস্তারিত লিখি। অভিযান চালাইবার এই প্রশস্ত সময়—একাদশীর উপবাস চলিলেও সকাল হইতেই আমি প্রস্তুত রহিয়াছি। আমি যদি জীবিত থাকি, পরে তোমাকে আরও লিখিয়া জানাইব।"

জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে লিখিত পত্র

"মহানুভব রাজা বেণী বাহাদুর তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবশতঃ আমার প্রভু ও মনিব নবাব নসিরুল মুলক বাহাদুরের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব সম্পর্কে নবাব সুজাউদ্দৌলা বাহাদুরকে সব কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার প্রতি এই অধমের শ্রদ্ধার কথাও লিখিত হইয়াছে। নিজের পত্র ও নবাব সুজাউদ্দৌলার পত্রাদি সমেত তিনি নবাব নসিরুল মুলুকের নিকট খরিতা প্রেরণ করিয়াছেন। সত্বর প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন, দেখিবেন যেন উষ্ট্র চালককে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিতে হয়। পরমানন্দ পাঠক, বাবু ছোটু রাম ও বালকরাম এখানে পৌঁছিয়াছেন এবং আন্তরিক ঐক্য ও সম-স্বার্থের ব্যাপারে তাঁহারা বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে আমি নবাব নসিরুল মুলক বাহাদুর ও নবাব সবত জঙ্গ বাহাদুরের ফিরিয়ে আসার কথা লিখিয়াছিলাম। আজিমাবাদে আমার প্রিয় ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণের নিকট খরিতাগুলি পাঠানো হইয়াছে। উপযুক্ত উত্তর দেওয়ার কথাও আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি। ইত্যবসরে পালোয়ান সিংহের পুত্র এখানে আসিয়াছেন। পালোয়ানের অনির্ভরযোগ্য উক্তির সহিত আমার মনোভাবের তুলনামূলক বিচার যাহাতে চলিতে পারে, সেইজন্য পাঠকজীকে আমি আটকাইয়া রাখিয়াছি। আপনি জানেন, পালোয়ান বন্ধুত্বের বাধ্যবাধকতা রক্ষা করিয়াছে। আপনার নিকট হইতে বার বার পত্র পাওয়ায় এবং পালোয়ানের ব্যাপারটি সম্পর্কে একটা কিছু মীমাংসা করার জন্য পাঠকজীকে যেহেতু পাঠাইয়াছেন, সেই হেতু

(১৫) অযোধ্যার নবাবের পারিষদ।

(১৬) ১৭৫৭ সাল থেকে সুজাউদ্দৌলার সাথে রামনারায়ণের অবিরাম পত্রালাপ চলে।

(১৭) মহান্ পার্সী কবি শেখ আলিহাজিনের কথা বলা হচ্ছে—রামনারায়ণ, পালোয়ান সিংহ ও বলবন্ত সিংহ এর যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন।

তাঁহার সম্পর্কে কিছু করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। পরে তিনি কি করেন, সেইটি আপনি নিজেই দেখিবেন।"

ধীরাজনারায়ণকে লিখিত পত্র

এই অধম ও পালোয়ান সিংহের মধ্যে সম্পর্ক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। কথা যদি আর না বাড়াইতেছি হয়, যেদিন তিনি রহম খান ও গোলাম শাহর (১৮) বাহিনীতে যোগ দেন এবং মূল সেনাদল হইতে দুই ক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন করেন, সেদিনই তাহার অযোগ্য পুত্রগণ একটি বার্তা লইয়া আসেন। তাহাতে বলা হয় যে, আমি যেন আগাইয়া যাইয়া মার্জনা চাই এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করি। বাবু সাহেবরাও (অপর ভোজপুরীগণ) এইরূপ করিতে আমাকে প্ররোচিত করেন। ইহা আমার কাছে খুব বিরক্তিকর বোধ হয় এবং আমি তাঁহাদিগকে সোজাসুজি জানাইয়া দেই যে, তাঁহারা যেন সঙ্গে সঙ্গে বিদায় হইয়া যান এবং আমি কখনও তাঁহার সহিত দেখা করিব না। অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য আমি লালা সঙ্গমলালকে পাঠাইতে নির্দেশিত হইয়াছি। উক্ত লালা আমাকে জানান যে, পালোয়ান সিংহ এইরূপ কথা কখনও বলেন নাই—সমস্ত ব্যাপারটি বাবু সাহেবদের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যাহা হউক, এমন হইল যে, পালোয়ান সিংহ নিজেই পরদিন সকালে জাঁকজমক করিয়া আসিয়া উপস্থিত হন। সঙ্গে এত লোকজন আসে যে, দেওয়ানখাসে ও প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। কিছুক্ষণ পর আমি তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেই। পরের দিন অপরাহ্নে রহম খানের তাগিদে তাঁহার সঙ্গেই আমি পালোয়ানের শিবিরে গমন করি। মাত্র কয়েকজন লোক আমার সহিত যায় এবং এই করা ছাড়া আমার বিকল্প উপায় ছিল না। রাত্রিতে এত প্রবল বৃষ্টি হইতে থাকে যে রাস্তাঘাটগুলিতে চলাফেরা অসম্ভব হইয়া পড়ে—সব যায়গা জলে ভর্তি হইয়া যায়। প্রতি পদক্ষেপেই আমার কাজের জন্য দুঃখ বোধ করি এবং এক ঘণ্টাকাল সেখানে অপেক্ষা করিয়া লেনদেন আগামী দিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া আমি ফিরিয়া আসি! বিদায়কালে তিনি আমার কাছে দুই হাজার টাকা অর্পণের প্রতিশ্রুতি সহ একখানি কাগজ উপস্থিত করেন। আমি ইহা ফিরাইয়া দেই এবং কথাবার্তা পাকা করিয়া আমি ঐ স্থল ত্যাগ করি। পরদিন তিনি (রহম খান?) আসিয়া এই অনুরোধ জানান যে, তাঁহার মধ্যস্থতায় রাজার (পালোয়ান) ব্যাপারটি মীমাংসিত হইবে, নবাব আহম্মদ খাঁর স্থলে অন্য লোককে বসাইতে হইবে এবং ভোজপুর প্রসঙ্গটি নিজের মর্যাদার যাহাতে হানি না হয়, সেইজন্য তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। আরও বলা হয় যে, আমি যদি নিজ হইতে তাঁহাকে এই সব করিতে বলি, তাহা হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। উত্তরে আমি বলি যে, এই সব কথা প্রকাশ্যে বলা আমার ও তাঁহার—দুই-এর পক্ষেই খারাপ হইবে। এই কথাও আমি জানাইয়া দেই যে, তাঁহাকে বর্ষার দুইটি মাস অপেক্ষা করিতে হইবে এবং আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া সরকারের

(১৮) বাংলার নবাবের এই দুই জন প্রবীণ অফিসার পালোয়ান সিংহের ষড়যন্ত্রের দরুণ মসিদপুরের যুদ্ধে রামনারায়ণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

ব্যাপারটি সম্পর্কে তিনি যদি কিছু করিতে চাহেন, তাহা হইলে এবং তিনি (পালোয়ান) যদি আজিমাবাদে আমার সহিত গমন করেন, সেক্ষেত্রে আমি তাঁহার সব সর্ত মানিয়া লইব। কিছুকাল ধরিয়া উত্তর ও প্রত্যুত্তর চলিতে থাকে, কিন্তু কোন সুফল দেখা যায় না। ঐদিনই অপরাহ্ণে তাঁহার খুল্লতাত সুন্দর সিংহের (১৯) মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশকল্পে সবল সিংহের শিবিরে গমন করি। সেখানেও তাঁহারা দুই হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি সহ একটি পত্র সামনে তুলিয়া ধরেন। আগের মতো এবারেও আমি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করি। পরের দিন সকালবেলা অর্থাৎ গতকল্য তাঁহারা সকলেই আমার কাছে আসেন। রহম খানের নিকট পূর্বেই আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন মধ্যস্থ হইয়া ঐ লোকগুলির আচরণ দেখেন এবং তাহাদের যেন বাইলে দেওয়া হয়, এইটি চাহেন। অতি তাড়াতাড়ি তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়—নিজের নিকট ডাকাইয়া তিনি তাহাদিগকে কয়েকটি কথা বলেন। লোকগুলি উদ্ধত প্রকৃতির বলিয়া তাহার কথায় কোন কর্ণপাত করে নাই। উক্ত খান বাহাদুর সুযোগ বুঝিয়া অশ্বপৃষ্ঠে শোণ নদীটি পার হইয়া যান। সেই সময় উহা এই ভাবে অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল। সিদ্ধিনারায়ণ (২০) আমার নিকট আসিয়া বলেন, 'আপনি আমার কথায় কান দিতেছেন না। আমি যে অর্থ আপনাকে দিয়াছি, তাহা ফেরত দিতে হইবে।' এই কথা শুনা মাত্র আমার শরীরে ক্রোধের সঞ্চার হয়। আমি উত্তর করিলাম, 'আপনি নিজের সম্পর্কে কি মনে করেন? আমার সৈন্যরা নদী পার হইয়া যাওয়ায় আপনি সম্ভবতঃ সাহস পাইয়াছেন আর আমি এখানে একা পড়িয়া আছি। রঘুনাথের (ঈশ্বর) নামে শপথ করিয়া আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি—আপনি যাহা করিতে চাহেন, এখনই করুন। কারণ, টাকার পরিবর্তে দিবার মত আমার জুতা আছে।' বাবু মুরলীধর ও বাবু ভরত সিংহ এবং আর আর সব বাধা দেন। শেষ অবধি পালোয়ান সিংহ আমার ক্রোধ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করেন এবং সিদ্ধিনারায়ণকে এইরূপ উক্তির জন্য নিন্দা করেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে অপ্রীতিকর পরিবেশের মধ্যে বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাক্ত-বিরক্ত মন লইয়া তাহারা স্থান ত্যাগ করে। আজ সকালে মুরলীধর এই সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন যে, তাহাদের মতলব খারাপ। মুরলীধরই তাহাদের বিদায় দিতে আগাইয়া গিয়াছিলেন। আমার যেমন ভাল মনে হইয়াছে, আমি সেখানে তাহাদিগকে একটি বার্তা প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা যদি সেইটি পায়, তাহা হইলে তাহারা আমার পক্ষে আসিতেও পারে। অন্যথা সম্পর্ক বড়ই জটিল হইয়া পড়িবে। সিদ্ধিনারায়ণ অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির এবং সবল সিংহ একটি গুজরাটী গরু ছাড়া কিছুই নয়। দাবুয়ার ও ভোজপুর সম্পর্কে যত কথা হইয়াছে, সবই এখন বাতিল হইয়া গেল। ইহার পরে কি ঘটে, তাহাই দেখিতে হইবে। এই স্থান সম্পর্কে, হীন বিবাগ সিংহের (২১) কার্য্যকলাপ নজর রাখা আবশ্যক। এই লোকটিকেও তাহারা প্ররোচিত করিয়াছে। গজরাজ সিংহকে আমি দলে টানিতে পারিব এবং আগামী কল্য তাঁহাকে নবাব আহমদ খানের নিকট পাঠাইব। খরচ বাবদ তুমি দশ হাজার টাকা নিতে পার এবং চিঠিখানি পড়িয়া মুস্তাফা কুলী খাঁর (২২) নিকট বিবরণ পেশ করিতে পার।

নবাব বাহাদুরের (২৩) নিকট লিখিত পত্র

"ইহার পূর্বে আমি একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে দুইটি দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। আজ শুক্রবার ৮ই জমাদি—আপনার দাস ক্যাপ্টেন সাহেবকে (ক্যাপ্টেন করয়েন) সঙ্গে করিয়া এবং রহম খান, গোলাম শাহ ও অপরাপর সর্দারদের সৈন্য সামন্ত লইয়া ঘোড়ার পিঠে সকাল বেলাতেই বাহির হইয়া পড়ে। পরাভূত ব্যক্তির (শাহ আলম) দলটি এক ক্রোশ দূরে তাঁবু পাতিয়া ছিল। আপনার নফর হিসাবে আমি এবং আমার সর্দারগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এক্ষণে দূরত্ব অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে। যতদূর মনে হইতেছে আগামী কল্য (২৪) যুদ্ধ হইবে। আশা করি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও মান্যবর নবাব বাহাদুরের সৌভাগ্যবলে জয়ের নজর পাঠাইতে পারিব। যদি ফল অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়, ঈশ্বর না করুন, আমার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা করিবেন এবং আমার পোষ্যদের যেন নবাব বাহাদুরের স্নেহ-পাশে রাখিবেন।"(২৫)

ধীরাজনারায়ণকে লিখিত পত্র

(ক) "...মুসি লা (এম্ লা) ও তাহার দলবল কর্মনাশা নদী অতিক্রম করিয়াছেন এবং এই দিকে আসিতেছেন। তিনি কি করিতে চাহেন, দেখিব। বদরুদ্দৌলা আগাইয়া গিয়াছেন। বুনিয়াদ সিংহের(২৬) নিকট আমি অনেক লিখিয়াছি। তিনি পাশ কাটাইয়া চলিয়াছেন। লোকে বলে মুসি লা'র নাকি আজিমাবাদ দুর্গ আক্রমণের একটি অভিপ্রায় রহিয়াছে। ইংরেজ সৈন্য সেখানে মোতায়েন আছে। এই অবস্থায় আমি বড়ই বিপন্নবোধ করিতেছি। আমার পক্ষে যাহা সম্ভবপর, আমি করিয়া যাইতেছি এবং যতক্ষণ জীবিত থাকিব, তাহাই করিব। দুর্গের উপর অধিকার আমি ছাড়িয়া দিব না। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়—শাহজাদার বর্তমান অবস্থা ও তোমার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে তুমি আমায় সম্যক্ অবহিত রাখিবে। রায় সরব সিংহ, কিদভি হাসান খান, শেখ গোলাম ইসা, শেখ তালে ও বালকৃষ্ণ পাঠক

---

(১৯) সাহাবাদের ভাবুয়া মহকুমার অন্তর্গত চৈনপুরের জমিদার। পালোয়ান সিংহ এঁর নিকট-আত্মীয়।

(২০) রাজপুত উজ্জয়িনীয়াবংশের প্রধান বীরের পুত্র। উইলসনের বিবরণে ১৭১৫-১৭ সালে বিহারের বিভিন্ন অংশে সিদ্ধিনারায়ণ যে সন্ত্রাসরাজ সৃষ্টি করেন, এর উল্লেখ আছে। তিনি যে ১৭৫৯-৬০ সাল অবধি জীবিত ছিলেন, সে সম্পর্কে এখানে একটি নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

(২১) পালামৌ জেলার সেরেস কুটুম্বার জমিদার। এঁর বিরুদ্ধে রামনারায়ণ ১৭৫৮ সালের জুন মাসে এক অভিযান চালান।

(২২) সিরাজউদ্দৌলার শ্বশুর ইরাজ খানের ভাই।

(২৩) পত্রখানি কাকে লেখা, সঠিক নির্দেশ নেই, তবে বিষয়বস্তু থেকে অনুমিত হয়, এইটি তৎকালীন নবাব বাহাদুরকে (বাংলা) লিখিত হয়।

(২৪) ২১শে জমাদির পূর্বে যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি।

(২৫) এই যুদ্ধে রামনারায়ণ পরাভূত হন।

(২৬) টীকারির রাজা সর্দার সিংহের নিকট আত্মীয়।

তোমাকে তাঁহাদের তত্ত্বেছা পাঠাইতেছেন। দুই পক্ষের অভিপ্রায় কি, সেই বিষয় আমাকে লিখিও। পশ্চিমাঞ্চল হইতে বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বলা হইতেছে যে, আমদালি অবসর গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, রাজা (২৭) শাজাহান এখনও সিংহাসনে আছেন এবং গাজীউদ্দীন খাঁ উজীরহিসাবে বহাল হইয়াছেন। নবাব-বাহাদুরের তিনি বিরোধী কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি নিজের সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে জড়াইয়া পড়িয়াছেন।"

(খ) "রমজানের ৬ই তারিখ হইতে এখানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সেই সকলের বিবরণ তোমাকে ইতোমধ্যে পাঠাইয়াছি। জাফর নবাব বাহাদুরের নিকট একখানি আর্জিও প্রেরিত হইয়াছে। ১৪ই তারিখ পর্য্যন্ত যেসব পত্র লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি আজ সকালে আমি পাইয়াছি। এই সকল পত্র হইতে দেখা যায় যে, আমার পত্রসমূহ এখনও গন্তব্যস্থলে যাইয়া পৌঁছায় নাই এবং নবাব বাহাদুর এই স্থানের ঘটনাবলী অবহিত নহেন। আজ রমজানের ২১শে তারিখ, বৃহস্পতিবার। এই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দ্বিপ্রহর অবধি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমার অর্দ্ধমৃত আত্মা এখনও দেহ-কাঠামোটির মধ্যেই আছে। আমার পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, ইহাতেই অনুমান হয়, কার্য্যতঃ ইন্দ্রিয়সমূহ অবরুদ্ধ। শাহজাদা, ফরাসীগণ, মারাঠারা ও কামগার এই অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। আমার সাহসী লোকদের বীর্য্যাভাব ও অনুগামীদের সংখ্যাল্পতা দৈহিক শক্তির ক্রমিক অবলুপ্তি ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধারণ বিনষ্টির অভ্রান্ত ইঙ্গিতসূচক এবং আমার সকল পন্থা ও কৌশলের চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচায়ক। এই সময় তিনবার সংঘর্ষ হয়—প্রারম্ভিক সংঘর্ষ, যখন তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম দুর্গ অবরোধ (২৮) করে এবং ইহা ঘটে তৃতীয় দিবস রাত্রিতে। দ্বিতীয় লড়াই হয় ফরাসীরা যখন বেগমপুর গেটে তাঁহাদের আক্রমণ চালান। সেইটি চতুর্থ দিবসে অর্থাৎ গতকল্য ভোর হইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। তৃতীয় সংঘর্ষ—যখন কামগার, মারাঠা ও ফরাসীরা পশ্চিম দিক হইতে আগাইয়া আসেন এবং রোহিলারা, জয়নুলাবাদিন খান (উজীর) ও মাদারাছ দাওলা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দুর্গের পূর্ব্ব দিক হইতে আমাদের উপর আক্রমণ চালান। একটি অদ্ভুত ধরণের লড়াই হইয়া যায়, অনেক সাহসিকতাপূর্ণ কাজ হয়, যাহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে বহু সময়ের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু সে সময় আমার নাই। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখন অবধি সবই ভালয়ভালয় চলিয়াছে। এই তিনটি সংঘর্ষে তাহাদের লোকক্ষয় হইয়াছে প্রায় এক হাজার, তাহাদের নিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষদের অনেকেই নিহত হইয়াছেন, সমস্ত মনোবল তাহাদিগের ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিন দফা লড়াই শেষ হইলে ক্যাপ্টেন নক্স অপরাহ্নে তাঁহার দলের পুরোভাগে থাকিয়া এখানে উপস্থিত হন এবং আমাদের সহিত যোগদান করেন। ইহাকে আমাদের সৈনিকরা প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু অপর পক্ষের লোকেরা নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিতে নিরস্ত হইতেছিল না। আমাদের সম্পর্কে বলিতে পারি, আমরা সব সময় সব দিকে নিজেদের সম্পূর্ণ তৈয়ারী রাখিয়াছি। রাত্রির অন্ধকার যখন নামে, সেই সময় আমরা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হই। এই মুহূর্ত্তে বসারের বরহম শাহ, খুবা সিংহ ও আহার সিংহের ন্যায় জমিদারগণ আসিয়া উপস্থিত হন এবং আমাদের সহিত যোগাযোগ করেন। ধুসিয়ামের (২৯) প্রায় এক হাজার লোকও আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। আমি এখন অবধি অধ্যবসায়ের রজ্জু শিথিল করি নাই এবং শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্য্যন্ত ইহা অটুট থাকিবে। আমি সঙ্কল্প নিয়াছি বারাণসীতে মরিব (এখানে নহে)। তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, আমার ব্যাপার লইয়া তুমি মাথা ঘামাইও না। আমি এই ভাবিয়াই বিশেষ দুঃখ অনুভব করি যে, এই কয়টি শিশু সন্তানের তখন কি হইবে এবং এইগুলি ও বিধবারা চরম অসহায় ও বিমূঢ় অবস্থায় পড়িয়া কি ভাবে মৃত্যুবরণ করিবে। তুমি আমার নিজের থেকেও প্রিয়, ঈশ্বর যেন তোমাকে নিরাপদে বাঁচাইয়া রাখেন। আমি যখন থাকিব না, সেই সময় নবাব বাহাদুরই তোমার উপর নজর রাখিবেন। আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—কি আগুনে আমি ভস্মীভূত হইতেছি আমার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস উহারই ইঙ্গিতসূচক। কিন্তু হা-হুতাশ করিয়া আমি মরিতে চাই না। আজ যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে জানিলাম, সকলের আগে তোমাকে চলিয়া আসার আগ্রহই যেন আমি দেখাইয়াছি। ঈশ্বরই আমার সাক্ষী, আমি কখনও সেইরূপ আগ্রহ দেখাই নাই। যতদিন আমি আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব, ততদিনই আমি বাঁচিয়া থাকিব। অন্যথা, আমি সকলের নিকট হইতেই বিদায় গ্রহণ করিব। ভদ্রলোকদের (ইংরেজ) শুভ-ইচ্ছার উপর আমার মুক্তির সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে। আমি যখন বাঁচিয়া থাকিব না, তখন এই ভূমির হাল কি হইবে, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এইবার কার্য্যত আজিমাবাদে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। আলমগঞ্জ, সুলতানগঞ্জ ও মহেনদ্রু'র সমগ্র অঞ্চল একরূপ ধূলায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং শাহ আরজানের (৩০) দরগায় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। নিরীহ লোকদের রক্তস্রোত উহার ইমামবাড়ীতে অবাধে বহিয়া চলে এবং সকরুণ দীর্ঘশ্বাস কারবালা যাইয়া পৌঁছে। বাস্তবিকই ইহা একটি কারবালায় পরিণত হইয়াছিল। সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলবর্ত্তী জেলাটি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। তোমার উদ্যান সম্পর্কে, সেখানে যে কি ঘটিয়াছে, আমি কি ভাবে লিখিব। আমার জীবিতাবস্থাতেই এই সকল ঘটিল বলিয়া আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। রাণীপুরের বাগানটি এখন একটি মাটির ঢিবিতে পরিণত হইয়াছে এবং আগুনে পুড়িয়াছে। গত পাঁচদিন যাবত পূজনীয়া জননীর এবং আমার চক্ষের মণি সম্পর্কে

(২৭) ইনি ছিলেন একজন সাক্ষিগোপাল, ১৭৫৯ সালে গাজী উদ্দীন ইমাদুল মুলকের সহায়তায় সিংহাসন পান।

(২৮) পাটনা অবরোধ ও দুর্গের ওপর আক্রমণ চালান হয় ১৭৫৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি। ২৮শে এপ্রিল ক্যাপ্টেন নক্স উপস্থিত হন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য করেন।

(২৯) মীরণের সৈন্যবাহিনীর অন্যতম সেরা সৈন্যাধ্যক্ষ ও সারণের সরকারের ফৌজদার। রামনারায়ণের সুপারিশে ইনি রাজার পদমর্য্যাদা পান।

(৩০) এই সাধু ১০৩৮ (১৬১৮) সালে পরলোকগমন করেন এবং সমাধিমন্দিরটি নির্ম্মিত হয় ১০৭২ (১৬৬১) সালে।

কোন খবর পাই নাই। অবরোধ অবস্থাধীন কয়েকজন ছাড়া কেহই জীবিত নাই, ইহাই মনে হইতেছে। গভীরতার (?) মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার (৩১) লোক প্রাণ হারাইয়াছে। তোমার এবং সেখানকার ভদ্রলোকটির পত্রে জানা যায় যে, সেখানে প্রায় এক সহস্র মারাঠা আছে। এখানকার হিসাব এই যে, অশ্বারোহী সৈন্য আছে প্রায় ছয় হাজার। শাহজাদার সৈনিকদের এবং অভিশপ্ত কামাগাবের একই অবস্থা। ফরাসী সৈন্য হইবে প্রায় ৩০০ (?) এই বিষয়ে আরও লিখিবার মত শক্তি আমার নাই। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি মনের কথা লিখি নাই এবং সে লিখিতে হইলে বহু তা কাগজ প্রয়োজন। অপর পক্ষ হইতে যে আক্রমণের আশঙ্কা করা হইতেছে, তাহা ঘটিবার এই-ই সময়। সেই জন্য এই কয়টি ছত্র লিখিয়াই আমি শান্ত থাকিলাম। আমার প্রভু ও মনিবদের কাছে এখনও আমি আর্জি প্রেরণ করি নাই, তোমাকে মাত্র সংবাদটি জানাইয়াছি।"

নবাব সৈয়দ জঙ্গের (কাইলন্দ) নিকট লিখিত পত্র

(ক) "শত্রুপক্ষের পুনঃপুনঃ আক্রমণের বিবরণ এবং ২২শে রমজান পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সকল বিষয়ই আপনাকে ইতিপূর্বে জানাইয়াছি। তাহাদের অনেকেই নিহত কিংবা আহত হইয়াছে। ক্যাপ্টেন নক্স দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শত্রুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং তাহাদিগের অনেককেই হত্যা করেন। ক্যাপ্টেন নক্সের আকস্মিক আক্রমণে তাহাদের ভিতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শাহজাদা নিরুপায় হইয়া রমজানের ২৩শে তারিখে পশ্চাৎ অপসরণ করেন। এখান হইতে ছয় ক্রোশ দূরে পুনপুনে যাইয়া তিনি দাঁড়ান। কিন্তু এখনও তিনি নূতন করিয়া গোলযোগ সৃষ্টির মৎলব ভাঁজিতেছেন। আপনি আমার সহৃদয় বন্ধু, আমার প্রভু ও মনিব নসিরুল মুলক বাহাদুরের সহিত আপনি বান, ইহাই সুবিবেচনার কাজ হইবে। কামগার, মারাঠা ও ফরাসীদের সহ শাহজাদার আজিমাবাদে উপস্থিতি এবং আজিমাবাদ দুর্গে তাহাদের অবস্থান বিষয় পূর্ব্বেই মান্যবর নবাব বাহাদুরের নিকট অবহিত করা হইয়াছে।"

(খ) "১৬ই সাওয়াল তারিখে লিখিত আপনার পত্রখানি পাইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রভু ও মনিব (মীরণ) আকবরনগরে (রাজমহল) প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং একই দিনে পূর্ণিয়া অভিমুখে অভিযান চালাইতে আগ্রহশীল ছিলেন। প্রয়োজন হইলে এই স্থানের দিকে তিনি আগাইয়া আসিতেন। আপনি জানেন যে, সাবনের মাঝামাঝি তিনি সেই ব্যক্তির (শাহ আলম) অনুসন্ধান ছাড়িয়ে দিয়াছেন এবং ফিরিয়া যাইয়া ১লা রমজান মুর্শিদাবাদে ঢুকিয়াছেন। সেই মানুষ এই দিকে আগাইয়া আসিতে পারেন বলিয়া তাঁহার চলাচলের (৩২) ওপর নজর রাখিতে মান্যবর নবাব বাহাদুর আপনাকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। সজাগও সক্রিয় থাকিবার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ জারী করাই যথেষ্ট কি না, কিংবা আত্মরক্ষার জন্য আরও কিছু সৈন্য সামন্ত আমার হেফাজতে পাঠাইবারও পরিকল্পনা আছে কি না, তা আমি বলিতে অক্ষম। আমার অবস্থা বুঝিবার জন্য এক মাসকাল মধ্যে কোন যত্ন লওয়া হয় নাই এবং সাহায্যের আশায় প্রেরিত আমার ব্যাকুল আবেদনপত্রগুলি সম্পর্কে কোন সাড়াই পাওয়া যায় নাই। এখন অবধি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং নবাব বাহাদুরের সৌভাগ্যের দরুণ আমি আমার মর্য্যাদা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছি কিন্তু এই পর্য্যন্তই। ইহার বাহিরে দাঁড়াইলেই দেখা যাইবে সেই বলিষ্ঠ পুরুষকে একা বাধা দিতে আমি অপারগ। খাদিম হাসান খানের গতায়াত এবং উক্ত পুরুষ পুঙ্গবকে সাহায্য দেওয়ার তাঁহার মৎলব সম্পর্কে বিস্তারিত আপনাকে এর পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। এই প্রসঙ্গে আমি আগে যাহা লিখিয়াছি, তদপেক্ষা বেশী কিছু আমি জানি না। উল্লিখিত খানের যখন পূর্ণিয়া হইতে এই অঞ্চলে চলিয়া আসার মৎলব আছে, এই অবস্থার পূর্ণিয়া অভিমুখে অভিযান চালান কেন যুক্তিযুক্ত মনে হইল না, কারণ বুঝিতে আমি অক্ষম। তাহারা কি এই প্রদেশের উপর অধিকার রাখার চিন্তা বাদ দিয়া দিয়াছেন? আপনি জানেন যে, আজিমাবাদ আমার পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তি নহে। উক্ত পুরুষ-পুঙ্গবের ব্যাপারটি (অভীপ্সা) অনেক বাড়িয়া চলিয়াছে। রাজা বলবন্ত সিংহ আমায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, খুব সম্ভব সুজাউদ্দৌলা তাঁহার সাহায্যার্থে আসিতেছেন এই পত্রের একখানি নকল এবং রাজা যুগলকিশোরের পত্র ইতিপূর্ব্বে মান্যবর নবাব বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। পত্রগুলি পড়িয়া আপনি বিস্তারিত অবহিত হইতে পারিবেন। পাঠান্তে যদি আপনি সেইরূপ যুক্তিযুক্ত মনে করেন, পূর্ণিয়া অভিমুখে আপনি অভিযান চালাইতে পারেন। কিংবা আপনি যদি চাহেন যে, এই প্রদেশের উপর অধিকার অটুট থাকুক, সেক্ষেত্রে আজিমাবাদের দিকে যেন দ্রুত আগাইয়া যাইবেন। আমার বিশ্বাস, এখানকার অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার সহৃদয় বন্ধু মীর আমিয়াৎ বাহাদুর, সমশের জং ইহার ভিতর আপনাকে সবিস্তার লিখিয়াছেন। যাহা হউক আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি এবং আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বক্তব্য নবাব বাহাদুরের সকাশে নিবেদন করিবেন। বিখ্যাত ব্যক্তিটি ১০ ক্রোশ দূরে তাঁবু স্থাপন করিয়া আছেন এবং খাদিম হাসান খানের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। পূর্ণিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে আমি কখনও অনুরোধ করিব না। এক্ষণে আমি এই কথা লিখিতেছি এইজন্য যে, আমার উপর যেন কোন দোষ দেওয়া না চলিতে পারে।"

(গ) "...মহম্মদ কামগারের বক্সী খান্দে রাম তাঁহার বাহিনী লইয়া শাহজাদার সহিত যোগদান করিয়াছেন। কামগার নিজে আপন এলাকা হইতে রওয়ানা হইয়া বুনিয়াদগঞ্জের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাজা সুন্দর সিংহ বাহাদুরের (মৃত) জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল এই বুনিয়াদগঞ্জ। বিলম্বের সময় নাই বলিয়া আপনাকে কোনক্রমে এই দিকে চলিয়া আসার জন্য জরুরী আবেদন পাঠাইতেছি। ইহাতে রাজ্যের স্বার্থ রহিয়াছে, কারণ,

---

(৩১) আলোচ্য অনুচ্ছেদটি খুব স্পষ্ট নহে। যে সংখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে, তা একটু অতিরঞ্জিত মনে হয়।

৩২। সেরপুরে ১৭৬০ সালে পরাজয়বরণ করার পর শাহজাদা বাংলায় অভিযান চালনার একটি পরিকল্পনা করেন। শাহজাদার সেই সাহসিকতাপূর্ণ ও সুসংহত পরিকল্পনার কথাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শাহজাদা যে হাঙ্গামা সুরু করিয়াছেন, দিনের পর দিন তাহা গুরুতর ও জটিল আকার ধারণ করিতেছে। খাদিম হাসান খান (৩৩) সারনের সরকারের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছেন।

নবাব জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে লিখিত আবেদনপত্র

"নদীর অপর প্রান্তের সন্নিহিত অঞ্চলে খাদিম হাসান খানের পৌঁছিবার বার্ত্তা এবং তাঁহার অগ্রগতি রোধের জন্য ক্যাপ্টেন নক্স ও রাও সিতাব রায়ের চিঠিপত্র ইতিপূর্ব্বে মাননীয় নবাব বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আজ ২রা জিকাদ, সোমবার। উল্লিখিত খান সাহেব শিবির হইতে পূর্ব্বদিকে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন এবং হাজিপুরে ক্যাপ্টেন ও রাও সিতাব রায়ের মুখোমুখী যাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। শেখ হামিদুদ্দীন যাহার নুণ খাইয়াছেন, তাহার গুণ গাহিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতা দেখাইয়াছেন। কামানের গর্জ্জন শুনিবামাত্র কোনরূপ লড়াই না দিয়াই তিনি পলাইয়া যান। অজিত নারায়ণের ন্যায় জমিদারগণও তাঁহার নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন। এই ঘটনায় সরকারের সেনাদলের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয়। খাদিম হাসান খান তাঁহার বাহিনী পুনর্গঠনের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং চতুর্দ্দিকেই অবরোধ সৃষ্টি করেন। ক্যাপ্টেন ও রাও সিতাব রায় বাহাদুর অনেক সাহসিকতার কাজ করেন। হরকরারা তীব্র সংঘাতের খবর এবং ক্যাপ্টেন ও রাও বাহাদুরের শৌর্য্যের বার্ত্তা আপনার নফর আমার নিকট অহরহ বহন করিয়া আনিতে থাকে। কারণ, আমি নদীর এই তীরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া মোতায়েন ছিলাম এবং আরও সৈন্য প্রেরণ করিতেছিলাম। প্রচণ্ড জনস্রোত ও রাজদ্রোহীদের বিপুল সমাবেশের জন্য সাহায্যকারী সৈনিকদের পক্ষে সেখানে পৌঁছান প্রায় কঠিন হইয়া পড়ে। কামানের গর্জ্জন এবং বন্দুক ও আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ সকাল হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে চার ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিরাম শুনা যাইতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, মহামান্য নবাব বাহাদুরের সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত জয় হইয়াছে। নফর সেই মুহূর্ত্তেই নবাব বাহাদুরকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি আর্জ্জি প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু, ইত্যবসরে আমি জানিতে পারি যে, জয়লাভের পর ক্যাপ্টেন ও রাও সিতাব রায় বাহাদুর আসিতেছেন। সংবাদটি কিছুটা উদ্বেগের সঞ্চার করে। আমি নিজেই ক্যাপ্টেনের সহিত দেখা করিতে এবং তিনি কেন এইদিকে আসিয়াছেন, জানিতে আগাইয়া যাই। তিনি বলেন যে, বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপনের জন্যই তিনি এই ভাবে আসিয়াছেন। তিনি ইহাও জানান যে, আর কোন ভয় নাই। সেই যায়গায় তিনি শক্ত লোকজন রাখিয়া আসিয়াছেন। রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বে চার ঘটিকায় তিনি পুনরায় সেই যায়গায় রওয়ানা হইয়া যাইবেন। আজ ক্যাপ্টেন ও রাও সিতাব রাও নদী অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারি যে, তাঁহারা দুইটি হাতী এবং উহাদের পৃষ্ঠে আরূঢ় দুই কি তিন জন প্রধানকে হত্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রায় ৪০০ লোককে তাঁহারা নরকে নিমজ্জিত করিয়াছেন বলিয়াও বলা হয়। আহত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক বেশী। ক্যাপ্টেন ও রাও বাহাদুরের অনুগামীদের প্রায় ৫০ জন হয় নিহত কিংবা আহত হয় এবং ক্যাপ্টেন ছয়টি কামান আটক করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও নবাব বাহাদুরের সৌভাগ্যের দরুণ সরকারের বিপুল জয় জুটিয়াছে। প্রায় ২০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়াই জয়লাভ করা সম্ভব হইয়াছে, ইহাও ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং নবাব বাহাদুরের ভাগ্যফল। রাও সিতাব রায় যে শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রত্যেকেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন সাহেবের সাহসিকতা সম্পর্কে কোন বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই নফর মাস্তবর নবাব বাহাদুরের নিকট মাথা নত করিতেছে এবং শ্রদ্ধা জানাইতেছে। খাদিম হাসান খান চার ক্রোশ দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।"

ধীরাজনারায়ণকে লিখিত পত্র (৩৪)

"সৈন্যবাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তন এবং সেই অভিশপ্ত অঞ্চলের (৩৫) পাশাপাশি উপস্থিতির সংবাদ সম্বলিত তোমার পত্র মঙ্গলবার বাবু মুরলীধরের হরকরা মারফত পাইয়াছি। এই পত্রে মেজর (কাইলন্দ) ও চতুর জমিদারের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিলাম। সেই দিনই আমি নবাব মেজর মুবারিজুদ্দৌলা সৈয়ফ জঙ্গ বাহাদুরের একখানি পত্র পাই এবং উহা আসে সমসের জঙ্গ বাহাদুরের (মিঃ আমিয়াট) মারফত। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনা (৩৬) সম্পর্কে উহা ছিল একটি শোকসূচক পত্র। আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই ইহা প্রেরিত হয়।...নবাব (কাইলন্দ) এইরূপ চাহেন যে, আমি যেন এই হৃদয়বিদারক সংবাদটি গোপন রাখি। সোমবার সন্ধ্যার এক ঘণ্টাকাল পূর্ব্বে আপনার লিপিটি হস্তগত হইয়াছে। আমি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ি এবং এই সম্পর্কে কাহারও নিকট একটি কথাও বলি নাই। তবে সন্ধ্যাবেলা স্বভাব অনুযায়ী আমি যখন সমসের জঙ্গ বাহাদুরের সকাশে গমন করি, আমি তাঁহার কানে কানে কথাটি বলি।...সেনাদলের অভ্যন্তরে যখন ইহা গোপন রাখা যায় নাই, এখানে উহা আর গোপন করিয়া লাভ কি? পরন্তু খবরটি যদি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, কি ক্ষতি হইতে পারে? শত্রুপক্ষের সৈন্য আগাইয়া আসিবার আশঙ্কার কথাই যদি বলা হয়, এই অধম শাহজাদার ভয়ে আদৌ ভীত নহে। এই মুহূর্ত্তেই তিনি আসুন—আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে প্রস্তুত। তিনিআমাকে বেশ ভালরকম চিনেন ও বুঝেন। গতকল্য সন্ধ্যায় এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তিনি মুছিবলিপুর ছাড়িয়া সমসেরনগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, আবদালির খিলাতকে লইয়া ঢাক পিটাইতে আদেশ দিয়াছেন। জানা যায় যে, আবদালির প্রেরিত অশ্বারোহীরা তাঁহাকে

(৩৩) এ থেকে আলোচ্য পত্রগুলি ১৬ই জুনের আগেকার বলা যেতে পারে। এই সময়ই খাদিম হাসান খান হাজিপুরে পরাজয় বরণ করেন।

(৩৪) মীরণের মৃত্যুর পর এই পত্রখানি লিখিত হয়।

(৩৫) বেত্তিয়া অঞ্চল।

(৩৬) মীরণ ও কাইলন্দ চম্পারণ জেলায় পাহাড় অঞ্চলে খাদিম হাসান খানের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন, এ অবস্থায় ১৭৬০ সালের ২রা জুলাই রাত্রিতে বজ্রাঘাতে মীরণ নিহত হন।

বারাণসী অবধি লইয়া যাইতে নির্দেশিত হইয়াছে। এবং তিনি সেই ভাবেই পশ্চিম দিকে রওয়ানা হইয়া যাইতেছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহা যেন সত্য হয়। কামগার এখনও তাঁহার নিজের বাসগায় অবস্থান করিতেছেন। সুজাউদ্দৌলা গঙ্গানদী পার হইয়াছেন এবং নাজিব খানকে সঙ্গে করিয়া আবদালির যোগদান করিতে যাইতেছেন। আবদালি জলেশ্বরে তাঁবু পাতিয়াছে এবং সমস্ত মারাঠা বাহিনী আকবরাবাদের নিকট প্রস্তুত হইয়া আছে। উভয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধ (৩৭) অনিবার্য্য এবং আসন্ন। কি ঘটে না ঘটে আমাদের দেখিতে হইবে।···ভূমি প্রশ্ন মীমাংসা ব্যাপারে তোমার এবং রাজা ধুসিরামের (৩৮) যে আশঙ্কা, তাহার কথা বলিতে গেলে, বিষয়টি দরাজ হৃদয় নবাব বাহাদুরেরই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই মুহূর্ত্তে তিনি তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন এবং সৈনিকদের মনোবল পুনরুদ্ধারের প্রয়াস নিতেছেন। তোমাকে এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, জমিদারের শয়তানী মনোভাব সর্ব্ববিদিত। তিনি সেই জঙ্গলের একজন বৃদ্ধ নেকড়ে এবং চতুর শিয়াল। সোজা পথে তাঁহাকে কি ভাবে ফিরাইয়া আনা চলিতে পারে? নবাবের অনুকম্পা সম্পর্কে পূর্ব্বেও সন্দেহ ছিল না, এখনও নাই। আমারই কপাল খারাপ—অবস্থাধীনে আমার সামর্থ্য ও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। বা খুব জোর সুরু হইয়াছে এবং এই সময়ে কোন পরিকল্পনা সফল হইবার আশা নাই। সেনাবাহিনীকে তুমি সেখানে থাকিতে দিও না, ইহাই প্রয়োজন। আজিমাবাদে সৈন্যদের লইয়া আস এবং বর্ষার গতির দিকে না তাকাইয়া সময়টির কথা বিবেচনা কর। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে ছিল। এখন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করা সমীচীন হইবে। নবাবকে (কাইলন্দ) এই কথা বলিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে যে, তিনিই আমাদের প্রভু ও রক্ষাকর্ত্তা এবং মহানুভবের উপর আমাদের সর্ব্বরকম আস্থা আছে। বেতিয়ার জমিদারকে শাস্তি দেওয়া একটি কঠিন কাজ নয়। তবে এই মুহূর্ত্তে তাঁহার অপরাধ উপেক্ষা করিয়া যাওয়াই সমীচীন। এক দুই মাস পর এই অভিশপ্ত মানুষটিকে ভাল রকম শাস্তি দেওয়া যাইবে এবং এই ব্যাপারে নবাব সাহেবকে কোন অসুবিধায় ফেলিবারও প্রয়োজন হইবে না। কোনরূপ চেষ্টা যদি করাও হয়, নবাবের সৈন্যদের সঙ্কটে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহা সমীচীন হইবে না। নবাবের সাহায্য ও সমর্থন লইয়া অনেক ভাল কাজ করিতে হইবে। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ইহার পূর্ব্বে সংক্ষেপে আমি তাঁহাকে এই বিষয় জানাইয়াছি। শুভক্ষণে এই যাত্রা সুরু করা হয় নাই। তুমি ও মহারাজা বাহাদুর এখানে নিরাপদে চলিয়া আস, ইহাই প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি। কয়েক দিন পর এবং নবাব বাহাদুরের অনুমোদনক্রমে সব কিছু করা যাইবে। তুমি, নবাব আহম্মদ খান, রাজা সিতাব রায়, রাজা ধুসিরাম পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভাল রকমে চিন্তা করিও এবং তার পর তুমি উহা মহারাজা বাহাদুরের নিকট লইয়া যাইতে পার। সর্ব্বশেষে উহা নবাবের সকাশে উপস্থাপিত করা চলিতে পারে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, পত্রখানি সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বেই নবাবের সৌভাগ্য বলে একটা মীমাংসায় আসা যাইবে। তাঁহার (বেতিয়ার জমিদার) সহিত কোন না কোন ধরণের ব্যবস্থা শেষ করিয়া তুমি যেন ঐ স্থান হইতে চলিয়া আসিও। নবাব ও মহারাজা উভয়কেই বলিও যে, তাঁহাদের দুই জনের নিরাপত্তার জন্যই আমি বিশেষ ব্যাকুল। জমিদারের শাস্তি সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেই কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করিব।

(৩৭) একটি বিখ্যাত পানিপথের যুদ্ধ, তবে ১৭৬১ সালের জানুয়ারী অবধি এ সংঘটিত হয়নি।

(৩৮) খাদিম হাসান খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ধুসিরাম নিহত হন, এ ঠিক নয়।

অনুবাদ—অনিলধন ভট্টাচার্য্য

কবর সঙ্গীত

[R. L. Stevenson অনুসরণে]

তারকা খচিত ওই আকাশের ছায়—
কবর খনন করিয়া তোমরা সবে
শয়ান করিও আমারি এ ক্ষীণকায়;
পৃথিবীতে আমি কাটিয়েছি উৎসবে।

শুধু কথাকটি লিখিও সমাধি 'পরে:
ঘুমিয়েছি আমি সব অভিলাষ শেষে
শিকারী ফিরেছে সকল শিকার করে
নাবিক ফিরেছে সাগর হইতে দেশে।

অনুবাদ: শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত।

সন্ত কবীর

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

যামিনীকান্ত সোম

৩

সন্ত কবীরের বাণীর মধ্যে "নিরঞ্জন"-এর উল্লেখ আছে। "সুরত" কথার উল্লেখ তো আছেই। কারণ "সুরত" নিয়েই আলোচনা। এ সকল পরিষ্কারভাবে নির্ণয় করতে গেলে পরবর্তী এক সন্তের বাণী থেকে "সুরত-সম্বাদ"-এর কথা বলতে হয়। তাই, "সুরত-সম্বাদ"-এর কথা সংক্ষেপে এখানে ব্যক্ত করি—অবশ্য যা সংগৃহীত হয়েছে।

সুরত অর্থাৎ চৈতন্যরূপী আত্মা। সুরত তার স্বধাম ছেড়ে বহুদূরে এসেছে। শুধু আসা নয়, দূর স্থানে এসে সে তার মন-বুদ্ধি আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি রিপুগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে এমনভাবে ফেঁসে গেছে অর্থাৎ আবদ্ধ হয়ে গেছে যে, সে নিজেই বুঝতে পারছে না তার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে। তার এই বন্ধন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট। শেষে তার পরিত্রাতা এসেছেন তার পরিত্রাণের জন্য। এখন সে তার প্রভু অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গলাভ করেছে, আর নিজধামে ফিরে যাবার পথের সন্ধান পেয়ে আনন্দে মগ্ন রয়েছে। কিন্তু নিজ অবস্থার কথা সে ভাবছে সর্বক্ষণ। শেষে একদিন সে তার স্বামীর কাছে নানা রকম প্রশ্ন করছে। পরমদয়াল স্বামী তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিচ্ছেন। সে সকল প্রশ্ন আর তার উত্তর অতীব মনোজ্ঞ। এ সব কথা শুধু ভক্তদেরই উপভোগ্য।

সুরত প্রশ্ন করছে তার স্বামীকে। হে স্বামী, তুমি তোমার নিজের কথা আর নিজধামের ভেদ আমাকে বর্ণনা করে শোনাও—

বাস তুম্হারা কৌন লোক মেঁ।
য়হাঁ আয়ে তুম কৌন মৌজ মেঁ।
দেশ তুম্হারা কিতনী দূর।
খোজে সুরত ন পাবে মূর।
মৈঁ বিছুড়ী তুম মে কহো কৈসে।
দেশ পরায়া আই ঐসে।

অর্থাৎ হে স্বামী, কোন্ লোকে তোমার বাস? কিসের ইচ্ছায় তুমি হেথা এসেছ? কতদূরে তোমার দেশ? সে দেশের মূল তো সুরত খুঁজেই পায় না। আমি তোমা হতে কি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে, এই পরের দেশে এসে পড়লুম?

স্বামী এই প্রশ্ন শুনে প্রশান্তভাবে বলছেন:

মেরা ভেদ ন কোই পাবে।
মৈঁ হী কহুঁ তো কহন মেঁ আবে।

অর্থাৎ আমার ভেদ কেউই পায় না। আমিই যদি বলি, তবেই তা বলা যেতে পারে।

পিরথম অগম রূপ মৈঁ ধারা।
দুসর অলখ পুরুষ হুয়া ন্যারা।
তিসর সত্যপুরুষ মৈঁ ভয়া।
সত্যলোক মৈঁ হী রচ লিয়া।

[illegible] অলখ পুরুষ—একেবারে পৃথক। তৃতীয় হলুম, সত্য পুরুষ, আর সত্যলোক সৃষ্টি করলুম।

তার পর স্বামী বলছেন:

ইন্ তিনোঁ মেঁ মেরা রূপ।
ঔহা সে উতরী কলা অনূপ।
য়হা তক্ নিজ কর মুঝ কো জানো।
পূরণ রূপ মুঝে পহিচানো।

এই যে তিনটি ধাম, এই তিন ধামেই হল আমার রূপ। এই তিন লোক আমারই লোক। পরিপূর্ণ রূপে আমি এখানে থাকি, জেনো।

এখান থেকে অতি আশ্চর্য 'কলা' বার হয়ে এসেছে। তার এক 'কলা'র নাম—জ্যোত নিরঞ্জন।

য়হ জো কলা উতর কর আই।
ঝঁঝরী দ্বীপ মেঁ আন সমাই।
য়হাঁ বৈঠ তিরলোকী রচী।
পাঁচ তীন কী ধুম অব মচী।

এই কলা 'নিরঞ্জন' আর তার সঙ্গে 'আদ্যা' অনেক নীচে নেমে এলো। নীচে নেমে এসে ঝাঁঝরী দ্বীপে অর্থাৎ সহস্রদল কমলে এসে আস্থানা নিল। ঐখানে বসে বসে তাঁরা ত্রিলোকী সৃষ্টি করলে—পাঁচ তত্ত্ব আর তিন গুণের ধূম লেগে গেছে এবার।

তারপর কি হল? স্বামী বলছেন:

তিন লোক ব্যাপক মৈঁ নহী।
বুন্দ এক মেরী য়হা রহী।
উসী বুন্দ কা সকল পসারা।
বেদ তাহি কহে ব্রহ্ম অপারা।
বেদান্তী যাহি ব্রহ্ম বখানে।
সিদ্ধান্তী যাহি শুদ্ধ পুকারে।
ইস্ কে আগে ভেদ ন পায়া।
সতগুরু বিন উন ধোখা খায়া॥

অর্থাৎ ঐ ত্রিলোকের মধ্যে আমি কিন্তু ব্যাপক নই। আমার এক বুন্দ অর্থাৎ বিন্দুমাত্র আছে ওখানে! ঐ বিন্দুর দ্বারাই সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। ঐ বিন্দুই সর্বত্র প্রসারিত। বেদ ওকে অপার ব্রহ্ম বলে। বেদান্তী ওকে ব্রহ্ম বলে বাখ্যান করে। সিদ্ধান্তী বলে—ও হল শুদ্ধ ও নির্মল। কিন্তু ওর বহির্ভূত উপর ধামের ভেদ জানে না। কারণ সতগুরুই সব। সতগুরু বা সন্ত সতগুরু ছাড়া সবাই ধোখা খেয়ে গেছে।

এর পর তিনি নিজধামের মহিমার কথা বলছেন:

বুন্দ দেশ কো ছোড়ো অবহী।
সিন্ধ দেশ চল খেলো তবহী।
হমরে দেশ এক সতনাম।
য়হাঁ বিচার কা কুছ নহীঁ কাম।
চলনা চঢ়না ইন্ কে নাহীঁ।
তা তে সিন্ধ না পায়া ইনহীঁ।

এই বিন্দু দেশ ছেড়ে দাও এখন। ছেড়ে দিয়ে সিন্ধুদেশে গিয়ে চল-খেলা করবে। আমার দেশে আছে কেবল একমাত্র সত্যনাম। সেখানে বিচারের কোন কাজ নেই। এদের চলনও নেই চড়নও

নেই। সেইজন্ত এরা অর্থাৎ নিরঞ্জন—আত্মা সিন্ধুদেশে যেতে পায় না।

সুরত আবার প্রশ্ন করছে! এ সব শুনলুম। কিন্তু জীব আবার সিন্ধুদেশে অর্থাৎ সত্যধামে পৌঁছাবে কেমন করে? সেখানে যাবার পন্থা কি?

স্বামী এই কথা শুনলেন। শুনে উত্তর দিচ্ছেন:

পাঁচ নাম কা সুমিরন করো।
শ্যাম সেত থেঁ সুরত ধরো।
পিরথম সুনো গগন মেঁ বাজা।

পাঁচ নাম সুমিরণ অর্থাৎ জপ করো, আর শ্যাম সেতের মধ্যে সুরতকে বসাও। তারপর প্রথমেই তোমার অন্দর গগনে অদ্ভুত বাত্ত শোনো।

সুরত আবার প্রশ্ন করছে। এই পাঁচ নাম কি? তার ভেদ কৃপা করে আমায় বলুন।

স্বামী উত্তর দিচ্ছেন:

প্রথম অস্থান খোল কর গাউঁ।
সহস কঁবল দল নাম শুনাউঁ।
জ্যোত নিরঞ্জন বাস লখাউঁ।
করতা তিন লোক যহ ঠাউঁ।
বেদ চার ইন রচে জনাউঁ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব তীনোঁ।
পুত্র ইন্‌হী কে হৈঁ যহ চীন্‌হো॥
জাল বিছায়া জগ মেঁ ভারী।
ইনকী পুজা জীব সম্‌হারী॥

প্রথম ধামের কথা খুলে বলি—তার নাম সহস্রদলকমল। সেখানে হল জ্যোত নিরঞ্জনের বাস, আগেই তা বলেছি। এই স্থানের কর্তাই ইনি। চার বেদ ইনিই সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব, এই তিন হলেন এঁরই পুত্র। এঁরা জগতে অপূর্ব জাল বিস্তার করেছেন। জীব এঁদেরই পুজা নিয়ে মগ্ন।

স্বামী তারপর এই প্রথম ধাম সম্বন্ধে আরো বর্ণনা দিলেন, কত ব্যাখ্যা করলেন। পর-পর আবার কত ধামের কথা বলে গেলেন। যেমন—দ্বিতীয় ধাম 'ত্রিকুটি'র কথা, যে স্থান হল 'ব্রহ্মমণ্ডল'—যেখানে ওঁকারধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তারপর তৃতীয় ধাম 'শূন্যমণ্ডল' যেখানে দশমদ্বারের তেজ ও শোভা প্রকাশমান। তারপর চতুর্থ ধাম 'ভঁবরগুফা'—যেখানে সোহংধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিক্ষণে। এই সকল ধামের বিষয় তিনি সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন এমনভাবে, যেসব কথা অবর্ণনীয়।

সব শেষে স্বামী বললেন পঞ্চম ধাম 'সত্যলোক'-এর কথা। বলছেন:

ষোড়স ভান চন্দ্র উজিয়ারা।
সুরত চঢ়ী দেখা নিজ দ্বারা॥
সতগুরু মিলে ভেদ সব দীন্‌হা।
তিন কী কৃপা দরস হম লীন্‌হা॥
দরশন কর অতি কর মগনানী।
সত্যপুরুষ সব বোলে বাণী।
বাদশাহ্ সচ্চা নিজ জানী।

পঞ্চম ধামের অর্থাৎ সত্যলোকের সুলতানী তখত্ (সিংহাসন) সাচ্চা বাদশাহের আসন। সেখানে 'ষোড়ষ' (অর্থাৎ অসংখ্য) সূর্য-চন্দ্র দেদীপ্যমান। সুরত সেখানে পৌঁছে সত্যপুরুষের দর্শনলাভ ক'রে আর তাঁর অনির্বচনীয় বাণী শুনে অপূর্ব আনন্দে উল্লসিত।

এই হল স্বামী ও সুরত-সম্বাদ। এই সম্বাদ সম্পূর্ণ নূতন ও অতীব অপূর্ব! এই সব উক্তি ভক্তদের বিশেষ ভাবে উপভোগ্য। পূর্ণ সতগুরুর স্মরণ নিলে আর তাঁর নির্দেশিত প্রণালী অনুসরণ করে চললে নিজের ধাম সত্যধামে পৌঁছানো যাবে সুনিশ্চয়রূপে। এই হল স্বামীর বচন।

৪

আবার সন্ত কবীরের প্রসঙ্গে আসা যাক্। কবীর নিজের সাধনবলে সত্যদৃষ্টি ও সত্যবস্তু লাভ করে সমস্ত ঝগড়া-কোন্দলের উপরে চলে গেলেন। তিনি বলেছেন:

সুর পরকাল তহঁ রৈন কহঁ পাইয়ে
রৈন পরকান নাহি সুর ভাসৈ।
জ্ঞান পরকাল অজ্ঞান কহঁ পাইয়ে
হোয় অজ্ঞান তহঁ জ্ঞান নাশৈ।
কাম বলবান তহঁ প্রেম কহঁ পাইয়ে
প্রেম জহঁ হোয় তহঁ কাম নাহীঁ?
কহে কবীর যহ সত্য বিচার হৈ
সমঝ বিচার কর দেখ মাঁহী।

সূর্য্য যেখানে প্রকাশমান, সেখানে রাত্রি পাবে কি করে? রাত্রি যেখানে প্রকাশমান, সেখানে সূর্য কি প্রকাশমান থাকে? জ্ঞানের আলোর যেখানে প্রকাশ, সেখানে অজ্ঞানকে পাবে কোথায়? আর অজ্ঞান থাকলেই জ্ঞানের নাশ হয়। কাম যেখানে বলবান, সেখানে প্রেম থাকবে কি করে? যেখানে প্রেম আছে, সেখানে কাম। এই হল সত্য বিচার। বুঝে সুঝে বিচার করে দেখ।

আর বলছেন, সহজ—সমাধির কথা। বলছেন:

সন্তো সহজ সমাধ ভলী,
গুর পরতাপ ভয়ো জা দিন তেঁ
সুরত ন অন্ত চলী।
আঁখ ন মুদূঁ কানন রুঁধূঁ কায়া কষ্ট ন ধারুঁ।
খুলে নৈন মেঁ হঁস হঁস দেখূঁ, সুন্দর রূপ নিহারুঁ॥
কহুঁ সো নাম সুনু সোই সুমিরণ, খাউ পিউ সোই পুজা।
গিরহ উদ্যান এক সম দেখূঁ, ভাব মিটাউঁ দূজা॥
জহঁ জহঁ জাউঁ সেই পরিকরমা জো কুছ করুঁ সো সেবা।
জব সোউঁ তব করুঁ দণ্ডবত, পুজুঁ ঔর ন দেবা॥
শব্দ নিরন্তর মনুয়া রাতা, মলিন বাসনা ত্যাগী।
উঠত বৈঠত কবহুঁ ন বিসরৈ, ঐসী তাড়ী লাগী॥
কহৈঁ কবীর যহ উনমুন রহনী, সো পর ঘট কর গাই।
দুখ সুখকে ইক পরে পরম সুখ, তেহি সুখ রহা সমাঈ॥

ওহে সন্ত, সহজ সমাধিই ভাল। গুরুর প্রতাপে যে দিন তোমার দ্বার, সেদিনের অন্ত থাকে না সুরতের। চোখ বন্ধ করি না, কানও ঢাকি না, কায়াকে কোন কষ্ট দিই না। চোখ খুলে আমি হাসতে হাসতে চাই, দেখি তাঁর সুন্দর রূপ। যা বলি, সেই নাম;

যা শুনি সেই জপ। যা খাই, যা পান করি সেই পূজা। বাড়ী আর উত্তান একই সমান দেখি; দু'ভাব মিটিয়ে দিই। যেখানে-যেখানেই যাই, সেই হয় পরিক্রমা, যা কিছু করি সেই হয় সেবা। যখন শয়ন করি, সেই হয় দণ্ডবৎ; অন্য দেবতার পূজা করি না। অনাহত শব্দে মন আমার মত্ত। করেছি মলিন বাসনা ত্যাগ। উঠতে-বসতে কখনো তাঁকে ভূলি না, এমনই হয়েছে মিলন। কবীর বলছেন, এই আমার উন্মুখ ভাব, তাই আমি প্রকাশ করে গান করলাম। দুঃখ-সুখের পরে এক পরম সুখ, সেই সুখেই সমাহিত হয়ে রয়েছি।

কবীর, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টাই করেছেন, আর মিলনও করে দিয়েছেন। তিনি যেমন হিন্দুর, তেমনি মুসলমানেরও। তখনকার ভাষায় কথায় তিনি বলছেন, মুসলমান হলেন সূচ, আর হিন্দু হলেন সুতো। তাই নিয়ে হবে কাঁথা সেলাই, হবে চাদর সেলাই, হবে পিরান সেলাই। যোগীরা আর ভক্তেরা সেই সব পরবেন, ব্যবহার করবেন। মুসলমান হলেন বীণার তুম্বী, আর হিন্দু হলেন বীণার তার। সেই বীণা ঝঙ্কার দিচ্ছে, অতি মধুর আর মোহন সুরে।

কিন্তু এত সব করা সত্ত্বেও হিন্দুও শুনলো না তাঁর কথা, মুসলমানও শুনলো না তাঁর কথা। দুই দলই মহা খাপ্পা তাঁর উপর। তাই তিনি শেষে আপশোষ করে বলছেন :

সাধো দেখো জগ বৌরানা।
সাঁচ কহৈ তৌ মারণ ধাপে, ঝুটে জগ পতিয়ানা।
হিন্দু কহত হৈ রাম হামারা, মুসলমান রহমানা।
আপন মেঁ দৌড় লড়ে মরত হৈ, মরম কোই নহি জানা।
ঘর ঘর মন্ত্র জো দেত ফিরত হৈ, মায়া কে অভিমানা।
গুরুয়া সহিত শিষ্য সব বুড়ে, অন্তকাল পছিতানা।
হিন্দু কী দয়া মেহর তুরকন কী, দেখোঁ ঘর সে ভাগী।
বহ করৈ জিবহ বহ ঝটকা মারৈ, আগ দোউ ঘর লাগী।
য়া বিধি হঁসত চলত হৈঁ হমকো, আপ কহাবৈঁ স্যানা।
কহৈ কবীর শুনো ভাই সাধো, ইনমে কৌন দিবানা।।

বলছেন, ভাই সাধু, দেখ এই জগৎটা খারাপ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বললে মারতে আসবে, আর মিথ্যা যদি বল তো বিশ্বাস করবে। হিন্দু বলছে আমার রাম, মুসলমান বলছে আমার রহিম—দু'জনে লড়াই করছে খুব, কিন্তু মর্ম কেউই জানছে না। ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়ে বেড়াচ্ছে মায়ার অভিমানে, গুরুর সঙ্গে শিষ্যও ডুবছে, শেষটাতে কি দুর্গতি। হিন্দুর দয়া আর মুসলমানের মেহর, এ দু'টোই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। ও দিচ্ছে বলি, আর এ করছে জবাই—দু'জনেরই ঘরে আগুন লেগেছে। ওরা আমায় উপহাস করে চলে, আর নিজেদের বলে সেয়ানা। কবীর বলছেন, ভাই সাধো—বল দেখি এদের মধ্যে কে পাগল?

মনে রাখতে হবে কবীর বলেছেন এই সব কথা পাঁচশ বছরেরও আগে। তখন ধর্মমত নিয়ে ছিল মহা রেষারেষি, মহা দলাদলি আর বিরোধ। কবীর এই সব দলাদলি আর বিরোধ যে দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন, সে দৃষ্টি জ্ঞানীরও হয় না, পণ্ডিতেরও হয় না।

কবীর-পন্থীরা বহু শাখায় বিভক্ত, অন্ততঃ হবে প্রায় পনেরোটি শাখা। সে বহুকালের কথা। এখনো অনেক শাখা বর্তমান আছে। অনেকের মতে কবীর সম্প্রদায়-সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন।

একবার কাশীর রাজা চৈৎসিং কবীর-পন্থীদের সংখ্যা জানবার জন্ত কাশীর নিকটে এক মেলা বসান। সেই মেলায় কবীর-সম্প্রদায়ের ৩৫,০০০ হাজার উদাসীর সমাগম হয়। এও তো বহুকালের কথা। আর এক মতে, কবীর-পন্থীদের সংখ্যা দশ লক্ষের বেশী।

কবীর দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি এক শত বৎসরের বেশীকাল জীবিত ছিলেন। এমনও প্রবাদ যে তিনি তিন শত বৎসর জীবিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে লিখিত আছে :

সম্বৎ বারহসয়ে ঔর পাঁচ
মো জ্ঞানী কিয়ো বিচার।
কাশী মাঁহি প্রঘট ভয়ো শব্দ কহ্যো টক্‌সার।।
সম্বৎ পন্দরহসয়ে ঔর পাঁচ
মো মগর কিয়ো গবন।
অগহন্ সুদি একাদশী
মিলে পবন সোঁ পবন।।

অর্থাৎ, ১২০৫ সম্বতে জ্ঞানী বিচার করে দেখলেন। তিনি কাশীতে আবির্ভূত হয়ে টক্‌সার শাস্ত্র প্রকাশ করলেন। ১৫০৫ সম্বতে মগর নামক স্থানে গমন করলেন, তারপর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশীতে পবনের সহিত পবনের হল মিলন, অর্থাৎ দেহ রাখলেন।

তিন শত বৎসর এ যুগে বেঁচে থাকা এক রকম অসম্ভব বলেই মনে হওয়ার কথা। কিন্তু এক দৃষ্টান্ত আছে। ত্রৈলিঙ্গ স্বামী কাশীধামে ২৮০ বৎসরকাল পর্যন্ত দেহ ধারণ করে বিদ্যমান ছিলেন। অবশ্য এটিও হয়তো প্রবাদ কথা—যদিও যোগীপুরুষদের সুদীর্ঘকাল দেহ ধারণ করা অসম্ভব কিছুই নয়।

কবীরের দেহত্যাগের স্থান সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কারো-কারো মতে সর্বশেষে তিনি কাশীতে এসে অসিনদীর তীরে বিরাজ করতে থাকেন। তিনি সেইখানেই পুষ্পশয্যায় শয়ন করলেন আর দেহত্যাগ করলেন।

তাঁর দেহত্যাগের পর বিরোধ বাধলো হিন্দু মুসলমানের ভেতর। হিন্দুরা বলেন, দেহটিকে তাঁরা দাহ করবেন, আর মুসলমানেরা বলেন, কবর দেবেন। মহা তর্ক, মহা দ্বন্দ্ব। দেহটি ছিল এক স্বচ্ছ শুভ্র বস্ত্রে ঢাকা। এক উদাসী এই দুই দলের বিরোধ দেখে বস্ত্রটি তুলে ফেললেন। দেখা গেল দেহ নাই। তার জায়গায় রয়েছে শুধু একরাশি স্বচ্ছ ফুটন্ত ফুল। দেখে সবাই অবাক। সেই ফুল তখন দুভাগ হল। তখনকার কাশীর রাজা বীরসিংহ একভাগ নিয়ে কাশীর এক মহল্লায় সমাধি-মন্দির তৈরী করলেন, তার নাম হল—কবীর চৌরা। এখনো এই সমাধি বর্তমান। অপরভাগ নিলেন মুসলমানদের সর্দার, পাঠান বিজলী খাঁন। এই ভাগ নিয়ে গোরক্ষপুরের নিকট মগহর গ্রামে এক সমাধি তৈরী হল। এ সমাধিও এখনো আছে। এই দুইটি স্থান হল কবীরপন্থীদের তীর্থভূমি।

কবীরের পর এলেন গুরু নানক ৭১ বছর পরে—যদিও অনেক পরে। কিন্তু এই দুই মহাপুরুষের আবির্ভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্মসমন্বয় হয়, দু দলের মিলনও হয়। মানবজাতির এ যে কত বড় কল্যাণকর সেবা, তার বর্ণনা করা যায় না।

কবীরের ধর্মপন্থা বিশেষভাবে প্রচারিত হয় উত্তর-ভারতে। কবীরের পর তাঁর অনুবর্তী হন অনেকেই। যেমন—অযোধ্যার জগজীবন দাস। জগজীবন দাস সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আনোয়ারের চরণদাস চরণদাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। মালব দেশের বাবালাল সাধু বাবালালী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এঁদের বাণী-বচনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ের কথা বেশ সুস্পষ্ট। হিন্দু-মুসলমানের অন্ধ কুসংস্কার এবং অন্ধ গোঁড়ামী যে কত বেশী তিরোহিত হয়ে গেছলো এঁদের প্রভাবে উত্তর-ভারত থেকে, তা দক্ষিণ ভারতের তখনকার অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

কবীরের গ্রন্থ আছে বিস্তর। সে সবই অতি মনোহর হিন্দী ছন্দে রচিত। আর সে রচনা হল—দোঁহা, চৌপাই, শাখী, শব্দ প্রভৃতি অনুপম ছন্দ নিয়ে। কবীরের ২১খানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তার ভিতর "শাখী" হল একটি। এই শাখীগ্রন্থে পাঁচ হাজার শ্লোক আছে। এই সব শ্লোক অতীব মনোহারী।

'শাখী' অর্থ উপদেশ। সন্ত কবীর নানা বিষয়ে, নানাভাবে জীবকে উপদেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর উপদেশের কিছু কিছু উদ্ধৃত করি—

দুখ মেঁ সুমিরণ সব করৈঁ
সুখ মেঁ করৈ না কোয়।
জো সুখ মেঁ সুমিরণ করেঁ
তৌ দুখ কাহে কো হোয়।

দুঃখে পড়ে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে, কিন্তু সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। সুখের সময় যদি স্মরণ করে, তো দুঃখ হবে কেন?

নাচৈ গাবৈ পদ কহৈ
নাহিঁ সত্য সো হেত।
কহৈ কবীর ক্যোঁ নাপজে
বীজ বিহুনা খেত॥

ভক্তি না হোলে, শুধু নর্তন, কীর্তন বা পদ পাঠে কোনই ফল নেই। কবীর বলছেন, ভক্তিরূপ বীজ ভিন্ন, হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে কোন শস্য উৎপন্ন হয় না।

রুখা শুখা খাইকে
ঠাণ্ডা পানী পিব।
দেখি বিরাণী চোপড়ী
মৎ ললচাবে জীব॥

রুক্ষ ও শুষ্ক খাদ্য ভোজন করে ঠাণ্ডাজল পান কর। পরের সুস্বাদু খাদ্য দেখে যেন তোমায় জিহ্বায় জল না পড়ে।

সাধুন কী ঝুপড়ী ভলী
না সাকট কো গাঁব।
চন্দন কী কুটকী ভলী
না বাঁবুল বনরাও॥

সাধুর ঝুপড়ীও ভাল, দুষ্টের গ্রামও ভাল নয়। চন্দন কাঠের একটু টুকরোও ভাল, কিন্তু বাবুলের একটা বৃহৎ বৃক্ষও ভাল নয়।

কবীর হস্‌না দূর কর
রোবনে সে দো চিত্ত।
বিন রোয়ে নহিঁ পাইয়ে
প্রেম পিয়ারা মিত্ত॥

হে কবীর, হাসি দূর কর। রোদনে তোমার চিত্ত দাও। প্রেমের সেই প্রিয় মিত্রকে বিনা রোদনে পাবে না।

হসি হসি কান্ত ন পাইয়া
জিন পায়া তিন রোয়।
হসি খেলে পিউ মিলে
তৌ কৌন দুহাগিন হোয়॥

হেসে হেসে কান্তকে পাওয়া যাবে না। যিনি পেয়েছেন, তিনিই রোদন করেছেন। হাসি-খেলা করে যদি প্রিয়কে পাওয়া যেত, তাহলে কেউই বিরহিনী হোত না।

সুখিয়া সব সংসার হৈ
খাবৈ ঔর সোবৈ।
দুখিয়া দাস কবীর হৈ
জাগৈ ঔর রোবৈ॥

সংসারের সকলেই সুখী, সবাই খায় আর শয়ন করে। দাস কবীরই কেবল দুঃখী, সে জেগে থাকে আর তাঁর বিরহে রোদন করে।

কামী ক্রোধী লালচী
ইনসৈ ভক্তি ন হোয়।
ভক্তি করে কোই সুরমা
জাতি বরণ কুল খোয়॥

কামী, ক্রোধী আর লোভী এদের ভক্তি হয় না। জাতি, বর্ণ আর কুল খুইয়ে দু'একজন বীর কেবল ভক্তি লাভ করে।

কবীর সব জগ নির্ধনা
ধনবন্তা নহি কোয়।
ধনবন্তা সোই জানিয়ে
সত্য নাম ধন হোয়॥

হে কবীর, জগতের সকলেই নির্ধন, কাকেও ধনবান দেখা যায় না। তাকেই ধনবান বলে জেনো, যার সত্যনাম-ধন প্রাপ্তি হোয়েছে।

পণ্ডিত ঔর মসালচী
দোনো সুঝে নাহিঁ।
ঔরণ কো করেঁ চাঁদনা
আপ অন্ধেরে মাহিঁ॥

পণ্ডিত আর মশালচী দুজনেরই বোধ নেই। এরা অপরকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেরাই থাকে অন্ধকারের মধ্যে।

বোলী তো অনমোল হৈ
জো কোই জানে বোল।
হিয়ে তরাজু তৌল কর
তব মুখ বাহর খোলে॥

বোলী অর্থাৎ বাক্য হোল অমূল্য, যদি কেউ তা বলতে জানে। হিয়ারূপ দাঁড়ি-পাল্লায় আগে তাকে তৌল অর্থাৎ ওজন কর—তারপর বাইরে মুখ খোল।

চলতি চক্কী দেখ কর
দিয়া কবীরা রোয়।
দো পাটন কে বিচ
সাবিত গয়া ন কোয়॥

জাঁতা ঘুরছে দেখে কবীরজী রোদন করতে লাগলেন। জাঁতার এই দুই পাটের মধ্যে এসে কোন প্রাণীই সাবিত অর্থাৎ আস্ত রইলো না।

সাধু কহাবন কঠিন হৈ
জৌঁ লম্বা পেড় খজুর।
চঢ়ে তো চখৈ প্রেমরস
গিরৈ তো চকনা চুর॥

সাধু হওয়া বড়ই কঠিন কাজ। ওটি লম্বা খেজুর গাছের তুল্য। গাছে চড়তে পারলে আস্বাদ লওয়া যেতে পারে, কিন্তু পতন হোলেই একেবারে চূর্ণ।

সাধু য্যায়সা চাহিয়ে
দুখৈ দুখাবৈ নাহি
ফল ঔর ফুল ছেড়ৈ নাহি
বসৈ বগীচা মাহি।

সাধুর এমন হওয়া চাই, যিনি নিজেও দুঃখ বোধ করেন না, অপরকেও দুঃখ দেন না। তিনি সংসাররূপ বাগিচায় বাস করেন বটে, কিন্তু ফুল বা ফল ছিঁড়িয়া ভোগ করেন না।

কন ফুঁকা গুরু হদ্দ কা
বেহদ কা গুরু ঔর।
বেহদ কা গুরু জব মিলেঁ
তৌ লগৈ ঠিকানা ঠৌর।

যে গুরু কানে মন্ত্র দেন, তিনি রয়েছেন সীমার মধ্যে। অসীমের গুরুর কথাই আলাদা। অসীমের গুরু যখন মিলবেন, তখনই ঠিক জিনিসের ঠিকানা পাওয়া যাবে, নইলে নয়।

লাখ কোস জো গুরু বসৈঁ
দীজে সুরত পঠায়।
শব্দ তুরী অসবার হোয়
ছিন আবে ছিন যায়॥

সাচ্চা গুরু কি রকম? না, লাখ ক্রোশ দূরে তিনি যদি থাকেন তাতে কি? শব্দের উপর সওয়ারী হোয়ে এক মুহূর্তে যায়, আর এক মুহূর্তে আসেন।

হম বাণী উস দেশ কা
জহাঁ অবিনাশী কী স্থান।
দুখ সুখ কোই ব্যাপে নহী
সব দিন এক সমান॥

আমি সেই দেশের বাসী, যেখানে অবিনাশীর স্থান। সেখানে জীবকে দুঃখ ও সুখ ব্যাপৃত করতে পারে না—সেখানে সকল দিনই এক-সমান।

হম বাসী উস দেশ কা
জহাঁ বারহ মাস বিলাস!
প্রেম ঝরৈ বিকসে কমল
প্রেমপুঞ্জ পরকাশ॥

আমি সেই দেশের বাসী, যেখানে বার মাস বসন্তঋতু বিরাজমান। যেখানে নির্ঝরসকল মহা অমৃত বর্ষণ করছে, আর সন্তগণ সেই অমৃতে সিক্ত হচ্ছেন।

হম বাসী উস দেশ কা জহাঁ পার ব্রহ্ম কা খেল।
দীপকজরৈ অসম কাবিন বানি বিন তেল॥

আমি সেই দেশের বাসী, যেখানে পরব্রহ্মের খেলা চলছে। যেখানে বিনা বাতি আর বিনা তেলে, অসম-আত্মার জ্যোতি জ্বলছে।

কবীরের সাধনপথের সম্যক পারদর্শী হতে হলে, তাঁর গ্রন্থসকল পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু এ সকল পড়বে কে? কার সে অধিকার? সে পথে কিছু এগিয়ে না গেলে, সে সকলের সত্য তথ্য উদঘাটন করা সুকঠিন। কবীরের বাণী সকল লোকেরই অন্তরের বাণী আর সে-বাণী জগতে অতুলনীয়।

পূর্ব কথার পুনরুক্তি করি—কবীর ছিলেন প্রথম সন্ত। তিনি যে সন্ত-পন্থা অনুবর্তন করে গেলেন, তা চলে আসছে তাঁর সময় থেকে পূর্ণভাবে, মহিমময় ভাবে, অবিকৃত ভাবে। একটি বাণীর মধ্যে আছে—

সন্তমতা সব সে বড়া
য়হ নিশ্চয় কর জান।
সুফী ঔর বেদান্তী
দোঁনো নীচে যান॥
সন্ত দিবালী নিত করেঁ
সত্যলোক কে মাহি।
ঔর মতে সব কানাকে
য্যাহী ধুল উড়াহী॥

সমাপ্ত

আধুনিক বঙ্গদেশ

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু

সত্যের প্রতি এই নতুন আনুগত্য সব সময়েই ধর্ম সংস্কারের পথে যায়নি। প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে এবং নিরীশ্বরবাদের দিকেও গেছে। এক বিগ্রহের বদলে আর এক বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা চলছিল। নতুন বিগ্রহ হাতুড়ির প্রতিচ্ছবি, তাই দিয়ে অন্য বিগ্রহ ভাঙা হচ্ছিল।

সংস্কার ও ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের প্রতি যে আনুগত্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল তার মধ্যে একটা গভীর সারবস্তু ছিল। এটা সংশয়বাদ, বিদ্বেষ অথবা হতাশার পরিণাম নয়। মানুষের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে অতীত ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে নবীন যাত্রার পথ প্রশস্ত হবে।

সংবাদপত্র ও ছাপাখানা

দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনের ফলে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক এবং কারিগরির ক্ষেত্রে যেভাবে পরিবর্তন ঘটছে, তারই ভিত্তিতে বাঙলার সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর গতিবিধি নির্ণয় করা যেতে পারে। বাঙলার সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের পক্ষে এই পদ্ধতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি, যদিও এটাকে অনেক সময় খাটো করে দেখা হয়। এই সমস্ত ঘটনার কিছু চিত্তাকর্ষক প্রমাণ সমাচারদর্পণ (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলন করে সংবাদপত্রে সেকালের কথা নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতার সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল শক্তি প্রাধান্যলাভ করেছিল। কিন্তু তার আগেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের অগ্রগতির জন্য পূর্বসূরীরা বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করে গেছেন। পরবর্তীকালে ঐতিহাসিকরা তাঁদের ভূমিকাকে অযথা খাটো করে দেখেছেন।

কারিগরীর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির কোন একটি উদাহরণ দিতে গেলে বাঙলা দেশে ছাপাখানার প্রবর্ত্তনের কথা বলতে হয়। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স আর কামার পঞ্চানন কর্মকার বাঙলা হরফ ঢালাই করেছিলেন। এই ঘটনা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। (বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, ১৩৫৩, পৃঃ ৩৮)

বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এন বি হ্যালহেড ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। বিচারকার্য পরিচালনা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যের জন্য ১৭৯১, ১৭৯২ ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি আইন বাংলা ভাষায় ছাপা হয়। ১৭৯৩ ও ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। এর ফলে বাংলা দেশে ছাপাখানা এবং সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় চিঠিপত্র লেখার বাংলা গদ্যের সূত্রপাত হল। এর আগে সংস্কৃত অথবা পারস্য ভাষায় চিঠিপত্র লেখা হত। (বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস পৃঃ ২২)

১৭৭৮ থেকে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এন বি হ্যালহেড ও হেনরী পিটস ফর্স্টার বাংলা ভাষাকে পারস্য ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তার জায়গায় সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দ চালু করবার চেষ্টা করলেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ২৭-৩১)

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত অথবা শকুন্তলার মত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রথম অনুবাদ করেন ইংরেজরাই। ফলে বিশ্ববাসীর কাছে এক নতুন বিশ্বের দুয়ার উন্মুক্ত হল। ইংরেজ লেখকদের কাছে বাংলা গদ্য যে ঋণী তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস— সজনী দাস, পৃঃ ১৫-৩১) বাংলার বিদ্বৎসমাজের কাছে যে নতুন সুযোগ এসে গেল তাঁরা তা গ্রহণ করলেন এবং আমরা দেখতে পাই ছাপাখানার যথেষ্ট ব্যবহার ও অনুবাদ কাজে নতুন উন্নত ধরণের গদ্যের প্রচলন বেড়ে গেল। এতকাল মুষ্টিমেয় সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে তার প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল।

শিক্ষা সম্পর্কে লোকের আগ্রহ বেড়ে গেল এবং গোঁড়া ও প্রগতিশীল লোকেরা দেশের সর্বত্র বিলিতি ছাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে দলবদ্ধ হল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের কাছে সংস্কৃত বনাম ইংরাজী শিক্ষা সম্পর্কে যে পত্র লিখেছিলেন এখানে তা উদ্ধৃত করা হল :—

কলকাতায় নতুন একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ভারতবাসীদের শিক্ষা উন্নয়নে গভর্ণমেণ্টের প্রশংসনীয় ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। এই আশীর্বাদের জন্য তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে এবং মানবজাতির প্রত্যেক কল্যাণকামী কামনা করবে যে এই প্রচেষ্টা কুসংস্কারবর্জিত আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হোক, যেন জ্ঞানের ধারা প্রয়োজনীয় খাতে প্রবাহিত হয়।

যখন এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন আমরা জানতে পেরেছিলাম যে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের শিক্ষার জন্য বার্ষিক একটা মোটা রকমের অর্থ ব্যয় করবার আদেশ দিয়াছেন। আমাদের নিশ্চিত আশা যে, ভারতের অধিবাসীদের গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, শরীরব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই অর্থে প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের নিযুক্ত করা হবে। ইউরোপের অধিবাসিগণ এই সমস্ত বিষয় আয়ত্ত করে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের অপেক্ষা উন্নত হয়েছে।

* * * *

আমরা দেখতে পাচ্ছি গভর্ণমেণ্ট ভারতে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য হিন্দু পণ্ডিতদের অধীনে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এই রকম বিদ্যালয়ে (লর্ড বেকনের আগে পূর্ব ইউরোপে এই ধরণের বিদ্যালয় বর্তমান ছিল) ব্যাকরণ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ও পরা বিদ্যা বিষয়ক আলোচনার দ্বারা যুবকদের মন ভারাক্রান্ত করা হয়, যা ছাত্র অথবা সমাজ কারও কোন কাজে লাগে না। দু' হাজার বছর আগে যে জ্ঞান প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তীকালে উদ্ভট কল্পনাপ্রবণ লোকেরা অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বরের দ্বারা যে জ্ঞানের

পরিধি অর্থহীনভাবে সম্প্রসারিত করেছে, সেখানে শুধু তাই শিক্ষা দেওয়া হবে। ভারতের সর্বত্রই তো এই ধরণের শিক্ষালয় প্রচলিত আছে।

* * *

ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হল ভারতের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের উন্নতিবিধান। সেজন্যে আমি মহামান্য হুজুরের বরাবরে নিবেদন করতে চাই, এখন যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা অনুকরণ করা হলে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। তরুণদের সংস্কৃত ব্যাকরণের কচকচি শেখবার জীবনের কয়েকটি মহামূল্য বছর এইভাবে অপব্যয় করতে প্ররোচিত করে কোন উন্নতি হবে বলে আশা করা যায় না। ব্যাকরণের কচকচি কি ভাবে সময় অপব্যয় করে ~ র একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। সংস্কৃত খাদ শব্দের অর্থ খাওয়া। খাদন্তি-র অর্থ কোন একজন পুরুষ অথবা একজন নারী অথবা কোন অচেতন জীব খাচ্ছে। এখন এখানে প্রশ্ন উঠে—খাদতি শব্দটা সমগ্রভাবে ধরলে তাতে কি নারী, পুরুষ অথবা অচেতন জীব খাচ্ছে বোঝাবে? না, শব্দটার ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দাঁড়াবে? ইংরাজি ভাষায় eat (খাওয়া) শব্দটার অর্থই বা কতটুকু আর S-বর্ণমালার অর্থ কতটুকু সে প্রশ্ন ওঠে কি? এবং এই দুই অংশ একত্রে অথবা পৃথক পৃথকভাবে কোন সামাগ্রিক অর্থে পৌছে কি?

ঈশ্বরপ্রাপ্তি করে আত্মার বিলুপ্তি হয়, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্পর্ক কি, বেদান্তে এই সব কাল্পনিক তত্ত্বকথার আলোচনা করে উন্নতি হবে না। বেদান্ত বলছে সবই মায়া, যা আমরা চোখে দেখছি আসলে তার কোন অস্তিত্ব নেই। বাপ ভাই বলে কিছু নেই, তাদের প্রতি মায়া-মমতা রাখবারও কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং যত শীঘ্র আমরা তাদের কাছছাড়া হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিই ততই মঙ্গল। যুবকেরা বেদান্তের এই শিক্ষালাভ করে সমাজের উন্নততর সদস্য হতে পারবে না। বেদান্তের কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করে পাঁঠাবলি দিলে কোন পাপ হয় না—এই মীমাংসা জেনে অথবা বেদের কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ প্রভাব অবগত হয়েও ছাত্ররা উপকৃত হবে না।

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ছাত্ররা জেনেছে বিশ্বপ্রকৃতির বস্তুসমষ্টি ক'টি আদর্শ শ্রেণীতে বিভক্ত, আর জেনেছে দেহের সঙ্গে আত্মার, আত্মার সঙ্গে দেহের এবং চোখের সঙ্গে কান ইত্যাদির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কি। কিন্তু তাতে ছাত্রদের মনের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

উপরে যে ধরণের কাল্পনিক শিক্ষার কথা বলা হল তাতে উৎসাহ দেওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে আমি মহামান্য হুজুরের বরাবরে জানাতে চাই যে বেকনের সময়ের আগে ইউরোপে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যে রকম অবস্থা ছিল তার সঙ্গে বেকনের লেখার পরবর্তী সময়ের জ্ঞানের অগ্রগতির তুলনা করা হোক।

বৃটিশ জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখাই যদি উদ্দেশ্য হত তাহলে অজ্ঞতা চিরস্থায়ী রাখবার জন্য স্কুল শিক্ষকরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তার পরিবর্তে বেকনীয় দর্শন প্রবর্তন করতে দেওয়া

হত না। সেই ভাবে বলা যায় বৃটিশ আইনসভার যদি তাই উদ্দেশ্য হয় তবে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা দেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা যাবে। কিন্তু দেশীয় অধিবাসীদের উন্নতি করাই যখন গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য তখন গভর্ণমেণ্ট শেষ পর্যন্ত আরও উদার শিক্ষা প্রণালী গ্রহণ করে গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়নশাস্ত্র, শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে আশা করা যায় এবং উক্ত অর্থে ইউরোপে সুশিক্ষিত প্রতিভাসম্পন্ন কয়েকজন ভদ্রলোককে নিযুক্ত করে এবং প্রয়োজনীয় বই, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সজ্জিত একটি কলেজ স্থাপন করে সেই কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে। (হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস,—রাজনারায়ণ বসু, ২৬-৩৩) সংস্কৃত শিক্ষার সমসাময়িক অবস্থা কি রকম ছিল তা রামমোহনের পত্রেই অত্যন্ত সঠিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যে সমস্ত বিজ্ঞান ও ফলিত জ্ঞান আয়ত্ত করে ইংলণ্ড একটি শক্তিশালী আধুনিক জাতিতে পরিণত হয়েছে তা আয়ত্ত করবার জন্য এদেশে প্রগতিশীল নেতাদের মধ্যে যে প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাও এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এখানে আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন দিগ্‌দর্শন নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন, তাতে বেলুন বাষ্পীয়পোত প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিবরণ থাকত। স্কুল বুক সোসাইটিও ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্বাবলী নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তাতে সিংহ, ভল্লুক, হাতী, গণ্ডার, জলজন্তু প্রভৃতি জন্তু সম্পর্কে সচিত্র প্রবন্ধ থাকতো। বিজ্ঞান সেবধি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানসার সংগ্রহ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পক্ষীর বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩) সুরু থেকেই বার বছর কাল অক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়। প্রচলিত বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধগুলো অপূর্ব ছিল এবং তা মাঝে মাঝে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হত। পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহে (১৮৫১) প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা ও ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞানের প্রচার হতে থাকে।

এই ভাবে বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত আগ্রহ দেখা দেয়, কারণ তখন সকলেই বুঝেছিল যে এর মধ্যে ইউরোপের মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে। সুতরাং গভর্ণর জেনারেলের কাছে রামমোহন রায় যে আবেদন করেছিলেন তা অনুরূপ ভাবে ভাবুক দেশবাসীর পক্ষ থেকে একজন বুদ্ধিমান নেতার কণ্ঠস্বর বলে ধরা যেতে পারে।

এ ছাড়াও, ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহের আরও একটি বাস্তব কারণ ছিল। ২৬শে জানুয়ারী, ১৮২৮ তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদ এই ঘটনার উপর চমৎকার আলোকপাত করে।

"পূর্ব্বে ইংরাজেরা এমত বুঝিতেন যে, বাঙ্গালীরা কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করে কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা আপনাদের দেশভাষার ন্যায় ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় সওয়াল ও জবাব করিবার কি আটক। এখন বাংলা দেশের মধ্যে তাবৎ আদালতে পারসি ভাষা চলিতেছে তাহা জজ সাহেবের ভাষা নয় ও উকীলদেরও ভাষা নয় আসামী ফরিয়াদীর ভাষা নয় এবং সাক্ষিদেরও ভাষাও নয়। আমাদেরও বিবেচনায় এই যে যদি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত। পূর্ব্বে তাহার এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গাল লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না ও কহিতে পারত না কিন্তু সে বাধা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে যেহেতুক আমরা দেখিতেছি যে কালকাতার হিন্দু কলেজে চারি শত বালক ইংরাজি শিখিতেছে এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মধ্যে অন্য অন্য ইস্কুলে যত বালক ইংরাজি শিখিতেছে তাহাদের সংখ্যা করিলে এক হাজারের ন্যূন হইবে না এবং তাহারা এমত শিক্ষা করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহাদের আটক হয় না। অতএব যদি আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষা চলন হয় তবে এই বিদ্যা শিক্ষার ফল দেখা যায় কিন্তু বাঙ্গালী লোকেরদিগকে তাহার উদ্যোগ করা উচিত। কালকাতাস্থ লোকেরদের উচিৎ যে তাহারা এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরখাস্ত করেন যে কালক্রমে আদালতে পারসি উঠিয়া ইংরাজি চলন হয় পরে যদি সে দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে বাঙ্গালি লোকেরা অধিক উৎসাহপূর্ব্বক আপনাদের বালকদিগকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করাইবেন ও শিক্ষার সাফল্য হইবে।" (সংবাদপত্রে সেকালের কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৬, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩-৩৪)

১৩ই জুন, ১৮১৯ তারিখে বঙ্গদূত পত্রে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তা এই প্রসঙ্গে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে :—

বঙ্গদূত (১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬)

গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই, পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্ব্বে, কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্ট রূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহাদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনপদ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশ ব্যবহার ও কর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৮)

নোনা গাং

শক্তিপদ রাজগুরু

এ রাজ্যে মানুষ আসে ভুল করে। মানুষের জগৎ এ নয়। কোথাও কোনখানে মানুষের জন্য খাদ্যের কোন সংস্থান নাই। গহন সীমাহীন বন, রাত্রির তমসা ভেদ করে কানে আসে হিংস্র শ্বাপদের মত্ত গর্জনধ্বনি, চোখের তারায় তারায় প্রজ্বলিত দৃষ্টি নিয়ে ফেরে জীবন্ত মৃত্যুর দূত। গাছে কোথাও মানুষের খাবার মত ফল জন্মেনা, নোনা মাটি মুখ থবড়ে পড়ে আছে বিশ্বাসঘাতকের মত, ফল ফলানোর স্বপ্ন—ধানের মঞ্জরীর মিনতি ভরা চাহনি এর দিকে কখনও পড়েনি। জল। জল—আর জল। কিন্তু গহিন কাজল-কালো তৃষ্ণাহারী পানীয় এ নয়। পঙ্কিল লবণাক্ত সমুদ্রের ভীষণতামাখা এর প্রতিটি বিন্দু, মাঝে মাঝে কোথাও এর বুকে ভেসে রয়েছে তাতোধিক কুৎসিত শেওলা পড়া কুমীরের দলছাড়া কোন বৃদ্ধ পিতামহ, চলতি নৌকার ধার ঘেঁসে চলছে কমটের ঝাঁক, যদি কোন খাদ্য ছিটকে পড়ে সেই আশায় এক একবার লেজঝাপটা দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। জীবনের সঙ্গে সন্ধিপত্রে কোথাও এই পরিবেশের স্বাক্ষর পড়েনি, অদৃশ্য অচ্ছেদ্য সম্পর্ক মাত্র একটিই বর্ত্তমান তা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে বিদ্রোহের—ধ্বংসের।

তিনদিন তিনরাত্রি ধরে চলেছি ভাঁটার টানে—সমুদ্রের দিকে সুন্দর বনের মধ্য দিয়ে। এখনও একভাটি গেলে তবে পৌছবো 'লোথিয়ান আইল্যাণ্ডে' সেই একই দৃশ্য, নদীর প্রসার বেড়ে চলেছে, অন্যপারের বনানী পরিষ্কারভাবে চোখে পড়ে না, একটা ক্ষীণ কালো রেখা কে যেন দিগন্তের কোলে টেনে রেখেছে।

সুরমান বাওয়ালি হালে বসেছে, সাড়ে তিনশো মণের নোতুন নৌকাখানা চার দাঁড়ে বেশ এগিয়ে চলেছে, নদীর দোলানিতে সারা শরীর দুলছে। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে বসে আছি নিঃসঙ্গ আমি—শূন্য দৃষ্টিতে এপাশের কেওড়া-গর্জ্জন পশুর গাছের ঘন সবুজ বনানীর দিকে; তিনদিন-তিনরাত্রি লোকালয় ছেড়ে এসেছি, মানুষের কণ্ঠস্বর শুনছি ওই বাওয়ালি পাঁচজনের, কুকুরের ডাক পাখীর ডাক—আজ তিনদিন কানে আসেনি, সমাজ আমাকে তার শান্ত নিবিড় আলিঙ্গন থেকে নির্বাসন দিয়ে বনবাসে পাঠিয়েছে।

—কই রে, গান গাইছিলি যে, থামলি কেন?

ছোকরা মাঝি ইয়াকুব ওদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী, মাঝে মাঝে কারণ অকারণে গুন্ গুন্ করে সারী গানের একটা কলি গেয়ে বসে। বুড়ো মাঝি সুরমান ধমক দেয়—চুপ কর, গান! এ জিনপরীর বনে গান করতে নাই। চ্যাঙড়া ছাওয়াল কোথাকার।

ছেলেটা চুপ করে যায়। মানুষ এখানে তার সমস্ত কিছু সৌন্দর্য্য—সুকুমার বৃত্তিকে পিছনে ফেলে আসে এই মৃত্যুপুরীতে, সুর এখানে স্তব্ধ, হাসি এখানে জোর করে ফুটিয়ে তুলতে হয়—সে হাসিও যা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় —তাকে আর যাই হোক কিছু বলা যেতে পারে—হাসি সে নয়।

আমার কথায় ইয়াকুব মুখ তুলে চাইল মাত্র। কোন কথা না বলে দাঁড়ের টানে টানে আগু-পিছু হটতে থাকে। একটা শব্দ কানে দিনরাত বাজতে সুরু হয়েছে, তা ওই দাঁড়ের ঝপ ঝপ ছন্দ।

বৈকাল নেমে এসেছে। ভাঁটার টান মন্দীভূত হয়ে আসছে। আঙুল দিয়ে দেখাল একজন দাঁড়ি—এই যে কেওড়াগুঁত।

চেয়ে দেখি, বড় নদী থেকে বার হয়ে গেছে দূরে বাঁকের মাথায় একটা প্রশস্ত খাল—দু'পাশে বিশাল কয়েকটা কেওড়া গাছ ঘন কালো ছায়ায় অন্তরালে কি এক গোপন রহস্য আবৃত করে রেখেছে।

বড় সাচ্চা মানুষ ছিল বাবু, ওরই দোয়ায় আজ বনে বনে কাম কাম করতিছি।

হালের মাচানের উপর থেকে সুরমান আলি সামনের

দিকে চেয়ে আছে, মাঝিদের কথা স্তব্ধ হয়ে গেল, কি যেন একটা নিবিড় স্তব্ধতা নেমে এসেছে ওদের মুখে

কথা কইল সুরমান—ভাঁটার টান কমি আসতিছে, জোরে বাতি হবে, নালি কেওড়াসুঁতে পৌঁচতি পারবা নি···

শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ওরা বাইছে নিরাপদ আশ্রয়টুকুর দিকে।

কোথাও জনমনুষ্যি নাই, এও বন—ওখানে বরং নিবিড়তর বনানী, তবু কেন ওরা ওখানে পৌঁছতে চায় জানিনা। নীরবে বসে আছি।

ঘন-কালো গাছের মাথায় মাথায় নেমে এসেছে আবছা অন্ধকারের স্পর্শ, বাতাসে ভেসে আসে দূরসমুদ্রের গর্জনধ্বনি, পশ্চিম আকাশের বুকে রং-এর শেষ খেলা তখনও মুছে যায়নি। কোন অধরা চিত্রকর আকাশজোড়া ইজেলের বুকে একরাশ লাল রং ছড়িয়ে নীচের দিক থেকে কালো কালিতে ঢেকে দিচ্ছে—নির্ধূম নীল আকাশের প্রশান্তি মিলিয়ে গেল, ফুটে উঠল ভীরু শঙ্কিত চাহনিভরা দু'-একটা ছিটকে পড়া তারার ফুল, অঙ্গনে অযত্নে বেড়ে ওঠা সন্ধ্যামালতীর মত।

—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মহম্মদ রসুল্লাহ—

সুরমান বাওলিয়া নেওয়াজ পড়ছে, আরও চার জন রয়েছে তার সঙ্গে। দিন শেষ হয়ে গেল—এল সন্ধ্যা। নিবিড় প্রশান্তিভরা রহস্যাবৃত অন্ধকার! হঠাৎ গাছের ডালের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। বাঁধা রয়েছে একটা জীর্ণ বিবর্ণ লুঙ্গি—একটা ছেঁড়া মাদুর—আর একটা পুঁটলিমত কি। গহন বনে—লোকালয় থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে—শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম বনের মধ্যে মানুষের স্পর্শমাখা কি এক রহস্য বাসা বেঁধেছে গাছের ডালে!

—ওটা কি সুরমান?

তামাক খাচ্ছিল সে নৌকার খোলে বসে, কলকের লাল আভা পড়েছে গোঁফ-দাড়িভরা মুখের এক পাশে, চোখের দৃষ্টি ওর সুদূর-প্রসারী আগত অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—মজিদ বাওয়ালির কবর!

অকারণে যেন আধপাকা চুল ভর্তি মাথাটাও নোয়াল একটু।

—কবর! বিস্মিত হয়ে উঠি। মাটি বলতে জোয়ারের পলিমাখা নোনা কালো কাদা, সমস্ত সুন্দরবনই প্রায় জোয়ারের সময় জলের তলে থাকে। এখানে কবর!

—বড় সাচ্চা মানুষ ছিল বাবু, ওরই দোয়ায় আজ বনে বনে কাম কাম করতিছি।

কেমন একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক চিরে বার হয়ে আসে।

চুপ করে আবার তামাকে মন দিল, কি যেন রহস্য—একটা অব্যক্ত ইতিহাস চাপা রয়ে গেল ওর স্তব্ধতায়।

ঢেউ-এর দোলায় নৌকাখানা দুলছে। অন্ধকারের বুক চিরে একফালি চাঁদ চেয়ে রয়েছে থমথমে বনানীর দিকে, কাছেই ডাকছে হরিণের দল।

'বনের মর্মরে জেগে ওঠে অরণ্যানীর জীবনস্পন্দন, ছই-এর ভিতর বসে আছি ব্যাগখানা মুড়ি দিয়ে। ওপাশে বসে সুরমান। হ্যারিকেনের পলতেটা নামানো, ক্ষীণ আলোটাও আড়াল করা হয়েছে।

—জল-জঙ্গলের কথা বাবু, কে জানে ডাকাতের ছিপও ঘুরি বেড়ায়, জন্তু জানোয়ার তো আছিই, বাতির নিশানা রাখতি নাই।

আবছা অন্ধকারে চেয়ে রয়েছি সুরমানের দিকে। ওর দৃষ্টি অতীতের জীর্ণ পাতাভরা ইতিহাসের ছিন্ন মলিন পুঁথি হাতড়াচ্ছে। জলো হাওয়া রাতের হিমেল স্পর্শ নিয়ে আসে, মৃদু মৃদু দুলছে নৌকাটা—স্বপ্ন দেখি মা যেন দোলনার সামনে দাঁড়িয়ে গুনগুন্ করে গান গেয়ে দামাল ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বনের বুক থেকে অনেক দূরে কোথায় একটি গ্রাম। জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হয় এর ধমনীতে এর মাটিতে ফসল ফলে সোনাধানের শিষে, গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রোদ আবীর ছড়ায় মুঠোমুঠো করে দিগন্তপ্রসারী ক্ষেতের বুকে।

সুরমান তখন যোয়ান, নোতুন গজানো কেওড়াগাছের মত পুরুষ্ট সতেজ গড়ন; খালের ধারেই মজিদ আলির বাড়ী, কয়েক বৎসর থেকেই বাওয়ালির কায ধরেছে—দু'পয়সা রোজগার করে মন্দ নয়, ছনের বেড়ার উপরে টিনের ছাদন দিয়ে ঘর বেঁধেছে দুখানা।

কায কাম নাই। ধান পোঁতা আর ধান রোওয়ার সময় কায কিছু পায়—বছরের বাকী দিনগুলো খোদার মর্জির দিকে চেয়ে থাকে, তাগড়া যোয়ান মরদ সুরমান, বিনি কাযে দিন গুজরান করতে মেজাজ চায় না। বুড়ী মা মাঝে মাঝে মুখঝামটা দেয়।

—গান করি, আর বাবরি চুল রাখলিই খাতি পাবি? কায কাম করতি হবে না? গিইছিলি আড়তদারের কাছে?

—আড়তদারের ওখানে জন মজুরির কায মাঝে মাঝে মেলে, তাও ওই খোদার মরজি অর্থাৎ কালে ভদ্রে—বসে বসে তামাক খাও ফুট ফরমাজ খাটো, দু'চার বস্তা ধান তুলে দিয়ে ডিঙ্গি বেয়ে ওঘাটের হাটখোলায় যাও, ব্যস ওই পর্য্যন্তই, পয়সা চাইলেই আড়তদার শাদা খাঁকের কলমের উল্টোপিঠ দিয়ে গা চুলকে বলে—পয়সার কি কাম করলি রে সুরমান? লে একছিলিম তামাক নিয়ে যা।

সুরমান মায়ের বকুনি নীরবে হজম করে, যেমন করে হোক একপালি চাল ও জোটাবে; সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, হাটখোলার ওপাশে গণি মিঞার দলিজে বসে জারি গানের আসর, বাঁশের বাঁশীটা ছনের আড়া থেকে বার করে গামছাখানা গায়ে চাপিয়ে বার হয়ে যায়। ছিরু সাহার দোকানে চৌদ্দ বাতির আলো জলছে, জুয়োর

মত নরম পলিমাটির রাস্তাটা ধরে চলে সে, কোথায় জলাতে কে পাট জাঁক দিয়েছে তারই টক-টক গন্ধ বাতাসে ভাসছে, বাঁশীটায় ফুঁ দেয় সে মজিদের কাছে এসে, সুরটা সকলেরই পরিচিত।

—এত দেরী কেন রে?

সুরমান গিয়ে ঢুকলো সেখানে।

গান-বাজনার পর বাড়ীমুখো হ'ল যখন রাত কত জানে না, একফালি চাঁদ সে-ও ডুবে গেছে।

সন্তর্পণে বেড়াটা ঠেলে বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাড়ী ঢুকলো, একটু শব্দ হলেই বুড়ীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, বুড়ী মায়ের চেয়েও সাবধানী ওই সুরমান।

বেশ কাটছিল দিনগুলো, অভাব অভিযোগ থাকুক তবুও সকালের স্বর্ণরৌদ্র তার মনে সুর আনতো, সন্ধ্যার স্থির নীরবতা প্রশস্ত কলগাছি নদীর বুকে শয়ন বিছাতো—বাতাসে বাতাসে কোথায় কদম ফুলের সৌরভ কাজলকালো বর্ষার আকাশ তার অন্তরের সেই সুরপাগল মানুষটিকে ডাক দিত বার বার।

এমনি দিনে হঠাৎ চোখে পড়ল তার মরিয়মকে, কাশেমগাজির মেয়ে মরিয়ম। সতেজ-বাড়ন্ত গড়ন, চোখ দুটোতে বর্ষার সজল আকাশের হাতছানি, মাথায় একরাশ চুলের ফাঁকে গোঁজা একটা হলুদ রং-এর কদম ফুল।

ভুবখালির ছোট খালটার ধারে ডিঙ্গি বেঁধে মাছ ধরছে সুরমান, মাছ দু'-চারটে পেয়েছে—ছিপ-সূতো পড়ে আছে জলে, ডিঙ্গিতে বসে সুরমান বাঁশীতে ফুঁ দেয় সময় কাটাবার জন্য।

হঠাৎ পিছনে হাসির শব্দে ফিরে চাইল, কলাগাছ-সুপুরীগাছের ঘন কালো ঘাটটাকে ঢেকে রেখেছে সবুজের আবরণে, নুইয়ে পড়েছে খালের জলে কয়েকঝাড় বাঁশ, নারকেল গাছের গুঁড়িপাতা ঘাটে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসছে খিল খিল করে।

—ভাল বা'র্শল তুমি, বাঁশী শুনিয়ে কি চারে মাছ ডাকতিছ?

মরিয়ম ওর বাঁশী এর আগেও জারিগানের দলে শুনেছে; তবে আজ খালের বুকে এমনি সবুজ শ্যামল বর্ষার মাঝে সুরটা যেন কি এক মায়ায় তাকে ডাক দেয়, বাবরি চুলগুলো সামলিয়ে বলে ওঠে সুরমান—মাছ না আসতে পারে, কিন্তু মানুষ যে আসিতেছে তা মালুম পেলাম।

মরিয়ম হেসে ফেলে—এ মানুষ তোমার মনের মানুষ না হয়ে, দুশমন যে নয়, তাই বা জানতেছ ক্যামনে?

—সাপের হাঁচি বেদে চিনতে পারে বিবি!

মরিয়ম কথার জবাব দিতে গিয়েও আর পারে না, কি একটা দুর্বার লজ্জা শান্ত শ্রীতে তার সর্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলেছে। সুরমান এগিয়ে এসে ওর হাতে তুলে দিল একটা ভেটকি মাছের বড় বাচ্চা।

—লও।

কি যেন বলবার চেষ্টা করে মরিয়ম, কিন্তু ঠিক প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ওর মাছ।

এর পর থেকে কায আর একটা বাড়লো সুরমানের। বাড়তি কাযটা কাযই নয়, একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের নেশায় তাকে মশগুল করে রাখে।

দুপুরের নির্জনতা ঢেকে রেখেছে ছোট ছায়াভরা খালটাকে, নুইয়ে পড়া বাঁশ গাছে বসে রয়েছে মাছরাঙা পাখী অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, দুপুরের হলদে রোদ কলাগাছের বুকে আলপনা কেটেছে আলোছায়ায়, নারকেল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে মরিয়ম, ডিঙ্গিটা গাছের নীচে খালধারে বাঁধা,

একটু ঘুরে আসবি চল মৈরাম?

মরিয়ম ডাগর দুটো চোখের তারায় লহর তুলে বলে, বাপজী জানতি পারলি পিঠের চামড়া তুলি নেবানি?

বাবরি চুল নেড়ে জবাব দেয় সুরমান—নেক তোর লাগি 'জান'ই দিয়া দিমু।

ইস!

ওর হাতটা সুরমানের হাতে, দুজনের চোখের দৃষ্টি কি একটা নিবিড় নেশার মাদকতায় ভরে উঠেছে। সুরমান আজ বাঁচতে শিখেছে—সব কিছু আজ সে দেখতে শিখেছে কি যেন স্বপ্নভরা দৃষ্টিতে। আরও কাছে টেনে নেয় মরিয়মকে, উছল হাসিতে তার উদ্যত হাতখানাকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে মরিয়ম।

—আঃ, দিনদুপুরে কি করতিছ? সাহস তো ধন্যি তোমার?

সুরমান অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ওর দিকে, মরিয়মের সারা মনে জেগে উঠেছে কোন নারী, যে চায় ভোগ করতে, জীবনের পরম-তৃষ্ণার অমৃতধারা পান করতে, নিজেকে সামলে বলে ওঠে মরিয়ম।
—যাও, বেলা পড়ে গেছে, কেউ আসতি পারেন

—সুরমানের মনে ধীরে ধীরে প্রথম প্রেমের স্বপ্নঘোর কেটে যায়, গেলাসে সদ্য ঢালা পানীয়ের উপরের বুদবুদ শেষ হয়ে গিয়ে বাস্তবরূপে দাঁড়িয়েছে সে।

কাশেম গাজির অবস্থা এমন কিছু ভাল নয়, ছেলেমেয়ে বেচারার অনেক ক'টিই, রোজগার পাতি সে তুলনায় তেমন কিছু নয়, কোন রকমে দিন আনে দিন খায়। ঈদের সময় হঠাৎ সুরমান আবিষ্কার করে, মরিয়মকে একখানা কাপড় যদি দিতে পারতো সত্যি বড় খুশী হতো সে, আর নিজেরও সাধ ওকে নিজের মনমত করে সাজাতে।

কয়েকটা টাকার দরকার সেদিন হাটখোলায় দেখেছিল নীলডুরে শাড়ীর দাম চার টাকা; সারা মণীপুর চিনখালিতে সে চার পাঁচদিন জনমজুরের কাযে ঘুরে বেড়িয়েছে। কে দেবে কায? বার বার কায নিজেরাই গায়ে গতরে তুলে নিচ্ছে। আড়তদার ওর কথা শুনে একটু চুপ করে থাকে, খাঁকের কলম দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলে—চার টাকা?

সুরমান চেয়ে রয়েছে ওর দিকে আশাভরা চাহনিতে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরিয়মের মুখখানা, শাড়ীখানা হাতে দিলে কেমন করে ফুটে উঠবে মিঠে একটু হাসি ওর দুটো চোখের তারায়, কাছে টেনে নেবে সে।

স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় আড়তদারের কথায়—টাকা কই মামু? চাইর টাকা! আটগণ্ডায় হবেনি? লে বস্তাটা তুলে দে ডিঙ্গিতে।

আড়তদারের দিকে চেয়ে থাকে সে স্থির দৃষ্টিতে, সব আশা-স্বপ্ন তার মিলিয়ে গেল কোন অসীম শূন্যে। নীরবে বার হয়ে এল সে। দিনের আলো সব যেন ম্লান হয়ে গেছে, বাতাসে বাতাসে কনক-চাঁপা ফুল আজ গন্ধ মাতাল ইসারা আনে না।

…কায করতে না পারলে চলবে না, পয়সা চাই—রোজগার

পাতি যার নাই মোহব্বৎ তার সাজে না। বুড়ী মা গজগজ করে, কি হলো তোর, মুখে রা শব্দ নাই, এমন চুপ মেরে আছিস ক্যান?

বিরক্ত হয়ে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে সুরমান—তবে কি চিল্লিয়ে হাট বানাবু?

বৈকাল বেলায় মরিয়মদের বাড়ীর দিকে চলেছে সে ক্ষুন্নমনে, হাতে একটা পুঁটুলিতে রয়েছে কয়েক পালি বাদাম চাল, ক্ষীর খেতে তাই দিয়ে আসবে, বাড়ীর কাছে আমগাছটার নীচে এসে থমকে দাঁড়াল সে, মজিদ মিঞা ওদের বাড়ী থেকে বার হয়ে আসছে, মজিদকে আজ চেনা যায় না, নোতুন লুঙ্গি, গায়ে পপলিনের কামিজ, তাতে রূপোর বোতাম বসানো, চুলও ছেঁটেছে 'ফ্যাশন' করে, পান মুখে বেশ হাসি-গল্প করতে করতে আসছে সে, কাশেম গাজি তাকে এগিয়ে দিতে চলেছে। মজিদ মিঞার সারা মুখে-চোখে উপচে পড়ছে খুশির আভ, টাকের উপর ফুরফুরে দু-এক গাছ চুলও নাচছে খুশির আবেগে।

গাছের আড়ালে দাঁড়াল সে, ওরা আপন মনে কথা কইতে কইতে পার হয়ে গেল।

মনটা আগে থেকেই বিগড়ে ছিল, হঠাৎ ওদের বাড়ীতে মজিদ মিঞার আসা-যাওয়া মানখাতির দেখে সারা মন জ্বালা করে ওঠে। বাড়ীতে ঢুকেই মরিয়মকে সামনেই পেল, তার দিকে চেয়ে থাকে সুরমান। হঠাৎ সাজবেশের অর্থও কিছু বোঝে না। পরেছে চাঁপা রং-এর চুমকী বসানো শাড়ী, হাতে গায়ে গোলাপী আভা ধরিয়েছে মেহদী পাতার রং-এ, চোখে টেনেছে সুর্মা।

কার জন্য এ অভিসার সাজ! ওকে দেখে মরিয়ম নীরবে মুখ তুলে চাইল মাত্র, অন্য দিনের মত হাসির ঝরণা ফুটে উঠলো না তার মুখে-চোখে। থমথমে বর্ষামেঘের মত গম্ভীর নীরবতা লেগে রয়েছে তাতে।

···শোন—

এগিয়ে এল মরিয়ম তার কাছে, হঠাৎ টলটলে দুটো চোখে নামল প্লাবন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মরিয়ম,—আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকবার চেষ্টা করে সরে গেল তার সামনে থেকে। আর এল না।

উঠোনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বার হয়ে এল সুরমান নীরবে। বৈকালের রোদ ম্লান হয়ে গেছে, খালের বুকে বেয়ে চলেছে অচেনা কত নৌকা বাদাম তুলে, আকাশের বুকে চলেছে অমনি টুকরো সাদা মেঘের দল। সারাটা দিন কি এক দুঃস্বপ্নে কাটলো তার।

সন্ধ্যার সময় গণি মিঞার মজলিসেও গেল না, বাঁশীটা নিয়ে বসে রইল খালধারে নির্জন অশ্বত্থগাছের নীচে, থমথমে অন্ধকারে শোনা যায় নদীর শব্দ—আর রাতজাগা পাখীর ডাক।

সারা মন তার শূন্য, হাহাকারে ভরে উঠেছে। এই দুঃখ-বেদনার স্বাদ সে এর আগে পায়নি, সারা অন্তর অসহ্য বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে।

ঝরণা বয়ে যায় নীরবে, নীচে যখন নুড়ি-পাথর ঠেকে গতিরোধ করে তার, তখনই সেখানে জাগে ছন্দ, জন্ম নেয় 'সুর'। ভাল লাগার মূল সন্ধান করতে পারেনি, দুজনেই আজ দেখে তাদের অজ্ঞাতেই দুজনের মনের গোপনতম ঠাঁই-এ রয়েছে তারা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে।

ছায়াঘেরা ঠাঁইটাতে বসে আছে মরিয়ম, সুরমানের বুকে তার মাথা। কান্নার বেগ তখনও থামেনি।

মজিদ মিঞা অনেক টাকা দিয়েছে বাপজানকে, সাত কুড়ি টাকা।

মরিয়মকে বিক্রী করবে তার বাবা। কাশেম গাজি সব পারে। অভাবের সংসার, ঈদের সময় মজিদই দিয়েছে পোষাক-আশাক। সাঁঝসকালে সেও ওঠ-বস করছে কাশেম গাজির সঙ্গে।

মজিদের ইতিপূর্বে তিনটে বিবিও রয়েছে, বিবিরাও বসে খায় না, মরিয়ম হলে চারটে হবে। শিউরে উঠে মরিয়ম। বুড়ো টাক-পড়া ওই লোকটা, ঘরে একপাল ছেলেমেয়ে, নাতি, বিবির দল, আবার তার দিকেও নজর দিতে ছাড়েনি। বিবিদিকে কারণ-অকারণে ধরে ঠেঙাতেও কসুর করে না। বনে কাঠের কাজ করে—যখনই বাড়ী আসে, বিবিমহলে প্রায়ই কান্নাকাটি পড়ে যায় তখন।

—ওখানে যাবার আগে গাং-এ ডুবে মরবো আমি।

মরিয়মের গালে লেগে রয়েছে কয়েক কোঁটা অশ্রু, সুর্মা মুছে গেছে চোখের জলে, সারা রাত সে কেঁদেছে, সুরমান তাকে কাছে টেনে নেয় নিবিড় করে—অশ্রুধোয়া গালে এঁকে দেয় চুম্বনরেখা। কি এক নিশ্চিন্ত নির্ভর নেমে আসে মরিয়মের সারা মনে, অদেখা প্রেমের স্পর্শ তাকে দুঃখ জয় করবার সাহস এনে দেয়।

কোথাও চলে যাই আমরা দুজনে।

মরিয়মের দিকে চেয়ে থাকে সুরমান। ওকে নিয়ে এই অনিশ্চিতের মধ্যে পা বাড়াতে সাহস হয় না।

অন্তরালে একটু ছোট্ট নাটকের অভিনয় হয়ে গেল এদের অলক্ষ্যে। দুজনেই তখন স্বপ্নবিভোর, কোনদিকে খেয়াল নেই। মজিদ মিঞা ডিঙ্গি বেয়ে যাচ্ছিল খালে, কি যেন কৌতূহলবশেই ওদিকে নজর দিতে দেখতে পায় ওদের দুজনকে ওই অবস্থায়, ঘন গাছের আড়ালে চলেছে ওদের গোপন অভিসার।

টাকের উপর রোদ চিন্ চিন্ করছে—তার উপর ওই দৃশ্য, ভাবী বিবিসাহেবার কেচ্ছা, রক্ত গরম হয়ে ওঠে কিন্তু সামলে গেল। আগে ঘরে আসুক ওই খুবসুরৎ বিবি—তার পর পয়জার আছে। দু' দিনেই ঠাণ্ডা করে দেবে ওই হাড়বজ্জাত মেয়েকে।

সুরমান ভাবছে, মরিয়ম আজ আশ্রয় চায় তার কাছে। কাশেম গাজিকে ঠাণ্ডা করে নিরস্ত করতে হবে কিছু টাকা দিয়ে, না হয় দুজনের পালানো দরকার। সেটা মন মানে না। টাকা! যেমন করে হোক, যেভাবেই হোক, টাকা রোজগার করতেই হবে তাকে। মরিয়মকে সুখী করবে সে, ঘর বাঁধবে তারা দুজনে। বেড়ার ধারে ফুটবে বুনো যুঁই, সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বসবে বাঁশী নিয়ে—পাশে থাকবে আজকের এই মরিয়ম।

কি ভাবছো? মরিয়মের ডাকে মুখ তুলে চাইল সুরমান।

—কিছুদিন সবুর কর, দেখি একটা কিনারা পাবই,

সুপ্ত পৌরুষ ভেসে উঠেছে সুরমানের দেহমনে। বাঁশী বাজিয়ে গান গেয়ে আর গালগল্প করে যে সুরমান দিন কাটাতো সে উঠে পড়ে লেগেছে, রুজি রোজগার করতে হবে তাকে। বুড়ী ছেলের দিকে চেয়ে মনে মনে খুশী হয়। হঠাৎ একদিন মাকে বলে বসে সুরমান—চাকরী পেয়ে গেছি মা, খোরাকী আর মাসিক তিরিশ টাকা বেতন।

—খোদার মরজি বুড়ীর চোখে মুখে ফুটে উঠে আনন্দের আভা।

কিন্তু বাদাবনে যাতি হবে। বাওলিয়ার কাম। সুরমান বলে ওঠে।

—বাদাবনে? কথাটা বুড়ীর মনঃপূত হয় না। বাদাবনে শুধু জল—আর বন। বিপদ আপদ সেখানে পদে পদে। যে মানুষের এখানে কিছু হয় না—পেট চলেনা সেইই যায় বাধ্য হয়ে ওই কঠিন বিপদের মুখে। তার দিনতো কেটে যাচ্ছে, তবে সে কেন যাবে ওখানে?

বাধা দেয় মরিয়মও—না তোমাকে যাতি হবে না।

মরিয়মের দুচোখে নামে প্লাবন। দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে সুরমানকে কি নিবিড় বন্ধনে। সেখানে গেলে মানুষ ফেরে না।

—তোকে আমার চাই মরিয়ম। সাত কুড়ি টাকা দিতি হবে তোর বাপজানকে, তারপরই চলি আসবো, তখন দেখিস তোরে ছাড়ি যদি যাই—

—মরিয়মের মন মানে না। একি এক বিচ্ছেদের জ্বালা। দিন কাটবে তার একা একা ওর পথ চেয়ে চেয়ে! এই ভালবাসার এত জ্বালা সে যদি জানতো জীবনে এ ভুল সে করতো না কখনও আজ নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছে সে তার অজ্ঞাতে।

অতীতের তীর হতে মধুগন্ধভরা বাতাস কি এক নাম না জানা ফুলের সৌরভ নিয়ে আসে সারা মনে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুটো বিদায় ব্যথাতুর জলভরা চোখের চাহনি—বেদনার ভারে টলোমলো। আজকের সুরমানের চোখে ও সে দৃষ্টি কি এক মধুর আবেশ আনে। দিন বদলে গেছে, বদলে গেছে পরিবেশ, বয়সের চিহ্ন পা ফেলে ফেলে তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে জীবনের শেষ সীমান্তের দিকে, তবু সেই দুটো চোখের চাহনি আজও তাকে অনুসরণ করে চলেছে অহরহঃ সে অসীম বেদনা ক্ষণিকের সীমা পার হয়ে অনন্ত যৌবনে মিশে গেছে।

অন্ধকার বনে বনে কাদের পায়ের শব্দ শোনা যায়, ছপ্-ছপ্-ছপ্। শিউরে উঠি—ডাকাতের ছিপের দাঁড়ের শব্দ কিনা কে জানে! হঠাৎ একটা মস্ত হুঙ্কারে কেঁপে ওঠে বনতল—নদীর জলধারা। গর্জ্জন ধ্বনি দূর নদীর ওপারের আকাশে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে নৌকার বাসনগুলো ঝন ঝন করে কেঁপে ওঠে। সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেছে।

সুরমান বসে রয়েছে গুড়ি শুড়ি মেরে, ছই-এর ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটু দূরে নদীর উপরেই কেওড়া গাছের নীচে জ্বলছে দুটো চোখ—প্রজ্বলিত আগুনের ভাঁটার মত। বাতাসে বোটকা বিশ্রী গন্ধ।

কোথায় গেল মরিয়ম—সেই সজল শ্যামল পরিবেশের স্মৃতি—যৌবনের কামনামদির দুটি মন। সামনে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে মৃত্যু। জীবনের সব সৌন্দর্য্য—কামনা—সৌরভকে নিঃশেষ করে এই বনরাজ্যে ধ্বংসের দেবতা পেতেছে তার সিংহাসন।

আবার ফিরে আসে প্রশান্তি বনের বুকে। নিবিড় নীরবতা মুখ বুজে রয়েছে অন্ধকারের আলিঙ্গনে। মাঘমাসের রাত্রি—আঁধারের সঙ্গে শীতের কুহেলি হাত মিলিয়ে নেমেছে বন ভ্রমণে। কোন অশরীরীর ছায়া ঘিরে রয়েছে নৌকাটা! মধ্য রাত্রে বনভূমি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—কান পেতে শোনা যায় তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুষ্ক বনমর্মরে। আকাশ-জোড়া এক দেবতা পা ফেলে ফেলে চলেছে ওর বুকে।

পিছনে পড়ে রইল মরিয়ম, ছায়াঢাকা নশীপুরের খাল—ওদের স্মৃতি বুকে নিয়ে যোয়ান সুরমান বাওলিয়া এল এই রাজ্যে। মহাজনের নৌকাতেই থাকে—খায়, বনে কায করতে শিখছে।

—বনের জীবন আর গ্রামের জীবন আশমান জমিন ফারাক বাবু, এখানের আইন কানুন আলাদা। প্রথম পা দিয়ে ভয়েই শুকিয়ে যাতি লাগলাম। সুরমান সেদিনের স্মৃতিগুলো ভোলেনি।

খালের বুকে জমেছে কয়েকটা নৌকা, এইখানেই বন কাটাই হবে। খাবার-দাবার নৌকাতেই। মজিদ মিঞা ও সেই মহাজনের কয়েকখানা নৌকার হেড মাঝি অর্থাৎ সর্দার গোছের। তার হাঁক ডাকেই সকলেই অস্থির। সুরমান লোকটাকে সহ্য করতে পারেনি।

—গোসল করে নাস্তাপানি করে বনে ঢুকবি ভাত নিয়ে। খুব হুঁসিয়ার!

বনে স্নান না করে কোন বাওলিয়াই পা দেয় না। বনবিবির পুজো দিয়ে তবে নামে তারা প্রথম বনে। সুরমান অবাক হয়ে চেয়ে থাকে এ পুজোর কোন মন্তর—মোল্লা লাগে না। একটা গাছের ডালে চাঁদমালা ঝুলিয়ে দিল—খানিকটা সিন্দুর লাগিয়ে দিল, গাছে সবাই মিলে চীৎকার করে উঠলো—বনবিবির, দোয়া লাগে। একটা মুরগীকে ছেড়ে দেওয়া হল বনবিবির নামে।

নৌকায় উঠে আসবে হঠাৎ দেখে লোকালয় থেকে আনা মুরগীটা বনের স্তব্ধ নির্জনতায় কেমন ভয় পেয়ে গেছে, করুণ আর্তনাদ করে ওদের পিছু পিছু এসে হাজির হয়—সেও নৌকাতে উঠে আসবে। ভাষাহীন দুটো চোখ দিয়ে সে অনুনয় করছে—এই গহন বনে আমাকে নির্বাসন দিয়ে যেও না!, নিয়ে যাও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের কাছে। আজীবন মানুষের সমাজে বাস করে বন্য পরিবেশ সে ভুলে গেছে। বড্ড মায়া হয় সুরমানের, মুরগীটাকে ধরে কোলে তুলে নেয়, আহা বেচারা! হঠাৎ মজিদের ধমকানি শুনতে পায়, বনবিবির মুরগী নৌকায় তুলবি! খবরদার, ছেড়ে দে—বেকুফ কোথাকার। বাদাবনের কানুন জানিস না?

পিছনে ফেলে এল তাকে। মুরগীটা তখনও খালের ধারে ধারে ছুটছে ওদের নৌকার সঙ্গে, ডাক পাড়ছে প্রাণপণে। নির্জন নীরব বনে ধ্বনিত হয় ওর ডাক। সুরমানের দু'চোখ জলে ভরে আসে—মরিয়মের কথা মনে পড়ে, আসবার সময় খালের ধারে ধারে সে এমনি বেদনাতুর দৃষ্টিতে তাকে অনুসরণ করেছিল কতদূর!

খেতে বসেছে সুরমান মাঝিদের সঙ্গে। থালা বলতে মাটির সরা—তাতে লাল ফাটা ফাটা চালের ভাত আর তরকারী বলতে খানিকটা পেঁয়াজ কুঁচি দু এক টুকরো আলুর ভগ্নাংশ দিয়ে হাতা কয়েক লঙ্কার টক-টকে ঝোল। ডাল আর তরকারী সব কিছুই ওই পদার্থটিই। সকালের নাস্তা। ভাতগুলো মুখে তুলতে পারে না। এ খাওয়া তার অভ্যাস নাই। চোখ ফেটে জল বার হয়ে আসে। চেয়ে দেখে অন্যান্য বাওলিরা তাই খেয়ে চলেছে গোগ্রাসে অমৃত মনে করে।

দু'-এক গ্রাস খেয়ে বাকীগুলো জলে ফেলে দেয় সুরমান, খাবার জলও মাপ করা। জলে বাস করছে কিন্তু তা এক বিন্দু মুখে দেওয়া যায় না, তিন দিনের পথ পার হয়ে জালায় জালায় ভর্ত্তি খাবার জল নিয়ে যেতে হয়।

প্রথমে যেদিন বনে নামলো সে, সেই স্মৃতি আজও ভোলেনি। ঘন বন নীচু হয়ে পথ চলতে হয়, নোনা কাদা মাটিতে উঠে রয়েছে গরাণের শূলো, অসাবধানে পা পড়লে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে, হাতে হাতিয়ার বলতে একটা কুড়ুল আর কোমরে গোঁজা ছোট দা। সারা দেহমন অজানা আতঙ্কে ভরে ওঠে কোথায় একটু শব্দ শুনলেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে কে জানে মৃত্যু কি বেশে অপেক্ষা করছে এখানে। গাছের ডালে ঝুলছে কোথায় বিষধর গোখরো সাপ উদ্যত ফণা বিস্তার করে—একটি মুহূর্ত—ধীরে ধীরে নেমে আসবে মৃত্যুর যবনিকা।

দু' জনে গাছে কোপ মারছে, ছিটকে পড়ে কাঠের টুকরো, একজন নজর রাখে চারিদিকে। কোথাও কিছু দেখা যায় কি না, অন্য জন গাছটাকে ফেলবার চেষ্টা করে।

বনে লুণ্ঠন করতে এসেছে মানুষ, বনদেবীর বাহনের দল সজাগ দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন অসতর্ক মুহূর্তে লুণ্ঠনকারীদের ঘাড়ে এসে পড়বে পড়েও মাঝে মাঝে। তাই ওরা এই ভাবে কাষ করে। হাত বুক টন্ টন করে সারাদিন কোপ দিয়ে। দুপুরের সময় সুরমান ওদের মতই সেই ঠাণ্ডা ভাত আর লঙ্কার ঝোল ভরপেট খেলো, দিনান্তে ফিরে আসছে নৌকায়। ক্লান্তি শুধু আতঙ্কে সারা মন ভরে উঠেছে; এ কোন জীবনে এসেছে সে।

সন্ধ্যাবেলায় আবার ফিরে আসে তার মনে নশীপুরের জীবন, গণি মিঞার দলিজে বসেছে জারি গানের আসর, সে নাই। বাঁশী আর বাজবে না সেখানে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরিয়মের মুখ—সেই বিদায় বেলার সজল চাহনি। বাঁশীটা বার করল সে, ফুঁ দিতে যাবে, কি ভেবে মুখ থেকে নামাল। এখানে বাঁশী সে বাজাবে না সুর আসবে না আর তাকে পিছনে ফেলে এসেছে ছায়া ঢাকা সেই অতীত জীবনে। মরিয়ম এখানে স্মৃতি-তবুও সব দুঃখকষ্ট জয় করবার সাহস আনে সেই-ই তার মনে।

পাশের নৌকায় টেমির আলোতে মজিদ সত্যপীরের দোয়া পড়ছে।

আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার
নবীর দোয়ায় হবে ভবনদী পার।

সুরটা ভেসে যায় কোন অসীম আঁধার ঘেরা বন রাজ্যে, ছইএর ফাঁক দিয়ে খালের জলে পড়েছে এক চিলেতে লালাভ প্রকম্প আলো; বনের ভিতর হরিণের ডাক শোনা যায়। মনটা হু হু করে ওঠে সুরমানের—মরিয়ম! নীচের মানুষ অন্ধকার আকাশের বুকে মধ্য রাত্রে জেগে ওঠা ধ্রুবতারার সন্ধান করে—তেমনি ওর বেদনাহত সারা মন উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে মরিয়মের স্মৃতির পানে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল জানে না, হঠাৎ কার ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

গণি মিঞার দলিজে বাঁশীর সুরে যবনিকা পড়লো মজিদের

তাকে—ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়াতে হবে? মেহমান এসেছিস নাকি? ওঠ—কাবের বেলায় চু চু কেবল খাতি পারবো।

কোঁস করে ওঠে সুরমান—খামু না।

হেসে ফেলে মজিদ—ওর ছেলেমানুষী দেখে। মায়া হয়—কেন ও এই কঠিন জীবনে এসেছে সেই সত্যটা তার অজানা নাই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত একটি দুপুরের ছবি, ছায়াঘেরা খালধারে ওর নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ দেখেছিল মরিয়মকে। সেই ক্ষণিক স্বপ্নটাকে ও পাকাপাকি করে গড়ে তুলতে চায়—তাই এই জীবন-পণ সংগ্রাম।

বলে ওঠে—বাড়ী এটা নয়। মৈরাম এখানে নাই যে গোসা ভাঙাবে। ওঠ—

সারা শরীরের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে মজিদের এই মন্তব্যে, সোজা হয়ে উঠেছে সুরমান, বাজে কাজিয়া করবা না মিঞা। উ কোন কথা কও?

ঠিক কথাই কইছি রে যোয়ান। বা খাই ল। তোর খ'নে উঠতি হবে।

কথা বাড়াল না মজিদ, সুরমান কোন রকমে চার্টি ভাত মুখে পুরে উঠে এল।

কয়েক দিন ধরে লক্ষ্য করছে মজিদ সুরমানের পরিবর্তনটা। কি এক অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাব করে চলেছে। বাবরী চুল কেটে ফেলেছে তেল অভাবে, গায়ে নোনা গাং-এর পানির দাগ, সারা দেহে কঠিন পরিশ্রমের ফলে পেশীগুলো ফুলে উঠেছে—চোখের সেই গ্রাম্য সহজ সরল হাসিমাখা দৃষ্টি মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে বন্য সন্ধানী সাবধানী দৃষ্টি—আর একটা ইন্দ্রিয় বন্য জীবনে স্বাভাবিক ভাবে প্রবল হয়ে ওঠে তা ঘ্রাণশক্তি।

বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আগামী বিপদের সন্ধান পায় সে।

—মনে মনে মজিদ বাহবা না দিয়ে পারে না। মরিয়মই তাকে ধ্রুবতারার মত পথ দেখিয়ে চলেছে বহু দূরে অদেখা জগতে থেকে। মোহব্বৎ-এর গল্প শুনেছিল সে, কিন্তু চোখের উপর দেখছে তার দৃষ্টান্ত।

মজিদ বাড়ী যাচ্ছে। কথাটা শোনা অবধি কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে সুরমান। মজিদ বাড়ী গিয়ে এইবার মরিয়মকে ঘরে তুলবে। তার জীবনের এই কষ্ট—এই বিপদ বরণ সব আশা স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মরিয়ম উঠবে তার ঘরে নয়—ওই আধবয়সী টেকো বৃদ্ধ শয়তানের ঘরে। কয়েক মাস চাকরী হয়ে গেছে তার—শো দেড়েক টাকাও জমেছে সেও বাড়ী যাবে। মজিদের সঙ্গে মুখোমুখী বোঝাপড়া হবে সেইখানেই। এখানে আর নয়।

মহাজনের নৌকায় গিয়ে উঠলো সন্ধ্যাবেলাতে। তামাক টানছিলো মহাজন ওকে দেখে মুখ তুলে চাইলো। কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করেছে সে সুরমানকে কাবের ছেলে, কাব বোঝে, হুঁসিয়ার।

—কি রে?

—বাড়ী যাবো বাবু, বেতন মিটিয়ে তান। এই চালানেই দেশে ফিরবো।

—তাইতো রে মজিদও যাব বলছে, তুই গেলে চলবে কি করে?

কথা কয় না সুরমান, গোঁ ধরে বসে আছে আমারে যাতিই হবে। মায়ের শরীর খারাপ মুকীমে তার দেখা দেখতি পারবু না

মিথ্যাকথাই বলল।

কথাটা মজিদের কানে যায়। হাসে মজিদ। যোয়ানটা বুঝতে পেরেছে তার মনের ভাব। এখানে এ বনে মানুষে মানুষে কোন শত্রুতা করতে নাই, বনবিবির কোপে পড়বে।

মহাজনকে টিপে দেয় মজিদ—ওকে ছাড়লে আর আসবে না বাবু, কাবের লোক।

মহাজন শেষ পর্যন্ত আটকে ফেলল সুরমানকে। দেশ গাঁ নয় যে পায়ে হেঁটে চলে যাবে, দেশে ফেরাও অনেক হাঙ্গামা এখানে। লোকালয় চারদিনের পথ—মাঝে দুর্গম বন—দুস্তর নদী সুরমানের সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে

—কাম করমু না বাবু।

মহাজন বলে ওঠে তোকে চল্লিশ টাকা করে দোব মাসে।

চটে ওঠে সুরমান, চল্লিশ কেন একশো দিলেও নয়।

মরিয়ম চলে যাবে তার জীবন থেকে অন্ধকার ঘরে—সব আলো নিভে যাবে তার। কি এক অসীম নিঃস্ব হাহাকার ভরা জীবন সে বয়ে বেড়াবে কল্পনা করতে পারে না।

তবু ছুটি সে পেল না। কাবকর্মে যায়নি দুদিন। কাল মজিদ মিঞা চলে যাচ্ছে দেশে। সুরমান ওর দিকে চাইতে পারে না—চোখে ভেসে ওঠে চর নবীপুরের জীবন, গানের সুর ছায়াঘেরা খালের ধারে অশ্রুসজল মরিয়মের দুটো চোখ, সারা মন হাহাকার করে ওঠে। জীবন আজ অর্থহীন বলে মনে হয়।

থামল সুরমান। আজ থেকে কুড়ি বৎসর আগে ঠিক এই কেওড়াদুঁতের মুখেই সেদিন বন কাটাই হচ্ছিল। নৌকা বোঝাই হয়ে গেছে, আর কয়েকখানা বড় বড় গরাণ কিংবা সুন্দরী গুঁড়ি চাই নৌকার দুপাশে ঝুলিয়ে দেবে ভারসাম্য বজায় রাখতে। ওই নৌকাতেই ফিরবে মজিদ, পড়ে থাকবে সুরমান এই বনরাজ্যে নির্বাসিত জীবনের বোঝা বইতে।

কয়েকজন বাওলিয়াকে নিয়ে নিজেই নেমেছে মজিদ দেখেশুনে বলকাঠ কাটতে হবে মাপজোপ করে। কি ভেবে সুরমানও নীরবে গিয়ে তাদের ডিঙ্গিতে উঠে বসলো।

খালের ভিতর দিয়ে বনে ঢুকে নেমেছে তারা গাছের সন্ধানে।

গভীর গহন বন। সোজা উঠে গেছে পশুর সুন্দরী কেওড়াগাছের গুঁড়িগুলো, নীচে জন্মেছে গেঁও গাছের ঘন বুকভোর জঙ্গল, ঠেলে পথ করে যেতে হয়। সূর্য্যের আলো, আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে কেওড়াগাছের বন, মানুষের পায়ের ছাপ এখানে পড়েনি।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বয়ে যায়, থমকে দাঁড়াল সুরমান—সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চারপাশ চাইতে থাকে। নীরব নিস্তব্ধ বনভূমি। গাছের শুকনো পাতা কোথায় হাওয়ায় বেগে ঘুরতে ঘুরতে নীচে পড়ছে। অন্তহীন বিশাল স্তব্ধতার মুখোস পরে মৃত্যু হানা দিয়েছে ওদের উপর।

—ছায়াটা নড়ছে।

—সুরমান! হুঁসিয়ার!

মজিদ চীৎকার করে ওঠে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সুরমান। সামনে অদূরে দাঁড়িয়ে মৃত্যু। পিঙ্গল ডোরাকাটা তার বিশাল দেহ, চোখ দুটোতে জ্বলসে উঠছে অগ্নিআভা, লেজটা নড়ছে মাঝে মাঝে।

যে যেখানে পেরেছে গাছে উঠে পড়েছে। সুরমানের সামনে গাছটা, ইচ্ছে করলে বাঁচতে পারতো সে, কিন্তু নড়েনি এক পা-ও। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চর নসীপুরের দিনগুলো—সেখানে নেমেছে অন্ধকার, মরিয়মের মুখখানা মুছে যায় তার চোখ থেকে—কে আর সে তার। সম্পর্ক তার সঙ্গে মুছে গেছে—সে হবে মজিদের বিবি। জীবনের সব আশা-আলো নিবে গেছে, দুঃসহ হয়ে উঠেছে জীবনের বোঝা। স্তব্ধ হয়ে যাক কোলাহল, নেমে আসুক মৃত্যু নিবিড় শান্তি।

সামনের পা দুটো ভেঙে বসেছে বাঘটা—চোখের দৃষ্টি রয়েছে ওর দিকে, মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে শ্বাপদ লালসার বিষাক্ত লালা। দাঁত দুটো দিনের আলোতে ঝলসে ওঠে।

মজিদ অবাক হয়ে গেছে—সুরমান মরছে। ঠিক মরছে নয়, নিজেকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হাতে তুলে দেবার জন্য তৈরী হয়েছে। চমকে ওঠে মজিদ।

হঠাৎ কোন দিকে কি হয়ে যায় টের পায় না, প্রচণ্ড ধাক্কায় দূরে ছিটকে পড়েছে সুরমান। কে যেন তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল সেখান থেকে। বনের উপর একটা ঝড় বয়ে গেল, ক্রুদ্ধ গর্জন মিলিয়ে গেছে। বনভূমিতে নেমে এসেছে স্তব্ধ প্রশান্তি। সুরমানকে বাঁচিয়ে গেল সে নিজের জান দিয়ে।

—কু উ উ উ—

বনভূমি মানুষের ব্যাকুল আর্তনাদে ভরে ওঠে। এখানে নাম ধরে কেউ কাউকে ডাকে না। জন্তু জানোয়ারের ভয়ে—তারাও বন্য জন্তুর মতই এমনি বিচিত্র সুরে বিপদ জ্ঞাপন করে। দলের অন্যান্য সকলে নেমে এসে দেখে সুরমান দাঁড়িয়ে রয়েছে মজিদমিঞা নাই। নরম কালো মাটিতে আঁকা রয়েছে কয়েকটা পায়ের চিহ্ন—খানিকটা তাজা রক্ত ছিটিয়ে আছে কর্দমাক্ত নোনা মাটিতে, মজিদের শেষ চিহ্ন ওইটুকুই। বাড়ী তার যাওয়া আর ঘটেনি জীবনে। প্রিয়জনের হাতে জীবনের শেষ শয্যাও রচিত হয়নি, যে মাটিতে জন্মেছিল—মানুষ হয়েছিল—সে মাটির বুকেও ঠাঁই তার হয়নি।

অবশিষ্ট হাড় দু'-এক টুকরো এই গহন বনের নির্জনতার সমাধিস্থ করেছিল তারা, এমনি এক তারকিনী রাত্রে বন্ধুবিহীন বনতলে রেখে গিয়েছিল তাকে···গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছিল মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে পরিধেয় বস্ত্র এক টুকরো—একমুঠো চাল—আর ছিন্ন মাদুর।

আজও যাবার আসার পথে তারা এইখানে নমাজ পড়ে যায়—তার আত্মার শান্তি কামনায়, 'চেরাগ' এ বনে জ্বলে না, রেখে যায় ওই আহার্য্য আর পরিধেয়।

সেই কেওড়ামুঁতের ধারে বসে আছি আমরা। চুপ করল সুরমান বাওলিয়া, অস্পষ্ট আলোকে দেখি, তার কোটরাগত চোখ দুটো চকচক করছে—গড়িয়ে পড়েছে দু'এক বিন্দু অশ্রু দাড়ির প্রান্তে—তখনও মিলিয়ে যায় নি। বাইরে রাত্রির নিবিড় স্তব্ধতা ভেদ করে কানে আসে হরিণ বনমুরগীর ডাক। আমার কথায় মুখ তুলে চাইল বৃদ্ধ—মরিয়মের কথাটা তো বললে না। সে এখন—আমার কথাটা শেষ হল না, বৃদ্ধের চোখে মুখে ফুটে ওঠে বিষণ্ন হাসির ম্লান আভা কান্নার করুণতা নিয়ে—ওর বাপ ছিল একটা কসাই। বেশী টাকার লোভে মেয়েকে ইরসাদ গাঁতিদারের সঙ্গে নিকেয় বসিয়েছিল, ইরসাদ তাকে বাড়ী নিয়ে যেতেও পারেনি—নদীতে যাবার সময় নৌকা ডুবে মরিয়ম মারা যায়। খোদা তাকে মুক্তি দিয়েছে, তার কসুর মাপ করেছে।

চুপ করল বৃদ্ধ। সেই থেকেই বন্যজীবনই মেনে নিয়েছে সে। বনের আহ্বান সে শুনছে, সে দেখেছে নিভৃত রাত্রে প্রকৃতির স্তব্ধ রূপের মহান সৌন্দর্য্য। ভালবেসে ফেলেছে এই কালো নদী সবুজ বন। এই মোহ থেকে তার নিস্তার নেই। বলে ওঠে—নদীর বাঁকে বাঁকে এখানে কবর বনে বনে ছড়ানো মরণ, আমার জন্যেও রয়েছে এমনি শেষ দিন, তবুও ঘর সংসার ছেড়ে এর মোহব্বৎ এ আটকে রয়েছি বাবু! চোখের জলে গাং-এর পানি লোনা হয়ে গেল—তবুও মায়া কাটলো না।

তারকিনী রাত্রির গহন নীরবতার মধ্যে বসে রয়েছে সুরমান—সুন্দরবনের গহনে স্তব্ধ রহস্যের মতই একটা অধরা রহস্য ঘনিয়ে রয়েছে ওর মনে।

জোয়ার শেষ হয়ে—ভাটার বান পড়েছে। এইবার আমাদের যাত্রা সুরু হবে আরও দক্ষিণে—কানে আসে দূর সমুদ্রের গর্জন-ধ্বনি কোন সুদূরের আহ্বান।

জলছবি

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

হাওয়ার হরিণ ঘুরছে ফিরছে ঘরছে
জ্যোৎস্নার জরি নক্সা আঁকছে আকাশে
সমধ্যে সুর থেকে থেকে পাতা মুড়ছে ;

খুশির হাওয়ারা কী কথা বলেছে কানে
মনের ময়ূর বলনা কি জানে কি জানে—
আয়নার মতো সাগরের মনে মনে
স্রোতের সোহাগে কী পারদ এনে পুরছে !

প্রেমিক হৃদয় তার, গান হয়ে মৌমাছি উড়ছে ;
দু'চোখে নীরব ভাষা, কালোচুলে হাওয়ার চিরুণী
ধ্যানব্রত ভবিষ্যৎ মৌননীল বার্তা-সঙ্গোপনে
অরণ্যে রেখেছে ঢেকে, সবুজের মন্ত্রে পদধ্বনি !

তবুও হাওয়ার হরিণ ঘুরছে ফিরছে,
নীলমাতানো সুরে আমাকেই ঘিরছে ;
জলতরঙ্গ কথার পাঁপড়ি ছিঁড়ছে—

জ্যোৎস্নার জরি নক্সা আঁকছে আকাশে ;
হৃদয়ে জোনাকি যুঁই হয়ে ফোটে,
বুঝিবা সে আসে, সে আসে।

ডেথ রেলওয়ে

অমিত দাস

[ঘটনাটা সত্য। বর্মা স্থিত আমার এক পরম আত্মীয়ের চিঠি অবলম্বনে ঘটনাটা বিবৃত। চরিত্রগুলি কাল্পনিক।—লেখক]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা তখনও বাজছে। জাপানী আক্রমণে বর্মা ছারখার হয়ে গেছে। জাপানী হামলা—মানবতার চরম অপমান। সাম্রাজ্যবাদের জিঘাংসামূলক প্রবৃত্তি ও আত্মিক অধোগতিতে মানুষ হয়ে গেছে দুষ্ট চক্রের হাতে নেহাৎ ক্রীড়াসামগ্রী। তেমনি এক অমানুষিক অত্যাচারের এক অধ্যায়—

সৈন্যসামন্ত ও রসদাদি পরিচালনের জন্যে জাপানীরা পরিকল্পনা নিয়েছে, বর্মা হতে শ্যামদেশ অবধি এক ব্রডগেজ ডবল লাইন তৈরীর। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের মসীলিপ্ত অধ্যায়ে যাকে আমরা 'ডেথ রেলওয়ে' বলে জানি।

লোয়ার বর্মার মার্গুই দ্বীপের সাগরের কোলঘেঁষা একটা বাড়ীতে মিঃ মজুমদার ও ডাক্তার চক্রবর্তীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলছে। ডাঃ চক্রবর্তী একদিন ডেথ রেলওয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এক নিঃশেষে বলে চলেছেন, তিলে তিলে কি করে মানুষ মরে—তা স্বচক্ষে দেখে আমার সামনে আলো নিবে গেছে। মনে হচ্ছে যেন—এত আবিষ্কার—এত সাধনা—মানুষের কি সব ব্যর্থ হলো? মানুষ কি কখনো মানুষ হবে না?

মিঃ মজুমদার কথার ফাঁকে ফাঁকে মন্তব্য করলো, আপনি যাই বলুন, আমি সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদকে আলাদা দেখি না। ভিতরের চরিত্রের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য কিছুটা থাকলেও গুণগত পার্থক্য মোটেই নেই।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, অস্বীকার করিনে সাম্রাজ্যবাদ মনুষ্যত্ব নাশ করে। কিন্তু আমি ডাক্তার। আমার কাছে রুগীর সেবা। কিন্তু ডেথ রেলওয়েতে আমার কাজ ছিল মৃত লাসগুলো সংগ্রহ করে তার হিসেব রাখা। কি ট্রেজেডী বলুন তো? ডাঃ চক্রবর্তী অতঃপর ডেথ রেলওয়ের এক মর্মন্তুদ দৃশ্য বর্ণনা করেন।

নিশীথ রাত্রি। পাড়ার যোয়ান ছেলেদের রাত্রিতে পালা করে পাহারা দিতে হয়। বলা যায়না, কোন সময় জাপানী সৈন্যরা অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে এসে এক এক বাড়ীর সমর্থ পুরুষদের টপাটপ ভ্যানে পুরে চলে যাবে। সেজন্যে পাড়ার সবাইকে সতর্ক করে দেবার জন্য পাহারা দেওয়া। রাত্রিতে কারও চোখে ঘুম নেই। এমন কি কোলের শিশুটা পর্য্যন্ত মৃত্যুর ক্ষণ গুণছে বুঝি! রাস্তার ধারেই বাড়ীটা। বাড়ীর সবাই জাগ্রত। তাদের এ ভাবে বহু বিনিদ্র রজনী কেটেছে। পাড়ায় আর পুরুষ মানুষ কোথায়? হয়ত বা এবার ওদেরই পালা। লণ্ঠনের আলো মিটমিট করে জ্বলছে। সবাই বোবার মত পরস্পরের দিকে করুণ দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। একটা যেন শ্বাসরুদ্ধ আবহাওয়া। হঠাৎ বাইরে গমগম আওয়াজ হলো বুঝি। লুংফুন ছুটে গিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরলো, বাবা, আমি তোমাকে যেতে দেব না।

—ছাড়, পাগলী, ও যে বাতাসের শব্দ।

জানলা ফাঁক করে নামথুন অন্ধকারের মধ্যে খুঁজে খুঁজে দেখলো, কেউই কোথাও নেই। নামথুন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু সত্যই মাঝরাত্রিতে অন্ধকার ফুঁড়ে চারদিক কাঁপিয়ে মিলিটারি ভ্যান এসে দাঁড়াল পাড়ায়। ভ্যান একটু এগিয়ে গেল। নামথুনের ভাষা হারিয়ে গেছে; মুহূর্ত্তেই বুঝি সমস্ত অশ্রু শুকিয়ে গেছে। পাড়ার ভোলান্টিয়ারদের সংকেতধ্বনির হুইসেল চারিদিকে বেজে উঠল; বোমা পড়ার পূর্ব্বেকার সাইরেনের মতোই বুঝি করুণ ও বীভৎস।

নামথুন হতাশ হয়ে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে নামথুন। লুংফুন তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—আমিও তোমার সাথে যাবো, বাবা!

—চুপ।

কান্নার রোল উঠল আশে পাশের বাড়ী হতে। নামথুনের বুক কেঁপে উঠলো। সে জানে, ডেথ রেলওয়েতে কাজ মানে মৃত্যু অনিবার্য্য। ও দণ্ডাদেশ বৈ আর কিছুই নয়। যারা যায়, তারা তো আর ফেরে না।

নামথুন আর ভাবতে পারল না। হঠাৎ দরজায় প্রবল আঘাত হলো। পাঁচ ছয়জন কালো পোষাক-পরা জাপানী সৈন্য ইতিমধ্যে নামথুনের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। লুংফুন মূর্চ্ছা গেল। বাড়ীর অন্যান্যরা হঠাৎ যেন চীৎকারেরও ভাষা হারিয়ে ফেলেছে!

সারা রাত্রির নৈঃশব্দে কান্নার শব্দে চারদিক মথিত হলো। ভ্যানটা যে পথে এলো—আস্তে আস্তে সে-পথ দিয়েই চলে গেল।

নামথুনের হাত-পা বাঁধা। সে ভ্যানের মধ্যেই কাঁদবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বেওনেটের গুঁতোয় কান্না থেমে গেল।

নামথুন ভাবে—এ কি স্বপ্ন, না বাস্তব! কিছুক্ষণ আগেও একমাত্র মেয়ে লুংফুনকে জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে কেন্দ্র করে কত আশা-আকাঙ্খা রূপ নিয়েছিল। আর এখন সে লুংফুন কোথায়? স্ত্রীকে তার এখন স্বপ্নরাজ্যের ঘুমন্ত প্রেয়সী বলে মনে হলো। এদের সে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। নামথুন কান্নায় আরও ভেঙ্গে পড়ে। ভ্যানে গোটা পনের লোক ছিল। অধিকাংশই নামথুনের পাড়ারই। সবাই আধমরা হয়ে গেছে, মুখ থুবড়ে পড়ে আছে যেন।

গন্তব্যস্থলে পৌছুতে প্রায়ই ভোর হয়ে গেছে। নামথুনকে নেমেই কাজে হাত দিতে হয়েছে। সারা রাত্রির অবসাদে তার দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। সে আশে-পাশের কয়েক জনের নিকট হতে কিছু খাবার চাইল। কিন্তু কেউ কোন কথা বললে না। তার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নামিয়ে দিল।

নামথুন অধীর হয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, এখানে খাবার টাবার মেলে না? এমন সময় পশ্চাদ্দেশ হতে শপাং শপাং করে বেত্রাঘাত হলো। নামথুনের সমস্ত পিঠটা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে গুঁড়িয়ে গেল। নামথুন হাত জোড় করে খাবার চাইল; খাবার চাইছে নামথুন। অন্যান্য কুলিদের চোখ বিস্ফারিত হলো। কি দুঃসাহস নামথুনের! জবাব পেলও সাথে সাথে, দুটো চড়েই একেবারে ঠাণ্ডা। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে পড়ে তার। চোখে অন্ধকার দেখে। সেখানেই বসে পড়ে।

শপাং শপাং শপাং...

পিঠের উপর এলোপাথাড়ি চাবুক চললো। যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে নামথুন কোন রকমে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে সে কোদাল চালাবার চেষ্টা করে।

এ যেন সেখানকার স্বাভাবিক ঘটনা। কুলিদের মধ্যে বিশেষ কেউ ফিরেও তাকাল না।

নামথুন বুঝলো এরা খাবার দেবে না। ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে হবে। অদূরে কতকগুলো লোক শুয়ে আছে দেখে পাশের এক কর্মীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

দুঃখের মধ্যেও লোকটা যেন হাসবার চেষ্টা করে, ওরা আর উঠবে না।

—অ্যাঁ, মারা গেছে?

—হ্যাঁ। কথা বল না। কাজ কর। নাহলে এবার চাবুক পড়লে ওদের মতোই হবে। নামথন শিউরে উঠলো। মৃত্যু? তাহলে লুংফুনের কি হবে? তার স্ত্রীর কি হবে?

ভোর হতে একটানা ছয় ঘণ্টা পরিশ্রমের পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম। প্রত্যেককে আধ পোয়া চাল আর এক টুকরো নোনা মাছ দেওয়া হলো। নামথন জিজ্ঞেস করে সঙ্গীকে, এ খাবো কি করে?

—চিবিয়ে চিবিয়ে। এখানে রান্নার বাসনপত্র নেই।

—এতে ক'দিন বাঁচা যাবে?

—বড়জোর তিন দিন।

—তোমরা কবে এসেছ?

—দু'দিন হলো। আর একদিন পৃথিবীতে থাকবো।

কথাটা যেন লোকটা নেহাৎ সাধারণ ভাবেই বললো। নামথুনের অবাক লাগে। লোকটা বলে কি? মৃত্যুকে সে ভয় করে না? নামথন এক্ষণে ভাল করেই দেখে লোকটাকে। তাইত! ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। ও ঠিকই বলেছে। বড়জোর একদিন টেনেটুনে বাঁচতে পারে। ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

প্রত্যেকের সময় খুব কম। কথাবার্ত্তাও খুব সংক্ষিপ্ত। নামথুন শুকনো মাছের টুকরো দিয়ে কিছু চাল চিবিয়ে খাবার চেষ্টা করে। বমি আসে তার। জিবে এক ফোঁটাও জল নেই। চালগুলো গলাতেই আটকে গেল।

মনে পড়ে যায় বুদ্ধপূর্ণিমার কথা। লুংফুন কত আরাম করে নামথুনের খাবার জোগাড় করতো। কত রকমারি। নামথুন ভাবে, না না। লুংফুনের কথা আর ভাবা চলবে না। তাতে আরও কষ্ট বাড়ে; জল শুকোয়। জল, জল।

নামথুন চারদিকে খুঁজে দেখলো, কোথাও জল নেই। সঙ্গীরা বললো, এখানে জল মেলে না।

নামথুনের মুখ দেখে ওরা নিকটবর্ত্তী একটা ডোবা দেখিয়ে দিল তাকে। ডোবাই হোক আর যাই হোক জল তো! নামথুন যেন হাতে পানি পেল।

নামথুনের আর ঘেন্নাপিত্তি নেই। গণ্ডুষ করে ঢক ঢক করে প্রাণভরে জল পান করে সে। মৃত্যু তো আসন্ন—সবাই যখন ঐ জল পান করছে, তখন তার পান করতে বাধা কি?

হুইসেল পড়লো। মুহূর্ত্তের মধ্যে সবাই কাজে লেগে গেল। নামথুন চাল চিবোতে পারেনি। তাই সমস্তই জলে ফেলে দিয়ে এসে কাজে এসে মন দিল।

—শপাং শপাং শপাং···

নামথুন লক্ষ্য করলো, বিলম্বকারীরা কৈফিয়তের জবাব পাচ্ছে।

কাজ চললো সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়-যায়। কাজ বন্ধ হলো। লে: কর্ণেল উচুকির আদেশে সমস্ত লোক ফল-ইন করে দাঁড়ায়।

—সোজা হও।

নামথুন কোন প্রকারে পিঠটা সোজা করার চেষ্টা করে।

—মার্চ্চ অন্।

মৃত্যুপথযাত্রীরা যেন এগিয়ে চলে বর্মার এক অন্ধকার প্রান্তরের উপর দিয়ে।

—লেফ্‌ট রাইট; লেফ্‌ট রাইট—লেফ্‌ট—লেফ্‌ট—

নামথুনের একবার ইচ্ছে হয়, অন্ধকারে ছুটে পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালাবার শক্তি কোথায়? তাছাড়া চারদিকেই তো জাপানীদের তাঁবু। কড়া পাহারা।

অনেকক্ষণ পরে তারা আস্তানায় এসে পৌঁছলো।

সেখানে অনেকগুলো বাঁশের ছুই নামথুনের নজরে পড়ে।

সঙ্গীরা বলে, ওতে শুতে হবে নামথুন! নামথুন তাদের দিকে তাকাল। —হাঁ গো। ঐ আমাদের শয্যা? বিছানাপত্র হচ্ছে গাছের পাতা। বেশী শীত লাগলে ঐ শালগাছের শুকনো পাতাগুলো গায়ের উপর বিছিয়ে দিও। শরশয্যাও বলতে পার, কেননা কাল ভোরেই অনেককে আর জীবন্ত দেখবে না! তাতে ক্ষতি কি? আবার নোতুন দোস্ত পাব, কি বল নামথুন।

লোকটা বিকট ভাবে যেন হেসে উঠল। নামথুনের বুক আবার কেঁপে উঠে যেন। তার লুংকুন? একটা বাঁশের ছুই-এর উপর বসে পড়ে নামথুন; কিসের যন্ত্রণা যেন তার স্মৃতিসূত্রগুলো টেনে হিঁচড়ে এক এক করে ছিঁড়ে ফেলে। ভালই হলো।

মাথা চেপে নামথুন সেখানেই চলে পড়ে।

দুপুরবেলাকার মতো আবার আধ পোয়া করে শুকনো চাল আর সেই নোনতা একটুকরো শুকনো মাছ। দুপুর থেকেই নামথুনের ভয়ানক জ্বর এসেছিল। অনাহারে আছে। সবশেষে খাবারের মধ্যে পাওয়া গেল ঐ আধ পোয়া চাল আর এক টুকরো শুকনো মাছ। কিন্তু ক্ষিদেটাও যে প্রচণ্ড পেয়েছে তার। নামথুন বসে বসে শুকনো চাল চিবোয়। দুচোখে অশ্রুধারা নেমে আসে। বাড়ীর কারু মুখ যে যেন আর স্মরণে আনতে পারে না।

এমন সময় ডা: চক্রবর্ত্তী এসে হাজির; সবাইকে তিনি পরীক্ষা করছেন। নামথুনকেও তিনি পরীক্ষা করলেন। ডা: চক্রবর্ত্তীর ভ্রূ যেন কুঁচকে গেল।

নামথুন ডা: চক্রবর্ত্তীকে ভারতীয় জেনে তাঁর হাতে পায়ে ধরলো।—একটু খাবার দিন ডাক্তারবাবু! একটু উঠি।

ডা: চক্রবর্ত্তী শুধু জবাব দিয়ে গেলেন, আইন নেই। আপনি মেজর উচুকির সাথে দেখা করতে পারেন।

মেজরের কাছে যেতে হবে? মেজরের কথা চিন্তা করতেই নামথুনের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। বাঁশের ছুই-এর উপর নামথুন জ্বরদেহে পড়ে থাকলো। তার শুধু মনে হচ্ছে এখন মানুষের এত দুঃখ কেন? মানুষ কেনই বা জন্মায়?

পরদিন ভোরবেলা। নামথুনের সারা গাটা ভয়ানক বেদনায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে! উঠবার শক্তি নেই। কাঁপতে কাঁপতে তবু নামথুন মেজরের সামনে গিয়ে হাজির হলো।

—কি চাস?

নামথুন আকার ইঙ্গিতে পরম বিনয়ের সাথে নিজের জ্বরের কথা জানাল। মেজর হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বেটা ধড়িবাজ।

দশবার বেত্রাঘাতের আদেশ হলো। নামথুন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। একজন জাপানী সৈন্য তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাঁশের ছুই-এর উপর ছুড়ে ফেলে দেয় মরা পশুর মতো। সারা পথটা নামথুনের শরীর নিঃসৃত তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

ফল-ইন-এর হুইসেল পড়লো। সবাই লাইন দিয়ে টপ করেই যেন দাঁড়িয়ে পড়লো। নামথুন দেখল সত্যই বাঁশের ছুই-এর উপর অনেকেই মরে পড়ে আছে। সেও শুয়ে থাকলো। সে পরিষ্কার বুঝতে পারলো, তারও হয়ে এসেছে। এমন সময় আচমকা টান দিয়ে একটা সৈন্য তাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিল।

—ব্যাটা ভণ্ড। হনলুলু কোথাকার।

নামথুন হাত তুলে প্রাণভিক্ষা চাইল। সৈন্যটা বেত তুলেই আবার কি মনে করেই বেত নামিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

—মার্চ অন!

নামথুন খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে। অনাহারে বেদম প্রহারে, জ্বরে, উত্তেজনায় নামথুন একটু গিয়েই ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লো। হঠাৎ যেন ভয়ানক মাথা ঘুরে উঠলো নামথুনের। চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে এলো। পায়ের নীচের মাটিও বুঝি-বা সরে গেল। নামথুন সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

—হোয়াট? মেজর হুঙ্কার দিয়ে উঠে।

—ডেড স্যার!

একজন সৈন্য নামথুনের নশ্বর দেহটা ছুড়ে রাস্তার এক পাশে ফেলে দিল। নামথুনের দিকে তাকাবার কারু সময় নেই। সবাই এগিয়ে চললো।

সঙ্গীদের পায়ে চলার কাজ বহুদূরে গিয়ে মিশিয়ে গেল নামথুনের সংজ্ঞাহীন দেহ নির্জনেই পড়ে রইল। আর হত্যার একমাত্র সাক্ষী হয়ে রইল উপরের অনন্ত নীলিমা আর চারদিকের নীরব প্রকৃতি।

এভাবে দৈনিক দু'শ হতে তিনশ' অবধি নামথুনের মতো লোক ঐ রেলওয়ে তৈরী করার জন্য জীবনাহুতি দিয়েছে। সমস্ত ঘটনা বলতে বলতে ডা: চক্রবর্ত্তীর দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে থাকে। হিরোসীমা নাগাসাকির পতনের পর জাপানীদের পরাজয়ের সাথে সাথে অক্ষশক্তির সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটলো। ডেথ রেলওয়ে জাপানীরা শেষ করে যেতে পারেনি। যেখানে হাজার হাজার মানুষের ক্ষুব্ধ প্রেতাত্মার কান্না নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বাতাসে বাতাসে মিশে আছে—সেই অভিশপ্ত ডেথ রেলওয়ে চিরকালের জন্য সভ্য মানুষের ইতিহাসে একটা কলংকময় অধ্যায় হয়ে রইল।

পেরেক

মিহিরকুমার কাঞ্জিলাল

আচ্ছা ধরুন, আপনি ভাল পাঞ্জাবীটি উড়িয়ে চলেছেন। বেশ সেন্টের গন্ধ। গালে পাউডার। হাতে সিগারেট। কোথাও হয়ত যাবেন, বেশ তাড়া আছে। হঠাৎ—কোথাও কিছু নেই চেয়ারের কোণটায় লেগে ফ্যাঁস করে আপনার পাঞ্জাবীটা গেল ছিঁড়ে। দেখলেন—একটা পেরেক, চেয়ারের কোণটিতে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

কিংবা জুতোর মধ্যে পেরেক উঠলে তার মর্মঘাতী অভিজ্ঞতা হয়ত আপনার থেকে থাকবে।

কিংবা ধরুন, প্রচুর মশাবহুল গ্রামে, বেমক্কা জায়গায় থাকতে গিয়ে আপনাকে কিংবা আপনার স্ত্রীকে, রাত্তিরে মশারির দুটো কোণ কোন মতে ম্যানেজ করে, অনেক সময় অগতির গতি (সময় বিশেষে দুর্মূল্য) একটা পেরেকের কথা মনে করতে হয়েছে কি না ভেবে দেখবেন। আর নিতান্তই পেরেক না পাওয়া গেলে অনেক সময় দলামোচা করে ঠেকুনো দেওয়া গোছের মশারি টাঙ্গানোতে যে কি অপূর্ব রূপসৃষ্টি করে তা আপনিই অনুভব করতে পারবেন।

সভ্যতার ইতিহাসে মাতৃতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র পর্য্যন্ত অনেক তন্ত্র—নিয়ন্ত্রিত যুগের মধ্যে দিয়ে আমাদের আসতে হয়েছে। কিন্তু আপনার আমার জীবনের অনেকখানিই যে পেরেক নিয়ন্ত্রিত একথা অস্বীকার করা যাবে না।

হাঁ। পেরেক—যা আপনি দেখেছেন। শ্যাম, যদু, মধু, মাধুও দেখেছে অথচ মনে করে রাখার কোন অর্থ খুঁজে পায়নি। এত নগণ্য এবং অপাংক্তেয় যে, ভেজাল হবার সম্মানটুকুও তার সৌভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু দুনিয়া জুড়ে আপনি মানুষ, মেয়েছেলে, পাহাড়, নদী, শহর, বাড়ী দেখেছেন ;—লক্ষ্য করেছেন কি কত লক্ষ লক্ষ পেরেক আপনার চতুর্দ্দিকে পড়ে রয়েছে, ছড়িয়ে রয়েছে, বসে আছে। টেবিলে পেরেক, চেয়ারে, দরজায়, জানলাটাতে, দেওয়ালে, তারের দুই প্রান্তে, গাড়ী, বাসে, ট্রামে, ঠেলাগাড়ীতে, এমন কি আপনার জুতো—জুতোটার তলায়ও—পেরেক। আপনার জীবনের চলার পথের আশে পাশে ছোট বড়, মাঝারি, বেঁটে মোটা, চ্যাপ্টা—পেরেক ছড়িয়ে রয়েছে।

পেরেক একপদ-বিশিষ্ট বস্তু। আমাদের গৃহপালিত বা গৃহরক্ষিত আর পাঁচটা বস্তুর মতই উপকারী। পেরেক চাল-আটা-কাপড়ের মত নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ বলা যায় না। আবার অব্যবহার্য্য জিনিষ্ বলা যায় না। তবে পেরেক সাধারণত মধ্য ব্যবহার্য জিনিষ। আপনার সব সময়েই কাজে লাগছে না ; কিন্তু হঠাৎ ধরুন চটির ষ্ট্রাইপটা খুলে গেছে, তখন পায়ের মধ্যে অচল চটিটাকে গলিয়ে অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছেন মুচির দোকান কোথায়। ডানলোপিলোর ওপর যারা শোয় তাদের থেকে আপনি একেবারে কেয়ার অব ফুটপাথ যাদের ঠিকানা তাদের চৰটা খোঁজ করে এলেও দেখবেন যে পেরেকের প্রয়োজন সমাজের সর্ব্ব স্তরেই আছে। কারণ একটা দামী অয়েলপেন্টিং থেকে রাস্তার কোণে চটখানা খাটাতে গেলেও পেরেকের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর প্রথম ঊষা থেকে শেষ দিনটি পর্য্যন্ত মানুষের কর্মখালি, ঘরখালি আর পেটখালি থাকুক আর না-থাকুক, পেরেকের প্রয়োজন কখনও ম্লান হবে না।

কিন্তু এই পেরেক বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। "একোঽহং বহু স্যাম্"—এক পেরেক বহুরূপে বিকশিত হয়েছে। কখনো সে কীলক, গজাল, গুঁজি, খোঁটা, স্ক্রু, হুক, আলপিন ইত্যাদি। অর্থাৎ এক এক যুগে মানুষের এক এক রকম অভাব বোধের চাহিদা থেকে পেরেক বহুধা বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আর দেশ কাল পাত্র হিসাবে তার নামকরণ হয়েছে নতুন নতুন। যতই কেন তার আলাদা আলাদা নামকরণ হোক না এবং মানুষের সভ্যতা যতই এগুক বা পেছুক না কেন—পেরেকের দাবী দুনিয়ায় শাশ্বত। চটের থলের বদলে প্ল্যাষ্টিক ব্যাগ হয়েছে, গরুর বদলে 'প্রাম-গাড়ি' হয়েছে, নীলাচলের মহাপ্রভুর রসাতলে মহাপ্রভু হিসাবে আবির্ভূত হওয়াও সম্ভব, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ অমৃতের পুত্রদের অমৃতির প্যাঁচাল মনযুক্ত পুত্র হতে দেখা গেছে, কিন্তু পেরেক সেই আছে প্রায় পৌরুষেয় বা অপৌরুষেয় বেদের মত। তাম্র প্রস্তর যুগ থেকে স্পুটনিক এর পর্য্যন্ত এই পেরেক, পাথর, ধাতুর বা কাঠের রূপ নিয়ে কিছু রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক পার্টির মত নামের ভোল পাল্টালেও, মানুষের প্রয়োজনের তালিকায় সর্ব্বযুগে, সর্ব্বকালে অনিবার্য্য ভাবেই তার প্রচণ্ড দাবী জানিয়ে গেছে।

পেরেকের ব্যবহারিক দিকটা ছাড়াও এর একটা ভাব বহনকারী ভূমিকা আছে। মনুষ্যসৃষ্ট হলেও, পেরেক আবার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারক। পেরেক আপনার মনের ভাব কিছু প্রতিফলিত করতে সমর্থ। যেমন আপনার ঘরখানায়—সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা সিনেমা লাইনের অভিনেত্রীর বিশেষ ভঙ্গিমা সম্বলিত খান দুই ক্যালেণ্ডার, নেতাজী, লেনিন, গান্ধী, রবি ঠাকুরের ফটো, পেরেক বেঁধা যীশুখৃষ্টের মূর্ত্তিটা, দুই-একজন আত্মীয়স্বজনের ফটো এবং সেই সঙ্গে গ্রাজুয়েট হবার সময় চোগা চাপ্‌কান পরে তোলা ফটোখানা ইত্যাদি।

আর এছাড়াও—পেরেক চালুনিটা আটকানো, ঘরের এ পেরেক থেকে ও পেরেক পর্য্যন্ত টাঙ্গানো দড়িটাতে বাচ্চা ছেলের কাঁথা, সাড়ী, গেঞ্জি, ব্লাউজ, কাপড়, ম্যায় চা-ছাঁকার বাদামী হয়ে আসা ন্যাকড়াটাও। আবার সেই ঘরের কোণে রাস্তার মোড় থেকে নীলামে কিনে আনা সাড়ে চার আনা দরের প্যাঁচা সমেত সিঁদুর লেপ্টানো শ্রীশ্রীমাতা লক্ষ্মীদেবীর বাঁধানো ফটো কিংবা বেলুড়মঠকে ব্যাকগ্রাউণ্ড করে ত্রিকোণ করে বসে থাকা রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, ও শ্রীসারদামণির ফটোখানাও পেরেকেই ঝুলছে। আচ্ছা, পেরেক যদি না থাকত এই সব সম্ভার আপনি রাখতেন কোথায় ভাবুন তো! আপনি যে রুচিবান বা কালচারাল, এ পরিচয় বহন করতে অনেকটা সাহায্য করবে আপনারই গৃহ রক্ষিত গৃহবাসী পেরেকগুলি। পেরেক আপনাকে একটা সুস্থ সবল, নিপাট নিভাঁজ জীবন চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। যাতে মশারির কোণা কুঁচকোবে না, দেয়াল থেকে পেরেক খসে গিয়ে গ্রাজুয়েট হবার সময় তোলা ফটোটা ভাঙবে না, জুতোর মধ্যে মর্ম্মঘাতী বেদনা সৃষ্টি করবে না, উপযুক্ত পেরেকের অভাবে দরজার পাটাটা খসবে না। অর্থাৎ আপনাকে রুচিবান, সংসারী হিসাবী, সিনেমা দেখিয়ে, গোছালো গিন্নী, কিংবা সুখী ভদ্রলোক বা

জ্রমহিলা হতে পেরেক যতো সাহায্য করবে এমন আর কেউ নয়। এদিক দিয়ে উপযুক্ত, সবল পেরেক, উপযুক্ত সন্তানেরই কাজ করবে।

আপনি আমায় পৃথিবীর এমন একটা দেশ দেখান তো, যেখানে পেরেক নেই ? বর্ত্তমান সভ্যতার চারমিনার সিগ্রেট, মেরিলিন মনরোর দেহ বর্ণনা, মধুবালা কিংবা জনৈকা সুমেনের খবর কিংবা হিন্দী সিনেমার গান (হিসেব করে দেখা গেছে হিন্দী সিনেমার গানের গতি আলোর গতিকেও হারিয়ে দিচ্ছে) না পেলেও পেরেক আপনি পাবেনই। দয়া করে বরফের দেশের এস্কিমোদের কথা তুলবেন না, কারণ তাদের জীবনে ধাতব পদার্থের প্রয়োজন খুবই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে পেরেকের প্রভাব খাঁটি ভাবে যাচাই করা তখনই সম্ভব হতে পারে যদি সমস্ত পৃথিবী.. নিষ্পেরেক করা যেতে পারে। জনহীন গণতন্ত্র, খাদ্যশূন্য খাদ্য বিভাগ বা দেশ, আইন এবং শৃঙ্খলা শূন্য শাসন ব্যবস্থা, আমেরিকাহীন চীয়াংচীন, বাগদাদহীন বাগদাদ-চুক্তি ইত্যাদি তবুও হয়ত কল্পনা করা সম্ভব কিন্তু পেরেকহীন দুনিয়ার একটি দিনও আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। ধ্বংসকারী হাইড্রোজেন বোমা, এটম বোমা, বটুলিনাম টক্সিন তুলে নিলে মোটেই ক্ষতি হবে না কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে যত নিরীহ, বেচারা পেরেকের আত্মীয়রা আছে তাদের তুলে নিলে মানুষের তৈরী সভ্যতা এবং সভ্যতার উপকরণগুলো হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে। পৃথিবীকে নিষ্পেরেক ভাবা আর ভয়াবহ ভূমিকম্পের ধ্বংসের কথা স্মরণ করা একই জিনিষ। নিষ্পেরেক পৃথিবীর কল্পনা অস্থিহীন ভগীরথের জন্মাবস্থা স্মরণ করিয়ে দেবে ! ঠিক এই অবস্থার পটভূমিকায় বলা চলতে পারে যে, সভ্যতার ইতিহাসে ইলিয়াড, ওডেসি, শাহনামা, রামায়ণ, মহাভারত শকুন্তলা, ফাউষ্ট, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সৃষ্টি, আইনষ্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি, ডারউইন এর ন্যাচারল সিলেকসন, ডায়লেকটিকাল মেটিরিয়ালিজম, পঞ্চশীল ইত্যাদি অবদানের পাশাপাশি পেরেকের স্থান আপাত নগণ্য হলেও গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া পেরেকের আর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। পৃথিবীর ইতিহাসের বর্ত্তমান চেহারাটা পেরেকের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে ! যীশুখৃষ্ট যদি পেরেকে বিদ্ধ না হতেন কিংবা ঐসময়ে যদি পেরেকের প্রচলনই না থাকতো তা হলে পৃথিবীর ইতিহাস আজ অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু কয়েকটি পেরেক যা নাকি যীশুর শরীরে বিদ্ধ করা হয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসের আজ এক অন্য চেহারা দান করেছে।

পেরেকের আসনটি কোমলে কঠোরে মেশানো হওয়া চাই, নইলে ক্ষণস্থায়ী এবং খুব দুর্ব্বল জমিতে বা দেওয়াল থেকে খুলে আসার সম্ভাবনা আছে। যে সমাজে, যে দেওয়ালে, যে জমিতে, যে জায়গায় দৃঢ়তা নেই, আত্মবিশ্বাস নেই পেরেক সেখানে থাকে না। ক্ষণভঙ্গুর, কাঁপা জীবনের মধ্যিখানে পেরেকের কোন গাম্ভীর্য্যময় অধিষ্ঠান সম্ভব নয়। পেরেককে এক আশাবাদী জীবনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কোমলে কঠোরে মেশানো মানব জমিনে মুক্ত জীবনের আকাঙ্খা বা স্বাধীনতার স্পৃহা পেরেকের মত সুদৃঢ় হয়ে চেপে বসতে থাকে। যেমন পিটিয়ে তুরমুজ করার নেশায় পাগল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর আলজেরিয়াল, মাউমাউ, গোয়াবাসীদের দেশপ্রেমের মত।

ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব ভেল্কি দেখা গেছে মানুষের 'টোটেম' বিশ্বাসে। প্রাচীন কালে এবং এখনকার কালেও কুকুর, পাখী কুমীর ইত্যাদিকে আমাদের 'টোটেম' বলে আমরা মানি। আর বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক 'টোটেম' বিশ্বাস কাস্তে-হাতুড়ি—বেলচা-কুড়োলরূপে প্রকাশিত হওয়ায় পেরেকেরও একটা সম্মানজনক পদলাভের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একবার নির্ব্বাচিত হয়ে ভোটদাতাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পেরেক-আঁটা হয়ে 'এম-এল-এ' পদ আঁকড়ে বসে থাকতে গেলে, পেরেককে এক নির্ব্বাচনী প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত বলে আমার মনে হয়। পেরেকের এই গৌরবজনক গাম্ভীর্য্যময় আসনটি গণতান্ত্রিক দুনিয়ার এক পবিত্র কর্ম্ম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সব অবজ্ঞাত, মরচে-পড়া কিংবা ঝক্‌ঝকে পেরেকের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন এবং চাই কি কবিতাও লিখে ফেলতে পারেন। উপনিষদে এবং আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে পেরেককে কীলক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পেরেক নিয়ে আধুনিক কবিতা আমার তো চোখে পড়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে পেরেকের প্রচুর উপমা পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে পেরেকের প্রভাব বা রবীন্দ্র সাহিত্যে পেরেকের উল্লেখের উপর কোন থিসিস আজো পর্য্যন্ত জমা দেওয়া হয়নি বলে আমি জানি। কালিদাস বা সেক্সপীয়র বিশ্বকবি পদবাচ্য হলেও পেরেককে অমর করার জন্যে, তার উপর একছত্র কাব্যচর্চ্চা করেছেন বলে খবর পাইনি। আপনি জানেন, ভেসোলিন সাবান, কুলেখা কালি, মাউণ্টেনপেন ইত্যাদিকে মহাকবি বা সাহিত্যিকদের বাণীর বসন পরিয়ে বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ায় অনেক রকম লাভ হয়েছে। শুধু যে বিজ্ঞাপন সাহিত্যই ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে পড়েছে তাই-ই নয়, মহাকবিদের নামের পাশাপাশি এইসব কোম্পানীও অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু যতদূর জানি পেরেকের ওপর কোন যুগোত্তীর্ণ বাণী মুখবন্ধ এঁটে দেওয়া হয়নি। দুনিয়ার পেরেক ব্যবসায়ী এবং আমার মত দুই একজন মুখ চোরা পেরেক প্রেমিকরা একত্র হয়ে মহাকবিদের কাছ থেকে বাণী আদায় করে নিতে পারিনি। এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের মত কবি যিনি তপসে মাছ, আনারসকে রেহাই দেননি তিনি কেন যে পেরেকের এই যুগান্তকারী মহিমা আবিষ্কার করতে পারলেন না তা সত্যিই দুঃখের বিষয়। বৌবাজারের লোহাপট্টি, বড়বাজার ইত্যাদি ছাড়া সাহিত্য বাসরে পেরেক কল্কে পায়নি বলে দুঃখিত হয়েছি।

পৃথিবীর ইতিহাসের পটভূমিকায় আমাদের সামাজিক, সাংসারিক প্রয়োজনের পটভূমিকায় পেরেকের স্থান নির্দ্দেশ করার চেষ্টা করেছি। দেখাতে চেয়েছি কাব্যে, জীবনে, সমাজে, রাজনীতি ক্ষেত্রে, ইতিহাসে উপেক্ষিত পেরেকের বেদনার কথা। এই পেরেক যেন শোষিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রোলেটারিয়েট। 'ভিখ না পাওয়া গেঁয়ো যোগীর' মত।—কবিগুরুর রাশিয়ার চিঠির একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—"এরা সভ্যতার পিলসুজ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এদের মাথা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এরা আলো পায় না।"

একটি নাৎসী মেয়ের ডায়েরী

মেরিয়া বিয়ারনোল্ড

[১৯৩৩ সালে জার্মানীর শাসনভার হিটলারের হাতে আসার মাধ্যমেই হল নাৎসীবাদের অভ্যুদয়। এই নাৎসীবাদ যে কোন জাতির কল্যাণ নিয়ে আসে না, বরং সভ্যতার চাকা, সংস্কৃতির চাকা পেছন দিকে ঘোরাতেই চেষ্টা করে, যুদ্ধকালীন জার্মানীর ইতিহাসই তার প্রমাণ। নিজের জাতিকে পৃথিবীর অপরাপর জাতিগুলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা, কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর এবং ইউরোপের দখলীকৃত অন্যান্য জাতিগুলির ওপর অমানুষিক নির্যাতন ইত্যাদি কতকগুলো কলংকজনক ক্রিয়াকলাপ মাত্র সেদিনকার ঘটনা। দেশের ভাগ্যাকাশের এমনি একটি কালো মেঘাবৃত পটভূমিকায় এই পত্রগুলির লেখিকা মেরিয়া বিয়ারনোল্ড গড়ে উঠেছিল। এই পত্রগুলি যখন সে তার প্রণয়ীর কাছে লিখছিল তখন পশ্চিমদিক থেকে ইংগ-মার্কিণ শক্তি এবং পূবদিক থেকে রাশিয়ার দুর্দান্ত লালফৌজ লৌহদৃঢ় আঘাতে জার্মাণ বাহিনীকে চুরমার করতে করতে দুর্দমবেগে জার্মাণীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে। তখনকার ক্ষ্যাপা হিটলারী যুবশক্তি মিত্রশক্তির এই জার্মাণী দখলের অভিযান যে প্রসন্নমনে গ্রহণ করেনি মাত্র ১৭ বৎসর বয়স্কা মেরিয়া বিয়ারনোল্ডের এই পত্রগুলিই তার জ্বলন্ত নিদর্শন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পত্রগুলি তখন মার্কিণ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের হাতে পড়ে। তারা এগুলি অনুবাদ করে আমেরিকার বিখ্যাত সাময়িক পত্র Readers Digest এ প্রকাশ করে। বর্তমান নিবন্ধটি সেই Readers Digest থেকেই অনূদিত হয়েছে।—অনুবাদক]

ব্রমসকউ, ৭ই অক্টোবর, ১৯৪৪

মার্কিণরা এখানে প্রবেশ করবার পর আমার মনকে দোলা দিতে পারেনা কিছুই। পিটার, তুমি এখন কোথায় আছ জানতে পারলে আমি অধিকতর সুস্থ বোধ করতাম। গতকাল আমি শুনেছি যে আমাদের প্রিয় কলোন শহরের ওপর আবার বর্বর আক্রমণ করা হয়েছে। পিটার, হ্যাঁ, আমি ক্রমশঃ বুঝতে পারছি যে এই যুদ্ধ এখন আর আমাদের বাঁচবার দাবী নিয়ে পবিত্র যুদ্ধ নেই। শুধুই জাগতিক সুখ-সুবিধার জন্য এই যুদ্ধ। আমাদের হতভাগ্য জার্মাণদের এটা কোন অপরাধ নয় যে আমাদের আমেরিকার মত উর্বর ভূমি নেই এবং এরকম নীচু উপায়ে অসহায় একটা দেশকে শোষণ করবার মত হীন প্রবৃত্তি আমাদের এখনও হয়নি।

অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও আমেরিকানরা অগ্রসর হতে পারছে না। কিছু না করে শুধু মাথা ঝেঁকে বার বার বলতে হয়, জার্মাণ সৈন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট সৈন্য আর নেই। আমেরিকানদের কাপুরুষতা অবর্ণনীয়।

৮ই অক্টোবর, ১৯৪৪

নীল আকাশ থেকে সূর্য কিরণ দিচ্ছে আজ। গণ্ডগোল শুধু এক যায়গায় বোমাবর্ষণের অবিরাম শব্দ এবং গোলাগুলীর অবিশ্রান্ত গুঞ্জন। জার্মাণরা অমানুষিকভাবে আক্রমণকারীকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তবুও তাদের একপা একপা করে পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে। প্রিয়তম পিটার, আমরা এমন কি করেছি যার জন্য আজ আমাদের এই ব্যথা? মনে শুধু ভাবছি যে কি জার্মাণ জনসাধারণ কাজ করেনি? সমস্তই কি··ভুল হয়ে যাবে?

না, পিটার, আমি ভাবি আমাদের যুবশক্তির কাজ হচ্ছে আমাদের নেতার আদর্শকে সফল করে তোলবার জন্য লৌহদৃঢ় হয়ে থাকা। আমাদের নেতাকে সকলেই ত্যাগ করে চলে গেলেও তিনি এই যুবশক্তির উপর নির্ভর করতে পারবেন। যুবশক্তি তার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হতে পারে এবং আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে জয়ের দিকে এগিয়েও যেতে পারি।

পিটার, তোমার প্রিয়া এই দুঃসময়ে একটি বোকা, ক্রন্দনপটু স্ত্রীলোক হয়ে যায়নি। ঠিক তার বিপরীত হয়েছে। আমার শান্ত মনোভাব আমার চিন্তাগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজনদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। ক্রন্দন, না, আমি একথা চিন্তাও করতে পারি না। আমার হাসি এখন অন্তর্হিত হয়ে গেলেও ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি আমার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা বজায় রাখতে পেরেছি।

৯ই অক্টোবর, ১৯৪৪

আজ গোলাগুলী তেমন চলছে না। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহরে গিয়ে "জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাসী" সংঘে শেষ সংবাদ জানাবার জন্য রওনা হব। আমি নারী বলে নিজেই নিজের সম্বন্ধে লজ্জিত। একথা যখন আমি ভাবি তখন আমি পাগল হয়ে যাই। কিন্তু যারা সংঘের সভ্য তাদের ওপর লোকে নির্ভর করতে পারে। সংঘের সবাই হিটলার যুবশক্তির নেতা।

পিটার হতভাগ্য জার্মাণদের চিরকালই দুর্ভাগ্য বহন করতে হয়েছে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করব। আমি মার্কিণীদের ঘৃণা করি, বিশেষ করে তারা প্রায় সকলেই পূর্বে জার্মাণ ছিল বলে।

১০ই অক্টোবর, ১৯৪৪

পিটার, আমার প্রিয় প্রতিবেশী এবং মেয়ে বন্ধুদের হীনতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ব্রমসকউ নিবাসী সংঘের দুজন নারী নেতা মার্কিণীদের সঙ্গে নৃত্য করছে বলে গতকাল আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনেছে। এটা অসীম নীচতার পরিচয়।

আজকের দিনটা বড় ভীষণ। চতুর্দিকেই মেসিনগান থেকে গুলীবর্ষণ করা হচ্ছে। গুলীর গুঞ্জনের মধ্যে অগ্নিকণার বৃষ্টি হচ্ছে যেন। বাস্তবিকই পিটার, আমরা এখনও পাহাড়ের ওপর নেই। আমাদের বনে জঙ্গলে এস. এস বাহিনীর সৈনিকেরা সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীচু দিয়ে মার্কিণ বোমারু বিমানবহর উড়ছে।

আজ রাত্রিতে আমরা সংঘে ডাঃ গোয়েবল্‌সের বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করেছি। শত্রু অধিকৃত দেশে অধিবাসীরা জার্মাণ থাকবার মর্যাদা নষ্ট করেছে, আমরা এখানে থেকে মার্কিণীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি—একথা বলবার জন্য আমি তাকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারব না।

আমাদের সংঘের প্রত্যেককে সে পাগল করে দিয়েছে। আমরা কোথায় যাব? রাইন নদীর পারে গিয়ে শত্রুর সাংঘাতিক বোমাবর্ষণের মুখে নিজেদের এগিয়ে দেব?

পিটার, জার্মাণ ভাষা যে কত আনন্দদায়ক তা আমি এখন উপলব্ধি করছি। জার্মাণ মানে যুদ্ধ করা। আমাদের সংঘের সভ্যসংখ্যা বর্তমানে দুজনে এসে দাঁড়িয়েছে—অন্য দুজন এবং আমি স্বয়ং। আমি শুনেছি যে মার্কিণীরা একেন সহরকে দশ ঘটিকার মধ্যে আত্মসমর্পণ অথবা বোমাবর্ষণ ও গোলাগুলীতে ধ্বংস হতে

আত্মসমর্পণ দাখিল করেছে। এস, এস সেনারা কি কখনও আত্মসমর্পণ করবে? আমি এখনও তা বিশ্বাস করি না। আমরা জার্মাণ হিসাবেই থাকতে চাই বলে ডাঃ গোয়েবল্‌স্ আমাদের বিশ্বাসঘাতক বলবেন—এ বাস্তবিকই সাংঘাতিক।

১১ই অক্টোবর, ১৯৪৪

এই প্রত্যুষে মার্কিণ গোলন্দাজবাহিনী এলোমেলো ভাবে পাগলের মত গোলাবর্ষণ করছে। চারিদিক থেকেই ঐ বড় বড় কামানগুলো প্রচণ্ড শব্দ করছে এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। একেন সহর কি করবে?

১৩ই অক্টোবর, ১৯৪৪

গত পরশু পত্রখানা শেষ করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত। আমাদের সকলকেই এই স্থান পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তারা জার্মাণ সৈন্য খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমরা আজ সকালে ফিরে আসতে না আসতেই তিন জন মার্কিণ সৈন্য রাইফেল হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। তারা সকল কোঠাই খুঁজে দেখল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের অন্যত্র চলে যেতে হবে।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৪

লকেনষ্ট্রেসীতে আমাদের একখানা ঘর দেওয়া হয়েছে। আমাদের ঘরটা মোটেই পছন্দ হয়নি। জনসাধারণ দরিদ্র। সব কিছুই খোয়া যাচ্ছে।

প্রিয়তম পিটার, আজ তোমার জন্মদিনে তুমি কোথায়? আমি যদি জানতাম যে তোমাদের অনেকের মত তুমি এখানকার জঙ্গলে লুকিয়ে আছ, তবে আমি তোমাকে দেখতে যেতাম।

একেন ও ডুইসবার্গের চরম দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে, আমাদের অন্যান্য নগরীগুলি ও চমৎকার কলোন সহরেরও কি এই দুর্দশা ঘটবে? এ অবস্থা এত সাংঘাতিক যে, একথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। সময় এবং নিয়তির হাতে সব কিছুই সমর্পণ করতে হবে। আমরা ফলাফল দেখা ও আশা করা ব্যতীত অন্য কোন পরিবর্তন আনতে পারি না। আবার তোমার বাবাও তোমাকে যন্ত্রণা দেবেন। আমিও আমার পরিবারের সংগে আমার প্রতিদিনকার যুদ্ধ করে যাচ্ছি।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৪

আজ আমি একজন প্রাক্তন বন্দী ওয়াকেন এস, এস, সৈনিকের সংগে আলাপ করলাম। মাত্র দু সপ্তাহ আগে সে মুক্তি পেয়েছে। যদি তুমি হঠাৎ আমার সুমুখে এসে দাঁড়াও, তবে কী সুখেরই না সেটা হয়!

আমি আজ বাড়ী গিয়ে আমার ছোট্ট ফরাসী বেতারযন্ত্রটা নিয়ে এলাম। চিন্তা করে দেখ, আমি প্রায় একটি মৃত্যুখনিতে প্রবেশ করেছিলাম। একজন মার্কিণী আমার জীবন রক্ষা করেছে। প্রিয়তম পিটার, যতই যুবক এস. এস, সৈনিকেরা এখানে আসছে ততই তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমার কলোন, আমার কলোন! পিটার, পৃথিবীতে এখন কি ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই—যা অপরাধীদের এই কাজের জন্য শাস্তি দিতে পারে। প্রতিশোধের জন্য আমাদের হৃদয় হাহাকার করে ওঠে।

গতকাল আমাদের একজন সভ্য জানতে পেরেছে যে, হিটলারী যুবশক্তির নেতাদের কাজে গিয়ে আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়েছে।

১১শে অক্টোবর, ১৯৪৪

জার্মাণ "গণ-সেনাবাহিনী" সম্বন্ধে তোমার এখন কি বক্তব্য আছে? এখানে ওরা এটাকে অপরাধ এবং পাইকারী হত্যার যন্ত্র হিসাবে ধরে নিয়েছে। এসব দেখে আমার মনে হয় আমাদের নূতন কোন অস্ত্র নেই। পিটার, এত বৎসরের পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের পরেও আমাদের যুবশক্তি পরাস্ত হয়েছে একথা ভাবতেও আমাদের হৃদয় ব্যথায় টনটন করে ওঠে। না, তা হতেই পারে না। তাহলে, আমাদের যুবশক্তির কি হবে, পিটার?

বৃহৎ এক জার্মাণ মেসিনগান থেকে আবার গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছে। ইফেল বনে যুদ্ধ খুব দানা বেঁধে উঠেছে। আমেরিকানরা আসে বটে, কিন্তু অগ্রসর হতে পারে না। আমাদের সৈনিকেরা যদি এই দুর্বলদের নেতৃত্বাধীন থাকত, তবে তারা আকাশপথে আমেরিকায় চলে যেত। তারা সৈনিক নয়। যুদ্ধ এবং অগ্রগতি শব্দ দুটি তাদের কাছে অজ্ঞাত। আমরা আশা করি, তারা এজন্য ন্যায্য শাস্তি পাবে।

পিটার, আমি যখন মনসৃকর্ড সহরে আমাদের যুগল জীবনের কথা স্মরণ করি তখন ভাবতে পারি না যে এই সুখের সময়টা এত তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়ে গেছে। মানুষের সেই বিবেচনা-শক্তি কোথায়? দুটি প্রাণীর জন্যও তাদের কোন দরদ নেই। কিন্তু, আমি এতক্ষণ কি সব বলছিলাম? আমরা কারও দয়া চাই না। বেঁচে থাকাই মানে যুদ্ধ করা। জার্মাণ মানেই বিশ্বাসী হওয়া এবং আমার শেষ কাজ ও আদর্শের কাছে আমি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী থাকব। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার সন্তান-সন্ততিরাও এই আদর্শে প্রতিফলিত হবে।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৪

প্রিয়তম, আমরা আর জার্মাণ থাকতে পারব না কেন? মনসৃকর্ড শহরে আর আমাদের দলের মাত্র তিনজন আছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপার? যুবকেরা হতাশ হয়ে পড়েছে। পনর বৎসর বয়সের শিশুদের হাতে আমেরিকান সিগারেট গুঁজে দিয়ে ধূমপান করতে বলা হয়। পিটার, তোমার হৃদয় কি বিদীর্ণ হয়ে যায় না? আমাদের আদর্শ, জার্মাণ যুবশক্তির সেই আত্মবিশ্বাস আজ কোথায়?

গতকাল দুজন আমেরিকান আমাদের প্রাক্তন দলের নেতাকে তার শিশু সন্তানের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তারা তার কাছ থেকে জেলার শাসনকর্তা ও অন্যান্যদের খবর জানতে চায়। কিন্তু সে কিছুই বলবে না। এবার, বোধ হয়, আমার পালা। তুমি ত জানই আমি কি বলব। আমি বলব যে সে একেন শহরে গেছে এবং তার দুটো পায়ে তাকে চেনা যাবে। আমি মিথ্যা কথা বলব, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৪

গতকাল অবস্থাটা নরকের মত দাঁড়িয়েছিল। মেসিনগান থেকে গুলীবর্ষণ করা হয়েছে। আকাশটা লাল। এই পরিস্থিতির মধ্যে নূতন আমেরিকান ট্যাংক-কামানের গুলী এবং গোলাগুলী চলছিল। এই নরকের মধ্যে আমাদের বোমাবর্ষণ। ওঃ, অবর্ণনীয়।

আজ আমাদের সামরিক শাসন-বিভাগ অফিসে যেতে হবে। এটা খুব সম্ভব যে বাড়ী যাবার জন্ত এই আমাদের শেষ সময়। তুমি ত জানই যে সময়মত আমেরিকানদের স্বরূপ বোঝা যায়।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৪

পিটার, আমি এখনও ভূতের মত সাদা আছি। এক ঘণ্টার জন্ত অনুমতি নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরে গিয়েছিলাম। মেঝের মাঝখানে অন্ধকারময় জায়গায় আমার পায়ে একটা কিছুর স্পর্শ পেয়ে বুঝতে পারলাম যে আমার পায়ে একজন মনুষ্যদেহ ঠেকেছে। ভয়ে আমার রক্ত জমে গেল বরফের মত। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে আমি চীৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত করলাম। দিয়াশলাই বের করে দেখলাম, আমায় সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে—একজন জার্মানের শব পড়ে আছে। সাংঘাতিক! শরীরের অংগপ্রত্যংগগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। দোতলায় আহত এক ব্যক্তি পড়েছিল। এই সাংঘাতিক দৃশ্যের অর্থ কি, আমরা তার কাছ থেকে জানলাম।

আমাদের বাড়ীর পেছনে যে সব জার্মাণ সৈন্ত লুকিয়েছিল তারা ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের ঘরে প্রবেশ করেছিল। কিছুক্ষণ পরে তারা নীচে শব্দ শুনতে পায়। হঠাৎ কয়েক জন আমেরিকান তাদের সুমুখে এসে দাঁড়াল। এখন কী দৃশ্যের অবতারণা হল, তুমি নিজেই তা কল্পনা করে নিতে পার। বর্বরগুলো তিন সারি মদের বোতল নষ্ট করলে। আলমারীতে কিছুই আর রইল না। সব কিছুই তারা মেঝের ওপর ছড়িয়ে ফেলেছে। একটা ভীষণ দৃশ্য! ঐ বর্বরগুলো লোহার একটা ষ্টোভ দিয়ে লেখার টেবিলটাকে ভেংগে ফেলেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

পিটার, প্রিয়তম, তোমাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে। তুমি এখন এস, এস বাহিনীর একজন সৈনিক। তুমি শুধু আমাকে এই অনুগ্রহটুকু দাও যে তুমি জনসাধারণের বাড়ী যাবে না। ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লে কিছু খাবার সংগ্রহ করে নিও; কিন্তু সাধারণ লোকের বাড়ী যেও না। বুঝতে পাচ্ছ? ওখানে যাওয়া বড় বিপজ্জনক ব্যাপার!

২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৪

চল্লিশ মিনিট অন্তর অন্তর ব্রুসেলস এবং লিজ সহরে ভীষণ শব্দে বোমাবর্ষণ হচ্ছে। ছ'সপ্তাহ আগে প্রতিবেশী একটি মেয়ে আহত হয়েছিল। সে ফিরে এসেছে। সম্ভবতঃ দু-তিন মাস ওকে শয্যাগত থাকতে হবে। হাঁটুর ঠিক ওপরে ডান পায়ে বোমার টুকরা ঢুকে গিয়েছিল। মনসকউ বা ইউপেন সহরে বিদ্যুৎ ছিল না বলে ওকে আমেরিকান রেডক্রশ ওয়েলকেন রেথে (বেলজিয়াম) পাঠিয়ে দিয়েছিল। এক্স-রে করে দেখা গেল যে ওর হাঁটুটা ভেংগে গেছে। তেজস্বিনী মেয়েটিকে ঘরের মধ্যে তারা ফেলে রাখলে। দুদিন পরে তারা হামবুর্গে আমেরিকান হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। সেখান থেকে লিজ। সেখানে সে বেলজিয়ানদের ঘৃণা এবং আমাদের বোমাবর্ষণের তীব্রতা সহ্য করেছে।

পিটার, এখন তুমি কোথায়? এই চিঠি কি তোমার কাছে কোন দিন পৌঁছবে?

পিটার, আমি জার্মাণরূপে থাকতে চাই এবং আমাকে তা থাকতেই হবে। নূতন অস্ত্রটা যদি এসে পড়ত। ওতেই আমাদের রক্ষা হতে পারে। তুমি কি মনে কর না যে আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্যের দায়িত্ব আমাদের বিশ্বাসঘাতকদের স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়া যায়? দিনের পর দিন তারা পিতৃভূমির সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর দলে ভীড়ে পড়ছে। এই চিত্র যে কোন লোককে হতাশ করে দেয়। তবু যুদ্ধ করার জন্ত সাহস এবং আকাঙ্ক্ষা থাকা দরকার। বেঁচে থাকা মানেই সংগ্রাম করা। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে তোমাকে বলি: সাহসী হও।

১লা নভেম্বর, ১৯৪৪

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে দেখা যাবে যে আমরা আমাদের যাবতীয় সম্পত্তি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু একটা জিনিষ তারা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেনা—সেটা হল কি করে বেঁচে থাকব বা কি প্রণালীতে আমরা চিন্তা করব এই অধিকারটা।

এ জিনিষগুলো আমাদের যুবশক্তিকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। আমরা কি সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বড় হয়ে উঠিনি? আমরা আমাদের পুরাতন আদর্শ অনুসারে আমাদের নূতন জীবন পরিচালনা করতে সুরু করব। তার জন্তই আমরা আশা করব এবং জার্মাণীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্ত বিশ্বাস রাখব।

৩রা নভেম্বর, ১৯৪৪

এখন আমরা যথেষ্ট মাংস পেলেও (সপ্তাহে জনপ্রতি দুই পাউণ্ড) শীতকালে অনাহারে থাকতে পারি। আলু এখনও মাঠে আছে। এক টুকরো রুটির জন্ত আমাকে চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এটা কি সাংঘাতিক ব্যাপার নয়?

আমি এইমাত্র ৫ ঘটিকার সংবাদ শুনলাম। সংবাদ ভাল বলে মনে হল না। আমি জার্মাণীর জয়ে এখনও বিশ্বাস করি। এর পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। আমি নিশ্চিত যে একদিন আমার মা তার মন পরিবর্তন করবে। সে চোখ খুলে দেখতেও পারে। চারিদিকে কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার দিকে সে নজর দিতে পারে। এই দিনে বেঁচে থাকা মানে সংগ্রাম করা। আমার অনেক আগেই পালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

৫ই নভেম্বর, ১৯৪৪

আমি সর্বদাই ক্ষুধার্ত। রুটি ও মাখন পাওয়া যায় খুব কম। শত্রুরা আমাদের সুন্দর জার্মাণীকে শাসন করতে চায় এবং আমাদের প্রাচীন, শক্তিশালী জার্মাণ জাতকে অপবিত্র করে তুলতে চায়, একথা ভাবলে আমি পাগল হয়ে যাই। আমাদের এত জ্বালাতন সহ্য

করতে হচ্ছে কেন ? কারণ এদের মধ্যে অনেকে মিথ্যা কথা বলে এবং উদ্ভট গল্প তৈরী করে। জার্মাণ সৈনিকের ওপর আমার বিশ্বাস অটুট আছে। কারণ জার্মাণ সৈনিকই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৈনিক। আমাদের শত্রুদের অনেক রসদ আছে কিন্তু তাদের সৈনিকরা কাপুরুষ, আমাদের সৈনিকদের মত নয়। এটা যান্ত্রিক যুদ্ধ। এর বিরুদ্ধে আমরা কি করে দাঁড়াব ?

একটা ১নং ভি অস্ত্র আমাকে আজ সকালে জাগিয়ে দিয়েছে। কয়েক মিনিট পরেই আমরা একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলাম। সারা বাড়ীখানা কাঁপতে লাগল; দরজা-জানালাগুলো খুলে গেল। ইউপেনের নিকটে ওটা নিশ্চয়ই বিস্ফারিত হয়েছে এবং আমি আশা করি লক্ষ্যস্থলের ওপরেই বর্ষিত হয়েছে। যেদিকে তাকাবে সেদিকেই বিমান দেখতে পাবে। হায়, আমাদের দুর্ভাগা সৈনিকগণ ও সুন্দর সহরগুলো !

৮ই নবেম্বর, ১৯৪৪

আমি আমার পরিবারের সংগে আর বাস করতে পারব না। আমার এখনও পেট ভরেনি, এই কথা টেবিলে বলাতে আমার সংগে ঝগড়া হল। আমার ভ্রাতা বলল, ডাক্তার দেখাও। আমার পিতামহী কয়েকটা নিদারুণ মন্তব্য প্রকাশ করলেন। এখন তোমরা হিটলার এবং তার দলবলের জন্ম চীৎকার করতে পার কিন্তু তোমাদের কোন সুরাহা হবে না। তারা তাদের কৃতকর্মের যোগ্য শাস্তি পাচ্ছে। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না।

আমাদের এখানে আজ বেশ গুলীবর্ষণ চলেছিল। তুমি কি মনে কর যে আজ রাত্রিতে আমাদের ফুয়েরার বেতারে কিছু বলবেন ? আমি আশা করি, তিনি বক্তৃতা দিলে তারা রেডিও বন্ধ করে দেবে না। আমি তার বক্তৃতা শুনতে চাই। আমার আকাংখা হয় যে আমি যদি ছেলে হতাম তবে আমার আদর্শের জন্ম সংগ্রাম করতে পারতাম।

৯ই নভেম্বর, ১৯৪৪

আজ বরফ পড়ছে। অন্যান্ত বৎসরে আমরা কত আনন্দ করে বেড়িয়েছি, কিন্তু এখন আমাদের রাস্তায় বেরোনো বা স্লেজ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আমাদের আলু নেই। তা ছাড়া, রাস্তায় ঐ বরফে নিমজ্জিত আমেরিকানদের আমাদের সহ্য করতে হয়। আমাদের, জার্মাণদের রাস্তায় বেরোতে কতই না ইচ্ছা হয়।

ভি—২ অস্ত্র ব্যবহৃত হওয়াতে আমরা খুবই খুশী হয়েছি। আশা করি, এই অস্ত্রে আমাদের অনেকটা সাহায্য হবে। গতরাত্রে আমরা ফুয়েরারের বক্তৃতা শোনবার অপেক্ষায় রইলাম, কিন্তু বৃথা। গতকালও আমি ফুয়েরারের জন্ম সব কিছু করতে পারতাম; কিন্তু আজ আমি কিঞ্চিৎ হতাশ হয়ে পড়েছি। এটা কি সত্য যে হিমলার আমাদের প্রিয় ফুয়েরারকে বন্দী করে রেখেছে। হাইকমাণ্ড আর ফুয়েরারের কথা ঘোষণা করেনা। আমার তার প্রতি এখনও বিশ্বাস আছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের উন্নতি হবে, একথাও আমি বিশ্বাস করি। আমাদের পতাকার জয় সুনিশ্চিত।

—অনুবাদক : বিমলকুমার ঘোষ

হামলেট

বরিস পাসটারনেক

শব্দ থেমে গেল। আমি মঞ্চে এসে দাঁড়ালাম।
দরজায় শরীরের সমস্ত ভর রেখে
দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনে ভাবতে চেষ্টা করলাম
আমার এ জীবনে কি ঘটছে।

হাজার অপেরা গ্লাসের দৃষ্টির সম্মুখে
রাত্রির অন্ধকার আমাকে কেন্দ্র করে আছে,
ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, যদি সম্ভব হয়—
পাত্রটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও।

তোমার দুরন্ত ইচ্ছাকে ভালবেসে
আমি অভিনয়ে সম্মতি দিলাম।
কিন্তু এখন অন্য নাটক অভিনীত হচ্ছে
এর জন্যে আমাকে প্রস্তুত হ'তে দাও।
জানি, নাটকের সমস্ত অঙ্ক পরিকল্পিত
এবং সমাপ্তি অপ্রতিরোধ্য।
আমি একাকী, সকলে ফেরেসিসের কপটতায় মগ্ন।
'তোমার জীবনধারণ করা মাঠ পার হওয়ার মত সহজ নয়।'

অনুবাদক—পৃথ্বীশ সরকার

সিদ্ধার্থ-সঙ্গীত

গৌতম বুদ্ধ

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসম
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গৃহকূটং বিসংখিতং
বিসংখর গতং চিত্তং তণহানং খয় মজ্‌ঝগা।

অনুবাদ—

জন্ম-জন্ম আসি আর যাই সন্ধান করে পাই না
কে করেছে এই গৃহ-নির্মাণ, জন্ম-জন্ম দুঃখ,
পেয়েছি এবার তোমারে তো কাছে, বুঝেছি সত্য তাই না,
দুঃখেতে গড়া এই গৃহ জানি মিছে মায়া ছল শূন্য।

অজ্ঞানতার শৃংখলে আর রবো নাকো আমি বাঁধা,
মিথ্যার গ্লানি, ভয়, মোহ হতে মুক্ত আমার মন—
বাসনা-কামনা করিয়াছি ত্যাগ, টুটিল সকল বাধা,
সত্য চিনেছি, পেয়েছি আজিকে শান্তির এ জীবন।

—ভাবানুবাদ : সলিল মিত্র

মানবদরদী রবীন্দ্রনাথ

কুমারী অপর্ণা সরকার

প্রায় একশতাব্দী পূর্ব্বে ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ঠাকুর বাড়ীর গৃহ কোণে উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মধ্যে অন্যান্য শিশুর মতই জন্মেছিল একটি শিশু। হয়তো দেবগণ বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সাধনের জন্যই এই শিশুকে পাঠিয়েছিলেন স্বর্গলোক হ'তে মর্ত্তলোকে। অন্যান্য শিশুর মত বড় হবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে তিনি পারেননি, তাঁর কল্পনা ও চিন্তা স্বাধীন, তাই তাঁর আত্মীয়গণের মনে এসেছিল হতাশা। তাঁরা অনেকেই বলতেন রবিকে দিয়ে অনেক আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু ওর কিছুই হলো না, সেদিন তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল যে, ভাবীকালের বুকে এই শিশুই একদিন প্রতিভাত হয়ে উঠবে ভারতীয় সাধনার, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি উত্তরাধিকারী রূপে, এই বীজরূপী শিশুই একদিন মহামহীরুহ রূপে বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে অসংখ্য তাপিত জনকে দান করবে শান্তিদায়িনী সুশীতল ছায়া। প্রতিষ্ঠা করবে ভ্রান্ত সংস্কারের প্রভাবে জীর্ণ পুরাতন ভাঙ্গা চোরা সমাজের বুকে কুসংস্কার বর্জ্জিত সমাজকে গরিমাদীপ্ত এক অভিনব রূপে, মানুষকে দিবে মুক্তির স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথের নাম সার্থক প্রতিপন্ন হয়েছিল, কারণে তাঁর রশ্মি-জালে মণ্ডিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, সর্ব্বোপরি তাঁর পরিচয় তিনি মানবদরদী।

রবীন্দ্রনাথ উপর তলার লোক ছিলেন বলে ধরিত্রীমায়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে আগমন করতে অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন তার জন্য তাঁর আক্ষেপের সীমা ছিল না, এবং যে অবস্থান করছে ধরিত্রীমায়ের নিকটে তার জন্য তিনি থেকেছেন উদগ্রীব হয়ে।

সুন্দর এবং মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন তাদেরই যারা দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে তাদেরই উপরে, যারা বিষাইছে বায়ু, যারা নিভাইছে আলো।

রবীন্দ্র প্রতিভা ছিল সতত সচেতন, যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দিতে রবীন্দ্র লেখনী কোনদিনই হয়নি কুণ্ঠিত। জাতীয়-আন্দোলন তাঁর অন্তরের অন্তস্তল হতে আগত আশীর্ব্বাদ লাভ করেছে। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে তীব্র কশাঘাত। তাই দেখি,—জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন সহস্র সহস্র নরনারী ইংরেজের গুলীতে অসহায়ভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ এই পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের নিকট এবং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভারত সম্রাট প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুন্দরের উপাসক, যেখানে সুন্দর তাঁর দৃষ্টি-গোচর হয়েছে সেখানেই তিনি সন্ধান পেয়েছেন মঙ্গলের। তাই সেখানেই তিনি ধাবিত হয়েছেন জানাতে তাঁর অভিনন্দন। জাপানী কবি নোগুচি জাপানী সাম্রাজ্যবাদের কাঞ্চন মূল্যের নিকট আত্মবিক্রয় করায় রবীন্দ্রনাথ তাকে কোনদিনই ক্ষমা করেননি। মিস রাতবোনের উদ্ধত অহমিকাকে কবি গুঁড়িয়ে দিয়েছেন তীব্র শ্লেষের আঘাতে। যে যান্ত্রিক সভ্যতা, সভ্যতার নামে কলঙ্ক লেপন করেছে, পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলিতে যে যান্ত্রিক সভ্যতা যান্ত্রিক বলে বিশ্বকর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় তার বীভৎসরূপ দর্শন করে কবি আতঙ্কিত হয়েছিলেন, তাই তার উপর তিনি আশীর্বাদ বর্ষণ করেন নি, বর্ষণ করেছেন শুধু অভিশাপ। সেই সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ায় যান্ত্রিক সভ্যতার কল্যাণকর রূপ দর্শন করে কবি বিস্মিত হয়েছেন, হয়েছেন বিমুগ্ধ, অধিকাংশ মানুষকে অমানুষ রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে একথা অনিবার্য্য বলে মেনে নিতে অক্ষম হয়েছে তাঁর দরদী মন। তাই তো দেখি সেই সব মানুষের প্রতি তাঁর দরদ, যারা সভ্যতার পিলসুজরূপে সভ্যতার ঠাট মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে, যারা সমাজের উচ্ছিষ্টের অন্নে প্রতিপালিত, এদের উদ্দেশ্য করে মনুষ্য নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জীবনে আনন্দ অল্প অথচ পেটের জ্বালা কম নহে, জীবনে যত বড় দুর্ঘটনাই ঘটুক, দুই মুঠি অন্নের জন্য নিয়মিত কাজ চালাইতে হইবে, কোন ত্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না—যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে, যাহাদের দুঃখ কষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত, যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দেই না, তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত। আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর।'

রবীন্দ্রনাথ লেখনীর দ্বারা ব্যঙ্গ করেছেন তাদেরই যারা অন্ধ কৌলিন্যের মোহে মুগ্ধ হয়ে শত শত নবীন নারীর জীবন নষ্ট করতে হয়নি কুণ্ঠিত, যেখানে নারীরা সারা জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করতে পারতো সেখানে পিতা মাতার ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে ভোগ করতে হয় বৈধব্য যন্ত্রণা। তিনি তাদেরকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন

অঙ্কন ও

যারা অর্থের গদীতে বসে নিছক একটা খেয়ালের বশে অর্থহীন লোকেদের করেছে গৃহচ্যুত।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সহস্রবর্ষের তমসা নিমজ্জিত জাতিকে তুলে আনা তাদের অবহেলিত লাঞ্ছিত জীবন থেকে মুক্ত করা এবং তাদের আত্মদর্শনের উপলব্ধি সঞ্চার করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে দেশের অগণিত মানুষ তাচ্ছিল্যের জঞ্জালে স্তূপীভূত সে দেশ স্বাধিকার লাভ করেনি। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, গভীরে প্রবেশ করে তাদের আপন সত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে।'

'মহা ঐশ্বর্য্যের নিম্নতলে
অর্দ্ধাশনে অনশন দাহ করে
নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্ম্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের
অবাধ অভিঘাত,
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের
হয় না সহায়,
হয় মহাদায়।

রবীন্দ্রনাথ শোষিতের কবি, রবীন্দ্রনাথ অবহেলিতের কবি, কবি তিনি মানবের। তিনি নিজেই বলেছেন, 'যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটিতে আরম্ভ করে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদেরই বন্ধু আমি তাদেরই কবি।'

মেয়েরাই দায়ী

মহামায়া দেবী

আমরা অনেক সময় সমবে মেয়েদের নানা দুর্দশা, দুরবস্থার জন্য পুরুষকে দায়ী করি, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মেয়েদের অহরহ দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা আছে পুরুষের। তাই সব কিছু সুবিধা-সুযোগ তারাই ভোগ করে আর মেয়েরা হয় বঞ্চিত, এ কথা ঘোষণা করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। কিন্তু গভীর চিন্তা করে মনের গহনে একবার যদি মেয়েরা দৃষ্টি দেন, তাহলে ভাল করেই বুঝবেন, সত্য কারা এর জন্য দায়ী।

লোকে বলে, জ্ঞানপাপীর উপায় কি! এই যে মেয়েজাতীর জীব, এঁরা হলেন জ্ঞানপাপী, সব জানেন বোঝেন তবু উপায় খোঁজেন কি করে সত্যকার ভাল, বুদ্ধিদীপ্ত মেয়েরা চিরকালই একভাবে এক গোয়ালে মাথা মুড়িয়ে ঢুকে থাকেন। অবশ্য এ মনস্তত্ব সনাতনী পন্থার সব কিছুই ভাল বিশ্বাসে যাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন সেই সব মেয়েদের। যেহেতু নিজেরা 'থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়' করে জীবন কাটিয়েছেন, সেইহেতু সব মেয়েদেরই তাই হতে হবে, সে যদি নিজের প্রতিভায় বা কার্য্যদক্ষতায় ভিন্ন রাস্তা ধরে সংসারকে সুখী করবার বা নিজেকে সুখী করবার চেষ্টা করে, তাহলে একেবারে রসাতল কাণ্ড বেঁধে যায়—'দেশ গেল, ধর্ম্ম গেল, ঐতিহ্য গেল' বলে লম্ফঝম্ফের শেষ থাকে না।

মেয়েদের মনের ঈর্ষা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব এসবের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। এত আইন, এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও আজও যে মেয়েদের অবস্থার সত্যকার কেন উন্নতি হয়নি, তাদের মর্য্যাদা যে তিমিরে সে তিমিরেই রয়ে গেছে, তার কারণও মেয়েরা। শিক্ষিতা মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাংসারিক সাশ্রয় করবার জন্য চাকরী করেন। দ্বিপ্রহরের সনাতনী নিদ্রার মায়া ত্যাগ করে তাঁরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ী ফেরেন শ্রান্ত অবস্থায়, কিন্তু তার জন্য কি কোন পর্য্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে! উপরন্তু 'ঝিঙ্গী বউ বা মেয়ে' বলে মেয়েরাই করে নানা সমালোচনা, তারা ফুরফুরে হাওয়া খেয়ে মজা লুটে বেড়াচ্ছে, একথাও শোনা যায় প্রায়ই।

আজকালকার মেয়েরা কেবল রেঁধে প্রিয়জনকে খাইয়েই পরম তৃপ্তিতে ডুবে যান না, তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গী বা মনোভঙ্গীর বদল সহ্য করতে পারেন না অনেকে। আধুনিকারা চায় নানাভাবে নিজেদের বিকশিত করতে, সুন্দর সুচারু ভাবে গৃহ সাজাতে, নানা রকম শিল্পের মাধ্যমে, নানা রকম খেলা ও সাহিত্যচর্চ্চার ভিতর দিয়ে নিজেরা আনন্দ পায় ও অপরকে তার ভাগ দিতে চায় কিন্তু তাই বলে গৃহকর্ম্ম বা রান্নার ব্যাপারে তারা মোটেই উদাসীন নয়, তবে তা করবার পদ্ধতি হয়তো পুরাতনের সঙ্গে মেলে না দুবেলা দীর্ঘ সময় রান্নাঘরে হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে কাটিয়ে দেওয়াটাই পরমার্থ ভাবেনা সেজন্য আশ্রয় করে কুকার, ষ্টোভ ইত্যাদি। সুরুচিকর, পুষ্টিকর সহজ পন্থায় রান্না স্বাদে কিছু মাত্র কম হয়না অথচ অল্প সময়ের মধ্যে অবশ্য কর্ত্তব্য রান্নার ব্যাপার মিটিয়েও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। মধ্যবিত্ত ঘরে এরূপ প্রতিভা প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যেখানে সবদিকে বিচক্ষণ দৃষ্টি ও কর্ম্ম কুশলতার জন্য প্রশংসাই মেয়েদের প্রাপ্য সেখানে এই মেয়েরাই প্রতিবাসিনী রূপে, নয় বান্ধবী-রূপে, নয় শাশুড়ী রূপে ঢেলে দেন এইসব মেয়েদের মাথায় নিন্দা ও কুৎসার ডালি। তাই মনে হয় মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ভাল সহ্য করতে পারে না। সাবলীল, স্বাধীন মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্না মেয়েরা এখনও যে কত বাধার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তা বলে শেষ করা যায় না।

আধুনিক মেয়ে কেবল স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী, রন্ধনকারিণী ও অজস্র সন্তানের জননী হয়ে থাকতে চায়না, সে চায় স্বামীর মর্ম্ম সহচরীও হতে। আজকালকার স্বামীও চান স্ত্রী তাঁর সাথে সমান কায়দায় সমাজে মেলামেশা ও চলাফেরা করবে, স্ত্রী ঘরের কোণে কেবল রান্নাই করবে ও স্বামী নিজের ক্লাব বা বন্ধু নিয়ে ফুর্ত্তিতে মাতবেন, আজকের যুগে এ প্রথার বদল হয়েছে। কাজকর্ম্মে, সভাসমিতিতে স্বামীর পাশে সঙ্গিনী হিসাবে স্ত্রী স্থান গ্রহণ করছে, এতে ভাল বৈ মন্দ হয়েছে বলে মনে হয়না। মেয়েরা জন্মগত সুখনীড় রচনায় স্বপ্ন দেখে সুতরাং বাইরের নানা কাজে অংশ গ্রহণ করলেও তারা নিজেদের গৃহস্থালীর প্রতি এতো উদাসীন সাধারণত হয়না যে স্বামী পুত্র বা আত্মীয় পরিজন সুখাদ্যের অভাবে হোটেল রেস্তোরাঁর শরণাপন্ন হন, আজকাল মধ্যবিত্ত ঘরে এতো পয়সাও কারও নেই। গৃহশান্তি

বজায় রেখেই মেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পায়।

আজকাল নববধূদের রান্নার অজ্ঞতা নিয়ে নানা রকম হাস্যকর কাহিনী অবতারণা করা হয় কিন্তু আধুনিক মেয়েরা একটু চেষ্টা করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুক্তো, মোচার ঘণ্ট রাঁধতে শেখে, আবার স্বামীর কোন বিশেষ পদস্থ অফিসরকে আমন্ত্রিত করে আপ্যায়ন করবার সময় সুন্দর ভাবে টেবিল সাজিয়ে বিলাতীখানাও পরিবেশন করতে পারে। আজকালকার মেয়েরা নানা রকম রান্নার পদ বা variety নিজেরাই সৃষ্টি করে, অল্প মেহনতে সুচারু পুষ্টিকর খাদ্যতালিকার দিকেই দৃষ্টি তাদের বেশী। ঘেমে নেয়ে, হাত নোংরা, কাপড় নোংরা না করে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ যদি সে সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য প্রশংসাই তার প্রাপ্য। নিজের স্বামী সন্তানের জন্য যে দরদ পুরাকালের মা ঠাকুমাদের ছিল, এখনও তাই আছে, নারী একই জাত, মাতৃরূপে, জায়ারূপে রূপান্তর বড় একটা তাদের ঘটেনা কাজেই আধুনিক রুচিসম্পন্ন পুরুষের জন্য আধুনিক রুচিসম্পন্ন নারীই দরকার।

আধুনিক মেয়েরা কেবল যে গৃহকে সুন্দর করে তুলতে চায় তা নয়, তারা সর্বরকম পুরুষকে আরাম দেবার চেষ্টায় নিজেরাই আজকাল বহু কাজ নিজেদের ঘাড়ে স্বেচ্ছায় সানন্দে তুলে নিয়েছে। সাইকেল চালিয়ে মেয়ে বাজার করে আনে বা কয়লা কিনে আনে রিক্সাতে চাপিয়ে এ দৃশ্য বোধ হয় বহুজনেরই দৃষ্টিকটু কিন্তু এতে দোষণীয় কি সত্যিই কিছু আছে? আজকাল ঘরে ঘরে ভৃত্য জাতীয় জীব নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে সারাদিনের কর্মক্লান্ত স্বামীকে আরাম দেবার জন্য স্ত্রী যদি এই কাজগুলি অনায়াসে করে রাখতে পারে তার মত ভাল আর কি হয়? আধুনিক বহু মেয়েকে এইঁ কাজগুলি আমি করতে দেখি আর ভাবি, কই আমরা তো কোনদিন সংসারের জন্য এই অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে পারতাম না, হয়তো সে যুগে এগুলি করার প্রয়োজন মেয়েদের খুব হতোনা কিন্তু বর্তমান ভৃত্য সমস্যার যুগে মেয়েরা যে এগুলি করতে ক্রমশঃ পারদর্শী হচ্ছে তা আনন্দের বিষয়।

ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া, চেক ভাঙ্গান, বাড়ীতে মনিঅর্ডার করা, পার্শেল বা চিঠি রেজিষ্ট্রী করা, অসুস্থ স্বামীকে পাশে বসিয়ে নিজেই মোটর ড্রাইভ করে হাওয়া খাইয়ে আনা, এসব কাজগুলিই আধুনিকারা অতি সহজে করেন। কে বলে—আধুনিকারা সর্বতোভাবে কেবল গৃহসজ্জার মত শোভা পায়, আলমারীর শোকেসে সাজিয়ে রাখা ছাড়া তাদের দ্বারা আর কিছু হয়না। কথাগুলি বলেন অবশ্য ঐ
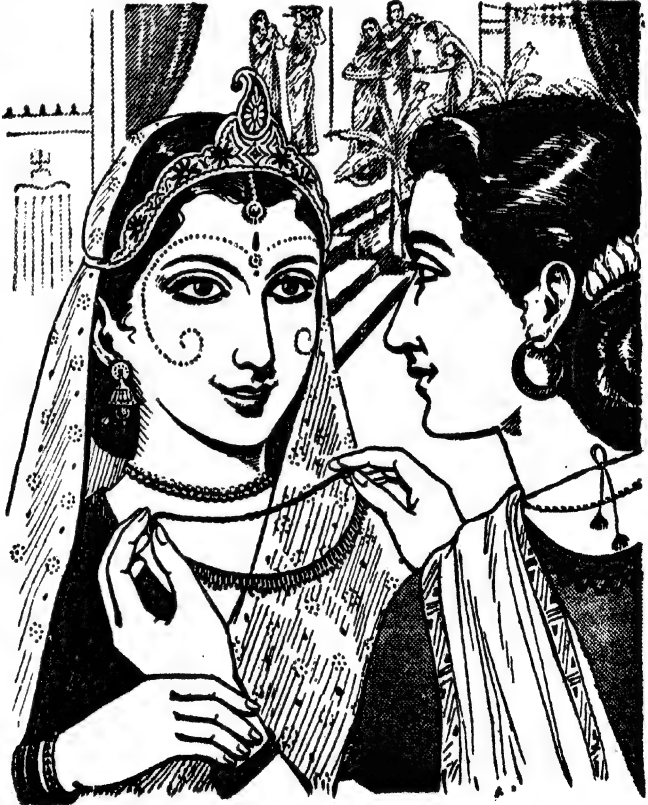
তথাকথিত মেয়েরা যাঁরা নিজেদের জীবনের বঞ্চিত বাসনা আজ মূর্ত্ত হয়ে উঠতে দেখছেন আধুনিকাদের মধ্যে।

আজও কন্যা সন্তানের জন্ম সংসারে আনন্দ আনেনা, আনে ভীতি। এ লজ্জা এ কলঙ্ক সব মেয়েদেরই। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব চিরন্তন তার শত অবগুণ থাকা সত্ত্বেও তারও কারণ মেয়েরাই। শাশুড়ীরূপে জননীরূপে এই সব মেয়েরাই এ জাতীয় পুরুষদের প্রশ্রয়ের সস্নেহ আঁচলে লালন করেন কিন্তু মেয়েদের বেলা এঁরাই হয়ে ওঠেন রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে আসীনা।

পণপ্রথা নিবারণ বা বধূর উপর নির্য্যাতন বন্ধ করা তখনই সম্ভব হবে যখন মেয়েরা নিজেরা হয়ে উঠবে উদার নয়তো শত আইন প্রণয়ন করেও এর প্রতিকার সম্ভব নয়। ছেলের বিয়ে দেবার সময় ছেলের মা ভুলে যান তিনি মেয়ে, তাঁর মনের মধ্যে কেবল একটি কথা জেগে থাকে তিনি 'ছেলের মা' কিন্তু তাঁর এই মনোভাবই যে টেনে আনে সমস্ত মেয়ে-জাতের উপর কলঙ্কের বোঝা। প্রতি মুহূর্ত্তে কুমারী কন্যা ও নির্য্যাতিতা বধূ নিজের মৃত্যু কামনা করে কিন্তু এর থেকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা একমাত্র মেয়েদেরই আছে। তিনি যে মেয়ে, মেয়েজাতের কল্যাণ, তাদের মর্য্যাদা যে তাঁরই হাতে। তাঁরও হয়তো একটি কন্যা আছে, সমস্ত মেয়েকে নিজের কন্যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে নিজেকে প্রশ্ন করুন তিনি, 'ছেলের মা' হিসাবে তাঁর ক্ষমতা কতদূর তা স্মরণে না রেখে বরং ছেলে ও 'ছেলের বাবা'কে সংবুদ্ধি দিয়ে সমাজ-কল্যাণের পথে চালনা করবার অসীম ক্ষমতারই সদ্ব্যবহার করেন যে নারী তিনিই প্রণম্য। মেয়েরাই তাদের সব রকম লাঞ্ছনার জন্ত দায়ী। পুরুষকে সংবুদ্ধি দিয়ে চালনা করলে সে সহজে অন্যায় করে না, কারণ বাইরের কাজই তাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ, সাংসারিক কূটনীতিতে স্ত্রীলোকের মত দক্ষ নয় সেজন্ত স্বভাবতঃ উদার কিন্তু এ উদারতা সহ্য করতে পারেন না তথাকথিত মেয়েরা ফলে আজও সার্থক হলো না কোন মেয়েদের জন্ত সৃষ্ট আইন যা সত্যই রচিত হয়েছে তাদের মঙ্গল ও মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে।

মেয়েজাতের সমৃদ্ধি ও উন্নতি তো পুরুষের হাতেই কিন্তু তাতে যুক্ত করতে হবে নারীর কল্যাণী শক্তি। অহেতুক মেয়েদের সমালোচনা করে তাদের দিকভ্রান্ত করার মধ্যে গৌরব নেই কিছু, মুষ্টিমেয় কয়েকটি অত্যাধুনিকা মুখসর্ব্বস্ব, আলস্যপরায়ণা মেয়েই তো সমস্ত মেয়েজাতের প্রতীক নয়।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, ভাল-মন্দ সব জিনিষেরই আছে। পুরাতন কিছু ভাল আবার নতুনও কিছু ভাল। এই আধুনিকাদের ভালর দিকেই দৃষ্টি রেখে প্রশংসা করে তাদের সমালোচনা করলে তারা নিজেরাই মন্দ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে কিন্তু তাদের অন্যান্য গুণাবলীকে সমালোচনার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেবার মধ্যে উদারতার কোন লক্ষণ নেই। আধুনিকা আমি নই কিন্তু আমার এ আলোচনা সমস্ত মেয়েজাতের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্খিনী বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

নারী শক্তির আধার, চণ্ডীতে চমৎকার এর বর্ণনা আছে অর্থাৎ ত্রিভুবনের সমস্ত পুরুষশক্তি একাগ্র হয়ে পুঞ্জীভূত হয়েছে ঐ নারী-শক্তির মধ্যে। নারী কি পারে আর পারে না, তা মন্ত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিজেরাই নির্ণয় করুন।

পাহাড়ে গেলে পর

শ্যামলী রায়

পাহাড়—পাহাড়ে গেলে পর
তুমি যদি পাও
ঠাণ্ড' বাতাস আর সকল তৃষ্ণার
যেখানে মধুর তৃপ্তি,
যেখানে সমস্ত রং সাদায় উধাও—
গভীরে প্রপাত নামা গান ভালবাসার,
তোমার অসীম সুখ
আমাকে জানাও।

আমি যে রৌদ্র-রুক্ষ সমতলে মাথাগোঁজা চরিত্রহীন—
ভীড়ে বাঁচি, অথচ বুকের পাষাণে
কত আশা, কত সাধ একা আসে যায়
ময়ূর পেখম ধরা স্বপ্নের কোলে আলেয়ারা ডাকে ইসারায়।

তাই, তুমি পাহাড়েই গেলে
তপঃক্লান্ত সমতলে সবুজ স্বপ্নের
ঘুমভাঙা গান এনো, নতুন দিগন্ত
নতুন নীলিমা, কোনদিন সার্থক হবো।

যে দুরধিগম্য ভবিষ্যত অন্ধকার-শ্রোণিতে জমা হয়—
তাহার চূড়ান্ত জয়, এনো সুনিশ্চয়, যা
পাহাড়েই মেলে।

খাঁজাদা বেগম

শিবানী ঘোষ

সমুখে সুবিস্তৃত হিন্দুকুশ পর্বতমালার পানে প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন বাবরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী খাঁজাদা বেগম। প্রাসাদ অলিন্দে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর মনে পড়ছে বিগত দিনের কথা। এই অলিন্দ থেকেই একদিন পতন ঘটেছিল পিতা ওমর শেখ মির্জার। তাঁর ঐ অপঘাতমৃত্যুর জন্য সেদিন প্রস্তুত ছিল না কেউই।

তখন বাবর ছিলেন নিতান্তই বালক। আজ সে হয়ে উঠেছে অষ্টাদশবর্ষীয় নির্ভীক সুদর্শন এক যুবক। এখন সে সমগ্র সমরখন্দের অধিপতি। শুধু সমরখন্দই নয় আজ তার অন্তরে সুপ্ত রয়েছে সমগ্র আফগানিস্তান জয় করার স্বপ্ন। এ স্বপ্ন একদিন তার সফল হবেই। কিন্তু তখন কি তার এই দিদিটির কথা মনে থাকবে?

না থাকুক। খাঁজাদা বেগম আপন স্নেহ থেকে কখনও বঞ্চিত করতে পারবেন না ঐ ভাইটিকে। তাঁর বড় আদরের জিনিষ ঐ ভাইটি। তার জন্যে তিনি নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন।

ঐ ভাইটির তদারক করতেই তাঁকে ভুলে থাকতে হয়েছিল নিজের কথা। খাঁজাদা বেগম নিজে ছিলেন বাগদত্তা। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সব কিছু হয়ে গেল ওলটপালট। তিনি তাই একুশ বছর বয়সেও রয়ে গেলেন কুমারী অবস্থায়।

—বড় চমৎকার ঐ পর্বতমালা তাই না বেগম সাহেবা ?

হঠাৎ পশ্চাৎ হতে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে পিছন ফিরে তাকান খাঁজাদা বেগম।

আগন্তুক মিষ্টি হাসি হেসে বলেন—তোমার দেখা এত সহজে পাবো ভাবিনি বেগম সাহেবা।

মুখে নেকাব ছিল না খাঁজাদা বেগমের। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর স্বচ্ছ মসলিন-ওড়নার একপ্রান্ত মুখের ওপর টেনে দিয়ে বলেন—কে ? কে তুমি ? এমন বেয়াদবের মত এসে দাঁড়িয়েছো আমার পশ্চাতে ?

আগন্তুক আপন দেহের ছদ্ম আবরণ সরিয়ে দিয়ে বলেন—আমি শায়বানি চিনতে পারছো না খাঁজাদা ?

—পারছি। কিন্তু তুমি ছলনা করে এমন নির্লজ্জের মত আমার পশ্চাতে এসে দাঁড়াবে তা আমি ভাবতেও পারিনি ! তুমি আমার পথ ছেড়ে দাও। আমার দেহে বোরখা নেই, এ অবস্থায় আমি তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে পারছি না।

শায়বানি তাঁর তন্বী দেহের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেন—পথ আমি নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো বেগম সাহেবা, আমি শুধু তোমার মতামতটুকু জানতে চাই।

খাঁজাদা বেগম কঠোর কণ্ঠে জবাব দেন—না তা কখনই হতে পারে না। আমি একজনের বাগদত্তা। এ অবস্থায় আমি তোমাকে স্বামিরূপে কখনই বরণ করে নিতে পারবো না।

শায়বানি হেসে বলেন—আবার সেই বাগদত্তার মিথ্যে ছেনালী। কিন্তু বেগম সাহেবা ভেবে ছাখো বয়স তো তোমার বসে থাকছে না। কোন্ অতীতে তুমি কার বাগদত্তা ছিলে তা সঠিকভাবে তুমি নিজেও জানো না। কাজেই মিথ্যে সেই সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকলে বিয়ে তোমার কোনদিনই হবে না।

শায়বানির কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে খাঁজাদা বলেন—আমার বিয়ে হোক আর নাই হোক সে চিন্তা আমি তোমার ওপর ফেলে রাখিনি। কাজেই তুমি এখুনি আমার পথ ছেড়ে দাও।

শায়বানি বলেন—আমার প্রশ্নের জবাব পেলেই আমি পথ ছেড়ে দেবো। আমি শুধু জানতে চাই তুমি আমার সহধর্মিণী হতে রাজী আছো কি না ?

—না !—দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেন খাঁজাদা বেগম।

—না ? বেশ তবে আমি চললাম। কিন্তু জেনে রেখো আমিও এর প্রতিশোধ নিতে জানি। আমি শীঘ্রই সমরখন্দের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বধ করবো তোমার ভাইকে। বলেই হনহনিয়ে চলে গেলেন শায়বানি।

তাঁর কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন খাঁজাদা বেগম। শায়বানি আক্রমণ চালাবে সমরখন্দের ওপর ? সে হত্যা করবে তাঁর ভ্রাতাকে। কথাটা চিন্তা করতেই যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গে।

খাঁজাদা বেগম আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। তিনি দ্রুত ছুটে যান বাবরের খাস মহলে।

আপন কক্ষে তখন পায়চারী করছেন বাবর। কাবুল জয় করার আনন্দে তখন দোলায়িত হচ্ছে তাঁর হৃদয়। এইবার তিনি যাবেন ভারত অভিযানে। তারপর তিনি হবেন এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর।

হঠাৎ খাঁজাদা বেগমকে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বাবর বিস্মিত হয়ে বলেন—এ কি দিদি তুমি এমন করে ছুটে এলে যে ! কি হয়েছে ? তুমি শুনেছো আমি কাবুল জয় করেছি এবং শীঘ্রই ভারত অভিযানে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছি ?

খাঁজাদা বেগম হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন—শুনেছি জহির, আমি সব শুনেছি ভাই। তুমি কাবুল জয় করবে, ভারত অভিযানে যাবে এ সব তো আমার অনেক দিনের স্বপ্ন। তা আজ পুরণ হয়েছে। কিন্তু তবু বলি খুব সাবধানে থেকো। কারণ মনে হয় শায়বানি শীঘ্রই এই সমরখন্দ আক্রমণ করবে এবং তোমাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে সে বধ করতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না।

বিস্মিত হয়ে বাবর বলেন—শায়বানি ? মানে তুমি কি উজ্‌বেকিস্তানের শাহি বেগ খাঁর কথা বলছো ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু হঠাৎ তার সমরখন্দ আক্রমণ করে আমাকে বধ করার কারণ কি থাকতে পারে ?

খাঁজাদা বেগম বলেন—দুরাত্মাদের কারণের কিছু অভাব হয় না। তার মনে অত্যন্ত নীচ বাসনা লুকিয়ে আছে। তুমি প্রতিটি মুহূর্ত সতর্কে থেকো।—বলেই খাঁজাদা বেগম দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান আপন মহলে।

এর দিন কয়েক পড়ে সত্যিই একদিন অতর্কিত ভাবে সমরখন্দ আক্রমণ করলেন শায়বানি। এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বাবর। ফলে শায়বানির নিকট পরাজিত হয়ে তাঁকে বরণ করে নিতে হল বন্দীদশা। শায়বানি স্থির করলেন এইবার তিনি নির্মমভাবে বাবরকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবেন খাঁজাদা বেগমের ওপর।

বেগমসাহেবা এই দুঃসংবাদ তাঁর মহলে বসে থেকেই সব শুনলেন। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গ। এখন কেমন করে বাঁচানো যায় তাঁর ভাইটিকে ? সারাদিনটা তাঁর কাটে নিদারুণ এক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে।

সেদিন সন্ধ্যাকালে দু' একটা তারা ফুটে উঠতেই খাঁজাদা বেগম বোরখা-পরিহিতা হয়ে বেরিয়ে পড়লেন শায়বানির শিবিরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে শুধু নিলেন একজন দাসী।

বেগমসাহেবা ধীরপদে হেঁটে চলেন পথ। যেতে যেতে অনেক কথাই উদিত হতে থাকে তাঁর মানসপটে। আজ তিনি তাঁর পবিত্র দেহ সঁপে দিতে চলেছেন শায়বানির মত এক লম্পটের হাতে। এ অপমান শুধুমাত্র খাঁজাদা বেগমের অপমান নয়। সমগ্র তৈমুর বংশে এটা হবে এক নিদারুণ কলঙ্ক। কিন্তু তবু উপায় নেই, বাবরের জীবন যেমন করেই হোক রক্ষা করতে হবে।

—বেগম সাহেবা, ঐ যে শায়বানির তাঁবু দেখা যাচ্ছে।

দাসীর কথায় সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েন খাঁজাদা বেগম। তারপর ধীর কণ্ঠে বলেন—আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, তুই গিয়ে খবরটা দিয়ে আয় !

আপন তাঁবুতে তখন শায়বানি সমরখন্দ জয়ের আনন্দে মশগুল হয়ে রয়েছেন বন্ধু পরিবৃত হয়ে। এমন সময় সেখানে গিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়ায় খাঁজাদা বেগমের দাসী। শায়বানি তার পানে ফিরে বলেন—কি চাই ?

দাসী বলে—বেগমসাহেবা একবার আপনার সাথে দেখা করতে চান।

—কোন্ বেগম সাহেবা?

—খাঁজাদা বেগম।

নামটা শুনে খানিকটা চমকে ওঠেন শায়বানি। মুখে তাঁর ফুটে ওঠে একটি ক্রূর হাসি। তিনি বলেন—নিয়ে এসো তোমার বেগমসাহেবাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন এক বোরখা পরিহিতা রমণী। শায়বানি তাঁকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন—কি চাই?

বোরখা-পরিহিতা রমণী মৃদু কণ্ঠে বলেন—আমার ভাই-এর প্রাণভিক্ষা।

তাঁর কথা শুনে হা-হা করে খানিকটা হেসে ওঠেন শায়বানি। তারপর হাসি থামিয়ে বলেন—তার বিনিময়ে যদি বলি তোমাকে চাই।

খাঁজাদা বেগম বলেন—আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

—বেশ তবে উন্মোচন করে ফেলো তোমার দেহের বোরখা।

তাঁর কথা শুনে খানিকটা শিউরে উঠে খাঁজাদা বেগম বলেন—তোমার এত লোকজনের সামনে?

শায়বানি হাসতে হাসতে বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ বেগম সাহেবা এরা আমার ইয়ার বন্ধু, এদের সামনেই তোমাকে খুলতে হবে বোরখা।

—বেশ তাই খুলছি। খাঁজাদা বেগম কম্পিত হস্তে উন্মোচন করে ফেলেন আপন দেহের বোরখা। মুহূর্তেই যেন আলো হয়ে ওঠে জায়গাটা।

শায়বানি তাঁর দেহের পানে নির্লজ্জ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেন—এবার এগিয়ে এসো আমার কাছে।

খাঁজাদা বেগম নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মাথা হেঁট করে। শায়বানি বলেন, না না ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। যদি ভাই-এর জীবন প্রকৃতই ফিরে পেতে চাও তবে সহজ ভাবে ধরা দাও আমার কাছে।

তাঁর কথা শুনে কেঁপে ওঠে খাঁজাদা বেগমের বুক। তিনি অবনত মস্তকে ধীর পদে এগিয়ে আসেন শায়বানির কাছে।

সেবার সত্যি বাবরের প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছিলেন শায়বানি এবং তিনি খাঁজাদা বেগমকে গ্রহণ করেছিলেন সহধর্মিণী রূপেই। এক বছর না যেতেই তাঁর কোলে এল একটি পুত্র সন্তান। তার নাম রাখলেন খুরম-শাহ।

কিন্তু জীবনে শান্তি পান না খাঁজাদা বেগম। শায়বানি তাঁকে বিবাহ করলেও স্ত্রীর মর্যাদা কখনও দেন নাই। তা ছাড়া বাবরের সাথে শত্রুতা করতে পারলেই তিনি যেন খুশী হন। এ জিনিষটা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না খাঁজাদা বেগম। পাছে ভাই-এর কোন অনিষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি স্বামীর দুরভিসন্ধির কথা অনেক সময় গোপনে জানিয়ে দেন বাবরকে।

এমনি এক ঘটনা হঠাৎ ধরা পড়ে গেল শায়বানির কাছে। তিনি দ্রুত ছুটে আসেন খাঁজাদা বেগমের নিকট। এসেই রুক্ষ কণ্ঠে বলেন—তুমি বাবরের কাছে আমার গোপন উদ্দেশ্য জানাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছো?

নিরুত্তর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন খাঁজাদা বেগম।

শায়বানি তাঁকে একবার ঠেলা দিয়ে বলেন—চুপ করে রইলে যে! আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

খাঁজাদা বেগম নিচু গলায় বলেন—হ্যাঁ পাঠিয়েছি।

শায়বানি বলেন—আপন স্ত্রী হয়ে এমন বেইমানী করতে তোমার একটুও বাধলো না?

খাঁজাদা বেগম দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দেন—আমাকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছো কি? তুমি আমার সাথে যে ব্যবহার কর তা লোকে তাদের রক্ষিতাদের নিয়েও অমন করে না।

—বটে! তোমার এত তেজ হয়েছে! যাও তবে আমি এখুনি তোমাকে তালাক দিচ্ছি।

খাঁজাদা বেগম বলেন—তোমার তালাক দেওয়াকে আমি আমার মঙ্গল বলেই মনে করি।—বলেই তিনি তাঁর শিশুপুত্র খুরম-শাহকে কোলে নিয়ে উদ্যত হন বাড়ী থেকে চলে যেতে।

শায়বানি বলেন—ছেলেকে রেখে যাও।

খাঁজাদা বলেন—ছেলে আমার, আমি তাকে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

—কখনই না।—শায়বানি বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দেন—শামিয়া!

বাঁদী এসে দাঁড়ায় কুর্ণিশ জানিয়ে। শায়বানি বলেন—শামিয়া ওর কোল থেকে কেড়ে নে ছেলেটাকে।

শামিয়া এগিয়ে যায় খাঁজাদা বেগমের কোল থেকে খুরম-শাহকে ছিনিয়ে নিতে। খাঁজাদা কঠোর কণ্ঠে বলে ওঠেন—শামিয়া! আমার কোল থেকে ছেলে কেড়ে নিলে তোর দোজখেও স্থান হবে না বলে রাখছি।

শামিয়া বলে—আমি প্রভুর আদেশ পালিকা বাঁদী বেগমসাহেবা। তাঁর আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।—বলে সে জোর করে খুরম-শাহকে ছিনিয়ে নেয় তাঁর কোল থেকে।

টানাটানিতে কেঁদে ওঠে শিশুটি। খাঁজাদা বেগম আর রোধ করতে পারেন না তাঁর অশ্রু। তিনি কান্নায় আবেগ নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান ঘর থেকে।

মাঠের প্রান্তর দিয়ে রাতের অন্ধকারে পাগলিনীর মত ছুটে চলেন খাঁজাদা বেগম। এমনি এক রাত্রে তিনি এসেছিলেন শায়বানির কাছে। আজ তিনি তার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে যাচ্ছেন। আজ এতটুকু স্থির নেই তাঁর চিত্ত।

মাঠের এই প্রান্তরে সকালের দিকেই বোধ হয় হয়ে গেছে এক খণ্ড যুদ্ধ। তাই অত্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠেছে মাঠ। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই খাঁজাদা বেগমের। তিনি দ্রুত ছুটে চলেন প্রান্তরের ওপর দিয়ে। হঠাৎ এক সময় তিনি হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়লেন মাটিতে। সংগে সংগে হারিয়ে যায় তাঁর চেতনা।

যখন খাঁজাদা বেগমের জ্ঞান ফিরল তখন তিনি চেয়ে দেখলেন তিনি শুয়ে রয়েছেন এক কুটিরের মাঝে শুভ্র বিছানায়। মাথার

কাছে বসে রয়েছে এক দাসী। খাঁজাদা বেগম তাকে জিজ্ঞেস করেন—আমি কোথায়?

দাসীটি জবাব দেয়—এটি সৈয়দ হাদার কুটির।

খাঁজাদা বলেন—সৈয়দ হাদা মানে শায়বানির অধীনস্থ এক সামান্ত কর্মচারী না?

—হাাঁ বেগম সাহেবা কাল রাত্রে মার্ভের প্রান্তরে অচেতন আপনাকে পড়ে থাকতে দেখে সৈয়দ আপনাকে উঠিয়ে এনেছিলেন। আজই তিনি আপনাকে শায়বানির কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

—শায়বানির কাছে? চমকে ওঠেন খাঁজাদা বেগম। তিনি সজোরে হাত নাড়তে নাড়তে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—ওগো না না আমাকে শায়বানির কাছে পাঠাতে হবে না। সে আমার সর্বনাশ করেছে।

দাসীটি বলে—বেশ তো শায়বানির কাছে যেতে না চান সম্রাট বাবরের কাছেই আপনাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

খাঁজাদা বেগম বলেন—ওগো তোমার মনিবকে বলো আমাকে এই কুটিরেই যেন তিনি কিছুদিন রাখেন। কারণ বিরাট বিরাট রাজপ্রাসাদে প্রতিনিয়ত থেকে আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি।

দাসীটি বলে—এতো বেগম সাহেবা আমাদের অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। আমি বেশ জানি আমার মনিব এ কথা সাগ্রহে গ্রহণ করবেন।

সত্যি সে কথায় বিন্দুমাত্র আপত্তি করেননি সৈয়দ হাদা। খাঁজাদা বেগম কিছু দিনের জন্ত থেকে গেলেন তাঁর কুটিরেই। ক্রমশঃ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে চলতে লাগল কথা বার্তা। খাঁজাদা বেগম অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন সৈয়দ হাদার ব্যবহারে। একদিন তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে সরাসরি বলে ফেললেন—ওগো আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি, তুমি কি আমার পাণিগ্রহণ করতে পার না?

বেগম সাহেবার কথায় শিহরণ লাগে সৈয়দ হাদার মনে। তিনি বলেন তোমার পাণিগ্রহণ করতে যত সুখ আমি কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু তবু আমি বলি রাজরাণী হয়ে আমার মত একজন সামান্ত ব্যক্তিকে স্বামিরূপে বরণ করে নিলে তোমার কষ্টই হবে খাঁজাদা।

খাঁজাদা বেগম বলেন—ওগো না না কষ্ট আমার কিছু হবে না। আমি যে কষ্ট পেয়েছি তাতে এত সুখ পাওয়া আমার কল্পনার অতীত।

সৈয়দ হাদার সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহ হল খাঁজাদা বেগমের। এই বিবাহে সত্যি সুখী হয়েছিলেন বেগমসাহেবা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সুখ স্থায়ী হল না খুব বেশী দিন। তাঁদের বিয়ের দু'মাস না যেতেই মৃত্যু ঘটলো সৈয়দ হাদার। তাঁর মৃত্যুতে চরম দুঃখ নেমে আসে খাঁজাদার অন্তরে।

কালো বস্ত্র পরিধান করে বেগম সাহেবা স্থির করলেন এবার ফিরে যাবেন বাবরের কাছে। হঠাৎ মনে হল তাঁর ভাই যদি স্থান না দেয়? না দিলে তিনি সোজা চলে যাবেন মক্কায়। তারপর আর কখনও ফিরবেন না এদিকে।

কিন্তু বাবর অবহেলা করেননি তাঁর দিদিকে। পূর্ব কৃতজ্ঞতা স্মরণ রেখে তিনি সসম্মানেই আপন প্রাসাদে স্থান দিয়েছিলেন খাঁজাদা বেগমকে। বেগমসাহেবা আবার পূর্বের মতই দিন কাটাতে লাগলেন কুমারী মেয়ের মত। কিন্তু অন্তরে তিনি শান্তি পান না মুহূর্তের জন্ত। সর্বদা তাঁর হৃদয় ভরে থাকে গভীর শূন্যতায়।

সেদিন প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে একাকিনী বসে রয়েছেন খাঁজাদা বেগম। মনে মনে তিনি পর্যালোচনা করেন আপন উপেক্ষিত জীবনের কাহিনী। কেন তাঁর এমন করে বিষিয়ে উঠলো হৃদয়? প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন বাগদত্তা। কার সাথে তা অবশ্য তিনি স্পষ্টভাবে জানতে পারেননি কোনদিন। কিন্তু তিনিই বা কেমন পুরুষ। আপন অধিকার তিনি কি আপন পৌরুষ দিয়ে জয় করে নিয়ে যেতে পারতেন না? খাঁজাদার চোখ ভরে ওঠে অশ্রুতে।

—তুমি কাঁদছো খাঁজাদা?

বেগম সাহেবা পেছন ফিরে দেখেন মাহদি খাজা। এঁর সাথেই ছিল তাঁর বাল্য-প্রণয়। প্রথম যৌবনে তাঁরা কতদিন পরস্পরে মিলিত হয়েছেন গোপন অভিসারে। সে-সব দিন আজ স্বপ্নের সামিল। খাঁজাদা তাড়াতাড়ি মুখের ওপর নেকাবটা টেনে নিয়ে বলেন—একি মাহদি তুমি হঠাৎ এখানে?

মাহদি খাজা বলেন—একটা কথা ছিল। আচ্ছা খাঁজাদা তোমার মনে পড়ে একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে আমাকে পাওয়ার মত সুখ তুমি বেহস্তে গেলেও পাবে না?

তাঁর কথা শুনে ফুঁপিয়ে ওঠে খাঁজাদা বলেন—বলেছিলাম কি বলছো মাহদি, আমি আজও সে-কথা বলি। তোমাকে না পেয়েই তো এমন ছন্নছাড়া হয়ে গেল আমার জীবনটা। জানো মাহদি, সেদিন আমি সত্যি বড় ভুল করেছি। তখন আমি কার না কার বাগদত্তা ছিলাম। মিথ্যে সে-কথা মনের মধ্যে পোষণ করে আমি তাকেও পেলাম না তোমাকেও হারালাম।

মাহদি খাজা বলেন—তুমি কার বাগদত্তা ছিলে তা আজও কি তুমি জানো না খাঁজাদা?

—না মাহদি।

মাহদি হেসে বলেন—কথাটা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

খাঁজাদা বলেন—তুমি আমার কাছে গোপন না করে সব কথা খুলে বলো মাহদি।

মাহদি বলেন—তুমি আমারই বাগদত্তা ছিলে।

চক্ষু বিস্ফারিত করে খাঁজাদা বলেন—তোমার বাগদত্তা ছিলাম! কি বলছো মাহদি?

—ঠিকই বলছি খাঁজাদা।

কম্পিত অধরে খাঁজাদা বলেন—তবে এতকাল এ কথা আমায় কাছে গোপন করেছিলে কেন? কেন আমাকে আগে এ কথা বলো নি?

মাহদি খাজা বলেন—গোপন করিনি খাঁজাদা। আসল ব্যাপার কি এ কথা আমি নিজেও জানতাম না। জানলে সেদিন তোমাকে জোর করে অধিকার করতাম। কারও কোন বাধাই মানতাম না। তা সম্প্রতি এ খবর জানলাম আমার পিতা খাজা মুসাকে লিখিত তোমার পিতা ওমর শেখ মির্জার এক পুরোনো পত্র থেকে। এই ত্যাখো সেই চিঠি।

মাহদি খাজা চিঠিটা এগিয়ে দিলেন খাঁজাদার হাতে। সেটা বার দুই পড়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন বেগম সাহেবা। তিনি কান্নার আবেগে

বলেন—ওগো যদি এমন কথাই এই পত্রে লেখা ছিল তবে তা আমরা আরও কিছুকাল আগে জানতে পারলাম না কেন ?

মাহদি খাজা তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলেন—খাঁজাদা আমি আবার নতুন করে তোমার পাণিগ্রহণ করতে চাই।

খাঁজাদা বেগম বলেন—আমার এ দেহ অপবিত্র হয়ে গেছে মাহদি। তা ছাড়া আজ আমি বিগত যৌবনা তেত্রিশ বছরের এক নারী। আমাকে নিয়ে তুমি কেমন করে সুখ পাবে ?

মাহদি বলেন—তোমার দেহ আমি চাই না খাঁজাদা। তোমার বয়স কত হয়েছে তাও আমি দেখতে চাই না। কামনার উর্ধ্বে যে প্রেম সেই প্রেমে অভিসিঞ্চন করে আমি তোমাকে পেতে চাই। বল খাঁজাদা তুমি কি এতে রাজী হবে না ?

কম্পিত অধরে খাঁজাদা বলেন—আমার মন এই রাজীনামায় চিরকালই মত দিয়ে এসেছে, আজও সে এতে সায় দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছে। বলতে বলতে বেগম সাহেবা মাথা রাখেন তাঁর বুকের ওপর। মাহদি খাজা তখন বাহু আবেষ্টনে জড়িয়ে ধরেন খাঁজাদা বেগমকে। ১

রামধনু আঁকে রঙ

মীনাক্ষী দালাল

যাচ্ছো ? কালো কোঁকড়ানো চুলেভরা মাথাটা দুহাতে চেপে আশ্চর্য্য এক ব্যথার ছোঁয়ায় দৃষ্টিটাকে ভাসিয়ে দিলে সে অনেকদূরের আকাশে।

হাঁ। ডাগর চোখের মায়ায় ছোট্ট একটা হাসির সুর ছটফটিয়ে নিটোল সবুজ পান্নার মত রাঙা ঠোঁটের প্রান্তে এসে থামলো হঠাৎ।

বেশ কিন্তু কথা দিয়ে যাও যদি কোনদিন দরকার হয় মনে করবে আমায়। সেই ব্যথিত বেদনাটুকু বিকেলের ছায়াঘেরা আলোয় আবার নতুন করে ঘনিয়ে উঠলো তার ক্লান্ত চোখের বিষণ্ণতায়।

কথা দিলাম। প্রচণ্ড এক ঠাট্টার হাসি দুই চোখের তারায় লুকিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বিষাদের সুর টানলো সে।

তোমাকে আসতে বলার অধিকার আমার আছে কি না জানি না তবুও বলছি আবার এসো। ফুরিয়ে আসা বিকেলের ঝিমিয়ে থাকা নির্জনতায় থরথরিয়ে কাঁপলো তার ভরাট গলাটা।

নিশ্চয়ই আসবো। মুক্তোর মতো সাদা একসার দাঁত ঝিকমিকিয়ে এই তীক্ষ্ণ ভাবনাটাকে যেন দুহাতে সরিয়ে দিতে চাইলো সোনালী সেন। কিন্তু ক্যামাক ষ্ট্রীটের ঘন হয়ে আসা জারুল গাছের ছায়ায় প্রতীক্ষারত এক আশ্চর্য্য মিষ্টি মুখের ছেলের স্বপ্ন আবির রঙ ছুঁইয়ে দিলো তার নিটোল কপোলের রক্তিমতায় আর সেই হঠাৎ লজ্জা পাওয়া চিবুকের পানে চোখ রেখে নতুন আশায় পাওয়ার বেদনাটুকুকে মুছে দিলো অরিন্দম।

আচ্ছা, এবার আসি তার—ঘন নীল পর্দাটার বুকে ছোট্ট একটু কাঁপন তুলে রঙীন আলপনা আঁকা মিষ্টি একটা প্রজাপতির মতই ডানা মেলে উড়ে গেলো তন্বী সুন্দর এক দেহ। আর সাদা ধবধবে শ্বেতপাথরের টেবিলে ছড়ানো বইয়ের বুকে মাথা রেখে এক ঢলোঢলো মেয়ের ভালবাসার ভাবনায় হারিয়ে গেল প্রফেসর অরিন্দম ঘোষ। কিন্তু ঠিক এমন সময় আউটরাম ঘাটের ছলোছলো ঢেউয়ের সুরে চাঁদের রুপো রঙে সোনালী সেনের রাঙানো দুটি ঠোঁটে একান্ত কাছে পাওয়ার গভীর স্বাক্ষর রেখে গেল এক আকাশ ছোঁয়া মনের দুরন্ত তৃষ্ণা। চন্দন মুখার্জ্জীর বুকে মুখ লুকিয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি এঁকে গোধূলির রঙীন আলোর মতই নরম মিষ্টি হাসে আগামী দিনের সোনালী মুখার্জ্জী। তবুও উড এ্যাভিনিউর তিনতলার ফ্ল্যাটে সেতারে সুর তোলে এক ভাল লাগা মনের নীল নির্জ্জনতা। ছোট্ট একটা প্রতিশ্রুতি অনেক আঁধারে দীপ জ্বালিয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় অরিন্দম ঘোষের ঘুমিয়ে পড়া চোখের ধরে রাখা খুশীর পাগলামিকে। আর ঘুমঘুম রাতের ছায়ায় পার্ক সার্কাসের সোনালী সেন রজনীগন্ধার গন্ধে, ডোমে ঢাকা টেবিল ল্যাম্পের হাল্কা সবুজ আলোর কথার মালায় ছন্দ গাঁথে ক্যামাক ষ্ট্রীটের এক মিষ্টি ছেলের সোহাগের রঙ মেখে নিয়ে। এতদিনের লুকিয়ে থাকা সুন্দর একটা স্বপ্ন বাস্তবের পটে আলপনা দিয়ে স্বীকৃতির মূল্য পাবে কিছুদিনের মধ্যেই। আত্মসমর্পণের আবেশে পরম পাওয়ার কামনায় ছন্দ দোলে সোনালী সেনের উন্নত বুকে। আজকের এই কুমারী লজ্জাটুকু সানাইয়ের সুরে সার্থক এক উৎসবের মধ্য দিয়ে চন্দন মুখার্জ্জীর নীরব চোখের ভাষায় সানিয়ে দেবে অনেক কিছু না জানাকে। আর সরু সীঁথি আঁকা চুলেভরা মাথাটা রাঙা সিঁদুরের মায়া ছড়িয়ে বিশেষ একটি পুরুষের কল্যাণচিহ্ন বয়ে নিয়ে সুন্দর এক অহঙ্কারের গর্বে ঝলমলিয়ে উঠবে মাত্র কয়েকদিন পরে। ফুল সাজানো শয্যায় সোনালী সেনের অনাহত কৌমার্য্যের বুকে স্বাক্ষর এঁকে দেবে জীবনের প্রথম পুরুষের প্রথম পদক্ষেপ। ভোরের শিশিরে ভেজা এক মুঠো শিউলীর মতো একরাশ হাসি নরম ঠোঁটের কোলে ছড়িয়ে দিয়ে ভাবী বধূ হবার কল্পনাও রঙে রঙে রঙীন হয়ে ওঠে এক অনাঘ্রাত যৌবন।

কিন্তু প্রতিদিন বেলাশেষের কনে দেখা আলোয় উড এ্যাভিনিউর অরিন্দম ঘোষের সেই তীক্ষ্ণ কামনাটা সাগ্রহ প্রতীক্ষা নিয়ে জেগে থাকে তেইশ বছরের এক লজ্জারাঙা মুখের ছায়া ভেবে। তবুও লাল সুরকি বিছানো রাস্তা মাড়িয়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলে সোনালী সেনের পায়ের শব্দ বাজে না তিনতলার সিঁড়ির বুকে। সোনারঙ রোদের মিষ্টি একটা দুষ্টুমী ঝিলিক দেয় না তার ভ্রমরকালো চোখের দুই ইশারায়। থিসিস শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পর্কের সূতোটুকু ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেছে সোনালী সেন। তাই সাঁঝ গোধূলির মিলিয়ে যাওয়া ছায়ায় চাঁপার কলির মত নরম আঙুলের ফাঁকে ধরে থাকা কলমটা সাদা কাগজের পাতায় রেখা টানে না। আর, নতুন তথ্য খোঁজার আনন্দে মোটা সোটা বইগুলোর মাঝে লুটিয়ে পড়ে না সর্পিল দুটো বেণী। শুধু হাতের সিগারেটটা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অস্তাচলের আবির মেখে দিনের শেষে নীড়ে ফিরে আসে পাখীরা। দলছাড়া কাকের ক্লান্ত সুরের ডাকটা ঝিমিয়ে

---

(১) এই গল্পটি লিখতে যে দু'টি বই-এর সাহায্য নিয়েছি :
Humayun-Nama of Gulbadan Begam —Annette S. Beveridge, M. R. A. S.
Tuzuk-i-babari—Leyden & Erskine.

আলোক চিত্র

মধুপায়ী

—অবনী গুহ

মুখ ও মুখোশ —দীপক চাকলাদার

ক্ষুধা —দিলীপ রায়

পুতুল (জাপান)

—পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

অযান্ত্রিক
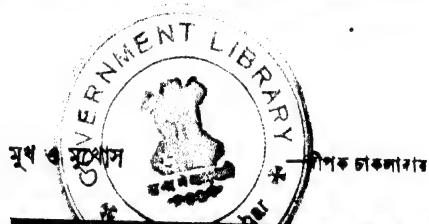
—ধীরেন অধিকারী

কাজের খেলা

—শম্ভু বসাক

হংস-মিথুন

—অজিতকুমার শ্রীমানী

দুধের ছেলে

—কুমার অজিত দাস

হসন্তিকা
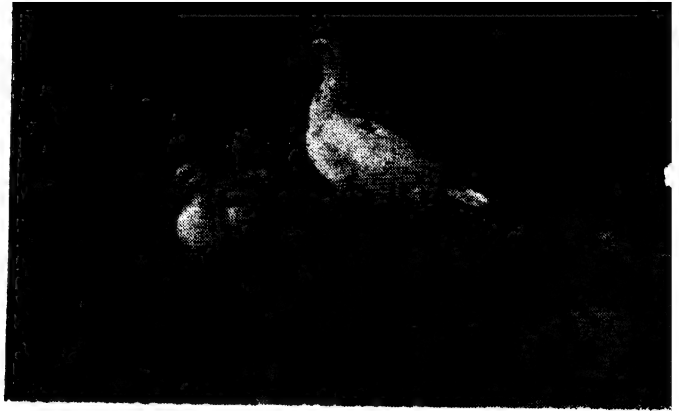
—কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

পড়ে আর আবার আসবার প্রতিশ্রুতির কথা ভেবে নতুন আশায় খেয়ায় পাড়ি দেয় অরিন্দম। এক ধূপছায়া সন্ধ্যায় সাগর নীল শাড়ীর ছন্দে যুঁইয়ের হাসিতে শিথিল কবরী সাজিয়ে নিয়ে এলো সোনালী সেন। ইভনিং প্যারিসের মিঠে গন্ধটা ছড়িয়ে গেলো বাতাসে আর প্রতীক্ষা শেষের আশ্চর্য্য আনন্দে চমকে উঠলো অরিন্দম ঘোষ।

কি খবর এতদিন পর যে?

একটু কাজ ছিল—নতমুখে উত্তর দেয় সোনালী সেন।

কিন্তু অরিন্দম জানে আজ সোনালী সেনের দীঘল কালো চোখ নীরব ভাষায় জানাতে এসেছে আত্মসমর্পণের গোপন ইচ্ছাটুকুকে। আর সেই ক'টি কথা শোনার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে যায় বহু প্রতীক্ষিত রঙীন আশাটা।

আপনাকে—মিষ্টি একটা লজ্জা আরও সুন্দর হয়ে ওঠে ভরা পুকুরের রহস্য নিয়ে জেগে থাকা অতলকালো চোখের গভীরতায়। আর সেই পরম মুহূর্তে সফলতার রঙে ঝিকমিকিয়ে উঠলো অরিন্দম ঘোষের নিরুদ্ধ মনের কোণে সযত্নে লুকিয়ে রাখা ভীরু ভাবনাটা পরিপূর্ণ দৃষ্টির মাঝে আশ্চর্য্য এক ভাল-লাগার আনন্দ ছড়িয়ে দিলো সে। কিন্তু সোনালী সেনের মুগ্ধ দুটি চোখের তারা হঠাৎ যেন চমকে উঠে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলে অসমাপ্ত কথাটা।

আপনাকে আগামী কাল আমার বিয়েতে আসতেই হবে কিন্তু। কথার শেষে আবার সরমে রাঙা হয়ে ওঠে সলজ্জ ঠোঁটের সুন্দর ভঙ্গিমাটুকু। সঙ্গে সঙ্গে থমকে যায় অরিন্দম ঘোষের সেই সোনার রঙে ভেজা বহু আকাঙ্ক্ষিত আশাটা। তবুও একরাশ বেদনা চাপা ঠোঁটের মাঝে লুকিয়ে নিয়ে স্মিত হাসি হাসে অরিন্দম।

নিশ্চয়ই যাবো—আজ আর হারিয়ে যাবার বেদনায় কেঁপে উঠলো না গম্ভীর গলাটা। কেবল এক শান্ত সুন্দর হাসি ঝরে পড়লো আর কিছু হারিয়ে না ফেলার আনন্দে। ব্যথিত এক হৃদয় দেহাতীত প্রেমের সুন্দর অর্ঘ্য সাজিয়ে দিলো জীবন দেবতার বেদীতে অন্তরের রঙে রঙ মিশিয়ে সেই অস্ত গোধূলির ফুরিয়ে-আসা ছায়ায়। তারই রেশ তুলে আস্তে আস্তে কোলের কাছে সেতারটা টেনে নিলো অরিন্দম। আর অতন্দ্র রাত্রির আঁধার ঘন নির্জনতায় মিলে মিশে একাকার হয়ে গেলো ছায়ানট সোহিনীর বিজু মুখামাজ সুরবাহার।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

পুষ্প দেবী

তোমার নরেন বিবেকানন্দ রূপেতে জগতে খ্যাত
কত রূপে তোমা করেছে যাচাই সত্যনিষ্ঠ ব্রত
কর্ম ও জ্ঞান ভক্তির সাথে
মিশে এক ধারা হয়ে যায় যাতে
প্রদীপ্ত সেই সূর্য্য সমান উজলিল দশ দিক
শিশুর মতন তারও মন-প্রাণ তোমায় নির্নিমিখ।

দূর-দূরান্তে তোমার প্রচার করিল বিশ্বময়
বুঝালো তোমার যত কিছু বাণী শাস্ত্র ছাড়া সে নয়
সরল রূপেতে জ্ঞানের আধার
মূর্ত্ত আপনি যুগ অবতার
শিশু তোমার পুত্র অধিক কুসুম কোমল মন
বজ্রের চেয়ে কঠোর তেমন অন্যায়ে সেইজন।

চলে গেছ তুমি ছাড়ি জগতেরে তবু আজ ঘরে ঘরে
দয়াল ঠাকুর তোমার মূরতি দিবসে নিশিথে স্মরে
তোমার কাছেতে লভি মহাজ্ঞান
দলে দলে সব তব সন্তান
জীবে সেবা তরে বাহু প্রসারিয়া দুঃখ লইল বরি
হে করুণাঘন মমতা কোমল তোমার আদেশ স্মরি।

তোমারি আদেশে শত সেবাধামে চলিতেছে জীবে সেবা
অভিনব তব পূজা সম্ভার মুগ্ধ না বলো কেবা
ভাঙিবার তরে আসেনি ত কেহ
বিশাল বিশ্ব আপনারই গেহ
গড়ে যাও শুধু যাহার যেটুকু সকল শকতি দিয়ে
দুখীর দুঃখ মুছাবার তরে মায়ের মমতা নিয়ে।

পতিত পাবন পতিত জনেও সাদরে বক্ষে নিলে
নামের মহিমা দেখায়ে তাদের পূর্ণ শান্তি দিলে
মানব জীবন প্রলোভনময়
অনুতাপ হলে বৃথা আর নয়
শোধন করিয়া যাহা কিছু কালো করে দিলে নিরমল
মায়ের মমতা কোমল ও-মন করুণায় ছলছল।

আজো পুনঃ দেখি যেদিকেতে চাই কত দ্বিধা-সংশয়
কত অন্যায় কত অনাচার অকারণ জীব ক্ষয়
কেহ নাই আজ তোমার মতন
দুর্গতদের করিতে যতন
গভ সংশয় সহজ পথের সংকেত কেবা দেয়?
দুঃখী জনেরে বক্ষের মাঝে দেবতা ছাড়া কে নেয়?

বন কেটে বসত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মনোজ বসু

একত্রিশ

প্রহর খানেক বেলায় তারা কুমিরমারি পৌছল। হাট বসে দুপুরের পর থেকে। বড্ড সকাল সকাল রওনা হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি ধরতে হল দায়ে পড়ে। বন কেটে সাধ করে বসত গড়েছিল, ঘেরি বানিয়েছিল। খাটবে, খাবে, পরবে, আমোদস্ফূর্তি করবে, এত দূরের বাদাবনে দিনগুলো শান্তিতে কাটবে। হল না, ভণ্ডুল ঘটাল জনপদের মানুষ এসে। সেকালে কত গরিব মানুষ নিঃসম্বল এসে গুছিয়ে নিয়েছে কাঙালি চক্কোত্তির মতো। এবারে রাস্তা হয়ে গেল—মোটরগাড়ি চড়ে বাবুভেয়েরা এসে খোলামকুচির মতো টাকা ছড়াবে। বাদার যত মানুষ কুকুরের মতো পা চাটবে তাদের। জগা হেন লোকের ঠাঁই নেই এ-মুলুকে। লোকজনের চোখের সামনে পালাতে লজ্জা লাগে, রাত পোহাবার আগেই তাই পালিয়ে এল। দেরি করা চলল না।

হাটে কেনাকাটা আছে বিস্তর। জঙ্গলে যাচ্ছে, রসদ চাই কিছু দিনের মতন। তা ছাড়া নৌকো থেকে ভুঁয়ে পা দিয়েই পুজো-আচ্চা—তার রকমারি উপকরণ। পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্ষ্যাপা মহেশ তড়-বড় করে ফর্দ বলছিল। কতবার কত মানুষ নিয়ে এসেছে তীর্থের পাণ্ডার মতো—রীত কর্ম সমস্ত নখদর্পণে তার। জগা বলে, বলেই যাচ্ছ তো ঠাকুর, খরচা জোগাবে কে? নৌকোও তো ডুবে যাবে তোমার ঐ গন্ধমাদনের ভারে। সংক্ষেপ কর, যার নিচে আর হয় না।

অত কে মনে রাখতে পারে? যদ্দূর মনে পড়ে কিনে টিনে চারজনের গামছায় বাঁধে। ফিরে আসুক মহেশ, তার পরে দেখা যাবে। মহেশ কুমিরমারি অবধি আসেনি। খানিকটা পথ এসে শশী গোয়ালার খোঁজে রাস্তা ছেড়ে আলপথে নেমে পড়ল। সর্বস্ব খুইয়ে এসে শশী এক দূরসম্পর্কের কুটুম্বর ভাতে পড়ে আছে। যথাসাধ্য খাটাখাটনি করে, দুটো দুটো খেতে দেয় তারা। নিঃসীম ধানক্ষেতের মধ্যে মাদার উপর বসতি। জায়গাটার নাম শোনা আছে, মহেশ ঠাকুর সেই তল্লাসে চলল। একটুখানি গিয়ে আলেরও আর নিশানা নেই, মহেশ তখন জলে নেমে পড়ে। জল বাড়ছে, কাপড় হাঁটুর উপর তুলছে। তারপরে এক সময় হয়তো দিগম্বর হয়ে পরনের কাপড় পাগড়ির মতন মাথায় জড়াতে হবে। বাদা অঞ্চলে এই নিয়ম যের মানুষের চলাচল—রাস্তা বাঁধা হালফিল এই শুরু হয়েছে।

জগারা এদিকে ভাড়ার নৌকো খুঁজে বেড়াচ্ছে। জগার মতো দক্ষ মাঝির হাতে নৌকা দিয়ে শঙ্কা কিছু নেই। খুব বেশি তো বিশ-পঁচিশ দিন—ভাড়া একেবারে পুরো মাসের ধরে দিয়ে নৌকো ঠিক সময়ে ঘাটে হাজির করে দেবে। এবারে কেবল দেখেশুনে আসা। জায়গা পছন্দ হলে তখন নিজস্ব নৌকোর ব্যবস্থা হবে।

ঘাটমাঝিদের ধরতে হয় নৌকো-ভাড়ার ব্যাপারে। তারা খোঁজখবর রাখে। ভাড়া থেকে দস্তুরি কেটে নেয় আর দশটা দালালি কাজের মতো। নৌকো নিয়ে কাজকারবার, সব ঘাটোয়ালই জগাকে চেনে ভাল মতে। জগা যে ভাল মানুষ হয়ে ঘাটে ঘাটে ভাড়ার নৌকোর তল্লাসে ঘুরছে, ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেকে না। নৌকো দিতে কেউ রাজি নয়। স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলছে না, এটা-ওটা অজুহাত দেখায়: জানাশোনার মধ্যে সব ক'টা নৌকোই যে বেরিয়ে গেল, ক'দিন আগে বললে হত। অথবা বলে, নৌকো ফুটো হয়ে পড়ে আছে, মেরামত না করে ছাড়বার উপায় নেই।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষটা জগা হাল ছেড়ে দেয়। কেউ বিশ্বাস করে না তাদের। ভবঘুরে মানুষ—ক'বছর কোন রকমে ঠাণ্ডা হয়ে ছিল, মাথার মধ্যে ঘুনিপোকায় আবার কামড় দিচ্ছে। ত্রিভুবন চক্কোর দিয়ে বেড়াবে, কোন বিশ্বাসে ওদের হাতে নৌকো ছেড়ে দেয়।

একজনে তাদের মধ্যে বলল, আছে বটে নৌকো একটা। কিন্তু মালিকের বড় সন্দেহবাতিক, কাউকে বিশ্বাস করে না। ঘেরিদার গগন দাস জামিন হয়তো বল, চেষ্টা করে দেখি।

নিজের কথাটা অনুপস্থিত অজ্ঞাত মালিকের দোষ দিয়ে বলল। সকল ঘাটোয়ালের এই এক কথা। জগাকে কেউ বিশ্বাস করে না। এক ছটাক ভূসম্পত্তি নেই, জগার কোন মূল্য দুনিয়ার উপর? গগন দাসের মূল্য হয়েছে এখন।

জঙ্গলে যাবার নামে মহেশ ঠাকুরের অসাধ্য কাজ নেই। খুঁজে বের করেছে ঠিক শশীকে। আগের হাটে খবর দেওয়া ছিল হাটুরে লোকের মারফতে। শশী একপায়ে খাড়া, কেলেডাঙার চরে তার মন পড়ে রয়েছে। দুপুরের পর হন্তদন্ত হয়ে দু-জনে কুমিরমারি পৌছল। হাট তখন জমজমাট। খুঁজে খুঁজে জগাদের পায় না। অবশেষে হাটের বাইরে নতুন চরের পাশে দেখা গেল গাছের ছায়ায় চারজনে

গোল হয়ে বসে। কোঁচড় থেকে মুঠো মুঠো মুড়ি নিয়ে মুখগহ্বরে ফেলছে। একদিকে মাটির মালসায় মুড়ি জমা রয়েছে, কোঁচড়ের মুড়ি ফুরোলে নিয়ে নিচ্ছে মালসা থেকে।

মুখ তুলে এক নজর তাকিয়ে দেখে জগা বলে, বড্ড কাদা-জল ভেঙে এসেছ। মুড়ি ঠেকা দাও এবারে জুত করে বসে।

মহেশ বলে, কেনাকাটা সারা করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক জগা। খাওয়া-টাওয়া নৌকোয় বসে হবে। উজোন বেয়ে—হল বা খানিক গুণ টেনে গিয়ে বিবখালির মুখে নৌকো ধরতে হবে। রান্নাবান্না সেই জায়গায়।

নৌকোই তো হল না। গুণ টানবে কিসের?

বলাই বলে ওঠে, তাই দেখ ঠাকুরমশায়। আমরা ভাল হতে চাইলে কি হবে? দেবে না ভাল হতে। আগাম টাকাকড়ি দিয়ে নিয়মমাফিক ভাড়া নিতে গেলাম, কেউ দিল না। ঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরেছি, ঘাটোয়ালের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্য্যন্ত তেল দিয়েছি।

মহেশ ব্যস্ত হয়ে বলে, সে কি গো! শশীকে আমি এক পথ টানতে টানতে নিয়ে এলাম। জগা নিয়ে যাচ্ছে শুনে কত আশা করে সে ছুটে এসেছে।

জগন্নাথ বলে, আশ্চয্যি করে ঐ রাধেশ্যাম এসেছে। সবাই আমরা এসেছি। বেরিয়ে এসেছি যখন উপায় কিছু হবেই। নৌকা দিল না, কিন্তু আমরা ঠিক নিয়ে নেব।

হি-হি করে সে হাসতে লাগল। বলে, বাবুভেয়েদের কায়দা ধরি এবারে। নেমন্তন্নবাড়ি যায় বাবুরা। একজনের তার ভিতরে খালি পা। কিম্বা শতেক তালি-মারা জুতো পায়ে। ভাল একজোড়া জুতোয় পা ঢুকিয়ে ফাঁক মতন সে বেরিয়ে পড়ে। বলাই পচা আর আমি সেই রকম ফাঁক খুঁজে বেড়াব এখন।

শশী বলে ওঠে, নৌকো চুরি করবে তোমরা? হাটেঘাটে ওরকম গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না। মার খেয়ে কুলোতে পারবে না। যাকে বলে হাটুরে মার। বুড়োমানুষ আমরা সুদ্ধ মারা পড়ব।

ডাকাত শশীর বিগত যৌবনের কোন ঘটনা হয়তো মনে পড়ে শিউরে উঠে সে না-না করে উঠল।

জগা হেসে বলে, সিঁদকাঠি এসে গেছে ঘোষ মশায়। কাজের তো পনের আনা হাসিল। কেউ কিছু করতে পারবে না! আমাদের হাতের কাজ দেখনি তাই। সাফাই কাজকর্ম।

নৌকো না হোক, তিনটে বোঠে জোগাড় করে এনেছে। সিঁদকাঠি দিয়ে দেয়ালে গর্ত কেটে চোরে জিনিষপত্র সরায়, নৌকো সরানোর কাজে বোঠে হল সেই সিঁদকাঠি। নৌকো খুলে দিয়ে তিন মরদে বোঠে ধরে পলকের মধ্যে বেমালুম হবে। নৌকোয় সেজন্য কেউ বোঠে রেখে যায় না। কাঁধে করে নিয়ে হাটের মধ্যে ঢোকে, কোনখানে রেখে দিয়ে কেনাকাটা করে। নৌকো হল না দেখে এরা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বোঠে সরানোর তালে ছিল। বোঠে ভেঙে গেছে বলে একটা বোঠে চেয়ে এনেছে চেনাশোনা এক জেলের কাছ থেকে। অন্য দুটো চুরি। হারানো বোঠের খোঁজ পড়বে হাট ভেঙে গিয়ে যখন বাড়ি ফিরবার সময় হবে। ততক্ষণ নিরাপদ।

জগা বলে, হাট বলে ভয় পাচ্ছ ঘোষ মশায়, কিন্তু হাট নইলে এত নৌকো পাচ্ছ তুমি কোথায়? ইচ্ছে মতন পছন্দ করে নেব এর ভিতরে। কিন্তু মুরুব্বি মানুষ তোমরা এর মধ্যে থেকো না। হাঁটনা শুরু করে দাও। পুব মুখো ফুঁড়ে বেরিয়ে একটা দোয়ানি পড়বে, সেইখানে কাঁচা-বাদার ধারে দাঁড়াও গিয়ে। রাধেশ্যাম জানে সে জায়গা। তুই থেকে কি করবি রাধে, ওঁদের সঙ্গে চলে যা। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

রাধেশ্যাম হাসতে হাসতে বলে, কুয়োপাখি ডাকবে—পাখি ধরে বেড়াব তো বনে?

জগা ঘাড় নাড়ে: হ্যাঁ। জানিস তুই সব। বেরিয়ে পড় এক্ষুণি, দাঁড়াস নে। আমদের আগে গিয়ে পড়বি।

বড্ড জোরে হাঁটে রাধেশ্যাম। মহেশ ও শশী গোয়ালা পেরে ওঠে না: আহা, দৌড়স কিসের তরে? আমাদের কি, কে আমাদের ছেড়ে ধরছে?

কিন্তু টানের মুখে নৌকো ছাড়বে জগারা, প্রাণপণে বাইবে আর এদের হল পায়ে হাঁটা। জোরে না হাঁটলে পেরে উঠবে কেন? ঐ ছুটোছুটির মধ্যেও কুয়োপাখির বৃত্তান্ত বলে এক সময়। কাঁচাবাদা হল গভীর বন—সেখানে 'কাকেভক্রে কাঠুরের কুড়াল পড়ে। বনের অন্ধিসন্ধি জুড়ে খাল। কে যেন খালের মস্তবড় খেপলাজাল ফেলেছে বনের উপরে—জালের ফুটোয় ফুটোয় বনের গাছ বেরিয়ে পড়েছে। ঠিক এই গতিক। জোয়ারবেলা এক বিঘত পরিমাণ ডাঙা জেগে থাকে না, গাছগুলো মনে হবে সমুদ্দুর ফুঁড়ে উঠেছে। নৌকো একবার তার মধ্যে ঢোকাতে পারলে কারো সাধ্য নেই খুঁজে

বের করে। জগার কিন্তু নখদর্পণে সমস্ত—ঐ জায়গার কথা বলে দিল সে। বলে তো দিল—কিন্তু এরা খুঁজে পাবে কোথায়? সাড়া দিয়ে তাই জানান দেবে—পাখির ডাক। লোকে ভাবে, কুয়োপাখি ডাকছে রাত্রিবেলা বনের ভিতর। ডাকছে কিন্তু বলাই। পাখির ডাক ছাগলের ডাক বেড়ালের ডাক মুরগির ডাক—অনেক রকম ডাক ডাকতে পারে। সেই ডাক নিরিখ করে জল ভেঙে গুলোর গুঁতো খেয়ে ওদের সেই নৌকোয় উঠে পড়।

সন্ধানী চোখ, পাকা হাত, ঘাঁতঘোঁত অজানা কিছু নেই। এর চেয়ে কত ভারি ভারি কাজকর্ম হয়েছে আগে। এত নৌকো জমেছে, নৌকোয় নৌকোয় জল দেখবার জো নেই, তবু কিন্তু সহজে উপায় হয় না। গাঙের একেবারে কিনারা অবধি হাট, হাটুরে মানুষ ঘোরাফেরা করছে, ঠিক হাটের নিচে কিছু করতে গেলে ব্যাসাদ হবে মনে হয়। একেবারে শেষ দিকে চার দাঁড়ের ছিপ নৌকো একটা। জুত মতন বানগাছ পেয়ে ঘাট থেকে কিছু সরিয়ে এনে ঐখানে নৌকো বেঁধেছে। লোহার শিকল গাছে জড়িয়ে ভারী তালা এঁটে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে।

প্রণিধান করে দেখে জগা বলে, দেখ তো পচা কুড়াল কোথা পাস। কামারের দোকানে মেরামতের জন্য দেয়—ওদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আয় একটা।

পচা বলে, কুড়াল কি হবে?

বলবি যে রসুই-কাজের জন্য কাঠের ক'খানা চেলা তুলে নিয়ে এক্ষুণি দিয়ে যাচ্ছি।

বলাই বলে, বানগাছ কেটে ফেলবি। কিন্তু শব্দ হবে, কেউ না কেউ দেখে ফেলবে?

জগা বলে, শব্দসাড়া করে কাটব। গরজ হয়েছে সদরে তাই গাছ কেটে নিচ্ছে—দেখেও কেউ দেখবে না।

কুড়াল এল। কপাল ভাল, গাছ কাটা অবধি দরকার হল না। কুড়ালের উল্টো পিঠের কয়েকটা ঘা দিতেই লোহার শিকলের জোড় খুলে গেল। নোনায় জরে গিয়ে লোহায় আর পদার্থ আছে কিছু?

কপাল আরও ভাল। এই টানের গাঙ, তার উপরে পিঠেন বাতাস। মাঝগাঙে নিয়ে ফেলতে নৌকো যেন উড়িয়ে নিয়ে চলল। বোঠে হাতে ধরে আছে বলাই-পচা, কিন্তু বাইতে হয় না। টানের জলে ছোঁয়ানোই যায় না বোঠে। নৌকোই যেন কেমন করে বুঝতে পেরে গাঙ বেয়ে চোঁচা দৌড় দিয়েছে।

এই রকম ছুটে পালানো দেখেই বোধকরি হাটের মানুষের নজরে পড়েছে। কিম্বা নৌকোর মালিকও দেখে ফেলে চেঁচামেচি করে উঠতে পারে। গাঙের কিনার ধরে বিস্তর জমায়েত হয়েছে। একটা হৈ-হৈ রব আসছে বাতাসে। এরা অনেক দূরে। স্পষ্টাস্পষ্টি নজর হয় না—মনে হল, আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। দেখিয়ে কি করবে বাবুমশিরা? নৌকো খুলে পিছন ধরবে, ততক্ষণে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এরা। বাতাসে মিশে গেছে। বড়-গাঙে আর নয়, খালে ঢুকে পড় এইবার। খালের গোলকধাঁধা। তখন আর খুঁজে পাবে কে? নৌকা মানুষজন এবং হয়তো বা লাঠি-বন্দুক নিয়ে সমারোহে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে—তাদেরই একেবারে পনের-বিশ হাতের মধ্যে হেঁতালঝাড়ের ফাঁকে নৌকো ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ-চাপ বসে আছে। এই অবস্থায় মানুষ বলে কি—স্বয়ং যমরাজও তো খুঁজে বের করতে পারবে না।

বত্রিশ

জঙ্গলে যাবে তারা ঠিকই। কয়েকটা দিন কেবল দেরি পড়ে যাচ্ছে। চোরাই নৌকোর প্রকাণ্ড ছই—ছইটা ভেঙে চুরমার করে গাঙের জলে ডুবিয়ে গোলপাতা দিয়ে নতুন একটু ছই করে নিতে হবে। আলকাতরা আর কেরোসিন মিশিয়ে পোঁচ টেনে দিতে হবে নৌকোর আগাগোড়া। আরও এক ব্যাপার—গুঁড়োর কাঠের উপর নাম খুদে রেখেছে 'তারণ'। তারণ নামে ব্যক্তি নৌকোর উপর নাম খোদাই করে স্বত্ব-স্বামিত্ব পাকা করে রেখেছে। নামটা চেঁচে তুলে দিতে হবে। না হলে পুরো কাঠখানাই ফেলে দিয়ে নতুন একটা বসিয়ে নেবে। নৌকোর ভোল এমন পালটে দেবে, খোদ মালিক সেই তারণ এসে স্বচক্ষে দেখলেও তখন চিনতে পারবে না। এই সব না হওয়া পর্যন্ত জনসমাজে বের হবে না নৌকো। ছইটা তো ভেঙে দেওয়া যাক সকলের আগে। বাকি কাজগুলো কোথায় নিয়ে করা যায়, তাই ভাবছে। সুদন ছাড়া অন্য কারো উপর আস্থা করা যায় না। তৈলক্ষর ছেলে সুদন। জগাকে বড্ড খাতির করে, জগার ইদানীং সে ডানহাত হয়ে উঠেছিল। সম্পন্ন চাষী-ঘরের ছেলে—দাঁও পেয়ে একটা নৌকো কিনে নিয়ে এসেছে, সেই পুরণো নৌকো ছুতার ডেকে মেরামত করাচ্ছে, ছই বাঁধছে। এতে কোন সন্দেহের কারণ ঘটবে না। জগা তারপরে সরে পড়বে একদিন সেই নৌকো নিয়ে। জঙ্গলে ঢুকে গেলে তখন কে কার তোয়াক্কা রাখে? গণ্ডগোল যতক্ষণ এই মানুষের এলাকায় ঘোরাঘুরি করছে। জঙ্গলের অত দূরে মানবেলার সব আইনকানুন গিয়ে পৌঁছতে পারে নি।

কিছু দেরি অতএব হবেই। খুব বেশি তো পাঁচ-সাত দিন। এই এক বাগড়া পড়ে গেল, পথের উপর আটক হয়ে থাকা। সকলে মুসড়ে গেছে। রাধেশ্যামের কিন্তু একগাল হাসি। বলে, আমি ঘরে চললাম। বাচ্চাটাকে একবার দেখে আসি। সাঁজরাতে সেদিন বড় কেঁদেছিল। নেড়ে চেড়ে আসি এই ক'দিন।

পচা টিপ্পনী কাটে: বাচ্চার মাও কিন্তু রয়েছে। জাল ফেলে পালিয়ে এসেছ, তুলোধোনা করবে এবার বাগে পেলে।

বললি ঠিক কথা বটে। মাগির জন্যেই আমার বিবাগী হয়ে যাওয়া। নইলে এক পা নড়ে বসতে চাই! মাগিটাকে জো-সো করে নিয়ে ফেলতে পারিস জঙ্গলে? তাহলে শান্তি পাই। বাচ্চাকে কোলে-পিঠে করে দিব্যি কাটাতে পারি।

ক্ষ্যাপা মহেশ বলে, শশীকে নিয়ে কি করা যায় এখন? আমার নিজের কথা বলছি নে। কালী কালীমায়া গাজি কালু উঠানে দাঁড়িয়ে যার নামে দোহাই পাড়ব, গৃহস্থ সঙ্গে সঙ্গে পিঁড়ি না দিয়ে পারবে না। কিন্তু শশী ঘোষ যায় কোথায় বল দিকি? পড়ে থাকত এক ব্যক্তি, তাদেরও আউড়ির ধান তলায় এসে ঠেকেছে। মানুষটার একদিন বিস্তর ছিল, চক্ষুলজ্জায় তারা কিছু বলতে পারছিল না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এসেছে, আবার এখন কোন মুখে ফিরে যায় সেখানে?

বলাই বলে, চলুন তবে আমাদের সাঁইতলায়। উপোস করে থাকতে হবে না। তুমিও চল ঠাকুরমশায়।

জগা বলে, তুই যাচ্ছিস তবে বলাই?

বলাই বলে, নৌকো তো বয়ারখোলা নিয়ে চললে। পরের জায়গায় সবসুদ্ধ পড়ে থেকে কি হবে? এঁরা সব যাচ্ছেন, রেঁধেবেড়ে খাওয়াবার মানুষ চাই তো একজন।

মহেশ তাড়াতাড়ি বলে, আমার খাওয়াবার লোক আছে। আমার জন্তে ভাবি নে। চারুবালার মতো মেয়ে হয় না। তোমরা ছিলে না, কী যত্ন করে যে খাইয়েছিল সেই ক'টা দিন। শশীকেও রেঁধেবেড়ে দিতে হবে না। বন-ঘোরা মানুষ—চাল পেলে নিজেই সে দুটো দুটো ফুটিয়ে নিতে পারবে।

জগা বলে, শুধু চাল কোটাতেই কি যাচ্ছে বলাইধন? আরও কত কত কাজ! চারুবালার হুকুম তামিল করা—রান্নার কাঠ কেটে দেওয়া, খাবার জল বয়ে আনা। পায়ের কাদা গাড়ুর জলে ধুয়ে দিয়েছে কিনা, সেটা অবশ্য আমার চোখে দেখা নেই।

বলাই বলে, ফুলতলায় সেই গয়নার নৌকোয় তোমায় আর চারুতে কী লয়ে যে দেখা সেই রাগ আজও মিটল না। সাঁইতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছি—চারুবালার তাতে কোন দোষ নেই। শয়তান ঐ খোঁড়া-নগনা।

মহেশ ঠাকুরও লুফে নিয়ে বলে, না জগন্নাথ। রাগ রেখো না। বড্ড ভাল মেয়ে। আমি বলছি, শুনে নাও। স্বয়ং রক্ষাচণ্ডী ঐ মেয়েটা ভাঙে না, সমস্ত বজায় করে রাখে। মানবেলা থেকে বাদায় এসেছে সকল দিক রক্ষে হবে বলে।

ফুলতলা থেকে চক্কোত্তি মশায় নতুন-আলায় ফিরে এলেন। সেই টৌর্নি চক্কোত্তি।

একা যে শালা আবার কোথায় আড্ডা গাড়ল?

চক্কোত্তি বললেন, কাজকর্ম না চুকিয়ে আসে কেমন করে? আরও ক'টা দিন থাকতে হবে নগেনবাবুর। দলিল রেজেষ্ট্রী হয়ে কাজ ষোলআনা পাকা হয়ে গেলে তবে আসবে। সেই রকম বলে এসেছি। আমি আর দেরি করতে পারলাম না। পরের উপকারে গিয়ে আমার ওদিকে সর্বনাশ হয়—বরাপোতার ধান ক'টা হরির লুঠ হয়ে গেল বোধহয় এদ্দিনে। বরাপোতা চলেছি—তা ভাবলাম দাস মশায় উতলা হয়ে আছে, এই পথে অমনি খবরটা দিয়ে যাই! আমায় যখন সহায় ধরেছ, কাজের ব্যবস্থায় কোন দিক দিয়ে খুঁত পাবে না।

গগন এত সমস্ত শুনছে না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, দলিল কিসের, বুঝলাম না তো।

চক্কোত্তি ভর্ৎসনা করে ওঠেন: কী কাণ্ড করে বসে আছ ভাব দিকি দাস মশায়। এত বড় জলকরের সম্পত্তি—আইন দস্তুর লেখাপড়া চুলোয় যাক, কস-কাগজের উপর দুটো চারটে ক-খ-ঠ অক্ষরও তো কেঁদে রাখনি! ম্যানেজারের কাছে শুনে কথাটা তো গোড়ায় বিশ্বাসই করতে পারিনে।

গগন বলে, প্রথম যখন এলাম তখন তো করালীর উপর ছিটেখানেক চটের জমি। যা নেবার চৌধুরিবাবুরা সমস্ত ঘের দিয়ে নিয়েছে। এটুকু বাতিল হয়ে বাইরে ছাড়া ছিল জোয়ারের সময় এক-কোমর জল, ভাঁটার সময় হাঁটুভর কাদা। সাঁইবাবাকে পর্যন্ত বাঘে ধরে নিয়ে যায়, এমন গরম জায়গা। তখন কি কানাকড়ি দাম ছিল যে লেখাপড়ার কথা ভাবতে যাব?

চক্কোত্তি চুকচুক করে: ভাবতে হয় গো দাস মশায়। দলিল-দস্তাবেজ করে আটঘাট বেঁধে তবে কাজে নামতে হয়। বিষয় নয়তো দু-দিন পরে বিষ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়কর্ম শক্ত ব্যাপার, সকলে বোঝে না। কিন্তু পুণ্ডরীক বাবু উকিল মশায় সদরে দপ্তর সাজিয়ে বসে আছেন কোন কর্মে? আমরা আছি কেন? শিক্ষিত মানুষ হয়েও এমন অবুঝের কাজ করলে দাস মশায়, ভাল লোকের পরামর্শ নেবার কথা একটি বার মাথায় এল না।

শিক্ষিত বলে উল্লেখ করায় গগনের গর্ব চাড়া দিয়ে ওঠে। বলে, সকলের আগেই তো ফুলতলায় গিয়েছিলাম, ম্যানেজার সেটা চেপে গিয়েছে চক্কোত্তি মশায়। পাঁচ টাকা নজর দিয়ে দেখা করলাম ছোটবাবুর সঙ্গে। আর ম্যানেজার নিল তিন টাকা। তিন টাকা গাঁটে গুঁজে বলে দিল, কিছু করতে হবে না, কোন ভয় নেই। গাঙ থেকে চর উঠেছে—চরের মালিক সরকার না চৌধুরি তারই কোন ঠিকঠিকানা নেই। বন কেটে তাড়াতাড়ি বাঁধ না হোক একটা পাতড়ি দিয়ে নাওগে। দখলই হল স্বত্বের বারোআনা—দখল কর গিয়ে আগে। এত সমস্ত বলে দিল, আজকে আর কিছু মনে পড়ছে না।

ঘাড় নেড়ে চক্কোত্তি বললেন, বলেছিল ঠিকই বটে। বারোআনা কেন সাড়ে-পনের আনা। এবারে আবার তাই মতলব পাকাল, রাতারাতি মাঝের বাঁধ উড়িয়ে দেবে, তোমার আলাঘরেরও চিহ্ন

রাখবে না। চৌধুরিগঞ্জের সীমানা বলে গাঙ অবধি দখল করে নেবে। আদালতে মামলা উঠলে অমন বিশ জনে হলপ পড়ে বলে আসবে। রেগে টং হয়ে আছে ম্যানেজার, ভরদ্বাজ তায় উস্কানি দিচ্ছে। আবার এদিকে সাঁইতলার মাছ-মারারা বিগড়ে আছে—এখন তোমার লোকবলও নেই। সমস্ত খবর চলে যায় ফুলতলা অবধি। এমন সুবিধা ছাড়বে কেন? সমস্ত ঠিকঠাক, দু-দশ দিনের ভিতর এস্পার-ওস্পার হয়ে যেত। এমনি সময় আমরা গিয়ে পড়লাম।

গগন আগুন হয়ে বলে, পাড়ার ওরা বিগড়াল তো ঐ নগনা-শালার জন্যেই। বাদাবনের মধ্যে কোমর বেঁধে খেটে সকলে মিলে একটা বাঁচবার পথ করছি, তা ভাঙনচণ্ডী এসে পড়ে তছনছ করে দিল সমস্ত।

চক্কোত্তি বলে, আঃ, নিন্দে কর কেন দাস মশায়? খুব পাকা বুদ্ধি নগেন বাবুর।

গগন আরও উত্তেজিত হয়ে বলে, মুখের নিন্দে শুধু নয়। পারলে ওকে নাকানি-চুবানি খাওয়াতাম। আমার ডান-হাত বাঁ-হাত হল জগা বলাই ওরা সমস্ত। হাত-পা কেটে ঠুঁটো করে দিল ঐ শালা। চৌধুরিরা সেইজন্যে সাহস পেয়ে যায়। তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়ে এসেছি, এদ্দিন তো কিছু করতে পারেনি।

চক্কোত্তি শান্ত করছেন গগন দাসকে: আর কিছু করবে না। মিটমাট হয়ে গেল। চৌধুরির মালিকানা আপোষে স্বীকার করে নেওয়া হল। নতুন ঘেরি নগেন বাবুর নামে, উচিত খাজনায় অনুকূল বাবু বন্দোবস্ত করে দিলেন।

গগন বলে, নগেনশশীর নামে কেন? সে আসে কেমন করে ঘেরির ব্যাপারে? সে কবে কি করল?

আহা, শালা-ভগ্নিপতি কি আর আলাদা? তোমার বদলে নগেন বাবুই না হয় হল। আসল যে কাজ—দুই পক্ষ এক হয়ে হটকো বদমাইসগুলোকে এবারে শায়েস্তা করে ফেল দিকি। ভেড়ির উপরে যাতে অত্যাচার না হয়, রাত-বিরেতে কেউ জাল না ফেলতে পারে। যে মাছটা জন্মাবে, তার ষোলআনা বেচাকেনা হয়ে যাতে ঘরে উঠে আসে।

গগন বলে, তা হলে ওরা খাবে কি?

মাছ-মারাদের কথা তো? খাবে না। না খেতে পেয়ে উঠে যাবে তল্লাট ছেড়ে। আপদের শান্তি হবে। তাই তো স্বার্থ তোমাদের।

গগন বলে, ভেড়ি বাঁধার সময় দরকারে লেগেছিল কিন্তু ওদের। আমাদের ছোট ব্যাপার, আমাদের কথা ছেড়ে দিন। চৌধুরি বাবুদেরও লেগেছিল। বছর বছর বাঁধে মাটি দেবার সময় এখনো ওদের ডাকতে হয়।

চক্কোত্তি ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, সে আর কতটুকু ব্যাপার? সমস্ত কথা হয়ে গেল বাবুদের সঙ্গে। ছোটবাবু বললেন, রাস্তা শেষ হয়ে গেল। শুকনোর সময় মাটি-কাটা কুলি আসবে লরী বোঝাই হয়ে। কাজকর্ম চুকিয়ে চলে যাবে। তাদের কাজকর্ম ভাল, মজুরিও অবরেসবরে মেরামতি, কাজের জন্য একজন দু-জন বেলদার রেখে দিলে হয়ে যাবে।

হেসে ফেললেন চক্কোত্তি। হেসে বললেন, তোমার কথাও একবার যে না উঠেছিল তা নয়। দাস মশায় পুরানো ঘেরিদার, দলিলটা সেই নামে কি ক্ষতি? তা ছোটবাবুর ঘোর আপত্তি। এক সঙ্গে ওরা সব বন কেটেছে, গগন দাস ওদের কি ঝেড়ে ফেলতে পারবে? আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওদের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দেবে? চক্ষুলজ্জার কারণ হবে তার পক্ষে। আর আমাদের হবে বেরাল কাঁধে নিয়ে শিকার করার মতন। প্রমথ ম্যানেজার তো মারমুখি একেবারে। সেদিনে সেই যে নাজেহাল হল, তার মধ্যে তোমারও নাকি যোগাযোগ ছিল। শেষটা নগেনবাবুর নাম উঠে তখনই সব রাজি হয়ে গেল, তা ঘাবড়াচ্ছ কেন দাশ মশায়? বিষয়সম্পত্তি লোকে বেনামিও তো করে। ধরে নাও তাই করেছ তুমি সম্বন্ধির নামে।

গগনও হয়তো সেই রকমটা বুঝে চুপচাপ হত। কিন্তু চারুবালা এসে পড়ল। বেড়ার কাছে শুনছিল বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মারমুখি হয়ে এল: আপনিই তো এই সব করাচ্ছেন। খোঁড়ার কাছে ঘুস খেয়ে। দাদার কাছে এখন আবার ভালমানুষ হতে এসেছেন।

গাল খেয়ে চক্কোত্তির কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই। এ সমস্ত অভ্যাস আছে ঢের। দন্ত মেলে হেসে আরও যেন উপভোগ করছেন। বলেন, করছি তো বটেই। নইলে তোমার সুদ্ধ হাতকড়া পড়ত। এত বড় একটা কাজ মাংনাই বা করতে যাব কেন? নগেনবাবু বলেছে খুশি করে দেবে। না দিলে ছাড়ব কেন? এই যখন পেশা হল আমার।

আরও উত্তেজিত হয়ে চারুবালা বলে, পাপের পেশা। একজনের হকের ধন অন্যায় করে অন্যকে পাইয়ে দেওয়া।

পরম শান্তভাবে চক্কোত্তি বলেন, তা ঠিক। মক্কেলের জন্য সব সময় ন্যায়-অন্যায় বাছতে গেলে চলে না। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারে তুমি কি জন্যে কথা বলতে এসেছ মা? যার জন্যে চুরি করি, সে কেন চোর বলবে? জগন্নাথ মহামানুষ—কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাক, জেলে নিয়ে পুরুক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু মেয়েমানুষ তুমি, গোঁয়ারটার সঙ্গে জুটে সরকারি কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করলে, সরকারি মানুষকে দেবীস্থানে বলি দেবার ষড়যন্ত্র করলে—তোমার ভাই বলেই দাস মশায় পর্যন্ত চৌধুরিবাবুদের কাছে দোষী। আর কোন্ উপায় ছিল বল, এমনি ভাবে মিটমাট করা ছাড়া?

সঙ্গে সঙ্গে আবার গগনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন: ঘাবড়াবার কি হল দাসমশায়? রেজেষ্ট্রী-দলিল হলেই কি সম্পত্তিটা অমনি নগেন বাবুর হয়ে যায়? দখলিস্বত্বে স্বত্ববান তুমি। আইন-আদালত আছে কি করতে? আমরা আছি কেন? যেদিকে বৃষ্টি, সেইদিকে ছাতা তুলে ধরব। প্রবল শত্রু চৌধুরিদের সঙ্গে যখন মিটে গেল, এবারে নিশ্চিন্তে নিজেদের মধ্যে লড়াপেটা কর।

চারু বলে, দাদাকে তাতিয়ে তুলে আবার নতুন গণ্ডগোল ঘটাতে চান বুঝি? বরাপোতায় না গিয়ে সেইজন্য এখানে আসা? ছাতা ধরতে হবে না আপনাকে, রক্ষে করুন। যা করতে হয় আমরাই ভেবেচিন্তে দেখব। আপনি আসুন এবারে চক্কোত্তি মশায়।

দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, এর পরে চক্কোত্তি মাদুরের উপর ধপ করে বসলেন।

এত বেলায় কে আমার জন্য সেখানে ভাত রেঁধে-বেড়ে বাতাস করছে। খেতে হয়, দুটো খেয়ে যাব তোমাদের এখান থেকে।

চারু মুখ ঝামটা দেয় : আমি পেরে উঠব না।

বলে পাক দিয়ে পিছন ফিরে ফরফর করে সে চলে গেল।

চক্কোত্তি ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, ওঃ, উনি না হলে আর লোক নেই! যে দেশে কাক নেই, সে দেশে যেন রাত পোহায় না। নগেনবাবুর বোন তো রয়েছে। ঘরের গিন্নি যিনি। বলি, শুনতে পাচ্ছ ভাল মানুষের মেয়ে? তোমার ভাইকে এর মধ্যে নিয়ে এসেই যত ফ্যাসাদ। তা সে যা-ই হোক, ব্রাহ্মণ-সন্তান ভরদুপুরে নিরম্বু চলে যাবে তোমার বাড়ি থেকে? গৃহস্থের তাতে কল্যাণ হবে?

রান্না শেষ হল চক্কোত্তির। মাছের তরকারি আর ভাত। ভাত বেড়ে নিয়েছেন পাথরের থালায়। আবাদে দেদার ধান হয়—ভাত খাওয়া অতএব শহুরে মাপে নয়। পাহাড়ের চূড়া না হল, তা বলে মোচার মাথাও নয়। বিড়ালে লম্ফ দিয়ে বাড়া ভাত ডিঙোতে পারবে না। কড়াইসুদ্ধ তরকারি টেনে নিলেন ভাতের পাশে। লোকে এই সব অঞ্চলে মাছ খেতেই আসে, অন্য তরকারি বাহুল্য। লোকালয়ে যেমন এক কুচি মাছ মুখে দিয়ে পরিতৃপ্তিতে জিভে টক্কর দেয়, বাদা রাজ্যের মাছ খাওয়া তেমন ব্যাপার নয়। ভাতের পরিমাণ যা, মাছের তরকারিও তাই। বাটিতে হয় না, বড় খোরার প্রয়োজন তরকারি ঢালার জন্যে। তার চেয়ে কড়াইতে রাখা সুবিধা—কড়াই থেকে তুলে তুলে খাবেন। তৈলাক্ত পারশে মাছ—তরকারির চেহারাখানা যা দাঁড়িয়েছে, তাই থেকে স্বাদের আন্দাজ পাওয়া যায়। আরম্ভের আগে গণ্ডূষ করে নেবেন, সেইটুকু সবুর সইছে না।

কিন্তু এক গ্রাস মুখে দিয়ে চক্কোত্তি থু-থু করে ফেলে দিলেন: নুনে পুড়ে গেছে। যবক্ষার।

বিনি-বউ বলে, একজনের মতো রান্না। নুনের আন্দাজ করতে পারেননি ঠাকুরমশায়।

আন্দাজ ঠিকই আছে। রান্না আজ নতুন করছিনে মা-লক্ষ্মী। নুন যা দেবার দিয়ে আমি একবার আলাঘরে গেলাম কলকেয় তামাক দিতে। শত্তুর এসে সেই সময় ডবল নুন ছেড়ে দিয়ে গেছে।

বলে হাসতে লাগলেন: কাঁচা কাজ হয়ে গেল। রান্না চাপিয়ে উনুনের পিঠ ছেড়ে যাওয়া উচিত হয়নি। এ রকম কখনো করিনে। নুন না দিয়ে খানিক সেঁকোবিষও দিতে পারত রাগের বশে। রাগ না চণ্ডাল—সে অবস্থায় মানুষের হুঁশজ্ঞান থাকে না।

অতিথি-ব্রাহ্মণ নিয়েও এমনিধারা কাণ্ড। লজ্জায় আর ব্রহ্মশাপের ভয়ে বিনি-বউ দিশা করতে পারে না। চলে যান তো ইনি, তার পরে হবে একচোট আজ চারুর সঙ্গে। বড্ড বাড় বেড়েছে। লজ্জা নেই শরম নেই, সকলের সঙ্গে পায়তারা করে বেড়ায়। দিনে দিনে ধিঙ্গি এক মাগি হয়ে উঠল, কোন চুলোয় ঠাঁই হয় না। সেইজন্যেই আরও বোধ হয় ক্ষ্যাপা অমন।

চক্কোত্তি ওদিকে হাসতে হাসতে বলছেন, আমিও ছাড়ন-পাত্র নই। আসন ছেড়ে ওঠা যাবে না, ভাত মরে যাবে। এক ঘটি জল নিয়ে এস দিদি। ঝোলের মাছ জলে ধুয়ে ধুয়ে খাব। উঃ, কত নুন দিয়েছে যে বাবা—নোনা-ইলিশের মতো মাছের কাঁটা অবধি জরে গেছে।

রান্নাঘরের দাওয়ার উপর সেই খাবারের জায়গায় গগন উঠে এল। হাসিখুশি ভাব নেই সেই থেকে। বলে, পাট্টা কবে রেজেষ্ট্রী হচ্ছে চক্কোত্তি মশায়?

চক্কোত্তি বলেন, বুধবার। সোম মঙ্গল দুটো দিন ছুটি—ইদের পরব পড়ে গেল কি না।

গগন বলে, ভাল হয়েছে। বুদ্ধীশ্বরকে ফুলতলায় পাঠাচ্ছি নগেনের কাছে। তার মুখে শুনি সমস্ত।

চক্কোত্তি আহতকণ্ঠে বলেন, আমার কথা বিশ্বাস হয় না—আমি কি মিথ্যে বানিয়ে বললাম? অত উতলা কেন হচ্ছ, তা ও তো বুঝিনে। হয়ে যাক না রেজেষ্ট্রী—যেমন খুশি লেখাপড়া করে নিক। তার পরে রইলাম আমরা সব। তোমার ঘেরির উপর কোন শালা না আসতে পারে, পুণ্ডরীক বাবুকে দিয়ে আমি তার যাবতীয় ব্যবস্থা করব। অমন দুঁদে উকিল সদরের উপর দ্বিতীয় নেই।

উঁহু, চলে আসুক নগেন। সামনাসামনি হোক। মতলবটা বুঝব। ঢাক-গুড়গুড় নয়, খোসা ছাড়িয়ে কথাবার্তা এবার।

চক্কোত্তি একগাল হেসে বলে, আসবে না, দেখে নিও। নেহাৎ সাদা মানুষ তুমি দাস মশায়, কথাটা তাই ভাবতে পারছ। এ সময়টা সামনাসামনি আসে কখনো? বলি, মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে তো একটা!

গগন বলে, আসবে ঠিক। চিরকুটে মন্তোর লিখে বুদ্ধীশ্বরের কাছে দিয়ে দিচ্ছি। মন্তোরে টেনে আনবে। বাঁদরকে কলা দেখিয়ে ডাকতে হয়। হাত মুঠো করে আ-তু-উ বলতে হয় কুকুরকে। তবে আসে। আপনাকেও কয়েকটা দিন থেকে যেতে হবে চক্কোত্তি মশায়।

[ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর

চড়ক উৎসব

শ্রীসুশীলকুমার মণ্ডল

বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ। দোল-দুর্গোৎসব থেকে সুরু করে সমস্তই বাংলার নিজস্ব উৎসব। আর বছরের শেষ উৎসবটিই হচ্ছে চড়ক উৎসব। চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই এই উৎসবের সুরু এবং শেষ পরিণতি একেবারে চৈত্রের ত্রিশে।

ফাল্গুন সংক্রান্তিতে শৈব নরনারী উপোস ক'রে থাকেন এবং পরদিন অর্থাৎ চৈত্রের প্রথম দিন গঙ্গার ঘাটে তাঁরা উত্তরীয় গ্রহণ করে শিবগোত্র ধারণ করেন।

গঙ্গার ঘাটের ব্রাহ্মণদের যে মন্ত্র তা হচ্ছে, 'নিজগোত্র ত্যাগ করো শিবগোত্র ধারণ করো', এমনি ভাবে তিনবার ব'লে গঙ্গায় ডুবে উত্তরীয় গ্রহণ করতে হয়, অবশ্য এই মন্ত্র যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণেই দেবেন তা নয়, যে কোন বর্ণের যে কোন লোক দিতে পারেন তবে তাঁকে হিন্দু হ'তে হবে এবং এ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতে হবে।

চৈত্রের প্রথম দিন থেকেই শৈব নরনারী ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়েন, এবং দিনের শেষে প্রতি ঘরের ভিক্ষালব্ধ চাউল সংগ্রহ করে সঞ্চয় করতে থাকেন। দিনান্তে আতপ চাউলে আহার সমাপন করেন।

এইভাবে প্রতিদিন তাঁরা ভিক্ষায় বেরিয়ে ভিক্ষালব্ধ চাউল সংগ্রহ করে উৎসবের শেষ দিনে তাঁরাই আবার সেই চাউল ভিখারীদের দান করেন।

দিনান্তে তাঁরা যা আহার করেন তাকে বলা হয় 'হবিষ্য'। গোধূলি লগ্নে তাঁদের এই হবিষ্য মালসায় তৈয়ারী হয়। তাঁরা যখন হবিষ্য করতে ব্যস্ত থাকেন, তখন তাঁদের মুখে কোন কথা থাকে না, শুচি বস্ত্র পরিধান করে শিবের নাম নিয়ে তিনটি খান ইটের তৈয়ারী উনানে আগুন ধরান। কিন্তু এর মাঝে কোনক্রমে যদি হঠাৎ সেই মালসা থেকে জল পড়ে কিংবা ফেটে গিয়ে থাকে তবে সেদিন আর তাঁদের আহার হয় না, সেদিন তাঁদের ফলমূলেই রাত কাটাতে হয়।

সন্ন্যাসীরা অর্থাৎ উত্তরীয়ধারী শৈবেরা 'তারকনাথের চরণে সেবা লাগি, মহাদেব', 'বুড়ো শিবের চরণে সেবা লাগি মহাদেব', প্রভৃতি মন্ত্র অনবরত বলতে থাকেন।

দিনের পর দিন গিয়ে শেষে মাসের শেষ আসে, তার পর সুরু হয় উৎসবের আসল ঘটা।

সাতাশ, আটাশ তারিখ ভোর বেলা থেকে শৈবেরা শিব মন্দিরের চারিদিকে গণ্ডী কাটতে থাকেন। এ যে শুধু উত্তরীয়ধারী সন্ন্যাসীরাই করেন, তা নয়, অনেক শৈব নরনারীও করেন।

এরপর সুরু হয় শিবের মাথায় জল ঢালা। একের পর এক জল ঢালতে থাকেন শিবের মাথায়। তবে ভক্তিপ্রাণা নারীরাই বেশী। মন্দির প্রাঙ্গনে গিয়ে দেখা যায় সেখানে অনেক মাটির তৈয়ারী ঘোড়া প্রভৃতি, শোনা যায় শৈবেরা তাঁদের শরীর সুস্থ আর সবল রাখার জন্য শিবের চরণে এই ঘোড়া মানসিক করেন, ঘোড়ার গায়ের শক্তি যেমন, মানসিককারীর গায়েও যেন তেমনি শক্তি হয়। আরও দেখা যায় মাথার চুলের মানসিক। কেউ হয় তো অনেক দিন রোগ ভোগের পর শিবের নামে চুলের মানসিকে সুস্থ হয়েছেন, তিনিও শিবের সন্তুষ্টি বিধানার্থে এখানে মাথার চুল উৎসর্গ করেছেন. এমনি আরও কত কি!

চড়কের আগের দিন নীলের বাতি, ভক্তিপ্রাণা নারীরা সেদিন উপোষ ক'রে নীলের বাতি জ্বালেন।

চড়কের দিনই অর্থাৎ ত্রিশে তারিখই উৎসবের শেষ দিন। এই দিন সবাই একত্র হন চড়ক তলায়, সেখানে গিয়ে যে যার ইচ্ছা মত চড়কে চড়েন।

কিছুকাল আগে চড়কের দিন বাণ ফোঁড়া হ'ত। অর্থাৎ পাঁজরার দু'পাশে দু'টো সূচালো শিক ফুটিয়ে দিয়ে দু'হাতে সেই শিক ধরে মন্দিরের চারপাশে ঘুরতে হ'ত। শিকদুটোর জোড়া মুখে থাকতো সরষের তেলের ন্যাকড়া ভিজানো. সেই ভিজানো ন্যাকড়া জ্বেলে ঘুরতে হ'ত সবাইকে এবং মাঝে মাঝে সেই জ্বলন্ত শিখাকে আরও জোর ক'রে ধরানোর জন্য ধূনোর গুঁড়ো তাতে দেওয়া হ'ত।

কিন্তু সরকার বাহাদুরের চেষ্টায় বর্ত্তমানে আর তা হয় না। কিংবা যদিও হয় তবে তাতে আর ভয় থাকে না অর্থাৎ পাঁজরায় আর শিক ফোটানো হয় না।

চড়কের একদম শেষে হয় আগুন ঝাঁপ। উত্তরীয়ধারী শৈবেরা বাঁশের ওপর থেকে ঝুলে পড়েন বাঁশের নিচের জ্বলন্ত আগুনের দিকে। এইটিই হচ্ছে আগুন ঝাঁপ। বাণ ফোঁড়া, আগুন ঝাঁপ ইত্যাদি হওয়ার পর চড়ক উৎসব শেষ হয়।

চড়কের দিন বিকেলে বিরাট মাঠের মাঝে চড়ককে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এবং খুব ধুমধামের সঙ্গে পূজো হয়।

বাংলাদেশের চড়ক উৎসব নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। বিশেষ ক'রে পাড়া-গাঁয়েই এই পূজো বেশী হয়। তবে কলকাতাতেও কয়েক জায়গায় হয়, যেমন, পদ্মপুকুর, কালীঘাট, বেলেঘাটা প্রভৃতিতে। কলকাতার পদ্মপুকুরে চড়ক উৎসবে এক মেলা বসে।

চড়কের প্রধান উৎসবের স্থান হ'ল হুগলীর তারকেশ্বর। এখানে সাতাশ তারিখ থেকে ত্রিশে পর্য্যন্ত বিরাট মেলা বসে। নার্গার পঞ্চানন্দ তলাতেও এই উৎসব হয় এবং এখানেও পাঁচদিন মেলা বসে।

উত্তরীয়ধারী সন্ন্যাসীরা ১লা বৈশাখ তাঁদের উত্তরীয় জলে ভাসিয়ে দেন। ভাসাবার সময়ও একটি মন্ত্র বলেন, 'নিজ গোত্র ধারণ করো, শিবগোত্র ত্যাগ করো।' পরের দিন ২রা বৈশাখ খুব ধুমধামের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন।

এইভাবে চড়ক উৎসব শেষ হয়।

লামেরিয়াং

(চীনে গল্প)

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

চাষার ছেলে। নাম লামেরিয়াং। গরু, ভেড়া, ছাগল চরাতো আর কোনো রকমে খেয়ে-পড়ে দিন কাটাতো। পাঠশালায় পড়ার খুব সখ—পয়সা পাবে কোথা ? তাই একদিন পাঠশালার গুরুমশাইয়ের কাছে গিয়ে সে সরাসরি বললো, আপনি আমাকে আঁকতে শেখাবেন—আমার খুব সখ আমি আঁকতে শিখি।

পয়সা আছে—বেতন দিতে পারবে আঁকতে শেখার বিনিময়ে ? গুরুমশাই জানতে চাইলেন।

না, পাবো কোথা। জবাব দিল লামেরিয়াং।

গুরুমশাই বললেন, তবে ভাগো। অন্য পথ দেখো—চাষার ছেলে রাখাল বালক গরু চরিয়ে খাও—আঁকার সখ কেন ?

কাঁদতে কাঁদতে লামেরিয়াং চলে গিয়ে বাড়ীতে শুয়ে রইল। রাতে ভগবান কু তার কাছে এসে তাকে সোনার একটা কলম দিয়ে বললো, এই কলম দিয়ে যা তুমি আঁকবে, তাই জীবন পাবে—লামেরিয়াং, তুমি লোকের ভাল ছাড়া কোনো দিন খারাপ কিছু করো না।

ঘুম ভেঙে লামেরিয়াং দেখলো, তার হাতে একটা সোনার কলম। খুসীতে লাফিয়ে উঠলো লামেরিয়াং। ভগবান তার ওপর সদয় হয়ে তাকে এই কলম দিয়েছেন—এখন আর তাকে পায় কে ? ছুটলো সে মাঠে।

আর চাষারা যে যা চাইলো—তাই সে মাটির ওপর এঁকে তাদের দিতে লাগলো একটা একটা করে। তারা তো লামেরিয়াংয়ের জয় জয় করতে করতে বাড়ী ফিরলো।

এমনি ভাবে লামেরিয়াংয়ের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কথাটা ওই দেশের রাজার কানেও গিয়ে উঠলো ; এমন একটা সোনার কলম লামেরিয়াং নামে একটা চাষার ছেলের কাছে কিছুতেই থাকতে পারে না। রাজা পাইক পাঠালেন লামেরিয়াংকে তার রাজসভায় হাজির করতে। পাইক ছুটলো এবং শীগ্‌গিরই লামেরিয়াংকে ধরে নিয়ে এলো রাজার কাছে। রাজা দেখলো লামেরিয়াংয়ের হাতে একটা সোনার কলমই বটে—কথাটা তাহলে মিছে নয়। রাজা বললেন, কলমটা আমাকে দাও লামেরিয়াং, আমি অনেক টাকা দেবো তার বিনিময়ে।

না, এটা আমি আমার প্রাণের বিনিময়েও দিতে রাজি নই রাজা। লামেরিয়াং জবাব দিল।

রাজা রেগে গেলেন। লামেরিয়াং তাঁর কারাগারে কয়েদী হোয়ে রইল। একফোঁটা একটা চাষার ছেলে তার কিনা এত বড় কথা। কয়েদী হোয়ে দুদিন থাকলেই বাছাধন সুড়সুড় করে কলমটা আপনা হতেই দিয়ে দেবে। রাজা এই না ভেবে মনে মনে খুব খুসী হলেন, আর সরষের তেল নাকে খানিকটা গুঁজে দিয়ে ঘুমুতে সুরু করলেন আরাম করে।

এদিকে লামেরিয়াং কারাগার থেকে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। সে তার সেই কলম দিয়ে পানতোয়া সন্দেশ জিবেগজা, ছানাবড়া, রসগোল্লা এই রকম অনেক অনেক খাবার এঁকে তাই বেশ মনের সুখে ভোজন করতে লাগলো।

পেটে খিদে থাকলে বুদ্ধিটা তেমন যোগায় না তাই পেট ভরে খেয়ে লামেরিয়াং এখান থেকে পালাবার উপায় খুঁজতে লাগলো। এবং একটু পরে উপায় পেয়েও গেল।

সে তাড়াতাড়ি পাথরের দেয়ালে যেদিকটায় অনেক উঁচুতে একটা জানালা আছে, সেই দিকটায় একটা মই এঁকে ফেললো সেই মইটা দেখতে দেখতে সত্যিকারের হোলো। সে তাই বেয়ে উঠে গেল ওপরে জানালার কাছে আর নামলো গিয়ে ওদিকের রাস্তায়। তারপর হৈ হৈ করে পাহারাদাররা তার পিছনে ছুটে এলো তাকে ধরতে কিন্তু লামেরিয়াং ততক্ষণে একটা ঘোড়া এঁকে ফেলে তাইতে চড়ে বসেছে। আর তাকে পায় কে ? ঘোড়া ছুটিয়ে লামেরিয়াং তখন যে ছুট কোথায় বা রাজা আর কোথায় বা তার পাইক পাহারাদার ! কেউই তার কিছু করতে পারলো না। লামেরিয়াংকে অনেক খুঁজেও রাজা আর ধরতে পারলেন না। সে তখন অনেক দূরের দেশে চলে গেছে তার সোনার কলমটাকে সাথে নিয়ে।

তবে রাজা বা রাজার অনুচরেরা তার দেখা না পেলেও গরীব লোকেরা তাকে ডাকলেই সে তাদের কাছে তখুনি হাজির হয়ে তাদের অভিযোগ শুনে অভাব মিটাতো তার সোনার কলমটা দিয়ে।

মন দিয়ে অভাব নিয়ে ডাকলে এখনো তার দেখা পাওয়া যায়। তবে মন দিয়ে ডাকতে হবে, তবেই না তার দেখা পাবে।

দেশী রং

শ্রীইন্দুবিকাশ দাশ

আমাদের দেশে নানাজাতীয় গাছ-গাছড়া জন্মায়, সেকালের পটুয়ারা দেশজ গাছগাছড়ার ফল, বীজ, ছাল প্রভৃতি থেকে নিজেরা রং তৈরী করে নিতেন। রং ব্যবহারের জন্য আঠা (medium) তাঁরা তৈরী করতেন, হাতের কাছে পাওয়া জিনিস থেকে—যথা—তেঁতুল বীজ, বেল ইত্যাদি। এখন অধিকাংশ পটুয়া বাজারে কেনা রং ব্যবহার করেন, তাছাড়া ক্রমে ক্রমে পটুয়াদের জাত ব্যবসা লোপ পেয়ে আসছে—তাঁতী সুতো রং করার জন্য দেশজ জিনিস ব্যবহার করতো। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশী নীলের কথা মনে পড়ে। নিজের তৈরী রং দিয়ে ছবি আঁকার একটা আনন্দ আছে।

কাঁঠাল কাঠ থেকে যে রং পাওয়া যায় তা আমার কল্পনাপ্রসূত নয়। এক বাউলের সঙ্গে অনেকদিন থেকে আলাপ। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কাছ থেকে জেনেছিলাম, যে তাঁর পূর্ব্বপুরুষগণ কাপড় রাঙানর জন্য কাঁঠাল কাঠের রং ব্যবহার করতেন। কিন্তু রং তৈরীর পথ তিনি দেখাতে পারেন নাই। রং তৈরী করা ও সেই রং দিয়ে ছবি আঁকা যায় কিনা তার পরীক্ষা করে যা পেয়েছি; তাই জানাচ্ছি।

রং তৈরী—পাকা কাঁঠাল কাঠের মাঝের অংশটি হলদে রঙের হয়ে যায়। কাঠ চেরাই করার সময় যে গুঁড়ো পাওয়া যায় তা দরকার। খুব ছোট করাত দিয়ে চেরাই করা কাঠের গুঁড়ো হলে

সবচেয়ে ভাল হয়। কারণ তাতে গুঁড়ো প্রায় পোস্ত দানার মত ছোট হয়। ঐ গুঁড়োকে ভাল করে বেছে নিতে হবে, যেন অন্য কোন জিনিস না থেকে যায়। কাচের বা চীনামাটির বাটিতে ঐগুলিকে পরিমাণমত ঠাণ্ডাজল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে প্রায় তিন দিন। মাঝে মাঝে অল্প ঠাণ্ডাজল মিশিয়ে জলের পরিমাণ সমান রাখতে হবে। পরিষ্কার মোটা কাপড়ের টুকরায় গুঁড়ো ছেঁকে নিতে হবে। প্রায় এক দিন পরে যে তলানি পড়বে, তা বাদ দিয়ে উপরের জলটুকু সাবধানে গড়িয়ে নিতে হবে অন্য বাটিতে। কোন ঢাকনা না দিয়ে বাটি ঘরে রেখে দিলে জল ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে জল ও রঙের ঘনত্ব বাড়তে থাকবে। শেষ পর্য্যায়ে জলটির রং ও ঘনত্ব মধুর মত হবে ও পরে শুকিয়ে যাবে। শুকনো রংএ ঠাণ্ডাজল দিলে তা আগের চেহারা ফিরে পাবে।

আঠার ব্যবহার—পরিষ্কার গঁদের টুকরো ঠাণ্ডাজলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে আঠা তৈরী হবে। পরে তা ছেঁকে নিতে হবে। কাঠের গুঁড়ো ছেঁকে নিয়ে তলানি বাদ দেওয়ার পর পরিমাণমত আঠা মেশাতে হবে ঐ রংএ। অন্য আঠা ব্যবহার করেও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

রং—ছেঁকে নেওয়ার পর জলের রং হবে ফিকে কমলা। একটু ঘন অবস্থায় রং হবে গৈরিক ও পরে কমলা। তুলি দিয়ে লাগানর সময় রংটি বেশ সহজেই কাগজের সঙ্গে ভাব করে নেয়। শুকিয়ে যাওয়ার পর রংটি ঘষাঘষিতে উঠে না বা আঙুলে কোন দাগ লাগে না। আঠা ব্যবহার করায় রংটি মোলায়েম হবে। 'জলযন্ত্রা' ছবি, রঙীন 'রেখাচিত্র', এ রং দিয়ে ভাল ভাবেই হয়েছে। এ রংদিয়ে অন্য ধরণের ছবি পরীক্ষা করা হয় নাই।

সংরক্ষা—একটু ঘন হয়ে এলে, পরিষ্কার তুলোতে শুষে নিয়ে, শুকিয়ে শিশিতে রেখে দেওয়া যেতে পারে। রং করার জন্য, ঐ তুলো পরিমাণমত কেটে নিয়ে জলে রগড়ে নিলেই হল।

ছড়া

মুস্তাফা নাশাদ

সোনার গালে সোনার রোদ
সোনার হাসি ছড়িয়ে।
সন্ধ্যা তারার নায়ে চড়ে
বিকেল গেল গড়িয়ে।
ও বিকেল তুই ফিরে চা,
সোনার হাসি দেখে যা।

এক পয়সার এল-বেল
এক পয়সার তেল।
মেট্‌চিকে খুকুর মেয়ে
আবার হ'ল ফেল।
ফেল নয়ত ফেল নয়ত
পরীক্ষকের ক্রোধ।
বাদলা দিনে মেঘ বুড়ো
'আটকে ছিল রোদ।

মহাকবি গ্যেটের বাল্যকাল

শ্যামাদাস সেনগুপ্ত

পৃথিবীর মহাকবি ও নাট্যকারদের জীবনী সংগ্রহ উপাদান খুব কম। উদাহরণ স্বরূপে গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের জনক ইসকাইলাসের যুগ পার হয়ে সফোক্লিস থেকে ইউরিপিদাস পর্য্যন্ত আমরা যদি আলোচনা করি তা হলে দেখা যাবে তাঁদের জীবনের উপর আমরা খুব বেশী আলোকসম্পাত করতে পারব না। এমন কি প্রাচীন মহাকবি হোমারের বিষয়েও আমরা বেশী জানতে সক্ষম হইনি। আমাদের দেশে চণ্ডিদাস সমস্যা আছে। অনুরূপে সমস্যা হোমারকে নিয়েও, হোমার নামে বাস্তবিকই কোন ব্যক্তি ছিলেন কি না, আর থাকলেও সংখ্যায় হোমার নামধারী ক'জন ছিলেন এ নিয়ে আজও অনেক বাদানুবাদ চলেছে। ক্ষুদ্র গ্রীক দেশের সাতটি প্রদেশ এই বলে দাবী জানাচ্ছে, হোমারের জন্মভূমি তাদের প্রদেশে। তা ছাড়া দান্তে ও সেক্সপীয়ার সমস্যাও রয়েছে। কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত দান্তের প্রতিকৃতি নিয়ে মতের গুরুতর পার্থক্য ছিল। সেক্সপীয়ার বিষয়েও সেই রহস্য। অনেকে বলেন সেক্সপীয়ার নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না। অনেকে বলেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহত মার্লো আমেরিকায় পালিয়ে সেক্সপীয়ার ছদ্মনামে লিখতে থাকেন। আবার অনেকে বলেন বিখ্যাত দার্শনিক বেকনের রচনা সেক্সপীয়ারের নাটক বলে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্য যাঁদের আমরা যুগমানব বলি তাঁদের বিষয়ে আমরা খুবই কম জানতে পারি। গ্রীক সাহিত্য পার হয়ে ইটালী থেকে ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত এসে দেখি মহাকবি ও নাট্যকারদের জীবনী খুব স্বল্পবিস্তৃত। তবে বিরাট পরিধি বিস্তৃত জীবনে যার বিষয়ে আমরা জানতে পারি তিনি হচ্ছেন যোহান উলফনভ্যাঙ ফন গ্যোটে। প্রত্যেক সমালোচকের মতে ইউরোপে দাভিঞ্চির পর এত বড় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ভাস্বর রূপ নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। আমরা জানি চরিত্র মানব জীবনের স্বরূপ। এই চরিত্র থেকে প্রতিভার জন্ম হয়। অনেক প্রতিভা লোক চক্ষুর অন্তরালে ঝরে পড়ে বিকশিত হয়ে। আর এক প্রতিভা আছে যা সংঘর্ষে গড়ে ওঠে। গ্যোটে বলতেন এই সংঘর্ষ রোধ করবার জন্য ভগবান মানুষকে শক্তি দিয়েছেন। সব কিছু জয় করবার শক্তি। শক্তির অপব্যবহার হলে ভগবান মানুষকে ক্ষমা করেন না। শক্তি নিঃশেষ হলে ভগবান সেই ব্যক্তিকে নিঃশেষ করে দেন। আর সংঘর্ষ চরিত্র পূর্ণ হয়। তাই বোধ করি তাঁর তীর্থ যাত্রা সুরু হয়েছিল ভের্থরের দুঃখ হতে ফাউষ্ট নাটক রচনা করবার সর্বশেষ সীমান্ত অবধি, অসীম পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহে চরিত্র গড়ে ওঠে। তিনি গুটিপোকার মত নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে জাল বুনে রেশম সৃষ্টি করে নিঃশেষ হননি।

বিপুলা পৃথিবীর ঘূর্ণনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সব কিছু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজের সঙ্কীর্ণ বেড়াজালের মধ্যে পরিবৃত হয়ে, ক্লান্ত হননি। চরিত্র তাঁর ছিল ব্যক্তিত্বে। কেউ বলেছেন তিনি পাগান বোহেমিয়ান জীবনাদর্শ তাঁর মধ্যে। কেউ বলেছেন তিনি পরম আলমিয়ান প্রেমিক। কেউ বলেছেন তিনি ভূজ স্বভাব কবি। অপরে বলেছেন তিনি আর্য্য ঋষি। কেউ তাঁকে দেখে বলেছেন তিনি দুরন্দর কটনীতিবিদ, কেউ বলেছেন তিনি সর্বশাস্ত্রবিদ

একাধারে তিনি বিজ্ঞানী। অস্থিবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, ভেষজ শাস্ত্র ও আলোক তত্ত্ব বিষয়ে তিনি ছিলেন অগ্রগামী পুরুষ। অপর দিকে তিনি ছিলেন নট, মঞ্চনির্দেশক ও সাহিত্যিক। কেউ তাঁকে বলেছেন philistine আবার কেউ তাঁকে বলেছেন তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ মানব।

এ-হেন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পূর্বপুরুষ বিষয়ে যতদূর জানা যায় তা থেকে বলা যেতে পারে যে তাঁর ঊর্দ্ধতন পূর্ব পুরুষ হান্স ক্রিশ্চিয়ান গ্যেটে ছিলেন অশ্বব্যবসায়ী। এই ভদ্রমহোদয়ের পুত্র পিতার জীবিকা গ্রহণ না করে দর্জির পেশা নেন। জার্মানীর আর্টেন প্রদেশের থুরিনগিয়া থেকে ফ্রেডারিক জর্জ ফ্রাঙ্কফার্টে বসবাসের জন্ম চলে আসেন। তাঁর দুই পত্নী ছিল। দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন বিধবা। এই পত্নীর হোটেল ছিল। এই বিধবা ভদ্রমহিলাকে বিবাহ করে ফ্রেডারিক জর্জ যৌতুক হিসাবে হোটেলের মালিকানা স্বত্ব পান। সেই থেকে ইনি ধনী হন। দর্জির পেশা তাই ছেড়ে দেন। এই জর্জ ফ্রেডারিকের দ্বিতীয় পুত্র হলেন মহাকবি গ্যেটের পিতা, ইনি সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। দেহের ওজন ছিল মাঝারি ধরণের। গ্যেটের পিতা আইন অধ্যয়ন করেন, আইনের এক বিষয়ের ওপর তাঁর একটি রচনা প্রতিনিধিমূলক কীর্ত্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। ব্যবহারজীবীরা গ্যেটের পিতার রচনা উল্লেখ করে বিচারালয়ে নজীর তুলত। তা ছাড়া সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও তাঁর ছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সৎ। গ্যেটের মাতার নাম ছিল কুমারী ক্যাথরিণ এলিজাবেথ টেক্সটর, ইনি ছিলেন জিলা শাসকের কন্যা। গ্যেটের বাবার বিবাহকালে বয়স হয়েছিল আটত্রিশ। আর গ্যেটের মায়ের বয়স ছিল মাত্র আঠারো। গ্যেটের মাতার দিক থেকে বংশ মর্যাদা থাকলেও পিতৃপুরুষের তরফ থেকে অভিজাত বংশীয় হিসাবে গ্যেটে পরিবার তখনও পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

১৭৪৯ খৃঃ ২৮শে আগষ্ট ঠিক দুপুর বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্কফার্ট অন দি মেইন-এ তিনি ভূমিষ্ট হন। শুভ তিথিতেই গ্যেটের জন্ম হয়, অনেকে ভবিষ্যংবাণী করে বলেছিলেন যে ছেলে খুব নাম ও যশের অধিকারী হবে। তাঁর আত্মজীবনীতে গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান তিনি দিয়েছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের অবস্থান ভাল ছিল। বুধের অবস্থান অশুভ ছিল না, তাঁর ওপর শনি ও মঙ্গলের প্রভাব খুব বেশী ছিল না। চাঁদের পূর্ণ প্রভাব ছিল। নিজের কক্ষপথে ঘুরছিল চাঁদ,, চাঁদ নিজের কক্ষপথ থেকে সরে না যাওয়া পর্যান্ত কবির জন্ম হয় নি। প্রসূত ও প্রসূতির তাই সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, সে-সময় ধাত্রী ভাল পাওয়া যেত না, সেই কারণে প্রসবের সময় মাতা ও সন্তানের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়েছিল, জাতকের প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। গ্যেটের পিতামহী জাতককে জীবিত দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে অস্ফুট স্বরে বলেছিলে, জাতক এখনও বেঁচে আছে। গ্যেটের মাতামহ এইজন্য গরীবদের কিছু দান করেছিলেন, শহরে ধাত্রীবিদ্যার উন্নতি করে কিছু অর্থ ব্যয়ও করেন, দান করবার হেতু এই যে তিনি রাজকর্মচারী হয়ে অনেক অন্যায় করেছিলেন। দানের অর্থে একটা দাতব্যশালাও খোলা হয়, যে ঘরে গ্যেটে জন্মেছিলেন সে-ঘরে শায়িত জাতকের বিছানার চাদর ছিল নীল রঙের, দম্পতীর বিবাহের এক বছর পরে গ্যেটের জন্ম হয়। গ্যেটের দেহ নীল ও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রাণের কোন অস্তিত্ব ছিল না বলে পেটে তাপ দেওয়া হয়েছিল। মদ দিয়ে দেহে মালিশ করা হয়েছিল, পঁচাত্তর বছর বয়সে গ্যেটের মার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গ্যেটের মা বলেছিলেন সন্তানের জন্মতিথির কথা তাঁর প্রায়ই মনে পড়ে।

গ্যেটের বয়স যখন মাত্র পাঁচ মাস, সে-সময় তিনি নানা ভয়ের স্বপ্ন দেখতেন। হাবভাবে এ-সব বোঝা যেত। ঘুম ভেঙে গেলে তিনি কাঁদতেন, মধ্যে মধ্যে গ্যেটে এত হাই তুলতেন যে গ্যেটের মা বাবা ভাবতেন ছেলে বোধ হয় মারাই যাবেন। শিশু ঘুমিয়ে পড়লে তাঁরা একটা ঘণ্টা বাজিয়ে টুং টাং শব্দ করতেন, তাঁরা ভাবতেন শিশুর দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে, গ্যেটের বয়স যখন তিন, নোংরা জামা কাপড় পরা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কিছুতেই খেলা ধূলো করতেন না, প্রতিবাদে তিনি কান্না জুড়ে দিতেন, তাঁর কান্নার কারণ কী এই প্রশ্ন করলে তিনি জানাতেন যে নোংরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গ তিনি চান না। গ্যেটের মা বলতেন এ-ব্যবহার তার শোভন হয় নি, তখন আবার তিনি কান্না জুড়ে দিতেন।

গ্যেটে সহোদরা কর্ণেলিয়াকে খুব ভালবাসতেন। কর্ণেলিয়া কাঁদলেই মুখে পাউরুটির টুকরো গুঁজে দিতেন, বোনের জন্য জামা বা প্যান্টের পকেটে পাউরুটি সযত্নে রেখে দিতেন, দোলনা থেকে কেউ যদি ছোট বোনকে তুলত তখন ক্রুদ্ধ হয়ে সে-ব্যক্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কাঁদতেন না অবশ্য, রেগেই যেতেন। গ্যেটের এক সহোদর তাঁর খেলার সঙ্গী ছিল। অল্পবয়সে এ-ভাই মারা যায়। ভাই মারা গেলে তিনি চোখের জল ফেলেননি। বরং তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যুকালীন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ পর গ্যেটের মাতা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : ভাই এর মৃত্যুতে গ্যেটে কী মৃত ভাইকে ভুলে গিয়েছেন ; তাঁকে গ্যেটে এখনও কী ভালবাসেন ? গ্যেটে তৎক্ষণাৎ একটা ঘরে ছুটে যান। বিছানার তলা থেকে অনেকগুলো কাগজ নিয়ে আসেন। এই কাগজে সেই মৃত ভাইয়ের পাঠ্যতালিকা লিখে রেখেছিলেন। গ্যেটে জননীকে জানালেন, ভাইকে শিক্ষা দেবার জন্য এ কাজগুলো আগে থেকেই তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

ফসল তোলবার সময় পল্লীগ্রামে নানা বাজী পোড়ান হত। নানা রকম উড়ন্ত বাজী শূন্যে ছোঁড়া হত। শহরের বাইরে মাথার টুপিতে আলো রেখে নাচ ও গানের আসরে তিনি যোগ দিতেন। তাঁর মায়ের বিবৃতি থেকে বোঝা যায় ; পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি তাঁর বেশ নজর ছিল। কবির জন্য তিন প্রস্থ পোষাক তাঁর মা প্রস্তুত করে রেখে দিতেন। একটা চেয়ারের ওপর ওভারকোট লম্বা ট্রাউজার আর একটা সাধরণ ভেষ্ট থাকত। তাঁর সন্ধ্যাকালীন পরিচ্ছদ ছিল রেশমের মোজা। বিবিধ ধরণের পোষাক। এই পোষাক পরিধান করে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেন। তৃতীয় প্রস্থ পোষাক ছিল সবচেয়ে দামী। পোষাকের সঙ্গে থাকত তরবারি আর কিছু পরচুলা। এ পোষাকগুলো ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। গ্যেটের মা এগুলো খুব যত্নসহকারে সাজিয়ে রাখতেন। তাঁর জুতো ছিল অসংখ্য। ছত্রাকার হয়ে পড়ে থাকত। বুট জুতোর মোজা কত ভাঁজকরা অবস্থায় থাকত। ধূলোবালি ঝেড়ে ঠিক জায়গায় তিনি রেখে দিতেন।

গ্যেটের মা সকলকে ভালবাসতেন। স্বামীর প্রিয় কাজে মন দিয়ে অনুগত হবার চেষ্টা করতেন। তিনি কোন উত্তেজক সংবাদ শুনতে পারতেন না। চাকর নিয়োগকালে আগে থেকে তাদের বলে দিতেন : পাড়ার কোন উত্তেজক কাহিনী বা ঘটনা তারা যেন না আনে। মায়ের ঋণ গ্যেটে চিরকালই স্বীকার করেছেন। কোন ছেলেমেয়ে অন্যায় করলে স্বামীর কঠোর শাসনের হাত থেকে তিনি বাঁচাতেন। গ্যেটের মা একজায়গায় লিখেছেন, যে কোন লোক, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, তার পদমর্য্যাদা কম হোক বা বেশী হোক, তাঁদের তিনি ভালবাসেন। খারাপটা তিনি না দেখে ভালোটা দেখার চেষ্টা করেন, গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন। যা মন্দ তা ভগবানের দান। মন্দকে ভগবানের নিকট সমর্পন করে নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করেন তিনি।

গ্যেটের মা রূপবতী রমণী ছিলেন। তাঁর চোখ ছিল চিকণ বাদামী রং-এর, বয়সের পার্থক্য বেশী ছিল না বলে অনেকে বিশ্বাস করতে পারত না যে তিনি গ্যেটের মা। তাই একবার বলেছিলেন : ছেলের কাছে আমি নিজেকে হ্যামলেটের মায়ের মত প্রকাশ করব না। গৃহের মানসিক শান্তি বজায় থাক এ-ই তিনি চাইতেন। অবশ্য এর জন্য অনুশোচনা করতে হয়েছিল। উত্তরকালে শিলারের মৃত্যুর সময় গ্যেটেও অসুস্থ হন। এ সংবাদ পূর্বে গ্যেটের মাকে জানান হয়নি। ভীষণ অসুস্থতার সংবাদ যখন তাঁকে জানানো হল, তখন তিনি বললেন এ কথা আগে তাঁকে কেন জানান হয়নি। তখন তাঁকে বলা হয় তাঁর আদেশ অনুযায়ী কোন উত্তেজক সংবাদ তাঁকে জানানো হয়নি। সন্তান পালয়িত্রী হিসাবে গ্যেটের জীবনে তার মায়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাড়ীর মধ্যে একটা সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখতেন তিনি। ছেলের কল্পনাকে তিনিই উদ্দীপ্ত করতেন। তাঁর মায়ের শিক্ষা বেশী ছিল না। তবু যে সব শিক্ষা তাঁর মার কাছ হতে তিনি পেয়েছিলেন তা তিনি ভুলতে পারেন নি। গ্যেটের মা জানতেন তিনি নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে পারবেন না। আর সব কর্ত্তব্য ছেলের প্রতি সম্ভব না হলেও স্নেহ দিতে কখনও কার্পণ্য দেখাতেন না। পিতার কঠোরতা হতে মুক্তি পাবার জন্য ছোটবেলায় মায়ের স্নেহ নীড়ে গ্যেটে আশ্রয় নিতেন। গ্যেটের পরবর্তী জীবনে শৃঙ্খলা সহজে আসেনি কারণ গ্যেটের জীবনকে গঠনমূলক ভাবে মা-বাবা আনতে সক্ষম হননি। এ-রকম বিশৃঙ্খল জীবন গ্যেটে প্রায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবনে কনিষ্ঠ বোনের প্রভাব পড়েনি। বোনের চেয়ে কবির চারিত্রিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বেশী ছিল। বোনের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ, শিশু সুলভ খেলা ও আমোদ নিয়ে তাঁর সময় কাটত।

[ক্রমশঃ।

মনস্তত্ত্ব

শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত

ওদের বাড়ির পুসী—
খাবার সময় এই কটি ভাত
দুধের সঙ্গে থুকুর দু'হাত
পেলেই সে খুব খুশী।
এদের বাড়ির ময়না—
খাবার সময় রোজ দু'বারে
কেউ যদি হায় খাওয়ায় তারে
রাগটি যে তার রয় না।
মামার বাড়ির ভলি—
পায় যদি রোজ হাড়ের কুচি
মাছের কাঁটা শুকনো লুচি
তবেই সে খুব জলি।
মাসতুতো বোন হাসি—
বইগুলো তার ভুলের দিকে
বসবে নিয়ে পুতুলটিকে
পড়তে হলেই কাশি॥

কীটসের কবিতা থেকে

[On the Grassopper and the Cricket অবলম্বনে]

পৃথিবীর চিরন্তনী কাব্যের আসর
কভু নাহি ক্লান্ত হয় এ নিস্তব্ধতায়
ঘন নীল মৃত্যুর বিলাপে, বৈশাখের
নিষ্করুণ তাপে, উত্তপ্ত শিলায়।
ঘাস ফড়িংয়ের চির অশান্ত যৌবন
মন্দালস জ্ঞানমূর্ত্তি করিছে বহন।
শীতের তুহিন স্পর্শে নির্ব্বাক অসাড়
তখনও প্রকৃতির বাজিছে সানাই
ঘাস ফড়িংয়ের মতো ঝিঁ ঝিঁরাও বলে
পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের কভু শেষ নাই।
তন্দ্রালস মানুষেরা শোনে এই গান
চিরন্তনী সংগীতের নেই অবসান।

অনুবাদ—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

অনাবশ্যক অস্ত্রোপচার

আজকে যে কথা বোলবো, তাতে দেখা যাবে, বৈজ্ঞানিকরা অদৃশ্য মনটাকেও টুকরো টুকরো করে দেখবার প্রয়াস করেন। মন অবশ্য চোখে দেখা যায় না কিন্তু কবির ভাষায় 'বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?' অসুস্থ অবস্থায় বেশীরভাগই মনই শরীরকে চালনা করে—এই দেখেই বিজ্ঞানে হল হল মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে।

এই ধরুন না অস্ত্রোপচারের কথা। এ সম্বন্ধে একটা গল্প বললে আপনাদের ভালো লাগবে। কোন একটি প্রসিদ্ধ হাসপাতালে একজন সুবেশা মধ্যবয়সীয়া ভদ্রমহিলা ডাক্তারকে গিয়ে সরাসরি বলেন: আমার সব সময় যন্ত্রণা হয়, অতএব আপনার কাছে কালকেই অপারেশন করাতে এসেছি। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করার সময় তিনি অনর্গল তাঁর আগেকার অস্ত্রোপচারগুলির গল্প করতে থাকেন। বলেন গত দশ বৎসরে তাঁর নাকি সাত বার অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার রুগীকে ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন, অপারেশন কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না—দুঃখের কথা লুফে নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, বলেন কি আপনি, যন্ত্রণায় যে আমার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মিনিট রেহাই নেই।

একটা বড়ো নিঃশ্বাস নিয়ে ডাক্তার বললেন আপনি কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার যন্ত্রণার কারণ মানসিক। আপনার জীবনে কোন গোলমাল আছে—বোধ হয় আপনার দাম্পত্য-জীবনে স্বাভাবিকতা নেই। আপনার মানসিক অশান্তি থেকে দূরে পালিয়ে যাবার জন্যে আপনি আসছেন আমার ছুরীর অত্যাচারের কাছে। তা ছাড়া অতীতে আপনার অতগুলো ব্যর্থ অস্ত্রোপচার আমার কথাটাই প্রমাণ করছে। আমার মতে যে টাকা অপারেশন করতে খরচ করবেন, সেই টাকা দিয়ে কোন মনোবিজ্ঞানীর (psycopath) এর পরামর্শ নিন। যদি চান ঐ লাইনের ভালো একজন চিকিৎসকের নাম আমি আপনাকে বলতে পারি।

ভদ্রমহিলা বেশ বুদ্ধিমতী। সাধারণ লোকের এক্ষেত্রে রাগ হবার, কথা, এবং মনে হওয়া সম্ভব যে ডাক্তারের কোন প্রতিভা নেই, সে একেবারে বাজে। কিন্তু এই ভদ্রমহিলা ডাক্তারের পরামর্শ মতই কাজ করলেন—তিনি ভাগ্যগুণে একজন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীর কাছে পৌঁছে গেলেন যিনি বিশেষভাবে মানসিক কারণে অস্ত্রোপচারের সম্বন্ধে বহু দিন ধরে গবেষণা করেছেন। তিনি ঐ ভদ্রমহিলাকে খুব ভাল ভাবে পরীক্ষা করে এমন পরামর্শ দিলেন যে রুগী শুধু নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই পেলেন না, তাছাড়া মানসিক ও অর্থনৈতিক মুস্কিল থেকেও রেহাই পেয়ে গেলেন। আজকে তাঁকে সুস্থ বলাই চলতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয় যাঁরা, তাঁরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন এই দেখে যে মানসিক কারণের জন্যে অনাবশ্যক অস্ত্রোপচার অত্যন্ত বেশী হচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার জেমস সি ডয়েল (Dr. James C. Doyle) ৬২৪৮টি আংশিক ও পরিণত হিসটিরিয়া জাতীয় রুগীকে পরীক্ষা করে দেখেছেন, পাঁচজনের মধ্যে দু'জন রুগীর অনাবশ্যক অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। প্যাথোলোজিষ্টরা প্রকাশ করেছেন, শরীর থেকে অপারেশন করা অনেক অবয়ব একেবারে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বিশেষ করে তো মেয়েদের। তাঁদের ব্যাপারে এত অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার হয় যে কোন দক্ষ ডাক্তারই ও বিষয়ে হাত দেবেন না।

বিজ্ঞান বার্তা
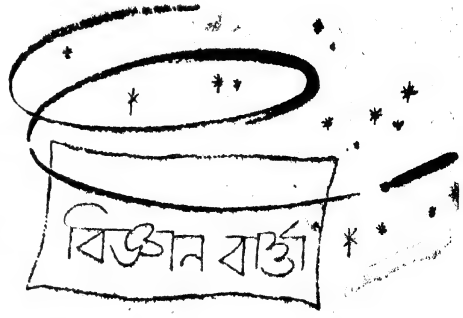
একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার এ্যাপেনডিসাইটিস-এর ৩৮৫ জন রুগীকে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তার মধ্যে ২২৫ জনের এ্যাপেনডিসাইট হয়নি—এ সব ক্ষেত্রে ভুল রোগনির্ণয় (diagnosis) হয়েছে।

উক্ত ডাক্তার প্রকাশ করেছেন যে ঐ ২২৫ জনের মধ্যে মাত্র দু'জনের পেটের ব্যথা সেরেছে এবং শতকরা ২৪ জনের অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

আরও আশ্চর্য্যের কারণ হচ্ছে এই যে অনেক রুগীর ২১ বার অপারেশন করিয়েও রোগ থেকে অব্যাহতি হয়নি। একজন একুশ বৎসর বয়স্ক ভদ্রমহিলার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তিনি ঐ রোগেই আটাশ বার বড় রকমের অস্ত্রোপচারে বিড়ম্বিত হয়েছেন।

মানসিক রোগী অনেক আছেন যাঁরা তাঁদের মনোবেদনা ভোলবার জন্যে অপারেশন টেবিলে পৌঁছে যান। তবে একটা কথা বোঝা যায় না—ডাক্তাররা কেন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও রুগীদের শরীরের অংশ কেটে বাদ দেন?

এখন অবশ্য অবস্থার উন্নতি হয়েছে। প্রত্যেকে প্রসিদ্ধ হাসপাতালে কোন রুগীর শরীরের কোন অংশ কেটে বাদ দিলে পরীক্ষাগারে সেটা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে ঠিক করা হয় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল কিনা। অবশ্য এ ব্যবস্থা সব হাসপাতালে নেই—অনেক চিকিৎসাগারে ডাক্তাররা কারণে অকারণে শুধু ছুরি চালাতেই ভালোবাসেন।

একটা মুস্কিল প্রায়ই এসে উপস্থিত হয়। মানসিক কারণে অস্ত্রোপচার করতে অস্বীকার করলে রুগী রেগে যায় এবং ডাক্তারের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তার নীচ ধারণা হয়ে পড়ে।

একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের কাছে এ রকম একজন রুগ্ন ভদ্রমহিলা এসে পড়েন। তাঁর স্বামীর সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতি ছিলনা। অপারেশনের প্রয়োজন নেই বলতেই তিনি ডাক্তারের ওপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং অন্য ডাক্তারের কাছে চলে যান। সেখানে দু'তিন রকমের অস্ত্রোপচার করা হয় তাঁর ওপরে, কিন্তু যন্ত্রণা তার কিছুতেই কমেনি।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যৌন সম্বন্ধের গোলমালই মেয়েদের পেটের ব্যথার প্রধান কারণ। তা ছাড়া ঐ কারণে অনেক লক্ষণই (Symptoms) আত্মপ্রকাশ করে। প্রচুর রক্তস্রাব, মেকী গর্ভসঞ্চার ঐ কারণ থেকেই হয়ে থাকে। গর্ভবতী হবার ও ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হবার প্রবল ভয়ের জন্যে অনেক মহিলা অপারেশন করতে এক কথাতেই সম্মত হয়ে যান।

—বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

কানপুরে রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

যুগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা বিস্তারের প্রয়াস নানাস্থানে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশে এক বা একাধিক শাখা বিস্তারে কষ্টকর প্রয়াস বিস্ময়কর ও প্রায় প্রত্যেক স্থানের এক এক মহাত্মার জীবনব্যাপী কষ্টসহিষ্ণুতা ও নিদারুণ অর্থ সঙ্কটের মধ্যে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয় ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের অসীম আনুগত্যের পরিচায়ক।

আজ কানপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে মাষ্টার মহাশয় বা পূজনীয় নেপাল মহারাজ তথা স্বামী নিত্যানন্দের কথা।

এই পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনের ব্রতধারী মহাত্মা বারাণসী হইতে আনুমানিক ১৯১৮ খৃঃ কানপুরে আসেন। তিনি ব্রহ্মচারী ও অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণ জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তা ভারতীয় এই ভাবধারায় তিনি ছিলেন প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও স্থানীয় কয়েকজন যুবকের সহায়তায় করাচিখানা মহল্লায় প্রথম এই আশ্রমের সূচনা হয়। প্রথম প্রচেষ্টায় যাহারা সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ শরৎ বিশ্বাস, মিলিটারি একাউন্ট অফিসের কেরাণি শ্রীরাখাল জানা ও হারনেস্ স্যাডলারী ফ্যাক্টরীর শ্রীভূপেন দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

মাত্র দশটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও ছাত্রাবাসের উদ্‌ঘাটন হয়। এই সময় ছাত্রাবাসে মাত্র চারজন ছাত্র রাখা হয়। সন্ধ্যায় নিয়মিত ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকের পড়াশুনা চলে। ইহার পর হরিজনদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় খোলা হয়। যাঁহারা এখানে ঐ সময়, সময় ও যত্ন লইয়া এ কার্যে সাহায্য করেন তাঁহাদের মধ্যে গ্যাস কোম্পানীর কর্মী শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বেগসাদারল্যাণ্ডের কর্মচারী শ্রীসহায় ভট্টাচার্য ও ক্যানাল ডিভিসনের শ্রীবসন্তলালের নাম উল্লেখযোগ্য। শুনা যায় সেই সময় হরিজনদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

ইহার ৩।৪ মাস পরে প্রথমে হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তাহার প্রায় দুই বৎসর পর অ্যালোপ্যাথি ঔষধেরও ব্যবহার শুরু করা হয়। হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণে ডাঃ শরৎ বিশ্বাস মনে-প্রাণে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসেন। পরে ডাঃ মনোজকুমার মিত্রও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় মিশন প্রতিষ্ঠিত এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে বহু সময় দিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ মিত্র সর্বপ্রথম একটি আলমারী দিয়া ঔষধপত্র সংরক্ষণে মিশনকে সাহায্য করেন।

মাষ্টার মহাশয় ও অপর কয়েকজন সুযোগ্য কর্মীর একান্ত চেষ্টায় সেই সময় প্রায় ২৫০ ব্যক্তি আশ্রমে নিয়মিত চাঁদা দিতে থাকেন। এই সময় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও কিছু কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিও সাহায্য করিতে আগাইয়া আসেন। বিনামূল্যে দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় এবং ৬ জন রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে কানপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীহাজামলের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন। তাঁহার একান্ত পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্যে মিশনের অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করে।

এই সময় স্থানীয় যুবকেরা মুষ্টি ভিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া দরিদ্র ভাণ্ডারের সৃষ্টি করেন। মিশনের কর্মীরা মাষ্টার মহাশয়ের সুযোগ্য ব্যক্তিত্বে নির্ভর করিয়া দরিদ্রকে সাহায্য দান, অসহায়ের পীড়ায় সেবা ও মৃত্যুতে সৎকারের ব্যবস্থা এই সকল সমাজ কল্যাণমূলক কার্যে মন ও প্রাণ সমর্পণ করেন।

মাষ্টার মহাশয় পূজ্যপাদ স্বামীজীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তিনি জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করার ব্রত লইয়াছিলেন। কাহাকেও তিনি হুকুম করিতেন না, কাহারও উপর তাঁহার জবরদস্তি ছিল না। কিন্তু পরিকল্পনা যাহাতে প্রকৃত রূপ গ্রহণ করে সেজন্য তাঁহার দৃঢ়তা ও যত্নের অভাব ছিল না।

পূজ্যপাদ স্বামীজী এই কথা বারংবার মনে করাইয়া দিয়াছেন যে সমাজ কল্যাণকারী বা প্রকৃত কর্মীর থাকিবে দৈহিক সুস্থতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। দেশের যুবকদের দৈহিক সুস্থতা যাহাতে বজায় থাকে সেজন্য এক্ষণে নিয়মিত দৈহিক ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা ছিল।

১৯২২।২৩ খৃঃ এই আশ্রমেই বিবেকানন্দ ইনিসটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বারাণসী হইতে শ্রীপ্রাণগোপাল ভট্টাচার্য এই সময় কানপুরে আসেন। তিনি একজন ব্যায়ামবিদ এবং তাঁহার পেশীবহুল দেহ সৌষ্ঠব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাণগোপাল বাবুর প্রচেষ্টায় এই সময় একটি সুদক্ষ ব্যায়াম অনুশীলনকারী দলের সৃষ্টি হয়। ব্যায়ামাগার স্থাপনায় সাহায্যকারীদের মধ্যে রোশনলালের নাম স্মরণীয়। তিনি এক ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন, এবং নিজেকে কবি এবং লিরিক—রচয়িতা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বিবেকানন্দ ইনিস্‌টিটিউটে এককালীন ৪০০৲ টাকা দান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, পূজ্যপাদ স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যের বৃহদাকার আলেখ্য এই সময় তিনি মিশনে স্থাপন করেন।

কানপুরের তদানীন্তন কালেক্টর সাহেব মিঃ মুলরো প্রাণগোপাল বাবুর পেশী সঞ্চালন ও স্বাস্থ্য দর্শনে অতিশয় মুগ্ধ হন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় এই সময় মলের নিকটে 'ম্যাবে' মাঠে বিবেকানন্দ ইনিস্‌টিটিউটের এক ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। খরচ-খরচা বাদে প্রায় ২৫০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। মিঃ মুলরো ডারহাম লাইট ইনফেন্ট্রির বাদক দলকে এই অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করিয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করেন।

এই সময় মাষ্টার মহাশয় মিঃ মুলরোর সহায়তা লাভ করিয়া তাঁহারই নির্দেশে সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এবং মিঃ মুলরোর সহায়তায় বার্ষিক ৮০০৲ টাকার মত সাহায্যের ব্যবস্থা হয়।

আশ্রম এই সময় মলের নিকটবর্ত্তী রেজা মঞ্জিলে স্থানান্তরিত হয়। তখন আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ জন। কাণপুরে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০।৩০০০। বহু বাঙ্গালী এই সময় নিজেদের কর্ম অনুষ্ঠানের পর মিশনের কোন না কোন কাজে আত্মনিয়োগ করিতেন।

মাষ্টার মহাশয় এই সময় বর্ত্তমান মিশন ভবনের পরিকল্পনা নিজে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের নিকট তিনি এই পরিকল্পনা রূপায়নের প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে ব্যক্ত

করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃঃ রামকৃষ্ণ নগরে সেই পরিকল্পনা অনুসারে আশ্রম নির্মিত হয়। প্রায় ২০ বৎসর অক্লান্ত সাধনা করিয়া তিনি বর্তমান মিশনের রূপ দিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজেরা অবশ্য সর্ব্ব সময়েই বলিয়া থাকেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্য্য তিনিই করেন। কিন্তু সেই সকল ব্যক্তিগত নমস্ত যাঁহাদের অক্লান্ত ধৈর্য্য ও পরিশ্রমে এই সব আশ্রম গঠিত হয় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব প্রচারে সহায়তা করে। এখন অবশ্য এই আশ্রমে অন্যান্য আশ্রমের মতো বহু গণ্যমান্য পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। বর্তমান রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে প্রায় ৫৫০ জন ছাত্র পড়াশুনা করিতেছে। কানপুরের ইহা এখন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলা চলে। এই বিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও পরীক্ষার ফলাফল সত্যই আজ গৌরবের বস্তু। এই বিদ্যালয়ের বর্তমান বার্ষিক আয়-ব্যয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ৫০০০ টাকার বেশী কাহারও এককালীন দান নাই। মাষ্টার মহাশয়ের কথা স্মরণ করিলে তাঁহার দুইজন সুযোগ্য শিষ্যের কথাও মনে করিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদে ইঁহারা দুইজনেই জীবিত এবং মাষ্টার মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনার প্রকৃত উত্তরাধিকারী। প্রথম উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ স্বামী চিদাত্মানন্দ বা অলপী মহারাজ। ইনি বর্তমান মিশনের সহসম্পাদক ও এক কথায় বর্তমানে এই আশ্রমের কর্ণধার, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের উচ্চশিক্ষিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি একজন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের হিন্দি ব্যাখ্যায় ইনি সর্বদা সকলকে মুগ্ধ করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীপাতিরাম, বর্তমান রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষা ইঁহার ব্রত এবং ইনিই এই শিক্ষা-মন্দিরের প্রকৃত স্তম্ভস্বরূপ।

মাষ্টার মহাশয় প্রথম যখন আশ্রম স্থাপনা করেন, সেই সময় তদানীন্তন যুবকসম্প্রদায় তাঁহাকে অতীব সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, এমন কি কয়েকজন যুবক তাঁহাকে দৈহিক নির্যাতন করিবারও প্রয়াস করিয়াছিল। বহু সময় তাঁহার প্রতি অতিশয় অপমানকর উক্তি তাঁহারা প্রয়োগ করিত। কিন্তু তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ক্ষমাপূর্ণ ব্যবহার পরে এই সমস্ত যুবককে তাঁহার অনুগামী করিয়াছে।

মাষ্টার মহাশয় সর্ব ঋতুতে বাহিরে শয়ন করিতেন, আশ্রমের প্রারম্ভে আবদুস বলিয়া তাঁহার এক ছাত্র ছিল, আবদুস আশ্রমবাসী এবং সে একটি সারস পক্ষী সঙ্গে আনিয়াছিল, সারস পক্ষীটি সারাদিন এদিক-ওদিক চরিয়া বেড়াইত, কিন্তু প্রতি রাত্রে মাষ্টার মশাইয়ের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া যেন তাহাকে পাহারা দিত, মাষ্টার মহাশয় নিজেও এই ব্যাপারটি বড় আশ্চর্যজনক মনে করিতেন।

মাষ্টার মহাশয়কে, 'মাষ্টার মহাশয়' বলার কারণ তিনি কানপুরের এ, ভি, স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং দু'একটি প্রাইভেট টিউসনিও করিতেন, অবশ্য তাঁহার আয় তাঁহার সামান্য ভরণ-পোষণের ব্যয়ের পর আশ্রমের কার্যে ব্যয়িত হইত, পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যানন্দ বা শ্রীনেপাল মহারাজ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কৃপা লাভ করেন, বারাণসীর আশ্রমে থাকাকালীন তিনি কয়েকজন স্বদেশী 'আন্দোলনের বিপ্লবীর সংস্পর্শে আসেন, তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ অতঃপর তাঁহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে মিশনের সহিত বাহ্য সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, অতঃপর নেপাল মহারাজ কয়েক বৎসর প্রায় অজ্ঞাতবাস। করেন ও ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ বা ঐ সময় কানপুরে আসিয়াছেন, কানপুরের এ, ভি বিদ্যালয় তখন প্রাথমিক পাঠশালা ছিল, তাঁহার নিষ্ঠা ও সেবায় এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নতি হয় এবং প্রায় ১৯৩১ অবধি তিনি এই বিদ্যালয়ের গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস তাঁহার কিরূপ ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবের সময় তাহা কতবার কত রকমে প্রকাশ পাইয়াছে, একবারের কথা তদানীন্তন কর্ম্মী শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, সেবার যথারীতি ২০০০|৩০০০ দরিদ্রনারায়ণকে খাইবার জন্য যথারীতি টিকিট দেওয়া হইয়াছে, দরিদ্রনারায়ণদের পূর্বেই টিকিট বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। সমস্ত করাচি খানার রাস্তায় প্রায় মল পর্য্যন্ত দরিদ্রনারায়ণদের ছয়বার বসাইয়া পেট ভরাইয়া খাওয়ানো হইত। খাওয়ানোর জন্য বরাদ্দ হইত পুরি, একটি তরকারি ও লাড্ডু, কর্মীরা দেখিলেন এত লোকের খাদ্য হিসাবে ছিল মাত্র একবস্তা আটা ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র। তাঁহারা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং বারংবার মাষ্টার মহাশয়কে ভাণ্ডারের অবস্থার কথা জানাইলেন এবং তাঁহাকে পুনঃপুনঃ উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্বাস কিন্তু অবিচল, বোধ হয় পূজ্যপাদ স্বামীজি ও অন্যান্য গুরুভাইদের প্রথম জীবনের মঠের কথা মনে হইয়া থাকিবে, শুনা যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে খাইব, অথবা উপবাস করিয়া থাকিব কাহারও নিকট কিছু চাহিব বা বলিব না, এইরূপ স্থির করিয়া স্বামীজি ও তদানীন্তন অন্যান্য গুরুভ্রাতারা পূজাপাঠ শেষ করিয়া চাদর মুড়ী দিয়া শুইয়া রহিলেন, কয়েক ঘণ্টা পর কেহ দ্বারে ধাক্কা দিতে লাগিল, স্বামীজির আজ্ঞায় দরজা খুলিতে দেখা গেল লালাবাবুর বাড়ীর পূজার প্রচুর প্রসাদ লইয়া একটি লোক সাধুমহারাজদের দিতে আসিয়াছে। এইরূপ অসংখ্যবার শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া বহু সন্তান তাঁহার কৃপা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। নেপাল মহারাজও কর্ম্মীদের ধৈর্য ধরিতে বলিলেন। তিনি অভয় দিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন যে ঠাকুরের কাজ শ্রীশ্রীঠাকুরই করিয়া দিবেন। কর্ম্মীরা সেদিন অবাক বিস্ময়ে দেখিয়াছিলেন যে কিরূপ ভাবে বস্তা বস্তা আটা ও আনুসঙ্গিক জিনিষপত্র একের পর এক রসদদার পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন। কালীবাবু বলিলেন, আমরা বিস্মিত হইলাম যে মাষ্টার মহাশয়ের অদম্য বিশ্বাসের জয় হইল, এবং এই দরিদ্রনারায়ণ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিল এবং কোনও জিনিষের অভাব হইল না।

আবাসিক ছাত্রদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল তাহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ১৯৬৩ খৃঃ বা ঐ সময় আবাসিক ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ জন। তাহারা ছিল সকলেই দরিদ্র এবং মিশনের স্বল্প আয়েই সকলের ভরণ পোষণ চালাইতে হইত। মাষ্টার মহাশয়ের সমস্ত আয় মিশনে ব্যয়িত হইত। অলপী মহারাজও শিক্ষকতা করিয়া প্রায় ১০০ টাকা পাইতেন। এবং তাহার সমস্তটাই মিশনের কাজে ব্যয়িত হইত। আর্থিক অনটনের জন্য অলপী মহারাজ প্রমুখ মাষ্টার মহাশয়ের একান্ত অনুগত কর্মীরা অনুযোগ করতেন ও ছাত্র সংখ্যা কমাইবার জন্য বারংবার মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করিতেন, মাষ্টার মহাশয়

বিব্রত বোধ করিতেন। শান্ত স্বভাবের জন্য উনি বিতর্ক হইতে বিরত থাকিতেন। অক্ষম বলিয়া তিনি এই অবস্থার জন্য অতীব মানসিক কষ্ট অনুভব করিতেন কিন্তু শ্রীশ্রী ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অবিচল আস্থার জন্য তিনি কিছুতেই এই মহা কর্তব্যবোধ হইতে বিরত হইতেন না। তিনি কাহাকেও এই অভাবের কথা বলিতে পারেন নাই কিন্তু নিদারুণ মনস্তাপে অতিশয় অধীর হইয়াছিলেন।• এই নিদারুণ অর্থ সংকটের সময় কোনও উপায় না দেখিয়া তিনি অন্য সকলের অজ্ঞাতসারে এক কাবুলিওয়ালার নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অহেতুকী দয়া এবারেও সকলকে বিস্মিত করিল। পরদিন কানপুরের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী শ্রীকমলাপতির জননী প্রায় একমাসের মত চাউল, ডাইল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তখনকার মত অর্থ সংকট দূর হইল।

প্রায় এই সময় আর একবার ৺দুর্গাপূজায় আশ্রমবাসী ছেলেদের নূতন কাপড় জামার কোনও ব্যবস্থা করা হইয়া উঠে নাই। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় চিন্তিত কিন্তু তাঁহার স্বভাবজাত শান্তমূর্তির কোনও পরিবর্তন প্রকাশ পাইল না। তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না এবং কাপড় জামা যোগাড় করিবার কোনও উদ্যোগ করিলেন না, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ তিনি নিজেই করেন, ৺পূজার দুই তিন দিন পূর্বে শ্রীছাঙ্গামল অযাচিতভাবে মিশনে আসিয়া নগদ ১০০৲ টাকা ছেলেদের জামা কাপড়ের জন্য দিয়া গেলেন। মাষ্টার মহাশয়ের আনন স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল এবং তাঁহার সমস্ত অবয়বে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস ও অবিচলিত মনোভাবের প্রকাশ পাইল। মানুষের দোষ না দেখিয়া তাহাকে ভালবাসা বা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কথায় অপরের দোষ না দেখিয়া নিজের দোষ দেখা এবং সমস্ত জগৎকে ভালবাসা, এই অনুশাসনটি নেপাল মহারাজের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল।

কালীবাবু বলিলেন, একবার মিশনের চাঁদা তুলিলাম প্রায় ৬৩৲ টাকা। একদিনে এত চাঁদা উঠাইতে পারিয়া ভারি আনন্দ হইল। এর পরে ক্লাবঘরে টাকাশুদ্ধ জামা টাঙ্গাইয়া রাখিয়া খেলাধূলা করিলাম, পরে পুনরায় জামা গায়ে দিয়া বাড়ী আসিয়া জামা খুলিয়া রাখিলাম। টাকার কথা মনে নাই। পরদিন নেপাল মহারাজের নিকট টাকা জমা দিতে গেলাম। মন-মেজাজ দুই-ই খুশী, কারণ সর্বাপেক্ষা বেশী আদায় আমিই করিয়াছি। কথাটা গর্ব ভরিয়া সকলকে বলিলাম এবং মাষ্টার মহাশয়ের নিকট আব্দার করিয়া মিষ্টি খাইতে চাহিলাম। মাষ্টার মহাশয় স্নিগ্ধ হাস্যে রাজি হইলেন। তখন টাকা বাহির করিতে গিয়া দেখি, পকেটে টাকা নাই। ক্লাব ঘরেই কেহ টাকাটি আত্মসাৎ করিয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম এবং দাদার নিকট হইতে টাকা লইয়া পুনরায় নেপাল মহারাজের নিকট গিয়া টাকাটা তাঁহার হস্তে দিলাম। আমার দাদা মিশনের চাঁদার টাকা হারাইয়াছি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা দিলেন। মাষ্টার মহাশয় পূর্ব স্বীকৃতি অনুযায়ী মিষ্টি আনিয়া খাওয়াইলেন এবং পরে অন্তরালে গিয়া আমাকে ৬৩৲ টাকা ফেরৎ দিয়া স্নেহভরে বলিলেন, টাকাটা তুই যখন হারিয়ে ফেলেছিস তখন আর কি করে দিবি। এ টাকার দরকার নেই। আমি অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বলিলাম, মাষ্টার মশাই তা হতে পারে না। মিশনের জন্য সাধারণের কাছ থেকে উঠিয়েছি। এটা হারিয়ে গেলে বা চুরি গেলে আমাকেই তার খেসারত দিতে হবে। মাষ্টার মহাশয় সেইরূপ স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, তোরা তো সব সময়েই মিশনের জন্য এত পরিশ্রম করছিস, এ টাকাটা-খোয়া যাওয়ায় কি আর এমন ক্ষতি হবে। এ টাকাটা তুই বাড়ী নিয়ে যা। আমি মিশনের বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। মনটা যেন কিরূপ হইয়া গেল। আমার চক্ষু জলপূর্ণ হইল এবং মাষ্টার মহাশয় কি করিয়া ধারণা করিলেন যে, আমি টাকাটা হারাইয়া ফেলিয়াছি তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার স্নেহপূর্ণ এবং একান্ত আপন জনের মত ব্যবহার আমাকে অভিভূত করিল।

আমার মনে পড়িল এইরূপ মহাত্মার বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র করিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে যাহাতে ভালভাবে দৈহিক নির্যাতন করিতে পারি সেজন্য চেষ্টিত হইয়াছিলাম, ঐদিন ঐ মুহূর্তে আমার মনে হইল মাষ্টার মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া যেন কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করি।

পূজ্যপাদ মাষ্টার মহাশয় কখনও কখনও বলিতেন, ওরে বেশীক্ষণ ধ্যান ও জপ যদি না করতে পারিস দিনান্তে একবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিস, আমাকে মানুষ করে দাও, এতেই কাজ হবে।

মাষ্টার মহাশয় আর ইহজগতে নাই। নবনির্মিত আশ্রমে বসবাস করার পর ১১৪৩ খৃঃ কেদার বদরী যাত্রার মানসে তিনি কানপুর ত্যাগ করেন। কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছাইবার পর তাঁহার মনে হয় শীঘ্রই তাঁহাকে ইহজগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি হরিদ্বার আশ্রমে ফিরিয়া আসেন এবং অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া ৩০শে মে ১১৪৩ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর পাদপদ্মে লীন হন।

পূজ্যপাদ স্বামীজী বলিয়াছিলেন, যাঁহারা পরের জন্য জীবন ধারণ করেন তাঁহারাই প্রকৃত জীবন ধারণ করেন মাষ্টার মহাশয়ের জীবনে এই অনুশাসনের প্রকৃত অর্থ প্রতিফলিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠায় বহু ত্যাগী মনীষীর অলিখিত জীবনের একটি লিপিবদ্ধ হইল। নিজ ইষ্টদেবতা বা ইষ্টধর্ম অনুশীলনে ধূপের মত নিজেকে সমর্পণ করা ও কোনও রূপ স্বার্থে নিজেকে বিচলিত না করিয়া অখ্যাত ও অজ্ঞাত থাকিয়া নিজেকে আজীবন পরার্থে সমর্পণ করার এই দৃষ্টান্ত মনকে শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে এবং এই সমস্ত মহাপুরুষদের শ্রীচরণে বারংবার মস্তক আনত করিতে ইচ্ছা করে। কানপুরবাসী সকলের সহিত এই মহাত্মার শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাই।

কেনাকাটা

মাছ ধরা—রকমারী পদ্ধতি

বিবর্তনবাদ অনুসারে মাছ হলো মানুষের আদি পুরুষ—মৎস্য থেকেই ক্রমিক ধারায় মনুষ্য—কিন্তু এমনি দাঁড়িয়ে গেছে—আজ নয়, স্মরণাতীত কাল থেকেই, সেই মাছই মানুষের একটি প্রধান খাদ্য-সামগ্রী। জল থেকে তাকে ডাঙ্গায় তোলবার জন্যে মানুষ রকমারী পদ্ধতি তাই চালু করেছে—মাছ ধরাটাই পরিণত হয়েছে তার একটি মস্ত নেশায় ও পেশায়।

জলের বাসিন্দা এই মাছ—পুকুর, খাল, বিল, হ্রদ, নদী, সাগর, সব জায়গায় এর রাজ্য ছড়িয়ে। স্থলের অধিবাসী মানুষ একে ধরবার জন্যে সব সময়ই ব্যস্ত। কিন্তু ইচ্ছে করলেই সে হাতে ধরা দেবার পাত্র নয়; ধরবার কৌশল খুঁজে বের করা সুরু হয় এরই কারণে। অল্প জলে নিছক হাতে পায়ে চেপে মাছ ধরা আগে অনেক জায়গায় চলতো, এখনও যে না চলে এমন নয়। তবে এই পদ্ধতিটি উল্লেখ করার মতো কিছু হতে পারে না। কারণ, এত সময় দিয়েও কয়টি মাছ ক'জনার পক্ষে কবলিত করা সম্ভবপর?

পল্লী-এলাকা যেখানে জলাভূমি বেশি, সে সব স্থলে দেখতে পাওয়া যায়, কত অভিনব উপায়ে মাছ ধরা চলেছে। ছিপ-বঁড়শি সাহায্যে, জালের সাহায্যে মৎস্য শিকার প্রায় সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থা চলতি বলা যায়। বঁড়শি-ছিপ যেমন রকমারী আছে, মাছ ধরা জালও আছে বিচিত্র ধরণের—যেখানে যে-টি সুবিধাজনক, সেখানেই সেইটির ব্যবহার। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে টোপ (নানা জাতীয়) ফেলতে হয়—লুব্ধ মাছ তা গিলতে যেয়েই বড়শিতে আটকে পড়ে। নানা ধরণের চার ফেলে বসে থেকে হুইল (চরকি) ছিপগুলিতে মাছ ধরায় সাধারণতঃ আনন্দ হয় প্রচুর এবং এ শখের ব্যবস্থাটি বহুদিন থেকেই চলতি।

মাছ-ধরার জাল নানা দেশে নানারকম দেখতে পাওয়া যায়। সব জালে সব রকমের মাছ ধরা পড়বে, এমনটি আশা করা চলে না। আবার, যে-জালে পুকুরে বা খালে বিলে মাছ ধরা হবে, নদীতে বা সাগরে সে জাল স্বভাবতঃই অকেজো। পদ্মা বা গঙ্গার মাছ ধরা পদ্ধতি বা সরঞ্জাম একটু ভিন্ন ধরণের লক্ষ্য করা যায়। দেশাঞ্চলে 'কমুই জাল' (ছোট) 'ধর্ম্মজাল' খেয়া জাল, বেড় জাল (বড়)—এ সব রকমারী জাল চালু। বেড় জালে যেখানে জাল জলে টেনে নিয়ে মাছের ঝাঁককে ঘেরাও করতে হয়, কমুই জাল ঠিক ঐ ধরণের বলা চলে না। শেষোক্ত জালটি বাহুবন্ধন থেকে ছুঁড়ে ফেলতে হয় জলে, তারপর আবার সেটি গুটিয়ে আনতে হয় একটু সময় পরই।

মাছ ধরার পদ্ধতি বা সরঞ্জাম এ দেশের পল্লী অঞ্চলেই আরও নানা ধরণের দেখতে পাওয়া যায়। 'পলো', চাই শড়কি, বল্লম—এ সবের মারফতও বহু জায়গায় মাছ শিকার করা হয়। 'পলো' (বাঁশের তৈরী) দিয়ে ঝাঁপিয়ে মাছ ধরা হয় জল থেকে, তবে খুব গভীর জলে এ ব্যবস্থায় কাজ চলে না। চাই এক প্রকার মাছ ধরা কঠিন ফাঁদ—জলে বাঁশের তৈরী এ জিনিসটি পেতে রাখা হয়। মাছ এতে ঢুকতে পারে, কিন্তু ঢুকলে বের হবার পথ খুঁজে পায় না। শড়কি বা বল্লম মাছ কোথায় আছে নিশ্চিত হয়ে, তবে তীরের মতো ছুঁড়তে হয়। বল্লম আবার এক ফলক বা একাধিক ফলক বিশিষ্টও হয়ে থাকে।

নৌকাযোগে নদী বা সমুদ্র থেকে বৃহৎ জালের সাহায্যে মাছ ধরার পদ্ধতি চলতি আছে অনেক দেশেই। উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলের ধীবরদের এই ভাবে মৎস্য শিকার করতে প্রায়শঃ দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য মাছ ধরার নানা বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে। এ সকল যান্ত্রিক সরঞ্জাম নিয়ে দূর দরিয়ায় যেয়েও অনেকটা সফলতার সঙ্গে মাছ ধরা সম্ভবপর। জাপান, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে মাছ ধরবার ব্যাপারে বিচিত্র পদ্ধতি চালু আছে। এমনও দেখা যায়, যেখানে বড় বড়শিতে মাছ হয়তো ধরা হলো, কিন্তু সেই মাছকে অমনি হাতে পাবার ক্ষমতা নেই। উপায় কি হ'তে পারে? অমনি দেখা যাবে, মৎস্য শিকারী একটা বল্লম ছুঁড়ে মেরেছে সেই মাছটি লক্ষ্য করে—বল্লমের অপর দিকটিতে রয়েছে একটি রবার সরঞ্জাম, যেটি জলে ভেসে থাকবেই। এমনি ক্ষেত্রে লড়াই দিয়ে দিয়ে একটি মুহূর্ত্তে হার স্বীকার না করে মাছ পারে না।

গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারের জন্যে আর সব দেশের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ ও উন্নত ধরণের পদ্ধতি কার্য্যক্ষেত্রে চালু করছে। হল্যাণ্ড থেকে এখানকার সরকার কয়েকখানি মাছধরা জাহাজ ক্রয় করেছেন। ট্রলারের সাহায্যে মাছ ধরতে যেয়ে তাঁরা সফল হয়েছেন, প্রথম থেকেই তাঁদের এই দাবী। কোন কোন দেশে বিজ্ঞান সম্মত এমন পন্থা অনুসরণ করা হচ্ছে—যা সত্যি অভিনব। সাবমেরিনের মতো একটি জাহাজকে সাগর-জলের নীচু দেশে ঘুরে বেড়াতে পাঠানো হয়, মাথায় শক্তিশালী ফোকাস আলোতে মাছ কোথায়, জলের তলা থেকে নির্দ্দেশ দেয় এ উপরের মানুষকে। তারপরই ব্যস, মাছ ধরা আর ততটা অসুবিধের হয়ে থাকলো না।

হাজারো রকম পদ্ধতিতে মাছ ধরা যায়, কিংবা ধরা হচ্ছে, এ আমরা নিশ্চয়ই মেনে নেব। এর ভেতর একটি বিশেষ পদ্ধতি উল্লেখ করা যায়—যেটি নিয়ে পাপুয়া ও নিউগিনির স্থানীয় বাসিন্দারা পরীক্ষা চালিয়েছেন দীর্ঘদিন। এই পদ্ধতি বা কল-কৌশলের মূল অঙ্গ হলো একটি করে মাকড়শার জাল। এখানে জালবুনন কাজটি যে মাকড়শা করছে, বুঝতে হবে সে বিরাট আকৃতির। এই আঁটালো জালে (ফাঁদ) জড়িয়ে জলের দুরন্ত মাছ আটকা পড়ে যায় অমনি। ঝড়ো হাওয়া থাকাকালীন সাগরজলে ঘুড়ির সহায়তায় মাছ ধরার পদ্ধতিও সে সব দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে। তীর-ধনুক মারফত মাছ ধরার রীতি চালু আছে দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি জায়গায়। উড়ন্ত মাছ আটক করার জন্যে কয়েকটি অভিনব উপায় অনুসরণ করা হয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে। চীন, মালয়, জাপান প্রভৃতি দেশে মৎস্য শিকারে ট্রেনিং দেওয়া পাখির সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এসব ক্ষেত্রে এবং অন্য আরও কতক জায়গায় রাত্রিতে জোর আলো জ্বালিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে মাছ ধরা হয়।

একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মাছ ধরা পদ্ধতি চালু করেছে স্কটিশ মেনটিয়েথ লেক (হ্রদ) অঞ্চলের যুব বাসিন্দারা। তারা লেকের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের (ইঞ্চমাহোম) ওপর কতকগুলি রাজহাঁসকে নিয়ে যায়। হাঁসগুলির পায়ে পায়ে টোপসমেত বঁড়শির লহর জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর ছাড়া হয় ওদের জলে একই সঙ্গে। জলক্রীড়া শেষ করে ওরা লেক পার হয়ে বাড়ি ফিরবার জন্যে এক সময় ব্যস্ত হয়। ইত্যবসরে কিন্তু কয়েকটি করে 'পাইক' মাছ আটকিয়ে পড়ে রাজহংসগুলির পায়ে পায়ে। মাছে ও পাখিতে অমনি লড়াই বেধে যায়। অল্পক্ষণ যেতে না যেতেই মাছকে হার স্বীকার করতে হয়, আর আনন্দোচ্ছ্বাস করবার একটা মস্ত সুযোগ মিলে যায় যুবকদের।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খাওয়ার জন্যেই মৎস্য শিকার বা মাছ ধরা, এর ওপর কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। কিন্তু তবু বলতে হবে—খাদ্য হিসাবে মাছ মূল্যবান হলেও এ থেকে প্রাপ্ত সার, তৈল, হাড় প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তাও উপেক্ষা করার নয়। বিশ্বময় মাছের বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্যে মাছের চাষ বাড়ানো প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন মাছ ধরবার আরও নতুন নতুন উপায় বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার।

চা ও কফি'র ব্যবহার

আজকাল এমন দেশ প্রায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে চা-এর প্রচলন নেই। কফিও নগরী বা বড় বড় সহরগুলিতে তো বটেই, আরও বেশ দূরবর্তী অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। মোটের ওপর এ যুগে পানীয় হিসাবে চা ও কফি'র ব্যাপক ব্যবহার চলতি আর এ সত্যি বাড়বে বই, কখনই কমবে না।

ক্ষণিকের জন্যে হলেও চা ও কফি দু-এরই একটু মাদকতা আছে, এ স্বীকার্য্য। অন্ততঃ ঝিমিয়ে পড়া স্নায়ুগুলিকে সচেতন করে তুলতে এক কাপ চা ও কফির মূল্যই সময়ে কম নয়। এ অজানা নয় মোটেই চা-এর নেশা যাকে একবার পেয়ে বসেছে, তার পক্ষে সেটি সহসা ছাড়তে যাওয়া মুস্কিলের ব্যাপার। তেমনি প্রত্যহ কফি পান করে যারা অভ্যস্ত, ইচ্ছামাত্র কফি ছাড়তে পারেন না তারা। কফি বা চাএর নেশা বলতে আসলে এই—মাত্রাতিরিক্ত খেতে গেলে এতেও অবশ্যি বিপদ আসবার কারণ হয়।

আজকের দিনের মতো ঘরে ঘরে চা এসে পৌঁছতে বেশ কয়েক শতক সময় লেগেছে। প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে চীনারা চা-এর নেশায় অন্যদের তুলনায় বেশি রকম মত্ত। জল ফুটিয়ে খাওয়ার যে নিয়ম বা পদ্ধতি, এ বোধ হয় চীনেই প্রথম চালু হয়। যখন দেখা গেলো সাদা ফুটন্ত জলে সুবিধা হচ্ছে না, তখনই তাতে ওরা লতা-পাতা মিশিয়ে খেতে সুরু করে। খেতে খেয়ে দেখতে পায় তারা একটি বিশেষ পাতায় পানীয়টি তাদের সুস্বাদু হয় বেশি আর এ পাতাটিই হলো কিন্তু চা পাতা।

কফির ব্যবহার কিভাবে চলতি হলো, সেই নিয়েও কথা-কাহিনী ঠিক কম নেই। একটি কাহিনী—সেকালের আবিসিনিয়ার একজন মঠাধ্যক্ষ দেখলেন তাঁর পালিত ছাগগুলি যথেষ্ট তাজা, অথচ মঠের বাসিন্দারা সবাই নিস্তেজ, উপাসনা করতে যেয়ে তাদের যখন তখন ঘুম পেয়ে যায়। বিশেষ নজর দিতেই মঠাধ্যক্ষের দৃষ্টিতে পড়লো, সন্নিহিত একটি গাছের পাতা (কফি) খেয়েই মঠের ছাগকুলের এমনি স্বাস্থ্য। সেই পাতা মঠের সকল বাসিন্দাই তখন ব্যবহার করতে সুরু করেন, সুফলও নিশ্চয়ই পেলেন যার জন্যে প্রচার পেয়ে যায় ব্যাপারটি দূর দেশেও।

চা ও কফি ক্ষেত্র বিশেষে ওষুধেরও কাজ করে থাকে, পরীক্ষাতেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রমক্লান্তি দূর করে সাময়িকভাবে হলেও মনে স্ফূর্তি এনে দিতে, দীর্ঘ সময় ধরে বিশেষভাবে অধিক রাত্রি অবধি কাজ করবার শ্রম জোগাতে, এ দুই-এর ক্ষমতা নিশ্চয়ই যথেষ্ট। শীত-গ্রীষ্ম—সকল আবহাওয়াতেই এদের ব্যবহার চলে এবং প্রথমেই যা বলতে চাওয়া হলো, মাত্রা রেখে খেলে এতে সাধারণতঃ শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। বেশিরকম হয়তো মাথা ধরেছে কিংবা গা-হাত-পা ব্যথা করছে অসম্ভব, এমনি সময় গরম গরম এক পেয়ালা চা বা কফি প্রতিষেধকের কাজ করতে পারে।

এক্ষণে দেখা যাক—ভারতে চাহিদার তুলনায় চা ও কফির উৎপাদন অবস্থা কিরূপ? এ কথা ঠিক, এদেশে চা-এর এমনি ব্যাপক ব্যবহার চালু হয়েছে, দীর্ঘকালের ব্যাপার নয়। তবু হিসাবে দেখা যায় পৃথিবীর মধ্যে চা-উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম পর্য্যায়ে। এর ভেতর শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ চা-ই পশ্চিমবঙ্গ (দার্জিলিং ও ডুয়ার্স অঞ্চল) ও আসামের বাগানগুলিতে উৎপাদিত হয়। চা উৎপাদনের অপর কেন্দ্রগুলি—রাঁচী, হাজারীবাগ, ছোটনাগপুর, পাঞ্জাবের কাংরা উপত্যকা, উত্তর প্রদেশের দেরাদুন, কুমায়ুন প্রভৃতি এলাকা মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চল, কেরালা রাজ্য, মহীশূর ও ত্রিপুরা প্রভৃতি।

ভারতীয় চা-এ ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে অসুবিধা হতে পারে না। এখানে উৎপাদিত চা-এর (যেমন, ১৯৫৩ সালে ৬৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড) শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই বাইরে রপ্তানী হয়ে যায় আর চা রপ্তানী ব্যাপারে ভারতের স্থান বিশ্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও আয়ার্ল্যাণ্ডে ভারতীয় চা রপ্তানী হয় মোট রপ্তানীর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ। বৃটেন ভারতীয় চা-এর একটি মস্ত বড় বাজার। কানাডা ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও চা রপ্তানী হয়ে যায় এখান থেকে কম নয়।

এদিকে কফি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের স্থান কিন্তু এখনও অনেক তলার দিকে। এখানে মহীশূরেই অবশ্যি সবচেয়ে বেশি কফি উৎপাদিত হয়—এর পর নাম করতে হয় মাদ্রাজের। ১৯৫৪-৫৫ সালের একটি হিসাব—ভারতে কফি উৎপাদনের মোট

পরিমাণ ছিল সে বছরে প্রায় ৫ কোটি ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণী, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় কফি রপ্তানী হয়ে যায় অনেক আগে থেকেই।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চা ও কফির একটি প্রকাণ্ড বাজার ইউরোপ; ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতকে চা খাওয়ার রীতি চালু হয়, তবে প্রথম পর্য্যায়ে সেটি ছিল অভিজাত মহলের বিলাস স্বরূপ। ইউরোপের মাটিতে কফির ব্যবহার চলতি দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতেই এবং লণ্ডনের বুকে দোকান খুলে কফি বিক্রী সুরু হয় ১৬৩২ সালে। এক্ষণে ইউরোপের বাজারে কফি ও চা-এর অভাবই নেই। চা ও কফির বাজার বিশ্বে এখনও প্রচুর সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে, এ সহজেই অনুমেয়।

কৃষি বিপণন ও ভারত

যুগ-যুগান্তকাল ধরে ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ বলে পরিচিত। স্বাধীন হওয়ার পর শিল্পায়নের উদ্যম চললেও এখন অবধি কৃষিই ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা ব্যাপক ভাবে এখানে চালু করার প্রয়োজনীয়তা তাই খুব বেশী।

কৃষি বিপণনের দিকে সরকারী সক্রিয় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, আজ প্রায় ২৫ বছর হলো। এই সময়ের ভেতর আলোচ্য ব্যবস্থার অগ্রগতি বিরাট রকমের কিছু হয়নি বটে, কিন্তু সেদিকে যে অব্যাহত চেষ্টা রয়েছে, এই বড় কথা। একটি সরকারী হিসাব থেকে বিপণন ব্যবস্থায় এ যাবৎ ১১৫টি পণ্যের মান নির্দ্ধারিত হয়েছে, জানতে পারা যায়।

বিক্রয় মারফত কৃষিজীবী যাতে উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গত মূল্য পেতে পারেন, বিপণন ব্যবস্থার এ একটি লক্ষ্য। সেজন্য সরকারী বিপণন ও পরিদর্শন ডাইরেকটরের তত্ত্বাবধানে উন্নত পদ্ধতিতে পণ্য-শস্যের বিন্যাস ও শ্রেণীবিভাগ, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং পণ্যের উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি বিপণনের প্রধান কাজই হলো কৃষিপণ্য, পশুপাক্ষী ও তদ্‌জাত দ্রব্যসমূহের সঠিক শ্রেণীবিন্যাস। ভেজাল ও নকল জিনিসের ভিড়ে খাঁটি জিনিস যেন হারিয়ে না যায়, সেইটির একটি রক্ষাকবচ এই বিপণন-ব্যবস্থা। ঠিক ভাবে পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও মাননির্ণয় হলে বিদেশের কাছ থেকেও যথেষ্ট সাড়া পাওয়ার কারণ ঘটে আর বিপণন ব্যবস্থার গুরুত্বও সেক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি না হয়ে পারে না।

১৯৩৭ সালের কৃষিপণ্য (শ্রেণীবিন্যাস ও বিপণন) আইন অনুসারে এদেশে এই ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম চালু হয়। গম, আটা, চাউল, ঘি, মাখন, তেল, ডিম, তুলা, ফল ও ফলজাত দ্রব্য, গুড়, আলু, আখ প্রভৃতির শ্রেণীবিন্যাসের সুযোগ রয়েছে এই ব্যবস্থাধীনে। রপ্তানীযোগ্য বলে পশম, তামাকপাতা, শণের আঁশ, শূকরের কুঁচি, চন্দনকাঠ, চন্দনতেল—এ কয়টির ক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস না করলেই নয়।

বিপণন ব্যবস্থা অনুসারে খাদ্যশস্য, শণের আঁশ, পশম, শূকরের কুঁচি প্রভৃতির বেলায় জোর দেওয়া হয় গঠন প্রকৃতির ওপর। কিন্তু ঘি ও খাদ্য তেলের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা অন্যরূপ—এ সকলের ব্যাপারে রাসায়নিক বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে অবশ্য কতকগুলো স্থানে গবেষণাগার সমেত গ্রেডিং (শ্রেণীবিন্যাস) কেন্দ্র খুলেছেন। কানপুর ও রাজকোটের নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগারে প্রেরিত হয় ঘি ও তেল আর বোম্বাই ও জামনগরের গবেষণাগারে পশম। পরীক্ষান্তে সরকারের কৃষি বিভাগের উপদেষ্টা নির্দিষ্ট পণ্যের গায়ে একটি লেবেল ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকেন। এই লেবেলকেই বলা হয় আনমার্ক—পণ্যের উৎকর্ষের প্রতীক হিসাবে এইটি গণ্য।

এ ধরণের শ্রেণীবিন্যাস ও পণ্যমান নির্দ্ধারণ অর্থাৎ বিপণন ব্যবস্থার দরুণ ভেজাল বন্ধ হয়ে যায়নি, এ ঠিক। কিন্তু ব্যবস্থাটি চালু থাকার ফলে কতকগুলো ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে হলেও সুফল দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন যে-টি, সে হলো এই ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করা ও দৃঢ়তার সঙ্গে পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা। সরকার এই ব্যাপারে আরও মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন, আশা করা যায় এবং তা হলেই বিপণন ব্যবস্থায় অগ্রগতির পথও হবে প্রশস্ত।

একজন মহৎ শিল্পীর মহাপ্রয়াণে

শ্রীতারক সেন

ভোর হয়ে হয়ে আসে
তখন নিভলো চিতা। ছাই এক মুঠি।
ভোরের নদীর জলে শ্মশান-মাটিকে করালাম স্নান
শোক-শ্লোক রচনায় রাত্রির প্রয়াণ।

এ কোন্ ভস্মের ভার দিয়ে গেলে আমাদের হাতে?
ভস্মের পরম প্রাণ যেখানেই রাখি পুষ্পবতী হবে।
ছড়াই নক্ষত্রলোকে, আকাশ-উদ্যানে
দেখা দেবে আলোকের ফুল
ছড়াই বায়ুস্রোতে উত্তর মরুতে
জন্ম নেবে ভস্মের মুকুল।

তোমার তো মৃত্যু নাই। তোমার এ 'মৃত্যুভস্ম' ভার
নিতে পারে একমাত্র হিরণ্ময় ত্রিকাল আধার।
আমরা করুণ হাতে নিতে পারি চিতাভস্মটুকু
তার বেশী পারি নাকো আর।

সাহিত্য পরিচয়

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

হরিণ-চিতা-চিল

সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রেই যাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণ সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র মূলতঃ কবি, আর সেজন্য-ই তাঁর যথার্থ রূপটি কাব্যে যতটা ধরা দেয় এমন আর কোথাও নয়, আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থটিতেও তাঁর সেই কবিমানস স্বপ্রকাশ। ভাষামাধুর্য্যে ভাব ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ নিটোল কবিতাগুলি যেন প্রস্ফুটিত রসশতদলের এক একটি পাপড়ি, রঙে রসে রূপে তারা আচ্ছন্ন করে চেতনাকে, আবিষ্ট হয় মন। জীবন জিজ্ঞাসু কবি আশাবাদী, পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করেন তিনি সহজেই, আজকের আত্মবিস্মৃত স্বধর্মচ্যুত মানুষকে তাই তিনি বলেন। একফোঁটা জল দাও যদি, এই ধুলোও দেখাবে ভেলকি, কোথা থেকে ঠিক প্রাণের সবুজ আনবে। হৃদয়ের সত্য ধর্মকে অস্বীকার করা কবির কাজ নয় তাই তিনি শঙ্কিত হয়ত। অতিশয় উদ্যোগের মর্মরিত রথচক্র এই শঙ্কা আবিল করেনি তাঁর বিশ্বাসকে কোথাও, তিনি জানেন জোয়ার যখন আসে কোন বাধা না মেনেই নিয়ে আসে তা পূর্ণতা, সব শুষ্কতা দূর হয় মুহূর্ত্তে, জীবনের শাশ্বত সত্য প্রকটিত হয় আপন মহিমায়। কবিতাগুলির চরণে চরণে সোচ্চার কবির এই বিশ্বাস সংক্রামিত হয় পাঠকের মনেও আর এখানেই কবির চরম সার্থকতা। সর্ব্বসমেত ত্রিশটি কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে সংকলনটিতে নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী, অপরাপর আঙ্গিক ও প্রশংসনীয়। 'হরিণ-চিতা-চিল'—প্রেমেন্দ্র মিত্র, ত্রিবেণী-প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—তিন টাকা মাত্র।

EDUCATIONAL SPEECHES

বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ৺স্যার আশুতোষের দান চিরস্মরণীয়, ৺শ্যামাপ্রসাদ বহন করেছিলেন তারই সুযোগ্য উত্তরাধিকার তাঁর অকালমৃত্যু দেশের এক মর্মান্তিক ক্ষতি যে ক্ষতির মূল্য নিরূপণ করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি করা হয়না। আমরা দেখে আনন্দিত হয়েছি যে শ্যামাপ্রসাদ সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক মূল্যবান বক্তৃতাবলীর একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, বর্ত্তমান গ্রন্থটিতে। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন স্বীয় নীতিতে অবিচল আদর্শবাদী পুরুষ, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, সংকলিত রচনাগুলি তারই স্বাক্ষর বহন করছে। ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ পর্য্যন্ত প্রদত্ত এই বক্তৃতাগুলি স্বর্গীয় চিন্তানায়কের আদর্শ ও কার্য্যধারার [illegible] আমাদের পরিচিতি সম্পাদন করে। যুগধর্মের প্রভাব বিশিষ্ট যে পরিবর্ত্তন অন্ধ গোঁড়ামির বশবর্ত্তী হয়ে তাকে কোন ও দিনই অস্বীকার করেননি ৺শ্যামাপ্রসাদ; মূলত তিনি ছিলেন গঠনধর্মী; সমস্ত অন্যায় সমস্ত দুর্ব্বলতাকে পরিহার করে জাতি গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা যেমন তাঁর ছিলনা, তেমনই জাতি হিসাবে বাঙ্গালী হিন্দুর আজ যে আত্মবিলুপ্তি ঘটতে বসেছে তারও ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি; উদাত্ত সবল কণ্ঠে জাতিকে বার বার আহ্বান করে এই সর্বনাশা আত্মলোপের পথ থেকেই অপসারিত করতে চেয়েছেন তিনি, আজ শ্যামাপ্রসাদ নেই আর সেজন্যই তাঁর পথনির্দেশক রচনাগুলির মূল্য এত অধিক। বর্ত্তমান সংকলনটিতে সংগৃহীত বক্তৃতাগুলি দিগ্‌ভ্রান্ত জাতির পথনির্দেশে কম সহায়তা করবে না। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীসর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আলোচ্য সংকলনটির ভূমিকাকার; আঙ্গিক সম্পদেও এটি সমৃদ্ধ, আমরা উল্লিখিত গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। 'Educational Speeches' by Dr. Shyamaprasad Mookerjee, with a forward by Sarvapally Radhakrishnan. A. Mukherjee & Co. (Private) Ltd., 2, College Sqr., Calcutta-12. Price Rs. 5·50.

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

একালের বাংলা সৃজনী-সাহিত্যে কলম ধরেই যাঁরা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন রমাপদ চৌধুরী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাঙালীর ধ্যান ধারণায় ও মানসচিন্তায় যে অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন অতিদ্রুততার সঙ্গে ঘটে গেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে খুব কম স্রষ্টাই সেই চিরবিচিত্র সূত্রটিকে সাহিত্যের কটু কষায় ও স্নিগ্ধ স্বাদু মাধ্যমে বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। তার জন্যে চাই অস্থিরতার মধ্যে আত্মমগ্ন সমাধিস্থের সাধনা। সে সাধনায় সার্থক সাধক যে রমাপদ চৌধুরী একথা নির্দ্বিধায় বলার সময় এসেছে।

বালকের বিস্ময়ানুভূতির মধ্যে দিয়ে জগতের মূল সূত্রটিকে ধরবার আকাঙ্ক্ষা দেখেছি তাঁর 'প্রথম প্রহর'-এ। কখনও শিল্পাকল্প কয়লাখনির মধ্যে বৈজ্ঞানিকের মত হীরার সন্ধানে তিনি ব্যাপৃত থেকেছেন। সে বৈজ্ঞানিকের অন্তর্দৃষ্টি মানবতা রহিত নয়। আবার ইতিহাস-আশ্রিত 'লালবাঈ' উপন্যাসে তাঁকে বাঙালীর ইতিহাস-পুনর্বিচারে, নবমূল্যায়নে ধ্যানীর আসনে সিদ্ধি হতে লক্ষ্য করেছি।

লেখকের স্বর্ণসন্ধান চলে খনিত্রের নিস্পৃহ অবিরত অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে। এখানে সে খনি হল মানুষের মন—আর পাত্রপাত্রী এই পৃথিবীরই মানুষ। তারা এই পান্থনিবাসের বাসিন্দা।

তাঁর নবতম গ্রন্থ 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' এক প্রাচীন শহরের একটি ছোট্ট হোটেলে সন্নিবেশিত চরিত্র নিচয় নিয়ে রচিত হয়েছে। কাহিনীর নায়ক এই হোটেলটি আর নায়িকা বলতে এই হোটেলেরই পরিচারিকা। শীতের মরশুমে নানা জায়গা থেকে মানুষ এসে জড় হয় এখানে—কেউ স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশা নিয়ে—কেউ অর্থ অন্বেষণে।

কাহিনীতে কোথাও কোন স্বকপোলকল্পিত ঘটনা নেই। এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ঘটনার দ্যুতিতে সমগ্র কাহিনী ক্রমে ক্রমে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে পরিণতিতে পৌঁছেছে। রসসৃষ্টি এখানে হর-পার্বতীর প্রস্তি-স্পর্শী মিলনের মত সার্থক হয়েছে।

জীবনের ঘটমান সত্যকে শিল্পী রমাপদ চৌধুরী জীবনরসিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। মানুষের ত্রুটিকে তিনি তিক্ততার কষায় জর্জরিত না করে প্রকৃত দ্রষ্টার ক্ষমাশীল চক্ষে দেখেছেন—তাই এই পৃথিবীর মানুষ হয়ে আমরা আমাদের 'এই পৃথিবী পান্থ নিবাসে দেখতে পাই—চিনতে পারি—দেখে মিলিয়ে নিয়ে তৃপ্তি পাই। শিল্পীর সাধনা তাই সার্থক। দাম পাঁচ টাকা। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ তথ্য সংকট ও সম্ভাবনা

বর্ত্তমান যুগকে বলা হয়ে থাকে পরমাণবিক যুগ, পরমাণু ও তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে রচিত আলোচ্য পুস্তকখানি একখানি অনুবাদ। এডওয়ার্ড টেলার ও এ্যালবার্ট এল ল্যাটার যুগ্মভাবে লিখেছেন। বইটি অনুবাদ করেছেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুবাদক ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, পরমাণু বিজ্ঞান ও তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে সাধারণের যাতে একটা মোটামুটি ধারণা হয়, তাই তাঁর গ্রন্থ-রচনার মূল কারণ; বইটি তাঁর এই আশা যে সফল করে তুলবে বলেই আমরা মনে করি। সহজ সরল বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে, পাঠে সন্ধানী পাঠক উপকৃত হবেন বলেই আমরা আশা করি। বইটির প্রচার প্রার্থনীয়। 'আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ তথ্য সংকট ও সম্ভাবনা', এডওয়ার্ড টেলার ও এ্যাল্‌বার্ট এল ল্যাটার। অনুবাদক : শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-ফিল রসায়ন বিভাগ, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক। পার্ল পাব্লিকেশন্স প্রাইভেট লিঃ, বোম্বাই-১। মূল্য এক টাকা।

রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র

বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্রের এবং সেজন্যই গণতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের ও মত বিরোধের শেষ নেই, বর্ত্তমান পুস্তকটিতেও লেখক

এই সমস্যা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্রের যথার্থ রূপটি যে কি তা নিয়ে বহুতর বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে, লেখক সহজ ও সাবলীল ভাষায় রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন; কয়েকটি মূল্যবান তথ্যেরও সমাবেশ ঘটেছে পুস্তকটিতে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ছাত্র ও সাধারণ পাঠক উভয়েই বইটি পাঠে আনন্দিত হবেন বলেই আমরা আশা করি। রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র পরিমলচন্দ্র ঘোষ, বি, এস-সি (ইকন) লণ্ডন, অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন, প্রাপ্তিস্থান—এইচ চ্যাটার্জী।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনা

আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি সমালোচনা পুস্তক, সাহিত্যানুরাগী পাঠক সাধারণতঃ সাহিত্য যে রস সৃষ্টি করে তারই আস্বাদনে পরিতৃপ্ত থাকেন, সমালোচনার কচকচি তাঁদের কাছে ভীতিপ্রদ বস্তু কিন্তু অনুসন্ধিৎসুকে যেতে হয় আরও গভীরে, সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হল না তাঁদের কাছে এ প্রশ্নের গুরুত্ব কম নয়। মোহমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্য রসের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে সমালোচনাকে দিতেই হবে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা, সন্ধানী পাঠকের অনেকাংশই যে বর্ত্তমান সমালোচনা পুস্তকটি পাঠে তৃপ্ত হবেন এ আশা করা দুরাশা নয়। কয়েকটি সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকটিতে; প্রবন্ধগুলিতে বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন উভয়বিধ রীতিরই সুষ্ঠু বিচার করা হয়েছে, লেখকের ন্যায়নিষ্ঠা ও সাহিত্যবোধের পরিচয়ে এগুলি প্রোজ্জ্বল। জ্ঞান-পিপাসু পাঠক গ্রন্থটিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন বলেই আমরা আশা করি। প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত ভূমিকা ও প্রখ্যাত সমালোচক সুনীতিকুমারের সুচিন্তিত অভিমত এই গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। এইরূপ সমালোচনা পুস্তকের প্রয়োজন বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রমশঃই বৃদ্ধির পথে। পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা যথাযথ। 'বাংলা সাহিত্যের আলোচনা'—শ্রীমদনমোহন কুমার। প্রকাশক—দাসগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য—৭ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

পঞ্চীমহল

আলোচ্য গ্রন্থখানি সুপ্রসিদ্ধা লেখিকার সাম্প্রতিকতম একটি ছোট গল্প-সংগ্রহ। আশাপূর্ণা দেবী প্রধানতঃ মনোধর্মী সাহিত্যকার। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী ভঙ্গী ও প্রোজ্জ্বল সরস কথকতা এই উভয়বিধ সম্পদে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ। বর্ত্তমান সংকলনটিতেও তাঁর স্বকীয়তা স্বপ্রকাশ। সর্বসমেত ১৩টি গল্প সংগৃহীত হয়েছে উল্লিখিত বইটিতে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত প্রায় সবগুলি কাহিনীই সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক। কয়েকটি গল্পে সেকালের সংস্কারাবদ্ধ জীবনের একটি পরিচ্ছন্নরূপ ফুটে উঠেছে; ঠাকুরমার ঝুলি, পঞ্চীমহল প্রভৃতি গল্পগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আবার অগ্নিদহন, অন্ধ, মফঃস্বল বার্ত্তা, বাসনার নেশা ইত্যাদি গল্পে মানব মনের অসীম বৈচিত্র্যকে নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন লেখিকা। মানুষের মন যেন এক বিচিত্র মহাদেশ, এই মহাদেশের পথে-প্রান্তরে স্বচ্ছন্দ পদচারণ লেখিকার, আর তারই পরিচয়ে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর রচনা। আমরা এই সুপাঠ্য সংকলনটির বহুল প্রচার কামনা করি। সুশোভন প্রচ্ছদটি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। পঞ্চীমহল—আশাপূর্ণা দেবী। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য—৪৲ মাত্র।

এক ছিল কন্যা

জীবনের গভীরতায় বিশ্বাসী ও জীবনের সত্য অনুসন্ধানী যে কয়েকজন ঔপন্যাসিক আছেন, তাদের ভেতর স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর বর্তমান উপন্যাসটি সুবৃহৎ। একটি কন্যার জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি মহত্তর জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছেন। এক ছিল কন্যা নাম তার মৃগনয়নী। অতিসাধারণ এই কন্যার কাহিনীতে কত বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, কত অভাবনীয় ঘটনার তরঙ্গ উঠেছে, মুছে গেছে, তবু বৃহত্তর জীবনের যে নিত্য-সুর, সেই সুরের মূর্ছনা এ কাহিনীকে এক মহান সঙ্গীতে পরিণত করেছে। এ সঙ্গীত সর্বকালের সুর-সন্ধান দেয়। ঘটনার সুতীব্র গতির মধ্যেও এক স্থায়ী চিরকালের সত্যের প্রশান্তি অনুভব করা যায়। লেখক প্রতিটি পাঠকের মনেই অনন্ত জীবন প্রবাহের অনুভূতি আনতে সক্ষম হয়েছেন। দাম ৬—৫০ নপঃ, প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিসিং কোং প্রাঃ লিঃ ১৩ হ্যারিসন রোড, কলকাতা—৭

হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র এবং সাহিত্য জগতে সুপরিচিত। তিনি কলিকাতা পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ সুযোগ্য অফিসার। পুলিসের কাজের এরূপ গুরুদায়িত্ব বহন করেও সাহিত্য ও গবেষণা মূলক কার্য্যে তাঁহার উৎসাহেরও অন্ত নাই। পূর্ব্বে তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তাঁর বিরাট গবেষণা গ্রন্থ "অপরাধ বিজ্ঞান" ৮ম খণ্ডে প্রকাশ করে, বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। এক্ষণে তিনি "হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান" নামক গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনা করে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। এবং সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গ্রন্থকার এই পুস্তক রচনা করে ইহাই প্রমাণ করেছেন যে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় যে কোন দুরূহ বিষয় ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষায় অধিকতর সহজ বোধ্যরূপে প্রকাশ করা সম্ভব। লেখকের দৃঢ় ধারণা যে এই একটিমাত্র পুস্তক পাঠ করলেই যে কোন একজন সাধারণ মানুষেরও পক্ষে প্রাণিবিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কীয় জ্ঞান সম্যকরূপে অর্জ্জন করা সম্ভব। এই পুস্তকে লেখক দেখিয়েছেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতের সঙ্গে হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানের অনেক মিল দেখা যায়। পাঠক পাঠিকাগণ তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায় "হিন্দু সৃষ্টিক্রম ও ইভোলিউসন" পাঠ করিলে বুঝতে পারবেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক তুলনা মূলক পদ্ধতিতে সৃষ্টি ক্রমের মতবাদ ও তৎ-সম্পর্কীয় প্রমাণ এবং হিন্দুমতে 'সৃষ্টি পর্য্যায়' আলোচনা করেছেন। নকসা-চিত্রাদির দ্বারা—তিনি তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে এই দুরূহ বিষয়গুলি বুঝা সহজসাধ্য হইয়াছে। লেখক এই পুস্তকে প্রাণিবিজ্ঞানের একটি নূতন দিক এবং তৎসহ ভারতে ও য়ুরোপে সৃষ্ট ঐ বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস ও উহার উৎপত্তির তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। জীব বৈজ্ঞানিক ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের শ্রম সার্থক হউক ও তাঁর রচিত 'হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞান' পাঠক সমাজে সমাদৃত হউক ইহাই আমাদের কামনা। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১—কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, দাম—পাঁচ টাকা।

সুর ও যন্ত্র

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নাট্যশাস্ত্রে ও সঙ্গীতগ্রন্থে যন্ত্র

সঙ্গীত সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে যতদূর জানা যায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রই সব চেয়ে প্রাচীন। নাট্যশাস্ত্রের সময় সাধারণতঃ খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৩য় শতাব্দীর মাঝেই নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। ভরত তার অগ্রগামীদের মত বাজনাকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ও তাদের সুস্পষ্ট বর্ণনাও দিয়েছেন যথা,—

"ততং চৈবাবনদ্ধং চ ঘনং সুষিরমেব চ।
চতুর্বিধং চ বিজ্ঞেয়মাতোদ্যং লক্ষণান্বিতম্।
ততং তন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবন্ [illegible] চ পৌষ্করম্।
ঘনস্তু তালো বিজ্ঞেয়ঃ সুষিরো বংশ এব চ।" ৮।২৮-২৯

অর্থাৎ তারের যন্ত্রকে বলা হয় 'তত'। বাঁশী প্রভৃতি বাতাসের সাহায্যে যাদের স্বরোৎপন্ন হয় তাদের 'শুষির', ধাতব যন্ত্র পরস্পরের সাথে বা কোন দণ্ডের আঘাতে যারা ধ্বনিত হয় তাদের 'ঘন' এবং চামড়ার বাজনা যেমন মৃদঙ্গ প্রভৃতিক অনদ্ধ বলা হয়েছে। অনদ্ধ ও 'ঘন' বাদ্য প্রধানতঃ তাল বা লয়কে রক্ষা করার উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হয়।

ভরত মাত্র দুটি বীণারই বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তার সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় রামায়ণে বর্ণিত নয় তারের 'বিপঞ্চী' ও সাত তারের 'চিত্রা' বীণার প্রচলন তখন ছিলো যথা—"সপ্ত তন্ত্রী ভবেৎ চিত্রা, বিপঞ্চি নব তন্ত্রীকা" (২৯।১২৪)। শুধু তাই নয় দুটি সমানাকৃতির বীণার সাহায্যে তাঁর শ্রুতি বিভাগ করা থেকে, তখন বীণার কতখানি সমাদর ছিলো এবং কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে বীণা শিক্ষা করা হোত, তার অনুমান করা যায়। ষড়জ, মধ্যম, প্রভৃতি গ্রামে-এর পরিচয় দিতে তিনি আবার বেণু, বংশ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এগুলিও সে যুগের যন্ত্র-সঙ্গীতে যে বেশ উন্নত-পন্থা অনুসৃত হোত তার পরিচায়ক। নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে তিনি বিভিন্ন বাজনা বাজাবার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

নারদ তার সঙ্গীত-মকরন্দে (৭-১১ খৃঃ) ১৯টি বীণার নাম করেছেন। যেমন, কচ্ছপী, কুব্জিকা, চিত্রা, পরিবাদিনী, জয়া, ঘোষাবতী, বহন্তী, নকুল, মহতী, বৈষ্ণবী, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, কূর্ম্মী, রাবণী, সরস্বতী, কিন্নরী, সৌরন্ধ্রী, ঘোষকা, জ্যেষ্ঠা। নারদ বলেছেন, তার সংস্থাপনের বিচিত্রতার জন্যই বিভিন্ন বীণার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি কোন প্রকার বর্ণনা দেননি এবং তার প্রদত্ত নামগুলির ভিতর এক মাত্র চিত্রা ছাড়া পূর্ব্বগামী গ্রন্থকারদের উল্লিখিত বৈদিক বা বৈদিকোত্তর যুগের কোন বীণার নাম পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ তেলাঙ্গ বলেন—"নারদ বীণা প্রসঙ্গে ১৮ প্রকার বীণা আছে বলেছেন অথচ তার প্রদত্ত তালিকা থেকে আমরা ২১টি বীণার নাম পাচ্ছি"। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে হয়, পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থকারদের অনেকেই 'কূর্ম্মী' ও কচ্ছপীকে একই শ্রেণীর বীণা বলেছেন তা যথার্থ। কেবলমাত্র নাম ছাড়া আকার বা প্রকৃতিগত ভেদ না থাকাতে নারদ তাদের একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন এবং তাই ২৮ প্রকার বীণাই তিনি স্বীকার করেছেন।

বীণা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর যন্ত্রেরও তিনি উল্লেখ করেছেন, যথা— মৃদঙ্গ, দর্দ্দুর, পণব, ঝরঝরি, পটাহ, শৃঙ্গা, ডক্কা, ডমরু, ডিমডিমা, গোপুচ্ছ, আলিঙ্গ প্রথা পার্শ্বদেবতার সঙ্গীত সময়সারে বিভিন্ন জাতীয় বাজনা এবং তাদের বাজানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি গানের সঙ্গে বাজনার সাহচর্য্য অপরিহার্য্য বলে স্বীকার করেছেন। অনদ্ধ, ঘন, তত, শুষির প্রভৃতি বিভাগের উল্লেখও তিনি করেছেন। তিনি বীণা, কিন্নরী, লঘু পত্রিকা বৃহৎ কিন্নরীকা, শাকিনী (৪।৫ প্রভৃতির) নাম দিয়েছেন। তার মতে বাজানোর পদ্ধতি অনুযায়ী বাজনার শ্রেণী বিভাগ হয়েছে এবং তারের সংখ্যানুযায়ী বীণার শ্রেণী বিভক্তি ঘটেছে। তবে প্রত্যেক বীণাতেই একটি মাত্র তারেরই প্রাধান্য থাকে। (৫।১২।১৩) তার উক্তি থেকে জানা যায় তখন দশটী পন্থা অনুসৃত হোত বিভিন্ন বীণা বাজানোর জন্য। তিনি বলেছেন,—

ছন্দো ধারা কৈকুটী চ কঙ্কালো বস্তুপূর্বকঃ ॥
গজলীলাভিধানং চ তথৈবোপরিবাদনম।
দণ্ডকং চ তথা জ্ঞেয়ং বাদ্যং পক্ষিরুতাভিধম্ ॥
এতদ্ দশবিধং নাম্না বীণাবাদ্যং সমীরিতম্। ৫।১৩ ১৫

অর্থাৎ ছন্দ, ধারা, কৈকুটি, কঙ্কাল, বস্তু, তূর্ণ, গজলীলা, উপরিবাদম, দণ্ডক, পক্ষিরুত। বাদ্যকে তিনি আবার 'সফল' ও 'নিষ্ফল' ভেদে দু'ভাগে ভাগ করেছেন সফলং নিষ্ফলং বেতি।

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত রত্নাকরে (১২২০-১২৪৭ খৃঃ) ১১টি বীণার নাম পাওয়া যায়। একতন্ত্রী, নকুল, ত্রিতন্ত্রীকা, চিত্রা, বীণা, বিপঞ্চী মত্তকোকিলা, আলাপিনি, কিন্নরী পিনাকী ও নিশঙ্ক বীণা। শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে তার সময়ের বীণার সঙ্গে আমাদের আধুনিক অনেক বীণার সৌসাদৃশ্য পাওয়া যায়। ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল বলেছেন চিত্রা ও বিপঞ্চি সম্ভবতঃ আমাদের সেতার ও স্বর-শৃঙ্গার। কিন্নরী বীণার বর্ণনা থেকে মনে হয় আধুনিক উত্তর ভারতীয় দুটি তুম্বা যুক্ত বীন্ ও কিন্নরী বীণা একই বস্তু। পিনাকী বীণার বর্ণনা থেকে মনে, হয় পিনাকী আধুনিক এস্‌রাজের পূর্ব রূপ হ'বে। কিন্নরী, মত্ত

কোকিলা একতন্ত্রী, ত্রিতন্ত্রীকা প্রভৃতি একই নামে আজও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। টীকাকার কালিনাথ (১৪৪৬—১৪৬৫ খৃঃ) বলেছেন, শেষোক্ত বীণাটা শার্ঙ্গদেবের নিজস্ব সৃষ্টি বলেই তার নামানুযায়ী ওটির নামকরণ করা হয়েছে 'নিঃশঙ্ক' বলে। রত্নাকরে ১৫ প্রকার বাঁশীর বিবরণ পাই—যথা, বংশ, পাব, পাবিকা, মুরলী, মধুকরী, কাহোলা, তুণ্ডকীনি, তুক্কা, শৃঙ্গা, শঙ্ক প্রভৃতি। তিনি অনুকৃতি 'শব্দ' বা 'বোল'এর উল্লেখও করেছেন। অপরাপর যন্ত্রের মধ্যে পাটাহ, মাদল, হুডুক্কা, করতটা, ঘণ্টা, ঘড়স্, ঢবস্, ঢক্কা, নন্দী, ডক্কা, কুরুবা, মুরজ, ত্রিবলী, ঝল্লরী, ডমরু, দুন্দুভী। আধুনিক ঢোলক পটাহের রূপান্তর এবং খোলএর উদ্ভব মুরজ হতেই।

শার্ঙ্গদেব ও নারদের বর্ণনায় বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক বাজনার নামোল্লেখ থাকাতে এবং নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মাত্র দুটি বীণার উল্লেখ করাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন, যে, বীণার এই বিচিত্র বিকাশ ভরতোত্তর যুগ থেকে শার্ঙ্গদেবের সময়ের মধ্যেই ঘটেছিলো। কিন্তু সিদ্ধান্ত কতকগুলি প্রতিকূল কারণ আছে। যেমন বিভিন্ন গ্রন্থকারদের বিবৃতি তাদের একজনের প্রদত্ত নামগুলির সাথে অপর জনের উল্লিখিত নামগুলির মিল কমই পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নূতন নাম করেছেন শুধু এমনই নয়, একজন তার পূর্ব্বগামী উল্লিখিত নামের মধ্যে যে নামগুলিকে বাদ দিয়েছেন তার পরবর্ত্তী জন আবার তারই মধ্যে থেকে দু একটি নামের উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে ও নাট্যশাস্ত্রে বিপঞ্চির উল্লেখ আছে, নারদের তালিকায় নেই অথচ শার্ঙ্গদেবের বর্ণনায় আবার তার যথাযথ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। পর পর তিন জনই কেবল মাত্র কিন্নরীর নাম করেছেন। নারদের 'নকুল' পার্শ্বদেবের তালিকায় স্থান পায়নি কিন্তু শার্ঙ্গদেব তার উল্লেখ করেছেন। তেমনি তার উল্লিখিত সরস্বতী বীণার চলন আজও দাক্ষিণাত্যে আছে, কিন্তু শার্ঙ্গদেব তাকে বাদ দিয়েছেন। 'কচ্ছপী, ত্রিতন্ত্রীকা, একতন্ত্রী প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই ব্যাপার লক্ষ্য করার বিষয়। এগুলি থেকে মনে হয়, স্থান ও কালভেদে। বিশেষ বীণা বিশেষ জনের কাছে প্রাধান্য লাভ করার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যাচ্ছে। কিছু কিছু যে নূতন সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু নামের বিকার ঘটেছেই বেশী, যার ফলে বৈদিক যন্ত্রের দু' একটির ছাড়া আমরা আর তাদের সন্ধান পাচ্ছি না। অথর্ব্ববৈদিক বীণা 'কাণ্ডপী'তে পর্য্যবসিত হয়নি তা মনে করার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে 'অলাবু' যে পার্শ্বদেবের অলাবনী নয়, তাও কেউ জোর ক'রে বলতে পারেন না। বরং কতকগুলি যন্ত্র খুব সমাদৃত হয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হোল ও কিছুকাল পরে আবার পটভূমিকায় অবতীর্ণ হোল ও পুনর্ব্বার অদৃশ্য হোল এরকম সিদ্ধান্ত করার পক্ষেই যৌক্তিকতার অভাব ঘটে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও বীণার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ চর্য্যাপদে (আনুমানিক ১০ম ১২শ শতাব্দী) বীণা বাজানোর বর্ণনা আছে। যথা।

বাজাই আলো সহি হেরু অ বীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুনা। (চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়)

কুরুরী, তন্ত্রী প্রভৃতি নামও এতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণব গীতি সাহিত্যেও নানা প্রকার বাজনা ও বীণার উল্লেখ আছে। এতে মুরলীর প্রাধান্য ও সর্ব্বজন বিদিত। মণিপুরী কীর্ত্তনের বীণা, মুরজ, মুরলী, বেণু, মৃদঙ্গ, মন্দিরার নাম প্রায়ই পাওয়া যায়। এগুলি সে সময়ের সমাজে এদের অমিত প্রচলনের সাক্ষ্য দেয়।

প্রাচীন স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে যন্ত্র

আজও সে সব মন্দির, সৌধ, গুহা, ও চৈত্য কালের নির্ম্মম হাত এড়িয়ে স্থাপত্যের চরম-উৎকর্ষের নিদর্শন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে, তারাও আমাদের অতীত যুগের বিভিন্ন যন্ত্রের বিকাশ ও প্রাচীনত্বের খবর দেয়। ক্যাপ্টেন ডে, সাঁচী ও অমরাবতীর খোদাই করা ছবির মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করেছেন যাতে এমন কয়েকটি যন্ত্র আছে সেগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্যের কয়েকটি যন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। তিনি অমরাবতীতে খোদিত একটি বীণা জাতীয় যন্ত্রের কথা বলেছেন যেটির সঙ্গে এসিরিয়ান হার্পের ও আফ্রিকার 'সাঙ্কো'র (সান্‌চো !) হুবহু মিল পাওয়া যায়। রোমক টাইবিয়াপিরর্সের অনুরূপ যন্ত্রের প্রতিকৃতি ও দেখা যায় সাঁচীর কারুকার্য্যে। শিঙার অনুরূপ একটি যন্ত্রসহ একটি মূর্ত্তিও সেখানে খোদিত আছে। অমরাবতীতে একটি প্রতিকৃতিতে ১৮টি নারীর মূর্ত্তি আছে, তাদের মধ্যে কোন জন শঙ্খ, কোন কোন জন মৃদঙ্গ জাতীয় বাজনা, কোন জন বা সানাই-এর মত বাঁশী এবং আরো দু'এক প্রকার যন্ত্রে মনোনিবেশ করেছে দেখা যায়। কোনারকের প্রাচীন শিল্পেও নানা-প্রকার যন্ত্র-সমন্বিত মূর্ত্তি খোদিত আছে।

বৌদ্ধ চৈত্যের বর্ণনা দিতে পার্শি ব্রাউন তাঁর ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার বইয়ে একটি সুন্দর প্রতিকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন তূর্য্য নিনাদের সঙ্গে সঙ্গে উমার আগমন ঘটতো, মৃদঙ্গের ধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ভিক্ষুদের আহ্বান কোরতো প্রার্থনায় যোগ দেবার জন্য। চালুক্য মন্দির শিল্পের অনুরূপ একটি মূর্ত্তি শিল্পে, নৃত্যারতা উমা ও তাঁর অনুবর্ত্তী দুটি বালকের প্রতিকৃতি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি বালককে বাঁশী বাজাতে দেখা যায়। তাঁর আইডিয়াল অব ইণ্ডিয়ান আর্ট বইয়ে, এখানেও ই, বি হ্যাভেল বর্ণনা করেছেন বালকটির নিবিড় অনুভূতিতে মূর্ত্ত বাঁশীর সুরের সাথে নৃত্য করছেন পার্ব্বতী দুহিতা উমা চিদাম্বরম হতে প্রাপ্ত শিবনটরাজের মূর্ত্তির ডান হাতে ডমরু আছে দেখা যায়।

রায়বাহাদুর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা যাদুঘর ও বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে সংরক্ষিত কয়েকটি মূর্ত্তির উল্লেখ করেছেন, যেমন নটেশ, সদাশিব, বিরূপাক্ষ, প্রভৃতি। এই মূর্ত্তিগুলির হাতে ডমরু, ঘণ্টা, প্রভৃতি যন্ত্র দেখা যায়। বীণা হাতে দেবী সরস্বতী-মূর্ত্তির ও বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। মাউণ্ট আবুতে তেজপাল মন্দিরের প্রাচীন শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে ডাঃ কুমার স্বামী একদল বাদ্যরত নরনারীর প্রতিকৃতির ছবি দিয়েছেন যাদের হাতে বেণু, বীণা, মৃদঙ্গ ও করতাল জাতীয় যন্ত্র দেখা যায়।

রাজস্থানীয় চিত্র শিল্পে (১৬-১৭ শতাব্দী) রাগরাগিণীদের চিত্রেও বেণু, বীণা, ঢোল, করতাল প্রভৃতি দেখা যায়।

অধুনা প্রচলিত যন্ত্র

বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত যন্ত্রের মধ্যে সচরাচর, দামামা, ঢাক, ঢোল, ঢোলক, খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, মাদল, তবলা, ডমরু, দুন্দুভী, জগঝম্প, তাসা, ঝল্লরী, বীণ, বীণা, সুর শৃঙ্গার, সুর বাহার, সরোদ, সেতার বা সিতার, স্বরমণ্ডল, তানপুরা (তম্বুর বীণা), দিলরুবা,

সারাঙ্গী, সুর-সারাঙ্গ, রবাব, বেহালা, তার সানাই, তড়িৎ বীণ, চৌটা একতারা, দুতারা, চৌতারা, সানাই, করতাল, খঞ্জনী, ঝাঁঝর ঘণ্টা, কাসর, নূপুর প্রভৃতি। এই ভাবে প্রতিটি যুগের পৃষ্ঠা আমাদের নূতন নূতন যন্ত্রের পরিচিতি দেয়। ভারতের সঙ্গীত তার উৎকর্ষতা শুধু কণ্ঠের মাধ্যমেই প্রকটিত কোরে তোলেনি, যন্ত্রের ঝংকারে প্রকাশ করেছে তার রূপ।

আমাদের যন্ত্র-সঙ্গীতের ইতিহাস আর একটু যত্নের সঙ্গে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে আজকের যে সব যন্ত্র আমাদের সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলছে তাদের জন্য আমাদের বাহিরের জগতের কাছে ঋণ স্বীকার করতে হবে না মোটেই। বরং সমস্ত সংস্কৃতির মতো এর জন্য আমরাও ঋণী আমাদের কৃষ্টির উৎস সেই বৈদিক যুগের কাছে। কতকগুলি যন্ত্র নিয়ে আলোচনা করলেই এ তত্ত্ব স্পষ্ট অনুভূত হবে। যেমন,

(১) কাণ্ডপী—ডা: ক্যালাণ্ড তার পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে অথর্ববৈদিক যন্ত্র বলে বীণা কাণ্ডপীর উল্লেখ করেছেন (পৃ: ৮৬)। পরবর্ত্তী যুগে সম্ভবত এইটিই কচ্ছপী নামে নারদের সঙ্গীত মকরন্দে পরিচিত লাভ করে ডা: উইণ্টার নিজ কাণ্ডপীকে গীটার বলেছেন। উইলিয়াম স্মিথ কচ্ছপী, লায়ার ও টেসটিভোকে অভিন্ন বলেছেন। এডলফ মার্কস ও স্যার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মতে এর থেকে গীটারের উৎপত্তি।

(২) অলাবুন—ডা: ক্যালাণ্ডের মতে অথর্ববৈদিক যন্ত্র অলাবুর সদৃশ আলাবনী (সঙ্গীত মকরন্দ স্যার সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের) উল্লিখিত অলাবু সারেঙ্গ সম্ভবত: অলাবুরই অনুকৃতি।

(৩) পিচ্ছোরা:—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও বৌধায়ণে প্রাপ্ত। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ কবির মতে ঔদম্বরী পিচ্ছোরারই অপর নাম।

(৪) শততন্ত্রী বীণা:—পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত। পরবর্ত্তী কালে কাত্যায়নী বীণা নামে পরিচিত। পাশ্চাত্যের ডালসিমার ও পারস্যের কুনাম্ কাত্যায়নীর নব-সংস্করণ।

(৫) চিত্রা:—ভরতের নাট্য শাস্ত্রে উল্লিখিত পরবর্ত্তীকালীন সেতার ও চিত্রা এক। গ্রীস ও ইউরোপে এইটাই সিথারা নামে পরিচিত।

(৬) বেহালা:—ধনুর্যন্ত্র বা রাবণাস্ত্রের নূতন রূপ। ইউরোপীয় ভায়লীন ও বেহালা একই শ্রেণীভুক্ত।

(৭) সারাঙ্গী:—রাবণাস্ত্রের অপর রূপ। জাপানে কোকিউ ও চিনের উনহিন্-এর উৎপত্তি অনেকের মতে সারাঙ্গী থেকেই ঘটেছে।

(৮) রুদ্র বা রৌদ্রী:—সঙ্গীত মকরন্দে প্রাপ্ত। পারস্যের রেবেক ও ভারতীয় রবাব রুদ্র-বীণারই অন্যতম সংস্করণ।

(৯) অপঘাতলিকা—অথর্ববৈদিক যন্ত্র। অধুনা যুগে করতাল রূপে পরিচিত।

যদিও বিস্তৃত বৈদিক সাহিত্যের মধ্য থেকে এই রকম ক'রে যন্ত্রের বর্ণনা খুঁজে বার করা সহজ নয় তবুও যত্ন সহকারে সাধ্য মত চেষ্টা করলে আমাদের বিশ্বাস এ থেকে এ ধরনের বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যার মূল্য অল্প নয়। এই অনুসন্ধানে আর একটি শুভ দিক আছে যা সহজেই সঙ্গীত গুণীদের অনুপ্রেরণা যোগাবে যথা এই যন্ত্রগুলির বর্ণনা যন্ত্রস্রষ্টাদের চিন্তার পরিপোষক হিসাবে তাদের সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা কোরবে। সে যুগের সাধনার প্রতিচ্ছায়া আমাদের সঙ্গীত ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়ে বৃহত্তর মানব মনের অনুপ্রেরণা যোগাতে হয়তো সক্ষম হবে।

—শ্রীমীরা মিত্র

শেষ

রেকর্ড পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

এন ৮২৪৫৭—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিজের দেওয়া চিত্তাকর্ষক সুরে গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান।

এন ৮২৪৫৪—শ্রীলা সেন পরিবেশন করেছেন ঘুম পাড়ানি গান শিল্পানুগ দক্ষতার সহিত।

এন ৮২৪৫৯—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন।

এন ৮২৪৬০—ইলা বসু দুখানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন।

এন ৮২৮৬১—শ্যামল মিত্রের সর্বাধুনিক অবদান, "চম্পাবতী মেয়ে" এবং "লাল চেলি পরনে তার"।

এন ৮২৪৬২—শ্রীমতী উৎপলা সেনের আধুনিক গান সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

এন ৮২৪৬৩—এই রেকর্ড নিশ্চয় রাণী ঘোষালের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করবে। নবীন শিল্পীদের মধ্যে এখন তিনি ঈপ্সিত আসন অধিকার করেছেন।

এন ৪২৪৬৪—সুধীর মুখোপাধ্যায় এই গানে শিল্পানুগ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও তিনি রেকর্ড গানের ক্ষেত্রে নবাগত।

এন ৪২৪৬৫—সুচিত্রা মিত্র, এন ৪২৪৬৭—পূরবী মুখোপাধ্যায়, এন ৪২৪৬৮—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, এন ৪২৪৬৯—চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, এই চারখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের আগামী জন্ম দিবস উৎসব উপলক্ষে। এঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

এন ৭৭০০৬, ৭৭০০৭—"নদের নিমাই" বাণী চিত্রের গান রেকর্ড করা হয়েছে।

এন ৭৭০০৮, ৭৭০০৯—"দুই বেচারা" বাণী চিত্রের গান রেকর্ড করা হয়েছে।

কলম্বিয়া

জি ই ২৪৯৮৮—মঞ্জুলা গুহঠাকুরতার স্নিগ্ধ কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের দু'খানি নির্ব্বাচিত গান রেকর্ড করা হয়েছে।

জি ই ২৪৯৮৪—লতা মঙ্গেশকর বাঙলা গান পরিবেশন করেছেন। এবার সুর দিয়েছেন বম্বের জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিচালক বিনোদ চট্টোপাধ্যায়।

জি ই ২৪৯৪৫—নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লী-গীতি পরিবেশন করেছেন।

জি ই ২৪৯৪৬—বিখ্যাত মিণ্টু দাসগুপ্ত দু'টি সরস ব্যঙ্গ রচনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এতে তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত জনপ্রিয় বাণীচিত্রের গানগুলির সুর ব্যবহার করেছেন।

জি ই ২৪৯৪৭—নবাগত শিল্পী পারুল বিশ্বাসের কণ্ঠে ভক্তি মূলক গান; কথা স্বামী সত্যানন্দ এবং সুর দিয়েছেন কীর্ত্তন কলানিধি রথীন ঘোষ।

জি ই ২৪৯৮৮—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের স্নিগ্ধ কণ্ঠে গাওয়া ...াং হয় সম্পূর্ণ নতুন ধরণের গান।

জ ই—২৪৯৪৯ পান্নালাল ভট্টাচার্য্য দু'খানি সুন্দর আধুনিক গান উপহার দিয়েছেন।

জি ই ৩০৪৩৭, ৩০৪৩৮—যুব চিত্রের জনপ্রিয় বাঙলা ছবি পারসোনাল এসিস্‌টেণ্ট বাণী চিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য শিল্পী।

জি ই ৩০৪৪১, ৩০৪৪২ এবং ৩০৪৪৩—এম পি প্রডাকসনের জনপ্রিয় বাঙলা ছবি "কুহক" বাণী চিত্রের ছয় খানি গান পরিবেশন করেছেন জনপ্রিয় গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

জি ই ৩০৪৪৪—"নদের নিমাই" বাণী চিত্রের গান গ্রহণ করা হয়েছে এই রেকর্ডে।

জি ই ৩০৪৪৫, ৩০৪৪৬ এবং ৩০৪৪৭—"সাধক কমলাকান্ত" বাণী চিত্রের গান রেকর্ড করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নীলিমা মিশ্র। প্রত্যেক গানে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল।

জি ই ৩০৪৪৮—কবি অতুল প্রসাদের দু'খানি গান পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এর মধ্যে "কে তুমি বসি নদী কূলে" এম, বি ফিল্ম-এর "ক্ষণিকের অতিথি" বাণী চিত্রের গান।

আমার কথা (৬৩)

শ্রীমতী নীলিমা সেন

শিশুবয়স থেকে শান্তিনিকেতনে অবস্থান, তখন থেকে মায়ের সঙ্গে ব্রহ্মসংগীত অনুশীলন, আর বাবার সাথে প্রত্যহ ভোরে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ ও রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক গান শেখার আগ্রহ—ক্ষুদ্র একটি নন্দিনীকে পরবর্ত্তীকালে দেশেও বিদেশে রবীন্দ্র সঙ্গীতে অন্যতমা বিশিষ্টা গায়িকা হিসাবে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে। পারিবারিক কৃষ্টি, উচ্চশিক্ষা ও গুরুদেবের আশীর্ব্বাদপূত খরোয়া পরিবেশে মানুষ হওয়ার জন্য শ্রীমতী নীলিমা সেন হলেন আত্মপ্রচারবিমুখা, নম্রা ও বিনয়াবনতা গৃহস্থ-বধূ। তিনি জানান—

ঢাকা জিলার বেজগাঁওর শ্রীললিতমোহন গুপ্ত ও শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবীর অন্যতমা কন্যা ১৩৩৫ সনের ১৫ই বৈশাখ কলিকাতায় আমি জন্মাই। গ্রামে যাবার সুযোগ সামান্যই হয়েছে। ছয় বৎসর বয়সে বাবা মার সঙ্গে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে আসি। পরিবারে গানের রেওয়াজ বেশী ছিল না তবে মা ও বাবার সঙ্গে একটু একটু গান গাইতাম। সেখানে থাকার জন্য বোধ হয় সঙ্গীতে আকৃষ্ট হই। শান্তিনিকেতন পাঠভবন (School) ও শিক্ষাভবনে (College) আমার লেখাপড়া হয়। ১৯২৫ সালে গ্রাজুয়েট হই সেখান থেকে। আমার সঙ্গীত শেখার হাতে খড়ি হয় অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে। ক্রমশঃ তাঁর স্নেহের পাত্রী হই। শুধু গানে নয় আমার লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও শ্রী মজুমদারের আগ্রহ ও

শ্রীমতী নীলিমা সেন

উৎসাহ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত সর্ব্বদা স্মরণ করি। আমার অগ্রজা ছেলেবেলা থেকে আমার অন্যতমা উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এ ছাড়া শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীসমরেশ রায়চৌধুরী, শ্রীওয়াজেলওয়ার, শ্রীকণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আমার সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। গুরুদেবের মৃত্যুর সময় আমি বালিকা। তাঁহার শেষ জন্মদিনের উৎসবে তাঁহাকে গান শোনাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কবিগুরু নিজে আমাকে 'ডাকঘর'এর 'অমল' ভূমিকায় মহড়া দিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা মঞ্চস্থ হয়নি। কিন্তু সেই উজ্জ্বল স্মৃতি প্রায়ই আমার মনে পড়ে। নৃত্যেও আমি বিশেষ অনুরক্তা ছিলাম কিন্তু সঙ্গীতকেই আমি একান্তরূপে গ্রহণ করি। পরলোকগত প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী যখন শান্তিনিকেতনে বরাবর থাকার জন্য আসেন, তখন রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের লেখা অনেকগুলি গান শ্রীমতী দেবী-চৌধুরাণীর নিকট শেখার সুযোগ পাই। 'সঙ্গীত-ভবন'এ চার বৎসর শিক্ষার পর আমি হিন্দুস্থানী ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ডিপ্লোমা লাভ করি। এখানে পড়ার সময় আমি সরকারী বৃত্তি ও শেষ পরীক্ষায় ধর্ম্ম-সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য Tagore-Hymns পুরস্কার পাই।

১৯৫০ সনে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র-ভবনের তদানীন্তন কিউরেটর (Curator) ও কুমিল্লার বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীপ্রমোদকুমার সেনের মধ্যমপুত্র শ্রীঅমিয়কুমার সেনের সহিত আমার বিবাহ হয়। সেই বৎসর তাঁহার সহিত আমি আমেরিকা যাই ও তথায় Social Studies কোর্সের সার্টিফিকেট লাভ করি।

চিকাগো, মিচিগান, উইনকনসিনের রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় বেতার-কেন্দ্র হইতে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করি। ফেরার পথে লণ্ডন বি, বি, সিতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাই। চিকাগোর একটি বিশিষ্ট গির্জ্জাতে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে আমায় গান গাইতে হয়। এ ছাড়া আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বহু সভা-সমিতিতে আমি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গায়িকা ছিলাম। আমেরিকার বৌদ্ধসঙ্ঘ বুদ্ধদেবের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ কৃত বুদ্ধ-প্রশস্তি গান গাইবার জন্য আমায় আমন্ত্রণ করেন। ভারতীয় মেয়েদের সম্বন্ধে কতকগুলো কথিকা আমায় বলতে হয় তথাকার বিদ্যালয় ও নারীমঙ্গল সমিতিতে। ১৯৫২ সালে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসি। কিন্তু ১৯৫৭ সালে শ্রীসেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে কলিকাতায় চলিয়া আসেন আর আমিও সেই থেকে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়ি। বর্ত্তমানে 'সুরঙ্গমা' সঙ্গীত-শিক্ষালয়ের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে যুক্ত আছি। শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতদলের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা জায়গা আমি পরিভ্রমণ করেছি। সদ্যলোকান্তরিত আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন আমার নিকট-আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সাথে আমি অনেকবার গেয়েছি। আমার স্বামীর গৃহেও সঙ্গীত-সাধনায় প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি।

আমার গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম রেকর্ড হয় ১৯৪৪ সালে। সেই বৎসর থেকে কলিকাতা বেতারকেন্দ্র আমি নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনা করে থাকি। কবিগুরু লিখিত অধ্যাত্ম সঙ্গীতের প্রতি আমার বেশী আকর্ষণ, আর আমি তাতেই প্রতিষ্ঠা পাব বলে মনে করি।

শ্রীমতী নীলিমার গান যাঁরা শোনেন, তাঁরাই জানেন যে গানের গুণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য সর্ব্বদাই আর তাঁর কণ্ঠ হল অন্তি-দরদী।

স্বয়ংবরা

'শতভিষা'

মরণ শ্যামের দখিন বাহুতে বাঁধিবারে সাধ মিলন-রাখী,
মোরে ভুলো নাকো প্রিয়তম ওগো মিলন আশায় আছি যে জাগি।
জানি দ্বিধাহীন নির্ভীক তুমি কাহারো নিষেধ মানো না কভু,
এ মরজগতে পরম সত্য হে বিজয়ী তুমি তোমার প্রভু।
ব্যথিতের বুকে কোমল করুণ সান্ত্বনা মায়া পরশ দানো,
অহঙ্কারীর দর্পিত মাথা চরণের তলে লুটাতে জানো।
আসন তোমার জীর্ণকন্থা অর্ঘ তোমার অশ্রুজল,
দীর্ঘশ্বাস বন্দনা তব হে চিরপ্রান্ত অচঞ্চল।
জীবন-বধূর বেলাঞ্চলেতে তব উত্তরী গ্রন্থি বাঁধা,
হে শ্যামকান্তি মোহন মরণ বামপাশে তব জীবন-রাধা।
বধূ, করুণ নয়নে মিনতি জানায় প্রিয়তম তার বাধা না মানে,
ছুটে যত দূরে পলাইতে চায় সবলে যে প্রিয় বক্ষে টানে।
তোমাদের এই লুকোচুরি খেলা হেরিলাম সারা জীবন ভরি,
স্বয়ংবরা এ বধূরে তোমার লয়ে যাও প্রিয় হরণ করি!

◎ দেশে-বিদেশে ◎

চৈত্র, ১৩৬৬ (মার্চ্চ-এপ্রিল, '৬০)

অন্তর্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ) : সার্কুলার বা ভূগর্ভস্থ রেলপথ ছাড়া কলিকাতায় যাত্রীর ভীড় হ্রাস অসম্ভব—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘোষণা।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ্চ) : এপ্রিল মাসে নেহরু-চৌ (ভারতীয় ও চীনা প্রধানমন্ত্রীদ্বয়) বৈঠকের প্রস্তাব সম্পর্কে চীনা সরকার এখনও নিরুত্তর—দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর উক্তি।

দণ্ডকারণ্য ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ (কলিকাতা) কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন (উদ্বাস্তু) সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার সহিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যসচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের জরুরী আলোচনা।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ্চ) : চলচ্চিত্রের উপর কর ধার্য্যের তীব্র সমালোচনা—লোকসভায় প্রচার ও বেতার দপ্তরের ব্যয়-বরাদ্দ দাবী সম্পর্কে বিতর্ক।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) : কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটে (১৯৬০-৬১ সাল) ১০ লক্ষাধিক টাকা ঘাটতি—ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীগুরুগোবিন্দ বসু কর্তৃক বাজেট পেশ।

বোম্বাই দ্বিধা বিভক্তিকরণ (মহারাষ্ট্র ও গুজরাট) বিল বোম্বাই বিধানসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৫ই চৈত্র (১৯শে মার্চ্চ) ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের প্রতীক ধর্ম্মঘট—ব্যাঙ্ক কর্ম্মীদের বিরোধ জাতীয় ট্রাইবুনাল প্রেরণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ।

দিল্লীতে পাক্-ভারত বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা সমাপ্ত।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ্চ) : নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিবসব্যাপী বৈঠক শেষ—রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের উপর তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যমান স্থির রাখা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব অর্পণ।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ) : চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই-এর ১৯শে এপ্রিল নয়াদিল্লী আগমন—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

ব্যাঙ্ক বিরোধ সম্পর্কে সালিশীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ) : পাকিস্তানকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধনের সিদ্ধান্ত—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ঘোষণা।

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সাধারণ খাতে ব্যয়-বরাদ্দের বিতর্কে সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনা।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ্চ) : দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের নরমেধ যজ্ঞের তীব্র নিন্দা—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

১০ই চৈত্র (২৪শে মার্চ্চ) : ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীদের ২০ দিন ব্যাপী ধর্ম্মঘট প্রত্যাহার।

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ্চ) : ভারতের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের রূপ পরিবর্ত্তনের আহ্বান—সেবাগ্রামে অখিল ভারত সর্ব্বসেবা সংঘের বৈঠকে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের দাবী।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ্চ) : দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনের দাবী পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় অগ্রাহ্য।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ্চ) : ভারত-চীন প্রধান মন্ত্রী বৈঠকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার আশা—কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালার মন্তব্য।

১৪ই চৈত্র (২৮শে মার্চ্চ) : দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ব্বর হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা—লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১৫ই চৈত্র (২৯শে মার্চ্চ) : ১২-দিন ব্যাপী ভারত সফরের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট গামেল আবদেল নাসেরের সদলে দিল্লী আগমন।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ্চ) : দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালীন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণের আশা নাই—লোকসভায় ইস্পাত-সচিব সর্দ্দার শরণ সিং-এর উক্তি।

দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সহিত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা।

১৭ই চৈত্র (৩১শে মার্চ্চ) : পরবর্ত্তী ছয় মাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভারতের আমদানী নীতি ঘোষণা—ক্ষুদ্র শিল্প, কাঁচা মাল ও যন্ত্রাংশের আমদানী বৃদ্ধির ব্যবস্থা।

লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিবৃতি—সিকিমের পৃথক্ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রশ্ন উঠে না।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) : ভারতের সর্ব্বত্র সরকারী প্রাইজ বণ্ড পরিকল্পনার উদ্বোধন—দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, অর্থসচিব শ্রীমোরারজী দেশাই কর্তৃক প্রথম দফায় বণ্ড ক্রয়।

দণ্ডকারণ্যে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ।

১৯শে চৈত্র (২রা এপ্রিল) : চৌ-এর (চীনা প্রধানমন্ত্রী) দিল্লী আগমনে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার সম্ভাবনা—নাঙ্গালে সাংবাদিকদের নিকট আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের আশা প্রকাশ।

২০শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল) : হাওড়া ময়দানে অনুষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ উদ্বাস্তু সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার অপসারণ ও দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার পুনর্গঠন দাবী।

সরকারী শিল্প প্রচেষ্টা বেসরকারী খাতের বিরূপ মনোভাবের নিন্দা—নিখিল ভারত পণ্য উৎপাদক সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর ভাষণ।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল) : পশ্চিমবঙ্গে সরকারী অর্থ লইয়া ছিনিমিনি খেলার চাঞ্চল্যকর কাহিনী—১৯৫৮-৫৯ সালের অডিট রিপোর্টে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়ের বিবরণ প্রকাশ।

২২শে চৈত্র (৫ই এপ্রিল) : চীন কর্তৃক এভারেষ্ট দাবী বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ বিতর্কের বিষয়ে পরিণত—দিল্লীতে বিশ্ব বিষয়ক ভারতীয় পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর মন্তব্য।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): স্কুল ফাইন্যালের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় রাজ্যবিধান সভায় উদ্বেগ—প্রশ্নপত্র ফাঁস ব্যাপারে কয়েক ব্যক্তি গ্রেপ্তার।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা কর্তৃক ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী বিল গৃহীত।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল): কাম্বেতে বড় আকারের তৈল খনি আবিষ্কার—লোকসভায় খনি ও তৈল সচিব শ্রী কে ডি মালব্যের ঘোষণা।

২৫শে চৈত্র (৮ই এপ্রিল): কমাণ্ডার নানাবতীকে (বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী আহুজা হত্যার মামলায় অভিযুক্ত) মামলা চালাইবার জন্য সরকারী সাহায্য দান অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক হইয়াছে—কম্পট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের মন্তব্য।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): ভারতের সীমান্ত সম্পর্কে ভারতীয় জনগণকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে— আসন্ন চৌ-নেহরু বৈঠকের উল্লেখকালে লোকসভায় কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেননের ঘোষণা।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): দিল্লীতে নেহরু-নাসের যৌথ ইস্তাহার প্রচার—কোন শক্তি-গোষ্ঠিতে ভারত ও সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের যোগ না দিবার সম্বন্ধ ঘোষণা।

আসাম-পূর্ব্ব পাকিস্তান সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রশ্নে উভয় অংশের চীফ সেক্রেটারীদের আলোচনার (শিলং) সন্তোষজনক সমাপ্তি।

২৮শে চৈত্র (১১ই এপ্রিল): কলিকাতার পৌর সভায় মেয়র নির্ব্বাচনে দারুণ হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা—ইউ-সি-সি ও কংগ্রেস দলের পৃথক্ পৃথক্ মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচন।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল): দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় ব্যর্থতার জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্ব্বাসন সচিব শ্রীখান্নার পদত্যাগ দাবী—লোক সভায় বিরোধী সদস্যদের প্রস্তাব।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল): খালের জল সংক্রান্ত বিরোধ-মীমাংসায় পাকিস্তানের বাধা সৃষ্টি—লোকসভায় সেচ ও বিদ্যুৎ সচিব মিঃ হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম কর্তৃক তথ্য জ্ঞাপন।

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক কলিকাতা পৌরসভার মেয়র নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনা।

বহির্দেশীয়—

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ্চ): জেনেভায় প্রাচ্য-প্রতীচ্য দশ জাতি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আরম্ভ।

৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ্চ): ইণ্ডিয়ানার মধ্যাকাশে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা—৬৩ জন আরোহীর সকলেই নিহত।

৪ঠা চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ): আসন্ন শীর্ষ সম্মেলন ও জেনেভা বৈঠকে সমস্ত সমস্যার সমাধান—রুশ প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের আশা প্রকাশ।

৬ই চৈত্র (২০শে মার্চ্চ): সাধারণ নির্ব্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ দহনায়কের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিদায় গ্রহণ।

৭ই চৈত্র (২১শে মার্চ্চ): চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌএন-লাই ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি. পি. কৈরালা কর্তৃক পিকিং-এ চীন-নেপাল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ): কেপটাউন ও জোহান্সবার্গে (দক্ষিণ আফ্রিকা) কৃষ্ণকায়দের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত—পরিচয়পত্র আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উপর সৈন্য ও পুলিশের বেপরোয়া গুলীবর্ষণ।

৯ই চৈত্র (২৩শে মার্চ্চ): সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মঃ ক্রুশ্চেভের ফ্রান্স সফর সুরু—প্যারিসে ফরাসী প্রেসিডেণ্ট দ্যগলের সহিত ঘরোয়া বৈঠক।

১১ই চৈত্র (২৫শে মার্চ্চ): গণ-চীন কর্তৃক নেপালকে দশ কোটি টাকা ঋণ দান—নেপাল-চীন সীমান্ত চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ।

১২ই চৈত্র (২৬শে মার্চ্চ): আফ্রিকানদের (কৃষ্ণকায়) বিনা পরিচয়পত্রে চলাফেরার অধিকার স্বীকার—দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের বিজ্ঞপ্তি।

১৩ই চৈত্র (২৭শে মার্চ্চ): রাওয়ালপিণ্ডিতে চারদিন ব্যাপী পাক্-ভারত অর্থনৈতিক আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত।

১৬ই চৈত্র (৩০শে মার্চ্চ): বিক্ষোভ দমনে দক্ষিণ আফ্রিকার ৮০টি জেলায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও আঞ্চলিক বাহিনীর সমাবেশ।

১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল): দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট বর্ণ-বৈষম্য নীতি পরিহারের আর এক দফা দাবী—হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রো-এশীয় প্রস্তাব গৃহীত।

২০শে চৈত্র (৩রা এপ্রিল): সকল আন্তর্জাতিক প্রশ্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার সঙ্কল্প—প্যারিসে প্রচারিত ক্রুশ্চেভ-দ্য গল (রুশ ও ফরাসী রাষ্ট্রপ্রধানদ্বয়) যৌথ ইস্তাহারে ঘোষণা।

২১শে চৈত্র (৪ঠা এপ্রিল): বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্টের উপর গণচীনের দাবী নেপাল কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৩শে চৈত্র (৬ই এপ্রিল): সিংহলকে 'কমনওয়েলথের মধ্যে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নূতন পার্লামেণ্টে গভর্ণর জেনারেল স্যার অলিভার গুণতিলকের ঘোষণা।

২৪শে চৈত্র (৭ই এপ্রিল): জেনেভা বৈঠকে সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক পশ্চিমী নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা অগ্রাহ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে দাগ হামারশোল্ডের (রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল) তৎপরতা—ইউনিয়ন সরকারের নিকট সরকারী ভাবে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ প্রেরণ।

২৬শে চৈত্র (৯ই এপ্রিল): আততায়ীর গুলীতে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ হেণ্ডিক ভেরউর্ড আহত।

২৭শে চৈত্র (১০ই এপ্রিল): তিব্বতে আক্রমণ ও ব্যাপক নরহত্যার ব্যাপারে চীন অপরাধী—আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কমিটির অভিমত।

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল): হেগের আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক পর্ত্তুগালের দাবী অগ্রাহ্য—ভারতের ভিতর দিয়া পর্ত্তুগালের সৈন্য লইয়া যাওয়ার অধিকার অস্বীকৃত।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল): দিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সহিত প্রত্যাশিত বৈঠকের উদ্দেশ্যে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌএন-লাই-এর সদলে পিকিং হইতে যাত্রা।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সীংম্যান রী বিদায়—

পঁচাশী বৎসরের বৃদ্ধ দক্ষিণ কোরিয়ার দুর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত প্রেসিডেন্ট ডাঃ সীংম্যান রী বিপুল রক্তপাতের মধ্যে গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৬০) পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যিনি একদিন কোরিয়ার জাতীয়তাবাদী জনপ্রিয় নেতা ছিলেন বার বৎসর দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকিয়া তাঁহার অভ্রভেদী ক্ষমতালিপ্সা এবং নিষ্ঠুর দমননীতির জন্য তিনি জনগণের অশেষ অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপুটে আশ্রয় না পাইলে বহু পূর্ব্বেই তাঁহার পতন হইত। মার্কিণ সরকারের সমর্থন পাইলে এবারও তাঁহার পতন ঘটিত কিনা সে কথা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। গত ১৫ই মার্চ্চের নির্ব্বাচনের পর হইতে প্রায় একমাসব্যাপী ছাত্র ও গণবিক্ষোভের ফলে ১৪৫ জন নিহত এবং ৭০৫ জন আহত হওয়ায় অনুতপ্ত হইয়া তিনি প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও স্বীকার করা সম্ভব নয়। গত ১৯শে এপ্রিলের বিক্ষোভ দমনের জন্য প্রেসিডেন্ট ডাঃ রী যে চরম নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার আশ্রয়দাতা এবং রক্ষাকর্ত্তা মার্কিণ সরকারও উদ্বিগ্ন না হইয়া পারেন নাই। কোরিয়ার রাজবংশোদ্ভব আভিজাত্যগর্ব্বী, দাম্ভিক এই বৃদ্ধটি তাঁহার উৎকট কম্যুনিজম বিরোধিতার জন্যই মার্কিণ সরকারের বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন। মার্কিণ সরকার মনে করিতেন শাসনভার ডাঃ রীর হস্তে ন্যস্ত না থাকিলে কম্যুনিজমের প্লাবনে দক্ষিণ কোরিয়া প্লাবিত হইয়া যাইবে। তাই ডাঃ রীর গণতন্ত্রবিরোধী এবং ফ্যাসিষ্ট সুলভ সমস্ত কার্য্যই মার্কিণ সরকার পরম ঔদাসীন্যের সহিত অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। গত ১৫ই মার্চ্চের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন উপলক্ষে চতুর্থবার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হওয়ার দুর্লোভ বশতঃ যে-সকল অনাচারের অনুষ্ঠান ডাঃ রী করিয়াছেন ১৯শে এপ্রিলের বিপুল অভ্যুত্থানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত মার্কিন সরকার সেগুলিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। কিন্তু এই বিক্ষোভ দমনের জন্য যেরূপ বিপুলভাবে ট্যাঙ্ক এবং কামান ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে মার্কিণ সরকারও বিচলিত না হইয়া পারিলেন না। মার্কিণ সরকার বুঝিতে পারিলেন, এইভাবে কম্যুনিষ্ট একনায়কত্বের অগ্রগতি-রোধ করিবার জন্য যদি দক্ষিণ কোরিয়ায় ডাঃ রীর ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাহাকে স্বাধীন বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করে সেই স্বাধীন বিশ্বের সর্ব্বত্র কম্যুনিজমেরই প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। দক্ষিণ কোরিয়ায় যে যুবশক্তি আজ ডাঃ রীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে দমননীতির ফলে কাল সেই যুবশক্তিই যে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যাপারে মার্কিণ সরকার আর উদাসীন থাকিতে পারেন নাই।

১৫ই মার্চের নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ যে ন্যায় সঙ্গত মার্কিণ সরকার তাহা জানিয়াও নীরব ছিলেন। কিন্তু সেই ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য প্রবল গণবিক্ষোভকে যেভাবে দমন করা হইতেছিল তাহাতে মার্কিণ সরকারও আর নীরব দর্শক থাকিতে পারিলেন না। দক্ষিণ কোরিয়াকে মার্কিণ আওতায় রাখিবার জন্য কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ফলে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ মার্কিণ যুবক নিহত হইয়াছে, আহত হইয়াছে প্রায় একলক্ষ মার্কিণ যুবক। সেই দক্ষিণ কোরিয়ায় ডাঃ রীর শাসন বহাল রাখিলে কম্যুনিজমেরই সুযোগ উপস্থিত হইবে। তাই ১৯শে এপ্রিল তারিখেই সিউলস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মিঃ ওয়াল্টার ম্যাকনগি প্রেসিডেন্ট রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় ৪৫ মিনিট কাল তাঁহার সহিত আলোচনা করেন এবং এই আশা প্রকাশ করেন যে, আর যাহাতে হতাহত না হয় তাহার জন্য যেন চেষ্টা করা হয়। তিনি বলেন, "The means adopted to maintain law and order would take into consideration the basic causes and grievances behind the disorder." অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের সময় বিশৃঙ্খলার মূলে যে মূল কারণ এবং অভিযোগ রহিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরও নীরব থাকিতে পারেন নাই। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের 'অভিযোগের সঙ্গত কারণ' (justifiable grievances) রহিয়াছে মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর সে-কথা স্বীকার করিয়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা দূর করিতে বলিয়াছেন। নির্ব্বাচনে যে গলদ (irregularities) রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হার্টারও স্বীকার করিয়াছেন যে, দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে ডাঃ রীর সরকার যে-সকল নিয়মবিরুদ্ধ কারসাজি করিয়াছেন, বিক্ষোভ প্রধানতঃ সেই কারণেই ঘটিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ডাঃ রীর সরকার গণ-অসন্তোষের মূল কারণগুলি দূর না করিয়া অত্যধিক মাত্রায় দমননীতি চালাইয়া ভুল করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নিজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রক্ষা করিবার জন্য ডাঃ রী শুধু সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনেই গণতন্ত্র-বিরোধী কারসাজী এবং দমননীতি প্রয়োগ করেন নাই। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের শেষে কোরিয়া জাপানের কবল হইতে মুক্ত হয়। উত্তর কোরিয়া থাকে রাশিয়ার প্রভাবাধীনে এবং দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে আসে। ডাঃ রী ১৯৪৮ সালে জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। সেই সময়

হইতেই তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইতে থাকে। তবু ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনেও তিনি প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। ঐ সময় কোরিয়ায় শাসনতন্ত্রে বিধান ছিল, কোনও ব্যক্তি পর পর দুই বারের বেশী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। ডাঃ রী ১৯৫৪ সালে ঐ বিধান বাতিল করেন।

১৯৫৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে যিনি ডাঃ রীর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, ভোট গ্রহণের একদিন পূর্ব্বে রহস্য জনক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হয়। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই কারারুদ্ধ হন এবং গত বৎসর জুলাই মাসে বিচারের এক প্রহসন করিয়া উত্তর কোরিয়ার সহিত যোগসাজসের অভিযোগে তাঁহার ফাঁসী দেওয়া হয়। কোরিয়ার গৃহ যুদ্ধের বিরতির পর হইতে দক্ষিণ কোরিয়ায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠীত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে বামপন্থী তো দূরের কথা প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদও গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতেছিল। কাহাকেও কোন কৌশলে কম্যুনিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে মৃত্যুদণ্ড এড়ানো তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়া আসিতেছে। এই অর্থ সরকারী এজেন্সী এবং জনকতক অভিজাত বংশীয়দের মাধ্যমে ব্যয় করা হইয়া থাকে। ফলে বড় লোকদের একটা বৃহৎ কায়েমী স্বার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। কম্যুনিজম নিরোধের জন্য মার্কিণ বাহিনী ১৯৪৬ সালে যে অর্ডিনান্স জারী করে সেই পুরাতন অর্ডিনান্স অনুসারে গত বৎসর এপ্রিল মাসে একটি স্বাধীন মতাবলম্বী বিশিষ্ট সংবাদপত্রকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গত মার্চ্চ মাসের নির্ব্বাচনে যে জবরদস্তী চলিয়াছে মার্কিণ সরকার আজ তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। এই নির্ব্বাচনের প্রাক্কালেও ডাঃ রীর প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হয়। তবে তাঁহার মৃত্যুটা নাকি রহস্যজনক নয়। ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য ডাঃ রীর লিবারেল দলের প্রার্থীর সহিত ডেমোক্রাট দলের প্রার্থী ডাঃ চাং মিউনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ডাঃ মিউন পরাজিত হন। মার্কিণ সাপ্তাহিক পত্রিকা 'টাইম' পর্য্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, স্বাধীন ভাবে ভোট প্রদত্ত হইলে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীই জয় লাভ করিতেন। প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় রক্তপাত বড় কম হয় নাই। সরকারী হিসাব মতই ৮ জন নিহত হয়। বেসরকারী মতে নিহতের সংখ্যা অনেক বেশী। অনেকে বলেন যে, বহু মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ভোট গ্রহণের দিনও জবরদস্তি ও ভয় প্রদর্শন চলিয়াছিল। ফলে বহু ভোটার ভোট দিতে যান নাই। এই সুযোগে ‍চিহ্নিত ব্যালট পেপার দ্বার ব্যালট বাক্স পূর্ণ করা হয়। নির্ব্বাচনে জয়লাভ সুনিশ্চিত-ই ছিল। ডাঃ রী শুধু জিতিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। সমগ্র দক্ষিণ কোরিয়া যে তাঁহাকেই চায় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। শত করা ৮০ জনেরও বেশী ভোটার ভোট দিয়েছেন বলিয়া দেখানো হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া যে তাঁহার বিরোধী তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হয় নাই।

স্বাধীন বিশ্ব, গণতন্ত্র এবং কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার নামে মার্কিণ সরকার ডাঃ রীর বার বৎসর ব্যাপী স্বৈরাচারিতা সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু এবার মার্কিণ সরকারেরও ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। মার্কিণ সরকারের চাপে গত ২৩শে এপ্রিল (১৯৬০) ডাঃ সীংম্যান রী অপ্রতিহত শাসন ক্ষমতার অধিকার ত্যাগ করিয়া নাম সর্ব্বস্ব রাষ্ট্র প্রধান থাকিতে সম্মত হন। তাঁহার মন্ত্রিসভার সকল সদস্য পদত্যাগ করেন। কিন্তু জনমত সন্তুষ্ট হয় নাই। গত ২৬শে এপ্রিল পাঁচ লক্ষ লোকের এক মারমুখী জনতা ডাঃ রীর বাসভবন ঘেরিয়া ফেলে এবং অবিলম্বে তাঁহার পদত্যাগ দাবী করে। তাহারা ডাঃ রীর একটি মূর্ত্তি টানিয়া হিঁচড়াইয়া রাস্তায় আনিয়া ফেলে ও উহাতে থুথু দেয়। ডাঃ রী জানান যে, জনগণ যদি চায়, তাহা হইলে তিনি প্রেসিডেণ্টের পদ অবিলম্বে ত্যাগ করিবেন। জনমতের দাবী আর কি ভাবে তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইল। গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৬০) তিনি পদত্যাগ করেন। ঐদিন অপরাহ্নে দক্ষিণ কোরিয়াস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন, "কোরিয়া রিপাবলিক এবং বিদেশস্থ বন্ধু বন্ধুদের ইহা একটি চিরস্মরণীয় দিন হইয়া থাকিবে। আমার বিশ্বাস, জনগণের ন্যায় সঙ্গত অভিযোগগুলির প্রতিকার করিবার জন্য যাহা কিছু করণীয়, কর্ত্তৃপক্ষ সেগুলি সমস্তই করিবেন।" ডাঃ রী এবং তাঁহার লিবারেল দল শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষেই নয় আমেরিকা যাহাকে স্বাধীন বিশ্ব বলিয়া মনে করে তাহার পক্ষেও বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মার্কিণ সরকারও বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই পদত্যাগ করা ছাড়া ডাঃ রীর উপায়ান্তর ছিল না।

ডাঃ সীংম্যান রী প্রেসিডেণ্টের পদ পরিত্যাগ করায় দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি দুর্ব্বার বাধা দূর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার জন্য প্রচুর রক্তপাতের প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্রের নূতন পাদক্ষেপ কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহা বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই। ডাঃ রীর পদত্যাগের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ হু চুং অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যদি এই বিপুল রক্তপাত এবং ডাঃ রীর পতনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহা হইলে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের লইয়াই তিনি সরকার গঠন

করিবেন এবং স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন হওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগের প্রতিকার হওয়া সম্পর্কে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত যে আশ্বাস দিয়াছেন স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইলেই এই অভিযোগের প্রতিকার হইবে। দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটা গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুখ্য দায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একথা অস্বীকার করা যায় না। কম্যুনিজমের ভয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় দ্বিতীয় সীংম্যান রী গড়িয়া উঠিবার কোন সুযোগ যদি মার্কিণ সরকার না দেন, তাহা হইলে যুব শক্তির এই রক্তক্ষয়কারী বিক্ষোভের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে হইবে। তাহা হইলেই ডাঃ রীর পদত্যাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। গত বার বৎসরে ডাঃ রী গণতন্ত্রের যে ধ্বংসস্তূপ রচনা করিয়াছেন তাহা অপসারণ করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ বাধা মুক্ত করাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন।

নেহরু-চৌ-আলোচনা ব্যর্থ—

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধী মীমাংসার জন্য নয়াদিল্লীতে ছয়দিন ব্যাপী নেহরু-চৌ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। আলোচনার এই ব্যর্থতা প্রত্যাশিত ছিল কি না এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। প্রথমে ব্রহ্মদেশ তারপর নেপালের সহিত চীনের সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা হইয়াছে বলিয়াই চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা প্রত্যাশিত ছিল, একথা হয়ত বলা যায় না। কারণ চীন-ব্রহ্মদেশ ও চীন-নেপাল সীমান্ত বিরোধ অপেক্ষা চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ বহু গুণে গুরুতর। এই সীমান্ত বিরোধ লইয়া এমন অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে যাহার ফলে ভারতবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে, চীন-ভারত মৈত্রী শুধু বিপন্নই হয় নাই, উহা ভাজিয়া পড়িয়াছে বলিলেও ভুল হইবে না। বস্তুতঃ ইতিপূর্ব্বে দুইবার চীনের প্রধান মন্ত্রীর সম্বর্দ্ধনায় যেরূপ আন্তরিকতা লক্ষিত হইয়াছিল এবার আর তাহা দেখা যায় নাই। শুধু এই সকল কারণেই নেহরু-চৌ আলোচনার ব্যর্থতা প্রত্যাশিত ছিল একথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের ফলে সমগ্র এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট চীনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, একথা মিঃ চৌ-এন-লাই বুঝিতে পারেন নাই, ইহা মনে করা সম্ভব নয়। এশিয়ায় কম্যুনিষ্টদেশ এবং অকম্যুনিষ্ট দেশের মধ্যে সহাবস্থান নীতি যদি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে ইউরোপে সহাবস্থান নীতি কার্য্যকরী করা মঃ ক্রুশেভের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। অনেকেই হয়ত আশা করিয়াছিলেন যে, মঃ ক্রুশেভ শীর্ষ-সম্মেলনের পূর্ব্বে চীন-ভারত মৈত্রী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান। এই ধারণা নেহরু-চৌ বৈঠকের সাফল্য সম্পর্কে একটা প্রত্যাশা সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। গত ১৯শে এপ্রিল (১৯৬০) পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করিবার পর চীনের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, বিরোধ মীমাংসার ঐকান্তিক আগ্রহ লইয়াই তিনি নয়া দিল্লীতে আসিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তি একটা কথার কথা মাত্র, ইহা মনে করা তখন সম্ভব ছিল না। তিব্বত লইয়াই সর্ব্বপ্রথম চীন-ভারত মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হওয়ার সূচনা দেখা দেয়। দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ায় চীন সন্তুষ্ট হয় নাই। ইহার পরেই আরম্ভ হয় চীন কর্ত্তৃক ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন এবং গুলীবর্ষণ। তা সত্ত্বেও পণ্ডিত নেহরুর নিকট সকল পত্রেই মিঃ চৌ-এন-লাই এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা দ্বারা চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের ন্যায় সঙ্গত মীমাংসা সম্ভব হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিয়াছে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়।

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই গত ১৯শে এপ্রিল (১৯৬০) নয়াদিল্লীতে উপনীত হন। ২৬শে এপ্রিল তিনি নয়াদিল্লী হইতে সদলবলে নেপাল যাত্রা করেন। ২০শে এপ্রিল হইতে ২৫শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় দিনে সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু এবং মিঃ চৌ এন লাইয়ের মধ্যে প্রায় ২০ ঘণ্টা নিভৃত আলোচনা হয়। এই সুদীর্ঘ আলোচনা সত্ত্বেও সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে কোন মীমাংসা হয় নাই, আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। আলোচনা একেবারেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে কি না সে সম্পর্কেও মতভেদের অবকাশ যে একেবারেই নাই তাহাও নয়। উভয় প্রধান মন্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উভয় দেশের সরকারী কর্ম্মচারীরা সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি পরীক্ষা করিবেন। যতদিন এই তথ্য প্রমাণাদির পরীক্ষা চলিবে ততদিন উভয় সরকারই সীমান্ত এলাকায় দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া চলিবেন। আলোচনার ব্যর্থতা হইতে সামান্য পরিমাণে হইলেও যেটুকু ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য বিশেষভাবেই যে চেষ্টা করা হইয়াছে তথ্য প্রমাণাদির পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং পরীক্ষাকালে সীমান্ত এলাকায় দ্বন্দ্ব পরিহারের সিদ্ধান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রথম বৈঠক বসিবে জুন মাসে। এই বৈঠক হইবে পিকিংয়ে। তারপর পাল্টাপাল্টি করিয়া উভয় দেশের রাজধানীতে বৈঠক বসিবে এবং সেপ্টেম্বর মাসে রিপোর্ট দাখিল করা হইবে। নেহরু-চৌ বৈঠক শেষ হওয়ার পর ২৫শে এপ্রিল তারিখে প্রচারিত যৌথ ইস্তাহারে এই সকল বিষয় ঘোষণা করা হয়।

উভয় প্রধান মন্ত্রীই নিজ নিজ দাবীতে যে অচল ছিলেন ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। মিঃ চৌ এন লাই ম্যাকমোহন লাইনকে মানিয়া লইতে রাজী নহেন। তবে লাইনের অপরদিকে চীনা সৈন্যের অগ্রগতি রোধ করিতে তিনি সম্মত আছেন। এই অপরদিকের মধ্যে লংজুও পড়িয়াছে। লাডাক অঞ্চলে ভারতের যে ৩০ হাজার বর্গমাইল ভূমি চীনারা দখল করিয়াছে উহা চীনের দখলে থাকা ভারত মানিয়া লউক মিঃ চৌ এন লাই ইহাই বলিয়াছিলেন। এই ধরণের প্রস্তাবে নেহরুজী রাজী হইতে পারেন নাই। কিন্তু আলোচনাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে দেওয়া হয় নাই। জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উভয় দেশের সরকারী কর্ম্মচারীগণ সীমানা বিরোধ সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণাদি পরীক্ষা করিবেন। পণ্ডিত নেহরু পিকিংয়ে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি কবে চীনে যাইবেন তাহা অবস্থা বুঝিয়া স্থির করা হইবে। আলোচনার পূর্ব্বে সীমান্তের অবস্থা যাহা ছিল আলোচনার পরেও তাহাই রহিয়া গেল।

ভারত হইতে মিঃ চৌ এন লাই নেপালে গমন করেন। সেখান হইতে পিকিংয়ে যাওয়ার পথে গত ২৯শে এপ্রিল তিনি সদলবলে

কিছু সময় দমদম বিমান বন্দরে অবস্থান করেন। ঐ সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন যে, তিনি দিল্লী ত্যাগ করার পর শ্রীনেহরু লোকসভায় এবং সাংবাদিকদের নিকট চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত এবং উহা বন্ধুজনোচিত হয় নাই। তিনি এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার সময় শ্রীনেহরু একথার উল্লেখ করেন নাই। সাংবাদিকগণ চৌ এন লাইকে পর পর প্রশ্ন করিতে থাকিলে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন ই উত্তেজিতভাবে হাত নাড়িতে নাড়িতে বলেন, 'আর নয়, আর নয়।' সঙ্গে সঙ্গে চীনা নিরাপত্তা বাহিনীর তের চৌদ্দজন কর্মচারী ধাক্কা দিতে দিতে সাংবাদিকদিগকে বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে। তখন মিঃ চৌ এন লাই উচ্চৈঃস্বরে চীনাভাষায় কি বলিয়া তাহাদিগকে থামাইয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে গত ২৮শে এপ্রিল কাটমণ্ডুতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ চৌ এন লাই পণ্ডিত নেহরুর উক্তি সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন।

এভারেষ্ট ও চীন—

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই ভারত হইতে ২৬শে এপ্রিল নেপালে গমন করেন। নেপাল হইতে স্বদেশে যাত্রা করেন ২৯শে এপ্রিল। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরলার সহিত তাঁহার আলোচনা হয় পোখরায়। নেপালের সহিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি করিতে এবং চীনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতে পারে এইরূপ সামরিক জোটে নেপাল যোগদান করিবে না, এইরূপ একটি স্বীকৃতি ঐ চুক্তিতে পাইবার জন্য চীনের প্রধান মন্ত্রী আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চুক্তি হইবে দশ বৎসরের জন্য এবং উহাতে এইরূপ সর্ত্ত থাকিবে যে নেপাল ও চীন কেহ-ই অপরকে আক্রমণ করিবে না এবং কেহ-ই অপরের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে এরূপ কোন সামরিক চুক্তিতে যোগদান করিবে না। নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৈরলা এইরূপ চুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতি সম্পর্কে বান্দুং ঘোষণাই যথেষ্ট, এইরূপ অনাক্রমণ চুক্তির কোন প্রয়োজন নাই। তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ চুক্তি কোন দেশকে এ পর্য্যন্ত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। নেপাল ও চীনের মধ্যে একটি শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি গত ২৮শে এপ্রিল (১৯৬০) স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

নেপাল ও চীনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সমস্যা দেখা দিয়াছে এভারেষ্ট পর্ব্বত লইয়া। গত মার্চ্চ মাসে পিকিংয়ে নেপাল ও চীনের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহাতে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র এভারেষ্ট পর্ব্বতটিই চীন দাবী করে। চীনের দাবী শুধু এভারেষ্টের দক্ষিণ পার্শ্বই নয়, উহার নিম্নস্থ খুম্বু গ্লেসিয়ার সহ নাম্চে বাজার পর্য্যন্ত পাঁচ মাইল ভূমিও এই দাবীর অন্তর্ভুক্ত। নেপালের প্রধান মন্ত্রী চীনের প্রধান মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, শুধু দক্ষিণ পার্শ্বই নয় এভারেষ্টের উত্তর পার্শ্বও রংবুক গ্লেসিয়ার পর্য্যন্ত নেপালের অন্তর্ভুক্ত। নেপাল সফরে যাইয়া চীনের প্রধান মন্ত্রী এভারেষ্ট পর্ব্বতের দক্ষিণ পার্শ্বের দাবী ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। পোখরায় শ্রীকৈরলাকে তিনি জানাইয়াছেন যে, এভারেষ্ট পর্ব্বতের চূড়া যদি চীন ও নেপালের সীমা বলিয়া স্বীকৃতি হয়, তাহা হইলে এভারেষ্টের দক্ষিণ পার্শ্বের দাবী তিনি ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,

এভারেষ্ট সম্পর্কে আলোচনার সময় চীনের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, পর্ব্বতের যে কোন দিক হইতে এভারেষ্ট শৃঙ্গে অভিযান পরিচালনার জন্য চীন ও নেপাল উভয় দেশের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে নেপালের সার্ব্বভৌমত্ব পুরাপুরি রক্ষিত হয় না বলিয়া নেপালের পক্ষ হইতে উহা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এভারেষ্ট সম্পর্কে আবার কবে কোথায় এবং কি ভাবে আলোচনা হইবে তাহা কিছুই জানা যায় না। তবে এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য যুক্ত সীমানা কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইবে না, একথা নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ।

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন—

৩রা মে (১৯৬০) লণ্ডনে বৃটিশ কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রীদের যে-সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের ইহা নবম সম্মেলন। ইতিপূর্ব্বে সম্মেলন হইয়াছিল ১৯৫৭ সালের জুন-জুলাই মাসে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের প্রথম সম্মেলন হয় ১৯৪৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে। ১৬ই মে (১৯৬০) প্যারীসে যে শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হইবে তাহার প্রাক্কালে আলোচ্য কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলন হইতেছে। এই দিক দিয়া এই সম্মেলনের যে বিশেষ গুরুত্ব আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। শীর্ষ সম্মেলনে শুধু চারিটি বৃহৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণই যোগদান করিবেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীই শীর্ষ সম্মেলনের সহিত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির যোগসূত্র, ইহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। নিরস্ত্রীকরণ, পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণ, জার্ম্মাণ সমস্যা, বার্লিন সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিবর্গ শীর্ষসম্মেলনে কি নীতি গ্রহণ করিবেন সে-সম্পর্কে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিত হইবে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীনের পররাষ্ট্র নীতি, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচী, দক্ষিণ এবং সুদূর প্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কেও কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রিগণ আলোচনা করিবেন। সুতরাং এই সম্মেলন যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একথা অনস্বীকার্য্য কিন্তু এই সম্মেলনের সম্মুখে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রহিয়াছে যাহা কমনওয়েলথ শ্বেতাঙ্গ প্রধান মন্ত্রীদের কাছে মোটেই মুখরোচক নয়। সমস্যাটি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরাজের নৃশংস বর্ণ-বৈষম্য নীতি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতি অনেকদিন ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত উহা কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। কিন্তু গত মার্চ মাসে (১৯৬০) পরিচয় পত্র আইনের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের বিক্ষোভ দমনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকার যে-নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বজনমত তীব্র ভাষায় উহার নিন্দা করিয়াছে। পৃথকীকরণ বর্ণবৈষম্য নীতি পরিহার করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে অনুরোধ করিয়া নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গরাজ তাহাতে একটুকুও বিচলিত হন নাই, অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা। বরং দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের দমননীতি আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কালা আদমী নিধনযজ্ঞের পর প্রশ্ন উঠিয়াছে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে কি না। এই নরমেধ যজ্ঞের পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী একজন শ্বেতকায় আততায়ীর গুলীতে আহত হইয়াছেন। তিনি যদি একজন কৃষ্ণকায়ের গুলীতে আহত হইতেন, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কালাআদমী নির্ম্মূল করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে কৃষ্ণকায় প্রধানমন্ত্রীদের সহিত শ্বেতকায় প্রধান মন্ত্রীরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি-সম্পর্কে আলোচনা করিতে রাজী হইবেন কি না। দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ কমনওয়েলথের একজন সদস্য। উহার প্রধান মন্ত্রী এখনও সুস্থ না হওয়ায় এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন না। তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এরিক লো। তিনি লণ্ডনে পৌছিলে তাঁহার হোটেলের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে। আফ্রিকায় আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকা গড়িয়া উঠিয়াছে মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন। উহার প্রধানমন্ত্রী স্যার রয় ওয়েলেন্স্কীও কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য লণ্ডনে গিয়াছেন। তিনি মনে করেন, দক্ষিণ আফ্রিকা যদি না চায় তবে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি আলোচনা হওয়া উচিত নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা যে চাহিবে না সে-কথা বলা বাহুল্য।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে নিউজীল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাস বলিয়াছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু পরে তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে, এ বিষয় সম্পর্কে সম্মেলনের বাহিরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধির সহিত তিনি আলোচনা করিবেন। শ্বেতকায় প্রধান মন্ত্রীরা যে দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় হইতে বাদ দিতে চাহিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল অশ্বেতকায় প্রধান মন্ত্রীরাই চাহেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্মেলনে আলোচিত হউক। মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টেংকু আবদুল রহমান লণ্ডনে যাওয়ার পথে সান্টাক্রুজ বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে একটা কিছু করা আবশ্যক। কারণ ইহা অনেকদূর গড়াইয়াছে। ঘানার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ কোয়ামে নক্রুমা লণ্ডনে পৌছিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি চাহেন যে, কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ আলোচনা করুন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও লণ্ডনে পৌছিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যে ভাবেই হউক দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি স্থান পাইবে কি? অশ্বেতকায় প্রধান মন্ত্রীরা উহাকে আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন কি? শ্বেতকায় প্রধান মন্ত্রীদের চোখ রাঙানীতে তাঁহারা ভীত হইবেন না তো? যদি হন তাহা হইলে অশ্বেতকায় দেশগুলির কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার কোন সার্থকতা নাই।

টোগোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ—

পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো অধ্যুষিত টোগোল্যাণ্ড ফ্রান্সের অছিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করায় আফ্রিকায় আর একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হইল। এই দেশটি খুবই ছোট, আয়তন প্রায় একুশ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা বার লক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে এই দেশটি জার্ম্মাণীর অধীনে আসে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য টোগোল্যাণ্ড দখল করে। যুদ্ধের শেষে সন্ধির সর্ত্তানুসারে উহার দুই-তৃতীয়াংশ ফ্রান্সের অধিকারে চলিয়া যায় এবং পশ্চিম এব-তৃতীয়াংশ যায় বৃটিশ অধিকারে। বৃটেন তাহার অংশটুকুকে গোল্ডকোষ্টের সহিত যুক্ত করিয়া লয়। গোল্ডকোষ্ট স্বাধীনতা লাভ করিয়া ঘানা নাম গ্রহণ করে এবং উহার সহিত যুক্ত টোগোল্যাণ্ডের অংশ ঘানার অংশ রূপে স্বাধীনতা লাভ করে। লীগ অব নেসান্স ১৯২২ সালে ফ্রান্সকে টোগোল্যাণ্ডের অছি নিযুক্ত করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও টোগোল্যাণ্ডের উপর ফ্রান্সের অছিগিরি স্বীকার করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে উহার অধিবাসীদের অভিপ্রায় নির্দ্ধারণের জন্য দশ বৎসর পর একটি গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। তদনুসারে ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট গ্রহণ করা হয়। ফ্রান্সের অছিগিরির অবসান ও স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে বিপুল সংখ্যায় ভোট হয়। অতঃপর ১৯৫৮ সালের ১৪ই নবেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করেন যে, ১৯৬০ সালে টোগোল্যাণ্ড ফ্রান্সের অছিগিরি হইতে মুক্ত হইবে এবং মুক্ত হওয়ার তারিখ ফ্রান্স ও টোগোল্যাণ্ড নিজেদের মধ্যে আলোচনা দ্বারা স্থির করিবে। তদনুসারেই ২৭শে এপ্রিল টোগোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভের দিন স্থির করা হয়।

টোগোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা প্রাপ্তি উপলক্ষে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; গত ৭ই এপ্রিল ঘানার রাজধানী আক্রায় অনুষ্ঠিত সর্ব্ব আফ্রিকা রাজনৈতিক সম্মেলনে ঘানার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ নক্রুমা বলিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল টোগোল্যাণ্ডের মত দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ পশ্চিম আফ্রিকার সম্মিলিত শক্তির মূলে কুঠার আঘাত করা। সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিদিগকে পশ্চিম আফ্রিকাকে 'বলকানাইজ' করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্ম আহ্বান জানাইয়াছেন। ডাঃ নক্রুমা আরও বলেন বলেন যে, টোগোল্যাণ্ডের যে-অঞ্চল ঘানার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছে সেই অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্ম টোগোল্যাণ্ডে এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তাঁহার এই উক্তির তৎপর্য্য বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। পশ্চিম আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব অবশ্যই ভাল। গত ১৯৫৮ সালের ২রা মে ঘানার প্রধান মন্ত্রী এবং গিনির প্রধান মন্ত্রী ঘানা ও গিনিকে সম্মিলিত করিয়া একটি শক্তিশালী নিগ্রোরাষ্ট্র গঠন করার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজও সেই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার চেষ্টা করা হয় নাই। কেন করা হয় নাই, এই প্রশ্ন উপেক্ষার বিষয় বলিয়া মনে করা যায় না। কোথাও কোন আশঙ্কা ও সন্দেহ উহার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে কি?

ইরাণের ভূমিকম্প—

আগাদীরের পর ইরাণ। গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৬০) দক্ষিণ ইরাণের লার এবং গারাস এই সহর দুইটি দুইবার প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই ভূমিকম্পের ফলে তিন হাজার লোক নিহত এবং আরও প্রায় তিন হাজার লোক আহত হইয়াছে। আগাদীরের ভূমিকম্পের আট সপ্তাহ পরে এই ভূমিকম্প হইল। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই তেহরাণ হইতে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কাস্পিয়ান সাগর এলাকায় ভূমিকম্পের ফলে প্রায় দুই হাজার লোকের প্রাণহানি হয়। ঐ বৎসরই ১৩ই ডিসেম্বর পশ্চিম ইরাণে ভূমিকম্পের ফলে সহস্রাধিক লোক নিহত হয়।

ভূমিকম্পের ফলে লার সহরটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। সহরে একটি বাড়ীরও দেওয়াল খাড়া নাই। এই সহরের সমগ্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে মাত্র একটি কনষ্টবলের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। একটি বিদ্যালয়ে শিশু-দিবস উপলক্ষে একটি উৎসবে সমবেত প্রায় পাঁচ শত ছাত্র-ছাত্রী সকলেই নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলে গবর্ণর নোসরাত খাবির সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন।

ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রথম কম্পন অনুভূত হয়। দ্বিতীয় কম্পন ঘটে উহার চারি ঘণ্টা পরে। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে ভূমিকম্প বলয় আছে বিজ্ঞানীরা তাহার সন্ধান পাইয়াছেন। কিন্তু কখন কোথায় ভূমিকম্প হইবে পূর্ব্বে তাহার আভাষ পাওয়া যাইতে পারে এমন কোন যন্ত্র এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

সিংহলে আবার সাধারণ নির্ব্বাচন—

সিংহলে গত মার্চ্চ মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার পর ইউনাইটেড ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতা মিঃ ডাডলী সেনানায়ক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন। গঠিত হওয়ার ৫৩ দিন পরেই উহার পতন হইয়াছে। এই পতন অপ্রত্যাশিত, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহার দল ৫০টি আসন লাভ করিয়াছিল। মন্ত্রিসভার পরামর্শে ছয় জন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং সিংহলের প্রতিনিধি পরিষদে সরকারপক্ষের সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৭ জন। মন্ত্রিসভা ১৩—৬৩ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে আর মাত্র সাত জন সদস্য মন্ত্রিসভার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেলের উদ্বোধনী বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনার পর যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, তাহারই এক সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত হওয়ায় মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। মিঃ ডাডলী সেনানায়ক হুমকী দিয়াছিলেন যে, তাঁহার মন্ত্রিসভাকে সমর্থন না করিলে তিনি গবর্ণর জেনারেলকে প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিবার পরামর্শ দিবেন। তাঁহার এই হুমকীতে কোন কাজ হয় নাই। কিন্তু ভোটে হারিয়া যাওয়ার পর তাঁহার পরামর্শ অনুসারে গবর্ণর জেনারেল প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আগামী ২০শে জুলাই নূতন নির্ব্বাচন হওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যেই প্রতিনিধি পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং নূতন নির্ব্বাচনের নির্দ্দেশ দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল বলিয়াই মনে হয়। শ্রীলঙ্কাফ্রিডম পার্টিকে মন্ত্রিসভা গঠনের একটা সুযোগ দেওয়া হইবে, এইরূপ আশাই বিরোধী পক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একটি সাধারণ নির্ব্বাচন হইলেই যে সিংহলের সমস্যার সমাধান হইবে, এরূপ আশা করার মতও কিছু দেখা যাইতেছে না। —৪ঠা মে, ১৯৬০

খেলাধুলা

বিশ্ব ফুটবল আসরে ভারতের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত

শুভ বাঙ্গালা নববর্ষ। এই দিনেই বিশ্ব ফুটবল আসরে ভারতের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের মাটিতে সর্ব্বপ্রথম একটি অলিম্পিক খেলার অনুষ্ঠানে ভারত সাফল্য অর্জ্জন করে। রোম অলিম্পিক ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায় ভারত অংশ গ্রহণের কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছে। অলিম্পিকের প্রাথমিক পর্য্যায়ের দু'টি খেলাতেই তারা ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জ্জন করে। ভারত কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম খেলায় ৪-২ গোলে এবং জাকার্ত্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলায় ২-০ গোলে জয়লাভ করে।

ভারতের মাটিতে অলিম্পিক পর্য্যায়ের খেলার আসর এই প্রথম। কিন্তু এই ঐতিহাসিক আয়োজন স্থানীয় ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে খুব বেশী আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারেনি। গত দশ বছরের মধ্যে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলায় চার বার সাক্ষাৎকার হয়েছে। এর মধ্যে তিনবার ভারত পরাজয় বরণ করে। ১৯৫৪ সালে ম্যানিলাতে ভারত ৪-১ গোলে, টৌকিওতে ২-১ গোলে ও ৪-১ গোলে পরাজিত হয়। তবে ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশীয় ক্রীড়ায় ভারত ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। ইন্দোনেশিয়ার ফুটবলের মান ক্রমশঃ উন্নতির পথে, এই তালিকাই তার সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের এবারকার সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসের গতিপথকে আরও কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। এই সাফল্য বিশ্ব ফুটবল আসরে ভারতকে এক নতুন মর্য্যাদা দিয়েছে। দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে অভিনন্দন না জানালে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সাবাস ভারতীয় খেলোয়াড়গণ !

ইন্দোনেশিয়া দলের খ্যাতি সকলের সুবিদিত। কিন্তু তাদের সম্পর্কে যেরূপ নাম-ডাক শোনা গিয়েছিল খেলা দেখে তার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে ইন্দোনেশিয়ার খেলা দেখলে ভাল ভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে ইহাদের খেলার পশ্চাতে অনুশীলন, অধ্যবসায় ও সাধনার কোনটারই অভাব নেই। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বয়সে তরুণ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাঁদের গতিবেগ খুবই তীব্র। আক্রমণ করবার কৌশলও প্রশংসনীয়। তবে গোলে ঠিক ভাবে "সট" করতে তাঁরা খুব বেশী পটু নন। তাঁদের খেলার বৈশিষ্ট্য যে তাঁরা উপরে খুব কম সময় বল রাখেন। মাটিতে বল রেখে বল দেওয়া নেওয়া কায়দাটাও দেখার বিষয়। প্রতিপক্ষের আক্রমণ রোধের ক্ষমতাও দলের যথেষ্ট আছে। মধ্য মাঠে ইন্দোনেশিয়ার খেলা বিশেষ ভাবে চোখে পড়েছে।

ভারতের জয়লাভ-সত্ত্বেও দলের খেলোয়াড়রা খুব উঁচু দরের খেলা দেখাতে পারেননি। তবে খেলোয়াড়দের নিয়মিত শিক্ষাধীনে রাখলে সাফল্য অর্জ্জন করা যায়, ভারতের এবারকার সাফল্য তার প্রমাণ করিয়ে দিয়েছে। ভারতের সাফল্যের জন্য "কোচ" জনাব রহিমের অবদান কম নয়। তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে। সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানাবেন।

'সর্ব্ব ঘটে কাঁটালিকলা' শ্রীএম, দত্তরায়

ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে জাকার্ত্তায় ভারতীয় দলের খেলা উপলক্ষে, ভারতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে দু'জন কর্ম্মকর্ত্তা যাবেন বলেই ঠিক ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত ঘোষণা করলেন যে প্রয়োজন হোলে দলের সঙ্গে একজন 'টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার' ও যাবেন। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল আই এফ, এ'র বেতনভুক সম্পাদক শ্রী এম, দত্তরায় উপরোক্ত পরামর্শদাতার পদ অলঙ্কৃত করে জাকার্ত্তা যাত্রা করলেন। বাঙ্গালা দেশে একটি প্রবাদ আছে—'সর্ব্বঘটে কাঁটালিকলা'। শ্রীএম, দত্তরায়ের অবস্থাও তাই। ভারত সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি কেমন করে 'এ্যাডভাইজার' সেজে পাড়ি দিলেন ?

এদিকে ভারত সরকার বিশেষ প্রয়োজনেও অর্থাৎ শিক্ষা বা চিকিৎসার জন্যেও বিদেশ যাত্রার অনুমতি দিতে রাজী হন না, অথচ এই এম, দত্তরায় প্রমুখ সুচতুর ব্যক্তিরা কথায় কথায় বিদেশ ভ্রমণে যান কেমন করে ? নাকি এঁরা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়েন না ? ভারত সরকারের উচিত, এই সময়েই এই সব লোকেদের পাশপোর্ট বাতিল করে দেওয়া।

শ্রীএম, দত্তরায়, আই, এফ এ'র কর্ম্মচারী। তিনি বেশ মোটা মাইনে পান। আই, এফ, এ'র অন্যান্য কর্ম্মচারীদের যেমন বেতন, ছুটি ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন আছে—সম্পাদকের বেলায় কি সেটা প্রযোজ্য নয় ? তা না হ'লে যখন তখন এখানে—সেখানে তিনি যান কি করে ? অথচ যে প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক কর্ম্মচারী তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদাকে নিয়ে তো ছিনিমিনি খেলছেন। গত মরশুমে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন বিভাগীয় লীগ চ্যাম্পিয়নদের পুরস্কারগুলো এখনও তিনি দেবার সময় পাননি অথচ ১৯৬০ সালের ফুটবল মরশুম সুরু হয়ে গেছে। যে লোকের কর্ম্মকুশলতায়—এ ধরণের ঘটনা ঘটতে পারে তিনি যে তার টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজারের পদ অলঙ্কৃত করে ভারতীয় দলের সঙ্গে জাকার্ত্তা যাবেন তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে ?

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের নূতন অধ্যায় রচনা

দর্শক-সমাকীর্ণ ক্যালকাটা মাঠ। এখানেই বাঙ্গালা তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় দল ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের গৌরবময় ইতিহাস

আর একটা নতুন অধ্যায় রচনা হয়েছে—১৯৬০ সালের প্রথম ডিভিসন হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভে। তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মহমেডান স্পোর্টিং দলকে এক গোলে পরাজিত করে অপরাজিতভাবে এই গৌরবের অধিকারী হয়। এর পূর্ব্বে কখনও তাদের এই গৌরব লাভ সম্ভব হয় নি। তবে ১৯৫৭ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা বাইটন কাপ লাভ করেছিল।

এত দিন পর্য্যন্ত ফুটবল খেলাতেই ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খ্যাতি বাঙ্গালা তথা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলীর হকি খেলার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় গত কয়েক বছর তারা বাঙ্গালা তথা ভারতেও শক্তিশালী হকি দল হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে। এবারকার ইষ্টবেঙ্গল দলের সাফল্য তারই নিদর্শন স্বরূপ বলা চলে। ক্রীড়ামোদী মাত্রই দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে সাধুবাদ জানাবেন।

প্রেমজিৎলালের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

তরুণ ও উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় প্রেমজিৎলাল খেলার সময় আম্পায়ারের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করায় ছয় মাস কাল কোন সাধারণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে বাঙ্গালা লন টেনিস এসোসিয়েশন যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন—নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশন প্রেমজিৎলালকে সতর্ক করে দিয়ে তাহা প্রত্যাহার করেছেন। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীশামসের সিং উক্ত সংবাদ ঘোষণা করে বলেছেন যে, প্রেমজিৎলাল ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে যথাযথ আচরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রেমজিৎলালকে কেন্দ্র করে যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়ায় ক্রীড়ামোদী মাত্রই খুশী হয়েছেন বলে মনে হয়।

ডেভিস কাপে ভারতীয় দল গঠিত

ডেভিস কাপ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চল ফাইন্যালে ফিলিপাইন অথবা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রামানাথ কৃষ্ণাণ, নরেশকুমার ও প্রেমজিৎলাল ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রেমজিৎলাল সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকলে তাঁর স্থানে জয়দীপ মুখার্জীকে দলভুক্ত করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। সকলেই ভারতীয় দলের সাফল্য কামনা করবেন, তা বলাই বাহুল্য।

হকি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সরকার চেষ্টা করিবেন

"ভারত সরকার রোম অলিম্পিকে ভারতীয় হকি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকল প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন"—সম্প্রতি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে, এল শ্রীমালি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে রোম অলিম্পিকের জন্য যে সকল হকি খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁরা যাতে শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করতে পারেন সেই জন্য ভারত সরকার ঐ সকল খেলোয়াড়ের নিয়োগকর্ত্তাদের কাছেও ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে প্রস্তুত আছেন।

তবে ডাঃ শ্রীমালি দুঃখ করে বলেছেন যে কতকগুলি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপে তিনি সন্তুষ্ট নন। কতকগুলি লোক কতকগুলি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণখনিতে পরিণত করেছেন। এই অবস্থায় সরকার যদি সমস্ত ভার গ্রহণ করে, তা'হলে সমস্যার সমাধান হবে না। এরজন্য প্রয়োজন প্রবীণ ক্রীড়ামোদী ও সাধারণের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই সকল ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে যাতে প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হন তার ব্যবস্থা করা। ডাঃ শ্রীমালি এতদিনে ভারতে খেলাধূলার অবনতির মূল কারণ অনুধাবন করেছেন। সত্যিই এক শ্রেণীর লোক রাজনীতির বেড়াজাল বেঁধে খেলাধূলার উন্নতির নামে তাঁদের স্বার্থ সিদ্ধি করে চলেছেন। তা যদি না হয় হকিতে ভারতের বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে টলায়মান হতে চলেছে সেখানেও তাঁরা রাজনীতির খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠনকল্পে ৩৮ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে কোন শিক্ষাকেন্দ্রে বা ট্রায়ালে যোগদান না করেই প্রবীণ খেলোয়াড় কেশব দত্তের নির্ব্বাচনে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। যে খেলোয়াড়ের বর্ত্তমানে নিজ দলে স্থান লাভের যোগ্যতা নেই সেই খেলোয়াড়কে টেনে আনার ভেতর যে রহস্য রয়েছে তা আজও উদ্ঘাটন হয় নি। আশা করা যায়, প্রবীণ খেলোয়াড় নিয়ে যখন এবারকার নির্ব্বাচন কমিটি গঠিত—তাঁরা অন্ততঃ কর্ম্মকর্ত্তাদের রাজনীতির বেড়াজালে পড়বেন না। যোগ্য খেলোয়াড়দের নিয়েই ভারতীয় দল গঠিত হউক, ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকুক, এটাই সকলে চান।

বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার দুরবস্থা কেন?

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতার দুরবস্থা দেখে ক্রীড়ামোদীরা মর্ম্মাহত হয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান বিশিষ্ট হকি দলের একটা বড় আকর্ষণ ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা সেরা দল অংশ গ্রহণ করতো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে গুরুত্ব লোপ পেয়ে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা এখন স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্য্যবসিত হোয়েছে। যে কয়েকটি বাইরের দল যোগদান করে তারও অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে বাইটন কাপের আর কোন আকর্ষণ থাকে না। খেলার মাঠে ক্রীড়ামোদীদের দৈনন্দিন উপস্থিতি থেকেই একথা প্রমাণিত হবে।

কিন্তু বাইটন কাপের এই শোচনীয় পরিণতির জন্যে দায়ী কে? নিশ্চয়ই বাঙ্গালা হকি এসোসিয়েশন। হকির স্বার্থের চেয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই যাঁরা বড় করে দেখেন, সেই সব পরিচালকের হাত থেকে বাঙ্গালা হকি এসোসিয়েশন নিষ্কৃতি না পেলে, বাইটন কাপের মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা নেই।

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে 'একখানি মুখ'-এর আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীমীরেন অধিকারী।

পাগলা হত্যার মামলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল

সকাল পাঁচটায় জানালা দিয়ে ভোরের আলো আসামাত্র আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই বিদেশ বিভুঁই-এ এসে পরের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছি। এঁছাড়া এ'শহরে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি তদন্তের কার্য্য আশু সমাধা করার প্রয়োজন। আমার ইচ্ছা হলো এখুনি উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও আমি বিছানা হতে উঠতে পাচ্ছিলাম না। বরং আবার আমার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল। ইতিমধ্যে হরিপদ কখোন উঠে পড়ে বাইরে রকের উপর পায়চারি করছিল। এই সময় সে ঘরে এসে বাকি জানালা খুলে দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। হরিপদ বাবু বোধ হয় বলতে চাইছিলেন, এবার উঠে পড়ুন, স্যার, কিন্তু তা আর তার বলা হলো না। সে এইবার আঁতকে উঠে বলে উঠলো, আপনার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে যে স্যার। হরিপদর মুখে এই কথা শুনা মাত্র আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু উঠবার চেষ্টা করা মাত্র আমি বুকের পাঁজরার উপর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। এর পর হরিপদ বাবু আর দেরী না করে ছুটে গিয়ে অফিসার ইন-চার্জ্জ সুরেশ বাবুকে ডেকে নিয়ে এলো। আমার এইরূপে অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র সুরেশ বাবু ও তাঁর সহকারী একজন বিহারী অফিসার তক্ষুনি সেখানে ছুটে এলেন। এর একটু পরে যশোয়াল বাবু একজন ডাক্তারও ডেকে এনেছিলেন। ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করে বললেন যে পাঁজরার কোনও ফ্র্যাকচার হয়নি। আমার শুধু নাকের উপরই আঘাত লেগেছে। যশোয়াল বাবুর পুরা নাম আমার মনে নেই কিন্তু তাঁর স্ত্রীর নাম আমার মনে আছে। তাঁকে বালিকা বললেই চলে। নাম তাঁর ছিল পুতুল। এতো ভগিনীপ্রতিম স্নেহ-যত্ন এখানে এসে পাবো তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হতে সেবা শুশ্রূষার প্রতিটি কার্য্য তাঁরা স্বামি স্ত্রীতে যথেষ্ট করেছিলেন। তাঁরা আজ কোথায় আছেন জানি না। কিন্তু আজও তাঁদের আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। সৌভাগ্যক্রমে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় খোকাবাবুর পদাঘাত মাত্র আমার নাকটাই জখম করেছিল। যশোয়াল বাবু ও তাঁর স্ত্রীর মানা সত্ত্বেও আমি বিকালের দিকে লোকাল সাব-জেলে গিয়ে খোকা-বাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। খোকাবাবু আমাকে দেখা মাত্র উঠে পড়ে আমাকে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলো, নাকটায় ব্যাণ্ডেজ কেন? লেগেছিলো নাকি। তা'ও কিছু নয়। প্রাণে তো বেঁচে গেছেন।

প্রাণে আমি যে বেঁচে গিয়েছিলাম তা সত্য কথা। কিন্তু তার জন্যে খোকাকে ধন্যবাদ জানাতে আমার মন চাইল না। আমাদের দেশের এই এক নম্বরের পাবলিক এনিমির এইরূপ আপত্তিকর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তাকে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, আপনি পাগলা বাবুকে খুন করেছিলেন?

খোকাবাবু আমার এই প্রশ্নে প্রথমে হো হো করে হেসে উঠলো। তার পর আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে উত্তর করলো, আমরা দুজনায় কেউ কচি খোকাটি নই। তাই এসব প্রশ্ন আমি অবান্তর মনে করি। সরকারী ভাবে আমি একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবো। কিন্তু বেসরকারী ভাবে জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো যে তাকে আমিই খুন করেছি। পাগলাকে খুন করা ভিন্ন আমার অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। সে আমার মনের শান্তি অপহরণ তো করেই ছিল। এমন কি সে আমার মলিনাকেও সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। পুলিশ আমাদের হন্যে কুকুরের মত এক পাড়া থেকে অপর পাড়ায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা না পেরেছি একটু খেতে, না পেরেছি একটু ফূর্ত্তি করতে। এজন্য একমাত্র দায়ী ছিল ঐ পাগলা। এই পৃথিবী কেবলমাত্র শক্তিমানদেরই উপভোগ্য। এই জন্যে আমরা পাগলাকে ইহলোক হতে সরিয়ে দিলাম। সুবিধে পেলে আপনাকেও আমি পরলোকে পাঠাতাম। অন্যথায় পাগলা বা আপনি যদি আমাকে এ পৃথিবী হতে সরিয়ে দিতে পারতেন তা'হলেও তাতে আমার ক্ষোভ হতো না। যাই হোক, আমি স্বীকার করবো যে বুদ্ধির ও শক্তির লড়াইতে আমি আজ আপনার কাছে হেরে গেছি, যদি কোনওক্রমে আদালতের বিচারে আমি মুক্তি পাই তাহলে আর একবার দেখা যাবে।

খোকার বিরুদ্ধে অনেকগুলি খুনের, তালা ভেঙে চুরির ও রাহাজানির অভিযোগ দিল। কিন্তু আমরা জানতাম যে এখুনি এই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করলে কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তার কাছে মামলার সহিত সম্পর্ক রহিত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করে তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে আসল কথাটা পাড়লে সুফল পেলেও পাওয়া যেতে পারে। এইজন্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাকে প্রভাবান্বিত করে আমি তার নিকট হতে একটি বিবৃতি আদায় করতে মনস্থ করলাম। আমি এই সময় তাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলাম। সে কখনও শান্তভাবে কখনও উত্তেজিত হয়ে সে সেইগুলির উত্তরও দিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তার কাছ হতে কথা বার করবার জন্য আমি প্রয়োজন মত সুপরিকল্পিত ভাবে উত্তেজিত করেছিলাম। এর কারণ এই যে আমি ভালো করেই জানতাম যে তখনও পর্য্যন্ত সে খুনের নেশায় ভরপুর। তাই সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলে সে বহু বাহাদুরীসূচক কাহিনীর অবতারণা করলেও করতে পারে। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রঃ। আচ্ছা। তুই যে ঐ রকম একটা জলজ্যান্ত মানুষকে এমনি নির্ম্মমভাবে খুন করলি, এতে কি তোর একটুও দুঃখ হচ্ছে না?

উঃ। কেন দুঃখ হবে মশাই। আপনারা যখন একটা

বেড়াল বা ইঁদুর মারেন তখন কি তাদের জন্ম আপনাদের একটুও দুঃখ হয় ? এরা কি আপনাদেরই মত দুই পাওয়ালা জীব নয় ? এই সব ইঁদুরদের মত পাগলাও আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল, তাই তাকে আমায় সরিয়ে দিতে হয়েছে। আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি যে এই পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার শুধু শক্তিমানদেরই আছে। তাছাড়া এই পাগলাকে তো আমি অকারণে মারিনি ?

প্রঃ—এ তো তুই আমাদের এই ইহলোকের কথা বললি। কিন্তু পরলোকে তোর কি হবে সে সম্বন্ধে কি তুই কিছু ভেবেছিস ? এখানকার শাস্তি এড়াতে পারলেও সেখানকার শাস্তি তুই এড়াতে পারবি না।

উঃ—আপনারা কি রকম লেখাপড়া শিখেছেন তা জানি না। আমার মতে পৃথিবীতে তিনটি জিনিস হচ্ছে একেবারেই অমূলক। এই তিনটি পদার্থের নাম হচ্ছে ভূত, ভগবান আর প্রেম। আবহমান কাল ধরে লোকে বলে আসছে যে এই তিনটি জিনিসের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু কোন দিনই কেউ এর চাক্ষুষ প্রমাণ পায়নি। আমার মতে লাইফটা হচ্ছে একটা মোটরকার। এ-পারেও কিছু নেই, ও-পারেও কিছু নেই। পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই তা থেমে যাবে। এর জন্ম ভয় পাবার কি আছে, তা তো আমি বুঝি না। তবে প্রেমটায় আমি হঠাৎ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সে বিশ্বাসও এবার আমার ভেঙে গিয়েছে। তাই পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে আমি সেটা মলিনাকে দেখিয়ে বলে এসেছিলাম, কি রে শালী ! আর কাউকে ভালবাসবি ? হতভাগী সে কথা বোধ হয় আপনাদের বলেনি ?

প্রঃ—এসব না হয় আমি বুঝলাম। কিন্তু তোর কি প্রাণের ভয়ও নেই ? এমন সুন্দর পৃথিবীতে তোর কি আরও কিছু দিন বাঁচতে ইচ্ছে হয় না ? ভালো করে ভেবে দেখ, আমি এই ব্যাপারে তোর জন্তে কিছু করতে পারি কি না ?

উঃ। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাতে ক্ষতি নেই। আমি কিন্তু সত্য কথা বলছি, সত্যই আমার মরতে ভয় নেই। এর কারণ এই যে, আমি আমার জীবনটা পুরাপুরি ভাবে ভোগ করেছি। আমি আমার লাইফের ইঞ্চি বাই ইঞ্চি ভোগ করে নিয়েছি। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত আমার ইচ্ছামত ভোগে লাগিয়েছি। তাই আজ আমার কোনও অনুশোচনা নেই। আমি মরবো আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়ে যাবো। অবশ্য ভগবান বলে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু থাকে, তবে। আমরা হচ্ছি জীবনধর্ম্মী, তাই মরতে আমাদের ভয় নেই। কিন্তু আপনারা যখন মরবেন তখন চিমড়ে খেয়ে খেয়ে আপনাদের তখন মনে হবে যে এটা করতে পারতাম, ওটাও করতে পারতাম। কিন্তু হায়, কোনটাই তো আমাদের করা হলো না, শুধু রাষ্ট্র ও সমাজের ভয়ে।

প্রঃ। কিন্তু সত্যই কি তোর জীবনে আজ কোনও অভাব বা ক্ষোভ নেই ? ক্ষোভ বা অভাব নেই, এমন জীবন তো কল্পনাও করতে পারিনি। এমন একটি নিরঙ্কুশ জীবনের অধিকারী হলে তোর এই সব খুন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ করার কোনও দরকারই হতো না। একটু ভেবে দেখে বল ত আমাকে ঠিক ঠিক কথা ?

উঃ। আপনারা যাকে অন্যায় মনে করেন, আমি তাকে অন্যায় মনে করি না। তবু মনে হত জীবনে মাত্র একটি অন্যায় আমি করেছি। আমি চন্দ্রনগরে একটা বিয়ে করে ফেলেছি। মাঝে মাঝে আমি কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই সব খুন-ডাকাতি আমার ভালো তো লাগেই না। এমন কি আমার লোকেদেরও তখন আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি তখন ভদ্রভাবে ভদ্রলোকদের সঙ্গ কামনা করে তাদের সঙ্গেই বসবাস করি। এমনি এক আমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে চন্দ্রনগরে এসে আমি একটা বিয়ে করে ফেলি। তবে তাকে আমি হাজার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এসেছি। আর তাকে আমি বলে এসেছি যে আমার মৃত্যু হলে সে যেন আমার মত এন্তার ফূর্ত্তি করে। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, সে হিন্দু বিধবা নারীদের ন্যায় তুলসীপাতার রস দিয়ে নিরামিষ খাবেও কিংবা সে বারমাসে বার ব্রত ও উপবাস করে মরবে। যদি সে তা না করে তাহলে আমার আত্মা স্বর্গে চলে যাবে। কিন্তু সে যদি তা করে তাহলে আমার আত্মা একটুক্ষণও শান্তি পাবে না।

খোকাবাবুর এই পরস্পরবিরোধী মতবাদ শুনে মনে হলো যে অপরাধদর্শন সত্যই কোনও স্থায়ী দর্শন নয়। উহা অপরাধীদের বিকৃত মনের পরিচয় দেয় মাত্র। আমি এই খোকাবাবুকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এই সময় আত্মস্থ হয়ে বলে উঠলো, বাজে কথা বলে অনেক কিছুই তো জেনে নিলেন দেখছি। আর কিন্তু আমি কোনও কথাই আপনাকে বলবো না। তবে সার কথা এই জেনে রাখুন যে চোরেরা মরে মেয়েদের ভালোবেসে। আর মেয়েরা মরে চোরেদের বিশ্বাস করে।

খোকাবাবুর এই সকল প্রলাপোক্তি শোনবার মত যথেষ্ট সময় এই দিন আমার ছিল না। এ ছাড়া এর এই সব কথাগুলো আমার মনে বিশেষ আগ্রহও সৃষ্টি করতে পারে নি। এর কারণ আমার শরীর ও মন এই দিন ভালো ছিল না। একটা নিদারুণ অবসাদ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মাসের পর মাস একটা নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেছি। হঠাৎ এই সাংঘাতিক উত্তেজনা হতে রেহাই পাওয়ায় আমরা যেন ভেঙে পড়েছিলাম। দ্রুতগতি যন্ত্রশকট হঠাৎ ব্রেক কসে থেমে গেলে তার কলকব্জার যা অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি আমাদেরও দেহ ও মন একটা বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে যেন থেমে যেতে চাইছে। তাই এইখানে আর দেরী না করে আমি দেওঘর থানায় ফিরে যেতে মনস্থ করলাম। ঠিক সেই সময় একজন বাঙালী অফসারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সেই শহরের একজন এ্যাংলো উর্দ্ধতন অফসার। হিন্দি ভাষায় তিনি পাগলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখো ! টোমরা পাশ আউর পিস্তল উস্তল হায় ? খোকাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই উর্দ্ধতন অফিসারটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে উত্তর করলো, আমি সব কথাই আপনাদের কাছে স্বীকার করবো একটা পিস্তল মাত্র আপনারা আমার ঘরে পেয়েছেন। কিন্তু আরও দশ বারোটা পিস্তল এক বাক্স টোটা ও এগারোটি তাজা বোমা আমি চিত্রকূট পাহাড়ের একস্থানে পুঁতে রেখেছি। এখুনি আপনারা সেখানে না গেলে আমার দলের লোকেরা সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাবে। খোকাবাবুর মুখের এই স্বীকৃতি শুনে উপরোক্ত উর্দ্ধতন অফসারটি একবারে

দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে তাঁর সঙ্গের অফিসারটিকে বললে, ওহে এখুনি তুমি থানায় গিয়ে দু' ট্রাক্‌ সশস্ত্র সিপাহী প্রস্তুত করো। আর এখান ওখান হতে আরও দশ বারো জন অফিসার আনিয়ে নাও। আমাদের এই খুনে আসামীকে নিয়ে এখুনি চিত্রকূট পাহাড়ে যেতে হবে।

এদের এই সব ব্যাপার দেখে আমি এক রকম হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। এখানকার পুলিশদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে আমার পক্ষে কোনও উপদেশ দেওয়া সাজে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে এই সম্বন্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাতে হলো। এর কারণ আমি ভালো রূপেই বুঝেছিলাম যে, খোকাবাবুর পুলিশ হেপাজতি হতে অতর্কিতে পলায়ন করবার এ এক সুপরিকল্পিত ফন্দি ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে খোকাবাবু পুলিশকে ভাঁওতা দিয়ে একবার চিত্রকূট পাহাড়ে পৌঁছুতে পারলে সে তার স্বভাবসুলভ রুদ্র-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করতো। এইরূপ অবস্থায় বহু পুলিশ ও শাস্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়েও সে মাত্র একটি উল্লম্ফন দ্বারা পলায়নে সমর্থ হতো। আমি প্রকৃত বিষয়টি ওখানকার ঐ উর্দ্ধতন অফিসারটিকে ইংরাজীতে বুঝিয়ে দেওয়া মাত্র খোকাবাবু বুঝেছিল যে, তার এই সব ফন্দি-ফিকির আর কাজে লাগলো না। সে এইবার একটু শ্লেষের হাসি হেসে নিয়ে সেই বাঙ্গালী অফিসারটিকে সম্বোধন করে বলে উঠলো, আরে, ইনি কি আপনাদের ডি-এস-পি নাকি? কোলকাতার জমাদাররাও এঁর চেয়ে চালাক। খোকাবাবু বাঙলায় কি বললো, তা বুঝতে না পেরে ঐ সাহেবটি আমাদের তা ইংরাজীতে বুঝিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু আমরা কেউই খোকাবাবুর বক্তব্যটুকুর সারমর্ম জানাতে পারিনি। খোকাবাবু এইবার আমার দিকে চেয়ে মুখ ভেঙচে বলে উঠলো, বড় বেয়াড়া সময়ে এসে পড়ে আপনি সব মাটি করলেন। এখন দেখছি আমি যে ভগবান বলে অনেক দূরদর্শী ব্যক্তি তাহলে সত্যই আছেন। তা না হলে বারে বারে আমার প্রতিটি কল্পনা এমনি করে আশ্চর্য্যজনক ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবেই বা কেন? কিন্তু আমার কমাণ্ডার চীফ কালাপাহাড়ের সন্ধানে মধুপুরে গেলে কিন্তু আপনার নির্ঘাত মৃত্যু।

পরের দিন সকালে আমি ওখানকার মহকুমা হাকিম পুলিশ সাহেব ও ডেপুটি পুলিশ সাহেবের সহিত এক পরামর্শসভায় মিলিত হলাম। আমি তাঁর কাছে খোকাকে সশস্ত্র পুলিশের পাহারাধীনে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্য একটি লিখিত আবেদনও করেছিলাম। কিন্তু এদিকে খোকাকে তখুনি কোলকাতায় নিয়ে যাবার একটি আইনগত বাধারও সৃষ্টি হলো। খোকার দেওঘরের ডেরাতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত একটি টোটা-ভরা পিস্তলও পাওয়া গিয়েছিল। এইজন্য বেআইনি ভাবে বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্য ভারতীয় অস্ত্র আইন অনুযায়ী দেওঘর থানায় এঁরা এই সম্পর্কে একটা পৃথক মামলাও রুজু করে দিয়েছিলেন। এই জন্য তাকে এখানকার এই মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোলকাতায় পাঠানো চলে না। পরের দিন আদালতে উপস্থিত হয়ে খোকাবাবু এই সব সমস্যা ইচ্ছা করেই আরও জটিলতর করে তুলতো। এই আগ্নেয়াস্ত্রটির হেপাজতী স্বীকার করে নিয়ে সে ইচ্ছা করেই এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করে সেখানকার জেলে চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এই সুযোগে কোলকাতার খুনের মামলাটির শুনানি দেরী করিয়ে দিতে চায়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে তার বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা ভয় দেখিয়ে আমাদের সংগৃহীত সাক্ষী সাবুতদের কোলকাতা শহর হতে ভাগিয়ে দেওয়া। অন্য প্রদেশের কোনও জেল হতে অপর প্রদেশের আদালতে আনা নিম্ন আদালতের এক্তিয়ারের বাহিরে ছিল। একমাত্র কোলকাতা হাইকোর্ট বিহার হাইকোর্টের মাধ্যমে এইরূপ আসামীকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের নিম্ন আদালতে বিচারের জন্যে আনিয়ে নিতে সক্ষম ছিল। এইরূপ অবস্থায় মামলা কোলকাতার ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটের আদালতে পাঠিয়ে সেখানে খোকাকে আনয়নের জন্য কোলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। অগত্যা নাচার হয়ে আমরা এইবার খোকার এখানকার সেকেণ্ড ইন্‌ কমাণ্ড কালাপাহাড়ের সন্ধানে মধুপুর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

[ক্রমশঃ।

প্রত্যাশা

কমলা দেবী

ঘটনাটা বিশেষ কিছু নয়—
তবু আমার কাছে দামটা যে তার
অনেক মনে হয়।
সেদিন শোভার বাড়ী গিয়ে
কথাবার্ত্তার ফাঁকে হঠাৎ দেখি চেয়ে
উঠোনেতে সোনালী রোদ মেখে
রংয়ের বাহার ছড়িয়ে, আমায় ডাকছে থেকে থেকে
মসলা মেখে সারা গায়ে—হ'ল না মোর ভুল—
ডালা ভরা নিটোল টোপাকুল।
রসনা মোর উঠলো ভ'রে জলে
গোপন রেখে সে ভাব, যেন এমনি কথাচ্ছলে
বললাম, 'কি রে শোভা, ছুটো কুল খাওয়াবি নাকি?'
'ওমা, ওমা, সে কি কথা! তোমায় আবার
বলতে হবে তা কি?
তবে ভাই এখন তো নয়, আগে মজুক ক'দিন ধ'রে,
তার পরেতে দেবো তোমায় একটি বোতল ভ'রে।'
বড়ই খুশী হলাম আমি শোভার কথা শুনে।
শুধু একটা খটকা থেকেই গেল মনে—
বোতলটা যে দেবে
কি মাপের তা হবে।
যা হোক, এ হ'ল আজ অনেক দিনের কথা।
শেষ অবধি শোভার ফাঁকি জাগায় প্রাণে ব্যথা
ভাবছি বসে এখনও কি সে কুল বসে মজছে
কিম্বা সে কুল সার হয়ে ভাই ধাপার মাঠে পচছে?
হায় রে বিধি! এই কি তোমার বিচার?
না হয় শুধু চেয়েছিলাম একটু কুলের আচার।

ক্রমিক পর্য্যায়ে ১৩৬৬ সালের বাংলা ছবি

ডিলুক্স প্রযোজিত 'সাগর সঙ্গমে' নিয়ে ১৩৬৬ সালের বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা সুরু। প্রেমেন্দ্র মিত্র এ চিত্রের কাহিনীকার, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : দেবকীকুমার বসু। গীতিকার শৈলেন রায়, রাইচাঁদ বড়াল করেন সুর যোজনা, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন যথাক্রমে বিমল মুখোপাধ্যায় এবং শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়, ভারতী, মঞ্জু অধিকারী, মাঃ বিভু, নীতিশ, জহর রায়, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি অভিনয় করেন। উত্তরা, পূরবী ও উজ্জলা চিত্রগৃহে ১৫ই এপ্রিল মুক্তিলাভ করে ডিলুক্সেরই পরিবেশনায়। পরের সপ্তাহে (২৪শে এপ্রিল) এস জে এন প্রোডাকসন্সের 'স্বপনপুরী'। শিশুদের ছবি, প্রযোজনা করেন জ্ঞানকুমার নওলক্ষা। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন কুমার সরকার। নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দগ্রহণে ছিলেন নিমাই রায় ও নৃপেন পাল। শ্রীমান বিভু, অলোক, অঞ্জলী, নিভাননী, বাণী গাঙ্গুলী, বেবী নাজ প্রভৃতি অভিনয় করেন, এলিট ডিস্ট্রীবিউটার্সের পরিবেশনায় দর্পণা ও প্রাচী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। এর পরই এল সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার', ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী। প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ রায়। রবিশঙ্করের সঙ্গীত। চিত্র ও শব্দগ্রহণে ছিলেন সুব্রত মিত্র, দুর্গাদাস মিত্র। সৌমিত্র, শর্মিলা, স্বপন, তুষার, অলক, বেলারাণী, পঞ্চানন প্রভৃতি অভিনয় শিল্পী, ছায়াবাণীর পরিবেশনায় ১লা মে রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে। ঐ দিনই মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে জি আর পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তি পায় বাদল পিকচার্সের 'দীপ জ্বেলে যাই'। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী ও সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেন অসিত সেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত। সুচিত্রা, বসন্ত, পাহাড়ী, দিলীপ, তুলসী চক্র, শ্যাম লাহা, অনিল, অনিতা, কাজরী, নমিতা প্রভৃতি অভিনয় করেন। একই দিনে আরও একটি শিশুচিত্র মুক্তি পায়। কে জি প্রোডাকসন্সের 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাহিনী, নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত, সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন কমল গাঙ্গুলী। তিলক, ছবি, তরুণ, অনুপ, শ্যাম লাহা, শীতল, পদ্মা, শান্তি প্রভৃতি অভিনয় করেন। টাস পিকচার্সের পরিবেশনায় বীণা বসুশ্রীতে মুক্তিলাভ করে। নবোদয় ফিল্মসের জগবন্ধু বসু প্রযোজিত 'বিভ্রান্ত' এল ৮ই মে মা আনন্দময়ী ডিস্ট্রীবিউটার্সের পরিবেশনায় রাধা, পূর্ণ ও প্রাচী চিত্রগৃহে। অজিত দের কাহিনী অবলম্বনে চিত্ত মুখোপাধ্যায় চিত্রটি পরিচালনা করেন, কাজি অনিরুদ্ধ ও সুজিত নাথের সঙ্গীত, চিত্রগ্রহণ করেন মুরারি ঘোষ। সাবিত্রী, অসিত, আশীষ, পাহাড়ী, কানু, কমল, পদ্মা, শীলা প্রভৃতি অভিনয় করেন। ১৫ই মে শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরা চিত্রগৃহে নর্মদা চিত্রের পরিবেশনায় মুক্তি পেল চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের 'জল জঙ্গল', মনোজ বসুর কাহিনী, পরিচালনা করেন কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন অমূল্য মুখোপাধ্যায় ও অতুল চট্টোপাধ্যায়। অসীমকুমার, মঞ্জুলা, সন্ধ্যা রায়, সুখেন, শিশির বটব্যাল, হরিধন, নবদ্বীপ, প্রেমাংশু, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করেন। গত বৎসরের আরেকটি আর্থিক সফল চিত্র হ'ল আর ডি বনশল প্রযোজিত প্রেস পিকচার্সের 'শশীবাবুর সংসার'। ২১শে মে জনতা পিকচার্সের পরিবেশনায় রাধা, পূর্ণ ও লোটাসে মুক্তিলাভ করে। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা করেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। অনিল বাগচীর সঙ্গীত, পরিচালনা করেন সুধীর মুখোপাধ্যায়, দেওজী ভাই-এর চিত্রগ্রহণ, শব্দযন্ত্রে ছিলেন সুশীল সরকার ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। ছবি, পাহাড়ী, অরুন্ধতী, তপতী, সাবিত্রী, বসন্ত, জীবেন, অনুপ প্রভৃতি অভিনয় করেন। এই সপ্তাহের অপর চিত্রটি ছিল এস বি প্রোডাকসন্সের 'অভিশাপ'। শ্যামল দত্তর প্রযোজনা, পরিচালনা করেন সম্পাদক বিনয় চট্টোপাধ্যায়, কাহিনী শেফালী দেবী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন তারক দাস ও নৃপেন পাল। কানু, বিকাশ, মঞ্জু, শোভা, সমর, পরেশ, গুরুদাস, শীতল, জহর রায়, গীতশ্রী, অজিত প্রভৃতি শিল্পী। ভ্যারাইটি ফিল্ম এক্সচেঞ্জের পরিবেশনায় উত্তরা, পূরবী, উজ্জলায় মুক্তিলাভ করে। ১২ই জুন বিশ্বভারতীর পরিবেশনায় বি পি ফিল্মসের 'মাহুত বন্ধু রে' মুক্তি পেল উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা প্রেক্ষাগৃহে, অলোকেশ বড়ুয়ার কাহিনী। সঙ্গীত ও পরিচালনা করেন ভূপেন হাজারিকা। অজয় মিত্রের চিত্রগ্রহণ, শব্দধারণ করেন অবনী চট্টোপাধ্যায়। তৃষ্ণা হাজারিকা, মানসী, দিলীপ, জহর রায়, প্রভাস, অরূপ, প্রকৃতিশ প্রভৃতি অভিনয় করেন। ২৫শে জুন অশোক চিত্রের 'পুষ্পধনু' মুক্তি পেল অঞ্জন ফিল্মসের পরিবেশনায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায়। মনোজ ভট্টাচার্য্যের চিত্রনাট্যে পরিচালনা করেন সুশীল মজুমদার, প্রবোধ সান্যালের কাহিনী, সঙ্গীত রাজেন সরকার। বিশু চক্রবর্ত্তী ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র ও শব্দগ্রহণ, উত্তম, অরুন্ধতী, ভানু, তপতী, অজিত, জয়শ্রী, বীরেন, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করেন। রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের অনন্ত সিং প্রযোজিত 'ভ্রান্তি' এল ৩রা জুলাই বীণা ও বসুশ্রী চিত্রগৃহে রাজকুমারীর পরিবেশনায়. শ্যামল মিত্রের সঙ্গীত, পরিচালনা প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, কাহিনী শুক্ল সেন, চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন বিভূতি চক্রবর্ত্তী ও সুশীল সরকার। ছবি, পাহাড়ী, নির্ম্মল, বাসবী, ভানু, ছায়া, তপতী, বাবুয়া প্রভৃতি অভিনয় করেন। ১৭ই জুলাই এল এশিয়ান ফিল্মসের প্রদীপ মৈত্র প্রযোজিত 'গলি থেকে রাজপথ,' গীতা পিকচার্সের পরিবেশনায়। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনা, সঙ্গীত সুধীন দাশগুপ্ত।

চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন দীনেন গুপ্ত ও অতুল চট্টো:। উত্তম, সাবিত্রী, বিকাশ, জহর, তুলসী, অনুপ, নৃপতি, হেলেন প্রভৃতি অভিনয় করেন। রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। ২৪শে জুলাই এল প্রমোদ লাহিড়ীর প্রযোজিত এল বি ফিল্মসের 'বাড়ী থেকে পালিয়ে' জনতা পিকচার্সের পরিবেশনায় মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে। শিবরাম চক্রবর্তীর কাহিনী, পরিচালনা ঋত্বিক ঘটক। সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত, দীনেশ গুপ্ত ও মৃণাল গুহঠাকুরতা চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেছেন। কালী বন্দ্যো:, পরম ভট্টারক লাহিড়ী, শৈলেন, পান্না, জ্ঞানেশ, জহর রায়, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি অভিনয় করেন। ২৪শে জুলাই উত্তরা, পূরবী, উজ্জলায় এল সানরাইজ ফিল্মস প্রযোজিত ভেনাস ফিল্মসের 'কিছুক্ষণ' বনফুলের কাহিনী নিয়ে সিনে ফিল্মসের পরিবেশনায় অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। নচিকেতা ঘোষের সঙ্গীত। চিত্র ও শব্দ যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও জগন্নাথ চট্টো:। অরুন্ধতী, অসীম, শোভা, গঙ্গাপদ, জীবেন, নিভাননী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি শিল্পী। ৭ই আগষ্ট এল শরৎচন্দ্রের কাহিনী-চিত্র কানাই গুহ প্রযোজিত ইন্দোবর্মা ফিল্ম কর্পোরেশনের নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'ছবি'। রবীন চট্টো: সুরকার। চিত্র ও শব্দ যথাক্রমে বিদ্যাপতি ঘোষ ও নৃপেন পাল, ছবি, বিকাশ, আশীষ, মালা, হরিমোহন, ভানু, প্রেমাংশু প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। চণ্ডিকা পিকচার্সের পরিবেশনায় রাধা, পূর্ণ, প্রাচীতে মুক্তিলাভ করে। ২১শে আগষ্ট বীণা, বসুশ্রীতে এইচ এস মেহেতা প্রযোজিত এম এম মুভিজের 'এ জহর সে জহর নয়' এল মেহতা সিনে কর্পোরেশানের পরিবেশনায়। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা কনক মুখো:, ভি বালসারার সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দ যথাক্রমে দেওজীভাই ও বাণী দত্ত। সুপ্রিয়া, জহর রায়, কমল, পাহাড়ী, নীতিশ, রবীন চন্দ্রাবতী তপতী, প্রভৃতি অভিনয় করেন এই চিত্রে। এই সপ্তাহে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে এল নালন্দা ফিল্মসের শ্রীতারাশঙ্কর পরিচালিত "আম্রপালী' চিত্রালোকের পরিবেশনায়। অনিল বাগচী সুরকার, চিত্র ও শব্দ গ্রহণ বিদ্যাপতি ঘোষ ও সুশীল সরকার। সুপ্রিয়া, ছবি, দীপক, কমল, নীতিশ, অসিত, বনানী, সুদীপ্তা, সিপ্রা সাহা প্রভৃতি অভিনয় করেন। ২৮শে আগষ্ট শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা চিত্রগৃহে অবধূতের কাহিনী-আশ্রিত বি এল খেমকা প্রযোজিত মেট্রোপলিটান পিকচার্সের নির্মল দে পরিচালিত 'নিষ্কারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে' নচিকেতা ঘোষের সুর চিত্রে ও শব্দে দেওজী ভাই ও সুশীল সরকার। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স পরিবেশন করেন, ছবি, বাসবী, ভানু, অনিল, তুলসী, প্রেমাংশু, কেতকী, তপতী প্রভৃতি অভিনয় করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে সরোজ সেনগুপ্ত প্রযোজিত এম এস জি প্রোডাকসন্সের 'খেলাঘর' এল মিতালী ফিল্মসের পরিবেশনায়। অজয় কর পরিচালক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত। সলিল সেনগুপ্তর কাহিনী। শব্দ গ্রহণ দেবেশ ঘোষ। উত্তম, মালা, অসিতবরণ, ছবি, সবিতাব্রত, আশীষ, মানসী অভিনয় করেছেন, ১১ই সেপ্টেম্বর দর্পণা, প্রিয়া, লোটাসে এল সুশীল মজুমদার পরিচালিত আর্ট য্যাণ্ড কালচারের 'অগ্নিসম্ভবা'। শান্তি দীপিঙ্করের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা মনোজ ভট্টাচার্য্য। চিত্র ও শব্দ গ্রহণ অনিল গুপ্ত ও বাণী দত্ত, মঞ্জুলা, নির্মল, ছবি, কালী, বনানী, নৃপতি প্রভৃতি অভিনয় করেছেন, ১৮ই সেপ্টেম্বর ইকা প্রোডাকসন্সের সুধীরবন্ধু রচিত ও পরিচালিত 'নৃত্যেরই তালে তালে' এল রাধা, পূর্ণ, প্রাচীতে। চিত্র ও শব্দ গ্রহণ বিভূতি চক্রবর্তী ও পরিতোষ বসু। গোপীকৃষ্ণ, রাগিণী, সন্ধ্যা, ছবি, পাহাড়ী, অসিত, সুকুমারী, ভারতী, পদ্মা, রাজলক্ষ্মী অভিনয় করেছেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনায় উত্তরা, পূরবী, উজ্জলায় এল রীতেন য্যাণ্ড কোম্পানীর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে অগ্রগামীর পরিচালনায় রচিত 'হেডমাষ্টার'। সুধীন দাশগুপ্তর সঙ্গীত। চিত্র ও শব্দ রামানন্দ সেনগুপ্ত ও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ছবি, করুণা, শ্যামল, রঞ্জনা, শোভা সেন, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি অভিনয় করেন। ৩রা অক্টোবার শ্রীমতী পিকচার্সের ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি মুক্তি পেল বিলিমোরিয়া য্যাণ্ড লালজীর পরিবেশনায় মিনার, বিজলী, ছবিঘরে, শরৎচন্দ্রের কাহিনী। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা হরিদাস ভট্টাচার্য্য, পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুর, চিত্র ও শব্দ জি কে মেহতা ও দেবেশ ঘোষ। বিকাশ, কানন সজল, পার্থপ্রতিম, মলিনা, গুরুদাস, প্রভৃতি অভিনয় করেছেন, ৮ই অক্টোবর গিরিজাশঙ্কর দত্ত প্রযোজিত 'সোনার হরিণ' এল এস কে ফিল্মসের পরিবেশনায় শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা মঙ্গল চক্রবর্তী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দ অজয় মিত্র ও অতুল চট্টোপাধ্যায়, উত্তম, কালী, সুপ্রিয়া, নমিতা, ভানু, তরুণ, বিপিন প্রভৃতি শিল্পী। তরুণকুমার প্রযোজিত গৌতম পিকচার্সের 'অবাক পৃথিবী' মুক্তি পেল ৬ই নভেম্বরে রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে চিত্র পরিবেশকের পরিবেশনায়। কাহিনী ও চিত্রনাট্য বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, পরিচালনা বিশু চক্রবর্তী, শব্দ দেবেশ ঘোষ। উত্তম, সাবিত্রী, তরুণ, শ্রীমান টুকাই, গঙ্গাপদ, তুলসী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। এই সপ্তাহে রাধা, পূরবী, পূর্ণতে এল সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের 'রাতের অন্ধকারে'। অগ্রণীর পরিচালনা, সঙ্গীত ভি বালসারা, চিত্র ও শব্দ নির্মল গুপ্ত ও জে ডি ইরাণী। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স পরিবেশক। ছবি, সাবিত্রী, অনিল, দীপক, চন্দ্রাবতী, রাজলক্ষ্মী, বীরেন প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ২০এ নভেম্বরে চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার 'শুভ বিবাহ' মুক্তি পায় ডিল্যুক্সের পরিবেশনায় উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা চিত্রগৃহে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র। চিত্র ও শব্দ দেওজীভাই ও শ্যামসুন্দর ঘোষ, ভি বালসারার সঙ্গীত। ছবি, পাহাড়ী, তৃপ্তি, সুপ্রিয়া, করুণা, ছায়া, গঙ্গাপদ, কমলা, শম্ভু মিত্র প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ২৭এ নভেম্বর মিরাকলস্ ইণ্ডিয়ার 'মৃতের মর্ত্যে আগমন' শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায় মুক্তি পায় শ্রীকৃষ্ণ ফিল্মসের পরিবেশনায়। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ গৌর সী। মন্মথ দাসের সঙ্গীত, চিত্র ও শব্দ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জে ডি ইরাণী। বাসবী, ভানু, তুলসী, জহর, হরিধন, অমর, তপতী, জয়শ্রী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। এই সপ্তাহে যুব চিত্রের 'পার্সোনাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট' মুক্তি পায় দর্পণা, প্রিয়া, লোটাসে প্রভা পিকচার্সের পরিবেশনায়। হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা চিত্রকর, সঙ্গীত নচিকেতা

ঘোষ, চিত্র ও শব্দগ্রহণ রামানন্দ সেনগুপ্ত ও দুর্গাদাস মিত্র। ভানু, রুমা, তরুণ, তুলসী, অমর, মিতা, নৃপতি, পাহাড়ী প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তি পেল এস বি ফিল্মসের 'ক্ষণিকের অতিথি'। নির্মল সেনগুপ্তের কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তপন সিংহ, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিত্র ও শব্দ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতুল চট্টোপাধ্যায়। রুমা, মাঃ তরুণ, নির্মল, ছবি, রাধামোহন, নৃপতি, অনিল প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ছায়ালোকের পরিবেশনায় মিনার, বিজলী, ছবিঘরে মুক্তিলাভ করে। ১লা জানুয়ারী এম কে জি প্রোডাকসনের 'মায়ামৃগ' মুক্তিলাভ করে কালিকার পরিবেশনায় রাধা, পূর্ণ, প্রাচী চিত্রগৃহে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত, পরিচালনা চিত্ত বসু। উত্তম, বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যারাণী, সুনন্দা, ছবি, বিকাশ, সন্ধ্যা রায়, তরুণ অভিনয় করেন, রাধা, প্রাচী, পূর্ণতে প্রদর্শিত হয়। এই সপ্তাহের অপর চিত্র হীরেন বসু প্রযোজিত নারদের সংসার পরিচালনা পঞ্চভূত, সঙ্গীত দুর্গা সেন, ছবি, নীতিশ, কালী সরকার জহর রায়, রঞ্জিত, নবদ্বীপ, নৃপতি অভিনয় করেন, শ্রীবিষ্ণুর পরিবেশনায় শ্রী, ইন্দিরা, সুরশ্রীতে মুক্তিলাভ করে। ৮ই জানুয়ারী ছায়াচিত্র পরিষদের 'রাজা সাজা' এল ছায়াবাণীর পরিবেশনায় রূপবাণী, অরুণা ও ভারতী চিত্রগৃহে, চিত্র নাট্য ও পরিচালনা বিকাশ রায়। উত্তম, সাবিত্রী, ছবি, বিকাশ, জীবেন, তরুণ, গঙ্গাপদ, চন্দ্রাবতী, মিহির অভিনয় করেছেন। ১২ই জানুয়ারী জে এম পিকচার্সের 'উত্তরমেঘ' মুক্তি পেল শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরায় ন্যাশনাল মুভিজের পরিবেশনায়, রাজকুমার মৈত্রের কাহিনী, পরিচালনা জীবন গাঙ্গুলী, সঙ্গীত রবীন চট্টোঃ। কমল মিত্র, মলিনা, শোভা, বীরেন, লীলা, জ্ঞানেশ বিধায়ক প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ১১ই জানুয়ারী এল সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্সের 'দেবী', অজন্তা পিকচার্সের পরিবেশনায় মিনার, বিজলী, ছবিঘর, প্রভাতকুমার মুখোর কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়, সঙ্গীত আলি আকবর খাঁ। চিত্র ও শব্দ সুব্রত মিত্র ও দুর্গা মিত্র, ছবি, করুণা, সৌমিত্র শর্মিলা, কালী সরকার, অনিল, পূর্ণেন্দু, মহম্মদ ইসরাইল অভিনয় করেছেন। ২৩এ জানুয়ারী নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনায় এম পি প্রোডাকসন্সের 'কুহক' এল উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা চিত্র গৃহে, সমরেশ বসুর কাহিনী, পরিচালনা অগ্রদূত, সঙ্গীত হেমন্ত মুখোঃ। উত্তম, সাবিত্রী, তরুণ, গঙ্গাপদ, তুলসী, প্রেমাংশু প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। ২৬এ জানুয়ারী এল চিত্রেশ্বরীর 'ভয়', বীণা, বসুশ্রীতে চিত্রটি মুক্তিলাভ করে, ছবি, অসিত, বীরেশ্বর সেন, শিশির মিত্র, মিহির, শিপ্রা, সবিতা, প্রভৃতি অভিনয় করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মুক্তি পেল, মালা প্রোডাকসন্সের 'দুই বেচারা' দিলীপ বসু পরিচালিত ও ভূপেন হাজারিকা সুরারোপিত এই চিত্রে অভিনয় করেছেন কালী, অনুপ, বাসবী, সন্ধ্যা, তুলসী, অনিল, জহর, কমল মিত্র প্রভৃতি, বিশ্বভারতীর পরিবেশনায় উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলায় মুক্তি লাভ করে।

১৩৬৬ সালে মোট উনচল্লিশটি ছবি আত্মপ্রকাশ করল। তারকাচিহ্নের সাহায্যে আমরা ছবিগুলির শ্রেণী নির্ণয়ের চেষ্টা করছি।

সাগরসঙ্গমে * *	গলি থেকে রাজপথ * *
স্বপনপুরী * * *	বাড়ী থেকে পালিয়ে *
অপুর সংসার *	কিছুক্ষণ * *
দ্বীপ জেলে যাই *	ছবি * * *
দেড়শ' খোকার কাণ্ড *	এ জহর সে জহর নয় * *
বিভ্রান্ত * * *	আম্রপালী * *
জলজঙ্গল * *	নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে * *
শশীবাবুর সংসার *	খেলাঘর * * *
অভিশাপ * * *	অগ্নিসম্ভবা * *
মাহুত বন্ধুরে * * *	নৃত্যেরই তালে তালে * * *
পুষ্পধনু *	হেডমাষ্টার * *
ভ্রান্তি * * *	ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদি *
সোনার হরিণ * * *	ক্ষণিকের অতিথি * *
অবাক পৃথিবী * *	মায়ামৃগ * *
রাতের অন্ধকারে * * *	দেবর্ষি নারদের সংসার * * *
শুভবিবাহ *	রাজাসাজা * * *
মৃতের মর্তে আগমন * * *	উত্তরমেঘ * *
পার্সোনাল অ্যাসিষ্ট্যান্ট * *	কুহক * * দেবী *
ভয় * * *	দুই বেচারা * *

১৩৬৬ সালে বাঙলার অভিনয়-জগতে ইন্দ্রপতন হ'ল। যাঁর অনবদ্য প্রতিভার প্রদীপ্ত আলোয় বাঙলার রঙ্গালয়ে নবযুগের উদ্বোধন ঘটল, সমস্ত হতাশার অন্ধকার ভেদ করে আশার আলো দেখা দিল, বাঙলার নাট্যজগতের গৌরবময় ইতিহাসের নবরূপায়ণ ঘটল—জনবন্দিত নটগুরু শিশিরকুমার এই বছরই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন সংস্কৃতির জগতকে বহুল পরিমাণে নিঃস্ব করে দিয়ে। শিশিরকুমারের অভাব সকল দিক দিয়েই অপূরণীয়।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববন্দিত প্রতিভার পুণ্য পরশদীপ্ত অসামান্য মর্যাদাসম্পন্ন ছোট গল্পগুলির মধ্যে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন একটি হৃদয়ধর্মী গল্প। এবং মূলতঃ বাৎসল্যরসাশ্রিত। বাৎসল্যরসের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিরাট রহস্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বর্তমানে এর চিত্ররূপ প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ছবিখানি অগ্রদূতগোষ্ঠী পরিচালনা করেছেন। কয়েকপাতার গল্পকে রূপালী পর্দায় ফোটাতে গেলে তার আয়তনবৃদ্ধি স্বভাবতঃই দরকার, এবং এঁরাও সেইজন্যে কাহিনীর আয়তন বাড়িয়েছেন অর্থাৎ রাইচরণের পরিবারবর্গকে দেখিয়েছেন কিন্তু এইখানেই ভাববার বিষয়, রাইচরণের পরিবারবর্গকে ইচ্ছে করলে হয় তো রবীন্দ্রনাথও দেখাতে পারতেন কিন্তু সে পথ তিনি ত্যাগ করেছেন। কেন না যে ভাবে তিনি গল্পটিকে গেঁথেছেন সে ক্ষেত্রে ঐ ভাবে কলেবর বৃদ্ধি তার সুরহানি ঘটাবে। গল্পের রসবিচার করলে এবং মূল সুরকে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীকে খোকাবাবুর পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, অন্যপথ অবলম্বন করে তার গভীরতা নষ্ট করেন নি। ছায়াছবিতে সেই দিক দিয়ে বিচার করলে গল্পের রসহানি ঘটেছে এ কথা বলতেই

হয়। অন্যান্য দিক দিয়েও চিত্রনাট্যকে ত্রুটিযুক্ত বলা চলে না। গল্পটি সে-যুগের। তখনকার পল্লীগ্রাম···সেই গ্রামের একটি অশিক্ষিতা কিশোরী বধূ, তার চালচলন, হাবভাব যে ভাবে হওয়া উচিত সুচরিতা সান্যালের অভিনয়ে সেই ভাবগুলি যথাযথ ভাবে ফুটে উঠতে পেরেছে কি? তাঁর অভিনয়ে অনেকখানি শহুরে মার্জিত ভাব পাওয়া যায়, অশিক্ষিতা পল্লীবধূর রূপটি তাঁর অভিনয়ের মধ্যে অদৃশ্য! উত্তমকুমারের ক্ষেত্রেই এই কথাই বলব। কোন কোন অংশে তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয় যেন রাইচরণের রূপসজ্জার অন্তরাল থেকে টালিগঞ্জের চিত্রজগতের একচ্ছত্র উত্তমকুমারই বুঝি কথা বলে চলেছেন, মনে হয় রাইচরণ যেন এখানে শিখণ্ডী আর উত্তমকুমার যেন অর্জুন।

এঁরা ছাড়া এ ছবিতে অসিতবরণ শিশির বটব্যাল, শোভা সেন, দীপ্তি রায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গ অভিনয় করেছেন।

হাত বাড়ালেই বন্ধু

হাসির ছবিও যে কত পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও ভদ্র ধরণের হতে পারে হাত বাড়ালেই বন্ধু তার নিদর্শন। অশ্লীলতা প্রমুখ বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ বর্জন করে এই হাসির ছবিটিকে রূপ দেওয়া হয়েছে। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসির ছবি অর্থে দেখা যায় অশ্লীলতা ও ন্যাকামির সমন্বয় কিন্তু তারই মধ্যে যে ক'টি ব্যতিক্রম চোখে পড়ে হাত বাড়ালেই বন্ধু তার অন্যতম। এক শিল্পী এই ছবির নায়ক, কর্মোপলক্ষে মায়ের আদেশে কলকাতায় আসে, কিন্তু তার ইচ্ছে শিল্পচর্চায় দিন কাটানো, কেমন করে নানা ঘটনার প্রবাহে সে জীবনে সাফল্য লাভ করল সেই কাহিনীই এখানে পরিবেশিত হয়েছে। এরই মধ্যে যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গেই প্রতাপ (শিল্পী) ও নীলিমার প্রেম গড়ে উঠছে ও পরিণয়ে সেই প্রেম সফলতা লাভ করছে এই প্রেমোপাখ্যান দর্শকের সামনে অনেকখানি গাম্ভীর্য সহকারেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। কাহিনীর মধ্যেই ত্রিলোচন ও তার ভাগনেকে কেন্দ্র করে বেশ একটি হাস্যসমৃদ্ধ অধ্যায় গড়ে উঠেছে, তবে সব কিছুর মধ্যে অনুভূতি সম্পন্ন দর্শকের যে অংশটি ভালো লাগবে সেটি হচ্ছে শিল্পীর সাধনার প্রথম দিকের ক্রমাগত ব্যর্থতা। জীবনে কি নিদারুণ ব্যর্থতাকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয় তারই একটি প্রতিচ্ছবি। প্রতিভাকে নিয়ে জুয়াখেলারই একটি নিখুঁত আলেখ্য, 'হাস্যরসের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে কাহিনী গড়ে ওঠে যথেষ্ট গভীর পটভূমিকে ভিত্তি করে।

ছবির কাহিনী রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুকুমার দাশগুপ্ত। ছবিতে অনবদ্য অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস ও তরুণকুমার। পাহাড়ী সান্যাল এবং উত্তমকুমার আশানুরূপ অভিনয় নৈপুণ্যই প্রদর্শন করেছেন বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ধীরাজ দাস, বেচু সিংহ, খগেন পাঠক, পদ্মা দেবী, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণা ঘোষ প্রভৃতি অন্যান্য চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছেন।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরীর "নতুন ফসল" কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র, সুরযোজনা করছেন স্বনামধন্য সুরকার রাইচাঁদ বড়াল বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অমর মল্লিক, নির্মল চৌধুরী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বাণী হাজরা প্রভৃতি।···পরিচালক অসীম পালের পরিচালনায় যে ছবিটি চিত্রায়িত হচ্ছে তার নাম "মিঃ ও মিসেস চৌধুরী।" রথীন ঘোষ সুরযোজনা করছেন। বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন নবগোপাল লাহিড়ী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় অজিত চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা পাল, শুক্লা দাস ইত্যাদি। "রতনলাল বাঙালী" নামে একটি ছায়াছবি আত্মপ্রকাশ করবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবির মাধ্যমে আশীষকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, ধীরাজ দাস, অনু দত্ত, চন্দ্রা দেবী সন্ধ্যা রায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী প্রভৃতির অভিনয় আপনারা দেখতে পাবেন।··· "রাগ ও অনুরাগ" নামে যে ছবিটি বটু দালালের পরিচালনায় রূপ নিচ্ছে তাতে অভিনয় করছেন বলে যাঁদের নাম শোনা যাচ্ছে তাঁদের মধ্যে নির্মলকুমার, সমীরকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ছবির সঙ্গীতাংশ গৃহীত হচ্ছে কালীপদ সেনের পরিচালনায়।···"মনে মনে" ছবিটি গৃহীত হচ্ছে উমাপ্রসাদ মৈত্রের পরিচালনায়। রূপায়ণে আছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চক্রবর্তী, অলোক চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, তুলসী চক্র, পশুপতি কুণ্ডু, সন্ধ্যা রায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজাতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবর্গ।

একটি সনেট

অনুরাধা মুখোপাধ্যায়

রাতের কবিতা শেষ করে দাও কবি
সবুজ পাতার বুকে হলুদের রেণু
ঝরে যাক ঝড়ে। তুহিন কান্নার হিম গলে
হোক মুক্তার তনিমা। তুমি আঁকো ছবি।

কামনার প্রতিবিম্ব প্রত্যয় গভীরে
দোলা দেয়। কুটিল রাত্রি ঘামে উদগ্র
কাম-মায়াজালে। বন্য লালসার ক্ষুধা
থির থির জলে ওঠে নয়নের তীরে।

শবর আত্মার ছায়া ছবি হয়ে বাসা
বাঁধে শরীরী-সত্তার। নেশার চাতক
দৃষ্টি ছায়ার জন্ম দেয় লুব্ধ মায়ায়
: মায়াবী সত্তার ভীড়ে নীরব হতাশা।

রাতের কবিতা শেষ করে দাও কবি
প্রাবিদ্ধ সভ্যতা নামে রাতের আঁধারে
মায়ার কুহরে জমে স্মৃতির গুঞ্জনি
অতনু ভিত্তিকা নিয়ে তুমি আঁকো ছবি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

"বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীদেশমুখ সম্প্রতি সরকারী নীতির সমালোচনা করিতে আরম্ভ করায় কংগ্রেসী মহল খুবই চটিয়াছিলেন, পার্লামেণ্টে কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত দেশমুখ দুর্নীতি তদন্তের জন্য স্থায়ী ট্রাইবুনাল গঠনের জন্য হৈ চৈ করিতেছেন কি করিয়া? সরকারী মহল এ ব্যাপারে অনেক অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত দেশমুখের মুখ বন্ধ করিবার কোন উপায় নাই। তিনি সরকারী চাকুরিয়া নন, সুতরাং সার্ভিস কণ্ডাক্ট রুলের বেড়াজালে তাঁহাকে বাঁধিবার কোন উপায় নাই। পেন্সনভোগকারী হিসাবেও তাঁহাকে শায়েস্তা করিবার উপায় নাই—কারণ পেন্সন-ভোগকারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না—এরূপ কোন আইনও নাই। সুতরাং কিল খাইয়া কিল চুরি করা ছাড়া আর উপায় কি?"

—দৈনিক বসুমতী।

মৎস্যপ্রীতি

"মৎস্যপ্রিয় বাঙালীর নিকট মাছের যোগান বৃদ্ধির যে কোন সংবাদ আনন্দদায়ক। প্রকাশ যে, সাইপ্রাস দ্বীপে সার্পিনাস কার্পিও নামক রোহিত, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি শ্রেণীর এক প্রকার মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উহা ওজনে সাত হইতে সাড়ে সাত সেরের বেশী হয় না বটে, কিন্তু উহার একটা বিশেষত্ব এই যে, উহা স্রোতের জল ও বদ্ধ জলাশয়ে—উভয় স্থানেই ডিম ছাড়ে এবং উহা হইতে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অথচ এদেশের রোহিত, কাতলা, মৃগেল ইত্যাদি মাছ নদীর জল ছাড়া বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না। প্রকাশ যে, এই মাছটি কয়েক বৎসর পূর্বে সাইপ্রাস হইতে চীন দেশে আনীত হয় এবং পরে জার্মানি, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে উহার প্রবর্তন হয়। ভারতে তিন বৎসর পূর্বে উহা আনিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের উড়িষ্যাস্থিত মৎস্য-গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা করা হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীস্থিত মৎস্য-গবেষণাকেন্দ্রেও উহার পরীক্ষা হইয়াছে এবং এই পরীক্ষায় নাকি খুব সুফলও পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় মাছ নাকি এক একবারে লক্ষাধিক ডিম ছাড়ে এবং উহার মধ্যে শতকরা ৬ ভাগ ডিম হইতে পোনা বাহির হয়। কল্যাণীতে পরীক্ষার ফলে নাকি এরূপও জানা গিয়াছে যে, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি অনুসরণ করিলে এই মাছের ডিমের শতকরা ৮০ ভাগ হইতে পোনা পাওয়া যাইতে পারে। সংবাদটি বিশেষ উৎসাহজনক। কারণ পশ্চিমবঙ্গে পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, নদী ইত্যাদিতে যদি এই মাছের চাষ হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের মাছের অভাব বহুলাংশে দূরীভূত হইতে পারে। তবে এই বিষয়ে যতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত বিলিব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্যন্ত কোন আশা ভরসা করিবার হেতু নাই। কিছুদিন পূর্বে এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আফ্রিকায় টিলাপিয়া নামক কই মাছ জাতীয় এক প্রকার মাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ভারতে যাহার চাষ হইতে পারে। এই শ্রেণীর মাছের এক একটি নাকি ওজনে এক হইতে দেড় সের হইয়া থাকে এবং কোন জলাশয়ে দুই একটি মাছ ছাড়িলে স্বল্প সময়ের মধ্যে উহা হইতে নাকি সহস্র সহস্র মাছ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে পরবর্তীকাল আর কোন উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই। আলোচ্য রোহিত জাতীয় মাছের সংবাদটিরও এই ধরণের পরিণতি হওয়া বিচিত্র নয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ইহাও সত্য

"কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ উৎসব উপলক্ষে গত রবিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ডাঃ শ্রীত্রিগুণা সেন বলিয়াছেন যে, এই বিদ্যালয়টির পরিচালনভার রাজ্য সরকারের গ্রহণ করা উচিত। বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটির চেয়ারম্যান কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস পি মিত্র বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়টির পরিচালনে মাসিক প্রায় চার হাজার টাকা হিসাবে ঘাটতি পড়িতেছে। রাজ্য সরকারের নিকট ইহার পরিচালনভার গ্রহণের জন্য আবেদনও করা হইয়াছে, তাঁহারা নাকি বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতেছেন। তাঁহার মতে সহরের উত্তরাংশে এই ধরণের আরও একটি বিদ্যালয় খোলা উচিত। মূক-বধির ও অন্ধদের জন্য কলিকাতায় কয়েকটি বে-সরকারী বিদ্যালয় আছে, কিন্তু এই ধরণের বিদ্যালয়, যাহা সাধারণ বিদ্যালয়ের পরিচালন অপেক্ষা বহু ব্যয়, মনোযোগ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, তাহা বেসরকারী ভাবে পরিচালনের অসুবিধা অনেক। নরেন্দ্রপুরে রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনাধীনে অন্ধদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। 'অন্ধের আলোনিকেতন' নামেও একটি বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তৈরী বিভিন্ন শিল্প দ্রব্যের প্রদর্শনী প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে, সরকারী কর্তৃত্বই হউক কিংবা বে-সরকারী পরিচালনেই হউক, এই সকল বিদ্যালয়ের সামগ্রিকভাবে আর্থিক সমস্যা সমাধান বাঞ্ছনীয়। কথায় বলে 'বোবার শত্রু নাই', 'অন্ধের ন্যায় দুঃখী নাই।' কিন্তু ইহাদের জন্য ভাবিবার লোকও যে খুব বেশী নাই, ইহাও সত্য। অথচ সমাজের লোকের তাহাদের সম্পর্কে বিশেষ কর্তব্য আছে এবং সে কর্তব্য সরকারী পর্যায়ে সম্পাদিত হওয়াই অধিক ফলপ্রসূ ও কার্যকরী। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, ইহাই আমরা আশা করি।"

—যুগান্তর।

বড় দুঃখে

"দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতা লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনে কমিউনিষ্ট প্রার্থীর বিপুল জয়লাভ সম্পর্কে লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গত মঙ্গলবার কংগ্রেসীদের মুখপত্র 'জনসেবক' লিখিয়াছেন 'যে অবস্থায় ভারতের উপর কমিউনিষ্ট চীনের আক্রমণ ঘটিয়াছে এবং সারা দেশের মধ্যে একমাত্র কমিউনিষ্ট দলই সেই আক্রমণের বিরোধিতা করিতে অস্বীকার করিয়াছে সেই অবস্থায় কমিউনিষ্ট প্রার্থী নির্ব্বাচনে জিতিয়াছে ইহা যদি নিতান্ত বিজাতির ফলে না

জটিয়া থাকে তাহা হইলে বলা চলে কমিউনিষ্ট প্রার্থীকে নির্বাচনে জিতাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতার ভোটদাতারা প্রকারান্তরে স্বদেশের উপর বিদেশী আক্রমণ সমর্থন করিয়াছেন', অর্থাৎ সহযোগী 'জনসেবক' বড় দুঃখে স্বীকার করিতেছেন কমিউনিষ্টদের 'চীনের দালাল ও দেশের শত্রু' বলিয়া তাঁহারা প্রাণপণে যত চীৎকারই করিয়াছেন সব ব্যর্থ হইয়াছে এবং জনসাধারণ কমিউনিষ্টদের বক্তব্যই বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাদের প্রকৃত দেশভক্ত বলিয়াই মনে করিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, 'জনসেবক' আর শুধু কমিউনিষ্টদের 'দেশের শত্রু' ও 'বিদেশীর দালাল' বলিতেছেন না, দক্ষিণ-পশ্চিম কলিকাতার নির্বাচকমণ্ডলী ও জনসাধারণকে ঐ আখ্যায় ভূষিত করিতেছেন। ইহার জবাব সংশ্লিষ্টরাই দিবেন।"

—স্বাধীনতা।

ঘুষ ও প্রতিকার

"বহরমপুর চীফ মেডিকেল অফিসের বিলক্লার্ককে পাঁচ টাকা ঘুষ গ্রহণের অপরাধে গ্রেপ্তারের সংবাদ এই সংখ্যায় অন্যত্র পরিবেশিত হইয়াছে। সংবাদটি সাধারণ একটি ঘুষ গ্রহণের সংবাদ হইলেও নানা কারণে অধিকতর গুরুত্ব দাবী করিতে পারে। কারণ অনুরূপ ঘুষ গ্রহণ সরকারী কর্মচারীদের একটি প্রচলিত প্রথা। যে কোন সাধারণ মানুষ এ কথা বাস্তব সত্য বলিয়াই জানে যে, সরকারী অফিসে ঘুষ না দিলে কোন কাজই উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। সৎ বিবেকবান কর্মচারী যে নাই, এ কথা বলিতে চাই না কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীরই সুযোগ এবং সুবিধামত উৎকোচ গ্রহণে সংকোচেরও বিন্দুমাত্র কারণ ঘটে না। উৎকোচ গ্রহণের একমাত্র কারণ যে অভাবজাত তাহা নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অভাবের চাপে বিপর্য্যস্ত নিম্ন বেতনের কর্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তাহা না হইলে তাঁহাদের সংসার চলে না। এই শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দশ-বিশ হাজার টাকার মালিক হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল। নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীরা প্রাণের দায়ে ঘুষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ মনে করবেন না যে, আমি কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণের সমর্থন করিতেছি। আমি ঘুষ গ্রহণ করিবার প্রধান একটি কারণ যুক্তিসহ উপস্থিত করিতেছি মাত্র। আমাদের সরকার নিম্ন পর্য্যায়ের কর্মচারীদের যে হারে বেতন দিয়া থাকেন, তাহার দ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায় না। বাঁচিয়া থাকিবার উপায় উদ্ভাবন মানুষেরই স্বভাবজাত। সৎ উপায়ে বাঁচিয়া থাকিতে না পারিলেই মানুষ অসৎ উপায় অবলম্বন করে সরকারী কর্মচারীরাও যখন মানুষ, তখন মানুষের যাহা স্বভাব তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহারা যাইতে পারেন না। সরকারের কর্তব্য, যে প্রতিষ্ঠানের তাহারা মালিক, সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বাঁচিবার মত ন্যূনতম বেতন প্রদান করা।"

—জনমত (বহরমপুর)।

কৃষিভিত্তিক পরিকল্পনা

"ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার কাজ প্রায় সমাপ্ত হইবার পথে। ত্রিপুরারও উন্নয়নমূলক কাজের কোন কোন অংশ তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইবে তাহাও আশা করা যায় মোটামুটি স্থির করা হইয়াছে। গত দুইটি পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি তৃতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরিহার করা হইবে ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে থাকায় ত্রিপুরা তাহার আয় অপেক্ষা বহুগুণে বেশী অর্থ প্রতি বৎসর ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে ত্রিপুরার বাজেটে কেবল খরচের প্রতিই নজর রাখা হইতেছে, যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তাহার বেশীর ভাগ অংশই কেন্দ্রীয় সরকারের দান খয়রাতির তহবিল হইতেই আসিতেছে। দুই দুইটি পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে কিন্তু ত্রিপুরার আয়ের দিকটা সেই পূর্ব্বের জায়গাতেই স্থির হইয়া রহিয়াছে বরং কোন ক্ষেত্রে মাপ নির্দ্দেশক পারা নিম্নাভিমুখী। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, আজও ত্রিপুরা সর্ব্ব ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী। লক্ষ লক্ষ লোকের আগমন হইয়াছে কিন্তু চাষোপযোগী জমির উন্নতি সাধন হয় নাই। লোক সংখ্যানুপাতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। প্রতি বৎসর হাজার হাজার টন খাদ্য বাহির হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। এমনি অবস্থায় আর কতকাল ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামো কেন্দ্রীয় সরকারের অজস্র অর্থব্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া থাকিবে? একটা অস্বাভাবিক কৃত্রিম উপায়ে আর কতকাল একটা অঞ্চলকে কাঁপাইয়া রাখা হইবে?"

—গণরাজ (আগরতলা)

হাসপাতাল প্রসঙ্গে

"বিজ্ঞানের কল্যাণে এই বিংশ শতাব্দীতে মানুষের জীবনের বিভিন্ন শাখায় যে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে চিকিৎসা ও আর্ত্তত্রাণ তাহারই অন্যতম। পূর্ব্বে রোগ মহামারীর এত শ্রেণীভেদ ও বৈচিত্র্যও ছিল না আর ছিল না প্রকৃতিকে পরাজিত করিবার এই অদম্য স্পৃহা, যাহার ফলে মানুষ আজ প্রায় জীবন-মরণের রহস্যের গ্রন্থিমোচনের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইয়াছে। জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে নাগরিকের স্বাস্থ্য বিধান ও রোগশয্যায় শুশ্রূষার ব্যবস্থা যথাসম্ভব সরকার করিয়া থাকেন। এই পশ্চিমবঙ্গেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বিজয়চাঁদ হাসপাতাল যাহা জেলা হাসপাতাল বলিয়া পরিগণিত, তাহার সর্ববিভাগে যে পরিমাণ অপচয় ও স্তূপীকৃত বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে তাহাতে ইহাকে আর হাসাপাতাল পর্য্যায়ভুক্ত করিতে দ্বিধা হয়। আগামী নভেম্বর মাসে ইহার প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পূর্ণ হইবে। বিগত ৫০ বৎসরের ইতিহাসে ইহার বিশেষ উন্নতি তো হয়ই নাই পরন্তু দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার ভারাক্রান্ত হইয়া ইহা ক্রমাবনতির পথে ঢলিয়া পড়িতেছে।"

—বর্দ্ধমান।

ভাষার প্রশ্নে কংগ্রেস

"গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় অসমীয়াকে অবিলম্বে আসামের সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করার জন্য রাজ্যসরকারের নিকট সুপারিশ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসে কাছাড়ের প্রতিনিধিগণ একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ভাষার প্রশ্ন লইয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবারই আলোচনা করিয়াছি। এই ব্যাপারে কাছাড়ের জনমত সুস্পষ্ট-

রূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাছাড়বাসীর দৃঢ় মনোভাবের কথা জানিয়াও আসাম উপত্যকার কংগ্রেসনেতৃগণ কাছাড়েও ক্রমে ক্রমে অসমীয়া ভাষা প্রবর্ত্তন করিবার যে সুপারিশ করিয়াছেন ইহার ফলে ইচ্ছা করিয়াই কাছাড়কে একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন আসামের ভাষা সমস্যা লইয়া বিস্তারিত আলোচনাই করিয়াছিলেন। অসমীয়া ভাষা এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা নহে—তৎসত্ত্বেও সংখ্যালঘু এই ভাষাকে অনিচ্ছুক ভিন্ন ভাষাভাষীদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রদেশে সরকারী পর্য্যায়ে যে সমস্ত চালাকী চলিয়াছে তাহা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দৃষ্টি এড়ায় নাই। অতি সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু অসমীয়া ভাষাকে লইয়া বাড়াবাড়ি না করিবার জন্য যে সাবধানবাণী গৌহাটিতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাতে কর্ণপাত করাও অসমীয়া বন্ধুগণ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সংবাদে প্রকাশ, অসমীয়াকে সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করাইবার উদ্দেশ্যে সত্বরই বিধান সভায় 'সরকারী ভাষা বিল' উপস্থিত করা হইবে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের এবং কাছাড়ের প্রতিনিধিগণের সমবেত বাধাদানের পরেও হয়ত বিলটি পাশ্ হইয়া যাইবে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিলে আসামকে একটি বহু ভাষাভাষী রাজ্যেই পরিণত করিতে হইবে। সংখ্যালঘু ভাষাভাষীগণের এই মৌলিক অধিকারকে অসমীয়া বন্ধুগণ প্রতিহত করিতে পারিবেন না। ভাষার প্রশ্ন সম্পর্কে কাছাড়ের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সুপ্রীমকোর্টের নিকট কাছাড়বাসীগণের পক্ষ হইতে আবেদন দাখিল করার জন্য কাছাড়ের জনসাধারণ এখনই প্রস্তুত হইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস রাখি। আসাম উপত্যকার প্রবাসকারী বঙ্গভাষাভাষীগণও এই ব্যাপারে চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। সন্তান-সন্ততিগণের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এই প্রকারে শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী তাঁহাদের যে মৌলিক অধিকার রহিয়াছে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহারাও তৎপর হইবেন—আমরা ইহাও আশা করিতেছি।"

—জনশক্তি (শিলচর)।

সুতীর ব্লক

"পশ্চিম বাংলার একমাত্র সুতী থানাতেই বোধ হয় সরকার দুইটি উন্নয়ন ব্লক স্থাপন মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। এই থানা আটটি ইউনিয়ন লইয়া গঠিত। বর্ষাকালে ইহার বিল অঞ্চলে জল জমিয়া এক বিরাট "পাথার" সৃষ্টি হয় তাহাতে থানার বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থা বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন চারি মাসকাল স্থায়ী হয়। এই সব দিক চিন্তা করিয়াই হয়ত অন্যান্য থানায় একটি ব্লক স্থাপিত হইলেও এই থানায় দুইটি ব্লক স্থাপনের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। ভৌগোলিক কারণে সরকারের এ সিদ্ধান্ত খুবই সঙ্গত ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্লক স্থাপনের ব্যাপারে থানাটিকে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা লইয়াছে। অরঙ্গাবাদ, বাজিতপুর, কাশিমনগর ও মহেশাইল—এই চারিটি ইউনিয়নের জন্য একটি ব্লক এবং নুরপুর, আহিরণ হিলোড়া ও বহুতালি এই চারিটি ইউনিয়নের জন্য আর একটি ব্লক। প্রথমোক্ত চারিটি ইউনিয়নের ব্লক অফিস অরঙ্গাবাদে স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু শেষোক্ত চারিটি ইউনিয়নের ব্লক অফিস কোন ইউনিয়নে স্থাপিত হইবে ইহা নাকি এখনও পাকাপাকি সাব্যস্ত হয় নাই। শুনা যাইতেছে সরকারী ভাবে আহিরণ ইউনিয়নের অজগরপাড়া গ্রামে দ্বিতীয় ব্লক অফিসটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে নাকি প্রান্তবর্ত্তী হিলোড়া ও বহুতালি ইউনিয়নের অধিবাসীরা সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদের বক্তব্য দ্বিতীয় ব্লক অফিসটি হিলোড়া ইউনিয়নে স্থাপিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। ইহাতে হিলোড়া ও বহুতালি এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চল দুইটি অধিকতর উপকৃত হইবে। অপর পক্ষে লোকসংখ্যার বিচারে আহিরণ ও নুরপুর ইউনিয়নের লোকসংখ্যা হিলোড়া ও বহুতালি ইউনিয়নের লোকসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ এবং প্রস্তাবিত অজগরপাড়া গ্রামটি প্রান্তবর্ত্তী নুরপুর ও বহুতালি ইউনিয়নের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এছাড়া হিলোড়া ও বহুতালি ইউনিয়ন দুইটিতে ইতিপূর্ব্বেই দুইটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে অথচ জনবহুল নুরপুর ও আহিরণ ইউনিয়নে আজ পর্যন্ত একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই এদিক দিয়া চিন্তা করিলে ব্লক স্থাপনের ব্যাপারে এই গ্রামের দাবী একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও শুনা যাইতেছে যে বহুতালি হইতে অজগরপাড়া পর্য্যন্ত একটি সড়ক নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং জাতীয় সড়ক হইতে হিলোড়া পর্য্যন্ত অপর আর একটি সড়ক নির্ম্মাণেরও দাবী উঠিয়াছে। এই সড়ক দুইটি নির্ম্মিত হইলে এই দিককার ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা অনেকটা দূরীভূত হইবে এবং এই কারণে ব্লকটি যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, পারস্পরিক বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।"

—ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)।

শোক-সংবাদ

বিভূতিভূষণ ভট্ট

প্রবীণ কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ ভট্ট গত ১২ই চৈত্র ৭১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাঙলার বরণীয়া সাহিত্যিকা স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী এঁর অনুজা। বাল্যকাল থেকেই ইনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘদিনের সাহিত্যসাধনায় বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্টির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় ভাগলপুরে এবং সেখানে শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সাহচর্য ও সান্নিধ্যে এঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বসুমতীর আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র কর মহাশয় আমার লিখিত এবং ভাদ্র মাসের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'বঙ্গরমণীর মৌনবিক্রম' শীর্ষক প্রবন্ধটির সমালোচনা করিয়াছেন। সমালোচনার সূত্রপাত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম, বোধ হয় নূতন কোন তত্ত্ব এবং তথ্য অবগত হইব। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। উপরন্তু জানিলাম, প্রবোধ বাবু নিজের অজ্ঞতা ত প্রকাশ করিয়াছেনই, অকারণ বিদ্রূপ করিতে যাইয়া নিজেকে ছোট করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বেণ্টিঙ্কের মূর্ত্তি কবে অপসারিত হইয়াছিল। কিম্বা খবরের কাগজে কবে অনেক আলোচনা হইয়াছিল, তাহা জানি না। আমি অন্ততঃ ৩৫ বৎসর যাবৎ High Courtএর main gateএ High Courtএর দিকে মুখ করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিটি দেখিয়া আসিতেছি; High Courtএর main gate দিয়া যে High Courtএ প্রবেশ করে সে ঐ প্রতিমূর্ত্তিটি দেখিতে পায়। Sensation ও Interestএর জন্ম ঐরূপ ভুল সংবাদ দিলে কখন কখন কাজ হয়, কিন্তু সর্ব্বদা কাজ হয় না; বরং হাস্যাস্পদ হইতে হয়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের মূর্ত্তিটি যে অপসারিত হইয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আমি মফঃস্বলের অধিবাসী। এখানকার পাঠাগারে এক মাসের বেশী কোন সংবাদপত্র রাখিবার প্রথা নাই, এ জন্ম সঠিক তারিখ দিতে পারিলাম না। তবে যতদূর মনে আছে দৈনিক বসুমতী, যুগান্তর এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় বেণ্টিঙ্কের মূর্ত্তি অপসারণ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল ইংরাজ শাসক বা সেনাপতিগণের মূর্ত্তি প্রকাশ্য স্থান হইতে অপসারণ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য কিন্তু উহা নির্ব্বিচারে অপসারণ করা সঙ্গত নহে। বেণ্টিঙ্ক, রিপণ প্রভৃতি ভারতহিতৈষী শাসকগণের মূর্ত্তি সম্বন্ধে ভিন্নতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অনুরোধই উক্ত সংবাদপত্র সমূহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, দৈনিক পত্রিকাগুলি না থাকায় অপহরণের সঠিক তারিখ আমি দিতে পারিতেছি না। তবে সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকার ১৩ই ভাদ্র (১৩৬৬) সংখ্যার ৩২৩ পৃষ্ঠার প্রতি প্রবোধবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহাতে বেণ্টিঙ্কের অপসারিত মূর্ত্তির প্রতিলিপি বা ফটো দেওয়া আছে এবং ফটোর নীচে লিখিত আছে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের অপসারিত মূর্ত্তি। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সংলগ্ন উদ্যান হইতে ৭ হাজার টাকা ব্যয়ে সম্প্রতি মূর্ত্তিটিকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। যতদূর মনে আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এই মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে। আমি মফঃস্বলের লোক। কাহাকেও High Court দেখানর সৌভাগ্য আমার হয় নাই। প্রবোধবাবু যখন অন্ততঃ ৩৫ বৎসর যাবৎ High Court দেখিয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার জানা উচিত ছিল High Courtএর main gateএ Higt Court এর দিকে মুখ করিয়া যে প্রতিমূর্ত্তিটি আছে তাহা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের নহে, North brook এর। ভরসা করি ভবিষ্যতে নিজে ভাল করিয়া না দেখিয়া তিনি অন্যকে High Court দেখাইবার চেষ্টা করিবেন না। ইতি—বিনীত শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী, মালদহ।

নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর সঙ্গে পরিচয় ছেলেবেলা থেকেই তবে তার বর্ত্তমান রূপের সঙ্গে তদানীন্তন রূপের তফাৎও অনেকখানি। মাসিক বসুমতী বর্ত্তমানে যত পড়ছি সত্যি বলছি যে চমৎকারিত্ব দেখে ক্রমেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি। মাসিক বসুমতী আপনার সুযোগ্য সম্পাদনায় যেভাবে সর্ব্বাঙ্গীন সমৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার তুলনা মেলা ভার, আপনার এই অতুলনীয় কীর্ত্তি ইতিহাসে অমরত্বলাভ করবে। ভবিষ্যৎ যুগে সাময়িকপত্রের ইতিহাসে মাসিক বসুমতীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে আরও একজনের নাম, যিনি তাকে এতখানি সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছেন। মাসিক বসুমতীর মধ্যে দিয়ে আপনি যে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। এতে আপনার রসপিপাসু মনেরই পরিচয় মেলে। জাতীয় জীবনে মাসিক বসুমতীর প্রভাব আজ অনতিক্রম্য, মাসিক বসুমতীকে শুধু সাময়িক পত্রের পর্য্যায়ে ফেললে তার প্রতি অবিচার করা হয়, মাসিক বসুমতী এমন একটি পত্রিকা যার মধ্যে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায় তার মনের ভাব, ভাষা, চিন্তা ধারণা সব কিছুরই ছায়া দেখতে পায় মাসিক বসুমতীতে। আপনার সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী আজ মানবচরিত্রের দর্পণে পরিণত হতে পেরেছে। নতুন যে লেখাগুলি আরম্ভ করেছেন তার মধ্যে হবিবুল্লার মেশিন ভাল লাগল। লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সমালোচনাদি যথেষ্ট মার্জিত ও রুচিপূর্ণ এবং যথাযথ। ঠাকুরের পবিত্র আশীর্বাদপূত আপনাদের প্রতিষ্ঠান, মাসিক বসুমতী আজ সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা, ঠাকুরের আশীর্বাদে এর গুরুত্ব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক কামনা করি। —কুন্তলা সেন, কাশীধাম (উত্তরপ্রদেশ)

গ্রাহক-গ্রাহিকা হতে চাই

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক ৭.৫০ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক নিয়মিত মাসিক ব· পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী নীহারিকা বসু, গৌহাটি।

এক বৎসরের গ্রাহক মূল্য ১ টাইলাম। আমাকে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। শ্রীরেণুকা রায়, ধানবাদ।

১৩৬৭ সালের মাসিক ব বার্ষিক মূল্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমঞ্জুশ্রী দেবী, অ

আমাদের মাসিক বসুমতী ন '৬৬ হইতে আশ্বিন '৬৭ পর্য্যন্ত ৮ মাসের চাঁদা বাবদ ১ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।—শ্রীরাণী মণ্ডল, মেদিনীপুর।

আমি মাসিক বসুমতী পত্রিকার গ্রাহক হইবার জন্য ১২ টাকা পাঠাইলাম। বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীসুচরিতা ভট্টাচার্য্য, গোঁগাও, আসাম।

আমাকে আপনার মাসিক বসুমতী পত্রিকার গ্রাহিকা করিবার জন্য ১৫ টাকা পাঠাইলাম। মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমৈত্রেয়ী , মজঃফরপুর।

Remitting Rs. 15/- ing my annual subscription of Masik Basumati Please send the magazine regularly.—Sm. Nirupa Das, Assam.

জন্য ৭.৫০ টাকা পাঠাইলা গত কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, পুণা।

Remitting Rs 7·50P. for six months subscription of the Monty Basumati.—Sm. Mira Das (Mitra), Shibsagar Assam.

বৈশাখ মাস হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবার জন্য ১৫ পাঠাইলাম। গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।—শ্রীজ্যোৎস্না ভট্টাচার্য্য, কানপুর।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা টাকা ৭. পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন—শ্রীঅর্পিতা দাশগুপ্তা, রায়পুর (এম, পি,)

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীপারুল চট্টোপাধ্যায়, হাজারিবাগ।

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ১৫ ও গত বৎসরের বাবদ ১ মোট ১৬ টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীরেখা মিত্র, জব্বলপুর।

Sending subscription for the year 1367 B.S. Kindly send Monthly Basumati regularly.—Mrs. Nirupama Majumder, Santoshpur, Cal-32.

Remitting Rs. 15/- in payment of subscription for the year 1367 B.S.—Sm. Malina Mookerjee, Jalpaiguri.

১৩৬৭ সালের মাসিক বসুমতীর জন্য অগ্রিম চাঁদা বাবদ ১৫ পাঠাইলাম।—শ্রীবিভা ভট্টাচার্য্য, নিউদিল্লী।

বৈশাখ হইতে চৈত্র (১৩৬৭) পর্য্যন্ত এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ১৫ পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।—শ্রীঊষারাণী ঘোষ, দার্জ্জিলিং।

Remitting herewith Rs. 7·50 np. being the half-yearly subscription of the Monthly Basumati.—Sm. Radharani Mitter, Calcutta-37.

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ সালের চাঁদা বাবদ ১৫ পাঠাইলাম।—শ্রীঅঞ্জলি বসু রায়, উড়িষ্যা।

১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে আমাকে গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। টাকা ৭.৫০ পাঠাইলাম।—শ্রীশুক্লা সেন, বীরভূম।

১৩৬৭ সালের চাঁদা বাবদ ১৫ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—শ্রীরমা ঘোষ, কটক।

আমার মাসিক বসুমতীর চাঁদা বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত টাকা ৭.৫০ পাঠাইলাম।—শ্রীপার্ব্বতী সেন, কানপুর।

১৩৬৬ সালের মাঘ সংখ্যা হইতে ১৩৬৭ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত চাঁদা বাবদ টাকা ৭.৫০ পাঠাইলাম। অসুস্থ থাকায় জন্য সময়মত চাঁদা পাঠাইতে পারি নাই।—শ্রীসান্ত্বনা দেবী, বর্দ্ধমান।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকার প্রতি বেদন

বাঙলা ও বাঙলীর প্রিয়তমা মাসিক বসুমতীর ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে ৩৯শ বর্ষে পদার্পণে আমাদের দেশের সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক বিস্ময় ও আনা অধ্যায় রচনা হবে। মাসিক বসুমতীর অগণিত পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা সমগ্র বাঙলা তথা ভারতবর্ষ তথা সর্ব্ববিশ্বে ছড়িয়ে আছেন—যাঁদের কারও কারও আত্মপরিচয় অনেকেই লক্ষ্য করেছেন মাসিক বসুমতীর শেষ পৃষ্ঠায়—আমাদের নূতন ও পুরাতন গ্রাহকতালিকায়। হয়তো আপনাদের লক্ষ্যে ধরা পড়েছে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যেও মাসিক বসুমতীর গ্রাহক-গ্রাহিকা আছেন।

বাঙলা দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর মূল্য এবং মূল্যমান পত্রিকার পাঠক-পাঠিকা গ্রাহকগ্রাহিকাই বিচার করেন। মাসিক বসুমতীর আগামী বর্ষের সূচীতে যা যা থাকবে তা আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না আমরা নিশ্চিত বলতে পারি। মাসিক বসুমতীর বর্ষারম্ভ বৈশাখ হইতে। আমাদের অনেক কালের পুরাণো গ্রাহক গ্রাহিকাগণ তাঁদের দেয় চাঁদা পাঠিয়ে বাধিত করুন। চিঠিতে 'গ্রাহক সংখ্যা' উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

নমস্কারান্তে ইতি—

কর্ম্মাধ্যক্ষ

মাসিক বসুমতী

কলিকাতা-১২

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজি: ডাকে .... ২৪৲

ষাণ্মাসিক „ „ .... ১২৲

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজি: ডাকে

(ভারতীয় মুদ্রায়) .... ২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

(ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক .... ১৫৲

„ ষাণ্মাসিক সডাক .... ৭॥০

প্রতি সংখ্যা ১।০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে ১৸০

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ .... ২১৲

ষাণ্মাসিক „ „ „ .... ১০॥০

বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা „ „ ১৸০

॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

দুই কবি

রবীন্দ্র-কাব্যের আলোকে অরবিন্দ-কাব্যের গভীর তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা। মূল্য ৪·৭৫

॥ ডাঃ শচীন সেন ॥

রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়

রবীন্দ্র-কাব্যের মুকুরস্বরূপ। মূল্য ৭·০০

॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ॥

আধুনিক বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। মূল্য ২·৫০

—উপন্যাস—

শৃঙ্খলিতা	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	৩·৫০
রোশনচৌকি	রমাপতি বসু	২·৭৫
বঙ্গবিজেতা	রমেশচন্দ্র দত্ত	২·৫০
ভাঙ্গাগড়া	কুমারেশ ঘোষ	২·৫০
পরাধীন প্রেম	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·০০
চক্রবৎ	বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়	৪·০০
পাঁক	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২·৫০
সন্ধান	বীরেন দাশ	২·০০

—গল্প—

প্রেমের গল্প —বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
(খ্যাতিমান লেখকদের সচিত্র গল্প সংকলন) ৭·৫০

মহাভারতের গল্প —অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল
(গল্পের মাধ্যমে মহাভারতের কাহিনী) ৪·৫০

লাজুকলতা —মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০

মারকে লেঙ্গে —পরিমল গোস্বামী ৪·০০

অনির্বাণ শিখা —পশুপতি ভট্টাচার্য ২·৭৫

—বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা—

থেরেসা —এমিল জোলা ৬·০০
(অবিনাশ ঘোষাল অনূদিত)

গান্ধী ও স্ট্যালিনিজম —লুই ফিশার ৪·০০

কমিউনিজম —হারল্ড ল্যাস্কি ২·৭৫

— শীঘ্রই বেরুবে —

॥ সমারসেট মম ॥

দি মুন অ্যাণ্ড সিক্স পেন্স

(অনিল চট্টোপাধ্যায় অনূদিত)

॥ যামিনীকান্ত সেন ॥

বাংলার রূপরস সাধন।

রীডার্স কর্ণার

৫ শঙ্কর ঘোষ লেন • কলিকাতা ৬